৪শ বর্ষ]　১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত　[১ম খণ্ড

সূচীপত্র

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৪শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৬২]　　(স্থাপিত ১৩২৯)　　[প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "ছোকরাদের ভালবাসি কেন? ওদের ভিতরে কামিনী-কাঞ্চন, বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই, তাই অন্তর অতো শুদ্ধ। আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি। ওদের জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে করেছে, মামলা-মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে, কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে রয়েছে, ওদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন করে থাকি? রামলালার উপর যা যা ভাব হতো—রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম, সঙ্গে সঙ্গে কোলে করে বেড়াতাম, রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদতাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! আমি যে এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্য? না, তবু চাকরী কোরে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি—সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি—কথায় না!"

"ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। ওদের জ্ঞান উপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। ছেলেদের ধর্ম্ম সাধনের অবস্থা এখন কেবল ভাল।—আমি ওদের মেয়েদের কাছে বেশী থাকতে বা আলাপ কর্ত্তে বারণ করে দিই। আমি ওদের বলি,—মেয়ে মানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না, দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ কর্ত্তে হয়—নিজের সাবধানের জন্য, আর লোক-শিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি,—তোমরা ঠাকুর দেখোগে। তাতে যদি না ওঠে, নিজে উঠে পড়ি—আমায় দেখে আবার সবাই শিখবে।"

আরবী ছন্দ

কাজী নজরুল ইসলাম

আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ তেম্‌নি তড়িৎ-চঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চম্‌কে-ওঠা-ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রকমের নয়,—তা একটু বেশ মন দিয়ে দেখ্‌লে বা পড়্‌লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।

আরবী ছন্দ-সূত্রের যেখানে যেখানে × বা + চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।

(১) হজয্।

সূত্র :—

×   ×
"মফ' আয়্‌লুন্ মফা আয়্‌লুন্
×   ×
মফা আয়্‌লুন্ মফা আয়্‌লুন্।"

কটির কিঙ্কিণ্,
চুড়ীর শিঞ্জিন্
বাজায় ঝিণ্ ঝিন্
ঝিনিক্ ঝিণ্ ঝিণ্।
কাঁকণ্-কম্পন্
আকুল কন্‌কন্
নাচায় মোর মন,
অধীর দিন দিন।

(২) রযজ্।

সূত্র :—
"মস্‌তফ্ আলুন্ মস্‌তফ্ আলুন্
মস্‌তফ্ আলুন্ মস্‌তফ্ আলুন্।"

বিলকুল নদীর
মন্ আজ অধীর!
ছল্‌ছল্ দু তীর
চঞ্চল্ অথির।
বর্ষার মাতন
প্রাণ্ উন্মাদন্,
ঝঞ্ঝার কাঁদন
শন্‌শন্ পতির।

(৩) রমল্।

সূত্র :—

×   ×   ×   ×
"ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্
×   ×   ×   ×
ফা এলাতুন ফা এলাতুন।"

খামখা হাসফাস্
দীর্ঘ নিশ্বাস,
নাই যে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।
হাস্‌তে প্রাণ চায়,
অম্‌নি হায় হায়
বাজ্‌লো বেদনায়
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস!

(৪) মোতা কারেব্।

সূত্র :—

×   ×
"ফাউলুন্ ফাউলুন্
×   ×
ফাউলুন ফাউলুন্।"

কলস-জল!
আবার বল্—
ছলাৎ ছল
ছলাৎ ছল!
ঝিনিক্ ঝিণ
ঝিণিক্ ঝিণ
বলুক কিন্
কাঁকণ মল।

(৫) সরীঅ।

সূত্র :—"মস্‌তফ আলুন্ মস্‌তফ আলুন্ মফ্‌উলাতুন্।"

কোকিল বেবাক্
একদম অবাক
এম্‌নি গান গায়!
কণ্ঠের গমক
চম্‌কায় চমক্
বিজ্‌লি ঝঞ্ঝায়।

(৬) খফীফ্।

সূত্র :—"ফা এলাতুন্ মোস্‌তাফ্ আলুন্ ফা এলাতুন্।"

আস্‌লো ফাল্গুন আস্‌মান জমীন হাস্‌লো বিলকুল্।
গাইল বুলবুল শোন্ ওই অলস ওঠ্ যে খিল ফুল।

(৭) মযুতস্।

সূত্র:— "মস্‌তফ্‌ আলুন্—ফাএলাতুন্
মস্‌তফ্‌ আলুন্—ফাএলাতুন্।"

সই তুই উদাস্—কেমনে কই চায়,
প্রাণ, মন উদাস কোন্ সে বেদনায়!
উন্মন্ হিয়ায় ক্লান্ত ক্রন্দন্
কোন্ মোর পিয়ায় বক্ষ-পুট চায়।

(৮) মোজারা-া।

সূত্র:— মফাআয়লুন্—ফাএলাতুন্
মফাআয়লুন্—ফাএলাতুন্।

ডাগর চোখ তোর বিজলী চঞ্চল
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্‌ছল্?
সিন্দুর-লাল গাল পাংশু পাণ্ডুর,
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

(৯) কামেল।

সূত্র:— মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্
মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্।

কুহুতান মদির
করে প্রাণ অধীর,
জাগে ওই অলস
চেয়ে আঁখ্ বধির!
মন্-আগুন দ্বিগুণ
এ যে সেই ফাগুন,
এ যে সেই বাসর
মদন আর রতির!

(১০) ওয়াফের্।

সূত্র:— মোফাআলতুন্ মোফাআলতুন্
মোফাআলতুন্ মোফাআলতুন্।

কানের তার দুল্ দোদুল্ দুল্ দুল্
কোথায় তার ভুল্ কোথায় তার ভুল?
ফুলের লাল্‌চায় গালের লাল ছায়
শরম পায় গাল নধর তুল্‌তুল্।

(১১) মোতদারিক্।

সূত্র:— ফাএলুন্ ফাএলুন্
ফাএলুন্ ফাএলুন্।

তোর অযুত
মন যতই
জিন্‌তে চাই
সই ততই
পাইনে থই
পাইনে থই!
মন শুধায়
কই সে কই?

(১২) তবীল।

সূত্র:— "ফউলুন্ মোফাআয়লুন্
ফউলুন্ মোফাআয়লুন্।"

চোখের জল!
আবার আয় ভাই,
হিয়ার মোর
সোহাগ তোর চাই।
তুহার তুল্
দরদ্ বুঝবার
আপন জন
এমন কেউ নাই।

(১৩) মদীদ।

সূত্র:— "ফাএলাতুন্ ফাএলুন্
ফাএলাতুন্ ফাএলুন্।"

হায় এ কান্নার
নাইক শেষ,
কই মা শান্তির
কোন্ সে দেশ?
কোন্ সে দূর পথ
অন্তে চায়
পান্থ-বাস যা'র
নাই মা ক্লেশ।

(১৪) বসীত্ ।

সূত্র :- "মোস্তাফ আলুন্ ফাএলুন্
মোস্তাফ আলুন্ ফাএলুন্ ।"

কোন্ বন্ এমন
শ্যাম-শোভায়
প্রাণ মন্ জুড়ায়,
চোখ ডুবায় ?
বুলবুল্ ভোমর
বন-বিহগ
চঞ্চল এমন
আর কোথায় ?

(১৫) মন্সরহ্ ।

সূত্র :— "মফ্ঊলাতুন্ মস্তফ্ আলুন
মফ্ঊলাতুন্ মস্তফ্ আলুন্ ।"

বাদ্‌লা-ঝমঝম্
তায় ঘোর নিশীথ,
দেখ্‌ছ মাঘ মাস
হায় হায় কি শীত !
শূন্য ঘর মোর
নাই কেউ দোসর—
ঝুর্‌ছে প্রাণ হায়—
অন্তর তৃষিত !

(১৬) করীব ।

সূত্র :— "মফাআলুন্ মফাআলুন ফাএলাতুন ।"

জীবন-সাধন,
প্রাণের বাঁধন—
হায় সে কান্নাই ।
পেলেম আদর
পেলেম সোহাগ
মনটি পাই নাই ।

(১৭) যদীদ্ ।

সূত্র :— "ফাএলাতুন্ ফাএলাতুন্ মফাআয়লুন্ ।"

রক্ত-লাল্ বুক,
সিক্ত চোখ-মুখ
হাসায় লোক ভাই ।
ছিন্ন-কণ্ঠের
কান্না শুনবার
দরায় কেউ নাই ।

(১৮) মশাকেল্ ।

সূত্র :— "ফাএলাতুন মফাআয়লুন মফাআয়লুন

আজকে শেষ গান,
বিদায় তারপর
বিদায় চাই ভাই ।
বেদনা হইতেই
জনম যার, নাই
শান্তি তার নাই ।

১৩১৮ সালে লেখা

নববর্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে নব বর্ষ, হে শুভ বর্ষ, তোমাকে নমস্কার,
তুমি ফিরে আন এই-ভারতের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
আন ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস,
অবিশ্বাসের বিষাক্ত নিঃশ্বাস
লাগে না ক' যেন,—জীবনের গ্লানি বাড়ে না ক' যেন আর ।

এসো হে ধন্য পুণ্য বর্ষ তোমারে প্রণমি বরি'
নবে পুরাতনে এমন করিয়া রেখ না পৃথক করি ।
ঘুচাইয়া দাও দুর্মতি দুর্গতি
এ বসুমতীরে কর হে কান্তিমতী
অবনত কর অতি দর্পীর ধারাল অহঙ্কার ।

নিষ্কলঙ্ক কর, উজ্জ্বল কর, নিরাময় নিরাপদ,
স্নিগ্ধ শুচি ও সুরভিত কর পঙ্কজ-বনবৎ ।
ফিরে দাও ত্যাগী সেই তপস্বী দল,
শান্ত অন্তরীক্ষ জল-স্থল ।
স্বর্গের সাথে সতত চলুক অমৃতের কারবার ।

সুভো ঠাকুর

সেদিন রবিবার। সকালে খবরের কাগজখানা ওল্টাতে গিয়ে অনেকেই অবাক হ'য়ে গেল! অনেকে, বিশেষ করে ওঁর পরিচিত বন্ধুরা—একবার, দু'বার, এমন কি তিন-তিন বার অবধি পড়িয়ে-ফিরিয়ে খবরটা পড়েও যেন মেনে নিতে নিতান্তই নারাজ! আসলে মনে মনে সবাই তখন খবরটার নির্ভুলত্ব যাচাই সম্পর্কে একান্ত উতলা।

'লাইনো'-র ছাপা খবরের কাগজের নিরেট সিসের নিখুঁত টাইপের সুস্পষ্ট অক্ষরগুলো দেখেও যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, বার বার জিজ্ঞাসা জাগে মনে, সত্যি খবর—না একটা ব্লাফ? হ'তেও তো পারে একটু পাবলিসিটি স্টান্ট মাত্র।

দিনেশ কিন্তু খবরটা দেখে, অকৃত্রিমতার সঙ্গেই উচ্ছ্বাস করল—"যাক, সত্যিই একটা সুখবর। চেনাশোনার মধ্যে এতো দিনে [illegible] গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, একটা লোক অন্ততঃ সুযোগ পেল শেষ অবধি।"

অনুরাগদের মধ্যে অধিকাংশই তখন আঁৎকে উঠেছে। বললে—"হ্যাঁ, দশ-পাঁচশ নয়, এ যে একেবারে হাজার হাজার টাকা। এই বাজারে অতগুলো সরকারি টাকা টাঁকে গোঁজা—লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ কাঁসানোর চেয়ে বেশি বই! একেই বলে বরাত!"

মওকা বুঝে কোপ মারলেন এবার সত্য বাবু—"এই সেদিনও যে সকালে বাজারের টাকা ধার নিয়ে গেছে মশায়, আজ সেই কি না কপালের জোরে কম-পক্ষে অঙ্ক লক্ষ টাকার অধিকারী! যাই হোক, মিন্-মিন্ করে থাকে, কিন্তু যা দেখেছি, তাতে মনে হয় ডুবে-ডুবে জল খায়।"

সঞ্জয় বাবু বললেন—"দেখ নি হে, আজকাল আবার দাড়িও রেখেছে যে?"

উত্তরে সত্য বাবু বললেন—"হ্যাঁ, ও-রকম দাড়ি তো দর্জি-পাড়ার অলিতে-গলিতে।"

এঁদের মধ্যে অতি-উদ্যোগী বন্ধুতম যিনি, তিনি এই খবরে আর তিলমাত্র তিষ্ঠোতে পারলেন না, এতই চঞ্চল হ'য়ে পড়লেন যে, উত্তপ্ত চায়ের পেয়ালা পরিত্যাগ করেই, উঠে পড়তে বাধ্য হলেন পাড়ার আড্ডার উদ্দেশে। সেখানে খবরটা না ছাড়তে পারলে স্বস্তি নেই!

কালবিলম্ব না করে, উদ্যোগী বন্ধুতমটি তখন পা বাড়িয়েছেন পথে—আর হঠাৎ-ই এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে হয়ে গেল সাক্ষাৎ! আর যায় কোথায়? উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানিয়ে তাঁকে বললেন—"ও মশায়, খবর শুনেছেন? পকেটের পয়সা খসিয়ে, সুভো ঠাকুরকে কি না গভর্নমেন্ট পাঠাচ্ছে পৃথিবীময় মাতব্বরি করতে।"

ভদ্রলোক এর উত্তরে গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন—"ঐ রেডিওতে যিনি গান-টান করেন তো? মাঝে মাঝে শুনেছি। গলাটা তো খাসা-ই। ভদ্রলোকের আগেই বাইরে যাওয়া উচিত ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের সমঝদার বলতে সব তো ওদেশেই। এই তো সেদিন আমার বন্ধু সম্বন্ধী তাঁর মেয়েকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে ওনার ইস্কুলে।"

বন্ধুতম ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন—"আরে না, না, এ সে [illegible] নয়। এ সুভো ঠাকুর—জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির ছেলে! সুযোগ বুঝে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বংশের শাপভ্রষ্ট দেব-শিশু বলে বাজার গরম করতে একটি ওস্তাদ-বিশেষ! আছে নাকি বাড়ি থেকে বিতাড়িত...হয়েছেন কি না?"

ভদ্রলোকটি এর উত্তরে আমতা আমতা ক'রে জিজ্ঞেস করলেন—"মানে?"

বন্ধুতম অতীব উৎসাহিত হয়ে বললেন—"ঐ যে, কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং ছবিগুলো আঁকে! যা আবার খবরের কাগজেও বেরোতে বাধ্য হয়। যার সোজা আর উল্টো দুই সমান। দেখেন নি মশায় জহরলালের ছবি? মুখের মধ্যে সিঁড়ি, খিলেন, ত্রিভুজ! কিম্বদন্তী, যার মানে বুঝতে গিয়ে স্বয়ং বিধাতা পুরুষ মানস-চক্ষু সর্ষে ফুল, মনন করতে বাধ্য হয়েছিল। আর ও সেই

দেখাবেই তো, ওয়ান্-ম্যান্-শো ছাড়া অন্য কোনো একজিবিশনে ছবি দেয় না। দু একটা উপন্যাস আর কবিতার বই-ও আছে। অধিকন্তু, সেরেফ ছেলে-বখানো বই। বিশ্বাস না হয় দেখুন না এক বার খবরের কাগজখানা।"

ঘরে ঢুকেই সমবেত শায়িত অর্দ্ধশায়িত এবং বসিত আড্ডাধারী ব্যক্তিদের উদ্দেশে হাতের খবরের কাগজখানা সজোরে এক বার আন্দোলিত করে' আস্ফালনের ভঙ্গিতে বললেন—"দেখেছো, কারবারখানা দেখ এক বার?"

এক জন বললে—"কেন, কি হয়েছে?"

আর এক জন বললে—"য্যামেরিকার হাইড্রোজেন বম তো?"

আর এক জন বললে—"রাশিয়ার নাইট্রোজেন বম্ তো?"

উত্তরে আর এক জন বললে—"না হে না, ঐ ডিয়েন বিয়েন ফু, ফুৎকারে উড়িয়েছে এবার ফরাসীদের!"

তার উত্তরে এক জন বলে উঠলো—"ও তো বাসি খবর, কালকের।"

মোড়লি মেরে আর এক জন বললে—"রাখ তোমাদের য্যামেরিকা আর রাশিয়া! বঙ্গদেশের একটি বোমায় হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন সব কুপোকাত!"

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—"বাজিমাত করা সেটা কি বস্তু শুনি এক বার?"

কোণে বসে-থাকা এক জন চেঁচিয়ে উঠলো—"কিন্তু শুনলে দাম দিতে হবে।"

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—"শুনি, শুনি···"

কোণে বসে-থাকা ভদ্রলোকটি এবার মোচে মোচড় মেরে, মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে উত্তর দিল—"সেটার নাম হচ্ছে গাঁজার বম্ অর্থাৎ দম্!"

আর এক দিক থেকে আর এক জন বলে উঠলো—"রাখ, তোমাদের সবতাতেই ঠাট্টা! জিপ্-স্ক্যান্ডেলের খবরটাই বেরিয়েছে হয়তো, দেখি একবার কাগজখানা?"

এতক্ষণ চুপ্ করে' বসে থাকা বঙ্কুত্তম, এবার গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন—"তার চেয়ে আর এক কাটি বেশি! আমাদের সুভো ঠাকুর গভর্ণমেণ্টের গন্দ'নটি ভাল ভাবেই ভেঙেছে এবার। রুটির কেঠাকুর সেজে পাড়ি মারছে পৃথিবীময়।"

সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো, বললে—"টিপ্পনি তো অনেক হয়েছে, এখন টাকা চাই। অর্থাৎ কি না—কবে যাবে, কখন যাবে, কোথায় কোথায় যাবে?"

ইতিমধ্যে বঙ্কুত্তমের হাত থেকে ফস্ করে' কাগজখানা নিয়ে খবরটা প্রসাদ পড়তে শুরু করে দিল চেঁচিয়ে—"ইরাক, ইজিপ্ট, টার্কি, উগোস্লাভিয়া, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মোরোক্কো, আলজিরস, টিউনিসিয়া, ব্রেজিল, আর্জেন্টিন্, চিলি, মেক্সিকো, আর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্···এ যে রামনাথ বিশ্বাসের ভূ-প্রদক্ষিণ! শুধু এই খবরটা মুখস্থ করতে পারলেই তো দেখছি ভূগোলের পরীক্ষা-পাশ! গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া স্পনসর করছে, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টও দিয়েছে দেখছি টাকা। যাক, সরকারের সুমতি হয়েছে তা' হলে এত দিনে। সঙ্গে আছে, আতোয়ার রহমন আর

এক জন বললে—"সঙ্গে লোক ছাড়া ও যে এক পা-ও নড়তে পারে না।"

আর এক জন বললে—"দেখনি, আগে এক জন মহিলা থাকতো ওর সঙ্গে?"

এবার অরুণ বললে—"সুভো ঠাকুরের হাজারো রকমের আর্ট কালেকশানের হাজারো রকম হচ্ছে—তার উপর নিজের ছবি ঐ বিরাট লটবহর পিঠে করে, পৃথিবীময় পিঁপড়ের মত পায় পায় চরে বেড়ানো, কি চাট্টিখানি কথা?"

নরেন বললে—"আমি কিন্তু খু-উ-ব খুশী! আমাদের দলের মধ্যে ও'র একটা হিল্লে হল যা' হ'ক।"

ভূপাল এবার মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে মন্তব্য করল—"যাক আশার কথা যে, দেশের শিল্পী আর শিল্পের ব্যাপারে, আমাদের গভর্ণমেণ্ট সত্যি সত্যিই এবার ইণ্টারেষ্ট নিতে শুরু করেছে। আজ-কাল একটা ফ্যাশান হয়েছে—কারণে-অ-কারণে গভর্ণমেণ্টকে গাল-পাড়া। কিন্তু মনে রেখো—ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট বলেই না আজ বিদেশে ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যের নিদর্শন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হল।"

বঙ্কুত্তমের কাছে অরুণ, নরেন আর ভূপালের এইরূপ উক্তি মোটেই পছন্দসই হ'ল না। তিনি ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সুরেই বললেন—"তোমরা দেখছি সব রি-এক্সানারির মতই কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছ। ওর সঙ্গে তোমাদের শুধু জানা-শোনা—সেখানে ও' আমার বন্ধু। তোমরা কি জান? এমন কি এবারকার চাকরিটাও আমার ওই করে দেওয়া—তা জানতে? কিন্তু তাই বলে সুভো ঠাকুরকে অযথা এতোগুলো টাকা দিয়ে দেবে?···"

অরুণ এবার বাধা দিয়ে বলে উঠলো—"ওকে অযথা এতোগুলো টাকা দিয়ে দিচ্ছে কোথায় দেখলে? ও'কে তো ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন সহ প্রদর্শনী করার জন্যে পাঠাচ্ছে, তাইই খরচ বাবদ মঞ্জুর করেছে ঐ টাকা।"

বঙ্কুত্তম বিদীর্ণ হ'য়ে উঠলেন বিস্ফোরকের ন্যায়। বললেন—"তার মানেই তাই। টাকা বাবদ টাকা দিয়েছে। ঐ মঞ্জুর হওয়া মানেই—পকেটস্থ।"

প্রসাদ বললে—"রাখ তোমার ঐ বাঁধা-বুলির কিচির-মিচির কপচানি। 'রিএক্সানারি' আর 'প্রোগ্রেসিভ' যাই বলো না কেন, আসলে পরশ্রীকাতরতা আর দলাদলির গলায় দড়িতে বাঙলা দেশ আজ আত্মহত্যার পথে। তুমি না করলেও সবাই স্বীকার করবে যে স্বাধীন সরকার হওয়াতেই বিদেশে এই রকম প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'তে চলেছে।"

পাশে বসে-থাকা অরুণ প্রসাদের হাত থেকে এবার খবরের কাগজখানা ছিনিয়ে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে—"সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট তা' হ'লে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে আর ওদিকে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দশ হাজার। অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস বোর্ড আরো সাড়ে সাত···কাজের মত কাজ করেছে তা'হলে এবার।"

এর পর, ও' বঙ্কুত্তমের দিকে ফিরে, বিশেষ করে' ও'কেই উদ্দেশ করে উল্লেখ করল—"দেখ, এত দিন নিত্য এই আড্ডায় বসে

প্রসারের জন্যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট কিছুই করছে না। এবারে যখন গভর্ণমেণ্ট কিছু করছে—তখনো আবার আক্রোশ করছ, কেন, এ সব করছে বলে। আসলে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে সেই, যাকে সরল বাঙলায় বলে—'যারে দেখতে নারি, তার চলন বেঁকা'—কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ!"

বন্ধুত্তম এবার ক্ষেপে উঠে জবাব দিলেন—"চুপ করো, হ্যঁঃ বড্ড জানো বলে' বড়াই তোমাদের। মাড়োয়ারি মহল যে ও'র মুঠোর মধ্যে সেটা কি হুঁস আছে কারো? বিড়লা, জালান, কানরিয়া, বাজরিয়া নাগরমল, আগরমল এমনি সব জগৎজি মোটা মোটা মাড়োয়ারি ও'র কথায় উঠ-বৈঠক মারে, সেটার খবর রাখা হয় কি বন্ধুগণ?"

এর পর, এতক্ষণ ধরে শ্রোতার সিংহাসনে বসে থাকা—আড্ডার মাতব্বর চৌনিবাবা যে মন্মথ, তার ধৈর্য্যকেও ধাক্কা মেরে ধরাশায়ী করেছে। তাই তো অধৈর্য্য হ'য়ে মন্মথ বন্ধুত্তমকে এবার বলতে গেলে এক রকম বাধা দিয়েই বলে উঠলো—"সব তো বুঝলুম, কিন্তু ব্যবসাদারদের অতটা আস্ত-আকাট মনে করো কি করে? ও'রা লোক পেল না আর, সে এক জন আধপাগলা আর্টিষ্টের কথায় উঠবে-বসবে? সুভো ঠাকুর 'পারমিট' দিতে পারে? না ব্যবসায় জোচ্চুরি বুদ্ধি বাতলাতে পারে? মাড়োয়ারিদের অত কচি খোকাটি মনে কোরো না, সে কারুর কথায় অত সহজে কদাপি কাকিয়ে উঠবে। তবে তোমার অমনিতর উক্তিতে আমার একটা মস্ত উপকার হ'য়েছে, আমার দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে—বিদ্যাসাগরের বাণী আজ আবার জাজ্বল্যমান চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠলো! ঠিক করেছি, একটা বিরাট 'নিয়ন' লাইটের সাইনবোর্ড এবার আমি তৈরি করাব; যাতে বড় বড় করে লেখা থাকবে—চরমে-ওঠা বঙ্গদেশের জগৎগুরু বিংশ শতাব্দীর এই পরম উপদেশ—'যদি কারো উপকার করিয়াছ, তবে মরিয়াছ।' ধন্য সুভো ঠাকুর, আর ধন্য বটে তুমি তার বন্ধু!"

সুভো ঠাকুর! সুভো ঠাকুর! কান ঝালাপালা হ'বার জোগাড়। যাই হোক, পরচর্চা তো পরের কথা, এমনি ধারা নিজের চর্চাতেও মন-নিয়োগ করতে সুভো ঠাকুরের নিজেরই তখন নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই। আড্ডার দলাদলিতে দালালি মারার মতলব? সে তো এখন সুদূর-পরাহত। বম্বে রওনা হ'বার দিন ঘনিয়ে এসেছে ঘাড়ের উপর। অথচ ও'র অগোচরে, ও'রই মুর্দাবাদ আর জিন্দাবাদের এই রকম গোড়ের মালা ও'র জিম্মিগীর গলায়। আর ও কি না নির্ব্বিবাদে চলেছে তাই দুলিয়ে—নেহাৎ-ই নাবালকের মত। কি করবে? ও' শুধু একটি মন্ত্র মনে মনে মালা জপছে তখন—'ত্বরা কর। সময় নেই। আর যে সময় নেই।—' হাতে মাত্র আর একটা দিন। বম্বে থেকেই ও'র জাহাজে চড়তে হবে। মালবাহী জাহাজে কারগো-বোটে। সঙ্গে আছে দেড়শ'-দুশো মন ওজনের জিনিষ—এক্জিবিট্স্! যেতে হবে চোদ্দ পনেরটা দেশে—তা প্রায় সাড়ে তিন বছরের প্রোগ্রাম। স্ত্রী আর আড়াই বছরের মেয়ে চিত্রলেখা কি না চিত্রাকে রেখে যাচ্ছে ও কোলকাতায়। চারি ধারে শুধুই খরচ।" খরচের খৈ উড়ছে যেন ও'র চার ধারে। ফেলে-রেখে-যাওয়া সংসারের খরচ। পরবার কাপড়-চোপড় তৈয়ারি করতে হবে, তার খরচ। সেল বাক্সের মত নিতে হ'বে ভারতবর্ষ থেকে নেবার মত আরো কিছু শিল্প-সৌন্দর্যের নমুনা—তারও খরচ। এমনি আরো আরো কত কি খুঁটি-নাটি, এখনো অজস্র জিনিষ বাকি। কিন্তু হাতে যে আপাতত একটি আধলাও নেই! রোজগার তো বন্ধ প্রায় বছর খানেকের বেশি। তবু রোজকার খরচ তো চাই! ট্রাম ভাড়া বাস ভাড়া থেকে বাড়ি ভাড়া আর গোয়ালার মাস কাবারি দুধের দাম। এ-ছাড়া নিত্যকার বাজার খরচ সে তো আছেই, আপাতত যদিও সেটার জোগাড় নিছক নির্ভর করছে, পাশের ফ্ল্যাটের মালিকদের খোশ মেজাজে টেম লাগানোর উপর। নয়তো, তাদেরই চাকরদের কাছ থেকে বকশিসের কবুলতিতে, গোপন-হাওলাতের মৌসুমী হাওয়ায়।

সংসার-খরচের খরচ, হাতে এসে পৌঁছুক আর না পৌঁছুক, ওর কষ্টহীন বুড়ো দেনা শোধ দেওয়া—হোক আর না হোক কোলকাতা আর বম্বের মধ্যে হাইফেনের মতই মূর্ত্তিমান মাত্র আর একটি দিন।...

তাই, সে দিন নিত্য নৈমিত্তিক প্রাতঃস্নানান্তে প্রার্থনার পর, জলযোগ ইত্যাদি সেরে, সুভো ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে ডেকে বললে যে, ও' এবার বেরোচ্ছে। ফিরতে দেরি হবে অনেক। অতএব, ও'র জন্যে না-খেয়ে ভাত আগলে যেন বসে না থাকে। হয়তো ফিরবে রাত্তির হবে। ও'র কাপড়-চোপড় যথাসম্ভব যা কিছু আছে সব যেন আজই গুছিয়ে রাখা হয়। কালকের জন্যে যেন কিছুই ফেলে না রাখে।

ও'র স্ত্রীর চোখ এবার ছল-ছল করে উঠলো। দীর্ঘ তিন বছর সাড়ে তিন বছর থাকবে না দেশে। তার মধ্যে গঙ্গায় কত জোয়ার ভাঁটা আসবে যাবে, কত বান ডাকবে, আবার থিতিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সে বান—কত নৌকো ডুববে আর ভাসবে, কত জাহাজ ফেলবে তাদের নোঙর উত্থান পতন-রহিত উদ্বেলন-হীন শুধু ও'র কি না পড়ে' থাকবে—উপুড় হয়ে, সমস্ত হৃদয় দলিত, নির্জ্জীব নিঃসঙ্গ একাকী! ওর ভাবতেও অন্তরের মত ভারি হ'য়ে ওঠে মন। পদে পদে মত হোঁচট খেতে থাকে ও'র হার্টের পেলপিটেশান! অথচ কেন?—চিত্রা যখন প্রথম দুনিয়ার আলো দেখলো, অর্থাৎ ও'যখন প্রথম মা হবার অভিজ্ঞতা অর্জন করল, সেই জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দোদুল্যমান নিদারুণ দিনগুলোতেও তো সুভো ঠাকুর ও'র সন্নিকট হ'তে অনেক, অনেক সুদূর! এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের কোন দারুচিনি-দ্বীপে হয়তো বা কোন অবকাশ-তিকার, ছায়া-নিবিড় নিশ্চিন্ত নিকুঞ্জে বিশ্রাম-নিমগ্ন। এ দিকে ওর পয়সা নেই কড়ি নেই, আসামের ম্যাসেরিকান মিশান হসপিটালে এই তো জন্ম নিয়েছে চিত্রা। কই, সে-দিনের সেই অসহায় দিনগুলিতেও তো এতো আকুলি-বিকুলি করেনি ও'র মন? কিন্তু আজকে এই কলকাতা ছেড়ে বম্বে চলে যাওয়ার কথাতেই মনটা ওর মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে অমন করে কেন?

যাই হোক, মনের ভাব মনের পেটিকেই পুরে চাবি লাগিয়েছে এখন ভাল করে'। তার পর সজল চোখে সুভো ঠাকুরের মুখের পানে চেয়ে বললে—"তুমি কি তা হ'লে পরশুই যাচ্ছ ঠিক ?···কৈ, তুমি যে এতো টাকাকড়ি পেলে গভরমেণ্টের কাছ থেকে, আমায় কিছ-পত্তরগুলো দিয়ে যাবে তো ? সে বারের মত বাবার ঘাড়ে ফেলে যাবে না আশা করি ? তা ছাড়া বি. এ. পরীক্ষাটা আমি দিয়ে ফেলতে চাই ইতিমধ্যে। বই-টইগুলোও কিনতে হবে।"

সুভো ঠাকুর কথাটা বাড়তে না দিয়েই বলে উঠলো—"হবে হবে, সব হবে।"

ও' কিন্তু নাছোড়বান্দা এবার। তাই অনেক চেষ্টায়, অনেকখানি মনের জোর সংগ্রহের পর, প্রকাশ্যে বলতে পারলে—"আমার চুড়িগুলো যে একজিবিশনের খরচের জন্যে বাঁধা দিয়েছিলে—সেই সে বার, সেগুলো এখন ছাড়িয়ে এনে দিলে, দরকারে অদরকারে কাজে লাগতে পারে। আমার গয়নার শখ নেই। তবে চিন্তা হয়েছে, অসুখে-বিসুখে, আমি কার কাছে হাত পাততে যাব ?"

ওর স্ত্রী কোনোরকমে বি. এ. অবধি পড়া—লিপষ্টিক-বিহীনা স্ত্রী। ছেঁড়া শাড়ীতে লেগে যায় হলুদের ছোপ, আর তাতে তেলের ঠেলায়, চিরুনি ছড়ানো হয়ে চার ধারে···সুভো ঠাকুরের মনে হ'ল, যেন হাজারো বছর আগের হারাপ্পা কিম্বা মহেঞ্জোদাড়োর আমলের সেই মেয়ে, একই! সেই একই রকম ঢং। সেই একই রকম হাবা-গোবা ভাব তাদের ঘর সংসার এই প্রাচীনত্ব ওর।

সাগর-সঙ্গমের স্বপ্নে বিভোর সমুদ্র-ছোটা নদীর বুকে, হঠাৎ মেঘের ছাওয়ার মত এবার, আবার কেন ছলছলিয়ে উঠলো ওর মনটা ? বারেক মনে হ'ল মেয়েটার কথা যার আঠারো বছর বয়েস। বাবা বাবা বলে অধি-অধি হয়ে, কত না আবদারের ভঙ্গি তার ! সেই সকলকে ফেলে চলে যাবে ও ! কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়—নিতান্তই নিষ্ফল এই নারীজনোচিত হা-হুতাশ পৃথিবীতে কে কাকে কবে ধরে রাখতে পেরেছে ?

আচ্ছা, কেলেই না হয় ও' দেশে যাচ্ছে ওদের, কিন্তু খরচপত্তরের ব্যবস্থা কি করে কি করবে ? আজ-কালকার শাস্ত্রে—স্বামীর ইনসিওরেন্স থাকলে বিধবা হওয়াতেও বিয় ঘটে না কোনো—তা তিন বছরের জন্যে ছেড়ে যাওয়া সে তুলনায় তো কিছুই নয়। অথচ, ওর এই আপাত-মৃত্যুর পূর্বাহ্নে, অর্থাৎ যাত্রার প্রাক্কালে, কি করে স্ত্রীকে বলবে—যে ওর হাতে একটি পয়সাও নেই। যাবার সময় সে বারের মত এবারেও ঈশ্বরের অনুকম্পা তাঁগুলার একটি ব্ল্যাঙ্কচেক দিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন অবধি উপায় তো কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না খুঁজে। কিন্তু এ-কথা য়্যাপ্রিসিয়েট করবার মত মেজাজ ওর স্ত্রীর কি আছে ?

ওর স্ত্রীর কেন, এ-রকম অবস্থায় হারাপ্পা থেকে ব্যারিংটন স্ট্রীট অবধি হয়তো কোনো স্ত্রীরই নেই। আর তাইতো ওকে বলতে হয়, নেহাতই হত-ইতিগজ করে বলতে হয় যে, আজ এখোনো অবধি ওর হাতে টাকাটা এসে পৌঁছয় নি, তবে কালকে নিশ্চিত ও টাকাটা পাবে।···

সুভো ঠাকুরের এই 'কাল'—কালকেও হ'তে পারে আবার এক বছর পরেও হ'তে পারে। মহাকালের একটি পাতা যেন সুভো ঠাকুরের এই কাল! মুহূর্ত থেকে মুহূর্তান্তর, যুগ থেকে যুগান্তরে যে কোনো একটা কিছু এর মানে। ওকে যারা চেনে, তাদের কাছে সুভো ঠাকুরের এই 'কাল' শব্দ চোরা-বালির চেয়ে চরম বলে অনেক দিন থেকে চেনা। মরীচিকার চেয়ে মর্মান্তিক বলে বহুৎ দিন থেকে জানা—তা'হলেও স্ত্রীর কাছে এই মিথ্যা স্তোকবাক্যের তাপ্পি মারতে সত্যিই কষ্ট হয় ওর। গলাটা নরম হ'য়ে আসে একটু। হয়তো বা কেঁপেও ওঠে এক বার। তবু, শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ কোরে, 'মেয়েদের কাছে মিথ্যাচরণে কদাপি মহাপাপ হয় না'—মনে মনে গীতার এই আপ্তবাক্য আওড়ে আবার বলতে হয় ওর স্ত্রীকে···এবার বোঝাতে গিয়ে মুখে মুখেই তৈরি করে চলে ঘটনা—তার পর বাতাস বুঝে মোড় ঘোরে তার এদিক-ওদিক। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তা'ও—নিখুঁত নিষ্পাপ কুঁড়ির মত কল্পনার এক একটি দানা। যারা মিথ্যার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রাণলাভ কোরে পৃথিবীর পরিপূর্ণতার আকারে স্বপ্ন দেখে শুধু। তরল কল্পনাকে প্রতিভার সুকৌশল পরিকল্পনায় কঠিন বাস্তবে প্রতিভাত কোরে পরিবেশন করতে হয় কবির মত। তার পর ঔপন্যাসিকের মত বিস্তার কোরে ও বলে চলে, যথা—"আর্ট অফ সুভো ঠাকুরের" ছিন্দি এডিশানের বিক্রির পাকাপাকি কথা হ'য়ে গেছে। কালকেই তার হাতে আসবে টাকাটা। তখন আর ওর ভাবনা থাকবে না কিছু। হিসেব কোরে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাবে ওকে। চুকিয়ে দিয়ে যাবে ওর সব দেনা-পাওনা। এমন কি কিছু টাকা বাড়তিও দিয়ে যাবে ওর হাতে।

কিন্তু ওর স্ত্রী এখন অভিজ্ঞতায় পাকা হ'য়ে গেছে অনেকখানি। আগের মত অত সহজে বিশ্বাস করানো আর সোজা নয়! তাই ত, ওসব কথা শুনে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ভাবে—এই যে সেদিন মন্দিরাভাই, দিল্লি থেকে খবরের কাগজখানা দেখিয়ে গেল—গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে! সেটা কি তবে স্রোত বাজে কথা ? এ তো বই লেকথাটার উচ্চবাচ্য করলো না তো একেবারেও ? কিন্তু মুখে সে সব কথা কিছু প্রকাশ না করেই ও তখন বলে—"ওগো, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার সব কথাই তো কালকের কথা, কাল দিতে পারবে তার পর কি করবে না-করবে, সে তো অনেক দিন থেকেই শুনছি। কেন তার বদলে আজকে তোমার ফিক্সড্ ডিপোজিট থেকে তুলিয়ে অন্ততঃ মাস কাবারির খরচটা দিয়ে যাও না—এক বছরের না হয় না-ই হল হিসেব করেই দিও। আমি জানি, তুমি ফিক্সড্ ডিপোজিট থেকে একটাও না কাখোনো টাকা—খুইয়েছ তাও। সংসারে কিছু টাকা জমিয়ে রাখা খুবই উচিত। তবু সময়-অসময়ে বিপদে-আপদে সে টাকা যদি কাজে না লাগে, তবে সে রকম জমিয়ে লাভ কি ? হয়, কালকে যদি সময় মত টাকাটা না পাও—তখন কি হবে ?"

সুভো ঠাকুর এমন ফাঁপরে জীবনে আর কখোনো পড়েনি। আবার কথাই তো—কাল যদি টাকা না পায় ? কিন্তু ফিক্সড্ ডিপোজিট!—এ আবার বলে কি ? ও'র ফিক্সড্ ডিপোজিট ? সে তো আছে ব্যাঙ্ক-অফ-বেঙ্গল-অফ-বেঙ্গলে। 'নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে' তো এ-কথা তো ও' বহু দিন আগেই ঘোষণা করেছে—ইনসলভেন্সি সার্টিফিকেট যোগাড় করা বিজ্ঞাপনের মত। তাই ত ওর পলক-হীন চোখ এবার নির্বাক পাবতুয়ার মত আবদ্ধ

আবৃত্তি করতে থাকে অনেকক্ষণ। তার পর অনেক কষ্টে এই ভাবান্তর সামলে নিয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে ও'র স্ত্রীকে—"কে তোমায় বললে যে আমার ফিক্স্‌ট্‌ ডিপোজিট আছে? এ আবিষ্কার কোথা থেকে করলে?"

স্ত্রী অভিমানে গুমরে-ওঠা গলায় বললে—"কেন, তোমার সব বন্ধুরাই তো বলে। এমন কি সে দিন বিরাম বাবু এসেছিল, সে-ও তো বলে গেল—তোমার ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা আছে। তা নইলে পাশ-বইটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে রাখ সন্তর্পণে কেন?"

অসহায় স্বভো ঠাকুর, দস্তুর মত মমতা হ'য় ও'র জন্যে—এবার করুণ কণ্ঠে আবেদনের মত আওয়াজ—"আমি কি চাকরি করি, না ব্যবসা করি যে টাকা পাব—ফিক্স্‌ট ডিপোজিট করব—জমাব?"

এতে ও'র স্ত্রী বললে—"তা হ'লে বিয়ের আগের এতো বছরের রোজগার—কেন ছবি বিক্রি, বই বিক্রির টাকাগুলো কি করলে? তা' ছাড়া এই যে এখন এত বার দিল্লি-দিল্লি করছ, তার বেলা টাকা আসছে শুনি কোথা থেকে? আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে গেলে কিম্বা সংসার খরচের টাকা দিতে হলেই তোমার পয়সা থাকে না জানি।···মেয়েটা জন্মে ইস্তক বাবার হাত থেকে একটা জামা কি জুতো তো দূরের কথা, একটা খেলনা অবধি এ পর্যন্ত পেল না!"

মেয়েরা যে কত বড় অবুঝ, তা স্বভো ঠাকুর মর্মে মর্মে জানে, কিন্তু এবারে মস্কার গিয়ে পৌঁছেচে, তবুও আর এক বার একটা চান্স নেয়—চেষ্টা করে বোঝাতে—যে, দিল্লি-বম্বে যাওয়া-আসা কিম্বা সেখানে থাকা ইত্যাদির যে খরচ সে ও'র টাকায় নয়। একজিবিশান ফাণ্ডের টাকায়। একজিবিশানের সময় যে স্যুভেনিয়র বেরিয়েছিল তাতে যে সব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়—তার টাকা, আর ঐ স্যুভেনিয়রগুলো বিক্রি করে যে টাকা—সেই টাকা থেকেই ওদের তিন জনের—মানে ও'র, রহমান সাহেবের আর কে, পি, সি'-এর দিল্লি বম্বে যাতায়াত, রেল ভাড়া, মালপত্তর নিয়ে যাওয়া, ওখানে থাকা ইত্যাদি বাবদ যা খরচ তা দেওয়া হয়। তার থেকে ও'র নিজস্ব খরচের জন্যে কেমন ক'রে টাকা নেবে? উপরন্তু ভ-বাবুর কাছ থেকে যে ন' হাজার টাকা একজিবিশানের খরচ বাবদ ধার নেওয়া হয়েছিল তা'ও শোধ হয়নি এখনো।"

উত্তরে ও'র স্ত্রী বললে—"তার মানে যা বুঝছি, তুমি এবারেও আমায় কপর্দক-হীন অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে চাও?"

স্বভো ঠাকুর বললে—"না, না, কালকে হিসেব করে সব টাকা দিয়ে দেব। অত ভাববার কিছু নেই। ভগবান আছেন মাথার উপর।"

এর উত্তরে আবেগে আটকে, থেমে থেমে ও'র স্ত্রী বললে—"তোমার মাথার উপর ভগবান আছেন জানি, কিন্তু আমার মাথার উপর তুমি ছাড়া কেউ নেই। মাস গেলে বাড়ি ভাড়া, মুদির দোকান, গোয়ালার বিল, খাই খরচ—সবাই 'মাইজি' বলে আমার কাছেই এসে হাজির হয়। তাদের কাছে 'মাথার উপর ভগবান আছেন' বললে কেউ যে ছেড়ে কথা কয় না। তোমার আয়-ব্যয় সম্পর্কে একটা কথাও তো আমায় জানাও না। কি এলো, আর কি খরচ হোলো, কিছুই তো আমি জানিনে—অথচ সংসারে অভাব হ'লে আমাকেই তো ধারের জন্যে ছুটতে হয়।"

স্বভো ঠাকুর ঐ একরত্তি মেয়ের অত হিসেবি-পণায় একেবারে হাঁ হয়ে গেছে তখন। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো সংসারের জন্যে কিছুই তো তেমন করে উঠতে পারে না! আর করবেই বা কখন? আর্টের উইপোকা জীবনের গোড়ায় একেবারে গুঁড়িতে ধরে গেছে যে। তার থেকে আর কি রেহাই পাওয়া যাবে এই বয়েসে? স্বভো ঠাকুরের নিবিড় নিরাশা ও'র দীর্ঘ নিশ্বাসটাকে অবধি নিবিয়ে ফেলে নিশ্চিহ্ন কোরে। ও তখন নিরুৎসাহে নিজের হতাশার স্বরেই বলে—"আমার নিজের বোলে কিছুই যে নেই। একজিবিশানের আয় একজিবিশানেই ব্যয় হয়।"

এর পর ও'র স্ত্রী আর থাকতে পারে না, অভিমানে আটখানা হ'য়ে উঠে বলে—"একজিবিশানের আয় যদি একজিবিশানেই ব্যয় হয়, তবে আমার গয়নাগুলো একজিবিশানের কাজে বাঁধা পড়ে অথবা বিক্রি হয় কেন? তোমার বই বিক্রির টাকাগুলোই বা একজিবিশানের আর্ট অবজেক্ট কিনতে অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় কি করে? আমাকে তোমার কাজের কোনো কিছুই তো জানাও না, জানাতে চাও না। যদি বা জানতে চাই—তা' হলেও তো সেই এক কথা—'ও-সব তোমার সীমানার বাইরে। ও-সব তুমি কিছু বুঝবে না।' অথচ তোমার বন্ধু, প্রোফেসর সাহা, কলেজের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি খবরটি ইস্তক জানান তাঁর স্ত্রীকে। মাইনের টাকা পেলেই সমস্ত এনে দিয়ে দেন স্ত্রীর হাতে। কত ভাল ভাল নতুন নতুন বই নিজে পড়িয়ে শোনান। সহরে একটা ভাল ড্রামা কিম্বা পারফরমেন্স হলে মিসেস সাহাকে সঙ্গে করে না দেখে এলে তাঁর ভাত হজম হয় না। আর সেখানে তুমি? আমি যে একটা মানুষ, আমারও যে একটা ভাল জিনিষ দেখার সখ থাকতে পারে, আমিও যে তোমার সাথে থেকে তোমার কাজে সাহায্য করতে চাই, তোমার সঙ্গে তোমার সুখ-দুঃখের সমান ভাগীদার হতে চাই, সে কথাও তোমায় মুখ ফুটে বলে মনে করিয়ে দিতে হয়? তুমি কি অনুভূতি-হীন পাথর—না সত্যি সত্যিই অন্য কোনো গ্রহের লোক?"

ওর স্ত্রীর এই একান্ত সত্য অনুযোগের উত্তর দিতে সে নিতান্তই অক্ষমতা অনুভব করে। অবাক হয়ে ও চুপ করে ভাবতে থাকে—ভাবতে ভাবতে তার পর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করে যে—সংসারের একেবারেই অনুপযুক্ত ও। তার পর তার চেয়েও আকস্মিক একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ও যেন দেখতে পায়—ওর যেন দুই বিবাহ। আর এই দুই পত্নীর মধ্যিখানে স্যাণ্ডউইচড হয়ে ওর জীবন! অভাবের কাঁকালো মাষ্টার্ডে অতিশয় উপাদেয়! আর যা চির জীবনের চায়ের টেবিলে বসে চেকে চেকে, কামড়ে কামড়ে, রসিয়ে রসিয়ে, ও আস্বাদ অনুভব করছে, এতো দিন ধরে নিত্যকাল।

এর পর নিরুত্তর স্বভো ঠাকুর এবার বৈপত্তিক বুকে, পাঞ্জাবীটা কোনো রকমে গায়ে গুলিয়ে আর চটিটা কোনো রকমে পায়ে দিয়ে, চম্পট দেওয়ার তালে ফ্ল্যাটের চৌকাঠ ডিঙোলো। মতলব, বন্ধুদের সঙ্গে এক চক্করে দেখা-শুনো শেষ করে আসা, সেই তিন বছর বাদে আবার কবে দেখা হবে—

ও' ফ্ল্যাটের চৌকাঠ ডিঙোলেও এবারেও দুর্ভাবনার চৌকাঠ ডিঙোতে-পারার অক্ষমতা বার বার অনুভব করতে লাগল মনে। এটা ওর মতন লোকের পক্ষে একটা অচিন্তনীয় ঘটনা। এতো দিন লক্ষ্যভেদ করার লক্ষ্যই ছিল ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। চার পাশের কোনো কিছুই নজরে পড়েনি এতো কাল। কিন্তু আজ ওর স্ত্রীর কথায় ত্রিশঙ্কুর কাহিনীটা বার বার যেন মনের মধ্যে ভেসিয়ে উঠতে লাগল। সংসারের দৈনন্দিন মাটি থেকে দূরে—অদূরে—শূন্যে ঝুলছে যেন ওর দু' পা। যেন, স্যুর-রিয়ালিষ্টের আঁকা একখানা ছবি! অথচ আদর্শের অপূর্ব্ব অপাপবিদ্ধ স্বর্গেও সম্পূর্ণ মন যেন আর নির্ভর করে নেই। ও ভাবতে ভাবতে আর ভাবতে পারে না—ও এবার ওর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে হিন্দ সিনেমার সামনে থেকে ঘুড়ির মত গোঁত্তা খেয়ে উঠে পড়লো একটা চলন্ত ডেকারে। তারপর সেই চলন্ত দোতলায় চু' মেরে, না-স্বর্গে না-মর্ত্তে এমনি একটা অবস্থায় বসে পড়ল, চঞ্চল দুলতে দুলতে জানলো পিলোর প্রাণান্তকর পাঁজা কোলায় পিঠ ঠেসে।

সেই তখন থেকে স্বভো ঠাকুর যত জায়গায় যে নামল আর উঠলো, উঠলো আর নামল, তার যেন ইয়ত্তা নেই। এক এক করে দেখা শেষ করেও দেখে—দেখা করার যেন শেষই হয় না আর। কোলকাতা সহরে ওর যে এতোগুলো বন্ধু লুকিয়ে ছিল, অত দিন বাদে তা' আজকে, যাবার আগের দিনে আবিষ্কার করে, পড়ে গেল যেন চৈতালী ঘূর্ণীর এক মস্ত ঘূরপাকের খপ্পরে।

তার পর দেখা-শুনো আর কথাবার্ত্তার মন্দাকিনীধারায় গা-ভাসিয়ে ও' যখন সারদা বাবুর বাড়িতে এসে নিশ্চিত নোঙ্গোর ফেলল—তখন এমনিতেই ঘড়িতে নটা-বেজে-যাওয়া রাত্তির। সেখানে আবার দেখা আমাদের বঙ্কিম দা' অর্থাৎ ডাক্তার বঙ্কিমের সঙ্গে। চলল খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা। গুরুদেব নাটু মহারাজ, য্যামেরিকার আবহাওয়া সম্পর্কে উপদেশ দিলেন কিছুটা। তার পর বর্ণনা করলেন, একিস ফাইস্যাণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপের। একে সারদা বাবুর বাড়ি, তাতে বন্ধুবান্ধবে গুলজার। সেখান থেকে অত সহজেই কি ছাড়ান পাওয়া সম্ভব? উপরন্তু, বৌদি রাহুরাণ অর্থাৎ কি না রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়ান দিলেন না। সোনার চাঁদের মত ইয়া ঝকঝকে কাঁসার থালায় রেশানের বাজারেও মিহি, মিহিদানার মতই সরু চালের গরম ভাত তাতে কোলকাতার বাজারে দুষ্প্রাপ্য খাঁটি গাওয়া ঘির ঘুমন্ত খশ্‌বুই···উপরন্তু থালার চার পাশে গ্রহ-উপগ্রহের মত সাজানো মাছ আর মাংসের অজস্র গোল গোল বাটিগুলো।—এই সব দেখে, ও' আর এক বার ভাল করে দেখবার লোভেই যেন খেতে বসে যায়।

তারপর খাওয়া শেষ কোরে, সিগ্রেটে সুখ-টান দিতে দিতে যখন বসবার ঘর থেকে ওঠা হোলো, তখন ট্রাম বাস সব গেছে বন্ধ হ'য়ে। সারদা বাবু নিজেই গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পরেশ এভিনিউ-এ, ওর ফ্ল্যাট যেখানে। ঘড়িতে রাতের কাঁটা তখন বারটার বেড়া ডিঙিয়েছে।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, আস্তে করে ফ্ল্যাটের ল্যাচ্‌কিটি খুলে, ও' যখন শোবার ঘরের সামনে এসে পৌঁছল, তখন দেখে—বাতিটা জ্বলছে তখনো দপ্‌দপ্‌ কোরে। কাপড়-চোপড় জামা-জুতো ছত্রাকার চার ধারে। অর্দ্ধেক কাপড় উঠেছে স্যুটকেশে, অর্দ্ধেক ওঠানো হয়নি তখনো। ষ্টিলের এয়ারটাইট্ ট্রাঙ্ক দুটো ডালা-খোলা, খবরের কাগজ বেছানো। জামা-কাপড় তখনো তা'তে তোলা হয়নি কিছু। কেবল নেপথলিন ছড়ানো শেষ হ'য়েছে তার সর্ব্বাঙ্গে। এরি মধ্যে এক পাশে হঠাৎ নজরে পড়ল—কালো ওভার কোটটায় মাথা দিয়ে, খালি মেজের উপর, কাৎ হয়ে, অকাতরে ঘুমিয়ে আছে আরতি। সংসারের কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়েছে কখন কে জানে? তার পর ক্লান্ত শরীরে শুরু করেছিল হয়তো গোছাতে। হয়তো এখনো খাওয়াই হয়নি ও'র। আহা বেচারা—দুশ্চিন্তায় দুর্ব্বল-দেহ, গোছাতে গোছাতে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো! বোঁজা-চোখের কোণটিতে তখনো চিক্‌চিক্ করছে শুকতারার মত শুকিয়ে-যাওয়া এক ফোঁটা জল··· কিন্তু হাতে ওটা কি? পাসপোর্ট? না তো, ওটা তো বাক্সর তলায় থাকা সেই ব্যাঙ্কের পুরোনো পাশ-বইটা—যার জমার ঘরে বাকি পড়ে' সাড়ে ছ' আনা পয়সা—আজ, এখনো এক দৃষ্টিতে ওর স্ত্রীর অদৃষ্টের পানে চেয়ে যেন উপহাস করছে!

[ক্রমশঃ।

যাওয়া-আসার খেলা

সিদ্ধেশ্বর পাকড়াশী

চৈত্র-শেষের জীর্ণ পাতা কখন গেল ঝরে'
নীড়-হারা সে, ঠাঁই পেল কি মাটির বুকের পরে?
মর্ম্মরিত বাণী তাহার রইল সেথায় ঢাকা,
অনাগতের চরণ-চিহ্ন তার 'পরে কি আঁকা?

এমনি যাওয়া এমনি আসা নিত্যকালের রথে,
এমনি ফোটে অচেনা ফুল, ঝরে বনের পথে।
কালের রথের চাকায় লেখা লক্ষ লিখনগুলো,
কিছু বা রয়, আরগুলো হয় ধুলোর মাঝে ধুলো।

নতুন করে শুরু আবার পুরান সেই খেলা,
বসে' বসে' সাগর-কূলে ঢেউ গোণা দুই বেলা,
দু' হাত ভরে জড় করা কাজ-অকাজের নুড়ি,—
'ফুরোবে এ খেলা ভুলে কোথায় বা সে বুড়ি!

ডাঃ হ্যাভলক এলিস

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

'জলে না নামলে কেউ সাঁতার শেখে না' বলে যে প্রবাদ-বাক্য আছে, সেটা অন্ততঃ এক জনের সম্বন্ধে খাটে না। সেই লোকটির কথাই আজ বলব। এই লোকটি এমন একটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন—আয়ত্ত বললে ঠিক বলা হবে না—একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, যে বিষয়ে তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এক রকম ছিল না বললেই হয়। অথচ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল এবং তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এই ভদ্রলোকটির নাম ডাঃ হ্যাভলক এলিস এবং তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল যৌনতত্ত্ব।

এত বড় এক জন মনীষীকে কিন্তু হঠাৎ দেখলে কিছু বোঝা যাবে না। বাস করতেন তিনি অতি সাধারণ ভাবে। তাঁর বসতবাড়ী ছিল অতি সাধারণ এবং তার পরিবেশও ছিল তদ্রূপ। অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্যে একখানি সাধারণ বাড়ীতে বাস করতেন এই অসাধারণ মানুষটি। সাধারণতঃ কোন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে সাক্ষাৎকারীর পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ডাঃ এলিসের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যেতেন, তাঁদেরও প্রথমে এই রকম হত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরমুহূর্ত্তে তাঁদের সমস্ত ধারণা বদলে যেত। সাক্ষাৎকারীরা দেখতে পেতেন যে, যাঁর সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে গেছেন তিনি নিজেই তাঁদের চেয়ে বেশী ঘাবড়ে গেছেন। এত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি!

তবে তাঁর চেহারার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। তাঁর তুষার-শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, উন্নত ললাট, সৌম্যমূর্ত্তি সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করত। তাঁর দৃষ্টি ছিল একটু অসাধারণ অর্থাৎ অন্তর্ভেদী—যার সাহায্যে তিনি অপরের মনের কথা টেনে বার করে নিতে পারতেন। কেবল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নয়, তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল। অথচ লোকটিকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না যে, ইনি কিছু কাল ধরে একটা তুমুল আলোড়নের কেন্দ্র ছিলেন। আজ হয়ত অনেকে ভুলে গেছেন যে, যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা রকমের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা এবং তথাকথিত সমাজপতি বা ধর্ম্মের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে হ্যাভলক এলিসকে কি প্রকাণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। আজ যে আমরা যৌনতত্ত্বকে খোলাখুলি ভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছি, এ সম্বন্ধে সকল প্রকার গোপনীয়তা বর্জ্জন করে মানুষের তথা সমাজের জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য ডাঃ হ্যাভলক এলিসের অবদান প্রধান।

১৮৫৯ সালে এলিসের জন্ম হয় ক্রয়ডনে, কিন্তু তাঁর আদি বাস ছিল সাফোকে। তাঁর বাবা এবং দাদামশাই ছিলেন জাহাজের কাপ্তেন। শৈশবে দু'বার তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে জাহাজে সুদীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রা করেছিলেন। দ্বিতীয় বার সমুদ্রযাত্রায় তাঁকে কয়েক বছর অষ্ট্রেলিয়ায় থাকতে হয় এবং সেখানে সিডনীতে স্কুলমাষ্টারী করে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো কি উনিশ। এই সময় থেকেই তিনি যে ধর্ম্মীয় আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন তার প্রভাব কাটাতে আরম্ভ করেন এবং নিজের ধর্ম্ম নিজে বেছে নেন। তাঁর এই ধর্ম্মটি এমনই বিচিত্র যেখানে সৌন্দর্য্যের কবিতার সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের বিচার-বুদ্ধির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। স্বাভাবিক প্রেরণা বশেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এবং শেষে এই লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবিকানির্ব্বাহ হলেও তিনি একথা কখনও স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন, লেখার জন্যই তাঁর জন্ম, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তিনি লেখেন না।

প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন যে ধর্ম্মযাজকতা করবেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে, এ কাজ তাঁকে দিয়ে হবে না। তবে কি আইনজীবী হবেন? সিডনীর স্কুলে মাষ্টারী করার সময় একদিন স্কুলের ছুটির পর স্কুল-ঘরেই শুয়ে শুয়ে চিন্তা করার সময় মনে হল, তাঁর পক্ষে একমাত্র পথ ডাক্তার হওয়া। সেই দিনই তিনি স্থির করে ফেললেন ডাক্তারী পড়বেন। তিনি লণ্ডনে ফিরে এলেন এবং কোন রকমে অর্থ সংগ্রহ করে সেণ্ট টমাসের হসপিট্যাল-স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন। এটা ১৮৮১ সালের কথা এবং তখন তাঁর বয়স বাইশ বৎসর। এই স্কুলে তিনি সাত বছর ডাক্তারী পড়লেন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এর চেয়ে কম পড়তে হয়, কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পাশ করতে না পারায় তাঁকে অধিক দিন পড়তে হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। যাই হ'ক, সাত বছর পরে তিনি পাশ করে লাইসেন্স অব দি সোসাইটি অব এপোথিকেরিস সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন।

ডাক্তারী পাশ করলেন বটে, কিন্তু ডাক্তারী তিনি করলেন না। কিন্তু তাই বলে ডাক্তারী শিক্ষা তাঁর বৃথা যায় নি। তিনি লিখেছেন যে, তিনি যদি ডাক্তারী না পড়তেন, দেহতত্ত্ব, শল্যবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি না শিখতেন, তা হলে যৌন-সমস্যা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন না। উত্তর কালে তিনি যে কীর্ত্তি রেখে যান, ডাক্তারী শিক্ষা তার ভিত্তি রচনা করেছিল। কেন যে তিনি ডাক্তারী না করে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন তা বলা কঠিন। কারণ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনও যৌন আকর্ষণের তীব্রতা অনুভব করেন নি। তিনি যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব বই লিখে গেছেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে সব বিষয়ে কোন সাহায্য পান নি।

যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যা কিছু অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশই তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। অবশ্য এই সংগ্রহের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। তাঁর প্রকৃতি, আচরণ এবং কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে এমনই বিস্ময়কর সম্মোহনী শক্তি ছিল যে, কেউ তাঁর কাছে নিজের জীবনের সব কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ না করে পারত না। মহিলারা পর্য্যন্ত তাঁদের যৌন-জীবনের গোপন কথাগুলি বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে ব্যক্ত করতেন।* তিনি প্রথম দিকে "ক্রিমিন্যাল" নামে

একখানা বই লিখেছিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই কোনও অপরাধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ কারাগার সমূহের অধ্যক্ষদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার অপরাধী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

তথ্য সংগ্রহের কৌশল তিনি ভাল রকমই আয়ত্ত করেছিলেন। বিশেষ ভাবে মেয়েদের পেটের কথা টেনে বার করতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু এ জোর করে আদায় করা নয়। চালাকী দিয়ে এসব কাজ হয় না। আসল কথা, নারী জাতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অসীম। তাঁর এই দরদ ও মমতার জন্য সম্রান্ত ঘরের মহিলারা পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে তাঁদের সব কথা প্রকাশ করতেন।

যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁকে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে হয়েছিল। কিন্তু কোনও নারীর সঙ্গে তাঁর প্রেম হয় নি। ডাক্তারী পড়ার সময় তাঁকে বহু নারীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। অনেকেই হয়ত তাঁর প্রেমে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু বহুর মধ্যে মাত্র দু'জনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এক জনের নাম অলিভ শ্রীনার। তিনি ছিলেন লেখিকা। তাঁদের মধ্যে বহু বছর ধরে হাজার হাজার পত্রালাপ হয়েছিল। এই মহিলাটির দৈহিক কামনা ছিল উগ্র। কিন্তু প্রতিদানের আশা করলেও তিনি তা পাননি। তাঁরা ঠিক সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলেন না। তাঁদের সম্পর্ক ছিল কেবল বন্ধুত্বের। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক এর চেয়ে বেশী ছিল না। তাঁর আত্মজীবনীতে এডিথ লীনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা বিশদ ভাবেই লেখা আছে। এই মহিলাটি ছিলেন অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং স্বামী অপেক্ষা জনকয়েক স্ত্রীলোকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। বিবাহের পর এডিথ অধ্যাপনা ক'রে ও প্রবন্ধাদি লিখে নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখে ছিলেন এবং বছরের অধিকাংশ সময়ই স্বামীর থেকে পৃথক ভাবে বাস করতেন। এলিসের পক্ষে এটা এক রকম শাপে বর হয়েছিল। বিবাহিত জীবন হয়ত তাঁদের সুখের হয় নি, কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ তাদের ছিল না। কারণ দু'জনেই ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং যৌনস্পৃহার দিক থেকে দু'জনেই ছিলেন cold.

প্রথম যখন তিনি যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখতে থাকেন তখন সমাজে যে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সরকারী রোষ থেকেও তিনি রেহাই পাননি। ১৮৯৭ সালে "সেক্সুয়াল ইনভার্সান" প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারের রোষদৃষ্টি প্রকাশিত হয়। তবে প্রকাশক বা এলিসের বিরুদ্ধে সরকার কোন অভিযোগ আনেন নি। অভিযুক্ত হয়েছিলেন ঐ পুস্তক বিক্রেতা জর্জ বেডবরো। বিচারের সময় বেডবরো অপরাধ স্বীকার করেন এবং মুচলেখা দিয়ে অব্যাহতি পান। এই মামলায় ডাঃ এলিসকে সাক্ষ্য দিতে দেওয়া হয় নি। বইখানি অত্যন্ত নোংরা, অশ্লীল এবং নৈতিক অবনতিসূচক বলে নিন্দিত হয়। এলিসও যে কোন সময় অভিযুক্ত হতে পারতেন। এই ঘটনার পর থেকে এলিস তাঁর পরবর্ত্তী সমস্ত বই আমেরিকা থেকে প্রকাশ করেন। আমেরিকায় অবশ্য এ নিয়ে কোন গোলমাল হয় নি।

নরনারীর যৌনক্ষুধাকে তিনি কখনও হীন চক্ষে দেখেন নি। বরং তিনি একে পবিত্র জ্ঞান করে গেছেন। পেটের ক্ষুধা যেমন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, যৌনক্ষুধাও তাই। এই দু'টিই হ'ল মানুষের আদিম ক্ষুধা। এই দুটি ক্ষুধা ঠিক ভাবে না মেটাতে পারলে মানুষের সব কিছুই ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানুষ কখনই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না, যত দিন না তার এই দু'টি স্বাভাবিক ক্ষুধা মিটবে। এর মানে এই নয় যে মানুষকে ব্যভিচার করতে হবে। শরীরকে ঠিক রাখতে গেলে খাদ্য সম্বন্ধে যেমন আমাদের সংযম দরকার, যৌনস্পৃহা সম্বন্ধেও সেইরূপ সংযম অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাই বলে নরনারীর যৌনস্পৃহা সম্বন্ধে গোপনীয় বা দূষণীয় কিছু নেই। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য যৌনবিজ্ঞানের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তার যৌন-জীবন—যার উপর তার নিজের সকল সুখ তথা সমাজের কল্যাণ নির্ভর করছে। কাজেই বিষয়টি মোটেই অবজ্ঞার নয়। অনেকে হয়ত মুখে স্বীকার করবেন না অথবা অজ্ঞতা বশতঃ বলতে পারবেন না যে, যৌনজীবন সুখের না হলে তার জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে তাকে পঙ্গু করে দেয়, তার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। কাজেই সমাজ-জীবনে যৌন-বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। ডাঃ হ্যাভলক এলিস তাই যৌন বিজ্ঞানকে সকলের নিকট উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, মানুষের জীবনকে সুস্থ সুন্দর ও পবিত্র করে তোলার জন্য। যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য বহু নরনারীর জীবন বিষময় হয়ে উঠে। এখনো পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আমাদের কত না অজ্ঞতা বর্ত্তমান রয়েছে। বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পর্য্যন্ত যৌনজ্ঞানের একান্ত অভাব। এই অভাব পূরণ করতে পারলে অনেকেরই জীবন সুখের হয়ে পড়বে। যৌনস্পৃহাকে চেপে রেখে মিথ্যা আবরণ সৃষ্টির ফলে সমাজের মঙ্গলের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। ডাঃ এলিস তাই সমাজের কুসংস্কারের মূলে আঘাত করেছিলেন। একজন্য তাঁকে অত্যন্ত সকল বিপ্লবীর মতই অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জয় লাভ হয়েছে। তিনি যে আলো জ্বালিয়ে গেছেন তাই থেকে আজ সকলে তাদের নিজেদের ছোট ছোট দীপগুলি জ্বেলে নিতে পারছেন এবং সেই আলোকে নিজেদের পথ করে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

ডাঃ হ্যাভলক এলিস শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাও ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক লেখার মধ্যেও সেই প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের উপাসক। এখানে তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করব :

"The world, if we like to view it so, is fundamentally a very ugly place. By facing this ugly world, by ranging wide enough in it, afar, and above and below—in nature or in one-self—one can find beauty. Slowly, patiently, one can reveal beauty, one can transmute it into beauty. The number of points at which one has been able to do this is the measure of one's success in living. This is the art of life. Beauty when the vision is purged to see through the outer vesture, is truth and when we can pierce to the deepest core of it, is found to be love."

বিনয় ঘোষ

[১৮৫৫ সালে এপ্রিল ও জুন মাসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বছরের প্রথমে তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রস্তাব রচনা করেন। এই বছরের শেষে এ-সম্বন্ধে তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব রচনা করেন এবং সরকারের কাছে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য আবেদন করেন। বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আবেদনও ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পাঠান। ১৮৫৫ সালেই তিনি পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জেলায় মডেল স্কুল স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ৩৫ বছর এবং তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। মনে হয়, ১৮৫৫ সাল যেন তাঁর জীবনে এক বিচিত্র কর্মপ্রেরণা নিয়ে আসে। ১৯৫৫ সাল তাঁর সেই বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের শতবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের এই আলোচনা আমরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

—সম্পাদক]

পূর্বরঙ্গ

ভাগীরথীর পশ্চিমে, সরস্বতী নদীর তীরে, সূর্য অস্ত গেল। একটা যুগের সূর্য। তার নাম মধ্যযুগ। ভাগীরথীর পূবে নতুন যুগের সূর্যোদয় হ'ল কলকাতা শহরে। নবযুগের জ্যোতির কেন্দ্র কলকাতা।

নবযুগের সূর্যোদয়কে যাঁরা অভিনন্দন জানালেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হ'লেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দু' পুরুষের। রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭৪ সালে, বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে। জন্মকালের ব্যবধান দু'পুরুষের হলেও, দু'জনের জন্মস্থানের ব্যবধান খুব বেশী নয়। হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলে দু'জনেই জন্মেছিলেন। পরগণা জাহানাবাদ ও সরকার মদারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল আরামবাগ। তারও আগে এ-অঞ্চলের নাম ছিল অপারমন্দার। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমা একই পরগণার মধ্যে ছিল। এখন রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর দক্ষিণ আরামবাগে, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায়। বীরসিংহ থেকে রাধানগর বার-চোদ্দ মাইলের বেশী দূর নয়, চার ঘণ্টার হাঁটাপথ। একদিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতা যিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেছেন, তাঁর কাছে এ পথ সামান্য পথ। বীরসিংহ থেকে রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের পথে বিদ্যাসাগর অনেক বার যাতায়াত করেছেন। রাধানগরের কাছে পাতুল গ্রামে ছিল বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়। বাল্যজীবনে তিনি পাতুলে থেকেছেন কয়েক বার এবং এই পাতুলের পথেই বীরসিংহ থেকে কলকাতায় যাতায়াত করেছেন পরে। জাতীয় জাগরণের দীক্ষাগুরু রামমোহনের পবিত্র জন্মস্থান—বালক বিদ্যাসাগর কয়েক বার পর্যটন করেছিলেন। রামমোহন তখন রাধানগর ছেড়ে স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন তাঁর মাণিকতলার বাড়ীতে।

বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয় গোঘাটে। আরামবাগ হয়ে এই গোঘাটের পথেই ঐতিহাসিক গড় মান্দারণে যেতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে গড় মান্দারণের বর্ণন আছে: "গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্ত নিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশির: পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত, দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড়

মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন—"। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। তার আগে বিদ্যাসাগরও দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক গড় মান্দারণের দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে বালক বিদ্যাসাগর সেদিন ভেবেছিলেন কি—আমাদের' এই কূপমণ্ডুক সমাজের এরকম অনেক গোঁড়ামির দুর্গ অদূর ভবিষ্যতে একদিন তাঁকে ধূলিসাৎ করতে হবে ?

গড় মান্দারণের পাশে গোঘাট, বিদ্যাসাগর-জননীর জন্মভূমি। প্রাচীন নাম অপারমন্দার। পালযুগে শূরবংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহ দমনের জন্য রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তরাজাদের সঙ্গে 'সমস্ত আটবিক সামন্তচক্রের চূড়ামণিস্বরূপ' অপারমন্দারের লক্ষ্মীশূরও রামপালের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। (১) উৎকল ও দক্ষিণ-ভারতের রাজারা এই পথে একাধিক বার অভিযান করেছেন বাংলা দেশে। এই পথেই শশাঙ্ক থেকে রামপাল পর্যন্ত বাংলার রাজারা দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত জয় করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মালিক ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন উজবক প্রথমে এই মদারণ অধিকার করেই রাঢ়দেশ জয় করেছিলেন। মুসলমান অভিযানের সময় উৎকলরাজ বাংলার এই অঞ্চল দখল করে মদারণেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই মদারণ থেকেই উৎকল অভিযান করেন। গড় মদারণের গড় ও দুর্গ ইসমাইল গাজীই তৈরী করেছিলেন শোনা যায়। শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ থেকে পুরীর পথে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যাত্রা করেন, সেই সময়ের কথা। পাঠান-মোগল সংঘর্ষের ঐতিহাসিক স্থানও এই মদারণ। রাজা তোডরমল্ল এই পথেই দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন উড়িষ্যা পর্যন্ত। ইতিহাসের আর এক যুগ-সন্ধিক্ষণের কথা। (২) অনেক উত্থান-পতন, অনেক ভাঙাগড়ার স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান এই মদারণ। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার অনেক পদচিহ্ন আঁকা আছে এই মদারণের পথে। মদারণের এই ঐতিহাসিক পথে চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে বালক বিদ্যাসাগর কি কোন দিন ভেবেছিলেন, নয়া বাংলার নতুন ইতিহাস রচনার কথা।

ঐতিহাসিক মদারণেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বাল্য-জীবনের অনেক দিন কেটেছে। তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান এই মদারণে। জঙ্গল নয় জাহানাবাদ। ঐতিহ্যরিক্ত কোন জনহীন প্রান্তরে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর জন্মাননি। মানুষের প্রথম জীবনের প্রথম পরিবেশ হ'ল তার জন্মস্থানের পরিবেশ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান। উভয়েই 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশজাত। রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রামমোহন, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যাসাগর। 'রায় রায়ান্' নবাব সরকারে চাকুরীগত উপাধি, তাই রামমোহন রায়। 'বিদ্যাসাগর' বিদ্যালয়ের উপাধি, তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গৌরব তাঁদের বংশগত, গোঁড়ামি তাঁদের মজ্জাগত। বিদ্যার দান উদারতা, গোঁড়ামির দান সঙ্কীর্ণতা। দু'য়ের সংঘাতের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলার দুই যুগপুরুষ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। উদারতা ও গোঁড়ামির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে শৈশবে তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন। মদারণের ঐতিহাসিক পথে চলতে চলতে তাঁরা বোধ হয় এইটুকু বুঝেছিলেন যে এগিয়ে চলাই ইতিহাসের ধর্ম। 'চরৈবেতি' ইতিহাসের মূলমন্ত্র, কেবল 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' নয়।

ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ করা সব সময় কল্পনা নিয়ে খেলা করা নয়। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশের দুই সন্তান প্রধানতঃ সামাজিক গোঁড়ামির দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। মদারণের পাথরের দুর্গের চেয়ে অনেক মজবুত সেই গোঁড়ামির দুর্গ। মধ্যযুগের বাংলার সমাজের অচল অটল দুর্গ। সমাজের নিস্তরঙ্গ গড্ডলিকাপ্রবাহ সেই আঘাতে ঘূর্ণীবাত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অমিতবিক্রমে সেই বিক্ষোভের মুখোমুখী এসে দাঁড়ান রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এ কেবল আকস্মিক ঘটনার অত্যাশ্চর্য যোগাযোগ নয়। ইতিহাসের এ-ও এক নিয়ম। ধ্বংসের সূত্রপাত হয় যেখানে, সৃষ্টিরও সূচনা হয় সেখান থেকে। হয়ত তাই কুলীন ব্রাহ্মণবংশে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েরই জন্ম হয়েছিল। ইতিহাসের খেয়াল এবং খেয়ালের কোন যুক্তি নেই। যুক্তির অবতারণাও করছি না। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপাত্রদের মধ্যেও অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণবংশের সন্তান ছিলেন। যেমন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সামান্য হলেও এই বংশকথা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। খেয়াল হলেও অগ্রগামী ইতিহাস এখানে একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম পালন করেছে দেখা যায়। ধ্বংসের স্তূপের ভিতর থেকেই নতুন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। যে ঘরে গোঁড়ামির অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল, সঙ্কীর্ণতার গুমোট জমেছিল সব চেয়ে বেশী, সেই ঘরেই আলোকের অগ্রদূতরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন একে-একে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ভাগীরথীর পশ্চিমে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, নতুন ভোরের আলো সেইখানেই দেখা দিয়েছে আবার। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন, ভারতের মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। (৩) নবযুগের যদি কোন

(১) রামচরিত : ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক : 'অবতরণিকা'

(২) History of Bengal, Vol II (Dacca Univ.) : Ed. Sir Jadunath Sarkar : পৃষ্ঠা ৫১—৫২, ১৪৮, ১৮১—১৯০।

(৩) "On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began"—ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯৭।

জনকণের নিশানা থাকে, তাহ'লে পলাশীর যুদ্ধের এই দিনটিই হ'ল সেই নিশানা। কিন্তু তার অনেক আগেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের ছাড়পত্র পেয়েছেন, কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদার হয়েছেন (১৬৯৮ সালে)। তার আগে, ১৬৫১ সালে, হুগলীতে তাঁরা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছেন। ইংরেজদের অনেক আগে পর্তুগীজরা আনাগোনা শুরু করেছে এদেশে। ষোড়শ শতাব্দীতেই তারা সপ্তগ্রামের বন্দরে বাণিজ্যের জন্য উপনিবেশ তৈরী করেছে। সপ্তগ্রাম তখন পশ্চিম-বাংলার প্রধান বন্দর, বাঙালী বণিকদের বসতিও সেখানে যথেষ্ট। প্রভু নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের এই বণিকদেরই ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন—

সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥…
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায়॥

(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম)

পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে আসার খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের নগর সঙ্কীর্তনের ধ্বনি না মিলাতেই পর্তুগীজরা এসেছিল বাণিজ্যের লোভে। সরস্বতী নদী ম'জে গেল যখন, বন্দর সপ্তগ্রামের তখন পতন হ'ল। তাম্রলিপ্তের পর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলী, হুগলীর পর কলকাতা। বন্দর কেন্দ্র ক'রে নগর গড়ে ওঠে, মধ্যযুগের বন্দর-নগরের মতন। বন্দরের অবনতির সঙ্গে নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। আকবর বাদশাহের রাজত্ব কালেই পর্তুগীজরা হুগলীতে বন্দর ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করল। হুগলীর পর্তুগীজ-নায়ক পেড্রো তাভারেশ উদারচিত্ত আকবরের কাছ থেকে স্বাধীন ভাবে ধর্মপ্রচারের অনুমতিও নিয়ে এলেন। হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশ গ'ড়ে উঠল প্রায় ১৫৭৯ সালে এবং ব্যাণ্ডেলের গির্জা স্থাপিত হ'ল ১৫৯৯ সালে। (৪) শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৈষ্ণবদের কোন ধর্মমঠ গ'ড়ে উঠেছিল কি না বলা যায় না। ব্যাণ্ডেলে কিন্তু খ্রীষ্টানদের গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের বৈষ্ণব গোস্বামীরা ও বিদেশের খ্রীষ্টান পাদরিরা প্রায় একসঙ্গেই বাংলা দেশে ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মনে হয়, হুগলী অঞ্চলেই তাঁদের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি! ইসলামের প্রথম সংস্পর্শে দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন অদ্বৈতবাদের বাণী নিয়ে। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিক। (৫) তারপর সেই ইসলামের সংঘাতেই, কয়েক শতাব্দী পরে, বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত হ'ল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আহ্বানের পাশে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির আহ্বান বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করল। এই সময় খৃষ্টান পাদরি সাহেবরা আর এক নতুন একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম 'বণিকদের' উদ্ধার করলেও, লোকচিত্তে খুব বেশী সাড়া জাগাতে পারেনি। সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল। লোকাচার ও লোকধর্মের হাজার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল না তারা। বৈষ্ণবধর্মের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, শাসকশ্রেণীর পোষকতার অভাব। মধ্যযুগের কোন ধর্মই শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ পোষকতা ভিন্ন জনসমাজে প্রসার লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্মের সম্রাট অশোক ছিলেন, বাংলার পালরাজারা ছিলেন। হিন্দুধর্মের তো কথাই নেই। ইসলামধর্মেরও তাই। খৃষ্টধর্ম তত দিন প্রসারলাভ করতে পারেনি, যত দিন না রোমান সম্রাট কনষ্ট্যাণ্টাইন নিজে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করতে পারেনি, তার কারণ বৃটিশ শাসকরা এদেশে মধ্যযুগের ধর্মরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে আসেননি। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা, তাই খৃষ্টান হয়েও খৃষ্টধর্মের রাষ্ট্রীয় পোষকতা করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবু পাদরি সাহেবদের প্রচারের জন্য বাংলার উপেক্ষিত জনসমাজে এবং শিক্ষিত সমাজেও একেশ্বরবাদের আবেদনে বেশ সাড়া পড়েছিল। ধর্মান্তরের সমস্যা না হ'লেও, বুদ্ধি ও যুক্তির দিক থেকে পাদরি সাহেবরা সেদিন যে বেশ একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রামমোহন রায় এই প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব দিয়েছিলেন। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন। বিদ্যাসাগরের যুগে সে-সমস্যা অনেকটা মিটে গিয়েছিল। জীবনে তাই 'ধর্ম' বা 'ঈশ্বর' নিয়ে বিদ্যাসাগর একদিনের জন্যও চিন্তা করেন নি। অন্তত তাঁর বাইরের জীবনে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সারা পৃথিবীতে সে যুগে এরকম দু'চারজন মানুষ ছিলেন কি না সন্দেহ। আজও ক'জন আছেন আঙুলে গোনা যায়। বাংলার ঈশ্বরচন্দ্র বাইরের সমাজের মধ্যেই তাঁর অন্তরের ঈশ্বরকে ধ্যান করেছেন। সমাজ-ই ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর। একথা নির্বোধ বাঙালী সমাজ আজও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। এই উৎসবপ্রবণ বাংলাদেশে তাই বিদ্যাসাগরের কোন উৎসব হয়

---

(৪) Campos : History of the Portuguese in Bengal. Dr. S. N. Sen : "The Portuguese in Bengal" (Hist. of Bengal, Vol II, chap 19).

(৫) Dr. Tarachand : The Influence of Islam on Indian Culture (1936 ed.) পৃষ্ঠা ১১০-১১২। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

না। প্রকৃত পুরুষ ও পৌরুষের বন্দনা করতে আজও আমরা ভয় পাই। ঢাকঢোল বাজিয়ে অন্যান্য নমস্য পুরুষদের যখন আমরা পূজা করি তখন নিঃশব্দে বিদ্যাসাগরের মাথায় একটি ফুল আর বেলপাতা দিয়ে বলি: দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর! অসীম আমাদের দুঃসাহস। এই আত্মপ্রতারণা ও ভীরুতার মুখোস খুলে দিয়েছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৯ সালের ১৭ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন (৬):

"আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এ কথার গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ, বিদ্যাসাগরের অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং বিদ্যাসাগরের সমাজসর্বস্ব চৈতন্যই হ'ল বিদ্যাসাগরের সত্যকার পরিচয়। দয়া নয়, বিদ্যাও নয়। জীবনে তাই ঈশ্বরচন্দ্র কোন দিন 'সমাজ' ও 'মানুষ' ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরের চিন্তা করার অবসর পাননি। অবসর পাননি, সেইটাই বড় কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি করতেন না, সে কথা তিনি বলেননি কোন দিন, জানতেও পারেননি কেউ।

একেশ্বরবাদ প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম ও হুগলী ছেড়ে অনেক দূর চ'লে এসেছি। হুগলী-সপ্তগ্রামে যখন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম ও পাদরি সাহেবদের খৃষ্টধর্মের প্রচার হ'তে থাকে, কলকাতা তখন সাধারণ পল্লীগ্রাম মাত্র। পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির সঙ্গে বাঙালী সমাজের প্রথম পরিচয় হয় পশ্চিম-বাংলার ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। নবযুগের জয়যাত্রার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে-ক্ষেত্র অবশেষে ঐতিহাসিক কারণে স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়।

কলকাতার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেন প্রথমে বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ-বসাকরা, ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় বণিকরা নন। তাঁদের কলকাতায় পদার্পণের আগেই শেঠ-বসাকরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভাগীরথীর পূর্বতীরে সুতার হাট প্রতিষ্ঠা ক'রে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ামের কৌন্সিলের 'ডাইরী ও কনসাল্টেশন্ বুক' থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেঠদের বাগানের খাজনা সম্বন্ধে কৌন্সিল ১৭০৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে দেখা যায়, তাঁরা বলছেন—"They being possessed of this ground which they made into Gardens before we had possession of the towns, and being the Company's merchants and inhabitants of the place."(৭) কৌন্সিলের সাহেব সদস্যরা পরিষ্কার প্রস্তাবের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা টাউনে আসার আগেই শেঠরা জমি দখল করে বাগান তৈরী করেছিলেন। এছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে। বড়বাজারের প্রাচীন শেঠ-বসাক পরিবারের বংশবৃত্তান্ত থেকে এ ইতিহাস অনেকটা পুনরুদ্ধার করা যায়। এখানে ইংরেজদের এই স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। অবশ্য একথা ঠিক, কলকাতা কখন মহানগরে পরিণত হ'ত না, যদি ইংরেজ শাসকদের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র না হ'ত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে জব চার্ণককেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। কিন্তু চার্ণক হঠাৎ একদিন গাছতলায় ব'সে তামাক খেতে খেতে কলকাতায় কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন নি। কিম্বদন্তীর হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা কলকাতা শহর নিছক কাব্যকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী ইংরেজদের 'ইচ্ছার' নিদর্শন নয় কলকাতা শহর। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক তৃতীয় বার 'হল্ট' করেন সুতানুটিতে। হুগলী ছেড়ে সুতানুটিতে কুঠি ও বসতি স্থাপনের এই সিদ্ধান্তের পিছনে শেঠ-বসাকদের শ্রীবৃদ্ধির পরোক্ষ প্রেরণা ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। কেবল কুঠি স্থাপনের জন্যও কলকাতা শহর গড়ে ওঠেনি। কুঠি বাংলা দেশের আরও অনেক জায়গায় ছিল, কিন্তু তার কোনটাই কলকাতা হয়নি। চেতুয়া-বরদার (ঘাটালে) জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইংরেজরা ফোর্ট বা দুর্গ নির্মাণের অধিকার না পেলে (১৬৯৬-৯৭ সালে) এবং কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদার না হ'লে (১৬৯৮ সালে), কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হ'ত না।

সপ্তগ্রাম বা হুগলী নয়, হিজলী বা উলুবেড়িয়াও নয়, কলকাতাই হ'ল বাংলার নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। শুধু বাংলার নয়, ভারতের। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষেই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের তখনও অনেক দেরী। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলীতে নবযুগের সূর্যোদয়ের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম হজেস ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত এদেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। হুগলী দেখে তখন তিনি লিখেছিলেন: "..."The old

(৬) প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯। এই বক্তৃতাটি "চরিত্রপূজা" গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের "বিদ্যাসাগর-চরিতের" সঙ্গে সংযোজিত

(৭) Diary and Consultation Book of the United Trade council at Fortwilliam in Bengal (Dec. 1706—Dec. 1707).

town of Hooghly which is now nearly in ruins, but possesses many vestiges of its former greatness." (৮)

এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল কলকাতা শহর।

১৭০০ সালে বাংলা দেশ স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী হ'ল এবং চার্লস আয়ার হলেন তার প্রথম প্রেসিডেন্ট। তার দু'তিন বছর আগেই কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু পাছে মোগল শাসকদের ঈর্ষার উদ্রেক করে, তাই সে-দুর্গের চেহারা ছিল গুদাম-ঘরের মতন—'Looking more like a ware house'. আয়ার সাহেব দুর্গের আয়তন বাড়ান। ১৭০২ সালের ৬ই অক্টোবর প্রথম বৃটিশ পতাকা ওড়ে কলকাতার দুর্গে। ১৭০৭ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। তার ফলে ইংরেজ মহলে কি রকম চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, ফোর্টের কৌন্সিলের রোজনামচা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

"The whole town and factory are thrown into confusion by the news that the Mogul is dead. As these tidings were received from several sources people were found to credit the story, and great was the consternation at the Fort." (৯)

এই দিনেরই ডাইরীতে তাঁরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"and as a revolution is expected"—টাকা-পয়সা যেখানে যা আছে সব গুটিয়ে আনা দরকার। চার দিন পর আবার তারা পরামর্শ করে ঠিক করেছেন—'Order that sixty black soldiers be taken into the company's service and posted round the towns." অর্থাৎ কি করবেন না করবেন ঠিক করতে পারছেন না, দিশাহারা হয়ে গেছেন। ষাট জন কালাসিপাই কোম্পানীর কাজে নিয়োগ করে টাউনের চারি দিকে মোতায়েন করার সঙ্কল্প করলেন।

বিপ্লবই বলতে হয়! সম্রাট ঔরঙ্গজীব—"the greatest of the Great Mughals save one" (১০) মারা গেছেন। রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন! বিপ্লব অবশ্য সশব্দে হয়নি, নিঃশব্দে হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পরে, ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা অভিযান করেন, এবং তার ঠিক এক বছর দু দিন পরে, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন, যখন তিনি দ্রুতগামী উটের পিঠে চ'ড়ে নিঃশব্দে পলাশীর রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করেন, তখনও বোধ হয় এরকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি।

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সালে কলকাতায় গোবিন্দপুর অঞ্চলের জঙ্গল হাসিল ক'রে নতুন দুর্গের ভিত্তিস্থাপন করা হ'ল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইব দেওয়ানীর সনদ আদায় করলেন। বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে লাগল। ১৭৭৪ সালে বাংলার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হলেন। কলকাতার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের রাজধানী হ'ল কলকাতা। এই বছরেই রামমোহনের জন্ম হ'ল রাধানগর গ্রামে।

এক নবাবী আমল শেষ হ'ল, আর এক নবাবী আমল আরম্ভ হ'ল। ইংরেজদের নবাবী আমল। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই প্রায় তাই বলা চলে। ইংরেজ নবাব এবং তাঁদের বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের স্বর্ণযুগ। 'নবাব' কথাটা ইংলণ্ডেও প্রচলিত হ'ল এবং হব্‌সন্‌-জব্‌সন্‌ অভিধানে তার অর্থ করা হ'ল এই ভাবে :

"It began to be applied in the eighteenth century, when the transactions of Clive made the epithet familiar in England, to Anglo-Indians who returned with fortunes from the East..." (Yule and Burnell : Hobson-Jobs'on : A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words & Phrases : NABOB).

'নবাব' কথার এই আভিধানিক অর্থের ভিতর থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ছবি পরিষ্কার ফুটে উঠে। বাংলার শূন্য সিংহাসনে নকল নবাব বসিয়ে, জমিদারী দেওয়ানী 'ইন্টারলোপারী' করে উৎকোচ উপঢৌকন নিয়ে, প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে সামান্য রাইটার ফ্যাক্টর জুনিয়ার মার্চেন্ট, ও সিনিয়ার মার্চেন্টরা, দেশে ফিরে 'নবাব' উপাধি পেয়েছেন এবং নবাবী করেছেন। নিজেদের দেশের কাগজেই তাঁরা "The Plunderers of the East.' "Robbers and Murderers' 'Execrable Banditti' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা, বস্তা বস্তা হীরে—"Lacks and Crowes of Rupees, sacks of Diamonds—" এই ছিল এদেশ সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণা।. এ-সম্বন্ধে চমৎকার একটি কাহিনী উইলিয়ম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। হিকি সাহেব যখন ভারতযাত্রা করেন তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একখানি তরবারি উপহার দিয়ে বলেছিলেন ; "বন্ধু, এটা নাও—তরবারি নিয়ে ইণ্ডিয়াতে যাও—গিয়ে অন্তত আধ ডজন বড়লোকের মুণ্ডচ্ছেদন করে 'নবাব' হয়ে আবার দেশে ফিরে এসো"। (১১) হিকি সাহেব মিথ্যা কথা লেখেননি সামান্য বেতনের রাইটার বা ফ্যাক্টর হয়ে এসে লক্ষপতি

(৮) William Hodges : Travels in India (London 1794) : পৃষ্ঠা ৪২।

(৯) Diary and Consultation Book (Dec. 1706—Dec. 1707) : ৩রা ও ৭ই এপ্রিল, ১৭০৭।

(১০) A Short History of Aurangzib : Sir Jadunath Sarkar (1930 ed.) : পৃষ্ঠা ৩৮৪। "Save One" কথার অর্থ "আকবর বাদশাহ ছাড়া।"

(১১) The Memoirs of William Hickey : Vol I : পৃষ্ঠা ১১১।

নবাব হয়ে দেশে অনেকে ফিরে গেছেন। তাই রাইটারের চাকরির জন্য বিলাতের পত্রিকায় প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ত উৎকোচের লোভ দেখিয়ে :

WRITER'S PLACE TO BENGAL. WANTED • A WRITER'S PLACE TO BENGAL, for which One thousand guinea will be given.

ক্লাইব যখন মাদ্রাজে আসেন (১৭৪৪ সালে) তখন কোম্পানীর রাইটারদের বাৎসরিক বেতন ছিল ৫ পাউণ্ড, বা মাসে প্রায় ৬৲ টাকা। বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় বিলাতের "The Public Advertiser" পত্রিকায় ১৭৮৫ সালের ১৪ই-১৫ই নভেম্বর। প্রায় চল্লিশ বছর পরে। রাইটারদের বেতন তখন সামান্য বাড়লেও, এমন কিছু বাড়েনি যে তার জন্য এক হাজার গিনি সেলামি দেওয়া যায়। বোঝা যায়, বেতনটা উপলক্ষ মাত্র। আসল হ'ল, মগের মুল্লুক লুঠের সুযোগ।

এদেশে এই ইংরেজ নবাবদের 'গাইড ও ফিলজফার' ছিলেন বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানরা। সেকালের ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই এই দেওয়ান বেনিয়ান সরকার মুন্সী ও খাজাঞ্চীর বংশ। কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি। শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড অফ রেভিনিউর দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত 'লালাবাবু' (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র। আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায় গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন। খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ান ও বিখ্যাত বেনিয়ান ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। সিমলের রামদুলাল দে কেয়ারলী কোম্পানীর দেওয়ানী করেন। জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ পাটনার চীফ মিডলটন সাহেবের ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন। (১২)

সেকালের (অষ্টাদশ শতাব্দীর) বেনিয়ানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বারাণসী ঘোষ, হুদয়রাম ব্যানার্জি, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জি প্রভৃতি। মেয়রস কোর্ট (১৭২৬) ও সুপ্রীম কোর্টের (১৭৭৪) দলিল-পত্র (Court Records) থেকে এঁদের বেনিয়ানির কীর্তিকথা কিছু কিছু জানা যায়। (১৩) কলিকাতায় এখনও এঁদের নামে রাস্তা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাঙালী বেনিয়ানরা ছিলেন সাহেবদের 'interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, supplier of cash and cash-keeper, and in general secret-keeper"—অর্থাৎ অসহায় অন্ধ সাহেবদের যষ্টিস্বরূপ। বেনিয়ানি ক'রে এঁরা প্রত্যেকেই প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। এই সব বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের বংশধররা সকলেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন, কেউ 'ক্যাপিটালিষ্ট' হননি। হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিস এঁদের নতুন জমিদার হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন, বনেদী রাজা ও জমিদারের উচ্ছেদ ক'রে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে তাই করার প্রয়োজন ছিল।

পলাশীর রণাঙ্গনে মধ্যযুগ অস্ত গেলেও, তার বর্ণচ্ছটা আরও প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পর্যন্ত অম্লান ছিল। বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানরা তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের মতন অস্তমিত মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষায়, মনোভাবে, কেউ কারও তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন না। পরবর্তী কালের ইংরেজরা সত্যকার এক নতুন যুগের প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আসেন। তাঁদের আমল থেকেই বাংলা দেশে প্রকৃত নবযুগের সূচনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী দেওয়ান বেনিয়ানদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী কালে এই নবযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পোষকতা করেন।

প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ডেভিড হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা করতে এদেশে আসেন। ১৮০১ সালে ডিগবি সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয় কলকাতায়। তখনও রামমোহন কলিকাতাবাসী হননি। ১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপিত হয়। ১৮১৭ সালে 'লটারি কমিটি' গঠিত হয় এবং কলকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৮১৭ সালেই 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭-১৮ সালে শিক্ষার প্রসারকল্পে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত হয়।

নবজাগরণের কাকলি শোনা যায় কলকাতায়। এই সময়, ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর, বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। [ক্রমশঃ ।

(১২) লোকনাথ ঘোষের "The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc" গ্রন্থের (Calcutta, 1881) দ্বিতীয় ভাগে, কলকাতার পারিবারিক [illegible] সঙ্কলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হ'লেও, অনেকটা [illegible]। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাগজপত্র থেকে (১৮৬১ সালের) সেকালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী বাঙালীদের নাম ও বংশপরিচয় "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ১৩৪৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

(১৩) মেয়রস কোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের নথিপত্র থেকে সেকালের বাঙালী বেনিয়ানদের চমৎকার একটি বিবরণ ডাঃ নরেন্দ্র সিংহ 'Bengal Past and Present' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন (Vol 69, Serial No 132, 1950)।

অবনীন্দ্র-চরিতম্

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

এর পর দিনের পর দিন চিত্রণবিদ্যার চলতে থাকে পাঠ। এ সেই রকমের পাঠ—

যা মলিনতা আনে,—চরিত্রে নয়,—কাগজের শুভ্রতায়,
তীক্ষ্ণতা আনে,—স্বভাবে নয়,—তুলিকার শিখায়,
চঞ্চলতা আনে,—হৃদয়ে নয়,—বর্ণের পল্লবে,
বিহ্বলতা আনে,—মস্তিষ্কে নয়,—ভাবের বরণডালায়।

গৃহশিক্ষক বা গৃহপণ্ডিতের কাছে নিত্যই ত পাঠাভ্যাস করতুম বাড়ীতে; কিন্তু গুরুদেবের এই গন্ধর্ববিদ্যার পাঠই আলাদা। এ পাঠের আকাশও নেই, পাতালও নেই। কী যে পড়ছি তার ঠিক-ঠিকানা'ই নেই, কারণ পাঠ্য কোনও পুস্তকই নেই, নির্ঘণ্টও নেই। এখনও দেখ শ্রীমান্, আমাদের দেশে ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পাঠ্য পুস্তক (?) ছাত্রদের হাতে দেখতে পাওয়া গেল না;—কানুনমাফিক আর্ট ইস্কুল থাকা সত্ত্বেও, হাজার হাজার টাকা ব্যয়িত হওয়া সত্ত্বেও; আশ্চর্য! কিন্তু আমাদের ছাত্রাবস্থায়, সবে ত তখন Oriental Artএর ঘুম ভাঙিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। জগতের বাইরের সব কেতাবই তাঁর কাছে খোলা। সত্যিই শ্রীমান, এই গন্ধর্ববিদ্যার পাঠই আলাদা, এর ভাষা আলাদা, এর অক্ষর আলাদা, এখানে নিজেকেই আবিষ্কার করতে হয় নিজের টেকনিকের মাধ্যমে।

মনে পড়ে যাচ্ছে;—এক দিন বিকেল বেলায় ফুটষ্টুলের উপর বসে আছি, আর ছবি আঁকছেন গুরুদেব। ফ্ল্যাট-ব্রাশে একটু ইণ্ডিগো রঙ নিয়ে ধীরে ধীরে ওয়াশ দিচ্ছেন ছবিতে, এমন সময় চক্ষু দুটিকে চিত্রে নিবেশিত রেখেই বললেন—

"ছবি তো শিখছিস্? বল্ দেখি তো, তোর ছবির জগৎটা কোথায়?"

আমি চুপ করে বসে থাকবার ছেলে নই। উত্তর দিই—

"প্রকৃতির জগৎ। nature এর ঘরই আমাদের ছবির ঘর।"

ফ্ল্যাটব্রাশটিকে সলিল-কুণ্ডে নিমজ্জিত করে, চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে, নয়ন হাসিয়ে বলেন—

"খাসা বলেছেন আমাদের ছোট্টু বাবু। পাঁচ ভূতের জগৎটাই হচ্ছেন তাহলে এই ছবির জগৎ? এই ত? কিন্তু আমরা যে, ঐ ভূতগুলোকেই নিয়ে একটা অদ্ভুত জগৎ সৃষ্টি করে চলেছি। বুঝলি, ঐ ভূতের রঙগুলোই আমাদের বর্ণমালা। তা, আবার মাত্র সাতটি বর্ণাক্ষর—সূর্যিঠাকুরের সাতটি ঘোড়া। এই ছবিখানাই এখন আমার কাছে অদ্ভুত জগৎ। আমি যা দেখেছিলেম, তাই বসেই তো এতে আঁকছি, রূপ দিচ্ছি, গড়ছি নব-রূপের জগৎ। কিন্তু বলতো দেখি, স্রষ্টা বসে থাকেন কোন্ দুনিয়ার ধারে? তাহলেই ছোট্টু বাবু, তোমার ছবির সীমানা-বাঁধা দুনিয়াটা হ'য়ে গেল, কি বলিস্,—এই ছোট্ট শাদা কাগজখানা।"

পড়াতে বসে হাসতে হাসতে কোনো শিক্ষককেই এই রকমের ছেলেমানুষী বুকনী আওড়াতে কখনো শুনিনি; অবাক্ হয়ে যাই। এবং সেই বাক্যহীন বিস্ময়ের মধ্য দিয়েই আমাকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসে নবীন মোহের মত গুরুদেবের আকর্ষণ। গৌরবর্ণটিকে ঘাম দিয়ে অট্টরস-সংযুক্ত বাণীর, প্রবাহ বইয়ে দিতেন আমার গন্ধর্ব গুরুদেব; আর তির্যক্-নয়নে অভ্র মারত হাসির ঝাড়ি।

এই হেন মানুষের কাছে শুভ দিন দেখে প্রথম যেদিন আমি শিখতে যাই, সেদিনকার দুগ্‌ড়ের কাহিনীটি শোনাই তোমাকে, শ্রীমান। তারপরে আসা যাবে অন্য কথায়। এখন, একটানে আঁকা হয়ে যাক্ আমার গুরুদেবের চিত্রম্।

এই ছবিটির পটভূমি,—দক্ষিণের বারান্দা। ঠিক হাটোপাটি নয়,—নির্বাধে গতিবিধি করছে বাড়ীর ছেলেরা। সেখানে জুড়ে নিজের নিজের সিংহাসনে, বারান্দার পূর্বভাগে বসে রয়েছেন শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বারান্দার তথ্য-বিস্তার আগেই বলেছি। ছবি আঁকছেন গগনেন্দ্রনাথ, পরিধানে আলখাল্লা। এবং সমরেন্দ্রনাথ,—থুৎনিতে ঔরঙ্গজেবী দাড়ি, লম্বা চোগা অঙ্গে, টুলের উপরে নিজের খড়ম-পা তুলে দিয়ে;—কেতাব পড়ছেন। তাঁদের প্রণাম সেরে আশীর্বাদ নিয়ে যেই মাথা তুলতে যাব, অমনি শুনি, গগনঠাকুর তাঁর হাল্কা আমীরী কণ্ঠে, ডেকে বলছেন—

"অবনের কাণ্ডটা এক বার দেখেছ? বারান্দায়...সমুদ্দুর বইয়ে দিলে। পা চুপ্‌চুপিয়ে, জল ছিটিয়ে, এবার চলতে থাকুক সবাই।"

বাক্যের অনুসরণ করে দেখি, আমার নবীন গুরুদেব তাঁর আসনটিতে বসে নেই। বারান্দার পশ্চিমকোণায় অন্দরমহলের

পার্টিশানের সামনে একটি প্রকাণ্ড তক্তাপোষ পড়েছে, এবং তার উপরে, ধারে, এপাশে-ওপাশে ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত, টক্‌টক্ করে চর্কী ঘুরছেন অবনঠাকুর। জামরঙের লুঙ্গি, জলে ভিজে গেছে; পিরাণের শাদা পুট-হাতা আস্তিন রঙে রঙ,। হাতে ফ্ল্যাটব্রাশ।—উঠছেন, বসছেন, ওয়াশ দিচ্ছেন, আর রহি-রহি হুকার—

"ঢাল্ জল, ঢাল্ জল—ছবির ভিতরে বাদ্‌শাহী গরম রয়েছে, বাবা,—গরমটা কমে যাক্। কড়া লাইন নরম হোক্। ঢাল্ জল্…"

তার পরেই হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই বল্লেন—"এই যে, এসে গেছিস্। ধর্, কোণা ধর্। জলে অত ভয় কি রে? জল ঘাঁটতে হবে যে রে—চিরটা কাল। ভাখ, ছবি আঁক্‌বার সময়—সিল্কের জামা পরে আসিস্ নি। ছোপ ধরে ধরে একেবারে পাকা রঙের পায়রার খোপ হয়ে যাবে জামা। চেয়ারটার উপর জামাটা খুলে রাখ।…রেখেছ ত? এবার কাজে লাগো শিষ্য, ধর দিকিনি কোণাটা। দে রোদে,—এবার। এবার শুকোও বাদ্‌শা;—রাজসিংগির হাতে যেমন করে শুকিয়েছিলে,—ঠিক সেই রকম।"

প্রকাণ্ড ৬ ফুটি ছবিটিকে ধরাধরি করে,এক বার রোদে ঝল্‌সানো হয়, আবার একটু নরম থাকতে থাকতে তুলে এনে কলার-ওয়াশ দেওয়া হয়। বহুক্ষণ ধরে চলতে থাকে এই রকমের কীর্তিকলাপ। মেহন্নৎ না মেহন্নৎ। ছবি আঁক্‌তেও যে শিল্পীকে নিতান্ত ঘর্মসিক্ত হতে হয়, সে খবর অনেকেই জানেন না; কিন্তু যে পরিশ্রম-দানে একটি ছবি সফল হয়—তার শ্রম-মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য আজও কোনো ট্রাইবিউন্যাল সৃষ্টি হয়নি;—দুঃখের কথা! রোদ আর জলে যুগপৎ ভিজতে ভিজতে গুরুদেবের নাটুকে কথা শুনি—

"বুঝেছিস্,—রঙগুলোকে একেবারে সেঁদিয়ে দিতে হবে—কাগজের মগজে।…ভাসা রঙ চল্‌বে না হে জলছবিতে।…

—বুঝেছিস্ শিষ্য, যত ভিজোবি আর শুকোবি, তত পরমায়ু বাড়বে ছবির। Secret। ভেজাও ভেজাও।…

—বুঝেছিস্, ছবির আবার immortality, আবার permanency। ওতো জলের হাতে আর রোদের হাতে।…

—বাদশা এলে খুসী হোতো। কি বলিস্।"

পার্টিশানের ধারে দু'জন ভৃত্য এসে তুলে ধরে রৌদ্রতপ্ত তসবির। গগনঠাকুর চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন, বল্লেন—

"অবন্, ব্যস্, এইখানেই ইস্তফা দাও। আর কিছু করতে যেও না যেন ছবিতে। বল্লে তুমি শোনো না। শেষ ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

সমর ঠাকুর সায় দেন, বল্লেন—"উৎরে গেছে। আমার এই নতুন দাড়ির নূরটার model না পেলে, কি আর অমন দাড়ি আঁকা হোতো বাদশার?"

শ্রীমান, এই ছবিটিই অবনঠাকুরের প্রসিদ্ধ "আলমগীরের" ছবি। কী ওতোপ্রানটাই ভুগিয়ে ছিল আমায়,—চিত্রণ-শিক্ষার প্রথম দিনে। তাই ভুলিনি।

লুঙ্গির দুরবস্থা দেখে ভাবছি, কেমন করে রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরব, এবং পাঞ্জাবী সিল্ক বসনটিকে তুলে ধ'রে রোদে শুকোতে তুলি সমানে বর্ণাঘাত করে চলেছে আলমগীরের বহিরঙ্গে। শেষে যখন "রাধু" চাকর এল—খাস-চাকর—এবং গোল রূপোর ডিবের করে মনিবের সামনে তুলে ধরল চার খিলি পান, তখন "আর নয়" বলে সোজা হয়ে, মাজা চিতিয়ে, দাঁড়িয়ে ওঠেন দীর্ঘ-তনু পুরুষ, থেমে বল্লেন—

"একটা পান খেয়ে নে, চল্, পাখার তলায় বসি।" তিনটি ঘণ্টা পুরো ধস্তাধস্তির পর গুরুদেবের মুখে ফুটে ওঠে এই স্বস্তির হাসি।

এদিকে কারু-কার্য-করা ছবির সামনে বাড়ীর আত্মীয়-স্বাউজিয়া এসে জমায়েৎ হয়ে গেছেন। জমাট বেঁধে উঠেছে প্রশংসা। কেউ তারিফ করেন তলোয়ারের বাঁটের,—আহা, কী কারুকাজ! Calligraphy। সিয়াকলম্। কেউ তারিফ করেন বাদশার মুকুটের পান্নার কন্তা। ওঃ। ঝাপটা এঁকেছেন বটে একখান!…

আর আমি দাঁড়িয়ে থাকি স্তম্ভিত।

সত্যিই, শ্রীমান, তারিফ না করে পারা যায় না, সেই বিরাট ওয়াটার কালারটির। তখনকার দিনে এর আগে অতবড় জলের ছবি আঁকা হয়েছিল কি না সন্দেহ। একেবারে নোতুন। গুলে খেয়ে ফেলেছেন "বিজাদী" কলম্। প্রতিটি ইকি তার শাহী, মুন্সী।

আর,—তার মধ্যে, আলমগীরের সেই হিংসাস্তিমিত চক্ষু, ধর্মভীরু শুভ্র শ্মশ্রু, সম্রাট শকুনির মত খর্ব-কপিশ দৃঢ়-দৃঢ় গ্রীবা!—তার মধ্যে, আলমগীরের-সাত্বিকতার মত, সেই শুভ্রবসনাবৃত সংযত দেহ, এবং তামসিকতার মত, সেই তরঙ্গু-ভূষিত শিরোভাগ!—তার মধ্যে,—ধর্মগ্রন্থ এক পবিত্র কোরাণ, এবং হিংসার ইতিহাস এক মুক্তহাস তলোয়ার! ধর্ম এবং হিংসা, এই দ্বয়ী, যেন নবৈক কলেবর ধারণ করে অভাবনীয় 'চিত্র' হয়ে উঠেছে বাদশার মধ্যে। বিনা-প্রশ্নেই চিত্রখানি যেন জানিয়ে দেয় তার আত্মনিষ্ঠ ভাব। ব্যঞ্জনার রাখে না পদচিহ্ন।

শ্রীমান্, কিছু দিন পূর্ব্বে, এই 'গ্রেট মোঘলের' ছবিটির সঙ্গে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল;—শান্তিনিকেতন "কলাভবনে" কাচ দিয়ে কেন যে সেটিকে বাঁধাই করে রাখা হয়নি, বুঝতে পারি নি। প্রাক্তন অযত্ন-রক্ষায়, তার অনেক জায়গায়,—বিশেষ ক'রে নীচের দিকে—মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেছে রঙ। যাবার কথা নয়, তবু—গেছে। তাই বলছি, প্লেটগ্লাসের মধ্যে শীল-মোহর করে রেখে দেওয়া উচিত ভারতবর্ষের এই যেন শিল্প রত্নগুলিকে। বাঙালী কারিগরের মেহনতে পড়লে, কতদূর উন্নত হতে পারে "বিজাদীর" কলম, নিদেন পক্ষে, তার নমুনা-হিসাবে। "গুরুজী"র পরে আমার গুরুদেবের কলম অদ্ভুত ভাবে সার্থক,—এবং জেনে রেখো পূর্ণাঙ্গভাবে সার্থক।

প্রশংসামুখরিত সেই দক্ষিণের বারান্দায় এমন সময় হঠাৎ আবির্ভূত হলেন—নাম মনে নেই—'মডার্ন' কাগজের তদানীন্তন এডিটর। আমার কাছে তিনি নূতন, কিন্তু এবং এ তিনি পুরাতন। আমুদে লোক, সকলেরি চাচা। সম্ভাষণাদি সমাপন করে দেখতে চললেন ছবি। আনন্দের গোলাপ ফুটে ওঠে তাঁর গালে। তাজ্জব, বড়িয়া—এই রকমের কিছু একটা উর্দু প্রশস্তি উচ্চারণ করতে যাবে তাঁর ঠোঁট,—এমন সময়, আয়নার মত কালো হ'য়ে গেল তাঁর মুখ: যেন তিনি ভূত

"বড় গলতি হয়ে গেছে,…এ তো…তস্‌বির হয়নি,…
এ ছবি যেন এক্সিবিশনে না যায়।"

আমরা সবাই হকচক। বলছেন কি এডিটর সাহেব? এ ছবিও ছবি হয়নি? বাদশা, তুমি কি শুধুই "ছবি, শুধু পটে লিখা"! "রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি,"—তুমি কি নও! কিন্তু:—শাস্ত্রে আছে—"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। তাই এডিটর সাহেব জানিয়েছেন আপত্তি! এ ক্ষেত্রে, কী হয়নি, কেন হয়নি,—ইত্যাদি সহজ অথচ দলিত প্রশ্নই সকলেরি মুখে ওঠা স্বাভাবিক। উঠলও তাই। কিন্তু এডিটর সাহেব ঘাড় নাড়েন। কিছু যেন বলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। ঘাড়ের নীচে যেন শিরাগুলিকে টেনে ধরেছে কেউ।

অবন ঠাকুরকে শেষে উঠতেই হয়। ছবির সামনে এসে দাঁড়ান, জিজ্ঞাসা করেন।

"মির্জা, তকলিফ, গোলাম, গাফিলতি হল কোথায়?"

অবনীন্দ্র-ভক্ত এডিটর সাহেব অনেক-মাফি-ইত্যাদি মেঙে, শেষে অনেক প্রচেষ্টার পর বলে ফেলেন—

"গুরুদেব, বাদশার তলোয়ার কোরাণশরিফের বুকের মাঝখান দিয়ে চিরে চলে গেছে। ইস্‌লাম্ কেমন করে…?"

পিন্‌পতন নিস্তব্ধতা!

কে যে তখন কী বল্‌বে,—তা কেউ নিজেই জানে না!

গগন ঠাকুর উঠে এলেন। বড়দাদার মত পেশোয়ারি চালে, পিছনে হাত রেখে, উঠে এসে দাঁড়ালেন,—ছবির সামনে। বাতাসে কাঁপ্‌ছে তাঁর আপরোট-রঙের আলখাল্লা।

গাল চুলকোতে চুলকোতে বলেন—

"তাইতো,…অবন…ও…তো…ঠিকই বলেছে!…ইস্‌লামকে চিরতে যাবেন কেন আলমগীর?…তুমি…না হয়…এক কাজ কর। ওটা বদলে দাও। হাতে মালা তো আছেই,…কেতাবটাকে মুছে দাও।"

কথা বলেই মানুষ হয় খালাস। কিন্তু এখন বদলে দেবে কে? বদ্‌লানো কি এতই সহজ? রোদ-বিষ্টি খেয়ে ইন্দ্রের মত, রাজপাটে বসে গেছে রঙ্‌। অত deep রঙ্‌ সে কি মোছা যায়? ঘষতে ঘষতে কাগজ ছিঁড়ে যাবে যে।

সমর ঠাকুর ফ্যাকাশে হাত নেড়ে বক্রাঙ্গুলের ইঙ্গিতে বলেন—

"ছবিতে,—কোরাণ না থাক্‌লে, ও ছবি আমার ছবিই হবে না আলমগীরের। ওটি যদি না থাকে, তা হলে, কোনো মানেই হয় না ছবির। কোরাণ রাখতেই হবে দুকলে, অবন।"

আমাদের মুখের দিকে দু'জনেই দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু আমরা সকলেই তখন অপ্রস্তুত। বলতো শ্রীমান, এ হেন ক্ষেত্রে কোনো suggestion দেওয়া আমাদের পক্ষে কি সম্ভব ছিল? আর, ছবির মধ্যে, ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা করাটাও তো ভাল কথা নয়। নীল ইস্পাতের একখানি বাস্তব ছোরা, বিধর্মী পর্দানের মধ্যে সেঁদিয়ে যেতেই বা আর কতক্ষণ? সে যুগই ছিল আলাদা। আর হয়েও ছিল তাই, কিছু দিন পরে কলকাতায়। পুস্তক প্রকাশক সেন ব্রাদার্স কোম্পানীর "সেন"-বাবু মহাশয় প্রাণ হারিয়েছিলেন "হজরৎ মহম্মদে"র একখানি ছবি ছাপিয়ে;—ইস্কুল-পাঠ্য কোন এক কেতাবে। ভাবনার কথা বই কি!

এবং সেইক্ষণে গুরুদেবের অন্তরের মাঝখানে…গম্ভীর কোনো আলোচনার আন্দোলন হয়েছিল, বা চলছিল;—বা, ছবিটিকে ছুরি মেরে ছিঁড়ে ফেলবার আগ্রহ জাগছিল, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলা; কিন্তু ওরূপ ক্ষেত্রে আমি হ'লে ছুরিকাঘাতে দীর্ণ ক'রে, নিপাতনে সিদ্ধ করতুম শাহীচিত্রকে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু গুরুদেবের স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখে অবাক্ কাণ্ড, কোনো ভাবেরই প্রকাশ হয় না। ওষ্ঠাধরে বিনয়ের রসকলি টেনে, এডিটর সাহেবের কাঁধ ধরে চলতে চলতে তিনি বলেন—

"বুঝেছ এডিটর সাহেব, ছবির জান্‌টাকে আজ তুমি বাঁচিয়েছ।"

বলেই গুরুদেব বসে পড়েন আরাম-কেদারায়। তিন ভাই আর এডিটর সাহেবে মিলে, তখন চলতে থাকে গল্প। জমজমাটি সব গল্প। দেখতে দেখতে এডিটর সাহেব তো মসগুল! আর ইতিমধ্যে কখন যে মাঝে মাঝে উঠে, পদচারণ করতে করতে চিত্রশোধন করে ফেলেছেন গুরুদেব, কারোর নজরেই পড়েনি সেটি। খেয়াল নেই কারোর। হাঁ ক'রে, হ্যাবাগঙ্গারামের মত আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সব কিছুই দেখছি! তার পরে এডিটর সাহেবের কাঁধে টোকা দিয়ে গুরুদেব বলেন—

"অনেক বেলা হয়ে গেল। এই বার…দেখত হে এক বার… তোমার বাদশাকে।"

জহরতের নকরকে—"মডার্ণ"র এডিটর সাহেব দেখালেন। দেখেই,—অদ্ভুত রসের একখানি মুখ সৃষ্টি ক'রে, দৌড়ে গিয়ে জোড় হাতে ধরলেন, গুরুদেবের স্বতঃ প্রসারিত দক্ষিণ করপল্লব। বল্লেন—

"ব্যস্, ঠিক হয়ে গেছে! খোদা জানে আপনার হাত!"

গুরুদেবের হাস্য বলে—

"মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে, কোরাণ আর তলোয়ারের মিল করিয়ে দিয়েছি হে। বাদশার মেজাজ-তো এখন খুশ?"

উপস্থিতবুদ্ধির দৌড়ই বলো, বা—ড্রাফটম্যানশিপের অদ্ভুত বাহাদুরিই বলো,—এত সহজে কণ্টক উদ্ধার করতে কাউকে দেখিনি। একটি-দুটি রেখার টানে তলোয়ারখানিকে বন্ধ করা হয়েছে মলাটে, এবং কাজে কাজেই কোরাণের পাতাগুলি তলোয়ারের ওপারে ঢাকা। বিরোধ-বুদ্ধির সমীকরণ হয়ে গেল এক আঁচড়ে,—শাহজাদী চিত্র ধর্মে।

শ্রীমান্, গন্ধর্বলোকের ধর্মের স্বরূপই পৃথক। হিন্দু, মুসলমান জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি লোকায়ত ধর্মের মত, তিনি আচরণশীল বা আচারবিশিষ্ট হয়ে চলেন না, তিনি কেবল ভাব এবং রসের ঘোড়াকে রঙ, রেখা ও সুরের শিল্পরথে জুতে দিয়ে রশ্মিহস্তে চালিয়ে নিয়ে যান সত্যসুন্দরের অভিমুখে। তাই, শ্রীমান্, দেখা যায়, যেখানে লৌকিক ধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ হয়েছে চিত্র বা মূর্তি সেইখানেই সে হয়ে উঠেছে কলহ বা বিদ্বেষের কারণ। ধর্মান্ধের হয় তার অভিপূজন করেছে, নয় তাকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলেছে। সেখানে চিত্র হারিয়ে ফেলেছে তার সার্বলৌকিক আবেদন। কিন্তু ভাব ও রসের পথ ধ'রে যখনই শিল্পী প্রয়োজনমত নিপুণ ব্যবহার ক'রে প্রাকৃতিক রূপকে (form), তখনই তা শিল্পসত্তার অদ্ভুত সমাদর লাভ করে বিশ্বের রূপরসিক সমাজে।

এক দিন বিকেল বেলায়, যখন "বাগেশ্বরী" lecture লিখছিলেন গুরুদেব, প্রসঙ্গক্রমে এই আলমগীরের ছবিখানির উল্লেখ ক'রে, তিনি আমাকে যা বুঝিয়েছিলেন তাঁর ভাষাতেই সেটি বলি—

"মতের চশমা দিয়ে দেখলে, অজন্তা ছবিতে কেন,—তাদের মধ্যেও অপরিণতি ও কলঙ্ক দেখা যায়, এবং সেই দোষ ধরে বিশ্বকর্মাকেও বোকা বলে, উড়িয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু সৃষ্টির প্রকাশ হ'ল স্রষ্টার অভিমতে; শিল্পের প্রকাশ হল শিল্পীর অভিমতটি নিয়ে; ব্যক্তি-বিশেষের বা শাস্ত্রমত বিশেষের সঙ্গে না মেলাই তার ধর্ম।"…(বাঃ পৃ. ১৩৩)।

সেই জন্যেই সেদিন যখন 'মডার্ন রিভিউ'র এডিটর সাহেব তাঁর আলমগীর চিত্রের ত্রুটি দেখিয়ে দেন, তখন গুরুদেবকে বিচলিত করেছিল,—তলোয়ারের কোষাণ-বক্ষ-বিদারণ খেলা নয়, পরন্তু চিত্রটিকে মতবাদের ঊর্দ্ধে তোলার করণীয়তা এবং স্বাভিমতে প্রতিষ্ঠার উপায়-চিন্তা। সেই হেতুই তিনি অত সহজে শোধন করতে পেরেছিলেন ছবির ত্রুটি। সেইক্ষণেই আমি চিনেছিলেম আমার গুরুদেবকে। এ তো সহজ গুরু নয়,—যিনি বলতে পারেন।

"এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্বলোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে,—সমস্তই দিব্যদৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ। যে এত দিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, স্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা।" (বাঃ পৃ. ৫১)।

এই রকমের অদ্ভুত শিক্ষানবীশীর মধ্য দিয়ে, শ্রীমান, অনেক বসন্ত আমার কেটে গেছে। কিন্তু গুরুদেবের এই শিক্ষণ পদ্ধতির উৎস কোথায়, সে খবর আমার জানা ছিল না। অথচ এতই সহজ, এতই উদার, মেঘমুক্ত তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি! "বেলী-পিসি"র সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে অকস্মাৎ সেই উৎসের সন্ধান আমি পাই।

'বেলী পিসি'টিও দেখি, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া চম্পকবর্ণটি ছাড়া, আর সব কিছুই কি পেয়েছেন তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে! সেই হাবভাব, সেই বাচনভঙ্গী, অঙ্গুলির সেই অদ্ভুত আন্দোলন। তিনিই বলছেন:

জানিস্, বাবামশায়ের…চিরটাকাল…খেলার সখ। তার মধ্যে পাখীর সখটি—ভীষণ। তুই যখন শিখতে এলি, তখন পাখীর সখ নিবে গেছে বাবার। "করুণা" (অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা) মারা যাবার আগে পর্য্যন্ত পাখীর সখ ছিল বাবার। তার পরে ছেড়ে দেন।

নীচের বাগানের গোলপাথরের ফোয়ারাটির পূব দিকে ছিল একটি চৌকো Summer House। তারি বাঁ পাশে, ঐ পাখীর ঘর। আর তার উত্তর দিকে গোলঘর, টালির ছাত, জালঘর। অগুনতি পাখী ছিল তাতে। তিনটি ভাই-এরি পাখীর সখ ছিল, কিন্তু বাবামশায়ের ছিল—সখ নয়, বাতিক। পাখীর বেয়ারা রয়েছে, খাওয়ালেই পারে, কিন্তু তা হবার নয়, গুরুজনরা নিজেরাই হাতে করে পাখীদের খাওয়াবেন। জ্যাঠামশাইরা, আর বাবা,—সকলেই ভোরে উঠতেন। হাত-মুখ ধুয়ে তাঁদের প্রথম কাজ ছিল পাখীদের খাওয়ানো। কত রকমের পাখী, আর তাদের কত রকমের খাওয়া! পাখীর বেহারা যোগাড় করে রাখে,—কাঁকনি দানা থেকে টিক্কিক আপেল কেঁচো। বুঝেছিস্, সেই সব খাওয়ানো তো চাই-ই আর তার পরে যখন তিন ভায়ের জন্যে গোলঘরে এসে হাজির হোলো সকালের দুধ-রুটি-বাল্যভোগ, তখন আগেই সেই দুধরুটির ভাগ পাবে পাখীরা, পরে খাবেন নিজেরা। পঞ্চাশ বছর আগে, এই রকমের অদ্ভুত পাখীর সখ অনেকেরই ছিল সহরে, কিন্তু বাবামশায়ের ব্যাপারখানাই আলাদা। দোতলার বারান্দায় তাঁর নিজস্ব পাখীর কারখানা। জোড়া জোড়া সেখানে থাকত ময়ুরা, লাভবার্ড, লাল ফুলটুস্কি, রামগঙ্গা, কেনেরি, ময়না। সেই স্পেশাল ডিপার্টমেন্টে বাবামশায় পাখীর বাচ্চা পুষতেন। ধাড়ী পাখীগুলো ডিম ফুটিয়ে যেই বাচ্চার মুখ দেখল, অমনি খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হোলো তাদের। তারা ছুটি পেয়ে গেল। তারা উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে; আর নাওয়া-খাওয়া ভুল হয়ে যায় বাবামশায়ের; তিনি বাচ্চা মানুষ করছেই পাগল। তাঁর পাগলামির চোটে মা পাগল, আমরা পাগল, বাড়ীর লোকজন হিমসিম। পাখীতে যেমন করে বাচ্চা পালন করে, ঠিক তেমনি করেই বাচ্চাগুলোকে তাঁর পালন করা চাই,—ঠোঁট ফাঁক করে তুলো ভিজিয়ে জল খাওয়ানো চাই, ছাতুর কৎ খাওয়ানো চাই। নিজের ঠোঁটের ডগায় ফল নিয়ে বসেই আছেন তো বসেই আছেন আর বাচ্চাগুলো কচি কচি ডানায় ভর দিয়ে ফল ঠুকরে খায়। ঠিক যেমন করে মা আমাদের কচিবেলায় মানুষ করছেন, তেমি আদরে, বকে-ঝকে, গান শুনিয়ে বাবামশায়ের—পাখী মানুষ করা চাই। তাদের মধ্যে কী রহস্য খুঁজছিলেন বাবামশায় জানি না,—কিন্তু এতে এক নতুন ফল দেখা গেল পাখীর সংসারে; তারা ভাল বেসে ফেলল বাবামশায়কে। বাবামশায়কে দেখলেই তারা চাকু-পাকু করে উঠত, যেমন সাধারণতঃ তাদের মাকে ঘিরে তারা হুপু তুলে, ঠোঁট ফাঁক করে, ডানা কাঁপিয়ে, চ্যাঁ চ্যাঁ করে।

এতোতেও সখ মিটত না বাবামশায়ের। যেই ডানা ঝাপটা দিল বাচ্চা, অম্নি তাদের খাঁচায় আটকে রাখা বাবামশায়ের পক্ষে—সইবে না,—অসম্ভব। "দাও, ছেড়ে দাও ওদের, ওরা মানুষ হোক; অমন ক'রে খাঁচায় পুরে রাখলে মানুষও অমানুষও হয়, পাখীও অপক্ষী হয়।"

সত্যিই, উড়িয়ে দিতেন—পাখী; অত যত্ন আত্তি করে মানুষ করেও। আচ্ছা, বলত, কেউ কখনও ফুলটুস্কি, আর কেনেরিগুলোকে ছেড়ে দেয়? তারা কি আর খাঁচায় ফেরে? আমরা চেঁচামিচি করলে বাবামশায় বলতেন,—

"এত বড় বাগান রয়েছে, পাখীগুলো বেড়াক। তোরাও তো বাগানে বেড়াস, তাই বলে কি তোরা পাঁচিল ডিঙিয়ে, ট্রাম গাড়ী চেপে, চৌরঙ্গী পালিয়ে যাস? দেখিস ওরা কিছুতেই পালাবে না।"

আর পাখীগুলোও ছিল তেম্নি ধড়িবাজ! বাবা মশায় বাগানে দাঁড়িয়ে যেই ছোট একটি শিস্ দিয়েছেন, অমনি, এ গাছ থেকে, ও গাছ থেকে, ফুড়ুক ফুড়ুক করে নেচে নেচে, নেমে আসছ সেই পাখীর দল—ধাড়ী, বাচ্চা সব, হাতে বসুক, কাঁধে বসুক। কিন্তু তিন তলার নার্সিং হোমে ফিরে ঢোকবার আর তারা ছাড়পত্র পেতো না! ডিম পাড়বার সময় হলেই আবার ছুটে তারা ল্যাজ নাচিয়ে হাজির হয়ে যেত খাঁচার আঁতুড় ঘরে। এ এক আচ্ছা সৌখীন খেলা ছিল বাবা মশায়ের। বললেই বলতেন—

"আমার পাখী বনের পাখী। তাই আসে,—বুনো মানুষের কাছে। বনেদী পাখিগুলো নেমকহারাম।" [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

হঠাৎ শক্ লাগলে যেমন চমকে উঠতে হয় তেমনি হঠাৎ জেগে উঠলাম স্বপ্নলোক থেকে, কোন এক জনের প্রশ্নে: কাল মাঠে যাচ্ছেন ত'? মনে পড়ে গেল এটা কফিহাউস, দুর্গার পিতৃগৃহ লোয়ার সার্কুলার রোডের পর্ণকুটীর নয়, মনে পড়ে গেল সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড-টাইম, নয় পঁয়ত্রিশ বছর আগের ফেলে-আসা জীবনের স্বর্ণকাল, প্রথম যৌবনের নানা রঙের দিন এ নয়, কিছুতেই নয়। আরও মনে পড়ে গেল কফিহাউস তার দরজা আজকের মত বন্ধ করে দেবে আর একটু বাদেই। বাড়ী ফিরতে রাত হবে ন'টা। তার আগে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাসের অপেক্ষায়। বহু দূর থেকে বাসকে আসতে দেখে মনে মনে সেক্সপীয়র আওড়াতে হ'বে 2-B বা not 2-B that is the Question.

ইতোমধ্যে আবার সেই একই ব্যক্তির দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা: কাল মাঠে যাচ্ছেন ত?

কী জবাব দেব ওর? হাসলাম। হেসে বললাম: কালকের দিনটা মাঠে না যাওয়া গেলে ত এ বছরটাই মাটি। কাল ভাইসরয়েস কাপ, থুড়ি প্রেসিডেন্টস।

সত্যিই-তাই। হর্স রেসে না গেলে, খেলতে না হক দেখতে ত এক বার যদি না যান হর্স রেস, তা'হলে হিউম্যান-রেসের অনেক দিক আপনার অজ্ঞাত থেকে যাবে। মানুষের আশা, মনের কত অন্ধকার দিক দেখা দেয় আমার আপনার এর-ওর-তার সকলের চোখে। দেখা দিয়ে দ্রুত মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার দেখি আরেক দৃশ্য! ঠিক যেন ফিল্মের রীল শুধু ছায়াচিত্র নয়, কায়াচিত্র!

শনি, ফকিরকে রাজা করে, রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা করে যেমন ফের ফকির করবার জন্যে, তেমনি রাজাকেও ফকির করে কখন কখন আবার রাজা করবার জন্যেই; তাই শনিবারকেই যে রেসের জন্যে প্রকৃষ্ট দিন বলে গণ্য করা হয়েছে, তার পেছনেও ভাগ্যের নির্দেশ আছে কি না কে ব'লবে?

বহু কাল আগে এক দিন অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে যেতে হ'ত মানুষের পেছন পেছন। আজ বিশ্বমেধ যজ্ঞের দিনে মানুষকে যেতে হয় অশ্বের পেছন পেছন।

সোনার পাথরবাটি কিংবা অশ্বডিম্ব, এ দুই-ই অলীক, অসম্ভব, অবাস্তব। যদি সত্যি সত্যি এ-বিশ্বাস মানুষের থাকত, তাহলে হর্স-রেসের হত না জন্ম, লটারী বলে থাকত না কোন বস্তু। জীবনের পাজল সলভ ক'রতে না-পারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়দের জন্যেই না দেশে দেশে ক্রসওয়ার্ড পাজল।

কিম্বদন্তীর কাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মানুষ যত মিথ্যে জন্মো করেছে, তার মধ্যে কোন্ কথা'টা সব চেয়ে বড় ধাপ্পা, ভাববার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। যে-মানুষ মদ খেয়ে বলে দুঃখ ভোলবার জন্যে খাচ্ছি, এ-প্রাইজ তার প্রাপ্য, না যে রেসে গিয়ে বোঝাতে চায় যে এ তার ঘোড়া-রোগ নয়, সে এসেছে sports-এর জন্য,—সব চেয়ে বড় মিথ্যে বলার সত্যিকারের কৃতিত্ব তারই!

কোন এক কালে রাজারা সিংহ-মানুষে লড়িয়ে দিয়ে, সুরার পাত্র হাতে নিয়ে মজা দেখতে দেখতে লুটিয়ে পড়তেন সাকীর গায়ে। সে দিন মানুষ ছিলো পশুর চেয়ে ভয়ংকর! এই নর-সিংহের সংগ্রাম হ'ক না যতই পৈশাচিক, অসভ্যোচিত, এবং বিত্তবানদের প্রতিক্রিয়াশীল খামখেয়াল, তবুও এর মধ্যেই যেন ছিল সত্যিকারের সেনসেশানের পরিচয়, থ্রিলের রোমাঞ্চ। তার বদলে আজকের সার্কাসে আফিং-আসক্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে চাবুক আস্ফালন হাস্যকর এবং মেয়েলী। মানুষের সেই অমানুষিক পৌরুষের দিন গেছে, এবং তার বদলে এসেছে একেবারে নিরামিষ। খেলা, যেখানে গায়ে গা ঠেকলেই আছে পাহারাওলার বংশীধ্বনি। কিন্তু যে-খেলা দেখবার সময় বড় কথা নয় গা বাঁচান, বড় কথা চোখ বাঁচানো। তাই গায়ে গা ঠেকে যাওয়া নয় কিছু, গায়ে গায়ে জড়াজড়িতেও বড় জোর সরি অথবা excuse me, কিন্তু দেখতে গিয়ে সাদা চোখে দেখার নেই পাট, তাই চোখের ওপর সেখানে বাইনোকুলারের চোখ ওঠা বেশীর ভাগেরই। এরই মধ্যে পুরাকালের সেই

মানুষ-পশুর উন্মত্ত হুহুঙ্কারের ক্ষীণতম সুর ধ্বনিত হয় অশ্বখুরেই এক মাত্র।" কিন্তু শুধু সেই থ্রিলের সন্ধানে যারা সেখানে যায় তারা ক'জন? কিন্তু যারা বেঙ্গলায় Race-goer, অর্থাৎ যাদের শনিবারের পাকা হাজিরা রেসের মাঠে, তারা Sportsএর থ্রিল খোঁজে না, অনুসন্ধান করে টিপস।

ভারতীয় রমণীর ঠোঁটে সিগারেট, এখনও বিলাতি মেয়ের গায়ে শাড়ীর মত দেখে অবাক হবার। কিন্তু রেসের মাঠে শাড়ীর পাড় ট্রাউজারের ক্রিজের পাশে কারুর কাছেই করে না বিস্ময়ের উদ্রেক। এই একটি মাত্র জায়গাতেই বলা চলে, নারী ও পুরুষে ঘোড়ার চক্ষে কোন ভেদাভেদ নাই। এমন কি সেই সঙ্গেই আনাড়ী লোক এবং স্ত্রীলোকেরও এখানে সমানাধিকার প্রথম দিন থেকেই বিনা তর্কে স্বীকৃত।

শুধু তাই বা কেন?—যাদের পড়া-শুনো Horse is a noble animal, (যার অপূর্ব অপরূপ বাংলা অনুবাদ হল: অশ্ব অতি মহৎ জন্তু!) পর্যন্ত, মানে ফার্ষ্ট বুকের সেই ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত যাদের দৌড়,—তাদেরও ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাবার নেই বিরাম।

এম, এ, থেকে ইউ, এম, মানে মাষ্টার অফ আর্টস থেকে আণ্ডার ম্যাট্রিক, রকফেলার থেকে রকে বসে যাদের নরক গুলজার, আশী বছরেও যাদের বুদ্ধি হ'ল না সেই টাক-মাথা থেকে টাকার মূল্য যাদের মাথায় ঢোকার বয়স হয় নি তখনও, এমনই অর্বাচীন পর্যন্ত। ইণ্ডিয়ান, খাস ইউরোপীয়ান এবং তার সঙ্গে না দেশী, না বিদেশী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের,—কারুর জন্তেই এখানে এই একটিমাত্র জায়গাতেই লেখা নেই: No Vaccancy।—তার বদলে এখানে অলিখিত আমন্ত্রণলিপি সর্বদাই পেশ করা আছে Wel-Come।—সু-স্বাগতম্!

যারা মাঠে ঢুকল শুধু তারাই নয়, কিন্তু যারা মাঠের আশ-পাশ আছে জুড়ে তারা ত' বটেই, যারা নেই মাঠের ধারে-কাছে, তারাও অনেকে নগদে অথবা ধারে খেলে তাকিয়ে আছে ঘোড়দৌড়ের রেজাল্টের দিকে। কেউ একা, কারা বা অনেকে মিলে জেতাবার জোটায় আছে জোরকাট! পাঁচ টাকায় দিতে পারে দু'হাজার,—এই কল্পনায় গড়া তাদের ঘর বানাতে বানাতে হিসেব থাকে না তাদের, যে, কত দু'হাজার, পাঁচটা টাকাও আনে নি পকেটে!

অশ্বঘোষ লিখেছিলেন বুদ্ধচরিত। মানুষ যে আসলে বুদ্ধু তা জানবার পর থেকে প্রতি শনিবার পৃথিবী জুড়ে রেসের মাঠে চলেছে অশ্ব লিখিত বুদ্ধচরিত রচনা। হর্স রেস, নয় হিউম্যান রেসের যা প্রয়োজন, তা হ'ল একটু হর্স সেন্স!

কিন্তু যারা যায় রেসের মাঠে তারা কি কেউ-ই বোঝে না যে, জুয়াতে রূপো চলে যায়, আসে না রুটি। রেস খেলে যদি রোজগার হ'ত, তাহলে প্রয়োজন থাকত না উদয়াস্ত পরিশ্রমের, দশটা-পাঁচটার জন্তে মানুষ করত না দাসবৃত্তি, জিওমেট্রির মত সহজেই করা যেত un-employment Problem সল্ভ!

নিশ্চয়ই বোঝে কেউ কেউ এ তথ্য। কিন্তু যখন বোঝে তখন আর সময় থাকে না। শেষ সময়ে বড় ডাক্তারকে Call-দেওয়ার মত! জলের জলের মত যখন টাকা খরচই সার হয়,—ডাক এসে গেছে যার, তাকে আর ধরে রাখা যায় না তখন! কেউ বোঝে যে ঠকে শেখে, দেরী হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে, তার গল্প ত' আমরা সবাই জানি। সেই দুর্ধর্ষ বড় লোকের এক মাত্র দুলালের কাহিনী। ইনসলভেন্সির এপ্লিকেশান নিয়ে যখন সে আদালতের শরণাপন্ন, তখন বিচারক জিজ্ঞেস করলেন: বসে বসে সাত পুরুষ ধরে খেলেও, আসল টাকায় যার হাত পড়ার কথা নয়, সেই অত টাকা তুমি ওড়ালে কিসে? 'আজ্ঞে', উত্তর দিল হৃতসর্বস্ব সেই ক্রোড়পতির এক মাত্র তনয়, তখন তার চোখ খুলেছে, বর্ণ পরিচয় নয়, বোধোদয় পর্যন্ত পাঠ নেওয়া হয়ে গেছে নির্মম বাস্তবের, সে বলল সুস্পষ্ট স্বরে, আস্তে আস্তে: "It is due to Slow horses & fast women, My Lord."

ঠিক তাই। জুয়া থেকে জুয়াচুরির পথও নয় খুব দূর। কারণ, টাকার জন্তে যাদের নেশা থাকে তারা যেমন এক দিন টাকা করেই, নেশার জন্ত যাদের টাকার দরকার তাদেরও কেমন ক'রে জানি জোগাড় হ'য়ে যায় টাকা। ধার করে, ধার না পেলে অফিসের ক্যাস ভেঙেও আসে এই নেশার রসদ। সুরা আর ঘোড়া এই দুই থেকেই মোটা অঙ্কে টাকা জমা পড়ে সরকারের ট্যাক্স আদায়ের ঘরে। তবুও যে সর্বনেশে খেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও লোভ যায় আবার খেলায়, সেই খেলায় থেকে টাকা আদায়ে আয়করের আয় বাড়ে বটে, কিন্তু সৎ-সরকারের মহিমা বাড়ে না তাতে!

মহাত্মাজীকে যখন বলা হয়েছিল যে 'যন্ত্র' জিনিষটা ত আর আসলে খারাপ নয়, যন্ত্রের জন্ম মানুষের উপকারের জন্তে, তাকে যদি মানুষ মন্দ কাজে লাগায় তার জন্তে যন্ত্রের অপরাধটা কোথায়? গান্ধীজী তার উত্তরে বলেছিলেন, 'না, যে জিনিষ হাতে পেলে, যেমন নাকি অস্ত্র, বেশির ভাগ লোকেরই বাসনা হয় আত্মরক্ষা নয়, অপরকে হত্যা করবার, বুঝতে হবে সে জিনিসের মধ্যেই কোথাও আছে গলদ।'

যার জয়যাত্রার মধ্যে গোপন আছে মানুষের পরাজয়বার্তা, মানুষের এক জন হয়ে আমাকে তার প্রতিবাদ করতেই হয়। অর্থাৎ যন্ত্র যদি দু'-একটি আরামের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম দিয়ে থাকে একাধিক যন্ত্রণার, তাহলে অযান্ত্রিক যুগেই যেতে হবে বৈ কি ফিরে। মদ আর জুয়া যদি বা দু'-একটি লোককে হঠাৎ রাজা করেও দেয়, তবু যার নেশায় মানুষের অমানুষ না হয়ে উপায় নেই। সে-নেশা শুধু কখন থ্রিলের কখন অবসাদের যুক্তিতে বজায় রাখার পক্ষে সব ওকালতিই শেষ পর্যন্ত নিরুপায়।

জানি, অনেকেই আছে যারা ভাঙে তবু মচকায় না। তাদের ভাব অনেকটা যেন রেসের মাঠে তাদের যাওয়া, টাকা জলে যাওয়ার জন্তেই। সেই যে পরিহাসপ্রিয় এক জন বলেছিলেন, 'আমার বাড়ীর, টেলিফোনের, গাড়ীর, এমন কি আমার ছেলেপিলের সংখ্যা সবই Nine এবং সেই সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছিলেন, ন'ঘোড়ার রেসে, যে ঘোড়াকে আমি ব্যাক করি সেও হয় Ninth!' নয়-এর পাকে পড়ে সব নয়-ছয় হয়ে যাওয়ার পরেও এই নিজেকে নিয়ে রসিকতার মধ্যে tragedy আছে কিন্তু truth নেই।

ঘোড়ার বাজী যারাই ধরতে যায়, তারাই আশা করে ভোজবাজী একটা কিছু ঘটবেই। আশা করে প্রত্যেক বার। আর প্রত্যেক বারই তামাসা করে ঘোড়া। কিছু পায় না

জেনে কেউ কারুর কাছে যায় না পৃথিবীতে। বিবেকানন্দও নয় ঠাকুরের কাছে। লটারী কেনে যারা তারা বলে বটে, 'ছুটো টাকা কি চোদ্দটা টাকা ত মোটে, কত ব্যাপারেই ত বেরিয়ে যায়, যাক না লটারীতে, পাব না ত' জানিই, তবুও—' এই তবুও-র বোরখা দিয়েই ঢাকা তাদের কুমারী 'আশা'। লটারী যদি এমনই, পাব না জেনে কিনত এত লোকে, তাহলে সকলের জানা অথচ আবার জানাবার মত এ-গল্প চালু রইল কি করে?

সারা জীবন লটারীর টিকিট কিনে গেছেন টাকার যার আর সত্যিই প্রয়োজন নেই এমন এক জন ধনকুবের। টিকিট কিনে গেছেন চল্লিশ বছর এক নাগাড়ে, কিন্তু কখন কিছু পাননি। তার পর মৃত্যুশয্যায় তাঁর ছেলেদের কাছে খবর এলো, কয়েক লক্ষ টাকার প্রাইজের লক্ষ্য ভেদ করেছেন তিনি।

গৃহ-চিকিৎসককে ছেলেরা বললে: যাতে shock না লাগে হঠাৎ এমন ভাবে সইয়ে সইয়ে খবরটা দিতে হবে বাবাকে।

ডাক্তার গিয়ে বললে: 'ধরুন আপনি যদি হঠাৎ খবর পান যে, লটারীতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছেন, তাহলে সে টাকা নিয়ে আপনি কি করেন?—আপনার ত' এমনিতেই অনেক টাকা—?'

মৃত্যুপথযাত্রী কিছু না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেললেন: 'তোমাকে অর্দ্ধেক দেব ডাক্তার—'

'এ্যাঁ?'

হ্যাঁ, ইহলোকে ডাক্তারের সেই শেষ কথা বলা মুমূর্ষু রুগীকে দেখতে-আসা সেই ডাক্তারের death certificate দেবে কে, সেই হ'য়ে দাঁড়াল রুগীর শেষ চিন্তা!

কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। ব্যতিক্রম আমাদের ধুনী বোস। লোকটাকে দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, হ্যাঁ, ধুনী নাম সার্থক বটে। মিশ কালো এলোমেলো চুল, ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বোতাম-ছেঁড়া ফতুয়া ঠেলে, অনবরত জলে ভিজান গামছা দিয়ে মুখ মুছচে, মোছা হয়ে গেলে কখন মাথার ওপর, কখন হাতের কাছে রাখা আছে গামছা, হাই ব্লাডপ্রেসার। সামনে পানের বাক্স, একসঙ্গে চারটে করে মুখে। শুধু চেহারায় লোকটা রাগলে সত্যিই খুন করে ফেলতে পারে, আপনার ওপর খুসী থাকলে প্রাণ দিতে পারে আপনার জন্যে। দু'কাজই হাসতে হাসতে করবে, কলের জন্যে করবে না অনুতাপ।

ধুনী বোসকে দেখতে হয় শনিবার সকালে। গঙ্গাস্নান করে আসবার পর, ফিটফাট পোষাক সেদিন। মুখের ভাবখানা যেন গোটা টার্ফ ক্লাবটাই তুলে নিয়ে আসবে সেদিনে। শনিবার সন্ধ্যের দেখতে হয় আবার। কালো মুখ নীল হয়ে গেছে। জামার বোতাম চুলোয় গেছে। ফেরবার ভাড়া নেই। মুখে মটরদানা, যা নাকি রেসের ঘোড়ারও খাবার অযোগ্য, দিলে ঘোড়া রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

শনিবার রাতে ফিরে এসে শুয়ে পড়া। রবিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, রেস আর এ-জীবনে নয়। সোমবার দুনিয়ার প্রতি বীতস্পৃহা। মঙ্গলবার রেস খেলার কুফল, এ-সম্বন্ধে বক্তৃতা, বুধবার একটু চাঞ্চল্য, রেস-গাইড নিয়ে নাড়াচাড়া, মনকে প্রবোধ দেওয়া খেলব ত' আর না, বই নিয়ে দেখতে কী দোষ, বৃহস্পতিবার থেকে টিপসের আসা-যাওয়া, শুক্রবার অন্তর্দ্বন্দ্ব, যাব কী যাব না; শনিবার গঙ্গাস্নানের পর সোচ্চার ঘোষণা, আজই শেষ বারের মত রেসের মাঠে পদার্পণ। কখন কখন কথা রাখেও ধুনী বোস কেন না, শেষ বারের মতই যাওয়া হয় সে-বছর, Season-এর সেইটেই Last Race কি না।

ধুনী বোস আপনাকে যে ঘোড়া খেলতে বলে হুস করে চলে গেল মাঠের আরেক দিকে, সে ঘোড়ার ওপর বাজী ধরে সত্যিই হয়ত আপনার জীবনে ঘটে গেল ভোজবাজী, ঘোড়া দিলে সাঙ্ঘাতিক টাকা পাইয়ে। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখলেন চুপসে গেছে ধুনী বোস। 'কী ব্যাপার দাদা?' 'আর দাদা, ধুনী বোস একদম শেষ মুহূর্তে কোন জকির প্রণয়িনী কিরিঙ্গী তরুণীকে অন্য ঘোড়ার ওপর বাজী ধরতে দেখে নিজের টিপস্ বিসর্জন দিয়ে এখন টিপসই দিয়ে টাকা ধার নিচ্ছেন অন্য লোকের কাছ থেকে।'

কিন্তু ধুনী বোসকে আপনি বোঝাতে যান এ-সব কথা, দু'দিনের অন্তরঙ্গ হলে, সে আপনাকে খুন হয়ত না-ও করতে পারে কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবে নিশ্চয়ই। ধুনী বোস হুম করে টেবিলে ঘুঁসি মেরে বলবে: তোমরা ভাই বি-এ এম-এ পাশ, বোধ অনেক বেশি, জ্ঞান অনেক কিছু, আমি মুখ্যু-শুখু মানুষ কিন্তু রেস খেলেছি মদ খেয়েছি নিজের পয়সায়, কেউ বলতে পারবে না ধুনী বোস তার পয়সায় বড়লোকী করেছে। যে বলবে, সে-ই এ-শর্মার পয়সায় খেয়েছে, এ-শর্মা যায় নি কারুর কাছে হাত পাততে! এর কোন জবাব হয় না। জবাব দিলেও চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ধুনী বোসেদের মত লোককে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, নিজের পয়সা বলেই ওর অপরাধ বেশি। নিজের পয়সায় যে করে সে নয়, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে যে করে, সেই হল জাত ব্যবসাদার।

নিজের পাঁঠা যে দিকে খুসী কাটা যায়। সত্যিই যায়। কিন্তু নিজের পাঁঠা হ'লে তবেই! নিজে পাঁঠা হলে কিন্তু আর যায় না, তখন অন্যেই যে দিকে খুসী কাটতে থাকে, কেউই রাখে না কিছু আর।

কে যেন বলছে, নারীচরিত্র স্বয়ং শিবেরও অজ্ঞাত। যেই বলুক, সে ভুল বলেছে। নারীচরিত্র যদি বা জানা যায়, যা জানা শিবজনকেরও সত্যি সত্যি অসাধ্য তা হ'ল মেয়েদের বয়স। কিন্তু তাও জানা যায় এই রেসের মাঠে আর লটারী খেলায়। সেই মহিলার গল্প আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। যাকে কত নম্বরের টিকিট তুললে প্রাইজ পাওয়া যাবেই, এ-সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল, যে আপনার যা বয়স, সত্যি যা বয়স ঠিক সেই নম্বরের টিকিট ধরলে, প্রাইজ উঠবেই। মেয়েটি কি ভেবে একুশ নম্বর ধরলে। দেখা গেল ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে একত্রিশ নম্বর। কিন্তু এ কী! —মহিলাটি হঠাৎ কি কারণে কে জানে তখন অজ্ঞান হয়ে গেছেন। হুঁশ ফিরে আসতে মহিলাটি বললেন কই হল না ত? তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হল হবে, আসছে বছর, তখন কিন্তু বাইশ না ধরে বত্রিশ নম্বর টিকিটটা ধরবেন।

এই রেসের ঘোড়ার আবার বংশপরিচয় কুষ্ঠিকুলজী সব

আছে। নিজের বাপ্-ঠাকুর্দার নাম মনে রাখতে না পারলে কিছুই এসে যায় না, কিন্তু জানা চাই ঘোড়ার পেডিগ্রী। কোন ঘোড়ার বাচ্চা কি এবং তার দৌড় কত দূর নির্ভর করে তারই ওপর। এ-খেলারও আছে ক্যালকুলেসন! যে-ঘোড়া প্রত্যেক রেসে হারছে, সে ঘোড়ার ওপরই টাকা ধরুন প্রত্যেক বার, প্রত্যেক বার টাকার অঙ্ক যান বাড়িয়ে, কারণ এক সময়ে সে জিতবেই আর জিতলেই এত দিনের হার হয়েছে আপনার জয়।

কিন্তু সব মিলেরই গরমিল আছে, সব হিসেবেরই আছে ঠিকে ভুল। সারা সীজন বাড়িয়ে গেলেন খেলার টাকার অংক হারা-ঘোড়ার ওপর। সে সীজন ভর হেরে গেল ঘোড়া, পরের সীজনএ সে-ঘোড়ার করলেন না মুখদর্শন। এবং তখনই উন্মুখ হল সেই অকৃতজ্ঞ জীব। এবং শুধু উন্মুখ হল না। জীব বেরিয়ে গেলে সেই করল আপসেট, জিতে নিয়ে গেল বাজী, দশ টাকায় কত টাকা দিলে তার হিসেবে আর যারই দরকার থাক আপনার ফুরিয়েছে প্রয়োজন। শুধু বাপ-ঠাকুর্দার খবর নয়, এর জন্তে আছে জ্যোতিষী। ঘোড়ার হাত নেই বলে আপনার হাত দেখেই বলে দেবে জ্যোতিষী। 'জমিদার' কোন ঘোড়া ধরলে ঘোড়ার ডিম, আর কোন ঘোড়া ধরতে পারলে আপনি কালই ছ্যাকরা গাড়ী থেকে গাড়ীঘোড়া করতে পারবেন আজই। এর জন্তে আছে ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করা পর্যন্ত। যাবার সময় মা কালীকে বলে যাওয়া, মা, পাইয়ে দিও ট্রিবল টোটটা। যে গৃহস্থ আশ্রয় রক্ষার প্রার্থনা জানায় তার মুখেও মা কালীর নাম, যে ডাকাত আসে গৃহস্থের সর্বনাশ করতে তার মুখেও জয় মা কালী, কালীর নাম নিয়ে আপনি মুখে চুণকালি যাই মাখুন মা তেমনি নির্বিকার; মড়ার ওপরই শুধু তাঁর খাঁড়ার ঘা।

কিন্তু সব জিনিষেরই কালোর মত একটা সাদা দিকও আছে। ডেভিলেরও আছে বই কি কিছু ডিউ। ফিল্মষ্টার থেকে মিনিষ্টার সবাই অচলচল, ময়ূর থেকে কেঁচো কেউ নয় তুচ্ছ। তাই রেসের মাঠও কাউকে কাউকে সত্যি রাজা করে দেয়। সত্তবিবাহিতা একটি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীতে বরণ হয়ে যাবার পরই নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটি ছবির সামনে। ঘোমটায় মুখ ঢাকা বউটিকে বলছেন শাশুড়ী, 'প্রণাম কর মা এঁকে; প্রণাম কর; এঁর দয়াতেই আমাদের যা কিছু।' মেয়েটি প্রণাম করে উঠে দেখবার চেষ্টা করতে গেল, যাকে প্রণাম করল সে কে? দেখল, ঠাকুর-দেবতা কেউ নয়, প্রণাম করেছে সে একটি ঘোড়ার ছবিকে। হ্যাঁ, অবাক হবার কিছু নেই, বউটির শ্বশুরবাড়ীর যা কিছু ঐশ্বর্য্য সবই এসেছে রেসের ঘোড়ার কাছ থেকে।

এটা পড়েছিলাম, একটা ব্যঙ্গচিত্রের কাহিনীতে, এটা গল্পই। কিন্তু ঘোড়া সব সময়ই পিঠ থেকে ফেলে দেয় না,—কখনও কখনও মানুষকে পিঠে নিয়ে সওয়ার হয়ে সে—দিগ্বিজয়ের সওয়ার! কারণ? কারণ, ফার্ষ্ট বুকে পড়েছি Horse is a noble animal যার অপূর্ব অপরূপ বাংলা হ'ল: অশ্ব অতি মহৎ জন্তু।

[ক্রমশঃ।

জমীর মালিক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"ভাগ যা ধন্ রাজ্ হো!
ভূম্‌রা ধন্ ম্‌হাজ্ হো!"

(মূল এই গানটি রাজপুতানায় অনার্য্য মীনাজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই মীনারাই নিজের অঙ্গুষ্ঠের তপ্ত রক্তে রাণাদের রাজটীকা পরিয়ে দিয়ে থাকে।)

খাজ্‌না রাণা! দিই তোমাকে
খাজ্‌না তোমার পাওনা,
তার বেশী আর চাও যদি তো
বল্‌ব সোজা—'যাও না।'
দেশের মাটি মোদের খাঁটি
জমীর মালিক আমরা,
মোদের হাতেই পাথর ঝামা
হয় হে ফসল-খামরা।
ছ'ভাগের ভাগ নাও না তুমি,—
পাওনা যা' তাই নাও না;
খাজ্‌না রাজার জমী প্রজার—
এই আমাদের গাওনা।
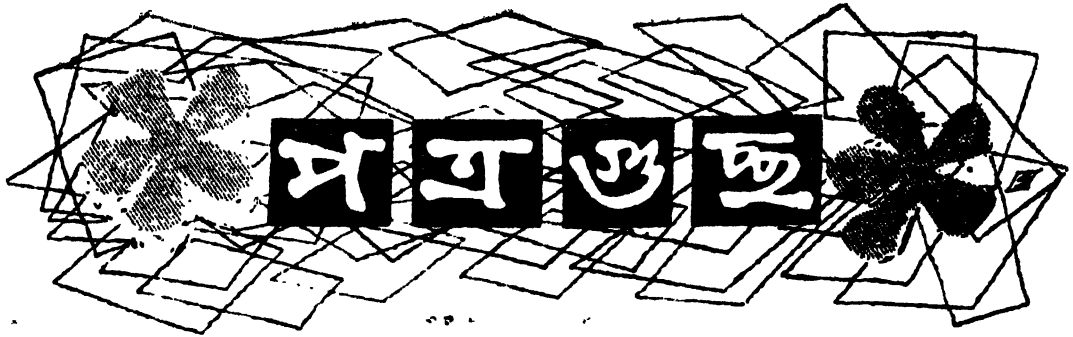
শান্তিনিকেতন আশ্রমের দলিলপত্র

(দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের ভূমি ক্রয় করেন। নিরালায় ব্রহ্মোপাসনা করার জন্যই তিনি এ স্থানটি বাছাই করিয়া লন। এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে ১২৯৭ সালের ২৬এ ফাল্গুন [১৮৮৬, ৮ মার্চ] দেবেন্দ্রনাথ একটি ট্রষ্ট ডীড করেন। এই দলিলের মধ্যেই আশ্রম-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের নির্দেশ ও আলোচনা আছে। এই জন্য দলিলখানি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল)

ট্রষ্ট ডীড

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সা° জোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্নেহাস্পদেষু।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা জোড়াসাঁকো হাল সাং পার্ক ষ্ট্রীট।

কস্য ট্রষ্ট ডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রিক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিভিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত ডদা বোলপুরের পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপশীলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিং দিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতলা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্ট ডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর-অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টিস্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের সর্ত্তমত স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎ লিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলীকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্ট ডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎবিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টিগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন ট্রষ্টী কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টিগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টিগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম, যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোনপ্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টিগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্মবিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবে। এই মেলার উৎসবে কোনপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টির উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি-সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির বিষয়ে সকল প্রকার

অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তিনিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতী গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাঁহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কখন কেহ এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয় সঙ্কুলান জন্য দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলি-বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন; উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোনরূপ নিরাপদ মালিকী স্বত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোনরূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্ট সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্যসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোনরূপ দান-বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোনরূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ী হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গালিমপুর ও ভর্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশতঃ ঐ কুঠীদ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকার দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তি ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমতে বাধ্য হইবেক। এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্ট ডিড লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্ত্তী কালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি

(বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত)

বন্দে মাতরম্

১৩১৪ মাঘ

সুহৃদ্বরেষু,—যখন তুমি এই চিঠি পাইবে তখন আমার জীবনের পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ এক শত বৎসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র রহিল। কিন্তু জীবনের আদর্শ এখনও বহু দূরে। Keats এ বয়সে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রসসৌন্দর্য্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যু-খণ্ডিত অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি?—?—?—?

আমার কথা যাক। তোমার সংবাদ কি? তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহার অন্তরে যে কতখানি মহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা উপলব্ধি করিবার জিনিস বটে। বিকাশোন্মুখ তরুণ মনকে তোমার মনের অনুকূল হাওয়ার মধ্যে এক একটি করিয়া পাপড়ি খুলিতে অবসর দেওয়া যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার তাহা আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি।

সে দিন পরেশনাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, একটা দুর্গন্ধের উদ্বেজনায় মনটা এই পল্লীর অধিবাসীদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাবে বাঁকিয়া বসিতেছিল। পচা আমানির গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ, পাঁকের গন্ধ এবং গোঁতাটার অকথ্য দুর্গন্ধ বাতাসটাকে একেবারে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর কলের ধোঁয়া, গাড়ীর ধূলা, গাড়ী-বিক্রেতাদের বাকবিতণ্ডা, ঋণকারী বৃদ্ধ চাচার শ্মশ্রু উৎপাটনকারিণী ভোজপুরবাসিনীর বীররসাত্মক গ্রাম্য ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর ও পল্লীর মিঞা মহলে উত্তেজনা। ইহারই মধ্যে,—তুমি কি মনে করিতেছ? রূপের ঝলক?—না, একটি সদ্যোজাত নিতান্ত শিশুর ক্রন্দনশব্দ! এক মুহূর্ত্তে—আমার সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই আবর্জ্জনার মধ্যে যে ক্ষুদ্র মানবসন্তানটির কণ্ঠস্বর শুনিলাম, সে স্বর আমাদের নিতান্ত পরিচিত, সে আমার কিংবা তোমার ঘরে যে ভঙ্গিতে প্রকাশ হইয়া থাকে এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। সে স্বর মনের যে পর্দ্দায় আঘাত করে এবং যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের সঙ্গীত রচনা করে তাহা স্থান ও কালের একেবারে অতীত হইয়া মনের রাজ্যে সনাতন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবশিশু! মানবের সমস্ত আশা ভরসা! মানবের ভবিষ্যৎ!

মানবের সর্বস্ব। তুমি সেই শিশুদের অপূর্ব্ব এবং অপরিণত জীবনের পথপ্রদর্শক, সহচর এবং গুরু একাধারে। তোমার জীবন ধন্য।

এইমাত্র পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া আনন্দিত যে হইয়াছি তাহা বোধ হয় লিখিয়া জানাইতে হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"হোমশিখা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। নামটি সার্থক হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা পুণ্য তেজস্বিতা আছে—যাহা পূর্ব্বতন ঋষিদের হোমশিখাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বাক্য আছে যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য। সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই সাম্যরসের একটা স্রোত বহিতেছে। শেষ কবিতাটিতে ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে। আমার মতে "সাম্যসাম" কবিতাটাই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ, যেন একটি সমগ্র বৃন্ত বাড়িতে বাড়িতে একটি সুন্দর পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। আমার রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ।" তুমি কি মনে করিতেছ জানি না, আমার পক্ষে এই সমগ্র চিঠিটা তোমাকে না পড়াইয়া থাকিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। আমার বই হয়ত এতটা ভাল না হইতে পারে। কিন্তু এই চিঠি আমার দেহে যতটা জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে সেই পরিমাণে যদি লিখিয়া উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিত।

মানুষ মিষ্ট কথার একান্ত কাঙাল। এই ফাল্গুনের প্রথম দিনে তুমি পূজনীয় রবীন্দ্র বাবুর "বসন্ত-যাপন" মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে এবং বোলপুরের শাল এবং মহুয়া গাছের আকস্মিক কিশলয় এবং মুকুল অঙ্কুরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের পক্ষে "বসন্ত-যাপন" নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কারণ সহরে যে বসন্ত বিকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দাগ রাখিয়া যাইতে ভুল করে না। অতএব তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার। তুমি ডাক্তারবাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা পড়িলাম। যাহারা নিজে না লিখিয়া কেবল অন্যের লেখা সমালোচনা করিয়া বেড়ায় তাহাদের সঙ্গে যাহারা নিজে বিবাহ না করিয়া অন্যের বিবাহের কথা আলোচনা করে তাহাদের প্রভেদ কি? লিখিও। আমার মনে যাঁহারা নিজে সুলেখক (যেমন Goethe এবং রবীন্দ্রনাথ) তাঁহারাই সুসমালোচক। এবং যিনি নিজে সুবিবাহিত, তিনিই নিজে সুঘটক। তুমি কি বল?

কলিকাতা, ৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট　　　　তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু
মাঘ সংক্রান্তি　　　　শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

তোমার চিঠি, এবং পোষ্টকার্ড যথাসময়ে পৌঁছেছে। ব্যোমকেশ দাদার মুখে শুনিলাম ৭ই বৈশাখ তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ হইবে সেই জন্য আর উত্তর লেখা হয় নি। তাছাড়া আমাদের বাড়ীশুদ্ধ অসুখ। মামার ছেলেটি বিয়াল্লিশ দিন টাইফয়েড জ্বরে ভুগছে। সকলের ছোট মেয়েটি বার দিন ভুগছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নববর্ষের প্রথম দিনে শয্যা ত্যাগ করেই অনেক দিনের পর একটু ভায়েল স্পর্শ করেছিলাম। তারপর একটু ফরাসী ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। Ruskin-এর Elements of Drawing এবং Cowell সাহেবের সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতক পড়েছিলাম। বাড়ীতে অসুখ বলে ইচ্ছা সত্ত্বেও হার্মোনিয়ম সম্বন্ধে নূতন খাতা করা হয় নি।

নূতন বর্ষ সম্বন্ধে সম্রাট বাবর যা লিখেছিলেন, তাঁর অনুবাদের অনুবাদ পাঠালুম—

হাসি ভরা বসন্ত সুন্দর।
সুন্দর সে বৎসর প্রবেশ
রসে ভরা আঙুর মধুর,
মিষ্টতর প্রেমের আবেশ!
ধর, ধর, জীবনের সুখ না পালায়
একবার গেলে সেও, ফিরিবে না হায়।

এই কবিতাটি তিনি কাবুলের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর একটি লাল পাথরের চৌবাচ্চা গাঁথিয়ে তারই গায়ে খোদিত করে নিয়েছিলেন। ঐ লাল পাথরের চৌবাচ্চা লাল রঙের মদিরায় পরিপূর্ণ করে রাখা হ'ত। এবং ঐ চৌবাচ্চার সিঁড়িতে বসে সুন্দরীদের নৃত্যগীত উপভোগ করতে করতে তিনি লাল পাথরের চৌবাচ্চাটায় লাল মদিরায় পাত্র ভরে নিতেন। আমার এই চৌবাচ্চাটা দেখবার ভারি ইচ্ছা হচ্ছে। তোমার হচ্ছে কি?

দ্বিজু রায়ের নূতন গান আমার ভালই লেগেচে অবশ্য একটা লাইন ছাড়া; সেটা হচ্ছে—"মানুষ আমরা, নহি ত মেষ"। ও গানটি আমার গানের * দ্বারা suggested মনে হবার কারণ কি? বুঝিতে পারিলাম না। পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু কি এখন বোলপুরে অবস্থান করচেন?

অজিতবাবুর খবর কি? তাঁহার বিবাহের কি হল? তোমার শুভেচ্ছার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ইতি:—
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২রা বৈশাখ ১৩১৫।

প্রত্নতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র

['চিত্র-বিকাশ' কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ।] পুরী স্কুলের হেড মাষ্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অনেকগুলি পত্র ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহ-উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল এগুলি লিখিয়াছিলেন। কয়েকখানি পত্রের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

(১)

মহাশয়েষু—

আপনার পত্র পাইয়া পরম উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উপকারজনক। আপনি শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া আমার জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এতন্নিবন্ধন বিশেষ বাধিত হইয়াছি। জগন্নাথের মস্তকের কথা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি

---

* 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।'

আপনার লিখিতানুসারে সমস্ত বর্ণন করিব। গুণ্ডিচা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী, তবে আপনি অনুমান করিয়াছেন যে গুণ্ডিচা গুঁড়িকাষ্ঠের, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাদ্রিমহোদয়ে ভদ্রার হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনকালে ভদ্রার হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব যাহারা ভদ্রাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভদ্রার হস্ত আছে কি না?…

কোণারকের মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, আমার বোধ হয় তদ্দৃষ্টান্তেই পূর্ব্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। পরে কোন কারণবশতঃ ঐ অশ্বমূর্ত্তি উত্তর-পূর্ব্ব দ্বারে লইয়া থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্ত্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, একণে উহাকেই জয়া-বিজয়া দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্ত্তি নাই, ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে পূর্ব্বে উক্ত দ্বারেই জয়া-বিজয়ার মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। আমার অনুভবানুসারে ভোগমন্দির ও নাট-মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, উহাই একণে জয়া-বিজয়ার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুঞ্জে প্রতি দ্বাদশ বৎসরেই কি জগন্নাথের মূর্ত্তি সমাহিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমি শুনিয়াছি, উক্ত কার্য্য ৫০।৬০ বৎসর অন্তরে সম্পাদিত হয়। আপনি এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যবহারের জন্য পুরী ও শ্রীমন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ করিলাম। জগন্নাথের মূর্ত্তি বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাহা এই যে জগন্নাথের করযুগল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অথবা সম্মুখদেশে প্রসারিত। আপনি এই সংশয়টির অপনোদন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

(২)

মহাশয়েষু—

তিন দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গতকল্য আপনার ৯ই দিবসের পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পুরীর ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত উড়িষ্যার মুদ্রাকার্য্য স্থগিত ছিল। অদ্য কোণার্কের প্রথম শোধনীয় আদর্শ পাইয়াছি।

বোধ হয় এক মাস মধ্যে মুদ্রাকার্য্য সমাধা হইবে। ইতোমধ্যে আপনি কোণার্কের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পারেন, তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম অনুমান হইয়াছিল তাহা বহু দিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইয়াছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু পরে জমি বসিয়া তাহা পড়িয়া যায়; এই একণে আমার মত। এ মতের বিশিষ্ট কারণ আকুল কাজল এবং জগমোহনের অন্তঃস্থিত স্তম্ভের পতন। শেষোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে পারিত না। ইংরাজী প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পুরীর মন্দির বালুকার উপর নির্ম্মিত নহে। নীলাদ্রি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।০ বালুকা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অট্টালিকার ভারে ভূমি দৃঢ় [illegible] নির্ম্মিত [illegible] অনুমান করিবার কারণ ছিল না।

আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এবং তাঁহার সময় হণ্টার সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দ্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আপনি মাদলা পাঁজীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ অংশ দেখিবেন, আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্ব্বে তথায় প্রাচীন মন্দির ছিল। নরসিংহ ঐ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার নিরূপিত করিতে পারি নাই; স্থানে স্থানে চিহ্ন নাই অপর স্থানে কর্ষিত হইয়াছে সুতরাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপিত হয় নাই। বোধ হয় আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই।…

মাণিকতলা, ২২শে নবেম্বর শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

নাটুকে রামনারায়ণকে প্রদত্ত মানপত্র

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিলহার্মোনিক অ্যাকাডেমি ৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও 'হরকুমার ঠাকুর কনক-কেয়ূর' প্রদান করিয়াছিলেন। এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এই উপলক্ষে রামনারায়ণকে প্রদত্ত মানপত্রখানি এইরূপ:—

THE BENGAL PHILHARMONIC ACADEMY.

PATRONS:

The Hon'ble Sir Ashley Eden, K. C. I. E.
Lieutenant-Governor of Bengal.
A. W. Croft, Esq M. A.
Director of Public Instruction, Bengal
Founded—Rajah Comar Sourindro Mohon Tagore,
Mus Doc. Sangita Nayaka.
companion of the order of the Indian Empire,
Diploma of Honour No. 14.

The Executive Council of the above named Academy has, at its sitting of the 9th March 1882, conferred upon Pandit Ramnaryan Tarkaratna of Harinavi the title of Kavyopadhayaya together with a gold Harakumar Tagore Kayura, the insignia thereof, in consideration of his proficiency in dramatic writing and of his being the first writer of Bengali dramas in a systematic form.

Sourindra Mohon Tagore, Founder and President

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী Director

Calcutta,
Pathuriaghata Rajbati
The 22nd August, 1882.

Baikunthanath Basu,
Honorary Secretary.

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প লেখার ইতিহাস

['বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক পল্লিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র]

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তাঁহার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত 'হিতবাদী'তে :—

সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমল বাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।—২৮ ভাদ্র ১৩১৭।

নাটক রচনার বিজ্ঞাপন-পত্র

['কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' রচনার ইতিহাস এইরূপ। রংপুর কুণ্ডী-পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'-আদি পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল ; বিজ্ঞাপনটি এইরূপ]

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালিচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমিদার।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামনারায়ণ 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করেন এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত রচনার পাণ্ডুলিপি রংপুরে পাঠাইয়া দেন :—

বিবিধ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী মান্যবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ
মহাশয় সর্ব্বোপকারকেষু—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী ও আপনার প্রস্তাবিত বিষয় অতি উপাদেয়। কিন্তু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই সাতিশয় শিরোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রেরণ করিতে শীঘ্র পারি নাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। একণে দৈবানুগ্রহে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যন্ত যত্ন ও অজস্র পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইলাম পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন।···

২৮ ফাল্গুনস্য। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা হিন্দু মিট্রোপলিটান বিদ্যালয়স্থ প্রধানাধ্যাপকস্য।

[বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০৲ টাকা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন।]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

'স্বর্ণলতা' পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থকার আখ্যাপত্রে নাম প্রকাশ করেন নাই। ১২৯০ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের পুস্তকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সমীপেষু।

প্রিয়তমেষু—

নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার 'স্বর্ণলতা' চতুর্থ বার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর-ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এ সকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জ্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী, তাহার অসাধারণ কোনও গুণ আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে? বাস্তবিক স্বর্ণলতা "স্বর্ণলতা" বটে।

মনে করিও না যে, তোমার কাছে তোমার গ্রন্থের গুণগান করিবার জন্যই এ পত্র লিখিতেছি। যে জন্য এ পত্র লিখিতেছি বলি—'স্বর্ণলতার' যশে তুমি যশস্বী হইয়াছ, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় দিবার জন্য এখন যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এ যশের ঘোষণা দেখিতে পাই অথচ তুমি কে তাহা অনেকেই জানেন না। না জানাটা বড় অন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ ইহাতে পাপিষ্ঠের প্রলোভন ; এই যে দিন বগুড়াতে এক ব্যক্তি 'স্বর্ণলতা'র যশোলাভে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে গ্রন্থকার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা আমার অসহ্য। দ্বিতীয়তঃ আমার আত্মীয় লোকের মধ্যেও কোনও কোনও ব্যক্তি আমাকে 'স্বর্ণলতা'র লেখক মনে করিয়া থাকেন। এ পরিচয়ে আমি গর্ব্বিত হইতে পারি বটে, কিন্তু যাহাতে আমার অধিকার নাই, তোমার সে গৌরব চুরি করিয়া আমি বড় হইব কেন? যাঁহাদের এ প্রকার ভ্রম আছে, তাঁহাদের ভ্রম দূর করা উচিত। তাই বলিতেছি যে তুমি আপন সম্পত্তি আপনার করিয়া লও।

আমি জানি, তুমি আমার কথা রাখিবে। জানি বলিয়া অনুরোধ করিতেছি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রন্থে নাম যোজনা করিবে। তোমার মনে যদি কোনও দ্বিধা হয়, বিজ্ঞাপন স্বরূপে আমার এই পত্রখানি গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিবে।

ইতি

বর্দ্ধমান, প্রণয়গর্ব্বিত,
জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি হেমচন্দ্র রচিত চিন্তাতরঙ্গিণীর বিজ্ঞাপন পত্র

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিতেছেন :—

প্রায় তিন বৎসর হইল আমি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের উপাধি গ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ, প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম ; কপালগুণে হয়ত যশের নয়ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে জানিয়া-শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক একবার চেষ্টা করিয়া দেখি সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটি আতোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃ[ত্ত] অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

খিদিরপুর, ৩১এ বৈশাখ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবির চিত্তবিকাশ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পত্র

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কা[র্য্য] হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হই[লে] ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটির অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্মব[ন্ধু] ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছি[ল] তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ করিলাম। উপরিলিখিত অবস্থাক[্রমে] ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের চিত্তবিনোদক হইবে ইহার আ[শা] নাই। তবে বিভালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পা[রে] এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

কাশীধাম
ইং ১৮৯৮। ২২ ডিসেম্বর
বাং ১৩০৫। ৯ পৌষ

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

অক্ষয়কুমার বড়াল

দূরে— মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ
তরু-লতা নত মাথা—ডাকে পুষ্পবাসে
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে কর আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে
পলাইছে নিশীথিনী ধূসর-বরণ।
ঝরণা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদু শ্বাসে,
পাটল তটিনী-বক্ষে আলোক-কম্পন
ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম।
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত-গম্ভীর।
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটির—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম।
অর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি।

উদয়শঙ্কর ও অমলা
—অজিত মিশ্র

পুণ্যপ্রিয়া

—পরিতোষ মিত্র
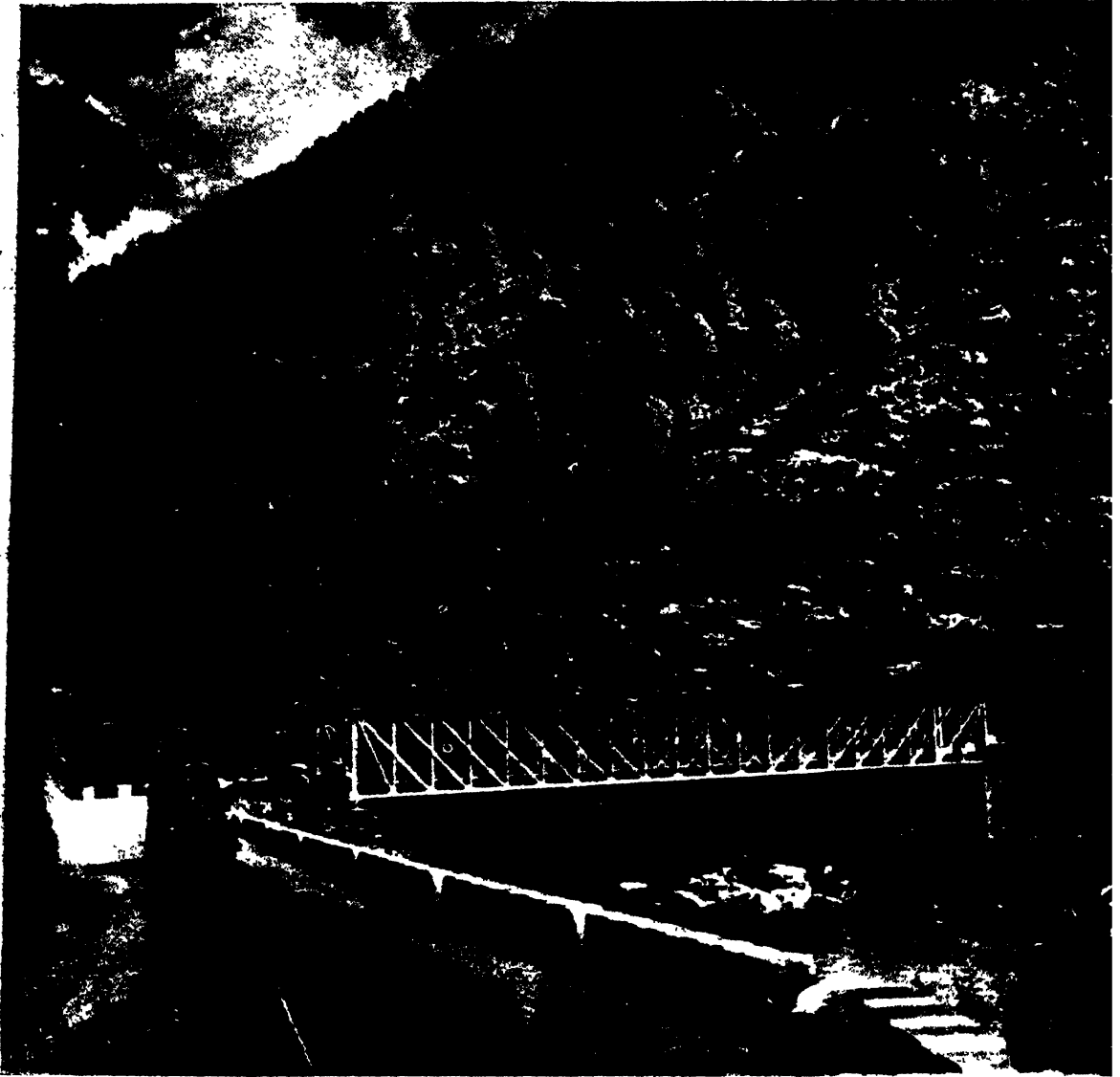
নৈনিতালের পথে —দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মা সি ক ব সু ম তী র

—আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি—

শাদার আর কালোর যতখানি করা সম্ভব তা করেছে এযাবৎ কাল মাসিক বসুমতী। প্রতি মাসে আট পাতা ভর্তি সেরা সেরা ফটো, ছোট বড় নানা সাইজের, কথাটি না কয়ে ছেপে গেছে। কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন শেষ হয়ে যায়ই। আবার সেই প্রায়-শূন্য কলসী ভরে নিতে হয়। তাই কয়েক মাস ধ'রে ডাক পড়েছে আবার নতুন ছবির জন্য। ভাল ভাল ছবিগুলি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার আপনাদের ছবি আবার নতুন ছবি পাঠাবার দিন সমাগত। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হোন। ছবি যেন একঘেয়ে না হয়। আলোর কম-বেশী, প্রিন্টের গোলমাল না থাকে। ছবির সাইজ বড় হয়। আগে নিজের ছবিগুলিকে নিজেই বাছাই করুন। পরে সেই বাছাই করা সব চেয়ে সেরা সেরা ছবিগুলি মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠিয়ে দিন। কদাচ যেন ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু এবং ফটোগ্রাফারের নাম-ধাম দিতে ভুলবেন না। এমন ছবি পাঠান, যা দেখে পাঠক-পাঠিকার চোখ জুড়োয়, আপনারও ছবি তোলা সার্থক মনে হয়; মাসিক বসুমতীর ঐতিহ্যও বজায় থাকে।

ছবির জন্য আবার ডাক পড়েছে, স্মরণ রাখুন।

ওরা কাজ করে

—ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক

—পি, কে, চট্টোপাধ্যায়

নববধূ —শুক্লা সেনগুপ্তা

ব্রহ্মচারী —ক,খ, গ

বোনটি —প্রবোধপ্রসাদ সিংহ

[দেশের আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের দায়িত্ব যাঁদের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে ন্যস্ত, নাগরিক ও জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি, মান ও প্রাণ রক্ষা-কল্পেই যাঁরা কাটিয়ে দেন জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো, নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা না করে, তাঁরা নিশ্চয়ই সাধারণ পর্য্যায়ে পড়েন না। রাজ্য-শাসনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ পুলিশ-বিভাগ তাঁদেরই বলিষ্ঠ অধিনায়কত্বে পরিচালিত হ'য়ে আসছে এবং যে কোন আপৎকালীন মুহূর্ত্তে তাঁরাই হন অগ্রণী প্রাথমিক সাহায্য ও নিরাপত্তা নিয়ে। স্বাধীন রাষ্ট্রে পুলিশ জনসাধারণের সেবক মাত্র—এ উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের ভিত্তিতে যাঁরা এখন পুলিশ বিভাগকে গড়ে তুলছেন এবং একে রূপায়িত করছেন প্রতি দিনের কার্য্যে ও প্রচেষ্টায়, এমন কয়েক জনের জীবন-পরিচিতিই এ বারের সংখ্যায় দেওয়া হ'লো।]
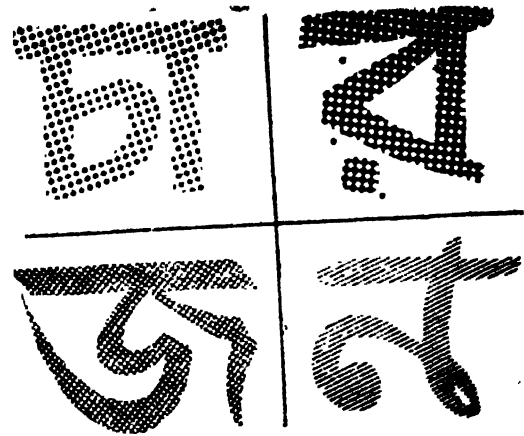
শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী

[পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল]

ঠিক কাছে না যেয়ে একটি মানুষকে সম্যক্ চেনা যায় না। শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী এ রাজ্যের পুলিশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ভাবতে পারা যায় পুলিশী মেজাজ নিয়েই হয়তো তাঁর জীবনটা গড়া। কিন্তু তাঁকে যখন সান্নিধ্যে পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল—স্পষ্টই পুলিশী আঁট-সাঁটএর মাঝেও একটি আলাদা সজীব ও সুন্দর মানুষ রয়েছে তাঁকে ঘিরে।

মেদিনীপুর জেলার গোপালনগর গ্রামে শ্রীহরিসাধন জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৭ সালে একটি প্রাচীন জমিদার-বংশে। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে তিনি—বার বছর বয়সেই হারালেন পিতৃদেবকে। মায়ের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদই তখন থেকে হলো তাঁর সম্বল। ছেলে-বেলায় তাঁর সামনে আদর্শ ছিল এক দিকে মমতাময়ী মা ও অপর দিকে নিজ জেলার শ্রেষ্ঠ সন্তান দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। তাঁর বিশ্বাস ছিল সব সময়েই মা যেখানে রয়েছেন, সেখানে অন্য ঠাকুর-দেবতার আরাধনায় প্রয়োজন নেই। অপর দিকে এ-ও তিনি মেনে নিয়েছিলেন—বিদ্যাসাগর যদি বড় হ'তে পারলেন এতখানি, তবে তিনিও চেষ্টা করলে কেন বড় হ'তে পারবেন না?

এ বড় হওয়ার মানস নিয়েই আরম্ভ হলো শ্রীঘোষ চৌধুরীর পড়াশুনো। ১৯২৩ সালে গ্রামের স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হলেন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি পেয়ে। তারপর কলকাতায় রিপণ কলেজে (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এসে তাঁর পড়াশুনো চলে। ১৯২৭ সালে এখান থেকেই তিনি অঙ্কশাস্ত্রে (অনার্স) প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং পর বৎসরই আই, পি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। আই, পিতে সাফল্যলাভের পরেই তিনি ভারতীয় পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন ১৯২৯ সালে।

শ্রীহরিসাধনের জীবনে ধর্ম্মের প্রতি একটা ঝোঁক বাল্যকাল থেকেই দেখা যায়। মাঝখানটায় কিছু কাল তিনি নাস্তিক মনোবৃত্তি পোষণ করলেও বাল্যের সে ধর্ম্মের আকর্ষণ ছাড়তে পারলেন না শেষ পর্য্যন্ত। এক মহাপুরুষের নিবিড় সান্নিধ্য নাস্তিকতার পথ থেকে তাঁর জীবনকে চমৎকার ভাবে ঘুরিয়ে দেয় সত্যধর্ম্মের দিকে।

শ্রীঘোষ চৌধুরী নিজের জীবনের এ দিকটার কথা বলতে যেয়ে বলছেন—ছেলেবেলায় ধর্ম্মের দিকে আমার খুব মন ছিল। মায়ের কাছে শুনেছিলুম আমাকে যখনই খুঁজে পাওয়া যেত না, দেখা যেত ভগবানের নাম যেখানে কীর্ত্তন হচ্ছে, আমি সেখানে রয়েছি। তারপর কলেজে যখন পড়ছি, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনাদি পড়ে আমার সন্ন্যাসী হতে মন চায়। এই মন নিয়ে গেলুম প্রথমে বেলুড় মঠে কিন্তু মিশন আমায় নিতে চাইল না। তারপর চলে গেলুম কাশীধামে। সেখানে সন্ন্যাসী হবো বলে দশাশ্বমেধ ঘাটে যেয়ে অবস্থানও করলুম। কিন্তু সেখানে

শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী

থেকে সন্ন্যাসীদের ছাই মাখা আভরণই শুধু দেখলুম, মনের মত কিছু পেলুম না। বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার কলেজ জীবনে ফিরে এলুম, হয়ে পড়লুম একজন মস্ত বড় নাস্তিক। পনের বছর কেটে যায় আমার এমনি ভাবে। তারপর এলো ১৯৪৬ সাল। নানা স্থানে সরকারী কাজে ঘুরে-ফিরে আমি এলুম কলকাতায়, দায়িত্ব নিলুম ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের। কতকগুলো ঘটনা কেন্দ্র করে আমার মনে সে সময় প্রশ্ন উঠতে থাকে—চরম সত্য বলে সত্যি কিছু আছে কি না? এ প্রশ্ন আমার মনকে দিনের পর দিন আকুল করে তুললো। এমনও হয়েছে, কোন বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিখেরীকে হয়তো পয়সা দিচ্ছি, আর আপন মনে দেখছি আমি যা খুঁজছি, সে ভিখেরী বেশে এসেছে কি না। প্রশ্নের উত্তর মেলেনি বহু কাল। এর পর ১৯৪৮ সালে এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হলো। আমার জীবনের মোড় ফিরে গেল সেই থেকে, সত্য উপলব্ধি করতে পারলুম আমি প্রত্যক্ষ ভাবে।

শ্রীহরিসাধনের কর্ম্মজীবন গৌরবদীপ্ত। পুলিশ বিভাগের কার্য্যে যখনই যে দায়িত্ব তাঁর উপর এসেছে, তিনি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তা পালন করে আসছেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি কখনই নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেননি। পদস্থ পুলিশ অফিসার হয়েও সে যুগে তাঁকে জাতীয় পোষাক ধুতি-পাঞ্জাবী পরে চলতে দেখা গেছে। এর জন্য তাঁকে অফিসার মহলে উপহাস ও বিদ্রূপ-বাক্য শুনতে হয় প্রচুর। কিন্তু নিজের এ স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবোধ তিনি ছাড়েন নি কখনো। লীগ আমলে মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী যখন অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী, তখন তিনি একবার শ্রীঘোষ চৌধুরীর কর্ত্তব্যের পথে অহেতুক বাধা সৃষ্টি করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা হরিসাধন অমনি তা মেনে নিতে চাইলেন না। কর্ত্তব্য রক্ষার অধিকার হারান মাত্রই তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করলেন প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর হাতে। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সে পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। এটি ১৯৪৬ সালের কথা—কলকাতায় তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। শ্রীঘোষ-চৌধুরী সে সময় ছিলেন কলকাতার অন্যতম ডেপুটি পুলিশ কমিশনার।

শ্রী ঘোষ চৌধুরীর অপর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ না করলে নয়। কঠোর পুলিশী দায়িত্ব বহন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু জনহিতকর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করে আসছেন। দরিদ্র ছাত্রদের লেখা-পড়া ও অসহায় বিধবাদের আর্থিক সাহায্যকল্পে তাঁর প্রাণে গভীর দরদ রয়েছে সর্ব্বদাই। অল্প বেতনপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ম্মচারীদের পরিবারের লোকদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য কয়েকটি মাতৃসদন ও তিনটি ডিসপেন্সারী তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মহানগরীতে।

কর্ম্মজীবনে শ্রীঘোষ চৌধুরী ধাপে ধাপে উন্নতি করে চলেছেন স্বীয় যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির দাবী নিয়ে। ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা পুলিশের সদর কার্য্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হন। পর বৎসরই তিনি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের। ১৯৫১ সালে তিনি নিযুক্ত হলেন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল হ'তে তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল পদের বিরাট দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। শ্রীঘোষ-চৌধুরী যেমন দক্ষ কর্ম্মক্ষম। তিনি যে তাঁর এ নোতুন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন এবং তাঁর আমলে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে অনেক উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জী

[কলিকাতার পুলিশ কমিশনার]

ইনি যে পুলিশ অফিসার হ'তে আসবেন, এ-ও এক বিচিত্র ঘটনা। এবং এ ঘটনাটি শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জী যে একজন প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ তারও স্পষ্ট পরিচায়ক। "পুলিশ বিভাগে চাকুরি নেব, এ কখনও ভাবিনি। আমার ঝোঁক ছিল বরাবর ইণ্ডিয়ান অডিট ও একাউণ্টস্ সার্ভিসের দিকে, কেন না, নিরিবিলি চাকুরিই আমার পছন্দ ছিল। কিন্তু সে সময় এ পরীক্ষা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়। পরীক্ষা দিতে পারছিনে বলে ভাইসরয়কে লিখলুম, উত্তর পেলুম—পরে পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে আমার সুযোগ দেওয়া হ'বে। ইত্যবসরে আমি যখন ল' পড়ছি, আমারই একজন সহপাঠী দেখলুম আই, পি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। এ পরীক্ষা ব্যাপারে সে আমার কাছে আসতো পড়তে ও পরামর্শ নিতে। তার পরীক্ষা দিতে দেখে আমার মনেও সহসা ইচ্ছা জাগলো পরীক্ষা দিই। সে ১৯৩৩ সালের কথা। আমার এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার দেড় মাস পরেই আমি আই, পি পরীক্ষা দিয়ে বসলুম। পরীক্ষা দিয়েই আমি চলে যাই রাজসাহীতে। কিছু দিন বাদে একখানি পত্র পেলুম, আমিই সেবার আই, পি'তে প্রথম হয়েছি।"

শ্রীউপানন্দের প্রথম জীবন কাটে রাজসাহীতে এবং সেখানেই তাঁর জন্ম হয় ১৯১০ সালে। তাঁর পৈত্রিক বাসভবন অবিভক্ত বর্দ্ধমান জেলায়। পিতা শীতলমণি মুখার্জ্জী রাজসাহীতেই কার্য্য-ব্যপদেশে বসবাস করতেন। শ্রীমুখার্জ্জী পিতৃদেবের কাছাকাছি থেকেই প্রথম পড়াশুনো আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে। ছোটবেলা মায়ের কাছ থেকে কি ভাবে মানুষ হ'তে হবে, এ শিক্ষা পেয়েছেন। কোন অবস্থাতেই মিথ্যে বলতে নেই, তাঁর প্রতি মায়ের ছিল সতর্ক নির্দ্দেশ। এ নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করেই শ্রীমুখার্জ্জী জীবনপথে এগিয়ে এসেছেন এতখানি এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের মূলে এটিই কাজ করে থাকবে সব চেয়ে বেশী রকম।

শ্রীমুখার্জ্জীর কলেজ-জীবনও অতিবাহিত হয় রাজসাহীতেই। সেখান থেকে ১৯৩০ সালে তিনি অর্থশাস্ত্রে বি, এ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং তার পরেই এম, এ ও ল' পড়বেন বলে চলে আসেন কলকাতায়, ল'তে যেমন তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, এম, এতে তেমনি একটি পেপারে পরীক্ষা

না দিয়েও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরবে ভূষিত হন। পড়াশুনোর ব্যাপারে পিতার কাছ থেকে টাকা-পয়সা কখনও নিতে হয়নি তাঁকে। বরাবর বৃত্তি পেয়ে তিনি পড়েছেন ও ট্যুসানি করেই নিজের সব খরচা চালিয়েছেন।

১৯৩৪ সালে শ্রীউপানন্দের সাফল্যময় কর্ম্মজীবনের হয় সূচনা। পুলিশ-অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কর্ম্মতৎপরতা ও বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন তিনি অনেক স্থলেই। দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি। এর একটি অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং অপরটি ঢাকার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পল্লীঅঞ্চলে। প্রথম ক্ষেত্রে কংগ্রেস-সভাপতিরূপে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) যাচ্ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে, সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারী মৌলবী আস্রাফউদ্দীন চৌধুরী, এ ১৯৩৮ সালের কথা। তখন প্রায় ৩ সহস্র মোসলেম লীগ-সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশনটি ঘিরে ফেলে। তাদের সঙ্গে ছিল কৃষ্ণপতাকা—বিক্ষোভটা ছিল আস্রাফউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধেই। আস্রাফউদ্দিনকে লক্ষ্য করে লীগওয়ালারা প্রস্তর নিক্ষেপ করে চলল, এবং এর ফলে সুভাষচন্দ্র কয়েক স্থানে আঘাতও পেলেন। এদিকে কংগ্রেস-সমর্থকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হ'লো—তাঁরা এর প্রতি-ব্যবস্থা অবলম্বনে হলেন উদ্যত। অবস্থা অত্যন্ত জটিল ও মারাত্মক আকার ধারণ করছে দেখে শ্রীমুখার্জ্জী এগিয়ে এলেন। তাঁর হাতে তখন কোন অস্ত্রই ছিল না। এ অবস্থাতেও একাই তিনি কিছুক্ষণ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্য্যন্ত তারা বিক্ষোভ ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ঢাকার ঘটনাটিও কম রোমাঞ্চকর নয়, পরন্তু আগেরটির চেয়ে এটি আরও গুরুতর। ১৯৪১ সালে শ্রীউপানন্দ তখন ঢাকায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। ঢাকায় এর ভেতর হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে নারায়ণগঞ্জের পল্লী-অঞ্চলে। এক শ' বর্গ-মাইল স্থান জুড়ে সংখ্যা-লঘুদের ঘর-বাড়ীগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। এ স্থানগুলো ছিল বিশেষ ভাবে মুসলমান অধ্যুষিত। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। এ সময় শ্রীমুখার্জ্জী এগিয়ে যান ওদিকে ছোট একটি পুলিশ-বাহিনী নিয়ে। রাত্রিতে একটি ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশনে যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে কোন সংবাদ দেবার মত কাউকে পাওয়া গেল না। চারি দিকে শুধু দেখা গেল লেলিহান আগুন। তিনি এগিয়ে চললেন ক্রমেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। কোন প্রকার ভীতি বা চাঞ্চল্য তাঁর হৃদয়কে তখন স্পর্শ করেনি। কয়েক মাইল যাওয়ার পর তিনি দেখতে পেলেন পাঁচ-ছয় হাজার লোক একটি স্থান ঘিরে আছে। পৌঁছে বুঝলেন এটি একটি থানা—এটি পুড়িয়ে দেবার জন্যেই হাজার হাজার লোকের এ অহেতুক সমাবেশ। থানার অফিসার ও অন্যান্য কর্ম্মীরা সব তখন দরজা বন্ধ করে অসহায়ের মত কান্নাকাটি করে চলছেন। এতটুকু বিলম্ব না করে বা পরিণতির কথা না ভেবে শ্রীমুখার্জ্জী উত্তেজিত জনতাকে নির্দ্দেশ দিলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থান ত্যাগ কর, নতুবা গুলী চালাবো। এই বলে সত্যি সত্যি তিনি গুলী করবার জন্য নিজ বাহিনীকে প্রস্তুত হবারও আদেশ দিয়ে দিলেন। তাঁর এ অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা ও দুর্দ্দান্ত সঙ্কল্প দেখে ক্ষিপ্ত জনতা ঘাবড়ে গেল মুহূর্তে এবং পালিয়ে যাবার জন্য তখন আরম্ভ হলো তাদের মধ্যে ছুটাছুটি। পাঁচ মিনিট মধ্যে ঐ স্থানটি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হ'লো এবং এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চারি দিকের দাঙ্গা-হাঙ্গামাও বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো আপনিই। ঢাকার তৎকালীন দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন ব্যাপারে

শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জী

শ্রীউপানন্দের যে অবদান, তা সকলে প্রশংসিত হয়। এই দাঙ্গা সম্পর্কে নিযুক্ত কমিশনও তাঁর অসীম সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং পুলিশ অফিসার হিসেবে তাঁর এ বীরত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শনের জন্যই সরকার তাঁকে পুলিশের সর্ব্বোচ্চ সম্মান "কিংস পুলিশ মেডেল" পর্য্যন্ত প্রদান করেন ১৯৪২ সালে। ঢাকা থেকে তিনি বদলি হয়ে আসেন হাওড়া রেল-পুলিশে। কয়েক মাস সে কার্য্য করার পর তিনি চলে যান হুগলীতে। ১৯৪৬ সালে সেখান থেকেই এ, আই, জি হ'য়ে চলে আসেন কলকাতায়। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন তিনি যুদ্ধোত্তর যুগের পুলিশ বিভাগীয় পুনর্গঠন কার্য্য সম্পন্ন করেন সাফল্যের সঙ্গে। দেশ বিভাগের পর যে সকল পুলিশ-অফিসার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবার জন্য মত প্রদান করেন তাঁদের এখানে উপযুক্ত কর্ম্ম-সংস্থানের কঠিন দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের দিকে পশ্চিমবঙ্গের যে আট শতাধিক মাইল সীমান্ত রয়েছে, একে সুরক্ষিত করার জন্য সকল ব্যবস্থাই সম্পন্ন করতে হয় তাঁকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত আধুনিক পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মূলেই তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে—বিশেষ করে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সংগঠন, সীমান্তে পুলিশঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন—এ সকল কাজ। তাঁর অসামান্য কর্ম্মদক্ষতার জন্য সরকার ১৯৪৮ সালে তাঁকে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করেন। ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল লাভ করেন তিনি। বর্ত্তমানে শ্রীউপানন্দ কলকাতার পুলিশ কমিশনারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। পূর্ব্বেও ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে।

১৯৫৪ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিনি কলকাতা মহা-নগরীর গুণ্ডাদমন বিভাগের স্পেশাল অফিসার ছিলেন। গুণ্ডা দমন কার্য্যে তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং এতে তিনি নাগরিকদের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। দৃঢ়সঙ্কল্প ও মনোবল এবং উপস্থিত বুদ্ধি থাকলে মানুষ যে জীবনে কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জী নিজেই এর এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রী পি, কে, সেন

[ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও এডিশনাল কমিশনার ট্রাফিক]

অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপর ও সাহসী এ পুরুষটি। দেখলেই বোঝা যায় ইনি একজন সামরিক বা পুলিশ-প্রধান। বাল্যকাল থেকেই তাঁর চরিত্রে একটা ডানপিটে ভাব, কোন বিপদেই ভ্রূক্ষেপ নেই, কর্ত্তব্যে কখনই পিছু হটা নেই। যখনই যে কাজের আহ্বান তাঁর কাছে এসেছে, যত কঠিনই হোক না কেন, সুষ্ঠু ভাবে ও অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে আসছেন তিনি তা। অসাধারণ সংগঠন শক্তি, বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—এ কয়টি মূলধন নিয়ে তাঁর জীবনযাত্রা হয় সুরু এবং এ ই সাহায্যে পুলিশ বিভাগে যোগদান করে শ্রী পি, কে, সেন (প্রণবকুমার সেন) আজ একখানি উচ্চ আসন ও মর্য্যাদা লাভ করেছেন।

বার বছর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীসেন বলতে গেলে তাঁর মাসীমার ঘরেই মানুষ। ১৯১২ সালে ফরিদপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পিতা রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত সেন ছিলেন তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট প্লিডার। শ্রীসেনের জন্মের পরই তাঁর মাতৃদেবী কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ফলে মায়ের কাছে থেকে মানুষ হওয়া তাঁর ভাগ্যে জুটলো না।

তিনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মাসীমার গৃহে তখন থেকেই তাঁকে থাকতে হয়। মাসীমা বড়লোক ছিলেন না। কাজেই নিজে বড়লোকের ঘরে জন্মাবার সুযোগ পেয়েও তাঁর ছোটবেলাটা কাটে দারিদ্র্যের মধ্যেই। এতে এক দিকে তাঁর পক্ষে ভালই হোল। নিজের মনটাকে বড় করে তোলবার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জ্জনের ও কষ্টসহিষ্ণু হ'বার সুযোগ পেলেন তিনি যথেষ্ট।

শ্রী পি, কে, সেন

দুর্দ্দান্ত ডানপিটে ছেলে বলে একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি শ্রীসেনের ছিল বরাবরই কিন্তু তাই বলে পড়াশুনোর ব্যাপারে এতটুকু অবহেলা ক'রতে দেখা যায় নি। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোয়, সাঁতারে, নৌকা চালনায়, ঘোড়ায় চড়া ও ব্যায়ামে সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অগ্রণী। ১৯২৮ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং ভর্ত্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। মেছুয়া বাজারে ওয়াই, এম, সি, এ হোষ্টেলে সে সময় তিনি থাকতেন। হোষ্টেলে থাকা কালীন জীবনটাকে তিনি গড়ে তোলেন আরও শক্ত ও নিয়মানুগ করে। স্কুল এবং কলেজ-জীবনে তিনি সকল প্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠান বিশেষ ভাবে হকি, বাস্কেট বল, ক্রিকেট ও টেনিসে এবং বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন প্রতি ক্ষেত্রেই। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ তিনি বি, এ, পাস করেন ১৯৩২ সালে। তার পর ১৯৩৫ সালে তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসরই প্রতিযোগিতা করেন আই, পি পরীক্ষায়। আই, পি তে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩৭ সালে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

পুলিশ বিভাগের একজন কর্ম্মকর্ত্তারূপে শ্রীসেন প্রথমে নদীয়ায় আসেন। সে সময় কৃষ্ণনগরে জেলা জজ স্বর্গত বীরেন মিত্র, আই, সি, এস এর সঙ্গে থাকবার তাঁর সুযোগ ঘটে। এতে লাভ হ'লো পুলিশী আবহাওয়ায় থেকেও মানুষ হিসেবে বড় হওয়ার তিনি কতকগুলো পথের সন্ধান পেলেন এবং সে সন্ধান দিলেন স্বর্গত মিত্রই—শ্রীসেনের মতে "এঁর হৃদয় ছিল প্রকাণ্ড বড়।" ১৯৩১ সালে নদীয়ায় ও অন্যান্য স্থানে যখন বন্যা হয়, দেখা গেল শ্রীপ্রণবকুমার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। পুলিশের দায়িত্বের উপরেও যে মানুষ হিসেবে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনের জন্য তিনি ছুটে যান এগিয়ে। তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—অন্যায়কে তিনি কখনও বরদাস্ত করেন না। একটি ছোট্ট ঘটনা তিনি তখন পটুয়াখালীর এস, ডি, পি ও। তাঁর অধীনস্থ এক জন পুলিশ-ইন্স্পেক্টর ধরা পড়লো তাঁর কাছে নারী-ঘটিত এক গুরুতর অপরাধে। ইচ্ছে করলে তিনি ছেড়ে দিতে পারতেন এ লোকটিকে, হয়তো বা দু'টো কটু কথা বলেই। কিন্তু শ্রীসেন সে ভাবে কখনোই গঠিত নয়, অপরাধ যখন হয়েছে, তার শাস্তিও পেতে হবে সমুচিত। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টরটিকে গ্রেপ্তার করলেন, কোনরূপ আবেদন-নিবেদন শুনতে চাইলেন না।

পুলিশ-অফিসার হিসাবে শ্রীসেন বিভিন্ন জেলায় কাজ করে এসেছেন এবং সর্ব্বত্রই সুদক্ষ ও সবল কর্ম্মিরূপে তাঁর সুনাম রয়েছে। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাওড়ায় এ, আর,

পি অফিসারের গুরু দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত হয়। এখানে থেকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল তিনি এ, আর, পি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন ও অন্যান্য সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সদস্য-সংখ্যা ছিল বার সহস্রেরও অধিক। এত বড় এ, আর, পি স্বেচ্ছাসেবক-সংস্থা ভারতে আর কোথাও ছিল না সে সময়ে। তাঁর অপূর্ব্ব সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভার মর্য্যাদার স্বরূপ তিনি ১৯৪৩ সালে এম, বি, ই উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিনে শ্রীপ্রণবকুমার কর্ম্মনিযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রামে এডিসনাল এস, পি হিসেবে। আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা বন্ধের জন্য তিনি তখন আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সফলকামও হন অনেকাংশে। তৎকালীন লীগ সরকার সে জন্য তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না, তাঁকে হত্যা করতেও চাওয়া হ'লো কিন্তু তবু তিনি কর্ত্তব্যে অবিচল রইলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি চলে আসেন কলকাতায় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হ'য়ে। তখনও কলকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছিল এবং তিনি এ দমনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ—কলকাতা পুলিশের ডাকাতি নিরোধ বিভাগ সৃষ্টি। এ বিভাগ তিনি বহু সশস্ত্র ডাকাতি ব্যর্থ করেন এবং বেশ কয়েক ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন। দেশ বিভাগের জটিল দিনগুলোতে কলকাতায় তিনিই ছিলেন একমাত্র হিন্দু ডেপুটি কমিশনার। কিন্তু তাহাতেও তিনি নির্ভীক ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করেন নি। দেশ স্বাধীন হ'বার পর ১৯৪৮ সালে তিনি কলকাতা পুলিশের সদর কার্য্যালয়ের ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। এ পদে থাকা কালীন শ্রীসেন নাগরিক জীবনের সুবিধার দিকে তাকিয়ে পুলিশ বিভাগকে নানা ভাবে সংগঠিত করেন। কলিকাতা নারী-পুলিশ বাহিনী ও স্পেশাল কনষ্টেবুলারী সৃষ্টি, রাজপথ সমূহে যান-বাহন নিয়ন্ত্রক বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা, ক'লকাতা পুলিশের বেতার ব্যবস্থার সংস্কার ও সম্প্রসারণ, কন্ট্রোল রুমের পুনর্গঠন, পুলিশের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ সৃষ্টি, প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরই নেতৃত্বে ও অগ্রগামিতায় সম্পন্ন হয় সে সময়ে। একই সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম্ সেন্সর বোর্ডের সেক্রেটারী এবং কলকাতা দমকল বিভাগেরও অধিকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীসেন ১৯৪১ সালে সরকার কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রাফিক সংক্রান্ত ও ফরেন্সিক সায়েন্সে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য। শিক্ষান্তে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায় এবং প্রবর্ত্তন করলেন ট্রাফিকের কয়েকটি উন্নততর ও আধুনিক ব্যবস্থা। এখানে ফরেন্সিক সায়েন্স সম্পর্কিত যে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। অপূর্ব্ব কর্ম্ম-দক্ষতার পুরস্কার-স্বরূপ ১৯৫৪ সালে তিনি ভারত সরকারের নিকট হইতে পুলিশ পদক প্রাপ্ত হন।

শ্রীপ্রণবকুমার যে পরিবার থেকে এসেছেন, সে পরিবারটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য। তাঁর প্রত্যেকটি ভ্রাতাই যে যেদিকে গিয়েছেন, সেদিকেই অর্জ্জন করেছেন প্রচুর সুনাম। তাঁর অগ্রজ ডাঃ প্রফুল্লকুমার সেন (ডাঃ পি, কে সেন) ভারতের একজন বিখ্যাত যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ। শ্রীসেন নিজেও বর্ত্তমানে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা নিয়ে আছেন। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর উপর পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় ট্রাফিক বিভাগের ডি, আই, জি ও এডিসনাল কমিশনারের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হ'য়েছে। এ বছরেরই এপ্রিল মাসে তিনি আই, বি ও সি, আই, ডি বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। এ ক'টি দায়িত্ব-সম্পন্ন কাজই এক সঙ্গে তাঁকে করতে হচ্ছে, এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

মনের দিক থেকে এখনও তিনি সতেজ ও বলিষ্ঠ, বয়সও তাঁর তেমন কিছু হয়নি, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর ভবিষ্যৎ যে আরও উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়, এ অনায়াসেই মেনে নেওয়া চলে।

শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণ রায়

[বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী ও আইন-সভার সদস্য]

গোলামখানা ছাড়বার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৃপ্ত আহ্বান এসেছে তখন। তরুণরা একে একে বেরিয়ে পড়ছে ঘর ছেড়ে, বিদ্যায়তন ছেড়ে, সে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ইনিও—জমিদার-বংশোদ্ভূত শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণ রায়। কোন প্রকার বন্ধনই তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি সেদিন। দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য সকল বিপদের ঝুঁকি অম্লান বদনে বরণ করতে তিনি হলেন প্রস্তুত। এ করতে যেয়ে তিনি বিদেশী সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং ভোগ করতে হয় তাঁকে লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন নানা ভাবে। এক বৎসর কাল তাঁকে অন্তরীণে আবদ্ধও থাকতে হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার খ্যাতিসম্পন্ন জেমো গ্রামে শ্রীবিজয়েন্দু জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৭ সালে এক বিশিষ্ট জমিদার-বংশে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন তাঁর মাতুল। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলছেন, "আমার ডাক নাম রেখেছিলেন আমাদের বড় মামা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর—'টিকেন্দ্রজিৎ', সে নামটি শেষ পর্য্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ালো—'টিকু', পরিচিত হ'লাম আপন জনের কাছে সেই মহাপুরুষের দেওয়া নামেই। আসল নামটি এক রকম উহ্যই রয়ে গেল।"

শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণের প্রথম পড়াশুনো কান্দীরাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি ভর্ত্তি হন বহরমপুর কলেজে। এ সময়েই দেশের কাজে স্কুল-কলেজ ছেড়ে আসবার জন্য তরুণদের কাছে ডাক আসে চিত্তরঞ্জনের। তিনিও কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বদেশী

আন্দোলনে। এ ব্যাপারে তাঁর পূজ্যপাদ মধ্যম মাতুল দুর্গাদাস ত্রিবেদী উৎসাহ জুগিয়েছিলেন প্রচুর। জেমো গ্রামে তাঁর বাসভবনটি সেদিনে হয়ে উঠেছিল স্বদেশসেবার একটি মস্ত বড় প্রাণকেন্দ্র।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ, যতীন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁদের গৃহে পদার্পণ করেন।

শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণ রায়

একনিষ্ঠ জনসেবক হিসেবে শ্রী রায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন বহু দিন থেকে। একাদিক্রমে ২১ বছর তিনি কান্দীর পৌরসভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ২৬ বৎসর কাল জেলা-বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন তিনি। কান্দীর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকেন প্রায় ১৫ বছর। কান্দীর উন্নতির মূলে তাঁর নিঃস্বার্থ যত্ন ও প্রয়াস রয়েছে অপরিসীম।

তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন চলেছে। কান্দী পৌরসভার গৃহশীর্ষে স্বাধীনতার পতাকা উড়লো। জেলা-শাসক এসে পৌরসভার সভাপতি শ্রীবিজয়েন্দুকে বললেন, "জমিদারের ছেলে হয়ে ঐ পতাকা নিয়ে থাকবেন না পৌরসভাতে।" কিন্তু শ্রী রায়ের স্বাধীন-চেতা মন সে কথায় এতটুকু সায় দিলে না. পতাকা নামাতে তিনি অস্বীকার করলেন। তাতেই রাজ-রোষ নেমে এলো তাঁর উপর; আদেশ হয়ে গেল স্বগৃহে অন্তরীণ থাকবার। বাড়ী-ঘর তচ-নচ করে তল্লাসী হ'লো। জমিদার হিসেবে বন্দুক রাখার অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন।

শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণের দেশসেবার আগ্রহ এখনও কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সমাজ ও জাতির যাতে কল্যাণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কাজ করে চলেছেন। প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম নির্বাচনে তিনি ভরতপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসেবে পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী আরও অনেক পাবে, এ আশা করতে পারি।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

নোতুন ক'রে গ'ড়ব এবার গ্রামখানা
দীঘি-পুকুর হবে মুকুর
ভুলবে শেওলা দাম-পানা।
রাখব বাগান ভর্ত্তি ফুলে-ফলে,—
র'চবে কাব্য হৃষ্ট প্রিয়া, পুষ্ট শিশুদলে,
খাঁচার পাখী পালিয়ে এসে
মেলবে হেথা দুই ডানা।
কলের লাঙল ছুটবে মাঠের বুকে
জলের তরে চাইব না আর
কালো মেঘের মুখে;
(মোরা) ছড়াব সার রকমারি
গাড়ী গাড়ী—
বুনব সেরা বীজদানা।
ধান, ভুলো, পাট, সর্ষে হবে ক্ষেতে,
ঘর-কানাচে সব্জি-শাকের
গাছে দেবে পেতে;
থাকবে মরাই নিত্যি ভরাই
গাই দেবে দুধ দই ছানা।

গাঁয়ে বসেই ক'রব যে যার পেশা,
কারুর ঘাড়ে চাপবে না কো
চাকরী খোঁজার নেশা
মায়ের কাছে সবার আদর, সবার কদর
খেতে-ছুঁতে নাই মানা।
থাকব না আর বাবার-বেটে—
অন্ধকারে প'ড়ে,
পেটের জ্বালায় দেবো না মান
বড়লোকের দোরে;
ফড়ে দালাল হবে কাবার
ঘুচবে দুঃখ একটানা
বুদ্ধিজীবীর ধোকায় প'ড়ে হব না আর কালকানা।
কলের তাঁতে বুনব চাদর-কাপড়
কামারশালে বড় ক'রেই
চলবে না হয় হাপর,
সহর থেকে ভেজাল-বিলাস
হবে নাকো আর আনা।
মাটির স্বর্গে জমবে না আর
চোর-ভিখারীর আস্তানা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো পঁয়ত্রিশ

মেডিকেল কলেজের ইংরেজ ডাক্তার কোটস এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। যদিও হোমিওপ্যাথি চলছে, একবার দেখে যেতে ক্ষতি কি।

যে প্রণালীতে সাহেবি পরীক্ষার বিধি তা এক কথায় বলা যায় আসুরিক। সরাসরি ঠাকুরের গলা টিপে ধরলেন।

যন্ত্রণায় শিউরে উঠলেন ঠাকুর। বুঝলেন ব্যাধির চেয়ে চিকিৎসাই মর্মান্তিক।

তখন কি আর করা! স্বভাবজ সমাধিতে ডুবে গেলেন। এখন দেখ তোমার যত খুশি। যত খুশি কসরৎ করো।

সাহেবের চক্ষু স্থির! এ কি অদ্ভুত রোগী! ভূতলে অতুল শোভা এ কি নির্মলকান্তি! রোগ দেখবে না রোগী দেখবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সাহেব।

কেমন দেখলে?

রোগ তো ক্যানসার, বলতে পারি সহজে। কিন্তু এ রোগী কে? সর্বলোকসুধাবহ· সর্বচক্ষুস্নেহপ্রদ। এমনটি তো আর দেখিনি কোথাও। বাইবেলে পড়েছি যীশুর এমন ভাবসমাধি হত। আজ দেখলাম স্বচক্ষে। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। শরীরে যে এত কষ্ট, আননমণ্ডলে যেন তার চিহ্নমাত্র নেই। কন্টক-টক উত্তীর্ণ হয়েও যেন ফুটে আছে আনন্দপদ্ম।

যিনি মহাচিন্ময় হয়েও বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিত, যিনি জড়ের অন্তঃস্বরূপ চৈতন্য—সাহেব যেন সেই পরমাত্মার রূপ দেখলে। ছদ্মবেশধারী রাজাকে।

ওষুধ? যেমন চলছে তেমনি চলুক। তাইতেই ভালো হবে।

চিকিৎসার ভার নিল না সাহেব। তা না নাও, তোমার প্রাপ্য ফি-টা নিয়ে যাও। হাত গুটোল সাহেব। বললে, টাকা ছুঁয়ে হাত ও মন অশুচি করতে পারব না। এ টাকাটা ওঁরই সেবায় ব্যয় হোক।

তার পর এল ডাক্তার নবীন পাল। মহেন্দ্র সরকার রোজ আসতে পারে না এত দূর, তাই হাতের কাছে একজনকে মজুত রাখো। নবীন পাল ডাক্তার হয়েও কবরেজি করে। মন্দ কি, তার চিকিৎসাই ক' দিন করা যাক না।

কিন্তু সুবিধে হল না। তার বিধিব্যবস্থাও ক্লেশদায়ক।

হোমিওপ্যাথিই ভালো। তবে এবার একবার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তকে নিয়ে এস।

কিন্তু রাজেন্দ্র শুধু ডাক্তার হয়েই আসে না, ভক্ত-মূর্তিতে আসে। কখনো হাতে একটি সুগন্ধি ফুল নয়তো সুমধুর একটি ফল। কি পথ্য খেতে ইচ্ছে করে তোমার—কখনো বা সেই পথ্য। বিদ্যুন্মালা-মণ্ডিত এ কে মহামেঘ! গ্রীষ্মকৃশ ধরিত্রীকে কৃপা-বারিসিঞ্চনে তুষ্ট-পুষ্ট করছেন! আমার তো চিকিৎসা নয়, আমার এ ব্রত, হরিতোষণ ব্রত। আহা, দুর্বল শরীরে ঐ চটিজুতোর ভার তুমি বইতে পারছ না—মখমলের নরম চটি হলে ভালো হয়। রাজেন দত্ত মখমলের চটি নিয়ে এল। নিজ হাতে পরিয়ে দিল শ্রীপদে।

নিত্যসিদ্ধ আগুন যেমন কাঠে আবির্ভূত হয় তেমনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর মহাভূতরূপে জন্ম নেয়। কিন্তু কে তাকে চেনে? সমুদ্রস্থ চন্দ্রকে মাছ কমনীয় জলচর মনে করে, চিনতে পারে না অমৃতপিণ্ড বলে। কৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বাস করেও যদুবংশীয়েরা চিনতে পারেনি হরিকে। শীতোষ্ণবাতবর্ষে অভিভূত আমরা, সংশয়খিন্ন বুদ্ধি আমাদের, চিনতে পারব কি তোমাকে? হে তমঃসংহর্তা বিজ্ঞানাত্মা, তোমার সর্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোটি কি আমাদের চোখে এসে পড়বে?

ডাক্তার সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন ওষুধ দিল রাজেন্দ্র। একটু যেন ফল হল। ব্যথার যেন উপশম হল খানিকটা।

কিন্তু সেই বল কি চিকিৎসায়, না, ভক্তির? ভক্তিই একমাত্র বলবিধায়িনী ওষধি।

ক'দিন পরেই আবার যে-কে-সে। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।

কিন্তু অসুখের কথা কই? কেবল ঈশ্বরের কথা। সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান জেগে রয়েছেন, ফুটে রয়েছেন, ফ'লে রয়েছেন সেই কথা।

'কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন', বললেন ঠাকুর, 'তুমি আমাকে ঈশ্বর বলছ—কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখবে এস। অর্জুন গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখছ? অর্জুন বললেন, মস্ত একটা গাছ। কি গাছ? জাম গাছ। কি ফলে আছে? অর্জুন বললেন, কালো জাম থোলো থোলো হয়ে ঝুলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কালো জাম নয়। দেখ ভালো করে। আর একটু এগিয়ে এসে দেখ। তখন অর্জুন দেখলেন, বললেন, থোলো-থোলো কৃষ্ণ ফ'লে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখলে তো? আমার মত কত কৃষ্ণ ফ'লে রয়েছে।'

ডাক্তার সরকার বললে, 'এ সব বেশ কথা।'

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেমন কথা?'

'বেশ।'

'তবে একটা থ্যাঙ্ক-ইউ দাও।' লোকাতিহর হাসি হাসলেন ঠাকুর।

পরিহাসের স্বচ্ছ জলের উপর ফোটাচ্ছেন বর্ণাঢ্য ভাবপদ্ম। ঈশ্বরকথার চন্দনে স্নিগ্ধ করছেন রোগযন্ত্রণা।

কিন্তু, জানো ডাক্তার, ব্যথাটা আবার বেড়েছে।

'নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছ।' ডাক্তার সরকার শাসিয়ে উঠল।

সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ, সন্ধ্যায় আবার একটু দুধ আর যবের মণ্ড—এই তো পথ্য সারা দিনের। তার মধ্যে আবার অনিয়ম কি?

'কি, কুপথ্য করেছ, তাই—'

ঠাকুর মাথা চুলকে বললেন, 'কই না তো!'

'আচ্ছা, আজ কোন কোন আনাজ দিয়ে ঝোল রান্না হয়েছিল?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'আলু কাঁচকলা বেগুন—'ঠাকুর আবার মাথা চুলকোলেন: 'দু এক টুকরো ফুলকপিও ছিল—'

'এঁ্যা! ফুলকপি? ফুলকপি দিয়েছ? এই তো খাবার অত্যাচার হয়েছে।' তড়পাতে লাগল ডাক্তার: 'ক টুকরো খেয়েছ?'

'না গো এক টুকরোও খাইনি।' ঠাকুর বললেন অপরাধীর মত: 'তবে ঝোলে ছিল দেখেছি।'

'দেখেছ? তবেই হয়েছে। না খেলে কী হয়?'

'না খেলে কী হয়!' ঠাকুর অবাক হবার ভাব করলেন।

'কপি না খাও ঝোল তো খেয়েছ। ঝোলে তো কপির গুণ ছিল। তারই জন্যে তোমার হজমের ব্যাঘাত হয়ে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছে।'

'সে কি গো!' ঠাকুর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: 'কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু-কি কপির রস ছিল তাইতেই অসুখ বাড়ল? এ কিছুতেই মানতে পারব না।'

'মানতে পারবে না কেন?' ডাক্তার বসল গ্যাঁট হয়ে: 'আমার বেলায় কি হয়েছিল তবে শোনো! হোমিওপ্যাথি করি, ছোট একটুকুর শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারি না। তুমিই তো বলো, ছোট-একটুকু বীজে বিরাট বনস্পতি। সে বার আমার দারুণ সর্দি হল। সর্দি থেকে ব্রঙ্কাইটিস। কিছুতেই সারে না। কেন যে অসুখটা লেগে থাকছে বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শেষে একদিন দেখি কি—'

ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'দেখি চাকর গরুকে মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। যে গরুটার আমি দুধ খাই সেই গরুটাকে। কি ব্যাপার? চাকর বললে, কোত্থেকে কতগুলো মাষকড়াই জুটেছে সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চাচ্ছে না, তাই ঠেসে ঠেসে খাওয়াচ্ছে গরুকে। হিসেব করে দেখলাম যেদিন থেকে মাষকড়াই খাচ্ছে গরু, সেদিন থেকেই আমার সর্দি।'

'তারপর কি করলে?'

'গরুর মাষকড়াই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর আমার সর্দিও সেরে গেল।'

সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

'কিসে কি হয় কিছু বলা যায় না।' আবার গল্প জুড়ল ডাক্তার। 'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুংরি কাশি, হুপিং কাফ। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল।'

'গাধা ভিজেছিল কি গো!'

'যে গাধার দুধ খেত মেয়েটি সেই গাধা ভিজেছিল বৃষ্টিতে।'

'কি বলে গো!' ঠাকুরও রঙ্গ করলেন: 'সেই যে বলে তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিল তাই আমার অম্বল হয়েছে।'

পড়ল আবার হাসির রোল।

'জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল।' ফোড়ন দিল ডাক্তার: 'তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের সারা গায়ে বেলেস্তারা লাগিয়ে দিলে।'

কিন্তু ঠাকুরের অসুখ নরম পড়ে না কিছুতেই।

শশধর তর্কচূড়ামণির অন্য কথা। নিজের চিকিৎসা নিজে করো। কি ছাই পরের কাছে ব্যবস্থা চাও, নিজেই নিজের ব্যবস্থা করো। তুমি নিজে ভবরোগবৈদ্য হয়ে কি করতে অন্য ডাক্তারের শরণ নিচ্ছ! হাতে যার লণ্ঠন সে টিকে ধরাবার জন্যে প্রতিবেশীর ঘরে আগুন চাইতে যায় কেন?

কি করতে হবে?

'শাস্ত্রে পড়েছি আপনার মত যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা ইচ্ছা করলেই শারীরিক রোগ আরাম করতে পারেন। যেখানটায় কষ্ট সেখানটায় মন একাগ্র করে আরামের তীব্র প্রার্থনা করলেই তা সেরে যায়। তা একবার দেখুন না চেষ্টা করে।'

'তুমি এত বড় একটা পণ্ডিত হয়ে এমন কথা বললে?' ঠাকুর আপত্তির সুরে বললেন, যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচার উপর দেব? এটা তুমি কেমন কথা বললে গো?'

সে বার এক কুষ্ঠরোগী এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'দয়া করে যদি একবার হাত বুলিয়ে দেন তবেই আমি সেরে যাই।'

'কই আমি তো জানি না কিছু!'

'আপনাকে কিছু জানতে হবে না।' লোকটি কান্নায় লুটিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। 'শুধু দয়া করে একটু হাত বুলিয়ে দিন।'

'যখন বলছ দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।' হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর।

হাত বুলিয়ে দেবার পর তখন নিজের হাতে কি অসম্ভব যন্ত্রণা। অস্থির হয়ে উঠলেন। মাকে বললেন আকুল হয়ে, 'মা এমন কাজ আর করব না।'

রোগীর রোগ সেরে গেল আর যত ভোগ নিজে টেনে নিলেন।

দেখতে পেলেন একদিন স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে এসে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দেখলেন তার পিঠময় ঘা। এমন কেন হল? তখন মা দেখিয়ে দিলে, যা-তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়, তখন তাদের সেই দুষ্কর্মের বোঝা নিতে হয় ঘাড় পেতে। সেই জন্যেই তো এই রোগ, এত কষ্ট।

সকলের শাপ আর তাপ জ্বালা আর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে যাব। আমার রোগে সকলের আরোগ্য।

নগরের প্রান্তে এসে সিদ্ধার্থ তাঁর অশ্বকে বিদায় দিলেন। দেখলেন পথের উপর কটিধৃত কাষায়পরিহিত এক কিরাত। বললেন, তোমার ঐ ছিন্ন কাষায়খানা আমাকে দাও।

সিদ্ধার্থের পরিধানে কৌষেয়। বিনিময়ে তা পাবার লোভে কিরাত তার কাষায় ত্যাগ করল। আর তথাগত কৌষেয়বাস ছেড়ে জীবরক্তকলঙ্কিত অশুচি বসন গায়ে ধরলেন। জীবজগতের পুঞ্জিত বেদনা বহন করে চললেন বনপথে।

কৌষেয়পরা ব্যাধ চলল তাঁর পিছু-পিছু। এ কি, তুমি কোথায় চলেছ এই গহন রাতে?

ব্যাধ বললে, 'এ কী বসন তুমি পরালে আমাকে? তীরধনুক খসে পড়ছে আমার হাত থেকে। জগৎ-প্রাণীকে মনে হচ্ছে আত্মজন। তুমি তোমার বসন ফিরিয়ে নাও। আমাকে দাও আমার জীর্ণ চীর।'

সিদ্ধার্থ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'ভাই তুমিই আমার সাধনার পথের প্রথম বন্ধু। জীবনবসন জীবহিংসাচিহ্নিত হয়ে আছে, অহিংসার সাধনায় এসে তাকে নবীনধবল করি। কৌষেয় জীর্ণ হোক, দূর হোক হিংসাদ্বেষকলহ আর কাষায় পবিত্র হয়ে বিশ্বমানবের নির্বাণবেশ রচনা করুক।'

একশো ছত্রিশ

নলিনীদলসনাথ সরোবরের পারে এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। দেখলেন, হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়—চার পর্বতের মত তাঁর চার ভাই, ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব, মরে পড়ে আছে। হা কুরুকুলকীর্তিবর্ধন, তোমাদের এ দশা কে করল? কাঁদতে লাগলেন আকুল হয়ে।

আমি করেছি। আমি যক্ষ। এই সরোবর আমার অধিকারে। আমার নিষেধ অমান্য করে তোমার চার ভাই জল পান করতে চেয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তার পর চাও তো জল খাও।

নিশ্চয়ই। তোমার অধিকৃত বস্তুতে আমার অভিলাষ নেই। বললেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারব ঠিক-ঠিক? আত্মশ্লাঘা করছিনে, সাধুপুরুষেরা আত্মশ্লাঘার নিন্দে করে থাকেন, তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, নিজের বুদ্ধি-অনুসারে তোমার উত্তর দেব।

বেশ, তবে শোনো।

সূর্যকে কে উর্ধ্ব রেখেছে? কে সূর্যের চার দিকে বিচরণ করে? কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় বা তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির উত্তর করলেন: ব্রহ্ম সূর্যকে উর্ধ্বে রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চার দিকে ঘুরে বেড়ান, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠান, আর তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন সত্যে।

ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি কারণে? তাদের কোন ধর্ম সাধু ধর্ম? কিসে তাদের মানুষ ভাব? অসাধু ভাবই বা কেন?

বেদপাঠের হেতু তাদের দেবত্ব। তপস্যাই সাধুধর্ম। মৃত্যু মনুষ্যভাব। আর পরনিন্দায় তারা অসাধু।

ক্ষত্রিয়গণের * দেবভাব সাধুভাব মনুষ্যভাব অসাধুভাবই বা কি?

অস্ত্রনিপুণতা দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব।

পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? আকাশের চেয়ে উচ্চতর কে? বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর কে? তৃণের চেয়ে বহুতর কে?

মাতা পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর। পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু। মন বায়ুর চেয়ে শীঘ্রগামী। আর তৃণের চেয়ে বহুতর হচ্ছে চিন্তা।

কে নিদ্রিত হয়েও নয়ন মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? কে বেগেওবর্ধিত হয়?

মাছ নিদ্রাকালেও চোখ বোজে না। অণ্ড প্রসূত হয়েও নিস্পন্দ। পাষাণই হৃদয়হীন। নদীই বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষু—এদের মিত্র কে?

প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্যা, আতুরের চিকিৎসক, মুমূর্ষুর দান।

কে সর্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম কি? অমৃত কি? সমুদয় জগৎই বা কি পদার্থ?

অগ্নি সর্বভূতের অতিথি। জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম। সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত। বায়ুই সমুদয় জগৎ।

কে একাকী বিচরণ করে? কে বারে বারে জন্মায়? কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

সূর্য। চন্দ্র। পৃথিবী।

ধর্মের, যশের, স্বর্গের ও সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

দাক্ষ্য ধর্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের, শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করলে শোক যায়? কি ত্যাগ করলে ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়?

অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক যায়, কামনা ত্যাগ করলে ধনী হয়, আর লোভ ত্যাগ করলে সুখী।

তপঃ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

স্বধর্মানুবর্তিত্বই ধর্ম, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাই ক্ষমা আর অকার্য থেকে নিবৃত্তিই লজ্জা।

জ্ঞান শম দয়া ও আর্জব কাকে বলে?

তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখাভিলাষই দয়া আর সমচিত্ততাই আর্জব।

স্থৈর্য ধৈর্য স্নান ও দানের কি লক্ষণ?

স্বধর্মে নিয়তাবস্থা স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান আর প্রাণিরক্ষাই দান।

অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি?

অজ্ঞানই অহঙ্কার, ধর্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য আর পরের প্রতি দোষারোপই পৈশুন্য।

সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? বার্তাই বা কাকে বলে?

যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে বা সন্ধ্যাকালে গৃহে শাক পাক করেন তিনিই সুখী। প্রাণিগণ শমনসদনে যাচ্ছে প্রত্যহ তবু অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এইটেই আশ্চর্য। নানা মুনির

নানা মত, ধর্মের তত্ত্ব গুহা-নিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গেছেন তাই পথ। আর বার্তা? মহা-মোহরূপ কটাহে কাল জগৎপ্রাণীকে পাক করছে, সূর্য তার আগুন, দিনরাত্রি তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার দর্বী।

যক্ষ বললে, তুমি ঠিক ঠিক সব উত্তর দিয়েছ। এখন শেষ প্রশ্নের জবাব দাও। পুরুষ কে? আর সর্বধনীই বা কোন জন?

পুণ্যকর্মের ফলে মানুষের কাম স্বর্গ স্পর্শ করে ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যত দিন থাকে তত দিনই সে পুণ্যকর্মা পুরুষ বলে গণ্য। যে অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ প্রিয়-অপ্রিয় তুল্য বলে মনে করে সেই সর্বধনী।

বেশ, খুশি হলাম। এখন ভ্রাতাদের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নাও, সে বেঁচে উঠবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, তবে একমাত্র নকুল জীবিত হোক।

সে কি? ভীম, অর্জুন কারু প্রাণ না চেয়ে বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ চাইলে?

ধর্মকে নষ্ট করলে ধর্মই আমাদের নষ্ট করবেন। বললেন যুধিষ্ঠির, আর রক্ষা করলে রক্ষা করবেন। কুন্তী আর মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। উভয়ে পুত্রবতী থাকুন এই আমার অভিলাষ।

তুমি কামনায় ও কার্যে অন্তরে-বাহিরে, অনৃশংস। অতএব তোমার সকল ভাইই পুনর্জীবিত হোন।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশ্নোত্তরমালিকা দেখ।

পথ কি? যত মত তত পথ।

দেবতা থেকেও বড় কে? মানুষ। মানুষ কে? যে মান-হুঁস সে। আর আমি কে? তুমি।

দয়া কি? সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া। চাতুরী কি? যে চাতুরীতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

সিদ্ধ কে? পরের দুঃখে যে কাঁদে। তত্ত্বজ্ঞান কি? আত্মজ্ঞান। লাভ কেমন? ভাব যেমন।

দেহের যত্ন করবে কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে বলে। ঈশ্বর কে? মানুষ। কোথায় তার বৈঠকখানা? ভক্তের হৃদয়ে।

জ্ঞান অজ্ঞান কি? এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। যখন তোথা তখন অজ্ঞান, যখন হেথা তখন জ্ঞান।

বীরভক্ত কে? সংসারে থেকে যে ঈশ্বরকে ডাকে। উপায় কি? দু'টি—অভ্যাস আর অনুরাগ। কার হয় না? যে বলে আমার হবে না।

তপস্যা কি? সত্য কথা। মন্ত্র কি? মন তোর মন্তোর। মায়া কি? কামকাঞ্চন। অবিদ্যা কি? যে ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়।

গীতার অর্থ কি? দশ বার গীতা গীতা বললে যা হয়। কার কাছে ঈশ্বর ছোট? ভক্তের কাছে। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়, কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্তের কেমন স্বভাব? আমি বলি তুমি শোনো, তুমি বলো আমি শুনি।

কোথায় নিমন্ত্রণের দরকার হয় না? যেখানে হরিনাম।

ঈশ্বর আমাদের কি? আমাদের বিলেত।

আর, ইচ্ছা কি? স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা? ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কলকাতার বড় আদালতের উকিল জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'মশায়, একটি সন্দেহ আমার যায় না। এই যে বলে ফ্রি উইল, স্বাধীন ইচ্ছে, মনে করলে ভালও করতে পারি মন্দও করতে পারি, এটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমরা স্বাধীন?'

'সব ঈশ্বরাধীন, সব তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা।' বললেন ঠাকুর: 'তাঁর ইচ্ছেতেই ছোট বড় সবল দুর্বল ভালো লোক মন্দ লোক। এই দেখ না বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।' আবার বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রমে তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত। পাপে ভয় হত না, পাপে শাস্তি হচ্ছে এ বোধ হত না।'

সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজা হচ্ছে। উঠানে ভক্ত সঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর। ঠেসান দেওয়ার জন্যে ঠাকুরকে তাকিয়া দেওয়া হল। তাকিয়া সরিয়ে রাখলেন।

'তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো অভিমান ত্যাগ করা বড় শক্ত। এই বিচার করছ অভিমান কিছু নয়, আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, জেগে উঠেও ভয়ে বুক দুর-দুর করে। অভিমানও সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে পড়ে কোত্থেকে। কেবল মুখভার, কেবল নালিশ, আমায় খাতির করলে না, আমাকে তাকিয়া দিল না ঠেসান দিতে।'

নদীর জল নদীতে আছে, সে জল কি আমার? বনের ফুল ফুটে আছে কাননে, সে ফুল কি আমার? জল যখন তুলে আনি কলসীতে তখন বলি আমার। ফুল যখন তুলে এনে ডালিতে সাজাই তখন বলি আমার। জল দিয়ে দাও তৃষ্ণাতুরকে, ফুল দিয়ে দাও দেবতার পূজায়। তখনই অহং সার্থক, তখনই অহং আত্মা।

আমি শরীর তুমি আত্মা। আমি রথ তুমি রথী। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি গাড়ি তুমি ইঞ্জিনিয়র।

বৈদ্যনাথের দিকে ফের তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'আপনি কি বলো? তর্ক করা ভালো?'

'আজ্ঞে না। তবে তর্ক করার ভাব জ্ঞান হলে যায়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। যদি কোনো মহাপুরুষ বলে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও লোকে তার কথা নেয় না। বলে ও যখন দেখেছে তখন আমাকেও দেখিয়ে দিক। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, সেই বৈদ্যের সঙ্গে ঘোরো। তখন কোন্‌টা কফের কোন্‌টা পিত্তের কোন্‌টা বায়ুর বুঝতে পারবে। আগে সুতোর ব্যবসা করো তবেই তো বুঝতে পারবে কোন্‌টা চল্লিশ নম্বর কোন্‌টা বা একচল্লিশ নম্বরের সুতো।'

খোল বাজছে। এবার কীর্তন সুরু হবে। গায়ক জিগগেস করছে, কি পদ গাইব? ঠাকুর বললেন, 'ওগো একটু গৌরাঙ্গের কথা কও।'

রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত কীর্তন চলল। ঠাকুর কত নাচলেন, আখর দিলেন।

সুরেন বললে, 'আজ কিন্তু মায়ের নাম একটুও হল না।'

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, 'আহা, মা কেমন আলো করে বসে আছেন। দর্শনে ভোগের ইচ্ছা দুঃখশোক সব পালিয়ে যায়। নিরাকার কি দর্শন হয় না—হয়, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি এতটুকু থাকলে আর হবে না। দেখ দেখি, বাইরে কেমন দর্শন করছ আর আনন্দ পাচ্ছ।'

সুরেন কারণ পান করে। একবার গিরিশ ঘোষ বসেছিল সামনে। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন সুরেনকে: 'তুমি আর কি! ইনি তোমার চেয়ে—'

'আজ্ঞে হাঁ।' সুরেন বললে হাসতে-হাসতে, 'ইনি আমার বড় দাদা!'

কারণ খেয়ে কি হবে? কারণানন্দদায়িনীর করুণাসুধা পান করো। সহজানন্দ হয়ে যাও।

'তুমি কারণ খেয়েছ?' বলতে-বলতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট।

প্রতিমার সামনে প্রণাম করলেন ঠাকুর। এবার যাবেন দক্ষিণেশ্বর। হাঁক দিলেন: 'ও—রা, জু—তো?'

অর্থাৎ, ও রাখাল, জুতো আছে, না হারিয়ে গেছে?

[ক্রমশঃ।
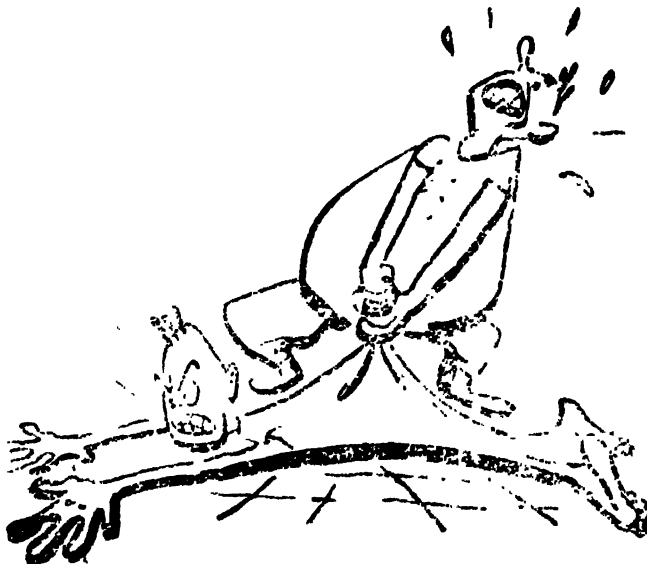
উদয়ভানু

কোদাল-কাটা মেঘ যেন ভোরের আকাশে।

সদ্যফোটা ফুলের সুবাগন্ধ। শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস। বনে বনে ফুল ফুটছে, প্রথম পবিত্র পবনস্পর্শে পাপড়ি খুলছে অস্ফুট কুঁড়ি। গন্ধের তরঙ্গ আসছে চাঁপা আর বন-মল্লিকার বন থেকে। আসমান-দীঘির দুই তীরে যুঁই আর গন্ধরাজের গাছ, দীঘির জলে ছায়া তুলেছে। ঐ চাঁপার বনে থাকে কাঠুরিয়া। গাছের আড়ালে বাসা বেঁধেছে। চালা তুলেছে, ঘর-সংসার পেতেছে দীন-দুঃখীর মত। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে বেরোয় রাত থাকতে থাকতে। কাঁধে কুড়ুল চাপিয়ে বন কাটতে যায়। বন কেটে কেটে যেন পরখ করে কুড়ুলের। পূবাকাশে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে গাছে গাছে কুঠারাঘাত পড়তে থাকে। ভোরের শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া শিউরে শিউরে ওঠে তখন গাছের আর্তনাদে। ক্ষুরধার কুঠারের ঘায়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে শাখা-প্রশাখা। তখনও আকাশ থাকে কালো-সাদা—আঁধারের রেশ আর আলোর আভাস।

কাঠুরিয়া কাঠ কাটে না কেন! আকাশে নতুন দিনের আলো, তবুও যেন স্থির হয়ে আছে বনাঞ্চল! শান্ত আর মৌন দিগ্বিদিক্। একটি পাখীও এখনও ডাকলো না। আঘাতে জর্জ্জরিত গাছের আর্ত চিৎকার শোনা যায় না।

আধো-ঘুম আধো-জাগা চোখে দীঘির পৈঠায় বসেছিলেন রাজকুমারী। আলস্যে না দুশ্চিন্তায় গালে হাত। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিন্ধ্যবাসিনীর রুক্ষ-মুক্ত কোঁকড়া চুলের রাশি থরথরিয়ে ওঠে। ঘুম-জাগা চোখে রাজকুমারী তাকিয়ে থাকেন চাঁপাবনের শীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথে। ঐ পথে দেখা যায় কাঁধে-কুড়ুল কাঠুরিয়াকে। তখনও থাকে পাৎলা অন্ধকার! আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে শুকতারা দপ্ দপ্ করে।

তবে কি চাঁদের আলো! দ্বাদশীর চাঁদ ডুবলো না এখনও! দিনের আলো ফুটলো না! মাঝ-ঘুমে হঠাৎ জেগে উঠেছেন রাজকন্যা। বাসকশয়ন বৃথা হয়ে গেছে, ঘরকরণের সাধ মিটলো না, মনে শুধু দুঃখদিনের ঝড় বইছে অষ্টপ্রহর। নিদ্রা নেই চোখে, জেগে ব'সে রাত কেটে গেল। চোখে জ্বালা ধরেছে।

আসমান-দীঘির পৈঠায় একা-একা বসে থাকেন গালে-হাত বিন্ধ্যবাসিনী। বাতাসে বস্ত্রাঞ্চল কাঁপছে। থরথরিয়ে উঠছে আলুথালু রুখু চুলের বোঝা! চোখে যেন ঘুমের ঘোর এখনও। মুখে জাগরণের কালিমা!

—তুমি কোন্ দিন চোর-ডাকাতের হাতে পড়বে। এমন রাত থাকতে ওঠ?

চোখ ফেরালেন রাজকুমারী! ঠোঁটে হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে বল্লেন,—কাকপক্ষীর সাড়া মেলে না, চোর-ডাকাত কোথায়?

আকাশে কোদাল-কাটা মেঘ পানে চোখ তুললো পরিচারিকা। বললে,—অভাবের দেশ, দিনে ডাকাতি হয় হেথায়! খুনোখুনি তো লেগেই আছে! কাল রাতেও গয়লাদের আটচালায় ডাকাত পড়েছে।

চোখ বড় করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘুম-জাগা চোখ। বললেন,—তুমি কেমনে জানলে?

—প্রহরীর কাছে। কথা বলতে বলতে ঘাটের পৈঠায় বসলো যশোদা। বললে,—গয়নাগাটি টাকাকড়ি কিছু বাদ দেয়নি। দুটো গাই-বাছুর। গয়লাদের পুরুষকে পেছো-কাটা ক'রে কেটে গেছে।

চোখ বড় করলেন রাজকুমারী। জোর হাওয়ায় বুকে আঁচল রাখতে দেয় না যেন। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—গয়লাবাড়ী কত দূরে যশো?

—চার পোয়া পথ। দূরে নয়, কাছেই।

যশোদা কথার শেষে হাই তুলতে থাকে হাঁ ক'রে।

ভোরের মিষ্টি ঘুমটুকু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ যেন তার, মুখে বিরক্তি।

চোখ মেলতে শয্যায় দেখতে পাওয়া যায়নি রাজকুমারীকে। শূন্য পালঙ্কে শুধু এলোমেলো শয্যা। কাঁথা-মাদুর। দেখলে ঠাওরানো যায়, কে যেন বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। ঘুম-ভাঙা চোখে যশোদা বিশ্বাস করতে পারেনি। ভেবেছিল সত্যি নয়, স্বপ্ন। দেখার ভুল, চোখ কচলে কচলে দেখে যশোদা। শূন্য শয্যা দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ভাবে, গেল কোথায় রাজকুমারী! চোখে ধূলো দিয়ে স'রে পড়লো নাকি রাতারাতি!

ভগ্ন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে খোঁজাখুঁজি করতে করতে দীঘির ঘাটের দিকে যায় যশোদা। ঘাটের পৈঠায় জমিদার-নন্দিনীকে দেখতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—আমার ভয় কি চোর-ডাকাতকে?

কেমন যেন হেসে হেসে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কথার সুরে নির্ভয়। বলেন,—আমার কাছে সোনাও নেই, দানাও নেই!

—তুমিই যে সোনাদানার চেয়ে বেশী দামী।

যশোদার কথায় গাম্ভীর্য্য। বলে,—তোমার মত একটিকে পেলে চোর-ডাকাতের বহুৎ লাভ।

বিন্ধ্যবাসিনী কপালের 'পরে নেমে-আসা রুখু চুর্ণকুন্তল সরিয়ে বললেন,—মিথ্যে মিথ্যে ভয় পাও কেন যশো। শেয়াল-কুকুরেও টানবে না। সাপেও দংশাবে না।

[illegible]কের মেয়ে, তুমি জানবে কি! যশোদা [illegible] সুরে বলে,—তোমার মত রূপসী একটিকে পেলে—

শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে। দীঘির তীরে ঘাসফুল নেচে নেচে উঠছে। যুঁই আর গন্ধরাজের শাখা প্রণাম করছে যেন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে! ভোরের বাতাস ভারী হয়ে আছে সদ্যফোটা ফুলের সুগন্ধে। বাঁশবনে ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ। আঁধার দিগন্তে!

—কাঠ-কাটুনেকে দেখা যায় না কেন?

রাজকুমারী বলেন আর ফিরে ফিরে দেখেন দূরের চাঁপা-বন। বুকের আঁচল বুকে থাকে না বাতাসের বেগে। রুখু চুলের গুচ্ছ নামে কপালে। আলুলায়িত কোঁকড়া কেশ উড়তে থাকে কাশফুলের মত।

যশোদাও চোখ ফেরালো। দেখলো চাঁপাবনের শীর্ণ পথ-রেখা। তার চোখে যেন এখনও ঘুমের জড়তা লেগে আছে। যখন তখন হাই তুলছে! যশোদা বলে,—আকাশে কোদাল-কাটা মেঘ, হয়তো বর্ষা করবে, তাই ঘরের বার হয়নি।

বৃষ্টি! কথা শুনে অধীর ভাব ফুটলো যেন বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। আকাশে চোখ তুললেন। ঈশানের হাওয়া বইছে।

—শিলাবৃষ্টি না হয়!

যশোদা কথা বলে আর আড়মোড়া ভাঙে। আসমানের শিলাবৃষ্টি! প্রকৃতির এ কি উৎপাত সাতসকালে! ‍ি এক আশায় যেন ভাঙন ধরে রাজকুমারীর।

—সূয্যি হয়তো উঠবেনি আজ।

আড়মোড়া ভাঙে আর বলে যশোদা। বলে,—ভা নদীর ওপারে, চাষারা আল বাঁধতে বেইরেছে।

কখন সকাল হয়েছে, খেয়াল নেই বিন্ধ্যবাসিনীর। গ জলের মত রঙ হয়েছে যেন নীলাকাশের। কোদাল-ক মেঘ। হলকর্ষণ করেছে কে যেন আকাশ-ক্ষেত্রে। লা চালিয়েছে।

'—বোশেখের পথম জলে, আউশ দ্বিগুণ ফলে।' যশে কথা বলে আর আসমানের জলে চোখ ফেরায়। দী জলের মত স্থিরদৃষ্টি তার চোখে। ঘুম-ভাঙা আল নিষ্পলক চাউনি। বললে,—এ্যাকটা বছর আকাল গে জল হয়তো ভাল হয়! দেশের লোক খেতে পায় দু' মুঠো

ঐ আকাশে মন চলে গেছে যেন রাজকুমারীর। ক কাক ডাকলো বনমল্লিকার বনে। ঈশানের হাওয়ায় তা বাসা দেখে ভয় পেয়ে ডাকলো যেন কাক। কাঠি-কুটো খুঁ খুঁজে ঠোঁটে ধ'রে বয়ে আনতে হবে—ভাঙা-বাসা য যদি উড়ে যায়! কচি কচি ছা এক পাল, কোথায় ছিট পড়বে সাঁই সাঁই বাতাসে। ঈশানের হাওয়ায় ভয়-পা আর্ত্ত ডাক কাকের। ভাঙা-বাসার কাঠি উড়ছে!

পাখীর প্রথম কাতর কাকলী কানে যায় না রাজকন্য প্রথম কাক ডাকলো। বিশ্ব যেন লুপ্ত হয়ে গেছে বিন্ধ্যবাসি চোখে। আমোদরের অপর তীরে শ্যামল তালবন, স্পষ্ট ওঠে ধীরে ধীরে। রাত্রির কালো মেঘে অরুণ-আলোর লাগে। শিরশিরে বাতাসে বিবশ ফুল খসে খসে প দীঘির তীরে। চাষারা আল বাঁধতে বেরিয়ে পড়েছে মাঠে। কোদাল-কাটা মেঘের ছায়া কাঁপছে আমোদ জলে! আকাশে উড়ছে চাতক আর চাতকী।

—যশো, যদি বর্ষা নামে!

কেমন যেন বিমর্ষ সুর বিন্ধ্যবাসিনীর। মুখপদ্ম হতাশায় পূর্ণ।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বৌ! দীঘির জল চোখ সরায় না যশোদা। বলে,—বর্ষা না নামলে মাঠ জ্ব'লে যাবে যে! ফসল যদি না হয়, কি খেয়ে বাঁচবে মা

রাজকুমারী কেমন যেন অবশ হয়ে পড়েন। বি নিশীথ-পারাবার শেষ হয়েছে। দিনের আকাশে স্ব স্বচ্ছ আলো নেই, মন থেকে যেন ভাল লাগে না প্রকৃতির পরিহাস। দু' হাতে মুখ ঢাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কি গোপন-স্বপন মিথ্যা হয়ে যায়, তাই যেন ভেঙে প নিরাশায়।

লাজ-আবরণের বালাই নেই দীঘির ঘাটে। বিবসনা বিন্ধ্যবাসিনী,—বাতাসে আঁচল উড়িয়ে দি প্রভাতের ফুলের মত কোথায় জেগে উঠবে, রাজকুমারী

দীঘির নিকষ-কালো জল থেকে চোখ ফেরালো পরিচারিকা। দেখলো জমিদার-নন্দিনীর ঊর্দ্ধদেহ—হলুদ রঙে যেন লালের আভা। স্বর্ণপিঁড়ি থেকে আঁস্তাকুড়ে স্থান হয়েছে—কঠিন শয্যার চিহ্ন পড়েছে মোমের মত নরম দেহে। যশোদা যেন রূপ দেখে অবাক মানে। রূপ আর রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। রাজকন্যা দেখতে পান না, যশোদা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেহের গঠন। কুমোরপাড়ার মাটির প্রতিমা যেন, বাহন ছেড়ে এসে ব'সেছে। প্রতি অঙ্গে যৌবন-লাবণ্যের নিটোল কোমলতা শুধু!

—নারায়ণের কি ব্যবস্থা হবে বৌ?

হঠাৎ কথা বললে যশোদা। আলস্যভরা ঘুম-জড়ানো কথা। ভোরের ঈশানী হাওয়ায় যেন তার ঘুম-ঘুম পায়। চোখ জড়িয়ে আসে। টাটকা ফুলের সুগন্ধে নেশা ধরে।

দীঘির দুই তীরে কাল বিহানের বিবশ ফুল খ'সে খ'সে পড়ছে। যুঁই ফুলের আস্তরণ ঘাসে আর শৈবালে। দীঘির জলে গন্ধরাজ আর করবী ফুলের সাদা লাল ছায়া। গাঁয়ের কচি কিশোরী ক'জন, ফুলের মত ছড়িয়ে পড়লো করবী-গাছের তলায় তলায়। কোথা থেকে ডানা মেলে উড়ে এলো আকাশ-পরীর মত—আঁচল উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো আসমানের সবুজ তীরে।

ভোরের আলো ফুটতে, ফুল-তোলার গান শুনাতে বেরিয়েছে ফুলের মত কুমারী-কিশোরীর দল। বাগানে বাগানে গান গাইবে দলে দলে, গান গাইবে আর ফুল তুলবে। গাছ-কোমর বেঁধে গাছে উঠবে।

রাজকন্যা উদাস-আঁখি তুললেন। অলকচূর্ণ সরিয়ে দিলেন কপাল থেকে। যশোদার কথার কোন জবাব নেই। ঘুম-ভাঙা চোখে তাকিয়ে থাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। যেন কি এক গোপন-স্বপন ভেঙে জেগে উঠেছেন। কাজল পড়েনি কত কাল, তবুও যেন কাজল-কালো চোখ। রাজকুমারীর চোখে যেন চোখ রাখা যায় না, এমনই শুষ্ক-উদাস দৃষ্টি।

যশোদা বললে,—নারায়ণের সেবা হবে না? তিন সন্ধ্যে পুজো!

লাজ-আবরণের বালাই নেই। তবুও আঁচল টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কেন কে জানে, মনে মনে যেন শপথ করলেন, চোখে যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়। তাঁর চোখ দেখে কেউ যেন না বোঝে তাঁর মন। দুয়োর বন্ধ থাক হৃদয়ের—অন্ধকারে লুকিয়ে থাক মনের কথা। আঁধার ঘরে থাকুক জলজলে মাণিকের মত। আলোয় যে শুধু কালো-কলঙ্ক!

এক-সন্ধ্যা পূজা হয় না, তিন-সন্ধ্যা।

নারায়ণ যদি থাকেন অস্নাত-উপোসী। পায়ে যদি তাঁর তুলসী না পড়ে। অঙ্গন্যাস নাই যদি হয়। দশোপচারের !

আসমানের তীরে ফুল-তোলার প্রভাত-সঙ্গীত। কচি কণ্ঠ, পাখীর কলকাকলীর মত। কুমারীকন্যারা দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে আসমানের ঘাস-বিছানো সবুজ তীরে, অশোক, করবী আর গন্ধরাজ-গাছের ছায়াতলে।

—কারা আসে যশোদা?

রাজকন্যা কথা বললেন করুণ করুণ সুরে। নিস্পৃহ চাউনি ফুটেছে চোখে। দীঘির তীরে চোখ।

পরিচারিকা বলে,—ওরা গাঁয়ের মেয়ে। আসছে দূর দূর থেকে। ফুল তুলছে ব্রতের। পেতত্যহ আসে।

স্বপ্ন দেখছিলেন হয়তো বিন্ধ্যবাসিনী। দেখছিলেন, কারা বুঝি আসছে তাঁকে উদ্ধার করতে। স্বর্ণপিঁড়ির রাজকন্যার ঠাঁই হয়েছে আঁস্তাকুড়ে। তাই কঠিন শয্যা থেকে হয়তো তারা নিয়ে যাবে ফুলের বিছানায়—পরিয়ে দেবে ফুলের অলঙ্কার—খেতে দেবে মধু।

ব্রতের লগন এসে গেছে। বৈশাখের নতুন হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে গ্রামের ঘর-আঙিনায়। যুঁই আর বেলায় মিলনলগ্নে ব্রত পালনের পুণ্য সময়।

যশোদা বলে,—পুণ্যিপুকুর আর অশ্বত্থপাতা করবে মেয়েরা। করবে দশ পুতুল, গোকল, হরির চরণ। পুরো বোশেখ মাস চলবে এই ব্রতের পালা। শিবপূজো করবে। তাই ফুল আর বিল্বিপত্তর তুলছে। তুলসী-দুব্বো তুলছে। দেবো কোন্ দিন প্রহরীকে ব'লে!

আসমানের ঘাটের এক পাশে আছে একটা বহুকালের বুড়ী মাধবীলতার ঝাড়। সাপের মত লতিয়ে লতিয়ে উঠেছে ঘাটের ভাঙা প্রাচীরে। কত কালের কে জানে, তবুও ফুল ধ'রে শাখায় শাখায়। ফুলের স্তবকে গাছের পাতা দেখা যায় না। মৌমাছিকে মধু বিলিয়ে ফুল ঝ'রে পড়ে ঘাটের পৈঠায়। হাওয়ায় গন্ধ ভাসিয়ে দেয়।

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—গাছে গাছে কত ফুল! কে বা তোলে! প্রহরীকে যেন জানিও না দাসী!

মেঘ ডাকলো গুরু-গুরু। থমথমে দিনের আলো, চমকালো যেন সেই শব্দে। ভোরের কালো আকাশে হলকর্ষণের কাটা-কাটা মেঘ। ঈশানের হাওয়া চলেছে বনমল্লিকার বনে।

—শিলাবিষ্টি আসে তো বেশ হয়! ফুল চুরি করার যথাত্ত শাস্তি হয়!

—না না। এমন কথা ব'ল না! কেমন যেন কাতর কথা বলেন রাজকন্যা।

শিলাবৃষ্টি! টুকরো টুকরো বরফ পড়বে আকাশ থেকে। ঝমঝম বর্ষণ। আকাশ থেকে পড়বে আর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়াবে। গাছের ফলে দাগ পড়বে। শূন্য প্রান্তরে যে থাকবে অনাবৃত, তীরের মত বিঁধবে তার মাথায়। বৃষ্টির জলে রক্তের ধারা মিশবে তখন।

—কি নিষ্ঠুর তুমি! অলক্ষ্মী কোথাকার! কাল-ভুজঙ্গিনী!

বিন্ধ্যবাসিনীর কথায় গঞ্জনার রেশ। চোখে উগ্র দৃষ্টি। বুকভরা শ্বাস টানলেন রাজকুমারী। পরিচারিকার কথা

…রুদ্ধশ্বাস ছিলেন যেন এতক্ষণ। শিলাবর্ষণের ভয়ে! …লেন,—আহা, কচি কচি বাছা সব।

—কার বাছা কে দেখছে! রাশি রাশি ফুল, চুরি করছে! শাসনের মূর্ত্ত প্রতীক যেন যশোদা। রুক্ষ কণ্ঠের কথা। …মিয়েরি ভাব।

—হেলায়-ফেলায় যায়। কেউ তোলে না ফুল!

দীঘির তীরে চোখ রেখে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁর …গ্র চাউনি যেন থমকে আছে ফুল-তোলার গান শুনে। পাখীর কলকাকলীর মত গান গাইছে ফুলের মত কচি কচি কিশোরী। গাছ-কোমর বেঁধে গাছে উঠেছে। ব্রতের ফুল …করছে সাজিতে। গান গাইছে না মন্ত্র বলছে, কে জানে। হয়তো তুলসী আর বিল্বপত্র আহরণের মন্ত্র বলছে গুনগুনিয়ে।

কাক ডাকলো কোথায়। আর্ত্ত আর্ত্তনাদ। ঈশানের হাওয়া চলেছে। ভাঙাবাসার ভয়ে কাক ডাকছে কর্কশ।

আকাশ-পরী আকাশে উড়লো। কার যেন রোষদৃষ্টি দেখে উড়ে পালালো ভয়ে। পুণ্যলোভী কিশোরীর দল এই ছিল এই নেই। গাছ-গাছড়ার আবডালে লুকিয়ে পড়লো না কি! ভয়-পাওয়া হরিণীর মত চকিতে অদৃশ্য হয় কোথায়!

খিল-খিল হাসি হাসলো যশোদা। তার চোখের শাসানি তবে ওদের চোখে পড়েছে! শ্যেনদৃষ্টি দেখে আর আকাশ-গর্জ্জন শুনে তারা পালিয়েছে আঁচল উড়িয়ে, সাজির ফুল ছড়িয়ে। দেখে তাই আনন্দের হাসি হাসছে যশোদা।

—হাতের কাছে পাই তো টুঁটি ছিড়ে খাই!

হাসি-হাসি সুরে কথা বলে যশোদা। দয়ামায়ার লেশ মাত্র নেই। এক তিল স্নেহ নেই মনের কোণেও! রুক্ষ, শুষ্ক হাসি।

পরিচারিকাকে দেখলে যেন ভয়-ভয় করে।

রাজকুমারী আড়ষ্ট হয়ে থাকেন যশোদার হাসি শুনে। দীঘির নির্জ্জন তীরে যেন হাসির প্রতিধ্বনি ভাসছে!

হাসির প্রতিধ্বনি না আকাশের গুরু-গুরু গর্জ্জন, ঠিক বোঝা যায় না। ভোরের আকাশে বিদ্যুতের কাঁপন দেখা যায়, আমোদরের অপর তীরে, আল-ভাঙা মাঠের ওপরে, খোলাটে আকাশে। বাতাস কখন থেমে গেছে!

—চল'. ঘরে যাই দাসী।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন ভয়ে ভয়ে। বিদ্যুতের ঝিলিক যেন চোখে দেখতে মন চায় না। রুপালী দিনের আলো, ভাগ্যে নেই যেন রাজকুমারীর। ভাগ্যে শুধু কালো আঁধার। কি এক গোপন-স্বপন যেন মিথ্যা হয়ে গেল অকাল-বর্ষণে। শিলাবৃষ্টি আবার আসন্ন!

—নারায়ণের সেবার কি হবে?

আবার বললে যশোদা। হাসি থামিয়ে বলে,—ঘরে যাবে …নি, ওঠ' তবে।

অলকো-ঝলকো চুল কপাল' থেকে সরিয়ে দিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আলগা আঁচল উঠলো আদুড় গায়ে। ক্লান্ত দেহ তুললেন ধীরে ধীরে।

আগে-হাঁটুনী যশোদা চললো আগে আগে। আড় দৃষ্টি তার চোখে। অন্তঃশিলা নদীর মত দাসীর বুকে যেন মাৎসর্য্যের বাসা। কাঠের পুতুলের কঠোর কঠিন ভাবভঙ্গী। তুলোপানা মুখ হয়ে আছে।

—কি করি যশো?

পিছু পিছু যেতে যেতে বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অসহায়ের মত বলেন,—ফুল বিল্বপত্র দিলে পূজো হয় না? জল দান করলে? স্নান হয় না আমোদরের জলে?

—হয় না কেন, সবই হয়। তোমাদের হিঁদুদের শাস্ত্রে কিছুই হয় না, আবার সবই হয়।

যশোদার যেন ধর্ম্ম অস্থ, এমনি কথার ধরণ। বলে,—তা উপায় যখন নেই, তখন কি আর করি!

গুরু-গুরু মেঘ ডাকলো ঈশানে। আসমানের জলে সোনালী-বিদ্যুৎ খেলছে ঘন ঘন। আকাশের ছায়া দীঘির জলে।

—তাই হোক দাসী। ভাঁড়ারে চাল আছে, ফল আছে। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন। বলেন,—নৈবিদ্যি হবে'খন। গাছে আছে ফুল। মালা গেঁথে দেবো।

—যা মন চায় কর'। যশোদা বলে। বলে,—আমি দীঘিতে ক'টা ডুব দিয়ে দু'টি মুড়ি-মোয়া খাই! দিন-রাত্তির পারি না আর হেপাজতের মধ্যখানে, ভাঙাঘরে বন্দী হয়ে থাকতে! তোমার তরে আমার দুর্ভোগ!

নীরব বিন্ধ্যবাসিনী। চুপিসাড়ে চলেছেন পিছনে। চোখের দৃষ্টি যেন অশ্রুনত হয়েছে। বুকের স্পন্দন পড়ছে কি পড়ছে না।

দাসী বললে,—শুনতে পাই, বাপের বাড়ী রাজার বাড়ী; তা দিয়ে দিক না আমাদের জমিদার যা চাইছে। দাবী চুকিয়ে দিক না এখুনি! মিটে যায় কষ্টের ভোগ!

রাজকুমারীর কানে জ্বালা ধরে কথা শুনে! পরিচারিকার কথায় যেন শ্লেষ আর বিদ্রূপ। বিন্ধ্যবাসিনী যেন জ্বলছেন মনে মনে! মুখে কত তিরস্কারের কথা আসছে, তবুও নিশ্চুপ! কথা বলতে যেন এখানে সাহস হয় না। যশোদার শান্ত, স্থির মূর্ত্তি দেখেছেন রাজকন্যা, দেখেছেন খুশী-খুশী মুখ। এমন ভয়ঙ্কর রূপ কোন দিন চোখে পড়েনি। সামান্য রাগে তার অন্য রূপ হয়ে ওঠে। দেখলে ভয় ভয় করে। বিন্ধ্যবাসিনী ভীতা হন যেন! ঘন ঘন শ্বাস পড়ে তাঁর। ছিন্নমূল স্বর্ণলতার মত ভূমিতে যদি প'ড়ে যান। চরণ যেন অবশ হয়ে আসে। কারাগারের অবাধ্য বন্দিনীর মত বিন্ধ্যবাসিনী দালান পেরিয়ে চলেন ধীরে ধীরে।

—দাবী যে বড় বেশী। পাহাড়-প্রমাণ!

অনিচ্ছায় কথা বললেন রাজকুমারী! ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—ভাগে যারা পেয়েছে তারা কেন ভাগ দেবে?

[১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রোম্যাণ্টিক্ কবি যতীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

'মরীচিকা' হইতে 'মরুশিখা'র ভিতর দিয়া 'মরুমায়া' পর্যন্ত কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্য তীব্র বেদনা এবং প্রতিবাদ মিশাইয়া প্রায় একটানাই চলিয়াছে। একটানা কথাটা এখানে দুই দিক হইতেই সার্থক—ভাবের দিক হইতেও বটে, ছন্দের দিক হইতেও বটে। এই তিন কবিতা-গ্রন্থে সংগৃহীত কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দোবৈচিত্র্য কম ; কবি তাহার একটা অনির্বাণ অন্তর্দাহের বাহনরূপে একটি ষড়্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোভাব প্রকাশের বহু স্থানেই একটি বিশেষ ভঙ্গিও লক্ষণীয়। সে ভঙ্গিটি হইল, একটি 'বন্ধু'কে সম্বোধন করিয়া নিজের সকল অন্তর্দাহকে প্রকাশ করা। এই বন্ধুর দুইটি রূপ রহিয়াছে, এক রূপে এই বন্ধু হইল একটি কল্পিত নিখিল বন্ধু—যাঁহার প্রেমে বিশ্বপাগল—অন্ততঃপক্ষে বহুর মতে যাঁহার প্রেমে বিশ্বের পাগল হওয়া উচিত। সেই কল্পিত বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত অন্তর্দাহের প্রকাশের কাব্য-যন্ত্রকৃতির দিক হইতে লাভ হইয়াছে এই, কবি এই কল্পিত বন্ধুর মিথ্যা-স্বরূপটি যে ভাবে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একটা সুরবন্ধের ভিতর দিয়া বিদ্রূপের কড়া-ঝাঁঝ-মিশ্রিত হইয়া স্পষ্টতম প্রকাশলাভ করিয়াছে। এই 'বন্ধু'র দ্বিতীয় রূপ হইল, সংস্কারের দ্বারা চিত্ত যাঁহার সম্পূর্ণ অনড় ছাঁচে গড়া হইয়া যায় নাই—সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণভাবেই নারাজ নয়—এমন একটি অন্তরঙ্গ সহৃদয়। সেই সহৃদয়ের নিকট বিষাক্ত মনের প্রতি ভাঁজ নিঃশেষে এবং নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া ধরিবার কাব্য-ভঙ্গিটিও কবিমনের প্রকাশকে সহজ এবং অকপট করিয়া তুলিয়াছে।

'মরীচিকা' কবির ভরা যৌবনের কাব্যগ্রন্থ, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির রচনাকাল কবির তেইশ হইতে ছত্রিশ বৎসর বয়স। তার পরে সাঁইত্রিশ হইতে একচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা 'মরুশিখা', বিয়াল্লিশ হইতে চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত 'মরুমায়া'র কবিতাগুলি। তাহার পরে পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে রচিত কবির 'সায়ম' কাব্য। কবি যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম্'-এর কাল দেখিতেছি পঁয়তাল্লিশের পর হইতেই ; আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনেও এক জীবনের পার হইতে একটা নূতন জীবনের পারে যাইবার 'খেয়া'র ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এই বয়স অপেক্ষাও এক-আধ বৎসর আগে। 'সায়ম্'-এর কাল হইতেই যতীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি—একটানা অন্তর্দাহের মধ্যে মধ্যে যেন অন্যমনা ছেদ পড়িয়াছে—সেই ছেদের পরিচয় স্পষ্ট হইয়াছে ছন্দোবৈচিত্র্যের মধ্যেও। জীবনের উপরে যে রহস্যের আবরণকে কবি প্রায় সচেতন ভাবেই বজ্রমুষ্টিতে, রোষকষায়িত নেত্রে এবং কুঞ্চিত ভ্রূক্ষেপে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, নিজের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই রহস্যের আবরণ আস্তে আস্তে যেন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। 'সায়ম্'-এর সময় হইতে এই যে সুর-পরিবর্তন তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার 'ত্রিযামা'র অনেক কবিতায়—'নিশান্তিকা'য় তাহারই পরিণতি।

'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' এই তিনখানি কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ 'মরীচিকা'র ভিতরে কিছু কিছু ছন্দোবৈচিত্র্য এবং ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিছু কিছু কবিতায় রাবীন্দ্রিক কাব্য-ধর্মের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। কিছু কিছু কবিতায় প্রকৃতির সুন্দর মূর্তির যেমন আভাস আছে, তেমনই কিছু কিছু কবিতায় প্রচলিত অধ্যাত্মবিশ্বাসের আবেগ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'বংশীধারী' কবিতায়—

> কে গো তুমি বংশীধারী—
> বাজাও বাঁশী কোন্ কূলে ?
> হৃদয় মম উদাসপারা
> বেড়ায় ঘুরে' দিক্ ভুলে'
> ধরার বুকে ঋতুর যত,
> বাঁশীর বুঝি রঙ্ ছুটি !
> বাজছে বাঁশী বারোমাসই
> মোহন সুর অকূলে ;
> কালিন্দীর ঐ কোন্ কূলে ?

অথবা—

> আমি যেন হায় কোন্ জীবনে,
> দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
> ছিলাম কোন পরীর হাতের খেলনা ;
> অকারণের কান্না হাসি
> মুখে যে মোর উঠছে ভাসি'—
> এ বুঝি সেই পূর্বজনমের খেলনা। (খেলনা)

প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমি যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র এই জাতীয় কবিতাগুলির খুব বেশি মূল্য দিতে চাহি না—আমার মনে এগুলি রবীন্দ্রযুগের ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যাওয়া পথের রচিত। নিজের সহজাত সংস্কার-প্রবৃত্তির সহিত নিজের অনুভূতি মিশ্রিত হইয়া কবির মধ্যে এই যুগেই যে বিশেষ কবি-প্রকৃতি গড়িয়া উঠিতেছিল, এই সব কবিতা সেই যথার্থ প্রতিষ্ঠিত কবি-প্রকৃতির হৃৎস্পন্দনজাত নহে। এগুলি কবির মনের গভীর হইতেও উৎসারিত নয়, পাঠকের মনের গভীরেও তাহারা তাই দীর্ঘস্থায়ী কোনও দাগ কাটে না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কবি যতীন্দ্রনাথ ভাব-বিস্তারে বা তাহার রূপ প্রকাশনে বহুপ্রচলিত সনাতন পন্থার অনুবর্তনবিরোধী ছিলেন। কিন্তু তথাপি কবিরূপে যে জাতীয় উত্তরাধিকার তিনি লাভ করিয়াছিলেন, প্রথম বয়সের কবি-মানসের উপরতলায় তাহারই টুকরা ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া বেড়াইত ; তাহাদের ভিতর হইতে কোন কোনটি বাছিয়া লইয়া রচিত কবিতাও কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে 'মরীচিকা'য়। সেই সকল কবিতাকে অবলম্বন

করিয়া যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম ও তাহার বিবর্তনের ইতিহাস বিচার করিতে গেলে আমরা ঠিক পথ গ্রহণ করিব না। মোটের উপরে দেখিতে পাই, 'মরীচিকা'য় একটি বলিষ্ঠ কবিধর্মের উদ্বোধ—'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া'র ভিতর দিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা—'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'র মধ্যে কিছুং পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহার ক্রম-পরিণতি।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, কবির এই যে মানস-পরিবর্তন এবং তজ্জনিত সুর-পরিবর্তন ইহা জীবন-সংগ্রামে শ্রান্ত-ক্লান্ত চাঁদসদাগরেরই বামহস্তে পুষ্প দ্বারা দৈব-স্বীকৃতির অনুরূপ। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখিতে পাইব, দৈব-স্বীকৃতির আমেজ ক্রমে কবির জীবনে এবং কবি-মানসে আসিয়া যাইতেছিল; যে অজানার ভূতকে কবির যৌবনের সবল দৃঢ় তীব্র ঝাঁকুনি দ্বারা দূরে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল—কবির প্রৌঢ় এবং বার্ধক্যের অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্কন্ধ যেন সেই ভূতকেই আবার ঘাড় পাতিয়া বহনে স্বীকৃতি জানাইতেছিল। অবশ্য দৈব-স্বীকৃতির আমেজ এখানে সেখানে আসিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দৈব যেটুকু পূজা লাভ করিয়াছে কবির নিকটে তাহা ঐ বাম-হস্তের পূজা—দক্ষিণ হস্ত তখনও মানুষের জীবনে বিগ্রহীভূত দুঃখের দেবতা মহেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত। দেখা যায়, সেই পূজাতেই তাঁহার প্রাণের স্ফূর্তি।

সুতরাং 'সায়ম্' হইতে কবির যে সুর-পরিবর্তন তাহাকে কবির স্বধর্মচ্যুতি বলা উচিত হইবে না—ইহা কবি-মনের ক্রম-পরিণতি। এই পরিণতি যদি না আসিত তবে 'মরুমায়া'র পরেই কবির মৃত্যু ঘটিত। কারণ মনের পরিবর্তনকে যদি তিনি জোর করিয়া [illegible]মের মাথায় আসিতে না দিতে চাহিতেন, তবে কলম বন্ধ করিয়া থাকা ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় ছিল না।

ভাবে, চিন্তায় এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতে এই পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া যতীন্দ্রনাথ আর এক দিক হইতে মস্ত বড় একটা সততারই পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করি, যে-জাতীয় সাহিত্য রচনায় এক জন সাহিত্যিক একটা সর্বজন-স্বীকৃত এবং অবিরত সাফল্য লাভ করেন, অক্ষম অনুকারকেরা তাহাকে চারি দিক হইতে সহস্র প্রকারে বাস্তিমাৎ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থারূপে গ্রহণ করুক, সার্থক শিল্পী লোভের বশবর্তী হইয়া সেই চলা পথে আবারও চলিতে চাহেন না। মধুসূদন 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য রচনা করিয়া যে আশ্চর্য আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে কেবলই বীররসাশ্রিত মহাকাব্যের-বিষয়বস্তু পাঠাইতে লাগিলেন,—কিন্তু তিনি সব ছাড়িয়া বন্ধুগণকে বিস্মিত করিয়া রচনা করিলেন 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'—কারণ মধুসূদন মনে মনে জানিতেন—'any attempt in the same direction will be something like a repitition!' রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে ঘন ঘন ঋতু-পর্যায়ের আনাগোনা চলিয়াছে—কোনও ভাব বা কৌশলের মোহ তাঁহার কাবিচিত্তকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথও তাঁহার 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' এবং 'মরুমায়া'র ভিতর দিয়া বাঙালা সাহিত্যে ভাব ও কবি-কৌশলের জন্য যে গৌরব অর্জন করিলেন, পাঠক-সাধারণের নিকট হইতে সেই 'বাহবা'র লোভ যদি কবিকে একান্ত করিয়া পাইয়া বসিত তবে পূর্ব সুরের অপরিবর্তিত প্রলম্বনে কয়েকটা 'হাপানির কবিতা' পাইতে পারিতাম, 'সায়ম্'; 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'র যে ভাল কবিতাগুলি পাইয়াছি তাহা আর পাইতাম না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কবির প্রথম তিনখানি কবিতা-গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে কবির কণ্ঠ যে ওজোগুণাশ্রিত সুরের উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছিল, পরবর্তী কবিতার অনেক স্থানে কবি-কণ্ঠ সেখান হইতে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু কণ্ঠ আপনার সহজ স্বাভাবিক শক্তিতে যেখানে গিয়া পৌঁছায় না সেখানে জোর করিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা কোনও সুগায়কের নহে; হয় তখন গান একেবারে থামাইয়া দিতে হয়, নতুবা কণ্ঠ যে সুরগ্রামে সহজে বিচরণ করে সেই সুরগ্রামেই গান বাঁধিতে হয়।

এ কথাটি সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বদাই অবহিত থাকিতে হইবে যে, 'সায়ম্' হইতে কবির কবিতার মধ্যে এই সুর-পরিবর্তন কাব্যের কোনও সাধারণ স্বধর্মচ্যুতি-সূচিত করে না; 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'র বহু কবিতার মধ্যে একই কবিধর্মের পরিচয় রহিয়াছে এবং আমরা পূর্বে কবির কবিধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মুখে যে আলোচনা করিয়াছি, সেই আলোচনায় 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা' হইতে উদ্ধৃত বহু কবিতা আমাদের অবলম্বন ছিল। যে-সব কবিতার মধ্যে কবির সুর পরিবর্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেই সব কবিতার প্রকৃতিই এখন আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

যতীন্দ্রনাথের কবিতার এই যে সুর-পরিবর্তন তাহা তাঁহার কোনও স্পষ্ট মতপরিবর্তন হইয়াই নয় (অবশ্য মতপরিবর্তনও কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব); একটা পরিবর্তন এই লক্ষ্য করি, 'মরীচিকা' হইতে 'মরুমায়া' পর্যন্ত কবির দৃষ্টির মধ্যে যেন কোনও বৈচিত্র্যের বিকল্পও নাই—একটি দারুণ দাহের আত্মাচক্রে একাগ্র যোগীর কঠোর দৃষ্টি এবং চিত্তবিহারণ। এই একটি ভাবদৃষ্টি তাঁহাকে যেন ভূতের মতন পাইয়া বসিয়াছিল। দাহচক্রের মেরুপ্রান্তে তাঁহার ধ্রুব স্থিতি; সেই দাহচক্রের আওতাতেই যেন তাঁহার সীমিত বিচরণ—তাই আমি তাঁহাকে বর্ণনা করিলাম দাবদাহের আত্মাচক্র বলিয়া। কবির একটি মানস প্রবণতা ছিল, জীবন ও জগতের যাহা কিছু সব লইয়া জীবনের একেবারে মূলে চলিয়া যাওয়া—এবং জীবনের মূল হইতে চলিয়া যাওয়া একেবারে সৃষ্টির মূলে। এই মূল ছাড়িয়া মধ্য মোহনায় তুচ্ছতের জন্য একটু ফুলকে উপভোগ করিবার যেন তাঁহার সময় ও রুচি ছিল না। কিন্তু 'সায়ম্' কবিতা গ্রন্থখানি খুলিয়া প্রথমেই যখন নূতন ছন্দে 'পারুলের আহ্বান' শুনিতে পাইলাম—

> সাত ভাই চম্পা, জা—গো—
> জা—গো—জাগো মোর সাত ভাই।
> নিদাঘের ভোরে শোন্
> ডাকিছে পারুল বোন্
> অরণ্য মাঝে আর বাত নাই,
> চম্পা গো চম্পা গো জাগো ভাই!

তখন একটা সহজানন্দের উপভোগে মন খুশি হইয়া ওঠে। এই চম্পাকে আহ্বানের মধ্যেও কবির বিশেষ মনোধর্মের পরিচয় আছে—

জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য,
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রিক তূর্য ;
বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!
পাতা হ'তে মাথা তুলি' ভাস্করে নমি' কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমিখে ?
কে পিয়ে অনলরাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো—জা—গো !—

কিন্তু এখানে মনোধর্মের একটা পরিণতি বেশ লক্ষ্য করিতে পারি। জীবনের আকাশে পরিব্যাপ্ত যে অনলরাশি তাহাকে পান করিয়াও যে তরল হাসি হাসিবার চম্পক-ধর্ম, কবির এখানকার সেই চম্পকধর্মই চিত্তে নূতন দীপ্তি আনে। জীবনের 'নবনীল অম্বরে' যে বসন্ত দেখা দিয়াছিল সে অনভ্যথিত ভাবে চলিয়া গিয়াছে তাহাতে ক্ষোভ নাই—কিন্তু কবিচিত্তের নিদাঘের রৌদ্রক তূর্যের ভিতরেও যেখানে দেখিতে পাই পারুল বোনের আহ্বানের ন্যায়—

শূন্য কাননে কেঁদে ফিরে অনুকম্পা,
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা !

তখন কবির শূন্য জীবনের আকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনাও আসিয়া চিত্তকে স্পর্শ করে।

উপরে সর্বদাই কেবল মূলে চলিয়া না গিয়া উপরের ফুলকে উপভোগ করিবার যে মনোবৃত্তির কথা বলিলাম, সেই প্রসঙ্গে কবির 'ত্রিযামা'র 'বাস্তু' কবিতাটিও স্মরণ করা যাইতে পারে। রৌদ্রপায়ী চাঁপার প্রতি স্বভাবতঃই রুদ্রপন্থী কবির সহজাত পক্ষপাতিত্ব; তাহা লইয়াই 'বাস্তু ভিটার বাড়ির আঙিনাতে' যে একটি চাঁপা গাছ এবং সেই গাছে ফোটা 'একটিগাছ ফুল' তাহা কবির অর্ঘ্য বহন করিয়া শুধু তাঁহার 'সপ্তপুরুষ পিতৃ-পিতামহদের' কাছেই গিয়া পৌঁছায় না—আমাদের হৃদয়েও আসিয়া পৌঁছায়। এই গ্রামেরই মাটি ছানিয়া পাঁজায় পোড়া যে ইট তৈয়ারী হইয়াছিল তাহাদের ভিতরেই আজ 'শত সাধের সাত পুরুষের ভিটে বিজন সুরে' কাঁদিয়া মরিতেছে,—কিন্তু তথাপি—

বিজন গাঁয়ে একক চাঁপা গাছে
আজও যখন একটি গাছ ফুল,—
চুকিয়ে আমি দিইনি সকল আশা
শুকিয়ে আজও যায়নি প্রাণের মূল।

*　　　*　　　*　　　*

ওগো আমার সপ্তপুরুষ পিতৃ-পিতামহ !
এই চাঁপারই নিত্য কৌটায়
লহ, লহ, আমার পূজা লহ।

এই যে চাঁপা দ্বারা পিতৃ-পিতামহের পূজা ইহার মধ্যে কবি-জীবনের 'মূল' সম্বন্ধে তেমন কোনও স্বীকৃতিও নাই—অস্বীকৃতিও নাই—কিন্তু জীবনের 'একটিগাছ ফুল' এখানে আনন্দের হইয়া উঠিয়াছে। এই 'সপ্তপুরুষ পিতৃপিতামহে'র পূজার প্রসঙ্গেই আবার স্মরণ হয় কবির একটি স্বীকারোক্তি তাঁহার এই 'ত্রিযামা' কাব্যেরই 'তর্পণ' কবিতায়—

নবীন বয়সে
নিতি নূতনের টানে
চলেছিনু কার পানে

পুরাতন, ওগো পুরাতন,
সেদিনের যত অযতন স্নেহসঞ্চয়
ছায়াবলিপ্ত সান্ধ্য স্মৃতির
অনিমেষ প্রীতি-পরিচয়
পিছু ডাকে মোরে
তব ধ্রুব তট হ'তে,
নূতনের খর লক্ষ্য-আবিল স্রোতে
মরণের মুখে ছুটে চলে যত
জীবনতরী ;
পুরাতন, তোমা' স্মরণ করি।
করি অর্পণ সবেদন অবনম্র চিত্ত
চরণ তলে,
করি তর্পণ অঞ্জলি ভরি'
নয়নজলে !

সেখানে অশ্রুসজল 'জীবনের মোহ' করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমরা যতীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলোচনায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, ভাবে ও প্রকাশভঙ্গীতে যতীন্দ্রনাথের একটা আপোষবিহীন তীব্র এবং তিক্ত রোম্যাণ্টিক্-বিরোধী মনোবৃত্তি। কিন্তু পরবর্তী কালের কবিতায় স্থানে স্থানে দেখিতে পাই সেই রোম্যাণ্টিক প্রথারই অনুবর্তন। এ ক্ষেত্রেও কবির রোম্যাণ্টিকধর্মী কবিতার মধ্যে আমি দুইটি ভাগ করিতে চাই, একটি ভাগে দেখিব সত্যকার রোম্যাণ্টিকধর্মী কবিতা, আর একটি ভাগে লক্ষ্য করিব প্রচলিত রোম্যাণ্টিক প্রথার অনুবর্তন। কাব্য-বিচারে আমি এই দুই শ্রেণীর কবিতাকে সমমূল্যের বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি নই,—তাহাদের ভিতরকার পার্থক্যের মধ্যেও একটা মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করি।

কবি যতীন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক্-বিরোধিতা মুখ্যতঃ এই রোম্যাণ্টিক প্রথার অনুবর্তনের বিরোধিতা। অবশ্য রহস্যবাদের কুয়াসাজালে জীবনকে আচ্ছন্ন করিবার বিরুদ্ধে, 'অজানার পিয়াসে'র বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার সংজ্ঞাত অসমর্থন অদ্বিধাহই প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু মন তাঁহার প্রতিক্রিয়ার দাহ প্রকাশ করিয়াছে সব চেয়ে বেশি সেইখানে যেখানে এই সকল 'বরণ-ধারণ' একটা প্রথাসিদ্ধ পথে অনুরণনবিহীন ধ্বনির জটিলাকারে দেখা দিয়াছে। কবি কালিদাস স্থানে স্থানে বেশ রোম্যাণ্টিক—তাঁহার কাব্য যতীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগিত—প্রমাণ যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'কুমার-সম্ভবে'র অনুবাদ ; রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ সুন্দরের পিয়াসী রোম্যাণ্টিক এবং রহস্যবাদী মিষ্টিক্—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি যতীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় বহু ভাবে পূর্বে দেখিতে পাইয়াছি। অথচ

কবি রোম্যাণ্টিক্-বিরোধী। তাই কবির এই রোম্যাণ্টিক্-বিরোধিতার প্রধান লক্ষ্য বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। বড় বড় এক একজন বৈজ্ঞানিক যখন প্রকাণ্ড কোনও আবিষ্কার করেন তখন মানুষের মনে আনে তাহা গভীর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা; কিন্তু তাহার পরে ব্যবহারে ব্যবহারে তাহার ব্যবহারিক মূল্য বাড়িয়াই যাইতে থাকে—কিন্তু সেই বিস্ময়ের আলোড়ন ক্রমস্তিমিত হইয়া শেষ পর্যন্ত স্পন্দনহীন হইয়া পড়ে। বড় বড় কবিও তেমনই নূতন নূতন অনুভূতি এবং তাহাকে প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা ও ছন্দ যত আবিষ্কার করিতে পারেন, মানুষ ততই মুগ্ধ হইয়া যায়; তারপরে ব্যবহারে ব্যবহারে আমাদের চিন্তানুশীলনের অবলম্বনরূপে তাহার ব্যবহারিক মূল্য যত বাড়িয়া যাইতে থাকে—তাহার পিছনকার সেই বিস্ময় এবং তৎপ্রসূত আনন্দের স্বাদমানতার বৈচিত্র্য ততই হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার অনুবর্তন শুধু অসার্থক নয়, অরুচিকরও—এ-কথাটা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বযুগে সর্বদেশেই অবশ্যস্বীকার্য।

কিন্তু রোম্যাণ্টিক্-বাদের আর একটা সূক্ষ্ম-গভীর দিক আছে, সেখানে তাহার মূলধর্ম একটা বিস্ময়ের স্বাদমানতা। এই সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক অর্থে এই রোম্যাণ্টিকতা ন্যূনাধিক কবিমাত্রেরই মূলধর্মের মধ্যে অনুস্যূত। জীবন-পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই যে বিস্ময়ের স্বাদমানতা তাহার বিভাবরূপ উপাধিরও ক্রম-পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। এই বিভাবরূপ উপাধি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোম্যাণ্টিকতা তাহার ঢঙ্ বদলায়। জীবনের বিস্ময়-বোধ যখন যুগানুযুগান্তের ভিতর দিয়া যুগের পাঠক-মানসের নিকট সানন্দ-গ্রাহ্য তখন এই রোম্যাণ্টিকতাই দেখা দেয় বাস্তববাদের রূপে। নূতন জীবন-পরিবেশে যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হয় তখন তাহাই দেখা দেয় 'রিয়াল্'-রূপে, সেই 'রিয়াল'-কে লইয়া যে সাহিত্য তাহাকেই তখন 'রিয়ালিজম্' বলিয়া গ্রহণ করিতে আগ্রহ আসে। যুগ-জীবনের পরিবেশ হইতে তাহা যখন পিছাইয়া পড়ে তাহাকেই তখন সজ্জিত করিতে ইচ্ছা জাগে 'আদর্শবাদ' বা 'রোম্যাণ্টিক'-বাদ বলিয়া।

কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম রোম্যাণ্টিকতা ছিল, যাহা আশ্চর্য ভাবে তাঁহার জীবন-পরিবেশের সহিত একটা সহজ সঙ্গতি লাভ করিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, যতীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের মানুষ হইয়াও বাঙলা দেশের শ্যামল-কোমল পরিবেশকে তাঁহার বিশেষ মানসিক সংগঠনের জন্য সহজ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার বিশেষ মানসিক সংগঠনের দ্বারা তিনি তাঁহার চারিদিকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন একটা মরুর পরিবেশ। কিন্তু সেই মরুর পরিবেশের মধ্যেও কি সুর নাই—বিস্ময়-মিশ্রিত ইঙ্গিত আকর্ষণ নাই? তিনি জীবনের ঋতুপর্যায়ের মধ্যে যে নিদাঘের দাবদাহকেই সাধারণ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার মনের রোম্যাণ্টিকতা আসিয়াছে সেই মরুর পরিবেশে নিদাঘের তপ্ত বালুর পথেই। তাই তাঁহার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'মরীচিকা'র মধ্যেই 'নব নিদাঘ' কবিতায় এই নূতন রোম্যাণ্টিক আমেজ দেখিতে পাই—

এসেছে তাহারা দিগন্ত হারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন্ বসরার
খর্জুরবীথি পথে;
কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু
দীপ্ত-অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরাণী বালা!

প্রেম যুগে যুগে কবিচিত্তে বিস্ময় ও রহস্য উদ্রিক্ত করিয়াছে। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রেমের রোম্যাণ্টিকতার এই সূক্ষ্ম দিকটি দীর্ঘ কাল ধরিয়া রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের পত্তন করিল সেখানেও প্রেমের সঞ্চরণ সমাজ-দেহের তথাকথিত উচ্চস্তরে; সেই উচ্চস্তর হইতে প্রেম ক্রমে মধ্যস্তর এবং সে স্তর অতিক্রম করিয়া নিম্নমধ্যস্তর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের যুগে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে—সর্বস্তরে। সমাজদেহে যাহাদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে—মানুষের অধিকার লইয়া সমস্তরের স্বীকৃতি লাভেও যাহারা ছিল বঞ্চিত—সেই বঞ্চিতদের বুকের কথাই আসিয়া সমাজ-চেতন কবির বুকে বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। সুদূর তেপান্তরের মাঠের পথিক-পথিকা রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেমের-রোম্যান্স মানুষ একেবারে ভুলিয়া যাইতে না যাইতেই খুব গূঢ়ার্থক ভাবে সুন্দরবনের মধ্যে দেখা দিল কৃষাণ ও তাহার প্রিয়াকে—যাহারা আমাদের কাছে অতি অল্পাংশেই জ্ঞাত এবং অল্পপরিচয়ের বিস্ময়াবহ আকর্ষণ এবং যুগোচিত গভীর সহানুভূতির সাদর অভ্যর্থনে যাহারা মহিমান্বিত। এমন একদিন ছিল যেদিন প্রেমের প্রতিপদের চন্দ্রলেখার মতন বিরহশীর্ণা প্রিয়াকে অলকাপুরীর শ্বেতসৌধ-বিলসিত অতুল সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে হেমদণ্ডের উপবিষ্ঠিত ময়ূরের সম্মুখীন রাখিয়া প্রিয়কে অগণিত নদ-নদী পাহাড়-পর্বতের ব্যবধানে সুদূর রামগিরিতে গিয়া একাকী অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে হইত। আবার কালের প্রবাহে এমন যুগ দেখা দিল, যখন প্রেমের জন্যই বিংশ শতাব্দীর শহর-গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়া প্রিয়-প্রিয়াকে কিষাণ-কিষাণীর বেশে সুন্দরবনে ঘর বাঁধিতে হইয়াছে।

> সুন্দরবনে বাস আমাদের, সুন্দরবনে বাস,—
> ভেড়ি বেঁধে' নোনা-পানি ঠেকাই বারো' মাস।
> সুন্দরবনের চর গো বন্ধু, দুল-দরিয়ায় ঘেরা,—
> তারি মাঝে মিঠে পানি সকল পানির সেরা;
> 'গেঁয়ো'র খুঁটি 'বাণী'র রুয়ো, 'হাতাল' বেটে ছড়,
> উলুখড়ের ছাউনি দেওয়া মোদের কুঁড়ে ঘর।
> উলুখড়ের ছাউনি চালে, উলুখড়ের ছাউনি,—
> তারি তলে কেঁপে' জলে পিয়ার চোখের চাউনি।
>
> (সুন্দরবনের গান, মরুমায়া)

এই বনের মধ্যে 'কালা-জঙ্গলে' সহসা বুনো আগুন জ্বলিয়া ওঠে, সেই বনের মধ্যে 'প্রিয়া' 'প্রিয়ে'র মঙ্গলে করে 'শনি

দলবার'; তাহারা 'সুন্দরী' গাছের মাচা বাঁধিয়া 'চৈতি রাতি' টায়, দূর-দরিয়ায় বাতি তখন দখিণ হাওয়ায় ঝিলিতে নিবিতে কে; বনে আগাগোড়া-ভোরা বনের বাঘা ডাকিতে থাকে, তাল ঝেপে ময়াল সাপ 'দাঁতাল বোরা' ধরে; চরের পাখী হঠাৎ সিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যায়, সাঁতার কাটিয়া কুমীর উঠিয়া 'জোছনা পাহায়'। এই পরিবেশের মধ্যে যে শ্বাপদ-সঙ্কুল বনাচ্ছন্ন একটা াদিম জীবনের অনাস্বাদিত প্রেমের আভাস—সেই ত কত বচিত্র—কত দূর—কত অজানা! আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-জর্জর মনের কাছে সে-ই ত বহন করে কেমন একটা মুক্তির স্বাদ—

> দেশের শেষে সুন্দরবন রে, দখিণ হাওয়ার দেশ,—
> চোখে মুখে ঝাপটু লাগে পিয়ার এলো কেশ!

যাহা সুবিন্যস্ত, অচঞ্চল, অনবচ্ছিন্ন—তাহার প্রতি আমাদের সীষম্য ও পরিচ্ছন্নতা জনিত চিত্তের একটা আকর্ষণ রহিয়াছে; কিন্তু ক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের এই আকর্ষণ স্পষ্ট, কিন্তু ভীর নহে। যাহা অবিন্যস্ত, অস্থির, তির্যগগামী—যাহা জটিলতার লা-কোলায় ক্রম-বিভ্রান্তিকর—তাহার প্রতি আমাদের চিত্তের যে াকর্ষণ তাহার ভিতরে শুধু তীব্রতা নাই—মাদকতাও রহিয়াছে। াজ-রাজড়ার প্রেমের পর উদ্‌গ্রিক্রমের নরম সোফায় কাকলী ও গুঞ্জনগীতি-মুখর প্রেমও আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের প্রতি চাখের আগ্রহ এবং মনের আগ্রহ উভয়ই যখন 'মিইয়া' আসিতেছে তখন আবার মনকে 'চাঙ্গা' করিয়া তুলিতেছে কে—? ঘরবাড়িহারা াধনহারা বেদে-বেদেনী—তাহাদের মাথার ঝাঁপিতে তাহারা বহন রে যে তীব্র হলাহল, তাহার সম্পর্শে তাহাদের বুকের ঝাঁপির ভিতরকার মাদকের মধ্যেও জাগিয়াছে তীব্র ঝাঁঝ। সেই বেদে বেদিনীর জীবনে ফাল্গুন আকাশে বাতায়ন-পথে দক্ষিণ হাওয়া আসে না, নামিয়া আসে কাল-সাঁঝ—'কোড়ো মেঘে দিক্‌-ঘেরা' এবং সে সন্ধ্যায় বেদের নিকট হইতে সহসা আহ্বান আসে—'ওই রে বেদেনী মোট বেঁধে নিই তুলিতে হইবে ডেরা।' সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট্ করিয়া মাঠ হইতে তাঁবুর খোঁটা তুলিয়া লইতে হয়,—'ভাঙা ফাটা-ফুটো তৈজস' গুটাইয়া সাপের ঝাঁপিটা উঠাইয়া লইতে হয়।—

> ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদেনী,
> দখিণ হাওয়া এ নয়,
> ঈশান-কোণের ফণীর ফণায়
> বিষের নিশ্বাস বয়।
> ওই আসে সেই ঝড়,—
> ওই রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে
> বেদিয়ার হাত ধর্। (বেদেনী, সায়ম্)

উপরের এই কয়েকটি পংক্তি যদি বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে পারি, কবির 'দক্ষিণের হাওয়ার পিয়াসী' জীবনের প্রতি একটা সহজাত বিতৃষ্ণা, আর যেখানে 'ঈশান-কোণের ফণীর ফণায় বিষের নিশ্বাস বয়' এবং সব কিছু উড়াইয়া লইবার ঝড় ওঠে সেই জীবনের পরিবেশে চিত্তের স্ফূর্তি,—আর তাহারই সহিত লক্ষ্য করিতে পারি, শতভালির ঘর এবং পরিচ্ছদের মোট মাথায় তুলিয়া যাহারা পথে ঘুরিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের সহিত কবির গভীর সমবেদনা। কবিচিত্তের এই সকল ধর্ম তাঁহাকে অত্যন্ত ভাবে তাঁহার যুগধর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই যুগধর্মের পটভূমিকায় জাগিয়া উঠিল আর একটি জিনিস—ঘরছাড়া পথের অনিয়ন্ত্রিত অনিশ্চিত জীবনে শত দুঃখ-দারিদ্র্য—পলে পলে বিপর্যয়ের মধ্যে হাত ধরাধরির অনাস্বাদিত রসের নেশা। তাহাই নব-রোম্যান্টিকতা। সেই রোম্যান্টিকভঙ্গি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে পরের পংক্তিগুলিতে।—

> কি হ'লো বেদেনী তোর?
> উড়ো মেঘে রাখি নিশ্চল আঁখি
> কোন বেদনায় ভোর?
> এবার সহসা উঠাইতে বাসা
> কেমন করে কি মন?
> মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে
> ক্লান্ত কি এ জীবন?
> • • • •
> বেদের ধারাটি বুঝিস্ বেদেনী,—
> যে ঘর বাঁধে সে দিনে
> রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার
> ঢেকে যায় ঘাস তৃণে।
> তবে বা কিসের লাগি
> এত কাল পরে হ'লি তুই আজ
> সেই ঘরে অনুরাগী?
> • • • •
> শোন রে বেদেনী শোন
> সুরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে
> গুরু-গুরু গর্জন!
> • • • •
> অকালের এই কালবৈশাখী—
> ভেঙে দিল তোর ঘর,
> সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
> বেদেনীর হাত ধর।
> ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—
> ভয় নাই ভয় নাই,
> এ মাঠ ছাড়িয়া চল রে বেদেনী
> আর কোন মাঠে যাই।
> হাওয়ার উজানে দিক ঠিক রেখে
> আঁধারে আঁধারে চল্—
> আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ
> পারের সাপুড়ে দল। (ঐ)

আমি এখানে যে-জিনিসটিকে নব-রোমান্টিকতা আখ্যা দিলাম, ইহা শুধু যতীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য নয়, এ যুগের যাঁহারা কবি এবং যুগ-পরিবেশ সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন তাঁহাদের অনেকের কবিতায়ই ইহা লক্ষ্য করিতে পারিব। শুধু কবিতায়ই বা কেন, এ-জিনিসটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এ-যুগের কথা-সাহিত্যের ভিতরে, খ্যাতনামা প্রায় সকল ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখকের লেখাতেই। সচেতন ভাবে তাঁহারা নিজেদের শিল্পধর্ম সম্বন্ধে মুখে

যে-কথাই বলুন—বা যে-শ্রেণীতে নিজেদের বিভক্ত করিয়া যে শিল্পাদর্শের কথাই বলুন,—যুগের রোম্যাণ্টিক্ ধর্ম সকল সার্থক লেখকের লেখাতেই স্পষ্ট—এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি সমগ্র ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে একটা পরিবেশ-সচেতনতা সহজেই লক্ষ্য পড়ে। এই পরিবেশ-সচেতনা তাঁহার বহু কবিতাতেই একটা বাস্তবতার দৃঢ় পরিপুষ্টি আনিয়া দিয়াছে। কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবি একটা ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে আত্ম-অতিক্রম করিয়া যান; কবিতার ক্ষেত্রে এই আত্ম-অতিক্রমের ফল দুই দিকেই দেখা দেয়—এক দিকে দেখা দেয় কবির রসানুভূতির ভিতরে একটা দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ আবেদনরূপে,—অন্য দিকে দুর্বল কবির পক্ষে এই ভাবোচ্ছ্বাসের ফল দেখা দেয় একটা কবিধর্মের প্রথাবদ্ধ সাধারণ ধর্মের মধ্যে ব্যক্তি-সত্তার সকল বৈশিষ্ট্য-লোপের মধ্যে। কোন মুহূর্তেই প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের মুখে নিজেকে ভাসাইয়া দিবার কবি ছিলেন না যতীন্দ্রনাথ—তাই তিনি পরিবেশক ভুলিয়া 'সাধারণ কবি'ও হইয়া ওঠেন নাই। তিনি যে মধ্যবিত্ত ঘরের অতিকষ্টে গড়িয়া ওঠা শ্রীযতীন্দ্রনাথ, সাকিন বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চল—অথবা কলিকাতার বস্তীভিত ভাড়াটে কুঠি এবং পেশা পূর্তকর্ম, ইহা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। কথাটাকে আর একটু ফিরাইয়া অন্য রকম করিয়া বলিলে বলা যায়, 'কবি-জাত'কে সাধারণ 'মানুষ-জাত' হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার মনোবৃত্তি যতীন্দ্রনাথের কোনও দিনই গড়িয়া ওঠে নাই। বরং সে জাতীয় একটা পার্থক্যের সংস্কারকে তিনি তরল পরিহাসে মুছিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'ত্রিযামা'র 'নব-কণিকা' কবিতা সমষ্টির একটি কবিতায় দেখি—

হাটের পথে তরুণ পথিক, 'কবি' ব'লে করলে প্রণাম,—
চিংড়িমাছের পুঁটলি হাতে আমি তখন ফিরছি বাড়ী।
এই দু'পরে তোমার দ্বারে বন্ধু, আমি তাই ত এলাম,
খটকা আমার মিটচে না ভাই, মাছ ছাড়ি কি কাব্য ছাড়ি!

এইটাই চিরাচরিত প্রথা—হয় মাছ ছাড়িয়া কাব্য ধরিতে হয়,—না হয় কাব্য ছাড়িয়া মাছ ধরিতে হয়; কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মন-মেজাজ ছিল এই প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার বাস্তব-জীবনের 'হাতুড়ি' চালান এবং কাব্য-জীবনে লেখনী চালানর মধ্যে তিনি কোনও গুণগত অব্যাপ্তি স্বীকার করিতেন না; তাই স্মিতহাস্যে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন 'হাতুড়ে কবি' বলিয়া। আটপৌরে জীবনকোড হইতে একেবারে পৃথক্ কোনও 'কাব্য-কোডে'-এর উপরে তাঁহার সহজাত অশ্রদ্ধাই ছিল। সে অশ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে লঘু চালে লিখিত তাঁহার স্ববিবরণীযুক্ত অনেক কবিতায়। যেমন 'মরুমায়া'র 'কবির ঠিকানা' কবিতায় দেখি, পাড়াগেঁয়ে কবি প্রভুর আদেশে শহরে আসিয়া 'মোহিনী রোডে' ছোট একটি বাসা ভাড়া লইলেন।

খুঁজে নিল বাসা, যথাসম্ভব মিলায়ে কাব্য-কোড,
অনতি দূরেই বকুল বাগান, পাশ দিয়ে বস্তা রোড।
বামে কারখানা, কোণে জঙ্গল, ছোট বাসার কাছে
বহু ভাষাভাষী গোটা পাড়া ও মস্ত বাজার আছে।

কারখানাটার ছোট সংসারে দিনরাত ঠোকাঠুকি,
হাতুড়ির চোপা শুনিয়া কোঁপায় হাপোর অগ্নিমুখী।

* * * *

একতলে কবি করে স্নানাহার, দোতালায় শোয় রাতে
মাঝে মাঝে ছুটে' তেতলায় উঠে খাতা পেন্‌সিল হাতে।

* * * *

নড়ে' নড়ে' ওঠে ছোট চিলে-কোঠা কালবোশেখীর ঝড়ে,
ঝঞ্ঝামত্ত ঢ্যাঙা নারিকেল টোলে এসে গায়ে পড়ে।
জ্যৈষ্ঠ-দুপুরে তেতে' ওঠে কোঠা নিজে কড়া রোদ টানি';
বর্ষার ছাটে নির্ঝঞ্ঝাটে—ধুয়ে যায় ঘরখানি।

* * * *

ঢাকনা-হারানো কৌটারই মত ছোট চিলে-কোঠা বটে,
সেথা ব'সে কবি হেরে জলছবি আকাশের মরুপটে।

কবির শুধু বাসস্থানের নয়, তাঁহার সারা কবি-জীবনের-পরিবেশেরই একটি ঠাঁই-ঠিকানার ইঙ্গিত আছে এই বর্ণনার ভিতরে। বাঙলা দেশের এই মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব-পরিবেশকে ভাব-কল্পনায় সম্পূর্ণ অতিক্রম বা অস্বীকার না করিয়া সেই পরিবেশের উপরেই তাঁহার কাব্য-জীবনকে কবি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির 'মরীচিকা'র 'পথের চাকরি' কবিতার মধ্যে এই মধ্যবিত্ত পূর্তকর্মকারী কবির চাকরি-জীবন ও কবি-জীবনের সহজ মিলটা একটা আপাতদ্বন্দ্বের আমেজে চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যের 'বারমাসী'র ভঙ্গিতে কবির আক্ষেপোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বারটি মাসকে অবলম্বন করিয়াই; কিন্তু আক্ষেপোক্তি যেটুকু রহিয়াছে তাহা যথার্থই কবির কর্মজীবন এবং কাব্যজীবনের দ্বন্দ্বের জন্য মনে হয় না,—এই দ্বন্দ্বকে যে আমরা এত দিন এত বড় করিয়া দেখিয়াছি তাহাকে লইয়া পরিহাসই এই বারমাসী আক্ষেপোক্তির ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

ফাল্গুন ফাগ-ফুল দু'হাতে ছিটায়,
নিস্তার নাই ঘর পড়ে কাটা খায়!
হায় হায় উহু আহা,—
'উহু' সব চায় যাহা,
কুহু কুহু পিয়া কাঁহা—বহে মধু বায়!
আশঙ্কা কি?
মোর পরানে থাকি;
শ্রীচরণে সুভীষণ
দূরে দু' সুদর্শন,
পাল মেপে দেখি—প্রেমে সকলই ফাঁকি!

প্রভৃতির ভিতর দিয়া সেই পরিহাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কবির প্রাত্যহিক কর্মজীবনের পরিবেশ-সচেতনতার মধ্যে রচিত একটি সার্থক কবিতা 'ত্রিযামা'র 'বানপ্রস্থ'। ইহাকে যদি কেহ প্রকৃতিতে 'রোম্যাণ্টিক' বলেন তবে আপত্তি করিব না, কিন্তু 'রোম্যাণ্টিকতা' সেখানে 'রূপ'ও নহে, 'গুণ'ও নহে—ইহা কাব্যের 'আত্মা'। বনের রোম্যাণ্টিক পরিবেশ যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি, কালিদাস—এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহা যেরূপে

যে ভাবে দেখা দিয়াছে কবি যতীন্দ্রনাথের কাছেও যে ঠিক সেইরূপে সেই ভাবেই দেখা দিতে হইবে এমন কথা নাই। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যতীত কবিতাটির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা যাইবে না বলিয়া একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতিই দিতেছি।

চলেছিনু শাল-জঙ্গল পরিদর্শনে ;—
দুর্গম পথ দুর্গমতর কালবৈশাখী বর্ষণে।
থেকে থেকে দেয়া চমকায় ;
আর মাঝে মাঝে বাজ ধমকায়
কালো তুরঙ্গে অকাল সন্ধ্যা
পথ খুঁজে ফিরে শালবনে,
সেথা গজ্জাক্ত গাছের সঙ্কটা বুড়ী
শত সন্ধ্যায় জাল বোনে,
সেই শালবনে, দূর শালবনে!

দুর্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জন বনবাংলায় :
নিম্নে পাহাড়ী নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে দোল সামলায়।
কল কেন হোথা ছলকায় ?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোনীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।
আনন্দময়ী সন্ন্যাসিনী জাগিয়া
যেন ভাঙা মন্দির নির্বাণে গেল লাগিয়া,
উঠে কল কল কল চমৎকার,
বলো নির্জন বনবাংলায় আসে
ঘুম কার ?

কিন্তু কবি জানেন, এই নিদ্রাবিহীন স্বপ্ন পরের দিন সকালের কড় আলোকে ভাঙিয়া যাইবে, এবং সেই সকালে এই বনে বসিয়াই কালো মলাটের মোটা মোটা খাতাপত্র কলটানা পাতা উল্টাইয়া যাইতে হইবে, আর তাহার ভিতরে লেখা সব সূক্ষ্ম হিসাব মিলাইতে হইবে, দেখিতে হইবে, বনে যত গাছ আছে তাহা গণা হইল কি না, সকল সঠিক ঠিকানা লেখা হইল কি না, সীমানা আঁটিয়া নক্সা হইল কি না ; কতনম্বরে কোন শালচক, কফুট লম্বা—মোটা ও বেঁটে! বিনা পাশে কেহ বনের ঘাস কাটিয়া ফাঁকি দিল কি না, যে লোক গাছের ডাল ভাঙিয়াছিল তাহার জরিমানার টাকা আদায় হইয়াছে কি না! সুতরাং এই কবির পক্ষে—

হায় রে হায়,—
আজি রজনীর স্বপ্নশঙ্কামোহঘন এই
নির্জন বনবাংলায়
কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে
আমলায় আর মামলায়!

এই বন আজ আর বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠের বন নয়, এখানে রাম-সীতা, গুহক-মিতা, কামাক, হিড়িম্বা, বক, দণ্ডক, সূর্পণখা, মায়ামৃগ, ছিন্নপক্ষ পিতৃসখা—কিছুই নাই।

স্ফটিক ফিরানো চলনদী-জলে
জপময় কোথা তপোবন!
হোম-ধূমাঙ্কী সাম-গুঞ্জিত
জটিল বটের ছায়াসন ?
ফুল-পল্লব মঞ্জরী-ময়ী
আশ্রম-সঞ্চারিণীরা কই ?
যতন-নিভৃত বল্কলা বালা ?
হলা পিয়া সখি ? কোথা বা কণ্ব ?
অরণ্য হায় দারুভূত আজ
বনবিভাগের বিপণি পণ্য।

যে-যুগে আমরা জন্মিয়াছি সে-যুগের হয়ত ইহাই অভিশাপ যে 'বনে আসিলাম, সাথে সাথে এল খাতা ও ফিতা' এবং 'বনবাসে এসে সই ক'রে চলি বাঁধা খাতায়।' এখন হয়ত আর 'মনে মন নাই,—বনে বন নাই ;' কিন্তু আজকের দিনেরও বন-রহস্য আছে,—সেই রহস্যই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে বর্তমান যুগের কবির মনে—

তবু,
কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসম্মোহঘন
নির্জন বন বাংলায়
আমি হেরেছিনু কোন্ শিখরচারিণী
বাঁকে বাঁকে টাল সামলায়!
আর শুনেছিনু কোন্ বনহরিণীর
হারা গাভী দূরে হামলায়!
ঘোর মেঘাচ্ছন্ন বন্ধ্যাপন্ন
গহনারণ্য বাংলায়।

মধ্যবিত্ত চাকুরে জীবনের পরিবেশেও কবি তাঁহার বিভিন্ন যুগের বহু কবিতাতেই একটি আরহস্যাবেদ কায় জুড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীচৌরঙ্গীধামে যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া হকুখানসামা লেনের 'ডেরায়' লইয়া গিয়া কবি কেরোসিন কুপি জ্বালিয়া তাঁহার কক্ষ আলো করিলেন—এবং সেইখানে বসিয়াই বন্ধুর সঙ্গে চলিল মুক্তিতত্ত্বের সব আলোচনা। 'চিরবৈশাখ' কবিতার গম্ভীর আনন্দময় পটভূমিকাটি হইল—

কাবার হতেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আনচান্ আইঢাই।
নীচে ও মাথায়, ঘরে কি কাঁকায়, বাতাসে হতাশে হায়,
প্রাণের পরশে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।
এ-হেন দুপুরে আফিসে আসিয়া হেরিলাম কি আনন্দ,
কাল চন্দ্রের গ্রহণ হয়েছে, আজিকে আফিস বন্ধ।

এ-জাতীয় পটভূমিকা অনাড়ম্বর আত্মীয়তার সুরে এবং ঘরোয়া আবেষ্টনীতে সহজগ্রাহ্য এবং সানন্দগ্রাহ্য। কবির পরিবেশ-সচেতনতা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য, তাঁহার সূক্ষ্ম রোমান্টিকতার ভিতরে এই পরিবেশ-সচেতনতা যে নূতন স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা। রোম্যান্টিকতার পরিপোষকতা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রেও ইহা পাঠক-হৃদয়ের অন্তরঙ্গতাকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

ফতেনগরের লড়াই

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিক্রমাদিত্য

আজ ব্যোমকেশ, প্রীতি ও প্রিয়ব্রত বাবুর কথা শুনে সাধন বাবু ভাবছিলেন যে, এ নিয়ে একবার পণ্ডিতপাবন বাবুর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু সেই দুপুর বেলা! আজকে ঘুমের ব্যাঘাত হলে চাকুরী থাকবে না, এ সাধন বাবুর বিলক্ষণ জানা আছে। তাই একটু ইতস্ততঃ বোধ করছিলেন।

এমনি সময় রিপোর্টার উমাকান্ত এসে উপস্থিত হলো। বললে: স্যর দারুণ খবর। ফিফটি পার্সেণ্ট অব ম্যাগ্নিফিকাণ্ট অব জোয়ার সার্কাস কিল্ড।

: কী বললে?—সাধন বাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

: বিরাট ব্যাপার! জোয়ার সার্কাস-পার্টিতে 'ফিফটি পার্সেণ্ট ম্যাগ্নিফিকাণ্ট মারা গেছে। বিরাট ষ্টোরী।

উমাকান্তের জবাব শুনে সাধন বাবু একটু নিরাশ হলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, উমাকান্ত হয়ত ফতেনগরের কোন ভালো খবর এনেছে। কিন্তু হাতীর খবর দিয়ে কী আর কাগজ ভরবে? তাই একটু উদাস কণ্ঠে বললেন: আচ্ছা, ফ্রণ্ট পেজেই দাও তোমার ঐ ষ্টোরী। ফতেনগর থেকে আর যখন ভালো খবর এলো না, তখন ঐটে দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

* * * *

'সমাচার' দপ্তরে সম্পাদক খগেন বাবু দেশনেতা হারাণ বাবুর বিবৃতিটা দেখিয়ে বললেন: দেখলেন স্যর! আমাদের উপর ঐ হারাণ ব্যাটা কী জোচ্চুরিই না করলে! স্পেশাল ও এক্সক্লুসিভ বিবৃতি বলে চালিয়ে দিয়ে কী অপমানটাই না করালে! এই দেখুন না ওর বিবৃতি। স্রেফ কার্বণ কপি—কার্বণ কপি! দেশনেতা বাবুলাল সিংগির বিবৃতি থেকে টুকে দিয়েছে। ঐ পড়ুন।

হরকরা বাবুলাল সিংগির 'বিশ্বশান্তির' উপর ঠিক এই বিবৃতি ছাপিয়ে বসে আছে। উফ্ কী কেলেঙ্কারী……

* * * *

'সমাচারের' রিপোর্টারের রুমে বসে রিপোর্টার টগর হাতে লিখে যাচ্ছিল—পাঠকগণ, সাবধান হোন! কাল যে সংবাদ 'হরকরা' কাগজে 'ফিফটি পার্সেণ্ট ম্যাগ্নিফিকাণ্ট' মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। 'সমাচারের' বিশেষ রিপোর্টার এই সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, সার্কাস পার্টিতে মোট দুইটি হাতী ছিল। তাহার মধ্যে কারণবশতঃ একটির মৃত্যু ঘটে। এই একটি হাতীর মৃত্যু ঘটনাকেই হরকরা 'ফিফটি পার্সেণ্ট' হাতীর মৃত্যু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সমাচারের রিপোর্টার অনুসন্ধান করিয়া আরো জানিতে পারিয়াছেন, যাহাকে হাতী বলিয়া চালান হইয়াছে উহা আদৌ হাতী নহে। উহা একটি গণ্ডার। হরকরা-দপ্তরের রিপোর্টার 'গণ্ডার' কী পদার্থ জানেন না, ইহা অবিশ্বাসযোগ্য। গণ্ডার হইল প……

উত্তেজনায় সাধারণতঃ হাতের লেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব টগরের হাতের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেলো। বাকীটা পড়া গেলো

* * * *

দেশের চার দিকে যখন ফতেনগরের লড়াই নিয়ে হৈ-হল্লা সুরু হয়েছে তখন 'নারীর অধিকার' পত্রিকার সম্পাদিকা লুতিলুতি হালদার বসে বসে ভাবছিলেন, এ সময়ে তাঁর কী করণীয়।

'নারীর অধিকার' সাপ্তাহিক। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের যে এক তালে চলতে হবে, এইটেই হলো 'নারীর অধিকারের' আদর্শ। লুতিলুতি হালদার শুধু যে এই পত্রিকার সম্পাদিকা তাই নন, তিনি আরো বহু মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। অন্যতম হলো 'নারী সভায় সমিতির' তিনি সম্পাদিকা।

লুতিলুতি হালদার বিশ্বাস করেন যে, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। অতএব ফতেনগরের লড়াই যখন দেশ, ছেয়ে উঠলো, এ লড়াইতে কার কত অবদান এ নিয়ে যখন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেলো, তখন লুতিলুতি হালদার ভাবলেন যে, এইবার নারী জাতির দাবী জনসমাজে পেশ করা উচিত

মিটিং করবেন। পাগল! আজকাল যা দিনকাল পড়েছে, সভার আগে ও পরে চাঁদা দেওয়াকে কেউ থাকতে চায় না। আর যদিও বা মিটিং হলো তা হলে সারাক্ষণ হয়ত নতুন ডিজাইনের শাড়ী কিংবা নতুন প্যাটার্নের সোনা নিয়ে আলোচনা চললো। আসল কাজের কথা একদম হয় না।

কী করতে পারেন তিনি? এ যুদ্ধে নারীদের কী কর্তব্য, এ নিয়ে তিনি রেডিওতে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে

একটু সাবধানে কাজ করা উচিত। কারণ, অনেক দিন ধরে বিরোধী কাগজ 'নারীর দাবী' তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। একটু মৌকা পেলেই হয়ত যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ দেবে। লুটিলুটি হালদার ভাবলেন যে, তিনি এমন কিছু একটা করবেন যাতে দেশবাসীর তাক লেগে যায়।

হঠাৎ তার মনে হলো, আচ্ছা এ লড়াইতে এক জন মেয়ে রিপোর্টার পাঠালে কেমন হয়? অর্থাৎ এ সংগ্রামে নারীজাতিও যে পিছিয়ে নেই, এইটে তার দেখানো চাই। প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু 'নারীর অধিকার' যে দৈনিকী নয়। সাপ্তাহিক কাগজ কী কখনও রিপোর্টার পাঠায়? এ কথাটা ভাবলেন লুটিলুটি হালদার।

ঠিক তার মনে হয়েছে, এ দেশে সাপ্তাহিক কাগজ রিপোর্টার পাঠায় না সত্য, কিন্তু বিলেতে? সাপ্তাহিক কাগজ তো দু-দুটো করে রিপোর্টার পাঠায়। যা ভেবেছেন, তাই তিনি করচেন অর্থাৎ সাপ্তাহিকের পক্ষ থেকে রিপোর্টার পাঠিয়ে তিনি পুরুষ জাতিকে 'জার্নালিজম' শিখিয়ে দেবেন।

প্রস্তাব মনোমত হলো সত্য, কিন্তু এবার ভাবতে লাগলেন কা'কে পাঠান যায়।

হঠাৎ মনে হলো সহকারী-সম্পাদিকা বাণী দেবী তো আছেন। বেশ স্মার্ট মেয়ে। যেখানেই যাক না কেন, সেখানেই যে বাণী দেবী আর একটি খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে দেবেন, লুটিলুটি হালদার এ কথা বিলক্ষণ জানেন।

অতএব ফত্তেনগর-রণাঙ্গনে বাণী দেবীর যাবার হুকুম হলো। আদেশ শুনে বাণী দেবী প্রথমে বেশ আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু যেই মাত্র লুটিলুটি হালদার মহিলাদের অধিকারের 'দশ পয়েন্টের' মেমোরাণ্ডাম তার চোখের সামনে তুলে ধরলে, অমনি বাণী দেবী চুপ করে গেলেন। কারণ, এই দাবীর সর্ত্তগুলো সমস্তই বাণী দেবী রচিত ও লুটিলুটি হালদার কর্তৃক প্রচারিত।

ঠিক হলো, বাণী দেবী রণাঙ্গনে যাবেন ও সপ্তাহে একটি করে কাগজের জন্যে ডেসপ্যাচ পাঠাবেন।

অতএব সমাজ অধিকারের দাবী নিয়ে বাণী দেবী ফত্তেনগরের রণাঙ্গন ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন।

* * * *

প্রেস-ক্যাম্পে বাণী দেবীর আগমনের বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলোড়ন সুরু হয়ে গেলো।

ব্যারী ক্রকসন বললে : কী বললে? মেয়ে রিপোর্টার এসেছে ফত্তেনগরে?

: তা নয়তো কী? তুমি ভেবেছো কী লর্ড নর্থক্লিফ এসেছে। ছোঃ, তোমার যা বুদ্ধি!—একটু শ্লেষ কণ্ঠ নিয়ে গিদোয়ানী জবাব দেয়।

: আর আসবেই না কেন? পুরুষের সঙ্গে নারীর অধিকার। তাদের এই দাবী মানতে হবে আমাদের। রক্ত-চক্ষু দেখিয়ে, ইস্পাতের ঝিলিক দিয়ে তাদের আর হকচকানো যাবে না। এ-যুগে আর তোমাদের 'বুর্জোয়া' মতবাদ চলবে না। সমান অধিকারের দাবীর যুগ—কমরেড নিটস্কি বললে।

গিদোয়ানী বললে : রামগোপাল, তোমার কত বার মানা করেছিলুম মেয়েদের ঐ দাবী পেশ—এই সমস্ত নিয়ে অতো ফলাও করে কাগজে লিখো না। এখন নাও, ঠ্যালা সামলাও।

: ছাই আমি কী অতো জানতুম যে, শেষ পর্য্যন্ত এই রিপোর্টিং লাইনে মেয়েরা আসবে!

জবাবটা আমি দিই—সত্যি ভাই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমাদের এই টেকনিক্যাল লাইনে মেয়েরা কাজ করচে, এ আমি ভাবতেও পারছি নে।

: কেন করবে না শুনি? এ কাজ করবার অধিকার ওদের সম্পূর্ণ আছে—কমরেড নিটস্কি জবাব দেয়।

: তুমি থাম তো কমরেড নিটস্কি—রুক্ষস্বরে বলে গিদোয়ানী।

: কমরেড নয়, কমরেড নয়,—বলো কামারাদ। সাধারণ একটা উচ্চারণ করতে জানো না? তোমরা আবার রিপোর্টার!

: ভালো, ভালো হবে না বলছি—গিদোয়ানী বলে।

: কী করবে শুনি? মারবে নাকি?—নিটস্কি জবাব দেয়।

ব্যারী বলে : সাইলেন্স—সাইলেন্স। আমি বলি কী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। আমাদের আসল আলোচ্য বিষয় হলো, এই বাণী দেবী না বাণী দেবীর এই রণাঙ্গনে উপস্থিতি যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাকে কী করে সমাধান করা যায়। তোমার কিছু বলবার আছে গিদোয়ানী? নাথিং নাথিং বেশ। তুমি নিটস্কি। তুমি বাণী দেবীকে সমর্থন করার পক্ষপাতী? তুমি রামগোপাল। কী অমন চুপ করে বসে আছো কেন?

এবার মুখ খুললে রামগোপাল। বললে : শোন এই গোলমালে তোমরা তো আসল জিনিষটাই লক্ষ্য করোনি। শৈল কোথায়?

সবার দৃষ্টি যেন সেদিকে গেলো। একসঙ্গে চীৎকার উঠলো : শৈল কোথায়?

সবাই আমায় জিজ্ঞেস করলে : কোথায় তোমার বন্ধু?

আমিও একটু হকচকিয়ে যাই। কারণ, সত্যি বলতে কী, এইখানে এসে সমস্ত সময়টাই শৈল আমার সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু আজ কোন মুহূর্ত্তে যে উধাও হয়েছে সেটা আমি নিজেও টের পাইনি। আমি জবাব দিলাম : তা হলে নিশ্চয়•••

: নিশ্চয় কোন স্টোরী পেয়েছে—বলে রামগোপাল।

: স্টোরী পেয়েছে—সবাই আবার একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে।

আমি যেন কী বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই সমবেত কণ্ঠস্বরের মধ্যে আমার কথাও যেন হারিয়ে গেলো। একটু বাদে আমিও ওদের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে বললাম : নিশ্চয়, স্টোরী পেয়েছে।

* * * *

সেদিন বেশ রাত্তিরে এসে আমায় শৈল ডাকলে। বললে : দাদা, ঘুমিয়েছেন?

আমি ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকি।

শৈল আবার বলে : ঘুমুলেন নাকি?

আমার কণ্ঠ থেকে এক বিচিত্র ধ্বনি বেরিয়ে আসে। কি যে জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। শুধু শুনতে পেলাম শৈল বলছে : বড্ডো বিপদে পড়েছি দাদা, 'হরকরা' দপ্তর থেকে কী তার পাঠিয়েছে দেখেছেন? বলছে খবর পাঠাতে—

আমার ঘুম ভেঙে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম : তার মানে আজ বিকেলে আপনি কোন 'স্টোরী' পাঠান নি।

: আপনি পাগল হলেন! এ পর্য্যন্ত এখানে এসে খবর আর পাঠালাম কি? কিছু পুরানো বিলেতি কাগজের কাটিং এনেছিলাম। গত মহাযুদ্ধের বিবরণী। ভাবছি ঐগুলোই একটু বানাই করে চালাব নাকি?

: গুড লর্ডস। আমি বলি। সত্যি বলছেন আজ বিকেলে কোন স্টোরী পাঠাননি?

আপনাকে আর মিথ্যে বলবো কেন দাদা! আজ বিকেলে কেন—কোন সকালেই কোন বিকেলেই পাঠাইনি। পাঠাতে পারলে তো বর্তে যেতাম। এই দেখুন না, 'হরকরা' দপ্তর কী কড়া তার পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস করছে খবর পাঠাচ্ছি না কেন?

: আপনি আমায় বাঁচালেন। আজ প্রেস-ক্যাম্পের সবাই বলছিল আপনি নাকি বিকেলে একটা চমৎকার নিউজ পেয়েছেন, আমি তো খবরটা শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম।

: পাগল হলেন? আমি তো গিয়েছিলুম নারীর অধিকারের রিপোর্টার বাণী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। উনি তো ঐ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে আছেন। বেশ আদর-যত্ন করলেন। কাল আবার খাওয়াবার নেমন্তন্নও করলেন।

: সত্যি বলছেন?

: একদম সত্যি। বলে শৈল চলে গেলো।

• • • •

শৈল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গিদোয়ানী বিছানায় উঠে বসলে।

: বিশ্বাস করলে তুমি ওর কথা? আমাদের ধাপ্পা দিচ্ছে!

: কিসের ধাপ্পা?—আমি প্রশ্ন করি।

: ঐ যে তোমায় বানিয়ে-বানিয়ে কথাগুলো বলে গেলো। চায়ের নেমন্তন্ন, আরো কতো কী। প্রেফ গাঁজা।

আমি শৈলকে সমর্থন করি। বলি—না, কথাটাও সত্যি হতে পারেও তো।

: তুমি বলছো সত্যি হতে পারে। আর যদি হলোই বা, তা হলে কী এটা উচিত হয়েছে বাণী দেবীর? আমরাও তো ছিলুম। আমরা কী আর চা খেতে জানিনে? উনি তো আমাদেরও নেমন্তন্ন করতে পারতেন। বলতে বলতে গিদোয়ানীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

• • • •

সেদিন রাত্রিবেলাই কমরেড নিটস্কি দেখা করলে বাণী দেবীর সঙ্গে। বললে: আপনাকে সতর্ক করে দিতে এলুম। সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আপনার উপর।

কমরেড নিটস্কির কথা শুনে বাণী দেবী একটু বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন: সাম্রাজ্যবাদী—সে আবার কী?

ঐ যে আপনার রিপোর্টার। ক্যাপিটালিষ্ট কাগজের প্রতিনিধি। বিশ্বাস করবেন না একটুকু। ওরা কী বলছিল জানেন?

: কী? প্রশ্ন করেন বাণী দেবী। এবার একটু বিপদে পড়ে কমরেড নিটস্কি। কারণ, শৈলর অন্তর্ধানের দরুণ আজকের সভা মুলতুবী হয়েছে। বাণী দেবীর ব্যাপারটারও একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। তাই, একটু ভেবে, বললে: অবশ্য ঠিক বলেনি কিছু, কিন্তু বলবার মতলব করেছিল। ওদের মনে কী রয়েছে জানেন, পটাসিয়াম সায়ানাড। কাউকে বিশ্বাস করবেন না—বিশেষ করে ঐ গিদোয়ানী হতভাগাকে। লোকটা এমনি লেংড়ি দিতে পারে—

বাণী দেবী কমরেড নিটস্কির কথা শুধু মাত্র শুনছিলেন। হ্যাঁ বা না, কিছুই বলেন নি। নিটস্কি বলতে লাগলো: প্রয়োজন যদি হয় তবে আমায় খবর দেবেন। 'এভরিথিং' আমি করে দেবো। কিসসু ভাববেন না। হ্যাঁ, হ্যাঁ............

বাণী দেবী শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত ভাষায় বললেন: সত্যি আপনার অশেষ দয়া। অনেক ধন্যবাদ!

: ধন্যবাদ কেন? এ তো আমার কর্ত্তব্য। ঐ পুঁজিবাদীদের সঙ্গে লড়তে হলে আমাদের যে হাতে-হাতে মিলিয়ে চলতে হবে।

নিটস্কি চলে গেলো।

• • • •

একটু বাদে অন্ধকার ভেদ করে দরজায় টোকা দিলেন রামগোপাল।

: আমি রামগোপাল। আমার কাগজের কাটতি হাজার পঞ্চাশেকের উপর হবে। ভেরী রেসপন্সিবল পেপার। ঐ কমরেড নিটস্কির মতো বাজে কাগজ নয়। আমাদের 'এডিটোরিয়াল' কলমের প্রতিটি কমেণ্ট মন্তব্য নিক্তিতে মাপা। একসঙ্গে রামগোপাল অনেকগুলো কথা বলে—

: কিন্তু কমরেড নিটস্কি বলছিলেন.........

: নিশ্চয় বলবে। তবে নিশ্চয় আমাদের কাগজের কথা বলেনি। ঐ গিদোয়ানীর কাগজের কথা বলছিল। তা কী বলছিল—উৎসুক কণ্ঠে রামগোপাল প্রশ্ন করে।

: বলছিল যে সত্যি কথা নাকি একদম ও কাগজে ছাপা হয় না—বাণী দেবী বলেন।

: একদম খাঁটি কথা। একবার গিদোয়ানীর কাগজ কী করেছিল জানেন? ভুল করে সত্যি খবর ছেপে দিয়েছিল। বাস্ খবরটা যেই জানাজানি হয়ে গেলো, কাগজের সার্কুলেশন কমে গেলো। আর শুধু কী তাই? গিদোয়ানীর কাগজ পড়ে সরকার পলিসি ঠিক করতেন। খবরটা প্রকাশ হওয়া মাত্র তারা বিপরীত 'য়্যাকশন' নিলেন। কিন্তু দু' দিন বাদে জানা গেলো যে খবরটা সত্যি। এই নিয়ে সরকারকে কী নাকাল না হতে হয়েছিল। অনেকগুলো টাকা ক্ষতি হয়ে গেলো। শেষে এক দিন কাগজের এডিটারকে ডেকে ধমকে দিলেন। বলা হলো, এই ভাবে সরকারকে নাজেহাল করা ঠিক হয়নি।

স্তব্ধ হয়ে বাণী দেবী এই কথাগুলো শুনছিলেন। রামগোপালের কথা শেষ হওয়া মাত্র বললেন: বলেন কী, এমনি কাণ্ড?

একটু লজ্জা-মিশ্রিত কণ্ঠে রামগোপাল বলে: কী আর বললাম। ঐ গিদোয়ানী, নিটস্কির হাঁড়ি যদি এক দিন ভাঙি, তা হলে একেবারে থ' হয়ে যাবেন। থাক ও সব কথা আর এক দিন হবে এখন। এবার নিচু গলায় রামগোপাল বললে: শুনুন এই হপ্তাটের কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না। ধোঁকাবাজী দেবে। তবে এই দপ্তরের কথা আলাদা। নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন। বিপদ-আপদে শুধু স্মরণ করলেই হলো। সমস্ত কিছু তৈরী পাবেন। আচ্ছা, আজ আসি, নমস্কার।

রাতের অন্ধকারেই রামগোপাল মিলিয়ে গেলো।

• • • •

ঐ অন্ধকারে আর একজনের ছায়া দেখা যাচ্ছিলো। রামগোপালকে বেরুতে দেখে ছায়া একটু সরে গেলো। তারপর একটু বাদে গিয়ে রামগোপালের সামনে উপস্থিত হলো।

: আরে ব্যারী ক্রকসন দেখছি! কী ব্যাপার? ঘুমুতে যাওনি?

: বড্ডো গরম। ভাবছিলাম এই দিকটায় যদি একটু হাওয়ার সন্ধান পাই। তা তুমি কোথায় গিয়েছিলে হে, এই অন্ধকারে? পাঠাবার মতো কোন মাল-মশলা পেলে?

কথাটা শুনে রামগোপালের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বলে: যদি একটা কিছু পেতুম তা হ'লে কী আমায় এইখানে দেখতে পেতে হে? একটা খবর দেবার মতো খবর আর এবার পেলাম কই? এমনি ভাবে চললে আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি, ফতেনগরের লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

: যা বলেছো ভায়া, পাব্লিসিটিই বলো আর ঐ প্রোপাগাণ্ডাই বলো ঐ তো হলো লড়াইর আসল জিনিষ। যে লড়াইর পাব্লিসিটি নেই, সে লড়াই আর ক'দিন চলতে পারে হে?

: ঠিক কথা বলেছো ব্যারী। কিন্তু এখন কী করি বলো তো? এদিকে তোমার ঐ কমরেড নিটস্কির যা ভাবগতি দেখলাম, তা'তে বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।

: কমরেড নিটস্কি আবার কী করলে হে?

: কী আর করবে। ঐ তোমাদের মেয়েরিপোর্টার তোমার নামে কী যাচ্ছেতাই বলে এসেছে। যাই বলো না কেন ব্যারী, নিটস্কির এই আচরণের একটা হেস্তনেস্ত আমাদের করতেই হবে।

: ঠিক বলেছো। ঐ সামনের মিটিং-এ।

: ছাট্‌স রাইট। এই ব্যাপার সামনের মিটিং-এ তুলতে হবে।

• • • •

গিদোয়ানীর কিন্তু ঘুম আসছিল না। বললে: ঐ ব্যারী ক্রকসনের কাণ্ড দেখলে? চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিষ আছে। বলা নেই, কওয়া নেই, নিজেকে প্রেস-কমিটির প্রেসিডেন্ট বানিয়ে বসে আছে। সেলফ ষ্টাইল্ড প্রেসিডেন্ট। আমি কিন্তু এর ঘোর আপত্তি করছি।

আমি চুপ করে থাকি। এর কোন জবাব দিই না। গিদোয়ানী বলে চলে: আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি ঐ চা-পার্টি সব কিছুই ব্যারীর কারসাজি। নিজেকে পাকাপোক্ত করে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করাই মৎলব।

আমাদের কথা চলতে থাকে।

• • • •

পরদিন প্রেস-ক্যাম্পে আর এক বিশেষ সভা বসলো। ব্যারী ক্রকসনই সভাপতিত্ব করলে। এতে গিদোয়ানী প্রথমটায় একটু আপত্তি করেছিল। আমি সেই প্রস্তাবে সায় দিয়াছিলাম, কিন্তু আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে গেলো।

ব্যারী ক্রকসন জিজ্ঞেস করলে: আমাদের আলোচ্য বিষয় কী?

রামগোপাল বললে: নিশ্চয়, আমাদের আলোচনার একটা বিষয় থাকা উচিত। ওয়েল, গিদোয়ানী, তুমি কি বলো?

: আমি কিছুই বলিনে—জবাব দিলে গিদোয়ানী

: গিদোয়ানী ইজ রাইট। বলবার কিছুই নেই—আমি চলি।

: ডিসগ্রেস—রামগোপাল মন্তব্য করলে।

: আমি বলি কি আমাদের 'ওয়ার-এলাউন্স' নিয়ে আলোচনা করলে হয় না—ব্যারী জবাব দিলে।

: ঠিক বলেছো ব্রাদার! 'ওয়ার-এলাউন্স' নিয়ে আমাদের একটা হেস্ত-নেস্ত করা প্রয়োজন। আর কত কাল চলবে এই অত্যাচার! ষ্টীম-রোলার চালিয়ে আর কত দিন আমাদের পিষে রাখা হবে? আমাদের এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে—কমরেড নিটস্কি উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে।

কিন্তু কথার মাঝখানে রামগোপাল বাধা দেয়। বলে: তুমি থাম ত নিটস্কি! আজকে এই সভায় আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বাণী দেবীর ফতেনগরে আগমন।

: কিন্তু ব্রাদার, মেয়েদের নিয়ে আলোচনা আইনসঙ্গত নয়। আমি এর প্রতিবাদ করি।

: অবজেকসন ওভাররুল্ড। মেয়েরা কেন 'ওয়ার কভারেজ' করবে? আমি জানতে চাই—গিদোয়ানী বলে।

: গিদোয়ানী ঠিকই বলেছে। বাণী দেবীকে আমাদের চোখে-চোখে রাখা প্রয়োজন! মেয়েমানুষ, এই লড়াই'র কতো 'টেকনিকালিটিস' আছে। হয়ত উনি সব বুঝবেন না। তার পর ঐ সব আজে-বাজে কথা যদি ওর কাগজে পাঠিয়ে বসে, তা হ'লে কী কেলেঙ্কারী হবে বলো ত! গুড লর্ড, আমি তো ভাবতেই পারছি নে।

এবার আমি জবাব দিই: না হে, ব্যাপারটা বেশ চিন্তারই হয়ে দাঁড়ালো দেখছি। আমাদের একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নইলে আমাদের প্রফেশনের মান-ইজ্জত যাবে। কী বলো হে ব্যারী?

আমার কথা শেষ হবার আগেই শৈল এসে উপস্থিত। মুখে তার বাস্তুতার ভাব। প্রায় চীৎকার করেই বললে: সর্বনাশ হয়ে গেছে!

: কী ব্যাপার? সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করি।

: ঐ তোমার মেয়ে-রিপোর্টার কী বলে জানো? আজকে আমায় চা'য়ের নেমন্তন্ন করেছিল। বললে, আচ্ছা, শৈল বাবু, ফতেনগরে লড়াইটা কোথায় হচ্ছে বলুন তো? এখন পর্য্যন্ত তো কিসসু দেখতে পেলাম না!

: তাই নাকি? এ কথা বললেন বাণী দেবী? সবিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করি।

: আহা, লড়াইটা উনি দেখতে পাবেন না। আমরাই দেখতে পেলাম না, আর উনি তো ছার সাধে বলে মেয়ে-বুদ্ধি? রামগোপাল মন্তব্য করলে।

এবার শৈল জবাব দেয়। বললে: আজও কী বললে জানেন। বললেন, উনি ফতেনগরের ফ্রণ্ট দেখতে যাবেন।

: গুড হেভেন্স, এই কথা বলেছে! ব্যারী ক্রকসন বলে।

না, একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখছি। আমি তো প্রথম থেকেই এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছি। এখন ঠ্যালা সামলাও।

গিদোয়ানী তার কথা শেষ করতে পারলো না। কমরেড

নিটস্কি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে: ভাখো গিদোয়ানী, এখানে তোমাদের সাম্রাজ্যবাদ চলবে না। যুগের গতি পাল্টেছে। মেয়েদের সমান অধিকার মানতেই হবে। নইলে—

: নইলে কী হবে শুনি? তোমার তো চিন্তে-ভাবনা নেই। খবর সত্যি হলো কী মিথ্যে হলো। আর আমরা যে খবর পাঠিয়েছি, এগুলো প্রতিবাদ হলে কি আর দপ্তরে মুখ দেখাতে পারবো—গিদোয়ানী বলে।

: গিদোয়ানী, আমি তো ভেবেছিলুম যে, দপ্তরে তুমি মুখ দেখানো বন্ধ করে দিয়েছো। ব্যারী উত্তর দিলে।

: ভাখো ব্যারী, এটা ঠাট্টার সময় নয়। সিচুয়েশান কতো 'সিরিয়াস' ভেবে দেখেছো কী?

: আমার কাগজের নিন্দে আমি সইবো না। আমি চললুম—নিটস্কি যাবার উপক্রম করে।

: কোথায় যাচ্ছো? আমি প্রশ্ন করি।

: যেখানে খুসী। 'আইডোলজিক্যাল' পার্থক্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। 'আই মাষ্ট গো', আই মাষ্ট প্রটেষ্ট, আই মাষ্ট···

: কমরেড নিটস্কির এই সব উক্তি ঘোরতর আপত্তিজনক। হি মাষ্ট উইথড্র হিজ ওয়ার্ডস—গিদোয়ানী চীৎকার করে বললে।

: উইথড্র মাই ওয়ার্ডস। নেভার। কস্মিন্‌কালেও নয়···

: মিঃ প্রেসিডেন্ট, দিজ ইজ অবজেকসনবল মানে আপত্তিকর অন্যায়···

: ইউ সাট আপ···

: আই প্রটেষ্ট।

: নিটস্কি ইজ এ···

অনেকের চীৎকারে বাকী কথাগুলো শোনা গেলো না। শুধু সভাপতি ব্যারী ক্রকসনের একটা কথা শোনা গেলো। দিস্ মিটিং ইজ এডজোর্ণড সাইনে ডাই।

* * * *

সভার কিছুক্ষণ বাদে ব্যারী ক্রকসন এসে রামগোপালকে বললে: রাম, নিটস্কির কাণ্ডটা দেখলে? তোমায় আমি কত বার বলেছি···ও কি ব্যাপার? অমন চুপ করে বসে রইলে কেন?

: আরো বলো কেন ব্যারী! এদিকে তোমার ঐ মেয়ে-রিপোর্টারের কাণ্ড দেখেছো?

: কেন সে আবার কী করলে?

: এই পড়ো।

ব্যারীর হাতে রামগোপাল এক টেলীগ্রাম দিলে: টেলীগ্রামে বলা হয়েছে যে, নারীর অধিকারের বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত খবরে জানা গিয়াছে যে, ফতেনগরের লড়াই সম্বন্ধে যে সব ভয়াবহ কাহিনী কাগজে প্রকাশিত হইতেছে—তাহা অতিরঞ্জিত, অতএব···ইত্যাদি।

টেলীগ্রাম পড়ে ব্যারী বললে: আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিনে যে, ঐ মেয়েটা এই সব কথা লিখবে। কী বিশ্রী কাণ্ড বলো দিকিনি! কী রকম 'আনজার্ণালিষ্টিক' কাজ করলে মেয়েটা!

: যা বলেছো, খবরের প্রতিবাদ করা বিংশ শতাব্দীতে অচল।—রামগোপাল জবাব দিলে।

: ঠিক কথা। আচ্ছা, কাক কী কখনও কাকের মাংস খায়? রিপোর্টার হয়ে মেয়েটা আমাদের অপমান করালে! আমাদের খবরের প্রতিবাদ করলে?

: ও আবার কাক হলো কবে হে! ওতো চড়ই, চড়ই হে। উড়ে এসে বসেছে—

: ঠিক বলেছো। কিন্তু এখন কী করা যায় বলো দিকিনি?

: আমিও ভাবছি, কী করা যায়। দি আইডিয়া, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। দি গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। ব্যারী ক্রকসন, আমার প্ল্যান কমপ্লিট।

শুনি তোমার প্ল্যানটা—ব্যারী ক্রকসন উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

: একটু সবুর করো দাদা! একটু সবুর করো। দেখতে পাবে মজাখানা······

* * * *

গিদোয়ানীর হাতে টেলীগ্রামটা দিয়ে বললাম: মেয়েটার কাণ্ড দেখলে? শৈলকে যা যা বলেছিল, সব ওর কাগজে পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে। এই ভাখো 'তার' এসেছে, আমার দপ্তর থেকে। কৈফিয়ৎ চাইছে······

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিদোয়ানী বলে: আমায় বলছো? এই ভাখো আমার দপ্তর কী লিখেছে। সত্যি বাপু, কোথাকার একটা মেয়েদের কাগজ, সে কী লিখলো না লিখলো, এ নিয়ে দপ্তর যে কেন মাথা ঘামায়, এ আমি বুঝতেই পারছিনে!

: আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম—আমি জবাব দিলাম।

* * * *

সমস্ত সংবাদপত্র-জগতে এক তুমুল আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। এই চাঞ্চল্যের কারণ 'নারীর অধিকারে'র সম্পাদকীয়। সম্পাদিকা লুটিলুটি হালদার লিখেছেন: পাঠিকাগণ, আপনারা দেখুন, পুরুষেরা আজকাল নারী-জগতকে কী প্রকার ধাপ্পা দিতেছে। ফতেনগরের লড়াই সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ প্রচারিত করিয়া তাহারা নারী-সম্প্রদায়কে কী বিপদে ফেলিয়াছেন তাহা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হওয়ার দরুণ সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে এবং স্বামিগণ যে টাকায় সংসার চালাইতে বলিতেছেন তাহা যে অসম্ভব, আশা করি সে সম্বন্ধে আমাদের কোন মন্তব্য না করিলেও চলিবে। পুরুষদের এই প্রকার প্রতারণা অসহ্য!

'নারীর অধিকার' আরো লিখলে: ইহার পূর্বেও বহু বার পুরুষেরা আমাদের ভাঁওতা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কিছু বলি নাই।

পুরুষেরাই যে 'সমাচার ও হরকরার' মহিলা বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের জানা থাকা সত্বেও চুপ করিয়া গিয়াছি। শুধু কী তাহাই, কিছুদিন পূর্বে 'হরকরার' 'রান্নাঘর বিভাগে' 'মুর্গীর সন্দেশের' যে নতুন পদ্ধতি লেখা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা 'হরকরা' বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী মুর্গীর সন্দেশ রান্না করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে মুর্গীর সন্দেশ হয়

, কচুর ঘণ্ট হয়। আমাদের এই ভাবে কেন প্রতারণা করা তাহার কৈফিয়ৎ চাই……

* * * *

গালে হাত দিয়ে পতিতপাবন বাবু 'নারীর অধিকারের' সম্পাদকীয় পড়লেন। এই মন্তব্য প্রকাশিত হ'বার পর রাত্রে বাড়ী ফেরা উচিত কি না, সেই সম্বন্ধে গভীর চিন্তা সুরু করলেন।

* * * *

ব্রজানন্দ বাবুও বাড়ীতে বলে পাঠালেন যে, সে রাত্রে তিনি অফিসেই কাটাইবেন।

* * * *

বাণী দেবীর সঙ্গে রামগোপালের হঠাৎ ডাকঘরের সামনে দেখা। রামগোপাল জিজ্ঞেস করলে: আপনার তো সাপ্তাহিক। আপনি স্টোরী টেলিগ্রাম করেন কেন?

: স্টোরী টেলীগ্রাম করতে আসিনি তো। এমনি একটা কটিকিট কিনতে এসেছিলাম—বাণী দেবী হেসেই জবাব দিলেন।

বাণী দেবীর আজ মন প্রসন্ন। লুটিলুট চাকলার তাকে প্রশংসা করে তার পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বলেছেন, নতুন কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা থাকলে যেন অতি অবশ্য পাঠানো হয়।

রামগোপাল ভাবছিল কী করে বাণী দেবীকে জব্দ করা যায়। কী ধাপ্পাবাজ মেয়ে বাবা! 'নারীর অধিকারে' কী যা-তা ভেলপাচ লিখে দিয়ে বসে আছে। ফতেনগরে লড়াই বড় বেশী হয়নি, রিপোর্টারেরা ভুল খবর দিচ্ছে—ইত্যাদি। 'নারীর অধিকারে'র রিপোর্ট পড়ে রামগোপালের দপ্তর কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েছে। এখন কী সে জবাব দেবে?

হঠাৎ রামগোপাল বললে: 'কনগ্রাচুলেশন' বাণী দেবী। আপনার স্টোরী ফাস্টো ক্লাস হয়েছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, এমন আর কেউ লিখতে পারত না।

: আপনার ভালো লেগেছে, ধন্যবাদ—বাণী দেবী হেসেই জবাব দিলেন।

: নিশ্চয়।

তার পর বললেন: বাণী দেবী, মস্তো বড়ো কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে ফতেনগরে। বিদেশী শক্তি গুপ্তচর পাঠিয়েছে। নিজ চোখে দেখে এলুম। তার পর এই মাত্র থি হাণ্ড্রেড ওয়ার্ডের স্টোরী পাঠিয়েছি।

: সত্যি বলছেন—বেশ উত্তেজনার কণ্ঠস্বর নিয়ে বাণী দেবী বললেন।

: কী যে বলেন! এই শর্মা ভুল করে মিথ্যে কথা লেখে বটে কদাচিৎ, কিন্তু ভুল করে মিথ্যে বলে না।

এর পরে ফিস-ফিস করে বললে: শুনুন বাণী দেবী! কাউকে বলবেন না। ডি লুক্স ফার্মেসী দেখেছেন ঐ বাজারের কাছে? ওখানে একটা বিদেশী শক্তির গুপ্তচর শুয়ে আছে। আমি তো এই ওর সঙ্গে কথা বলে এলুম। বিশ্বেস না হয় নিজের চোখেই দেখে আসুন না।

: বলেন কী? বিস্মিত হয়ে বাণী দেবী প্রশ্ন করলেন।

: কী আর বলবো। সব সত্যি কথা। লোকটা ঐ ডি লুক্স ফার্মেসীর দাওয়ায় বসে আছে। দেখলে মনে হয় ভিখিরী, কিন্তু সত্যি কথা বলছি আপনাকে, ঐ হলো গুপ্তচর। লোকটি এমনি ভাণ করছে যেন ইংরেজী জানে না। দেখবেন একটু সাবধানে কথা বলবেন।

* * * *

ডি লুক্স ফার্মেসীর কাছে এসে বাণী দেবী দেখতে পেলেন যে, সত্যি এক জন বিদেশী বসে আছে। তার মলিন বস্ত্র দেখলে বোঝবার উপায় নেই লোকটি কোন দেশীয়।

প্রশ্ন করলেন বাণী দেবী: আপনি এখানে নতুন এসেছেন?

মাথা নেড়ে লোকটা জবাব দিলে। বাণী দেবীর প্রশ্ন বুঝতে পারলে কি না বোঝা গেলো না।

বাণী দেবী মনে মনে বললেন, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেলো দেখছি!

বাণী দেবী আবার জিজ্ঞেস করেন: কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

আবার সেই একই জবাব।

: বলি, কেন এলেন এখানে?

কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না। মাথা নাড়া ছাড়া লোকটি যে কিছুই বলে না। তা হলে হয়তো ইংরেজী জানে না। বিদেশী! কিন্তু বিদেশী হলে এ বেশে কেন? হয়ত গুপ্তচর। ঠিকই বলেছে রামগোপাল।

একটু বাদে রামগোপালের সঙ্গে বাণী দেবীর আবার দেখা হলো।

: সত্যিই লোকটার হাব-ভাব দেখে কিছুই বুঝতে পারলুম না। কোত্থেকে এসেছে, কেন এলো?

: ঐ তো বিপদ বাধালেন আপনি। আসল কথা শুনুন, আমি আপনাকে হলপ করে বলে দিতে পারি লোকটা 'ফরেইনার'। অর্থাৎ কি না 'ফরেইন' 'ইণ্টারভেনশন ইন ফতেনগর।' এই হেপাস্থরের মাঠে লোকটা যে হাওয়া খেতে আসেনি, এ আপনি নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন।

: তা'হলে কী করি বলুন তো?

: কী করবেন, এ নিয়ে ইতস্ততঃ বোধ করছেন? শুনুন আপনার কাগজ তো সাপ্তাহিক। এই যে বিদেশী শক্তির চক্রান্ত কিংবা অদূর ভবিষ্যৎ বিদেশী শক্তির চক্রান্ত হতে পারে এ নিয়ে কষে লিখুন। দেখবেন সরকার সতর্ক হয়ে উঠবে।

একটু দ্বিধায় পড়লো বাণী দেবী। বিদেশী শক্তির আগমন, এই নিয়ে কিছু লিখবেন কি না, এই হলো চিন্তার বিষয়। কিন্তু যদি আর বাকী সবাই পাঠিয়ে থাকে এই খবর, তাহ'লে? কী কেলেঙ্কারীই না হবে। লুটিদি' তাকে আস্তো রাখবেন না। লুটিদি' সব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পুরুষের কাছে পরাজয়? অসম্ভব! অসম্ভব!

ক্রমশঃ।

নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

তিন

সমরেশ যখন শৈলেশকে ইঁদারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল, শৈলেশ তখন ছয়-সাত বৎসরের বালক মাত্র। এখন ঘটনাটা তাঁর আর মনে পড়ে না, কিন্তু সেই ঘটনার আতঙ্কটা তাঁর স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মতো চেপে ব'সে আছে। সেটা আজও তিনি ভুলতে পারেন নি। সুতরাং সমরেশ এখানে স্থায়িভাবে বাস করার পর থেকে তিনি সন্ধ্যার পর আর বাড়ির বার হন না। চন্দ্রসুন্দরীরও এ বিষয়ে তাঁর উপর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আছে।

শিশুকাল থেকেই সমরেশের নৃশংসতা সম্বন্ধে বাড়ির সকলের কাছ থেকেই সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী শুনে শুনে শৈলেশের মনে কৌতূহল জমেছে প্রচুর। দুই ভাইয়ে দেখা নেই। সমরেশ গ্রামে ফিরে আসার পরে দু'জনের এক দিনও সামনা-সামনি দেখা হয় নি। কিন্তু শৈলেশের চর সকল সময়েই সমরেশের পিছনে রয়েছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমরেশ কি করেন, কোথায় যান, কে তাঁর কাছে আসে, কিসের জন্যে আসে, এ খবর প্রতিদিন শৈলেশ পেয়ে থাকেন। কিন্তু সে নিতান্ত একঘেয়ে খবর। অর্থাৎ সমরেশ কিছুই করেন না, কোথাও যান না, কেউ তাঁর কাছে কোনো প্রয়োজনেই আসে না,—এই খবর। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এই একই খবরে অবশেষে সমরেশের সম্বন্ধে শৈলেশের কৌতূহলও শান্ত হয়ে এল।

কিন্তু তাহলে লোকটা করে কি?

রামপ্রসাদ এক দিন বিজ্ঞের মতো বললেন, আমার সন্দেহ, উনি রাত্রে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্ম করেন বোধ হয়।

শৈলেশ সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মানে মারণ-উচাটন-বশীকরণ?

—তা-ও হোতে পারে।

—সর্বনাশ! কার কাছে খবর পেলেন?

—খবর কারও কাছে পাইনি, কিন্তু সেই রকম সন্দেহ হয়।

—কেন সন্দেহ হয়?

—আমি ওই রকম এক জন সন্ন্যাসী গয়ায় একটি পাহাড়ের গুহায় দেখেছি। তিনিও হাসতেন না, কথা বলতেন না। হয় নিঃশব্দে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন, নয় প্রেতের মতো অন্ধকারে পায়চারী করতেন।

এঁর সম্বন্ধেও শৈলেশ অবিকল এই রকম খবরই পেয়েছেন। তিনি নিঃশব্দে রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে রইলেন।

রামপ্রসাদ বললেন, গ্রামের আরও পাঁচ জন লোকেরও এই রকমই সন্দেহ। সন্ধ্যার পরে ও-বাড়ির সামনে দিয়ে কোনো লোক হাঁটে না, তা জানো?

তা-ও শৈলেশ জানেন।

রামপ্রসাদ বললেন—সন্ধ্যার পরে কোনো দরকারে ওদিক দিয়ে যাদের যেতে হয় তারা বলে, সন্ধ্যার পর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত হয় উনি বারান্দায় প্রেতের মতো পায়চারী করেন, নয় বাগানে কোনো ঝোপের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। মনে হয়, যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, কোনো প্রেতমূর্তি।

—দিনের বেলায় দেখলে কি মনে হয়?—শৈলেশ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

—মনে হয় মানুষ, কিন্তু যেন মানুষ নয়। ঠোঁটের উপর ঠোঁট বন্ধ, চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, অন্যমনস্ক। ভালো লাগে না।

—সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা অন্য লোক-জনও তো কেউ আসে না?

—না। শুধু পলাশডাঙার ছোট তরফের নায়েবকে কাল দেখলাম।

—ওখানেই গিয়েছিলেন?

—আমি দূর থেকে দেখলাম। অন্য লোকে ওখান থেকে তাঁকে বেরুতে দেখেছে।

চিন্তিত ভাবে শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার জানতে পারলেন কিছু?

—বোঝা যাচ্ছে না। তবে লোক লাগিয়েছি। জানা যাবে কয়েক দিনের মধ্যে, আশা করি।

অনেকক্ষণ পরে শৈলেশ বললেন—কিন্তু রাত্রে জপ-তপ, ক্রিয়া-কাণ্ড কিছু হয় না, আমি নিশ্চিত জানি।

—কি ক'রে জানলে?

—রাত্রে চাকর-বাকর যারা থাকে ওখানে তাদের জিগ্যেস করেছি।

রামপ্রসাদ বিজ্ঞের মতো হাসলেন। বললেন—বাবা! এত সহজ সোজা নয়। ক্রিয়া-কাণ্ড সত্যি যদি করেন উনি, চাকর-বাকরের বাবাও তা টের পাবে না। সারা রাত মড়ার মতো ঘুমুবে তারা। জানো? নইলে আর তন্ত্র বলেছে কেন?

তা বটে। তান্ত্রিকের অসাধ্য কাজ কি আছে? উদ্বেগে ও আশঙ্কায় শৈলেশ গোবিন্দের সমস্ত দেহ-মন কণ্টকিত হয়ে উঠলো।

গ্রামের এক প্রান্তে বিশাল জমিদার-ভবন। তার পরেই বিস্তীর্ণ মাঠ। তার পরেই চিত্রমারীর বিল,—তার আর এদিক-ওদিক দেখা যায় না। যখন বন্যা আসে, তার গৈরিক জলরাশি চারি দিকে থৈ-থৈ করে। অন্তত কয়েকটা দিনের জন্যে।

জমিদার-ভবনের পরে বিঘা কয়েক জমি পার হোলেই সমরেশের নতুন বাড়ি। বাড়িটা বাংলো ধরনের। চারি দিকেই বারান্দা। সমরেশ বিবাহ করেন নি। সুতরাং অন্দরের বালাই নেই। পিছনে

টা পুষ্করিণী। অন্য তিন দিকে অনেকখানি জায়গা ফেলে রেখে মাঝখানে বাড়িটা।

অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটা আলপথ জমিদার-ভবনের পিছন দিকে সমরেশের বাড়ির সামনে দিয়ে চ'লে গেছে বটে, কিন্তু এদিকে সাধারণের যাওয়া-আসা কম। অনতিদূরে এ মাঠের একটা পুকুরের উঁচু পাড়ে প্রকাণ্ড বড় একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। রাখাল ছেলেরা গ্রামের গরু-বাছুর এই দিকে চরাতে নিয়ে আসে। মাঠে যখন ফসল থাকে না, তখন গরু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তারা গাছতলার প্রশস্ত ছায়ায় ব'সে খেলা করে।

কিন্তু সমরেশ সারা রাত তন্ত্রসাধনা করেন,—অমাবস্যা রাত্রে আকাশ-পথে উড়ে গিয়ে শ্মশান থেকে মড়া এনে শবসাধনা করেন,—এই গুজবটা সাধারণের মধ্যে এমন ছড়িয়ে পড়লো যে, রাখালরাও আর এ মাঠে গরু চরাতে সাহস করে না। তারা অন্য মাঠে যায়।

সমরেশের বাড়ির মেহেদীগাছের বেড়ায় অনেক বিচিত্র রংএর ফড়িং এসে বসে। তারই লোভে মাঝে মাঝে দু'চারটে দুঃসাহসী বালক এদিকে আসে। তার মধ্যে হঠাৎ যদি চোখে পড়ে বারান্দায় কিংবা কোনো ঝোপের আড়ালে সমরেশের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্তি,—তখনই তারা ছুটে পালায়।

কিন্তু এরা তো বালক। সন্ধ্যার আবছায়ায় মাঠ থেকে এই দিকে ফেরার পথে কোনো চাষী যদি দেখে, দূরে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় একটা শুভ্রবসন মূর্তি ধীরে ধীরে পদচারণা করছেন, কিংবা দূরের দিকে চেয়ে একটু দীর্ঘ ঋজু দেহ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তারও বুকটা কেঁপে ওঠে। সে পর্যন্ত এই পথটুকু একটু পা চালিয়ে চলে।

এর মধ্যে এক দিন একটি চাষী একটি রক্তাক্ত ছাগল কোলে ক'রে শৈলেশ গোবিন্দর কাছারীতে এসে উপস্থিত হোল। ছাগলটার একটা পা ঝুলছে।

রামপ্রসাদ চমকে উঠলেন: ও কি রে! কে অমন করলে?

লোকটির গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না। কোনো ক্রমে বললে, বড় বাবু!

—বড় বাবু!—রামপ্রসাদের বিস্ময়ের অবধি নেই।—বড় বাবু ছাগলের পা কেটে দিলেন! মাথা খারাপ হয়েছে তোর!

লোকটি ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—আজ্ঞে হাঁ। জেনারেই যাও!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! রামপ্রসাদ শৈলেশকে ডেকে নিয়ে এলেন। বললেন,—শোনো ব্যাপারটা। বড় বাবু ওর ছাগলের একটা পা কেটে দিয়েছেন।

রক্তে তখন উঠানের খানিকটা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। ছাগলটাও ধুঁকছে। তারও সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ছাগলটার অবস্থা দেখে শৈলেশ চীৎকার ক'রে উঠলেন,—ব্যাপার তোর পরে শুনছি বাবা! আগে ছাগলটা সরিয়ে নিয়ে যা!

সেই রকমই অবস্থা! চোখে দেখে সহ্য করা যায় না। লোকটি ছাগলটাকে সরিয়ে দিয়ে ঘটনাটা বিবৃত করতে লাগলো:

ঘটনাটা নিতান্তই তুচ্ছ। ছাগল স্বভাবতঃই লোভী জীব। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যখন থর-থর ক'রে কাঁপে, তখনও সামনে একটা পাতা পেলে কুড়িয়ে খায়। এ-হেন লোভী জীব সমরেশের বাগানে গাছ-পালা দেখে যে ভিতরে ঢুকবে, তাতে আর অবাক হবার কি আছে?

আলোচ্য ছাগলটিও তাই করেছিল, বোধ করি একাধিক দিন। সমরেশ বারে বারেই তাড়িয়ে দিয়েছেন। আজও নাকি বার দুই তাড়িয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় বার ভদ্রলোক আর রাগ সামলাতে পারেন নি। ছাগলটি আসতেই একখানা রামদা ছিনি ছুঁড়ে মারেন। ছাগলটা বোধ করি ছুটে পালিয়েই আসছিল। দা এসে লাগলো তার পিছনের পায়ে। তার পরে···

তার পরের অবস্থা সকলে চোখেই দেখেছে। সমরেশের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় সকলে শিউরে উঠেছেন: সকলেই ছাগলটির জন্যে খুব বেদনাও অনুভব করলেন।

কেবল ভবতারণ জিজ্ঞাসা করলে,—কত দূর থেকে দা'টা ছুঁড়েছিলেন?

লোকটি বললে, বারান্দা থেকেই।

—ওঃ!—ভবতারণ সপ্রশংস ভাবে বললে,—তাকৎ বটে!

শৈলেশ গোবিন্দ জ্যেষ্ঠের শারীরিক শক্তির পরিচয়ে উল্লাসের কোনো কারণ দেখলেন না। রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি করা যায় এখন?

মামলা যেন শেষ হয়েই গিয়েছে, এমনি ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ভবতারণ বললে,—কি আর করা যাবে ম্যানেজার বাবু! একটা তুচ্ছ ছাগলের জন্যে তো আর ওঁকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা যায় না। তার চেয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে ওটা কেটে ফেল। সের খানেক মাংস আমাকেও দিও খুড়ো। আমি কেহ দাম দোব।

প্রস্তাবটা শুনে সবাই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে। কিন্তু ভবতারণ কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই উঠে গেল। এমনি অপ্রিয় কথা সে বরাবর আমল থেকেই ব'লে আসছে। কিন্তু জমিদারী সম্পর্কে সমস্ত দুরূহ কাজে তার সাহায্য এমনই অপরিহার্য এবং আসলে লোকটার মন এমনই সাদা যে, তার অপ্রিয় বাক্য সকলে হেসে সহ্য ক'রে থাকে।

অথচ কথাটা সত্য। সমরেশ যে রকম ভয়ঙ্কর লোক, তাতে তুচ্ছ একটা ছাগলের জন্যে তাঁকে ঘাঁটানো যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, এ বিষয়ে রামপ্রসাদেরও কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং সমরেশকে একটা ধাক্কা দেবার জন্যে শৈলেশ গোবিন্দের মতো তাঁরও মন ভিতরে ভিতরে একটু প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি ভবতারণের উক্তির সারবত্তাই উপলব্ধি করলেন এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থেকে অবশেষে লোকটির দিকে চেয়ে বললেন,—তুমি এখন যাও বাপু! আমরা ভেবে দেখি, কি করা যেতে পারে।

রামপ্রসাদকে যারা দীর্ঘকাল থেকে চেনে তারা বুঝলে, এ মামলা এইখানেই শেষ হোল বটে, কিন্তু এর একটা জের রামপ্রসাদের মনের গভীরে খুব গোপনে রয়ে গেল।

কিন্তু লোকটার চলে কি ক'রে হে?

প্রশ্নটা শৈলেশের মুখ থেকে বেরুলেও শুধু তারই প্রশ্ন নয়। গ্রামবাসী সকলের মনেই প্রশ্নটা জেগেছে, সমরেশের চলে কি ক'রে?

হোলই বা অবিবাহিত। মা হয় সংসার বলতে নিজে এবং

এক জন হিন্দুস্থানী চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। গলায় তার পৈতা একগোছা অবশ্য আছে, কিন্তু কে জানে কি জাত! রান্না থেকে চাষ পর্যন্ত সবই করে। স্বীকার করা গেল, দু'টি প্রাণীর খরচ খুব বেশি নয়, বিশেষ গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু সমরেশের জমি বলতে একটি কাঠাও নেই। থাকেনও সাধারণ গ্রামবাসীর মতো নয়, বেশ চালের উপরই। লোকজনও প্রায় প্রত্যহই দু'টি-একটি খাটছে বাগান নিয়ে।

সেই খরচটা চলে কি ক'রে?

এর উত্তর কয়েক মাস পরে পাওয়া গেল।

দেখা গেল, চাষ সম্বন্ধে সমরেশের চমৎকার বোধ আছে। তাঁর বাড়ি-সংলগ্ন ক্ষেতে প্রচুর তরকারী হোল। গ্রামবাসীদের মনে তখন আর একটা প্রশ্নের উদয় হোল: তরকারী তো হচ্ছে খুব, কিন্তু লোক তো দু'জন, গ্রামের লোকের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই,—এত তরকারী খাবে কে? এত খরচ ক'রে যে তরকারী লাগাচ্ছেন, সে নিশ্চয়ই দানছত্রের জন্যে নয়। অথচ ভদ্রলোকে তরকারী বিক্রিও করে না।

প্রথম ফসলটা উঠলে দেখা গেল, এ অঞ্চলে রেওয়াজ যাই হোক, সমরেশ নিজে দাঁড়িয়ে তরকারী হাটুরেদের কাছে বিক্রি করেন, এবং হাটুরেরা তা হাটে নিয়ে যায়।

শৈলেশ পাঁচ জনকে ডেকে বললেন—এইবারে গ্রামের বাসটা তুলতে হোল। ছেলেবেলায় দাদা আমাকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলেন, এর চেয়ে সে ছিল ভালো। এখনও মারণ-উচাটন ক'রে আমাকে মেরে ফেলেন তা-ও ভালো। এ যে সামনে দাঁড়িয়ে মুখ পোড়ানো। কোনো ভদ্রলোক গ্রামে ব'সে যে কাজ করতে পারে না, রায় বংশের সন্তান হয়ে উনি তাই করলেন! আমি মুখ দেখাব কি ক'রে?

রামপ্রসাদ বললেন—খাওয়া-পরার অভাব হচ্ছে, এসে জানালেই তো পারেন। বৈমাত্রেয় হোলেও এক পিতার সন্তান তো? উনি খেতে না পেলে ছোট বাবু কখনই তা চোখে দেখতে পারবেন না। কিন্তু এ কী! আজ বেগুন বিক্রি করছেন, কাল মূলো বিক্রি করবেন, পরশু পটল বিক্রি করবেন,—এমন ক'রে বংশের মুখ পুড়িয়ে গ্রামে না থাকলেই নয়? ভবতারণ!

—আজ্ঞে।

—তুই তো মাঝে-মিশেলে যাস ওবাড়ি। কথাটা ব'লে আসতে পারিস?

ভবতারণ সবিনয়ে বললে—আগে হোলে পারতাম ম্যানেজার বাবু! এখন—ভবতারণ মাথা চুলকোতে লাগল।

—এখন পারিস না কেন?

—ওই নাতিটার জন্য বাবু। সেদিন ছাগলটার কাটা-পা তো দেখলেন বাবু, কিম্বৎটা আন্দাজ করুন। ওই সব কথা ব'লে কি ফিরে আসতে পারব? ছেলেবেলা থেকেই দেবতাটিকে চিনি কি না!

ভবতারণ সিঁড়ির উপর বসলো। বললে—তাহলে এক দিনের কথা বলি, শুনুন: বড় বাবুর বয়েস তখন তেরো-চোদ্দর বেশি নয়। আমার কাছে তলোয়ার খেলা শেখেন। কিছু দিন শেখার পরে অনেকখানি হাতযশ যখন হয়েছে, তখন এক দিন খেলা হচ্ছে। যত খেলা চলছে, তত ওঁর রোক বাড়ছে। খালি বলছেন, তুমি ছেলেখেলা করছ ওস্তাদ, আরও জোরে খেল। দেখতে দেখতে রোক আমারও চ'ড়ে গেল। হঠাৎ এক ঘা দিলাম একটু জোরেই। ঢালে সামলাতে পারলেন না। পিছলে ওঁর বাঁ হাতে তলোয়ার ব'সে গেল। সে কী রক্ত বাবু! আমি তো ভয়ে ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছি। বড় বাবু হেসে বললেন, চোট না খেলে কি তলোয়ার-খেলা যায় হে! কিন্তু রক্তটা বড় বেশি পড়ছে যেন। চল কবরেজের কাছে। তিনি কি কি সব গাছ-গাছড়া বেটে লাগিয়ে দিতে রক্ত বন্ধ হোল। কিন্তু দাগটা রয়ে গেল। আজও সে কথা আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না।

মুখ বেঁকিয়ে ম্যানেজার বললেন—খুব বাহাদুর তোরা! এখন এই কথাটা বলবার জন্যে কি আমাকে আর একটা সর্দার রাখতে হবে?

ভবতারণ রাগলে না। হেসে বললে—রেখে দেখতে পারেন। কিন্তু আমি বলছি তাতেও কুলোবে না।

—কেন?

—কেন, তাও কি বলতে হবে? ওঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁর গায়ে হাত তোলে এমন লোক পাবেন না। ওঁর মার হজম ক'রে বেঁচে ফিরে আসতে পারে, এমন লোকও জানি না।

এতক্ষণ পরে শৈলেশ গোবিন্দ কথা বললেন,—তাহলে কি করা যেতে পারে?

—কিছুই করা যেতে পারে না ছোট বাবু! আমি বলি, তার দরকারই বা কি! উনি এক টেরে ব'সে যা খুশি করুন কেন, তাতে কার কি এসে যায়। কর্তাবাবু ওঁকে ত্যেজ্যপুত্র করেছেন, সেই ভালো। কাজ কি ওঁর ব্যাপারে থাকা!

অগত্যা। তা ছাড়া উপায় যখন নেই, তখন উনি তরকারীই বেচুন, আর মাছই বেচুন,—সেটা একান্ত ক'রে ওঁর নিজেরই ব্যাপার। অকারণে তাই নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে গিয়ে নতুন ঝামেলা বাধানো কারও পক্ষেই কাজের কথা নয়।

রামপ্রসাদ এবং শৈলেশ অবশেষে সেটা বুঝলেন এবং যাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই কার্যতঃ নেই, তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত এবং উদাসীন থাকাই কর্তব্য বিবেচনা করলেন।

চার

বিধবা হওয়ার পর থেকে হরসুন্দরী কঠোর জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ভোর পাঁচটায় উঠে তিনি স্নান ক'রে আসেন। তার পরে তেতলায় তাঁর পূজার ঘরে ঘণ্টা দেড়েক সন্ধ্যাহ্নিক করেন। নেমে আসেন সাতটায়। তখন আরম্ভ হয় গৃহকর্ম: দাস-দাসীদের কাজের তত্ত্বাবধান, রান্না সম্পর্কে বামুন মেয়েকে নির্দেশ দান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতিরিক্ত আদরে শৈলেশ গোবিন্দ অপদার্থ হয়েছেন। জমিদারীর কাজকর্ম তিনি বোঝেন না, বুঝতে চানও না। তার উপর সন্ধ্যায় ইয়ার-বক্সীর দল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কেবল তাঁর একটি মাত্র গুণ মাকে এবং ম্যানেজার-কাকাকে ভয় করেন। এই ভয়টা উভয়তঃই। শৈলেশের ক্ষেত্রে এটা যেমন স্পষ্ট, হরসুন্দরী এবং রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে সে রকম স্পষ্ট নয় হয়তো।

তথাপি মাতাল পুত্র ও মনিবকে হরসুন্দরী এবং রামপ্রসাদ কেউই বিশেষ প্রয়োজন না হোলে ঘাঁটাতে চান না। বস্তুতঃ, জমিদারী সংক্রান্ত কাজ-কর্ম প্রধানত রামপ্রসাদ এবং হরসুন্দরী পরস্পর পরামর্শ ক'রেই চালান। যেখানে জমিদারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় শুধু সেখানেই শৈলেশের আবশ্যক হয়, এবং সে-ও সেই কাজ বিনা প্রশ্নে সম্পন্ন ক'রেই স'রে পড়েন।

তখন শীতকাল। মাঠের ধান উঠে গেছে। মাঝে মাঝে দু'-চারটে আখের জমি ছাড়া অবারিত মাঠে কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই।

হরসুন্দরী স্নান সেরে তেতলায় পূজার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তখনও অন্ধকার অল্প একটু আছে। কিন্তু সে অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। শীতের হাওয়া বইছে হু-হু ক'রে। হরসুন্দরী দেখলেন, সেই দুরন্ত শীতে সমরেশ গোবিন্দের বাড়ি থেকে মাঠের খানিকটা পর্যন্ত গরুর গাড়ির সারি। ইট আসছে ব'লেই মনে হোল। স্বয়ং সমরেশ দাঁড়িয়ে থেকে ইট নামানো এবং সাজানো তদারক করছেন।

এত ইট কি হবে? যে বাড়িতে সমরেশ আছেন, একক সমরেশের পক্ষে তাই যথেষ্ট। সমরেশ কি আরও বাড়ি বাড়াতে চান? একতলার উপর দোতলা?

হরসুন্দরীর বুকের ভিতরটা কি রকম ক'রে উঠলো। সন্ধ্যাহ্নিক মাথায় উঠলো। ব্যাপারটা জানবার জন্যে কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠলো। কিন্তু কার কাছে জানা যায়?

সারা রাত্রি হল্লোড়ের পরে শৈলেশ এখন ঘুমে অচৈতন্য। ন'টার আগে তাঁর ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। রামপ্রসাদেরও আসতে দেরি আছে। সাধারণত আটটার আগে তিনি কাছারীতে আসেন না। অথচ কৌতূহল নিবৃত্তির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সন্ধ্যাহ্নিকে মনোনিবেশ করা অসম্ভব।

একটি ভৃত্যকে খবরটা নেবার জন্যে পাঠিয়ে তিনি অন্যমনেই আহ্নিকে বসলেন এবং প্রতি মুহূর্তেই ভৃত্যের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

যখন পূজা মধ্যপথে তখন কার পায়ের শব্দে তিনি পিছনে চেয়ে দেখেন, ভৃত্য নয়, রামপ্রসাদ স্বয়ং। হাতের এবং চোখের ইসারায় তাঁকে অপেক্ষা করতে ব'লে হরসুন্দরী পূজা সেরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দেখে রামপ্রসাদ ব্যস্ত ভাবে বললেন,—ওদিকে গাড়ির সার দেখলেন বৌঠাকরুণ?

—দেখেছি। খবর নিতেও লোক পাঠিয়েছি। কি ব্যাপারটা বলুন তো?

—বড় বাবুর দোতলা উঠছে।

—হঠাৎ দোতলা কেন? একটা লোকের পক্ষে একতলাই তো যথেষ্ট ছিল।

—সেই কথাই তো ভাবছি বৌঠাকরুণ। ক্ষেতের তরকারী, পুকুরের মাছ পর্যন্ত বেচেন। টাকাও যে লাখ-পঞ্চাশ আছে, তা নয়। যা আছে তাই নিয়ে একা প্রাণী খুব কৃপণতার সঙ্গে চলেন, তাই চ'লে যাচ্ছে। খামোকা এতগুলো টাকা তাঁর মতো লোককে অকারণে খরচ করতে দেখে অবাক হয়ে গেছি। এত ভোরেই তাই ছুটতে ছুটতে এলাম আপনার কাছে। যদি আপনি কিছু জানেন।

হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন,—আপনি যেটুকু জানেন, আমি তাও জানতাম না। তবে লোক পাঠিয়েছি, সে কি খবর আনে দেখা যাক।

একটু পরেই চাকরটা ফিরে এল।

রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন,—কি রে, কি খবর পেলি?

চাকরটা বললে,—কিছুই না ম্যানেজার বাবু!

সবিস্ময়ে রামপ্রসাদ বললেন, সে কি রে! ইট আসছে গাড়ি গাড়ি। কিসের জন্যে আসছে, তার লোকজনের কাছ থেকে কোনো খবর পেলি না?

—তারা বললে, বড় বাবু কাল কি করবেন তা আজ কেউ জানতে পারে না। ইট আসছে, বাড়িও হোতে পারে। আবার হয়তো সস্তায় কোথাও পেয়েছেন, ভালো দাম পেলে বেচেও দিতে পারেন।

—বলিস কি রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাইতো বললে সবাই।

চাকরটা চ'লে গেল। ওঁরা দু'জনে স্তম্ভিতের মতো ব'সে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে হরসুন্দরী বললেন,—ওই লোকটার সঙ্গে শৈলেশের যখন তুলনা করি ম্যানেজার বাবু, তখন ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। এই দুরন্ত শীতে অত ভোরে দেখি সমরেশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত তদারক করছে। আর আমার বাবাজীবন বেলা ন'টার আগে চোখই মেলবেন না! তীব্র জ্বালার সঙ্গে হরসুন্দরী হাসলেন।

আবার বললেন,—ছাদে এলে মাঝে মাঝে দেখি, সমরেশ হয় প্রেতের মতো পায়চারী করছে, নয় হাঁ ক'রে এই বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে। গা'টা কেমন ভয়ে শির-শির ক'রে ওঠে। ভয় হয়, সমস্ত বাড়িটা এক দিন না ওর ওই রাক্ষুসে হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে!

হরসুন্দরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করলেন।

রামপ্রসাদ মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন,—আপনি বুদ্ধিমতী। ভগবান আপনাকে শক্তিও দিয়েছেন অসামান্য। কিছুই আপনার দৃষ্টি এড়ায় না। ভয়ের কারণ আছে বই কি! ভাবনা আমারও হয়।

হঠাৎ হরসুন্দরী বললেন,—ম্যানেজার বাবু, রাত্রে আমি ঘুমুতে পারি না। মাথায় আমার চব্বিশ ঘণ্টা যেন আগুন জ্বলে। চারি দিকে চেয়ে এক আমার ঠাকুর আর আপনি ছাড়া ভরসা করার কিছু দেখি না।

রামপ্রসাদ নত নেত্রে নিঃশব্দে ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলেন। আর হরসুন্দরী মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চাইছিলেন।

বললেন,—ম্যানেজার বাবু, সামনে ঠাকুর রয়েছেন। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, শৈলেশকে প্রাণপণে রক্ষা করবেন, আমি নিশ্চিন্ত হই।

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ ঠাকুর-ঘরের মেঝের হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন,—শৈলেশকে বাঁচাবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?

—কি ?

—আপনি-আমি দু'জনে মিলেও বোধ হয় বড় বাবুর সমকক্ষ নই। তাছাড়া,—

—তা ছাড়া ?

—তা ছাড়া বৌঠাকরুণ, কেউ কাউকে মারতে পারে না, যদি সে নিজে নিজেকে না মারে। দেনার পরিমাণ কি রকম বেড়ে যাচ্ছে জানেন ?

হরসুন্দরী গম্ভীর ভাবে ব'সে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,— জানুয়ারী-কিস্তির কি হচ্ছে ?

—এটার জন্যে চিন্তা করি না বৌঠাকরুণ! এখন প্রজার ঘরে ফসল উঠেছে। খাজনা ভালোই আদায় হবে। এই সময় সুদে-আসলে যদি দেনায় কিছু দিতে পারা যায়, ভালো হয়।

—তাতে অসুবিধাটা কি ?

—অসুবিধা শৈলেশ স্বয়ং। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে আমাকে ভয় করে, মান্যও করে। তখন সে টাকা চায় না। সে টাকা চায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, যখন আমি তাকে ভয় করি।

রামপ্রসাদ শীর্ণ ভাবে হাসলেন।

হরসুন্দরী নিজেও সে সময় শৈলেশকে মনে মনে ভয় করেন, কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করেন না। বললেন,—কেন, ভয়টা কিসের ?

—কেলেঙ্কারীর।—রামপ্রসাদ বললেন,—প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমাকে ভয় করে, সেইটেই ভালো। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেই ভয়টা এক বার যদি ছুটে যায়, যদি কেলেঙ্কারীতে অভ্যস্ত হয়, আর আমরা ওকে সামলাতে পারব না। সেই ভয়ে হাতচিঠে পাঠালেই টাকাটা দিই।

দাঁতে দাঁত চেপে হরসুন্দরী বললেন,—ভুল হয়ে গেছে সেই সময়।

—কোন্ সময় ?

—উইল করবার সময়। তখন একেও যদি ত্যাজ্যপুত্র করিয়ে কমলেশের নামে যদি সমস্ত লিখিয়ে নেওয়া যেত, তাহ'লে এ দুশ্চিন্তা পোয়াতে হোত না।

ম্যানেজার বাবু চমকে উঠলেন,—সে কি সম্ভব ছিল ?

—সবই সম্ভব ছিল ম্যানেজার বাবু! কিন্তু এতখানি আমি ভাবিনি। নাবালক-নাতির অভিভাবিকা হয়ে আমি যদি আপনাকে নিয়ে জমিদারী চালাতাম তাহ'লে সমরেশের ভয়ে চোখের ঘুম এমন ক'রে চলে যেত না।

অনুতাপে হরসুন্দরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রামপ্রসাদ সান্ত্বনার সুরে বললেন,—সে কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই বৌঠাকরুণ! যা হবার হয়ে গেছে। চলুন নিচে যাই।

দু'জনে নিচে গেলেন।

না, ইটগুলো সস্তায় কিনে চড়া দামে বিক্রির জন্যে নয়। যদিও কেউ যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে চড়া দামে কিনতে চাইতো, তাহলে সমরেশ কি করতেন, নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।

যাই হোক, বাণিজ্যের প্রয়োজনে সমরেশ ইট কেনেন নি। কেন না, সঙ্গে সঙ্গেই সুরকী ভাঙা আরম্ভ হয়ে গেল এবং চুণ ও বালি আসতে আরম্ভ করলো। তার কিছু দিন পরেই সকলের কৌতূহল চরিতার্থ ক'রে সমরেশের দোতলা উঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকের বেড়াগুলো ভেঙে ফেলে সেখানেও প্রাচীর উঠতে লাগলো। আরম্ভ হোল একটা গেট আর সামনের দিকটায় উঁচু প্রাচীরের বদলে রেলিং।

প্রাচীর খানিকটা উঁচু হোতেই ছাগল-ওয়ালারা নিশ্চিন্ত হোল, আর ছাগল বড় বাবুর বাগানে ঢুকতে পারবে না, রাম-দায়ের আঘাতে আহতও হবে না।

বাড়িটা আগে ছিল বিঘা কয়েক জায়গার মধ্যে একটা বাংলোর মত। অন্দরের কোনো বালাই ছিল না। এখন সমরেশ বাড়িটার দু'পাশের জায়গাটাও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলেন।

কাছারীতে ব'সে শৈলেশ টিপ্পনী কাটলেন,—বড় বাবু এবার বোধ হয় বিবাহ করবেন। আমাদের একটা নিমন্ত্রণ পাওনা হচ্ছে।

সকলে হাসলে। হাসিরই কথা সন্দেহ নেই। পল্লীগ্রামে এই বয়সে পুরুষের বিবাহটা কিছুই নয়। ষাট বছরের বুড়ো টোপর মাথায় নিয়ে বিয়ে ক'রে আসে। তবু সমরেশের ব্যাপারটা গ্রামের লোকের কাছেও এমন যে, তাঁর বিবাহের প্রশ্নে হাসিই আসে সকলের।

শৈলেশ বললেন,—হাসছ তোমরা ? নইলে বড় বাবুর হোটেল-বাড়িতে অন্দরের দরকার হচ্ছে কেন বুঝিয়ে দাও।

তাও বোঝানো অসম্ভব। তবু সবাই আর এক দফা হেসে উঠলো।

ইন্দির পণ্ডিত এসেছিলেন তাঁর নাতির অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে। বয়সে প্রবীণ, তাতে পণ্ডিতি ক'রে তাঁর স্বভাবে একটা গাম্ভীর্য এসেছে। ব'সে ব'সে শুনছিলেন তিনি শৈলেশের রসিকতা। সকলের সঙ্গে তিনিও যে এই রসিকতা উপভোগ করছিলেন না, তা নয়। সমরেশ এবং শৈলেশ উভয়েই তাঁর ছাত্র।

তিনি বললেন,—কথাটা যদি বললে বাবাজি তাহ'লে বলি, সমরেশ বাবাজির বিয়ে করাই উচিত।

—কেন বলুন তো ?

—লোকটা তাহ'লে হয়তো স্বাভাবিক হয়।

কতকটা ইন্দির পণ্ডিতের গাম্ভীর্যের জন্যে, কতকটা কথাটার অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে সকলেই চুপ ক'রে রইল।

পণ্ডিত বলতে লাগলেন,—মানুষটার জীবনযাত্রাটা এক বার দেখ। বাড়িতে মা নেই, স্ত্রী নেই, ছেলে-মেয়ে নেই। বাইরে বন্ধু-বান্ধব নেই, কারও সঙ্গে মেলামেশা, খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ নেই।

—এমনি ক'রে দিন কাটে কি ক'রে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পণ্ডিত বললেন,—ভগবান জানেন কি ক'রে কাটে। চেহারা দেখে টের পাও না ? মানুষের মতোই অবয়ব, কিন্তু যেন মানুষ নয়। ছেলেদের দোষ দোব কি, আমাদেরই কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে।

—সত্যি।

পণ্ডিত আবার বললেন,—বেঁচে যায় যদি একটা বিয়ে করে, ছুটো ছেলে-মেয়ে হয়।

—সেই চেষ্টাই করুন না। আপনাকে তো খানিকটা মান্য করে।

পণ্ডিত হাসলেন—না শৈলেশ বাবাজি, এ সংসারে ও কারও আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ-মায়া-মমতা, এ সব কিছুই বোধ হয় ওর মধ্যে নেই। ছেলেবেলা থেকেই নেই।

সকলে পণ্ডিতের কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলো।

পণ্ডিত বলতে লাগলেন,—তোমরা হয়তো ভাব, ও-সব বৃত্তি মানুষের সহজাত। সব মানুষের মধ্যেই আছে ঠিক। সব জমিরই ফসল উৎপাদনের শক্তি আছে। তবু চাষ করতে হয়; সার দিতে হয়, নইলে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ওর মুস্কিল কি হয়েছে জানো? জীবন-ভোর ও স্নেহ-মমতার চাষই করলে না। জমিতে যেটুকু উর্বরা-শক্তি ছিল, তাও কাঁটা-গাছেই শুষে নিলে।

কথাটা সকলেরই খুব মনঃপূত হোল। সবাই উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করলো।

পণ্ডিত বললেন,—তাই বলছিলাম, সমরেশ বেঁচে যায় যদি একটা বিয়ে করে। ছেলে-মেয়ে হোলে মনের জমিতে আবার হয়তো স্নেহ-মমতার চাষ হবে। আবার স্বাভাবিক মানুষ হোতে পারে।

শৈলেশ বললেন, তাইতো বলছিলাম পণ্ডিত মশাই, উনি কাউকে যদি কিছু শ্রদ্ধা করেন, সে আপনি। আপনি বললে উনি বিয়ে করতেও পারেন।

সমরেশ সম্বন্ধে শৈলেশের মনোভাব সবাই জানে, সমরেশের কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠলো। শৈলেশের কণ্ঠস্বরে তারা যেন কোমলতার আভাস পেলে!

পণ্ডিত হাসলেন। বললেন,—সে তোমরা যে বয়সে বিয়ে করেছিলে, সে বয়সে হোলে হোত বাবা! এখন হয় না। এখন বিয়ে করতে হয়তো ও ভয়ই পাবে।

—ভয় পাবে? সকলে সবিস্ময়ে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো,—কেন?

—বিচিত্র নয়। বয়স হয়েছে। জীবনযাত্রা একা-একা এক ধরণে অভ্যস্ত হয়েছে। ভয় পাবে, বিবাহিত জীবন হয়তো সেটা উলটে দেবে। আরও কত চিন্তা আসবে হয়তো।

সে আবার কি? বিয়ে করতে কোনো পুরুষমানুষ যে ভয় পেতে পারে, এ তাদের কাছে কল্পনার অতীত। কত লোক বিপত্নীক হবার পর পাঁচ-ছয়টা বিবাহ করে। এক স্ত্রী বর্তমানে দারপরিগ্রহও একেবারে বিরল নয়। সেই বিবাহে ভয়টা কিসের। তারা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলে।

পণ্ডিত মহাশয় অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছিলেন। আপন মনেই এক বার বললেন,—নারায়ণ! নারায়ণ!

তার পর শৈলেশের দিকে চেয়ে বললেন,—তা সে যাই হোক বাবা, পরশু আমার দাদুভাই ছ'টি প্রসাদ খাবে। তোমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। যাবে যেন বাবা!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। বড় বাবুকেও নিমন্ত্রণ করছেন তো?

পণ্ডিত বিপদে পড়লেন। পাড়াগাঁয়ে আবার নিমন্ত্রণে ঝামেলা আছে। এ গেলে ও যাবে না, ও গেলে সে যাবে না আছে। আবার এ না গেলে ও যাবে না, তাও আছে।

সভয়ে বললেন,—স্বজাতি আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করছি বাবা। কেন বল তো? কিছু কি গোলযোগের আশঙ্কা আছে?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি বললেন,—না, না। বলছিলাম কি, যদি যান বিবাহের কথাটা এক বার তুলবেন?

পণ্ডিতের ভয় দূর হোল। মুখে হাসি ফুটলো। বললেন, বেশ তো! না হয় তুলব এক বার কথাটা। অন্যায় অনুরোধ তো নয়!

ইতিমধ্যে পণ্ডিত হাসতে হাসতে উঠলেন এবং সমরেশকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এক সময় কথাটা তুললেনও।

সমরেশ যেন চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক বার পণ্ডিতের দিকে চাইলেন। না, সে মুখে পরিহাসের কোনো চিহ্ন নেই।

সমরেশ হেসে বললেন,—আপনি কি মনে করেন পণ্ডিত মশাই, আমার এখন বিবাহের বয়স আছে?

অবলীলাক্রমে পণ্ডিত বললেন,—আছে বই কি বাবা! নিশ্চয়ই আছে।

—আমার কত বয়স হোল জানেন?

—জানি বই কি? যে বারে তোমার পিতামহ কৃষ্ণসাগর সংস্কার করলেন। পানীয় জলের অভাবে লোকের দারুণ কষ্ট দূর হোল। তার পরেই তুমি হোলে। তাহলে ধর গিয়ে তোমার বয়স হোল চুয়াল্লিশ বছর, আর ধর এই তিন মাস।

সমরেশ হাসলেন,—এই বয়সে বিবাহ করা যায় মনে করেন?

—কেন যাবে না? তোমার বড় ছুই জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। অকালে তাঁরা যখন মারা গেলেন, তখন তোমার পিতামহীর সন্তান-সম্ভাবনার বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। অথচ বংশ লোপ হয়। তখন তোমার পিতামহী নিজে উদ্যোগী হয়ে কর্তার বিবাহ দিলেন। তাঁর বয়স তখন একষট্টি বৎসর। তার পরে ধর গিয়ে তোমার পিতা হোলেন।

এই ইতিহাস, সমরেশ কেন, প্রবীণেরা ছাড়া অনেকেই জানে না।

বিস্মিত ভাবে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন,—তাই নাকি!

—হাঁ বাবা! গ্রামের প্রবীণেরা অনেকেই একথা জানেন। স্বাভাবিক অবস্থায় একষট্টি বৎসর বয়সে হয়তো অনেকে বিবাহ করতে সম্মত হন না, বিশেষ এক স্ত্রী বর্তমানে। কিন্তু পিণ্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন এবং পুত্রের জন্যে ভার্যা গ্রহণের নির্দেশ শাস্ত্র দিয়েছেন।

সমরেশ কি যেন ভাবলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

তার পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার পৌত্রের অন্নপ্রাশন কবে বললেন?

—পরশু। আসছ তো বাবা?

—নিশ্চয়। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমার খাওয়া-দাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে।

—না, জানি না তো! কী অসুবিধা?

—আমি স্বপাক নিরামিষ খাই।

—তাই না কি! ভালো, ভালো!—ব্রাহ্মণ-সন্তানের আচার-পরায়ণতায় পণ্ডিত মহাশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু তখনই বিমর্ষ ভাবে বললেন,—তাহ'লে!

বাধা দিয়ে সমরেশ বললেন,—তার জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমি যথাসময়েই যাব, খাটব-খুটব, তার পরে এই দই-সন্দেশ খেয়ে চ'লে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন, না খেয়ে আসব না।

সমরেশ হাসলো!

যে-লোক কচিৎ হাসে না, তার হাসি বড় মনোহর! সমরেশের হাসি দেখে আনন্দে পণ্ডিতের চোখে জল এসে গেল। বললেন,—ও তো তোমাদেরই বাড়ি বাবা! না খেয়ে এলে চলবে কেন? কিন্তু পংক্তি ভোজনে বসলে বড় ভালো হোত।

সমরেশ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বললে,—সে তো কোনো মতেই সম্ভব নয় পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বললেন,—আচ্ছা, থাক থাক। কিন্তু তুমি যাবে যেন বাবা!

পণ্ডিত চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁকে ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে দিতে সমরেশ আশ্বাস দিলেন;—নিশ্চয় যাব।

ফিরে এসে মজুররা যেখানে কাজ করছে সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু হাত চালিয়ে কাজ কর বাবা! কাজ বড্ড ঢিমে তালে চলছে।

লোকটির কণ্ঠস্বরে কি যেন আছে। মিষ্টি ক'রে কথা বললেও লোকে ভয়ে কাঁপে। মজুররা ব্যস্ত হয়ে ঠিকঠাক কাজ আরম্ভ করলে।

[ক্রমশঃ।

যাদুঘরে

শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝম-ঝম-ঝম বৃষ্টি পড়ে, শুনছো অধ্যাপিকা,
হঠাৎ এলুম তোমার যাদুঘরে,
শুনবো কিছু প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাসের টীকা,
এক পেয়ালা গরম চায়ের পরে—
তোমা মেটাও লক্ষ্মী মেয়ে, স্টোভটা লাগাও আগে,
ইতিহাস তো অনেক দিনের, তেষ্টা তারও আগে।

সুমুখের ঐ কঙ্কালটা, ওটা কেমন মেয়ের
মরলো না কি তোমার বয়েসেতেই?
চলছিলো কি পাশের বাড়ী কথাবার্ত্তা বিয়ের,
অক্কা পেলো পাকাপাকি হ'তেই?
আইবুড়ো ঐ মেয়ের কাছে চেয়ার আনো টেনে,
আইবুড়োরা আইবুড়োমির প্রত্নতত্ত্ব চেনে।

মাথার ওপর দুটো আলো, একটা সুইচ টেপো,
অন্ধকারের খাতায় পড়ুক জমা,
সরিয়ে রাখো বইগুলো সব, ওরা বেজায় ডেঁপো—
দাঁড়ি দেবার পরে বসায় কমা;
কালকে ক্লাশে কি পড়াবে, কালই ভেবো সেটা,
অনাসৃষ্টি বৃষ্টিরাতের অন্ধ জাতের 'ভেটো'।

ফুলের ওপর মৌমাছিটা, দুটোই ফসিল বুঝি,
পাথরের তার এমন কাতরতা,
সোজা কথায় অধ্যাপিকা, বোঝাও সোজাসুজি,
দুটো প্রেমের পাথর হবার কথা—
পৃথিবীর সব পিয়াসীদের ফসিল তোমার মুখ,
তোমার বুকে জমে পাথর শকুন্তলার বুক:

আজীবনটা মানুষ না কি ছিল এমনি দামাই,
চিরটা দিন তৃষ্ণা ভালোবাসার,
রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, যে কোন পথ মাড়াই,
ভালোবাসাই, রাজার কিম্বা চাষার—
নর-নারীর ভালোবাসাই গড়ছে না কি মহাজাতি,
এক বালিশে শোবে এবার ভালোবেসে পিঁপড়ে-হাতি।

বৈজ্ঞানিকার মন্দিরে আজ হঠাৎ কবি এলো,
জ্ঞান-পাহাড়ে রসের সমুদ্দুর—
ঝম-ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ে, কোথা কি গেলো গেলো,
বাজছে বুকে রক্তকোষের সুর;
কঙ্কালটায়, পাথরগুলোয় গরম রক্ত ছোটে,
কেমন যেন ছায়া ঘনায় অধ্যাপিকার ঠোঁটে।

চা ঢেলেছে লক্ষ্মী মেয়ে হলুদবরণ কাপে,
দুটো বাতির গায়ে হলুদ যেন—
অন্ধকারের নিদসায়রে চমকে-ওঠা কাঁপে,
হঠাৎ আলো ফিউজ হ'ল কেন?
জলদি করো অধ্যাপিকা, মোমবাতিটা জ্বালো,
ঐতিহাসিক মেয়ের ঘরে ঐতিহাসিক আলো।

ইতিহাস তো অতীত দিনের অতল-কালো কূপ,
কাল যা' ছিল, আজকে নেই যেটা,—
বিদ্যুতে আজ তাই জেগেছে অন্ধকারের রূপ,
ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এটা;
এখানেতে উঁচু আঙুল নরনারীর পানে,
আলো নেবার এখানেতে ঐতিহাসিক মানে:

কালো অ'ঙুর মদ খেয়েছে, অধ্যাপিকা টলে,
হাতড়ে বেড়ায় কোথায় যে দেশলাই,
হিংসেতে ঐ কঙ্কালটার আইবুড়ো হাড় জ্বলে,
মৌমাছি আর ফুলটা গলে কাই;
হরপ্পা ও তক্ষশিলার প্রতিধ্বনি জাগে,
বাতির আলোয় বৈজ্ঞানিকার নতুন নতুন লাগে।

স্মরণে

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

ডাক্তার বাবুর বাসা ঠিক কান্দীর মধ্যস্থলে। বড় ডাক্তার বলতে কান্দীর লোকে বোঝে যিনি থাকবেন সরকারী হাসপাতালে। তিনি যদি এম, বি না-ও হন, তা'হলেও বড় ডাক্তার।

মস্ত বড় উদ্যান। এত বড় উদ্যান কান্দীতে আর একটাও নেই। তারই পাশে কোণের দিকে ডাক্তার বাবুর দোতলা কোয়ার্টার। শুনছি নতুন-আসা এ ডাক্তার বাবু খুব ভাল লোক।

হঠাৎ এক দিন দেখা হ'লো তাঁর বাসাতে। প্রথম দর্শনেই ব'ললেন—"সুপ্রভাত! হঠাৎ এদিকে শুভাগমন কেন? আপনারা না চিনলেও আমি চিনি। আপনি ত বিধাতা-পুরুষ আমাদের।" শেষের টুকু ব'ললেন ভায়ার দিকে লক্ষ্য ক'রে। বিজয়েন্দু ভায়া তখন চেয়ারম্যান কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির।

প্রথম দর্শনেই বুঝলাম, বয়স হ'লেও মানুষটির রসশূন্য হয়নি অন্তর।

"আপনাকে ব'ললে রাগ করবেন না, এ স্থান মশায় ডাক্তার-বৈদ্যের থাকার মত না।"

"কেন?"

"আমি ত এই প্রথম এসেছি। যা নমুনা দেখলুম, ভয় করে।"

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"কী এমন দেখলেন আমাদের দেশে ভয় করার মত?"

"নাম ক'রবো না মশায়, এই প্রথম আলাপে। গেলুম আপনাদের স্বজাতীয় আত্মীয়ের বাড়ী। ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে ব'লে এলুম, এই তিনটে পুরিয়ে খাবেন। নিশ্চয়ই অসুখ কমে যাবে! ও হরি! পরদিন গিয়ে দেখি, অসুখ ত কমেই নি, বরং বৃদ্ধি। ভাবতে লাগলুম কান্দীতে এসে এ কী হ'লো আমার! জিজ্ঞেস করলম আপনার কি একটুও কম মনে হ'চ্ছে না? ভদ্রলোক নাকি সুরে টেনে ব'ললেন—'ওষুধ ত আপনার খাওয়াই দায় মশায়, সারা মুখ কালীতে বোঝাই।' আমি ভেবে পাই নে এ কী বলেন ভদ্রলোক। তার পর বোঝা গেল—তিনটে পুরিয়ের ব্যবস্থা দিয়ে ব'লে গেছলুম এই তিনটে পুরিয়ে খাবেন। ভদ্রলোক ভাল ভাবে অর্থ বুঝে পুরিয়া তিনটি অগ্নিশিখায় বেশ ক'রে পুড়িয়ে কালিঝুলি খেয়ে ব'সে রয়েচেন। বলুন দিকি মশায় আমার দোষ কী? ভাবলুম আর পুড়িয়ে খাবার ঔষধ দেবো না। ব্যবস্থা ক'রে এলুম মিকশ্চার। ব'লে এলুম চার দাগ থাকবে। চার বারে দু ঘণ্টা অন্তর চার দাগ খাবেন। আবার গিয়ে দেখলুম রোগীর অবস্থার মোটেই উন্নতি হয়নি। মহা চিন্তায় প'ড়লুম। জানলুম যা তাতে বুঝলুম এখানকার অন্ন আমার উঠেচে।"

বিস্মিত ভায়া প্রশ্ন করলেন—"কেন, আবার কী?"

"আর কী বলেন মশায়, ছেড়ে দিন, ব'ললে মারতে আসবেন। আমি ব'লে এলুম চার দাগ শিশির ওষুধ খেতে। বলেছিলুম চার দাগ চার বারে দু ঘণ্টা অন্তর খাবেন। তিনি আঠা দিয়ে আঁটা দাগ চারটে বহু আয়াসে খুঁটে খুঁটে তুলে খেয়ে ব'সে রয়েচেন। বুঝুন দিকি ব্যাপার!"

বুঝলাম ডাক্তার বাবু গভীর জলের মাছ। প্রথম দর্শনেই বন্ধুত্ব গভীর হয়ে গেল।

যদিও এস্, ডি, ও, মুন্সেফ বাবুর বাসা যাবার ইচ্ছা প্রায়ই থাকতো ভায়ার, তা হ'লেও বড় রকমের আকর্ষণ প'ড়লো ডাক্তার বাবুর ঝাউতলার বাড়ীর উপর।

একদিন সন্ধ্যার দিকে তিনি গল্প আরম্ভ করলেন; আমরা শ্রোতা। গল্প বললে ভুল হবে, তাঁর নিজেরই জীবনের প্রকৃত ঘটনা।

তিনি ব'লতে লাগলেন—"এম্ বি পাশ ক'রে সরকারি চাকরি পেলুম, বিনা আয়াসে ভগবানের দয়াতে। কাজও করলুম দশ বারো বছর। তার পর ইচ্ছা হ'লো উপর দিকে একটু ওঠবার। বুঝলুম বিদ্যে বুদ্ধি থাকলেই হয় না। দরকার পায়ার। তা-ও জোড়া-তালি দিয়ে ঠিক ক'রলুম। তাঁর একখানা চিঠিতেই ফল হ'লো। সিভিল সার্জ্জনের পোষ্ট পেলুম আপনাদের এই মুর্শিদাবাদেই। আমি তখন আনন্দে আত্মহারা। বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ীতে ষোড়শোপচারে মায়ের পুজো দিয়ে জোড়া পাঁঠাও বলি দিলুম। আগে থেকে কয়েক জন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেচি। ভূরিভোজন ক'রে তাঁরা আমাকে ধী চীয়াবুস দিয়ে গেলেন। চাকরি পেয়ে ভাবে ডগমগ আমি। আমাকে পায় কে? একটা বামুন দারোয়ান ছিল আমার। সে তখনও আছে আমার কাছেই, তাকে পাঁচ টাকা বকশিস্ দিলুম। বকশিস্ পেয়ে সে ত আনন্দে আটখানা। চার্জ্জ প'ড়লো আমার উপর ডেটিনিউ ক্যাম্পের। পাগলা গারদ তখন ভরতি সব গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষের লোকে। তাদের দেখা-শোনার, চিকিৎসার ভার প'ড়লো আমার উপর।

"প্রথম গিয়ে দেখি মস্ত বড় হল। দেড়শো দুশো ফুট লম্বা। যেন খেই ই পাওয়া যায় না। প্রশস্তও বেশ ভাল রকম। দু'চার দিন কাটলো আলাপ জমাতেই। তখন র'য়েচেন প্রায় তেরশো বন্দী। শুনলুম, তাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। প্রায়ই দেখচি অনেকেই বই খুলে ব'সে রয়েচেন। পাশ দিয়ে গেলে বই মুখ থেকে নামিয়ে নমস্কার করেন। খুবই ভাল লাগলো।

"কয়েক দিন বেশ কাটলো। একদিন এক ভদ্রলোককে দেখলুম, ব'সে রয়েছেন হলের এক প্রান্তে, তিনি ডাকলেন। দুশো ফুট হল ভেঙে উপস্থিত হলুম তাঁর কাছে। বই মুখে ব'সেই রয়েছেন। প্রশ্ন ক'রলুম আপনি কি অসুস্থ? আমার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন। আমার ছেলের বয়সী নির্ব্বাক্ ছেলেটির কাছ থেকে অন্য দিকে যাত্রা করলুম। প্রায় দেড়শো ফুট যাওয়ার পর হাততালির আওয়াজ পেলুম। শব্দের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখি, একটি যুবক হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কী করি বিরক্তি চেপে

রওনা হ'লুম আবার দেড়শো ফুট রাস্তা। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন—আপনি কী নূতন ডাক্তার এসেছেন ?"

মাথা নেড়ে জানালুম—হাঁ। চশমাওয়ালা চোখ তুলে ব'ললেন—আপনি ডিউটি ক'রতে এসেছেন না বয়স্য হ'য়ে পান চিবুতে এসেছেন ? সত্যই আমার দারোয়ানের দেওয়া পান মুখেই ছিল। অবশ ভাবে পান মুখ থেকে বের ক'রে ফেলে দিলুম। নালির পাশেই পড়লো। ধমক দিয়ে ব'ললেন ছেলেটি—উঠিয়ে ফেলুন। সে কী ধমক! বাপ মাও ছেলে বয়সে আমাকে অমন ধমক কোন দিন দেননি—মাষ্টার মশায়রাও নয়। নিজের সম্মান বাঁচিয়ে জুতো ঘ'ষে ফেলে দিলুম কোনও রকমে বাইরে। বাপ রে সে যা চোখ! সে চোখ মনে পড়লে আজও রাত্তে ঘুম ভেঙে যায়।

শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞেস ক'রলুম—আপনি ডাকছিলেন কেন ? সেই রকম গম্ভীর কণ্ঠেই উত্তর দিলেন—আপনি অপেক্ষা না করেই চ'লে গেলেন কেন ? আপনি আমাদের সকলের জন্যই নিযুক্ত মনে রাখবেন। যান। বেশ মুরুব্বির মতই কথাগুলো ব'ললেন। বাক্যব্যয় না ক'রে চ'লে এলুম। প্রাণ তখন আমার খাঁচাছাড়া।

তিন দিন পরের আর একটা ঘটনা বলি। এক ভদ্রলোক শুনলুম খুব শিক্ষিত। এই বয়সেই সাত বছর জেল খেটেচেন। এখন তিন বছর ধ'রে ডেটিনিউ হ'য়ে রয়েচেন। বেশ নম্র ভাবেই ব'ললেন—মাথা ধ'রেচে, বড্ড কষ্ট পাচ্ছি, ওষুধ দিন ত। একটু দেখে তাঁকে ব্যবস্থাপত্র দিলুম। ভাল ভাবে প্রেসক্রিপসনটা প'ড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি ত হতবাক্। তার পর পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বের ক'রে নিজেরই নোট-বুকের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখলেন কী। লিখে কাগজখানা আমার গায়ে ছুঁড়ে দিলেন। প'ড়ে দেখলুম একটা পেটেণ্ট মেডিসিন। বিনয়াবনত হ'য়ে বললুম—আমাদের এ ওষুধ দেবার অধিকার নেই। তৎক্ষণাৎ তিনি বেশ রুক্ষ কণ্ঠেই বললেন—কোন কথা শুনতে চাইনে। আমি যে ওষুধের ব্যবস্থা দিলুম তাই দিতে হবে।

মুখ থেকে বের হ'ল আমার—বে-আইনি ওষুধ দিতে পারবো না সার্। এক সাথে শত বজ্রের আওয়াজে যেন কাণে এসে ঢুকলো। সে কী গর্জ্জন! এ দিকে পাঁচ সাতশো বীর এসে তখন আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের তরফেরও পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠেছে তত্‌ক্ষণে। অস্ত্রধারী দেড়শো দুশো লোক জেলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন আমাকে ছেড়ে তাণ্ডব আরম্ভ হ'লো পুলিশ-গার্ডদের সাথে। সে কী যুদ্ধ মশায় তিন ঘণ্টা ধ'রে। কি ভাগ্যে টিয়ার গ্যাস নিয়ে হাজির হ'লো আরও কত জন পুলিশ। তাই রক্ষে। দেখলুম ওরা মরিয়া। হয় ভারত স্বাধীন ক'রবে, না হয় প্রাণ দেবে, এই ওদের সঙ্কল্প। এ ধরণের মরিয়া যারা তাদেরকে কি পারার উপায় আছে ? এইখানেই যবনিকা প'ড়লো না মশায়। পরাজিত ডেটিনিউরা ঘোষণা ক'রলেন তাঁরা অনশন করবেন। অত বড় উচ্চ প্রাচীর পার হয়ে সংবাদ বড় বড় কাগজে মোটা মোটা হরফে হেডলাইন দিয়ে ছাপান হ'য়ে গেল। অত্যাচার! অত্যাচার! জেলের ভিতর ডেটিনিউদের উপরে পুলিশের বর্ব্বরতা!

বড় কর্ত্তা এসে হাজির। তলব দিলেন আমাকে। বিনীত ভৃত্য হাজির হ'লো সঙ্গে সঙ্গেই। বললেন—আপনি মশায় এ কাজের উপযুক্ত নন। এই সব ভদ্র ছেলেদেরকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারলেন না ? ক'দিনই বা এসেছেন, ক'দিনের মধ্যেই এই বিভ্রাট! সেটাতে আমাদের নিন্দে হবে বুঝচেন না ? ভয়ে আমার মুখ থেকে একটি কথাও বের হ'লো না। মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে গেল। সাত দিনের মধ্যেই আবার আমার পুনর্মূষিকত্ব প্রাপ্তি ঘটলো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বিষ্ণুপুরের কালী-বাড়ীতে মাকে আবার জোড়া-পাঁঠা দিয়ে বললুম—আমাকে বাঁচালে মা! আমি উচ্চ হ'তে চাই না।

চৈতি-হাওয়ার রাত

অমলেন্দু দত্ত

এমনি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কাল
হয়তো তখন হবেও বা মাঝ-রাত ;
জানালার ফাঁকে বাড়িয়েছে দেখি চেয়ে
জ্যোৎস্না-নরম শাদা-শাদা দুটি হাত।
সে হাত এসেছে বিছানার 'পরে নেমে
সে হাত ছুঁয়েছে আলগোছে সারা গায়,
চৈতি-হাওয়ার অকারণ লুটোপুটি
চপল-পায়ে জানালায় জানালায়,

তাদের নরম অশরীরী দেহ ছোটে
মশারির বৃথা বারণ কেউ না মানে ;
অবাক রাতের তারাদের মৃদু চোখে
ভুলো ভুলো যেন সরম-ঘোমটা টানে।
কখন উঠে যে এসেছি বাড়ির ছাদে
সে কথা আজো কি আমিই জানি ?
রজনীগন্ধা জ্যোৎস্নার কানে কানে
কী বলে চলেছে অতি পুরাতন বাণী,

হয়তো অযুত অযুত দিন শেষে
তবু বলো তারে ডাকি কোন অছিলায়
চৈতি-হাওয়ার মাঝ-রাতে কভু যদি
এমনি হঠাৎ কেন ঘুম ভেঙে যায় ?

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

২

দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

জীবনকে ও শিক্ষাকে যিনি প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এবং সর্বাঙ্গীন বিষয়ের ও সর্ব দেশের মানুষের মধ্যে বিস্তৃত করে দেখেছেন, তাঁর কাছে গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি যে নানা দিক দিয়েই ধরা পড়বে ও তিনি বিচিত্র রকমের উদ্ভাবনা দ্বারা তার বহু সংস্কার সাধন করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত আগে নানা দিকে নানা লোকে নানা কাজে ব্রতী হলেও, এরূপ সর্বাঙ্গীন শিক্ষার এমন বড় দৃষ্টি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না।

শিক্ষার সংকীর্ণতা তাঁকে বহু স্থলেই বেদনা দিয়েছে : প্রথমত, ইট-কাঠের খাঁচার মধ্যে পরিবেশের অভাব, দ্বিতীয়ত, পুঁথিগত ধরাবাঁধা পড়া ও পরীক্ষা নেওয়া,—সেখানে বিষয়-বৈচিত্র্য ও জ্ঞান-প্রসারের অভাব। তিনি জানাচ্ছেন,—

"মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজু রেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চারি দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে, তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণ ভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।" (তপোবন, শিক্ষা ১৩১৮) আর,—

"যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে।……যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।" (শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা)

লেখাপড়া করা ছাড়া হাতে-কলমে কাজ করার শিক্ষা কিছু দিন আগেও কমই ছিল। শিক্ষায় সমাজের সকল শ্রেণীর স্থান আজো তেমন হয়নি। খেলাধুলা, নৃত্যগীত, স্বাস্থ্যচর্চা, অবহেলিত হয়েই পড়েছিল। নিরানন্দের মধ্য দিয়ে, নীরস শিক্ষা নিতে হত নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনে, তাও নিতে হত বৈদেশিক ভাষায় ; মুখস্থ প্রণালীই ছিল পাঠ অভ্যাসের একমাত্র ভরসা। "তোতা-কাহিনী"র ব্যাপার ঘটত পদে পদে : এ সব দেখেই কবি লিখেছিলেন,—

"চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি…দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি…বাদ দিলে চলে না।" শিক্ষায় "উদ্ভাবন ও সৃষ্টির অভাব"—তারি ফল। অথচ "আমরা যে সমর্থ তার প্রমাণ,—জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল" ইত্যাদি। এতৎ সত্ত্বেও আমরা তিনি অনুন্নত ও নিরুপায় হয়ে আছি কেন, এই আত্মসম্বিৎ-এর প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন বহু আগে থেকে। তাঁর প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মধ্যে তিনি সেই নিরুপায়তা যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবে মোচনেরই চেষ্টা করেছেন।

অনেকে বলেছেন, জাতীয় দুর্গতির কারণ ছিল আমাদের রাষ্ট্র-পরাধীনতা। অনেকাংশে তা সত্য হতে পারে, কিন্তু কবি বলেছিলেন, "নিশ্চিত জানি, সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ—শিক্ষায় পরবশ।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা)

"দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য, আমরা যেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি। নিজের কাছে নহে। জোর করিয়া বলি, আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

"দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন ও তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।" (শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা ১৩১৩)

খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকার চেয়ে উচ্চ কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল না। সে-অনুযায়ী চাকরিকেই আমরা জেনেছিলাম

শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। জীবিকায় প্রতিযোগিতায় চাকরিও হল দুর্লভ। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ কোথায় রইল প'ড়ে। বাইরের জীবন তো জীবনের এক দিক, জীবনের সিদ্ধি চাইলে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে হবে,—চিত্তের প্রসারও তার জন্য প্রয়োজন। তার অভাবে বাইরের জীবনযাত্রাও এক দিন ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কবি বলেন,—"চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবন-যাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনও যথার্থ ভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?" (শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ১১৩৫)

সংস্কৃতির দিকে যেটুকু আমাদের ঝোঁক গিয়েছিল,—তাও পরের দেখাদেখি; বিষয়কার্যে পরের সংস্রবে এসে, বাইরের চলা-ফেরা এবং বস্তুর ঐশ্বর্যের চাকচিক্য বাড়াতেই অনেকে মেতে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সেই শিক্ষিত সাধারণের পরিচয় ছিল কম। পরিচয় স্থাপনের উৎসাহে পড়েছিল মন্দা। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাটিকে আগে চিনতে বলেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় চিত্তের ঐশ্বর্যে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতের প্রকাশ হলে তা স্বাভাবিক হবে না। বিকৃতি আনবে বিনাশ। সেই জন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে ক'রে কবি বলছেন,—"ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।"

"তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিত ভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি? সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।" রাষ্ট্রে, অর্থে, আধিপত্য বিস্তার ক'রে পাশ্চাত্য বাইরে প্রবল ভাবে বিশ্বব্যাপী ক'রে আপনাকে প্রকাশ করতে উন্মুখ,—কবি বলেন,—"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল।" কেন না, "ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষের পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গল কর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতার ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্ত-সংগতপূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়।" ভারতের সেই পরিপূর্ণতা ছিল আত্মপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি উভয়ের উপলব্ধি ও শক্তি-নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে। "এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে" স্থূল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষে যে যে আত্মিক জগত, তাকেও ভারতবর্ষ বাদ দেয়নি। সেদিকটিকে সমভাবে সত্য জেনে, তার সঙ্গে সংগতি স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সে সংসারের বিষয়কর্ম-সাধনে সচেষ্ট হয়েছে। "মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবে মানুষের এত কালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে; নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।" সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায়, তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চরিত্র-নীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান ব'লে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র শাসনকে নিযুক্ত করেছে।...পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশলাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারি দিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করেনি।

"মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না। তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হ'ক বড় হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শত্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

"মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলে-ঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায়, সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানব-জন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই। তাঁরা যুক্তাত্মা।...আমাদের দেশে এই একটি সত্য ও বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকেই ত্যাগ করা তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।...সাম্রাজ্যিকতা বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সেজন্য বিচিত্র ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ ব'লে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায়-দীক্ষায় আহারে-বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে।" (বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন ১০)

এই হচ্ছে ভারতের স্বভাবগত চিন্তার ধারা। তার শিল্পে-সাহিত্যে এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অবধি এই আত্মিক বিচারবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক ছাপ কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। মূল লক্ষ্য পরিপূর্ণতার আদর্শ থাকলেও ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতাই যে প্রাধান্য পেয়েছে, একথা বলতেই হবে। সেই আধ্যাত্মিকতা আচারে-বিচারে কোথাও কোথাও গোঁড়ামিতেও এসে ঠেকেছে। বস্তুর পরিচয় সকলে সম্যক্ না জেনেই কেবল বাপপিতামহের পুরোনো মত ও হৃদয়বৃত্তির ধারা রক্ষণেই জীবনের সার্থকতা মেনেছে। ঠিক যেমন পাশ্চাত্য সমাজ জেনেছে বস্তু-বিজ্ঞান ও বিষয়সম্পদের প্রসারেই হবে সে সকলের উপরে জয়ী, সেই তার সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। এ বিষয়ে বিচার ক'রে রবীন্দ্রনাথ

দেখেছেন—"আমেরিকায় 'বৈষয়িকতা'র ব্যাপ্তি, ভারতে ছিল 'সামাজিকতা'।" ওদের 'বৈষয়িকতা'র বাহন হয়েছে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কল-কারখানা; আর আমাদের আধ্যাত্মিকতা আশ্রয় করেছে শেষে সামাজিক আচার-বিচারকে। কবি বলছেন,—"আমি বলিনে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ, কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার বাণী নেই।" তিনি আরো বলেছেন,—"একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যের দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।"

"ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেন না, আচারেই হোক আর ব্যবহারেই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।" (শিক্ষার মিলন)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের বৈশিষ্ট্য যতই থাক্, তাদের মধ্যে আধুনিক কালে আত্মীয়তার অভাবই বড় অভাব। মানুষের প্রতি দরদ নিয়ে তার চিত্তের ও বিত্তের বিকাশ ঘটাতে হবে,—এইটিই কবির পরম সিদ্ধান্ত। সর্বসাধারণের জন্য সেই আদর্শের ভিত্তিতেই সমস্ত পৃথিবীতে শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। দেশ-বিদেশে ঘুরে, দুনিয়ার হাল-চাল দেখে শুনে, অধ্যয়ন ও নানা আলাপ-আলোচনায় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যা বলেন, শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে তা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালকগণেরও সে-সম্বন্ধে অবহিত হবার আছে। তাঁর প্রধান কথাই এই—

"শিক্ষার ঐক্যযোগে চিত্তের ঐক্যরক্ষাকে সভ্যসমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য ব'লে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এশিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই সাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দাবি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদান-প্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্রদেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ মানেনি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম, তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, তার প্রথমভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থস্বচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্য-বঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা)

দরদহীন সভ্যতার রূপ দেখিয়ে, আপন দেশে কবি 'জনশিক্ষা'র আবশ্যকতায় সকলকে সচেতন করে তোলবার জন্য বললেন,—"মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। গণসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোটো।" সর্বাঙ্গীনতার প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি ছিল ব'লেই, সমাজের নিম্ন সাধারণ শ্রেণীর অবস্থাও কবি এত গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন এবং তাই এই বিসদৃশ ব্যাপারটা ধরিয়ে দিলেন যে, "আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।" (পল্লীসেবা, শিক্ষা ওয় স° ১৩৩৭)

সমাজকে তার অব্যবস্থার জন্য ধিক্কার দিয়ে বললেন,—"সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-প'রে পরিস্ফুট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। সেই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা)

দেশ-বিদেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে কবির তিন রকম বাতির উদাহরণটি বিশেষ উপযোগী। আগে দেশে ছিল সেজের বাতি; তাতে উপরে ভাসত তেল, নিচে জল। তেল ছিল ভদ্র সমাজের জ্ঞানের অংশ, জোলো অংশ নিম্নসাধারণের জ্ঞানের। দুয়ে মিশ না খেলেও দু'য়ের যোগেই দেশের সংস্কৃতির শিখা একরকম দীপ্তি পেত। মাঝে মাঝে তা নিবেও যেত। পাশ্চাত্য শিক্ষা এল। সে কেরোসিনের বাতির মতো। সকলের জন্যই তার জ্ঞানের উপকরণ সমান তেজের। আলো তার ধোঁয়ালো। কিন্তু সে আলোও প্রকাশ পায় একটি শিখায়, সে শিখার গতি উপরের দিকে। শেষে অধুনা পাশ্চাত্য থেকেই এল বিজলি বাতি; যে তারের বাহনে তার চলাচল, সকল অংশেই তায় সমান ব্যাপ্তি, ঘরে-বাইরে আনাচ-কানাচ—সকল জায়গায়ই সে সমান ভাবে আলো করে। এখনকার এক ধরণের পাশ্চাত্য জনশিক্ষার বিস্তারও হচ্ছে সর্বসাধারণের জন্য সমভাবে। এ দেখে কবির আশা জেগেছে, হয়তো এত দিনে মানবসভ্যতার কলঙ্ক ঘুচবে। প্রথম থেকেই তিনি বলে আসছিলেন, দেশের সাধারণের শিক্ষার ভার সাধারণকেই স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করতে হবে। কোনো রাষ্ট্রের অপেক্ষাতে তা ফেলে রাখলে চলবে না। এ বিষয়ে তিনি আইরিশ জাতির উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন,—

"আইরিশ জাতি কি প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা বিপ্লব বাধাইয়া চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়।"

রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভর করার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করবার জন্য কবি দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করেন,—টলষ্টয়ের বর্ণিত রুশিয়ার শিক্ষানীতি। (শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষা)

"It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore oppose true elinightenment. It is time we realized that fact....And I am extremely sorry when I see valuable disinterested, and self sacrificing efforts spent unprofitable. It is

strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on this struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make."

কবির মতে জনসাধারণকে শিক্ষা বিলাবার বাহন হওয়া চাই—মাতৃভাষা। তিনি য়ুরোপের নজির তুলে বলেন—"ভাষা স্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায় সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্রক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে।" (বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষা ১৯৩৩)

প্রাচ্যদেশ জাপানের কথা তিনি আগেই বলেছিলেন,—"আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি।" (পরিশেষ, শিক্ষা ৩য় সং ১৩৩৭)

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"মনের চিন্তা ও ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা)

এ বিষয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর এই,—"আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভরতি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি স্কুল মাষ্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা)

"কবির বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাও বাংলার মধ্য দিয়া দিতে আরম্ভ করিলেই গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইবে।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ৪০৪) এমন কি তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন,—"যে সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে।" (শিক্ষার বিকীরণ, শিক্ষা) ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চালু রাখা না রাখা নিয়ে আজো বাদানুবাদের শেষ নেই। এ অবস্থায় কবির এই মন্তব্যটি সকলে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করবেন আশা করি।

এ থেকে যা হোক, কবির শিক্ষা আলোচনার মধ্যে জনশিক্ষা, স্বাধীন ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব এতক্ষণে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবার কথা। আমাদের দেশে যে এক কালে জনশিক্ষার প্রসার কিরূপ ছিল, তাও কবি দেখিয়েছেন। কথকতাকে তিনি সেদিকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তুলনা ক'রে বলেছেন,—"আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।" আর "আমাদের দেশে জনশিক্ষা ছিল 'স্বৈচ্ছিক', পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে 'আবশ্যিক'।—এই তারতম্যের উক্তিও করেছেন তিনিই। সকলের চেয়ে আদর্শ এ বিষয়ে তাঁর কাছে মহাভারতের শিক্ষা। বলেছেন,—

"ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রূপ মহাভারত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষের চিরকালের শিক্ষার প্রশস্তভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক।"

—"তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পরমার্থিক সদগতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।"

অবিলম্বেই যে কাজ হাতে নেওয়া দরকার, স্বদেশী যুগ থেকে কবি সেদিকে ছাত্র-সমাজকে আহ্বান করে বলেছেন,—

"কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা যোগ স্থাপন করিতে হইবে।"

আরো নির্দিষ্ট ভাবে কাজের উল্লেখ ক'রে কবি সংগ্রহ করতে বলেছেন,—"বাংলা দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য।" (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ)

আর বলেছেন,—করা চাই দেশব্যাপী পরীক্ষার ব্যবস্থা।

কবির আরেকটি মন্তব্য সম্বন্ধেও এখানে শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। শিক্ষাকে প্রাচীন কালের বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাকে আধুনিক কালে প্রসারিত করে আনা প্রয়োজন। না হলে, সর্বাঙ্গীনতায় তো ত্রুটি থেকে যাবেই, শিক্ষা প্রাণবন্ত হ'তেও বাধা পাবে। কবি বলেছেন,—

"লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা" চলছে "ম্যাঞ্চেষ্টর য়ুনিভার্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগ করছে। আধুনিক সমাজের সঙ্গে যোগ চাই।" (শিক্ষার বিকীরণ, শিক্ষা)

দেশের এবং বিদেশের বহুদর্শিতা থেকে কবি যে কথাগুলি ভেবেছেন, যে সব প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন, বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগের জন্য নির্ভর করেছেন বেশি আপনার গড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর, বাইরের লোককে শুনিয়েই সব কর্তব্য শেষ করেন নি। সে প্রতিষ্ঠানের কর্ম বহু এবং বিচিত্র, আজো তার পরীক্ষা চলছে।

[ক্রমশঃ।

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

১০

'মেরীর সঙ্গে আমারও যাওয়া উচিত ছিল'—বললেন মাদাম দুগার্দে—'মঁজিদের বাড়ীতে যে ও একলা রয়েছে, এটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

স্ত্রীর এ-কথায় প্রতিবাদ করলেন স্বামী। 'তোমার যাওয়ার কথাই ওঠে না। জান ত ডাক্তার তোমায় বিশ্রাম নিতে বলেছেন'—

জানলায় কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেরীর বাবা। চারটে বাজেনি এখনো, এর মধ্যেই জানলা আধ-ভেজান করে খোলা হয়ে গেছে। সেই ঝড়-জলের পর থেকে আজ-কাল দিনের বেলাতে বাইরের আগুনের হলকা ক্রমশঃ কমছে। একটা সিগারেট ধরালেন আরাম করে। কিন্তু স্বামীর সিগারেট ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর অভিযোগের পাঁচালি সুরু হয়ে গেল।

'ওগো, দয়া করে এখানে নয়'—

অত আরামের ধরানো সিগারেটটা বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন স্বামী। শূন্য পেয়ালাটা এগিয়ে দিতেই গিন্নীর হাত থেকে সেটি নিয়ে নিল আগাথা। বললে—'আমি এক্ষুণি ও-বাড়ী গিয়ে খোঁজ করছি। মেরীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি বাড়ীতে।'

—'সার্কোনের বাড়ীর সেই ছেলেটাও নিশ্চয় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছে ওদের বাড়ী। এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। মঁজিদের ত কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। যাকে তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেই হল?'

—'মেরী আমাকে কথা দিয়েছে'—বললে আগাথা। 'কথা দিয়ে গিয়েছে যে, ও গিলসকে এড়িয়ে চলবে। একটি কথাও পারত পক্ষে কইবে না তার সঙ্গে।'

—'কথা কইবে না ত খুব বুঝলাম। কিন্তু চোখ ত আর বুঁজে থাকবে না গো! চোখাচোখি হতে বাধা নেই। চোখের ইসারায় হাজার রকম কথা বলা যায়। মেরীর জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। যখন ভাবি সে আমারই পেটের মেয়ে—'

—'কিন্তু আমি বলি কি জান?'

মেরীর বাবা পাড়লেন বটে কথাটা, কিন্তু শেষ না করে মাঝ-পথে থেমে গেলেন। উঠে গিয়ে আবার জানলার কাছে দাঁড়ালেন। অল্পক্ষণ চুপচাপ সময় কাটল ঘরের ভিতর। তার পর আবার মেরীর মা ধনুঃশর নিয়ে সুরু করলেন অনুযোগ বর্ষণ।

—'ঐ যে ডাক্তার সালোন। কেন যে ঐ হাতুড়ে গেঁয়ো ডাক্তারকেই সময়ে-অসময়ে ডাকি জানি না। যত বার ওর কাছে দেখাতে গেছি, মস্ত মস্ত কেতাব খুলে ডাক্তার অমনি পড়তে বসল। ডাক্তারীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। লোকটা একেবারে আকাট মুখ্যু!'

—'কিন্তু হাঁটতে গেলেই ঐ যে তোমার পা দুটো জগদ্দল বোঝা ঠেকে, তার ব্যবস্থা? অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে'—বললেন স্বামী—'এ সব ব্যাপারে ডাঃ সালোনের মত বিচক্ষণতা ঐ অল্পবয়সী ছোকরার কাছে আশা করাই অন্যায়।'

কুশন থেকে মুখ তুললেন মেরীর মা। অসুস্থ মুখটা বিসদৃশ লম্বা করে টেনে টেনে বললেন—'তাই বলে ঐ ফন্দিবাজ লোকটার দুয়োরে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকব—এই কথাই বলতে চাও না কি?'

—'এ বিষয়েতে'—বললেন মেরীর বাবা—'এ বিষয়েতে তোমার চেয়ে তার আগ্রহ বেশী নয়।'

—'কী বাজে বকছ তুমি? এই সব গল্প-কথা কোত্থেকে শুনলে বল ত?' 'কেন, আগাথার কাছ থেকে'—বলতে গিয়ে আত্মসম্বরণ করলেন স্বামী। আগাথা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে দেখে চুপ করে গেলেন তিনি। শুধু বললেন—'সারা সহরে সবার মুখেই ত ঐ কথা শোনা যাচ্ছে। খবর পেলাম Baluze কেনার পর আমাদের ভালমানুষ ডাক্তারটি ভবিষ্যতের প্ল্যান নিয়ে বসে আছেন। অনেক নামও শোনা যাচ্ছে। লোকে বলাবলি করছে, যদি জানতে পারি আমরাও নাকি চকচকিয়ে যাব···বোর্দোর বড় বড় ব্যবসাদাররাও নাকি এর মধ্যেই এখানকার ভূসম্পত্তির দিকে চোখ দিতে সুরু করেছে।'

—'তাতে তাদের যদি লাভ হয় তারা যা খুশী করুক।'

মেরীর মা যেন ভয়ঙ্কর মুষড়ে পড়লেন স্বামীর কথা শুনে। কিন্তু মুখে সে-ভাব গোপন করে বললেন—'যে সব জমি-জায়গা আমরা ঘেন্নায় ছোঁব না, ঐ সব পয়সাওলা হাঘরেগুলো তাই নিয়ে দেখবে মস্ত নাচানাচি করবে। যা পাবে তাই কামড়ে পড়ে থাকবে ওরা। তা থাক। করুক না ওরা খোঁজ-খবর—তারপর দেখা যাবে'খন। কিন্তু এখানকার মেয়ে-পুরুষ আমার মেয়ের কাণ্ড নিয়ে যা সব বলাবলি করছে, শুনে যে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে গো!' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কথাটা শেষ করলেন মেরীর মা।

স্বামি-স্ত্রীর ঘরোয়া কথাবার্তায় আগাথাও তার বক্তব্য পেশ করলে। বললে—'ও রকম মানুষদের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কি আশা করতে পারেন? টাকাই জপ-তপ ধ্যান নয়, এমন লোকও যে সংসারে আছে তা [illegible]। আপনারা

আর ওরা শুধু ত দু'ঘর নন। জাতই আলাদা। ওদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। বয়-কনে দু'জনের পক্ষে মেরী যে যথেষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে একথাটা ওদের বোঝাতে আমার মুখে ফেনা উঠে যাবে। 'আহা, যাদের অভাব লেগেই আছে সংসারে'—এমন ইডিয়েটের মত কথা বলে যে শুনলে গা জ্বলে যায়। হবে নাই বা কেন, ওদের ভাবনা-চিন্তা সব ঐ এক চরকিতেই পাক খাচ্ছে ত।'

—'এ সবের মধ্যেও কিছু সত্যি আছে বই কি'—চাপা গলায় বললেন মেরীর বাবা। তারপর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন—'সে কথা যাক, আমি যত দূর শুনলাম যে আহাম্মুকরা বালুজ বিক্রী করেছে তারা লাইব্রেরীটাকেও নাকি বেচে দিয়েছে। লাইব্রেরীতে সত্যিকার দামী বইপত্তর অনেক ছিল শুনেছি।'

—'আমি নিজে জানি'—বললে আগাথা—'কলেজে সবাই বলাবলি করত, লাইব্রেরীতে নাকি প্রভিন্সিয়ালের প্রথম সংস্করণের একখানা বই ছিল—তাতে মহামতি Arnould-এর নিজের হাতে নোট লেখা ছিল মার্জিনে।'

—'তা কি করে সম্ভব? তখন ত……' স্বামীর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিলেন মেরীর মা।

—'পাঁচটা অবধি অপেক্ষা না করে এখনই মঁজিদের ওখানে তোমার যাওয়া ভাল আগাথা। তাই যাও তুমি।'

—'তাই চল। আমি তোমাকে ক্লাব পর্যন্ত এগিয়ে দেব'খন' বললেন মেরীর বাবা।

—'তোমার যাবার দরকার নেই। তুমি দয়া করে আমার কাছে থাক। একলা এই ঘরে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না আমার। ঘণ্টা বাজালেও নীচে থেকে চাকর-বাকরদের সাড়া পাওয়া যায় না। তা ছাড়া তুমি ত সেখানে গিয়ে শুধু মদ গিলবে'—

তারপর যেন খুব ঔদার্য দেখাচ্ছেন, এমনি একটা ভাব নিয়ে বললেন—'যদি চাও এখানে বসেই যত খুশী সিগারেট খেতে পার। দরজা হাট করে খোলা থাকলে খুব অসুবিধা হবে না আমার।'

নিরুপায় হয়ে পা রাখবার টুলে ধপাস করে বসে পড়লেন স্বামী। তারপর অলস হাতে পকেট থেকে ক্যাপোরালের প্যাকেট বার করলেন। প্রথম দৃষ্টিপাতেই আগাথা বুঝতে পারলে মেরী তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। নিমন্ত্রিতদের যে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে টেনিস খেলা দেখছিল গিলস, তার থেকে বেশ ব্যবধান রেখেই এক টেরে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। উপস্থিত সব ক'টি মেয়ের মধ্যে তাকেই সবার আগে চোখে পড়ে, এমনি বৈশিষ্ট্যময়ী তার রূপ। মাজা-ঘষা সুপরিপাটি চেহারাটি তার। সর্বাঙ্গে একটা মদালসা ভাব। আজকের নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে মেদ-সর্বস্ব মাথায় ছোট মেয়েদের ফিতে কাঁটা আর প্রসাধন সম্ভারের জৌলুষের মধ্যে নিরলঙ্কৃতা মেরীকেই দেখাচ্ছে ছিমছাম দীর্ঘাঙ্গী। ক্ষীণ-কটি মেরীর নিতম্ব দুটি এখনো পরিপূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি বুঝি? এক মুঠি দুটি নরম উদ্ধত বুকের দিকে তাকালে দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়—মেয়েটির শরীরের আর সব অবয়ব ভুল হয়ে যায়।

বাগানের আর এক প্রান্তে খাবার-দাবারের আয়োজনের কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে গিলস। হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে অধৈর্যের ভাব। চুলে জবজবে করে ব্রিলিয়ান্টাইন ঢেলে এসেছে গিলস, তবু মাথার চুল তার মোরগের ঝুঁটির মত খাড়া হয়েই আছে। চোস্ত কলার গলায় ফাঁস লেগে সারা মুখে যেন আগুন ঢেলে দিয়েছে। ছেলেদের মধ্যে গিলসকেও একটু অন্য রকম লাগছে। তার বয়সী ছেলেরা ত এর মধ্যেই শরীরে মেদের সঞ্চয় সুরু করেছে। ঘাড়ে-গর্দানে পায়ে-হাতে এরা সবাই যেন এক রকম দেখতে। মনে পড়ল আগাথার—এই জন্যেই নিকোলাস একদিন বলেছিল, গিলসের শরীরে একটা পবিত্র আভা আছে অনেকটা দেবদূতের মত। সে-কথার সার্থকতা আজ যেন উপলব্ধি করল আগাথা।

সালোনদের ছেলেটাকে দেখে এখন আর রাগে গা জ্বালা করে না তার। ঈর্ষাও হয় না। মাদাম মঁজিকে ঘিরে মহিলাদের যে ছোট একটি জটলা সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের কয়েক জনের সঙ্গে অল্প কথায় আলাপ করলে আগাথা। কিন্তু কেউই তাকে বসতে অনুরোধ করলে না। কোন এক ঘরের আদরিণী মেয়ে বটে সে, কিন্তু এখানে ত সে গভর্ণেস হিসেবে এসেছে। তাকে সামাজিক সমাদর না করলেও যেন চলে।

যেতে যেতে আগাথার কানে এল, কে যেন তার সম্বন্ধে মন্তব্য করে বললে—'মেয়েটার ভেতরে ভেতরে কি হচ্ছে কে জানে? ওর রকম-সকম আজ-কাল সব বদলে গেছে। কেমন যেন পুরুষ-ঢলানি ভাব।'

—'ও সবের নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা। ও মেয়ে ডুবে ডুবে'—

—'ওরে বাবা, হাওয়ার মুখে খবর ছোটে—ও-সব কি আর চাপা থাকে? কাণাঘুষো আমিও শুনেছি।'

তার পিছনে একটা হাসির রোল উঠল মেয়েদের ভিড়ে। ইতস্ততঃ ছড়ানো নানা দলের মধ্য দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে গেল আগাথা। একটু পাক খেয়ে শেষে খাবারের আয়োজনের পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই গিলস এগিয়ে এল। সাগ্রহে বলল—'কেমন আছেন?'

কোন রকমে সাড়া দিল আগাথা। দু'-একটি টুকিটাকি কথা সেরে নিয়েই ফেরার পথ ধরল সে। তবে একেবারে মুখ ফেরাবার আগে গিলসকে শুনিয়ে দিয়ে এল—'আজ রাত নটার সময় বীথির ধারে থাকব। নিকোলাসকে বলবেন। মেরীও আপনার জন্যে চাতালে অপেক্ষা করবে।'

গিলস তার কথা বুঝতে পারলেও মনে মনে আশঙ্কা করলে আগাথা। অথচ আর বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হল না, পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে। হয়ত এতেই বেশী দেরী হয়ে গিয়ে থাকবে।

মেরীর কাছে গিয়ে বললে আগাথা—'এবার বাড়ী চল।'

আরও দু'-চার মিনিট থাকার জন্যে মেয়েটা মিনতি করতে লাগল। আগাথা তাকে অস্ফুট গলায় আশ্বাস দিয়ে বললে—'ভয় কি মেরী, আজ সন্ধ্যাবেলাতেই দেখা হবে'খন তার সঙ্গে।'

'সত্যি'—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে মেরী।

চিত্তচাঞ্চল্যে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে নব-অনুরাগিণীর। গভর্ণেসের বাহুলগ্না হয়ে সে যেন বিশ্রাম নিতে লাগল। সোহাগের গদগদ স্বরে গুন্ গুন্ করে বললে আগাথা—'দুষ্টু মেয়ে। আমার বোকা মেয়ে।'

—'কি ভালো মেয়ে তুমি গো—তোমায় খুব ভালবাসি আমি'—বললে মেরী।

—'ওর দিকে আর তাকিও না, চল আমরা নিরিবিলি সরে যাই।'

তাদের অপস্রয়মান ছায়া দুটির দিকে চেয়ে মঁজি গিন্নী বললেন—'চপল মেয়েটাকে টেনে নিয়ে। যাক গে।'

১১

ক্ষীয়মান শশিকলাও এত আলোর সুধা ঢালতে পারে, আশ্চর্য! কেউ যাতে না দেখতে পায় এমনি ভাবে আত্মগোপন করে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগল আগাথা। এক পাশে পাথরের স্তূপ, আর এক পাশে নালা—তার মাঝ দিয়ে পা টিপে টিপে সাবধানে এগুতে লাগল সে। অভিসারিণীর মনে উৎকণ্ঠার অবধি নেই। নিকোলাস নিশ্চয়ই নগরের উপান্তে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। কিংবা হয়ত গিলস ধরতেই পারেনি তার ইংগিতের মর্মার্থ। হয়ত খবরটা বিকৃত করে পৌঁছেচে তার কাছে। রাস্তাটা যেখানে লেরোকে ছুঁয়ে গেছে সেই পর্যন্ত যাবে সে। জলার ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে। আশে-পাশে কোথাও সুর তুলেছে ব্যাঙেরা। ঠিক তার মাথার উপরই একটা পেঁচা ডেকে উঠল কর্কশ কণ্ঠে। হঠাৎ নিকোলাসের মূর্তি নজরে এল আগাথার। ছায়ার আঁধারে উঁচু আলসের উপর বসে আছে সে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল নিকোলাস। আগাথা সোজা তার কাছে এগিয়ে যেতেই বললে—'বস। এখানে রাস্তা থেকে তোমায় চোখে পড়বে না।'

কত আশা করে অপেক্ষা করতে লাগল আগাথা, কিন্তু নিকোলাস আদর করে কাছে নিল না তাকে। মুগ্ধা নারীকে এমন নির্জনে পেয়েও তার অধর-সুধায় লোভ করলে না পুরুষ।

—'ওরা দুটিতে এক হয়েছে? কোন বিপদের ঝক্কি নেই ত?'

—'কিসের বিপদ?' রসহীন গলায় প্রতিপ্রশ্ন করল আগাথা। 'মেরীর মা অসুস্থ। আর ধরাই পড়ে যদি, সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। তখন বাপ-মা হয়ত ওদের দু'হাত এক করে দিতে বাধ্য হবেন।'

তবু নিকোলাস কিছু বললে না। ও বুঝি ঐ পাথরের মতই হৃদয়হীন? ঐ যে বিরাট মহৎ দেওদার মৃত্তিকার অন্তর্লোক দিয়ে সহস্র শিকড় স্রোতস্বতীর জল অবধি পাঠিয়ে দিয়ে আকাশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিকোলাস কি ঐ বনস্পতির মতই? ভাবলে আগাথা। তারপর বললে—'অবশ্য সে রকম কিছু ঘটলে সেখানে আমায় চাকুরীটি খোয়াতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেতে হলে আগে হোক পরে হোক, এ চাকুরী আমায় একদিন ছাড়তেই হবে।'

আচম্বিত নাড়া খেয়ে জেগে উঠল যেন নিকোলাস।

—'না আগাথা না। অমন কথা মনেও স্থান দিও না। চাকরী হারানো চলবে না কোন মতেই। কিছুই ত পাকাপাকি হয়নি। এ সম্বন্ধে মাকে এখনো একটি কথাও বলা হয়নি আমার।'

—'কেন বলনি? আর কিসের অপেক্ষায় দেরী করছ বল ত?' প্রশ্ন করল আগাথা। প্রাথমিক ব্যবস্থা করছে, এই ধরণের কি যেন বললে নিকোলাস তোতলাতে তোতলাতে। চারি দিকের আঁটঘাট বেঁধে খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে ত।

—'মায়ের সম্মতি আদায়ের ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। তাঁকে রাজী করানোর উপায় জানি আমি। তাঁর মন পেতে বেশী সময় লাগবে না আমার।'

নিজের উপর কী অবিচল আস্থা আগাথার! কেমন তীরের মত সোজা এগিয়ে যাচ্ছে সে লক্ষ্যের দিকে। কেমন একটা উৎকণ্ঠিত আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠল নিকোলাস। ওর ভরসা ছিল মায়ের মত পেতেই দীর্ঘ দিন লাগবে। হয়ত মায়ের মৃত্যু-দিন অবধি অপেক্ষা করতে হবে তাদের। এই রকম একটা আশা ছিল তার মনের অগোচরে। এ প্রস্তাবে মা যে না বলবেনই, সে-সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল সে। আর এই একগুঁয়ে মেয়েটা অপার আত্মবিশ্বাসে তার সমস্ত ভাবনা-বাসনাকে তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

—'আমার মাকে তুমি চেন না।'

—'কিন্তু আমাকে ত জান তুমি?' বললে আগাথা—'আমি যখন কোন বিষয়ে মন স্থির করে ফেলি—'

একটা কপট ঔদাসীন্যের ভাব মুখে এনে প্রশ্ন করলে নিকোলাস —'মাকে কি বলবে তুমি?'

—'সেটা আমার ব্যাপার—গোপনীয়। দেখবে তুমি আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে মা তোমাকে বিয়ের দিন ঠিক করতে তাগাদা দেবেন। বলেন কি না দেখে নিও।'

শুনে নিকোলাস শিউরে উঠল। হয়ত আগাথা মস্ত দম্ভ দেখাচ্ছে তাকে। কে জানে, হয়ত এই ভাবে তাকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করছে মেয়েটা।

সেই নিবিড় নির্জনতায় ক'টি মুহূর্ত নীরবতায় নীথর হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত নিকোলাস বললে—'বিয়ের দিন ঠিক করার কথাই ওঠে না। তা কি করে সম্ভব? আমাদের সংসার পাতার মত যথেষ্ট টাকা যত দিন না জমাতে পারছি তত দিন ত অপেক্ষা করতেই হবে।'

যাক তবু 'আমাদের' কথাটা উচ্চারণ করেছে পুরুষ। এই কথাটুকুর জন্যে নিজেকে কম ভাগ্যবতী ভাবলে না আগাথা। বললে—'কিন্তু আমিও ত কাজ করব। আমার জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না তোমাকে। কারুরই করতে হয়নি কোন-দিন। আমি প্যারিসে চাকরীর চেষ্টা করছি—দু'-একটা সুযোগও পেয়েছি। তাছাড়া'—নিবিড় অনুরাগের সঙ্গে বললে আগাথা—'একটি ঘর হলেই চলে যাবে আমাদের। দিনে একবেলা কোন সস্তা হোটেলে খাওয়া হলেই যথেষ্ট। ও আমার অভ্যাস আছে। স্পিরিট-ল্যাম্পে রাঙাআলু রান্না করতেও জানি আমি। একবার সারা শীতকাল সিদ্ধ রাঙাআলু খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম আমি।'

এই পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে বিশাল বনস্পতির পটভূমিকায় একটি মুগ্ধ রমণীর রমণীয় কণ্ঠে এই গভীর বেদনা-মধুর কাহিনী নিকোলাসের প্রাণের তন্ত্রীতে সকরুণ ঘা দিয়ে দিয়ে আর্তনাদ তুলতে লাগল। মানবজীবনের সরল অনাড়ম্বর মহিমাকে

মনের বেদীতে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য আরাধনা করে নিকোলাসের নিভৃত সত্তা। দারিদ্র্যের প্রতি বিমুগ্ধ মমতা তার। কিন্তু সে দারিদ্র্য হবে মহান সৌন্দর্যে শোভন। কল্পনা করতে ভাল লাগে—সে যেন একটি দৈবী-সুরে বাঁধা সংসারের কেন্দ্রে বসে আছে—যেখানে প্রাত্যহিকতার সব তুচ্ছতাই অন্তহীন কালের জ্যোতির্ময় আলোয় ভাস্বর। প্রতিদিনের অন্ন-ব্যঞ্জন, ডিসে সাজান ফলমূল নিঃশব্দ বিলম্বিত একত্র ভোজন—এসব তার কাছে ধর্মের মহিমায় মহিমান্বিত। আর এই সব স্পিরিট-ল্যাম্প আর ফিরে গরমকরা রাঙাআলুর গন্ধ। লুব্ধ দাম্পত্য-সুখের বিনিময়ে এই আদর্শ-হীন ধর্মহীন স্থূল গৃহস্থালীর বিরস দারিদ্র্য নিকোলাসের মনকে গভীর বিতৃষ্ণায় ডুবিয়ে দিলে।

নিরুত্তর রইল আগাথা। তার আর নিকোলাসের মধ্যে যে ভয়াল নিস্তব্ধতার প্রাচীর রচনা করে ফেলেছে সে, তা যেন তার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে নির্বাপিত করে দিল। কুণ্ঠিত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিল আগাথা। নিকোলাস সরিয়ে নিল না নিজের হাত। দুর্বোধ পুরুষের হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিল নারী। আগাথার কম্পিত করতল যেন কোন্ দুর্বল প্রাণীর বিষ-নখরে থর থর মৃত্যুভয়। আগাথার হাতের চাপ স্পষ্ট অনুভব করতে পারলে নিকোলাস। তবু নিজেকে গুটিয়ে নিল না সে। তার কাঁধে মাথা রেখে এলিয়ে বসে রইল আগাথা। খুলে ফেলে দিলে মাথার হাল্কা টুপি। বনস্পতির গুঁড়ির মত অনড় হয়ে বিপুল আশ্রয় দিল নিকোলাস। বললে আগাথা—'আমি তোমার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতে চাই।' সত্যিই কি সে সাহস করবে মেয়েটা? অবাক হল নিকোলাস সাহসিনীর ভঙ্গিমায়। তার শার্টের ভিতর দিয়ে বুকে হাত রাখল আগাথা। হঠাৎ নিকোলাস যেন তার অনাবৃত শরীরে অনুভব করল একটা প্রাণীর নখপীড়ন। বললে আগাথা—'কই পাচ্ছি না ত তোমার বুকের সাড়া?' ঐ শিলাভূত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন না জানি কেমন? ছোট ছোট দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ে আগাথার। এবার সে কি বলবে যেন বুঝতে পারে নিকোলাস।

আগাথা বলে—'আমায় একটি বার চুমু খাও। আমায় এ পর্যন্ত তুমি কখনো চুমু খাও নি।'

অধীর আগ্রহে নিজের মুখখানি নিকোলাসের মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে এল আগাথা

—'না আগাথা'—বললে নিকোলাস—'না না। তোমার চোখ—তোমার ঐ দুটি চোখ আমার বড়ো ভাল লাগে।'

নিকোলাস যেন বলতে চায়, ঐ চোখ দুটি, তোমার ঐ চোখ দুটিতে শুধু অধর স্পর্শ করতে পারি—তাতে আমার বিমীষা হবে না। নিকোলাসের কথা শুনে আগাথার সারা দেহে সুখের রোমাঞ্চ হল।

দৃশ্য পরিবর্তনে দেখা গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে দুবার্ণের বাড়ীর চাতালে অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ উঠল। এত লঘু সে-শব্দ যে দিগন্তে হেলে-পড়া ক্ষীণ শশিকলারও ভ্রম হল—সে বুঝি ঘুমন্ত পৃথিবীতে হাওয়া-কাঁপা পাতার খসখসানি।

—'কি করছ প্রেমি—না, মা—'

বলছে মেরী—'তুমি আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলবে।…মা গো, হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে।'

তেমনি মর্মরিত সুরে ঘন শ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে বললে,—'ওগো আমি যে দম নিতে পারছি না—একটু ছাড়ো।'

চুমুতে যে সময় ভুল হয়ে যায়, জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল তার। কোন মতে নিঃশ্বাস নিয়ে বললে—'এ রকম চুরি করে আর ভাল লাগে না। মন ভরে তোমায় যদি পেতাম আরো কত সুখ পেতাম না জানি।'

'না না'—প্রতিবাদ করলে গিল্স—'না, না।'

পৃথিবীর প্রেমের যাদুতে সম্মোহিত হয়ে মস্ত টিউলিপ গাছের শিওরে চাঁদ বিমুগ্ধ শিশুর মত স্থির হয়ে রইল। প্রথম যৌবনের পূর্ণ নিবেদন নিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোরী। আর পুরুষ? স্বভাব সম্ভোগী পুরুষ সংযমের বাঁধ সতর্ক হাতে পাহারা দিচ্ছে। ঐ দুটি কোমল অবদ্ধ ওষ্ঠাধরে যে মধু, সেই মধুপান ভিন্ন নারীদেহের আর কোন রহস্য জানার চেষ্টায় ব্যাকুল আগ্রহ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে সে নিজেকে। বাহু বেষ্টনে নব কিশোরীর স্পন্দিত গ্রীবা জড়িয়ে সে যেন নিজের বিহ্বল আবেগকে বৃত্তায়িত করে রেখেছে।

—'তোমরা দুটিতে কি পাগল হয়ে গেছ? জান এখন রাত ক'টা?'

কখন চাঁদ অদৃশ্য হয়েছে আকাশ পট থেকে। চাতালের প্রাচীর গাত্রে আগাথার অস্পষ্ট ছায়া কাঁপছে। অপার মিলনের আনন্দে বিচ্ছেদের ব্যবধান ঘটল।

—'কাল—কাল নিশ্চয় দেখা হবে'—কম্পিত অনুরাগের সঙ্গে বলল গিল্স্—'কোথায় আমি বুঝতে চাই না। দেখা হওয়া চাই-ই। তোমাকে এমনি করে বুকে না নিয়ে একটি দিনও কাটাতে চাইনে আমি।'

—'কাল দেখা হবে'—বার বার বললে মেরী—'কাল,—ওগো আবার কাল।' যত দিন বেঁচে থাকবে দেখা হবে। শুধু কাল নয়। জীবনের প্রতিটি আগামী কাল।

পায়ে-চলা পথের দু'ধারে যে উইলোর ঘন বসতি তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল গিল্স্। আর পাড়া পথে আগাথা এসে চাতালে পৌঁছল।

—'মা যেন ঘুমিয়ে থাকেন এই প্রার্থনা করি।'

—'কোন ভয় নেই। তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।'

আগাথার ঘরে এসে ঢুকল মেরী। যেমন জ্বেলে রেখেছিল তেমনি জ্বলছে বাতি। একবার মেরীর দিকে তাকালে আগাথা। দেখলে মেরীর অসম্বৃত ব্লাউজ, স্ফীত অধর, অবিন্যস্ত কেশের নীচে দুরবগাহ স্বপ্নিল চাউনি। হয়ত তিরস্কারের ভয়ে, হয়ত সোহাগ পেতে কিশোরী অনুরাগিণী আগাথার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে এল তার বাহু। বললে—'তুমি কাঁদছ মাদাম! কাঁদছ কেন? তবে কি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি, বল না মাদাম! এ কি তোমার সুখের কান্না, না তৃপ্তির অশ্রুধারা?'

সে কথায় কোন উত্তর দিল না আগাথা। সে যে এই কচি মেয়েটাকে ঈর্ষা করে তা নয়। কামনার জোয়ার কখন নেমে

গেছে। জীবনের বেলাভূমিতে পড়ে রইল শুধু আনন্দহীন আকুতি। আশার কোন চিহ্নই রইল না। চোখের জল মুছল না আগাথা। কে দেখতে পেলে তার কান্না, তার হিসেব রাখার প্রয়োজন রইল না আর।

১২

চাঁদের ভাঙা টুকরোটি পরের দিন সন্ধ্যাবেলাতেও টিউলিপ শাখার অন্তরালে উঁকি দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু নৃত্যপরা পাতার মর্মরধ্বনির সঙ্গে আজ আর কোন মিলন-মধুর লঘু শ্বাসের হাল্কা ধ্বনি তার কানে গেল না। পায়ে-দলা ঘাসের আস্তীর্ণ শয্যায় আজ আর বিমুগ্ধ দুটি অভিসারীর দেখা মিলল না। কোথাও কিছু অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়ই ভাবলে চাঁদ। সেই আচম্বিত বিপদের কথাই নিকোলাসের ঘরে বসে দুই বন্ধুকে বিশদ করে বিবৃত করছিল আগাথা। সেই দিন ভোরে মেরীর মায়ের এমন সাংঘাতিক ব্যথা ধরেছিল যে, বাধ্য হয়ে ছোকরা ডাক্তারকে খবর দিতে হয়েছিল। রোগের গুরুত্ব বুঝে সে আবার গিলসের বাবাকে ডাকিয়ে আনতে উপদেশ দিলে। আসল রোগিণীর মতামত নেবার কোন প্রয়োজন বোধ করলে না কেউ। গিলসের বাবা ডাক্তার সালোন মেরীর মাকে সোজা বোর্নমোথে পাঠাবার উপদেশ দিলেন। সেই মত কাজও হল। ডাক্তারের মতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। আরো অনেক আগেই তাকে পাঠানো উচিত ছিল। বাবার সঙ্গে মেরীও বাড়ী ছেড়ে গেছে।

মেরীর বাবা কত অনুরোধ করলেন, মিনতি করলেন কিন্তু কে কার কথা শোনে! যাবার বেলা মেরীর মা তাকেই বলে গেছেন দুটো দিন এ বাড়ীতে থাকতে। জিনিষপত্র অগোছাল পড়ে রইল। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাকেই। এমন করে বলে গেলেন যেন আর বাড়ীতে ফিরবেন না কোন দিন এমনি একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গেছে মনে মনে। কি জানি হয়ত বা আসন্ন মৃত্যুর ইসারা পেয়েছেন মানুষটি। আহা, অমন শান্ত মনে বড়ো কেউ মৃত্যুর মুখোমুখী হতে পারে না।

. গিলসের সেই বিশিষ্ট চেয়ারটিতে মস্ত মহিমা নিয়ে বসে আছে আগাথা। যেন নিজের ঘরে রাজরাণীর মত শোভা ছড়িয়ে বসেছে। নিকোলাসের সঙ্গে আর তার কোন বাঁধন নেই। নিকোলাসের প্রাণের জগত থেকে সে স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা। আর তার জন্যে নিকোলাসেরও মনের কোন তারে কোথাও বেসুরা কিছু বাজছে না।

—'মেরীর মায়ের কথা ভাবছি আমি। তার আত্মার সদ্গতি :—'

—'মেরীর মা? সে বিষয়ে কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই। ভগবানের সঙ্গে তাঁর সব সম্বন্ধের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তিনি। নিজের জীবনের সব কিছু, এমন কি যে কটি বড়ো বড়ো দান-ধ্যানের কাজ তিনি করেছেন, যার খবর ত্রিভুবনে দু'জন ভিন্ন আর সকলের অগোচর—মানে তিনি আর তাঁর ভগবান শুধু জানেন—সে সব তিনি ভগবানের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তবে মৃত্যুর পর যদি দেখেন যে, [illegible] তার নয়। ওদের ধর্মাধর্মের মাপকাটি আমাদের বুদ্ধিতে কূল পায় না।'

'যাই বল, মেরীর মায়ের আত্মাও ত অবিনশ্বর'—বললে নিকোলাস অস্ফুট কণ্ঠে। 'ভাবলে সত্যি আশ্চর্য লাগে।'

'বাবা বলছিলেন'—গিলস্ বললে—'বাবা বলছিলেন, যে ওর মার রোগ, বাবার যা সন্দেহ তা যদি সত্যি হয়, তবে ওর মার আর সেরে ওঠবার আশা খুব কম। তবে কটা দিন এখনও টানতে পারে হয়ত। তবে যাই হোক'—মনের গোপন পুলক লুকালে না গিলস, বললে—'যাই হোক, নিয়তি আমাদের পক্ষেই দান ফেলেছে। এবার থেকে আনন্দেই কাটবে আমাদের সময়।'

তার কথা শুনে আগাথা মনে মনে ভাবলে যে, গিলস যেন বলতে চায় যে, তাদের প্রেমাভিসারে আগাথার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

'তা নয় আবার'—কথায় ঝাঁঝ মিশিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললে আগাথা—'ভাগ্যদেবী তোমার ওপর প্রসন্ন হচ্ছেন বৈ কি। হচ্ছেন না আবার? একটা বাধা তোমার সরে যাচ্ছে। এখন অন্তরায় বলতে শুধু রইলাম আমি।'

এই মুখরা মেয়েটির কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেল গিলস। বললে—'তোমার কি অধিকার আছে শুনি, যে—'

উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে হাতব্যাগটা তুলে নিলে আগাথা। কটু কণ্ঠে জবাব দিলে—'আমার অধিকার কতখানি সেইটাই জানতে পারবে শীগ্‌গির। সেটা জানতে দামও দিতে হবে তোমাকে।'

হাত নেড়ে আগাথাকে নিবারণ করলে নিকোলাস।

'কি বলছ তুমি, আমি ত কিছুই বুঝছি না। সব ব্যবস্থাই ত পাকাপাকি হয়ে গেছে। এখন আবার এ সব কি কথা উঠছে?'

নিকোলাসের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আজ আর চোখ নামালে না আগাথা। কতক্ষণ নিষ্পলক চোখে সোজা চেয়ে রইল তার দিকে। বললে—'যাই হোক, কথা পাকা ত?'

নিকোলাস মাথা নেড়ে সায় দিতেই আগাথা তাকে কাছে টেনে নিলে। যেমন তেমন করে তাকে জড়িয়ে নিয়ে আদর করতে লাগল। জানলার ধারে গিয়ে একলা দাঁড়িয়ে ছিল গিলস। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে দু'চোখের আনন্দাশ্রু মুছে নিলে আগাথা।

—'তোমার কথায় আমি কোন দিন সন্দেহ করি নি। কিন্তু এখন আমি যাই। তোমার মা আমার পথ চেয়ে আছেন। বলে এসেছি যে, খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে যাব। আমার মুখে মেরীদের সব খবর শোনবার জন্যে তিনি এতক্ষণ ব্যাকুল হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আজ আমি তাঁকে আমাদের দু'জনের কথা সব খুলে বলব।'

'আজ কেন? এর মধ্যেই কেন আগাথা?'

যেন একটা আচম্বিত ধাক্কায় আর্তনাদ করে উঠল নিকোলাস। কিন্তু আগাথাকে আজ যেন অবুঝ একগুঁয়েমিতে পেয়েছে। কোন কথাই সে শুনতে নারাজ। আর অপেক্ষা করার কি কারণ থাকতে পারে? হাতে সময়ও বড়ো অল্প। বোর্নমোথে গিয়ে মেরীদের [illegible]

আছেন। তাকে যে কথা দিয়ে রেখেছে আগাথা যে দু'দিন পরেই সে আসছে তার কাছে। নার্সিংহোমে তাকে রাত দিন থাকতেই হবে। আগাথাকে ছেড়ে সে মানুষটি একটি মুহূর্তও থাকতে পারে না।

'কি বলবে তুমি মাকে ?' মনের ভয় গোপন করতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীন কণ্ঠে বললে নিকোলাস।

'সে তোমায় আমি বলব না। সন্ধ্যাবেলা মার কাছে গিয়ে সব শুনতে পাবে। তার জন্যে তুলে রাখলাম—বুঝলে ?'

নাকের ডগায় একটু কুঞ্চন দেখা দিল আগাথার। অধরোষ্ঠের ফাঁকে স্মিত হাসি বিকশিত হতেই বড় বড় দাঁত দুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

'তুমি আমার বাগ্‌দত্তা বধূ, সে কথা বলতে তোমার লজ্জা করবে ?'

এতক্ষণে সংশয়ের অকূল পেরিয়ে নিশ্চিন্ত কূলের আশ্বাস পেলে আগাথা।

একটা দুষ্ট হাসি হাসলে আগাথা।

বললে—'সে আমার গোপন কথা। সে কথা আমি বলি ?'

মনে কোন সংশয়-দ্বিধা নেই। বিজয়িনীর হাসি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আগাথা।

'নীচে চললাম তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাত ন'টায় আবার দেখা হবে, জানো ? ঠিক রাত ন'টায়—'

আগাথা ঘর থেকে বিদায় নিতেই গিলসের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। রাগে ফেটে পড়ল যেন সে। বললে—'নোংরা মেয়ে মানুষ—কোথাকার একটা রাস্তার—'

তার মুখে হাত চাপা দিলে নিকোলাস। বললে—'ভুল করো না গিলস। আগাথাকে তুমি একদম ভুল বুঝেছ !' তারপর কোমল নিষ্প্রভ গলায় বললে—'ও মেয়ে সত্যি যে কি, তা বুঝতে একটা পুরো জীবনের আয়ু ত আমার হাতে রইল—ভয় কি ?'

'তুমি ওকে ভয় করো। রীতিমত ভয় করো, আমি বলছি। যতই কথা চাপা দাও সত্যিটা আমি বেশ ধরতে পেরেছি নিকোলাস।'

নিজের মনের কথা অমন করে প্রকাশ করার কোন ইচ্ছা ছিল না নিকোলাসের। তবে কথা যখন দিয়েই ফেলেছিল আগাথাকে, কোন ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যে দেয়নি, একথা তার মত এমন নিশ্চিত করে আর কে জানবে ? গিলসের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল জানালার ধারে। কনুয়ে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল পরম ঔদাস্যের সঙ্গে।

এ বছর সোয়ালোদের দেশান্তরী হবার তোড়জোড় চলছে সকাল সকাল। লেবু-গাছের ডালে ডালে তাদের জটলা বেড়েই চলেছে দিনে দিনে। যেন কী একটা অদৃশ্য লোভনীয় বস্তুকে ঘিরে তাদের অবিশ্রান্ত কলহ কচ-কচানির বিরাম নেই।

তার ক্ষোভ হল মেরীকে আজও নিজের বলে পায়নি গিলস। আজও আগাথা তার পথের কাঁটা হয়ে আছে। মিথ্যে ভয় দেখানোর মেয়েমানুষ নয় আগাথা, সে কথা খুব ভাল ভাবেই জানে গিলস। তাকে তাড়িছলা দেখিয়ে মস্ত বোকামীর কাজ তার। মধুলোভী মাছিটাকে জালে আটকে ফেলতেই হবে, পথের কণ্টক তুলতেই হবে। ঐ মেয়েমানুষটার লুব্ধ কামনার আগুন থেকে শেষ অবধি বন্ধুকে সে নিষ্কৃতি পাইয়ে দেবে। জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ারে সশব্দে বসে পড়ল গিলস। দেখলে একখানা বই খুলে বসে আছে নিকোলাস। পড়ছে বলে মনে হল না। নীচ থেকে আগাথার কলকণ্ঠ হাসির শব্দ ভেসে আসছে। তার মাঝে মাঝে একটা পুরুষালী গলার সাড়া পাচ্ছে নিকোলাস। বয়সের ভারে আজ-কাল মায়ের গলা ভারী হয়ে এসেছে।

কাকলী-মুখর সোয়ালো পাখীদের বিরতিহীন পাক খাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল নিকোলাস, কিন্তু দৃষ্টি ছিল তার অন্য দিকে। তাকিয়ে দেখছিল সে পড়ন্ত বিকেলের এক ঝলক রোদে এক-ঝাঁক মাছি অকারণে গুঞ্জন করে ফিরছে। সূর্যালোকিত এক একটি চঞ্চল প্রাণবিন্দুর মত, তার দৃশ্যমান জগত আবর্তেও এই সব ছুবার্ণে, ক্যামব্র‍্যা, প্লাসাক, সালোন আর মক্ষি পরিবারদের উদ্দীপিত পরিক্রমা চলেছে। প্রাণজগতের সর্বনিম্ন স্তর থেকে মনুষ্য-সমাজ অবধি। ভাবলে নিকোলাস, সেই এক সুর, এক সাড়া এক ঐক্যতান। এই সব সময় প্রাণের গভীর অন্তস্তলে এক প্রচণ্ড অনুভূতির প্লাবন তার দোসর হারা নিঃসঙ্গতায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বলে বোঝাতে পারে না সে, কেন এমন ধারা হয় তার। মনের অপার রহস্যলোকে আত্মমগ্ন হয়ে যায় নিকোলাস। যখন সম্বিৎ ফেরে, দেখে প্রার্থনার ভঙ্গীতে করজোড়ে জানু পেতে বসে আছে সে।

কিন্তু এখন তা হ'ল না। তার ঘরের জানলার সামনে আকাশের উদার মহিমাকে দেহরেখায় কলঙ্কিত করে যে বসে আছে, সে তার মিত্র নয়। কেন না তার ভগবানকে আড়াল করে আছে সেই লোক।

'গিলস ?'

বন্ধুর সাড়া পেতেই গিলস মুখ ফিরিয়ে বসল। তার রসহীন মুখে ঈশানের মেঘের ভ্রূকুটি দেখলে নিকোলাস।

'একটা সিগারেট ছুঁড়ে দাও ত।' বললে নিকোলাস—'আবার আমি সিগারেট ধরব। দেখি না কি হয় শেষ অবধি।'

—'প্যাকেটটাই থাক তোমার কাছে।' বলে বিদায় নিলে গিলস। তাদের দীর্ঘবন্ধুত্বের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল যে, পরদিন দেখার কোন সময় ঠিক না করেই আজ চলে গেল সে।

কী একটা আশঙ্কায় নীচে নামতে সাহস হল না নিকোলাসের; ভয় হল, যদি যায়, আচমকা সে গিয়ে পড়বে মা আর আগাথার মধ্যে। ঘরের মেঝেতে এখনো অবাধ দুটি বিপরীত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে নিকোলাস। মায়ের থর থর পুরুষালী কণ্ঠের জবাবে আগাথার সেই মধুস্রাবী উচ্চহাস! এ হাসি ওর মুখের পোষাকী হাসি—আটপৌরে জীবনে কোন দিন এমন করে হাসে না আগাথা। আজ কতক্ষণ ধরে মায়ের কাছে বসে আছে আগাথা ভেবে অবাক হল নিকোলাস। কি জানি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ে মানুষের মধ্যে তাকে নিয়ে কি স্থির হল।

সে কে ?

আপন চেতনার একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নলোক রচনা করে তার মধ্যে সঙ্গিহীন বাস করার অভ্যাস করছিল সে। দিনে দিনে সে আচ্ছন্নতাকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আপন খেলাঘরের মধ্যে আত্মমগ্ন তার মন এত দিন শুধু নিষ্ফল আরাম খুঁজেছে। কোথাও গিয়ে তার পরিত্রাণ নেই। তার সেই মাটির নকল গড়ে সংসারী জীবনের হানা দুর্বার হয়ে উঠছে। শত্রুপক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে দুর্গপ্রাচীরের খুব কাছেই। দরজায় কার করাঘাত শুনে চমকে উঠল নিকোলাস।

'আমি ভেতরে যাব না।' দ্বারান্তরাল থেকে বললে আগাথা—'বলছি যে—'

দরজা খুলে তার সামনে এসে দাঁড়াল নিকোলাস। মিনতির সুরে বললে—'ঘরে এসো আগাথা—'

স্মিত মুখে মাথা নাড়লে দ্বারবর্তিনী।

'এখন যাব না। সত্যি যাব না এখন। বলছি যে আজ সন্ধ্যায় বীথিপথে আমার অপেক্ষায় থাকবার দরকার নেই তোমার। আমি বরং এখানেই আসব। এই বাগানে বসেই গল্প করব দু'জনে। তোমার মা রাজী হয়েছেন জানো?'

কথা শেষ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল আগাথা। হয়ত বা নিকোলাসের প্রতিপ্রশ্ন এড়াবার জন্যেই মুখ ফিরিয়ে বিদায় নিলে। হয়ত বা প্রেমাস্পদের চোখের সেই আর্ত চাউনি দেখতে চায় না রমণী, যা দেখে তার মন ভয়ে কাঁপে।

১৩

মায়ের মুখোমুখী হয়ে বসেছিল নিকোলাস।

—'সন্ধ্যে হয়ে এল। আলোগুলো জেলে দে না বাবা!'

মাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলে না নিকোলাস। সোজা প্রশ্ন করলে মা যে মেয়েলী চাতুরীতে এড়িয়ে যাবেন, তা ভাল করেই জানে সে। মা যখন মুখ খুলেছেন, কথার প্রবাহে বাঁধ দেবে না সে। আপনিই আপনাকে উন্মুক্ত করবেন তিনি।

'আহা, কী মন্দ ভাগ্যি ও বাড়ীর গিন্নীর! লোকে বলত বটে যে দুবার্গে-গিন্নীর বড় দেমাক। তা হবে নাই বা কেন? অমন পুরোনো বনেদী ঘরের বৌ, অত জমি-জায়গা জমিদারী। ও রকম বড়ো ঘরের বৌ হয়ে গেলে আমারই কি কম দেমাক হত? বেশী বৈ ত কম হত না। গিন্নী সম্বন্ধে সবাই যে কিছু কেঁদে ভাসিয়ে দেবে তা অবশ্য নয়। আগাথা সে সব কথা তোকে কিছু বলেনি রে নিকোলাস? গিন্নী যখন মরবেই তখন কটা দিন সবুর করতে লোকের কি হয়? মরার আগেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা? কি জানি হয়ত বা ভগবান এত দিনে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। তবে একমাত্র ডাক্তার স্যাকোনই জানেন রুগীর অবস্থা কত দূর খারাপ হয়েছে। যে রকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, আগাথার মনে যে খুবই স্বস্তি বোধ হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?'

দুবার্গে-গিন্নী তার উইলে আগাথার নামে কিছু দিয়েছেন কি না, সে-কথা মাকে জিজ্ঞেসা করলে নিকোলাস।

মা হাত নেড়ে বললেন—'কিছু না কিছু না। ওধার দিয়েই যায়নি।—'

'কি তুমি বলছ মা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এর আর বোঝার শক্তটা কি। গিন্নী ভালো হয়ে উঠুক আর না উঠুক আগাথার বাবা বুড়ো কার্ল্যার পুরো দেনা শোধ করে দেবে ঠিক করে রেখেছে। Belmonte'র উপর আর কারুর কোন দাবী থাকবে না। তবে এ সবই হবে যদি বুড়ো তার মেয়েকে সব সম্পত্তি নিঃস্বত্ব দান করতে রাজী হয়। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু বুঝছিস কি রে নিকোলাস? তবে স্বার্থে-গিন্নীই আগাথাকে হাতে করে এই সম্পত্তির দান তুলে দেবে. মেরীর বাবার কোন হাত থাকবে না এ ব্যাপারে।'

ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় নিকোলাস—'তা জেনে আমার কি লাভ হল, বল ত মা?'

'শোন ছেলের কথা। লাভ হল না? লোকের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। সেটা তোর কম লাভ ভাবছিস? এখানকার লোকের জিভে যা ধার জানিস ত? একটা কিছু বলতে পেলে ত তারা ছাড়বে না। এখানে কে না জানে যে, মেরীর মায়ের হাতেই সব সম্পত্তি—তুই কিছু শুনছিস না নিকোলাস? কী যে নিজের খেয়ালে থাকিস, আমি ত কিছু বুঝি না তোর রকম-সকম।'

যতখানি গরীব হতশ্রী দেখায় নিজেকে ততখানি নয় আগাথা, ভাবলে নিকোলাস। সে যে কি বিরাট সম্পত্তির অধীশ্বরী হবে তার সামান্য ইঙ্গিত অবধি সে দেয়নি তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে। নিকোলাসের মায়ের মনকে ঐশ্বর্যের জৌলুষে চমকে দিয়ে জয় করে নেবার জন্যেই বুঝি এত দিন এমন সযত্নে আত্মগোপন করে ছিল ছলনাময়ী।

একটু চুপ করে থেকে মা আবার প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছেন।

'গত বছরই আগাথার বাবা আটক পড়ে যাওয়াতে সব কিছু ভেস্তে যাবার যোগাড় হয়েছিল। জমি-জায়গা বাগান দেখা-শুনা করার এক জন বিশ্বাসী লোক তাদের দরকার হয়ে পড়েছে। বছর ভরের ফসল উঠে রয়েছে ঘরে, সে সব তদারক করা। অমন সোনার টুকরো জমি থাকলে দু'মুঠো খাওয়া-পরার জন্যে মোটে ভাবনা করতে হয় না। হিসেব করে দেখ না হাজার একর মতন জমি—তার মালিক শুধু এক জন। তাই আগাথা আমায় বলছিল, আমি যদি গিয়ে—তুই অবিশ্যি এখুনি বলবি 'আমি কোন্ অধিকারে যাব ওর জমিদারী তদারক করতে। এই বুড়ো হাড় ক'খানা ওর জমিতে নিয়ে গিয়ে ফেলব? তুই যদি মন করিস্ বাবা—'

মা উঠে এসে ছেলেকে সোহাগ করে চুমু খেলেন। যেন ছেলের মন পেয়েছেন. এমনি গদগদ কণ্ঠে বললেন—'আমার সোনার গোপাল। লোকে যে বলে, ভালো মানুষের ভাঁড়ার ভগবান শূন্য রাখেন না. সে কথা খুব সত্যি, না রে নিকোলাস?'

সন্ধ্যা উত্তরিয়ে গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। আর একটু পরেই সারা সহর ঘুমে নিশ্চেতন হয়ে যাবে। এক দিন এই সহরের কত ঐশ্বর্য ছিল, কত বড়ো ধর্মপাঠ ছিল এর গীর্জার বেদীতে, কত বার কত যুদ্ধের রঙ্গভূমি হয়েছিল, এর বীথিপথ রাজপথ। সে সব কথা ভুলে গিয়েছে আজকের অর্ধমৃত নগরের কূপমণ্ডুক বাসিন্দারা।

মা বললেন—'আমার সঙ্গে আয় নিকোলাস। একটা জিনিষ দেবো তোকে—আয়।'

মায়ের পিছন পিছন রান্নাঘরে গিয়ে উঠল নিকোলাস। আমার পকেট থেকে একগোছা চাবী বার করলেন মা। বললেন—'আলোটা তুলে ধর না বাবা! দেখ দিকিনি কত বেঁটে তোর মা? শরীরে আর কিছু নেই। ক'খানা হাড়সার হয়ে গেছে! দে তো বাবা টুলটা আমার পায়ের কাছে।'

ড্রয়ারের ভেতরে হাতড়ে ফিরলেন মা। তারপর এক বাণ্ডিল কাগজ-পত্তরের নীচ থেকে বার করে আনলেন একটা কাগজের বাক্স।

—'দেখ দিকিনি বাবা!'

এর আগে আরো অনেক বার মা তাকে এই আঙটিটি দেখিয়েছেন। লাল পাথরের উপর হীরের কুচি বসান সুন্দর একটি অঙ্গুরী। মা অন্ততঃ বলেন যে, ওগুলো আসল হীরেই। তার পিসিমা ঐ একটিই জড়োয়া সম্পত্তি রেখে দিয়ে গেছেন এদের সংসারে।

'আমাদের এখানে রেখেছিলেন কেন মা?'

—'তা কি জানি বাছা!'

রান্নাঘরটি তাদের পরিপাটি সুন্দর। মাজাঘষা বাসন-পত্রগুলি উজ্জ্বল দীপের আলোয় কেমন আশ্চর্য ঝকমক করছে। ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিষটি রাখার মা নিপুণ গৃহস্থালীর বড়াই করতে পারেন বটে. ভাবলে নিকোলাস।

'ও আংটি নিয়ে আমি কি করব মা?'

'কী বোকা ছেলে রে আমার! এমন পুরুষের দিকে আবার মেয়েমানুষ ফিরে চায়? আজ রাত্রে বাগানে যাকে দেখতে পাবি, তার আঙুলে পরিয়ে দিস্ এই আংটি। দেখিস বাবা, হারাসনি। বুড়ী মাকে তোর ভালবাসতে ইচ্ছা করছে না রে নিকোলাস?'

মাকে একটি ভালবাসার কথাও বললে না ছেলে। নিঃশব্দে মায়ের হাত থেকে আংটি নিয়ে বদ্ধ মুঠির মধ্যে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

আয়নায় মুখ দেখে কি মনে হয়?

ত্বকের যত্ন নেওয়া এবং পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া, এ দুয়েরই একান্ত প্রয়োজন—সেই সঙ্গে রঙের কথাটাও ভুললে চলবে না। বুদ্ধিমতী মেয়েরা জানেন যে কোমল ত্বকের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতিদিন "'HAZELINE' SNOW" "'হেজলিন' স্নো" ব্যবহার করলে ত্বক শুভ্র ও মসৃণ হয়ে ওঠে এবং এই স্নোর হালকা প্রলেপের দরুন ত্বক সজীব থাকে।

"'HAZELINE' SNOW"

(TRADE MARK)

"'হেজলিন' স্নো" (ট্রেড মার্ক)

বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, বোম্বাই

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী। এম-এ অধ্যাপক, স্কটিশচার্চ কলেজ। পিতা—অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—বঙ্গসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, মহামানব মহাত্মা গান্ধী, বিংশতি মহামানব, কাব্য—প্রেমগীতিকা, আবৃত্তি-মঞ্জুষা, মেঘনাদবধ কাব্য।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ—কবি। জন্ম—১৮৮৬ খৃঃ শ্যামবাজার, কলিকাতায়। মৃত্যু—১৯৪৯ খৃঃ ১৭ই মে কালিম্পঙে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সহিত সংযুক্ত। বঙ্গীয় আইন-সভার রিপোর্টার ও লাইব্রেরিয়ান। গ্রন্থ—ওমর খৈয়াম (কাব্য), রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (ঐ), সনেট (কবিতা), সেবিকা (ক), ধূমকেতু (গল্প)।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৩ বঙ্গ ২০এ অগ্রহায়ণ নবদ্বীপে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ ২৮এ ভাদ্র হুগলী। পিতা—দীননাথ রাঢ়ী। মাতা—অন্নপূর্ণা। শিক্ষা—হুগলী নর্মাল স্কুল (১৮৬৬), মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কর্ম—বাল্যে ব্যারাকপুরের বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। হাওড়ায় মোক্তারী, হুগলীতে রেভেনিউ একাউন্টশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যর দুর্গাচরণ লাহা, রাজা ইন্দ্র সিংহ প্রভৃতি জমীদারবর্গের আমমোক্তার। গ্রন্থ—ভারতের ইতিহাস, ২ খণ্ড (১২৮১), নবদ্বীপ-মহিমা (১২৯৮)।

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৮৪২ খৃঃ। মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ ১০ই মার্চ। শিক্ষা—বিভিন্ন টোলে। কর্ম—অধ্যাপনা, টোলে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে। 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি (১৯০০) লাভ। এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো (১৯১১)। নব্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত রূপে ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাতি অর্জন। গ্রন্থ—কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা বিবৃতি (১৮৯২), সাংখ্যদীপনী (১৯০০); সম্পাদিত গ্রন্থ—চতুর্বর্গচিন্তামণি (এ-এস-বি, ১৮৭৯), নীতিসার (১৮৮৪), তত্ত্বচিন্তামণি, নব্যন্যায়, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি বিবৃতি (সটীক)।

কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—বিবেক (মাসিক, ১৩০৩, শ্রাবণ)।

কামিনী শীল—মহিলা সাহিত্যিক। খৃষ্টধর্মাবলম্বিনী। সম্পাদিকা—খৃষ্টীয় মহিলা (১৮৮১)।

কামিনীসুন্দরী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। ছদ্মনাম—দ্বিজতনয়া। হাওড়া-শিবপুর নিবাসিনী। গ্রন্থ—উর্বশী নাটক (মহিলা কর্তৃক প্রথম নাটক, ১২৭২), বালাবোধিকা (১৮৬৮)।

কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দি—বাঙালী বৌদ্ধ কবি ও সাংবাদিক। জন্ম—১২৫৭ বঙ্গ ৫ই শ্রাবণ চট্টগ্রাম পাহাড়তলী। মৃত্যু—১৩৩৬ বঙ্গ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ। কর্ম—পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত। 'কাব্যনিধি' ও 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ। যুগ্ম-সম্পাদক—প্রভাত (চট্টগ্রাম, মাসিক, অন্যতর সম্পাদক—কবি নবীনচন্দ্র সেন)। সম্পাদক—বৌদ্ধ বন্ধু (মাসিক, ১২৯৯ বঙ্গ বৈশাখ)। গ্রন্থ—চটল উল্লাস (কাব্য), কুমুদিনী (উপন্যাস)।

কালীকৃষ্ণ ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৬ বঙ্গ ৩রা পৌষ মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জের বালীগাঁও-এ। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ ১৬ই কার্ত্তিক। গ্রন্থ—ফুলের তোড়া (কাব্য), সেকালের চিত্র, অঞ্জন।

কালীকৃষ্ণ সেন—সাংবাদিক। জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ হুগলী জেলার শ্যামানন্দপুর। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ১৪ই শ্রাবণ। সহ-সম্পাদক—বেঙ্গলী, ডেলি নিউজ; সম্পাদকীয় বিভাগে ক্যাপিট্যাল। সম্পাদক—**Illustrated India** (সাপ্তাহিক), **Orlent, Advance** (১৯৩৫)।

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে। পিতা—বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—উপাসনা, গীতাঞ্জলি।

কালিদাস নাগ—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৯২ খৃঃ ২৩এ মার্চ। এম-এ, পি-এচ-ডি, ডি লিট (প্যারিস, ১৯২৩)। কর্মজীবন—অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ (১৯১৫-১৯), অধ্যক্ষ, মাহিন্দ কলেজ, সিংহল (১৯১৯-২০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে (১৯২৩), ভিজিটিং অধ্যাপক রূপে—নিউইয়র্ক (১৯৩১) হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭), ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়, হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫১-২) গ্রন্থ—স্বদেশ ও সভ্যতা (১৯৪০), রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা, বিশাল ভারত (হিন্দী অনুবাদ, ১৯২৭), **Les Theories Diplomatiques de l' Inde et l' Arthasastra** (প্যারিস, ১৯২৩), **Cygne** (রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ, **P. J. Jouve** সহ, ১৯২৩), **'Mahatma Gandhi', 'Ramkriena', 'Vivekananda'** (ফরাসী ভাষায়, রমাঁ রোলাঁ সহ, ১৯২২-২৯), **Greater India and other Monographs** (১৯২৬-২৮), **Golden Book of Tagore** (সম্পাদিত, ১৯৩১-৩১), **Art and Archaeology Abroad** (১৯৩৬), **India and the Pacific world** (১৯৪১), **With Tagore in China & Ceylone** (১৯৪৪-৪৫), **New Asia** (দিল্লী, ১৯৪৭), **Tolstoy and Gandhi** (পাটনা, ১৯৫০), **India and the Middle East** (১৯৫৩), সম্পাদক—**India and the World, Bicentenary of Sir William Jones, 1745-1946** (১৯৪৬), **Centenary of Women's Education in India** (বীটন কলেজ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৫১), **Mahabodhi Diamond Jubilee Volume** (১৯৫১)।

কালিদাস ভট্টাচার্য—সাহিত্য-সেবী। জন্ম—১৩১৬ বঙ্গ ভাটপাড়া ২৪ পরগণায়। পিতা—দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। শিক্ষা—স্থানীয় বিদ্যালয় ও হুগলী কলেজ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রতিষ্ঠাতা—সাহিত্যাগার। সম্পাদক—বন্দনা (মাসিক), উদয়শ্রী (১৩৫৬)।

কালিদাস রায়—কবি। জন্ম—১২৯৬ বঙ্গ আষাঢ় বর্ধমান

জেলার শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী বড়ুই গ্রামে বিখ্যাত বৈদ্যবংশে। পিতা—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। মাতা—রাজবালা দেবী। শিক্ষা—বড়ুই মাইনর স্কুল, এন্ট্রান্স (বৃত্তিসহ, খাগড়া এল, এম, এস স্কুল, (বহরমপুর ১৯০৬), বি-এ, (বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ), কাশিমবাজার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা। এম-এ (স্কটিশ চার্চ কলেজ) কিছুকাল অধ্যয়ন। কর্মজীবন—সহকারী ও পরে প্রধান শিক্ষক, রঙ্গপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী হাই স্কুল (১৯১৩-২০), বড়িশা হাই স্কুলে সহ-প্রধান শিক্ষক (১৯২০-৩১), ভবানীপুর মিত্র স্কুলে শিক্ষকতা (১৯৩১-৫২)। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা ও সাহিত্য সেবা। ইঁহার কাব্য-সাহিত্যে ব্রজলীলা, পল্লীজীবন, হিন্দুর উৎসব, সামাজিক পরিবেশ, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, হাস্য কৌতুক প্রভৃতি বিষয় দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে 'কবিশেখর' উপাধি লাভ। প্রতিষ্ঠাতা—রসচক্র সাহিত্য সংসদ। গ্রন্থ—কাব্য—কুন্দ (১৯০৭), কিশলয় (১৯১২), পর্ণপুট, ১ম (১৯১৪), ২য় (১৯২১), বল্লরী (১৯১৭), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২৯), ব্রজবেণু (১৯২২), ঋতুমঙ্গল (১৯২২), আহরণী (১৯২৭), লাজাঞ্জলি (১৯৩১), রসকদম্ব (১৯৩০, হাসির গান), চিত্রচিতা, বৈকালী (১৯৪০), আহরণ (১৯৪৭, বি-এ পাঠ্য), হৈমন্তী (১৯৩০), পঙ্কানুবাদ—চিত্রে গীতগোবিন্দ (১৯২৭), গীতাঞ্জলি (১৯৩০), কাব্যে শকুন্তলা (১৯৪৬), ইন্দুমতী (১৯৪৯), কুমারসম্ভব (১৯৬০), ব্রজবাঁশরী (১৯৫৮), ঋতুরঙ্গ (১৯২২), গদ্য—সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ১ম (১৯৩২), ২য় (১৯৩৪), প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ১ম (১৯৩০), ২য় (১৯৪৭), ৩য় (১৯৪৮) বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম (১৯৩৭), ২য় (১৯৪১), ৩য় (১৯৫১), জাতক-মালিকা, ভক্তমালিকা; সম্পাদিত গ্রন্থ—রসচক্র (উপন্যাস, ১২ জন কথাশিল্পী রচিত), অষ্টরম্ভা (হাসির গল্প)।

কালীনাথ লাহিড়ী—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার উঙ্গি গ্রামে। গ্রন্থ—দোলতীর্থ, হোলিগান, কবিগান।

কালীপদ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—বন্দীর চিঠি (প্রিয়ব্রত কুণ্ডু সহ, ১৯০৬)।

· কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। শিক্ষা এম-এ। সম্পাদক—সংসার (মাসিক, ১৩০৪, পৌষ)।

কালীপ্রসন্ন সেন—গ্রন্থকার। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারে কর্ম। বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ। সম্পাদিত গ্রন্থ—রাজমালা, ২ খণ্ড (ত্রিপুরা, ১৯২৭)।

কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক ও কবি। জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ বরিশাল জেলার বাকপুরে। পিতা—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—নলোপাখ্যান নাটক, হরমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, কুলীন বামন। সম্পাদক—স্বায়ত্ত শাসন (সাপ্তাহিক)।

কালীভৈরব ভট্টাচার্য—সাধক। জন্ম—১২৩৬ বঙ্গ মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ, ভিলাইয়া। মৃত্যু—১৩৪০ বঙ্গ। গ্রন্থ—শ্যামার্চন, তত্ত্বসার।

কালীনাথ রায়—সাংবাদিক। পৈতৃক নিবাস—যশোহর। সম্পাদক—Citizen (ডিব্রুগড়, সাপ্তাহিক, ১৯০৪—৬), The Punjabi.

কালী মির্জা—সঙ্গীতজ্ঞ। পূর্ণনাম—কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। মৃত্যু—১৮২৫ খৃঃ কাশীতে। পিতা—বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস গুপ্তিপাড়া। ইনি বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সঙ্গীতে তথাকার শ্রেষ্ঠ মুসলমান গায়কের সমকক্ষতা হেতু মির্জা উপাধিলাভ ও কালি মির্জা নামে প্রসিদ্ধ ও জমীদার গোপীমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ। গ্রন্থ—গীতলহরী (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯০৪)

কালীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। যুগ্ম সম্পাদক—কালিকাপুর গেজেট (মাসিক, কালিপাহাড়ী, বর্ধমান, ১৩০৭ বঙ্গ ভাদ্র)।

কাসিম শাহ্—মুসলমান গ্রন্থকার। ১৭৩১ খৃঃ বর্তমান। গ্রন্থ—হংস জবাহির।

কিরণচন্দ্র দত্ত—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৮৩ (?) আষাঢ় হাওড়া জেলার ব্যাটরায় পৈতৃক ভবনে। পিতা—লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শিক্ষা—নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল, মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউসন, ডাফ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ। কর্মজীবন—র‍্যালি ব্রাদার্সের কণ্ট্রাক্টর। রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর এষ্টেটের রিসিভার (১৯২৩-১৯২৯), গিরিশ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭ (প্রদত্ত, ১৯৫০)। গ্রন্থ—গিরিশ-গৌরব, চারুস্মৃতি, পিতৃবিয়োগ শোকাষ্টক, বন্দনা (গীতি কবিতা), সাধনা (সঙ্গত ও গীত), অর্চনা, সম্মাননা। যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্ববাণী (১৩৩৬, মাসিক)।

কিরণচন্দ্র দে—সাংবাদিক। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় বসুলপুরে। শিক্ষা—কেমব্রিজের র‍্যাংলার। সম্পাদক—ভাস্কর (মৈমনসিংহ, সাপ্তাহিক, ১৯০২)।

কিরণবালা সেন—সাময়িক পত্রসেবিকা। স্বামী—ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী। সম্পাদিকা—শ্রেয়সী (শান্তিনিকেতন, ১৩২১)।

কীর্তিচন্দ্র সেনগুপ্ত—বৈষ্ণব পণ্ডিত। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ বীরভূম জেলার ভবানীপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৯ খৃঃ। গ্রন্থ—ভবানী-ভাবনা (কাব্য, ১৯০৮)।

কীর্তিনাথ শর্মা—অসমীয়া নাট্যকার ও গীতিকার। জন্ম—১৮৭৮ খৃঃ ৭ই নভেম্বর। মৃত্যু—১৯৫২ খৃঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারি। নাট্যগ্রন্থ—বাসন্তী অভিষেক, লুইত বিজয়, স্বর্গবিজয়, মেঘাবলী (মুক্তিনাথ শর্মা সহ)।

কুতবন, সুফী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—১৫শ শতাব্দী। গ্রন্থ—মৃগাবতী (১৫০০ খৃঃ)।

কুমারেশ ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩২০ বঙ্গ ২১শে পৌষ কুষ্টিয়া শহরে। পিতা—মন্মথনাথ ঘোষ, শিক্ষা—প্রবেশিকা (প্রাইভেট) আই-এস সি (সেণ্ট-জেভিয়ার) বি-কম (বিদ্যাসাগর কলেজ) কর্ম-জীবন—ওরিয়েণ্টাল মেশিনারী সাপ্লাইং এজেন্সীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মডার্ণ ইণ্ডিয়া মেশিন টুলস কোং-র শিল্প-পরামর্শদাতা। সহ-সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট 'গ্রন্থগৃহ' পুস্তক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। সিরিয়া, তুর্কী, গ্রীস, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মাণী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, মিশর প্রভৃতি ভ্রমণ (১৯৫৪-৫৫)। গ্রন্থ—ভাঙ্গাগড়া, (১৩৫৪), ওগো মেয়ে সাবধান (ঐ), ম্যানিয়া (ঐ), লাভের ব্যবসা (ঐ), কাকি-স্থান

(১৩৫৫), ক্যাসান ট্রেনিং স্কুল (১৩৫৮)। কটাক্ষ (ব্যঙ্গ কবিতা, ১৩৫১), সালোম (অনু, ১৩৬০), স্বামীপালন পদ্ধতি (ঐ), পঙ্কিল (অনু. ১৩৫৪), ভ্যাগাবণ্ডস ১৩৫৫), চক্র নোটিশ. ১৩৬০), বেনপুর (শিশু, অনু, ১৩৬১), পণ্যা (উপ, ১৩৬১)। সম্পাদক—যষ্টিমধু (মাসিক), মিতালী (ঐ)।

কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রাম। গ্রন্থ—প্রবাদের আবাদ (সংগ্রহ)।

কুমুদচন্দ্র সিংহ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৩ বঙ্গ ১৮ই আষাঢ় মৈমনসিংহের সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজবংশে। মৃত্যু—১৩২৩ বঙ্গ ১৩ই আশ্বিন। 'মহারাজ' উপাধিলাভ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ লেখক। গ্রন্থ—কৌমুদী।

কুমুদনাথ দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় বাসুদেবপুরে। কর্ম—রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার। গ্রন্থ—Legal practitioners.

কুমুদনাথ লাহিড়ী—কবি। জন্ম—১২৮৬ বঙ্গ মাঘ ফরিদপুর জেলায় কোয়াকদী গ্রামে বিখ্যাত জমীদার বংশে। মৃত্যু—১৩৪০ বঙ্গ আষাঢ় কলিকাতায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। সাময়িক পত্রে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—সাগরের ডাক, বিল্বদল, পাপ ও পুণ্য।

কুলদারঞ্জন রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার মসূয়া। গ্রন্থ—রবিনহুড।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—সন্ন্যাসী ও ধর্মোপদেষ্টা। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ, ৫ খণ্ড।

কুসুমকুমারী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—বরিশাল। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ ভাদ্র। স্বামী—রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী (বরিশাল লাখুটিয়ার জমীদার), পুত্র—কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী। ইঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ 'কোন মহিলা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ—স্নেহলতা (উপ, ১২৯৬), প্রেমলতা (উপ, ১২৯৯), প্রসূনাঞ্জলি (প্রবন্ধ, ১৩০৭), শান্তিলতা (উপ. ১৯০২), লুৎফউন্নিসা (ঐতি-উপ, ১৩১২)।

কৃষ্ণকান্ত বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—An account of Burdwan (১৮৬৫)।

কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—শ্রীসনাতনী (বাগবাজার, মাসিক, ১৩০৩, অগ্রহায়ণ)।

কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৩১৮ বঙ্গ ১৩ই ভাদ্র হাওড়া গঙ্গা গ্রামে। 'সাহিত্যভারতী' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—এসেছে জ্যোতির্ময় (উপ), গোপালের বাঁশী (গ)।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—An Epitome of Jainism (১৯১৭)।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। মৃত্যু—১৩১৭ বঙ্গ কাশীতে। সম্পাদক—বঙ্গবাসী।

কৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—খৃষ্টীয় শক্তি (মাসিক, ১৩০৪, আষাঢ়)।

কৃষ্ণদাস—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় ভিটাদিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী (অনুবাদ, ১০৮৭ বঙ্গ)।

কৃষ্ণদাস বাবাজী—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৪ বঙ্গ ১১ই শ্রাবণ যশোহর জেলায় নড়াইল সব-ডিভিশনের হাতরা গ্রামে। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ ১৫ই আশ্বিন। পূর্বনাম—ইন্দ্রচন্দ্র দাস। পিতা—নরোত্তম দাস। সন্ন্যাস গ্রহণ (যতি আশ্রম)। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ চরিত (১৩২১)।

কৃষ্ণদাস সুর—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—বিদ্যামালিনী, ২য় খণ্ড।

কৃষ্ণধন দে—কবি। শিক্ষা—এম-এ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। গ্রন্থ—ব্যথার পরাগ (গীতিকাব্য)।

কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাস—সাহিত্যসেবিকা। সম্পাদিকা—মাহিষ্য-মহিলা (মাসিক, উদয়পুর, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩১৮)।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—কবি ও সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৯১৪ খৃঃ বলরামপুর, শ্রীহট্ট। গ্রন্থ—প্রবাহ (গল্প, ১৯৪১), এদিক ওদিক (গল্প), যাত্রী (কবিতা), বরুণা (উপ. ১৯৪২), ত্রিবেণী (কবিতা), সম্ভাবনা (না, ১৯৪৩), চিঠি (উপ, ১৯৪৫), পাতাল গঙ্গা (উপ, ১৯৪৬)।

কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু—সাহিত্যসেবিকা। যুগ্ম সম্পাদিকা—সোহাগিনী (মাসিক, ১২৯১)।

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি—পণ্ডিত। জন্ম—যশোহর জেলায় মহেশপুর গ্রামে। ইনি প্রায় এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। 'বিদ্যাসরস্বতী' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—অন্তর্ব্যাকরণ নাট্যপরিশিষ্ট (জর্মানীর পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক আদৃত)।

কেদারনাথ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দ্রকেতু (উপ, ১৮৭৭)।

কেদারনাথ দাশগুপ্ত—দার্শনিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৭৮ খৃঃ ১১ই অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার ভাটিখাইন গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪২ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর ইউইয়র্কে। পিতা—হরচন্দ্র দাশগুপ্ত (বিচার বিভাগ)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (মিউনিসিপ্যাল স্কুল, চট্টগ্রাম), আইন (টেম্পল ইন, লণ্ডন), ডি-ফিল (নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়), কলিকাতায় ইণ্ডাষ্ট্রি ও ভাণ্ডার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা (১৯০৪—৫)। স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে সরলা দেবীর সহায়তায় রাখীবন্ধন উৎসব, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী হিসাবে 'লক্ষ্মীভাণ্ডার' নামক শিল্পের দোকান প্রতিষ্ঠা, ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম লণ্ডনে ও আমেরিকায় ভারতীয় প্রাচীন নাটক শকুন্তলা, সাবিত্রী সত্যবান অভিনয় করাইয়া পাশ্চাত্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করান। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারে লণ্ডনে সম্বর্দ্ধনা সভার উদ্যোক্তা। নিউ ইয়র্কে 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ ফেথস' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। সাময়িক পত্রিকার লেখক। গ্রন্থ—The great book of procedings of the world fellowships of faiths ; Princes of Arakan 'আরাকানের যুবরাজ'-এর ইংরাজি অনুবাদ। সহ সম্পাদক—(রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার) (মাসিক) ; সম্পাদক—Appreciation (নিউ ইয়র্ক)।

কেবলচন্দ্র বসু—অনুবাদক। জন্ম—মৈমনসিংহের কেদারপুরে। গ্রন্থ—কাশীখণ্ড।

কেশবলাল দাস—কবি। জন্ম—২৪-পরগনার বনগ্রাম। কর্ম—এ. জি. বি. অফিসে। ইনি 'কবিকেশব' এবং বহু সদনুষ্ঠানে

অর্থদান করায় 'জনবন্ধু' উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাপীঠ নামে এক স্কুল (বনগ্রামে) স্থাপন করেন। গ্রন্থ—গীতিকাঞ্জলি, মন্দারমালা, সিন্ধুবিজয়, লালাবাবুর গান, ছাইভস্ম, সরল কবিতা, আবদার, ষট্‌পদী, চতুর্দশী, বোষ্টম বৌদিদি।

কেশবচন্দ্র সাধু—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—স্পর্শ-নিন্দা ও কল্পনাপ্রসূন।

কৈলাসচন্দ্র কাব্যতীর্থ—পল্লীকবি ও নাট্যকার। জন্ম—১২৬৮ খৃঃ মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনের কৃষ্ণমাইতিবাড় গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৬ বঙ্গ নয়াগ্রাম থানায় রেড়্যাজাল গ্রামে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (উড়িষ্যা লক্ষ্মণনাথ হাইস্কুল), 'কাব্যতীর্থ' দাঁতন সংস্কৃত বিদ্যালয়। কর্ম—শিক্ষকতা। বীরবর রাজা সুরেশচন্দ্র রায় সাহিত্যভূষণ মহাশয়ের শিক্ষাগুরু। নাট্যগ্রন্থ—পরশুরাম চরিত, পার্থগৌরব, বেণীবন্ধন, সত্যাসুর বধ, জলন্ধর বধ, মদনভস্ম, কংস বধ (সংস্কৃত কাব্য), পিকদূত (ঐ)।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ—সাহিত্যসেবী। জন্ম—বর্ধমান জেলায় রায়না গ্রামে। গ্রন্থ—বাংলা সাহিত্য। সম্পাদক—আর্য প্রতিভা (মাসিক)।

কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—কুমুদ্বতী ও স্বর্ণা।

কৈলাসনাথ রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪০ বঙ্গ ফরিদপুর জেলায় উলপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩০২ বঙ্গ জ্যৈষ্ঠ। পিতা—কমলাকান্ত রায়। আইন ব্যবসায়, যশোহর সদর আমিনের আদালতে, হাইকোর্টের মোক্তার, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এষ্টেট, বৃন্দাবনে পাইকপাড়া এষ্টেটের সদর নায়েব। গ্রন্থ—রাজনিয়ম (১৮৫১), জমীদারী কার্যের নিয়মাবলী, প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন (১৮৯৪)।

কৈলাসবাসিনী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। স্বামী—দুর্গাচরণ গুপ্ত। গ্রন্থ—হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা (সন্দর্ভ, ১৮৬৩), হিন্দু অবলা কুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার উন্নতি (১৮৬৫)।

কৈলাসেশ্বর বসু—ভক্ত কবি। জন্ম—১২০৩ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলায় পিঙ্গলা গ্রামে। মৃত্যু—১২৯২ বঙ্গ। গ্রন্থ—কবিতাবলী ও ভবগীতা, অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ।

কোটীশ্বর—পাঁচালীকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় দীঘজান নেত্রকোনায়। পিতা—রমাকান্ত। মাতা—সারদা। গ্রন্থ—ছিন নাথ পীরের পাঁচালী।

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী—মহিলা কবি। জন্ম—১৯১১ খৃঃ ৭ই মার্চ কলিকাতা ইণ্টালীতে। পিতা—নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী (এ্যাডভোকেট এবং রোটারী ইণ্টার ন্যাশনালের ভূতপূর্ব সহ সভাপতি এবং ডিরেক্টর)। স্বামী—যতীন্দ্রকুমার ভাদুড়ী (ইষ্টার্ণ রেলওয়ের অফিসার)। শিক্ষা—প্রবেশিকা পর্যন্ত। বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখিকা। গ্রন্থ—দ্রাক্ষালতা (কবিতা), সুদূরের পিয়াসী (ভ্রমণ)। যুগ্ম-সম্পাদিকা—বঙ্গলক্ষ্মী (মাসিক)।

ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এ। গ্রন্থ—গোধূলি।

ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯১ বঙ্গ নদীয়ার আর্যকিছ জৌজনপাশে। মৃত্যু—১৩৩২। গ্রন্থ—কৃষিক (নাটিক)।

ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—A Pilgrimage to the excavating site at Pahartur (কলি, ১৯২৮)।

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ ১৮ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে। মাতামহ—স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষা—প্রবেশিকা (মেট্রপলিট্যান ইনষ্টিটিউসন, ১৯১৩), আই-এস সি (বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৯১৮), বি-এসসি (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯১৭), এম-এস-সি (কেম্ব্রিজ)। কর্ম—অধ্যাপক, কলি বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার (১৯২৪—২৭), পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৪২)। কলিকাতা পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ (১৯২৭), জাতীয় আন্দোলনে যোগদান। ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—The date of Kalidas (এলাহাবাদ, ১৯২৬)।

ক্ষেত্রমণি দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ মণিরামপুরে। মৃত্যু—১৯২১ খৃঃ কলিকাতা। পিতা—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মণিরামপুর)। স্বামী—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাথুরিয়াঘাটা)। পুত্র—কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেজারার পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ—চিন্তাহার (না, ১২৬৫), পতিহারা (১২৯৬), বিলাপমালা।

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। মৃত্যু—১৮৫০ খৃঃ ১৫ই জুলাই। সম্পাদক—সংবাদ রসসাগর (১৮৪৯ খৃঃ মার্চ, সাপ্তাহিক, পরে ১৮৪৯ ডিসেম্বরে বারত্রয়ীকে পরিণত)।

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও সাংবাদিক। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ ১লা নভেম্বর কলিকাতা। গ্রন্থ—পদ্মা (কাব্য ১৩৩৮), বিস্ময়বিহ্বল (১৩৪১); কঙ্কাহারা (উপ, ১৩৫১), ছবি-ছড়ায় অ-আ-ক-খ, ২ ভাগ (১৯৫১); সম্পাদক—নব-মিলন (মাসিক, ১৩৩৪-৪), বাঙালী (সাপ্তাহিক, ১৩৪০-৫১). বিবাদ (পাক্ষিক, ১৩৪২-৪৬)।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে। পিতা—নীলকমল মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—সর্বধর্ম সমন্বয়।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ব্যবহারজীবী। জন্ম—১৮৭৩ খৃঃ ১২ই জুলাই কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৪৩ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর চন্দননগর। পিতা—ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাতা—শরচ্চিন্দুবালা দেবী। প্রপিতামহ—মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়)। শিক্ষা—বি-এ। এটর্নী, আইনজীবী। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক (১৩২৬-২৯)। গ্রন্থ—রবীন্দ্র কথা (১৯৪২)।

খয়রাতুল্লা সরদার, মুন্সী—কবি। জন্ম—১২৪৮ বঙ্গ খুলনা জেলায় (তৎকালে যশোহর) নয়াবাদ থানার অন্তর্গত সামন্তসেনা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৩ বঙ্গ সামন্তসেনায়। পিতা—এবাদতুল্লা সরদার। শিক্ষা—হুগলী জেলার নর্মাল স্কুল। কর্ম—জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবী। গ্রন্থ—খোদা হাফেজ (১৯০১), ইহা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়), কর্বালা-ভয়দ কাব্য (সংহার পর্ব, ১৩১৩), তারিখে কসুল বা বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ (১৩২০)।

[ক্রমশঃ।

৩

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

যাই হোক, ট্রেণ থেকে নেমে খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি, এই রক্ষে। ভাদুড়ী মশাই দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন যেন।

একেবারে নতুন জায়গা। তার ওপর প্রথম বারেই সপরিবারে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি, চলন্তি ট্রেণে অনেকক্ষণ ধরে এ কথাটাই যেন পেয়ে বসেছিল ভাদুড়ীকে। এর পর কেউ যদি ষ্টেশনে এসে আগে থেকে উপস্থিত না থাকে, তা' হলেই তো বিপদ! এমনি সব দুর্ভাবনার বোঝা বইতে বইতে পানাগড় ষ্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমেই তাই চেনামুখের তল্লাস শুরু করে দিলেন তিনি।

: ভাদুড়ী মশাই এসেছেন, ভাদুড়ী মশাই!—দু'পা এগুতেই একটা ব্যাকুল চিৎকার কানে ভেসে আসে ভাদুড়ীর।

: এই যে এখানে।—পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ভাদুড়ী আর একটু এগোতেই একেবারে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েন রাধারমণ পণ্ডিতের। দেবশালা মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত রাধারমণ সরকার। হেড মাষ্টার হবার সখ তাঁরই ছিলো পুরোপুরি। পুরোনো হেডমাষ্টার যে এখানকার চাকুরী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সে তাঁরই জন্যে। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও যেমন সবাই তাঁকে বাঘের মতো ভয় করে, আবার ঠিক তেমনি সবাই তাঁর একান্ত বশ। কিন্তু হলে হবে কি, তাঁর হেড মাষ্টার হবার আশা কোন দিনই পূর্ণ হবার নয়। ট্রেনিং পাশ না হলে কিছুতেই হেড মাষ্টারি করা চলবে না, এ বিষয়ে সেক্রেটারীর মত অত্যন্ত দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। আর সেক্রেটারীর যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করার দুঃসাহস কোন দিনই রাধারমণের হবে না। তবে হেড মাষ্টারকে গোড়া থেকে হাত করে রাখতে পারলেই যে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, এ কথাটা তিনি ভালো করেই বুঝে নিয়েছেন। তাইতো সুরু থেকেই তিনি সেরূপ চেষ্টাই আরম্ভ করেছেন।

: আরে কেষ্টা, মাষ্টার মশাইর হাত থেকে পুঁটলিটা আগে নিয়ে নে। হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? প্রণাম করেছিস?

প্রণাম করবার কথা উচ্চারণ করতেই কেষ্টা, পান্তু, শ্যামল, সোনা এবং আর সবাই একেবারে দপাস দপাস, করে পায়ের ধুলো নিতে শুরু করে দেয় মাষ্টার মশাইর। ওরা সব দল বেঁধে ষ্টেশনে এসেছে সেকেণ্ড পণ্ডিতের সঙ্গে নতুন হেড মাষ্টারকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্যে। ওদের কারুর পরনে ছেঁড়া প্যান্ট, কারুর বা পাজামা, আবার কেউ বা এসেছে ময়লা এক টুকরো কাপড় পরে। দু'-তিন জনের গায়ে নোংরা গেঞ্জি বা ফতুয়া দেখা গেলেও ছেলেদের অধিকাংশই এসেছে খালি গায়ে এবং তারা প্রায় সবাই কংকালসার। সুদূর পল্লীর এই চেহারা দেখে মুহূর্তের জন্যে আঁতকে ওঠেন ভাদুড়ী।

এই তো আমার দেশ, এই তার আসল রূপ! এরই সেবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সবাইকে। তা' হলেই এর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে একটু ভাবেন নতুন হেড মাষ্টার।

: হ্যাঁরে পান্তু, ভানু, পাগলা তোরা সবাই এক একটা করে জিনিষ-পত্র নিয়ে চল এবার। মা-মণির হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নে কেউ। ছিঃ ছিঃ, তোরা এতগুলো ছেলে থাকতে মা-মণি বোঝা নিয়ে চলবেন? তোরা দেখছি সব জানোয়ার হনে গেছিস একেবারে!

: না, না ওদের গাল-মন্দ করবেন না, পণ্ডিত মশাই! আর ওদের ওপর কোন বোঝাও চাপাবেন না জোর করে, ওদের এই শরীরে কতটুকুই বা আর শক্তি আছে! হাতে হাতে যতটা পারা যায় তা বরং আমরাই নিয়ে নিচ্ছি, আপনি একটা কুলি ডেকে দিন! একটা সহানুভূতির সুর বেজে ওঠে ভাদুড়ীর কথায়।

নতুন হেড মাষ্টারের সস্নেহ উক্তি ছেলেদের মন খুশিতে ভরে তোলে, কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র কথায়ই রাধারমণ টের পেয়ে যান যে, এঁকে ঘায়েল করা খুব সহজ হবে না।

রাধারমণকে চিনতে ভাদুড়ীর একটুও দেরী হয় নি। ঠিক এই পোষাকেই তিনি তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের হাওড়ার স্কুলে। দেবশালা মাইনর স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গী হয়ে তিনিও গিয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে। সেই তেল-চিটচিটে জামা কাপড় অর্থাৎ হাতাকাটা ফতুয়া আর ধুতি আর তালি-সর্বস্ব একজোড়া চটি রাধারমণ পণ্ডিতের এই পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ভাদুড়ীর ঠিক মনে আছে। তাঁর এই জামা-কাপড় কোন ধুলো-বালি ও ময়লাই যে আর নতুন করে কোন রেখাপাত করতে পারে না, একথা সেই এক মাস আগেই তাঁর মনে হয়েছিল এবং সে কথা যে নিতান্তই ঠিক তার প্রমাণও তিনি হাতে-হাতেই আজ পেলেন। সত্যি সত্যি একেবারে পাকা রঙ হয়ে গেছে রাধারমণের জামা-কাপড়ের, এর ওপর নতুন করে আর কোন রঙ ছাপ ফেলতে পারে কখনো? কিছুতেই না!

একটা কুলিকে ডেকে নিয়ে এসে তার মাথায় যতটা সম্ভব বোঝা চাপিয়ে দেন রাধারমণ। তারপর বাকি সব জিনিষপত্র হাতে হাতে নিয়ে তাঁরা রওনা হলেন গ্রামের দিকে। ষ্টেশনের বাইরেই পাঁচ সাতখানা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে যাত্রী নেবার জন্যে. তার মধ্যে দু'খানা দেবশালা জমিদার-বাড়ির। রাধারমণ একখানায় হেড মাষ্টার, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাকে বেডিং ও স্যুটকেশ সহ তুলে দিয়ে আর একখানা গাড়িতে ছেলের দল ও আর সব খুচরো জিনিষ নিয়ে উঠে পড়লেন।

উঁচু-নীচু গ্রাম্য রাস্তায় গরুর গাড়ি হেলে-দুলে এগিয়ে চলে। বিছানো চটের তলাকার খড়ের গাদা মচমচ করে ওঠে। অনীতা ভয় পায়। গাড়ি উল্টে যদি পড়ে যায়, এই ভয়। শুধু অনীতাই বা কেন, তার মা-ও ভয়ে ভয়ে শক্ত করে ধরে থাকেন গাড়ির এক ধারের বাঁধা একটা বাঁশকে। হেড মাষ্টারেরও গরুর গাড়ি

চড়ার এই নতুন অভিজ্ঞতা। তাই মনে মনে ভয় পেলেও, বাইরে তা কিছুতেই প্রকাশ করা চলে না। তা হলে যে স্ত্রী আর কন্যাকে মোটে সামলানোই যাবে না। ছেলে নন্তুর ভয়-ডর নেই, গরুর গাড়িতে চড়ে তার বরং আনন্দই হয়েছে খুব।

পিছনের গাড়িতে রাধারমণের নেতৃত্বে ছাত্র দল খুব হৈ-হল্লা করতে করতেই অগ্রসর হতে থাকে। এক এক বার 'নতুন হেড মাষ্টার কি জয়' ধ্বনি ওঠে ওদের গাড়ি থেকে। আবার এক এক সময় সমবেত কণ্ঠের গানও শোনা যায়। চোখের অন্তরালে থেকেও রাধারমণ এ ভাবে ভাদুড়ীর মনে রেখাপাত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

দেখতে দেখতে গাড়ি একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে যায়। গাড়োয়ানটাকে দেখা গেল, গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পড়েই সে শালগাছের ডাল-পালা ভাঙতে সুরু করেছে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল যে, গাড়ি হয়তো গন্তব্যস্থলেই এসে গেছে। কিন্তু নির্জন শালবনের মধ্যে গাড়োয়ানকে এ ভাবে গাছের ডাল ভাঙতে দেখে ভয়ে-ভয়ে নবাগতদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল একেবারে। ভাদুড়ী মশাই এক বার পিছনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সে গাড়িতে তো আরো ভীষণ ব্যাপার! সেখানে সবাই মিলে লাফিয়ে লাফিয়ে এক একটা করে ডাল ভাঙছে আর পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলছে চার দিকে। সকলেই যখন একই রকম কাজে মেতে উঠেছে তখন নিশ্চয়ই এর কোন গূঢ় অর্থ রয়েছে। ভাদুড়ী একটু আশ্বস্ত হন এই ভেবে।

: গাড়োয়ান, এ কি ব্যাপার তোমাদের বল তো?

: বাবুজী, এ এক বনদেবতার ঠাঁই। এখানে শালপাতা দিলে 'ভুলো' লাগে না। এই বিরাট শালবনে পথ ভুল করে কি কম হয়রাণি হয় লোকের? তার থেকে রেহাই পাবার জন্যেই সবাই এখানে শালপাতা দিয়ে প্রণাম জানায় বনদেবতাকে।

গাড়োয়ানের কথায় আশ্বস্ত হন ভাদুড়ী এবং গাড়িও আবার চলতে সুরু করে।

: এ শালবনের কি শেষ নেই? সেই প্রায় ষ্টেশনের গা থেকে আরম্ভ করে এই যে চলছে তো চলছেই। এখনো তো এর শেষ হবার কোন রকমই দেখা যাচ্ছে না। এমনি বনে পথ ভুল হওয়া তো স্বাভাবিক।

: তাই তো বাবু এই মাঝ-পথে এসে বনদেবতার কাছে বর-ভিক্ষা, যেন ভুলো না লাগে। সেই কোন্ কালে দেবতা নাকি স্বপন দেখিয়েছিলেন গাঁয়ের জমিদারকে শালগাছের ডাল ভেঙে বেদীর ওপর পাতা ছড়িয়ে দিতে। তাতে এই বনপথে তাঁর আর কোন আপদ-বিপদ ঘটবে না, এমনি আশ্বাস নাকি পেয়েছিলেন জমিদার। সেই থেকেই এই ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছে এত কাল ধরে। জমিদারই ঐ বেদী তৈরী করে দিয়ে গেছেন পথের পাশে এবং প্রজাদেরকেও অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে স্বপ্নাদেশ পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সকলকে।

: তাই নাকি, তা হলে তো বেশ ভালই বলতে হবে জমিদারকে?

: সে কথা মোটেই মিথ্যে নয় কর্তা। তবে সেই পুরোনো আমলের জমিদারের সঙ্গে এ কালের জমিদারের তুলনা হয় না। এ পথে কি আগে বেশী লোক একত্র না হয়ে চলার জো ছিল কোন? 'মেটে' দস্যুদের হাতে পড়ে কতো লোকের যে আগে মুণ্ডপাত হতো, তার হিসেব-নিকেশ নেই কোন। পথ ভুলিয়ে তারা পথিকদের সব লুঠপাট করে নিয়ে যেতো এবং খুন করে লাস গুম করে ফেলতো। এক বার জমিদার-কন্যার শ্বশুরালয়ে যাবার পথে জমিদারেরই দু'জন লোক খুন হয়ে যায় 'মেটে'দের হাতে এবং তাঁর কন্যার সমস্ত গহনাপত্রাদি লুণ্ঠিত হয় তাদের কাছ থেকে। সে বারই জমিদারের ওপর স্বপ্নাদেশ হয় এবং তিনি এই শালবনের মধ্যপথে বেদী প্রতিষ্ঠা করে কয়েক জন পাহারাদার বসিয়ে দেন, সেই বেদীর পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যে। সেই থেকেই শালবনের এই পথ চলাচল অনেকটা নিরাপদ হয়েছে এবং আজ-কাল আগেকার মতো পাহারাদারের ব্যবস্থা না থাকলেও খুনখারাপি আর তেমন বড় একটা ঘটে না। তবু লোকে আসতে-যেতে ঐ বেদীকে উপলক্ষ্য করে অভ্যাস বশে শালগাছ থেকে ডাল ভাঙতে এবং তার পাতা ছড়িয়ে ফেলতে ভুল করে না কোন।

গাড়োয়ানের কথাগুলো এক মনে শুনে যান ভাদুড়ী মশাই। তার কথা থেকে এটুকু স্পষ্ট করেই বুঝে নেন যে, গাঁয়ের বর্তমান জমিদার সুবিধের লোক নন। অথচ এই জমিদার-বাড়িতেই নাকি তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন সেক্রেটারী! জমিদারের সঙ্গে আবার গোলমাল লেগে যাবে না তো ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে? ভাদুড়ী কেমন যেন একটু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন মনে মনে। পুত্র-কন্যাও গৃহিণীকে নতুন জায়গায় একটু সতর্ক হয়ে চলা-ফেরা এবং কথাবার্তা বলার জন্যে সাবধানও করে দেন আগে থেকেই।

: খুব কড়া মেজাজী লোক নাকি হে তোমাদের জমিদার? ভাদুড়ী গাড়োয়ানকে নতুন করে জিজ্ঞেস করেন।

: কড়া-চিলে বুঝি না কর্তা, অত্যন্ত হিসেবী মানুষ, আধ পয়সা এদিক-ওদিক হলেই তিরিক্ষি হয়ে ওঠেন। খোকাবাবুর সঙ্গে তো রাত-দিন তাই নিয়েই লেগে আছেন। এদিকে যে জমিদারী লাটে উঠতে বসেছে, আজ হোক, কাল হোক, দু'দিন বাদে সরকারী আইনে যে সব কেড়ে নেওয়া হবে সেদিকে কি ভাবছেন জানি না। তবে প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্যে একটি পয়সা খরচ করতে বুড়ো জমিদারের যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। খোকা জমিদারের অন্তরটা ভারি বড়ো কর্তা, ভগবান করুন তাঁর জয়-জয়কার হোক।

এর পর নতুন হেড মাষ্টার আর কথা বাড়ালেন না, বুঝতে পারলেন সব ব্যাপারটা। গরুর গাড়ি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সবাই এক রকম চুপচাপ। একমাত্র গাড়োয়ানই মাঝে-মাঝে গানের সুর তুলে শালবনের নীরবতা ভাঙবার চেষ্টা করে। রাধারমণদের গাড়ি এতক্ষণে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তা'হলেও ওদের গাড়ির হৈ-হল্লার শব্দ বাতাসে-বাতাসে খানিক খানিক ভেসে আসে।

: ঐ যে বিরাট একটা দুর্গের মতো দেখা যাচ্ছে, ওটা কাদের বাড়ি হে গাড়োয়ান?

: ঐ তো জমিদার-বাড়ি, কর্তা! বাড়ি বলতে ঐ একখানাই বাড়ি, আশ-পাশের দুই তিন গাঁয়ের মধ্যে, আর সবই তো কুঁড়ে-ঘর।

পাঁচ মাইলব্যাপী শালবনের শেষ প্রান্ত পেরিয়ে গাড়ি এসে গাঁয়ের পথে পড়েছে। ভাদুড়ী চাদরটাকে গুছিয়ে এক বার কেড়ে

নিয়ে কাঁধে ফেলে নেন। হেড মাষ্টার-গিন্নী হেমাঙ্গিনী ও কন্যা অনীতাও গাড়ির মধ্যেই একটু নড়ে-চড়ে বসে ঠিক হতে থাকেন। হাফপ্যান্ট ও খাকির হাফসার্ট-পরা নন্তুর কোন হাঙ্গামাই নেই, সে সব সময়েই সব কিছুর জন্য প্রস্তুত।

: এই অশথতলায় একটু বিশ্রাম করে নিই কর্তা, নরহরিটাও ততক্ষণে এসে পড়বে। আরো আধ মাইলটেক পথ বাকি। এটুকু এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। এই বলে ভাদুড়ীর গাড়ির গাড়োয়ান শ্যামসুন্দর গাড়ি থেকে নেমে আসে হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে। গ্রামে পৌঁছুবার আগে ধূমপান করে একটু চাঙা হয়ে নেবে আর কি।

: আপনারাও একটু ঘুরে-ফিরে নিন না কর্তাবাবু! অনেকক্ষণ তো বসে আছেন একটানা।—এই বলে শ্যামসুন্দর গরু দুটোকে গাড়ি থেকে খুলে দেয় খানিকক্ষণের জন্যে।

: বেশ তো জায়গাটা। চলো, ঐ মন্দিরের দিকটায় একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

স্ত্রী আর পুত্র-কন্যাকে নিয়ে ভাদুড়ী মশাই দেবশালা গ্রামের প্রবেশ-পথে শিবমন্দিরে প্রণামের সুযোগ পেয়ে ধন্য মনে করলেন নিজেকে। মন্দির থেকে ফিরে আসতে আসতেই দেখা গেল, রাধারমণ নরহরির হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে কষে টানছেন আর ধোঁয়া ছাড়ছেন ভুর-ভুর করে। ভাদুড়ী মশাইর দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় জিভ কেটে হুঁকোটাকে এক পাশে সরিয়ে ফেলেন সেকেণ্ড পণ্ডিত!

: এই যে পণ্ডিত মশাই, আপনারাও চলে এসেছেন এরই মধ্যে। ভালই হয়েছে।—এর আগে কিছুই যেন দেখতে পাননি এমনি ভাব করে বলেন হেড মাষ্টার।

: হাঁ, এই তো এলাম। আপনারাও এই অবসরে একটু বেড়িয়ে এলেন বুঝি? বুড়ো শিবের ঐ মন্দিরের খুব নাম-ডাক আছে এ অঞ্চলে, শনিবার শনিবারে খুব ধুমধাম করে পূজো দিতে আসে আশ-পাশের গ্রামের লোকেরা। অনেক লোকের অনেক রকমের মানত থাকে। সেই মানতের পূজো দিয়ে নাকি অনেকেই ফল পেয়েছেন। তার থেকেই প্রতি শনিবারে বুড়ো শিবের মন্দিরে ক্রমাগত পূজার্থীদের ভীড় বেড়েই চলেছে। দেবশালার পুরোনো জমিদারদেরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। গাঁয়ের লোকরা এই বুড়ো শিবকে জাগ্রত দেবতা বলে মনে করে।

: ও তাই নাকি, তাহলে তো ভালই হয়েছে দেখছি এখানে নেমে। প্রণামটাও সেরে নিয়েছি। কিন্তু তা নয় হলো, কতক্ষণ আর দেরী করতে হবে তাই বলুন দেখি? দিনমানে বাড়িতে যেয়ে উঠতে পারলেই ভাল হতো। আবার একটু গোছগাছ করেও যে নিতে হবে।

: তা যা বলেছেন মাষ্টার মশাই, একটু গুছিয়ে না নিলে চলবে কেন? এ তো আর আমরা নই, এক জন হেড মাষ্টার। রীতিমত মানানসই ভাবে জাঁকিয়ে বসতে না পারলে চলে কখনো? কি বলো মা অনীতা? তবে তার জন্যে লোকজনের কোন অভাব হবে না আপনার, কোন অসুবিধাও হবে না। তার ওপর অনীতা মা রয়েছে, আমরাও তো রয়েছি। এর পরে আর ভাবনাটা কি আপনার?

: তা ঠিক, তা ঠিক!—এই বলে এ আলোচনায় দাঁড়ি টানেন হেড মাষ্টার।

: ও নরহরি, আরে শ্যামসুন্দর! খুব বিশ্রাম হয়েছে, আর দেরী করিস নি। চল্ এবার।

রাধারমণের ডাকে নিজ-নিজ গাড়িতে গরু জুড়ে দেয় নরহরি আর শ্যামসুন্দর।

: আসুন কর্তা, মাকে দিদিমণিকে নিয়ে উঠে পড়ুন তাহলে। আর তো আধা ঘণ্টার ব্যাপার, দেখতে দেখতে চলে যাব।

শ্যামসুন্দরের গাড়ি এবারও আগে আগেই চলে, নরহরির গাড়ি অবশ্য আসে ঠিক পিছে পিছেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে। পশ্চিম-আকাশ জুড়ে সূর্যদেব আবীর ছড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরালে যেন পালিয়ে যাচ্ছেন। দু'খানা গাড়িও ছুটে চলেছে পশ্চিম দিকে। আর তো কয়েক মিনিটের পথ। কিন্তু তবু যেন তর সয় না। দু'জোড়া গরুকেই লাঠির খোঁচায়-খোঁচায় উত্তেজিত করে তোলে আরো জোর ছুটে চলতে। একটু ঝিমিয়ে পড়লেই 'হট্, হট্, হট্'—বিচিত্র-বিকট মুখের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দমাদম লাঠি পড়ে গরুর পিঠে, আর লেজ ধরে জোর মোচড় দিতেই ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলতে শুরু করে গরু-জোড়া।

এমনি ভাবেই পথের শেষ করে আনে শ্যামসুন্দর আর নরহরি। গাড়ি দু'খানা জমিদার-বাড়ির সদর দরজায় এসে থামতেই নতুন হেড মাষ্টারকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসেন সেক্রেটারী শশধর গাঙ্গুলী ও জমিদার-নন্দন সুমন্ত চক্রবর্তী। সেক্রেটারী জমিদারেরই ভাগিনেয়। নিজে বাস্তব্যাপিতে পঙ্গু হয়ে পড়ার পর পুরোনো আমাদের এই স্কুলটা পরিচালনার ভার ভাগিনেয় শশধরের ওপরই জমিদার ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা হলেও স্কুলের কাজকর্ম প্রায় ষোল আনাই চলে তাঁরই পরামর্শ মতো, যদিও বাইরের লোকদের ধারণা ঠিক তার উল্টো।

: এই যে, আসুন আসুন ভাদুড়ী মশাই! কোন কষ্ট হয়নি তো পথে?—সেক্রেটারী এই বলে নতুন হেড মাষ্টারকে হাতে ধরে নামান গাড়ি থেকে। তার পর একে একে নেমে আসে অনীতা এবং তার মা। অনীতা হাত-জোড় করে নমস্কার জানায় শশধর আর সুমন্তকে। সুমন্ত ভুল করে না তাকে প্রত্যভিবাদন জানাতে, কিন্তু শশধর হেড মাষ্টারকে নিয়েই অত্যধিক ব্যস্ত, অন্য কোন দিকে চোখ দেবার তাঁর অবসর কোথায়?

প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা। অতীত জাঁক-জমকের নীরব সাক্ষ্য। এখন ইট-সুরকি খসে খসে পড়ছে সেই প্রাসাদের গা থেকে, তা আর সারিয়ে নেবার দিকে দৃষ্টি নেই কারুর, ক্ষমতাও নেই বোধ হয় আর জমিদারের। তা হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সতর্ক নজর এ বাড়ির ঝি-চাকর আর মালীদের। বিরাট বাড়ির এক নিরিবিলি কোণায় হেড মাষ্টারের জন্যে নির্দিষ্ট অংশে উপস্থিত হয়েই প্রথম প্রথম সকলেরই কেমন যেন একটু ভয়-ভয় লাগে। কিন্তু সে সাময়িক মাত্র। সুমন্তর আশ্বাসে অনীতাও যেমন আশ্বস্ত হয়, তেমনি তার মা। তবে ভয় কেটে গেলেও এ বাড়ির অস্বাভাবিক নীরবতা সকলকেই বিস্মিত করে। জমিদার, জমিদার-গৃহিণী ও তাঁদের এক মাত্র পুত্র সুমন্ত ছাড়া পরিবারে আর

কেউ না থাকলেও বাড়িতে দাস-দাসী এবং অন্যান্য লোকজনের আনা-গোনার তো অভাব নেই। কিন্তু তবু যেন এ পুরীতে সব কাজ কলের পুতুলের মতো চলে, কারুর মুখে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নেই।

এরূপ নীরবতার অবশ্য যথার্থ কারণও আছে। সে কারণ জানা গেল পরদিন কর্তা বাবু ও গিন্নী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে। ছেলে সুমন্তের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে তীব্র মতভেদ দেখা দেওয়ায় কর্তা বাবু এক মাত্র পুত্রের মুখ দর্শনেও নারাজ। মানসিক উত্তেজনায় বাতব্যাধিগ্রস্ত জমিদার আরো বেশি পঙ্গু হয়ে পড়েছেন সম্প্রতি। এখন আর ভালো করে কথাও বলতে পারেন না। অবশ্য কথা বলতে বারণও রয়েছে ডাক্তারের। তবু কেউ কাছে এসে দু দণ্ড বসলে যেন একটু আনন্দ বোধ করেন তিনি, কিন্তু সুমন্তর দর্শন তাঁর কাছে অসহ্য। অবশ্য চোখেও তিনি তেমন দেখতে পান না। যৌনব্যাধির ফলে একটি চোখ তাঁর যৌবনেই নষ্ট হয়েছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় অপর চোখটির দৃষ্টিশক্তিও প্রায় নিঃশেষিত। তবুও তাঁর ঘরে কে আসে যায়, তার কোন কিছুই বুঝতে তাঁর বাকি থাকে না; প্রবল অনুভব শক্তিই তাঁকে সব বুঝিয়ে দেয়।

কে?—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই চমকে উঠে প্রশ্ন করেন জমিদার।

আমি ভাদুড়ী।

ও, আমাদের নতুন হেড মাষ্টার! আর এরা?

আমারই মেয়ে অনীতা, ছেলে নন্দ আর……!

ও বুঝেছি, বেশ, বেশ। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? আর এখানেও থাকার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

না, না, মোটেই না। আপনি এ জন্যে একটুও ভাববেন না।

আর কথা বলা ঠিক হবে না কর্তাবাবুর সঙ্গে, দূর থেকে ইসারায় জানায় সুমন্ত।

: আচ্ছা, আজ যাই আমরা। আবার তো আর একটু পরেই স্কুলে যেতে হবে।

: তা হোক, তবু বসুন না আর একটু!—এই বলেই জমিদার যেন একটু হাঁফিয়ে পড়েন। বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস বইতে সুরু করে তাঁর।

: আজ্ঞে, আজ প্রথম দিন, তাই একটু বেশী তাড়া।

: বেশ! এই বলে জমিদার বিদায় দেন হেড মাষ্টারকে।

প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মধ্যে পুরোনো কালের বড় বিচিত্র এক মজবুত পালংকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত জমিদার তারাচরণের মাথায় পুরোনো ঘি মালিশ করছিলেন তখন গৃহলক্ষ্মী সৌদামিনী। ভাদুড়ী মশাই ও তাঁর স্ত্রী-কন্যার ভুল হয় না তাঁকেও প্রণাম করতে। কিন্তু তাঁর বেদনা মলিন মুখখানা দেখে তাঁদের মনও যেন বিষাদে ভরে ওঠে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই গ্রামাঞ্চলের মাঝখানে এই একটি মাত্র বাড়িতে অনন্ত ঐশ্বর্য্য মজুত হয়ে আছে দীর্ঘ কাল থেকে। তার মধ্যে থেকেও এত দুঃখ সৌদামিনীর! আর তারাচরণই কি সুখী? তা হলে তাঁর দু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়বে কেন? ভাদুড়ীর লক্ষ্য এড়ায়নি জমিদারের সেই অশ্রুরেখা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য যে অভিশাপ, তারাচরণ আর সৌদামিনীই তার প্রমাণ। স্বামীর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সৌদামিনী মুখ বুজেই সহ্য করেছেন, অত্যধিক পানাসক্তি ও অমিতাচারে পঙ্গু স্বামীর সেবা-যত্নেও কুণ্ঠা নেই তাঁর, কিন্তু একমাত্র পুত্রের সঙ্গে পিতার বিচ্ছেদের মর্মদাহে তিনি অর্দ্ধমৃতা হয়ে কোন রকমে বেঁচে আছেন মাত্র। তারাচরণেরই কি কম মনোবেদনা? জলের মতো তিনি অর্থের অপচয় করেছেন যৌবনে, এবং তাতে ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে পেয়েছেন রোগ, যন্ত্রণা ও অস্বাস্থ্য। সেই অনুতাপে তাঁর সারা অন্তর আজ জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যাতনায় প্রতি মুহূর্তেই তিনি মৃত্যুকে কামনা করেন। কিন্তু সাত পুরুষের জমিদারীর মোহ কর্তাবাবু কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। কী অবর্ণনীয় যে তার আকর্ষণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। আর তা নিয়েই তো একমাত্র সন্তান সুমন্তর সঙ্গে তাঁর বিরোধ, শুধু বিরোধ নয়, একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।

জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে দেশে। এক এক করে জমিদারী দখল সুরু করবেন সরকার, এরূপ ঘোষণাও প্রচারিত হয়েছে। বসতবাড়ী সমেত একশ' বিঘে জমি খাস ভিটে হিসেবে রেখে বাকি সমস্ত জমিদারী দেবোত্তর করে দিলেই সরকারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছেন শরৎ হালদার, সুরেন ঘটক, শৈলেন আচার্য প্রভৃতি পারিষদবর্গ এবং তারাচরণও তাই করণীয় বলে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু সুমন্ত তাঁর ঘোর বিরোধী। জমিদার-পুত্র হলেও নতুন ভাবধারার স্পর্শ লেগেছে তার মনে। দেশ আজ আর পরাধীন নয়, বিদেশী শোষণের পথ আজ অবরুদ্ধ, জাতির কল্যাণে জাতীয় সরকার যখন জমিদারীর বিলোপ সাধন প্রয়োজন বলে স্থির করেছেন, তখন দেবোত্তরের আবরণে সেই জমিদারীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাকে সুমন্ত দেশবাসীকে প্রতারণার নামান্তর বলেই মনে করে। এ সে কিছুতেই হতে দেবে না। অথচ পূর্বপুরুষের আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁদের স্মৃতিপূত জমিদারী যেমন করেই হোক রক্ষা করতেই হবে, এই হলো তারাচরণের সংস্কারাবদ্ধ ধারণা। এর মধ্যে কোন মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাই উভয় পক্ষই যেন একটা চরম পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলছিল।

ঠিক এমনি সময়েই রঙ্গমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন সপরিবারে নূতন হেড-মাষ্টার ভাদুড়ী মশাই। কর্তাবাবু ও কর্তামাকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে আসার আগে কর্তার মাথার দিকের দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরাট তৈলচিত্রখানি প্রথমেই চোখে পড়ে অনীতার। সে তার মাকে ডেকে দেখায় সেই ছবিখানি।

: মা দেখেছো, কী সুন্দর ছবি? যেন জীবন্ত বসে আছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

: হাঃ, ভারি চমৎকার তো! এই বলেই মা আর মেয়ে আর সব দেয়ালের বড় বড় তৈলচিত্রগুলোর দিকে তাকাতে যেয়ে চোখ নামিয়ে আনতে বাধ্য হন সঙ্গে সঙ্গেই। বিচিত্র বিসদৃশ সব নগ্ন উলঙ্গ নারীমূর্তি দেখে শিউরে উঠে অনভিজ্ঞা অনীতা এবং তার মা-ও। জমিদারের শিল্পবোধ আঘাত হানে তাঁদের রুচিবোধের ওপর। কিন্তু কোন কিছু তো আর মুখ ফুটে বলার উপায় নেই সেখানে? তাই তাঁরা ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় যাবার সিঁড়ি ধরে নেমে যান নীচের দিকে। নামতে নামতেও সিঁড়ির দু' পাশের দেয়ালে যেমনি সব নগ্ন ছবিই চোখে পড়ে তাঁদের। মন তাঁদের বিষিয়ে ওঠে তাতে।

রাধারমণ পণ্ডিতকে বলে দেওয়া ছিল যে, নতুন হেড-মাষ্টার একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবেন। আর নির্দিষ্ট তারিখের সঙ্গে তার মিলও ছিল। কিন্তু ভাদুড়ী মশাই মনে মনে স্থির করেছেন অন্য রকম। এক দিনও বিলম্ব না করে তিনি আকস্মিক ভাবে স্কুলে উপস্থিত হয়ে দেখতে চান যে, দেবশালার সরকার ও জমিদারের সাহায্যপুষ্ট মাইনর ইস্কুলের শিক্ষাদান কোন্ ধারায় চলে। এ বিষয়ে সুমন্ত তাঁর সহযোগী। ইতিমধ্যেই সুমন্ত তাঁকে জানিয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষ জন-শোষণের অর্থে জনকল্যাণের জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন অর্থাভাবে সেগুলোর অবস্থাও আজ শোচনীয়! দেবশালা পল্লী দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ঔষধ বলতে আর কিছু নেই, কাজেই ডাক্তার কম্পাউণ্ডারেরও কাজও নেই বললেই চলে। গাঁয়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই দীঘি—সাগরদীঘি আর নগরদীঘি—এখন শুধু নামেই তাদের পূর্ব-গৌরব বহন করে চলেছে। অথচ এদের সংস্কার করলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কতো উপকার হতে পারে। এ সবই সুমন্ত দু'ঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে ভাদুড়ীকে।

সহসা স্কুল-বাড়িতে উপস্থিত হয়েই বিস্মিত হয়ে যান হেড-মাষ্টার। আজই আরামের শেষ দিন ধরে নিয়ে রাধারমণ পণ্ডিত এবং আঁর এক জন শিক্ষক এক খেজুরপাতার চাটাইয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলেন তখন নাক ডাকিয়ে। তাঁদের পাশেই জন পনেরো নগ্নগাত্র ছেলে-মেয়ে তালপাতার চাটাইয়ে বসে গোলমাল করছে! আর একটু দূরে আরো একটু বেশী বয়সের দশ বার জন ছাত্র-ছাত্রী মাটিতে ঘর এঁকে গুটি খেলছে দু'ভাগে গোল হয়ে বসে। আর এক কোণের ঘরে বার-তের বছর বয়সের জন চার ছেলে বসে বসে বেশ গল্প জমিয়েছে. তাদের মাষ্টার মশাই তখনো পর্যন্ত স্কুলেই আসেন নি। আর আজই তো শেষ দিন, একটু জিরিয়েই নেয়া যাক্, হয়তো এই ধারণা।

শিক্ষকদের হাজিরা-খাতায় ঐ দিনই নতুন প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁর নাম সই করলেন—শ্রীনীলকমল ভাদুড়ী। মাষ্টার মশাইরা এই দেখে নিশ্চয়ই সবাই চমকে উঠবেন। ছেলে-মেয়েদের চার ক্লাসের চারখানা হাজিরা খাতায় তো নাম কম নেই, তবে উপস্থিতি এত কম কেন? হেড মাষ্টারের মনে প্রশ্ন জাগে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে সারা গ্রামে ঢোল পিটিয়ে আহ্বান জানালেন, বাধ্যতামূলক ভাবে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে। দু'দিন অপেক্ষা করেও দেখলেন। কিন্তু তেমন কোন সাড়াই তো পাওয়া গেল না গ্রামবাসীদের কাছ থেকে।

ভাদুড়ী মশাই তখন তার কারণ অনুসন্ধানে লেগে গেলেন। কিন্তু এ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের এক নতুন শিক্ষা। দেব-শালার গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য বর্ণনার ভাষা নেই তাঁর। এক ছাত্রীর বিধবা মা তাঁকে জানিয়েছেন—বাবা, লেকাপড়া মেয়েকে শেখাতে আমার অমত নেই। কিন্তু ইস্কুলে আমি মেয়েটাকে পাঠাই কি করে? দশ বছরের মেয়ে—না আছে একটা জামা, না আছে একখানা কাপড়—ছেঁড়া ন্যাতা পরে থাকে। এ ভাবে ঘরে থাকাই দায়। তারপরে খেতেই বা দিব কি? সারা দিন আমি গতর খাটাই—মেয়েটা ঘর আগলায়, হয়তো দু'-এক নাদা গোবর কি দু'-চারখানা শুকনো ডাল বা দু'মুঠো শুকনো পাতা জোগায়। তা না হলে যে, যা এক-আধ মুঠো দানা জোগাড় করে আনি তাও সিদ্ধ হবার উপায় থাকে না।

প্রায় সব বাড়িরই এ অবস্থা। পরের জমি চাষ করে যা মেলে তাতে দু'-তিন মাস, বড় জোর বছরে ছ'মাস কোন রকমে চলে। তাও আবার সবার ভাগ্যে জোটে না। তাদের ভরসা দিন-মজুরী জুটলো তো খেতে পেলো, না জুটলে অনশন। ইচ্ছে থাকলেও এরা ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবে কি করে?

একটি ছেলে রোজই টিফিনের সময় সেই যে চলে যায়, আর সে স্কুলে ফিরে আসে না। ভাদুড়ী মশাই সেই ছেলেটির ওপর লক্ষ্য রাখছিলেন ক'দিন ধরে। 'কেন সে এমনি করে রোজ স্কুল পালায়? এক দিন তাকে ডেকে সে কথা জিজ্ঞেস করায় ভয়ে সে কেঁদে ফেলে হেড মাষ্টারের সামনে। তারপর তাঁর অভয় পেয়ে সে খুলে বলে সব কথা। যে ছোট গামছাখানা সে পরে আসে স্কুলে তা পরেই বাড়ির সবাইকে স্নান করতে হয়। তাই বেলা দু'টোর মধ্যে বাড়ি চলে যেতে হয় তাকে এবং সে গেলে তবেই বাড়ির সকলের স্নান-খাওয়া। এ কথা শুনে ভাদুড়ী শিউরে ওঠেন দেবশালার মানুষের দারিদ্র্যের কথা শুনে। এ অবস্থায়ও এদের জমিদারের খাজনা দিতে হয়। তা না হ'লে লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।

অনীতা তার বাবার কাছ থেকে এ গাঁয়ের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার নানা কাহিনী শোনে। তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এ সব কথায়। এমন কি কেউ নেই যে, এদের হয়ে দু'টো কথা জমিদার ও সরকারকে বলতে পারে? সুমন্তকে তো খুব সহানু-ভূতিশীল লোক বলেই মনে হয়। আচ্ছা, তাকে এক বার বলে দেখলে হয় না?—অনীতার মনে প্রশ্ন জাগে।

: আচ্ছা, সুমন্ত-দা', সারা দেশ জুড়েই তো দুঃখ-দারিদ্র্য। কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের মানুষদের মতো এত দুঃখী মানুষ তো কোথাও দেখিনি! এদের পাশে এসে দাঁড়াবার কি কেউ নেই সুমন্ত-দা'?

: কেন থাকবে না অনীতা? তুমিই তো রয়েছ। তুমি যেমন ভাবছো তেমনি হয়তো আরো কেউ কেউ ভাবছে এই সব লাঞ্ছিত মানুষের কথা। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যখন এগিয়ে আসবে, তখন নিশ্চয়ই আর কোন মানুষেরই এমনি অভাব আর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে না।

সে দিন কথায় কথায় সুমন্তর মুখ থেকে এ উত্তর পেয়ে অনীতা জমিদার-পুত্রের দরদী হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে খুশি হয়। তা ছাড়া এ-ও সে লক্ষ্য করেছে যে, গরীব হলেও তাদের প্রতি সুমন্তর কোনরূপ উপেক্ষার ভাব কখনো দেখা যায়নি, বরং তাদের সুবিধা-অসুবিধার নিত্য খোঁজ-খবর নেওয়া তার যেন একটা কর্তব্যের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। ভাদুড়ী মশাই, তাঁর স্ত্রী এবং অনীতা, সবাই একজে সুমন্তর কাছে কৃতজ্ঞ।

নিত্য দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার ফলে অনীতার সঙ্গে সুমন্তর বেশ একটা ঘনিষ্ঠতাও জন্মে যায়। এদিকে আর কারুর নজর না পড়লেও অনীতার মা সুহাসিনীর লক্ষ্য পড়ে। সুহাসিনী গোপনে এ সম্বন্ধে স্বামীকে একটু ইংগিত দিতে গেলে ভাদুড়ী তা হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

: আরে পাগল! তোমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে আসবে ও-সব

রাজা-মহারাজার ছেলে, তাকে বিয়ে করে পাটরাণী করে নেবে, কী সখ!

: যাও, আমি তাই বলেছি না কি? কোথায় আমি আরো সাবধান হতে বললাম যাতে কোন কেলেংকারী না ঘটে, আর তুমি কি ভেবে নিলে?—সুহাসিনী বেশ চালাকি করে পাশ কাটিয়ে যান এই ভাবে। অথচ আসলে কিন্তু তাঁর মনের ভাব অন্য রকম। অনীতাকে সত্যিই যদি সুমন্তর ভালো লেগে থাকে এবং সে তাকে বিয়ে করে, মন্দ হয় না কিন্তু! এই ভাব সুহাসিনীর।

এ ভাবে আরো কিছু দিন কাটে। তারাচরণের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যায়। ইদানীং আরো মুস্কিল হয়েছে কর্তামা সৌদামিনীও শয্যা নিয়েছেন। স্বামী ও পুত্রের মধ্যে যে বিরোধ চলেছে তার কোন মীমাংসা করতে না পেরে ভেবে ভেবেই তাঁর মাথাটা যেন গুলিয়ে গেছে। দাউ-দাউ করে যেন আগুন জ্বলে তাঁর মাথায়। সারা রাত জেগে কাটাতে হয় তাঁকে, একটুও ঘুম আসে না। যদি বা কখনো চোখ বুজে আসে, অমনি 'সুমন্ত, সুমন্ত' চিৎকারে সকলকে ব্যস্ত করে তোলেন তিনি।

সৌদামিনীকে দেখা-শুনো করার ভার নিয়েছেন সুহাসিনী নিজে, আর তারাচরণের শুশ্রূষার ভার পড়েছে অনীতার ওপর। ঝি-চাকরের সেবায় বিরক্তি বোধ করেন তারাচরণ। সৌদামিনীও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তাঁর অসুখ আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

হঠাৎ একটা সোরগোল পড়ে যায় জমিদার-বাড়িতে। অনীতার চিৎকারে লোকজন সব জড়ো হয়ে যায় কর্তাবাবুর ঘরে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ছটফট করছেন তারাচরণ।

: মা অনীতা, তুই কি জানিস সুমন্ত কোথায় আছে? আচ্ছা থাক তোর বাবাকেই একটু ডেকে দে তো মা! তাকেই দুটো কথা বলে যাই।—এই বলতে বলতে হাঁফিয়ে পড়েন জমিদার।

: এই যে আমরা দু'জনেই তো এখানে, বলুন? এই বলে সুমন্তকে হাত ধরে টেনে নিয়ে তারাচরণের সামনে ভাদুড়ী বসে পড়েন মেঝের ওপর।

: না, আমার আর কিছু বলার নেই মাষ্টার! অনেক ভেবে দেখলাম, দেবোত্তরের ফাঁকিতে কোনই লাভ নেই আমার, আমাকে সবটাই ফেলে যেতে হবে। কাজেই তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, তোমরা যা ভালো মনে করবে তাই করবে।

: তা কেন বাবা! তুমি যে সম্পত্তি দেবোত্তর করার কথা এত কাল ধরে ভেবে আসছো, সে সম্পত্তি দেবোত্তরই করা হবে, তবে সে দেবোত্তর হবে মানুষ-দেবতার উদ্দেশ্যে—মানুষকে ফাঁকি দেবার জন্যে তথাকথিত পাথরের দেবতার নামে নয়।

: এই যে কর্তাবাবু, সুমন্ত ঠিকই তো বলেছে। এতে শুধু আপনার নয়, আপনি আপনার যে সব পূর্বপুরুষের কথা গভীর ভাবে ভেবে আসছেন, তাঁদের সকলেরই আত্মা তৃপ্ত হবে গণদেবতার জন্যে আপনার সমগ্র সম্পত্তি উৎসর্গ করা হলে।

: বেশ তো, তাই করো তা হলে। তবে যাবার আগে আরো একটা কথা বলে যাই হেড মাষ্টার! আমি জানি, অনীতা মা আমার সুমন্তকে বড্ড ভালবাসে। মানুষ-দেবতার সেবায় ওদের দু'জনকে মিলিয়ে দাও তুমি! আমার আর সময় নেই, আমি আর তা দেখে যেতে পারলেম না!

এই বলে তারাচরণ যে ঘুমিয়ে পড়লেন, সে ঘুম আর ভাঙলো না।

বসন্ত-বিদায়

বন্দে আলী মিয়া

আমার চৈত্র-রাতি শেষ হলো—শেষ হলো ফুলের স্বপন
বন্ধ দুয়ার হতে ফিরে গেল কর হানি নিশীথ বাতাস।
কুয়াসা-মলিন হলো নিথর ধরণী আর পুবের আকাশ
আমার জীবন হতে বসন্ত যাবে আজি তার আয়োজন।
একটি প্রভাতী তারা মুখ দেখে বারে বারে মাটির ধুলায়,
দেহের পাত্র হতে প্রাণের মদিরা তার পড়েছে উছলি—
প্রদীপ নিবিয়া আসে—থেমে গেছে জনতার রাতের কাকলি,
দিনের যাত্রা শেষে ভীরু পাখী ফিরেছে কি আঁধার কুলায়?
স্মৃতির সিন্ধুতটে ঘুমায়ে পড়েছে মোর একটি অতীত
রাতের প্রহর আর দিনের প্রবাহ যেথা লভেছে বিরতি
বন্ধ্যা বালুর চরে হারায়ে গিয়েছে বুঝি জীবনের গতি—
থামিয়া গিয়াছে আজ চৈত্রি-বেলার মোর পাতা-ঝরা গীত।
পৃথিবী ধূসর হলো—আমার পথের তবু হলো না কো শেষ
এ পথ ঊষর মরু, ঝলিছে বিষের ধোঁয়া অনাগত কালে
জানি না আবার কবে জাগিবে মাধবী দিন মনের আড়ালে
হারায়ে গিয়েছে হায় চৈত্রি-দিনের মোর একটি নিমেষ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

কাজের কথা

শক্তির নব রূপ

যে ত্যাগ মানুষকে শক্তিধর করে ভোগের সামর্থ্য দেয়, সেই ত্যাগ সার্থক। নেতি পথে বিভবময় রাজপাট গড়া যায় না, কৃচ্ছ্রসাধনের আত্মঘাতে আত্মঘাতী হতে হতে মানুষ শক্তিচর্চা ভুলে যায়, দুর্ব্বলতাকে শক্তি বলে ভুল করে বসে। মানুষ মনের অনেক ওপরে উঠলে, তবে ভাগবত শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার কাছে অসি তুচ্ছ, তার চোখের পলকে জগত জয় সম্ভব হয়। নীচের জগতে কিন্তু অসি শক্তির বস্তু রূপ, যে মানুষ সে খড়্গময়ী রূপের অবমাননা করেছে সে ঐ খড়্গমুখেই নিহত হবে। ভগবান অনন্ত সত্য, একটাকে ধরে বাকিগুলোকে ছেঁটে ফেলতে গেলে ঐ একটা খণ্ড সত্যও ঘোর মিথ্যা হয়ে ওঠে। তোমরা শক্তিমান হও, অর্থ শক্তি, জন শক্তি, জ্ঞান শক্তি, অসি বল, ধর্ম্ম বল, কোন বলই ত্যাগ করো না। সবারই সত্য আছে, সবারই ক্ষেত্র আছে, ব্যবহার আছে, ফল আছে। তোমরা শক্তির সন্তান মহাশক্তি; রাজনীতি শক্তিমানের জিনিস, তামসিক নীতিভীরু বৈষ্ণবে রাজপাট গড়তে পারে না।

৩৬ সংখ্যার এই কাজের কথার পর "জীবন কাহিনী" আরম্ভ হচ্ছে ৩৭ সংখ্যা বিজলী থেকে সঙ্কলন ও সঙ্গ্রহ করে। এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় গত ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৮ সালে—ইংরাজি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে। এই সংখ্যায় কালবৈশাখী আরম্ভ হয়েছিল জীবনের একটি মূল সত্যকে ধরে। কালবৈশাখী বলছে—"শক্তি জমাট হয়ে রূপ নিচ্ছে, আবার নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে ভেঙে মুক্ত হচ্ছে—নব সৃষ্টির জন্য। ধ্বংস নাশ নয়—রূপান্তর মাত্র; শক্তি কঠিন হয়ে সৃষ্টির রূপে বদ্ধ হয়েছিল, আবার ভেঙে নব রূপ ধারণের জন্য মুক্ত হচ্ছে। ভারত কালবৈশাখীর মুখে মরে মরে তামস অজ্ঞানের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে হয়ে ভাগবত জীবনে রূপান্তর হচ্ছে।

তার পর চলছে দেশে দেশে কালবৈশাখীর খবর—কেমালীদলের তুর্কী সৈন্যের গ্রীকদের হাতে পরাজয়ের কথা—এথেন্স ও কনষ্ট্যান্টিনোপল থেকে জয়-পরাজয়ের বিপরীত খবর ও কৈফিয়ৎ আসছে। আইরীস নেতাদের ও ডি ভ্যালেরার গরম গরম উক্তি, রুষিয়ায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ এবং কলেরা-টাইফয়েডের দুঃসংবাদ। চীনে ও ইংরাজে ইঙ্গ-জাপ সন্ধি নিয়ে ও সাটং অধিকার নিয়ে মন কষাকষির খবর—এমনি সব ঝঞ্ঝাবাতের দুঃসংবাদে এবার কালবৈশাখীর স্তম্ভটি পূর্ণ। বিজলী নির্ব্বিচারে ডাক হরকরার মত খবর পরিবেশন না করে এই ভাবে পাঠকের বোধগম্য করে গুছিয়ে ছাপতো খবর কালবৈশাখী, পাঁচ মিশেলী ও খড়কুটোর কলমে কলমে।"

৩৭ সংখ্যা বিজলীর প্রধান লেখা দু'টি হচ্ছে "জ্ঞান চাই" ও "নারীর মিনতি"। "জ্ঞান চাই" লেখাটির বক্তব্য সর্ব্বকালের সত্য—সে লেখায় বলছে—"বাঙালী ভাবপ্রবণ, বাঙালী ইমোশন্যাল তাই বাঙালীর অন্তরে ভক্তিযোগ যেমন সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে আর কিছু তেমন নয়। • • • বাঙালীকে নাচতে দাও দু'বাহু তুলে নাচবে, কাঁদতে দাও দু'পা ছড়িয়ে কাঁদবে—কিন্তু বাঙালীকে ভাবতে দাও কিছু বুঝতে দাও, তখন দেখবে যেন তার প্রাণে নেমে এসেছে একটা বিভীষিকার ভয়—বাঙালী হৃদয়কে এমনি কোমল করে ফেলেছে যে, একটু তন্ত্রীর মূর্চ্ছনায় একটু রসের আমেজে তা অসামাল হয়ে ওঠে। • • •

"কিন্তু এই যে ভক্তির প্রেমের রসের চর্চ্চা তা ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যতই মজার হোক—যতই সুখের হোক যতই নেশার হোক, সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শক্তিমান করে তুলতে হলে জ্ঞান চাই—চাইই চাই। • • • হৃদয়ের আবেগে মানুষ আপনাকেই হারিয়ে ফেলে—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে মানুষের মধ্যেকার পরম পুরুষের বড় সমস্তা নেই। • • ভক্তির আতিশয্যে আমরা যেন সোনা কথা না আওড়াই • • • স্বরাজই হোক বা স্বর্গই হোক দুই-ই আত্মোপলব্ধির কথা।"

তারপর "নারীর মিনতি"—সেই চিরন্তন স্তোত্র—"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" আক্ষেপ ও আর্ত্তনাদ করতে করতেই ভারত আড়াই শ' বছরের মাথার ঝুঁটি বুট ছুঁড়ে ফেলে জেগে গেছে, তবু নারী প্রায় যে তিমিরে সেই তিমিরে। পথে-ঘাটে আলো করে সুসজ্জিতা সুরূপা কুরূপা সচ্ছন্দগতি স্বাধীন মুষ্টিমেয় জেনানার দল এখনও বিশাল বন্দী ও সংস্কার-মূঢ় নারীসমুদ্রের ফেনা মাত্র। এই লেখাটির বক্তব্য তাই এখনও সদ্যমুক্ত ভারতে এখনও প্রযোজ্য। লেখাটিতে আছে—'ওগো ঋষি, ওগো অতীতের সাধনার যুগের সত্যদর্শী সাধক, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কবে কোন দিন তোমার দিব্য জ্যোতিরুদ্ভাসিত পবিত্র হৃদয়ে এই মহাবাণী ধ্বনিত হয়েছিল, এই মহাসত্য উপলব্ধির গোচর হয়েছিল? সে দিন তুমি মুক্ত কণ্ঠে, মেঘগম্ভীর স্বরে—যেমন করে সেই বৈদিক যুগে আদিম সমুদ্রতীরে বসে প্রথম প্রভাতোদয়ে বেদবেত্তা ঋষির উদাত্ত স্বরে সামবেদ-ধ্বনিতে সিন্ধুসৈকত ধ্বনিত করেছিলে। তুমিও তেমনি পবিত্র, তেমনি মধুর সুললিত ছন্দোবন্ধে গেয়ে উঠেছিলে—

"এস নারী, এস মাতা, দেশ তোমাকে চায়। তুমি না জাগলে এ নিদ্রিত দেশের মহানিদ্রা কে আর ভাঙবে, মা? এ জড়তা কে ঘুচাবে, জননি?" * * *

"এও কি সম্ভব! জগতের কর্মক্ষেত্রে সকলের স্থান হতে পারে, কিন্তু আমাদের কোন দিন কি স্থান হবে? সেই মহাযজ্ঞশালায় চির অশুচী আমাদের ডাক পড়বে? * * * আজ কালের পরিবর্তনে শিক্ষিত বাঙালীর অন্তশ্চক্ষু খুলে গেছে, সম্ভ্রমে রোমাঞ্চিত কলেবরে তারা বলছে—'মায়ের কোলে ছেলে নয়, ও যে দেশ—ও যে পুরাতনের সবটুকু আবার নূতনের কত কি! * * * তাই বলি দান করবে তো মানুষকে তার হারান মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দাও।

"এ বার এ ভাবের তরঙ্গ এসেছে যদি তবে একে নিষ্ফলে যেতে দিও না, নারীকে এই স্রোতে ঠেলে ফেলে দাও। ঐ যে বিগত স্মৃতির স্তূপ, অতীত প্রীতির ভগ্নাবশেষ, মহাগৌরবের অস্তাচল, ও তো অনেক কাল অমনি পাষাণ প্রতিমার মত কালস্রোতের দিকে চেয়ে বসে আসে। নীরবে নিঃশব্দে সর্বস্ব অপহরণ করতে দিয়েছে। এবার পার যদি বাঙালী, নারীকে নিয়ে অবগাহন কর।

"বহুকাল এই অন্ধকারে থেকে আমরা বাস্তিলের কয়েদীর মত আলোক যে কি পদার্থ তা' ভুলে গেছি। হে নবীন বাসুদেবের দল! তোমরা এই ধ্বংস-কারাগার হতে দেবকীর মত আমাদের উদ্ধার কর। * * *

"আজ তারা ধর্ম মানে না, কর্ম জানে না, সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়েছে। তবু এই ক্রিয়াকাণ্ড বিবর্জিত অজ্ঞানের প্রতিমূর্তি শিথিল-বন্ধন জীবন-তরণীগুলির মধ্যেই দেখতে পাবে এত অত্যাচার চক্রান্ত সহ্য করেও ধর্মের পবিত্রতার যে আলোক জ্বালছে তা তোমাদের মধ্যে বুঝি নেই।" এই সুরে গোটা লেখাটি জীবন্ত ও গীতমুখর।

তার পর এই ৩৭ সংখ্যায় আছে উপেনের লেখা উনপঞ্চাশী ও বন্ধুবরের চিঠি। এ সংখ্যার উদ্ধৃতি দু'টি "কাজের কথা" দিয়ে শেষ করি।

কাজের কথা

পণ্ডশ্রম ও সার্থক কর্ম

কাজকে সহজ করতে হবে, আনন্দের করতে হবে, ফলপ্রসূ করতে হবে। অনেক পণ্ডশ্রম করে বহু শক্তি ব্যয় করে একটুখানি ফলের নাম অকাজ। পরিমিত পরিশ্রমে অনেকখানি ফল পেতে হবে, একটুখানি শক্তির যথাযথ ব্যয়ে পাহাড় ধ্বসিয়ে দিতে হবে। এইটি হয় না যদি কর্মত্যাগের ওপর গড়া না হয়। হৃদয়ের অন্ধ-আবেগে কাজ মানেই অনেকখানি ছুটাছুটি, অনেক বার হাতড়ানো, অনেকটা উত্তেজনার অপব্যয়। যা' হোক একটা আপাতরমণীয় লক্ষ্য ধরে বেগে ছুটতে পারলেই কাজ হয় না। একাধারে জ্ঞানী, আনন্দময় ও শক্তিধর পুরুষই ভাবী ভারত গড়বার অমিতবল কর্মী, সেই জ্ঞানে মানুষকে শান্ত স্থিতধী করে, দূরপ্রসারী দৃষ্টি দেয়; আনন্দে মানুষকে ধারণ করে ও কামনার অন্ধ আবেগ থেকে মুক্তি দেয়, আর শক্তিতে মানুষকে অজেয় করে। জ্ঞানীর মুক্ত অনায়াস সার্থক কর্মই তোমাদের আর্য্যজীবনের কর্ম।

কাজের কথা

বন্ধন ও মুক্তির কর্ম

মানুষের জীবনে এমন একটা দিন আসে যেদিন সব পরিচিতই তার কাছে অপরিচিত হয়ে দাঁড়ায়, কোন ছোট আনন্দেই আর তার মন ভরে না। টাকার মোহ, ঘরের স্নেহ, কর্মের নেশা সবই তার ছুটে যায়। যাদের এত দিন এত বড় করে দেখেছিল তারা সবই তার চোখের কাছে শুষ্ক বদরীর মত ছোট হয়ে যায়। নূতন জীবনের অজানা টানে সে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সেই দিনই তার বন্ধনের কর্ম শেষ হয়ে যায়।

তৃষিতা ধরিত্রীর বুকে বর্ষাবারিপাতের মত ভগবানের করুণাধারা যে দিন তার জীবনে নেমে আসে, অন্তরের স্পর্শে যে দিন সে আবার নিজেকে নূতন করে খুঁজে পায়, ক্ষতের সব রক্ত চিহ্ন যেদিন চন্দনের লেপ হয়ে দাঁড়ায়, দুঃখের স্মৃতি যে দিন আনন্দের আবেগে ভরে কেঁপে ওঠে, অন্তরের দৈন্য যে দিন ভাগবত ঐশ্বর্য্যে পরিণত হয়, হৃদয়-উৎসার আনন্দধারা যেদিন শতমুখী হয়ে বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে ছোটে—সেই দিন আবার মুক্ত জীবনের কর্মের আরম্ভ।

৩৮ সংখ্যা বিজলী প্রকাশিত হয় ২০শে শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল, ইংরাজি ৫ই আগষ্ট, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। এই সংখ্যার কালবৈশাখী হচ্ছে—

"পাগলে মাতালে মিলিয়া করেছে হট্টগোল,
দে দোল—দোল!"

মানুষের প্রাণ আজ বিষয়ের নেশায় মাটি কামড়ে পড়েছে, তার আর নড়বার শক্তি নেই। মানুষের মন আজ পাগলের মত খেয়াল কল্পনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, আজ যা' গড়ছে কাল তা' ভাঙছে। তাই দুনিয়ায় আজ শুধু হট্টগোল।

হে শান্ত, হে মহান্, হে সুন্দর—আজ তুমি মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তাকে নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দাও।

কালবৈশাখীর খবরের মধ্যে আছে—আপার সাইলেসিয়ায় সৈন্য পাঠাবার ফরাসী মৎলব নিয়ে বৃটেন, ফ্রান্সে ও জার্মানীতে মন কষাকষি ও গরম গরম পত্রালাপ চলছে। গ্রীক সৈন্যের হাতে কামাল পাশার বাহিনী পর্য্যুদস্ত ও সন্ধির চেষ্টা চলছে। পারস্য আফগানিস্থান ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বল্‌সেভিক দূত রূপে এম্ ক্রসিনফের কার্য্যকলাপের সংবাদ ও আফগান দূত ওয়ালি খাঁর সহসা বিলাত যাত্রার রহস্যজনক খবর কালবৈশাখী দিচ্ছে।

এ সংখ্যার প্রধান লেখা হচ্ছে 'ভাগবত জীবনের ভিত্তি' ও 'নারীর পথ।' প্রথম লেখাটি বড় চমৎকার! তা থেকে উদ্ধৃত করি—"ভগবান চির নূতন তাই চির সুন্দর। প্রত্যেক যুগান্তর হয়ে গেলে মানুষের অন্তর ভরে এই চির-নূতনের ডাক আসে, সে আবার নূতন করে সুন্দর হতে সুন্দরতর হতে চায়, তাই জগত ভরে তখন সৃষ্টির সাড়া পড়ে যায়। আজ সেই রকম একটি মহাযুগান্তরের সন্ধিক্ষণ এসেছে, তাই মানুষের বুক জুড়ে ভগবানের উষা আজ সোণার আলোয় মানুষের সকল অন্তরধাম আলো করেছে।"

এই লেখাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে পণ্ডিচারীর দিব্য রূপান্তরের সাধনার আশা, এক নূতন জগত রচনার সংকল্প। তখন আমরা

পালা ক্রমে শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে এই সব পারমার্থিক প্রেরণা ও সত্য মন ভরে গ্রহণ করছি। ১৩২৮ সালের শ্রাবণের এই ৩৮ সংখ্যা বিজলী লিখছে,—ভগবান নেমেছেন। তাই এবার তাঁর শক্তি ধারণ করে অটল শান্ত যোগযুক্ত থাকতে পারে এমন শত শত অহঙ্কারমুক্ত আধার চাই। যে যে হৃদয়ের গোপন মন্দিরে তাঁর শঙ্খ বেজেছে তাদের এখন শুদ্ধ হবার যুগ। তাই বিজলী ডাক দিয়ে বলছে, 'যেখানে যে আছ জীবন যোগময় কর অহঙ্কার থেকে মুক্ত হও, সাধনায় শক্তি লাভ কর।" এই যে ভাগবত শক্তির অবতরণের ডাক এ ডাক যুগে যুগে মানুষের জীবনে আসে, যখনই বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্যের মত বিরাট আধার মানুষের ক্রমপরিণতির পথে উদয় হয়। আসলে ভগবান তো নেমেই আছেন, শক্তি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন? ক্ষুদ্র মানুষ, অজ্ঞান মানুষ ভেদবুদ্ধির বশে তাঁর সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে পৃথক বোধে দেখে, অহঙ্কার নাশ করতে ছোটে এই আধারস্থ অহং বুদ্ধিকে ঐশী রূপায়নের অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র রূপে না ধরে একে ঊর্দ্ধগতির অন্তরায় বলে ধরে নেয়। অহঙ্কার অন্তরায় বটে, পথও বটে সেই অহঙ্কারই; এই অহঙ্কারের বলেই গণ্ডী সীমা ভেঙে তুমি বিরাট স্থিতির মাঝে উঠে বুঝতে পার তুমি শিব, আবার এই জীববুদ্ধির কোষে নেমে তুমি দেখ তুমি জীব বা মানুষ। এই সৃষ্টির তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সিন্ধু চির-বিরাজমান, মানুষের জগতে তার জোয়ার-ভাঁটা দেখে মানুষ বলে তার প্রগতি ও ক্রমপরিণতির কথা; আসলে গতি নাই, বন্ধন নাই, আছে গতি ও বন্ধন মুক্তির বোধ।

"ভাগবত জীবনের ভিত"—এই লেখাটিতে বড় সুন্দর জ্ঞানগর্ভ ভাষায় বোঝান রয়েছে সমর্পণের কথা বিজ্ঞানে রূপান্তরের কথা। শ্রীঅরবিন্দের জীবন কালে এসেছিল তাঁর পথের পথিক অনুরাগী-জনের মাঝে ঊর্দ্ধগতির এই এক পরম আকূতি, তাঁর অকস্মাৎ দেহাবসানে সে স্বপ্ন গেছে ভেঙে। তবু মানুষের 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র এই ডাক এই আহ্বান তার সমগ্র জীবনসিন্ধুর জোয়ার, বিশাল অনন্ত জলরাশির মধ্যে তা' বোঝা না গেলেও সাগর সংযুক্ত নদনদী খালে-বিলে সে জলোচ্ছ্বাস কূল ছাপিয়ে দেখা দেয়।

এই ৩৮ সংখ্যা বিজলীতে দ্বিতীয় সম্পাদকীয় লেখাটি হচ্ছে "নারীর পথ"—সেই নারীর চিরন্তন প্রশ্ন। একটি ১৭ বৎসরের বিবাহিতা বধূর ভাগবত জীবন লাভের চেষ্টায় পরিবার পরিজনদের দিক থেকে বাধার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র নিয়ে এই লেখাটির সূচনা।" বিজলী বলছে—"আমরা জাতি হিসাবে যত দিন মরে পড়েছিলাম, নারীও তত দিন স্বতোধিক মরণে মরে শবের সঙ্গে শব হয়ে সংসার করেছে। এখন পুরুষরা জ্ঞানে বিদ্যায় দেশপ্রেমে ভাগবত জীবনে কত উঁচু প্রেরণার স্পর্শে বেঁচে উঠছে, তাই নারীরও মধ্যে সেই নতুন জীবনের তাড়িত-প্রবাহ জেগেছে; তাই নারীও আজ বাঁচতে চায়, ভগবানের আনন্দ বৃন্দাবনে সেও আর মরে থাকতে চায় না, সেও জীবনের বৃহৎ স্পর্শ ও পূর্ণ আস্বাদ নিতে ব্যাকুল হয়েছে।

* * * *

এদেশে ছেলেদের মধ্যে রাজনীতিক মুক্তির স্বাদ জাগতে না জাগতে ছেলেরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে মা-বোন ভুলে দেশমায়ের পায়ে মরণ অবধি বেছে নিয়েছিল, তার ফলে আজ দেশের নামে একটা মাত্র ডাকে হাজার হাজার ছেলে ভবিষ্যতের ভয় ভাবনা ভুলে বেরিয়ে পড়ে। আমাদের দেশের নারীর মধ্যে সে বান কি এসেছে, সে সাড়া কি জেগেছে? আজও তা জাগে নাই যে তা' ঐ জাগা-মেয়েদের জ্ঞানকৃত অবহেলায়। তোমরা যারা জ্ঞান শক্তি ও স্বাধীনতা (অবরোধ থেকে) পেয়েছিলে তারা তো লাখ লাখ অন্ধ-মূক বোনেদের দুঃখের কথা ভাব নাই, তাদের জন্ত আত্মস্বার্থ বলি তো দেও নাই। ফাঁকি দিয়ে পরের মুখ চেয়ে মুক্তি কি কেউ পায়?

যাদের বাঁধন কম ও অর্থ আছে তারা দুই-তিন বছর এই ব্রত জীবন-ব্রত কর যে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে বই লিখে কাগজ লিখে আশ্রম গড়ে ধর্ম্ম-জীবনের স্পর্শ দিয়ে মেয়েদের মাঝে মুক্তির স্বাদ জাগাবে।

* * * *

স্বাধীন মেয়ে ঢের আছে; মাদ্রাজের মেয়েরা অবরোধের দুঃখ জানে না, পাঞ্জাবে তা' নেই। কিন্তু তাই বলে কি তারা উন্নত? তবে মুক্ত অবাধ জীবনে যা সুলভ অর্থাৎ সাহস, বল, ভরসা ও বহির্জগতের জ্ঞান তাদের আছে, তাও বড় কম লাভ নয়। * * * পুরুষের সঙ্গে ঘুরে নকল রাজনীতি না করে জাগা-মেয়েরা একত্র হয়ে মেয়েদের জীবনের সমস্যা পূরণ কর। * * এ জাত ভগবানগত জীবন, একে তোমরা বিদেশী আদর্শের নকল আলোয় গড়তে পারবে না।"

৩৮ সংখ্যা বিজলী সমস্তটাই পরম উপভোগ্য সম্ভারে পূর্ণ। এ সংখ্যায় উপেনদার উনপঞ্চাশী থেকে কিছু অংশ 'বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিই।

উনপঞ্চাশী

* * কলমটা বেশ করে বাগিয়ে বসেছি, লেখাটা বার হবে হবে করছে, এমন সময় অন্দর দুয়ার হতে কে যেন হেঁকে বললে, "ওরে! লিখিস নি, মারা যাবি।" কলমটা হাত থেকে আপনি খসে পড়ে গেল, আর বুকের সেই ভাবের কাঁপুনিটা একেবারে হৃদকম্পে পরিণত হলো।

লিখে সত্ত সত্ত মরবার ইচ্ছে মোটেই আমার নেই—অক্টোবর কাবার হবার আগে তো কিছুতেই নয়। কারণ আমি শুনেছি, পরাধীন অবস্থায় মরলে স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের কাপড় কাচবার ধোপা হতে হয়, আর স্বাধীন জাতির লোকেরা মরে হয় সেখানকার নন্দন কাননের পাহারাওয়ালা। তিনটে মাস চোখ মুখ বুঁজে কোন মতে কাটিয়ে দিতে পারলেই, লেখটার বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো, "ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়!" তা'হলে নন্দন কাননের পাহারাওয়ালার পোষ্ট কিছুতেই ফসকে যাবে না। * * * পেটের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে এতটা কষ্ট পেয়েছি যে, বড় সাধ যায় দেবতাদের মত এক বিন্দু অমৃত পান করেই অনন্ত ক্ষুধা জয় করি। নন্দন কাননে পাহারা দিতে দিতে দেবতাদের বয়াটে ছেলের নষ্টামি কিছু চোখে পড়লেই একেবারে তার জীবন ধারণের কোন Ostensible means নেই বলে তাকে গ্রেপ্তার করে বসবো। তখন খালাস পাবার বিনিময়ে দু'কোটা অমৃত

সে কবুল করবেই। তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ক্ষুধার অবসান, আর দেবত্ব লাভ।

স্বর্গের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লুম, হাত-পায়ে খিল ধরে গেল। * * * দৃষ্টি হারিয়ে শক্তি হারিয়ে নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে কাছিমের মত হাত-পা সব গুটিয়ে নিলুম। এমনি করে যেন দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গেল।

সহসা এক সময় ফট করে একটা আওয়াজ হোল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন হাইড্রোজেনের চাইতেও হাল্কা হাওয়ায় ভেসে ভেসে উপরে উঠতে লাগলুম। * * * আওয়াজটা হয়েছিল ব্রহ্মরন্ধ্রভেদের, আর শরীরটা সূক্ষ্ম হওয়ায় হয়েছে অতটা হাল্কা। ব্যোমে ভেসে স্বর্গে যাচ্ছি, ভেবে বেশ আরাম পেলুম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, মুক্তকেশে ধুলোয় লুটিয়ে দু' হাতে বুক চাপড়ে 'হা নাথ, হা নাথ' বলে গিন্নী আমার কাঁদছেন। তাঁকে বললুম, অমৃতের সন্ধান পাব, কেঁদে মায়া বাড়িও না।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে এতটা ওপরে উঠলুম যে, সেণ্টপলের গম্বুজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, অক্টারলোনী মনুমেণ্ট, একে একে সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

• • • •

এই তো নন্দন-কানন। কিন্তু বাপ রে! এ যে অগণ্য অসংখ্য প্রহরীর দল গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝলুম, ইউরোপের যুদ্ধে স্বর্গের প্রহরী-সংখ্যা এত অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। আমি একেবারে ভড়কে গেলুম। আমার রোগা দুর্বল অস্থিসার কঙ্কাল এই দেহ দেখে তাড়িয়ে দেবে, অমৃত আর জুটবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় দেখি পাঁচ হাত উঁচু হিটলারী ঢঙের একটি লোক বোধ হয় প্রহরীদের মোড়ল ইসারায় আমায় ডাকছে। আমার তিন বছরের সঞ্চিত পিলে নড়ে গেল। যাক বাবা আমার অমৃত খেয়ে অমর হওয়া, এখন প্রাণে বাঁচলেই হয়। সরে পড়বার আয়োজন করতেই সে এসে আমায় চেপে ধরলে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটুও ব্যথা পেলুম না।

সে হেসে আমায় জিজ্ঞেস করলো,—পালাচ্ছিলে কেন?

'আজ্ঞে না, পেছন ফিরে আপনার দিকেই যাচ্ছিলুম।'

লোকটা হো হো করে হেসে উঠলো, জিজ্ঞেস করলো, 'পেছন ফিরে আসছিলে কেন?' তার সরল হাসি শুনেই আমার দুরু দুরু চিত্ত খানিকটা সহজ হয়েছিল, তাই সহজভাবে জবাব দিলুম, 'আজ্ঞে, আমাদের দেশে এই রকম নিয়মই প্রচলিত হয়েছে। দুনিয়ার লোক এত দিন ঠেলাঠেলি মারামারি করে অগ্রগমনের পথটাই স্বর্গের পথ ভুল করে ছুটছিল আর মরছিল। তাই দেখে আমরা স্থির করেছি যে, স্বর্গটা সামনের দিকে নয়, পিছন দিকেই। আমাদের দেশের লোকেরা তাই সহর ছেড়ে গ্রামে ফিরছে, সহর ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকছে, কল-কারখানা ভেঙে ফেলে তাঁত-চরকা প্রতিষ্ঠা করছে। আর এতে করে আমাদের জাতটা স্বর্গের এত কাছে এসে পৌঁচেছে যে, অমৃতের গন্ধ পেয়ে দেশের ভাত-জলে আর তাদের রুচি হচ্ছে না, তাই যত তারা জন্মাচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশি মরে স্বর্গে আসবার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সব শুনে লোকটা মুখ টিপে খালি একটু হাসলে, তার পর বললে, "কিন্তু তোমরা যে স্বর্গে এলেও ত্রাণ পাবে না, এখানকার দেবতাদের কাপড় কাচতে হবে।"

আমি দেখলুম লোকটা অনেক খবরই রাখে না। গম্ভীর হয়ে বললুম, "সে ভয় আর আমাদের নেই। অক্টোবরে সে কাঁড়া আমাদের কেটে গেছে।"

লোকটা ভ্রূ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলে, "ইংরেজ তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছে?"

"আজ্ঞে এখনও আছে ঠাট-পাট বজায় রেখে, কিন্তু সে একেবারে ফাঁকা আর শূন্য—আমরাই সরে দাঁড়িয়েছি।"

"দেশ শাসন করছে কে?"

"আজ্ঞে শাসনের বালাই নেই—আমরা এখন অনুশাসন মাথা পেতে নিতে শিখেছি।"

লোকটা কিছু কাল চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষা, শিল্পকলার উন্নতি নিজেরাই তোমরা করছো?"

লোকটা দেখলুম একেবারে সেকেলে। নতুন জগতের কোন কিছু খবরই রাখে না। আমি বললুম, "জীবনের complexity ঘোচানোই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষাকে আমরা বেশ সহজ করে নিয়েছি, তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তে পারলেই চলবে। স্বাস্থ্যহানির মূল কারণই হচ্ছে বেশি খাওয়া, সেইজন্যই আমরা এক বেলা আধপেটা খাবার ব্যবস্থা করেছি। এক কথায় মশাই আমাদের নতুন কিছু গড়তে হয়নি—জীবনের প্রায় সবই বাদ দিয়েছি।"

লোকটার চোখে-মুখে নিষ্ঠুরতার ভাব ফুটে উঠলো, গম্ভীরনাদে সে হেঁকে বললো, "এই কে আছ, নিয়ে যাও একে, দেবতাদের কাপড় কাচবে।"

আমার সারা দেহটা ঝিম-ঝিম করে উঠলো। চোখ মেলে চেয়ে দেখি [illegible] কবিরাজ আমার নাড়ী ধরে বসে আছে।

তখন গান্ধীজীর এই দেশি নেতৃত্বের কথা চলছে। উপেন ভায়ার এই উদ্ভট কাহিনীই তার নমুনা। যে নিষ্ঠুর পাপের কশাঘাতে তাঁর চরকা কাটা, তাঁত বোনা [illegible] শক্তি পীঠ চলেনি, [illegible] যে নেতৃত্ব পাপের ভূত এই সব মুক্ত [illegible] না। তাই উপেন ভায়ার প্রকৃত [illegible]।

পরের লেখাটি হচ্ছে—"মেয়ে ভূতের চিঠি।"

ঠিকানা—কলকাতার [illegible] এই শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল। রবিবার।

মহাশয়েষু,

আপনার চিঠির-ঝাঁপিতে এক জন কুমারীর চিঠি পড়ে মর্মাহত হলাম না, কারণ বিষয়টা অনেক দিনই ও বিষয়ে হত হয়ে এখন ভূতত্ব পেয়েছে। শুধু আমার নয়, সমস্ত নারী সমাজেরই প্রায় এই অবস্থা! আর এ ভূত যেমন তেমন ভূত নয়, এ একেবারে গলায়-দড়ে ভূত! আত্মহত্যা আর অপঘাতের তাণ্ডব নৃত্য ভারতের নারী আসরকে খুব জাঁকিয়ে তুলেছে। * * * যাক সেই অজানা কুমারীটিকে লক্ষ্য করে আমি সমস্ত কুমারীর দলকেই অর্থাৎ কাঁচা-ডাঁসা সকলকেই দু'চারটে কথা বলতে চাই। * * *

বলি তোমাদের বিয়ের বাজার দিন দিন চড়ে যাচ্ছে দেখে যে কাঁদচো কাটচো ! কিন্তু কোন উপায় করতে পারছো কি ? * * * কখনও পারবে কি না তার ঠিক নেই। * * * অশ্রুর বন্যা ছুটিয়ে কারু স্বার্থকে ভাসাতে পার আর না পার, নিজেরা বেশ ভেসে চলেছ। আমিও এক দিন ঐ বন্যায় ভাসতে ভাসতে ডুবে যাই। তার পর মরে ভূত হয়ে বাঁশ গাছের মগডালে আশ্রয় পেয়েছি। এখন তোমাদেরও সেই মরণ পথের যাত্রী হতে দেখে ভারি দুঃখু হচ্ছে। * * * তা' তোমরা কান্না বন্ধ কর দেখি, তা' হলে এক দণ্ডে এ জল শুকোবে আর তোমাদের পাও মাটিতে ঠেকবে। দেখ, ভাল জিনিসটা যদি বিগড়োয় ত ভারি বেয়াড়া রকমই বিগড়োয় ! এই দেখ না কেন দুধ, কেমন উপাদেয় জিনিস ! যদি পচলো তো গুয়ের গন্ধকেও হারিয়ে দেয়। সেই রকম তোমরা সব মহাশক্তির অংশ। * * * এবার তোমরা নিজেকে চিনতে শেখ, দেখ তোমরা কি না করতে পার। যে মুহূর্তে তোমরা নিজেদের গুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে সেই মুহূর্তে জগতের স্বার্থান্ধ শেয়াল-কুকুরের দল তোমাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাবে। * * * এই দেখ না পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ ধর্ম্মঘট করে করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিচ্ছে। * * * তোমরাও কেন সকলে মিলে ধর্ম্মঘট করে বল না—বিয়ে আমরা করবো না। ব্যস্ ! * * * বিয়ে না করলেই এক দফায় দাসীত্ব ঘোচা আর স্বরাজ পাওয়া—নিজের হৃদয় রাজত্ব নিজের হাতে আসা কি কম লাভ ? * * আর তিন দফায় বরের বাপের ১৮ হাজার টাকার স্বর্গখানিও বানের জলে ভেসে যাওয়া। চার দফায় এম্-এ বি-এ সেজুড় জোড়া বর মশাইদের শ্বশুরের ভিটে বেচবার বিবেক বুদ্ধির মাথায় বজ্রাঘাত করা হ'লো। পাঁচ দফায় বাপ-মাকে পাগল হতে হলো না, উপরন্তু তাঁদের ভিটেটিও রয়ে গেল।"

মেয়ে ভূত এমনি নয় দশ দফা লাভের হিসাব দিয়ে উপসংহারে বলেছেন—যদি বল মা-বাপ শুনবে কেন ? সংসারে এমন কোন মা-বাপ নেই যিনি সন্তানের সংসাহসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সাধ করে কি কেউ নিজের সন্তানের গলায় ফাঁসী দেয় গা ? তোমরা পাছে মনে কষ্ট পাও বোলে বেচারারা নিজের গলায় ভিক্ষের ঝুলি বেঁধেও তোমাদের বিয়ের জন্যে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে বেড়ান। যদি প্রসন্ন মনে বল বিয়ে কিছুতেই করবো না, তা' হলে তো তাঁরা বেঁচে যান। * * * কেনা-বেচার হাটবাজারে বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমের বাষ্প গন্ধও থাকতে পারে তা' তোমাদের মত জ্যান্ত মানুষে বিশ্বাস করলেও আমাদের মত মরা ভূতরা বিশ্বাস করে না। * * * অনেক কথাই বলে ফেললাম, ভূত বলে অগ্রাহ্য করো না নইলে নিজেরাই ঠকবে। আমার আর কি, আমি যে বাঁশ গাছে সেই বাঁশ গাছেই থাকবো। তবে তোমরা এসে আমার জায়গাটুকু দখল করে পাছে, এইটুকুই ভয়।

তোমাদের হিতৈষিণী ভূত।

এ সংখ্যায় "বন্ধুবরের চিঠিখানি" আরও উপাদেয়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করলাম না। তার পর "কাজের কথা"।

এক কোটি টাকায় কি না হোত ?

দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, সেখানে কেউ যদি বলে চাল বন্ধ করে দিয়ে সবাই ছাতু খেয়ে থাকো কি দু'মুঠো ঘাসের বীচি খাও, সেটা যেমন দেশের অন্ন জোগাবার পথ নয়, অন্ন মারবারই পথ, তেমনি আমরা যদি বলি শুধু চরকায় বোনা সুতার কাপড়ই পড়বো আর সব বাতিল, তা' হলে ঠিক সেই রকম হয় না কি ? আমরা বলি এ সঙ্কট কালে দেশের তৈয়ারী যা' পাও পর, আর চেষ্টা কর যাতে সামান্য সুতাগাছিটি অবধি বিদেশ থেকে না আসে। এই যে এক কোটি টাকা উঠলো ইচ্ছে করলে এই টাকাকে ভিত্তি করে ভারতে একটা ম্যাঞ্চেসায়ার গড়া চলে। কিন্তু দেখে বড় দুঃখ হয় যে বুদ্ধিকে আমরা বিদেয় দিয়ে কাজে নামছি। গাছের বাকল, পাটের চট আর কলাপাতা পরলে কোপনী আটলে তো এখনই বস্ত্র সমস্যা মেটে। কিন্তু সে রকম করে নগ্ন ভারতের বস্ত্র সমস্যা তো ভারত জুড়েই মিটে আছে। মোটা ছালার মত কাপড়ই তো তোমার দেশের ভাই-বোন অধিকাংশই পরে, তবে তারা গরীব। ক'টা বড় লোক ক'দিন সখ করে মোটা খদ্দর পরবে ? শেষটা দেশের কাজ যে সঙ বাজীতে দাঁড়াবে তা'তে তো তোমাদেরই মুখ হাসবে, দাদা। স্কুল ছাড়ায় মুখ হেসেছে, আদালত ছাড়ায় দু'খেচ, আর কেন ? এবার ক্ষেমা-ঘেন্না দিয়ে কাজের পাকা গাঁথনী কর।

এ সব স্বদেশী যুগের—মহাত্মার নন্-কো-অপারেশনী যুগের পুরাতন কথা। গান্ধীজীর সংগৃহীত এক কোটি টাকার অপব্যয়ের আপশোষ। এখনও স্বাধীন ভারতের নেতারা এমন বহু অকাজে ইমোশনের তাড়নায় হাত দেন, যাতে দেশের কল্যাণ হয় না, হয় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। সরকারী বনমহোৎসব তারই একটি আধুনিক নমুনা। সখ করে বড় বড় রাষ্ট্রনেতারা সরকারী গভর্ণর গভর্ণরপত্নীরা কোদাল হাতে মাটি কেটে লক্ষ বকুল, পলাশ চারা রুইলেন, তার আশী হাজার গেল মরে। বনসম্পদ বৃদ্ধি ভাল জিনিস, তাকে নিয়ে এমন নাবালকের খেলার কোন সার্থকতা নাই। লোক হাসে, টাকার শ্রাদ্ধ হয়, জাতির জীবন গুছায় না।

এক কাপ চায়ের পশ্চাতে

খৃষ্টপূর্ব ১৭৩৭ সালে এক চীনা সম্রাটের বাগানে এক পার্টিতে প্রথম পরিবেশিত হল চা। আমাদের মধ্যে এর ব্যবহার মাত্র তিনশো বছরের। ১৬৫৭ সালে চা প্রথম এল ইউরোপে। তখন চা ছিল ধনীর পানীয়। এক পাউণ্ড চায়ের মূল্য ছিল ছয় পাউণ্ড থেকে দশ পাউণ্ড। অর্থাৎ একশো টাকার কিছু কম-বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখছি, ইউরোপে চায়ের বেশ প্রচলন হয়ে গেছে। ডক্টর জনসনের মত ব্যক্তি বলছেন, I am a hardened and shameless tea-drinker। ১৮২৩ সাল অবধি পৃথিবীর যাবতীয় চা আসত চীন দেশ থেকেই। তার পর চায়ের চাষ করে সুফল পাওয়া গেল উত্তর-পূর্ব ভারতে। আজ ১,০০০,০০০ একর জায়গা জুড়ে চায়ের চাষ করা হচ্ছে। ভারতীয় প্রথম চায়ের জাহাজ গিয়ে লণ্ডনের ডকে নোঙর করল ১৮৩১ সালে। চায়ের রপ্তানীতে বিশ্বে এর পরই সিংহলের স্থান। কফির ব্যবসায়ে লোকসান খেয়ে ভারতের প্রায় ত্রিশ বছর পরে সিংহল এ ব্যবসায়ে এগিয়েছিল।
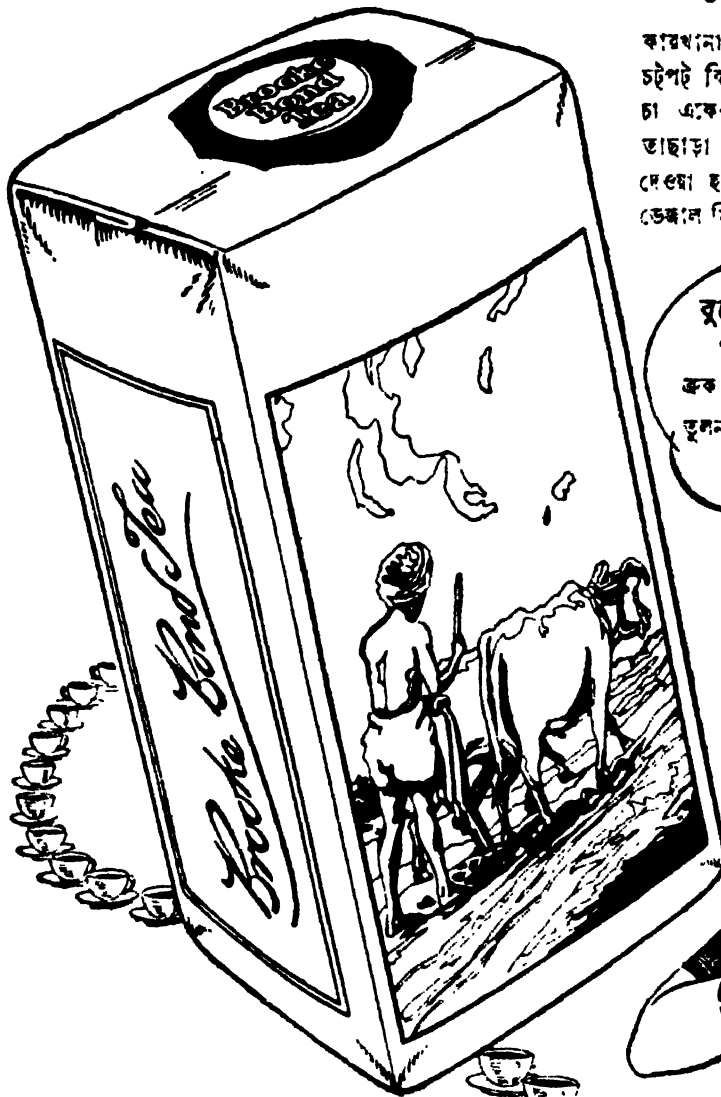
একেবারে তাজা ব'লেই
সবার প্রিয় !
কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চটপট বিলি করা হয় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা ত থাকেই, তাছাড়া মোড়কে পুরে সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে ধুলোবালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না।
বুঝেসুঝে কিনুন ও পয়সা বাঁচান !
ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ সুস্বাদু চা পাবেন !
এই কারণেই
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে কেনেন !

জিমি…
আর মলি…
…আর জিমি

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্রের আরম্ভেই কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ক্যাসুয়েরিনা, বুগেনভিলিয়ার স্তবকময় বর্ণসম্ভারে যখন রঙিন হয়ে ওঠে কলকাতার বসন্ত, ময়দানের সোনালী-সবুজ গাছগুলোর অন্তরাল থেকে ভেসে-আসা কোকিলের কুহু কূজনে আনমনা হয়ে ওঠে এসপ্লানেডের ট্রাফিক পুলিশ, দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় ঝির-ঝির করে ফুটপাথের হকারদের পাতাবাহার মন,…ডেলহাউসি স্কোয়ারের লোক-ঠাসাঠাসি অফিসের কর্মব্যস্ততায় সে সবের কোনো খবর পায় না এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে-স্টেনোগ্রাফার। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি সক-সক ফ্যাকাশে আঙুলগুলোর বর্ষণ ঝরিয়ে যায় টাইপ মেশিনের উপর, সাহেবের ডাক এলে খাতা-পেন্সিল তুলে নিয়ে ডিক্টেশান নিতে ছোটে, আর ফিরে এসে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে হিসেব করে, মাস কাবার হতে আর কতো দিন বাকি।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পেরিয়ে পাঁচটা বছর কেটে গেছে মলি মার্টিনের। ভোরে ভোরে উঠে বাজার করে ফিরে এসে চা-টোস্ট-পরিজের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরী করে স্বামীকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, মেয়েটিকে দুধ খাইয়ে পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ি জনসনের জিম্মায় রেখে এসে, তাড়াহুড়ো করে মুখে পাউডার ঘসে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে ছুটতে ছুটতে ওয়েলেসলি স্ট্রীটে এসে ট্রাম ধরেছে। অফিসে এসে কাজ করে গেছে যন্ত্রের মতো, দেশ-বিদেশের নানা লোকের নামে নানা রকম চিঠি টাইপ করে গেছে, লাখ লাখ টাকার ব্যবসার চিঠি, আইন বে-আইনের চিঠি, নতুন কর্মচারী নিয়োগের চিঠি, পুরোনো কর্মচারী ছাঁটাইয়ের চিঠি। আর তারই ফাঁকে মাঝে-মাঝে মনে পড়েছে, এখন মেয়েটির দুধ খাওয়ার সময়, বুড়ি জনসন তাকে ঠিক মতো খাওয়ালো তো, নাকি রকিং চেয়ারে বসে উল বুনতে বুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে! প্রৌঢ় স্বামী জনি মার্টিন হয়তো অফিসে-অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্ডারের সন্ধানে। কী গরম বাইরে, জনির পিঙ্গল মুখ হয়তো ঘামে চক-চক করছে। কাল শনিবার, বাড়ি ফিরতেই হয়তো জনি দশটা টাকা ধার চাইবে ফ্লাইং-এক্সেলের উপর ধরবে বলে। প্রতিজ্ঞা করবে শনিবার সন্ধ্যেবেলা পঁচিশ টাকা ফিরিয়ে দেবার—জিতলে মদ খেয়ে ফিরে আসবে, হারলে মুখ চুণ করে ফিরে এসে বলবে, দিনকাল খারাপ, ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়, হিকস এ্যাণ্ড কুইন কোম্পানীতে হাজার দশেক টাকার বিল পড়ে আছে, সেটা আদায় হলে দিয়ে দেবে। সে বিল আদায় কোনো দিনই হয় না, টাকাও ফেরত পায় না মলি মার্টিন।

মলির বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হোলো, কিন্তু আজও সে ঠিক মতো জানলো না জনি মার্টিনের কিসের ব্যবসা। জিজ্ঞেস করলে বলে অর্ডার সাপ্লাই। কিসের অর্ডার? কেন, যে কোনো কিছুর, ষ্টেশনারী, হার্ডওয়ার, মিলষ্টোরস, স্ক্র্যাপস্। যুদ্ধের সময় নাকি প্রচুর পয়সা কামিয়েছে সে, কিন্তু কোথায় গেল সে পয়সা? কেন, ইনকাম ট্যাক্স দিতে দিতেই সব শেষ হয়ে গেছে। মলি, তুমি মেয়েমানুষ, তুমি ফাইন্যান্সের কি বোঝ? সুখ ছিলো বৃটিশ আমলে। এই নেটিভ ইণ্ডিয়ানদের হাতে পাওয়ার আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যে কি ট্রাবলসাম হয়েছে বলবার নয়! যা আয় করবে, তাই ইনকাম ট্যাক্স বলে নিয়ে যাবে। থাকবো না এ দেশে, চলে যাবো সাউথ-আফ্রিকায় নয় অস্ট্রেলিয়ায়। মার্টিনেরা খাঁটি ইউরোপীয়ানের বংশধর, তার ঠাকুর্দা নাকি একটি সাহেব হাউসের ডিরেক্টার ছিলো। আজ, এই মুহূর্তেই চলে যেতো জনি মার্টিন, তবে এশিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একটি তিরিশ হাজার টাকার বিল পড়ে আছে……

প্রথম প্রথম জানতে চাইতো মলি, তার পর নিস্পৃহ হয়ে গেল। নিজের দেড়শো টাকার মতো মাইনে, সবটাই ঢেলে দিতো সংসারে, কালে-ভদ্রে জনিও দিতো দশ-বিশ টাকা। জনি কিছু আয় করতো নিশ্চয়ই, তা নইলে জনি ওয়াকার, ব্ল্যাক নাইটের বোতলগুলো কিনতো কি দিয়ে? কিন্তু কিছু বলতো না মলি। থাকগে, ওর পয়সা দিয়ে ও যা করবে করুক, কে জানে হয়তো কোনো ব্যাপারে মস্তো ঘা খেয়েছে জীবনে, হয়তো সত্যি সত্যিই পয়সা ছিলো এক কালে, বড়লোকের অভ্যেস আর ছাড়তে পারে না। মদের বোতল কেনবার পয়সা না থাকলে এক এক সময় মলিই দিয়ে দিতো নিজের হাত খরচের সঞ্চয় থেকে—কারণ, মদ না খেলে অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে উঠতো সে, আর খিটখিটে লোক মলি সহ্য করতে পারে না। আর মদ যতো বেশী খেতো ততো বেশী ভালোবাসতো মলিকে। মলিকে খুব ভালোবাসে জনি মার্টিন, মলির অভাব-বিপর্যস্ত জীবনে এটুকুই একমাত্র শ্যামলিমা। সন্ধ্যের পর সে বাইরে থাকতো না বড়ো একটা, মলিকে ছাড়া কোনো দিন কোনো ড্যান্সে যেতো না, মলি ছাড়া আর কারো সঙ্গে নাচতো না, কিন্তু আর কেউ এসে মলির সঙ্গে নাচতে চাইলে কখনো কিছু মনে করতো না, আর প্রত্যেক রোববার সকালবেলা মলিকে নিয়ে যেতো সাড়ে দশটার সিনেমার শো'তে।

সেদিনও অফিসে বসে টাইপ করতে করতে জনির কথাই ভাবছিলো মলি। জিমির জেল হয়ে যাওয়ার পর কী বিপদেই না পড়েছিলো মলি। জনিই এসে বাঁচিয়ে দিলো মলিকে। সে না এলে হয়তো, কে জানে, হয়তো গলায় দড়ি দিতো মলি—

জিমি। জীবনের প্রথম রঙিন স্বপ্নগুলো জিমিকে দিয়ে।

জিমির জেল হয়েছিলো চার বছরের জন্যে। তার পর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি তার।

সেই জিমি এদ্দিন পর হঠাৎ টেলিফোন করলো মলিকে।

"ম্যাগিট সাহাব।" বেয়ারা এসে বলল।

খাতা-পেন্সিল নিয়ে উঠে পড়লো মলি। দরজা ঠেলে ম্যাগিট সায়েবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

"য়েস্ সার?"

"নিউ ইয়র্কের চিঠিটা হয়েছে?"

"নট য়েট সার!"

ম্যাগিট সায়েব মেঘগর্জন করলো।

"এক্ষুণি এনে দিচ্ছি সার!"

নিজের জায়গায় ফিরে এলো মলি মার্টিন। পাশের টেবিলে কাজ করছিলো মাদ্রাজী টাইপিষ্ট কৃষ্ণাস্বোয়ামি। তাকে বলল, "দিস ফেলো ম্যাগিট একটি বরাহ। দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত পোনেরোটা চিঠি ডিক্টেট্ করেছে আর আশা করছে যে, আমি চারটের মধ্যে সব করে দেবো।"

"তোমার পক্ষে খুব শক্ত কিছু নয়," কৃষ্ণাস্বোয়ামি দাঁত বার করে বলল।

"আজ শরীরটা ভালো নেই।"

"দেখে তো মনে হচ্ছে না।"

"খুব ক্লান্তি বোধ করছি।"

"তোমায় খুব অন্যমনা দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার? নতুন বন্ধু-ট্রেণ্ড পাকড়েছো নাকি?"

কোনো উত্তর দিলো না মলি মার্টিন। চিঠি টাইপ করে গেল চুপ-চাপ। চিঠি শেষ করে বেয়ারাকে দিয়ে সায়েবের কামরায় পাঠিয়ে দিলো।

মাথাটা তখন টনটন করছে। হাত দিয়ে রগ দুটো টিপে ধরে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো মলি।

পাশের টেবিলের টাইপ মেশিনে অবিরাম খট্‌খট্ শব্দ। তারই প্রতিধ্বনি জাগলো মলি মার্টিনের মনে। সেই প্রতিধ্বনির রেশ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল পাঁচ বছর আগে যখন আরেকটি এমনিতরো অফিসে নতুন টাইপিষ্ট হয়ে ঢুকছিলো সবে স্কুল থেকে বেরুনো মিস্ মলি উইলসন আর পাশের টেবিলে বসে টাইপ করতো নীল চোখ আর সোনালি চুল রূপসুন্দর এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে জিমি।

আলাপ হয়ে গেল প্রথম দিনই। শনিবার দিন একসঙ্গে চাইনিজ খেতে গেল ব্লেইন্ড ক্লাবে, মাস কাবারে মাইনে পেয়ে একই সঙ্গে নাচতে গেল ফ্লোনাড্রাইভে। তার পর ফেরার পথে মলিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলো দুজনে। মামুলি টাইপিষ্ট হয়ে যে কিছু হয় না, জিমি যদি একটি পোষ্টাল কোর্স নেয় সেক্রেটারিয়েল প্র্যাকটিসে তাহলে যে জেমস্ মরিসন কোম্পানীতে ভালো চাকরি পাবে সেই গল্প— মামুলি টাইপিষ্ট হয়ে যে কিছু হয় না, মলি যে ষ্টেনোগ্রাফি শিখলে হারবার্ট ফ্রেজার কোম্পানীতে বেশী মাইনের চাকরী পাবে সেই গল্প। গল্প কিছুতেই ফুরোতে চায় না। জিমি আর মলি হাঁটতে-হাঁটতে মলিদের বাড়ির নীচে অবধি গেল। সেখানেও কাবার হয়ে গেল একটি ঘণ্টা। মলির মা বারান্দায় এসে দেখে গেল কয়েক বার। শেষ পর্যন্ত দূর গির্জার ঘড়িতে যখন বারোটা বাজতে সুরু করলো আর পূর্ণিমার চাঁদ ঢলে পড়লো সামনের ম্যানসন বাড়িটির ছাতের পর জলের ট্যাঙ্কগুলোর পেছনে, মলির মা হাঁক দিলো উপর থেকে, "মলি, তুমি কি আজ রাতে আর বাড়ি ফিরছো না?"

"জিমি, কী চমৎকার কাটলো আজকের সন্ধ্যা— আমার আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না", মলি বলল জিমিকে।

"আমারও না।"

"জিমি!"

"মলি!"

"আমি তোমার অনেক সময় নষ্ট করলুম।"

"মলি!"

"কি?"

"একটি কথা বলবো তোমায়?"

"বলো।"

"আচ্ছা, আজ থাক, আরেক দিন—

"না, না, আজই বলো।"

"বলবো?"

"হাঁ, বলো।"

"আমি জীবনে কোনো দিন কাউকে ভালোবাসিনি, মলি!"

"কী এমন বয়েস তোমার? এক দিন না এক দিন কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই ভালোবাসবে।"

"অদ্দিন কেউ অপেক্ষা করবে না, মলি। আমার মনে হচ্ছে আমি আজই এক জনকে ভালোবেসে ফেলেছি।"

"কাকে, জিমি?"

"মলি, তোমাকে।"

"জিমি!"

কিন্তু জিমি অপেক্ষা করলো না। হন্‌হন্ করে দৌড় মারলো

একটা দারুণ ধাক্কা দিয়ে নিজের পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল জিমির

মোড়ের দিকে। মোড়ের কাছে গিয়ে এক বার দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

মলি হাত ঢেউ খেলালো।

জিমিও হাত নাড়লো। তার পর অন্তর্ধান করলো নির্জন নিথর হয়ে আসা বড়ো রাস্তার আধো-অন্ধকার আবছায়ায়।

সোমবার দিন অফিস থেকে ফেরার পথে দু'জনে গিয়ে নিউ মার্কেটের ভিতর একটি স্টলে চা ও প্যাটিস্ খেতে বসলো।

"কাল আমার উপর রাগ করেছিলে মলি?"

"হ্যাঁ।"

একটু চুপ করে রইলো জিমি। মুখ ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, "সত্যি, আমার ও কথা বলা উচিত হয়নি। যাক, সে কথা ভুলে যাও মলি।"

মলি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, "না জিমি, সে জন্যে নয়।"

"তা' হলে?"

মলি তার কালো গভীর চোখ দুটো জিমির নীল বিষণ্ণ চোখ দু'টির উপর রাখলো। হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল লাল টকটকে ঠোঁট দুটোর কোণে।

আস্তে আস্তে বলল, "জিমি, কাল তুমি আমায় গুড নাইট জানিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে।"

জিমির হৃদয় দীঘির বুকে চাঁদের ছায়ার মতো দুলতে লাগলো।

"তুমি আমায় ভালোবাসো, মলি?"

"তুমি যেন জানতে না।"

"আমি খুব গরীব, মলি!"

"আমিও।"

একটু চুপ করে রইলো জিমি। তারপরে বলল, "তোমায় একটা কথা বলবো মলি? আমার বাবা' কে, সে কেউ জানে না। আমার জন্ম দেবার সময় আমার মা মারা যান। কেউ ছিলো না যে ডাক্তার ডাকবে বা মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আমি প্রায় খেতে না পেয়ে বড়ো হয়েছি।"

মলি জিমির হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো।

"এর জন্যে তুমি আমায় ঘৃণা করবে না মলি?"

মলি আস্তে আস্তে বলল, "আমি তোমার মতো এতো অভাগা নই জিমি, কিন্তু আমার জীবনও সুখের নয়। আমার বাবা মাকে ছেড়ে আরেকটি মেয়েছেলের সঙ্গে থাকে, যার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি। মা আমায় অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছে।"

"আমায় বিয়ে করবে মলি?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

"তুমি আর আমি যে দিন এ মাসের মাইনেটা পাবো।"

এত খুশি হোলো জিমি যে, মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না, অনেকক্ষণ পর বলল, "মলি, এসো এক কাজ করি। কালকের দিনটা আমাদের এনগেজমেন্ট সেলিব্রেট্ করি।"

"কি ভাবে?"

'এসো, কাল অফিস পালাই।'

'তার পর?'

"সকাল বেলা আলীপুর চিড়িয়াখানায়, দুপুরে সিনেমা, রাত্তিরে ফার্পোতে ডিনার। দু'জনে নাচবোও একটুখানি। তার পর দু'বোতল বিয়ার খেয়ে বাড়ি। হায় রে, যদি শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করা যেতো! যাক, তার জন্যে ভেবো না মলি, আমাদের বিয়ের রজত জয়ন্তীতে শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা হবে, আমি কথা দিয়ে রাখছি।"

"কিন্তু কাল অফিসে যে যেতেই হবে?"

"কেন?"

"জরুরী কাজ আছে।"

চিড়িয়াখানা আর সিনেমার প্রোগ্রাম বাতিল হোলো। রইলো শুধু ফার্পোয় ডিনারের প্রোগ্রাম।

"কিন্তু বেশ কিছু টাকা খরচা হবে যে!"

"কি আর খরচা হবে?" জিমি বলল, "আমি চাকরী করছি আজ এক বছর, এরই মধ্যে চল্লিশ টাকা জমিয়েছি। তার থেকে কিছু ভেঙে খরচা করা যাবে।"

"আমিও কিছু জমিয়েছি। দু'জনে মিলে খরচা করা যাবে।"

"না, না, এ খরচা আমার একলার।"

"সে হবে কেন? বিয়ে কি তুমি একলা করছো নাকি?"

তার পরদিন অফিসে সারা দিন কাজে ডুবে রইলো ওরা দু'জনে, এ টেবিলে মলি, ও টেবিলে জিমি। ট্যাপ ডান্সিং-এর পদক্ষেপের মতো ছন্দোময় হয়ে উঠলো তাদের টাইপ রাইটার দুটো। আর তারই তালে-তালে বেজে চলল তাদের হৃদয়ের অর্কেষ্ট্রা।

বেলা শেষ হয়ে আসছিলো। এমন সময় মলির সায়েব তাকে ডেকে পাঠালো। কোম্পানীটা ইউরোপীয়, কিন্তু সম্প্রতি এক বিশেষ ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায়ের লোক এটি কিনে নিয়েছিলো। মলির সায়েব সেই সম্প্রদায়েরই এক জন।

তার ভাঙা-ভাঙা ব্যাকরণ বিহীন ইংরেজীতে বলল, "মিস টমসন, আমি তোমার কাজ কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি। বেশ কাজ করছো। তোমার ভালো চান্স পাওয়া উচিত। চান্স পেলে সেটি অবহেলা কোরো না। জীবনে চান্স বেশী আসে না।"

"য়েস্ স্যর!"

"সত্যি কথা বলতে কি আজ তোমার একটি চান্স এসেছে। আমার সেক্রেটারী মিস ফ্রেজার আজ অফিসে আসেনি। সে অসুস্থ। তুমি হয়তো জানো যে, আমরা মাঝে মাঝে আমাদের কোনো-কোনো ব্যবসায়ী বন্ধুকে এক একটা ঘরোয়া পার্টি দিয়ে থাকি। সেখানে অনেক অফিসিয়াল কথাবার্তা হয়, যার নোট নেওয়ার জন্যে এক জন স্টেনো রাখতে হয়। সে অবশ্য পার্টিতে আমাদের অন্য সবারই মতোই এক জন অতিথি হিসেবে যোগ দেয়। অফিসের বাইরে আমরা ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ রাখি না। তুমি কি শর্টহ্যাণ্ড জানো?"

"নো, স্যর!"

"তা' হলে তো মুশকিল! আর কা'কে বলা যায়?"

"মিসেস মরিস্ আছেন, পারচেস্ অফিসারের স্টেনো।"

"না:, ও বড়ো কুৎসিত দেখতে। ওকে দেখলে অতিথিরা টেবিল ছেড়ে পালাবে। তোমার মতো স্মার্ট আর অল্পবয়েসী মেয়েই আমার দরকার। ঠিক আছে, তুমি সব কিছু লং-হ্যাণ্ডেই নোট করবে। তোমায় ছুটি দিলাম। বাড়ি চলে গিয়ে রেডি হয়ে

নাও। আমার গাড়ি সাড়ে সাতটায় গিয়ে তোমায় তুলে আনবে।"

"আজ ?"

"হ্যাঁ, কেন ?"

"আজ তো আমি পারবো না। আমার অন্য কাজ আছে। আর আমি অন্য দিনও যেতে পারবো না।"

"কেন ?"

"আমার মা পছন্দ করেন না যে, আমি সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরুই।"

"ও, আচ্ছা, তুমি যেতে পারো। আর হ্যাঁ, আমি যে ষ্টেটমেণ্ট-খানি টাইপ করতে দিয়েছি, সেটি হয়েছে ?—না, না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওটা শেষ করে দিয়ে তার পর বাড়ি যাবে।"

সেদিন সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত বসে কাজ করলো মলি ; কিন্তু কাজের ভারটি অনুভব করলো না মোটেও। জিমি বসেছিলো পাশে।

জিমির সঙ্গে বাইরে খেতে গেল ফার্পোয়, কয়েক পাক নাচলো। তার পর বাড়ি ফিরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার পরদিন অফিসে যখন সবাই খুব কাজে ব্যস্ত, দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে মল্লিক সাহেব তার খাস কামরা থেকে বেরিয়ে এলো : বেরিয়ে এসে সোজা চলে এলো জিমির টেবিলে।

জিমি উঠে দাঁড়ালো।

"কাল একটি জরুরি রিপোর্ট টাইপ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই ?" বললে মল্লিক সাহেব, "সেটি দেখি একবার ?"

"সেটা এখনো তৈরী হয়নি স্যর !"

"কেন ?"

"লম্বা রিপোর্ট। সময় নেবে।"

"হুঁম্…আচ্ছা, তুমি তো এখন অনেক টাকা কামাচ্ছো, না ?"

"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যর !"

"আমাদের কানে এসেছে যে, আমাদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী আমাদের এক জন টাইপিষ্টকে ঘুষ দিয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্ট টেণ্ডারগুলোর কোটেশান জেনে নিচ্ছে। স্বচ্ছল অবস্থা তো তোমার ছাড়া আর অন্য কোনো টাইপিষ্টের দেখছি না !"

"আমার অবস্থা স্বচ্ছল ? আপনি নিশ্চয়ই কিছু ভুল বুঝেছেন স্যর !"

"বলছো ? কিন্তু জিমি ছোকরা, তোমার মতো সামান্য টাইপিষ্ট ক্লার্কের পক্ষে তো ফার্পোয় গিয়ে ডিনার খাওয়া আর নাচবার কথা নয়, তাও একটি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে। সুন্দরী মেয়ের তো আজ-কাল অনেক দাম—"

"স্যর্ !"

"শাট আপ্। এদ্দিন অফিসে চাকরী করছো, এই এটিকেট তুমি আজো শিখলে না যে, যেখানে অফিসার আর ডিরেক্টারেরা যায় তাদের সন্ধ্যে কাটাতে, সেখানে পেটি ক্লার্কদের যেতে নেই ?"

"স্যর্, আমি—"

"স্যর তুমি একাউণ্টস্ থেকে তোমার এক মাসের মাইনে নিয়ে চলে যাও। তোমার কাগজপত্র সব মিস টমসনকে বুঝিয়ে দাও। তার পর যতো তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে দূর হয়ে যাও।"

নিজের ঘরে ফিরে গেল সায়েব।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো জিমি। সারা অফিস নিথর, নিস্পন্দ !

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মলি। কিছুক্ষণ মাত্র। তার পর গট-গট করে সোজা সায়েবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

"য়েস্ মিস টমসন ! তোমার কি চাই ?"

"আপনি জিমিকে তাড়িয়ে দিলেন কি এ জন্যে যে, কাল আমি আপনাদের সঙ্গে না বেরিয়ে জিমির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, আর আপনি আমাদের ফার্পোয় দেখেছেন ?"

"আমায় কি তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে ?"

"দেবার হিম্মত আপনার নেই। আপনি একটি কাওয়ার্ড, আপনি একটি সোয়াইন, আপনি একটি র‍্যাস্কেল, আপনি একটি স্কাউন্ড্রেল—"

মলি রাগে হাঁফাতে লাগলো।

"এ অফিস যদি তোমার ভালো না লাগে, তুমি ও তোমার বয় ফ্রেণ্ডের অনুগমন করতে পারো।"

জিমির সঙ্গে সঙ্গে মলিও বেরিয়ে এলো।

তার পর সুরু হলো দু'জনেরই জীবন-সংগ্রাম। বিয়ে করবার কথা দূরে থাক, খাবার পয়সা আয় করাই সমস্যা হয়ে উঠলো। মলির মা ছিলো, সে কাজ করতো একটি দোকানে। মলির যদিও বা চলতো জিমির একেবারেই চলতো না। মা'কে লুকিয়ে জিমিকে যতোটা সম্ভব সাহায্য করতো মলি। কিন্তু কিছু দিন পর মলির মা হঠাৎ হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। তখন মলির দুর্গতি হোলো সব চেয়ে বেশী।

এই দুর্দিনের প্রথম দিকে মলির সান্ত্বনা ছিলো জিমির সাহচর্য। সিনেমায় বা ট্রিঙ্কাস্ বা ডাকে যাওয়া আর হয়ে উঠতো না, কিন্তু

"ও, আচ্ছা, তুমি যেতে পার"

ময়দান খোলা পড়েছিলো তাদের জন্যে। প্রত্যেক দিন বিকেলে সেখানেই ঘুরে বেড়াতো ওরা আর বিহ্বল কোকিলের তীক্ষ্ণ কুহু-কূজনের মায়ায় ডুবু-ডুবু সূর্য যখন ময়দানের পশ্চিমের গাছগুলোর ডালপালা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইতো আরো কিছুক্ষণ, তখন ঘাসের উপর বসে চীনেবাদাম খেতে খেতে আগামী দিনের রঙিন গল্প করতো ওরা দুজনে।

তার পর একদিন মলি লক্ষ্য করলো, জিমির চেহারা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। তার চোখের সেই লাজুক দৃষ্টি নেই, সে দৃষ্টি অনাহার-অত্যাচারে ধারালো হয়ে উঠেছে ডাস্টবিনের পাশের কুকুরের মতো। দূর থেকে যাদের সঙ্গে সে মিশতে দেখলো তাকে, তারা খুব ভদ্রশ্রেণীর লোক নয়। মলি তাকে একদিন বোঝালো, দু'দিন বোঝালো।

জিমি শুধু বললে, "সে পয়সা কামাবার চেষ্টা করছে।"

মলি বলল, "তুমি আমার কথা কি একটুও ভেবে দেখছো না?"

কয়েক দিন পর জিমি বলল, সে একটি চাকরী পেয়েছে। খুব খুশি হোলো মলি। জিমি ওকে নিয়ে গেল সিনেমায়, চা খাওয়ালো নিউ মার্কেটে। তার পর মলিও একটি চাকরী পেলো চৌরঙ্গীর একটি দোকানে। মাইনে খুব সামান্য। তা হলেও চাকরী। কিন্তু দিনে দশ ঘণ্টা কাজ। বেশী বেরুনোর উপায় নেই। জিমিও আসতে পারে না। তারও নাকি কাজের চাপ। জিমি চিঠি লিখতো মলিকে। মলিও চিঠি লিখতো জিমিকে।

এমন সময় মলির জীবনে এলো জনি মার্টিন। জনির বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। সে নাকি মলির মায়ের কোন এক ছেলেবেলার বন্ধুর ছোটো ভাই। দেখে-শুনে মনে হয়, পয়সা আছে। দু'-পাঁচ-দশ টাকা সাহায্য করে মলির মাকে। শোনা যায়, সে নাকি নানা রকম কি সব ব্যবসা করে।

মলির মা বললে, "মলি, তুই জনিকে বিয়ে কর, সুখে থাকবি।"

মলি বললে, "না।"

জনি মার্টিনকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করলো জিমি আর মলি।

তার পর কিছু দিন জিমির দেখা নেই। জিমি যেখানে থাকতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলো মলি। জিমি আরেকটি ছেলের সঙ্গে একটি ঘর ভাগাভাগি করে থাকতো। সে মলিকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে আমতা-আমতা করে বললে, জিমি একটু বেরিয়েছে। ফিরতে দেরী হবে। কয়েক দিন পর জিমির ওখানে আবার গেল মলি। শুনলো জিমির ফিরতে রাত হবে। আরও কয়েক বার গিয়ে পেলো না।

তখন মলি একটি চিঠি লিখলো জিমিকে।

তার কোনো উত্তর এলো না।

মলি পর-পর আরো দুটো চিঠি লিখলো কয়েক দিন অপেক্ষা করবার পর।

এবারও উত্তর এলো না।

আরো কয়েক দিন অপেক্ষা করবার পর মলি আরেকটি চিঠি লিখলো—তার মধ্যে এ-কথা সে-কথার পর লিখলো, "তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার জরুরী দরকার। কিন্তু দেখা তো কিছুতেই হয়ে উঠছে না। তোমার ওখানে গেলেই শুনি তুমি খুব ব্যস্ত। যাক, কেন দেখা করতে চাই সেটি অগত্যা চিঠিতেই লিখতে হচ্ছে। আমাদের আজকের দিনের এ একটা ট্র্যাজেডি যে অর্থনৈতিক কারণে বিয়েটা যদিও ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম, এবার সামাজিক কারণে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি চাই না যে আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করুক। সে যদি তোমার মনঃপূত না হয়, তা হলে অগত্যা আমায় জনি মার্টিনকেই বিয়ে করতে হয়। যাই হোক, আমায় এসে এক বার বলে যাও তোমার কি অভিপ্রায়। লাইট হাউসে রোমিও-জুলিয়েট হচ্ছে। যদি কাল আসো তো একসঙ্গে দেখা যাবে—মলি।"

জিমি এলো তার পর দিন। কি রকম যেন রুক্ষ চেহারা হয়েছে।

"এদিন ছিলে কোথায়?" মলি জিজ্ঞেস করলো।

সে কথার উত্তর না দিয়ে জিমি বলল, "তুমি যে মা হতে চলেছো, সে কথা আমায় এদিন বলো নি কেন?"

"তোমায় পাবো কোথায় যে বলবো?"

জিমি চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তার পর বললে, "জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।"

"কেন?"

জিমি আস্তে-আস্তে সব কথা বলল মলিকে। চাকরী-বাকরী সব বাজে কথা। ও-সব কিছু ছিলো না জিমির। সে যে-সব কাজ করতো, সে-সব অসামাজিক, বে-আইনী। তারই একটির দরুণ সে সম্প্রতি দিন কুড়ি-পঁচিশ হাজত বাস করে এসেছে।

"শহরটাকে ছাড়তে হবে মলি! কোথাও কাজ-কর্ম একটা দেখতে হবে। চোর আর বদ ছেলের সঙ্গে থেকে এদিন যা করছিলাম, সে তো আর চলবে না।"

মলি অবাক হয়ে শুনছিলো।

জিমি মলির হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল, "তুমি দুঃখ কোরো না মলি! একটু দেখে নিই আমি। ভালো হয়ে যাবো। তোমাদের কাছেই যে ফিরে আসতে হবে আমাকে।"

কয়েক দিন জিমি যাওয়া-আসা করলো আগের মতো। তার পর আবার তার দেখা নেই।

খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলো, সম্প্রতি একটি মোটর গাড়ি চুরির ব্যাপারে হাতে-হাতে ধরা পড়েছে জিমি। বাঁচবার রাস্তা নেই। জেল হয়ে যাবে।

"কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিলো—"

মলির নামে চিঠি ছিলো একটি: "মলি—আমায় ক্ষমা কোরো। টাকার দরকার বলে শেষ বারের মতো একটি অন্যায় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। তুমি যদি আমার জন্যে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করো তো ভালোই, যদি না করো, তো আমার কিছু বলবার নেই।"

মলি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিলো—।" সে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিখানি। জিমির জেল হয়ে গেল চার বছরের জন্যে। মলি বিয়ে করে ফেলল জনি মার্টিনকে।

• • • •

সেই জিমি এদ্দিন পর হঠাৎ টেলিফোন করলো মলিকে। তখন সবে লাঞ্চের ছুটি হয়েছে, এমন সময় টেলিফোন এলো।

"মলি ?"

"হ্যাঁ। তুমি কে ?"

"জিমি।"

"জিমি !!"

"হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে অনেক দরকার আছে। কদ্দিন দেখা হয়নি। পাঁচ বছর, না ? ছেলেটি কতো বড়ো হোলো ?"

মলি কোনো উত্তর দিলো না :

"মলি, এক কাজ করো। বিকেলে অফিস-ফেরত পার্ক স্ট্রীটের সেই টী-রুমটিতে এসো, হ্যাঁ, যেটিতে তুমি আমি প্রায়ই বসতাম।"

"কিন্তু আমার যে অন্য কাজ আছে ?"

"ও-সব আজকের মতো বাদ দাও, মলি ! এসো, কেমন ?" বলে আর উত্তরের অপেক্ষা রাখলো না, লাইন ছেড়ে দিলো।

* * * *

"আমি জানতাম তুমি আসবে," জিমি বলল।

মলি তাকিয়ে দেখলো জিমকে। একটু মোটা আর বেশ একটু রাশভারী হয়েছে জিম। চোখ দুটো এখনো নীল, কিন্তু অমি এমিটিকিন 'ব্লো-লাইটের মতো দৃষ্টি। পরনে দামী স্যুট, দামী টাই, দামী জুতো।

জিম তাকিয়ে দেখলো মলিকে। এখনো সেই আগের মতো সুন্দর দেখতে, তবে চোখের সেই চপল হাসি আর নেই, অভাব-অনটনের কালি পড়েছে চোখের নীচে। সস্তা ছিটের ফ্রক, যদিও ছাঁট খুব স্মার্ট। পায়ে সস্তা স্যুয়েডের জুতো, গোড়ালি এক পাশে ক্ষয়ে-যাওয়া। কিন্তু সেই রক্তিম সূর্যের মতো ঠোঁট, প্রথম ঊষার মতো গায়ের রঙ আর এপ্রিলের আকাশের মতো উজ্জ্বল প্রশান্ত দৃষ্টি এখনো আছে।

"আমি জানতাম তুমি আসবে," জিমি বলল।

"আমি স্থির করেছিলাম আমি আসবো না," বলল মলি।

"কিন্তু এলে তো !"

"এলাম শুধু তোমায় এটুকু বুঝাতে দিতে যে, আমি তোমায় এতখানি গুরুত্ব দিই না যে তোমায় এড়িয়ে চলতে হবে।"

জিমি হাসলো।

"অন্য যে কোনো পুরোনো চেনা-জানা আমার কাছে যা তুমিও এখন তাই জিমি, তার বেশী কিছু নয়।"

"তুমি তো জনি মার্টিনকেই বিয়ে করেছো শেষ পর্যন্ত ?"

"হ্যাঁ।"

"প্রথম ছেলেটি কোথায় ?" জিমি একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলো। খুব নরম, স্নেহপ্রবণ শোনালো তার কথাগুলো।

"নষ্ট হয়ে গেছে", সাদাসিধে বিহ্বলহীন পরিষ্কার উত্তর এলো।

কান্নার ছায়া নেমে এলো জিমির মুখের উপর।

"জনি মার্টিন কি রকম লোক ?"

"খুব ভালো।"

"ওকে তুমি এখন খুব ভালোবাসো বুঝি ?"

"খুব। ও আমার স্বামী। আমাদের একটি মেয়ে আছে। খুব মিষ্টি মেয়ে।"

জিমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করতে গেল। পারলো না।

"জীবনটাকে আর আগের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, না মলি?"

"অন্তত তোমার আমার সম্পর্কে সে চেষ্টা নিরর্থক।"

"হুঁম।" চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলো জিমি। তার পর আস্তে আস্তে বলল, "যাক, যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে। তা নিয়ে আর হা-হুতাশ করে লাভ নেই। আমার কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল।"

"কি কাজ?"

"যে কাজের জন্তে তোমায় ডাকিয়ে এনেছি। ভয় ছিলো যে, আমার জন্তে তোমার যদি কোনো দুর্বলতা থাকে তো সে কাজ হয়তো আমি পেরে উঠবো না। সে ভয়টা ভাঙলো।"

"কি কাজ শুনি?" একটু উদ্বিগ্ন শোনালো মলির কথাগুলো।

"আমি যখন হাজতে ছিলাম", জিমি আস্তে-আস্তে বলল, "তুমি আমায় চারটি চিঠি লিখেছিলে। মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ভাষা এবং বিষয়গুলো মনে আছে?"

মলির মুখ দিয়ে কথা সরলো না। একটা অজানা আশঙ্কার ছায়া পড়লো তার মনে।

"ভাবছি চিঠিগুলো জনি মার্টিনকে দেখাবো।"

"ও, এই ব্যাপার, তাতে কি জনি খুব উৎসুক হবে? জনিকে চেনো না। ও আমার বিয়ের আগের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

"ও তো জানবে না এ চিঠি বিয়ের আগের", জিমি পাইপ ধরিয়ে নিলো। "ও হয়তো জানবে যে, যেহেতু তার বয়েস অনেক বেশী, তুমি এখনো কমবয়েসী, তুমি জিমি নামে একটি লোকের সঙ্গে—"

"জিমি!"

জিমি হাসতে সুরু করলো।

"জিমি! তোমার কি ধারণা জনি আমায় বিশ্বাস না করে তোমায় বিশ্বাস করবে?"

"করবে। আমার হাতে যখন এ চিঠি আছে তখন আমার সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ত তো তোমায় দিতে হবে। তুমি তো ওকে আমার কথা আগে বলোনি?"

"তুমি কি চিঠির তারিখগুলো বদলে ফেলবে?"

"না। তুমি তো চিঠিতে শুধু তারিখই দিয়েছো, বছর তো দাওনি। সে চিঠিগুলো সব এপ্রিল মাসে লেখা। সে যে কোনো বছরের এপ্রিল হতে পারে। এখন মে মাস। গত মাসের ব্যাপারও হতে পারে।"

"না, না, জনি কক্ষণো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমি বলবো যে, এগুলো বিয়ের আগের ব্যাপার।"

"বেশ তো নাই বা করলো। তখন তোমার চার নম্বর চিঠিখানি পড়ে উনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।"

"কোন্ চিঠি?"

যে চিঠিতে, তুমি লিখেছিলে—অর্থ নৈতিক কারণে বিয়েটা যদিও ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম, এবার সামাজিক কারণে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি চাই না যে, আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করে। সে যদি তোমার মনঃপুত না হয় তা'হলে অগত্যা আমায় জনি মার্টিনকেই বিয়ে করতে হয়।—মনে পড়ে?—মার্টিন এ চিঠি পড়ে কি ভাববে বলো তো?"

মলি অবাক হয়ে জিমির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। "এ কাজ তোমার পক্ষে সম্ভব আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি," অস্ফুট স্বরে বলল অনেকক্ষণ পর।

"তোমার পক্ষে জনি মার্টিনকে বিয়ে করা সম্ভব, সে কথা আমিও ভাবতে পারিনি মলি!" একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো জিমি। "একটা সহজ জীবন পেলাম না। সুতরাং আমিও আর সহজ নই মলি। কি করবো, নানা রকম চুরি-জোচ্চুরি করে পয়সা কামাতে হয়। এ সব করতে দুঃখে বুক ফেটে যায়, কিন্তু না করে উপায় কি? আমার জন্তে তো কারো কোনো দুঃখু হয়নি। তাই আমারও কোনো মায়া-মমতা নেই।"

"তোমার সহজ জীবন পাওয়ায় বাধা দিয়েছিলো কে? আমি না অফিসের সায়েব?"

জিমি হাসলো। "মলি, তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা সেদিন ধার করে নিয়েছি। সব খরচা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমার অপরাধ?"

"আমার যখন জেল হোলো, তখন তুমি আমার ছেলে পেটে নিয়ে আরেক জনকে বিয়ে করেছো। আমার জন্তে তোমার একটুও দুঃখ হয়নি।"

অতি কষ্টে চোখের জল সামলে নিলো মলি, "কিন্তু তার আগে তুমি আমার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখোনি। তুমি বলেছিলে, কোনো অন্যায় কাজ আর করবে না। আর তার পরদিনই গাড়ি চুরি করলে।"

"তোমারই জন্তে করেছিলাম মলি! নতুন সংসার পাততে অনেক টাকা লাগে।"

"আমি তো সে ভাবে ঘর বাঁধতে চাইনি, জিমি!"

"তুমি কি এসব নরম কথা বলে আমার মন ভোলাতে চাইছো যাতে জনি মার্টিনকে এসব চিঠি আমি না দেখাই?"

"ওকে এসব দেখিয়ে তোমার লাভ? আমার জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করে দেওয়া ছাড়া তোমার আর তো কোনো উপকার হবে না।"

"হয়তো তাই আমি চাই। কিংবা কিছু আর্থিক উপকার হতেও পারে। জনি তো শুনেছি ব্যবসা করে। একটু খোঁজ করলেই বন্ধু-বান্ধবদের সন্ধান পেয়ে যাবো। এ সব ব্যাপার ওরা জানতে পারলে হাসাহাসি করবে। সেটা জনি পছন্দ না-ও করতে পারে। শুনেছি বিব্রত স্বামীরা এ ধরণের চিঠিপত্র অনেক সময় টাকা দিয়ে কিনে নেয়।"

"তোমার আসল মতলব তা'হলে কিছু পয়সা কামানো?"

"আজ কাল তো সবারই একমাত্র উদ্দেশ্য কিছু পয়সা কামানো।"

"জিমি," মলি আস্তে আস্তে বলল, "আমি যে জিমিকে চিনতাম তুমি সে নয়। তুমি—তুমি জানোয়ারেরও অধম।"

"যদ্দিন মানুষ ছিলাম তদ্দিন উপোস করেছি। এখন জানোয়ারেরও অধম হয়ে নানা রকম ভাবে কিছু টাকা উপায় করছি। আমি আমার সম্বন্ধে একটুও লজ্জিত নই।"

মলি চুপ করে তাকিয়ে দেখলো জিমিকে। জিমি এক চোখ বুজে পাইপে কয়েকটা টান দিলো। বয় এসে এক পট চা দিয়ে গেল। জিমি নিজের জন্তে চা তৈরী করে নিলো এক কাপ। মলি চায়ের পটের দিকে তাকালোই না।

"কি সর্তে আমার চিঠিগুলো তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে?" মলি আস্তে আস্তে বলল।

"তোমার স্বামীর কাছ থেকে আমি খুব কম করে হলেও এক হাজার টাকা বার করতাম। যদি চিঠিগুলো তুমি কিনে রাখতে চাও তো শ'পাঁচেক টাকা পেলে দিয়ে দেবো।"

"আমি সামান্ত চাকরী করি। অতো টাকা আমি পাবো কোথায়?"

"আমি আমার লাষ্ট অফার দিয়ে দিয়েছি।"

মলি ভাবলো একটুখানি। তার পর বলল, "বেশ, তাই পাবে। তবে একসঙ্গে সব টাকা দিতে পারবো না।"

"বেশ, প্রথম তিনটে চিঠি একশো একশো করে, শেষ চিঠিখানি দুশো। আমি তোমায় দু'-চার দিন অন্তর অন্তর টেলিফোন করে জেনে নেবো তুমি কবে কবে আমায় টাকা দিচ্ছো।"

মলি আবার ভাবলো একটুখানি। সেদিন সে মাইনে পেয়েছে দেড়শো টাকা। আস্তে-আস্তে ব্যাগ খুললো। একশো টাকার নোটখানি বার করলো। মেয়ের ফ্রকগুলো ছিঁড়ে গেছে এ মাসে তাকে নতুন ফ্রক কয়েকটা না করে দিলে নয়। ক্যান্টিনের দুধের কুপন কেনবার পয়সাই বা আসবে কোত্থেকে? হাত কাঁপতে লাগলো। না, জিমির সামনে কোনো দুর্বলতা দেখাবে না সে। নোটখানি টেবিলের উপর রাখলো। দেখলো জিমির হাতে একটি পুরোনো ভাঁজ-করা চিঠি, খুলে দেখলো, তারই নিজের হাতের লেখা। কি সব লিখেছিলো সে? এ লোকটাকেই লিখেছিলো নাকি? সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগলো মলির।

উঠে পড়ে গট-গট করে বেরিয়ে চলে গেল মলি মার্টিন

• • • •

পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল মলির। বিয়ে করে ভেবেছিলো স্বচ্ছল জনি মার্টিনের সংসারে সুখ না হোক হয়তো একটু সোয়াস্তি পাবে। ছেলেবেলা থেকেই অভাবের মধ্যে বড়ো হয়েছে মলি, মা উল বুনে, ছোটো খাটো চাকরী বাকরী করে মলিকে বড়ো করেছে। জিমিকে পেয়ে অভাব-অনটন সম্বন্ধে তার সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছিলো, জিমিকে হারিয়ে আরো বেশী হয়ে ফিরে এসেছিলো সেই ভীতি। জনি মার্টিনকে বিয়ে করে যখন দেখলো তার বাইরের বোল-চাল সব লোক দেখানো, তখন অনেক খোঁজাখুঁজি করে এই চাকরী জোগাড় করতে হয়েছিল তাকে। তখন এক-এক সময় মনে হোতো তাকেই যদি চাকরী করে খাওয়াতে হবে স্বামীকে, জিমির জন্তে অপেক্ষা করে থাকলেই তো পারতো। কিন্তু সে পথ বন্ধ করলো জিমি নিজেই, নিজের জেলে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করতে। নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে বিয়ে না করে মলির উপায় ছিলো না। জনির বিরুদ্ধে, জিমির বিরুদ্ধে, সবার বিরুদ্ধে একটি তিক্ত বিক্ষোভ এসেছিলো তার মনে।

আজ কি করে যেন কেটে গেল বিক্ষোভের মেঘ! মনে হোলো, জনির চেয়ে আপনার তার আর কেউ নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের মেয়ে ডলিকে বুকে করে আদর করবার জন্তে, জনির পাশে বসে তার কাঁচা-পাকা চুলে আঙুল বুলোনোর জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠলো মলির মন।

তবু বার বার ফিরে ফিরে এলো অনেক দিন আগের পুরোনো একটি সিনেমার গান:

I'll love you in my dreams,
In my dreams every night.

জিমি সব সময় শীস দিয়ে ভাঁজতো এই সুর। ওরা দু'জনে কতো দিন একসঙ্গে এ গানটি গেয়েছে। ক্লাবের বল্-রুমে অন্ত সবার জনতার মধ্যে জিমি আর মলি কতো দিন নেচেছে এ গানের অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে—In my dreams every night......

জোর করে অন্ত কথা ভাববার চেষ্টা করতে লাগলো মলি। বুড়ি জনসনের জুতো নেই। ও একজোড়া জুতো চেয়েছে। ওর ছেলে নিউজিল্যাণ্ড চলে গেছে। মায়ের খোঁজ নেয় না। ওকে একজোড়া পুরোনো জুতো দিয়ে দিলেই চলবে। পাশের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে থাকে গোয়ানিজ মেয়ে ডাঁথনি। ওর স্বামী বছর খানেক বেকার বসে থাকবার পর মাস দুয়েক আগে কোথায় যে ফেরার হয়েছে কোনো খোঁজ নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই ডাফ্নির ছেলে হবে। ওর কেউ নেই যে ওকে দেখে। দু'মাসের বাড়িভাড়া বাকি বাড়িওয়ালা হাকিম খান প্রত্যেক দিন এসে গাল-মন্দ করছে। নীচের তলার মিসেস স্মিথের মেয়েটি এখনো তার কৈশোর কাটিয়ে ওঠেনি, কিন্তু এরই মধ্যে সে ফিরিঙ্গিপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এমন নোংরামি সুরু করেছে যে, মিসেস স্মিথ এ পাড়ায় নিজের জন্য বেরুতে পারে না, কারো কাছে টাকা ধার চাইতে পারে না। মেয়েটিকে বকে দিতে হবে।

......In my dreams every night—আঃ, আবার! অফিসের বুড়ো ডিসপ্যাচ ক্লার্ক কালী বাবুকে হেড ক্লার্ক দত্ত বাবু সময় ফুরোনোর আগেই রিটায়ার করিয়ে দিতে চাইছেন। মেমসাহেব বড় সাহেবের প্রিয়পাত্রী। যদি একটু বলে দেয়...। কি রকম প্রিয় কালী বাবু যদি জানতো! যাক কাল একবার ম্যাগিট সাহেবকে গিয়ে ধরতে হবে...In my dreams every night —আঃ, জ্বালাতন!

দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলো। হুড়মুড় করে ছুটে এলো মলির মেয়ে ডলি:

"মামি, মামি, আমার জন্তে কি এনেছো?"—

"আজ কিছু আনিনি ডলি। কাল একটি মস্তো বড়ো টেডি-বেয়ার নিয়ে আসবো।"

জনি শীস দিতে দিতে বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে এলো—In my dreams every night...

"কী ব্যাপার? খুব খোশ মেজাজ দেখছি", মি... নিজের গলার স্বর অত্যন্ত হেঁড়ো হয়ে বেরুলো।

জনি উত্তর দিলো, "আজ একটি পার্টি আছে। মাইনে পেয়েছো না? আমায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে পারো? পরশু দিয়ে দেবো।"

মলি দশ টাকার একটি নোট বার করে দিয়ে বলল, "এই স্পেয়ার করতে পারি, এর বেশী নয়।"

টাকাটা নিলো জনি। তার পর বলল, "তুমি এত কঞ্জুস জানলে কে বিয়ে করতো তোমায়?"

চোখের জল ঠেলে রাখলো মলি। "জনি, আজ না হয় নাই বেরুলে। আমি তোমায় নিয়ে একটি সিনেমায় যাবো ভাবছি।"

"পুঃ। একটি নতুন বয়-ফ্রেণ্ড জোগাড় করে নাও মলি। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি।"

গলায় কালো বো বেঁধে গায়ে শার্কস্কিনের কোট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল জনি মার্টিন। বেরিয়ে গেল একটি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে—I'll love you in my dreams,

In my dreams every night.

* * * *

ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু টাকা জমিয়েছিলো মলি, হিসেব করে দেখলো একশো আশী টাকার মতো আছে। দু'দিন পর সেটি তুলে আনলো। গোটা কুড়ি টাকা ধার করলো অফিসের এক জন সেলস্‌ম্যানের কাছ থেকে। দুশো টাকা দিয়ে পরের শনিবার জিমির কাছ থেকে আর দুটো চিঠি নিয়ে এলো। আর একটি বাকি।

জিমি বলল, "আগামী শুক্রবারের আগে আমার বাকি টাকাটা চাই, তা নইলে সেটি জনি মার্টিনের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।"

"পেয়ে যাবে", উত্তর দিলো মলি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে দু'শো টাকা ধার পাওয়ার জন্যে সে আবেদন করে রেখেছে।

জিমি বলল, "শুক্রবার দিন মিশন রো'র মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। সেখানে এসে দেখা কোরো পাঁচটার পর।"

কিন্তু শুক্রবার দিন জিমি সোজা মলির অফিসে চলে এলো সাড়ে চারটের সময়। বলল, "টাকাটা দাও।"

"তুমি এখানে এলে কেন?"

"মিশন রো'র মোড়ে আমার দাঁড়ানোটা একটু বিপজ্জনক হয়ে উঠলো বলে। ওখানে আমার চোখের সামনে এক জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আরেক জনের একটি গাড়ি চুরি করে পালালো, কেউ ধরতে পারলো না তাকে। গাড়ি চুরির ব্যাপারে এক বার আমিও ধরা পড়েছিলাম। আমিও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তার উপর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আমার নেই। তাই আমিও সরে পড়লাম, তা নইলে পুলিশে হামলা করতো। দাও, টাকাটা দাও।"

জিমিকে নিয়ে বাইরে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো মলি। বলল, "জিমি, আমায় আর দু'দিন সময় দাও। টাকাটা সোমবার দিন নিও।"

"কেন, তুমি যে বলেছিলে আজ দেবে?"

"বলেছিলাম, টাকাটা জোগাড়ও করেছিলাম, কিন্তু—কিন্তু একটা জরুরী দরকারে ওটা খরচা হয়ে গেছে, প্লীজ জিমি, সোমবার নিও। আমি এ্যাডভান্স মাইনের জন্যে দরখাস্ত করেছি।"

"সে হয় না, মলি, আমি অনেক সময় দিয়েছি। আজ আমি বসে যাচ্ছি। আমার টাকার দরকার।"

"প্লীজ জিমি!"

"বেশ, আর দু' ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। সাড়ে ছ'টার সময় তুমি পার্ক ষ্ট্রীটের সেই টী-রুমে এসো। সেখানে থাকবো।"

মলির মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

"আমি পৌনে সাতটা পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। যদি তার মধ্যে না আসো আমি তোমাদের বাড়িতেই গিয়ে উপস্থিত হবো। আমি তোমার ঠিকানা জানি।"

জিমি চলে গেল।

সে যে এত হৃদয়হীন হবে মলি ভাবতে পারেনি। বিশেষ জরুরী দরকারে তার টাকাটা খরচা হয়ে গেছে। ভেবেছিলো দু'-চার দিন সময় পাবে জিমির কাছ থেকে।

কিন্তু এখন উপায়? একমাত্র উপায় দেখলো জনিকে গিয়ে আগের থেকে সব খুলে বলা। হয়তো ফল হবে না, কিন্তু অন্য কোনো পথ নেই। এখন কোথায় পাওয়া যায় জনিকে?

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মলি মার্টিন।

* * * *

মলির জন্যে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো জিমি। তার পর একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলল মলিদের পাড়ার দিকে। এলিয়ট রোডের কাছাকাছি একটি রাস্তায় থাকতো মলিরা। মোড়ের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। বাড়িটি খুঁজে বার করলো, তবু ঢুকতে উঠলো না, কাছের একটি পান-দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো জনি মার্টিনের বাড়ি কোনটা? পানওয়ালা দেখিয়ে দিলো, আর বললো সে এখনো ফেরেনি। ফেরার পথে প্রত্যেক দিন তার কাছ থেকে সিগারেট কিনে নিয়ে যায়। জিমি তার কাছ থেকে একটি আইসক্রীম সোডা কিনলো।

একটু পরেই সে পথে ঢুকলো একটি গাড়ি। খুব চেনা গাড়ি বলে মনে হোলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখে এ সেই গাড়িটি, যেটি চুরি গেছে মিশন রো থেকে। গাড়ি এসে থামলো মলিদের বাড়ির সামনে। একটি লোক বেরিয়ে এসে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। জিমি মনে মনে হাসলো। লোকটিকে চিনেছে সে। সেই লোকটি, যে মিশন রো থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

"ওই লোকটিই জনি মার্টিন সাহেব", বলল পানওয়ালা।

বটে! তা'হলে এই হোলো জনি মার্টিনের ব্যবসা!

রাস্তা পেরিয়ে এসে জিমিও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলো। দরজা খোলাই ছিলো। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লো জিমি। বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো জনি আর মলি।

"এত দেরী করে ফিরলে কেন? তোমায় আমার ভীষণ দরকার।"

"খুব কাজ। আবার বেরুবো। আমি কিছু দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে কথা আছে। বোসো।"

বসলো ওরা দু'জনে।

"জনি, তুমি আমায় ভালোবাসো?"

"আঃ, এ আবার কি প্রশ্ন! ও-সব পরে হবে।"

"না। বলো আমায়।"

"কেন?"

"দরকার আছে।"

"তুমি কিছু জানো নাকি?" গলা নামিয়ে সন্দিগ্ধ গলায় জনি জিজ্ঞেস করলো।

"কি জানবো?"

"আচ্ছা, কিছু না বলো।"

"জানো জনি, বিয়ের আগে আমি একটি ছেলেকে ভালোবাসতাম। সে ফিরে এসেছে।"

"তাই নাকি?" হঠাৎ খুব খুশি হয়ে গেল জনি। "তোমার কাছে আমার কথাটা কি করে পাড়বো ভাবছিলাম। ভালোই হোলো। বেশ কয়েক মাস আমিও একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছি। ওর অনেক টাকা। কদিন আর তোমার উপর বসে খাবো। তোমায় নিষ্কৃতি দেওয়াই ভালো। জানো, সেই মেয়েটির নামও মলি। মলি ল্যাম্বিন, তোমার নেম সেক।"

মনে মনে কপালে করাঘাত হানলো জিমি। জনি মার্টিন আর মলি মার্টিনের চিঠিতে আশ্চর্যান্বিত হবে না।

"হাঁ শোনো, আমায় একশোটা টাকা ধার দাও তো। আমি পরশু পাঠিয়ে দেবো। ডিভোর্সের ব্যবস্থা ঠিক ঠিকই করে ফেলবো। কোনো হাঙ্গামা হবে না।"

"আমার কাছে টাকা নেই। কিছু নেই।"

"নেই? মিছে কথা বোলো না। আজ সকালে তুমি পাশের বাড়ির সেই লোহাওয়ালার বৌ ফ্যানিকে দু'শো টাকা ধার দাওনি?"

"ওর ছেলে হবে জিমি। ওর স্বামী ওকে ফেলে পালিয়েছে। টাকাটা না দিলে সে হসপিটালে যেতে পারতো না, সে মারা পড়তো।"

একটা দারুণ ধাক্কা দিয়ে নিজের পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল জিমির। তার বাবা তার মাকে ফেলে পালিয়েছিলো। তার জন্ম দেওয়ার সময় তার মা মারা যায়। মলির মতো কেউ এসে তার মাকে সেদিন সাহায্য করেনি। করলে আজ হয়তো......

জিমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

পেছন থেকে শোনা যাচ্ছিলো, "আমার আর ফ্যানির কি হবে জনি?"

"তুমি তো চাকরী করো। তোমার ভাবনা কি?"

বাইরে এসে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো জিমি। তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। দূরে বড়ো রাস্তায় পুলিশের ভ্যান ঘুরছে। ফিরে দেখলো। চুরি-করা গাড়িটি ছায়ার আড়ালে দূর থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ভ্যান গলিতে ঢুকলেই চোরাই-গাড়ি দেখে ফেলবে, চিনেও ফেলবে।

পকেটে হাত দিয়ে মলির চিঠিটি অনুভব করলো জিমি। তার পর ফিরে এসে সিঁড়ি বেয়ে মলিদের ঘরে উঠে এলো।

তাকে ঢুকতে দেখে মলির মুখ ছাই হয়ে গেল। "তুমি?"

"আপনি ভুল করছেন,, মিসেস মার্টিন, আপনি আমায় চেনেন না। আপনিই জনি মার্টিন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি আপনার কাছেই এসেছি। আপনি কেন আমার ফিঁয়াসি মলি ল্যাম্বিনের পেছন পেছন ঘুরছেন?"

"আপনার ফিঁয়াসি?"

"পড়ুন এই চিঠিখানি।"

জনি মার্টিন পড়লো—"...এবার সামাজিক কারণে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি চাই না যে, আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করুক। সে যদি তোমার মনঃপূত না হয় তাহলে অগত্যা আমাকে জনি মার্টিনকেই বিয়ে করতে হয়—মলি"...

"—কি? সে এত বড়ো ভালগার, ক্যাডার? তার জন্যে আমি—"

চিঠিটি জিমি মলিকে দিলো। "মিসেস মার্টিন, এটি আমি আপনাকেই প্রেজেন্ট করছি। আই হোপ, এরই জন্যে আপনি আপনার স্বামীকে এখানে রাখতে পারবেন। ওহ্ মিষ্টার মার্টিন, আরেকটা কথা। আপনি মিলন রো থেকে আমার গাড়িটি চুরি করেছেন। নীচে দেখলাম। এখন ভালোয় ভালোয় আমার গাড়ি কি ফিরিয়ে দেবেন, না পুলিশ ডাকবো?"

"আপনার গাড়ি?"

গাড়ির চাবী নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো। মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলো। জনি, মলির হাত দুটি চেপে ধরেছে।

"তুমি আমায় মাপ করো মলি।"

শীস দিতে দিতে জিমি নেমে এলো—In my dreams every night...

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে বসলো। তার পর গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে এলো।

মোড় ফিরে বড়ো রাস্তায় পড়তেই পুলিশ ভ্যান তাকে চ্যালেঞ্জ করলো। জিমি থামলো না, আরো জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলো। দুটো ভ্যান তাড়া করলো তাকে। পরস্পর কাছাকাছি আসছে দেখে সামনে থেকে আরেকটা ভ্যান আসছে। গাড়ির গতি আস্তে আস্তে কমিয়ে আনলো জিমি।

কবরখানার ওপার থেকে তখন চাঁদ উঠেছে। বসন্ত এসেছে কলকাতায়। দক্ষিণের হাওয়ায় ঝিরঝির করছে পথের দু'পাশের গাছগুলো। ট্রাফিকের কোলাহল ছাপিয়ে একটি নিঃসঙ্গ কোকিল ডাকছে কোথায় যেন।

পুলিশের ভ্যানগুলো চারী গাড়ি-চোর জিমির গাড়িটিকে ঘিরে দাঁড়ালো। জিমি তখনো শীস দিয়ে ভাঁজছে একটি গানের কলি—

I'll love you in my dreams,
In my dreams every night.

আর চাঁদের আলোয় রুপালী হয়ে উঠেছে কলকাতার জনহীন বসন্ত।

নিখিল সেন

শহর বাড়ছে।

পূর্বে এদিকটা ছিল জলা মাঠ—বাবলা, আসশেওড়া আর পাঁচমিশালী নানান গাছ-গাছড়ায় ভর্তি। দিন-দুপুরে শিয়াল করতো দাপাদাপি। কিলবিল করতো বিষাক্ত সাপ। সে বন-বাদাড় সাফ করে এখন ঘন বসতি বসেছে এদিকটায়। হোগলা, টিন আর করোগেটের একচালায় ছেয়ে গেছে অঞ্চলটা। ভুঁইফোঁড় খানকয় পাকা দালানও মাথা তুলেছে এখানে-ওখানে। আর তাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে এক বা একাধিক ছিন্নমূল পূব-বাংলার উদ্বাস্তু-পরিবার। গড়ে উঠেছে 'দেশপ্রিয় রিফিউজি কলোনি।' 'তালুকদার এ্যাণ্ড সন্স কাটিলাইজার কারখানা'টিও জেঁকে বসেছে এর অনেকখানি স্থান জুড়ে। আর রেল-লাইনের ওধারে নতুন এক হোসিয়ারি মিল। কারখানা আর মিলের সাপ্তাহিক 'হপ্তি'র উপর নির্ভর করে থাকতে হয় 'দেশপ্রিয় কলোনি'র অনেক পরিবারকে।

রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছার পাট চুকলেই বেলা রোজ গড়িয়ে যায়। শনিবারের দিনও তাই। দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সেরে শৈল স্নান করছিল ভেতরের উঠানের এঁদো ইদারাটার পাড়ে বসে। পরনে তার খাটো একখানা আটপৌরে শাড়ি।

দূরে এ সময় শোনা যায় কর্ম-ফেরতা এক দল পুরুষের কণ্ঠস্বর: শৈল মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে:

'মা গো! কি বেলাটাই না হয়ে গেল দেখতে না দেখতে!' শৈল বিড়-বিড় করে ওঠে আপন মনে —'এখনো ছাই, কাপড় ছাড়া হোল না! ও যে এক্ষুণি এসে পড়বে।'

ইদারার পাড় থেকে শৈল শাড়িখানা টেনে নিল। আর তাড়াতাড়ি তা পরে নেবার আগেই রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে রুপোর-চকচকে গুটিকয়েক চাকতি গড়িয়ে পড়ল উঠানের মধ্যে টুং-টাং শব্দে।

এক ঝিলিক চাপা হাসি খেলে গেল শৈলর ঠোঁটের কোণে। লম্বা-চওড়া জোয়ান মানুষটা সামনের ফটক দিয়ে না ঢুকে ছাইয়ের গাদা আর রাজ্যের যত সব নোংরা জঞ্জাল মাড়িয়ে পেছনের খিড়কীর দরজা দিয়ে-চোরের মত কখন নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে আর বেহায়ার মত লুকিয়ে লুকিয়ে তার কাপড়-ছাড়া দেখছে—শৈল যদি জানত। প্রত্যেক শনিবার দুপুর বেলা এমনি হয়। রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে 'হপ্তি'র টাকাগুলি ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে উঠানের লাউয়ের মাচাটার নীচে লুকিয়ে পড়ে লোকটা। তার পর অপেক্ষা করতে থাকে শৈলর।

ত্রস্ত পদে শৈল ছুটে আসে বারান্দায়। চোখে-মুখে তার কপট আতংক।

'জানলার ফুটো দিয়ে ভেতরে টাকা ছুঁড়ে মারে কে?'—শুধায় সে এদিক-ওদিক ফাঁকা তাকিয়ে।

কোন সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। বারান্দা থেকে এবার সে লাফিয়ে পড়ে নীচের উঠানে। আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়ায় কা'কে যেন। সদর দরজা খুলে দেখে নেয় দূর রাস্তার দিকে। কিন্তু পরিচিত কাউকে দেখা যায় না কোথাও! খালি ফার্টিলাইজার কারখানার অবসন্ন ক্লান্ত শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে চলেছে দলে দলে। শৈল যখন সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, লাউয়ের মাচার নীচ থেকে এ সময় লোকটা গিয়ে লুকোয় জামগাছটার পেছনে। এবার আর যায় কোথায়? শৈল দেখতে পেয়ে তাড়া করে।

'আমাকে টাকা ছুঁড়ে মারা দেখাচ্ছি। কেন, আমি কি টাকার বশ? আমাকে রোজ টাকার অত লোভ দেখান কেন?'

কপট রাগে ফেটে পড়ে শৈল। তার পর লোকটার পিছু-পিছু তাড়া করে সারাটা বাড়ি। শোবার ঘরের সামনে পাকড়াও করল সে মানুষটাকে। ঘরে ঢুকে দোর দেবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ওর উপর। তার পর কিছুক্ষণ ধরে দু'জনের মধ্যে চলল ক্ষ্যাপার মত ধস্তাধস্তি, টানা-হ্যাঁচড়, পরস্পর পরস্পরকে সুড়সুড়ি, হুলুস্থুল একাকার এক কাণ্ড, শৈল জাপটে ধরল বিজয়কে আর বিজয় তা'র কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য যেন আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

'পকেট ছিঁড়ে গেল বলছি, পকেট থেকে হাত বার করে নাও, বৌ!'—চীৎকার করে উঠল বিজয়।

'উঁহু, নেবো না। চব্বিশ ঘণ্টা খালি বউ-বউ-বউ! কেন, আমার নাম নেই?'

'বেশ নিও না। পকেট ছিঁড়ে গেলে আমার দুখ বয়ে গেল কি না? তোমাকেই তো আবার সেলাই করে দিতে হবে।'

শৈল কিন্তু নাছোড়বান্দা, বিজয়ের ট্রাউজারের পকেট থেকে পুরিয়াগুলো সে বার করবেই। বিজয় তবু হাঁ-হাঁ করে উঠল।

'ও চকোলেট নয় বলছি। আচ্ছা, মেয়ে-মানুষ হয়ে ব্যাটা-ছেলের প্যান্টে হাত ঢুকিয়ে দিতে তোমার লজ্জা করে না একটুও?'

'উঁহু,' শৈল নীচু হয়ে এঁচকা একটা টান দেয় আর বিজয়ের পকেট থেকে একটি একটি করে বার করতে থাকে সুগন্ধি সাবান, রুমাল, ক্রিম, স্নো, চকোলেট ডালমুটের পুরিয়া।

বিজয় আর তেমন বাড়াবাড়ি করে না। চিবিয়ে চিবিয়ে সে হাসতে থাকে স্ত্রীর দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে। তার পর এক সময় বলে ওঠে:

'বাব্বা! ধস্তাধস্তি করে ঘেমে উঠেছি রীতিমত। কই, গামছা আর ইয়েটা দাও, স্নানটা সেরে নিই চটপট।'

ইয়ে মানে আণ্ডারওয়ার। বিয়ের আড়ষ্টতার প্রথম পর্ব হুল্লো কেটে গেলে বিজয়কে তার মেস-জীবনের পুরনো অভ্যাসে পেয়ে
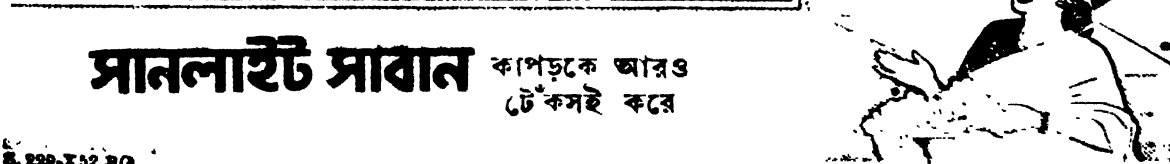
কোট খুলে রাখতে লজ্জা করে
আছড়ে কাচার ফল
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান কাপড়কে আরও টেঁকসই করে

বসে। কারখানার পোষাক ছেড়ে সে আরও অনেকের মত আণ্ডার-ওয়্যার পরেই থাকত ঘরে। শৈলর কিন্তু আপত্তি। বলে: ওটা পরে ঢ্যাং-ঢ্যাং করে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না? আলনা থেকে আমার একখানা শাড়ি ছুঁভাঁজ করে পরলেই তো হয়! বিজয় অবশেষে হার মানে।

সপাসপ জল ছিটিয়ে বিজয় তার পর স্নান সেরে নেয় সুবোধ বালকের মত। স্বামি-স্ত্রী দু'জন তার পর খেতে বসে। দাম্পত্য প্রেমের কপট কলহটা এবার বুঝি ঢিমে হয়ে আসে কিছুটা। খেতে খেতে বিজয় প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে:

'বিকেলে সিনেমা যাবার পথে তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাবো। পুজোর শাড়িখানা পরে নিও, বুঝলে?'

শৈল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। বলে: 'কোথায় গো?'

'বীরেন বাবুর রেস্তোরাঁয়। ভাল আইস্‌ক্রিম খাওয়া যাবে।'

'এখানে আবার আইস্‌ক্রিমের দোকান কোথায়?'

'বাজারের পাশে নতুন হয়েছে। খাস কলকাতার লোক না কি ভদ্রলোক।'

'ওঃ, সোনার দাঁত-বাঁধান হোঁৎকা সেই লোকটার কথা বলছো? যে ঘড়ির বুক-পকেটে সোনার মোহর ঝুলিয়ে বেড়ায়?'

'হ্যা হ্যা। তুমি ওকে দেখলে কোথায়? চেনা না কি?'

'না গো! একখানা সাবান আনতে গিয়েছিলাম কাল বাজারে। দেখি, ভদ্রলোক মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের মণ্ড দি'র সঙ্গে গল্প করছে। আমি তো চলে গেলাম পাশ কাটিয়ে। সাবান কিনে ফিরবার পথে দেখি, ভদ্রলোক তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। আমায় দেখে গায়ে পড়ে হেসে বললে: সাবান কিনলেন বুঝি? তা 'বল' সাবানের চাইতে 'বার' সাবানগুলোই ইয়ুজ করবেন। দেশী সাবান বিদেশি হাই ক্লাশ!'

শৈল এবার থামে। রাগত ভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে: 'ব্যাটা-ছেলেদের গায়ে-পড়া আলাপ বাপু আমি বরদাস্ত করতে পারিনে। সাবান নিয়ে আমার সঙ্গে দালালি করার কি দরকার ছিল?'

'কলকাতার লোক কি না, তাই খুব আপটুডেট্!' বিজয় ফিকে হাসে। বলে: 'যাই বলো, তোমার ভদ্রলোক কিন্তু এমন সব দামী দামী স্যুট পরেন সব সময়, আমরা কল-কারখানার লোকেরা যা চোখেও দেখিনি।'

'আপটুডেট্ না ছাই!' শৈল প্রতিবাদ করে।—'আসলে ও হোল একটা দেশজ কুকুর—আস্ত একটা গোবর-গণেশ। টাকা থাকলে কি হয়?'

বিজয় হাত বাড়িয়ে শৈলকে আদর করে একটু। বলে: 'তুমি আমায় ভালবাসো কি না বউ, তাই অমন বলছো। নইলে 'কাফে ডু বেগবো'-র খোদ মালিক বীরেন বাবুর সঙ্গে আমার আবার তুলনা?'

'কেন নয় গো?' শৈল ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর কোলের উপর। তার পর তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে চুম্বনে চুম্বনে। বলে: 'জানো, ও নাকি যেখানেই যায়, রাজ্যের সব মেয়ে পাগল হয়ে ছোটে ওর পেছনে পেছনে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'বাঃ, ও যে নিজ মুখে বলে বেড়ায়।'

'তাই না কি?' প্রশ্ন করে বিজয়।

'হুঁ, বললেই হোল!' শৈল ঠোঁট ওলটায়।

'—কে না কে, পথের একটা কুকুর! মুখে যা আসে তাই বলবে আর আমরা তা মেনে নেবো কি না? আমি বলছি; স্রেফ বানানো সব—একটা কথাও ওর সত্যি নয়।'

'বলো কি? ওর জেব-ঘড়ির সোনার চেন-শুদ্ধ মোহরটার কথা না হয় ছেড়েই দাও, হীরে-বসানো বীরেন বাবুর সোনার বোতামগুলোর দাম কত জানো? ওগুলোর যা দাম বউ, আমাদের ভিটে-মাটি বিক্রি করলে—'

শৈল স্বামীকে থামিয়ে দেয়। প্রতিবাদে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বিজয় বাধা দেয়। বলে: 'থাক গে, পর-চর্চায় কাজ নেই। তার চাইতে বরং তুমি কাপড়-চোপড় পরে নাও। চল বেরিয়ে পড়ি। তোমাদের বীরেন বাবু যতই তার প্রিয় বান্ধবীদের কথা বলে বেড়াক না কেন, আমার প্রিয়াটিও খাটো নয় কোন অংশে।'

• • • •

রাতে বাড়ি ফিরবার পথে বিজয় অনর্গল বকে চলে শহরতলীর সারা পথ মুখরিত করে।

'কেমন, আমি তখন বলিনি? দেখলে তো তোমাদের বুড়ো বীরেন বাবু কেমন দামী-দামী পরে—হৈ-চৈ বেমন চোস্ত?'

'তা হবে না? শহরে লোক কি না।' শৈল গোঁজ হয়ে থাকে। সারা পথ একটিও কথা কয় না।

'আচ্ছা, হীরেগুলো অন্ধকারে খুব ঝক ঝক করে, না?' ছেলে মানুষের মত শৈল সহসা প্রশ্ন করে বিজয়কে। স্বামীর আরও কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলে: 'সত্যিকার বলো না যেন। জানো, এ প্রথম আমি হীরে চোখে দেখলাম।'

অসংলগ্ন কথাগুলো শৈলর নিজের কানেও বুঝি কেমন খাপ-ছাড়া ঠেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে: 'নিশ্চয় কারো কাছ থেকে ও চুরি করেছে ওগুলো। তোমারও যদি থাকতো এক সেট ওর মতো?'

'কার? আমার?' বিজয় হেসে ওঠে হো-হো করে। 'পাগল হলে না কি তুমি বউ? আমার মতো কারখানার এক মিস্ত্রী পরবে কি না হীরের বোতাম? পাবেই বা কোথায় শুনি?'

শৈল এবার চুপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এক সময় বলে: 'না, তুমি পরলে তোমাকে ওর চেয়ে ঢের ফাইন মানাতো কি না তাই বলছিলুম।'

• • • •

পরের শনিবারও বিজয় স্ত্রীকে নিয়ে বীরেন বাবুর 'কাফে ডু বেগবো' থেকে আইস্‌ক্রিম খেয়ে আসে। সঙ্গে কিছু স্যাণ্ডউইচও। কেবল শনিবারের রাতটাই তার ছুটি। রাত্রির দিকটাই বেশীর ভাগ তাকে কাজ করতে হয়। অন্য দিন সন্ধ্যে ছ'টা বাজতে না বাজতেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় কাজে। তার পর পরের দিন সকাল বেলা দেখা যায় তাকে ঝিলের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে ক্লান্ত-অবসন্ন পা ফেলে। আরক্ত চোখ দুটি ঘুমে ঢুলু-ঢুলু।

পূর্ব-দিগন্তের কোল বেয়ে প্রভাত-সূর্যের তির্যক আলো এসে ছিটকে পড়ে বাঁকা তলোয়ারের মত ঝিলের কালো জলের উপর। আশ-পাশের সবুজ গাছ-পালাগুলোর শীর্ষদেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন মুঠি মুঠি সোনা যেন!

সে তখন বাড়ি ফেরে শৈলর কাছে। 'দেশপ্রিয় কলোনির' ছায়া-ঘন এক প্রান্তে ছোট্ট তাদের ঘর-সংসার। শনিবারের প্রতি দুপুরে তাদের কপট সেই দাম্পত্য কলহ, পরিপাটি খাওয়া, সিনেমা দেখা, কোন দিন বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করা—এমনি ভাবে চলছিল তাদের সদ্য-বিবাহিত প্রাত্যহিক মধুছন্দা জীবন। সুখী পরিবার।

এক দিন রাত প্রায় এগারটার সময় 'তালুকদার এ্যাণ্ড সনস্ ফার্টিলাইজার' কারখানার এসিড গেল ফুরিয়ে। ছুটি হয়ে গেল কারখানার শ্রমিকদের।

ঝিলটার পাড় দিয়ে বিজয় যখন বাড়ি ফিরছিল, শুক্লপক্ষের এক ফালি চাঁদ তখন ভেসে উঠেছে আকাশের নিস্তরঙ্গ কোলে।

পথ চলতে চলতে হাঁ করে বিজয় তাকিয়ে রইল না আকাশের চাঁদের দিকে। কারখানার শ্রমিক সে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করবার অবকাশ তার কই? কিন্তু অনুভূতির বান ডাকল তার প্রাণে। মনে পড়ল শৈলর কথা। আহা বেচারী, বিয়ে হয়েছে এখনো তাদের একটি বছর পুরোয় নি। বেচারীকে সারাটা রাত একাকীই কাটাতে হয় নিঃসঙ্গ। ঘরে যদি একটা কাচ্চা-বাচ্চা থাকতো। তবু কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়া যেতো। বুকটা তার টন-টন করে উঠে ব্যথায়। অজান্তে শিশুর একটি মুখ সহসা ভেসে উঠে মনের পর্দায়। কান পেতে থাকে যেন সে কার কলকণ্ঠ শোনবার জন্য! বিয়ে হয়েছে তাদের এক বছর হতে চলল, একটা বাচ্চা থাকলে—

শোবার ঘরটা থেকে এক ঝলক মৃদু আলো ঠিকরে পড়ছে। শৈল বোধ হয় এখনো ঘুমোয় নি। হয়তো কাঁথা-টাথা কিছু সেলাই করছে। কিম্বা হয়ত পাড়ার 'দেশপ্রিয় পাঠাগার' থেকে আনা অর্দ্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসটি শেষ করে নিচ্ছে। আহা, সারাটা রাত্রি একলা কাটাতে হয় বেচারীকে।

যখন জেগেই আছে শৈল, একটু মজা করা যাক না, ভাবলে বিজয়। রান্নাঘরের পাশে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকবে সে চুপি চুপি। নোংরা হাত-মুখও ধুয়ে নেয়া যাবে। তার পর শৈলকে পেছন থেকে গিয়ে আচমকা জড়িয়ে ধরার আগে পর্য্যন্ত কিছুই সে টের পাবে না। ভয় পেয়ে নিশ্চয় চমকে উঠবে সে। তার বুকে মুখ গুঁজে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকবে। কি মজাটাই না হবে!

নোংরা জঞ্জাল আর ছাইগাদা মাড়িয়ে দেয়াল টপকে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল টুপ করে। তার পর পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে সে এগিয়ে চলল শোবার ঘরের দিকে। দাওয়ার এক পাশে তার রাত্রির খাবারের টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখতে গিয়েই এক-রাশ এঁটো থালা-গ্লাশ-বাটির উপর অন্ধকারে সে হোঁচট খেয়ে পড়ল। জলের গ্লাশটা বুঝি গড়াতে গড়াতে উঠানে গিয়েই ছিটকে পড়ল। অভ্যাগত কেউ এলো নাকি? খাবার-দাবারের এত আয়োজন?

ঘর থেকে শৈলর চাপা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল। বিজয় সাড়া দিলে।

'ভয় নেই, আমি গো—আমি!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড এক ঝড় উঠল যেন! খাট থেকে দপ করে ভারী কিছু একটা নেমে পড়ার শব্দ বুঝি ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও গেল নিবে। আর সারাটা ঘর গেল অন্ধকারে ডুবে।

কি! চোর? ডাকাত? বাটপাড়? দস্যু? হিংস্র কোন জানোয়ার ঢুকে পড়েছে নাকি তার শোবার ঘরে? অনুপস্থিতির সুযোগে তারা চড়াও করেছে বুঝি অসহায়া স্ত্রীকে? বিজয় কাটি জ্বালাল দেশলাইয়ের। তার পর সতর্ক-দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে গেল সে ভেজান দরজাটার দিকে।

নিস্তব্ধ নিঃসাড়! নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে যেন মহাকালের চাকা। ভেজান কপাটটা ঠেলে দেশলাইয়ের কাঠিটা উঁচু করে ধরতেই নজরে পড়ল একজোড়া জোয়ান ঠ্যাং একটা ট্রাউজারের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পরে নেবার দিশাহারা চেষ্টা করছে। অনধিকার প্রবেশকারীকে তার অভ্যর্থনার এই চরম মুহূর্তে একেবারে সাবাড় করে দেবার সময় ও সুযোগ দুই-ই ছিল বিজয়ের। কিন্তু মানুষের আশ-পাশে যে সব অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়ায় তারা বুঝি তাকে দিল বিভ্রান্ত করে। নিদারুণ দুর্বল এক অসহায়তা অনুভব করল সে। মুঠিটা নিশপিশ করতে থাকলেও হাত সে তুলতে পারল না।

কেলেঙ্কারির পর [illegible] বুঝি এবার সব ভাঙল। বিজয় হেসে উঠল হা-হা করে। কাঠিটা নিবে গিয়েছিল। আর একটা কাঠি জ্বালল সে। বুকের ভেতর তার তখনও তুমুল ঝড় বইছে। এদিকে ঘরের এক কোণে এক জনের ফিঁচ ফিঁচ একঘেয়ে কান্না আর অপর দিকে আর এক জনের কাতর কাকুতি [illegible] প্রাণভিক্ষার। প্রাণের বিনিময়ে সে বুঝি তার সর্বস্ব দিতে রাজি।

'আপনার পায়ে পড়ি স্যার, প্রাণে মারবেন না। একটি হাজার টাকা দাম করে সব [illegible] নিলাম। আপনার দুটি পায়ে পড়ি স্যার, প্রাণে মারবেন না একেবারে।'

বিজয় দাঁড়িয়ে রইল অসাড় নিস্পন্দ হয়ে। এদিকে ঘরের মধ্যের লোকটা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। না, পালাবার উপায় নেই বুঝি প্রাণ নিয়ে? দোরগোড়ার উপর অক্ষয় অটল হিমাদ্রির মত সে দাঁড়িয়ে আছে [illegible]। হুলো-বেড়ালের মত হাঁপাচ্ছে লোকটা, ফুঁসছে। হাসছে খুশি হা-হা করে। নাকে খৎ! আর না কোন দিন। এ যাত্রা কোন রকমে প্রাণে বাঁচলে বাঁচি! এক পাটি [illegible] ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে লোকটা তখন বুঝি ইষ্টনাম জপছিল! ঠিক এ সময় প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়ল তার মুখের উপর।

'কাপড়-চোপড় তোমার পরে নাও চটপট। তার পর যে পথ দিয়ে এসেছিলে সে পথ দিয়ে বেরিয়ে যাও শীগ্গির।'

সোনা-মোড়া দাঁত দুপাটি ছিটকে পড়েছিল মেঝেতে। লোকটা তা কুড়িয়ে নিল। তার পর উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে। কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বিজয় তার কলারটা ঝাঁকড়ে ধরল 'চুপ, একটিও কথা না!'

জোরে ঝাঁকুনি দিল সে একটা। তার পর আর একটা ঘুষি। টাল সামলাতে না পেরে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাইরের দাওয়ায়। ওখান থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে উঠানে। তার পর কোন রকমে উঠে বসে খোলা দরজা দিয়ে পালাল সে ল্যাজ-গুটানো ভয়ে কুকুরের মত। বিজয় তখনও দাঁড়িয়ে। এক সময় তার মনে হোল, কি যেন আঁকড়ে রয়েছে তার মুঠিতে। মুঠিটা সে মেলে ধরল। কলার শুদ্ধ খানিকটা ছেঁড়া শার্ট। আর তাতে অন্ধকারে জলজল করছে এক সেট হীরের বোতাম!

শৈল তখনও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কি করবে বিজয় ঠিক করে উঠতে পারল না। কলার-শুদ্ধ ছেঁড়া শার্টটা আবার সে তুলে ধরল চোখের উপর। হীরের বোতামগুলো তখনও সমানে জল-জল করছে অন্ধকারে। বোতামগুলো সে তার বোতামের ঘরে এক বার সেঁটে ধরল: 'ওগো, তোমাকেও বেশ মানাতো!'—অনুরণন তুলল সে যেন তার কথার।—'তোমাকেও বেশ মানাতো!' বিজয় সহসা হেসে উঠল হা-হা করে। তার পর সটান গিয়ে এক সময় শুয়ে পড়ল বিছানায়। শুধাল: 'কাঁদছো কেন, শৈল?'

শৈল জবাব দেয় না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খালি কাঁদতে থাকে। বিজয় আবার শুধায়: 'অতো কাঁদবার কি আছে?'

শৈল তবু একঘেয়ে কাঁদতে থাকে—'এর চেয়ে আমার মরণ হোল না কেন গো! এ পোড়ামুখ কি করে দেখাবো গো!'

কথা খুঁজতে গিয়ে বুঝি বিজয় বালিশের মধ্যে মুখ গোঁজে। ধরা-গলায় বলে: 'তা ভাববার এখনো ঢের সময় আছে, শৈল!'

'না গো না, মুখপোড়াটা তার হীরের বোতামগুলো বাঁধা রাখতে এসেছিল। বলল: একশো রেখে গোটাকয়েক টাকা দিতে পারেন মিসেস ভাটু। আসল হীরে দেখছেন না! বড় বিপদে পড়েছি।' শৈল কৈফিয়ত দিয়ে চলে আপন মনে—'অতো করে যখন বলছে, তাই তো আমি। কিন্তু মুখপোড়া শয়তানটার পেটে অতো ছিলো কে জানতো?'

চাপা-কান্নায় শৈল আবার ফেটে পড়ে বিজয় অনেকক্ষণ চুপ-চাপ পড়ে থাকে। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে বলে: 'থাক, মিছিমিছি আর কেঁদো না শৈল! তোমার হীরের বোতামগুলো আমি কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছি ওর কাছ থেকে!'

টেবিলের ওপর ছোট্ট টাইমপিসটা এগিয়ে চলেছে টিক-টিক শব্দে। বিছানার এক প্রান্তে বিজয় পড়ে রইল অসাড় হয়ে। আর অপর প্রান্তে উপুড় হয়ে পড়ে সমানে তখনও ফুঁপিয়ে চলেছে শৈল।

গত রাত্রির মসীময় কাহিনীর যবনিকা অপসৃত হোল এক সময়। ভোরের আলো দেখা দিল। নতুন সূর্য উঠল আকাশে। থাক-পরা রুক্ষ মুখখানা তুলে শৈল তাকাল জানলা দিয়ে। সকাল হয়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এক-ফালি রোদ তাদের উঠানে। না, আর নয়। আর আর দিনের মত বিজয়কে আজ গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আসতে হবে না। উঠানটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতেও হবে না। উনান ধরিয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাবারও প্রয়োজন হবে না। আর নয়। পাট চুকেছে। এ বাড়িতে তার স্থান কই?

বিছানার ও পাশে অদ্ভুত যে লোকটা চুপচাপ শুয়ে আছে যেন তার লজ্জা করতে লাগল। ও উঠে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বিছানায় সে পড়ে থাকবে। বেরিয়ে গেলেই চটপট সে কাপড়-চোপড় পরে নেবে। তারপর চিরতরে বিদায় নেবে এখান থেকে। বিদায় নেবে ঐ মানুষটার তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি আর উপেক্ষার শাণিত হাসির আড়াল থেকে। কিন্তু লোকটা যে উঠবার নাম করছে না?

প্রশস্ত শয্যায় দু'জনের মাঝখানে আজ অতলান্তিক ব্যবধান! নিরপেক্ষ স্থানটুকুর অপর প্রান্ত থেকে কার গলা যেন শোনা গেল: 'কই, উনানে আঁচ দিলে না শৈল? চা হবে না আজ?'

শৈল ধড়ফড় করে উঠে বসে। না, অমন করে যখন বলছে মানুষটা। শৈল পরনের শাড়িখানা ঠিক করে নেয়। তার পর বলে: 'যাই।'

ছুটে গিয়ে সে উনানে আঁচ দেয়। জল চাপিয়ে দেয় কেটলি-শুদ্ধ। দু'টি চিঁড়েও ভাজে। বিজয় গরম চিঁড়েভাজা খেতে ভালোবাসে।

মুখ-হাত ধুয়ে বিজয় নীরবে খেয়ে চলে। রাগ-অভিমান—হাসি-ঠাট্টার কোন ছোপই লেগে নেই বিজয়ের তার মুখে। চায়ের কাপে চুমুক বসিয়ে বিজয় প্রথম কথা পাড়ে: 'কই, তোমার চা নিলে না?'

'পরে খাবো।' শৈল জবাব দেয় ধরা-গলায়।

বিজয়ের কাপটা খালি হয়ে এসেছিল। শৈল কাপটা ভর্তি করে দিলে। নীচু হয়ে চা ঢালতে গিয়েই হঠাৎ তার নজরে পড়ল তিনটার পাশে চিক-চিক করছে এক সেট হীরের বোতাম। শৈল এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল খান-খান হয়ে।

সূর্য ওঠে প্রতিদিন। প্রতি দিবসের অধিনায়ক নিরপেক্ষ বুড়োটি আলো বিতরণ করে চলে জন্ম-মৃত্যু—সমানে। রাঙিয়ে তোলে প্রভাতের আবীর-গোলা আকাশকে। নীল মণ্ডল অতি ক্রম করে সায়াহ্নে আবার গিয়ে ঢলে পড়ে অসীম সমুদ্রের কোলে আগুন লেগে যায় তখন পশ্চিম-দিগন্তে। পাখীরা ফিরে আসে আপন কুলায়ে।

শৈলর আর বিদায় নেয়া হয় না। এ বাড়ির মায়া ছাড়তে পারে না সে। সত্যি সে ভালোবাসে বিজয়কে। কিন্তু বিজয়ের কথা আলাদা। ও কেন তাকে তাড়িয়ে দেয় না? তাকে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন করে ঘর সংসার পাতে না? বিয়ে করে না আবার? নিষ্ঠুর পাষাণের মত অমন নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ, নির্বিকার অসহযোগই বা কেন? এর চাইতে তাকে তাড়িয়ে দিলেই সে পারে?

শনিবারের সেই উজ্জ্বল প্রাণময় দাপাদাপি লাফালাফি আর নেই। রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে টাকা ছুঁড়ে দেবার পালা গেছে ফুরিয়ে। খাবার আর প্রসাধন দ্রব্যের পুরিয়া নিয়ে হুটোপুটি বাধাইও নেই। সব আনন্দই আজ যেন উবে গেছে নিঃশেষে। বিজয়ের হাওয়াই-শার্টের পকেটে হীরের ওই বোতামগুলো যেন এ একটা আস্ত দানব। শৈলকে উদ্বস্ত করবার জন্যই বুঝি ওৎ পেতে আছে। সুযোগ একটা পেলেই হয়।

মাঝ-রাত্রির দিকে বিজয় একদিন বাড়ি ফিরে এলো গোজা

ঠিক নীচটায়। একটু গরম তেল মালিশ করে দিতে অনুরোধ করল সে শৈলকে। সে দিনের সে ঘটনার পর পুরো তিন মাস আজ হতে চলল শৈলকে সে স্পর্শ করেনি। শৈলও না। তার কেমন যেন একটু বাধ-বাধ ঠেকল। তবু তো একটা সুযোগ পাওয়া গেল। গরম তেলটা সে মালিশ করতে লাগল বিজয়ের মাজায়। রাত পোয়াবার পূর্বেই তাদের এত দিনকার চোখ-ঠারা কপট অনুশাসনের সব বাঁধ গেল বুঝি কখন খান-খান হয়ে ভেঙে। অন্ধ কামনা হোল বিজয়ী! পরম তৃপ্তির একটা হাঁফ ছাড়ল শৈল।

পরদিন সকাল বেলা বিছানা পাট করতে গিয়ে শৈল দেখে, তার বালিশের নীচে পড়ে আছে এক সেট বোতাম। বোতামগুলো সে তুলে ধরল চোখের উপর। বুন্দা বাবুরই সেই বোতাম। কিন্তু এ কি, এ যে কতকগুলি পাথর—আসল হীরে তো এ নয়! শৈলর তখন মনে পড়ল বুন্দা বাবু কেন তার বোতামগুলো হাত দিয়ে ছুঁতে দিত না। কলোনির এতগুলো গেঁয়ো লোককে আচ্ছা বোকাটাই না বানিয়ে এসেছে লোকটা।

বোতামগুলো মুঠোয় নিয়ে শৈল এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। যাক, বাঁচা গেল এবার। এত দিন ধরে নারকীয় যে যন্ত্রণা ও নিপীড়নের বিষে দগ্ধ হচ্ছিল সে তিলে তিলে, এবার বুঝি তার অবসান হবে। স্বামি-স্ত্রীর সহজ স্বাভাবিক দিনগুলি ফিরে আসবে আবার তাদের মধ্যে। বোতামগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পর-মুহূর্তেই কিন্তু তার মনে হোল কিন্তু এগুলো তার বালিশের তলায়ই বা রেখে গেল কেন? এ কি তার তেল মালিশের প্রতিদান? উপঢৌকন তার প্রেমের? ভাবল সে।

লেখকদের অদ্ভুত খেয়াল!

পাঠক-পাঠিকাগণের অনেকেরই বিশ্বাস যে, লেখকগণ বুঝি গভীর রাতে একলা বসে চুপি চুপি রচনা করেন তাঁর সাহিত্য, কাব্য। তেল পুড়িয়ে, আলো জেলে নিশীথে চলে তাঁর সাধনা। কিন্তু তা যে একেবারেই ভুল, এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে। অনেকে আরও ভাবেন, লেখকেরা বুঝি খুব গম্ভীর। সব সময়েই মুখ গম্ভীর করে গল্পের কি উপন্যাসের প্লট ভাবছেন। তা-ও ঠিক নয়। আসলে লেখকদের সব রকম মজার অভ্যাস আছে। ঠিক লেখার আগে চৌক করে এক কাপ চা কি কফি, ওভালটিন কি দুধ। সিগারেট কি চুরুট। কত বায়নাক্কা দেখুন!

স্কট আর এল, এ, কি ট্রুক যা কিছু লেখবার ব্রেকফাস্টের আগেই সব লিখে ফেলতেন। ভিক্টর হিউগোর খেয়াল ছিল দাঁড়িয়ে লেখার। সামনে একটি উঁচু ডেস্ক রেখে লেটা 'লা মিজারেবল'টাই তিনি শেষ করেছেন। জেমস জয়েস লিখতেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে। গোটা 'ইউলিসিস'এর জন্মই হল এই ভাবে। টেনিসন আর ওয়ার্ডসওয়ার্থও তাই। জে, বি, প্রিষ্টলে আর আয়ার্সের লিখতে লিখতে পাইপ খাওয়াটি চাই-ই। সেন্ট. জন, আরভিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, I bought a pipe and tried to look like Priestley ; but the smoke got in my eyes and, I had to throw the pipe away। বালজাকের ছিল কফি খাওয়ার বাই। সারা দিন-রাত তিনি লিখতেন আর তাঁর চাকর জোগাতো কফির পেয়ালা। অসংখ্য বার। I'll die of 10,000 Cups of Coffee, তিনি বলেছেন। হফমান কি এডগার এ্যালেনের লেখা জমতো না চায়ের পেয়ালা না পেলে। শুনলে অবাক হবেন, ডুমা লেখবার সময় খেতেন অজস্র লেমনেড। জার্মাণ কবি শীলার রাখতেন হাতের কাছে আপেল। ম্যাকেঞ্জীর চাই গান। তা আবার ক্ল্যাসিকাল হতে হবে। তবে আসবে লেখা। Esther Mccracken আবার কোন কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। তাঁকে ঘিরে নাচুন, চিৎকার করুন, গান গা'ন কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা না বললেই হল। তিনি ঠিক লিখে যাবেন। অন্য দিকে টমাস কার্লাইল আবার এতটুকু চিৎকার সহ্য করতে পারতেন না। একটা বিড়াল ডাকলে কি রাস্তায় একটা কুকুর চিৎকার করলে, পাশের বাড়ী রেডিও বাজলে তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে যেত। A E. W. Mason কখনও কোন নোট কি ফাইল রাখার ধার ধারতেন না। এদিকে ওয়াল্টার পিটার টেবিল ভরিয়ে ফেলতেন কাগজ-পত্রে, নোটে আর রেফারেন্সে। তবে তাঁর আসতো লেখার আমেজ। আর্নল্ড বেনেট লিখতেন ছোট ছোট বই সাইজের কাগজে ছাপলে যেমন দেখাবে, বড় পাতা হবে মেপে মেপে। কিপলিং লিখে থাকেন রু, আর পেন্সিল কালি দিয়ে। সংশোধন করে থাকেন সবুজ কালিতে। উইনষ্টন চার্চিল ব্যবহার করেন লাল। ই. এম. ফর্ষ্টার লেখেন সবুজ কালিতে। জেমস জয়েস পছন্দ করতেন কালো কালি।

লেসলি হাচিনসন লেখার জন্য ব্যবহার করতেন নীল পোষ্টকার্ড। ডিকেন্স আবার কম্পোজিটারদের প্রাণান্ত করে ছাড়তেন নীল কাগজে নীল কালি দিয়ে লিখে। ডেভিড সিসিল লিখতেন পেন্সিলে।

লেখার সময় অদ্ভুত ধরণের সাজ-পোষাক করার অভ্যাস ছিল ডুমার। একটি জাপানী ড্রেসিং-গাউন, কর্ক লাইফবেল্ট আর হেলমেট পরে তিনি একদিন ওয়েগনারকে নিজের ঘরে বাইরে থেকে ডেকে এনে বসালেন। পরে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললেন, Half my ideas are lodged in this helmet and the remainder in a pair of wollen socks I put on to compose love scenes.

কিন্তু সব চেয়ে অবিশ্বাস্য আর বিচিত্র ইভিওসিনক্রেসী বোধ হয় সমরসেট মমের। তাঁর 'চিহ্ন'। Gothic archএর ওপর ক্রশ। কোনও দুষ্ট গ্রহ কাটাবার জন্যই নাকি তাঁর এই অদ্ভুত বস্তুটির ব্যবহার। খামখেয়ালীতে আমাদের এনারাও কিছু কম নন। রবীন্দ্রনাথ শুনেছি জলচৌকী সামনে রেখে মোটেই লিখতে পারতেন না। অথচ শরৎচন্দ্রের তা না হলেই চলত না। নানা রকম কলমের সখও ছিল তাঁর। মাইকেল না কি পায়চারী করে লিখতেন। অন্যান্য দেশী ও বিদেশী লেখকদের খেয়াল যদি কেউ জানান, ভাল হয়।

টোপ
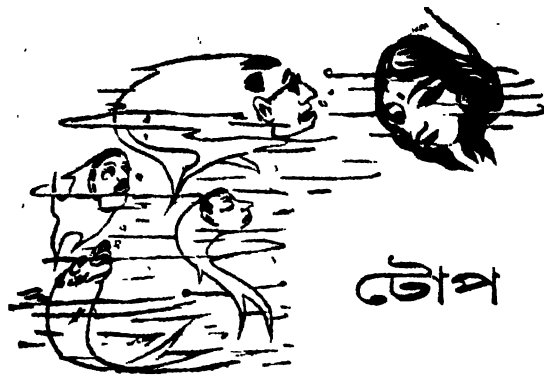
শ্রীঅজিতকুমার রায়-চৌধুরী

সুধীর বলিল, 'যাই বল না কেন, মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের লাইফ মিজারেবল। কি সুখে যে বেঁচে আছি!'

আমি বলিলাম, 'কেন, পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছ, এটাই ত' মস্ত সুখ।'

সুনীল মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 'সুখের ত' আর অন্ত নেই। পুরুষের আবার সুখ! আরে বাবা, রাত একটায় যে হতভাগার বিয়ের লগ্ন তার যে অবস্থা, আর ঐ সময়ে খাটে নিয়ে যাওয়া ডেড-বডিরও সেই অবস্থা। পুরুষের আবার সুখ কোথায় রে?'

সুধীর এতটা আশা করে নাই। তাই বলিল, 'বরের সঙ্গে ডেড্-বডির তুলনা! তুই কি বল্‌ছিস্?'

—'ঠিকই বলছি, পুরুষ মানুষের সুখের কথা বলছি। আচ্ছা, মনে কর, নাড়ুর বিয়ে গড়িয়াহাটার মোড়ে। আমরা সব বরযাত্রী গেছি, বিয়ের লগ্ন রাত একটায়।'

কথাটা শুনিয়াই স্বেদ-পুলকাঞ্চিতে শরীর শিহরিয়া উঠিল, কোনও রকমে উত্তেজনা চাপিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলাম, 'বেশ, তার পর?'

'—তার পর? রাত নটা থেকে-কেটে সাড়ে দশটার মধ্যে যত বাইরের লোক ইস্তক আমরা অবধি খাওয়া-দাওয়া সেরে চাওয়া। এইবার তোমার অবস্থাটা একবার চিন্তা কর ত' মানিক! রাস্তাঘাট ঠাণ্ডা, কদাচিৎ দু'-এক জন লোক যাতায়াত করছে, দূরে একটা বাড়ীতে একটা ছোট ছেলে কাঁদছে, একটা হাঁপানী রুগী কাশছে, ডাষ্টবিনের কাছে এক পাল কুকুর জড় হয়ে মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে ঝগড়া করছে, রকে কয়েকটা ভদ্দুরে বাউণ্ডুলে খাবারের জন্যে বসে আছে আর মাঝে মাঝে চোরের বিড়ি ফুঁকছে, বাড়ীর ভেতর থেকে মাঝে কলরব ভেসে আসছে —আর তুমি? ফাঁকা একটা ঘরের মধ্যে ফরাসের ওপর দু'-একটা ছোট ছেলে তোমার আশে-পাশে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, দরজার পাশে বেঞ্চিতে টুবু হয়ে বসে নাপিত বেটা ঢুলছে আর ঘরের এক কোণে দু'পাশে দুটি ফুলের তোড়ার মধ্যিখানে ভেলভেটের গোল্লা টেশান দিয়ে নবাবী ঢং-এ কাত হয়ে বসে তুমি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ছ, আর মশা তাড়াচ্ছ। মাথার ওপর কড়া-পাওয়ারের আলোতে রাজ্যের পোকা এসে ভীড় করেছে, তোমার মুখে-মাথায় বসছে। মাঝে মাঝে দু'-একজন এসে তোমায় দেখে যাচ্ছে অর্থাৎ এখনও ঠিক আছ কি না। মুখখানা তোমার শুকিয়ে টুটেনখামেনের মমি হয়ে গেছে। বিয়ের চেয়ে পালাতে পারলে তুমি বাঁচ। অথচ রাত্তিরটা কিন্তু তোমার বিয়ের রাত্ত, রেড লেটার ডে।'

'খাটের মড়ারও ঠিক একই অবস্থা। কেবল তুমি আধ-শোয়া আর নিশ্বাস নিচ্ছ, আর সে বেটা দড়ির খাটের ওপর চিৎ হয়ে আছে আর দম্ নিতে পারছে না। তারও বুকে-মুখে পোকা বসছে, মাথার দু' পাশে দুটো ফুলের তোড়া ঠিক বরের তোড়ার কোয়ালিটি, পায়ের ধারে খাট ছুঁয়ে সাত-আট বছরের ছেলেটা ঝিমুচ্ছে, শ্মশান-বন্ধুরা কেউ বেঞ্চিতে বসে বিড়ি ফুঁকছে কেও বা রেজিষ্টারী অপিসে, কেউ বা কাঠের খোঁজে গেছে। ও তুমি বরও যা, ডেড্-বডিও তাই। দু'জনেরই 'সেম' অবস্থা। পুরুষের আবার সুখ কোথায় রে?'

প্রবীণ উচ্ছসিত হইয়া বলিল, 'বড় জুতসই উপমা দিয়েছিস্ সুনু। কিন্তু কেন এমনটা হয় জানিস্? পুরুষদের মধ্যে ইউনিটি নেই বলে। ঐ ত' দেখলে নাড়ুর ঐ অবস্থা, বে' করতে গিয়ে একা একা বসে রাত দুপুরে মশা তাড়াচ্ছে, কিন্তু ওদিকে কনের ঘরে গিয়ে দেখ নরক গুলজার। দশ বারটায় ছোক আর চোদ্দটায় ছোক, দশের বছরের খুকী থেকে আরম্ভ করে থুণ্ড়ে বুড়ী অবধি হৈ-হৈ করছে। মেয়েদের ফেলো-ফিলিংটা অনেক বেশী, সেই জন্যেই দেখবি চাকরের সঙ্গে যখন কর্তার ফাইট্ হচ্ছে তখন ঝি গিন্নীর চুল বেঁধে দিতে দিতে ফষ্টিনষ্টি করছে, রসের কথা বলছে, কৌটো থেকে জরদা খাচ্ছে। আরে, মেয়েদের তুলনা নেই।'

সুধীর বলিল, 'কিন্তু ওদের মত ভ্যানিটি আর কারও নেই। আজ তোমাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না, কাল তুমি ছাড়া আর সবাইকে জানে।'

প্রবীণ বলিল, 'মোটেই না। তুই যাকে বলিস্ ভ্যানিটি আমি তাকে বলি ম্যাকিয়াভেলিজম্। বলই দেখ যে যুগে যুগে এডোয়ার্ডরা সিম্পসনদের জন্যে রাজ্য ছেড়েছে অথচ এলিজাবেথরা খাড়া হয়ে রাজ্য জুড়ে বসে আছে, কিছুই করেনি—বলি, করবে কেন? মেয়েরা অনেক ঠেকে তবে শিখেছে। সেই গোড়া থেকেই ধর। দ্রৌপদীর অবস্থাটা এক বার ভাব ত' ব্রাদার, কেষ্ট ত' বাঁশী ফুঁকে কদম গাছে চড়ে বসেই ইতি—আর বাকী? সাবিত্রীর অবস্থাটা কি? সত্যবান ত' প্রিয়ে সাবিত্রী বলেই চিৎ, যমের সঙ্গে হাতাহাতি পোয়ালে কে? এই সব দেখে-শুনে মেয়েরা টাইট হয়ে গেছে। অবলা জাত, বল নেই বটে, কিন্তু মাথায় কিছু আছে; তাই পুরুষদের সঙ্গে যুঝে আছে। তা'ছাড়া মেয়েদের বুদ্ধি কত?'

আমি বলিলাম: 'অবশ্য পুরুষদের যে কোনও গুণ নেই এমন নয়।'

'—দেখ নাড়ু, বাজে ফাজলা করিস্ নি। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের তুলনাই হয় না। আচ্ছা বল দেখি, আজ অবধি কোনও ছেলেকে সবার সামনে বলতে শুনেছিস্ যে, হাঁ আমি ওকে ভালবাসি ও আমার আসমান তারা? দেখি কোন্ পুরুষে বলতে পারে?'

আমি বলিলাম, 'এ কি আবার চেঁচিয়ে বলবার জিনিষ নাকি?'

'—এ ছাড়া লাইফে আর কি চেঁচিয়ে বলার থাকতে পারে? এই পাতে দই দাও, এ ত যে-সে লোকে বলতে পারে। কিন্তু মেয়েরা বলবার ক্ষমতা রাখে। এক বার দুর্গেশনন্দিনীখানা খুলে দেখ। আয়েসা ত' ওসমানকে জগৎসিংহকে দেখিয়ে চোখ পাকিয়ে ওসমানকে বললে,—এ আমার প্রাণেশ্বর। তোর জগৎসিংহের ক্ষমতায় হ'ত? কেষ্টকান্তের উইলে দেখ, রোহিণী বলছে

গোবিন্দলালকে—মেরো নি মেরো নি, আমার নতুন যৌবন, নতুন জীবন। কত বড় কথা. এর একমাত্র প্যারালাল লাইন হচ্ছে ম্যর ভুখা হুঁ। তাও বলেছে এক জন মেয়েছেলে। আরে বাবা, ওরা হ'ল শক্তি, ওদের অবহেলা করার দরুণই ভারতবর্ষের এত দিন এই হাল হয়েছিল।'

বিরিঞ্চি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'কিন্তু শুনেছিলুম যে, গোজাতিকে অবহেলা করেই না কি।—'

'—তোর মাথা, গোজাতিকে অবহেলার দরুণ ত' গুঁড়ো-দুধ গিল্‌ছি। জাত ডুবেছিল মেয়েদের ব্যাপারে। এখন মেয়েদের পুজো করতে শিখেছি, জাতেরও চড় চড় করে উন্নতি হচ্ছে।'

সুধীর বলিল, 'তুই তা'হলে বলতে চাস্ যে, এবার থেকে গিন্নীকে পুজো করলে আমারও উন্নতি হবে?'

—'পূজো ত' ভাই করলেই হয় না, মনে ভক্তি থাকা চাই। আর ভক্তি থেকেই আসবে ভেড়ুয়া ভাব; তখন দেখবি উন্নতি হয় কি না। আমার ত' ভাই পার্শোন্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে।'

বিরিঞ্চি বলিল, 'বাড়ীতে বৌদিকে পূজো করেছিলি নাকি?'

'—বাড়ীতে নয়, অপিসে। ওয়ার টাইমে এরিয়ারের গুঁতোয় হোল্ অপিস কোলাপস্ করার দাখিল, সেন্টারে টনক নড়ল কি করা যায়, অনেক ভেবে ঠিক হ'ল, মেয়ে নাও, মকরধ্বজের কাজ করবে। প্রথমে একটি মেয়ে নেওয়া হ'ল তার পর ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি ব্যস্। অপিসের কাজের চেহারা পাল্‌টে গেল। ছোকরাদের কি এফিসিয়েন্সি! এই সময় আমি একটি মেয়েকে দেখেছিলুম। অমন ট্যালেন্টেড্ গার্ল আজ অবধি চোখে পড়েনি। আমাদের সব কটাকে মুর্গিহাটায় কুমকুমির দরে বেচে আসতে পারত।'

এই অবধি বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর প্রবীণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতকটা আপন মনেই বলিয়া চলিল, 'তুলনা হয় না, কোটিতে অমন মেয়ে একটা মেলে কি না সন্দেহ! একটি কথায় হাজারেও যেও হয়ে পড়ল! আজও সে দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছে।'

বুঝিলাম প্রবীণ কিছু একটা শুনাইতে চায়।

সুধীর বলিল, 'ব্যাপার কি খুলেই বল, তুই যে নিজে নালে নিজেই বুঁদ হয়ে রইলি!'

চোখ খুলিয়া প্রবীণ বলিল, 'তোরাও দেখলে বুঁদ হতিস্।'

আমি বলিলাম, 'তা যখন দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তখন শোনার ভাগ্য থেকে আর বঞ্চিত ক'রো না।'

শোন তাহলে। 'এখন দশটা-পাঁচটায় অপিস-কোয়ার্টারে গেলে মনে হবে যেন কাছে-পিঠে কোনও মহিলা-সম্মেলনের প্রকাণ্ড অধিবেশন ভাঙল। কিন্তু যুদ্ধের আগে এমনটি ছিল না। সে সময়ে কালে-ভদ্রে মেমসাহেব ছাড়া আর কাউকে ও অঞ্চলে দেখা গেলে অপিসের জানলায় ভীড় জমে যেত। সাহেবরাও সে সময়ে কেরাণী-কুলের কাণ্ড দেখে মুচকি হেসে 'well, well' বলে সরে পড়তেন, যেন কিছুই দেখেন নি। সে এক যুগ রে ভাই, কি সব সাহেব!'

আমরা আলোচনা করতুম, আমাদের অপিসে কেন মেম সাহেব নেওয়া হয় না। আমরা আলোচনা করতুম, আর সাহেবদের ওপরে চটে যেতুম। কেউ কেউ বলত, 'মেয়েরা নেটিভদের সঙ্গে কাজ করবে না।' আবার কেউ কেউ বলত, 'কেন করবে না, মার্চেন্ট অপিসে কাজ করে না?' এখন মার্চেন্ট অপিসে মাইনে ভাল, সাহেবরা সব নজরে নজরে রাখে, কাজেই মেয়েরা সেখানে সুখে থাকত। কাজের মধ্যে ডিক্‌টেশন নেওয়া আর টাইপ করা। তা সাহেবরা সব বেশ ভদ্র, ধীরে-সুস্থে ডিক্‌টেশন দিতেন, তাড়াতাড়ি বলতেন না, পাছে গ্রামার ভুল হয়। সে ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে শর্টহ্যাণ্ড ত' দূরের কথা, পাঠশালার ছোঁড়ারাই যথেষ্ট। আর টাইপ! সারা দিনে যদি ঠুকে ঠুকে দশ-বার লাইন টাইপ হ'ল ত' যথেষ্ট। তার ওপর যদি শুদ্ধ হয় ত' কথাই নেই, চেম্বার অব কমার্স-এ হৈ-চৈ পড়ে যেত। কি টাইপিষ্ট মিস কেলী! হবেই বা না কেন? কত বড় বংশের মেয়ে! ওর রেকারিং গ্র্যাণ্ড ফাদার ডাচেস্ অব হোহোর হেড্-বাটলার ছিল।

শেষ কালে সবাই খেদ প্রকাশ করতুম, না এ জন্মটা বৃথাই গেল। সাহেব হয়ে যদি সামনের জন্মে জন্মাই তবেই মেম সাহেবের সঙ্গে এক অপিসে কাজ করতে পারব। হায় রে! তখন কি স্বপ্নেই ভেবেছিলুম যে, মেম সাহেব নয় এমন স্বজাতি মেয়ে দেখব যে জন্ম সার্থক হয়ে যাবে!'

আমাদের কামিনীদা' বয়সে সুপ্রাচীন ছিলেন, তিনি মাথা নেড়ে বলতেন, 'না ভাই, গবরমেণ্ট মেয়ে-ছেলে অপিসে নেবে না।'

—'কেন?'

—'মেম সাহেবরা ত' আসবেই না আর যদিও বা ইণ্ডিয়ান কেউ আসে তাহলেও খরচা কত? আলাদা একটা রিটায়ারিং-রুম কর, এ কর সে কর, নানা হাঙ্গামা, তার পর মেয়েদের ছুটি বাড়াতে হবে, ষষ্ঠীর পুজোর ছুটি, নীলের উপোসের ছুটি, অম্বুবাচীর ছুটি বিধবাও ত' চাকরী করতে আসবে। তার চেয়ে দরকার নেই ভাই প্রবীণ, এ বেশ আছি। তা ছাড়া অপিসে মেয়ে ঢুকিয়ে কি শেষে ফৌজদারীতে পড়ব? পঁচিশটি বছর বয়স হতে চলল, তবু গিন্নীর যা সন্দেহ তা আর বলবার নয় ভাই। তার পরে ভাই যদি শোনে যে, অপিসে মেনকা, উর্ব্বশী ঢুকেছে তাহলে আর রক্ষে নেই, বেঁটিয়ে প্রাণ হাতে তুলে দেবে। আর কেন, কোনও রকমে সত্তরটা বছর হলেই বাঁচি।'

আমি বলিলাম, 'বলিস কি! সত্তর বছর অবধি কামিনীদা চাকরী করেছিলেন? রিটায়ারের এজ কত?'

—'সে সময়ে কি আর বয়সের কড়াকড়ি ছিল! যা হোক একটা বয়েস বললেই হল। আমাদের তিনুদা'র সঙ্গে তার ছেলের অফিসিয়াল এজের তফাৎ হচ্ছে দশ বছর।'

সকলে সমস্বরে বলিলাম, 'য়্যাঁ!'

'হ্যাঁ। তিনুদা' গোটা দশেক বছর কমিয়ে অপিসে রেকর্ড করিয়েছিলেন। তার পর ছেলে চাকরী করতে এসে তার সার্টি-ফিকেট দেখিয়েছে, তিনুদা'র সময়ে সে বালাই ছিল না। ব্যস্, আর যায় কোথায়, দেখা গেল বাপ-বেটার বয়েসের তফাৎ দশ বছর। অপিসময় হৈ-চৈ পড়ে গেল, সে এক কেলোর কীর্ত্তি! সে আর এক ইতিহাস। আর এক দিন হবে'খন। বুঝলে, তবে একটা কথা, আমরাও তখন কাজ করতুম ঐ মিস্ কেলীর মত। যে সুখে ছিলুম তা বলবার নয়। হপ্তায় গোটা চারেক চিঠি

করলেই মনে করতুম যথেষ্ট কাজ করেছি। তা ছাড়া বিপদে-আপদে অফিসাররা বাঁচাতেন। তাঁরা সব ছিলেন মহাশয় ব্যক্তি। এখনকার মত নয়। তাঁদের কলমে জোর ছিল, গলায় 'ভল্যুম' ছিল, চোখে লাল আভা খেলত। এক লাইনে অর্ডার দিয়ে নোট পাঠালে এক পাতা ইংরেজীর তুবড়ি ছোটাতেন। কেরাণীকুল ছিল তখন নিতান্ত নগণ্য, কাজেই অফিসাররা ঘেন্নায় কারুকে শাস্তি দিতেন না। তখন অপিস বলতে বোঝাত ফ্যামিলি সার্কেল। অনেকেরই ছেলে, জামাই এক অপিসে কাজ করত; কাজেই জেঠা, খুড়ো সম্বন্ধ পাতান ছিল।

আমাদের বড়বাবু ছিল সুবোধ সরখেল নিতান্ত বাচ্চা, প্রবেশনার হয়ে ঢুকে পরীক্ষা দিয়ে বড়বাবু হয়েছে। আমাদের খুব সমীহ করত। সহ-বড়বাবু অর্থাৎ এ ডবল এস্ বা গাধা ছিল রাঘব আমাদের ইয়ারবক্সী, কাজেই আমরা খুব মজাতেই চাকরী করতুম। এখন একটা কথা বলব ভাই, কথাটা খাঁটি। যে অপিসে পাঁচটা ভাল-মন্দ কথা হয় না, সেটা অপিসই নয়; আর যে কেরাণী সে কথা বলে না বা যোগ দেয় না, তার চাকরী রাখা দায়। এদিকে অপিস সম্বন্ধে জেঠা মশায়, সামনে সিগারেট খাও চড়িয়ে গাল টুপসে দেবে, কিন্তু ফেউড় কর, খুসী হয়ে টিফিনের সময় গোকুলের গজেরী খাওয়াবে। এখন রাঘব ছিল আমাদের মুকুটমণি। ত্রিসন্ধ্যা জপ না করে জল খেত না, তাই মুখে বেদবাক্য ফুটত। কেউ কেউ বলত, রাঘব মরে গেলে মুখখানা বাঁধিয়ে রাখব। কি সব কথা, কে বার শুনলেই একেবারে হাট পাঁচার মেরে।

বিরিঞ্চি বলিল, 'বাড়ীতেও ঐ রকম কথা বলত?'

'—মোটেই না। গিন্নীর সঙ্গে চুপি চুপি দু'একটা রসের কথা ছাড়া রা'টি কাড়বে না। ছেলে একবার আলেফ সে বে পাস দেখুক না, চেঁচিয়ে বিক্রমন দেখাবে।'

সুধীর বলিল, 'বলিস্ কি? কি করে কলোল করত?'

—'শিখেছেই ত ভারত ভুলিও না তোমার শিক্ষা, তোমার আদর্শ। এই ত ভারতবর্ষের শিক্ষা, এক দিকে ভোগ আর এক দিকে ত্যাগ। বাইরে ফেউড় বরছি, কিন্তু ভেতরটা একবারে সংযম নিয়ে।'

সুনীল উদাস স্বরে বলিল, 'কদ্দিনের পুরোন দেশ।'

'—নিশ্চয়ই ···এখন বুঝলে, ওদিকে তখন পুরোদমে যুদ্ধ লেগে গেছে। জার্মাণী দুড়দাড় করে সব দখল করে নিচ্ছে, এদিকে জাপানী তড়পাচ্ছে। কংগ্রেস বলছে, কুইট ইণ্ডিয়া, মুসলিম লীগ বলছে, উহুঁ, ডিভাইড কুইট পাকিস্থান দিয়ে যাও। ইংরেজের তখন গেল রাজ্য, গেল মান অবস্থা।'

আমরা অপিসে নাম সই করে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে বসে যেতাম খবর শোনবার জন্যে। কামিনীদা নোট সীট্ দিয়ে বাঁধান খাতায় লাল কালিতে কোনও রকমে এক বার শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় এই চাকুরী করিতেছি লিখে তার তলায় কয়েকটা ঐ ঐ বসিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলতেন, 'তার পর কি দাঁড়াল ভাই?'—বাস্, ঐ থেকেই সুরু হয়ে যেত। বড়বাবু মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি করতেন কিন্তু কে কার কথা শোনে? কাজকর্ম সব ডুবে গেল। পুরোন লোক সব লিয়েন নিয়ে অন্য অপিসে গেছে, বাকী আমরা ক'জনই তখন যা আছি। আর গোটা অপিসটা নতুন লোকে ভর্ত্তি। তাও আজ যে লোক আসে, কাল সে আর থাকে না অন্য অপিসে যায়। দেশময় তখন ব্যাঙের ছাতার মত নতুন অপিস গজিয়েছে, সেখানে মাইনে বেশী। লেখাপড়া শিখে কে আর আশী—পঁচানব্বই, একশ—কুড়ি—দশ দু'শো তিরিশে আটকা থাকবে? কাজেই ফাঁক পেলেই সব কেটে পড়ছে। এদিকে সরকারের খোলা হুকুম কেউ যেন চাকরী চেয়ে ফিরে না যায়। কারণ, যে চাকরী পাবে না, সেই বাইরে গিয়ে কুইট ইণ্ডিয়া করবে, না হয় লাইন ওপড়াবে।

আমাদের মস্তান নানা খবর আনে। অদ্ভুত সব খবর, জিজ্ঞেস করলে মুচকি হেসে বলে, 'আছে দাদা, কদিক থেকে সব জোগাড় করতে হয় তার কি ঠিক আছে? তবে আর বেশী দিন নয় মেরে-কেটে এক মাস। আমি ত' জাপানী ফাষ্ট বুকের তালে আছি।'

সুধীর বলিল, 'এক মিনিট, মস্তান কি লোকের নাম?'

'—হাঁ, যেমন পাড়ার মস্তান মানে মাতব্বর, ছোঁড়ারা যাকে রুস্তম বলে। বিরিঞ্চি আমার ত' সোহরাব-রুস্তমের কথাই জানা ছিল, পাড়ায় আবার রুস্তম আছে নাকি?'

—'আছে বৈ কি। মস্তান বা রুস্তমের কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে, দুনিয়ার কাকেও গ্রাহ্য করবে না, সব কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তড়পানির চোটে গগন অন্ধকার করে দেবে, কথায় কথায় হেক্কার দেবে।'

সুনীল বলিল,—'হেক্কার বস্তুটি কি?'

—'মানে চেঁচাবে।'

আমি বলিলাম, 'হেক্কার বোধ হয় হুঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ।'

'—ঠিক বলেছিস্। তুই দেখছি ফিললজিতেও খেয়েছিস। বুঝলে, কিন্তু মস্তানের চেহারাটা হবে লোহা ইটপাটকেল ব্রেথ। অনেকটা তোমার।'

সুধীর বলিল—'নাদুস নুদুস?'

প্রবীণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাকে পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'মস্তানের কাছে নাদু ত' ন্যাংলা, নাদুকে যদি আজ-কালকার ফ্যাশনে গজিশ্রী টাইটেল দিস্, তাহলে মস্তানকে দিতে হবে বাঘাবীরশ্রী। আমাদের অপিসের মস্তান ছিল বিশ্বম্ভর মুখুয্যে, অল্প বয়েস। ছোকরা ভারী এক্সেপার ছিল আর মনটাও ছিল সরল।'

সেদিন কামিনীদা খাতা কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে বললেন, 'ভাই বিশু, ভাই মস্তান, খবর বল শুনি।'

কামিনীদা বিশুকে খুব ভালবাসতেন, কারণ বিশুই পরশুরামের গল্প পড়ে কামিনীদাকে ঐ কালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় লেখার সর্টকাট বাৎলে দিয়েছিল। কিন্তু কামিনীদার কথা শুনে উদাস স্বরে বললে, 'আর খবর দাদা, সমূহ বিপদ!

কামিনীদা একটুতেই উত্তেজিত হতেন, কাজেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ও মা, বিপদ কিসের ভাই! ও রাঘব ও মহীপুতি শুনে যাও মস্তান কি খবর এনেছে।'

আমরা মস্তানকে ঘিরে দাঁড়ালাম মায় বড়বাবু অবধি।

—'কি ব্যাপার?'

মস্তান যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, 'অপিসে মেয়েছেলে নেওয়া হবে।'

মহীপতির দিকে গেল আর ব্যাটম ওয়েট্ আমাদের কাছে এল। কামিনীদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি কি যেন একটা বলবার জন্যে হাঁ করছেন। মস্তান আগে থেকেই কামিনীদা'কে ওয়াচ্ করছিল, এবার কামিনীদা' বলবার উদ্যোগ করতেই সে কাশতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে। আমিও বুঝতে পেরে কাশ্‌তে সুরু করলুম। কামিনীদা' কিন্তু কিছু না বলে একটা হাঁই তুলে নিরস্ত হলেন। মস্তান আর আমাকে এ ভাবে কাশ্‌তে দেখে ব্যাটম ওয়েটটি একটু অবাক হ'ল।'

আমি কাশি থামিয়ে ওর বসবার ব্যবস্থা করে দিলাম। মস্তান বললে, 'প্রবীণদা'র আবার মানে হুপিং-কাশির ধাত কি না। তা আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

আমি নাম জিজ্ঞাসা করলুম। উত্তর পেলুম, 'মিসেস্ মায়া বিশ্বাস।'

কামিনীদা'কে আর ঠেকান গেল না, তিনি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'বেশ নাম, ঐ সঙ্গে মহামায়া হলে আরও ভাল হ'ত! আমাদের সময়ে ঐ সব নামই চল্‌ত কি না, না ভাই প্রবীণ।'

মায়া হেসে বললে, 'আমার নামেও মহা ছিল, কিন্তু স্কুলে বন্ধুরা সব ঠাট্টা করত বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি।'

—'দেখলে ভাই প্রবীণ ঠিক ধরেছি। তা বেশ করেছ ভাই মহা বাদ দিয়ে, কি দরকার বাবা নাম নিয়ে ঠাট্টা শোনার। এই যাঃ, তুমি বলে ফেললুম, কিছু মনে করো না ভাই!'

—'না না, মনে করব কেন? তা' আমায় কি কাজ করতে হবে প্রবীণদা'?

ওর মুখে 'প্রবীণদা' শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

সুনীল বলিল, 'তা আর হবে না, কি চীজ তুমি সেটা ত' দেখতে হবে।'

—চীজ বলে নয়, তুই শুন্‌লে তুইও মুগ্ধ হতিস্। মায়াকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল কলকাম্যা মহিলা। তবে আমাদের কপালে অনেক দিন টিকে থাকবেন। দেখলুম আমার ধারণা ভুল নয়। মায়া সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সেকশনে এমন ভাবে সবার সঙ্গে মিশ্‌তে লাগল যে, দেখে মনে হল, ও যেন বছর দশেক আমাদের সেকশনে আছে। সবার সঙ্গেই হেসে কথা বলে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এমন ছেলে-ছোকরার দলও ত' আছে, লক্ষ্য করলুম দু'-এক জন একটু টাল্‌মাটাল অবস্থায় এসেছে। মায়াকে বলে দিতে হ'ল না ও নিজেই বুঝে নিল। তার পর থেকে দেখলুম সেই সব ছোকরারা কেমন শুম মেরে রয়েছে। আগে পালা করে মাসে এক-দু'দিন করে সব ক্যাজুয়েল লীভ নেওয়া হত, বিশেষ করে ছোকরারা আর যারা বাইরে থেকে আসত তারা ত নিতই। এখন লক্ষ্য করলুম, কামাই প্রায় সেভেন্টি পার্সেণ্ট বন্ধ হয়ে গেছে। মাধব বললে, কিছু ভাবনা নেই, শেষ কালে সব বড়সাহেবের কাছে যাবে যে, রোববারে অফিস খোলা রাখতে হবে।'

বড় সাহেব তার কয়েক দিন বাদে রিপোর্ট পাঠালেন, শুনলুম তিনি নাকি জানিয়েছেন যে, অপারেশন্ সাক্‌সেসফুল।

সেদিন কি একটা উপলক্ষে অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। তার পর বসল আড্ডা এবং এ-কথা সে-কথার পর তর্ক বেধে গেল। কামিনীদা' মাথা নেড়ে বললেন, 'না ভাই, যেমন ভেবেছিলুম তেমন

আমাদের ভূষণ ছিল ঘোর কনসারভেটিভ অর্থাৎ ওর বাড়ী ছাড়া আর সব বাড়ীই খারাপ। সে গম্ভীর ভাবে বললে, 'কিন্তু কথা বলার ধরণ বাপু ভাল নয়। মনে হয় যেন মুখে রসগোল্লা নিয়ে বলছে, কেবল রসাল-রসাল ভাব খুব খারাপ।'

কাঁচাদের মধ্যে বরুণের রসজ্ঞান ছিল খুব টনটনে। সে বললে, 'মোটেই খারাপ নয়। বরং ঐ ভাবে কথা বলা, ওটা আর্ট। ওকে বলে, 'উইপিং অব দি হার্ট' মানে প্রতিটি কথায় অন্তরের দরদ মেশান থাকবে। খুব সেন্‌সিটিভ মাইণ্ডের লক্ষণ।'

কামিনীদা' চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হার্ট-এর আবার কান্না কি রে বাবা! আমরা ত' বরাবর শুনে আস্‌ছি উইল্ডারনেসের কান্না, টু ক্রাই ইন দি উইল্ডারনেস্, না ভাই প্রবীণ!'

ভূষণ ছাড়বার পাত্র নয়, বললে, 'আরে বাবা, দেখতে ত' আর বাকী নেই। বলি ঐ ত চেহারা তার আবার অত ঠমক কেন? বৌ মানুষের আবার চোখে কাজল দেওয়াই বা কেন? আমার ত—।'

বরুণ বাধা দিয়ে বললে, 'ভূষণদা, আই বেগ টু ডিফার। চেহারা বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না। তবে আমি বলব মিসেস বিশ্বাসের চেহারা আপনাদের আমলের তিল ফুল তিনি নাসা নয় বলেই অপূর্ব। বিউটির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে টুইস্‌ট্। যার ক্রিয়েশনে টুইস্‌ট্ বেশী সেই হচ্ছে সব চেয়ে বড় আর্টিষ্ট। সুখে সংসার করছেন কষ্ট করে মরে গেলেন সংসারে একটা ওলট-পালট হয়ে গেল, যাকে বলে টুইস্টিং, তাই থেকে এল কনফ্লিক্ট, ট্রাজিডি, বিউটি। ভগবানকে সেরা আর্টিষ্ট বলা হয় এই জন্যেই। চেহারাতেও তেমনি দেখতে হবে চেহারায় টুইস্টিং আছে কি না অর্থাৎ চেহারাটা ষ্ট্রেট আর প্রোপোরশনেট্‌লি কাণ্ড কি না। পিকাসোর ছবি দেখেছেন? আচ্ছা, অত দূরে যাবার দরকার নেই, নন্দ বাবুর শূয়োরের ছবি দেখেছেন? যাক্‌ গে, কিছু দেখবার দরকার নেই, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—।'

ভূষণ হাত জোড় করে বললে, 'বাবা, আমায় বোঝাতে হবে না, আমি খুব বুঝেছি।'

—'তেন, দেয়ার এণ্ডস্ দি ম্যাটার। বাই দি ওয়ে, কাজলেরও একটা নেসেসিটি আছে, ওতে চোখের স্পেসিফিক গ্রাভিটি বাড়ে, ফিগার লুক্ হয়।'

মস্তান মাথা নেড়ে বললে, 'এ কথা মেনে নিতে বাধবে। সত্যিই লুক্ বটে, যেন বড্ডি লাইন বাম্পার, অতি কষ্টে বেঁচে আছি।'

আমি চুপ করে ওদের আলোচনা শুনলুম। মায়ার সম্বন্ধে আমি যা জানি তা যদি ওদের জানাই তাহলে এক্ষুণি মহাভারত তৈরী হবে।

আমি বলিলাম 'তুই কোত্থেকে জান্‌লি?'

—মায়াই আমাকে বলেছিল। ওর কেমন একটা আমার সম্বন্ধে ইনসেণ্ট ধারণা জন্মেছিল। আমি জানতুম যে, ওর অনেক বন্ধু আছে, অনেক ক্লাবে বিশেষ করে দক্ষিণ পাড়ার একলা থেকো না, আর সাহেব পাড়ার কিলোওয়াট্ ক্লাবে ওর যাতায়াত আছে। মাঝে মাঝে থিয়েটার-সিনেমাতেও এমন সব লোকের সঙ্গে ও যেত যাদের জন্যে কলকাতায় এখানে-সেখানে আউট অব বাউণ্ডস্ নোটিশ টাঙান হয়েছিল। অবশ্য এ জন্যে মায়ার তেমন কোনও দোষ দেওয়া যেত না। ওর স্বামী এতে আপত্তি করত না বরং এই ভাবে মেলা-

[illegible]

নতুন
বড়
সাইজ
রেক্সোনা
আরও নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বকের জন্য
'ক্যাডিল'* যুক্ত একমাত্র সাবান
GIANT SIZE
Rexona
তেলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

সুধীর বলিল, 'দেবতাটি করেন কি ?'

—সাব-কন্ট্রাকটার। আলু পটল থেকে আরম্ভ করে মাছ-মাংস এমন কি মানুষ অবধি মিলিটারীতে সাপ্লাই দিত। মায়া মেলামেশা করত বটে, কিন্তু ওর স্বামী আড়াল থেকে চোখে চোখে রাখত। ওদের নতুন বাড়ী হচ্ছে সিঁথিতে, এক তলা হয়ে গেছে। দোতলা তুলতে হবে, টাকার দরকার, তাই মায়াকে চাকরী করতে আসতে হয়েছে। ইচ্ছে ওদের যে, স্বামি-স্ত্রীতে খেটে-খুটে ছোট্ট একটি নীড় বাঁধবার। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নীড়টা বোধ হয় মায়াকে একলাই বাঁধতে হবে। স্বামী আয় করত মন্দ নয়, ব্যয় করত কিন্তু প্রচুর। মাঝে মাঝে প্রায়ই এমন সব লোককে বন্ধু বলে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে আনত যাদের দেখে মায়ার মনে হ'ত এরা সতীন না হয়ে যায় না। মায়া মাঝে মাঝে নিষেধ করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে অফিসে এসে ঢুকেছে।

অফিসের সোসাল ফাংশানে মায়া দু'খানা গান গাইলে। প্রথম গানটা পরিচিত—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।' দ্বিতীয়টি একখানা আধুনিক গান, সেখানা ত গান নয়, কামান। গানটার মানে হচ্ছে, 'তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ী আসবে বলেছিলে অথচ এলে না। সংসারে খুব টানাটানি যাচ্ছে, বাজারে মাছ বেশ সস্তা, যদি এর মধ্যে আস, তাহলে আসবার সময় আমার জন্যে দু' গজ ছিট নিয়ে এস। আচ্ছা, তুমি কি বল ত ? অমন ভাবে চিঠি লেখে ? যদি চিঠি আর কেউ দেখে ফেলত ? দিন দিন ভারী অসভ্য হচ্ছ তুমি, আমার বুঝি লজ্জা করে না। দুষ্টু কোথাকার !'

পরদিন একতলা থেকে চারতলা অবধি অফিসে সবার গলাতেই ঐ গানের শেষের দু'টি লাইন, 'আমার বুঝি লজ্জা করে না, দুষ্টু কোথাকার।' গোটা অফিসটা মায়াময় হয়ে গেল। অর্থাৎ আগে ভিনি ভিসি ছিল ভিডি হ'ল। বরুণ বললে, 'ভিভাল্ট এম বি।' মস্তান তার ব্যাখ্যা করে বললে, 'মায়াবিনী দৈবজ্ঞী বৌদ্।'

আমাদের সাহেব বা অফিসার এস. মহেন্দ্র ঘোষ সাহেব আর ভয়ানক রসপিপাসু। তিনি কোনও দিন সেকশানে ঢুকতেন না, কারণ ক্লার্কদের সঙ্গে তাহলে কথা কইতে হবে। যা কিছু হুকুম তা সব কাগজ মারফৎই চালাতেন। নিতান্তই যদি কাউকে গালাগাল দেবার দরকার হ'ত, তাহলে কেরাণী আর বড়বাবু দুজনকেই ঘরে ডাকতেন আর গালাগাল দিতেন বড়বাবুকে, বড়বাবু আবার সেটা কেরাণীকে শোনাতেন। অনেকটা তোমার সেকেলে ছেলেকে সামনে রেখে ভাসুরের সঙ্গে কথা বলার মত। কিন্তু মায়ার গান শুনে সাহেব এত মুগ্ধ হলেন যে, তিনি ঘন-ঘন সেকশানে আসতে লাগলেন এবং প্রায়ই বড়বাবু ছাড়াই কেরাণীদের বিশেষ করে মায়াকে ঘরে সেলাম দিতে লাগলেন।

সেদিন কামিনীদা' কি একটা কাজে সাহেবের ঘরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললেন, 'ও ভাই প্রদীপ, সাহেব গান গাইছে।'

'—তাতে কি হয়েছে ? সাহেব কি মানুষ নয় ?'

—'কিন্তু এ গান সে গান নয়। মায়ার গান গাইছে।'

মহীপতিও বাইরে থেকে ফিরে এসে বললে, 'ও স্পষ্ট শুনলুম সাহেব গান গাইছে, 'দাঁড়িয়ে আছে, তুমি আমার গোলার পারে।'

ভূষণ বলিল, 'মরেছে, আঁটকুড়ির ব্যাটা শেষে গানকে গোলা বানিয়ে ফেললে ?'

কামিনীদা' বললেন, 'কি হল ভাই ?'

মস্তান বলিল, 'কুসুমে কীট প্রবেশ করিল।'

সত্যই কুসুমে কীট প্রবেশ করল। আগে পোষ্ট পেমেণ্ট চেক ভেরিফিকেশন করত রাঘব, এখন দেখলুম সে কাজ রাঘবের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মায়াকে দেওয়া হল। কাজটায় অনেক লেখা-পড়া করতে হত আর সাহেবের সামনে বসে করতে হ'ত। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাকে-তাকে দেওয়া যায় না এক মায়া ছাড়া। কাজটি মায়া পেল আর সাহেব হুকুমজারী করলেন যেন এ সময়ে কেউ বিরক্ত না করে। কাজটা 'হেভী', কাজেই বিকেল থেকে আরম্ভ হত আর শেষ হত ছুটির পর সন্ধ্যে নাগাদ। ওপর থেকে আরও কয়েকটি কচি সাহেব এসে জুটতেন, হাসি-ঠাট্টার ভেতর দিয়ে কিণ্ডারগার্টেন মতে ভেরিফিকেশন হত অর্থাৎ লাফ হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক। পর্দার আড়াল ভেদ করে সে হাসি মাঝে মাঝে বাইরে ছিটকে পড়ত আর তাই কুড়িয়ে নিয়ে বেঁটে টিপাতে টিপাতে চোখ বড় বড় করে চাপরাসীরা বলাবলি করত, 'কা হোয় রে ?'

—'ভারিফিকিশন বা।'

কাজেই বুঝতে পারছ আমরা কি সুখে ছিলুম। আমাদের কোন কিছুর জন্যে দরবার করার দরকার হলে মায়াকে বলে খালাস হতুম, মায়া ম্যানেজ করত। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, আগে আমাদের কাছে চিঠির গাদি পড়ে থাকত, এখন চিঠির গাদি পড়ে থাকে অফিসারদের কাছে। এরিয়ার সমানই আছে শুধু টেবল পাল্টেছে। বাড়ীতে যদি কখন বেশ বড় করে মাংস রান্না করা হয়, তার খোসবু আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়বেই। তেমনিটি ঠিক মায়ার বেলাতেও। সোসাইটিতে বাস করে তুমি যে চেপে যাবে তা হবার যো নেই, এক কান থেকে শতেক কান হতে বেশী দেরী লাগে না। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অফিসের বন্ধুদের কাছেও আস্তে আস্তে আমাদের অফিসের কথা শুনতে পেলুম, গর্বে বুক ভরে উঠল :

আমাদের ছিল পেমেণ্ট সেকশন। কাজেই বাজেট চাপ বুঝতেই পারছ। লোকে পেমেণ্টের জন্যে দু'বেলা ভীড় করে। তাদেরও দোষ নেই। দু' তরফ তিন তরফ ধরে অর্ধেক মাল দিয়ে পুরো মালের বিল করেছে। বেশ জানে যদি তাড়াতাড়ি চেক বার করতে না পারে তাহলে হয়ত' বিপদে পড়বে। এত দিন যুদ্ধের ডিড়িকে কর্তাদের কাক-কাঁকর জ্ঞান ছিল না, এখন যুদ্ধ থেমেছে এইবার বাবুরা যা টাইট হবে তা আর বলবার নয় ! তারা আমাদের দুবেলা তাগাদা দিতে ছাড়ত না আমরা আমাদের কথা বলে খালাস হতুম। কিন্তু তারা সব ব্যবসাদার লোক, সুযোগ-সন্ধান কি করে বার করতে হয় তা তারা জানে। দিন কয়েক বাদেই তারা হাসিমুখে এসে জানালে, দাদা পেয়েছি। এখন আপনারা দয়া করে বিলটা চেক করে সাহেবের ঘরে পাঠান, তাহলেই হবে।'

দেখলুম মায়ার সঙ্গে তাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে।

বিপুল, কে, বিপুল কোম্পানীর বেশ মোটা টাকার বিল হ'ত, মস্ত বড় ব্যবসাদার ফার্ম, কাজেই ওদের লোকেরা আমাদের প্রায় সবারই পরিচিত ছিল। আমরা ওদের আমল দিতুম না বলে ওরা

একটু সমীহ করত। কিন্তু সেদিন এক জন স্পষ্ট বললে, 'দাদা যাই বলুন, মিস্ বিশ্বাস যা বলবেন তাই হবে।'

আমি বললুম, 'মিস নন উনি মিসেস্।'

—'তা হবে, কিন্তু সিঁদুর-টিঁদুর ত' দেখলুম না?'

কামিনীদা' বললেন, 'আছে বেহ্মতালুর ওপরে।'

মায়াকে রেগেই বললুম, 'এবার দেখছি আমাদের মান-ইজ্জৎ রইল না।'

—'কেন প্রবীণদা'।

কর্মচারীর কথাটা বলতেই মায়া জ্বলে উঠল, বললে, 'আপনারা প্রোটেষ্ট করলেন না কেন? আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা।'

কি মজা দেখালে জানি না, কিন্তু দিন কতক বাদে কর্মচারীটি এসে হাতজোড় করে বললে, 'প্রবীণ বাবু, যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে ত' ক্ষমা করবেন।'

মন্মথ চুপি চুপি আমায় বললে, 'কত দূর অবধি মায়াজাল বিস্তার হয়েছে দেখুন!'

কর্মচারীটি আবার বললে, 'আমাদের ছোট কর্তা আসবেন আপনাদের নেমন্তন্ন করতে।'

—'কিসের নেমন্তন্ন?'

—'আমাদের কোম্পানীর ফাউণ্ডেশন-ডে অ্যানিভারসারি। আপনি, কামিনী বাবু, মিসেস বিশ্বাস আর কাকে কাকে বোধ হয় বলবেন। কর্তার কয়েক জন পার্সোনাল ফ্রেণ্ড্স্ আর আপনারা এই নিয়ে। সোমবার ছুটি আছে, সেই দিন বাগান-বাড়ীতে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা।'

কামিনীদা' শুনে বললেন, 'আমি ত ভাই যেতে পারব না? সোমবার বাবা তারকনাথের উপোস করি, পিতৃপুরুষের ওষুধ পেয়েছি কি না।'

—'বেশ ত' কর্তাকে বলব খান না হয় খাবারে হবে।'

কামিনীদা' এবারেও সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, 'খাবারেও হবে না, শুধু নিরিমিষি খাই।'

আমি বললুম, 'সে দেখা যাবে'খন।'

পরদিন ছিল শনিবার, কাজেই ছুটি হবার আগেই সেকশন প্রায় ফাঁকা। আমরা পড়লুম মহাবিপদে। মায়া বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি জ্বালাতন বলুন ত' প্রবীণদা'! আমি কাল থাকতে বারণ করে দিলুম। ভুটো বাজে, এখনও দেখা নেই। ইকান্সেটি, আমি কক্ষনো যাবো না পার্টিতে। আমি উঠলুম, জ্ঞানপ্রদায়িনী ক্লাবে যেতে হবে।'

এই করতে করতে কর্মচারীটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, 'আর বলেন কেন, এক প্রসেশন বেরিয়ে সব গুলিয়ে করে দিলে। কর্তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তাঁর ধারণা, আপনারা সব চলে গেছেন। কর্তার কয়েক জন বেশ্চও আছেন পাশেতে।'

আমরা সেকশনের বাইরে এলাম।

বিপুল, কে, বিপুল কোম্পানীর ছোট বিপুল এলেন। বেশ চেহারা, প্রথম দর্শনেই বিশ্বরূপ দর্শন হ'ল। ছোট কর্তা তিনি মাথার ওপর, কাজেই অন্য সব আছেন তাঁরাই ব্যবসা দেখেন। ইনি কেবল বিশেষ কোনও মিশন ছাড়া বের হন না, বাগান-বাড়ীতেই থাকেন। আমাদের সঙ্গে যে সময়টা তিনি দেখা করতে এলেন সে সময়টা বোধ হয় ওঁর সীজ-ফায়ার টাইম। অর্থাৎ গত রাত্রিবের খোঁয়াড়ি সবে ভেঙেছে আর আজকের নেশা শুরু হবারও দেরী আছে, এমনি এক মহেন্দ্রক্ষণে আমাদের তিনি নেমন্তন্ন করতে এলেন। তিনি জানালেন যে, অফিসিয়াল কর্মাতিথিদের মধ্যে আমাদের সূত্রপাত হলেও এ পরিচয় টাল্ ইটারনিটি থাকবে। আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তিনি খুশী হয়েছেন আর মায়ার সঙ্গে জানা-শোনা ঘটাতে তিনি ধন্য হয়েছেন। তার পর তিনি কর্মচারীটিকে বললেন, 'দেখ ত অতীন, ওরা আসছে না কেন?'

মায়া যেন একটু চমকে উঠল।'

—'কার কথা বলছেন?'

'—আমার কলেজের বন্ধু অতীন বিশ্বাসের কথা বলছি। এখন আবার আমার সঙ্গে কিছু কিছু কারবারও করে, তবে মেনলি ফ্রেণ্ড। এ স্মার্ট গাই। আমি এখানে আসব শুনে বললে—চল আমিও ঘুরে আসি আর আলাপ করে আসি মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে। ওর কে এক আত্মীয় নাকি এখানে কাজ করে।'

এক জন সুবেশধারী ভদ্রলোককে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম।

কর্মচারীটি বললে, 'স্যার, ঐ যে আসছেন।'

'এস অতীন, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এ হচ্ছে আমার বন্ধু।'

মায়া মাথা দিয়ে আমায় সরু ভাবে বললে, 'প্রবীণদা', ইনি হচ্ছেন মিঃ বিশ্বাস।'—এই অবধি বলে প্রবীণ চুপ করে রইল।'

বিরিঞ্চি উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, 'ইয়ে এসে আর হরী ডোবাচ্ছিস্ কেন? বল, তার পর কি হল?'

তার পর? তার পর যাত্রা সব শেষ তাড়া করে থাকে সব কালে। ছোট বিপুল তার কর্মচারী নিয়ে মুচকি হেসে কেটে পড়লেন, আমি কামিনীদা'কে এক রকম জোর করে টেনে সেকশনে ঢুকে পড়লুম।

এখন অতীন এতটা আশা করেনি। সে ভেবেছিল কে ব কে? আর সত্যিই অতীনের দোষ দেওয়া যায় না। বাপের ঘরেই যোগের বাসা হয় বটে, কিন্তু বাপ তা জানবে কি ক'রে বরং দোষ জানে। আজও চোখের ওপর সে দৃশ্য ভাসছে। অফিস ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, বাড়ী এক রকম ফাঁকা, আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি, কামিনীদা' চোখ কপালে তুলে হাঁ করে আছেন। অতীন এক বার এদিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে নিশ্বাস ফেলে বললে, 'হুঁ, এই সব হচ্ছে।'

'বা রে! কি আবার হচ্ছে!'

—'এগুলো কি?'

—'কি আবার! তুমিই ত বেশ স্মার্টলি চালে চাকরীটা বজায় রাখতে বলেছিলে, নইলে দোতলা উঠতে না বলে শাসিয়েছিলে।'

অতীন ছোকরাটা দেখলুম বেশ রসিক। বললে, 'তা চাকরী বজায়ের যা নমুনা দেখলুম, তাতে দোতলা কেন বাড়ীর ওপর হ্যাংগিং গার্ডেন অব ব্যাবিলন হবে।'

প্রবীণ গল্প শেষ করিল। সুধীর বলিল, 'ভাল কথা, এটা কোন অফিসের ঘটনা। তুই ত' অনেক ঘাটেরই জল খেয়েছিস্।'

'—অফিস পার্টিশনের পর উঠে গেছে। নাম শুনে আর কি করবি।'

অমর মুখোপাধ্যায়

বর্ষণ মুখর রজনী। প্রতিদিনের বাঁধা রুটিনের শৃঙ্খল ছিন্ন হয়েছে সে দিন প্রকৃতির তাণ্ডব খেয়ালে। বৌবাজারের সুপরিচিত বিপিনদা'র আস্তানায় বিপিনদা'কে ঘিরে বসে আছি আমরা ক'জন। আবদার হয়েছে 'রডা' লুটের গল্প শোনার। বিপিনদা' শুরু করলেন—বাইরে বজ্রপাতের সঙ্গে তাল রেখে বিপিনদা'র বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সে দিন যে গল্প শুনলুম, আজও তা' মনের পাতায় এতটুকু ম্লান হয়নি।

"বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির সোনালী স্বপ্ন নিয়ে শুরু হ'ল 'আত্মোন্নতি সমিতির।' দেহ ও মনের অনুশীলন নিয়মিত চলতে লাগল। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের অসাড় প্রাণে সাড়া আনতে হবে। সেই সাধনায় 'আত্মোন্নতি সমিতি' এগিয়ে চলে। শত্রু ইংরাজ অসুরের প্রবল তার বজ্রমুষ্টির কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। দুঃসাধ্য কর্তব্য—পালন করতেই হবে। তাই, অস্ত্র চাই। বিরাট সমস্যা! তবু, অন্ধকারেই পথের নিশানা খুঁজে নিতে হবে—নূতন প্রভাতের রক্তরাঙা সূর্যের আমন্ত্রণ মিথ্যে হবে না।

"সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীঅনুকূল মুখোপাধ্যায় খবর দিলেন যে, কলকাতার বন্দুক-ব্যবসায়ী 'রডা কোম্পানি' বাইরে থেকে কিছু অস্ত্র আমদানি করছেন—যে ভাবেই হোক ঐ অস্ত্র হাত করা চাই। গোপন সভা বসল দুর্গা পিতুরি লেনের একটি বাড়ীর দোতলায়। পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করলেন বিপিনদা'। দায়িত্বের অনেকটা অর্পিত হ'ল প্রধানতঃ শ্রীশ মিত্রের উপর। শ্রীশ মিত্র ছিলেন রডা কোম্পানির সরকার। তাঁর ডাকনাম ছিল 'হাবু'। কোম্পানির মাল আমদানি-রপ্তানির কাজ অনেকটাই তাঁর উপর ন্যস্ত থাকত। কখন, কোথায়, কি ভাবে সেই অস্ত্র হস্তগত করা যায়, তার নির্দিষ্ট কার্যক্রম স্থির করা হল।

"তার পর, যথাদিনে 'কাস্টমস হাউস' থেকে গরুর গাড়ী ক'রে দিনে-দুপুরে শ্রীশ মিত্র সেই মাল পাচার করে দিলেন, কিছু মাল কোম্পানির ঘরে গেল। বাকীটা বৌবাজারের বিভিন্ন অলি-গলির মধ্যে লুকিয়ে ফেলা হ'ল। 'আত্মোন্নতি সমিতির' হাতের মধ্যে এসে পড়ল পঞ্চাশটি মশার পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ বুলেট। বিদ্যুতের ঝলকানির মত ভারতবর্ষের আকাশ সেদিন চমকে উঠল। ইংরাজের রোষদীপ্ত মুখমণ্ডল অধিকতর রক্তিম হয়ে সারা সহরে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসীর নূতন ধরণের মহড়া শুরু করে দিল।

"কিন্তু আর দেরী নয়। যোগ্য পাত্রে অস্ত্র প্রদান করতে হবে। বণ্টনের দায়িত্ব নিলেন বিপিনদা'। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 'আত্মোন্নতি', 'অনুশীলন,' ও 'যুগান্তর' দলের মধ্যে ঐ অস্ত্র ভাগ করে দেওয়া হল। নূতন উদ্যমে শুরু হল বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি।

"পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আরও তৎপর হল—বিপিন গাঙ্গুলীকে তার দলবল সহ গ্রেপ্তার করতে হবে। মোটা টাকা পুরস্কার। এমনই এক দিন—মানিকতলার কাছে এক মুসলমান-বস্তীতে প্রবেশ করতে দেখা গেল এক কাবুলিওয়ালাকে, সঙ্গে তার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে তখন। বস্তীর এক আলো-বাতাসহীন ঘরে টিমটিমে বাতি জ্বালিয়ে রহিমউল্লা বসে আছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। আগন্তুকদ্বয় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। তার পর, তিন জনের মধ্যে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথাবার্তা চলতে লাগল। রহিমউল্লা বলতে থাকে—'আমরা যে অস্ত্র সংগ্রহ করলাম তা' ত, সামান্য। ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে বাইরে থেকে অস্ত্র-সাহায্য চাই।...কি বলেন বিপিনদা'?' কাবুলিওয়ালা ঘাড় নেড়ে সায় দেয় এবং মাড়োয়ারীটির দিকে ফিরে বলে—'অনুকূল বাবুর মতটাও শুনি।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একমত হয়ে বলেন—'হাবুর কথাই আমার কথা। আমাদের কয়েক জনকে দেশের বাইরে চলে যেতে হবে।' কাবুলিওয়ালা গম্ভীর ভাবে মত প্রকাশ করেন—'আমি ভাবছি, হাবুকে চীনের দিকে পাঠিয়ে দিই।...কি হাবু! পারবে ত?' রহিমউল্লা বিনীত কণ্ঠে বলে—'আপনার আদেশ মাথায় নিলাম।'

"তিব্বতে এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে দিলেন বিপিনদা'। সেই পত্রখানি এবং যৎসামান্য পাথেয় সম্বল ক'রে 'হাবু' ওরফে 'শ্রীশ মিত্র' বেরিয়ে পড়লেন। তিব্বতে কয়েক দিন কাটিয়ে চীনের পথে পাড়ি দেবেন—এই স্থির ছিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে সেই বন্ধুটির কাছ থেকে বিপিনদা' চিঠি পেলেন যা তার মর্ম নিদয়, ভয়ঙ্কর! তিব্বতের পাহাড় ডিঙিয়ে হাটাপথে চীন যাত্রা করেছিলেন 'শ্রীশ মিত্র' এবং সেই দুর্গম পথে চলার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফলতে দেরী হয়নি মোটেই। হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ দিতে হ'ল তাঁকে।"

বেশ মনে আছে, সেদিন গল্প বলতে বলতে বিপিনদা'র স্বর শেষের দিকে ভারী হয়ে এল, চোখে তাঁর নেমে এল আষাঢ়ের সজল ছায়া। চমকে উঠে বললুম—'এ কি বিপিনদা', আপনার চোখে জল?' বিপিনদা' নিজেকে সংযত ক'রে বললেন—'এ অশ্রু আমার নয়। সন্তানহারা ভারত মায়ের চোখের জল। উৎসবের দিনে মায়ের যেমন হারান ছেলে-মেয়ের কথা বেশী ক'রে মনে পড়ে, আমারও তেমনই আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের কথাই মনে হচ্ছে। যাদের আমি নিজে হাতে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে দিয়েছি—যারা আমার কথায় হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছে। যদিও আমি জানি, গোলামের লেখা ইতিহাস ছিঁড়ে ফেলে যে দিন আমরা স্বাধীনতার সত্যকার ইতিহাস লিখব সেদিন আমার 'হাবু'র মত হাজার হাজার অমর প্রাণের নীরব আত্মদানের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলি সোনার অক্ষরে লেখা হবে।'

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

সেই কত দিন আগে ক্যান্টন-ষ্টেশনে ফুটফুটে এক পায়োনিয়র মেয়ে নতুন আগন্তুকের হাত ধরে পথ দেখিয়ে এনেছিল! ওয়াই মিঁ এ—নামটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলাম, ওয়াই মিঁ এ। আজকে শেষ দিন সেই ক্যান্টনে।

ওঁরা বলেন, পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে এবার যাওয়া তো উচিত!

নিশ্চয়, নিশ্চয়! সব শহরে এমনিতরো ঘাঁটি আছে, একটাও দেখার ফুরসৎ হয় নি। তা ভালই হল। যাচ্ছি ওয়াই মিঁ এদের ওখানে। উঃ, কি বিপদেই ফেলেছিল! হাত কিছুতে ছাড়বে না—মোটরে উঠে দরজা দিতে পারি নে। এক হাতে ফুলের তোড়া, আর এক হাত তার কুচের হাত দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ছাড়িয়ে নেওয়া সোজা! আজকে হদি—কপালের কথা কি বলা যায়?—ওয়াই মিঁ এ কে হঠাৎ যদি পেয়ে যাই! চিনতে কি পারব আলো-ঝলমল ষ্টেশনের বিপুল জনতার মধ্যে কপের রঙের উল্লাসের দীপ্তির মাঝখানে মিনিট কয়েকের দেখা সেই ক্ষুদ্র বান্ধবীকে? সকলের থেকে আলাদা করে নিতে পারব?

পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে ওয়াই মিঁ এ কে পেলাম না, কিন্তু তাতে কি! আর অন্তত পঞ্চাশটা রয়েছে অবিকল সেই মেয়ে! বিদেশি মানুষ, কালো রঙের লম্বা চেহারা—একটুকু ভড়কে যায় না কোনটি। যেন সকালে-বিকালে দেখা হচ্ছে, হামেশাই এসে গল্প-গুজব করি—আজকেও এসেছি। অচেনা নেই, এক নজর একটুখানি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে তা-ও নয়। গিয়ে দাঁড়াতেই চক্ষের পলকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল আমাদের। গুণতিতে আমরা কম, তারা অনেক বেশি। তাই তিনটি চারটির একমালি সম্পত্তি হয়ে পড়লাম আমরা প্রতি জন। ভাগের মা গঙ্গা পান না, কিন্তু ভাগ-করা এই বুড়ো বুড়ো ছেলেগুলোকে কাড়াকাড়ি করে এ-গঙ্গায় ও-গঙ্গায় নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাদের পায়োনিয়র-দলের ঐশ্বর্যের অবধি নেই—এবাড়ি-ওবাড়ি এঘরে-ওঘরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ধরল ডান-হাত তো ও এসে ধরে বাঁ-হাত। এ সোনালি মাছ দেখাবে তো ও টেনে নিয়ে দেখাবে লাল পাতাবাহার।

সান ফুন-লিন নামে অতি-ছোট মেয়ে—আমি পড়লাম তার দখলে। আরও তিন-চারটে ভাগীদার আছে, কিন্তু সানের দোর্দণ্ড প্রতাপে তারা আমল পাচ্ছে না। লোকে যেমন ছাতা কি ঘটি-বাটি কিম্বা গামছাখানা খুশি মতন হাতে নিয়ে ঘোরে, আমাকেও তেমনি এদিক-ওদিক যথা ইচ্ছা হাত ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছেলে—তারও ভাগের আমি—বোধ করি, একেবারে বেদখল হয়ে যাচ্ছি বলেই আস্তে আস্তে আমার পিছন ঘেঁষে দাঁড়াল; সান অমনি মিলিটারি কায়দায় গটমট করে ছেলেটা ও আমার মাঝখানে গুঁজে দিল নিজেকে। গতিক বুঝে বেচারি আপোসে আরও খানিক পিছিয়ে গেল; ও-মেয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের তাগত নেই। সান কড়কড় করে একগাদা কি বলছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। মূর্খ মানুষ—আমি কি বুঝব তার কথা, বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি? যা মেজাজ এই দেখলাম—বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। বিপন্ন হয়ে দোভাষিকে বললাম, শীগগির মানে বলে দাও, ভুবন রসাতলে গেল—দেখছ না মুখভার? মহাপুরুষ নিজে এসে পড়ল, আর রক্ষে নেই। কি বলছে, বুঝিয়ে দাও শীগগির।

দোভাষির সঙ্গে গোপন-বার্তা এই তো কাজকর্মের কথা—তাতেও চটে গেছে। নিয়ে বের করল সেখান থেকে, দোভাষির কাছ থেকে নিরাপদ দূরে নিয়ে গেল। বটেই তো! সে যখন কর্ত্রী, যত কিছু বলাকওয়া একমাত্র তারই সঙ্গে। তার আদেশ বিনা অন্য লোকের কাছে মুখ খুললে সহ্য হবে কেন?

মিউজিয়ামে নিয়ে হাজির করল। মিউজিয়াম তো বহু

কৃষক-শিক্ষণ কেন্দ্র

দেখলেন, এ বস্তু একেবারে আলাদা। ছেলেপুলেদের নিজ হাতে বানানো। আমরা বড়রা কি পারি ওদের সঙ্গে? বলুন। দলের পর দল বড় হয়ে বেরিয়ে যায়, নতুন নতুন ছেলে-মেয়ে আসে—মিউজিয়ামের সঞ্চয় বেড়েই চলেছে সকলের যত্ন ভালবাসায়। এ-আলমারির সামনে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে, ও-টেবিলের কাছে ঝুঁকে দেখাচ্ছে। বকবক করে তাবৎ বস্তুর পরিচয় দিচ্ছে অনুমান করি।

দোভাষি দূর থেকে হাসি-হাসি চোখে অবস্থা তাকিয়ে দেখে,—কিন্তু তার ক্ষমতা কি, আমাদের এলাকার মধ্যে এসে একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেয়! সানের মা-বাবা যখন অক্লেশে কথা বোঝে, ভাইবোন ও অন্য সব লোকে বুঝতে পারে, আমাদের বেলা দোভাষির এসে বোঝাতে হবে কি জন্যে? তবু একটুকু সন্দেহ হয়ে থাকবে বুঝি—মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সাড় নিচ্ছে, বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধা হচ্ছে কি না। আরে, 'না' বলবার কি তাগত আছে, পরমোৎসাহে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছি—অর্থাৎ, হে কন্যা মনসাঠাকরুণ, তোমার কমাদাঁড়ি-হীন তাবৎ চীনা বকবকানি জলের মতন বুঝে যাচ্ছি। শ্রোতার বুদ্ধিমত্তায় পরম খুশি হয়ে সান কথার তোড় আরও বাড়িয়ে দিল।

দেয়ালে-দেয়ালে ছবি। ইজেলের উপর ছবি—আধেক আঁকা, পুরো-আঁকা সব ছবি। ছবির গাদা বের করে মেলে ধরে দেখাচ্ছে। ছবি আঁকে—তার বাবদে কত রং, কত সরঞ্জাম! অভিনয় করে, তার জন্যে সাজ-পোশাকেরই বা বাহার কত! রেলগাড়ি-এরোপ্লেন বানায়, টুকরো টুকরো লোহা সাজিয়ে ক্রেণ তৈরি করে। আরও কত রকম কারিগরি! ঐশ্বর্যের অভাব নেই। কত পুতুল, কত রকম-বেরকমের খেলা!…এসো না, খেলবে একটু আমাদের সঙ্গে। এক আছে গাড়ি-গাড়ি খেলা—দৌড়তে হবে এঞ্জিন হয়ে। আরে দূর দৌড়ঝাঁপের খেলা ভদ্রলোকে খেলে বুঝি! চেয়ারে বসে বসে যা খেলা যায়! কানামাছির বুড়ি হয়ে বসি—ছোঁও দেখি চোখ বুজে কেমন পারো! তা ছুঁয়েই তো দিল প্রায় সকলে। হেরে গেলাম। হেরে গিয়ে তখন জোর করে কোলের উপরে তুলে নিই। তোমরা শুধু মাত্র ছুঁয়েছ, আমি এই ঝাপটে ধরেছি বুকে। শেষ অবধি জিত আমারই, কি বলো? চলো, আর কোথায় যাওয়া যায়, অন্য কি দেখবার আছে?

ছোট হলঘর। ঐ যে অভিনয়ের কথা শুনলেন, তার ঠেক হল এখানে। থিয়েটার ছাড়া সভাও হয়ে থাকে। ঠেকটুকু বাদ দিয়ে ছোট ছোট চেয়ারে বাকি ঘর বোঝাই। সেই সব চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসলাম সকলে। দেখাচ্ছে আমাদের কত ছোট। কেউ ফোটো তুলে রাখে নি যে। তা হলে আপনাদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতাম কেমন করে বয়স ভাঁড়িয়ে ছোট্ট একটুকু হওয়া যায়। ভেবেছিলাম চেয়ার ভেঙে পড়বে। তা নয়, দিব্যি শক্ত। কিম্বা হতে পারে, মাথা থেকে জ্ঞানবুদ্ধির আবর্জনা নেমে গিয়ে আমরাই ওজনে হালকা হয়ে গেছি। চেয়ার কেন ভেঙে পড়বে?

সে তো হল, বক্তৃতা শুনতে চাই যে একটু! যেই মাত্র বলা, একটু দৃক্‌পাত নেই। ভাবখানা হল, এ আর শক্তটা কি—হলে এসে বসে পড়েছ, শোনাতেই হবে যা-হোক কিছু। মরীয়া হয়ে দোভাষিকে কাছে টানলাম। বক্তার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখছি—কথার মানে না বুঝলে পুরো মজা পাওয়া যাবে না।

'বিদেশি বন্ধুরা, তোমাদের পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে। দেশে ফিরে ভারতের ছেলেমেয়েদের কাছে বোলো আমাদের কথা। তাদের সঙ্গে ভাব করতে চাই…'

আমরা হলেও এর চেয়ে বেশি কি বলতাম? বক্তৃতার পরে আবার এক আবদার—গান শোনাতে হবে। তাতে ডরায় বুঝি! সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তানসেন আঁ-আঁ করে তান ধরল। গান হয়ে গেল তো—এবারে কি? নাচ। মস্ত বড় এক ঘরে নিয়ে দাঁড় করাল। ঘুরে ঘুরে নাচছে বাচ্চারা। আনন্দের মেলা। নাচছে, লাফালাফিও করছে। এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখছি। সান উসখুস করছে। লোলুপ চোখে একবার নাচিয়ে দলের দিকে তাকায়, তার পরে একবার আমার দিকে।

তা যাও না, তুমিও নেচে এসো একটু—

এক পা করে এগোয় আর মুখ ফিরিয়ে দেখে আমাকে। হাত নেড়ে খুব স্ফূর্তি দিচ্ছি, যাও—যাও না—

লোভ কতক্ষণ আর সামলানো যায়! ঝাঁপিয়ে পড়ল দলের মধ্যে, চক্ষের পলকে বেমালুম মিশে গেল।

কিন্তু এক পাক হয়েছে কি না হয়েছে—ছুটে এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে আবার হাত ধরল। নাচলেই হল, ইতিমধ্যে অপর কেউ দখল ক'রে বসে যদি। আর, সত্যিই তো—কয়েকটা ছেলেমেয়ে সন্দেহজনক ভাবে আমাদের আশপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নাচের পা কি ওঠে এ অবস্থায়? বলুন?

কষ্ট হল। আহা, সবাই স্ফূর্তি করছে—ও বেচারা পারছে না মনের ধুকপুকানির জন্য। এগিয়ে তখন নাচের একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়াই। এই রইলাম একেবারে নজরের সামনে। মন খুলে নাচো গে—ভাবনা নেই।

তবু জমে না। নিয়ে চলল এবার মাছ আর খেলনা-ঝাঁপি দেখাবার তরে। কাচের বাক্স সারি সারি রেখে দিয়েছে। বলে, একটা একটা করে সমস্ত দেখবে: সবগুলোই। (দোভাষি শুনিয়ে দিল হুকুমটা) বাস রে, রাত্রি যে হয়ে যাবে, সময় কোথা অত? তা কে জানে—দেখতেই হবে।

ঘোর হয়ে এলো। এবারে ইতি। একটুকু মন্তব্য দিতে হবে যে কি রকম দেখলেন। সেটা হয়ে গেল তো অটোগ্রাফ। পাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এক এক টুকরা কাগজ এগিয়ে দেয়—নাম লেখো, আমরা খাতায় সেঁটে রাখব। সাদা কাগজে সই করিয়ে নিচ্ছ, হ্যাণ্ডনোট লিখে নেবে না তো বাপু ঐ নাম সইর উপরে? যে, চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অদ্য তারিখে শ্রীমতী সান কুন-লিন দেব্যার নিকট হইতে চলিত সিক্কায় এক কোটি ইয়ুয়ান ধার করিয়া লইলাম—

পাঁচ-দশটায় সই হতে না হতে গাড়ি ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা বারোটায় রওনা, সমস্ত নয়-ছয় হয়ে আছে, কখন যে

আই-চুন হোটেলের করিডরে সকলের মালপত্র এসে জমেছে। আরে সর্বনাশ! চীনের সীমানা অবধি এরা না হয় বয়ে দিল—তার পরে? প্লেনে পুরে এই পর্যন্ত দেশে নিয়ে তুলতে হবে তো!

ভোজে ডাকছে। না, আজকে আর যাবো না। কিচলু এসে তাঁর ভারবোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন—আমি আর কে এখন? এ কয় দিন দায়ে পড়ে ধকল সয়েছি, নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচি রে বাবা! সামান্য কিছু খাবার ঘরে পাঠিয়ে দাও, বসে বসে আমি লিখব। চীনের মাটির উপর এই শেষ কলম ধরা।

লিখছি। একার জন্য একটি ঘর—কতক্ষণ ধরে লিখে চললাম, হুঁশ নেই। ক্ষিতীশের ঘরটা, পার্লনদীর ঠিক উপরে; ক্লান্ত হয়ে এক সময় তার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নদ দেখছি। কাশ্মীরে গিয়ে হাউস-বোটে ছিলাম, এ নদীতে বিস্তর তেমনি বোট। কিনারায় বেঁধে বেঁধে রয়েছে। বোট নজরে আসে না, বোটের উপরের মিটমিটে লণ্ঠনগুলো শুধু। সন্ধ্যার মুখে চাঁদ দেখেছিলাম, সে চাঁদ কোন বড়-বাড়ির আড়ালে চলে গেছে! মাঝে মাঝে স্টিমারের বাঁশি—সার্চলাইটে সাদা হয়ে যাচ্ছে মাঝনদীর জলতরঙ্গ। নৌকোও চলাচল করছে—নৌকো নয়, ভাসমান আলোর কণিকা। আট তলার ঘর থেকে দেখছি, রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে জলের উপর দিয়ে অগণিত তারা ভেসে চলেছে।

ঘরে ফিরে আবার ডায়েরি খুলে বসেছি, দরজায় ঘা পড়ল। আছেন নাকি!

এসো, এসো ভাই—

ইয়ং—পিকিন দোভাষিদলের সর্দার আমাদের সেই ইয়ং উড়ে কিচলুর সঙ্গে ভোরবেলা ট্রেনে এসে পৌঁছেছে। আবার তাকে দেখব, ভাবতে পারি নি। কী ভাল যে লাগল পুরানো মানুষ কাছে পেয়ে!

ইয়ং বলে, কিছুই তো খেলেন না! তা শুয়ে পড়ুন এবারে, কত আর লিখবেন?

বারোটায় রওনা—তাই ভাবছিলাম, লিখেই কাটিয়ে দিই সময়টুকু। খাতা-কলম পকেটে পুরেই গাড়িতে উঠব।

ইয়ং জেদ ধরল, না—গাড়িতে ঘুম হয় কি না হয়—ঘুমিয়ে নিন এই ঘণ্টা দুই। আমরা জেগে রয়েছি, ঠিক সময়ে তুলে নিয়ে যাবো।

আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইয়ং চলে গেল। এবং রাতদুপুরে ডেকে তুলে মোটরে চাপাল। শহরের ঘরবাড়ি তখন দুয়োর-জানলা এঁটে ঘুমুচ্ছে। রাস্তার আলোগুলো অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে রয়েছে শুধু। এমনি নিশিরাত্রে আর একদিন চৌরঙ্গি থেকে দমদম-এরোড্রোমের দিকে ছুটছিলাম—কি বুঝি, কি বুঝি তখন!

বড় বড় বাড়ির ছায়ায় রহস্যময় জনশূন্য এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে স্টেশনে এলাম। আরে মশায়, শহরের রাস্তায় লোক থাকবে কি—সবাই তো দেখছি স্টেশনে। সাধারণ গাড়ি এখন নেই, আমাদের স্পেশাল ট্রেনটাই শুধু। শীতার্ত রাত্রে এত মানুষ বিদায় দিতে এসেছে। একদিন এই স্টেশন থেকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, বিদায়-দিনেও ঠিক তেমনি সুবিপুল জনতা।

ঝকমকে স্পেশাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে পৌনে একটা। সেই অগণ্য মানুষের হাতে হাত দিয়ে দিয়ে আমরা এক এক কামরায় উঠে পড়লাম। প্রতি খোপে দু-জনের জায়গা। ব্যবস্থায় তিল পরিমাণ খুঁত নেই। ছেলেমেয়েরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে—উই একেবারে ইঞ্জিন অবধি। বেশির ভাগ মেয়ে —সব কাজে মেয়েরাই বেশি অগ্রগণ্য। গাড়ি থেকে হাত দেড়েক বাদ দিয়ে প্লাটফরমের উপর বরাবর লাইন টেনে দিয়েছে— প্রথম ঘণ্টা পড়ল, আর চক্ষের পলকে প্রতিটি প্রাণী সেই লাইনের ওদিকে। সেখান থেকে হাত বাড়াচ্ছে, শেষবারের ছোঁওয়া ছুঁয়ে নেবে। ব্যবধানটুকু দিয়েছে—ট্রেন ছাড়বার মুখে ভিড়ের দরুন যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে।

ঠিক একটায় গাড়ি ছাড়ল। শত শত কণ্ঠে স্টেশন মন্দ্রিত হচ্ছে—হিন্দী-চিনী ভাই-ভাই। আর—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। এত ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে গাড়িও যেন এগুতে পারে না—যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে—কামরার আলো এক একখানা আনন্দ-উজ্জ্বল মুখের উপর ঝিকিক হেনে হেনে যাচ্ছে। সে মুখ বলছে—শান্তি…শান্তি…শান্তি—নিখিল ধরিত্রী শান্তিময় হোক! প্লাটফরম শেষ হল, শেষ হয়ে গেল চকিত-দেখা মুখের পর মুখ। অন্ধকার। জানলায় বসে আছি

সংস্কৃতি-ভবন, ক্যান্টন

বাইরে চেয়ে। ফুল দিয়ে গেছে—সবুজ আলোয় কামরা-ভরা সুগন্ধ। মাঠ নদী পাহাড় আবছা-আবছা নজরে আসছে। দেখে দেখে দেখে—তার পরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘরমুখো ছুটছি, কিন্তু ঘরে ফেরার আনন্দ পাচ্ছি কই?

শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। তোলপাড় করে তীব্রগতিতে ট্রেন ছুটেছে। সুবিস্তীর্ণ এক জলাভূমির কিনারা ঘেঁসে ছুটছি। করিডরে বেরিয়ে এসে দেখি উঁচো টিকটার পাহাড়। বর্ণার জলধারা তারার আলোয় চিকচিক করছে। জানলা ধরে এক তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম, ইশারা করে সে অন্য দিকে যেতে বলল। দিকে এলো পিছু পিছু—বাংলাদেশের দরজা এসে খুলে দিল দেখছি. একা সে নয়—দেখছি ছেলেমেয়ে অনেকেই পাহারা দিচ্ছে দশ-বিশ হাত অন্তর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ক্যাপ্টেন থেকে এই এলাকাটা ভাল নয়, চিয়াং-এর চরের আনাগোনা আছে বলে সন্দেহ। ট্রেনের কামরায় কামরায় বিদেশি মানুষগুলো বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছে, এদের চোখে সারা রাত্রির মধ্যে পলক পড়ল না।

সেন-চুনে এসে গাড়ি থেমে দাঁড়াল। তখনো চোখ বুঁজে পড়ে আছি। কিজীন ডাকল, উঠে আসুন। চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক। ডাইনিং-কারে চা সাজিয়ে বসে আছে।

কামরা থেকে নেমে পড়লাম। মুখ-আঁধারি তখনো। শীতও খুব—ওভারকোট ইত্যাদি গায়ে চড়িয়েও কাঁপুনি যায় না। যতটুকু সময়ই বা আছি আর নতুন-চীনের মাটিতে। ডাইনিং-কারে গিয়ে বসেছি। আহা, ছেলে-মেয়েগুলো রাত জেগেছে—প্রভাত-কুসুমের মতো স্নিগ্ধ মুখে এখন আবার হাতে হাতে চা এগিয়ে দিচ্ছে। কারো পাজামা সাদা শার্ট ও কারো কোর্তায় কি অপরূপ দেখাচ্ছে! এমন আতিথ্য এত সহৃদয়তা কোথায় পাবো দুনিয়ার ভিতর!

ভোরের আলো ফুটছে ক্রমশ, ঝোপে-ঝাড়ে পাখি ডাকছে। দূর পাহাড়ের উপর ছবির মতো ঘরবাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সীমান্ত পাহারাদার আর রেলকর্মীরা থাকে ঐ সব বাড়িতে। এক দল ছাত্রীর সৈন্য নেমে এলো উপর-পাহাড় থেকে। ষ্টেশনে বইয়ের টেবিলগুলো খালি; বই আলমারিতে বন্ধ। ক্লাস যাত্রীদের পড়াশোনো হয়ে যাবার পর যত্ন করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে; পড়বার লোক এত সকালে এখনো এসে জমেনি।

ক্রমে জেগে উঠল চারি দিক। সেকশনের ভিসা দিতে বড় দেরি করছে—সেটা হল ওপারের বৃটিশ-এলাকার ব্যাপার। তা হোক, আমাদের তাড়া নেই; তাগিদই করছে—হুড়োহুড়ি কিসের? সামান্ত ষ্টেশনে আরও খানিকটা এদের সঙ্গে জমিয়ে বসার সময় পাওয়া গেল। আর ক'গজই বা নতুন চীন—খাল দেখা যাচ্ছে, পুরো খালটাও নয়, খালের মাঝ বরাবর গিয়েই শেষ।

অবশেষে ভিসা এসে গেল। চলি ভাই! পুলের উপরে উঠেছি। ছোট-খাট এক মিছিল—আমরা যাচ্ছি, ওরা আসে পিছনে-পিছনে। পা আর চলে না, চোখ ছলছল করছে সকলের। যবে চাচ্ছি, না সব ছেড়ে চলে যাচ্ছি—পথিক দেখে কেউ বুঝবেন না। কুমুদিনী মেহতা আমার পাশে; বাংলায় তিনি বললেন, প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে ঠিক এমনি অবস্থা হয়—কি বলো বোন? ভুলে গেছেন, উনি যখন স্ত্রী-জাতীয় নই আমি। পুরুষরা শ্বশুর-বাড়ি যায় ড্যাং-ড্যাং করে—কোঁচা-কাঁচা করবে তারা কোন দুঃখে? এই সব বলে আবহাওয়াটা হালকা করতে চাই। কিন্তু হয় না, হাসে না কেউ। কাঁটা-তারের বেড়ার মুখে এসে গিয়েছি। কাস্টমসের লোকগুলো অভিবাদন করে পথ ছেড়ে দিল; বোঁচকা-বুঁচকি হাতটাও ছোঁয়াল না। আরে বাপু, তামাম মাল নিয়ে যাচ্ছি তোমার দেশ থেকে—দেখ হে, নতুন খুলে দেখ একবার। নতুন ভুবন হতে সোনালির পর—হাসিমুখে আর একবার নমস্কার করল।

পুলের আধাআধি অবধি ওদের এক্তিয়ার। সেই অবধি এসে দাঁড়িয়েছি। মেয়েরা হাত জড়িয়ে ধরছে এক এক করে। ছেলেরা বুকের মধ্যে লুফে নিচ্ছে। ছাড়তে দেবে না, কিছুতে ছাড়বে না। এই একবার হয়ে গেল তো আবার গান ধরল কিজীন। সকলের মুখে গান। বন্ধু, তোমাদের ছেড়ে যেতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে—ঘুরে-ফিরে এই এক গানের কথা। গান আর কোথায়—হাত বন্ধ দিয়ে এখন তো কান্নায় দাঁড়িয়েছে। পরশু রাতের সেই যে বক্তৃতা—এসেছিলাম বিদেশি হয়ে, চলে যাবার মুখে আত্মীয়ের কষ্টবোধ হচ্ছে—আর সেটা সাহিত্যিকের অতিশয়োক্তি হল না। তাকিয়ে দেখুন, চোখে-চোখে জল। এই নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করব—হবে তো নিজের চোখ দুটোও শুকনো রাখতে হয়।

পুল পার হয়ে ভিন্ন পারের মাটি ছুঁয়েছি। আর ওদের আসবার জো নেই। দূরত্ব নগণ্য কিন্তু ব্যবধান অতি-দুস্তর। এখানে আর এক জগৎ। গান চলছে দু-দিক দিয়ে অবিশ্রান্ত। হাত ছেড়ে দিয়ে এসেছি—গানে আমাদের এক করে রেখেছে। হাওয়ায় ভেসে গানের সুর এপার-ওপার করছে, তাতে পাসপোর্ট ভিসা লাগে না। আরও এগিয়ে গেলাম। চেহারাগুলো একেবারে অদৃশ্য—শুধু ঐ গান। গানও থেমে গেল ক্রমশ।

লাউ-চ ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসেছি, ওদিককার কিছুই আর নজরে আসে না। হঠাৎ দেখা যায়, ঢিবি মতন একটা জায়গায় ওরা উঠে পড়েছে—রুমাল নাড়ছে সেখান থেকে। আমাদের ক'জন ষ্টেশনের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন, খবর পেয়ে হুড়মুড় করে বেরুলেন। দু-দিক দিয়ে উড়ছে রুমাল। উড়ন্ত শান্তির পারাবত পাখা নাড়ছে এপারে-ওপারে। প্রশান্ত হিমপ্রভাত গানের সুরে সুরে বিমোহিত হয়ে রয়েছে।...

ওয়েটিং-রুমে ঢুকে, ওরে বাবা, বিদ্যুতের শক খেলাম। এক তরুণী কোথায় যাবে, গাড়ির অপেক্ষা করছে। পোশাক-আশাকে নিরতিশয় স্বল্প। অন্যমনস্ক মানুষের ভয় যদি নজর এড়িয়ে যায়, কয় টুকরো কাপড়ে রঙের বাহার করেছে কত! ছাত্রেরা পাঠ্য-বইয়ের দরকারি জায়গায় জায়গায় লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রাখে, মেয়েটার দেহের এখানে সেখানে তেমনি

আমাদের মেয়ের বিয়েতে...
...খাবার লোক হয়েছিল অনেক! সত্যি বলতে কি খরচটা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল—যদি ডালডা বনস্পতি আমাদের না বাঁচাতো। ডালডায় রাঁধলে খরচও কম পড়ে—খাবার খেতেও হয় চমৎকার! আর ডালডা বায়ু-রোধক শীল-করা টিনে বিক্রী করা হয় ব'লে, তা যে সর্বদা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর পাওয়া যায় সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। প্রতি-দিনের রান্নাতেই হোক বা বড় রকম ভোজের ব্যাপারেই বলুন, সর্বদা ডালডা ব্যবহার করবেন।
দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
বোম্বাই ১
DALDA
ডালডা
ডালডা বনস্পতি
রাঁধতে ভালো—খরচ কম
১/২, ১, ২, ৫ ও ১০ পাউণ্ড টিনে ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

যেন রঙিন ডোরা কাটা। একটা ইংরেজি বইয়ের নাম মনে এলো হঠাৎ—ম্যানইটার অব কুমায়ুন, কুমায়ুনের মানুষখেগো বাঘ। কিন্তু কোথায় কুমায়ুন পর্বত আর কোথায় বা—উঁচু, ডোরাকাটা বাঘের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল আছে। এ-ও এক চীনা মেয়ে—কিন্তু এতদিন ধরে চীন ঘুরলাম, একটা মেয়েরও এমন বেয়াড়া বদরুচি পোশাক দেখতে পাইনি।

ওয়েটিংরুমে হল না তো প্লাটফরমের শেষ দিকে গাছতলার এক বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সিগারেট ধরিয়েছি। কালেভদ্রে কদাচিৎ ধোঁয়া খাই। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট আপনি পুড়ছে। উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছি। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে মালুম হল, পুড়তে পুড়তে গোড়ায় এসে ঠেকেছে। পোড়া-সিগারেটের টুকরো নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। তাই তো, কোথায় ফেলি? কোথায়, কোথায়? ফেলবার জায়গা দেখতে পাইনে তো—

সহযাত্রীর নজরে পড়েছে। বললেন, হংকঙের এলাকা—যেখানে খুশি ফেলে দাও। বিলকুল ডাষ্টবিন—

যেন ঘুম ভেঙে উঠলাম। জেগে নতুন-চীন পার হয়ে এসেছি—অবাধ-স্বাধীনতা এবার। পোড়া-সিগারেট প্লাটফরমের উপর ফেলে জুতোর তলায় পিষে দিই।

শেষ

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত

পঁচিশে বৈশাখে যে আলোর রেখা
নিলো দেখা,
জ্বেলে দিলো সবাকার মনে
জানি না, জানি না তা' কোন প্রয়োজনে :
তবু জানি সে আলোর শিখা
চিরদিন অমলিন রবে তাহা লিখা
অগণিত যুগ ধরে' জানি রবে তবু
—হবে না বিলীন
উঠেছে যে নবসূর্য, স্বর্ণপ্রভা নিয়ে—
শুধু সেই দিন।
জানি কতো যুগ যাবে এ পৃথিবী পরে,
মহাকাল বাঁধা দেবে চলার অন্তরে
কালের শিলায় বসে অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে
উদ্দাম ঝড়ের গতি কেড়ে নিয়ে কতো রাত জেগে,
প্রলয় প্রকৃতি নিয়ে কালের কবলে
ধ্বংসস্তূপে সৌধ গড়ি সভ্যতাকে দ'লে ;
হয়তো বা চলে যাবে—রবে শুধু স্মৃতি,
নালন্দার কীর্তি সম হবে যে প্রতীতি !
—তাই জানি
যে রবির আলো,
পঁচিশে বৈশাখে জ্বেলে দিলো—
পৃথিবীর আয়ু যত দিন
জেগে রবে দীপ্ত রবি চির অমলিন,—
সহস্র কুয়াশা ভেদি আলোর প্রকাশ
হবে বার মাস।
হে রবীন্দ্রনাথ,
হে মহাসমুদ্র তব অতলান্ত গহ্বরে যে রত্নালয়,
কীর্তির সৌন্দর্যদীপ
তার কাছে তুচ্ছ হিমালয়।
পঁচিশে বৈশাখে যে রবির প্রকাশ মর্ত্যমাঝে
আঁধারে অভয় বাণী
দিতে যেন সে কবি বিরাজে।

চলমান

হরপ্রসাদ মিত্র

শান্ত গ্রামের মন্থরতায় ছায়াতরুদের দেশে
কামার-কুমোর-তাঁতী-চাষী-জেলে-মালো—
কাজ করে তারা। রাত্রি-দিনের চন্দ্র-সূর্য-তারা
খোলা মাঠে দেয় খর আর মৃদু আলো!
রাস্তা বানাও। রাস্তা বানাও প্রদীপ আকর্ষণে
অস্থির লোক স্থিরমাটি-গ্রাম বিবিধ অন্বেষণে।

নগরে ঘনায় সংস্কৃতির তুফান, রুচির মেলা—
প্রত্যহ সভা উত্তরে-দক্ষিণে!
শিক্ষা-সমাজ-ধর্ম-আচার, বহু ভাবনার খেলা
কী চাঞ্চল্য প্রবীণে-অর্বাচীনে!
জমিদারী গেল,—হিন্দু-বিবাহে ত্রুটির সংস্কারে
ব্যস্ত বিজ্ঞ। তন্ত্র পুস্তিকা।
কি হবে? কি হবে? বৃহৎ বিশ্বে যুদ্ধ কি উদ্যত?
বান্দুঙে মেলে এশিয়া ও আফ্রিকা!

কতো খণ্ডিত চেতনার ধারা নিত্য চলেছে ছুঁয়ে
তারই এক ছেদবিন্দুতে ক্ষণ-জাগা!
সকালে রোদের শুভ সংবাদ—সূর্য এসেছে নেমে
বৈশাখী হাওয়া কদ্রের ছোঁয়া-লাগা!
ছেঁড়া পালকের সঙ্গে শুকনো লতার টুকরো ঠোঁটে
আনে দূর থেকে শালিখ, প্রাণের কুঁড়ি।
প্রতি বছরেই এমনি এখন বাগানে মাধবী ফোটে
পাখিদেরও লাগে বাসা বাঁধা তাড়াতাড়ি!

আহা, প্রাণ চলো, চলো অহরহ চলৎ-লহর সুখে
গ্রাম নগরের, জড়ের-জীবের আঘাতে বোবার মুখে।

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

এ কথা যদি আমরা স্বীকার করি যে, জুয়া খেলার মূলে আছে (ক) সহজে লাভের মোহ, (খ) উত্তেজনার নেশা, (গ) যুদ্ধের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, তা হলে বলতে হবে—জুয়ার মাধ্যম হিসাবে তাসের আবিষ্কার মানুষের এ বিষয়ে কল্পনার বাস্তব রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক।

সারা পৃথিবীতে জুয়ার মাধ্যম হিসাবে যে তাস সকলের উপরে, তার বিষয়ে যদি সব দিক থেকে বিশদ ভাবে আলোচনা করা যায়, তা হলে তা শিল্প এবং বিজ্ঞানের এক বিরাট ইতিহাস হয়ে উঠবে। অনেকে বলেন, ইতিহাসের যে সব বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে তাস অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত তাঁদের প্রত্যেকেরই যদি এই রচনায় উপস্থিত করা হয় তা হলে তা মানুষের যা জানবার তার কিছুই বাকি থাকবে না। এমন কি, মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা চিন্তা করে বা করতে পারে তারও সূত্র পাওয়া যাবে এখানে। আমাদের পক্ষে এখন বিস্তৃত আলোচনা করবার সুযোগ নেই। আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের কোন অবস্থায় তাসের উদ্ভব এবং কোন দেশে প্রথম চালু হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা।

তাস খেলা সর্ব্বপ্রথম কোন দেশে চালু হয়েছিল এ নিয়ে অনেক বাক্‌-বিতণ্ডা হয়েছে এবং এখনও একেবারে স্থির কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন, এ কথা জোর করে বলা চলে না। কেউ বলেন, চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম তাস দেখা দিয়েছিল, কেউ বলেন ভারতবর্ষে, কেউ বা বলেন আরবদেশে, আবার কেউ কেউ বলেন ইয়োরোপে—বিশেষ করে স্পেনে বা ফ্রান্সে। কারও কারও মতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি মিশরেই তাসের সৃষ্টি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্যকে সমর্থন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আমি চেষ্টা করবো এই সমস্ত বক্তব্যকে উপস্থাপিত করে তাদের মধ্য থেকে সব দিক বিচার করে গ্রহণীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবার আগে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলি, ইয়োরোপকে যাঁরা তাসের জন্মস্থান বলেন, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে সমর্থন করেন এই বলে যে, যেহেতু তাস কাগজের উপর ছাপা এবং যেহেতু ছবিগুলো ছাপা হয়েছে কাঠের 'ব্লক' থেকে এবং যেহেতু ইয়োরোপে ছাপার কাজ আরম্ভ হয় সব চেয়ে আগে (চীনদেশের কাগজ তৈরী এবং ছাপার কথার কোন উল্লেখ নেই!) সেই হেতু ইয়োরোপই তাসের জন্মস্থান। তার পর ইয়োরোপের কোন্ বিশেষ দেশে তাসের জন্ম এই নিয়েও অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। স্পেন বলে, কবে কোন্ সময়ে তা ঠিক করে বলা সম্ভব না হলেও এ কথা ঠিক যে, তাসের জন্ম স্পেনে—কারণ ক্যাষ্টিলের রাজা প্রথম জন্ (John I) ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনে তার ব্যবহার (তাস খেলা) বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন। ফ্রান্স নিজেকে তাসের আবিষ্কর্ত্তা বলে দাবী করে এই জন্য যে, ইয়োরোপে প্রচলিত তাসে 'ফ্লয়র ড লি' (Fleur-de-lis) দেখা গেছে এবং লিলিফুলের এই চিহ্নটি ছিল ফ্রান্সের রাজকীয় চিহ্নের প্রতীক। ইয়োরোপ তাসের জন্মস্থান, এ মত প্রচার করেন ব্রেট্‌কফ (Breitkopf) এবং ফ্রান্সের হয়ে দাবী পেশ করেছিলেন ম্যাঁসিয়ে বে।

আমি আলোচনা শুরু করবো ভারতবর্ষই তাসের জন্মস্থান বলে। এবং আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের বক্তব্যকেও উপস্থিত করবো এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবো তা খণ্ডন করতে।

তাস সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তা হল: মানুষের সমাজে তাস এল কেন এবং কোথা থেকে এবং কেমন করে? তারপর বিচার্য্য হবে তাসের মাধ্যমে আমরা কি জানতে পারি?

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবার আগে আমাদের মানুষের ইতিহাসের গোড়ার দিকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে এবং মনে রাখতে হবে ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের কথা: "The cooking, tool making. gambling animal displays its rationality by knowing how to find or invent a plausible pretext for whatever it has an inclination to do."

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানবদেহধারী জুয়াড়ী জানোয়ার ('gambling animal') যে দিন থেকে কিছু সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং 'জোড়-বিজোড়' ও 'ছোট-বড়' বুঝতে শিখেছে, সেই দিন থেকেই এক 'ভাগ্য-পরীক্ষা' খেলায় মেতেছে। পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে খেলাটি জুয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকার পূর্ব্বযুগে মানুষ সর্ব্বপ্রথম কোন জুয়া খেলেছিল, সে কথা প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোন লেখকই স্থির করে বলতে পারেন নি, কিন্তু মানুষের মনের গঠনের বিশ্লেষণ করে যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, 'হাঁ কিংবা না' কিংবা 'জোড় না বিজোড়' এই নিয়ে প্রথম জুয়া শুরু হয়েছিল, তা হলে খুব অসমীচীন হবে না।

এ কথাও পরের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, দু'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে কোন এক জন যখন এই ধরনের জুয়ায় (বিশেষ করে 'জোড়-বিজোড়' খেলায়) তার বাজি হরবার পালা এসেছে, তখন অধিকতর অভিজ্ঞ জন একটু চালাকি করে নিজের জিতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে নিয়ে অনিশ্চয়তার যবনিকা ছিঁড়ে নিজেকে প্রায় ভগবানের পর্য্যায়ে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ তখন যে অনিশ্চয়তার বশীভূত নয় তাকে দৈবজ্ঞ বলে বিশ্বাস করা হত। এখনও যারা 'ভবিষ্যৎ বাণী' করে তাদের দৈবজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জুয়া খেলার প্রবৃত্তি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে প্রবঞ্চনা করবার প্রবৃত্তিও জেগেছে।

তাস সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের প্রাচীন পাশা সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানতে হবে কারণ, তাস হচ্ছে পাশারই রূপান্তর। কথাটা শুনে কেউ কেউ হয়ত বিস্মিত হবেন, কিন্তু প্রাচীন পাশা এবং তাস এই দুই খেলার পদ্ধতির মধ্যে সমতা (affinity) এবং প্রাচীন তাসের উপর অঙ্কিত চিত্র ও পাশার প্রধান

ঘুঁটিগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের কথা ব্রেটকফও (Breitkopf) স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই যে, তাসের উদ্ভব হয়েছে দাবা থেকে।

দাবা খেলা কবে কোথায় প্রথম প্রচলিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন ভণিতা না করে নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, দাবাখেলা (চৌষট্টি ঘরওয়ালা ছক সমেত) সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই প্রচলিত হয়েছিল। আবিষ্কারকের নাম ছিল সিসা (Sissa) এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে। তবে কাল নির্ণয়ে দু-তিন শ' বছর এদিক-ওদিক হবার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়।

প্রাচীন দাবার ঘুঁটিগুলি ছ'ভাগে শ্রেণীবদ্ধ ছিল। যেমন: শাহ্ (Schach) রাজা, ফার্জ (Pherz) সেনাপতি, ফিল (Phil) হাতী, Aspen-suar অশ্বারোহী, Ruch (রুখ) উট, Beydel বা Beydak পদাতিক। কিন্তু ইয়োরোপের বর্ত্তমান দাবার ঘুঁটির দ্বিতীয়টিকে রাণী (Queen) বলা হয়, কিন্তু যুদ্ধের বিকল্প এই দাবা খেলার ছল-চাতুরীর মধ্যে কোন নারীর উপস্থিতি ভারতীয় রুচি ও সংস্কৃতির বিরোধী ছিল বলেই ভারত থেকে আমদানি করা ইউরোপের দাবাতেও প্রথমে এই রাণী ছিল না। এমন কি রূপান্তর গ্রহণ করবার পরও বহু দিন যাবৎ Fierce, Fierche বা Fierge নামে অভিহিত ছিল। Fierge কথাটির সঙ্গে ফরাসী Vierge কথাটির (কুমারী মেয়ে) সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমানে অবশ্য ফরাসী দাবায় এই ঘুঁটির নাম Dame। ভারতবর্ষের দাবা ইয়োরোপে গিয়ে যে নব রূপ লাভ করেছে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতবর্ষের ফিল (Phil) বর্ত্তমানে ফ্রান্সে Fol বা Fou এবং ইংরেজি দাবায় Bishop-এ রূপান্তরিত হয়েছে, Aspen-suar বা অশ্বারোহী ফ্রান্সে Chevalier এবং বিলেতে Knight, রুখ (Ruch) উট ফ্রান্সে Tour এবং বিলেতে Rook বা Castle এবং Beydel বা Beydak বা পদাতিক (বড়ে) ফ্রান্সে Pions এবং বিলেতে Pawns-এ রূপান্তরিত হয়েছে। উপরের কথাগুলি বললাম এই জন্য যে, দাবার দ্বিতীয় ঘুঁটির মত তাসেরও দ্বিতীয়খানি বিলেতে এবং ফ্রান্সে গিয়ে রূপ পরিবর্তন করেছে। কারণ আজ পর্য্যন্ত প্রাচীনতম তাস যা সংগৃহীত হয়েছে তাদের কারো মধ্যেই রাণী (Queen) বা বিবি নেই। দুর্ভিক্ষের প্রাচীন যে তাস পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রধান তিনখানি তাসের নাম হচ্ছে রাজা (the king) অশ্বারোহী (the kinght) এবং গোলাম (the Valet or Knave)। স্পেনদেশীয় পুরনো তাসে এমন কি জার্মানীর পুরনো তাসেও কোন রাণী ছিল না। স্পেনের প্রত্যেক রঙের (suit) প্রধান তিনখানি তাসের নাম ছিল Rey (the king), Cavallo (the knight), Sota the knave, groom বা attendant) এবং জার্মানীতে Koing (the king), Ober (a chief officer), Unter a sublatern)। কেবলমাত্র দেখা গেছে, ইটালীতে এ তিনখানি তাসের কোন পরিবর্তন না করে কখনও কখনও (sometimes) একখানা তাসযোগ করে দিয়ে নাম দিয়েছিল রাণী এবং সেই জন্য

তাসের ইতিহাসে পৌঁছবার আগে আমাদের এখনও অনেক পথ দাবাকে অনুসরণ করতে হবে।

স্যার উলিয়াম জোন্স বলেন (Asiatic Researches, Vol. II), এ কথা যদি প্রমাণের দরকার হয় যে, দাবা হিন্দুদের আবিষ্কার তার জন্য আমরা পারস্যবাসীদের কথার উপর নির্ভর করতে পারি। পারস্যবাসীরা অন্যান্য দেশের আবিষ্কার এবং সংস্কৃতি স্বকীয়করণে বিশেষ পারদর্শী হলেও, তারাও স্বীকার করে যে, পশ্চিম-ভারত থেকে খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিষ্ণু শর্ম্মার উপকথার সঙ্গে সঙ্গে দাবা খেলা আমদানী করা হয়েছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে দাবা চতুর-অঙ্গ নামে অভিহিত হয়ে এসেছে। চতুরঙ্গ হল চারিটি অঙ্গ, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর চারটি অঙ্গ। অমরকোষে চতুরঙ্গের বর্ণনায় আছে: হাতী, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক সৈন্য এবং আমাদের মহাকাব্যের সব জায়গায়ই সেনাবাহিনীর বর্ণনার সময় এদের কথাই বলা হয়েছে। এই চতুরঙ্গ কথাটি পারস্য দেশে গিয়ে রূপ নেয় চৎরং (chatrang) এবং আরবরা যখন পারস্যদেশ জয় করে নেয় তখন এই চৎরং কথাটি সংক্ষেপে পরিবর্ত্তিত (Shatranj) হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দাবার সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ পার্সী ভাষায় চৎরঙ্গ, আরবীতে সৎরঞ্জ, গ্রীক ভাষায় *Zatrikion*, স্পেনদেশীয় ভাষায় *Axedex*, ইতালীয় ভাষায় *Scacchi*, জার্মান ভাষায় *Schach*, ফরাসী ভাষায় *Echecs* এবং ইংরেজী ভাষায় *Chess* নামে অভিহিত হয়েছে। একটি কথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, দাবা খেলার কথা আমাদের কোন কাব্যে বা মহাকাব্যে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু একটা খেলার কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায় যার নামও কেউ কেউ বলেছেন চতুরঙ্গ কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে চতুরাজী বা চার রাজা বলে। এই খেলা চার জনে (রাজা) খেলে এবং প্রত্যেকের দলে একই দল করে সৈন্য থাকে। ভবিষ্যপুরাণে রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ব্যাস নকল যুদ্ধের প্রতীক এই খেলা কি করে খেলতে হয় তা বুঝিয়েছেন: আটটি ঘুঁটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে নিয়ে লাল রঙের সৈন্যকে পূবে, সবুজ দক্ষিণে, হলদে পশ্চিমে এবং কালোকে উত্তর দিকে বসাতে হয় এবং তার পর কোন্ ঘুঁটি কোন্ দিকে যাবে তা অক্ষের সংখ্যার দ্বারা নির্ণীত হবে। ("the moves were determined by casts with dice"—Chatto) অনেকে বলেন, হিন্দুদের চার রঙ ওয়ালা আটটি তাসের সৃষ্টির সূত্রপাত এখানে। এবং অনেকে আবার ইয়োরোপের whist খেলার সঙ্গে এর তুলনা করেছেন, যদিও whist এবং এ খেলার মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে—এক খেলায় ঘুঁটি ব্যবহার করা হয় এবং অন্যটিতে তাস ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় পুরানো দাবা খেলার পদ্ধতির সঙ্গে এই তাস খেলার তুলনা করে দেখে অনেকে আবার বলেন, এই চার রাজা খেলা প্রকৃত পক্ষে তাস খেলা, দাবা খেলা নয়। এই মত সমর্থনে তাঁরা বলেন: প্রথম এডওয়ার্ডের ব্যক্তিগত খরচের হিসাবে এই চার রাজা (four kings) খেলার জন্য খরচ লেখা আছে এবং এই চার রাজা খেলা যে তাস খেলা সে সম্বন্ধে মাননীয়া

Mr Anstis's History of the Garter, whom he cites from the Wardrobe Rolls, in the sixth year of Edward the First. (1278).

ঘটনাটি এই রকম : প্রথম এডওয়ার্ড যখন ওয়েলসের যুবরাজ সেই সময় তিনি পাঁচ বছর সিরিয়ায় (Syria) ছিলেন। যখন যুদ্ধ বন্ধ থাকতো তখন তিনি অবসর বিনোদনের জন্য অহিতকর নয় এমন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে বলতেন। এবং যে হেতু এশিয়াবাসীরা কদাচিৎ তাদের আচার-আচরণ পরিবর্তন করে এবং যে হেতু তারা তাস খেলায় অভ্যস্ত ছিল সেই হেতু তারা একেবারে ভিন্ন ধরণের হলেও এডওয়ার্ডকে এই চার রাজা খেলা শিখিয়ে দিয়েছিল এবং যত দিন তিনি সেখানে ছিলেন তত দিন এই খেলা খেলেছেন। Archaeologia, vol-VIII. P. 135)

অনেকে আবার বলেন, চতুরঙ্গ বা বিশেষ ভাবে চতুরাজী (চার রাজা, Four Rajas বা kings) যে খেলা প্রথম এডওয়ার্ড সিরিয়ায় খেলেছিলেন—তা দাবা, তাস নয়। তবে এই নাম যে ভারতীয় সে বিষয়ে তাঁরা কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না। আমরা যদি এই তথ্যই স্বীকার করে নিই, তা হলে এ কথা প্রমাণিত নিশ্চয়ই হল যে 'চার' এই সংখ্যাটি ইয়োরোপে প্রচলিত দাবা খেলার সঙ্গে বিজড়িত ছিল এবং এ কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি যে "the game of chess, which, has been previously shown, bore so great a resemblance to a game of cards,"

তাসের প্রাচীন নাম কি ছিল, তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা যদি "চার" এই সংখ্যাটিকে অনুসরণ করি তা হলে দেখতে পাব : "there are four Suits, and in each suit there are four honours, reckoning the ace." এবং Sir Thomas Urquhart-ও বলেছেন "After supper, were brought into the room the fair wooden gospels, and the books of the Four Kings, that is to say, the tables and Cards" (Rabelias, Chap : 22, Book—1) এবং Mrs. Piozzi তাঁর Retro spection (1801) বইয়ে বলেছেন : "It is a well-known vulgarity in England to say, 'Come, Sir, will you have a stroke at the history of the Four Kings ;' meaning, 'Will you play a game at cards ;"

এখন তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, Chahar, Chatur এবং ইংরেজীতে যে কথাটি কখনও কখনও Chartah বলে লেখা হয়, তার মানে হল 'চার' এবং যেহেতু চারই হল চতুরঙ্গ এবং যেহেতু দাবা থেকেই তাস খেলার উদ্ভব হয়েছে, সেহেতু এই দুই খেলাই যে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছে, সে বিষয়ে আর বিশেষ কোন সন্দেহ নেই। আরও একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের সন্দেহ নিরসন হবে।

ভারতীয় ভাষায় তাস (Taj বা Tas) কথাটির আসল অর্থ ফুল গাছের পাতা (হিন্দীতে তাসকে 'পাত তি' বলে) কিন্তু যেহেতু তাসকে অনেক সময় 'তাজ' বলা হয় এবং যেহেতু 'তাজ' মানে মুকুট সেই হেতু চার-তাস বা চার-তাজ যে ইংরেজীতে Four Kings এবং লাতিন শব্দ Chartae বা Chartas-এর বিশেষ মিল আছে।

প্রাচীনতম ফরাসী এবং জার্মান লেখকরা তাসকে *Cartes* এবং *Karten* এবং লাতিন ভাষায় *Chartae* বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যেহেতু *Charta* মানে কাগজ এবং যেহেতু তাস কাগজ দিয়ে তৈরী সেই হেতু অনেকের ধারণা যে, তাসের নাম হয়েছে এইখান থেকে। কিন্তু যদি একথা ধরে নেওয়া হয় যে, তাসের মূলে 'চার' এই কথাটি আছে তা হলে এই 'চার' কথাটি ভারতীয় কিংবা লাতিন quarta যা থেকেই উদ্ভূত হোক না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে তাস Chartae এই নামে অভিহিত হয়েছে Charta কাগজ বলে নয়, চার অর্থবোধক লাতিন অন্য একটি শব্দের উচ্চারণও এই বলে (It can scarcely be doubted that they acquired the name of *Chartae*, not in consequence of their being made of paper, but because the Latin word which signified paper had nearly the same sound as another word which signified four.—Chatto) যেমন Pherz (দাবার সেনাপতি) ক্রমে Fierge এবং তার পরে Vierge এবং তারপর Dame-এ রূপান্তরিত হয়েছে। গবেষকরা বলেন যে, ফ্রান্সে তাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে এমন সময়ের পরে অন্তত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যাঁরা তাসের কথা লিখেছেন তাঁরা লিখেছেন, Quartz বা quartes এবং এ থেকে এ ধারণা, হঠাৎ অসঙ্গত নয় যে, কাগজ অপেক্ষা চার (four) এই কথাটিই তাঁদের মনে হয়েছে বেশী। Mr. Gough, তাঁর Observations on the Invention of Cards (Archaeologia, Vol. VIII)-এ বলেছেন '*Quartes*, ludus *Quartarum* sive *Cartarum*' মানে তাস বা *Quarta* থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

প্রাচীনতম ইটালীয় লেখকরা যাঁরা তাসের কথা লিখেছেন তাঁরা এর নাম দিয়েছেন *Naibi* এবং তাস প্রথম প্রচলিত হবার দিন থেকেই স্পেনে '*Naypes* বা *Naipes* নামে অভিহিত। ভারতবর্ষে (Hindostan) যেখানে চার, চতুর কিংবা চারটা

(*Chahr*, *Chatur*, *Chartah*) কথা প্রচলিত আছে সেখানে নায়িব, নায়েব (*Na-eeb* বা *Naib*) কথাটিও প্রচলিত আছে এবং উচ্চারণ থেকে মনে হয় যে *Naibi* এবং *Naipe* কথা দুটির মূলও এইখানে—যেমন ইংরেজী Nabob কথাটির। Na-eeb মানে হচ্ছে সহকারী বা প্রতিনিধি যে কোন রাজার নিকট আনুগত্য স্বীকার করে কতকগুলি জিলার শাসনভার পরিচালনা করে। স্পেনের বিখ্যাত লেখকেরা যাঁরা নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, তাঁরা বলেন, আগে এ কথার যে মানেই থেকে থাকুক না কেন, *Naipes* মানে যে তাস, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এ কথা এসেছে আরবী থেকে।

Covelluzzo-র জবানবন্দী যদি বিশ্বাস করতে হয় (History of the City of Viterbo) তা হলে কথা *Naibi* বা *Naipes* এবং তাস যে আরব থেকে ইয়োরোপে এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। "১৩৭১ খৃষ্টাব্দে ভিতরবো শহরে তাস খেলা আমদানী হয়েছিল আরব দেশ থেকে এবং সেখানে একে নায়েব বলা হত।" আরব দেশে এখনও সুলতানের সহকারীকে (deputy) নায়েব বলে। যদি একথা ধরে নেওয়া যায় যে, 'নায়েব' কথাটা ভারতীয় নহে কিন্তু এমনও হ'তে পারে যে, ভারতবর্ষের অনেক অংশ যখন মুসলমানদের অধীন হয়ে পড়েছিল এবং যখন এখানকার অনেক রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুসলমান বিজেতারা নিজেদের লোককে 'নায়েব' নিযুক্ত করেছিলেন (মহম্মদ গজনিং ১১১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ প্রথম আক্রমণ করেছিলেন অনেকের মতে ১০০১ সালে) তখনই একথাটা এখানে প্রচলিত হয়েছিল। এমনও অবশ্য হতে পারে যে, *Naibi or Naipes* কেবল তাসকেই বুঝায় নি। এক রকম তাস খেলাকেও বুঝিয়ে থাকতে পারে—যেমন 'the Four Kings' মানে এক রকম তাস খেলা—কারণ চারটি রঙের প্রত্যেক স্যুটের রাজাই ছিল সব চেয়ে বড়। তবে 'Naipe' মানে যে এক-রঙা তাস তা পর্তুগীজ অভিধানেও আছে—'Naipe, is, a Suit of Cards'.

হিন্দুস্থানী ভাষায় 'চিঠ' (Chit) মানে ছোট চিঠি—যা লাতিন এবং জার্মাণ ভাষায় বলা হয়, *Epistola* এবং *Briefe*. কিন্তু চিঠ, মানে কাগজের টুকরাও বুঝায় (It may be noted that the word *Wuruk* or Wuruq, used by the Moslems in Hindostan to signify a card, signifies also the *leaf* of a tree, a *leaf* of paper, being in the latter sense identical with the Latin *folium*.—Chatto), তা হলে চারটা (লাতিন—charta—কাগজ) কথাটি যা চারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা a square—quarre অর্থাৎ চৌকা কাগজকেও বুঝাতে পারে—এবং তা হলে 'chartah' যে তাসই সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকবে না।

Heineken, যিনি দাবী করেন তাস জার্ম্মাণীতে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, তিনি বলেন, "আমাদের দেশে তাসকে ("playing cards") Briefe (চিঠি) বলা হত এবং এখনও নাকি তাই বলা হয়। তিনি বলেন, সাধারণ লোকেরা কখনও বলে না, আমাকে একজোড়া তাস দিন (give me a pack of cards) কিংবা আমাকে একখানা তাস (card) দিন—বলে, I want a *Briefe*, সুতরাং ফ্রান্স থেকে তাস যদি জার্ম্মাণীতে এসে থাকতো, তা হলে আমরা অন্ততঃ 'cards' কথাটা রাখতাম।"

Heineken-এর বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ, জার্ম্মাণীতে তাসের নাম '*Briefe*'-এ রূপান্তরিত হবার আগে *Karten* নামে অভিহিত ছিল এবং Briefe হচ্ছে লাতিন Chartae-এর অনুবাদ। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জার্ম্মাণরা ফরাসী বা ইতালীয়দের কাছ থেকেই তাস পেয়েছে। কারণ, ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষায় তাস বলতে যা বুঝায় তাকে লাতিনে রূপান্তরিত করলে, জার্ম্মাণ কথা Briefe-এ যা বুঝায়, তা-ই বুঝায়।

ব্রেটকফ (Breitkopf) অবশ্য বলেন, তাস পূর্বদেশ থেকেই এসেছে, তবে *Naibi* বা Naipes যে নামে তাস ইতালীয় এবং স্পেনদেশীয়দের নিকট পরিচিত, সেই কথাটির মূল হচ্ছে আরবী Naba শব্দ, যার মানে হচ্ছে দৈবজ্ঞতা, ভবিষ্যদ্বাণী করা বা ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ বিষয়ে এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নি যা থেকে বুঝা যাবে যে, ইহুদী কিংবা আরবদের মধ্যে তাস 'Naibe' নামে পরিচিত ছিল।

[ক্রমশঃ।

গঙ্গা-তীরে

দুর্গাদাস সরকার

এখানে তোমাকে সহজে চিনতে পারি,
আকাশে মাটিতে একটুই অন্তর।
এ-পারে ও-পারে দেবদারুদের সারি,
দু'পারে সবুজ অনন্ত প্রান্তর।

এখানে তোমার প্রভাতে সোনালি মায়া,
দুপুরে নীথর অভ্রের ঝিকিমিকি।
এখানে তোমার সায়াহ্নে পড়ে ছায়া,
ছায়া, কে আমার এখনো চেনো না কি?

এখানে তোমায় সহজে চেনাই যায়,
ছলছল সুর ঢেউয়ের আঙিনাতে
এখানে তোমার পরিচয় ভেসে যায়
পাল-পাখিদের পাখনার ঝাপটাতে।

এখানে তোমার অতীত রয়েছে পড়ে,
মিশে আছে এই বর্তমানের স্রোত।
অনামা দিনেরও বার্তা এখানে ওড়ে,
ঝির-ঝির-ঝির দুকূলে ওতপ্রোত।

লাঞ্চ

—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

[ফটো পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ও ঠিকানা লিখতে যেন ভুল না হয়]
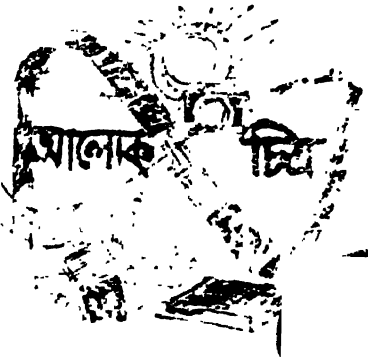
জলকে চল
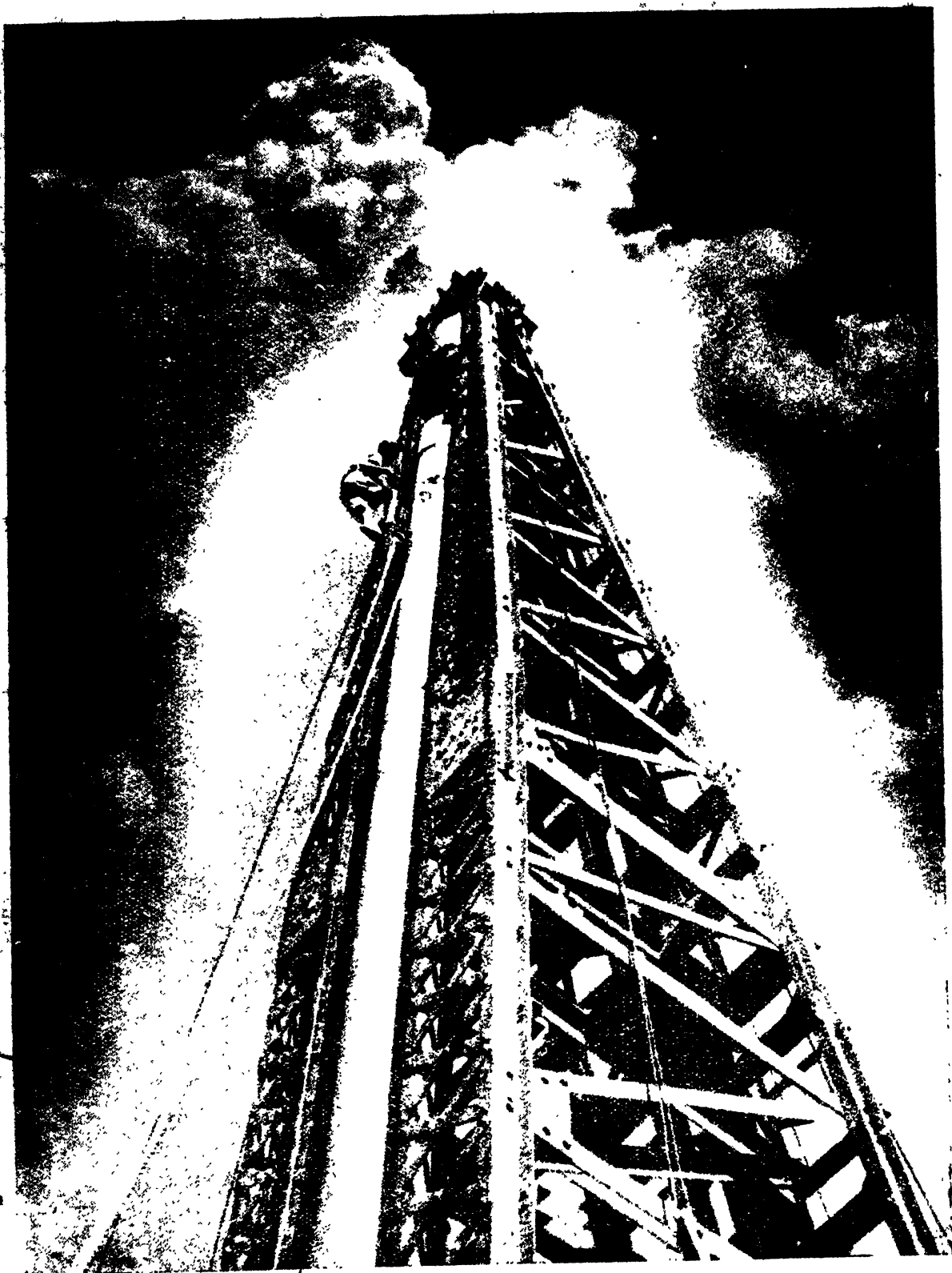
—সুধীরেশ নন্দী

বাদিনী (কোণারক)

—মদন বসু

যন্ত্রদানব

—সৌরেন মুন্সী

একটি শিল্প-কীর্তি

এ্যান্টন শেকভ
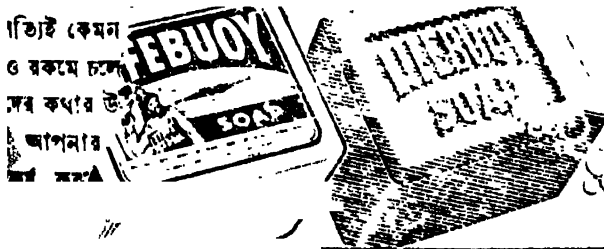
খবরের কাগজে মোড়া একটি বস্তু বগলদাবা ক'রে ডাক্তার কোশেল কোভ-এর দপ্তরে প্রবেশ করল সাশা স্মার্ণভ। তার মায়ের সে একটি মাত্র পুত্র।

"এই যে!" সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করে উঠল ডাক্তার, "কেমন আছো আজ? সুখবর কি আছে, বলো।"

উত্তরে সাশা কিছুক্ষণ চোখ পিট-পিট করল। তার পর হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রেখে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে তোৎলাতে লাগল।

"আমার মা আপনাকে নমস্কার পাঠিয়েছেন। আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মায়ের আমি এক মাত্র ছেলে। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি। কি ভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—"

"হয়েছে, হয়েছে। ও সব কথা থাক—" গলে গিয়ে সাশার কথায় বাধা দিয়ে উঠল ডাক্তার, "আমি নতুন কিছু করিনি। আমার অবস্থায় যে থাকত—সেই ওটুকু করত।"

"মায়ের আমি এক মাত্র সন্তান। আমরা গরীব, তাই আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে এবং সেজন্য আমাদের লজ্জার অবধি নেই। তাই ডাক্তার বাবু, আপনি যদি কিছু মনে না ক'রে, অনুগ্রহ ক'রে আমার মায়ের এবং তার এক মাত্র পুত্রের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে এই বস্তুটি নিতে রাজী হন—এটি একটি দুর্লভ শিল্প-বস্তু—ওস্তাদ কারিগরের হাতের কাজ—ব্রোঞ্জের তৈরি—"

ডাক্তার কিন্তু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। "এ সবের কিছু প্রয়োজন নেই"—বাধা দিয়ে উঠল ডাক্তার, "আর এ সব জিনিষের কোনো দরকারও নেই আমার।"

"না না—" বলে আবার তোৎলাতে লাগল সাশা, "আমি মিনতি করছি আপনি এটি গ্রহণ করুন।" এবং মিনতি করতে করতেই কাগজ খুলে বার করতে লাগল উপহারটি।

"আপনি নিতে অস্বীকার করলে আমরা মা ও ছেলে দু'জনেই ভয়ানক কষ্ট পাবো মনে। এ অতিশয় একটি দুর্লভ শিল্পসৃষ্টি—পুরনো ব্রোঞ্জের। আমার বাবার কালের জিনিষ এটি। তাঁর স্মারক হিসেবে এটি আমরা কোনো দিন হাতছাড়া করিনি। আমার বাবার ব্যবসা ছিল এই পুরনো ব্রোঞ্জের জিনিষ শিল্প-অনুরাগীদের বিক্রি করা। আমি ও মা সেই ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছি"—বলতে বলতে সাশা কাগজের আবরণ সরিয়ে বস্তুটিকে ডাক্তারের টেবিলের উপর রাখল।

বস্তুটি পুরনো ব্রোঞ্জের একটি দীপদান এবং সত্যিকারই একটি শিল্পসৃষ্টি এবং বিশেষ যুগের বিশেষ শিল্পিগোষ্ঠীর কাজের নিদর্শন। একটি বেদীর উপর দু'টি নারীমূর্তি—বসনের কোনো বালাই নেই অঙ্গে এবং ভঙ্গীটিও প্রকাশ করবার মত ধৃষ্টতা ও রুচির নিতান্তই অভাব আমার। মূর্তি দু'টির মুখে সলজ্জ বিচিত্র হাসি কিন্তু দেখলে এই ধারণাই জন্মায় যে, নেহাৎই দীপদানটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন না পড়লে নিশ্চয়ই বেদী থেকে তারা নেমে পড়ত এবং এমন লীলার অবতারণা করত যা প্রকাশ করে পাঠকদের বলা দূরে থাক, ভাবতেই আমার লজ্জা হচ্ছে।

উপহারের বস্তুটি নিরীক্ষণ ক'রে মাথা চুলকোতে লাগল ডাক্তার। তার পর নাক ঝাড়ল, গলা পরিষ্কার করল।

"হ্যাঁ জিনিষটি সুন্দর!" বলে ইতস্ততঃ করতে লাগল ডাক্তার, "তবে কি জানো, মানে কথাটা হচ্ছে, আমি যা বলতে চাই তা হল একটু অন্য ধরণের। মানে ঠিক অন্যান্য শিল্পবস্তুর মতন নয়।"

"সে কি?"

"স্বয়ং শয়তানও এর চেয়ে নোংরা কিছু কল্পনা করতে পারত না। এ-হেন বস্তু টেবিলে রাখা মানে সমস্ত বাড়ি ঘর অপবিত্র করা।"

"বলছেন কি ডাক্তার বাবু? শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে আপনার এ কি অদ্ভুত ধারণা?" আহত কণ্ঠে আপত্তি ক'রে উঠল সাশা, "সত্যিকার উঁচুদরের একটি শিল্পসৃষ্টি এটি। লক্ষ্য ক'রে দেখুন। সৌন্দর্যের কি আশ্চর্য সমন্বয়—দেখলে চিত্ত কি অপূর্ব আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়—আপনা থেকে রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠ! সৌন্দর্যের এ-রকম আশ্চর্য প্রকাশ দেখলে মন থেকে পার্থিব সব-কিছু কোথায় হারিয়ে যায়। ভালো করে দেখুন, দেখুন জীবনের কি ছন্দ, কি গতি, কি প্রকাশ!"

"বুঝতে পারছি, সবই বুঝতে পারছি"—বাধা দিয়ে উঠল ডাক্তার। "তবে কি জানো? আমি বিবাহিত লোক। এখানে ছোট ছেলে-মেয়েরা অনবরত আসছে যাচ্ছে—ভদ্রমহিলাদের যাতায়াত রয়েছে।"

"অবিশ্যি সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে যদি আপনি এটি দেখেন, তবে এই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির নোংরা অর্থ যে করতে পারবেন না এমন নয়। কিন্তু ডাক্তার বাবু আপনি ত' সাধারণের ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া আপনি যদি আবার এই উপহারটি নিতে অস্বীকার করেন ত' মায়ের এবং আমার—দু'জনেরই দুঃখের আর অবধি থাকবে না। আমি আমার মায়ের একটি মাত্র ছেলে। আপনি আমার জীবনদাতা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমাদের সব চেয়ে মূল্যবান সব চেয়ে প্রিয় জিনিষটি আপনাকে দিচ্ছি। শুধু দুঃখ এইটুকু যে, এর জোড়া দীপদানটি আপনাকে দিতে পারলাম না।"

"তার জন্যে ধন্যবাদ। প্রচুর ধন্যবাদ। তোমার মাকে বোলো গিয়ে। কিন্তু ভগবানের দোহাই, তুমি বুঝতে পারছ না এ-ঘরে ছোটো ছেলে-মেয়েরা আর ভদ্রমহিলারা অনবরত যাচ্ছে-আসছে। তোমায় বোঝাতে পারব না। ঠিক আছে, রেখে যাও।"

"আর আপত্তি করবেন না!" আনন্দে লাফিয়ে উঠল সাশা, "এই পাত্রটির পাশে এটি সাজিয়ে রাখুন। দু'দিকে দুটি রাখতে পারলে সুন্দর মানাতো, কিন্তু বললাম যে, এর জোড়াটি আমাদের কাছে নেই। কি আর করা যাবে। আজ তবে আসি ডাক্তার বাবু!"

সাশা বিদায় হবার পর অনেকক্ষণ ধরে দীপদানটি [illegible] লক্ষ্য করল ডাক্তার, আর থেকে থেকে মাথা চুলকোতে লাগল।

"জিনিষটি সত্যিই সুন্দর—" ভাবতে লাগল [illegible] ডাক্তার, "ফেলে দেওয়াটা সত্যিই লোকসান হবে; কিন্তু রাখতেও [illegible] যে সাহস হয় না। হয়েছে! কা'কে এই অমূল্য জিনিষটি উপহার বা [illegible]ন হিসেবে দিয়ে দিতে পারি আমি?"

অনেক চিন্তার পর বন্ধু উকিল উখভ-এর [illegible] নাম মনে পড়ল ডাক্তারের। তার কাছে একটি মামলা ব্যাপারে কি[illegible] কৃতজ্ঞতার দেনা রয়ে গেছে তার। অত্যন্ত বন্ধু বলে পারিশ্রমিক তাকে [illegible] দিয়ে নেওয়াতে পারেনি ডাক্তার।

"সেই ভালো—" খুশীতে ভরে উঠল ডাক্তার, "পারিশ্রমিকের পরিবর্তে এই অসভ্যতাটুকু নিতে হবে হতভাগাকে। হতভাগার

অসুবিধেও নেই—বিয়ে করেনি যখন। তা ছাড়া ফুর্তির প্রাণ ব্যাটার!"

ব্যস, মনে হওয়া মাত্রই উঠে পড়ল ডাক্তার। পোশাক পরে দীপদানটি নিয়ে অবিলম্বে পৌঁছে গেল উকিল-এর বাড়িতে।

"সুপ্রভাত, চন্দ্রবদন!" বন্ধুকে দেখেই সম্ভাষণ ক'রে উঠল ডাক্তার, "তোমার উপকারের জন্যে ধন্যবাদ দিতে এসেছি। টাকা তুমি নেবে না, তাই এই অমূল্য বস্তুটি দিয়ে তোমার দেনা শুধতে এসেছি। দেখো, বলো সত্যিকার একটি শিল্পীর স্বপ্ন কি না এটি?"

দীপদানটি দেখামাত্র তার কারুকার্যে উল্লসিত হয়ে উঠল উকিল।

"কি অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি!" উচ্চ হাস্যে বলে উঠল উকিল, "এই শিল্পীগুলির মাথায় আসেও বটে। কি পাগল-করা ভঙ্গী! পেলে কোথায় হে?"

কিন্তু বলতে বলতেই যেন উৎসাহ নিবে গেল উকিলের। উৎসাহের জায়গায় আশঙ্কা দেখা গেল তার চোখ-মুখের ভঙ্গীতে। ভীত ভাবে দরজার দিকে বার বার দেখতে লাগল এবং অবশেষে কাতর ভাবে বলল: "কিন্তু এটা ত' আমি নিতে পারব না, ভাই! তোমায় এটা ফেরৎ নিতে হবে।"

"কেন?" ভীত কণ্ঠে বলে উঠল ডাক্তার। "কারণ, আমার মা প্রায়ই আসেন এখানে। তা' ছাড়া মক্কেলরা অনবরত যাতায়াত করছে। আর চাকর-বাকররাই বা আমায় কি ভাববে?"

"ও-সব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না"—ডাক্তারও ছাড়বার পাত্র নয়, "এটি তোমায় নিতেই হবে। এটা নিতে অস্বীকার করা তোমার পক্ষে অতিশয় কৃতঘ্নতা হবে। তাকিয়ে দেখো, কি অপরূপ শিল্পসৃষ্টি! কি ছন্দ, কি গতি, কি প্রকাশভঙ্গী! এটি গ্রহণ না করলে আমি রীতিমত অপমানিত বোধ করব।"

"কোনো রকম আবরণ—একটু ডুমুরের পাতার আবরণও যদি থাকত—"

কিন্তু উকিলের কোনো কথা শুনতে আর রাজী হল না ডাক্তার। উকিলের সকল আপত্তি হাত-পা নেড়ে উড়িয়ে, সাশা-র উপহারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বন্ধুর বাড়ি থেকে যেন দৌড়ে বেরিয়ে এল ডাক্তার।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর উকিল-ব্যক্তিটিও অনেকক্ষণ ধরে দীপদানটি পর্যবেক্ষণ করল এবং তার পর তার চিন্তাধারাও ডাক্তারের চিন্তার অনুসরণ করল। এই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির কি গতি করা যায়!

"কি অপরূপ শিল্পসৃষ্টি!—" ভাবতে বসল উকিল, "জিনিষটি ফেলে দেওয়া অপচয় হবে, কিন্তু রাখাও বিপদ। কারুকে উপহার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। হয়েছে! আজ সন্ধ্যেতে এটি অভিনেতা শোশকিনকে দিয়ে দেব। হতভাগার রুচিও এই জাতীয়। তার উপর আজ সন্ধ্যেতে হতভাগার সম্মান-রজনী।"

মন স্থির করতে যেটুকু দেরি, সেটিকে কার্যে পরিণত করতে আর দেরি হল না উকিলের। সেদিন বিকেলে সুদৃশ্য কাগজে মোড়া দীপদানটি পৌঁছে গেল শোশকিন-এর কাছে।

সেদিন সন্ধ্যের পর থেকে থিয়েটারে শোশকিন-এর সাজঘরে থিয়েটারের সকল পুরুষের ভীড় এবং হৈ-হৈ, হাসি এবং উল্লাস; যার সঙ্গে এক মাত্র অশ্বের হ্রেষাধ্বনির তুলনা চলতে পারে।

অভিনেত্রীদের কেউ দরজায় ধাক্কা দিলেই শোশকিন-এর কাছ থেকে একটি মাত্র উত্তর শোনা যেতে লাগল: "ঘরে ঢুকো না! আমার পোশাক এখনো পরা হয়নি।"

রাতে থিয়েটার ভাঙবার পর দীপদানটির সামনে চিন্তিত মুখে দেখা গেল শোশকিনকে।

"এই বস্তু নিয়ে আমি কি করব? বাস করি একটি ঘর নিয়ে এবং সেখানে অভিনেত্রীরা মাঝে মাঝে মোলাকাৎ করতে আসে। ছবিও নয় যে কোথাও লুকিয়ে রাখব।"

পরচুলা পরিষ্কার করতে করতে এক জন শুনছিল শোশকিন-এর কথা। সে পরামর্শ দিল বিক্রি করবার। তার জানা এক বৃদ্ধাও নাকি রয়েছে যে, এ-সব কেনা-বেচা করে।

দিন দুই পরে ডাক্তার কোশেলকোভের ঘরে আবার উপস্থিত সাশা। তার বগলে খবরের কাগজে মোড়া একটি বস্তু।

"ডাক্তার বাবু!" ডাক্তারকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল সাশা, "দেখুন, ভাগ্য থাকলে কি না হয়! আপনার দীপদানটির জোড়া পেয়ে গিয়েছি। আমার এত আনন্দ হচ্ছে! মায়েরও খুব আনন্দ যে, জোড়াটিও আপনাকে আমরা দিতে পারলাম। আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমার এবং মায়ের। মায়ের একটি মাত্র ছেলে আমি। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।"

আনন্দে বিহ্বল অবস্থায় তাড়াতাড়ি কাগজের আবরণ খুলে ডাক্তারের টেবিলে দীপদানটি রাখল।

কোন রকম আপত্তি করবার বা ধন্যবাদ দেবার অবস্থা তখন আর ডাক্তারের নেই

অনুবাদক—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

আপনি কেমন আছেন?

সত্যিই কেমন আছেন আপনি? ভাল? মন্দ? মোটামুটি? কোনও রকমে চলে যাচ্ছে? ঠিক ঠিক আপনি দিতে পারবেন না আমাদের কথার উত্তর। সঠিক ভাবে বলতে পারবেন না কেমন যাচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য, শরীরে ঠিক জোর পাচ্ছেন কি না, কাজ-কর্ম করতে কেমন লাগছে, এই সব। এ সম্পর্কে নিজের মনে মনে নিজেই নীচের প্রশ্নগুলি আপনি যাচাই করে দেখুন তো!

সর্বদাই কি ক্লান্ত আপনি?

কাজে উৎসাহ বোধ করেন?

নতুন নতুন কাজ পেলে উৎসাহ সহকারে লেগে যাবেন?

ব্যথা বা বেদনা হাতে বা পায়ে কি শরীরের অন্য কোথাও আছে আপনার?

ঘর হয়?

সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, পা টনটন করা, মাথা ধরা?

রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত?

ছুটতে পারবেন?

অত্যধিক নিদ্রার অভ্যাস?

দিবা-নিদ্রার প্রয়োজন?

অঙ্গনা ও প্রাঙ্গণ

রবীন্দ্র-কাব্যে নারীর ক্রম-পরিণতি

শ্রীমতী মীনা চৌধুরী

দেশকে রবীন্দ্রনাথ ভালবেসেছেন। দেশের আলো ছায়া তাঁর বুকে প্রতিক্ষণ বাঁশীই শুধু বাজায় নি, কর্মক্লান্ত পুরুষ যেখানে মুক্তি চায়, তিনি সেখানে বলেছেন—

"আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে,
দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।"

শুধু দেশকে নয়—বিদেশকেও তিনি ভালবেসেছেন। মানুষের সন্ধানে, সৌন্দর্য্যের হাতছানিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন—দেশ থেকে দেশে—খুঁজে পেয়েছেন মনের মানুষ, তাঁর চোখের আনন্দ। তবু আশ্চর্য্য এই, ফিরে যদি আসেন ত' আসতে চেয়েছেন এই লক্ষীছাড়ার দেশে। লক্ষীছাড়া বলেই বোধ হয় তাঁকে পেলুম বেশী করে। এইখানেই তাঁর পরিচয়—তিনি প্রেমিক। তাই তিনি ফিরে আসতে চান। শত ভোগাভোগেও তাঁর আসক্তি নিবৃত্তি হল না,—প্রেমিকের বুক যে লাখ লাখ যুগেও জুড়োয় না! যা-কিছু সুন্দর তা ত' তিনি ভালবাসেনই—ভালবাসেন হতভাগ্যকেও। আপন প্রেমে ফিরিয়ে দেন তার হতশ্রী। এই প্রেমেই নারী পেয়েছে তার আপন পরিচয়।

তাঁর সমস্ত কাব্য এক অদ্ভুতপূর্ব প্রেম-ব্যাকুলতা। শ্রাবণের ঝরঝর বর্ষা-রাত্রি, আমাদের দরজা সব বন্ধ, চোখে ঘুম, কিন্তু কবি জেগে আছেন, তাঁর বুকে প্রেমের দোল, মনে বিরহ-ব্যাকুলতা, মিলন-আকুতি। বাতাসের ঝাপটায় প্রদীপ নিবে গেছে, ঘর [illegible]র, তবু দরজা খোলা, যিনি চিরকাল ধরে আসছেন তিনি যদি আজ এসে পৌঁছেন!

এ প্রতীক্ষা শুধু বর্ষায় নয়, সর্ব্বঋতুতে। ধারাজলেই শুধু তার সুর নয়—ফুলে-ফলে সর্ব্বত্রই সেই প্রেমময়ের আসন্ন মিলন-আভাস।

এই প্রেম-ব্যাকুলতা আমরা শ্রীচৈতন্যেও পাই। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে এ প্রেম এক নবরূপ লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্য আর সব সাধনাকেই বলেছিলেন—"এহ বাহ্য," "এহ হয়, আগে কহ আর।" রাধাপ্রেম অঙ্গীকার করেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র তিনি সেই এক কৃষ্ণই দেখেছেন—তাঁর জীবনে বহুর কোন বিশেষ স্থান ছিল না। রবীন্দ্র-কাব্যে এক আর বহুর অচিন্তিত-পূর্ব্ব সমন্বয়!

ভারতীয় দর্শনে সংসারটা বিষবৃক্ষ। সাহিত্য তার অমৃতফল। সাহিত্যে এই বিষবৃক্ষ-রূপ জগৎকে অস্বীকার করার চেষ্টাই বেশী। অর্থাৎ কবি-কল্পনার গতি বাস্তব-স্বীকৃতির দিকে নয়, বাস্তব-বিস্মৃতির দিকে। জগৎকে অস্বীকার করলে নারীকেও অস্বীকার করতে হয়। নারী তাই—"দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী" ছাড়া আর কিছু নয়। সাহিত্যেও সে তার প্রকৃত স্থান পায়নি। প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও সে দেবী, কোথাও পুরুষ-শাসিত সমাজের সেবিকা মাত্র। সাহিত্যে সে দেখা দিয়েছে সেবাদাসী-রূপে, একাধারে দেবতার ও পুরুষের। এর কারণ দৈনন্দিন জীবনে এর বেশী মর্য্যাদা নারীর ছিল না, নারী-জীবনের যুগান্তরের এই গ্লানি কবি গানে গানে মুছে নিয়েছেন, কথা গেঁথে গেঁথে সাধারণ মেয়ে থেকে তাকে মহীয়সী করে তুলেছেন! অর্জ্জুনের মুখে যে প্রশস্তি তিনি দিয়েছেন তার তুলনা কমই পাওয়া যায়—

"সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান,
সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম।"

নাথ-সাহিত্যে কবি নারীর মুখেই নারীর নিন্দা দিয়েছেন। রাণীমা ময়নামতীর ইচ্ছা, রাজপুত্র গোপীচাঁদ বারো বছর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে অমরতার অধিকারী হোক, কিন্তু কিশোরী রাজবধূ অদুনা আর পদুনা কান্নায় আকুল—"তোমার জন্য আমরা প্রিয়জন, পরিজন ছেড়ে এসেছি, তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে?"

রাণী ময়নামতী ছেলেকে বোঝাচ্ছেন,—"এদের মন-ভোলানো কথায় কান দিও না, তোমার ইহকাল-পরকাল নষ্ট হবে। মেয়েদের বিশ্বাস করো না—এদের মায়ায় যদি এক বার ভোলো তাহলেই এরা সুযোগ বুঝে বাঘিনীর মত তোমার রক্ত শুষবে।"

চৈতন্য-ভাগবত আর চৈতন্য-চরিতামৃতে উচ্ছ্বসিত প্রেমের কোথাও বিষ্ণুপ্রিয়া নেই। মহাপ্রভুর জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন প্রভাব ছিল কি ছিল না, তার উল্লেখমাত্র নেই। বিষ্ণুপ্রিয়ার দারুণ শোকমুহূর্তের বর্ণনাই বা আমরা কতটুকু পাই? রাধার বেনামীতে বৈষ্ণব গীতি-কবিতায় নারীর অন্তর-জীবনের কিছুটা হাসি-কান্না আমরা পাই কিন্তু সে কতটুকু? কিশোরী রাই এক অস্বাভাবিক ভাবজীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতিদিনের হাসি-কান্নায় দোলায়িত যে নারী-মন, তার পরিচয় কই? তার পরিচয় নেই, কারণ জীবনে নারীকে অস্বীকার করার চেষ্টাই চলেছিল আগাগোড়া। রবীন্দ্রনাথ এই জগৎকে মেনে নিয়েছেন—মায়া বলে দূরে ফেলে রাখেন নি আর তারই সাথে স্বীকার করেছেন নারীকে তাঁর অপূর্ব্ব প্রেমের মন্ত্রে। দেবতার জন্য তা একান্ত করে রাখেন নি—

"দেবতারে যাহা দিতে চাই
তাই দিই প্রিয়জনে
আর পাব কোথা,
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

কিন্তু নারী শুধু তাঁর প্রিয়াই নয়—তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বমহিমায়। তাই সে বলতে পেরেছে, "আমি নারী, আমি মহীয়সী—"

আধুনিক সাহিত্যে প্রাক্-রবীন্দ্র লেখকদের লেখায় নারী তার স্বাভাবিক মর্য্যাদা কিছুটা ফিরে পেয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা দীর্ঘ বোধে এখানে পাশ কাটাতে হল। বুদ্ধ, চৈতন্য শঙ্কর, গোরখনাথ এদের নারী-নির্ব্বাসন অথবা তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তন্ত্রের উৎকট ভোগবিধি—এই দুইয়ের মধ্যে স্বাভাবিক নারী ব্যক্তি নারী—মা ও প্রিয়ায় যার সম্পূর্ণতা সেই চিরন্তনী ফিরে এসেছে রবীন্দ্র-কবিতায়। সেই মানবীকে পেয়েছি আমরা চিত্রাঙ্গদায়—

"আমি দেবী নই, সামান্যা নারীও নই—"

তবে আমি কে? আমি তোমারই মত সুখে-দুঃখে দোলায়িত এক মানবসত্তা। যদি আমায় মর্য্যাদা দাও, বিশ্বাস করো তবেই আমার পূর্ণ পরিচয় পাবে। এ কথা আমরা আর এক বিদ্রোহী কবির কবিতায় পেয়েছি—"শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

রবীন্দ্র-কাব্যে এই নারী এক সাধারণ মানবী থেকে ধাপে ধাপে অপূর্ব্ব কল্পনা-কান্ত রূপ লাভ করেছে। বাস্তবের ধূলা-মাটি কল্পনার স্বর্গে সার্থক হ'য়েছে! এইখানেই রবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই মাটি তিনি অস্বীকার করেন নি,—তাকেই গানে গানে স্বর্গে রূপান্তরিত করেছেন।

'কড়ি ও কোমলে' কবি যে নারীকে দেখেছেন, সে এই জগতের রক্ত-মাংসে গড়া। তার প্রতি অঙ্গে "সহস্র হারানো সুখ, জন্ম-জন্মান্তরের বসন্তের গীতি"—

তবু সে মর্ত্ত্যের মানবী। তার জন্য কবি-মনের যে আকুতি সে "লালরক্ত লালসার রাঙা শতদল"—মর্ত্ত্যের মিলন-পিপাসারই কাব্যরূপ। মর্ত্ত্যের এই মানবী কবির কল্পলোকে ধীরে ধীরে এক দেহাতীত শ্রী লাভ ক'রেছে—তার ইঙ্গিতও "কড়ি ও কোমলে" আছে। ভোগের মধ্যে যে অতৃপ্তি সেই অতৃপ্তি বোধ কবির মানসীকে রূপ থেকে অরূপের পথে নিয়ে চলেছে। "মানসী"তে এই কথা আরও স্পষ্ট ভাবে পাই। এমন কি, যে চোখ দিয়ে "সুরদাস" সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রেছে, আকাঙ্ক্ষা ক'রেছে—কবি-মনের নির্দ্দেশে সেই চোখই সে সৌন্দর্য্যের পূজায় উপহার দিতে চেয়েছে—

"তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার
সে আঁখি তোমারই হোক—"

সৌন্দর্য্যলোভের কঠিন শাস্তি আর কি হ'তে পারে? তবু মনের একান্তে বুঝি কিছু ক্ষোভও থাকে—

"রূপ যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মত
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—"

না—তাঁর কাব্যে সীমার লোপ হয়নি—অরূপের পিপাসায় অধীর সমগ্র কবি-কথা রূপের বিদেহী স্মৃতিতে চির-উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সুরদাসের উক্তিতে, রবীন্দ্র কাব্যে নারীর যে স্থান—তারই ইঙ্গিত পাই। কবির চক্ষে রূপের স্থান আছে, কিন্তু সে রূপ ভোগের দ্বারা ম্লান নয়। ভোগচক্ষুর বিসর্জ্জনেই এ রূপের উদয়। এ রূপ বর্ণনার সামনে মদন সমস্ত অস্ত্রত্যাগ ক'রে আত্মসমর্পণ ক'রেছে।

কবি নারীকে গ্রহণ ক'রেছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সুরদাসের মতই কামনার অঞ্জন আঁকা দুই চোখ ভরে—কিন্তু কখন সেই মানবী তাঁরই কল্পনার এক নবরূপ লাভ ক'রেছে, তিনি নিজেও কি তা বুঝতে পেরেছেন?

"অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা"—এ কল্পনা কার? কবির না পুরুষের? এ কল্পনা তারই—যে নারীকে তার সত্য মর্য্যাদায় আবিষ্কার ক'রে ধন্য হ'য়েছে।

নারীর এই কল্পনা-কান্ত রূপ সমস্ত কাব্যের ছত্রে ছত্রে ব্যাপ্তি বিস্তার ক'রেছে। পরিণত জীবনের কাব্যে নারী শুধু মাত্র কবিতার বিষয়বস্তু নয়, কবিতার মূল প্রেরণারও সঞ্চার ক'রেছে—কবিতার অন্তরে সে কবি—তাই উচ্ছ্বসিত গানের সুরে পাই—

"নয়ন সমুখে তুমি নাই—
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

কড়ি ও কোমলের প্রিয়া পরিণত জীবনে "শ্যামলে শ্যামল" ও "নীলিমায় নীল"—সর্ব্বত্র তারই ছায়াছবি

"আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।"

কবির কাব্যজগৎ প্রেয়সীর মধ্যেই তার অন্তরের মিল খুঁজে পেয়েছে।

যে নারীকে উদ্দেশ ক'রে কবি প্রথম জীবনের কাব্যে, যৌবনের উজ্জ্বল-মদির মুহূর্ত্তে, গানে, কবিতায় স্তব পাঠ করেছেন—সেই মানবী গোপন-পদ-সঞ্চারে কবিমনের অন্তরে এসে দাঁড়িয়েছে—তার সুরই কাব্যে ঝঙ্কার তুলেছে;

"তব সুর বাজে মোর গানে"

যে আনন্দরূপ ধ'রেছিল রমণীতে কবির মন পরমসুন্দরের রহস্য-আভাসে তার তুলেছিল—সে আনন্দ এখন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা লাভ ক'রেছে

কিন্তু তরুণ কবির প্রথম দেখা প্রিয়া—সে দেখা অমর হয়ে রইল। সে প্রিয়ার বয়স গেছে থেমে। কবির কাব্যে নারী তাই চির-তরুণী, শুধু একালের নয়, চির কালের। আগামী দিনের তরুণীকে কবি প্রত্যক্ষ ক'রেছেন এই জীবনের সীমায়—অরূপ, অনাগত তার কাব্যে রূপায়িত "ওগো তরুণী"—আমি পথ ভুলে তোমাদের দিনে এসে পড়েছি, সাথে এনেছি গান, তাতে তুমি পাবে হারানো দিনের সুরকে, পাবে আপনাকে।

শেষ-কালের উক্তি এই যে "চিরন্তনী," এই "চিরন্তনী" বাঁধা পড়েছে কবিপ্রেমে। হাতে তার ছন্দের মঙ্গল-সূত্র, কণ্ঠে তার মধু-মঙ্গল গান, সীমন্তে তার কবিকল্পনার উজ্জ্বল রাগে রাঙা। এই নারী ছন্দে, গানে কবিকে অরূপলোকের সন্ধান দিয়েছে—আবার ফিরিয়ে এনেছে কল্যাণীর অঞ্জ আঁকা মঙ্গল কামনায় ব্যাকুল এক কুটির-প্রান্তে।

রবীন্দ্র-কাব্যে তাই নারীর উর্ব্বশী আর কল্যাণী উভয় রূপই সম্পূর্ণ ও সার্থক। তবু কবিতারূপে "উর্ব্বশী" যে কল্যাণীকেও ছাড়িয়ে গেছে এইখানেই ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কবি-মন! নারীর উভয় রূপকেই কবি দেখেছেন, স্বীকার করেছেন, তবু উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্যই বুঝি তাঁকে কাব্যের স্বর্গলোকে পৌঁছে দিয়েছে। কল্যাণকে অস্বীকার করলে কাব্যের চলে না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কাছেই কবি একান্ত ভাবে ধরা দেন।

ভুবন-সুন্দর যিনি, তাঁরই অঙ্গকান্তি স্বীকার করে উর্ব্বশী পুরুষের

কল্পলোকে পা রেখেছে—তাই তার প্রেমে কবি উচ্ছসিত। কিন্তু সৌন্দর্য্য-মোহে কোথাও উদ্‌ভ্রান্ত হতে দেননি নিজেকে—তখুনি সামলে নিয়ে গেয়ে উঠলেন কল্যাণীর উদ্দেশে—

"সর্ব্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।"

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মনোদা দেবী

এই সবই বড় হইয়া আমার শুনা কথা; দিদি আমার ৭ বৎসরের বড়, তখন পর্য্যন্ত জন্ম হয় নাই। বৃদ্ধপিতামহ ঢাকাতে তখন ডাক্তারী করিতেন ও আমার বাবা সেখানে থাকিয়া ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। যথাসময়ে ঐ মেয়ের ৮টি ছোট দাদামহাশয়ের জিম্মায় আসিয়া পৌঁছিল এবং উহাদের যেন কোনরূপ খাওয়া-পরা ইত্যাদির কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে দাদামহাশয় বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া পাঠাইলেন। ছোট দাদামহাশয় যথাসম্ভব উহাদের যত্নের ত্রুটি যাহাতে না হয় সেরূপ উপদেশ দিয়া ঠাকুর-চাকরদের বলিয়া দিলেন, সময় ও সুযোগ মত উহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, আছে তারা ভাল ভাবেই; খাওয়া-পরার স্বচ্ছন্দতার মধ্য দিয়া দেশছাড়া, আত্মীয় বন্ধুদের হইতে চিরজন্মের মত বিচ্ছেদটা যে তাদের মনের মধ্যে উঁকি না দিত তাহা নয়, কিন্তু উদরের জ্বালার কাছে সবই যেন তুবিয়া যাইত। তাই উহারা বেশ ভাল ভাবেই অর্থাৎ হাসিখুসী হইয়াই উহাদের দিনগুলি কাটাইতেছিল। কিন্তু একদিন দেখা গেল, একটি কোঠার মধ্যে উহারা ৪.৫ জন গলাগলি ধরিয়া হাউ-মাউ করিয়া বিষম কান্নাকাটি করিতেছে; ছোট দাদামহাশয় রুগীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া এটা কি ব্যাপার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। যতই উহাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় ততই যেন উহারা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে বেশী করিয়া। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিবার পর তাদের কান্নার ভাষা হইতে প্রকাশ পাইল, ঠাকুর ও চাকররা বলিয়াছে তাদের 'বলি' দেওয়ার জন্ম আনা হইয়াছে এবং আলমারীতে সিরাপ ও লাল টুকটুকে ঔষধগুলি দেখাইয়া প্রমাণ করিল, ইহা বলির রক্ত রাখা হইয়াছে। ঠাকুর ও চাকররা ইহা বলিয়াছে এবং দেখাইয়াছে। তখন ছোট দাদামহাশয় নাকি কিছু কাল হাসি বন্ধ করিতে পারিলেন না, পরে ঠাকুর চাকরদের বলিয়া দিলেন ভবিষ্যতে যেন এরূপ ঘটনা না হয়। যথাসময়ে উহারা বাড়ীতে একটি বিরাট পরিবারে সোনরঙ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গেল এবং মহা নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাদের নূতন জীবন আরম্ভ করিল। কাঙ্গাইলা ভাইর বয়স যখন মাত্র ৫ বৎসর, দুর্ভাগ্য ক্রমে তার মার মৃত্যু ঘটিয়া গেল। পিতৃমাতৃহীন ঐ শিশুটিকে মাতা ঠাকুরাণী ও দিদিমা অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্গাইলা ভাইকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন মাতা ঠাকুরাণী। কিন্তু তাহার মন গেল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। থালা, ঘটী ইত্যাদি মাজিবার দিকে তার ঝোঁক গেল বেশী করিয়া, তার মত এমন ঝকঝকে বাসন কেহই মাজিতে পারে না, এই ছিল তার বড় গর্ব্বের বিষয়। মা বহু চেষ্টা করিয়াও নাম স্বাক্ষরটুকুও শিখাইতে পারিলেন না। সকলের ইচ্ছা ছিল যে, অন্ততঃ উহাকে একটা প্যাদা বা পিওন, চাপরাশীগিরি কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। কিন্তু কিছুতেই আর সেটা পারা গেল না, অগত্যা দাদামহাশয় কিছু কিছু টাকা কাঙ্গাইলা ভাইর জন্ম জমা রাখিতে লাগিলেন। উত্তর জীবনে সেই টাকায় বহু জমী-সংযুক্ত ২।৩ খানা টীনের ঘরসহ একখানা বাড়ী করিয়া দিয়া কাঙ্গাইলা ভাইকে সংসারে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন।

কাঙ্গাইলা ভাইকে দিদিমা বিবাহ করাইবেন, আমরা ছোটর দল একটা হুজুগ পাইলেই আনন্দে উন্মত্ত; বিবাহে আমাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামের লোকদিগের আনন্দের ত কথাই ছিল না। আমার বয়স তখন ৮ বৎসর, এ বিবাহে দিদিমা ঘটা করিলেন যথেষ্ট এবং সেই দিদির বিবাহের মত তৈল সিন্দূর ও পান-বাতাসার বরাদ্দ যথেষ্ট হইল। ঘটক একটি ভাল সম্বন্ধ জুটাইয়া দিলেন। জানি না, কন্যাপক্ষ ঘটক বিদায় কত টাকা দিয়াছিলেন। এক ঠাকুরবাড়ীর মৃতা দাসীর ৫ বৎসরের একটি মেয়েকে অতি সস্তায় মধ্যস্থের হাত দিয়া ৫০০৲ শত টাকায় কিনিয়া লইলেন আমার ঠাকুর মা। মেয়ের পেট-ভরা প্লীহা-যকৃত, কত দিন তার পরমায়ু তাহাই বা কে বলিতে পারে? কাঙ্গাইলা ভাই ছিল কুৎসিত কদাকার ও কালো, তার জন্ম দিদিমা আনিলেন একটি অতি ফর্সা টুকটুকে বৌ, ইহাতেই তিনি আহ্লাদে আটখানা! কত সস্তায় পাইলেন এমন টুকটুকে বৌ! আমরাও এই আনন্দের মধ্যে খেই হারাইয়া গেলাম। এই বিবাহ ব্যাপারে বহু টাকা খরচের জন্ম দাদামহাশয়ের কতখানি স্বীকৃতি ছিল তাহা আমরা বড় হইয়াও সন্ধান লইতে আগ্রহান্বিতা ছিলাম না। যিনি এই বিবাহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার উপরে "টু" শব্দটি করিবার দ্বিতীয় লোক যে কেহ ছিল না তাহা আমরা অতি অল্প বয়সেও বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিতাম। কল্পনা বাজারের বুঠীর স্মৃতির সঙ্গে আজও কয়েকটা বিশেষ ঘটনা মনে জাগিয়া রহিয়াছে। একবার কলিকাতা হইতে লাট সাহেবের সঙ্গে ৪০ জন কেরাণী প্রভৃতি ঢাকায় গিয়াছিল এবং তাহাদের খাওয়া দাওয়ার ভার দাদামহাশয় নিজে লইয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে সে এক বিরাট ব্যাপার! আমাদের ঠাকুর কাকার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র, তাকে দাদামহাশয় অতিযত্নে প্রতিপালন করিতেন, তার বিশেষ একটি কারণও ছিল। তার বড় ভাইটি বাবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বেড়াইত ও বাবাকে খুব যত্ন করিত কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য—বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এক বৎসরের মধ্যেই সে ঠাকুরটিও মারা গেল। সেই অবধি ঠাকুর কাকাকে সবাই খুব স্নেহের চক্ষে দেখিত, বিশেষ করিয়া বাবার নামের সহিত তাহার নামের মিল ছিল, ইহাও যেন একটা বিশেষ করিয়া ঘনিষ্ঠতায় জড়াইয়া গেল। ঠাকুর কাকারও পড়াশুনায় দিকে মন বসিল না। তাই দাদামহাশয় ঠাকুর কাকাকে আমিষ, নিরামিষ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করিবার সুযোগ সুবিধা দিয়া একেবারে রান্নার কাজে ওস্তাদ করিয়া তুলিলেন। কপিলবাবু বলেন বড় ও

দাদামহাশয় যখন মফঃস্বলে বাহির হইতেন তখন দাদামহাশয় ঠাকুর কাকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং রমেশ দত্তের খানসামার নিকট হইতে ঠাকুর কাকাকে নানা প্রকার মাংসের রান্না শিখাইয়া লইতেন। উত্তর জীবনে ঠাকুর কাকা আমিষ, নিরামিষ, মিঠাই, মণ্ডা, তৈয়ার করিবার উচু দরের ওস্তাদ হইয়া গিয়াছিল। লাট সাহেবের দলকে ভাল ভাবে খাওয়াইতে হইবে, এবার ঠাকুর কাকার রান্নার সমস্ত রকম পরীক্ষা হইবে; ঠাকুর ও চাকর মহলে বিরাট হৈ-চৈ লাগিয়া গেল। চাঙারী ভরা ভরা মুর্গী ও মাছ ইত্যাদি। ঠাকুর কাকা এই বিরাট রান্নায় খুব প্রশংসা পাইয়াছিলেন। আমি মায়ের ঘরের নিরামিষ ডাল তরকারি দিয়া ভাত খাইয়া মার বুকে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিমন্ত্রণের খাওয়া দাওয়া চুকিয়া যাইতে বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ছোট কাকার চিৎকার দিয়া কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম দিদিমা অতি মাত্রায় ক্রোধান্বিতা হইয়া হাতের পাখাখানা দিয়া ছোট কাকাকে বেদম মারিতেছেন, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং ইচ্ছা হইল দিদিমার মারণাস্ত্রখানাকে ছিনাইয়া লইয়া আসি, কিন্তু দিদিমার ঐ ভয়ঙ্কর রাগের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? একমাত্র দিদি (প্রমদা) ছাড়া; দিদি তখন শ্বশুরবাড়ীতে। যাক্, মনের সাধ মিটাইয়া দিদিমা ছোট কাকাকে মারিয়া থামিলেন, কিন্তু তর্জ্জন-গর্জ্জন চলিল অনেকক্ষণ পর্যান্ত। পরে দাদামহাশয় খুব শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "দেখ, হে মারটা আজ তুমি ধনেশকে মারিলে ইহা সবই আমার পিঠেই পড়িয়াছে। ধনেশের কোনই দোষ নাই, সব দোষই আমার, ইত্যাদি।"

দিদিমা আবার রাগিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন, আপনার পিঠে কি করিয়া মার পড়িল? ইত্যাদি নানা কথার কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। মোট কথা মুর্গী ইত্যাদি সেদিনে হিন্দুর অতি নিষিদ্ধ জিনিস, তাহা আবার স্বামী ও পুত্রগণ সকলেই খাইল ইহাতে দিদিমার রাগের কারণ যে যথেষ্ট ছিল, তাহা অস্বীকার করা কিছুতেই চলে না। বিশেষতঃ সে যুগের দিনে। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, উত্তর জীবনে এমন একটি মহা বিপর্যায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল যে স্বামীকে মুর্গীর মাংস ও সুপ ইত্যাদি রান্না করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাক, সেদিনের ব্যাপারে আমি খুবই বাঁচিয়া গেলাম, কারণ—আমি ত আর সেদিন ঐ সব অখাদ্য গ্রহণ করি নাই, দিদিমা ইহাতে আমার উপর মহা খুশী।

এদিকে কাঙ্গাইলা ভাইর এক মহা কাণ্ড! সকলে এত সব জিনিস খাইল কেবল মাত্র আমিই বাদ পড়িব ইহা যেন তার সহ্য হইতেছিল না। সে সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে পরের দিনের জন্য অতি যত্নে আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল। পরদিন অতি চুপি চুপি রান্নাঘরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া আমাকে খাওয়ানোর জন্য অতি ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন আমি খুব প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম কিন্তু কাঙ্গাইলা ভাই তাহা কোন ক্রমেই গ্রাহ্য করিল না। বাধ্য হইয়া খাইলাম ও খাওয়ার পরেও ভয়ে ভয়ে যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। খাওয়ার পরে কাঙ্গাইলা ভাই সাবান ও লেবু দিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া আমাকে আঁচাইয়া দিল এবং ভাল করিয়া আমার মুখ মুছিয়া দিল, যেন পেঁয়াজ বা মাংসের গন্ধ না থাকে। বলা বাহুল্য, কুঠি হইতে রান্নাঘরখানা অনেক দূরেই অবস্থিত ছিল, সুতরাং দিদিমা ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু আমি যেন চোরের মত সারা দিন অতি অপ্রসন্ন ভাবে কাটাইতে লাগিলাম কত যেন অপরাধী আমি! কলতা বাজারের বাসার আর একটি ঘটনা বিশেষ করিয়া মনে জাগিয়া রহিয়াছে আজও। একদিন সন্ধ্যা-বেলায় ঠাকুর চাকর ছেলের দল সকলেই যেন কি একটা উপলক্ষে কুঠি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার সময় সমস্ত ঘরেই আলো জ্বালাইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু চাকররা সে সময় কেহই বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। সুন্দর খুড়ীমা টেবিলের উপর সজ্জিত গ্লাসের বাতীটি ম্যাচ দিয়া ধরাইয়া দিয়া আসিলেন। তখনকার দিনে খোলা কাচের গ্লাসের বাতীরই চলন ছিল; সুন্দর খুড়ীমার বয়স ১০।১১ হইতে পারে। এদিকে টেবিলের নিকটের জানালাটা বন্ধ না করিয়া আলো জ্বালাইয়া দেওয়াতে এক ঝটকা বাতাস আসিয়া জানালার পরদাখানাকে খোলা গ্লাসের বাতীর উপর ফেলিতেই দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সুন্দর কাকার সদ্য বিবাহিত শ্বশুর-বাড়ী হইতে প্রাপ্ত মূল্যবান ক্রেপ ইত্যাদির মশারি গদী প্রভৃতি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল অল্প সময়ের মধ্যে। মাতাঠাকুরাণী যখন এই আগুন লাগিবার খবর জানিতে পারিলেন তখন ছুটিয়া যাইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলেন 'ভারী' স্নানের ঘরে জল রাখিয়া গিয়াছে, তাহা অতি বড় বড় পিতলের পাত্রে ভরা, এক একটির ওজন দুই কি আড়াই মণ হইবে। মাতা-ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি সেই একটি বড় জল-ভরা পাত্র ও বুদ্ধি খাটাইয়া কে যেন একখানা ডালা সেই ঘরে রাখিয়াছিল, সেই ডালাসহ সেই অগ্নিময় ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে জলসেচন করিতে লাগিলেন এবং আগুনের তেজটা জলসেচনে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। এদিকে বাড়ীর সবাই বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং মাতাঠাকুরাণীর উপস্থিত বুদ্ধির ও অসম্ভব শক্তির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল, তাহা আমার খুবই স্মরণ আছে। এত বড় জলপাত্রটা একটি মেয়েমানুষ যে কক্ষান্তরে বহন করিয়া আনিতে পারে, ইহা যেন কেহই ভাবিয়া ঠিক পাইতেছিল না। সবাই বলিতে লাগিল, ইহা একটি ভৌতিক কাণ্ড-বিশেষ। দেওয়াল-ঘেরা বাড়ী, ২।৩ দিক ঘেরিয়া ঢাকাই কুট্টীদের বস্তী ছিল। আগুন লাগার দরুণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সাহেবের কুঠীতে বিনানুমতিতে কোন্ সাহসে তাহারা ঢুকিবে! এইখানেই গরীব ও ধনীদের মাঝখানে প্রকাণ্ড লৌহ-যবনিকা! শত বিপদপাতেও কেহ কাহারও কাজে লাগে না।

কলতা বাজারের বাসার আর একটি ঘটনা লিখিয়াই এই অধ্যায় শেষ করিব। আমি ত একদিন বিকাল বেলা সমস্ত বাগান ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবিষ্কার করিলাম কি চমৎকার বড় বড় পটল লতা-গাছ ভরিয়া রহিয়াছে। ডালা ভরিয়া আনিয়া দিদিমাকে সেগুলি দিলাম, তিনি ত মহাখুসী, আমারও উল্লাসের অন্ত নাই। দিদিমা মালী, ঠাকুর, চাকরদের বলিতে লাগিলেন, কেহই দেখিয়া শুনিয়া বাগানের জিনিসপত্র ঘরে আনে না, আমাকে খুব তারিফ করিয়া, তখনই বসিয়া গেলেন তরকারী কাটিতে। নানা রকমের তরকারী ছিল তন্মধ্যে দিদিমা সন্ত-তোলা পটলও কাটিয়া দিলেন কতকগুলি। ঠাকুর কাকাও খুব তেল, ঘি সংযোগে ভাল করিয়া প্রায় ৪০

রনের তরকারী এক মস্ত কড়াইতে রান্না করিলেন এবং লবণ ইত্যাদি ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবার জন্ত কাঙ্গাইলা ভাইকে দেওয়া হইল। কিন্তু কাঙ্গাইলা ভাই উহা মুখে দিয়াই চিৎকার দিতে দিতে রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিল "কুইনাইন! কুইনাইন!" হায়! হায়! এ কি হইল! ব্যাপার কি! এত সখের তরকারী কেন এমন হইল কেহই কিছু ঠিক পাইতেছিল না, বহু সন্ধান চলিতে লাগিল, এদিকে মায়ের কাণে একথা পৌঁছিতেই তিনি তরকারির ডালা হইতে সভ-তোলা পটলের কিয়দংশ লইয়া জিহ্বায় দেওয়া মাত্রই এই অনাসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিলেন। তখন লাগিয়া গেল হৈ-চৈ, আমার বাহাদুরী গেল গোল্লায়। দিদিমা নিজেও খুব হাসিতে লাগিলেন. তাহার নিজের ত্রুটিও ছিল। ঐ পটলগাছগুলি নিজে নিজেই জন্মাইয়া থাকে উহাকে "তিত পটল" বলে. উহা কেহই খাইতে পারে না, দিদিমা যদি কাটিবার সময় একটু আস্বাদ করিয়া লইতেন তবে আর এতগুলি লোকের এক কড়াই তরকারী নর্দ্দমায় ফেলিতে হইত না। আমি ত ছেলেমানুষ, আমার উপরে আর কোন দোষ বর্ত্তিল না। তবু খুব মন-মরা হইয়াই রহিলাম কয় দিন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে ঐ কথাটা মনে হইলেই মালীর ত্রুটির কথা মনে হইয়া যাইত। কারণ, ঐ পটলগাছগুলি কাটিয়া ফেলাই ছিল মালীর কর্ত্তব্য কাজ, সে ত ঐ পটলের গুণ অবগত ছিল নিশ্চয়ই।

কিছুকাল পরেই আমরা কলতা বাজারের কুঠী ছাড়িয়া আসিলাম বাগান বাজারের একখানা নূতন বাড়ীতে, বাড়ীখানা তখনও পুরাপুরি শেষ হয় নাই। ভাগ্যক্রমে এ বাসায়ও খুব ভাল দুটি কুলের গাছ ছিল। এ বাসায়ও ছাত্র ও লোকজনের অপ্রতুল ছিল না। আমরা ছোটর দল অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই কুলগাছতলায় যাইয়া হাজির হইতাম, কিন্তু ইহার অতি পূর্ব্বেই কাঙ্গাইলা ভাই কুলগাছতলা হইতে ভাল ভাল কুল কুড়াইয়া লইয়া নিজের দখলে রাখিয়া দিত কিন্তু পরে সেগুলিকে সবাইকে ভাগ করিয়া দিত ও নিজে খাইত। একদিনের একটি ঘটনা মনে হইতেছে, সব ছোট ও ছাত্রের দল দেখিতে পাইল, গাছে অতি অস্বাভাবিক রকমের একটি বড় কুল ঝুলিতেছে; কিন্তু ঐ কুলটি এমন স্থানে ছিল যে কেহ সহজে তাকে পাড়িয়া লইতে পারে না, অথচ ঐ কুলটির প্রতি সকলের মস্ত-বড় লোভ হইয়া গেল। এদিকে স্কুল কলেজের ও অফিসআদালতের সময় হইয়া গেল, সকলেই খাওয়ার জায়গায় যাইয়া বসিয়া গেলেও মনে মনে ভাবিতে লাগিল, স্কুল হইতে যত শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ কুলটির মালিক হইবে। এই অনেকের যুগের মধ্যে একটিমাত্র মানুষ নীরব রহিলেন, কোন উৎসাহে যোগ দিলেন না যে মানুষটি হইলেন বাড়ীর জামাইবাবু অর্থাৎ আমার "সেনজী" (কুঞ্জপতি) তাহা ছাড়া সকলেই একটু উৎসুক চিত্তে ভাবিতেছিলেন এই অস্বাভাবিক বড় কুলটির কে মালিক হইবে। এদিকে যথা-সময়ে যে যার কাজে চলিয়া গেল. চাপরাশি প্যাদা প্রভৃতি যখন বাসায় অনুপস্থিত তখন কাঙ্গাইলা ভাই তার শকুনের স্তেন দৃষ্টি লইয়া কুলটিকে দেখিতেছিল। যেই না সকলের চলিয়া যাওয়া অমনই সেই কুলগাছতলায় কাঙ্গাইলা ভাই যাইয়া হাজির। মনে নাই কেন জানি আমার সেদিন স্কুলে যাওয়া হয় নাই। বোধ হয় জ্বর-জ্বর ভাব ছিল গায়ে। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল তাখ চুপ করিয়া এই জায়গায় দাঁড়াইয়া থাক্, কুলটা পাড়িয়া আমি তোকেই দিব, এই বলিয়া একটি নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিল। আমার তখন মহা আনন্দ, কুলগাছটা খুব বড় ও গায়ে খুব কাঁটা ছিল, সুতরাং ঐ কুলগুলিকে গাছে উঠিয়া পাড়িয়া লইবার সুযোগ ছিল না মোটেই। হাতের জোরে ঢিল ছুড়িয়া যে যার প্রয়োজন মত পাড়িয়া লইয়া খাইত। কিন্তু বহু চেষ্টায় ঐ অস্বাভাবিক কুলটিকে কেহই পাড়িয়া লইতে সমর্থ হইতেছিল না, কিন্তু সকলেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিল যে, স্কুল হইতে যত শীঘ্র আসিয়াই আগেই ঐ বড় কুলটিকে পাড়িয়া লইবেই লইবে। এদিকে কাঙ্গাইলা ভাই সকলের জল্পনা কল্পনাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ঢিল ছুড়িয়া সেই বড় কুলটিকে পাড়িয়া লইতে অতি উৎসাহী হইয়া উঠল এবং প্রাণপণ ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই ঢিল তার লক্ষ্য স্থলে যাইয়া পৌঁছিতেছিল না। আমাকে নিরাপদ স্থানে দাঁড় করাইয়া প্রাণপণে কাঙ্গাইলা ভাই ঢিল ছুড়িতেছিল কুলটাকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এদিকে অতি উৎসাহে কুলগাছের নীচে যাইয়া হাজির! কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে গাছের নীচে যাইতে দেখিতে পায় নাই। তার শুধু লক্ষ্য ছিল "বড় কুলটি" অকস্মাৎ একটি মস্ত বড় ঢিল আসিয়া আমার মাথার উপর পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই বড় কুলটি গাছ হইতে তলায় পড়িয়া গেল; কাঙ্গাইলা ভাই তাড়াতাড়ি কুলটি আমার হাতে দিতে আসিয়াই দেখে সর্ব্বনাশ! আমার মাথা কাটিয়া ফিন্‌কী দিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কাপড়-জামা সব রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, তখন একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া কাঙ্গাইলা ভাই কাপড় চাপা দিয়া জোরে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিল কিন্তু রক্তের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হইল না, তখন নিরুপায় হইয়া কুয়ার কাদা-মাটী সামনে পাইয়া তাহা দিয়া আমার ক্ষত স্থানটাকে ভরিয়া দিল এবং তাহাতেই রক্ত পড়াটা বন্ধ হইয়া গেল। এখন দারুণ ভয় উপস্থিত হইল, কাঙ্গাইলা ভাইকে সবাই বকাবকি ত করিবেই কত না জানি মারধর করে, এই হইল আমার মস্ত ভাবনা। এত রক্তপাত, ব্যথা বেদনা, কিন্তু আমি কোনরূপ চিৎকার দূরের কথা 'টুঁ' শব্দটি পর্যান্ত করিলাম না, অসুস্থ শরীর বলিয়া স্কুলে যাই নাই তা আবার কুলতলায় যাইয়া এই অবস্থা! তাহা আবার কাঙ্গাইলা ভাইর ছোড়া ঢিল আসিয়া আমার মাথায় পড়া সবগুলিই যেন মস্ত বড় অপরাধ-স্বরূপ হইয়া আমাকে বাক্ রোধ করিয়া দিল। কিন্তু এত বড় বিপদ, মাথায় এক ঝুড়ি কাদা-মাটি এ সব ত আর গোপন করা চলে না। আস্তে আস্তে কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে লইয়া মার কাছে হাজির হইল। মা সব শুনিলেন ও বুঝিলেন ব্যাপারখানা; তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাহা যাহা করা তখনকার একান্ত দরকার তাহাই করিতে লাগিলেন ও দাদামহাশয় দিদিমার কাণে যেন এত বড় ঘটনাটা না যায় সেজন্ত খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ, তাহা হইলে কাঙ্গাইলা ভাই খুবই তিরস্কৃত হইত সন্দেহ নাই। একমাত্র দাদামহাশয় দিদিমা ছাড়া ক্রমে সকলেই এই ঘটনাটা জানিয়া গেল। আমি বেহুঁসের মত বিছানায় শুইয়া রহিলাম, কিন্তু সেই কুলটি নাকি তখনও আমার হাতেই ছিল।

[ক্রমশঃ।

মনে থাকবে চিরদিন

শোভা দুই

পুণ্য-তীর্থ জয়রামবাটী। ক'লকাতা থেকে দেড়শ' মাইল। বিষ্ণুপুর থেকে ছাব্বিশ মাইল। বাসে যেতে হয়। পূর্ব্বে রাস্তা খুব খারাপ ছিল। বাস চলতো না। দু'পাশে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা, খানা-ডোবা, শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রাস্তা মেরামত হয়েছে। ঝোপ-ঝাড় কেটে দোকান-পাট বসেছে। জায়গায় জায়গায় চায়ের ছোট ছোট ষ্টল। এখন অনবরত যাত্রী যাতায়াত করে সেই মহাতীর্থে।

জয়রামবাটী মায়ের জন্মস্থান। মা এসেছিলেন এখানেই নর-দেহ ধারণ করে। মায়ের জন্মস্থানের উপরেই মন্দির। আর যে জায়গায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ঠিক সেই জায়গাতেই মায়ের বেদী। বেদীর উপর মা মৃন্ময় মূর্তিতে বিরাজমানা। মন্দিরের পশ্চাতেই আশ্রম।

মা, বাপের বাড়ীতে ভাইদের সংসারে যে ঘরে বাস করতেন, সে ঘরটি অতিশয় যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে, সেই ঘরে সিংহাসনের উপর মায়ের সুসজ্জিত ছবি। ঐ ঘরেই দেওয়ালে টাঙানো মায়ের একটি অয়েল পেন্টিং। ছবিটি এত প্রাণবন্ত যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মা বসে আছেন। মুখে তাঁর মধুর হাস্য, চোখ দুটি দিয়ে করুণা ঝরে পড়ছে। এমন জীবন্ত ছবি আর কোথাও চোখে পড়েনি। মায়ের দেহ রাখবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ অর্থাৎ শরৎ মহারাজ যে বাড়ী করে দিয়েছিলেন, অতি যত্ন সহকারে সে বাড়ীটিও রাখা হয়েছে। যে ঘরে মা থাকতেন সেখানে সিংহাসনে মায়ের ছবি আছে। নিত্য ফুল-চন্দন, ধূপ দীপ দেওয়া হয়। বাড়ীটিতে তিনখানি ঘর। রান্নাঘরটি বেশ বড়। রান্নাঘরের দালানে উনুন পাতা। নাড়ু, মোয়া, খৈ, মুড়ি এখানেই ভাজা হয়। খিড়কির দরজা দিয়েই পুণ্যপুকুর। এখানে মা হাত, পা, মুখ ধুতেন। ঘাটে সেই আমলের তিনটি পাথর এখনও আছে। মা থাকতে যেমন ছিল বাড়ীটি ঠিক তেমনি রাখা হয়েছে।

মায়ের মন্দির থেকে কয়েক পা গেলেই বিখ্যাত সিংহবাহিনীর মন্দির। যেখানের মাটি খেয়ে মায়ের দুরারোগ্য আমাশা সেরেছিল। মন্দিরের নিকটেই একটি নাতি-বৃহৎ পুকুর। যাকে বাঁড়ুয্যে-পুকুর বলা হয়। এখানে মা প্রত্যহ স্নান করতে আসতেন। স্নানের পর দেবী সিংহবাহিনীকে প্রণাম করে পাড়ার সকলের খবরা-খবর নিয়ে বাড়ী ফিরতেন।

মায়ের আমলের এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হোল। ওখানে সকলে তাঁকে গয়লা-মা বলে। বললাম, "আমাদের কাছে একটু

মায়ের কথা বলুন।" বৃদ্ধা আমাদের বসতে দিয়ে ছল-ছল চোখে বললেন, "মা গো, তোমরা তাকে দেবী বল, কিন্তু আমরা বুঝিনি, আমরা জানি আমাদের ঠাকুরঝি। আমাদের গাঁয়ের ঝিউড়ি সারু। রান্না রাঁধত, ঢেঁকিতে পাড় দিত, কাপড় কাচত, মুনিষদের খেতে দিত। ঠিক আমাদের মত। তখন কি বুঝেছি গা! শিষ্য-সেবক আসত, দেখতাম কত জিনিষ দিত। কত টাকা পড়ত পায়ের কাছে। মনে করতাম বামনী, বড় বড় শিষ্য-সেবক তাই অত দিচ্ছে। বলেছিলাম একদিন, ঠাকুরঝি, ভাইদের পিছন খরচ না করে একদিন দাও চব্বিশ-পহর গাঁয়ে। আমার কথা শুনে হেসে ফেললে ঠাকুরঝি। বলল, কত অষ্টপহর হবে পরে। তখন বুঝিনি মা কখন এখন বুঝছি। উঃ, কি দেখাই না দেখলাম। আর বাদ রইলনি কিছু। যাত্রা, বাউল, ঢপ, কেত্তন, জীবনে আর দেখবনি মা! হ্যাঁ গা, তোমরা এসেছিলে মেলাতে?"

বললাম আক্ষেপের সুরে, "আসতে পারিনি।" আমাদের উত্তর শুনে বললেন গয়লা-মা সমবেদনায় সুরে—"আহা আর কি হবে তেমনটি।" বললাম, "মেলায় এলে কি আপনার দেখা মিলত? আপনার মুখে মায়ের কথা শুনতে পেতাম?" "কি আর জানি মা আমি। কিছু জানিনি। কেবল জানি আমাদের ঠাকুরঝি। এখন মনে করি মহামায়া মায়ায় আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছিল। তাই ভাবি বেঁচে থাকতে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়েছিল মরলে কি পায়ে জায়গা দিবেনি?"

বললাম আমরা "নিশ্চয়ই দেবেন। তাঁর অপার করুণা!"

একদিন গেলাম শিহড়ে। পায়ে হেঁটেই রওনা হলাম। সঙ্গে একটি ছেলে গেল পথপ্রদর্শক হয়ে। খানিকটা যেতে মিশনের স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় দেখা গেল। দু'পাশে সবুজ ক্ষেত, মাঝে মাঝে পুষ্করিণী দেখতে দেখতে চললাম। কিছুক্ষণ চলবার পর পৌঁছলাম ঠাকুরের ভাগিনেয় এবং সেবাসঙ্গী হৃদয় মুখুজ্যের বাড়ী। বাড়ীর সামনেই ছোট্ট একটি চালাঘর। এখানে হৃদয়রাম দুর্গাপূজা করেছিলেন। এই স্থানেই মায়ের আরতির সময় ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিয়েছিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করে অগ্রসর হলাম। কিছুদূর যেতেই প্রসিদ্ধ শান্তিনাথ শিবের মন্দির দর্শন করা গেল, শিবের গাজন উপলক্ষে শান্তিনাথ শিবের পূজা দিতে আর মেলা দেখতে দূর দেশ থেকেও লোকসমাগম হয়। সন্ধ্যে হয়ে এলো, কাজেই ফিরতে বাধ্য হলাম। মায়ের মামাবাড়ী আর সেই প্রসিদ্ধ বেলগাছটি দেখবার ইচ্ছা ছিল। সেদিন আর হোল না। পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে গরুর গাড়ীতে রওনা হলাম। শীতকাল, চার দিক সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত। দু'পাশে সবুজ ক্ষেত, সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশ, নির্জন প্রান্তর সব মিলিয়ে মনকে উদাস করে দেয়। মনে পড়লো এখানেই এক গানের আসরে বালিকা মা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভাবী পতি বলে।

আবার সেই শান্তিনাথ শিবের মন্দির ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী চললো। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর শিহড়ে মায়ের মামার বাড়ীতে এসে পড়লাম। মামার বাড়ীটি নেই। সেই জায়গায় পাকা বাঁধানো তুলসীমঞ্চ, শুনলাম ঐ মঞ্চটি মায়ের আমলের আর এখানেই মামার বাড়ী ছিল। মায়ের মামার বাড়ীর এক আত্মীয় আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। প্রসিদ্ধ বেলগাছটি দেখলাম। যেখানে মা বালিকাবেশে রক্তবর্ণ চেলী পরে শ্যামসুন্দরীর গলা জড়িয়ে বলেছিলেন, "মা, আসছি গো তোমার কাছে।" বেলগাছটি নূতন। বেশী বড় নয়। মনে হয় ঐ জায়গাতেই সেই গাছের নূতন চারা লাগান হয়েছে। বেলগাছকে প্রণাম জানিয়ে ফিরলাম সন্ধ্যের সময়।

পরদিন সকালে চা-পর্ব্বের পর আবার গরুর গাড়ীতে রওনা হওয়া গেল কামারপুকুর অভিমুখে। ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর। মহাতীর্থ। এই পথ দিয়ে মা গেছেন কত বার জয়রামবাটী, ঠাকুরও যাতায়াত করেছেন কত বার। জয়রামবাটী আর কামারপুকুরের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। পবিত্র আকাশ-বাতাস। দু' পাশে প্রসারিত ধান-ক্ষেত, সামনে প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশ মনকে ভরিয়ে দেয়, চোখকে মুগ্ধ করে। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর দেখা গেল মাণিক রাজার বাগান। তার পরেই এসে পড়লাম ভূতির খালে। দূরে একটি বৃহৎ বটগাছ দেখলাম, গাছটির তলা বেশ মোছা। ঠাকুর প্রথম জীবনে এই ভূতির খালেই বসে সাধনা করেছিলেন। শ্মশান ছাড়িয়ে অল্প কিছু পথ গেলেই কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দির।

এসে পড়লাম আশ্রমে। গাড়ী ছেড়ে প্রণাম করলাম মন্দিরে। ঠাকুরের মর্ম্মর মূর্ত্তি অতি সুন্দর প্রাণবন্ত। ঠাকুরের বেদীতে পায়ের কাছে খোদাই করা ঢেঁকি, উনুন। ঠাকুর বলেছিলেন ঢেঁকিশালে। জন্মেই প্রবেশ করেছিলেন উনুনে। বিভূতি সারা অঙ্গে মেখে হয়েছিলেন বিভূতীশ্বর। দেখলাম নাটমন্দির তৈরী হচ্ছে। আশ্রমটি অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চার ধারে ফুলের বাগান। নয়ন-মুগ্ধকর। দর্শন করলাম রঘুবীর, ঠাকুরের চালাঘর, তাঁর স্বহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ, ঠাকুরের বৈঠকখানা।

শান্ত সুর

নীলিমা দাশগুপ্তা

এখানে এসে তোমাকে দেখি একা
ফুলেরা নেই ভ্রমর নেই, কেকা,
ওঠে না কোনো আকাশ ভেজা বনে,
শব্দহীন ডানায় যেন পাখি,
এসেছে নেমে, চিহ্ন তার আঁকি
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালে মনে।

কত না বাধা, অশান্ত ঝড় বাঁকে
চেয়েছি যেতে অদূর কল্লোলে,
দেখেছি শুধু নদীর তীরে তীরে
ঢেউয়ের গান শুধুই গেছে ফিরে,
ফেনিলোচ্ছ্বাসে বাধার আগলে।
তবু যে আজ আলোর আশা জাগে
সে যে তোমার পায়ের অনুরাগে,
তুমিই যেন গোপন সুরে ডাকো,
কূজনহীন বনের কানে কানে
তোমারি সুর গভীর নেশা আনে,
এপারে মেশে ওপার-ছোঁয়া সাঁকো।

ডি. এচ. লরেন্স

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শরৎকালে পল অনেক বার ওয়াইলি ফার্মে যাতায়াত করেছে। মিরিয়ামের সঙ্গে পলের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। তবু মাঝে মাঝে পল ওদের বাড়িতে গিয়ে মিরিয়ামের সঙ্গে না মিশে, ওর ভাই এডগারের সঙ্গে এসে জুটত। মিরিয়াম আর তার ভাই, দু'জনের স্বভাব ঠিক বিপরীত।

এডগার বুদ্ধি দিয়ে বাঁচে, সব কিছুতেই তার অদম্য কৌতূহল, জীবনের প্রতি তার আগ্রহ বৈজ্ঞানিকের আগ্রহের মত। এডগারের প্রতি মিরিয়ামের ছিল গভীর অশ্রদ্ধা। মিরিয়াম যখন দেখত পল তাকে ছেড়ে এডগারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে, তখন তার মনে বিষম তিক্ততার সৃষ্টি হ'ত। কিন্তু পল উপভোগ করত এডগারের সঙ্গ। বিকেলবেলা ওরা দু'জনে মাঠে কাটাত, কিম্বা বৃষ্টি হলে মাচানে বসে ছুতোরের কাজ করত। কখনও বা গল্প করত দু'জনে, কখনও এ্যানির কাছে পল পিয়ানোতে যে যে গান শিখেছিল তারই সুর সে শেখাত এডগারকে। মাঝে মাঝে পুরুষরা সবাই মিলে,—এমন কি মিঃ লীভার্সও থাকতেন সেই দলে—গভীর তর্ক বাধিয়ে তুলত। জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া উচিত কি না কিম্বা এই ধরণের কোন বিষয় নিয়ে জমে উঠত তাদের তর্ক। এ সব বিষয়ে মায়ের মতামত পলের জানাই ছিল, মায়ের মতামতের বাইরে তার নিজস্ব কোন মত তখনও গড়ে ওঠেনি, তাই নিয়েই সে তর্ক করত। মিরিয়াম সেখানে থাকত এবং তর্কেও যোগ দিত, কিন্তু সারাক্ষণ সে অপেক্ষা করে থাকত সেই সময়টুকুর জন্যে, যখন তর্ক শেষ হয়ে আবার ব্যক্তিগত কথাবার্তা শুরু হবে। মনে মনে সে ভাবত: 'জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হলই বা, তবু এডগার, পল আর আমি ত' যেমন আছি, তেমনই থাকব।' তাই কখন পল আবার ফিরে আসবে তার কাছে, তারই জন্যে সে অপেক্ষায় থাকত।

পল ছবি আঁকা শেখবার চেষ্টা করছিল। রাত্রে মায়ের সঙ্গে একা ঘরে বসে সমানে কাজ করে যেত সে। মা সেলাই কিম্বা পড়া নিয়ে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে কাজ থেকে চোখ তুলে এক মুহূর্ত মায়ের উজ্জ্বল, দীপ্তিমান মুখের দিকে চাইত পল, আবার মহা আনন্দে কাজের মধ্যে ডুবে যেত।

পল বলত, 'তুমি যদি, মা, তোমার ঐ দোলনা-চেয়ারটায় বসে থাক, তাহলে আমার কাজ খুব ভাল হয়ে বেরুতে থাকে।'

মা অবিশ্বাসের হাসি হাসতেন। কিন্তু সেই অবিশ্বাস তাঁর অন্তরের নয়। বলতেন, 'তাই নাকি!' ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই ভাবে বসে থাকতেন মা, ছেলে কাজ করে যাচ্ছে, সেলাই করা কিম্বা বই পড়ার মধ্যেও এই ক্ষীণ অনুভব জেগে থাকত তাঁর মনে। ছেলেও তার প্রাণের সবটুকু ধরে দিত পেন্সিলের ডগায়, মায়ের সান্নিধ্যটুকু যেন কোন উষ্ণ অনুভবের মত শক্তিসঞ্চার করত তার মনে। এই নিয়ে দু'জনেই পরম সুখী, অথচ কেউ-ই সচেতন নন এ সম্বন্ধে। এই সময়টুকু এত সার্থক, এইটুকু সময়ের জন্যেই বাঁচার মত করে বাঁচা, তবু সজ্ঞানে একে বিশেষ কোন মূল্য দিতেন না কেউই।

উদ্দীপনা না পেলে পল সচেতন হ'ত না। ছবি শেষ হয়ে গেলে মিরিয়ামের কাছে নিয়ে যেতে চাইত সে। সেখানে সে উৎসাহ পেত, নিজের অজ্ঞাতসারে যে সৃষ্টি সে করেছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠত তার মন। মিরিয়ামের সান্নিধ্যে এসে তার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হ'ত; তার দৃষ্টি গিয়ে প্রবেশ করত মর্মস্থলে। মায়ের কাছ থেকে সে পেত জীবনের তাপ, সৃষ্টির প্রেরণা। মিরিয়াম সেই তাপকে ফুটিয়ে তুলত তীব্র আলোকের পরিপূর্ণ শুভ্রতায়।

ফ্যাক্টরিতে ফিরে এসে পল দেখল কাজের চাপ অনেক কমে গেছে। বুধবার বিকেলে আর্ট-স্কুলে যাবার জন্যে ছুটি পেত সে। এটা অবশ্য মিস্ জর্ডনের ব্যবস্থা অনুসারে হয়েছিল, আবার সন্ধ্যা হলে সে ফিরে আসত। বৃহস্পতি আর শুক্রবার সন্ধ্যায় কারখানা বন্ধ হয়ে যেত আটটার বদলে ছ'টায়।

একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, মিরিয়াম আর পল লাইব্রেরী থেকে বাড়ি ফেরবার পথে মাঠে বেড়াতে গেছে। তাদের বাড়ি থেকে এ মাঠগুলো মাত্র তিন মাইলের পথ। ঘাসের ডগায় তখনো ঈষৎ সোনালী আভা, সোরেল ফুলগুলো তাদের লাল টুকটুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ: উঁচু নীচু পথে বেড়াতে বেড়াতে তারা দেখল আকাশের হলদে আভা মিলিয়ে লালের ছোপ দেখা দিয়েছে, ক্রমশ: আরও ঘন লাল, তার পর যেন একটা নীল রঙের তুহিন আবরণের নীচে সেই আলোকের আভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

মাঠের উপর অন্ধকার নেমে আসছে, শুধু মাঝখানকার রাস্তাটি সাদা। অ্যানফ্রিটনে যাবার পথ। এখানে এসে পল যেন ইতস্তত: করতে লাগল। এখান থেকে পলের বাড়ি যাবার পথ দু'মাইল, আর মিরিয়ামের যেতে হবে আরও এক মাইল এগিয়ে। উত্তর-পশ্চিম আকাশের আবছা আলোর ঠিক নীচে অন্ধকারে ছাওয়া এই রাস্তাটির দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইল দু'জনেই। পাহাড়ের চূড়ায় সেলবি শহরের বাড়িঘর আর কয়লাখনির মাথাগুলো যেন আকাশের পটে 'সিলুয়েট'-এ আঁকা ছবি।

পল ঘড়ির দিকে চাইল। বললে, 'নটা বেজে গেল যে!'

দু'জনে বুকে বই আগলে দাঁড়িয়ে রইল, এখুনি বিদায় নেবার ইচ্ছা কারুরই নেই। মিরিয়াম বললে, 'এখনই ত' বন দেখতে সুন্দর। আমি ভেবেছিলুম তুমি দেখবে।'

পল ওকে অনুসরণ করে আস্তে আস্তে শাদা ঘটকটার কাছে গেল।

বললে, 'আমার দেরি হলে ওরা আবার ভারী বিরক্ত হয়।'

—'কেন তুমি ত' অন্যায় কিছুই করছ না।' অসহিষ্ণু জবাব এল মিরিয়ামের কাছ থেকে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে পল শূন্য মাঠের উপর দিয়ে চলল ওর পেছনে। বনের শীতলতা, পাতা আর ফুলের সুবাস আর সবার উপর গোধূলির শান্ত আবরণ। দু'জনে নীরবে চলতে লাগল। রাত্রি যেন আচমকা এসে উপস্থিত হ'ল বনে, যেন সে এসেছে বড় বড় গাছগুলোর অন্ধকার গুঁড়ি বেয়ে। পল চারি দিকে তাকাল একবার, তার মন যেন কিসের আশায় দুলে দুলে উঠতে লাগল।

মিরিয়াম একটা বন-গোলাপের ঝাড় আবিষ্কার করে রেখেছিল। পলকে সেইটে দেখানোই ছিল তার ইচ্ছে। গোলাপগুলো যে আশ্চর্য্য সুন্দর, এ বিষয়ে মিরিয়ামের মনে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু পল যতক্ষণ না দেখছে, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল যেন জিনিসটা তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। জিনিসটাকে তার একান্ত নিজস্ব, তার পক্ষে একান্ত অবিনশ্বর করে তুলবে, এ শুধু পলই পারে। তার মন তাই নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করছিল।

এখনই শিশির পড়ে রয়েছে পথের উপর। পুরোন ওক-গাছের বনে যেন কুয়াশা জমেছে। পল বুঝতে পারছিল না দূরের ঐ দোঁয়াটে সাদা রঙটা কি শুধু কুয়াশা, অথবা মেঘলা রাতের আবরণে ঢাকা সাদা এক ঝাড় ক্যাম্পিয়ন ফুল।

পাইনের গাছগুলোর কাছে এসে যখন ওরা হাজির হল, তখন মিরিয়াম উৎকণ্ঠা আর আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছে। হয়ত গোলাপ গাছের ঝাড়টা হারিয়ে গেছে, খুঁজেই হয়ত পাবে না তাকে অথচ সেই জন্যে তার কী তীব্র ব্যাকুলতা। পল যখন গিয়ে ফুলগুলোর সামনে দাঁড়াবে, তখন তার পাশে থাকবার জন্যে কী আবেগ আকুল আকাঙ্ক্ষা তার মনে। যেন ঐ ফুল ঝাড়টার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা কার স্পর্শ পাবে মনে মনে—সেই স্পর্শে তার শিহরণ জাগবে, কত পবিত্র সেই স্পর্শ। পল নীরবে হেঁটে চলেছিল তার পাশে। দু'জনার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। কাঁপন জাগছিল মিরিয়ামের সারা দেহে, আর পল যেন চকিত হয়ে কান পেতে কি শুনছিল।

বনের প্রান্তে এসে আকাশটাকে ওরা দেখল শুভ্র মুক্তাবিন্দুর মত আর মাটির বুকে দেখল অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। পাইন গাছের প্রান্ত-প্রসারিত শাখা-প্রশাখা থেকে মিষ্টি ফুলের গন্ধ অবিরত ভেসে আসছে।

পল একবার জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ দিকে?'

কাঁপা গলায় মিরিয়াম আস্তে আস্তে বললে, 'মাঝখানের রাস্তা দিয়ে।' পথের মোড় ফিরে মিরিয়াম থমকে দাঁড়াল। পাইন গাছের সারির মধ্যে দিয়ে চওড়া রাস্তা, মিরিয়াম ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখল খানিকক্ষণ, কিছুই তার নজরে এল না—সব জিনিসের রঙ যেন ধূসর আলোতে মিলিয়ে গেছে। তার পর হঠাৎ তার চোখ পড়ল ফুলের ঝাড়টির উপর। 'আঃ, এই ত'!' বলে দৌড়ে এগিয়ে গেল সে।

চারি দিক নীরব, নিস্পন্দ। সামনের গাছটা লম্বা, আঁকা-বাঁকা। গাছের ডালগুলি নুয়ে পড়েছে একটা কাঁটাফুলের ঝোপের উপর। লম্বা পাতার রাশি ঝাঁকড়া হয়ে প্রায় ঘাসের উপর অবধি ঝুঁকে পড়েছে। অন্ধকারের বুকে শাদা ফুলগুলো যেন একরাশ তারা, অন্ধকারকে চিরে ওরা ছড়িয়ে আছে। এই শাদা আর কালোর পটে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে গোলাপগুলো। পল আর মিরিয়াম ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখতে লাগল। থরে থরে সাজানো ফুলগুলো যেন শান্ত হয়ে উজ্জ্বল মুখ তুলে ওদেরই দিকে চেয়ে আছে; ওদের অন্তরে সঞ্চার করছে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভবের। প্রদোষের আবছা আলো ধোঁয়ার মত ওদের ঘিরে রেখেছে, তবু গোলাপ ফুলগুলোর ঔজ্জ্বল্য একটুও ম্লান হয়নি।

পল মিরিয়ামের চোখের দিকে চেয়ে দেখল। তার মুখ শুকনো, সে যেন বিস্মিত মনে কিসের প্রতীক্ষা করে আছে, তার ঠোঁট দু'টি ঈষৎ আলগা, কালো কালো চোখ দু'টি মেলে রেখেছে পলের দিকে। পলের দৃষ্টি যেন মিরিয়ামের মনে অবগাহন করে ফিরে এল। মিরিয়ামের অন্তর স্পন্দিত হয়ে উঠল, এই তো সেই স্পর্শ, সেই সংযোগ, সে

চেয়েছিল। যেন ব্যথায় আকুল হয়ে পল চোখ ফিরিয়ে নিল, ঝাড়টার দিকে চেয়ে বললে, 'দেখে মনে হয় ফুলগুলো যেন ঠিক প্রজাপতির মত ওড়ে, আপনা থেকেই ওরা যেন দুলে ওঠে।'

মিরিয়াম তার গোলাপগুলোর দিকে চেয়ে দেখল। শাদা শাদা ফুল, তার কোনটি যেন কুণ্ঠিত, শুচিশুভ্র, কোনটি বা বিস্মিত পুলকে নিজেকে মেলে ধরেছে। পেছনের গাছটি ছায়ার মত অন্ধকার। মিরিয়াম ফুলগুলোর দিকে হাত মেলে দাঁড়াল, এগিয়ে গিয়ে ফুলগুলোকে স্পর্শ ক'রে যেন প্রণাম জানাল তাদের।

পল বললে, 'চলো এবার।'

শাদা গোলাপের স্নিগ্ধ সুবাস; শুভ্র, পবিত্র, নির্মল একটি গন্ধ। পলের মনে হতে লাগল কিসে যেন তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে; তার মন অযথা চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দু'জনে নীরবে পথ অতিক্রম করতে লাগল।

বিদায় নেবার সময় পল ধীরে ধীরে বললে, 'রবিবার অবধি।' বলে সে চলে গেল। মিরিয়াম মন্থর পদক্ষেপে গৃহে ফিরে এল, রাত্রির পুণ্যস্পর্শে তার অন্তর আজ তৃপ্ত হয়ে উঠেছে। পল অন্যমনস্কের মত বন-পথ ধরে চলতে লাগল। বন ছাড়িয়ে খোলা মাঠে পড়েই সে জোরে জোরে দৌড়তে শুরু করল, তার শিরায় শিরায় যেন একটা বিকার,—মধুর বিকারের সঞ্চার হয়েছে।

যেদিনই মিরিয়ামের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পলের দেরি হ'ত, সেদিনই পল বুঝতে পারত মায়ের মেজাজ ভাল নেই, তার উপর রাগ করে বসে আছেন তিনি। এই রাগের কোন কারণ পল খুঁজে পেত না। আজ বাড়িতে ঢুকেই টুপিটা খুলে ফেলতেই, মা ঘড়ির দিকে চাইলেন। মায়ের চোখে ঠাণ্ডা লাগার জন্য আজ আর তাঁর পড়বার কোন উপায় ছিল না। বসে বসে শুধু ভাবছিলেন তিনি। পল যে এই মেয়েটির টানে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে, মায়ের কাছে তা আর গোপন ছিল না। মিরিয়ামের জন্যে তাঁর ভাবনা নয়। মেয়েটা এমন, ওর টানে ছেলেদের মনে আর নিজের বলে কোন পদার্থ থাকে না; পুরুষ মানুষের সবটুকু অন্তর-রস ও যেন টেনে নেয়। আর ছেলেটাও ত' বোকার মত আত্মসমর্পণ করেছে ওরই কাছে। কিন্তু ওকি মানুষ হতে দেবে ছেলেটাকে, তা দেবে না। মায়ের ভয় সেইখানেই। তাই পল যতক্ষণ মিরিয়ামকে নিয়ে থাকে, ততক্ষণ মা ভেবে ভেবে সারা হতে থাকেন।

ঘড়ির দিকে চেয়ে নিতান্ত শ্রান্ত আর বিরস সুরে মা বললেন, 'অনেক রাত করে ফেলেছ আজ।'

মিরিয়ামের সান্নিধ্য থেকে পল যেটুকু উত্তাপ আর মুক্তির আস্বাদ নিয়ে ফিরে এসেছিল, এক মুহূর্তে তা যেন উবে গেল, সঙ্কুচিত হয়ে উঠল তার মন। মা আবার বললেন, 'ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি অবধি গিয়েছিলে বুঝি?'

জবাব দেবার ইচ্ছে হ'ল না পলের। মিসেস মোরেল এক চোখে চেয়ে দেখলেন ছেলের দিকে, তার কপালের চুল ঘামে ভিজে, বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ছুটে চলে এসেছে। আর দেখলেন ওর ভ্রু-দুটি বিরক্তিতে কুঞ্চিত, রাগ হলে ওর যেমন হয়। বললেন, 'মেয়েটিকে নিশ্চয়ই তোমার ভয়ঙ্কর ভাল লেগেছে, নইলে ওকে রেখে আসতে পার না তুমি, ওর পেছনে এত রাত্রে আট মাইল ছুটে যেতে হয় তোমার!'

একটু আগে মিরিয়ামের মনোরম সান্নিধ্য আর এখন মায়ের এই বিরক্তি এই দুয়ের মধ্যে পলের মন আহত বিরক্ত হয়ে উঠল। জবাব দেবার ইচ্ছে তার ছিল না, চুপ করেই থাকত সে। কিন্তু মাকে একেবারে এড়িয়ে যাবার মত কাঠিন্য সে মনে মনে সঞ্চয় করতে পারল না। একটু রাগ দেখিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে আমার।'

—'আর কেউ কথা বলবার লোক নেই বুঝি?'

—'আমি যদি এডগারের সঙ্গে যেতাম, তা'হলে তুমি আর ও কথা বলতে না।'

—'নিশ্চয়ই বলতুম, তুমি তা জানো। নটিংহাম থেকে এসে আবার এত রাত অবধি ঘুরে বেড়ানো, তা তুমি যার সঙ্গেই যাও না কেন, আমি নিশ্চয়ই বলব। তাছাড়া—'বলতে বলতে রাগে, ধিক্কারে তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ বিকৃত হয়ে এল। তিনি বললেন, 'তাছাড়া একটুখানি সব ছেলেমেয়ে তাদের এমন মাখামাখি, এ ভাবতেও আমার বিচ্ছিরি লাগে!'

পল চীৎকার করে বললে, 'এটা মাখামাখি কিছু নয়।'

মা বললেন, 'আমি ত' জানিনি একে আর অন্য কী নাম দেওয়া যেতে পারে।'

—'নিশ্চয়ই নয়। তুমি কি ভাবো আমরা—আমরা শুধু গল্প করি বইত' নয়!

মা ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা যত রাতই হোক আর যত দূরেই না যেতে হোক।'

পল রাগে তার বুটের ফিতে ধরে টানতে লাগল। বললে, 'তুমি অমন আবোল-তাবোল বকছ কেন? না, ওকে দেখতে পারো না বলে?'—

—'আমি ওকে দেখতে পারি না, এমন কথা বলি না। কিন্তু সেদিনের সব ছেলেমেয়ে এমন জোড়-বেঁধে বেঁধে ঘুরবে, এ আমার সহ্য হয় না। কোন দিনই নয়।'

—'কিন্তু এ্যানি যে জিম ইঙ্গারের সঙ্গে বেড়াতে বেরোয় তাকে ত' কিছু বল না তুমি?'

—'তোমাদের দু'জনের চেয়ে ওরা অনেক বেশী [illegible]।'

—'মানে?'

—'মানে, আমাদের এ্যানি ঐ [illegible] ধরণের মেয়ে নয়!'

মায়ের এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝতে পারল না পল। মা-ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। উইলিয়মের মৃত্যুর পর বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি চোখের যন্ত্রণাও তীব্র অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

পল বললে, 'যাক গে। গ্রামের দিকটা ভারী সুন্দর। মিঃ স্মিথ তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তুমি যেতে পারোনি বলে খুব দুঃখ করছিলেন তিনি। তোমার শরীর কি একটু ভাল মনে হচ্ছে?'

মা বললেন, 'আমার শুয়ে পড়া উচিত ছিল অনেকক্ষণ আগেই।'

—'কী যে বল মা! সওয়া দশটার আগে তুমি কিছুতেই শুতে যেতে না।'

—'যেতুম বই কি!'

—'হ্যাঁ গো, এখন আমার উপর রাগ হয়েছে কিনা, তাই এখন যা' খুশি তাই বলছ।'

মায়ের ললাটে চুম্বন করলে পল। সেই অতি পরিচিত ললাট, তার ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্ত্তী রেখাগুলির গভীরতা, সুবিন্যস্ত কেশদাম ক্রমশঃ ধূসর আকার ধারণ করছে, সারা ললাট জুড়ে গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব। চুম্বনের পর মায়ের কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর শুতে গেল ধীরে ধীরে। তার মন থেকে মিরিয়াম তখন সরে গিয়েছে। মায়ের প্রশস্ত সুকুমার ললাট থেকে কুঞ্চিত কেশরাশি কেমন সুন্দর উঠে গিয়েছে চেয়ে চেয়ে শুধু তাই সে দেখতে লাগল। আর মায়ের মনে কেন জানি না সহসা বেদনায় টনটন করে উঠল।

এর পরের বার মিরিয়ামের সঙ্গে দেখা হলে পল বললে, 'আজ যেন আমাকে আর দেরি করিয়ে দিও না। রাত দশটার বেশী হলে মা বড় ভাবতে থাকেন।'

মিরিয়াম মাথা নীচু করে চিন্তা করতে লাগল। বললে, 'কেন এত ভাববার তাঁর কী আছে?'

—'মা বলেন, আমায় ভোরে উঠতে হয়, তাই রাতে দেরি করে ফেরা উচিত নয়।'

—'ভালো।' মিরিয়াম শান্ত সুরেই বললে, একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে।

রাগ হতে লাগল পলের। কিন্তু আবার প্রায়ই তার দেরি হতে লাগল।

মিরিয়াম আর তার মধ্যে যে সম্বন্ধটুকু গড়ে উঠেছে, সেটা যে ভালবাসা জাতীয় কিছু, এ তাদের দু'জনের কেউ-ই স্বীকার করত না। পল ভাবত, এমন ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবার মত অনভিজ্ঞ সে নয়, আর নিজের সম্বন্ধে মিরিয়ামের ধারণাও ছিল উঁচু দরের। ওদের দু'জনেরই বিকাশ হতে বিলম্ব ঘটছিল, আর দেহের বিকাশের চেয়ে মনের বিকাশ ঘটছিল আরো দেরিতে। তার মায়ের মত মিরিয়ামের অন্তরও ছিল একান্ত স্পর্শকাতর, যেখানে সামান্যও স্থূলতার পরিচয় পেত সেখান থেকেই তার মন গভীর আঘাতে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসত। তার ভায়েরা গুণ্ডাগুণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় তারা কোন দিনই অভদ্র ছিল না। চাষবাসের ব্যাপার নিয়ে যা কিছু কথাবার্তা, সে তারা পুরুষমানুষরা বাইরেই সেরে আসত। কিন্তু চাষী-গেরস্তর বাড়িতে ছেলেপুলের জন্ম দেওয়া কিম্বা গর্ভধারণ করা ছিল নিত্যকারের ব্যাপার। হয়ত সেই জন্যেই এসব বিষয়ে মিরিয়ামের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এ ধরণের অন্তরঙ্গতার সামান্য আভাস মাত্র পেলেই তার রক্তে শুচিতা জেগে উঠত, তার বিরক্তির আর সীমা থাকত না। এসব বিষয়ে মিরিয়ামের ধারণাকেই পল নিজের বলে গ্রহণ করত, কাজেই একান্ত নীরক্ত আর নিষ্পাপ অন্তরঙ্গতাই তাদের দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠতে লাগল।

পলের বয়স উনিশ হলেও তখন সপ্তাহে বিশ শিলিং মাত্র তার রোজগার। কিন্তু এ নিয়ে তার ক্ষোভ ছিল না। তার ছবি আঁকা ভালোভাবেই চলছিল, আর বেশ ভালই কেটে যাচ্ছিল তার দিনগুলি। গুড্ ফ্রাইডের দিন হেমলক্ পাহাড়ে বেড়াতে যাবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলল পল। তার দলে তার নিজের বয়সী আর তিনটি ছেলে, এ ছাড়া এ্যানি, আর্থার মিরিয়াম আর জ্যাফ্রে। আর্থার নটিংহামে এক বিজলীবাতির দোকানে কাজ শিখছিল, সে সেখান থেকে ছুটিতে এসেছিল বাড়িতে। মোরেল তার অভ্যাস মত ভোরে উঠে শিস দিতে দিতে উঠানে করাত দিয়ে কাঠ কাটছিল। সাতটার সময় বাড়ির সবাই শুনতে পেল, সে তিন পেনি দামের বুন্-পিঠে কিনেছে। ছোট একটি মেয়ে পিঠে বিক্রি করতে এসেছিল, তাকে পরম উৎসাহে সে যাদু মাণিক বলে সম্বোধন করলে। পরে কয়েকটি ছেলে আরও পিঠে নিয়ে এসেছিল, তাদের সব ফিরিয়ে দিয়ে বললে, একটা ছোট্ট মেয়ের কাছে তারা হেরে গেছে। খানিক বাদে মিসেস মোরেল উঠে এলেন, বাড়ির সবাই ঘুম-জড়ানো চোখে নেমে এল নীচে। ছুটির দিনে একটু বেশীক্ষণ অবধি বিছানায় শুয়ে থাকা, এ যেন এ-বাড়ির সবাইকার কাছেই এক চূড়ান্ত বিলাস। সকাল বেলায় খাবার তৈরি হতে হতে পল আর আর্থার কিছুক্ষণ পড়াশোনা করল, তারপর গা-হাত না ধুয়েই খেতে বসল। এও ছুটির দিনের আর এক বিলাস। ঘরখানা বেশ গরম। কারু মনেই আজ যেন ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই বাড়িতে আজ প্রাচুর্য্যের সমারোহ!

ছেলেরা পড়াশোনা করছে। মিসেস মোরেল বাগানে গিয়ে ঢুকলেন। স্কারগিল স্ট্রীটের পুরনো বাড়ি উইলিয়মের মৃত্যুর পরই

থেকে দেওয়া হয়েছিল, তারই কাছে আর একটা প্রাচীন বাড়িতে তারা উঠে এসেছিলেন। একটু পরেই বাগানের দিক থেকে ডাক শোনা গেল, 'পল পল, দেখ এসে।'

মায়ের গলা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল পল। হাতের বইখানা ফেলে ছুটে গেল সে। লম্বা বাগানখানা খোলা মাঠের ধার অবধি গিয়েছে। দিনটি ভারী ঠাণ্ডা আর ধোঁয়াটে, ডার্বিশায়ারের দিক থেকে কনকনে হাওয়া উড়ে আসছে। দু'টি মাঠের ওপারে বেষ্টউড গ্রাম, সেখানকার বাড়ি-ঘরের ছাদ আর লাল কিনারাগুলো ইতস্ততঃ ছড়ানো, তার মাঝখান থেকে গির্জার চূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারও ওপারে পাহাড় আর বন। ক্রমশঃ গিয়ে মিশেছে দূরে, যেখানে পেনাইন (Pennine) পর্ব্বতমালার উঁচু পাহাড়গুলো অস্পষ্ট ধূসর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাগানে গিয়ে পল চার দিক চেয়ে দেখতে লাগল। দেখল কচি কচি কার‍্যান্ট ঝোপের মাঝখানে মায়ের মাথাটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখেই মা ডাকলেন, 'এসো এদিকে।'

—'কেন?'

—'এসে দেখই না।'

কার‍্যান্ট গাছের কুঁড়িগুলোর দিকে মা চেয়েছিলেন। পল এগিয়ে গেল। মা বললেন, 'ইস, এগুলো এখানে, আমি যদি না দেখতাম!'

ছেলে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বেড়া ঝোপের নীচে মাটির উপর বিবর্ণ ঘাসপাতার মাঝখানে তিনটি ছোট্ট ফুল। মা আঙুল দিয়ে নীল ফুলগুলিকে দেখালেন; বললেন, 'দেখছ? আমি ত' কার‍্যান্ট ঝোপ দেখতে এসে হঠাৎ দেখলাম নীল রঙের কী যেন ফুল। ভাবলাম, 'সুগার ব্যাগ' হয়ত। ও মা! সুগার-ব্যাগ হতে যাবে কেন? তিনটি নীল মণি যেন, কী সুন্দর! কিন্তু এখানে ওরা এল কী করে?'

পল বললে, 'জানি নি ত'!'

—'ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু। আমার ধারণা ছিল, এ বাগানের প্রত্যেকটি লতাপাতা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু কেমন সুন্দর এরা বেড়ে উঠেছে। ওই যে কাঁটা-ফুলের ঝোপটা ওই বাঁচিয়ে রেখেছে এদের। নইলে কেউ ত' ছোঁয়ও নি এখানে।'

বসে পড়ে পল ফুলের পাপড়িগুলি উলটে-পালটে দেখতে লাগল, বললে, 'কেমন চমৎকার রং!'

—'চমৎকার নয়? আমার মনে হয় এগুলো সুইজারল্যাণ্ডের ফুল, শুনেছি সে দেশেই এমন চমৎকার ফুল ফোটে। একবার ভেবে দেখো, শাদা বরফের মাঝখানে এই ফুলগুলি! কিন্তু এখানে এরা এলো কোথা থেকে? সত্যি কিছু উড়ে আসে নি, কী বল?'

হঠাৎ পলের মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কতকগুলো চারাকে সে অযত্নে এখানে পুঁতে রেখেছিল।

মা বললেন, 'কই, আমাকে ত' কিছু বলো নি?'

—'না, আমি ভাবলাম, ফুল ফোটে কিনা দেখে নিই।'

—'এখন দেখলে ত'? আর একটু হলেই আমার ভাগ্যে আর দেখা হ'ত না ত'! জন্মেও এমন ফুল আমার বাগানে ফোটে নি।'

উল্লাসে আর গৌরবে মায়ের হৃদয় ভরে গিয়েছিল। বাগানখানা তাঁর অশেষ আনন্দের বস্তু। এ বাড়ির লম্বা বাগানটি মাঠের ধার অবধি গিয়েছে, অবশেষে এমন বাড়ি পেয়ে মায়ের জন্য পলেরও মনে তৃপ্তির সীমা ছিল না। প্রতিদিন সকাল বেলা প্রাতরাশের পর মা বাগানে গিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। আর এ বাগানের প্রতিটি তৃণ আর পাতা যে তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল, এ কথাও মিথ্যে নয়।

বেড়াতে যাবার জন্যে সবাই এসে হাজির হয়েছিল। খাবার বাঁধাছাঁদা হলে আনন্দে উৎফুল্ল দলটি সকলে মিলে যাত্রা করল। হেমলকষ্টোনে পৌছুতে দুপুর বেলার খাবার সময় হয়ে এল। এখানকার মাঠ নটিংহাম আর ইলকষ্টনের লোকে লোকারণ্য।

নীচে মাঠের উপর কারখানার ছেলেমেয়ের দল কেউ বা লাফ খাচ্ছে কেউ বা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মাঠের ওপারে একটা পুরনো ম্যানর-বাড়ির বাগান। ইউ-গাছের ঝাড় আর মোটা গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা বাগানখানা, খোলা মাঠের উপর হলুদ রঙের ক্রোকাস ফুলের সারি।

পল মিরিয়ামকে বললে, 'দেখছ, কেমন শান্ত ছবির মত বাগান?'

মিরিয়াম একবার কালো কালো ইউগাছ আর সোনালী ক্রোকাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখল, তার পর কৃতজ্ঞচোখে চাইল পলের দিকে। এত সব লোকের মাঝে পলকে এতক্ষণ সে ত' তার নিজের বলে মনে করতে পারে নি, এ যেন আর কেউ, এ যেন সে পল নয় যে তার অন্তরের সূক্ষ্মতম স্পন্দনটুকুও বুঝে নিতে পারে। এতক্ষণ সে যে ভাষা বলছিল সে ভাষা যেন মিরিয়ামের অবোধ্য। মিরিয়ামের মন তাই পীড়িত হয়ে উঠেছিল, তার বোধশক্তিই যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এবারে যখন পল তার কাছেই ফিরে এল, ফিরে এল তার কূক্ষ্মতর সত্তাকে ত্যাগ করে, তখন মিরিয়ামের মনে হ'ল আবার তার প্রাণ জেগে উঠেছে।

আবার তাকে ছেড়ে পল অন্যদের দলে গিয়ে যোগ দিল। তার পর বাড়ির দিকে রওনা হ'ল তারা। মিরিয়াম ধীরে ধীরে সকলের পেছনে আসতে লাগল। অন্যদের সঙ্গে তার মিল খায় না; কারু সঙ্গে সাধারণ মানুষের মত সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করতে সে অপারগ। তার বন্ধু বল, সখী বল, প্রেমিক বল, সে শুধু প্রকৃতি।

পল রাস্তার মাঝখানে এক জায়গায় নিমগ্নচিত্তে দাঁড়িয়েছিল। সেই রূপহীন ধূসর সন্ধ্যার পটভূমিতে এক টুকরো সোনালী আলো পলের মূর্ত্তিটিকে উজ্জ্বল করে দেখাচ্ছে। মিরিয়াম চেয়ে দেখল, ক্ষীণ অথচ দৃঢ় দেহ পলের, আজকের অস্তগামী সূর্য্য যেন মিরিয়ামের জন্যেই তাকে দান করে গেছে। মিরিয়ামের মনে এক গভীর বেদনার সঞ্চার হ'ল, সে বুঝতে পারল পলকে না ভালবেসে আর তার উপায় নেই। আজ সে নূতন করে পলকে আবিষ্কার করল, আবিষ্কার করল তার দুর্লভ সম্ভাবনার মুহূর্ত্তে, তার একান্ত নিঃসঙ্গতার ক্ষণে। দীক্ষার মন্ত্রে যেন তার দেহ থরথর করে কাঁপছে, মিরিয়াম ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ-স্তোত্রম্

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

৫

'রাম-সীতা' গেছে বনবাসে
হৃদ্‌-পদ্ম খালি ক'রে দিয়ে।
মা' বলেন,—"শিবপুজো কর্
শিবের ধ্যানস্থ মূর্তি নিয়ে।"
শিশু-সন্ন্যাসীর ভালো লাগে,
আরো ভালো লাগে তাঁর জটা;
গভীর ধ্যানের ফলে তাঁর
মাথার ওপরে ঘনঘটা!

* * *

সেই দিন থেকে
শিবকে হৃদয়ে রেখে
নিয়মিত ধ্যান ক'রেছে সে।
জীবন সন্ধ্যায়
হিসেবের খাতায় লিখেছে,—
"Shiva!
Since a child
I have taken refuge in Thee…
My stay—my guide…
My friend—my teacher—
My God—my real self."*

* * *

জীবনের শেষ দিনও তাই;—
শিবধ্যানে শিব হ'তে হ'তে
শব হ'য়ে তবে ছেড়েছেন।

৬

ধ্যানে নাকি 'জটা' হয়,—
কে ব'লেছে তা'কে।
শেকড়ের মত নাকি
মাটিতে সেঁধোয়?
"এত ধ্যান করি আমি
চুপচাপ ব'সে,
'জটা' কেন পিঠ বেয়ে মাটিতে নামে না?
মা বলেন,—'জটা' হ'তে লাগে বহু দিন,
কঠোর তপস্যা চাই, অনেক সাধনা।"

* * * *

কঠোর তপস্যা ছিল, তবু
শুনিনিকো স্বামিজীর 'জটা' ছিল কি না।
যদি নাই থেকে থাকে,—ভালোই হ'য়েছে।
পাহাড়ে-গুহায়
যারা শুধু চোখ বুঁজে
নিজেদের মুক্তি নিয়ে থাকে,
—তাঁদেরই মাথায়
পর্বত-প্রমাণ জটাভার;
'জটাজুট' তাঁদেরই মানায়।
আর,
ল্যাজেতে বারুদ্ নিয়ে যা'রা
এক্ লাফে সিন্ধু পার হয়,
তাণ্ডবের প্রলয়রুদ্র তালে
ছারখার করে দৈত্যকুল,
আকাশের সত্য-সূর্যটাকে
বগল-দাবাই ক'রে স্রেফ
সকলের মোহ-অন্ধকার
নির্বিচারে করে আত্মসাৎ,
হঠাৎ না-ব'লে-ক'য়ে যা'রা
ব'সে যায় যুগ-উদ্বোধনে,
—তা'দের অন্ততঃ
প্রাচীনকে কেটে-ছেঁটে ছোট করা
সব চেয়ে ভাল।

৭.

'জটা' না হ'লেও তার ছোটা-মন
হাতের মুঠোয়;
যখনি সে ধ্যানে বসে একেবারে 'নেই'
হ'য়ে যায়।
এক বার সঙ্গীদের নিয়ে
সার দিয়ে চোখ বুঁজে চুপ মেরে ব'সে
ধ্যান-ধ্যান খেলা সুরু করে।
কিছুক্ষণ পরে—ওরে বাপ!
চোখ খুলে তারা দেখে কি না,
—এয়া লম্বা এক কাল-সাপ!
সেই দেখে যে যে দিকে পারে
কাছা খুলে দেয় পিঠটান্!
তার মধ্যে এক জন শুধু
একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন;
ধ্যান-সিদ্ধ সপ্তর্ষির ঋষি
ব'সে আছে আত্মধ্যানে লীন!

* * *

ভবিষ্যতে কত সাপ এসে
ফেড়ে-ফুঁড়ে ফোঁস্ ক'রে গেছে,
তা' ব'লে কি সেই ভয়ে ভয়ে
কাজ ফেলে লাফ দেবে না কি?
"কাপুরুষ আর কৃমিকীট"
দু'জনে সমান তার চোখে।
"চিরকাল একগুঁয়ে সানা,"
কোনো দিন কাঁপেনিকো ত্রাসে।
যা'দের ক'রেছে উপকার
তা'রাই ছোবল দিতে আসে!

* "হে শিব! বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি।…তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার নিয়ন্তা।…তুমিই আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ।"

হাতীর মতন চ'লে গেছে
বীরদর্পে ভবের বাজারে ;
কুকুরের ভীরু চিৎকার
এক-চুল হটাতে পারেনি।
"ব্রহ্মময়ীর বেটা আমি."
চিঠি লেখে 'ব্রহ্মানন্দজী'কে।
(এই যদি চিঠি লেখা হয়
সিংহের হুংকার কাকে বলে ?)
"বল্ অস্তি সোঽহং সোঽহং,
আত্মাতে বিপুল শক্তি ঠাসা,
নেই নেই নেই বলে শেষে
কুকুর-বেড়াল হ'বি না কি ?
দীনা-হীনা ভাব না ব্যারাম ?
ওটা স্রেফ্ শুধু অহংকার,
দূর কর্ কুলোর বাতাসে,
শুন্‌লে মাথায় বজ্র মারে !
ভয় ? ওরে কেন ?—কা'র ভয় ?
দুনিয়ার মাথার ওপর
* 'Avalanche'এর মত পড়্,
ফেটে যাক্ চড়্-চড়্ ক'রে।"

৮

এক দিন কি হয়েছে, খিল্ দিয়ে ঘরে
এক জন বন্ধু নিয়ে ধ্যান সুরু করে।
কতক্ষণ কেটে গেছে—সে-খেয়াল নেই।
বাড়ির লোকেরা খোঁজে—কোথায় নরেন ?
কোথাও মেলেনাকো তাঁকে।
বন্ধ ঘর দেখে শেষে ধাক্কা মারে তা'রা।
সেই দেখে সঙ্গীটির আত্মা খাঁচা-ছাড়া !
জোর ভেঙে ঘরে ঢুকে সব বাক্য-হত !
দেখে কি,—নরেন
একেবারে সংজ্ঞাহীন,
পদ্মাসনে ব'সে আছে
অবিকল 'সপ্তর্ষি'র মত !

৯

আসলে সন্ন্যাসী কি না, তাই
সন্ন্যাসীকে বড় ভালোবাসে।

---

* পড়ন্ত পাহাড়ের চাঁই

সন্ন্যাসী এলেই
এটা-সেটা যেটা পায় হাতের গোড়ায়
তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেয় তাকে।
পরনের ধুতি চাই ?—বেশ তাই সই।
নতুন কাপড়খানা খুলে তক্ষুণি
ছুঁড়ে দেয় অম্লান বদনে।
তাই,
সাধু-সন্ন্যাসী কেউ এলে
নরেনকে বন্ধ-ঘরে পুরে রাখা হয়।
শিশু-সন্ন্যাসীর মন এতে
সহসা প্রচণ্ড ধাক্কা খায় !
সন্ন্যাসীর দুঃখ-দুর্দশা
সংসারীর মস্তকে কি ঢোকে ?
সন্ন্যাসীর অন্তর্বেদনা
'ত্যাগী' ছাড়া 'গৃহস্থ' কি বোঝে ?
তাইতো সে যেখানে যা' পায়
ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে রাস্তায় ;
ক্রোধে তার সর্ব অঙ্গ কাঁপে।
—এ নিছক্ সাধু-প্রীতি নয়,
সংসারীর ঘোর বদ্ধতার
'বিবেকানন্দে'র প্রতিবাদ।

* * * *

—সংসারীরা ভারী ওস্তাদ !
সাধু ডেকে উপদেশ নেবে,
ঠিক ক'রে বেঁধে নেবে তার,
হাল-ভাঙা জীবনের ফুটো নৌকোটাকে
মেরামত ক'রে নেবে আগা-পাশ-তলা ;
দুর্দিনের ঝড় এলে ছেঁড়া পাখা দিয়ে
তারি কাছে নেবে আশ্রয় ;
তবুও সে হাত পেতে যদি কিছু চায়,
অমনি সিদ্ধান্ত হয়,—সে-সাধু খারাপ !
বলি,
তোমাদের এটা-সেটা সব কিছু চাই
সাধু শুধু আকাশের হাওয়া খাবে না কি ?
—ভারি পাটোয়ার !
আর,
কি-ই বা সে চায় ?
"তার কাছে বহুমূল্য উপদেশ নেবে,
তোমরা দেবে না তাকে সামান্য দুটো
খাওয়া-পরা ?

১০

নিদ্রাকালে বিছানায় শুয়ে
কপালে জ্যোতির্বিন্দু দেখেছো কি কেউ
'ফুটবলের' মত নাকি এসে
কপালেতে গোত্তা খেয়ে পড়ে ?

* * *

বাস্তবিক, গায়ে কাঁটা দেয় !
নরেনের সবই অদ্ভুত !
বিছানায় শুতে না শুতেই
পুলকে রোমাঞ্চ লাগে গায় !
খাটেতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে
দেখে কি নিজেরই প্রতিচ্ছবি ?

* * *

—বিপুল পুলক দিয়ে গড়া
এক-একটা জ্যোতির মণ্ডল,
অসীমের সুর নিয়ে তা'রা
দূর থেকে ভেসে-ভেসে আসে,
আল্‌গোছা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়
ভার-করা মনোভাব নিয়ে,
তার পর চোখের পাতায়
নেচে-নেচে করে উৎসব।
বেশ ক'রে ভাব ক'রে শেষে
ঘিরে ফেলে বন্ধুর মত।
চোখে যেন ঝিম্ লেগে যায়,
খেলা শেষ, শিশু নিদ্রাগত।

* * *

দেখে শুনে সন্দেহ হয়,
কেন তা'রা আসে রোজ-রোজ ?
কি যেন কি মন্ত্রণা দেয়
চুপিসাড়ে তার কানে-কানে !
'জ্যোতির্মণ্ডল' থেকে এসে
'সপ্তর্ষির ঋষিটিকে তা'রা
চুরি ক'রে যায় না তো' নিয়ে,
স্বপ্নের সুড়ঙ্গ দিয়ে দিয়ে,
ফের সেই 'জ্যোতির মণ্ডলে' ?

[ক্রমশঃ।

দুল পরার বিপদ

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কেবল মহিলারাই দুল বা মাকড়ী পরতেন বটে, কিন্তু ডাঃ ম্যাকলরেন তাঁর বৃটিশ জার্ণাল অব প্লাষ্টিক সার্জ্জারীতে লিখেছেন, এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই কর্ণকুণ্ডল ব্যবহার করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কানে ছিদ্র করে দুল পরা হ'ত, কিন্তু আজকাল ক্লিপ বা স্ক্রু লাগিয়ে দুল বা মাকড়ী পরার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। ডাঃ ম্যাকলরেন লিখেছেন, এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। খুব জোরে ক্লিপ বা স্ক্রু এঁটে দুল পরার ফলে মেয়েদের কানের নিম্নভাগের কোমল অংশ কেটে দু'ভাগ হয়ে যেতে আরম্ভ হয়েছে এবং যাদের এরকম হচ্ছে, তারা আর লজ্জায় কান খোলা রেখে বাইরে বেরুতে পারছে না। প্লাষ্টিক সার্জ্জারী দ্বারা অবশ্য কাটা কান জোড়া লাগান হচ্ছে, কিন্তু এই ভাবে দুল বা মাকড়ী পরতে হলে সতর্কতা অবলম্বন করাই ভাল।

কেনা কাটা

হালখাতার পুনরাবির্ভাব

ব্যবসায়ের হাল ভাল না হলে ঘটা করে হালখাতা ব্যবসায়ী কদাচিৎ করে থাকেন। নতুন বছরে কাজ-কারবার ভাল হোক, কেনা-বেচা বাড়ুক, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হোক, ঘরে লক্ষ্মী অচলা থাকুন, এই কারণেই হালখাতা। পুরনো খাতার হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে, বাকী বকেয়ার সালতামামী করে নতুন বছরের প্রারম্ভে কেনা-বেচা শুরু করার প্রাক্কালে সহযোগী ব্যবসায়িগণ, ক্রেতাগণ, ঠিকাদার, আড়তদার, ভিন দেশের টকিষ্ট, এজেণ্ট প্রভৃতির সঙ্গে একত্র বসে মধুরেণ পরস্পরের সম্পর্ককে মধুরতর করা। এ সালে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী অঞ্চলে এবং অল্প-বিস্তর প্রায় সারা কলকাতাতেই নতুন-খাতা উৎসব করা হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে এ কথাই মনে হয়। বৌবাজার ষ্ট্রীটের জুয়েলারী হাউসগুলি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের হার্ডওয়ার-মার্চেণ্ট, বড়বাজারেরও যে কিঞ্চিৎ বাঙালী কারবারীর ব্যবসা-বাণিজ্য এখনও টিকে আছে সেখানে, দক্ষিণ-কলকাতায়, শ্যামবাজার অঞ্চলে, বড়বাজার, নতুন বাজার, হাতীবাগান, মাণিকতলা, শিয়ালদহ, কলেজ ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে নতুন খাতা হয়েছে। হালখাতায় অনুষ্ঠানাদি যথাযথ রেখে নতুন বছরের সেল, কমিশন, রিবেট, ক্রেতাকে নানা প্রেজেণ্টেশন, বিক্রীত ক্যাশমেমোগুলির উপর ব্যালেন্স করে প্রাইজ ইত্যাদি দেওয়া চালু করে কিঞ্চিৎ নতুনত্ব করা যায় না কি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেল্‌স-এম্পোরিয়ম্‌

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সবে ধন নীলমণি সেলস এম্পোরিয়মটির বিষয়ে আমরা এর আগে দু'-এক বার নানা কথা বলেছি। এমন কি এ কথাও বলেছি যে, প্রচারের অভাবে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের যে কোনও সেল্‌স এম্পোরিয়ম আছে, এ কথাই অনেকে জানেন না। কি বিক্রি হয় সেখানে? কত দাম সে সব জিনিষের? কুটীর-শিল্পজাত নানা দ্রব্য, চামড়ার, কাঠের, মাটির পাওয়া যাবে? এই দোকানটিরও অঙ্গসৌষ্ঠব অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। সামনের প্রবেশদ্বার এত ছোট যে, একাধিক ব্যক্তি একত্রে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। সে সব কথা আর নয়। কানে তুলো আর পিঠে কুলো আটকে বসে থাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিরকালীন অভ্যাস জানি, তবু বলছি যে, কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে অর্থাৎ যেদিকে বহু হালফ্যাসানের সাহেব আর মোসাহেবদের গৃহ, মডার্ণ আর আলট্রামডার্ণদের গতিবিধি সেখানে এমনি একটি সেল্‌স এম্পোরিয়ম কি লাভজনক হত না? কত বেস্তকী মিত্রের জন্মদিন, বিবাহ-দিনে প্রেজেণ্ট খুঁজতে আর ট্রাম-বাস খরচা করে তাঁদের নিউ মার্কেট ছুটতে হোত না। রাসবিহারী এ্যাভিন্যু থেকে গড়িয়াহাট মার্কেট কি লেক মার্কেটের মধ্যে এমন একটা দোকান করার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিন্তা করে দেখবেন?

হগ মার্কেট বন্ধ থাকে ঠিক ছুটির দিনে, কেন?

সোমবার থেকে শনিবার অবধি অফিস করে রবিবার দিন সকাল বেলায় বেশ আটটা সাড়ে আটটা অবধি নিদ্রা দিয়ে উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে এক কাপ ধূমায়িত চা সহযোগে প্রাতরাশ সেরে আপনি গেলেন হগ মার্কেটে দু'-একটা টুকিটাকি জিনিষপত্র কিনতে। পাবেন না। তখন রবিবারের ছুটির আমেজ ভোগ করছেন দোকানদারগণও। অতএব আপনাকে সারাদিন অফিসে হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে সন্ধ্যা ছ'টার বাড়ী এসে কোন রকমে বৈকালিক আহারাদি সেরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। অন্য কোনও উপায় নেই। এই মার্কেটটির উন্নতির জন্য আমরা এর আগে অনেক বার অনেক কিছু বলেছি এবং দেখেছি যে সব পালনের চেষ্টাও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাই এবারও বলছি যে, ঠিক ছুটির দিনে মার্কেট বন্ধ না রেখে বরং সপ্তাহের অন্য কোনও দিন ছুটি দিয়ে যদি রবিবার দিন বা অন্যান্য ছুটির দিন মার্কেট খোলা রাখা

যায়, তাতে করে মার্কেটের আয় বৃদ্ধি পাবে। ক্রেতাগণও নিশ্চিন্ত মনে স্থির হয়ে দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারবেন। শনি ও রবিতে এই বন্ধ থাকার রীতি বোধ হয় ইংরেজ আমল থেকে প্রচলিত। কিন্তু ইংরেজদের হাত থেকে আমরা বোধ করি মুক্তি পেয়েছি এত দিনে। সুতরাং এ রীতি দেশবাসীর প্রয়োজনে অবিলম্বে পরিবর্ত্তন হওয়া সমীচীন। কর্ত্তৃপক্ষ একটু নজর দিন।

শুধু টাইপের বিজ্ঞাপনে ব্যবসা চলে না

বরের সঙ্গে বরকন্দাজের, চালের সঙ্গে চালতার কোনও ভেদ নেই! ভেদ নেই জলের সঙ্গে জলপাইয়ের! আছে। কিন্তু পোষাকের দোকানের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে কলমের দোকানের বিজ্ঞাপনের কোনও ভেদ আছে? কোনও ভেদ আছে মিষ্টান্নের দোকানের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জোতার কি ঘড়ির দোকানের? চশমার কি জুতোর? নেই। অধিকাংশই সীমাবদ্ধ সেই ফোর লাইন পাইকা থেকে বর্জ্জাইসের মধ্যে, সেই টাইপের কেরামতি! বাহার দেখানোর চেষ্টা। নিখরচায় যা করা চলে তাই। কিন্তু এখন দৃষ্টিভঙ্গী পালটাবার দরকার হয়েছে। শুধু টাইপে চলবে না। লেটারিং করতে হবে। ডুইং চাই। রীডিং ম্যাটার লিখে দেবার জন্ত অভিজ্ঞ লোক রাখতে হবে (দোকানের ম্যানেজারকে দিয়ে লেখালে চলবে না আর!) সর্বত্র। কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন লোককে মিডিয়াম্যান হিসাবে রাখতে হবে, নচেৎ বিজ্ঞাপনের এজেণ্টদের দ্বারা দিয়ে পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। গাদাগাদি করে টাইপ সাজিয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করলে আর চলবে না, আগেভাগেই তা বলে রাখলাম।

মনিহারী নতুন দোকানের আধিক্য কেন?

লেখাপড়া হোল না, পয়সাকড়িরও তেমন সুবিধে নেই, বৃদ্ধ বাপ রিটায়ার করলেন, চাকরী-বাকরী পাওয়া তো এক প্রকার অসাধ্য, বাড়ীতে নিয়ত যন্ত্রণা, গঞ্জনা, সুতরাং ব্যবসা করতে হবে। পাড়ার রকে বসে দিন কাটানো আর যখন গেল না, তখন খেয়াল হোল দোকান করতে হবে। কি দোকান? দরজীর না হয় ড্রাই ক্লিনিং। একটু পয়সা হাতে থাকলেই মনিহারী। ব্যস্। দোকান করেই শেষ। দোকান করবার আগে একটুকু তিনি চিন্তা করলেন না যে, পাড়ায় মনিহারী চালু দোকান ক'টা? কত তাদের গড়পড়তা বিক্রি? নতুন দোকানের স্কোপ কতখানি? কি ক্যাপিটেল? কত দিন যুদ্ধ করতে পারবো? ঝট করে একটা দোকান পাতিয়ে বসলেন। এই কারণেই বাঙালীর ব্যবসা হয় না। দোকান যদি করতেই হয় তো মিষ্টান্নের দোকান, মাংসের দোকান, ফুলের বা ফলের দোকান কি দোষ করল? অবাঙালীরা কলকাতার বুকে বসে এই দোকানগুলি থেকে কত টাকা লাভ করছে ভাবুন তো? মনিহারী দোকানে ক্ষতির ভয় কম, জিনিষ পচবে না, ধার পাওয়া যাবে কোম্পানীর কাছ থেকে, সবই জানি কিন্তু যদি পয়সাই না আসে তো ব্যবসা করে লাভ কি? নো রিস্ক নো গেন্!
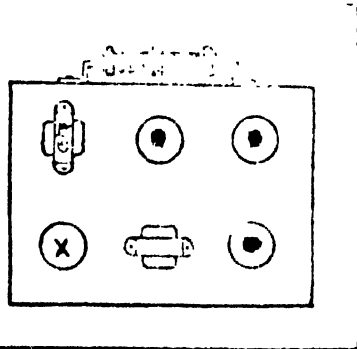
কলকাতা ও শহরতলীর বাজারগুলি কত নোংরা!

কলকাতায় এমন অনেক বাজার আছে যেখানে প্রতি বর্গফুট হিসেবে প্রতি ঘণ্টায় জমির দাম ধরা হয়ে থাকে। প্রতি এক ঘণ্টা কি দু'-ঘণ্টা অন্তর আবার জমির মালিকানা হস্ত পরিবর্তিত হয়। বেগুনের ব্যবসায়ীর স্থলে পটলের ব্যবসায়ী স্থান গ্রহণ করে। স্থায়ী ষ্টলগুলির ভাড়াও কোন অংশেই কম নয়। বাজারের 'তোলা' থেকেও বেশ মোটা রকমেরই রোজগার হয়। অথচ সেই অনুপাতে কর্পোরেশনের ট্যাক্স কি নায়েব, গোমস্তা, সরকারদের মাহিনা কিছুই নয়। এই বাজারগুলি অধিকাংশ সময়ই নোংরা। রাস্তাগুলির চার ধারে আবর্জ্জনার স্তূপ। শালপাতার ঠোঙা,

মেটাল চেসিসে ফিল্টার চোকের পজিসন
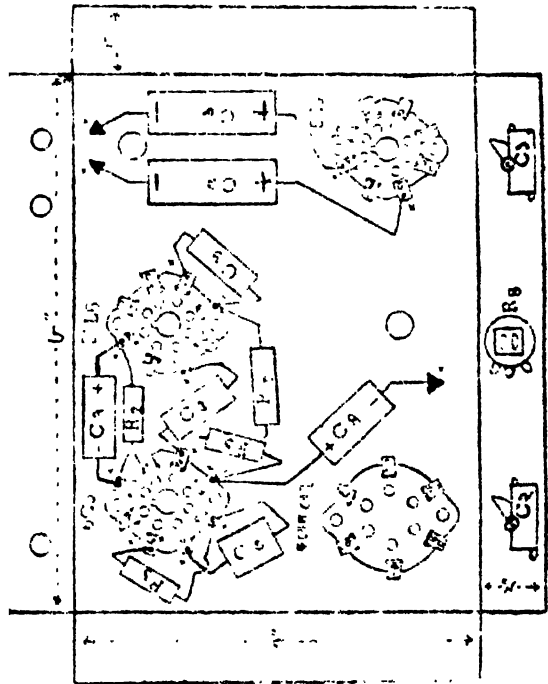
সেকসানাল ডায়গ্রাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংযোগগুলি দেখানো হয়েছে। গত মাসের স্কীমেটিক সার্কিটের পরবর্তী চিত্র। ছোট ছোট সংযোগগুলির ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বর্ণিত হয়েছে।

কলাপাতা প্রায়ই এঁটো, দড়ি, ঝুড়ির ভাঙ্গা অংশ, পায়ে পায়ে চলা কাদা, খাওয়া ডাব ইত্যাদিতে স্থানটি নরকপ্রায় হয়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টাই। অথচ এই বাজারগুলি থেকেই সমস্ত কলকাতার শাকসব্জী, আলু, কপি, পটল, মাছ, মাংস ইত্যাদি সরবরাহ হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদেরও এদিকে নজর নেই, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টও দেখেন না, আর বাজারগুলির মালিকদের কথা নাই-ই বললাম অধিক। সরকার নিজে এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন কি ?

বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরিচয়

দফায় দফায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি মাসেই এক একটি ব্যবসায়ের শীর্ষে একদা অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন সব ব্যবসায়ীদের নাম আমরা উল্লেখ করছি। কারণ, বাঙালী আজ ব্যবসায়ে নিজ ভূমে পরবাসীর মত। সমস্ত বড়বাজার, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, ডালহৌসী, ক্যানিং ষ্ট্রীট জুড়ে আজ অবাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এই সব প্রাচীন কথা শুনে দু'-এক জন বাঙালী ধনী ব্যক্তি কি জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ায় জমিদারগণ এদিকে একটু নজর দেন তো বাঙালীর হাল ফিরতে পারে। যাই হোক, যথারীতি আবার প্রাচীন ব্যবসায়ীদের নাম করছি। সঙ্গে এবার কিছু বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরও নাম দিলাম। ডকের কারবারে পয়সা করেছিলেন তারক প্রামাণিক, সাগর দত্ত, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ মিত্র, রামদুলাল সরকার প্রভৃতি। এ ছাড়া নিবারণ সরকার, নীলমণি চৌধুরী, মণীন্দ্র নন্দী, গোবিন্দ বসু, রায়বাহাদুর অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত নাগ, টাওয়ার হাউসের ডবলিউ, সি, ব্যানর্জী, এইচ, পি, ব্যানার্জী প্রভৃতিও নানা কারবারে বহু পয়সা রোজগার করেন। বাঙালী ষ্টীভেডরের মধ্যে নাম করতে হয় শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির।

এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রের নামও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

ব্যালাষ্ট রেজিষ্ট্যান্স। সেরামিকের তৈরী। রেডিওর পশ্চাদ্দেশে থাকে।

অল্প খরচায় ব্যবসা

গত সংখ্যায় মুর্গীর ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা গেছে। এবারে তারই জের টানছি।

রাত্রে থাকবার, ডিম পাড়বার এবং ডিমে তা দেবার উপযোগী ঘর চার দিকে বেড়া দেওয়া; বর্ষা বা অধিক রোদের, শীতের জন্য Shed; আহারা-ন্বেষণ এবং ভ্রমণের জন্য একটি বৃহৎ স্থান (Run) মুর্গীর ব্যবসার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিটি মুর্গীর থাকবার ও বসবার জন্য ২০ বর্গফুট এবং চারণের জন্য ২০০ই থেকে ৪০০ বর্গফুট স্থান দরকার হয়। এই হিসেবে তিন বিঘা জায়গায় এক শত থেকে দুই শত অবধি মুর্গী পোষা চলতে পারে।
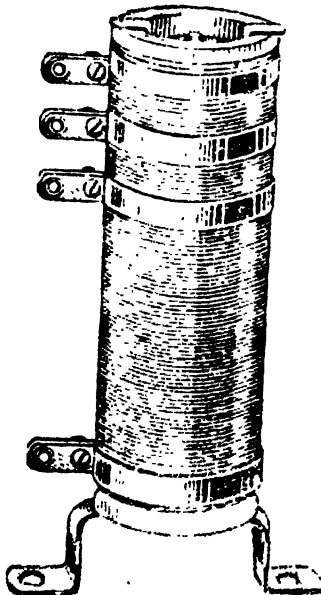
যেখানে চারণভূমিতে যথেষ্ট কীটপতঙ্গ পাওয়া যায়, সেখানে এক ছটাক খাদ্যই একটি মুর্গীর পক্ষে যথেষ্ট। গম, যব, ওট, ভুট্টা, ধান, মটর, শাক, চুণ, মাংস, দুধ, কয়লা বা পুরনো দালানের চুণমিশ্রিত সুরকি মুর্গীর খাদ্য। মুর্গীর নানা রোগ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা আগেই দরকার। অর্পিংটন্ ও হোয়াইট্ ওয়েনডট জাতীয় মুর্গী বেশী ডিম দেয় এবং খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রসব করে! এই কারণে এই জাতীয় বিলাতী মুর্গী পোষাই শ্রেয়ঃ। মুর্গীর সঙ্গে গরু পোষা উচিত। Skimmed milk মুর্গীর ডিম অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য। যে মুর্গী বছরে অন্ততঃ ১২০টি ডিম দেয় না সে মুর্গী চাষ করা বৃথা।

অতি ক্ষুদ্র আকারেও এই ব্যবসায়ে কি পরিমাণ লাভ হওয়া সম্ভব তাই দেখুন,।

মাসিক আয়	এককালীন ব্যয়	মাসিক ব্যয়
বার্ষিক ৮৪০টির	২টি মোরগের জন্য ১০০৲	৩ বিঘা জমির খাজনা ৩৲
হিসাবে মাসিক ৭০টি	১২টি মুর্গীর মূল্য ২৪০৲	৪৪টি মুর্গীর ব্যয় ২৫৲
মুর্গীর প্রত্যেকটি ৪৲	৩০টি দেশী মুর্গীর দাম ৬০৲	৭০টি মুর্গী মোটা
হিসাবে দাম	ঘর ইত্যাদির প্রস্তুত ব্যয় ১০০৲	করিবার ব্যয়
২৮০৲ টাকা		।০ আনা হিসাবে ১৭॥০
মোট—২৮০৲ টাকা	মোট—৫০০৲	চাকর ১০৲
বাদ খরচ ৬৫৲		বাচ্ছা পোষা ১০৲
২১৫৲ টাকা		মোট ব্যয় ৬৫॥০

এ ছাড়াও ডিম বিক্রয় করেও অর্থ উপার্জ্জন করা যাবে। এ সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় আরও নানা কথা বলবার ইচ্ছা রইলো।

রেডিও তৈরীর বৃত্তান্ত

গোড়ায় ভাল্ভ-বেস আর কয়েল-বেসগুলি চেসিসের নীচের দিক থেকে লাগিয়ে নাট-বোল্ট দিয়ে চেসিসের গায়ে শক্ত করে বসিয়ে দিন। দেখবেন বেসগুলির key way যেন এমাসের ২নং ছবির মত চেসিসের পিছন দিকে মুখ করে বসে। তা নাহলে সেট নিয়ে ওয়ারিং করার সময় ভুল হয়ে যেতে পারে।

এই বার ১নং চিত্রানুযায়ী ফিল্টার চোকটিকে চেসিসের ওপর বাঁ দিকের কোণে আড়াআড়ি ভাবে বসিয়ে শক্ত করে এঁটে দিয়ে লীড দু'টিকে চেসিসের ছিদ্রপথে গলিয়ে রেক্টিফায়ার টিউবের ৬নং ও ৮নং পিনে আলগা ভাবে লাগান। আর আউটপুট ট্রান্সফর্মারটিকেও চেসিসের সামনের দিকে সোজা করে বসিয়ে নাট-বোল্ট দিয়ে শক্ত করে লাগিয়ে দিন। দেখবেন, প্রাইমারী লীড ও সেকেণ্ডারী লীড যেন যথাক্রমে পিছন দিকে ও সামনের দিকে মুখ করে থাকে। চেসিসটির মাপ হবে দৈর্ঘ্য ৮", প্রস্থ ৭" এবং উচ্চতা ২"। অবশ্য

হিসেবে এর পরিবর্তনও করতে পারেন। প্রাইমারী লীডকে পরে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চেসিসের নীচে নিয়ে গিয়ে পাওয়ার টিউবের ৩নং ও ৪নং পিনে লাগানো হবে আর সেকেণ্ডারী লীড থাকবে স্পীকারের জন্ত চেসিসের ওপরের দিকেই। পিনগুলিকে সব সময়ই clock-wise ডাইরেক্‌শনে পড়তে হবে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে।

চেসিসের সামনের দিকে যে ২´ ইঞ্চি উচ্চতার বিট্‌ আছে; তাতে ২নং চিত্রানুযায়ী তিনটি ছিদ্র করে নিয়ে প্রথমটিতে ভলুম কনট্রোল (R_4) এবং দু' পাশের দুটিতে ভেরিএবল্‌ কণ্ডেন্সার (C_1 এবং C_2) পেছন দিক থেকে শক্ত করে লাগাতে হবে।

এইবার ফিলামেণ্ট রেজিষ্ট্যান্সকে (R_6) চেসিসের পিছন দিকে শক্ত করে লাগিয়ে সেট ওয়ারিং করতে শুরু করতে পারেন। চিত্রে যে ক, খ, গ রয়েছে তার অর্থ হোল 'ক' ক্ল্যাম্পে যেন লাইনের এক প্রান্ত লাগানো রয়েছে, 'গ' ক্ল্যাম্পকে ফিলামেণ্ট সাপ্লাইয়ের 'খ' ক্ল্যাম্পকে রেকটিফায়ার টিউবের প্লেট সাপ্লাইয়ের কাজে রাখা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে 'ক' আর 'খ'য়ের মধ্যেকার পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা রেজিষ্ট্যান্স হবে :

ফিলামেণ্টগুলির মোট ভোল্টেজ—২৫ + ২৫ + ৬ = ৫৬ ভোল্ট। সুতরাং ড্রপিং ভোল্টেজ :—

২২০ − ৫৬ = ১৬৪ ভোল্ট।

Ohm's Law : $R = \frac{E}{I}$ বা $R = \frac{১৬৪}{.৩}$ = ৫৪৬·৬ ওমস।

সুতরাং রেজিষ্ট্যান্স ৫৪৫ ওমস হলেই চলবে। বেতার তথ্য আবার আগামী বারে।

খাপছাড়া কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

তোমার আমার প্রেমে কোনো দিন মহা প্রেমায়ন
লেখা যদি হয়,
কেহ তাহা পড়িবে না, এ কথাটি জানিও নিশ্চয়।
জেনো সেই পাণ্ডুলিপি ধুলায় পাণ্ডুর
করিবে ভোজন শ্বেত-পিপীলিকা অথবা ইঁদুর।
যদি কভু তার আগে
পাণ্ডুলিপি দেখে কোনো প্রকাশক-চিত্তে ভালো লাগে।
তার প্রকাশন
ছাপিয়া বাজারে ছাড়ে আমাদের মহা প্রেমায়ন,
হয়তো বা কোথা কোথা (যদি হয় ভালো মত সাধা)
ছাপিবে সমালোচনা "মন্দ নহে ছাপা আর বাঁধা।"
তার কিছু কাল পরে বিকায়ে ওজন-দরে
মহা প্রেমায়ন গ্রন্থ মুদীর দোকানে অবশেষে
ঠোঙা-রূপে পঁহুছিবে এসে।
তাই বলি চুপি চুপি, নাই বা হইল নাম-ডাক,
তোমার আমার প্রেম তোমার-আমারি শুধু থাক,
নাই হলো মহা প্রেমায়ন ছাপা,
অপ্রকাশ-অন্তরালে থাক্‌ চির-চাপা।
পরে একদিন
ভূত হয়ে পঞ্চভূতে হয়ে যাবো লীন,
তুমি আমি দু'জনেই, তার পর কে করে কেয়ার?
মিশে যাবে এক প্রেমে অনন্ত প্রেমের পারাবার।

বাউল

চিত্ত সিংহ

আমি সখি মধুকণ্ঠ মাধবীর গানে।
দেখেছি অনেক রূপ যুঁই-বেল-কদমে-বকুলে,
মুগ্ধ চোখে প্রতিদিন বেসেছি নিবিড় ভাবে ভালো
তবু সখি পাইনি তো আলো।
তার পরে এক দিন মধুস্মিতা সবিতার চোখে
দেখলাম মাধবীকে, বাসলাম ভালো,
কথা এল, সুর এল, হয়ে গেল গান : হৃদয় আকুল;
প্রাণ পেল রিক্তকণ্ঠ, মুক্তি পেল উদ্‌ভ্রান্ত-বাউল।
আমি সে বাউল সখি, দ্বার হতে দ্বারে ফিরি রোজ :
শিশিরের সুরে সুরে স্নিগ্ধ-শান্ত প্রভাত-আলোয়
আমিই সে বৈতালিক, ভৈরবীর সুরে বেঁধে সুর
এখানের মনোমাঠে ধীরে আনি দুরন্ত-দুপুর।
সে গান শুনেছো তুমি, সেই সুরে
তুমিও বলেছো জানি কথা,
জানি মোর মধুকণ্ঠ, ভেঙেছে রাত্রির নীরবতা।
রাত্রির ভেঙেছে ঘুম, রেখেছে দিনের চোখে চোখ,
আমার চোখের রূপে, জানি আমি,
তুমিও দেখেছো এক অরূপ আলোক।
তোমাকে করেছি বাধ্য, আমাকে দিয়েছো ভালোবাসা;
আমিও চিনেছি প্রেম, চিনেছি তোমাকে,
তুমিই তো সেই সখি, তুমিই মাধবী,
তোমারই মুগ্ধ গানে মধুকণ্ঠে :
আমি সে বাউল খ্যাপা কবি।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পাঁচ

পুত্র বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। শশাঙ্ক বিবাহ করতে রাজী হয়েছে। অতএব আর কালবিলম্ব নয়। আহারাদির পরই সুরেশ্বরী স্বামীর শয়ন-কক্ষের দিকে চললেন। অবিলম্বে স্বামীকে কথাটা জানানো দরকার।

নিশ্চিন্দপুরে চৌধুরী-বাড়ীতে একটা সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন।

দ্বিতলে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর বেলা চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত রাজশেখর বিশ্রাম নিয়ে থাকেন।

দিনের বেলা ত নয়ই, রাত্রেও ওই ঘরের দিকে সুরেশ্বরী বড় একটা যান না। নেহাৎ কোন বিশেষ জরুরী কাজ-কর্ম না থাকলে বা স্বামী না ডেকে পাঠালে।

বহু দিন হতেই স্বামি-স্ত্রী পৃথক পৃথক ঘরে শয়ন করছেন।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সকলেরই চুকে গেছে। কেবল রন্ধনশালার দিকে দু'-চার জন দাসীশ্রেণীর স্ত্রীলোক পরস্পরের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে কথাবার্তা বলছে।

অত বড় জমিদার-বাড়িটা যেন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতায় নিঝুম হ'য়ে গিয়েছে।

টানা বারান্দাটা অতিক্রম করে সুরেশ্বরী স্বামীর শয়ন-ঘরের দিকে চললেন।

ঘরের দরজাটা ভেজান ছিল এবং দরজার গোড়ায় বসে একটি বালক ভৃত্য ঢুলতে ঢুলতে টানাপাখার দড়িটা টানছিল।

নিঃশব্দে ভেজান দরজাটা ঠেলে খুলে সুরেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘরের জানালা-দরজাগুলি বন্ধ। ঘরের মধ্যে দিনের বেলাতেও তাই একটা অস্পষ্ট পাতলা অন্ধকারের ছায়াচ্ছন্নতা।

প্রকাণ্ড উঁচু পালঙ্কের উপরে রাজশেখর চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। সুরেশ্বরীর সতর্ক মৃদু পদশব্দও তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়াতে পারল না। চোখ খুলে রাজশেখর প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি।

সবিস্ময়ে রাজশেখর শয্যার 'পরে উঠে বসলেন, সুরো!

হাঁ। এগিয়ে এলেন সুরেশ্বরী স্বামীর শয্যার কাছটিতে ধীর শান্ত পদে।

কী ব্যাপার! হঠাৎ এ সময়ে?

—তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম না ত?

না। না—ঘুমাইনি, চোখ বুঁজে এমনি শুয়ে ছিলাম। কি বলছিলে?

বলছিলাম শেখরের বিয়ের কথা।

শশাঙ্কর? সে রাজি হয়েছে?

হাঁ। তাই বলছিলাম, আর দেরি করে কাজ নেই, কালই নায়েব মশাইকে একটা দিন স্থির করে নিশ্চিন্দপুরে একটা খবর পাঠাও।

ইতিমধ্যে রাজশেখর শয্যার উপরে উঠে বসেছিলেন। স্ত্রীর কথার কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

চুপ করে আছো যে? সুরেশ্বরী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

একটা কথা ভাবছিলাম সুরো।

কী?

দৈবাচার্য শেখরের কোষ্ঠী বিচার করে কি বলেছিলেন মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার? ২৪।২৫ বৎসরের সময় কোষ্ঠীতে তার সংসার-ত্যাগের যোগ আছে।

মনের মধ্যে হঠাৎ শিউরে উঠলেন যেন সুরেশ্বরী! মায়ের প্রাণ হঠাৎ যেন কি এক আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে!

কিন্তু মুখে বলেন, ষাট্ ষাট্!···কোন্ দুঃখে সে সংসার ত্যাগ করতে যাবে? আমি তার মা বেঁচে আছি আজও।

কিন্তু দৈবাচার্যের গণনা যে কত নির্ভুল এর আগেও ত তা দু' দু'বার প্রমাণিত হয়েছে সুরো! মনে নেই তোমার, আমার মায়ের মৃত্যুর কথাটা? দৈবাচার্য বলেছিলেন, অপঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে ষাট বৎসর বয়েসের সময়।

শয়নঘরে দোতলায় সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হলো। আর তোমার সেই প্রথম সন্তান, দৈবাচার্য বলেছিলেন, দেড় বৎসর বয়েসের সময় তার মৃত্যু হবে পেটের ব্যাধিতে। ঠিক তাই হলো। তাই বলছিলাম আর দু'টো বছর অপেক্ষা করে—

কথাটা যে কত বড় সত্যি, সুরেশ্বরী নিজেও তা জানেন বৈ কি!

তাই বোধ হয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন, না, না—ও-সব অমঙ্গলের কথা মনে এনো না। তুমি বিবাহের আয়োজন কর।

বেশ। তোমার ছেলে, তুমি যখন চাও তাই হবে।

ও কি কথা! ছেলে কি আমার একার? তোমার নয়?

হাঁ তাই বটে, তবে—যাক সে কথা! আজই আমি ঠাকুর মশাইকে ডেকে একটা দিন স্থির করে নায়েব মশাইকে কালই পত্র দিয়ে নিশ্চিন্দপুর পাঠাবো।

হাঁ! তাই পাঠাও। গোপীবল্লভের কৃপায় সবই মঙ্গল হবে! তুমি মনে চিন্তা করো না।

না। চিন্তা কি! ভবিতব্যকে কেউ কোন দিন খণ্ডাতে পারেনি, আমি বা তুমিও পারবো না।

যা বলবার তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বরী ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দু' পা অগ্রসর হয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

স্ত্রীকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে রাজশেখর প্রশ্ন করলেন, আর কিছু বলবার আছে না কি?

একটা কথা—

কী?

চৌধুরীদের মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী ত?

মৃদু একটা হাসির বঙ্কিম রেখা রাজশেখরের ওষ্ঠ প্রান্তে জেগে ওঠে। ভয় নেই তোমার সুরো! স্বর্ণময়ী সত্যিই স্বর্ণ-প্রতিমা। এ বংশে তার মত রূপ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন বৌ ইতিপূর্বে বোধ হয় আসে নি!

যাক। তাহ'লে আর তুমি দেরী করো না।

সুরেশ্বরী ঘর থেকে নিক্রান্ত হ'য়ে গেলেন। দীর্ঘ টানা বারান্দাটা

অতিক্রম করে তার নিজের কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন সুরেশ্বরী।

প্রথম পুত্রের জন্ম ও তার মৃত্যুর কথা শশাঙ্ককে কোলে পাওয়া অবধি সুরেশ্বরী যেন ভুলেই গিয়েছিলেন।

মনের রক্তাক্ত ক্ষতটা মনের বিস্মৃত চেতনার মধ্যে যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ সেই শুকিয়ে-যাওয়া ক্ষতে যেন আঘাত দিয়ে রক্ত ঝরালেন রাজশেখর।

দৈবাচার্য! এ বংশের কুলগুরু। তান্ত্রিক, মন্তপ। কোন দিন তাঁকে সুরেশ্বরী স্বচক্ষে দেখতে পারেন নি। এমন কি তার কাছ থেকে মন্ত্র পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি স্বামীর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও।

লোকটার মুখে যেন বিষ মাখানো আছে। অমঙ্গলের কথা এক বার সে মুখে উচ্চারিত হলে আর তার অন্যথা হয় না। হঠাৎ যেন আবার সুরেশ্বরী নিজের মনে শিউরে ওঠেন।

না। না—গোপীবল্লভ! গোপীবল্লভ! শেখর তার একমাত্র পুত্র সন্তান!

মাধবী ঘরের এক কোণে বসে এক খণ্ড রেশম বস্ত্রের উপরে জরির কাজ তুলছিল, মার পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে ডাকল, মা!

তা হয় না মাধু! আপন মনে কতকটা স্বগতোক্তির মতই কথাগুলো বললেন সুরেশ্বরী।

মাধবী কিছু না বুঝতে পেরে বললে, কি বলচো মা! কী হয় না?

হাঁ রে মাধু! দেখে আয় ত মা, তোর দাদা ঘরে আছে কি না?

দাদা ত নেই মা!

নেই! এই রোদে কোথায় গেল আবার?

কোথায় আবার, বন্দুক ঘাড়ে করে বেরুল।

শুনেছিস মাধু, শেখর বিয়েতে রাজী হয়েছে।

সত্যি মা?

হাঁ রে।

তবে আর দেরী করো না মা, তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দাও। দেখচো না, দাদার যেন কেমন কেমন ভাব, এক মুহূর্ত বাড়িতে থাকে না। টো-টো করে কৃষ্ণসাগরের তীরে তীরে ঘোরা আর বন্দুক দিয়ে শিকার। দেখো, বৌদি এলে ঠিক হয়ে যাবে।

সুরেশ্বরী মেয়ের কথায় কোন জবাব দিলেন না, মৃদু হাসলেন কেবল।

প্রখর রৌদ্রতাপে নীলাকাশটা যেন ঝলসে যাচ্ছে। কৃষ্ণসাগরের বিস্তীর্ণ জলের মধ্যে থেকেও যেন একটা তাপ উঠছে।

শর আর হোগলার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে শশাঙ্ক বন্দুকটা হাতে এগিয়ে চলেছে। পাতায় পাতায় লেগে একটা মৃদু খস্-খস্ শব্দ উঠছে।

পরিশ্রমে ও রৌদ্রতাপে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেচে। লম্বা লম্বা মাথার অবিন্যস্ত চুল কয়েক গাছি স্থানভ্রষ্ট হয়ে ঘর্মসিক্ত কপালের 'পরে জড়িয়ে গিয়েছে।

কয়েক দিন থেকেই একটা বেলে হাঁসের সন্ধানে শশাঙ্ক হোগলা ও শর-বন তচ-নচ করে ফিরচে।

শীতের শেষে হাঁসের দল উত্তর দিকে আবার উড়ে গিয়েছে, তাদেরই একটি বোধ হয় দলভ্রষ্ট হ'য়ে এখনো কৃষ্ণসাগরের তীরে শরবনের মধ্যে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ গত পরশু বৈকালের দিকে নজরে পড়ে শশাঙ্কর। সেই থেকেই শশাঙ্ক হাঁসটার খোঁজ করচে।

হঠাৎ দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ নির্জনতায় কঁক্ কঁক্ একটা ডাক শোনা গেল।

চকিত হয়ে ওঠে শশাঙ্ক। হাঁসের ডাক। এদিক ওদিক তাকায় শশাঙ্ক। মৃদু একটা হাওয়ার ঝাপটায় শরবন কেঁপে উঠলো। একটা হাওয়ার ঢেউ যেন হঠাৎ কম্পন তুলল।

তার পরই একটা যেন পাখার মৃদু ঝটপটানির শব্দ।

এবারে সেই শব্দ লক্ষ্য করে বাঁয়ে তাকাতেই শশাঙ্কর অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেন সহসা স্থির হ'য়ে গেল।

মাত্র হাত আট-দশ দূরে, কৃষ্ণসাগরের বুকে যেখানে পাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে জলকে ছুঁয়েছে, ছোট ছোট জলজ ঘাস।

ঠিক সেইখানে জলের মধ্যে অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে পরমানন্দে পাখার ঝটপটানি তুলে সর্বাঙ্গে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে জলস্নান করচে সেই খুঁজে না-পাওয়া হাঁসটি।

কী অপূর্ব গাত্রবর্ণ! কি মনোরম পালকের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ! ফিকে নীলের উপরে গাঢ় লাল ও সোনালী চুমকী। তার উপরে লেগেচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা, এবং সেই জলকণার উপরে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে রয়েছে যেন রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য। লম্বা ছড়ানো ঠোঁট দুটি। চক্ষু দু'টি যেন দু'টি পান্নার মত জ্বল-জ্বল করচে।

হাতের বন্দুক তুলতে গিয়েও যেন শশাঙ্ক তুলতে পারল না। পান্নার মত দু'টি চক্ষু যেন চকিতে মনে পড়িয়ে দিল ঠিক অমনি আর দু'টি চক্ষু! আরো সুন্দর! আরো সজল! মনের মধ্যে কেউ কে বলে উঠলো, না, না, না—

আপনা থেকেই মৃত্যুশর নিক্ষেপে উদ্যত হাত দু'টি যেন ঝুলে পড়ল।

বন্দুকটা নামিয়ে বন্দুকের নলটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরে মুগ্ধ বিবশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শশাঙ্কশেখর।

না, না, মৃত্যু নয়, রক্তপাত নয়।

পলাতক সেই হাঁসটি নয়। ও যেন তার চন্দ্রা, নির্জন দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণসাগরের জলে জলকেলি করচে।

এলানো চুলে বিন্দু বিন্দু জলকণাগুলি যেন মুক্তার মত জড়িয়ে রয়েছে।

চন্দ্রা! চন্দ্রা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় শশাঙ্কর চন্দ্রার কথা। আর ঠিক সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় আজই কিছুক্ষণ আগে দেওয়া জননীকে তার বিবাহের প্রতিশ্রুতি।

নিশ্চিন্দপুরের চৌধুরীদের সেই মেয়েটিকে সে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেচে।

এ কি করলো সে! এ কি করলো!

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় জননীকে সে এ কি কথা দিয়ে এলো?

কেমন করে সে আর এক জনকে স্ত্রী বলে বুকে টেনে নেবে? তার সমস্ত বুক যে ভরে আছে চন্দ্রা! চন্দ্রা!

পলাতক হাঁসের সন্ধানে আনমনে ঘুরতে ঘুরতে শশাঙ্ক যে একেবারে বাগান-বাড়ির অতি নিকটে চলে এসেছিল, তা সে বুঝতেও পারে নি।

হোগলা ও শরবনের ধারেই গুলীভরা বন্দুকটা পাশে রেখে বসে পড়ে শশাঙ্ক। আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। হঠাৎ একটা জলের ঝাপটা ও পাখার ঝটপটানির শব্দে চমক্ ভেঙ্গে সামনের দিকে তাকাতেই শশাঙ্ক যেন বিস্ময়ে চম্কে উঠলো।

ও কে! ঐ সামনে কৃষ্ণসাগরের কালো জলের মধ্যে মাথা তুলেছে, ও কে!

খিল খিল করে একটা মিষ্টি হাসির শব্দ নয়, যেন সঙ্গীতের একটা সুর চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

চন্দ্রা! চন্দ্রা জলের মধ্যে মাথাটি শুধু পানকৌড়ির মত সকৌতুকে যেন জাগিয়ে আছে।

আনন্দে স্থান-কাল ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে শশাঙ্ক, চন্দ্রা! চন্দ্রা!

টুপ করে মাথাটা জলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

চন্দ্রা! চন্দ্রা—আমি! আমি—

কিন্তু কোথায় চন্দ্রা?

কৃষ্ণসাগরের গভীর কালো জলের মধ্যে একটা কেবল ঢেউয়ের আলোড়ন চক্রাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রা নেই!

মানুষের সাড়া পেয়ে চন্দ্রা ডুব দিয়েছে।

দিগন্ত-বিস্তৃত শুধু কৃষ্ণসাগরের কালো জল! জল আর জল।

উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে শশাঙ্ক, কিন্তু আশে-পাশে চন্দ্রাকে আর দেখতে পায় না।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ আবার অদূরে নজর পড়ে শশাঙ্কর। চন্দ্রা মাথা তুলে মরাল গতিতে সাঁতরে চলেছে তীরের দিকে।

মাঝে মাঝে চন্দ্রার আজ-কাল খেয়াল হয় কৃষ্ণসাগরের জলে স্নান করতে। দ্বিপ্রহরের নির্জনতায় চারি দিক যখন স্তব্ধ হয়ে আসে—স্তব্ধ শূন্যতার মধ্যে কেবল কচিৎ কখনো এক-আধটা ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক শোনা যায়; সরযূ তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। বাগান-বাড়ির খিড়কীর দরজাটা খুলে চোরের মত চুপি চুপি, পা টিপে টিপে চন্দ্রা ইচ্ছা মত স্নান করে, সাঁতার দেয়। আজ সাঁতার দিতে দিতে একটু বেশীই এগিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ যে আচমকা ঐ ভাবে দ্বিপ্রহরের এই স্তব্ধ নির্জনতায় শরবনের ধারে শশাঙ্কর দেখা পাবে, চন্দ্রা কল্পনাও করেনি। গলার স্বর শুনে টুপ্ করে তাই ডুব দিয়ে পালিয়ে এসেচে।

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা!

ডাঙ্গায় উঠে সর্বাঙ্গে অগোছাল ভিজে শাড়িটা ঠিক করতে গিয়ে চন্দ্রা যেন শশাঙ্কর মুখটা মনে পড়ায় লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে।

চারি দিকে একবার হরিণীর মত তাকায় ভীরু সশংক দৃষ্টিতে।

ভিজে শাড়ির সপ-সপ শব্দ করতে করতে খিড়কীর দরজা-ঠেলা অন্দরের আঙ্গিনায় পা দিতেই সরযূর গলা শোনা গেল।

কি সাহস তোর চন্দ্রা! একা একা কৃষ্ণসাগরে স্নান করতে গিয়েছিলি?

কেন, তাতে কি হয়েচে?

কি হয়েচে? বড্ড সাহস তোর আজ-কাল বেড়েছে দেখচি! তুই ভেবেছিস কি! সাপের পাঁচ পা দেখেছিস না?

গরমে গা'টা জ্বলসে যাচ্ছিল তাই একটু—তা ছাড়া তোলা-জলে স্নান করে কি তৃপ্তি পাওয়া যায়?

ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থেকে একটা অসুখ না বাধালে চলছে না, না? যা যা—ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেল গিয়ে। চন্দ্রা হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে পিছন থেকে শুনতে পেল সরযূ বলচে, মরবি! মরবি! নিজে ত মরবিই আমাকেও মারবি! চন্দ্রা হাসতে হাসতেই ঘরে এসে ঢুকল। হঠাৎ কি খেয়াল হলো দড়ির উপর থেকে একটা শুকনো শাড়ি নিয়ে এই দ্বিতীয় বার সে উত্তরের বড় ঘরটায় গিয়ে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল।

এ-বাড়িতে আসবার পর এক দিন মাত্র, এক দিন চন্দ্রা ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল! আর দ্বিতীয় বার প্রবেশ করেনি। প্রশস্ত একটা হলঘরের মত ঘরটা। আগাগোড়া জাজিম পাতা। দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় সব প্রমাণ আর্শী।

মাথার উপরে দোদুল্যমান পঞ্চাশ বাতির বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন।

দরজাটা বন্ধ করে চন্দ্রা প্রকাণ্ড একটা আর্শীর সামনে এসে দাঁড়াল।

মধ্যে মধ্যে দেখেছে চন্দ্রা সরযূ এই ঘরের মধ্যে ঢুকে সব ঝাড়-পোঁছ করে যায়। তবু মসৃণ আর্শীর গায়ে পাতলা একটা ধুলোর প্রলেপ জমেছে। নিজের প্রতিবিম্বিত ছায়াটা তাই আবছা-অস্পষ্ট দেখায় আর্শীর গায়ে। ভিজে শাড়ির অঞ্চল দিয়ে চন্দ্রা আর্শীর গায়ের ধুলোর প্রলেপটা মুছে নিতেই ঝল-মল করে উঠলো আর্শীর গায়ে তার নিজের প্রতিবিম্বটা।

চন্দ্রা! চন্দ্রা!

লজ্জায় লাল হয়ে চন্দ্রা তাড়াতাড়ি সর্বাঙ্গে শাড়িটা জড়িয়ে দেয়।

বাইরের ঘরে বিস্তৃত ফরাসের উপরে পঞ্জিকা-হাতে চোখে চশমাটা দড়ির সাহায্যে জড়িয়ে ভট্টাচার্য্যি মশাই শুভ দিন দেখছিলেন। সম্মুখে বসে জমিদার রাজশেখর রায়। হাতে জরি-জড়ানো আলবোলার লম্বা নলটির এক প্রান্ত।

কি হলো ভট্‌চায, দিন পেলে ?

আজ্ঞে, এই মাসের শেষাশেষিই ত একটা শুভ দিন রয়েছে দেখছি কর্ত্তা !

কবে ?

চব্বিশে।

চব্বিশে ? আজ হলো নয় তারিখ মাসের। হাতে রইলো তাহ'লে মাত্র পনেরটা দিন। জোগাড়-যন্ত্র তারা আবার সব করে উঠতে পারলে হয়। কন্যাদায় ত সহজ নয় ! যাক। গিন্নীর ইচ্ছা তাড়াতাড়ি কাজটা সারা, তুমি যাবার সময় নায়েবকে এক বার ডেকে দিয়ে যাও। ঐ দিনটাই ঠিক করে চিঠি দেওয়া যাক।

আজ্ঞে, কর্ত্তা, ও দিনটা না হলেও পরের মাসের ৫ই শুভদিন আছে।

তবে দুটো দিনের কথাই লিখে দেওয়া যাক। যেমন ওদের সুবিধা সেই দিনেই শুভ কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ রাজশেখর রায়ের নজরে পড়লো, সামনের বারান্দা দিয়ে শশাঙ্ক, বন্দুক হাতে অন্দরের দিকে চলে গেল।

রাজশেখরের মনটা যেন হঠাৎ কেমন বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। এক মাত্র ছেলে, এত বড় বিরাট জমিদারীর এক মাত্র উত্তরাধিকারী, কোথায় জমিদারীর কাজে মন বসাবে, সব দেখা-শুনা করতে শিখবে, তা নয়, ভবঘুরের মত বন্দুক হাতে সারাটা দিন শিকার করে বেড়ায়।

ইচ্ছা থাকলেও কোন কথা রাজশেখর শশাঙ্ককে বলতে পারেন না, সুরেশ্বরীর জন্যই না। কিন্তু সুরেশ্বরী কি বুঝচেন না এ ভাবে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে এক মাত্র ছেলেকে তার, রায়-বাড়ির ভবিষ্যৎ জমিদারকে অকর্মণ্য অপদার্থ করে তুলচেন ?

পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাজশেখরের বোধ হয় খেয়ালই ছিল না। ইতিমধ্যে কখন এক সময় ভট্‌চার্যি মশাই তাঁর পুঁথি-পত্র গুটিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন ও নায়েব এসে ঘরের মধ্যে তাঁর সামনে নির্দ্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছেন টেরও পান নি।

সম্বিৎ ফিরে এলো তাঁর নায়েবের কণ্ঠস্বরে।

আমাকে ডেকেছিলেন ?

হাঁ, নিশ্চিন্দপুরে চৌধুরীদের একটা চিঠি দিতে হবে।

বলুন কি লেখা হবে ?

লিখে দিন, এ মাসের চব্বিশে বা সামনের মাসের ৫ই যে কোন একটা দিনেই তারা প্রস্তুত হ'তে পারলে, সেই তারিখেই বিবাহ হতে পারবে।

ছোট বাবু তাহ'লে বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন ?

হাঁ। যাক চিঠিটা লিখে আমার কাছে নিয়ে আসুন, কালই প্রত্যূষে এক জন ঘোড়সওয়ার পাঠাবেন নিশ্চিন্দপুরে।

যে আজ্ঞে।

রাত্রি যত বাড়তে থাকে শশাঙ্কর মনের অস্থিরতা যেন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এ কি সে হঠকারিতা করে বসল ! কেন মাকে প্রতিশ্রুতি দিল ? সেই পুঁচকে মেয়েটা তাকে কিনা স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে হবে ? মনে পড়ে গেল শশাঙ্কর সেদিনের কথাটা।

ঠাকুরমার একমাত্র আদরিণী নাতনী। ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাত ধরে ঝুমুর-ঝুমুর নূপুরের শব্দ তুলে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে তাকাতেই একজোড়া চোখের সঙ্গে শশাঙ্কর চোখাচোখি হলো। ছোট-খাটো মেয়েটি দেখতে হলে কি হয়, চোখের দৃষ্টিতে সেই মুহূর্তে তার একটুকু সংকোচ বা ভয় ছিল না। সরল সোজা দৃষ্টি।

হঠাৎ পাশা-পাশি মনের পাতায় ভেসে উঠলো ভীরু সশংকিত লাজুক একজোড়া চোখের দৃষ্টি।

চম্পা ! চম্পা !

এখুনি এই রাত্রে চম্পার কাছে একটি বার গেলে কেমন হয় ? কিন্তু রাত কত হলো ? অনেক হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। এত রাত্রে সেখানে যাবে ! চম্পা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। থাকুক সে ঘুমিয়ে, ডেকে তাকে তুলবে শশাঙ্ক। তাড়াতাড়ি শশাঙ্ক প্রস্তুত হ'য়ে ঘর থেকে বের হ'য়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে তার উপরে সওয়ার হয়ে বসল এবং ছুটালো ঘোড়াকে।

বাগান-বাড়ির সামনে এসে যখন শশাঙ্ক বল্‌গা টেনে ঘোড়াকে থামাল, চারি দিকে নিশুতি রাতের অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে।

বাড়ির কোথায়ও কোন আলোর চিহ্ন মাত্রই নেই। ঠিক চম্পার শয়নঘরের জানালা বরাবর এসে নাতি-উচ্চ কণ্ঠে ডাকল শশাঙ্ক চম্পা ! চম্পা !

[ক্রমশঃ।
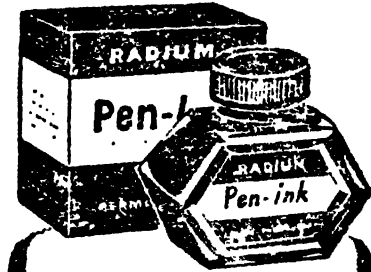
জর্জ-মাইকেল

আটাশ

'দেবদূত' এদিকে হাসপাতাল থেকে পলায়নের উপক্রম করছে; অর্ধাচ্ছন্ন মনের বিকারগ্রস্ত চিন্তাধারায় তার মনোভঙ্গী হাসপাতালের সতর্ক লোকজনের ওপর অত্যন্ত বিরূপ হয়েছে, তাই সে ঠিক করেছে ওদের চোখে ধূলো দিয়ে পালাবে। রবিবার রাত তিনটের উঠে সেই শক্ত ক্যানভাসের ট্রাউসারটা পরলো, মদের শিশিগুলো কোমরে চন্দ্রহারের মত জড়িয়ে বাঁধল, তখনও ভোর হতে ত্ব'ঘন্টা বাকী, তার পর চুপি চুপি পাশের ঘরে সরে পড়ে। মনে মনে ভয়, হয়ত হাসপাতালের রোগীরা নিছক কর্তব্যের খাতিরে না হলেও হয়ত রাগের বশে চেঁচামেচি করবে। সবাইকে জানাবে। তাই সকলকে তার অবিশ্বাস।

এই পাশের ঘর থেকে রাস্তা বেশ দেখা যায়, একতলার ওপর রাস্তা থেকে বেশ উঁচুতে। জানলার ধারে একটা গদি-আঁটা চেয়ার রয়েছে, সেই চেয়ারটিতে হাঁটু-চেপে বসে চেয়ার-শুদ্ধ নীচ-তালা পথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মোদকল্লো।

"আর্টিষ্টকে বন্দী করে রাখা, চালাকি!"

নীচের রাস্তায় পড়ে চেয়ারটা চুরমার হয়ে গেল। হাঁটুতে আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল—কিন্তু জ্বরের ঝোঁকে যতটুকু সম্ভব বেগে দৌড়তে লাগল।

এখন বৃষ্টি পড়ছে না। কিন্তু তুষার পড়ছে, বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ কনকনে ভাব।

তিন-চারটে রাস্তার মোড় পার হয়ে যখন হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে চলে গেছে তখন ওর মনে হল যেন কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে! তাই ভয়ে ভয়ে পথের ধারে একটা ছাউনীর ভিতর ঢুকে পড়লো মোদকল্লো। পাথর-কাটিয়েদের আস্তানা সেটা, অসম্পূর্ণ পাথরের চাঁই আর কর্দমাক্ত মাটিতে পা জড়িয়ে যায়, তবু ভেতরটা বেশ গরম,—একটা টুল খুঁজে তার ওপর বসে পড়ে মোদক,—একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে,—আজ রবিবার, লোকজন কেউ আসবে না কাজ করতে, এইটুকু শান্তি। বিকেলের দিকে সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়বে।

কিন্তু ভোর না হতেই বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত বেদনা নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল মোদকর।

"হয়ত এইবার মরে যাবো।" আপন মনে বলে মোদক, তারপর আবার বলে—"না।"

কোমর থেকে মদের শিশি খুলে নিয়ে একে একে সবগুলি খালি করলো মোদক। এ যে কি বিষাক্ত সংমিশ্রণ সে খেয়াল তার হল না। বুকটা জ্বলতে থাকে। মোদক বলে ওঠে—"সব জয় করেছি,—সব বিপদ দূর হয়েছে। এইবার কাজ।"

কি যে করছে সে বিষয়ে নিজেরই মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক ছিল এই কারখানায়, সিন্দুকটা খুলে ফেলল মোদক। তার ভেতর পাথরকাটা যন্ত্র, হাতুড়ি ছেনি সব রয়েছে। পাথর কাটার সব রকম যন্ত্র পাওয়া গেল, সেগুলি সংগ্রহ করে সারা কামরাটায় ঘুরতে থাকে মোদক। দেখলো একটা লম্বা পাথর শোয়ানো রয়েছে—পাথরটির দিকে চেয়ে মোদক বলে—"হারিকট-রুক্ষ!"

আশ্চর্য কাণ্ড, পাথরটায় মোটামুটি ভাবে একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দেহাকৃতি দেখা যায়, যন্ত্র নিয়ে পাথরটা কাটতে শুরু করে মোদক। গোল মুখ,—মাথার চুল লম্বা, ঘাড় আর পেটের ওপর তুখানি হাত খোদাই করলো।

"এই আমার সমাধি-ফলক,—আমার কবরে এইটুকু থাকলেই যথেষ্ট। আমার স্ত্রী, মাতৃত্বের প্রতীক, আমার অনন্ত অস্তিত্বের স্বর্গীয় স্মারক। এর ওপর লিখে দিই—আমার সমাধি ফলক।"

সারা দিন ধরে এইখানেই কাজ করলো,—মনে মনে নিজেকে তারিফ করে যে ছবি আঁকার আগে ভাস্কর্য শিখেছিল। শিল্পকর্মটি যখন শেষ হ'ল, মনে হল যেন যে প্রস্তরীভূত দুর্দশা যেন সহসা মুক্তি পেয়েছে, পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তার পর সেই অন্ধকারে আর শীতে মোদক আর একটি অন্যায় কর্ম করে বসলো। সারা গায়ে পাথর ছিটকে লেগে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল, তার ওপর সেই বিশাল পাথরটি কাঁধে তুলে পাতাল রাজপথ ধরে সে ষ্টুডিও-প্রাঙ্গণের দিকে চললো। আট ঘণ্টা ধরে হোঁচট খেয়ে, পা পিছলে সেই গুরুভার বহন করলো মোদক, দু'-একবার পড়েও গেল। যখন ষ্টুডিওতে পৌঁছল তখন বুঝলো মূর্তিটার মাথাটা কখন পথে ভেঙে পড়েছে, হারিয়ে গেছে কোথায়। বার বার পড়ে যাওয়ার মুখে ভেঙেছে হয়ত। সুদীর্ঘ কীর্তিকলাপ যেন শুধু অঙ্গ-বিশেষের প্রতীক।

"বেশ! বিধাতার ইচ্ছা নয় যে কবরে শুয়েও যেন এই দেহের মাথাটা কার তা জানতে পারবো না,—কে আমার সন্তানের জননী, রাজকুমারী না মুদীর মেয়ে হারিকট।"

প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল,—আরো শীর্ণ দেহ আরো অবনত হয়ে পড়েছে, যখন ভারী পাথরের মূর্তিটা নিয়ে কষ্ট করে হাঁটছিল তার চাইতেও যেন ক্ষীণ হয়েছে দেহ।

গাড়ি করে কে একজন যাচ্ছিল,—মোদকর পথ চলার ধরণ দেখে সে চিনেছে—তাড়াতাড়ি গাড়িটা থামিয়ে মোদককে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়।

সেখানে ভিজানে শয্যা না নিয়ে মোদক মাথা তুলে চারদিক দেখে বেড়ায়। এই ভদ্রলোকও শিল্পী, এঁর ছবি মোদকর মনে লেগেছে।

তার নাম জারাগো। মেক্সিকোর লোক। সাধু প্রকৃতির মানুষ ষ্টুডিওতে কাজ করার সময় স্প্যানীশ পোষাক পরে থাকেন, দেখাবার জন্য নয়, আরামের জন্য। সারা য়ুরোপ তিনি দেখেছেন। ভেনিসের টিন টরেক্টো বিশেষ ভাবে পরিভ্রমণ করেছেন। শুধু সেইখানেই এই মহৎ শিল্পীর বর্ণজ্ঞান উপলব্ধি করেছে। স্পেনের ক্যাথিড্রালের দেয়ালগাত্র তিনি অলংকরণ করেছেন, খৃষ্টের

চাইতেও এল গ্রেকোর মর্যাদাই যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁকে তিনি এই প্যারীতেও প্রকট করেছেন।

চিত্র ব্যাপারে এই মানুষটির অসাধারণ পাণ্ডিত্য যেমন শাস্ত্র বিষয়ে থাকে ফ্রানসিসিয়ান পণ্ডিতদের, তাই মোদক্লো তাঁর সঙ্গে চিত্র সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল, আগে কোনো দিন মনে মনে কিংবা কখনো হয়ত চার্লকটের সঙ্গে শুধু এই বিষয়ে আলোচনা।

কিন্তু এত দিন সে এমন পরিবেশে কাটিয়েছে যেখানে আর্ট একটি বিধি-বহির্ভূত বিষয়।

এই বিশাল ষ্টুডিয়ো, বুলভার্দ আরাগোর দিকে প্রকাণ্ড জানলা, ষ্টোভের আগুনে সারা ষ্টুডিও পরিপূর্ণ। বেশ মোটা-সোটা রেশম-কোমল বেড়াল ষ্টুডিওর কুশনে শুয়ে গুঞ্জন করছে। তামার পাত্রে নানাবিধ সাময়িক ফল সাজানো রয়েছে। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য ছবি সাজানো।

পিকাসো এবং র‍্যাফায়েল সম্পর্কে আলোচনা করে মোদক। কিন্তু পৃথিবী অ্যাগোস্তও ভূর্গত মানুষকে পুরোহিত যেমন স্বর্গীয় মহিমা বর্ণনা করেন, তেমনই মনোহর ভঙ্গীতে অ্যারাগো বললেন—

"সেই অনাগত-বিধাতার আবির্ভাবের প্রস্তুতি হিসাবে কিউবিজম্‌টা আমরা গ্রহণ না করলেও পারতাম। কিউবিজমের পরিসমাপ্তি কিউবিজমে। আজ কিউবিজমের মৃত্যু ঘটেছে, কারণ তা'র প্রসারতাও ছিল অতি দ্রুত—ভয়ঙ্কর। কিউবিজমের অবসান ঘটেছে। কারণ উঁচুদরের কিউবিষ্ট কেউ জন্মায়নি। মহৎ শিল্পীর অভাব ছিল। অত্যধিক পদ্ধতি আর প্রকরণের ঠেলায় কিউবিজমকে একবারে ঠেসে মেরেছে। লোথ আর মেৎসিনগার আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। ব্রাক্‌ আজ চোরাগলিতে আটকে আছে। পিকাসো কোনো ক্রমে পাঁচিল টপকিয়ে পালিয়েছে। একবার তথাকথিত কিউবিষ্ট ছবির পানে তাকাও। একরোখা ব্রাক আজ সমতাবদ্ধ—তার সেই অকুণ্ঠিত সুন্দরতা আর দুঃসাহসের চিহ্ন কই? লোকটা স্থূল! জাতে ফরাসী। ইতালীয়ত্ব গ্রহণ করেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। পিকাসো? অবশ্য ইদানীং কালে এমন কোনো শিল্পী নেই যিনি পিকাসোর কাছে কিছু না কিছু ঋণী। একজন অভব্য সমালোচক বলেছিল একবার, টুপীওলা যেমন টুপী বানায় তিনিও তেমনই ছবি আঁকেন। কোথাও একটা ফুল আঁকছেন, কোথাও একটা বিবরণ বসাচ্ছেন। যাই হোক সমতার একটা মাষ্টার পীস্‌ সন্দেহ নেই—সহজাত—অথচ কাঁকতালীয়।"

মোদক বলল—"আমি এই কাঁকতালটাই পছন্দ করি এই ত' স্বতোৎসারিত ভঙ্গী। ব্যক্তিবিশেষের জাগ্রত মন থেকে তার উৎপত্তি তা' নির্দেশ করা যায় না। এইখানেই ত' প্রতিভা আর দৈবী শক্তির সংযোগ ঘটে, এই ত' আমাদের উত্তরাধিকার দশ পুরুষ ধরে এর প্রস্তুতি চলেছে—যেমন র‍্যাফায়েল!"

অ্যারাগো বলে—"আমি বরং বলবো—মাইকেল এঞ্জেলো। যেমন পছন্দ করি দেলাক্রয় থেকে ইনগ্রেস,—এখন ওদের প্রকৃত

বিপ্লবী বলে চালাবার চেষ্টা চলছে। কারণ কিউবিজমের ত্রিকোণে যারা মাথা ঠুকছে, ওদের বর্তুলাকার মসৃণতা তাদের ভালো লাগে। তেজ, শক্তি লালিত্য থেকে বিভিন্ন। এর মধ্যে এক পদ্ধতি আজ পাঁচ শতাব্দী ধরে টিকে আছে :—এসব যে কত দিন টিকবে তা জানি না। সব কিছুই এখন আবিষ্কার করতে হবে, র‍্যাফায়েল একজন দেবদূত! এই ক্ষুদে দেবদূতটি বরং দানব সদৃশ, যা কিছু পেয়েছে সবই গিলেছে, ফিডিয়াস থেকে মাইকেল এঞ্জেলো। কিন্তু যাই হোক, রেমব্রানডট, এলগ্রেচো, ইনগ্রেসের মতো র‍্যাফায়েল এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। ওদের কাজ শেষ হয়েছে। এখন ওদের কালে ফিরে যাওয়াটা ভুল হবে। এখন এর ওর তার কাছ থেকে যা কিছু ভালো, যা গ্রহণযোগ্য তা আহরণ করতে হবে, কারো কাছ থেকে শক্তি, কারো কাছে অলংকরণ, সব ভ্রান্তি সংশোধন করে অপরের প্রদর্শিত পথ লক্ষ্য করে লাভবান হতে হবে। সিনয়েল্লী, মাইকেল এঞ্জেলো, এরা না জন্মালে র‍্যাফায়েল হত, আর পরে দেলাক্রুয়, কুরবেট, চ্যাসেরিউ, সিউরাত···ও কিউবিজমের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলে কি না করা যেত!"

"ওরা হল···মাটি, উনি···আকাশ! চরম সমাপ্তি।"

"সৃষ্টি করতে চাও না মহাপুরুষ হয়ে বসতে চাও?" স্টোভের জলন্ত লৌহখণ্ড হাতে নিয়ে উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠলো মোদক।

—"আমিই সেই কল্পিত ধরণী, স্বর্গীয় শিখার সঙ্গে আমার মধ্য থেকে আকাশের জন্ম। আর এই স্বর্গীয় শিখা একটা ফুলটা,—"

অবাক-বিস্ময়ে জ্যাবাগো মোদককে ঘর থেকে ছুটে চলে যেতে দেখলো।

"পৃথিবীতে আর কিছু নেই, সব ঝুটা হ্যায়, ঝুটা হ্যায়···"

গলিত তুষারে হোঁচট খেয়ে পা পিছলে পড়তে পড়তে ছুটলো মোদক। বুলভার্ আরাগো, বুলভার্দ রাসপেইল পার হয়ে, লিওনস্ত বেলফোর্ট অতিক্রম করে, রু ডেন্‌ফেয়ার্ড তারপর রাঁ পারনাস। ঠাণ্ডায় পা লাল হয়ে উঠেছে, আর পুড়ে গিয়ে হাতের মুঠি জ্বলছে। লা রোতন্দের সামনে এসে দাঁড়ালো মোদক্লা। সেখানে আজ আবার এক লড়াই বেধেছে। নতুন মালিক আর দু-চার দল মডেল আর আর্টিষ্টের সঙ্গে হল্লা চলছে। ওই জ্যাকটই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলো মোদক্লা এসেছে। সে নতুন মালিককে মোদকের কথা বলল,—মালিক উন্মত্ত মোদককে দেখে বললেন—

"আর যাই হোক, ঐ লোকটাকে আমি কিছুতেই ঢুকতে দেব না।"

"কিন্তু ও একজন বড় দরের আর্টিষ্ট, সত্যই বড় শিল্পী।"

নতুন মালিক আর্টিষ্টদের চটাতে চান না, তাই বললেন—"বেশ তাহ'লে আসুক।"

ওরিৎস আর লিজার ছুটে এল।

রাস্তার ওপরকার একটা চেয়ারে জামা খুলে বসেছিল মোদক, বুকের লোম দেখা যাচ্ছে। বলল—"মরতে চাই, আমি মরতে চাই। আমাকে মরতে দাও।"

"এসো ভেতরে এসে, ও সত্যি তোমাকেও চায়।"

"আমাকে চায়। আর আমার মরবার অধিকার আছে।"

"···বোম! স্বপ্নের বোম!"

সকলে ধরাধরি করে নিয়ে চলে। এত লাল দেখাচ্ছে যে মনে হয় যেন গায়ে রঙ মেখেছে।

ৎবরোস্কী সেই মাত্র ফিরেছে, সে বলল—"ওকে আমার বাসায় নিয়ে চলো।"

এই সময়টায় একজন বিরাটাকৃতি স্থূলদেহ ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি থেমে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে এসে দেখতে এলেন। বিড় বিড় করে বলল—"এই হতভাগাটার সঙ্গেই ছুঁড়িটা আছে।"

এমন সময় শুনতে পেল মুমূর্ষু মোদক ক্ষীণগলায় বলছে—"কই হারিকট রুজ কোথায়?"

পথচলতি লোকটা কিছু বুঝতে পারে না। তবু কেমন যেন মনে হয়। অতি মৃদু-গলায় প্রশ্ন করে—"হারিকট রুজটা কে?"

"ওর বান্ধবী। রু ছ লা গেইটের এক মুদীর মেয়ে।"

"ওঃ, তাই নাকি? তা মেয়েটা থাকে কোথায়?"

রু ভাসিনজেটরিক্সের ঠিকানা দেওয়া হল। কারণ সেই উত্তেজনাকর মুহূর্তে কেউ খেয়াল করলো না এই অজানা লোকটা কে?

রু ছ লা গেইটের মুদী গাড়ি চালিয়ে ভাসিনজেটরিক্সে চললো—তুষার ভেদ করে অতি দ্রুত ছুটলো তার গাড়ি। এমনই ভঙ্গীতে ছুটেছে মুদী যেন পয়সা না দিয়ে কোনও খদ্দের পালিয়েছে।

"থামো, দাঁড়াও।"

দারোয়ানের কাছে সব খবর নিয়ে পাঁচতলার ওপর উঠলো মুদী।—দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। হারিকট আগের দিন বিকেল থেকে বিছানায় শুয়ে আছে।

লোকটি চার দিকে তাকালো না,—শুধু তার মেয়েটিকে দেখলো! ঠোঁটের গোড়ায় প্রতিশোধের তীক্ষ্ণ সুর, তাই ভূমিকা না করেই বলে—

"তোমার সেই বাউণ্ডুলেটা ত' মরলো, শুনেছ?"

বেচারী হারিকট শুধু বলে—"হুম!"

"এইবার আমার সঙ্গে এসো।"

কোনো রকমে একবার জোর-জার করে দোকানে টেনে নিয়ে যেতে পারলে হয়। তারপর আবার সেই কাজের ঘানিতে জুতে দেওয়া যাবে। ঐ হতভাগীটার জন্ম মাইনে করে একটা ঝি রাখতে হয়েছে।

হারিকট নিঃশব্দে উঠে পেটটা দেখালো তার বাপকে। যেন এক বিরাট পুতুল: লাল টুক্ টুক্ করছে।

হারিকটের মার কথা কানে বাজলো মুদীর—

"একেবারে নষ্ট, উচ্ছিষ্ট হয়ে তবে ফিরবে"—

আ-গেলো! এ যে আর এক জ্বালা! প্রসবের খরচ আছে! লোক-লজ্জাটাও কম নয়।

গালাগাল দিয়ে, বার বার অভিশাপ দিয়ে অশান্ত মুদী যে গতিতে এসেছিল সেই ভাবে নামলো। তার গাড়ি আবার সেই ভাবে রাস্তায় ছুটলো।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কিছু জানালো। কারবারে মেতে গেল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

চাকরির সন্ধানে গিয়ে এক বাঙালী বড় সায়েব ইংরেজকে খুশী করার জন্য বলেছিল, 'হুজুর, আপনার বাঙলোতে আসবার জন্য ভয়ের চোটে পা আর ওঠে না। যদি এক পা এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে যাই।' বড় সায়েব মাত্রেই যে গাধা হয় তা নয়,—এ সায়েবের বুদ্ধি ছিল। বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই শুধালে, 'তা হলে এখানে পৌছলে কি করে?' সায়েব যে বাবুর বিনয় বচন এতখানি শব্দার্থে নেবেন বেচারী সেটা অনুমান করতে পারেনি। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু চাকরির ফিকিরে বাঙালীর কাছে কোন কসরৎ কোনো কৌশলই অজানা নেই। একটিমাত্র শুকনো ঢোক না গিলেই বললে, 'হুজুর, তাই আমি আপন বাড়ির দিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করলুম আর এই দেখুন, দিব্য হুজুরের বাঙলোতে পৌছে গিয়েছি।'

গল্পের বাকিটা আমার মনে নেই, তবে আবুল আসফিয়ার কাইরো ভ্রমণ প্রস্তাবে উমেদাররা যদি এক পা এগোন তবে তিন পা পিছিয়ে যান। পল, পার্সি আর আমি ছাড়া কেউই পাকাপাকি কথা দেন না, আমাদের পার্টিতে আসছেন কি না। অথচ হাঁড়ি হাঁড়ি তেরো বেতেরো প্রশ্ন। গাড়ি যদি মিস্ করি, কাইরোতে হোটেলে যদি জায়গা না মেলে, যদি রাত্রিবেলা হয় আর আকাশে চাঁদ না থাকে তবে পিরামিড দেখব কি করে, আরো কত কি বিদঘুটে সব প্রশ্ন। ওদিকে আবুল আসফিয়া আপন কেবিনে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। প্রশ্নের ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাদেরই— আমরা যেন ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের ভারতীয় ভাইসরয়! শেষটায় আমরাও গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করলুম।

সন্ধ্যার ঝোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌছল। সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ নোঙর ফেলতেই ডাঙা থেকে একটা ষ্টীম-লঞ্চ এসে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তখন জনা গেল আবুল আসফিয়ার দলে সবশুদ্ধ আমরা ন'জন যাচ্ছি। তাঁকে নিয়ে দশ জন।

কুকের গাইড ষ্টীম-লঞ্চে করে ডাঙা থেকে জাহাজে এসেছিল। দেখলুম, তার দলে বারো জন যাত্রী। তা হলে আমাদের দশ জন এমন মন্দ কি!

গাইড চড় চড় করে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে নামলো—পিছনে পিছনে তার দলের বারো জন নামলো পাণ্ডা-গোরুর ন্যাজ ধরে পাপী যে রকম ধারা বৈতরণী পেরোয়। আমাদের আবুল আসফিয়াও চচ্চড় করে নামলেন যেন কত যুগের ঝানু গাইড!

কুকের গাইড এ রকম ব্যাপার আগে কখনো দেখেনি। তার তদ্বির জিম্মেদারী উপেক্ষা করে এক পাল লোক চলেছে আপন গোঠ বেঁধে—এতখানি রিস্ক নিয়ে—এ ব্যাপার তার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আবুল আসফিয়ার দিকে যে ধরণে তাকালে তাতে সে দুর্বাসা হলে তিনি নিশ্চয়ই পুড়ে খাক হয়ে যেতেন—উনিই তো তার মক্কেল মেরেছেন।

তখন ভালো করে দেখলুম আবুল আসফিয়ার নবীন বেশ-ভূষা। সেই ঝুলে-পড়া আঠেরো-পকেটি কোট, মাটি-ছোঁয়া চোঙা-পানা পাতলুন তিনি বর্জন করে পরেছেন, একদম ফাস্ক্লাস নেভি ব্লু স্যুট—কোট, পাতলুন ওয়েষ্ট কোট সমেত— সোনালি বেনারসি সিল্কের টাই, তদুপরি ডাইমণ্ড টাই-পিন, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের মোলায়েম জুতো, তদুপরি ফন্ রঙের স্প্যাট, মাথায় উচ্চাঙ্গের ফেল্ট্ হ্যাট্ গরম বলে বাঁ হাতে ধরে রেখেছেন, লেবু রঙের কিড্ গ্লাভস্, ডান হাতে চামড়ার একটি পোর্টফোলিয়ো।

বিবেচনা করলুম, এই স্যুটে আঠেরোটা পকেট নেই বলে তিনি পোর্টফোলিয়োতে টফি চকলেট, সিগার সিগরেট ভর্তি করেছেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আর আপন নীলে মিলে বেগনি রং ধরতে আরম্ভ করলে। তারই আভাতে লাল দরিয়ার আনীল জলে ফিকে বেগনি রঙ ধরে নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর থেকে, একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া। সে হাওয়া লাল দরিয়ার এই শেষ প্রান্তে তুলেছে ছোট ছোট তরঙ্গ। তার-ই উপর দিয়ে দুলে দুলে আসছে আমাদের ষ্টীমলঞ্চ। তার রঙ আসলে সাদা কিন্তু এই নীল লাল কোনির পাল্লায় পড়ে তারো রঙ যেন বেগনি হতে আরম্ভ করলে।

ষ্টীমলঞ্চটি শুভ্রপুচ্ছ রাজহংসবৎ। রাজহাঁস সাঁতার কেটে যাবার সময় যে রকম শুভ্র বীচিতরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, এ তরণীটিও তেমনি প্রপেলারের তাড়নায় জাগিয়ে তুলছে শুভ্র ফেননিভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চক্রাবর্ত। বড় জাহাজের বিরাট প্রপেলার যখন এ রকম আবর্ত জাগায় তখন সেদিকে তাকাতে ভয় করে, মনে হয় ঐ দ'য়ে পড়লে আর রক্ষে নেই কিন্তু ক্ষুদে লঞ্চের ছোট্ট ছোট্ট দয়ের

সৈয়দ মুজতবা আলী

একটি সরল মাধুর্য আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায়।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে। পদ্মার সূর্যাস্ত, সমুদ্রের সূর্যাস্ত যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ধরে ঠিক তেমনি মরুভূমির সূর্যাস্তও এক দর্শনীয় সৌন্দর্য। সোনালি বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রঙ বদলাতে থাকে। তার একটা রঙ ঠিক চেনা কোন্ জিনিসের রঙ সেটা বুঝতে না বুঝতে সে রঙ বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রঙ ধরে ফেলে। আমাদের কথা বাদ দাও, পাকা আর্টিষ্টরা পর্যন্ত এই রঙের খেলা দেখে আপন রঙের পেলেটের দিকে তাকাতে চান না।

সুয়েজ বন্দরে ইংরেজ সৈন্যদের একটা ঘাঁটি আছে। তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় 'বড় সায়েবের বিবিগুলো নাইতে নেমেছে।' কেউ কেউ আবার ছোট্ট ছোট্ট নৌকো করে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে। নৌকোগুলি হাল-ফ্যাশনের ক্যাম্বিসে তৈরী। নৌকোর পাঁজর ভেনেস্তা কাঠের দড় শলা দিয়ে বানিয়ে তার উপর ক্যাম্বিস মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় নৌকো কলাপ্সিবল্-পোর্টেবল্ অর্থাৎ নৌ-ভ্রমণের পর ভেনেস্তার পাঁজর আর ক্যাম্বিসের চামড়া আলাদা আলাদা করে নিয়ে, ব্যাগের ভিতর প্যাক করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। ওজন দশ সেরের চেয়েও কম। পরিপাটি ব্যবস্থা। অবশ্য নৌকোগুলো খুবই ছোট। দু'জন মুখোমুখি হয়ে কায়-ক্লেশে বসতে পারে। মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে জল বাঁচিয়ে টুকিটাকি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। একজোড়া গুণী দেখি সেখানে একটা পোর্টেবলের উপর রেকর্ড লাগিয়েছে ব্লু ডানয়্যুবের।

ঐ তো মানুষের স্বভাব, কিম্বা বলবো বজ্জাতী। যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায় না। যে জোড়া ব্লু ডানয়্যুব বাজাচ্ছে তাদের যদি এক্ষুণি ডানয়্যুব নদীর উপরে ভাসিয়ে দাও তবে তারা গাইতে সুরু করবে, 'মাই হার্ট ইজ্ ইন্ দি হাইল্যাণ্ড; মাই হার্ট ইজ নট্ হিয়ার'।

তাকে যদি তখন তুমি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে, 'ইম্ রোজেন-গার্টেন ফন্ সাঁসুসী' অর্থাৎ 'সাঁসুসীর গোলাপ-বাগানে'—সাঁসুসী পৎসদামে, বার্লিনের কাছে। তখন যদি তুমি তাকে বার্লিন নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে ভারতবর্ষের গান। জর্মানীর বড় কবি কি গেয়েছেন শোনো,

> গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
> কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
> পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
> নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।
> আম্ গাঙ্গেস্ ডুফ্‌টেট্‌স্ লয়েষ্টেট্‌স্
> উন্ট্ রীসেনবয়মে ব্লুয়েন,
> উন্ট্ শ্যোনে ষ্টিলে মেনশেন
> ফর্ লস্টুস্ মেন ক্লিয়েন।

এবং সেখানেও যখন মন ওঠে না তখন গেয়ে ওঠেন স্বপ্নপুরীর গান, যে পুরী কেউ কখনো দেখেনি, যার সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ জনের কোনোই পরিচয় নেই, কবিরাই শুধু যাকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন—

> কোথা হায় সেই আনন্দ নিকেতন?
> স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,
> রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, স্বামী
> ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।
> আখ্, ইয়েনস্ লান্ট ডের্ ভনে,
> ডাস্ জে ইখ্ অফ্‌ট্ ইম্ ট্রাউম্;
> ডখ্ কম্‌ট্ ডী মর্গেনজনে,
> ফের্‌ফ্লীস্‌ট্‌স্ ভী আইটেল্‌শাউম্।

আমি কিন্তু যেখানে আছি সেখানে থাকতেই ভালোবাসি। নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গাঁ ছেড়ে বেরুতে রাজী হইনে। দেশভ্রমণ আমার দু'চোখের দুশমন্। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গেয়ে ওঠেন তখন আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য আরম্ভ করি। শোনো—

> তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
> সেথায় আলো
> রঙে রঙে আকাশ রাঙায়
> সারা বেলা
> ফুলের খেলা
> পারুল ডাঙায়।
> হ'ক না ভালো যত ইচ্ছে—
> কেড়ে নিচ্ছে
> কেই বা তাকে বলো, কাকী?
> যেমন আছি
> তোমার কাছেই
> তেমনি থাকি!
> ঐ আমাদের গোলাবাড়ি
> গোরুর গাড়ি
> পড়ে আছে চাকা ভাঙা,
> গাবের ডালে
> পাতার লালে
> আকাশ রাঙা।
> সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে
> রাখো কোলে
> মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
> চালতা-শাখে
> পেঁচা ডাকে
> বাড়ে রাতি।
> স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
> বলছি, কাকী,
> দেখব আমায় কে কী করে।

চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার প্রাণের গান, তাতে আমার সর্ব দেহ-মন সাড়া দেয়। বিস্তর দেশভ্রমণের পর আমি তাই এই ধরণের একটি কবিতা লিখেছিলুম। কত না ঝুলোঝুলি, তারো বেশী ধস্নে দেবার পরও যখন কোনো সম্পাদক সেটা ছাপতে রাজী হন নি—'বসুমতী'র সম্পাদকও তাঁদেরই এক জন—তখন তোমাদের ঘাড়ে আজ আর সেটা চাপাই কোন অধর্ম বুদ্ধিতে ?

ধুম করে ধাক্কা লাগতে সম্বিতে ফিরে এলুম। লঞ্চ পাড়ে লেগেছে। কিন্তু এরকম ধাক্কা লাগায় কেন? আমাদের গোয়ালন্দ চাঁদপুরে তো এরকম বেয়াদবী ধাক্কা দিয়ে জাহাজ পাড়ে ভিড়ে না !

আবার !

'সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
দেশ পানে মন ধায়।'
[ক্রমশঃ।

স্বপ্ন না সত্যি ?

[রাশিয়ার রূপকথা]

ইন্দিরা দেবী

ফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে। মাথা ভর্তি সোনালী-রঙের ঝাঁকড়া চুল। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট। নীল টানা টানা চোখ দু'টি দুষ্টুমীতে ভর্তি। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। হোক না একটু চঞ্চল, দেখতে কিন্তু ভারি মিষ্টি। যখন হাসে গালের কাছে সুন্দর টোল পড়ে। সাদা মুক্তোর মত দাঁতগুলো ঝকঝক করতে থাকে, যখন হঠাৎ অকারণে খিল-খিল করে হেসে ওঠে। বয়স আর কতোই হবে, আট কি ন'।

বাপ-মায়ের ঐ এক মেয়ে। একটু আদুরে বৈ কি? বাড়ীতেই পড়াশুনা করে। কিন্তু পড়াশুনোর চেয়ে ভালো লাগে খেলাধূলা। পাড়ার ছোটদের ডেকে নিয়ে খানিকক্ষণ লাফালাফি হৈ-হল্লা চলে। তার পর কোন কোন দিন খেলা শেষ হবার আগেই হঠাৎ বাড়ী চলে আসে। সঙ্গীদের ডাকাডাকি কোন কিছুতেই কান দেয় না। সোজা বাড়ী এসে একেবারে মা'র কোলে। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু আমি জানি হঠাৎ খেলা ছেড়ে বাড়ীতে চলে এল কেন? মা'র কথা মনে পড়েছে তাই। মা-পাগলা মেয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ এক ভাবে থাকা তার স্বভাব নয়। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মার কাছ থেকে বেরিয়ে চলে এল রাস্তায়। মা পেছন থেকে ডাকলেন 'গ্রুসেঙ্কা, লক্ষ্মীটি, অবেলায় বেরিয়ো না।' মেয়েটির নাম গ্রুসেঙ্কা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। ঘাড় দুলিয়ে পেছনে না তাকিয়েই ছুটু ঘোড়ার মত জোর পা ফেলে এগিয়ে যায় গ্রুসেঙ্কা। অদ্ভুত খেয়ালী মেয়ে। খানিক পরেই গা-ভর্তি রাস্তার ধুলো-মাটি নিয়ে ফিরে আসে। রোদে তেতে-পুড়ে, ধুলো-কাদা-মাখা চেহারা। মা রাগ করেন। তবু মাঝে মাঝেই এমনি হয়।

কখন কী খেয়াল মাথায় আসবে, কেউ বলতে পারে না—সে নিজেও নয়। কোন দিন হয়ত নদীর ধার দিয়ে জোয়ারের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে সরু পথটা গেছে সেই দিকে বেড়িয়ে এল খানিকক্ষণ। মা-বাবা হয় ত রোববার সকালে ওকে সঙ্গে নিয়ে গির্জ্জেয় গেছেন। প্রার্থনা চলছে। হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে গ্রুসেঙ্কা বেরিয়ে এল। গির্জ্জার ডান পাশে মস্ত ঝাঁকড়া ঝাউ-গাছ। তার তলায় কাঠবিড়ালী ঘুরে বেড়ায়। অপলক চোখে গ্রুসেঙ্কা সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রার্থনার পর সবাই বেরিয়ে আসে। গ্রুসেঙ্কা তখনও ঝাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে।

সব চেয়ে ভাল লাগে তার নদীর ওপারে উঁচু পাহাড়ের দিকটা। সাঁকোর ওপর দিয়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া চলে। শুধু একা যেতে কেমন একটু ভয় লাগে। মা-বাবার সঙ্গে দু'-চার দিন বেড়াতে গেছে। পাহাড়ের একটা দিক উঁচু হয়ে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। তার গায়ে সবুজ ঘাস আর ছোট-বড় গাছের সারি। তার ভারী ইচ্ছে করে ওখানে যেতে। কিন্তু মা-বাবা রাজী নন। তাঁরা বলেন, অতোটুকু মেয়ে অতো উঁচুতে উঠবে কি করে ?

তবু গ্রুসেঙ্কা আশা ছাড়েনি। বাড়ীর সামনেই মাঠ। মাঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ের উঁচু চূড়া। যেন হাতছানি দেয় গ্রুসেঙ্কাকে। একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা শুয়ে বিশ্রাম করছেন—বাবা সকাল দশটায় বেরিয়ে গেছেন—ফিরতে রাত হবে। কেউ কোথাও নেই। রাস্তা-ঘাট নির্জ্জন। ভাল মানুষের মত জানালার ধারে বসেছিল গ্রুসেঙ্কা। হঠাৎ কি মনে হলো দরজা খুলে একেবারে রাস্তায়। তার পর সাঁকো—সাঁকো পার হয়েই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। বিকেল হতে এখনও অনেক দেরী। তক্ষুণি উঁচু চূড়াটায় পৌঁছে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে গ্রুসেঙ্কা। অনেকক্ষণ চলবার পর তার মনে হলো, মা-বাবা ঠিকই বলেছিলেন—অতোটুকু মেয়ে পারে কখনও অতো উঁচু পাহাড়ে চড়তে? ভারী ক্লান্তি বোধ হলো। আর উঠতে পারছে না। একটা গাছের ছায়ায় বসে জিরোতে চাইল। ঝির-ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভাবছে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ীতেই ফিরে যাবে। মা হয়ত ভাবছেন। তা ছাড়া অত দূর একা চলে আসা ঠিক হয় নি। কিন্তু আর ভাবতেও পারছে না। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। তার পর কী হলো তার মনে পড়ে না। শুধু যখন ঘুম ভাঙলো দেখতে পেলো একটা সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় শুয়ে রয়েছে—লোক-জন কেউ কোথাও নেই। কিন্তু কী সুন্দর জায়গা! কত রং-বেরংএর গাছ—কি অজস্র ফুল! আর ও কি? পাথরের মত ছড়িয়ে আছে। পাথর ত নয়! কি চকচকে আর কি উজ্জ্বল! মা'র হাতের আংটিতেও এমনই পাথর বসানো আছে। দু'হাত দিয়ে যতোগুলো পাথর সম্ভব সে তুলে নিল তার পকেট বোঝাই করে। কিন্তু ভাবনা হলো এখান থেকে ফিরে যাবে কোন্ রাস্তায়? যেখানটায় গাছের তলায় বসে সে ভাবছিল বাড়ী ফিরে যাবার কথা, এ তো সে জায়গা নয়? এই বার সত্যি সত্যি তার কান্না এলো। কেন বাড়ী ছেড়ে এসেছিল? এমনি

সময় দেখতে পেলো বেঁটে মোটাসোটা একটা লোক—মাথাভর্তি শাদা চুল আর গালভর্তি লম্বা দাড়ি। গায়ে সবুজ রঙের জামা আর মাথায় লম্বা লাল টুপি—তার দিকে এগিয়ে আসছে।

তাকে দেখতে পেয়ে গুলেঙ্কা তার বিপদের কথা সব খুলে বললে। কিন্তু লোকটির দয়া-মায়া হওয়া দূরের কথা সে কটমট করে তাকালো গুলেঙ্কার দিকে। তার রকম-সকম দেখে গুলেঙ্কা ভয়ে কেঁদেই ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির হাবভাব বদলে গেল। সে ভালো করে গুলেঙ্কার দিকে তাকিয়ে বললো—"ওঃ, তাহলে তুমি পরীদের মেয়ে নও? আমি প্রথমে ভেবেছিলুম তুমি পরীদের মেয়ে বুঝি। কিন্তু তারা ত কাঁদে না। তোমার কান্না দেখে বুঝতে পারছি তুমি মানুষদের মেয়ে। দেখো, এই পরীগুলো ভারী দুষ্টু। ভালো মানুষের মত এখানে আসবে, আর যাবার সময় পকেট ভর্তি করে নিয়ে যাবে এখানকার মণিমুক্তো। দেখছো ত, পাথরকুচির মত এখানে মণিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে। তারা ত আর ভাবে না কতো কষ্ট করে আমি এ সব জোগাড় করেছি। যাক্, তুমি তাদের দলে নও?

গুলেঙ্কা কান্না থামিয়ে বললো—মণিমুক্তা আমি চাই না। এই নাও তোমার মণিমুক্তো—বলে পকেট থেকে সব বার করে দিল। বললে—আমি ত জানতুম না এগুলো তোমার। তাহলে কখনও নিতুম না। আমি পরীদের মত ও রকম না বলে জিনিস নেওয়া অপছন্দ করি।

লোকটি তার কথা শুনে হাসতে লাগলো। তাই দেখে গুলেঙ্কার সাহস হলো। সে বললে,—আমি মার কাছে যাবো। বাড়ীর রাস্তাটা বলে দেবে কি? এখানে এসে খুব ভুল করেছি দেখছি।

লোকটি বললে, সব ব্যবস্থাই আমি করে দেবো। তুমি ভেবে না। কিন্তু তুমি ত আমার অতিথি; তোমাকে না খাইয়ে ছাড়বো কি করে? চল আমার বাড়ী। ঐ ত দেখা যাচ্ছে।

গুলেঙ্কা রাজী হলো। না গিয়ে উপায়ই বা কি? লোকটি এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত নিয়ে এল। গুলেঙ্কার তেষ্টাও পেয়েছিল খুব। ঢক ঢক করে সরবৎ খেয়ে নিল। কিন্তু এ কি হলো, আবার যে ঘুম পাচ্ছে।

লোকটি বললে, কিছু ভয় পেয়ো না। ঘুমের মধ্যেই তোমাকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব। ঘুম ভাঙলেই দেখতে পাবে বাড়ীতে নিজের বিছানায় শুয়ে আছো। আর এই পাথরগুলো তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। শুধু একটা সর্ত মানতে হবে। এগুলো কোথায় পেলে সে খোঁজ কাউকে দিয়ো না। গুলেঙ্কা রাজী হলো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার পর ঘুমের মধ্যে কি হয়েছে, কিছুই জানে না। শুধু ঘুম ভাঙতে দেখতে পেলো সত্যি সত্যি নিজের বিছানায়ই শুয়ে আছে। ভাল করে ঘুম ভাঙতেই এক ছুটে মার কাছে। তার পর পাথরগুলো পকেট থেকে বার করে তাঁকে দেখালো।

মা জিজ্ঞেস করলেন কোথায় পেলে এসব তুমি?

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়ে গুলেঙ্কা বললে তা আমি বলতে পারবো না মা, আমি যে কথা দিয়ে এসেছি।

মেয়ের জবাব শুনে মা খুসী হলেন না। সত্যিই ত কথার খেলাপ করা অন্যায়। তাই তিনি পীড়াপীড়ি করলেন না। রাতে বাবার কাছে সব বলা হলো। পরদিন সকাল বেলা পাথরগুলো নিয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর ফিরে এলেন একগাদা টাকা নিয়ে।

গুলেঙ্কাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করতে চায় সে টাকা দিয়ে; এতটুকু মেয়ে, কিন্তু কী অসাধারণ বুদ্ধি। বললে—টাকা দিয়ে আমি আর কি করবো? তবে আমার মনে হয় গরীব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এগুলো বিলিয়ে দিলে তাদের খুব উপকার করা হবে। বাবা তার কথাই রাখলেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলাধূলার মাঠ, পড়াশুনার জন্য ইস্কুল তৈরী করে দেওয়া হলো।

সবার সঙ্গে গুলেঙ্কার এবার খুব ভাব। এখন আর অত দুষ্টুমি নেই। কতো জনে কত ধরণের প্রশ্ন করে তাকে হাসি মুখে, সবার কথার জবাব দেয়। কিন্তু কেউ যদি মণি-মুক্তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে চান, তাহলে গুলেঙ্কা একেবারে চুপ। কোথা থেকে সেগুলো পেলো সে খোঁজ রাখে শুধু গুলেঙ্কা আর আমরা আর আজ আমরা বলে দেওয়ায় তোমরাও জেনে গেলে। কিন্তু গুলেঙ্কার মত একলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেওনা তোমরা।

গরমের গুজব

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

কিছু নাহি লাগে ভাল উৎকট গরমে,
ফারেনহাইটের পারা উঠে গেছে চরমে।
মনে হয় শুয়ে থাকি বরফের বিছানায়,
সরবৎ খেয়ে নিই যত খুসী মন চায়।
তার সাথে চাই কিছু আইসক্রীম সন্দেশ,
তা হলে এ গরমেও সময়টা কাটে বেশ।
গরমও লাগে ভাল আঙুরের মজাদার,
নইলে এ গরমেতে ভনতে গরজ কার?
কোন্ দেশে লোক নাকি গরমের চোটে জব্দ
বাড়াবাড়ি বলে চলে গেছে ছেড়ে লোকালয়?
কোথাকার মহারাজ নাকি বলে আহারে
সপাসপ চলে গেছে ভুটানের পাহাড়ে?
সেথা বসে খায় চা সে বরফের সঙ্গে,
গরম পেয়েও সেথা লোক নাচে রঙ্গে!
সত্যি কি, এ গরমে হিমালয় পর্বত
গলে গলে হয়ে গেছে বরফের সরবৎ?
তাহলে তো ভারী মজা, চিনি কিছু মিশায়ে
পেস্তা-বাদাম দাও লাল করে পিষায়ে।
নাই কোন চিন্তা—উৎকট গরমে
আমাদের সুখ তাই উঠে যাবে চরমে।

নিজেকে গড়ো

শচীন্দ্র মজুমদার

আগেকার কালে আমাদের দেশে সুখীর সংজ্ঞা ছিলো—যে অঋণী ও অপ্রবাসী, সেই সুখী। সেটা এখন একটা অর্থহীন বাক্য মাত্র। ঘরছাড়ায় তোমার ভরসা তুমি ঘর। পৈতৃক ধনসম্পদ তোমার না থাক, শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর ছেলের তা নেই, তোমার অন্তরে নিজস্ব ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনের ক'টা দিনই বা তুমি ঘরের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারো? তোমার দশ বছর কেটেছে অসহায় বাল্যে। যদি অতিশয় ভাগ্যবান হও, কুড়ি বছর বয়সের পরই তোমাকে সংসারের সম্মুখীন হতে হবে। সে সংসার বিচিত্র—নির্মমতায় কঠোরতায়, শ্রমের ঘেমে ভরা।

এ সংসারে চোখের জলে ভেজাবার মতো মাটি নেই; কান্না, নালিশ, অবশতার স্থান নেই। ও সব দিয়ে সংসারের দয়া কেড়ে নেবার, ভগবানের কাছে এ মুঠি ভিক্ষা চেয়ে বেঁচে থাকবার সঙ্কল্প বৃথা সঙ্কল্প। ও সব তোমার পুরুষকারের অপচয়; তোমার নিজের আত্মার অপমান: দুঃখ-সংগ্রাম-সংঘর্ষ সব কিছুই তোমাকে মেনে নিতে হবে। জীবন তো তাই দিয়েই ভরা, জীবনের খেলা তো তাই। জীবনে থেকে তার খেলায় যোগ দেবে না, তা হয় না। দুঃখ নেই, এমন কোন মানুষ তুমি দেখেছো? দেখোনি; কখনো দেখবেও না। হাতে কোন ঠাকুরের মাদুলী বেঁধে আঙুলে কোন পাথরের আংটি পরে দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। দুঃখের জলে নেমেই উত্তীর্ণ হতে হয়। কবির কথার অনুধ্বনি করি, যে মুহূর্তে তুমি দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করবে সেই মুহূর্তে তুমি দুঃখ অতিক্রম করে যাবে। এ কথাটা ভাল করে জেনে রেখো যে, দুঃখ না পেলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের পেশী মজবুত হয় না, জীবন শক্ত হয়ে গড়ে না। বেদনা না পেলে জীবনের রস সমৃদ্ধ হয় না। বঞ্চিত না হলে ভোগের তীব্র আনন্দ অনুভব করতে পারা যায় না। যে দুঃখ না পেয়েছে, যে ছেলের খাদ-মাটি পুড়ে জীবন সোনা হয়ে যায়নি। যে ছেলে চাইবা মাত্র সব হাতের কাছে পায়, তার মতো বঞ্চিত, তার মতো কৃপার্হ আর কেউ থাকতে পারে না। তার সবই শিথিল, নিজের ওপর নির্ভর করবার তার শক্তি কোথায়? দুঃখ গুণশূন্য নয়। সে তোমার সকল শক্তিকে পুষ্ট শাণিত তীক্ষ্ণ করে দেয়। অনেক সময়ে দুঃখ মায়ের মতো। মা বেদনার দুঃখ না পেলে তোমার জন্ম হোত কি করে? দুঃখ না পেলে মানুষ করুণা শেখে না, ভালবাসতেও শেখে না। দুঃখকে জেনেই বুদ্ধ করুণা ভালোবাসার অবতার হয়েছিলেন। প্রাচীন এক বাঙালী সাধক দুঃখকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন শোন:

আগে পাছে দুখ চলে মা রেজো পদাতি দল,
আমি যাদের রাজা তাদের তারা আমার প্রজা দল।

রবীন্দ্রনাথ বঞ্চনার শক্তিটা জানতেন, তাই বলতে পেরেছিলেন—

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।

বঞ্চনার দুঃখ অপহারী এবং উপদ্রবকে অর্জনের অপেক্ষায় বঞ্চনা শক্তিপ্রদায়িনী। তা বলে আমি বঞ্চনাকে চিরদিনের মতো স্বীকার করে নিয়ে ঠাকুর বানিয়ে তোমাকে প্রয়োজনহীন হতে বলছি নে। আমার বলার কথা, প্রথম গঠনের বয়সে শক্তিকে তীব্র করবার জন্য বঞ্চনা জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রথম বয়সে যেমন বঞ্চনা আবশ্যক, তেমনি বড়ো হয়ে যতোটা সম্ভব, যতোটা আয়ত্তের মধ্যে ততোটা ভোগেরও অতিশয় দরকার। সে-ভোগে সাদামাটা সহজ উপকরণই কামনা করা উচিত। কিন্তু উপকরণ ভালো হওয়া প্রয়োজন, যাকে বলে Simplicty with good things. ভোগ না করলে জীবন সরস হয় না; পৃথিবীকে মধুর লাগে না। ভোগের বস্তু আহরণ করবার উদ্যম না থাকলে জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা প্রেরণা থাকে না। কিন্তু ভোগের মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় বঞ্চনাকে গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে জীবন করায়ত্ত হয়ে থাকবে না। সাধারণ মানুষ জীবনের দাস, তোমাকে দাস বানাতে হবে জীবনকে। জীবনের সঙ্গে কোন রফা বা compromise করা আমার ভাল লাগে না। যা চাই তা হয় পুরোপুরি নেবো, না হয় একটুও নেবো না। এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও জেনে রাখো যে, জীবনে সবই হারিয়ে যায়, কিছুই আগলে রাখা যায় না। সুতরাং শক্তি বজায় থাকতে থাকতেই তাকে ত্যাগ করার অপার আনন্দ, যেমনি নষ্টপ্রায়কে আঁকড়ে ধরে আগলাতে যাওয়ার গ্লানিটা মর্মান্তিক। এ কথাটা বড়ো হলে, জীবনে অভিজ্ঞ হলে বুঝতে পারবে, এখন পারবে না।

নির্ভীক হওয়ার জন্য সাধনার দরকার। দুর্বল দেহ ও মন নিয়ে নির্ভীক হওয়া যায় না। আত্মবিশ্বাস ও নিজের ওপর অটুট শ্রদ্ধা না থাকলে নির্ভীক হওয়া অসম্ভব। দু'টি কনুই প্রসারিত করে তোমাকে সংসারে ঠাঁই করে নিতে হবে, নির্ভীক ও দৃঢ় না হলে তোমার চলবে না। দেহের ও মনের শক্তি সংগ্রহ করা ছাড়া নিজের ওপর আস্থা ও শ্রদ্ধা স্থাপন করবার জন্য আরো উপায় আছে। মনে অহং বুদ্ধি না থাকলে রাজসিক শক্তি অর্থাৎ বল উদ্দীপিত হয় না। সংসারে বিচরণ করবার জন্য অহঙ্কারকে মূল্যবান ভেবে পোষণ করো। অহঙ্কার আত্মশক্তির উপলব্ধি, এ সংসারে অহঙ্কার তোমার রক্ষাকবচ। সমাজ-জীবনে অহঙ্কার তোমাকে পদদলিত হতে দেয় না। আজ-কাল আমরা বংশমর্যাদা বস্তুটা ভুলতে বসেছি; কারণ চারি দিকে দেখি, ভাল ঘরের ছেলেরা দিশেহারা হয়ে হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু বংশমর্যাদা-বোধ মানুষকে রক্ষা করে, তার উৎকর্ষ সাধন করে, তাকে পতিত হতে দেয় না। সে-বোধ আমাদের অন্তরের দীপশিখা। তোমার পরিবারের, বংশের ও জাতির সকল সংস্কারকে পোষণ করো। কুসংস্কার বলে কিছুই নেই, সেটা পরের মুখের ঝাল খাওয়া। তোমার নিজেরটি ছাড়া অপরের সংস্কার মাত্রেই কুসংস্কার। তোমার সংস্কার যতো ভালোই হোক না কেন, সমালোচনা করতে গেলে অপরে সেটাকে কুসংস্কার বলবেই। ইংরেজেরা ক্রমাগত সমালোচনা

করে করে আমাদের প্রায় সকল সংস্কারকে কুসংস্কার বলে আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা করে দিয়ে গেছে। অথচ নিজেদের সু ও কু সকল সংস্কারকে, সেই সংস্কারগত গুণকে জীবন্ত করে রাখতে ও জাহির করতে ভুলনা হয় না। বড়ো গলা করে ওরা নিজেদের কুসংস্কার সংরক্ষণ করার তারিফ করে। ষ্ট্যানলি বল্ডুইন কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দম্ভ ভরে লিখে গেছেন যে, ইংরেজ-সন্তান লেখাপড়া শিখতে বিদ্যালয়ে যায় না, লেখাপড়া তার মনে প্রবেশ করে না। যায়, ইংলণ্ডের যতো কুসংস্কার ও অভিমান শিখে পাকা ইংরেজ হতে; ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার মতো শক্তি আহরণ করতে। সে শিক্ষায় আর কিছু না হোক, ইংরেজ-সন্তানের নার্ভ নষ্ট হয় না। দাঁতে দাঁত দিয়ে, দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে সে ইংলণ্ডকে রক্ষা করবার জন্ম লড়তে শেখে। কুসংস্কারের অনুশীলনই তাদের অপরাজেয় করে রেখেছে।

তোমাকেও দাঁতে দাঁত দিয়ে দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে অনেক লড়াই লড়তে হবে। সুতরাং নিজের বংশের, তার পর বাঙালীর, তার পর ভারতের কুসংস্কারকে সযত্নে পোষণ করো। নিজের বংশের তিলক না হলে ভালো বাঙালী হতে পারবে না। ভালো বাঙালী না হলে কখনই ভালো ভারতীয়ও হতে পারবে না। নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দিয়ে কিছুই হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথকে দেখো, তিনি স্ববংশের, বাংলা দেশের, ভারতের এবং সমগ্র জগতের মুকুটমণি। আগে তিনি প্রাণভরে বাংলার মাটি পুণ্যগান গেয়েছিলেন বলেই তেমনি ভারতভাগ্য-বিধাতার জয়গান করে সমগ্র ভারতের চিত্তকে দুলিয়ে দিয়ে গেছেন। ভারত-চিন্তার বহু পূর্বে তাঁর স্বদেশচিন্তা; তিনি নূতন করে বাঙালী-সমাজ স্থাপন করেছিলেন। এটা বাঙালী কবিরই কবিতার পদ, "দেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" এ গভীর উপলব্ধি তোমার হোক।

এ কুসংস্কারের সাধনা যদি করো, তোমাকে দিয়ে কখনো তোমার দেশ বেশ ভাষার অপমান হতে পারে না। উপলব্ধি করো যে, আমাদের দেশের মতো এমন স্নিগ্ধ মধুর দেশ জগতে নেই। জলবায়ুর কারণে আমাদের মতো শরীর ধর্মসঙ্গত এমন সুশ্রী বেশ আর হতে পারে না। বাংলা ভাষার মতো এমন মধুর ভাষা আর ত্রিভুবনে নেই। বেশ ও ভাষার বিষয়ে ইংরেজ হও। ইংরেজ নিজের বেশ সকল জাতিকে পরিয়েছে, নিজে অন্য কারো দেশের একটা অংশও গ্রহণ করে নি। অন্য ভাষা জানলেও ইংরেজ পর্যটক বিদেশেও মাতৃভাষাই ব্যবহার করে। শুনেছি এবং পড়েছি যে, ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি দেশের ছোট ছোট গ্রাম্য হোটেলগুলোও বাধ্য হয়ে বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে রাখে, "English is spoken here." আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি ইংরাজী-ভাষী এ দেশী চাকর দেখেছি, অথচ সে বন্ধুটি বেশ উর্দু বলতে পারেন। পরিচিত বাঙালী সাহেবের বাড়ীতেও ইংরাজী-ভাষী চাকর শুধু দেখি নি, তার সঙ্গে বাঙালী খাদ্য ও বেশও নির্বাসিত হতে দেখেছি। এ দু'টি দৃষ্টান্তের বিভিন্ন অর্থ। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, অবাঙালী সমাজে তুমি বাংলা দেশের, অভারতীয় সমাজে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ও রক্ষপাল। এ ছোট কথাটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট। উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথাযোগ্য আচরণ করবার শক্তি তোমার আপনিই হবে।

সামাজিক জীবন থেকে আমি এখন অবসর নিয়েছি। আক্ষেপ পাই যে, ইংরেজ চলে গেলেও আমাদের সমাজে সাহেবিয়ানা এখন উগ্র ভাবে বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশের একটি চমৎকার ক্ষুদ্র সমাজের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেটি পার্শী-সমাজ। পার্শীরা ধনী, গুণী, অসীম কর্মপরায়ণ, প্রতিষ্ঠা তাদের বিস্ময়কর। পার্শী-সমাজে দরিদ্র নেই, পতিতা রমণী নেই। ওরা নিজের সমাজের কাউকে দরিদ্র পতিত হতে দেয় না। ওদের নিজের বেশ, ভাষা নিজের, নিজের সামাজিক আচারে ও ধর্মে ওরা পরম আস্থাবান। ওরা নীরব আত্মস্থ, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো ওরা কখনও কিছু করে না। এই সকল গুণগুলি গ্রহণ করবার মতো।

[ক্রমশঃ।

আমার শুভতম মুহূর্ত

শ্রীকাশীনাথ পাল

তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। আমার দাদার খুব অসুখ হওয়াতে তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হল। কাকা সেখানকার ডাক্তার। একদিন দাদাকে দেখতে গিয়ে নীচে লিফ্‌টের কাছে কাকার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় কয়েক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে ইয়া বড় দাড়িওয়ালা খুব লম্বা-চওড়া চেহারার এক বৃদ্ধ সেখানে এলেন। কাকা তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে সরে দাঁড়ালেন। তাই দেখে তিনি "এস, ওপরে যাবে?"—বলে আমার হাত ধরে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন। লিফ্‌ট্‌ম্যানকে নিয়ে পাঁচ জনের বেশী ওঠা যায় না। তাই তিনি অন্য সকলকে পরে আসতে বলে, আমি, কাকা ও আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওপরে উঠলেম। আমার নাম, কোথায় বাড়ী, কে আছে হাসপাতালে, এই সব জিজ্ঞাসা করলেন। লিফ্‌ট্‌ থেকে বেরুবার সময় কাকা আস্তে আস্তে বললেন,—"প্রণাম কর।" তার পর তিনি ও আমি সেই সুন্দর সৌম্যমূর্তি ঋষির মত পক্ককেশ বৃদ্ধকে প্রণাম করলেম পায়ে হাত দিয়ে। তিনি আমার চিবুকটি ছুঁয়ে ধরে একটু নেড়ে দিলেন।

তার পর আর এক বার সেই কবিকে বীরভূমের এক আমবাগানে দেখেছি—খাতা-কলম নিয়ে লিখছেন। তখনও আমি ছাত্র। প্রণাম করতে তিনি বললেন—"তোমাকে মেডিকেল কলেজে দেখেছি না?" আমি অবাক হয়ে গেলাম।

এবার বোধ হয় বুঝতে পেরেছ এই বৃদ্ধ লোকটি কে? ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমার মনে তিনি "সহজ মানুষ"রূপে যে ছাপটি এঁকে দিয়েছেন তা কোন দিনই মুছবার নয়। আজও মনে পড়ে তাঁর সেই স্নেহস্পর্শ দাদার অসুখের উদ্বেগ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আজও তাঁর সরল মনের ছোঁওয়া তিনি সাধারণের জন্য রেখে গেছেন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। তিনি সকলকে ঐ রকম আপন করে টেনে নিয়েছিলেন। এত দিন পরেও বাল্যের সেই দু'টি মুহূর্তের কথা মনে করে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি, আর ভাবি, তোমরা কি আমার চেয়েও সুখী, ভাগ্যবান হতে পার?

বাংলা সাহিত্যে সংকট

সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতায় দু'টি মনোজ্ঞ সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইদানীং কালে এযাবৎ এতগুলি সাহিত্য-সেবকের সমাবেশ আর দেখা যায় নি, তারপর ফুলের মালা, খানা-পিনার কথা উল্লেখ না করলেও চলে। বিশেষতঃ একটি ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকর্তারা পরিচারক নিযুক্ত না করে স্বহস্তে খাদ্যাদি পরিবেশন করে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। এই উভয় সভার মধ্যে প্রথমটিতে (অর্থাৎ এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায়) আচার্য যদুনাথ সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সুধীবৃন্দ যে সব মন্তব্য করেন তা নিয়ে সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আচার্য যদুনাথ বলেছিলেন: "অর্থাৎ গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে রবীন্দ্রের প্রতিভায় ভাঁটা লাগার পর হইতে আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী মূল্যের কিছুই সৃষ্টি হয় নাই।" শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—"লোকে আশা করেছিল দেশ স্বাধীন হলে নূতন যুগ আসবে জীবনের সব কটা বিভাগে। অতএব সাহিত্যেও। সাত বছর পরে দেখছি সে আশা পূর্ণ হয়নি।" আর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—"অধিকাংশ লেখক আজ কাল লিখতে শুরু করেই কি ভাবে আত্মোন্নতি হতে পারে সেদিকে মন দিয়ে না কি ভাবে বই কাটবে সেইদিকেই মন দিচ্ছেন, এটা সুলক্ষণ নয়।"

তিন জনের বক্তৃতা বেশ দীর্ঘ, আরো অনেক বস্তু আছে। আমরা অংশ-বিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। আচার্য যদুনাথ স্বয়ং ঐতিহাসিক, বয়সে প্রবীণ, সম্ভবতঃ তাঁর আধুনিক সাহিত্যের ধারার সঙ্গে পরিচয় নেই, কেউ তাঁকে কিছু মাত্র জানায় নি, সুতরাং তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে এই সব কথা বলেছেন। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনাবলী, শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী প্রকাশিত হয়েছে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের কাব্য ও ছোট গল্প সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, আবির্ভাব হয়েছে বহু শক্তিমান সাহিত্য-সাধকের। এখন বিরাট প্রতিভার যুগ নয়, খণ্ড প্রতিভার যুগ, তাই সকলেই কিছু না কিছু সাহিত্য কর্ম করে সাহিত্যকে নূতন রূপে সঞ্জীবিত করেছেন এবং হয়ত করবেন। হতাশ হওয়ার কিছু নেই,—আর তাই যদি হবে রবীন্দ্র পুরস্কারের বিচারক হিসাবে আচার্যদেব রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য এই ত্রিশ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দু'জন সাহিত্যিককেই নির্বাচিত করেছেন কেন?

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর বলেছেন স্বাধীনতার পর সাহিত্যে তেমন উৎকর্ষতা লক্ষিত হয় নি,—কথাটা ঠিক নয়। এই সাত বছরেই আমরা অন্ততঃ একাধিক নূতন সাহিত্যিক আবিষ্কার করেছি যাঁদের সাহিত্য কৃতিত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। জীবন আজ মন্দাক্রান্তা তালে প্রবাহিত নয়, সেই জীবনের সঙ্গে তাল রেখে সাহিত্যও তাই মসৃণ পথে চলতে পারছে না। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলে, কিন্তু বর্তমানে তার প্রয়োজন নেই।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের কথাটি চিন্তা করবার। লেখকেরা রচনা কার্য নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আত্মপ্রচারণায় ব্যস্ত। মোট কথা, প্রকাশকের যে কাজটুকু করণীয়, সাহিত্যিকরা সেই কাজটাও হাতে নিয়েছেন। প্রকাশকরা তেমন আত্মসচেতন ন'ন, তাই সাহিত্যিক স্বয়ং স্বীয় পণ্য দ্রব্যের ফেরিওয়ালার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এতে সাহিত্য-কর্ম ক্ষুণ্ণ হয়,—অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়। কিন্তু একথা স্বয়ং বক্তারও অজানা নেই যে, বাংলা দেশের প্রকাশকরা যত দিন পর্যন্ত লেখকদের শুধু লেখার কাজেই আটকাতে না পারবেন তত দিন এই উঞ্ছ বৃত্তির হাত থেকে সাহিত্যিকদের রেহাই নেই।

মোট কথা, সাহিত্যের সংকট আমরা স্বীকার করি না। কি স্থায়ী হবে আর কি অস্থায়ী, তার বিচার করবেন মহাকাল, উপস্থিত যে যার ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়াটাই প্রধান কর্ম। বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের ঢেউ বাংলা সাহিত্যেও যে লাগেনি এ কথা কে বলবে? পরিবর্তিত মূল্যবোধ অনুসারে বিচার করাটাই এখন প্রয়োজন। নইলে সাহিত্যিকের চাইতে সমালোচকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। সংকটের কণ্টক আমাদের মন থেকে নামানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সাময়িক পত্র ও সরকার

সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সমিতির এক অধিবেশনে বাংলা দেশের সাময়িক পত্রগুলিকে সাহায্য করার জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংবাদে জানা গেল না এই সাময়িক পত্র সমিতির সদস্য কোন্ কোন পত্রিকা। সাহিত্য পত্র এবং সংবাদধর্মী রাজনৈতিক পত্র সাময়িক পত্রের আওতায়

পড়ে। হয়ত উভয়বিধ পত্র-পত্রিকার মালিক বা সম্পাদকবৃন্দ এই সভার কর্ণধার,—কিন্তু এক টুকরা মাংসখণ্ডের মত শুধু সরকারি অনুগ্রহেই কি পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব? এখনও বাংলা দেশে অসংখ্য ছোট বড় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় দেখা যায়। কিন্তু সূচীপত্র ওলটানোর পর আর কিছু পাঠ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সাময়িক-পত্র সমিতি লেখা বা সম্পাদনার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছেন কি? পাঠককে আগ্রহান্বিত করার জন্য যে সব সম্পাদকীয় কর্তব্য আছে, তা ক'জন পালন করেন? সাময়িক পত্র-সমিতি আজ লেখক, সম্পাদক এবং পাঠক এই ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত। নইলে কোনোরূপ সরকারী 'পেনিসিলিনে' মুমূর্ষ সাময়িক পত্রকে বাঁচানো যাবে না।

কবিপক্ষ ও গ্রন্থ-পার্বণ

গত মাসে এই বিভাগে "কবিপক্ষে কর্তব্য" শীর্ষক মন্তব্যে আমরা বাংলা দেশের সকল পুস্তক প্রকাশককে সুবিধা দরে পুস্তক বিক্রয়ের পরামর্শদান করেছিলাম, সকল শ্রেণীর পুস্তক এই কালটিতে সুবিধাদরে বিক্রীত হলে নূতন গ্রন্থে মানুষের আগ্রহ বর্ধিত হবে। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুরূপ আহ্বান জানিয়ে এই সময়টিকে 'গ্রন্থ পার্বণ' হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে বই উপহার দেওয়ার এই পবিত্র কালটি "গ্রন্থ-পার্বণ" হিসাবে চিহ্নিত হোক। আমরা শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবেদনে আন্তরিক সমর্থন জানাই। কিন্তু "গ্রন্থপার্বণ"কে রূপায়িত করতে হলে চাই সারা বর্ষব্যাপী নিয়মিত আন্দোলন। সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি অতি ক্ষীণ, একথাও যেন আমরা স্মরণে রাখি।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর

সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংকলন 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' প্রকাশিত হয়েছে, তিনটি বিভাগে বিভক্ত এই কাব্য গ্রন্থে মোট তেত্রিশটি কবিতা আছে। ঠিক কি হিসাবে এই ভাবে কবিতাগুলিকে পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে তা বোঝা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু কঠিন হবে, কারণ কবিতা সাজানো রচনাকাল হিসাবে যে নয় তা লক্ষ্য করা যায়। সুরসঙ্গতি অনুসারেই কবি কবিতাগুলি সাজিয়েছেন মনে হয়। বুদ্ধদেবের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে আজ আর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। প্রেমের কবিতায় আজো তিনি অনন্য। এই একখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলেই যে কোনো বিদগ্ধ পাঠক বাংলা কাব্যের নূতন ধারা সম্পর্কে অবহিত হবেন সন্দেহ নেই। পরিচ্ছন্ন শব্দ চয়ন, মিষ্টি সুর আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে বুদ্ধদেব বসুর এই কবিতাগুলি বাংলা-সাহিত্যের অনবদ্য সম্পদ। সুন্দর ভাবে ছাপা গ্রন্থটির প্রকাশক—নাভানা, দাম আড়াই টাকা।

বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা

চর্যা পদ থেকে সুরু করে বৈষ্ণব কবিদের কাব্য-সুষমার উদাহারণে কুশলী লেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে অতি মনোরম ও সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। মাত্র ৪১ পাতার মধ্যে এমন একটি সুন্দর নিবন্ধ দীর্ঘকাল চোখে পড়েনি। গ্রন্থটি "বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা"র অন্তর্ভুক্ত। দাম আট আনা মাত্র।

নানার মা

এমিলি জোলার বিখ্যাত উপন্যাস "নানার মা" বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন সুলেখক গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। দীর্ঘকাল পূর্বে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের চেষ্টায় এমিলি জোলার 'নানা' প্রকাশিত হয়। আজ অবশ্য জোলার অনেকগুলি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়েছে। কিন্তু এই অমূল্য গ্রন্থটি এতদিন বাংলাভাষায় অনূদিত না হওয়া বিস্ময়কর। গৌরাঙ্গপ্রসাদ ভাষান্তরকরণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থটির প্রকাশক—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, দাম দুই টাকা মাত্র।

যৌনবিজ্ঞান

আবুল হাসানৎ সাহেবের 'যৌন-বিজ্ঞান' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৪২ সালে এর প্রথম প্রকাশের পর বাংলা দেশে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সেই সময় বিজ্ঞান সম্মত যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তেমন ছিল না। মেসার্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স সেই অমূল্য গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই সংস্করণে যৌনতত্ত্ব সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এবং গ্রন্থটিও সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। সংস্কারমুক্ত লেখক বিজ্ঞান সম্মত ধারায় এই জটিল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত কামশাস্ত্র, ও বহুবিধ অপ্রকাশিত পুঁথি থেকে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করেছেন। গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই। ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স কর্তৃক প্রকাশিত এই শোভন সংস্করণের দাম দশ টাকা মাত্র।

১৩৬১ সালের এক শত সেরা বই (বৈশাখ—চৈত্র)

[পাঠাগার কর্তৃপক্ষ ও সাহিত্য-পাঠকের সুবিধার্থে বিগত বছরের মত এই বছরেও ১৩৬১ সালের এক শত সেরা-গ্রন্থের তালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকা প্রণয়নে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়েছে এবং বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতির সহযোগিতায় ও মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা প্রেরিত তালিকানুসারে তালিকাটি রচিত। পরিশেষে শিশু-সাহিত্যের একটি বিভিন্ন তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। আশা করি, এই তালিকা পাঠাগার পরিচালক ও পাঠকের সহায়ক হবে। এই সূত্রে আমরা বাংলা দেশের পুস্তক প্রকাশকদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। —সম্পাদক মাসিক বসুমতী।]

প্রবন্ধ সাহিত্য ও আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা — গোপাল হালদার — এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং
বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক — রমেন চৌধুরী — বি. সেন এ্যাণ্ড কোং
বাংলা সাহিত্যে নজরুল — আজাহারউদ্দীন খান — ক্যালকাটা বুক ক্লাব
বাংলার লোক-সাহিত্য — আশুতোষ ভট্টাচার্য — ঐ
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য — শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — দীপায়ন
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম — ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী — বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প — প্রমথ বিশী — মিত্র ও ঘোষ
প্রমথ চৌধুরী — জীবেন্দ্র সিংহরায় — ক্যালকাটা বুক ক্লাব
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ — হরপ্রসাদ মিত্র — ইষ্ট এণ্ড কোং
কবির কথা — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ঐ
পৌরাণিক উপাখ্যান — যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি — এম. সি. সরকার
ভারত-আত্মার বাণী — জগদীশচন্দ্র ঘোষ — প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
সৌন্দর্য দর্শন — প্রবাসজীবন চৌধুরী — বিশ্বভারতী
নিরীক্ষা — ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত — মিত্র ও ঘোষ
প্রজ্ঞার আলো — ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার — প্রবর্তক পাব্লিশার্স
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ — যোগেশচন্দ্র বাগল — বিশ্বভারতী

জীবনী, সাহিত্য স্মৃতিকাহিনী

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৩) — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — সিগনেট
যুগপুরুষ বিবেকানন্দ — গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ — প্রাচ্যভারতী
শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান — মহেন্দ্রনাথ দত্ত — ঐ
আমার মা সারদা — অতুলানন্দ রায় — নবগ্রন্থ
সারদা-রামকৃষ্ণ — দুর্গাপুরী দেবী — শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
আত্মস্মৃতি (২) — সজনীকান্ত দাস — ডি. এম. লাইব্রেরী
স্মৃতিরঙ্গ — তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় — নাভানা
রক্তের অক্ষরে — কমলা দাশগুপ্ত — ঐ
চলমান জীবন (২) — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় — ক্যালকাটা বুক ক্লাব
হাসির অন্তরালে — নলিনীকান্ত সরকার — ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:
যখন পুলিশ ছিলাম — ধীরাজ ভট্টাচার্য — নিউ এজ

ভ্রমণ

দেশে দেশে চলি উড়ে — দিলীপকুমার রায় — ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:
দেশান্তরী — ইন্দ্রনাথ — ঐ
য়ুরোপের অগ্নিকোণ — বিমল ঘোষ — মিত্র ও ঘোষ
অবিস্মরণীয় চীন — শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
অজ দেশ — নিখিলরঞ্জন রায় — বেঙ্গল পাবলিসার্স

সুকুমার সাহিত্য

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে — কালকূট — বেঙ্গল পাবলিসার্স
মুখর লণ্ডন — সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় — ঐ
বৃষ্টি এল — প্রেমেন্দ্র মিত্র — নিউ এজ
অগ্নি কন্যা — ইন্দ্র মিত্র — ক্যালকাটা পাবলিসার্স
অবিস্মরণীয় মুহূর্ত — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় — ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:

কবিতা

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা — [illegible]
অনুপূর্বা — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
প্রতিধ্বনি — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — সিগনেট
নীল নির্জন — নীরেন্দ্র চক্রবর্তী — ঐ
সমর সেনের কবিতা — ঐ
ছিমিয়াভিমার — হরপ্রসাদ মিত্র — এম. সি. সরকার
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর — বুদ্ধদেব বসু — নাভানা

আরেক জীবন	অমলেন্দু দত্ত	কাব্যলোক
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা	প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	নূতন সাহিত্য ভবন
রাজকন্যা	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	সিগনেট বুক সপ
কলরোল	অনিল ভট্টাচার্য্য	সোয়ান বুকস্
দক্ষিণ নায়ক	অরবিন্দ গুহ	ক্যালকাটা পাবলিসার্স
একতারা	সন্তোষ দে	সোয়ান বুকস্

সংকলন ও গ্রন্থাবলী

আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী		বসুমতী সাহিত্য মন্দির
রামপদ গ্রন্থাবলী		ঐ
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী		ঐ
শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী		ঐ
বঙ্কিম রচনাবলী (২ খণ্ড)		সাহিত্য সংসদ
শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৫ম ও ৬ষ্ঠ)		এম, সি, সরকার
হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী		বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
অষ্টাদশী	সাগরময় ঘোষ	টি, কে, ব্যানার্জি
স্ব-নির্বাচিত গল্প	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:
স্ব-নির্বাচিত গল্প	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
স্ব-নির্বাচিত গল্প	প্রতিভা বসু	ঐ
স্ব-নির্বাচিত গল্প	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঐ

উপন্যাস

একই বৃন্ত	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিসার্স
চাঁপাডাঙার বউ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
এক বিহঙ্গী	মনোজ বসু	ঐ
অচিন রাগিণী	সতীনাথ ভাদুড়ী	ঐ
কৃশানু	সরোজকুমার রায়-চৌধুরী	ঐ
পদসঞ্চার	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	গুরুদাস চট্টো: এণ্ড সন্স
শঙ্খবিষ	দীপক চৌধুরী	এম, সি, সরকার
নীল ভূঁইয়া	অমিয়ভূষণ মজুমদার	নাভানা
কর্ণফুলী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
নতুন দিন	প্রফুল্ল রায়	ইষ্ট লাইট
ত্রিবেণী	বিমল কর	ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:
আচমকা	জ্যোতির্ময় রায়	ঐ
প্রথম প্রহর	রমাপদ চৌধুরী	ডি, এম, লাইব্রেরী
কাশবনের কন্যা	আবুল কালাম সামসুদ্দীন	ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
বিবাহিতা স্ত্রী	প্রতিভা বসু	নাভানা

ছোট গল্প

কামিনী-কাঞ্চন	অন্নদাশঙ্কর রায়	এম, সি, সরকার
বিচিত্র রূপিণী	শিবরাম চক্রবর্তী	নিউ এজ পাব্লিসার্স
অপরিচিতা	সতীনাথ ভাদুড়ী	বেঙ্গল পাবলিসার্স
বাঈসাহেবা	বিমল মিত্র	ক্যালকাটা পাব্লিসার্স
ধূপকাঠি	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	সত্যব্রত লাইব্রেরী
নবমঞ্জরী	বনফুল	গুরুদাস চট্টো: এণ্ড সন্স
বাস্তব ও অবাস্তব	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	জেনারেল প্রিণ্টার্স
সংকরী	রঞ্জন	ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:
শালিক কি চড়ুই	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	ঐ
রোম থেকে রমনা	দেবেশ দাশ	ঐ
ভাঙা বন্দর	মবিন উদ্দীন	মালিক লাইব্রেরী, ঢাকা

অনুবাদ

আমার ছেলেবেলা (গর্কী)	অমল দাশগুপ্ত	কারেন্ট বুক এজেন্সী
নানা লেখা (গর্কী)	সরোজ দত্ত	ন্যাশানাল বুক এজেন্সী
সাল্লালুসিরা (গলসওয়ার্দি)	নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়	নবভারতী
পরকীয়া (চেখভ)	প্রফুল্ল চক্রবর্তী	ঐ
অন্তরতম (জিদ্)	অশোক গুহ	আনন্দ পাবলিসার্স
নরকে এক ঋতু (র্যাঁবো)	লোকনাথ ভট্টাচার্য	নাভানা
দুই নগরের গল্প (ডিকেন্স)	শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী	সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
রেণীর প্রেম (জোলা)		আর্ট এণ্ড লেটার্স
দুই বোন (বাঁল্যা)		র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
রেবেকা (দ্যু মরিয়র)	শিউলি মজুমদার	সাহিত্যায়ন
যৌনমনোদর্শন (হ্যাভেলক এলিস, ২য় খণ্ড)	ত্রিদিবনাথ রায়	বসুমতী সাহিত্য মন্দির

শিশু-সাহিত্য

ঝিলাম নদীর তীরে	বিনয় মুখোপাধ্যায়	নিউ এজ পাবলিসার্স
একে তিন তিনে এক	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এম, সি, সরকার
মাসি	ঐ	বিশ্বভারতী
বিচিত্র কাহিনী	সুধাংশুকান্তি ঘোষ	এম, সি, সরকার
পোপুর চিঠি	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান এ্যাসো:
কাকাবাবুর কাণ্ড	শিবরাম চক্রবর্তী	কলিকাতা পুস্তকালয়
আবিষ্কারের অভিযান	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিসার্স
গল্প-সঞ্চয়ন	হেমেন্দ্রকুমার রায়	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
সোনাতের পাহাড়ে	দক্ষিণারঞ্জন বসু	বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স
দেশে দেশে মোর ঘর আছে	স্বপনবুড়ো	সোয়ান বুকস্
এতিমখানা	শওকত ওসমান	ওয়াসী বুক সেণ্টার, ঢাঃ
চিত্র-বিচিত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ডেভিল্‌স্ আইল্যাণ্ড	বিশু মুখোপাধ্যায়	শরৎ-সাহিত্য-ভবন

হার্প ভারতের ধনুর্যন্ত্র

'এন সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা' The primitive voil is a modified form of the lute ; and the lute is an adaptation of the small lyre of classical antiquity, the name of which (fidicula) survives in both groups of the common names for bowed instrumenta , বেহালা তথা বীণার আদিরূপ নাকি ধনুর্যন্ত্র। এফ. জে. ফেটিসের মতেও এই ধনুর্যন্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। প্রবাদ আছে, রাজা রাবণ এই যন্ত্রের স্রষ্টা। এ জন্য এর অপর নাম রাবণাস্ত্রম্। শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আরবীয়দের 'কেমানচে ফৌজ' ভারতবর্ষীয় ধনুর্যন্ত্রের অনুকরণ মাত্র। কেমানচে ফৌজের আকৃতি-প্রকৃতি অনেকটা ধনুর্যন্ত্রের মতই। ফেটিস সাহেব বিশেষ জোরের সহিত বলেছেন, There is nothing in the west which has not come from the east। মোটের ওপর হার্প বা ধনুর্যন্ত্র ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। ভারতবর্ষ থেকে পরে তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ইয়াট পিগট, জেমস নাসর, গলপিন, কারওয়েন প্রভৃতিও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।

বর্মায় সঙ্গীতের রূপ

বর্মাদেশের সঙ্গীতও ভারতবর্ষের কাছে কম ঋণী নয়। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন রয়েছে বর্মার অভিনয়ে। হিন্দুদেরই পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে বর্মীরা নাট্যাভিনয় করেন। সৌঙম্, ম্যো, গঙ প্রভৃতি বর্মার সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র। কী-বেন আর কী-ওয়েন অসংখ্য গঙ-এর সমাবেশে অর্কেষ্ট্রা-বিশেষ। ক্যাট যন্ত্রটি সম্পর্কে স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন,

It has usualy 12 or 13 strings, and supposing the lowest to be D, the scale does not rise by tones and half tones, D, E, F, G, but thus,— 1st string D, 2nd F, 3rd A. The 4th then begins with G and so on.

কার্ট স্যাক্স সমগ্র এশিয়ার সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, The evolution of East Asiatic scales now begins to stand out. It starts from strictly pectatonic scales with thirds of any size. In a second stage, heptatonics appear in the form of seven Loci for strictly pentatonic scales...In China and Japan, on the contrary, scales have bean rather well tempered to whole and semi tones and to major thirds...In siam. Cambodia, and Burma, on the other hand, seven Loci have been assimilated to form almost equal seven eighths of which are actually used in melodies.

প্রলয় নাচন নাচলে যখন

নন্দিকেশ্বর তাঁর 'কাশিকাবৃত্তি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নটরাজ তাণ্ডবনৃত্য শেষ করে যখন নব-পঞ্চবার ঢক্কা নিনাদক ডমরু ধ্বনি করেছিলেন তখন ১৪টি পর্যায়ে সঙ্গীতশাস্ত্রীয় বর্ণগুলির সৃষ্টি হয়। যথা,

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো
ননাদ ঢক্কাং নব-পঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তু কামঃ সনকাদিসিদ্ধা-
নেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।

এই থেকেই পরবর্তী কালে ছবিতে, নানা ভাস্কর্য্যে নটরাজের মূর্তি কল্পনা করা গেছে। ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Dance of Sivaতে বলছেন, ত্রিজগতের জননীকে যেন স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে বিচিত্র মণি-মাণিক্য দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। শূলপাণি কৈলাস পর্বতের চূড়ায় নৃত্য করছেন, দেবতারা আছেন তাঁকে চার দিকে ঘিরে, দেবী সরস্বতী বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছেন, ইন্দ্র বাজাচ্ছেন বেণু, ব্রহ্মার করতালের ছন্দে লক্ষ্মী গান ধরেছেন, বিষ্ণু বাজাচ্ছেন মৃদঙ্গ, আর গন্ধর্ব যক্ষ অমর ও অপ্সরারাও আছেন চার দিকে।

ইলোরা, এলিফেন্টা, ভুবনেশ্বর কি দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরম্ মন্দিরের গায়ের নটরাজের মূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন এর সৌন্দর্য, স্বর্গীয় কল্পনা এবং সৃষ্টি-কুশলতা।

মনীষী হ্যাভেল বলেছেন, The Tandavan, which summed up the threefold processes of Nature, Creation, Preservation and destruction.

এ সম্পর্কে আগামী বারে আরও কিছু জানাবার বাসনা রইলো।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক (২)

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১২৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর। সঙ্গীতে এরকম উৎসাহী ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গীত-সভায় যে সব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতো তার এক ফিরিস্তি ছাপছি। তাই থেকেই বুঝতে পারবেন এঁর সঙ্গীত-প্রবণতার কথা।

(১) প্রসিদ্ধ গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (নুলো গোপাল) যাঁর ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা তখন বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

(২) গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়াল গাইয়ে সাহেব খাঁ।

(৩) লক্ষ্ণৌ নিবাসী বিখ্যাত টপ্পা গায়ক বক্কাজান খাঁ।

(৪) গোন্দলপাড়ার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৫) সঙ্গীত-রত্নাকর ধ্রুপদী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬) ঠুমরী গায়ক প্যার সাহেব।

(৭) আগ্রা নিবাসী সুরবাহার বাদক প্রসিদ্ধ সৈয়দ মহম্মদ।

(৮) সেতারী ইমদাদ খাঁ।

(৯) সরোদীয়া ও সেতারী এ. কে. কৌকব।

(১০) জলতরঙ্গ, কাসতরঙ্গ, এসরাজ, সেতার প্রভৃতিতে পারদর্শী সঙ্গীতাচার্য্য নীলমাধব চক্রবর্তী।

(১১) প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী ভৈইয়া লাল।

এ ছাড়াও পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি মহারাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভাঁড় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সানাই বাদক আসাউল্লা খাঁ, হোসেন খাঁ, রুস্তম খাঁ প্রভৃতিও তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই সব কারণে।

ওস্তাদ মৌলাবক্স—ভারতের সঙ্গীত-সাধক (১)

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সন্নিকটে ভিওয়ানী নামক স্থানে ওস্তাদ মৌলাবক্সের জন্ম হয় এক বিশিষ্ট ধনী গৃহে।

কথিত আছে, এক বার এক বিদেশী ফকির ভিওয়ানী শহরে আসেন এবং মৌলাবক্সের গৃহে অতিথি হন। মৌলাবক্সের মধু কথাবার্তায় বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে দু'-একটি গান গাইতে বলেন। গান শুনে পরম প্রীত হয়ে ফকির সাহেব মৌলাবক্সকে অন্য সব কিছু ছেড়ে সঙ্গীত সাধনাতেই নিজের মনকে নিবিষ্ট করতে বলেন। এবং সেই থেকেই নাকি শুরু হয় মৌলাবক্সের সঙ্গীত আরাধনা।

এ ঘটনায় সত্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, মৌলাবক্স পরবর্তী কালে এক বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বড়ই বিচিত্রময় তাঁর জীবন। বাল্যকাল থেকেই গৃহত্যাগী ঘাসিট খাঁ নামে এক মস্ত বড় ওস্তাদের ঘরানা ঠিক আমাদের বহু ভাটের মতই তিনি চুরি করেছিলেন। রাতের মধ্য ভাগে চলতো সেই সঙ্গীতগুরুর সাধনা এবং শেষ রাত উষার মহেন্দ্রক্ষণে সারা রাত মৌলাবক্স বসে থাকতেন বাগানের দারোয়ানদের ঘরে ইয়ারকী, ঠাট্টা, আড্ডা চলতো আর সেই ফাঁকে তিনি অভিজ্ঞের মত শিখে নিতেন ঘাসিট খাঁর সঙ্গীত-কৌশল। কয়েক বছর এমনি চলবার পর এক দিন তিনি ধরা পড়ে গেলেন গুরুর কাছে

নিজের ঘরে বসে মৌলাবক্স সাধনা করে চলেছেন গত রাত্রির শেষ অংশের, এমন সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ঘাসিট খাঁ। তার পর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হোল গুরুদেবকে। শিষ্য নিতেই হল মৌলাবক্সকেও সঙ্গে সঙ্গে।

এর পর উত্তর-ভারত ছেড়ে মৌলাবক্স এলেন দক্ষিণ-ভারতে। তিনি বুঝলেন, আসল ভারতীয় সঙ্গীত এখনও বিশুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে দ্রাবিড়দের কর্ণাটীয় সঙ্গীতের মধ্যে। মৌলাবক্স তখন ত্যাগরাজ, দীক্ষিতার প্রভৃতির 'শ্রুতি' নিয়ে পড়া-শুনা করতে শুরু করলেন। আরবী ও পারসী সঙ্গীত যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করেছে তা-ও তিনি বুঝতে পারলেন তখন।

এই সময়ই মৌলাবক্সের সঙ্গে দেখা হল দাক্ষিণাত্যের দরবার সঙ্গীত কল্লার সঙ্গে। এঁর অপূর্ব্ব বীণার বাজনা শুনে মৌলাবক্স তাঁর কাছে বীণা শেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেই কল্লা উত্তর করলেন, সঙ্গীত আমাদের ব্রাহ্মণজাতির বংশগত সম্পত্তি, অন্য কোন বাহিরের লোকের ইহার বিজ্ঞান ও অন্তর্নিহিত অর্থ শিখিবার অধিকার নাই। আপনার যদি একান্তই শিখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আগামী জন্মে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন।

এর পর মৌলাবক্স মহীশূর, মাঙ্গালোর, মালাবার, তাঞ্জোর ইত্যাদি স্থানে উপযুক্ত গুরুর খোঁজে বেড়াতে লাগলেন। এবং পেলেনও তাঁর ঈপ্সিতকে। তাঞ্জোরের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁকে নানা শাস্ত্র বিশেষ করে সঙ্গীত বিষয়ক নানা ব্রাহ্মণ্য তথ্যের জ্ঞান দিলেন। এবার মৌলাবক্সের বিজয়ের পালা। মহীশূরের তৎকালীন মহারাজা কৃষ্ণরাজ তাঁকে সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ উপাধি দিলেন। নিজের সভায় স্থান দিলেন: হিন্দুপ্রথা মত ছত্র, চামর, কলাগী, শিরপেঁচ, মশাল প্রভৃতির দ্বারা মহাসম্মান করলেন।

মৌলাবক্সের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কোনও এক প্রাচীন রাজবংশের কন্যার বিবাহের কথা শোনা যায়।

মৌলাবক্সের জীবনী বড় অদ্ভুত! একদিন মহারাজা তাঁকে প্রশ্ন করেন, সামান্য সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে তুমি রাজচিহ্ন পরিধান কর কেন? মৌলাবক্স তাঁকে উত্তর দেন, রাজার সম্মান তাঁর নিজ দেশে মাত্র কিন্তু শিল্পীর সম্মান স্বর্গে, মর্ত্ত্যে সর্বত্র।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এঁর পরিবারের সকলেই সঙ্গীতে বিশেষ গুণী। মর্তজা খাঁ, বরোদার ষ্টেটমিউজিশিয়ন এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ এ, এম পাঠান লণ্ডনের Royal Acodemy of Music-এর ছাত্র। নেপালে সঙ্গীতের অধ্যাপক।

ইহুদী মেনুহীনের প্রশংসা

সম্প্রতি মার্কিণ মুলুকে ভ্রমণরত ভারতীয় বিশিষ্ট শিল্পী আলি আকবর, শান্তা আপ্তে ও চতুরলালের এক ডিমনষ্ট্রেশন মার্কিণ দেশে প্রচুর প্রশংসালাভ করেছে। বিখ্যাত বেহালাবাদক মেনুহীন তাঁর এক ভারতস্থ বন্ধুকে এই সম্পর্কে তার করে কয়েক জন শিল্পীকেই প্রচুর প্রশংসা করেছেন ও বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক হাওয়ার্ড টাবমান নিউইয়র্ক টাইমস কাগজে এঁদের কাজের এক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ভারতীয় এই সঙ্গীত বা নৃত্যধারার সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ না থাকলেও এঁদের দেখে মনে হয় নিজ নিজ পরিধিতে এঁরা প্রত্যেকেই সবিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন। আলোচনার শেষে তিনি এদের যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন। বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের এই বিশেষ সম্মানে শিল্পিগণের সঙ্গে আমরাও যথেষ্ট গর্ব অনুভব করছি।

আমাদের দেশী নাচ গান বাজনা হয়তো বহির্ভারতের দেশবাসীরা এখনও তেমন শুনতে পাননি, অর্থাৎ যথারীতি পরিবেশিত হয়নি—তা হ'লে এই ধরণের প্রশংসা বহু পূর্ব্বেই আমাদের প্রাপ্য।

রেকর্ড-পরিচয়

বৈশাখ মাস পুণ্য মাস, ভারতের সর্বত্র এই মাসটিতে নানা উৎসব হয়। বিশেষ করে বাংলা দেশে এ মাসটিতে রবীন্দ্র-জন্মতিথি পালনে যে উৎসাহ-উদ্যম দেখা দেয় তার সঙ্গে একমাত্র শারদীয় উৎসবেরই তুলনা হতে পারে। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এখন একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই সময় ছোট বড়ো নানা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালিত হয়। কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান শুধু এই উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতেই গড়ে ওঠে। প্রকাশকেরা 'কবিপক্ষ' পালনে উদ্যোগী হন, বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে উচ্চহারে কমিশন দিয়ে তাদের বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে নাচ গান অভিনয়ের ধুম। গুরুদেব যে আপামর জনসাধারণের কত আপনার জন, তা বোঝা যায় এই সময় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অবাধ ও অপরিমেয় প্রচার ও প্রসার দেখে।

আর কোনো দান যদি তাঁর না-ও থাকতো তবু শুধু গানের জন্যও রবীন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। শুধু প্রকারেই নয়, পরিমাণেও এত গান আর কোন দেশে, কোন কালে কোন কবি রচনা করেছেন কি না সন্দেহ। সেই হাজার হাজার গানের মধ্যে আজ পর্যন্ত রেকর্ডে কয়েক শ' গান বেরিয়েছে, তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ডের জনপ্রিয়তা বুঝতেও কষ্ট হয় না। প্রতি বৎসর রবীন্দ্র-জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া সারা বছর ধরেও প্রকাশ হতে থাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কিছু কিছু নতুন রেকর্ড।

এবার রবীন্দ্র-জন্মতিথি উপলক্ষে যে সুনির্বাচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে তার জন্য আমরা গ্রামোফোন কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাই। এবারের রেকর্ডগুলির বিষয়ে বিশেষ করে বলবার কথা এই, শিল্পিনির্বাচনে এবং সঙ্গীত চয়নে সমান যত্ন নেওয়া হয়েছে। রেকর্ডগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া গেল।

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে—"তুমি তো সেই যাবেই চলে" আর "আমার জলেনি আলো অন্ধকারে"।—(N 82650)

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গান সকলেরই চিত্তজয়

করেছে সেই বিখ্যাত—"রোদন ভরা এ বসন্ত" এবং "আমার মিলন লাগি"।—(N 82651)

শিল্পী-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, গানগুলি তাঁদের সেরা গান স্বচ্ছন্দে বলা চলে।

কলম্বিয়া

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা ছেড়ে গেলেও রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়েন নি, এ গীতিরসিকদের পরম পরিতৃপ্তির বিষয়। এবারে তিনি গেয়েছেন—"যখন ভাঙলো মিলন-মেলা"—এবং "আমার এ পথ।" "যখন ভাঙলো মেলা"র মত গান হেমন্তও বহুকাল গান নি। এক কথায় বলা চলে চমৎকার!—(GE 24757)

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় রসবিচারে হেমন্তেরই গোত্রের বলা যায়। এমন সুকণ্ঠ শিল্পী যে সবারই প্রিয় হবেন তা প্রথম থেকেই আশা করা গিয়েছিল। এবারের গান দুটিতে সে আশা তিনি আবার পূরণ করেছেন। —"একলা বসে হেরো তোমার ছবি" এবং "ওই জানালার কাছে"—(GE 24758)

শীতের মরসুমেই কলকাতার পার্ক-ময়দানে, প্রেক্ষাগৃহে, গৃহস্থ জনেরও অনেকের ঘরে ঘরে সঙ্গীতের জলসা বসে, এই আমরা এত দিন জানতাম। কিন্তু এবার এই একশো এক ডিগ্রী গরমে, বৈশাখের মধ্যেও যে পরিমাণ সঙ্গীতের জলসা বসছে কলকাতা ও শহরতলীতে তা দেখে আমরা একটু অবাকই হয়েছি বলবো। অবশ্য প্রায় সবেরই উপলক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। ১৬শে বৈশাখ থেকে আশুতোষ কলেজ-হলে দক্ষিণীর সপ্তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী এবং রবীন্দ্র-জন্মোৎসব একসঙ্গে পালিত হচ্ছে। বৈতানিক ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করছেন মহর্ষি ভবন, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি পরিবেশিত হচ্ছে। গীতবিতান রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করছেন আশুতোষ কলেজ-হলে। এঁদেরও নাচ-গান-নাটক ইত্যাদির পরিবেশন উল্লেখযোগ্য। গত ২৩শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় জগন্নাথ সুর লেনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে ঋতুর রূপ ও অরূপের মিলন ঘটেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবীথিকা কুন্ডু, নীলা সিংহ, কৃষ্ণা বসু, দীপ্তি দীঘাঙ্গী, ঝর্ণা দীঘাঙ্গী, মিনতি বর, বীণা ভট্টাচার্য, নিশীথ বসু, সোমেন বসু, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত বর, সুশীল শীল, অমল গুপ্ত ও রণেন ভট্টাচার্য। যন্ত্রসঙ্গীতে নবীন চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বিশ্বাস, জয়া বসু, নীরেন বসু, হীরেন মিত্র, নিশীথ বসু, অজিত দে। কৃষ্ণা দত্ত ও সুনীতা বসু নৃত্য-প্রদর্শন করলেন। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সম্মেলন হাওড়া গার্লস স্কুলে ২৫শে থেকে ৩১শে বৈশাখ অবধি রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করছেন। শ্রীসমরেশ চৌধুরী, শ্রীগায়ত্রী চৌধুরী, শ্রীসোমেশ ঘোষ, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রভৃতি এঁদের এখানে অংশ গ্রহণ করবেন। নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন আট দিন-ব্যাপী এক গান-আবৃত্তি-নাটকের অনুষ্ঠান করছেন রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে। বি, কে, পাল পার্কের সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলন হচ্ছে। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন—শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপূর্ণা ঠাকুর প্রভৃতি। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করবেন অনুভা গুপ্তা, উদয়শঙ্কর, জহর গাঙ্গুলী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। দক্ষিণ-কলকাতা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘ এ বৎসরের কমিটি ঠিক করেছেন। ডাঃ অমরনাথ মুখার্জী প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। গত ২৬শে এপ্রিল মৈদাবাদ গীতমন্দিরে সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সপ্তম তিরোধান দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞানকৃষ্ণ সান্যাল। তিনি ছাড়া সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবিবিক্তিমোহন পাত্র, শ্রীবুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজগন্নাথ দাস, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিমলকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকেশব ভট্টাচার্য প্রভৃতি। হাওড়া রূপম সঙ্গীত-সমাজের উদ্বোধন হল গত ১লা বৈশাখ সুরেন্দ্র মেমোরিয়াল হলে, ১১।১৭ আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়া। কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ নন্দী, হরিপদ মল্লিক, শ্রীবাসুদেব চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ পাল, শৈলেন দত্ত, কার্ত্তিক সান্যাল, নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গ যুব-উৎসব উপলক্ষে আগামী মে মাসে গান-বাজনা আর নাচের এক প্রতিযোগিতা হবে। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত এই চার বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিগণের বয়স হিসাবে দুই ভাগ করা হয়েছে। বিস্তারিত খবর পেতে হলে ১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোডে খবর নিতে পারেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের এক জলসা হয়ে গেল ৩০শে এপ্রিল। হীরেন গাঙ্গুলী, শচীন দাস মতিলাল, রেণুকা সাহা প্রভৃতি সঙ্গীতালাপে অংশ গ্রহণ করেন।

গত শনিবার ১৬ই বৈশাখ ৮নং জগন্নাথ সুর লেন শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তের বাড়ীতে ঘরোয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাসিক অধিবেশনে 'লোকসংগীত' অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও সম্প্রদায়। বাউল, আউল, সারি, ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের লোকসংগীত তিনি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দান করেন। রোনাচ ও ধামাই নৃত্যে শিল্পকুশলতার পরিচয় দান করেন মহিলা শিল্পীরা।

গত ১লা বৈশাখ সকাল ৮টায় ৫নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেনস্থিত রবীন্দ্র-ভারতীতে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নাট্য ও নৃত্য-সংসদের উদ্বোধন করেন। সঙ্গীত, নাট্য ও নৃত্যের শিক্ষাদান, প্রচার ও গবেষণার ইহা প্রধান কেন্দ্র হইবে। বাঙ্গলার শিল্প-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষাদান ও প্রচার এই সংসদের

প্রধান উদ্দেশ্য। উপদেষ্টা কমিটি এবং সাধারণ কমিটির উপর সংসদের ব্যবস্থার ভার থাকিবে। সঙ্গীত-বিভাগে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং নৃত্যে শ্রীউদয়শঙ্কর পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। এই তিন জন পরিচালক বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এবং তাঁহাদের বাঙলা তথা ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দান সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে এই সংসদ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ললিতকলা কেন্দ্রে পরিণত হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সঙ্গীত, উচ্চশিক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত হতে চলেছে। অবশ্য নৃত্য ও নাট্য এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসদের সহিত যোগাযোগ থাকিবে এবং পরীক্ষা পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হইবে। সংসদের আর একটি প্রধান কার্য্য হইবে মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রচার। আমাদের দেশে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ এক সংস্করণ প্রকাশের পর অর্থাভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠে না। 'সংসদ' এই সকল গ্রন্থ প্রচারের ভার গ্রহণ করবে। এতদ্ব্যতীত একটা প্রণালীবদ্ধ শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত হবে, সেটা হবে সর্ব্ববাদি-সম্মত। গত ২৭শে এপ্রিল ২৪ নং পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ফ্রেঞ্চ কালচারেল সোসাইটিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান হয়। দেশীয় এবং বিদেশীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত গান এবং শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সুর-শৃঙ্গারের আলাপ করেন। শ্রীপ্রবোধ নন্দী সকলের সহিত সঙ্গত করেন।

আমার কথা (৫)

(বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত)

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৮ সালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীতগুরু অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি দ্বিতীয় পুত্র।

সঙ্গীতনায়ক মহাশয় তাঁর পিতার নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন এই মন্ত্রে যে, যত্ন তাঁকে জ্ঞানার্জনে ও সাধনায় দিয়েছিল নিষ্ঠা, প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় সংযম এবং বিদ্যাদানে স্বার্থশূন্যতা। এইরূপ পিতার আদর্শ-শিক্ষায় গড়ে উঠল তাঁর বাল্য কৈশোর ও যৌবন। ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ঘরাণার সমস্ত কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেন তিনি পিতার আদর্শ শিক্ষায়। গোপেশ্বর বাবু শিল্পি-মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু সঙ্গীতে নয়, চিত্র-বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। তাঁর অঙ্কিত চিত্র অনেক সময় বিশেষজ্ঞদিগকে মুগ্ধ করত।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। গোপেশ্বর বাবু শিবনারায়ণ মিত্রের নিকট ধ্রুপদ, গুরুপ্রসাদ মিশ্র ও গোপাল চক্রবর্তীর (নুলো গোপাল) নিকট খ্যাল ও টপ্পা সংগ্রহ করেন। গোপেশ্বর বাবু বলেন যে, "শিবনারায়ণ মিত্র ছিলেন ধ্রুপদের জাহাজ, এক এক রাগের কত ধ্রুপদ যে তিনি জানতেন, তা আমাদের ধারণাতীত। গুরুপ্রসাদের ছিল খ্যালের অফুরন্ত ভাণ্ডার ; প্রত্যেকটি গান সুরে ও ছন্দে কি অপূর্ব্ব! আর নুলোগোপালের খ্যাল ও টপ্পা গানের সুরের ঢং সকলকে চমৎকৃত করত।" গোপেশ্বর বাবুর সমসাময়িক অনেক ওস্তাদ ইহাদের নিকট শিক্ষা করতে যেতেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গত লালচাঁদ বড়াল ও গোপেশ্বর বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। ১৮১৮ ১১ সালে গোপেশ্বর বাবুর গানের সংগ্রহ ছিল প্রায় ৫ হাজার। এই অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে শুধু নিজস্ব করে না রেখে তিনি বিলিয়ে দিলেন দেশবাসীকে। তাঁর এই বিপুল সংগ্রহ ও সঞ্চয় সার্থক হয়ে উঠল দানের মধ্য দিয়ে। এই সময় ১১০১ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর স্বর্গত বিজয়চাঁদ মহতাব গোপেশ্বর বাবুকে তাঁর সভা-গায়ক পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য অনুরোধ জানান। গায়ক হিসাবে তখন যুবক গোপেশ্বরের সুনাম, বাঙলার আভিজাত্য ও শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করে। তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং এইখানে তিনি সাধনা, গবেষণা, লুপ্ত সঙ্গীত উদ্ধার ও প্রচারে ব্রতী হন। সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়নের তাঁর বিশেষ সুযোগ হয়। মহারাজ বাহাদুরের সাহায্যে তিনি দেশ-দেশান্তর থেকে বহু মূল্যবান গ্রন্থ আনিয়েছিলেন। প্রায় দশ বছর গভীর গবেষণার পর তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয় এবং বিখ্যাত তানসেন ঘরাণা গানের স্বরলিপি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থ বাঙলার শিক্ষিত সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী কালে 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' ১ম ও ২য় খণ্ড সমগ্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়। শুধু ভারতবর্ষে কেন, সুদূর ইউরোপ হইতেও অনেক সঙ্গীতগুণী এই গ্রন্থ পড়িয়া মুগ্ধ হয়ে গোপেশ্বর বাবুকে অভিনন্দন জানান। গোপেশ্বর বাবু এই সকল গানকে প্রচার করায় ওস্তাদ-সমাজ এবং ওস্তাদপন্থীরা ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। কিন্তু গোপেশ্বর বাবু এই সব যুক্তিহীন প্রতিবাদকে অবহেলা করে স্বীয় কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন। গোপেশ্বর বাবুর একজন গুরু-ভাই উপদেশ দিয়েছিলেন, "ভাই যা ছাপিয়েছ তা থাক, আর কিছু প্রকাশ কর না, তাহলে ছেলেপুলেরা কি গাইবে ?" গোপেশ্বর বাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "যা দেশশুদ্ধ সকলে গাইবে, তাই গাইবে ছেলেরা।" 'গীতমালা', 'তানমালা', 'গীতদর্পণ' প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি তিনি বর্দ্ধমানে থাকা কালীন রচনা করেন।

১১৩৫ হইতে ৪০ সালের মধ্যে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পুস্তক 'গীতপ্রবেশিকা' এবং বহুভাষা গীত প্রকাশ করেন। ইদানীং তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ১ম খণ্ড

প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ। সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ গ্রন্থ ভারতের কোন সঙ্গীতজ্ঞ আজ পর্য্যন্ত লিখেন নি। সুলেখক এবং সুকবি হিসাবে গোপেশ্বর বাবু সুপরিচিত। তাঁর রচিত বাঙ্গলা, হিন্দী, ভজন গান সমূহ ভারতীয় সঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ। সাহিত্য তিনি চিরদিনই ভালবাসেন। স্বর্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "সঙ্গীত-প্রকাশিকা," "আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা" প্রভৃতি সঙ্গীত মাসিক পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিক ভাবে স্বরলিপি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাসী প্রভৃতি বাঙ্গলার বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর গান ও সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা বর্ত্তমান যুগের সঙ্গীত ক্ষেত্রে এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। তাঁর চিন্তাধারা ভারতীয় সঙ্গীতকে নিয়ে চলেছে প্রগতির পথে। ওস্তাদপন্থীদের অন্ধ গোঁড়ামিকে তিনি কোন দিনই আমল দেন নি। সঙ্গীতকে সর্ব্বতোভাবে শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন করাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। 'বসুমতী'র সহিত তাঁর যোগাযোগ বহু দিনের। গোপেশ্বর বাবু একদিন বললেন—বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন, আমার গান ও লেখা তিনি আগ্রহ সহকারে ছাপাতেন, একদিন তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, "দেখ, ইনি বড় গুণী লোক, এঁর সম্মান রাখবে" বলা বাহুল্য, বন্ধুবর সতীশ বাবু সে কথা আজীবন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে গেছেন। বসুমতী আমি আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকি এবং বাঙ্গলায় শ্রেষ্ঠ পত্রিকা বলে বিবেচনা করি। এখন পর্য্যন্ত 'বসুমতী'তে কিছু না লিখলে আমার কর্ত্তব্যচ্যুতি হল মনে করি।"

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সহিত বিশেষতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তদীয় ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়দ্বয়ের সহিত গোপেশ্বর বাবুর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোপেশ্বর বাবু কবিগুরুর গান গেয়ে যেমন আনন্দ পেতেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানের ছিলেন এক পরম ভক্ত। কলকাতা এলেই তাঁর ডাক পড়ত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। গোপেশ্বর বাবু গানের পর গান গেয়ে যেতেন এবং কবি তন্ময় হয়ে শুনতেন। এক এক দিন কবির ঘরে ছোটখাট আসরই জমে যেত। সাহিত্যিক, কবি, গুণী, জ্ঞানী কত আসতেন কবিগুরুর দর্শন মানসে, তার শুনে যেতেন বাঙ্গালা তথা ভারতের এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীর অপরূপ সুরমাধুরী। গোপেশ্বর বাবু এক কালে সুরবাহার ও সেতারে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন এ কথা অনেকের অবিদিত। তাঁর রচিত বহু আগমনী ও শ্যামাসঙ্গীত His Master Voice ও Hindusthan রেকর্ড করে প্রকাশিত হয়েছিল। এক সময়ে এইগুলি বাঙ্গলা ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আদর্শ ছিল।

গোপেশ্বর বাবু নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। ১১:৮ সালে, বেনারসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে, তিনি প্রথম বাঙ্গালী আমন্ত্রিত হন। ঐ সম্মেলনে তিনি ভারতের এক জন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীরূপে সম্মান লাভ করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—উক্ত অধিবেশনে গোপেশ্বর বাবু এবং তৎকালীন ভারত প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী আলাবন্দে খাঁ সাহেব, তুল্য সম্মান লাভ করেছিলেন। স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ঠাকুর, নবাব আলি খাঁ, শিবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ গোপেশ্বর বাবুকে বিশেষ সম্মান করতেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে গোপেশ্বর বাবুর প্রণীত সঙ্গীত-চন্দ্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত প্রবর্তনের তিনি এক জন প্রধান উদ্যোক্তা।

গোপেশ্বর বাবু—"সঙ্গীতনায়ক" 'স্বর-সরস্বতী' "সঙ্গীত-সম্রাট" Doctor of Music প্রভৃতি পদবীতে ভূষিত হয়েছেন।

বর্দ্ধমান রাজদরবার ব্যতীত তিনি নাটোর, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি দরবারে সভাগায়ক ছিলেন। প্রায় ২১।২৮ বৎসর বর্দ্ধমানে সভাগায়ক থাকবার পর তিনি বহু ত্যাগ করেন। তৎকালীন বাঙ্গলায় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যালয় 'সঙ্গীত-সঙ্ঘের' তিনি হলেন অধ্যক্ষ। রাজ-দরবারের গণ্ডী ছেড়ে তিনি সাধারণের মধ্যে এসে পড়লেন। স্বাধীন ভাবে দেশে ও দশের মধ্যে সঙ্গীত প্রচার করাই তাঁর জীবনের এক মাত্র ব্রত হল। এখন তাঁর বয়স ৭৬ বৎসর। ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও তিনি সাধনা ও শিক্ষাদানে নিমগ্ন আছেন। ১৯৫৪ সালে দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর গান এখনও ভারতের বেতার-শ্রোতাদের কর্ণে বাজছে। বিষ্ণুপুর 'রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' তাঁর আর এক কীর্ত্তি। তিনি বলেন, সঙ্গীতেই তাঁর জীবনের সার ধর্ম, সঙ্গীত তাঁর পরিচয়। ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অনন্যসাধারণ দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে মাসিক পেন্সন দিয়া থাকেন।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন

ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সহরে গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে-এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন হইয়া গেল, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন যে উঠে নাই তাহা নয়। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সম্মেলনকে শুধু ঐতিহাসিক সম্মেলন বলিলেও উহার গুরুত্ব সঠিক ভাবে বুঝানো সম্ভব হয় না। অতীত ইতিহাসে এই ধরণের সম্মেলন আর কখনও হয় নাই। ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে নয়াদিল্লীতে এশিয়া-সম্মেলন হইয়াছে বটে, কিন্তু বান্দুং সম্মেলনের গুরুত্ব উহা অপেক্ষা বহু গুণে বেশীই শুধু নয়, উভয়ের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে অবশ্য ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রুসালস্ সহরে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী লীগের সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শুধু ইউরোপে এবং ইউরোপীয় পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় নাই, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি তখনও সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনে নিপীড়িত হইতেছিল। তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় এবং প্রয়োজনের তাগিদে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাই। এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীন ইচ্ছায় এবং তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে। ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া সম্মেলনের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে, সেগুলি সকলেরই জানা কথা। এখানে সেগুলির উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ সকল ঘটনা হইতে উদ্ভূত শক্তিই যে বান্দুং-সম্মেলনে প্রতিফলিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির যে একটি সম্মেলন হইয়াছিল, বান্দুং-সম্মেলনের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহার কথাও আমাদের মনে না পড়িয়া পারে না। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির ঐ সম্মেলন হইয়াছিল, ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার ঐক্যবদ্ধ দাবী জানাইবার জন্য। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির ঐক্যবদ্ধতা প্রথম পরিস্ফুট হয় এই সম্মেলনে। এই ঐক্যবদ্ধ দাবীর সাফল্য ঘোষণা করিয়া ডাচেরা ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। সেই ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সহরে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হওয়া যেমন তাৎপর্য্যহীন নয়, তেমনি এই সম্মেলনের সাফল্যের কথা আলোচনা করিতে হইলে উহার বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিয়া দেখাও একান্ত প্রয়োজন। প্রথমে আমরা সম্মেলনের বৈশিষ্ট্যের কথাই আলোচনা করিব। এই সম্মেলনে যে ২৯টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করিয়াছেন তাহাদের দ্বারাই এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্মেলনের আহ্বায়ক পাঁচটি দেশ সহ এশিয়া ও আফ্রিকার নিম্নলিখিত ২৯টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল: ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, সিংহল, আফগানিস্থান, কাম্বোডিয়া, লোকায়ত্ত চীনা প্রজাতন্ত্র, মিশর, ইথিওপিয়া, গোল্ডকোষ্ট, ইরাণ, ইরাক, জাপান, জর্ডান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সৌদী আরব, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, তুরস্ক, গণতন্ত্রী ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ ভিয়েটনাম এবং ইয়েমেন। এই দেশগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ যাহারা সামরিক চুক্তির বিরোধী এবং সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়তঃ যাহারা সামরিক চুক্তির সমর্থক এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বার্থের রক্ষক। এই দুইটি শ্রেণীর দেশগুলি ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলির কোন সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নীতি আছে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহাদের নীতিকে আমরা দোদুল্যমান নীতি বলিতে পারি। এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও সুদৃঢ় নহে, এ কথা বলিলে মোটেই ভুল হয় না। যে সকল কারণে এই ২৯টি দেশকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি সেগুলির দ্বারাই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলির আদর্শগত বিভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যের কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। কাজেই এই সম্মেলনে মতভেদ হইবে না, এতখানি দুরাশা বোধ হয় কেহই করেন নাই। মতভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে, যদি বিভিন্ন পক্ষ তাহাদের দাবী কিছু কিছু ছাড়িতে রাজী হন। বান্দুং সম্মেলনে তাহা হইয়াছে কি না সে কথাও বিবেচনা করিতে হইবে।

যে-সকল দেশ পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বার্থের রক্ষক এবং সামরিক চুক্তির পক্ষপাতী তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ যে তাঁহাদের গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সম্মেলন সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। এই নির্দ্দেশের সামান্য এদিক-ওদিক করিবার অধিকারও তাঁহাদের ছিল না। সম্মেলনে আলোচনার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কথা এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন মতভেদ হইবে না, এই আশাও পূর্ণ হয় নাই। কয়েকটি দেশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংজ্ঞাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে সোভিয়েট রাশিয়ার উপনিবেশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ফরাসী উপনিবেশ টিউনিশিয়াকে যাঁহারা একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন তাঁহারাই আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিতে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মতভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধান না করিয়াও যে-ভাবে সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা ২৪শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত করা হইয়াছে তাহাতে রচনার মুন্সিয়ানা-ই শুধু আছে এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই উহার প্রধান সাফল্য। সম্মেলনে যোগদানকারী কতগুলি দেশের পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত গাঁটছড়া বাঁধা থাকা সত্ত্বেও এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির প্রতিনিধিরা একত্রে মিলিত হইতে পারিয়াছেন, পরস্পরের অভিমত শুনিয়াছেন, তাঁহাদের সমস্যাবলী লইয়া আলোচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহা বড় কম কথা নয়। ইহা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রথম চেষ্টা। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, একথা অবশ্যই বলা চলে না।

বান্দুং সম্মেলনের নিকট অত্যধিক প্রত্যাশা কেহ যদি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে সম্মেলনের ফলাফল দেখিয়া তাঁহার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সম্মেলনের নিকট কি প্রত্যাশা করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে বোগোর সম্মেলনের কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলম্বো শক্তি পঞ্চক অর্থাৎ ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহল বোগোর সম্মেলনে সমবেত হইয়া এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বান্দুং সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোগোর সম্মেলনে গৃহীত ২৯শে ডিসেম্বরের (১৯৫৪) ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা, তাহাদের পারস্পরিক ও অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর আলোচনা করাই এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের লক্ষ্য। পরস্পরের মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়াও উহার অন্যতম লক্ষ্য। আর একটি উদ্দেশ্য বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। বান্দুং সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত কি ভাবে গৃহীত হইবে, বোগোর সম্মেলনে তাহাও স্থির করা হয়। কোন এক বা একাধিক দেশ যদি কোন অভিমত প্রকাশ করেন তাহা অন্যান্য দেশ ইচ্ছা না করিলে বাধ্যকর কিম্বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ তাহাদের আদর্শ ও সরকারী নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে বান্দুং সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বান্দুং সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে একথা স্বীকার করা যায় না।

বান্দুং সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে ২৪শে এপ্রিল তারিখে যে সুদীর্ঘ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা 'শান্তি ও ঐক্যের বাণী' বলিয়া অভিহিত। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কোনও একটি বৃহৎ শক্তির স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমষ্টিগত রক্ষা ব্যবস্থা চলিবে না এবং উহার জন্য কোন দেশ অপর দেশের উপর চাপ দিতে পারিবে না। বিশ্বশান্তি ও পরমাণু যুদ্ধ সম্পর্কে ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতার প্রশ্নটি সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সহিত বিবেচনা করিয়াছেন এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনায় এবং পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কায় সম্মেলনে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হইয়াছে, ব্যাপক ধ্বংসের হাত হইতে মানব জাতি ও সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য নিরস্ত্রীকরণ এবং আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও উহার পরীক্ষা কার্য্য নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া সম্মেলন মনে করেন। সম্মেলনে বিঘোষিত দশটি নীতির ভিত্তিতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সহিত পাশাপাশি বসবাস করা এবং সহনশীল মনোভাব অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতি উনত্রিশটি দেশ আহ্বান জানাইয়াছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য দূর করিতে তথাকার অধিবাসীদের দৃঢ় সঙ্কল্প সমর্থন করা হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পশ্চিম নিউগিনির উপর ইন্দোনেশিয়ার দাবী সমর্থন করিয়া এ সম্পর্কে সত্বর পুনরায় আলোচনা চালাইবার জন্য ওলন্দাজ সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। আলজিরিয়া, মরক্কো ও টিউনিসিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে এই অধিকার দিবার জন্য ফ্রান্সকে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্যালেস্টাইন আরব সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সম্মেলনের শেষ মুহূর্তে যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন রূপে ঔপনিবেশিকতাকে দুষ্টগ্রহ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে এই ঔপনিবেশিকতার অবসান দাবী করা হইয়াছে।

সম্মেলনে যাহা গৃহীত হইয়াছে তাহা এখানে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। কিন্তু যাহা গৃহীত হয় নাই তাহাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে কম্যুনিজমের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তুরস্ক, ফিলিপাইন, ইরাক প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কম্যুনিজমকে এক নূতন ধরণের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ হিসাবে গণ্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্মেলনে উহা গৃহীত হয় নাই। সম্মেলনে যে সহাবস্থানের নেহরু-চৌ পঞ্চনীতি গৃহীত হয় নাই, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সম্মেলনের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, সহাবস্থানের পঞ্চনীতি যাহাতে গৃহীত না হয় তাহার জন্য দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বতোভাবে বাধা দিবার জন্য কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি মণ্ডলী যে তাঁহাদের গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ পাইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে এই নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছেন, একথাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিতে যাইয়া পাকিস্তান তো ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে ত্রুটি করে নাই। তবে একথা অবশ্যই বলিতে পারা যে, 'সহাবস্থান' কথাটা বাদ দেওয়া হইলেও শান্তি ও সহযোগিতার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সম্মেলনে গৃহীত দশ নীতির মধ্যে সহাবস্থানের নীতি বর্ণচোরা আমের মতই লুক্কায়িত রহিয়াছে। নীতি-দশকের এই ব্যাখ্যা যে অবশ্যই করিতে পারা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'সহাবস্থান' কথাটি পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রভূত প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সমষ্টিগত রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোষণার মধ্যেও। উহাতে সামরিক চুক্তির নিন্দা করা হয় নাই, বরং সমষ্টিগত রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কোন বৃহৎ শক্তির স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমষ্টিগত (Collective) রক্ষা-ব্যবস্থা চলিবে না বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা দ্বারা 'সিয়াটো' এবং প্রস্তাবিত 'মেডো'র (MEDO) নিন্দা করা হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, আঞ্চলিক সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইলেও 'সিয়াটো' চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি এই চুক্তিকে তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিবে। কথাটা খুবই ঠিক। এ কথাও সত্য ঠিক যে, বান্দুং সম্মেলন হইতে 'সিয়াটো' প্রভৃতি আঞ্চলিক সামরিক চুক্তিগুলি কোন নৈতিক সমর্থন লাভ করা হইতে বঞ্চিত হইল। কিন্তু সহাবস্থান নীতির বিরোধী ও সামরিক চুক্তির সমর্থক পক্ষ যেমন মনে করিতেছেন সম্মেলনে তাঁহারাই জয়লাভ করিয়াছেন, তেমনি অপর পক্ষ ভাবিতেছেন জয়লাভ হইয়াছে তাঁহাদের ই। ইহা শুধু ঘোষণা রচনার কুশলতার জন্যই সম্ভব হইয়াছে তাহা নয়। সহাবস্থান নীতির বিরোধী এবং আঞ্চলিক সামরিক চুক্তির সমর্থকদের সংখ্যা আটটি রাষ্ট্রের বেশী নয়। অবশিষ্ট ২১টি রাষ্ট্রের উপর তাহারা যে কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মেলন যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তাহার জন্য তাহারা যতটুকু প্রভাবিত হইতে চাহিয়াছেন তাহার বেশী তাহারা প্রভাবিত হন নাই।

বান্দুং সম্মেলনে মতভেদ যে হইবেই সে-সম্বন্ধে সন্দেহ যেমন কাহারও ছিল না, তেমনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের উপরেই সম্মেলনের সাফল্য বিশেষরূপে নির্ভর করিয়াছে। বিরোধীপক্ষের দাবীর সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কতটুকু তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন, তাহা তাঁহারা বিশেষ ভাবেই জানিতেন। এই সীমা তাঁহারা কোন সময়েই অতিক্রম করেন নাই। তাঁহাদের এই নীতির জন্যই সহাবস্থান নীতির বিরোধীদল সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দিবার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপাইবার সাহস করেন নাই। সামঞ্জস্য... জন্য দর কষাকষি যে হয় নাই তাহা নয়। এই দরকষাকষির মধ্যে মতৈক্যের গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। বান্দুং সম্মেলনের ইহা বড় কম সাফল্য নয়। সাম্রাজ্য রক্ষা এবং কম্যুনিজম বিরোধিতার সুদৃঢ় বন্ধন সত্ত্বেও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতভেদ হয় না, একথা কেহই বলিতে পারিবে না। বান্দুং সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও একমত হইয়া তাঁহারা যাহা বলিতে পারিয়াছেন তাহার মূল্যও বড় কম নয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এশিয়া-আফ্রিকা এই বাণীকে কতটুকু মূল্য দিবে তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা বড়ই কঠিন। কিন্তু বান্দুং সম্মেলনে

অশ্বেতকায়দের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বলিলে ভুল বলা হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে শ্বেতকায়দের প্রাধান্য। শ্বেতকায়দের প্রাধান্য হইতে মুক্ত অবস্থায় এই সর্বপ্রথম এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সম্মেলন হইল। বান্দুংয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার নব শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে কি না, বান্দুং সম্মেলন বিশ্ববিরোধের আশঙ্কা হ্রাস করিয়াছে কি না, সে-বিষয় মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু বান্দুংয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার নবশক্তি অভ্যুদয়ের সূচনা হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই সম্মেলনকে ব্যর্থ করিবার গোপন প্রয়াস যে একেবারেই চলে নাই, তাহাও বলা যায় না। এই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। মানবজাতির বৃহত্তর অর্দ্ধাংশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নৈতিক শক্তিকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার শক্তিতে শক্তিশালী পশ্চিমী শক্তির পক্ষেও বড় সহজ হইবে না। এই সম্মেলন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। যত সামান্য রকমেই হউক বান্দুংয়ে এই ঐক্যের সূচনা দেখা গিয়াছে। ইহাই বান্দুং সম্মেলনের বৃহত্তম সাফল্য।

বান্দুং সম্মেলন ও ফরমোসা—

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার ন্যায্য আসন দিবার জন্য দাবী করিয়া কোন প্রস্তাব যেমন উপস্থিত করা হয় নাই, তেমনি ফরমোসা সমস্যা সম্পর্কেও কোন আলোচনা হয় নাই। এদিক দিয়া কলম্বো সম্মেলনের সহিত এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের পার্থক্য বিশেষ ভাবেই মনে পড়ে। কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন দেওয়ার প্রস্তাবে বান্দুং সম্মেলনে গুরুতর মত ভেদ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল বলিয়াই হয়ত উহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্য কোন প্রস্তাব করা হইল না কেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা খুব সহজ নয়। অবশ্য সম্মেলনের বাহিরে যে এ সম্পর্কে কোন চেষ্টা একেবারেই হয় নাই তাহা নয়। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটেলেওয়ালা এসম্পর্কে একটি বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং ফরমোসা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁহার নিজেরও একটি প্রস্তাব ছিল। তিনি এক অষ্ট শক্তির বৈঠকের প্রস্তাব করেন। কলম্বো শক্তি পঞ্চক, চীন, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড এই-আট-দেশ লইয়া যে-বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব তিনি করেন কার্যাতঃ তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ২১শে এপ্রিল (১৯৫৫) এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা স্যার জন কোটেলেওয়ালা প্রকাশ করেন। তাঁহার পরিকল্পনাটি ফরমোসার জন্য ট্রাষ্টিশিপ গঠনের পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার কথা এই যে, ফরমোসা কম্যুনিষ্ট চীনেরও নয়, চিয়াং কাইশেকেরও নয়। ফরমোসাকে ফরমোসার অধিবাসীদের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে একটি ট্রাষ্টিশিপ গঠিত হইবে এবং গণভোট গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত ফরমোসা থাকিবে ট্রাষ্টিশিপের হাতে। তাঁহার প্রস্তাবিত এই স্বাধীন ফরমোসার বাদশা চিয়াং কাইশেকই থাকিবেন কি না, তাহাই শুধু তিনি বলেন নাই।

সময়ের অভাবেই নাকি তাঁহার প্রস্তাবিত ফরমোসা সম্পর্কে অষ্ট-শক্তির বৈঠক হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্যার জন কোটেলেওলা ফরমোসা সংক্রান্ত তাঁহার পরিকল্পনা সম্পর্কে জওহরলালজী এবং চৌ-এন লাইয়ের সহিত আলোচনা না করিয়াই অষ্টশক্তির বৈঠকের প্রস্তাব করেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহার পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেন। তাঁহার পরিকল্পনা ও বৈঠকের প্রস্তাবের উপর কেহই কোন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু চৌ-এন লাই এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে সম্মত হইতে বিলম্ব করেন নাই। বোধ হয় এই সূত্র ধরিয়াই তিনি ২৩শে এপ্রিল এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, চীনের জনগণ মার্কিণ জনগণের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করে। তাহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ চায় না। সুদূর প্রাচ্যে, বিশেষ করিয়া তাইওয়ান অঞ্চলে উত্তেজনার ভাব হ্রাস করার প্রশ্ন লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলোচনা চালাইতে চীন গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত আছেন। সিংহল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং থাইল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি এই বিবৃতি প্রচার করেন। তাঁহার এই প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দ্রুততার সহিত চৌ-এন লাইয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেন তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্র বিভাগের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে ফরমোসা সম্পর্কে চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধি
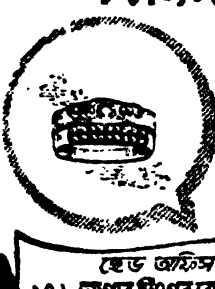
উপস্থিত থাকার দাবী করিবে। এইরূপ দাবী যে কার্য্যতঃ চীনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, ফরমোসা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত বৈঠকে তিনি যোগদান করিবেন না। আবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদী চীন ছাড়া তাঁহারা বৈঠকে যোগ দিবেন না। ব্যাপারটা সত্যই ভারী চমৎকার। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস অবশ্য গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৫৫) বলিয়াছেন যে, ফরমোসা প্রণালীতে যুদ্ধবিরতির জন্য কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত সরাসরি আলোচনা করিতে আমেরিকা রাজী আছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারও বলিয়াছেন (২৭শে এপ্রিল) যে, তিনি মিঃ ডালেসের সহিত একমত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বান্দুং সম্মেলনে চীনের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পর পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে যে-বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে চীনা জাতীয়তাবাদীদের ফরমোসা এলাকা সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদানের আবশ্যকতা সম্পর্কিত ঘোষণার ভাষায় হয়ত ভুল ছিল। তিনি মনে করেন, "ফরমোসা প্রণালীতে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী চীন সরকার জড়িত নহেন। কারণ জাতীয়তাবাদী চীন সৈন্য খাস চীন আক্রমণ করিবে না।" প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের উল্লিখিত উক্তি সত্ত্বেও ফরমোসা সম্পর্কে চীনের সহিত আমেরিকার আলোচনার সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এদিকে গত ১০শে এপ্রিল (১৯৫৫) মার্কিণ জয়েন্ট চীফ অব ষ্টাফের চেয়ারম্যান এডমিরাল র‍্যাডফোর্ড এবং রাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব মিঃ ওয়াল্টার রবার্টসন হঠাৎ ফরমোসা গিয়াছেন। উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশ নাই। কুময় ও মাৎসুদ্বীপদ্বয় পরিত্যাগ করা সম্পর্কে বৃটিশ মতবাদের দিকে মার্কিণ মতবাদ ভিড়িতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। সে-সম্পর্কে চিয়াং কাইশেকের মত কি তাহা জানাই নাকি তাঁহাদের ফরমোসা যাওয়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠার জন্যই যে তাঁহারা তাড়াতাড়ি ফরমোসা যাইতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিসের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর হইতে একটা কথা খুবই শোনা যাইতেছে যে, চীনের উপকূল ভাগে শান্তি রক্ষিত হইলে ফরমোসার স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার জন্য বৃটেন এবং কমনওয়েলথের একটি বা দুইটি দেশ সামরিক গ্যারান্টি দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের নামও উঠিয়াছে। ইহাতে আমেরিকার রাজী হইতে আপত্তি হয়ত হইবে না। কিন্তু সমস্যা হইয়াছে চিয়াং কাইশেককে লইয়া। চিয়াংয়ের বিমানবাহিনী যে চীনের উপকূল ভাগে হানা দিবে না সে-সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া কঠিন। অবশ্য মার্কিণ তাঁবেদার চিয়াং প্রত্যক্ষ মার্কিণ নির্দ্দেশ অমান্য করিতে সাহস করিবে, ইহাও কল্পনা করা কঠিন। অনেকে মনে করেন যে, এ সম্পর্কে চিয়াং কাইশেককে রাজী করাইবার উদ্দেশ্যেই এডমিরাল র‍্যাডফোর্ড এবং মিঃ রবার্টসন স্থিতাবস্থা ফরমোসা গিয়াছেন। ফরমোসা সম্পর্কে বজায় রাখাই যে বর্ত্তমানে বৃটিশ ও মার্কিণ নীতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

বান্দুং সম্মেলনের প্রাক্কালে বিমান ধ্বংস—

বান্দুং সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন কোন বৃটিশ ও মার্কিণ সংবাদপত্র উহাকে "সিরিয়ো কমিক" অনুষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের কাশ্মীর প্রিন্সেস নামক বিমানখানি গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫৫) সারওয়াক উপকূলের অদূরে বিধ্বংস হওয়ার ঘটনাটি শুধু গুরুতরই নয়, মর্ম্মান্তিকরূপে শোচনীয়। এই বিমানখানিতে বান্দুং সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি দলের পূর্ব্বগামী অফিসারগণ ছিলেন। বিমানখানি হংকং হইতে জাকার্ত্তা যাইতেছিল। কাশ্মীর প্রিন্সেস যে-দুর্ঘটনায় পতিত হয় তাহাকে সাধারণ বিমান দুর্ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষ হইতে যে-অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। নিউ-চায়না নিউজ এজেন্সী ১৩ই এপ্রিল (১৯৫৫) এই অভিযোগ করেন যে, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা প্রতিনিধি দলকে হত্যা এবং এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন পণ্ড করিবার জন্য যে চক্রান্ত করা হয় উক্ত বিমান ধ্বংস হওয়া সেই চক্রান্তের ফল। এই অভিযোগটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। উক্ত নিউজ এজেন্সীর সংবাদে আরও প্রকাশ যে, চীন গবর্ণমেন্ট বান্দুং গামী বিমান ধ্বংসের চক্রান্তের কথা জানিতে পারিয়া গত ১০ই এপ্রিল (১৯৫৫) পিকিংস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতকে বিষয়টি জানাইয়াছিলেন এবং হংকংয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যাহাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র ১২ই এপ্রিল (১৯৫৫) লণ্ডনে স্বীকার করিয়াছেন যে, পিকিংস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতকে এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনালের বিমানখানি দুর্ঘটনায় পতিত হইতে পারে, এ সম্পর্কে হংকং সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগকেও এই আশঙ্কার কথা জানান হইয়াছিল। তবে 'স্যাবোটাজ' কথাটি ব্যবহার করা হয় নাই। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও হংকং সরকার কেন সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, তাহা সত্যই বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। পূর্ব্বে সতর্কতা অবলম্বন করিলে বিমানখানিকে রক্ষা করা এবং প্রাণহানি নিরোধ করা হয়ত সম্ভব হইত। বিমানখানির ইঞ্জিন বা তৈল বা অন্য কোন যন্ত্র বিকল হওয়ার ফলে এই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড যে ঘটে নাই, তাহা এয়ার ইণ্ডিয়া লেনদেনের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানখানির যে তিন জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের মতে যে-বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমানখানি ধ্বংস হইয়াছে বিমানখানির কাঠামোর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, উহা বাহিরের সূত্র হইতে ঘটিয়াছে।

এই বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়া গবর্ণমেন্ট তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদন্তের ফলাফল জানিবার জন্য বিশ্ববাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই বিমান দুর্ঘটনার ফলে বান্দুং-এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কঠোর তর

করা হইয়াছিল। সম্মেলনের প্রাক্কালে বিমান দুর্ঘটনা অশুভ-সূচক বলিয়া মনে হইলেও সম্মেলন নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়াছে।

বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলন—

পৃথিবীর বৃহৎ সমস্যা সমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে আলোচনা করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স গত ১০ই মে (১৯৫৫) রাশিয়াকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়াছে। উক্ত আমন্ত্রণপত্রে পৃথিবীর বৃহৎ সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য এক নূতন পদ্ধতি সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এই বৈঠক বসিবে অষ্ট্রিয়া শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। পশ্চিমী শক্তিবর্গ মনে করেন, অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্যেই শান্তির জন্য রাশিয়ার আগ্রহ যে খাঁটি, তাহা প্রমাণিত হইবে। এদিকে রাশিয়া মনে করে, প্যারী-চুক্তি অনুমোদিত হইয়া পশ্চিম জার্ম্মাণী সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইলে জার্ম্মাণী স্থায়ী ভাবে বিখণ্ডিত হইয়া ইউরোপকেও বিখণ্ডিত রাখিবে।

গত ৫ই মে (১৯৫৫) পশ্চিম জার্ম্মাণী সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। প্যারী-চুক্তি অনুমোদিত হওয়ায় দলিলগুলি বৃটেন ও ফ্রান্সের হাই-কমিশনার চ্যান্সেলারীতে দাখিল করায় পশ্চিম জার্ম্মাণীর দখলকার অবস্থার অবসান হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্ব্বেই এই কার্য্য সমাধা করিয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মাণী শুধু সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রেই পরিণত হয় নাই, উত্তর আটলাণ্টিক পরিষদেও আনুষ্ঠানিক ভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছে। রাশিয়ার সহিত বৈঠকে মিলিত হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজী হওয়ার ইহাই সম্ভব কারণ। এদিকে পূর্ব্ব-ইউরোপের আটটি কম্যুনিষ্ট দেশ পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ১১ই মে (১৯৫৫) ওয়ারশতে সম্মিলিত হইয়াছেন। এই তারিখেই পরমাণু অস্ত্র ও অস্থান্য অস্ত্র বর্জ্জনের জন্য রাশিয়া এক নূতন প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছে। বৃটেন অবশ্য এই নূতন প্রস্তাবকে অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক বলিয়া মনে করে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন, ইহা আশা করা কঠিন। ইহাতে বিদেশস্থ সমস্ত সামরিক ঘাঁটি তুলিয়া দেওয়ার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, আমেরিকা উহা আদৌ পছন্দ করিবে না। ধাপে ধাপে কিরূপে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা হইবে, তাহা লইয়াও গুরুতর মতভেদের আশঙ্কা রহিয়াছে।
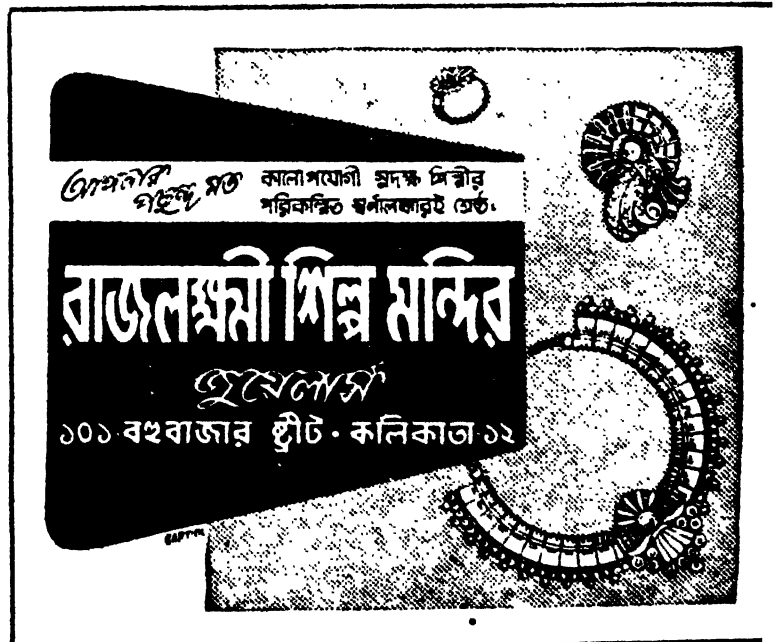
গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্থানে বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের সর্ব্বোচ্চস্তরে সম্মেলন হইবে। পটসডাম সম্মেলনের পর এ পর্য্যন্ত বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের সর্ব্বোচ্চস্তরে সম্মেলন আর হয় নাই। ১৯৪৫ সালের অবস্থার সহিত ১৯৫৫ সালের অবস্থার গভীর পার্থক্য বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ঠাণ্ডা-যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এই প্রথম মার্কিণ প্রেসিডেন্টের রুশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত বৈঠকে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই বৈঠক সাফল্য মণ্ডিত হইবে কি না, বলা কঠিন। কিন্তু পরমাণু যুদ্ধ নিরোধ যে এই সম্মেলনের উপরেই নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ ভিয়েটনামে গৃহযুদ্ধ—

দেড় মাসেরও অধিক কাল হইল দক্ষিণ ভিয়েটনামের ক্ষমতা লাভের জন্য যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে তাহার কোন সমাধান আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। গত ৪ঠা মে তারিখের এক সংবাদে বলা হইয়াছিল, দক্ষিণ ভিয়েটনামের জাতীয় সৈন্যবাহিনী বিন্‌হুয়েন বে-সরকারী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। এই জয়লাভই যে চূড়ান্ত তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ ছিল না। ১১ই মে তারিখের সংবাদ প্রকাশ, দক্ষিণ ভিয়েটনামে সায়গনের নিকট দক্ষিণ ভিয়েটনাম সরকারী বাহিনী ও হোয়া হোয়া বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

দক্ষিণ ভিয়েটনামের এই গৃহযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ ভাবে ডিয়েম গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতেছে। ফ্রান্সের পরোক্ষ সমর্থন পাইয়াছে বে-সরকারী সৈন্যবাহিনী। এই ব্যাপারে ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। প্যারী হইতে ১১ই মের সংবাদ প্রকাশ, দক্ষিণ ভিয়েটনাম সম্পর্কে ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য হইয়াছে। দিন দিয়েমের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রসারণের প্রস্তাবে ফ্রান্স মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং আমেরিকাও বাওদাইকে বহাল রাখিতে রাজী হইয়াছে। এই মতৈক্যের ফলে কি ভাবে গৃহযুদ্ধের সমাধান হইবে, তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন হইবে না। ডিয়েম ভয়ানক কম্যুনিষ্ট বিরোধী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহার গবর্ণমেণ্টই যে বহাল থাকিবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

রঙ্গপট

নায়ক-নায়িকার সংজ্ঞা কি ?

তারিখ কি সন ঠিক মনে নেই, বছর পাঁচেক আগের কথা, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যর উইনষ্টন চার্চিলের কন্যা সারা চার্চিল একবার এসেছিলেন হলিউডে অভিনয় করতে। হলিউড থেকে তাঁর দেহের কয়েকটি দোষ দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, এই দোষগুলি যেমন অতিরিক্ত মেদবহুল চেহারা, কর্কশ কথা, পেশীগুলির অসমবর্দ্ধিত রূপ ইত্যাদির কারণে হলিউডে তাঁর স্থান হবে না। সেই সঙ্গে কল্পনা করি আমাদের দেশের কোনও পরিচালক-গোষ্ঠীর কথা। প্রধান মন্ত্রী তো অনেক বেশী, শুধু মন্ত্রী এমন কি কোনও উপমন্ত্রীর।···সে কথা থাক, নায়ক-নায়িকা গ্রহণের কি কোনও সংজ্ঞা নেই ? কোনও মাপকাঠি ? অমুকের চোখ ঠিক কানন দেবীর মত। অমুক কথা বললে অমৃত ঝরে। অমুক অমুকের অমুক ? এই কি যোগ্যতার মাপকাঠি ? বিদ্যা, বুদ্ধি, দৈহিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ, সৌন্দর্য্য, অভিনয়-ক্ষমতার কি কোনও দাম নেই তবে ? সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী তো ঘটা করে খোলা হল। খাকা-খাওয়া-বৃত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও তো স্থান পাওয়া গেল। দেখি এবার কিছু হয় কি না প্রতিকার।

চিত্রাঙ্গদা কেন 'ফেল' করলো ?

সারা বাঙলা জুড়ে আজ ওই এক কথা, চিত্রাঙ্গদা কেন 'ফেল' করলো ? সব সমালোচকই নিন্দা করছেন এক বাক্যে। আনন্দবাজার পত্রিকার সেই বিরূপ সমালোচনার অংশ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে ছবির কর্তারা আর এক দফা হৈ-চৈ তুলেছেন বাজারে। কাউকে ধরে-টেনেই হবে বোধ হয়, চিত্রাঙ্গদা ছবিটির কয়েকটি প্রিন্ট বিদেশী ভাষায় 'ডাব' করিয়ে অন্যান্য দেশে দেখাবার এক চেষ্টার কথাও শুনলাম। তাতে করে গোলমালই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটির আসল দিক নিয়ে মাথা ঘামান কি কেউ। আসলে ছবিটির গোড়ায় গলদ। চিত্রাঙ্গদা মোটেই সিনেমার উপযোগী গল্প নয়। সত্যি কথা বলতে চিত্রাঙ্গদার গল্প প্রায় নেই বললেই চলে। এরকম জিনিষকে শুধু মাত্র রবীন্দ্রনাথের নামেই বাজার গরম করা যাবে ভেবে পরিচালক ভুল করেছেন। এর আগেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছবি 'ফ্লপ' করেছে, তাও তাঁদের মনে করা উচিত ছিল। 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ' প্রভৃতিতে তবু একটু গল্প ছিল। কিছু ভাল 'ডায়লগ' ছিল। রূপকধর্মী গল্পের চিত্ররূপ অতি দুঃসাহসের কাজ। 'মাস' বিশেষ করে বাংলা দেশে তো তা নেবেই না। মেট্রোর ছবির 'রিলিজ' করার পেছনেও যেন একটা প্রচ্ছন্ন 'ট্রিক' দেবার চেষ্টা রয়েছে। এত করেও কিন্তু চিত্রাঙ্গদা 'ফ্লপ' করলো। এক্ষেত্রে পরিচালক-গোষ্ঠীর কাছে আমাদের একমাত্র নিবেদন, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। কখনো না।

কি ধরণের গল্প চাই ছায়াচিত্রের জন্য ?

ঠিক কি ধরণের গল্প আপনার চাই তাই বলুন তো ? শিকার কাহিনী, এ্যাডভেঞ্চার, ডিটেকটিভ এ-সবের কথা এখন বাদ দিন। ক্রাইম-ষ্টোরি কি কোনও শিল্পীর জীবনকথাও বাদ থাক। নেহাত ঘরোয়া গল্পের কথাই ধরা যাক। আজ বাংলা দেশে সব ছবি উঠছে, তার শতকরা আশীটি ছবির গল্পই কি মেয়েদের জন্য লেখা বলে মনে হয় না আপনার ? বিয়ে থাকবে, কম পক্ষে দু'বার চিতার আগুন দেখাতে হবে, একজন বিধবার চোখের জল থাকবে, ছেলে কি মেয়ে 'মা' বলে কিছুতেই ডাকতে চাইবে না অথচ ছবির শেষে তাকে তা ডাকতেই হবে, এ্যাকসিডেণ্ট (ছোট ছেলের গাড়ী চাপা পড়া দেখানোটাতেই সুবিধে), গরীব হয়ে খবরের কাগজ বিক্রি, রিক্সা টানা, শেষে আত্মহত্যা হতে হতে মিলন দেখাতে হবে। ব্যস, অমনি লেডিজ সেকেণ্ডক্লাস 'ফুল' সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। এ ছাড়াও সতীর পায়ের ছাপ, বাল্যবিধবার মূক ভালবাসা ইত্যাদি থাকলে তো একেবারে বক্স-অফিস হিট্। জিজ্ঞাসা করি, কি হচ্ছে এ-সব ? আর কত দিন এমনি করে চলবে ? এখনও হাল-ছেড়াবার দিন যায় নি। কি ধরণের গল্প সিনেমার জন্য বিশেষ উপযোগী তার কয়েকটা দিক নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো আগামী বারে।

বম্বে থেকে ফিরে আসছেন বাঙলার কলাকুশলীরা, কেন ?

ছবি যেখান থেকেই তোলা হোক না কেন, তা সে বোম্বাই, মাদ্রাজ কি কলকাতা যেখানেই হোক, ছবি কাটবে কলকাতার বাজারে। অর্থাৎ কলকাতাই মার্কেট। ছবির টাকার শতকরা প্রায় ষাট ভাগ উঠবে কলকাতার লোকের পকেট থেকেই। কিন্তু সেই কলকাতাতেই আজ হিন্দী ছবি প্রায় অচল। মধুবালা, নার্গিস, সুরাইয়া, সাকীলা, নলিনী জয়ন্ত এমন কি বীণা রায় থেকে মুনওয়ার সুলতানা, মেহতানা অবধি বাজার জমাতে পারছেন না। অশোককুমার, দেবানন্দ, বলরাজ সাহানীও প্রায় অচল

১৩ই মে হইতে সগৌরবে চলিতেছে

জ্যোতি ★ বসুশ্রী ★ বীণা

● ডিস্ট্রিবিউটার্স ● মেসার্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ● কলিকাতা—১ ●

...আজ চার রাস্তা থেকে থিয়েটার এ্যাণ্ড মিসেস ৫৫ অবধি কেউই সুবিধে করে উঠতে পারছে না। আলীবাবা চল্লিশ ...বাতুই চিরাগ, আলাদীনের দিন গত। স্বর্ণহরিণের লোভে ...বাংলার কলাকুশলীরা সকলেই বোম্বাই গিয়েছিলেন। ...অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে ক্যামেরাম্যান সব। কিন্তু এক ... করে তাঁরা আবার ফিরছেন। লঙ্কায় সোনা আর সস্তা নয়। ...নাচ, ক্যাবারে কি বিদেশী সিমফনী দিয়ে আর বাজার মাৎ ...গেল না। অতএব, সসম্মানে।···এবার কি করবেন তাঁরা? ...কুল-ওকুল রাখার চুঁকুলই যে গেল। বাংলা দেশ কিন্তু বড় ভাল। ...রা ফিরে আসছেন তাঁরা তো বাঙলারই। অনেক তো হোল! ...বার এখানেই আসর জমিয়ে বসুন। বাঙলা ছবির জন্য কিছু নতুনত্ব করুন দেখি!

সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমীর কর্তব্য কি?

গত ১লা বৈশাখ রবীন্দ্র-ভারতীতে সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক সংসদের উদ্বোধন করলেন প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। গত কয়েক বছর ধরেই ডাক্তার রায় নানা পরিকল্পনা, বহু গুণীজনের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন এবিষয়ে। বক্তৃতার উদ্বোধনে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন ক্লাবকে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন। অথচ আমরা জানি যে, তার খুব সামান্যই কাজে লাগে। সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমীর জন্য তিনি যথাক্রমে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়শঙ্কর ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে ভার দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে কাজের সুবিধার জন্য এক একটি উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠন করতে। বর্তমানে প্রতি বিভাগে কুড়ি জন করে ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া যাবে। থাকা-খাওয়া ছাড়াও একটি মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে তাদের জন্য। কিন্তু পাঠ্যবস্তু কি হবে, কোন যোগ্যতাবলী এখানে ছাত্রদের থাকা দরকার, কত বৎসর পড়তে হবে সে-সব এখনো ঠিক হয় নি। এখানকার ছাত্ররা বেরিয়ে রোজগার করবে কি ভাবে, তাও বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, সব দিক বিবেচনা করে তবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কোনও কিছু করতে বলি। আত্মীয় পোষণ, সরকারী অর্থের অপব্যয়, কতকগুলি বেকার সৃষ্টির জন্য শিখণ্ডীর মত যেন এই সংসদটিকে ব্যবহার করা না হয়।

বড়লোকের মেয়ে কিংবা গরীবলোকের ছেলে

'উদয়ের পথে'র আইডিয়া এখনো আমাদের কাঁধ থেকে নামে-নি। 'ছুঁচের মত সূক্ষ্মযন্ত্র দিয়ে কি আর দারিদ্র্যের মত বড়···' সেই সব বড় বড় গালভরা কথা নিয়ে ছবি রচনা করতে আজও আমরা ভালবাসি। আজও গরীবের ছেলে এবং বড়লোকের মেয়ের প্রেম···। বড়লোকের মেয়েটি সরল, শিল্পী-মন-সম্পন্ন, ভাবপ্রবণ। গরীবের ছেলেটিকে 'এম, এতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হতেই হবে। হয় ফার্ষ্ট, না গ্রাজুয়েটেড, সঙ্গে একটি বোন রাখতে হবে। আজও পরিচালক 'এমনি ধরণের গল্প খুঁজছেন। রামা-শ্যামা পরিচালক নন, একজন বিশেষ খ্যাতনামা পরিচালক আমাদের কাছে প্রেমের গল্প খুঁজতে এসেছিলেন। যে প্রেমে ওই বড়লোকের মেয়ে গরীবের ছেলে না হয় গরীবের মেয়ে বড়লোকের ছেলে আছে এমন, গল্প জোরালো হবে, কান্নাকাটি থাকবে, বিরহ-মিলন আরও কত কি! ফরমায়েসী গল্প-লেখকের হয়ত অভাব হবে না এবং তৈরী হবে আরও একখানি এক-রঙার ছবি যার নাম লেখা থাকবে 'উদয়ের পথে জাতীয় গল্পের' লিষ্টের অনেক অনেক নীচে।

"নাটক কেন লিখি না?"—শরৎচন্দ্র

জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র একবার লিখেছিলেন, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরী পোষাবে না। মনে করো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলছি। সংসারে টাকার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিক-পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্য পাব্লিসারের অভাব হবে না···গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গাটায় অকৃশন (action) কম,—দর্শক নেবে না, কিম্বা এ বই অচল হো তাকে সচল করার কোন উপায় নেই।···নাটক হয়তো আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানি নে তা নয়।···আর একটা কথা, উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়তো চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, করে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে এমন একটিও অভিনেত্রী তো নজরে পড়ে না! এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এ দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছা করে না; আশা করি, একদিন বর্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয়তো চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয় ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করি নে।

আজ থেকে বিশ বছর আগে শরৎচন্দ্র যা লিখেছিলেন এখনই কি তার খুব পরিবর্তন হয়েছে?

পরিশোধ

পরিচালনায় সহস্র ভুল। একমাত্র অনুভা দেবীর অভিনয় দর্শনীয়।

বিজয়গড় ষ্টেট থেকে একদিন ডাক এল। ডাক্তার চ্যাটার্জীকে যেতে হবে। কুমারের বড় বাড়াবাড়ি। সঙ্গে এক হাজার টাকা টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার করে। ডাক্তার চ্যাটার্জী আর ইহলোকে নেই তখন। তাহলে কি হবে? ডাক্তার চ্যাটার্জীর পুত্র জহর বাবু

অবশ্য ডাক্তারই। কিন্তু বাপের মত হাতযশ নেই। অতএব ডাক পড়লো শক্তিপদ কম্পাউণ্ডারের। ডাক্তারী পড়লে যিনি নাকি অনেক বড় বড় ডাক্তারকে ঘাল করতে পারতেন। গল্প শুরু হল বিজয়গড় ষ্টেটেই। ডাক্তার হরিশ চ্যাটার্জী যানে জহর বাবু মারা গেলেন হঠাৎ এবং শক্তিপদ কম্পাউণ্ডারই ডাক্তার হরিশ চ্যাটার্জীর নাম নিয়ে সারিয়ে তুললেন কুমার বাহাদুরকে। অবশ্য পরে তাঁকেও ধরা পড়তে হল। কিন্তু মহত্বের খাতিরে মার্জনা করা হল তাঁর অপরাধ এবং তিনি স্থায়ীভাবে প্রধান চিকিৎসকের পদ পেলেন নবনির্মিত বিজয়গড় ষ্টেট হাসপাতালে। গল্পের পাশে পাশে শক্তিপদ কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ডাক্তার হরিশ চ্যাটার্জীর শালীর (অনুভা দেবী) এক মৌন প্রেমেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আসলে গল্পটা 'ডবল লাইফ' গোছের এবং তাই হলেই গল্পটা জমতো ভাল। 'ক্রাইম' চৌর্যের বাজার আছেও এখানে। শক্তিপদ কম্পাউণ্ডারের উদার প্রকৃতিটা না দেখালেই যেন ভাল হোত বলে মনে হচ্ছে। অভিনয়ের দিক থেকে কিন্তু একমাত্র অনুভা দেবী ছাড়া আর কারুকেই প্রশংসা করা যাবে না। জহর গাঙ্গুলী এ ছবিটিতে কেমন যেন একটু ঢিলে ভাবে অভিনয় করেছেন। ছবি বিশ্বাসের ওই কায়দা করে কথা কওয়ার অভ্যেসটা না গেলে এ জাতীয় অভিনয়ে কখনই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন না। অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভয়ানক 'ফ্লেক্সিবল্' হওয়া দরকার। কোনও রকম মুদ্রা দোষই তার পক্ষে ক্ষতিকর। কায়দা করে চলা, বসা কি কথা কওয়া তো মারাত্মক রকমের 'ড্যামেজিং'। মঞ্জু দের 'নার্স'এর মতই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল যেন হাসপাতালের সবটুকু দায়িত্বই তাঁর একার হাতে রাণী ছেড়ে দিয়েছেন। বরং মোটামুটি মন্দ হয়নি পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়। পরিচালনায় বহু ভুল। যে ষ্টেট থেকে এক হাজার টাকা টি• এমও করা হয় ডাক্তারের ভিজিট দিয়ে আগাম আর টাকাটা ডেলিভারীই বা হল কি করে? তার গাড়ীর ঐ ছিরি! ক্লাস্, প্যাকার্ড কি সানবিম ট্যালবট্ জুটলো না! অন্ততঃ একখানা ডজ কি বুইক্। বিজয়গড় ষ্টেটের ঐটুকু তো রাস্তা তাতে অত-বড় একটা 'রোড্ ক্লোজড' কেন? যে রাজকুমারকে নিয়ে সব ঘটনা একবারও তার দর্শন মিলল না? রাণী বিশেষ করে ষ্টেটের মহারাণীরা যতদূর জানি প্রায়ই পর্দায় থাকেন না। তাঁকে দেখলাম না কেন? শুধু 'গেষ্ট হাউস' দেখিয়েই ছেড়ে দিলেন? যে ডাক্তারেরই চেয়ার-টেবিল বেচে দিন চলছে তাঁর কম্পাউণ্ডারের গায়ে বিলাতী টুইডের স্যুট্। ডাক্তারের নিজের স্যুট ধার দিয়েছেন যে তাও তো নয়। চেহারার অত তফাতেও বেশ চমৎকার 'ফিট' করেছে তো? অত রাত্রে 'স্যুট' দার পাওয়া গেল নাকি? বিজয়গড় ষ্টেটের রাস্তার ধারের ডাক-বাংলো, পাশের পায়ে-ওঠা পাহাড় সবই খুবই নীচু স্তরের সেটের কাজ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখাতে 'স্ক্রীণ' টানাতে হল? তাহলে আর ছবি তোলা কেন? অন্ততঃ আগে ছবি তুলে পরে ব্যাক-ভিউ প্রোজেক্ট করাও তো চলতো। বেশী আলোচনা না করে শুধু এই কথাই বলছি যে, এ জাতীয় ছবি যত কম ওঠে ততই মঙ্গল।

ছোট বউ

এ ছবি পয়সা দেবে কিছু দিন। ঘরোয়া কাহিনী। মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ এমন কি জহর গাঙ্গুলীরও প্রশংসনীয় অভিনয়।

দুই ভাই, এক ভাই কেরাণী অপর জন ডাক্তার। অনেক কষ্টে বড় ভাই ছোট ভাইটিকে ডাক্তার করেছেন। ছোট ভাইয়েরও দাদা-অন্ত প্রাণ। দুই বৌয়ের মধ্যে বড়-বৌ মাটির মানুষ। ছোট-বউও লোক মোটেই খারাপ নন। সুখের সংসার। তবু কোথায় যেন কি একটা কাঁটা রয়েছে। যার জন্য ডাক্তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বনি-বনা হয় না তাঁর স্ত্রীর। কেমন যেন বিষাদ জড়ানেই। আসল ঘটনা অর্থাৎ যেটুকু দিয়ে গল্প তার জন্য দরকার হল একটি ফ্লাশব্যাকের। বহুদিন আগের কথা নয়, এই সেদিন ডাক্তারী পড়তে গিয়ে অবস্থাপন্ন ঘরের একটি মেয়ের (লিলিই বোধ হয় নাম) সঙ্গে পরিচয় হয় ছোট-ভাইয়ের। ডাক্তারী পড়ে গাঁয়ে এসে প্র্যাকটিশ করাটা পছন্দ হয় না লিলির এবং অঙ্কুরেই মরে যায় সেই প্রেম। সেই ক্ষত বুক পুরে গেঁয়ো স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হচ্ছিল। পরে অবশ্য স্ত্রীর মহত্ত্ব ধরা পড়লো তাঁর চোখে এবং ওল্ড ফাইন মনিং অর্থাৎ গৃহপ্রবেশের প্রাতঃকালে মিলন ঘটলো স্বামি-স্ত্রীতে। মেয়েদের উঁচু রাড়াবার পক্ষে একেবারে আইডিয়েল গল্প। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি পরিচালক মশাইকে, তিনি ছবির জন্য গল্প ঠিক করার আগে একবারও ভেবেছিলেন কি যে ক'জন এই জাতীয় গল্প সামান্য একটু এধার-ওধারের তফাৎ এর আগেই প্রদর্শিত হয়ে গেছে বাংলা দেশে? টিম ওয়ার্ক দেখে অবাক হয়েছি এ ছবির। এক ভাল অভিনয় এবং সব চেয়ে বড় কথা হল একসঙ্গে সকলেরই, বড় একটা চোখে পড়ে না। পরিচালনাতেও খুব মারাত্মক রকমের কিছু ভুল নেই।

এ, ভি, এম-এর "শিবভক্ত" চিত্রে পাভারী বাঈ

...ও প্রশংসাই করতাম। কিন্তু একটি, একটি মাত্র ...ই সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে দাশগুপ্ত মশাই। ...র সঙ্গে প্রেম নিবেদনের দৃশ্যটির কথা বলছি। মনে মনে ...র চেষ্টা করছি জায়গাটা কোথায়? পেরু, হনলুলু, কামস্কাটকা, ...? নিজের মনে নিজেই যত অদ্ভুত অদ্ভুত ...র নাম মনে করছি। কোথাকার আর্কিটেকচার ওই বাগানে। ... একটা কলসী (উল্টো করে বসানো আর চুণ মাখানো) ...ত বসে নি এবং সেই কলসীটিই আমার সকল সমস্যার ...ধান করে দিল, বলে দিল, এটা ইণ্ডিও ক্লাব, কলকাতা। আপনি ...ছেন কি না জানি না, একটি কলসীর মুখ সিঁড়ির দিকে একটু ... হয়ে পড়েছিল। চণ্ডীমণ্ডপের পরিকল্পনাটিও ভাল লাগে নি, ...থা বলতে বাধ্য হব। এ ছাড়া মেকআপ, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি ...র হয়নি খুব। গানগুলি শুনে তৃপ্ত হয়েছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ...কথাও বলছি যে, ছবি হিসেবে 'ছোট-বউ' দর্শকগণকে আনন্দই ...তে পারবে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা। বাইরের রূপ দেখে তার অন্তরের খবর পাওয়ার উপায় নাই। শোনা যাচ্ছে "ফল্গু"র স্রোতের ...খে প'ড়েছেন অমিতা দেবী, অসিতবরণ, মলিনা, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি শিল্পীরা। পরিচালনা কোরছেন সতীশ দাশগুপ্ত। ...ডিয়োর মধ্যেই এখন "ফল্গু"কে আবদ্ধ কোরে রাখা হ'য়েছে। ...হরে আত্মপ্রকাশ করার আগে কাগজে কাগজে প্রচার করা হবে। তখন কিন্তু জনসাধারণকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুভব করতে হবে এই "ফল্গু"কে।

"ভাঁড়" এর কীর্তি এবার জ্যোতির্ময়ী প্রোডাকসন্স ক্যামেরায় ...'রে দেখাবেন। গোপাল ভাঁড়ের কীর্তি যখন মুখে মুখে প্রচার হ'য়ে এসেছে, তখন এই নতুন "ভাঁড়" এর ক্রিয়া-কলাপও মানুষে মর্যাদা রাখবে বোলে আশা করা যায়। "ভাঁড়" এর জীবনবৃত্তান্ত লিখেছেন অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়। পাহাড়ী, জহর, কমল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যেই "ভাঁড়" এর সন্ধান পাওয়া যাবে।

পার্থসারথি চিত্র প্রতিষ্ঠান এবার "মায়াডোর"এ জড়িয়ে পড়েছেন। ষ্টুডিয়ো থেকে টেনে আনা সহজ ব্যাপার নয় তো! মায়াডোরে বাঁধা তো এই সারা দুনিয়াটাই। ষ্টুডিয়োর মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে কত দিন আর থাকবে! শহরের রূপালী পর্দায় সব লোককেই হয়ত অভিজ্ঞতা পেতে হবে একদিন। তখন হয়ত মায়া কাটানো কঠিন হ'য়ে উঠবে।

পথের পাথেয় না থাকলে পথ চলা দুষ্কর, পথ সে দুর্গমই হোক্ আর সুগমই হোক্। এস এণ্ড এস্ প্রোডাকসন্স এবার কিন্তু "পাথেয়" নিয়েই নেমেছেন ষ্টুডিয়োতে। "পাথেয়"র শক্তি কতখানি, কিছুদিন পরেই জনসাধারণ প্রেক্ষাগৃহে বসেই উপলব্ধি কোরতে পারবেন। "পাথেয়"র খুঁটিনাটি পরিচয় পাওয়া গেছে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দপ্তর থেকে।

"সাধনা"র এই সবে সুরু। মুক্তির অবশ্য এখনও দেরী আছে। "সাধনা" কোরছেন ছায়া, চন্দ্রাবতী, প্রণতি, পাহাড়ী, বীরেন চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি নাম-করা শিল্পীরা। সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে মুক্তিলাভ করাটা তো আর মুখের কথা নয়! প্রেরণা দিচ্ছেন মোহিনী চৌধুরী। "সাধনা"র ইতিবৃত্ত রূপালী পর্দায় দেখাবার ভার নিয়েছেন ডিলক্স পিকচার্স।

"আত্মসমর্পণ" করা কি সহজে হয়! নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার! সারদা চিত্রপীঠ কোরছেন "আত্মসমর্পণ"। শোনা যাচ্ছে, ছোটদের শিক্ষার আদর্শ থাকবে এতে প্রচুর। ইতিহাস রচনা কোরেছেন সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম-করা চিত্রতারকার দল, এই কঠিন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন।

"ঝড়" এখনও উঠলো না, অথচ "ঝড়ের পরে"র ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন এস, এল, কার্ণানী। "ঝড়ের পরে"র অবস্থাটির পরিকল্পনা কোরেছেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। পরিচালনা কোরছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। "ঝড়ের পরে" এ যাঁরা অভিনয় কোরেছেন, সকলেই নাম-করা শিল্পী যেমন, প্রণতি, রেণুকা, মলিনা, রবীন, ছবি, মিহির সন্তোষ প্রভৃতি। ছবিখানি পর্দায় দেখানোর ভার নিয়েছেন রাজশ্রী পিকচার্স।

"বাঁশীওয়ালা" ধরা পড়েছে সাউণ্ড এণ্ড ক্যামেরার কাছে। শ্রীভাস্করের তত্ত্বাবধানে বেচারাকে সুদূর কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বারোদোলের মেলায় পর্য্যন্ত যেতে হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে তাকে ষ্টুডিয়োর মধ্যেই বন্দী কোরে রাখা হ'য়েছে। "বাঁশীওয়ালা" কিন্তু ষ্টুডিয়ো ছেড়ে এই শহরেই আত্মপ্রকাশ কোরবে একদিন।

এম, কে, জি প্রোডাকসন্স তুলছেন

নর্মদা চিত্র পরিবেশিত "ঝিলিমিলি" চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও উত্তমকুমার

"ব্রতচারিণী"র ছবি। ব্রত অনুষ্ঠানে জড়িয়ে পড়েছেন সন্ধ্যারাণী, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, অহীন্দ্র, ছবি, সাবিত্রী, মলিনা, চন্দ্রাবতী, ছায়া, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি শিল্পীরা। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর এই কাহিনীটিকে সঙ্গীত-মুখর করার দায়িত্ব নিয়েছেন কমল দাশগুপ্ত।

জীবনের মহালগ্ন আসে কোনো এক পরম মুহূর্ত্তে। এম, এম পিকচার্স সেই রকম এক "মহালগ্ন" চিত্রে রূপায়িত কোরে জনসাধারণের চোখে তুলে ধরবেন। "মহালগ্ন" কবে আসবে, তারই প্রতীক্ষা করছে জনসাধারণ।

আজ প্রোডাকসন্স "দস্যু মোহন" এর দক্ষিণপর্ব্বার ছবি তুলছেন পিনাকী মুখার্জ্জীর পরিচালনায়। শোনা যাচ্ছে, গেভাকলারে রঙিন করা হবে ছবিখানি। ইতিমধ্যে নাচের দৃশ্য তুলতে কর্ত্তৃপক্ষ বোম্বাই পর্য্যন্ত ছুটেছিলেন। ছবিখানিতে রূপ দিয়েছেন অরুন্ধতী, দীপক, অজিত ব্যানার্জ্জী, বিমান ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি শিল্পীরা। সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন রাজেন সরকার।

বাংলার দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যকল্পে গত ১১শে বৈশাখ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতৃ-সঙ্ঘের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" নাটকটি অভিনীত হয়। মঞ্চ ও পর্দ্দার বিভিন্ন গুণী শিল্পী সমন্বয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের এই ধরণের অভিনয় ব্যবস্থার আমরা প্রশংসা করি। মাঝে মাঝে এরূপ সুষ্ঠু অভিনয়ে নাট্যামোদী মাত্রেই খুসী হবেন নিঃসন্দেহ। অভিনয়ে সেদিন অংশ গ্রহণ কোরেছিলেন নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতিশ, রবীন মজুমদার, মলিনা, সরযূবালা, রাণীবালা, মিহির, ভানু, জহর প্রভৃতি।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

কুশলা অভিনেত্রী শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

ঘটনা-বৈচিত্রে এঁকে অভিনয়-জগতে আসতে হয় সত্যি কিন্তু একবার যখন আসা হ'লো, এ লাইনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'বার সঙ্কল্প ইনি নিলেন। শুধু সঙ্কল্প নেওয়া নয়, তাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রবার জন্যেও চললো তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস। তিনি যে এর ভেতরই তাঁর প্রচেষ্টায় প্রচুর সফলকাম হ'য়েছেন, বাঙ্গালার মঞ্চ ও পর্দ্দাই এ'র জলন্ত সাক্ষ্য। স্নেহশীলা মা, বোন কিম্বা বধুর দরদী ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে আজকের দিনে শ্রীমতী অপর্ণা দেবী অপরিহার্য্যা, এ নিয়ে আর প্রশ্ন নেই। শিল্পী ও অভিনেত্রী হিসেবে তিনি যে কুশলতা ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখে যাচ্ছেন, বহু কাল এ দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে পরিস্ফুট থাকবে!

চলচ্চিত্র সম্পর্কে এবার যখন লিখতে যাবো, তখন শ্রীমতী অপর্ণার কথাই মনে পড়লো আমার। শুধু মঞ্চ নয় রূপালী পর্দ্দায়ও আজ তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন রয়েছে। অভিনয়ে তাঁর যে সাবলীলত্ব রয়েছে, তা দর্শকগণের হৃদয় স্পর্শ না করে পারে না। শিল্পী-প্রাণ ও শিল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকলে এমনটি কখনই হবার নয়। তাই ভাবলুম, তাঁর মতামতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং সে ভাবনার উপরই এবারকার প্রবন্ধের সূচনা।

দেখা করবো বলে শ্যামবাজার ভবনাথ সেন লেনে শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর বাসভবনে যেতে হ'লো একদিন। যাওয়া মাত্র আমাকে নিয়ে বসান হলো তাঁর সুসজ্জিত বসবার ঘরটিতে। দেয়ালে দেখলুম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দু'খানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি টাঙানো রয়েছে মুখোমুখি। ভাবলুম শ্রীমতী অপর্ণা নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ-ভক্ত। ঘরেরই অপর একটা দিকে রয়েছে আলমারী-ভর্ত্তি পুঁথি-পুস্তক, এ'রা বোধ হয় শিল্পজ্ঞান-পিপাসু মনের খোরাক যোগায় প্রয়োজনের সময়।

"১১ বছর পূর্ব্বে 'কালী ফিল্মস্'-এর অবদান 'বড়বাবু' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ",—বললেন শ্রীমতী অপর্ণা দেবী। আমার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রথম মুহূর্তেই তিনি বলতে থাকেন—এর পর অনেক ছবিতেই এবং বিচিত্র ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি ও করছি। অভিনয় করতে যেয়ে তৃপ্তিও পাচ্ছি প্রায় সব ক্ষেত্রেই, তবু বলবো দেবকী বাবু (পরিচালক শ্রীদেবকী বসু) পরিচালিত 'সার শঙ্করনাথ' এবং শ্রীনরেশ মিত্র পরিচালিত 'পণ্ডিত মশায়' ছবি দুখানিতেই মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে আমি সব চেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি।

চলচ্চিত্র জগতে আপনার যোগদানের কারণ কি এবং এ লাইনে আসতে প্রথম প্রেরণাই বা পেলেন কোথায়?—

শ্রীমতী অপর্ণা ধীরে ধীরে উত্তর করলেন—স্বীকার করছি, এ লাইনে আসতে প্রথমে আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। পরন্তু ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়া শিখবো—ম্যাট্রিক পাস করে নার্সিং বিদ্যাটা আয়ত্ত করবো। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মানবসেবা। শেষ পর্য্যন্ত দুর্গত নারী-সমাজের কল্যাণ কল্পে ডাক্তারও আমায় হতে হবে—এ সঙ্কল্পও ছিল কিন্তু সব বানচাল হয়ে গেল অর্থনৈতিক কারণে। অপর দিকে এ কারণেই অভিনয়-জগৎ আমায় বেছে নিতে হলো। বাবা আমার দু'বছর বয়সেই মারা যান। সংসারে উপার্জ্জনক্ষম কেউ তখন ছিল না। মাতৃ ও দিদিমা'র আশ্রয়ে ও স্নেহে আমি বড় হতে থাকি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এমন কি মাতৃকেও হারাতে হ'লো একদিন। তখন থেকেই আমি অসহায় হয়ে পড়ি এবং অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমাকে আসতে হয় এ লাইনে এক রকম বাধ্য হয়েই। একবার যখন এদিকে এসে পড়লুম তখন শিল্পী-জীবনটাকেই আমি সর্ব্বস্ব বলে মেনে নিলাম।

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, শ্রীমতী অপর্ণা বলতে থাকেন, "তবে বলবো, আমি আর পাঁচ জনেরই মত ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করি। সাংসারিক পরিবেশ ও কাজকর্মের মধ্যে থাকতেই আমার মন চায়। ঘুম থেকে ওঠার পর ঘর-দোর পরিষ্কার করে প্রথমে স্নানটা সেরে নিই। তার পর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা দেখি, দুটো ফুটে দিলুম হয়তো নিজ হাতেই। ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাবার ব্যবস্থা করাও আমার একটা কাজ বলতে পারি। স্যুটিং যেদিন থাকলো সেদিন ওদিকেই ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্য দিন অবসর সময়ে সেলাই করি ও বই পড়ি।"

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন শুনে শ্রীমতী অপর্ণা দেবী বললেন, 'হবি' বলতে বাঁধাধরা তেমন কিছু আমার নেই। তবে সেলাই করতে ও বই পড়তে আমি ভালবাসি—এটাকে 'হবি' বলতেও পারেন। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা দেখতে আমার ভাল লাগে কিন্তু সেও দেখা হয়ে ওঠে না। পুঁথি-পুস্তক যখন যা পাই, পড়ে থাকি—রূপমঞ্চ পড়ি, মাসিক বসুমতীও পড়ে থাকি মাঝে মাঝে এবং আমার ভালও লাগে। উপন্যাস ও গল্পের বই পড়তে আমি ভালবাসি—অবিশ্যি যার ভেতর গভীরত্ব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এসব তো পড়িই, আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তারাশঙ্কর, ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, সৈয়দ মুজতবা আলী—এঁদের রচনা পড়তে আমার ভাল লাগে।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণ না থাকলে নয়, এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামতই বা কি—প্রশ্ন করলুম আমি। উত্তরে শ্রীমতী অপর্ণা স্পষ্ট বললেন, "প্রথমেই চাই সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্য ও শিল্পি-মন। শিল্পি-জীবনের প্রতি একান্ত দরদ, অভিনয়-ক্ষমতা, কণ্ঠের মাধুর্য্য—এ সকলও না থাকলে নয়। স্বাস্থ্যের উপর আমি আবারও জোর দেব। কারণ স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যই শিল্পীদের প্রধান মূলধন। এটা বাঁচিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে তা হয় না।"

শ্রীমতী অপর্ণা এখানেই থামলেন না; এ প্রশ্নটা টেনে নিয়ে আরও বললেন, "অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে যোগদান করা উচিত ও বাঞ্ছনীয়। এঁরা এদিকে এলেই এ শিল্পের সব দিক থেকে উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমানে এদেশে ভাল ছবিই নির্ম্মিত হচ্ছে। মাঝে কিছু দিন বাংলা ছবির মান নীচে নেমে গেছলো। সুখের বিষয় সেটা কেটে যেয়ে এখন আবার উঁচু দরের ছবি হচ্ছে। আশা করবো, বাংলা ছবি ভবিষ্যতে আরও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।"

এ ভাবে বেশ খানিকক্ষণ আমাদের মধ্যে আলোচনা চললো চলচ্চিত্র শিল্পের ভাল-মন্দ সব দিক নিয়ে। অনেক কথাই তিনি বললেন যাতে তাঁর প্রচুর শিল্পজ্ঞান এবং এ শিল্প সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ধরা পড়লো। শেষ পর্য্যন্ত আমি এ জিজ্ঞেস করতে ইতস্ততঃ করলুম না—ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে ইচ্ছে করছেন আপনি?

শ্রীমতী অপর্ণা দেবীও দ্বিধাহীন ভাবে উত্তর করলেন—"শিল্পী আমরা, যত দিন পারি শিল্পি-জীবন যাপন করতেই চাই। তার পর সংসারে যদি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি, সেও আমার কাম্য। আর যদি ঘটনা-বৈচিত্র্যে এ'র কোনটাই না হয়ে উঠে, তা হ'লে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম, বেলুড় মঠ এ ধরণের কোন আশ্রমে যেয়ে কাটিয়ে দেবো শেষ জীবনটা।"

ভুয়া-ভুঁইয়া

[৪৮ পৃষ্ঠার পর]

—তবে কি মরতে হবে এই বন-জঙ্গলের দেশে ? যশোদা মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে কথা কয়। মিশি-মাখানো দাঁত দেখা যায় তার। মুখে শুধু নির্ম্মম বিরক্তি ফুটে আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী এক প্রস্তরময় সোপানে বসলেন। কোমল দুই হাত কপোলে রাখলেন। বললেন,—আমি আর চলতে পারি না। দাসী, তুমি থামো। আমার হাত কোথায় ? আমি তো নিরুপায় !

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। নিটোল বুক কাঁপছে থর-থর।

—বৌ, তুমি হেথায় থাকো। আমি আনিগে তোমার শুকনো বস্তর। স্নান সেরে নাও।

যশোদাও সুর বদলায় কথায়। বৌকে সোপানে ব'সতে দেখে ঈষৎ ভীত হয় যেন। চোখে যেন দেখতে পায় রাজকন্যার অসহায় অবস্থা। কষ্ট-কাতর মুখ। করুণ চাউনি কাজল-কালো চোখে।

অপরিচ্ছন্ন, ধূলি-মলিন প্রস্তরময় সোপান। বৌকে একা ফেলে এগোয় যশোদা। সাপের মত এঁকে-বেঁকে ওঠে দাসীর চঞ্চল দেহ।

ফিরে ফিরে দেখেন রাজকন্যা। যে-পথে এসেছেন দেখেন সেই দীঘির ঘাটের পথ। সোপান থেকে সোজা দেখা যায় আসমানের বুক। পানীয় পরিপূর্ণ। জল না জমি ধরা যায় না আপাত চোখে। মনের বীণার তার ছিঁড়েছে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। এক গোপন স্বপন যেন ভেঙে গেল হঠাৎ ঘনঘটায়। দিনের রূপালী আলো ফুটতে না ফুটতে কালো মেঘ জমলো আকাশে। হাওয়া থামলো। গুমোট আকাশ। থেকে থেকে মেঘ ডাকছে।

বক উড়ছে না কি আকাশে ? চাষীরা বেরিয়ে পড়েছে আল বাঁধতে। কুটো-কাটির সন্ধানে উড়েছে কাক-কোকিল। আমোদরের জল যেন গতিহীন।

বিন্ধ্যবাসিনীর বুকের শিরায় শিরায় যেন আকুল আগ্রহের ব্যগ্র ব্যাকুলতা নাচানাচি করে। তবুও কত সাবধানতা, আঁখিতে যেন প্রকাশ না পায়। মনের দুয়ার বন্ধ থাকে যেন !

রাজকন্যার মুখ যেন লজ্জারুণ হয়ে ওঠে। কেন কে জানে, নিজের কাছে নিজে যেন লজ্জা পান। রাজকন্যা হঠাৎ হাসলেন, স্মিত হাসি। গোপন হাসি। আকাশের ক্ষণপ্রকাশ বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি হঠাৎ দেখা দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজকুমারী আপন মনে স্বগতোক্তি করেন। বলেন,—বেশ আছি আমি। এই মান্দারণই আমার ভাল।

কথা ব'লে যেন তৃপ্তি পান বিন্ধ্যবাসিনী। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। মুখে যেন ফুটলো সুখের আকুলতা। চোর-ডাকাত-বাঘ-শিয়ালের সঙ্গে একত্রে বাস, কিন্তু শত-লক্ষ চোখ নেই এখানে। শাসনের ঝড় নেই কথায় কথায়। ব্যথার ব্যথী না থাক, আছে সরমহীন আরামসুখ। দুধের মত ফর্সা শয্যা নাই বা থাকলো।

গুমোট গরমে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে রাজকন্যার কপালে। মুখ যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ থেমেছে হাওয়া। গাছের পাতাটি আর নড়ছে না যেন। দীঘির ঘাটে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকতে হয় বিন্ধ্যবাসিনীকে। পলক পড়ে না চোখের।

—চল' বৌ, ঘাটে চল।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যশোদা। কথা বলছে সহজ সুরে। বনবাসের দুঃখ যেন ভুলে গেছে ইতিমধ্যে। বললে,—মুখ-হাত ধুয়ে, স্নান সেরে নাও। আমাকে আবার জোগাড় করতে হবে নারায়ণের সেবার উপকরণ। ফুল তুলতে হবে। নৈবিদ্যি সাজাতে হবে।

আনন্দের হাসি চাপলেন রাজকুমারী।

কেমন যেন ঠোঁট টিপে টিপে হাসলেন, গোপন হাসি। বললেন,—তোমাকে কিছু করতে হবে না যশো। আমি সব ক'রে দেবো। তুমি শুধু তুলে দাও ফুল-তুলসী দীঘির তীর থেকে।

—আচ্ছা গো আচ্ছা। চল' দেখি তুমি।

কথা বলতে বলতে ঘাটের পথে পা চালায় পরিচারিকা। যশোদার হাতে ধৌতবস্ত্র, গুলের চূর্ণ, ফুলেল তেলের পাত্র। ক্ষণেকের মধ্যে যেন অন্য আকৃতি হয় তার। মুখে আর নেই সেই বিশ্রী বিরক্তি। কাঁকালো কণ্ঠ কোমল এখন। পদক্ষেপে যেন আর তেমন শব্দ হয় না। বলে—তোমার জল-খাবার প্রস্তুত করতে হবে আমাকে। স্নান শেষ করে, ফুল তুলে দিয়েই যাবো আমি রসুইয়ে।

তাড়াতাড়ি আবার আলো জ্বলে। শেষ পৈঠায় পা রাখতেই জলে ছায়া ভাসলো রাজকন্যার। কাঁপা-কাঁপা ছায়া !

বিন্ধ্যবাসিনী গুলের চূর্ণ ঘষেন মিছরী-দানার মত দাঁতের সারিতে। হাতের কাজ থামিয়ে বললেন,—রসুইয়ে যাবে কেন এই সকালে ? খেতে যেন রুচি নেই আমার। খাবো'খন ফলমূল।

নিশ্চিন্ততার অম্লান হাসি হাসলো যশোদা। হাসিমুখে বলে,—খাবে বৌ, খাবে ? ফলমূল খাবে তো ? পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ছাই কিছু কি পাওয়া যায় ? ক'দিন ক'রাত কিছু কি দাঁতে কেটেছো !

বিন্ধ্যবাসিনী সহাস্যে বলেন,—তবুও যদি না যাশো এমনই পরমায়ু !

চাঁপাবনের শাখায় শাখায় সোনা-ফুল ফুটেছে। হাওয়া চলে না, কিন্তু সুগন্ধ ভেসে আসে যেন ফুলের ! ঘাটের এক পাশে বুড়ী মাধবীলতা। মাধবীর গন্ধ, যেন থমকে আছে দীঘির ঘাটে। প্রজাপতি আর মৌমাছি উড়ে আসছে। মাধবীর বুকে হুল ফুটিয়ে মধু শুষছে।

হাওয়া থেমেছে। গাছের পাতাটি আর নড়ে না। বন-মল্লিকার বন আর দুলে দুলে ওঠে না বাতাসের বেগে। গুমোট হয়ে আছে ভোরের আকাশ।

—মরণ চাইলেই কি মেলে বৌ? যশোদা জলে নামতে নামতে কথা বলে। ঘাটের অদৃশ্য পৈঠায় শৈবাল-শাদুল, তাই যেন কত সাবধানে জলে নামতে হয়। শ্যাওলায় কখন পা পিছলায় কে বলতে পারে!

যশোদা বললে,—মরণ চাইলেই মেলে না। যা চাওয়া যায় তাই কি পাওয়া যায়?

ছাঁৎ করে ওঠে যেন রাজকন্যার বুক। পরিচারিকার শেষ কথাটি কানে বাজে যেন। কে কাকে চায় আর কে কাকে পায় না! কি চাইলে পাওয়া যায় না! কত কথা মনে আসে বিন্ধ্যবাসিনীর। মনে আসে আর অন্যমনা হন মাঝে মাঝে।

আমোদরের অপর তীরে শ্যামল তালবনের পেছনে বিদ্যুতের ঝিলিক চিকচিকিয়ে ওঠে সাপের মত আঁকাবাঁকা। গুমোট আকাশে মেঘের গুরু-গুরু ডাক। ঈশান কোণে কালো মেঘের জটলা! গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত যেন অনড় হয়ে আছে। বিবশ ফুল খ'সে পড়ছে চাঁপাগাছের শাখা থেকে। অলস পাপড়ি ঝরছে।

রাতের আঁধার-পারাবার শেষ হয়ে গেছে। রুপালী আলো ফুটবে দিকে দিকে, উজ্জল সূর্য্য উঠবে, রৌদ্রের ঝিলিমিলি খেলবে। গম্ভীর আকাশ কালো হয়ে আসছে। বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আকাশের বুকে। হাওয়া চলছে না হঠাৎ। গুমোট গরম।

যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না। বার বার ঐ একটি কথা কাঁটার মত যেন বিঁধছে বুকের কোথায়। বিন্ধ্যবাসিনীর বুকের কাছে দীঘির জল, কানাকানি করে নেচে নেচে। জলের 'পরে কাঁপা কাঁপা ছায়া। দীঘির জলে যেন যৌবন টলমল করছে।

—আমার তরে তোমারও কত কষ্ট।

রাজকুমারী জলের ঢেউ তোলেন আর বলেন। আঁজলা-ভর্ত্তি জল দেন চোখে-মুখে। দীঘির জল যেন রাতের আকাশ! সোনার চাঁদের মত দেখায় যেন রাজকন্যাকে। বিন্ধ্যবাসিনী আবার বলেন,—দাসী, তোমাকে আমার সাতনরী দেবো। হীরামাণিকের আংটি দেবো। তুমি যা চাও তাই দেবো। তোমাকে ছাড়া আমার গতি কোথায়?

ডুব দিতে গিয়ে দেওয়া হয় না। পরিচারিকার মুখে যেন অফুরন্ত হাসি ফুটলো। কৃতার্থ হয়ে পড়েছে যেন যশোদা। তার চোখে যেন উগ্র লোভ। দাসী বললে—, বৌ, তোমার পায়ের বাঁদী হয়ে থাকবো আমি। ভাবনা কেন এত?

—জরির ডুরে শাড়ী দেবো, পাঠিও তোমার মেয়েকে।

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলেন মিষ্টি মিষ্টি। হেসে হেসে বলেন,—সাতগাঁ থেকে আমার একটা প্যাটরা এনেছি। তাতে আছে ক'খানা গয়না, ডুরে শাড়ী, অড়য়ের কৌটো। কৌটোয় আছে বাদশাহী মোহর।

—ভাগ্যি এনেছিলে বৌ! তুমি কি যে-সে ঘরের মেয়ে! তোমার নজর কত উঁচু! যশোদার কথায় যেন মন-জোগানো সুর। দাসী বলে,—নিছক কষ্ট তোমার বিনি অপরাধে দণ্ডভোগ! রাজার মেয়ে তুমি—

—বর্ষা নামবে কি না বল' না দাসী?

রাজকুমারীর মিনতিপূর্ণ প্রশ্ন ধৈর্য্য হারিয়ে পরিচারিকার কথার মধ্যপথে কথা কইলেন। বুকের কাছে দীঘির জল কানাকানি করে নেচে নেচে। রাজকন্যার মনেও যেন এক কৌতূহল নাচানাচি করছে!

—বলা কি যায় বৌ! হাওয়া বইলে আর জল হবে না। যশোদা কথা বলে আকাশ-পানে দু' চোখ ফিরিয়ে! আমোদরের অপর তীরে শ্যামল তালবনের পেছনের আকাশে তাকিয়ে বললে,—এক পশলা বৃষ্টি হয় তো হরির লুট দিই আমি! এ্যাকটা বছর আকাল গেছে! দু' মুঠো খেতে পায় দেশের মানুষ!

ভাল লাগে না দাসীর কথা। বিন্ধ্যবাসিনী আর শুনলেন না। জলের তলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অবগাহনের ডুব দিলেন।

যশোদার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। এক দৃষ্টে দেখছে তো দেখছেই। কি যেন লক্ষ্য করছে সাগ্রহে। ঘুম-ভাঙা চোখ, আবার ভুল দেখছে না কি! চোখে জলের ছিটে দিয়ে দিয়ে দেখে যশোদা।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। কোদাল-কাটা মেঘ। আঁধার নেমেছে যেন দিকে দিকে। কি দেখতে কি দেখলো যশোদা! কাকে দেখতে কাকে!

রাজকন্যাকে মাথা তুলতে দেখে দাসী যেন ব্যস্ত হয়ে বলে,—বৌ, ঘাট হ'তে উঠে যাও এক্ষুণি। ডুব সেরেছো, আবার কি!

—কেন? জলে নামতে না নামতে উঠবো কেন?

রাজকন্যা বলেন অতৃপ্তির সুরে। সিক্তবাসের আড়ালে দুধের মত শুভ্র রঙ উঁকিঝুঁকি দেয়। শ্যাওলা-সবুজ জল রাজকন্যার মুখের কাছে, নেচে নেচে কানাকানি করে।

যশোদার চোখ অন্য দিকে! অনিমেষ দেখছে তো দেখছেই। দাসী বলে,—বৌ, সেই ব্রাহ্মণ আসছে। খানিক থেমে বলে,—দেখে যদি তোমার আদুড় গা। তুমি উঠে পড়' তার চেয়ে! আমি দুটো ডুব দিয়ে নিই ততক্ষণে।

বুকের শিরায় শিরায় শিহরণ শুরু হয়। বুক দুর-দুর করতে থাকে! তবুও দীঘির শীতল জলের পরশ লাগছে বুকের কাছে। বিন্ধ্যবাসিনীর সজল নয়নতারা অচল হয় যেন। মনে যেন উচাটন। সঘন শ্বাস ফেলেন। আলুলায়িত সিক্ত কেশে দেখায় যেন যোগিনীর মত।

বসন-অঞ্চল পদতলে লুটিয়ে, দু' হাতে মুখ ঢেকে, জল ছড়িয়ে ত্রস্ত চললেন রাজকন্যা। ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, আকাশের বিদ্যুতের মত ঝিলিক তোলে ঘাটের পৈঠায়।

রাজকন্যার অরুণ অধরে যেন মৃদু-মন্দ হাসি খেলে ওঠে অলক্ষ্যে।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। আকাশ ডাকছে থেকে থেকে। অস্ফুট গর্জ্জন! আমোদরের তীরে শ্যামল তালবনের পেছনে আঁকাবাঁকা বিজলী-রেখা। গাছের পাতা নড়ে না। হাওয়া চলে না। চাতক পাখী পাক দিয়ে দিয়ে উড়ছে জলের আশে। চাঁপার শাখের সোনা-ফুল বিবশ হয়ে ঝ'রে পড়ছে। কাঠি-কুটোর সন্ধানে উড়ছে কাক-কোকিল।

—ওঁ নমো নারায়ণায়।

দীঘির ঘাটে জলদগম্ভীর কথা শোনা যায়। পথশ্রমে ক্লান্ত, তাই যেন কণ্ঠস্বর ঈষৎ পরিশ্রান্ত। ক্ষণেক ব্যবধানের পর আবার শোনা যায় সেই কণ্ঠ।—গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

ব্রাহ্মণ পদচারণা করেন দীঘির কাট-ধরা ঘাটে। এক প্রান্ত থেকে ঘাটের অন্য প্রান্ত চলাফেরা করেন আর মন্ত্র উচ্চারণ করেন গানের সুরে। ব্রাহ্মণের কপালে, কণ্ঠে ও দুই বাহুতে শ্বেতচন্দনের শুভ্র প্রলেপ। গ্রন্থিবদ্ধ কেশের গুচ্ছে একটি লাল কলকে-জবা। ব্রাহ্মণ নধরকান্তি, শুভ্রবর্ণ, সুদর্শন যুবা। পায়ে-হাঁটা ধূলি-কাঁকরের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, গরদের ধুতি তাই এঁটেসেঁটে পরা। কাঁধের মুগাপাড় ধুতির উড়ুনী ঘামে ভিজে গেছে। লোমশ বুকে শ্বেত উপবীত, রুদ্রাক্ষের মালা। ব্রাহ্মণ কখনও অস্ফুটে, কখনও সশব্দে গুঞ্জন তোলেন ঘাটের চাতালে। মাধবীর গন্ধ থমকে আছে দীঘির ঘাটে। মাধবীর স্তবকে নাচতে নাচতে ডাকছে কালো-ভ্রমর।

—নারায়ণ যে উপোসী রয়েছেন। বিহিত হবে না?

কার কথায় লুপ্তজ্ঞান ফিরে আসে যেন। ব্রাহ্মণ ঘাটের দুয়োরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কি এক ধ্যানের মগ্নে যেন আচ্ছন্ন ছিলেন। বলেন,—সেবার ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রমত! আমিও নিয়োগ দিতে পারি এক পূজারী ব্রহ্মচারীকে। কিন্তু—

—কিন্তু? বললে যশোদা কৌতূহলের সুরে। বললে,—থামলে কেন বামুন ঠাকুর?

স্মিতহাসি ফুটলো ব্রাহ্মণের সুস্মিত ওষ্ঠে। যেন খানিক চিন্তা করেন, বক্তব্য ব্যক্ত করবেন কি না তাই যেন ভাবতে থাকেন। বলেন,—দৈনিক একটি সিধার বন্দোবস্ত যদি পাকা হয় তবেই। তৎসহ ত্রিসন্ধ্যা পূজার নৈবেদ্যাদিও যদি প্রাপ্য হয়, নচেৎ নয়।

বিরক্তির কুঞ্চনরেখা যশোদার মুখে। চোখে কুটিল কটাক্ষ। যশোদা বলে,—এত কথা কৈ কাল বল' নাই তো! তোমার শালগ্রামশিলে তুমি ফিইয়ে নাও।

প্রথমে চোখের ঈশারা, তার পর হাতছানি—কিছুই চোখে দেখতে পায় না যেন পরিচারিকা। কে যে কোথায় অন্তরালে থেকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, নজরে পড়ে না।

—দৈনিক একটি সিধা দেওয়া হবে যশো!

কে যেন কোথায় দৈববাণী করে অদৃশ্যে থেকে। কোমল কণ্ঠে কথা বলে।—তিন-সন্ধ্যার ফল-নৈবিদ্যিও দেওয়া হবে।

এত ডাকাডাকি, ইশারা, হাতছানি যখন দৃষ্টিতে এলো না পরিচারিকার, তখন বাধ্য হয়ে কথা বলেছেন রাজকুমারী। ঘাটের দুয়োরের পাশে নিজেকে লুকিয়ে।

অদেখা নারীকণ্ঠের কোমলমিষ্ট কথায় ব্রাহ্মণের দুই ভ্রূ বক্র হয়ে ওঠে। সুস্মিত ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির মৃদু আভা।

—যশো, তুমি বৃথা দাঁড়িয়ে থাকো কেন? আবার সেই সুধাকণ্ঠের কথা। রাজকুমারী বলেন,—যাও গন্ধফুল তুলে আনো। দুর্ব্বো-তুলসী আনো। আমি দেবো চন্দন ঘষে। নৈবিদ্যি র'চে দেবো।

অগত্যা চললো যশোদা। ভাঙাঘাটের পাশ দিয়ে কুটোকাটা মাড়িয়ে চললো ফুল তুলতে। গজরাতে গজরাতে চললো পরিচারিকা!

ব্রাহ্মণ তখন চিত্রার্পিতের মত; নিষ্পলক দৃষ্টি তাঁর বিশাল চোখে। ঘাটের দুয়োরে কাকে যেন দেখছেন। চোখের সমুখে।

সদ্যস্নাতার সিক্ত কেশ কোমর ছাপিয়ে নেমেছে। লালপাড় ধৌতবস্ত্র পরনে। শুভ্র নিটোল মুখে প্রসন্ন হাসি। লাজে ভয়ে থরো থরো, তবুও বারেক দেখা দিলেন বিন্ধ্য-বাসিনী। শরমের বাধা না মেনে বললেন,—নারায়ণের পূজা যদি স্বয়ং আপনি করেন তবেই এই ব্যবস্থা হবে, নয়তো নয়।

ব্রাহ্মণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেখতে দেখতে হতভম্ব। বাহন-ছাড়া প্রতিমা দেখেন চোখের সমুখে।

মুহূর্তমধ্যে সেই সহাস মূর্ত্তি আর দেখা যায় না। কথার শেষে অদৃশ্য হন বিন্ধ্যবাসিনী।

আকাশের চাঁদ দেখা যায়। মেঘের আবরণে কখনও ঢাকা থাকে, দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের চোখে তাই যেন ব্যর্থ দৃষ্টি। বাহন-ছাড়া প্রতিমা আর দেখা যায় না।

মাধবীর গন্ধ থমকে থাকে ঘাটের চাতালে। মাধবীর স্তবকে স্তবকে কালো-ভ্রমরের গুঞ্জন।

[ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদ-পট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে মণিপুরী নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমার আলোকচিত্র প্রকাশ হয়েছে। চিত্রটি শ্রীসুনীল জানা গৃহীত।

অস্পষ্ট কথা !

"এখন কিন্তু লোকে কংগ্রেসে কি প্রস্তাব পাশ হইল, তাহা জানিতে আগের মত উৎসাহ বোধ করে না। বহুকাল পরে আবাদী কংগ্রেসের সোস্যালিজম্ প্রস্তাবে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যর্থতা যত প্রকাশ পাইতেছে, আবাদী প্রস্তাব সম্বন্ধে উৎসাহও ততই স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই দিকটিতে মনোযোগ না দিলে খুব ভুল করিবেন। বহরমপুরে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত ঢেবর কংগ্রেস প্রস্তাবগুলি হইতে বাছিয়া যে কয়টি অবশ্য কর্তব্য, তৎপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দশ বৎসরের মধ্যে বেকার-সমস্যা দূর করিতে হইবে। ইহা অবশ্যই একান্ত কাম্য। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে, তাহা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট বা পরিকল্পনা কমিশন কেহই পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। পাঁচসালা পরিকল্পনার সাড়ে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, বেকার-সমস্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। ইহা আশ্চর্যজনক! একথাও গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম মহলেই কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন। দশ বৎসরে বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে গেলে কি করা কর্তব্য, গভর্ণমেণ্ট কতটা করিবেন, জনসাধারণই বা কতটা করিবে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলে কাজ হইবে না।"

—দৈনিক বসুমতী।

ঠাঁই নাই

"নানা প্রকার ভাষ্য ও ব্যাখ্যার দ্বারা এক দল লোক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্তমান আয়তন বৃদ্ধির দাবী উড়াইয়া দিতে উৎসাহী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিরূপ জীবন-মরণ সমস্যায় পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এই দাবী উত্থাপনে বাধ্য হইয়াছে, তাহা সংসদ-সদস্য ডাঃ [illegible] সংক্ষেপে ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সম্মেলনের ভাষণে তিনি বলিয়াছেন,—"ভাষাগত নীতির ভিত্তিতে মানভূম, সিংভূম, সেরাইকেলা ও গোয়ালপাড়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তন যদি প্রসারিত করা না হয়, তবে জীবন ধারণের উপযোগী স্থানের অভাবে বাঙ্গালী-সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে।" বক্তা এস্থলে কোন অতিশয়োক্তি করেন নাই। ভারত খণ্ডন, তথা বঙ্গব্যবচ্ছেদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ এক ক্ষুদ্রকায় রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমনে পশ্চিমবঙ্গের জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। সরকারী হিসাবেই দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ এখন ভারতের মধ্যে সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ক্ষুদ্র সে তরী"—ইহাই দাঁড়াইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব অবস্থা। এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির বিরোধিতা পরিহার করিতে পারেন না, তাঁহারা কার্য্যতঃ বাঙ্গালী সমাজের ধ্বংস ও বিলুপ্তি কামনা করেন। ইহা নিঃসন্দেহে দুর্মতির পরিচায়ক। সুতরাং বিরোধী দলের চিত্তে দুর্মতির স্থলে সুমতি ও শুভ বুদ্ধির উদয় যত শীঘ্র দেখা দেয়, ততই মঙ্গল।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

জল ! জল !!

"পশ্চিমবঙ্গে যদি কোন জিনিসের অভাব সম্পর্কে সার্বজনীন অভিযোগ থাকে, তাহা অবশ্যই জলাভাব। সহর বা পল্লী অঞ্চল সর্বত্রই জলের জন্য হাহাকার লাগিয়াই আছে। এমন অবস্থায় কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের মুখে যদি শুনা যায় যে, তাঁহারা গ্রামাঞ্চলে জলাভাব দূর করিতে অবহিত হইয়াছেন, তাহা হইলে সে আশ্বাসটুকুই বা কম কি? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, শীঘ্রই তাঁহারা রাজ্যের জলাভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে বহুসংখ্যক নলকূপ খনন করিতে পারিবেন। সরকারী কাজ, বিশেষতঃ এই ধরণের জনহিতমূলক কাজগুলি অগ্রসর হয় অপেক্ষাকৃত ধীরে-সুস্থে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের জলাভাব এত নিদারুণ যে, যত শীঘ্র এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা হইবে, ততই তাঁহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিবেন। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, পল্লী অঞ্চলে এ যাবৎ যত নলকূপ খনন করা হইয়াছে, দুই-চারি বৎসরের মধ্যেই তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যথেষ্ট গভীরতার অভাব, স্থান নির্বাচনের অসমীচীনতাই ইহার প্রধান কারণ। সুতরাং নলকূপ খনন করিতে হইলে তাহা যাহাতে দুই-এক বৎসরেই খারাপ হইয়া না যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গভীর এবং স্থায়ী নলকূপ খনন করা আবশ্যক। যাহারা নলকূপের কন্ট্রাক্ট লইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও এই মর্ম চুক্তি আদায় করা উচিত। তাহাতে

সাময়িক ভাবে কিছু বেশী টাকা ব্যয় হইলেও ভবিষ্যৎ অসুবিধার আশঙ্কা লাঘব হইবে।" —যুগান্তর

অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে

"বহরমপুর অধিবেশনে শ্রীনেহরু মূলধন কি ভাবে সংগৃহীত হইবে সে সম্পর্কে কোন কথা না বলিয়া শুধু মানুষকে কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলিয়াছেন। সংবিধান (চতুর্থ) সংশোধনের পর ধনিকদের অর্থ তাঁহাদের ইচ্ছা মত মুনাফা বৃদ্ধির পরিবর্তে সরকারী নিয়ন্ত্রণে খাটাইবার যে অধিকার আসিয়াছে, সে কথাও বলা হয় নাই। দেশী ও বিদেশী মূলধনের মধ্যে যে বাস্তব পার্থক্য আছে, কংগ্রেস-নেতারা সে সম্পর্কেও নির্ব্বাক্। বিলাতী মূলধন এ দেশকে লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থ সরকারের আওতার বাহিরে বিদেশেই পাচার করিয়া দেয়। তাহা ছাড়াও সম্প্রতি মহীশূর সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত কোলার স্বর্ণখনি তদন্ত-কমিশনের রায়ে দেখা গিয়াছে যে বিলাতী মালিকেরা তাঁহাদের নিয়োজিত মূলধন চার বছরে তুলিয়া নিয়া বাকী ৭০ বছর শুধুই লুণ্ঠন করিয়াছেন। এমন কি, আজও সরকার নিয়োজিত কমিশনকে তাঁহারা তথ্য দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সরকার কর্ত্তৃক বাধ্য রয়ালটি দিতে গররাজি হইয়াছেন। অথচ এই লুণ্ঠনের সম্পর্কে কংগ্রেস-নেতারা শুধু নিরুত্তরই নহেন, অন্য কেহ কথা তুলিলে শ্রীনেহরু তাঁহাদিগকেই "শ্লোগান সর্ব্বস্ব", "নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে অবুঝ" প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কংগ্রেস-নেতাদের এইরূপ শাসন-পরিচালনাধীন অবস্থায় পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য মূলধন সংগ্রহ তো দূরের কথা, মানুষের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষের সচেতন শ্রমকে পাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিতে থাকিবে।" —স্বাধীনতা।

জেলাবোর্ড নির্ব্বাচন পিছায় কেন ?

"প্রচণ্ডতম যুদ্ধের সময়েও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেস নির্ব্বাচন বন্ধ থাকে নাই। বৃটেনে প্রধান মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের এক মাসের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করা হইয়াছে। আর আমাদের দেশে মিউনিসিপালিটি এবং জেলাবোর্ড নির্ব্বাচন অতি সাধারণ অজুহাতে পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। কোন কোন জেলাবোর্ড বোধ হয় বছর সাতেকের হইতে চলিল, নির্ব্বাচন হয় নাই। ২৪ পরগণা জেলাবোর্ডের নির্ব্বাচন পিছাইবার তোড়জোড় শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচন না করার অজুহাত জেলাবোর্ডের দেখায় যে, টাকা নাই। এই অজুহাতে নির্ব্বাচন বন্ধ রাখা গেলে এক দল লোক বোর্ড দখল করিয়া উহার সর্ব্বস্ব এক বার ফুঁকিয়া দিতে পারিলে কায়েম হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে। ইহা কি নিয়ম, আমরা তো বুঝি না। নির্ব্বাচনের নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। নির্ব্বাচনের খরচ প্রতি বৎসরের বাজেট হইতে কিছু কিছু করিয়া লইয়া নির্ব্বাচন ফাণ্ডে রাখিয়া দিলে শেষ সময়ে অসুবিধায় পড়িতে হয় না।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

বিচারে বিলম্ব

"স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারী মামলার বিচারে বিলম্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ হইয়াছে। যাহারা জামীন লইতে অসমর্থ তাহাদের সুদীর্ঘ কাল বিচারের অপেক্ষায় জেলে পচিতে হয়

দেবী আসরে মহিলা
কথাসাহিত্যিক সম্মেলনে শ্রীঅনুরূপা দেবী ও শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী প্রভৃতি

ফৌজদারী মামলা যাহার বিচার অতি দ্রুত ও সত্বর হওয়া উচিত, তাহা যদি দেওয়ানী মামলার মত সুদীর্ঘ কাল টানিয়া লওয়া হয় তবে মানুষের দুর্গতির শেষ থাকে না। এ সকল অবস্থা আজ-কাল দেখিবার কেহ নাই। আদালত আছে, কিন্তু সেখানে চলিয়াছে এক অস্বাভাবিক অবস্থা। প্রতি স্তরে স্তরে গলদ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, উচ্চ বা নিম্ন কোন কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

পানীয় জল

"আজ সারা দেশব্যাপী বাঁচিবার তাগিদে 'জল জল' রবে হাহাকার উঠিয়াছে। মফঃস্বল পল্লীর সর্ব্বত্রই জলাভাব,—বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জলের। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব যে নানা প্রকার রোগোৎপত্তি ও স্বাস্থ্যহীনতার কারণ, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এ অবস্থায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহে পল্লীবাসী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ফিল্টার প্রথায় জল পরিস্রুত করিয়া কিম্বা ফুটাইয়া ব্যবহার করা উচিত। স্থানে স্থানে নলকূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। অনেক স্থানে নলকূপ কার্য্যকরী না হওয়ায়ও পানীয় জলের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ঘরে আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার জন্য জল পাওয়া যায় না। এই জন্য দেশের সর্ব্বত্র গৃহদাহের সংখ্যাও এ বৎসর অধিক বলিয়া অনুমিত হইতেছে।"

—নীহার (কাঁথি)

ভারতীয় ভাষা সমূহের একীকরণ!

৺অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতাংশ "ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" ইহার বিভিন্ন ভাষায় যথাসম্ভব একীকৃত রূপ — সহজ সংস্কৃত—ভারত: পুন: জগৎসভায়াম্ শ্রেষ্ঠাসনং লপ্স্যতে বাঙ্গালা—ভারত পুন: জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইবে। অসমীয়া—ভারত পুন: জগৎ সভাত শ্রেষ্ঠ আসন লব। হিন্দী—ভারত পুন: জগৎ সভামে শ্রেষ্ঠ আসন লেগা।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

পরিকল্পনার কি হইল?

"চন্দননগর বাংলা দেশে যাইবার পূর্ব্বে ভারত সরকার ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার উভয় তরফ হইতেই বার বার ঘোষণা শুনিয়াছিলাম—চন্দননগরে Sewerage scheme চালু করা, গঙ্গাতীর বাঁধানো এবং মিউনিসিপাল মজুরদের বাসস্থান ইত্যাদি করার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। মাঝে কিছু কিছু Engineer ইত্যাদি আসিয়া কি সব মাপজোপ করিয়া গেলেন। তার পর সেই যে সরকারী কর্ত্তারা-সব মুখে চাবি আঁটিয়াছেন, ঐ সকল পরিকল্পনার কি হইল, কিছুই জানা গেল না। আমাদের স্থানীয় কর্ত্তারা চন্দননগরের ব্যাপারে এত সজাগ যে, এ বিষয়ে তাঁহারা কিছু করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ সকল পরিকল্পনা যাহাতে কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য স্থানীয় নেতারা সচেষ্ট হইয়া ভারত সরকার ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে স্মরণ করাইবেন, আশা করি।"

—সমাচার (চন্দননগর)।

বহরমপুর মূক-বধির বিদ্যালয় প্রসঙ্গে

"গোটা পশ্চিম-বাঙ্গলায় তিনটি মাত্র মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। বলা বাহুল্য, বহরমপুর মূক-বধির বিদ্যালয়টি তাদের অন্যতম। এই বিদ্যালয়টির কৃতিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, শুধু এই জেলার সাধারণ অধিবাসীর দ্বারাই স্বীকৃত নয়, এই জেলার বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন কয় জন জেলাশাসক, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্ত্তা, মন্ত্রী, কংগ্রেসী নেতা, স্থানীয় এম-এল-এ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারাও ইহার কৃতিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত; তথাপি আর্থিক দিক দিয়া ইহা গত কয়েক বৎসর হইতে যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছে—বর্ত্তমান বৎসরে যে সেই স্থানের অত্যন্ত আশঙ্কনীয় প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ইহার উপর শুনিয়া ব্যথিত হইলাম যে, বহরমপুর পৌরসভা হইতে এই বিদ্যালয়কে যে বার্ষিক ২৪০্ সাহায্য করা হইত, গত বৎসরের সেই টাকা এই বিদ্যালয় পান নাই। দাতার ইচ্ছার উপর জোর নাই ইহা সত্য, কিন্তু এই দানের জন্য বহরমপুর পৌরসভার এক জন প্রতিনিধি এই বিদ্যালয় কমিটির অন্যতম সভ্য, তিনিও সময় মত এই দান-বিরতির খবরটুকু রাখিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য করেন নাই বলিয়া শুনিতেছি।"

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

ভূস্বামীদের সুকৃতি!

"জমিদারী উচ্ছেদে হিন্দু-সংস্কৃতির এক মহিমময় অবসান হইল। জ্ঞান-যাজ্ঞিককে আর কেহ ব্রহ্মোত্তর দক্ষিণা দিবে না। জল-মাদল, বিষহরণ, লোকমঙ্গ একশো আট শিবমন্দির নির্ম্মিত হইবে না। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি চূড়ায় বাঁধিত, গ্রামে গ্রামে বিষ্ণুমণ্ডপ, চতুষ্পাঠী, কালী সিংহ, মহাভাগবতদের মহাভারত রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম, সাবর্ণ চৌধুরীদের কালীমন্দির, রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর, গঙ্গাস্তুতি বঙ্গভূমির সমারোহ, শ্যামসাগর, কৃষ্ণসাগর—বর্ষান্তে এই মহান সংস্কৃতির চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। রাষ্ট্র বিশ্বামিত্র আর্য্য-হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডাল করিয়া ছাড়িলেন। শাসকগণ ভূস্বামীদিগের অনুষ্ঠিত সুকৃতি সমূহের অনুসরণ করিলে জমিদারী উচ্ছেদ কিয়ৎ পরিমাণেও সার্থক হইবে।" —আশা (বর্দ্ধমান)।

হায় জল, হায় সিমেন্ট

"কেউ বা গরমের জন্য, কেউ বা চাষের জন্য এবং কেউ বা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে জলের জন্য হাহাকার আরম্ভ করিয়াছে। জানা যায়, সরকার বাঁকুড়ার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে এক দফায় ২০৭টি কূপ নির্ম্মাণে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। মোট খরচের অর্দ্ধেক সরকার বহন করিবেন। প্রতি বৎসরই এইরূপ কিছু না কিছু মঞ্জুর হয়, কিন্তু এমনই বুভুক্ষু এই দেশ, তৃষ্ণা আর নিবারণ হয় না। সরকার-সাহায্যপুষ্ট কূপ ও বাঁধগুলির দিকে তাকাইলে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসে, কিন্তু জলপান আর হয় না। বলিতে গেলে এই কূপগুলির জন্যই জিলায় আমদানী সমস্ত সিমেন্ট আজ দুই মাসের উপর অন্য কাজে বিক্রয় বন্ধ রহিয়াছে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান এবং কাজ বাগাইতে জানেন, তাঁহারা এই সুযোগে সিমেন্টের মোটা পারমিট সংগ্রহ করিয়া দুর্মূল্যের বাজারে ব্যবসা করিবার তাকে করিতেছেন।

অবশ্য খুব কম লোকের ভাগ্যেই ইহা জুটিয়াছে।" ট্রিক্টের গুদামে সিমেণ্ট আসিয়া জমা হইয়াছে কিন্তু তাহার পারমিট ইস্যু করা হয় ধীরে-সুস্থে। স্কুল ইত্যাদির জন্যও সিমেণ্ট দেওয়া হইতেছে না। অথচ জানা যায়, গত সপ্তাহ হইতে জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা পাইতে সুরু করিয়াছেন। বাজারেও সিমেণ্ট যে না মিলে তাহা নয়, কিন্তু কালোবাজারী ছয় টাকা হইতে আট টাকায় উঠিয়াছে। লোকের আশা, সরকার যদি চটপট সৌভাগ্যবানদেরই কিছু সিমেণ্ট দিয়া দেন, তবে তাহার এঁটোকাঁটা খাইয়াও দুর্ভাগারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন।"

—নবজাগরণ (জামশেদপুর)।

তাঁত শিক্ষা

"সরকারী প্রচার বিভাগ দেশবাসীকে অনেক ভাল খবর জানিতেই দেন না। আমরা জানিতাম না যে, ঝাড়গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বিভাগ দ্বারা পরিচালিত দুই জন শিক্ষক সমেত তাঁত শিক্ষার এক ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা এই স্থানে নাকি পাঁচ-ছয় বৎসর আছেন এবং বিনপুর থানার শিলদা গোপীবল্লভপুর থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক বৎসর করিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁতীদের উচ্চাঙ্গের তাঁত-শিল্প শিক্ষা দিয়াছেন। প্রচার বিভাগ জানাইবেন কি যে, এই কেন্দ্রের জন্য বৎসরে কত টাকা ব্যয় হয়? সরকারী হিসাবে কত সূতা আনা হইয়াছে? কত তাঁতীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা?"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

আগুন লইয়া খেলা !

"ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। হিন্দুর চিরসমুজ্জ্বল গৌরবসৌধের স্বর্ণচূড়া চূর্ণ করিয়া লোকসভা জোর করিয়া ডাইভোর্স বিল পাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুর জিদের জয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি মূক ম্লান দেশবাসীর প্রীতি ভালবাসার উৎসধার রুদ্ধ করিয়া সে জয়ের বৈভব যে কত হানি পরিম্লান হইয়া গেল, নেহরুজীর স্তাবকেরাও তাহা বুঝে নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নর-নারীর অধ্যুষিত এই বিশাল রাষ্ট্রে একই প্রকার বিবাহ আইন প্রবর্ত্তিত করিতে যাহাদের সাহসে কুলায় নাই, তাহারাই নিতান্ত নিরীহ দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হিন্দুর পবিত্র বিবাহ বিধির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ছিঃ, ছিঃ! কাপুরুষতার আবার জয়! মুখে সীতা-সাবিত্রীর জয়ধ্বনি করিয়া যাহারা সতীমহিমার বেদীমূলে পশুবৃত্তি চরিতার্থতার নারকীয় চিত্র প্রতিষ্ঠার ভণ্ডামীর চূড়ান্ত করিল, তাহারা জানে না দেশের কি সর্ব্বনাশ করিল! পাশ্চাত্যের নরকচিত্র দেখিয়াও কেন যে ইহারা সতর্ক হইল না, এ এক দুর্জ্ঞের রহস্যই হইয়া রহিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিভ্রান্তবুদ্ধি মুষ্টিমেয় নরনারীর জন্য বিশেষ বিবাহ বিধি বর্ত্তমান থাকিতেও Brute majority বলে ধর্ম্মাশ্রীভূত হিন্দু বিবাহকে যৌনলিপ্সার পণ্যচুক্তির পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়া যাহারা ভাবিল—সহস্র বৎসরের তপস্যাপূত পুণ্য প্রদীপ এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিলাম—তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

"সংবিধানানুযায়ী কোন প্রকার মৌলিক অধিকার বা নাগরিক অধিকারের কোন অস্তিত্বই মানভূম জিলায় নাই। ব্যক্তির নিরাপত্তা, প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এখানে আকাশ-কুসুম হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন সভ্য শাসনে—যে সমস্ত গুণ্ডা ও দুষ্কৃতিকারীদের যোগ্য স্থান এক মাত্র কারাগার—বিহারে কংগ্রেসী শাসনে মানভূমে তাহারা সরকারী শক্তির সহায়ে যাহাকে যেখানে খুসী যখন ইচ্ছা মারিতেছে, যাহা খুসী করিতেছে—কে কোথায় যাইবে বা থাকিবে তাহার হুকুম বা আদেশ জারি করিতেছে, না শুনিলে লাঠীর আইনে মাথা ফাটাইতেছে। এখানে মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন, অধস্তন কর্মচারী হইতে দারোগা পর্য্যন্ত সকলকেই জনসাধারণ 'গুণ্ডার সর্দার' বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকে। কারণ কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা ইহাদের নিকট হইতে অন্য কোন পরিচয় পায় নাই বা পাইতেছে না। শাসনের ক্ষমতা লইয়া জনসাধারণের মনে ইহারা এই আসনই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা বোধ হয় ই[illegible]রবের বিষয় বলিয়া মনে করেন, তাহা না হইলে অন্ততঃ [illegible]লি ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ সংযত হইতেন। যাহা হউক, [illegible] এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন তাহা এখনও আমরা দেখিতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে চাই যে—ভারতবর্ষে কোথাও সত্যকারের কেহ আছেন কি না; যিনি বা যাহারা সত্য সত্যই এই অনাচার প্রতিকারের জন্য আগ্রহশীল। মানভূমের জনসাধারণ তাহাদের কর্তব্য করিয়া চলিয়াছে, চলিবে। কিন্তু আজ ইহাও দেখিতে হইবে যে, ভারতের কোন অংশের কোন জনসমষ্টির সমস্যা সমগ্র দেশেরই সমস্যারূপে বিচার ও ব্যবস্থা করিতে ভারতবর্ষের কোন দায়িত্ব এখনও আছে কি না।"

—মুক্তি (পুরুলিয়া)।

রামপুরহাটের জরীপ

"[illegible]পুরহাট মহকুমায় জরীপের কার্য্য চলিতেছে। কোথাও [illegible] প্রাথমিক জরীপের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই এটেষ্টেশান বা তসদিকের কার্য্য আরম্ভ হইবে। আমরা অভিযোগ পাইতেছি যে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্য-দলাদলির কল্যাণে অনুপস্থিত [illegible] স্বত্ব বা দখল যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং তসদিকের কার্য্য যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে তদবিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে আবার এই সকল ক্যাম্পে আইন ব্যবসায়িগণের সহায়তাও প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথায় এবং কখন হইতে কোন মৌজায় এই তসদিকের কার্য্য আরম্ভ হইবে, তাহার সঠিক বিবরণ কেহই পূর্ব্বে জানিতে পারিতেছেন না। আমরা কর্তৃপক্ষ মহোদয়কে এ বিষয়ে সজাগ হইতে অনুরোধ করি এবং স্থানীয় সংবাদপত্র বা ইউনিয়ন বোর্ড মারফত প্রত্যেক মৌজার তসদিকের তারিখ জনসাধারণ মধ্যে জানাইয়া দিবার অনুরোধ করি।"

—রাঢ়দীপিকা। (রামপুরহাট)

"আমরা কিছু দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, নদীর স্নানের ঘাটে স্থানীয় রজকদের মধ্যে কেহ কেহ কাপড়ের বোঝা লইয়া আসিয়া কাচিতে সুরু করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে নদীতে স্রোত বন্ধ হইয়া বদ্ধ-জলার মত অবস্থা হয়। গ্রীষ্মকালে স্নানার্থীর সংখ্যাও বাড়িয়া থাকে, তাহা ছাড়া অনেক বাড়ীতে গঙ্গাজল না ফুটাইয়া খাওয়ার বদভ্যাস এখনও আছে। গৃহস্থবাড়ীর মেয়েদের কাঁথা-কাপড় কাচিবার অভ্যাস একটুও কমে নাই, ইহার উপর রজকেরা আসিয়া কাপড় কাচিতে শুরু করিলে ভাগীরথী অচিরেই পচাপুকুরে পরিণত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশা করি, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ অচিরে জোর হস্তে এই কু-অভ্যাস বন্ধ করিবেন।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

পরলোকে ডাঃ এলবার্ট আইনষ্টাইন

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডাক্তার এলবার্ট আইনষ্টাইন আর ইহজগতে নাই। গত ১৮ই এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। পিত্তাশয়ের স্ফীতিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৭৯ সালে সুইজারল্যাণ্ডে এক ইহুদী পরিবারে আইনষ্টাইনের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে বার্ণের পেটেণ্ট অফিসে ইঞ্জিনীয়ার পদে কাজ করিবার পর তিনি কিছু দিন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও পদার্থবিদ্যার প্রাগ জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জুরিখ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি প্রাশিয়ান বিজ্ঞান-একাডেমির আমন্ত্রণে বার্লিনে আসেন এবং জার্মাণ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কাইজার উইলহেলম পদার্থবিদ্যা পরিষদের ডিরেক্টর পদে কার্য্য করেন। জার্মাণীতে নাৎসীরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মাণ নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া কিছু দিন কলেজ দ্য ফ্রাঁসে অধ্যাপনা করেন। ঐ সময়ে তিনি আমষ্টার্ডাম, কোপেনহেগেন ও প্যারিস বিজ্ঞান-একাডেমিরও সদস্যপদ লাভ করেন। ফোটো ইলেকট্রিক সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আইনষ্টাইন, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও বহু মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। পরবর্তী কালে তিনি আমেরিকায় আসিয়া মার্কিণ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৩ সালে মার্কিণ নৌ-বহরের অর্ডিন্যান্স বিভাগে বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ করেন। আইনষ্টাইনের রচনাবলীর নাম নিম্নে দেওয়া হইল: রিলেটিভিটি, ব্রুৎস্বর আইনষ্টাইটলিচেন কেভথিওরি, অ্যাবাউট জিওনিজম, হোয়াট ওয়ার, মাই ফিলজফি, দি ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আই সি, ইট, দি ইভলিউশন অব ফিজিক্স ও আউট অব মাই লেটার ইয়ার্স।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চ্যাটার্জী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্যা

[জাপানী চিত্রকর হিরোসিগি অঙ্কিত]

মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৮

চিত্রাধিকারী—প্রাণতোষ ঘটক]

সেই সব

কোথায় আর

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৪শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২] (স্থাপিত ১৩২৯) [প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিব দর্শন হলো! আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে—সমাধি। মাঝিরা হৃদেকে বল্‌তে লাগলো—ধর, ধর, পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন! প্রথমে দেখ্‌লাম দূরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আস্‌তে দেখ্‌লাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন! ভাবে দেখ্‌লাম—সন্ন্যাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, একটি ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকলাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো!"

"তীর্থে গেলাম, তা এক একবার ভারি কষ্ট হতো। কাশীতে সেজ বাবুর সঙ্গে রাজা বাবুর (কাশীর প্রসিদ্ধ মিত্র-পরিবার) বাড়ীতে কয় দিন আমরা ছিলাম। মথুর বাবুর সঙ্গে বইঠকখানায় বসে আছি, রাজা বাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা কেবল বিষয়ের কথা কইছে—এত টাকা লোক্‌সান হয়েছে, এই সব কথা। সেই সব কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগ্‌লাম। বললাম—মা! কোথায় আন্‌লে? আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম। তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা! কিন্তু সেখানে ত বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই!"

"কাশীতে মঠ্‌ দেখ্‌লাম—মোহন্তের কত মান। বড় বড় পোটারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বল্‌ছে, কি আজ্ঞা! কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম। আমায় বল্‌তো—প্রেমীসাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। মোহন্তকে দেখলাম যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—উপায় কি? সে বললে—কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ করছিল। পাঠ শেষ হলে বল্‌তে লাগ্‌লো—জলে বিষ্ণু স্থলে বিষ্ণু বিষ্ণু পর্ব্বত মস্তকে, সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। সব শেষে বললে—শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।"

"একদিন গীতা পাঠ করলে, তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়্‌লে। সেজ বাবু ছিল—সেজ বাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়্‌তে লাগলো। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল—উপায় নারদীয় ভক্তি। ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে।"

জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়

শ্রীকালিদাস নাগ

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ পাক্ষিক পত্রিকারূপে যার জন্ম, তার 'উদ্বোধন' নামকরণ করেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তার আগে কয়েক মাস (১৮৯৮) তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পাদি অবলম্বন করে যে সব বহুমূল্য প্রবন্ধ পরে লিখেছেন, তার বিষয়বস্তু নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর এই সময়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। আরো বছর দুই আগে—অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে—দেখি স্বামীজীকে তাঁর পাশ্চাত্য ভক্ত ও বন্ধুরা এক বিদায়-সভায় সম্বর্ধনা করছেন লণ্ডনের Royal Society of Painters পরিষদে। সুতরাং শিল্পি-মহলে যে স্বামীজীর অনেক অনুরাগী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। চার বৎসর ভারতীয় আদর্শ ও বৈদান্তিক ঐক্যবাদ প্রচারে প্রাণপাত পরিশ্রম করে স্বামীজী দেশে ফিরেছেন; আগাগোড়া জাহাজে এলে বিশ্রাম হত। কিন্তু তিনি এলেন শরীর জখম করার পথ ধরে প্যারিস, মিলান্, পীসা, ফ্লরেন্স, রোম, নেপল্‌স্ প্রভৃতি শহরের জগদ্বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে। লণ্ডন থেকেই ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন্ রাস্‌কিন্ (Ruskin) পন্থী, সুতরাং স্বামীজীর সঙ্গে শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন যে কত বড় আনন্দের কারণ হয়েছিল, তা আমরা কল্পনা করিতে পারি।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে নিবেদিতাকে নিয়ে (Master as I saw Him এই যুগের অপূর্ব সৃষ্টি) স্বামীজী শেষ বার পাশ্চাত্য দেশের বেদান্তকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে বেরোন। লণ্ডন, নিউইয়র্ক হয়ে ক্যালিফর্ণিয়াতে এসে সাত মাস কাজ করেন। এই সময়ে দেখি, স্বামীজীর প্রেরণায় নিবেদিতা দু'টি অধুনা প্রসিদ্ধ অভিভাষণ দেন—(১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা (New York, Aug 1899); সঠিক সন তারিখ তখনকার স্থানীয় পত্রিকাদি ঘেঁটে নির্ধারণ করা প্রয়োজন যে, স্বামীজী ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে বক্তৃতা দিতে নিবেদিতাকে কেন উদ্বুদ্ধ করেন এবং সে দিকে কতটা সাড়া জেগেছিল। নিবেদিতার যে ফরাসী জীবনী সম্প্রতি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এ বিষয়ে কোন নতুন তথ্য নির্ণয়ের প্রমাণ পাইনি, অথচ এই যুগেও প্রশ্নটির গুরুত্ব যে খুব বেশী, আমি তা' দেখাতে চেষ্টা করব।

১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেস (Congress of the History of Religions) বসে। ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বামীজী উহাতে যোগ দেন এবং অন্যান্য আলোচনার মধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন; সেটি ভারতীয় শিল্পের উপর তথাকথিত 'গ্রীক-প্রভাব' নিয়ে। ঐতিহাসিক সংযোগের ভিতর দিয়ে আদান-প্রদান হওয়া স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও যেমন অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে, তেমনি ভারতীয় শিল্পীরাও গ্রীক্-শিল্পীর কাছ থেকে কিছু নিয়েছে; কিন্তু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় শিল্পের প্রাণ গ্রীক-প্রভাবে কোন সময়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বামীজীর একথা ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদী ফরাসী অধ্যাপক Foncher শুনেছিলেন কি না জানি না। এ সব কথা ভারত-শিল্পি-বন্ধু হ্যাভেল তখনও স্পষ্ট করে লেখেন নি এবং আনন্দকুমার স্বামী তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশী করছেন। অথচ এত বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের গবেষণার পূর্বাভাস দিয়ে গেলেন—তার সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও Prof. Patrick Geddes; স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস থেকে Miss Mc Leod, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন শিল্প-তীর্থ পরিক্রমা (Oct-Dec 1900); এবার তিনি চিত্র ভাস্কর্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন না, তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে ভেসে চলেছে পশ্চাত্য শিল্প-ধারা—Austria, Hungary, Servia, Rumania, Bulgaria র বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করে দেখে স্বামীজী ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য শিল্প-নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কত ভাবে গিয়েছে, কী আগ্রহে সেটি বুঝবার ও বুঝাবার। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে, উদার প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, কারণ সেখানে শুধু শিল্প নয়, শিল্পীও যেন অস্পৃশ্য (Untouchable)! স্বামীজী এ ক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ (pioneer); অথচ তাঁকে আমরা মনে রাখি না, যখন ভারতীয় শিল্পের নব-জাগরণ বিষয়ে আলোচনা করি।

১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি, স্বামীজী বেলুড়ে ফিরেছেন। ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছর আগে গঙ্গাতীরে জমি কিনে যখন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নিজেই স্বামীজী এক বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা শুধু ধ্যানে নয়, নক্সায় তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে, তাঁর অধিকার পুঁথিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। পায়ে হেঁটে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠ-মন্দির স্বামীজী যেমন তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন, এমন কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকরা দেখেছেন। ১৮৮৮—১৮৯২ সালে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সব তীর্থই তিনি পরিদর্শন করেন। আবার জীবন-দীপ নির্বাণের পূর্বে শেষ বার মায়াবতী থেকে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঘুরেছিলেন (১৯০১—২)। রোগে যখন প্রায় শয্যাশায়ী তখন হঠাৎ জাপানী ভিক্ষু Rev. Oda ও প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ চৈনিক চিত্রকলার চরম সমঝদার Count Okakura ১৯০১ সালের শেষে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হলেন। আট বৎসর আগে Chicago ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেবার পথে স্বামীজী চীন থেকে জাপানে আসেন; এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সাল থেকে প্রাচ্য শিল্প ও জাপানী শিল্পীদের বিষয়ে স্বামীজী খবর রাখছেন। Oda ও Okakura এই সময় স্বামীজীকে আবার জাপানের ধর্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সে আশা অপূর্ণ থেকে যায়। জীর্ণ শরীর নিয়ে তবু স্বামীজী জাপানী অতিথিদেরও সেই সঙ্গে মহাবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপালকে নিয়ে

বুদ্ধগয়া ও কাশী পরিক্রমা শেষ বার করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও সঙ্গে ছিলেন। নিবেদিতার রচনাবলী থেকে আজ ভাল করে দেখা উচিত তিনি ভারতীয় শিল্প নিয়ে এত গভীর আলোচনা করেছিলেন কোন্ প্রেরণায়।

ভগিনী নিবেদিতাই আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে আর একবার বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমায় বিহার ভ্রমণ করেন এবং জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী (১৯০১) ও Modern Review পত্রিকার সাহায্যে নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মিরূপে ভারতের নব-শিল্পের প্রচারে নামেন।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায় আধুনিক ভারত-শিল্পের ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার করবে বলে আমার বিশ্বাস; অথচ এই দিকে গবেষণার যে উদার ক্ষেত্র রয়েছে, সে বিষয়ে আজও অনেকে সচেতন হননি। ১৯০২ সালে বিবেকানন্দের তিরোভাব ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভাব; এ সালের Studio পত্রিকা লণ্ডন থেকে তাঁর অধুনাপ্রসিদ্ধ 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রভৃতি চিত্রগুলি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসে প্রকাশ করে। যে যুগ থেকে ১৯১১ সালে যখন দেহত্যাগ করেন তখন পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা একা অবনীন্দ্রনাথের ও নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের কত ছবির লিপিভাষ্য নানা প্রবন্ধে বিশেষতঃ প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার 'চিত্রপরিচয়ে' রেখে গেছেন। ভারতবাসীদের বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পিসঙ্ঘের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ নিবেদিতার উপযুক্ত স্মৃতি স্থাপন করে ঋণ পরিশোধের কথা ভাবা উচিত।

১৯ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথও আভাসে জানিয়েছেন যে, তাঁর জীবনে যেন এক বিপ্লবের ঢেউ লেগেছিল। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করে কেরল-শিল্পী রবি বর্মা প্রচুর সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য রীতিতে হাত পাকিয়ে তুলেছেন, এমন সময় দেখা দিলেন মনীষী E. B. Havell: তাঁর সহানুভূতি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। ক্যানভাসে আঁকা বড় বড় তৈল-চিত্র বিসর্জন দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন 'কৃষ্ণলীলা', রূপকথার নায়ক-নায়িকা এবং ক্রমশঃ ১৯০১-১৯০৫ সালের মধ্যে বুদ্ধ ও সুজাতা, ভারতমাতা প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতি-কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে আবার অতিথি হয়ে এলেন Count Okakura এবং তাঁর সঙ্গে চিত্রকর Taikwan যিনি জাপানী আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৫) আগেই প্রকাশিত হয় Okakur-র "Ideals of the East"; এবং ক্রমশঃ Havell সাহেবের "Indian Sculpture and painting" প্রভৃতি বইগুলি ছাপা হয়ে ভারতীয় শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ গুণী গগনেন্দ্রনাথ শুধু নিজেদের ছবির ভিতর দিয়ে নতুন করে জাতীয় জাগরণের ইতিহাস লিখে সন্তুষ্ট হননি; তাঁরা গড়ে তোলেন উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী, যাঁদের মধ্যমণি হয়ে আছেন শ্রীনন্দলাল বসু। তাঁকে দেখা মাত্র ভগিনী নিবেদিতা যেন দিব্যদৃষ্টিতে চিনেছিলেন যে ভারত-শিল্পের ধুরন্ধর হবেন তিনি; অবনীন্দ্রনাথের মানস-পুত্র নন্দলালকে তাই নিবেদিতা অজন্তা-গুহা চিত্রাবলী নকল করতে পাঠান (১৯১০) Lady Harringham এর সঙ্গে।

ইতিমধ্যে Indian Society of Oriental Art প্রতিষ্ঠিত হল (১৯০৭-৮) কলিকাতায়। Justice Woodroff প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ভারত-বন্ধু ছাড়া দেখি Lord Kitchener ও পরে Lord Carmichael স্বদেশী শিল্পের বিদেশী সমঝদাররূপে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীরা নানা শিল্প-প্রসঙ্গ করেছেন, তেমনি ভগিনী নিবেদিতাও ভারত-শিল্প-সাহিত্যের মর্মকথা তাঁর অনুপম ভাষায় লিখে গেছেন প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায়। নিবেদিতা ও রামানন্দের সহযোগিতায়, সাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও নব্যভারত শিল্প কি ভাবে বেড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। (Nivedita: The Civic and National Ideals, pp. 73-148); তার মধ্যে এসে হাজির হলেন সিংহল-ভারতের উপযুক্ত সন্তান আনন্দকুমার স্বামী; তিনি ছাপালেন তাঁর Art and Swadeshi, তার পর Mediaeval Sinhalese Art এবং তার পর, প্রায় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪৭), চল্লিশ বছর ধরে, কত বিচিত্র গভীর শিল্প-সন্দর্ভ! তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে নীরবে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে মনে পড়ল ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে যে কয় ছত্র কুমারস্বামী লিখেছিলেন: 'Sister Nivedita's untimely death in 1911 has made it necessary that the present work (Myths of the Hindus and Buddhists, 1913) should be completed by another hand. A most sincere disciple of Swami Vivekananda who was himself a follower of the great Ramkrishna, she brought to the study of Indian life and literature a sound knowledge of western educational and social science and an unsurpassed enthusiasm of devotion to the peoples and the ideals of her adopted country. Through these books Nivedita became not merely an interpreter of India to Europe, but even more, the inspiration of a new race of Indian students no longer anxious to be Anglicized, but convinced that all real progress, as distinct from mere political controversy must be based on national ideals, upon inventions already clearly expressed in Religion and Art."

ভারতের ধর্ম শুধু পরকাল আর পরলোক আশ্রয় করে আছে, এ ধারণা যে কত বড় মিথ্যা, তা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগ্নিময়ী বাণীর ভিতর দিয়ে ও চরম আত্মোৎসর্গের সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা নিবেদিতা সেই চিরন্তন ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মাধুর্যভরা ছোটখাট আচার-অনুষ্ঠানের যোগ কত গভীর, সেটি তাঁর রচনায় তাঁর

সেখায় প্রমাণ করে গেছেন। তাই নন্দলাল বসুর 'সতী' চিত্রখানির এমন গভীর ব্যাখ্যান তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। সতী চিত্রখানি জাপানের সর্বপ্রধান শিল্প-পত্রিকা Kokka তে প্রকাশিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা যে এক নব যুগের আরম্ভ করেছেন, সেটি বিশ্বের শিল্পি-মহলে প্রমাণ হয়ে যায়।

কালের ধর্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা ভিন্ন খাতে বইবে, সেটা স্বাভাবিক এবং আধুনিক ভারতের শিল্প তার নূতন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে নেবে। কিন্তু বিবেকানন্দ-নিবেদিতার তথা অবনীন্দ্র-নন্দলালের যুগকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারবে না। যে গভীর ভাব-স্রোত থেকে অন্তহীন রূপলহরী ভেসে উঠেছে, সেটি বুঝতে হলে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সাহিত্যসাগরে ডুব দিতে হবে।

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া—
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।'

রবীন্দ্র বিবেকানন্দ যুগের ভাব যে বাঙলার শিল্পে সার্থক রূপ পেয়েছে, সে বিষয়ে আজ কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা হারিয়েছি অকালে; এবং তাঁর পর শিল্প-ভারতীর সার্থক ভাষ্য আজ পর্যন্ত আমরা কমই পেয়েছি; শুধু অলিখিত ইতিহাসের জের টেনেই আমরা চলেছি। ভারত-শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস লেখা বাকী আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পায়রা

বিগত দুই বিশ্ব-মহাযুদ্ধে নানা রকমের পশু-পাখীর প্রয়োজনও বড় কম হয় নি। মালবাহী অশ্ব, উট, খচ্চর, হাতী থেকে সামান্য পায়রাটিও যুদ্ধে এক একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল। কোনও ভিক্টোরিয়া ক্রশ তাদের ভাগ্যে জোটে নি সত্যি, কিন্তু তা বলে মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। ভিক্টোরিয়া ক্রশের বদলে ব্যবস্থা হয়েছে Dickin Medal। এখন শুনুন সেই পায়রাদের অসীম বীরত্বপূর্ণ কার্যের সংক্ষিপ্ত কিছু সমাচার :

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ভার্দুর সংগ্রামে ব্রিটিশ পক্ষের তিনটি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ যে পায়রাটি পৌঁছে দিয়েছিল ঘন ঘন কামানের গর্জন, মর্টার, ব্রেন-গান কি স্টেন-গানের গুলীকে উপেক্ষা করে এবং যার ফলে সম্ভব হয়েছিল ভার্দুর রক্ষা ব্যবস্থা তাকে পুরস্কৃত করা হয় এক রৌপ্য-অঙ্গুরী দিয়ে। ১৯২১ সালে পায়রাটির মৃত্যুর পর তাকে স্মারক্তি কবরস্থ করা হয় এবং তার মৃত আত্মার সম্মানার্থে একটি ফলকও প্রোথিত করা হয় কবরভূমিতে।

১৯১৭ সালে পায়রা নং ২,৭০৯ নাইটস ক্রশস এক অসমসাহসিক কাজ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। মেনিন রোডের ওপর দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে উড়ে যাবার প্রাক্কালে তার পা জখম হয় গুলীতে এবং তখন সে সেই সংবাদটি মুখে করে অতিক্রম করে সমগ্র পথ এবং যথাস্থানে পৌঁছে দেয় সংবাদ। হোয়াইট হলের রয়াল ইউনাইটেড সার্ভিস মিউজিয়মে মৃত পায়রাটি আজিও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের দপ্তরের এক খবরে প্রকাশ যে, ১৬,৫৫৪টি শিক্ষিত পায়রাকে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে নানা পঞ্চম বাহিনীর লোকের কাছে খবর সংগ্রহার্থে পাঠানো হয়েছিল। এবং তাদের মধ্যে ১,৮৪২টি পায়রা কাজ বাগিয়ে নিয়ে বাঁচিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে বলেও খবরটিতে বলা হয়েছে।

১৯৪০-এর অক্টোবরে বাস্তা বর্ড অঞ্চলের একটি শিক্ষিত পায়রা এক অদ্ভুত খবর বয়ে আনে রাজপ্রাসাদে একদা। প্লেনে করে রাজবাটিস্থ কোনও লোক পায়রাটিকে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে বিমানটির কল বিগড়োয় এবং পায়রাটি সেই খবর বয়ে নিয়ে আসে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দ্রুতগামী পায়রার নাম হোল 'উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ'। ঘণ্টায় ৭০ মাইল রাস্তা চলাটা তার কাছে কিছুই নয়। পায়রাটি Arnhem এর এয়ার ফোর্সের কাজে ছিল এবং সবচেয়ে বেশী ওড়ার ইতিহাসে একবার ২৬০ মাইল ৫ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে উড়ে পায়রাদের জগতে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিল।

'ডিকিন মেডাল' প্রথম যে পায়রাকে দেওয়া হয়, তার নাম ছিল 'উইনকি'। 'মেডিটারেনিয়ান সীতে হাবুডুবু খাচ্ছে এমন চার জন বৈমানিকের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য হ'ল এই পুরস্কার প্রাপ্তি।

Manus Island, নিউগিনিতে এক বার এক আমেরিকান ট্রুপের রেডিও খারাপ হয়ে গেল। এদিকে জাপানীরা ক্রমেই ঘিরে ধরছে। সেই বিপদের সময় পায়রা ছাড়া হল। প্রথম দু'টি পায়রাকে গুলী করে নামাল জাপানীরা। তৃতীয়টি কিন্তু সক্ষম হল হেড কোয়ার্টারে সংবাদ নিয়ে আসতে। ফলে রক্ষা পেল ট্রুপটি।

পায়রা যুদ্ধের কাজে আজ প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাই সামরিক বাহিনীতে পৃথিবীকে পায়রাদের জন্য পৃথক ইউনিট এবং তাদের ট্রেনিং দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

বাংলা দেশেও একদা জমিদারগণের মধ্যে পায়রা ওড়াবার খুব সখ ছিল। তবে তা ছিল নেহাতই বিলাসিতা মাত্র। ভারতবর্ষে অবশ্য পায়রার সাহায্যে জরুরী চিঠিপত্র, গোপন প্রেমপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল রাজা-রাজড়াদের মধ্যে।

শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় রেলপথ

অনিলচন্দ্র দে

১

এক শত বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের বিষয় ইংরাজ শাসকদের মনে সর্বপ্রথম উদয় হয়। ইংরাজী ১৮৩১-৩২ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করিয়া এ দেশে পাঠান। (Parliamentary select Committee on the Affairs of the East Indian Company 1831—32)। এই কমিটির নিকট ভারতবর্ষে চলাচলের সুবিধার জন্য খালপথ খনন ও রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়।

ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা তখন বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ। শক্তিমান মোগল সে সময়ের অনেক পূর্ব্বেই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। মারাঠা-তেজ তখন ক্ষীয়মাণ এবং রণনিপুণ খালসা বাহিনী আপন আধিপত্য বিস্তারে উন্মুখ। ইংরাজ শক্তি সে যুগে শুধু রাজ্যজয়েই ব্যস্ত। তখনও তাঁহারা বিজিত অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) সর্বপ্রথমে এ দেশে ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ় ও সংহত করিবার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লর্ড ডালহাউসির সময়েই তাঁহার অসামান্য নেতৃত্ব-শক্তি বলে ভারতে ইংরাজ শাসনের নানারূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়। তিনি কেবল মাত্র রাজ্যজয় করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই; শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যান-বাহনাদির সুব্যবস্থায় বিশেষ যত্নবান হন। শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার ফলে সে দিনের ভারত শতধা বিভক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, দেশে যাতায়াতের পথ-ঘাট নাই, নানা দুঃখ-কষ্টে মানুষ পীড়িত। স্যর্ উইলিয়াম এণ্ড্রু এ দেশের তৎকালীন অবস্থার বিবরণে বলিয়াছেন—"সম্ভবতঃ কখনও এমন কোনও দেশ ছিল না, যে দেশের জনসাধারণ এত বিত্তশালী ও বুদ্ধিমান, কিন্তু যে দেশে পথ-ঘাট এত স্বল্প এবং চলাচলের ব্যবস্থা এত কষ্টকর।" (Probably there never was a country with a people so rich and intelligent in which roads were so few and travel so difficult—Sir William Andrew)।

দক্ষিণ-ভারত অপেক্ষা উত্তর-ভারতে চলাচলের ব্যবস্থা ভাল ছিল। উত্তর-ভারতে বহু-বিস্তৃত সমতল ভূমিতে বর্ষাকাল ছাড়া সকল সময়েই সহজেই চলা-ফেরা করা যাইত। গঙ্গা ও সিন্ধু নদের সংযুক্ত অঞ্চল সমূহের বহু নদ-নদীতে খেয়া দেওয়া যাইত; ইহা ছাড়া এমন অনেক খালপথও ছিল যাহাতে সহজেই নৌকা খেয়া দিতে পারিত। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত সমতল ভূমির সুবিধা তো ছিলই না, বরং অসমতল পার্ব্বত্য ভূমির অসুবিধা ছিল। একমাত্র সমুদ্রোপকূল দিয়া জলপথে যেটুকু চলাচল সম্ভব সেটুকুর সুবিধাই পাওয়া যাইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী পূর্ত-কমিশনার (Public works Commissioner) মাদ্রাজ প্রদেশে রাজপথের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করেন। দ্রব্য-সামগ্রী গবাদি পশুরাই বহন করিত; প্রায়ই দেখা যাইত, গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা শ্রমকাতর হইয়া মারা পড়ে। রৌদ্র-বৃষ্টিতে দ্রব্যাদিও মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িত। যদিও বা গন্তব্যস্থলে দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছিত, এই ভাবে উৎপত্তিস্থল হইতে ব্যবসাকেন্দ্রে পৌঁছিতে খরচ পড়িত অত্যন্ত বেশী। নাগপুর ও অমরাবতী হইতে মির্জাপুরে এক টন তূলা লইয়া যাইতে খরচ পড়িত প্রায় ১১ পাউণ্ড ১০ শিলিং অর্থাৎ টাকার হিসাবে প্রায় দুই শত চল্লিশ টাকা।

চলাচলের সুব্যবস্থা না থাকার ফল বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সারাটি দেশ ছোট ছোট ও পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রতি অঞ্চল অপর অঞ্চল হইতে নানা ভাবে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল। রেলপথ ও রাজপথের মাধ্যমে দূরবর্ত্তী বিভিন্ন প্রদেশ-সমূহের মধ্যে বর্ত্তমানে যে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা সে কালের মানুষের নিকট অজানা ছিল। বিভিন্ন স্থানের মানুষের সামাজিক ও ধার্মিক আচার ও রীতি-নীতি ভিন্ন হইয়া উঠিল, অথচ সকল অঞ্চলের মানুষই একই সমাজ ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ওজনের মান, জমিজমার মাপের হারও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিও বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। এমন কি, একই ভাষাভাষী এবং একই আবহাওয়ার প্রভাবাধীন অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গীর পার্থক্য অনুভূত হইতে লাগিল। এই সকল নানা প্রকারের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য এত গভীর ভাবে জনসমাজের মধ্যে প্রবেশ করে যে, ভারতে রেলপথ স্থাপিত হইবার এক শতাব্দী কাল পরেও সেই সকল পার্থক্য একই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আজও বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সকল পার্থক্যের ফলে আর্থিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবও বিশেষ ভাবে অনুভূত হইত। একই সামগ্রীর মূল্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হইত। এক স্থানে হয়ত প্রচুর শস্য জন্মায় এবং সে অঞ্চলের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকে, কিন্তু তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মানুষ সেই শস্যের অভাবে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে। লর্ড ডালহাউসি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন—"Great tracts are teeming with produce they cannot dispose of. Others are scantily bearing what they would. Carry in abundance if only it could be conveyed whither it is needed. England is calling aloud for cotton which India does already produce in some degree and would produce sufficient in quality and plentiful in quantity if only these were provided the fitting means of conveyance for it from distant plains to the several ports adopted for its shipment."

বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল ফলে উচ্ছলিত। অপর অনেক অঞ্চলে স্বল্প মাত্র ফসল ফলে, কিন্তু চাহিদা ক্ষেত্রে

করিতে বাংলা সরকার সকল সময়েই আগ্রহান্বিত ছিলেন। ১৮৪৫ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা সরকারের তৎকালীন সম্পাদক হ্যালিডে সাহেব (Mr. Halliday, Secretary to the Government of Bengal) ভারত সরকারের নিকট তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, সাম্রাজ্যের রাজধানীকে (Imperial Capital) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করিতে পারিলে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা হইবে। হ্যালিডে সাহেব আরও মন্তব্য করেন যে, কলিকাতাকে দিল্লীর সহিত যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা রেলওয়ে ইনজিনিয়ারদের লইয়া গঠিত কোন কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত।

১৮৪৫ সালের ৭ই মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ (Court of Directors of the East India Company) ভারত সরকারের নিকট এক বার্তালিপি (Despatch) পাঠাইয়া এদেশে রেলপথ স্থাপনের স্বপক্ষে মত দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এদেশে রেলপথের সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা এদেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভারত সরকারের মনোযোগ এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ করেন। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ :—

১। সাময়িক বৃষ্টি ও বন্যা (Periodic rains and inundations)

২। প্রবল বাতাসের অবিরাম ক্রিয়া ও প্রখর সূর্য্যের প্রভাব। (Continued action of violent wind and influence of a vertical sun)

৩। কাঠ ও মাটির কাজের উপর পোকামাকড়ের উপদ্রব। (The ravages of insects and vermin upon timber and earthwork)

৪। কাঠের তক্তার উপর আপনা আপনি যে সকল আগাছা জন্মায় মাটি ও ইটের কাজের উপর তাহাদের ক্ষয়কারী প্রভাব। (The destructive effects of the spontaneous vegetation of underwood upon earth and brick-work)

৫। যে সকল অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেলপথ যাইবে তাহাদের অনাবৃত ও অরক্ষিত অবস্থা। (The unenclosed and unprotected nature of the country through which railroads would pass) এবং—

৬। ভারতে রেলপথ নির্মাণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যোগ্য ও বিশ্বস্ত পূর্তবিদ্ এবং শিল্পী সংগ্রহ করিবার অসুবিধা ও ব্যয় (The difficulty and expense of securing competent and trustworthy engineers and workmen to carry out the construction and maintenance of railroods in India)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, যাত্রী চলাচল হইতে আয় অতি সামান্য মাত্র হইবে। কারণ হিসাবে যুক্তি দেখান যে, ভারতের লোক দরিদ্র এবং বহু বিস্তৃত ভূভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে তাহারা বসবাস করে। মাল চলাচল হইতে যেটুকু আয় হইবে সেইটুকু মাত্র আয়ই তাঁহারা আশা করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের এই দুই আশঙ্কাই রেলপথে চলাচল আরম্ভ হইবার অল্প কালের মধ্যেই অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হয়। দেশের যে সকল অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেলপথ নির্মাণ করা হইয়াছিল সে সকল অঞ্চল জনসম্পদে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; এমন কি, এই সকল অঞ্চল তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাত্রী চলাচল প্রচুর হয়। এই বিষয়ে মিঃ হোরেস্ বেল বলিয়াছেন—"সকল শ্রেণীর মানুষের বহুল অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য নানা কাজকর্ম, নিছক ভ্রমণের আনন্দ কিম্বা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে রেলপথ চলাচল করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন; তাঁহারা এই সব ভ্রমণোপলক্ষে ব্যয় বহন করিবার সঙ্গতিও রাখিতেন" ("A large proportion of all classes were both able and willing to travel, whether on business or pleasure or from religious motives".—Horace Bell)

যে সকল সর্তে ভারতে রেলপথ নির্মাণ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে সে সকল সর্তের উপর অভিমত দিবার জন্য ভারত সরকারকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেন। ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ (Court) প্রেরণ করেন :—

১। মূল রেলপথগুলি (Trunk lines) এমন সকল সর্তে স্থাপিত হইবে যেন রেল কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকে। প্রয়োজন হইলে সেই কোম্পানী খরিদ করিয়া লইবার অধিকার সরকারের থাকিবে।

২। রেলপথ নির্মাণের পূর্ব্বে নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে। কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ও চুক্তির সর্তনামা (Constitution and terms of agreement) সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে।

৩। কোম্পানীর হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিবার অধিকার সরকারের থাকিবে।

৪। লাভের হার স্বল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সরকার লাভের হার কমাইয়া দিতে পারিবেন।

৫। জরীপ কার্য্যে সরকার সাহায্য দিবেন। রেলপথ স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়ে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সরকার সহায়তা করিবেন।

৬। সরকার কর্তৃক লভ্যাংশ দিবার অঙ্গীকার ব্যবস্থা ভাল নয় বলিয়া মনে হয়; কারণ অংশীদারেরা অবিবেচক ভাবে ফাট্‌কাবাজীতে লিপ্ত হইতে পারেন, এমন আশঙ্কা করা যাইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ লভ্যাংশ দিবার অঙ্গীকার ব্যবস্থার বিরোধী হইলেও কোন এক রকম সরকারী সাহায্য দিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৮৪৫ সালের জুলাই মাসে স্যার ম্যাক্‌ডোনাল্ড ষ্টিফেন্‌সন্ তিন জন সুযোগ্য সহকারী সঙ্গে লইয়া বাংলা দেশে আসেন। মির্জাপুরের মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে রেলপথের পরিকল্পনা তিনি ইতিপূর্ব্বে করিয়াছিলেন, তাহার জন্য জরীপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ

করেন। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে এই জরীপকার্য্য সমাধা হয়। তিনি হিসাব করিয়া দেখেন যে, সরকার বিনামূল্যে জমি দিলে তাঁহারা প্রস্তাবিত রেলপথ নির্মাণের ব্যয় মাইল-প্রতি পনর-হাজার পাউণ্ড পড়িবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৮৪৫ সালের ৭ই মে তারিখে বার্তালিপি (Despath dated 7th may 1845 ভারত সরকারের নিকট পাঠাইবার অনতিকাল পরেই মিঃ সিম্‌স্ নামে এক অতি অভিজ্ঞ পূর্তবিদ্‌কে ভারতে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করেন। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশে পরীক্ষামূলক ভাবে কোন রেলপথ স্থাপন করা সম্ভব কি না। মিঃ সিম্‌স ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে আগমন করেন এবং ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার প্রাথমিক অভিমত জ্ঞাপন করেন।

১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ সিম্‌স মাদ্রাজ হইতে ওয়ালাজাহানগর পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রেলপথের বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট তাঁহার মন্তব্য দাখিল করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ ৭ই মে তারিখের বার্তালিপিতে যে ছয়টি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে গুলির আলোচনাও করেন এবং এই অভিমত দেন যে, সেই সকল অসুবিধা দুর্লঙ্ঘনীয় নয়। মাদ্রাজ হইতে ওয়ালাজাহানগর পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রেলপথ স্থাপন করা উচিত এবং এই রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভবপর। মিঃ সিম্‌স্ এমন মতও প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক রেলপথ, তাহা দৈর্ঘ্যে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, এমন ভাবে স্থাপিত হওয়া উচিত যেন তাহা সর্বাঙ্গীন রেলপথ স্থাপন-ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। কারণ, সেই ক্ষুদ্র রেলপথ ভবিষ্যতে এই সর্বাঙ্গীন স্থাপন ব্যবস্থার অঙ্গ বলিয়াই গণ্য হইবে। (every line, however short, should have a reference to a general system of Railways of which it will ultimately become a part)। তিনি পরামর্শ দেন যে, সকল রেলপথই স্থায়ী এবং অভিন্ন গঠন পদ্ধতিতে নির্মাণ করা উচিত। রেল স্থাপনার প্রথম দিকে একটি লাইনে (single line) রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেতু এবং ইট-পাথরের গাঁথনী এমন ভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে দুইটি লাইন (double line) তাহাদের উপর দিয়া বসান যায়। হিসাব করিয়া দেখা হয় যে, এই রেলপথ স্থাপনের ব্যয় ছয় লক্ষ পাউণ্ড পড়িবে। এবং শতকরা পাঁচ পাউণ্ড হার লাভের আশা করা যায়। মালের ভাড়া ধরা হয় প্রতি টন-প্রতি মাইল-পিছু দুই পেন্স (2d per ton per mile) এবং যাত্রীভাড়া ধরা হয় মাইল-প্রতি তিন ফার্দিং (3 farthings per mile)।

১৮৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মিঃ সিম্‌স্ তাঁহার স্মারকলিপি (memorandum) প্রস্তুত করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, কোন রেলপথ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাহার মূল-নির্দেশ (specification) নক্সা ও নির্মাণের যাবতীয় খুঁটিনাটি সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে। এই সকল মঞ্জুরীকৃত খুঁটিনাটির কোনরূপ রদ-বদল করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে পুনরায় সরকারের নিকট মঞ্জুরী লইতে হইবে। সকল রেলপথ একই ধরণের মূল-নির্দেশ (specification) অনুযায়ী নির্মিত হইবে। সকল রেলপথ পরিচালন-ব্যবস্থা একই ধরণের হইবে এবং গাড়ীগুলির গঠনশৈলীও একই ধরণের হওয়া চাই।

৫

মিঃ সিম্‌স্ ও তাঁহার দুই সহকারী ১৮৪৬ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে ভারতে রেলপথ প্রবর্তন করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। (Practicability of Introducing Railways in India)। এই রিপোর্টেই কলিকাতা, মিরজাপুর এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিবার জন্য কোন একটি রেলপথ স্থাপনা সম্ভবপর কি না, তাহাও তাঁহারা আলোচনা করেন। মিঃ সিম্‌স্ ও তাঁহার সহকারী-দ্বয় মন্তব্য করেন যে, ভারতের বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রেলপথ প্রবর্তনের কোন প্রতিবন্ধক নাই। বরং সে দেশে রেলপথ স্থাপনার বিশেষ প্রয়োজন আছে; শুধু তাহাই নয়, চেষ্টা ও যত্ন সহকারে কাজে হাত দিলে ইয়োরোপের যে কোন অঞ্চলে যেরূপ সুষ্ঠু ভাবে রেলপথ নির্মাণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব, ভারতেও সেইরূপ সম্ভব। সে-দেশে সুদূরপ্রসারী সমতল ভূমির বহু-বিস্তৃত অঞ্চলে কোন কোন দিক অভিমুখে শত শত মাইল অতিক্রম করিলেও কোন অসমতলতা দেখা যায় না; সে দেশে আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যয় স্বল্প, ভূমির মূল্য অল্প, পারিশ্রমিকের হার সুলভ এবং গৃহাদি নির্মাণের উপকরণাদি সহজলভ্য। এই সকল কারণে ভারতে রেলপথ প্রবর্তন করা সম্ভবপর। (railroads are not inapplicable to the peculiarities and circumstances of India, but, on the contrary, are not only a great desideratum, but with proper attention can be constructed and maintained as perfectly as in any part of Europe. The great extent of its vast plains, which may in some directions be travessed for hundreds of miles without encountering serious undulations, the small outlay required for Parliamentary and Legislative purposes, the low value of land, cheapness of labour, and the general facilities for procuring building materials, may all be quoted as reasons why the introduction of a system of rail roads is applicable to India.)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ৭ই মে তারিখের বার্তালিপিতে যে ছয়টি সমস্যার প্রসঙ্গ উঠাইয়াছিলেন, সেগুলির বিষয়েও মিঃ সিম্‌স্ তাঁহার রিপোর্টে আলোচনা করেন। সমস্যা কয়টির সমাধান এই ভাবে হইতে পারে বলিয়া তিনি অভিমত দেন :—

১। সাময়িক বৃষ্টি ও বন্যা। এই দুই কারণে রেলপথের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে না। বাঁধ এবং কাঁচা ও পাকা এই দুই ধরণের রাস্তাই যখন রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তখন রেলপথও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভবপর।

২। প্রবল বাতাসের অবিরাম ক্রিয়া ও প্রখর সূর্য্যের প্রভাব :—রেলপথ নির্মাণে যথোচিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই দুই কারণ হইতে অসুবিধা দূর করা যাইতে পারিবে। বাতাসের ঘর্ষণ জনিত উত্তাপের ক্রিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নির্মাণকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। কাঠ ও মাটির কাজের উপর পোকামাকড়ের উপদ্রব :—
সেগুন ও আরাকানের লৌহকাঠ ব্যবহার করা হইবে ; কারণ, পোকার উপদ্রব এ দুই শ্রেণীর কাঠের উপর নাই বলিলেই চলে। মূষিক ও অন্যান্য জন্তুর অনিষ্টকর উপদ্রব সদা সতর্কতার ফলে বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

৪। কাঠের তক্তার উপর আপনা আপনি যে সকল আগাছা জন্মায় মাটি ও ইটের কাজের উপর তাহাদের ক্ষয়কারী প্রভাব :—
এই সকল আগাছা কর্মীরা অতি সহজেই উপড়াইয়া ফেলিতে পারিবে।

৫। যে সকল অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেলপথ যাইবে তাহাদের অনাবৃত ও অরক্ষিত অবস্থা : ভেরেণ্ডা গাছের কিম্বা কাঁটা গাছের বেড়া অথবা যেখানে শাল কাঠ পাওয়া যাইবে সেখানে শালের বেড়া দিলেই এই অসুবিধা অতি সহজেই দূর করা যাইবে।

৬। যোগ্য ও বিশ্বস্ত পূর্ত্তবিদ্ ও শিল্পী সংগ্রহ করিবার অসুবিধা : কয়েক জন দেশীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় (East Indian) যুবক ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠান হইবে। এই সকল যুবক এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেশীয় শিল্পীদের শিক্ষাদান করিবে।

মিঃ সিম্‌স্ ও তাঁহার সহকারীদ্বয় এই রিপোর্টে এত সকল বিষয় আলোচনা করিলেও সংখ্যাতাত্ত্বিক মতবাদের অভাবে যাত্রী ও মাল চলাচল বাবদ কি পরিমাণ আয় হইতে পারে সে বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ (Court) সিম্‌স্ কমিটিকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, কমিটি যেন এমন একটি প্রস্তাব করেন, যেন ভারতে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে মাঝারী ধরণের দৈর্ঘ কোন রেলপথ নির্ম্মাণ সম্ভবপর হয়। (to suggest some feasible line of moderate length as an experiment for railroad communication in India")। কমিটি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেন যে, এলাহাবাদ হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত কিম্বা কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপন পরীক্ষামূলক ভাবে করা যাইতে পারে। সিম্‌স্ কমিটি আরও অভিমত দেন যে, এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ মূলধন পাওয়া যাইবে।

সিম্‌স্ কমিটি কলিকাতা হইতে মির্জ্জাপুরের মধ্য দিয়া দিল্লি পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রেলপথের রাস্তা (route) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কমিটি মন্তব্য করেন যে, বর্ত্তমানে না হইলেও ভবিষ্যতে দুই লাইনের রেলপথের প্রয়োজন হইবে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তার Lieutenant Governor প্রস্তাবিত আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলপথের উল্লেখ করিয়া সিম্‌স্ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট শেষ করেন।

ভারত সরকার সিম্‌স্ কমিটির রিপোর্ট এবং ইন্‌জিনিয়ারদের কমিটির রিপোর্ট (Report by the Committee of Engineers) উভয়ই বিবেচনা করেন। ১৮৪৬ সালের ১ই মে তারিখে এক পত্র লিখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের সুপারিশ সকল জানান। মিঃ সিম্‌স্ রেল কোম্পানীকে বিনা মূল্যে জমি দিবার যে সুপারিশ করেন তাহা ভারত সরকার অনুমোদন করেন। সরকার কর্ত্তৃক লভ্যাংশ দিবার নিশ্চয়তা (guarantee) দেওয়া অনুচিত বলিয়া মন্তব্য করেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী রেল কোম্পানীগুলির মালিকানা স্বত্ব সরকার পাইবেন। নির্ম্মাণ-কার্য্যের খুঁটিনাটি ও নক্সা সমূহের উপর সরকারের কর্ত্তৃত্ব থাকা সমীচীন বলিয়া ভারত সরকার অভিমত প্রকাশ করেন। অবশ্য এই ব্যবস্থা বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে, একথাও ভারত সরকার স্বীকার করেন। রেল কোম্পানীগুলির লাভের হার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও থাকিবে সরকারের হাতে।

তদানীন্তন বড়লাট (Governor-General) লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) ১৮৪৬ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে স্বয়ং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি বিবরণী প্রেরণ করেন (Minut to the court of Directors)। তিনি অভিমত দেন যে রেল কোম্পানীকে বিনামূল্যে জমি দিবার ব্যবস্থা (সরকার কর্ত্তৃক খুবই সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মন্তব্য করেন যে, কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত দ্রুত ও দৈনন্দিন চলাচল ব্যবস্থা হইতে রাষ্ট্র যে পরিমাণ লাভবান হইবে সেই অনুপাতে একমাত্র বিনামূল্যে জমি দিয়ে সমর্থন ও সাহায্য করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। তিনি আরও মন্তব্য করেন, "সামরিক দিক হইতে বিচার করিলে আমার অনুমান হয়, সৈন্য ও রসদের অতি দ্রুত চলাচল ব্যবস্থা চারি পদাতিক বাহিনীর সাহায্যের সমতুল হইবে।" (In a militar point of view, I should estimate the value c moving troops and stores with great rapidit would be equal to the services of four regimen of infantry)। লর্ড হার্ডিঞ্জ অভিমত দেন যে, একমাত্র সামরিক প্রয়োজনেই কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেলপথে জন্য দশ লক্ষ পাউণ্ড এককালীন সাহায্য অথবা বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া উচিত। স্থান হইতে স্থানান্তরে সৈন্যবাহিনী চলাচলের যে সুবিধা হইবে এই রেলপথটির স্থাপন ফলে তদ্দ্বারা সৈন্যবাহিনী হ্রাস করিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করা সমীচীন হইবে। (On military cosideration alone, tl grant of one million sterling or an annual cont: bution of five lacs of rupees may be contribute to the great line from Calcutta to Delhi, and pecuniary saving be effected by diminution (military establishments, arising out of tl facility with which troops would be move from one part to another).

এইরূপে এক শত আট বৎসর পূর্ব্বে ভারতে রেলপথ স্থাপন প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় ভাবে স্বীকৃত হয়। রাজশক্তি এই অ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যথাশক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলে রেলপথ স্থাপনের সর্বপ্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার প্রায় প বৎসর পরে রেলপথ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং আ তিন বৎসর পর প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তক সকল ও দলিলাদির সাহ লওয়া হইয়াছে—১। W. P. Andrew—Indian Railwa; ২। Horace Bell—Railway Policy in Ind ৩। G. Huddleston—History of the East Indi Railway. ৪। N. Sanyal—Development of Indi Railways. ৫। Parliamentary Papers—1831-46

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

দুই

পূর্বপুরুষ

পলাশীর যুদ্ধের সময় বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বনমালিপুর গ্রামে বাস করছিলেন। জাহানাবাদের ঈশানকোণে, প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, বনমালিপুর গ্রাম। আরামবাগের অনতিদূরে এই গ্রাম এখনও আছে। এই বনমালিপুর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন—"উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান।"(১)

বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে তখনও কোন সূত্রে বিদ্যাসাগর-পরিবারের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বীরসিংহে বাস করতেন। বনমালিপুরের পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার এবং বীরসিংহের পণ্ডিত তর্কসিদ্ধান্ত সমসাময়িক। বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয়, রামজয় চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র রামজয়ের সঙ্গে তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয় কন্যা দুর্গা দেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন বনমালিপুরের সঙ্গে বীরসিংহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রামজয় তর্কভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ, দুর্গা দেবী পিতামহী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রাম।

ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের সমসাময়িক আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাতুলগ্রামে বাস করতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে পাতুলগ্রাম। পাতুল-নিবাসী এই পণ্ডিতের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ। তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়; জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী, কনিষ্ঠা তারা দেবী। জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী বিবাহযোগ্যা হ'লে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সুপাত্রের সন্ধান পেয়ে গোঘাটে উপস্থিত হলেন। আরামবাগের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোঘাট, গড় মান্দারণের কাছে। গোঘাটের সুপাত্রটির নাম রামকান্ত তর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায়)। মুখটি বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিচার ক'রে দেখলেন, পাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাও করে। সুতরাং কন্যা গঙ্গা দেবীর সঙ্গে রামকান্তের বিবাহ দেওয়া তিনি স্থির করলেন। এই গঙ্গা দেবী হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহী এবং রামকান্ত তর্কবাগীশ মাতামহ। গঙ্গা দেবীর গর্ভে কালক্রমে দুই কন্যার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী দেবী, কনিষ্ঠা ভগবতী দেবী। কনিষ্ঠা ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরের জননী।

বনমালিপুর, বীরসিংহ, পাতুল ও গোঘাট—এই চারটি গ্রামই বিদ্যাসাগর-পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার সঙ্গে ক্ষীরপাই গ্রামের কথাও উল্লেখ করতে হয়, কারণ ক্ষীরপাই বিদ্যাসাগরের শ্বশুরালয়। ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ তিন-চার মাইল দূর, একঘণ্টায় হেঁটে যাওয়া যায়। বনমালিপুর বিদ্যাসাগরের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান, বীরসিংহ বিদ্যাসাগরের পিতার মাতুলালয়, পাতুল বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়, গোঘাট বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয়। পরে বিদ্যাসাগর-পরিবার বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে বসতি স্থাপন করেন। বনমালিপুর বীরসিংহ পাতুল গোঘাট—প্রত্যেকটি গ্রামে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ও পিতামহের কালে, বিখ্যাত পণ্ডিতদের বসবাস ছিল। এই সব বিদ্যাসমাজের কোন ধারাই কি উত্তরাধিকারসূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র পাননি? অবশ্যই পেয়েছিলেন। সেই ধারার বৈশিষ্ট্য কি? তার ইতিহাসই বা কি?

বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ বনমালিপুরের ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগরের পিতার মাতামহ বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত, বিদ্যাসাগর-জননীর মাতামহ পাতুলের পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশ, সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্বরচিত জীবনচরিতে বিদ্যাসাগরও তাঁর সম্বন্ধে

---

(১) স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত : ৩

উল্লেখযোগ্য কিছু লিখে যাননি। মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের আরও অনেক পণ্ডিতের মতন তিনিও চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে বনমালিপুরে অধ্যাপনা করতেন। "অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ" ব'লে বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ যখন মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন তখন নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রাদ্ধসভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছে ব্যাকরণবিদ্যার পরিচয় দিয়ে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁকে খুশী করেছিলেন। শঙ্কর তর্কবাগীশ সন্তুষ্ট হয়ে তর্কসিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন ক'রে বাহবা দিয়েছিলেন। নৈয়ায়িক শঙ্করের কাছে বাহবা পাবার পর তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিপত্তি গ্রাম্যসমাজে যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর মাতামহ পাতুলনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নিজের বাড়ীতেই চতুষ্পাঠী ছিল এবং ছাত্ররা সেই চতুষ্পাঠীতে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতিরই অধ্যাপনা করতেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ এবং মধ্যম রামধন ন্যায়রত্নও অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশ বাল্যকাল থেকে অবাধে অধ্যয়ন ক'রে, একুশ-বাইশ বছরের মধ্যে ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে "বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন" হন এবং তর্কবাগীশ উপাধি পান। গোঘাটে নিজগৃহের চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রকে তিনি অন্নদান করতেন এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদানও করতেন। তখনকার টোল-চতুষ্পাঠীতে এই অন্নদান ও শিক্ষাদানের রীতিই প্রচলিত ছিল। রামকান্তের এই বিদ্যানুরাগের পরিচয় পেয়েই পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ দেওয়া স্থির করেছিলেন।

হুগলী জেলার আরামবাগ ও মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল প্রধানত: খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্যাসমাজের অধীন ছিল। পূর্বাঞ্চলের নবদ্বীপ সমাজের মতন দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খানাকুল বিদ্যাসমাজের প্রতিপত্তি ছিল বেশী। খানাকুল ও ভাঙ্গামোড়ার বিদ্যাসমাজের তখন খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। খানাকুল-সমাজের মতামতই আরামবাগ ও ঘাটাল অঞ্চলে গ্রাহ্য হ'ত বেশী এবং তার একটি স্বতন্ত্র ধারাও ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই খানাকুল বিদ্যাসমাজের পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয় পাতুল এবং বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল-সমাজের অধীন ছিল। মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলেও খানাকুল-সমাজের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। খানাকুল-সমাজের কথা তাই বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। কারণ, বিদ্যাসাগর-পরিবারের বিদ্যানুশীলনের ধারা খানাকুল-সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিতৃকুল ও মাতৃকুল, দুই দিক থেকেই এই ধারা এসে বিদ্যাসাগর-প্রতিভায় মিলিত হয়েছে। এই পুরুষানুক্রমিক ধারার মধ্যেই বিদ্যাসাগর-প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়েছে।

খানাকুল-সমাজ প্রসঙ্গে প্রথমেই বিখ্যাত পণ্ডিত কণাদ তর্কবাগীশের নাম করতে হয়। শোনা যায়, তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত মহাপণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন এবং কিছুদিন নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে পাঠাভ্যাস ক'রে, চূড়ামণির কাছে পাঠশেষ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত কণাদের কাল ধরা যায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কাল। কণাদের তিন পুত্র—রুদ্র বাচস্পতি, রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ ও গোপী সার্বভৌম। এই রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশের ধারাই খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী। এই বংশের বিভিন্ন ধারা বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ ক'রে খানাকুল বিদ্যাসমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কণাদ ও তাঁর পুত্র রত্নেশ্বরের ধারা ছাড়া আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নামের সঙ্গে খানাকুল সমাজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জড়িত। তিনি হলেন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার নারায়ণ ঠাকুর [বন্দ্যোপাধ্যায়] কণাদের সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের কাল-ব্যবধান প্রায় ১৫ বছরের। (২) নারায়ণ ঠাকুরের নিজস্ব স্বাধীন মতামত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য খানাকুল-সমাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ-সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটি কাহিনীর এখানে উল্লেখ করছি।

শাস্ত্রালোচনার জন্য সেকালের পণ্ডিতেরা মধ্যে মধ্যে কাশীধামে যেতেন। একবার নারায়ণ ঠাকুর যখন কাশীতে ছিলেন তখন একটি ঘটনা ঘটে। একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে ব'সে ঠাকুর সন্ধ্যাবন্দনাদি করছেন। এমন সময় কয়েকজন প্রৌঢ়া রমণী জল নিতে এসে বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে: "কেমন পোড়া শাস্ত্র দেখেছ? কেমন হতভাগা পণ্ডিত দেখেছ? আর রাজাই বা কেমন দেখেছ গো? ১২ বছর পরে লোকটা ফিরে এল ঘরে, ঘরের লোকের কত আনন্দ করবার কথা, তা না, পণ্ডিতে বলে কি না, ঘরে থাকতে পাবে না!" বোঝা যায়, কোন সংসারী লোক স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়েছিল, দ্বাদশ বছর পরে ফিরে এসেছিল ঘরে। শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী সে মৃত, সুতরাং ঘরে তার স্থান হবে না ব'লে পণ্ডিতেরা রায় দিয়েছিলেন। প্রৌঢ়াদের মধ্যে তাই নিয়ে ঘাটের ধারে, যেমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তেমনি আলোচনা হচ্ছিল। "বারো বছর পরে লোকটা ফিরে এল ঘরে, বলে কি না ঘরে থাকতে পাবে না!" সন্ধ্যাহ্নিক

(২) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য: বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান ১০৮-১১১

নারায়ণ ঠাকুরের কানে কথাগুলি পৌঁছতেই তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন।

নারায়ণ ঠাকুর বললেন: "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে বাড়ীতে থাকতে পারে।"

পাশাপাশি ঘাটের পর ঘাট। একঘাট থেকে অন্যঘাটে ঠাকুরের কথা রটে গেল। ঘাট থেকে ঘরে ফেরার পথে কাশীর অলিগলিতে রটল। কে নারায়ণ ঠাকুর? কেউ জানে না, চেনে না। শুধু এইটুকু জানে, বাংলাদেশের কোন বাঙালী পণ্ডিত। ধীরে ধীরে কাশীরাজের কানে গেল কথাটা। কে এই বাঙালী পণ্ডিত? এত বড় স্পর্ধা তাঁর? কাশীর পণ্ডিতদের বিধান ও কাশীরাজের আদেশ কি তা জেনেও তিনি বলেন: "হ্যাঁ, সে বাড়ীতে থাকতে পারে।" ডাক পড়ল পণ্ডিতের। রাজার হুকুমে দরবারে হাজির হলেন নারায়ণ ঠাকুর। বললেন: "কি আদেশ, বলুন?"

রাজা বললেন: "আপনিই কি বলেছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গৃহে গ্রহণ করা যায়?"

"হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম।"

"আপনার নিবাস কোথায়?"

"কৃষ্ণনগরে মদীয় বাসোপ্যুনা।"

"কোন্ বিধান অনুসারে আপনি এই ব্যবস্থা দিলেন?"

ঠাকুর বললেন: "বিধান? শ্রীকৃষ্ণ তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে নিজেকে মৃতজ্ঞান করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনদিন পরে এসেও তিনি যখন জীবিত ব'লে গণ্য হন এবং গৃহে গৃহীত হন, তখন দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দিষ্টের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? এই আমার বিধান।"

রাজসভা নিস্তব্ধ। রাজা স্তম্ভিত। সভাপণ্ডিতেরা বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত। তুমুল তর্ক-বিতর্ক হ'ল ঠাকুরের বিধান নিয়ে। অবশেষে নারায়ণ ঠাকুরের মতই গ্রাহ্য হ'ল। কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা তা জানবার উপায় নেই, দরকারও নেই। যা 'রটে,' অনেক সময় দেখা যায়, তার কিছুটা 'বটে'। নারায়ণ ঠাকুরের ক্ষেত্রে রটনার সঙ্গে ঘটনার মিল থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। 'ধাতুরত্নাকর' ও 'স্মৃতিসার' গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। অনেক প্রচলিত তথাকথিত শাস্ত্রমত খণ্ডন ক'রে তিনি নিজের মতামত ও বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জন্যই খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে বেড়েছিল। (৩) বিদ্যাসাগরের পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ এই খানাকুল-সমাজের ধারাতেই শিক্ষা পান। এই ধারাকে একটা স্বাধীন বিদ্রোহী ধারা বলা যায়। শাস্ত্রের সাহায্যে অনেক প্রচলিত শাস্ত্রমত বিদ্যাসাগরও খণ্ডন করেছিলেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল—দুই কুলের বিদ্যাসমাজের আওতা বা ধারা থেকে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে যে তিনি কিছু করেছিলেন, তা মনে হয় না। তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিবেশের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ধারার উৎস সন্ধান করা যায়।

প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য যেমন, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও মহত্ত্বও তেমনি বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। "ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।" এই কথা ব'লে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ প্রসঙ্গে উক্তি করেছেন: "লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নেই।" (৪) রামজয় সত্যই অনন্যসাধারণ ছিলেন। যেমন ছিলেন পিতামহ রামজয়, তেমনি ছিলেন মাতামহ রামকান্ত। উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগর নিজে এবং তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এরকম কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। (৫) চরিত্রবিশ্লেষণে এই কাহিনীগুলির যথার্থ মূল্য দিতে রবীন্দ্রনাথও কুণ্ঠিত হননি।

ছেলেবেলা থেকেই রামজয় বেশ একরোখা লোক ছিলেন। যেমন তাঁর শক্তি ছিল, তেমনি ছিল সাহস। পথচলার সময় সদা তিনি একটি লৌহদণ্ড নিয়ে চলতেন। তখন এ-অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। আরামবাগ মান্দারণ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাতদের গল্প আজও শোনা যায়। এরকম গল্প আমরা অনেক শুনেছি। এখনও ডাকাতি ও খুনখারাবি হয় যথেষ্ট। আরবী-ফার্সি অভিধানে 'মদারণ' কথার অর্থ নাকি 'জঙ্গল'। আরামবাগের অনেক স্থান, অনেক মাঠঘাট, আজও ডাকাতের আড্ডা ব'লে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি অর্জন ক'রে রয়েছে। ভিকদাসের মাঠ, তেলভেলের মাঠ, ভাদুরের মাঠ, বলুপুষ্করিণী, সুলতানদীঘি, ময়নাদীঘি, আমোদর খাল, আগুনের খাল, তারাযোলির খাল, পচার খাল, মায়াপুরের সরাই ইত্যাদি ডাকাতদের ঐতিহাসিক আড্ডার স্থান। মাঠে-ঘাটে মৃন্ময়ী কালীমূর্তি স্থাপন ক'রে, মদ্য-মাংসযোগে পূজা ক'রে তারা ডাকাতি করতে বেরুত। শত্রুকে কালীর সামনে নরবলি দিতেও দ্বিধা করত না।(৬) দু'চারজন ক'রে দল বেঁধে লোকে পথ চলাচল করত। রামজয় প্রায় একলাই পথ চলতেন বড় বড় মাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে ফিরতেন সঙ্গে কেউ থাকত না, একমাত্র তাঁর নিত্যসহচর লৌহদণ্ডটি ছাড়া। ডাকাতের হাতে দু'চার বার যে তিনি পড়েন নি

(৩) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি: সন্দর্ভ-সংগ্রহ (১৮৯৭): "খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৪) রবীন্দ্রনাথ: বিদ্যাসাগরচরিত

(৫) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: বিদ্যাসাগর জীবনচরিত: "উপক্রমণিকা"।

(৬) জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২: শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি "গড় মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তা নয়। কিন্তু সহচর লৌহদণ্ডটির যথেষ্ট পরিমাণে সদ্ব্যবহার ক'রে রেহাই পেয়েছিলেন। আক্কেলসেলামি পেয়ে পরে ডাকাতরাও আর তাঁর কাছে ঘেঁষত না। দূর থেকে লৌহদণ্ডটি দেখেই তারা বুঝত, তর্কভূষণ যাচ্ছেন। ডাকাতরা জানত না যে এই দুর্জয় রামজয় তর্কভূষণই বাংলার অদ্বিতীয় অজেয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী পিতামহ। রামজয়ও তখন জানতেন না।

শুধু ডাকাতের ভয় নয়, এ অঞ্চলে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুর, আরামবাগ থেকে মেদিনীপুর তখন লোকে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। এখনও স্থানীয় লোকরা অনেকে তাই করেন। পথঘাটের অবস্থা এখনও প্রায় তাই রয়েছে, বিশেষ কিছু বদলায়নি। হালে বদলাচ্ছে, আর দু'পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক বদলে যাবে। কিন্তু এখনও আরামবাগ বা ঘাটাল অঞ্চলে হাঁটাপথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। পাল্কি আছে, পঙ্গু ও ধনীদের জন্য, সুস্থ ও সাধারণের জন্য নয়। গরুর গাড়ীরও পথ নেই। পাল্কী চ'ড়ে পুরুষ মানুষ গেলে (এমন কি গরুর গাড়ীতেও) দেখেছি, গ্রামের লোক ভিড় ক'রে দেখতে আসে। জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি, তারা মনে করে, সহরের হাসপাতালে কোন রুগী যাচ্ছে! মনে মনে ভেবেছি, বিদ্যাসাগরের দেশই বটে! এই দেশের সন্তান বিদ্যাসাগরের পক্ষেই কথায় কথায় হেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহ গ্রামে যাওয়া সম্ভব! বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয়ও এইরকম হাঁটতেন। একবার হেঁটে তিনি বনমালিপুর থেকে মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর একুশ হবে। শালবন ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে হ'ত। তার মধ্যে বাঘ-ভাল্লুকও থাকত যথেষ্ট। চলার পথে এক জায়গায় খাল পার হয়ে তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এমন সময় একটি ভাল্লুক তাঁকে আক্রমণ করল। ঘন ঘন নখরাঘাতে ভাল্লুক তাঁর সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, আর তিনি তাঁর লৌহদণ্ডটি দিয়ে তাকে কেবল পিটতে লাগলেন। দুর্দ্ধর্ষ বন্য ভাল্লুক যখন নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল, তখন প্রচণ্ড পদাঘাতে তিনি তাকে ধরাশায়ী করলেন। ভাল্লুকও জানত না, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ। রামজয়ও তখন জানতেন না যে, ভবিষ্যতে একদিন তাঁরই পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজের অনেক বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক্ষতবিক্ষত হ'লেও, কখনও পরাজয় স্বীকার করবে না।

এ কেবল রামজয়ের দৈহিক শক্তির পরিচয় নয়, মানসিক শক্তিরও পরিচয়। বলিষ্ঠ মন না থাকলে, দুর্দ্ধর্ষ জোয়ানও পঙ্গু ও হীনবীর্য হয়ে যায়। রামজয় নির্ভীকচিত্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে কেবল যে তিনি ডাকাত আর বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তা নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নীচতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রেও তিনি কম ক্ষতবিক্ষত হননি। বাঘ-ভাল্লুক ও ডাকাতদের জন্য মনের বলের সঙ্গে দেহের শক্তি ও নিত্যসহচর লৌহদণ্ডটি ছিল। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের সংগ্রামে সম্বল ছিল শুধু ভয়শূন্য চিত্ত। লৌহদণ্ডটি তখন কোন কাজেই লাগেনি। পিতা ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর পারিবারিক মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'ল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। তৃতীয় রামজয়ের কোন কর্তৃত্বই খাটত না। রামজয় তখন বিবাহিত এবং দুই পুত্র ও চার কন্যার পিতা। সামান্য বিষয় নিয়ে প্রায় ভাইয়ে-ভাইয়ে কথান্তর হ'ত, একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে যা সাধারণত হয়ে থাকে। কথান্তর থেকে ক্রমে "বিলক্ষণ মনান্তর" ঘটে গেল। রামজয় কাউকে কিছু না ব'লে হঠাৎ একদিন দেশত্যাগী হলেন। অল্পদিনের মধ্যে দুর্গা দেবীকেও অতিষ্ঠ হয়ে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে চ'লে যেতে হ'ল। সাত আট বছর পরে তর্কভূষণ আবার ফিরে এসেছিলেন। সংসারী হয়ে, সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে, তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে চাননি। আট বৎসর-কাল তিনি দ্বারকা, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। ফিরে এসে প্রথমে তিনি বনমালিপুরে যান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে, শ্বশুরালয় বীরসিংহে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হন। মিলনের কাহিনীটি চমৎকার।(১) গেরুয়া বসন প'রে সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বীরসিংহ গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আত্মপরিচয় দেননি। এমন সময় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা দূর থেকে তাঁকে দেখে চিনতে পেরে 'বাবা' ব'লে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। রামজয় আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হন। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে, কয়েকদিন বীরসিংহে থেকে, তিনি সপরিবারে বনমালিপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু স্ত্রীর মুখে নিজের ভাইদের অসদ্ব্যবহারের বৃত্তান্ত শুনে, বনমালিপুর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। শ্বশুরালয়ে শ্যালকদের সংস্পর্শে বসবাস করার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীরসিংহে বসবাসের সিদ্ধান্ত করলেন তিনি, কেবল সহোদরদের নীচতার জন্য। পৈতৃক সম্পত্তি ও ভিটের মোহ তিনি এই ভাবে ত্যাগ করলেন। কয়েক বছর পরে এই বীরসিংহ গ্রামেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হ'ল। বীরসিংহের ভূস্বামী বসবাসের জন্য বাস্তুভূমি রামজয়কে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। বাস্তুজমি ব্রাহ্মণকে দান করেছি, এই অহঙ্কার যাতে ভূস্বামী ভবিষ্যতে কোনদিন না করতে পারেন, তার জন্য রামজয় খাজনা ধার্য ক'রে নেন। কে বলবে, রামজয় তর্কভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ ন'ন?

রামজয়ের শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ ছিলেন গ্রামের

(১) বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন: বিদ্যাসাগর জীবনচরিত: "উপক্রমণিকা"।

প্রধান ব্যক্তি। তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র, সুতরাং প্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। উদ্ধতস্বভাব রামসুন্দর চেয়েছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁর অনুগত হয়ে বীরসিংহে থাকবেন। কিন্তু ভগিনীপতিটি যে কি প্রকৃতির ব্যক্তি তা তিনি বুঝতে পারেন নি। নানাভাবে তিনি রামজয়কে জব্দ করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রামের লোক দিয়ে তাঁকে শাসিয়েছেন এবং তাঁর বাধ্য করবার চেষ্টা করেছেন। রামজয় মাথা হেঁট করেন নি। গ্রাম্যসমাজের যাবতীয় নীচতা দীনতা ও পরশ্রীকাতরতার মূর্তিমান জীব এই শ্যালকটিকে ও তাঁর অনুচরদের দেখে, গ্রামের লোক সম্বন্ধে ঘৃণায় তাঁর মন ভ'রে গিয়েছিল। গ্রামের লোকের চক্রান্তকে উপেক্ষা করেই তিনি [বীরসিংহ গ্রামে বীর সিংহের মতন বসবাস করতে লাগলেন। কথায় কথায় তিনি মুক্তকণ্ঠে বলতেন—"এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সবই গরু"। একদিন তিনি গ্রামের পাশে একটি মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গ্রামের একজন লোক তাঁকে বলে: "ওদিক দিয়ে যাবেন না পণ্ডিত মশাই, ময়লা আছে"। তর্কভূষণ মশাই সমানভাবে চলতে চলতেই জবাব দেন: "এখানে কি মানুষ আছে যে মল বা ময়লা থাকবে? আমি তো গোবর ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।" এইভাবে গ্রাম্য নীচতা ও দলাদলিকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্রূপ করতেন। অথচ তাঁর মতন অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি তখন দুর্লভ ছিল। অন্যায় শঠতা বা কপটতার সঙ্গে রামজয় জীবনে কোনদিন আপস করেন নি। স্বার্থের জন্য কখন আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। নিজের সহোদর ও স্ত্রীর সহোদরদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছেন এককথায়। যিনি যত বড় বিদ্বান ধনবান বা ক্ষমতাবান হ'ন না কেন, প্রকৃতিতে অভদ্র হ'লে, তিনি কদাচ তাঁদের ভদ্রলোক জ্ঞান করতেন না। স্পষ্ট কথা শতগুণ স্পষ্ট ক'রে বলতেন। (৮) এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করতে পারেন নি। কেবল তাঁর অক্ষয় সম্পদ যে চরিত্রমাহাত্ম্য, তাই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে দান ক'রে গিয়েছিলেন। (৯)

পিতামহ রামজয়ের মেরুদণ্ডটি ঈশ্বরচন্দ্র বংশানুক্রমে পেয়েছিলেন। পিতামহের নিত্যসহচর লৌহদণ্ডের মতন সেই মেরুদণ্ড। অমেরুদণ্ডী বাঙালী সমাজে, তাই দেখতে পাই, এক শ্রেষ্ঠ ঋজু মেরুদণ্ডী জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে। বাঙালী সমাজে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব তাই যুগান্তর নয় শুধু, কল্পান্তর ব'লে মনে হয়।

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের পর, মাতামহ রামকান্ত তর্কবাগীশের কথা মনে হয়। গোঘাট অঞ্চলে রামকান্তের মতন পণ্ডিত খুব অল্পই ছিলেন। খানাকুল বিদ্যাসমাজের প্রতিপত্তির কথা আগে বলেছি। খানাকুল-সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, তান্ত্রিক উপাসনার ধারা। রামকান্ত এই ধারারই অনুগামী ছিলেন। ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তার ফলে তাঁর অধ্যাপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের পড়াশুনার দিকে তিনি আর তেমনভাবে মন দিতে পারেন না। ছাত্ররা একে-একে চতুষ্পাঠী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। রামকান্ত বিচলিত হলেন না। একাগ্রচিত্তে তিনি তন্ত্রের অনুশীলন করতে লাগলেন। অবশেষে তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং কঠোর শবসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। শবের উপর ব'সে সাধনা করতে করতে একদিন রামকান্ত তুড়ি দিয়ে 'মঙ্গুর' 'মঙ্গুর' ব'লে গাত্রোত্থান করলেন। তার পর থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি তুড়ি দিয়ে 'মঙ্গুর, মঙ্গুর' ব'লে চুপ ক'রে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যেত, একা ব'সে ব'সে কেবল তুড়ি দিচ্ছেন, আর 'মঙ্গুর মঙ্গুর' করছেন। খবর পেয়ে পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাই, কন্যা ও দৌহিত্রীদের নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপে জামাই রামকান্তের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। দৌহিত্রীরা মাতুলালয়ে মানুষ হ'তে লাগল। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী তাই ছেলেবেলা থেকে পাতুলে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছেন।

মাতামহ রামকান্তের চরিত্র পিতামহ রামজয়ের মতন স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট না হ'লেও, ধোঁয়াটে নয়। সেকালের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, যিনি তন্ত্রশাস্ত্র অনুশীলনে এবং বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি ন'ন। পণ্ডিত রামকান্তের সাধনা আর উন্মার্গগামী ব্যভিচারীর তথাকথিত তন্ত্রোপাসনা, এক বস্তু নয়। রামকান্তের শক্তিসাধনা শক্তির উৎস-সন্ধানে অভিযানের মতন। এই শক্তিসাধক রামকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্রের গর্ভধারিণী। নামেও ভগবতী দেবী, শক্তির প্রতিমূর্তি। এর কোন তাৎপর্য নেই ব'লে মনে হয় না। কথাপ্রসঙ্গে রামমোহনের দীক্ষাগুরুর কথা মনে

---

(৮) স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিতে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন: "তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন: আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" (পৃঃ ৩৫)

(৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।" (বিদ্যাসাগর-চরিত)।

হ'চ্ছে। চোদ্দ বছর বয়সে রামমোহন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে তিনি অধ্যাপনা করতেন, পরে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। এই হরিহরানন্দ কুলাবধূতই রামমোহনের দীক্ষাগুরু। ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষাগুরু তাঁর জননী ভগবতী দেবী, তান্ত্রিক সাধক-পণ্ডিত রামকান্তের কন্যা। সাক্ষাৎ শক্তির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রামমোহনের দীক্ষাগুরু তান্ত্রিক সাধক-পণ্ডিত কুলাবধূত হরিহরানন্দ। দু'য়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, বোঝা যায়, ব্যক্ত করা যায় না।

উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রকন্যাদের মধ্যে তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবী ছিলেন রামজয়ের আদর্শ সহধর্মিণী। স্বামী গৃহত্যাগী হবার পর তিনি সংসারের কঠোর কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি করেন নি কোনদিন, অথচ প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে একদিনের জন্যও নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করেন নি। মোটাকথায় যাকে সাংসারিক বুদ্ধি বলে, দুর্গা দেবীর তা ছিল না। সত্যই তর্কসিদ্ধান্তের তেজস্বী কন্যা ছিলেন তিনি, তাই বনমালিপুরে স্বামীর সহোদরদের কাছে যেমন মাথা হেঁট ক'রে থাকেন নি, তেমনি বীরসিংহে নিজের সহোদরদের আশ্রয়ে থেকেও অপমান সহ্য করেন নি। রামজয় দেশত্যাগী হবার পর দুর্গা দেবীর পক্ষে যখন আত্মসম্মান বজায় রেখে শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন তিনি পুত্রকন্যাদের নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ে চ'লে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আদরযত্নে ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর অসহায় অবস্থাটা ভাইদের পরিবারে প্রকট হয়ে উঠলো, তখন ভাইবৌ'রা মধ্যে মধ্যে বাক্যবাণে তাঁকে জর্জরিত করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা তর্কসিদ্ধান্ত সব বুঝে-শুনেও চুপ ক'রে থাকতেন, উপযুক্ত পুত্রদের পারিবারিক ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারে যা সাধারণত হয়ে থাকে, ঠিক তাই। দুর্গা দেবী অপমান সহ্য ক'রে ভাইদের পরিবারে বেশীদিন থাকতে পারলেন না। পিতাকে বললেন: "আমাকে একখানা আলাদা কুঁড়ে ঘর বেঁধে দিন, আমি সেখানে থেকে যা হোক ক'রে ছেলেমেয়েদের মানুষ করব।" পণ্ডিত পিতার বুঝতে দেরী হ'ল না। কন্যার পক্ষে যে আর বিবাহিত পুত্রদের পরিবারে একত্রে ও একান্নে বাস করা সম্ভব নয়, তা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। গ্রামের লোকদের ব'লে তিনি একটি পর্ণকুটীর তৈরী ক'রে দিলেন বীরসিংহ গ্রামে। এই পর্ণকুটীরে, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস, খুড়া কালিদাস, এবং মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা নামে চার পিসিমা ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছেন। তখন টাকু ও চরকায় সুতো কেটে, সেই সুতো বেচে, নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোকেরা কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে দুর্গা দেবীও সেই ভাবে নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারে এমন কেউ ছিল না তখন। পিতা তর্কসিদ্ধান্ত বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনিও অক্ষম। সামান্য বৃত্তি বা বিদায় যা পেতেন তিনি, তা নিশ্চয় গুণধর পুত্রদের সংসারে দিতে হ'ত, তা না হ'লে বৃদ্ধবয়সে হয়ত তাঁরও অন্নসমস্যা ও গৃহসঙ্কট দেখা দিত। তবু তার মধ্যে থেকেই সামান্য অর্থ সাহায্য, যখন যা সম্ভব হ'ত, তিনি কন্যাকে করতেন। তাতে কিছুই হ'ত না। সুতো বিক্রী ক'রেও ছয়টি ছেলেমেয়ের দু'বেলা অন্ন জোটানো সব সময় সম্ভব হ'ত না। অনেকদিন অনাহারে কাটাতে হ'ত। তবু দুর্গা দেবী নিজের ভাইদের কাছে হাত পাতেন নি, অথবা ভাইয়ের সংসারে অবাঞ্ছিত বোঝার মতন অপমান সহ্য করতে ফিরে যাননি। শ্বশুরবাড়ী বনমালিপুরেও অন্তত: আর একবার তিনি ফিরে যেতে পারতেন। পুত্রকন্যার দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে, কত জননীই তো দিনের পর দিন কত অপমান, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য ক'রে, কত ভাই ও ভাসুরের সংসারে মুখ বুজে থাকেন। দুর্গা দেবীও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। কিন্তু নারী হয়েও, এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সেকালের পরনির্ভর অসহায় বধূ হয়েও, তিনি আত্মসম্মানের বিনিময়ে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে চাননি। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী তিনি, রামজয় তর্কভূষণের স্ত্রী। ভগবতী দেবী এই দুর্গা দেবীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ।

সাধারণ মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে যত রকমের মালিন্য থাকা সম্ভবপর, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃ-মাতৃকুলের অধিকাংশ পরিবারেই তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। বনমালিপুরের ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পরিবার, বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের পরিবার, কোথাও সুস্থ পরিবেশের কোন চিহ্ন ছিল না। বিস্ময়কর হ'ল, পূর্বপুরুষদের এই সঙ্কীর্ণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও এমন দু' এক জন মানুষের মতন মানুষ জন্মেছিলেন, যাঁদের প্রত্যক্ষ পুরুষানুক্রমিক ধারাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের মতন বংশধরের জন্ম হয়েছিল। ভুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃসিংহরাম বা মধ্যম গঙ্গাধরের ধারাতে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়নি। তৃতীয় পুত্র রামজয়ের ধারাতেই বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল। মানবচরিত্রের রূপায়ণে পূর্বপুরুষদের যদি কোন প্রভাব থাকে, তাহ'লে জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে পিতামহ রামজয় সেই প্রভাব যে সবচেয়ে বেশী বিস্তার করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিবারের মধ্যে ভগবতী দেবীর পাতুলের মাতৃ পরিবার ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-রকম আর কোন পরিবার করেনি। একমাত্র এই এক পরিবারের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র নিজে (১০) প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল বিদ্যাসমাজের অন্তর্গত ছিল

---

(১০) বিদ্যাসাগর স্বরচিত জীবনচরিতে জননীর

পাতুল। ভগবতী দেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের ধারায় অনেক সুপণ্ডিত জন্মেছেন, এবং শাস্ত্র অধ্যাপনা ক'রে জীবন কাটিয়েছেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর ও তার পাশাপাশি গ্রামগুলির পরিবেশই ছিল অন্যরকম। বিদ্যাচর্চা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রভাবে গ্রাম্যসমাজের কূপমণ্ডূকতা ও সঙ্কীর্ণতা তেমন দানা বাঁধতে পারেনি এখানে। এরকম পণ্ডিতবহুল সমাজ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে আর কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক সময় কন্যাদেরও উচ্চশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। মনে হয়, নীতির দিক থেকে না হলেও, কুলীন ব্রাহ্মণকন্যারা অকাল বৈধব্যের জন্য কোন কোন উদার পণ্ডিত পিতার কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা পেতেন। রাঢ়ীয় সমাজের বিখ্যাত মহিলা পণ্ডিত হটী বিদ্যালঙ্কার (বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রামনিবাসী) এই ভাবেই শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং কাশীতে টোল খুলে অধ্যাপনা ক'রে জীবনধারণ করতেন। (১১) খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি বেড়াবেড়ি গ্রামের দ্রবময়ী দেবীও বালিকাবয়সে বিধবা হয়ে এইভাবে পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে শিক্ষালাভ ক'রে বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে গণ্য হন এবং অধ্যাপনা ক'রে জীবন কাটান। (১২) পাতুলের বিদ্যাবাগীশ পরিবারও উচ্চশিক্ষিত পরিবার। ভগবতী দেবীর মাতুলদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার মৃত্যুর পরেও শাস্ত্রানুশীলনে বিরত হননি। চারভাই একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে বসবাস করেও সুখে ও শান্তিতে ছিলেন। অগ্রজকে সকলে পিতৃতুল্য মনে করতেন এবং কোন দিন তাঁর ব্যবহারে কেউ অসন্তোষের কোন কারণ খুঁজে পাননি। গ্রাম্যসমাজে ভগবতী দেবীর এই মাতুল-পরিবারের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁদের পারিবারিক জীবনের আদর্শ গ্রাম্যসমাজের আদর্শ ছিল। কেবল বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, উদারতা, মহানুভবতা, দানশীলতা ও অতিথিসেবাপরায়ণতার জন্যও বিদ্যাবাগীশ পরিবারের সুনাম যথেষ্ট ছিল। ভগবতী দেবীর বাল্যজীবন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য-জীবনের অনেক দিন, পাতুলের এই পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কেটেছে। স্বরচিত জীবনচরিতে তিনি লিখেছেন: "আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে মাতৃদেবী পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যও স্নেহ যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি ঘটিত না।" সামান্য অসুখবিসুখ হলেই ভগবতী দেবীর মাতুল বীরসিংহ গ্রাম থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে পাতুলে নিয়ে যেতেন। পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের স্বাস্থ্যনিবাস। দৈহিক স্বাস্থ্যের নয় শুধু, মনে হয় মানসিক স্বাস্থ্যেরও। বীরসিংহ থেকে কলকাতা পায়ে হেঁটে যাতায়াতের পথেও তিনি একদিন করে পাতুলে অবস্থান করতেন। পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের চলার পথে সবচেয়ে মনোরম সরাইখানা। বীরসিংহ থেকে পাতুল ক্রোশ ছয়সাত দূর হবে। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে কিছুই নয়। তিনি নিজেই লিখেছেন: "এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিতাম।" জননীর মাতুলালয় পাতুলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল আন্তরিক। সে আকর্ষণ উদার উন্মুক্ত পারিবারিক পরিবেশের আকর্ষণ। জননীর মাতুল-পরিবারের এই স্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন ভুলতে পারেন নি। [ক্রমশঃ।

পরিচর্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই"। (পৃঃ ২৮)।

(১১) শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম ওয়ার্ড রচিত: Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos (1811): Vol I, 1956. প্রবাসী: আশ্বিন ১৩৫৩: শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "হটী বিদ্যালঙ্কার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা: ১ম খণ্ড, সম্পাদকীয়।

(১২) সমাচার দর্পণ, ১১শে এপ্রিল ১৮৫১: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ডে উদ্ধৃত, ৪১৩—৪

বর্ষাকাল

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(কবির সর্ব্বপ্রথম বাঙলা রচনা)

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্তরে।

সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।

অবনীন্দ্র-চরিতম্

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

শ্রীমান্, এই কিছুক্ষণ আগে আমার ঐ—গন্ধবরীর বক্র শাখায় একজোড়া বুলবুলি পাখীকে তুমি দুলতে দেখেছিলে; তাদের নাচন-কোঁদন দেখে একটি স্নিগ্ধ হাসি তুমি হেসেছিলে;—কিন্তু' বিস্মিত' হবে যদি বলি, ঐ আকাশচারী পাখীর দলই গুরুদেবের ছিল সত্যিকার সখা। ওরাই তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে আসত,—রূপময় বর্ণময় গন্ধর্বলোক থেকে, তার চিত্র-কানন থেকে,—এক পৃথিবী-ভোলানো সঙ্গীত, যে সঙ্গীতটির অমৃত-মাধুরী কানের মধ্যে প্রবেশ না করলে কোনো মনুষ্যশীল মনুষ্যই রূপ-দেখবার অধিকারী হয় না। উপরকার আলোক, আর নীচেরকার মৃত্তিকার মধ্যে ওরাই ছিল যেন তাঁর সম্বন্ধ-সূত্র।

এই পক্ষী-রূপকই রচনা করেছে গুরুদেবকে; এই পাখীদেরই আবার রচনা করেছেন গুরুদেব; এই পাখীর মত করেই আবার গুরুদেব রচনা করেছেন আমাদের। ভেবে দ্যাখো একবার, কী অদ্ভুত গুরুদেবের এই পাখীর কারখানাটি,—"দ্বা সুপর্ণা..."।

পক্ষীমহলের উপর এই পক্ষপাতিত্বই অনুপ্রাণিত করেছিল গুরুদেবকে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই; কারণ এই বিহঙ্গ-বিত্তার চিত্রকল্প তোমরা দেখতে পাবে গুরুদেবের অজস্র রচনায়। এই সেদিনেও আমাকে স্তম্ভিত হয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হয়েছিল অবনীন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনীতে, মিউজিয়ামে। ৭:৮ ইঞ্চি একখানি ছোট্ট ছবির মধ্যে, বলব কি, একটি ছোট্ট "চড়াই"-হেন পক্ষী আমার ক্ষুর-পাকেও ঠায় যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখলে হে! কী-যে মায়া তার বাতাপী ফুলের মত নরম পালকে, কী যে নিবেদন তার আলোক-সজাগ চক্ষে, কী যে ক্ষুধা তার যবের দানার মত কচি কচি চঞ্চুতে! বলব কি শ্রীমান্, সে এক নতুন চোখে দেখলুম যেন—প্রাত্যহিকতার অবলুপ্ত, একটি অতিসামান্য চড়াই পক্ষীকে। সেই চড়াই পাখীটি এখন এখান থেকে উড়ে গিয়ে কোথায় বসেছে জানো? ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রহালয়ের কুলুঙ্গীর মাথায়। ঐ তো ঝাঁক ঝাঁক চরছে চড়াইপাখী ওখানে, ঐ বাগানে; কিন্তু কই, তোমার আমার চোখে তো ভিড় জমাচ্ছে না তারা? আর, তাও বলি শ্রীমান, পুষব ব'লে কি কেউ কখনো চড়াই পোষে? না। কিন্তু অবন ঠাকুরের হাতে-গড়া চড়াই পাখীটিকে আজ পুষতে লেগে গেছে ভারতবর্ষের রসিক মন। আশ্চর্য লেগে তাই। গুরুদেবের প্রথম ও প্রিয় শিষ্য শ্রীনন্দলাল বসুও তাঁ "শিল্পকথা"য় (P. 17) এক জায়গায় লিখেছেন—

"এক চীনা আর্টিষ্ট বলেছেন,—"দেবতার মূর্তি আর দুর্গ অঙ্কুর,—যথার্থ আর্টিষ্টের নিকট দুইয়ের একই মূল্য; একই র প্রেরণা জাগাবার শক্তি দু'জনে ধরে।"...শিল্প সাধনায় শি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায়।...সৃষ্টির সময় শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্বে ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং তার বিষয়ও আবেগ থেকে ইমোশন থেকে রসে গিয়ে পৌঁছয়।...রসের দিক্ থেকে সৃষ্টি করা না হ'লে, র না পৌঁছলে, রচনা বিকৃত হয়—সুখে বিকৃত, দুঃখে বিকৃত।"

তাই বলছিলুম, ঐ চড়াই পক্ষীটি রসের বিষয়বস্তু হয়ে বলেই রসিক ভারত আজ ওটিকে তুলে রেখেছে তার রত্ন-ভাণ্ডারে শিল্পীর হাতে পড়লে একটি নগণ্য চড়াইও এমনি ক অমূল্য হ'য়ে লাভ ক'রে বসে, অগণ্য নয়নের অনাবিল ভালবাসা।

অবন ঠাকুরের animal Painting series এর এই চ আগার কথা। তিনি কেবল তাঁর চোখটি কাঁপিয়ে বলছেন-"Study কর্। চোখ দিয়ে ভালো করে ছাখ, ওদের ক শোন্।"

কিন্তু কী দেখব? রূপমাত্রই তো নয়ন-ক্যামেরায় ফটো প্লেটের মত ধরা দিয়ে আছে! তাই আমার মনে হয়, ভা করে শিল্পীদের ভেবে দেখা উচিত গুরুদেবের বাণীর তাৎপর্য।

শ্রীমান্, রূপদর্শন বড় সূক্ষ্ম ব্যাপার, এবং চক্ষুরত্নটি কেবলমাত্র ক্যামেরা নয়। যতটা সহজ ভাবি ততটা সহজ ন এই রূপ (form) দেখা। আমার এই দু'টি চক্ষু প্রথম দি থেকেই তো রূপ দেখছে। দুন্দুভি বাজিয়ে রূপময় পদার্থটি আমা এই চক্ষুরত্নের সামনে এসে বিকশিত হচ্ছে; আর ছাখো, নানা হাব-ভাবের ফুলকারী করতে করতে অগুন্তি রেখার সূত্র দ বেঁধে ধরে রয়েছে রূপের ঐ ডৌলটিকে। কিন্তু চক্ষুর কাজ শেষ হয়ে গেল,' যখনি রূপের প্রকাশ-খবরটিকে দেহের দ্বারে এ সে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল? তা হয় না শ্রীমান্। চক্ষু:—শব্দে অর্থই হচ্ছে;—রূপকে সে ব্যক্ত করে, তার কাহিনী সে বলে দেয় (চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি+উসি প্রত্যয় কর্তা)। তবেই সে হ

চক্ষুঃ। ধীর, উদাত্ত বা ললিত মন চোখের মারফতে ঐ রূপের ভিতরে যখনি কোনো রসস্যন্দিনী রেখার কাব্য শুনতে পেল, তখনি সে ভাবের আনন্দ-লাবণীতে সমাহিত হয়ে গেল; তখনি সে রূপের গুহাহিত সত্তাটিকে দর্শন করে, আর সেই মুহূর্ত্তে সে রূপদক্ষ হয়, আর্টিষ্ট হয়ে ছবি আঁকে। এই ব্যাপারখানি না ঘটলে, তখনি দেখবে শিল্পী ছেঁটে ফেলে দিয়েছে অনাবশ্যককে, বৈরস্যকে—আবর্জনার মত। রূপ-দেখার প্রসঙ্গে তাই গুরুদেবকে বলতে শুনি—

"...রূপদক্ষতা সেইখানে যেখানে—রূপে-রেখায় রূপে ভাবে সুরে-কথায় এবং এক-রেখায় অন্য-রেখায় একরূপে অন্যরূপে এক সুরে অন্য সুরে একাত্ম হয়ে রস সৃষ্টি করে। রেখা ছাইলো রূপকে, রূপ ছাইলো রেখাকে এমন ভাবে যে, কেউ কাউকে মারলে না, কিন্তু মিল্লো সহজ ছন্দে—তখনি হল রস; না হলে বিরস হল ব্যাপারটি।"—(P. 24)

"...মধুকরের সঙ্গে রূপদক্ষের তুলনা দেওয়া হয় কখনো কখনো, কিন্তু রূপদক্ষ ফুলের মাধুরী ফুলের রূপের সঙ্গ পায়, মধুকর শুধু পায় ফুলের মধু, ফুলকে পায় না। রূপের মধ্যে মধুকর ফাঁকা অরূপ রস পেয়ে বঞ্চিত হল, আর রূপদক্ষ মানুষ রূপে রসে সমান অধিকার পেয়ে চরিতার্থ হয়ে গেল।"

"...রূপ কি তা বোঝাতে হয় না কাউকে, রূপ চোখে পড়লেই জানায় আপনি কি বস্তু; কিন্তু রূপের মাধুরী সে যে অন্তরের জিনিষ, তাকে বোঝাতে গেলেও বোঝানো হয় না, রূপদক্ষ যারা তারা তা জানে, কিন্তু জানাতে পারে না।...মাধুর্য্য এবং রূপ দুটোর বিষয়েই 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' লেখা আছে। কিন্তু রূপ যে দেখলে না, রূপের মাধুরী হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করলে না, সে হাজার বার 'নীলমণি' উল্টে-পাল্টে পড়েও কিছু পেলে না। রূপ দেখে ভুলে যাওয়া যার হল না সে পড়েই চললো পুঁথি।...(বাগে : P242/3)

শ্রীমান, কতকগুলি আপ-শব্দ আমরা (অর্থাৎ ভারতবাসীরা) প্রতিদিন শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি, যেগুলির প্রকৃত অর্থ আমরা নিজেরাই আমাদের সঙ্কুচিত মন নিয়ে সন্ধান করি না, বা অলসতায় করতে চাই না;—অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যবহার করে থাকি;—জলের মত। গ্রাম্য অপব্যবহারে তারা ভ্রষ্টার্থ হ'য়ে আমাদের সদ্‌বুদ্ধিকে অশুভ পথে চালিত করছে। তাই, শ্রীমান হাস্য করে বলছি,—প্রথমতঃ শাসন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ঐ শব্দগুলিকেই; এবং তাদের এই অপব্যবহার-বৃত্তিটিকে। "রূপ" শব্দটি তাদের মধ্যে দু' নম্বর। "চক্ষুঃ" শব্দটির কথা প্রথম নম্বরেই আমি বলেছি। সেই-হেন বস্তু-চক্ষুর বিষয়টিকে ব'লে "রূপ"। ভারতবর্ষ কোনো দিন "রূপ" শব্দটিকে নয়নের অগোচর বলে বা ক'রে, চিন্তা করেনি।

রূপ রূপক্রিয়ায়াম্ চৌ প্যন্তঃ। অস্য পকারলোপঃ নিপাত্যতে অগুণত্বং চ। রূপয়তি রূপ্যতে বা তৎ শোভনম্ ইতি রূপং—চক্ষুর্বিষয়ঃ। কর্ত্তা কর্ম চ।—(দশ : উঃ ৭.৭)।

রূপের শোভন অস্তিত্ব তোমাকে মানতেই হয়েছে, যখনি তুমি ভালবাসার শোভনতা বা মাধুরী ছড়িয়ে তুমি তাঁকে আহ্বান করেছ—'অরূপ', 'অপরূপ' বলে। নিরূপিত বা নিরূপ্যমান বলল-বালা এই শোভন মূর্ত্ত পদার্থ টি "রূপ"। ব্যাকরণের জঞ্জাল ছাড়িয়ে, এই "রূপ" নিয়েই কাব্যসৃষ্টি করেছেন আধুনিকতম শ্রীরবীন্দ্রনাথ। যথা:—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে,"
তাই এই রূপসম্বন্ধে আমার অ-নিরক্ষর গুরুদেব যা বলেছেন, তা তাঁর কথাতেই বলি—

"রূপ-সম্বন্ধে বলবার সময়ে অরূপের কথা ওঠে, প্রায়ই দেখি; এবং অরূপের আধার রূপ এ-ও বলা হয়, এবং অরূপের সাধনার জন্যেই আর্টে রূপের অবতারণ, এমনো কথা প্রচলিত হয়ে গেছে চিত্র সমালোচনাতে; সুতরাং গত তিন মাস ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ছবিতে এই রূপ অরূপের ঠিক্ যোগাযোগটা কি ভাবের, তা ধরবার চেষ্টায় রইলেম। দেখতেম পর্বতের সামনে যখন কুয়াসা তখন অরণ্য নেই, পাহাড়ের ঝরণা নেই, চোখের কাজ ফুরিয়ে গেছে তখন মনের বা কানের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। জলের শব্দ শুন্‌ছি, পাখীর গান শুন্‌ছি আর ভাবছি কত কি, কিন্তু এটা যে পাখী গাইছে, ওটা যে ঝরণা ঝরছে, তা মনে-ধরা রূপ সমস্ত কুয়াসা হবার আগে থেকেই আমাকে জানিয়েছে! আবার পর্বতের উপরে অমাবস্যার রাত্রি যে কী ভয়ানক অন্ধকার তা পাহাড়বাসী মাত্রেই জানেন, পায়ের তলা থেকে মনের কাছ থেকে পথ সম্পূর্ণ হারিয়ে যা'য়, অরূপ ঘিরে নেয় চারদিক, দূরের নৈকট্য আর থাকে না, বিষম ভ্রান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় চোখ আর মন, তখনেই, হারানো রূপ আর তার স্মৃতি।" (বাগে : P. 246)

শ্রীমান্ এই বিষম বেদনার মাধ্যমে তোমাকে পেতে হবে রূপের দৃষ্টিভাষা। যে পেয়েছে, সেই হয় রূপজ্ঞ।

আর বন্ধু, যদি কিছু মনে না করো; তাহলে তোমাকে এইখানে সংক্ষেপে জানিয়ে দি "রূপভেদ" কথাটির মহিমা। বাংলার আর্টিষ্ট মাত্রেই সকলেই জানেন—এই "রূপভেদ" কথাটিকে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, বাৎস্যায়নের টীকাকার "জয়মঙ্গলের" অনুকম্পায়। কিন্তু ষোলো রকমের হয় এই রূপভেদ। নতুন কথা। শিল্প বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ক্রিয়াকৌশল একটি বর্গকে, কিন্তু মনে রেখো শ্রীমান্ প্রাচীনেরা "শিল্প"-শব্দটির আর একটি অর্থ করেছেন—যথা,—"রূপ"। (নিঘণ্ট্)। অর্জুনং অরূপং অপ্সঃ, প্সরঃ, কৃশনম্ শিল্পম্ ইত্যাদি ক'রে ষোলোটি "রূপ"ভেদ আমার গুরুদেবের চিত্রবিদ্যার প্রথম পাঠ। সেই গুলিকেই আশ্চর্য, এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষ ভুলে রয়েছে। আশা করি এদেশের কোনো প্রবীণ রূপ-শিল্প-সমালোচক আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করবেন এই বিষয়ে। পরে আসা যাবে সে সব বিজ্ঞানী কথায়।

কারণ, আজ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না তাঁকে, যিনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন দিশা। বারবার প্রণাম করি আমার প্রণম্যকে। অথচ, যাঁর মুখে এই গহন তত্ত্বের দেশনা আমি পাই, একদিন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সামাজিকেরা তাঁর সম্বন্ধেই হেসে, গোঁফ চুমড়িয়ে বলেছিলেন—

"অবনঠাকুর ড্রয়িং জানেন না। কী সব যে কিম্ভূতকিমাকার form (রূপ) দিয়েছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই; তাঁর লাইন জ্ঞান

নেই ; ওহে, perspective এর বোধ এতটুকুও নেই—মানুষটার ; ইত্যাদি—"

শোন ত একবার ! হাস্ত-ছাড়া এ-সবের কি কোনো শুভ উত্তর দেওয়া চলে ?

ঠিক এই প্রশ্নই প্রথম উঠেছিল, আমাদের বাড়ীতেও···যখন পিতৃদেব প্রথম প্রথম কিনতে সুরু করেন অবনঠাকুরের আঁকা ছবি, Oriental Art Society থেকে।

এখন একদিন হোলো কি ! বাবা,—অবনঠাকুরের একখানি "কাদা-খোঁচা" (Snipe) পাখীর ছবি কিনে আনলেন, আর আমাদের বুড়ো হরিচরণ বাবুকে বললেন—"সিঁড়ির ঘরে ছবিটিকে টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আর দেখো, তার পাশে dado-তে Space যেন থাকে।"

সাদা দাড়ি নেড়ে হরিচরণ বাবু নোকর-মহলে গিয়ে বল্লেন— "এই টুকুনিতো ছবি। টাঙাতে বলছেন টাঙাবো। কিন্তু আছে কি ছবিতে ?"

আমাদের তখন একজন ঝাড়-পোঁছের বেহারা ছিল, নাম "গুরুচরণ"। সে সব শুনলে হরিচরণ বাবুর কথা। ছবি টাঙিয়ে পেরেক ঠুকে সে হয়ে গেল খালাস।

কিন্তু গুরুচরণের সঙ্গে তখন আমাদের—অর্থাৎ ছেলেদের-মহাভাব। সিঁড়িতে বসে সে আবার আমাদের মাঝে মাঝে পিপারমিণ্টের লজঞ্চুষ খাওয়াতো। সেই গুরুচরণকে দেখি, বিকেল বেলায়, সিঁড়ির মেহগ্নি কাঠের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে ; হাঁ, তারিফ করছে চাহা পাখীর (Snipe) নব-ক্রীত ছবিটিকে। গুরুচরণকে বলি—

"এই নিরেট্, তুই আবার ছবি দেখছিস্ কি রে ? তুই বুঝিস্ কি ছবির ?"

গাজীপুরের বাসিন্দা গুরুচরণ তার দেশওয়ালীতে কাড়ে, "ও চাহা পাখী···বহুৎ উম্‌দা বনা হায়। হামারে হিঁয়া—গঙ্গা কিনারমে চরি করতা হায়। ইসিসে হাম্, দাদাবাবু পয়চানা, কি, এ, চাহাপাখী হায়। বহুৎ সুন্দর হায়। আপ বোলিয়ে, দাদাবাবু, কাঁহা দেখেথে আপ চর ? আপ, তো—কলকাত্তিয়া।"

হুকুম করা শক্ত অপবাদ। দু'-পাটি পান-খেকো লাল দাঁতের মধ্যে বুড়ো আঙুল কামড়াতে কামড়াতে জবাব খুঁজে মরি ; কিন্তু পাই না। কি মুস্কিল ! হঠাৎ আমার নজরে পড়ে অবন-জ্যাঠার ঐ "চাহাপাখীর"—ছবিটির পাশেই নন্দদার (শ্রীবসু) Lost Cow ছবিটি টাঙানো রয়েছে। সেটির দিকে আঙুল তুলে গুরুচরণকে বলি—

"তুই একটা আস্ত ভূত। বল্ দেখি তো ওটা কিসের ছবি ?"

মুহূর্ত্ত বিলম্ব করল না গুরুচরণ। মাথা থেকে নীল ফেঁসো লোপাস্তি খুলে,—নেড়া-মাথা—চুলকোতে চুলকোতে বললে—

"গাইয়া কো রূপ হায় ঠিক্। বল্‌কি দুধ-ওয়ালী ঠিক্ নেহি হুয়া।"

"কিঁউ ?"

"ওনে গাই নাগিনা উপর ছুট্‌তা হায়। ইসিসে হাম জান্‌তা হায়, তস্‌বির খিঁচা ঠিক নেহি হুয়া হায়। উস্‌কো তো বানানা থা জঙ্গল, বল্‌কি, উস্‌নে তো মায়া-কানন বানায়া হায় হুজুর।"

মনে আছে,—"ঠিক হায়"—ব'লে পালিয়ে গিয়েছিলুম ;—forensic জবাবটি শুনে।

পালালুম বটে। কিন্তু জানো শ্রীমান্, কেন পালিয়েছিলুম ? সত্যি কথা বলতে আজ বাধা নেই, সত্যের বালাইও নেই। শ্রীনন্দলালের ঐ ছান্দসিক ছবিটি (Kangra-Bengal School ?) গুরুচরণ বুঝতে পারেনি। কিন্তু তার বিবেচনায় সে যা ধরেছিল, সেই ধারণাটিকেও ভুল বলতে সাহস হয়নি আমার ; ভুল বলতে এখনও বাধা লাগে,—পারি না। কেন না—

"নাগিনা" (Jewel) আর পাথরের (Stone) রস বোঝবার মেধা বা ক্ষমতা,—বিধাতা গুরুচরণকে দেন নি।

শ্রীমান্, এইখানেই আসে প্রত্যক্ষ দর্শন ও অপ্রত্যক্ষ দর্শনের dovetailed হিসেব-নিকেশের মিল। আশা করি, তুমি ছুতোরের কাজ জানো। যাক্, বেঁচাই পেলুম।

Aesthetics এর এই হিসেব-নিকেশ নিয়েই বিভ্রান্ত হয়েছে জগৎ। দর্শনের হিসাব হয় না মননের তেরিজে। সোজা বাংলায় যাকে বলে—দেখার হিসেব মিললো না মনের যোকড়ে। কিন্তু শ্রীমান্, ভালো লাগছে বলেই বলছি—art এর জগতে, একমাত্র হিসেব চলে গান্ধর্ব্বীর ভালবাসার ; যেখানে মনের খাতা আর চোখের দেখা এক হয়ে মিলে যায়। কমার্শিয়াল রঙের ঘোরপ্যাঁচ ছিল না ঐ Snipe ছবিটিতে, কমার্শিয়াল রঙের ঘোরপ্যাঁচ ছিল না ঐ Lost Cow ছবিটিতেও। কিন্তু,···সাধারণ মানুষ দেখলুম,—চোখের দৃষ্টি-কাঠামোর বাইরে দৌড়ে যেতে পারে না, প্রকৃতি-কাঠামোটি চায়ও না। এ ক্ষেত্রে কি কোনো উপাদান-করণ, বা কোনো অপাদানে-পঞ্চমীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ?

ওরা বোঝে না, শোনে না, কেন ঐ সূর্য্যমুখী ফুলটি চন্দ্রসোণার ঘেরাটোপের মধ্যে Vandyke রঙ দিয়ে তার বীজটিকে, অপত্যটিকে বুনলো ! বিধাতার এ সৃষ্টিসঙ্কেত তারা বোঝে না। এবং সেই তথ্য নিয়ে বিবাদ করাও অসমীচীন। প্রত্যক্ষ বোঝা এক, আর শঠপ্রজ্ঞা ঐ মায়াটিকে (Art) বোঝানো আর এক। "স্বভাবোক্তি" অলঙ্কারটিকে বোঝানো এক, আর "বক্রোক্তি" অলঙ্কারটিকে তোমার গায়ে পরানো আর এক। হ'তে পারে, উদ্দেশ্য সমান ; কিন্তু ভিন্ন-গাঁয়ের এই বিভিন্ন পথ। আশা করি শ্রীমান্, তুমি প্রণিধান করতে পেরেছ আমার সূত্র-ভাষা। অনুপমকেই বোঝাবার নিত্য-চেষ্টা চলেছে উপমার মাধ্যমে। তেমনি, "রূপ"কে বুঝতে হয় অপরূপের কঠোর ঠিকেদারীতে ; তবেই মধুবাণীর মত মধুময় অমৃতময় ধনময় হয়ে ওঠে রূপ।

সেইজন্যেই আমার মনের নিকষ-পাষাণে লিখিত হয়ে আছে —সেদিন দুপুর বেলায়,—ঘুমোতেন না তখন গুরুদেব দুপুরে,—লাল খেরোর খাতায় যখন লিখলেন—

"আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার। নতুন নতুন আলোর ঝলকি দিকে দিকে সকলকে যুগ-যুগান্তর আগে এই কথাই বলে চললো।—তারপর—একদিন এলো মানুষ। সে বললে—"কেবলই নেবো, কিছু কি দেবোনা ? দেবো এমন জিনিষ, যা নিয়তির নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী। তোমার রস, আমার শিল্প। এই দুই কূলে গাঁথা নব-রসের নির্মিতি—এই মালা

ধরো।" এই ব'লে মানুষ, নিয়মের যে বাইরে—সে তার পাশে জয় ঘোষণা করলে—

"নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিম্ আদধাতি ভারতীকবের্জয়তি।"

শ্রীমান্, আজ সে সব আনন্দ-বিক্ষেপী গন্ধর্ব দিনগুলি আমার হারিয়ে গেছে। তবু ভবিষ্য-দর্শনিকা শুভ-আশার মুখ চেয়ে বল্‌তে বাধা নেই ;—

"ভরতবর্ষ ভুলেছিল এই নিয়ম (philosophy of discipline)। তাই সে হারিয়েছিল তার প্রকাশ-বিহ্বলতা, তার ব্যক্তিত্ব! কিন্তু।—"

—শ্রীনন্দলালের—"হারানো গরু"—কেন যে তার রঙ্গমণি গাছগাছালির মধ্যে, পাথরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় হাঁপিয়ে,—সে বোধ ছিল না 'গুরুচরণে'র। গুরুচরণ বুঝতে পারেনি—শিল্পীর হস্ত-প্রসারকে, হস্ত-দীধিতিকে। তার মনুষ্যচেষ্টা বাঁধা পড়ে গিয়েছিল দীনতার অভ্যন্তরে। নতুন বর্ণ, নতুন ছন্দ,—যা তার অদেখা অ-শোনা,—নিয়মের দড়-ছেঁড়া সীমানার বাইরে অতীত হয়ে গিয়ে, ঊর্দ্ধে কোথায় যে তার মানুষী চেষ্টাকে নিয়ে যেতে পারে সে সম্বোধি তার ছিল না।

আজ এইটুকু বলে ক্ষান্ত হই,—যিনি বৃহৎশিল্পী, বিশ্বকর্মা, তিনি মনুষ্যকে যা দিতে চেয়েছেন, তা সত্যই তিনি ছড়িয়ে দিয়ে রেখেছেন জগতে, সুধী হৃদয় গ্রহণ করে সেটিকে অকুন্ঠিত চিত্তে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সংসার-পরিক্ষীণ জনতা-মন দ্রুত গ্রহণ করতে পারে না সেই দান। দুঃখ নেই। পরিমিত মানবও ফেরা-জবাব যা দেয়, তাও তাঁকে, সেই বিশ্বকর্মাকে, নিতে হবে ;—রূপের পরিমিতির মধ্যে সেইটাই সে ছড়িয়ে দেয় তরঙ্গে। বলোতো শ্রীমান, সমুদ্রের মধ্যে থেকেও তরঙ্গের এই অকুতোভয় সমুদ্রালিঙ্গনই—কি আশ্চর্য ব্যাপার নয়? এইখানেই ভাসতে থাকে রসের অপরিমিতির, ভালবাসার সার্থকতার মায়া (art)-বুদ্‌বুদ। তাই বলছিলুম,—প্রতীক্, বা ছন্দ, বা মুদ্রা,—বোঝবার ক্ষমতা সেদিন গুরুচরণের ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমল হোমের চপল ভাষায় বলতে হয়, অধিকারীর ভেদ।

যাক্, এখন আজে-বাজে কথা রেখে কাজের কথা কই। ফিরে আসা যাক,—অবন ঠাকুরের animal series-এর কথাতেই। বাংলার চঞ্চলী মন সেই চিত্রকলা দেখে আর তার কারুকার্য দেখে, যেন পথ খুঁজে পায়। ও: হো:, তা হ'লে তো অবন ঠাকুর আঁকতে জানেন। শ্রীমান ঠিক,—এই দুর্দশাই ঘটেছিল Rodin-এর জীবনে। একটি Supra Anatomical মূর্ত্তি গড়ে, তাঁকে একদা দেখিয়ে দিতে হয়েছিল যে,—হ্যাঁ এও আমি জানি।

দেখা-জিনিষটিকে হুবহু গড়তে পারে,—এই পাসপোর্টটা না পেলে সত্যিই, আর্টিষ্টের পক্ষে জনতার সঙ্গে পা মিলিয়ে পথ-চলা দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায় এই বিচিত্র সংসারে।

ঐ পাখী, ঐ গরু, ঐ ছাগল ঘোড়া, সূর্যের অরুণোদয়, নিয়মিতা প্রকৃতির এই কনে-সাজা রূপ, পাখীর মত উড়ে-যাওয়া একটি আঁখি,—ঐ সমস্তেরই ভোল-বাঁধা রূপ, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুলে দিয়েছিলো, অবনঠাকুরের নয়ন-বাতায়নটিকে ; এবং শ্রীমান্, ঐ রূপ-দেখার মধ্য দিয়েই, তিনি ভোগ করতেন—রূপলোকের নিগূঢ়কে, এবং বিরাজ করতেন গন্ধর্বলোকে। তাই বোধ হয়, সেদিন আমায় গুরুদেব ট্যারা চোখ কাঁপিয়ে বলেছিলেন—

"Study কর্, চোখ দিয়ে ভালো করে ত্যাখ, ওদের কথা শোন্।"

অধুনার নব্যযুগে শুনতে পাই, যোগীদের মতো ধ্যান না করলে কোনো সাধনাই নাকি কোনো মনিষ্যির সার্থক হয় না। কিন্তু এ-রকমের পাঠ আমি গুরুদেবের কাছে পাইনি, তিনি শেখান নি। তিনি তাঁর অদ্ভুত ভাষায়, কথায় মজা চড়িয়ে বল্‌তেন,—আর নড়তে থাকতো পায়ের বুড়ো আঙুলটি,—

"বুঝেছিস্ শিষ্য, ছবি আঁকতে এসেছিস্। বলি,—ধ্যান ক'রে যদি ছবিই খুঁজতে চাস্, আঁকতে চাস্, তাহলে পয়লা নম্বর,—রূপের রেখার, ছন্দের, বর্ণের ধ্যান করিস্, বুঝলি, আর চোখ খুলে করিস্, চোখ বুজে নয়। চোখ খুলেই ছবি আঁকবি। মনের আর সূক্ষ্ম কল্পনার রথ ছুটিয়ে যোগী-ঋষির মত ব্রহ্ম ভগবান,...ও-সব দর্শন করতে হয় করিস্, কিন্তু রূপ-চক্ষু: যদি তোর না খুলল, বৃথাই হোলো তোর ছবি লিখতে আসা ,...তুই তো আবার কাব্যি-টাব্যি লিখতে সুরু করেছিস্। তাতেও বুঝলি, অক্ষরের রূপ দেখতে শিখবি ; তবেই নামবে সরস্বতীর আশীর্বাদ, তবেই দেখতে পাবি তাঁর ছন্দের ভঙ্গি, তাঁর যতির শান্তি ; শুনবি—পায়জোরের মিঠে বোল্।"

এই প্রসঙ্গেই তাঁর মুখে শুনেছিলুম, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের দুর্গার পট-আঁকার গল্প। "জোড়াসাঁকোর ধারে"—পুস্তকে (P. 101) শ্রীমতী রাণী চন্দ সুন্দর ভাবে অনুলিখন করেছেন সেটি।—

"সে বললে—ধ্যানে বসে একটা রূপ ঠিক্ করে নিয়েছিলুম, তাই পরে আঁকলুম।

আমি বল্লুম—"তা হবে না বারীন্। ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখো। তবেই ছবি আঁকতে পারবে। যোগীর ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে ঐখানেই তফাৎ।"

[ক্রমশঃ।

ছড়া

এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর,
তার মধ্যে বসে আছে
শিব সদাগর।
শিব গেল শ্বশুর-বাড়ি,
বসতে দিল পিঁড়ে,
জলপান করতে দিল
শালিধানের চিঁড়ে।
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে
বিন্নি-ধানের খই,
মোটা মোটা সবরি কলা
কাগমারির দই।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে কত কথাই জানি। কিন্তু এত দিন লিখি নাই তাঁর কারণ জীবন-ব্যাপী, আত্মনিষ্ঠ, সাধনার মধ্যে কোনটি আগে লিখিব তাহাই ভাবিয়া এত দিন লিখিতে নিরস্ত ছিলাম। শ্যামাপ্রসাদের জীবন-লীলা অল্প দিনেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। তিনি অল্প জীবনে যাহা করিয়াছেন অনেকে দীর্ঘ জীবন পাইয়াও অনেক সময় তাহার একাংশও লাভ করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের মূল-মন্ত্র আমি যত দূর বুঝিয়াছি তাহা হইতেছে গীতার সেই অমোঘ বাণী।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

তিনি দুঃখেতে অবিচল ছিলেন এবং সুখে ছিলেন স্পৃহা-শূন্য। সুতরাং তাঁহাতে আসক্তি ক্রোধ এবং ভয়ের লেশ-মাত্র ছিল না। এই জন্যই তিনি এত কাজ করিতে পারিতেন এবং সেগুলি সমস্ত সু-সম্পন্ন হইয়া যাইত। তাঁহার পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কর্ম্মযোগী। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার যত্নে গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি যাহা করিতেন বিপ্লবের মতই সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। কিন্তু তাঁহার পুত্রের অবদানও কিছু ন্যূন নহে। শ্যামাপ্রসাদ যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পিতার কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই। কিন্তু তাহার ফল এতই সুদূরপ্রসারী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস কোন ক্রমেই তাহা ভুলিতে পারিবে না। আমি এই সব পরিবর্ত্তনের কথা বারান্তরে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহারই সম্বন্ধে দু'-একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

আমি যখন 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপকের পদের জন্য প্রার্থী হইলাম, তখন অন্য প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য। একজন ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) অন্য জন ছিলেন মহম্মদ শহীদুল্লাহ, অন্য যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, সুশীলকুমার দে তাঁহাদের অন্যতম। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ষাট বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বলিয়া তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইল। বিশেষ সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। শেষোক্ত দু'জন অর্থাৎ ডাঃ শহীদুল্লাহ, ও সুশীলকুমার উভয়েই আমার ছাত্র বা ছাত্র-কল্প। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারা অধ্যাপনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুসলমান-সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তখন খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। তিনি শ্যামাপ্রসাদকে ধরিয়া বসিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ আরেক জন ভাষাতত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন বলিয়া শহীদুল্লাহর ন্যায় আরেক জন ভাষা-তত্ত্ববিদ্ অনাবশ্যক মনে করিলেন। সিলেক্শন্ কমিটিতে শহীদুল্লাহর নাম উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি বেশী ভোট পাওয়াতে ঐ পদে নিযুক্ত হইলাম। সে সময় ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন স্যার হাসান সুরাবর্দ্দী। কিন্তু তিনি আমাকেই বেশী পছন্দ করিতেন বলিয়া বোধ হইত। অনেকে মনে করিতেন, অধ্যাপক সুশীলকুমার নিযুক্ত হইলেই যোগ্যতর ব্যক্তিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাইত। কিন্তু সিলেক্শন কমিটিতে আমি যত দূর শুনিয়াছি তাহাতে তাঁহার নাম আদৌ ওঠে নাই। অবশ্য সেনেটের সভায় যখন আমার নিয়োগের প্রশ্ন উঠিল, তখন অধ্যাপক দে'র নাম স্বভাবতঃই উঠিয়াছিল। কিন্তু সেনেটের সদস্যগণ সিলেক্শন কমিটির মনোনয়ন সমর্থন করিলেন। এই হইতেই আমার 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের' পদ পাইয়া সরকারী চাকুরীতে কিছু পূর্ব্বেই এস্তেফা দিলাম।

বাংলায় 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি হইল এবং আমি প্রথম অধ্যাপক হইলাম। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন এ অধ্যাপক-পদ সৃষ্ট হয় নাই। হইলে তিনিই এই পদ পাইতেন। আর একটি স্মরণ করিবার মত বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের সম্মতি পাওয়া গিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য। তিনি হইলেন আচার্য্য ('প্রোফেসর' কথা তিনি পছন্দ করিতেন না)। রবীন্দ্রনাথ বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা পাইবেন এবং কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন, এই সর্ত্তে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি অবশ্য 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপকই হইলাম। আমার প্রথম কাজ হইল শান্তিনিকেতনে তীর্থ-যাত্রা করা এবং রবীন্দ্রনাথ কি করিবেন না করিবেন তাঁর সহিত পরামর্শ করা। অবশ্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশে যাই নাই। আমি গিয়াছিলাম নিজের প্রয়োজনে এবং রবীন্দ্রনাথকে আমার সমস্ত সহযোগিতা সমর্পণ করিবার উদ্দেশে। কবি আমাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কার্য্যের জন্য যে পরামর্শ হইল আমি তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্যামাপ্রসাদের কৃতিত্ব স্মরণ করিয়া আমি আজ তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি। তাঁহার চাল আমি বুঝিতে না পারিলেও, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁহার এই যুগ্ম-নিয়োগে দেশের লোক মোটের উপর অসুখী হয় নাই।

আমি পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ১৩৩২ সালে। কিন্তু আমি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলাম দীর্ঘ তের বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমার যতটুকু সামর্থ্য তাহাতে আমি বাঙলা বিভাগের মান সমুন্নত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বাংলা বিভাগকে অনেকেই হয়ত তেমন স্নেহের চোখে দেখেন না। কিন্তু আশুতোষের পরিকল্পিত এই বিভাগটি তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমি যখন অবসর গ্রহণ করি তখন এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী অনেক বিভাগ হইতে বেশী সংখ্যক ছিল।

আমার চাকরী সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, শ্যামাপ্রসাদের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করিবার জন্য। আমি উপকৃত হইয়াছিলাম বলিয়া নহে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকালের মধ্যে আমার যত কিছু শক্তি-সামর্থ্য তাহার পূর্ণ পরিণতি হওয়ার সুযোগ হইয়াছিল।

স্যার হাসানের পর স্যার আজিজুল হক যেদিন ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইলেন সেদিন স্যার আজিজুলকে সঙ্গে লইয়া শ্যামাপ্রসাদ আমায় (বাংলা বিভাগের) কক্ষে পদার্পণ করিলেন। আমার সেদিন আনন্দের সীমা ছিল না। আজিজুল হক এবং শ্যামাপ্রসাদ দুই জনেই আমার ছাত্র। সেদিন দু'জনে আমার কক্ষে আসিয়া আমাকে যে আনন্দ দান করিলেন তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। আজিজুল হক সাহেব যখন বিলাতে হাই-কমিশনের পদ পাইয়া গমন করেন সেদিন তিনি নত হইয়া আমার পদ-ধূলি লইয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি আমার সমক্ষে চুরুট খাইতেন না। আমি দেখিলাম সিণ্ডিকেটের মিটিং—আমি তখন সিণ্ডিকেটের মেম্বর ছিলাম—অনেক সময় শেষ হইতে দীর্ঘকাল লাগে। এত সময় পর্যন্ত সিগারেটসেবীর পক্ষে চুরুট না খাইয়া থাকা এক কঠিন ব্যাপার। ইহা স্মরণ করিয়া আমি তাঁহাকে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলাম। তার পর হইতে ভাইস-চ্যান্সেলর সিগারেট খাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামাপ্রসাদের কিন্তু এ সব কোন দোষই ছিল না। আমি তাঁকে কখনও সিগারেট বা পান খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

শ্যামাপ্রসাদ যখন ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন আমিও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলাম। তিনি ঐ পদ পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ক্ষমতা এত দূর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তিনি যাহা বলিতেন, ভাইস চ্যান্সেলার তাহাই গ্রহণ করিতেন। সে ক্ষমতার রহস্য ছিল এইখানে যে তিনি সমস্ত ব্যাপারের সন্ধান রাখিতেন এবং সিণ্ডিকেটে যে সব বিষয় বিচারের জন্য আসিত, তৎ-সমস্তই শুধু যে তাহার অধিগত ছিল, তাহা নহে। তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতি-শক্তির বলে যখনই কোন প্রশ্ন উঠিত তখনই সে ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তিনি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। ইউনিভার্সিটির সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত। এই অভ্যাস তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত পিতৃদেব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ হইতে। ১৯১৭ সালে যখন তিনি বালক তখন স্যাডলার কমিশনের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার পিতার সমভিব্যাহারে মহীশূরে গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই দেশের শিক্ষানীতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে তিনি সু-পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেন। এবং তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাঁর মতামত গঠন করিতেন।

পিতৃদেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যথেষ্ট ট্রেনিং পাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা সেই শিক্ষারই ফল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। প্রখর বুদ্ধি ও তেজস্বিতার জন্য তিনি সমস্ত বিরোধকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। শ্যামাপ্রসাদের সে সকল ক্ষমতা ও পদ না থাকিলেও, তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত বিরোধের অবসান করিয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সময় বিরোধ বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্টতম কর্মকুশলতার নিদর্শন। তিনি একমাত্র ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি কোন পদগৌরবের অধিকারী ছিলেন না। আমি যে ক'জন ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্ব-গৌরবে ও মতামতের সরলতায় শ্যামাপ্রসাদই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক এক দিন সিণ্ডিকেট মিটিং-এ তিন শত দফা কার্য্যসূচী থাকিত। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই এই দীর্ঘ কর্ম্ম-সূচী আমরা শেষ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার নিমন্ত্রিত হইয়া সিণ্ডিকেট মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইলে চার দিনেও আমরা এ দীর্ঘ তালিকা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।" তিনি অবাক হইয়া গেলেন যে এত কর্ম্মসূচী-বহুল তালিকা মাত্র এক ঘণ্টা বা তাহারও কম সময়ে শেষ হইল! এই দীর্ঘ কর্ম্মসূচীর জন্য পরবর্ত্তী কালে সিণ্ডিকেট দুই-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আরেকটি Standing Committee এই দীর্ঘ কর্ম্মসূচীর অর্দ্ধেকখানি ভার লয়। অবশ্য Standing Committee সিণ্ডিকেটের সভ্যদের দ্বারাই গঠিত। আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এই Syndicate Standing Committee র সদস্য ছিলাম এবং কখনও ইহার প্রেসিডেন্টগিরিও করিয়াছি। এখনও শুনিতে পাই এই Committee আছে। ইহা সিণ্ডিকেটের কার্য্যভার লাঘব করে। এখন আর শ্যামাপ্রসাদ নাই, সেই জন্য সিণ্ডিকেটের কর্ম্মসূচী ভাগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং দেখিয়াছি সিণ্ডিকেটের অর্দ্ধেকটা কাজ হইতেও তিন চার দিন কাটিয়া গিয়াছে। তাহাও আবার এক-আধ ঘণ্টা নহে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—পাঁচটা হইতে নটা পর্য্যন্ত অনেক টানাটানি করিয়াও সে কাজের কূলকিনারা হয় নাই। আমি অনেক দিন হইল সিণ্ডিকেটের সদস্য পদ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। হাল-আমলে কি হয় ঠিক বলিতে পারি না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

কফি-হাউসে 'রেস'-এর পরেই দ্বিতীয় মুখরোচক আলোচনা, হ'ল সিনেমা। 'মা'-এর জায়গা নিয়েছে আজ সিনেমা,—স্বর্গাদপি গরীয়সী। Twinkle Twinkle little star নয় আজ, তার বদলে—Twinkle Twinkle film star, How I wonder what you are?—পড়ছে নবযুগের বালক-বালিকারা। বর্ণপরিচয়ের প্রচ্ছদপট দেখে বই পড়বার আগেই তারা প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত ছবিটি চিনে ফেলে,—চিনে ফেলে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি ব'লে নয় পাহাড়ী সান্যালের ছবি বলে। সিনেমা চালু হবার আগে ছিল হিরো ওয়র্শিপের যুগ, এখন এসেছে হিরোইন ওয়র্শিপের হুজুগ!

সর্বাধুনিক ষ্টাইলের ঘড়িতে সবগুলো ঘণ্টার নেই উল্লেখ। দাগ আছে শুধু তিন-ছয়-নয় আর বারোটার ঘরে। এবং তা ঠিকই আছে। দেশের বারোটা বাজাবার জন্তে ৩টা ৬টা ৯টা-র অবদানই ত' সব চেয়ে বেশি!

ঘরে চাল না থাকলে একদিন দেশে দুর্ভিক্ষের হ'ত ঘোষণা। আজ চাল নয় আর, বাইরে যথেষ্ট চাল না মারতে পারলে—তবেই তাকে মনে করা হয় দুর্দিন। লোকের খেতে না পাওয়া কোন 'ঘটনা' নয় আজ, সিনেমায় যেদিন লোকের অভাব হবে, (স্ত্রীলোকের আর কী!) সেদিন সেইটেই হ'বে সত্যিকারের দুর্ঘটনা।

একদিন বারবনিতারাই শুধু সতী-অসতী দুই ভূমিকাতে নামত। এখন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আছে 'চান্সে'র অপেক্ষায়। তাই কেরাণী স্বামীর স্ত্রী চাইছে রাজরাণী হতে। বাপের দারিদ্র্য মোচন করতে গিয়ে মেয়েকে পর্দায় অঙ্গমোচন করতে হচ্ছে স্নিসারিণ চোখে। বিশ্ববিদ্যালয় তাই বাধা দিচ্ছে না আর স্কুল ছাত্রকে ষ্টুডিওর জোরে মহড়া দিতে। তিনি ঠিকই বলেছেন যিনি বলেছেন, 'প্রগতির অনেক দূর গতি। অশেষ দুর্গতি তার সত্যিই।'

একটা জাতের পরিচয় না কি তার রঙ্গমঞ্চে—অর্থাৎ তার Stage-এ তার ঐতিহ্যের, শিল্পের, সংস্কৃতির, রুচির মানের এক কথায় তার কৃষ্টির, তার মনোলোকের আয়না হ'ল এই পাদপ্রদীপ। মঞ্চ হল জাতির সত্যিকারের মানস সরোবর, সেখানে সকল কালের সব মানুষের হাসি-কান্নার হীরা-পান্নার আলিম্পন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের দিন গেছে, তার বদলে এসেছে সিনেমা। পাদপ্রদীপ নয় মাইকের। সামনে নয় নেপথ্যে। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক নয়। তার বদলে সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স সটডিভিশন।

Stage-এর চেহারা দেখেই যেমন বলা যেত দেশ কোথায় ছিল,—তেমনি 'সিনেমা'-ই আজ বলে দিচ্ছে সেই দেশ আজ কোন Stage-এ এসে নেমেছে।

সিনেমার লেখকই আজ সাধারণের চোখে লেখক, সিনেমা ষ্টারই একমাত্র শিল্পী, সিনেমায় যিনি গান করেন, সুর দেন, তিনিই সঙ্গীতজ্ঞ। বেতারের অনুরোধের আসর মানেই ফিল্ম-সঙ্গীতের উপরোধ, জলসায় জনপ্রিয় শুধু—সেও সিনেমার গান। গ্রামোফোন রেকর্ডের রেকর্ড বিক্রী,—তাও সিনেমায় গাওয়া গানের কল্যাণেই।

সিনেমার খবর ছাড়া পত্র-পত্রিকা অচল। সিনেমা ষ্টারের ছবি ছাড়া দর্শনযোগ্য নয় কিছু। জীবনী মানেই চিত্র-তারকার দিনপঞ্জী। বিজ্ঞাপন মানেই হিরো-হিরোইনদের সার্টিফিকেট। তাঁরা যে সাবান মাখেন, যে দাঁতের মাজনে তাঁদের বিশ্ববিগলিত দন্ত বিকাশ, সেই সাবান সেই দাঁতের মাজনই বেচবার এবং কেনবার। শাড়ীর গা থেকে প্যান্টের পা, মাথার চুল থেকে কানের গয়না সব নির্দেশই তাঁদের। হোর্ডিং থেকে ফোল্ডার সুন্দর মুখের নয়, সিনেমা-মুখোদেরই সর্বত্র জয়-জয়কার।

পান করেন নি জীবনে একবারও এমন লোক কম, কিন্তু একেবারে নেই, এমন নয়, ধূমপান করেন নি জীবনে এরকম বয়স্ক লোকের নেই অভাব, কিন্তু সিনেমা দেখেন নি এমন লোক নেই একজনও। এক-আধ জন লোক, থাকলেও সে রকম

স্ত্রীলোক সমাজে বাস করেন না, তাঁর অবস্থান বাবুঘরে। আট থেকে ঘাটের মড়া, বালিকা থেকে একাধিক নাবালিকার মা, রাঁচী থেকে করাচী, রাণী থেকে কেরাণী, রূপালী পর্দা সকলের জন্যই খোলা, পর্দানসীন থেকে পর্দা-উদাসীন সবাই তার দর্শক। আর যে ছবিতে এডাপটেশন যত বেশি, এডাল্টস ওনলি-র তকমা ঝুলিয়ে তার জন্যে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা তত জোরে!

রাধা মজেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে, থিনিকেটেরা আজকে বাঁশী বাজায় না 'সিটি' দেয় দূর থেকে। পৃথিবীতে সব চেয়ে জোরালো 'সিটি' হল সিনেমার পাবলিসিটি। সে সিটি শুনে আজকের তরুণ-তরুণীর ঘুম টুটেছে, স্বপ্ন ছুটেছে!

আগে কিছু করতে না পারলে, হ্যানিম্যানের নামও শোনে নি এমন লোকও হোমিওপ্যাথি না জেনে হত হোমিওপ্যাথ, রাশি-লগ্ন না জেনে জ্যোতিষী হওয়াও অনেক নিরুপায়ের ছিল শেষ উপায়। এখন দরকার হয় না তার। যার কোন স্কোপ নেই কিছু করবার, সে-ও করছে বায়স্কোপ!

বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় উপন্যাস লিখতে ভয় পেতেন। কারণ, উপন্যাস শুরু করা মাত্র, দামোদর মুখুজ্জে তার উপসংহার ভেবে রাখতেন। কিন্তু হায়, দামোদর নয় সিনেমার দামড়ারা তখনও তাঁর চিন্তার অগোচর ছিল, তাই না হ'লে তিনি জানতেন 'উপসংহার' তবু এক রকম, কিন্তু চিত্রসংহার সে কল্পনার অতীত এক হঠকারিতা—উপন্যাসকে নস্যাৎ করবার সব চেয়ে বড় মারণাস্ত্র! আজ, সাহিত্যের জনক কেন, সিনেমায় 'ক্লাসিকের' অমর্য্যাদায় মা-বাপ বলবার নেই কেউ!

চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার চেয়েও লোভনীয় এখন কোন তরুণী চিত্র-তারকাকে ইন্টারভিউ করতে যাওয়া। তাতে ইহলোক ধন্য। পরলোক কৃতার্থ। সেই 'ইন্টারভিউ' করতে গিয়ে দেখা জনমন-অধিকারিণী অভিনেত্রী পড়ছেন শিশুপাঠ্য ডিটেকটিভ বই, ফিরে এসে কাগজে লেখা: দেশের অমুক নেতৃস্থানীয়া অভিনেত্রী তিন জন লেখকের ভক্ত। একজন রাসেল, অন্য দু'জন বর্ণার্ড শ ও রবীন্দ্রনাথ। সেই ইন্টারভিউ-এর সময় নিজের চোখে দেখা, সম্রাজ্ঞী অভিনেত্রী যখন পিয়ানোয় বসে, তখন বারান্দায় তাঁর স্বামী কোল দিচ্ছেন ছোট ছেলেটাকে; ফিরে এসে কাগজে রিপোর্ট দেওয়া: আপনাদের চিত্তে যার অচঞ্চল আসন পাতা সেই অমুক, ষ্টুডিও থেকে ফিরে স্বামী এবং পুত্রের সেবা করাকেই একমাত্র কর্তব্য মনে করেন। সেই জীবন-সার্থক-করা ইন্টারভিউতেই প্রথম প্রত্যক্ষ করা: বক্স অফিস ষ্টার মাংস খাওয়াচ্ছেন এ্যালশেসিয়ানকে। ফিরে এসে কখন লিখে ফেলা: চিরতরুণী চিত্রনায়িকা এসে বললেন, 'ঠাকুর-ঘরে ছিলাম।' খবর কাগজ মানে আসলে খবর কগজ?—যিনি করেছিলেন এই উক্তি, তাঁকে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়। সত্যিই, যে যত সত্য-অর্ধসত্য মিলিয়ে যত গল্প লম্বা করতে পারে খবর, সেই তত বড় খবর-কাগজওলা।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাঙালী কবে প্রথম কী করেছে একদিন তাই জানাই ছিল সাধারণ জ্ঞানের প্রমাণ। আজ সিনেমায় কবে, কে, কিসে নেমেছে, তাই জানাই হ'ল অসাধারণ জ্ঞানের নমুনা। সেই কারণেই চাকরীর পরীক্ষায় 'অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কী'?—এর উত্তরে নির্বিবাদে শুনতে হয়, 'মহল'।

সিজার নয়, VINI—VIDI—VICI,—একথা সত্যি সত্যি বলতে পারে এক সিনেমা ইণ্ডাষ্ট্রিই। Silence যে সত্যি Golden তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে চলচ্চিত্র নির্বাক্ ছিল যেদিন, সেদিনকার কথা স্মরণ করে। সবাক হয়েছে যেদিন থেকে ছায়াছবি সেই মুহূর্ত থেকেই বাজে বকতে আরম্ভ করেছে সে। সংলাপ নয় ছায়াচিত্রের পাত্র-পাত্রীদের মুখে এখন যা বসানো হয় তা নিছক প্রলাপ-উক্তি।

চলচ্চিত্র আজও পায়নি আর্টের শিলমোহর। কোন ইনটেলেকচুয়াল তাকে এখনও দেয়নি শিরোপা। চার্লি চ্যাপলিনকে বাদ দিলে একজন চিত্রসেবীও পাওয়া যাবে না, 'প্রতিভা' বলে সে পেয়েছে স্বীকৃতি। ইংরেজি ছবি দেখতে দেখতে যতই 'লাল' পড়ুক আমাদের জিব দিয়ে, যতই কেন না গদগদ হই আমরা,—'এমন আর হয় না,'—বলে অভিভূত হই, ওদের দেশের মণীষীরা সিনেমা মধ্যে পায়নি রসের সন্ধান, চিন্তার উদ্দীপনা, জীবনের গভীরতার উৎস।

অভিনয়-কলার সব চেয়ে নির্ভেজাল হচ্ছে 'যাত্রা'। আদি এবং অকৃত্রিম। দৃশ্য-পরিকল্পনা নেই, আলোক-সম্পাত নেই, সকলের সামনে শুধু মাত্র অভিনয়-ক্ষমতা নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া। তাতেই হাসানো-কাঁদানো, নিষ্ঠুরতায় ভয় দেখানো, ভালোবাসায় ভাসানো। যাত্রা-র পর থিয়েটার। সেখানে কৃত্রিম ব্যবস্থা আছে কিছু কিছু নিশ্চয়ই। তবুও তার মূল আবেদন প্রত্যক্ষ এবং অভিনয়-সর্বস্ব। কিন্তু সিনেমা গোড়া থেকে শেষ আগাগোড়া মেকানিক্যাল। তাই শিল্পের ধর্ম থেকে সে বিচ্যুত। কবিতার সঙ্গে গদ্যের যে পার্থক্য চিরকালের, থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমার সেই চারিত্রিক তফাৎ কোন দিন ঘোচবার নয়।

তবে চলচ্চিত্রের জয়যাত্রা কোন্ মন্ত্রবলে? সে-মন্ত্র 'সিনেমা'-র বিশেষ মাধ্যমে নেই, আছে আধুনিক মানুষের বহু সমস্যায় জটিল মনের মধ্যে। যে আধুনিক মন কিছু বুঝতে চায় না তলিয়ে, শুধু ভুলে থাকতে চায় খানিকক্ষণ। তা'র সময় নেই। পাঁচশো পাতার ক্লাসিক পড়বার নেই ফুরসৎ। দশ আনার টিকিট কেটে রূপালী পর্দায় মোদ্দা গল্পটা দেখে এলেই সে তৃপ্ত। ছবি দেখবার জন্যে, দেখে হাততালি দেবার জন্যে খবর-কাগজ পড়তে পারার মত বিদ্যেরও হয় না প্রয়োজন। অথচ পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত বই-এর চিত্তাকর্ষক চুম্বক সংস্করণ শুধু চলচ্চিত্রই হ'তে পেরেছে। যা সস্তা তাই দিয়েই কিস্তিমাৎ করার জন্যে ব্যস্ত বিংশ শতাব্দী। সম্ভবত তার ট্র্যাজেডীও সেই কারণেই। আর 'চলচ্চিত্র' হ'ল এই শতাব্দীর বুড়ো খোকাদের মুখের চুষিকাঠি।

তখনও 'সিনেমা'-র দিন আসেনি বলেই মহাকবি মানুষের পৃথিবীকে তুলনা করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে। কিন্তু আজ তিনি 'ওয়ার্ল্ড ইজ এ ষ্টেজ', বলতেন না, বলতেন ষ্টেজ নয়, ওয়ার্ল্ড ইজ এ ষ্টুডিও-ফ্লোর। বলতেন আমরা এর পাত্র-পাত্রী নই। আমরাই এর কাহিনী। সত্যিই, মানুষের 'জীবনে'র চেয়ে বড় 'সিনেমা'। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরও অজ্ঞাত।

এ-সব কথা আমার মাথায় আসত না কখনই, যদি না দুর্গার কথা মনে পড়ত। দুর্গার অতীত ও বর্তমান পাশাপাশি যদি না এসে দাঁড়াত, যদি না দেখতাম রাজনন্দিনী হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত

গৃহিণী, নিজের নয় মোটা কাপড় গাছকোমর করে পরা, পাউডারের প্রলেপ নয়, সারা মুখময় ঘাম আর হাতে আর পায়ে ফোস্কা আর কড়া নিয়ে সংগ্রাম করছে অনভ্যস্ত জীবনে। চাল-ডালের হিসেব করছে, কালকে কি করে চলবে সেই চিন্তায় আজকের রাতে আসছে না ঘুম;—দুর্গার জীবনের সঙ্গে সিনেমার তফাৎ কোথায়? চলচ্চিত্রের মতই চিত্রের পর চিত্র মোশনে এবং ইমোশনে মিলে দুর্গার জীবন—সব চেয়ে বিচিত্র মোশন পিকচার ত' সেই।

চলচ্চিত্রের পরিভাষায় যাকে বলে ফ্ল্যাশ ব্যাক, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার যে-জীবন দর্শকের নেপথ্যে, বর্তমানকে ব্যক্ত করবার জন্যে সেই অতীতকে এনে দাঁড় করানোর যে-প্রথা আছে সেই প্রথাতেই এসে দাঁড়াল দুর্গার সেই কিশোরী থেকে তরুণীতে পদার্পণের পেছনে ফেলে-আসা মণি-মুক্তো-বসানো অহোরাত্রের আশ্চর্য ইতিবৃত্ত।

দুর্গার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় তার দাদামশায়ের প্রাসাদের মত, লোয়ার সার্কুলার রোডের বিখ্যাত বাড়ী 'পর্ণ কুটীরে',—সেদিনকার কলকাতা আর আজকের কলকাতায় আকাশ-পাতাল ফারাক।

আজকের কলকাতা যেমন কেরাণীর, সে-কলকাতা ছিলো তেমনি কাপ্তানের। গিলে-করা পাঞ্জাবীতে ধুলোয় লুটোন লম্বা কোঁচায়, দামী শাল আর হীরে-বসানো আংটিতে সেদিনকার পুরুষেরা এবং বেনারসী শাড়ী আর জড়োয়ায় জড়োসড়ো সে সমাজের মহিলারা, ইংরেজি শিক্ষা আর এদেশী সংস্কারের ছিলেন জীবন্ত গোঁজামিল।

দুর্গার পিতামহের গৃহ ছিলো সে-ক'লকাতার তীর্থকেন্দ্র। টাকা ছাড়া মানুষের কোন দাম ছিল না। শিক্ষা বলতে শুধু ভালো ইংরেজি বলা; কালচার বলতে সুরায় ডুবে থাকা। নিজের স্ত্রী এবং একাধিক পুত্র-কন্যা সত্ত্বেও একজন রক্ষিতা থাকলে তবেই সে সমাজের স্বনামধন্যদের কালচারের সর্বস্বত্ব হ'ত সংরক্ষিত। না হ'লে নয়।

দুর্গাদের বাড়ী গিয়েই আমি প্রথম দেখলাম নিজের চো'খে, বড়লোকরা মানুষ হিসেবে কত দরিদ্র হতে পারে! শুধু কি তাই দেখলাম? না, আরো দেখলাম যে-সব লোককে আমরা অসাধারণ বলে জানি, প্রতিভা বলে যাঁদের পায়ে জোগাই বিস্ময়ের প্রণতি, যাঁদের এক টুকরো 'সই',-এর মূল্য এক একটি হীরে দিয়ে, সেই সব অসাধারণ পুরুষরা কত ব্যাপারে অতি সাধারণ যারা, তাদের চেয়েও কত ছোট। তাঁদের মধ্যে কেউ আইন জানে, কেউ অংক, কেউ ডাক্তারীতে ধন্বন্তরি, কেউ রাজনীতিতে চাণক্য। কিন্তু ওই পর্যন্ত, স্বার্থবুদ্ধি, লোভ, লালসা, হীনবুদ্ধির কালিমায় তারা, যাদের আমরা নগণ্য মনে করি, মনে করি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, তাদের তুলনায় আরো কত কালো, আরো কত অধম। খ্যাতি এবং অর্থের নেশায় বুঁদ সেই সব পুরুষকারের দম্ভে স্ফীত পুরুষরা একদিন মিলিয়ে যায় বুদবুদের মত। যারা চিরকাল হাল ধরে থাকে, দাঁড় টানে, যারা কাজ করে তারা হ'ল সাধারণ মানুষ। সকল যুগে, সব দেশে এদেরই মাথায় পা দিয়ে অসাধারণদের ধাপে ধাপে ওঠা। সেই ধাপ থেকে পড়বার দিন কত দূরে?—সেই ধাপ্পা থেকে আমাদের বাঁচবার?

দুর্গা, ছেলে হ'লে বলতাম, দৈত্যকুলে সে এসেছে প্রহ্লাদের মত, মেয়ে বলে বলতে হয় দেবীর মত। যে-ঐশ্বর্য মানুষকে অমানুষ করে, যে-বিদ্যা দান করে না বিনয়, যে কালচার শুধু ওড়াতে শেখায় হাল্কা কথার রঙীন ফানুস, সেই আবহাওয়াতেই দুর্গা ফুটে উঠল ফুলের মত, বেজে উঠল আগমনীর মত, জ্বলে উঠলো জলের ওপর সূর্যের আলোর মত।

কিশোরী থেকে তরুণী, স্কুল থেকে কলেজের ছাত্রী হ'ল দুর্গা। সেই কো-এডুকেশন চালু কলেজে একদিন বিতর্ক-সভায় এলো একটি ছেলে যে বিপক্ষতা করল দুর্গার। বিতর্কের বিষয় ছিল, মেয়েদের চাকরী করা উচিত না অনুচিত। দুর্গা বলল: অবস্থা বিপর্যয়ে মেয়েদের সব সময়ই এসে দাঁড়াতে হ'বে ছেলেদের পাশে,—এবং প্রয়োজন হ'লে জীবিকার ক্ষেত্রেও। কারণ তাতে কোন অন্যায় নেই। এবং এ-পৃথিবীতে দারিদ্র্যই একমাত্র অন্যায়, আর কোন অন্যায়কে সে করে না স্বীকার।

বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'ল দুর্গা। দ্বিতীয়, সেই ছেলেটি। বিতর্ক-সভার শেষে সেই ছেলেটি বলল দুর্গাকে, বিচারপতিরা পুরুষ মানুষ, তাই এক জন মেয়ের ভাগ্যে 'প্রথম' পুরস্কার, নইলে—দুর্গা হেসে জবাব দিল: আচ্ছা আসছে বার মেয়ে-বিচারক রাখতে বলব আপনার জন্যে।

সেই প্রথম দেখা, কিন্তু শেষ নয়।

দ্বিতীয় বার: কলেজের পরীক্ষা চলছে; ছেলেটির কলমে গেছে কালি ফুরিয়ে। দুর্গা নিজের কলমটা বাড়িয়ে দিল।

আপনি কি দিয়ে লিখবেন?—প্রশ্ন শুনে মিষ্টি করে হাসল দুর্গা, তার পর বলল: আমার না লিখলেও চলবে, পরীক্ষকরা পুরুষ মানুষ, কাজেই আপনার ধারণায় প্রথম হওয়া ত' আমার বাঁধা। হাসতে হাসতে বলল দুর্গা। বিতর্ক-সভার কথা সে ভোলেনি, ভুলতে পারল না এবারের দেখা হওয়াও। হাসল সেই ছেলেটাও।

পরীক্ষার পর রাস্তায় দুর্গাকে বলল: আমার নাম নীলমণি।

দুর্গা বলল: আমার নাম দুর্গা। [ক্রমশঃ।

৫

জীবন যখন তৃষ্ণা-কাতর
যখন বীতভৃঙ্গ।
স্মরণ কোরো শরণালয়
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী

(কেশবচন্দ্র সেনকে লেখা)

হিমালয় পর্ব্বত
১৪ আশ্বিন, ব্রাঃ সং ৫৪ (১৮০৫ শক)।

প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ !

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেম সহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

'কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

নিম্নে বসুন্ধরা ঊর্দ্ধে দেবলোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর
আনন্দময়ের মঙ্গলস্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও, তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দজনক সুন্দর আনন দেখ রে, নয়ন, সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল-সংবাদ লিখিলে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ
আচার্য্য মহাশয় কল্যাণবরেষু

প্রাণাধিকেষু।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীতি হইল যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সাম্বৎসরিক উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে, এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে দুই স্থানে না হইয়া দুই দিনে হয়। ১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই তাহা সম্পন্ন হউক, আর ১১ই অথবা ১২ই মাঘ যে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই সাম্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্য্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন। এইরূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হইব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
২রা মাঘ, ১৭৯১ শক

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

(রাজনারায়ণ বসুকে লেখা)

কলিকাতা
১৫ মাঘ, ১৭৭৫ শক

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

তোমার ১৩ই মাঘের পত্র পাইয়া সদ্যুক্তি লাভ করিলাম। তুমি বহুদর্শী, জাতিভেদ বিষয়ে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা যথার্থ। এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবে না, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে: যেহেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে; আমি যখন লিখিয়াছিলাম যে, এমত কাল উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার সাধ্য দিবার সাধ্য নাই—তাহার এ তাৎপর্য্য নহে যে, এক দিবসেই সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইবেক। কিন্তু যে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কাহারও বাধা দিবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দেওয়া বড় নূতন কথা লিখিয়াছ। বড় কুতূহলজনক। আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করিতে ব্যগ্র; তুমি ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ। যাহা হউক, জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীঅক্ষয় বাবুরও এই মত। তিনি বলেন যে, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে, তুমি আপনার যথার্থ অভিপ্রায় যে লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহাতে আমার জ্ঞান লাভ হইল।...জাতিভেদ যে না থাকে তাহা কিছু আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে, আমাদিগের লক্ষ্য যে, জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার ও ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু জাতিসংস্কারের মধ্যে পৌত্তলিকতা থাকাতেই এত অনর্থ হইয়াছে। ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

(জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নব নাটকের অভিনয় সম্পর্কে ভাইপো গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে)

কালীগ্রাম—নাটোর
৪ মাঘ, ১৭৮৮ শক

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ—

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু, আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ !

৩০শে আষাঢ়ের (১৮০৪) শক প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ, আপশোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "কাহাকেও এমন পাই না যে, আমার কথায় সায় দেয়।" তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠত, আর খুসী হয়ে বল্‌তে থাকত—"কিমস্তি জানি না যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিয়াছি, এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকট কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ বন্ধন হইয়াছিল; নানা প্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা," যেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উঁচু নিচুর কোন গিরকিচ নাই। ইতি ২রা শ্রাবণ ৫৩ ব্রাঃ সং (১৮০৪ শক)।

তোমাদের অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

(জমীদারীর কর্ম্মচারিগণকে পূজার সময় বোনাস স্বরূপ এক মাসের বেতন দিবার প্রসঙ্গে)

বোলপুর
১৩ ভাদ্র, ১৭৮৭ শক

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

পূজার সময়ে পার্ব্বণি সকলে এক মাসের বেতন পায় এই নিয়ম ধার্য্য করিলে ভাল হয়। দেওয়ানজীও এক মাসের বেতন পরিমাণ পার্ব্বণি পাইতে পারেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর চিঠি

১

[বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সুবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে কলিকাতা 'সারস্বত সম্মেলন বা সমাজ' এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সমাজের প্রাণ। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। ভৌগোলিক নামের পরিভাষা গঠন করিয়া সমাজ একখানি পত্রী প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসুর নিকট ইহা প্রেরিত হইলে তিনি এ সম্পর্কে এই পত্র লেখেন।]

দেওঘর ৮ঠা আষাঢ় ১২১০

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না, ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিশেষরূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক; কেহ কাহারও কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "Irritabile vates tritiOn" আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা—উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটি হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্য প্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে?

English Channel একটি উপসাগরের নাম ; Channel শব্দে কেবল মাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ—
শ্রীরাজনারায়ণ বসু

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতি শব্দও থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

২

দেওঘর ২০শে কার্ত্তিক, ব্রা, স, ৫৭।
৫ই নবেম্বর, ১৮৮৬।

মান্যস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২শে অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটি মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা, স্বভাব ও রুচি অনুসারে এক একটি প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন, কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি, কেহ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি। ক্রিয়াকলাপেও ঐরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে ধর্ম্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে।

আপনার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধনের জন্য অন্য কোন জাতির নিকটে যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া, আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা বিধি দিতেছেন, "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেন।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।" কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপতাপ ও সাংসারিক দুঃখ-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্মুক্তি এই মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন, "বিবেক বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা।" উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে কিছু থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন এবং আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এমৎ বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না?

আপনারা প্রচারকদিগের কর্ত্তব্যে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।" ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক "অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না।" যদি আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না?

যদি কোন ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না?

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না?

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য ধরিয়া শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ব্রাহ্মের মত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না? এবং এরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহেন অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায়, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে শোভায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে শোভায় না। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ঐ শব্দের "ব্রহ্মের উপাসক" এই অর্থ করিতেন। সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সঙ্কোচ করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নির্ব্বিশেষে যে কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু যে ব্রাহ্মেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এমং আমরা বলি না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞানবৃদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের অনুবর্ত্তী লোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অল্পই পাইবেন; কারণ আমি দেখিতেছি এক-একটি ব্রাহ্ম এক-একটি সম্প্রদায়।) তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটি প্রচার-সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে "প্রচার-সভা" এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। অবিলম্বে আপনাদিগের মধ্য হইতে এক দল উঠিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিবে। কমিটি সব কমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে মতবদ্ধ (Creed bound) করিতে চেষ্টা করা বৃথা, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ শৃঙ্খলবদ্ধ করা উচিত হয় না, তাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মের স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য, আসল বিষয়ে মিল থাকিলেই হইল।

নিবেদক—

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুঃ—উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না, যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০শে নবেম্বরের সভায় পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

ভাই-ভাই

বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ বিটোভেনের এক ভাই ছিলেন। অনেক পয়সার মালিক বলে তাঁর একটু বড়মানুষী দেমাক ছিল। একদিন বিটোভেনের ভাই তাঁর বাড়িতে দেখা করতে এলেন কিন্তু তাঁকে না পেয়ে একখানা কার্ড রেখে গেলেন, তাতে লেখা ছিল: Tohan von Beethoven, Land owner.

বাড়ি ফিরে কার্ডটি পেয়ে বিটোভেন তৎক্ষণাৎ ভাইয়ের উদ্দেশে ছুটলেন। ভাই তখন উপর তলায়। চাকরকে দিয়ে ভাইয়ের কার্ডটির পিছনেই লিখে পাঠালেন:

Ludwing Von Beethoven, Brain owner.

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো সাঁইত্রিশ

গোপালের মা ভাত রাঁধছে ঠাকুরের জন্যে। সব তৈরি, খেতে বসেছেন ঠাকুর। কিন্তু এ কি, ভাতগুলি যে শক্ত, সেদ্ধ হয়নি ভালো করে। ঠাকুর বিরক্ত মুখে বললেন, 'এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে ভাত আর আমি কখনো খাব না।'

এ কখনো হতে পারে? গোপালের মা যার তিনি অঞ্চলের নিধি, যার তিনি অন্ধের নড়ি, কাঙালের কড়ি, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? এ নিশ্চয়ই অভিমানের কথা, হয়তো বা ভয় দেখানো। ভবিষ্যতে সাবধান হোয়ো, মনোযোগী হোয়ো, তারই শাসন-উচ্চারণ। দেখবে, এখুনিই মেঘ কেটে যাবে, ধুয়ে যাবে, অভিমান, গোপালের মাকে কাছে ডেকে এনে করবেন কত স্নেহ-সমাদর, আবার রাঁধতে বলবেন আরেক দিন।

কিন্তু, না, অক্ষরে-অক্ষরে ফলল। ক দিন পরেই অসুখ হল ঠাকুরের। দেখতে দেখতে বেড়ে গেল অসুখ। বন্ধ হল ভাত খাওয়া। গোপালের মার হাতে ভাত খাওয়া ঘুচে গেল এবারের মত।

'আজ বিকেলে একবার যদু মল্লিকের বাগানে যাব।' এক ভক্তকে একদিন বললেন ঠাকুর।

কিন্তু সেদিনই দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের সমাগম। সারা দিন কেবল কথা আর কথা। আর সব প্রসঙ্গের শেষ আছে ঈশ্বর প্রসঙ্গের শেষ নেই। আর সব কথা বলতে ক্লান্তি শুনতে ক্লান্তি কিন্তু ঈশ্বরকথা যে বলে যে শোনে দুই-ই অফুরন্ত।

অনেক রাত্রে, যখন সবাই বিদায় হয়ে গিয়েছে, যদু মল্লিকের বাগানে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। আর কি স্থির থাকা যায়। তখুনি উঠে পড়লেন, চললেন হন হন করে। ও কি, কোথায় যাচ্ছেন? যদু মল্লিকের বাগান। সে কি, এত রাতে, এই অন্ধকারে। তা হোক। বারণ শুনলেন না কারু, সটান এগিয়ে চললেন। কিন্তু যাবেন কোথায়, বাগানের গেট বন্ধ। তাতে কি, দমবার পাত্র নন ঠাকুর। বাক্য যখন একবার উচ্চারণ করেছেন তখন সত্য পালন করতেই হবে। দারোয়ানকে ডাকলেন। বললেন, গেট খুলে দাও। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তখন বাগানের মধ্যে খানিক পাইচারি করে সুস্থির হলেন।

সুরেন মিত্তিরের বাগান থেকে ফিরছেন ঠাকুর, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি তখন লুচি খাইনি, আমাকে একটু লুচি এনে দাও।'

লুচির থালা নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। একটু কণিকামাত্র ভেঙে মুখে দিলেন। বললেন, 'এর অনেক মানে আছে। লুচি খাইনি মনে হলে আবার ইচ্ছে হবে। হয়তো আবার আসতে হবে এখানে।'

মণি মল্লিক হেসে বললে, 'বেশ তো সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আসতাম।'

'দেখ রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট।' একদিন বললেন মণি মল্লিককে: 'তুমি সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দাও না কেন। কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনি তুমি নাকি বড় হিসেবী।'

বরানগরে বাগান আছে মণিলালের। সিঁদুরেপটি থেকে প্রায়ই সেখানে আসে আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে দেখে যায়। সারা পথই কি আর গাড়িভাড়া করে আসে? ট্রামে করে প্রথমে শোভাবাজার, সেখান থেকে শেয়ারের গাড়িতে বরানগর। আর বাকি পথটা কখনো পায়ে হেঁটে। অথচ অঢেল পয়সা।

পয়সার প্রতি যে টান সে টান দিতে পারো ঈশ্বরকে? কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টান। ঠাকুর

বললেন, 'তোরা আর কিছু নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টানটুকু নে।'

হেসে বললেন, 'টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছে করে।'

'টাকা বার করতেই অনেক হিসেব।' বললে মাষ্টার। 'তবে ঐ যে বলছিলেন ত্রিগুণাতীত হয়ে সংসারে থাকা—'

'হ্যাঁ, বালকের মত।' ঠাকুর আরো সহজ করে দিলেন।

'কিন্তু বড় কঠিন।' সহজ হওয়াই শক্তিমানের তপস্যা।'

স্বভাবকে লাভ মানেই সহজকে লাভ। নেব—এটা স্বভাব নয়, দেব—এটাই স্বভাব। মেঘ জল দেয়, বৃক্ষ ফল দেয়, আগুন আলো দেয়। চার দিকেই এই দেওয়ার দেওয়ালী। বিনা কারণে উৎসর্গের উৎসব। আমার চার দিকে এই উৎসব, আর আমি ম্লান স্তব্ধ ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে থাকব? আমিও মাতব এই উৎসবে। দায় নেই দান বাধ্যতা নেই বিতরণ—সেই আনন্দযজ্ঞে। আর কাউকে কিছু দিইনি, তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে যাব। মৃত্যু দিয়ে তৈরি, তুচ্ছ উপকরণ নয়, অমৃত দিয়ে ভরা আমার উপঢৌকন।

শুধু ধূমায়িত হব, একবারও প্রজ্বলিত হতে পারব না, এই কলঙ্ক থেকে আমাকে ত্রাণ করো। জ্বালাহীন তুষানলের মত আমাকে অবসাদধূমে আচ্ছন্ন রেখো না। আমাকে একবার তোমার জন্যে দীপ্ত হয়ে ওঠবার তেজ দাও। ত্যাগই আমার তেজ, বিসর্জনই আমার জীবনালোক।

প্রভু, আমার দোষ আর ধোরো না। তোমার তো সমদর্শন, যদি আর-কাউকে পার করে দিয়ে থাকো, দয়া করে আমাকেও পার করে নাও। তোমার খুশি তা জানি। কিন্তু আমার খুশির জন্যে তুমি একটু খুশি হতে পারো না? পূজার ঘরের কল-কাটার যে বঁটি আর কসাইয়ের হাতে যে হিংসার খড়্গা দুই-ই এক লোহায় তৈরি। কিন্তু স্পর্শমণির অন্তরে তো দ্বিধা নেই, সে ভালো-মন্দ দুটো অস্ত্রকেই সোনা করে। একই জল, নদীতে তা স্বচ্ছ নালায় তা মলিন, অপবিত্র, কিন্তু দুই-ই গঙ্গায় এসে পড়ে স্বচ্ছন্দে এবং গঙ্গায় পড়ে একই রঙে রঙিন হয়। যেমন গঙ্গার বর্ণ তেমনি ঐ নদী-নালার। তেমনি আমাকে যদি টেনে নাও তোমার মধ্যে, হই না যেন অস্বচ্ছ-অপরিচ্ছন্ন, ঠিক তোমার বর্ণে বর্ণায়িত হব। তবে কেন দয়া করবে না? কেন হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে না বলহীনকে?

আমি শুকনো মাঠ, আমার পাশেই তুমি রয়েছ জলাশয়। আগের থেকেই রয়েছ। আমার সেচের জল, আর্দ্রীকরণ উর্বরীকরণের জল। শুধু আমি অহঙ্কারের আল্-বেঁধে রেখেছি বলেই তুমি ঢুকতে পারছ না। নইলে কবে ভেসে যেতাম স্নেহসিঞ্চনে, অকৃপণ ফসল ফলাতাম। তুমি এত কিছু ভেঙে-চুরে ফেলছ, আমার এই সামান্য মৃত্তিকার আল ভূমিসাৎ করতে পারো না?

এই মণি মল্লিকের বাড়িতেই, ৮১ সিঁদুরেপটি, একবার নাচলেন ঠাকুর। শুধু নিজে নাচলেন না, সকলকে নাচিয়ে ছাড়লেন। শুধু ভক্তদের নয়, যারা দেখছিল তাদেরও। আপনি মেতে জগৎ মাতায়। আপনি হেসে জগৎ হাসায়। আর সঙ্গে চিরঞ্জীব শর্মার গান, 'নাচ রে আনন্দময়ীর ছেলে'—বাম বাহু তুলে ও দক্ষিণ ভুজ কুঞ্চিত করে, বাম পা আগে ও ডান পা পিছনে রেখে ঠাকুরের সেই ভুবনস্পন্দন নাচ। এ যেন সেই 'পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।' বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে যে নৃত্য চলেছে তারই স্বতোৎসার।

এই মণি মল্লিকের বিধবা মেয়ে নন্দিনী। আমাকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দিন এই আকুল প্রার্থনা নিয়ে একদিন প্রভুর পায়ে এসে পড়ল।

'ইষ্ট? ইষ্টকে দেখতে চাও?' যেন কত সহজ এমনি নিশ্চয়ভরা চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, দিন দেখিয়ে।'

'বাড়িতে কোন ছেলেটিকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসো?'

'আমার ছোট্ট একটি ভাইপো আছে—তাকে।'

'তবে আর কি। পেয়ে গেছ তোমার ইষ্ট। ঐ ছোট্ট ভাইপোকেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভেবে সেবা করো।'

ভেবেছিল ঐ আঁচলধরা অনুরক্ত ছেলেটাই জীবনের বন্ধন। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন আসলে ঐটেই মুক্তি। যেখানে বন্ধন সেখানেই মুক্তি। তোমার স্বভাবই তোমার আসন; তোমার প্রবণতাই তোমার ধ্যান। প্রাণ যা চায় তাই ঈশ্বর। সব পেলেও আবার যা চায় তাই ঈশ্বর।

ঈশ্বর আমাদের ফাউ। বাঁধাবরাদ্দের উপর

মহাবলীপুরম্
—এম, এল, ঘোষ

—নিমাইচাঁদ শীল

[পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসগৃহ ত্যাগ করেছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী]

পুরীর বাজার —সুধীন্দ্রনাথ কর

হুড্রো —শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

দারুণ অগ্নিবাণে

—বিশ্বনাথ দাস

পাষাণী (কোণারক) —মদন বসু
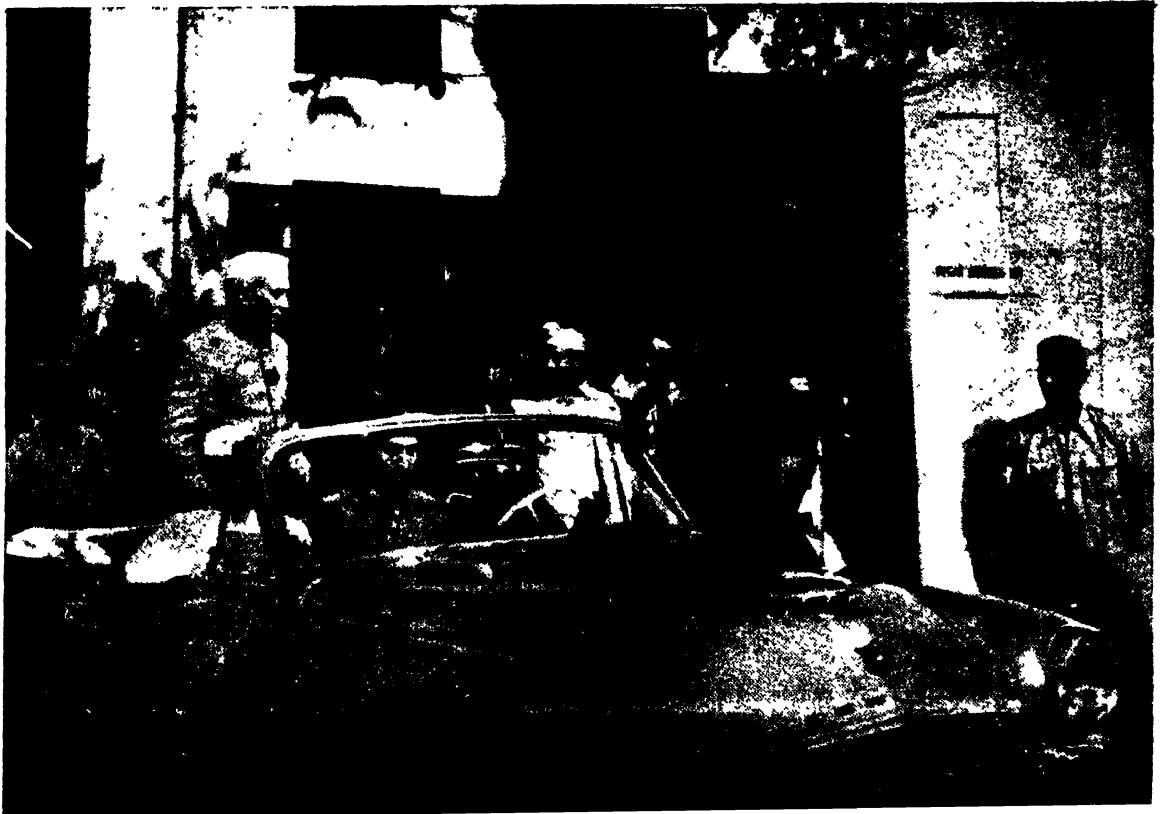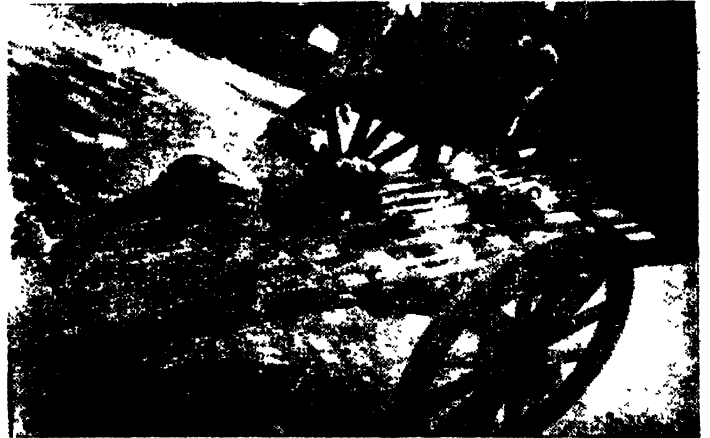
উপরি-পাওনা। সমস্ত প্রাপ্তির পরিধির বাইরে মহত্তম উদ্‌বৃত্ত।

ওগো আমার একটু পালো-দেওয়া ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করছে। কলকাতায় নেমন্তন্ন বাড়িতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি। ডাক্তারদের একটু জিগগেস করো না খাওয়া চলবে কি না।

ডাক্তারদের আপত্তি নেই।

যোগীন গেল সেই ক্ষীর কিনতে। পথে যেতে যেতে ভাবনা ধরল, বাজারের ক্ষীর খাওয়া কি ঠাকুরের পক্ষে ভালো হবে? বাজারের ক্ষীরে তো শুধু পালো নয় রয়েছে আরো কত কি ভেজাল কে জানে! তার চেয়ে কোনো ভক্তের বাড়িতে বলে সেখান থেকে ক্ষীর তৈরি করে নিই গে। কে জানে সেইটেই বা ঠাকুরের মনঃপূত হবে কি না। তেমন কথা তো কিছু বলে দেননি ঠাকুর।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলে এল সে বলরাম বাবুর বাড়ি। এখন বলুন দেখি কি করি।

বাজারের কেনা জিনিস ঠাকুরকে খাওয়াবে, তুমি পাগল হয়েছ? বাড়িতে তৈরি করে দিচ্ছি। কিন্তু সকাল বেলাতেই তো হবে না। তুমি এ বেলা এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো, পরে বিকেলে নিয়ে যেও তৈরি ক্ষীর। ঠাকুর খুশি হবেন ক্ষীর দেখলে।

তথাস্তু। ক্ষীর নিয়ে কাশীপুর পৌঁছুতে বিকেল চারটে।

দুপুরে খাওয়ার সময় ঠাকুর অনেকক্ষণ বসে ছিলেন ক্ষীরের জন্যে। এই আসে এই আসে করে মুহূর্ত গুণেছেন। বরাদ্দ সময় পার হয়ে গেল তবু দেখা নেই। তখন আর কি করা, রোজ যা দিয়ে খান তাই দিয়ে খেলেন শুকনো মুখে।

'কি রে এত দেরি হল কেন?'

'জ্বাল দিয়ে আনলুম বলরাম বাবুর বাড়ি থেকে।'

'তোর কি বুদ্ধি! তোকে কি তাই আমি আনতে বলেছিলুম!'

যোগীন তাকিয়ে রইল অপরাধীর মত।

'আমি তোকে বলেছিলুম, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বাজার থেকে কিনে আন। ভক্তদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে তৈরি করে আনবার কি হয়েছিল?'

'বাজারের ক্ষীর খেলে আপনার অসুখ বাড়বে মনে করে—'

'আর এ খেলে বাড়বে না? দেখেছিস কেমন ঘন গুরুপাক ক্ষীর।'

অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

যেমনটি বলে দিয়েছি তেমনটি করবি। যা করবি বলে বেরিয়েছিস তার থেকে বিচ্যুত হবি না। সম্পূর্ণ করাই সম্পন্ন করা। ঠিক ঠিক কথা ঠিক ঠিক কাজ।

'এ ক্ষীর আমি খাব না'। বলে পাঠালেন শ্রীমাকে।

কিন্তু কত কষ্ট করে ভক্ত তৈরি করেছে, কত কষ্ট করে বহন করে এনেছে আরেক জন। সব তো তাঁরই নিবেদনে। তিনি যদি একটুও মুখে না দেন তা হলে কি করে চলে!

'সমস্তটা ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ, গোপালের মাকে। ভক্তের দেওয়া জিনিস ফেলা চলবে না। ওর মধ্যেই গোপাল আছে। ওর খাওয়াতেই আমার খাওয়া।'

সাধন আর কি? সহজ সাধন। সেই যা পড়েছিলে ছেলেবেলায়: 'সদা সত্য কথা কহিবে।' এ তো তোমার নিজের আয়ত্তের মধ্যে, এর জন্যে তো কোনো দৌড়-ঝাঁপের দরকার নেই, কোনো কাঠ-খড়ও পোড়াতে হবে না। সহজ সংসারে চলো-ফেরো আর সত্য কথাকে আঁট করে ধরে থাকো। কি হয়েছে, কি দেখেছ, কি করেছ, সব ঠিক-ঠিক বলো। এর জন্যে তো শাস্ত্র পড়তে হবে না, করতে হবে না যাগ-যজ্ঞ, যেতে হবে না তীর্থে স্নানে। শুধু সত্যবাদী হও। হও রৌদ্রে নিষ্কাশিত জ্বলন্ত তরবারি।

'যারা বিষয় কর্ম করে, আফিসের কাজ কি ব্যবসা —তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত।'

সত্যই সাহস। সত্যই ঔজ্জ্বল্য। সত্যই পবিত্রতা।

সামান্য-সাধারণ কথায় সামান্য-সাধারণ আচরণে সত্যকে ধীরে ধীরে আরোপ করো জীবনে। দেখবে কত বড় প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়ে উঠেছ। রক্তের মধ্যে বিদ্যুদগ্নি বয়ে চলেছে। দেখছ পথ রোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। তোমার সত্যময় জীবন সে পাহাড়কে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করবে।

'মাকে সব দিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।' বললেন ঠাকুর। 'সত্যেতে থাকবে তা হলেই ঈশ্বরলাভ।'

কথা একটু কম কও। দয়া করো, একটু চুপ করে থাকো। চুপ করে থেকে অন্যের কথা শোনো।

মন্ত্র আর কোথায়। তোমার অন্তরতম। তুমি চুপ করলেই তার কথা শুনতে পাবে। শুনতে পাবে সেই গভীর গুঞ্জন।

চুপ করে থাকলে অন্তত মিথ্যে বলার হাত থেকে রেহাই পাবে। চুপ করলেই বন্ধ হবে সব ইন্দ্রিয়ের হট্টগোল। হবে পাহাড়ে বেড়ানো, হবে সমুদ্রস্নান। অনুভব করবে সব প্রবাহই জাহ্নবী, সব স্বরূপই সমুদ্র। অন্তরক্ষেত্রে কোথায় সুপ্ত শক্তির বীজটি পড়ে আছে কুড়িয়ে পাবে। মৌনের আকাশে বহু বিস্তশাখায় প্রসারিত হবে সে বনস্পতি। নিজেকে নিজে আবিষ্কার করবে, হবে নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অণীয়ান ও মহীয়ানকে দেখবে একসঙ্গে।

আর কিছু না পারো নির্জন পথে একা-একা হাঁটো। চুপ করে থাকো।

আর যদি কথাই কইবে, সকালে-বিকেলে হরিবোল বলো। হাততালি দাও আর হরিনাম করো।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, কথকতা করে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। সাতাশ-আটাশ বয়স, কি নাম কে জানে, সবাই ঠাকুরদাদা বলে ডাকে। সংসার ঘাড়ে পড়েছে তাই বৈরাগ্য নিয়ে উধাও। কিন্তু মন টিকল না, আবার ফিরে এসেছে স্বস্থানে। তার মাটির কেল্লায়।

'কোত্থেকে আসছ?' জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে বরানগর থেকে।'

'পায়ে হেঁটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানে কি দরকার?'

'আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। একটা কথা আপনাকে জিগগেস করব।'

'করো।'

'তাঁকে ডাকি অথচ মনে অশান্তি কেন? দু'-চার দিন বেশ আনন্দে থাকি, তারপর আবার অশান্তি।'

'বুঝেছি।' বললেন ঠাকুর, 'ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে-দাঁত বসিয়ে দেয়। ঠিক পড়ছে না। কোথায় একটু আটকে আছে।'

কি সুন্দর করে বললেন। দাঁতে-দাঁত বসছে না। কারিকরের হাতেই সে কারসাজি। একটুখানি সরিয়ে দাও, একটুখানি বেঁকিয়ে দাও, ঠিক খাঁজে খাঁজ লেগে যাবে। তখন জলের মত চলে যাবে ক্ষুর। তখনই সর্বশান্তি।

গঙ্গাই শুধু সমুদ্রকে চায় না, সমুদ্রেরও গঙ্গা ছাড়া গতি নেই। 'সাগরাদনগা হি জাহ্নবী, সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ।' গঙ্গা সমুদ্র ছেড়ে অন্যত্র যায় না, তেমনি সমুদ্রও গঙ্গার মুখরসেই আনন্দ লাভ করে।

'মন্ত্র নিয়েছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?'

এইবার মুখে আর কথা নেই ঠাকুরদাদার। তবেই বুঝতে পারছ, কেন বসছে না দাঁতে-দাঁত। মন্ত্রের কাছেই প্রাণ খোঁজো। নামের কাছেই প্রেম চাও। অভ্যাসের থেকেই নিংড়ে নাও অনুরাগ। অনুরাগকে দৃঢ় করো, প্রগাঢ় করো। তখনই দেখা দেবে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য তো নঙর্থক নয়, নেতিবাচক নয়। বৈরাগ্য সদর্থক, অস্তিবাচক। বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে নিবিড়ানুরাগ।

মর্কট-বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্য আনো। আসক্তির চেয়েও তা বড় শক্তি। আস্পৃহার চেয়েও তা তীক্ষ্ণতর আকর্ষণ।

'জানো না বুঝি, সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরে কাশী গেল।' বললেন ঠাকুর। অনেক দিন খবর নেই। তারপর বাড়িতে একখানা চিঠি এল। লিখেছে 'তোমরা ভেবো না, আমার এখানে একটি কাজ হয়েছে।'

সবাই হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'তুমি একটা গান ধরো।'

ঠাকুরদাদা গান ধরলেন। তন্ময় হয়ে শুনলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার মধ্যে গান আছে, তবে আর কি। ঐ গান ধরেই এগোও ঈশ্বরের দিকে। সংসারে থাকতে গেলেই জ্বালা, হয়তো মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলেকে পড়াতে পারছে না, বাড়ি ভাঙা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, মেরামতের টাকা নেই। তবু থাকো, থাকো সংসারে। কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করো। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেই বেশি বিপদ, সোজা গায়ের উপরেই গোলাগুলি এসে পড়ে।'

'সংসার ত্যাগের দরকার নেই?'

'কি দরকার! সাধুদের কত কষ্ট! সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছে একজন, তার স্ত্রী বললেন, কোন সুখে চলেছ গৃহ ছেড়ে? এই এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ এই তো আরাম, মিছিমিছি কেন আট ঘর ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে?'

'তা হলে এখন আমি কি করব?' কাতর হয়ে প্রশ্ন করলেন ঠাকুরদাদা।

'হাততালি দিয়ে সকালে-বিকালে হরিনাম করবে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলবে।'

আর, বলি আরো একটি সহজ কথা, সত্য কথা বলবে। থাকবে সত্যকে আশ্রয় করে।

সেই শুষনি শাক তোলার ঘটনাটা মনে করো। চার-চার মেয়ের মধ্যে বিষয়-আশয় সব ভাগ করে দিয়েছেন রাসমণি। যে পুকুরটা দ্বিতীয় মেয়ের ভাগে পড়েছে তাতে সেজগিন্নি স্নান করতে নেমেছে। সুন্দর শুষনি শাক হয়েছে পুকুরে। আঁচলে করে কিছু শুষনি শাক তুলে নিয়ে গেল সেজ গিন্নি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠাকুরের চোখে পড়ল। স্নান করতে এসেছিস স্নান করে যা, তা নয়, পরের পুকুরের শাক তুলে নিচ্ছিস। পরের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হল না? কি দরকার ছিল পরের জিনিসে লোভ করে? বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন ঠাকুর। দ্বিতীয় মেয়েকে ডাকিয়ে আনলেন। সব কথা খুলে বললেন তাকে। এমন গম্ভীর মুখ করে বললেন, সত্যি যেন সেজ গিন্নির অন্যায়ের অবধি নেই। হাসতে লাগল দ্বিতীয়া। রঙ্গ করে বললে, 'তাই তো, বড় অন্যায় করেছে সেজ। এ চুরি ছাড়া আর কি।' সেজ গিন্নিও তখন সেখানে এসে উপস্থিত। সেও হাসতে লাগল। বললে, 'কত কষ্ট করে শাকগুলি তুলে নিয়ে এলুম লুকিয়ে, আর তুমি কি না তাই বলে দিলে!' 'কি জানি বাপু,' ঠাকুর গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ-যোগ হয়ে গিয়েছে তখন পরেরটা না বলে নেওয়া কেন? তাই ভাবলুম যার জিনিস গেছে তাকে বলে দি, সে একটা বোঝাপড়া করে নিক।' দু বোনে আরো হাসতে লাগল।

সব মাকে দিয়েছি, সত্য দিতে পারিনি।

একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে বলে ফেললেন ভাবাবস্থায়, 'এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।'

তখন ঠাকুরে অসুখ নেই, যথাবিধি খাচ্ছেন ঝোল-ভাত। হঠাৎ এমন কথা কেন বলে বসলেন, শ্রীশ্রীমার বুকের মধ্যিখানটা শিউরে উঠল। তিনি বললেন, 'তা কেন? আমি তোমাকে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব।'

'না, না, পায়সান্ন খাব আমি।'

কিছু দিন পরেই ঠাকুর অসুখে পড়লেন। তখন ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল ঝোল-ভাত। তখন শুধু মণ্ড আর দুধ, নয়তো স্রেফ দুধ-বার্লি।

একশো আটত্রিশ

গিরিশ নিমন্ত্রণ করেছে ঠাকুরকে, যেতেই হবে তার বাড়ি।

বলরামের বাড়িতে আছেন, রাত প্রায় নটা হল, উঠে পড়লেন ঠাকুর। ওরে গিরিশের বাড়ি যাব। নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। হ্যাঁ, এই রাত্রেই যেতে হবে।

আহা, কি সব গান বেঁধেছে বলো দেখি। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী। যার ভেতরে এই সব গান এত সজীব অনুরাগ তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারি?

সেদিন ঠাকুরকে বললে গিরিশ, 'মশাই ছেলেবেলায় আমি কিছু লেখাপড়া করিনি তবু লোকে বলে বিদ্বান—'

বই-শাস্ত্র একটা উপায় মাত্র। ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, 'আসল হচ্ছে খবর সব জেনে নিয়ে নিজেই কাজ আরম্ভ করে দাও।'

নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করো। সেই তো স্বাধীনতার অর্থ। নিজের ঘরে নিজের দেহের মধ্যে নিজের জীবনের মধ্যে কাজ করো। দেখাও তোমার বীরত্ব, তোমার পুরুষকার। তুমি স্বাধীন হয়েছ বুঝব কিসে যদি তুমি এখনও ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে বাস করো। শুধু পড়ে কি হবে কাজ করে দেখাও, তুমি কত বড় কারু, কত বড় শিল্পী।

'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে?' বললেন ঠাকুর, 'অনেক শ্লোক অনেক শাস্ত্র মুখস্ত কিন্তু মন রয়েছে টাকা আর দেহসুখের দিকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় মরা জানোয়ার।'

বই-শাস্ত্রও দেখ। পথ-পদ্ধতি জেনে নাও। তার পর বই বন্ধ করে দিয়ে বাজার করতে বেরোও। যে বাজারে আসল বস্তুলাভ।

কাজ করো। সাধন করো।

'বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি, কত কঠোর সাধন।' বলছেন ঠাকুর, 'গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত।'

'আর সকলের ধারণা, এক মুহূর্তেই সব হয়ে

যাবে।' মাষ্টার টিপ্পনি কাটল: 'বাড়ির চার দিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই যেন দেয়াল হল।'

কি অবস্থাই গিয়েছে! কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, নেমন্তন্ন করলে রামকৃষ্ণকে। অনেক সাধুর ভিড়, পঙক্তি করে বসেছে সবাই। রামকৃষ্ণও বসল এক পাশে। কেউ-কেউ পরিচয় জিগগেস করল, এ কে, কোন মতের, কই আগে তো কখনো দেখিনি। অত খবরে কাজ কি। রামকৃষ্ণ আলাদা হয়ে সরে বসল। যেই পাতায় খাবার দিল, কারু দিকে না চেয়ে কারু জন্যে অপেক্ষা না করে সরাসরি খেতে সুরু করে দিলে। যেন অভব্য কিছু একটা করছে এমনি অবাক হবার ভাব করে কেউ-কেউ বলে উঠল: এ কেয়া রে!

এ অনন্যসাধারণ! নিজের ঢাক পিটতে রাজি নয়, একেবারে নিরহঙ্কার। পাতে খাবার পড়লে এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজি নয়, এমনি তার সত্যপথাশ্রিত সরলতা।

রাত নটা, উঠে পড়লেন ঠাকুর।

সে কি, আপনার জন্যে খাবার তৈরি করেছি যে। বলরাম আপত্তি করল।

তাও তো ঠিক। খেয়ে না গেলে বলরাম যে কষ্ট পাবে—আবার ওদিকে গিরিশের ডাক, দেরি করবার উপায় নেই। তখন উপায় কুশল বললেন, এক কাজ করো, খাবারটা দিয়ে দাও সঙ্গে।

বোস পাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন, কাছেই গিরিশের বাড়ি, প্রায় ছুটে চলেছেন। পথটুকু পার হতেও যেন তর সইছে না।

কিন্তু এ কে, সহসা এ কে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল!

আর কে! আপনার সেই লোচনলোভনীয়! যার নাম বলতে আপনি পাগল! সেই ইন্দ্রপ্রতিম নরেন্দ্র।

পলক ফেলতে পারছেন না ঠাকুর। যেন 'পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।' কথা সরছে না মুখ দিয়ে। এরই নাম বোধ হয় ভাব। পরম প্রাপনীয়কে পেয়েও অপ্রবৃত্তি। অণুমাত্র প্রাণপবনস্পন্দেই যেন মহীয়ান স্বরূপানন্দ!

চলে গেলেন পাশ কাটিয়ে। গিরিশের ঠিক বাড়ির সমুখে আবার দেখা হল। তখন দিব্যি সহজ-স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'ভালো আছ তো বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারিনি।'

একজন একটা কুয়ো খুঁড়তে আরম্ভ করল। কিছুটা খোঁড়ার পর একজন এসে বললে, এখানে খুঁড়ে কোনো লাভ নেই। নিচে কেবল শুকনো বালির স্তূপ। লোকটা জায়গা বদলালো। খানিক দূর খুঁড়েছে, আরেক জন এসে বললে, কেন পণ্ডশ্রম করছ, এখানটায় বোদা জল। আবার পিছু সরল। তোমার সময় আর পয়সার কি দাম নেই? নইলে এমন কাঁকুরে জায়গায় কি কেউ মাটি খোঁড়ে? দক্ষিণে যাও, সেখানেই মিলবে তোমার মিষ্টি জলের ঝরণা। বললে আরেক জন। হায়, দক্ষিণে এসেও আবার প্রতিবন্ধ। কি করেছেন মশাই, উত্তর ছেড়ে কি কেউ দক্ষিণে আসে?

কুয়ো খোঁড়া ভুয়ো হয়ে গেল।

কিন্তু নরেনের স্থানবদল নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ই তার খননাস্ত্র। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই খুড়ছে। হোক তা রুক্ষরুষ্ট, হোক তা প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ, সেখান থেকেই উদ্ধার করবে সে তৃষ্ণার পানীয়। জলও আমার মধ্যে, অস্ত্রও আমার হাতে—আমাকে আর পায় কে! আমিই আত্মদীপ, আমিই জগদ্ব্যাতি সূর্য। গজেন্দ্র-বিক্রম আয়তবাহু মহাবীর। আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড-খণ্ড হলেও উঠব না আমার ব্রতাসন থেকে। আত্মোদ্ধার করব, করব আত্মোদ্ঘাটন।

কিন্তু অবতার মানতে সে রাজি নয়। এদিকে গিরিশ অবতারবাদে নিদারুণ বিশ্বাসী।

'তোমরা দুজনে একটু এ নিয়ে বিচার করো না।, গিরিশের বাড়ি এসে বললেন ঠাকুর: 'একট ইংরিজিতে তর্ক করো। আমি শুনি।'

বাঙলাতেই কথা হল, মাঝে-মাঝে ইংরেজির ছিটেগুলি।

'ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন।' বললে নরেন, 'শুধু একজনের মধ্যেই এসেছেন এ কখনো হতে পারে না।'

'আমারো সেই মত।' নরেনের কথায় সায় দিলেন ঠাকুর। 'তবে একটা কথা আছে। কোনো আধারে শক্তি বেশি কোনো আধারে শক্তি কম। কেউ গেড়ে পুষ্করিণি কেউ বা সায়র দীঘি। কেউ কুঁজো-কলসী কেউ বা জালা। যেখানে যত বেশি শক্তি সেখানে তত বেশি ভগবত্তা।'

গিরিশ নরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুমি কি করে জানলে তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?'

'তিনি মনোবাক্য-বুদ্ধির অগোচর। তিনি আবার একটা সীমাবদ্ধ জীব হবেন কি করে?'

হলে ভগবানের খুব ক্ষতি হয়ে যায়, তাই না? তাঁর পূর্ণতা, তাঁর অনন্ত শক্তিমত্তা, তাঁর সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিতা বাধিত হয়? কখনোই না। জীবের প্রতি অনুগ্রহই তাঁর শরীর গ্রহণের মুখ্য কারণ।

'অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে?' বললে গিরিশ: 'মানুষকে জ্ঞানভক্তি দেবার জন্যেই তাঁর দেহধারণ। না হলে শিক্ষা দেবে কে?'

'কেন, অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।' নরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নরেনকে আবার সায় করলেন ঠাকুর। 'হ্যাঁ, নইলে তিনি অন্তর্যামী কেন?'

'তুমি তাঁর অচিন্ত্যশক্তির কি জানো?' এবার গিরিশ উঠল লাফিয়ে।

দুই সাধু বসে আছে গাছতলায়, সেখান দিয়ে নারদ চলেছেন বীণা বাজিয়ে। প্রভু, কোত্থেকে আসছেন, একজন জিগগেস করলে। বৈকুণ্ঠ থেকে আসছি বৈকুণ্ঠ থেকে? ভগবান সেখানে এখন কি করছেন দেখে এলেন? নারদ বললে, ছুঁচের ছ্যাঁদার মধ্য দিয়ে হাতী-উট এধার-ওধার করছেন। তা আর তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি! তিনি সব করতে পারেন। বললে এক সাধু। অন্য জন বললে, গাঁজাখুরি! ছুঁচের ছ্যাঁদায় হাতী-উট গলানো স্রেফ আষাঢ়ে গল্প। নারদকে বললে, আপনি কোনো কালে বৈকুণ্ঠে যাননি মশাই।

তিনি সূর্য-চন্দ্র করতে পারবেন, সৃষ্টি-প্রলয় করতে পারবেন, শুধু একটা মানুষের ছদ্মবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হতে পারবেন না! যেন ওটিই তাঁর হতে বারণ, আর যা তিনি হোন না করুন না। কিছু বাদ দিয়ে কিছু কেটে-ছেঁটে ছোট করে ঈশ্বরকে নেব কেন? তিনি যদি সব হতে পারেন অবতারও হতে পারবেন।

লেগে গেল তুমুল তর্ক।

শেষকালে ঠাকুর শান্তিবারি সেচন করলেন। বললেন, 'তিনি যদি দেখিয়ে দেন এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন তা হলে আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। যেমন অন্ধকারের মধ্যে দেশলাই ঘষতে-ঘষতে দপ করে আলো হয়। সেই রকম দপ করে আলো যদি তিনি জেলে দেন তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়, তা নইলে নয়।'

'ও ভাই হরিপদ, একটা গাড়ি ডেকে আন।' বলে উঠল গিরিশ, 'আমাকে এক্ষুণি থিয়েটারে যেতে হবে।'

'সে কি, এত রাতে?'

'উপায় নেই। কর্মবন্ধন।' গিরিশের মুখে কাতরতা ফুটে উঠল। 'এদিকে আপনি এখানে বসে, আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে থিয়েটার।'

ধিক্কার দেবার মতন ব্যাপার। কিন্তু ঠাকুর উদার প্রসন্নতায় বললেন, 'তা ঠিক আছে। এদিক-ওদিক দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজার মত। এ-দিক ও-দিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেক বার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই। ছুটি নিই ছোটাছুটি থেকে।'

'না, না, ও বেশ আছে।' ঠাকুর আবার অভয় দিলেন: 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।'

কিন্তু নরেনের সইল না। বিদ্রূপ করে উঠল। 'এদিকে বলছে ঈশ্বর, অবতার, আবার ওদিকে থিয়েটারে টানছে।'

'আমি কি করব, আমি পাপী, ঘোরতর পাপী—'

পাপী? এবার ঠাকুর উঠলেন হুঙ্কার দিয়ে। খবরদার, ও কথা মুখে আনবিনে। বারে-বারে পাপী-পাপী বললে পাপীই হয়ে যেতে হয়। বল আমি মায়ের ছেলে। মায়ের ছেলের আবার পাপ কি! সব ধূলো-কাদা মুছে যদি কোলে তুলে না নেবেন তবে আবার তিনি কেমন মা!

আমি পুরুষ। বীর্যস্বরূপের অনন্ত বীর্য আমার মধ্যে বর্তমান। আমি স্বস্বরূপবিশ্বাসী। আমি শৃগালের শিশু নই, আমি সিংহের কুমার। আমি অনন্ত শক্তির আধার, আমি দ্বিবাহু হয়েও বহুবাহু। বলো আমি দুর্বল নই, অধম নই, পাপী নই, দীন-হীন নই, আমি অকল্মষ, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির পুত্র। বারে-বারে এই মন্ত্র জপ করলেই ভগবৎশক্তি শঙ্খসর্প গর্জনে জেগে উঠবে। যে নিজেকে বলে ভীরু, কাপুরুষ, দাসত্বসেবী তার মুক্তি কোথায়? দৃঢ়ধন্বা অর্জুন হও, পাবে তবে সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণের বন্ধুত্ব।

'আজ ওই শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে, দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধূলায় শুতে। তোমার কোল যতই শুভ্র হোক, আর আমার সর্ব অঙ্গে যতই মালিন্য থাক, তুমি আমার মা, আমি জানি

তুমি আমাকে কোলে তুলে নেবেই নেবে। তোমার কোলের জন্যে যখন আমার আকুলতা জেগেছে তখন নেই আর আমার মালিন্য দৈন্য নেই আর আমার ধূলিশয্যা।

হে অর্জুন, তুমি মন্মনা হও, তা যদি না পারো মদ্ভক্ত হও। তাও যদি না পারো নিষ্কাম কর্মে পূজাপরায়ণ হও। তাও যদি না পারো নমস্কার করো আমার সর্বপ্রকাশিত বিশ্বরূপ। তাও যদি না পারো সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতে শরণ নাও। হে সাগরপারলিপ্সু, আমি তোমাকে পার করিয়ে দেব।

কিন্তু কি করে চিনব তোমাকে ?

আপন জন বলে অনুভব করো, চিনতে দেরী হবে না। প্রভু যে বেশেই আসুক কুকুর তাকে ঠিক চিনতে পারে। মেষশিশুকে যে খোঁয়াড়েই আটকে রাখুক, প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলেই সে উত্তর দেবে। ঠাকুর বললেন, 'যে হয় আপনজনা নয়নে তারে যায় গো চেনা।'

ঠাকুরের কাছে করজোড়ে বসেছে গিরিশ। বলছে, 'ভগবান, আমায় পবিত্রতা দাও। যাতে কখনো একটুও পাপচিন্তা না হয়।'

'তুমি পবিত্র তো আছ।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ।'

'আনন্দ ? আজ্ঞে না।' গিরিশ বললে কাতর স্বরে, 'মন বড় খারাপ। বড় অশান্তি। তাই তো ঠেসে মদ খেলুম।'

[ক্রমশঃ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হস্তাক্ষর

([illegible] লেখা চিঠি)

শ্রীপান্নালাল বসু

[পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী]

এক কালে এ প্রতিষ্ঠাবান মানুষটির নাম ছিল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে। শুধু বাঙ্গালা কেন, বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতি অনেক দূর। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার সুদক্ষ বিচারক শ্রীপান্নালাল বসু কার কাছে অপরিচিত? তাইতো দেখা গেল স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে তাঁর উপর যখন শিক্ষামন্ত্রীর গুরু দায়িত্ব ভার হলো অর্পিত, দেশবাসীর কাছে তিনি পেলেন সাদর সম্বর্দ্ধনা।

১৮৮১ সালের ৭ই অক্টোবর কলিকাতার আমহার্ষ্ট রোস্থিত সম্ভ্রান্ত বসু-পরিবারে শ্রীপান্নালালের জন্ম হয়। নিতান্ত বাল্য বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। কাজেই পিতার স্নেহ ও যত্ন পেয়েই তাঁকে বড় হ'তে হয়। পিতা ঠাকুরদাস বসুর কর্ম্মস্থল ছিল কলকাতার একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিস। সুকিয়া ষ্ট্রীটে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে স্কুল ছিল সেখানেই শ্রীবসুর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। এ স্কুল-বাড়ীটির অস্তিত্ব এখন অবিশ্যি নেই। সুকিয়া ষ্ট্রীটের স্কুলে পড়াশুনোর পর তিনি ভর্ত্তি হন শঙ্কর ঘোষ লেনে প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলেরই নতুন বাড়ীতে। এ সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভের সুযোগ ঘটে তাঁর। এ সম্পর্কে তাঁর কথাতেই— 'শঙ্কর ঘোষ লেনের নতুন স্কুল-বাড়ীতে পড়বার সময় বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখবার সৌভাগ্য আমি লাভ করি। তিনি চটি জুতো পায়ে দিয়ে স্কুল পরিক্রমণ করতেন। শিক্ষকেরা তাঁকে ভয়ের চক্ষে দেখতেন। ব্রজ বাবু নামে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন— যাঁকে সমস্ত স্কুল ভয় করতো। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁকে স্নেহ ভরে 'বেজা' বলে ডাকতেন। ছাত্রজীবনের এ সকল কথা আমার মনে আছে আজও বেশ স্পষ্ট।'

বাল্য বয়সেই আদর্শ শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শ পাওয়ায় শ্রীপান্নালালের জীবন নতুন আলোকে গড়ে উঠবার সুযোগ পেল। শিক্ষায় দীক্ষায় বড় হ'য়ে উঠবেন, তখন থেকেই তাঁর মনে জাগে এ প্রচণ্ড সঙ্কল্প। শুধু সঙ্কল্প নয়, একে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্ত চললো তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। শঙ্কর ঘোষ লেনের স্কুল ছেড়ে ১৮৯১ সালে তিনি ভর্ত্তি হ'লেন এসে ক্যালকাটা একাডেমীতে। তার পর তিনি চলে আসেন আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশনে। সে সময়ে স্বনামধন্ত রামদয়াল মজুমদার ছিলেন এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এ বিদ্যালয় থেকেই ১৮৯৬ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দু' বছর পর আর্য্য মিশন কলেজ থেকে তিনি উত্তীর্ণ হলেন এফ, এ পরীক্ষায়। এফ, এ পাশ করার পর তিনি কিছু কাল জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে পড়াশুনা করেন। ক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ও বি, এল পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হন।

শিক্ষাব্রতী হিসেবেই শ্রীপান্নালালের সাফল্যময় কর্ম্মজীবনের হয় সূত্রপাত। প্রথমে তিনি কলকাতার একটি ক্রিশ্চিয়ান কলেজে গ্রীক ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজে এবং কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষাব্রতীর জীবনের মাঝেই আইন ব্যবসার দিকে তাঁর ঝোঁক যায়। তিনি এক সময়ে জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছু কালের

পান্নালাল বসু

জন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশন তদন্ত কমিশনের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন।

শ্রীবসুর জীবনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি বরাবরই সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্যসেবী হিসেবে তাঁর খ্যাতিও নিশ্চয়ই কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর ইংরেজী অনুবাদ করে তিনি কবিগুরুর বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ইংলণ্ড থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শ্রীবসুর অনূদিত 'হাঙ্গরি ষ্টোনস্' ক্ষুধিত পাষাণ রচনাটি স্থান পেয়েছে যথাযোগ্য ভাবে। তিনি বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থিরূপে শ্রীপান্নালাল পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় তাঁকে আহ্বান জানালেন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত হ'লো পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের যৌথ দায়িত্ব। শিক্ষা-দপ্তরের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি পরে অবিশ্যি এ বিভাগটিই হাতে রাখলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব ভার বহন করে আসছেন সেই থেকে আজও পর্য্যন্ত। রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা যাতে উন্নততর ও ব্যাপক হয়, তজ্জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

হুমায়ুন কবির

(ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী
এবং কবি, সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ্)

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এই নীতি ও আদর্শের উপাসক যাঁরা, তাঁরাই জাতি-ধর্ম নির্ব্বিশেষে ও দল-নিরপেক্ষ ভাবে মানুষকে ভালবাসতে পারেন। ভারতে নানা ধর্ম-কর্মের অগণিত নর-নারীকে সমভাবে দেখার দর্শন যাঁরাই নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাই আজ দেশকে সত্যিকার ভালবাসেন,—তাঁদের হাতেই দেশের মঙ্গল সম্ভব।

দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে যে কয় জন নেতৃস্থানীয় উচ্চপদস্থ অহিন্দু আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে উপরের এই নীতি ও আদর্শকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে মেনে চলেন, হুমায়ুন কবির তাঁদেরই অন্যতম। একাধারে তিনি আদর্শবাদী কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাব্রতী ও আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন বিদগ্ধরসিক। জ্ঞানের দীপ্তি তাঁর চোখে-মুখে; কথাবার্ত্তা মধুর ও যুক্তিপূর্ণ। বিদ্যা যে বিনয় দান করে, হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে তা অনুভূত হয়।

হুমায়ুন কবির

সরকারী অফিসের ন্যায় দিল্লীর ক্লাইভ রোডে তাঁর আবাসও সারা ক্ষণ কর্ম্মব্যস্ত হয়ে থাকে শিক্ষা দপ্তরের আনুষঙ্গিক বিবিধ কাজে। অবসরের উজান ঠেলে ভারতকে জ্ঞানের গরিমায় মহান ক'রে তোলার জন্ত তিনি নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন। দেশের মূঢ় ম্লান মূখে ভাষা ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর চিন্তার অবধি নেই। বয়স্ক নিরক্ষরদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, বিনা ব্যয়ে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কি উপায়ে শিক্ষিত করে তোলা যায়,—শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি, দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি কি ভাবে সম্ভব, নানা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে রূপায়িত করার জন্ত তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহযোগিতা করে চলেছেন অনলসে।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি। এই সহানুভূতি-সম্পন্ন দৃষ্টির ফলেই আজ সাহিত্য একাডেমী, ফোক্ লিটেরেচার কমিটী প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে এবং সাহিত্যিকদের উৎসাহ বর্দ্ধনে ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে নানা সম্মান ও পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। কবির সাহেব নিজে সত্যিকার একজন দরদী সাহিত্যিক বলেই সম্ভবতঃ স্বাধীন দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি এদিকে তিনি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মনীষীরা নানা দিকে নানা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ভারতকে যে উন্নততর রূপদানে সচেষ্ট রয়েছেন, শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রণা-দপ্তরের উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী হুমায়ুন কবিরও তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছেন। এটি যে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রীতি ও বিদ্যোৎসাহী মনোভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

ব্যক্তিগত ভাবে জীবনে মিঃ কবির শিক্ষাকে সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে স্থান দিয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন বলেই আজ দেশের

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সর্ব্বক্ষেত্রে শিক্ষিত করে তোলার জন্ত তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই।

সত্যিকার কৃতী ছাত্র ছিলেন হুমায়ুন কবির। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক ও নানা পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৩১ সালে তিনি Exeter College Foundation Prize লাভ করেন। স্বদেশে ও বিদেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানা ভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদব্যতীত নানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসঙ্ঘ ও দেশহিতকর কার্য্যের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ ছিল। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই তিনি যেন বিভিন্ন কর্মপ্রেরণা ও সংগঠন শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র দলের নেতা ও অধ্যাপক হিসাবেও তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করেন বিদ্বজ্জন-সমাজে। কলিকাতা ও অক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছু কাল অধ্যাপনা করেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে হুমায়ুন কবির নিজ গুণে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির সম্পাদক ও জোয়েন্ট সোসাইটির সভাপতির আসন লাভ করেন। উক্ত সময় বিলেতে ভারতীয় তথা বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে এ সম্মান লাভের গৌরব আর কেউ-ই লাভ করেন নি। অক্সফোর্ডে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় লেখক ডি. এফ্. কারাকার ইংরেজীতে এক স্থানে লিখেছিলেন, "The power behind us all was Humayun Kabir—one of the greatesh products of modern Oxford. I remember Kabir that night at the Majlis dinner. Seldom have I seen anyone speak with such sincerity.. It was the soul of India that was pouring out of the mouth of Humayun Kabir—the soul of the new India, my India, his India, the India of those like us, who are young and unafraid. Revolt was the one word which emLLraced us all."

সক্রিয় ভাবে কিছু কাল ছাত্র-আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন হুমায়ুন কবির। কৃষক পার্টির নেতা হিসাবেই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের জন্তই হোক বা নেতৃত্বের উপযুক্ত শক্তিধর হিসাবেই হোক, ছাত্র মহলে কবির সাহেব এমনই প্রিয় হয়ে ওঠেন যে, সর্ব্বভারতীয় ষ্টুডেন্ট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ছাত্ররা তাঁকেই প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচন করেন।

ভারত গভর্ণমেন্টে যোগদানের অব্যবহিত পর থেকেই বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত হয়, এবং তিনি সেগুলি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। ১৯৪৬ সালে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডিসপিউট-এ বিচারক মণ্ডলীর সহায়করূপে তিনি কার্য্য করেন। ১৯৪৭ সালে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এনকোয়ারী কমিটিরও তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এর পরই বহির্ভারতে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে যেতে হয় ভারত গভর্ণমেন্টের নির্দ্দেশে। ১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোর তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহকারী নেতা হয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯৫৩ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেসন্সের সহঃ-সভাপতি এবং উক্ত সালেই নিউইয়র্কে এ্যাডভান্সমেন্ট অফ এডুকেশন ফণ্ড-এর পরামর্শ দাতা নিযুক্ত হন হুমায়ুন কবির।

বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কার্য্যের সঙ্গে ছাত্রাবস্থা থেকে এযাবৎ নানা ভাবে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হুমায়ুন কবিরের সাহিত্যিক জীবন গড়ে ওঠে—বয়ে চলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। যে কাব্য-সাহিত্যের প্রতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর অনুরাগ ছিল, সেই কাব্য-সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখা দেখা দেয় বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে। ১৯১৯-২০ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'পায়ের ধূলা' প্রকাশিত হয় 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়। এর পর থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর ভাবগভীর ও রসোত্তীর্ণ কবিতা ও নানা ধরণের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে, এবং এরই পরিণতিতে দেখা দেয় 'স্বপ্ন-সাধ', 'সাথী' কাব্যগ্রন্থ ও ক্যাণ্ট-এর দার্শনিক মতবাদের উপর 'ইমানুয়েল ক্যাণ্ট' নামক আলোচনা-গ্রন্থখানি। এর পর 'ধারাবাহিক,' 'Manads and Society কবিতা; 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যালোচনা'; 'মুসলীম রাজনীতি' 'বাংলার কাব্য' প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করে। তাঁর 'Men & River বইখানি ইংরেজী থেকে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'Our Heritage,' 'Three stories of Cabbages & Kings,' 'মার্কসবাদ' প্রভৃতি বইগুলিও তাঁর বিখ্যাত। 'নদী ও নারী' নামক একখানি বাংলা উপন্যাসও রচনা করেছেন হুমায়ুন কবির। ১৯৫০ সালে কলিকাতার একটি বিদেশী প্রকাশক প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এখনও যে অক্ষুণ্ণ আছে, তা প্রকাশ পায় 'চতুরঙ্গ' পরিচালনার মধ্যে দিয়ে। দীর্ঘ দিন এই উচ্চাঙ্গের ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকাখানির তিনি সম্পাদনা করে আসছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরণের ত্রৈমাসিক পত্রিকা আর নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর দার্শনিক মন ও সাহিত্য-কার্য্যের অন্যতম নিদর্শন ইংরেজীতে History of Philosophy Eastern & Western নামক দু' খণ্ডের বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে ধরা পড়ে। এই গ্রন্থের তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেন্ট এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে মনস্থ করেছেন।

১৯০৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হুমায়ুন কবির পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আমেদ। হুমায়ুন কবির কলিকাতায় আসেন ১৯২২ সালে এবং উক্ত বৎসরেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৩২ সালে কবির সাহেব বিবাহ করেন দেশকর্মী হিন্দু মহিলা শ্রীমতী শান্তি দাসকে। বিবাহের সমকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি দাসের নাম বিশেষ পরিচিত ছিল। এই বিদুষী মহিলাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বর্ত্তমানে শ্রীমতী কবিরও বহু জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ডক্টর নির্ম্মলকুমার সেন

[বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী]

কর্ম্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, এ দু'টি মূলধন নিয়েই যাত্রা করে-ছিলেন ইনি জীবনপথে। আজ আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি সাফল্যের সু-উচ্চ শিখরে—ডক্টর নির্ম্মলকুমার সেন শুধু একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতীই নয়, সর্ব্ব দিক থেকে তিনি একজন কৃতী পুরুষ। বাঙ্গালী-সমাজ তাঁকে পেয়ে এতখানি গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করছে সে কারণেই। আজ থেকে ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে ডক্টর নির্ম্মলকুমার জন্মগ্রহণ করেন তাঁর মাতুলালয়ে যশোহর জিলার হরিহর নগরে। ফরিদপুর জিলা-স্কুলে সুরু হয় তাঁর প্রারম্ভিক পড়াশুনো। সেখানে কিছু কাল থেকে তিনি চলে যান পাবনায় তাঁর জেঠা মশাইয়ের কাছে এবং পাবনা ইনষ্টিটিউশনে পড়বার জন্যে ভর্ত্তি হলেন। এ স্কুল থেকেই ১৯১৫ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে। দু' বছর পর পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ থেকে অনুরূপ কৃতিত্বের সঙ্গেই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সফলতা অর্জ্জন করেন। এর পর তিনি এলেন ঢাকা কলেজে এবং এখান থেকে রসায়ন শাস্ত্রে বি, এ অনার্স ও এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সকলের প্রশংসা-ভাজন হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সফলকাম হওয়ার পর ডক্টর সেন প্রবেশ করেন তাঁর ততোধিক সাফল্যমণ্ডিত বিরাট কর্ম্ম-জীবনে। প্রথমে তিনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের 'লেকচারার' হিসেবে নিযুক্ত হন। অপূর্ব্ব কর্ম্মদক্ষতা ও সৃজনী প্রতিভার বলে তিনি এ কলেজের রসায়ন-শাস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেন। তিনি এ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রায় তিন বছর।

ঢাকায় তিনি যখন অধ্যাপনার কাজ ক'রছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চলছিল রসায়ন-শাস্ত্রে নতুন ধরণের গবেষণা। এ গবেষণার ব্যাপারে তিনি প্রচুর সহায়তা লাভ করেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। ১৯৩১ সালে তাঁর সুচিন্তিত মৌলিক প্রবন্ধে মুগ্ধ হ'য়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, এস, সি ডিগ্রিতে ভূষিত করেন। এবং এর ফলে দেশে-বিদেশে সুধীসমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এখানেই ডক্টর নির্ম্মলকুমারের গবেষক মন কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হয়নি। আর সকল দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণা কার্য্যও চলে অবিশ্রান্ত ভাবে। ১৯৩৩ সালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী তাঁকে রসায়ন-শাস্ত্রে ইলিয়ট পুরস্কার দান ক'রে সম্মানিত করেন।

ডক্টর নির্ম্মলকুমার সেন

সুনামের সঙ্গে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের গুরু দায়িত্ব পালন করে ডক্টর নির্ম্মলকুমার চলে আসেন হুগলীর সরকারী কলেজে। এখানে এসেও শুধু রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকই নয়, এ বিভাগের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন বাঙ্গালা সরকারের রাসায়নিক উপদেষ্টা। এ সময়ে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এ কলেজ থেকেই ১৯৫২ সালে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন, শিক্ষাব্রতী হিসেবে অত্যন্ত সুনাম নিয়ে।

ডক্টর সেনের অটুট কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা লক্ষ্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেমিক্যাল সায়েন্সের উচ্চ গবেষণার জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন বিলেতে। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ-প্রাঙ্গণে অবস্থিত কেমিক্যাল বিজ্ঞান-গবেষণাগারে পরিচালকের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সিনিয়র কেমিকেল এগ্‌জামিনার'এর দায়িত্বও তখন থেকে তাঁর উপর অর্পিত হয়। সেই থেকে আজ অবধি তিনি ঐ দুটো পদেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং অপূর্ব কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন প্রতি ক্ষেত্রেই।

ডক্টর সেন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্ত্তা।

তিনি তাঁর গৌরবদীপ্ত জীবনে বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর গবেষণা প্রসূত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। তিনি গ্রেট-বৃটেনের রয়াল ইনষ্টিটিউট অফ কেমিষ্ট্রি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান-মন্দির এবং ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার ফেলো পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসেরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। ১৯৫২ সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসে তিনি একজন বিভাগীয় সেক্রেটারী ছিলেন। রাসায়নিক শাস্ত্রের দ্বাদশ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয় নিউইয়র্কে ১৯৫১ সালে।

ডক্টর নির্ম্মলকুমারের জীবনধারার আর একটি দিক হ'লো খেলা-ধূলো ও গান-বাজনার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ক্রিকেট খেলাটি তাঁর একটা 'হবি'র সমতুল্য। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ক্রিকেট টিমগুলির অধিনায়কত্ব ক'রে এসেছেন। শিক্ষা ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে গান-বাজনা, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে তাঁকে বরাবর। ভারতীয় সঙ্গীতকলায় তিনি বিশেষ পারদর্শী।

ডক্টর সেনের কাছাকাছি গিয়ে অবাক হতে হয় তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্য দেখে। এত বড় গবেষক ও পণ্ডিত তিনি, অথচ তাঁর ভেতর এতটুকু অহঙ্কার বা আভিজাত্য বোধের ছাপ নেই। সত্যিই তিনি একজন আদর্শ পুরুষ—যাঁর কাছ থেকে দেশ ও জাতির এখনও অনেক শিখবার ও পাওয়ার রয়েছে।

শ্রীঅন্নদা মুন্সী

[ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন-শিল্পী]

সত্যিকারের প্রতিভা যদি থাকে এবং সে সঙ্গে নিষ্ঠা ও উত্তমের যদি হ'লো সংমিশ্রণ, তবে সে লোকের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন-শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সীকে আমরা যখন দেখি তখন বার বার এ কথাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কতটুকু বা ছিল তাঁর আর্থিক সম্বল অথচ শিল্প-প্রতিভা নিয়ে তিনি যখন এগিয়ে এলেন সাধকের মত, তখন দেখা গেল তাঁর অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। সমগ্র ভারতে বিজ্ঞাপন-শিল্প জগতে আজ তাই তিনি একজন পথপ্রদর্শকই নয়, ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর আসন অনেক উচ্চে।

১৯০৬ সালে যশোহর জিলায় শ্রীমুন্সী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীঅনুকূলচরণ মুন্সী একজন বিখ্যাত ঝিনুকশিল্পী। বহু কাল থেকেই তাঁর নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। বাল্য-কাল থেকেই অন্নদা বাবুর শিল্পের প্রতি একটা অসাধারণ দরদ ও অনুরাগ ছিল। এ ব্যাপারে পুত্রের উপর পিতার স্বাভাবিক প্রভাব অনেকখানি পড়ে থাকবে। প্রথমে তিনি পড়াশুনো করেন যশোহরের নাকোল হাই স্কুলে। তার পর পাবনা জিলার লাহিড়ী মোহনপুর হাই স্কুলে শ্রীমুন্সী ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

পড়াশুনোর মাঝেও শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন শ্রীমুন্সীর বরাবরই ছিল। তাই দেখা গেল, প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ১৯২৫ সালে কলকাতায় এসেই সরাসরি ভর্ত্তি হ'লেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। এখানে তিনি এক বছর কাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর নানা সাংসারিক কারণে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাঁর তখনই। তিনি ক'লকাতায় "আর্মি এণ্ড নেভি ষ্টোর্স" এ বিজ্ঞাপন-শিল্পী হিসেবে একটি কাজ গ্রহণ ক'রলেন। তাঁর শিল্পদক্ষতা দেখে 'আর্মি এণ্ড নেভি ষ্টোর্স'এর তৎকালীন অধিকর্ত্তা মিঃ সি. এফ. গোল্ডিং অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তিনি যখন বোম্বাই অফিসে বদলি হয়ে যান, তখন শ্রীমুন্সীকেও সাগ্রহে নিয়ে যান সেখানে। সেখানে গিয়ে শ্রীমুন্সীর কাজের সুযোগ অনেক বেড়ে যায় এবং তাঁর সুনাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

শ্রীমুন্সীর কর্ম্মজীবনে একটির পর একটি উন্নতির সুযোগ মিলে যেতে লাগলো। 'আর্মি এণ্ড নেভি ষ্টোর্স'এর বোম্বাই অফিসে দেড় বছর কাটিয়ে তিনি যোগদান করলেন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে। এখান থেকে তিনি চলে যান 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রের অফিসে। এ সময়েই মিঃ চার্লস মুর হাউস ও মিঃ টেচেলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ ঘটে তাঁর এবং প্রায় ৪ বছর তাঁদের কাছাকাছি থেকে বিজ্ঞাপন-শিল্পে আরও পারদর্শিতা লাভ করেন। এর ভেতর মিঃ টেচেল ছিলেন এক হিসেবে তাঁর শিক্ষাগুরু। মিঃ টেচেল বোম্বাই ছেড়ে যখন কলকাতায় চলে আসেন, ডি, জে, কিমার (বিখ্যাত বিজ্ঞাপন প্রচার সংস্থা) সে সময় শ্রীমুন্সীকেও তিনি এখানে নিয়ে আসেন তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি লক্ষ্য করে। দীর্ঘ ১১ বছর কাল শ্রীমুন্সী ডি, জে, কিমারে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। তার পর মনের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সেখানে আর তাঁর কাজ করা হ'লো না। তখনকার তাঁর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন—ডি, জে, কিমারে আমি প্রায় ১১ বছর ছিলুম। কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর থেকেই আমার মনের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কার্সিয়াংএ থাকবার সময়েই আমি ডি, জে, কিমারের চাকুরি ছেড়ে দিই। তখন থেকে আমার মন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত আমার এ মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন।

১৯৪৭ সাল থেকে শ্রীমুন্সী করে চলেছেন স্বাধীন ব্যবসা। তবে বিজ্ঞাপন-শিল্পী হিসেবে তিনি এখনও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তাঁর বহু প্রতিভাবান ছাত্র রয়েছেন যাঁরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। কত ছাত্রকে তিনি বিজ্ঞাপন-শিল্প শিক্ষা দিচ্ছেন কোনরূপ পারিশ্রমিক না নিয়েই। বিজ্ঞাপন-শিল্পের উন্নতির জন্যে তাঁর অসীম দরদ রয়েছে বলেই তিনি এমনটি করছেন। উপযুক্ত ছাত্র পেলে তাদের নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন-শিল্প শিক্ষায়তন খোলার পরিকল্পনাও তাঁর আছে।

শ্রীমুন্সীর আর একটি জীবন রয়েছে—যাকে বলা চলে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। সঙ্গীতের উপরও তাঁর অনুরাগ অসামান্য। 'বেহালা' ও 'পিয়ানো' তাঁর প্রাণের জিনিস। সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তিনি ব্যাকুল। অবসর সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে কালী-কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। মাসিক বসুমতীর তিনি একজন বিদগ্ধ সমঝদার ও শিল্পকর।

শ্রীঅন্নদা মুন্সী

উদয়ভানু

বীণানিন্দিত মধুর স্বরে মৃদু-মৃদু সঙ্গীত, না শুধুই কথা! দৈববাণী না সত্যিই কোন পুরনারীর সুমিষ্ট কণ্ঠ! আকাশের বিদ্যুতের মত ক্ষণেক দেখা দিয়ে যিনি অন্তর্হিতা হ'লেন তিনি কে? চাঁপাফুলের মত গাত্রবর্ণ, অথচ সে-অঙ্গ নিরাভরণ। ঘন-কালো কুঞ্চিত অলক-কেশ বন্ধনহীন। সুদীর্ঘ, চঞ্চল, আবেশময় চোখে কজ্জলপ্রভার কোন' চিহ্ন নেই। প্রগলভ-যৌবনা স্বভাবতই অহঙ্কারী হয়, কিন্তু দর্শনদানের সঙ্গে সঙ্গে যে-সুন্দরী অদৃশ্যা হ'লেন, তিনি যেন কোমলা, স্নেহময়ী, বর্ষার আকাশের মত যেন সিক্তশীতলা। ঐ রূপবতীর দেহায়তন এখনও যেন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত নয়। মুখাবয়বে বালিকাভাব প্রচ্ছন্ন। প্রশান্ত মাধুর্য্য যেন সেই অতুলনীয় রূপে। ললাটতলের ভ্রূ-যুগ অতি সূক্ষ্ম ও নিবিড় কালো; যেন চিত্রাঙ্কিত। চোখের দৃষ্টি যেন শান্তজ্যোতিঃ। এ সৌন্দর্য্যপ্রভায় কারও মন প্রদীপ্ত হয় না। আগুনের মত দগ্ধ করে না; অর্দ্ধস্ফুট পদ্মের মত শুধু আকৃষ্ট করে। দাহিকা নেই, আছে শুধু মধুগন্ধ। হর্ষবিকসিত রক্তিম অধরে অস্ফুট মিষ্টি হাসি যেন।

মিষ্টি হাসিতে দৃষ্টি ধায়। কথা বলতে বলতে মুখ টিপে টিপে যেন অসংবৃত হাসি হেসেছিলেন রাজকুমারী। ব্রাহ্মণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়। অন্য আর কিছু চোখে পড়ে না, ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথে কেবল সেই অদৃশ্যপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী। কর্ণকুহরে যেন সঙ্গীত-সুধা! চঞ্চল মন।

তুর্কীনাচন নাচতে নাচতে ফিরে আসে পরিচারিকা। তুরঙ্গের ঘোড়ার মত তার চালচলন। জমিদার-নন্দিনীর কথা আর দেখা দেওয়ায় অখুশী হয়েছে যশোদা। অজ্ঞাত-কুলশীল একজনের সমুখে ঘরের বৌ দেখা দিয়েছে, মন থেকে পছন্দ করতে পারেনি সে আদপেই!

—কি গো ঠাকুর, দেখে যে চোখ দু'টো ঠিকরে বেইরে আসছে!

পরিচারিকার কথায় তাচ্ছিল্যভরা বিদ্রূপ। চোখে কটাক্ষ। তুর্কীনাচন নাচতে নাচতে আসে আর বলে। হাতে তার কচুপাতায় ফুল-তুলসী।

আসমানের ঘাটের এক পৈঠায় স্তব্ধ হয়ে ব'সেছিলেন ব্রাহ্মণ। কোদাল-কাটা আকাশে চোখ তুলে নিশ্চিন্তচিত্তে কি যেন চিন্তা করেন। ব্রাহ্মণকে নিরুত্তর থাকতে দেখে পরিচারিকা আবার বললে,—আগে জানলে কে রাখতো তোমার শালগ্রামের নুড়ি! এখন হাত-পা ধুয়ে এসো আমার সনে, ভাবনা পরে ভেবো'খন।

—কুত্র? কোথায়?

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করেন গম্ভীর স্বরে। দুই ভুরু বক্র হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন কৌতূহল নেই, আছে শুধু বিস্ময়।

কৃত্রিম ও শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—ভয় নেই, যমের দক্ষিণ-দুয়োরে নয়। তোমার নারায়ণ যে পূজো পায়নি এখনও!

ঈষৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ। তবুও ঘাটের পৈঠা ত্যাগ ক'রে গাত্রোত্থান করলেন। আসমানের সবুজ-কালো জলে নেমে গা ধৌত করলেন। বললেন,—তোমাকে দাসী মনে হয়, তুমি কে, তাই শুনি?

—আমি? আমি আর কে! পরিচারিকার কথা যেন হতাশ-করুণ। বলে,—তোমার অনুমানই ঠিক। আমি দাসী-বাঁদী ছাড়া আর কি! তবে অশূদ্দুর, বামুনের মেয়ে।

ভিজে পায়ের ছাপ পড়ছে ঘাটের শুষ্ক-মলিন ধাপে। ঘাটের চাতালে উঠে ব্রাহ্মণ বললেন,—আর একজন, তিনি কে? মনে তো হয় কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া! এই ভগ্নপ্রাসাদেই বা কেন?

যশোদার চোখে ফুটলো রোষদৃষ্টি। মুখভঙ্গী যেন বিকৃত হয়। বলে,—গপ্পগাছার ফুরসৎ নেই অত! জমিদার

কেষ্টরামের ইস্ত্রী উনি, আর কিছু জানি না। জেনেও বলবো নি।

—জমিদার কৃষ্ণরাম!

কথা ক'টি স্বগত করলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর মনে যেন কিছু পুরানো স্মৃতি জাগরুক হয়। প্রশস্ত ললাটে স্মরণরেখা দেখা দেয়।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকা অগ্রসর হয় গৃহাভ্যন্তরের পথে। তার সশব্দ পদক্ষেপ বিলীয়মান।

কয়েক পল অতীত হয়ে যায়, খেয়াল থাকে না ব্রাহ্মণের। অতীতের চিত্র তাঁর চোখে। ভুলে-যাওয়া দিনের ছবি। পরিচারিকাকে আগুয়ান দেখে অগত্যা ব্রাহ্মণও সেই পথে চললেন। অস্ফুট উচ্চারণে কি এক মন্ত্র আওড়াতে থাকেন আর দ্রুত পদে এগিয়ে চলেন। বলেন,—ওঁ প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং ...... বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং...শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং, ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ কুলকুণ্ডলিনী-ধ্যানের মন্ত্র বলেন। প্রথম সন্ধ্যায় কুলকুণ্ডলিনী চিন্তা ও উত্থাপন করতে সচেষ্ট হন। দীঘির জলে নেমে পঞ্চশুদ্ধির মন্ত্র বলা আগেই শেষ হয়েছে—আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেহশুদ্ধির মন্ত্র। মাধবীলতার শাখা থেকে ছিন্ন করেছেন সুগন্ধ মাধবীর একটি গুচ্ছ। হাতের ফুল হাতে থাকে না। ঘাটের দ্বারপ্রান্তে অর্ঘ্যদান করেন কা'কে যেন। দ্বারশুদ্ধির মন্ত্র বলেন আর দ্বারদেবতাকে পুষ্পার্ঘ্য দেন। দ্বারপূজার পর গৃহপ্রবেশ করবেন, এই বাসনায়।

পথ রোধ হয়ে যায় সহসা। কোষমুক্ত বাঁকা তরোয়াল সমুখে উদ্যত। মেঘলা-দিনের অল্প-আলো, তবুও তরবারির চাকচিক্য মিলায় না। ব্রাহ্মণ দেখলেন এক বর্মধারী প্রহরী। অস্ত্রাঘাত নিবারণের জন্য সাঁজোয়ার অঙ্গাবরণ। প্রহরীর মুখ দেখা যায় না, লৌহশিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত। হাতের অস্ত্র স্থির, অকম্প।

প্রহরী কথা বলে খাঁটি উর্দ্দু। যা বলে, তার অর্থ বোধগম্য হয় ব্রাহ্মণের। কিঞ্চিৎ দক্ষতা আছে তাঁর নবাবী ভাষায়। এখন মহম্মদীয় জয়ধ্বজা উড়ছে বঙ্গদেশে, একটু-আধটু ফার্সী না জানলে চলে না।

প্রহরী বলে,—পরিচয় ব্যক্ত কর অচিরাৎ, নতুবা সমুচিত শাস্তি আছে বরাতে। এখানে আগমনের হেতুই বা কি?

ব্রাহ্মণও নিষ্কম্প। তাঁর বক্ষ উন্নত। উঁচানো তরোয়াল বুকের কাছে, তবুও সহাস মুখ। ভয়লেশহীন চক্ষু। কিন্তু বাক্য নেই মুখে।

প্রহরীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। আবার বলে,—নীরব কেন, তুমি কি বধির না মূক? উত্তর দানে অধিক বিলম্ব হয়তো তরোয়াল আর স্থির থাকবে না।

প্রশ্ন শুনে ঈষৎ হেসে ব্রাহ্মণ বললেন,—সেখজী, পাগলের গো-বধে আনন্দ হয়, তুমি যদি ব্রাহ্মণ-বধে খুশী হও তো নিশ্চিন্তায় অস্ত্রচালনা করতে পারো, আমি বাধা দিব না। তবে আমি তস্কর নই। আমি দোষমুক্ত।

অনেক দূরের কোন এক গবাক্ষ থেকে কে যেন এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে শিউরে শিউরে ওঠে!

প্রহরী আবার রুষ্ট কণ্ঠে বলে,—এখানে কেন তাই বল, কথার বেয়াদপি শিকেয় তুলে রাখো।

ব্রাহ্মণ ইদিক-সিদিক দেখেন ব্যগ্র চোখে। কোথায় গেল পরিচারিকা! কা কস্য পরিবেদনা, কেউ কোথাও নেই।

আকাশে মেঘ ডাকছে। গুমোট আবহাওয়া কেঁপে কেঁপে ওঠে অস্ফুট মেঘগর্জ্জনে। বাতাস থমকে আছে। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত অনড়, অটল।

পরিচারিকার কথা ভেসে আসে কোথা থেকে। কোন দ্বারপ্রান্ত থেকে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসন্ন দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে কোথায় আত্মগোপন করেছে যশোদা। কথা বলছে ভয়ে ভয়ে! বলে,—প্রহরী, অস্ত্র নামাও! বৌঠাকরুণ হুকুম করেছেন, নারায়ণের পুজো করবেন ঐ ঠাকুর মশাই।

তবুও অস্ত্র নামে না। কোষমুক্ত তরবারি যেমনকার তেমনি উঁচিয়ে থাকে প্রহরী। জলদগম্ভীর কণ্ঠ প্রহরীর, —হুজুরের হুকুম নেই। জমিদারের জমাদার আমি, শেষে কি খামকা আমার গর্দ্দানটা যাবে!

—সেখজী! যে নিরস্ত্র ও নিরপরাধী তাকে আক্রমণ করা বীরোচিত কাজ নয়। কার আকুল অনুরোধ শুনে প্রহরী ফিরে দেখলো। তার দুই চোখ থেকে যেন অগ্নি স্ফুরিত হয়! বিনা ব্যবহারে একেই তরবারিতে মরিচা পড়েছে। হাতের নাগালে শিকার পেয়ে প্রহরী যেন তাই হিংস্র ও রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে। মুষ্টিবদ্ধ অস্ত্র যে নামে না!

দুই বিশাল চক্ষুর কটাক্ষ-সন্ধান, এই প্রথম দেখেছে পাঠান প্রহরী। অন্দরের গভীর ছায়ান্ধকারে যে তন্বী দণ্ডায়মানা, তার অপরূপ রূপরাশি এই প্রথমে দেখলো প্রহরী। সৌন্দর্য্য-প্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত হয়। সুন্দরীর স্থির ধীর শুভ্র-কোমল মূর্ত্তি কেন কে জানে, প্রহরীর হৃদয়মাঝে যেন বিষধর দন্তের দংশন-জ্বালা জাগিয়ে তোলে। প্রহরীর ভঙ্গী-ভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়। প্রবল পাঠান ওষধির গুণে যেন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হাতের অস্ত্র নামতে থাকে ধীরে ধীরে।

—পাঠান জাতির মুখে কলঙ্ক দিতে চাও? জাত-পাঠান সম্মুখ-সংগ্রাম ছাড়া অস্ত্র ধরে না।

অন্দরের ছায়ান্ধকার কাঁপিয়ে দীপ্তকণ্ঠে কথা বলে সেই নারীমূর্ত্তি। প্রহরী চিত্রার্পিত পুতুলের মত নিস্পন্দ। বিহ্বল ও হতবুদ্ধি। বাক্যহীন জড় যেন। তার স্থিরদৃষ্টি আর ফিরে না। ঐ চাঁদমুখে কত শোভা! জ্যোৎস্নার ঝিলিক প্রতি অঙ্গে।

—একজন পূজারীর প্রয়োজন আছে। নারায়ণকে বিনি পূজায় রাখা হিন্দুর চরম পাপ। তাই ঐ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়েছি আর কেউ নয়, আমি।

সুন্দরীকে দেখে কার না চিত্তচাঞ্চল্য আসে? সুন্দরীর কথায় কে না মুগ্ধ হয়? যে না হয় সে বনচারী পশু, কিংবা হিমালয়-গুহাবাসী সন্ন্যাসী। পাঠান তো ছার!

তরোয়াল কোমে রেখে প্রহরী পর পর এক শত সেলাম ঠুকলো আনতভঙ্গীতে। যুক্তকরে বললে,—মাফ করুন বেগমসাহেবা! আমি আন্দাজ করেছি এক বদজাত, খিড়কি পেরিয়ে এমারতের অন্দরে ঢুকছে বদ মতলবে। দৌলত লুঠতে এসেছে!

জমিদারনন্দিনীকে এই প্রথম দেখলো প্রহরী, চোখের সমুখে। দেখে আর চোখ ফেরে না।

—চিন্তার কোন কারণ নেই। বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, আকপাল গুণ্ঠন টেনে। বললেন,—তুমি তোমার ডেরায় যাও। অন্দরে আর আসিও না।

ব্রাহ্মণ নিশ্চুপ, স্মিত হাস্যরেখা তাঁর ভয়হীন মুখে। নীরব দর্শক যেন। পাঠান কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয় জমিদারণীর আদেশ-বাক্যে। অপমান বোধ করে। ব্যঙ্গের সুরে বলে,—বেগমসাহেবা, কাজী হয় পাজী, পাজী হয় কাজী! আর বামুন গণক কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।

ব্রাহ্মণ যেন বিচলিত হন এ কথায়। তবুও হাসির রেখা মিলায় না মুখ থেকে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ যেন কালিমা-প্রাপ্ত হয় প্রহরীর উদ্ধত কথায়। হাতের মুঠি দৃঢ়। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে কর্ণমূল। বললেন,—আর কথায় কাজ নাই, তুমি বিদায় লও এখন।

সেলাম ঠুকে, আগন্তুকের প্রতি একবার রোষদৃষ্টি হেনে প্রহরী স্থান ত্যাগ করলো। বর্মধারীর সাঁজোয়া পোষাকের সঙ্গে তরবারি-কোষের ঘর্ষণে শব্দ ওঠে ঘন ঘন।

ব্রাহ্মণ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন, আবার অদৃশ্য হয়েছে সেই নারীমূর্তি। আছে শুধু পরিচারিকা। ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। মুক্ত তরবারি দেখে ভয় পেয়ে হয়তো কাঁপছে ঠক-ঠক।

—চল' ঠাকুর চল'। প্রহরী ফের যদি এসে হাজির হয়! যশোদা কথা বলে ভয়ার্ত কণ্ঠে। বিস্ফারিত চোখ তার। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে ভয়ে ভয়ে। আবার যদি হঠাৎ কোথাও থেকে নাকের ডগায় এগিয়ে আসে ধারালো তরোয়াল!

বাইরে মেঘের গর্জন না গাছ কাটছে কাঠুরিয়া? ভোরের থমকানো ঠাণ্ডা হাওয়া শিউরে শিউরে ওঠে বিকট শব্দে। কাঁধে কুড়ুল চাপিয়ে বন কাটতে বেরিয়েছিল কাঠুরিয়া। বন কেটে কেটে যেন পরখ করবে কুড়ুলের কত ধার! তীক্ষ্ণধার কুঠারের আঘাতে আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে গাছের শাখা-প্রশাখা। গাছের আর্তনাদ না মেঘের ডাক, অনুমানে বোঝা যায় না অন্দরের পথ থেকে।

ভগ্নপ্রাসাদে আছে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ। পরিত্যক্ত, অপরিচ্ছন্ন। কত দিন ঝাঁট পড়েনি কে বলবে? কোন কক্ষ অন্ধকারময়, কোন কক্ষের বাতায়ন অর্গলহীন, তাই আলোকপূর্ণ। কাঠের কবাটে ঘুণ ধরেছে। ঘরে ঘরে আরশুলা আর চামচিকার বাসা। কোন কক্ষে শূন্য কলসী, ভগ্নপাত্র, ছিন্নবস্ত্র! কোথাও বা মরা-বেড়ালের দাঁত-খিঁচানো খুলি। পায়রার পাখনা! ছেঁড়া চাটাই! বঁটি, ঝাঁটা। কয়লা ময়লা। সাপের খোলস।

একদা বসতি ছিল, আজই না হয় শূন্য। কেউ সিঁদোয় না। ঘরের দেওয়ালের চুণ-বালি খ'সে পড়েছে। কাঠের কড়ি-বরগায় উই। ফুটো ছাদ, আকাশ দেখা যায়।

আসমানের সংসার ছিল এই আলয়ে। জমিদার কৃষ্ণরামের মুসলমানী পত্নী না উপপত্নী, আসমানীর সাজানো ঘর-দোর আজ ভগ্নপ্রায়। রূপসী আসমানীর কাণে হরিনাম শুনিয়ে তাকে জাতে তুলেছিলেন কৃষ্ণরাম। আমোদরের তীরে এই বিশাল গৃহে আসমানীকে রেখেছিলেন সুখসম্পদের মাঝে। কে যেন হত্যা করেছিল আসমানীকে! কোন্ এক গভীর রজনীতে পাওয়া আর না পাওয়ার খেলায় জান হারিয়েছে সে।

—বৌ!

শঙ্কিত কথার সুর যশোদার। এখনও যেন বুক ধুকপুক করছে। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, পলক পড়ছে না। বললে,—বৌ! খুন-জখম করবে না তো প্রহরী?

সলজ্জায় গুণ্ঠন টানলেন রাজকুমারী। নৈবেদ্য রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন এক কক্ষমধ্যে। চাল ধৌত করছিলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন,—না, ভয় নাই।

কক্ষ প্রায় অন্ধকার। তবু অন্যান্যের তুলনায় তত ধূলিধূসর নয়, হয়তো সদ্য-পরিষ্কৃত। পিতলের পিলসুজে দীপ জ্বলছে। দীপালোকে কক্ষাভ্যন্তর অস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় বাহির থেকে।

পরিচারিকা বললে,—পুজোর জোগাড় কত দূর? আমি তো ভয়েই মরি। কাজের জোগান দেবো কোথায়, হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁদিয়েছে যেন।

—জোগাড় প্রায় শেষ। ফিস্-ফিস বললেন রাজকন্যা। নৈবেদ্যর পাত্রে চালের চূড়ো গড়তে গড়তে বললেন।

—ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করছে যে!

কথা বলতে বলতে দ্বারপ্রান্তে ব'সে পড়লো যশোদা।

আরও কিঞ্চিৎ গুণ্ঠন টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখ ফিরিয়ে দেখতে মন চাইলেও ফিরে যেন তাকানো যায় না।

একটি বার দৃষ্টিপথে আসায় কক্ষমধ্যে চোখ পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ব্রাহ্মণ। পরনারী, পুরবাসিনী, অসূর্য্যম্পশ্যা, দর্শনেও পাপের সঞ্চয়। তদুপরি এক দৈবকার্য্যে রত। দীপের আলোয়

দেখা যায় কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে বসুধারার ফোঁটা। শুধু সিঁদুর আর ঘৃতের ধারা। বসুধারার সারি। কে কবে হয়তো শুভ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে, তারই চিহ্ন আঁকা রয়েছে। কোন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গৃহভিত্তিতে কে এঁকেছে বসুধারা।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে হয়। গুণ্ঠন টানতে হয় ঘন ঘন। প্রহরী তরোয়াল দেখিয়ে বাধা দিয়েছে, অকথা-কুকথা শুনিয়েছে,—এ লজ্জা যেন আর গোপন থাকে না। বিন্ধ্যবাসিনীর নারী-মন সঙ্কোচে জর্জর।

ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ লক্ষ্য করেছেন, এক শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত বেদীমূলে নৈবেদ্য রচনায় রত সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অধিকারিণী। দীপের আলোয় চোখে পড়ে সাবগুণ্ঠনা রমণীর শুভ্র বাহু আর চিবুক মাত্র। মূর্তির পিছনে রুক্ষ কেশের রাশি, ভূমি স্পর্শ করেছে।

কেন কে জানে, মনে হয়, আর কখনও এমন অলৌকিক রূপরাশি হয়তো দেখা যাবে না! আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রকোষ্ঠমধ্যে আরেক বার দৃক্‌পাত করতেই দেখা যায়, কক্ষ শূন্য। দীপের উজ্জ্বল শিখা নিথর হয়ে আছে। প্রস্তরবেদীতে এক খণ্ড লাল চেলী। চেলীতে ফুলের স্তূপমধ্যে কৃষ্ণমূর্তি শিলা। বেদীমূলে পূজার উপকরণ শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-নৈবেদ্য, সধূম-ধুনুচি।

কক্ষস্থ অন্য এক দ্বার খুলে কোন্ পথে কখন নীরবে বেরিয়ে গেছেন রাজকুমারী। অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ সরিয়ে অনিমেষ চক্ষুতে দ্বারপ্রান্তে দেখেছেন একবার।

ব্রাহ্মণ হতাশ-শ্বাস ফেললেন। দেখলেন, পূজার সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। শুধু সেই অলৌকিক রূপরাশি আর দেখা যায় না।

নিবু-নিবু দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলে আবার ধীরে ধীরে জ্বলে। তাপদগ্ধ শুষ্কশাখা বর্ষাধারায় আবার পল্লবিত হয়। এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে বিন্ধ্যবাসিনীও যেন পুনর্জ্জীবন পেয়েছেন।

কেবল ঐ দুর্মুখ প্রহরী যদি না তরোয়াল উঁচিয়ে কটু-কাটব্য ক'রতো। কি লজ্জা, কি লজ্জা!

দ্বারে ছিল পরিচারিকা। নীরবতা ভঙ্গ করলো হঠাৎ কথায়। বললে,—যাও গো ঠাকুর, পুজোটা চুকিয়ে দাও।

কেমন যেন ইতস্ততঃ ভাব ব্রাহ্মণের। অপরিচয়ের সঙ্কোচ। কি যেন চিন্তা করেন মনে মনে, মুখভাবে অসম্মতি যেন।

মৃত্যুকে ভয় নেই। তবুও মরণে আপত্তি আছে। অপঘাতে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত নয়। ঘোর দুশ্চিন্তার ছায়া ব্রাহ্মণের চোখে-মুখে। কক্ষে প্রবেশ করতে যেন পা চলে না, মনের দ্বিধায়। আকাশে চোখ তুললেন ব্রাহ্মণ। কালো মেঘ আকাশে। আগ্নেয়গিরির কালো ধোঁয়ার মত বিস্তীর্ণ ও বৃহৎ একখানি মেঘ। আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক জুড়ে উড়ে আসছে মন্থরগতিতে। কালো মেঘ দেখে ব্রাহ্মণ যেন আরও বেশী ভাবিত হন। আজ না হয় পূজাটা সেরে দেওয়া যাবে, কিন্তু প্রতিদিন কে আসে পূজা করতে। ব্রাহ্মণ মৃত্যুভয়হীন, কিন্তু গুপ্তশত্রুর হাতে মরণ বরণ করতে পরাঙ্মুখ। প্রতিদিন গমনাগমনে একদিন না একদিন দৃষ্টি পড়বে ঐ সঙ্ঘারামের বৌদ্ধতান্ত্রিকদের।

আমোদরের তীরে আছে এক বৌদ্ধ-মঠ। বিশাল অশ্বত্থের ছায়ায় লুকানো। মঠের চূড়া নজরে পড়ে না ঐ মহীরুহের অন্তরাল থেকে। অন্ধকার রাত্রে, শুধু দেখা যায় মঠের আলো। কষ্টির মূর্তি আছে মঠে। তপস্যাক্লিষ্ট, শীর্ণ বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধতন্ত্রমতে পূজা হয় মঠে। নির্ব্বাণ-দীপ জ্বলে, রাত্রির আঁধারে সেই আলোক-পরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন ও উজ্জ্বলতর হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পূজা ও ধ্যান করেন। মঠের চতুর্দ্দিকে নরকপালের ছড়াছড়ি। মঠাভ্যন্তরের দেওয়ালগাত্রে আছে নানা ধরণের শাণিত অস্ত্র। খড়্গ, কৃপাণ, তরবারি, তীর, ধনুক। সম্রাট বুদ্ধের অহিংস বাণী বিস্মৃত হয়েছে তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীর দল। বিধর্মী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের নিস্তার নেই এই সঙ্ঘারামের সন্ন্যাসীদের হাতে। উচ্চনীচ জাতিধর্ম্মের ভিন্নতা রক্ষা করে ব্রহ্মধর্ম্মাবলম্বীরা। বুদ্ধ অবতারকে হয়তো অমান্য করে। তাই কোন' ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে এই অহিংস পথের যাত্রীরা। শাণিত অস্ত্র সাহায্যে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে। মৃতের দেহ বন্য শৃগাল-কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করে।

শঙ্কায় নিরস্ত থাকা পুরুষোচিত নয়। এই ভেবে ব্রাহ্মণ সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বেদীমূলের কুশাসনে আসীন হ'লেন। মৃদু-মন্দ কণ্ঠে বলেন,—ওঁ তৎসৎ। আরও কি যেন বলেন, অন্যান্য মন্ত্র অশ্রুত থাকে।

মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে আচমনের রীতিতে ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করেন। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা মুক্ত রেখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা সংহত ও ঊর্দ্ধমুখ করলেন। করতল সঙ্কুচিত হয়, হাতে ব্রাহ্মতীর্থ রচিত হয়। অঙ্গুষ্ঠ-মূলের নিকটে যাতে একটিমাত্র মাষকলাই নিমগ্ন হয়, সেই পরিমিত জল ধারণ করেন।

—মহাশয়ের নাম?

বামাকণ্ঠের বাণী। এক দ্বারের কাষ্ঠের কবাট ঈষৎ মুক্ত করে কথা বললেন কে যেন। কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট।

ইতি-উতি দেখলেন ব্রাহ্মণ। কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু প্রশ্নকারিণীকে দেখা গেল না। ব্রাহ্মণের চক্ষু ফিরতেই ঈষৎ মুক্ত কবাট বন্ধ হয়ে গেছে। কে-ই বা প্রশ্ন করে, কা'কেই বা উত্তর দেওয়া যায়? ব্রাহ্মণ আচমনের জল মুখে তুলবেন, আবার সেই বামাকণ্ঠ। কথার সুরে যেন কৌতূহলী হাসি।

—পরিচয় দানে বাধা আছে কি? আমা দ্বারা কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

কক্ষমধ্যে চন্দনধূনার গন্ধ। টাটকা ফুলের সুবাস। অতি উজ্জ্বল প্রদীপালোক। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। নিথর শিখা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মন ভাবেন, আর নীরব থাকা উচিত নয়। এক হিন্দু কুলনারী, অন্তঃপুরবাসিনী, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া, তদুপরি কুলীনশ্রেষ্ঠ কুলীনকুলচূড়ামণি জমিদার রাজারামের না কি সহধর্ম্মিণী —তাঁর দ্বারা কোন্ অপকারই বা সম্ভব। ব্রাহ্মণ বিনম্র সুরে বললেন,—নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মা। জাতিতে গৌণকুলীন। যাজনিক ও শিক্ষাদানের ক্রিয়া-কর্ম্মে অনধিকারী নই।

—মহাশয়ের নিবাস কোথায়? যদি বাধা না থাকে তো জেনে রাখি।

ক্ষণেক নীরব থাকেন ব্রাহ্মণ। ঠিকানা ব্যক্ত করবেন কি না চিন্তা করেন। ইতস্ততঃ কণ্ঠে বলেন,—নাম ধাম এ সকল কিছু জানাতে বিপত্তি নাই, যদি গোপন থাকে।

—গোপন কেন? আত্মগোপনের রহস্য কি?

—আছে। রহস্য আর কিছুই নয়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভয়! গুপ্ত আক্রমণের ভয়। অপঘাতে নিপাত যাওয়ার ভয়। ব্রাহ্মণ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বৌদ্ধ তান্ত্রিকের দল। অতর্কিতে আক্রমণ করে, হত্যা না করা পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। তাই আত্মপরিচয় গোপন রাখাই শ্রেয়ঃ। আমার আসা-যাওয়ার সংবাদ সঙ্ঘারামে পৌঁছলে আর নিস্তার নেই।

প্রশ্নকারিণীর কণ্ঠস্বর যেন শান্ত, বেদনাহত। মুক্ত কবাটের ফাঁক থেকে মিহি সুরের কথা ভেসে আসে,—আমা দ্বারা কোন ক্ষতির ভয় নেই। আমি কা'কেই বা চিনি! সঙ্ঘারাম কোথায় তা-ও জানি না।

চন্দ্রকান্ত বলেন,—নিবাস আসমানদীঘির অপর তীরে। এই গ্রামের নাম মান্দারণ, মধ্যে আসমানদীঘির ব্যবধান, দীঘির শেষে মধুমাটী গ্রাম। বসতি সেখানে।

—মহাশয়ের টোল না চৌবাড়ী? শিষ্যসংখ্যাই বা কত?

—সামান্য এক ক্ষুদ্র টোল, শিষ্যের সংখ্যা কতই বা হবে, পঞ্চবিংশতিও নয়। জনা কুড়ি।

ঈষন্মুক্ত কপাট ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। আরও কোন প্রশ্ন যদি আসে তাই পূজায় মন বসে না। ব্রাহ্মণ প্রশ্নের অপেক্ষায় প্রস্তরমূর্ত্তির মত ব'সে থাকেন। দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি হয়ে আছে কতক্ষণ। আচমনের জল হাতে। আর কোন শব্দ নেই। নারীকণ্ঠ আর কথা বলে না। ব্রাহ্মণ পূজায় মনোনিবেশ করেন। আচমনের শেষে নারায়ণের স্নানমন্ত্র শুরু করলেন,—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ···ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য···

এক তাম্রপাত্রে সচন্দন তুলসীর 'পরে শালগ্রাম স্থাপন করলেন পূজারী। শিলার মস্তকে দিলেন তুলসীপত্র।

ধুমুচির ধোঁয়া এঁকে-বেঁকে ওঠে। ধূম্রজাল রচনা হয় চন্দ্রকান্তর আশ-পাশে। অতি ভক্তিভরে তিনি নারায়ণের স্নানকার্য্য সমাধা করেন। ধ্যানাদি ন্যাস করবেন এখনই।

কাঠুরিয়া গাছ কাটছে না মেঘ ডাকছে? কড়-কড় শব্দ আসে যেন আমোদরের অন্য তীর থেকে, যেখানে ঘন জঙ্গল। ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তে। কুঠারাঘাতে আহত বৃক্ষের শাখা মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ছে না মেঘের গর্জ্জন ঠাওরানো যায় না, অন্দর থেকে। গন্ধের তরঙ্গ আসছে বনমল্লিকার বন থেকে। ঝড়-বৃষ্টি হয়তো আসন্ন, ভয়ার্ত্ত কাক ডাকাডাকি করছে তারস্বরে। বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে থেকে থেকে।

বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি ডাকলেন,—যশো, যশোদা, বলি ও যশোদা! মরলে না কি, সাড়া নেই কেন?

পূজার ঘরের দ্বারপ্রান্তে ছিল পরিচারিকা। উবু হয়ে বসে দেখছিল হয়তো ব্রাহ্মণের পূজাপদ্ধতি। উঠে দাঁড়ালো সে। বললে,—বৌ, বিধবার কি মরণ আছে কপালে! একশো বচ্ছর পেরমায়ু নিয়ে যে জন্মেছি! কি হুকুম তাই বল'।

হাস্যময়ী রাজকুমারী। হাসি-হাসি মুখ। আধো-ঘুম আধো-জাগা চোখে যেন উৎফুল্ল চাউনি। সহাস্যে বললেন,—তুই মরতে যাবি কেন? মরবো আমি। আগে আমি যাই, তার পর তুই যাবি। নয়তো কে আমাকে সাজিয়ে দেবে ফুলের সাজে? পায়ে আলতা দেবে কে?

বিরক্ত হয়ে ওঠে যশোদা। বলে,—রসিকতা রাখো, কি হুকুম তাই বল'। মন মেজাজ ভাল নয় আমার। ভয়ে এখনও আমি কাঁপছি।

—কেন রে যশো, মনের আবার কি রোগ ধরলো? কিসেরই বা ভয় এত?

হেসে হেসে বললেন রাজকন্যা, ফিসফিসিয়ে কথাগুলি বললেন। পরিচারিকার হাত ধরে টানতে টানতে এগোলেন।

—না বাপু, ছোরাছুরি চোখে দেখতে পারিনে আমি। তোমার সোয়ামী জানলে রক্ষে রাখবে আর? যশোদা কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে রাজকন্যার পিছন, পিছন। এক বৃহৎ তরণী যেন রজ্জুবন্ধনে টেনে নিয়ে যায় অন্য এক তরী। পরিচারিকা যেন শক্তিহীনা, পা চলে না তার। বললে,—কোথায় চললে এমন হনহনিয়ে?

খিল-খিল শব্দে হেসে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী, লুটানো আঁচল বুকে তুলতে তুলতে। পূজার ঘর থেকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে যেন সশব্দে হাসতে সাহসী হলেন। কত দিন যে মুখে হাসি ফোটেনি, কে বলবে!

এত হাসির কি যে অর্থ বোঝে না পরিচারিকা। বিরক্তির সুরে বলে,—পাগল হ'লে না কি বৌ?

রাজকন্যা আরও জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর উচ্ছ্বসিত হাসিতে যেন ভরাযৌবন টলমলিয়ে ওঠে। কপালের 'পরে নেমে-আসা রুক্ষ কুন্তল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন,—সত্যি কথা বল তো যশো, পাগলে কি এত মিষ্টি হাসি হাসতে জানে?

[৩২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৯

কিন্তু কি কাজের কথা শোনাবার জন্য চুমকি তাকে বসতে বললে—রঞ্জন সেই কথাটাই শুনতে চাইলে।

চুমকির কাজের কথা না ছাই!—আবোল-তাবোল বকতে লাগলো। বললে: কেন তুমি মিছেমিছি মালার পেছনে লেগে আছ বল তো? মালার সঙ্গে বিয়ে তোমার হবে না।

—হবে না?

—না।

—জানলে কেমন করে?

চুমকি বললে: তোমার বাবা যখন সেই রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে বলবে, তখন পারবে তুমি তোমার বাবার মুখের ওপর জবাব দিতে?

রঞ্জন বললে: জবাব দিতে না পারি, পালিয়ে যাব।

—কোথায় পালাবে?

—যেখানে আমার খুশী।

—তার পর?

তার পর?—রঞ্জন বললে: কিছু দিন পরে ফিরে আসবো। বাবা তখন বুঝতে পারবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার নেই।

চুমকি তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

রঞ্জন বললে: উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে।

চুমকি তার হাতটা চেপে ধরলে। উঠতে দিলে না। বললে: রাত করে বাড়ী ঢুকতে ভয়ে মরছো, তুমি পালাবে?

—সত্যি বলছি পালিয়ে যাব।

চুমকি বললে: তাহলে এখনই চল। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। এমন জায়গায় নিয়ে যাব, এমন করে তোমাকে লুকিয়ে রাখবো—কেউ জানতে পারবে না।

—তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে?

—দোষ কি?

রঞ্জন বললে: ওরে বাবা! মেরে ফেলবে।

চুমকি বললে: না না মারবে না। আমি মারতে দেবো কেন?

রঞ্জন বললে: বিশ্বাস নেই তোমাদের জাতকে। আর একটু হ'লে আজই আমাকে শেষ করে দিত।

চুমকি বললে: অন্ধকারে চিনতে পারিনি তাই ও-কথা বলছো। আজ যে তোমার গায়ে হাত দিয়েছে সে বাঙালী—তোমাদের জাত।

—তা হোক্। চল।

রঞ্জন আর কিছুতেই থাকতে চাইলে না। উঠে দাঁড়ালো।

চুমকিও উঠতে বাধ্য হ'লো। বললে: তাহ'লে আমাকেও তুমি বিশ্বাস কর না?

রঞ্জন সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলো। চুমকিও চললো তার সঙ্গে সঙ্গে।

—বল। কথার জবাব দাও।

রঞ্জন বললে: কি জবাব দেবো?

—তুমি শুধু বল আমাকে বিশ্বাস কর কি না?

বিশ্বাস করি না—কথাটা বলতে গিয়েও রঞ্জন বলতে পারলে না। তার ভয় হ'লো। বললে: বিশ্বাস করেই তো তোমাকে আমি মালার কাছে যেতে বলছি।

চুমকি বললে: তার কাছে নাই বা গেলাম!

রঞ্জন থমকে থামলো। বললে: যাবে না?

চুমকি বললে: না। তার চেয়ে তুমিই বরং কাল সন্ধ্যেবেলা এসো ওই মুখুজ্যেপুকুরে। তোমাকে নিয়ে আমি এমন জায়গায় চলে যাব—যেখানে থেকে কেউ তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

সর্বনাশ! মেয়েটা বলে কি!

চুমকি বলে যেতে লাগলো: আমার কথাগুলো তুমি মন দিয়ে শোনো। যে-কথা মেয়েরা মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমি আজ তোমাকে তা-ও বলছি। যখন থেকে তোমাকে আমি দেখেছি আমার এত ভাল লেগেছে—তোমাকে ছাড়তে আমার ইচ্ছে করছে না। তুমি চল আমার সঙ্গে। তোমাকে আমি খুব সুখে রাখবো। তোমার ভাল না লাগে, তুমি চলে আসবে।

জবাবে রঞ্জন কি যে বলবে, বুঝতে পারলে না। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে সম্মতি দেওয়াই ভালো। বললে: ভেবে দেখি।

চুমকি তাকে ধরে বসলো।—না, ভেবে দেখি নয়। কাল এসো। আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো।

রঞ্জন বলে বসলো: মালা কি করবে?

চুমকি বললে: মালার কথা তুমি ভুলতে পারবে না জানি। মালাকে কাল আমি জানিয়ে দেবো—রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার জন্যে তুমি দিন কতক লুকিয়ে থাকবে। তা হলেই সে ভাববে না।

রঞ্জন বললে: সেই ভালো। —এবার তুমি যাও, আমি যেতে পারবো।

চুমকি বললে: তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছো?

রঞ্জন বললে: না। আমি ভাবছি, যারা ওখানে মারামারি করছে তারা হয়তো তোমার খোঁজে এই দিকে চলে আসবে।

বলেই সে পেছন ফিরে একবার তাকালে। অন্ধকারে দূরের জিনিস কিছুই ভাল দেখা যায় না, তবু মনে হলো কারা যেন সেই দিকেই এগিয়ে আসছে।

চুমকি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে সে কথা শোনবার মত মনের অবস্থা তখন রঞ্জনের নেই। সে তখন প্রাণপণে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

তার পরেই এক হুলুস্থুল কাণ্ড!

সে রাত্রে রঞ্জন বাড়ীতেই ছিল। বাড়ীর ঝি-চাকর বলছে, তারা দেখেছে। ঠাকুর বলছে, খাবার জন্যে ডাকতে গিয়ে সে দেখেছিল বাবুর ঘরের দোর বন্ধ। 'বাবু বাবু' বলে ডাকতেই দোর খুলে ঘরের বাইরে এসে বলেছিল, খাবার তুমি দিয়ে যাও আমার ঘরে।

ঘরের টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছিল ঠাকুর।

খাবার খেয়েছিল সে—সে কথাও সত্যি। বাড়ীর ঝি ঘর পরিষ্কার করতে এসে এঁটো বাসন তুলে নিয়ে গেছে।

তার পর সকাল থেকে কেউ আর রঞ্জনকে দেখেনি। দেখবার প্রয়োজনও হয়নি। খোঁজ করবার মত কোনও ঘটনাও ঘটেনি।

রঞ্জনের বাবা কোথায় যে কখন থাকে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সে চলে গেছে আমেদাবাদ। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে—সুলতানপুরে ফিরে আসবে বোম্বাই হ'য়ে।

রঞ্জনের মা নেই। কাজেই খোঁজ-খবর নেবার লোকও নেই।

লোকটা যে সারা দিন বাড়ী ফিরলো না, দিনের বেলা স্নান করলে না, খেলে না, রাত্রেও ফিরে আসবার কোনও আশা-ভরসা নেই, তা ওই সাহেবী ধরণের বিরাট বাড়ীটার কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। কাজ-কর্ম্ম যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। ডাইনিং টেবিলের ওপর রঞ্জনের রাত্রের খাবার ঢাকা দেওয়া পড়েছিল, চাকর এসে সকালে তুলে নিয়ে গেল। কেন আসেনি, কেন খায়নি, কেউ একবার কাউকে জিজ্ঞাসাও করলে না।

বাড়ীতে একমাত্র সুধীর ছিল রঞ্জনের সমবয়সী না হ'লেও বন্ধুর মত। তাকে কিছু না জানিয়ে রঞ্জন গেল কোথায়? বাবু এসে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবেই বা কি?

অস্থির চঞ্চল হয়ে সুধীর ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

রাজার মেয়ের সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ের কথাটা যে দিন জানাজানি হয়ে গেল, রঞ্জন সে দিন একমাত্র সুধীরকেই বলেছিল—এ বিয়ে সে করবে না।

সুধীর জিজ্ঞাসা করেছিল—বাবা যদি বলে করতেই হবে?

রঞ্জন বলেছিল: পালাব।

এইটিই তার একমাত্র সান্ত্বনা। বাবু গেছে আমেদাবাদ, বোম্বাই থেকে ফিরে আসতে তার দেরি হ'তে পারে, এই সুযোগে তাই'লে বোধ হয় সে পালিয়েই গেল।

কিন্তু তিন দিনের দিন এ আবার কি দুঃসংবাদ তার কানে এলো?

দেবু চাটুজ্যে বাড়ীতে নেই, হাতে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। সুধীর গিয়েছিল সুলতানপুর গ্রামে ননীগোপালদের বাড়ীতে তাস খেলতে। ঘড়িতে তখন বোধ হয় বিকেল চারটে। ছুটতে ছুটতে নিকুঞ্জ এসে খবর দিলে—দেবু চাটুজ্যের ছেলে রঞ্জন মরে গেছে।

সুধীরের হাতের তাস হাতেই রইলো। জিজ্ঞাসা করলে: কে বললে?

নিকুঞ্জ বললে: আমি নিজে দেখে এলাম। মুখুজ্যেপুকুরের উত্তর দিকে যে জঙ্গলটা আছে না—সেইখানে কে যেন মেরে ওকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। মাটি খুঁড়ে শেয়াল-কুকুরে টেনে টেনে বের করে খেয়ে ফেলেছে, দেখলে চেনা যায় না—নাকে কাপড় দিয়ে যেতে হয়। বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে।

সুধীর তখন তাস ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে: চেনা যায় না তো তুই চিনলি কেমন করে?

নিকুঞ্জ বললে: সবাই বলছে। তুই যা না—দেখে আয়। এতক্ষণ বোধ হয় পুলিশ এসে গেছে।

সুধীরের বুকের ভেতরটা ধক্-ধক্ করতে লাগলো। মুখুজ্যে-পুকুর সেখান থেকে খুব কাছে নয়। যারা সেখানে ছিল সবাই ছুটলো।

সুধীর বললে: আমি বাইকটা নিয়ে যাচ্ছি, তোরা যা।

বাইক্ নিয়ে সুধীর তাদের আগেই গিয়ে পৌঁছোলো। গিয়ে দেখলে, মুখুজ্যেপুকুর লোকে লোকে লোকারণ্য! দু'জন কনেষ্টবল লোকজনের ভিড় সরাচ্ছে। পচা দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তবু নাকে কাপড় চাপা দিয়ে লোকগুলো এগিয়ে চলেছে। দেখা যাদের শেষ হয়ে গেছে, তারা কিছু দূরে গিয়ে গাছের তলায় মজলিস বসিয়েছে। এক দল লোক যাচ্ছে, আবার নতুন লোক এসে জড়ো হচ্ছে। সুলতানপুর এখন আর সে সুলতানপুর নেই। কয়েকটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছে। খবর পেয়ে জামজুড়ি থেকে লোক এসেছে—দেবু চাটুজ্যের ছেলেকে দেখতে।

সকলেরই ধারণা—মৃতদেহ রঞ্জনের।

মুখুজ্যেপুকুরের বাঁধানো ঘাটের ওপর দাঁড়িয়েছিল সীতারাম মুখুজ্যে আর বুড়ো শিব।

সুধীর প্রথমে সেই দিকেই এগিয়ে গেল। তাকে দেখবামাত্র সীতারাম ব'ল উঠলো : এই তো সুধীর এসে গেছে।

সুধীর তার বাইকটা সেইখানে রেখে জিজ্ঞাসা করলে : কি দেখলেন ?

সীতারাম বললে : চিনতে তো পারছি না বাবা, তবে সবাই বলছে যখন—তুমি একবারটি দেখে এসো। মাথার চুল, গায়ের রং আর ছেঁড়া কাপড়জামা দেখে তোমরা হয়তো চিনতে পারো !

বুড়ো শিব কি যেন ভাবছিলেন। সুধীরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি আমাদের প্রমথর ছেলে, না ?

সুধীর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেবু চাটুজ্যের বাড়ীতেই থাকো, না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওইখানেই কাজ-কর্ম্ম কর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেবু কোথায় ? কলকাতায় গেছে ?

সুধীর বললে : আজ্ঞে না। গেছেন আমেদাবাদ। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করেছেন—বোম্বাই হয়ে এখানে ফিরবেন। প্লেনে আসবেন। কাজেই আজ রাত্রে কি কাল সকালে এখানে এসে পৌছোতে পারেন।

বুড়ো শিব জিজ্ঞাসা করলে ; রঞ্জন কি এখানেই ছিল ?

সুধীর বললে : ছিল।

সীতারাম বললে : কবে থেকে তাকে ভাখোনি ?

—তিন দিন দেখিনি।

—যাবার আগে কিছু বলে যায়নি ?

এবার আর সুধীরের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। চোখ দুটো জলে ভরে এলো। তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে মৃতদেহটা একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে।

সীতারাম তাকালে বুড়ো শিবের দিকে।

বুড়ো শিব নীরব।

সীতারাম বললে : কিন্তু কে করলে এ-কাজ ? তখন তার গলার আওয়াজ ভারি হয়ে এসেছে। এ যে রঞ্জন—তাতে আর কোনও সন্দেহই রইলো না। বড় আশা করেছিল সে রঞ্জনের সঙ্গে মালার বিয়ে দেবে। বুড়ো শিবের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললে : এ রকম নিষ্ঠুর ভাবে কে তাকে মারলে বলতে পারো ?

বুড়ো শিব, মনে হলো তখনও কি যেন ভাবছে। [ক্রমশঃ।

ফতেনগরের লড়াই

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

বিক্রমাদিত্য

'নারীর অধিকারে' এই খবরটা বেশ ফলাও করে ছাপা হলো। কিন্তু যে হৈ-চৈ এ সংবাদ সৃষ্টি করলো, সে হলো অতি ক্ষণস্থায়ী। কারণ, দু'দিন বাদে ফতেনগর থেকে বিভিন্ন কাগজের বিশেষ সংবাদদাতারা লিখলেন : যাঁকে বিদেশী বলে 'নারীর অধিকারে' বলা হইয়াছে, তিনি আদৌ বিদেশী নহেন। তাঁর প্রকৃত নাম ঘণ্টারাম। ঘটনার দিন একটু বেশী মাত্রায় অহিফেন সেবন করার দরুণ তাঁর কথাবার্ত্তা সমস্ত জড়াইয়া যায় এবং 'নারীর অধিকারের' সংবাদদাতার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই। ঘণ্টারাম সবে মাত্র কয়েদখানা হইতে ছাড়া পাইয়াছেন। তাই তাঁর পরিধানের বস্ত্র নিতান্তই জীর্ণ ছিল। যদিও তাঁহার চেহারার মধ্যে বিদেশীর ছাপ ছিল, আসলে তিনি বিদেশী নন। 'নারীর অধিকারের' প্রকাশিত সংবাদ নিতান্তই মেয়েলি।

* * * *

এই খবরের উপর সাপ্তাহিক 'কর্কট' যে মন্তব্য করলে, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'কর্কট' লিখলে : আমরা বহু বার বলিয়া আসিয়াছি যে, হেঁসেল-ঘর ও রণাঙ্গন এক ক্ষেত্র নয়। আমরা লুটিলুটি হালদারকে এই ধরণের ঘুমপাড়ানী গল্প শুনাইতে নিষেধ করি। ইহার চাইতে তিনি যদি 'বচুর ঘণ্টের' নতুন ফর্ম্মুলা নিয়ে গবেষণা করতেন, তাহলে দেশের খাদ্যসমস্যা অনেকটা লাঘব হয়ে যেত। আমাদের বক্তব্য যে, ভবিষ্যতে নারী জাতি যেন এই ধরণের স্পেশালাইজ্‌ড কাজে হাত না দেন। ইত্যাদি ইত্যাদি···

* * * *

'দৈনিক সমাচার' লিখলে : ইহা তো আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম। ফতেনগরের লড়াই ছেলেমানুষী ব্যাপার নয়, এ কথা 'নারীর অধিকারের' সম্পাদিকার জানা উচিত ছিল। আমরা আবার বলিতেছি, ফতেনগরের পতন শুভস্য শীঘ্রম্। এই সামান্য কথাটি লুটিলুটি হালদার যদি না জানেন, তাহলে স্বামী খলিলানন্দ এ বিষয়ে বিনামূল্যে তাঁহার উপদেশ দিতেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে প্রস্তুত আছেন।···

* * * *

পতিতপাবন বাবু সাধন বাবুকে ডেকে বললেন : পড়েছেন সব?

: কোনটা স্যর?

: আবার কী! ঐ তোমার 'নারীর অধিকারে'র কেলেঙ্কারী। কত বার বলেছি যে, মেয়েদের···কথাটা পতিতপাবন বাবু শেষ করলেন না। দেয়ালেরও কান আছে। যদি গৃহিণী এ কথা জানতে পারেন তা হলে? থাকগে, এই সব বিপদজনক কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। তাই একটু চুপ করে বললেন : দেখলেন তো 'সমাচার' লিখছে, ফতেনগরের পতন অবশ্যম্ভাবী। শুনুন, আপনি বুটলোকে তার পাঠান।

: কী জিজ্ঞেস করবো স্যর?

: কী আর জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করুন, ফতেনগর ক্যাপচারড অর নট ক্যাপচারড।

ওদিকে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে লুটিলুটি হালদারের। তিনি বাণী দেবীকে ফিরে আসবার আদেশ দিলেন।

* * * *

এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন কামারাদ নিটস্কি গম্ভীর হয়ে ফতেনগরের প্রেসক্যাম্পের সামনে পায়চারী করছিল।

চিন্তার কারণ আর কিছুই নয়। দপ্তর থেকে তার এসেছে এই সংগ্রামের উপর 'পাবলিয়্যাকশন' অর্থাৎ কি না ফতেনগরের জনমত পাঠান হয়নি কেন?

জনমত! বিস্মিত হয়ে কামারাদ নিটস্কি ভাবলে, সত্যিই আজ পর্য্যন্ত এই লড়াই নিয়ে জনসাধারণ কী ভাবছে, কী করছে কিছুই তো লেখা হয়নি?

কামারাদ নিটস্কি ভাবলে, কোন বাড়ীর গিন্নীকে জিজ্ঞেস করবেন এই লড়াই সম্বন্ধে তাঁর কী মতামত। অর্থাৎ এই লড়াইর দরুণ তাঁকে সংসার চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে কি না?

কামারাদ নিটস্কি পোষ্ট-অফিসের পানে রওনা হলেন। সংকল্পটা তাঁর যে, পোষ্ট-অফিসের সামনের কোন বাড়ীতে গিয়ে 'পাবলিয়্যাকশন' জেনে নেবেন।

পোষ্ট-অফিসের কাছে এসে তাঁকে কোন বাড়ীতে যেতে হলো না। কারণ, পোষ্ট-অফিসের সামনে কামারাদ নিটস্কি বিলাসিনীর দেখা পেলেন।

: হেঁ, হেঁ, আমি কামারাদ নিটস্কি। হেসেই নিটস্কি বলে।

নবীনের সাথে প্রেমটা বিলাসিনীর ভালো করে না জমার দরুণ মনটা তার একটু বিগড়ে ছিল। বেশ একটু ঝামটা দিয়ে বললে: আমার বাপু কামারের দরকার নেই। খুন্তির একটা দরকার ছিল। ওটা বাজার থেকেই কিনে এনেছি।

: না, না, আমি কামার নই। মানে আমি হলুম গিয়ে নিউজ পেপারম্যান অর্থাৎ কি না খবরের কাগজের লোক। নিটস্কি ব্যস্ত হয়ে বিলাসিনীর ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করে।

: বেশ তো পাঁচ সের কাগজ পাঠিয়ে দিও। উনুন ধরাতে লাগবে।

কামারদ নিটস্কি স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, যাকে সে 'ইন্টারভিউ' করছে সে বড়ো কঠিন পাত্রী। কিন্তু দমলে চলবে না। তার আগমনের প্রকৃত কারণ বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই আবার বললে: এই যে লড়াইটা চলছে এটা সম্বন্ধে আপনার মতামত একটু জানতে পারলে···

বিলাসিনী কথাটা শেষ হতে দিলে না। বললে: ও মা এ কি বিত্তেকিচ্ছিরি কথা গো! লড়াই আমি করবো কেন? ঐ নবনেই তো করলে। বললে···

: বাস্, বাস আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। সব বুঝে নিয়েছি। এই লড়াইতে আপনার বেশ কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট তো হবেই। এই সাম্রাজ্যবাদী, নরঘাতকদের চক্রান্ত, ও হলো অক্টোপাসের বন্ধন বুর্জোয়াদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ···

* * * *

কমরেড নিটস্কি 'তার' পাঠালে: 'বুভুক্ষার' বিশেষ সংবাদদাতা একজন গৃহকর্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, বুর্জোয়াদের স্টীমরোলার জনসাধারণকে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * * *

'হরকরা' দপ্তরের টেলীগ্রাম শৈল আমায় দেখালে। বললে: কী বিপদে পড়লাম! এখন কী করি বলুন তো? দপ্তর 'তার' পাঠিয়েছে। বলছে: Confirm or deny the fall of Fatehnagar," আরে এদিকে লড়াই যে মন্থর গতিতে চলছে, এতে কী আর শীগ্‌গির ফতেনগর দখল হ'বার যো আছে?

আমি হেসে জবাব দিই: যা বলেছেন। লড়াই কী আর চাট্টিখানি কথা যে সুরু হলো আর শেষ হলো? লিখে দিন,—Fatehnagar not captured.

ঠিক কথা। এই 'তার' এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

* * * *

'তার'-অফিসের সারখেল বাবু মনের আনন্দে গুন্‌গুন্ করে সিনেমার একটা নতুন গান গাইছিলেন। অনেক দিন পরে তিনি হাত-পা ছড়িয়ে একটু বসতে পেরেছেন। এই কয়েক দিন তাকে কী কাজটাই না করতে হয়েছে! রোজ-রোজ অতোগুলো করে টেলীগ্রাম করা কী আর চাট্টিখানি কথা! এমনি সময়ে শৈল এসে উপস্থিত হলো। আর্জেন্ট টেলীগ্রাম। 'ফতেনগর নট ক্যাপচারড।' কী করবেন তিনি! বেশ গম্ভীর হয়েই আবার কাজে বসে গেলেন।

: কতোক্ষণ লাগবে এ টেলীগ্রাম যেতে?

: কতোক্ষণ আর! এই ঘণ্টা দু'য়েকের ব্যাপার আর কী।

শৈল চলে গেলো। সারখেল বাবু আবার গান ধরলেন। আর টেলীগ্রামের যন্ত্রটা নিয়ে ডাকলেন 'ধারাপুকুর' তার-অফিসকে। সারখেল বাবু গানের এক-একটা কলি গুন্‌গুন্ করেন আর 'তার' পাঠাতে থাকেন। টরে-টক্কা-টরে-টক্কা··· নাঃ কী বিচ্ছিরি হাতের লেখা রে বাপু! কিসসু বুঝতে পারা যায় না। এটা কী লিখেছে। ফতেনগর। বেশ, বেশ। তারপর লোকটা গেলো কোথায়?

সারখেল বাবু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন যে শৈল চলে গেছে। এখন কী করবেন তিনি? এদিকে ধারাপুকুর যে জিজ্ঞেস করছে···ফতেনগর···তারপর কী। Not না Now··· বোধ হয় Not···টরে টক্কা···না নিশ্চয় Now য্যাদ্দিন ধরে লড়াই চলছে, ফতেনগর দখল হ'বার দিন তো কবেই পেরিয়ে গেছে! না, একবার মাষ্টার বাবুকে জিজ্ঞেস করে নেয়া যাক। ওঃ মাষ্টার ম'শায়, পড়তে পারেন, এটা কী লিখেছে—Fatehnagar not captured না Fatehnagar now captured?

মাষ্টার বাবু একটু প্রসন্ন মনেই ঘরে বসে ছিলেন। আজ বহু দিন পরে তাঁর তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়েছে। গৃহিণীর মান ভাঙ্গাতে পেরেছেন। এ কী চাট্টিখানি কথা! মাষ্টার বাবু নিজের চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করলেন, কী হলো সারখেল বাবু?

এই দেখুন না, কী বিপদ! আমাদের এক রিপোর্টার সাহেব লিখেছেন ফতেনগর······

তারপর বাকীটা ঠিক পড়তে পারছি নে। 'নট ক্যাপচারড' না নাউ ক্যাপচারড'। কী হবে এটা?

মাষ্টার বাবু জবাব দিলেন: সত্যি সারখেল বাবু, আপনার বলিহারী বুদ্ধি, কতো বার না আপনাকে বলেছি 'সেন্টেন্সের' থেকে আসল মানেটা করে নেবেন! ছিঃ ছিঃ, এই সামান্য জিনিষটা করতে আপনার এতো সময় লাগে? সত্যি বাপু! হ্যাঁ, কী বলছিলেন? 'নট ক্যাপচারড' না 'নাউ ক্যাপচারড' আরে এ তো একদম সহজ কথা। এ বুঝতে আবার দেরী হয় নাকি? য্যাদ্দিন ধরে এই তল্লাটে রিপোর্টার সাহেবরা কী আর বসে বসে ঘাস খাচ্ছেন? ওটা 'নাউ' হবে। আপনি দিন পাঠিয়ে।

টেলীগ্রামটা এক বার পাঠান হয়ে গিয়েছিল, Fatehnagar not captured মাষ্টার বাবুর কথা শুনে সারখেল বাবু তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিলেন—Fatehnagar now captured বলে।

···টরে-টক্কা ধারাপুকুর···Fatehnagar now captured. Fatehnagar not captured নয়।'

* * * *

ধারাপুকুরের টেলীগ্রাফ-মাষ্টার তারা বাবু স্বামী চিদানন্দের চেলা বিপুলের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

রোজই বিকেলে বিপুল তারা বাবুর কাছে আসেন। 'হরকরার' তারের একটা কপি নিয়ে যেতে হয়। কারণ, গুরুদেব ধ্যানে বসেন আর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে যান 'সমাচারের' ব্রজানন্দ বাবু ও খগেন বাবুর কাছে।

আজ স্বামী জিবিদানন্দ বিশেষ তাগিদ দিয়ে বিপুলকে তার-অফিসে পাঠিয়েছেন। অনেক দিন ধরে ব্রজানন্দকে কোন চাঞ্চল্যকর খবর বলা হয়নি। একটা কিছু না বললে আর মুখ রক্ষা হচ্ছে না।

তারা বাবু ও বিপুল গল্প করছে, এমনি সময় তার-অফিসের যন্ত্রটা নড়ে উঠলো। টরে-টক্কা, হ্যালো ধারাপুকুর। 'হরকরার' জন্যে তার আছে। তারা বাবু টরে-টক্কা শুনে একটু সচকিত হয়ে বললেন। হ্যালো : টরে-টক্কা এই যে ধারাপুকুর। কী ব্যাপার··· টরে টক্কা। 'হরকরার' টেলীগ্রাম······টরে-টক্কা······কী খবর··· Fatehnagar not captured,

তাই নাকি !···টরে-টক্কা···খবরটা পেয়েই তারা বাবু চীৎকার করে উঠলেন। বললেন : বিপুল, বিরাট খবর···ফতেনগর নট ক্যাপচারড, আরে আমি তো আগেই জানতুম। হাঁ, হাঁ, নট ক্যাপচারড······

তারা বাবুর মুখ থেকে কথাটা বেরুবা মাত্র বিপুল আর দেরী করলে না। বললে : কী বললেন ?

এ তো বিরাট খবর দেখছি। Not captured.

না, আর দেরী নয়। এক্ষুণি গুরুদেবের কাছে যেতে হচ্ছে। ফতেনগর নট ক্যাপচারড। ওরে বাবা, এ যে বিরাট কাণ্ড! এই লড়াই আর ক' দিন চলবে। এদিকে গুরুজী তো বাণী দিয়ে বসে আছেন যে, সাত দিনের মধ্যে এই লড়াইর সমাপ্তি। এখন ? না, শীগ্‌গিরিই এই ভবিষ্যদ্বাণী পালটাতে হবে। নইলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। বিপুল আর দেরী করলে না। তারা বাবুর কথা শেষ হওয়ামাত্র দৌড়ে গুরুজীর কাছে চলে গেলো।

টেলীগ্রাফ-অফিসের তার যন্ত্রটা তখন টরে-টক্কা করছে। তারা বাবু লিখে নিচ্ছেন। টরে-টক্কা-টরে-টক্কা···Fatehnagar now captured. Fatehnagar now captured. ওটা নট নয়, নাউ হবে।

: ওহে বিপুল, ফতেনগর নাউ ক্যাপচারড—নাউ ক্যাপচারড···বিপুল, কোথায় গেলে হে। ওটা 'নট ক্যাপচারড' নয়—'নাউ ক্যাপচারড' হবে। বিপুল—বিপুল তারা বাবু যন্ত্রটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর এদিক তাকিয়ে বললে, আচ্ছা ক্যাসাদে তো পড়া গেলো। টেলীগ্রাম শেষ না হতেই বিপুল চলে গেলো ! এখন কী করি···ফতেনগর 'নাউ ক্যাপচারড' আর বিপুল যে খবর নিয়ে গেলো। ফতেনগর নট ক্যাপচারড। কী বিশ্রী কাণ্ড রে বাবা ! দুত্তোর ছাই। কী হবে আর চিন্তা করে··· তারা বাবু টেলীগ্রাম 'হরকরা'-দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

*　　*　　*　　*

স্বামী জিবিদানন্দ ধ্যানে বসেছেন। সামনেই ব্রজানন্দ বাবু ও খগেন বাবু বসে আছেন। একটু বাদে জিবিদানন্দ চোখ খুললেন।

: খবর যে বিশেষ সুবিধের নয় ব্রজ ! শনি ও বৃহস্পতির যোগাযোগ কেটে গেলো। ভেবেছিলাম এই দুই গ্রহের মিলনে হয়তো লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু না, এখন দেখছি আরও কয়েক দিন এই লড়াই চলবে।

: আজকের ফ্রন্টের খবরটা একটু বলুন না ; খগেন বাবু একটু ভীত কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন।

: কী আর হবে···ফতেনগর নট ক্যাপচারড। এখনও দখল হয়নি। জোর যুদ্ধ চলছে···হতাহতের সংখ্যা···দাঁড়াও বলছি··· প্রায় হাজার পনেরো হবে। চলবে এ লড়াই বেশ কয়েকটা দিন···প্রায় দু'বছর তো নিশ্চয় !

: দু' বছর···বলেন কী গুরুদেব ? ব্রজানন্দ বাবু এবার প্রশ্ন করেন।

: তা হলে, তুমি কী ভেবেছিলে ব্রজ ? দু' দিন হবে এ লড়াই। ছোঃ। সে বার হান্‌ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারে ভীম, অর্জুন সবাই এসে যখন···

কথাটা শেষ হবার আগেই খগেন বাবু প্রশ্ন করেন···আপনি মহাভারতের যুদ্ধের কথা বলছেন ?

: আরে রামোচন্দোর ! মহাভারতের কথা বলছি নে—পোষ্ট মহাভারত ওয়ারের পর অর্জুন-ভীমকে এক বার ভাড়া করে হান্‌ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারে নাবানো হয়েছিল। ওদের দু-একটা নূতন কসরৎ দেখানো হবে বলে।

: তারিখটা যদি বলেন, তা হলে সুবিধে হয়। হেড লাইনে দিতে পারবো···খগেন বাবু আবার কাতর কণ্ঠে বলেন।

: না, না ওই যুদ্ধের হিষ্ট্রি এখনও লেখা হয়নি। সেদিন তোমাদের গভর্ণমেন্টের এক ছোঁড়া এসে বললে যে, এই হান্‌ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারের একটা পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করা হবে। আমাকেই বলেছে প্রিফেস লিখে দিতে। তাই ভাবছি···

স্বামী জিবিদানন্দের কথাটা শেষ হবার আগেই খগেন বাবু ব্রজানন্দ বাবুর কানে কানে ফিস-ফিস করে বললেন : একদম ফার্ষ্ট ক্লাস নিউজ। গত দশ বছরের মধ্যে এমনি খবর ছাপিনি। এ খবর দিয়ে স্পেশাল এডিশন বের করলে কাগজ হু-হু করে বিকিয়ে যাবে।

ব্রজানন্দ বাবু জবাব দেন : তা হ'লে আর দেরী নয়। 'হরকরা' বাজারে বেরুবার আগে কাগজ বেরুনো চাই। গুরুদেবের ফটো ও বাণী সহ। আর ফতেনগরের একটা ম্যাপ।

: ফতেনগরের ম্যাপ তো দপ্তরে নেই স্যর, বিষণ্ণ বদনে খগেন বাবু বললেন।

: না আছে তো বয়ে গেলো। গত রোববার যে আইসল্যাণ্ডের ম্যাপটা ছেপেছিলুম, ঐটেই উল্টো করে ছেপে দিন। কার সাধ্যি আছে যে, বলে ওটা ফতেনগরের নয়। শুধু নজর রাখবেন 'হরকরা' যেন টের না পায়। তা হলেই মুস্কিল।

এবার খগেন বাবু স্বামী জিবিদানন্দকে বললেন, গুরুদেব, আপনার বাণী দিয়ে আমরা একটা বিশেষ সংখ্যা বের করছি। 'ফতেনগর নট ক্যাপচারড।' স্বামী জিবিদানন্দ একটু মৃদু হাসলেন। বললেন : ব্রজ, কাজটা ভালোই করছো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বিপুল বলছিল ওর নাম নাকি আজ পর্য্যন্ত কাগজে বেরোয় নি। কাগজের কোন এক জায়গায় ওর নামটা ঢুকিয়ে দিতে পারো না ?

: আপনি সে জন্যে চিন্তা করবেন না স্যর ! সব ঠিক হয়ে যাবে।

*　　*　　*　　*

'হরকরা'-দপ্তরে টেলীগ্রাম পেয়ে সাধন বাবু চীৎকার করে উঠলেন।

: কী হলো স্যর, প্রিয়ব্রত-উমাকান্তের দল এগিয়ে এলো।

: ফতেনগর ক্যাপচারড। বিরাট স্কুপ—বিংশ শতাব্দীর সব চাইতে বড়ো খবর।

: প্রিয়ব্রত বাবু, আমাদের স্পেশাল বের করতে হবে। মেসিন বন্ধ করে ডাক-সংস্করণ ছাপা বন্ধ করুন। তৈরী করুন স্পেশাল। না, না 'প্লেট' চেঞ্জ করার দরকার নেই। একদম আলাদা সংস্করণ হবে। 'স্ট্রীমার' হেডলাইন। আপনারা কাগজ তৈরী করুন, আমি পতিতপাবন বাবুকে খবরটা দেখিয়ে আনছি।

* * * *

ফতেনগর দখল হয়েছে খবরটা শুনে পতিতপাবন বাবু চম্‌কে উঠলেন। বললেন : বলেন কী সাধন বাবু?

: হ্যাঁ স্যর, বুটলোকে আমরা তার পাঠিয়েছিলাম, confirm or deny the fall of Fatehnagar জবাবে বুটলো লিখেছে :

Fatehnag r now captured আমরা এ খবর দিয়ে স্পেশাল বের করছি।

: আলবাৎ বের করবেন। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে 'গুরুদেব' স্বামী খলিলানন্দের ফটো ও বাণী ছেপে দিন। যুদ্ধ ও শান্তির উপর বাণী। লোক পাঠান ওঁর কাছে বাণী নিয়ে আসুক। হাঁ, আর একটা কথা। ফতেনগরের একটা ম্যাপ ছাপছেন তো।

: ফতেনগরের ম্যাপ তো নেই দপ্তরে—করুণ কণ্ঠে সাধন বাবু জবাব দেন।

: তা হলে আপনারা আছেন কী করতে? কুছ পরোয়া নেই। আলগড়িয়া বলে যে জায়গাটা আছে—

: আলগড়িয়া! বিস্মিত কণ্ঠে সাধন বাবু প্রশ্ন করলেন। এই জায়গাটা কোথায় স্যর?

: সাধন বাবু, আপনাকে দিয়ে কিসসু হবে না। আপনি নিশ্চয় স্কুলে জিওগ্রাফি পড়েছেন। পড়েন নি 'আলগড়িয়া কার্পাস তুলার জন্য প্রসিদ্ধ?'

: ও স্যর, আপনি 'আলজেরিয়ার' কথা বলছেন। আফ্রিকার সেই দেশটার কথা বলছেন তো?

পতিতপাবন বাবু চিরকালই ইংরেজী বর্জনের পক্ষপাতী। আজ এই 'আলজেরিয়ার' প্রসঙ্গের পর তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, এই ভাষা যতো শীগ্‌গিরই বর্জন করা যায় ততোই ত মঙ্গল।

: ঠিক বলেছেন। আপনাদের ঐ আলজেরিয়ার একটা ম্যাপ ছেপে দিন। কালীর ইম্প্রেশনটা একটু বেশী করে দেবেন, যাতে 'সমাচার' টের না পায় যে, ওটা আলজেরিয়ার ম্যাপ। ওরা টের পেলে আর রক্ষে রাখবে না।

: ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সব ঠিক করে দেবো—সাধন বাবু জবাব দিলেন।

: হ্যাঁ, আর একটা কথা। রমণী বাবুকে বলুন, ঐ ইংরেজী ভাষা বর্জনের উপর একটা সম্পাদকীয় লিখতে। এই বিদেশী ভাষা নিয়ে একটা আন্দোলন করতে হবে। কী বলেন?

: ঠিক বলেছেন স্যর! 'সমাচার' আন্দোলন সুরু করার আগেই আমাদের সুরু করা উচিত।'

: ঠিক তাই—পতিতপাবন বাবু জবাব দেন।

* * * *

বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

অফিস-ফেরতা সবার হাতে একখানা করে 'দৈনিক সমাচার।'

বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে সমাচারের বিশেষ সংখ্যা পড়ছেন। 'ফতেনগর দখল হয়নি। আরো বহু দিন চলবে এই লড়াই, স্বামী জিবিদানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী।'

এক যাত্রী মন্তব্য করলেন : ছ্যো ম'শায়। ফতেনগর তো সামান্ত একটা গ্রাম, সেইটে দখল করতে লোকগুলো হিমসিম খেয়ে গেলো! এ কী লড়াই হচ্ছে না যাত্রা হচ্ছে?

অপর এক যাত্রী জবাব দিলেন : ফতেনগর যে গ্রাম এ কথা কে বললে? ঐ দেখুন না ফতেনগরের ম্যাপ। বাপস্ কী প্রকাণ্ড জায়গাটা!

: ফতেনগরের ম্যাপ বেরিয়েছে না কি? সমাচার তো দারুণ স্কুপ করলে ম'শায়। আজ ক'দিন ধরে এই লড়াইর খবর বেরুচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একটা ম্যাপ ছাপলে না, বললে না ফতেনগরটা কোথায়। আর সব রদ্দি মার্কা খবর ছাপছে।—প্রথম যাত্রী বললেন।

খবর কী আর বেরুবার যো আছে মশায়! সব খবরই তো সরকার সাপ্রেসড করে দিচ্ছে। এই তো পরশু দিন আমাদের বাড়ীর সামনে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেলো। একটা অক্ষরও বেরুলো না কাগজে। ছি: ছি:···তৃতীয় এক যাত্রী মন্তব্য করেন।

: যা বলেছেন দাদা! আমাদের কোম্পানীতে ছাঁটাই হচ্ছে, আজ পর্য্যন্ত কাগজওয়ালারা এ নিয়ে একটা কথা লিখলে না!—চতুর্থ যাত্রী বলেন।

প্রথম যাত্রী বুঝতে পারলেন যে মূল আলোচনা থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছেন। তাই আবার ফতেনগর প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন। বললেন : যাই বলেন না, এ সব ব্যাপারে সমাচার চমৎকার কাগজ। ঐ স্বামী জিবিদানন্দের কী মর্ম্মস্পর্শী বাণী ছেপেছে পড়ুন না। বেশ চিন্তার কথা বলেছেন উনি—

: স্বামী জিবিদানন্দের কথা বলছেন তো?—আরে ম'শায় উনি তো পণ্ডিত মানুষ—তৃতীয় যাত্রী মন্তব্য করেন।

: ফিলসফার গাইড ম'শায়। শুনেছি দশ-দশটা বিদেশী ভাষা জানেন। যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ না করতেন, তা হলে উনিই তো এ্যাদ্দিনে দেশের এক জন মহারথী হয়ে যেতেন।

: যা বলেছেন—চতুর্থ যাত্রী মন্তব্য করেন।

এই রকম ধরণের টুকরো কথা যখন বাসের মধ্যে চলছিল তখন হঠাৎ হকারের চীৎকার শোনা গেলো : ফতেনগর কামাল হো গিয়া। ফতেনগর কামাল হো গিয়া। হরকরা স্পেশাল এডিশন পাঢ় লিজিয়ে।

বাসের সবাই ঝুঁকে পড়লেন।

প্রথম নম্বর যাত্রী বললেন : ও, মশায় বলছে কী! এ যে দেখছি অবাক কাণ্ড! ফতেনগরের বারোটা বেজে গেলো। —এই 'হরকরা' দাও দিকিনি এক কপি।

শেষের কথাগুলো হকারকে উদ্দেশ্য করে বলা।

দু'নম্বর যাত্রী বলেন : আমি তো প্রথম থেকেই বলছিলুম দাদা, সরকার নিউজ 'সাপ্রেসড' করছে।—

তৃতীয় যাত্রী মন্তব্য করলেন : আরে ফতেনগর হলো এক ছোট গ্রাম। ঐটে দখল করতে এতো কাণ্ড! ১১১৪ সালের লড়াইতে, বুঝলেন দাদা—

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই চতুর্থ নম্বর যাত্রী বললেন : ফতেনগর যে ছোট গ্রাম, এ কথা কে বললে আপনাকে শুনি? ও মশায়, দাদাকে একটু শুনিয়ে দিন না ফতেনগরের আয়তনটা কতো।

: আয়তন তো দেয়নি, কিন্তু একটা ম্যাপ দিয়েছে। কিন্তু কিছুই যে বুঝতে পারছিনে। সব কালো হয়ে গেছে কালিতে!

: ও আর নতুন কী দাদা! ঐ যে রণজিৎ সিংগি না কে বলেছিল 'সব লাল হো জায়েগা।' আর আজ-কাল কালো হবে এতে আর আশ্চর্য্যি হবার কী আছে! এ তো কালোবাজারীর যুগ—দ্বিতীয় যাত্রী বললেন।

তৃতীয় যাত্রী এবার মন্তব্য করেন : আর ইদিগে আমাদের 'সমাচারের' কাণ্ডখানা দেখেছেন? যতো সব ভুল খবর ছেপে বসে আছে!

চতুর্থ যাত্রী এবার বলেন : আরে দুত্তোর মশায়, 'সমাচারের' কথা ছেড়ে দিন। আমার সাহেব বলেন, 'লাহিড়ী, তোমার ডিপার্টমেন্টকে দ্যাখো 'সমাচার' কতো গালিগালাজ করেছে।' আমি কী বলেছি জানেন, বলেছি সাহেব, 'সমাচারের' নিন্দে গালমন্দ নয়, ওটা প্রশংসাপত্র।

: যা বলেছেন। আর এই দিকে দেখুন 'সমাচার' কোথাকার একটা 'হনলুলু' না 'পাগো-পাগো' দেশের ম্যাপ ছেপে বসে আছে। ছিঃ! ছিঃ! এমনি ভাবে জনসাধারণকে ধাপ্পা দিচ্ছে 'সমাচার'—প্রথম যাত্রী বললেন।

: যা বলেছেন স্যাণ্ডালাস। ঐ যে স্বামী জিবিদানন্দ। ঐ ব্যাটাই তো সমাচারকে সব পরামর্শ দেয়। লোকটা ঠগ, জোচ্চোর।

আর এক যাত্রী বললেন : কাগজের কথাই যদি বলেন, তাহলে বলুন 'হরকরা'। সব টাটকা খবর ছাপে। আর কী চমৎকার ছবি। আর এডিটোরিয়াল। এই দেখুন না, আজকে কী লিখেছে—'বলো কথা'। আহা কী চমৎকার, মার্ভেলস! লিখতে পারবে এমনি রকম কেউ এডিটোরিয়াল? হ্যাঁ, লিখতে পারতেন এই ধরণের সম্পাদকীয় শুধু মাত্র স্যরেন বাঁড়ুয্যে।

যিনি চার পয়সা দিয়ে সমাচার কিনেছিলেন তাঁর মুখে শুধু একটা করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেলো। শুধু কাতর কণ্ঠে বললেন, ও: দাদা, আমার পয়সা চারটা তাহলে জলে গেলো—

এক জন মন্তব্য করলেন : শ্রেফ গঙ্গায়—

আর একজন ছড়া কেটে বললে :

"এক্ষুণি দাদা চড়ে টঙ্গায়,
ভাসিয়ে আসুন 'সমাচার' মা গঙ্গায়।"

ক্রেতা এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন : আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী চলবে না বলে দিচ্ছি। ঐ সমাচারের সম্পাদকের নামে আমি 'কেস' ঠুকবো। কতো ধানে কতো চাল বুঝিয়ে দেবো বাছাধনকে—বাসের যাত্রীরা একমতে স্বীকার করলে যে, এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাগজ 'হরকরা'। 'সমাচার' অতি বাজে কাগজ।

* * * *

স্বামী জিবিদানন্দ বসে বসে চা পান করছিলেন। সামনে বিপুল বসে।

: কী ব্যাপার? জিবিদানন্দ প্রশ্ন করলেন।

: সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গুরুদেব—টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ব্রজানন্দ বাবু কাতর কণ্ঠে বললেন।

: কী হলো?—

: আজ্ঞে আমার দপ্তরের সামনে প্রায় হাজার খানেক লোক। বলে 'সমাচারের' বিশেষ-সংখ্যা কিনেছি। ভুল খবর ছেপেছো। পয়সা ফেরৎ দাও নইলে মজা দেখাচ্ছি। লোকগুলো গুরুদেব, ভয়ানক উত্তেজিত।

: ভুল খবর? সে আবার কী। সমস্ত কথা খুলেই বলো না?—স্বামী জিবিদানন্দ বললেন।

: আর কী বলবো গুরুদেব! ঐ পতিতপাবনের 'হরকরা'ই সব সর্ব্বনাশের মূল। আমরা স্পেশাল বের করার একটু বাদে 'হরকরা' বিশেষ-সংখ্যা বের করেছে। ঠিক আমাদের উল্টো খবর ছেপে বসে আছে—অর্থাৎ কি না ফতেনগর নাউ ক্যাপচারড্। এ নিয়েই বাইরের লোকগুলো চীৎকার হল্লা করছে। আমায় যে এরা একেবারে ধনে-প্রাণে মারলে। আপনি এসে এদের একটু শান্ত করুন না—"

টেলিফোন কেটে দিলেন স্বামী জিবিদানন্দ। বললেন : বিপে, হরিদ্বারের গাড়ী ক'টায় বল দিকিনি?'

: রাত—রাত সাতটায়।'

: তা হলে চল। আজই রওনা হয়ে পড়ি। ট্যাক্সী ডাক। অনেক দিন শ্রীভগবানের দর্শন পাইনে। তাই মনটা বড়ো কাতর হয়ে উঠেছে। আর দেরী নয়, গুছিয়ে নাও। সময় হাতে নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে ওরা আসতে পারে।

* * * *

আয়নার সামনে বসে চুকন্দর সিং নিজের গোঁপটা চুমরে নিচ্ছিলেন। এমনি সময় দৌড়ে এলো বন-বন চৌবে।

: কী ব্যাপার, এই অসময়ে আবার বিরক্ত করতে এলে কেন?

: হুজুর 'হরকরা' কাগজ পড়ুন। দেখুন কী লিখেছে। 'ফতেনগর নাউ ক্যাপচারড।'

খবরটা পড়ে চুকন্দর বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই লড়াইর কর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা তিনি। অথচ ফতেনগর দখল হয়ে গেলো এ খবরটা তাকে জানান হয়নি! তিনি প্রায় চীৎকার করেই বললেন : আপনার সি, ই ডি গুলো কী করে? এই রকম খবর আমায় দেয়নি কেন? ডাকুন তো ওদের—

একটু ইতস্তত: করে বন-বন বললে : আজ ভোর থেকে ওদের পাচ্ছিনে।

: পাচ্ছেন না! কী ব্যাপার?

: আজ্ঞে, রোজই বিকেলে ওরা ডাকঘরে যায়। রিপোর্টারদের কপি থেকে যুদ্ধের খবর নিয়ে আসে। কাল বিকেলে একটু সিনেমায়

গিয়েছিল। তাইতো অতো বড়ো খবরটা আনতে পারেনি। বোধ হয় এখন আনতে গেছে!'

এর পরে চুকন্দর আর কী বলতে পারেন?

তার পর জিজ্ঞেস করলেন: লুটেরা ছুবেকে টেলিফোন করেছিলেন? কী বলে লুটেরা? লড়াই চলছে না বন্ধ হয়ে গেছে?

: সে কথা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি—বন-বন জবাব দিলে।

: তা হ'লে কী ছাই করছেন? দিন দেখি টেলিফোনটা?

* * * *

'ফরোয়ার্ড এরিয়ার' লুটেরা ছুবে গুম্ হয়ে বসে ছিলেন। মন তাঁর প্রসন্ন নেই, কারণ এ কয়েকটা রাত মশার উপদ্রবে তিনি একদম ঘুমুতে পারেন নি। এই অনিদ্রার দরুণ তাঁর রক্তশূন্যতার ব্যামো হয়েছে। এমনি সময় চুকন্দর সিং-এর টেলীফোন এলো।

: হ্যালো, লুটেরা 'এনিমি'রা কখন এলো। এই অসুখের দরুণ লুটেরা আজ-কাল একটু কম শুনতে পাচ্ছেন। তিনি শুনতে পেলেন লুটেরা, এনিমিয়া কখন হলো।

তাই জবাব দিলেন: পরশু রাত্রে। কী যন্ত্রণাই না দিচ্ছে গুর! 'আসল মসকুইটো' আক্রমণ করেছিল কাল রাত্রি-বেলা। লুটেরার জবাব শুনে চুকন্দর ঢোঁক গিললেন। এবার একটু কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন: বলো কী হে! 'মসকুইটো' য়্যাটাকস্! এ তো বিরাট কাণ্ড দেখছি! একটু বাদে আবার প্রশ্ন করলেন: আমাকে আগে বলোনি কেন?

লুটেরার মাথা যেন বনবন করে ঘুরছে। তিনি শুনতে পেলেন: ডাক্তারকে আগে বলোনি কেন?

লুটেরা জবাব দিলে: সে সুবিধে আর পেলাম কোথায়? তার আগেই তো কাহিল হয়ে—মানে কুপোকাৎ হয়ে পড়েছি।

হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়লো চুকন্দরের। শুধু এক বার বললেন: সারেণ্ডার করলে লুটেরা?

এবার লুটেরার কানে শুধু 'সারেণ্ডার' কথাটি ভেসে এলো। আর দেরী নয়। এক্ষুনিই হেস্তনেস্ত করে দে'য়া প্রয়োজন। নইলে হয়ত কর্তার মত পাল্টাতে পারে। তিনি বললেন: সে জন্যে ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু বাদে রণাঙ্গন ক্ষেত্রে সন্ধির পতাকা ঝুলতে লাগলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগলো যুদ্ধ সমাপ্তির বিউগল।

* * * *

ময়দানে মিটিং হচ্ছে। দুটো ভাঙ্গা চেয়ার, চারটে পতাকা—ছিন্ন ছাতির কাপড় দিয়ে তৈরী। দেশনেতা হারাণ চাটুজ্যের বক্তৃতা হবে। 'ফতেনগরের লড়াই ও অতঃপর।'

হারাণ চাটুজ্যে তাকিয়ে দেখলেন, তার মিটিং-এ জনসমাগম বিশেষ হয়নি। ঐ তো রাস্তার পাশের মাঠে কাতারে-কাতারে লোক হয়েছে। দেশনেতা বাবুলাল সিংগী বলছেন। বক্তৃতার বিষয়: 'লড়াই শেষ হলো কেন?'

এক বার করুণ চক্ষে হারাণ চাটুজ্যে বাবুলাল সিংগীর ময়দানের দিকে তাকালেন। তার পর নিজের মিটিংএর লোক গুণতে লাগলেন···এক, দুই···তিন···সবশুদ্ধ বারো। এর মধ্যে তিন জন ভলান্টিয়ার, হারাণ চাটুজ্যের ভাগ্নে ও তার বন্ধু। বাকী সাত জন ঐ বড়ো মিটিং-এ জায়গা পায়নি বলে এখানে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে হারাণ চাটুজ্যে জনতার প্রতীক্ষায় রইলেন। আরো দু'জন লোক বাড়লো। পুলিশ বিভাগের কেউ হবে।

হারাণ চাটুজ্যে ভাবলেন যে, তার বক্তৃতা শুরু হলে পর হয়তো জনতা বাড়তে পারে। তিনি বলতে লাগলেন: ফতেনগর! আপনারা জানেন কী ফতেনগরে শত্রুপক্ষের কেল্লাকতে হলো কেন? জানেন না। বেশ, জিজ্ঞেস করুন ঐ বাবুলাল সিংগীকে, ঐ যে বড়ো মাঠে বসে বসে গলা ফাটাচ্ছে আপনারা শুনুন এই ফতেনগরে···

হারাণ চাটুজ্যের বক্তৃতা শেষ হবার আগেই জনতার মধ্যে দু'জন উঠে দাঁড়ালো। তারা যাবার উপক্রম করে। ভলান্টিয়ারদের এক জন চেঁচিয়ে বলে: যাবেন না। মিটিং-এর শেষে চা দে'য়া হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে লিলি বিস্কুটও আছে।

শ্রোতাদের মধ্যে এক জন জবাব দিলে: নহী জী। রাষ্ট্র ভাষামে বোলুন। হমি বংলা নহী সমঝি।

করুণ কণ্ঠে হারাণ চাটুজ্যে আবার তাকালেন। শ্রোতার সংখ্যা ভলান্টিয়ার, আত্মীয়-পুলিশ বাদ দিয়ে পাঁচ জনায় এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন, যেন আর একটা লড়াই হয়। তাহলে তিনি বাবুলালকে এক হাত দেখিয়ে দেবেন।

* * *

ফতেনগরে সন্ধির নিশান উড়বার সঙ্গে-সঙ্গে প্রেস-ক্যাম্প নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

সবাই চুপ। ফতেনগরের পতন হয়েছে, এতো বড়ো স্কুপ শুধু মাত্র যে শৈল পাবে এ কথা তারা কখনই কল্পনা করতে পারেনি। বিছানার কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে রামগোপাল। ব্যারীর চুলগুলো এলোমেলো, তার কণ্ঠস্বর মিহি হয়ে গেছে। শৈল স্কুপ করার পর গিদোয়ানী ও আমি এসে প্রেস-ক্যাম্পে আস্তানা নিয়েছি। টেবিলের উপর শুয়ে আছে গিদোয়ানী। আমি চেয়ারে বসে। ঘরের মধ্যে শুধু উত্তেজিত কথা বলছে কমরেড নিটস্কি।

: অন্যায়, ঘোর অন্যায়। শৈলকে এ ভাবে 'এক্সক্লুসিভ' স্টোরী দেয়া ঘোর অন্যায়। আমাদের 'প্রেস-কোডে'র বাইরে। উই মাষ্ট প্রটেষ্ট।

কম্বল থেকে মুখ বের করে রামগোপাল প্রশ্ন করলে: কার কাছে শুনি?

: কেন আবার। কর্তৃপক্ষের কাছে। নিটস্কি জবাব দেয়।

: তোমার মাথা আর মুণ্ডু। নতুন গভর্ণমেন্ট এখনও পর্য্যন্ত কায়েমী হলো না, কর্ত্তা পাবে কোথায় তুমি, শুনি?

: তাহ'লে ৬ই মার্চ ডেমোনেষ্ট্রেড।

: 'নিটস্কি, আমার একটু লেমনেড খাওয়াতে পারো? নইলে ভাই 'ডেমোনেষ্ট্রেড' করার শক্তি নেই। জানো গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমি এতো বড়ো বিরাট স্কুপ মিস করিনি।

: কিন্তু একটা বিহিত করার সত্যিই প্রয়োজন। এ কী ঘোর অন্যায় নয়? এতগুলো প্রেস-রিপোর্টার থাকতে এত বড়ো একটা স্টোরী শুধু মাত্র শৈলকে দেয়া হলো? আমরা আবেদন করবো।

: ও-সব আবেদনে কিসসু হবে না। বরং বলো আমরা

প্রতিবাদ করবো। লেট আস্ ড্রাফ্ট আওয়ার মেমোরাণ্ডাম—কাগজ-কলম নিয়ে কমরেড নিটষ্কি বসলো।

: কী লিখবে শুনি ?—রামগোপাল জিজ্ঞেস করে।

: কেন লিখবো উই দি আনডারসাইনড 'করেসপণ্ডেণ্ট হিয়ার বাই প্রটেষ্ট···না না, ষ্ট্রাইকেটলি প্রটেষ্ট অ্যাণ্ড টেক একসেপসন···উঁহু একসেপসন নয়, বরোং অবজেক্ট অবজেক্ট টু দি ট্রিটমেণ্ট······

কমরেড নিটষ্কি তার প্রতিবাদপত্র লিখতে লাগলো।

* * * *

শৈলকে আড়ালে ডেকে আমি বললাম: এটা কী ভালো হলো ?

বিস্মিত হয়ে শৈল বলে: কোনটা ?

: এই যে ফত্তেনগরের দখলের খবরটা। এক-যাত্রায় পৃথক ফল······

: সত্যি বলছি আমি তার পাঠিয়েছিলুম···

আমি মনে মনে হাসি। সবাই এ কথা বলে থাকে। এটাই তো পাকা রিপোর্টারের চাল। আমি কি জানিনে। আলবাত জানি। এত বছর রিপোর্টারী করে চুল পাকিয়ে ফেললুম। সবই জানি, সবই জানি।

* * * *

আমার কথা ফুরুলো।

প্রারম্ভেই বলেছি যে এ কাহিনী সাংবাদিক-জীবনের এক অংশ, অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। তাদের বৃহত্তর জীবনের কাহিনী লিখতে গেলে এ কাহিনী শেষ করতে পারতাম কি না সন্দেহ! কারণ সে জীবনে রূপাও নেই, কথাও নিঃশেষিত, কিন্তু শুধু আছে গ্লানি, শুধু আছে শত বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে দুঃখ। সেই দুঃখের জীবনের মাঝে মাঝে যদি 'ফত্তেনগরের লড়াইর' মতো ছোটখাটো ঘটনা না হতো তা হলে সাংবাদিক-জীবন সত্যিই দুর্বিসহ হয়ে পড়তো। তাদের বেদনাময় জীবনের মাঝে এই অনাবিল আনন্দটুকুই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

* * * *

আমার আর একটা কথা বলার আছে।

'ফত্তেনগরের লড়াই'র পর এক দিন নিজের কর্মস্থলে ফিরে শুনতে পেলাম শৈল বুটলোর তুখিয়ে হরকরায় একটা ভালো কাজ পেয়েছে। বুটলোরও তার ভগিনীপতির কাছে আদর বেড়েছে। এখন আর পয়সার জন্তে হাত পাততে হয় না। শুভাথিনী দেবী বুটলোর জন্তে 'হরকরার' পাত্র-পাত্রীর বিভাগে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। অতএব 'মন দেওয়া-নেওয়া' ক্লাবের সদস্যদের মেয়ে দেখার অজুহাতে চায়ের একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

পতিতপাবন বাবু প্রস্তাব করেছেন যে, বিয়ের প্রারম্ভে বুটলোর দেশনেতা হওয়া প্রয়োজন। কোনটা আগে হবে বিয়ে না দেশনেতা, সেই নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ চলছে। 'সমাচার' কাগজের সম্পাদকীয়তে এর একটা ফলাফল শীগ্‌গিরই জানতে পারা যাবে।

* * * *

প্লেনে আমি ও গিদোয়ানী একই সঙ্গে এলাম। নিজের সিটে বসে গিদোয়ানী একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলো: একটা প্রশ্ন করবো দাদা।

: কী ?

: আচ্ছা, রাইফেলের ট্রিগার ক'টা বলতে পারো ?

আমি বিস্মিত হলাম। লোকটা বলে কী? রাইফেলের ট্রিগার ক'টা জানতে চায়! আশ্চর্যি!

আমি বলি: সে কী গিদোয়ানী, ফত্তেনগরে এত বড়ো একটা লড়াইর রিপোর্ট করে এলে, আর এখন কি না জিজ্ঞেস করছো, রাইফেলের ট্রিগার ক'টা ?

এক-গাল হেসে গিদোয়ানী বলে: আরে রামোচন্দোর! তুমিও জানো আমিও জানি। ফত্তেনগরে কী দেখেছি, আর কী লিখেছি!

তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে: তবু যদি ও'খানে একটা 'টয়'-পিস্তল দেখতে পেতাম তা হলে মনে আর কোন খেদ থাকতো না!

আমিও হাসি, বলি: ঠিক কথা ব্রাদার, সত্যি কী হলো আর কী লিখলাম। সাধে লোকে বলে: Imagination! thy name is Journalism.

শেষ

ফতেপুর সিক্রীতে

শ্রীরেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বাদশাহী অভীপ্সায় জন্ম তব হে পাষাণ-পুরী!
অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি, আরক্তিম, নয়নাভিরাম,
ধন্য তোমা করেছেন কত গুণী, জ্ঞানী, মানী, সূরি,
পাষাণের লীলাপদ্মে আজো শোভে শিল্পীর প্রণাম।

নেচেছে অযুত শিখী হেথা স্তম্ভে অলিন্দে বসিয়া,
চিত্রার্পিত চিতাবাঘ ভ্রমিয়াছে রক্ষকের সাথে।
বীরবল রসিকতা মুগ্ধ, লুব্ধ, করিয়াছে হিয়া,
আল্লাহো আকবর বাণী ধ্বনিয়াছে শুক ঊর্দ্ধ রাতে।

সেলিম চিস্তির এ যে সাধনার পুণ্য নিকেতন,
আকবর বিজয়বার্ত্তা আজো ঘোষে বুলান-দুয়ার।
কৃত্রিম হ্রদের পার্শ্বে "হিরণ-মিনার" সুশোভন
মুঘল গরিমা-কথা স্মরণ করায় বার বার।

তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল জানি।
তবু তব শিল্পরূপ আজো মোরা শ্রেষ্ঠ বলে মানি।

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

১৪

—'তুমি গরীব, একথা কেন আমায় বলেছিলে আগাথা?'

—'গরীবই ত আমি নিকোলাস। যখন প্যারিসে থাকব বেলমঁত থেকে একটি পাই-পয়সাও আমরা পাব না। আঙুরের বাগান সর্বস্ব খেয়ে ফেলে জান ত। বেলমঁতে থাকলে কোন অসুবিধা হবে না—তবে একবার দু'জনে গিয়ে প্যারিসে বাসা করলে—।'

বাগানের চেনা লেবু গাছের গন্ধে-ভরা ছায়ায় বসে দু'জনে কতক ক্ষণ গল্প করলে। প্রিয় মানুষটিকে কাছে পেয়ে কত রকম করে বোঝাতে চাইলে আগাথা যে, কোন দিনই সে তার সঙ্গে ছল-চাতুরী করতে চায়নি। তার প্রেম-বিগলিত গদগদ ভাষা শুনতে শুনতে নিকোলাস আঙুলে পকেটে রাখা আঙটিটি ঘোরাচ্ছে। এখনো দেখায় নি বটে, তবে আপনার জানতে বাকি নেই কি অভিজ্ঞান আজ সে পাবে মনের মানুষটির কাছে।

'তাই বলে ভেবো না যে, তোমার মা আমাদের শুকিয়ে ফেলে রাখবেন। ভালো-মন্দ খাবার কখনো-সখনো পাঠাবেন বৈ কি ছেলে-বৌকে।'

'দরকার কি আছে। তুমি স্পিরিট ল্যাম্পে আলু সেদ্ধ করে দেবে আর আমি তাই সোনা-মুখ করে খাব।'

'সেই ভাল ডার্লিং'—কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটা খাদে নামিয়ে নিলে আগাথা। ডার্লিং কথাটা শুনলে নিকোলাস যে অসন্তুষ্ট হয়, তা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অথচ নিকোলাসের কথার তীব্র পরিহাস মুগ্ধমতি রমণীর মনেই লাগল না।

সেই তরল অন্ধকারে হতশ্রী বাগানটির চারি দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল নিকোলাস। সংসারের এই একটি দিক কিছুতেই সে সুষমা আনতে পারেনি। হাঁস-মুরগীগুলো বাগানের কোথাও একটুখানি ঘাস রাখতে দেয় না। সারা বছর ময়লার গন্ধে বাগানে বসা যায় না। গ্রীষ্মের আতপ্ত রাত্রে যখন বায়ু লেবুগন্ধবহ, তখনও এই বাগানে বসে একটু গা জুড়োতে পারে না নিকোলাস। এই মুহূর্তে আগাথার মনের সব কল্পনা-ভাবনাকে নিজের মুঠির মধ্যে পেয়েছে সে। তার একটি মুখের কথায় এই মেয়েটির মনের পাত্রে এখনি অমৃত উপচিয়ে পড়তে পারে। কিংবা সে নৈরাশ্যের ব্যর্থতার গভীর অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে এই মেয়েটির আকুতিকে। ভালবাসার বুকফাটা তৃষ্ণায় মরণমুখী ঐ মেয়েটিকে একটি মুখের কথায় সঞ্জীবনী সুধা পান করাতে পারে। এই মদির সন্ধ্যায় নিকোলাসের মনে সেই প্রলোভনই বলবতী হয়ে উঠল। বন্ধু গিলসের জীবনে আগাথার কতখানি প্রয়োজন, সে কথা মনেই এল না নিকোলাসের। এই আবছা অন্ধকারে ঐ রূপহীনা মেয়েটির মুখ তার চোখে পড়ছে না, কিন্তু নিকোলাস জানে যে কান্নায় ভেসে যাচ্ছে সেই মুখখানি। অশ্রু কারুর অশ্রু-ভেজা মুখ দেখে সহ্য করতে পারে না সে।

'কেঁদো না আগাথা। তোমার হাতখানি দাও আমায়।'

হাতের আঙুলে নিকোলাস যে আঙটি পরিয়ে দিলে, অশ্রুমুখী নিঃশব্দে তার আস্বাদ গ্রহণ করলে। প্রিয় মানুষটির করতলের তাপ সেই অঙ্গুরীর সঙ্গে তার চেতনায় সঞ্চারিত হল। কী একটা অনির্বচনীয় পুলকে রোমাঞ্চিত হল তনু। বাসনার প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গে মনের বাঁধ চুরমার হয়ে গেল। তার প্রাণে নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ হল এত দিনে। এই মুহূর্তে ঐ কাছের মানুষটির কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন করতে চাইলে আগাথা, নিজের দেহকে আরতি-দীপ করতে চাইলে ওর প্রেমের, কিন্তু আত্মসংবরণ করলে আগাথা। এখন সে যদি তুলে ধরে আপনাকে নিকোলাস তার দান গ্রহণ করবে না। তাই তার কূল-ভাঙা কামনাকে তীরের বাণে বাঁধলে আগাথা—প্রাণের বাসনাকে যন্ত্রের মন্ত্র অন্তর্লীন করলে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমাস্পদের কপালে অধর স্পর্শ করলে আগাথা।

'তোমায় দেবার মত আমার কিছুই নেই।' —বললে নিকোলাস—'তার জন্যে আগেই তোমার মার্জনা চেয়ে রাখছি আগাথা। আমার কাছে তুমি বেশী কিছু যেন প্রত্যাশা করে থেকো না।'

'আমি কিছু চাই না গো! শুধু তোমার কাছে কাছে তোমার ছায়ায় থাকতে চাই। তার বেশী সুখ আর চাই না আমি।'

যেন আত্মভোলা হয়েই বললে নিকোলাস—'কত ধৈর্য ধরতে হবে তোমায়। তুমি জানো না আগাথা, লোকের সঙ্গে মিশ খেতে আমার কত দেরী লাগে। কি জানি আমার মনের ভেতর কি একটা আছে—বলে তোমায় বোঝাতে পারব না আগাথা—সেই যে ভগবানের ছেলে বলেছিলেন না—স্পর্শ করো না আমায়। কি জানি তুমি আমার কথা বুঝলে কি না?'

বুঝলে বৈ কি আগাথা। ব্রীড়াময়ী নত কণ্ঠে বললে—'যত দিন না আমায় তোমার ভাল লাগে, আমি অপেক্ষা করে থাকব। অপেক্ষা আমি খুব করতে পারি। কত মেয়ে

সংসারে কত কি পায় সহজে। তাদের শুধু নিজেদের টুকু হলেই চলে। কিন্তু আমার ত তা নয়। কত ধৈর্য ধরে কত সাধনা করে তবেই না তোমার জীবনে এতটুকু-একটু জায়গার অধিকার পাব আমি। দেরী হোক, তবু একদিন আমিও সুখ পাব জীবনে তা আমি জানি।'

'সুখ'-যেন কত বিষণ্ণ সুরে বললে নিকোলাস—'তুমি ভারী আশাবাদী আগাথা। এ সংসারে সত্যিকার সুখের সন্ধান পায় কে?'

কান্না ঠেলে আসছিল গলায়। নিকোলাসের কাঁধে ঠোঁট চেপে সেই কান্না দমন করলে আগাথা। গভীর আবেগে নিকোলাস এই অবাঙময়ীর নরম পাতলা চুলে ঠোঁট ছোঁয়ালে। কাছে টেনে নিলে আদর করে।

'কী ভাল তুমি গো!'

মনে মনে ভাবলে নিকোলাস—তুমি আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছ। আমি নিষ্ক্রিয় বসে দেখছি। ভাল বৈ কি। ভাল নয় আবার।'

১৫

পরের দিন বোর্দোতে গিয়ে মেরীদের সঙ্গে মিলিত হল আগাথা। গিলসও চলে গেল। বন্ধুকে বলে গেল বালুজে যাচ্ছে। এখন শিকারের মরশুম। এখন না গেলে সব আনন্দ মাটি। বন্ধুকে সে সম্পূর্ণ বানানো মিথ্যে বলে গেল বটে, কিন্তু নিকোলাস যে তার একটি বর্ণও বিশ্বাস করেনি তা ভাল করেই জানলে গিলস। বোর্দোতে গিয়ে নিরিবিলি কোন একটা হোটেলে সাময়িক আস্তানা নেবে গিলস, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। মেরী কি আর সারা দিন নার্সিং-হোমে বন্দিনী হয়ে থাকবে? আগাথার প্রথম চিঠি পেয়ে নিজের অনুমানের নির্ভুলতা বুঝতে পারলে নিকোলাস। আজ-কাল রুগ্না মায়ের সেবা থেকে ছুটি নিয়ে মেরী বেশ অনেকক্ষণ ধরে একলা বাইরে কাটিয়ে আসে। কোথায় যায়—কেন যায়, তা বুঝতে আর বাকী রইল না নিকোলাসের।

মেরীর মায়ের পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। তাঁর শরীরের যা গতিক হয়েছে তাতে তাঁকে আর তাঁর নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। তবে হয়ত শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি আসতে আরো কিছু বিলম্বিত হতে পারে। মৃত্যুপথযাত্রিনীকে মুহূর্তের জন্যও একা ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারে না আগাথা। প্রেমাস্পদকে চিঠির দূতী পাঠিয়ে মনের আকুতি জানায় সে। তার সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রেমতৃষাতুরা চাতকিনীর অধীরতা ফুটে ওঠে। যে অধীরতা তার মনকে নিরাশায় ভেঙে ফেলছে।

আর আগাথার নৈরাশ্যে আশার আলো দেখতে পায় নিকোলাস। তার চিঠিগুলি পড়ে ভাবে, এবারকার ছুটি শেষ হওয়ার আগে হয়ত আগাথা এখানে ফিরে আসতে পারবে না কোন মতেই। মৃত্যুর এই দীর্ঘসূত্রিতার অবকাশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে সে। নিজেকে কত সুখী মনে হল। পৃথিবীর একটি মেয়েমানুষের প্রাণ নিয়ে জীবনের বেলাভূমিতে মৃত্যুর এই খেলায় ব্যস্ত হয়ে আছে আগাথা। সে খেলা যেন না ফুরোয়, ভাবলে নিকোলাস। বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে এমনি ভাবে মেরীর মায়ের ভাগ্যসূত্র যদি অনন্ত কাল ঝুলে থাকে তাহলে আগাথার সঙ্গে আর দেখা না হয়েই সে ফিরে যেতে পারবে প্যারিসে। আগাথাকে বিয়ে করার যে অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে, তার ওপরে আর কিছু করতে চায় না নিকোলাস—ভাবতে পারে না। রোজ রোজ চিঠি পাঠায় আগাথা। সে সব চিঠি খুলে পড়ে নিকোলাস এই আশায় যে, আগাথার ফিরে আসার অজুহাতে সেই দু'টি কথা লেখা থাকবে তাতে। 'সেই রকমই আছে।' কথাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে নাচে নিকোলাসের চোখের সামনে। তা না থাকলেও চিঠি খুলে পড়ার মত উৎসাহ থাকত না তার। চিঠি খুলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সেই পরিচিত কথাগুলি খোঁজে নিকোলাস। দেখে মন তার হাল্কা হয়। তখন ক্যালেণ্ডারের পাতার উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। এখনও কুড়ি দিন বাকি ছুটি ফুরোতে। আরো আঠার দিন। দিনে দিনে ছুটির শেষ হয়ে আসছে—তার পর আবার নতুন করে ক্লাস সুরু হবে।

তার মায়ের মনে আগাথা যে বীজ বপন করে গেছে, তা অঙ্কুরিত হয়ে দিনে দিনে আগাছার মত বেড়ে উঠেছে। মায়ের মনের আশা-আকাঙ্খা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হচ্ছে। সে ত স্পষ্ট চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে নিকোলাস। বেলর্মত। বেলর্মত জমিদারীর অধীশ্বরী হবেন মা। সেখানকার প্রজা আর প্রাণীদের আসল মালিকানা হবে তারই। তার মানে নয় যে, তিনি দাস-দাসী পরিবৃতা হয়ে রাণী-মা হবেন। বড় বড় ভোজ দিয়ে সালঙ্কারা হয়ে বসবেন সভা আলো করে। বড়ঘরের রাণী হবার সখ নেই আর। তিনি ত আর বড়ঘরের ঘরণী নন। তবে এ কথা সত্য যে, ড্রয়িং-রুমের চেয়ে রান্না-ঘর থেকেই সব কিছুর উপর নজর রাখা সহজ। ইতিমধ্যেই তিনি জমিদারীর খুঁটিনাটি সংবাদ নিয়েছেন। বুড়ো বয়সে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হওয়ার পর আগাথার বাবা আর বাইরের কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না—জমিদারীর কিছুই দেখতে পারেন না। যে মেয়ের উপর তার ভরসা সেই মেয়ে হবে আমার বেটার বৌ। তার সুখ-শান্তি, জানিস নিকোলাস, এবার আমাদের হাতের মুঠোয়। তোর সুখের জন্যে তাকে জমি-বাগানের ভালো-মন্দ বুঝে নিতেই হবে। বুঝে চলতেই হবে। তবে অবশ্য তোতে-আমাতে যত দিন না মতান্তর ঘটে। আমার সঙ্গে বাছা তোমায় মানিয়ে চলতেই হবে—কোনো অমিল কোঁদল যেন না হয়, সে তুমি দেখবে। কপাল ফিরেছে দেখে লোকে অনেক কথা কানাকানি করবে। তা করুক তারা। তবে বড্ড দেরী হয়ে গেল রে! কপাল যদি ফিরলই ত এত দেরী হল কেন? বয়স গেল, বুড়িয়ে গেলাম। এত দিনে কি পোড়া বিধাতার মনে পড়ল রে? কিন্তু আমার কোন রোগ নেই—আমি এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছি। ঐখানে গিয়ে এবার আমার বুড়ো হাড় ক'খানা একটু জিরুণি পাবে। এত দিনে জীবনের সাধ-আহ্লাদ একটু মেটাতে পারব।'

আগাথার চিঠি আসে দিনে এক বার। আর এই সব কথাবার্তা সব সময় লেগে আছে তার মায়ের মুখে। দেখে-শুনে নিকোলাসের

মনের স্বস্তি ঘুচে যায়। মনে হয় কোথাও পালিয়ে গিয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অপরাধী যেমন নির্বিঘ্নে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্তে বিরাট নগরের জনারণ্যে ভিড়ে গিয়ে বাঁচতে চায়, তেমনি প্যারিসের চিন্তা নিশি-দিন নিকোলাসের মনকে অধিকার করে বসে থাকে। প্যারিস তার আশ্রয়—প্যারিসেই তার মুক্তি।

আগাথার ধরণই আলাদা। একবার কলম হাতে পেলেই হল, বেহায়া মেয়েটার কোন সংযমের বালাই থাকে না। বন্যার জল যেন তট ছাপিয়ে উদ্দাম হয়ে ছুটে আসছে—ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব-কিছুকে এলোমেলো করে দিয়ে। শুভ্র পাতাটায় কি লিখে ভরে দিচ্ছে সে-সম্বন্ধে একটু সাবধানী নয় মেয়েটা। সাবধানের যে দরকার তাও বোধ করি ভাবে না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হা-ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন লিখতে বসে আগাথা মন তার ইচ্ছা-বিন্দু থেকে এক তিল নড়ে না।

রোজ চিঠি পেলেও দু'-তিন দিন অন্তর চিঠির উত্তর পাঠায় নিকোলাস। দু'-চারটে মামুলি কথা লিখে পাঠায়। তাতে একটুও নিরাশ হয় না আগাথা। নিকোলাসের কাছ থেকে কোন সোহাগ ভালবাসা না পেয়ে পেয়ে এমন অভ্যস্ত সে যে এই সব মধুহীন পানসে উত্তরে তার মন বেদনা বোধ করে না। নিকোলাস ভাবে—একবার প্যারিসে পাড়ি জমাতে পারলে হয়। তখন সপ্তাহে এক-আধ বার খবরের দানা ছড়িয়ে দেবে সে—তাই খুঁটে খুঁটে আগাথার মনের ক্ষিদে মিটবে। আগাথার কাছে যে প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে, তার বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। শপথ ভাঙবে না। যত দিন না সেই আইডিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে, তত দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল সে আগাথাকে। নিকোলাস ভেবে রেখেছে যে সময়ের ব্যবধানে আগাথার মনের আগুন কমবে, উত্তেজনা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে আসবে। তখন একটা নিরুদ্দাম প্রীতিতেই খুসী হবে আগাথা। কলেজের বন্ধুর মত বন্ধুত্বের আসঙ্গেই তৃপ্তি পাবে। মেয়ে-পুরুষে একটা রক্তিহীন মোহনায় সম্মিলিত হবে পরম আনন্দে। বর হিসেবে নয়, প্রিয়বর হিসেবে পেতে চাইবে তাকে।

কিন্তু কি করবে নিকোলাস? সেই 'কি'টা কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না—নিজের মনে তার সুস্পষ্ট ধারণাও করতে পারে না। তবে করবে সে, সে কথা সত্যি। উত্তেজনা হীন নিরুদ্বেগ চিত্তে সে কাজটা সমাধা করবে নিকোলাস রাত্রির অন্ধকারে। নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করতে পারে সে। অনেকটা রক্ত দেওয়ার মত অবিচলিত ঔদাস্য।

এখনও পনের দিন কাটতে বাকি। তার পর দশ দিন—। এই দশটা দিন পার হলেই সে হবে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন তিন ছত্র লেখা চিঠি এল। মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এল একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস।

—'সব শেষ হয়ে গেছে। মেরীর মাকে কফিনে তোলা অবধি এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। তার পর কাল বাদে পরশু দিনই তোমার আগাথাকে বুকের ভেতর পাবে।'

কফির পেয়ালাটা সামনে নিয়ে বসেছিল রান্নাঘরে। ছেলের হাত থেকে চিঠিখানা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলেন মা।

'যাক্ শেষ কালে চোখ বুঁজল মেরীর মা। এই রকমটা যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম। যা হোক, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব আমি।'

সত্যিই এত দিনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

'নিকোলাস কি সত্যি প্যারিসে ফিরবি বাবা? এ সময় সে ভারী বোকামীর কাজ হবে।'

ইচ্ছা করলেই ত সে বিয়ের জন্ত ছুটি নিতে পারে। বিয়েটাও সত্ত-সত্ত সেরে নিতে পারে। মিছিমিছি গাফিলতী করে লাভ কি?

নিরুত্তাপ প্রেত-গলায় মায়ের কথায় জবাব দিয়ে নিকোলাস বললে, ভেবে দেখবে সে। নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখী করে দেখবে এক বার।

রাজপথে বেরিয়ে পড়ল নিকোলাস। আপন মনে সোজা বাইরে কুয়াশা-মলিন সূর্যালোকে এগিয়ে যেতে লাগল। যেন নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যাচ্ছে। যেন কী একটা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে পড়ে গেছে।

বন্দী বিহঙ্গ সে। পিঞ্জর ভেঙে পালাবার পথ নেই। বৃথা চেষ্টা তার। সব তার পর হয়ে গেল, যা ছিল তার আপন, তার আত্মীয়। ঐ পচা কাঠ আর ঝরে-পড়া পাতার গন্ধ। আঙুরের সুবাসে ভুরভুরে বাতাস। শাখান্তরালে উড়ে-যাওয়া ঘাসের কাকলি। অলক্ষিত বিহঙ্গ-পক্ষধ্বনি কানে আসে কিন্তু চোখে কিছু পড়ে না। সেই এতটুকু ছোটবেলা থেকেই শেষ সেপ্টেম্বরের মনোরম প্রকৃতি কত প্রিয় ছিল তার। এখন সে সব তার পর হয়ে গেল। খাঁচার পাখী যেমন লোহার গরাদে মাথা ঠোকে আর বোনের কামনায় কেঁদে মরে নিকোলাসের মন, তেমনি ব্যথায় কাঁদতে লাগল। মনে হল এ মৃত্যু যদি সত্যিকার মৃত্যু হত?

'আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। সত্ত-দেহমুক্ত আত্মাকে বিশ্রাম দাও হে প্রভু।'

সত্ত-মৃতের জন্ত গীর্জার প্রার্থনায় যে অনন্ত বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি থাকে—সে যদি একান্ত সত্য হত? কিন্তু এই পরম শান্তির প্রার্থনায় কোন মহৎ প্রতিশ্রুতি পেলে না নিকোলাস। সেই বিরাট নিরুত্তরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অনন্ত উত্তর পেল—'আলো, অজস্র আলো—আলো আর আগুন।'

হাঁটতে হাঁটতে নিকোলাস চেষ্টনাট বীথিতে এসে উপস্থিত হল। এই নিভৃত নির্জন বনস্থলীতে সে আর গিলস কত দিন ব্যাঙের ছাতা অন্বেষণ করে ফিরেছে।

চিরদিনের স্বভাব যেমন আজও সে যন্ত্রচালিতের মত পা দিয়ে মরা পাতা সরিয়ে দেখতে লাগল। নিজের ভিতরের ক্রিশ্চীয় বিশ্বাসের নিরেট পাথরের বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবার। তার মুমূর্ষু আত্মার পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কোন পথে, এ বিশ্বাসে মন আর শক্তি পেল না। সংসার তাকে কোণঠাসা করে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এ শূন্যতা থেকে আর তার মুক্তি নেই। মোক্ষ নেই।

নিজের হাতে যে বোঝা সে পিঠে তুলে নিয়েছে সে-বোঝা তাকে হাসিমুখে বইতেই হবে। 'শত ধিক্ তোমাদের, কেন না তোমরা দুর্ভার দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ মানুষের পিঠে। তবু একটি অঙ্গুলি দিয়ে সে বোঝার এতটুকু হাল্কা করতে চাওনি।' করুণাময় ভগবান যে দিন এই মহাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন তিনি কি

অপরিসীম ক্ষোভে না জানি বলেছিলেন—দুর্ভাগা তারা, যারা নিজের হাতে নিজের পিঠে ক্রুশ তুলে নেয়—যে ক্রুশ তাদের ধ্বংস করবে—যা বহন করার ক্ষমতা নেই তাদের—যে ক্রুশ তাদের নিজের জন্তে নয়। কত নির্বোধ মানুষ নিজেদের শক্তির অতীত বোঝা মাথায় তুলে নেয়। বোঝার ভারে মুখ গুঁজে মরে। আত্মত্যাগের কথা মুখে বলা কত সহজ। কত সহজ প্রতিশ্রুতির নাগপাশে নিজেকে বেঁধে ফেলা। নিজের ইচ্ছায় লোহার বেড়ি পায়ে পরে লোকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় সেই শৃংখল টেনে টেনে। কিন্তু যে অপরাধী, পায়ের বেড়ি তার শরীরকে বাঁধে মাত্র, তার মনকে ত বাঁধতে পারে না। আর আমি? হা ঈশ্বর! এই মেয়েটা মৃত্যু-দিন পর্যন্ত, হয়ত মৃত্যুর পরপারেও আমার দেহ-মনের উপর অহর্নিশি ভর করে থাকবে…। শুধু শরীর নয়, নিজের আত্মাকেও আমি নির্বোধের মত শৃংখলিত করেছি।

কী দুর্ভেদ্য সংকল্প নিয়ে আগাথা প্রতিটি বাধার প্রাচীর অতিক্রম করেছে। মায়ের অসম্মতির কথা ভেবে নিকোলাস এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল। আগাথার প্রতি মায়ের বৈরিতার অন্ত ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য কৌশলে মাকে সে জয় করে নিয়েছে। এখন আর তার মুখের উপর এ স্বর্গের দ্বার ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিতে পারবে না সে। হায়! হায়! যা করে ফেলেছে কেন সে কাজ করতে গেল সে? নিজের উপর নৃশংস আক্রোশে মুঠি বন্ধ হয়ে এল তার। কে সে? যে তাকে ঘাড় ধরে এমন করে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে? গিলস…তার বন্ধু গিলস? অথচ এমনই ভাগ্যচক্র যে আগাথার সাহায্য ছাড়াই গিলস সিদ্ধি লাভ করে ফেললে। ঐ তার বন্ধু গিলস! মমতাহীন যার মুখের মধ্যে দুটি চোখ শুধু লোভে জ্বলজ্বল করে। রক্ত-মাংসের একটা জীবন্ত পিণ্ড, শুধু দেহ-ক্ষুধার তাগিদে ছুটে বেড়াচ্ছে সংসারের পথে। যে ক্ষুধার নিবৃত্তি তাকে দিতেই হবে। কিন্তু দোষটা কার, ভাবলে নিকোলাস। দোষ তার। দোষ একান্তই তার। চোখের সামনে সর্বক্ষণ একটা আদর্শের প্রতীকমূর্তি তার থাকা চাই-ই। না থাকলে তার বৈরাগী চিত্তের তৃপ্তি হয় না। সেই ধ্যান আদর্শের সামনে নিজেকে বলি দিয়ে সে নৈবেদ্য দেয়। এবারও তাই হল। ভালই হল, ভাবলে নিকোলাস। মূর্খ সে—তার বলি হওয়াই উচিত। সেই তার নিজের হাতে গড়া নিয়তি।

নিকোলাসের প্রকৃতিই তাই। তার অনুভূতি-প্রবণ চিত্ত-সরসীতে বেদনার ঘূর্ণী ওঠে। তবু সেই ঘূর্ণীতেই শেষ অবধি পাক খেয়ে খেয়ে মরবে না সে। তার ভিতর থেকেই একটা চরম মুক্তি সে আবিষ্কার করবেই। একটা সর্বশেষ আত্ম-স্মৃতির হোমাগ্নিতে তার আত্মা হয়ে উঠবে নিকষিত হিরণ্ময়। তার জীবন আগাথার ইচ্ছার ছককাটা পথে চলতে দেবে না সে। যত দিন না আগাথার সঙ্গে মালা বদল হচ্ছে—বিবাহোত্তর জীবনের ঘূর্ণীপাকে বাঁধা পড়েছে সে। যত দিন না তার মা বেলমঁত জমিদারীতে পাকাপাকি ভাবে জেঁকে বসতে পারছেন তত দিন এ জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে পালানোর পথ নেই! এর চেয়ে বুঝি আত্মহত্যা সহজ। মনে মনে সে একটা দুর্ঘটনার চিত্রও আঁকতে চেষ্টা করলে, যাতে হবে তার অপমৃত্যু। এই চিন্তায় তার মনের ক্ষোভও অনেকটা নিস্তরঙ্গ হয়ে এল। কিন্তু গিলসের বিরুদ্ধে একটা দারুণ বিদ্বেষ তার এই নবলব্ধ শান্তির আশ্রয়কে বিচূর্ণ করতে লাগল। যে পথে ছোটবেলা থেকে তারা দুটিতে কত আসা-যাওয়া করেছে, সে পথে একলা চলতে চলতে আজ একথা তার বারে বারে মনে হতে লাগল—'তাদের বন্ধুত্বে সে-ই চিরদিন প্রতারিত হয়ে এসেছে। আকাশমুখী গীর্জার চূড়ার চারি পাশে কুয়াশা আনা-গোনা করছে। সহরের চিমনীর ধোঁয়ায় এখনও সেই কুয়াশা ঘন হয়ে উঠেছে। আশৈশব চেনা এই প্রিয় সহর যেন আজ মৃতের রাজ্য তার জীবনে।

১৬

দুর্গ-পাঁচিলের পাশ দিয়ে বাড়ীর পথে ফিরল নিকোলাস। হঠাৎ পরিচিত কার ডাক শুনে থমকে থামল সে। উপরে চেয়ে দেখল তারই ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে গিলস।

কে বুঝি গাড়ী করে বোর্দো থেকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বাড়ী অবধি যায়নি গিলস—নেমে পড়েছে বন্ধুর বাড়ীর দরজায়। কত কথা তার বলার আছে সে সব কি আর এক সময়ের জন্তে তুলে রাখা যায় না কি?

বালুজে শিকার করার কথাটা সত্যিই বানানো। ওটা মিথ্যা বলে গিয়েছিল গিলস। দুটো হপ্তা বোর্দোতে যা কাটল সে আর পেলো না—স্বর্গ স্বর্গ। তবে ব্যাপারটা একটু বিশ্রীও হয়ে গেছে তাদের ভেতর। মানে, মায়ের নার্সিং-হোমে ত হাঁফিয়ে উঠেছিল মেরী। তার মাও তাকে রাখতে চাইছিলেন না ঐ ভাবে দম বন্ধ করে। বাইরে খোলা হাওয়ায় মেয়েকে পাঠিয়ে দিতেন জোর করে। দু'জনে দেখা করার কোন অসুবিধে ছিল না। মানে, বাগানে বাগানে, ডকের ধারে—সর্বত্র দু'জনে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছে। অবশ্য ষ্টেশনের ধারের ঐ হোটেলটায় কখনো যায়নি তারা।

ক'দিন দিব্যি চলছিল। শত প্রলোভনেও হার মানেনি দু'জনে। জানি ত, এ বয়সে দরজা দিয়ে ঘরে একলা হলে কি হতে কি হবে… আর শেষ অবধি হলও তাই। খুব খারাপ লাগছিল পরে। আমার ত বটেই—মেরীও বলছিল সেই কথা। মনে মনে লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা ছিল না দু'জনকার। মানে একটা অপরাধী ভাব আর কি! ক'দিন পরেই যা ভাল ভাবে পেতাম তা যেন চুরি করে নিলাম। তা ছাড়া ঐখানে ওর মা মৃত্যুশয্যায় আর মেয়ে হয়ে সে কি না ভালবাসার মানুষের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে…অবশ্য তা বললে কি হয়? সুখের পথে অমন কত পাপ গায়ে লেগে যায়।

'তোমায় বলতে আমার লজ্জা নেই নিকোলাস, ঐ আমার জীবনে প্রথম বার, জানো, ঐ সবের পর জীবনে ঐ প্রথম বার আমার মনে হয়েছে…তুমি বুঝতে পারছ ত আমার কথা—মানে যত বার ওসব হয়েছে মনে হয়েছে যেন আর এই মাটির পৃথিবীর মানুষ এই আমি! একেবারে সপ্তম স্বর্গে আনন্দের অমরাবতীতে চলে গিয়েছি। আর প্রত্যেক বার নতুন নতুন—যেন সেই বারই প্রথম। মেরীর অবশ্য ওসব নয়। ও বলে ঐ যে রকম প্রথমার আর কি? অবশ্য ও ত মেয়েমানুষ, ওর প্রথম অভিজ্ঞতা—ও আর বুঝবে কি? তুমি বুঝবে না নিকোলাস—এ একটা কি আশ্চর্য আবিষ্কার। মানে আমায় যেন যাদু করে ফেলেছে ঐ মেয়েটা।

মুখ তুলে তাকালে না অবধি গিলস। চিরদিনের মত আজও নিজের মনে-প্রাণের কথা বলে যেতে লাগল—চেয়েও দেখলে না শ্রোতা তার শুনছে কি না। তার কিছু বলার আছে কি না তাও ভেবে দেখবার স্বভাব কোন দিনই নয় তার। চিরদিনের মতই বন্ধুর নৈঃশব্দের পটভূমিকায় আজও রং-তুলি দিয়ে মনের কথা এঁকে যাচ্ছিল গিলস। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হতে মুখ তুলে তাকাল গিলস। আজকের নীরবতার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেসুরো বাজতে লাগল তার আত্মমগ্ন মনেও। দেখলে বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে নিকোলাস। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখছে দেয়ালের গায়ে। বন্ধুর চুলের গোছা ধরে তার মুখ তুলে ধরলে। তখন যেন আজকের অস্বাভাবিকতার কারণটা বুঝতে পারলে গিলস। তাই অবাক কণ্ঠে বললে—

'কি হল কি তোমার? আগাথার জন্যে এসব হয়নি তা তোমায় আমি আগেই জানিয়ে দিচ্ছি। আগাথার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই তার কাছে তোমার কোন বন্ধনও রইল না এর জন্যে। আমি তোমার কাছে যেটুকু আত্মত্যাগ চেয়েছিলাম তার দরকার হল না, বুঝলে ত? তুমি ত আর সত্যি তাকে বিয়ে করব বলে পাকা কথা দাওনি। যেটুকু কথা হয়েছে তার মধ্যে অনেকখানি ফাঁকির অবকাশ রয়ে গেছে, অনেকখানিই অনির্দিষ্ট। আর তোমার ইচ্ছেও ত ছিল তাই যে দরকার হলে সরে দাঁড়াতে পারবে। তা ছাড়া আর কিছু তোমার মনে থাকতে পারে এ আমি কোন দিন বুঝিনি বা বুঝতে চাইনি।

ঐ হাঙর মেয়েটা তোমায় গিলে খাবে আর আমি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখব, এ তুমি কোন দিন ভেব না নিকোলাস! ও মেয়ে যদি তোমার বৌ হয়ে ঘরে আসে—সে জিনিষটা কি রকম দাঁড়াবে কোন দিন সত্যি ভেবে দেখেছ নাকি তুমি? নিজের কথাটাই খালি ভেবে রেখো না—ঐ মেয়েমানুষটার কথাটাও ভেবে দেখো। তোমায় বিয়ে করা মানে ওর পক্ষে তিলে তিলে আত্মহত্যা করা? কি হয়েছে? তোমায় না পেলে ও মরে যাবে? তুমি ওকে ত্যাগ করলে ও প্রাণে বাঁচবে না? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? ও সব বাক্ চাতুরী আমি ঢের জানি। ও রকম মেয়েছেলের ঝুলিতে ওসব দু-চারটে ভানুমতীর খেল থাকেই। বিশ্বাস করো, ও রকম মেয়েমানুষের রীতি-নীতি আমার ঢের জানা আছে। সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না বন্ধু! মোটে মাথা ঘামাতে হবে না।

তুমি ওকে বিয়ে করলে ওর জীবনে মিথ্যে একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হবে। তুমি হবে ওর কাঁটা,—চলতে শুতে সর্বদা খচ-খচ করবে কাঁটাটা। দু'জনেই মরবে—দু'জনেরই দুর্দশার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে থাক না ও মেরীর বাবার কাছে—স্ত্রী মারা যেতে ভদ্রলোক এখন সত্ত বর সেজে বসেছে। কি ভাবছ তুমি? তোমার সঙ্গে একটা মুখের কথা দেওয়া আছে তাই—নইলে দেখতে সোজা ঐ বুড়োটার পাশে কনে সেজে দাঁড়াত তোমার আগাথা। সারা শহরে ত এখন ঐ কথাই কানাকানি হচ্ছে। তুমি কিছু শোননি? আশ্চর্য করলে যে বন্ধু! বোধ হয় তুমিই কানে তুলো দিয়ে আছ।

অবশ্য ওদের মধ্যে কিছু একটা ঘটাঘটি হয়েছে তা আমি বলছি না। কিন্তু হাওয়া যেমন চলছে তাতে বুঝতে কিছু বাকি নেই লোকের। এই যে 'বেলমণ্ডে'র মস্ত বড়ো জমিদারীটা এক কথায় ঐ মেয়েটার হাতে তুলে দিয়েছে সে বুঝি নিছক ভালমানুষী বন্ধুত্বের দায়ে?

আগাথার ওপর একটু মমতা পড়েছে বুড়োটার। পড়লে আশ্চর্য হবার খুব কিছু নেই। সব মেয়েমানুষেরই জীবনে একবার ভালবাসার সুযোগ আসেই—তা আগেই হোক আর পরেই হোক। বুড়োটা সব কাজে ওর বুদ্ধি নেয়—পরামর্শ শোনে। সব সময় দু'জনে বসে আছে—কত রকম গালগল্প হয়। কাগজে কি পড়ে, আগাথার কাছে সব গল্প করে শোনায় মেরীর বাবা। আগাথার মতে এখানকার একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ মানুষ হলেন উনি—নিতান্ত গেঁয়ো ভূত নয়।

এই ব্যাপারটা নিয়েই, তুমি অক্লেশে জল ঘুলিয়ে দিতে পারবে। রীতিমত একটা জোরালো যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে আগাথার কাছে। বলতে পারবে অবিশ্বাসের কাজ করেছে আগাথা।

তোমার মান-সম্মানের হানি করে দিয়েছে আগাথা সে আমি বুঝতে পারছি নিকোলাস, কিন্তু খুব ক্ষতি তোমার হয়নি এখনো।

তুমি কিছু ভেবো না। কাল সন্ধ্যেবেলা বাবার গাড়ীতে করে তোমায় আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে তখন থাকবে প্যারিসে যখন ঐ আগাথা মেরীর মায়ের কফিন নিয়ে ভোর্থে এসে উপস্থিত হবে। এসে দেখবে পাখী পালিয়েছে। তারপর প্যারিস থেকে গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখে পাঠাবে তাকে। আমি ত থাকছি এখানে। বেশী ভেঙে পড়লে সান্ত্বনা দিয়ে একটু সামলে দেবো খন।

অবশ্য তোমার মায়ের কথাটা ভাববার। বুড়ো মানুষের মনটা ভেঙে যাবে। তা সে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে খন। বলবে, প্যারিসে কিছু কাজকর্ম আছে, সেরে না এলে বিয়ে করা অসম্ভব তোমার পক্ষে। মানে ঐ রকম একটু কিছু বানিয়ে বললেই হবে। তারপর প্যারিস থেকে তাঁকেও একখানা চিঠিতে সব বুঝিয়ে লিখে দেবে। মায়ের সুখের জন্তে তাই বলে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে পারো না ত তুমি!

আগাথাকে নিরাশ করার চেয়ে বরং নিজের জীবনটা নষ্ট হতে দেবে! কি পাগলের মত বকছ তুমি নিকোলাস? কি ভাবো তুমি? আগাথার বুড়ো বাবা যতই অথর্ব হয়ে পড়ুক না কেন সে কখনো এরকম ব্যাপার সহ্য করবে না। অমন মেয়েকে এক হপ্তার মধ্যে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবে। ওর বাবাকে সারা জীবন ধরে বাবা দেখছেন। ও যে কি চীজ তা আমি ভাল করেই জানি। নিজের ভোগ-জাতে কেউ এসে ভাগ বসাবে মুখ বুঁজে সে অপমান সহ্য করার মানুষ সে নয়।

গিলস যত কথা বললে তার মধ্যে ক'টা হাঁ হাঁ ছাড়া কথা বলার অবকাশ পেলে না নিকোলাস। এত কথার পরেও বন্ধু গিলসের সুপরামর্শ সে যেন প্রাণ ভরে মেনে নিতে পারলে না। বার বার নিজের ওপর জোর দিতে লাগল।

শুনে রাগে গরগর করতে লাগল গিলস। বললে—'ছাড়ো ত ও সব। আমি যেমন বলছি তেমনি করো। ও মেয়েকে মন থেকে সরিয়ে ফেলো। ও ব্যাপারের ইতি করে দাও।'

তাই করবে। ইতি করেই দেবে। ভাবলে নিকোলাস। ভেবে মন তার অনেক হাল্কা বোধ হল। এত দিনে তার ভাবনার পঞ্জীভূত মেঘের অন্তরাল থেকে অলদর্চি রেখার ইংগিত পেল সে। আলো এল। কুয়াশার তমিস্রা ভেদ করে তার আকাশে সূর্য দেখা দিলেন। এ রাত্রির অন্ধকারকে কোন দিন বুক দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফেলতে পারত না নিকোলাস। বুকের ওপর চাপা হিমালয়ের ভার টলাতে পারত না একলা। গিলস আজ প্রিয়বন্ধুর কাজই করলে। সে তাকে বাঁচালে। মৃত্যুর পঙ্ক থেকে নবজীবনের আলোয় টেনে তুলে নিলে।

তবু নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল নিকোলাস। বললে তার ত বিবেক বলে একটা বস্তু আছে।

একদিন আগাথাকে উদ্দেশ করে যত জোরে গিলস বলেছিল যে তার হৃদয়ের বালাই নেই, ততোধিক সশব্দে ফেটে পড়ল আজ বন্ধুর কাছে। বললে—'বিবেকের বালাই নেই আমার।'

কয়াজের কলে আজ রাত্রে যতক্ষণ না বাঁশীর ভোঁ দিল, ততক্ষণ অবধি বিবেকের বৃশ্চিক দংশন সহ্য করলে নিকোলাস। এতক্ষণে খাবার সময় হল।

আজ সারা সকাল নিকোলাসের মা অস্থির হয়ে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। যেন বন্ধ খাঁচায় মধ্যে একটা প্রাণী মনের অদম্য কৌতূহল নিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে। মায়ের পায়ে হাল্কা চটি। আসছেন যাচ্ছেন শব্দ হচ্ছে না। তবে ছেলের ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে কান পেতে পেতে কিছুই শুনতে পেলেন না তিনি। দু' একবার আগাথার নামটা শুনতে পেলেন যেন মনে হল।

ঐ গিলস ছোকরাটি যে তার বাঁধা ভাতে ছাই দিতে বসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই নিকোলাসের মায়ের। অবশ্য গিলসকে দোষ দিতে পারেন না তিনি। কাল সারা রাত ঐ দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হয়নি। বাতি জেলে দিয়ে এসেছেন ঘরে। অথচ কাল সন্ধ্যায় যে প্রত্যাশায় মন ছিল রোমাঞ্চিত আজ তাই যেন বুকের মধ্যে খচ-খচ করে বিঁধছে। কি জানি, একটা মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছে না ত তার নিকোলাস। নিশ্চিত করে কেউ কি কিছু বলতে পারে? হয়ত বেলমঁতে গিয়ে তার চিত্তে সুখ থাকবে না। তখন কি হবে তার ভাগ্যে? নিজের বাড়ী যে তার হাতের মুঠোয় পাবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? শ্বশুর এই সম্পত্তিটুকু করেছিলেন। সেই বাড়ী এখন নিকোলাসের ভোগ দখলে—সেই সঙ্গে বাৎসরিক কিছু আয়। ছেলে তাও এনে মায়ের হাতে তুলে দেয়। এমন স্বভাব-সরল ছেলে এইটুকুই যে তার পৈত্রিক সম্পত্তি তা যেন বুঝেও বুঝবে না।

আর এ কথাটাই বা কে বলতে পারে যে, ঐ আগাথা মেয়েটারই লোভ নেই এই সম্পত্তি বাড়ী ঘরদোরের ওপর? হয়ত এই বিয়েতে রাজী হওয়ার উদ্দেশ্যই তাই। আবার তখুনি আপন মনে মাথা নাড়লেন। তা হবে কি করে? ওর নিজেরই বেলমঁতে অত বড় সম্পত্তি। তবে একটু চোখ-কান খুলে রাখা দরকার। ও মেয়েকে বৌ করে নিয়ে এসে ওর কাছে কিছু শিখে পড়ে নেবো আমি।—ভাবলেন নিকোলাসের মা।

সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন চার হাত এক করে দিতে পারলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। সাঁলোদের ঐ ছেলেটাকে পথ থেকে সরাতে না পারলে তার সব সাধে বালি পড়বে। বরং টেলি করে আগাথাকে এখানে ডেকে পাঠালে হয়। 'শীগগির চলে এসো'—এর চেয়ে অল্প কথায় অবশ্য আর টেলি পাঠানো যায় না। তাই পাঠাবেন তিনি আগাথাকে। ডাক-ঘরের ঐ নতুন পোষ্টমাষ্টার মেয়েটার একটু সন্দেহ হবে বটে, তবে সে নতুন আমদানী এখানে। এখানকার সহরে জীবনের হালচালের কোন খবর রাখে না।

বিকেল বেলা রান্নাঘরে তরকারী রান্না করছিলেন। মুখ তুলে দরজায় আগাথাকে দেখে এক রাশ বিস্ময়ে চোখ ভরে উঠল।

—'এরি মধ্যে?'

হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ। বাঁ গালে কালো মতন একটা কিসের কালো দাগ লাগা। ছোট টুপির অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্তে মাথার চুলগুলো যেন আছাড়ি পাথাড়ি করছে।

—'ওপরে আছে?'

জবাবে নিকোলাসের মায়ের সমর্থন পেয়ে বুকটা অনেক হাল্কা বোধ হল আগাথার। আজ সব কিছুর জন্ত প্রস্তুত হয়েই সে

এসেছে। তার ছক-বাঁধা পরিকল্পনার কোথাও কোন ফাঁক রাখেনি সে। থাকলেও মনের জোরে তা ভরাট করে নেবার কৌশল তার করায়ত্ত।

মায়ের কথার বিরাম নেই। সন্ধ্যার দিকেই যাবে নিকোলাস। তাকে নিবারণ করতে আগাথা প্রায় পুরো দু'দিন হাতে পাচ্ছে। যদি পারে সে, তার হাত-যশ। তবে এমন কিছু ভাবনার নেই তার? প্যারিসে যাচ্ছে তবে ফিরছে ত?

—'যাবে আর আসবে আর কি?'—বললেন মা।

—'তাই বলেছে বুঝি আপনাকে?'

—'বলেছে ত তাই—তবে সে না বলারই মতন বাছা। বললে প্রফেসারের সঙ্গে দেখা না করে তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ছুটি নিতে হবে—কাগজপত্তর সই-সাবুদ আছে। ওখানে কাজ-কর্মও কিছু সেরে আসতে হবে।'

—'এই সব কৈফিয়ৎ দিয়েছে বুঝি আপনাকে?'

—'তোমার কথাবার্তা আজ বড়ো হেঁয়ালি বোধ হচ্ছে, বাছা! সব কথা কিছু খোলসা করে বলেনি আমায়। তবে আমার মনে হয় এই রকম—'

—'সেই কথাটাই ত জানতে এসেছি। জানতে পাচ্ছি ও এখন।'

—'জানতে এসেছ? তোমার সবই যেন কেমন জোর জবরদস্তি। রান্নাঘর পরিষ্কার করছিলেন। মুখ তুলে দেখলেনও না তার দিকে তাকিয়ে। বললেন—'চাওয়াটাই বড়ো নয় আগাথা সংসারে—হওয়াটাই বড়ো—'

যেন কত মিষ্টি গলায় বললে আগাথা।

—'ও কথা আমায় শোনানোর মানে কি?—'

—'মানে? মানে কিছুই নেই। আমার দিকে অমন করে চেয়ে দেখছ কি বাছা? আমার নিকোলাসকে আমি যেমন জানি তেমন আর কে চেনে? সে ত আমারই পেটের ছেলে। অমন মিষ্টি স্বভাবের ছেলে একালে হয় না। তবে কি জানো, তবুও ত পুরুষ মানুষের শরীর—রাগ-ঝাল ত থাকবেই।'

এর পর অসহ্য বোধ হল আগাথার। রাগ দেখিয়ে বললে—'নিকোলাসকে আর আমায় চেনাতে হবে না আমাকে। একলাই আছে ত?'

একলা বই কি। জিনিষপত্র বাঁধা ছাঁদা করছে। যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে আর কি? যা কিছু ওর সম্পত্তি সবই নিয়ে ত চলল। এই বাচাল মেয়েটা যে তার মাতৃত্বের দাবীকে ছাপিয়ে উঠতে চায় সেই আক্রোশে যোগ দিয়ে বললে—'যে ভাবে যাচ্ছে বোধ হয় আর ফেরার ইচ্ছা নেই।'

হাতের কাজ থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলে নিকোলাসের মা। ঘর দুয়ার শূন্য—আগাথা ততক্ষণে সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে।

'ঐ ডোবা অবধি নিয়ে যাবে বাছা। ঘোড়া তোমার জল খাবে না। মরে গেলেও না।'

কান পেতে শুনলেন ওপরের ঘরের জিনিষ নাড়াচাড়ার শব্দ। চড় চড় করে একখানা চেয়ার সরে গেল। তার পিছনে একটা ট্রাঙ্ক বুঝি হটর হটর করে সরালে কে। তারপর কথা কাটাকাটির আওয়াজ আসতে লাগল। তখন মুরগীর মত এক পাশে হেলে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন তিনি।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ময়ূরাক্ষী

(তিলপাড়া ব্যারেজ দর্শনে)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিদাঘে শীর্ণা সিকতায় লীনা, যেতে সাড়া নাহি দিয়া,
বরষায় তুমি হইয়া উঠিতে অতি দুর্দ্দমনীয়া।
ডুবায়ে চুবায়ে সব
সারা হত উৎসব,
চঞ্চলা তুমি কোথায় ছুটিতে ধুয়ে-মুছে সব নিয়া।

মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে তোমারে হাতে শাঁখা, পায়ে মল্
শোচ্যা তো নও প্রিয়দর্শনা—রূপ করে ছল্-ছল্।
নীরস এ ভূমি মাঝ
তৃপ্তি পেলাম আজ,
অসময়ে শুনি তোমার ভবনে সলিলের কল-কল।

নহ কাপালিক-কন্যা তো আর চলে না সে ভাবে চলা,
'লোহা পরি' তুমি গৃহিণী হয়েছ হে কপালকুণ্ডলা!
হইয়াছ রমণীয়
বহু পরিজন প্রিয়,
শিখেছ এখন বিত্তবতী গৈরিক অঞ্চলা।

ভুলে যাও সেই উচাটন ব্রত, ভুলে যাও বালিয়াড়,
সংসারী সাজো সংসার কর হইয়াছ সংসারী।
আনো ডাক দিয়া তুমি,
শুভ বায়ু মৈশুমী,
তৃষিত ভূমিকে নন্দিত কর দিয়া সঞ্চিত বারি।

যোগিনী হওয়ার গৌরব আছে লয়ে উদাসীন মন,
গৃহেতে তোমার কল্যাণময়ি গড়ে তোল তপোবন।
সব আশ্রম হয়ে
আশ্রয় পাবে তায়,
স্নিগ্ধ হইবে যাত্রার পথ দুই কূল সুশোভন।

বদল হয়েছে অনেক, তবুও—দেখে সহজেই চিনি,
অন্নপূর্ণা গড়িছে, কে ভাঙি' সে মহিষমর্দ্দিনি!
হয়েছে তোমার দান
সংযমে মহীয়ান,
সবার উপর মানুষ সত্য তুমি জানাইছ দিনই।

বিপর্যয়

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

এক

পুরানো মানুষের মন যেন পুরানো স্মৃতির মিউজিয়াম্। পুরানো বাড়ীর ইট-কাঠে কোনো মন আছে কি না জানি না, কিন্তু এক একটা বাড়ী থাকে পুরানো দিনগুলোকে আঁকড়ে। রায়েদের দু'শো বছরের পুরানো বাড়ীটা ভূতে-পাওয়া। তার পাঁজরার ভেতর থেকে আজো কোনো কোনো দিন অকারণে ধূপধুনোর গন্ধ ছোটে, কোথাও যেন কার চাপাকান্নার শব্দ শোনা যায়। কোথাও নর্তকীর নূপুর-নিক্কন, কোথাও মদের উগ্র গন্ধ। বাইরে আজ এ সবের কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অতীত যেন বর্তমানে তার ছায়া-দেহ ক্ষেপণ ক'রে চলেছে।

আমি ও-বাড়ীকে আশৈশব চিনি। শুনেছি, ও-বংশের কর্তাদের সঙ্গে আমাদের কর্তাদের অনেক লঙ্কাকাণ্ড, অনেক খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেছে। রায়বংশকে জব্দ করবার সর্বনেশে নেশায় মেতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা লক্ষ্মীর শতদল পদ্মের স্বর্ণ-পাপড়ীগুলি একে একে উন্নচণ্ডিকার হোমানলে আহুতি দিয়েছিলেন। শেষে হৃতসর্বস্বা লক্ষ্মীকে পেচক বাহনের স্কন্ধে চেপে পালাতে হল। তখনো আমি ভবিষ্যতের গর্ভে। প্রাক্তন কর্মফলের দুর্ভাগ্যে যখন জন্মালাম, প্রাচীন গৌরবের শীর্ণ নিদর্শন অবশিষ্ট ছিল তখন আমাদের প্রাসাদে জীর্ণ ইটের স্তূপ। রায়েদের কাছে জ'মে-ওঠা যে একগাদা ঋণের স্তূপটি ছিল সেটি তেমন শীর্ণ নয়। ওঁদের সৌজন্য বলতেই হবে, দ্বিতীয়টির পরিশোধে প্রথমটি কেড়ে নিয়েই রেহাই দিলেন। আদালতের ঢোল-সহরতাদি যখন বিধি মতেই নির্বাহ হল, আমরা তার পূর্বাহ্নে বিধবা মায়ের হাত ধরে আমাদের নিঃসন্তান কুলপুরোহিতের খোড়ো ঘরে এসে উঠেছি। মা সেদিন কেন যে চোখে আঁচল চেপে কেঁদেছিলেন, তার মানে বুঝিনি। পুরানো ভাঙা ইটের পাঁজার চেয়ে আমার কাছে ছোট ঝকঝকে খোড়ো ঘর তো দিব্যি ভালো লেগেছিল!

পরিহাসপ্রিয় বলে বিধাতার প্রসিদ্ধি আছে। তাই বংশমর্যাদার চরম অসম্মান ঘটিয়ে আমি হলাম কলকাতার সওদাগরি অপিসের

মেয়ে আভার সঙ্গে হল আমার বিবাহ। সে আজকের কথা নয়, সে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাকে বিবাহ বলব, পরিণয় বলা চলবে না। 'পরিণয়' বলতে যে কাব্যকল্পনার ঘোড়-দৌড় বোঝায়, তা নয়; বিবাহ বলতে যে বাস্তব ছ্যাকড়া-গাড়িত্ব বোঝায় তাই। এই রূঢ় বাস্তব সম্ভব হল এই জন্যে যে, রায়েদের অবস্থা তখন অনেকটা পড়ে এসেছে, নইলে বর হিসেবে খুব যে বরণীয় ছিলাম না, একথা বললে কেউ আমার বিনয় বলে ভুল করবে না। আমার মা অবিশ্যি খুবই খুশি হয়েছিলেন, ব'লেছিলেন, "সব হারিয়েও আমাদেরই হল জয়, লক্ষ্মী এলেন ঘরে।" আর একটা জয়ের চিহ্ন আমার মায়ের চোখে পড়েনি। আমাদের পরিত্যক্ত পোড়োবাড়ীর ভিটায় যে সব সরীসৃপ বাস করত, তারা কৌলিন্যে আমার সমতুল্যই বোধ হয় ছিল। কিন্তু তাই বলে আমার মতো নির্বিষ কেরাণী ছিল না। মহামান্য আদালতের অমর্য্যাদা ঘটিয়ে তারা দখল ছাড়ল না, কোঁস্ করে উঠল। অত বড় যে রায়বংশ আর অত বড় যে আদালত, তাঁদের সমবেত শক্তি এই মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থদের কাছে ব্যর্থ হল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যগগনে যখন মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থদের জয়গান বাজে, ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগের আমার পোড়োবাড়ীর আণ্ডার-গ্রাউণ্ডওয়ালাদের শৌর্য-বীর্য স্মরণ ক'রে আমি শ্রদ্ধায় নতশির হই।

রায়েদের কর্তাব্যক্তিরা সবাই গত হয়েছেন। এখন তাঁদের বংশে কেবল দুই পিতৃমাতৃহীন অবিবাহিত সহোদর বর্তমান, জ্যেষ্ঠ হেমন্ত, কনিষ্ঠ বসন্ত। হেমন্তকিরণ অতিশয় ক্ষীণদৃষ্টি এম, এ, এবং পি-এইচ.-ডি, সদর ও অন্দরের মাঝামাঝি পিতামহদের আমলের চলনঘরে লাইব্রেরি স্থাপন ক'রে বইয়ে ঠাসাঠাসি আলমারির পাশে স্থান ক'রে নিয়ে বাস করেন। আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান দিয়েও বুঝতে পারি পড়াশোনার বহর তাঁর অসামান্য। অনেক কষ্টে নোট মুখস্থ ক'রে পাশ করা আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষ বাবু এক বার পল্লীগ্রাম দর্শন করতে এসে কোন্ এক শিলালিপির পাঠোদ্ধার নিয়ে হেমন্তের সঙ্গে বিতর্ক জুড়েছিলেন। নোট-মুখস্থ-করা বিদ্যার জাহির দেখে হেমন্ত একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। প্রচুর মিষ্টান্ন ও জয়গৌরবে পুষ্ট হয়ে অধ্যাপক যখন উঠে দাঁড়ালেন, আমার স্ত্রী আভা তখন হেমন্তের প্রকাণ্ড ডেস্কের কোন্ এক খোপ থেকে কি একটা বার ক'রে অধ্যাপক মশায়ের সামনে ধরলেন। সেটা ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপকের স্তুতি, হেমন্তের লেখা ঐ শিলালিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প'ড়ে। আমাদের অধ্যাপক মশায়কে তখন পালাতে হ'ল চাদর গুটিয়ে, কিন্তু হেমন্ত করলেন আভাকে তিরস্কার। বললেন, "কী দরকার ছিল এ সব জাহির করবার! আমি তো চুপ করেই ছিলাম।" তাঁর স্বভাব ঠিক ঐ রকম। মান-সম্মানে লোভ নেই, হেরে যেতে পারলেই বেঁচে যান।

শিলালিপির লুপ্তোদ্ধার, মোহেন-জো-দারোর প্রাগার্য সভ্যতা, এই সব নিরীহ বিষয়ের আলোচনায় পুলিশের চোখ পড়ে না। কিন্তু মুস্কিল হল, হেমন্ত যখন কম্যানিজমের পাঠ করলেন শুরু।

প্রবন্ধ বার হতে লাগল নানা দেশী-বিদেশী কাগজে। হেমন্ত দেখাতে চেষ্টা করলেন কম্যুনিজমের এমন কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই যা অন্ততঃ ভারতীয় ভাবধারার কাছে নতুন, রাজর্ষি জনক যার আদর্শ পুরুষ। উত্তরে কোন্ এক ইংরাজ লিখলেন, ভারতীয়ের স্পর্দ্ধা, জাত-পাত যার নাসিকার নিশ্বাস সে আবার সাম্যের আদর্শ আনে তার ঐতিহ্য থেকে। হেমন্ত জবাব দিলেন ভারতবর্ষ জাতিভেদে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজদের মতো স্বার্থান্বেষী বিদেশীদের সংঘাতে। শেষে কোথাকার কোন্ ভক্কী না কক্কী এলেন হেমন্তের মতের সমর্থনে, লিখলেন "হিউএন্থ্‌সাং-এর কাছে ভারতবর্ষ তার সর্বস্ব উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, কেন না, হিউএন্থ্‌সাং বিদেশী হলেও তস্কর ছিলেন না, ছিলেন মহাপুরুষ। আর কালাপাহাড়ের কাছে ভারত সব দ্বার রুদ্ধ করেছিল, কেন না কালাপাহাড় স্বদেশী হলেও তস্কর। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্যে অবস্থাবিশেষে জাতিভেদ প্রথা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, যেমন হয়েছে আজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজদের।" আর যায় কোথা! কলকাতার সি, আই, ডির কানাকানি-বিভাগ স্থানীয় থানার কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, হেমন্তর ওপর চোখ রাখতে আর থানার কর্মচারীরা অনাবশ্যক ভুল ইংরেজীতে সদরে রিপোর্ট পাঠাতে লাগল রায় জমিদার হেমন্তের বিরুদ্ধে। মহামান্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সজাগ হতে বললেন। ভাগ্যিস্ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ইংরেজ, নইলে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হলে গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরুতে বিলম্ব হ'ত না। ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন হেমন্তের বাড়ী আতিথ্য স্বীকার ক'রে, গোপন উদ্দেশ্য নিজে সব দেখে-শুনে যাওয়া। হেমন্তকিরণ ভারি খুশি, সাহেবকে লাইব্রেরি-ঘরে করলেন নিমন্ত্রণ। প'ড়ে শোনাতে লাগলেন তাঁর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ। পাঠশ্রবণরত সাহেব মুগ্ধদৃষ্টিতে রইলেন চেয়ে, আর হেমন্ত কেবলই বলেন, "এক জন যথার্থ বিদ্বান্ পেয়ে বাঁচলাম। এ পাড়া-গাঁয়ে এমন একটা লোকও পাই না যার সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে বাঁচি।" সাহেব আর যাবার নামটি করেন না, হেমন্তর প'ড়ে শোনানোও আর শেষ হয় না। এদিকে সদর থেকে আসতে লাগল জরুরি ফাইল, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। অবশেষে ফিরে যেতে হল সাহেবকে। চশমা মুছতে মুছতে হেমন্ত বললেন, "তুমি চলে গেলে আমার খুবই একলা লাগবে, মিষ্টার প্রিয়ারসন্। আবার এদিকে যদি সফরে আসো, আমার এখানে এসেই থেক।" সাহেব বললেন, "অক্সফোর্ডে আমার অধ্যাপককে দেখেছি, আর এখানে আপনাকে দেখলাম, স্যর! বিভিন্ন দেশের মানুষ এমন এক ধাতুতে গড়া হয় জানতাম না। কি আশ্চর্য স্যর, কি আশ্চর্য!"

সার্চওয়ারেণ্ট, গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রভৃতি আবশ্যকীয় ফর্মে বাক্স ভর্তি ক'রে থানার বড় দারোগা বাবু সদরের বৈঠকখানা-ঘরে ঝাড়লণ্ঠনের নিচে টানাপাখায় হাওয়া খেতে খেতে গদি-আঁটা সাবেকি আমলের সোফায় এ কয় দিন আরাম করছিলেন, কোন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের হুকুমে ধর-পাকড়ের ডাক হয় সেই আশায়। হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন্ন প্রস্থানের খবর শুনে স্ফীতোদরকে কষ্টে-স্রেষ্টে খাকিকোট এবং চামড়ার পেটিতে জড়ালেন। তারপর হাত কাঁপিয়ে দুই-পা ঠুকে খটাস-খট্ শব্দে সেলাম ক'রে মোটরে উঠতে উঠতে তাঁর দিকে বক্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাহেব বললেন তাঁর নিজস্ব বাংলায়, "হালো ড্রোগা (দারোগা) তুমি একটি পাকা বোড্‌মাস্ (বদমাইস্) বেকুটি আছ। এইখানে সময় নষ্ট না করিয়া তুমি চোর ঢরিটে যাও। কি নিমিট্ট আলাপ করিটেছ?"

সাহেবের মুখে চোস্ত বাংলা শুনে মর্মাহত বড়বাবু ফিরে এসে ছোটবাবুকে বললেন, "বুঝলে বিপিন, এই সব আহাম্মক সাহেব ব্যাটাদের বোকামিতেই একদিন বৃটিশ-সাম্রাজ্য রসাতলে যাবে।"

প্রবীণ দারোগার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়নি। ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্য স্বেচ্ছায় রসাতলে গেছে, কিন্তু সেটা যে ঠিক বোকামি, তা আজো প্রমাণিত হয়নি।

তা সে যাই হোক্। রায়েদের নায়েব-গোমস্তার দল দারোগাবাবুর 'হেরি সে ভুবন-গরব-দমন অভিমান বেগে অধীর পবন' অতিশয় 'উচাটন' হয়ে রইল, না জানি কখন কি অঘটন ঘটে। পুরানো আমলের কর্তারা হ'লে নরমে-গরমে দারোগাকে কেমন করায়ত্ত ক'রে রাখতে পারতেন সে কথা আলোচনা ক'রে হেমন্তকে একদম নিস্তেজ ও নির্বীর্য স্থির ক'রে ফেললেন। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন এমন সদয়, তখন এ সদয় ভাব থাকতে থাকতেই হেমন্তর ধড়াচূড়া প'রে এখনি সদরে যাওয়া উচিত এবং রাজাবাহাদুর খেতাবটা যাতে আগামী বছরেই পাওয়া যায় খুব তদ্বির ক'রে রাখা উচিত। এ সকল বিষয়ে হেমন্তর কোনো উৎসাহই নেই দেখে তাঁরা এটাকে বুদ্ধিহীনতার নিদর্শন বলেই ধরে নিলেন। আলোচনাটা বড়ই মুখরোচক ব'লে শীঘ্র ছড়িয়ে পড়ল, আমরাও শুনলাম।

আমি যখন নিভৃতে এই নিয়ে হেমন্তকে অনুযোগ করলাম যে, অন্ততঃ নায়েব-গোমস্তাগুলোকে ডেকে ধমকে দেওয়া দরকার তাদের এ অনধিকার-চর্চার জন্যে। তিনি বললেন, "ভাবলই বা আমাকে নির্বোধ, ভাবলই বা নিস্তেজ। তাই বলে শুধু শুধু রাগ দেখাতে হবে তাদের ওপর? তেজ আর রাগ কি এক বস্তু নাকি হে?"

আমি বললাম, "না তা নয়, তবে মাঝে মাঝে ফোঁস্ করতে হয় বৈ কি।"

"শুনেছি ও মহাপুরুষবাক্য, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ওরা ফোঁসেরও অযোগ্য। তৃণখণ্ড যদি বলে সূর্যের তেজ নেই, তাহলে তাঁকে মাঝে মাঝে লোকের খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে বেড়াতে হয়!"

তর্ক নিষ্ফল দেখে চলে এলাম।

এমনি ধরণের মানুষ হলেন হেমন্ত। আর তাঁর ছোট ভাই বসন্তকিরণের স্বভাব হল ঠিক উল্টা। লেখাপড়া বেশি দূর এগোয়নি, সকল রকম দুঃসাহসিক কাজে পরিপক্ক। অপরিসীম গায়ের জোর, অনমনীয় তেজ, বেপরোয়া গোঁয়ার প্রকৃতি। চেহারাতেও দুজনের পার্থক্য। হেমন্ত যেন স্নিগ্ধ আলো, দাহ নেই, জ্বালা নেই, স্বতঃ-উদ্ভাসিত। আর বসন্ত যেন রাঙা আগুন, মাথার চুল থেকে গায়ের রং পর্যন্ত সবই লাল্‌চে। বাড়ীতে সে প্রায় থাকেই না, হয় ফুটবলের দলবল নিয়ে কলকাতা-বোম্বাই-লক্ষ্ণৌ ক'রে বেড়াচ্ছে, নয়তো শিকার করতে গেছে কোন্ দুর্গম অরণ্যে। যখনি বাড়ী ফেরে, অক্ষত অঙ্গে ফেরে না। হয়তো

হাত ভাঙা, নয়তো হাঁটুতে বা মাথায় ব্যাণ্ডেজ। অন্তঃপুরের দূরসম্পর্কীয়ারা নিজেদের ছেলেপুলে আহার-বিহার এবং কলহ নিয়ে এমনি ব্যস্ত যে এ দুভায়ের কে বাঁচল কে মরল দেখবার ফুরসৎ নেই। লক্ষ্মীছাড়া সংসার যাকে বলে, এ একেবারেই তাই।

দু'ভাইকে নিয়ে আভার ভাবনার অন্ত ছিল না, কিন্তু নিজের দাস-দাসীহীন অনটনের সংসারে উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর ভায়েদের সংসারের খোঁজ-খবর নেবার সময় খুব কমই পেতেন। তাঁর আসল ভাবনা ছিল ছোড়দা বসন্তকে নিয়ে। অমন অবুঝ, অমন গোঁয়ার, অমন বদ্‌রাগী অথচ অমন স্নেহশীল মানুষকে লোকে প্রায়ই ভুল বোঝে, তাই বসন্তের জন্যে আভার ভাবনার অন্ত ছিল না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রোদ্দুরে চুল ছড়িয়ে বসেছেন, ও বাড়ীর দাসী এল। জিগেস করলেন, "কি গো রাধুর মা, খবর কি? বাবুদের খাওয়া-দাওয়া চুকেছে?"

"না দিদিমণি! বড় দাদাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে। ছোট দাদাবাবু খেতে বসেছিলেন, রাগ ক'রে এঁটো হাতেই টমটম্ হাঁকিয়ে কোথায় চলে গেলেন।"

"ও মা সে কি? কেন?"

"তা তো জানি না দিদিমণি!"

আভা ছুটলেন ও বাড়ী। জিগেস করলেন সুদর্শনকে, "কি হয়েছিল সুদর্শন?"—সুদর্শন চক্রবর্তী পুরাতন আমলের পাচক, এ বাড়ীতে আজ চল্লিশ বছর আছে।

সুদর্শন তার কপালে ঝুলে-পড়া পাকা চুল সরিয়ে সেখানে করাঘাত ক'রে বললে, "আমার পোড়া কপাল দিদিমণি! ছোট দাদাবাবু আজ কার ওপর রাগ ক'রেছিলেন। মাংসের বাটি থেকে মাংস ঢেলে এক গ্রাস মুখে দিয়েই থু থু ক'রে ফেলে দিলেন, বললেন, এটা কি মাংসের ঝোল রেঁধেছ না কোনো কোবরেজী দাওয়াই?"

"কেন, কেন?"

"হলুদ-বাটা, জিরে-মরিচ, আদা-বাটা, পেঁয়াজ-বাটা দিয়ে ঘন ক'রে মাংসের ঝোল করেছিলাম দিদিমণি। ছোটবাবু অত গরগরে রান্না পছন্দ করেন না, আপনি যেমন শুধু একটু হলুদ আর রসুন দিয়ে মাংসের ঝোল করেন, সেই রকম তাঁর পছন্দ।"

"তা সেই রকম ক'রেই রান্না করনি কেন সুদর্শন? জানো ছোড়দা সামান্য কারণেই চ'টে যান।"

"আমার অন্যায় হয়ে গেছে দিদিমণি! কত বার ভেবেছি আপনার কাছে ও রান্নাটা শিখে নেব। সে আর হ'য়ে ওঠেনি। তাই ছোড়দাদা বাবু আজ বললেন, এ মাংস তুমিই খাও চক্কোত্তী, গাঁজার মুখে তোমার ভালই লাগবে। ব'লে এঁটো হাতে উঠে চলে গেলেন।"

"কী বিপদ! কোথায় গেলেন?"

"তা তো জানি না দিদিমণি! আমার ধারণা ছিল, আপনার ওখানেই গেছেন। আমার দোষে বাবুর আজ সারা দিন খাওয়া হল না দিদিমণি! মহা পাষণ্ড আমি।"

"না না, তুমি বুড়ো মানুষ, যা পেরেছ রেঁধেছ। ছোট বাবুর যত বয়স বাড়ছে, ছেলেমানুষীও তত বাড়ছে। আমি তাঁকে খুব

"দিদিমণি আমি ছোট বাবুকে কত সাধ্যসাধনা করলাম, তিনি কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, তোমার কোব্‌রেজী দাওয়াই তুমিই খাও, তোমার গাঁজা খাওয়ার কাশি সারবে।"

চক্কোত্তী এক-আধ ছিলিম গাঁজা খেত এমনি একটা কুখ্যাতি তার ছিল, বসন্ত রাগের মাথায় সেটা নিয়ে শ্লেষ করেছে।

সুদর্শন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "দিদিমণি, বড় বাবুর কানে কথাটা গেলে এখুনি আমায় তলব করবেন, আমার হয়তো চাকরি যাবে। তখন এই বুড়ো বয়সে আমার পেট চলবে কি ক'রে দিদিমণি?"

একটা গোলমালের গন্ধ পেয়ে দূরসম্পর্কের পিসি-মাসিরা সব এসে হাজির। পিসি সুদর্শনের মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, "মুখে আগুন তোমার, চক্কোত্তী! বাছা বসন্ত আমার আজ সারা দিন উপোসী রইল, তোমার রান্নার গুণে।"

মাসি বললেন, "চক্কোত্তীর বড় বাড় বেড়েছে। কাল আমার ননীর জন্যে এক বাটি দুধ বেশি চেয়েছিলাম ব'লে আমায় কি মুখ-ঝামটা দিলে! ননী শুনে বললে, চল মা, নিজের বাড়ী ফিরে চল। হেমন্ত-বসন্ত আমার নেহাৎ আপনজন, গেলে ওদের দেখবে কে, তাই ওদের ছেড়ে যেতে পারি না। তা ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। বসন্ত উপোসী আছে শুনলে হেমন্ত আর তোমায় আস্ত রাখবে না সুদর্শন, একথা বলে দিলাম।"

আভা বললেন, "কেন আপনারা অনর্থক তর্জন গর্জন করছেন? যান, নিজের কাজে যান। আমি চাইনে এই সামান্য ব্যাপার বড়দার কানে ওঠে। যা ব্যবস্থা করবার আমিই করব।"

পিসি গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। মাসি বলে গেলেন, "তাই কোরো বাছা, তাই কোরো। আরো ভাল হয় জামাইকে এ বাড়ীতে উঠিয়ে এনে ঘরজামাই ক'রে রাখলে।"

ওবাড়ীতে গেলে আভাকে প্রায়ই এমনি অপমানিত হতে হয়। সুদর্শনকে আশ্বাস দিয়ে ম্লান বিষণ্ণ মুখে আভা বাড়ী ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে টম্‌টম্ নিয়ে বসন্ত আমাদের বাড়ী এল। আভাকে বলল, "ওরে, আজ আমি এখানেই খাবো। তাড়াতাড়ি জোগাড় কর, ভারি খিদে পেয়ে গেছে।"

আভা বললেন, "ভাতের থালা ফেলে দিয়ে এঁটো হাতে উঠে গিয়েছিলে তা আমি জানি। ছোড়দা, তুমি কি দিন দিন ছেলেমানুষ হ'চ্ছ নাকি? তোমার চণ্ডাল রাগকে এখনো একটু দমাতে শিখলে না?"

অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে বসন্ত বলল, "অন্যায় হয়ে গেছে রে! তা, এসব তুই কি ক'রে জানলি? তুই গিয়েছিলি নাকি ও-বাড়ী?"

সে কথার জবাব না দিয়ে আভা বললেন, "আজ সারা দিন ছিলে কোথায়? এঁটো হাতে ঘোড়ার লাগাম ধ'রে কোন মুল্লুক ঘুরে এলে?"

"কোথাও যাইনি, গঙ্গার ধারে বটগাছের তলায় বসে ছিলাম। ভারি সুন্দর হাওয়া সেখানে।"

"বুড়ো সুদর্শনের ওপর রাগ ক'রে তুমি তো গঙ্গার হাওয়া খেয়ে দিন কাটালে। ওদিকে সে-বেচারী সারা দিন উপোস ক'রে

যদি শোনেন তোমার কাণ্ড, তা'হলে তার চাকরি যাবে। বুড়ো বয়সে চাকরি খুইয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খাবে। তাতে তুমি খুব খুশি হবে তো ছোড়দা? সে আমাদের বাবা-মায়ের আমলের লোক।"

বসন্ত ছেলেমানুষের মতো ঝর্‌-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। বলল, "চাকরি যাবে? বলিস কি? আমারই তো দোষ। আমি দাদাকে বুঝিয়ে সব বললে দাদা বুঝবে না? তুই আমার হয়ে দাদাকে বোঝাবি না?"

আভা তাঁর আঁচল দিয়ে অগ্রজের চোখ মুছিয়ে বললেন, "তুমি একটা আস্ত পাগল ছোড়দা'। তোমার মতো পাগল আর আমি একটিও দেখিনি।" তারপর বললেন, "যাও হাত-মুখ বেশ ক'রে ধুয়ে এসো। তোমার জন্তে মাংস রেঁধেছি, যা তুমি খেতে ভালবাসো।"

এমনি হল বসন্তের স্বভাব। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটিমাত্র উল্লেখ করলাম, তা থেকেই বোঝা যাবে তাকে, আশা করি।

ভাই দু'টির আর যা কিছু মতিগত পার্থক্য থাক, বিয়ে না করার বিষয়ে উভয়ের মতের ছিল আশ্চর্য মিল। চশমার কাচ মুছতে মুছতে বিবর্ণ বিপন্ন মুখে হেমন্ত বলতেন, "বলো কি! বিয়ে! বই আর বউ,—উভয়ে সর্প-নকুল সম্পর্ক যে, তা বুঝি জানো না! তার চেয়ে তোমরা বসন্তকে ধরো। ও বিয়ে করুক, আমার তাতে সানন্দ সম্মতি।"

বসন্ত তার স্বাভাবিক উচ্চ স্বর আর একটু উচ্চে তুলে বলত, "এ তোমাদের কী আক্কেল বলো তো! দাদা থাকতে আমি করব বিয়ে! সানন্দ সম্মতির মানে আমি বুঝি। বিয়ের মধ্যে যদি কিছু ভালো থাকত, দাদা তাহলে নিশ্চয় বিয়ে করতেন। বিয়ের মধ্যে নিশ্চয় কিছু খারাপ আছে, তাই উনি বিয়ে করছেন না, আমি কি এতই বোকা যে, এ সবের মানে বুঝি না?"

এতে অন্তঃপুরের দূরসম্পর্কের পিসি-মাসির দল ছিলেন ভারি খুশি। বউ এলে তাঁদের একাধিপত্য যাবে ঘুচে। তাঁরা পছন্দ করতেন না ও বাড়ীতে আভার আনাগোনা। মাঝে মাঝে কথার ঝঙ্কারে তাঁরা প্রকাশ করেই ফেলতেন, ও বাড়ীর প্রতি আভার আকর্ষণ ভালবাসায় নয়, প্রাপ্তির আশায়। যিনি নিজে যেমন প্রকৃতির, তিনি অন্যের মধ্যেও সেই প্রকৃতি অনুমান করেন। আমরা গরীব, তাই এ ধরণের অপবাদ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধত, আমার চেয়ে বেশী বিঁধত আভাকে। হেমন্ত নির্বিকার, কিন্তু বসন্তকে ঘুণাক্ষরে বলবারও উপায় ছিল না, কেন না তাহলে গোঁয়ার বসন্ত রাগের মাথায় দূরসম্পর্কীয়াদের পৃষ্ঠের সঙ্গে নিজের লাঠির নিকট সম্পর্ক স্থাপন করবে এমন সম্ভাবনাও ছিল। তাই এ সব অপবাদের বিষ আমরা চুপ করেই হজম করতাম।

বাইরে থেকে কোনো জিনিষ এলে আভাকে দিতে তাঁদের মন সরত না। বসন্ত এ কথা জানত। বাড়ী থাকলে সে আপন হাতেই ব্যবস্থার ভার নিত। মহাল থেকে মাখনভরা টিন এসেছে, খবর পেয়েই বসন্ত গিয়ে বলত, "হ্যাঁ গো মাসি, আভাকে দিলে না?"

"দেবো বই কি বাবা, দেবো বই কি। তাকে না দিয়ে আমরা কোন্ জিনিষটা খাই?"

"মেয়াক্তি রাখো। কি দেবে তাকে দাও, দিয়ে আসি।" মাসি দেখলেন না দিয়ে আর উপায় নেই, বরং একটু বেশি করেই দিতে হবে, কেন না বসন্ত নিজে নিয়ে যাবে বলছে। তাই হাতায় ক'রে দু' তিন হাতা মাখন একটি পাত্রে রাখলেন।

বসন্ত বলল, "ছিঃ মাসি, তোমার একটু চক্ষুলজ্জাও নেই। সমস্ত টিনটা পড়ল আমাদের ভাগে, আর আভার বেলা মাত্র দু' হাতা?"

হিড়-হিড় ক'রে সমস্ত টিনটা বসন্তর দিকে ঠেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ মাসি বললেন, "তবে আর ভাগাভাগির বালাই কেন বাবা, সমস্ত টিনটাই দিয়ে এসো গে পেয়ারের বোনকে।"

"সমস্ত টিনটাই? বেশ, বেশ। মাসিবাক্য বেদবাক্য বলে মানি।"—ব'লে বসন্ত নিজেই টিনটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে চলল। এক জন ভৃত্য দেখতে পেয়ে ছুটে এল, "করেন কি ছোট মহারাজ, আমাদের অপরাধ হবে যে!"—বলে টিনটা নিজের ঘাড়ে তুলল।

আভা সমস্তটা শুনে লজ্জিত হয়ে বললেন, "ছিঃ ছোড়দা, ওঁরা সবাই কী ভাববেন বল তো?"

"কি আর ভাববেন? ভাববেন বসন্ত আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল।"

"না, না, ও টিন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। বড়দা আর তোমার মুখে যে একটুও পড়বে না।"

"ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই পড়বে না কি? জানিস না ওদের? আর দাদার কথা বাদ দে। সে দিন নলেন গুড়ের পাটালি এসেছে বাড়ীতে, আমি শাসিয়ে রাখলাম, দাদার পাতে পড়া চাই। সুদর্শন ভয়ে ভয়ে বেশ খানিকটা পাটালি দিল দাদার পাতে। দাদা খেয়ে উঠে যাচ্ছেন, আমি জিগেস করলাম, কেমন লাগল ওটা, দাদা?"

"কোন্‌টা?"

"ঐ যে এখনি যেটা খেলে।"

"ও: ! ভারি চমৎকার মাখন তো! ঠিক যেন মিষ্টি গুড়।"

আভা শুনে হেসে বললেন, "অমন অন্যমনস্ক মানুষ আর নেই। সেদিন বিকালে এখান দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন, পিছন পিছন যাচ্ছে রামদীন দাদা। আমি দেখতে পেয়ে ডেকে বললাম, বড়দা, চা খেয়ে যাও। বড়দা চা খাচ্ছেন আর অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবছেন। জিগেস করলাম, কি ভাবছ বড়দা তখন থেকে? বড়দা বললেন, আমার তাড়া আছে রে, আমায় এক জায়গা যেতে হবে। জিগেস করলাম, কোথায়? বড়দা বললেন, ঐটেই মনে করতে পারছি না। রামদীন দাদা দাঁড়িয়েছিল কাছেই, সে বললে, দিদিমণি কো মোকানমেই আনেকো বাত থা মহারাজ। শুনে বড়দা বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, তোর এখানে আসবারই জন্তে বেরিয়েছিলাম। তা ঠিক তাই তো এসেছি। দেখছিস তো, ভুল হয় নি! বলে সে কি হাসি!"

দু'ভায়ের স্বভাবে এমন বিভিন্নতা, তাদের বিবাহিত জীবন কেমন হবে আমরা অনেক সময় স্বামি-স্ত্রীতে তার আলোচনা করেছি। হেমন্তর পক্ষে তাঁর পুঁথিপত্র ছেড়ে কোনো নারীকে ভালবাসা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। কিন্তু অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, তাঁর ধ্যান-মৌন স্বভাবে সে ভালবাসার প্রকাশ বোধ হয় থাকবে না। ভালবেসে প্রতিদান যদি না পান, অনুযোগের দণ্ডও

বোধ হয় মুখে উচ্চারণ করবেন না। তাঁর পক্ষে আদর্শ গৃহিণী হবেন তিনিই যিনি ভক্তিমতী, সেবাপরায়ণা, মাতৃস্বভাবা। কিন্তু কাজের বেলা বোধ হয় অন্য নিয়ম। তার স্বভাবে আর সকল বিষয়ে যে তেজ, ভালবাসার মধ্যেও সেই তেজ। সে কোনো কিছুকেই গণ্ডীর মধ্যে রাখতে জানে না, ধৈর্য তার নেই, তার সকল মনোভাবই অবারিত, স্ফূর্ত। সেবা-পরায়ণা ভক্তিমতী মাতৃস্বভাবা তার কাছে উপেক্ষাই পাবে, তার মন জয় করতে পারবে না। তার সহধর্মিণীর কাছে সে চাইবে তেজ, তীক্ষ্ণতা, কাঠিন্য। সেবিকা নয়, সঙ্গিনী। করুণাময়ী নয়, প্রিয়া।

আভা তামাসা করে বললেন, "জানতে ইচ্ছা করে আমি কোন্ ধরণের স্ত্রী। বলো না সত্যি করে, এই দুই পর্য্যায়ের মধ্যে আমি কোন্ পর্য্যায়ে পড়ি"।

আমি বললাম, "আমরা অতি-বিবাহিত। মানে, উদ্বাহের জারক রসে আমরা অতিমাত্রায় জীর্ণ। এই জন্যে তুমি আমি ঠিক কোন্ পর্য্যায়ে পড়ি সেটা বলা শক্ত। বোধ হয় দুই পর্য্যায়েই পড়ি।"

"তার মানে আমার ভক্তিও আছে, সেবাও আছে, আবার তীক্ষ্ণতা আর কাঠিন্যও আছে, এই না?"

"ঠিক তাই। আমারো প্রিয়ার প্রতি লোভ আছে, আবার সেবার প্রতিও লোভ আছে, বুঝলে?"

আভা বললেন, "তুমি গভাচরচণ্ডোর আর কি। ডুড়ও খাও, টামাকও খাও।"

"বুদ্ধিমান মাত্রেই তাই। যারা বোকা তারা হয় কেবল দুধ ভালবাসে নয়তো কেবল তামাক ভালবাসে। তারা প্রায়ই ঠকে।"

আভা বললেন, "তোমার এ কথাই ঠিক। যে-সব মেয়ে বোকা নয় তারাও এ কথা মানবে।"

"কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তামাক খাওয়ার চলন এখনো হয়নি।"

"দোক্তাও তামাক, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

"আমার ভুল ভাঙল। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ! আমাদের এই কবি-অধ্যুষিত বাংলা দেশে আজো কেউ বলল না তার স্ত্রীকে, অয়ি গৃহিণী, তুমি যেন আমার বিষ্ণুপুরী তামাক।"

"কোনো গৃহিণীও বলল না তার স্বামীকে, ওগো স্বামী, তুমি যেন আমার রঙপুরী দোক্তা!"

"বাংলা সাহিত্যের এত বড় ত্রুটি যখন তুমি ধরে ফেলেছ তখন তোমার উচিত এখনি সেটা কবিসম্রাটকে জানিয়ে দেওয়া।"

"দাও না একটা মুসাবিদা ক'রে। এখুনি আমি নিজের নামে পাঠিয়ে দেব।"

"তবেই হয়েছে। তার চেয়ে খাবারের জোগাড় করো। খিদে পেয়েছে।"

আভা খাবার আনতে উঠে গেলেন। আমাদের কাব্যরস জঠর-রসে পরিসমাপ্ত হল। আমরা উভয়েই মেনে নিলাম, এইটাই সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ। [ক্রমশঃ।

নোবেল আর নোবেল-প্রাইজ

আলফ্রেড নোবেলের চেয়েও বিখ্যাত হয়ে পড়েছে, আজ তাঁরই সৃষ্টি নোবেল প্রাইজ। ১৮৩৩ সালের ২১শে অক্টোবর ষ্টকহলমে আলফ্রেড নোবেলের জন্ম। পিতা ইম্যানুয়েল নোবেল। পৈত্রিক অধিকারের সূত্রেই নোবেল পেলেন প্রচুর অধ্যবসায়, ব্যবসায়-প্রীতি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং নতুন নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা।

খুব অল্প বয়স থেকেই নোবেল মাতলেন বিস্ফোরক আবিষ্কারের কাজে। এই কাজ শুরু করার পিছনে ছিল, তাঁর এক আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা। তখন বিস্ফোরক পদার্থ বলতে একমাত্র গান-পাউডার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এক দিন তাই দিয়ে একটি পরীক্ষা করবার প্রাক্কালে আলফ্রেডের এক ভাই হঠাৎ বিস্ফোরণের ফলে মারা গেলেন। সেই থেকে শুরু হল সাধনা এবং একদা আবিষ্কৃত হল ডিনামাইট। ১৮৮৬ সালে নোবেল আবিষ্কার করলেন **Kieselguhr** বা **Infusorial earth** যার সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশিয়ে তৈরী হল নতুন বিস্ফোরক এই ডিনামাইট। ডিনামাইট তৈরীর কারখানা বসালেন নোবেল এবং এক মাত্র ভাই বিক্রয়েরই মূলধন রেখে গেলেন ২,০০০,০০০ পাউণ্ড। যা থেকে দেওয়া হচ্ছে নোবেল প্রাইজ।

১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেল মারা গেলেন। সারা জীবন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুকালে এক উইল করে সমস্ত টাকা তিনি সুইডিস একেডামী অব সায়েন্সকে দিয়ে যান নোবেল-প্রাইজ দেবার জন্য। এই জমানো টাকার সুদ থেকেই চিরদিন নোবেল-প্রাইজ দেওয়া চলবে।

পদার্থ এবং রসায়ন-বিদ্যার জন্য নোবেল পুরস্কার বেছে দেন সুইডিস একেডামী অব সায়েন্স। চিকিৎসার জন্য **Caroline** ইনষ্টিটিউট অব ষ্টকহলম। সাহিত্যের জন্য ষ্টকহলম একেডামী। শান্তির জন্য নরওয়েজিয়ান পার্লিয়ামেণ্ট।

নোবেল পুরস্কারের পরিমাণ দশ-আউন্স ওজনের এক স্বর্ণপদক। ১২,০০০ পাউণ্ডের একখানি চেকও তৎসহ। অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

পদার্থ-বিদ্যায় প্রথম পুরস্কার পেলেন, উইলহেলম্ কনরার্ড রঞ্জন তাঁর বিখ্যাত **X-Ray**র জন্য। ১৯০১ সালে।

নোবেল পুরস্কার প্রদানে জাতি, ধর্ম, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের কোনও ভেদ থাকতে পারবে না, এমন ব্যবস্থা উইলে করে গেছেন আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল।

দু'জন ভারতবাসী এ যাবৎ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সি, ভি, রমণ। এক জন 'গীতাঞ্জলীর' জন্য সাহিত্যে অপর জন বেঙ্গিন্ ষ্ট্রাকচারের বিথমিক্ মুভমেণ্টও আরও নানা কাজ করার জন্য পদার্থ-বিদ্যায়।

পুতুল-নাচ

—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র অঙ্কিত

ওদিকে ললিত দেবীর উত্তর প্রতীক্ষা করতে থাকে। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। চিঠির জবাব না পেয়ে সে ব্যথিত হয়ে দেবীর ছবিকে জিজ্ঞেসা করে—কৈ, কি হলো? চিঠির জবাব ত এল না? মনে তার অভিমান জাগে—ছবির সঙ্গে ঝগড়া করে, মুখের কথা না রাখার জন্যে মনের দুঃখে কেঁদে ফেলে।

[উপন্যাস]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

কাশীর বিখ্যাত কলেজিয়েট স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং-এ আলাদা একখানি ছোট ঘরে ললিতের থাকার ব্যবস্থা হয়। নিজের পাঠানুরাগ ও বিনয়নম্র ব্যবহারে বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশংসা সে অর্জন করেছে। কিন্তু পড়ার সময় তার টেবিলে প্রধান স্থান পেয়েছে দেবীর সেই ফটোখানি। এখানেও তাকে উদ্দেশ করে কবিতা আবৃত্তি চলে, মনের কথাগুলি বলে—যেন সেই আলেখ্যটি কান পেতে শুনছে তার প্রতিটি কথা।

বোর্ডিং-এর ছেলেরা লক্ষ্য করে, নিজের ঘরখানির দরজা বন্ধ করে ললিত-অধ্যয়নে নিমগ্ন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সব ধরা পড়ে যায়, তারা ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের লক্ষ্য করে বলে—জানিস্ ভাই, আমাদের বোর্ডিংয়ে একটা ছেলে আছে, একখানা ছবি সামনে রেখে তাকে কবিতা শোনায়, তার সঙ্গে কথা কয়।

তাদের চোখের ইশারায় উদ্দিষ্ট ছেলেটিও প্রকাশ পায়। তখন চার দিক থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে—কার ছবি রে ললিত ভাই? কি রকম ছবি রে? কাকে কবিতা শোনাস তুই? কার সঙ্গে কথা বলিস্?

এমনি কত প্রশ্ন। কিন্তু ললিত প্রতি প্রশ্নটি এড়িয়ে যায়—মুখখানা ভার করে চুপ করে থাকে। ছেলেরাও চুপি চুপি নানারূপ আলোচনা করে।

হঠাৎ ললিতের মনে পড়ে যায় যে, দেবীকে তার চিঠি লিখবার কথা ছিল, দেবী সে জন্যে অনুরোধও করেছিল। সেই দিনই ললিত কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে যায়। হরগৌরীপুরে সেই বিদায়ের দিন থেকে তার দুঃখের কথা, পড়া-শোনা, তার পর দেবীর ফটো পাওয়ার কথা। ফটো সামনে রেখে কবিতা শোনানো, বাবার অনুযোগ, মায়ের সান্ত্বনা দান, তার পর—তাঁর কঠিন অসুখ ও মৃত্যুর কথা, গ্রাম থেকে কাশীতে এসে বোর্ডিংএ থেকে পড়াশোনা, সব কথাই দিব্যি গুছিয়ে লিখে দেবীর নামে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। সেই চিঠি যথাসময়ে দেবীর বাবা বগলাপদর হাতে এসে পড়ে। তিনি তখন টেবিলের সামনে বসে অফিসের কাজ করছিলেন। দেবীর তখন অসুখ চলেছে, ললিতদা'র নাম ধরে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে। বগলাপদ না পড়েই সে চিঠি ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন—চিঠির প্রসঙ্গও বাড়ীতে কারও কাছে তোলা প্রয়োজন মনে করেন না।

আশ্চর্য, বোর্ডিংয়ের বিভিন্ন বয়সের ছেলের দল, ক্লাসের সহপাঠিগণ—কারও দিকে তার লক্ষ্য পড়ে না—দেবীর ছবিই তাকে সর্বক্ষণ যেন অভিভূত করে রাখে।

বছরের পর বছর ধরে এই ভাবে দিন কাটে। স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ললিত কলেজের সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হয়। স্কুলের পুরাতন বোর্ডিংও ত্যাগ করে কলেজ-বোর্ডিং-এর একখানি ছোট ঘরে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। সেই যে গ্রাম ছেড়ে ললিত কাশীর বিদ্যানিকেতনে বিদ্যার সাধনা আরম্ভ করে, তার মধ্যে কোনরূপ ছেদ আর পড়ে নাই, দেশের মাটি স্পর্শ করবার সুযোগও ঘটে নাই। পিতা পশুপতিই প্রতি বছরে দু'বার গ্রাম ছেড়ে কাশীধামে এসে পুত্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছেন।

কলেজে প্রবেশ করে ললিত কাব্যের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। দেবীর সেই ছবি ধীরে ধীরে তার টেবিল থেকে সরে গিয়ে কাচের আবরণ প'রে ঘরের দেওয়ালের শোভাবৃদ্ধি করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার বিবেক-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হয়ে আবাল্যের সংশক্তিশীল সংস্কারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের মুখে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বিশদ ব্যাখ্যা তার তরুণ মনে নূতন এক ভাবের প্রবাহ এমন উদ্দাম গতিতে সঞ্চালিত করে যে, মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থরাজির রসধারা আস্বাদন করতে সে অধীর হয়ে ওঠে। অত্যন্ত তরুণ বয়সে ললিতের এই কাব্যানুরাগ এবং বোর্ডিংয়ের ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে বসে একাকী অভিনিবেশ সহকারে এ ভাবে তার কাব্যচর্চা দেখে বোর্ডিং-এর অন্যান্য ছাত্রেরা মনে মনে কৌতুক বোধ করে। সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে যে-সব ছাত্রের কিছু কিছু পরিচয় আছে, তারা কিন্তু বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকে—কালিদাসের কাব্যের উপর নিবিড় ভাবে এতখানি অধিকার ললিত কি করে পেল? ফলে স্কুলের ছাত্র-জীবনে ছবিকে কবিতা পড়ে শোনাবার মত, এখন একা একা উদাত্ত কণ্ঠে ললিতের কাব্যাবৃত্তি নিয়েও বোর্ডিং ও স্কুলের ছাত্রগণ নানা ভাবে তাকে বিদ্রূপ করে, কিন্তু ললিতের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ললিতের মনে আর একটি খেয়াল জেগে ওঠে—সেটি হচ্ছে ছবি আঁকা। কারো কাছে শিক্ষা না নিয়ে নিজের
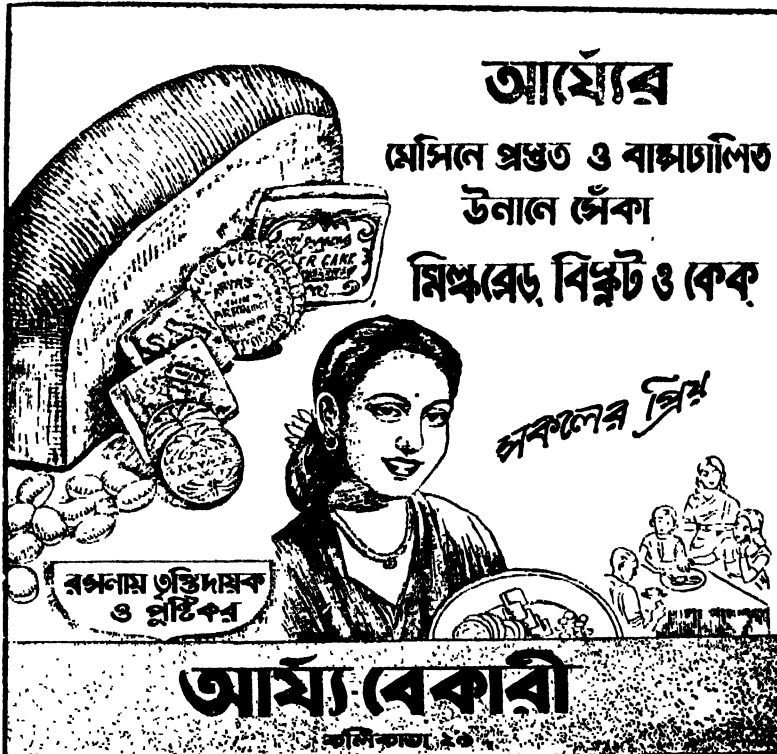
ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই এই আঁকার কাজটি বরাবরই সে অতি সংগোপনে চালিয়ে এসেছে। চিত্র-বিদ্যার সাধক যাঁরা, প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজিকেই সাধারণতঃ আদর্শরূপে গ্রহণ করে থাকেন—গাছ, পাতা, ফুল, ফল, পাহাড়, নদী, এমনি কত কি! কেউ কেউ বা পশু, পাখী, মানুষকে আদর্শ করে তাদের ছবি তুলে আনন্দ পান। কিন্তু ললিত ছেলেটির চিত্রাঙ্কনের যত কিছু সাধনা একখানি প্রতিকৃতি বা ফটো নিয়ে। সে আলেখ্য আর কারও নয়—তার বাল্যের সাথী, বালিকা—দেবীর। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, পূর্বের সেই ফটোখানি বিবর্ণ অবস্থায় কক্ষের দেওয়ালে উঠেছে; এখন আর তার প্রতি তরুণ ললিতের কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু নিজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফটোর বালিকাটির অবয়বের আয়তনটিও তার বর্তমানের বয়ঃক্রম অনুসারে বড় করে এমন ভাবে এঁকেছে যে, পর পর দু'খানা ছবি দেখলেই মনে হবে—আগের বালিকাটির তরুণ যৌবনের প্রতিকৃতি এবই হাতে আঁকা এই ছবিখানি। বর্ষের পর বর্ষ ধরে এই ভাবে ললিত তার কৃষ্টির সাধনা চালিয়ে এসেছে। পাছে সহপাঠী বা মেসের বন্ধুরা ব্যাপারটি জানতে পেরে হৈ-হুল্লোড়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে, এই ভয়ে বেচারী তার আঁকা ছবিগুলি অতি সন্তর্পণে ডেস্কের ভিতরে লুকিয়ে রাখে। যদি ঘুণাক্ষরেও ললিত তার এই গুপ্তসাধনার কথা সহপাঠীদের জানাত, তাহলে তারাও নিশ্চয়ই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করত যে, বছর কয়েক আগে এই ছেলেটি যে বালিকার ফটোখানিকে সাথী করে কবিতা পড়িয়ে আনন্দ পেত, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বয়োবৃদ্ধির তালে তালে তুলি চালিয়ে কি ভাবে সে তার বাল্য-সাথীর আকৃতির আয়তনও আশ্চর্য ভাবে বাড়িয়ে তরুণ যৌবনের সাথী করে নিয়েছে।

ছবির পর ছবি আঁকার ফলে রীতিমত একখানি য়্যালবাম তৈরী হয়ে উঠেছে। রুদ্ধ কক্ষে য়্যালবাম খুলে এক এক করে প্রত্যেক ছবিখানি দেখে সে আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। একই রকমের ছবি সব—মুখ, চোখ, নাক, চুল পর্যন্ত কোথাও খুঁৎ নেই। বালিকা দেবীর ছবিতে মাথার চুলগুলি খাটো-খাটো ছিল, এখন নূতন ছবিতে চুলের রাশি তার পিঠ ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ছবি আঁকার পর্ব শেষ হতেই আর এক পর্ব নিয়ে ললিত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। য়্যালবামের ছবির তলায় কালিদাসের প্রণয়-কাব্যগুলির বাছা বাছা শ্লোক চয়ন করে গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে থাকে। লেখার পর সুর করে সেই ছড়া পড়ে। মেসের ছেলেরা যখন দল বেঁধে বেড়াতে যায়, ললিত কৌশলে আত্মগোপন করে থাকে, তার পর আবৃত্তি করে লেখা কবিতা; আবার ছেলেদের ফেরবার সময় হলেই য়্যালবামখানা ডেস্কের মধ্যে রেখে, পড়ার বই খুলে বসে। এই ভাবে লুকোচুরির ভিতর দিয়ে বছরের পর বছর ধরে এই অতি মাত্রায় ভাবুক ও কল্পনা-বিলাসী ছেলেটির চিত্র-শিল্প তথা কাব্য-চর্চা এগিয়ে চলে।

পশুপতির ইচ্ছা নয় যে, ললিত ছুটি-ছাটাতেও গ্রামে গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে আসে। তিনি লক্ষ্য করেছেন—কলকাতাবাসী হবার পর বগলা যেন গ্রামের সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্লিপ্ত ভাবে থাকতে ব্যস্ত। তিনি নিয়মিত ভাবে চিঠি লিখলেও, বগলার কাছ থেকে অনিয়মিত ভাবে তার উত্তর আসে। চিঠির

উক্তিগুলিতে নূতনত্ব কিছু নেই, সেই একঘেয়ে মামুলি নির্দেশ; 'কাজের অসম্ভব ভীড়ে অবসর কম; তাঁর লক্ষ্য, অর্থ উপার্জন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা। দুই কন্যা পড়া-শোনা নিয়েই ব্যস্ত—উচ্চশিক্ষার পথে তারা এগিয়ে চলেছে। তোমার ছেলেকেও মানুষ করে তোল, তোমার জীবনেও এটা মস্ত কর্তব্য।' এ-ধরণের চিঠি বগলার কাছ থেকে পশুপতি প্রত্যাশা করেন না—চিঠি পড়তে পড়তে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে দুই বন্ধুর অতীতের সেই সব প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায়, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসেন—সত্যই কি ওবে বগলার মনে পরিবর্তন এসেছে? সে কি গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধও কাটাতে চায়?

কিন্তু পুত্র ললিতকে তিনি এ-ব্যাপারে তফাতে রাখতে চান। সে যদি দেবী বা বগলাদের কথা ভুলে যায়, তাতে ক্ষুব্ধ হবার কিছুই নেই, বরং তিনি খুশিই হবেন। ললিত কাশী গিয়ে অবধি তাঁকে যে সব চিঠি লিখেছিল, গোড়ার দিকে দেবীর কথা প্রায়ই থাকত, সেই সঙ্গে বগলাদেরও। কিশোর বয়সে একখানা চিঠিতে আক্ষেপ করে পিতাকে জানিয়েছিল যে, দেবীকে সে চিঠি লিখেও জবাব পায়নি। দেবীর বাবা ত তাঁকে চিঠি দেন; তিনি যেন জিজ্ঞাসা করেন—দেবী তার চিঠির জবাব দেয়নি কেন?

এই সময় বগলারও চিঠি আসে পশুপতির নামে। সেই চিঠির মর্ম অনুসারে পশুপতি ললিতকে লেখেন, দেবীর বাবা চান এখন তোমরা চিঠি-লেখালিখি ছেড়ে মন দিয়ে লেখাপড়া কর। সেই জন্যেই বোধ হয় দেবী তোমার চিঠির জবাব দেয়নি। তুমিও পড়ায় মন দাও; তোমাকে ভবিষ্যতে কৃতবিদ্য দেখে ওরা আনন্দ পেলে আমিও আনন্দিত হব।

এই চিঠি পাবার পর শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিকাল থেকেই ললিতের মনের ভাবধারার গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। দেবীর ছবিকে সামনে রেখে কবিতা পড়ার পাট বন্ধ করে খাতার পাতায় ফটোর অনুকরণে ছবি আঁকার কাজ শুরু করে দেয়। খাতার পর খাতার পাতাগুলি ভরে ওঠে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকৃতির আয়তনও বর্তমানের বয়স-অনুসারে প্রসারিত হয়। সাধারণতঃ সে অত্যন্ত অভিমানী; পিতার পত্রে দেবীর পিতার নির্দেশ তাকে রীতিমত আঘাত দেয়—তাই সে দেবীর স্মৃতি তার মনোমন্দিরে জাগিয়ে রাখবার এই অভিনব ব্যবস্থা করেছে এবং এই বিচিত্র পরিকল্পনা তার নিজস্ব। তার ধারণা, একদিন না একদিন দেবীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবেই; তখন সে ছবির য়্যালবামখানি তার হাতে দিলেই সযত্নে অংকিত ছবিগুলিই জানিয়ে দেবে—দেবীকে সে কি রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে মনে করে রেখেছে।

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যার দিকে মজলিস বসে, নানা কথার আলোচনা হয়। সে দিন বয়োবৃদ্ধ সত্য ঘোষাল বগলাকে লক্ষ্য করে বললেন: ব্যাপার কি হে পণ্ডিত! বগলা যে এক দম চুপ, সাড়া-শব্দ নেই, অথচ তুমিও দিব্যি চুপ করে আছ?

পশুপতি কিঞ্চিৎ ব্যথিত হয়েই জবাব দিলেন: সহরে গিয়ে বগলা এখন টাকা চিনেছে. শুনতে পাই—মস্ত লোক হয়েছে, তাহলেও তার টাকার সাধনা বোধ হয় এখনো শেষ হয় নি—তাই চিঠি লেখে না। মনে নেই—লিখেছিল, দু'চোখ বুজিয়ে টাকার সাধনা করবে, মেয়ে দুটোকে রীতিমত লেখাপড়া শেখাবে, লেখে লিখেছিল—সময় মত বা একেবারেই চিঠিপত্র যদি না লেখে, আমরা যেন তার জন্যে রাগ বা দুঃখ না করি। কাজের ভীড়ে সাড়া দিতে পারেনি—এই বুঝে আমাদের চুপ করে থাকতে হবে।

সত্য ঘোষাল বললেন: আমি ভেবে পাইনে, তোমার সঙ্গে তার অত মাখামাখির কথা কি করে সে ভুলে আছে? তার পর তোমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ে দেবীর বিয়ের কথাটাও ভেবে দেখ! বগলার মেয়ে ত সেই থেকে বাগদত্তা হয়ে আছে—দুই সইয়ে হরগৌরী-মন্দিরে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, কেউ তা ভোলেন নি। তোমার স্ত্রী ছেলের মা হয়েও শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে তোমাকে কি অনুরোধ করে যান—সে কথাও কে না জানে? কিন্তু আশ্চর্য এই, বগলার কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন কথাই শোনা যায় নি, সেই ক'খানা চিঠি দিয়ে তারা চুপ করে আছে—লম্বা কটা বছর ধরে।

পশুপতি বলেন: আমার মনে হয়, বাল্যকালে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঐ সব আলোচনা ঠিক নয়। তাতে ব্যাপারটা নানা সূত্রে এমনি জেঁকে ওঠে যে, ঐ বয়সেই ওদের মনে ভালবাসাবাসির একটা ছাপ পড়ে যায়। আমরা তখন তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছি, আহ্লাদ করেছি, আনন্দ পেয়েছি। জানি, বড় হ'তে হ'তে ওসব কথা অবিশ্যি চাপা পড়ে যায় পড়াশোনার দাপে। কিন্তু এমন ভাবপ্রবণ ছেলে-মেয়েও থাকে—যাদের মন থেকে শৈশবের সেই সব কথা পড়াশোনার চাপেও মুছে যায় না, আগাগোড়া ব্যাপারটাকে তারা মনে করে রাখতে চায়। এদের কল্পনার দৌড়ও খুব বেশী। ললিতের ছেলেবেলাকার এই নিয়ে গুলতানি মনে পড়ে না? ধমক পর্যন্ত দিতে হয়েছিল আমাকে। আর, ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি ওকে এখানকার পরিবেশ থেকে সরিয়ে কাশী পাঠিয়ে দিই পড়ার দিকে যাতে মন নিবিষ্ট করতে পারে। সেটা ভেবে বিশেষ করে পড়ার ব্যবস্থা করে দিই; বাড়ীতে যাতে হামেশা না আসতে পারে, সে জন্যে বছরে দু'বার নিজে গিয়ে এখানকার খবর সব শুনিয়ে দিই, আমিও তাকে দেখে আশ্বস্ত হই। কেবল, এ বছরই যাওয়া হইনি; যাব যাব করছি বটে, কিন্তু হয়ে উঠছে না, শরীরে কেমন যেন জুত পাচ্ছি না। যাই হোক, আজ-কালের মধ্যেই দু'-জায়গায় দু'খানা চিঠি লিখব ঠিক করেছি; একখানা বগলার স্ত্রীকে, আর একখানা ললিতকে।

সত্য ঘোষাল একটু শক্ত হয়ে বললেন: ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার স্বভাবটা নিতান্ত কড়া হয়ে গেছে, তাই একমাত্র ছেলেটাকে এভাবে নির্বাসনে পাঠিয়ে স্থির হয়ে আছ! বেশী কি বলব, আমার ভাগনী—ওদের ছেলেবেলার খেলার সাথী রাধার বিয়ে হয়ে গেল, তোমাকে কত করে বললাম, ললিতকে বিয়ের সময় আনাবার জন্যে, তা তুমি কিছুতেই গা করনি। জানো, রাধা তার ললিতদাকে দেখবার জন্যে কত আশা করেছিল?

পশুপতি বললেন: সে কথা মিছে নয় খুড়ো। তখন শুনেছিলাম, বগলাকে তোমরা নিমন্ত্রণ করেছিলে। সপরিবার সে এলে দেবী মেয়েটির সঙ্গে পাছে ললিতের দেখা হয়ে যায়, আবার তার মাথায় সেই সব খেয়াল চাপে, সেই জন্যে তাকে আনা বা রাধার বিয়ের কথা জানানো উচিত মনে করিনি। এ-ব্যাপারটা ঠিক

সংক্রামক ব্যাধির মত, বুঝলে খুড়ো! রাধার বিয়ে হচ্ছে শুনলেই তার মাথায় এই চিন্তা ঢুকবে—তার বিয়েটা দেবীর সঙ্গে হচ্ছে না কেন, বা কবে হবে? আমি ওখানে খবর নিয়ে জেনেছি, গোড়ার দিকে দেবীর জন্ত চিন্তা, তার ছবিকে পড়ানো, বরাবর চলেছিল! এদানীং সে খেয়ালটা গেছে, বেশ গম্ভীর হয়ে কলেজের পড়া পড়ছে। আমার ইচ্ছা কি জানো, কলকাতা থেকে চিঠিখানার জবাব আসুক, তখন নিজে গিয়ে কথাবার্তা সব পাকা করে আসব। আর, চেষ্টা করব—গায়ে-হলুদ থেকে বিয়ে, বৌভাত সব কটা উৎসবই যাতে এখানে হয়—সারা গ্রাম সে উৎসবে যোগ দেয়।

সত্য ঘোষাল বললেন: ভালো, সেই আশাতেই থাক। এমনি সময় ডাকঘরের পরিচিত পিওন হরিহর চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার নীচে এগিয়ে এসে চিঠি বাছতে লাগল। গ্রামের মধ্যে পশুপতি ও সত্য ঘোষালের নামে প্রায়ই চিঠিপত্র আসে; উভয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিওনের হাতে মোটা কাগজের মধ্যে রাখা চিঠির গোছার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হরিহর একখানি পোষ্টকার্ড গোছার ভিতর থেকে টেনে বার করে সসম্ভ্রমে সুপ্রবীণ ঘোষাল মশায়ের হাতে দিলেন।

ফতুয়ার পকেট থেকে চশমাটি বার করে চোখে লাগিয়ে সত্য ঘোষাল মনে মনে চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। কিন্তু খানিকটা পড়েই কপালে করাঘাত করতে করতে আর্তনাদ তুললেন: মা জগদম্বা, এ কি সর্বনাশ আমার করলি মা!

চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সকলেই ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সবার মুখে এক প্রশ্ন—কি হলো? কি ব্যাপার?

সত্য ঘোষাল চিঠিখানা পশুপতিকে পড়তে দিলেন। তিনি এক নিঃশ্বাসে পাঠ সমাপ্ত করে সরোদনে জানালেন: সত্যিই সর্বনাশ হয়েছে সত্য খুড়োর। তাঁর আদরের ভাগনী রাধা গত বৃহস্পতিবার বিধবা হয়েছে; জামাতা বাবাজী রেলের আর, এম, এস-এ চাকরী করতেন, দুর্ঘটনায় মারা পড়েছেন।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেল। কিন্তু সুপ্রবীণ সত্য ঘোষালকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠল, কি আকুলি-ব্যাকুলি কান্না তাঁর! পশুপতি ও পাড়ার আরও জন দুই লোক তাঁকে ধরে বাড়ীতে নিয়ে চললেন।

প্রায় বছর পূর্ণ হতে চলেছে—পশুপতি পণ্ডিতের এবার আর কাশী যাওয়া হয়নি। একেই উপলক্ষ করে পাছে ললিত কাশী থেকে চলে আসে, এই আশঙ্কায় সম্প্রতি ললিতকে এক পত্র লিখেছেন তিনি। পত্রে সকলের কথাই অস্পষ্ট ভাবে থাকে। যেমন বগলাদের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, তিনি চুটিয়ে ব্যবসা করছেন বড় মানুষ হবার জন্তে, তাঁর মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিচ্ছেন—তারা যাতে আধুনিকা বলে সমাজে সম্মান পায়। এখনো শিক্ষা চলেছে তাদের। সুতরাং তোমারও উচিত শিক্ষার দিকে সমস্ত মন নিবিষ্ট করা। শেষের দিকে রাধার বৈধব্যের কথা লিখে আক্ষেপ করেন—সত্য খুড়ো এ ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তাঁর কত আদরের ঐ ভাগনীটি। তিনি রাধাকে আনাচ্ছেন, এখানেই সে থাকবে। তার পরে লিখেছেন, শরীরটি কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না বলে, আমি এবার কাশী যেতে পারিনি, তার জন্ত উদ্বিগ্ন হয়ো না; একটু সুস্থ হলেই আমি তোমাকে দেখতে যাব।

চিঠি পড়ে ললিত কিন্তু একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সেই রাধা—শৈশবে যার সঙ্গে কত কলহ করেছে দেবীর পক্ষ নিয়ে, ললিতদা বলতে সে যে অজ্ঞান হ'ত···কত দিনের কত স্মৃতি মনে জড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে···সেই রাধার এই সর্বনাশ! আর, এ যে আরও আশ্চর্য কাণ্ড! রাধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে? কিন্তু আমাকে কেউ বিয়ের খবরটা পর্যন্ত দিলে না! রাধার বিয়ে হয়ে গেল—তার ললিতদাকে মনে পড়ল না? তার পর এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তার!

এ ভাবে উচ্ছ্বাসের পর একটু থেমে কি ভেবে শিউরে উঠে বলতে থাকে: তাহলে ত দেবীরও বিয়ে হয়ে যেতে পারে! অ্যাঁ!—দেবীর বিয়ে হবে, আমি এখানে আছি—আমাকে ছেড়ে···আকুল আবেগে চিৎকার করে ওঠে ললিত—দেবী! দেবী! না, না, না, আমি মস্ত ভুল করেছি, এ ভুল আমাকে শোধরাতেই হবে। আমি যাব—দেশে যাব।

পরদিনই কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে সুটকেশ ভরে ললিত দেশে রওনা হলো। যাবার আগে পশুপতিকে একখানা তার করে দিল।

[ক্রমশঃ।

আমি কিছু বলতে চাই!

প্রাচীন ইতিহাসে আমার কোনও নিশানা নেই। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কি আমার বংশ-পরিচয় সে সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা কোনও গল্প চালু নেই। প্রবাদ কি প্রবচন আপনি পাবেন না। ব্যবিলনের যে সভ্যতা আজ শুধু পুরাতত্ত্ববিদদের বিস্ময় সেখানে মাটী দিয়ে খুঁদে নাকি আমার প্রথম চেহারা বেরিয়েছিল। সে কথায় হয়ত সত্যের পরিমাণ সামান্ত কিন্তু জার্মাণীর এক মণিকার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসে তাস খেলতে খেলতে হঠাৎই একদিন কাঠে খুঁদে আমাকে বানাবার যে চেষ্টা করেছিল তা মিথ্যা নয়। তারপর সুরু হল সেই মণিকারের সাধনা। গোটা বাইবেলটাকে পাতার পর পাতা খুঁদে ফেলতে হবে কাঠে। কিন্তু একটা বিড়াল তাকের উপর তুলে রাখা সেই কষ্টার্জিত কাঠের ছাঁচগুলিকে ফেলে ভেঙে দিয়েছিল। টুকরো টুকরো হয়ে এক-একটি অক্ষর ঘরের মেঝের এক-এক কোণে গিয়ে পড়ল। আর সেই থেকেই প্রবর্তন হল টাইপের পাশে টাইপ বসিয়ে কথা সাজাবার। তাইতেই আপনারা জানতে পারলেন সেক্সপীয়রকে, গ্যেটেকে, মোঁপাসাকে, মমকে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে। আমি কে জানতে চাইছেন? আমিই টাইপ!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

ডাকাতরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে একেবারে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্থানে।

উদ্দেশ্য অতি সাধু। চৌকীদার অভয় দিয়ে বলল যে, প্রাণে মারবার কোন মতলব তাদের নেই। ওরা এ রকম প্রায়ই করে থাকে। সাধারণতঃ উট ভাগিয়ে পাকিস্থানে নিয়ে যায় পালে পালে। নিদেন পক্ষে ভারত আর পাকিস্থানের সীমান্তে অজানা নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ডে। সেখানে জনমানব হীন জায়গাতে অনেক সুবিধা মত পোড়ো কেল্লা আছে। যার জানের কোন দাম আছে অর্থাৎ যে খোয়া গেলে অন্ত কারো লোকসান হতে পারে, এমন মানুষ পেলে উটের চেয়ে মনিষ্যিদের ওপরই ডাকাতের লোভ বেশী। কারণ, তাতে র‍্যানসম অর্থাৎ মুক্তিপণ অনেক বেশী পাওয়া যায়।

উটের চেয়ে মানুষকে আটকে রাখাও সহজ। খিদে-তেষ্টায় বিশেষ করে তেষ্টায় মারা যাবার ভয়ে ওই কেল্লা থেকে ভেগে তেপান্তরে পাড়ি দিতে আর যেই সাহস করুক, মানুষ করবে না।

তত দিন কত টাকা দিলে ডাকাতরা ছেড়ে দিতে রাজী হবে তার দর কষাকষি হতে থাকে।

হাতে হাতে তার প্রমাণও দেখে এসেছি স্বচক্ষে। আমাদের রেল-লাইন মরুভূমির মধ্যে পাকিস্থানের দিকে এসে এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সেই শেষ রেল-ষ্টেশন থেকে মাইল পঁচাত্তর উত্তর-পশ্চিমে খাঁটি মরুভূমির ভিতর পাড়ি দিয়ে বশলমীরে এসেছি। এ মরুতে একটুও ঘাস-জল এমন কি একটা ঝাউ বা ঝোপের ভেজাল পর্য্যন্ত নেই।

শুধু একটা ভেজাল আছে। তাও আধুনিকতার কল্যাণে। আমি চলেছি একটা জীপ গাড়িতে, উটের পিঠে নয়।

কিন্তু মরুভূমি তার খাজনা আদায় করতে ছাড়েনি। ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা সাতেকে পৌছে গেলাম বটে কিন্তু কি ঝাঁকুনী যে বাবা! আমি কোন রকমে টিকে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমার সঙ্গী পঞ্চনদের বীর মদনলাল লম্বা হয়ে বালিতে শুয়ে পড়ল। তার অন্নপ্রাশনের দিনের স্মৃতি ফিরে এসেছিল।

পথ বলে কিছু নেই। শুধু দূরে দূরে বালিয়াড়ীর চূড়োগুলো দেখা যায়। তাও একটা দমকা-ঝড়ে পিল-পিল করে বালির রাশি কোথা থেকে উড়ে গিয়ে কোথায় নতুন টিপি তৈরী করে তার ঠিক নেই। সরকার থেকে কিছু খোয়া-পাথর বিছিয়ে একটা রাস্তা গোছের কিছু বানিয়ে ছিল [illegible]। কিন্তু মরুভূমি হাসতে হাসতে তার উপর বালির ঝড় বইয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছে। তার পর খোঁজ পথ, যে জাম সন্ধান।

অবশ্য পথে আসতে আসতে কয়েক জায়গায় কাঠের ডাণ্ডায় লেখা আছে যে, সাত মাইল ভেতরে গেলে অমুক গ্রাম পাওয়া যাবে। এ রকম একটা গ্রামের নাম লাঠি। মদনলালের ইচ্ছা যে সেখানেই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে বিশ্রাম করবে। ফিরে আসবার সময় আবার জীপে উঠিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু লাঠির দৌড় কত দূর তা জেনে সে তাড়াতাড়ি মত বদলাল। কষ্ট সওয়া সহজ। কিন্তু তা বলে ডাকাতের হাতে?

তা ছাড়া খেসারত দেবে কে?

লাঠির সর্দার কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে নিবেদন করল যে, তার শ্বশুরকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে। নয়াদিল্লীতে খানাপিনার পর এয়ারকণ্ডিশন ঘরে বসে আমেরিকানরা গল্প বলছে যে ওদের দেশে ডাকাতরা শাশুড়ীকে ধরে নিয়ে গুম করে রাখে। তার পর হুমকি পাঠায়—ভেজো দশ হাজার ডলার জলদি; না হলে এই দিলাম শাশুড়ীকে ফেরৎ পাঠিয়ে। ভয়ে ভয়ে বড়লোক জামাই ডাকাতদের টাকা পাঠিয়ে দেয়। টাকা যাক, কিন্তু শাশুড়ী যেন ফেরৎ না আসে।

সেখানে নাকি মর্ত্ত্যলোকে মা সিংহবাহিনীর অবতার হচ্ছেন জামাইবাহিনী শাশুড়ী। শুনে সবাই এমন হাসি হেসেছিলাম যে, কোন দিন ভুলব না। কিন্তু আজ এই 'বানিয়া' বেচারার গল্প শুনে মদনলালের মুখ শুকিয়ে গেল। পেটে পাথর চাপা দিয়ে সে জীপের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

মহারাওল (মহারাজা) বাহাদুরের জীপ আমায় এনে তুলল খাস রাজপ্রাসাদে। চাঁপাফুলের রঙের মার্বল পাথরের প্রাসাদ। তার মিহি আর নিপুণ কারুকার্য্যের ছবি রাজস্থানের সব দ্রষ্টব্যের তালিকার মধ্যেই একেবারে উপরের দিকে ঠাঁই পেয়েছে। সেখানে ঠাঁই পেলাম আমি।

সহর আর কেল্লা থেকে মাইল দুই দূরে এই দোতালা রাজবাড়ী। ঝকমকে ফার্ণিচার আর দামী পুরু কর্পেটে ভরা। মহারাওলের প্রাইভেট সেক্রেটারী অতিথিকে আদরের কোন ত্রুটি করলেন না। কিন্তু একটু পরেই কোথায় যেন গা-ঢাকা দিলেন।

সব খাবার মায় চা পর্য্যন্ত এল রাজবাড়ী থেকে। কিন্তু এ-বাড়ী নয়, কেল্লার গায়ে লাগান রাজবাড়ী থেকে।

বিকেল বেলা মহারাওল নিজে আর তাঁর খুড়ো এলেন জীপে করে। সমস্তটা বশলমীর সহর—খুড়ি পোড়ো গ্রাম—ঘুরিয়ে দেখালেন। যত্ন করে দেখালেন কয়েক মাইল দূরে দূরে মহারাওলদের অমর কীর্ত্তি চবুতরা আর মরূদ্যানগুলি। এই ওয়েসিসগুলির মধ্যে শুধু পুকুর নয়, পদ্মফুল পর্য্যন্ত আছে। আছে বেল, চামেলী আর বাংলা দেশের আম। স্তরের পর স্তরে 'টেরাস' কাটা বাগানবাড়ী। মরুভূমির মধ্যে সত্যিই বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু সহরখানা মরুভূমি হয়ে এল। নতুন সরকার প্রথমে এটাকে কমিশনারের ডিভিসন বানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন একটা ছোট্ট মহকুমা মাত্র। কারণ, ব্যবসা নেই বলে সহর উজাড় হয়ে যাচ্ছে। একদিন গজনী কাবুল ইরাণের ব্যবসা উটের পিঠে

বলমীর হয়ে ভারতে ঢুকত। আজ উটের পিঠে চড়ে হঠাৎ হামলা দেয় শুধু ডাকাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্যারাভান নয়।

রাজধানীতে লোক নেই। রাজপ্রাসাদে নেই রাজা। তরুণ মহারাওল তার নতুন বিয়ে-করা মহারাণী আর সামান্য প্রিভি পার্স অর্থাৎ রাজত্ব যাওয়ার দরুণ খরচের টাকা নিয়ে কেল্লার পাশে পুরোনো রাজবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। না হলে বড় নিঃসঙ্গ লাগে।

শুধু নিঃসঙ্গ নয়। নিরাপদ মনে করেন না—টিপ্পনী কাটল এক জন যশলমীরী। হালফ্যাসনের প্যালেস যখন বানান হয় তখন মহারাজা রাজত্ব করতেন। আজ তিনি সরকারের সাধারণ প্রজা বৈ ত কিছু নন। কাজেই যেখানে নিজের ধন-সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপদে রাখতে খরচ কম হবে সেখানেই তিনি থাকবেন।

অবশ্য হাত-পা ঝাড়া মেহমানের এই রাজবাড়ীতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। পাকিস্থানের ডাকুরা—হিন্দুস্থানের ডাকুরাও সুবিধা পেয়ে ওদেশে বহাল তবিয়তে আস্তানা গেড়েছে—শুধু স্থানীয় বানিয়াদেরই ভাল শিকার বলে মনে করে। তবে দরজা-জানলা বন্ধ করে শোয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে শিয়াল ডাকতে লাগল। শিয়াল ডান দিকে দেখে সীতা অমঙ্গলের চিহ্ন বুঝতে পেরেছিলেন। বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। কিন্তু আজ আমাদের চার দিকেই শিয়াল। সে কথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু শিয়ালকে ভোলা সাধ্য কি? এই যশলমীরের এক রাজা লক্ষ্মণ সেন একবার প্রত্যেক রাতে শিয়ালের চীৎকারে অস্থির হয়ে ওরা কেন রাতে কাঁদে তার খবর নিতে হুকুম করেছিলেন। পারিষদরা বলল যে, ওদের ঠাণ্ডা লাগে বলে ওরা চেঁচায়। তাতে হবুচন্দ্র রাজা ওদের তুলোর পোষাক বানিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন।

পোষাক যার গায়েই চড়ুক বা তার দামটা যার পকেটেই যাক, শিয়ালের রা থামল না। আবার লক্ষ্মণ সেন ওদের কান্নার কারণ শুধোলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেই ঠিক করলেন যে, ওরা ঘর-বাড়ী নেই বলে কান্নাকাটি করে। মরুভূমিতে অনেক জায়গাতে ছোট ছোট কুঠরী বানিয়ে দিলেন। সুধী পাঠক, আপনি এটাকে নেহাৎ গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন না। এখনো এখানে-সেখানে পাথরের ছোট কুঠরী দেখলে বিনা সন্দেহে ধরে নিতে পারেন যে, শিয়ালের আস্তানা খুঁজে পেয়েছেন। টড সাহেবও পেয়েছিলেন।

সেই রাজা যে কেল্লাটার মধ্যে বসে রাজত্ব করতেন সেখানে মাত্র দু'-একটা বাতি এখনো জ্বলতে দেখছি। বাকী সব বাতিই নিবিয়ে লোকরা ঘুমোতে গেছে। আমিই শুধু জেগে আছি।

আলাউদ্দিনের পাঠান সৈন্যদলও এমনি ভাবে রাতের পর রাত ওই কেল্লার বাতির দিকে চেয়ে থাকত। দোষ ওদের নয়। ওরা এসেছিল প্রতিশোধ নিতে। রাওল জৈৎসিংহের ছেলেরা গমের ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একটা খুব দামী ক্যারাভানের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। বেশ কিছু দিন দহরম-মহরম করার পর সব লুঠ করে নিয়েছিল। তাতে পনের শ' ঘোড়া আর পনের শ' খচ্চর বোঝাই ধনরত্ন যাচ্ছিল আলাউদ্দিনের কাছে দিল্লীতে। এক কৌটা ধনরত্নও পাঠান সম্রাটের কাছে পৌছায় নি।

"ভাদ্র মাসের মেঘ এমন করেই আকাশ ভরে আসে"—পাঠান সেনাদলের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে যশলমীরের চারণ কবি।

কেল্লার বাইরে নবাব মাবুব খান আস্তানা গেড়েছেন। কিন্তু কেল্লার পাঁচীলের মাথায় ছাপ্পান্নটা কোণার ঘাঁটি আগলাচ্ছে তিন হাজার সাত শ' ভাটি অর্থাৎ যশলমীরী বীর। বাইরে মরুভূমির বালিয়াড়ির পিছন থেকে হঠাৎ হামলা দেয় রাওলের ছোট ছেলের সৈন্যরা। পাঠানদের রসদ আনা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা শুধু আস্তানা গেড়ে দুর্গ ঘেরাও করে রাখল।

এদিকে রাওলের ছেলে রতন সিং মাবুব খানের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে ফেললেন। দু'জনেরই এক রোগ—দাবা খেলা। সময় ঠিক করা আছে। রোজ ঠিক সেই সময়ে লড়াই স্থগিত থাকে। কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসেন রাজপুত্র আর তাঁবু ছেড়ে এগিয়ে আসেন নবাব। দু' পক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় গাছতলায় দু' জনের হুঁকো-বরদাররা দাবার ছক বিছিয়ে দেয়। শত্রুতা আর লড়াই ভুলে দু' জনে খেলেন দাবা।

আট বছর ধরে এ-হেন লড়াই—হাতিয়ার আর দাবা দুই নিয়েই চলল। একেবারে রূপকথার ব্যাপার!

একদিন দাবা খেলতে এসে নবাব দেখলেন রাজপুতদের মধ্যে খুব স্ফূর্তি গান-বাজনা চলছে। ব্যাপার কি? রতন সিং বললেন যে, তার বাবা মারা গিয়েছেন আর বড় ভাই মুলরাজের অভিষেক হচ্ছে। নবাব অভিনন্দন জানালেন। তার পর দুঃখ করে বললেন যে, গাছ-তলায় বসে দাবা খেলার দিনও ফুরিয়ে গেছে। আলাউদ্দিন হুকুম পাঠিয়েছেন যে, দুষমণের সঙ্গে দহরম-মহরমের কথা তার কাণে পৌছেছে। এবার দাবা থামাও আর শুধু লড়াই চালাও। কাজেই দু' জনে অনেক দুঃখের মধ্যে শেষ বার চুটিয়ে সুখ করে দাবা খেলে নিলেন। আলিঙ্গন করে বললেন যে, পরের দিন ভোরে আবার তাঁরা মিলিত হবেন—মরণ-আলিঙ্গনে।

ভাটি আর পাঠানে পরের দিন মারাত্মক লড়াই হল। এক দিনেই ন' হাজার সৈন্য হারিয়ে মাবুব খান তাঁবুতে ফিরে এলেন। আনালেন নতুন সৈন্য দিল্লী থেকে। এবার আরো জোর আক্রমণ চালাবেন।

এ দিকে কেল্লার মধ্যে সৈন্য আর রসদ দুই-ই ফুরিয়ে এসেছে। মুলরাজ আর তাঁর সামন্তরা ঠিক করলেন যে, রাজপুতের শেষ উৎসর্গ করবার মত যা আছে তাই অর্থাৎ প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্য এবার শেষ যুদ্ধ করতে যাবেন।

কিন্তু পরের দিন ভোরে দেখা গেল, পাঠানরা আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কেল্লায় খুব আনন্দ উৎসব শুরু হল। যে মৌড় অর্থাৎ মুকুট পরে যমের বোন যমুনার সঙ্গে শেষ অভিসারে যাবার কথা, সে মৌড় পরে তাঁরা করলেন প্রেয়সীর সঙ্গে নতুন বিয়ের নতুন অভিনয়। তরোয়ালের ঝনঝনের বদলে সবাই শুনল নূপুরের ঝুন-ঝুন।

কিন্তু এই ফাঁকে নবাব মাবুব খানের ছোট ভাই যে কেল্লার কারাগার থেকে পালিয়ে উধাও হয়ে গেল সে খবর কেউ রাখল না।

ক'দিন পরেই আবার ভাদ্র মাসের মেঘের দল যশলমীরে ছবির মত সুন্দর ঢেপ্রার তলায় জমা হল। নবাব তার ভাইয়ের কাছে জেনেছেন যে, রাজপুতদের আর সৈন্য বা খাবার বলতে

বিশেষ কিছু বাকী নেই। ক'দিন আগে যে শেষ উৎসব স্থগিত হয়েছিল সেটা এবার সেরে নিতে হবে।

রতন সিং বললেন—মেয়েরা সব চিতায় আত্মসমর্পণ করুন। আগুন আর জল দিয়ে যা নষ্ট করা যায় সবই আমরা শেষ করে দেব। তার পর কেল্লার দরজা খুলে তরোয়াল দিয়ে কেটে কেটে স্বর্গের পথ বানিয়ে নেব।

মূলরাজ বললেন—লড়াইয়ে হাতীও তোমাদের রুখতে পারে না। আমার রাজসিংহাসনের সম্মান এই তরোয়াল রইল তোমাদের হাতে। শত্রুর উপর এরই আঘাতে আঘাতে যশলমীরে আলো জ্বলে উঠুক।

শেষ রাত্রিটুকু কাটল স্বজনের সঙ্গে মিলনে—চিরকালের জন্য মিলনের ভূমিকায়। রাজপুতানীরা বলেছিলেন—আজ রাতে আমরা তৈরী হয়ে নিচ্ছি। ভোরের আলোতে আমরা স্বর্গে চলে যাব। স্বামী, ভাই, ছেলেদের জন্য জায়গা ঠিক রাখবার জন্য একটু আগেই যাব।

চব্বিশ হাজার রাজপুতানী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সে দিন। রাজপুতরা খোলা তরোয়াল হাতে দেখল সে আগুন জ্বালা। আগুন রঙের পোশাক পরে বিয়ের মুকুটমৌড় মাথায় চড়িয়ে তিন হাজার আটশ' রাজপুত পরস্পর আলিঙ্গন করল। এত ভাল তারা আগে কখনো বাসেনি। তার পর চলল শেষ অভিসারে। নিজেরাই খুলে দিল দুর্গ-দ্বার।

চারণ কবি লিখেছেন,—"যুদ্ধের সমুদ্রে রতন সিং ডুবে গেলেন, কিন্তু তার তরোয়ালের সামনে শুয়ে পড়ল এক শ' কুড়ি জন বীর। মূলরাজ বর্বরদের শরীরে বর্শা চালিয়ে চললেন। রক্তে মাটি ভেসে গেল।"

নবাব মাবুবও বীরপূজা জানতেন। তাঁর ভাইকে রাজপুতরা প্রাণে না মেরে শুধু বন্দী করে রেখেছিল। তাই তিনি যুদ্ধে জিততে পেরেছিলেন। তিনিও প্রতিদানে রতন সিংহের ছেলেদের বাঁচিয়েছিলেন; যশলমীরের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

যশলমীর কেল্লা আর কখনো শত্রুর হাতে হার মানে নি।

সেই কেল্লার শেষ বাতিটি এখন নিবে গেল। রতন সিং আর মাবুব খান কি এখন আবার গাছতলায় দাবার ছক নিয়ে বসবেন রোজকার মত?

বিজলী বাতি আর পাখা এখন বন্ধ হয়ে গেল। মহারাওলদের রাজত্বের সময় সারা দিন-রাত বিজলী পাওয়া যেত। নিজের খরচে বিদ্যুতের কারখানা বসান; যা কিছু লোকসান হয় তা-ও নিজের। এখন গণতান্ত্রিক সরকার যে টাকাটা জনসাধারণের কাছ থেকে ফেরৎ পাবেন না সেটাকে লোকসান বলে ধরে? কাজেই বিজলীর কারখানা চলে মাত্র ঘণ্টা বার। রাত্রে মরুভূমির গরমে যদি হাঁসফাঁস কর সে তোমার নিজের দোষ। এটা যে বৈশ্য-যুগ।

কিন্তু বিজলীর ঝিলিক দেখেছি সারা সন্ধ্যাবেলা। মহারাওলের পূর্বপুরুষের তৈরী অমর সাগরের পারে। আজ ওদের ভাদোন্ উৎসব গেছে।' রাজোয়ারার সব চেয়ে বেশী অনুর্বর মরুতে তৈরী হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর ফুল। বালির দেশে পাথরের ফুল। চোখ ঝলসিয়ে দেওয়া রোদের মধ্যে স্নিগ্ধ বাতাস আর আলো বাড়ীর মধ্যে আসতে দেবার জন্য আশ্চর্য্য সুন্দর পাথরের ঝিলমিল। এত সুন্দর যে হাতে খুদে করা হয়েছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

আজ সেই অদ্ভুত সুন্দর "হাভেলী"তে লোক নেই। যে দেশ এই সেদিনও সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন দেখেছিল সে দেশ এখন স্বপ্ন দেখে পাকিস্থানে চোরাই মাল আমদানী-রপ্তানীর, দুঃস্বপ্ন দেখে ডাকাতি আর রাহাজানির। এক কালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমল বাপনার প্রাসাদ বোধ হয় সব চেয়ে বড় আর সুন্দর। পুলিশ-দারোগার লোহার নাল-বাঁধাই নাগরার খটাখট আওয়াজে সেই হাভেলী এখন রোজ কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে। মাসিক বখশিষ মাত্র পঁচিশ টাকা।

সেই পড়ো আর ছেড়ে আসা পাড়াগুলির ভিতর থেকে রঙীন সোনালী-রূপালী চুনরী শাড়ীতে ঝেলিতে ঝলমল করতে করতে বেরিয়ে এল রাজস্থানের রূপসীরা। শিরে গাগরী, চেম ভারী। জল নয়, বালির উপর দিয়ে তারা যেন রাজহংসীর মত লীলাভরে ভেসে আসতে লাগল। চলেছে তারা অমরসাগরে। না, না, স্বপ্ন-সায়রে।

পোষাকের অত রঙ, গয়নার অত বাহার, ফুলের অত মিছিল চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। চোখ বুজে কাণ পেতে রইলাম। ভুলে গেলাম রঙহীন সাদামাঠা বাঙালী-জীবনের কথা, নুণ আর পান্তের সমস্যায় ঘেরা আটপৌরে দিনগুলি।

কালীয়ে কালায়ণ উপড়ী এ পানিহারী হেলো
গুড়লা সা বরষে মেহ সোনেলো।
মোটোরী ছোটোরী বরসে মেহ সোনেলো।

কালো মেঘের ডাকে মেঘনার কালো জলে বান-ডাকা দেখেছি। আজ চোখ বুজে মরুভূমির বুকে সোনালী মেঘের আবাহন করলাম মনে মনে। প্রাণের মধ্যে সাড়া পেলাম মল্লার রাগের। অমর-সাগরের টলটলে বুকের উপর গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হবে কি? ছোট আর মোটা বৃষ্টির ধারা রিমঝিম সুরে ঝরবে কি? বিরহিণীর করুণ ডাকে সাড়া দেবে কি?

পানিয়া ভরণের গানের পর ওরা গাইতে লাগল 'উমরলো'। ওগো আমার প্রিয়, বহু দূর থেকে মেঘ আসছে, বল কোথায় তারা ঝরবে। বল প্রিয়তম আমার, তুমিও কখন উটে চড়ে আসবে। ওগো, বিরাট কালো পাহাড়ের মত মেঘ উঠেছে আকাশে, আর শীগগিরই বরফের মত শাদা হয়ে যাবে। ওগো প্যারে, তোমার ফিরে আসার সময় যে এলো। আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই সময় মত আসবে। কচি সবুজ বাঁশ আনা হয়েছে মণ্ডপ বাঁধবার জন্য, সাজানো হয়েছে কলস। ওগো প্রিয়তম, তোমার কথা মত তুমি নিশ্চয়ই আসবে।...ওগো, মণ্ডপের মধ্যে চৌকী সাজান হয়েছে আর চেরাগ দিয়ে তা সাজানো হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই আসবে।

'আওয়েরে ঢোলো উমরলো' গানের প্রত্যেক পদের শেষে করুণ রাগিণীতে গেয়ে উঠতে লাগল তারা 'আওয়েরে ঢোলো উমরলো।'

উজ্জয়িনীর পাহাড়ের চূড়া থেকে, বাংলা দেশের তমাল-বন থেকে মেঘের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে কবিরা যুগে যুগে। জলহীন মেঘহীন মরুভূমি যশলমীরের বিরহিণীদের মুখেও সেই নিমন্ত্রণ ধ্বনিত হচ্ছে।

কালিদাস একা নন, ঘরে ঘরে আমরা ক্লান্ত অকবির দলও মর্মে মর্মে বুঝি—মেঘালোকে, মেঘ দেখে মন আনমনা হয়ে যায়—প্রেয়সী

পাশে থাকলেও। আর তিনি যদি থাকেন দূরে, বহু দূরে? এই দুস্তর মরুর ওপারে? আরো, আরো অনেক দূরে?

প্রেয়সী যদি থাকেন ওই দূর দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়? কেল্লার মধ্যে জানলার পাশে বসে আছেন বিরহিণী, আঁধার রাতে বাতি জালিয়ে। প্রিয় আসবে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যাকুল বেগে। চাইবে নিচের সমতল ভূমির বন-জঙ্গল থেকে আকাশের তারাগুলির পানে। তার মাঝে নিজের বাতায়নের পাশে একটি দীপশিখা আর দু'টি আঁখিতারাকে খুঁজে বের করবার জন্ত। কিন্তু যদি তবু মিলন না হয়? বিরহ-সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যদি দু'জনে দু'জনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?

আঁধার রাতে আজ আকাশে কয়েকটি তারা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘুমও নেই আমার চোখে। রোমিও জুলিয়েটের আত্মা হয়ত আকাশে তারা হয়ে চিরকাল বিরহী বিরহিণী হয়ে আছে। পৃথ্বীরাজ আর তারা বাঈও নিশ্চয়ই এমন ভাবেই আছে। মেবারের বীর প্রেমিক পৃথ্বীরাজ আর 'বেদনোর সহরের তারা' তারা বাঈ।

রাণা রায়মল্লের তিন ছেলে আর ছোট ভাই পাহাড় বেয়ে উঠছেন চারণী দেবীর মন্দিরে। সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ আর জয়মল্লের মধ্যে কে যে পরে রাজা হবে সে কথা তিন জনেরই মনে আগুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলছে। সঙ্গ বড় ছেলে। বাপের পর মেবারের সিংহাসন তাঁরই পাবার কথা। (তিনি তা পেয়েছিলেন ও বাবরের সঙ্গে লড়েছিলেন)। কিন্তু তিনি একটু হিসেবী আর সাবধানী। পৃথ্বীরাজ হচ্ছেন বেপরোয়া। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের যুদ্ধে নিয়ে যাবার জন্ত তিনি অস্থির আর সেজন্ত তাঁর শিক্ষা আর সাহসের শেষ নেই। আর জয়মল্ল?—তা, ছোট ছেলে বলে কি সিংহাসন পাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে না? খুড়ো সূর্য্যমল্লেরও নজর সে দিকে আছে।

খুড়ো আর ভাইদের পৃথ্বীরাজ বোঝাচ্ছিলেন যে, দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সব চেয়ে ভাল ভাবে লড়বার জন্ত তারই রাজা হওয়া উচিত। সঙ্গও দেশকে কম ভালবাসেন না। বললেন,—বেশ ত, ভগবান যাকে সব চেয়ে বেশী কাজের বলে মনে করবেন, তাকেই মেবারের রাণা করবেন। আমি বড় হলেও দাবী ছেড়ে দিতে রাজী আছি। বাঘপাহাড়ে চারণী দেবীর মন্দিরে গিয়ে পুজারিণীকে জিজ্ঞেস করা যাক।

পুজারিণী মন্দিরের গুহাতে ছিলেন না। কাজেই ওঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন: পৃথ্বীরাজ আর জয়মল্ল বসলেন পুজারিণীর বিছানার উপর, আর সঙ্গ বাঘছালের উপর। সূর্য্যমল্ল বসলেন মাটিতে, একটি হাঁটু বাঘছালের উপর রেখে।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির আর দুর্য্যোধন দু'জনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্য্যোধন এসে বসলেন তাঁর মাথার কাছে। আর যুধিষ্ঠির পায়ের কাছে। সেই বসার ভঙ্গির মধ্যে ছিল নিয়তির ইঙ্গিত। যিনি পায়ের কাছে বসেছিলেন আসল সাহায্য-ভিক্ষা ত তিনিই করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে দেখতে পেলেন যুধিষ্ঠিরকে। প্রথম সাহায্য বেছে নিতে দিলেন তাঁকেই।

পুজারিণী গুহায় ফিরে এলেন। পৃথ্বীরাজ সব কাজেই আগুয়ান। হুড়মুড় করে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য খুলে বললেন। কিন্তু পুজারিণী সঙ্গর দিকে ফিরে তাকালেন। বাঘের ছাল হচ্ছে আদ্দিকাল থেকে রাজার আসন। তুমি যখন বাঘছাল বেছে নিয়েছ, ভবিষ্যতে মেবারের রাণা হবে তুমিই।

পাশেই বসে সূর্য্যমল্ল। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আর তুমি যে একটি হাঁটু বাঘছালের উপর রেখে বসে আছ, তুমিও ভবিষ্যতে এক টুকরো রাজ্য পাবে। তবে অনেক দুঃখ, অনেক লড়াইয়ের পর।

লড়াই বেধে উঠল তখনি। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পৃথ্বীরাজ তখনি সঙ্গকে মেরে ফেলতে উঠলেন। কিন্তু মাঝখানে এসে পড়লেন খুড়ো। বেঁচে গেলেন মেবারের ভাবী রাণা। একটা চোখ গেছে আর সারা গায়ে ঝরছে রক্ত।

না। তবু রক্ষা নেই। পৃথ্বীরাজ আর সূর্য্যমল্ল লড়াইয়ের চোটে জখম হয়ে পড়ে রইলেন গুহাতে। কিন্তু জয়মল্ল তার সঙ্গী-সামন্ত নিয়ে তেড়ে চললেন সঙ্গকে। এক জন রাঠোর একটি মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সঙ্গ তাকে পরিচয় দিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রাঠোর তাঁকে আশ্রয় দিলেন। যতক্ষণ না সঙ্গ পালিয়ে যেতে পারেন ততক্ষণ একা তরোয়াল হাতে জয়মল্লের দলের সঙ্গে লড়লেন। আশ্রিত বেঁচে গেল, কিন্তু রাঠোরকে প্রাণ দিতে হল।

হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে বীরত্বে সব চেয়ে বেশী বড় ছিল মেবার। চার পাশে মুসলমান শত্রুর রাজ্য। তারা একে একে হিন্দু রাজ্যগুলি গ্রাস করছে। উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথে আসছে তৈমুর-বাবরের আক্রমণ। তবু এই মেবারের রাজপুত্রদের মধ্যে ভায়ে ভায়ে মারামারি। সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি। কাজেই হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়?

রাণার কাণে সব খবর এল। তিনি পৃথ্বীরাজকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। লড়াই যখন এতই ভালবাস, যাও লড়াই করেই খাও গিয়ে।

নরওয়ে দেশের ডাকাত ভাইকিংদের এই রকম ব্যবস্থা ছিল। সব জোয়ান ছেলেকেই নিজে চরে খেতে হত। বড় হয়ে বেই ঘরে গোলমাল সৃষ্টি করতে সুরু করত তাদের বাইরে খেদিয়ে দেওয়া হত। নিজের ব্যবস্থা তখন থেকে নিজের হাতে। বাঙালী জমিদার-ঘরের মত নয় যে, পৈতৃক কিছু আছে, অতএব সেটুকু ভাগাভাগি করেই দিন চালাতে হবে। অথচ এদিকে কয়েক বছরের মধ্যে তাল-পুকুরে ঘটি ডোবে না।

পৃথ্বীরাজ চরে খেতে লাগলেন। কাজ হচ্ছে একটার পর একটা পরগণা গায়ের জোরে দখল করে নিজের নাম বাড়ান। আর বাপের রাজত্ব।

মেবারে বেদনোর সহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন টোডার রাজা। পাঠানরা তাকে রাজ্যহারা করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বার বার চেষ্টা করেও নিজের রাজ্য ফিরে পাচ্ছিলেন না। বহু রাজপুত বীর তার হয়ে লড়েছিল। কারণ যে টোডা জয় করতে পারবে রাজা তার সঙ্গেই রাজকুমারী তারা বাঈয়ের বিয়ে দেবেন। তারা বাঈ অন্দরে বসে রান্না আর সেলাই আর সংসারের সেবা নিয়ে বসে ছিলেন না। তরোয়াল হাতে দামাল ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতেন।

তার হাতের বর্শা আর চোখের চাহনী সমান ঝিলিক হানত। রূপের জন্ম তাকে সবাই বলত বেদনোরের তারা।

জয়মল্ল টোডারাজের কাছে তার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু উত্তর দিলেন তারা বাঈ। যে আমার বাবার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে, শুধু তাকেই দেব বরণমালা। শুধু বসুন্ধরাই বীরভোগ্যা নয়। নারীও।

জয়মল্ল কথা দিলেন যে, তাই করবেন। দেখতে এলেন তারা বাঈকে। পেলেন তার পরিচয় আর সঙ্গ। কিন্তু আফিমের ঝোঁকেই হোক বা তার চেয়ে কড়া যৌবনের নেশাতেই হোক, মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। টোডারাজের তরোয়ালে তাই মাথা হারাতে হল।

পুত্রহত্যার প্রতিশোধ চাই। মাথার বদলে চাই মাথা। মেবারের সামন্তরা গরম হয়ে উঠলেন। রাণাকে ক্রমাগত উস্কাতে লাগলেন। কিন্তু রাণা মাথা নাড়লেন। যে অসহায় নারীকে অসম্মান করে, আশ্রিতকে দেয় না মর্য্যাদা, তার মরাই উচিত। শুধু তাই নয়। এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। বেদনোরের জায়গীর আমার পুত্রহন্তাকেই দিলাম।

ভাই এমন ভাবে মরল। বাপ প্রায়শ্চিত্ত করলেন এমন ভাবে। আর সবার উপরে তারা বাঈয়ের এত রূপ। এতেও যদি পুরুষত্ব না জেগে ওঠে তবে সে কেমনতরো রাজপুত?

পৃথ্বীরাজ কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে নিলেন।

সোজা বেদনোরে এসে একেবারে তারা বাঈয়ের পাণি-প্রার্থনা করলেন।—হবে কি তুমি আমার সহধর্মিণী?

—তুমি কি আমার বাবাকে টোডা ফিরিয়ে দিতে পারবে?

পারব। রাজপুতের দিব্যি দিয়ে বলছি, নিজের কসম খেয়ে বলছি, পারব।

আচ্ছা, তবে তাই হোক। হলাম তোমার সহধর্মিণী। এবং সহকর্মিণীও।

দু'জনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চললেন টোডা জয় করতে। বাহুতে তুমি যে শক্তি। সেই শক্তি এখন চলেছেন জীবন-মরণ কী সাথী হয়ে।

"যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী।"

টোডা সহরে খুব উৎসব চলছে। মিছিলে মিছিলে লোক একাকার। উপরের ঝুল-বারান্দা থেকে পাঠান সুবাদার দেখছেন লোকের ভিড়; পরে নিচ্ছেন দরবারের পোষাক। এমন সময়ে নজরে পড়ল যে, দু'জন ভিনদেশী পোষাক-পরা লোক সেখানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এরা কারা? কোন্ সুদূরের বিদেশী?

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পেতে হল না। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ধনুকের ছিলা টঙ্কার দিয়ে কেঁদে উঠল। একটা বর্শা শন-শন করে বাতাস ফুঁড়ে উপরে ছুটে এল। বারান্দায় গড়িয়ে পড়ল সুবাদারের মৃতদেহ।

চার দিকে মহা হৈ-চৈ। কি ব্যাপার? কি করে হল? দুষমণরা ক' হাজার লোক? মেবারের রাণা হামলা করল না কি?

কিন্তু কে দেয় জবাব, আর কে করে খবর! সবাই চাচা আপনা বাঁচা। ততক্ষণে বীর-দম্পতি চলেছেন সহরের দরজার দিকে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাজপুত সৈন্যদল।

পাঁচীলের দরজার সামনে একটা হাতী শুঁড় তুলে রুখে দাঁড়াল। নিমেষে একটা তরোয়ালে ইস্পাতের বিদ্যুৎ খেলে গেল। শুঁড় ধড় থেকে কেটে গড়িয়ে পড়ল। হাতী পালাল পথ ছেড়ে। তারা বাঈ নিজ হাতে ফটক খুলে দিলেন। জয় বেদনোরের তারার জয়!

আজমীরের সুবাদার তৈরী হতে লাগলেন এই হারের শোধ নেবার জন্য। কিন্তু আগে থেকে নিজে হামলা করাই আত্মরক্ষার সব চেয়ে ভাল পথ। চিরকালের যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে এই। পৃথ্বীরাজ রাতারাতি দলে বলে চললেন আজমীরে। ভোর না পোয়াতে আজমীরের কেল্লার চূড়ায় রাজপুতের নিশান পৎ-পৎ করে উড়তে লাগল।

এদিকে বুড়ো রাণার মন ভেঙ্গে গেছে। বড় ছেলে সঙ্গ নিখোঁজ; ছোট ছেলে জয়মল্ল নেই। এক আছে পৃথ্বীরাজ। সে-ও নির্বাসনে। অথচ তার জয়গানে, পুত্রবধূর রূপ আর বীরত্বের গাথায় রাজস্থান ভরে উঠেছে। তিনি ছেলেকে ফিরে আসতে নিমন্ত্রণ করলেন।

পৃথ্বীরাজের বাপের সঙ্গে আর কোন মন-কষাকষি রইল না। কিন্তু তা বলে কি তিনি রাজপুত্রের মত আরামে রাজপ্রাসাদে দিন কাটাবেন? মেবারের পশ্চিম দিক থেকে আসে দিল্লীর হানা, মালবের সুলতানের আক্রমণ। তিনি পশ্চিম-সীমান্তে কমলমীরে নতুন কেল্লা বানালেন। একটার পর একটা সারি সারি যুদ্ধের দেওয়াল, তাতে গুলী ছুড়বার ঘুলঘুলি, পাহারা দেওয়ার ঘুমটিঘর সবই বসান হল। আর সবার উপরে একেবারে চূড়ায় তৈরী হল তারা বাঈয়ের মেঘমহল।

রাজ্যের সীমান্তে হঠাৎ হঠাৎ হানা দিত ডাকাত আর লুঠেরার দল। বিচার-ব্যবস্থা ভাল ছিল না। পৃথ্বীরাজ সেখানে শান্তি আর ন্যায়ের রাজত্ব ফিরিয়ে আনলেন। য়্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে দলে দলে রাজপুত নানা দেশ থেকে তাঁর দলে এসে যোগ দিল। চারণ কবি গেয়েছেন যে, "তাঁদের তরোয়াল আকাশে ঝকমক করত আর পৃথিবীতে সবাই ভয় করত। কিন্তু যাদের রক্ষা করবার কেউ নেই তাদের সাহায্য করত।" রবিণহুডের রাজ সংস্করণ।

এদিকে সুর্য্যমল্ল বিদ্রোহ করে বসলেন। পূজারিণীর ভবিষ্যদ্বাণী তিনি ভোলেন নি। রাজা তাঁকে হতে হবেই। তাই মালবের সুলতানের সাহায্য নিয়ে তিনি লুঠপাট করতে করতে মেবারের বেশ খানিকটা দখল করে ফেললেন। রাণার সঙ্গে যুদ্ধ হল। ব্যাপার বেগতিক দেখে রাণা নিজে সাধারণ সিপাইয়ের মত লড়ে গেলেন। তবু ওদের বেদম হার হত যদি না পৃথ্বীরাজ হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে নিজের রবিণহুডের দল নিয়ে হাজির হতেন।

রাত আঁধার হয়ে যাওয়াতে যুদ্ধ মুলতুবী রইল সেদিনকার মত। কিন্তু দু' দলেরই শিবিরে জ্বলছে আলো। কখন আবার ভোর হবে, আবার সুরু হবে লড়াই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ বেপরোয়া ভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন একেবারে সুর্য্যমল্লের তাঁবুতে। খুড়োর গায়ের সব জখম নাপিত সেলাই করে দিয়েছে। তিনি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে পৃথ্বীরাজ। ভয়ে

ধাঁতকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন সূর্য্যমল্ল। এত হঠাৎ, এত জোরে যে জখমের সেলাইগুলি সব ছিঁড়ে গেল। আবার রক্ত পড়তে লাগল।

কিন্তু পৃথ্বীরাজ হেসে অভয় দিলেন।—আমি নিশুতি রাতে চোরের মত মারতে আসিনি। আপনি ভাল ত?

খুড়োও কম যান না। বললেন,—বাবা, তোমায় দেখেই আমি ভাল হয়ে গেছি। কোন কষ্ট আর নেই।

—কিন্তু, কাকা, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত আমার একটুও তর সইল না। লড়াইয়ের পর বাবার সঙ্গে এখনো পর্য্যন্ত দেখা করিনি। এমন কি খাইনি পর্য্যন্ত। এখন কিছু খেতে দাও আমায়।

খাবার এল। যারা সারা জীবন পরস্পরের মরণ চেয়েছেন মনে মনে আর মারামারিতেও—তারা একসঙ্গে বসে এক থালা থেকে খেতে লাগলেন। যেন এত বড় বন্ধু আর হয় না!

—সকালেই আমাদের লড়াইয়ের এস্পার-ওস্পার করে নেওয়া চাই—এই বলে পৃথ্বীরাজ বিদায় নিলেন।

খুড়ো জবাব দিলেন,—সেই ভাল বাছা! একটু তাড়াতাড়ি এসো।

পরের দিন সূর্য্যমল্লের বেধড়ক হার হল। কিন্তু পৃথ্বীরাজের তরোয়ালের ছোঁয়া তার গায়ের উপর পড়ল না। বনে পালিয়ে গাছপালা দিয়ে লুকোবার ঠাঁই তৈরী করে নিলেন। আশা করলেন যে, শত্রুপক্ষ আর তার নাগাল পাবে না। কিন্তু এক দিন গভীর রাতে হঠাৎ ডাল-লতা-পাতার বেড়াগুলি মড়-মড় করে আওয়াজ করে উঠল। সূর্য্যমল্ল চেঁচিয়ে উঠলেন—এ নিশ্চয়ই আমার ভাইপো। তা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হাতে তরোয়াল তুলে নিতে না নিতেই পৃথ্বীরাজের তরোয়ালের এক ঘায়ে সেটা খসে পড়ে গেল।

সূর্য্যমল্ল যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করলেন। বললেন,—আমি যদি মরি কিছু যায়-আসে না। আমার ছেলেরা রাজপুত। তারা আবার লড়তে পারবে; শোধও নিতে পারবে। কিন্তু বাবা, তুমি যদি মর তাহলে চিতোরের কি হবে?

শেষ পর্য্যন্ত চিতোরের ভবিষ্যৎ ভেবেই সূর্য্যমল্ল এই শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরই এক বংশধর, দেওলার রাজা, আকবরের চিতোর জয়ের সময় কাপুরুষ রাণার বদলে নিজের মাথায় রাজছত্র নিয়ে লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছিলেন।

একটি নারীর কাতর মিনতি এখন পৃথ্বীরাজের মনকে নাড়া দিল। তাঁর নিজের এক বোনের বিয়ে হয়েছিল সিরোহীর রাজার সঙ্গে। মাউন্ট আবুর মত সুন্দর জায়গা মেবার জামাইকে যৌতুক দিয়েছিল। তবুও জামাই নববধূর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে। আফিম খেয়ে বা মাতাল হয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার অনেক স্বামীর বীরত্বের প্রমাণ হয়ে আছে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এ-হেন বীর পুরুষরা স্ত্রীকে চুল ধরে হেঁচড়িয়ে বিছানা থেকে নামিয়ে পালঙ্কের নীচে মেঝেতে ফেলে রাখে।

সিরোহীরাজ আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, আর তাঁর স্ত্রী খাটের নীচে। এমন সময় বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিরাট লম্বা মূর্ত্তি। মাঝ-রাতে রাজবাড়ীর দেওয়াল বেয়ে সিপাই-শান্ত্রীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পৃথ্বীরাজ এখানে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু স্বামীর গলার কাছে ছোরা দেখে স্ত্রী ভাইয়ের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করলেন। রাজার তখন ভয়ের চোটে ঘুম উধাও হয়ে গেছে। স্ত্রীর জুতো নিজের মাথার উপর রেখে স্ত্রীর পা ছুঁয়ে আর কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করতে হল। প্রাণে রক্ষা পেলেন তিনি।

এর পরে পৃথ্বীরাজ ভগিনীপতিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক যেমন ভাবে পরাজিত শত্রুকে তিনি করতেন। যে রাজপ্রাসাদে চোরের মত ঢুকেছিলেন সেখানে রাজার মত সম্মান পেলেন। অনেক দিন সেখানে থাকতে হল তাঁকে। মেবারের যুবরাজ আর রাণীর ভাই। কত আনন্দ উৎসব হল।

বিদায় নেবার সময় ঘোড়ায় উঠতে যাবেন এমন সময় সিরোহীরাজ নিজে হাতে পৃথ্বীরাজকে কিছু মিঠাই দিলেন। মিঠাইয়ের জন্ত সিরোহীর খুব নাম-ডাক আছে। আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরাও যাবার দিন হাঁড়িতে কিছু মিষ্টি দিয়ে দেন রাস্তায় খাবার জন্ত:—পথে যেন তোমার খাবার কষ্ট না হয়, অসুবিধা না হয়। আর লক্ষ্মীটি, আমার কথা মনে রেখো।

সম্মুখ সমরে যিনি সর্বদা ধর্মযুদ্ধ করেছেন, শত্রুর হাতে খানা-পিনাকে তিনি সন্দেহ করবেন কেন? সিরোহীর মিঠাই খেতে খেতে তিনি চললেন। কিন্তু কমলমীরে তাঁকে পৌঁছাতে হল না। যে পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে কমলমীরের গিরিবর্ত্ম দেখা যায় সেখানে এসে তাঁর বুক ধুক্-ধুক্ করতে লাগল। তারা বাঈকে তখনি তিনি খবর দিয়ে পাঠালেন। তারা তখন অপেক্ষা করছিলেন মেঘ-মহলের বাতায়নে। বহু দূরে স্বামীকে দেখতে পাবেন গিরিবর্ত্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। তারা বাঈ চোখ মেলে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন। পৃথ্বীরাজও বুজে-আসা চোখ কোন মতে টেনে রেখেছেন, একবার বেদনোরের তারাকে শেষ বারের মত দেখে যাবেন।

শেষ দৃষ্টি-বিনিময় আর হল না। বীর নারীর গানে গানে যে আকাশ ভরে আছে, তার নীচে তারা-ভরা রাতে আমি একা নই। একা নই।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

পাঁচ

কমলেশ এন্ট্রান্স পাশ করলে এ বৎসর। সেটা সুসংবাদ কি দুঃসংবাদ, কি ভাবে এ খবরটা গ্রহণ করতে হবে, সেইটে স্থির করতেই কিছুক্ষণ সময় গেল। কারণ, এতাবৎ কালের মধ্যে এ বাড়ির কোনো ছেলে স্কুল-পাঠশালায় পড়েনি। এ বংশের ঐতিহ্য এক পাশে ঠেলে রেখে হরসুন্দরী এক রকম জোর করেই কমলেশকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন।

কেন দেন, তার কারণ এখনই কাউকে তিনি বলেন নি। কিন্তু অনুমান করা যায়। প্রথমত, তাঁর পিতৃকুলে ইংরাজি লেখাপড়ার চর্চা আছে। সে বংশে কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ বা সরকারী কর্মচারী। এ বংশ সে জন্য তাঁদের কিছুটা অবজ্ঞাই করতেন। খেটে-খাওয়াটা এই বংশের কাছে অবাঞ্ছনীয়। বধূ হরসুন্দরী তার প্রতিবাদ করতে সাহস করতেন না। কিন্তু উভয় বংশের মধ্যে তুলনায় তাঁর কাছে পিতৃকুলের পুরুষেরাই বাক্যে এবং ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হোত।

দ্বিতীয় কারণ, বধূ মণিমালা। অশিক্ষিত, মত্তপ শৈলেশকে নিয়ে শ্বশ্রু এবং বধূ উভয়েরই দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ যথেষ্ট। হরসুন্দরীকে তিনি বাঘের মতো ভয় করেন। অন্য সমস্ত কিছুর মতো নিজের পুত্রের উপরও তাঁর কোনো জোর নেই। কমলেশ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কেউ চায় না, তিনিও কিছু বলেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হরসুন্দরী ইঙ্গিতেই বধূর ইচ্ছা বুঝে নিলেন। বোধ করি, সেইটেই হরসুন্দরীর কাজের এক মাত্র সমর্থন।

তৃতীয় কারণ সমরেশ। হরসুন্দরীর মনে সমরেশ সম্বন্ধে ভয়ের আর শেষ নেই। সম্পত্তি এবং মর্যাদায় নিজের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমরেশের লুব্ধ দৃষ্টি এই পরিবারের সমগ্র সম্পত্তি এবং মর্যাদার দিকে প্রসারিত হয়েছে ব'লে হরসুন্দরীর সন্দেহ। সেই দুরন্ত লোভ প্রতিহত করতে গেলে এই বংশে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান সন্তান আবশ্যক। হরসুন্দরী তাই বংশের সনাতন ধারা উপেক্ষা ক'রে কমলেশকে শিক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

চতুর্থ কারণ শৈলেশ। সে মত্তপ, অলস এবং উচ্ছৃঙ্খল। অপরাহ্ণের ছায়ার মতো ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কে জানে, শৈলেশ এ বংশের শেষ জমিদার কি না। হরসুন্দরীর মনে সন্দেহ আছে। কমলেশ যাতে একেবারে অসহায় হয়ে না পড়ে, সে ব্যবস্থা ক'রে রাখা তিনি কর্তব্য মনে করেন।

ডাক এখানে বিকালে বিলি হয়। সেই ডাকে কমলেশ তার পাশের খবর পেয়েই হরসুন্দরীর কাছে ছুটলো।

সূর্য সবে অস্ত যাচ্ছে।

হরসুন্দরী তখন ছাদে পায়চারি করছিলেন। সিঁড়ি থেকে কমলেশের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের ডাক শুনেই তিনি সুসংবাদটা অনুমান ক'রে সহাস্যে দাঁড়ালেন।

ঠাকমাকে জড়িয়ে ধ'রে কমলেশ বললে, আমি পাশ করেছি ঠাকমা। ফার্স্ট ডিভিশনে। আমাকে কি দেবে বল?

হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, কি নিবি বল্?

—যা চাইব দেবে?

—সাধ্যে কুলোলে দোব। আমরা ক্রমেই গরীব হয়ে যাচ্ছি কমল, বুঝতে পারিস না?

—পারি ঠাকমা।

ব্যথা-ভরা বড় বড় চোখ মেলে কমল ঠাকমার দিকে চেয়ে রইল।

হরসুন্দরী বললেন, তোর বাপের ওপর আমার আস্থা নেই। তার উপর বাঘ থাবা পেতে ব'সে রয়েছে। ব'লে সমরেশের নতুন দোতলা বাড়িটার দিকে কুটিল দৃষ্টিতে চাইলেন। হরসুন্দরীর চোখে এ রকম তীক্ষ্ণ, অগ্নিগর্ভ, কুটিল দৃষ্টি কমলেশ কখনও দেখেনি। সে যেন কি রকম হয়ে গেল।

হরসুন্দরী বলতে লাগলেন, ওই বাঘের মুখ থেকে সমস্ত বিষয় বাঁচাতে হবে। তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে। শক্ত হোতে হবে।

—কিন্তু বাবা বলেন, আর পড়তে হবে না। বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা কর।

—না। তুমি কলেজে পড়বে, সেই রকমই আমি স্থির করেছি। তোমার মা কি বলেন?

এ বাড়িতে মণিমালা যে এক জন ব্যক্তি, তার যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা মতামত থাকতে পারে, কমলেশ এ ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। এ বাড়ির দাসী-চাকরের মনেও সে প্রশ্ন কখনও ওঠে না।

কমলেশ বললে, মা কিছুই বলেন না।

হরসুন্দরীর এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। বরং প্রশ্নটা করাই তাঁর ভুল হয়েছিল। একটু ক্ষণ নিঃশব্দে সেই কথাটাই বোধ হয় তিনি ভাবলেন। তার পর বললেন, তাঁকে ডাক একবার।

মণিমালা প্রসাধন সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুরের টিপটি সযত্নে পরছিলেন। শাশুড়ীর আহ্বান শুনে প্রথমে যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। শাশুড়ী কখনই তাঁকে ডাকেন না। ডাকার কোনো প্রয়োজনই হয় না। ব্যাপারটা অভাবিত। কিন্তু যখন বুঝলেন সত্য, তখন ব্যস্ত হয়ে ছাদে গেলেন।

হরসুন্দরী তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কমলের পাশের খবর শুনেছ?

—শুনলাম।

—এই বারে কি করা যায় বল?

—আপনি যা বলবেন তাই হবে।

হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, তোমার ছেলে, তোমার কোনো সাধ-ইচ্ছে নেই ?

—না মা! আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে।

—সে তো জানি বৌমা! আবার তোমার কমলের যখন বৌ আসবে, আমি যখন থাকব না, তুমি গিন্নী হবে—তখন তোমার ইচ্ছেতেই সব কাজ হবে। কিন্তু—

মণিমালার ঠোঁটের আভাস দেখে হরসুন্দরী কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসলে যে বৌমা ?

ভয়ে মণিমালার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো। ঠোঁটের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বললেন, হাসিনি মা!

—হাসলে, আমি দেখলাম। কেন হাসলে ?

—সে অন্য কারণে মা!

—সেটা আমার শোনা দরকার।

মণিমালার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, আমি কোনো দিনই গিন্নী হব না মা! কমলেশের বৌ এলে সে-ই গিন্নী হবে।

—তার মানে ?

—আমার গিন্নী হবার ইচ্ছে নেই মা! ও আমার ভালো লাগে না।

হরসুন্দরী অবাক হয়ে গেলেন। গিন্নী হোতে ভালো লাগে না! এই গৃহ-পরিজন, দাস-দাসী, এমন কি বুদ্ধি থাকলে কর্তার উপর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাব, যেমন হরসুন্দরী নিজে ক'রে এসেছেন,—এ সব ভালো লাগে না ? এমন কথা কোনো মেয়ের মুখে তিনি ইতিপূর্বে শোনেন নি। বললেন, গিন্নীপনা কোনো মেয়ের ভালো লাগে না, এ আমি এই প্রথম শুনলাম বৌমা! কেন ভালো লাগে না ?

—ভয় করে।

—ভয়!—হরসুন্দরীর চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠলো—তুমি অবাক করলে বৌমা! ভয়টা কিসের ?

—যোগ্যতা নেই ব'লে ভয়। কখনও তো করিনি।

এবারে হরসুন্দরী চুপ ক'রে রইলেন। বুঝলেন অপরাধটা তাঁরই। মণিমালা এখন আর ছেলেমানুষ নন। কিন্তু এ বাড়িতে একটি সূচের প্রয়োজন হোলেও তাঁর অনুমতি নিতে হবে। এ বাড়িতে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়া গৃহিণী। কথাটা তাই চাপা দিয়ে বললেন, ওর সব কলেজে পড়বে।

মণিমালার ঠোঁটে অল্প একটু হাসির রেখা খেলে গেল। হরসুন্দরীর তা দৃষ্টি এড়ালো না। অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, কমলের সম্বন্ধে সকল কথাতেই কেমন যেন তোমার ঠাট্টার ভাব বৌমা!

মণিমালা তাড়াতাড়ি বললেন, ঠাট্টা করিনি মা, কেমন যেন হাসি এল।

—হাসির কি আছে এতে ?

—মনে হোল কমলের সখ কেমন বিদঘুটে।

—বিদঘুটে! বিস্ময়ে হরসুন্দরী চোখ কপালে তুললেন,—লেখা-পড়ার সম্বন্ধে তুমি বিদঘুটে মনে কর?

—আমি করিনে মা! আমার বাপের বাড়িতে লেখা-পড়া ছাড়া ছেলেদের আর কোনো সখ নেই। কিন্তু এ-বাড়িতে সখ বলতে যা বোঝায়, তা শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

হরসুন্দরী অবাক হয়ে মণিমালার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই বধূটির সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অন্য রকম। মনে হোত, নিতান্ত গোবেচারী, নির্বিরোধ, আলস্য এবং আরামপ্রিয় একটি স্ত্রীলোক। এ যে কথা বলতে পারে, এবং তাঁর সামনে এমনি ক'রে কথা বলতে কোনো দিন সাহস করতে পারে, এ তাঁর ধারণার অতীত। হরসুন্দরী একটা জায়গায় হিসাবে ভুল করছেন যে, মণিমালাকে যে বয়সে তিনি এনেছিলেন, সেইখানেই মণিমালা ব'সে নেই। ইতিমধ্যে তার বয়স বেড়েছে, এবং গৃহিণী না হোলেও সে কমলেশের মা।

সংসারের অথবা অন্য কোনো ব্যাপারে কখনও তিনি মণিমালার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আজ তাঁর প্রথম মনে হোল, এ মেয়ে উপেক্ষণীয় নয়! সুতরাং এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, যে বাড়ির যে দস্তুর বৌমা! শৈলেশের ইচ্ছা নয় কমল কলেজে যায়। কিন্তু এ বাড়ির দস্তুর ভাঙবার এখন সময় এসেছে। আমি স্থির করেছি, এ বাড়ির দস্তুর ভেঙে ওকে যেমন ক'রে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলাম তেমনি ক'রে কলেজেও পাঠাব। সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম। ব'লে গম্ভীর ভাবে নেমে গেলেন।

মণিমালা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু হরসুন্দরী সমস্যাটার যত সহজে মীমাংসা করলেন, তত সহজে মীমাংসার ব্যাপার নয়। শৈলেশ দাম্ভিক, কিন্তু দুর্বলচিত্ত। সুতরাং কমলেশকে কলেজে পাঠান হবে শুনে তিনি প্রথমটা বারুদের মতো ফেটে পড়লেন। কিন্তু যখন শুনলেন, ব্যবস্থাটা করছেন স্বয়ং হরসুন্দরী, তখন গুম হয়ে রইলেন। মাকে চটাবার শক্তি এবং সাহস কোনোটাই তাঁর নেই।

ডাকলেন রমাপ্রসাদকে। জিজ্ঞাসা করলেন, কমল নাকি কলেজে পড়তে যাচ্ছে?

—তাই তো শুনছি। কর্ত্রী সকালে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন, কমলকে কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে।

—কোন্ কলেজে?

—সদরে।

—বাড়ি নিতে হবে তো? না, হষ্টেলে থাকবে?

কথাটা রমাপ্রসাদের খেয়াল হয়নি। হরসুন্দরীরও না। মাথা চুলকে রমাপ্রসাদ বললেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি এখনও।

শৈলেশ বললেন, কিন্তু সেও স্থির করতে হবে। কাকাবাবু, এ বাড়ির কোনো ছেলে এর আগে সাধারণের সঙ্গে স্কুলে পড়েনি। প্রথম পড়ল কমল, মায়েরই ব্যবস্থায়। কিন্তু সে-ও আমি কিছু মনে করিনি। কারণ, সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা ওই স্কুলের ক' ঘণ্টা। কিন্তু কলেজে গিয়ে যদি কমল হষ্টেলে থাকে, তাতে ঘোরতর আপত্তি আছে।

এ বিষয়ে রমাপ্রসাদ ও শৈলেশের সঙ্গে একমত। বস্তুতঃ, মূল নীতি হিসাবে এ বিষয়ে হরসুন্দরীর সঙ্গেও যে শৈলেশের খুব বেশি অনৈক্য আছে, তা নয়।

নিজের মনোভাবের উপর জোর দেবার জন্যে শৈলেশ তার বক্তব্যের শেষাংশের পুনরাবৃত্তি ক'রে বললে, ঘোরতর আপত্তি আছে।

একটু চিন্তা করে রমাপ্রসাদ বললেন, অনুমান করি, বাড়িই একটা নেওয়া হবে।

—তার মানে চাকর, ঠাকুর এবং অন্যান্য খরচ নিয়ে বত পড়বে অনুমান করেন?

একটু বেশিই পড়বে নিশ্চয়। ঋণভার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দাঁড়িয়েছে। সেই ভার কমলেশকে পড়াতে গিয়ে আরও স্ফীত হবে, তাতেও সন্দেহ নেই। রমাপ্রসাদ এত ভাবেন নি। এখন সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাঁরও মুখে শঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠল।

বললেন, আমি এমন করে সমস্ত দিক বিবেচনা করিনি। এখন দেখছি, কাল সদরে যাওয়ার আগে কর্ত্রীর সঙ্গে এক বার কথা বলা দরকার।

—তাই বলুন। আমাকে আর ডোবাবেন না।

এ কথায় রমাপ্রসাদের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু সেটা গোপন করবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্ভবত কর্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

কথাটা হাসির সত্যই। শৈলেশ এমন করে বললেন যেন ঋণভারের দায়িত্ব তাঁর নয়, পাঁচ জনে চক্রান্ত করে তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং শৈলেশের নিজের সেইটেই দৃঢ় বিশ্বাস।

রমাপ্রসাদ ফিরে এসে জানালেন, বাড়িই নেওয়া হবে।

শৈলেশ বললেন, তার মানে ঠাকুর-চাকর।

—হাঁ। সমস্তই।

শৈলেশ স্তম্ভিত হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার অর্থ রমাপ্রসাদের অগোচর নয়। মৃদু হেসে বললেন, উনি বললেন, বাজে খেয়ালে কত টাকা জলের মতো খরচ হয়েছে, এবারে কাজের কাজে কিছু টাকা খরচ আমি করব। আপনারা বাধা দেবেন না।

রমাপ্রসাদের মৃদু হাসিটাই মারাত্মক। শৈলেশ সে হাসি লক্ষ্য করলেন এবং করে চোখ নামালেন।

রমাপ্রসাদ বলে চললেন: তা ছাড়া গঙ্গার তীরে বাড়ি না হয় একটা রইলই। মাঝে মাঝে আমিও গিয়ে থাকতে পারব, বৌমাও গিয়ে থাকতে পারবেন। সেই বা মন্দ কি!

বিস্ময়ে শৈলেশের চোখ কপালে উঠল। বললেন, মা নিজে সেখানে গিয়ে থাকবেন?

—মাঝে মাঝে।

মাথা নেড়ে শৈলেশ বললেন, ওটা বাজে কথা কাকাবাবু! কমলকে ছেড়ে উনি থাকতে পারেন না। এখন মাঝে-মাঝে বলছেন বটে, কিন্তু একবার গেলে আর সহজে আসবেন না। আমি জানি কি না। বলে বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে লাগলেন।

রমাপ্রসাদ হেসে বললেন, আমি তা মনে করি না বাবা!

—তার মানে আপনি যাকে চেনেন না।

রমাপ্রসাদ এই অভিযোগ যেন ভ্রূক্ষেপই করলেন না। আগের কথার জের টেনেই বলে চললেন, এই পরিবার, এই বাড়ি, জমিদারী, এর মর্যাদা এ সবের ওপর ওঁর এত টান যে, ওঁর সাধ্য নেই এর বাইরে কোথাও উনি বেশি দিন থাকেন। তীর্থে যেতে পারছেন না। কত বার ব্যবস্থা হল, কত বার ভাঙলেন। কোনো বারেই অবশ্য যুক্তিসহ উপলক্ষ্যের অভাব হয়নি। কিন্তু আসল কারণ কি, তা আমি জানি।

এবারে রমাপ্রসাদ বিজ্ঞের মতো মাথায় ছুটো ঝাঁকি দিলেন। তার পর বললেন, যাই হোক, ওঁকে বাধা দেওয়া নিরর্থক। কোনো দিন ওঁর ইচ্ছায় কেউ বাধা দিতে পারেনি। সুতরাং উনি যা স্থির করেছেন, তা হবেই।

বলেই হঠাৎ গলা খাটো করে বললেন, তা ছাড়া কি জান বাবা! ওঁর ইচ্ছায় বাধা দিতে আমার ভয় হয়। আজ বলে নয়, বহু দিন থেকে দেখে আসছি, ওঁর বুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। হঠাৎ কিছু উনি স্থির করেন না। অনেক দূরের কথা অনেক দিন থেকে ভেবে ভেবে উনি কিছু স্থির করেন। তুমি নিশ্চয় জেনো, কমলকে কলেজে পড়াবার কথাও একটা কিছু ভেবেই উনি স্থির করেছেন। এ ক্ষেত্রে ওঁর বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আমাদের চুপ করে থাকাই ভালো।

—তাই থাকুন। বলে শৈলেশ পরম অশ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়াটায় ঠেস দিলেন।

রমাপ্রসাদ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।—বড় বাবুর যে বিয়ে!

শৈলেশ লাফিয়ে উঠলেন : বলেন কি?

—হ্যাঁ। এখনও কেউ জানে না। কিন্তু আমি টের পেয়েছি।

শৈলেশের বিস্ময় তখনও কাটেনি। সেই দিকে চেয়ে রমাপ্রসাদ হেসে হেসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলেন:—কত বড় সাহস দেখ! ও জানে এ অঞ্চলে ওই প্রেতের হাতে মেয়ে দিতে কেউ সম্মত হবে না।

বাধা দিয়ে শৈলেশ বললেন, তাহলে সম্মত হল কি করে? কে সম্মত হল?

—রায়পুরের বাবুরা।

—রায়পুরের বাবুরা! ওই বুড়োর হাতে!

এ একটা অভাবনীয় ঘটনা! রায়পুরের বাবুরা বনেদি জমিদার। খুব সম্মানী ঘর। তাঁরা যে সমরেশের হাতে কোনো কারণেই কন্যা সম্প্রদান করতে পারেন, এ সম্ভাবনা চিন্তারও অতীত।

সমরেশের সম্বন্ধে শৈলেশের মনোভাব যাই হোক, সমরেশ যেখান থেকে যে ভাবেই হোক প্রচুর বিত্ত যে সঞ্চয় করেছে তাতে আর ভুল নেই। এবং যখনই শৈলেশের একটি চোখ পর্বতপ্রমাণ ঋণের দিকে চেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠত, আর একটি চোখ সমরেশের রহস্যাবৃত বিত্তের দিকে চেয়ে কিছু পরিমাণ যেন আশ্বাসও পেত।

সেই সমরেশ শেষ পর্যন্ত বিবাহ করতে চলেছে! এ-ও যেন তাঁদের উপর শত্রুতা সাধনের জন্যে। একদিন বালক সমরেশ শিশু শৈলেশকে ইঁদারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলেন। আজও আবার শৈলেশের মাথায় পা দিয়ে ঋণের গহ্বরে ডুবিয়ে মারতে চলেছেন!

শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, রায়পুরে লোক পাঠিয়েছিলেন?

—পাঠিয়েছিলাম।

—সুবিধা হল না?

—না। পঁচিশ হাজার টাকা দেনা। সুদে-আসলে চল্লিশের কাছাকাছি উঠেছে। ভদ্রলোক নাচার। প্রেতটা নালিশের ভয় দেখাচ্ছে। নালিশ করলে রায়পুরের কিছু থাকবে না।

—আর মেয়ে দিলে সব থাকবে? দেনার টাকাটা বড় বাবু ছেড়ে দেবেন? ভদ্রলোক এটা বিশ্বাস করেন? বড় বাবু একটা পয়সা সুদ ছেড়েছেন এমন দৃষ্টান্ত তিনি দেখাতে পারেন?

রমাপ্রসাদ এ যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন না। সমরেশ কোনো কারণে কোনো অধমর্ণের দুঃখে বিগলিত হয়ে একটি পয়সা সুদ ছেড়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত সত্যই নেই। তাঁর উপর যথার্থই বিশ্বাস করা চলে না। তিনি শুধু রায়পুরের মেজ বাবুর কাছে যে কথা শুনেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

বললেন, বিশ হাজার টাকায় রফা হয়েছে।

উত্তেজিত ভাবে শৈলেশ বাবু বললেন, বলেন কি! এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন? মেজ বাবু এ ধাপ্পায় বিশ্বাস করলেন?

রমাপ্রসাদ বললেন, আমি করি না, কিন্তু মেজ বাবুর তো হাত-পা বাঁধা। বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি? ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তার পর বললেন, অবশ্য তাঁরাও পুরুষানুক্রমে জমিদার। আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা করেছেন।

—কী সেটা?

—পরশু নাকি পাকা-দেখা এবং আশীর্বাদ।

—পরশু! শৈলেশ চমকে উঠলেন। পরশু হলে তাঁর পক্ষ থেকে বাধা দেবারই বা সময় কই?

রমাপ্রসাদ বললেন, হ্যাঁ। সেই দিন পুরোনো দলিল ছিঁড়ে ফেলে বিশ হাজার টাকার একটা নতুন দলিল হবে।

না। বাধা দেবার আর সময়ও নেই, কোনো উপায়ও নেই।

শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু বিশ হাজার টাকাই বা ভদ্রলোক শোধ করবেন কি করে?

—পারবেন না। সে সন্দেহও বড় বাবুর আছে। তিনি নাকি ভাবী শ্বশুরকে বলেছেন, এর পর পরস্পরের মধ্যে একটা আত্মীয়তা হতে চলেছে। সুতরাং টাকাটা দেনার আকারে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

—কি করে রাখা হবে তাহলে?

—মেজ বাবু তাঁর রসুলপুরের মহালটা তাঁর মেয়ের নামে বিক্রি-কওলা করে দেবেন।

—রসুলপুরের মহাল? বিশ হাজার দাম হবে তার?

—না। মেরে-কেটে পোনেরো হাজার হতে পারে।

শৈলেশ চিন্তিত ভাবে বললেন, তাহলে সুদ দূরের কথা, আসল থেকেই তো ভদ্রলোক দশ হাজার ছাড় পাচ্ছেন।

—সেই রকমই তো দাঁড়াচ্ছে।

—আচ্ছা, আপনি যান।

শৈলেশ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চিন্তা করতে বসলেন। মন

খুবই খারাপ। হঠাৎ তাঁর মনে হল, আহা, তাঁরও যদি মেয়ে থাকত এবং এই রকম একটা জামাই পাওয়া যেত! খাপেয় জন্তে শৈলেশ আজ-কাল বেশ চিন্তিত। পাওনাদারে খুবই তাগাদা করছে।

ছয়

বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

রায়পুরের মেজ বাবু তাঁর মেয়ের বিবাহে নিজের দিক থেকে ধূমধাম করা উচিত, তার ক্রটি রাখলেন না। সদর দরজায় রহবৎ, দু-তিন রকমের বাজনা, আত্মীয়-স্বজনের সমাবেশ সমস্তই ছিল। তবু মনে মনে কেমন যেন কুণ্ঠিত। কারও সঙ্গেই যেন চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছেন না।

অন্ত দিকে একখানা ঝকঝকে নতুন মোটর গাড়িতে এলেন সমরেশ। সঙ্গে একটিমাত্র বরযাত্রী,—ইন্দির পণ্ডিত। নাপিত নয়, পুরোহিত নয়, কিছু নয়। এই কয় বৎসরে মাথার চুলে বিলক্ষণ পাক ধরেছে। কিন্তু বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ তেমনি ঋজু আছে, চোখের দীপ্তিও তেমনি উজ্জ্বল, মুখ তেমনি নির্বিকার।

শ্বশুর এসে জামাতাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন। মনে হল, সমরেশের চেয়ে বয়সে যেন দু'-এক বৎসরের ছোটই হবেন। ছাঁদনাতলায় শাশুড়ী জামাতাকে বরণ করলেন, কিন্তু মুখের ঘোমটা খুলতে পারলেন না। জামাতার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে অনেক বাচাল মেয়েও বাসরে ভিড় জমাতে সাহস করলে না। স্ত্রী-আচারের কত কি বাদ রয়ে গেল।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যে ক'টি মেয়েকে কনের সঙ্গে বাসরে আসতে হয়েছিল, তারাও খুব ভয়ে-ভয়েই এসেছিল।

তাদের দিকে চেয়ে সমরেশ বললেন, মিথ্যে রাত্রি জেগে লাভ কি? নিজের নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে।

কথা নয়, যেন আকাশ থেকে দৈববাণী হল। মেয়েরা একবার [illegible] উঠেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু কথা কিছুই চাপা রইল না। মেয়েরা ফিস্ ফিস্ কথা বলে। আর দেওয়ালগুলো যেন এ-পিঠ দিয়ে সেই সমস্ত কথা শুষে নিয়ে ও-পিঠ দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

অরুন্ধতীর পরনে সুন্দর বেনারসী। ললাট চন্দন-চর্চিত। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে নিঃশব্দে, নত নেত্রে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার সমস্ত দেহ কি যেন একটা অজানা অনুভূতিতে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে।

কিন্তু সমরেশ সে দিকে চাইলেন বলেই মনে হল না। তাঁর মুখ যেন আরও শক্ত হয়ে উঠেছে।

খাটে হাত দিতেই নরম গদিতে তাঁর হাতটা বসে গেল। যেন আগুনে হাত পড়েছে এমনি ব্যস্ত ভাবে হাতটা সরিয়ে সমরেশ বিড়-বিড় করে বললেন, ওরে বাবা! এ যে ভীষণ নরম!

তার পরে অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে বললেন, এত নরম বিছানায় আমি শুতে পারি না। তুমি ওটাতে শুয়ে পড় বরং। আমি নিচে এই কার্পেটে চমৎকার শোব। বলে গায়ের গাঁটছড়া-বাঁধা চাদরটা অরুন্ধতীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিচের কার্পেটখানির উপরেই নিজের বিশাল দেহ ছড়িয়ে দিলেন। শুধু বললেন, আলোটা কমিয়ে দাও।

কিন্তু আলোটা কমিয়ে দিয়ে মেয়েটা খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল অথবা আবার আগের জায়গাটিতে ফিরে গিয়ে তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, সেদিকে একবার ভ্রূক্ষেপ করবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তখনই যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, তা বোঝা গেল তাঁর নাসিকা গর্জনে।

অরুন্ধতী এতক্ষণ অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই ছিল। নাসিকা গর্জনে উচ্চকিত হয়ে স্বামীর দিকে চাইলে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই চাইলে। দেখলে, যেন নিরেট পিতলে কোঁদা কঠিন একখানি মুখ। বিশাল বক্ষ নিশ্বাসের তালে তালে আন্দোলিত হচ্ছে।

অরুন্ধতী চুপি চুপি খাটের এক প্রান্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর তার মা, যখন সবাই ঘরে ঘরে নিদ্রিত, তখন ধীরে ধীরে মেজ বাবুর ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। বাইরে শুকতারা কি ভয়ঙ্কর জ্বলছে! কিন্তু মেজ বাবু তখনও জেগে। ঘুম আসছে না হয়তো।

অরুন্ধতীর মা খাটের কাছে এসে দাঁড়াতে একবার যেন তিনি কি একটা বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তাড়াতাড়ি ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। [ক্রমশঃ।

স্বামীকে উত্যক্ত করবেন না

স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের বিরক্ত করে কেন? করে অনেক কারণে। কখনো কখনো শারীরিক অসুস্থতার জন্তও ওরূপ হয়ে থাকে। নিয়মিত ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা করালে এ সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। যদি ক্লান্তির জন্ত স্বামীকে বিরক্ত করার প্রবৃত্তি হয়, তা হলে যাতে ক্লান্তি দূর হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন,— স্বামী ও পরিবারের অপর লোকজনদের সহযোগিতা আদায় করুন।

কোন বিষয়ে মাত্র এক বার কথা বলতে এবং তার পর সে কথা একেবারে ভুলে যেতে শিখুন। বিরক্তিভরে স্বামীকে কোন কাজ করবার জন্ত বার বার উত্যক্ত করলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যাবে না।

কাজ [illegible] জন্ত নরমপন্থা অবলম্বন করুন। ভিনিগারের চেয়ে চিনি দিয়ে বেশী মাছি ধরা যায়।

হাস্যরস পরিবেশনের অভ্যাস করুন। সামান্ত ব্যাপার হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল, তিলকে তাল করে তুললে নিজেরই ক্ষতি হবে, মেজাজ ঠাণ্ডা না রাখলে প্রেম ঘৃণায় পর্য্যবসিত হবে।

বড় বড় অভিযোগ সম্বন্ধে শান্ত ভাবে কথা বলুন। যে সব কারণে মেজাজ খারাপ হয়, সেগুলি সাদা কাগজে লিখে রাখুন। পরে যখন আপনি ও আপনার স্বামী শান্ত থাকবেন, মন যখন ভাল থাকবে তখন সেই কাগজগুলি বার করে পড়ুন। তখন আপনার নিজেরই লজ্জা হবে এবং আপনি সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা দ্বারা অনেক অশান্তির অবসান ঘটান যায়।

সমস্যা সমাধানে নিজের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখুন। কাউকে আদেশ করবেন না, মিষ্টি কথায় কাজ আদায় করতে শিখুন।

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।

একদা,—লং আইলাণ্ডের উত্তর প্রান্তে এক বিরাট প্রাসাদে থাকতো একটি ছোট্ট মেয়ে। এই অতুল ভূসম্পত্তির অধিকারী 'লারাবী-পরিবার'। সম্পত্তির পরিমাণ বিশাল, তাই দাস-দাসীর সংখ্যাও প্রচুর।

মোটর-চালক ফেয়ারচাইল্ড হলেন এই দাস-দাসীদের অন্যতম। কুড়ি বছর আগে সদ্য-ক্রীত রোলস্ রয়েসের সঙ্গে এই সোফার বা চালকটিকেও ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা হয়। ফেয়ারচাইল্ডের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, তার নাম সাবরিণা। অদ্ভুত নাম এ-কথা মানতেই হবে, তবে ফেয়ারচাইল্ড এক অ-সাধারণ প্রাণী।

লারাবীরা মোট চার জন,—কর্তা, গিন্নী, আর দুই ছেলে। বড় ছেলে লাইনাস প্রোটোন আর ইয়েলের গ্রাজুয়েট। ছাত্রজীবনে সবাই ভোট দিয়ে স্থির করেছিলেন, "জীবন-যুদ্ধে সে বিজয়ী হবে"; তখন লাইনাস মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মালিক। সহপাঠীদের ভবিষ্যৎ বাণী সে অচিরাৎ সফল করেছে, সোজা একটা হোমবুর্গ হ্যাট কিনে সে 'লারাবী ইনডাস্ট্রিজে'র বিষয়কর্মে আত্মনিয়োগ করল। লাইনাস লারাবী ভেরেণ্ডা-ভাজার দলের মানুষ নয়, কাজের লোক!

ছোট ভাই ডেভিড, পোলো-খেলোয়াড় হিসাবে তার খ্যাতি আছে। সে কিন্তু ভেরেণ্ডাভাজার দলের দলপতি হওয়ার যোগ্য। পূর্বাঞ্চলের অনেকগুলি ভালো কলেজে অল্প কিছু কাল সে কাটিয়েছে, আর অতি দ্রুতগতিতে বিবাহেরও কয়েকটা অনুষ্ঠান সেরেছে।

লারাবীদের জীবন মন্দাক্রান্তা তালে চলে, এবং একথা নিঃসন্দেহে কল্পনা করা যায়, এই ইন্দ্রপুরীর অধিবাসিনী যে কোনো তরুণীর আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করাটাই স্বাভাবিক। প্রেমের ব্যাপারে অবশ্য কোনো কিছুই শেষ কথা নয়,—সাবরিণাও স্মরণাতীত কাল থেকে ডেভিডের প্রেমে মজে আছে।

লারাবীরা অবশ্য এই অবস্থাটা অন্য ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মনে হয়েছিল, ছোটো বাবুর প্রতি শিশুসুলভ শ্রদ্ধা। একটা জিনিষ কারো খেয়াল হয়নি যে সাবরিণা আর শিশু নয়, এখন তার বয়স বেড়েছে. আর প্রতিদান হীন প্রেমের অবস্থা বড়ই অসহনীয়! ফেয়ারচাইল্ড কিন্তু অবস্থাটি বুঝেছিল, তাই সে মেয়েকে প্যারীতে পাঠাবে স্থির করলো।

এই সিদ্ধান্ত যে কত দূর বিচক্ষতার পরিচায়ক তা একদিন বুঝলো ফেয়ারচাইল্ড। লারাবীদের প্রাসাদে সেদিন বাৎসরিক ভোজসভা, চার দিকে সম্মানিত অতিথিদের ভীড়, ফেয়ারচাইল্ড সহসা লক্ষ্য করলো সাবরিণা গাছের ডালে বসে নৃত্যরত ডেভিডকে এক মনে দেখছে।

ডেভিড একটি তম্বী তরুণীর সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন, তরুণীর পরিধানে বহুমূল্য ইভনিং ড্রেস, ডেভিডের বাহুলগ্না হয়ে সে হাসছে।

সাবরিণা প্রশ্ন করে—"মেয়েটি কে বাবা?"

"ওর নাম ভ্যান হর্ণ, গ্রেসেন ভ্যান হর্ণ, চেস্ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক।" তার পর সাবরিণার দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে—"সাবরিণা,

সারা জীবন কি তুমি ডেভিডের পেছনে এই ভাবে ছুটবে? তোমার পক্ষে প্যারী যাওয়াটা ভালোই হয়েছে। চলে এসো, সাবরিণা!"

"যাই বাবা, এক মিনিট, তুমি এগোও আমি যাচ্ছি।"

ফেয়ারচাইল্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্যারাজের দিকে এগিয়ে যায়, তার ওপরই ওদের বাসা।

সাবরিণা সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল—ডেভিড সরে গেল, একটু পরে গ্রেসেন এসে প্রশ্ন করল—"টেনিস কোর্টটা কোন দিকে জানো?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সাবরিণা বলে—"কোনটা? ইনডোর না আউটডোর?"

গ্রেসেন খিল্‌খিল্ করে হেসে বলে—"ইনডোর।"

মনে মনে সাবরিণা ভাবে, এই সব খিল্‌খিলে হাসি-খুশী মেয়ে আমার দু'চক্ষের বিষ। তবু ভদ্র ভাবে জবাব দেয়—"এই সামনেই—"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল গ্রেসেন, দূর থেকে সে দিকে নজর রাখলো সাবরিণা,—তার পর দেখল, ডেভিড এক বোতল শ্যামপেন আর দু'টি গ্লাস নিয়ে চলেছে।—ক্ষুণ্ণ মনে গ্যারাজে ফিরলো সাবরিণা।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ফেয়ারচাইল্ড ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে—"সাবরিণা,—কাল সকালে যেন তোমার পাসপোর্ট নিতে ভুলো না।"

ক্ষীণ গলায় সাবরিণা, উত্তর দেয়—"না বাবা, ভুলবো না।"

অতি মোলায়েম কণ্ঠে ফেয়ারচাইল্ড আবার বলে—"জানো মা, তুমি যে সুযোগ পেয়েছ তা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে, সব মেয়েই প্যারী যেতে পায় না। আর তুমি যেখানে ভর্ত্তি হবে, পৃথিবীর মধ্যে ঐটি সর্বশ্রেষ্ঠ রান্নার স্কুল। আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতেন আনন্দের তাঁর সীমা থাকতো না। সারা লং আইলাণ্ডে তাঁর মত রাঁধুনী কেউ আর ছিল না।"

সাবরিণা এই কথার জবাব দেয় না, দূরাগত অর্কেষ্ট্রায় ওয়ালজের সুর ভেসে আসছে, সাবরিণা তাই শুনছে। মানস চক্ষে দেখছে ডেভিড আর গ্রেসেন নামধারিণী একটি মেয়ে শ্যামপেন পান করছে আর পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে নাচছে।

শান্ত কণ্ঠে ফেয়ারচাইলড বলে—"আমি বলছি না যে, তুমিও তোমার মার মত রাঁধুনী হবে, আর আমার মত এক জন সোফারকে বিয়ে করবে। কিন্তু আমার মনের কথা তুমি তো জানো। তোমার মা এবং আমি ভালো ভাবেই জীবনটা কাটিয়েছি, সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এই পৃথিবীতে আর কি কাম্য আছে। চাঁদের পানে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই মা!"

মৃদু কণ্ঠে সাবরিণা বলে—"না বাবা!"

"আমি তোমাকে সকাল সাতটায় বিছানা থেকে তুলে দেব। জাহাজ ছাড়ে সেই দুপুরে। গুডনাইট।"

শয়নকক্ষের দিকে যেতে যেতে সাবরিণা জবাব দেয়—"গুডনাইট!"

সঙ্গীত-ভবনের মিঠে সুর তার প্রাণে আগুন ধরিয়ে দেয়, পা টিপে নিঃশব্দে নীচে গ্যারাজে নেমে যায়। অতি সাবধানে দরজা খুলে আবার ভেতরে ঢুকে আবার বন্ধ করে দেয়, তার পর একে একে আটখানি গাড়ির মোটর চালু করে দেয়,—চাঁদের আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে,—এক মুহূর্ত চাঁদের দিকে তাকায় সাবরিণা, কালো চোখ দু'টি জলে ভরে যায়—বাবা বলেছেন—চাঁদের পানে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই মা!'

গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় চোখ প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, এমন সময় গ্যারাজের দরজা খুলে গেল। লাইনাস লারাবী এসে গ্যারাজে ঢুকলেন। গ্রাসেনের মা যদি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ না করতেন তাহ'লে কেউ হয়ত গ্যারাজে আসতোই না, আর এই হ'ত সাবরিণার শেষ নিদ্রা। লাইনাস্ তিরস্কার করলেন সাবরিণাকে, যে-কোনো একটি গাড়ির কার্বন মনোক্সাইড তাকে শেষ করতে পারতো। তার পর ওপর তলায় কোলে তুলে পৌঁছে দিলেন।

পূর্ব-ব্যবস্থা মত দুপুরের দিকের জাহাজে প্যারী রওয়ানা হ'ল সাবরিণা।

সপ্তাহ দুই পরে ভৃত্য-মহালের সংবাদে প্রকাশ, সাবরিণা খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছে, আর ব্যারণ ক্যঁতেনএলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। সাবরিণা লিখেছে, "ব্যারণ স্যাফলস রান্নার পদ্ধতি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন, এখন এমন পছন্দ হয়েছে আমাকে যে মাছের রান্নাটার জন্যও রয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে হরেক রকম মজার লোকের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।"

মাসে কয়েক বার চিঠি আসে সাবরিণার। স্কুলে পড়াশোনার অগ্রগতি সম্পর্কে সুখবর-সম্বলিত পত্র। সেই সঙ্গে থাকে সামাজিক মেলামেশার সংবাদ। শেষের চিঠিটায় লিখেছে—"আমি এখন বাঁচতে শিখেছি, কি ভাবে বাঁচার মত বাঁচতে হয়, আর আমি জীবন বা প্রেমকে এড়িয়ে চলবো না।"

এই সংবাদ শুভ কি অশুভ, তাতে লারাবী-পরিবারের অবশ্য কিছু এসে-যায় না। কারণ, সেই সময়টা "লারাবী টাইসন" সংযুক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে লাইনাস্ আর তার বাবা অতিশয় ব্যস্ত। ডেভিডকে আবার বিয়ে করার জন্য তৈরী হতে হবে, এই জন্য সে ব্যস্ত। আর লারাবী-গিন্নী নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত।

সংবাদপত্রের সামাজিক বিজ্ঞপ্তির স্তম্ভে ডেভিডের বিবাহ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হ'ল—

"আবার বোধ হয় ডেভিড লারাবীর বিয়ের ফুল ফুটলো। পাত্রীর নাম এলিজাবেথ টাইসন।"

এই সংবাদটা ডেভিডকে এমন ক্ষিপ্ত করে তুললো যে, সে আইন-কানুন জব্দ করে সোজা 'লারাবী ইনডাষ্ট্রিজে' ঢুকে পড়লো, তার পর লাইনাসকে বলল—"দাদা, এ নিশ্চয়ই তোমার প্যাঁচ।"

এই কথায় বিশেষ গুরুত্ব দান না করে লাইনাস্ বলে—"ও ত' সকলেই জানে,—দেখি তোমার লাইটার, এ জাতের প্লাসটিক আর তৈরী হয়নি।"

লাইটারটা লাইনাসের হাতে দিয়ে ডেভিড পুনরায় বলে—"থাক, আমার কথায় ফেরা যাক, আমি এলিজাবেথ টাইসনকে বিয়ে করতে চাই না।"

"এখো আগুনে পুড়বে না, গলবে না, ভাঙবে না, কি জাতের পুতুল দেখেছ ?"

ডেভিড বিরক্ত হয়ে বলে—"যথেষ্ট হয়েছে, তিন তিন বার বিয়ে দিয়েছে—আবার !"

"তবে এই প্রথম তোমার বিয়ের কথা বাড়ির সকলে মনোনীত করেছে। তার কারণ, এই প্রথম তুমি একটা গঠনমূলক কাজে হাত দিয়েছ।"

তার পর এক খণ্ড প্লাস্টিক ডেভিডের হাতে দিয়ে বলে—"খেয়ে দেখো।"

বিরক্তিভরে বড় ভায়ের হুকুম তামিল করে ডেভিড বলে—"বেশ মিষ্টি।"

"ঠিক বলেছ,—চিনি দিয়ে তৈরী কি না ?"

—ও—তাই,—

"পোয়র্তো রিকোয় টাইসনদের বিরাট আখের চাষ, তোমার কল্পনা বুঝেছি, তোমাদের ব্যবসায় হাড়িকাঠে আমাকে নরবলি দিতে চাও। একটা জিনিষ তোমরা ভুল করছো আমি এখনও বিয়ের প্রস্তাব করিনি, মেয়েটিও তা গ্রহণ করেনি, সুতরাং..."

"ওঃ, তার জন্ত ভেবো না, আমি প্রস্তাব করেছি, মিঃ টাইসন তা গ্রহণ করেছেন।"

"আর বোধ করি মিঃ টাইসনকে আমার হয়ে চুমাও দিয়েছ ?"—তিক্ত গলায় বলে ওঠে ডেভিড। সে ঠিক বুঝতে পারছে না। পৃথিবীর অর্ধেক টাকার ক' দাদা মালিক, তাই সে প্রশ্ন করে—"এত তাড়া কিসের ?"

লাইনাস্ বোঝানোর চেষ্টা করে, "একটা নতুন জিনিষ তৈরী করার আয়োজন হচ্ছে,—বর্তমান জগতের এক প্রয়োজনীয় বস্তু, নতুন একটা শিল্প-প্রচেষ্টা অনুন্নত অঞ্চলে চালু হবে। নতুন কারখানা গড়ে উঠবে, মেশিন বসবে, আর সব চেয়ে বড় কথা তুমি কারবারে নাম্‌বে। যারা কখনও এক আধলা চোখে দেখেনি তারা পাবে হাজার হাজার টাকা। যারা জুতো দেখেনি তারা পায়ে জুতা পরবে, গায়ে জামা পাবে।"

—"অর্থাৎ আমি যদি এলিজাবেথকে বিয়ে না করি, তাহ'লে পোয়র্তো রিকোয় কোন অজ্ঞাত-কুলশীল বালক খালি পায়ে ঘুরে বেড়াবে, এই ত ?"

ডেভিডের এই দ্রুত উপলব্ধির পরিচয় পেয়ে লাইনাস্ উৎসাহ ভরে বলে চলে—"লারাবী প্লাসটিক্স" এর ব্যাপারে ল্যারাবী কনস্ট্রাকশনের ব্লু প্রিন্ট একেবারে তৈরী। আমাদের ইচ্ছা সামনের গ্রীষ্মকালের ভেতর বিয়েটা সেরে ফেলা, তাহলে এ বছরের আখের ফসলটা পাওয়া যাবে। তুমি সুখী হও ডেভিড।"

অবশেষে রন্ধন-পাঠশালায় স্নাতক হয়ে সাবরিণার ঘরে ফেরার সময় হয়ে এল। ফেয়ারচাইল্ডকে সে লিখেছে, "যদি তোমার মেয়েকে চিনতে না পারো বাবা, বুঝবে গ্লেনকোভ ষ্টেশনের সব চেয়ে ফ্যাসান-দুরস্ত মহিলাটি তোমার সাবরিণা।"

অতিরিক্ত ফ্যাসান-দুরস্ত না হলেও নারীর পোষাক পরিহিত সন্দেহ নেই। একটি ফরাসী পুড়ল কুকুরকে বুকে বেঁধে আদর করছে।

মিসেস লারাবীকে হেয়ার-ড্রেসারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল, তাই ফেয়ারচাইল্ড ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হতে পারেনি। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে ডেভিডের যেন কেমন একটা অলৌকিক শক্তি আছে, সে ঠিক এই সময়টিতে ষ্টেশনে এসে হাজির।

সাবরিণাকে চিনতে পারলো না ডেভিড, সাবরিণাও কিছু বলে না,—ডেভিড তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়। নয়া সাবরিণা যে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

পুরাতন স্মৃতি যখন মনে জাগল, তখন বিস্মিত হল ডেভিড। বলল—"কি আশ্চর্য! কিন্তু বাড়ির হাঙ্গামাটাও রয়েছে যে—" সাবরিণা বলে—"তাতে কি, যতক্ষণ তুমি আছো ততক্ষণ ভয় কি ?"

ডেভিড বলে—"অদ্ভুত ছোট্ট রোগা মেয়েটি চার ধারে ঘুরে বেড়াত, কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না ঘটেছে !"

লাইনাস্ কিন্তু কোনো পরিবর্তনই লক্ষ্য করেন না, ডেভিড অবশ্য এই বিষয় গবেষণা করেছে এবং সাবরিণার বয়স বেড়েছে আর সেই সঙ্গে প্যারীর হাওয়া গায়ে লেগেছে। যাই হোক, ফেয়ার-চাইল্ড নিশ্চয়ই সব হাঙ্গামা মিটিয়ে দিতে পারবে।

ফেয়ারচাইল্ড অবশ্য সেই কর্মই করছিল—ডেভিডের বিবাহ-ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে এ-কথা সবিস্তারে বলল।

এ খবরে ভেঙে পড়ে না সাবরিণা,—বলে—"এখনও ত' বিয়ে হয়নি বাবা ? সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ফেয়ারচাইল্ড গম্ভীর গলায় বলে—"কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি, ওর নাম ডেভিড লারাবী, আর তুমি সেই সোফার ফেয়ারচাইল্ডের মেয়ে। এখনও সেই চাঁদের পিছু ছুটছো ?"

সাবরিণা মাথা নেড়ে তার পর চটুল গলায় বলে—"চাঁদ এখন আমার হাতের মুঠায় বাবা !"

লাইনাস যা ভয় করছিলেন তাই হল,—প্যারীর গাউন-পরিহিতা সাবরিণাকে দেখা মাত্র ডেভিড তাঁর বাগ্‌দত্তাকে ছেড়ে সাবরিণাকে নিয়ে নাচ সুরু করলো।

দু-একটা টুকরো কথা যা লাইনাসের কানে এল তাতে বোঝা গেল ডেভিড অনেক দূর এগিয়েছে। ডেভিড বলছে—"সাবরিণা, কি বোকা আমি বলো ত, এত দিন তোমাকে লক্ষ্যই করিনি। যাই হোক, একেবারে ফাঁকি পড়ার চাইতে বিলম্বে পাওয়া তবু ভালো।"

আর বিলম্ব সমুচিত নয়, বাড়ির কর্তাদের এই বার হস্তক্ষেপ করা উচিত। প্রথমটা লাইনাস ডেভিডকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, তার পর যখন দেখলো সাবরিণা চলেছে ইনডোর টেনিস কোর্টের দিকে তখন বুঝলো অবিলম্বে একটা পারিবারিক বোঝাপড়া হওয়া উচিত।

পানশালায় ডেভিড সযত্নে দু'টি শ্যাম্পেন গ্লাস পকেটে লুকিয়ে রাখছিল, লাইনাস পিছন থেকে এসে বলে—"কর্তা তোমাকে

কর্তা গম্ভীর গলায় বললেন—"কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি দাসীকে প্রেম-নিবেদন করে না। তোমার কাণ্ডটা কি?"

—"সাবরিণা আমাদের দাসী নয়।"

"চাকরের মেয়ে, তোমার ব্যবহারে শুধু যে তোমার মা উৎপীড়িত তা নয়, তুমি আমাদের ড্রাইভার ফেয়ারচাইল্ড বেচারীকেও বিব্রত করে তুলেছ। ফেয়ারচাইল্ডকে আমি ভালোবাসি, তাকে ক্ষুন্ন করতে আমার বাধে। আমার সন্তানরাও তাকে বা তার মেয়েকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবে, এটুকু আমার আশা ছিল।"

গিন্নী বললেন—"ডেভিড, সাবরিণাকে দেখতে-শুনতে ভালো, তা আমি জানি, তার ওপর নজর পড়া বিচিত্র নয়"—

"আমি শুধু নজর দিই না মা, আমার প্রেম আরো গভীর।"

লাইনাস কর্তাকে বলে—"আমাদের হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ডেভিড এখন সাবালক, নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে। যদি ওর মনে হয় সাবরিণা ওর যোগ্য সঙ্গিনী—

দাদার দিকে সবিস্ময়ে তাকায় ডেভিড, বলে—"কিন্তু তাহলে ত' তোমার ব্যবসার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে?"—

"ও! প্লাসটিকের কারবার? যাক্ সে—যদি তুমি ওকে ভালোবাসো তাহ'লে তাই হোক, এখন বিংশ শতাব্দী।

কর্তা বললেন—"বিংশ শতাব্দী! আমার টুপীর ভেতর থেকে মিনিটে অমন কত শতাব্দী উড়ে যায়"—

লাইনাস বলল—"থাকৃগে, সভ্য মানুষের মত সমস্ত বিষয়টা বিচার করা যাক্—বসো ডেভিড।"

ডেভিড বসবার উপক্রম করে, তার পর পকেটস্থ কাচের গ্লাসের কথা মনে হয়, সে বলে ওঠে—"কিন্তু, আমাকে যে যেতেই হবে।"

লাইনাস বলে—"আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, বসো।"

এই বার ডেভিড বসে পড়ে, আর তার ফলে পকেটের গ্লাস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

লাইনাস গম্ভীর গলায় বলে—"নড়িস্ নি একটুও, মা, যাও একটু আইডিন নিয়ে এসো, আর ডাঃ কালোয়েকে সংবাদ দাও।"

ডেভিড প্রশ্ন করে,—"আর সাবরিণার কি হবে?"

উপদেশ দিয়ে লাইনাস বলে—"চেপে বসো, আমি সাবরিণার তদারক করছি।"

লাইনাস ভাবে, এ আর এমন কঠিন কি কাজ! একবার সহানুভূতির সুরে মেয়েটাকে ঠাণ্ডা করতে পারলে আর সবই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

লাইনাসের সহৃদয়তা আর বিবেচনায় মুগ্ধ হ'লো সাবরিণা। সে বলল—"সত্যি বলছি, আপনাকে আসতে দেখে আমার মনে হল আপনি বুঝি একটা বোঝাপড়া করতে আসছেন। ভিয়েনার এক অপেরায় এমনই একটা কাহিনী আছে। ভিয়েনার এক গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু অনেকটা এই রকম। স্বয়ং রাজকুমার এক হোটেল-পরিচারিকার প্রেমে মসগুল। শেষে প্রধান মন্ত্রী এলেন মেয়েটিকে ভোলাতে, সঙ্গে অনেক টাকা—"

"মেয়েটাকে বুঝি টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চায়?"

"হ্যাঁ, পাঁচ হাজার না, না দশ হাজার ক্রোণেন দিতে চাইল, না, বোধ হয় দশ হাজারেরও বেশী।"

লাইনাস বলে—"তাহলে পনের হাজার?"

"না, না।"

"পঁচিশ হাজার ডলার? তা ট্যাক্স বাদ দিলে অনেক টাকা হবে সাবরিণা।"

"কি বলতে চাইছেন?"

হাসলেন লাইনাস্,—বললেন, "টাকার অঙ্কটা বাড়াচ্ছিলাম, কোনও আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন প্রধান মন্ত্রী দশ হাজার ক্রোণেনের কথা বলবেন না—"

"কোনও আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন হোটেল-পরিচারিকা সে টাকা ছোঁবে না।" এই বলে হাসতে থাকে সাবরিণা।

দূরে অর্কেষ্ট্রার সুর বাজছে। সাবরিণা লাইনাসের মুখের দিকে তাকায়। কাছে সাবরিণাকে টেনে নিয়ে লাইনাস মৃদু গলায় বলে—"ডেভিড এখানে থাকলে হয়ত তোমাকে চুমা দিত, না সাবরিণা?"

স্বপ্নময় ভঙ্গীতে গুঞ্জন করলো সাবরিণা—"মুম্‌মুম্"

হেসে লাইনাস চুম্বনে অভিষিক্ত করলো সাবরিণাকে।

মূলত: সৎপ্রকৃতির তাই লাইনাস এই ভণ্ডামির অভিনয়ের জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ করেন।

পরদিন প্রাতে ডেভিড প্রশ্ন করে—"কাল কি হল? সাবরিণা ক্ষেপে গিছল?"

লাইনাস বলল—"ঠিক তা নয়, তবে হতাশ হয়েছে।"

"তুমি কি বললে?"

"সত্যি কথা বললাম। বাড়ির কারো মত নেই। তবু তুমি একেবারে পাহাড়ের মত অটল, তার পর বসে পড়েছ ইত্যাদি—"

ডেভিড ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে—"তেইশটা সেলাই আমার সারা অঙ্গে। তুমি আমার একটা উপকার করবে? জানি, হয়ত বিরক্ত হবে, কিন্তু মেয়েটাকে যদি একটু দেখা-শোনা করো ত' ভালো হয়।

লাইনাস বলল—"আজ ওকে নিয়ে নৌকাবিহারে যাচ্ছি!"

"ওকে বলে দিও ডাক্তার ক্যালওয়ে যে মুহূর্তে সেলাই কাটবেন, আমরা তখনই পালাবো।"

"আর এলিজাবেথের কি হবে? বাবা আর মা?"

ডেভিড কাঁধ নেড়ে বলে—"মনের দুঃখে এলিজাবেথ আরো গোটা চারেক টুপী কিনবে। মা মাথার যন্ত্রণায় বিছানা নেবেন। আর বাবা প্রকাশ্যে বোতল খুলবেন, ছ'টা সিগার ধ্বংস করবেন। আমাকে হয়ত নির্বাসনে পাঠাবেন। দাদা, তুমি আমাকে সাহায্য করবে ত'?"

শান্ত গলায় লাইনাস বলে: "নিশ্চয়ই, আমি সর্বদাই সাহায্যের জন্য তৈরী।"

জামা খুঁজতে গিয়ে লাইনাস দেখে, তার বাবা আলমারীর ভিতর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, এক হাতে তাঁর মদের গ্লাস আর অপর হাতে বিরাট সিগার।

নার্ভাস ভঙ্গীতে কর্তা বললেন "তাই ভালো, আমি ভেবেছিলাম বুঝি তোমার মা। তা সেই ড্রাইভারের মেয়েটার খবর কি?"

"ডেভিড তার সঙ্গে পালাতে চায়।"

চীৎকার করে কর্তা বললেন—"বলো কি,—ঐ ড্রাইভারের মেয়েটার সঙ্গে?"

"মালীটার ঠাকুমার সঙ্গে যদি পালায় তাতেও কিছু এসে যায় না, কিন্তু আমার প্লাসটিকের কারবারের জন্যই ত' চিন্তা!"

"বেশ, মেয়েটাকে একটা মোটা টাকার চেক্ কেটে দাও।"

"টাকা সে চায় না, চায় প্রেম।"

"তা বেশ কথা, কিন্তু ডেভিডের মাথা খাবে কেন? আরও অনেকেই ত' আছে।"

লাইনাস প্রাচীন কালের কলেজী ব্লেজার কোট টেনে বার করলো, তার পর সেইটা গায়ে দিতে দিতে বলে ওঠে—"দেখা যাক্ চেষ্টা করে।"

"সে কি? তুমিও ঐ দলে ভিড়লে নাকি?"

"ভারী আনন্দ আমার, অফিসে টেবল-বোঝাই কাজ পড়ে আছে, আর আমি বুড়ো মিন্‌সে চলেছি একটা বাইশ বছরের মেয়েকে নিয়ে নৌকা-বিহারে। আমার অবস্থা চমৎকার!"

সেদিন নৌকায় সব কথা সাবরিণাই বললো, লাইনাস শুধু শুনলো। অবশেষে সাবরিণা বলে "তোমার এখন প্যারী যাওয়া উচিত, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন।"

কথাটা মনে লাগল লাইনাসের।

ফেয়ারচাইল্ডকে লাইনাস বললে—"আজ সন্ধ্যার পর তোমাকে একটু দরকার হ'বে, সাবরিণাকে নিয়ে একটু বেরোব।"

বিব্রত ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফেয়ারচাইল্ড বলে—"আমাকে বরং ছুটি দিন। পৃথিবীটা চিরদিন মোটর গাড়ির মত দেখেছি, সবাই ছুটছি বটে লক্ষ্য কিন্তু বিভিন্ন দিকে,—সে পথ আমাদের জানা চাই, আর আছে সামনের সীট, পিছনের সীট,—মধ্যে ব্যবধান।"

"এতটা বুঝিনি, যাকগে তুমি বরং সাবরিণাকে ডেভিডের গাড়িটা নিয়ে যেতে বলো।"

"একটা কথা হুজুর, প্রথমে ডেভিড সাহেব, এখন আবার আপনি! আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি ঠিক জানতে পারছি না!"

"তোমার মেয়েকে আবার প্যারী পাঠাতে চাই,—টাকার জন্য ভেবো না।"

টাকার জন্য ভাবিনি হুজুর, ভাবছি বেচারী সাবরিণার কথা। বেচারী কষ্ট না পায়।

"দেখি, কি করা যায়!"

"কলোনী" হোটেলে ডিনারের সময়, প্যারীতে কি কি করা উচিত আর কি অনুচিত বোঝালো সাবরিণা। প্যারীতে প্রথম দিন কি করা উচিত, হয়ত একটু বৃষ্টি হবে, প্যারীর বৃষ্টিটা দরকার। প্যারীর বাতাসে যখন সোঁদা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে, ভিজে চেষ্টনাটের গন্ধ।"

কর্তা সে দিন অফিসে প্রশ্ন করলেন—"সেই ব্যাপারটার মীমাংসা হল? ফেয়ারচাইল্ডের মেয়েটা কোথায়?"

"হাঁ, একটা ব্যবস্থা হয়েছে বলে ত' মনে হয়।" এই বলে ফোনে "লিবার্টি" জাহাজে দু'টি জায়গা ঠিক রাখার অনুরোধ জানালো লাইনাস।

কর্তা ফেটে পড়লেন—"তার মানে? তুমি আর ঐ মেয়েটা? ব্যাপার কি? আমি কি দুটো গর্দভের জন্মদাতা?"

"কে বলল, আমি যাবো? মেয়েটা যাবে। আমার কেবিনটা খালি পড়ে থাকবে। পরে কিছু উপহার পাঠিয়ে ক্ষমা চাইব। তাতেই সব ঠাণ্ডা হবে।" এই বলে সেক্রেটারীকে আবার ফোনে নির্দেশ দেয় লাইনাস—"সাবরিণার জন্য প্রচুর ফুল যেন যায়, প্যারীতে নেমেই একটা গাড়ি, থাকার জায়গা, ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা যেন সাবরিণার নামে থাকে, আর লারাবী ইন্‌ডাসট্রিজের এক হাজার শেয়ার।"

"বলো কি? এক হাজার শেয়ার?"

—"আচ্ছা পনের শ' শেয়ার ওর নামে ট্রান্সফার করে দাও।" কর্তাকে বুঝিয়ে লাইনাস্ বললো, "এই বার বাড়ি যান, আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

সাবরিণা এলো সাড়ে আটটার পর। বললো—"আমি তোমার সঙ্গে যাবো না, কারণ, ক'দিনেরই বা পরিচয়। তোমাকে ভালোবাসা ঠিক নয়। সারা জীবন ধরে যে ডেভিডকেই ভালোবেসেছি। ভেবেছিলাম বড়ো হয়েছি। এখন দেখছি, সব ভুল। শুধু চুলটাই কায়দা করেছি, বয়স বাড়েনি।"

সাবরিণার কথাগুলো সহজ। চুপ করে থাকে লাইনাস।

অনেকক্ষণ পরে সাবরিণা জানালার ধারে গিয়ে বলে—"লিবার্টি" জাহাজ কোন্‌টা?"

"ডানদিকেরটা।" জবাব দেয় লাইনাস।

"ঠিক ত'? শেষটায় ভুল জাহাজে উঠে বসোনা যেন।"

"না জাহাজে উঠবো না।"

"কেন? প্লেনে যাবে বুঝি?"

"না, হয়ত যাওয়া হবে না, ব্যবসার চাপে অনেক সময় এমনই ঘটে। নাও কিছু খাওয়া যাক্।"

সাবরিণা টেবলের ধারে এসে বসল,—চঞ্চল ভঙ্গীতে টেবলের অসংখ্য ঘণ্টার মধ্যে একটি টিপতেই ড্রয়ার খুলে গেল, তার ভেতর জাহাজের দু'খানি টিকিট দেখা গেল—একখানি তার আর একটি লাইনাসের। টিকিটটা তুলে দেখে সাবরিণা, চোখে তার অপমানিতের আহত দৃষ্টি। লাইনাসের মনে হয় আর কোনও কথা গোপন করা উচিত নয়। সব পরিকল্পনা সে খুলে বলে। প্যারীতে ওর জন্য যে সব বন্দোবস্ত হয়েছে, মায় মার্জনা-ভিক্ষার চিঠি পর্যন্ত।

সাবরিণা বলে—"আপনি মহৎ, আমার অত-শত দরকার নেই, একখানি প্যারীর টিকিট হলেই চলবে। নমস্কার মিঃ লাইনাস

সাবরিণার বাবা ঠিকই বলেছিল। সে বিশ্বাস করেনি পৃথিবীটা মোটর গাড়ির মত, সামনের সীট, পিছনের সীট, মধ্যে ব্যবধান। ভালো, ওকে প্যারী পাঠালে যদি লারাবী-পরিবারের ঝঞ্ঝাট কাটে, ও প্যারীতেই যাবে। একটা মঙ্গল হ'ল, এখন আর সে ডেভিডের প্রেমে মগ্ন নয়। জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেওয়ার সময় ওর বাবা ফেয়ারচাইল্ড বলল—"মোটেই ভালো হ'ত না মা, খবরের কাগজ ঢাক পিট্‌ত, লারাবীরা কত মহৎ, ড্রাইভারের মেয়েকে বিয়ে করছে, কি গণতান্ত্রিক সারল্য! কিন্তু গরীব ড্রাইভারের মেয়ে সাবরিণা সম্পর্কে গণতন্ত্র কিছু বল্‌তো না। বড়লোককে বিয়ে করলে গরীবদের কেউ গণতান্ত্রিক বলে না।"

সারা রাত্রি অফিসে কাটালো লাইনাস লারাবী। সকালে সেক্রেটারীকে ডেকে বলল, "অনেক কাজ, প্লাসটিকের কারবার সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করে চিঠি দাও, লারাবী সিনিয়র অর্থাৎ কর্তা, মিঃ টাইসন আর এলিজাবেথ টাইসনকে খবর দাও, অফিসে আসতে বলো। আমার ডেস্কে একটা টিকিট আছে আমার নামে সেটা ডেভিডের নামে ট্রান্সফার করো।"

দোর খুলে গেল, ডেভিড ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বলে—"দাদা, শুনে সুখী হবে, সেলাই কেটে দিয়েছে ডাক্তার।"

"কন্‌গ্রাচুলেসনস্! আজই প্যারী যাও, টিকিট রেডী।"

"চেংড়ামো কোরো না।"

"সাবরিণাও সঙ্গে যাবে, খুশী নও?"

"হ্যাঁ, দেখলাম প্যাক্ করছে বটে!"

"কি বলল?"

"কিছু না, আমাকে চুমা দিল। চুমার ধরণটা 'বিদায় চুম্বনের' মতো। দু'ফোঁটা চোখের জলও হয়ত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝলাম, দুই আর দুয়ে চার—বুঝতেই পারছ! কিন্তু তুমি ব্যস্ত মানুষ বাজে কথা কওয়া ঠিক নয়।"

"যাকগে, তুমি আর সাবরিণা প্যারীতে আনন্দে কাটাও।"

"কি করে জানলে সাবরিণা আজো আমাকে চায়?"

"নিশ্চয়ই চায়, সারা জীবন ধরে ভালোবাসে। যাও এখন, নইলে বোট মিস্ করবে।"

"তুমি ওর সঙ্গে যেতে চাও না ঠিক বলছ?" ডেভিড সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

"বা রে, আমি কেন যাবো?"

"তার কারণ তুমি সাবরিণার প্রেমে পড়েছ।" সোজাসুজি বলে ডেভিড।

মিটিং হচ্ছে। লারাবীদের প্লাসটিক কারবার সম্পর্কে আলোচনা। সবাই আছে মিঃ টাইসন আর এলিজাবেথও আছে। ডেভিড নেই। এলিজাবেথ বলে—"ডেভিড কোথায়?"

জানলার ধারে গিয়ে কি দেখল লাইনাস, তার পর বলে—"যাক্ জাহাজ ছাড়লো—আমাদের মিলন ব্যবস্থাও ভাঙলো।"

কর্তা বললেন—"কিসের জাহাজ, আবার গোড়া থেকে বলো।"

লাইনাস বলে—"দুঃখের কথা, এলিজাবেথ সংবাদটা জানাতে আমার কষ্ট হচ্ছে, ডেভিড—"

এমন সময় ঝড়ের মত ঘরে এসে ডেভিড বলে…"চিরদিনের মত লেট।. হ্যালো ডার্লিং।" এলিজাবেথকে চুম্বনে অভিষিক্ত করে।

লাইনাস দুর্বল কণ্ঠে বলে—"সাবরিণা কোথায়?"

"বোধ করি জাহাজে।" ডেভিড বলল।

"বেচারী একলা জাহাজে?" লাইনাস চেঁচিয়ে ওঠে।

সান্ধ্য দৈনিকপত্র বলছে—"সাবরিণা ফেয়ারচাইল্ড আর লাইনাস লারাবী সঙ্গোপনে "লিবার্তি" জাহাজে পাশাপাশি ডেক্ চেয়ার রিজার্ভ করেছেন।"

এলিজাবেথ বলে—"সেটি আবার কে?"

"আমাদের ড্রাইভারের মেয়ে, প্রথমটা আমার পেছনে ছিল, পরে লাইনাসকে ধরেছে, বোধ হয় জানে ওর টাকা বেশী। ঐ সব মেয়েরা ত' এই জাতের।"

লাইনাস এই কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ডেভিডকে প্রচণ্ড ঘুঁসি মারল।

ডেভিড উঠে বলল…"মাফ করো দাদা, টেষ্ট করছিলাম। তোমার জন্ম সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। সোজা চলে যাও,—একটা টাগ-লাঞ্চ রেডী।"

লাইনাস বলে—"আপনারা মাফ করবেন, আমার অন্য এনগেজমেন্ট আছে।"

সাবরিণা আপন মনে তার কুকুরকে আদর করছে। জাহাজ এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। এমন সময় দেখা হল লাইনাসের সঙ্গে।

কোনো কথা নেই। দু'জনে নিবিড় বাহুর বাঁধনে বাঁধা।

সাবরিণার বাবা বলেছিল—চাঁদের দিকে হাত বাড়িও না। আজ চাঁদ মাটিতে এসে ধরা দিয়েছে।

আনন্দে আবেগে দু'টি চোখে জল নামে সাবরিণার।

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

বইয়ে মলাট দেওয়া চালু হল!

ঠিকই। বইয়ে মলাট দেওয়ার রেওয়াজ আজকের নয়, বহু দিনের। পুরোনো বই-পত্র, পুঁথি, দলিল কি দস্তাবেজগুলোতে কাঠের মলাট দেওয়ার প্রচলন তো ছিলই আর সেই কাঠের মলাটের ওপর চামড়া কি পার্চমেণ্ট দিয়ে মজবুত করার ব্যবস্থাও যে না ছিল এমনটি নয়। ঠিক এর পরই মানুষের মাথায় এল এই কভারগুলোর গায়ে সোনালী জলে নানা কাজ করার চিন্তা। এমবসিং। সোনালী জলে নাম লেখার রেওয়াজ ছিল ভারতের। তুলোট কাগজে আজও তার নিদর্শন মিলবে। মাত্র পঞ্চাশ বছর হল জাপান জুগিয়েছে এক শ্রেণীর চামড়া বই বাঁধাইয়ের কাজে। প্লাষ্টিক তো কেবল এই সেদিন। রেক্সিন আজও চালু রয়েছে। ক্যাকড়া কি কাপড়ের, বোর্ডের বাঁধাইও কম যায় না। ধনী ব্যক্তির গৃহে ভেলভেট, সিল্ক, লিনেন, নাইট্রো, সোমুলোজপেপার ইত্যাদির বাঁধাই সেদিনও ছিল, সুদ্রিত, আছে।

সুভো ঠাকুর

এই মধ্য-রাত্রের মাঝখানে এসে সময়ের রথচক্র মুখ-থুবড়ে হঠাৎ যেন থেমে গেছে…

অন্ততঃ সুভো ঠাকুরের কাছে তো তাই মনে হোলো !

এত দিন ধরে লোকের মুখের নথ-নাড়াকে ও' যে লবডঙ্কা দেখিয়ে বেড়িয়েছে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরেও তাকায়নি—আজ তার সুদে-আসলে আদায় কোরে, ও'র অদৃষ্ট যেন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, নিঃশব্দে অট্টহাস্য হাসছে।

ও'র ঘুমন্ত বৌ এর হাতে, সেই কবেকার যুদ্ধের বাজারের প্রাণ রক্ষ-মার্কা ব্যাঙ্কের পাশবইখানা—ও'র চোখে যেন চাবুকের মতই চমকে উঠলো। ও'র সেই বকেয়া সাড়ে ছ' আনা পয়সা সমেত ও-ব্যাঙ্ক তো ফেল পড়ে গেছে কবে। তা ছাড়া, ও'র ব্যাঙ্কে যে কিছুই নেই—এ কথা তো সুস্পষ্ট উচ্চারণে, যুক্তি সহকারে, ও'র বৌকে বুঝিয়ে বলেছে। তা সত্ত্বেও যখন এই কাণ্ড, তখন সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ও'র স্ত্রীরও কি সত্যিই তা'হলে সন্দেহ—যে, মোটা টাকা ফিক্‌স্‌ড ডিপোজিটে লুকোনো আছে ও'র ? না—না—এ কখনই হ'তে পারে না। এত দিন একসঙ্গে থাকার পরেও ও'র স্ত্রী নেহাতই জমাদার হিসেবে সন্দেহ করবে কি ও'কে ?

পয়সা জমায় যারা—তারাই তো জমাদার। সে জমাদার আর কেহ হ'তে পারে, নিজে জমিদার না হলেও, অন্ততঃ জমিদারের ছেলে সুভো ঠাকুর যে তা' নয়—তা ওর সঙ্গে যার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মোকাবেলা হয়েছে, সে-ও শত মুখে স্বীকার করবে।

কিন্তু তা'হলে বাক্‌সের তলা থেকে ওটা বেরোলো কি করে ?—ও তো বাক্‌সের তলায় যে খবরের কাগজ পাতা থাকে, তারও তলায়, প্রায় এক যুগ বিস্মৃত অবস্থায় অধিষ্ঠান করছিল। কেহ ফিরেও তাকায়নি। তবে, দোষের মধ্যে কুঁড়েমি কোরে ফেলে দেওয়া হয়নি—এই যা। ঐ ফেল-পড়া কোন ইনসিগনিফিকেন্ট ব্যাঙ্কের এত দিনের অবহেলিত পাশবইখানা, যে এতো আবশ্যকীয়, এতো ইম্‌পর্ট্যান্ট হ'য়ে উঠবে—তা আজ এই মুখ-থোবড়ানো মধ্য-রাত্রে আবিষ্কার কোরে, ও' যেন অবাক হ'য়ে যায় আপনা আপনি।…এই পাশ-বইটার কথাই কি তাহলে ও'র বৌ উল্লেখ করেছিল সকালে ? আর তাই কি এখন সুযোগ পেয়ে জমার অঙ্কগুলোয় সন্দিগ্ধ কৌতূহলে উঁকি দিতে গিয়ে এই—এই ঘটনা ? তাই যদি হয়, তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে 'পঞ্চাশ হাজার' পেয়েছে বোলে—গুজবে বাজার গরম, সেটার ব্যাপারেও অন্য সকলের মত নিশ্চিত সন্দেহ হওয়া তো একান্তই স্বাভাবিক। হয়তো ফণিমনসার মতই সে-সন্দেহ, কণ্টকাকীর্ণ কোরেছে—ক্ষত-বিক্ষত কোরেছে ও'র কচি কলাপাতার মত মসৃণ এক কুড়ি চার বছর বয়েসের, সুকমল মানসিক সরজমিন্‌কে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে, ও' নিজেও তখন মনে মনে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে নিজেকেই—গভর্মেন্টের কাছ থেকে যেন সত্যিই ও' পেয়ে গেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ! কিন্তু সে টাকাটা পকেটে পুরে, ও' করল কি ?—এর পরে এমন কি ফিক্‌সড, ডিপজিটের টাকাটাও মনে হ'তে লাগল—যেন, সত্যি সত্যিই ও'র ছিল ! কিন্তু সে টাকাটারও কি হাত-পা গজিয়ে 'যার যেথা স্থান' বোলে টাঁকশালে ফিরে গেল ?—জমি কোরল না, বাড়ি কোরল না, বৌ-এর জন্যে নতুন কোনো গয়না গড়ানো তো দূরের কথা—সেই পুরোনো গয়না, যেগুলো বাঁধা ছিল, সেগুলোই ছাড়িয়ে আনল না, তবে হোলো কি অতগুলো টাকা ?—দিল্লী একজিবিশানের খরচ ? সে তো 'ভু—' বাবু ন' হাজার হাওলাত দিয়েছেন, তার পর ইংরিজি এডিশান 'আর্ট অফ সুভো টেগোর'-এ বেবোনো বিজ্ঞাপন, আর ঐ বই-এর বিক্রির টাকা—এক্‌জিবিশানের খরচ তো সেই টাকায় চলেছে।

—তবে কি রেস ?

—কাট্‌কা বাজার ?

না, তাও নয়।

—তবে কি ?

ও'র চোখের সামনে দপ-দপ কোরে জ্বালা অতগুলো ক্যাণ্ডেলের আলোটা এবার ক্রমশঃ ঝাপসা হ'তে আরো ঝাপসাতর হ'তে হ'তে একটা অপূর্ব্ব রহস্যলোক রচনা করেছে, যেন, আর তারই রোশনাই-এর অস্পষ্ট আওতায় বসে, ও' একদৃষ্টিতে ও'র স্ত্রীর দুশ্চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল, উপায় খুঁজতে লাগল, কি কোরে কা'কে বোঝাবে—যে, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে-টাকা মঞ্জুর কোরেছে তা'র একটা আধলাও আঙুল দিয়ে টিপে-দেখা তো দূরের কথা, ও' চোখ দিয়েও চেকে দেখবার সুযোগ পায়নি। রাষ্ট্রপতির সে মঞ্জুরি—মাত্র কাগজে-কলমে। নগদ-বিদায়ের নাম-গন্ধ নেই তা'তে। যে যে দেশে, যখন যখন প্রদর্শনী পৌঁছবে, তখন সেই সেই দেশে, এ-দেশীয় দূতাবাস থেকে সেই মঞ্জুরি অর্থের কিয়ৎ অংশ সংগ্রহ কোরে প্রদর্শনীর প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ হবে—এই তো হচ্ছে হুকুমনামা।

দিল্লীর 'গরিবখানায়' একজিবিশান্ করতে গিয়ে—তার আগেই কিন্তু গরিব সুভো ঠাকুর এণ্ড কোম্পানি ফতে কোরেছে ফতুর হওয়াকেও, অর্থাৎ যেখানে যা ছিল এবং যেখান থেকে যা' পাওয়া যায়—সব-কিছু হাতানো তহবিল, হাঁড়ি সমেত উপুড় করে ঢালা হ'য়েছে। খরচের ধাক্কা একা দিল্লীতেই বিশ হাজারের উপর দাঁড়িয়ে হুমকি ছেড়েছে—তার উপর তো আছে বম্বে! তা' হবে না? সংখ্যায় প্রায় দু'হাজার, আর ওজনে তিনশ মণের উপর জিনিষ—এক বছর ধরে' রহমান সাহেবের ঐ ফ্ল্যাটের বড় বড় ঘরগুলোকে গুদমে পরিণত কোরে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে ফেলেছিল। তার পর চলেছিল প্যাকিং। অফুরন্ত সে প্যাকিং—প্যাকিংএর যেন শেষ নেই। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির শুধু নয় প্রায় প্রত্যেকটি জিনিষেরই আয়তন অনুপাতে ছন্দ বজায় রেখে ভাল নিরেট কাঠের আসন, তথা সিংহাসন বিশেষ তৈরি হ'য়েছে। মানে ইংরিজি পোষাকে যাকে হাজির করলে—ষ্ট্যাণ্ড অথবা বেজ্রস বলা হয়—তাই। তার পর সেই বিরাট মাপের জিনিষ-পত্তর ভাল ভাবে গুছিয়ে বিপুলায়তন ওয়াগনের ঘাড়ে চাপানো...এ কি চারটিখানি কথা? এক ওয়াগন খরচের ধাক্কায় ধরাশায়ী হবার উপক্রম। আর্টিষ্টের মত নয়, ঝাঁকা-মুটের মত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সামাল দিতে গিয়েই তো আজ ও'র এই বে সামাল অবস্থা।

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে এ-সব কথা?

বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, লোকের কাছে সুভো ঠাকুর যত বলে—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটি পয়সাও স্পর্শ করার পুলক পায়নি ও'র দুই করের কোনো একটিও। লোকে কতই মনে করে—সুভো ঠাকুর আজ কাল বিশেষ রকম বৈষয়িক হয়ে উঠেছে। ক্যালকেশিয়ান ককনিতে এইরূপ ব্যবহারে—'ছোটলোক' শব্দটি ব্যবহার হলেও, ও'র উদ্দেশে ব্রাহ্মমতে 'ক্ষুদ্র ব্যক্তি' বলেই বার বার উচ্চারণ করে ও'র বন্ধু মহল। এমন কি অনেকে, আন্দাজে ও'র সাইকো-এনালিসিস্-ও শেষ কোরে ফেলে বলে—"আসলে মোটা টাকা পেয়ে মোটেই ভাঙতে চাইছে না। একান্ত অভাবের পর অকস্মাৎ আসমান থেকে অতগুলো টাকা কোকোটসে হাতে পেয়ে গেলে সব লোকেই চালাক হ'য়ে যায়, চেপে যায় আসল কথা, তা ও' তো কোন্ ছার!"

কাগজে-কলমে পেলেও, সুভো ঠাকুর সত্যিই কিন্তু হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কানা কড়িও পায়নি—তাই অকস্মাৎ আকাশ থেকে অতগুলো টাকা পেলে, সব লোকেই যেমন চালাক হ'য়ে যায়, সে রকম চালাক হবারও কোনই সুযোগ পায়নি ও'।—তা সত্ত্বেও তো চালের মাথায় চালিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু এই যে পাই পয়সা পকেটে না-রেখে বুক ফুলিয়ে চালিয়ে যাওয়ার চাল—এটা চলছে কি কোরে?

অথচ কোথায় টাকা? কে কিনছে ঐ আল্ট্রা মডার্ণ ভঙ্গির আর্টের বই?—তার আবার হিন্দি সংস্করণ! 'আর্ট অফ সুভো টেগোর'—রাষ্ট্রভাষায় যা 'সুভো টেগোর কি চিত্রকলা'—সে বই বুঝনেওয়ালা, হিন্দি-পড়ুয়া লোকের মধ্যে এক জনও কি আছে? অথচ যেটা থেকে পয়সা আসে—সেই ইংরিজি এডিশানের সব কিছু—অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বিক্রি, সব কিছুই—একজিবিশানের খরচের জন্যে ও' দিয়ে দিয়েছে। মাত্র হিন্দি এডিশানটা ও' রেখেছে নিজের বোলে। তাই ভেবে কূল-কিনারা পেল না কি করবে। আর এই জন্যেই তো, বলতে গেলে এক রকম নিরুপায় হ'য়েই—বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেছিল সকালে। তার পর এই এখন ফিরছে! কিন্তু কাল যে ও পাবলিশারের কাছ থেকে নির্ঘাৎ টাকা পাবে—নির্ব্বিবাদে বুঝিয়েছে ও'র বৌকে—কোথায় সে পাবলিশার? আর কোথায় সে টাকা?

আসলে, এই হিন্দী এডিশান বিক্রি করার জন্যে, হেন পাবলিশার নেই যার কাছে না ও পৌঁছিয়েছে! আপশোষ হয় ওর—কেন আইন-ভঙ্গের মত আশা-ভঙ্গের জন্যে শাস্তির বিধান নেই দুনিয়ায়! তা'হলে সেই আশা-ভঙ্গের দায়েতে, প্রত্যেকটি হিন্দীওয়ালাকেই ও পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারতো। সত্যি সত্যি হ্যারিসন রোড বড়বাজারের এ-হেন দোকানদার নেই যার কাছে ও হাজির হয়নি। কেউ ঠিকানা দিয়েছে বেনারসের, কেউ এলাহাবাদের, কেউ গোরক্ষপুর, আগ্রা এবং জয়পুরের। সেই সব ঠিকানা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাবলিশারের কাছে আবেদন-পত্র সহ বই পাঠাতে পাঠাতে আন্তিক মিঞার ষ্ট্যাকাউন্ট-এ খুচরো ধারের অঙ্ক ক্রমশঃই অতিকায় আকার ধারণ করতে চলেছে।

হায় রে সুভো ঠাকুর! আসর জমাতে গিয়ে আমাদের আনন ঘোষাল আজও যার অর্থ সম্পর্কে অপরিসীম ঔদাসীন্য ঘোষণা করতে উচ্ছ্বসিত—যা'র টাকার প্রতি তাচ্ছিল্যের কিম্বদন্তী আজও তাতিয়ে তোলে পাড়ার পুরোনো চায়ের দোকানগুলোর আনাচ-কানাচ—যার নামে একশ' টাকার নোট পাকিয়ে সিগ্রেট-ফোঁকার গল্প-কথা রটনা হয় রোয়াকে রোয়াকে—তারই কিনা আজ অর্থের অভাবে এই অবস্থা!

এ-সম্পর্কে সুভো ঠাকুরের একটি বিশিষ্ট দর্শন আছে। ও'র ধারণা, আদর্শের পথে পথ-চলা সুরু করতে হোলে প্রথম ত্যাগ করতে হবে অহঙ্কারের—অবলীলাক্রমে শতছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের মত মৃত্তিকার 'পরে তাচ্ছিল্যে পড়ে থাকবে তা' পরিত্যক্ত হোয়ে। আত্মাভিমান লুটিয়ে থাকবে সে পদতলে—অবহেলায়। আদর্শের লক্ষ্যভেদ ছাড়া লক্ষ্য থাকবে না কোনো কিছুতেই। মান এবং অপমান হ'য়ে যাবে তখন একাকার। সকল অহঙ্কার সকল অভিমানের আভরণ পশ্চাতে ধূলায় ফেলে এগিয়ে চলতে শিখলে—তবেই না আদর্শ-সিদ্ধির সম্ভাবনা। তাই সুভো ঠাকুর বলে—এই পিরিয়ড,

এই অধ্যায়, ও'র কঠিন তপস্যার। সকল অপমান, সকল অবহেলা, মাথায় কোরে নেবার এ-সাধনা—এটা শেষ হ'লে, এটা ওত্‌রাতে পারলে তবেই হয়তো কখনো পাবে তার সাম্‌না-সাম্‌নি সাক্ষাৎ। কোথায় কবে হবে সে দেখা ও'র প্রেয়সীর সঙ্গে—কে জানে! তীর্থ-পরিক্রমার মত তাই ত এই পথচলার মত্ততা। আদর্শের পথে এগিয়ে চলার এই আনন্দ। তাই ত এই দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করে চলার অসম সাহসিকতা ও'র। সকল উপহাস সকল অবজ্ঞা উপেক্ষা কোরে চলে ও'—অপমান হতাদর—স্মিতহাস্তে অঙ্গের আভরণ কোরে গ্রহণ কোরেছে যেন নিরতিশয় আনন্দে।

এক ধারে এই আদর্শের মদিরেক্ষণা ছলনাময়ীর অস্পষ্ট হাতছানি—আর তার অশ্রান্ত সন্ধান। আর এক ধারে জীবন্ত প্রেয়সীর দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের দুরন্ত অভাবের অব্যক্ত আবেদন। অনন্ত নাগের ন্যায় সংসারের সহস্র নাগপাশের নিষ্পেষণকারী পাকে পাকে নিতান্তই নির্বাসিত বিপর্য্যস্ত ও'।

এই দুই বিরুদ্ধ তরঙ্গভঙ্গের লীলা-ভূমিতে ভূলুণ্ঠিত সুভো ঠাকুর—নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের দোদুল্যমান দোলায় সেই কাপড়-চোপড় ছড়ানো ঘরের আর একটি নিভৃত কোণে, ভূমি-শয্যায়, হয়তো কোন নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের মধ্যে নিবিড় নিদ্রামগ্ন হ'য়ে গেছে ততক্ষণে।...

ভোরের আলো যখন ও'র ফ্ল্যাটে, বারান্দার রেলিং টপকে, ও'র কপালে এসে টোকা মারছে—ও' তখন উঠে দেখলো, ও'র আদরের কন্যা চিত্রলেখা মেঝেতে শোয়া—তার মায়ের বিস্তৃত অঞ্চলাশ্রয়ে নিশ্চিন্তে মুদিত-নয়না। ও' আর একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলো—এই দরিদ্র শিল্পীর কন্যাকে। জমিদার-পুত্রের মেজাজ নিয়ে দেখলো—অনুকম্পায় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো ও'র অন্তর। মনেই হোলো না যেন ও'র মেয়ে—যেন কোন অনাথা কন্যা, ফুটপাতে ফুটে আছে অনাদৃত। আগের মত টাকা থাকলে, পদি কিনতে—এখুনি হয়তো ছুটতো ট্যেক্সি নিয়ে—হল এণ্ড এণ্ডারসন অথবা হোয়াইট ওয়েজে। না—না—কমলালয় ষ্টোর্সে। ও' যেন ভুলে যায় এটা উনিশ শ চুয়ান্ন সাল—উঠে গেছে হোয়াইট ওয়েজ, উঠে গেছে হল এণ্ড এণ্ডারসন। এমনি ধারাই ও ভুলে যায় অনেক কিছুই। ও' ভুলে যায়—ও'র বর্ত্তমান অবস্থা। ভুলে যায়—কা'কে দয়া দেখাচ্ছে। ভুলে যায়—দয়া দেখানোর দাম্ভিকতা করছে যে, সেও তো সেই একই পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। এমন সময় অকস্মাৎ ও'র মনে ঝিলিক্ মেরে যায়—ও'দের বাড়ির পূর্ব্ব-পুরুষের কড়িকাঠ-ছোঁয়া সেই বিরাট বিরাট তেল-রং-এ আঁকা ছবিগুলো—প্রিন্স দ্বারকানাথ, তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, তারপর ও'র পিতা ঋতেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর সেই দালান, সেই উঠোন, সেই চক্-মেলানো বারান্দা, উড়িষ্যার জমিদারী—অম্বিলি আর পাতুয়া কাছারি—ওর চোখের উপর কেলিডোস্কোপিক ম্যাজিকের মত এক একবার এক এক রংয়ের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

ও' আস্তে আস্তে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে তখন। সকালের ভেজা-পিচের রাস্তা, মনে হয়, সদ্য-স্নাতা সাঁওতালী-তনয়ার ত্বকের মত মসৃণ আর তকতক্ করছে পরিচ্ছন্নতায়। ও'র গত রাত্রের জাগরণ-ক্লান্তি, আজো মনের কোণে কোণে অতৃপ্ত আলস্যে দু'হাত তুলে যেন আলস্য ভাঙছে। হঠাৎ, বারান্দার এক কোণে পড়ে থাকা সব-কেনা সেই বিদ্যেসাগরী চটিটার দিকে একবার নজর পোড়ে গেলো সুভো ঠাকুরের। একবার বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপণে নজর করল ওটার গোড়ালিটায়—দেখলো, এরি মধ্যে সেটা ক্ষয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের মত একটা জায়গা নিছক উঁচু হয়ে গেছে। আর সেইখানটার মাধ্যমে প্রেমিক পদতলের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর মিলন ঘটার অবৈধ সুযোগ ঘটেছে অপূর্ব্ব। এ-দৃশ্যে, ওর মানসিক রিএক্‌সান্‌-এর মর্ম্মভেদ না করা গেলেও, এটুকু বোঝা গেল যে,—'আর্ট অফ সুভো টেগোর'-এর হিন্দী এডিশানের কথা আবার মনে পড়ে গেছে ও'র।

এই এক মাস কোলকাতার বইএর বাজারে ঘসড়ানি খেতে খেতে ও'র জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে গেলেও এ-ব্যাপারে এখনো অবধি কোনই ভরসা দেখছে না ও'। অথচ, এই একটি মাত্র আশার উত্তমাশা অন্তরীপ—যাকে আঁকড়ে ও' এবারকার তরঙ্গসঙ্কুল বিপদ-সমুদ্র তরে যাবার আপ্রাণ করছে প্রচেষ্টা। তাই, 'মানুষের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই প্রবাদ বাক্য বারম্বার স্মরণ করতে করতে হিন্দী সংস্করণ নিয়ে কোন্ পাব্‌লিশারের কাছে আবার একবার শেষ বারের মত আদাব ঠুকে হাজির হোয়ে যেতে পারে—মনে মনে পায়তারা কস্‌ছে তখন।

কোলকাতা সহরের বারান্দায় এসে দাঁড়ানো সেই চমৎকার সকাল—যখন, সবে মাত্র পিচ-এর রাস্তাগুলো, কর্পোরেশনের চাকাওয়ালা ভিস্তিরা এক প্রস্থ ভিজিয়ে দিয়ে গেছে—যখন, এমন কি ও'র চা-খাওয়া তো দূরের কথা, মুখ ধোয়াও হয়নি, কেবল অলস্ত সিগারেটটা—দুটো আঙুলের মাঝখানে চেপে, চুপ কোরে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে দারুণ দুশ্চিন্তায়—দাঁড়িয়ে আছে আর দেখছে, দেখছে আর দাঁড়িয়ে আছে—সেই ভাবনার বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে খারাপ কেন, ভালই তো লাগছে ও'র—সহরের কিছুক্ষণের জন্ম এই জন-বিরল মুহূর্ত্তটি।...হঠাৎ এমনি সময় স্মরণ হোলো সত্য বাবুর কথা। সে দিন সত্য বাবুর কাছে ধারের জন্ম গেছিল যখন—তখন সত্য বাবুই তো টিপস্ দিয়েছিলেন, সেই নতুন এক পাবলিশারের নাম। চৌরঙ্গি পাড়ার পাবলিশার। —ইংরিজি, বাঙলা, হিন্দী, সব রকমই আছে। তবে, রাজনীতির বই-ই নাকি বেশি ছাপে। তা চেষ্টা কোরে দেখতে তো দোষ নেই, লেগেও তো যেতে পারে। তেত্রিশ কোটি টিবিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে, মায় ভগবানের সঙ্গেও তো লাগতে পারে ঠোকাঠুকি! কিন্তু ঐ দুর্নীতির মতই রাজনীতির কথা মনে হতেই সুভো ঠাকুরের মন মুচড়ে উঠলো নারাজ হ'য়ে। ও যেন ভাল ভাবেই জানতো যে, হবে না কিছুই। যারা রাজনীতির বই ছাপে, তাদের কাছে আর্টের বই তো একেবারে অচ্ছুৎ। তার উপর ও' কমিউনিষ্ট নয়, সোসালিষ্ট নয়, 'ইষ্ট'এর মধ্যে মাত্র আর্টিষ্ট। অতএব একে চৌরঙ্গি-মার্কা, তার গোদের উপর বিষফোড়ার মত রাজনীতি সম্পর্কিত বইয়ের পাবলিশার—দুর্নীতি জ্ঞানে দূর কোরে দেবে তো ও'কে দরজার ওপার থেকেই। সুভো ঠাকুর, বৃথা চেষ্টা মনে কোরে আধপোড়া সিগারেটটা এবার আঙুলের কায়দায় দূরে ছুঁড়ে দিয়ে হতাশার সঙ্গেই চেয়ে রইল সামনে—যেখানে রাস্তার

ও-ফুটে দুর্দান্ত 'মিটার হাউস'-এর দুর্নিবার দেহ, বারবার ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগল ও'র সেই দুর্বোত্তর দৃষ্টিকে।

কিন্তু সময় কোথায় আর!···

চিন্তার-চিন্তা-লেকে নাও ভাসাবার সময় কিম্বা অবসর দুটোর কোনটাই আপাততঃ ও'র নেই। ঐ পাবলিশারের কাছে কোনো সম্ভাবনা থাকুক আর না থাকুক ওর কাছে হাজির হওয়া ছাড়া ও'র অন্য কি গতি আছে? কিছু হোক আর না হোক অন্তত নিজের মনের কাছেও তো সাচ্চা প্রমাণ করতে পারবে নিজেকে। বলতে পারবে তো যে, পুরুষকারকে দিয়ে পথের একটি পাথরও বাকি রাখেনি ওল্টাতে। অন্তত ও'র স্ত্রীর কাছেও শেষ অবধি ক্লিয়ার কনসান্সে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে—যে চেষ্টা কোরেছে প্রাণপণ, পারেনি, কিন্তু বম্বে পৌঁছে নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা করবেই করবে।

তাই স্নান সেরে, ভগবানের নাম সেরে, স্নুভো ঠাকুর সাড়ে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বরাতের বিগ্রহের উপর, ফুল-চন্দন চাপিয়ে, হিন্দি সংস্করণটা হাতে নিয়ে—দোমামোনা করতে করতে, দোতলার বারান্দা থেকেই ডেকে বসল একটা রিক্সাকে,—ডেকেই মনে হোলো, বাঃ রিক্সা-ভাড়াটাই গেল লোকসান! তবু ধড়ফড়িয়ে নিচে নেমে, উঠলো গিয়ে রিকশাটায়। এমন কি ঘর থেকে বেরোবার আগে ও'র চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েটাকে একবার আদর কোরে যেতেও ভুলে গেল এবার।

ঠিকানা অনুযায়ী পাবলিশারের নির্দ্দিষ্ট অফিসে পৌঁছে—বাহিরের লক্ষণ অবলোকনে ও'র যা ইম্প্রেশন হোলো, তাতে মনে হয়—সত্যিই, এ সে রকম কলেজ ষ্ট্রীট অথবা হ্যারিসন রোড মার্কা নয়। কর্তার সঙ্গে দেখা করতে দস্তুর মত কার্ড লাগে অথবা স্লিপ দিতে হয়। কর্তা অ-বাঙালী কিন্তু নিশ্চিত ভদ্রলোক।

কথায় চিঁড়ে ভেজে না বটে কিন্তু এখানে দেখা গেল—স্নুভো ঠাকুরের কথায় তখন একেবারে চিঁড়ে ভিজে গেছে। শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক স্নুভো ঠাকুরের অবস্থায় সত্যিই কিছুটা দরদীও হয়ে উঠেছিলেন বোধ হয়। তা' হলেও, সেই দিনই যে তৎক্ষণাৎ টাকাটা পকেটে পাবে এবং তা কচলাতে কচলাতে পায়ে হেঁটেই পথ চলবে, এমন কথা শপথ করে বলা যায়—ও' স্বপ্নেও ভাবেনি।

না-গুণেই নগদ নোটের তাড়াটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এলো যখন তখন ঘড়িতে মাত্র সাড়ে এগারটা বাজলেও এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ও যেন অন্য লোক হয়ে গেছে। ও' উত্তেজনায় রিক্সা নিতেও ভুলে যায়। শরীরটা তখন পাখির পালকের মতই হয়ে গেছে যেন ফুরফুরে আর হাল্কা। ঢিলে-পাঞ্জাবীর দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটছে ও'। এক পকেটে এখোনো সেই এলাহাবাদ থেকে আসা 'ইণ্ডিয়ান প্রেসের' প্রত্যাখ্যান-পত্র। আর এক পকেটে নতুন ত্রিসিংহ দাগা তাজা দেড়শ' খানা নোট—দেড়শখানা পাখা ঝাপটে ওকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবার মতলব।

কম নয়, একসঙ্গে দেড় হাজার টাকা। মনে হোলো দেড় হাজার বছরের মতই নিশ্চিন্ততায় নৈমিষারণ্যে নির্ব্বিবাদে উড়ে যাবে ও'—পারবে না? নিশ্চিত পারবে। কৃপণের মত, যক্ষের ধনের মত, বক্ষে ধরে বসে থাকবে এই টাকা! এক পাই-পয়সাও এর থেকে খরচ করবে না আর। অর্থের জন্যে যা কষ্ট পেয়েছে এ বার। [ক্রমশঃ।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

ঝড় উঠেছে ভরা-গাঙে, উড়্‌ল ছই।
ঘাটের কাছে ডুবল ডিঙে
আমি শুধু বেঁচে রই!
ও-পারে মোর পরাণ বঁধু
এ-পারে মোর ধান,
হেথায় আমার তানপুরোটা—
হোথায় আমার গান;
দুই কূলেতে ধ'রল ভাঙন
মাঝখানে জল অথৈ-থৈ।

মানস-তরী ভাসিয়ে দেবো
ধর্‌ব আমার হাল
ঝড়-তুফানে বাইব ক'সে
উড়িয়ে রঙীন পাল;
তরী আমার হবে না খানচাল—
আঁধার রাতে সাথে সাথে থাকবে আমার সই।

ঊষার আলো ফুটবে যখন,
পড়বে নদী ঘুমিয়ে তখন,
ভাসবে চখা চোখের জলে—
জানে না সে চখী বই।
এক ডুবেতে ও-পার গিয়ে
ডাকবে আমায় প্রিয়া কই।

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

৩

রূপায়িত কর্ম : ব্রহ্মবিদ্যালয়

কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কর্মের পরিচয়ে আরেকটি আখ্যায় বিশ্ববাসীর নিকট তিনি ক্রমেই স্থায়ীভাবে বরণীয় হবেন,—দিনে দিনে লোক জানবে তাঁকে মহান একজন শিক্ষাবিদ ব'লে। তাঁর এই বিশিষ্ট ভূমিকাতে আবির্ভাবের গোড়ায় সূক্ষ্ম যে সূত্রটি রয়েছে তা আগেই নির্দেশ করা গেছে তাঁর বাল্যকালের নর্ম্যালস্কুলের স্মৃতির আলোচনায়। তাঁর গোটা জীবনের স্তর পরম্পরায় শিক্ষার প্রেরণাটি কিরূপে ক্রমবিকশিত হয়েছে, তার ইতিহাসও কিছু কিছু জানা থাকা প্রয়োজন। তার সাহায্যে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা জিনিসটা কবির কাছে একটা মত (Theory) দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহের উপযোগী গবেষণার বিষয় নয়, এটা তাঁর জীবন-বিকাশের উপযোগী সত্যসাধনার অঙ্গ।—

"শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ রূপ আছে। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম করে প্রকাশ করেছি, সেইটের দ্বারাই প্রমাণিত হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী।" (পথে ও পথের প্রান্তে; পত্র ৮, ১৩২৭) শান্তিনিকেতনের শিক্ষা চর্চার পথ দিয়েই কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োগক্ষেত্রে পৌছান।

কবি ছিলেন বৈষয়িক কাজে লিপ্ত। শিলাইদহে জমিদারি দেখেন। একত্রিশ বছর বয়সের আগে শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁর প্রকাশ্যে আলোচনার উপলক্ষ্য ঘটেনি। সে উপলক্ষ্য দেখা দিল রাজশাহী এসোসিয়েশন থেকে যখন শিক্ষাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ার আহ্বান এল। লিখলেন 'শিক্ষার হেরফের,' সভায় তা পঠিত হল (১২৯৯)।

তখন দেশের কথা ভাবছেন। সেই ভাবনার মধ্যে রাজনীতির বিষয়ও আছে। লিখেছেন 'মন্ত্রী অভিষেকে'র পুস্তিকা (১২৯৭)। ক্রমে কালিদাসের কাব্যপাঠে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী দিনগুলি মনশ্চক্ষে ভাসছে। তপোবনের প্রেরণায় মন ভরপুর। গান অভিনয় এমন কি সামান্য ভাবে চিত্রবিদ্যারও এর আগে থেকে দীক্ষা হয়ে গেছে। সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ ধারার স্পর্শ জীবনের শুরু থেকে তিনি পেয়েছিলেন। পরে এক স্থলে তিনি লিখেছেন, "কেবলমাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয়, সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।" (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, শিক্ষার ধারা ১৩৪৩) অন্যত্র লিখছেন,—"বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুদের সংগীত-সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা।" (বিশ্বভারতী, ১৩২৯) রাজনীতি, সমাজসেবা এবং ধর্মান্দোলনের প্রেরণাও পরিবারের আবহাওয়া থেকে জীবনের প্রারম্ভেই তাঁর পক্ষে সুলভ হয়েছিল। স্বাধীন এক নূতন সমাজ গড়বার সূচনা ১৩০৫ সনের বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের দান। সেদিন থেকে স্বাধীনতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাণী ও কর্মের মধ্যে দিয়ে যা প্রকাশ পেয়ে এসেছে, 'রবীন্দ্র-জীবনী'-কারের ভাষায় তার মোট কথাটি এই যে—"পরাধীনতার কারণ বাহিরে নাই—তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। সাধারণত স্বাধীনতা অর্থে রাজনীতিক স্বাধীনতা বুঝায়; কিন্তু উহা যে মানবের সর্ববিধ স্বাধীনতা বা মুক্তির বিষয়ে প্রযোজ্য, এ কথা সহজে স্বীকৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর জন্য এই সমগ্র স্বাধীনতা চাহেন—কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতায় তিনি তুষ্ট নহেন।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৮)

ঢাকায় সে-সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তাতে গৃহীত একটি প্রস্তাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩০৫) লেখেন—"কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না। আমরা বিবেচনা করি, এই মন্তব্য প্রকাশ ঢাকা প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ গৌরবের কারণ।" কবি তখন থেকেই সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য মানুষের নূতন সমাজকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সুগঠিত করবার প্রয়োজন যে অনুভব করছেন, এই মন্তব্যটি দ্বারা তা সূচিত হচ্ছে। এই সঙ্গে শিক্ষার দিকে দৃষ্টি

পড়ায় আরো কারণ ঘটে। নিজের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কথা হচ্ছে। শিলাইদহে রেখে নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের শিক্ষার আয়োজনে তিনি ব্যাপৃত আছেন। ত্রিপুরার মহারাজা কবির বন্ধু। রাজপুত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও অনুরোধ আসছে সেখান থেকে। সমাজের সাধারণের জন্য একটা-কিছু করার আগ্রহে এবং নিজের ঘরোয়া দায়িত্ব থেকেও বটে,—শিক্ষাকেই কবি মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনগঠনের সুষ্ঠু ক্ষেত্ররূপে বেছে নিলেন। ১৩০৮ সনের থেকে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে কবির শিক্ষাব্রত শুরু হল। তার পরে আজ ১৩৭২ সনে এসে এর ইতিহাসের বাঁকগুলির দিকে যদি ফিরে তাকানো যায়, তবে স্বতই এ কথা মনে হবে,—স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দেশে অনেক রয়েছে যা বয়সে এবং বিষয়ে অনেক প্রাচীন ও অনেক বড়ো। তা সত্ত্বে, এত শীঘ্র এইটুকু প্রতিষ্ঠানের বিশ্বব্যাপী এত প্রসারের কারণ কী। সে কথা ভেবে যখন বিস্ময় লাগে, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির প্রতিই প্রথমত দৃষ্টি পড়বে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্পর্কে "রবীন্দ্রজীবনী"কারের কথাটি আরো সুসংগত মনে হয়। কবির কবিখ্যাতি নয়, সামান্য বিদ্যালয় থেকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার মূলে রয়েছে এই সাধারণ সত্যটি যে, 'ভাবের স্পর্শে রূপ তাহার সামান্যতা বিসর্জন দিয়ে অপরূপ হয়।' (রবীন্দ্রজীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড) কখন্ কোন্ ভাবের স্পর্শে এই রূপান্তর ঘটল, এবারে তা দেখা যাক।

শিক্ষার কাজ হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনের ন্যায় নিরালায় এক কোণে আপনাকে আবদ্ধ করলেন, তখন অন্যান্য অনেকে দেশের নানা কাজের কথা ভাবছেন। কেবল একটা কাজ নিয়ে লেগে থাকার বা এতটা স্বাধীনভাবে নূতন একটা বিষয়ে কলকাতার এত দূরে এসে হস্তক্ষেপ করার সাহস ও ধৈর্য অনেকের মধ্যেই কম ছিল। সুযোগ ও সংস্থতাও হয়তো ঘটে ওঠেনি। তা ছাড়া, 'লেখাপড়া'র ভালোমন্দ নিয়ে মাথাব্যথাই বা ক'জনের ছিল। স্কুলে যাওয়া, বইর নির্দিষ্ট পড়া মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় পাশ করা চাই। তার মধ্যে দেশ আর বিদেশ কী! বরং বিদেশের হালচাল রপ্ত হলে দেশে সম্মান বাড়ে, অর্থেরও সুবিধে হয়। সে-জ্ঞান জীবন গঠনের অল্প কাজে লাগুক আর না-ই লাগুক, মাথা ঠুকে এক বার তা মগজে ভরে রাখতে পারলেই হল। তার প্রয়োগ নিয়ে তত দায় নেই, দাবী আছে অর্জনের। জীবনের সংশ্রব-হীন শুধু জীবিকাসর্বস্ব অনভ্যস্ত বৈদেশিক শিক্ষা ভেসে বেড়ায় দেশের উপরতলায় মুষ্টিমেয় সমাজে, দেশের মানুষের মধ্যে তা ভিত্তি পায় না; জাতিকে উন্নত করবার জন্য যত দিকে যত বড় কল্পনাই থাকুক, কৃত্রিম জ্ঞানের ব্যর্থতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই আগে; সে জন্য জ্ঞানশিক্ষার প্রণালীর পরিবর্তন আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ এই কাজটিই গ্রহণ করলেন। কাজে ব্রতী হওয়ার পর্বের কথাগুলি তাঁর এই—"জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে।"

"আইডিয়া যত বড়ই হউক তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।" কবির শান্তিনিকেতনের কাজ সেই হস্তক্ষেপেরই যে প্রয়াস, তা বলাই বাহুল্য।

চাকুরি-মোক্ষ-করা শিক্ষার দিকে দেশের ঝোঁক, সেদিন তো তা খুবই ছিল,—আজো তা কমেনি। কিন্তু কবির অভিমত এই যে, গতানুগতিক শিক্ষায় "বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।" নানা দিক থেকে নানা কারণেই তিনি প্রচলিত ধারার প্রতি বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন। সে সব কারণের কথা পূর্বেই অনেকটা বলা হয়েছে। নিজে যখন নূতন একটা বিদ্যালয় গড়তে লাগলেন, তখন তাঁর মনে আদর্শ বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে দেখা যায়,—প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার অচ্ছেদ্য যোগে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করবার কথাটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জীবিকার দিকের ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে আছে, কিন্তু তা আছে জীবনকেই কাজের বৈচিত্র্যে ও শক্তির চর্চায় সরস ও পরিপুষ্ট ক'রে। লিখছেন,—

"আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এই রূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র-পরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

...এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই।"

কেন না কবি বলছেন,—"গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম নয়।"

প্রথমত তপোবনের আদর্শেই কবি বিদ্যালয়কে রূপদান করতে উদ্‌বুদ্ধ হন। তিনি বলেন,—"এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে, জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিষ হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্তার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না। মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্ত কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং-রূপে বিরাজ করছেন, তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্তে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্তে তপোবনের প্রয়োজন।" (শান্তিনিকেতন ১, আশ্রম) পরেও কবি আরেক স্থলে লিখছেন এই কথাই,—"বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্তে একদা কিছুকাল ধ'রে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।" (আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা)

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। শেষ-জীবনে কবি নিজেও বলেছেন এবং সে সূত্র ধ'রে অনেকে এখন বলে থাকেন যে, কবির তপোবনের আদর্শটা কেবল প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যগত একটি আদর্শই, ওর ঐ ভাবগত ভিত্তি ছাড়া ঐতিহাসিক ভাবে কোনো কালেই কোথাও ওর কোনো বাস্তব সত্তা ছিল না; কবি নিজেও সেভাবে ওর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু কবির উপরি-উদ্ধৃত বাণী এবং তখনকালের আরো অনেক অনুরূপ রচনাংশ এ বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা জোগায় কি না, তাও বিশেষভাবেই বিচার্য! মনে হওয়া অস্বাভাবিক হবে না, যে, কবি পরে যা-ই বলুন, অন্তত এক কালে তিনি ভারতবর্ষে তপোবনের ঐতিহাসিক অস্তিত্বেও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, এ নিয়ে তাঁর মনে সেদিন কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। বরং "যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া" এই তপোবন কবির ধারণায় সেই 'মিথ্যা' ও 'মায়া'-শ্রেণীর জিনিস ছিল না ব'লেই তিনি বিদ্যালয় স্থাপনে এমন যত্নবান হয়েছিলেন, এরূপ কেহ মনে করলে তা নিতান্ত অমূলক হবে না।

কবির এই উক্তির মধ্যেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এক দিন তপোবনের আদর্শে কাজ আরম্ভ ক'রে থাকলেও কিছুকাল পরে বিদ্যালয়ে অন্য রকম আদর্শের রূপদানের আগ্রহ তাঁর মন অধিকার করে। তবে "সকালে সন্ধ্যায় প্রাচীন তপোবনের কোনো মহৎ বাণী উচ্চারণ"—করার রীতি তখনো ছিল, এখনো আছে।

কিন্তু পরিবর্তন সে তো আরো পরের কথা। তার আগে এই গঠনের প্রথম পর্বে কবি নিজে কি ভাবে বিদ্যালয়ের জন্ত কাজ করেছেন, তার পরিচয়টি পাওয়া দরকার। নিজের কাজের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া।" (বিশ্বভারতী, ১৩২১) ছেলেদের কবি পড়াতেন;—কিন্তু কোথায় ব'সে; তাঁর সেই প্রিয় জায়গাটির কথা ক'জনই বা মনে রেখেছে; তার কোনো পরিচয় আজ সুলভ না হলেও, কোনো চিহ্ন খুঁজে না পেলেও, কবির লেখা থেকেই একটা নাম-মাত্র হদিশ আমরা পেতে পারি। লিখেছেন,—"আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলা।" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—২ পৃঃ ২৪) এ সঙ্গে তাঁর 'গুরুদেব' নামের ইতিহাসটুকুও তাঁর ভাষা থেকেই জেনে রাখা ভালো।—

"তখন উপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারিনে, কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দান স্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখিনে।" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)

কবি যে এখানে আশ্রমের দুর্বহ আর্থিক ভারের উল্লেখ করেছেন, তার জন্ত তাঁর নিজের অনেক অর্থ ও সামর্থ্য জোগাতে হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকেই এ সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে,—

"সমুদ্র-তীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি এক দিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সকল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট।" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ —৩, আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা)

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষেপে দু' কথায় কবি বলেছেন,—"নিম্নতর লক্ষ্য—ব্যবহারিক সুযোগ লাভ। উচ্চতর লক্ষ্য—মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন।—এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি।" (বিশ্বভারতী)

কবি সেই উৎপত্তিকালে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার ক'রেও কোন্ মহাফলের আশায় কী ভাবে এই ডাঙার মধ্যে পড়ে ছেলেদের নিয়ে দিন কাটাতেন তার বিবরণও তাঁর ভাষাতেই বলা যাক,—"আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্ত সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না ব'লে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্ত নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের
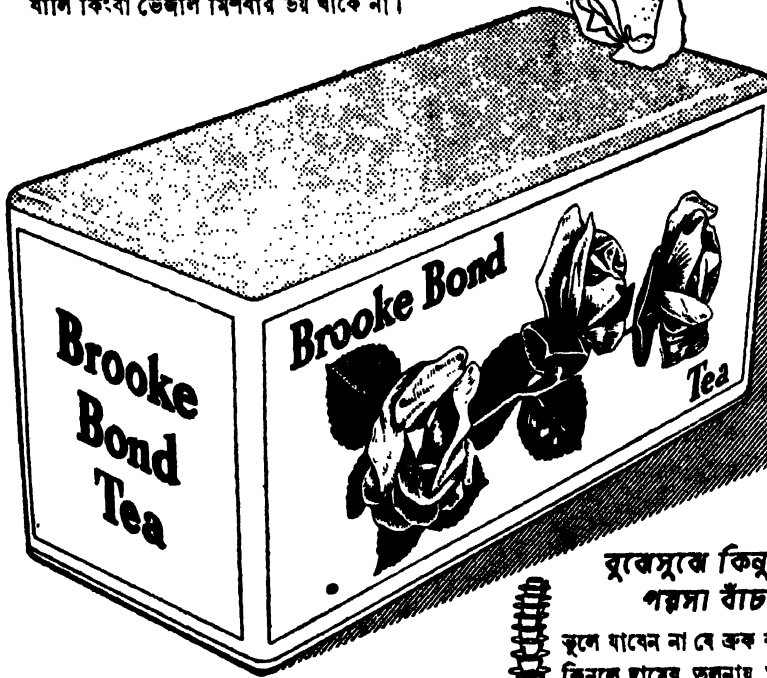
সত্যি সত্যিই তাজা !
কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চটপট্ বিলি করার নিখুঁত ব্যবস্থা থাকায় ব্রুক বণ্ড চা বাগান থেকে সদ্যতোলা চায়ের মত তাজা থাকে।
ষোলআনাই খাঁটি !
মোড়কে পুরে সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে ধুলো-বালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না।
Brooke Bond Tea
Brooke Bond
Tea
বুঝেসুঝে কিনুন ও পয়সা বাঁচান !
ভুলে যাবেন না যে ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন।
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে কেনেন !

জন্ত নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্ত তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি। তাদের সমস্ত সময় পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক, গান তাদের জন্তই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এই সব ব্যবস্থা অন্তত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্ত বিভালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে—অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম—মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়মের দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে—শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশঃ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।" (বিশ্বভারতী, ১৩৪২)

কবি গোড়ার দিকে এ বিভালয়ে এক জন হেডমাষ্টারও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী হন। নানা ছক বেঁধে নিয়ম মানিয়ে ফল আদায় করবেন, এই তাঁর ঝোঁক ছিল। ছাত্রদের মন জানবার আগ্রহ ছিল তাঁর কম। তাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করা তাঁর দ্বারা হয়ে উঠল না। তাঁকে বিদায় দিতে হল। যে-সব শিক্ষক ছাত্রদের ভালোবাসতেন, অথচ লেখাপড়ায়ও সাহায্য করতেন প্রচুর, তাঁদের কবি জানতেন এবং নানা স্থলে সে-সব আদর্শ শিক্ষকের কথা তিনি দরদের সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের এরূপ এক জন শিক্ষাব্রতী ছিলেন স্বর্গত জগদানন্দ রায়। কবি লিখেছেন—"এক জন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার এক বেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে (জগদানন্দ রায়কে) অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি।" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ-২, পৃঃ ২১)

গোড়াকার এই দিনগুলিতে কবি তাঁর বিভালয়ের কাজ বাংলা দেশের সীমা ছাড়িয়ে যাবে বলে ভাবতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন,—"আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে।" (বিশ্বভারতী)

তাঁর মন তখন স্বদেশের হিতচিন্তা ও গৌরবের ধ্যানে নিয়োজিত। আশ্রমের পরিচালনা-প্রণালী নির্দেশ করতে গিয়ে জনৈক শিক্ষককে তিনি লিখলেন,—"স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে মহত্ব ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।"

স্বদেশী যুগ দেখা দিয়েছে। দেশের ছাত্রেরা দেশের ক্ষতিজনক অপমানকর রাষ্ট্র-নির্দেশের প্রতিবাদে বয়কট আন্দোলনে যোগ দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে স্কুল-কলেজ থেকে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ছাত্রদের এই বয়কট আন্দোলন সমর্থন ক'রে বলেন যে, "অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হইতে পারা যায়, ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ সংকটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন বয়স্কেরা ব্যবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা আমোদ-প্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই এইরূপ ঘটে, এবং এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি। বৃদ্ধেরাও বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সহিত বর্তমান আন্দোলনে মাতিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের আবার যদি কোনো বৃদ্ধতর অভিভাবক থাকিতেন, তবে তাঁহারা নিঃসন্দেহেই বলিতেন যে, ইঁহাদের এই কাজ বৃদ্ধোচিত হইতেছে না।

ছাত্রগণ এ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, বিশেষত আমাদের দেশে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃঃ ৬২৪) ছাত্রেরা সাময়িক আন্দোলনে যোগ দিবে কি না এ-সম্বন্ধে তিনি [কবি] তাঁহার পূর্ব প্রকাশিত মতের পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, "ছাত্রজীবনে যদি কাহারও স্বদেশের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচয় না হয়, তবে পঁচিশ বৎসর বয়সের পরে যে তাহা হইবে, ইহা কখনই স্বাভাবিক নহে। দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকরও হইতে পারে না।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী-১২, পৃঃ ৬২৮)

কালক্রমে কবির এ অভিমতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পর্বটি সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রজীবনী'কার লিখেছেন,—'বাঙালীর কাছে সেদিন দেশ সত্যই মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ যে সেই মহাযজ্ঞে শক্তি-মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেশ-মাতৃকার বন্দনা করিয়াছিলেন, এ কথা কবির অস্বীকৃতি বা দেশবাসীর বিস্মৃতি দ্বারা অপ্রমাণিত হইবে না।' (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৮) অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ছাত্রগণ যখন স্কুল-কলেজ বর্জন করে, তখন কবিকে "শিক্ষার মিলন"-এর বাণী প্রচারে ব্যাপৃত দেখা যায়। (১৫ অগষ্ট ১৯২১) এর তিন বছর আগে থেকে কবির কাছে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সহযোগের সাধনাই মুখ্য হয়ে ওঠে; দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের নানা দেশ ও নানা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় সংগ্রহ ও সমবায়ের কাজ গ্রহণ ক'রে কবি 'বিশ্বভারতী' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮)।

তবে সহসা একেবারেই সে পর্যায়ে কাজ পৌঁছায় নাই।

বাংলা-দেশের সীমা পেরিয়ে গিয়ে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রের যোগ ঘটে আগে। নূতন প্রণালীর শিক্ষাকেন্দ্র 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র নাম নানা প্রদেশে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। ১৩২৫ সনে বিদ্যালয়ে গুজরাটী এক দল ছাত্র আসে। তার আগে স্বদেশী আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও মনের ধারণাকে পরিণতি দানে সাহায্য করে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দেশের কল্যাণের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দেখা দিল। আত্মসংগঠনের অভাবও ছিল আত্যন্তিক। পত্রে কবি লিখছেন, "পূর্ব-পশ্চিম রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও এক ক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্ত চিরদিন চেষ্টা করছে—এই তার ধর্ম, এই তার কাজ; অন্তদেশের পলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই, আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে, এই আমার বিশ্বাস—যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয়। তেমনি আমরাও রাখিবন্ধনের গণ্ডি দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই গড়ব এবং অন্তকে বর্জন করব তা চলবে না।...আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব সকলকে নিয়ে এক হব—এবং একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব। বঙ্গ বিভাগের বিরোধ ক্ষেত্রে এই যে, রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে, এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাত রূপে পরিণত হোক।" মানুষে মানুষে অখণ্ড যোগের তত্ত্বটিকে সত্য ভাবে হৃদয়ংগম করতে পারলে তবেই নানা দেশের নানা জাতির মানুষ নানা গণ্ডির মধ্যে থেকেও পরস্পরকে আত্মীয় ব'লে অনুভব করতে পারে। সে ভাব মনে থাকলে, সহযোগের পথ সহজ হয়ে আসে। বিরুদ্ধতা বিচ্ছিন্নতার কারণ কমে যায়। সহ্য ধৈর্য দেখা দিয়ে পারস্পরিক উন্নতিতে সকলের উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। জীবনের সার জিনিষ টিঁকে থাকে মানুষের সংস্কৃতিতে। তারই অনুশীলন দ্বারা সমবায়-প্রবণ নূতন সমাজ সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। আনন্দময় প্রগতির দিন আসবে, সকলের জন্ত সকলের মিলনকে ভিত্তি ক'রে,—তার থেকেই। মানুষের ইতিমূলক এই সংস্কৃতি-সাধনার প্রেরণাটি ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে কবি লাভ করেন। এদেশে নানা কালে নানা জাতির আগমন ও তাদের বিচিত্র দানের সমন্বয়কে তিনি ভাবীযুগের বিশ্বমিলনের ভূমিকা বলে বিধাতৃনির্দিষ্ট বিধানরূপেই গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের এই উপলব্ধি থেকে বিশ্বভারতী স্থাপনের ভূমিকা যেদিন মনের মধ্যে প্রস্তুত হচ্ছে, সেই পর্বে তিনি বলেন,—"ভারতবর্ষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, এবং এক দিন যে কোনো—এক বিশিষ্ট জাতি তাহার সর্বময় কর্তা হইয়া বসিবে তাহাও নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বপ্নের ইতিহাস নহে, তাহা সত্যের ইতিহাস। যে মহান সত্য নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে, ব্যক্তি-বিশেষের বা সমাজবিশেষের কর্তৃত্বলাভের চেষ্টায় মর্যাদা কিছু নাই। ভারতবর্ষকে একটি অপূর্ব পরিপূর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা তাহার একটি উদাহরণ মাত্র একথা যেন মনে রাখি। আমরা যদি দূরে দূরে থাকি বা নিজের স্বাতন্ত্র্যে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে চাই—সে নির্বুদ্ধিতার জন্ত আমরাই দায়ী। আমরা যেটুকু মিলিতে পারিব সেইটুকুই সার্থক হইবে। যেটুকু গণ্ডিবদ্ধ সেটুকু নিরর্থক, এবং তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী।" (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ১৩১৫)

কবির 'মহাভারতবর্ষ গঠনে'র প্রেরণার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে বিশ্বযোগের কথার উদয় হচ্ছে। জ্ঞানের সাধনা সকলকে মেলাবে, তার সূচনা তিনি এদেশে আধুনিক কালেও দেখতে পেয়ে লিখছেন,—

"আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহা সম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতম মনীষিগণ এ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রাণাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন—তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানব মাত্রেই ধন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রও অসীম প্রতিভাবলে বাংলা-সাহিত্যে পশ্চিম এবং পূর্বের মিলন সাধন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করাইয়া, কম সার্থক করিয়া তোলেন নাই।

অতএব আজ আমাদের এই মিলনের সাধনা করিতে হইবে, রাজনৈতিক বললাভের জন্ত নহে, মনুষ্যত্বলাভের জন্ত, স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়া নহে, ধর্মবুদ্ধির মধ্য দিয়া। (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ১৩১৫)

নানা প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্যে তখন এই ভাবের কথাই ছড়িয়ে আছে। এক স্থলে লিখছেন,—"ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং যোগ সাধনা।, ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীর ভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক ক'রে নেবে ব'লে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়,—সাত্ত্বিকভাবে সাধকভাবে। যত দিন তা না ঘটবে তত দিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে।"

কবির চিন্তাধারা ও কাজের পরিকল্পনার প্রগতির মূলে তাঁর পারিবারিক-সূত্রে-প্রাপ্ত উপনিষদের উদার প্রভাবের কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু দেশের ঐতিহ্য এবং বর্তমান ঘটনার প্রভাব ছাড়াও তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও যে একই সঙ্গে ঐ সময়ে তাঁকে নিগূঢ়ভাবে বিশ্বদৃষ্টিলাভে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে কথা জানা যায় তাঁর নিজেরি উক্তিতে। দেশ-কালের ব্যবধান দূর হয়ে গেছে। ঘটনার প্রভাবে বা বিচার-বিবেচনার ফলে বহু দিনে যে-সত্যের ধারণা জন্মেছে, বেদনার মধ্যে তিনি সে-সত্যকে পেয়েছেন কত সহজে। বলেছেন,—

"এখানকার এই বাঙালীর ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে

বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরায় সমস্ত মানব সন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে, সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতি দিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে।" (বিশ্বভারতী, ১৩২৮)

শান্তিনিকেতনের এই ছেলেরা গুরুদেবের আদর্শ ও কর্মধারার তাৎপর্য কতটুকু তখন বুঝেছিল, তার আভাস দেয় তাদের হাতেলেখা পত্রিকার একটি লেখায়—"প্রভাত" নববর্ষ বৈশাখ ১৩২৪ সংখ্যায় (বাগান ?) লিখিত হয়েছে,—

"২৫শে বৈশাখ আমাদের পূজনীয় আশ্রম-আচার্যদেবের জন্মদিন। এ বৎসরে তিনি ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিলেন। * * * কিন্তু গুরুদেবের এত বড় সম্মান লাভের প্রধান কারণ আমাদের মনে হয় এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

* * কিন্তু গুরুদেব শুধু তো কবি না—যদিও অনেকে ব'লন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি—আমার মনে হয় যে গুরুদেব কবি বটে কিন্তু তিনি যে শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়াছেন এ রকম কাজ দেশে আরো হ'লে যথেষ্ট উপকার হয়। স্বদেশীর সময় তিনি শুধু দেশে ভাব দেন নাই, তিনি নূতন নূতন কাজের "প্ল্যান" (Plan) করিয়া নিজের জমিদারীতে খাটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সর্বাপেক্ষা দরকার নিজের জীবনকে গড়িয়া তোলা। তিনি আন্দোলনের গোলমাল ছাড়িয়া আশ্রমে আসিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, দেশের সব চেয়ে বড় কাজ একটি আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা দেশকে বড় করিয়া তুলিবে না।

* * * *

গুরুদেব তাই চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে দেশের ছেলেরা সংস্কারের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া, স্বাধীন মনুষ্যত্বের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।" (শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়, শ্রীসাধনা কর)

১৯১৩ সনে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন। তার আগে থাকতেই শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের বিচিত্র সাধনাকে কার্যত সমন্বিত করবার চেষ্টা শুরু হয়, কবির প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায়। ১৯০১ সনের শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের একটি বিবরণ 'রবীন্দ্র-জীবনী' (২য় সং ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩৩-৩৪) থেকে এখানে সংকলিত হল।

"অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এবার আশ্রমে ফিরিয়া কবি বিদ্যালয়ের নানা প্রকার বিধিব্যবস্থা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। বিদ্যালয় পরিচালনায় নানা প্রকার নিয়ম নিষেধ, অপিস পত্তন, নানা প্রকার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেছেন। লাইব্রেরীর পাশে একটি ঘর ছিল সেইখানে হইল অপিস। তথায় কবি নিয়মিত বসেন, স্কুলের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ-কর্ম দেখেন; এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নলহাটির অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র; অঘোরনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের কর্মকর্তা ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বি· এ· পাশ (১৯০৮) করিবার কয়েক মাস পরে (১৯০১ জানুয়ারি) বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসেন। তিনি আশ্রমের কর্মশালা সর্ব প্রথম সুব্যবস্থিত করেন।" এখানে বলা আবশ্যক, আশ্রমে যে দৈনিক কাজের ক্রমপর্যায় মতো সময় ভাগ ক'রে ঘণ্টা বাজাবার রীতি রয়েছে, এ ব্যবস্থারও প্রচলন করেন এই জ্ঞানেন্দ্রনাথই।"

'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখছেন, "এই সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্ত 'সর্বাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হয়। প্রথম 'সর্বাধ্যক্ষ' হন জগদানন্দ রায়। সর্বাধ্যক্ষ বর্তমানের সচিবের ন্যায় পদ, তবে তিনি অধ্যাপক-মণ্ডলীর দ্বারাই নির্বাচিত হইতেন ও অন্যান্য শিক্ষকদের ন্যায় অধ্যাপনা করিতেন; অপিসের কাজের জন্ত কোনো বিশেষ উপরি-বেতন তিনি পাইতেন না। এ ছাড়া ছাত্র পরিচালনার জন্ত তিনটি বিভাগ—আদ্য, মধ্য ও শিশু পৃথক করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের জন্ত এক-একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতেন। শিক্ষাদি ব্যাপার সর্বাধ্যক্ষ সাধারণভাবে দেখা-শুনা করিতেন। তবে আসল ভার থাকিত বিষয়ের পরিচালকদের উপর। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ইতিহাস, ও বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক পরিচালক ছিলেন; তাঁহাদের কাজ ছিল নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যেক ছাত্রের পাঠোন্নতি লক্ষ্য রাখা। ইহারা মাসান্তে প্রত্যেক অধ্যাপকের নিকট হইতে তাহাদের নিজ নিজ বর্গের পাঠচর্চা, প্রত্যেক ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির বিস্তারিত সংবাদ, মাসিক বা সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ আকারে আদায় করিতেন। সেই প্রতিবেদন অথবা তাহাদের এই সব রিপোর্ট আলোচিত হইত। এখানে একটি কথা বলা দরকার। তখনো বিদ্যালয়ে শ্রেণী বা Class-প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই—বর্গ (Group) প্রথা ছিল। বর্গের নামকরণ করা হইত—ছাত্রদের নাম দিয়া যেমন 'অমিতাভ বর্গ।" এখানে দেখা যাচ্ছে, কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের মর্যাদা রক্ষা করতে বিশেষ ভাবে যত্নবান ছিলেন। আরো নানা ব্যবস্থায় সে কথা সুস্পষ্ট করে জানা যায়,—'আশ্রমসম্মিলনী'র কার্যপ্রণালী তার অন্যতম নিদর্শন।

'রবীন্দ্র-জীবনী'তে রয়েছে, "এই বর্গ-প্রথার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সকল ছাত্র সকল বিষয়ে একই বর্গে না-ও পড়িতে পারিত। কোনো ছাত্র বাংলায় ভালো বলিয়া এক বর্গে পড়ে, কিন্তু ইংরেজিতে কাঁচা বলিয়া ইংরেজি পড়ে অন্য বর্গে। ম্যাট্রিকের শেষ দুই বৎসর কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়ানো হইত। বিদ্যালয়ে কখনো বাজারের পাঠ্য-পুস্তক পড়ানো রীতি ছিল না। Murche Science Readers, Highroads of History, Highroads of Literature, Britain and her neighbours প্রভৃতি শ্রেণীর বই নির্বাচন করা হইত ইংরেজির জন্ত। উপরের ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্য অজিতকুমার পড়াইতেন। তখন সংস্কৃত পড়াইতেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন; বিজ্ঞানাগারে রীতিমতো পরীক্ষা দেখাইয়া বিজ্ঞান

পড়াইতেন জগদানন্দ রায়। সন্ধ্যার পর বিরাট এক টেলিস্কোপের সাহায্যে মাঝে মাঝে আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখানো হইত। সন্ধ্যার পর প্রথম দুই বর্গের ছাত্রদের ছাড়া অন্যদের জন্য নিয়মিত 'বিনোদন' পর্ব বসিত; এই সব সময়ে অধ্যাপকেরা সাহিত্যের গল্প ছাত্রদের জন্য মনোরম করিয়া বলিতেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে ছিল। ছাত্রদের সাহিত্যসভা হইত মঙ্গলবারে সন্ধ্যার পর—সাহিত্য, ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ পঠিত হইত। গান বা নৃত্যে সভাগুলি তখনো ভারাক্রান্ত হয় নাই।

"ছাত্রদের ব্যক্তিগত পড়াশুনার উপর যেমন নজর দেওয়া হইত, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। বুধবারে মন্দিরের পর ছাত্ররা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে হাসপাতালে যাইত। সেখানে প্রত্যেক ছাত্রের ওজন লওয়া হইত ও পাকা খাতায় লেখা হইত। দুই সপ্তাহ পর পর কাহারও ওজন কমিলে তখনই তদারক শুরু হইত। সকল ছাত্রের পক্ষে প্রাতে স্নান ও ব্যায়াম ও বৈকালে ক্রীড়া আবশ্যক ছিল। এ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের ছাত্ররা পালা করিয়া বাগানের কাজ করিত। এই বাগানের কাজে উৎসাহী ছিলেন সত্যজ্ঞান ভট্টাচার্য নামে একজন শিক্ষক। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরাতন হাসপাতালের সম্মুখ দিয়া যে একটি রাস্তার চিহ্ন আছে, উহার নাম দেওয়া হয় সত্যজ্ঞান পথ। সন্তোষচন্দ্র আমেরিকা হইতে আসিয়া আশ্রমের কাজে যোগদান করিবার পর হইতে ছাত্রদের মধ্যে ড্রিল প্রবর্তিত হয়। সেই mass drill একটা দেখিবার জিনিস ছিল; মাঝে মাঝে তাহাদের দিয়া fire drill করানো হইত। আমেরিকায় শেখা yell তিনি ছাত্রদের শেখান; দুই শত ছাত্রের সমবেত চীৎকার রীতিমত কম্প সৃষ্টি করিত।

"রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত কাজের খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নিয়মাবলী তৈয়ারি করিয়া দিতেন। তবে এই শ্রেণীর কাজ কবির পক্ষে দীর্ঘকাল করা সম্ভব ছিল না, তিনি কর্মান্তরে মনোনিবেশ করিলে অথবা স্থানান্তরে গমন করিলেই কর্মের সমস্ত সুর নামিয়া পড়িত—নিয়ম পালনের দিকে হয়তো নিষ্ঠা থাকিত, কিন্তু প্রাণ চলিয়া যাইত; চারিদিকে স্বাভাবিক শৈথিল্য নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিত।"

'রবীন্দ্র-জীবনী'কারের এই মন্তব্য থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যালয়ের জীবনীশক্তির সঞ্চালক। দেশের অন্যান্য স্থানের দশটা প্রতিষ্ঠানের মতো সাধারণ শৈথিল্য নিয়েও এবং আকারে এত ক্ষুদ্র হয়েও, কবির সাক্ষাৎ সান্নিধ্য, ভাবের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ এবং বিচিত্র কর্মধারা প্রবর্তনের বৈশিষ্ট্যের গুণেই যে এত শীঘ্র এ প্রতিষ্ঠানটি প্রসার লাভ করল, সে কথা অমূলক নয়। এরূপ মহৎ ভাব ও কর্মকৌশল-প্রবর্তনার একটি ঘটনা যা এ সময়ে ঘটেছিল, 'রবীন্দ্র-জীবনী'কারের বর্ণনায় অতঃপর তারি উল্লেখ মিলে। তিনি লিখেছেন, কবি "বিদ্যালয়ের কর্মব্যবস্থায় যেমন পরিবর্তন আনিলেন, আশ্রমের পরম্পরাগত আদর্শের মধ্যে কিছু কিছু অভিনবত্ব প্রবর্তন করিলেন। এবার পৌষ-উৎসবে 'বড়দিন' খৃষ্টোৎসব হইল; কবি স্বয়ং মন্দিরে উপাসনা করিলেন। অনেকের ধারণা যে, এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবের আগমনের ফলে আশ্রমের এই উদার পন্থা অবলম্বিত হয়, তাহা যথার্থ নহে। এই সময়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'খৃষ্ট' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় খৃষ্ট-জীবনের মূলগত কথাটি বলেন। এই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উপলক্ষ্যেও মন্দিরে কবি ভাষণ দান করেন। এই বৎসর হইতে স্থির হয় যে, অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণকে উপযুক্ত দিনে বা তিথিতে স্মরণ করা হইবে। এতদিন শান্তিনিকেতন মন্দিরে আদি সমাজীয় পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনাদি চলিয়া আসিতেছে, ঔপনিষদ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের বিশেষ আলোচনা হয় নাই। এইবার বিশ্বমানবের বিচিত্র সাধনাকে কবি আশ্রমে স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সব তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ও সামাজিক মতের ক্রম-অভিব্যক্তির পরিচায়ক।" শুধু তাই নয়, এটি যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের থেকে বিশ্বভারতীতে অভিব্যক্তির উপযোগী সাংস্কৃতিক যোগের সূচনারও পরিচায়ক, এতে সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উৎকর্ষজ্ঞাপক এরূপ বৈশিষ্ট্য অন্য দিক দিয়েও অনেক কিছু রয়েছে। সাধারণ খেলাধূলা, নৃত্য-গীত ও নাট্যাভিনয় এবং ঋতু-উৎসবাদির মধ্য দিয়া শিক্ষাকে একই কালে সৌন্দর্য, সংযম ও স্বাধীনতায় মিলিয়ে কি ভাবে আনন্দময় করে তোলা যায়, তারও পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই শিক্ষাকেন্দ্রে থেকেই। এ বিষয়ে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন,—"রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের মূলতত্ত্ব হইতেছে স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মোচন—বিদ্যায়তন সেই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্র মাত্র। কবির মতে স্বাধীনতা নিয়মহীনতা নহে। সংযমও নিরানন্দময় নীতি পালন নহে; আনন্দহীন সংযম ও বিচার-বিহীন আচার পালন নঞাত্মক গুণ মাত্র, তাহার দ্বারা বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবে না।

এই কারণে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নাট্য ও ক্রীড়ার স্থান এত ব্যাপক। এই উভয় ক্ষেত্রে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে সমষ্টির সহিত এক-যোগে, সংহত আবেগে কার্য করিতে হয়। স্বাধীনতার আনন্দময় রূপটি এইভাবেই প্রকাশ পায়। খেলা ও কাজ কঠোর নিয়ম সংযমের মধ্যে সফল ও সুন্দর হয় বলিয়া আনন্দ কখনো উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসে পরিণত হইতে পারে না।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ১৭০-৭১)।

মনের 'আবরণ' ঘুচানোর সাধনা আরেকভাবে কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা হয়েছে পঠন পাঠনের দিকে। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার সে বিষয়ে লিখেছেন, "আমাদের দেহকে যেমন বৃথা আবরণে অকারণে আচ্ছাদিত করাটা সমাজের পক্ষে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি বালকদের মনের উপর অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সংবাদ পুঞ্জীভূত করিয়া তাহাকে সভ্য বলিয়া অভিহিত করার চেষ্টায় ফল আরো মারাত্মক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন শিক্ষা আন্দোলনের দিনে এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, বই পড়াটাই যে শিক্ষা, ছেলেদের মনে এই কুসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে। পুরাকালে গুরু শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের একটি বড়ো কথা হইতেছে

এই মনের আবরণ ঘুচানোর সাধনা।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ: ১৫১)

আজকের বুনিয়াদী শিক্ষারও অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মনের আবরণ ঘুচানো।' পুঁথির শিক্ষা কমিয়ে শিক্ষক যথাসম্ভব মৌখিক আলাপ-আলোচনায় দ্বারাই শিক্ষার্থীকে জ্ঞান বিতরণ ক'রে থাকেন। কবি এ প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্তন ক'রে শান্তিনিকেতনকে এ দেশে বহু পূর্বে আদর্শ করে রেখেছেন।

পরবর্তীকালে যখন 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হয়ে শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়ে উভয়শ্রেণীর জন্যেই সহশিক্ষা শুরু হল, তখনকার একখানি পত্রে কবির শিক্ষাপদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সন্দেহ ও শাসনের চেয়ে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করাই শ্রেয়।—এই ছিল তাঁর নীতি। তিনি লিখেছেন,—"আমাদের স্বভাবের মধ্যে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, এ কথা বলা অত্যুক্তি, কিন্তু তাকে নিয়ে বাইরে থেকে যত অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি করতে যায় ততই সেটা ব্যাধিতে এসে দাঁড়াবে। এই সংশয়কে অগ্রাহ্য করার দ্বারাই এ'কে বিনাশ করা যায়। পরস্পরকে বিশ্বাস করার দ্বারাই সমাজের হাওয়া নির্মল হয়।···যাকে বিশ্বাস করিনে, সে বিশ্বাসের অযোগ্য হয়; যতই অযোগ্য হয়, ততই বাঁধন আরো কড়াক্কড় করতে হয়। মানবচরিত্রের স্খলন প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই আছে, ভিতরে তার উত্তেজনা আরো বেশি। বস্তুত আচারের দ্বারা মানুষের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না, বরঞ্চ তার বাড়াবাড়িতে চরিত্রের মূলে দুর্বলতা ও নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে। ভিতরের মানুষের পরেই দাবি রাখতে হবে, দারোয়ানের পরে নয়।···সংশয়-কণ্টকিত বেড়ার বাহুল্য করতে গেলেই ভিতরে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে পশুর কোঠায় ফেলা হয়। আমি মেয়েদের স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি; এই জন্য তাদের আমি সন্দেহের কারাকুঠরির মধ্যে পৃথক রাখতে দেখলে ব্যথা পাই।··· সংশয়ের চেয়ে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাই বেশি কাজে লাগে। এই কাজে চাই চিরসহিষ্ণু অনুকম্পা।" (প্রবাসী ১৩৩১ অগ্রহায়ণ)

শান্তিনিকেতনের কর্মীদের পরিচালনা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সহনশীল দৃষ্টি-ভঙ্গীর উদারতার পরিচয় মেলে একখানি পত্রে। সাময়িক ঘটনার ক্ষোভের ছায়াপাত এতে যে কিছু না পড়েছে এমন নয়, তবু ধরে নেওয়া চলে, মোটামুটি তাঁর মনোভাবটি ছিল এই রকমই। তিনি এক সময়ে পিয়ার্সনকে লিখছেন,—

"In Santiniketan, some of my thoughts have become clogged by accumulations of dead matter." "I do not believe in lecturing or in compelling felloworkers in coercion; for all true ideas must work themselves out through freedom. Only a moral tyrant can think that he has dreadfull power to make his thoughts prevail by means of subjection. It is absurd to imagine that you must create slaves in order to make your ideas free. I would rather see them perish than leave them in the charge of slaves to be nourished. There are men who make idols of their ideas, and sacrifice humanity before their alters. But in my worship of the idea I am not a worship of Kali.

So the only course left open to me, when my felloworkers fall in love with the form and cease to have complete faith in the idea, is to go away and give my idea a new birth and create new possibilities for it. This may not b a practical method, but possibly it is the right one."

—রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ: ৩১৮।

এই সমস্ত বহু আরো উদার ভাব ও কর্মধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার দান-সৌধ বিশ্বভারতী বা বিদ্যা-সমবায় সাধনা। সকল দেশের সংস্কৃতিকে তিনি যে এনে মেলাবেন, তার ভূমিকায় আরো কয়েকটি ঘটনার যোগ উল্লেখযোগ্য।

[ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মনোদা দেবী

রাত্রিতে প্রবল বেগে জ্বর আসিল, সে জ্বরে ৩।৪ দিন ভুগিয়া ভাল হইয়া গেলাম ও পরে শুনিলাম, কাঙ্গাইলা ভাইকে সবাই মন্দ বলিয়াছিল, কেন আমাকে গাছের নীচে যাইতে দিয়াছিল। কিন্তু সে দোষ ত আমারই সম্পূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

এই নূতন বাসায় ফুলগাছ ছাড়াও অনেক রকম ফুল ও ফলের গাছ ছিল। এই বাসায় ঢুকিতেই একটি খুব উচ্চ বড় গেইটের ভিতর দিয়া সরু এক ছোট গলি পার হইতে হইত। ইস্কুলের গাড়ী বড় রাস্তায় ঐ বড় গেইটের সামনেই আসিয়া দাঁড়াইয়া যাইত—আমাদের বাসা হইতে মাত্র কয়েক পা ব্যবধানে; আমাদের তাহাতে কোন অসুবিধাই হইত না। আমাদের বাংলার শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুতা মনোরমা মজুমদার (ভবিষ্যত জীবনে ডাঃ নীলরতন সরকারের শ্বশ্রূমাতা ও তটিনী গুপ্তার মাতামহী) খুব শান্তপ্রকৃতি ও স্নেহশীলা ছিলেন, তিনি আমাদের খুব স্নেহ করিতেন। তাঁর এক মেয়ে ঊর্ম্মিলা আমার সঙ্গে একই ক্লাশে পড়িত; ক্রমে সে আমার পরম বন্ধু হইয়া গেল। গেণ্ডেরিয়ার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক মেয়ে চারুও আমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড ছিল, (ভবিষ্যত জীবনে চারুর সুবিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল) চারু ও ঊর্ম্মিলা উভয়েই আমাপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিল, সবাই আমাকে খুব ভালবাসিত। বহু যুগ যুগান্তর পরে এক বার ঊর্ম্মিলার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হইয়াছিল, পত্রের আদান-প্রদান বহুকাল চলিয়াছিল। চারুর সঙ্গে স্কুল ছাড়ার পরে আর দেখা-শুনা হয় নাই। এক বার বহুকাল পরে কলিকাতায় মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। সে সময় চারু আমার কথা নাকি খুব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল, অর্থাৎ সেই স্কুল-জীবনের বন্ধুত্বকে তখনও মনে রাখিয়াছিল।

স্কুলে পড়া-শুনা ভালই চালাইয়া যাইতেছিলাম, ক্লাশে প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম বা দ্বিতীয় থাকিতাম এবং বৎসরান্তে ১ম প্রাইজ লইয়া বাড়ী ফিরিতাম। ঊর্ম্মিলা ও আমি একটু সহজ সরল অর্থাৎ যাকে বলে হাবা-গোবা। চারু ছিল খুব স্মার্ট মেয়ে। কিন্তু পড়া-শুনায়, খেলা-ধূলায় ও গায়ের জোরে আমি ছিলাম ক্লাশের প্রথম ছাত্রী। ইস্কুলের গাড়ী সূত্রাপুরে লোহার পুলের এপারে দাঁড়াইত, ঝি আসিয়া যাইয়া গেণ্ডেরিয়ার বাড়ী হইতে চারুকে নিয়া আসিত। তখনকার গেণ্ডেরিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান গেণ্ডেরিয়ার তুলনা করা অসম্ভব। তখন 'গেণ্ডারী' বনে নানা জীব-জন্তুতে গ্রামখানা ভয়াবহ বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না। গেণ্ডারী বনের মধ্য দিয়া অতি সরু একটি পায়ে হাঁটার পথ ছিল, সেই পথ বহিয়া ঝি যাইয়া চারুকে লইয়া গাড়ীতে আসিত। আমি কিন্তু শত নিষেধ সত্ত্বেও ঝির সঙ্গ ধরিয়া চারুর বাড়ীতে উপস্থিত! চারুকে লইয়া গাড়ীতে ফিরিতাম। ইক্ষুপাতার তীক্ষ্ণ ধারে অনেক সময় হাত-পা ছড়িয়া যাইত এবং রক্ত বাহির হইত; কিন্তু আমার তবু যাওয়ার উৎসাহ কমিত না। ঊর্ম্মিলাও মাঝে মাঝে যাইত, কিন্তু কাপড়-জামা ও গায়ের অবস্থা শোচনীয় হয় বলিয়া তার মা তাকে বারণ করিতেন, অবশ্য আমাকেও তিনি বারণ করিতেন। কিন্তু আমি ছিলাম অতি উৎসাহী, তাঁহার নিষেধ আমি মানিতাম না। আমার কেন জানি ইক্ষু-বন দলিত করিয়া সরু ঐ পথটি বহিয়া যাওয়ার অতি উৎসাহ ছিল।

একদিনের একটি ঘটনা আজও বেশ স্মরণে জাগিয়া রহিয়াছে। চারুর বাবা শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবু তাঁর ঘরের বারেণ্ডায় একখানা চৌকীর উপর এক ধারে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছেন, ঘরখানা ছিল হোগ্‌লা পাতার বেড়া ও চাল ছিল 'মাইলা' নামক একরূপ বন তাহা দিয়া ছাওয়া। ঘরের বারেণ্ডায় উঠিতে গেলে মাথা খুব নীচু করিয়া তবে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে পারা যায়। তখনকার দিনে ঘরের রূপ এরূপই ছিল সাধারণ লোকদের। ভিত মাটির, তাহাও খুব নীচু নীচু। এক দিন চারুর বড় দাদা সীতাকান্ত হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই ঘরের ঝাপনা-ওয়ালা দরজা খানাকে এক নিদারুণ পদাঘাত করিল। উদ্দেশ্য ছিল ঘরে প্রবেশ করিবে, দরজা খানা প্রবল বেগে আপত্তি জানাইয়া সীতাকান্তের কপালে সজোরে আঘাত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। ব্যথা পাইয়া সীতাকান্ত রাগিয়া আরো দুর্দ্দান্ত জোরে সেই রুদ্ধ ঝাঁপের দরজা খানাকে পদাঘাত করা মাত্রেই পূর্ব্বের অভিনয়। অর্থাৎ ঝাঁপের দরজা খানা অতি বেগে আসিয়াই সীতাকান্তের কপালে দারুণ আঘাত করিল। এবার কিন্তু সীতাকান্তের ক্রোধটা সীমার বাহিরেই চলিয়া গিয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ দুর্দ্দান্ত এক লাথী মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপের দরজা খানা স্থানচ্যুত হইয়া মোটা একটি বাঁশের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িল সীতাকান্তের মাথার উপরে—ইহাতে সীতাকান্তের মাথার কিয়দংশ কাটিয়া যাইয়া খুব রক্ত পড়িতে লাগিল।

এত সব ঘটনার মধ্যে নবকান্ত বাবু নীরবে দ্রষ্টারূপে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পরে অতি ধীর স্থির কণ্ঠে পুত্রকে বলিলেন, "ভাখ, যে যেমন ব্যবহার করে, সে সেইরূপ ব্যবহারই প্রতিদানে পায়। তুই দরজাখানাকে ধীরে-সুস্থে খুলিয়া ঘরে ঢুকিলে আজ তোর এই দুর্দ্দশা ভুগিতে হইত না এবং ঘরের দরজাখানাও নষ্ট হইত না।" এই ঘটনাটি ঘটিয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। যত দূর মনে পড়ে সীতাকান্তের বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। চারু একটু বিমনা হইয়া গেল, অন্য লোকে তার দাদার স্বভাবখানার পরিচয় পাইয়া গেল এই বলিয়া। এদিকে ঝি ত' আর ঐ ব্যাপারের জন্য বেশী বিলম্ব করিতে পারিবে না, চারু তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে চলিয়া আসিল ও গাড়ীতে ক্ষুণ্ণ মনে

বসিয়া রহিল। শুনিয়াছি সীতানাথের ঐরূপ অকাণ্ড-কুকাণ্ড করার খুবই অভ্যাস ছিল এবং ছেলের মধ্যে তার সুনাম ছিল না। পরবর্ত্তী জীবন তার কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল সে খবর আমরা জানি নাই; তবে নবকান্ত বাবুর অন্ত ছেলে ঐরূপ ঝোপের ঘরের বদলে অতি সুন্দর ফল ও ফুলের বাগানসহ সুরম্য দালান-কোঠাওয়ালা বাড়ী করিয়াছিল। উত্তর জীবনে নবকান্ত বাবু সে সব দেখিয়া গিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না।

আর একটি কথা খুব মনে পড়ে যেখানে আমাদের ইডেনের গাড়ীখানা লোহার পোলের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিত—তার এপাশে-ওপাশে নিঃস্ব অবাঙ্গালী মুসলমানদের বস্তি ছিল; সূত্রাপুরের থানাটি একটু দূরে হয়ত ক্ষীণ ভাবেই ছিল, বর্ত্তমানের অনুরূপ কিছুই ছিল না। সে আজ ৬৫।৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গাড়ীখানা লোহার পোলের নীচে দাঁড়াইতেই প্রতি দিন এক বৃদ্ধাকে তার ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া খুব ছোট ছোট চিংড়ি মাছ কুটিতে দেখিতে পাইতাম। তখনকার দিনে এক আধ পয়সায় ঐ মাছ নাকি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত বলিয়া সকলেই বলাবলি করিত। বৃদ্ধা বেচারী প্রায় প্রতি দিনই আমাদের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিত 'আমি মাছ পকাই তোমরা খাউঙ্গে' ইত্যাদি, আমরা ত ছোটর দল হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া যাইতাম। কিন্তু বৃদ্ধার হয়ত মনে হইত তার এই প্রতি দিনের নিমন্ত্রণটা এক দিনও রক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব ছিল তাহা বৃদ্ধার মনের মধ্যে একেবারেই স্থান পাইত না, তাই বৃদ্ধা সকাতরে প্রতি দিনই তার একান্ত প্রাণের নিমন্ত্রণের নিবেদনটি জানাইয়া যাইতেই থাকিত। মনোরমা শিক্ষয়িত্রীর বাসা ছিল আমাদের বাসার অতি নিকটে, মাঝে মাঝে বই হাতে করিয়া যথা সময়ে আমি তাঁদের বাসায় চলিয়া যাইতাম। উর্ম্মিলা ও শিক্ষয়িত্রীর সহিত ওখান হইতেই ইডেনের গাড়ীতে স্কুলে চলিয়া যাইতাম। এক দিন দেখিতে পাইলাম একটি যুবক খাইতে বসিয়াছে, বিমলা দিদি অর্থাৎ উর্ম্মিলার মেজদিদি পরিবেশন করিতেছে ও নানারূপ গল্প-গুজব হাসি-তামাসা করিতেছে। শিক্ষয়িত্রীর আর ত বিলম্ব করা চলে না। তাড়াতাড়ি বিমলা দিদিকে যাহা যাহা বলার ভাল ভাবে উপদেশ দিয়া হাত-মুখ ধুইয়া গাড়ীর দিকে চলিলেন। উর্ম্মিলার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা বোন নির্ম্মলা দিদি যেন লজ্জায় জড়সড় হইয়া এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করিতেছে দেখিতে পাইলাম। যুবকের খাওয়ার সামনে চিংড়ি মাছ ও আলু দিয়া এক বাটি ঝোল ও এক বাটি ডাইল পরিবেশন করা হইয়াছে, আরো কিছু ছিল কি না তাহার খবরের আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই উর্ম্মিলাকে ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেই উর্ম্মিলা বলিল, ঐ ছেলেটির নাম নীলরতন সরকার, সম্প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষায় খুব কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে এবং ঐ ছেলেটির সঙ্গে নির্ম্মলা দিদির বিবাহ হইবে, নিশ্চয় হইয়াছে। মেয়ে দেখিতে ও অন্যান্য কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে নীলরতন সরকার নিজেই আসিয়াছেন। নির্ম্মলা দিদির বয়স তখন ১৬,১৭ হইতে পারে, দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলা যায়। যেমন রং তেমন গড়ন ও মুখখানা ছবির মত সুন্দর ছিল। ঈষৎ কোঁকড়ান একরাশ কালো চুল, এ সমস্ত মিলাইয়া নির্ম্মলা দিদি একটি পদ্মিনী নামের যোগ্যতা বহন করিয়া চলিয়াছিল। ঐ নীলরতন সরকারই তাঁর ভবিষ্যত জীবনে ডাঃ নীলরতন সরকার নামে আখ্যাত হইয়া কত শত শত লোককে নিরাময়ের দিকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইডেন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বরিশালের সঙ্গীদের অভাব যেন ঘুচিয়া গেল এবং নূতন এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া খুব আনন্দের মধ্য দিয়াই আমাদের দিনগুলি যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় দাদামহাশয়ের মাসিক ভাড়া করা (মফঃস্বলে যাওয়ার) গ্রিনবোটে চড়িয়া আমরা ছোটরা বুড়ী-গঙ্গায় সানাতে আনন্দে ঘুড়িয়া বেড়াইতাম ও এর পরে প্যাদা বা চাপরাশিদের সঙ্গে আমরা যথা সময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। এখন আর সেই একা একা জাহাজে ভ্রমণের অনুযোগ শুনিতে হইত না, কারণ আমরা সব ছোটর দলেরা সবাই মিলিয়াই বোটে চড়িয়া বেড়াইতাম। বরিশালে ছিল বহু পাড়ার দল লইয়া বন্ধুত্ব আর ঢাকায় গণ্ডীবদ্ধ বাড়ী ও শুধু বাড়ীর লোকের সঙ্গেই যত কিছু দহরম-মহরম হৈ-হল্লা চলিত। ঠাকুর-খুড়ার মফঃস্বলে যাওয়ার গ্রীনবোট খানাও সাজান-গুছান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। দাদামহাশয়ের বোট খানা খুব বড় ছিল, কিন্তু অনাবশ্যক আসবাব পত্র বেশী ছিল না। কিন্তু ঠাকুর খুড়ার বোট খানা খুব বেশী বেশী আসবাব পত্রে সাজান থাকিত। আমরা সময় সময় অদল-বদল করিয়াও ঠাকুর-খুড়ার বোটে চড়িয়া বেড়াইতাম।

এক দিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, দিদিমা আমাকে ও ছোট কাকাকে লইয়া গ্রামের বাড়ীতে (সোনারং) নূতন দালান উঠিতেছে তাহা দেখিতে যাইবেন। আমাদের ত মহা আনন্দ, মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে নৌকাখানা আসিয়া বাড়ীর ঘাটে পৌঁছামাত্র বাড়ীতে মস্তবড় হৈ-চৈ লাগিয়া গেল। নৌকা হইতে বাড়ীতে পৌঁছামাত্র দৃশ্য দেখিয়া আমার ত চক্ষু স্থির হইয়া গেল! কি যে এক অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সেই যে অতি বড় ঘরখানা বহু কোঠা ও বারেণ্ডা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এই ঘরেই ত দিদি ও কাঙ্গাইলা ভাইর বিবাহ, মহা আনন্দ সবই যেন চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। খুব বড় দালান উঠিতেছে সুতরাং ঘর-দুয়ারের বহুবিধ অদল-বদল হইয়া গিয়াছে, আমাদের ছোটদের ত এসব কিছুই জানা ছিল না,—ঐ সব পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনটা যেন একেবারেই মুসরিয়া গেল। ৩৬ খানা ঘরের মণ্ডিত বাড়ীর এইকি শ্রী হইল! দালান উঠিতেছে—লম্বা লম্বা বাঁশ গাড়া হইয়াছে, তার উপরে মাচাং বাঁধিয়া অসংখ্য রাজ-মজুর ইট-শুরকী লইয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে রস পাইলাম না কিছুই আমি। আরো একটা অদ্ভুত দেখিলাম—খুব একটা লম্বা বাঁশ পুতিয়াছে ও তার মাথায় এক খানা ভাঙ্গা ঝুড়ি, একখানা ছেঁড়া জুতা ও একটি ভাঙ্গা পিঁড়া সগৌরবে ঝুলিতেছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আর কিছুই কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না—কেবল দেখিয়া চলিলাম মাত্র।

এক দিন সকাল বেলা হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দিদিমার কান্নার শব্দ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া দিদিমার কাছে ছুটিয়া গেলাম, যাইয়া

দেখি তিনি বাবার নাম ধরিয়া নানারূপ বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছেন। এবার বাড়ীতে আসিবার পথে লোকজনকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন প্রকারেও কেহ 'শ্যামপুর' নাম উচ্চারণ না করে, সে বিষয়ে নৌকার লোকজনরাও খুব সতর্ক ছিল তবে কেন দিদিমা এ ভাবে আকুলি ব্যাকুলি হইয়া কান্নাকাটি করিতেছেন, তাহা আমি কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরে বুঝিতে পারিলাম, এই যে এত বড় দালান বাড়ী হইতেছে, এখন দিদিমার সেই সুযোগ্য পুত্র কোথায় রহিল, এই গভীর শোকে মাতৃহৃদয়ের চির জীবনের সাথী ও এই শোক-দুঃখ বিরামবিহীন। ৫।৭ দিন পরেই দিদিমা আমাকে ও ছোট কাকাকে লইয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাসায় আসিয়া চুপি চুপি মাকে বলিলাম—মা বাড়ীখানা খুবই খারাপ হইয়া গেল! এত বড় ঘর ও কত কত দরজা-দুয়ার সবই ত নষ্ট হইয়া গেল। মা পরে ধীরে সুস্থে আমাকে একে একে সব বুঝাইতে লাগিলেন এবং সেই ভাঙ্গাঝুড়ির, ছেঁড়া জুতা, ভাঙ্গাঝাঁটার ব্যাখ্যাও ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন। বলিলেন, উহা রাজমজুরদের একটা বিশ্বাস এই যে, ঐরূপ একটা পোঁতা থাকিলে তাহারা কাজ করিবার সময় উঁচু হইতে পড়িয়া যাইবে না, দালান শেষ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা নামাইয়া ফেলিবে। দালান দেখিয়া তোমার এখন ভাল লাগে না, কিন্তু সম্পূর্ণ হইয়া গেলে দেখিবে কত সুন্দর ও কত ভাল লাগিবে। মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য, মনের সকল গ্লানি যেন ধুইয়া-মুছিয়া গেল। ইহার পরে এক বৎসর বাদে দালানের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় দাদামহাশয় কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়া গৃহে-প্রবেশের দিন ধার্য্য করিয়া বাসার সকলকে লইয়া বাড়ীতে যাত্রা করিলেন ও ছেলে-মেয়ে আত্মীয়স্বজন সকলকেই উপস্থিত থাকিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। বাড়ীতে উঠিয়াই দেখি এ কি! এই যে সেই বুড়ি গঙ্গার পাড়ে—"নর্থ ব্রুক হল!" ব-ি.য়া কতই আনন্দে তার আসে-পাশে ঘুরিয়া বাগানের মালী হইতে কত গোলাপ ফুলের, পাতাবাহারের তোড়া সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিতাম। এই যে সে রকম রংরূপ ধরিয়া আমাদের বাড়ীখানা সাজিয়া রহিয়াছে, তখন ভাবিলাম মা'ত সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। এখন বাড়ীখানা কত সুন্দর দেখাইতেছে, এখন আর সেই বড় ঘরখানার দুঃখ আমার রইল না। ক্রমে দেখিতে দেখিতে সকল আত্মীয়-স্বজনগণ আসিয়া বাড়ীখানাকে একটি আনন্দের দোলমঞ্চ করিয়া দোলাইয়া দিল। দূরদূরান্তের বহু আত্মীয়স্বজন আসিয়া এই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিতে ভুলিল না।

যথা সময়ে গৃহদেবতার যজ্ঞানুষ্ঠান পর্ব্ব শেষ করিয়া পুরোহিত প্রথামত কর্ত্তা ও গৃহিণীর কপালে যজ্ঞের ফোঁটা পরাইয়া দিলেন, ও ঐ ফোঁটা সবাইর কপালে দিতে শুরু করিয়া দিলেন। যথা সময়ে ফোঁটা দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করিয়া পুরোহিত দিদিমার মাথায় একটি যাত্রাঘট স্থাপিত করিয়া দাদামহাশয়ের হাতে একখানা বড় রামদাও দিয়া সকলকে সহ এই দালানের চতুর্দ্দিকে সাত বার ঘুরিতে আদেশ করিলেন। আমরা ছোটর দল ত কেবলই ছুটিয়া চলিলাম। দাদামহাশয়ের চার দিকেই ছিল প্রখর দৃষ্টি, তিনি খুব জোরে হাঁক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কে কোথায় সকলেই যজ্ঞের শান্তি জল, আশীর্ব্বাদী ফুল লও", সকলেই হাত পাতিয়া শান্তি জল লইয়া মাথায় মুখে দিতে লাগিল। সে এক মস্ত ব্যাপার আজও মনের মধ্যে যেন গভীর ভাবে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এখন আসিল দালানের চতুর্দ্দিকে সাত বার ঘুরিয়া পরে গৃহে প্রবেশ করা। সর্ব্বপ্রথমে 'রামদা' হাতে দাদামহাশয় দাঁড়াইলেন, পরে দিদিমার মাথায় পল্লবযুক্ত মঙ্গল-ঘট, পর পর পূর্ণকুম্ভ বরণ-ডালা সহ ছেলেরা, পুত্র-বধূরা ও তাঁহার অতি প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয় (তাঁহার মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যার পুত্রদ্বয় ইন্দ্রভূষণ ও রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত) সহকারে সারিবদ্ধ ভাবে বাদ্য বাজনার সহিত যেন একটি মিছিল চলিতেছিল। দাদামহাশয় কিন্তু পিছন দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন কাঙ্গাইলা ভাই, সূর্য্যকাকা, ঠাকুরকাকা প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে কি না। তাঁহার যে এই সকলই চাই, এদের ছাড়া যে তাঁহার শান্তি নাই ও থাকিতে পারে না, ইহা ছিল তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা। এখানে তাঁহার জাত্যাভিমান বা উঁচু-নীচের কোন প্রশ্নই মনের মধ্যে ঠাঁই পাইতেছিল না। সবাই সমান, সকলকেই তিনি সমান ভাবে লইয়া শান্তিতে থাকিতে চান, কাহাকেও বাদ দিয়া বা দূরে সরাইয়া নহে! উহাদের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল এবং উহাদের অমঙ্গলে নিজের অমঙ্গল বলিয়াই তাঁহার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল, সুতরাং সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানেই উহাদের কাছে টানিয়া লইতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিতেন না। যথাসময়ে সাত বার দালান প্রদক্ষিণ করার পরে সবাই গৃহে প্রবেশ করিল, ও মহাসমারোহে বহু বহু লোক জন ও গরীব দুঃখীদের খুব ঘটা করিয়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। [ক্রমশঃ।

ব্রত

পুষ্প দেবী

সকাল বেলা উঠেই নেমন্তন্ন—এতে তো মানুষের খুসী হবারই কথা। তায় আবার মিসেস চ্যাটার্জ্জীর বাড়ী—তবু কেন জানি না আতঙ্কিতই হলুম। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে যা সর্ব্বোচ্চ নিশ্চয়ই তারই ব্যবস্থা হবে, কারণ ওসব বিষয়ে কৃপণতা করা মিসেস চ্যাটার্জ্জীর স্বভাবই নয়! কিন্তু আমরা হলুম কায়স্থ এবং তিনি নিজে ব্রাহ্মণ, এ অবস্থায় এত লোক থাকতে আমার কেন নিমন্ত্রণ হল তাই বুঝলুম না। এক বার এ কথা তাঁকে বলতেও গেছলুম, কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জ্জী তাঁর বহু দিনের অভ্যাস করা সেই কৃত্রিম মিষ্টি হাসি হেসে বলেছিলেন, কি যে বলেন মিসেস সিনা, আজ-কালকার দিনে কেই-বা ব্রাহ্মণ আর কেই-বা অব্রাহ্মণ? আচার কি আমাদের মধ্যেই আছে? তার চেয়ে যাদের আমি সত্যকারের শ্রদ্ধা করি তাঁদেরই ডেকেছি। মনে বারে বারে প্রশ্ন জাগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে হয়ত আচার নিষ্ঠা কমেছে, কিন্তু আমার মধ্যেই বা কি এমন বৈশিষ্ট্য উনি খুঁজে পেলেন তা জানি না। তবু আত্মস্তুতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে পারি না। চুপ করে থাকি। যাবার সময় 'আবার নিশ্চয় আসবেন কিন্তু' বলে মিসেস চ্যাটার্জ্জী চলে যান।

আমার স্বামী এতক্ষণ খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে বসেছিলেন, এবার নড়ে-চড়ে বসে বললেন—শ্রদ্ধার কারণটা অতি প্রাঞ্জল,

এই অধম হল পরীক্ষক এবং ওঁর সব বিষয় বারে বারে ফেল করা ভাইটি যে আবার পরীক্ষা দিয়েছে। কালই তো তার ষোল নম্বর সুশীল বাবু দিয়ে গেলেন। বারে বারে বলে গেছেন, 'ব্রাদার! এবার যেন ব্রাদার-ইন-ল বেড়া ডিঙুতে পারে—একটু দেখবেন নইলে আর শ্বশুর বাড়ীতে মুখ দেখান ভার হবে।' ঘটনাটা সত্য হলেও 'যাও কি যে বলো' বলে অন্ত কাজে চলে যাই।

তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসে মন চলে যায় সেই অতীত দিনের কাহিনীতে। প্রথম যখন এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত করি, তখন শাশুড়ীমা বলে ছিলেন, 'তোমার মাকে দিয়ে ব্রতটা নাও বৌমা' মূল এয়ো হবেন তোমার মা। মার চেয়ে গুরু তো আর কেউ নেই।' তাঁকেই এয়ো করতে গেছলুম বাপের বাড়ীতে। বাবা এসে দাঁড়ালেন, বললেন, 'একি কাণ্ড? জামাই বাড়ীর এত জিনিষ নিতে তোমার লজ্জা করবে না? এ সব ব্রতর উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাবীকে দান করা বা যারা সত্যকারের ব্রাহ্মণের আচার পালন করেন তাঁদের সম্মান করা। তোমার মেয়ে তোমায় কিছু জিনিষ দিয়ে তবে আশীর্বাদ পাবে?' লজ্জায় সঙ্কোচে মাথা নামিয়ে বলেছিলুম যে, কিন্তু ও বাড়ীর মা যে বলেছেন। বাবা বললেন, 'বেশ বেয়ান যখন বলেছেন, মাকে প্রণাম করে যাও, তবে এসব জিনিষ অন্ত কারুকে দিয়ে দিও। তা ছাড়া তোমার মায়ের চেয়ে তিনিই যে তোমার বেশী গুরু। তিনি তোমার গুরুর গুরু।' মাও তাই বললেন। বাবা চলে গেছেন কতকাল। তবু তাঁর কথা আজো কানে বাজছে। সবাই বলতো তিনি নাকি বাইরের কাজ নিয়েই মেতে থাকতেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় প্রতি কাজেই আমাদের তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকতো ঘিরে।

এর পর ভারি সুন্দর নিয়ম দেখেছিলুম আমার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে। সে যখন ব্রত নেয় তার দিদিশাশুড়ী গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীনা দুঃস্থা সধবাকে দিয়ে তাকে ব্রত নেয়ান। সে ব্রতের মধ্যে সোনার নোয়া, সোনার শাঁখা, আয়না, সাবান, সেন্ট, সন্দেশ কিছু ছিল না। প্রত্যেক মাসের এয়োর দল এসে পেট ভরে মাছ ভাত খেয়ে নতুন মিলের লাল পাড় সাড়ী পরে চলে যেতো। হাতে থাকতো নতুন বাসনে করে চিনি, পান, সুপুরি, তেল ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। বছরের শেষে মূল এয়ো সেই বৃদ্ধাকে সোনার দুগাছি মটরকলি, সোনার নোয়া ও গরদের শাড়ী দিয়ে ব্রত উদযাপন করা হোলো। সাধারণ নিমন্ত্রিতের মধ্যে আমিও ছিলুম—আজো মনে পড়ে সেই বৃদ্ধা গৃহিণীর উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদ্। মনে হল সোনার জিনিষ তাঁর গায়ে এর আগে ওঠেনি এবং গরদ পরাও এই প্রথম। বারে বারে আমার ব্রতর দিনে সবার কথা মনে পড়লো।
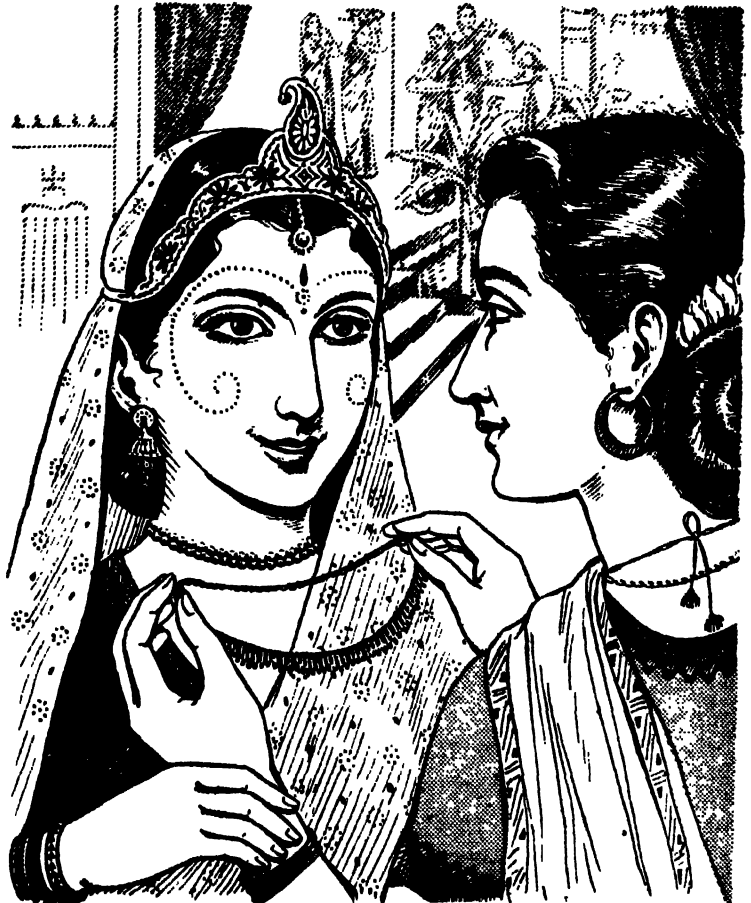
যাক ওসব কথা—এ নেমন্তন্ন আবার সন্ধ্যেবেলায়। আমাদের কালে নিয়ম ছিল এয়োদের না খাইয়ে যিনি ব্রতী তিনি জল খেতে পারেন না। এই সারাদিন উপোস করে থাকবেন নাকি মিসেস চ্যাটার্জ্জী। সন্ধ্যেবেলা তো যথারীতি গেলুম—বোধ হয় একটু সকাল সকালই। ও হরি! কোথায় কি! এযে মস্ত পার্টির ব্যাপার। টেবিলে টেবিলে ফুলের তোড়া, বয়-বাবুর্চির ঘোরাঘুরি ট্রেতে করে কফি, চা, আইসক্রীম। নিজের বেশভূষার দৈন্যে একটু কুণ্ঠিত হলুম। আর একটু গর্জ্জাস কিছু পরলে হোতো। এর মধ্যে নিজেকে বেশ একটু ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। মিসেস চ্যাটার্জ্জীর খাস আয়া অন্নপূর্ণাও একখানা বেশ ঢাকাই পরে বেড়াচ্ছে। জরিটা অবশ্য একটু জ্বলে গেছে। মিসেস চ্যাটার্জ্জীর প্রসাদী নিশ্চয় তবু তো ঢাকাই।

চুপচাপ একপাশে বসে আছি। ক্রমে ক্রমে সবাই এলেন। মিসেস রুদ্র, মিসেস পাল, মিসেস চন্দ, মিসেস ভাওয়ালকা, মিসেস লাহা, যাক নিজের কায়স্থ বলে যে এয়ো হবার কুণ্ঠা ছিল তা খানিক কাটলো। এবার নামলেন মিসেস মল্লিক, এঁর স্বামী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়। কাজেই খাতির পেলেন প্রচুর। কিন্তু মনে প্রশ্ন উঠলো এযে দেখছি ব্রাহ্মণদেরই বাদ দেওয়া হয়েছে শুধু। তা ছাড়া এই মল্লিক-গিন্নির নিন্দায় তো পঞ্চ মুখ হয়ে ওঠেন মিসেস চ্যাটার্জ্জী—এঁকেও কি শ্রদ্ধা করেন আমার মত? যা সেদিন বলে এলেন! ওঁর কথা বারে বারে মনে পড়ে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ওঁর শাশুড়ী বা বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী কারুকেই দেখি না, অথচ তাঁরা দু'জনেই ত সধবা। এবার গাড়ী থেকে নামেন মিসেস রহমান, ইনি শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গিণী, হাতে তাঁর সোনার সিগার কেস্। হাতে এ্যাস্-ট্রে নিয়ে ছুটে এলেন মিসেস চ্যাটার্জ্জী। এটি নইলে এক দণ্ড চলে না মিসেস রহমানের। বিশেষ খাতির পেয়ে প্রীতা হয়ে মিসেস রহমান বললেন, 'পরশু সে কি ব্যাপার! সেই কক্‌টেল পার্টিতে দেখলেন তো? মিসেস আয়ারের লজ্জায় বহর? কিছুতেই ড্রিঙ্ক করবে না, বলে না না, আমার মায়ের বারণ আছে। আরে বাবা, অত মাতৃ-আদেশ মানতে গেলে কি ওসব পার্টিতে আসা চলে? আর মিসেস নন্দীর কাছে অন্ন ট্যাংএর কথা শুনে ওর চোখ তো গোল গোল হয়ে উঠলো। একেবারে গেঁয়ো, সত্যি আয়ার সাহেবের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। আহা, অমন মজলিসি মানুষটার জীবন একেবারে মাঠে মারা গেলো। যাক, আপনি কিন্তু তাকে একেবারে ডাউন করে দিলেন। পর পর যখন তার গেলাসটাও শেষ করলেন তখন তো সে একেবারে চুপ। আবার বলে কি না ওঁর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস, আর না খেলে অভ্যাস হবে কোথা থেকে? বেগতিক দেখে তো মিসেসকে নিয়ে আয়ার সরে পড়লো, নইলে শেষের কাণ্ড দেখলে ওতো ফেন্ট হয়ে যেত। সেই আপনাদের জাপানী নৃত্য। সত্যি ঐ পোষাকটায় ভারি মানিয়েছিল আপনাকে।'

তাঁর কথাস্রোতে বাধা দিয়ে মিসেস চ্যাটার্জ্জীর মেয়ে সুলতা এসে দাঁড়ালো। 'ও আণ্টি যে' বলে মিসেস রহমানকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে মিসেস রহমান বলেন গৃহকর্ত্রীকে, 'কি মিষ্টি মেয়ে আপনার!' জুতোর গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে এক পাক ঘূরপাক খেয়ে সুলতা চলে যায়।

ইতিমধ্যে খাবারের ডাক পড়ে। পোলাও-মাংস থেকে চপ, কাটলেট, কাউলরোষ্ট, বিরিয়ানী কাবাব, বাসার ক্যাকারোল কিছুই বাদ পড়েনি। আজ যেন অবাক হবারই দিন এসেছে আমার, পটলভাজা ভেবে দোর্ম্মা, চিংড়ী মাছ ভেবে তার ভেতর মাংস, টমেটো ভেবে তার মধ্যে আলুসেদ্ধ, কত যে পেলুম বলার নয়। সব যে সুস্বাদু হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে অত্যাধুনিক যে হয়েছিল এটা নিশ্চয়। যাবার সময় মিসেস রহমানের হাতে সুদৃশ্য সোনার রিষ্টওয়াচ বেঁধে দিতে দিতে মিসেস চ্যাটার্জ্জী বলেন, 'এটা আমাদের ব্রতের নিয়ম মিসেস রহমান। যিনি প্রধান অতিথি তাঁকে আজকের দিনের স্মরণচিহ্ন একটু দিতে হয়।' মনে প্রশ্ন জাগে, উনিই মূল এয়ো নাকি?

তার পর প্রত্যেকের হাতেই এক একটা প্যাকেট দেন মিসেস চ্যাটার্জ্জী বলেন 'এ হল এয়োডালা আপনাদের সৌভাগ্যের প্রতীক।' হাতে করে বাড়ী ফিরি। এমন সময় মিসেস রুদ্র বলেন—চলুন না এক সঙ্গে যাই, পথে আপনাকে নামিয়ে দেব। তাঁর গাড়ীতেই উঠি। বাড়ী ফিরে নামতেই ছোট ননদ উমা ছুটে এসে হাত থেকে প্যাকেটটা নেয় বলে, 'কিনে আনলে বুঝি?' আমি বলি নারে এয়োডালা। কৌতূহল ভরে উমাই খোলে প্যাকেটটা, একখানা সুতি কাবেরী শাড়ী, পাতা আলতা, সিঁদুর, চুবড়ী কাঠের সিঁদুর কৌটো, আয়না আর একটা বাক্স করে সন্দেশ। সন্দেশ সম্বন্ধে আমার স্বামীর একটু বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে, তিনি এবার গাত্রোত্থান করেন। একটা সন্দেশ মুখে দিয়েই বলেন, 'ওরে বাপরে! এযে একেবারে চিনির ডেলা—না বাবা এসব তোমাদের এয়োদের পক্ষেই ভালো। শেষে কি পৈত্রিক দাঁত কটা যাবে সন্দেশ খেতে গিয়ে?'

এমন সময় এসে দাঁড়ান মিসেস রুদ্রের ড্রাইভার। তার হাতে একটা অনুরূপ ব্রাউন পেপারের প্যাকেট। সেটা নামিয়ে সেলাম ঠুকে সে একটা চিঠি দেয়। তাতে মিসেস রুদ্র লিখেছেন, এ প্যাকেটটিতে আপনার নাম লেখা। মনে হয় নামবার সময় বদলে গেছে। অন্যমনস্কে খুলে ফেলেছিলুম কিছু মনে করবেন না।

তাড়াতাড়ি এ প্যাকেটটা বেঁধে ড্রাইভারের হাতে দিই, সত্যিই ত এটাতে মিসেস রুদ্র লেখা। ড্রাইভার চলে গেলে প্যাকেটটা খুলে দেখি তাতে দামী সিল্কের শাড়ী, ব্রকেডের ব্লাউজ পিস ও আমার স্বামীর একান্ত প্রিয় ভীমনাগের দেলখোস সন্দেশের বিরাট বাক্স—প্রথমে এ তারতম্যের কারণ বুঝি না—আরো লজ্জা পাই মিসেস রুদ্রর কথা ভেবে, কি বিশ্রি কাণ্ডই না হল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অধ্যাপক মশাই বলেন, 'হোলো তো? এবার বুঝলে, এ ব্যাপারটে হল আসলে ঘুষ!'

কাশী স্মৃতি

শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষ

সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামের উদ্দেশ্যে কত মনীষী কত কাব্য, কত প্রবন্ধ, কত গল্পগাথা রচনা করে গেছেন। সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য লিখে গেছেন "যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।" প্রবাদ আছে যে, কাশীধাম নাকি এ

পৃথিবীতে অবস্থিত নয়, এ পুণ্যভূমি নাকি শিবের ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত। তাই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে আছে যে, সসাগরা পৃথিবী দান করার পরও দানবীর হরিশ্চন্দ্রকে কাশীতে থাকবার অধিকার থেকে কেহই বঞ্চিত করতে পারল না। ওই যে—"যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।" পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্র ও পতিপ্রাণা শৈব্যার ব্যথা-বেদনা-বিজড়িত কাহিনীর সাক্ষীস্বরূপ হরিশ্চন্দ্র-ঘাটকে আজিও শোকতাপনাশকারিণী কাশী বুকে করে রেখেছে। পুণ্যসলিলা মন্দাকিনী যোগিজন-বাঞ্ছিত কাশীধামকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে কি শোভারই না সৃষ্টি করেছেন। ভক্তের চক্ষে এ শোভার বুঝি তুলনা হয় না।

সুদূর কৈশোরের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা মনে হলেই কাশীর আনন্দময় স্মৃতি আমার মনে চিরকাল জেগে উঠে, সে বুঝি ভুলবার নয় তাই বার বার জেগে উঠে। দিকচক্রবালে ঘননীল আকাশের বুকে অকস্মাৎ মালার ন্যায় শুভ্র বলাকা দেখলে মনে যেরূপ একটা চাঞ্চল্যকর শিহরণ জাগে, সেইরূপ সংসারের বৈষয়িক পঙ্কিলতার মাঝে যখনই আমার মানসপটে ভেসে উঠে বাল্যের সেই বিশ্বনাথের আবাসভূমির মধুমাখা স্মৃতি, তখনই যেন একটা আনন্দের জোয়ার এসে পার্থিব দুঃখ-শোক বোধ সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সুরেন্দ্র মোহন বসু একনিষ্ঠ নীরব সাধক ছিলেন। তিনি সরকারের গুরুদায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। কর্মময় জীবনের মধ্যে তিনি যতটুকু সময় পেতেন ভগবদ্-আরাধনায় লিপ্ত থাকতেন। কাজ সবই করতেন, কিন্তু আসক্তি নেই। এক বার পৌষমাসে বড়দিনের সময় অকস্মাৎ পিতৃদেব স্থির করলেন কাশী যেতে হবে। বাল্যের সে কি আনন্দময় উত্তেজনা! আমরা দুই-ভগিনী ও পিতা-মাতা একটি বন্ধু-পরিবারের সহিত সেই বাঞ্ছিতভূমির উদ্দেশে যাত্রা করলাম। আমরা যে দ্বিতল অট্টালিকাটিতে ছিলাম তা দশাশ্বমেধ-ঘাট থেকে খুব বেশী দূরে নয়। কাজেই পিতার সহিত আমরা অনায়াসে সেখানে ও শ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরে হেঁটে যেতাম। আজও মনে পড়ে সন্ধ্যা-বেলা সেই মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা ও কাঁসরধ্বনির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট কি অপূর্ব্ব লাগত। কতলোক দেখতাম কর্পূর জ্বালিয়ে গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়ে দিচ্ছেন।

পিতৃদেবের ঐকান্তিক বাসনা ছিল তখন কাশীতে শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ দর্শনের। তিনি জানতেন এই কাশীধামেই এঁরা অতি গুপ্তভাবে ও অতি দীনভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তাঁদের দর্শন সহজে মেলেনা। পদ্মপত্রস্থ নীরবিন্দুর ন্যায় যে চঞ্চল জীবন, তাতে সাধুসঙ্গই যে সংসারের শোকতাপবারিধি পার হবার নৌকাস্বরূপ—

"ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

তাই না শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ধর্ম্মপিপাসার্ত্ত অগণ্য নরনারীর ভীড় হোত। দক্ষিণেশ্বর আজ পুণ্যতীর্থ। সেই করুণাময় কত—শোকতাপ-ক্লিষ্ট জনগণকে মূঢ়তার, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে হাত ধরে তুলে বিমল-আলোর সন্ধান দেখিয়েছিলেন। সাধু সন্তরা লোকের মঙ্গলের জন্য বসন্তানিলের মত সদাই বিচরণ করে থাকেন।—

"শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।—"

কাশীতে পৌষ মাসে তখন খুব শীত। এক দিন অতি প্রত্যূষে পিতৃদেব তাঁর খড়মটি পরে দ্বিতলের ভিতরের বারাণ্ডায় পরিক্রমণ করছিলেন ও অবিরাম স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ কে নীচ থেকে দীপ্ত কণ্ঠে বললে—"ভিক্ষাং দেহি!" পিতা চরণটি পূরণ করে উপর থেকেই উত্তর দিলেন "কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী"—আমরা সকলে উপরের বারাণ্ডা থেকে দেখলাম, এক-তলার উঠানের সামনে এক জন আলখাল্লা পরিহিত গৌরবর্ণ সাধু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভিক্ষা তো কত লোকেই করতে আসে,—কিন্তু এ কি অপরূপ ভিক্ষুক! তাও ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন শুদ্ধ সংস্কৃতে। দীর্ঘ দেহ সন্ন্যাসী—উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ-মণ্ডলে যেন জ্যোতির বিকাশ।

পিতৃদেব নীচে গিয়ে সাধুটিকে শ্রদ্ধা ভরে বসালেন ও তাঁর সঙ্গে নানা সৎ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবং কাশীতে তখন মহাপুরুষ কে আছেন, জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর পেলেন যে, এখন কাশীধামে দু'টি মহাপুরুষ আছেন। এক জন যতিরাজ শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ দেবের শিষ্য। তিনি থাকেন অতি গুপ্ত ভাবে,—দশাশ্বমেধ ঘাটের সংলগ্ন একটি শিবমন্দিরের বারাণ্ডায়, একেবারে উলঙ্গ অবস্থায়। মাঝে মাঝে একটা হুঙ্কার দেন, তা শুনে কেহই এগোয় না। সকলে ডাকে শ্রীব্রহ্মদাস বাবা বলে—অতি উচ্চ অবস্থা, পূর্ণ হতে একটু দেরী। কেউ জানে না যে, তিনি কত বড়—নিজের মত নিজে ধুনী জ্বালিয়ে পড়ে থাকেন। এ কথা শুনে পিতৃদেবের অপার আনন্দ হোল,—তিনিও যে শৈশবে ওই একই গুরু মহারাজের কাছে দীক্ষিত। যোগীরাজ শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ দেব শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে একই সময় কাশীতে বিরাজমান ছিলেন। দু'জনের মধ্যে অতিশয় প্রীতির ভাব ছিল। অসিঘাটের সন্নিকটে দুর্গাকুণ্ডের পাশে আনন্দ-বাগ আশ্রমে শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ দেব থাকতেন। দেহরক্ষার পর আনন্দবাগে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরে তাঁর পূজা হয়।

আর একটি মহাপুরুষের সন্ধানও পিতৃদেব পেলেন—নাম শ্রীবীতরাগ স্বামী। তিনি থাকেন কাশীর সঙ্কটমোচন নামে একটি স্থানে আশ্রমে। এঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য পরে আমাদের হয়েছিল।

পিতার অনুরোধে সেই অপূর্ব্ব সাধু কৃপা করে উপরে এসে আহার করলেন। বিদেশে কোন আড়ম্বরই নেই—শুধু খিচুরী ও গব্যঘৃত। তাই যেন পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করলেন। আমরা প্রণাম করতে হাস্যমুখে আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর দর্শন আমাদের আর মেলে নাই। সেই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর কথা আমরা পরে কত বিস্ময়ের সহিত আলোচনা করেছি। তিনি যেন পিতার অন্তর্নিহিত বাসনা পূরণ করবার জন্যই ভগবদ্-প্রেরিত হয়ে মহা-পুরুষের সন্ধান দিয়ে গেলেন।

তার পর পিতৃদেবের আশা পূর্ণ হয়—তিনি দেখা পান তাঁর চির আকাঙ্খিতের—তাঁর ইপ্সিতের। এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদের দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে যান। মনে পড়ে শিবমন্দিরের

বারাণ্ডায় একটি ছেঁড়া চট্ ঝুলছিল,—তারি আড়ালে জলন্ত ধুনীর পাশে বিভূতি-ভূষিত-কলেবর উলঙ্গ সন্ন্যাসী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে একটা হুঙ্কার দিচ্ছেন, অতর্কিতে সে শব্দ শুনলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু এটা যে তাঁর বাহ্যাড়ম্বর—যাতে কেহ তাঁকে না বিরক্ত করে। তিনি বাইরে বজ্রের মত কঠোর, কিন্তু ভিতরে যে তিনি কুসুমের থেকেও কোমল তা যে আমরা কতখানি অনুভব করেছিলাম, তারি কথা পরে বোলব।

তিনি পিতৃদেবের সশ্রদ্ধ অনুরোধে এক দিন "আনন্দবাগে" শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ দেবের সমাধি-মন্দিরে আসেন। বলাবাহুল্য আমরা পূর্ব্বেই সেখানে এসে তাঁর জন্ত অপেক্ষা করছিলাম। আশ্রমস্থ যে দ্বিতল অট্টালিকাটিতে শ্রীগুরুমহারাজ থাকতেন, তারি নীচের তলায় প্রশস্ত বারাণ্ডায় পিতৃদেব ও অন্তসকলে স্বামিজীকে নিয়ে উপবেশন করেছিলেন। ওই বারাণ্ডার নীচে একটি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ ছিল। এই কুঠরীতে শ্রীগুরুমহারাজ মহাযোগ সমাধিতে নিমগ্ন থাকতেন। আমরা সেই সময়কার একটি কাহিনী শুনেছিলাম। এক দিন নিশীথ রাত্রে যখন যোগীরাজ তপে মগ্ন ছিলেন, তখন স্থানীয় এক রাজা ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা তিনটি রমণীকে নিয়ে আনন্দবাগে আসে ও সাধকপ্রবরকে পরীক্ষা করবার মানসে রমণী তিনটিকে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রেরণ করে। তারা কক্ষে প্রবেশ করবার অনতিকাল পরেই যোগীরাজের সমাধিভঙ্গ হয়—সুপ্ত সিংহ গর্জ্জে উঠলেন—"প্রাণের ভয় থাকে তো এখনি পালাও।" সেই স্বর শোনামাত্র দু'টি রমণী তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উধাও হয়। কিন্তু তৃতীয় রমণীটি যাবার কোন লক্ষণ প্রকাশ কোরল না। তখন কোথা থেকে এক বিশালকায় সর্প এসে সেই রমণীকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলল। যোগীবর সেই কক্ষ ত্যাগ করে অন্তত্র চলে গেলেন। এদিকে সেই রাজা ও তার লোকজনেরা অবশিষ্ট রমণীর কি হোল জানবার জন্ত ভূগর্ভস্থ কক্ষে নেমে এসে সেই রমণীকে সর্পদ্বারা বেষ্টিত দেখে, অবিলম্বে উর্দ্ধশ্বাসে আনন্দবাগ থেকে পলায়ন করে। প্রত্যুষে সেই মহাসর্প সেই রমণীকে ত্যাগ করে ধীরে ধীরে কোথায় চলে গেল, এবং সেই স্ত্রীলোকও আনন্দবাগ থেকে চলে যায়। সর্প তাকে শুধু বেঁধেই রেখেছিল। সেই ভীষণ রাতের পরে সেই রমণীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। শুদ্ধ সাধনায় সে পরবর্ত্তী কালে তপশ্চর্য্যাময়ী মহিয়সী নারীতে পরিণত হয়েছিল। করুণাময়ের দয়া যে কোথা দিয়ে আসে তা কে বলতে পারে?

সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে আমরা সকলেই নেমে গিয়ে দেখে এলাম। মনে হোল তপশ্চর্য্যার পুণ্য সেই কক্ষের প্রতি ধূলিকণা। মনে হোল আনন্দবাগের প্রতি বৃক্ষলতায়, আনন্দবাগের আকাশে-বাতাসে যেন কার পুণ্য পরশ সমস্ত দুঃখচিন্তা ভুলিয়ে দিয়ে এক অচিন্ত্যনীয় অমৃতলোকের বার্ত্তা বহে এনে দিচ্ছে।

> "আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতি সতাম্
> বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ।"

কে বলে স্থান-মাহাত্ম্য নেই? কিন্তু এ শুধু উপলব্ধির বিষয়। ছুটী ফুরিয়ে যাওয়ায় পিতাকে তাঁর প্রিয় কাশীধাম ছেড়ে আমাদের নিয়ে কলিকাতায় চলে আসতে হোল। কিন্তু সাধুসঙ্গের জন্ত প্রাণ যে ব্যাকুল! সে আকুল অনুরোধ প্রত্যাখান তো করা যায় না। তাই বোধ হয় দুই বৎসর পরে শ্রীশ্রীস্বামী বজ্রানন্দ বাবা কাশীধাম ত্যাগ করে কিছু দিনের জন্ত আমাদের বাড়ীতে দয়া করে এসে অবস্থান করেছিলেন, সঙ্গে একটি মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত। আমাদের ভাড়াটিয়া বাড়ী তখন তীর্থস্থানে পরিণত হোল। অগণিত শোক-তাপ-ক্লিষ্ট নর-নারী মহাপুরুষের দর্শনের জন্ত আসতে লাগলেন। সর্ব্বত্যাগী স্বামিজী আমিত্ব একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। সমস্তই তাঁর গুরুতে সমর্পিত। এ প্রেমের তুলনা তাঁরি কাছে। 'আমি' শব্দ কখনও তাঁকে উচ্চারণ করতে শুনি নাই। সবই শ্রীগুরুমহারাজ করছেন—সে এক অপূর্ব্ব ভাব। আহার করবেন কি না জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—"হাঁ, গুরু মহারাজ খায়গা।" নিজের বিষয় কখনও কিছুই বলতেন না। শুধু মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি—"অরে, গুরুমহারাজ তো কাণ ফুকুকে ছোড় দিয়া হ্যায়"—অর্থাৎ কি না গুরুমহারাজ শুধু কাণে মন্ত্রদান করে ছেড়ে দিয়েছেন, তার পর বহু সাধনা করে তবে ইপ্সিতকে তিনি পেয়েছেন। তাঁর আবাসভূমি কোথায় ছিল, কি বা নাম, কেহই জানতে পারেন নাই। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, তা আমরা অনুমান করেছিলাম। সহজ-সরল মাধুর্য্যমাখা তাঁর বাণী শুনে কত লোক শান্তি পেয়েছে। করুণাময় তিনি অনেককেই দীক্ষাদান করেছিলেন। দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে শিষ্যকে নির্দ্দেশ দিতেন শ্রীগুরুমহারাজের মূর্ত্তিকে পূজা করতে, তৎপরে মন্ত্রদান করতেন।—দাও সমস্ত ইষ্টদেবকে সমর্পণ কর, নিজের বলে কিছু রেখো না,—আমিত্ব বিসর্জ্জন দাও, তবে তো তাঁকে পাওয়া যাবে।

কাশীতে যখন তিনি বাস করতেন, তখন দুধ ছাড়া আর কিছুই আহার করতেন না। মহারাষ্ট্রীয় ভক্তরাই এনে দিত। কলিকাতায় এসে আমার ভক্তিমতী মায়ের স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন যৎসামান্ত আহার করতেন, তাও এক বেলা, রাত্রে দুগ্ধপান করতেন। নিরাসক্ত, বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী কি করে নগরীর সভ্যতামূলক সংসারের মাঝে বাস করেছিলেন, চিন্তা করলে এখনও আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। তবে লোকের হিতের জন্ত, মঙ্গলের জন্ত, মহাপুরুষরা যে বসন্তানিলের মতই বিরাজ করেন।—তা না হলে পবিত্র গঙ্গাতীরে, উন্মুক্ত আকাশতলে, নির্জ্জন গিরিকন্দরে যাঁর বাস, তিনি কিরূপে জনাকীর্ণ নগরীর বুকে এসে অবস্থান করলেন। স্বামিজী যেদিন রাত্রে কাশীতে ফিরে গেলেন, সেদিন আমাদের সকলেরি নয়নে অশ্রুধারা বহেছিল। বিদায়কালে তাঁর সেই অমিয়মাখা সান্ত্বনাবাণী—"রোও মৎ, রোও মৎ," কালের উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গভঙ্গ পার হয়ে এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চক্ষু অশ্রুসজল করে দেয়। তাঁর কথা মনে হলেই মনে পড়ে গীতার শ্লোকটি :—

> "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
> নির্ম্মম নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
> সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
> মর্য্যার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।"

স্বামিজী কাশীধামে প্রত্যাগমন করবার পরে পিতৃদেব পুনরায় কাশীতে যাবার জন্ত বড়ই ব্যাকুল হলেন। সেই বৎসরেই,

শারদোৎসবের কিছু পূর্ব্বেই পিতা এক মাসের ছুটি নিয়ে কাশীতে আসেন। এবারে আমরা আনন্দবাগেই একটি প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহে অবস্থান করি। দ্বিতলে একটি ঘর, চারি দিকে বারাণ্ডা, নীচের ঘরটি সম্পূর্ণ খোলা। আমার মনে পড়ে, আমরা সেখানে আসবার কিছু দিন পরেই আশ্রমস্থ শেফালী গাছগুলি ফুলে ভরে উঠেছিল। কিশোর বয়সে সব কিছুই যেন মধুময় মনে হোত। অতি প্রত্যূষে আমাদের সেই শুভ্র গন্ধে-ভরা ফুলগুলি কুড়াবার সে কি উদ্দীপনা। আশে-পাশের ব্রাহ্মণ-পূজারীরাও আশ্রমে ফুল নিতে আসতেন। তাঁরা আমাদের দেখে প্রসন্ন হাস্যে বলতেন "দেবীলোক ভি আ গিয়া।"

পূর্ব্বাকাশে উষার রক্তিমছটা ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কাশীবাসীর দিনের শুভ প্রারম্ভ হোত মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণ করে,—আর শান্ত সন্ধ্যায়, ধূপগন্ধবাহী বাতাসে, আরতির ঘণ্টাধ্বনির মাঝে নেমে আসত প্রশান্তি, জেগে উঠত অবসাদ-ক্লান্ত চেতনায় কোন অমৃতলোকের আভাষ।

আমরা সেবারে যত দিন আনন্দবাগে ছিলাম, পিতৃদেবের সভক্তি আমন্ত্রণে স্বামিজী প্রায় তত দিনই তাঁর প্রিয় গঙ্গাতীর ছেড়ে আনন্দবাগে এসে ছিলেন। পৃথিবীতে রাজ্য সম্পদ যাঁদের কাছে ধুলার মত, এক মাত্র ভক্তি ও প্রেমের ডোরেই তাঁরা বাঁধা পড়েন। নীচের খোলা প্রকোষ্ঠটিতে ধুনী জ্বালা হোত, তার পাশে স্বামিজী বিশ্রাম নিতেন। পিতার স্নেহে, অকৃত্রিম বন্ধুর অকপট প্রীতি দিয়ে তিনি আমাদের পরিবারস্থ সকলের শুভানুধ্যান করতেন। তাঁর করুণা ও মাধুর্য্য মাখা কথাগুলি যেন প্রাণে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিত। প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ যে কোন সময় ইচ্ছা হোত, পদব্রজে অতি দ্রুত দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যেতেন। গুরুমহারাজের পূজা থেকে বড় তাঁর আর কিছুই ছিল না, এবং সকলকে এই কথাই বলতেন। কাশীতে তাঁর কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় শিষ্য ছিল। তাঁরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন ও আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি এই মহারাষ্ট্রীয় ভক্তেরা ধূপ দীপ, ফুল-চন্দন দিয়ে যেমন লোকে দেবী বিগ্রহ পূজা করে তেমনি করে তাঁরা স্বামিজীর পূজা করতেন। প্রত্যহ পূজার উপকরণ নিয়ে তাঁরা কাশীর অন্য প্রান্ত থেকে আনন্দবাগে হেঁটে আসতেন গুরুকে পূজা করবার জন্য। ভক্তিমতী বৃদ্ধা মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অনায়াসে বালক-বালিকাদের সঙ্গে নিয়ে হেঁটে আসতেন। কোন ক্লেশই এঁরা অনুভব করতেন না। ধন্য এঁদের ভক্তি ও অদ্ভুত এঁদের আতিথ্যধর্ম্ম। এক বার একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার আমাদের মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণ করেন। অনেকটা পথ এবং মধ্যাহ্ন-আহার নিশ্চয়ই খুব দেরী করে হবে মনে করে, আমরা যখন তাঁদের গৃহে এসে পৌঁছলাম তখন অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একি—এসে দেখি তাঁরা অনেকক্ষণ রন্ধন ক্রিয়া সমাপন করে আমাদেরি অপেক্ষায় বসে আছেন। নিজেরা তো অনাহারে আছেনই, দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে পর্য্যন্ত খেতে দেন নাই। আমরা সেদিন সত্যই বড়ই ব্যথিত ও লজ্জিত হয়েছিলাম।

আনন্দবাগে পিতৃদেব মহাপুরুষের সাহচর্য্যে তাঁর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর সময়টুকু বড় আনন্দেই কাটিয়েছিলেন। আমার প্রত্যক্ষ মনে আছে—সন্ধ্যায় সময় পিতৃদেব যখন তাঁর শ্রীগুরুমহারাজের সমাধি-মন্দিরে দরবিগলিত অশ্রুধারে স্তোত্রপাঠ করতেন, তখন সমাধির উপরিস্থ বৃহৎ ঘণ্টাটি নিজে নিজে আন্দোলিত হতে থাকত, অথচ কোন শব্দ হোত না। অনেকেই এ দৃশ্য দেখেছেন ও বিস্মিত হয়েছেন। আর একটি ঘটনা বলি—তখন কিছু দিন পূর্ব্বে মাত্র সারনাথের খনন কার্য্য আরম্ভ হয়েছিল। পিতা এক দিন আমাদের সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যান। তখন museum এ রক্ষিত দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি ও excavations পরিদর্শন করবার পর আমরা ইতস্তত: বিচরণ করতে করতে সেখান থেকে একটু দূরে একটি শিব মন্দিরে উপনীত হলাম। স্থানটি বড়ই নির্জ্জন ও সন্ধ্যার সময় মনোরম লাগল। পিতৃদেব সেই মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভক্তিভরে শিবস্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। তখন উপস্থিত আমরা সকলে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম শিবলিঙ্গের উপরিস্থ ঘণ্টাটি নিঃশব্দে এধার-ওধার করে আন্দোলিত হচ্ছে। কেন এরূপ হোত বা কিরূপে হোত জানিনা, তবে যা প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম, তাই লিখলাম। শুধু একটি কথা এই সঙ্গে মনে পড়ে—

"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

স্মৃতির ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে কাশীর অভিজ্ঞতার কাহিনী হয়তো আরো লিপিবদ্ধ করতে পারতাম। কিন্তু আর যা আছে তা থাক্ মনের মণিকোঠায় নিভৃতে চির দিন।

আমাদের যত কাশী ছেড়ে আসবার দিন নিকটবর্ত্তী হতে লাগল, পিতৃদেবের ব্যকুলতা যেন ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল! তিনি যেন আরো বেশী করে শ্রীগুরুমহারাজের সমাধি-মন্দির ও স্বামিজীর পদযুগল আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতেন। জলন্ত দীপশিখার তৈলাধারের তৈল যে শুষ্ক হয়ে আসছে—তা কি তিনি জানতে পেরেছিলেন—সাধকের সূক্ষ্ম চেতনায় হয়তো জেনেছিলেন যে, প্রিয় আনন্দবাগের পুণ্য সমীরণ তিনি শেষ বার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করে চলে যাবেন,—হয়তো জেনেছিলেন যে, স্বামিজীর প্রিয় মূরতিখানির সহিত এ জগতে তাঁর এই শেষ সাক্ষাৎ,—দেখা হবে পরে—লোক-লোকান্তরে।

আমরা যেদিন কাশী ছেড়ে চলে এলাম, সেদিন করুণানিধান স্বামিজী নিজে আমাদের সাথে নিয়ে ষ্টেশনে এলেন বিদায় দিতে। অশ্রুবারিতে আমাদের সকলের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল,—আমরা অপলক নেত্রে চেয়ে রইলাম তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে।—চলে যাচ্ছেন যোগীবর—তপস্যায় ক্ষীণ দীর্ঘতনু,—বিদায়-আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চলে যাচ্ছেন প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষি। সেই দৃশ্য মানসপটে চির দিন অঙ্কিত হয়ে আছে, কারণ সেই তাঁকে আমাদের শেষ দর্শন। মনে মনে হয়তো বলেছিলাম—বিদায় সাধুজনপূজ্যা কাশী—বিদায় আনন্দনিকেতন আনন্দধাম। যাবার আগে বিশ্বনাথের পায়ে প্রণাম জানিয়ে গেলাম—

"শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি।"

বিবেকানন্দ-স্তোত্র

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

১১

এক দিন গভীর রাত্তিরে
ধ্যান শেষ হ'য়েছে তখন,
এমন সময় দেখে কি না,—
দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে নিয়ে
সন্ন্যাসীর বেশে এক ঋষি
অপরূপ লাবণ্যচ্ছটায়
পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঠেলে
অনির্বচনীয় মমতায়
দাঁড়ালেন তার মুখোমুখি !
এ যেন হুবহু 'বুদ্ধদেব'
বেড়াতে এলেন তার কাছে,
হয়ত কি গোপনীয় কথা
শোনাবেন এই অবকাশে !
জ্যোতির্ময় সর্ব-অঙ্গ তাঁর,
অলৌকিক মহিমায় ভরা ।

*　　*　　*

শিষ্যমন রোমাঞ্চিত হয়,
পুলকের ঢেউ ওঠে বুকে ;
স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ
অলৌকিক উত্তেজনা নিয়ে ।
অকস্মাৎ ভয় পেয়ে যায়,
ঘর থেকে দেয় পিঠটান ;
তার পর সারাটা জীবন
অনুতাপে করে হায় হায় !
অন্তরের নীরব প্রার্থনা
মাথা কুটে মরে তাঁর পায় !

*　　*　　*

যখনি উঠেছে তাঁর কথা,
উগ্রতেজা সন্ন্যাসীর মুখে
ফুলের বাগান ব'সে গেছে !
সদম্ভ-গম্ভীর পাখোয়াজে,
ঐ শোনো প্রণয়-মধুর,
মৃদঙ্গের মিঠে বোল বাজে ;—
"Verily was He
The only man in the world
Who was ever quite sane....
Such a fearless search for Truth
And such love....
The world has never seen....
So full of pity that He—
　　Prince and Monk—
Would give his life
To save a little goat !....
Sacrificed himself
To the hunger of a tigress !...
　　And He
Came into my room
While I was a boy...." *

যদি কের তাঁর দেখা পায়
জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায়
বুদ্ধ-গয়ায় গেছে ছুটে ;
ভাষাহীন স্তব্ধ হাহাকারে
মর্মরিত বোধি-বৃক্ষতল
আকুল ক'রেছে মাথা কুটে ;—
"Is it possible that
I breathe the air He breathed ?
I touch the earth He trod ?" *
কিন্তু তাঁর পদশব্দ কৈ ?
তমোনাশী নিঃস্বার্থ নিশ্বাস ?
এতো শুধু পাতার মর্মর !
আশাহত ব্যর্থ হাহুতাশ !

তপঃশ্রান্ত সন্ন্যাসী তাই
জীবনের গোধূলি-সন্ধ্যায়
বুদ্ধ-গয়ায় গেছে ফের,
দিব্যসত্ত্ব 'সর্বার্থ-সিদ্ধে'র
পদধ্বনি যদি শোনা যায় ।

*　　*　　*

তবু আর কভু কোনো দিন
বুদ্ধ এলোনা তার কাছে ।
বিশ্ব-জয়ী আচার্য হ'য়েও
খেদ করে সন্তানের কাছে !

১২

যত কিছু আছে অনুপম
তারা বুকে এক বারই আসে ।
সূর্য রোজ ওঠেনা দু'বার
দুটো কিংবা তিনটে আকাশে ।

---

* "বাস্তবিক, তিনিই জগতে এক মাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি···এমন নির্ভীক সত্যানুসন্ধান এবং এমন প্রেম জগতে কেউ কখনো দেখেনি···বুদ্ধের এত দয়া—যে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হ'য়েও একটা ছাগল-ছানাকে বাঁচাবার জন্যে আত্মবলি দিতে উদ্যত !···

একটি ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাতৃপ্তির জন্যে স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত দান ক'রেছিলেন !······

আর তিনিই আমার ছেলেবেলায় আমার ঘরে এসেছিলেন······"

* "এও কি সম্ভব যে তিনি যে-বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছিলেন, আমিও সেই বাতাসেই নিশ্বাস নিচ্ছি ?

যে-মাটির ওপর তিনি বিচরণ ক'রেছিলেন, আমি তারই ওপর বিচরণ করছি ?"

সব চেয়ে দামী মুহূর্ত্তটা
একবার এলেই মঙ্গল।
যা দেবে তা' একইবারে দেয়,
কোথাও রাখেনা কিছু বাকি ;
দশ বার ছুঁলে স্পর্শমণি
দশ বার সোনা হও নাকি ?

* * *

তা'ছাড়া বুদ্ধই ব'লেছন,—
"Buddha is not a man
But a state."
তাই
বুদ্ধ আর না এলেও
আমাদের নেই কোনো খেদ্।*
আমরা দেখেছি কত বার
কি ভারতে কি অ্যামেরিকায়
স্বামিজীর কাজে ও কথায়
জলজ্যান্ত বুদ্ধদেবটিকে ;—
"With a bleeding heart
I have crossed half of the
world....
I may perish of cold....
But I bequeath to you,
youngmen,
This sympathy,
This struggle for the poor,....
Vow then to devote your
....lives
To the cause of the millions
Going down and down
every day....
May I be born again and
again....
So that I may
Worship the only God....
The only God I believe in
The sumtotal of all souls—
And above all,
My God the wicked
My God the miserable...." *

* * *

ঐ শোনো স্বামিজীর গলা
কি ভীষণ ভার-ভার লাগে !
সেদিন নিঃশব্দে পা-টিপে
একবার এসে তথাগত
অনাগত বিবেকানন্দের
কলকাঠি নেড়ে দিয়ে গেছে !
"(For) Centuries people
have been
(Taught) Theories of
degradation....
So frightened..they have
become
Nextdoor-neighbours
to brutes....
Does it make you restless ?
Does it make you sleepless ?
Has it made you mad ?....
Ye fools ! who neglect the
living God
And his infinite reflections
With which the world is full,
While ye run after imaginary
shadows,....
Him worship, the only visible !
Break all other idols !" *

* * *

ঐ শোনো রুদ্র-বীণায়
ওঠে কা'র ক্রন্দনের রোল !
মানুষের উপকূলে এসে
বাজে কা'র করুণ কল্লোল !
জনহীন গিরি-গুহা ফেলে
কেন ছুটে আসে সন্ন্যাসী ?
পৃথিবীটা জাপটাতে চায়,
প্রেম কেন এত সর্বগ্রাসী ?
কেন এই ধূসর মরুতে
ফুল ফোটাবার অভিযান ?
দুনিয়ার হাহাকার নিয়ে
কোন মুখে থাকো অম্ল'ন ?

[ক্রমশঃ।

---

* "বুদ্ধ কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, ওটা হচ্ছে মানব-মনের একটা উচ্চাবস্থা।"

* "হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে অর্দ্ধেক পৃথিবী আমি অতিক্রম করেছি··· হয়ত এই দারুণ শীতে আমার মৃত্যু হ'তে পারে···কিন্তু যুবকগণ, আমি তোমাদের কাছে গরিবদের জন্যে এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ ক'রে যাচ্ছি, তাহ'লে ব্রত গ্রহণ কর, কোটি-কোটি ভারতবাসী যারা দিন দিন ডুবছে, তা'দের উদ্ধারের জন্যে তোমরা জীবন উৎসর্গ ক'রবে।···

নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান আছেন,···এক মাত্র যে-ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পুজোর জন্যে আমি যেন বার-বার জন্মগ্রহণ করি ; আর আমার সর্বাধিক উপাস্য হবেন আমার পাপী-নারায়ণ, আমার তাপী-নারায়ণ।"

* "শত-শত শতাব্দী ধ'রে মানুষকে কেবল হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদগুলো শেখানো হ'য়েছে···এমন ভয় দেখানো হয়েছে যে সত্যিই তা'রা পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে··· এই চিন্তায় তোমরা অস্থির হ'য়েছ কি ? ঘুম ত্যাগ ক'রেছ কি তার জন্যে ? এই দুশ্চিন্তা কি তোমাদের পাগল ক'রে তুলেছে ?······

মূর্খ কোথাকার ! জীবন্ত ঈশ্বরকে উপেক্ষা ক'রে, তাঁরই অসংখ্য প্রতিচ্ছবি হ'য়ে যারা দুনিয়াময় ছড়িয়ে রয়েছে, তা'দের অবহেলা ক'রে তোমরা কি না কাল্পনিক ছায়ামূর্তির পেছনে দৌড়চ্ছো,······সমস্ত বিগ্রহ ভেঙে ফেলে দিয়ে জলজ্যান্ত ঈশ্বরের পুজো করোগে !"

মানবেন্দ্র পাল

বাড়িটা ছোটোই। তবু তাতে কোনো অসুবিধে ছিল না। কারণ বাড়ির তুলনায় পরিবারটি বৃহৎ নয়। ইলা আর । নায়িকা আর নায়ক। নেপথ্যে শুধু এক বৃদ্ধা—অমলের মা। বাতে পঙ্গু।

তবু বৃদ্ধার সম্মান আছে, খাতির আছে, আদর আছে। ইলা একালের মেয়ে হয়েও স্বচ্ছন্দে সব রকমের সেবা-পরিচর্যার ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে।

শুধু সেবাই নয়, কেমন এক রকমের অন্ধ কৃতজ্ঞতা ইলা মনে মনে অনুভব করে। সে জিনিসটা ঠিক কাউকে ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না।

অমল এ নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামায় না। তিন বারে আই-এ পাস ক'রে তিন-চার বছর ভালো চাকরীর জন্তে ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অগত্যা ঢুকেছে এক বড়ো ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে।

কখন কি ওষুধের জন্তে অর্ডার দিতে হবে—কত টাকা দরকার, মাল ঠিক সময়ে এসে পৌঁছল কি না, ষ্টেশনে গিয়ে পার্শেল ছাড়িয়ে আনা, এজেন্টদের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স করা, এসব তো আছেই, তা ছাড়া রোজ ওষুধ বিক্রির হিসেব রাখা—রোগীর প্রেসক্রিপসন কালেক্ট করা, এও বাদ যায় না। কেবল পারে না ওষুধ তৈরি করতে।

বন্ধু বান্ধবরা পরামর্শ দেয়, সেটুকুও আয়ত্ত করে নেবার জন্তে, তাতে নাকি ভবিষ্যৎ খুলে যেতে পারে।

কিন্তু অমল সরকারের বিশেষ উৎসাহ নেই। এ লাইন যেন ঠিক তার মনোমত নয়। ওই দিনগত পাপক্ষয়। তার ইচ্ছে, বড়ো কোনো অফিসে ঢোকে। দশটা থেকে পাঁচটা ফ্যানের তলায় ব'সে লেজার থেকে ফাইল ঘাঁটা-ঘাটি করে। নানা রকমের এ্যালাউন্সের সঙ্গে বাঁধা মাইনের বরাদ্দ ঠিক থাকলেই তার ছোট্ট সংসার হাসিখুশিতে চলে যাবে এক রকম।

এখানে সবচেয়ে যা অসুবিধে সেটা হচ্ছে ছুটির অভাব। ছুটি বলে কিছু নেই। রোজই সকাল থেকে এগারোটা পর্যন্ত আর ওদিকে পাঁচটা থেকে আটটা। মাইনে যা, তা ব'লে বেড়ানো যায় না।

তবু অমলকে বিয়ে করতে হয়েছিল, কিন্তু ইলা কী করে যে এই অপরিচিত আকর্ষণশূন্ত মানুষটির কণ্ঠলগ্না হল, সে ইতিহাস জানা নেই। এ বিয়েতে ইলার মতামতের কোনো প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছিল কি না সে তত্ত্বও আজ ইলার একান্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অমল এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার কাছে দু'টি সত্য দু'টি নক্ষত্রের মতো অচঞ্চল। প্রথমতঃ ভালো চাকরী তাকে জোগার করে নিতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ পৈতৃক এই বাড়িটুকুকে গুছিয়ে নিতে হবে, সংস্কার করতে হবে।

ইলা এ বাড়িতে প্রথম এসেই স্বামীর আয় ঐশ্বর্যের ওপর একটা সকরুণ দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। সেই সঙ্গে কেন জানি না, ওই বৃদ্ধা পঙ্গু মানুষটির ওপর তার সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিল।

তার এই দুর্দশার প্রথম পদপাতে হঠাৎই যেন মনে হল ওই বৃদ্ধাই তার এক মাত্র আশ্রয়। সত্যিই আশ্রয়,—এ বাজারে এই আয়ের ওপর ভরসা করে অনেক অবিবেচকই তরুণী ভার্যার ভার গ্রহণের জন্তে ভাগ্যের ওপর ভরসা করে এগিয়ে আসে কিন্তু—

কিন্তু ইলা বুঝেছিল, সে ভরসার পরিণতি। বড়ো ভয়া·হ! আজ এই আশ্রয়টুকু না থাকলে, অমলের বিয়েতে আপত্তি হত না, কিন্তু তাকে আজ পথে দাঁড়াতে হত।

মা-বাপ আজও যেমন চিন্তা করেন নি, সেদিনও যে চিন্তাকে বড়ো প্রশ্রয় দিতেন তা মনে হয় না।

ঘরগুলো ছোটো হোক, তবু চারখানা ঘর। দু'খানা ভেতর দিকে। মাঝে সরু এক ফালি বারান্দা। বারান্দার ওপাশে আর দু'খানা ঘর। বাইরে দিকের ঘরখানার কোণে পাঁচীলের ধারে ছোট্ট এক টুকরো জমি। সেই জমিটুকু আলো করে ফুটন্ত গোলাপ। একটি মাত্র গাছ—একটি-দুটির বেশি ফুলও ফোটে না। বয়েস অল্প। এখনো দেখলেই মনে হয় কৈশোরের ঘোর লেগে আছে ছোটো ছোটো পাতাগুলিতে। বেশি ফুলের ভার সইতে পারে না। সইতে পারে না দুরন্ত বাতাসের সোহাগ। অতি সাবধানে একান্ত লজ্জায় সবার অগোচরে রাত্রি ভোরে হয়তো এক বার ফুল ফোটায়। সারা দুপুর ধরে ভ্রমর গুন্‌গুন্ করে অভিযোগ করে বেড়ায়। কিশোরী গোলাপ লজ্জায় যেন মিশিয়ে যায় পাঁচীলের গায়ে।

ইলা মুগ্ধ চোখে দুপুর-বিকেল তাই দেখে। ও যেন তার মেয়ে।

সত্যিই ইলা না থাকলে আজ কি এত বড়োটি হতে পারত? ইলার হাতের যত্ন—আজ কি গোলাপ তুলতে পারে?

ইলা যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এল, তখনই ও আবিষ্কার করল একে। সরু একটা ডাল মাটিতে পোঁতা। মাথায় গোবর দেওয়া। একান্ত অযত্নে পড়ে রয়েছে এক পাশে। তবু ছোটো ছোটো সবুজের আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে ডালটার গা থেকে।

DALDA
ডালডা

কী মনে হল, ইলা লেগে পড়ল পরিচর্যায়। মাটি খুঁড়ে ঢেলা গুঁড়িয়ে মোলায়েম করে দিল। জল দিতে লাগল ঠিক সময়ে। তার পর একটু একটু করে গাছ বাড়তে লাগল। একটি দু'টি ক'রে পাতা গজালো।

এক দিন মহা আনন্দে বুঝি ইলা অমলকেও এ সুসংবাদ দিতে গিয়েছিল। অমল কি শুনেছিল তা জানা নেই, উত্তরে গম্ভীর ভাবে বললে— কিছু টাকা যোগাড় করে দিতে পার? তাহলে—

অবাক হয়ে ইলা বললে—তাহলে কী করবে? একটা বাগান?

অমল বললে—সামনে সীজন্ আসছে। ভাবছি এক বার চেষ্টা করে দেখব।

ইলার আর তর সয়না, রোজই ভোরে উঠে এক বার আসবে দেখতে। কত বড়োটি হল। কবে কুঁড়ি ধরবে—ফুল ফুটবে।

কিন্তু আশ্চর্য। গাছ যেন আর বাড়তেই চায় না। এরই মধ্যে বুঝি টের পেয়েছে পৃথিবীর হাওয়ায় বড়ো লোভের তাত!

ইলা মনে মনে হাসে, আ গেল হতভাগী! চির কাল বুঝি কচিখুকিটি হয়ে থাকলেই চলবে! বড়ো হতে হবে না?

ছোটো গোলাপচারা সে ইঙ্গিত বোঝে কি না জানি না, তবু তার কচি কচি পাতা ঝির-ঝির বাতাসে নড়ে ওঠে, হালকা-হাসির ভারে পাতলা ঠোঁটের মতো।

এমনি ভাবে কত দিন গেল। হঠাৎ এক দিন ইলা দেখল তার গাছ বড়ো হয়েছে। কিন্তু এমন লতিয়ে পড়ছে কেন? ব্যাধি ধরে নি তো?

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হলনা। লতানে গোলাপের বংশ। জড়িয়ে লতিয়ে বাড়বে।

মনে পড়ল ইলার, তারও এক দিন পনেরো বছর বয়েসটা এসেছিল। কোথা থেকে যে সেদিন লজ্জার জোয়ার এল, আজ ঠিক ভেবে উঠতে পারে না। কারণে অকারণে কেবলই লজ্জা। কেউ হাসলে লজ্জা, কেউ ঠাট্টা করলে লজ্জা, কেউ তাকালে লজ্জা। তখন মনে হত, বিশ্বসুদ্ধ মানুষ যেন তাকিয়ে তাকে দেখছে। এমন করে আগে তো কেউ দেখেনি!

আজ গোলাপ গাছকে লতিয়ে যেতে দেখে ইলা হেসেই খুন। —ও, তাই ভাবি মেয়ে মাথাটি তোলে না কেন? এত দিনে বুঝলাম—কোন ঘরের মেয়ে তুই? তাই এত লজ্জা!

তার পর হঠাৎ এক দিন এক পশলা অকাল বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে লজ্জার ভোল গেল বদলে। গায়ের রঙ হল গাঢ় সবুজ—পাতার খাঁজগুলো দেখা গেল নিখুঁত। মনে হল মেয়ে এবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, দু'-একটা কুঁড়িও যেন উঁকি মারছে।

তার পর সত্যিসত্যিই ফুল ফুটল। কিন্তু লাল নয়—কেমন যেন সাদা ভাব।

তা হোক, সাদাই ভালো। ইলার মনে আর খুশি ধরে না। এত দিনে তার পরিশ্রম আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝি সফল হল।

ইলা সেদিন বিকেলে গা ধুলো; বাক্স থেকে বের করল ভালো একখানা শাড়ি। কপালে বড়ো করে পরল সিঁদুরের টিপ—অনেক দিন পর চোখে দিল কাজল! আর—

আর নিজে হাতে সেই ফুলটি তুলে গুঁজল খোঁপায়। তার পর এসে দাঁড়ালো আয়নার সামনে।

কত বার ঘুরে-ফিরে নিজেকে দেখল—যেন একখানি ছবি! মনে মনে ভাবল, আজ ওকে অবাক করে দেবে। কিন্তু—

কিন্তু সে ব্যর্থ রাত্রির কাহিনী থাক। বুকের মধ্যে সোহাগ-কাঙাল কামনা-বধূটির দীর্ঘ শ্বাস বুঝি কোনো দিনই বুকের বাইরে নিজেকে প্রকাশ করে না। ইলার বুকেও তো অমনি এক কামনা-বধূ আজও অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করে আছে!

পরের দিন ভোরে শুধু শুকনো ফুল মেঝেতে ঝরে পড়ে রইল। তবু ছুটে গেল ইলা সেই মাটি টুকুর কাছে। সারা রাত্রের চোখের জলে সে কেবল ওই গোলাপ গাছটিরই ছবি এঁকেছে যে।

অমল এক দিন বাড়ি ফিরল খুব খুশি মনে। আজ লের কাঁকে বুঝি একটা ক্যাপ্ষ্টানও।

বললে চেঁচিয়ে—বাস্ ঠিক হয়ে গেছে।

ইলা আশ্চর্য হয়ে বললে—কী ঠিক হল!

—মনে বড়ো কষ্ট ছিল, নতুন বিয়ে করে আনলাম, কোন দিনও সুখের মুখ দেখাতে পারলাম না। কী করব, টাকাতো ওই কটা—

ইলা গম্ভীর ভাবে বললে—আসল কথাটা কি?

অমল হেসে বললে—ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

ইলা বললে—তাহলে তুমিও এখন ভগবানের দিকে মুখ চেয়ে থাকো, আমি চললাম, ভাত ধরে গেল বোধ হয়।

অমল বললে—শোনো শোনো সব ঠিক করে এসেছি। এমন কি আগাম পর্যন্ত দেবে ঠিক হয়ে গেছে। সামনে মাস থেকে রাস্তার দিকের ঘর দুটো ভাড়া দিয়ে দেব।

ইলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তখনই কিছু বলতে পারল না।

অমলের চোখ দুটো খুশিতে নেচে উঠল। নিচুগলায় বললে—থার্ টি রুপিজ গিন্নি, থার্ টি রুপিজ!

ইলা বললে—ভাড়াটে বসাবার কথা মনেও ভেবো না। ও-সব আমি পছন্দ করি না।

তার পর একটু থেমে বললে—কেন, এত লোভ কিসের? সংসার কি অচল হয়ে পড়েছে? দু'টি তো মানুষ। মায়ের কথা বাদ দাও। ছেলেপেলের বালাইতো নেই-ই।

অমল ক্ষুব্ধ স্বরে বললে—ভাড়াটে আমি বসাবোই। তুমি বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না। তা ছাড়া, টাকাকড়ির ব্যাপার পুরুষের, এতে মেয়েদের নাক গলাতে আসা ঠিক নয়।

ইলা বললে—তোমার কম্পাউণ্ডারিতে কত দূর কী উন্নতি হল, সে খবর আমি রাখতে যাইনা; কিন্তু বাড়িতে ভাড়াটে এলে তার খুটিনাটি সব ব্যাপারে আমাকেই এগোতে হবে। সতীনের সঙ্গে ঘর করা আর ভাড়াটের সঙ্গে বাস করার জ্বালা মেয়েদেরই পোয়াতে হয়।

কিন্তু আসল কথা যা, সে কথা ইলা চেপে গেল। ও ঘর দুটো ভাড়া দেওয়া মানেই তার সাধের গোলাপকে চির দিনের মতো বিসর্জন দেওয়া! এত বড়ো দুর্ঘটনা ইলা সইবে কেমন করে?

ইলা ইচ্ছে করেই অমলের কাছে সে কথা তুললো না। অমল গোলাপ ফুল চেনে, কিন্তু গোলাপের কথা বোঝেনা। শেষ পর্যন্ত ইলারই জয় হল। অমল দুদিন রাগ করে বাড়িতে খেলনা বটে, কিন্তু রাগ পড়তে তার দেরি হলনা। অমলের রাগ পড়ল কিন্তু পরের সপ্তাহেই রোগে পড়লেন মা। প্রথম প্রথম তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু দিনে দিনে রোগ জটিল হতে লাগল, উপসর্গ বাড়তে লাগল।

ইলা কেঁদে পড়ল—ওগো আরও এক জন ডাক্তার দেখাও।

অমল গম্ভীর হয়ে বললে—নতুন ডাক্তার দেখাবার দরকার নেই, চিকিৎসা ঠিকই হচ্ছে, ওষুধও ঠিক পড়ছে, কিন্তু—

—কিন্তু কি বল?

—উপযুক্ত পথ্য দিতে পারছিনা যে! একটা হরলিক্সের দাম কত জান? তা ছাড়া দামী দামী ইন্‌জেকশান, ডাক্তার বিনা পয়সায় আর কত দেবেন? এখন অন্ত জায়গা থেকে কিনে আনতে হবে। সে টাকাই বা কই? এমনিতেই দেনা হয়ে গিয়েছে কিছু—

অমল একটু থামল। তার পর আবার বললে,—তখন বাধা দিলে; আজ যদি ঘর দুটো থেকে ভাড়া আসত তা হলে হয়তো পথ্য-চিকিৎসার অভাবে মাকে মরতে বসতে হত না।

ইলার দুই চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা। ছুটে এসে অমলের দু'হাত ধরে কাতর স্বরে বললে—এখন এক বার চেষ্টা করে দেখোনা।

গোলাপের কথা যে সে মুহূর্তে ইলার মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু মনকে বুঝিয়েছিল, ভাড়াটে আসবে আসুক; তার সঙ্গে গোলাপের সম্পর্ক কী? সে যেমন রোজ যায় তেমনি যাবে, দেখবে, আদর করবে, জল দেবে, সার দেবে। ফুল?

না, ফুল আর তুলবে না। ওই এক দিন যা তুলেছিল। আর নয়। তার ঘরে ফুলের সম্মান কেউ দেয় না! ওর চেয়ে বরঞ্চ গাছের ফুল গাছেই ঝরে যাক।

অবশ্য অন্যের সংসারের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের অসুবিধে আছে। তা আর এমন কি? এইটুকু আর ভাড়াটেরা সহ্য করতে পারবে না? বিশেষ সে যখন মহিলা।

শেষে সত্যিই এক দিন গাড়ি বোঝাই মালপত্তর নিয়ে নতুন ভাড়াটে এল। ইলা শুনেছিল ভাড়াটেরা লোক খুব ভালো, ফ্যামিলিও বড়ো নয়। তাদেরই মতো স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু আজ প্রথম দর্শনেই ইলা দেখল অমলের সেদিনের আশ্বাসবাণীর সঙ্গে কিছু গরমিল চোখে পড়ছে।

প্রথম আশ্বাসটির সত্যমিথ্যা এখুনি ধরা যাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখাই যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী তো আছেই। সঙ্গে আবার যোগাযোগা দু'টি ছেলে। পেছনে একটি ছোকরা—নিশ্চয়ই অনাত্মীয় নয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল নামাচ্ছে।

ইলা এগিয়ে এল না। দূর থেকে চুপচাপ দেখে গেল। ভদ্রতার ভার সেদিন অমল নিজেই নিয়েছে। আলাপ হতে দেরি হল না। বৌটি নিজেই এসে আলাপ করে গেল। বয়েসে ইলার চেয়ে বড়ো। চোখ দুটো ছোটো। দেখলেই মনে হয় সংসারের ধকল সইতে পারছে না।

প্রথম আলাপেই ইলাকে 'দিদি' 'দিদি' বলে সম্বোধন করছিল। ইলার ভালো লাগছিল না। সে যেন ওর চেয়েও বড়ো। এক সময়ে বলে ফেললে—আপনি আমাকে বোনের মতো দেখবেন, আমিই বরঞ্চ আপনাকে 'দিদি' বলব।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—বেশ, তাই হবে। কথা শেষ করে তিনি আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

ইলার মুখটা হঠাৎ কেমন লাল হয়ে উঠল। বললে,—হাসছেন যে?

—ঠাকুরপোর কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে।

ইলা বললে—ওই যে ভদ্রলোক থাকেন, উনি আপনার ঠাকুর পো?

—হ্যাঁ।

ইলা বললে—সেই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, ওঁদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখলেও কিন্তু দু' ভাই বলে মনে হয় না।

ভদ্রমহিলা সহজ ভাবে হেসে বললেন—ও বয়েসে উনিও অমন সুন্দর ছিলেন। এখন একটু মোটা হয়ে পড়েছেন। ওদের বংশের ধারাই এই।

ইলা কী ভেবে বললে—হ্যাঁ, কী কথা বলছিলেন যেন?

—ঠাকুরপোর কথা। পরশুদিন ওর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, ঠাকুরপো ও মেয়েটির বয়েস আন্দাজ করতে পার?

ঠাকুরপো সঙ্গে সঙ্গে বললে—বয়েস বলতে পারব না, তবে তোমার চেয়েও যে বড়ো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, অমন চোখ নিয়ে আর মেয়েদের দিকে তাকিও না, মেয়েরা হাসবে। কিন্তু কী বলব, ঠাকুরপো কিছুতেই মানবে না আমার কথা। শেষে বাজি পর্যন্ত ধরা হয়েছে। ভদ্রমহিলা কথা শেষ করে হাসতে লাগলেন।

ইলার বুকের ভেতর একটা নিষ্ফল আক্রোশ গর্জে উঠছিল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারল না। শুধু বললে—বাজি জিতে মিষ্টি খাবার সময় আমাকেও একটা ভাগ পাঠাবেন। আপনার ঠাকুরপোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব।

ভদ্রমহিলা বললেন—পাঠাব কেন? আমি নিজে ধরে নিয়ে যাব আপনাকে। তাকে শাসন করার ভারটা ওর সামনেই আপনাকে দেব। ভদ্রমহিলা উঠে পড়লেন।

ইলা এক বার ভাবলে,—এই বার গোলাপ গাছটার কথা এক বার বলে নেয়। কিন্তু তখনই বলতে পারল না, কেমন একটু লজ্জা করল।

গোলাপ গাছটার কথা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইলা না বলে পারে নি।

শুনে ভদ্রমহিলা বললেন—ও মা, এ কী আবার বলছে! আপনার বাড়ি, আপনার গাছ, আপনি যত বার খুশি আসবেন যাবেন, দেখা-শোনা করবেন, তাতে আমাদের আপত্তি কী? বরঞ্চ আপনাকে বেশি করে পাব, এ একটা মস্ত লাভ।

ইলা খুশি হল। সেই থেকে শুরু হল ইলার যাতায়াত।

দু'-বেলা যায়, মাটিগুলো খুঁড়ে নরম করে দেয়, জল দেয়, কুঁড়ি ফুটতে কত দেরি, আগ্রহভরে লক্ষ্য করে।

এক দিন অমনি বিকেল বেলা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল, ভদ্রমহিলার ঠাকুরপোটির সঙ্গে দেখা।

খালি গায়ের ওপর একটা গামছা, কাপড়টা লুঙ্গির মতো করে পরা। চোখোচোখী হতেই ভদ্রলোক সরে দাঁড়ালো। ইলা মাথার কাপড়টা টেনে দ্রুত পায়ে চলে গেল। তারই ফাঁকে চোখে পড়ল ভদ্রমহিলার আর এক রূপ। কার সঙ্গে যেন ঘুঁটের দর নিয়ে ঝগড়া করছেন।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বৌটি এল। এ-কথা ও-কথার পর বললে—একটা কথা বলব ভাই, যদি কিছু মনে না করেন।

ইলা বললে—কী বলুন।

—ঠাকুরপো বলছিল, যদি একটা সময় ধরে যান—মানে, আজ ও গা ধুতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে আপনি গিয়ে পড়েছিলেন। ও বড়ো অপ্রস্তুতে পড়েছিল। বড্ড লাজুক ছেলে কি না।

ইলা চুপ করে রইল। আশ্চর্য হল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ঠাকুরপো এ কথা বলতে পারে না।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—কী, রাগ করলেন না তো?

ইলা গম্ভীর ভাবে বললে—না, রাগের আর কী আছে।

কিন্তু রাগের ব্যাপারও ছিল; তাই এর পর অতি সামান্য কয়েকটি কারণে দুই পরিবারের মধ্যে এক দিন সত্যিই বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠল। সে ভাবটা এত তাড়াতাড়ি এত দূর গড়ালো যে সদ্ভাব তো ঘুচে গেলই, এমন কি উভয়ের মধ্যে সামান্যতম ভদ্রতাচরণের অভাবটাও অভাবনীয় হয়ে উঠল।

ইলা এক দিন অমলকে বললে—ওদের তুলে দাও এখান থেকে। বৌটা নাকি ঘুঁটে বিক্রি করে। সেদিন গিয়ে দেখি গোবর দিয়ে দিয়ে দেওয়ালগুলোর অবস্থা করেছে কী—?

অমল বললে—নিশ্চয়ই তুলব। কিন্তু এ মাসটা থাক, বড্ড টানাটানি।

ইলা বললে—যত সব ছোটোলোক—

অমল বললে—আরে রামঃ, এ জানলে কি আর খাল কেটে কুমীর আনি!

তার পর একটু থেমে বললে,—আজ ওরা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল কোথায়?

ইলা বললে—ওদের বাড়িতে একটা নতুন মেয়ে এসেছে। সে বুঝি ভুল করে আমাদের এদিকে কাপড় শুকোতে দিয়েছিল, বৌটা খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে—ওরে রুবি, করছিস কি? খবরদার—খবরদার। এক্ষুণি তোকে আস্ত গিলে খাবে।

অমল অস্পষ্ট ভাবে মুখে একটা শব্দ করলে—হুঁ! তার পর বললে—আমি সামনে মাসেই ওদের নোটিশ দেব। দুষ্ট গোরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।

পরের দিন সকালে হঠাৎ বৌটির সঙ্গে ইলার চোখোচোখী হতেই বৌটি মুখের ওপর সশব্দে দরোজাটা বন্ধ করে দিলে।

ইলা তখন কিছু বললেনা। আস্তে আস্তে মুখ ধুয়ে মায়ের ঘরে এসে ঢুকল। তার পর মুখ ধোবার জল, ছাড়বার কাপড় দিয়ে আবার গেল কুয়োতলায়।

কুয়োতলার সামনেই ওদের ঘর। বেশ একটা জটলা বসেছে। হাসি গল্প চলছে। বোধ হয় এখন চা-আসর বসেছে। ঠাকুরপোর গলাও পাওয়া যাচ্ছে। বেশ ফুর্তিবাজ ছোকরা। ইলা শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—দুষ্টু গোরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।

বলেই ইলা পালিয়ে এল। এখুনি নেপথ্যে প্রত্যুত্তর আসবে। সে বাণ সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। তা ছাড়া এসব নোংরামি ভালও লাগেনা। কবে যে আপদ বিদেয় হবে।

কিন্তু আপদ বিদেয় হবার তো কোনো লক্ষণই চোখে পড়ে না। আজ টেবিল আসছে, কাল চৌকি আসছে, পরশু লাগছে ঠিকে-ঝি। আর এই একটা মেয়েও আবার কবে প্রজাপতির মতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

মেয়েটা কিন্তু মন্দ না। হালকা-পাতলা গঠন। মুখটা বড়ো স্নিগ্ধ। হাসিখুশি সব সময়ে। যেন উড়ে বেড়ায়। ইলার সঙ্গে চোখোচোখী হলেই মুচকে হাসে। আলাপ করতে চায়।

এক দিন লুকিয়ে লুকিয়ে আলাপও হয়েছিল। ওই ঠাকুরপোটির কাকীমার বোন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে মাস দুয়েকের জন্যে বেড়াতে এসেছে।

কিন্তু ইলা এবার হুঁশিয়ার হয়েছে। মেয়েদের বিশ্বাস নেই। তাই রুবির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করে না। দূর থেকে দু'একটা কথা বলে এড়িয়ে চলল।

কিন্তু রুবি আসে। ইচ্ছে হয় বসে একটু গল্প করে, কিন্তু ইলা বসতে বলে না। কী জানি—যা ও বাড়ির ঠাকুরপো-বৌদি! রুবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যায়।

সেদিন বিকেলে চুপচাপ বসে ইলা কী ভাবছিল। মনটা অকারণে বড়ো খারাপ হয়ে আছে। অনেক দিন আগের অনেক সব ভুলে-যাওয়া কথা হঠাৎ আজ নতুন করে মনে পড়ছে। এ রকম যে কেন হয়, তা আজ পর্যন্ত ইলা বুঝে উঠতে পারেনা। এক এক সময়ে তাই তাকে মনের কাছে এমনি নিষ্ঠুর ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

না না কথার মধ্যে আজ অনেক দিন পর তার গোলাপ গাছটার কথা মনে পড়ল। উঃ কতদিন দেখেনি। আশ্চর্য! এত দিন ঝগড়া-ঝাটির মাঝে সে কেমন অক্লেশে ভুলে ছিল।

কিন্তু আজ আবার নতুন করে তার সেই পুরনো দরদ উথলে উঠল। না জানি সে গাছটা এত দিনে কত দূর লতিয়েছে, কত ফুল ফুটেছে—কত ফুল ঝরেছে এই দীর্ঘ সময়ে! সাদা সাদা গোলাপ, সন্ধ্যের অন্ধকারে ওইটুকু জমি আলো করে থাকত।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন ভয় হল ইলার। গাছটায় জল দেয় তো? মাটিগুলো নড়িয়ে-চড়িয়ে দেয়? না কি তাদের সঙ্গে শত্রুতা আছে বলে গাছটাকেও শুকিয়ে মারছে তিলে তিলে?

ইলার চোখ ফেটে জল এল। ভাবলে, এক বারটি যদি গাছটা দেখতে পেতাম—শুধু এক বার? যদি দেখা নাও হয়, তাহলে অন্তত একটা খবর—একটা কুশল সংবাদ!

কিন্তু উপায় কি?

তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। কালো অন্ধকার নেমে আসছে

আকাশের বুক থেকে। আজ চারি দিক বড়ো স্তব্ধ। অমল গিয়েছে ডাক্তারের সঙ্গে বাইরে, শাশুড়ীর শরীর খারাপ, বিকেল থেকে ঘুমোচ্ছেন। ও বাড়িটাও কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। বাড়ি শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে গিয়েছে কোথাও মজা মারতে। কেবল আজ এই সব শূন্যতার মধ্যে সে একা। আজ যেন সে কেমন হাঁফিয়ে উঠছে। এ রুক্ষ জীবন আর ভালো লাগছে না। এমনি সময়ে কে যেন এল বারান্দায়।

চমকে উঠে ইলা জিগ্‌গেস করলে—কে?

—আমি বৌদি।

রুবি এল।

বড়ো সুন্দর লাগছিল আজ রুবিকে। বিকেলে গা ধুয়েছে—চোখে দিয়েছে কাজল। পরণে একটা কমলা রঙের শাড়ি। খোঁপায় গোঁজা একটা গোলাপ—সাদা গোলাপ। চমকে উঠল ইলা। দু'চোখ বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠল। এ ফুল যে তারই গাছের। তাহলে সে গাছ বেঁচে আছে, আজও ফুল ফোটে।

লোভীর মতো ইলা ছুটে এসে হাত পাতল—দেখি দেখি ফুলটা।

রুবি কিন্তু কেমন হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে করুণ চোখে বললে—কী করবেন?

—দেখি না।

রুবি ফুলটা খোঁপা থেকে খুলে ইলার হাতে দিল। ইলা দেখল, ফুলটা দিতে গিয়ে রুবির হাত যেন কাঁপল।

ইলা বললে—ফুলটা আমায় দিয়ে যাও। রুবি চমকে উঠে খপ্ করে ফুলটা তুলে নিয়ে বললে,—না, এটা নয়। বলেই ফুলটা খোঁপায় গুঁজে ত্রস্ত পায়ে চলে গেল।

ইলা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। আশ্চর্য! রুবি তো তাকে ফুলটা দিল না। সামান্য একটা ফুল, কিন্তু রুবির কাছে তা অসামান্য!

অনেক দিন পর আজ আবার ইলার বুকটা টনটন্ করে উঠল। অনেক দিন—অনেক দিন সে দেখেনি তার গাছ। না জানি কত বড়ো হয়েছে—কত ফুল ফোটে রোজ!

এক বার ভাবলে যায়, চুপি চুপি চোরের মতো দেখে আসে। শুধু চোখের দেখা। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে, না থাক। যা ছোটোলোক ওই বউটা!

একটু পরে আবার মনে পড়ল, আজ তো বাড়িতে কেউ নেই। যে আছে সে তো ওই রুবি—এক ফোঁটা মেয়ে। না হয় ওকে গিয়েই বলবে, গাছটা একটু দেখব। যদি বলে দেয়?

দেয় দেবে। তার নিজের বাড়ি, নিজের পরিচর্যায় বড়ো ক'রে তোলা গাছ,—না হয় মাস গেলে তিরিশটা করে টাকাই দেয়, তা বলে তো এ সব ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

সত্যি সত্যিই ইলা আজ অনেক দিন পর এগিয়ে চলল। এ বাড়ি তার নিজেরই। এক দিন—খুব বেশি দিন নয়, এই বাড়ির এই দরোজা দিয়ে কত বার আনাগোনা করেছে—কত দুপুর ভেতরের সিঁড়ির ওপর বসে তাকিয়ে থেকেছে তার সাধের গোলাপ-লতার পানে। তবু আজ সেই পরিচিত পথেই চলতে কী সংকোচ!

কিন্তু এত অন্ধকার কেন? বাড়িতে কেউ নেই বলে কি মেয়েটা আলোও জ্বালতে পারে নি? সহসা ইলা থমকে দাঁড়ালো। কী যেন শুনল নিজে কানে! কী যেন দেখল এই মুহূর্তে! সেই অন্ধকারে নিজের চোখ দুটোকে আরও উজ্জ্বল করে তাকালো ইলা। না, ভুল দেখেনি। সেও রয়েছে।

সেই মুহূর্তে সহসা ইলার চোখের সামনে খুলে গেল আর এক জগতের সিংহদ্বার। বুকের ভেতরটা যেন হঠাৎ হু-হু করে জ্বলে উঠল,—বহু কালের সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস আজ যেন ঝড়ের বেগে তার হৃদ্‌পিণ্ড খান্ খান্ করে দিতে লাগল।

রাগ নয়, অভিমান নয়—এ যে ঈর্ষা! এ ঈর্ষা আজ এল কোথা থেকে? কোন্ অতলান্ত রহস্য-লোকের গহ্বর থেকে? একবার ভাবলে, এই মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়ায় ওদের মাঝে। বৈরী নিপাত হোক।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে, না থাক। বড়ো সাধ করে রুবির খোঁপায় ফুল গুঁজে দিয়েছিল ছেলেটি। সে গোলাপ তো তারই। তারই হাতের গুণে না এত বড়ো হয়েছে—এত সুন্দর হয়েছে।

ইলা পায়ে পায়ে ফিরে চলল। খুব সাবধানে পা ফেলছে যেন শব্দটি না হয়। ও ঘরে এখন দু'টি হৃদয় মিলিত হয়েছে, অনুভব করছে পরস্পরকে—ব্যাঘাত না ঘটে।

কিন্তু অবাধ্য চোখের জল কেবলই যে তার দৃষ্টি রোধ করে দিচ্ছে।

ডি. এচ. লরেন্স

পল চোখ তুলে চাইল এবার। মিরিয়ামকে দেখে কৃতজ্ঞতা জাগল তার মনে। বললে, 'সে কী! তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ আমার জন্তে?'

মিরিয়াম দেখল পলের চোখে গভীর বিষাদের ছায়া। বললে, 'কী হয়েছে?'

'এই স্প্রিংটা ভেঙে গেছে।' বলে ছাতাটা যেখানে ভেঙে গিয়েছিল মিরিয়ামকে দেখাল পল।

মুহূর্তে মিরিয়াম বুঝতে পারল পল নিজে এর জন্তে দায়ী নয়। এ জ্যাক্রের কাণ্ড, ভেবে মিরিয়ামের লজ্জা হতে লাগল। বললে, 'ছাতাটা ত' পুরোনই ছিল, তাই নয়?'

এই সামান্ত ব্যাপার নিয়ে পল কেন যে তিলকে তাল করে তুলছে বুঝতে না পেরে মিরিয়ামের আশ্চর্য্য লাগল। পল আস্তে আস্তে বললে, 'কিন্তু এটা যে উইলিয়মের ছাতা। মা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।' বলে আবার ছাতাটা সারবার জন্তে পরম ধৈর্য্যসহকারে চেষ্টা করতে লাগল।

পলের কথাগুলো যেন ছুরির ফলার মত মিরিয়ামের মনে এসে বিঁধল। পলকে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, তার পরিণতি এই! সে পলের দিকে চেয়ে রইল। ওর আশেপাশে কোথায় যেন একটা নিঃসঙ্গতার বর্ম, তাকে ভেদ করে মিরিয়াম ওকে সান্ত্বনা দেবে কিম্বা দুটো মিষ্টি কথা বলবে, এমন সাহসও তার হ'ল না। পল বললে, 'চল এবারে। আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।' আর কোন কথা না ব'লে দু'জনে চলতে লাগল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নেদার হ্রদের ধারে মাঠের উপর বেড়াচ্ছিল দু'জনে। পলের কথার সুরে অস্পষ্ট বিরক্তি, যেন নিজেকে বোঝাতে না পেরে তার অশান্তির সীমা ছিল না। গলায় একটু অতিরিক্ত জোর দিয়ে পল বললে, 'তুমি শোন, আমি বলছি, একজন যদি ভালবাসে তা'হলে অন্ত জন ভাল না বেসে থাকতে পারে না।'

'তাই ত' বলছি আমি।' মিরিয়াম জবাব দিয়ে বললে, 'ছোটবেলায় মা আমাকে বলতেন, ভালবাসা থেকেই ভালবাসা জন্মনের।'

—'হাঁ, ওই ধরণেরই কিছু হবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এমনই হয়।'

—'আমিও তাই ভাবি। তা যদি না হবে, তাহ'লে ভালবাসাটা তো একটা ভয়ঙ্কর জিনিস হয়ে দাঁড়াত।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু অনেকের কাছেই ভালবাসা বাস্তবিক ভয়ঙ্কর।'

মিরিয়াম ভাবল পল ভরসা পেয়েছে নিজের মনে, সে নিশ্চিন্ত হ'ল, নির্ভয় হ'ল। সেদিন গলির মুখে হঠাৎ পলের সামনে এসে পড়া, এটাকে দৈবের ইঙ্গিত বলেই সে মেনে নিয়েছিল। আজকের এইটুকু কথাবার্ত্তা তার মনে খোদিত-লিপির মতই উৎকীর্ণ হয়ে রইল।

এখন থেকে সে শুধু পলের সঙ্গে, শুধু পলেরই জন্তেই। এই সময়ে একদিন বাড়ির সবাই পলের ব্যবহারে নিজেদের অপমানিত বোধ করেছিল, কিন্তু মিরিয়াম এসে দাঁড়াল পলের পাশে, তার বিশ্বাস পল ঠিকই করেছে। এখন থেকে মিরিয়ামের স্বপ্নে ফুটে উঠতে লাগল পলের ছবি, সুস্পষ্ট, অবিস্মরণীয়। আবার ক্রমশঃ একই স্বপ্ন আরও সূক্ষ্ম মনোগত রূপে বিকাশ লাভ করে বার বার দেখা দিতে লাগল।

মিরিয়ামের এক বড় বোন ছিল, তার নাম অ্যাগাথা—সে ছিল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এই দু'টি মেয়ের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল। মিরিয়ামের মনে হ'ত অ্যাগাথা একেবারে ষোল আনা সংসারী। আর তার ইচ্ছা ছিল, সেও স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়।

একদিন শনিবারের বিকেল বেলা অ্যাগাথা আর মিরিয়াম উপর তলায় সাজ-সজ্জা করছে। তাদের শোবার ঘরটা আস্তাবলের ঠিক উপরে। বেশী বড় নয় ঘরটা, নীচু, আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। দেয়ালের উপর পেরেক দিয়ে মিরিয়াম ভেরোনীজ-এর আঁকা 'সেণ্ট ক্যাথারীণ'-এর ছবি টাঙিয়েছে। তার ভাল লাগে ঐ মেয়েটিকে, জানালায় বসে কী এক স্বপ্নে সে বিভোর। তার নিজের জানালাগুলো ভারী ছোট, বসবার মত নয়। কিন্তু সামনের জানালাটি লতা-পাতায় ঘেরা, সেদিক দিয়ে চাইলে নীচের আঙিনার ওপারে ওক্-বনের গাছের মাথাগুলো চোখে পড়ে। পেছনের ছোট জানালাটি একটা রুমালের চেয়ে বড়ো হবে না। ওটা তার পূব-দিকের ঘুলঘুলি, ওই দিক দিয়েই তার আদরের গোলাকার পাহাড়-গুলোকে বেয়ে উষার আবির্ভাব।

দু'টি বোন পরস্পর কথা বলত খুব কম। অ্যাগাথা ছিল দেখতে সুন্দর, ছোট-খাটো আর একগুঁয়ে, বাড়ির পরিবেশের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল তাদের 'অন্ত গাল ফিরিয়ে দেওয়া' নীতির বিরুদ্ধে। বাইরের পৃথিবীতে তার পদক্ষেপ এখন নিশ্চিত, স্বাতন্ত্র্যের পথে অনেক দূর সে এখন এগিয়ে এসেছে। আর সাংসারিক মূল্যগুলোকে মর্য্যাদা দেবার কথা সে বলত; চালচলন, বেশভূষা, প্রভাব-প্রতিপত্তির মর্য্যাদা স্বীকার করবার দাবী জানাত সে, কিন্তু মিরিয়াম এগুলোকে উপেক্ষা করে চলতে পারলেই বাঁচত।

পল যখন আসে, তখন দু'টি বোনই চাইত তারা যেন উপর-তলায় থাকে, ওর পথে না পড়ে। উপর থেকে ছুটে এসে সিঁড়ির

গোড়ায় দরজা খুলে পলকে দেখা—সে উৎসুক চোখে তাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—দু'জনেই চাইত যেন এমনি হয়। মিরিয়ামকে পল একটা মালা দিয়েছিল, সে সেই মালাটা মাথার উপর দিয়ে গলাবার চেষ্টা করতে করতে এসে দাঁড়াত। মালাটা জড়িয়ে যেতে থাকত তার চুলের জালে। অবশেষে মালাটা সে পরত, তার নরম, বাদামি গলায় কাঠের মালার লালচে খয়েরি আভা সুন্দর মানাত· মিরিয়ামের দেহের বিকাশে ত্রুটি ছিল না, দেখতে সে খুবই সুন্দরী। কিন্তু তার ঘরের চুনকাম-করা দেয়ালে টাঙান ছোট আয়নাটুকুতে তার দেহের অতি সামান্য অংশই ধরা পড়ত এক বারে। অ্যাগাথা নিজের জন্যে একখানা ছোট আরশি কিনেছিল, নিজের সুবিধা মত সেখানা খাটিয়ে নিয়েছিল সে। মিরিয়াম জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ চেনের খুটখাট শব্দ শুনে চেয়ে দেখল পল সামনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বাইসাইকেলখানা আঙিনায় টেনে তুলছে। পলকে বাড়ির দিকে চোখ তুলে চাইতে দেখে মিরিয়াম সঙ্কুচিত হয়ে সরে গেল। পল সোজাসুজি এসে ভিতরে ঢুকছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বাইসাইকেলখানা চলেছে যেন ওটা একটা জীবন্ত পদার্থ।

এদিকে এসে মিরিয়াম বলে উঠল, 'পল এসেছে!'

অ্যাগাথা ঠেস দিয়ে বললে, 'তাহলে ত' তুমি খুসী?'

মিরিয়াম আহত, নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, কেন, তুমি হও নি?'

'হয়েছি কিন্তু ওকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি না, কিম্বা আমি ওকে চাই, এমন মনে করবার সুযোগ দিচ্ছি না।'···

মিরিয়াম চমকে উঠল। শুনতে পেল, নীচের আস্তাবলে পল তার বাইসাইকেলখানা রেখে জিমির সঙ্গে কথা বলছে। জিমি একটা খনির ঘোড়া।

পল বললে, 'ওহে জিমি আছ কেমন? অমন রোগা আর মনমরা দেখাচ্ছে কেন তোমায়? সত্যি, এ ভারী খারাপ, লজ্জার কথা!'

পলের আদরে ঘোড়াটার মুখ উঠাবার সঙ্গে সঙ্গে গর্তের মধ্যে দড়ির শব্দ মিরিয়াম শুনতে পেল। ভারী ভাল লাগছিল তার, আড়িপেতে ঘোড়ার সঙ্গে পলের এই একান্ত আলাপ শুনতে। কিন্তু মিরিয়ামের স্বর্গরচনার মাঝে কোথাও সর্পও ছিল। মনে মনে সে সন্ধান করে দেখল, সত্যি পল মোরেলকে সে চায় কিনা। এর মধ্যেকার লজ্জাটুকু তার অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে গেল। দোটানায় পড়ে তবু তার মনে হতে লাগল পলকে সে সত্যিই চায়। নিজের কাছে নিজেকেই তার অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। তার পর আবার এক নতুন লজ্জায় কেঁপে উঠল তার বুক; যন্ত্রণার পেষণে নিজের মধ্যে নিজেই সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। সে যে পল মোরেলকে চায়, পল কি তা জানে? অস্পষ্ট এক কলঙ্কের স্পর্শ যেন লাগল তাকে; তার সমস্ত সত্তা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল।

অ্যাগাথার সাজসজ্জাই প্রথমে শেষ হ'ল, সে দৌড়ে গেল নীচে। উপর থেকে মিরিয়াম শুনতে পেল, সে উৎফুল্ল সুরে পলকে স্বাগতঃ জানাচ্ছে। সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গে তার ধূসর দু'টি চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মিরিয়াম যেন মানসচক্ষে তা দেখতে পেল। এমন করে পলকে গিয়ে সম্ভাষণ জানাতে মিরিয়াম পারত না, এটা তার নির্লজ্জতা বলে মনে হ'ত। তবু পলকে সে চায়, এই গভীর আত্মগ্লানির যন্ত্রণা তাকে অবিরত পীড়া দিতে লাগল, মুক্তিকে তার মনে হতে লাগল অনেক দূর। এই বিষম জটিলতার জালে আবদ্ধ হয়ে মিরিয়াম হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল: 'হে ভগবান্, পল্ মোরেলকে যেন আমি ভাল না বাসি। তাকে ভালবাসা যদি আমার উচিত না হয়, তা'হলে ভালবাসতে দিও না আমায়।'

এই প্রার্থনার অসঙ্গতিই তাকে কোথায় বাধা দিল। মাথা তুলে সে গভীর ভাবতে লাগল, পলকে ভালবাসা তার অনুচিত হয় কি করে? ভালবাসা ত' ভগবানের দান। তবু তার লজ্জা করতে লাগল, লজ্জা ঐ পল মোরেলের জন্যে। কিন্তু···পলের কথা এখানে অবান্তর, এ ত' শুধু তার নিজের কথা, তার নিজের আর ঈশ্বরের। উৎসর্গ করবে সে নিজেকে, কিন্তু সে উৎসর্গ ভগবানের, পল মোরেলের নয়, তার নিজেরও নয়।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। তারপর বালিশে মুখ লুকিয়ে মিরিয়াম বলতে লাগল: 'ভগবান, ওকে আমি ভালবাসি, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তা'হলে ওকেই ভালবাসতে দাও আমায়। যেমন করে যীশু ভালবেসেছিলেন মানুষের আত্মার জন্যে, তেমনি আত্মার ভালবাসা আমাকে দাও। সেও ত' তোমারই সন্তান, ওর প্রতি আমার ভালবাসাকে মহান্ করে তোল।'

হাঁটু গেড়ে কিছুক্ষণ সে একান্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। গভীর ভাবে আলোড়িত হচ্ছে তার মন। তার কালো চুল এলিয়ে পড়েছে, লাল ফুল-আঁকা লেপের উপর। প্রার্থনার প্রয়োজন তার ছিল। তারপর ধীরে ধীরে আত্মবিসর্জ্জনের গভীর মোহাবেশের মধ্যে সে ডুবে গেল। যে ঈশ্বর নিজেকে বলি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে নিজেকে একাসনে বসিয়ে সে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতে লাগল। অনেকের কাছেই এই আত্মবলির কল্পনার মত প্রবল আনন্দ আর কিছু নেই।

মিরিয়াম যখন নীচে গেল, পল তখন একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে অ্যাগাথার সঙ্গে ভীষণ তর্ক করে চলেছে। পল একটা ছোট ছবি তাকে দেখাতে এনেছিল, অ্যাগাথা তার নিন্দে করছিল। মিরিয়াম একবার মাত্র ওদের দিকে চাইল, ওদের চপলতায় যোগ দেবার ইচ্ছে তার হ'ল না। একটু একা থাকবার জন্যে সে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পলের সঙ্গে প্রথম কথা বলার তার সুযোগ হ'ল চায়ের আসরে। তখনও তার হাবভাব বেশ একটু দূরত্বপূর্ণ। পলের ভয় হ'ল হয়ত অজান্তে সে তাকে কোন অপমান করে থাকবে।

প্রতি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় বেষ্টউডের পাঠাগারে যাবার যে নিয়ম ছিল, মিরিয়াম হঠাৎ একদিন তা ছেড়ে দিল। সারা বসন্তকাল নিয়মিত সে পলের কাছে হাজিরা দিয়েছে। কিন্তু কয়েকটা সামান্য ঘটনা এবং পলের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে ছোট-খাটো অপমান তাকে বেশ সচেতন করে তুললো তার প্রতি সে-বাড়ির লোকেদের মনোভাব সম্পর্কে। সে স্থির করলে আর সে সেখানে যাবে না। একদিন পলকে সে জানিয়ে দিল, এখন থেকে বৃহস্পতিবার রাত্রে তার বাড়িতে তাকে ডাকতে যাবে না।

পল শুধু সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

—'এমনি। আমার ইচ্ছে করে না।'

—'বেশ।'

—'কিন্তু।' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মিরিয়াম বললে, 'তুমি যদি আমার এখানে আস, তা'হলে এক সঙ্গে যাওয়া চলতে পারে।'

—'কোথায় আসব ?'

—'এই কোনোখানে, যেখানে তোমার খুশি !'

—'আমি কোথাও যাব না। তুমি কেন ডেকে নেবে না আমায়, এর কোন কারণ নেই। তুমি যদি না যাও, তবে আমি চাই না তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

বৃহস্পতিবারের এই দেখা-শোনাটুকু তাদের দু'জনের কাছেই ছিল পরম মূল্যবান ; আজ থেকে তা বন্ধ হ'ল। তার বদলে পল মন দিল কাজের দিকে। মিসেস মোরেল এ ব্যবস্থায় যে খুশিই হলেন, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল।

পল কিছুতেই স্বীকার করবে না তাদের দু'জনের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেটা ভালবাসা। তাদের অন্তরঙ্গতা এতদিন রয়েছে ধরা-ছোঁয়ার একান্ত বাইরে, শুধু আত্মার পর্য্যায়ে। এ যেন শুধু একটা ভাবনা, চৈতন্যের রাজ্যে উঠে আসতে বার বার ঠেকে ঠেকে ফিরে যাচ্ছে। পলের কাছে এ প্লেটনিক্ বন্ধুত্ব মাত্র। এ ছাড়া আর কিছু আছে তাদের মধ্যে, পল তা সজোরে অস্বীকার করবে। তার কথা শুনে মিরিয়াম চুপ করে থাকে, নয় ত' শান্ত ভাবে সায় দেয়। নির্ব্বোধ পল, জানে না তার জীবনে কোথায় কি পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে। আত্মীয়-পরিচিতদের মন্তব্য এবং ইঙ্গিত তারা অগ্রাহ্য করে যাবে, এমনি একটা ব্যবস্থায় নীরবে সম্মতি জানিয়েছিল দু'জনেই। পল বলত তাকে, 'আমরা প্রেমিক নই, বন্ধু। এ শুধু আমরাই জানি। ওরা যা বলে বলুক। কী আসে যায় তাতে ?'

কোন কোন দিন বেড়াতে বেড়াতে মিরিয়াম ভয়ে ভয়ে নিজের বাহু তুলে দিত পলের বাহুতে। কিন্তু পল এতে বিরক্তি বোধ করে, তাও সে জানত। এর ফলে পলের মনে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'ত। মিরিয়ামের সামনে এসে সে নিজেকে সরিয়ে নিত ধরা-ছোঁয়ার বাইরের রাজ্যে ঊর্দ্ধলোকের অস্পষ্ট মহিমায় ; তার স্বাভাবিক ভালবাসার আগুন পরিণত হ'ত সূক্ষ্ম চিন্তার বাষ্পে। মিরিয়ামও চাইত তাই। পলের স্বাভাবিক চাপল্য যদি কখনো ফুটে উঠত, মিরিয়াম তাকে বলত, হালকা। যতক্ষণ না আবার তার পরিবর্ত্তন ঘটত, যতক্ষণ না সে ফিরে আসত তার নিজের মধ্যে, ততক্ষণ মিরিয়াম চুপ করে অপেক্ষা করত।

এদিকে পল তার মনের সঙ্গে লড়াই করত, শাসন করত নিজেকে, জানবার আগ্রহে আকুল হয়ে উঠত তার মন। এই জানবার আগ্রহেই মিরিয়ামের মন এসে দাঁড়াত পলের পাশে, এখানেই মিল দু'জনার, এখানেই পল তার একান্ত নিজের। কিন্তু প্রথম প্রয়োজন পলের সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়া, ধরা-ছোঁয়ার রাজ্যে তার থাকা চলবে না।

এমন সময় মিরিয়াম যদি নিজের বাহুমূল তুলে দিত পলের বাহুতে, তা'হলে পলের মনে গভীর যন্ত্রণার সৃষ্টি হ'ত। তার চেতনা যেন বিখণ্ডিত হয়ে যেতে চাইত। যে স্থানটুকুতে মিরিয়ামের স্পর্শ লেগে আছে, সেই স্থানটুকু দুঃসহ উষ্ণতায় ফেটে পড়ত। যেন এক অমানুষিক সংগ্রাম চলত তার অন্তরে, এরই জন্যে মিরিয়ামের উপর বিরূপ হয়ে উঠত তার মন।

একদিন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাবেলা মিরিয়াম পলের বাড়িতে এল। উঁচু রাস্তাভাঙার পরিশ্রমে গরম হয়ে উঠেছে তার দেহ। রান্নাঘরে পল একা ; উপরতলায় মায়ের চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওকে দেখেই পল বললে, 'চলো, সুইট-পী ফুলগুলো দেখিগে।'

ওরা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ছোট শহরটির প্রান্তে, গির্জ্জের ওপাশে আকাশখানা কমলালেবুর মত লাল। একটি অদ্ভুত উজ্জ্বল আলোকে ফুলবাগানটি উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে ; সেই আলোর স্পর্শে প্রতিটি পাতা যেন একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য লাভ করেছে। এক সারি সুইট-পী, দেখতে চমৎকার—তার পাশ দিয়ে চলতে চলতে মাঝে মাঝে এক-আধটা ফুল পল কুড়তে লাগল। নবনীর মত সাদা আর হালকা নীল রঙের ফুল। মিরিয়াম তার পেছনে, ফুলের গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছে সে। ফুলের আকুল আবেদন গ্রহণ না করে তার যেন উপায় নেই, ফুলকে নিজের অঙ্গ করে তুলতেই হবে তাকে। নীচু হয়ে যখন সে ফুলের গন্ধ নেয়, মনে হয় ফুল আর সে, দু'জনে যেন প্রেম-নিবেদন করছে পরস্পরকে। দেখে পলের গায়ে জ্বালা ধরে। এমন করে নিজেকে মেলে ধরে মিরিয়াম, মনে হয় এতটা ঘনিষ্ঠতা বড়ো বাড়াবাড়ি।

বেশ অনেকগুলো ফুল তোলা হয়ে গেলে ওরা বাড়ি ফিরল। এক মুহূর্ত্ত কান পেতে উপরতলায় মায়ের চলা-ফেরার শব্দ শুনল পল, তার পর বললে, 'এসো এদিকে। ফুলগুলো পিন দিয়ে এঁটে দিই তোমার জামায়। বলে, তার পোশাকের বুকে এক এক বারে দুটো-তিনটে করে সাজিয়ে দিলে। একটু দূরে সরে গিয়ে আবার দেখতে লাগল কেমন দেখায়। মুখ থেকে পিনটা বার করে বললে, ফুল-সাজ করতে মেয়েদের সর্ব্বদা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে করা উচিত, বুঝলে ?'

মিরিয়াম হাসল। জামায় ফুল-আঁটা, সে যেমন তেমন করে লাগালেই হ'ল, এই তার ধারণা। পল যে এত কষ্ট করে সযত্নে তার ফুল এঁটে দিচ্ছে, এ শুধু তার খেয়াল বই ত' নয়।

ওর হাসি দেখে পলের একটু অভিমান হ'ল। বললে, 'হ্যাঁ, কেউ কেউ তাই করে, যারা ভদ্র, ভব্য মেয়ে, তারা।'

মিরিয়াম আবার হাসল, কিন্তু এবার তার হাসিতে আনন্দ নেই। পল তাকে অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে, এ তার সহ্য হয় না। অন্য কেউ হলে তার কথা সে উপেক্ষা করত। কিন্তু পলের মুখ থেকে এ ধরণের কথা তাকে ব্যথা দেয়।

ফুলগুলো সাজিয়ে দেওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় সিঁড়িতে মায়ের পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি শেষ পিনটা এঁটে দিয়েই সরে গেল সে। বললে, 'মাকে জানতে দিও না কিন্তু।'

মিরিয়াম তার বইগুলো তুলে নিয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আহত চিত্তে চেয়ে রইল সূর্য্যাস্তের মনোরম আভার দিকে। মনে মনে বললে, আর নয়, আর কোনদিন পলের কাছে সে আসবে না।

'গুড ইভনিং, মিসেস মোরেল।' মিরিয়াম যেন দূর থেকে সম্মান জানাচ্ছে, এমনি করে বললে। তার কথার সুরে প্রকাশ পেল, সে জানে, ওখানে থাকবার কোন অধিকার তার নেই।

মিসেস মোরেল নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'কে, মিরিয়াম নাকি?' কিন্তু পল সবার কাছ থেকেই এইটুকু অন্ততঃ চাইত, যেন এই মেয়েটির সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে তারা স্বীকার করে নেয়। মিসেস মোরেল অবিবেচক ছিলেন না, কাজেই প্রকাশ্য-বিচ্ছেদ তিনি ঘটতে দিতে চাইতেন না।

পলের বয়স কুড়ি পূর্ণ হবার আগে এ-বাড়ির লোকের কোনদিনই ছুটিতে বাইরে যাওয়া ঘটে ওঠেনি। মিসেস মোরেল ত' বিয়ে হবার পর থেকে একমাত্র তাঁর বোনকে দেখতে যাওয়া ছাড়া আর একদিনও ছুটিতে বেরুতে পারেন নি। এবারে পল বেশ কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল, সবাই এবার তারা বাইরে যাচ্ছে ছুটিতে। বেশ একটি দল জুটেছে—এ্যানির কয়েকটি বান্ধবী, পলের বন্ধু একটি, উইলিয়ম যে অফিসে কাজ করত সেখানকার এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক, আর মিরিয়াম।

ঘর ঠিক করতে লেখা হবে নানা জায়গায়, তাই নিয়েই ঘটল কত! পল আর তার মা দু'জনে ত' অনবরত এ-নয়-তা করে চলেছেন। দু' সপ্তাহের জন্তে একটা আসবাবপত্রওয়ালা ছোট বাড়ি তাদের চাই। মা বলেছিলেন, এক সপ্তাহই যথেষ্ট, কিন্তু পল কিছুতেই দু' সপ্তাহের কমে শুনবে না।

অবশেষে ম্যাবলথর্প থেকে একটা জবাব পাওয়া গেল, সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং ভাড়ায় তাদের পছন্দমত একটা ছোট বাড়ি পাওয়া যায়। সকলের আনন্দ আর ধরে না। পল ত' একথা ভেবে আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল; এবার সত্যি সত্যিই মায়ের ছুটি পাওয়া হবে। সন্ধ্যাবেলায় মা আর ছেলে দু'জনে বলাবলি করতেন, ছুটির দিনগুলো কেমন কাটবে। এ্যানি এসে ঘরে ঢুকল, তার সঙ্গে লিওনার্ড, অ্যালিস্ আর কেটি। মহা হুলুস্থুল বাড়িতে, সবাই ভবিষ্যতের নেশায় মশগুল। পল মিরিয়ামকে গিয়ে বললে। সে যেন আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে ভাবতে বসল। মোরেলদের বাড়িখানা যেন উত্তেজনায় মুখর হয়ে উঠল।

শনিবার সকাল সাতটার ট্রেনে তাদের যাবার কথা। পল ব্যবস্থা করল মিরিয়াম আগের দিন রাত্রে এ বাড়িতে শোবে, নইলে ও-বাড়ি থেকে অনেকটা তাকে হেঁটে যেতে হয়। মিরিয়াম রাত্রির খাওয়ার আগে চলে এল এখানে। আজ সবাই নেশায় মাতাল, তাই মিরিয়ামকেও তারা পরম আদরে গ্রহণ করল। কিন্তু সে এসে বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ-বাড়ির লোকেদের মনোভাব যেন বিরূপ হয়ে উঠল, আগের মত সহজ, উন্মুক্ত তারা আর থাকতে পারল না। পল একটা কবিতা খুঁজে বার করেছিল, জীন্ ইঞ্জেলোর লেখা, তাতে ম্যাবলথর্প জায়গাটার উল্লেখ আছে। কাজেই মিরিয়ামকে তার সেটা পড়ে শোনানো চাই-ই। এমন ভাবপ্রবণ পল কোনদিনই নয় যে, বাড়ির লোকেদের কাছে কবিতা পড়ে শোনাবে। কিন্তু এখন তারাও শুনতে রাজী হ'ল। মিরিয়াম সোফায় বসে, সে যেন মগ্ন হয়ে রয়েছে পলের মধ্যে। পল যতক্ষণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ মিরিয়াম তারই মধ্যে ডুবে থাকে, সে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে। মিসেস মোরেল নিজের চেয়ারে বসে ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করছিলেন যেন। তিনিও শুনবেন। এমন কি এ্যানি এবং তার বাবাও উপস্থিত সেখানে। মোরেলের মাথাটি *একদিকে হেলানো; ধর্ম্মমন্দিরে* ভাষণ শুনতে গিয়ে সে সম্বন্ধে গভীর ভাবে সচেতন হয়ে উঠে লোকে যেমন করে থাকে, তেমনি। যাদের যাদের তার শোনাবার ইচ্ছে, তারা সবাই এখানে উপস্থিত। মিরিয়ামের সঙ্গে মিসেস মোরেল আর এ্যানির এ যেন একটা প্রতিযোগিতা, কে সব চেয়ে ভাল শুনে পলের অনুগ্রহভাজন হবে। পল আজ সবার ঊর্দ্ধে।

শুনতে শুনতে মিসেস মোরেল হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কিন্তু ওই ঘণ্টাগুলো যে গানের সুরে বাজে, সেই 'এণ্ডারবির বধূ' গানটা কি?'

—'ও একটা পুরোন গান। জলের মধ্যে সতর্ক ধ্বনি করবার ঘণ্টাগুলো ওই সুরে বাজে। আমার বিশ্বাস, এণ্ডারবির বধূটি জলে ডুবে মরেছিল, তাই।' পল্ বললে। কিন্তু এ বিষয়ে তার কিছুই জানা ছিল না। তাই বলে বাড়ির মেয়েদের কাছে মাথা হেঁট করবার পাত্রও সে নয়। মেয়েরাও বিশ্বাস করল তার কথা। নিজের কথায় তারও বিশ্বাস হতে লাগল।

মা বললেন, 'ওই গানটার মানে জানত ত' লোকে?'

—'হ্যাঁ। স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা যেমন বনফুলের গান শুনে বোঝে। আর বিপদের আশঙ্কা দেখলে ঘণ্টাটাকে ওরা পেছন দিকে ঠেলে, তা কেমন করে হয়?' এ্যানি বললে, 'ঘণ্টা সামনের দিক থেকেই বাজুক আর পেছনের দিক থেকেই বাজুক, শব্দ ত' হবে একই রকম।'

পল বললে, 'তবু, তুমি যদি খাদের দিক থেকে আস্তে আস্তে চড়িয়ে নাও'—এমনি করে বলে নিজের গলায় সে শোনাল। তার গলার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হ'ল সবাই। নিজেও সে নিজেকে তারিফ করল। তারপর এক মিনিট থেমে আবার আরম্ভ করল তার কবিতা পড়া।

পড়া শেষ হলে মিসেস মোরেল বললেন, 'হ'ল ত' কিন্তু যা কিছু লেখা হয়, সবই এমন করুণ হবে, এ আমার ভাল লাগে না।'

মিঃ মোরেল বললেন, 'আমি ত' বুঝতে পারি না ওরা অমন করে ডুবে মরে কেন?'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। এ্যানি উঠে টেবিলটা পরিষ্কার করতে গেল।

মিরিয়াম বাসনপত্র সরিয়ে তাকে সাহায্য করবে বলে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তুমি ভাই বাসন ধোবে, আমিও আসছি।'

এ্যানি চীৎকার করে উঠল: 'না না, সে কী! তুমি বসো। বেশী বাসন ত' নয়।'

একেবারে গ'লে মিশে গিয়ে নিজের দাবীই বজায় রাখবে, এমন মেয়ে মিরিয়াম নয়। সে আবার বসে পড়ে পলের বইখানা দেখতে লাগল।

দলের প্রধান ব্যক্তি পল, তার বাবা এ-সব ব্যাপারে নিতান্ত অপটু। ভেবে ভেবে পল সারা হয়ে গেল, পাছে টিনের বাক্সটা ম্যাবলথর্পে না গিয়ে ফারসাবিতেই থেকে যায়, এই নিয়েই তার কত মনঃপীড়া। গাড়িখানা ডাকবার মত সাহসও তাঁর হ'ল না। তার মা দেখতে ছোট হলে কি হয়, তাঁর সাহস অনেক বেশী, তিনিই ডাকলেন গাড়িওয়ালাকে। বললেন, 'এই যে, এই দিকে এসো।'

সকলের শেষে গাড়িতে উঠল পল আর এ্যানি, লজ্জা আর খুশিতে তারা আকুলিবিকুলি করছে।

মিসেস মোরেল বললেন, 'ক্লক-কটেজে যেতে কত নেবে হে ?'

—'দু' শিলিং।'

—'কেন, কতটা দূর ?'

—'সে ঢের দূর।'

—'মনে হয় না আমার।' বলে ঠেলেঠুলে গাড়িতে উঠে পড়লেন তিনি। পুরনো গাড়িখানায় আট জন লোক উঠে ভিড় করেছে। মিসেস মোরেল বললেন, 'জন প্রতি তাহ'লে পড়ল তিন পেন্স ক'রে। ট্রামে চললেও—'

গাড়ি ছুটে চললো। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে এসেই মিসেস মোরেল চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এইটে নয় ত' ? হ্যাঁ, হ্যাঁ এইটেই বটে !'

সবাই যেন খাস বন্ধ করে বসে। বাড়িখানা ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো। তখন সবাই এক সঙ্গে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মিসেস মোরেল বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওই অদ্ভুত বাড়িটা যে নয়। আমার এমন ভয় করছিল !'

গাড়ি তাদের নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চললো। অবশেষে বড় রাস্তার ধারে বাঁধের উপর একটা নিরালা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন তারা। সামনের বাগানে যেতে হলে একটা ছোট সাঁকো পার হয়ে যেতে হয়, এতেই তাদের উৎসাহের অন্ত নেই। আশ-পাশে আর বাড়ি নেই, শুধু এই বাড়িখানা একা দাঁড়িয়ে আছে। এর এক পাশে সমুদ্রতীরের মাঠ, অন্য দিকে শাদা যব, হলদে ওট্, লাল গম আর সবুজ ফসলে বিচিত্রিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমতল হয়ে আকাশের কোলে গিয়ে মিশেছে। দেখে তাদের বড়ো ভাল লাগলো।

হিসাব রাখবার ভার পলের। ঘরকন্না চালাবেন মা। থাকা, খাওয়া সব মিলিয়ে মোট খরচ পড়ল সপ্তাহে জনপ্রতি ষোল শিলিং। সকাল বেলা পল আর লিওনার্ড নাইতে যেত। মোরেল খুব ভোরে উঠে বেড়াতে চলে যেত দূরে।

মা শোবার ঘর থেকে ডেকে বললেন, 'শুনছ পল, এক টুক্রো রুটি-মাখন খেয়ে নিও।'

পল বললে, 'আচ্ছা'।

ফিরে এসে পল দেখল সকাল বেলার খাবার দেওয়া হয়েছে, টেবিলে অধীশ্বরী হয়ে বসে আছেন মা। এ বাড়ির কর্ত্রীর বয়স অল্প। তাঁর স্বামী অন্ধ, উনি কাপড়-ধোয়ার ব্যবসা করে চালান। কাজেই রান্নাঘরের বাসন-কোসন মিসেস মোরেলই ধুতেন আর বিছানাও করতেন তিনিই।

পল একদিন বললে, 'মা, তুমি না সত্যি সত্যি ছুটি নেবে বলেছিলে, এই ত' কাজ করছ।'

'কাজ ?' মা বললেন, 'বলছ কী তুমি ?'

মাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রামে কিম্বা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে তার ভাল লাগত। কাঠের সাঁকো দেখে মিসেস মোরেলের ভয় হ'ত আর পল তাঁকে কচি খুকী বলে ক্ষেপাত। মোটের উপর পল বেশীর ভাগ মায়ের কাছে কাছে রইল, যেন সে একান্ত ভাবে মায়েরই।

মিরিয়াম পলের সঙ্গ খুব বেশী করে পেত না, শুধু যখন অন্যেরা 'কুন' শুনতে চলে যেত সেই সময়টুকু ছাড়া। মিরিয়ামের সহ্য হ'ত না ওই 'বান'দের গান, নিতান্ত গেঁয়ো বলে মনে হ'ত। তাই পলও গানগুলোকে অসহ্য বোকামি ছাড়া আর কিছু বলে মনে করতে পারত না। রুচিবাগীশের মত সে এ্যানির কাছে ওই গানগুলো শুনবার অসারতা প্রতিপন্ন করতে চাইত। অথচ ওদের গান সব তার জানা। রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে মহা উৎসাহে ওই গানই সে গাইতে থাকে। আর যদি কখনো তার কান যায় ওই গানের দিকে তখন এর বোকামিই তাকে আনন্দ দেয় প্রচুর। তবু এ্যানির কাছে গিয়ে সে বলে, 'জঘন্য সব গান ! একটু যদি বুদ্ধির ছাপ থেকে থাকে ওতে। কী করে যে লোকে গিয়ে বসে শোনে ওই গান, আশ্চর্য্য !' আবার মিরিয়ামের কাছে গিয়ে এ্যানি আর তার সঙ্গী-সাথীদের ঠাট্টা করে বলে, 'ওরাও যেমন, নিশ্চয়ই 'কুন' গান শুনতে গেছে।'

আর আশ্চর্য্য লাগে মিরিয়াম যখন 'কুন' গায় তখন তাকে দেখতে। তার চিবুকটা নীচের ঠোঁট থেকে গলার প্রান্ত অবধি ঋজু রেখার আকারে প্রসারিত ; তাকে দেখে পলের মনে পড়ে যায় বত্তিচেল্লির আঁকা কোন দেবদূতের ছবির কথা, তার গানের কথাগুলি যদিও :

'প্রেমের পথে এসো আমার কাছে,
আমার সঙ্গে বেড়াতে, আমার সঙ্গে কথা কইতে।'

শুধু যখন পল ছবি আঁকে, কিম্বা সন্ধ্যাবেলা অন্যরা যখন 'কুন' গান শুনতে চলে যায়, তখনই পলকে সে একান্ত নিজের করে পায়। তখন অনবরত কথা বলে পল তাকে বোঝাতে চায় লম্বা, সরল রেখা দেখতে তার কত ভাল লাগে—লিংকনশায়ারের আকাশ আর প্রান্তরের সমতল প্রসার তার কাছে ইচ্ছাশক্তির চিরন্তন প্রভাবের বার্ত্তা এনে দেয়, ঠিক যেমন গির্জ্জার নোয়ানো নর্ম্মান-ছাঁচের খিলানগুলোর অবিরত পুনরাবৃত্তি দেখে মনে পড়ে যায় মানুষের আত্মার অবিরত আবর্ত্তনের কথা, কোথায় তা কেউ জানেনা। ঠিক তার উলটো কথা মনে পড়ে 'গথিক' ছাঁচের গির্জ্জার রেখাগুলির দিকে চাইলে, ওরা যেন আকাশের দিকে উঠে সেই দৈবী প্রেরণার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। পল বলে, সে নিজে 'নর্ম্মান' ছাঁচের, আর মিরিয়ামের ছাঁচ 'গথিক'। পলের এ কথাটাও মিরিয়াম নতমুখে স্বীকার করে নেয়।

প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ বালুর চর। একদিন সন্ধ্যাবেলা মিরিয়াম আর পল সেখানে বেড়াতে গেল। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো ফেণায় উছলে উঠে তীরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। উষ্ণ একটি সন্ধ্যা। সেই লম্বা বালুচরে তারা দু'জন ছাড়া আর কোন জনপ্রাণী নেই, কোন শব্দ নেই সমুদ্রের গর্জ্জন ছাড়া। মাটির গায়ে সমুদ্রের এই আছড়ে-পড়া দেখতে ভারী ভালো লাগে পলের। একদিকে এই গর্জ্জন, অন্য দিকে বালুপ্রান্তরের স্তব্ধ নীরবতা, এ দুয়ের মাঝখানে নিজেকে অনুভব করে নিজেই সে খুশি হয়ে ওঠে। আজ মিরিয়াম তার সঙ্গে, চারদিকে সব কিছু যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রখর অনুভূতি নিয়ে সজাগ হয়ে উঠেছে। ফিরতে ফিরতে তাদের বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। বাড়ি যাবার পথ বালুপাহাড়ের একটা ফাঁকের মাঝ দিয়ে, তারপর দুটো বাঁধের মাঝখানকার একটা উঁচু ঘাস-পথ ধরে। নিস্তব্ধ, অন্ধকার দেশ। পেছনের বালু-পাহাড়ের ওপার থেকে সমুদ্রের মৃদু শব্দ ভেসে আসে। পল আর মিরিয়াম নীরবে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ পল চমকে উঠল। তার দেহের সমস্ত রক্ত দপ

করে যেন জ্বলে উঠল, উত্তেজনায় তার নিঃশ্বাস প্রায় রোধ হয়ে এলো। বালুপাহাড়ের ধার থেকে প্রকাণ্ড একটা কমলা লেবু রঙের চাঁদ একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছে। পল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেই লাগল।

মিরিয়ামের সেদিকে চোখ পড়তে সে বলে উঠল, 'আঃ!' পল সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সেই প্রকাণ্ড রক্তাভ চাঁদের দিকে চেয়ে। প্রান্তরের বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র দর্শনীয় বস্তু এই। পলের হৃদয় সজোরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, তার বাহুর পেশী শিথিল হয়ে এলো।

পলের জন্যে মিরিয়ামও দাঁড়াল, অস্ফুটস্বরে বললে, 'কী হ'ল?' পল মুখ ফিরিয়ে চাইল ওর দিকে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে মিরিয়াম, ছায়া যেন তাকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার মুখখানা টুপির অন্ধকারে ঢাকা, সে যে তারই দিকে চেয়ে আছে পল তা বুঝতে পারল না। মিরিয়াম চিন্তা করছিল গভীর ভাবে। একটু একটু ভয় করছিল তার—তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কী এক দৈবভাবের প্রেরণা অনুভব করছিল সে। মিরিয়ামের চরম আবেগের অবস্থা এই। এর সামনে এসে পলের অক্ষমতার সীমা থাকত না। তার রক্ত বুকের মাঝখানটাতে আগুনের মত জমে উঠত। কিন্তু মিরিয়ামের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও তার ছিল না। ক্ষণে ক্ষণে তার রক্তে ঝলক জাগত, কিন্তু মিরিয়াম তাকে যে করেই হোক উপেক্ষা করত। মিরিয়াম আশা করেছিল পলের মধ্যে কোন দৈব-প্রেরণার সঞ্চার হবে। তবু, এই তীব্র কামনা বুকে নিয়েও, পলের আবেগের কথা যে সে একেবারেই বুঝতে পারেনি এমন নয়। দ্বিধাহতের মত পলের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। আর একবার চুপি চুপি বললে, 'কী হ'ল?'

পল বিস্তারিত ভ্রূ-কুঁচকে জবাব দিল, 'চাঁদটা দেখছি।'

'হুঁ:'। মিরিয়ামও সমর্থন জানাল, 'আশ্চর্য্য, নয়?' তার অবাক লাগল পলের কথা ভেবে। সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা পলও ঠিক বুঝতে পারলে না। তার বয়স অল্প, তাদের মেলামেশাও একেবারে ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে, তার মন যে চায় ওই মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরে বুকের জ্বালা নেবাতে, পল তা জানতেও পারল না। মিরিয়ামের কাছে তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। পুরুষ যেমন করে নারীকে চায়, ঠিক তেমনি করে সেও মিরিয়ামকে চাইতে পারে, এ চিন্তাটাকে চাপা দিতে গিয়ে সে একে পরিণত করেছিল দুঃসহ লজ্জায়। এ কথার চিন্তা মাত্রেই মিরিয়ামের মন যখন সঙ্কুচিত, নিমীলিত হয়ে যেত, তখন পলও নিজের আত্মার গহনে ডুবে যেত একেবারে। এই নির্মল, নিষ্পাপ ভাবই তাদের প্রেম-চুম্বন রচনার পথে বাধা। যেন দেহগত প্রেমের, [illegible] কি একটি মাত্র আবেগময় চুম্বনের, আকস্মিক আঘাতও মিরি[illegible] সহ্য করতে পারবে না; আর ওই চুম্বনটুকু দেবার মত শক্তিই পলের নেই, সে এত লাজুক, এমন স্পর্শকাতর।

অন্ধকার ফেন-[illegible] ঢাকা মাঠের উপর দিয়ে চলতে চলতে পল চাঁদটাকে দেখতে লাগল, কথা কইল না। তার পাশে মিরিয়াম চলেছে ধীর পদে। পলের [illegible] বিরূপ হয়ে উঠেছে মিরিয়ামের দিকে, মনে হচ্ছে মিরিয়ামের জন্যেই যেন তার খেয়া ধরে যাচ্ছে নিজের উপর। সামনের দিকে তাকিয়ে এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে একটিমাত্র আলো তার চোখে পড়ল—এ তাদেরই বাড়ির প্রদীপে আলোকিত জানালাখানা। মায়ের কথা, আর অন্যদের আনন্দিত জীবনের কথা ভেবে, তার মন খুশি হয়ে উঠল। ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেখে মা বলে উঠলেন, 'এরা সবাই ত' কখন ফিরে এসেছে!'

পল বেশ চড়া মেজাজেই জবাব দিল, 'কী হয়েছে তাতে? যতক্ষণ খুশি বাইরে বেড়াব আমি, কেন নয়?'

মা বললেন, 'অন্ততঃ রাত্রের খাবারটার জন্যে সবাই এক সঙ্গে বসবে, এটুকু আমি আশা করছিলাম।'

পল বললে, 'সে আমার খুশি। এখনও এমন কিছু দেরি হয়নি। আমার যেমন ইচ্ছে, তেমনি চলব।'

মা ঠেস দিয়ে বললেন,—'চমৎকার! তবে তোমার যা খুশি তাই করো, বাছা।' সেদিন রাত্রে ছেলের দিকে আর চোখ তুলেও চাইলেন না তিনি। পল ভাবখানা দেখাল যেন সে কিছু জানেও না, গ্রাহ্যও করে না, বসে বসে বই পড়তে লাগল। মিরিয়ামও পড়তে বসল, নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলবার সঙ্কল্প নিয়ে। ওর দিকে চেয়ে মিসেস মোরেলের মন বার বার জ্বালা করে উঠতে লাগল, ওই তাঁর ছেলেকে অমন করেছে। পল যে ক্রমশঃ বদমেজাজি খুঁৎখুঁতে আর মনমরা হয়ে যাচ্ছে, এ তাঁর সহজেই চোখে পড়ে, এর জন্যে মিরিয়ামকেই তিনি দোষ দেন, মিরিয়ামকেই এর জন্যে দায়ী করেন। এ্যানি আর তার বন্ধুরাও মিরিয়ামের বিরুদ্ধে। মিরিয়ামের বন্ধু এ বাড়িতে কেউ নেই, শুধু পল ছাড়া। কিন্তু এর জন্যে তার আক্ষেপ নেই, ওদের ক্ষুদ্রতাকে সে মনে মনে ঘৃণাই করে।

আর পলও তাকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে এই জন্যে যে ওই মেয়েটিই যেন কী করে তার নিজের সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। নিজেকে তার নিতান্ত দীন, অবমানিত বলে মনে হয়, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার মন যেন পাক খেয়ে উঠতে থাকে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

কয়লা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

বাইরে টিপ-টিপ কোরে বৃষ্টি পড়ছে। অরুন্ধতী অনেকক্ষণ বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলো। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। সকাল থেকে সুরু। এ বৃষ্টির যেন আর বিরামও নেই। আকাশ ভেঙে সমস্ত চরাচর অন্ধকার কোরে দিয়ে এক এক সময় শোঁ-শোঁ শব্দ কোরে বৃষ্টি নামে। কখনও বা সে বৃষ্টি মন্থর-গতিতে টুপটাপ শব্দে বাঁশ-বনে মৃদু ঝঙ্কার তুলে নামে।

অরুন্ধতী অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। কবে কোন কালে দিদিমার বুকের কাছে জড়ো হোয়ে শুয়ে এই বৃষ্টির সময়ে ভূত-প্রেতের গল্প শুনতে শুনতে দিদিমার বুকের কাছে আরো নিবিড় হোয়ে শুয়ে থাকতো। বৃষ্টির ঝাপটে একটু একটু শীত করলে জড়োসড়ো হোয়ে শুয়ে দিদিমাকে কতই না আপনার মনে হোতো। আর আজ দিদিমা কেন যারা অত্যন্ত কাছের, এখনও জীবিত; তাদের কাছেও অরুন্ধতী এক বার যেতে পারে না। বৃষ্টির মাঝে বার বার মনে হয়, তার মার কথা, ছোট ভাইটার কথা, বুধি-গাইটার কথা।

—কোথায় গো সব কোথায় গেলে?—মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে দীপঙ্কর দরজায় ধাক্কা দেয়।

—এই যে—অরুন্ধতীর স্বপ্ন ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিতে যায় সে।

বারান্দায় উঠে ছাতাটি বন্ধ কোরে দীপঙ্কর একটু বিরক্ত ভাবেই বলে—এতক্ষণ কি ঘুমিয়েছিলে নাকি?

—তোমার সংসারে কত দাসী-বাঁদী আছে তারাই তো কাজ করে—আমি ঘুমোনো ছাড়া কি করবো বল? পাল্টা জবাবটা অরুন্ধতী শ্লেষের সঙ্গে অথচ নরম গলাতেই দেয়।

—দাসী বাঁদী থাকলে তোমার কথা শোনার দায় থেকে অন্ততঃ বাঁচতাম। যাই হোক, এখন একটু চা কর দেখি! বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপসে গিয়েছি।

—চা হবে কোথা থেকে! কয়লা নেই—নিস্পৃহভাবে কথা বলে অরুন্ধতী।

—ঠিক এই বৃষ্টির মধ্যেই তোমার কয়লা ফুরোলো!

—আজ কয়লা ফুরোবে কেন, ক'দিনই হয় কয়লা নেই! এত দিন কেবল এটা-ওটা কুড়িয়ে রান্না করেছি।

কথা বাড়ায় না আর দীপঙ্কর। সত্যিই কয়লা ফুরিয়েছে ক'দিনই হোলো। তাকে সে ক'দিন আগেই কয়লার কথা বলেছিলো। কিন্তু বললেই তো কয়লা মেলেনা। যখন কয়লা থাকে ডিলারের কাছে তখন টাকা থাকে না, যখন টাকা থাকে তখন কয়লা ফুরোয়। শুধু কয়লা নয় সব জিনিষের বেলাতেই দীপঙ্করদের মত লোকদের একই অবস্থা।

—আজ তা হোলে রান্নার কি হবে? শঙ্কিত মনে দীপঙ্কর কথাটা বলে।

—কি হবে, তুমিই জানো। যে ক'দিন পেরেছি চালিয়েছি, এখন কি করবো তা তুমিই জানো।

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। শেয়াল-কুকুর পর্য্যন্ত এ সময় বাইরে বার হয় না। ছেলে-মেয়েরা পাশের ঘরে খেলা করতে করতে বাবার গলার সাড়া পেয়ে ছুটে আসে বারান্দায়। চোখের সুমুখে এতোগুলো প্রাণীর রান্নার কথাটা নূতন কোরে যেন দীপঙ্করকে ভাবায়। অরুন্ধতী আস্তে আস্তে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

—এই বৃষ্টিতে কি করবো বলতো আমি? সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করও ঘরে ঢোকে।

—কি করবে, আমি কি জানি! তখন মনে ছিল না যখন এখানে আসো?

—আমি কি ইচ্ছা কোরে এসেছি?—

—না আমি তোমাকে বলতে গিয়েছিলাম যে হুজুগে মেতে মাষ্টারীটা পাড়াগাঁয়ে বদলী কোরিয়ে নাও!

কথা জোগায় না দীপঙ্করের। ৪৭।০ টাকার পাঠশালার মাষ্টার। কাছাকাছি এক মফঃস্বল সহরের পাঠশালায় মাষ্টারী জুটেছিলো তার। ছাত্রদের উপর গুলী চালনার প্রতিবাদে যে মিছিল যায় সহরে, তার সঙ্গে দীপঙ্করও যোগ দিয়ে মাতামাতি করায় স্কুল-বোর্ড থেকে তাকে এই পাড়াগাঁয়ে বদলী কোরে দেয়। এখানে বদলী হোয়ে দীপঙ্করের অনেক দিকে অসুবিধা হোয়ে যায়। না মেলে টিউসানি আর না মেলে প্রয়োজনীয় চাল-কয়লা-কাঠ।

রাগ হয় দীপঙ্করের জেলা স্কুল-বোর্ডের কর্ত্তাদের ওপর। অন্যায় ক'রে গুলী চালাবে অথচ তার প্রতিবাদ করলেই চাকরী যাবে, নয়ত বদলী করা হবে। যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই অন্যায়। যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কোন অধিকারই পাঠশালার মাষ্টারের নেই। পাঠশালার মাষ্টার যেন হৃদয়হীন কলের-পুতুল।

বৃষ্টিটা একটু ধরে আসতেই দীপঙ্কর কয়লার খোঁজে যায়, কয়লা ডিলার এক জন মাত্র গোটা একটা ইউনিয়নে। ক্ষমতায় [illegible]ধিষ্ঠিত দলের অনুগ্রহ-ভাজন বড় বড় লোকদের বাড়ী ডিলার [illegible]ড়ী বোঝাই কোরে যেচে কয়লা দিয়ে আসবে, অথচ দীপঙ্করদের মত লোকদের একটি পয়সাও বাকী রেখে কয়লা নিতে গেলেই অনেক কথা শুনতে হবে—কয়লায় লোকসান হচ্ছে—অনেক টাকা বিলেত পড়ে আছে—ধার দেওয়া সে বন্ধ কোরেছে, এই সব আর কি!

তবু দীপঙ্কর সকলের কাছে যায়, অন্ত দিন সে যাইই বলে থাকুক। আজ কয়লা আনতে হবেই। কথায় কোন রকমেই কয়লা-সঙ্কট ঘুচবে না।

—কি খবর দীপু! কি মনে কোরে—দীপঙ্করকে দেখে আপন জনের মত সরল বাবু আপ্যায়িত করলেন।

—কয়লার জন্তে এসেছি, এখনই কয়লা দিতে হবে যে!

—কয়লা তো ভাই নেই: দু'দিন আগে আসতে হয়—

—সে কি? কয়লার অভাবে রান্না চাপবে না যে!

—কয়লা এসে গেল প্রায়! ছুটো দিন ভাই কোনরকম কোরে চালিয়ে নাও। কয়লা কালও ছিলো! প্রেসিডেণ্ট বাবু লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দু' মণ কয়লার জন্তে। তাই যা ছিলো দিয়ে দিলাম।

—তিনি আগে এক গাড়ী নিয়েছেন আবার নিলেন যে—

—তাঁর সংসারও বড়, তাছাড়া তিনি কয়লা কয়লা কোরে কোথায় ঘুরে বেড়াবেন, তাই দু'মণ বেশীই সংগ্রহ কোরে রাখলেন!

—আর আমরা এক মণও না পেয়ে রান্না চাপাতে পারছি না—

—কি করবো বল, রাগ কোরলে ভাই উপায় নেই! তাঁর মত লোককে কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়! তুমি আগে এলেই তো পেতে!

—আগে আসতে গেলেতো টাকার জোগাড় করে আসতে হবে! আমাদের তো আর টাকা ছাড়া দেবেন না!

—রান্নাই চাপবে না তোমার? সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করেন সরল বাবু! কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চান।

—না, তা না হোলে এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ কয়লা কিনতে আসে?

—কয়লা অবশ্য পেতে পার। কাঁচা-কয়লা আছে এক জায়গায়, দামটা কিছু বেশীই পড়বে।

দীপঙ্কর কোন কথা বলতে পারে না। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপে। বেনামে অন্ত এক জায়গায় কাঁচা-কয়লা রেখে সরল বাবু এই কয়লার অভাবের সময় বেশ অস্বাভাবিক চড়া দরে দু'পয়সা লাভ করবেন। এ সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীরা নীরব। বাধ্য হোয়েই প্রয়োজনের তাগিদে চড়া দরে কাঁচা-কয়লাই তাদের নিতে হবে। এ যেন বলির পাঁঠার মত বেঁধে মারা। যে টাকায় পোড়া-কয়লা পাওয়া যাবে, তার চেয়ে বেশী দিয়ে কাঁচা গুঁড়ো কয়লা আনতে হবে। কাঠ নেই। কোথাও কাঠ নেই। যুদ্ধের সময় সরকারী কণ্টাকটর গ্রামাঞ্চলের কাঠ, বনজসম্পদকে নির্মূল করেছে। ইংরাজের জীবন-মরণ সঙ্কটে ভারত জুগিয়েছে তার বাঁচার উপকরণ, বিনিময়ে এখানে অব্যাহত শোষণ চালাবার সনদ সে পেয়েছে।

বাড়ী ঢুকেই দীপঙ্কর দেখে অরুন্ধতী উপুড় হোয়ে পড়ে উনুনে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করছে। কি একটা আস্ত কাঁচা জিনিষ উনুনে দিয়ে অনবরত ফুঁ দিয়ে তাকে জ্বালাবার চেষ্টায় নিযুক্ত অরুন্ধতী। ধোঁয়ার ঠেলায় চোখ ছুটো তার রক্তবর্ণ। চোখের দু'পাশ বেয়ে ঝরছে জল। এলো-করা চুল সমস্ত দেহ, মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

—তোমার ভারী কষ্ট হচ্ছে না? সর দেখি আমি একটু ফুঁ দিই—বেশ সহানুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়েই কথাটা দীপঙ্কর বলে। কোন সাড়াই অরুন্ধতী দেয় না। নিজের মনেই ফুঁ পাড়ে।

—তুমি সরো, আমি দেখি—বোলে দীপঙ্কর অরুন্ধতীকে সরিয়ে নিজে ফুঁ দিতে যায় উনুনে।

—থাক্ আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই! যার সংসার চালাবার মুরোদ নেই তার আবার বিয়ে করার সখ কেন? ঝাঁঝের সঙ্গে কণ্ঠে সবখানি বিষ ঢেলে অরুন্ধতী বলে।

—সখ না থাকলে চিরকাল বাপের ঘাড়ে আইবুড়ো হোয়ে ঝুলে থাকতে হোতো যে! আহত পৌরুষ দীপঙ্করের জ্বলে উঠেই যেমন কোরে বিভিন্ন সময় তার মত অসহায়দের তা হজম কোরে ফেলতেই হয়, তেমনি কোরে অরুন্ধতীর এই বিষমাখা কথাটাকে হজম কোরে জবাবে সে হাস্তরসের অবতারণা করার চেষ্টা করে। কথাটাকে সে অত গভীর ভাবে নেয় নি এমনি ভাবই দেখায়।

—তোমার হাতে পড়ার চেয়ে আইবুড়ো থাকা ঢের ভালো ছিলো! বোধ হয় তার কড়া কথাটাকে দীপঙ্কর সহজ ভাবে নেওয়ায় অরুন্ধতীও কিছুটা চেষ্টা কোরেই সহজ হোতে চায়।

—তাই থাকলেই তো পারতে এভাবে জ্বালাতন হোতে হোতো না আমাকে! কয়লার অভাব আমার একার নয়: আশে-পাশে যেখানে খবর নেবে দেখবে আমাদের মত অবস্থার লোকদের সব জায়গাতেই একই সঙ্কট!

—না, তোমার মত অভাব কোথাও নয়? দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে অরুন্ধতী।

—ঘরের মধ্যে থাকো, তাই বাইরের খবর তুমি জানো না!

—ঘরের মধ্যে থাকলেও বাইরের খবর পাই! দু'-এক দিন মানুষ কষ্ট কোরে চালাতে পারে! দিনের পর দিন কয়লার অভাবে কোন সংসারটা চলছে দেখাতে পাবো?

—পারি! কিন্তু তোমার দেখার চোখ নেই! থাক্ তোমার সঙ্গে বাজে বকার আমার সময় নেই।

—সময় আমারও নেই! পাশের ঘরে ছেলে-মেয়েদের কান্না-কাটি আর ঝগড়া মেটাতে চলে যায় অরুন্ধতী। উনুন যে অবস্থায় ছিল তাই থাকে। সে রাত্রে রান্না-খাওয়া ওদের হয় না। বিরাট প্রাচীরের মত একটা বাধা স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে অন্ততঃ সে রাত্রির

মত থাকে। ছেলে-মেয়েরা কোন রকমে মুড়ি খেয়ে রাত কাটায়। দীপঙ্কর সারাটা রাত বিছানায় ছটফট কোরে কাটায়।

পর দিন সকালে আর আকাশে মেঘ দেখা যায় না। চারিদিক বেশ পরিষ্কার মনে হয়। কোথাও দু'-এক টুকরো ছেঁড়া মেঘ লুকিয়ে থাকলেও তা সাধারণতঃ দেখা যায় নি।

অরুন্ধতী স্বাভাবিক ভাবেই সকালে উঠে কাজ-কর্ম চালায়। দীপঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে যেখান থেকে যেভাবেই হোক কয়লা সে সংগ্রহ করবেই। জীবনের কোথাও যেখানে সুখ আর শান্তি নেই সেখানে সংসারের সামান্য, ক্ষণিকের শান্তিটুকু সে আর নষ্ট হোতে দেবে না। কয়লার খোঁজে বার হবার আগেই সে দু'-এক বার চেষ্টা করে অরুন্ধতীর সঙ্গে কথা কইবার। কিন্তু পাথরে আঘাত ফিরে আসার মত তার কথা তার কাছেই ফিরে আসে। দীপঙ্কর যে অরুন্ধতীকে কিছু একটা বলছে, এমন ভাবই অরুন্ধতী দেখায় না, যেন কানে শুনতে পায়না সে, যেন কোন কিছু বুঝতে পারছে না, এমন ভাবই দেখায়।

দীপঙ্কর কয়লার খোঁজে বার হবে বোলে ছাতার খোঁজ করার আগে এক বার আকাশের দিকে তাকালো। আকাশ বেশ পরিষ্কার। ছেঁড়া মেঘও যা দু'-এক খণ্ড ছিলো তাও দেখা যায় না। অতএব নির্ভয়ে বার হওয়া চলে।

শেষ রাত্রে কোনসময় এক দমকা হাওয়া মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। বার হওয়ার মুখে আবার অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা।

—পোড়া-কয়লা তো নেই—তবে কাঁচা-কয়লাই আনবো? কথাটা বোলেই দীপঙ্কর তাকালো অরুন্ধতীর দিকে। আশ্চর্য্য ঝড়ের এতটুকু আভাস পর্য্যন্ত মুখে নেই। থমথমে ভাবও কেটে গিয়েছে।

—জানো! আজ যে মা আর তপু আসছে! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন গলার স্বরেও।

—তাই নাকি? পত্র দিয়েছেন বুঝি?

—হাঁ, এখন খুকিটার খেলাঘরে গিয়ে দেখি পত্রখানা পড়ে আছে। কাল কোন সময় পিওন দিয়ে গিয়েছে। ওরা কুড়িয়ে খেলাঘরে নিয়ে গিয়েছে। ভাগ্যি ছিঁড়ে ফেলেনি।

—কাল বোধ হয় আমাদের ঝগড়ার সময় পিওন দিয়ে গিয়েছে। সে বেচারা আমাদের কুরুক্ষেত্র দেখে আর ঢুকতে সাহস পায় নি?

—যাও! কুরুক্ষেত্র তো তুমিই বাঁধাও। তুমি যা নইলে নয় তাও আনতে চাও না কেন?

—আমি আনতে চাইনে?—

—আনতে চাও তো আমো দেখি! মা আসছেন কত কি আনতে হবে জানো! এই নাও—এক লম্বা ফর্দ্দ দেয় অরুন্ধতী স্বামীর হাতে, দশ দফা জিনিষ, তার মধ্যে কয়লার স্থান প্রথমে। দ্বিতীয় মাকে আনতে ষ্টেশনে লোক পাঠানো।

ওরা কথা বলতে বলতেই তপন আর তার মা এসে হাজির। রাত্রের ট্রেনেই তারা এসেছেন এখানকার ষ্টেশনে। রাত্রে কোন রকমে মশার কামড় খেয়ে সারা রাত্রি জেগে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। সকাল বেলায় শুধিয়ে শুধিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হোয়েছেন অতি কষ্টে।

—আয় আয় তপু। কত দিন পরে এলি বলতো? তপন আগে ঢোকে বাড়ীতে। অরুন্ধতী এক রকম ছুটে যায় ওঁদের অভ্যর্থনায়। তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধূলো নেয়। ছেলে-মেয়েদের প্রণাম করায়।—মা, কোন কষ্ট হয়নি তো পথে? তোমার শরীরটা কত খারাপ হোয়ে গিয়েছে! অম্বলে ভুগছো বুঝি! পাড়ার খবর কি? বুধি গাইটার কটা বাছুর হোলো? দুধ দিচ্ছে তো? একসঙ্গে অনেক কথা ঝড়ের বেগে বোলে যায় অরুন্ধতী। মাকে পেয়ে যেন ছোট্ট মেয়েটি হয়ে গিয়েছে সে। বৃষ্টির দিনে একা একা যখন বাড়ীতে ভাল লাগে না তখন কত দিন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে মায়ের কথা ভেবেছে। ভেবেছে স্বর্গগতা দিদিমার কথা। পুরানো দিনের হাসি-আহ্লাদের কথা।

মা অরুন্ধতীর ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দাওয়ায় ওঠেন। দীপঙ্কর এগিয়ে গিয়ে ঢিপ কোরে প্রণাম করে।—তোমার শরীরটা যে বড্ডই খারাপ হোয়েছে বাবা!

জবাব দেবার আগেই অরুন্ধতী ইসারা করে, তাকে জিনিষ আনিতে হবে একথা সাময়িকভাবে ভুলেই গিয়েছিলো দীপঙ্কর। হঠাৎ অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে সব কথা, বিশেষ এক নম্বরের কথাটাই আগে।

মায়ের চোখ এড়িয়ে অরুন্ধতী ওরই ফাঁকে বলে যায়-কয়লাটা আগে পাঠাবে কাউকে দিয়ে, তাছাড়া ঘি-ময়দাটাও আগে আমার দরকার, বুঝলে।

বুঝছে দীপঙ্কর, পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই, যার জন্যে অরুন্ধতীর কথা বুঝতে তার দেরী হোয়েছে। কার কাছে হাত পাতবে ভাবতে ভাবতে দীপঙ্কর বেরিয়ে যায়।

অরুন্ধতী মাকে ঘরে বসিয়ে বাতাস করে আর সেই সঙ্গে দেশের যাবতীয় খবর শুধোয়। ছেলেরা দিদিমার কাছে কিছু পয়সার লোভে খেলাধূলা বাদ দিয়ে ঘুরঘুর করে। অরুন্ধতী চায় মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় কাটিয়ে দেবে কিছুটা। সেই ফাঁকে দীপঙ্কর সব জিনিষগুলো এনে হাজির করবে। অরুন্ধতীর ভয়—মা তার কাজের লোক, কোথাও গিয়ে চুপ কোরে বসে থাকতে পারেন না। যদি তার কাজের ঝোঁক চাপে তখন অরুন্ধতীর সংসারের সব ফাঁক, সব অভাব মায়ের চোখে পড়বে।

কিন্তু দু'চার কথার পর মায়ের চোখ পড়লো ছেলে-মেয়েদের ওপর। ছেলেমেয়েদের জন্যে মা কিছু আনতে পারেন নি। সেই লজ্জা ঢাকবার জন্য তিনি ছেলে-মেয়েদের দিকে লক্ষ্য দেন। বাছাদের মুখগুলো শুকনো শুকনো হচ্ছে—এদের বুঝি এখনও কিছু খেতে দিসনি অনি! হা দাদু খাওনি বুঝি কিছু? মা সকাল থেকে কিছুই খেতে দেয়নি?

—এইবার দেব মা! কাজকর্ম্ম সেরে দেব ভাবছিলাম।

—না, না, আগে খেতে দাও ওদের। সকালে কি [illegible] খায় ওরা রুটি—উনুনে আঁচ দিয়েছিস তো, বরং তুই [illegible] স্নানটা সেরেনে আমি আঁচটা দিয়ে দিই।

—না না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি সারারাত জেগে এসেছ, না হোয়েছে খাওয়া-দাওয়া, না হোয়েছে স্নান। তুমি বরং বিশ্রাম কর। তপন জামা [illegible] খুলে একটু বস ভা[illegible]

দেখি উনুনে আঁচটাচ যা দেবার দিয়ে দিই—বলেই অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি বাইরে আসে।

কিন্তু বাইরে এসেও তার শান্তি নেই। দীপঙ্কর না আসা পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারে না অরুন্ধতী। এক-একবার দরজার বাইরে আসে সে। কোথাও দেখা যায় না দীপঙ্করকে। রাগে অরুন্ধতীর সারা শরীর জ্বলে যায়। লোকটার কোন হুঁসই নেই। মায়ের কাছে বোধ হয় সাতভালি দেওয়া সংসারের দুরবস্থা ঢেকে রাখা যায় না।

—হাঁরে, এখনও আঁচ দিসনি! ছেলেগুলো যে শুকিয়ে সারা হোলো মা!

—এই যে দিচ্ছি—বিরক্তিতে আর দীপঙ্করের ওপর রাগে ফেটে পড়তে চায় অরুন্ধতী। মনে হয় দিক্ সে সব ফাঁস কোরে। জানিয়ে দিক কি কষ্টে তার দিন কাটে। জানিয়ে দিক গায়ের গহনাগুলো কি ভাবে একটার পর একটা তার বাঁধা পড়েছে সুদখোর মহাজনের গ্রাসে। কি ভাবে তার শেষ সম্বল চুড়ীটা পর্য্যন্ত বিক্রী করতে হোয়েছে এই ক'দিন আগে।

—একটু চা করনা দিদি! বড্ড মাথা ধরেছে! চাখোর তপন বারান্দায় এসে দিদির কাছে মুখ ফুটে বলেই ফেলে। তোদের এখানে ষ্টেশনে আবার চা পাওয়া যায় না রাত্রে।

ছটফট করে অরুন্ধতী। একটা কাঠের টুকরো পর্য্যন্ত ঘরে নেই। নেই একটা বাঁশ-বাখারি। নেই তো কিছুই নেই। কি জোরে সে এ সময় সংসারের টাল সামলাবে, দীপঙ্করের মানসম্ভ্রম রক্ষা করবে। লোকটার সত্যিই কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে!

বৌমামুখ হোয়ে অরুন্ধতী দরজার বাইরে একবার যায় আর ভেতরে ঢোকে।

—দিদিমণি কয়লা কোথায় থাকে রে? তোর মায়ের যেমন কাজের ধারা। আমিই আঁচটা দিয়ে দিই। মা রান্নাঘরের কাছে আসেন।

—কয়লা তো নেই দিদিমা!

—কয়লা নেই! সে কিরে!

—ওই যে এসে গিয়েছে সব। বুক থেকে পাষাণ নেমে গিয়েছে যেন এই ভাবে হাঁফ ফেলে অরুন্ধতী।

দীপঙ্কর একে একে সব কিছুই দাওয়ার উপর নামিয়ে রাখে। জিনিষগুলো নামাতে নামাতে ঐ সময়ের মধ্যেও মুটেটা এসে পৌঁছায় না কেন, অরুন্ধতীর রাগে শরীর জ্বলে।

—কয়লা? মায়ের সুমুখেই অরুন্ধতী বলতে বাধ্য হয়।

—কাঁচা-কয়লাও পাওয়া যায়নি! ফুরিয়ে গিয়েছে!

শিকারী-জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

লালগোলার পাশেই পদ্মা। স্কুলের ছাত্রের মত বেলা দশটায় আহারাদি সমাধা করে বেলা এগারোটায় রওনা হলাম।

নৌকাযোগে পদ্মা পার হয়ে আমরা সব চলেছি গো-যানে বালুর চড়ার উপর দিয়ে—যা'ব হড়্‌কো টোলার বিলে পক্ষী-শিকারে। এখন সেটা পাকিস্তানে। ওপারে দু'টি বেশ বড় তাঁবু খাটানো হয়েছে—আর একটি ছোট। চাকর-বামুনকে বাসন, বিছানা যাবতীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে দিয়ে আগেই পাঠানো হয়েছে—তারা গিয়ে ঐ ছোট তাঁবুটায় আশ্রয় নিয়েছে—দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা চাই তো। আর বড় দু'টি তাঁবু বেশ সুসজ্জিত—নীচে কার্পেট, ড্রেসিং-টেবিল, চেয়ার, ক্যাম্পখাট যথাস্থানে সব সাজানো। একটি আমার নিজস্ব, অপরটি আমার বন্ধুদের।

সঙ্গে আমার দুই বন্ধু—ক-বাবু আর খ-বাবু—নাম প্রকাশ করা চল্‌বে না। ক-বাবু শক্তির পূজারী—আজীবন শরীর আর বন্দুকের চর্চ্চা করেই সময় কাটিয়েছেন। এক দিন রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—ধনীর দুলাল—উঠতে-বসতে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতেন—বেশ জাঁদরেল, শাঁসালো গোছের ভদ্রলোকটি। বন্ধুবর্গের পরামর্শে অনেক কিছু ব্যবসায়ে বেশ মোটা রকমের লোকসান দিয়ে এখন চর্বিটা ঝরে গেলেও তিনি সব সামলে নিয়েছেন—। এখনও তহবিলে তাঁর যা অবশিষ্ট আছে—বেশ স্বচ্ছন্দে, পায়ের উপর পা দিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন।

সামনে উঁচু-নীচু বালুর চড়া। উত্তপ্ত বালুকারাশির বুকে তার দগ্ধ ইতিহাসখানা যেন খোলা কেতাবের মত পড়ে আছে। চৈত্রের প্রথম।

গরুর গাড়ী যতই এগিয়ে যায়, তার ঝাঁকুনি আর ধাক্কায় তাঁর মনের অবস্থা যেন সদ্য আই-সি-এস পাশ করা মেজাজের মত তিরিক্ষে হয়ে ওঠে।

খ-বাবু—ইণ্টারন্যাশনাল-প্রেমিক—জার্ম্মানী, ফ্রান্স, লণ্ডন, সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে সদ্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেই আমার অতিথি হয়েছেন। শিকারে তাঁরও সখ মন্দ নয়। গলাটাও বেশ মিষ্টি। কথায় কথায় তিনি আক্ষেপ করে বলতেন—"কোন নষ্টচন্দ্রে জন্মেছি—জানি না—আমার কোনো প্রেমই ধোপে টিকলো না—তবুও হাল ছাড়িনি—প্রেম নিবেদন করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। শেষটায় জমা-খরচ করে খতিয়ে দেখব—লাভ-লোকসানের হিসেবটা।" সেই বন্ধুটি বেশ সহজ, সরল, আর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেন যে, তাঁর প্রেমের পথে নাকি চড়চাপড়টাও খেতে হয়েছে।

যা হোক আমরা তাঁবুতে এসে পড়লাম। ক-বাবু—গোযান হতে নেমেই বিসর্গ দিয়ে খেদোক্তি করেন—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে:
এসেছি দিখাড়া দেশে:—
ওঃ কিঃ বেয়াড়া দেশ রে ব্যাবাঃ।

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানে সব গুছিয়ে নিয়ে একটি ক্যাম্প-খাটে লম্বা হলেন।

বেলা প্রায় আড়াইটে। আমাদের তাঁবু থেকে আধ মাইলটাক দূরে গ্রামের বসতি। স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় আমার পৌরোহিত্য করবার নিমন্ত্রণ ছিল, আর আমরা এখানে শিকারে আসবো জেনে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ সেই দিনই তাঁদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমাদের পৌঁছুবার সময়টাও তাঁদের জানা ছিল। কাজেই গোযান থেকে নেমেই দেখতে পেলাম কয়েক জন স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। মনে মনে নিজের অদৃষ্টের কথাই স্মরণ করলাম। এত দূরে, এই নির্জ্জন নদী-প্রান্তেও নিস্তার নেই। প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি—যদি তাদের মনে আঘাত লাগে।

চারটের সময় পুরস্কার বিতরণী সভা, যাবার জন্য তখনই প্রস্তুত হওয়া দরকার। আমরা তিন জনেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিলাম।

একখানা সেকেলে পুরনো ঝরঝরে ফোর্ড মোটরে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এসে পৌঁছুতেই স্থানীয় লোকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তিনি সবিনয়ে আমাকে অনুরোধ করলেন—ক-বাবুকে প্রধান অতিথিরূপে সঙ্গে নেবার জন্য। এদিকে খ-বাবুর তখন উচ্চকিত অবস্থা। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে আমি বললাম—

—খ-বাবু, তোমাকেও ছাড়বো না—চল, গান গাইতে হবে।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম—

—তোমায় আলিঙ্গন করলেই মনে হয় যেন গানের সঙ্গে কোলাকুলি। কী অদ্ভুত মিষ্টি গলা তোমার।

আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী করযোড়ে খ-বাবুকে বল্লেন,

—খুব ভাল হবে। সভা শেষের গানখানা আপনি গাইবেন। উদ্বোধন সঙ্গীতটা আমারই লেখা—ছাত্রীরা রিহার্স্যাল দিয়ে তৈরী করেছে। আপনি যদি রাজী হ'ন, তা' হলে, বিশেষ করে আমি কৃতার্থ হ'ব।

খ-বাবুর আঁখিপল্লবে কী যেন একটা ভাষাহীন তৃপ্তির আবেশ—তিনি সম্পূর্ণ দ্রবীভূত—কণ্ঠস্বরে যেন এক বস্তা চিনি ঢালা, তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলেন। বৈষ্ণব বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললেন—

—আমি জীবনে কোনো মহিলার অনুরোধ অবহেলা করিনা—তাই হবে।

ক-বাবু গোযানে বা পদব্রজে যেতে রাজী ন'ন—

—নাঃ আর গোযানে নাঃ—লাখ টাকা দিলেও নাঃ!

তদুত্তরে আমি বললাম—তা হ'লে এক কাজ করুন, দু'চার জন ভদ্রলোককে নিয়ে আপনি ঐ মোটরে যান, আমি আর খ-বাবু হেঁটেই যাবো।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নির্ম্মলা দেবী বল্লেন—

—তা'হলে আমিও আপনাদের সঙ্গেই যাই,

আমার উত্তর দেবার প্রয়োজন হ

উঠে বল্লেন—

—বেশ বেশ, সেই ভালো।

এইটুকু পথ,—কষ্ট অ

ক-বাবু একখানা কালোপেড়ে ধুতি আর গিলে করা আদ্দি-পাঞ্জাবী পরে পাক দেওয়া চাদর কাঁধে ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে এসেই বললেন—

—তা হলে: আমরা: রওনা হই—কী বল: ?

খ-বাবু উত্তর দিলেন।

—আমরা: হেঁটেই মরি:—যান্ তাই যান্।

ক-বাবু বিনা বাক্য ব্যয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

খ-বাবু আগেই কবিজনোচিত মেক-আপ করে নিয়েছেন।

নির্ম্মলা দেবীকে দু' নম্বর তাঁবুতে বসিয়ে আমি আমারটায় প্রবেশ করলাম। তৈরী হতে মিনিট দশেকের বেশী লাগেনি। বেরিয়ে এসে দেখি, খ-বাবু ইতিমধ্যে নির্ম্মলা দেবীর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন। দেশ-বিদেশের নারীর কথা শুনিয়ে তাঁকেও হকচকিয়ে দেবার উপক্রম!

আমরা চলেছি। তাঁরা দুজন আগে, আমি একটু পেছনে। খ-বাবুর হাসি আর কথার শেষ নেই। ভাল শুনতে পাওয়া না গেলেও বুঝলাম—আলাপটা বেশ গভীর হয়ে উঠেছে।

আমরা সভামণ্ডপে এসে পড়লাম। দু'দিকে দণ্ডায়মানা বালিকাদের শঙ্খ ধ্বনিতে জানিয়ে দিলে আমাদের আগমন-বার্ত্তা। দেখা গেল ক-বাবু সভাপতির মঞ্চে তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে একলা বসে চতুর্দ্দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করছেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীত, সভাপতি বরণ, মাল্যদান, বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ, পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি সূচীপত্রের কার্য্যগুলি একে একে শেষ হয়ে গেল। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণও শেষ হ'ল। তার পর উঠলেন প্রধান অতিথি—আমাদের ক-বাবু। বিসর্গের শ্রাদ্ধ করে তাঁর অভিভাষণ সুরু হ'ল—

মাতৃমণ্ডলী:, আমি: বক্তা: নই। তবে: এইটুকু: বলব:—তোমরা: সব শক্তির অংশ: নিয়ে এসেছো:—শক্তির চর্চ্চার সঙ্গে লেখাপড়া: তোমারা কর:—তা' কর্ম্মসচিবের বিবরণ পাঠে: অবগত হয়ে: বড়: আনন্দলাভ করেছি:—বিশেষত: তোমরা: সব বাংলার নারী: এক দিন মাতৃত্বের আসনে: প্রতিষ্ঠিত হবে:—তোমরাই জাতির ভবিষ্য—বাংলার নারী: ভারতের নারী:, জগতের একটা বৈশিষ্ট্য:। রামায়ণ মহাভারতের আমল থেকে: যুগে যুগে: নারীর যে রূপ আমাদের সামনে মহীয়ান হয়ে আছে:—গরীয়ান্ হয়ে আছে: তা: পৃথিবীর কুত্রাপি নেই: —অন্য দেশের মেয়েরা: কখনই তা: কল্পনা করতে পারে না:—এমন কি: এ দেশের নারীর পায়ের কাছে ও পৌঁছতে পারে না:—তথাপি বড়: দুঃখের বিষয়-এই সেদিন মিস্ মেয়ো: তার মাদার ইণ্ডিয়া: কেতাবে: লিখেছেন যে:, ভারতের সব নারীই বুঝি সকলের হৃদয় স্পর্শ করছে তাই বুঝি এত আনন্দ কোলাহল। পুনরায় অনুনাসিক সুরে জোর দিয়ে বললেন—

হ্যাঁ: হ্যাঁ: বিশ্বাস করুন—তারা মনে করে: আমাদের মা: অসতী: ভগ্নী অসতী: এমন কী: পিসিমা পর্য্যন্ত:—

আর যাবে কোথায়? কে এক জন পেছন থেকে বলে উঠলো—মা-ভগ্নী অসতী হলেও চলে—কিন্তু পিসিমা অসতী হলে আর বুঝি রক্ষে নেই? বুদ্ধির গোঁড়ায় ধোঁয়া দাও! ক-বাবু নিরাশ হ'য়ে বসে পড়লেন!

—না:, আর বক্তৃতা দেওয়া চলে না:!

কোলাহল বেড়েই চলেছে, প্রশমিত হ'বার নাম গন্ধ নেই। অগত্যা সভা ভঙ্গ করে দিতে হ'ল!

খ-বাবু আক্ষেপ ক'রে বললেন—এ ভাঙ্গা হাটে আর গান চলেনা। আহা, সেই গানটা গাইতাম—সেই যে প্রেমিক প্রেমিকার কাছে চোখের জলে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

তদুত্তরে তার কানে কানে সান্ত্বনা দিলাম—

—ভালই হ'ল—শাপে বর হয়েছে—তোমার প্রেমের গান এই বালিকা-বিদ্যালয়ে অচল।

ক-বাবু আর খ-বাবুর চোখে বিভিন্ন জাতের দুঃখ। আমরা সব রওনা হয়েছি—খ-বাবু কিছুটা দূর এসেই, দৌড়ে ফিরে গিয়ে নির্ম্মলা দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আবার যোগ দিলেন।

আমরা সব নীরবে তাঁবুতে ফিরে এলাম। কারো মুখে কথা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার চারি দিক ছেয়ে ফেলেছে। ক-বাবু শরীরকে একটু চাঙ্গা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজস্ব ব্যাগ খুলে অতি সযত্নে রক্ষিত লালপানির বোতল বের করে গেলাসে ঢেলে নিলেন। তার পর সুরু হ'ল তাঁর বক্ষলগ্ন কতকগুলি কবচ এবং বাহুলগ্ন কয়েকগণ্ডা মাদুলি—একটাকে বাবাছলি বললেও চলে—যেন একটা ছোটখাটো ঢোল—সেইগুলি সব রঙীন সুরায় ডুবিয়ে হয়ত শোধন করে নিলেন—তার পরেই চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় জয় মা তারা বলে গলাধঃকরণ।

ক বাবু আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা প্রবীণ। খ বাবুকে সম্বোধন করে বললেন—হ্যাঁরে খ: তুই বিয়ে করলি না কেন: ?

উত্তরটা যেন জিহ্বাগ্রে বসানো ছিল।

—জীবনে যদি বুদ্ধির কোনও কাজ করে থাকি—তবে ঐ বিয়ে না করাটা! ওরে বাবা:—

খ বাবুকে এক পেগ্ এগিয়ে দিয়ে ক বাবু বললেন—যা বলেছো ভায়া: কর্ত্তা হলেন সং, আর গৃহিণী: হলেন সার।—এই তো সংসার! নাও ধর:।

—দিচ্ছ দাও—বিলেতে পার্টিতে মাঝে মাঝে এক-আধটু খেতাম বটে—তবে তোমার মত অভ্যস্ত নই। গান-টান নাচ-টাচেই যা' একটু নেশা—

কী একটা আমেজে ক-বাবুর ভাবিক্কে মাথাটা দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত দুলতে থাকে, জিভের জায়গায়ও ঠোঁটটা চেটে নিয়ে কাটা কাটা বচন দেন—

গান-টান? নাচ-টাচ?—হুঁ:—আমি ভায়া:, গানে নেই, টানে আছি:—নাচে নেই—touchএ আছি:।

আনন্দে উচ্ছল ক বাবু এর পর আমাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন—খাও না হেঃ একটা পেগ,—কী রকম যে তুমিঃ, বুঝি নাঃ—শরীরটা 'ফিট্' থাকবেঃ—দেহে বেড়ে ফুর্ত্তিঃ-আনন্দঃ আসবেঃ—

বলেই তিনি মত্তপানের উপর একটা নাতিদীর্ঘ বিসর্গ সমন্বিত বক্তৃতা দিলেন।

করযোড়ে সবিনয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বললাম—

—জানেনই ত' আমি চা, পান, মশলা, কিছুই খাই না—হুইস্কী তো দূরের কথা! সংসারে এত সব খোরাক থাকতে, ধার করে এই সাময়িক আনন্দ কেনার পক্ষপাতী আমি নই।

ক বাবুর চক্ষু-তারকা উৰ্দ্ধে উঠে অবলুপ্ত হবার সামিল—ঐ অবস্থায় বলে যান—

—ধার করেঃ আনন্দ কেনাঃ—বল কিঃ?

—নিশ্চয়ই ওই সাময়িক নেশাটাই আপনার ধার ওটা আনন্দ নয়, আনন্দের মুখোস পরে আসে নিরানন্দের অগ্রদূত! ওটা ভোগ নয়—উপভোগ—

—অর্থাৎ?

—খুব সোজা কথা, ভোগে আনন্দ, আর উপভোগে কষ্ট জানেন তো?

—ছেড়ে দাও ও সব বড়ঃ বড়ঃ কথাঃ।

—বেশ, চুপ করলাম। চলুন খেয়ে দেয়ে শোয়া যাক—কাল খুব ভোরেই শিকার, মনে আছে তো?

পর দিন। ভোর রাতে ক-বাবু আড়মোড়া ভেঙ্গে বেশ ভাল করে চক্ষুদ্বয় কচলে নিলেন। শয্যা ত্যাগ করে উঠে বসেই কর্ণ বিমর্দ্দনের সঙ্গে উক্তি করেন।

—দেখঃ—গরুর গাড়ীতে শিকারে যাব নাঃ।

—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? চলুন না হেঁটেই যাই, এই তো মাইলটাক দূরেই বিল।

সেই ভোর রাতেই আমরা প্রাতঃকালীন আহার সেরে বেরিয়ে পড়লাম। ঠাকুর-চাকর আগে থেকেই সব প্রস্তুত করে রেখেছিল। কোনই অসুবিধে হয়নি।

বিলের ধারে এসে দেখি বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর দল। তাদের কাকলিতে সমস্ত জলাটা মুখর। প্রভাত সূর্য্যকে অভিনন্দন জানিয়ে যেন তারা চারি দিক সচকিত করে তুলতে চায়।

আমরা তিন জন তিন দিক দিয়ে জলাটা ঘিরে দাঁড়ালাম। আমাদের প্রথমেই ঠিক হয়েছিল ক-বাবু আওয়াজ করলেই খ-বাবু আর গ-বাবু অর্থাৎ আমি বন্দুক চালাবো।

তাই হ'ল—বন্দুকের শব্দ হতেই পাখীরা কলরব করে উড়তে লাগলো—দু' ভাগ হয়ে;—কোনও দল খ-বাবুর দিকে—আর কিছুটা আমার সামনে এলো। দুটো লাল-শির মোরগাব ঠিক আমার মাথার উপর আসতেই উড়তি মারে বিলের মধ্যে পড়ে গেল।

এমন সময় এক ঝাঁক "চিল"কে জলের ঠিক ফুট চারেক উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম। তখন, কে জানতো সীতার সেই স্বর্ণ-মৃগের মত তারা দলে দলে আমায় প্রলুব্ধ করতে এসেছে।

আমিও তৎক্ষণাৎ আমার 'প্রীথার' বন্দুকে 'বি বি সট্' ভরে নিয়ে উপর্য্যুপরি দুটো আওয়াজ করতেই ওপার থেকে একটি করুণ আর্ত্তনাদ ভেসে এলো!

কী সর্ব্বনাশ! নারী হত্যা করলাম! চেয়ে দেখি একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট্ করছে। চোখে অন্ধকার দেখলাম। ঘুরে ওপারে যেতে বহু সময় লাগে, তাই, বন্দুকটা ফেলে, খাঁকী হাফ সার্ট প্যান্ট নিয়েই জলে ঝাঁপ দিলাম। কত গভীর জল, সেটা চিন্তা করারও অবসর ছিল না—পায়ে কাবলী জুতো খেয়াল নেই। জলেই সেই জুতো জোড়াটা সমাধি লাভ করলে। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা সাঁতার কেটে সোজা ওপারে উঠলাম। ছুটে মেয়েটির কাছে গিয়ে দেখি ছররা তার ডান পায়ের জঙ্ঘা প্রদেশের মাংসবহুল স্থানের একটা পাশ কেটে বেরিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তার অন্যান্য সহচরী কাঁখের কলসী ফেলে দিয়ে পাশের গাঁ থেকে বহু লোকজন ডেকে এনেছে। তাদের মুখের দিকে যেন আর চাইতে পারি না। মনে মনে তোলপাড় করি—তারা সেলাম ঠুকবে না নিশ্চয়ই, বরং উল্টো দু'-চার ঘা না খেতে হয়। আবার তারাই যখন এগিয়ে এসে পরে আমায় সান্ত্বনা দিলে, লজ্জায় মরে গেলাম।

ভগবানের অসীম কৃপা। কোনও গুরুতর জখম হয়নি। মেয়েটি জাতে গয়লানী, বয়স বোধ হয় ২০।২১ হবে। পকেট থেকে ভিজে রুমাল বের করে আহত স্থানটা চেপে ধরলাম। রুমালটা রক্তস্নাত হয়ে উঠলো।

কেউ এসেছে মজা দেখতে—কেউ বা দরদ নিয়ে। ঐ জনতার মধ্যে এক জন হাকিম—সেও তার ওষুধপত্রের থলেটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—বিড় বিড় করে কী সব মন্তর আউড়ে, একটা প্রলেপ মাখিয়ে ঐ ক্ষতস্থানটা ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে। বেশ মোড়ল মাতব্বর গোছের লোক।

ইতিমধ্যে ক আর খ-বাবুও এসে পড়েছেন। পেছনে এক কৃষকের হাতে অনেকগুলো পাখী। সামনে মেয়েটির ঐ অবস্থা—আমারও এই অপরূপ মূর্ত্তি—তাঁরা দু'জনেই দু' ধার থেকে এসে থমকে দাঁড়ালেন। লোকের মুখে মুখে তাঁরা ব্যাপারটা আগেই জেনে নিয়েছিলেন—আমার কর্দমাক্ত নগ্নপদ দেখেই ক-বাবু বলে উঠলেন—

—কিঃ ভেজা বেড়াল, খুব ভালঃ—শিকার করেছোঃ তোঃ?

সাধারণতঃ আমি কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারি না—তবুও মনটা যেন কেমন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। আমি তার দিকে চাইতেই, খ-বাবু উত্তরটা দিয়ে বসলেন—

—ছিঃ ক-বাবু, ভদ্রতার একটা সীমা আছে—সেটা লঙ্ঘন করা কোনো মানুষের উচিত নয়। দেখছেন না, ওঁর চেহারাটা যেন ছ'মাসের রুগী। ইচ্ছে করে সে যে করেনি—এটুকু বুদ্ধি আপনার ঘটে নিশ্চয়ই আছে, আশা করি। মানুষের দুর্গতি যে কখন কী ভাবে আসে তা বলা যায় না।

ক-বাবু যেন অপ্রতিভ হয়ে কথাটা সামলে নিলেন—

যাঃ বলেছো ভায়াঃ—দ্রৌপদীর আঁচলে বাঁধা [illegible]

—তবু ও কত নাঃ তাঁকে দুর্গতিঃ পোয়াতে হয়ে[illegible]। খ-বাবু [illegible]

আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি মনিব্যা[illegible]

আমার সঙ্গ ত্যাগ করে লজ্জায় জলে ডু[illegible]পনার কষ্ট হবে না তো?

জনতার মধ্যে কে এক জন পরিচ[illegible]?

স্বামীর সঙ্গে। আমি খ-বাবুর কাছে শ দুয়েক টাকা আছে কি না জিজ্ঞাসা করতেই ক-বাবু ফস করে তাঁর মনিব্যাগ থেকে দুশো টাকার দুখানা নোট খুলে আমার সামনে ধরলেন। খ-বাবু নিয়ে আমার হাতে দিতেই, আমি সেটা মেয়েটার স্বামীর হাতে দিলাম। অপরাধীর মত তার দু'টি হাত ধরে কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বললাম—

—অন্যায়ের ঋণ টাকা দিয়ে শোধ হয় না—তবে এটা না নিলে খুবই কষ্ট পাবো।

সে কিন্তু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি, অনেক করে তাকে বুঝিয়ে টাকাটা গছিয়ে দিলাম।

আমার চোখ-মুখ দেখে বুঝি তার দয়ার উদ্রেক হয়েছিল—তাই উপদেশ দিলে—

শিকারী মানুষ—এইটুকুতে এত ঘাবড়ে যান্ ক্যানে? আমরা জেতে গয়লা—রোজ বীর হনুমানজীর পূজা করি—

আমার যাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা—সেই যখন উল্টে আমায় বোঝাতে চাইল তখন তৃপ্তি পেলাম বৈ কি।

এরই মধ্যে কে এক জন গরুর গাড়ী ডেকে এনেছে—মেয়েটি নিজের চেষ্টায় গাড়ীতে উঠে বসল দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমি তার স্বামীটিকে বললাম—চল, তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আর এইখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—এক বচ্ছর বন্দুক ধরব না—এইটেই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

ক-বাবু চীৎকার করে উঠলেন—আহা: হা:—কর: কী:—কর: কী:, এখানে যে: চারদিন ব্যাপী: শিকারের প্রোগ্রাম!

—আপনারাই করবেন—আমি দাঁড়িয়ে দেখব—শিকার আমায় বড্ড পেয়ে বসেছে—এখন থেকে এই বাতিকটাকে আমার তাঁবে রাখতে চাই। আর একটা কথা—আপনি বলেছিলেন না লালশির মোরগাব খেতে খুব সুস্বাদু। ঐ জলে দুটো পড়েছে—কাউকে দিয়ে তুলিয়ে নিন্—আমি এদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসৃছি। আর ভাই খ—আমার বন্দুকটা ঐ গাছ-তলায় পড়ে আছে, কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নাও।

খ-বাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন—তার পর আমার কানে কানে বললেন—ভাই, নির্ম্মলা দেবী তাঁর বাড়ীতে আমায় চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন—কালকের আলাপে আমাদের একটা সম্বন্ধ বেরিয়ে পড়েছে কি না। তা একটু দেরীই হয়ে গেল, যাই, আমার জন্যে তিনি এতক্ষণ বুঝি ইস্কুলে অপেক্ষা করছেন।

অতি দুঃখেও হাসি এল।

আমি খ-বাবুর দিকে চাইতেই, তিনি মৃদু স্বরে বললেন—জানোই ত ভাই নারীদের প্রতি আমার কী রকম যেন একটা দুর্ব্বলতা—I mean সম্ভ্রমবোধ আছে—অনুরোধ করলে আর না বলতে পারি না।

—বেশ, তাই যাও—ভাগ্যবান্ তুমি—সন্দেহ নেই।

এমন ... ক ক-বাবু যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন—তোমাদের কী:

ক-বাবু ... : বুঝি না:—

বলে উঠলেন— ... টির স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন—বলি:

—এমন কি: শিশি...

সভাস্থলে তিন ধারণের

ও বিকট হাস্য ধ্বনি।

—শ্রীগোপীজনবল্লভ-পদরেণু ঘোষ।

—বা, বেশ ছোট: নামটি তো। আচ্ছা:, গয়লা-দিদি থুড়ি:—

ঘোষ জায়ার নামটি: কী:।

—সে ঠিক বুঝতে পারলে না যে ক-বাবু কী জানতে চান।

খ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বৌয়ের নাম কি হে?

—যমুনা—ঐ ভাখেন তার দিদিও এইস্তাছে ওনার নাম গঙ্গা।

ক-বাবু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন—

আহা:—তা: বেশ, তা: বেশ—গঙ্গা: যমুনা: আর একটা অন্তঃসলিলা: গুপ্তা: সরস্বতীর সঙ্গম হলেই তো: প্রয়াগতীর্থ: কী বল:?

খ-বাবু অধীর হয়ে উঠলেন তাঁর টি পার্টির বেলা বয়ে যায়!

—সময় নেই, অসময় নেই সব সময় বাবুর ঠাট্টা লেগেই আছে। যান্ না ঐদিকে পাখীটাখী শিকার করে ফিরে যান—আমি একটা জরুরী কাজ সেরে এখুনি আসৃছি।

—আচ্ছা:, এবার থেকে না হয় পাঁজীর অমৃতযোগটা: দেখেই ঠাট্টা করা যাবে:—বেলা: হয়ে: গেল: না:—তবে যাও বট্‌পট্ কাজটা: সেরেই এসো:—হা: হা: হা:—

মন্থর গমনে গরুর গাড়ী এগিয়ে চলেছে। আমি আর গোপীজনবল্লভ হেঁটে পথ চল্‌ছি, কত কথাই না সে বলে যেতে লাগলো। "যমুনার আগের স্বামী তাকে মারধর করে ভাত-কাপড় দায় না, তাই সে এক দিন পালিয়ে এইস্যা হামার সঙ্গে নিক্যা করেছে, ছোটবেলা থেকেই ভাবছ্যালো কি না। যমুকে হামি পরাণের চেয়েও ভালবাসি—"ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছইয়ের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দু'নম্বর পতি পরমগুরু জিজ্ঞেস্ করলে—

—ওরে যমু, পায়ের বেথাটা ক্যামন রে?

ঘোষজায়া চোখ-মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলে—ভালই মুনে হচ্ছে।

আমার সামনে ভেসে উঠলো যমুনার মূর্ত্তি—কপালে বিচিত্র উল্কি, প্রজাপতি-মার্কা পাছাপেড়ে সাড়ী, হাতের উপর-নীচে মোটা রূপোর তাগা ও বালা, পায়ে বেশ ভারী ওজনের চাঁদির মল—নাকে নথ, কোমরে বিছে, বাংলার স্বাস্থ্যবতী গ্রাম্যবধূ!

—দ্যাখছেন, বুলেছিলাম না—উ-কিছু নয়—আপনারা বুলেন গুয়ালারা নাকি ষাট বছরে সাবালক হয়। যমুকে নিকা করার পরই পিত্যাঠাকুর আমাকে সাটিফিটিক্ দিয়্যাছিলো—

—কী সার্টিফিকেট্?

—বা—এবার তুই পঁচিশ বছরেই সাবালক হয়ে গ্যাছিস্।

লায়েক গোপীজনবল্লভের অট্টহাসিতে সামনের চলমান্ গরুর গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গেল। ছইয়ের মধ্যেও একটানা জলতরঙ্গ হাসি!

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ছয়

ভাষার দ্বারা অন্তরের অভিব্যক্তি প্রকাশের যে দিন থেকে সুরু হ'য়েছে, সেদিন হ'তেই কত পুরুষ তার প্রিয়তমার নামটি এমনি হৃদয়-নিঙড়াণ প্রণয়-মাধুর্যে ডেকেছে। প্রণয় মধুর ঐ ডাকটি আজিও তাই পুরাতন হয় না, হয়নি এবং হবেও না।

কার্তিকের শেষ। রাতের আকাশ নিঃশব্দে শিশির ঝরায়। সেই শিশিরে আর্দ্র রাত্রির বাতাস মৃদুমন্দ বহে চলেছে। এদিকে-ওদিকে জ্বলছে আর নিবছে জোনাকীর বাতি টিপ-টিপ করে।

শুধু শশাঙ্কই যে দু'চোখে নিদ্রা ছিল না সে রাত্রে তা নয়, চন্দ্রার চোখেও বুঝি নিদ্রা ছিল না। সেও দ্বিতলে তার শয়ন ঘরের খোলা বাতায়নের সামনে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আনমনা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

শুনেছে সে দাই সরযূর মুখেই এখান থেকে জমিদারের প্রাসাদটি খুব বেশী দূর নয়, আনমনা সে ভাবছিল বোধহয় শেখরেরই কথা। প্রাসাদের কোন একটি নিভৃত কক্ষে পালঙ্কপরি শুভ্র দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় পাখীর পালকের নরম উপাধানে মাথা দিয়ে এখন হয়ত সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

পূর্বে কোন দিন কেশ বা বেশ প্রসাধনের উপরে কোন মাত্র যত্ন বা স্পৃহা ছিল না চন্দ্রার, কিন্তু আজকাল কেন না জানি সে প্রতি সন্ধ্যায় সযত্নে কবরী-বন্ধন করে, যুগ্ম দু'টি বঙ্কিম ভ্রূ মধ্যস্থলে পরে একটি কাঁচপোকার টিপ। নিত্য নতুন ছাঁদে কবরী-বন্ধন সে করে।

আজও করেছিল। আর পরিধানে ছিল একটি আকাশ নীল-জরির বুঁটি দেওয়া নীলাম্বরী শাড়ী, কেবলই তার মনে পড়ছিল আজ দ্বিপ্রহরের সেই ঘটনাটি। আপন মনে খুসীর আনন্দে সাঁতার কাটতে কাটতে কৃষ্ণসাগরে অনেকটা দূর চলে গিয়েছিল সে। হঠাৎ সেই শর ও হোগলা বনের সামনে সবুজ মখমলের মত ঘাসের উপরে উপবিষ্ট শশাঙ্ককে দেখেই সে চমকে উঠেছিল।

শশাঙ্ক ডেকে উঠেছিল, চন্দ্রা! চন্দ্রা—

কিন্তু কেন যে সে হঠাৎ ডুব সাঁতার কেটে পালিয়ে এলো ত্রস্তা হরিণীর মত। কি ভাবল শশাঙ্ক কে জানে, রাগ করেছে কি না সে তার উপরে, তাই বা কে জানে। পালিয়ে না আসা ছাড়া তখন আর তার উপায়ই বা ছিল কি? সর্বাঙ্গে লেপটে যাওয়া জলসিক্ত শাড়ী নিয়ে সেই বা কোন লজ্জায় গিয়ে তার সামনে দাঁড়াত। ছিঃ! শশাঙ্ক হয়ত ভাবত, কি প্রগলভা, কি নির্লজ্জা চন্দ্রা?

একাকিনী ঘরের মধ্যে আপনা থেকেই শুভ্র গণ্ড দু'টিতে যেন রক্তিমাভা দেখা দেয় চন্দ্রার। অকারণেই এক বার ঘরের মধ্যে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে চন্দ্রা, ঘরের কোণে রৌপ্য নির্মিত পিলসূজের 'পরে প্রদীপ-শিখাটি যেন হঠাৎ কেঁপে উঠলো তারই মত লজ্জায় থির-থির করে, হঠাৎ এমন সময় চাপা কণ্ঠের ডাকটি তার কানে এসে বাজলো, চন্দ্রা, চন্দ্রা! প্রথম দু'বারের ডাক অস্পষ্ট হলেও তৃতীয় বারের ডাকটি বুঝতে চন্দ্রার আর এতটুকুও কষ্ট হয় না, আনন্দ, বিস্ময় ও আকস্মিকতায় চন্দ্রা যেন চমকে ওঠে।

ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক তাকাল চন্দ্রা। না, ঘরে কেউ নেই, সে একা, সরযূও এতক্ষণে দোতলার দক্ষিণের ঘরে নিদ্রাচ্ছন্ন, চির দিনই ঘুম তার গাঢ়। নিশ্চয়ই সে কিছু শুনতে পায়নি। দরোয়ানও তার ঘরে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আবার ডাক এলো চতুর্থবার, চন্দ্রা! চন্দ্রা—

কে? চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে চন্দ্রা।

আমি শেখর। দরজাটা খুলে দাও চন্দ্রা।

কিন্তু সদর দরজায় ত' এখন ভারী লোহার তালাটা পড়ে গেছে ভিতর থেকে। রাত এগারটায় শুতে যাবার আগে প্রত্যহ নিজে সরযূ তালাটা লাগিয়ে দরজায় তবে নিশ্চিন্ত হয়, কেমন করে সে শশাঙ্ককে এত রাত্রে ভিতরে নিয়ে আসবে। চাবী সরযূর আঁচলে।

আবার নীচের অন্ধকার থেকে শশাঙ্কর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কি করছো চন্দ্রা, দরজাটা খুলে দাও। আমি শেখর।

তাইত! এখন উপায়? হঠাৎ একটা কথা চন্দ্রার মনে পড়ে, ঠিক সেই ভাবেই ওকে সে ভিতরে নিয়ে আসবে। নাতি উচ্চকণ্ঠে শশাঙ্ককে সম্বোধন করে চন্দ্রা বলে, পুবের খোলা ছাদের দিকে যাও, আমি ছাত থেকে শাড়ী ঝুলিয়ে দেবো, তাই ধরে তুমি উপরে উঠে আসতে পারবে না?

পারবো। পারবো। শশাঙ্ক জবাব দেয়।

পুবের ঘরটার সামনেই প্রাচীর ঘেরা খানিকটা খোলা ছাদ। আলনা থেকে চট্পট্ দু'টো সাড়ী নিয়ে ছাদের দিকে চলে গেল চন্দ্রা তড়িৎ লঘু পদবিক্ষেপে। দু'টো শাড়ীর দুই অঞ্চল প্রান্তে গিঁট বেঁধে এবং এক প্রান্ত শাড়ীর প্রাচীরের সঙ্গে বেঁধে অন্ত প্রান্ত ঝুলিয়ে দিল নীচের অন্ধকারে।

কিছুক্ষণ বাদেই সেই ঝুলন্ত শাড়ীর প্রান্ত ধরে ঝুলতে ঝুলতে উপরে উঠে এল শশাঙ্ক। প্রাচীরের উপর থেকে লাফিয়ে ছাদে নামল।

পরিশ্রমে তখনও হাঁপাচ্ছে শশাঙ্ক, প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

সত্যিই চন্দ্রা, ভাবতেই পারিনি এত রাত্রে তুমি জেগে থাকবে।

কিন্তু এই রাত্রে এমনি করে আসা তোমার উচিত হয়নি।

উচিত-অনুচিত বোধ কি আর এখনো আমার অবশিষ্ট আছে চন্দ্রা? উচিত অনুচিত বোধ না থাক, প্রাণের ভয়ও ত আছে, তাও বুঝি এখন আর আমার নেই চন্দ্রা।

চল, আমার ঘরে চলো।

তোমার ঘরে, বেশ তাই চল।

ঝুলন্ত শাড়ীটাকে আবার উঠিয়ে নিয়ে চন্দ্রা এগিয়ে চলল, শশাঙ্কও তার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হলো।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে। প্রদীপ-দানে প্রদীপটি টিপ্-[illegible]বায় ও করে জ্বলছে। প্রদীপের স্বল্পালোকে একটা স্বপ্নসম আ[illegible]নটা সে[illegible] লুকোচুরী যেন ঘরের মধ্যে।

চন্দ্রার পালঙ্কের উপরে পা ঝুলিয়ে বসবে না। তুমি সারা কনুইয়ে ভর দিয়ে অর্ধশয়ন অবস্থায় চন্দ্রা[illegible]শোওয়া, না হোয়েছে [illegible] কবরীবন্ধনকে ইতিমধ্যে আদর করতে [illegible]খোলা খুলে একটু বস

"লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে"
—এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
ভারতে প্রস্তুত
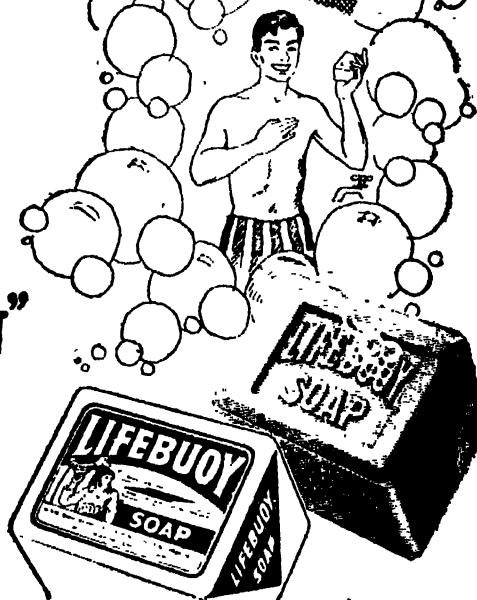
মুক্ত করে দিয়েছে শশাঙ্ক। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ এলিয়ে পড়েছে বুকে বেণী হয়ে।

তার হাতের আঙুল দিয়ে সেই খোলা কেশ নিয়ে খেলা করতে করতে এক সময় শশাঙ্ক বলে, দুপুরে অমনি করে আমার ডাক শুনেই টুপ করে ডুব সাঁতার দিয়ে পালিয়ে এলে কেন বলত ?

বারে। আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম নাকি।

দু' আঙুলে আলতো ভাবে চন্দ্রার নরম গালটা একটু টিপে দিয়ে শশাঙ্ক বলে, ওরে মিথ্যুক ! এখনো অস্বীকার।

তুমিই বা জলে নেমে এলে না কেন ?

নাববো ত' ভেবেছিলাম। কিন্তু টুপ করে ডুব দিয়ে কোথায় কোন দিকে যে তুমি পালালে।

হাগো দুষ্টু! পালিয়ে এসে এখন কথা ঢাকা হচ্ছে।

আবোল-তাবোল অসংলগ্ন সব কথা। যার না আছে কোন অর্থ না আছে কোন শেষ। শুধু মাত্র বলবার আনন্দেই বা বলা। শোনার আনন্দেই শোনা। অর্থহীন কূজন।

আচ্ছা চন্দ্রা ! একটা কথার জবাব দেবে ?

বল ?

আমাদের এই মিলন এর মধ্যে কি কোন পাপ বা অন্যায় আছে ?

ওকথা বলছো কেন ?

কি জানি কেন ! আমার কেবলই আজ-কাল মনে হয় অত্যন্ত দূরের তুমি, নাগালের বাইরে। মন্ত্র পড়ে তোমাকে ঘরে নিয়ে আটকে রাখা চলবে না। কোন বন্ধনেই যাবে না তোমাকে বাঁধা।

ওসব কি কথা আবার। শঙ্কিত চন্দ্রার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয় কথাগুলো।

মনে হয় যেন তুমি শুধু স্বপ্নই ! রাত্রির একটি মধুর স্বপ্ন। ঘুম ভাঙলেই দিনের আলোয় তুমি পালিয়ে যাবে। তোমার নাগাল পাওয়া যাবে না।

কেন। তুমি আমাকে এমনি করে জোর করে ধরে রাখতে পারবে না।

কিন্তু যদি এমন হয় আমাদের এই স্বপ্নকে ভেঙে দেবার জন্ত ভয়াবহ কোন দুঃস্বপ্ন আমাদের সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়।

তার পরই হঠাৎ কি ভেবে নিবিড় বাহু বন্ধনে চন্দ্রাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে শশাঙ্ক বলে ওঠে, না, না—তোমাকে হারাতে আমি পারবো না চন্দ্রা, কিছুতেই পারবো না।

চন্দ্রা চুপটি করে শশাঙ্কর বুকের মধ্যে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বলে —না। না—আমাকে তুমি ছেড়ো না।

নিবিড় আলিঙ্গনে দু'টি বক্ষের গোপন-মধুর-কামনার তপ্ত স্পর্শ যেন উভয়েই অনুভব করে।

নিস্তব্ধ ঘর। কেবল যেন তাকিয়ে আছে ওদের দিকে ভীরু কম্পিত প্রদীপ শিখাটি। দু'টি বক্ষের তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস যেন একে অন্যকে ছুঁয়ে চলে।

আবার এক সময় শশাঙ্ক ডাকে, চন্দ্রা।

উঃ।

ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?

না।

তবে চুপ করে আছো, কথা বলছো না কেন ?

তুমি বল আমি শুনি।

এমনি করে যদি রাত্রিই কেবল আমাদের সামনে থাকতো অনন্ত কাল ধরে তার কালো পক্ষ বিস্তার করে। এমনি নিবিড় পাওয়ার মধ্যে দিয়েই সময় তার চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

এসব তুমি আজ কি বলছো, আমার বড্ড ভয় করছে।

আচ্ছা চন্দ্রা এমন যদি কখনো হয় আমাকে দূরে চলে যেতে হয়।

না। না—ওকথা বলো না গো, বলো না।

তুমি বড় ভীতু চন্দ্রা! বড় কোমল, বড় বিশ্বাসী। কিন্তু জগৎটাত তা নয়। বড় কঠিন, বড় কর্কশ, অবিশ্বাস আর সন্দেহ, দুঃখ ও বেদনা এর সর্বত্র।

না, তবু। কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তার আগে আমি···বলতে বলতেই উঠে বসে চকিতে কোমর থেকে গোঁজা একটি হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা খাপ সমেত তীক্ষ্ণ ছোরা টেনে বার করল চন্দ্রা। মৃদু প্রদীপালোকেও ইস্পাতের ছোরাটা ঝিল ঝিল করে উঠলো।

চকিতে ছোরা সমেত হাতটা মণিবন্ধে চেপে ধরে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে শশাঙ্ক—ও কি !···

হাঁ। তার আগেই এই ছোরা আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে, মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করলেও এ করবে না কোন দিন।

ছোরাটি ততক্ষণে কেড়ে নিয়েছে শশাঙ্ক।

এ ছোরা সব সময়েই তোমার কাছে থাকে নাকি ?

হাঁ !

কিন্তু কেন ?

বললাম ত। আজকাল ত দ্রৌপদীদের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ভগবানের আবির্ভাব হয় না, তাই নিজে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাই ত' নির্ভাবনা আমি।

হঠাৎ কী যেন একটা মনে পড়ে যায় শশাঙ্কর। ছোরাটা চন্দ্রার হাতে ফিরত দিতে দিতে বলে, তাই যেন পারো তুমি।

রাত্রের নিঃসঙ্গ প্রহর গড়িয়ে চলে পলে পলে। ত্রিযামা রাত্রি আসানের পথে। শিশিরসিক্ত ভোরের হাওয়া ঝির ঝির করে কক্ষে এসে প্রবেশ করে।

চন্দ্রা বলে, এবারে ফিরবে না ? রাত বোধ হয় আর বেশী নেই।

হাঁ, যেতেই ত হবে।

ঝুলন্ত শাড়ীটা ধরে নীচের দিকে ঝুলতে ঝুলতে উপরের দিকে আবার তাকায় শশাঙ্ক। অস্পষ্ট ফিকে অন্ধকারে প্রাচীর গাত্রে দেখা যায় তখনও চন্দ্রার মুখখানি।

চন্দ্রা যাই।

এসো।

কাল আবার ঐ সময় আসবো।

এসো।

এমনি করে আবার তুলে নেবে ত।

নেবো।

এবারে তুমি ঘুমিও চন্দ্রা।

ঘুমাবো।

···ধীর ওরা
···নটা সেরেে
···ব না। তুমি সারারাত
···াওয়া, না হোয়েছে স্নান
···াথা খুলে একটু ঘুম ভা

ত্রিযামা রাত্রির অবসন্ন শেষ যাম।

কৃষ্ণ সাগরের তীর দিয়ে অশ্বারূঢ় হয়ে চলেছে শশাঙ্ক প্রাসাদের দিকে। মাথার উপরে নভঃপ্রান্তে শুকতারাটা জেগে রয়েছে। শুকতারা নয়, ও যেন চন্দ্রাবই চক্ষু! চলছে ওর সঙ্গে সঙ্গে। মৃদুমন্দ বাতাসে জাগরণ-ক্লান্ত চক্ষু দু'টি যেন ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায়।

আস্তাবলে ঘোড়াটা বেঁধে রেখে বাইরের মহাল অতিক্রম করে চলছে শশাঙ্ক, হঠাৎ কাণে এলো তানপুরা সহযোগে চাপাকণ্ঠে মিষ্ট-মধুর সুরালাপ। জয় জয়ন্তির আলাপ চলেছে। থমকে দাঁড়াল শশাঙ্ক।

মনে পড়লো আজকালকার মধ্যেই উস্তাদ দবীর খাঁর দেশ থেকে ফিরবার কথা ছিল। সংগীতপ্রিয় পিতার মাহিনা করা উস্তাদ দবীর খাঁ।

পিতা এককালে ওর কাছে সংগীত শিক্ষা করতেন। লক্ষ্ণৌ থেকে নিয়ে এসেছিলেন উস্তাদ দবীর খাঁকে প্রথম যৌবনে।

এখন অবিশ্যি যৌবনের সেই একদা উগ্র সংগীত স্পৃহা আর নেই রাজশেখরের। তবে দবীর খাঁকে বিদায় দেন নি। এখানেই মোটা মাহিনা দিয়ে রেখে দিয়েছেন।

বৃদ্ধ হয়েছেন এখন দবীর খাঁ। সত্তরের কাছাকাছি প্রায় বয়স। সমস্ত মাথার কেশ পেকে শাদা হয়ে গিয়েছে। রেশমের মত শাদা কেশ, সাদা দাড়ি। রক্ত গোলাপের মত টক্‌টকে গাত্রবর্ণ। হাতের পাতা ও নখাগ্র মেহেদী রাঙানো। পরিধানে সিল্কের পায়জামা ও জোব্বা।

বহির্মহলের নিভৃত একটি কক্ষে থাকেন।

একমাত্র কন্যা রাবেয়ার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে লাহোরে গিয়েছিলেন। কন্যাটি বাঁচেনি তা তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়েছিলেন রাজশেখরকে। লিখেছিলেন—বাবু সাহেব, আমার রাবেয়া আর ইহজগতে নেই। বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী আব্বাজানকে ফেলে চলে গেছে সে বেহস্তে। আজ আমি সম্পূর্ণ একা। কোন বন্ধনই আর নেই।

শশাঙ্ককে বড় ভালবাসেন দবীর খাঁ। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো শশাঙ্ক উস্তাদের ঘরের দিকে। তানপুরার মৃদু ঝঙ্কারের সঙ্গে চলেছে রাগালাপ। ভেজান দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল শশাঙ্ক।

মেঝেতে বসে তানপুরাটা বুকের কাছে চেপে ধরে কক্ষের মৃদু প্রদীপালোকে রাগালাপ করছেন দবীর খাঁ। নিমিলিত ভাব সমাহিত দু'টি চক্ষু। একপাশে এসে বসল শশাঙ্ক।

এই মুহূর্তে বড় ভাল লাগছে দবীর খাঁর কণ্ঠে রাগালাপ। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গান থামিয়ে চক্ষু মেলে তাকাতেই উস্তাদজী সম্মুখে অদূরে উপবিষ্ট শশাঙ্ককে দেখে বলে উঠলেন, বেটা! কখন এসেছো, টের পাইনি ত।

সংগীতের সময় কি আপনার জ্ঞান থাকে উস্তাদজী!

মৃদু হাসলেন দবীর খাঁ।

ভাল ত বেটা।

হাঁ। তারপর একটু থেমে আবার বলে।

আপনি কেমন আছেন উস্তাদজী।

আমার আর থাকা থাকি বেটা। কবরের উপর এক পা। এখন খোদাতাল্লার কাছে যেতে পারলেই হয়।

আজই ফিরেছেন?

হাঁ—সন্ধ্যার পরে।

আর একটা গান করুন উস্তাদজী।

দবীর খাঁ তানপুরাটা আবার তুলে নিলেন। এবারে ধরলেন ভৈরো রাগ।

রাত্রির শেষ প্রহরটুকুও শেষ হয়ে আসে। পূর্বাকাশে রক্তিম ছোপ লাগে অত্যাসন্ন উষার।

ঘুমে চোখের পাতা এতক্ষণ ভারি হয়ে আসছিল, সুরের স্পর্শে সে ঘুম যেন গেছে পালিয়ে। জাগো। কে কোথায় আছো ওগো অমৃতের পুত্ররা জাগো। খোলা জানালা পথে প্রথম ভোরের প্রসন্ন আলোর ধারা কক্ষের মধ্যে এসে উঁকি দেয়। ওস্তাদজীর কণ্ঠে সুরের ইন্দ্রধনু রচনা চলে।

* * * *

দিন দুই পরে।

ঘুম ভাঙতেই কানে এলো শশাঙ্কর সানাইয়ের মধুর আলাপ।

ভারী মিষ্টি লাগে সন্ত নিদ্রাভঙ্গের পর শিথিল অনুভূতির জাগরণ সুরের বাহুস্পর্শে। কাল অনেক রাত্রে চন্দ্রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিল শশাঙ্কশেখর। তাই উঠতে আজ বেলা হয়ে গেছে। মাধবী দু' তিনবার ঘরে এসে তার দাদাকে তখনও নিদ্রাভিভূত দেখে ফিরে গিয়েছে। সমস্ত শরীরে একটা আরামদায়ক আলসেমীর শৈথিল্য। কি রাগ ওটা বাজছে সানাইয়ে। নিশ্চয়ই রামকেলি। চোখ বুজে শুনতে থাকে শশাঙ্ক সানাই।

দাদা। অ দাদা!

কি রে মাধু! চোখ খুলে তাকাল, আয় বোস।

মাধবী এসে দাদার শয্যায় উপরেই বসে পড়ে। একটা লাল চওড়া পাড় শাড়ী সে পরেছে। তাতে লেগেছে হরিদ্রার সব ছোপ।

ওকি রে মাধু, কাপড়ে এত হলুদ লাগালি কি করে?

ওটা তোমার গাত্রহরিদ্রার শুভ চিহ্ন দাদা।

গাত্রহরিদ্রা!

হাঁ গো। আজ যে তোমার গাত্রহরিদ্রা। শুনচো না নহবতে সানাই বসিয়েছেন মা। এ একেবারে ফুলশয্যার রাত পর্যন্ত চলবে।

হুঁ! বলে চুপ করে যায় শশাঙ্ক। গত কয়েক দিনে সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল কথাটা! সে বিবাহে সম্মতি দিয়েচে। শুভলগ্ন অত্যাসন্ন হয়ে এসেছে তাহলে। সত্যি সত্যিই সে তাহলে বিবাহ করছে। সেই নিশ্চিন্দপুর নাকি, সেখানকারই বড় তরফের কোন এক কন্যা স্বর্ণময়ীকে। হঠাৎ মনের মধ্যে কথাটা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রভাতের সমস্ত প্রসন্নতার উপরে একটা বিরক্তির কালো মেঘ নেমে এলো। না। নিস্তার নেই তার। বিবাহ তাকে করতেই হবে।

চল, ওঠো ত দাদা! ঠাকুর মশাই বলেছেন, বেলা ১১০টার মধ্যেই গাত্রহরিদ্রা দিতে হবে। হাত ধরে শশাঙ্কর টানাটানি শুরু করে দেয় মাধবী।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলে, তুই যা, আমি আসচি।

দেখো, বেশী দেরী করো না যেন। সব তোমার জন্ম অপেক্ষা করচে।

শয়নঘর থেকে বের হ'য়ে দালানে পা দিতেই শশাঙ্ক বুঝতে পারল সত্যি সত্যিই জমিদার-ভবনে আসন্ন উৎসবের যেন সাড়া পড়ে গিয়েছে। অথচ মাধবীর মুখে শোনার পূর্ব পর্যন্তও এদিকে তার নজর পড়েনি বা দৃষ্টি দেওয়ার ফুরসং হয়নি। নীচের দালানে এসে পা দিতেই চারিদিক থেকে মেয়েদের দল তাকে ঘিরে ধরে।

সারাটা দিন উৎসব ও হৈ-হল্লার মধ্যে দিয়েই কোথা থেকে যে কেমন করে অতিবাহিত হ'য়ে গেল, শশাঙ্ক যেন ভাল করে বুঝতেও পারল না। দম দেওয়া একটা কলের পুতুলের মতই যেন গাত্রহরিদ্রার শুভ-মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয় শশাঙ্ক। কেবল প্রতি মুহূর্তে মনে হ'তে থাকে কখন এসব কিছু থেকে তার মুক্তি মিলবে। আর কেবলই ঐ সঙ্গে মনে হ'তে থাকে এ কোন্ মিথ্যার মধ্যে নিজেকে সে সমর্পণ করতে চলেছে।

ঢং ঢং ঢং জমিদার-বাড়ির দেউড়ীর পেটাঘড়িতে রাত্রি এগারটা ঘোষিত হলো। উৎসব-বাড়ি যেন ঝিমিয়ে পড়েচে এতক্ষণে। একটু আগে ক্লান্ত সানাই বেজে বেজে থেমে গিয়েছে। শশাঙ্ক চুপি চুপি পা টিপে টিপে নিজের শয়নকক্ষ থেকে বের হ'য়ে এলো। প্রতি রাত্রির মত একটা অন্ধ আবেগে এগিয়ে চললো শশাঙ্ক তার দয়িতার অভিসারে। বহির্মহল পার হ'তে গিয়ে হঠাৎ তার কানে এলো তানপুরা সহযোগে উস্তাদজীর সুরালাপ। এত বড় প্রাসাদে একক বিচ্ছিন্ন একটি সুর যেন আপন নিভৃতে আত্মসমাহিত। দবীর খাঁ একটি মীরার ভজন গাইছেন। রাত্রি যেন স্তব্ধ নিভৃতে সুর-নির্ঝরে অবগাহন করছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল শশাঙ্ক অশ্বশালার দিকে। অশ্বশালার এক প্রান্তে তেজী কালো অশ্বটি প্রভুর সাড়া পেয়ে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল। অশ্বের মখমলের মত মসৃণ গায়ে মৃদু দু'টি চপেটাঘাত করে আদর জানাল শশাঙ্ক। তার পরই এক লাফে অশ্বারূঢ় হলো।

রাত্রির কালো অন্ধকারে দিগন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণসাগরের জল যেন কেমন ভয়াবহ বলে মনে হয়। পায়ে চলার অপ্রশস্ত পথের পাশে কৃষ্ণসাগরের তীর ঘেঁষে শর ও হোগলার বন মৃদুমন্দ বাতাসে এদিক-ওদিক দুলছে।

একটা সর সর শব্দ শোনা যায়। দুলকি তালে ঘোড়াটা চলেছে। বাগান-বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সহসা অন্ধকারে দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি শশাঙ্কর পথরোধ করে দাঁড়াল।

কে? শশাঙ্ক প্রশ্ন করে।

তুমি কে? ভারি গম্ভীর গলায় পাল্টা কণ্ঠ হতে।

আমি শশাঙ্কশেখর। তুমি কে?

আমি সূর্যকান্ত। জবাব এলো।

বিজ্ঞান বার্তা

গাছের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এলুমিনিয়ম ধাতু। অবিশ্বাস করবার উপায় নেই, খবরটা সরবরাহ করেছেন অষ্ট্রেলিয়া সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা-পরিষদের বনজ-শিল্প বিভাগ। নিউগিনি এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন গাছ দেহমধ্যে এলুমিনিয়ম ধাতু সঞ্চয় করতে পারে, এই অস্বাভাবিক সংবাদে জগতের বিজ্ঞানী মহল খুবই বিস্ময়ান্বিত হয়েছেন। বনজ শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগ প্রায় ৮০টা নমুনা পরীক্ষা করে প্রত্যেকটি কাঠের মধ্যেই তাঁরা শক্ত সাদা যৌগিক পদার্থ রূপে এলুমিনিয়ম পেয়েছেন। শুধু কাঠ কেন, পাতা, ডালপালা, সব কিছুর মধ্যেই এলুমিনিয়মের অবস্থিতি দেখে মনে হয়, এই ধরণের গাছ মাটি থেকে ধাতু গ্রহণ করতে পারে।

এলুমিনিয়ম প্রথম পাওয়া গিয়েছিল কুইন্স ল্যাণ্ডের একটি গাছে, বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, এই দুর্ঘটনা-প্রসূত ব্যাপারটি প্রকৃতির খেয়ালখুশীর পাগলামি থেকে জন্মলাভ করেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড!—সেই বনের অন্য সব গাছপালা থেকেও পাওয়া গেল এলুমিনিয়ম ধাতু। গবেষণা চলেছে, কিন্তু এখনও জানা যায়নি, গাছ এই ধাতু নিজের ইচ্ছেমতো মাটি থেকে গ্রহণ করে, না গাছের বৃদ্ধির ওপর এর প্রভাবই একে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়? সব চেয়ে মজার কথা, অষ্ট্রেলিয়ার শুকনো অঞ্চলের গাছের মধ্যে এই ধাতু পাওয়া যায়নি—পাওয়া গেছে বৃষ্টিস্নাত ভিজে অঞ্চলে। এলুমিনিয়ম এখানে গাছের মধ্যে বিভিন্ন জৈব-এ্যাসিডের সঙ্গে যৌগিক পদার্থ রূপে অবস্থান করে।

* * * *

মানুষের দেহে কতোখানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ বর্তমান আছে, তা আজকের বিজ্ঞানী মহলের এক বিরাট প্রশ্ন। বর্তমান আণবিক জগতে সকলেই চিন্তা করেছেন, ঠিক কতোখানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহে থাকা ক্ষতিকর নয়, কতোখানি মানুষ সহ্য করতে পারে এবং কতো বেশী তার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এই নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদেরও অন্ত নেই। ক্রেব সাহেব সর্বপ্রথম জানান মানব দেহে সাধারণতঃ এক কোটি ভাগের এক ভাগ রেডিয়াম-জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে এবং এই পরিমাণ থাকা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু ১৯৫০ সালে হার্স এবং গেটস্ ঘোষণা করলেন, মানুষের দেহে উপরোক্ত পরিমাণের প্রায় ১০০ ভাগের ১ ভাগ কম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। এতে গোলমাল গেল আরো বেড়ে—কার কথা ঠিক? ১৯৫১ সালে সীভার্ট একটা নতুন গামা-রশ্মি পরীক্ষা করবার যন্ত্র বার করলেন এবং একটি জীবন্ত দেহকে সম্পূর্ণ পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন, ক্রেবের কথাই ঠিক। ক্রেবের মতে, সব সময়েই দৃষ্টি রাখতে হবে প্রতিদিন খাদ্য পানীয় এবং বাতাস থেকে মানুষ কতোখানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ গ্রহণ করে এবং পৃথিবীর যতো বেশী স্থানের মানুষের তেজস্ক্রিয়তার গড় পরিমাপ নেওয়া যায়, ফলাফল হবে ততই নির্ভুল।

* *

।। হওয়ার জন্য রোগীর কষ্ট ভার লাঘব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে—নাম তার এই নবাবিষ্কৃত ওষুধের কার্য্যক্ষমতা পাঁচ গুণ বেশী। দেহের কোষের মধ্যে নতুন ওষুধটি অনেকটা তার অনুরূপ। প্রথম নিউইয়র্ক ষ্টেট-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেক্ গ্রোস্ কর্তৃক মানুষের রক্তে আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং তিনি লণ্ডনের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট্ ফর্ মেডিক্যাল রিসার্চের ডাঃ পিট-রিভারের সঙ্গে এই পদার্থ গবাদিপশুর থাইরয়েড থেকে নিষ্কৃত করে এর বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী উদ্ঘাটন করেন। বিজ্ঞানীদ্বয় বস্তুটিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত করতেও সক্ষম হয়েছেন।

* * * *

আলুকে কি করে সংরক্ষিত করে রাখা যায়, তার এক নতুন উপায় আমেরিকার এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এবং মিসিগান ইনজিয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সম্মিলিত ভাবে উদ্ভাবন করেছেন। ইনষ্টিটিউটের আণবিক ফিসনের প্রধান অধ্যাপক ব্রাউনেল সাহেবের এক বিবৃতি থেকে জানা যায়, আলুকে কিছুক্ষণ তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে রাখলে, এই আলু বহুদিন না পচে গিয়ে বেশ ভালোভাবেই থাকে। এর জন্য আলুকে কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে একটি মোটা দেওয়াল সমন্বিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ কক্ষেই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব এর ওপর প্রয়োগ করা হয় এবং কিছুক্ষণ পরে একই ভাবে নিয়ে আসা হয় বাইরে। তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা সংরক্ষিত এই আলু ৫০ ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যে বেশ কয়েক মাস গুদামজাত করে রাখা হলেও এর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

* * * *

শিল্পক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার অণুর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ্ সোভিয়েট রাশিয়ার একাডমি অফ্ সায়ান্সের একটি সভা মস্কোতে আহ্বান করা হয়েছিল। সেই সভায় শিল্পক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় অণুর সামান্য ব্যবহারের ওপর বিভিন্ন প্রতিনিধি ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন। বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলিমারিন জানান যে, সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ব্যবহার করলে, লোহার মধ্যেকার ফসফরাসের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি পরিমাপ করা যায়। এ ছাড়াও ধাতব শিল্পের বিভিন্ন প্রয়োজনে তেজস্ক্রিয় ধাতুর সামান্য পরিমাণ ব্যবহার খুবই শুভফলদায়ক। অধ্যাপক বরেস্কোভ ক্যাটালিটিক পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণায় আইসোটোপ ব্যবহারের গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

* * * *

আণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার জন্য ১০ বৎসর ব্যাপী একটি বিরাট পরিকল্পনা গ্রেটব্রিটেন গ্রহণ করেছে। সরকার

এবং বিজ্ঞানীরা আশা করছেন আগামী ৫ বছরের মধ্যেই তাঁরা এই বিদ্যুৎ-শক্তি সাধারণ কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রথম চারটি ষ্টেশন মনে হয় ১৯৬৩ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে ৪০০,০০০ থেকে ৮০০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করবে। ১০ বছর শেষ হলে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে ষ্টেশনের সংখ্যা হবে ১২ এবং শক্তি সরবরাহের পরিমাণ হবে ১,৫০০,০০০ থেকে ২,০০০,০০০ কিলোওয়াট। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে খরচ লাগবে প্রায় ৩০ কোটী পাউণ্ড এবং এর দ্বারা বৃটেনের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা, ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টন কম খরচ হবে।

* * * *

কিছু দিন আগে দিল্লীতে প্রকৃতির দু'টি শক্তি,—সৌর-শক্তি ও বাতাস-শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য যে বিজ্ঞানী-সভার ব্যবস্থা করা হয়, তাতে সোবিয়েৎ বিজ্ঞানী অধ্যাপক বাউম, সৌর শক্তি ব্যবহারের চেষ্টায় সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণার কথা আলোচনা করেন। অধ্যাপক বাউম তাসখণ্ডের ক্রুশিঝানোভস্কি শক্তি গবেষণা মন্দিরের পরিচালক। তাসখণ্ডের অবস্থিতি আফগানিস্থানের উত্তরে, সিংকিয়াং প্রদেশের পশ্চিমে এবং এর মধ্যে পড়ে রয়েছে মরুভূমি-সদৃশ বিরাট অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রতিটি অংশে যে পরিমাণে সৌর-শক্তি এসে পড়ছে তার পরিমাণ খুবই বেশী। সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা ১০ মিটার ব্যাসের বিরাট প্যারাবোলিক প্রতিফলকের সহায়তায় সূর্য্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে বহু কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। একটি প্রতিফলক প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি ইঞ্চিতে ১০০ পাউণ্ড চাপে ৬০ কিলোগ্রাম বাষ্প প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। এর দ্বারা খাদ্য টিনজাত করা, রেফ্রিজারেটর চালান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বহু কাজই করা যায়। গবেষণা চলেছে সোলার ষ্টীম্ জেনারেটর প্রস্তুতের জন্য, যার দ্বারা অট্টালিকা-সমূহকে গরম কালে ঠাণ্ডা এবং শীতকালে গরম রাখা যাবে। অধ্যাপক বাউম আরও ঘোষণা করেছেন যে, বিদ্যুৎ শক্তি জমা রাখার কোন উপায় আবিষ্কার না হওয়ার জন্য সূর্য্য-শক্তিকে, বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা এখনও সম্ভব হয়নি।

স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পূর্ব্ব শতাব্দীর কবি পূর্ব্ব সূরী যুগ-পথ-ধাতা
পতিত নিদ্রিত জাতি বাঙালীর তুমি পরিত্রাতা।
'চাষের মালিক' চাষী 'গ্রামের মালিক' তবু নয়
অপমানে অত্যাচারে অনাহারে তবু সুপ্ত রয়।
তুমি জাগাইলে তারে জাগৃতির রূঢ় ভাষা-ভাষি'
নির্ম্মম বিদ্রূপে শ্লেষে ডাক দিলে "জাগো বঙ্গবাসী",
জেগেছে বাঙালী পরে পূর্ণ ক'রে সে ভবিষ্যবাণী
হে লাঞ্ছিত অগ্রজাত! লহ মোর এ প্রণতিখানি।
রাজরোষে নির্ব্বাসিত বিতাড়িত জন্মভূমি হ'তে
ভাওয়ালের সুসন্তান লহ স্থান স্বাধীন ভারতে।
জাতির বক্ষের ধন সে দিনের নয়নের মণি
যেদিন কুজ্ঝটি ঢাকা সেদিনের তুমি দিনমণি।
স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক প্রতিভার হে ভাস্বর কবি!
দুঃখের অনলে দগ্ধ সমুজ্জ্বল স্বর্ণত্রয় ছবি।
দেহাত্মগ প্রেমধর্ম্মী মানবীরে ভালবাসো তুমি
ধ্যানের দেবতা গড়ি চাহনি কল্পনা স্বর্গভূমি।
কৌলীন্য মালিন্য পাপ-গ্লানি হ'তে দিতে পরিত্রাণ
বিদ্যুৎবাহিনী জিহ্বা ভারতীর নির্ভীক সন্তান।
দুর্গমের পথিকৃৎ, স্বাধীনতা, পিপাসা ও ক্ষুধা
জাতীর সঙ্কট কালে তুমি কিছু দিয়াছিলে সুধা।
জাতির জীবন বাঁচে, তাই কহি তুমি কবিরাজ,—
স্বদেশে স্বভাব-কবি গোবিন্দে প্রণাম করি আজ।
বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে না লভি অধীত বিদ্যা জ্ঞান
বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি অর্জ্জিয়াছ কবিত্ব সম্মান।
গ্রামীণ জীবনধারা মিটাইল তব স্বপ্নসাধ
স্বল্পবিত্ত গৃহনিষ্ঠ বাঙালীর অন্নে সুধাস্বাদ।

তাহাতেই তৃপ্ত তুমি তাহারই চেয়েছো অধিকার
ছাই হ'য়ে ভস্ম হ'য়ে তারি বুকে মিশে রহিবার।
অকৃত্রিম গ্রাম-প্রীতি স্বগ্রামের সরস মৃত্তির
কাব্যে ছলা-কলা নাই মর্ম্মে নাই ফন্দি বা ফিকির।
বিদ্রূপের হে গাণ্ডীবি! সমস্ত জাতির তুমি কষা·
তোমার আঘাত বিনা আমাদের কি যে হ'ত দশা!
ঋজুশীর্ষ বীর্য্যবান, পঙ্গুরে লজ্জাও তুমি গিরি
'পীলে ফাটা'—ভয় ভাঙি ক্লীবেরে করাও 'হারিকিরি',
পরপদ লেহ ছাড়ি নিজ প্রাণে করি অবহেলা
অগ্নি যুগে তাই তারা প্রাণ নিয়ে ক'রেছিল খেলা।
'বাঙালী মানুষ যদি প্রেত কা'রে, কয়'-বল শুনি
সেই রূঢ় ভর্ৎসনায় তুমি তা'রে জাগাইলে গুণী।
প্রভু পদে তৈল দান ছাড়ি তাই প্রভুর চাকুরী
বাঙালী ছেলেরা পরে দেখাইল কিছু বাহাদুরী।
ভালো হোক মন্দ হোক হিংসা হোক হোক দুঃসাহস
মূঢ়তা জড়তা ছাড়ি হইল জাগ্রত আত্মবশ।
'হরিহর' কবিতায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'তে
রাঙা-রাখী বাঁধিবারে চেয়েছিলে বিশাল ভারতে।
হিন্দু-মুসলমান মিছে এক মা'র ক্রোড়ের সন্তান
এক মন্ত্রে দীক্ষা দিতে তুমি গেয়েছিলে ঐকতান। এ ওরা?
খেদ ক'রেছিলে কবি 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'. এটা সেরেনে,
কেন না জন্মিলে তুমি এই বাঙালীর প্রাণে
আজি শতবর্ষ পরে বাঙালী বন্দনা করে না। তুমি সারারাত
জাতির জাতীয় যজ্ঞে হে ঋত্বিক, অঁধিয়া, না হোয়েছে ম্লান।
... খুলে একটু বন্ধ ভাই

প্রলয় নাচন নাচলে যখন

শোনা যায়, পার্বতীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিব তাণ্ডব-নৃত্য করেছিলেন। পার্বতীও না কি নৃত্য করেছিলেন। তার নাম 'লাস্য'। সঙ্গীতে এই থেকেই না কি 'তাল' কথাটির উৎপত্তি। 'তাণ্ডবের' তা আর 'লাস্যে'র ল নিয়ে। দক্ষিণ-ভারতে শৈব-সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশী, তাই শিব কখনো ধ্যানমৌন শান্ত-সমাহিত যোগী, আবার কখনো বা ভয়ঙ্করবেশ ভৈরব।

নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণতঃ নটরাজমূর্তি চার হাতবিশিষ্ট। দক্ষিণের ওপরের হাতে 'ডমরু' অনন্ত অনাহত নাদের প্রতীক, যে শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ ও পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত রয়েছে, বামে 'অর্ধমুদ্রা', তা'তে আছে অগ্নিকুণ্ড-ধ্বংসের পরিচায়ক। দক্ষিণের নীচের হাতে 'অভয়মুদ্রা'—শান্তি ও সান্ত্বনা-দায়িনী। বামের নীচেকার হাত উন্নত, আন্দোলিত ও চরণপ্রান্তে প্রসারিত। এই চরণ অসংখ্য ভক্তের আশ্রয়স্থল। এই হাতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা'। তা বিঘ্ননাশক গণপতি বা বিনায়ক বলে খ্যাত। পদতলে বামন 'অপস্মার'-পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞান ও অপবিত্রতার নিদর্শন। বামনের হাতে সর্প-বন্ধন বা অজ্ঞানরূপ সংসার-চক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করেছেন—অজ্ঞানকে বিনাশ করে মুক্তি ও শান্তির আলো আনছেন। নৃত্যের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পঞ্চশক্তি ও পঞ্চক্রিয়া বিকশিত হয়ে রয়েছে। নটরাজকে ঘিরে আছে এক প্রভাবমণ্ডল বা অগ্নিশিখা যা বিশ্বের ও বিশ্ববাসিগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। শিবের জটাজাল গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কপালে অর্ধচন্দ্র, শিরে সর্প যথাক্রমে জ্ঞান ও প্রাণশক্তির চিহ্ন। বারান্তরে এ প্রসঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করার ইচ্ছা

ভারতের সঙ্গীত-সাধক (২)—তানসেন

তানসেনের অন্তর্নিহিত অর্থ হোল—তান অর্থে সুরের বিস্তার আর সেন অর্থে চিহ্ন। যিনি সুরের বিস্তারের মধ্যেই সতত বিরাজমান, সুরই যাঁকে চিনবার একমাত্র চিহ্ন তিনিই তানসেন।

গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ এক গায়ক মকরন্দ পাঁড়ের গৃহে সংবৎ ১৪৮৮ সালে তাঁর জন্ম হয়। আসলে এঁরা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। পিতা মকরন্দ পাঁড়ে একজন অসামান্য সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে তাঁর সমকক্ষ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় কেউ ছিলই না বলা চলে।

পিতার নিকটেই সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয় তানসেনের। তখন নাম ছিল রামতনু। রামতনু পাঁড়ে। তানসেন—এই খেতাব তাঁকে দেন সম্রাট আকবর স্বয়ং তাঁর গান শুনে। অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে গুণীকে তিনি এই সম্মান দেন।

তানসেনের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলেই তখনকার ভারতবর্ষের সঙ্গীত-আবহাওয়ার খবরাখবর নিতে হবে আগে। Alexender the great-এর যুগে আবু আলি সিনাহ প্রাচীন পারস্যে সঙ্গীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। আমীর খসরুর আমলে মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে সঙ্গীতের আদান-প্রদান ঘটে। ওস্তাদ সুলতান হোসেন সার্কী, শের বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সঙ্গীতের ধারা আসে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারত আমীর খসরুর নিকট চিরকাল ঋণী। ওস্তাদ 'সায়েব', আসির, তাসির, নাসির, মহম্মদ গাওস, হাকিম সুখারত, বুকারত, জলিনাস প্রভৃতির ক.” মিশ্রণ তানসেনের মধ্যে প্রভাবিত হয়েছে। , বলেন প্রবন্ধ

তানসেনের গুরু ছিলেন বাবা রামদাস স্বামী ও .. । খ-বাবু লা।
গোকুলের হরিদাস ভাণ্ডর ছিলেন তখনকার ভা”
সঙ্গীতসাধক। তানসেনের সম্প্রদায়ের পারি(…)নার কষ্ট হবে না তো?

ভালবাসতেন। হরিদাস হিন্দুদের শিব, ভারত প্রভৃতি সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁকে এসব শিক্ষা দেন।

তানসেনী সঙ্গীতকলার চরম দান হচ্ছে ধ্রুপদী। তানসেনী ধ্রুপদে চারটি বাণী রয়েছে—ডাগর, খন্ডর, গৌরী আর নোহর। ডাগর গম্ভীর রস পরিবেশন করছে। খন্ডরের দ্রুতগতির কারিগরী বিস্ময়জনক। গৌরীতে রয়েছ অলঙ্কার বা গমক—সাদাসিধে পোষাক তার। নোহরে আছে রূপের বিচিত্র প্রকাশ। ধ্বনির উঁচু-নীচু লম্ফন একে একটা বিশেষ 'শ্রী' এনে দিয়েছে।

তানসেনী সঙ্গীতের পাঁচ অঙ্গ। তানসেন নিজেই বলেছেন, তাঁর সঙ্গীতের অংশগুলির নাম। রাগঅঙ্গ, বাকঅঙ্গ, ক্রিয়াঅঙ্গ, ধ্যানঅঙ্গ, সুরঅঙ্গ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বর্তমানে যাঁরা শুধু রাগ-রাগিণীর কেরামতী দেখাতে ব্যস্ত তাঁরা অবহিত হোন।

তানসেনের বংশধরগণ প্রায় সকলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সারা ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁদের নামও পরিচিত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে। নিজ পুত্র বিলাস খাঁ ও জামাতা নহবত খাঁয়ের নাম তো সকলেরই জানা রয়েছে। বিলাস খাঁয়ের বংশধরদের রবাব যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হতে দেখা যায়। নহবত খাঁয়ের বংশধরগণ খেয়াল ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিলাস খাঁয়ের পুত্র মশিদ খাঁ ও নহবত খাঁয়ের পুত্র নিয়ামত খাঁ দিল্লীর শেষ সম্রাট মোহম্মদ শায়ের দরবারে ছিলেন। নিয়ামত খাঁকে মোহম্মদ শাহ উপাধি দেন—শাহ সদারঙ্গ। শাহ সদারঙ্গের শেষ উল্লেখযোগ্য বংশধর হলেন রামপুরের ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ। তানসেনের বংশের গোলাব খাঁ, জাফর খাঁ, পিয়ার খাঁ, বসৎ খাঁ ইত্যাদিও সঙ্গীতের নানা দিকে নানা কাজ করেছেন এবং বংশের নামগৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

তানসেনী সঙ্গীতকলার শেষ বিখ্যাত রবাবীয়া হলেন ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ এবং বীণকর ছিলেন মহম্মদ ওয়াজির খাঁ। লক্ষ্ণৌতে ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁয়ের নাম এখনও গানের জলসার প্রারম্ভে করা হয়।

ওস্তাদ দবীর খাঁ এবং ওস্তাদ সগীর খাঁ তানসেনী বংশের এঁরা দু'জন এখনও বেঁচে রয়েছেন। নিয়মিত সুর সাধনা করে নিজ ঘরাণার পরিবেশনও করে চলেছেন জনারণ্যে।

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক (৩)—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণার ইতিহাসে কাশিমবাজারের রাজবাড়ীর নাম চিরপ্রসিদ্ধ। এই বংশেরই মহারাজ ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আমলেই অবশ্য তার চরম বিকাশ ঘটে। ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বহু দিন এঁর রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। মহারাজ বাহাদুর কাশিমবাজারের অন্তর্গত বহরমপুরে এক সঙ্গীত-[illegible] স্থাপন করেন। এই সঙ্গীত-বিদ্যালয় থেকে বহু কৃতী [illegible] জন্ম হয়। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় এবং [illegible]বের কালে মহারাজ দেশ-বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী-[illegible] নিয়ে এসে সঙ্গীতের জলসা বসাতেন। তিন[illegible]। দৌলত খাঁ, মজফর খাঁ, ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নাসির খাঁ, ৺অঘোরলাল চক্রবর্তী, ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺কীর্ত্তিচাঁদ গোস্বামী, ৺মাখনলাল দুবে, ৺শ্রীপতিচরণ অধিকারী, তবলাবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র দেবঘরিয়া, রামলাল দত্ত ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয়ের পরীক্ষকের কাজও করেছেন। ছাত্রদের মধ্যে শ্রীগিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্তী, গোপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরী কর্ম্মকার প্রভৃতি নানা বিভাগীয় সঙ্গীতে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

এ দি[illegible]
যে ফুসফাস হচ্ছে
তার পর যে[illegible]
তোমার নাম কী: বাবা: ?

কলকাতার বাইরে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের শাখা খুলুন

সংবাদ সংগ্রহ করে যতটা জেনেছি, একমাত্র কলকাতাতেই নাচ, গান আর বাজনার স্কুল রয়েছে প্রায় দুই শত। বেশ নাম-জাদা স্কুলের সংখ্যাই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট। এমন সব স্কুল যাদের নাম আপনার কি আমাদের মুখেই রয়েছে। চিন্তা করতে হবে না, ভাবতে হবে না। এই সব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু এই অনুপাতে হাওড়া, হুগলীর শিল্পাঞ্চল, দমদম, বারাকপুর কি বজবজ, ক্যানিংয়ে একটি-দু'টির বেশী গানের স্কুল আছে কি না সন্দেহ! নাচ কি বাজনার তো প্রায় নেই বললেই চলে। এ ছাড়াও প্রতি জেলার সদরে যেখানে মানুষের বসতি ঘন এমন সব স্থানেও গানের স্কুল খুব খারাপ চলবে বলে তো আমাদের মনে হয় না। সেখানে নতুন স্কুল খোলায় নানা অসুবিধা অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু কলকাতার প্রতিষ্ঠিত নাচ-গানের শিক্ষায়তনগুলির পক্ষে

সে সব স্থানে শাখা স্থাপন করায় অসুবিধা কোথায়? অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে যেমন কোনও নতুন কাজে হাত দেওয়া সহজ, কম সময়-সাপেক্ষ, ব্যয় কম, ঠিক সেই কারণেই আমাদের এ আবেদন। গীতবিতান, দক্ষিণী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আমরা এজন্য তাকিয়ে রইলাম। সঙ্গীত-নাটক সংসদেরও এ কাজে যথেষ্ট কিছু করবার রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এতে তাঁদেরই অগ্রণী হওয়ার কথা। সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত এই সংসদটির উপর এখনই সে ভার না চাপিয়ে তাই সকলকেই আমরা এ কথা জানালাম।

ঋতু-পরিক্রমা ও গান-বাজনা

আধুনিক সঙ্গীতের সঙ্গে ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ভেদ আছে, ভেদ আছে প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের লোকসঙ্গীতে, দেশী সঙ্গীতের সঙ্গে মার্গ-সঙ্গীতের। বাংলায় যেমন কীর্তন, রামপ্রসাদী, আউল, বাউল, ভাটিয়ালী, সহজিয়া, গম্ভীরা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যান্য প্রদেশেও তেমনি কাজরী, চৈতী, ভজন, লীলাগান আরও কত কি! কিন্তু বাংলা দেশের কোথাও ঋতু-পরিক্রমার সঙ্গে গানের ভেদ নেই। দুঃসহ একশো পাঁচ ডিগ্রী গরমেও এঁদের রুচিতে আটকায় না। 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা' কি 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' শুনতে। ফাগুন বনে বনে লাগুক আর নাই লাগুক কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায়, পান-বিড়ির দোকানে, গ্রামোফোন কি রেডিও-পশে, গৃহস্থজনের ঘরে ঘরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে শ্রাবণ মাসেও এসে হাজির হয়। কৃষ্ণচূড়ার ফুলে বনানী ঢেকে যাবার সময় হয় তো সেটা নয়ই, তবু আদিখ্যেতা করে আমাদের বেতারের গায়ক গাইবেন, 'তুমি কি দেখেছ প্রিয়...'। প্রিয় তখন গরমে সারা গায়ে টক দই মেখে, ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে, গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে মেঝেতে এপাশ-ওপাশ করছেন হয়ত। পুরবীর সঙ্গে ইমন, ভৈরবীর সঙ্গে বাগেশ্রীর কি হিন্দোলের যেমন একটা ভেদ আছে, ভেদ আছে মেঘমল্লারের সঙ্গে মিঞাকিমল্লারের ঋতুভেদের প্রসঙ্গে এ কথাটাও সকলকে মনে রাখতে বলি। কলকাতার বেতার কেন্দ্রে গানের নির্বাচনটা থাকে গায়কের হাতে জানি, তবু এ বিষয়ে একটা নির্দেশ কি গায়কদের দেওয়া যায় না?

আমার কথা (৬)

(বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত)

উদয়শঙ্কর

একখানা গাড়ী দেবে ভাই, একখানা গাড়ী, এই কিছুক্ষণের জন্য, এক্ষুণি ফিরিয়ে আনবো।

বললাম একখানা নয়, যতখানা চান দেব। কিন্তু শুনুন স্যার, এখন ত নয়। শ্রীমতীর হুকুম (শ্রীমতী মানে শ্রীমতী দেবিকারাণী রোয়েরিক, প্রভাত সাথে সাথে যাঁকে ফিল্ম সেমিনারের সদস্যবৃন্দ যমের মতন ভয় করতেন কনফারেন্স রুমে) নেই। তাঁর লেটেষ্ট হুকুম হল কোনো ডেলিগেট যেন আলোচনা ছেড়ে না যান। শঙ্কর সাহেব (সকলে উঁকে 'শঙ্কর সাহেব' বলেই ডাকেন, জওহরলালজী, দেবিকারাণী তাঁরা ডাকেন 'শঙ্কর' উদয় কথাটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে!) এক্ষুণি কৃষ্ণমেনন সাহেব আসছেন। তিনি এলেই আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু আপনাকে যেন একটু চঞ্চল দেখছি। শরীর ভালো আছে ত? বসন্তের শান্ত সকালে কপালে ঘামের স্রোত? চুপি চুপি বললাম, যাবেন কোথায় বলুন দেখি?

ছোট দুরন্ত শিশুকে বাজারে নিয়ে যাবার আপত্তির পর তাকে গাড়ীতে উঠবার নির্দেশ দিলে যেমন ফিক করে মৃদু সরল হাসির রেখা পড়ে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী সেই ঢঙে শিশুর মতন খুশী হয়ে বললেন, "কোটা হাউস", মাত্র দশ মিনিটের জন্য।

বললাম, ব্যাপারখানা কি বলুন না? কি করবেন সেখানে?

বললেন, ব্যাগ খুঁজতে যাব।

বললাম, ব্যাগ? কিসের ব্যাগ? আপনার ত কোনো ব্যাগই আনেন নি।

বললেন টাকার পার্সটা খুঁজছি। পাচ্ছি না।

বললাম, ও হরি! তাই বলুন। টাকার পার্স ভলান্টিয়াররা খুঁজে দেবে। আপনি দয়া করে কনফারেন্স-রুমে বসুন। আজ আপনাকে ছাড়া যায় না। তা ক'টাকা ছিল তাতে, কিছু মনে আছে?

বললেন, হাঁ একটু একটু মনে পড়ছে, হাজার দেড়েক।

হায় খোদা! ড্রাইভারকে বললাম, শঙ্কর সাহেবকে কখনও যেন সে একলা না ঘরে ঢুকতে দেয়। সাথে সাথে চলবে। সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। যেন কোথা'ও হারিয়ে না যান।

উদয়শঙ্কর

বললাম, শঙ্কর সাহেব টাকা হারালে টাকা পাওয়া যায়। দোহাই ভগবানের আপনি দয়া করে নিজেকে হারিয়ে বসবেন না। আপনি মহান্ শিল্পী, সাত খুন মাপ। গর্দান যাবে বেচারা এ হতভাগার, "কেন যেতে দিলে?" বলে। বুঝলেন? মনে আছে আজ, মানে বেস্পতিবার, প্রথম কাগজখানাই পড়তে হবে আপনাকে On message of dance?

* * * *

হলও ঠিক তাই। কৃষ্ণমেনন সাহেবের বক্তৃতা হয়ে গেছে। উদয়শঙ্করকে পাওয়া যাচ্ছে না! কি কাণ্ড? সেমিনারের কাজ শুরু হয় কি করে? চারি দিকে ব্যস্ত-চোখে সবাই দেখছেন। শঙ্করের আসন শূন্য!

সভাপতি সরকার সাহেব বললেন, সেনগুপ্ত সাহেব আপনার ল্যাবোরেটরির ওপর কাগজ পড়ুন।

সব জেনে শুনেও আমি নির্বাক্ রইলাম। শেষ-মেষ ... করে দিয়ে এই ব্রেণহীন মাথাখানাও খোয়াব?

হাঁপাতে হাঁপাতে যখন শিল্পী কনফারেন্স ... খ-বাবু না। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

... কষ্ট হবে না তো?

শঙ্কর ভারী পরিশ্রান্ত।

ক্লান্তি আসে না। বম্বের বিখ্যাত অভিনয়-শিল্পী ডেভিড আব্রাহাম সাহেব ওঁর কাগজখানা পড়লেন। সবাই একবাক্যে কোরাস গাইলেন অপূর্ব! মনে মনে বিধাতাকে প্রণতি জানালাম। আপন-ভোলা শিল্পী যে অনুগ্রহ করে নিজেকে না হারিয়ে সুস্থ শরীরে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছেন সভায় এ-ও কি কম লাভ? ফাঁড়ার প্রথম পর্ব শেষ হল। সভা বাঁচলো। মান রইলো সবার।

* * * *

অপূর্ব আভায় দীপ্ত মুখ আমি অনেক দেখেছি। লাজুক মেয়ের সরস-রক্তরাগ-সিক্তি অধরের মতন চিরসুন্দর মুখ চোখে খুব কম পড়েছে। এ সৌন্দর্য সাধারণ সৌন্দর্য্য নয়। এ উজ্জ্বল সৌন্দর্য ধ্যানমগ্ন তাপসের শুভচিহ্ন!

* * * *

উদয়পুরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই সেদিন সবাই নবজাত সন্তানের নামকরণ করলেন উদয়শঙ্কর। উদয়শঙ্করের পিতৃদেব ছিলেন উদয়পুরের মহারাণার এডুকেশনাল এ্যাডভাইসার। শঙ্করের শৈশব মাতামহের সাথেই কাটে।

শৈশব থেকেই উদয়শঙ্করের জন-নৃত্যে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়ের পথে বহু দিন তিনি স্থানীয় নৃত্যরত পুরুষ-রমণীর কুশলতা পরিদর্শনে সময় অতিবাহিত করেছেন। একটা কথা আজ আমার মতন সাধারণ ভারতবাসীর হয়ত জানাই নেই। উদয়শঙ্কর শুধু নৃত্যশিল্পীই নন। তিনি একজন বিশিষ্ট কলাশিল্পীও বটে। লণ্ডনে শঙ্কর রয়্যাল কলেজ অব আর্ট্‌স্‌-এর উইলিয়ম রদেনষ্টিন সাহেবের অধীনে স্নাতক জীবন যাপন করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে উদয়শঙ্কর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যকল্পে লণ্ডনে এক নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উদয়ের জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পাবলিক ষ্টেজে শঙ্করের সেই প্রথম অবতরণ। তার পর শঙ্কর বন্ধু-বান্ধবের সামাজিক অনুষ্ঠানে কিছু দিন নৃত্যশিল্পের নিপুণতা দেখান। এগুলো সবই প্রাইভেট।

একদিন হল কি রাশিয়ার নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভা কোত্থেকে এসে হাজির। শঙ্করের নিপুণতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে তিনি তাঁর সাথে টেনে নিতে চাইলেন। ভারী মজার ব্যাপার! এক দিকে স্যার উইলিয়ম টানছেন শঙ্করকে কলাশিল্পী করার জন্য, অন্য দিকে আনা পাভলোভা টানছেন নৃত্যশিল্পের দিকে। এই টাগ অব ওয়ারে কেঁদে শঙ্কর নিজেও চিন্তায় পড়লেন। দু'জনেই বাঘা শিল্পী। গুণীর মনে কে যেন আবৃত্তি করলো—"দু নৌকোয় পা দিও না বৎস!"

উদয়শঙ্কর জীবনের এত সাধের আশাকেও ছেড়ে এলেন। স্যার উইলিয়ম রদেনষ্টিন্ অশ্রুসিক্ত নয়নে শিষ্যকে নব শিল্প শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিলেন! রদেনষ্টিনকে প্রণতি জানিয়ে উদয়শঙ্কর আনা পাভলোভার ব্যালে কোম্পানীতে যোগদান করলেন।

এ দিকে পাভলোভার সাথে উদয়শঙ্কর সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে যে কুসুকাস হচ্ছে শিল্পের নিপুণতা দেখিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও তার পর যেখানে যাবেন, যুগ যুগ ধরে ভারত সন্তান আমরা তোমার নাম কী: বা... করব। শুধু ভারতবাসী নয়, এ অমূল্য ...র ভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে যে সহায়তা ...য়োগী গুণী মাত্রই, সেজন্ত উদয়শঙ্করের সাথে সাথে ভারতবর্ষকে স্মরণ করবে। উদয়শঙ্করের সাথে, তাই এ বিদেশিনী মহীয়সী নারীর নাম ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে চির-অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আনা পাভলোভার সাথে উদয়শঙ্কর যে দু'খানা "হিন্দু ব্যালে" প্রযোজনা ও প্রদর্শন করেছিলেন ভারতীয় শিল্প-অনুরাগী কোনো দিন সে অপূর্ব নিপুণতার দৃশ্য বিস্মৃত হবে না।

পাভলোভার সাথে উদয়শঙ্কর দেশ-দেশান্তরে নৃত্যশিল্প প্রদর্শন করালেন। মার্কিণ দেশের কূলে-উপকূলে নৃত্য প্রদর্শনের সময় একদিন হঠাৎ দেখা গেল আমেরিকার পত্র-পত্রিকা এ ক্ষণজন্মা বঙ্গসন্তানের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। কাগজে কাগজে ব্যানার হেডিং ভারতশিল্পী নৃত্য-যাদুকর উদয়শঙ্কর—ইণ্ডিয়ান ডান্সিং উইজার্ড। আনা পাভলোভার ব্যালে কোম্পানী ছেড়ে উদয়শঙ্কর লণ্ডনে চলে যান। নৃত্যকেই তিনি জীবনের পেশারূপে বরণ করে নিলেন।

লণ্ডন। লণ্ডন থেকে প্যারী। সব জায়গাতেই বিদগ্ধ দর্শকের দল প্রাণভরে অভিনন্দন জানাল এ সন্তানকে।

হ্যাঁ, একটু ভুল হয়ে গেছে বলতে। নৃত্যকে তিনি জীবনের "পেশা" হিসেবে নেন নি। নিয়েছেন জীবনের "দর্শন" হিসেবে। "you see not as profession but as mission"

যা বলছিলাম। জীবনের এক বিরাট অভিলাষ পূর্ণ হল। ভারতীয় শিল্পিশ্রেষ্ঠ সমবেত করে উদয়শঙ্কর এক দল সংগঠন করলেন। শুনলে অবাক লাগবে কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। উদয়শঙ্করের দলে যে ক'টি যন্ত্রসঙ্গীত সমবেত করা হয়েছিল তার সংখ্যা মাত্র দেড় শত। আমাদের দেশে যে কত রকমের যন্ত্রসঙ্গীতের প্রচলন আছে, এক প্ল্যাটফরমে বোধ হয় এর পূর্বে কেউ কখনও দেখার সৌভাগ্য পায় নি। রাজা-বাদশার সামনেও সেটা হয়েছিল কি না জানি না।

উদয়শঙ্করের এই মহান দল দিগ্বিজয়ে জয়তিলক ভালে ভারতে ফিরে এল। সমস্ত পৃথিবী শ্রদ্ধার সাথে এ মনীষীকে গ্রহণ করল। ঐতিহাসিকরা লিখলেন এ নৃত্যশিল্পী পৃথিবীর সেরা শিল্পী।

দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে দ্বিধা করব না—বাংলা আজও তাঁর উচ্চতম সোপানে—জ্ঞানে সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে। গুণীদের মনে মাঝে মাঝে যে নিরাশার ঝলক খেলে, সে ঝলক অলীক, মিথ্যা। বঙ্গ সন্তান বলে উদয়শঙ্কর গর্বিত। আমি প্রথম দিনের পরিচয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার অনুমতি নিতে গিয়ে "আহাম্মক" বনে গিয়েছিলাম। তাতে আমি মনে মনে গৌরবান্বিত। "নিশ্চয়ই বলবেন, কেন না?" বাংলায় কথা বলা এখানকার রেওয়াজ নয়!

ভারতের গুণী মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, উদয়শঙ্কর কেবলমাত্র যে ভারতের ক্লাসিক্যাল এবং জন-নৃত্যকে যে নতুন জীবন দিয়েছেন তাই-ই নয়; তিনি তাঁর উন্মেষশালিনী শক্তিতে নৃত্যকে রূপ দিয়েছেন নতুন ভাবে, নতুন ভঙ্গিমায়।

বছর পনেরো-ষোলো পূর্বে উদয়শঙ্কর হিমালয়ের পাদপ্রান্তে আলমোড়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Indian culture centre) নামে একে প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে ছাত্রদের শুধু নৃত্য শিক্ষাই নয়, তাদেরকে দেশের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেন। দ্বিতীয় মহাসমর শুধু লক্ষ মানব সন্তানের জীবন গ্রাস করেই যায় নি। বহু দেশের

বহু সাধনার ধন ও সংস্কৃতিকে খান খান করে চূর্ণ করে গেছে। উদয়শঙ্করের সংস্কৃতি কেন্দ্রও সেই রুদ্র-রোষানলে সেদিন মুকুলে শুকিয়ে ঝরে পড়ছে! আর কি তাকে কখনও জাগানো যায় না?

"কল্পনার" কথা না বললে উদয়শঙ্করের কথা বোধ হয় বলাই হলো না। "কল্পনা"তে উদয়শঙ্কর যে ভারতীয় নৃত্য-শিল্পের নিপুণতার অপূর্ব সমাবেশ তুলে ধরেছেন তা উদয়শঙ্করকে অমর করে রাখবে। "রামলীলা" তাঁর নবতম অবদান।

উদয়শঙ্কর তাঁর সংস্কৃতি-কেন্দ্রকে পুনর্জীবন দিয়ে তাকে সর্বজাতীয় সংস্কৃতির মহান্ মঞ্চে তুলে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তাঁর মহান চেষ্টা কখনও বিফল যাবে না, আমরা বিশ্বাস করি, আমরা প্রার্থনা করি।

যদু ভট্টের ধ্রুপদ গান

(সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি)

খাম্বাজ—সুরফাক্তা

আজু শম্ভু হর নাচত ডমরু করে
বজাবত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ আনন্দভরে ॥
পঞ্চানন অনাদি নাদ আলাপ করে, গাবত সুরগণ সমবেত ভয়েরি
রঙ্গনাথ নিরখ বিগলিত মোহন রূপম বিরাজে ॥ *

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
পা ধা ণা র্সা | র্সা -া | র্সা র্রা ণা ধা I মা -া পা পা | পধা পা | মা গা রা গা I
আ ০ ০ জু শ ০ ম্ভু ০ হ র না ০ চ ত ড ০ ম রু ০ ০ ক

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মা -া -া মা | পা -া | পা রা সা সা I রা রা রা পা | -া মা | -া গা রা গা I
রে ০ ০ বা জা ০ ব ত গ জ ব দ ন ল ০ ম্বো ০ দ র মৃ

১´ ২ ৩
মা -া পা পা | পাঃ ধঃ | মা গা মা -া II
দ ০ ঙ্গ আ ন ০ ন্দ ভ রে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মা -া ধা -া | ধা না | না র্সা -া না I র্সা -া র্সা র্সা | না র্রা | র্সা ণা ধা -া I
প ০ ঞ্চা ০ ন ন অ না ০ দি না ০ দ অ লা ০ প ক রে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মা -া পা পা | পা ধা | ধর্রা র্সা ণা ধা I মা ধা পা মা | মা -া | গা -া রা গা I
গা ০ ব ত সু র গ০ ণ স ম বে ০ ত ভ য়ে ০ রি ০ র ঙ্গ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মা -া পা পা | মা মা | পা রা পা পা I মা -া পা পা | ধপা -া | মা গা -া গা I
না ০ থ নি র খ বি গ লি ত মো ০ হ ন রূ০ ০ প ম ০ বি

১´ ২ ৩
মা ধপা ধা ণা | র্সা র্সা | ণা ধা পা মা II
রা ০০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

* যদু ভট্টের এই গানের অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় "আজি বিশ্বজন গাহিছে মধুর স্বরে" গানটি রচনা করেছিলেন।

কেনা কাটা

অল্প খরচায় ব্যবসা

করা যায়। এবং পরের দরজায় সামান্য একটা সত্তর-আশী টাকার চাকরীর জন্য উমেদারী না করে স্বাধীন ভাবে সম্মানের সঙ্গেই তা করা চলে। ক্যাপিটাল কম, রিস্ক প্রায় নেই, অভিজ্ঞতা সামান্য অবশ্যই লাগবে, এমন সব ব্যবসায়ের কথাই একে একে আলোচিত হচ্ছে বিস্তারিত ভাবেই। সব রকম বিপদ-আপদ, আইন-কানুন, তথ্য-কৌশল পরিবেশন করা যাচ্ছে যথারীতি। এবারে আমরা এই প্রসঙ্গে বইয়ের ব্যবসার কথা বলছি।

বইয়ের ব্যবসায়ে প্রথমেই দু'টি ভাগ—প্রকাশনা আর বিক্রয়। তার পরের ভাগ হল, কি কি বই প্রকাশ করা যাবে তার। এরও দু'টি দিক। টেক্সট বুক বা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক আর নাটক-নভেল কাব্য-ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদির প্রকাশ।

বই প্রকাশের কথাই আগে বলা যাক। বই প্রকাশ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে বাজারে কোন্ জাতীয় বইয়ের কি রকম চাহিদা সে কথা জানতে হবে। কোন্ কাগজের কি দাম, মলাট তৈরীর জন্য বোর্ড বাঁধাই, চামড়ার বাঁধাই, সিল্ক-স্ক্রীন কি স্পে করে ছাপার কেমন খরচা জানতে হবে। ব্লকের কত রকমফের—হাফটোন, লাইন সে সম্পর্কে জানতে হবে। কাগজের নানা সাইজ—ফুলস্কেপ, ডিমাই ইত্যাদি—সে সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে। কোন কাগজের কি ওজন এবং ওজনের সাথে সাথে দামের কত হের-ফের হবে তার খবর। নভেল বা উপন্যাস ছাপবার জন্য কি সাইজ হবে বইয়ের, কি সাইজ হবে কবিতার বইয়ের কি নাটকের, পুরাতত্ত্বের আর গবেষণার? কি সাইজ হবে ছেলেদের বইয়ের। এ সব সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। কত ছাপবেন? এগারো শ' কি বাইশ শ'? কিসে সুবিধে? টেক্সট-বই কেমন করে স্কুলে বা কলেজে পুস্ করাতে হবে? ছাপার ফর্মা-পিছু খরচ কত? টাইপ কত জায়গা নেবে? প্যাইকা, স্মল-পাইকা, বারো পয়েন্ট, দশ পয়েন্ট, সাড়ে-দশ পয়েন্ট, বর্জাইস, পাইকা-বোল্ড কি এ্যান্টিক? প্রুফ দেখা? কতগুলো প্রুফ হয়? এই সব।

যদি আপনার নিজের প্রেস করা সম্ভব হয় তো আপনার প্রেস চালানো সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান দরকার। টাইপের ওজন, ইম্প্রেশন, দাম, ডরেব্লিটি জানা চাই। মেসিনের নানা কাজেও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

যাই হোক, বইয়ের ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত করে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো আগামী বারে। এবারে শুধু প্রস্তাবনা করলাম।

বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরিচয়

ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনায় ইতিহাসে পাইওনীয়ারীত্বের গর্ব বাঙালীর। কারণ, বাঙালীই একমাত্র জাত, যে বুঝতে পেরেছিল ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে হলে শুধু কামান, বন্দুক কি বিপ্লব করে চলবে না। বণিকের জাতকে ভাতে মারতে হবে। সত্যিই তাই। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের তুলনায় মাথা-পিছু মাত্র তিন মাসের খাবার হয়। বাকী আনতে হয় সংগ্রহ করে ভিনদেশের লোকের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে। তাই বাঙালীর সেদিনের দেশনায়কগণ ঠিক করলেন, ব্যবসা করতে হবে। তাই আমরা দেখতে পাই, বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি যেমন জুট, কটন, বেল্টিং, এনামেল কি গ্লাস, কেমিক্যালসের ব্যবসায় বাঙালীই এগিয়ে গেছে প্রথম। জুট ইণ্ডাষ্ট্রির ইতিহাসে প্রথম পাটকল স্থাপনের পিছনে আছেন একজন বাঙালী নাম বিশ্বম্ভর সেন, একথা আগেই বলেছি। তার কাপড়ের কলের কথা। বাঙালায় কাপড়ের করলেন ডি, এন চৌধুরী।

করা প্রয়োজন সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সূর্য্যকুমার বসু, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে করলাম। এনামেলের সব চেয়ে প্রাচীন বাঙালী ব্যবসায়ী সুর-নিয়োগী-কুমারের নামও আপনারা সকলেই জানেন।

নারিকেল তৈল প্রস্তুত প্রণালী

আজ-কাল শতকরা নব্বুই জনের কাছেই অভিযোগ শুনি, মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে অকালে। কারণ, ভাল তেল পাওয়া যায় না। অবশ্য ভাল তেল না পাওয়াটাই যে চুল পড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ এমনটি নয়। শরীরে ভাইটামিনের অভাব, ক্যালসিয়ামের হ্রাস কি চুলের নিয়মিত যত্ন না করার জন্যও তা পড়তে পারে। কিন্তু সত্যিই যদি আপনি নারকোল তেল খাঁটি না পান তো ঘরেই তা তৈরী করে নিন না। কি করে করবেন?—

(১) কার্ত্তিক মাসের শেষ আর অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় গাছ থেকে কি বাজার থেকে 'কাটঝুনো' নারকোল কিনে এনে যে সমস্ত নারকোলের মধ্যে জল আর নেই বুঝবেন সেগুলোকে কুড়ুল দিয়ে চিরে কোনও খোলা জায়গায় চড়া রোদে শুকাতে দিন। যখন দেখবেন যে, কোনও রকম কষ্ট না করেই নারকোলের 'মালা' থেকে শাঁস আলাদা করে ফেলা যাচ্ছে তখন বুঝবেন যে, আর শুকাবার প্রয়োজন নেই। এইবার শাঁসগুলো আলাদা করে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটুন বঁটি দিয়ে। পরে সেগুলো আবার উত্তমরূপে শুকান। রাত্তে বা সন্ধ্যার দিক যেন শিশির না লাগে সেদিকে নজর রাখবেন। মাস খানেক এমনি করে নিয়মিত ভালো ভাবে শুকাবার পর ঘানিতে ঐ নারকোল ভাঙাতে দিন। যদি আপনার সুগন্ধি নারকোল তেল মাখা অভ্যাস থাকে তো সুগন্ধযুক্ত ফুল নারকোলের টুকরার সঙ্গে সঙ্গে শুকাতে দিন। ঠিক নারকোলের টুকরার মতই ফুলগুলোও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে এবং ফুলের গন্ধ নারকোলের সঙ্গে মিশে যাবে। নারকোল ঘানিতে ভাঙাবার পরও গন্ধ ঠিক থাকবে। পরে তা উত্তমরূপে ছেঁকে আর থিতিয়ে নিন।

(২) দ্বিতীয় প্রণালীতে নারকোলের শুকনো শাঁস উত্তমরূপে বেঁটে নিন। পরে তাতে খানিকটা বেশ গরম জল ঢেলে দিন। সারা রাত ধরে ঐ নারকোল-বাটা মিশ্রিত উত্তপ্ত জল কোনও পাত্রে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দেবেন। সকালে উঠে দেখবেন যে, সমস্ত নারকোল-বাটা মিশ্রিত জল জমে গেছে। এবার ঐ জমাট নারকোল অন্য কোনও পাত্রে আগুনে [illegible] করে জ্বাল দিন। নারকোল পাতা, আমের পাতা কি তুষ দিয়ে মৃদু জ্বাল দেওয়াই উচিত। এইবার খাঁটি তেল পাবেন। নিজের পছন্দমত সুগন্ধ দ্রব্য এইবার মিশিয়ে নিন।

পল্লীগ্রামে আজও এই সব প্রক্রিয়াতেই ঘরে ঘরে নারিকেল তেল তৈরী হয়। সহরে আপনারাও চেষ্টা করে দেখুন না কেন?

চোর ধরা কল তৈরীর কথা

সাধারণ মানুষের শরীরের উত্তাপ—৯৮'৪ ফারেণহাইট। বড় কম নয়। বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসেও কদাচিৎ ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এর ওপরে থাকে। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম থেকে আমরা জানি যে, কোনও বস্তু যদি পাশের বস্তু অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয় তো তাপ-প্রবাহ সেই অধিক উত্তপ্ত বস্তু থেকে অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত বস্তুর দিকে তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটে চলে। একে বলে র‍্যাডিয়েশন। Thermo-Couple বা দুই পরস্পর-বিরোধী
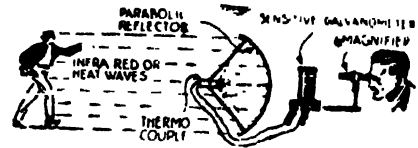
চোর ধরার কলের ডায়গ্রাম—ঘরেও করা চলবে এ দেখে।

ধাতুখণ্ডের সংযোগে উৎপন্ন এক রাসায়নিক উত্তাপ দিয়ে অনায়াসেই অন্তত ৬০০ ফুট দূরের কোনও লোকের আগমনবার্তার খবর অনায়াসেই জানা যায় অন্ধকারে। Thermo-Couple কে একটা প্যারাবোলার আকারের মধ্যে রেখে (একে বলে 'ফোকাস') Thermo-Couple এর দুই ধাতুর দুই তারকে একটি গ্যালভানোমিটার বা বিদ্যুৎ-মাপযন্ত্রের সঙ্গে লাগানো হয়।
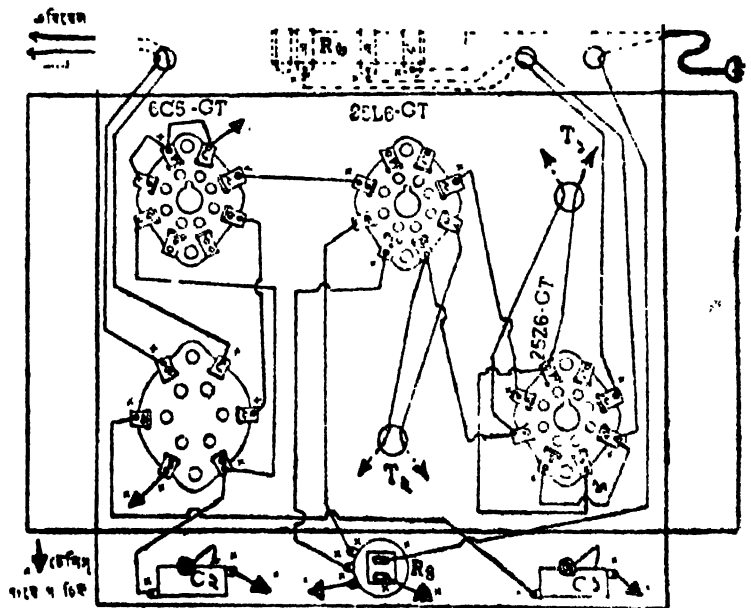
সেকসানাল ডায়গ্রাম (২)—গত মাসের এবং এ মাসের নানা ছোট ছোট সংযোগগুলির বিবরণ পাবেন এতে। এটি এবং গত মাসের দু'টি ছবি মিলিয়ে সেট ওয়্যারিং করুন।

কোনও লোকের শরীর থেকে নির্গত তাপপ্রবাহ এসে প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টরে ধাক্কা খাবে এবং ফোকাসে গিয়ে জড়ো হবে। সেই ধাক্কায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে থার্মো-কাপালের সাহায্যে এবং গ্যালভানোমিটারে তা ধরা পড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধকারে অনায়াসেই আপনি পথ চলতে পারেন। চোর-ডাকাত কিছুই আপনাকে হঠাৎ বেকায়দায় কাবু করতে পারবে না। জিনিষটির তৈরী করার খরচা খুব বেশী হবে না। সত্তর-আশী থেকে একশো টাকার মধ্যেই হবে। বিশেষ করে পুলিশের কাজে এটি বিশেষ সুবিধাজনক হবে। অবশ্য অন্ধকারে দেখার জন্য গ্যালভানো-মিটারের কাঁটাটি প্লাটিনাম কোটেড হওয়া দরকার।

রেডিও তৈরীর বৃত্তান্ত

চিত্রে ভল্যুম কন্ট্রোল (R) এর পেছনে যে সুইচের কথা বলেছি, তাকে দিয়েই একেত্রে সমস্ত সার্কিটটি অফ-অন করা চলবে। সুবিধা মত আপনি কোনও পৃথক সুইচ বেসিসের বাঁটে বা বাইরেও করে নিতে পারেন।

গত মাসে যা যা বলেছি তারই একটি বিস্তারিত চিত্র দেওয়া গেল এ মাসে। চিত্রে যে সমস্ত জায়গায় (X) চিহ্ন আছে দেখছেন সেখানে সল্ডার করা আছে। সল্ডারের কথা আগেই বলেছি। আর যেখানে ও-রকম কোনও চিহ্ন নেই সেখানকার কাজ এখনও শেষ হয় নি জানবেন। আরও সংযোগ বাকী আছে। সল্ডারগুলি সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেবেন। এ মাসের চিত্রানুযায়ী ওয়ারিং করুন এবং সব চেয়ে প্রথমে ছাপা স্কীমেটিকসার্কিটের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন। মাঝে মাঝে দেখতে পাবেন ভ্যালভ বেসগুলির কয়েকটা পিনে—যেমন রেকটিফায়ার ভ্যালভ বেসের ৬নং পিনে, পাওয়ার ভ্যালভ বেসের ৬নং পিনে এবং ডিটেক্টর বেসের ৩, ৬, ১ ইত্যাদি পিনগুলোতে—টিউবের নিজস্ব কোন সংযোগ না থাকা সত্বেও ঐ পিনগুলোতে তার সংযোগ করা রয়েছে। জানবেন, এখানে Tie-Point হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

এ মাসের দেওয়া চিত্রটির কথাই দু' মাস ধরে বললাম। গত মাসের দেওয়া চিত্রটিতে রেজিষ্ট্যান্স আর কণ্ডেন্সারের ছোট ছোট কানেকসনগুলি পেয়েছেন। সেগুলির কাজ যদি আপনার করা হয়ে গিয়ে থাকে তো এইবার স্কীমেটিক সার্কিট এবং সেকসানাল ডায়গ্রাম—এক ও দুই নিয়ে বসুন। কানেকসনগুলি সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন আর একবার।

সব সময়ই খুব অল্প তারে আর কম জায়গায় সংযোগ করার চেষ্টা করবেন। নচেৎ শর্ট-সার্কিট হয়ে যেতে পারে। গ্রাউণ্ড সংযোগগুলি চেসিসের গায়েই করবেন। নেগেটিভ কানেকসনের জন্য তাহলে আর লম্বা লম্বা তার টানতে হবে না।

আর্থকে এরিয়াল কয়েলের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে স্কীমেটিক সার্কিটে। এতে রিসেপশান খুব ভাল পাওয়া যাবে। আপনার মেন লাইন পজিটিভ যদি এ্যালাইভ থাকে তো আর্থকে কণ্ডেন্সারের সাথে সিরিজে না লাগিয়ে সোজা চেসিসেও লাগাতে পারেন। স্পীকারটিকে আউটপুট ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারী লীডের সঙ্গে যুক্ত করে নিন এবং ক্যাবিনেটের যে কোনও স্থানে বসিয়ে দিন।

প্লাসটিকের খেলনা নয়, ব্যবহার্য্য দ্রব্য চাই

প্লাসটিক মানেই যেন খেলনা। আলু মোম কি চিনেমাটীর স্থান কেড়ে নিয়েছে প্লাসটিক। প্লাসটিকের শুধু খেলনাই যে হয় একথা বলছি না, কিছু সৌখিন জিনিষও অবশ্য হয়। যেমন ধরুন—চুড়ি, চিরুণী। তাও খুব কিছু ব্যবহার্য্য নয়। প্লাসটিকের চিরুণী তো সপ্তাহে তিনটে করে ভাঙে। দামে সস্তা হলে কি হবে। প্লাসটিকের শাড়ীর কথাও শুধু কথাই রইলো। সুতরাং আমাদের দেশের প্লাসটিক ইণ্ডাষ্ট্রি শুধু সীমাবদ্ধ রইলো বাচ্চাদের মোটরগাড়ী, ট্রামগাড়ী, পুতুল, ফ্যান তৈরীর কাজে, মেয়েদের চুড়ি কি ছেলেদের এ্যাস ট্রে অবধি এসে। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই প্লাসটিক আজ যুগান্তর এনেছে। ঘরের পরদা, মেঝের কার্পেট, পাপোষ, মোজা, নানা রকমের আর সাইজের জার, টাম্বলার প্যান থেকে মোটর গাড়ীর নানা পার্টস, হেভী মেসিন-পার্টস এমন কি ডাক্তারী শাস্ত্রের সার্জ্জারীতেও প্লাসটিক সার্জ্জারী কাজে লাগছে। আমেরিকাতে তো প্লাষ্টিক শেষ হয়ে 'নাইলোনে'র যুগ এসে গেছে। কলকাতার আশে-পাশে প্লাসটিকের খেলনা তৈরীর জন্য তো নানা রকম কারখানা খোলা হয়েছে। তাঁরা এদিকটা একটু ভেবে দেখুন। প্লাসটিকের ব্যবহার্য্য দ্রব্য যদি মজবুত করে বানাতে পারেন তো তার খুব ভাল মার্কেট কলকাতাতেই হওয়া সম্ভব। সরকারী প্রচেষ্টাও এদিকে থাকা দরকার।

লেখায় হাত ও হাতের লেখা

লেখায় হাত ভাল হলেই যে হাতের লেখা ভাল হবে এমন কোন কথা নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, সেন্সারের বড় কড়াকড়ি। একটি মোটা-মোটা খাতা এসে পৌঁছুল লণ্ডনে মেল মারফৎ। এই রহস্যময় দুর্বোধ্য লেখা পড়তে না পেরে সেন্সর বিভাগ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। এ নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষকে সাংকেতিক ভাষায় লেখা কোন রিপোর্ট। এলেন হস্তলিপি-বিশারদেরা। অনেক মাথা ঘামলো। অবশেষে মুখে হাসি ফুটে উঠলো তাঁদের, এটি একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। এটাই হলো জেমস্ জয়েসের বিখ্যাত উপন্যাস—

আয়নায়
মুখ দেখে
কি মনে হয়?

ত্বকের যত্ন নেওয়া এবং পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া, এ দুয়েরই একান্ত প্রয়োজন—সেই সঙ্গে রঙের কথাটাও ভুললে চলবে না। বুদ্ধিমতী মেয়েরা জানেন যে কোমল ত্বকের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতিদিন "'HAZELINE' SNOW" "'হেজলিন' স্নো" ব্যবহার করলে ত্বক শুভ্র ও মসৃণ হয়ে ওঠে এবং এই স্নোর হালকা প্রলেপের দরুন ত্বক সজীব থাকে।

"'HAZELINE' SNOW"
(TRADE MARK)

"'হেজলিন' স্নো" (ট্রেড মার্ক)

বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, বোম্বাই

হকি

কলকাতার মাঠে হকি শেষ হয়ে গেল। সিনিয়র ডিভিসনের লীগ খেলায় মোহনবাগান দল অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করলো। সিনিয়র ডিভিসনে মোহনবাগান দল যে বেশ শক্তিশালী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ানশিপ ভবানীপুর দল থেকে ওয়াহিদুল্লা, জি পেরেরা ও সি, এস, গুরে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ায় মোহনবাগান দল যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো তেমনি ভবানীপুর দলকে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। তবুও খ্যাতিমান খেলোয়াড় না নিয়ে ভবানীপুর দল লীগে যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে এটা কৃতিত্বের পরিচায়ক। গত বছরের রাণার্স আপ কাষ্টমস দল এবারেও তাদের সে সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

হকি লীগে মোহনবাগান ও মহঃ-স্পোর্টিং-এর খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিলো, আর এই খেলাটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ ও খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য খেলাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান দল ৩—১ গোলে জয়লাভ করে।

লীগের রাণার্স আপ কাষ্টমস হীনবল মেসারার্সের নিকট পরাজিত হ'ল. এর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মনে হয়, কাষ্টমস দলের খেলোয়াড়গণ ভেবেছিলেন মেসারার্সের নিকট জয়লাভ তাদের সহজসাধ্য হবে। তাই কিছুটা তাচ্ছিল্য করায় শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। মোহনবাগান ও আর্মড পুলিশের খেলায় অনুরূপ ফল ফলতে পারতো এ কথা বলা যায়। অতর্কিতে দুটি গোল খেয়ে শেষ পর্যন্ত ড্র করে কোন রকমে সেদিন সম্মান বজায় রেখেছিলো।

প্রত্যেকটি দলের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, প্রতিপক্ষ যতই হীনবল হোক না কেন, সে প্রতিপক্ষ। এ-কথা ভুললে প্রতিযোগিতার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য উভয়ই নষ্ট হয়।

এবার নিয়ে মোহনবাগান দল চার বার হকি লীগ জয়ের গৌরব অর্জন করলো। লীগ জয়ের পক্ষে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের আন্তরিকতা ও কুশলতা উভয়ই আছে। তবু এক জনের কৃতিত্ব বেশী। তিনি হচ্ছেন সি, এস, গুরু। একই দলের হয়ে ৩১টি গোল করেছেন। এবারে লীগে তিনি সব চেয়ে বেশী গোল দিয়েছেন।

আইনের বেড়াজাল প'লে কয়েক জন খেলোয়াড়কে এ বছর কলকাতা মাঠে হকি খেলতে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা নিজেদের কৃতিত্ব অনুযায়ী খেলেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করা যায় কুলদীপ সেন। এ ছাড়াও ইষ্ট বেঙ্গলের সৈয়দ ও পোর্ট দলের আনোয়ারের নাম করা যায়।

বাইটন কাপ:—এবারে বাইটন কাপের খেলায় ওয়েষ্টার্ণ রেল ও উত্তর-প্রদেশ দল যুগ্ম ভাবে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করলো। যুগ্ম ভাবে চ্যাম্পিয়ানশিপ হকি-ইতিহাসে নূতন নয়।

এবারের বাইটন কাপের খেলায় দু'-একটি খেলা ভিন্ন কোন খেলাতেই খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য বা খেলার উৎকর্ষতা কোন কিছুই মনের মাঝে রেখাপাত করেনি। বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ও উত্তর-প্রদেশের খেলায় কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত দু'বছরের বাইটন-বিজয়ী টাটা স্পোর্টস অনেক আশা নিয়ে কলকাতা বাইটন কাপে খেলতে এসেছিলো। মনে ছিল অসীম উৎসাহ। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে কলকাতা থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে।···

রেল দল এবং উত্তর-প্রদেশ ফাইনালে ওঠায় দুই প্রাক্তন অলিম্পিক অধিনায়কের মিলন ঘটেছিল। এই দুই অধিনায়ক বাইটন কাপের ফাইনালের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু। প্রথম দিনের খেলায় কেবলমাত্র ষ্টিক্ চালাচালি আর ফাউলের আধিক্যই ছিল বেশী। অখেলোয়াড়ী মনোভাব আর অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছিলো। দ্বিতীয় দিনের খেলায় কিছু উন্নতি দেখা দিয়েছিল। রেল দলের এ'টক, সিদ্দিক আর উত্তর-প্রদেশের মালহোত্র, অনিল দাস ও ইদ্রিসের খেলায় নৈপুণ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিলো।

বিশ্বের দরবারে ভারতীয় হকির স্থান আজও শীর্ষে। তবে এবারের হকি খেলা দেখে শুধু এ-কথা'ই মনে হয়েছে যে, খেলার ধারা যদি এভাবে চলে তাহলে সে সম্মান বোধ হয় আর বেশী দিন থাকবে না। কারণ, অন্যান্য দেশ আগামী অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় হকির স্থান যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা থাকে, তবে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

টেবিল টেনিস

এবারের বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হল্যাণ্ডের উটরেখ নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের ৩৫টি দেশ এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলো। গত বারের ন্যায় জাপান পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে। জাপানের তরুণ খেলোয়াড় তোশিয়াকী তানাকা বিশ্বের দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বারে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী ছিল জাপান। এবারে মহিলা বিভাগের কার্বিলিন কাপ ছাড়া অন্য দু'টি সম্মান তাদের অক্ষুন্ন আছে। কার্বিলিন কাপ জয় করেছে রুমানিয়া।

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান প্রতি বছর খেলোয়াড় পাঠাচ্ছে এবং তাঁরা তাঁদের দেশের সম্মান ঠিক বজায় রেখে চলেছেন। জাপানের এই ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের কাছে কোন দেশের করে উঠতে পারছেন না। জাপানের টেনিস খেলায় একটা নিজস্ব টেকনিক আ

মিসেস এঞ্জেলিকা রোজুর কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী। এবার নিয়ে তিনি উপর্য্যুপরি ছ'বার চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করলেন। ইতিপূর্ব্বে বিশ্বের দরবারে কোন পুরুষ বা মহিলা খেলোয়াড়কে এ সম্মান লাভ করতে দেখা যায়নি। পুরুষ খেলোয়াড় ভিক্টর বার্ণা ও মহিলা খেলোয়াড় এম, মেডানিস্কি উপর্য্যুপরি পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জন করেছিলেন।

এবারের ফলাফল—সোয়েদলিং কাপ—জাপান ৫—৩ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে। কার্বিলন কাপ—রুমানিয়া ফ্যাইনাল পুলে ৩—২ খেলায় জাপানকে এবং ৩—২ খেলায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করে।

পুরুষদের সিংগল্‌স ফ্যাইনালে জাপানের তোশিয়াকী তানকা ২১-১২, ২১-৯ ও ২১-১৪ পয়েন্টে যুগোশ্লাভিয়ার জেড ভেলিনারকে পরাজিত করে সেণ্ট বাইড ভেস জয়লাভ করেন।

মহিলাদের সিংগল্‌স্‌ ফ্যাইনালে রুমানিয়ার এঞ্জেলিকা রোজু ২১-১৩, ২১-১ ও ২১-৮ পয়েন্টে অষ্ট্রেলিয়ার মিসেস লিণ্ডি ওটেলকে পরাজিত করে গিষ্ট প্রাইজ পান।

পুরুষদের ডাবল্‌স ফ্যাইনালে ইরাণ কাপ জয়লাভ করেন চেকশ্লোভাকিয়ার আইভান আন্দ্রিয়াদ ও এল, ষ্টিপের ২১-১০, ২১-৭ ও ২১-১৮ পয়েন্টে যুগোশ্লোভিয়ার জেড ডলিনার ও ভি, হারাঙ্গানোকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফ্যাইনালে পোপ কাপ জয়লাভ করেন, রুমানিয়ার এঞ্জেলিকা রোজু ও এলা কেলার ২১-১৭, ১৬-২১, ১৭-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৬ পয়েন্ট ইংল্যাণ্ডের ডায়না রো ও রোজেলিণ্ডকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলসে হেডুসেক কাপ জয়লাভ করেন হাঙ্গেরীর কে সেপসি ও ইভা কেজিয়ান ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১৬, ও ২১-১৩ পয়েন্টে স্কটল্যাণ্ডের এ সিমনস্‌ ও হেলেন ইলিয়টকে পরাজিত করেন।

ফুটবল

ক'লকাতা মাঠের ফুটবল এখনও পর্য্যন্ত ঠিক মত জমে উঠতে পারে নি। তবু সঙ্গে নিয়ে এসেছে এক বিরাট উন্মাদনা। তাই আশা করা যাচ্ছে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ফুটবল বেশ জমে উঠবে।

ফুটবল খেলায় গৌরচন্দ্রিকা-স্বরূপ আছে খেলোয়াড়দের ক্লাব ছাড়ার হিড়িক। সে সব মিটে গিয়ে এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ দলই ১টি করে খেলেছে। এখনও লীগ কোঠার শীর্ষে আছে কলকাতার খ্যাতনামা দল মোহনবাগান। তবে ইতিমধ্যে মোহনবাগানকে তিনটি পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। রেল দলের কাছে পরাজয় এবং মহঃ-স্পোর্টিং এর সংগে খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়ে। এখনও লীগের খেলায় অপরাজিত মহঃ-স্পোর্টিং দল। ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রথম দিকে অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। এ পর্য্যন্ত তারা দু'টি হেরেছে এবং একটি ড্র করেছে। লীগ কোঠায় তাদের স্থান দ্বিতীয়।

৪ঠা জুন ক'লকাতা মাঠে প্রথম চ্যারিটি খেলা হল রাজস্থান বনাম ইষ্টবেঙ্গলের সংগে। এ খেলায় রাজস্থান দল ১—০ গোলে জয়লাভ করে। এই দুইটি শক্তিশালী দলের খেলায় কোথাও নিপুণতার ছাপ দেখা যায় নি। ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রথম পরাজয় রাজস্থানের কাছে। খেলোয়াড় অদল-বদল এবং পুরোভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার জন্যই এ পরাজয়। তবে এবার প্রথম থেকেই রাজস্থান দল তিন ব্যাক পদ্ধতিতে খেলছে। এদিনেও খেলেছিলো। রাজস্থান দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের অপেক্ষা রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের নিপুণতা বে[illegible] করে চোখে পড়ে। পুরোভাগের খেলোয়াড়রা ঠিক মত বল আদান প্রদান করে খেলতে পারলে তাদের খেলার উন্নতি দেখা যাবে, আশা করা যায়। গত বছরের দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান অরোরা প্রথম ডিভিসনে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। লীগ কোঠায় তাদের স্থান সর্ব্বনিম্নে।

এবারে ফুটবল লীগে খেলোয়াড়দের সর্ব্বোচ্চ গোল-সংখ্যা ৫টি। দিয়েছেন এস দত্ত, সি গোস্বামী, (মোহনবাগান) প্যাট্রি[illegible] (ইষ্টবেঙ্গল) এস ঘোষ (উয়াড়ী)।

টুকরো খবর

মুষ্টিযুদ্ধে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান রকি মার্সিয়ানা ইংলণ্ডের [illegible] ককেলকে পরাজিত করেন। এ নিয়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মা[illegible] বেশ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিলো। ফ্লাইওয়েটে আর্জেনটি[illegible] পিরাজো জাপানের যোশিও শিরাইকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান[illegible] আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ওয়ার উইকশায়ারের প্রবীণ লেক[illegible] বোলার হেলিস মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দু'হাজার উইকেট [illegible] করেছেন। ইতিমধ্যে ওয়ার উইকশায়ারের কোন খেলোয়া[illegible] ভাগ্যে এ কৃতিত্ব লাভ হয়নি। এশিয়ান ভলিবল প্রতিযোগি[illegible] ভারত এবার জাপানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানশিপ আখ্যা পে[illegible] এক বছর বিরতির পর ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা আগা কাপ লাভ করেছে পাঞ্জাব পুলিশ হকি টিম।

বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জোলুই-কে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করলেন
আপনি কত জনকে মারাত্মক মার মেরেছেন?
জো-লুই : তা অনেক-কে।
ভক্ত : আর আপনাকে কে সব চেয়ে মারাত্মক মার মেরেছে?
জো-লুই : ইনকাম-ট্যাক্স অফিস!

ছোটদের আসর

১৩

সৈয়দ মুজতবা আলী

সুয়েজ বন্দর কিছু ফেলনা বন্দর নয়। বন্দরটার 'সামরিক' গুরুত্ব—ষ্ট্রাটেজিক ইম্পর্টেন্‌স্‌—আছে বলে ইংরেজকে তার নৌবহরের একটা অংশ এখানে রাখতে হয়। যে সব গোরাদের ক্যাম্বিশের নৌকয় করে জলকেলি করতে দেখেছিলুম তারাই এই সব নৌবহরের তদারকি করে। ফলে তাদের জন্য এখানে দিব্য একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছুই নয়, কিছুই নয়, পূর্বের তুলনায় আজ সুয়েজ বন্দরের কি আর জমক জৌলুস। কেপ অব গুড হোপের পথ না বেরনো পর্যন্ত এমন কি তার পরেও ভারতবর্ষ, বর্মা, মালয়, যবদ্বীপ, চীন থেকে যে-সব জিনিস রপ্তানি হত তার অধিকাংশই সমুদ্রপথে এসে নামত সুয়েজ বন্দরে—এবং ভুললে চলবে না, তখনকার দিনে প্রাচ্যই রপ্তানি করত বেশী। এখান থেকেই ফিনিশিয়ানরা, তার পরে গ্রীক, তার পর রোমান; তার পর আরবরা ভারতের দিকে রওয়ানা হত। ভারত থেকে মাল এনে সুয়েজে নামানো হত। সুয়েজ থেকে একটা খালে করে এসব মাল যেতো কাইরোতে এবং সেখান থেকে নীল নদ বয়ে সে মাল পৌছত আলেকজেন্দ্রিয়ায় —আরবীতে যাকে বলে ইস্‌কন্দরিয়া। সেখান থেকে ভেনিসের মাধ্যমে তাবৎ ইয়োরোপ।

এই সব মাল কেনা-কাটা আমদানী রপ্তানীতে ভারতবর্ষের প্রচুর সদাগর-শ্রেষ্ঠী, মাঝি-মাল্লার বিরাট অংশ ছিল। যে যুগে ভাস্কো-দা-গামা এ পথকে নাকচ করে দেবার জন্য আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার পথ বের করলেন সে যুগে পূর্বপ্রাচ্যের তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ভারতীয় এবং সুয়েজ অঞ্চলের মিশরীয়দের হাতে।

এক দিকে ভারতীয় এবং মিশরীয়; অন্য দিকে ভাস্কো-দা-গামার বংশধর পর্তুগীজ দল।

জাত তুলে কথা কইতে নেই, তাই ইসারা-ইঙ্গিতে কই। এই যে পর্তুগীজ গুণ্ডারা গোয়া নিয়ে আজ দাবড়াদাবড়ি করছে এ-কিছু নূতন নয়। ওদের স্বভাব ঐ। এক কালে তারা ছিল জলের বোম্বেটে এখন তারা ডাঙার গুণ্ডা। 'বোম্বেটে' শব্দের মূল আর অর্থ অনুসন্ধান করলেই কথাটা সপ্রমাণ হবে। 'বোম্বেটে' কিছু বাঙালীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো আজগুবী কথা নয়। 'বোম্বেটে' শব্দ এসেছে ঐ পর্তুগীজদের ভাষা থেকেই—bombardeiro, অর্থাৎ যারা না-বলে না-কয়ে যত্র-তত্র bomba—বোমা ফেলে হয়তো বলবে, আমাদের কলকাতাতেই কেউ কেউ এরকম বোমা ফেলে থাকে। ফেলে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য এবং ঘৃণ্য যে তাই আজ তাবৎ কলকাতাবাসীকে কেউ বোম্বেটে নাম দেয়নি। কিন্তু তাবৎ পর্তুগীজরাই এই অপকর্ম করত বলে তাদের নাম হয়ে গেল 'বোম্বেটে'।

ওদের দ্বিতীয় নাম—আমাদের বাঙলা ভাষাতেই—'হারমদ'। সেটাও পর্তুগীজ কথা armada থেকে এসেছে। বিখ্যাত কোষকার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানে এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পর্তুগীজ জলদস্যু'। এই জলদস্যুরা যখন বাঙলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় তখন তাদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালীরা সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের ঘরোয়া কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে,—

> 'ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
> রাত্রিতে বহিয়া যায় হারমদের ডরে॥'

অর্থাৎ এই সব 'হারমদ'—'armada,' 'বোম্বেটে' 'bombardeiro'দের ডরে তখন দক্ষিণ-বাঙলার লোক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমতে পারত না।

এস্থলে যদিও অবান্তর, তবু প্রশ্ন, বাঙালীরা এত ভয় পেয়ে পালালো কেন?

উত্তরে বলি, যে কোনো বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমে, এক পাল লোক সেটাকে লুঠ-তরাজ করতে পারে। এটা আদপেই কোনো কঠিন কর্ম নয়, যদি,—

এই খানেই এক বিরাট 'যদি'—

যদি সে দেশের রাজা তার সমুদ্র-কূল রক্ষার জন্য নৌবহর মোতায়েন না করেন। জনপদ রক্ষা করার জন্য যে রকম পুলিশ সেপাই রাজাকেই রাখতে হয়, ঠিক তেমনি সমুদ্র-কূল-বাসীদের হেপাজতীর জন্য রাজাকেই নৌবহর রাখতে হয়।

কিন্তু হায়, তখন বাঙলা দেশ হুমায়ুন, আকবর মোগল বাদশাদের হুকুমে চলে। মোগলরা এদেশে এসেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে। তারা শক্ত মাটির উপরে খাড়া পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিযূথ, উষ্ট্রবাহিনী চতুরঙ্গ সামন্তের কি প্রয়োজন সে-তত্ত্ব বিলক্ষণ বোঝে। রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। ——— — গুজরাত থেকে তাদের কাছে অনেক কর্ম ধরে গানটি

গেল—'হুজুরেরা দয়া করে একটা নৌ-বহরের ব্যবস্থা করুন; না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মানে-ইজ্জতে গেলুম।'

কথাগুলো একদম শব্দার্থে খাঁটি। 'ধন' গেল, কারণ পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানী-রপ্তানী বন্ধ। 'প্রাণ' যায়, কারণ তারা বন্দরে বন্দরে লুঠ-তরাজের সময় যে-সব খুন-খারাবী করে তারই ফলে বন্দরগুলো উজাড় হতে চললো। মান-ইজ্জৎ? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্তুগালের হাটবাজারে গোলাম-বাঁদী, দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করছে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মোগল বাদশারা বসে আছেন পশ্চিম পানে, খাইবার পাসের দিকে তাকিয়ে। ঐদিক থেকেই তাঁরা এসেছেন স্বয়ং, তাঁদের পূর্বে এসেছে পাঠান শক্-হূন্-সিথিয়ান্-এরিয়ান। তাই তাঁরা তৈরী করেছেন চতুরঙ্গ। ওদের ঠেকাবার জন্য। নৌবহর চুলোয় যাক্‌গে। ভারতবর্ষ তো কখনো সমুদ্রপথে পরাজিত এবং অধিকৃত হয়নি। তার জন্য বৃথা দুশ্চিন্তা এবং অযথা অর্থক্ষয় অতিশয় অপ্রয়োজনীয়।

ফলে কি হল? পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপথেই মোগলদের মুণ্ডু কেটে এদেশে রাজ্যবিস্তার করলো।

সে কথা পরের কথা। উপস্থিত আমরা আলোচনা করছি, ভারতীয় উপকূলবাসীরা পর্তুগীজদের সঙ্গে যে লড়াই দিয়েছিল তাই নিয়ে। এরা তো মোগলদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেল না, উল্টে যারা লড়ছিল, তাদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন শত্রুতা।

গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ বাদশাহ তখন লড়ছিলেন পর্তুগীজ বোম্বেটের সঙ্গে। তার প্রধান কারণ, গুজরাতের সুরট, ব্রউচ, (ভৃগু), খম্বাত (Cambay, স্তম্ভপুরী) ভিতর দিয়ে উত্তর-ভারতের যাবতীয় পণ্যবস্তু ইয়োরোপে যেত। সে ব্যবসা তখন পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে মর-মর। বাহাদুর শাহ বাদশার তখন দুই শত্রু। এক দিকে সমুদ্রপথে পর্তুগীজ, অন্য দিকে স্থলপথে রাজপুত। প্রথম রাজপুতদের হারিয়ে দিয়ে পরে পর্তুগীজদের খতম করার প্ল্যান করে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে করলেন আর্মিস্টিস্—সময়কালীন সন্ধি। তার পর হানা দিলেন রাজপুতানায়।

দিল্লীতে তখন রাজত্ব করেন বাদশা হুমায়ুন। ইতিহাসে পড়েছো, তখন এক রাজপুতানী শাহ-ইন্‌শাহ্‌ জগদীশ্বরকে পাঠালেন রাখী। সেই রাখীর [illegible] হুমায়ুন ছুটলেন রাজপুতানার দিকে। বুঝলেন [illegible]দুর শাহ হেরে গেলে পর্তুগীজদের আর কেউ [illegible]বে না। পূর্বেই বলেছি, নৌবহর নৌসাম্রাজ্য [illegible], মোগলরা সে-কথা আদপেই বুঝতো না। [illegible]তানায় পৌছলেন দেরীতে। বাহাদুর [illegible]র্বে রাজপুতানা জয় করে ফেলেছেন।

তখন আক্রমণ করলেন বাহাদুর শাহকে। বাহাদুর তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চম্পানির দুর্গে। সেখানে কি করে হুমায়ুন দুর্গ জয় করলেন, সে কাহিনী অবশ্য ইতিহাসে পড়েছ। ইতিমধ্যে বাহাদুর দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছেন গুজরাতে আপন রাজধানী অহমদাবাদের দিকে। হুমায়ুন সেদিকে তাড়া লাগাতে তিনি পালালেন সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ কাঠিয়াওড়ায়ের দিকে। সেখানকার কোনো কোনো উপকূলে তখন পর্তুগীজরা বেশ পা জমিয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন খবর পেলেন, বিহারের রাজা শের শাহ দিল্লী জয় করার উদ্দেশ্যে সে-দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তদ্দণ্ডেই তিনি বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চললেন দিল্লীর দিকে। সেখানে শের শাহের কাছে মার খেয়ে তিনি পালালেন কাবুলে। তারপর শের শাহ ব্যস্ত হয়ে রইলেন, উত্তর-ভারতে আপন প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে। বাহাদুরকে তাড়া দেবার ফুরসৎ তাঁর নেই। বাহাদুর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বললেন, 'এই বারে তবে পর্তুগীজ বদমায়েশদের ঠাণ্ডা করি।' পর্তুগীজরা তত দিনে বুঝতে পেরেছে, বাহাদুরের পিছনে তখন আর শত্রু নেই। তাই তারা আরম্ভ করলে তাদের পুরনো বদমায়েশী। বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানালে, তাদের জাহাজে এসে, ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ধি চুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা-পরামর্শ করার জন্য।

বাহাদুর আহাম্মুখের মত কেন গেলেন, সেই নিয়ে বিস্তর ঐতিহাসিক বহু আলোচনা—গবেষণা করেছেন। সে নিয়ে আজ আর আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।

তা সে যাই হোক্, এ-কথা কিন্তু সত্য, বাহাদুর জাহাজে ওঠা মাত্রই বুঝতে পারলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পর্তুগীজদের বদ-মৎলব তাঁকে খুন করার, তাঁর সঙ্গে সন্ধি-সুলেহ্ করার জন্য নয়। তৎখুনি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে—সাঁৎরে পাড়ে ওঠার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশটা পর্তুগীজও হাতে বৈঠা নিয়ে তাঁর পিছনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব বৈঠে দিয়ে গুজরাতের শাহ-ইন্-শাহ্, বাদ্‌শাহ্, শাহ্, বাহাদুর শাহের মাথা ফাটিয়ে দিলে।

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই শেষ লড়াই।

• • • •

কিন্তু আজ সুয়েজ বন্দরে ঢোকার সময় আমি দেশ পানে ফিরে গিয়ে এ সব কথা পাড়ছি কেন?

কারণ, এই সুয়েজের রাজাকেই বাহাদুর তখন ডেকেছিলেন তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে এসে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে নৌ-সমরে সাহায্য করতে। পূর্বেই বলেছি, সুয়েজও বেশ জানতো, পর্তুগীজদের বোম্বেটেগিরি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কতখানি মারাত্মক। শুধু বাহাদুর নয়, তাঁর পূর্বপুরুষগণও বার বার এঁদের ডেকেছেন, দু'য়ে মিলে পর্তুগীজদের একাধিক বার ঝিঙে-পোস্ত চন্দনবাটা করেছেন

তারা তখন যে সব কামান এনেছিল সেগুলো ফেরৎ

যাচ্ছেন কেন?' তখন তারা বলেছিল, 'এই সব পর্তুগীজ বদমায়েশরা আবার কখন হানা দেবে তার ঠিক-ঠিকানা কি? আবার তখন কামান নিয়ে আসার হাঙ্গাম হুজ্জোৎ ঠেলবার কি প্রয়োজন?'

* * * *

এ ঘটনার দশ বৎসর পর আকবর গুজরাত জয় করেন। তিনি কামানগুলো দেখে তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস জেনেও নৌ-বাহিনী নৌ-সমরের মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই পর্তুগীজরা জিতল। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ জিতল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ কলকাতা হয়ে তাবৎ ভারতবর্ষে আপন রাজ্য বিস্তার করলো।

* * * *

আজ সুয়েজে ঢুকে সেই কথাই স্মরণে এল, এই সুয়েজের লোকই একদিন, আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে কী লড়াই-ই না দিয়েছেন!

১৪

পন্ধিতে ফিরে এলুম। দেখি, বখেড়া লেগে গিয়েছে। বন্দরে নেমে যে দপ্তরের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে আমাদের—অর্থাৎ আবুল্ আস্‌ফিয়ার দলকে আটকে দিয়েছেন বন্দরের কর্তারা। কেন, কি ব্যাপার? আমাদের হেল্‌থ সার্টিফিকেট কই? সে আবার কি জ্বালা? দিব্য তো বাবা ডাক থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এখানে এলুম, স্ট্রেচারে চেপে কিম্বা মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে আসিনি; তবে আমাদের হেল্‌থ সম্বন্ধে এত সন্দ কেন? 'উঁহুঁ,' কর্তারা বলছেন, আমরা যে ভিতরে ভিতরে বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, ৎসেৎসে জ্বর (সে আবার কি মশাই?) স্পটেড ফীভর (ততোধিক সমস্যা; আম্‌না-কাটা জ্বর?) ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক রোগে ভুগছি না তার সার্টিফিকেট কই? আমরা যে এসব পাপিষ্ঠ রোগ তাঁদের সোনার দেশ মিশরে ছড়াবো না, তার কি জিম্মাদারী?

শুনি পার্সি বলছে, 'স্যর, এ-সব মারাত্মক রোগেই যদি ভুগবো, তবে বাপ-মার সেবা-শুশ্রূষা ছেড়ে, পাদ্রীসাহেবের শেষ ধর্মবচন না শুনে এখানে আসবো কেন?'

ব্যাঙ্কের লোক প্রতুল সেন বলছে, 'মিশরের সঙ্গে এরকম ধারা দুশমণী আমরা করতে যাবো কেন?'

তার বউ রমা বলছে, 'পিরামিড তোমাদের গৌরবের বস্তু, আমাদের যে-রকম তাজমহল। তার কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ সে বিচারের সুযোগ না দিয়ে আপনারা আপন দেশের প্রতি কি অবিচার করছেন, বুঝতে পারছেন কি?'

আমি কানে কানে রমাকে শুধালুম, 'তবে কুকের সঙ্গে যে সব লোক এসেছিল তারা পেরুল কি করে?'

রমা বললে, 'চুপ করুন; ওরা যে ঐ সব হলদে হলদে কাগজ দেখালে। আমাদেরও আছে। জাহাজে ফেলে এসেছি। আমরা তো জানতুম না এখানে ও-সব রাবিশের দরকার হবে। কুকের লোক জানতো, ওরা তাই সার্টিফিকেট এনেছিল। ভ্যাক্‌সিনেশন্ ইনকুলেশন করিয়েছিলুম বটে এবং ফলে একখানা হলদে রঙের সার্টিফিকেটও পেয়েছিলুম বটে। সেইটে নেই বলেই এখানে এ গর্দিশ।

কিন্তু এ শিরঃপীড়া তো আমাদের নয়। আবুল্ আস্‌ফিয়া যখন আমাদের দলের নেতা তখন তাঁরই তো বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ম্যাটম্যেটে হলদে রঙের কাগজটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞান যার নেই—

চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। দেখি, পল আমার হাত টানছে, আর কানে কানে বলছে, 'চলুন, জাহাজে ফিরে যাই।'

কিন্তু আবুল আসফিয়া কোথায়?

তিনি দেখি নিশ্চিন্ত মনে, একে সিগরেট দিচ্ছেন, ওকে টফি খাওয়াচ্ছেন, তাকে চকলেট গেলাচ্ছেন! কোলে আবার একটা বাচ্চা! খোদায় মালুম কার?

লোকটা তাহলে বদ্ধ পাগল! পাগলের সংস্পর্শ ত্যাগ করাই ধর্মাদেশ।

পলের হাত ধরে পোর্টআপিস ছেড়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছলুম। তখন দেখি আমাদের জাহাজ ভোঁ-ভোঁ করে, গুরুগম্ভীর নিনাদে সুয়েজ খালে ঢুকে গিয়েছে। [ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীপদ্ম বসু

আজ তোমাদের এক জন ঋষির গল্প বলিব, যাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা খুবই অসাধারণ ছিল। তদানীন্তন বাংলা এক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক একদা উক্ত ঋষির নিকট হইতে তাঁহার কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপি পড়িতে চাহিলেন। সেই রচনাগুলি ছিল রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজী-পদ্যানুবাদ। ইতিপূর্ব্বে উক্ত ঐতিহাসিকও উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনের এক প্রকাশক প্রকাশ করিবার জন্য লইয়াছিল। সেই ঋষির অপূর্ব্ব অনুবাদ পাঠ করিয়া ঐতিহাসিকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঋষি চিরদিন আত্মপ্রচারে বিমুখ এবং আত্মপরিচয়ে বীতস্পৃহ এবং তাঁহার রচনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহী ও উদার-হৃদয় ঐতিহাসিক অকুণ্ঠচিত্তে বলিলেন, "ঋষি, আমিও ইহা অনুবাদ করিয়াছি এবং লণ্ডনের Everyman's Libraryকে উহা প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছি। এত দিন হয়ত উহা কতকটা ছাপা হইয়া থাকিবে। কিন্তু তোমার এই অনুবাদ এত সু... হয় যে, আমার এই অনুবাদ বাহির করিতে আমি লজ্জা বো... যোগল বহু গ্রন্থপ্রণেতা ঐতিহাসিকের মুখে এই কথা শুনি... ছে মধ্য মাত্র উল্লসিত বা গর্ব্বে স্ফীত হইলেন না। শান্তভা... র খাড়া "এ সব আমি ছাপাইবার উদ্দেশ্যে লিখি নাই। আমি... কালে এ সব ছাপা হইবে না।" তথাপি ঐতিহা... অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য ঋষিকে অনেক ক... তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বলিতে ... "মনে" গানটি রচনা

বাঙালীর ছেলের ওপোর আমার অটুট অসীম আস্থা। আমি ভারতীয় ও বিদেশী অনেক যুবজনের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু তোমাদের মতো উগ্র সাধনায় তৎপর, নিহিত শক্তিতে এমন ভরপুর, নিজেকে উড়িয়ে দেবার বিপুল তেজে, চমৎকার মেধায়, এমন যুবজন আমি কোথাও দেখিনি, তোমরা কেবল আত্মবিস্মৃত। হাতী যেমন নিজের শক্তি জানে না, তুচ্ছ শৃঙ্খলটাকে নিজের চেয়ে শক্তিধর বলে ভাবে, তোমরাও তেমনি নিজের নারায়ণী শক্তির বিষয়ে অবহিত নও। অনেক নির্ভীকতার, অনেক বীরের কাহিনী তোমরা জানো।

একটি বাঙালী ছেলের অবিশ্বাস্য কাহিনী তোমাদের বলি। ১৯০৭ বা ১৯০৮ সালের কথা, তখন আমার বয়স ১৫।১৬ বছর। এর আগেই অনুশীলন সমিতিতে আমার হাতে-খড়ি হয়েছিল; তার পর আমরা এ প্রদেশে চলে আসি। কলকাতায় গেলে আমি সেই দলের কর্তাদের সাকরেদি করতুম, তাঁদের ফাই-ফরমায়েস খাটতুম। এক রাত্রে একটা বাড়ীতে নূতন সভ্যদের দীক্ষার ব্যবস্থা হোল; খুব নামজাদা বয়স্ক এক নেতা দীক্ষা দিতে এলেন। সেখানে আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ো একটি যুবক ছিলো, তার নাম বলবার দরকার নেই। ধনীর ছেলে, তার বাপ তখনকার কলকাতার উচ্চপদস্থ নামজাদা এক বাঙালী-সাহেব। কিন্তু সে ছেলেটি আরামে কোমলদেহ নয়। ঘরে টেবিলের ওপোর একটা ভিটমরের পড়বার আলো জ্বলছিল। দীক্ষা আরম্ভ হতেই সেই যুবকটি কিছু না বলে আলোর ডোমটা খুলে নিয়ে ডান হাতের মুঠো দিয়ে চিমনীটা ধরে বসে রইলো; তার মুখে হাসি মাখানো। সে মুখটা আমি আজও ভুলিনি। নেতাটি শিউরে উঠে যখন তাকে আলো থেকে হাত সরাতে বললেন, সে হাত সরালো বটে, কিন্তু তার তালুর চামড়াটা চড়চড় করে খুলে গিয়ে চিমনীটার গায়ে আটকে রইলো। নেতাটি সে রাত্রে তাকে দীক্ষা দেননি। সে বীরকে আমি একবারও নিজের পোড়া হাতটার পানে চেয়ে দেখতে দেখিনি। তার পরবৎসর আবার তার সঙ্গে আমার দেখা হলো, তখন বোমা ফেটে তার ডান হাতের চারটে আঙুল উড়ে গেছে। তার অবসান অবশ্য আন্দামানে হয়েছিলো। সেটা ভিন্ন কথা।

সংসারে প্রবেশ করলেই যে তোমাদের সংসারের পথ সহজ সরল হবে, একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। হয়তো তোমাদের অনেকের ভাগ্যে বেকারত্বের অখণ্ড অবসর এসে পড়বে। যান্ত্রিক সভ্যতার কালে এ সমস্যার মূল উৎপাটিত হবার আশা আছে বলে মনে হয় না। তোমরা যাকে প্রোলেটেরিয়েট বলো, তাদের দিন গেছে। যতো দিন অতিবাহিত হবে আমাদের দেশে যন্ত্রের আধিপত্য বৃদ্ধি পাবেই, তাতে কৌশলী যন্ত্রবিৎ ছাড়া আর কারো বেকারত্ব ঘোচবার আশা কম। যুদ্ধের কাল ভিন্ন সম্যক্ ভাবে বেকারত্ব ঘোচা অসম্ভব। কাজেই সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বেকারত্বের বিপদ অজস্র। সব চেয়ে বিপদ ও লজ্জা, পরনির্ভর, পরাশ্রয়ী হয়ে থাকা। তাতে মানবের সম্যক অপচয়ের বিরাট সম্ভাবনা। কিন্তু অন্য দিকে বেকারত্বের আশীর্বাদও আছে। আমাদের দেশে বেকারকে অন্ন ও আশ্রয় দান করবার ভার যৌথ পরিবারের ওপোর গিয়ে পড়েছে। কর্মহীনকে সামলাতে কর্মক্ষমের ভার বেড়েছে। তা বলে সভ্য জগতের কোথাও আর কর্মহীনেরা লক্ষ্যশূন্য হয়ে দিবানিদ্রা দিয়ে আর তাস পিটে জীবন কাটাতে চাইছে না। বেকারেরা এখন অবসরকে আত্মোৎকর্ষের চমৎকার একটা সুযোগ বলে গ্রহণ করেছে। বইএর মতো আত্মোৎকর্ষ ঘটাবার এমন চমৎকার উপকরণ আর নেই। বেকারত্বের কারণে সর্বত্র পাঠস্পৃহাটা আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পঁচিশ বছর পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। বেকারের সমাজসেবায় আত্মপ্রকাশ করা ছাড়া অন্য প্রকাশও আছে। যাদের মননশীল মানুষ বলা যায়, তারা আর শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল সমাজেই আবদ্ধ হয়ে নেই, সামান্য দোকানীর দলে, কলে, কারখানায়, এবং পরোপজীবী পরাশ্রয়ীদের ভেতরও যত্র-তত্র ছড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের সমাজ তাদের দিয়ে পুষ্ট হতে, শক্তিসঞ্চয় করতে বাধ্য। বেকার মননশীলের শক্তি বেকার বলেই ভুয়ো নয়। কে বলতে পারে যে, এই বেকারের দল থেকেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প নূতন জীবনীশক্তি পাবে না?

নির্ভয় হওয়া মানুষের জীবনের পরমতম সাধনা। তা হতে গেলে দেহ-মনের মজবুত কাঠামোর প্রথম উপাদানটি দরকার। জীর্ণ দেহ ও জীর্ণ অবসন্ন মন নির্ভয়তার আধার হতে পারে না। দৈহিক সাহসের সীমা আছে। চেতনায় অধিষ্ঠিত না হলে পূর্ণরূপে সাহসী হওয়া অসম্ভব। ভয়ের ভালো ও মন্দ আছে। কিছু ভয় জীবন-সংরক্ষক, সেগুলি সংস্কারজ। আমাদের মন্দ যা ভয় তা বহুল ভাবে অপরের শেখানো। মেয়েদের লজ্জা যেমন সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষাপ্রসূত, অনেক ভয়ও তেমনি। শেখান বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক ও আরো অনেকে। এঁরা সকলেই নিজেদের মন্দ ভয়গুলি আমাদের চরিত্রে নিষিক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের কথায়, আচরণে চিন্তায়, নানা উপায়ে সন্তানদের মনকে ভয়-জর্জরিত করে আমরা সেই ধারাটা বজায় রেখেছি, সকল বিদ্যালয়ে একটু কলুষ আবহাওয়া আছে, সেটা দেখবার মতো সকলের চোখ নেই। যে ছেলে যতো তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরে পৃথিবীর মুক্ত প্রাঙ্গণে গিয়ে পড়ে, তার পক্ষে ততোই মঙ্গল, তার উৎকর্ষ শক্তিসঞ্চয় ততো বেশি সম্ভব।

স্বরূপ সন্ধানের কথাটা আপাততঃ সামান্য একটুখানি জেনে রাখো। গোড়াতেই বলেছি যে, প্রকৃতি মানুষকে একটা স্তর পর্যন্ত গঠন করে ত্যাগ করে; সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষ অসম্পূর্ণ। তার প্রায় সকল শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। স্বয়ং তুমি যদি তোমার সুপ্ত শক্তিগুলোকে না জাগাও, তারা কখনোই জাগবে না এবং চিরকালই তুমি অসম্পূর্ণ অবস্থাতে থেকে যাবে। এখন তোমার দেহ এবং মন, কোনটাই পূর্ণতার নিরিখ অনুসারে কাজ করে না। প্রকৃত পক্ষে, তারা নিরিখের অনেক নিচে কাজ করে। তোমার ফুসফুসের কথা ধরো। ফুসফুসটা অগণিত বায়ুকোষ দিয়ে গঠিত। কিন্তু অনুক্ষণ তোমার যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটা চলছে তাতে সব বায়ুকোষ কাজ করছে না, অল্প কিছু করছে। তার ফলে তোমার

শচীন্দ্র মজুমদার

দেহের রক্তস্রোত যতোটা পুষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হচ্ছে না। এই ন্যূনতমের ব্যবহার তোমার বেঁচে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েও পূর্ণশক্তির প্রয়োজনের অনুকূল নয়। দেহের অন্যান্য যন্ত্র ও মনের বিষয়েও এ কথা সত্য। কাজেই সাধনা করলেই দেহ ও মনের নূতন ক্রিয়া এবং নূতন গ্রহণ-ক্ষমতা উজ্জীবিত হবেই। আত্যন্তিক প্রয়োজন হলে দেহ ও মনের নূতন যন্ত্র গড়ে ওঠে। এর বাড়া সত্য আর নেই।

এই ন্যূনতমের অবস্থায় তুমি একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নও। সেই যন্ত্রটিকে যে চালিত করছে সে-ও তুমি নও। কারণ, এই যন্ত্রাবস্থায় তোমার প্রকৃত "আমি" বলে কিছুই নেই। তোমার মধ্যে পুঞ্জীভূত নানা সংস্কার ও বহির্জগতের নানা উত্তেজনা তোমাকে অনুক্ষণ চালিত করছে। কাজেই তুমি পুতুল-নাচের একটা পুতুল ছাড়া আর কিছুই নও; অদৃশ্য সুতোর টানে তোমার যতো কর্ম। এই বহির্জগতের উত্তেজনাটা যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে তুমি একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে; তুমি কোন কাজ করতে, কথা কইতে, ভাবতে, খেতে, শুতে কিছু করতে সক্ষম হবে না। এই যান্ত্রিক মানুষকে আমাদের দেশে সংস্কারী মানুষ বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে মানুষ সংস্কারের দ্বারা চালিত। এ সংস্কারী মানুষের আবার বিবিধ রূপ ও পর্যায় আছে, তা এখন তোমার জানার দরকার নেই। আমি, তুমি, তুমি যাদের চেনো সকলেই এই যান্ত্রিক সংস্কারী মানুষ। কাজেই এমন অসম্পূর্ণ মানুষটা অপরের হাতে খেলার পুতুল হতে বাধ্য। এই সংস্কারী মানুষ দিয়েই সংসারটা পরিপূর্ণ। এমন ভয়ঙ্কর বন্ধনদশা থেকে যে নিজেকে উদ্ধার না করতে পারে, তাকে কোন শক্তিই মুক্তি দিতে পারে না।

প্রতিমা গড়ার দু'টি ধরণ। কুমোর একটা কাঠামোর ওপোর মাটির প্রলেপ দিয়ে দিয়ে মোটামুটি একটা আকৃতি গড়ে নেয়। পরে সেটাকে চেঁছে-ছুলে, মানানসই করে, রং লাগিয়ে, পালিশ করে প্রতিমাটাকে শেষ করে। এটা হলো বাহ্যিক ধারণা।

ভাস্কর মর্মর পাথর বাটালি দিয়ে কেটে কেটে প্রতিমা গড়ে। সে প্রতিমাটি পাথরের ভেতর নিহিত হয়ে আছে। বাইরের অপ্রয়োজনীয় পাথরটাকে কেটে ফেলে দিয়ে প্রতিমাটাকে ফুটিয়ে তোলা ভাস্করের কাজ। এটা হলো প্রতিমা গড়ার আন্তরিক ধরণ।

এই দুই ধরণেরই তুমি প্রতিমা হতে পারো। বাহ্যিক উপায়ে তুমি একটা কাদার তাল। সেই তালটাকে ঘেঁটে-খুঁটে তোমাকে প্রতিমার আকার দিচ্ছে তোমার পরিবার, ইস্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এ অবস্থায় তোমার সম্পূর্ণ মানুষ হবার কথা নয়, কারণ যা বাহ্যিক উপায় সেটা অন্তরের সম্ভাবনাকে ডাক দেয় না। তাই এই উপায়ে তোমার যন্ত্রভাগ্যটা আর ঘোচে না। সব চেয়ে বড়ো কথা, এ উপায়টি দিয়ে তোমার সত্তার বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় না।

আন্তরিক উপায়ে তুমিই একাধারে তোমার মর্মরশিলা ও ভাস্কর। সাধনার হাতুড়ি বাটালির ঘা দিয়ে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অবান্তর সব কিছু নিজের অঙ্গ থেকে ছেঁটে ফেলে তুমি তোমার অন্তর্নিহিত প্রতিমাটিকে জাগিয়ে তোল। এই একটি মাত্র উপায়ে তুমি সম্পূর্ণ হতে পারো; তোমার সকল শক্তি ও পূর্ণ সত্তাকে লাভ করতে পারো। তোমার অন্তরশায়ী যে প্রতিমা তার নাম চেতনা। তাকেই বাংলা দেশের এক ধরণের সাধকেরা "মনের মানুষ" বলে বর্ণনা করে গেছেন। এই মনের মানুষই তোমার অন্তরস্থিত দিব্যজ্যোতি। তাকে পাওয়াই সব পাওয়া। যতক্ষণ তুমি মানুষ ততক্ষণ তুমি অসম্পূর্ণ, দুঃখ ক্লেশের দাস। ততক্ষণ তোমার ন্যূনতম প্রকৃতিটিকে সহায় করে সংসারে অকিঞ্চিৎকর ভাঙা-গড়া খেলা। কিন্তু মনের মানুষের আঙিনায় গিয়ে পড়লে তোমার উৎকর্ষ ঊর্দ্ধপরিণাম পূর্ণ হোল। তখন তোমার সংসারের নূতন মূল্যের, নূতন অর্থের উপলব্ধি। পাহাড়ের পাদদেশে থাকলে সীমাবদ্ধ খানিকটা দেখো। কিন্তু তার শিখরাসীন হলে দিগ্বলয় থেকে নভোশীর্ষ পর্যন্ত সব দেখতে পাও। এ-ও সেই রকম; সাধারণ মানুষ হয়ে সংসারকে অনুভব করা ও চেতনাশীল হয়ে অনুভব করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একটায় ক্ষুদ্রতমকে, অন্যটায় বৃহত্তমকে দেখো। তুমি যে মুহূর্তে নিজের ভাস্কর হবার জন্যে ব্যাকুল হবে, সেই ক্ষণটিতেই তোমার যান্ত্রিকতার অবশ দশাটা ঘুচতে আরম্ভ করবে এবং সত্তাও ঊর্দ্ধগামী হবে। কিন্তু ব্যাকুল না হলে তা হয় না। তার মানে, বাহিরের দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিয়ে ভিতর পানে দৃষ্টি ফেরাবার ব্যাকুলতা। এ প্রণালীটার কথা আর একদিন তোমাদের বলবো, আজ নয়। জানতে যদি ব্যাকুল হও, আমাকে বলতে বাধ্য হতে হবে।

ইস্কুলে থাকতে নিশ্চয়ই তুমি সেই চর্বি-মাখানো লাঠি ও তাতে আরোহণ-অবরোহণরত বাঁদরের দারুণ অঙ্কটা কষেছ; আমি, তুমি, তুমি যাদের চেনো তাদের প্রত্যেকের ওই দুর্ভাগা পরিশ্রমখিন্ন জীবটার দশা। আমাদের চেতনা ঠিক ওই চর্বিমাখানো লাঠিটার মতো। কদিচ কখনো আকস্মিক ভাবে আমরা চেতনার লাঠিটায় একটুখানি উঠি, কিন্তু পরমুহূর্তেই বাঁদরটার মতো পিছলে অচেতনার মাটিতে নেমে আসি। চেতনার ডগায় গিয়ে অবস্থিতি না করতে পারলে এই পিছলে নেমে আসাটা অনিবার্য ঘটনা। এরূপ সন্ধান এই ডগায় গিয়ে অবস্থিতি করার সন্ধান।

এই পিছলে নেমে আসাটা যে কেবল ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে তা নয়; একটা সম্পূর্ণ জাতিও এ ঘটনার বশ। বিবেকানন্দকে আমি দেখিনি, কিন্তু তাঁর প্রভাবের আবেষ্টনে আমার জীবনের আরম্ভ। এখন বুঝতে পারি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আমাদের জাতিটাকে কতোখানি ওপরে টেনে তুলেছিলেন। কিন্তু যেই তাঁদের প্রভাবটা সংসার থেকে সরে গিয়ে অন্তঃশিলা নদীর মতো হয়ে গেলো, আমাদের জাতিটাও স্খলিত হয়ে আবার মাটিতে নেমে এলো। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন সাগরকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিজের পানে আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথও তেমনি করে বাঙালীর জাতীয় চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের কালে যে সেই রবির করে নিজের হৃদয়কে উষ্ণ করেছিলো, সে এ কথাটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর দেখতে দেখতে কয় বৎসরে আমরা আবার পিছলে পড়ে রুক্ষ মাটিতে নেমে এলুম। যান্ত্রিক মানুষের সংসারে এ বিচ্যুতির, এ প্রতীপ গতির নিয়মটা অমোঘ। আত্মসাধনা দিয়ে যে নিজের যন্ত্রনিয়তিটা না ঘোচাতে পারে, তার আর অন্য উপায় নেই।

তোমাদের ধর্ম-কর্ম ও দর্শন নিয়ে খেলা থেকে আত্মরক্ষা করতে বলেছি। কারণ, তার ফলে অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যুবজনকে

আত্মবঞ্চনা ও ভাণ শিখিয়ে লক্ষ্যশূন্য কর্মহীন করে। যার প্রকৃত পক্ষে সত্তা না বদলেছে সে ধর্মকে অনুসরণ করতে পারে না। এখন একটা বিষম গুরুতর বিপদের বিষয়ে তোমাদের সাবধান করবো। যান্ত্রিক-মানুষের অপার দুর্ভাগ্য। আমরা যান্ত্রিক মানুষেরা অতিশয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কিছু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, কিন্তু শক্তিলোভী নিষ্ঠুর মানুষ আমাদের নিয়ে নিদারুণ খেলা খেলে। একালে আইডিয়া দিয়ে ধরতাই বুলি দিয়ে মানুষকে শুধু খেলানো-নাচানো নয়, খুব উন্মত্ত করে দেওয়া যায়। তার গল্পটা শোন।

কয়েক বছর পূর্বে এক বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁর নাম প্যাভলভ। তিনি তাল-মান যন্ত্রের মাপা-জোপা ধ্বনি দিয়ে কুকুরের প্রতীবর্তি ক্রিয়াকে (Reflex Action) আয়ত্তীভূত করবার এক সাংঘাতিক উপায় আবিষ্কার করলেন। ওয়টসন নামের আর এক বিজ্ঞানী মানুষের মনের ওপর অভীপ্সিত শব্দের প্রভাবের গবেষণা করে মানুষ বশ করবার আর একটা প্রণালী রচনা করলেন। এই পাভলভ ও ওয়টসন ভগবানের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিধর নূতন মানব ভাগ্যবিধাতা। শয়তান বিজ্ঞানীরা দেখলে যে ঐ দুটো উপায়ে মানুষেরও প্রতীবর্তি ক্রিয়া বেশ হাতের মুঠোয় আনা যায়। এই নূতন অস্ত্র দিয়ে মানুষকে তারা কুকুর বানালে। সে-অস্ত্রের প্রথম ব্যাপক ব্যবহার করলে হিটলর ও তৎশিষ্য মুসোলিনি। এ বিষম অস্ত্রের তিনটি অঙ্গ: রেডিও, সিনেমা ও ছাপাখানা। তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, কেনো, এ-সব দিয়ে তো মানুষের মঙ্গল করাও যায়? সে কথা অবশ্য সত্য।

মূলে বিজ্ঞান মানবহিতৈষী। কিন্তু যাদের হাতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ তাদের সত্তার যদি অনুরূপ উৎকর্ষ ও উন্নতি হোত, তাহলে বিজ্ঞান মানবহিতৈষী হতে পারতো। দুঃখের বিষয় এই যে, বিজ্ঞানীর ঈশ্বরলাঞ্ছন শক্তি আয়ত্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সত্তার ঊর্দ্ধগতি ঘটেনি। বিজ্ঞান যে বহুল ভাবে মানুষের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে মানব-সত্তার অপকর্ষ তার কারণ। বিজ্ঞান নিজে সে জন্য এক কোঁটাও দায়ী নয়।

স্বর্গ কোন্ দিকে দেখাতে হলে আমরা হাত তুলে আকাশটাকে দেখাই। আকাশটাকে আমরা এতো কাল পরমেশ্বরের এলাকা বলেই জানতুম। আগে নাকি ঐ আকাশে মাঝে মাঝে দেবতাদের দৈববাণী হতো। কিন্তু আমাদের কালে সমগ্র আকাশটায় মানুষের কদর্য হাত পড়েছে, সেটা আর নির্মল নয়। ধাপার মাঠকেও বোধ করি এখন তার চেয়ে স্বাস্থ্যকর ভালো জায়গা বলা চলে। আকাশটা এখন আকাশবাণীর বিষাক্ত মিথ্যার জালে ছাওয়া। এখন রেডিওর কাণ টিপলেই সেই আকাশ থেকে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির যত্নরচিত বিবিধ ভাষায় মিথ্যা, হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, লালসা ক্রোধ, লোভ, কাম, অহঙ্কার, দম্ভ, পরশ্রীকাতরতা, প্রত্যেক দেশের স্বমত ও স্বাভিপ্রায় প্রচার ইত্যাদির আনন্দে আমরা ডুবে যাই। খবরের কাগজও কোটি কোটি সংখ্যায় মানুষের ওই সকল অপগুণগুলোরই প্রচার করে। প্রত্যহ প্রাতে আমরা চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজের রসাল খবর গলাধঃকরণ করি। এ খবরের নিরিখ কি? সংবাদপত্রগুলি যে মানদণ্ডটি অনুসরণ করে চলে তা Vice is news Virtue is not. খবর পড়ার নেশা আফিম খাওয়ার নেশার চেয়ে তীব্র। দাম দিয়ে আমরা পাপের বার্তা কিনি। আমরা পাপের বার্তা চাই; ভিন্নতর কিছু দিয়ে আমাদের তৃপ্তি হয় না। তারপর আছে অজস্র পুস্তক ও পুস্তিকা যা উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তমসাচ্ছন্ন মনের সৃষ্টি। সিনেমা ওই দু'টির অন্তরঙ্গ মিতা। কাম তার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র হলেও হিংসা, ঘৃণা, লালসা, ক্রোধ, লোভ, সংঘর্ষণ প্রভৃতি তার উপাদান।

সাধারণ মানুষ আমরা, সত্তাহীন, বুদ্ধিহীন, চেতনা আমাদের গভীর নিদ্রামগ্ন। অমরা স্বপ্নচারি, দিবাস্বপ্নে আমাদের দিন কাটে। কাজেই অবিরাম দেখে, শুনে ও পড়ে স্বাভাবিক কারণে নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে ফেলে জড় আমরা আরো জড়ত্ব প্রাপ্ত হই। ঐ সকল পরম ক্ষমতাশালী সম্মোহন অস্ত্র আমাদের অভিভূত অবশ একট যূথে পরিণত করে। এতটুকু হলেও না হয় রক্ষা ছিলো। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের মন নঞর্থক চিন্তায় (Negative thinking) ভরে যায়; আর আমরা সোজাসুজি সার্থক চিন্তা করতে পারিনে। মানুষের এর চেয়েও বড়ো বিনষ্টি আর নেই। এ নঞর্থক চিন্তা যে কি ভয়ানক ব্যাপক তা বোঝাবার আমার ক্ষমতা নেই। লক্ষ্য করে বন্ধু-বান্ধব ও অন্য লোকের কথা শুনি, নঞর্থক চিন্তায় তাদের মন পরিপূর্ণ। খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে তাই। আমাদের সাহিত্যেও তাই দেখি। একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দি। বড়ো বড়ো সংবাদপত্রগুলি মাঝে মাঝে "স্বাস্থ্য সংখ্যা" প্রকাশ করে। সে স্বাস্থ্যালোচনার উপকরণ যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রমুখ নানবিধ জটিল রোগ এবং নানা ওষুধের গুণবিচার।

মানুষের সহজ স্বাস্থ্য এখন বিলুপ্ত; স্বাস্থ্য বলতে একালে আমরা ওষুধ দিয়ে শরীরধর্মের পরিচালনা বুঝি। এখনকার স্বাস্থ্য প্রচেষ্টার মানে কাতারে কাতারে, হাজার হাজার ছোট ছেলের অঙ্গে বি সি জি'র সূঁচ ফোটানো। আমাদের নূতন দেশ, তাতে স্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠান কি গড়ে উঠেছে? যক্ষ্মা হাসপাতাল! সে হাসপাতাল স্থাপন করবার জন্য শহরে শহরে রেষারেষি বিরল নয়। রোগ প্রচার এ কালের অভিনব বস্তু। এই সেদিন এলাহাবাদ শহরে স্থানীয় ডাক্তারেরা "ক্যান্সর সপ্তাহ" অনুষ্ঠান করে ক্যান্সর প্রচার করলেন। এ সবই অবিশ্রাম নঞর্থক চিন্তার ফল। এ কথাটা ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখো যে মানুষের প্রায় সকল যান্ত্রিক রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী নঞর্থক চিন্তার ফলে। মানুষের অপচয়ের যা চরম, উন্মাদ রোগ ও ক্রাইম তাও এই নঞর্থক চিন্তার ফল। এ চিন্তায় মানুষের পাপ বোধ ও বিবেকের সংযম বিলুপ্ত হয়। হিংসা-ঘৃণা-লালসা-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। তুমি কোনো পাপী গুণ্ডার বস্তীতে বাস করতে পারবে কি? নিশ্চয়ই বলবে, পারি না। কিন্তু নঞর্থক চিন্তায় যে তোমার অন্তর্দেশটা পাপী গুণ্ডার বস্তীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে! তারা তোমাকে দিয়ে যে কখন কি করিয়ে নেবে তার ঠিক নেই। করিয়ে নেওয়া খুবই সম্ভব কথা, কারণ সংস্কারা মানুষ সর্বদা অধোগতি-পরায়ণ, এ পথে তার অপচয় অধোগতি বিনাশ ধ্রুব। এ ভয়ঙ্কর দুর্গতির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে আত্মসাধনাই সর্বরোগভয়াপহা দুর্গা, তাঁর শরণ নাও। [ক্রমশঃ।

ইন্দিরা দেবী

এ কাজ কখনই সাদা বাচ্চা বেড়ালটার নয়, সবটাই ঐ কালো কুচ্ছিত বেড়ালটা করেছে নিশ্চয় করে বলা যায়। সাদা ছানাটা দিব্যি আরাম করে মার কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল। মা বাচ্চাকে টেনে নিয়ে একটা থাবা কানের কাছে দিয়ে টেনে শুইয়ে দিল, আর একটা থাবা দিয়ে ওর গা ঝেড়ে দিতে লাগলো—যেমন বুরুষ দিয়ে ঝাড়া হয়। পাকা আধ ঘণ্টা সাদাটা মার কাছে শুয়ে ছিল, তাই ঐ কাণ্ডটা তার পক্ষে করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাহলে ব্যাপারটা ঘটলো কি করে? নিশ্চয়ই কালোটার কাজ। তার গা-ঝাড়া-মোছা অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল।

ঘরের কোণে গদা-আঁটা চেয়ারটায় এলিস ঘুম-চোখে একটা সুতোর বল তৈরী করছিল—আর মাঝে মাঝে ঢুলছিল। আর কালো বেড়ালটা সেই বলটাকে নিয়ে খেলছিল।

এলিসের কষ্ট করে সুতো-জড়ানো বলটা খেলার জন্য আলগা হয়ে গেল। শুধু কি আলগা হয়ে গেল—মেঝের কার্পেটে জড়িয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছেতাই হয়ে গেল।

হঠাৎ এলিস এই কাণ্ড দেখতে পেল আর অত ঘুম কোথায় যে চলে গেল তার ঠিক নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কালো বাচ্চাটা কিটিকে টেনে নিয়ে এলো। ভাবছো বুঝি তাকে ঘা কতক বসিয়ে দিল?

উঁহু তা মোটেই নয়—ওকে দু'হাতে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলতে চাইলো: যে কাজটা তুমি করেছো তার জন্য তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, তোমার মা তোমায় যা শেখাতে চায়, তা তুমি কিছু শিখলে না, লজ্জা হয় না তোমার?

এলিসের ভাবখানা এ রকম—যেন ওর কিছুই দোষ নেই সব দোষ বাচ্চাটার মার। তাই এলিস দূরে ওর মার দিকে কটমট করে চেয়ে দেখে—কিটিকে কোলে করে সুতোর বলটা নিয়ে এসে চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসলো।

বলটার কি আর তখন পদার্থ আছে, কেবল এক-তাল জট-পাকানো সুতো। তাহলে কি হয়, এলিস আবার চেয়ারে বসে তাই পাকাতে লাগলো।

কিন্তু কাজটা বেশী দূর এগোচ্ছিল না। কোলের উপর আরাম করে কিটি শুয়েছিল। এলিস মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আর মাঝে মাঝে নিজে নিজেই কথা বলছিল।

কিটির তো বেশ মজাই লাগছে। পিট-পিট করে সুতো-জড়ানো দেখছে আর মাঝে মাঝে পা তুলে সুতোটা ধরতে চাইছে—যেন বলতে চাইছে, বলো আমি তোমায় কি সাহায্য করবো?

এলিস হঠাৎ সুতো-জড়ানো বন্ধ রেখে কিটিকে বললে: কাল কি হবে তার খোঁজ রাখো কি? খুব তো খেলা হচ্ছে। আর জানবেই বা কি করে তখন তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হচ্ছিলে, আর আমি জানলার ধারে বসে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কি দেখলাম জানো? জানো না? তবে শোনো। দেখলাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল রাশি রাশি কাঠ-কুটো কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যত পারছে, তত কুড়োচ্ছে, আরো হয়তো কুড়িয়ে নিতো, কিন্তু যা বরফ পড়তে আরম্ভ হলো, কনকনে বাতাস বইতে লাগলো—তাতে আর কি থাকতে পারে? ছুটতে হলো বাড়ীর দিকে—পথ তো তখন বরফে সাদা হয়ে গেছে। পিট-পিট করে তাকাচ্ছো কেন? কাঠ কুড়োচ্ছিল কেন তাও জানোনা, আচ্ছা বোকা কোথাকার—শোনো তবে বলি। কাল যে উৎসব আছে, ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে খেলতে আসবে—আর এই কুড়োনো খড়-কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাবে। আগুনের শিখা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে তখন তার চারি পাশ ঘিরে ওরা নাচ-গান করবে—এখন বুঝতে পাচ্ছ কাঠ কেন কুড়োচ্ছিল? ও মা! তোমার বুঝি দেখতে ইচ্ছা করছে? বেশ নিশ্চিন্ত থাকো, কাল তোমাকে নিয়ে যাবো—সেই উৎসবে। কথা বলতে বলতে এলিস সুতোর একটা দিক কিটির গলায় পরিয়ে দিলে।

—বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়! এলিস বললে।

কিন্তু চমৎকার দেখালে কি হবে, কিটির তাতে খুব আপত্তি, কিছুতেই সুতো গলায় দিতে সে রাজী নয়। এলিসও সুতোটা পরাবেই আর কিটিও পরবে না—ব্যস লেগে গেল দু'জনে তাক-ধুমাধুম—ভয়ঙ্কর রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি।

আবার গড়িয়ে গেল বলটা, আর যেটুকু সুতো জড়ানো হয়েছিল তা সবটুকু খুলে গেল।

অগত্যা আবার সুতো জড়াতে হলো এলিসকে। গম্ভীর হয়ে এলিস বলতে লাগলো: জানো কিটি, আমার কী রকম রাগ হয়েছে? মনে হচ্ছে জানলা দিয়ে তোমায় ঐ কনকনে রাস্তায় ফেলে দিই, আর তাই করা উচিত, করলে কিছু অন্যায় হয় না। তাকাচ্ছো যে? কি বলতে চাও শুনি? দোষ তোমার কি একটা? আমি একটা একটা করে বলি মন দিয়ে শোনো। কিটি গলাটা উঁচু করে মুখটা বাড়িয়ে দিল। এলিস মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বললে।

এলিস এবার সুরু করলে—আজ যখন তোমার মা তোমায় গা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল, তুমি দু' বার চেঁচিয়েছিলে। আবার তাকাচ্ছ? আমি মিথ্যে কথা বলছি, তা মোটেই নয়—তবে বলতে চাইছো চেঁচিয়েছি তো কি দোষ হয়েছে, মায়ের থাবাটা তোমার চোখে ঢুকে গিয়েছিল তাই? বেশ, যদি তাই হয়ে থাকে—তাহলেই বা দোষটা কার? চোখটা বুজে থাকতে পারোনি? বড্ড সব

বাজে ওজর দেখাচ্ছো যে ? এবার দু' নম্বর বলি—সাদা ছানাটাকে যখন দুধের পেয়ালা দিলাম তখন পিছন থেকে তুমি তার লেজ ধরে টেনেছিলে কেন ? তোমার তেষ্টা পেয়েছিল তাই বলছো ? কিন্তু ওরও তো তেষ্টা পেতে পারে ? আর তিন নম্বর, অত কষ্ট করে আমি যে সুতো জড়ালুম তা তুমি সব খারাপ করে দিলে ? এই যে তিনটে দোষ করেছ—এর প্রত্যেকটার জন্ত তোমার শাস্তি হওয়া উচিত। আপাততঃ তোমার শাস্তি সব তোলা রইল—আসছে সপ্তাহে দেখবো, কি উপযুক্ত শাস্তি তোমায় দেওয়া যায়।

কিন্তু কিটিকে শাস্তি দেবার কথা বলেই এলিসের নিজের দোষ-ত্রুটির কথা মনে পড়লো, তাই ভাবলো তারও এত দোষ জমা হয়ে আছে যে, তার জন্ত তাকে একসঙ্গে শাস্তি পেতে আর সেই শাস্তি যদি খেতে না দিয়ে হয়—তাহলে বছরে অন্ততঃ তাকে পঞ্চাশ দিন উপোস থাকতে হবে। তা হোক্ উপোস থাকা মন্দ কি, যা-তা ছাই-ভস্ম খেয়ে কি হবে ?

যাক্ গে, এসব এখন ভেবে কি-ই বা লাভ! কিটির দিকে তাকিয়ে এলিস আবার বললে, জানালার বাইরে থেকে বরফগুলো এসে শার্সিতে লাগছে—তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না ? কি মিষ্টি আওয়াজ, মনে হচ্ছে কে যেন জানালাটাকে আদর করছে। বরফের টুকরোগুলো খুব ভাল—গাছপালা মাঠ-ঘাট সবাইকে আদর জানায়—তাদের গায়ে টুপ-টুপ করে পড়ে তারপর সাদা লেপের মত ঢেকে দেয় আর বলে, যত দিন না গ্রীষ্মকাল আসছে তত দিন শুয়ে ঘুমোও। তার পর সত্যি যেদিন গ্রীষ্মকাল এসে পড়ে সেদিন গাছের পাতাগুলো সবুজ আর তাজা হয়ে ওঠে, আর হাওয়া পেলে মনের খুশীতে দুলতে থাকে—কি আনন্দ তখন বলো তো ওদের ?

এলিস যেন ওদের আনন্দ বুঝতে পারলো তাই বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো।

আবার এলিস বললে : কিটি, তুমি দাবা খেলতে জানো ? হেসো না কিন্তু, খেলতে জানো কি না তাই বলো। আমি সত্যি সত্যি জানতে চাইছি। একটু আগে যখন আমরা খেলছিলাম তখন তো খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলে। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল কখন কি চাল দিচ্ছি সব বুঝতে পারছো। জানো, খেলায় নিশ্চয় আমি জিতে যেতাম, কিন্তু কোথা থেকে সেই বেয়াড়া, হতচ্ছাড়া সেপাইটা এসে সব গোলমাল করে দিলো।

হঠাৎ এলিসের মাথায় আবার এক খেয়াল এলো—অবশ্য এরকম খেয়াল ওর মাঝে মাঝে আসেই। খেয়ালটা হলো যে কিটিকে দাবার খেলার রাণী ঘুঁটির মত সাজাতে। যেই ভাবা সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল। টেবিল থেকে লাল টুকটুকে রাণীকে নামিয়ে আনা হলো আর তাকে সামনে রেখে কিটির সাজগোজ আরম্ভ হলো।

বেশ কিছুক্ষণ সাজগোজ নিয়ে কাটছিল, কিন্তু গোল বাধালো কিটি। রাণীর তো জোড়হাত ছিল, কিন্তু কিটি কিছুতেই তা করতে রাজী নয়। যত বার হাত টেনে এক করে দেওয়া হয়, তত বারই সে খুলে দেয়।

এলিস রাগ করে কিটিকে দু'হাতে তুলে নিয়ে চলে গেল, টেবিলের উপর যেখানে আয়না ছিল সেখানটায়—বললে : এইবার আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে কত অবাধ্য তুমি। খুব মজা হতো যদি আয়নার ভিতরে যে ঘরটা আছে সেখানে তোমায় পাঠাতে পারতাম! কি তাকাচ্ছ যে আয়নার ঘর শুনে ? জানো না তো ? বেশ শোনো বলছি। *

[ক্রমশঃ।

* Lewis Carroll এর লেখা Through the Looking-glass and what Alice found there এর অনুবাদ।

লেখকদের অদ্ভুত খেয়াল (২)

শ্রীরণজিৎকুমার বিশ্বাস

গত বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৬২) মাসিক বসুমতীতে 'লেখকদিগের অদ্ভুত খেয়াল' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত হয় নাই এই প্রকার কয়েক জন লেখকের খেয়াল জানাইতেছি।

ভিক্টর হিউগোর মত কলিন্সও না দাঁড়িয়ে লিখতে পারতেন না, রুশো যখন লিখতেন তখন গাছতলায় যেতেন। পরচুলো না পরলে বাফন লিখতে পারতেন না। মাথার উপর বরফ রেখে বিঠোফেন রচনা করতেন। কাঠগুদামে না গেলে হুইটম্যানের লেখা বেরুতো না। লেখার সময় এডগার ওয়ালেসের মুখে সব সময় বর্মাচুরুট থাকত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ভলটেয়ারের নজর খুব বেশি ছিল, তিনি এক সংগে তিনখানা ক'রে বই লিখতেন। চেষ্টারটনের এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। রাস্তায় বের হবার সময় তিনি সেজে-গুজে বের হতেন। একটা হাতাহীন গলাবন্ধ কোট তাঁর গায়ে থাকত, আর হাতে থাকত ছড়ির মধ্যে লুকানো একখানা সরু ধারাল তরোয়াল। এ সবের কারণ যদি কেউ জানতে চাইত তবে তিনি বলতেন যে, রাস্তার কোন কুমারী গুণ্ডার হাতে পড়েছে দেখলেই তিনি সংগে সংগে তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন। টলষ্টয় মনে করতেন যে, তিনিও বোধ হয় পাখির মত উড়তে পারেন। একদিন সত্যিই তিনি হাত-পা ছেড়ে দোতালা থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিলেন। নীচে ফুলের কেয়ারী না থাকলে সে যাত্রা রক্ষা পাওয়াই কঠিন ছিল।

এমিল জোলা আর জনসন্ রাস্তায় বের হলেই এক অদ্ভুত বাতিক তাঁদের পেয়ে বসত। তাঁরা রাস্তার লাইট-পোষ্ট আর রেলিংগুলি গুণতে গুণতে পথ চলতেন।

জর্জ-মাইকেল

ঊনত্রিংশ

কি করে—কোথায়—কি ভাবে ওর মৃত্যু হ'ল? ইচ্ছে করে একবার উঠে সব সংবাদ সংগ্রহ করে। কিন্তু এক অব্যক্ত তাকে বাধা দেয়, যে ভাবে শুয়েছিল সেই ভাবেই পড়ে ়। উংরোকিকেমপাকের বিড়ালটা ঘরময় ঘুরে বেড়ায়।

এই হতভাগা পশুটা ছ'দিন ঘরে আবদ্ধ ছিল, হারিকট ় প্রতি পদে পদে আছাড় খেয়ে ফিরে এল, বিড়ালটা লাফিয়ে ওর সারা গায়ে আঁচড়ে দিয়েছে, হাতে কামড়ে দিয়েছে।

বিড়ালটা যে ভাবে ঘুরছে এবং মাঝে মাঝে উলটে-পালটে ়, ভয় হয় হয়ত ক্ষেপে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত এমন কামড়ে দেবে ফলে হয়ত হারিকটের জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে।

হারিকটের মনে হয়, মোদক্লো হয়ত হাসপাতাল থেকে য়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে, পালাতে গিয়ে পড়ে গেছে। রের জানালার দিকে তাকায় হারিকট, জানালাটা যেন ওকে ়ানি দিয়ে ডাকছে।

ুনে পড়ে মোদক যেদিন সর্বপ্রথম ওর আঁকা ছবি দেখেছিল, সেই সাংবাদিকের সঙ্গে তর্ক করেছিল, ৎবরোসকীর ঘরের র হারিকটের পোর্টরেট এঁকেছিল, আফতালিয়েনের দোকান ফিরে ছবির দোকানের কাচের জানালায় কত ছবি রছিল, একদিন ওদেরও এই ধরণের ষ্টুডিও হবে এই আশা তারপর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় সেই স্বপ্নলোকে বিচরণ: ! অতি দ্রুতগতিতে মিউজিয়ম থেকে মিউজিয়মে নিয়ে ় মোদক বেপ্লোকে নিয়ে পুরাতন গাড়িতে ভেসপেরোর ছোটা—সবই যেন একটা সোনালি স্বপনের মত মনে ভেসে । টিনটা ডি মন্‌টি, পিনচি—তার পর সেই প্রদোষান্ধকার, ম মুহূর্তে অনাগত বিধাতার জীবনোন্মেষ ঘটলো···

খন? আনন্দ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, সে আনন্দেই র? কিন্তু সে কি···?

অ না গ, ত, বি ধা তা সুখে থাকুক। আনন্দে থাকুক। য়েদের মত সে-ও হয়ত অল্প বয়সে পৃথিবী ত্যাগ করবে। ীবন আর স্থূল কর্ম নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হবে না। ব্য-শিশু, দিব্য জীবন তার। আমরা দিন-মজুর। মোদক —"সেই মহামানবের জন্য পাদপীঠ রচনা করতে হবে। দপীঠ আমাদেরই রক্তমাংসে গঠিত হবে। তাঁর জন্যই আমরা হীন সার্ট পরছি আর রক্তমাখা পায়ে পথ চলছি—।"

কিন্তু আজ আর মোদক নেই। সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন-চৈতন্য হয়ে আর কেউ নেই। যে যার তালে আছে। মোদক্লো বলেছিল "পিকাসো তাঁর অনুগামীদের দিক থেকে মুখ রছেন।" কিস্‌লিঙ আজ গোলাপফুল আঁকছে, মোদক্লোর যা কখনও পাইনি তার চাইতে অনেক বেশী দাম ৎবরোসকী তাই কিনছে। সবাই এখন দিব্য শিশুকে পরিত্যাগ করেছে। এই শুকনো ক্ষীণ দেহে হারিকট একাই শুধু তাকে লালন করে চলেছে। এখন তার জনকের মৃত্যু হল—ততঃ কিম্?

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো হারিকট। ভোর পাঁচটা, আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, ধূসর মলিন আকাশ। ক্ষীণকণ্ঠে হারিকট উচ্চারণ করে—"মোদক!"

হয়ত ইচ্ছা করে নয়, হয়ত বিড়ালটা কাছে এসে ওকে সচকিত করেছে,—মাথা ঘুরে নীচে পড়ল হারিকট,—সেই শয়তান বিড়ালটাও সেই সঙ্গে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

রাজমিস্ত্রীরা নীচের উঠানে কাজ করতে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—

"ওরে—বোমা পড়্‌ল!"

অপর ব্যক্তি বল্‌ল—"সত্যি! খুব জোর আওয়াজ হয়েছে কিন্তু,—যেন বোমার চেয়েও জোর আওয়াজ।"

একজন জোগাড়ে এগিয়ে এল।

"ওরে বাবা—আয় না দেখাই যাক্ কি ব্যাপার!"

প্রথমটা দেখাই যায় না, তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি, তাছাড়া হারিকটের স্কার্টের খানিকটা উল্‌টে ওর মুখ ঢেকে দিয়েছে।

"ম্‌ম্‌ম্‌!—"

"ঐ দেখ, একটা বাচ্ছাও রয়েছে।"

সেই দিব্য শিশু জননী-জঠর থেকে মুক্তি পেয়েছে, একটা রক্তপিণ্ড! যেন একটা রক্তমাখা পতঙ্গ। জননীর চূর্ণ-বিচূর্ণ দেহাবশেষ অকথ্য ভঙ্গীতে ছড়িয়ে আছে।

চৌকিদারণী এসে হাজির হল।

"জানি, এই রকম একটা কাণ্ড ঘটবে, অনেক আগেই জানি। যত সব পাগল-ছাগলের কাণ্ড! তা নইলে আসবাবপত্র পুড়িয়ে কেউ আনন্দ করে? আমার বাড়িতে ওকে নিয়ে যাওয়া চলবে না, ও আমার ভাড়াটে নয়। আমি কিছুতেই ভেতরে যেতে দেব না।"

সবাইকে একবার করে শোনায় চৌকিদারণী—"ও আমার ভাড়াটে নয়।" ভীড় জমে গেল,—পুলিশ এল, তাদের সকলকেই ঐ এক কথা বলল চৌকিদারণী।

কে একজন বল, ওর দেহটা বাপ-মার কাছে পাঠানো হোক্।

"নিশ্চয়ই, তাই করাই উচিত, বাপ-মা আগে।"

একজন পাহারাওলা সেই মাংসপিণ্ড একত্রিত করে উঠানের এক প্রান্ত থেকে তুষার-মণ্ডিত এক টুকরা তেরপল এনে তার ওপর ঢাকা দেয়।

চৌকিদারণী তীব্র ভাষায় আপত্তি করে।

"আমি বাছা, তোমার ঐ পুরানো তেরপল ফেরৎ দেব।"

আর একজন পাহারাওলা একটা অতি প্রাচীন ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এল।

সেই কুৎসিত শববাহী শকট ক ভ লা গেইটের দোকানের দোর-গোড়ায় এসে থাম্‌লো।

হারিকটের বাবা চীৎকার করে ওঠে—"ও আমার মেয়ে নয়। আমি ওকে চাই না। আপনারা যে কবরস্থ ব্যবস্থা করছেন তার
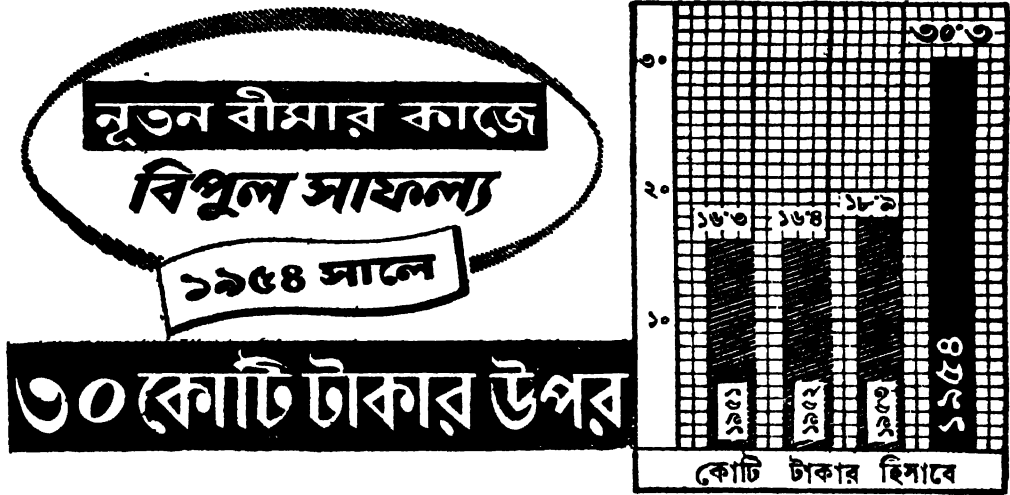
জন্ত ধন্তবাদ দিই, কিন্তু আমি মশাই কারবারি মানুষ, ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক, অধর্ম আমার সয় না। অশাস্ত্রীয় অবস্থায় ও মেয়ে গর্ভিণী হয়েছে। ওকে আমি ত্যাগ করেছি।"

একজন পাহারাওলা চীৎকার করে বলে—"তাহ'লে চলো কমিশনার সাহেবের কাছে যাই। তিনি যা বলবেন তাই হবে। হয়রাণ হয়ে গেলুম মশাই!"

আবার সেই গাড়িতে গিয়ে ওঠে পুলিশের লোক।

সব খবর শুনে কমিশনার বললেন—"কাণ্ডটা কোথায় ঘটেছে?"

"রু ভার্সিনজেটরীক্সে।"

"তাহ'লে প্লাইসানসের কমিশনারের কাছেই যাও।"

সেই গাড়ি, তার ঘোড়া, গাড়োয়ান সবাই আবার সেই দিকে ছুটলো। সেখানকার কর্তা অতিশয় বিরক্ত হয়ে বললেন—"যেখান থেকে এনেছ সেখানেই রেখে এসো।"

রেগে আগুন হয়ে পাহারাওলা হারিকটের সেই দেহপিণ্ড কোনো ক্রমে উপর তলায় জরাজীর্ণ বিছানায় রেখে দিয়ে বলল—"এই নাও চৌকিদারণী, তোমার সেই পুরানো তেরপল। হাতে একটু জল দাও, হাতটা ধুয়ে ফেলি।"

ত্রিশ

এদিকে লা বোত্তন্দে প্রচণ্ড আন্দোলন চলেছে।—ঠিক হারিকট রুজের জন্ত নয়। মেয়েরা অবশ্য তার অদৃষ্ট-চিন্তা করে দুঃখ প্রকাশ করছে। মোদিল্লিয়ানির জন্তও শোক করছে। সে যে ছিল এখানকারই মানুষ! সারা প্যারী ঝেঁটিয়ে এল ছবিওলার দল, যদি কিছু দাঁও মত হাতিয়ে নিতে পারে সেই চেষ্টা। সমালোচক,—ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার মালিক, লর্ড জ্যাক্ট এদের দালাল। এ-পক্ষ আর ও-পক্ষের হয়ে দর-কষাকষি করছে।

লা বোত্তন্দের স্বত্বাধিকারী যখন এক কথায় সতেরখানা ক্যানভাস বিক্রী করলো তখন বুঝলো মজা মন্দ নয়। প্রাক্তন স্বত্বাধিকারীর কাছে এগুলি বাঁধা রেখেছিল বা জমা রেখেছিল। পরদিন প্রভাতে যে সংবাদপত্র এত দিন নীরব ছিল সহসা মুখরিত হয়ে উঠল—ম' পারনাশের এই শিল্পীর প্রশস্তিতে। দুঃসহ দুঃখের যন্ত্রণায় এই প্রতিভাধর চিত্রকরের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হ'ল। দুটি প্রধান দৈনিকপত্র মোদিল্লিয়ানি-অঙ্কিত কয়েকটি ছবির প্রতিলিপিও প্রকাশ করলেন। যে সাংবাদিকটিকে মোদিল্লি কিসলিঙ ও সেলুয়ারসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল সে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী রচনা করলেন। সেই বাসন্তী সন্ধ্যায় মোদিল্লিয়ানি তাকে যেসব সুন্দর কথাগুলি বলেছিলেন, সেই সব কথা এই কাহিনীর মধ্যে ভরে দিলেন সাংবাদিক। আগুন-ভরা যার চোখ সেই মহৎ মানুষটির এক চমৎকার রেখাচিত্র কুশলী লেখকের লিপিচাতুর্যে মনোহর হয়ে উঠল। শিল্পীদের উপযোগী কয়েকটি কাল্পনিক কাহিনী উদ্ভাবন করে সেইগুলি এই কাহিনীর মধ্যে সংযুক্ত করলো। ৎবরোসকীর বাসায় এলো রাশি রাশি ফুলের তোড়া, তার কাছে তখনও অনেকগুলি মোদিল্লির আঁকা ছবি ছিল। গদীর তলায় লুকানো ছিল এত দিন। অপরিচিত সমিতি, বিভিন্ন সংস্থা, জজকুল, গুণমুগ্ধ বন্ধুরা, সৌখীন দু'চার জন খোঁজের সংগ্রহে মোদিল্লির দাঁকা ছবি ছিল। আর সিবাদুর আর আক্তালিয়েন।

শবযাত্রা যখন সুরু হল তখন দেখা গেল, রু বারার রৌত্র-জর্জর পথে প্রায় সহস্রাধিক লোক জমেছে।

ৎবরোসকী এবং আক্তালিয়েন এই মহৎ শিল্পীর সম্মানার্থে একটা চমৎকার শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে একমত। কারণ তাহ'লে শুধু যে শিল্পীর প্রতি সম্মান দেখানো হবে তা নয়, তাঁর অঙ্কিত ক্যানভাসগুলিরও দাম বাড়বে।

কফিনের পাশাপাশি যেতে যেতে জনৈক ভদ্রলোক আত্মপরিচয় দিয়ে ৎবরোসকীকে বললেন—"আমি ম'সিয়ে নভেরার"—

"বলুন, কি বলতে চান?"

"আপনার কাছে মোদিল্লিয়ানির আঁকা ছবি আর ক'টি আছে?"

"ম'সিয়ে, ও সব কথা এখন থাক।"

ৎবরোসকী বেদনা পায়, সে বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, নাকে রুমাল চাপা দেয়।

"দেখুন! ভাবাবেগ অবশ্য থাকবেই, এ রকম মৃত্যুতে নিশ্চয়ই শোকের কারণ আছে, কিন্তু ব্যবসার কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে,—'প্রথমাগতকেই প্রথম দিতে হবে।' আমি সেই 'প্রথমাগত,' আমাকে বঞ্চিত করবেন না, আপনার বাসায় যাচ্ছি,—সব খুঁজে-পেতে দেখব। যদি আমি সব কটা ক্যানভাস নিই আপনাকে কত দিতে হবে?"

প্রতিবাদ জানিয়ে ৎবরোসকী বলে—"না ম'সিয়ে!"

"ম'সিয়ে, শুধু একবার কথা দিন, আমি আপনাকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ দেব। আমার কাছে ছবিগুলি বাঁধা রাখুন।"

"কত?"

"চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ! এক আধলা কম নয়। এই দেখুন।"

লোকটি ওভারকোটের বোতাম খুলে ভেতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করলো।—ৎবরোসকী লুব্ধ দৃষ্টিতে উঁকি দেয়।

বরো বলে—"আচ্ছা! এদিককার ব্যাপার মিটুক—"

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীর কানে কানে সংবাদ দেয় ৎবরোসকী।

সমাধি-ভূমিতে মোদিল্লির অপরিচিত অনেকে বক্তৃতা দিলেন। যে সব সমালোচকের নামও কখনও শোনেনি মোদিল্লি তারাও বক্তৃতা দিল, তারপর বলেন সালমন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটিতে আন্তরিকতা ছিল,—শিল্পীকে যথার্থ সম্মানিত করলেন তিনি। বললেন:

"জীবনে মোদিল্লি ছিল সম্রাট, প্রাণের দেবতা। তাঁর মধ্যে ছিল মহৎ সম্ভাবনার বীজ। মহামানব হিসাবে বিচরণ করার গরিমা ছিল তাঁর জীবনযাত্রায়—অথচ অদৃষ্টের কুটিলতায় এই পরম ঐশ্বর্যময় মানুষটিকে বাস করতে হয়েছে নরককুণ্ডে। তাঁর কর্মে ও জীবনে নাটকীয়ত্ব এবং গীতিকাব্যের সুর অনুরণিত, পরস্পর সংযুক্ত ছিল। মৃত্যুতেও আজ তা বিজয়ীর দীপ্ত ভঙ্গীতে দীপ্যমান…"

এই সমাধিক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি হতভাগিনী হারিকটকে তিনি স্মরণ করেছিলেন।

আক্তালিয়েন বান্দারকে বলছিল—"অনেকে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।"
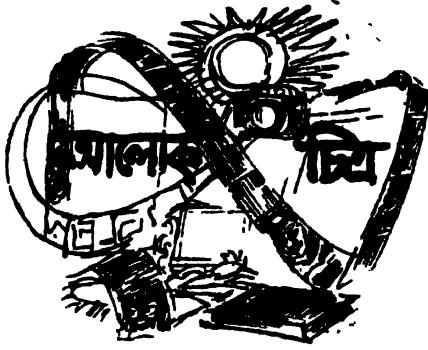
[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা এবং ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

মনের ময়ূর

—স্বদেশ ঘোষ

নদী ও নারী

—পরিতোষ মিত্র

আদিবাসিনী

—সুনীল জানা

—আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি—

শাদায় আর কালোয় যতখানি করা সম্ভব তা করেছে এযাবৎ কাল মাসিক বসুমতী। প্রতি মাসে আট পাতা ভর্ত্তি সেরা সেরা ফটো, ছোট বড় নানা সাইজের, কথাটি না কয়ে ছেপে গেছে। কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন শেষ হয়ে যায়ই। আবার সেই প্রায়-শূন্য কলসী ভরে নিতে হয়। তাই কয়েক মাস ধ'রে ডাক পড়েছে আবার নতুন ছবির জন্য। ভাল ভাল ছবিগুলি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার আপনাদের ছবি আবার নতুন ছবি পাঠাবার দিন সমাগত। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হোন। ছবি যেন একঘেয়ে না হয়। আলোর কম-বেশী; প্রিন্টের গোলমাল না থাকে। ছবির সাইজ বড় হয়। আগে নিজের ছবিগুলিকে নিজেই বাছাই করুন। পরে সেই বাছাই করা সব চেয়ে সেরা সেরা ছবিগুলি মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠিয়ে দিন। কদাচ যেন ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু এবং ফটোগ্রাফারের নাম-ধাম দিতে ভুলবেন না। এমন ছবি পাঠান, যা দেখে পাঠক-পাঠিকার চোখ জুড়োয়, আপনারও ছবি তোলা সার্থক মনে হয়; মাসিক বসুমতীর ঐতিহ্যও বজায় থাকে।

ছবির জন্য আবার ডাক পড়েছে, স্মরণ রাখুন।

তাজমহল —মীরেন অধিকারী

—প্রচ্ছদপট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি সত্যিকার পাখী ও পাখীর বাসার আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি শ্রীজহর ঘোষ গৃহীত।

বিলোল-কটাক্ষ
—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

ভালুক নাচ —অবনী মতিলাল

অভিমান —বাসুদেব ভট্টাচার্য্য

"তাহ'লেই ঠিক হ'ত। দশ ফ্রাঁতে ছবি কিনে হাজার হাজার ফ্রাঁ লাভ করেছ—তার বেলা ?"

বক্তৃতার সময় সেই নোটারী ৎবরোসকীর জামার হাতা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর লর্ড জ্যাকটের কাছ থেকে ওকে টেনে নিয়ে দু'জনে মিলে রু বাবার সেই ঘর থেকে পঞ্চাশখানি ক্যান্‌ভাস সংগ্রহ করল। বিরাট নগ্ন চিত্রাবলী, লাল আর সুবর্ণ গৈরিকরঙে আঁকা মুখাকৃতি, অশ্বশীর্ষ, ষ্টাডি, আর দু-একটি নিসর্গ চিত্র।

সবগুলি ছবি ট্যাক্‌সিতে ওঠালো—ৎবরো কয়েকটি পোর্টরেট সরিয়ে রাখতে পেরেছে ভেবে আনন্দিত। এক তামাকের দোকানে বসে উভয়ে চুক্তিপত্র সই করলো। ৎবরোসকী চিত্রগুলি ধার দিচ্ছে মাত্র। উভয়েই ভাবলো খুব চালাকী করা গেছে।

নোটারী ভাবে—"ও আর আমার চল্লিশ হাজার শোধ করেছে।"

এক একটি করে ৎবরোসকীর অনুমোদন অনুসারে ক্যান্‌ভাসগুলি হস্তান্তরিত হল, একসঙ্গে বিক্রী করলে যা পাওয়া যেত, লাভের পরিমাণ তার চাইতে অনেক বেশী।

একত্রিশ

বর্ষণসিক্ত সেই ষ্টুডিয়োতে হারিকট-রুজের মৃতদেহ-সম্বলিত কফীন বিছানার ওপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে আছে।

উংরোকিকেমপাক্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মৃতদেহের প্রতি নজর রাখতে রাজী হয়েছে, তার আগে সে ফুয়েজেক, গিলে নামক জনৈক অনুগত বন্ধু, বেহালা-বাদক, শিল্পী, একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পালা ক্রমে এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

উংরো এলো মধ্য রাত্রে, হাতে দুটি বোতল—তার পর মৃতদেহের পাশে বসল। রাত্রি তিনটা নাগাদ প্রতিবেশীরা এসে দরজায় ধাক্কা দিল—ব্যাপার কি। উংরো ভীষণ নেশা করেছে, নাচছে আর চীৎকার করে গান গাইছে। বলছে :—

"ও আর আমার সঙ্গে নাচবে না। এখন আমাকে অবজ্ঞা করে। আমার বেড়ালটার কি অবস্থা করল? আমাকে অবজ্ঞা করে অথচ কি মজা, পৃথিবীর আর সকলের মত শেষ পর্যন্ত কফিনে শুয়েছে। তোমরা হয়ত—"

সকলে মিলে তাকে টান্‌তে টান্‌তে নীচে নিয়ে গেল। উংরো কফিনের গায়ে অদ্ভুত ছবি এঁকেছে, আর কয়েকটা কাঠ খুলে নিয়েছে, ছন্দোবদ্ধ আকৃতি আনার দিকেই তার লক্ষ্য।

অবশেষে মেয়েটির বাপ-মা এল। তখন প্রায় আটটা বাজে, সকালের মত দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে চলে এসেছে। হারিকটের বাপের অঙ্গে উৎকৃষ্ট ছুটির দিনের পোষাক, হাতে হ্যাট, মার গায়ে রঞ্জিত ফ্রক, লোকদেখানো শোকের খাতিরে চোখের নীচে রুমাল চেপে ধরে শবদেহের পিছনে অনুসরণ করে কবর-ভূমিতে চলেছে—

কয়েক ঘণ্টা আগে মোদকের শেষ কৃত্য শেষ হয়েছে।

পরিশেষ

এই একজোড়া ট্র্যাজেডির কয়েক সপ্তাহ পরে মোদক্সোর কয়েক জন বন্ধু, বাসক্, ওরিজ, সরভেজ, লাজার, সাভাচুরকী, প্রানোউস্কী, লানডউস্কী সকলে মিঃ বুলভার কাফের এক টেবলের ধারে বসে তার বিষয়ে আলোচনা করছিল।

মোদক্সো কবরস্থ হওয়ার পর কোনো শিল্পী বা ভাস্কর আর লা রোতন্দে যায় না। লা রোতন্দ এখন মর্মর-প্রাসাদ, সাঁসে লিজের ঐ জাতীয় নৃত্য এবং পানশালার অনুকরণে গঠিত, মঁমার্তারের নৃত্যশালার কাছে নগণ্য। নীচের তলায় যদি কফি খেতে চাও তাহলেও একজনের জীবনের দাম পড়ে যাবে। তা ছাড়া হাতে কাদামাটি বা রঙ লেগে থাকলে চলবে না, ড্রেস করতে হবে। মঁপারনাসে এখন একেবারে গোল্লায় গেল। এই নামটি এখন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীর মনে কঠোর শ্রমের প্রেরণা আনে না, স্থানটি এখন প্রমোদাগার মাত্র, নকল শিল্পী আর আসল গণিকারা সেখানে ভীড় করে বসেছে। সচিত্র পত্রিকার তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীরা এখন কিউবিজম সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়, এদিকে কিউবিজম কবে ভূত হয়ে গেছে। এখন পোষাকের দোকানের জানলার কাচে কিউবিজমের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের পোষ্টার আর ক্যাটালগে কিউবিজম। জার্মাণীতেও এই ব্যাপার অনেক আগেই ঘটেছে।

কাঠের টেবলের ধারে পীতাভ আলোর তলায় বসে এই সব শিল্পীরা বিগত দিনের ইতিহাস রোমন্থন করছেন—

"ও সেই মূর্তিটা—"

"হ্যাঁ, ওই ষ্ট্যাচুর নীচেই মোদক্ লিখেছিল 'আমার সমাধিফলক' স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই হারিকট রুজ।"

"শুধু তাই ওদের যে একত্রে কবরস্থ করা হয়েছে তা নয়, ঐ ষ্ট্যাচু…"

"সেটা কোথায় আছে বল তো?"

"বোধ হয় রু ভার্সিনজেটোরী উঠানে হয়ত এখনও পড়ে আছে।"

সকলে এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। ওরিজ বলল—"শোনো ভাই, আমারা ত' ছ জন আছি, এখন ত' রাত একটা,—চলো না আমরা সেটাকে তুলে নিয়ে কবরখানায় ওর কবরের ওপর স্থাপনা করে দিই।"

এ ওর মুখের পানে তাকায়। সকলের চোখে জল।

ওরিজ উঠে দাঁড়ায়।

"চলে এসো।"

রু ভার্সিনজেটোরীতে এসে ওরা গেটটা ঠেলতেই গেট খুললো। নিঃশব্দে ওরা প্রাঙ্গণে সেই মূর্তির সন্ধান করতে থাকে—এক-গাদা খড়ের ভিতর সেই মূর্তি আবিষ্কৃত হ'ল। পরিষ্কার করার পর সকলেই সমস্বরে বলে উঠল—

"চমৎকার! কি সুন্দর!"

সকলের সমবেত চেষ্টায় মূর্তিটা টেনে বার করা হল।

"কি করে এটা প্যারী থেকে এনেছিল ভাই? শক্তি ছিল বটে।"

এ্যাভিন্যু দ্যু মেইনে একটা ঠেলাগাড়িওলাকে ডেকে বলল, "বন্ধু—এই ষ্টাচুটা কবরে পুঁতে দিতে পারবে? সত্যিকা একজন মহৎ মানুষের কবর।"

"এক গ্লাস মদ পাব ত'? তাহলে নিশ্চয় করবো!"

সকলে মিলে সেই ভারী মূর্তিটা গাড়িতে তুলে গাড়িতে উ বসে নিঃশব্দে কবরখানায় চলল।

ওদের জানা ছিল না কবরখানা রাত্রে বন্ধ হয়ে যায়। সুতঃ ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। তার পর আর কেয়ার টেকার আইন সঙ্গত না হলে কিছুই ভেতরে নিয়ে যে দিতে রাজী নয়। বৃথাই তাকে সবাই বোঝানোর চেষ্টা করে অবশেষে তার নিজের বাড়ির পাশে বিকেল পর্যন্ত ষ্টাচুটা রাখে রাজী হল কেয়ার টেকার।

ওরা ছ' জন ফিরতেই দেখে এক পুলিশ ইনস্পেকটার ওদে অপেক্ষায় বসে আছেন। কমিশনারের কাছে ওদের নিয়ে যাওয়া জন্য এসেছেন।

কমিশনার বললেন, "আপনাদের কোনো অধিকার নেই। ও পাথরটা এখনই আবার রু ভার্সিন জেটোরীতে রেখে আসুন মৃত ব্যক্তির অনেক ঋণ ছিল, তাই আদালতের পরোয়ানা আছে।"

"কত টাকা? আমরা সে টাকা দেব।"

বাড়িওয়ালী অনেক হিসাব করে টাকার অঙ্কটা বলল চল্লিশ ফ্রাঁ।"

পরস্পর মুখের দিকে তাকায়। আমরা টাকাটা আপনা চাঁদা করে তুলে দেব।"

সহসা ওরিজ তার কপালে চড় মারল, হা ভগবান!—ও তলায় মোদক্র হাতের অনেক কাজ ছিল, সুন্দর চূড়া-চূড়া, পা আকাশের ছবি,—কত নিসর্গ চিত্র, রাজকুমারীর কাছ থেকে ফিরে এসে মোদক্ সেগুলি আঁকতো। মোদক্র আঁকা ছবি ভাস্কর্যের সেগুলি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

বাড়িওয়ালী হাত পা নেড়ে বলে—আমি কি জানি আমি কি অত-শত বুঝি।"

"কি করেছ সে সব বলো?"

"গদির চাপা করেছি—"

"কি?"

"আমরা সেগুলি কেটে রঙ উঠিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি।"

সকলে তার মুখের দিকে এ ভাবে তাকালো যে বাড়িওয়া ভয়ে পালাল।

ষ্টাচুটাকে আবার সেই খড়ের গাদায় ফেরৎ দিতে হল।

নীলামে মোদক্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি—(অর্থাৎ কিছুই শুধু এই ষ্টাচুটি—)রু ড বিউনের এক প্রাচীন দ্রব্যাদি বিক্রে কাছে মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রাঁ মূল্যে বিক্রী করা হল,—সে আ কয়েক সপ্তাহ পরে সেটি তের হাজার ফ্রাঁতে বিক্রী করে হারিকট রুজের প্রতি মোদক্র এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশস্তির দাম রু ড ভিলে ইভেন্যুতে আরো অনেক উঠবে।"

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ

সমাপ্ত
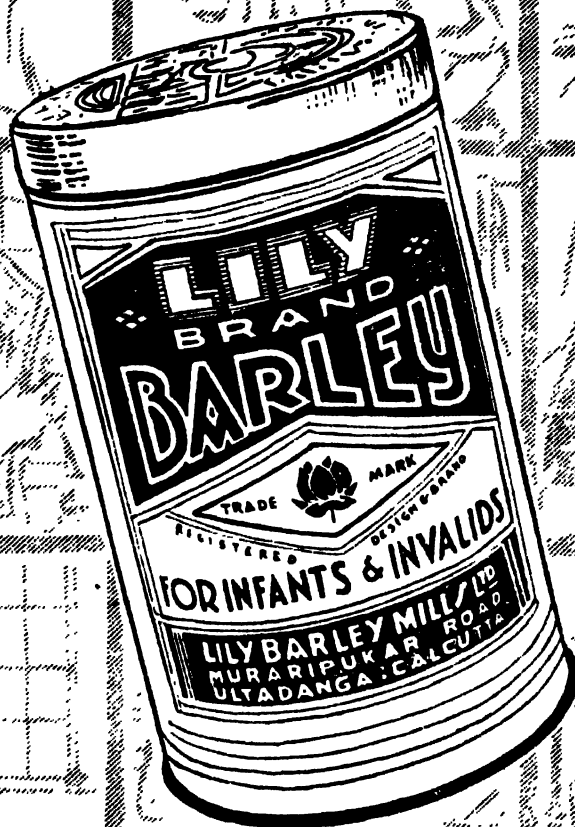
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
REGISTERED DESIGN & BRAND
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA : CALCUTTA
সুস্থ ও অসুস্থ সকল অবস্থাতেই
বার্লি সমান উপকারী
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ ও নির্ভরযোগ্য
লিলি বার্লি মিলস লিঃ কলিকাতা-৪

বৃটিশ নির্ব্বাচন —

গত ২৬শে মে (১৯৫৫) বৃটেনে যে-সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহাতে রক্ষণশীল দলের জয়লাভ করা অপ্রত্যাশিত ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু রক্ষণশীল দল যেরূপ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে তাহা প্রত্যাশিত ছিল কি না নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বস্তুতঃ, বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের গত ৪৫ বৎসরের ইতিহাস রক্ষণশীল এত অধিক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা আর কোন সময় লাভ করে নাই। এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কয়েকটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের সীমানা পরিবর্ত্তনের ফলে বৃটিশ কমন্স সভার আসন-সংখ্যা বিগত পার্লামেণ্টে ৬২৫টি আসন হইতে বাড়িয়া ৬৩০টি আসনে দাঁড়াইয়াছে। নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর পুনর্ব্বণ্টনের প্রতিক্রিয়া এই সাধারণ নির্ব্বাচনে কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল এবং উহার সহযোগী দলগুলি মোট ৩৪৫টি আসন দখল করিতে পারিয়াছে। শ্রমিক দল দখল করিয়াছে ২৭৭টি আসন। উদার-নৈতিক দল ৬টি এবং অন্যান্য দল ২টি আসন দখল করিয়াছে। রক্ষণশীল দল সর্ব্বমোট ৬০টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিয়াছে। বিগত পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা কোন সময়েই ১৮টি আসনের বেশী হয় নাই। ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল কমন্স সভায় ৩৯৮টি আসন দখল করিয়া ১৮৫টি আসনের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছয়টি আসনে পর্য্যবসিত হয়। ১৯৫১ সালের অক্টোবরের নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল পরাজিত এবং রক্ষণশীল দল বিজয়ী হইলেও তাহাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ১৮টি আসনের বেশী ছিল না। এবার রক্ষণশীল দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বাড়িয়া ৬০টি আসন হইয়াছে। রক্ষণশীল দলের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া জয়লাভ এবং শ্রমিক দলের পরাজয় তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বৃটিশ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী রক্ষণশীল দলকে কেন বিজয়ী করিলেন এবং শ্রমিক দল পরাজিত হইল কেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এবারের নির্ব্বাচনে মোট ভোটারদের শতকরা ৭৬·৭৮ জন ভোট দিয়াছেন। বিগত নির্ব্বাচনে মোট ভোটারদের শতকরা ৮২·৬০ জন ভোট দিয়াছিলেন। ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৫ সালে ভোটার-সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে ১৯৫১ সালে তুলনায় ১৯৫৫ সালে শতকরা ৫·৮২ জন ভোটার কম ভোট দেওয় তাৎপর্য্যহীন মনে করা যায় না। নির্ব্বাচনের জন্য প্রচারকা আরম্ভ হওয়ার সময়ে নির্ব্বাচন সম্পর্কে ভোটারদের আগ্রহে অভাবের কথা শোনা গিয়াছিল। ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্বে বিগত নির্ব্বাচন অপেক্ষা এই নির্ব্বাচনে কম সংখ্যক ভোটার ভো দেওয়ায় নির্ব্বাচনে ভোটারদের আগ্রহের অভাবের কথাটা একেবা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কোন্ শ্রেণীর ভোটারদের মধ্যে আগ্রহের অভাব লক্ষিত হইয়াছে তাহা উপেক্ষার বিষয় নয় অনেকে মনে করেন, শ্রমিক ভোটারদের মধ্যেই নির্ব্বাচন সম্প উদাসীনতা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছে। গত চারি বৎস বৃটেনের আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়াই ইহার কারণ বলিয়া অনুম করা হইয়াছে। এবারের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল ১৩৩,৪০,১১ ভোট পাইয়াছেন। ইহা মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৯·৮ ভাগ। শ্রমিক দল পাইয়াছেন মোট ১,২৪,২১,১৬২ ভো অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৬·৪২ ভাগ। ১৯৫১ সাে নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল মোট ১,৩৭,১৮,০৬৯ ভোট এবং শ্রমিক দ ১,৩৯,৪৯,১০৫ ভোট পাইয়াছিলেন। বিগত নির্ব্বাচনে শ্রমি দল পরাজিত হইলেও রক্ষণশীল দল অপেক্ষা ২ লক্ষ ৩০ হাজ ভোট বেশী পাইয়াছিলেন। এবারের নির্ব্বাচনে শ্রমিক দ রক্ষণশীল দল অপেক্ষা প্রায় ৯ লক্ষ ১১ হাজার ভোট ক পাইয়াছেন। ফ্লোটিং ভোটারদের কথা বাদ দিলে বৃটি ভোটারদিগকে সমাজতন্ত্রী ভোটার এবং সমাজতন্ত্র-বিরো ভোটার এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই দুই শ্রে ভোটারদের সংখ্যাও প্রায় সমান; এই সকল ফ্লোটিং ভোটার অধিকাংশই যে রক্ষণশীল দলের পক্ষে ভোট দিয়াছে তাহা সন্দেহ নাই! শ্রমিক বা সমাজতন্ত্রী ভোটারদের মধ্যে নির্ব্বা সম্পর্কে ঔদাসীন্য শ্রমিক দলের পরাজয়ের যেমন একটি কা তেমনি পরাজয়ের আর একটি কারণ ফ্লোটিং ভোটারদের অনেে রক্ষণশীল দলের অনুকূলে ভোট দেওয়া। ইহা ব্যতীত তৃত আর একটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, বৃটে সমাজতন্ত্র বিরোধী ভোটারের সংখ্যাও কিছু বাড়িয়াছে। তিনটি কারণ মিলিত ভাবে রক্ষণশীল দলকে বিপুল সংখ গরিষ্ঠতা সহ জয়লাভ করাইয়াছে এবং পরাজিত করিয়াছে শ্রমি দলকে ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। কিন্তু ইহ কারণ কি?

বৃটিশ ভোটারগণ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। এই দিক দিয়া রক্ষণশীল দলের জয় ও শ্রমিক দলের পরাজয়ের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, শ্রমিক দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধই তাঁহাদের পরাজয়ের কারণ। আপাত দৃষ্টিতে উহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। শ্রমিক দলের এই পরাজয়ের জন্য এটলীপন্থীরা বিভানপন্থীদিগকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে বিভানপন্থীদিগকে যদি শাস্তি দেওয়া হইত অর্থাৎ দল হইতে বহিষ্কৃত করা হইত, তাহা হইলে শ্রমিক দলের এই পরাজয় হইত না। বিভানপন্থীরা বলিতেছেন, শ্রমিক দলের খাঁটি সমাজতন্ত্রী কর্ম্মসূচী গ্রহণ না করাই এই পরাজয়ের কারণ। কিন্তু বিভানপন্থীরা নির্ব্বাচনে যে বেশ ভাল রকমেই ঘায়েল হইয়াছেন, একথা যেমন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তেমনি রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে ভোটারদের মধ্যে বিভান-ভীতি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও স্মরণ করা আবশ্যক। ডেইলী স্কেচ পত্রিকা ২৪শে মে তারিখের সংখ্যায় এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করেন যে, শ্রমিক দলের এটলী-মরিসন-গেইটস্কেল উপদলকে অপসারিত করিয়া বিভানকে নেতা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী করিবার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডেইলী স্কেচ পত্রিকা সম্ভবতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই বিভান সম্পর্কে এইরূপ প্রচারকার্য্য করিবার ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভাগ সম্পর্কে প্রচারকার্য্যের নমুনা পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত কল্পিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ হইতে। উহাতে বিভানকে চিত্রিত করা হইয়াছে মার্কিণ শ্রমিক নেতা জন লিউইসের মত করিয়া, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা ষ্ট্যালিনের মত। বিভান ইংলণ্ডের ভাবী প্রধান মন্ত্রী, একথা ভাবিয়া বৃটিশ ও মার্কিণ জনগণ যে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে, ইহা কি সত্য হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিভান বলিতেছেন যে, তিনি ইহার কারণ জানেন না এবং বিনিদ্র রজনী যাপন সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ আছে। তাঁহাকে আমেরিকা-বিরোধী বলা সম্পর্কে তিনি বলেন, উহার মত বোকামী আর নাই। কারণ তিনি যতখানি রাশিয়া বিরোধী তাহার বেশী আমেরিকা বিরোধী নহেন।

বৃটিশ ভোটারদের বিভান-ভীতি রক্ষণশীল দলের জয়লাভে কতখানি সহায়তা করিয়াছে তাহা অঙ্ক করিয়া বলা হয়ত কঠিন। কিন্তু বিভানকে বৃটিশ শ্রমিক দলের ভাবী নেতা এবং বৃটেনের ভাবী প্রধানমন্ত্রিরূপে কল্পনা করিয়া তাহাদের মনে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠে তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় না হওয়ারই কথা। শ্রমিক দল জয়লাভ করিলে বিভানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশঙ্কা অপেক্ষা শ্রমিক দলে তাঁহার প্রভাবই বৃটিশ ভোটারদিগকে কতক পরিমাণে বিচলিত করিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। অবশ্য বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির রূপ অনুকূল এবং মার্কিণ বিরোধী পরিবর্ত্তনের কোন আশঙ্কা তাঁহারা করেন নাই। পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে শ্রমিক দল রক্ষণশীল দল হইতে স্বতন্ত্র কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিতে পারেন নাই। পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্যও নাই। কিন্তু ঘরোয়া ব্যাপারে পার্থক্য অবশ্যই কিছু আছে। কিন্তু সাড়ে চারি বৎসরের টোরী শাসন কালে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে, বেকার সমস্যা হ্রাস পাইয়াছে, যুদ্ধের আশঙ্কা দূরবর্ত্তী হইয়াছে। এইগুলি যে টোরী দলের জয়ের অনুকূল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্ব্বাচনে নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া টোরী দল কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহা বলা কঠিন। ভাবী চতুঃশক্তি সম্মেলনে শান্তি প্রতিষ্ঠাতারূপে প্রধান মন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেনের ভূমিকা সম্পর্কেও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী টোরী দল বেকার সমস্যা সমাধানে ভবিষ্যতে কি নীতি গ্রহণ করিবে তাহাও বলা কঠিন। টোরী দল আবার বৃটেনের পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনিবে, বৃটিশ ভোটারগণ যদি সে আশা করিয়া থাকেন, তবে তাহা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল যেমন পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি শ্রমিক দল পাইয়াছে মরণাঘাত। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া কাটাইয়া উঠিতে শ্রমিক দলের দীর্ঘ দিন লাগিবে।

বৃটেনে ডক ও রেল ধর্ম্মঘট—

নির্ব্বাচনে বিপুল জয়লাভ করিয়া বৃটিশ রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই ২১শে মে হইতে রেলওয়ের ৭০ হাজার ইঞ্জিন ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার প্রায় ছয় দিন পূর্ব্বে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে ২৩শে মে হইতে ২০ হাজার ডক-শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ
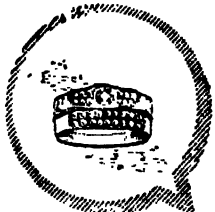
করিয়াছেন। এই ধর্ম্মঘটকারীরা নেশন্যাল এমালগ্যামেটেড ষ্টেভেডোর্স এণ্ড ডকার্স ইউনিয়নের সদস্য। জাহাজ শিল্পে আলাপ-আলোচনার পথে বিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের এই ইউনিয়নের স্বীকৃতি দাবী করিতেছেন। এই ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রান্সপোর্ট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম্মঘটের নিন্দা করা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ৬টি প্রধান বন্দরে ১২৬টি জাহাজ এই ধর্ম্মঘটের ফলে আটক পড়িয়াছে।

রেলধর্ম্মঘট আহূত ও পরিচালিত হইতেছে এসোসিয়েটেড সোসাইটি অব লোকোমোটিভ ইঞ্জিনীয়ার এণ্ড ফায়ারম্যান কর্ত্তৃক। নেশন্যাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েম্যান এই ধর্ম্মঘটের বাহিরে থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ট্রেন চলাচল গুরুতর ভাবে ব্যাহত হইয়াছে। গত বৎসরের শেষ ভাগে এই ইউনিয়নটি অর্থাৎ নেশন্যাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েম্যান উহার অল্প বেতনের সদস্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবার নোটিশ দিয়াছিলেন। অনেক তর্কবিতর্ক এবং আলাপ-আলোচনার পর এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করা হইলে শেষ মুহূর্ত্তে ধর্ম্মঘট করার সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। এই বৎসরের প্রথম দিকে অল্প বেতনের রেলকর্ম্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। ধর্ম্মঘটী ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানদের অভিযোগ না কি এই যে, অল্প বেতনের রেলকর্ম্মীদের বেতনবৃদ্ধির ফলে কুশলী শ্রমিক এবং অ-কুশলী শ্রমিকদের মধ্যে বেতনের তারতম্য হ্রাস পাওয়ায় কর্ম্মদক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহারা বেতন বৃদ্ধির দাবী করিতেছেন।

ডক-শ্রমিক এবং রেলকর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ১৯২৬ সালের ধর্ম্মঘটের সহিতই শুধু তাহার তুলনা করা চলে। রেলযাত্রীদের অসুবিধাই যে শুধু হইয়াছে তাহা নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য চলাচলের পক্ষেও গুরুতর বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্য। এই ধর্ম্মঘট যে রক্ষণশীল দলের সম্মুখে এক বিপুল পরীক্ষা তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত মীমাংসার সম্ভাবনা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না।

কাশ্মীর প্রিন্সেস—

হংকং হইতে জাকার্ত্তা যাওয়ার পথে এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের কাশ্মীর প্রিন্সেস নামক বিমানখানি গত ১১ই এপ্রিল ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়া গবর্ণমেণ্ট যে তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, তদন্তের ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ধ্বংসাত্মক কার্য্যের ফলে বিমানখানি ধ্বংস হইয়াছে। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তে কেহ-ই বিস্মিত হইবেন না। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানখানির যে তিন জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, যে-বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমানখানি ধ্বংস হইয়াছে বিমানের কাঠামোর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই, উহা বাহিরের সূত্র হইতে ঘটিয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনের গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই এই বিমান ধ্বংসের চক্রান্তের কথা জানিতে পারিয়া হংকংয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। এই সতর্ক-বাণীতে সাবোটাজ কথাটি ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়া হংকং কর্ত্তৃপক্ষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিমানখানি যখন হংকংয়ের বিমানঘাঁটিতে ছিল সেই সময়ই উহাতে টাইম বোমাটি রক্ষিত হয়। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর প্রিন্সেস ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পরই তাঁহারা তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় মহল হইতে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, যে-কুয়োমিণ্টাং চীনা কাশ্মীর প্রিন্সিসে টাইম বোমা রাখার সহিত জড়িত সে তাইপেতে পলায়ন করিয়াছে এবং ফরমোসায় তাহার জন্য সন্ধান করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টের যে-বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও যে-সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেগুলি বিস্তৃত ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কাশ্মীর প্রিন্সেসের ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং এই ধ্বংসাবশেষ হইতেই ধ্বংসাত্মক কার্য্যের সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ষ্টারবোর্ড হুইল ওয়েলের মধ্যে যথাকালে বিস্ফোরিত হওয়ার যোগ্য একটি নারকীয় যন্ত্র রক্ষিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলি অংশ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে ৩নং ফুয়েল ট্যাঙ্কটি ফাটিয়া যায় এবং আগুন এত দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে যে, উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যের মত জঘন্য এবং নারকীয় ধ্বংসাত্মক কার্য্য আর কিছু যে হইতে পারে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

কাশ্মীর প্রিন্সেস বিমানের ষ্টারবোর্ড হুইল ওয়েলে টাইম বোমা রাখিয়া যে উহাকে ধ্বংস করা হইয়াছে তাহা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এক জন কুয়োমিণ্টাং চীনা এই ব্যাপারের সহিত জড়িত তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যের জন্য যে বা যাহারা দায়ী তাহাদিগকে ধরিয়া বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে হইলে উক্ত কুয়োমিণ্টাং চীনাকে সর্ব্বপ্রথম গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। এই লোকটি পলাইয়া ফরমোসায় গিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ফরমোসা গবর্ণমেণ্ট এই লোকটিকে গ্রেফতার করিয়া বৃটিশের হাতে অর্পণ করিবে, ইহা আশা করা দুরাশা মাত্র। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যদি চিয়াং কাইশেকের উপর চাপ দেন, তাহা হইলেই শুধু এই লোকটিকে গ্রেফতার করা সম্ভব। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন তাহা কিছুই জানা যাইতেছে না। কাশ্মীর প্রিন্সেস ধ্বংস করা কোন সাধারণ অপরাধ নয়। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহা ভয়ানক বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জন্য যে বা যাহারা দায়ী তাহাদিগকে রাজনৈতিক কারণে আশ্রয় দিলে আন্তর্জ্জাতিক মন কষাকষি আরও তীব্র হইয়া উঠিবে। কম্যুনিষ্ট চীন চারি জন মার্কিণ বৈমানিককে মুক্তি দিয়া আন্তর্জ্জাতিক মন কষাকষি দূর করিবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। কাশ্মীর প্রিন্সেস ধ্বংসকারীকে ধরিবার ব্যবস্থা না করিয়া মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এই মুক্তদ্বারকে রুদ্ধ করিবেন কি না, বিশ্ববাসী সাগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিবে।

শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত—

অবশেষে অষ্ট্রিয়া সমস্যার একটা সমাধান হইয়া গেল। গত ১৫ই মে (১৯৫৫) ভিয়েনার বৃহৎ চতুঃশক্তি কর্তৃক অষ্ট্রিয়া শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় অষ্ট্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। ১৯৪৯ সালে অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বৃহৎ চতুঃশক্তি একমত হইলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে উহা স্বাক্ষরিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। গত এপ্রিল মাসের মধ্য ভাগে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে মস্কোতে অষ্ট্রিয়ান ও সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে আলোচনার ফলে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়াকে কতকগুলি সুবিধা দিতে রাজী হন এবং ঐ সকল সুবিধার বিনিময়ে অষ্ট্রিয়া অবিচলিত ভাবে নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে থাকিতে, কোন সামরিক জোটে যোগদান না করিতে এবং অষ্ট্রিয়ার ভূখণ্ডের উপর কাহাকেও সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণের অনুমতি না দিতে স্বীকৃত হয়। গত ১৫ই এপ্রিল (১৯৫৫) এ সম্পর্কে এক যুক্ত বিবৃতিতে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভ এবং অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার হের জুলিয়াস রাব স্বাক্ষর দান করেন। এই চুক্তির ফলেই এবং অষ্ট্রিয়ার এই নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স রাজী হওয়াতেই অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। নিরপেক্ষতার বিনিময়ে অষ্ট্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে নাৎসী বাহিনী অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। সেই হইতেই সুরু হইয়াছে অষ্ট্রিয়ার পরাধীনতা। অতঃপর ১৯৪৫ সালে রুশ বাহিনী অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণ কবল হইতে মুক্ত করে এবং অষ্ট্রিয়া চতুঃশক্তির দখলকারিত্বের অধীনে আসে। ১৭ বৎসর পরে অষ্ট্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। অষ্ট্রিয়া শান্তি-চুক্তি অনুমোদিত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে এবং যে-কোন ভাবেই হউক ১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দখলকার সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। অষ্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার বিনিময়ে সোভিয়েট রাশিয়া যে-সকল সুবিধা দিতে রাজী হওয়ায় অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে এই সকল সুবিধা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে অষ্ট্রিয়াকে, ইহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা যে রুশ কূটনীতির জয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অষ্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করা পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অস্বীকার করিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অষ্ট্রিয়াবাসীর মধ্যে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইত এবং বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের দাবী তীব্রতর হইয়া উঠিত। পশ্চিমী সামরিক ব্লক ও সোভিয়েট সামরিক ব্লকের মধ্যে নিরপেক্ষ অষ্ট্রিয়ার 'ব্যাফেল ওয়াল' সৃষ্টি করার মধ্যে রাশিয়ার একটা গভীর উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। এই উদ্দেশ্য যে বাল্টিক সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আড্রিয়াটিক পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ রাজ্যের ব্যাফেল ওয়াল গড়িয়া তোলা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মধ্যে ইউরোপের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা করিতেছে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সূচনায় কি পরিণতি হইবে তাহা জার্ম্মাণ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে বুঝিতে পারা যাইবে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ সম্পর্কে রাশিয়ার নীতি যে অনেকখানি কঠোর ভাবে অবলম্বন করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। গত ৭ই মে (১৯৫৫) সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪২ সালের ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি এবং ১৯৪৪ সালের ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়াছে। অতঃপর ওয়ারসতে রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট শক্তিবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে গত ১৪ই মে (১৯৫৫) রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের ৭টি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠনের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। উহা যে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির অনুরূপ এবং উহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে পশ্চিমী শক্তিবর্গ সর্ব্বোচ্চ স্তরে আন্তর্জ্জাতিক প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য রাশিয়াকে যে-দিন আমন্ত্রণ করে সেই দিন রাশিয়াও এক প্রস্তাব করে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউরোপের বিমানঘাঁটিগুলি পরিত্যাগ করে, তবে রাশিয়াও তাহার সৈন্যবাহিনীকে রুশ সীমান্তের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবে। তা ছাড়া সোভিয়েট-রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের নিকট নিরস্ত্রীকরণের যে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে তাহা এমন ভাবে রচিত হইয়াছে যে, তাহা ব্যর্থ হইলে এই ব্যর্থতার দায়িত্ব হইতে পশ্চিমী শক্তিবর্গ রেহাই পাইবে না।

ওয়ারস সম্মেলনে যখন রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের সাতটি রাষ্ট্র সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠনের চুক্তি সম্পাদন করিতেছিল সেই সময় ভিয়েনাতে সম্পাদিত হয় অষ্ট্রিয়া শান্তি-চুক্তি। অষ্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে অষ্ট্রিয়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠিয়াছে জার্ম্মাণীর নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করা সম্ভব হইবে কি না? জার্ম্মাণ সমস্যা অষ্ট্রিয়ার মত অত সহজ নয় সে-কথা বলাই বাহুল্য। অষ্ট্রিয়ার মত রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিলে পশ্চিমী সামরিক জোটের কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু জার্ম্মাণীর সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। জার্ম্মাণীর নিরপেক্ষতায় পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় যে রাজী হইবে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বোপরি বড় কথা, জার্ম্মাণীর নিরপেক্ষতা নির্ভর করিবে সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর উপর। পশ্চিম জার্ম্মাণী পশ্চিমী শক্তি জোটে যোগদান করিয়াছে। রাশিয়া কোন্ কূটকৌশল পশ্চিম জার্ম্মাণীকে এই জোটের বাহিরে আনিতে সমর্থ হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়। কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই, ৭ই জুন (১৯৫৫), ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী যে-দিন মস্কোতে পৌঁছেন সেই দিন পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনুয়েরকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডাঃ এডেনুয়ের সর্ত্তাধীনে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অর্থাৎ পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি চূড়ান্ত ভাবে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ডাঃ এডেনুয়ের কর্ত্তৃক রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণে মার্কিণ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালেসের আপত্তি নাই। প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট নেতাদের সহিত আলোচনায় ডাঃ এডেনুয়ের তাঁহার মিত্রশক্তির অনুকূলেই থাকিবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

যুগোশ্লাভ-রুশ মৈত্রী—

অষ্ট্রিয়া শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেলগ্রেডে সাত দিনব্যাপী আলোচনার পর যুগোশ্লাভিয়ার সহিত রাশিয়ার নূতন মৈত্রীবন্ধন সম্পর্কে টিটো ও বুলগানিনের যৌথ ঘোষণা। ভিয়েনায় অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদনের আলোচনা যখন চলিতেছিল সেই সময় ১৪ই মে (১৯৫৫) মস্কো হইতে ঘোষণা করা হয় যে, রাশিয়ার উচ্চস্তরের তিনজন নেতা রুশ-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের অধিকতর উন্নতির জন্য বেলগ্রেড যাইবেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই ঘোষণায় যেমন বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই, তেমনি রুশ-যুগোশ্লাভ আলোচনা সম্পর্কে যুগোশ্লাভিয়া মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, যুগোশ্লাভিয়া তাহার স্বাধীনতার নীতিতে দৃঢ়তার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। রাশিয়ার বৃহৎ নেতৃবর্গের বেলগ্রেড সফরের ঘটনার নজীর রুশ কম্যুনিজমের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। কূটনৈতিক প্রয়োজনে রাশিয়া যে অ-কম্যুনিষ্ট দেশের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে চুক্তি করিতে পারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নাৎসী জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তির মধ্যে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বিদ্রোহী কম্যুনিষ্টের সহিত মিতালী করিবার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। রুশ পররাষ্ট্র নীতিতে ইহা কিরূপ পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে এবং যুগোশ্লাভিয়ার সহিত রাশিয়ার নূতন মৈত্রীবন্ধনের যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন, সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ক্রুশেভ এবং প্রথম ডেপুটী প্রধান মঃ মিকোয়ান এই তিন জনকে লইয়া বেলগ্রেড বৈঠকের জন্য রুশ-প্রতিনিধি দল গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব করেন রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন নয়, সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ক্রুশেভ। সুতরাং আলোচনা শুধু গবর্ণমেণ্টের স্তরে হয় এবং শুধু রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মীমাংসা করা হয়, ইহাই রুশ-নেতৃবর্গের অভিপ্রায় ছিল না। আদর্শগত বিরোধের মীমাংসা করার অভিপ্রায়ও তাঁহাদের ছিল। অবশ্য গত অক্টোবর মাস হইতেই মার্শাল টিটো যে একজন ভাল কম্যুনিষ্ট তাহা স্বীকার করিতে রাশিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। যুগোশ্লাভিয়ার সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময় তাহার প্রথম লক্ষণ মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

রাশিয়া যখন যুগোশ্লাভিয়াকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের আলিঙ্গনের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিল তখন মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে সাত দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহাকে বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী, প্রতিবিপ্লবী ট্রটস্কীপন্থী, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গঠিত সমাজতন্ত্রী ফ্রণ্টে ভেদ সৃষ্টিকারী প্রভৃতি যে-সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুতর। বুলগেরিয়ার এক পত্রিকায় টিটোকে গোয়েরিংরূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল। রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী Georghiu-Dej বলিয়াছিলেন যে, যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি 'হত্যাকারী ও গুপ্তচরদের' দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। হাঙ্গেরীর Matyas Rakosi টিটোর শাসনকে 'the storm detachment of imperialism' বলিয়া

অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাভদা পত্রিকায় যুগোশ্লাভ নেতাদের উপর তীব্র আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রাভদারও গুরুতর মত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধে সোভিয়েট ও যুগোশ্লাভ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নৈকট্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, উভয় দেশেই মালিকানা স্বত্ব জনসাধারণের হাতে আসিয়াছে এবং উভয় দেশেই রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং কৃষকদের প্রাধান্য। উভয় দেশের মধ্যে মতবাদের যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় দেশের মধ্যে মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে। প্রাভদা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যেখানে মতভেদ হয় সেখানে ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না। প্রাভদা পত্রিকায় মতের গুরুতর পরিবর্তন যে যুগোশ্লাভিয়াকে আবার রুশ ব্লকে ভিড়াইবার জন্য ভূমি প্রস্তুতের আয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৪৮ সাল হইতে টিটোর বিরুদ্ধে যে সকল প্রচারকার্য করা হইয়াছে তিনি যে তাহা ভুলিয়া যান নাই রুশ প্রতিনিধি দল তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রাভদার টিটোকে তোয়াজ করিবার প্রয়াস হইতে ১৯৪৮ সালে রাশিয়ার সহিত যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণেও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণটির উল্লেখ করিয়াছেন রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ক্রুশেভ। তিনি বেরিয়াকে ইহার জন্য দায়ী করিয়াছেন। বেচারী বেরিয়া! হত্যা করার পরেও তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইতেছে না। রুশ যুগোশ্লাভ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে ষ্ট্যালিনের কি কোনই হাত ছিল না? বেরিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপাইলেও আদর্শগত ভিত্তিতে যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্রুশেভের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। এক সময় কথা উঠিয়াছিল, মাও সে তুং টিটো হইবেন কি না। আজ টিটো-ই মাও সে তুং হইবেন কি না এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে। কিন্তু সাত দিনব্যাপী আলোচনার পর গত ২রা জুন (১৯৫৫) টিটো ও বুলগানিন যে যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে টিটোর মাও হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। অবশ্য গোপন কোন চুক্তি হওয়া সম্পর্কে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন।

রুশ যুগোশ্লাভ যৌথ ঘোষণায় রাশিয়ার পক্ষে প্রতিনিধি দলের নেতা ক্রুশেভ দস্তখত না করিয়া দস্তখত করিয়াছেন রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন। কাজেই চুক্তি উভয় দেশের গবর্ণমেন্টের ভিত্তিতে হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই চুক্তিতে দেখা যায়, উভয় দেশের নাগরিকদের মানবিক ভিত্তিতে ফেরৎ পাঠাইবার, আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করিবার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করিবার এবং উভয় দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিবার সম্পর্কে মতৈক্য হইয়াছে। চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণ করিবার, নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করণের দাবী করা হইয়াছে। ফরমোসার উপর চীনের অধিকার স্বীকার করিবার জন্য দাবীও করিয়াছেন। জার্ম্মাণী সম্পর্কে যুক্ত ঘোষণায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। সাধারণ নিরাপত্তা ও জার্ম্মাণ জাতির স্বার্থের খাতিরে জার্ম্মাণ সমস্যার সমাধান দাবী

তাঁহারা করিয়াছেন। এই দাবী যে খুবই অস্পষ্ট ও অর্থহীন তাহা বলাই বাহুল্য। সামরিক শক্তি জোট সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সামরিক জোটগুলির নীতির ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে এবং যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই যৌথ ঘোষণা হইতে যুগোশ্লাভিয়া নিরপেক্ষ দেশরূপে থাকিবে তাহা বুঝা যায় না। স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়া নিরপেক্ষ থাকিতেও পারে না-ও থাকিতে পারে।

টিউনিশিয়ার স্বায়ত্ত শাসন—

নয় মাসেরও অধিক কাল আলোচনার পর গত ২৯শে মে (১৯৫৫) টিউনিশিয়াকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া সম্পর্কে ফ্রান্স এবং টিউনিশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির বিবরণ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, টিউনিশিয়ার শাসন পরিচালনের জন্ম একটি আইন-সভা গঠিত হইবে, কিন্তু দেশরক্ষার ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি থাকিবে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হাতে। ইহাতে টিউনিসিয়াবাসীর স্বাধীনতার দাবী পূরণ হইবে না। স্বাধীনতার জন্ম আন্দোলন চলিতেই থাকিবে। টিউনিশিয়াকে ছিটা-ফোঁটা স্বায়ত্ত শাসন দিবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মরক্কো এবং আলজিরিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি যাঁহারা পরিচালন করিতেছেন তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের যে-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা স্বাধীনতার জন্ম শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দেশব্যাপী সংঘর্ষের পথে ঠেলিয়া দিতেছে।

জওহরলালজীর রাশিয়া ভ্রমণ—

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি ভ্রমণের জন্ম ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু গত ৭ই জুন (১৯৫৫) মস্কো পৌঁছিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত জওহরলালজীর রাশিয়া ভ্রমণের প্রথম পর্ব্ব হইয়া দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশ হইবার সময় পর্য্যন্ত হয়ত তাঁহার রাশিয়া সফর শেষ হইয়া যাইবে এবং রুশনেতাদের সহিত তাঁহার আলোচনার ফলাফল সম্বলিত একটি যুক্ত বিবৃতিও প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা। জওহরলালজীর রাশিয়া ভ্রমণ তাঁহার চীন ভ্রমণ অপেক্ষা একটুকুও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মস্কোতে তিনি যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন রাষ্ট্রনায়ক রাশিয়ার রাজধানীতে এরূপ সম্বর্দ্ধনা পান নাই। বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের রাষ্ট্রনায়কদের সর্ব্বোচ্চ স্তরে আলোচনার প্রস্তুতি যখন চলিতেছে এবং রাশিয়া তাহার সহাবস্থান নীতি-সম্পর্কে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে যখন উদ্যোগী হইয়াছে সেই সময় জওহরলালজীর রাশিয়া ভ্রমণ যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার রাশিয়া সফর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মনে কোন আশঙ্কা বা ভ্রান্ত-ধারণা সৃষ্টি করে নাই, একথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। বরং পশ্চিমী জন-সাধারণ তাঁহার এই সফরকে আন্তর্জাতিক মনকষাকষি হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা-পূর্ণ আশার দৃষ্টিতেই দেখিতেছে।

জওহরলালজী মার্কিণ-বিরোধী মনোভাব লইয়া রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে গুরুতর ভুল হইবে। তিনি কমুনিষ্ট সমর্থক হিসাবেও রাশিয়ায় যান নাই। শান্তি এবং সহাবস্থান নীতির প্রতি রুশ-নেতাদের আন্তরিকতা কতখানি অকৃত্রিম জওহরলালজী এই ভ্রমণের সময় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাশিয়া কি কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহাও হয়ত তিনি রুশ-নেতাদের সহিত আলোচনা করিবেন। অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা সম্পর্কে রাশিয়ার আন্তরিকতা প্রমাণের জন্ম তিনি হয়ত কমিনফর্ম্মের বিলোপের জন্ম রুশ নেতাদিগকে অনুরোধ করিবেন। তাঁহারা কি ভাবে নেহরুজীর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে রাশিয়ার কিরূপ সহযোগিতা কি ভাবে এবং কতখানি পাওয়া যাইতে পারে তাহাও তিনি আলোচনা করিবেন বলিয়া মনে হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার পূর্ব্বে জওহরলালজী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার প্রাক্কালে তিনি গিয়াছেন রাশিয়ায়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তিনি মস্কো পৌঁছিবার ৪৮ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া এইরূপ আভাস দিয়াছে যে, কোন রকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই রাশিয়া ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের হিড়িক

নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া স্কুল, কলেজ, সওদাগরী অফিস, ফুটবল ক্লাব, ব্যায়াম সমিতি, ড্রামাটিক ক্লাব প্রভৃতি অসংখ্য ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান বৈশাখ থেকে স্বরু করে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করেছেন। কার্যসূচী সর্ব্বত্রই প্রায় এক, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা এবং নাটকের সঙ্গে কিছু নৃত্য ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আর্টিষ্টরা অনেক ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যোগদান করেছেন, সাংবাদিক, অধ্যাপকরা সাহিত্যিকরা অবশ্য বিনামূল্যে বক্তৃতা বিতরণ করেছেন। সর্বত্রই সেই নাচ, গান, হল্লা। প্রখর তপন-তাপে সঙ্গীতের আসর বা জলসা বসিয়ে যে আসর জমানো যায় তা দেখা গেল এই সূত্রে। সংবাদপত্রের প্রায় পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী সংক্ষিপ্ত সংবাদে মফঃস্বলে ও সহরে যে কত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে তার হিসাব পাওয়া গেল, অনেক সংবাদ অবশ্য মুদ্রিত হয়নি। নিঃসন্দেহে এর জন্য হাজার হাজার টাকা খরচও হয়েছে একথা বলা যায়। এই ধরণের সস্তা উৎসবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। যে সব মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা কিছু কাল পূর্বে পনের দিন ধরে রবীন্দ্র-উৎসব করা যায় বলে ফতোয়া জারি করেছিলেন তাঁরা এবং সংবাদপত্রে যাঁরা এই সব অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করেন তাঁরাও কতকাংশে এই জাতীয় বারোয়ারীর জন্য দায়ী। একমাত্র শ্রীযুক্ত অমল হোম সাহস করে এর বিরুদ্ধে দু'কথা বলেছেন, আপত্তি করেছেন, অধিকারী ভেদের কথা তুলেছেন। তার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে বক্রোক্তি হয়েছে। আমরা শ্রীযুক্ত হোমকে সাধুবাদ জানাই। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব শুধু যাতে পঁচিশে বৈশাখেই সীমাবদ্ধ থাকে তার জন্য আন্দোলন করা উচিত, নতুবা সরস্বতী পূজার মত মাইক উৎসবে পরিণত হবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কাছে পরম মূল্যবান সম্পদ, এই জাতীয় সস্তা উৎসবের মাধ্যমে তাঁকে অপমানিত করার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, এক কথায় কি লেখেন নি। তিনি পল্লীসংস্কার বা সমবায় ব্যবস্থার জন্যও চেষ্টিত ছিলেন, কুটিরশিল্পে আগ্রহ ছিল, সেই দিক থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের চেষ্টা কই? যে পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি স্মরণে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করে থাকি তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দেশে এখনও যে সব সুস্থ-মস্তিস্ক-সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন তাঁদের কি কিছু করণীয় নেই?

আতংককর রঙ্গচিত্র

তিন বছর চেষ্টার পর ন্যু ইয়র্ক ষ্টেট নরহত্যা, গুণ্ডামি, রাহাজানি, যৌনবিষয়ক রঙ্গচিত্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আইন সম্মত করেছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই আইন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় অনেক বাকবিতণ্ডা হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকারও এই জাতীয় চিত্রাদি নিষিদ্ধ করেছেন অবশ্য অনেক সহজ উপায়ে। স্তার কমপটন ম্যাকেনজী প্রভৃতি মনীষীরা বলেন, মুদ্রিত অক্ষর বা চিত্রে এমন কিছুই থাকতে পারে না যা মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটায়। কেউ কেউ বলছেন, 'আরব্য উপন্যাস' বাহানস্ ক্রিশ্চিয়ান এনডারসন, রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থও নিষিদ্ধ করা উচিত। কোনো কিছু নিষিদ্ধ করলেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আতংককর চিত্রে যা থাকে পাশের বাড়িতে সে ঘটনা ঘটতে পারে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ত' অনেক রকমের সংবাদ থাকে যায় নারীধর্ষণের বিস্তারিত বিবরণ। মানসিক উৎকর্ষতার ফলেই মানুষ এই সব তুচ্ছ ব্যাপারকে উপেক্ষা করতে পারে, সেই চেষ্টাটাও আইন অনুসারে করা প্রয়োজন। বাংলা দেশে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের নামে কি সব জঘন্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার সন্ধান কেউ রাখে?

সেকস্পীয়র প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস কিংবা কালিদাস বাঙালী ছিলেন কি না, এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। মার্কিণ সমালোচক কলভিন হফ্‌ম্যান আজ কয়েক বছর ধরে বলছেন, সেকস্পীয়ারের নামে যে সব নাটক চালু আছে তা ক্রিস্টোফার মারলো নামক সমকালীন জনৈক নাট্যকারের রচনা, তিনি স্বনামে টামবারলেন, ডাঃ ফাস্টাস প্রভৃতি নাটক লিখেছেন। যুক্তিস্বরূপ হফম্যান বলেছেন, ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ফোলিও সংস্করণ সেক্সপীয়ার গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থকারের ছবিটি মার্লোর প্রতিকৃতির অনুরূপ। তা ছাড়া মার্লোর রচনার সঙ্গে সেক্সপীয়ারের রচনার আঙ্গিক ও ভাষাগত মিল বর্তমান। তৃতীয়তঃ এক পানশালায় কলহের ফলে মার্লো নিহত হন বলে প্রকাশ কিন্তু আসলে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন স্যার টমাস ওয়ালসিঙ্গহাম নামক জনৈক ধনী বন্ধুর ঘরে আত্মগোপন করে থাকেন এবং অবসর সময়ে নাটক রচনা করেন সেক্সপীয়ারের বেনামীতে। সেক্সপীয়ার একজন সাধারণ অভিনেতা মাত্র ছিলেন। আগামী জুলাই মাসে হফ্‌ম্যান ওয়ালসিঙ্গহামের সমাধি খনন করে প্রমাণ সংগ্রহ করবেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভ করেছেন। সেক্সপীয়ার সম্পর্কে সন্দেহটা অনেক প্রাচীন, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর আকৃতি সবই যে জাল তা বার বার বলা হয়েছে। সেক্সপীয়ার

গ্রাম থেকে ঘোড়ার সহিস হিসাবে সহরে আসেন, আবার একদিন সহসা গ্রামে ফিরে যান, সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর জন্ম-দিবস এবং মৃত্যুতিথি একই দিন। নানা কারণে সেক্সপীয়ার সংক্রান্ত সন্দেহটা একেবারে আজগুবি বলা যায় না। কোনো সমালোচক বলেছেন, কোন দিন শোনা যাবে টেনিসনের 'স্মরণে' নামক কবিতা হয়ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রচনা এবং সেদিন আবার কবর খনন করা হবে। মোট কথা, হফ্‌মানের প্রচেষ্টা সার্থক হলে একটি জটিল সাহিত্যিক রহস্যের সমাধান হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেক্সপীয়ারকে যে কোনো নামে অভিহিত করলেও সেক্সপীয়ার সেক্সপীয়ারই থেকে যাবেন।

পাঠাগার কেন্দ্রীকরণ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি জেলায় একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপন করবেন স্থির করেছেন, সেই পাঠাগার অন্যান্য পাঠাগারের পরিচালন নীতি এবং পুস্তক নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করবেন। এই মূল পাঠাগারটি সরকারী নীতি অনুসারেই কর্তব্য পালন করবেন সন্দেহ নেই। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা আমাদের জানা নেই। যেটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তদ্দ্বারা এমন সন্দেহ করা অন্যায় হবে না যে, কিছু পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর পুস্তক নির্বাচন করা হবে। গ্রন্থাগারে সকল প্রকার মত ও পথের পরিপোষক গ্রন্থাবলী থাকাই যুক্তিযুক্ত। অপাঠ্য গ্রন্থ অবশ্যই বর্জনীয় কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের খামখেয়ালীতে গ্রন্থাগার পরিচালিত হলে জনশিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হবে, এ-কথা চিন্তা করা উচিত।

জাতীয় গ্রন্থাগারে মুদ্রণ প্রদর্শনী

পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় মি: চার্লস উইলকিন্‌স বাংলা ছাপার হরফ প্রস্তুত করেন। হালহেদ সাহেবের 'শব্দশাস্ত্র' ইংরাজী ভাষায় লিখিত হলেও তার অন্তর্গত উদাহরণাদি ছিল এদেশী রামায়ণ, মহাভারত, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি জনপ্রিয় গ্রন্থ থেকে। কিন্তু উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে আসার পর ১৮শ শতকের প্রথম দিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হয়। ১৮০১-১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা, আরবী, ফারসী, দেবনাগরী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, চীনা প্রভৃতি চল্লিশটি বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় ২,১২,০০০ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। কেরী সাহেবের প্রেসে বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কলিকাতার মেয়র সতীশচন্দ্র ঘোষ এক অভিনব মুদ্রণ-শিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ছাপাখানার সেকাল ও বর্তমান কালের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনের এক ধারাবাহিক পরিচয় এই প্রদর্শনীতে পাওয়া যায়। জাতীয় পাঠাগারে রক্ষিত জার্মাণ ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন বাইবেলও এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল। শ্রীযুক্ত কেশভন এবং তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এই অপূর্ব প্রদর্শনী সাফল্যলাভ করেছে। এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত সুমুদ্রিত পুস্তকটিও বিশেষ প্রশংসনীয়।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সমবায় নীতি

"মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এই খানেই প্রাণের নিকেতন ; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন—" লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "গ্রামে ফিরে চলো" এই নীতি ঘোষিত হওয়ার অনেক পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ হাতে-কলমে সেই নীতিকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাঁর উৎসাহে গ্রামাঞ্চলে কর্মিসঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল। কবি শুধু কমলবিলাসী ছিলেন না, সংগঠক রবীন্দ্রনাথের আকৃতি বিভিন্ন। জীবনের অনেকখানি সময় তিনি এই কর্মে ব্যয় করেছেন। যেদিন এই বিষয়ে কোনো সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হবে সেদিন তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে। রবীন্দ্রনাথের সমবায়, সমবায়, নীতি, ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা এবং চরকা সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই গ্রন্থটির সম্পদ। কবির স্বহস্ত লিখিত ভূমিকাটি এই গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছে, কিছুকাল পূর্বে মাসিক বসুমতীতে এই ভূমিকা অংশত: প্রকাশিত হয়। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের শততম গ্রন্থ, দাম আট আনা মাত্র।

নদীপথে

বাংলা ও আসামের 'নদীপথে' ভ্রমণ কালে গ্রন্থের সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, 'নদীপথে' এই নামে সেগুলি একত্রিত করে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে, এত দিনে তার পুনর্মুদ্রিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। সুতরাং এই গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্র পুরস্কারের নাম জড়িয়ে কোনো কোনো পত্রিকায় যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা অশোভন। কম লিখলেও অতুলচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত। 'নদীপথের' মধ্যে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় প্রচুর পাওয়া যাবে। কয়েকটি মাত্র কথায়, সামান্য কয়েকটি রেখায়, অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে আঁকা এই বিচিত্র রেখাচিত্র বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। রম্যরচনার পিটুলিগোলা পানে যাঁরা আত্মহারা তাঁরা 'নদীপথে' পাঠ করলে উপকৃত হবেন। পরিতোষ সেনের চিত্রালংকরণ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা বিশ্বভারতীর সুরুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। গ্রন্থটির দাম মাত্র দু টাকা।

ভারত-প্রেমকথা

সুবোধ ঘোষ শুধু মাত্র গল্প, উপন্যাস বা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, কয়েকটি জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর 'ভারতের আদিবাসী', 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস',

সৌন্দর্য্যের
ক্রমবিকাশ...
শিল্পীর কল্পনা তার তুলির স্পর্শে যেমন ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তেমনি, সৌন্দর্যাভিলাষিণীদের লাবণ্যের সাধনাও ধীরে ধীরে সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে ক্যাল-কেমিকোর শ্রেষ্ঠ প্রসাধন সামগ্রীর নিয়মিত ব্যবহারে।
মার্গো সোপ— ক্যালকেমিকোর অনুপম সুগন্ধি নিমের প্রসাধনী সাবান। দেহ মন নির্মল করে তোলে।
নিম টুথপেষ্ট— দাঁত ও মাড়ী সুন্দর ও সুদৃঢ় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস স্নিগ্ধ সুরভিত হয়।
ক্যাষ্টরল— কেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে এই মনোহর সুগন্ধি বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল।
লাবণি স্নো— সৌন্দর্য্য সুষমার লাবণ্য প্রলেপ। মুখকান্তি অনিন্দ্য-সুন্দর হয়ে ওঠে। রূপের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।
রেণুকা ফেস পাউডার— মুখের শোভা ও কমনীয়তা বাড়ায়। রূপের মালিন্য দূর করে।
Neem
MARGO
La bonny
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ
কলিকাতা-২৯

'অমৃত-পথযাত্রী', প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন। "ভারত-প্রেমকথা"র সুবোধ ঘোষ কয়েকটি সুনির্বাচিত মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যান পরিবেশন করেছেন। মহাভারতের অন্তর্গত বহু কাহিনী সর্বজন-পরিচিত। সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত, সেই গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং বর্তমান সময়ে সাহিত্য-সুষমামণ্ডিত কয়েকটি মনোরম কাহিনী সুবোধ বাবু নির্বাচিত করে তাঁর অনন্য-সাধারণ ভাষায় রূপায়িত করেছেন বলে তিনি অকুণ্ঠিত প্রশংসার অধিকারী। এই ৩৭৪ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থটির প্রকাশক—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

চীন দেখে এলাম

মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' নামক জনপ্রিয় ভ্রমণ-গ্রন্থের ২য় পর্ব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। "মাসিক বসুমতী"র পৃষ্ঠায় এই ভ্রমণ কাহিনী এত দিন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কথকের ভঙ্গীতে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক এই বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী বলে গেছেন। তাই 'চীন দেখে এলাম' গ্রন্থটি শুধু যে সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ তা নয়, এর ভেতর সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল। নতুন চীনের যে নিখুঁত আলেখ্য মনোজ বসু রচনা করেছেন তা সাহিত্য পাঠককে মুগ্ধ করবে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—বেঙ্গল পাব্লিসার্স, মূল্য তিন টাকা আট আনা।

প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আর একটি যে স্মরণীয় নাম আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি, তিনি প্রমথ চৌধুরী। এই সাহিত্য-গুরুর কাছে বাঙালী ও বাংলা ভাষা অশেষ প্রকারে ঋণী, অথচ তাঁর সাহিত্য বা জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করি খুব কম, বাংলা সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' এক স্মরণীয় পথচিহ্ন। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে রচিত প্রবন্ধাবলী, 'চার ইয়ারী কথা', 'ঘোষালের ত্রিকথা,' 'নীল লোহিত,' 'সনেট-পঞ্চাশৎ' এবং বিশেষত: সমসাময়িক রাজনীতি সংক্রান্ত সরস প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক এই গ্রন্থটি রচনা করে এক হিসাবে জাতীয় কর্তব্য পালন করলেন। 'সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য' ও 'ষ্টাইল' নামক অধ্যায় দুটি অনবদ্য হয়েছে। পরিশিষ্ট সংযোজন করায় গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এই গ্রন্থটির প্রকাশক—ক্যালকাটা বুকক্লাব, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার প্রিয় কবি, তাঁর অকাল মৃত্যুতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে শোককবিতা রচনা করেন, বাংলা সাহিত্যে তা চিরস্মরণীয়। ১৩২৯ সালে ১০ই আষাঢ় সত্যেন্দ্রনাথের লোকান্তর ঘটে, আজ প্রায় তাঁকে ভুলতে বসেছি আমরা। প্রচারের অভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা শুধু পাঠ্যপুস্তকেই ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি হরপ্রসাদ মিত্র প্রচুর শ্রমসহকারে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী এবং কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি এই নিবন্ধের জন্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, ফিল্ উপাধি লাভ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সত্যেন্দ্রনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শুধু যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা নয়, সমকালীন কবিদেরও প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তাঁর কবিতার গণজাগরণের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্বকীয়ত্ব তাঁকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিছু বিদেশী কবিতাও তিনি অপরূপ ভঙ্গীতে ভাষান্তরিত করেন। ডাঃ হরপ্রসাদ এই বিরাট গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি পরিচ্ছেদ পরবর্তী সংস্করণে বর্জন করলেই ভালো হয়, একটি গ্রন্থসূচীরও অভাব আছে। এই গ্রন্থের প্রকাশক—ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, দাম দু' টাকা মাত্র।

মহলানবীশ পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে রচিত অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের পরিকল্পনা আমাদের হস্তগত হয়েছে। ভারতীয় প্রয়োজনে ভারতীয় পরিকল্পনা রচনা করেছেন অধ্যাপক মহলানবীশ। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য বেকার সমস্যার সমাধান—তার জন্য কর্মসংস্থান ব্যবস্থা। তাঁর পরিকল্পনায় একদিক ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপর দিকে লগ্নীবৃদ্ধি একযোগে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা আছে। জাতীয় আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজের নিম্নস্তরেও আয়বৃদ্ধি হবে। আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষকর আয়-বৃদ্ধি না করে অন্য ভাবে করবৃদ্ধি করতে হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ছয় থেকে আট বছরে বেকার-সমস্যার সমাধান হবে এবং চোদ্দ বছরে জাতীয় সম্পদ দ্বিগুণিত হবে। আমরা অধ্যাপক মহলানবীশের পরিকল্পনার মুন্সীয়ানায় মুগ্ধ। জনগণের কল্যাণে রচিত এই পরিকল্পনা সার্থক হোক।

প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর জনপ্রিয়তা অসীম। দীর্ঘ কাল ধরে এই জনপ্রিয়তা তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রঙ্গমঞ্চে, পর্দায় তাঁর একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ বা চিত্ররূপ সাফল্য লাভ করেছে। অনুরূপা, নিরুপমা, সীতা দেবী, শান্তা দেবীর পর তাঁর আবির্ভাব ঘটে এবং আজ পর্যন্ত তাঁর অক্লান্ত লেখনীতে অসংখ্য উপন্যাস ও গল্প রচিত হয়েছে। জটিলতামুক্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গী প্রভাবতীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'প্রতীক্ষায়', 'ঘূর্ণিহাওয়া,' 'ব্রতচারিণী,' 'আপ-টু-ডেট,' 'প্রিয়ের উদ্দেশে,' 'ছায়ার মায়া' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ এই গ্রন্থাবলীতে একত্রিত করলেন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,—মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

হস্তচালিত বয়ন-বিজ্ঞান

শান্তিপুর বয়ন-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশ ও সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীনিত্যদাস প্রামাণিকের সংযুক্ত প্রচেষ্টায়

'হস্তচালিত বয়ন-বিজ্ঞান' বিষয়ক আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বয়ন সম্পর্কিত নানা বিষয় অত্যন্ত সরল ভাবে বোঝানো হয়েছে। কয়েকটি নক্সা ও উদাহরণ অনভিজ্ঞকে সাহায্য করবে। এই জাতীয় গ্রন্থের সাহায্যেই কুটিরশিল্পের প্রসার হবে সন্দেহ নেই। যাঁরা অল্প খরচে ব্যবসার পথের সন্ধান করেন এই গ্রন্থ তাঁদের সহায়ক হবে। গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্থান, ইষ্টার্ণ ষ্টোর্স—১০৩, নেতাজী সুভাস রোড, কলিকাতা (১), দাম চারি টাকা।

নববর্ষ

ইদানীঃ বাংলা দেশে বাসিক পত্রের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। 'মঞ্জরী' এবং 'বর্ষবাণী' নামক মহিলা চালিত দুটি বার্ষিকের কথা আমরা জানি। 'নববর্ষ' বার্ষিক পত্রটি সর্বসাধারণের, তাই তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। মুদ্রণ-পরিপাট্য, অঙ্গসজ্জা, রচনা নির্বাচন সকল ব্যাপারেই সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাণা বসু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতির প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও প্রাণতোষ ঘটকের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'বাসিফুলের মালা' এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। নববর্ষ (১৩৬২) ১১, নূর মহম্মদ লেন থেকে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা মাত্র।

বসন্ত বাহার

কবি গোপাল ভৌমিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বাক্ষর' প্রকাশের পর হাল্কা সুরের প্রেমধর্মী তেইশটি কবিতা নিয়ে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এই 'বসন্ত বাহার'। কবির কবিতাগুলোতে একাধারে বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়াবেগের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তিনি আধুনিক কবি হয়েও অকারণে দুর্বোধ্য নন। 'বসন্ত বাহারে'র প্রায় সব কবিতাই কবির ভাবস্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। ছাপা ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। এই কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক : গ্রন্থজগৎ, ৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-২৯। দাম : দেড় টাকা।

জানবার কথা

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত দশটি খণ্ডে সমাপ্ত 'জানবার কথা' ছোটদের জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের অভাব পূরণ করেছে। প্রথম খণ্ডে বিজ্ঞান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ইতিহাস, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে যন্ত্রকৌশলের কথা, ষষ্ঠ খণ্ডে পৃথিবীর খবর, সপ্তম খণ্ডে অর্থনীতি রাজনীতি, অষ্টম খণ্ডে সাহিত্য, নবম খণ্ডে চারুশিল্প ও দশম খণ্ডে দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নানান দিক থেকে নানান ভাবে শ্রীঅশোক ঘোষ, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ হাত মিলিয়ে দশখানা বই লিখেছেন। জানবার কথায় প্রতিটি খণ্ডে হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে। ছাপা ও কাগজ খুবই ভালো। জানবার কথা মুখ্যত ছেলেদের জন্যে রচিত হলেও বড়রাও যে পড়ে একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জানবার কথার প্রকাশক : স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা-২০। দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা।

অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি—কাকলি

অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর যাবতীয় রচনার স্বত্বাধিকার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে দান করে গেছেন। কয়েক বছর আগে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ অতুলপ্রসাদ সেনের গানের এক সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন 'গীতিগুঞ্জ' নাম দিয়ে। সম্প্রতি 'কাকলি' এই নামে সমাজ অতুলপ্রসাদ সেনের গানগুলির মধ্যে কয়েকটির স্বরলিপি প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। পর পর কয়েকটি খণ্ডে কবির গানের স্বরলিপির সংগ্রহ সম্পন্ন হবে একথাও জানিয়েছেন মুখপত্রে। অতুলপ্রসাদ সেনের গানের চাহিদা ক্রমেই বাঙালী এমন কি অবাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্দ্ধিত হচ্ছে। এ সময়ে কবির স্বরলিপির প্রকাশ প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। পুস্তকটির ছাপা, বাঁধাই ভাল। দাম দু' টাকা।

রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী-সংগম

পরের সুরে নিজের কথা বসানো কি পরের কথায় নিজের সুর বসানোর আর এক নাম গানভাঙা। আড়াই হাজার গান রয়েছে কবিগুরুর। যার কিছু গান এমনি ধারা। সংখ্যায় নগণ্য হলেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এদিকটা নিয়ে এর আগে কখনও আলোচনা হতে দেখিনি বড়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সে দিক দিয়ে এ বই প্রকাশ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এদিকটায় এক নতুন আলোক আনলেন। হিন্দী, কানাড়ী, গুজরাটী, মান্দ্রাজী, মহীশূরী, পাঞ্জাবী বা শিখ ভজনের আওতায় যারা পড়েছে সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দর ভাবে তিনি সেগুলিকে বিচার করে দেখিয়েছেন। উদাহরণও দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। শেষে একপ গানের একটি তালিকাও পুস্তকটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পুস্তকটির ছাপা, বাঁধাই, অঙ্গসজ্জা মনোরম। প্রকাশক বিশ্বভারতী। দাম বারো আনা মাত্র।

আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অন্তমা, (উপন্যাস), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিসার্স। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। * * * হরিনারায়ণ বাবু বর্মামুলুকের কাহিনী লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের পটভূমিকা বাংলা দেশ। নায়ক সুপ্রিয় সংস্কৃতি-সম্পন্ন নির্ভীক যুবক, অনুভাকে ভালোবাসত, জেল হওয়ায় বিবাহ হয়নি। অনেক হাঙ্গামার পর অবশেষে মিলন ঘটলো। * * * * * * নিশ্চেতন মন (উপন্যাস), শোভা দুই। প্রকাশক—ডি, এম লাইব্রেরী, দাম আড়াই টাকা মাত্র।···শোভা দুই মাঝে মাঝে কিছু ছোট গল্প রচনা করেছেন, উপন্যাস বোধ করি এই প্রথম। উপন্যাস হিসাবে শ্রীমতী শোভা দুই নিশ্চেতন মনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক কাহিনী * * * রেল লাইনের ধারে (উপন্যাস)···অন্নপূর্ণা গোস্বামী, প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিসার্স, মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। শ্রীমতী গোস্বামীর নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। 'রেল লাইনের ধারে' একখানি সরল সুখপাঠ্য কাহিনী। ভাষার বৈচিত্র্য এবং ঘটনার অভিনবত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

রঙ্গপট

অভিনয়-শাস্ত্রের নানা দিক—কনসেনট্রেশন (১)

অভিনয়, শুধু অভিনয় নয়। আরও অনেক কিছু। কনসেনট্রেশন, ড্রামাটিক এ্যাকশন, অবজারভেশন, মেমারি, রিদম্ আরও কত কি! শুধু হাত-পা নেড়ে, চীৎকার করে, ষ্টেজের ওপর লাফালাফি করে অভিনয় করা আর চলে না। এবং তা অভিনয়ও হয় না। সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী নাটকের দিকে বিশেষ মন দিয়েছেন। অভিনয় কলার নানা ছলাকলা সম্পর্কে তাঁরা এবার ওয়াকিবহাল হবেন। সরকার থেকে এবং বে-সরকারী ভাবে থিয়েটার সেণ্টার, আই. পি. টিএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সমূহও অভিনয়ের নানা দিকে উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করছেন। এই সময় আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকার জন্য অভিনয়-শাস্ত্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। সে আলোচনা তাঁদের কেমন লাগে আমাদের জানবার আগ্রহ রইলো।

রিচার্ড বোলসাভস্কি, রাশিয়ার এক মস্ত অভিনেতা কনসেন্ট্রেশন কি সেই সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে বলছেন, **Concentration is the quality which permits us to direct all our spiritual and intelectual forces towards one definite object and to continue as long as it pleases us to do so—sometimes for a time much longer than our Physical strength can endure.** উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলছেন, **I knew a fisherman once who, during a storm, did not have his rudder for forty-eight hours, Concentrating to the last munites on his work steering his schooner. Only when he had brought the schooner back safely into the harbor did he allow his body to faint,**

আর্ট কাউকে কখনো শেখানো যায় না। তা সে যে আর্টই হোক না। প্রতিভা নিয়ে না জন্মালে বড় জোর একলব্য হওয়া চলে, অর্জ্জুন হওয়া যায় না। তবু সেই প্রতিভার উন্মেষের জন্য প্রয়োজন হয় সাধনার।

কনসেনট্রেশন কি? বিজ্ঞানী বসে আছেন মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে, শিল্পী ছবি আঁকছেন ইজেলে, পাইলট প্লেনে ইঞ্জিন কণ্ট্রোল করছেন, সকলেই বাইরের সমস্ত বিশ্ব ভুলে গেছেন। সকলের সামনেই শুধু এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক তপস্যা, এক লক্ষ্য। কি করে সফল করবেন তাঁদের কাজ, অহরহ চিন্তা করছেন তাই। কিন্তু অভিনেতা? তাঁর তো মাইক্রোসকোপ নেই ইজেল কি ক্যানভাস নেই, নেই ইঞ্জিন? অভিনেতার কনসেনট্রেশনের মিডিয়াম কি? তিনি নিজেই তার মিডিয়াম। কি করে হয় সেই কনসেনট্রেশন? **It is only after studying and repairing that the actor starts to create.** সত্যিই তাই কি?

কিন্তু সেই এ্যাকটিং কি?—**Acting is the life of the human soul receiving its birth through art।** সৃষ্টি করার জন্য স্রষ্টার যে আবেদন, যে পরিশ্রম, যে এ্যাডভেঞ্চার তাই অভিনয়। সু-অভিনয়ের জন্য চাই শিক্ষা। দস্তুর মত শিক্ষা। কনসেন্ট্রেশন আনবার জন্য সে শিক্ষা তার তিন ভাগ। প্রথমেই শরীর। একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন, একেবারে কাদার মত নিয়ে খেলা করতে হবে নিজের দেহকে। তিনি প্রেসক্রপশন্ দিচ্ছেন, **An hour and a half daily on the following exercises : Gymnastic, rhythmic gymnastics, classical and interpretive dancing, fencing, all kinds of breathing exercises, Voice placing exercises, diction, singing, Pantomime, make-up. An hour and half a day for two years with steady practice,** তিনি আরও বলছেন। শিক্ষার পরিচ্ছেদ হোল ইনটেলেক্‌চুয়াল এবং কালচারাল। সেক্সপীয়র, মলিয়ের, গোটে থেকে সুরু করে যোগেশ চৌধুরী অবধি সব পড়তে হবে। শুধু পড়া নয়, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষক এগুলি সুকণ্ঠে আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীর মনে গেঁথে দিতে পারলে আরও ভালো হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রকৃতি এবং অর্থ উপলব্ধি করতে হবে সম্যক ভাবে। তৃতীয় ভাগ হল, এডুকেশন এ্যাণ্ড ট্রেণিং অব দি সোল। ড্রামাটিক এ্যাকশনের এইটাই হলো সব চেয়ে বড় জিনিষ। এইটিই এমন একটি জিনিষ যা চট করে শেখানো চলে না। পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, ডেভলাপমেণ্ট অফ এ মেমারি অব ফিলিং, কল্পনা শক্তির বিকাশ, স্মৃতি ইত্যাদি নানা শক্ত জিনিষ রয়েছে এ অধ্যায়ে। অন্যান্য বক্তব্য আগামী সংখ্যায় পাবেন।

শাপ-মোচন

ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল। গল্প মন্দ নয়। অভিনয়ে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর ভাল। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত। ছবি 'সাকসেসফুল' হবে বলেই বিশ্বাস। একাধিক বার দেখা চলবে।

সেই 'উদয়ের পথে'। বড় লোকের মেয়ে আর গরীবের ছেলে। গরীবের ছেলেটি প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে-বাজিয়ে ('উদয়ের পথে'তে

লেখক) বংশপরম্পরায়। কিন্তু বংশে অভিশাপ আছে গুরুর। সঙ্গীতের আরাধনায় বারণ আছে। নচেৎ অকালমৃত্যু বা অঙ্গহানি কিংবা দুই হবে (এই কারণেই নিউ বটল বলছি) নিশ্চিত। কিন্তু চুপচাপ বাড়ী বসে থাকলে কারও দিন চলে না। শুধু পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাক দিয়ে চিরকাল সংসার করতে পারা যায় না। তাই বড় ভাইকে ঘরে রেখে ছোট ভাই (উত্তমকুমার) বেরুলেন কলকাতায়। সম্বল একটি মাত্র ঠিকানা—অমুক চন্দ্র অমুক, টিম্বার মার্চেন্ট। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা কলকাতায়। অপ্রত্যাশিত ভাবে জুটলো আশ্রয়। (শুধু আশ্রয় নয় স্নেহ ভালবাসা। একেবারে অর্দ্ধেক রাজ্যের সঙ্গে এক রাজকন্যা (সুচিত্রা সেন) তাঁরই কাছে ! কারণ, এক দিন উত্তমকুমারের পিতা নাকি রোগশয্যায় অপরিসীম সেবাযত্ন দিয়ে সারিয়ে তুলেছিলেন মাধুরীর (সুচিত্রা সেন) পিতা (কমল মিত্র)কে। তার পর একটি মধুর ভালবাসার বিস্তার। ধীরে, অতি ধীরে। এবং শেষকালে নানা ভুল বোঝাবুঝি, বিরহ-মিলন, গান আর কথা, রোগ আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে মিলনও ঘটল এক দিন। মোটামুটি গল্পটির আউট লাইন হল এই। এবারে ছবির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক একে একে। প্রথমেই ধরা যাক, গল্প। কাহিনী শুরু হল ফ্লাশব্যাকে। এক ভাই (পাহাড়ী সান্যাল) আর এক ভাইকে শোনাচ্ছে বংশের অভিশাপের কথা। কিন্তু সেই গল্প শোনাবার 'অকেশন'টা কি ? পরে উত্তমকুমারের কথা শুনে তো মনে হল না যে গল্পটি তিনি সেদিনই শুনলেন (খড়ের গাদার নীচে রাখা বেহালাই তার প্রমাণ। ভাইপোকে গান-বাজনা করতে নিষেধ করাও।) হঠাৎ। তাহলে ? কলকাতায় এলেন উত্তমকুমার। বাড়ী পেলেন কি করে তা দেখানো হল না কেন ? ছবি বড় হবার ভয়ে কি ? তাহলে বলব, অনেক কিছু অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাদ দিয়ে ছবিটিকে সাড়ে পনেরো হাজার ফুট থেকে বারো হাজারে আনা যেত ! সুচিত্রা সেন হঠাৎ যে ভাবে উত্তমকুমারকে ঘরে ডেকে এনে খাট, টেবিল-চেয়ার বোঝাতে শুরু করলেন তাতে তো মনে হল উত্তমকুমারের আসাটা যেন আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। ছবির গোড়াতেই অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ওঠাটা ঠিক হল ? এত বড় টিম্বার মার্চেন্ট একটা চাকরী করে দিতে পারলেন না ? পার্টির ছবিটা কি কোনও রেষ্টুরেন্ট থেকে নেওয়া ? শুধু দু'জনের সঙ্গে দু'জনের ছাড়া আর যে কথাই হল না যে কারও ? চিন্ময় লাহিড়ী বললেন হাজার টাকা পেলেও তিনি গান শেখান না তবে ঐ বাড়ীতে গানের শিক্ষক তিনি কেন ? আর ঐ মুখ টিপে হাসি আর কাকাতুয়ার মত শেখানো বুলির আবৃত্তিটা কি হল ? বরং শ্যামল মিত্র মন্দ করেন নি এদিক থেকে। মেস মানেই কি কয়েক ডজন ভাঁড়ের আস্তানা ? যে গৃহে পরিচিত কি অপরিচিত যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম আলাপে তুমি বলাটাই রেওয়াজ সেখানে নৈনিতাল যাবার আগে সুটকেসের গায়ে বাংলায় 'নৈনিতাল' লেখাটা কি যুক্তিযুক্ত হল ? আর ঐ রেলওয়ে ষ্টেশন বাংলায় সাইনবোর্ড ? এই প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে এবার অন্যান্য দিক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই নাম করব সুচিত্রা সেন এবং উত্তমকুমার দুজনের। দুজনেরই অভিনয় ভাল হয়েছে (যদিও গান আর বাজনায় দু'জনেই বিশেষ কাঁচা। বেহালায় আবোল-তাবোল ছড় টানা আর ভুল এ্যাঙ্গেলে বাঁধে টিপ ফেলা, বাঁ হাত ইনএ্যাক্টিভ থাকা মাঝে মাঝে এই সব কারণেই বলছি।) মোটামুটি। কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায় এমন কি একটি দৃশ্যের জন্য এসে অমর মল্লিকও সু-অভিনয় করে গেছেন। গঙ্গাপদ বসুর অভিনয়টা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। বনানী চৌধুরী কি তপতী ঘোষ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করবার নেই। সেট সম্পর্কে বাঙালী দর্শক ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছে। ফিক্সড্ সেটগুলিকে সব সময়ই ঘর-বাড়ী তৈরীর কাজে না লাগিয়ে কিছু কিছু টেম্পোরারী অরিজিন্যাল সেটেরও দরকার। অঙ্গশ্রী টেলারিংয়ের ঐ গলি আর কত ছবিতে আমরা দেখব। ষ্টুডিওগুলির খোলনলচে বদলানো এখুনি দরকার। এ ছবির সব চেয়ে সমৃদ্ধ দিক হচ্ছে সঙ্গীত। এবং সত্যিই বলছি, তা' হয়েছেও ভাল। 'নগরীর ইতিকথা' গানখানি তো খুব পপুলার হবে মনে হয়। ফটোগ্রাফী এবং শব্দগ্রহণ মন্দ নয়। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করেই বলছি, যে কোনও শ্রেণীর দর্শককে ছবিটি আনন্দ দিতে পারবে। একাধিক বার দেখবার মত অনেক অনেক দিন পর বাঙলায় একখানা ছবি পাওয়া গেল একথাও বলছি, সেই সঙ্গে কেন তা আর নাই বললাম নতুন করে।

বীর হাম্বীর

ঐতিহাসিক ছবি তুলতে গিয়ে ছবির ইতিহাসে এক ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্টের পরিচায়ক। প্রচুর ভুল-ত্রুটি। অভিনয় প্রায় সকলেরই খারাপ লাগল।

সাধারণ ইতিহাসের ছাত্র বীর হাম্বীরের কথা মনে করে রাখেনি। পড়েছে কি না সন্দেহ। 'দলমাদল' কামানের কথাটা হয়ত মনে আছে। মনে আছে মল্ল রাজাদের কথা। সেই মল্লরাজাদের শেষ বংশধর বীর হাম্বীর। রাজপরিবারের সন্তান মানুষ হল জঙ্গল-পাহাড়ে এক দস্যুসর্দারের হাতে। দস্যুসর্দারও আসলে মল্লরাজবংশের এক পুরাতন পদস্থ কর্মচারী। বীর হাম্বীর গোকুলে বড় হল। এবং একদা পুরাতন বংশ-শত্রুদের কাছ থেকে ছাড়িয়েও নিল তার অধিকার। এরই পাশে পাশে দস্যু-সর্দারের (কমল মিত্র) কন্যার (মঞ্জু দে) সঙ্গে বীর হাম্বীরের (নবাগত অরুণপ্রকাশ) এবং বর্তমান মল্লরাজ (অহীন্দ্র চৌধুরী) কন্যার (মিত্রা বিশ্বাস) এক প্রেমের ট্যাঙ্গল্ পাওয়া গেল। চোখের জল থেকে কামানের গোলা অবধি সব আছে। ফকির মাথায় পালখ গোঁজা তীর দিয়ে এক সেকেণ্ডে মানুষ খুন থেকে ডাকাতি, জঙ্গলে লড়াই, ঘোড়সওয়ার, কেল্লা, তাঁবু, হরিণ-শিকার সব আছে এ ছবিতে। কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে সামঞ্জস্য নেই। ছবির গোড়াতে বাঙলা কথা টেনে টেনে বলবার চেষ্টা দেখলাম মঞ্জু দে এবং অরুণপ্রকাশকে। কিন্তু ছবির শেষে একেবারে পরিষ্কার কলকাতার আধুনিক বাংলা উচ্চারণ। সঙ্গীতের ভাষাও আধুনিক। সুরও। মিত্রা বিশ্বাসের ড্রেস করে শাড়ী পরাটা বড় চোখে লাগল। তখন কি ওর রেওয়াজ ছিল? গরুর গাড়ীটাকে 'ক্লোজশটে' দেখাতে গিয়ে সেটা যে এক পাক ঘুরে আটকে গেল এবং তার পিছন দিকটা যে তখনও লেন্সের আওতার বাইরে যায়নি তা এডিটিংয়ের সময় চোখে পড়ল না? পরেই লঙশটে আবার গরুর গাড়ীটিকে দেখা গেল যে। হঠাৎ গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গিয়েই সব গোলমাল করল না কি? অভিনয়ের দিক থেকে প্রায় সকলেরই খারাপ। একমাত্র কমল মিত্রের অভিনয়টা মন্দ লাগেনি। মঞ্জু দে'ও চলনসই। নবাগত ও নবাগতা অরুণপ্রকাশ ও মিত্রা বিশ্বাস হোপলেস। মিত্রা বিশ্বাস তো আবৃত্তি করছেন মনে হয়। মোটেই 'ফ্রী' নন তিনি। দু'-একটি দৃশ্যে নীলিমা দাস মন্দ অভিনয় করেননি। যাই হোক, ইতিহাস নিয়ে ছবি তোলার এই প্রচেষ্টাটুকুর প্রশংসাই করব, ছবি যে রকমই হোক না কেন। ভবিষ্যতে এঁরা নিশ্চয়ই ভাল করবেন আশা রাখি।

জ্যোতিষী

উৎকৃষ্ট গল্প। বিকাশ রায়ের অভিনয় বেশ ভাল লাগল। বিষয় নির্বাচনে বাঙলা ছবির 'ডিপার্চার' দেখে আনন্দ পাচ্ছি।

ভবিষ্যৎকে জানবার আগ্রহ প্রজার চেয়ে রাজার কম নয়। সত্যিকারের একজন জ্যোতিষী। গণনা যার অভ্রান্ত তারই গল্প। কিন্তু শুধু অপরের ভাগ্য নয়, নিজের ভাগ্যও গণনা করতে হয় জ্যোতিষীকে। করতল আর কোষ্ঠি মিলিয়ে কেবলই পাওয়া যায় দু'টি অমঙ্গল চিহ্ন। জাতক মাতৃঘাতী আর তার স্ত্রী করবে কুলত্যাগ। তাই জ্যোতিষী বরদাচরণ বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' তার মা মারা গেলেন কাশীতে গঙ্গায় ডুবে। বিয়েও করতে হল কাশীরই একটি মেয়েকে। মেয়ে কুলত্যাগও করল সত্যি। কিন্তু সত্যিই কি কুলত্যাগ? না, পাশের বাড়ীর এক ধনী মাতাল দুশ্চরিত্র পুত্রের কারসাজীতে স্বামি-স্ত্রীর এক কলহের সুযোগ গ্রহণ? শেষেরটাই ঠিক হল এবং একদিন যখন সরমা (জ্যোতিষীর স্ত্রী) শাড়ীতে গলা আটকিয়ে···। তখনই এল বরদা। নিজের চেয়েও বড় এক জ্যোতিষীর (তারই গুরু) কাছে জেনে এসেছে যে একের ভাগ্য অপরের ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সরমা কখন কুলত্যাগ করতে পারে না। না! অতএব···মিলন। খুব মিষ্টি একটি গল্প নিয়ে ছবি তোলা হয়েছে। এবং গল্পের নানা অসঙ্গতি শুধু এই গল্পের মিষ্টতাটুকুর জন্যই উৎরে গেছে। নানা অবাস্তব সিচুয়েশন যেমন লোকাল ট্রেনের পক্ষে অতক্ষণ ধরে একটানা চলা গাড়ীতে অপর কোনও ব্যক্তি না থাকা। গাড়ীটা কি রিজার্ভ করা ছিল? এক বৎসর সময় যে অতিবাহিত হয়েছে তা দর্শক কি করে জানবে বরদার মৃত্যুর পর? সেই কাশীতে সরমা যখন একাই পথ চিনে যেতে পারল তখন ভুল ট্রেণে ওঠার সময় তার সন্দেহ হল না কেন? সে তো পথ-ঘাট চেনে না এমন নয়। যে ভাই (মাসতুতো) অত স্মার্ট ভাবায় বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার সময় চিঠি দিতে পারে তার ঐ বোকামীটা কি সমর্থনযোগ্য? পাউডার ফেলার ঘটনাটাও অস্বাভাবিক নয় কি? এ রকম জোর করে হাসাবার চেষ্টা কেন? বউ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাদলের ষড়যন্ত্রটা বড় চোখে লাগে, সরমা পরিষ্কার করে বাদলের সব কথা স্বামীকে বলল না কেন? ঝি যে টাকা নিল সেটা কি কারণে (একশো টাকার কথা বলছি) তা না হয় বুঝলাম কিন্তু সে রকম কিছু তো করতে দেখলাম না? এই রকমের নানা অসঙ্গতি থাকলেও ছবিটি সত্যিই আমাদের ভাল লেগেছে। ছবিতে বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ভালই লাগলো। প্রশান্তকুমারের ন্যাকামীটা অসহ্য, অবাস্তব। দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় খানিকটা উন্নত হয়েছে এ ছবিতে। তিন জন নবাগতা মিত্রা বিশ্বাস, নীরা দত্ত ও মীরা রায় সকলেই হোপলেস। এখনো কথাই বলতে পারেন না ক্যামেরার সামনে ভাল করে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পাশের মুদীর চরিত্রে মাঝে মাঝে চমৎকার দু'-একটি হাসির আবহাওয়া এনে দিয়েছেন। সেটের সাহায্যে মথুরা, বৃন্দাবন না প্রয়াগ কি সব জায়গা দেখানো হল ওটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। ফটোগ্রাফী অন্যান্য ছবির অপেক্ষা খারাপ হয়নি, এ-কথাই বলব। তবে সব চেয়ে বিড়ম্বনার কথা হল এই যে, এর পর শুনছি শুধু এই ভাগ্যের বিড়ম্বনা নিয়েই বাঙলা দেশে হাফ-ডজন ছবি উঠছে! সেগুলোর কি গতি হবে তাই ভাবছি। পরিশেষে বলছি, জ্যোতিষী পণ্ডিত না ৪২০ এই বিজ্ঞাপন দিয়ে সিনেমার কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিকৃত রুচিরই পরিচয় দিয়েছেন।

— রঙ্গপট প্রসঙ্গে —

চাওয়া আর পাওয়াটাই জীবনের প্রায়সব-কিছুই বলা চলে। মন যেটুকু চায়, পাওয়াটা কিন্তু নিখুঁত ভাবে ততখানি হয় না। কোথায় যেন খানিকটা অভাব থেকে যায়। উত্তমকুমার, সুচিত্রা, কাবেরী, প্রদীপকুমার প্রভৃতির "চাওয়া ও পাওয়া"র চিত্ররূপ দেখা যাবে শহরের রূপালী পর্দায়। কে যে কতখানি চেয়েছিল আর কে বা কতখানি পেয়েছিল, ছবি দেখার পর প্রমাণিত হবে।

"শুভ পরিণয়" এর ছবি তুলছেন ডি, জি, প্রোডাকসন্স। এই পরিণয়ে সাক্ষী থাকবেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, তুলসী, মঞ্জু, জয়শ্রী, অজয়কুমার প্রভৃতি শিল্পীরা। "শুভ পরিণয়" যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় পরিচালক দিব্যেন্দু ঘোষ সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

পাপ করলেই পাপী হতে হবে। যেখানেই পাপী সেখানেই পাপের দর্শন পাওয়া স্বাভাবিক। অশোক চিত্র তাই "পাপ ও পাপী"র ছবি একসঙ্গে তুলে ধরবেন জনসাধারণের চোখের সামনে। ছবিখানিতে দেখা যাবে মুখ-চেনা অনেক শিল্পীদের—যেমন পাহাড়ী, বিকাশ, অসিতবরণ, শিশির মিত্র, অনুভা, সবিতা প্রভৃতি।

কোলকাতায় তো ভাড়া বাড়ী পাওয়াই দায়। এক বাড়ীতে এখন নানা রকমের বিভিন্ন ভাড়াটিয়া। মনের মিল বা মতের মিল পরস্পরের মধ্যে খুব কমই আছে। জানি না, কো অপট্ ফিল্ম যে "ভাড়া বাড়ী"র সন্ধান দেবেন, জনসাধারণের সে বাড়ীখানি মনঃপূত হবে কি না!

"উপেক্ষিতা"কে ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে দীপ পিকচার্স বন্দী কোরে রেখেছেন অনেক দিন। সত্যিই সে উপেক্ষিতা কি না, জনসাধারণকেই বিচার করতে হবে শহরের রূপালী পর্দায়। প্রণতি, রবীন, শোভা সেন, রবি রায়, তুলসী, নৃপতি, অনুপকুমার প্রভৃতি শিল্পীদের ভিড়ের মধ্যেই "উপেক্ষিতা"র সন্ধান পাওয়া যাবে।

বোবা মেয়ে "শ্যামলী"র অভিনয় দেখেনি এমন লোক কোলকাতার মত শহরে খুব কমই আছে। এবার কিন্তু "শ্যামলী"র দেখা পাওয়া যাবে রূপালী পর্দার উপরে। অভিনয় কোরেছেন কিন্তু কাবেরী আর তাঁর সঙ্গে আছেন উত্তমকুমার। কল্পনা মুভীজ ছবিখানি পরিবেশনার ভার নিয়েছেন।

ছবির পর্দায় কবে যে "চলাচল" শুরু হবে, তাই এখন চিন্তার বিষয়। শুরু হলেই কিন্তু শহরের সিনেমা-হলগুলিতে লোক চলাচলের মাত্রাও বাড়বে নিঃসন্দেহ। কারণ, অরুন্ধতী, বসন্ত চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি নামকরা শিল্পীদের "চলাচল" দেখবার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা আশ্চর্য্য নয়। এই ব্যাপারে আসল উদ্যোক্তা এভারেষ্ট সিনে কর্পোরেশন।

"সাহেব বিবি গোলাম"কে এবার ক্যামেরায় ধরে রাখছেন প্রযোজক বি, এন, সরকার। আপাততঃ নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওটাই হ'য়েছে ক্যামেরাম্যানের ব্যাকগ্রাউণ্ড। "সাহেব বিবি গোলাম"কে উপলক্ষ কোরে বহু নামকরা শিল্পীরা ঐ দলে ভিড়ে গেছেন। ষ্টুডিও থেকে তুলে শহরের পর্দায় আনার ভার নিয়েছেন নন্দন পিকচার্স।

"শ্যামলী" নাটকের নায়ক উত্তমকুমার হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ষ্টার থিয়েটারের টিকিট-ঘর মাঝে বেশ কিছু দিন বন্ধ রাখতে হ'য়েছিল। লোকসানটাও সেই কারণে মন্দ হয়নি। উত্তমের ভাগ্য উত্তমই বলতে হবে।

"দেবী মালিনী" ছবির সুটিং-এর সময় এই সেদিন হঠাৎ পা ফসকে পড়ে গিয়ে শিল্পী কাবেরী বসু একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলেন। সুখের কথা, তিনি এখন সেরে উঠে, আবার রীতিমত সুটিং-এ যোগ দিয়েছেন। শিল্পীরা যেন পালা কোরে বিপদের সামনে এগিয়ে চলেছেন। নায়িকা কাবেরী বসু আহত হওয়ার পরই নায়ক বসন্ত চৌধুরীও পড়লেন দুর্ঘটনার কবলে—ছোঁয়াচে বলতে হবে। শিল্পী রবীন মজুমদারও সুটিং-এর হাড়-ভাঙা খাটুনি সহ্য কোরতে না পেরে, সত্যি সত্যিই মোটর-দুর্ঘটনায় নিজের হাড় ভেঙে ফেললেন একদিন। ভাঙা হাড় জোড়া দিয়ে এখন তিনি আবার সুস্থ হ'য়েছেন। ওদিকে মঞ্জু দে অনেক দিন টাইফয়েডে ভুগে ভুগে এখন আবার সুস্থ হ'য়ে রীতিমত সুটিং-এ যোগ দিয়েছেন। বসন্ত চৌধুরী এক দুর্ঘটনার পর আবার পড়লেন রবীন মজুমদারের সঙ্গে। সুখের কথা, তিনিও সেরে উঠেছেন। সুপ্রভা মুখার্জ্জীর ক্যানসার অপারেশন বেশ নিরাপদেই হয়ে গেছে। শিল্পীদের এখন বিপদের পালা। সাবধান থাকাই উচিত।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরামেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

কুশলী অভিনেত্রী শ্রীমতী শিপ্রা দেবী (মিত্র)

সুর ও সঙ্গীতের প্রতিই অনুরাগ ছিল তাঁর। বরাবর অভিনয়-জগতে যে তিনি এলেন সে একটা ঘটনাচক্রেই বলা চলে। শ্রীমতী শিপ্রা দেবী নিজেই নিজের সম্পর্কে বলছেন—প্রকৃত পক্ষে আমি ছিলুম একজন সঙ্গীতশিল্পী। ছেলেবেলা থেকেই আমি সঙ্গীত চর্চ্চা ক'রতুম—সুর ও সঙ্গীত ছিল আমার প্রাণ। মেগাফোন কোম্পানীতে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে যখন কাজ করছি সে সময় প্রেরণা পেলুম, স্বর্গীয় প্রমথেশ বড়ুয়ার (বিখ্যাত চিত্র পরিচালক) কাছ থেকে। অভিনয়-জগতে নেশায় এসেছিলুম, এখন দাঁড়িয়ে গেছে পেশায়।

মঞ্চ ও পর্দ্দায় কুশলী শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী শিপ্রা দেবীর (মিত্র) নাম আজ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে। দীর্ঘ দশ বছর কাল ধরে নানা ভূমিকায় তাঁর অভিনয় চলছে, অভিজ্ঞতাও কম লাভ করেননি এ'র ভেতর নিশ্চয়ই। চিত্রাভিনেত্রী শিপ্রা দেবী যখন যে চরিত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছেন ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে প্রাণবন্ত করে। শিল্পের প্রতি গভীর দরদ ও মমত্ব বোধ না থাকলে এমনটি হ'তে পারে না, এ

বলাই বাহুল্য। মঞ্চে শিপ্রা দেবীর ভূমিকা, সে'ও এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এখন যে তাঁর অভিনয় চলেছে, সাম্প্রতিক কালে এমন কুশলতা খুব কম শিল্পীই হয়তো প্রদর্শন করেছেন। এক কথায় ব'লতে গেলে কি মঞ্চে কি রূপালি পর্দ্দায় আজকের দিনে তিনি একজন সার্থক শিল্পী, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী।

এর ভেতর একদিন শ্রীমতী শিপ্রা দেবীর সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে আলোচনা হ'লো আমার। আলোচনা কালে তাঁর উচ্চ শিল্প-জ্ঞান আমি লক্ষ্য করলুম। আমি এক একটি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করে চলছিলুম তিনি দিয়ে যাচ্ছিলেন উত্তর অত্যন্ত ধীর ভাবে। এ লাইনে আসবেন বলে একদিন হয়তো তাঁর কোন স্বপ্নই ছিল না কিন্তু আসার পর এ'কে কতখানি দরদ দিয়ে গ্রহণ ক'রেছেন, বার বারই ধরা পড়লো তা তাঁর কথায় ও বাচনভঙ্গীতে।

'নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত ভাবীকাল এ আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি, সে ১৯৪৫ সালের কথা। তারপর কত ছবিতে কত ভূমিকাতেই তো অভিনয় করলুম। আনন্দ ও তৃপ্তিও যে কম পেয়ে আসছি, এমন ব'লতে পারিনে।' আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী শিপ্রা এ ভাবে উত্তর দিয়ে চলেন। 'কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি, হিসেব কষে জোর করে হয়তো ব'লতে পারবো না। তবু যদি বলতে হয়, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'কৃষাণ' ছবিতে দুর্গার চরিত্রে অভিনয় করে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম।'

শ্রীমতী শিপ্রা দেবী আমার পরবর্ত্তী প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে বললেন, 'চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়া যখন স্থির করলুম, তখন ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি আমার মনে স্থান পায়নি। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে যেটুকু দ্বিধা বা আপত্তি হতে পারে, এর হয়তো ব্যতিক্রম হয়নি আমার বেলাতেও। তবে সেটা তেমন কিছু নয়।'

নিজের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর বিবরণ দিতে যেয়ে শ্রীমতী শিপ্রা বললেন 'নিতান্ত সহজ ভাবে—সকালে উঠে এক দিকে স্নানাদি সেরে ফেলি, অপর দিকে অশ্বারোহণ ও শরীরচর্চ্চায় মনোযোগ দিই। স্নানের পর পূজা-অর্চ্চনার কাজ চলে। তার পরেই হয় বাচ্চাকে নিয়ে পড়তে বসা। বাচ্চার পরিচর্য্যা শেষ করে স্বামী দেবতার কাজ-কর্ম্ম করতে হয়। এর মাঝে সংসারের এটা-ওটাও না দেখলে চলে না। পরিচারকদের রান্নাবান্নার কাজও বুঝিয়ে দিতে হয় আমাকে। নামকরা লেখকদের বই পড়ারও আমার অভ্যাস রয়েছে। বর্ত্তমানে টেক্নিক সংক্রান্ত বই আমি বেশী পড়ি। মঞ্চে যোগদানের পর থেকে মঞ্চের নামকরা নাটকগুলোও পড়তে আমার ভাল লাগে। স্যুটিং যেদিন থাকলো, সেদিন বেরিয়ে পড়ি, আর যেদিন অবকাশ, বিকেল বেলা চলে আমার সঙ্গীতচর্চ্চা। মোট কথা আমি ঘোর সংসারী—সন্ধ্যা-পূজা করি, গৃহকাজ দেখি, সঙ্গীতচর্চ্চা করি ইত্যাদি।'

এর পর আমি প্রশ্ন তুললুম—আপনার 'হবি' বলতে কি আছে? শ্রীমতী শিপ্রা অমনি বললেন—রাইডিং বলতে পারেন। খেলাধূলোর ভেতর আমি সব কিছুই ভালবাসি, তবে 'টেবল টেনিস' আমার সব চাইতে প্রিয়। সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিও

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুপ্রসিদ্ধ গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
টেলিফোন :-৩৪-১৭৬১ গ্রাম ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ
২০০/২/জী. রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা·ফোন·সিকে: ৪৪১১.
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে
ব্রাঞ্চ ঃ—জামসেদপুর

আমার একটা দুর্ব্বলতা আছে। আমি প্রায় সব কয়টি মাসিক পত্রেই লিখে থাকি—গল্প, প্রবন্ধ যখন যা হয়। পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বলতে হ'লে আমি বলবো সাদা-সিধে ধরণের পোষাকই আমার বেশী প্রিয়। সব রকম শালীনতা বজায় রেখে পোষাক-পরিচ্ছদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অভিনেত্রীদের বেলাতে এ কথা অবিশ্যি সব সময়ে খাটে না।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি? প্রশ্নটি শুনে শ্রীমতী শিপ্রা দেবী স্পষ্টই জানালেন—'একান্তই আবশ্যক। কিন্তু বাংলা দেশের শিল্পী আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরের উপর নজর দেওয়া আমাদের সব সময় হয়ে উঠে কি? এটা আমাদের অবশ্য একটা মস্ত বড় দোষ স্বীকার করবো।'

এ ভাবে আমাদের আলোচনা চললো বেশ খানিক ক্ষণ। দেখলুম তখনও শিপ্রা দেবীর কাছ থেকে জানবার রয়েছে দু-একটি জরুরী কথা। আমি জান্‌তে চাইলুম চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? শ্রীমতী শিপ্রা দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর করলেন—'সকলের আগে চাই অভিনয়-ক্ষমতা, সুকণ্ঠ, চেহারা। আরো যেটি না হলে নয় সেটি হচ্ছে নিষ্ঠা। অথচ আমাদের দেশের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে এ বিরল। এ শিল্পকে সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার জন্ম আমি বলবো অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ'তে আসবার প্রয়োজন রয়েছে এবং সবাই এ'তে আসতে পারেন।'

এর পর আমি একটা হাল্কা প্রশ্ন করলুম—বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি? শিপ্রা দেবীও হাল্কা ভাবে উত্তর দিলেন এ প্রশ্নটির—'অন্যের কথা বলতে পারিনে, আমার সম্পর্কে বলতে পারি, আমার স্বামী কখনও আপত্তি তো করেনই নি, পরন্তু স্পষ্ট বলবো তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন প্রচুর।'

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? এ প্রশ্নটি তুলে ধরতেই শ্রীমতী শিপ্রা পরিষ্কার বললেন—'আমার মতে চলচ্চিত্রের স্থান সমাজ-জীবনে অনেকখানি। এর মাধ্যমে আমাদের অনেক শেখবার আছে। এ'কে আমি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গই বলবো। এর উন্নতির জন্যে সরকারের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।'

সর্ব্বশেষে নিজের জীবনকথা বলতে যেয়ে শিপ্রা দেবী দ্বিধাহীন ভাবে বললেন—'ছোটবেলার কথা তো বললুম খেলা-ধূলো, সঙ্গীতচর্চ্চা ও পড়াশুনোতেই আমার প্রথম জীবনের দিনগুলো কাটে। বাবা ছিলেন রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার, বাবার সঙ্গে আমরা প্রথমে ছিলুম কাটিহারে। সাত আট বছর যখন আমার বয়স হ'লো তখন কল্‌কাতায় আসি আমি বাবার সঙ্গেই। তখন থেকে কখনও কল্‌কাতা, কখনও কাঁচড়াপাড়া এ ভাবে দিন কাটে। স্কুলে পড়বার সময়েই সঙ্গীতের দিকে আমার ঝোঁক যায়। আমার মা-বাবা দু'জনেই গানের ভক্ত। তাঁদের থেকে আমিও প্রেরণা পেলুম গান শেখবার। এখন অভিনয়-জগতে এসেছি, শিল্পী হিসেবে যদি এতটুকু ছাপ রেখে যেতে পারি, তবেই বুঝবো আমার জীবন সার্থক।'

"স্বপ্ন ভাঙা"

শ্রীপূরবী চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখার দিন হল শেষ
এবার এস ফিরে,
এই ধরণীর শ্মশান-ঘাটে
শুষ্ক নদীর তীরে।

ফিরে এস হেথা, সুখ-দিন গত
দুঃখ এল বুঝি জমা আছে যত।
কঠিন মাটির বুক-ফাটা কান্না
ধোঁয়া ওঠে আকাশের পরে।
তপ্ত হাওয়ার প্রবল আঘাতে
ফুলগুলি ঝরে পড়ে—

আকাশের মুখে মিনতি জানায়,
দুঃখ তাদের ভরা কানায় কানায়।
চলেছিনু আমি আকাশে ভেসে
আপন মনে দূর কল্পলোকে।
হল মোর বন্ধ ডানার এ ছন্দ
হারানু ভাষা চক্ষের পলকে।

কালো মেঘ ঘিরে রুধিল গো পথ,
গতি তার হারাল থেমে গেল রথ।
পড়িনু অতলে অশ্রুর জলে
জীবন আমার হারাল গতি।
ঝরে গেল রূপ নিবে গেল ধূপ,
জীবন-পথের নিখিল জ্যোতি।

গন্ধ বহে না কণ্ঠ গো চুপ
সে বীণা বাজিত সুরে অপরূপ,
সে আজি বাজে না লহরী তোলে না।
মনের বরণা-ধারা বন্দী হল,—
নিঠুর প্রাচীরের আড়ালে।
এই দুর্দ্দিনে চক্ষে তোমার কে অঞ্জন পরাল?

ভুয়া-ভুঁইয়া

[২৫২ পৃষ্ঠার পর]

বিকৃত মুখাকৃতি পরিচারিকার। ভয়ে আর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ। কোন এক দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন যেন। যশোদা বলে,—আমাদের জমিদারের কানে গেলে কি যে পরিণাম হবে, ভাবতেও কণ্ঠরোধ হয়ে আসে আমার। কোথা থেকে কা'কে একটা যে জোটালে!

ক্ষণমধ্যে বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে নামে কালো ছায়া। হাসি মিলিয়ে যায় রক্তিম অধরের। নিমেষের মধ্যে যেন তাঁর ভাবপরিবর্তন হয়। রাজকন্যা বলেন,—তোমাদের জমিদারই বা জানবে কোথা থেকে? অন্যায় কি হ'ল?

যশোদা বললে,—বামুনটাকে সরাসরি অন্দরে ডেকে আনলে, আগু-পাছু ভাবলে না একবার? প্রহরী যদি সাতগাঁয়ে খবর পাঠিয়ে দেয়?

শ্রাবণের মেঘ নামলো যেন বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। নীরব গম্ভীর হ'লেন। অপলক চোখে তাকিয়ে পাষাণের মত নিস্পন্দ হলেন। রাজকুমারীকে বাক্যহীন দেখে পরিচারিকা আবার বলে,—কি ব'লবে তাই বল'। বেশ ছিনু ওখানে, পুজো দেখছিনু। ব্রাহ্মণের পুজো করার ধরণ দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়।

বিন্ধ্যবাসিনী পরিচারিকার শেষের কথায় খুশী হন, কিন্তু প্রকাশ করেন না। কম্পিতকণ্ঠে বললেন,—সিধেটা সাজিয়ে দেবে না যশো?

যশোদা বললে,—পারবোনি আমি। সিধে সাজাতে যে জানিনে। তুমিই দাও না কেন। তোমার রাঙাহাতের সাজানো সিধে দেখলে না জানি কত খুশীই হবে ঐ পূজারী ঠাকুর।

পরিচারিকার মুখ চেপে ধরলেন বিন্ধ্যবাসিনী। তার আরও যেন কিছু বক্তব্য ছিল, বলা হয় না আর। রাজকন্যার মিনতিপূর্ণ সুর। বললেন,—তোর পায়ে ধরি যশো।

আরও কি যেন বলতে চায় পরিচারিকা, থাকে অব্যক্ত। তার মুখে রাজকুমারীর নধর নরম হাত। বিন্ধ্যবাসিনী আবার বললেন,—ভাঁড়ারে গিয়ে সিধেটা সাজিয়ে দে ভাই। চাল, ডাল, ঘি, তেল আর কাঁচা শব্জী দিয়ে সাজিয়ে দে। একজনের মত পরিমাণ দিবি। এই তোর হাতে ধরছি আমি।

কথার শেষে যশোদার হাত রাজকুমারী নিজের হাতে ধরলেন। যশোদা আর কোন দ্বিরুক্তি করলো না। সেই স্থান ত্যাগ করলো তৎক্ষণাৎ।

পরিচারিকাও চলে গেল, বিন্ধ্যবাসিনীও ছুটলেন অন্য এক পথে। বুকের আঁচল সামলে ছুট দিলেন উর্দ্ধশ্বাসে। প্রথমে একতলার লম্বমান দালান অতিক্রম করলেন। উঠান, চাতাল পেরিয়ে ছাদের সোপান ধরলেন। বিদ্যুৎগতিতে গৃহের ছাদে আরোহণ ক'রে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অনেকটা পথ পেরিয়েছেন, হাঁফ ধ'রে যায় যেন। কিন্তু কালক্ষেপ নয়, বিন্ধ্যবাসিনী আবার দৌড়লেন। বিস্তীর্ণ ছাদ পেরিয়ে চললেন খাস কামরায়। সেখানে আছে তার কাঁথা-মাদুর, পুঁটলী-প্যাটরা, কাপড়-চোপড়।

আকাশ-দিগন্ত কেঁপে উঠছে থরথরো। বিদ্যুৎ চমকায় ঘন ঘন, সাপের মত আঁকাবাঁকা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমেছে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে। বাতাস নেই বললেই হয়। গাছের পাতা স্থির হয়ে আছে। গুমোট গরম।

বিদ্যুৎশিখার মতই ছুটেছেন যেন সোনার বরণ রাজকন্যা। রুক্ষ এলো কেশরাশি উড়ছে পেছনে। ছুটতে ছুটতে ছাদ থেকে বারেক দেখলেন পাশে তাকিয়ে। অথৈ জল আমোদরকে দেখলেন, ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের প্রতিবিম্ব নদীর জলে। আকাশের মত যেন থমকে আছে নদীর জল, প্রবাহ নেই।

নদীর ওপারে বৃক্ষরাজি। চাষের জমি। বর্ষণের লোভে লোভে চাষারা হাসি মুখে আল বাঁধতে বেরিয়েছে

ক্ষেত-খামারে। যে যার জমিতে আল বাঁধবে, বর্ষাজলের আগে।

বিন্ধ্যবাসিনী কামরায় পৌঁছে পালঙ্কে বসে পড়লেন। অনাহারে দুর্ব্বল শরীর আর বুঝি বয় না! সজোর শ্বাস পড়ছে রাজকন্যার। বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছে ঘন ঘন। কপালে স্বেদবিন্দু ফুটেছে।

কালক্ষেপ নয়, এখনই যে কাজ সারতে হবে। পালঙ্ক ত্যাগ করলেন রাজকন্যা। কলে চাবি ঘুরিয়ে প্যাটরা খুলে কি যেন তুলে নিয়ে লুকোলেন বস্ত্রাঞ্চলে। কলের চাবি ঘুরিয়ে প্যাটরা বন্ধ করলেন। চাবি রাখলেন কামরার এক গোপন কুলঙ্গীতে।

ছাদ থেকে গৃহের ফটক লক্ষ্যে আসে। ছাদের হেথায়-সেথায় ধূলিজঞ্জাল জড় হয়ে আছে। কাণা কড়ি, নুড়ি-ঢেলা, মাটির ঘড়া-কলসীর ভাঙা-টুকরো কোথাও স্তূপীকৃত। ছাদের নালা-নর্দ্দমার মুখে পাতখোলার রাশ।

বিন্ধ্যবাসিনী এক খণ্ড ঢেলা তুলে ফটক লক্ষ্য ক'রে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। কোন সাড়া নেই দেখে আরেকটি তুললেন। একটি বেশ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড।

প্রহরী ইতি-উতি তাকিয়ে দেখে সক্রোধে। কার এমন সাহস যে ঢ্যালা ছোঁড়ে তার উদ্দেশে! বর্ম্মধারী পাঠানের দৃষ্টি এড়ায় না। দেখে হাতের দেশী বন্দুকটা নামিয়ে নেয়।

বিন্ধ্যবাসিনী হাতছানি দিলেন। ডাকলেন। বস্ত্রাঞ্চল আন্দোলিত করলেন আহ্বানের ইশারায়।

বর্ম্মধারী প্রহরী দ্রুত এগিয়ে আসে গৃহের প্রান্তর পেরিয়ে। ছাদের নীচে এসে দাঁড়ায় ঊর্দ্ধমুখে। লৌহশিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত পাঠানের মুখ দেখা যায় না।

একখানি রেশমী রুমাল কুণ্ডলীকৃত প্রায়, ছাদ থেকে নীচে ফেলতেই পাঠান লুফে নেয় অচিরাৎ। খুলে দেখে, এক বহুমূল্য রত্নহার। শিরস্ত্রাণে ঢাকা মুখ প্রহরীর, নয়তো লক্ষ্যে পড়তো, ঐ নির্দ্দয়ের শ্রীমুখেও হাসি ফুটেছে। প্রহরী গোটা কয়েক সেলাম ঠুকে আবার তাকালো ওপর দিকে।

রাজকন্যা সহাস্যে ও মৃদুস্বরে বললেন,—বকশিশ। তুমি লও।

আবার সেলাম ঠুকতে থাকে প্রহরী। দেশী বন্দুকটা নামিয়ে পর পর আরও শত খানেক সেলাম দেয়।

বিন্ধ্যবাসিনী আর এক পল দাঁড়ালেন না। ছাদ ত্যাগ করে পূর্ব্ববৎ দৌড় দিলেন। সিঁড়িতে নামলেন। তড়িৎ-গতিতে সোপানশ্রেণী ভেঙে চললেন ভাণ্ডারে। পরিচারিকা যশোদা নিশ্চিত এখনও সেখানেই আছে।

ঝড়ের মত গিয়ে হাজির হ'লেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘন ঘন শ্বাস ফেলেন, কথা যেন আর বলা হয় না। হাঁফ ধরে বুকের মধ্যে।

যশোদা সিধা সাজানোর কাজ করছে তখনও। থালায় চাল তুলেছে, ডাল তুলেছে। মৃন্ময়পাত্রে ঘি আর তেল ঢেলেছে। কাঁচা শাকশব্জী চাপিয়েছে থালায়।

কেমন যেন শ্রান্তকণ্ঠে রাজকুমারী বলেন,—দাসী, এই নাও দক্ষিণা। পুরোহিতকে দাও। আর বল' একই সময়ে যেন তিনসন্ধ্যের পূজো চুকিয়ে যান। বার বার আসা-যাওয়ায় তাঁর যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকালেই পূজার সুবিধা, তাও জানিও।

—একটি পৈতে যে দিতে হয় বৌ। কথা বললো আর হাত পাতলো পরিচারিকা। বিন্ধ্যবাসিনী তার হাতে দিলেন একটি আসরফি। বললেন,—এই দক্ষিণার সাথে মূল্য ধ'রে দিও। হাতে-কাটা পৈতা এখন কোথায় মেলে!

কথার শেষে কেমন যেন ক্লান্তচরণে চললেন রাজবালা। এই ভাণ্ডার থেকে দোতলার উপরে খাস-কামরা, অনেকটা পথ। পা যেন চলতে চায় না, অবশ অঙ্গ যেন। ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, তমসাবৃত আকাশের মত বিন্ধ্যবাসিনার মুখ। খিল-খিল হাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ কি কথা শুনে, কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন।

কম্পমান পদক্ষেপ, অঙ্গ যেন বইতে চায় না আর। বিন্ধ্যবাসিনী সিঁড়ির মুখে গিয়ে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফিরে দেখলেন, কালো আকাশ। কাজল-কালো।

সত্যিই আকাশ গুমরে গুমরে ওঠে তখনই। বজ্রপাত, কানে হাত তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। অজগরের মত ঘনান্ধকার সোপান-শ্রেণীতে রাজকুমারীর চরণধ্বনি বেজে উঠলো।

আমোদরের তীরে কোন এক মাথা-উঁচু তালগাছের শিখরে আগুন ধরলো। নিদাঘ-শুষ্ক গাছের পাতা জ্বলছে দাউ-দাউ। শূন্য থেকে ছিটকে, বাজ পড়েছে বৃক্ষশিরে। কাজল-কালো আকাশের ঠিক বুকে যেন আগুন ধ'রেছে

[ক্রমশঃ।

আমাদের দারিদ্র্যের বিজয়-কেতন

"স্বাধীনতা লাভের আট বৎসর পরেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সেই সময়ও স্বাধীন ভারতের দিকে দিকে যে দারিদ্র্যের বিজয়-কেতন উড্ডীন রহিয়াছে, কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীইউ এন ধেবরও এই পরম সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। গত সোমবার বোম্বাই-এ স্বদেশী লীগের বৈঠকে তিনি দেশে ভয়াবহ দারিদ্র্যের এক মর্মান্তিক কাহিনী প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে সফর করিতেছেন···এইরূপ এক কংগ্রেসকর্মীর পত্রে জানিতে পারিয়াছেন, কোন গ্রামের এক মহিলা জীবন ধারণের উপযোগী কর্মসংস্থান করিতে না পারায় পাঁচ দিন যাবৎ উপবাস করিতেছেন। গ্রামবাসীদের সাহায্য লইতে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ অস্বীকার করা সঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নয়। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ-বাক্য আছে —'নিত্য নাই যার তাকে দেয় কে!' নিজের উপার্জনের পন্থা যাহার নাই, অন্য লোকে তাহাকে কত কালই বা সাহায্য করিতে পারে! কংগ্রেস-সভাপতিই উল্লিখিত ঘটনাটি সম্পর্কে বলেন যে, উহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ-পর্যন্ত তাঁহার কাছে এইরূপ ত্রিশটি ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু এইরূপ কত ত্রিশটি ঘটনার সংবাদ যে তাঁহার কাছে পৌঁছিবার সুযোগও পায় নাই, তাহার তালিকা পাওয়া যাইবে কোথায়? আমাদের দেশের চরম দরিদ্রতার উহা সামান্য একটি অংশ মাত্র।"

—দৈনিক বসুমতী।

পূর্ববঙ্গ শান্ত হোক

"সে যাহাই হউক, পূর্ববঙ্গে গভর্ণর শাসনের অবসান হইয়া যে মন্ত্রিশাসন পুনরায় প্রবর্তিত হইল, ইহাতে সকলেই আনন্দিত। যদিও পূর্ববঙ্গের গভর্ণর সাহাবুদ্দিন সাহেব ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পদত্যাগই করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, অনুমান করা হইতেছে যে, মন্ত্রিশাসন প্রবর্তন সম্পর্কে তিনি মিঃ মহম্মদ আলীর সহিত একমত নহেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহাকে পূর্বে কিছু জানানো হয় নাই বা তাঁহার সহিত পরামর্শ হয় নাই, এজন্যও তিনি ক্ষুব্ধ দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ। যদিও তাহাতে বিশেষ কিছুই যায়-আসে না। কারণ, পূর্ববঙ্গের প্রধান বিচারপতিকে সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণর নিয়োগ করা হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যুক্তফ্রন্ট দলের নির্বাচন কালীন বহু বিঘোষিত একুশ দফা কর্মপদ্ধতির প্রতিশ্রুতির কি হইবে? নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সরকার আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহারা আগামী সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে যতটা সম্ভব, উহা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার এ উক্তি কতটা সত্য, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি দ্বারাই বুঝা যাইবে। পূর্ববঙ্গের সেক্রেটারী বাহিনীর মনোভাব পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মনোভাবের অনুকূল নহে। হক সাহেবের পদচ্যুতির প্রধান কারণও ছিলেন তাঁহারাই। তাঁহারা কিন্তু বহাল তবিয়তে সেখানেই রহিয়াছেন। শ্রীআবুহোসেন সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও উঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠা কত দূর সম্ভব হইবে, তিনিই বুঝিবেন। আমরা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ঐক্য, যোগাযোগ ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থরক্ষা সুনিশ্চিত হইলেই খুসী হইব। নূতন মন্ত্রিসভার শাসন ও পরিচালনে পূর্ববঙ্গের শান্তি ফিরিয়া আসুক, আমাদের ইহাই কামনা।"

—যুগান্তর।

বিরোধী দল থাকুক

অথচ এদেশের পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল প্রকৃত বিরোধী দলের প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের দোষ-ত্রুটি কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডগণ দেখিবেন, সংশোধন করিবেন, উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন—ইহা সত্য হইতে পারিলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন আত্মানুসন্ধান ও 'আত্মদোষস্খালন' আদর্শ নির্ভরযোগ্য নিরাপদ ব্যবস্থা নহে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলের বাহিরে আর একটি এমন দায়িত্বশীল জনসাধারণের আস্থাভাজন রাজনৈতিক দল দেখা দেওয়া প্রয়োজন, যাহা কেবলমাত্র সরকারের ভুল-ভ্রান্তিরই নিরাকরণের চেষ্টা করিবে না, যাহাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব এমন স্তরে উন্নীত হইবে, যাহার দ্বারা জাতির বিকল্প নেতৃত্বও প্রয়োজন দেখা দিলে কায়েম হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা সেই দায়িত্বের ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব নহে, বাকি থাকে কম্যুনিষ্ট পার্টি। এই দল সুযোগ-সুবিধা পাইলে সব-কিছুরই জন্য প্রস্তুত। এই দলের আদর্শ ও কর্মনীতি এবং মতিগতি ভারত-ছাড়া বলিয়াই ভারতবাসীর নিকট অগ্রহণীয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিরোধী দলগুলির অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি

তাঁহাদের এতাবৎ কালের কর্মনীতি মাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইতেছে বলিয়া উহা হইতে বিরত হইবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। বিকল্প নেতৃত্ব কাহারো নাই বলিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বে জাতি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল থাকা এদেশেও আবশ্যক। ভারতের গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্যই তেমন একটি আদর্শনিষ্ঠ বিরোধী দলের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন, এমন কি, বর্ত্তমানে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের নেতা ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও তেমন বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

শিক্ষকদের বেতন-সমস্যা

"আমাদের শিক্ষক-সমাজ এবং বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা জীবন ধারণের নিম্নতম মানেরও অনেক নীচে—একথা দেশের সমস্ত বিবেচক মানুষই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু শাসক মহলের মুখে সদা-সর্ব্বদা শুধু একটি কথাই শোনা যাইত—হাটে-মাঠে সুযোগ পাইলেই তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতেন যে, এই শিক্ষকগণ একেবারে অযোগ্য বলিয়াই নাকি দেশের শিক্ষার এই দুর্দ্দশা। এখন আর কেউ নয়, একেবারে ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারী জনাব হুমায়ুন কবীরও বেশি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, শিক্ষক-সমাজ এবং বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে-রকম শোচনীয় বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা সমাজে শিক্ষকদের যথাযোগ্য সম্মান পাওয়ার পথে অন্তরায় বাধাস্বরূপ। আর এই শোচনীয় পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের মনেও খুব ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। দেরীতে হইলেও কর্তৃপক্ষের একজনেরও যে কিছুটা চৈতন্য হইয়াছে, তাহা আশার কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্ব্বনিম্ন বেতনের যে-ছকটি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না।" —স্বাধীনতা।

ফ্যামিলি এলাউন্স

"বাঙলার মন্ত্রীদের প্রত্যেকের তিন শত টাকা দামের কনফিডেনসিয়েল এসিসটেন্ট মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছামত এক বা ততোধিক লোক লইতে পারিবেন, টাকার পরিমাণ ঠিক থাকিলেই হইল। শুনিলাম, বাঙলা দেশে মন্ত্রী মহাশয়েরা কনফিডেনসিয়েল লোক খুঁজিয়া পাইতেছেন না। নিতান্ত বাধ্য হইয়া ঘরে ঘরেই টাকাটা রাখিয়া দিতে হইতেছে। ডাঃ আর আমেদ নিজের পুত্রটির জিম্মা করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বরদাস জালান নিয়াছেন একশ টাকায় গুরুপুত্র আর দুই শ টাকায় আতুষ্পুত্রকে। আমরা বলি, নলচে আড়ালের আর প্রয়োজন কি? মন্ত্রীদের বেতন বাড়াইতে চক্ষুলজ্জায় আটকায়। তাহাদের বহু রকম ভাতা তো হইয়াছে। একটা তিন শত টাকার "ফ্যামিলি এলাউন্স" করিয়া দিলেই তো ঝামেলা চুকিয়া যায়।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার

নয়াগ্রাম থানার ২নং ইউনিয়ান হইতে শ্রীজন্মেজয় নায়েক জানাইতেছেন যে, ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্যান্য স্থানের মতন খেলাড় নয়াগ্রাম পরগণাতেও এ বৎসর অনাবৃষ্টি জনিত ব্যাপক অভাব দেখা দিয়াছে। লোকের দুঃখ-কষ্টের শেষ নাই। নয়াগ্রাম পরগণা মুর্শিদাবাদ নবাবের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। উক্ত নবাব ষ্টেট প্রজাদের এই দুর্দ্দিনের বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য, সার্টিফিকেট, মালক্রোক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রভৃতি বাহির করিয়া দুঃস্থ প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্য ২।১ বৎসরের খাজনার জন্যও এই অত্যাচার চলিতেছে। সরকার অবিলম্বে ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে গরীব প্রজারা এই দুর্দ্দিনে মারা যাইবে। এই বিষয়ে জেলাশাসক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)

সরকার এখনও সতর্ক হউন

"চন্দননগরে জলাভাব সম্পর্কে যে প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ রহিয়াছে, যে বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং তাঁহাদের স্থানীয় প্রতিনিধিরা একেবারে পিঠে কুলা এবং কানে তুলা দিয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর দিন দারুণ গ্রীষ্মে ১০৫°, ১০৮° ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে পানীয় জলের অভাবে বিরাট এলাকা জুড়িয়া হাহাকার উঠিয়াছে। মহিলারাও আজ তাঁহাদের ধৈর্য্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া জলের দাবীতে পথে নামিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু সরকারী ভবনে Refrigerator-এর জল পান করিয়া পাখার ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে বসিয়া কর্ত্তার দল এখনও উপলব্ধি করেন নাই—গণ-বিক্ষোভ আজ কোন স্তরে পৌছিয়াছে। রাস্তার কলে কলে আজ জল লইতে যাইয়া সাধারণ লোক পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি করিতেছেন। কিন্তু আর দুই দিন বাদে নিজেদের মারামারি ভুলিয়া তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ ক্রোধের আগুন সরকারের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া দিবে, এ চিন্তা সরকারের মনে উদয় হইতেছে না কেন? হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া নির্ব্বাচনের আগে (কংগ্রেসের প্রচার করার জন্য কি-না জানি না) সরকারী প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ-মহল তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু সামান্য তৎপরতা দেখাইলে, সামান্য অর্থব্যয় করিলে চন্দননগরের তীব্র জলাভাবের উপশম হয়, সেদিকে নজর দিবার ক্ষেত্রে সরকারের কর্ম্মচারীরা Callous Indiffernce অবলম্বন করিতেছেন।" —সমাচার (চন্দননগর)।

হায় সোনার বাঙলা!

"ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল বাঙলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে। বাংলার তিন ভাগের দু'ভাগ উর্ব্বর ভূমি দিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তানের হাতে। বাংলার শস্যশ্যামল অঞ্চল পদ্মা মেঘনার পলি দিয়ে তৈরী। কৃষিবঙ্গ হারিয়ে বাংলার আয়তন কমে গেল। অপর দিকে ভারতের অন্যান্য রাজ্য বৃদ্ধি পেল। বিহারের আয়তন বৃদ্ধি পেল সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান রাজ্যকে যুক্ত করে। যুক্তপ্রদেশের সাথে যুক্ত হলো রামপুর, তেহরি গাড়োয়াল ও বেনারস রাজ্য (৬৩৭৬ বর্গ-মাইল), বোম্বাই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোলাপুর, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, গুজরাট ইত্যাদি ১৭৬৩টি রাজ্য (৩৬৭৮৬+১১১৪), মাদ্রাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাদুকোত্তি, বনগোনাপল্লী ও সুন্দর রাজ্য—১৬০২ বর্গমাইল। বাংলাকে কেটে কেটে ছোট ছোট করে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার বিষময় ফল ফলতে সুরু করেছে। এই

বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে বাঙ্গালী আজ বিশের জ্বালায় ছটফট করছে —মৃত্যু এসে দেখা দিয়েছে সবার সম্মুখে। এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ এক দল লোক। এই সব মতলববাজ লোক বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন চালিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অপর দিকে বাংলার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাচ্ছে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে একচেটিয়া মালিকানা কায়েম করে। বাংলায় আর্থিক কাঠামোর ভারসাম্য ভেঙ্গে গেছে দেশ বিভাগের ফলে। পশ্চিম বাংলার বিধান সভায়ও এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলার নিজের বলতে আজ আর কিছু নেই,—তার মূলধন নেই, নেই কাঁচা মাল, সে বাজার হারিয়েছে, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রমিকও নিজের নয়। কাজেই বর্ত্তমানে বাংলাকে অন্যান্য রাজ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরতাই বাংলাকে করেছে মৃত্যু-পথ-যাত্রী।

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ

"আবাদীর মিটিংএর 'সোসালিষ্টি'ক প্যাটার্ণের প্রস্তাবে কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকেরা মোটেই চিন্তিত না হইলেও সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী দেশমুখ মহাশয় তাঁহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন। আবাদীর এ্যাকসন কিরূপ চলিতেছে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বোঝা যাইবে।

পাইকারী মূল্যহার ১৯৬১ আগষ্ট—১০০

	৩০শে এপ্রিল	৩০শে মার্চ্চ	১ বৎসর পূর্ব্বে
	১৯৫৫	১৯৫৫	১৯৫৪
খাদ্যদ্রব্য—	২৭৪'৯	২৯৫'৩	৩৭২'৭
শিল্পের কাঁচা মাল	৩৯৪'১	৪০৩'৪	৫৭৩'৫
আধা তৈয়ারী মাল	৩২৮'৫	৩২৯'৫	৩৬৫'০
তৈয়ারী মাল	৩৭৪'৪	৩৭৫'১	৩৮৩'৬

দেখা যাইতেছে, খাদ্যদ্রব্য বা কাঁচা মালের মূল্য যথেষ্ট হ্রাস হইলেও তাহা যখন শিল্পপতিদের অর্থাৎ কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকদের হাতে পড়িতেছে তখন সেই হারে উহা হ্রাস পায় নাই। স্পষ্টতই শিল্পপতি, গোষ্ঠী উচ্চ দাম কৃত্রিম ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কংগ্রেস সরকার তাহাদের ঘাঁটাইতে চাহিতেছেন না। নির্ব্বাচন আসিতেছে। তাহাদেরই দেওয়া টাকা পাইয়া তবেই তো সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ সমাজ গঠন সম্ভব হইবে।।"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)।

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে

"বর্দ্ধমান বিজলী কারখানা সরকারী দখলে আসার পর কর্ত্তৃপক্ষ বর্দ্ধমান সহরে বিজলী সরবরাহ ব্যবস্থার দ্রুত নিশ্চিত উন্নতির প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়াছিলেন। গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের জানান হইয়াছিল যে, ১ই এপ্রিল একটি নূতন মেসিন্ ফিট করা হইয়াছে, ২।৩ দিনের মধ্যে আরও দুইটি মেসিন ফিট করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে, এবং চতুর্থ মেসিনটি যথাশীঘ্র আনয়নের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু আজ জুন মাসেও আমরা দেখিতেছি—যথা পূর্ব্বং, তথা পরং। বিজলী সরবরাহের ত্রুটি ও অব্যবস্থার জন্য আজও সহরবাসীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ছোট শিল্প ও ব্যবসার ক্ষতি হইতেছে। প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ এখন নাকি বলিতেছেন যে, মেসিন ফিট করিতে বিদেশ হইতে ইঞ্জিনীয়ার আনিতে হইবে। 'ডি-ভি-সি'র বিদ্যুৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত নানা অজুহাতে এই প্রকার গতিগচ্ছং চলিতে থাকিবে—সহরবাসী অনেকেই এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন।"

—বর্দ্ধমানের ডাক।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গতি, না দুর্ভিক্ষ ?

"সমগ্র পশ্চিম-বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়িয়া আজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি সমগ্র রাজ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে সাধারণ দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের নিকট এক ভয়াবহ সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহাকে বরং সমস্যা না বলিয়া মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন বলা যাইতে পারে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বীরভূমের সদর মহকুমার সিউড়ী, দুবরাজপুর, রাজনগর, খয়রাশোল, বোলপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহাকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ছাড়া আর কিছু বলা যাইতে পারে না। যদিও পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন সমাগত সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও বৎসরের এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের গড়পড়তা মূল্য যদিও কম তথাপি এই রাজ্যের নয়টি জেলার জনগণের মধ্যে অন্নবিত্তের দুর্গতি বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সোয়া দুই লক্ষ দুর্গত লোক টেষ্ট-রিলিফ কার্য্যে

যুক্ত রহিয়াছে।......জনগণের মধ্যে উপরোক্ত যে দুর্গতি তাহা খাদ্যাভাবের দরুণ হয় নাই। সাধারণ ভাবে ভূমিহীন কৃষকদের পূর্ণ কর্মাভাব ও সম্পূর্ণ বেকারী অবস্থার দরুণই এরূপ দুর্গতি দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়ের উক্তিতে উপরোক্ত দুর্গত এলাকার প্রকৃত অবস্থা লঘু করিয়া দেখান হইয়াছে। ঐ সব অঞ্চলে সরকারী ব্যবস্থায় যে সাহায্য কার্য্য চলিতেছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাহাও নিঃসন্দেহে অপ্রচুর। যদিও সরকারী মহল যাহাকে 'দুর্গতি' বলা হইতেছে, আসলে তাহা দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর। তাই আজ জেলার ৫৩টি ইউনিয়নের দুর্গত এলাকায় অনেক লক্ষ নিরুপায় অধিবাসী সরকারী দাক্ষিণ্যের দ্বারে সাহায্যের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে এবং আজিকার এই সরকারী সাহায্যই এই দুর্গত জনতার জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল। এই দিনে সাহায্যমন্ত্রী হিসাবের অংক কষিয়া চাউলের দরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই দুর্গতির কারণ খাদ্যাভাবের নহে, কর্ম্মাভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

গোয়ালপাড়ার ঘটনা

"গোয়ালপাড়ার ঘটনা আসামকে শুধু নহে, বিশ্বের চক্ষে সামগ্রিক ভাবে ভারতবাসীকেই হেয় করিয়াছে। সেই ঘটনার উৎপত্তি কোথায় এবং আবার যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না হয় এ সম্পর্কে উভয় রাজ্য সরকার এবং উভয় প্রদেশ কংগ্রেস যদি আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া একটি কার্য্যকরী পন্থা বাহির করিতে পারেন—direct actionএর হুমকি আসে কোথা এবং কিসের বা কাহাদের জোরে এই মামদোবাজী দেখাইবার সাহস আসিতেছে তাহা অবশ্যই খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গালী নিজের প্রদেশে সভা করিয়া বৃহত্তর বঙ্গের দাবী করিলে প্রাদেশিকতার রব তুলিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করা হয়,—কিন্তু অন্য প্রদেশের লোক তুচ্ছ অহমিকায় বাঙ্গালীকে অপমান করিবে, লাঞ্ছনা করিবে এবং তাহার জন্য বড় জোর একটা মামুলী 'এনকোয়েরী' হইবে কিংবা 'ও কিছু নয় স্থানীয় সাময়িক উত্তেজনা' বলিয়া ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করা হইবে—ইহা দেখিতে বা শুনিতে বাঙ্গালী সমাজ আর প্রস্তুত নহে। প্রাদেশিকতা ঘৃণ্য,—ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ততোধিক ঘৃণ্য যদি দেখা যায় উদারতার আড়ালে এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বরূপ নিষ্ক্রিয়তার ছায়ায় সেই প্রাদেশিকতাকে পুষ্ট হইতে।" —বীরভূমের ডাক।

মুক্তিসংগ্রাম শেষ নয়

"পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তির সন্ধানে আজ দিকে দিকে নিপীড়িত বঞ্চিত ও অবহেলিতগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুগের প্রয়োজনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লাভে প্রত্যেক দেশ ও জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ সরকার গোয়ার মুক্তিকামী দলের উপর সম্প্রতি যেরূপ নৃশংস অত্যাচার চালাইতেছে, তাহাতে বিদেশী বর্ব্বরতারই নগ্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। ভারতের মাটিতে বৈদেশিক শাসনের অবসান হওয়া উচিত। জাতীয় জন্মগত অধিকার দাবীর স্পৃহা দমনের এই অত্যাচার শাসন ভিত্তির সমাধি রচনা করিতেছে সন্দেহ নাই। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন বিলুপ্ত করার দাবী সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। ভারত সরকার এই সব দেখিয়াও নির্ব্বিকার রহিয়াছেন! কোন প্রতিকারমূলক পন্থা গ্রহণ করিতেছেন না। অথচ পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, গোয়া হইতে পর্ত্তুগীজ শাসনাধিকার অপসারিত না হইলে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের শেষ হইয়াছে মনে হয় না।" —নীহার (কাঁথি)

শোক-সংবাদ

এন, এম, যোশী

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এন, এম, যোশী ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। গত বহু বৎসর যাবৎ যোশী দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী এবং শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাপার সমূহে মূল্যবান পরামর্শ দিয়া সাহায্য করেছেন। যোশী এই দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি গোখেলের মতবাদের সমর্থক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নরমপন্থী ছিলেন।

স্নেহময় দত্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন ডি-পি-আই ডাঃ স্নেহময় দত্ত (৬১) ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডাঃ দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ১৯২৩ সালে তিনি স্পেকট্রোসকোপ বিষয়ে গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি আই-ই-এস-এ যোগদান করেন এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

বিজয়রত্ন মজুমদার

কলিকাতার অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিজয়রত্ন মজুমদার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি কিছু কাল হইতে অসুখে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—মুক্তি পথে—

জীবনের ভাঙ্গাগড়া হাসি
কান্নার এক অগ্নিক্ষরা ছবি!
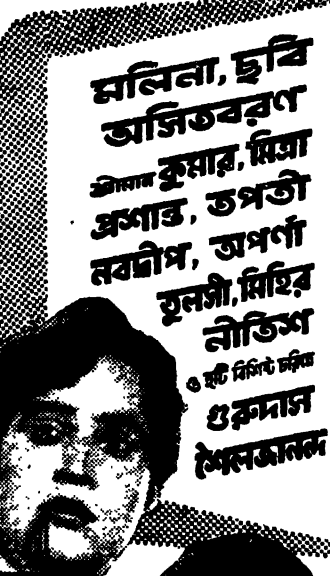
নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত:

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অসিতবরণ
উৎপলা সেন, মৃণাল চক্রবর্ত্তী,
অঞ্জশ্রী সিংহ।

শুভারম্ভ ১৭-ই জুন শুক্রবার

সর্ব্বজনপ্রিয় মঞ্চ নাটকের অনন্যসাধারণ চিত্ররূপায়ণ!

শ্রী • বীণা

ও সহরতলীর সাতটি ছবিঘরে

• শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স লিঃ রিলিজ •

বাঙলার বাহিরে বাঙলা বইয়ের দোকান

চৈত্রের (১৩৬১) মাসিক বসুমতীর 'সাহিত্য-পরিচয়' বিভাগে দেখলাম যে আপনারা সাহিত্যালোচনা ক্রমে একটি সুচিন্তিত প্রশ্ন তুলেছেন, যে "বাংলা বইএর দোকান—বাংলার বাইরে।"—সত্যি বাংলা সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী হিসাবে আমিও আপনাদের এই সুচিন্তিত প্রশ্নের সমর্থন না করে পারি না। কারণ ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য হিসাবে বাংলা সাহিত্য অগ্রণী ও ঐশ্বর্য্যশালী,—তথাপি বাংলা সাহিত্যের কোন প্রকার সম্প্রসারণে চেষ্টা হয় না। তাই আমি প্রবাসী বাংগালী সাহিত্য-পাঠকদের ও বাংলা সাহিত্যের সম্প্রসারণের দিক থেকে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত জানিতে ইচ্ছুক।—সুব্রত রায়। ৬, সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জ্জী লেন, বেহালা।

[প্রকাশকগণ বিক্রেতাদের কমিশন দেন। যে কোন প্রবাসী বাঙালী এই সুযোগ নিতে পারেন। কলকাতার পুস্তক প্রকাশকগণ প্রত্যেক প্রদেশের একেকটি প্রধান সহরে শাখা খুলতে পারেন।—স]

সাপের বিষ দোহন

চৈত্র, ১৩৬১র মাসিক বসুমতীতে শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ লিখিত "সাপের বিষ দোহন" প্রবন্ধে লেখা আছে যে, সাপের বিষ-দাঁত ভাঙিয়া দিলে পনের দিনের মধ্যে আবার বিষ দাঁত গজায়, উহা সত্য নহে। বিষ-দাঁত একবার ভাঙিলে আর বিষ দাঁত গজায় না। তবে অনেক সময়ে accessory ছোট এক বিষ-দাঁত বা mucous membraneএ ঢাকা থাকে, তাই দিয়ে সাপ কাজ চালিয়ে নেয়। আশা করি, এই ভুলটি সংশোধন করিয়া দেবেন।—ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ময়ূরভঞ্জ)।

সাহিত্য পরিচয়

মাসিক বসুমতীর সাহিত্য পরিচয় বিভাগ ক্রমশঃই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইতেছে। গত সংখ্যায় রবীন্দ্র পুরস্কার সংক্রান্ত বক্তব্যটি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, নির্ভীক সমালোচক রামানন্দ বাবুর লোকান্তরের পর এই জাতীয় সংযত ও শোভন মন্তব্য খুব কমই চোখে পড়িয়াছে।—শ্রীমতী বীণা মুখোপাধ্যায়। ২০৩।৩ অপার সারকুলার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা—৪

বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরভক্তি

মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৬২) শ্রীবিনয় ঘোষ "যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"জীবনে তাই 'ধর্ম' বা 'ঈশ্বর' নিয়ে বিদ্যাসাগর একদিনের জন্যও চিন্তা করেননি। অন্ততঃ তাঁর বাইরের জীবনে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

বিনয় বাবুর এই উক্তিটি সঠিক বলা যায় না। কারণ শ্রীনবকুমার বাগচির শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঈশ্বর-ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "একদিন গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করেন, তাহাতে তাঁহার অশ্রু বিগলিত হয়। তাহা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—'আপনার ভক্তিভাব থাকিলেও আপনার পুস্তকে ঈশ্বরের কথা না থাকায় লোকে আপনাকে নাস্তিক বলে।' ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় 'বোধোদয়ে' 'ঈশ্বর' বলিয়া একটি পাঠ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।" 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা আমি উদ্ধৃত করিতেছি:—ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা।" ইহার পর আর বলিতে পারা যায় কি যে তিনি একদিনের জন্যও ঈশ্বর-চিন্তা করেন নাই? এই বিষয়ে লেখক কি বলেন জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীসনৎকুমার মৌলিক, উকীল (মেদিনীপুর)

[ঈশ্বরভক্তি অন্তরের। বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরভক্তির সত্যিই কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে আমরা একমত। বোধোদয়ে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু সেটি ঈশ্বর শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র, লেখকের ভক্তিপ্রকাশের কোন লক্ষণ নেই এ লেখায়।—স]

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতীর মত ইদানীং বাংলা ভাষায় পত্রিকা আর নেই বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। সম্প্রতি পাঠক-পাঠিকার মতামত প্রকাশের এই মূল্যবান বিভাগটি খুলে সত্যিই বড় আনন্দ দিয়েছেন। বৈশাখের পত্রদাতা, শ্রীবসাক মশাইয়ের মত আমারও কিন্তু একই সন্দেহ। 'আকাশ-পাতাল' ও 'ভুয়া-ভুইয়া' লেখক দু'জন নয়। যদি দু'জনই হয়, তবে 'উদয়ভানুর' ওপরে 'আকাশ-পাতালে'র লেখকের প্রভাব সামান্য নয়। "কোদাল-কাটা মেঘের" আড়ালে 'উদয়ভানু' আর কত দিন লুকিয়ে থাকবেন? তা' সে যাই হোক, সাহিত্যের আকাশে তিনি নিশ্চয়ই উদয়ভানু নন; নইলে ভাষাতে প্রভাত-সূর্য্যের লাবণ্য থাকলেও, সাহিত্য পরিবেশনে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের বলিষ্ঠতা থাকতো না। বাস্তবিক, উদয়ভানুর লেখা চাঁদের আলো কিংবা Oscer Wilde-এর লেখার মত মনকে এমন একটা অতীন্দ্রিয় আবেশে স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে দেয়, যে সমালোচনা করবার ইচ্ছে থাকলেও উত্তেজনা পাওয়া যায় না। বিনয় ঘোষের "যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর" খুব ভালো লাগছে। ঐতিহাসিক মন নিয়ে প্রবন্ধমূলক জীবনী লেখায় Styleটি ভারি সুন্দর। "শান্তিনিকেতন আশ্রমের দলিল" যোগাড় করলেন কোত্থেকে? বাস্তবিক, আপনি সব করতে পারেন, মায় দলিল চুরি পর্য্যন্ত! সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিটাও কম উপভোগ্য নয়। পরিশেষে নজরুলের 'আরবী ছন্দে'র জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—জ্যোৎস্না ঘোষ, ২নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। বালী, হাওড়া।

[পাঠক-পাঠিকার নির্দ্দেশেই এই বিভাগটির প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। 'ভুয়া-ভুইয়া' সম্পর্কে কোন মতামত অপ্রকাশ থাক। শান্তিনিকেতনের দলিলখানি বৈশাখ ১৮১০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়।—স]

পত্রিকা সমালোচনা

বসুমতী এখন শুধু সবল প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বৈশাখ সংখ্যার "পত্রগুচ্ছ" পড়লাম "শান্তিনিকেতন আশ্রমের দলিলপত্র।" এটি প্রকাশ করার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আপনার। আপনাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। "পরমপুরুষ" শেষ হবার আগেই শুরু করেছেন "বিবেকানন্দ স্তোত্র"। লেখাটির মধ্যে যেমন আছে force; তেমনি আছে কাব্য। স্বামীজী কবি ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন পৌরুষেরও প্রতীক। লেখাটি সেই হিসাবে সঙ্গত। বাংলা কবিতার মধ্যে ইংরাজী quatation দেওয়ার রীতিটিও খুব মৌলিক বলে মনে হোলো। শ্রীঅরুণা সরকার। মধু রায় লেন, কলি-৬।

যাঁরা মাসিক বসুমতীতে লেখেন তাঁদের পরিচয় আমার মত অনেক উৎসুক পাঠক-পাঠিকা জানতে চান। তাই লেখকের প্রথম প্রকাশের সাথে তার পরিচয় দিতে অনুরোধ করি। পরলোকগত ব্যক্তিদের যে পরিচয় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহা কোন ক্ষেত্রে খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ করে আমার চোখে পড়েছে—ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ও অধ্যাপক আইনষ্টাইনের পরিচয়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির বহুদিন হইতে বাংলা সাহিত্যের বইগুলি সুলভে দিয়ে অনেক বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা পাইয়াছে। আমার মত অনেকে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাইতে চায়। আশা করি মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের অনুগ্রহে তাঁর পত্রিকার মারফতে আমাদিগকে জানাবেন।—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। লালগোলা।

[আমাদের বিখ্যাত লেখকদের পরিচয় সকলেই জানেন। নবাগতরা লেখা পাঠানোর সময়, পরিচয় দেন না। মৃত ব্যক্তিদের সংবাদ মাত্র প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত জীবনী প্রকাশের একান্ত স্থানাভাব। বসুমতীর পরিচিতি ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে।—স]

ইদানীং মাসিক বসুমতী বর্দ্ধিতাকারে বাহির হওয়ায় ছয় মাসের একসঙ্গে বাঁধাই করায় বেশ অসুবিধা রহিয়াছে। সেই জন্য আমি বৈশাখ সংখ্যায় "পাঠক-পাঠিকার চিঠি" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমতী মজুমদারের বৎসরে তিনবার চতুর্মাসিক সূচীপত্র দেওয়ার প্রস্তাবের সমর্থন করি।—বিজন পাল (আন্দুল-মৌরী)।

[বিষয়টি আমাদের বিবেচনাধীন আছে।—স]

আমি 'মাসিক বসুমতী'র একজন নিয়মিত পাঠক : বর্ত্তমান কালে 'মাসিক বসুমতী'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা বলিয়া মনে করি। গত বৈশাখ (১৩৬২) সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "তিন খণ্ডের সূচী" সম্বন্ধে শ্রীমতী উমা মজুমদার মহাশয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন আমি তাহা বিশেষ ভাবে সমর্থন করি। পত্রিকার বাঁধাই সম্বন্ধে জানাই যে বর্ত্তমানে পত্রিকার পিছন অংশে পাঠ্য-বস্তুর শেষে কোন বিজ্ঞাপনপত্র না থাকিয়া একেবারেই মলাট থাকায় এক মাস কাল ধরিয়া একাধিক হস্তে পত্রিকা ব্যবহৃত হইতে হইতে উহার শেষের মলাট তো নষ্ট হইয়াই যায়, অধিকন্তু ১।১ পাতা পাঠ্য বস্তুও নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আমার মনে হয় বিজ্ঞাপন পত্রগুলি সমান দুইভাগে ভাগ করিয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে দিয়া পত্রিকা বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। "সাহিত্য সেবক মঞ্জুষা"র জন্য অশেষ ধন্যবাদ। উহা প্রকৃতই মূল্যবান "রেকর্ড" রূপে চিরকাল আদৃত হইবে। "১৩৬১ সালের এক শত সেরা বইয়ের তালিকা" প্রশংসনীয়।—শ্রীবিধুভূষণ সিংহ। প্রধান শিক্ষক, মংলাপোতা, জুঃ হাই স্কুল, পোঃ—খড়কুশমা, মেদিনীপুর।

[সূচিপত্র প্রকাশের ত্রৈমাসিক নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে আমরা সচেষ্ট। বিজ্ঞাপন শেষের দিকে প্রকাশ করতে চান না বিজ্ঞাপন-দাতা।—স]

বৈদ্যুতিক অনুসন্ধান

মাসিক বসুমতীর আমি একজন বহু পুরাতন গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। নিম্নলিখিত প্রশ্নের পূর্ণ বিবরণ ও তথ্যাদি, সম্ভব হইলে কোম্পানীর নাম-ঠিকানা জানিতে ইচ্ছা করি, আশা করি পাঠক-পাঠিকার চিঠির মধ্যমে তাহা প্রকাশ করিলে উপকৃত হইব। পল্লীগ্রামে ইলেকট্রিক ব্যবস্থা নাই, সেখানে নলকূপ হইতে দোতালা বাড়ির উপরে সহজে জল উঠান কি প্রকারে সম্ভব, এরূপ কোন কম মূল্যের ইঞ্জিন বা সহজ হস্তচালিত পাম্প কোথায় পাওয়া যাইতে পারে তাহার পূর্ণ বিবরণ। কম খরচাতে পল্লীগ্রামে ইলেকট্রিক মেশিন দ্বারা পাখা ও আলোর ব্যবস্থা সম্ভব কি না কিংবা তেল বা যন্ত্রে চালিত কোন প্রকার ফ্যান পাওয়া যায় কি না। শ্রীগোপাল মহবুব 47325 তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ।

[মাসিক বসুমতীর অন্যতম নিয়মিত বিজ্ঞাপনদাতা মেসার্স দি ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস লিঃ, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা—৩৪ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করি।]

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১৩৬১র মাঘ সংখ্যায় ৫৪৭ পৃঃ নিম্নদিক হইতে অষ্টম লাইনে আছে "তারক মানে বেলঘরের তারক মুখুজ্জে"—ইহা সম্পূর্ণ ভুল। "বারাসাতের তারক ঘোষাল হইবে।" লেখক অচিন্ত্য বাবু নিশ্চয় ঠাকুরের পার্ষদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে mean করিয়াছেন। বোধ হয় ইহা তাঁহারই ভুল। সূর্য্যকুমার আইচ মাধব চ্যাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা—২০।

হেড ফোনে কলকাতা 'ক'

মাসিক বসুমতীর ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায়—(কেনা-কাটা বিভাগ) রেডিও তৈয়ারীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া Head Phone সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় জানিবার জন্য আপনারের দ্বারস্থ হইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া পত্রোত্তরে অথবা মাসিক বসুমতী মারফৎ জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। বিষয়টি হইতেছে—Head Phone-এ কলকাতা "ক" কি করিয়া শোনা যাইবে। আমি একটি Head Phone তৈয়ারী করিয়াছি তাহাতে শুধু কলকাতা 'খ' আসে। এবং যতগুলি Head Phone দেখিয়াছি তাহাতে সব 'খ'ই আসে। কি করিলে "ক" শোনা যাইবে অথবা আদৌ শোনা যাইবে কি না। শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল, (°৪৭১৩৮) ডোমজুড়, হাওড়া।

[আপনি এই বিষয়ে ষ্টেশন-অধিকর্ত্তা, কলকাতা শাখা, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, ১নং গ্যাস্টিন প্লেসে পত্র দিন।—স]

প্রকাশক কে ?

"মাসিক বসুমতী"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের "সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা" ও নীলকণ্ঠের "চিত্র ও বিচিত্র" ভবিষ্যতে বই আকারে প্রকাশিত হইবে। "মাসিক বসুমতী" মারফৎ জানাইলে বাধিত হইব। —কাবেরী নিয়োগী। ১৭ বি, রাণী হর্ষমুখী রোড। কলিকাতা-২।

[উক্ত দুই রচনাকার প্রকাশকের ঠিকানা পত্র মারফৎ আপনাকে জানাবেন।—স]

'ছোটদের আসর' প্রসঙ্গে

বৈশাখ ১৩৬২ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' শীর্ষক নবতম বিভাগের সংযোজনা দেখে আনন্দিত হলাম। কেন না, পাঠক-পাঠিকার কিছু জানা ও জানান-র দিক থেকে এ বিভাগের প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই ছিল; এবং সে প্রয়োজন আপনারা সর্বপ্রথম পূরণ করেছেন দেখে ধন্যবাদ জানাই। 'মাসিক বসুমতী'র প্রতিটি বিভাগ নিঃসন্দেহে নতুনতর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে থাকে। এবং বর্তমান প্রসংগে 'ছোটদের আসর' উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে প্রকাশিত কবিতা, গল্প, ছড়া ও অন্যান্য রচনা ইত্যাদি কিশোর মনের খোরাক পরিবেশন করার পক্ষে পরিপূরক। তবে আমার মনে হয়, এই বিভাগে প্রকাশিত ছড়া বা গল্প-কাহিনী ইত্যাদি প্রয়োজন বোধে সচিত্র (Illustrated) হওয়া দরকার। তা'তে বোধ করি বিভাগীয় উৎকর্ষতার শ্রীবৃদ্ধি-ই কেবল হবে না, উৎসাহী কিশোর-পাঠকেরা নিজেদের মনের মতন ছবি পেয়ে পুলকিত হবে এবং কবিতা ও গল্প ইত্যাদি পাঠে তাদের আরো আগ্রহ বাড়বে। শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত। টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

[বর্ত্তমানে ছোটদের আসরে ক'টি ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। জলে-ডাঙায় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর লেখায় চিত্রালঙ্করণ অপছন্দ করেন। 'নিজেকে গড়ো' লেখাটি সচিত্র হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আপনার প্রস্তাব আমাদের বিবেচনাধীন থাকলো।—স]

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ব্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র মাসিক বসুমতীর 'গ্রাহক-গ্রাহিকা' ছড়িয়ে আছে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ায়। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাবো। গত সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব, সেজন্য বর্ত্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

১

গত বৈশাখ মাস ১৩৬২ সন হইতে আমি আপনাদের "মাসিক বসুমতীর" গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। সে কারণে আপনি পত্র পাঠ মাত্র বৈশাখ ১৩৬২ সন মাসিক বসুমতী ভিঃ পিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মাধবী মুখোপাধ্যায়। Chandajee Khubajee & co Guntur.

২

বসুমতী ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ আসিলে মূল্য দিয়া গ্রহণ করিব। এবং মাসে মাসে পাঠাইতে থাকিবেন। অন্যথা করিবেন না। একেবারে এক বৎসরের যাহা খরচ পড়িবে সেই মত ভিঃ পিঃ করিয়া দিবেন। শ্রীনিরঞ্জন মাজি, পোঃ কুলটিকরী, জেলা মেদিনীপুর।

৩

আমার নিজের পত্রিকার জন্য ১৩৬২ সালের বার্ষিক মূল্য ১৫১০ টাকা মণি-অর্ডার করেছি। আশা করি পেয়ে থাকবেন। নিম্ন ঠিকানায় আরেকটি V. P. পত্রপাঠ পাঠাবেন দয়া করে এই V. Pর জন্য আমি দায়ী রইলাম। ওরা আমার খুব ব্যস্ত করে লিখেছে। রেণু গুহ, ৬২, সাদার্ণ এভিনিউ, কলিঃ-২৯। মিসেস উমা বর্দ্ধন, রাণীক্ষেত, আলমোড়া।

৪

আমাকে "মাসিক বসুমতীর" বার্ষিক গ্রাহক করিয়া লইলে বাধিত হইব। এই সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে "বসুমতী" ভি, পি, যোগে ফেরৎ ডাকে পাঠাইবেন। গায়ত্রী দত্ত। জংপুরা এক্সটেনসন, নিউ দিল্লী।

৫

ইতঃপূর্ব্বে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইব বলিয়া একখানা পত্র দিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় ভুল বশতঃ ১৩৬৩ সনের বৈশাখ হইতে V. P. P. যোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু ১৩৬৩ সনের পরিবর্ত্তে ১৩৬২ সনের বৈশাখ হইতে বহি পাঠাইতে থাকিবেন।—শ্রীমতী সুরুচিবালা বসু শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং।

Please send the Baisak (1362 B. S.) issue of "Mashik Basumati" per V. P. P. to the address of this Library when it would be out, charging the Yearly Subscription of Rs. 15/- P. C. Dhar. Secretary, The Karimganj Public Library.

অর্দ্ধনারীশ্বর

—শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

স্বপনের মোহজাল রচে
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।
পামিকোকো
মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।
ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
মহোপকারী
কেশতৈল।
যোজনগন্ধা
অনুপম
নির্য্যাস।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪
নিত্য প্রসাধনের সার্থকতায় প্রতিটি অপরিহার্য্য
UPCO.

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৪শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬২] (স্থাপিত ১৩২৯) [প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "ছাখ না আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? ও দেশে ধান মাপে রামে রাম, রামে রাম, এই সব বল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে আর ফুরিয়ে আসে আসে এমন সময় পেছনে আর একজন রাশ ঠেলে ছায়। তার কম্ম ঐ—ফুরোলেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি পেছন থেকে তাঁর জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দ্যান। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না।"

"প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয়, শাস্ত্রে আছে সে সব হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে,—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। ঈশ্বর দর্শন হলে পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে সে বালকের ন্যায় ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার কখন পাগলের মত ব্যবহার করে,—কভু হাসে, কভু কাঁদে। এই বাবুর মত সাজগোজ আবার খানিক পরে ন্যাংটো, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে,—তাই উন্মাদবৎ। কখনও জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম করতে পারে না,—কর্ম্মত্যাগ হয়। পূর্ণ জ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ,—পিশাচবৎ। খাওয়া-দাওয়ায় বিচার নাই। শুচি-অশুচির বিচার নাই। শুচি-অশুচি তার কাছে দুই সমান।"

"আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো। কখন দেখতাম, জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ; কখন চারি দিকে যেন পারার হ্রদ, ঝক্-ঝক্ করছে। আবার কখন রূপা-গলার মত দেখতাম। কখন দেখতাম, রংমশালের আলো যেন জ্বলছে।"

"আবার দেখালে তিনিই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। উঃ কি অবস্থাই গেছে! একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন ঢেঁকির পাট। একদিক নীচু হয় তো আর একদিক উঁচু হয়। যখন অন্তর্মুখ সমাধিস্থ তখন দেখছি তিনি। আবার বাহিরের জগতে মন এলে তখনও দেখছি তিনি।"

"আর একদিন দেখালেন,—নৃমুণ্ড স্তূপাকার, পর্ব্বতাকার আর কিছুই নাই। আমি তার মধ্যে একলা বসে।"

"কুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে গায়ে হোমাগ্নি জেলে দিলে। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে কাঁটা পোড়ান! এই সব সাক্ষাৎ দর্শন হতো।"

"যখন প্রথম এই অবস্থা হলো, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জ্বল্-জ্বল্ করতো,—বুক লাল হয়ে যেত। তখন বললাম,—মা! বাহিরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। তাই এখন এই হীন দেহ! তা না হলে, লোক জ্বালাতন করতো—লোকের ভিড় লেগে যেত—সেরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেহ থাক্‌লে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাক্‌বে।"

শ্রীব্রহ্মণ্যভূষণ ও শ্রীমতী ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলোয়াড় হিসাবে,—Sportsman হিসাবে আমাদের কেউ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে চিনি কি? তাঁর Sportsmanly careerটি তিনি সম্পূর্ণ ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতের সাহিত্য-রসিকগণ রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে নানাবিধ অনুসন্ধান (research) করিবেন। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের এক দিনের খেলার কথা লিখিতেছি।

The Idea! কবি চঞ্চল হইয়াছেন। নূতনের ডাক তিনি কেমন করিয়া রুধিবেন? অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর কেরামতী বলিব, না হঠাতের লীলা বলিব জানি না। ঠিক যেমন নিউটন সাহেব আপেল ফলটি পড়িল কেন ভাবিতে বসেন, অথবা মহর্ষি জমীদারী পরিক্রমার পথে ছাতিমতলার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া এক—

"প্রাণারামং মম আনন্দম্
শান্তি-সমৃদ্ধম্ ঔদার্যম্"—

স্থান খুঁজিয়া পান, কবিও সেইরূপ এক দিন রেলেতে পরিভ্রমণ কালে গোমো জংশন রেলওয়ে-ষ্টেশনে পাদচারণা করিতেছিলেন, হঠাৎ শুনিতে পাইলেন একজন যুবক নজরুলী সুরে গাহিতেছিল—

"ক্রিকেট, এসো এসো ডাকিছ মোরে ভাই
গেছি ত তোর বুকে আমি ত দেখা নাই
প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর
আমার জান দিয়া ভরিব জান তোর।"

কবি গোমোতেই ক্রিকেট খেলিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কবি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে ঋতুরঙ্গ দেখাইয়াছেন, নিদারুণ গ্রীষ্মেও হৈমন্তিক আবহাওয়া বহাইয়াছেন, বৈশাখের রুদ্র তেজের মধ্যেও সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা শীতের নাচন লাগাইয়াছেন, তিনি যে সুকোমল তরুণ-তরুণীদের লইয়া Tagore wonderers তৈয়ারী করিবেন, কিম্বা গোমোতেই ক্রীড়াক্ষেত্র করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ গোমো যখন B. N. R., E. I. R. ও C. I. C. রেলওয়ে লাইনের সংযোগস্থল, কি কলকাতা কি উত্তর-ভারত এবং ছোটনাগপুর উপত্যকা সমস্ত দেশ হইতে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা আছে।—

আজ প্রভাতে আনন্দ বায় চঞ্চলি। অনন্ত আনন্দে সকলে উদ্বেল। আনন্দের সঙ্গে উন্মাদনাও আছে। কবি ক্রমাগত সুর সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, শিষ্যগণ কথায় চরণগুলি লিখিয়া লইতেছে, দিবু ঠাকুর সুর তুলিয়া লইতেছেন—গোমোতে এক "অভিনব স্বর্গ-লোক হইল সৃজন"।

সব আয়োজন হইয়াছে। মাঠ ঠিক হইয়াছে, ষ্টেশন হইতে অদূরে ছোট পাহাড়টি পার হইয়া গেলে যে উপত্যকা পড়ে, সেইখানে। উপত্যকার এক দিকে পাহাড়শ্রেণী, অপর দিকে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী জামুরা। উপত্যকার এক প্রান্তে কবির শিবির, অপর প্রান্তে রাজন্যবর্গের তাঁবু।

বলা হয় নাই খেলার সব বন্দোবস্ত হইয়াছে, অপর পক্ষ Princes' Eleven। পাতিয়ালা, পতৌদি, দলীপসিংজী ও আরো অনেকে নিজ নিজ প্লেনে আসিলেন। কুচবিহারের মহারাজা আসিলেন মোটরে, মোটর-চালক স্বয়ং মহারাণী এক টানেই (one lap) আগে ভাগেই পৌঁছিয়াছেন। প্লেনে যাঁরা আসিলেন তাঁহাদের landing-এর কোন অসুবিধা হইল না, কারণ প্রান্তর বিস্তীর্ণ, হাজারিবাগ জেলা রুক্ষ মালভূমি দিগন্ত-প্রসারিত। তাঁহাদের camp সারি সারি পড়িয়াছে। অনেক বড় বড় রাজারা আসিয়াছেন—স্বয়ং কবিগুরুর Team-এর সহিত খেলা, কেহই miss করিতে চাহেন না। যাঁহারা Cricket খেলেন না, শুধু শিকার ও অন্যান্য মনোবিনোদন কার্য্যে সময় ব্যয় করেন তাঁহারাও আসিলেন।

কবিগুরু চঞ্চল হইয়াছেন—খেলার দিন সন্নিকট। কিন্তু তিনি কি শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবেন—ব্যাট, বল, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির জন্য তাঁহার চিরদিনের সংস্কার কলুষিত করিবেন? ইউবেরয়, এসরয় প্রভৃতি সমস্ত দেশী দোকানদার আসিলেন, কিন্তু কবির চক্ষে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়, তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইঁহারা বিদেশী ব্যবসায়ীর এদেশী এজেন্ট মাত্র।

তাই কবি বাহিরিলেন দেশী ব্যাটের সন্ধানে। প্রথমে যে গ্রামে গেলেন তাহার নাম গুণবুসসা। এবং যে কাষ্ঠের সন্ধান পাইলেন—যাহা দ্বারা ভাল ক্রিকেট-ব্যাট তৈয়ারী হইতে পারে তাহার নাম জানিলেন "আঁকো"। কাঠ খুব শক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু "আঁকো" নামটা যেমনই শ্রীহীন তেমনই বীভৎস গ্রামের নাম "গুণবুসসা"। কবি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কয়েক জন শিষ্যের সহযোগিতায় ছোট একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ কাঠ ও গ্রামের নূতন নামকরণ করিলেন অঙ্কন ও অঙ্কবর্ত্তিকা। আঁকো চলতি নাম—আসল নাম অঙ্কন এবং অঙ্কন কাঠের দ্বারা সুসজ্জিত গ্রামের নাম হইল অঙ্কনবর্ত্তিকা বা আঁকাবাট।

ব্যাট হইল, ষ্ট্যাম্প হইল কিন্তু ভাল ম্যাটিং চাই, না হলে বলের পিচ ঠিক বুঝা যাইবে না। সময়টা শীতকাল, মাঠে ঘাস ত নাই-ই, সুতরাং Turf কথাটা মনেই পড়ে না। কিন্তু দুঃখ কি—

মেদিনীপুর হইতে শীলা মাইতি অনেক মছলন্দ আনিয়া দিলেন। রাজন্তবর্গ বিলাতের Turf, matting সবই দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন চিত্র-বিচিত্র মছলন্দ কখনও দেখেন নাই।

খেলার দিন সমুপস্থিত। শুভ মুহূর্ত্তও সমাগত। প্রভাত বেলা—অরুণ আলোর অঞ্জলি না থাকিলেও রোদটি খুব মিঠা। খেলা সকালে হইবে—মধ্যাহ্নে বিশ্রাম। আবার বৈকালে খেলা। তাঁহার বিশ্বায়তনেও এই নিয়ম। দ্বিপ্রাহরিক মুহূর্ত্তগুলি বিশ্রামের জন্য। বৃথা পরিশ্রমে জর্জ্জরিত হইবার জন্য নহে।

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। বাদল বাবুর বাড়ীতে তিনি অতিথি। সম্মুখের পাহাড়ের উপর যে প্রশস্ত স্থানটি আছে, সেইখানে তাঁহার প্রার্থনা-বেদী স্থাপিত হইয়াছে। একতারাটি হাতে লইয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিকে তিনি সামবেদের মন্ত্রে অভিনন্দন জানান। তাহার পর তিনি আত্মসমাহিত হইয়া ধ্যান করেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি Pet—বামে ময়ূর "কেকা," দক্ষিণে হরিণ "তৃষ্ণা"। সম্মুখে ক্ষুদ্র রৌপ্যাধারে আদা, ছোলা ও কফি। তৃষ্ণা ও কেকা আদা-ছোলার প্রসাদ পাইবার পর তবে নড়িবে। হঠাৎ কবি একটি নূতন সুরের সন্ধান পাইলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠে ডাকিলেন, "দিনু" "দিনু"। তাঁর সে মধুর কণ্ঠস্বরের নিকট বীণা মৃদঙ্গ-মুরলী লজ্জা পাইল। দীনেন্দ্র ঠাকুর ইদানীং অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন। বনিয়াদী জমিদার-বংশের সন্তান, পেলব-তনু রাখা তাঁহার পক্ষে খুবই শক্ত। তবু তিনি আগেভাগেই কবির নিকটে নিজের আসন রাখেন—কারণ, কখন কি সুর তুলিয়া লইতে হইবে কে জানে? এবারও তিনি সুরটি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু ক্রিকেট খেলার বিবরণের সঙ্গে সেটা অবান্তর বলিয়া লেখা হইল না।

ওদিকে রাজন্যবর্গের তাঁবুতে কর্ম্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। মহারাজ বাহাদুরেরা ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গগণ আর চিত্তচাঞ্চল্য রোধ করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যেই নিজ নিজ শরীর সম্মার্জ্জিত করিয়া Flannels চড়াইয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের Blazer-এ তাঁদের কৃতিত্ব-চিহ্ন আঁকা। কেহ বা Cambridge-এর Blue, কেহ বা M. C. C-র সভ্য, ইত্যাদি। তাঁদের তাঁবুতে Scottish Highlanders স্কটিশ হাইলাণ্ডার দলের ব্যাগপাই Pipe Band বাজিতেছে। স্যর ভি জি ব্যাট-হাতে ছুটাছুটি করিতেছেন।

কিছু দিন কংগ্রেসী রাজনীতি অনুধাবন করার ফলে তাঁর ইচ্ছা সানাই বাজানর ব্যবস্থা করেন। কাশীধামে তাঁর বন্ধু মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের বাড়ীতে শানাই-এর মৃদু মূর্চ্ছনা তাঁর প্রাণে অপরূপ পুলক জাগাইয়াছিল। তিনি সে কথা পাতিয়ালাকে জানাইবার পূর্ব্বেই তাঁদের কোন বিলাতী বন্ধু এক জন বড় স্কটিশ পীয়র (scottish Peer) তাঁর Pipe Band পাঠাইয়া দিয়াছেন—উড়োজাহাজে তাহারা আসিয়া গিয়াছে।

কবির Player-রা সব ready। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—মাঠের পূজা ও দেবতার বন্দনা-গান হইল। এ কার্য্যে সক্রিয় সহযোগিতা দিলেন বালিগঞ্জের শীলা ও মীরা এবং বেহালার খুতা গাঙ্গুলী।

কবির এ খেলার কথা (Reuter) রয়টার সারা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিয়াছে। সভ্য জগতের sportsman-রা কবিকে নিজেদের দলে পাইলেন বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল এবং কবিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা তাঁহারা প্রত্যেকে টেলীগ্রামে প্রকাশ করিলেন।

All India Radio কবির লেখা উৎসারিত করিবার জন্য গোমোতে হাজির। রয়টার, এ, পি, ইউ-পির প্রতিনিধিরা আগে-ভাগেই পৌঁছাইয়াছেন এবং কবির সেক্রেটরী অমিয় চক্রবর্তীকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন।

ক্ষুদ্র গোমো আজ লোকে লোকারণ্য। পাহাড় দুইটির কোলে একজোড়া তাঁবু দেখা যাইতেছে। কবির তাঁবু হইতে কী সুর ভাসিয়া আসিতেছে—বোধ হয় বেদগান গীত হইতেছে। কথা আছে, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী"। বেদ আমরা বুঝি না, কিন্তু সেই শব্দ-ব্রহ্মে বিলীন হইয়া আমাদের আত্মা তখন সীমার মধ্যেও অসীমের সুমধুরতার আস্বাদ পাইল। দেখা গেল, কবি তাঁবুর বাহিরে আসিতেছেন, কিছুটা পুলকিত, কিছুটা উদ্বেলিত। কিন্তু কই তাঁহার পরনে খেলার পোষাক নাই ত! অবশ্য ভিন্ন দেশে প্রস্তুত অথবা তাঁহাদের অনুকরণে তৈয়ারী কোন ফ্লানেল প্যাণ্ট বা ব্লেজার পরিতে আমরা কোন দিন আশা করি নাই, কিন্তু তাঁর হাতে ওটা কি? সেই "অঙ্কন" জাত হাতে গড়া খাঁটি নিভেজাল অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব ব্যাট নামধারী সোঁটা। পরনে তাঁর সেই সর্ব্বতনু-পরিব্যাপ্তকারী আগুল্ফবিলম্বিত আলখাল্লাটি! প্রভাত-সমীরণে তাঁর সুন্দর সুকোমল রেশমী চুলগুলি উড়িতেছে। যদি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে হইতে এক দমকা বাতাসে কয়েক গাছি চুল চোখে-মুখে আসিয়া পড়ে, এবং সেই মুহূর্ত্তে বিপক্ষের একটা সজোর-নিক্ষিপ্ত বল····ওঃ শান্তিনিকেতনের রেণুকা রায় আর ভাবিতে পারেন না। শীলাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দৌড়াইয়া কবি-সন্নিধানে গেলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন—গুরুদেব।···কবি তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়াই তাহাদের মনোভাব বুঝিলেন—এবং বালিগঞ্জের জেদী মেয়ের কাছে হার মানা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মাথা নীচু করিয়া দিলেন। দুই বান্ধবীতে একটা হেলীয়োট্রোপ রঙের কাপড় বৃহত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে মাথায় জড়াইয়া দিলেন—খানিকটা বর্ম্মী, খানিকটা যবদ্বীপীয় ফ্যাশনে।

টাগোর ওয়ানডারার্স তাঁহাদের তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন। পুরোভাগে চলেছেন কবি তাঁহার "অঙ্কনা" হাতে। তাঁহার পশ্চাতে আছেন মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে ধীরেন সেন, অনিল চন্দও আছেন। তাহাদের পরনে ধুতি, মালকোঁচা বাঁধা। গায়ে হাফ-পাঞ্জাবী, চলতি ভাষায় যাহাকে নিমে বলা হয়। মাথায় তালপাতার হাল্কা টোকা। কৃষকেরা রৌদ্রে বৃষ্টিতে যেরূপ শিরশ্ছাদন ব্যবহার করিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচায় সেইরূপ আর কি। মেয়েরা সাড়ী পরিয়াছেন মহারাষ্ট্রীয় প্রথায়—তাঁহাদের দেখিতে অনেকটা রাজা রবি বর্ম্মার ছবির নায়িকাদের মত। মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল, বাদল দেবের শিষ্যা শেলী (শেফালীর ডাক নাম) ও মণি বেন যিনি গরবী নৃত্যকে জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ভঙ্গিমার মধ্যে মূর্ত্ত করেন এবং বৈষ্ণব

রাষ্ট্রপতি সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

উপকার ভুলে যেতে, মোরা বুঝি হইনে কাতর,
আজ যারে 'শিব' বলি কাল তারে বনাই পাথর।
বর লভি স্মরি না ক' সুচির আরাধ্য দেবতায়,
বৃষ্টিশেষ বারিদের দিকে আর ক'জন তাকায়?

তুমি ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অধিকারী,
জাতীয় যজ্ঞের হোতা, নান্দীকর, প্রথম পূজারী।
তুমিই বহালে গঙ্গা নিঙাড়ি জটিল জটাজাল,
ছুটে আজ নীল ধারা দিঙ্‌নাগের করিয়া নাকাল।

বিধাতা-বিমুখ দেশে, বিমাতার বাক্যে পেয়ে ব্যথা,
যখন ধ্রুবের মত হে সুরেন্দ্র, এলে তুমি হেথা।
রাজ-সিংহাসনকামী, তুচ্ছ করি সে পার্থিব ধন,
হরির কৃপায় পেলে জনগণ-মনেতে আসন।

গুরুগোবিন্দের মত শক্তি তব অনন্ত অপার,
বাঙালীর মৃত দেহে করে দিলে জীবন সঞ্চার।
গড়িলে চিতোর নব এই পলি-মৃত্তিকার বুকে,
ব্রাহ্মণের নগ্ন বুক পেতে দিলে কামানের মুখে।

তোমার 'জাগৃহি' মন্ত্র শমী-বুকে বহ্নি উঠে জ্বলি,
দধীচির অস্থি-মাঝে খেলে যায় শক্তির বিজলি।
অহল্যার শিলা-দেহে সঞ্চারিত হয় নব প্রাণ,
'কদলীপত্তনে' এলো নিদ্‌ভাঙা মৃদঙ্গের তান।

তোমার বাগ্মিতা দেশে আনিল নবীন সুপ্রভাত,
ভাষার পাগ্‌লা-ঝোরা—ভাবের সে কাবেরী-প্রপাত।
বীণার ঝঙ্কারে জাগে গাণ্ডীবের ভয়াল টঙ্কার,
মধুর মুরলী-রবে চামুণ্ডার বিজয় হুঙ্কার।

ক্লান্তিহীন কর্মরথী তীব্রতেজা অসীম সংযমী,
নির্বাণের স্পৃহা নাই, মুক্তিকামী চিরদিন তুমি।
ঘৃণা কর দুর্বলতা শত্রু-মিত্র দুই অকপট,
দেশের অজেয় দুর্গ দুষ্প্রধর্ষ "Surrender not"।

দেখেছি তোমারে মোরা পক্ককেশ তরুণ অন্তর,
নয়ন প্রতিভাদীপ্ত, বাণী বজ্র সুধার নির্ঝর।
সম্রাট কিরীটহীন অখণ্ড সমস্ত ভারতের,
কি বিশাল, কি বিরাট, আজও মোরা পাই নাই টের।

তোমারে ভুলেছি মোরা—ভারতের বরেণ্য সবিতা,
তোমারে ভুলেছি মোরা—লভিয়া আলোক স্বাধীনতা।
গঙ্গা এলো—এ যে দান তোমার সে কৃচ্ছ্র তপস্যার,
আমরা ভুলেছি তাহা—রীতি এই ধূলার ধরার।

চূড়ামণি শ্রীশ্রীপঙ্কজ কিষণগড় রাজের রাজকুমারী শশিকলা যিনি **A. A. B.** পরিচালিত মোটর-দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এঁরা, ওঁরা এবং আরও অনেকে আছেন।

ওদিকে রাজাদের তাঁবুতে আছেন স্বাধীন ত্রিপুরার পঞ্চশ্রী সেনবর্ম্মা, পাতিয়ালার রাজা, পতৌদির নবাব, বিজয়নগরম-এর স্যর ভি জি ও নিজাম-নন্দন প্রিন্স অব বেরার। ওদিককার তাঁবুতে দেখা যাইতেছে গায়কোয়াড়-দুহিতা, বারদোয়ানের মহারাজাধিরাজ-কুমারী এবং ফ্রান্সে সুশিক্ষিতা শামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার কন্যাদ্বয়। তাঁদের নৃত্যদোদুল ছন্দে চলন-বলন দেখিলেই বোঝা যায়, রাজাদের খেলাতে ও সর্ব্বকর্ম্মে প্রাণসঞ্চার করার জন্য তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা।

কবিগুরু মাঠে নামিতেই শান্তিনিকেতনের স্পেশাল ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা একটি ছবি তুলিলেন। অরোরা ফিলম করপোরেশন ছবি তুলিবার জন্য set প্রস্তুত করিয়া সময় গুণিতেছেন। বিশ্বভারতীকে অনেক টাকা দেওয়ায়, কবি অরোরার অনুরোধ রক্ষা করেন। সূর্য্যদেব তখন দিকচক্রবাল ছাড়িয়া অনেকটা উপরে উঠিয়াছেন। শারদ-রবির সোনালি-আলোয় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। কবি ও মহারাজা পাতিয়ালা Toss-এর ফলাফল দেখিবার জন্য ঝুঁকিলেন! রাজন্যদলেরই জয়—তাঁহারাই খেলা আরম্ভ করিবেন। টস তাঁহারা জিতিয়াছেন তাঁদের খুসী তাঁহারা ব্যাট করেন বা বোল করেন। পাতিয়ালা বলিলেন— so poet, you lose the toss but I hope you will win the game কবি, আপনি টসে হারিলেন বটে, কিন্তু খেলাতে আশা করি জিতিবেন। অপূর্ব্ব সে কথনভঙ্গী, সেই আড়নয়নের দৃষ্টিপাত, কাঁধের পেশী সঙ্কোচন, নাসিকার উন্নত ভাব সবই অনবদ্য ভাবে বিলাতী অ্যারিষ্টোক্রেসীর ছাপ মারা।

খেলা সুরু হইল। প্রথম ব্যাট ধরিলেন মহারাজা কুচবেহার। পরের কাহিনী পরে।

বোবার ডায়ারী

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

১

'ওগো কথা কও—বৌ কথা কও—'

তুমি ত বলছ কথা কও, কিন্তু কি করে কইব? আমি যে একেবারে বৌ! মা-প্রকৃতি আমার বাক্‌যন্ত্রের উপরেও ঘোমটা টেনে দিয়েছেন যে! তবু তুমি বলছ কথা কইতে? আচ্ছা, বেশ, কথাই কইব, কিন্তু কেবল তোমারই সঙ্গে। আর বাক্‌দেবী যখন আমার জিভের উপর এতটা নির্দ্দয়তা করেছেন, তখন তাঁর কলমটার আশ্রয় নিলাম—দেখি সে আমার কথা সব লিখতে পারে কি না। আর এই কলমটা ব্যবহার করবার শক্তি হতে তিনি যখন আমায় বঞ্চিত করেন নি, তখন সেটুকু দয়ার জন্ত তাঁকে নমো নমঃ।

বাক্‌দেবতাকে নমস্কার!—ওগো আমি কথা বলতে পারি, যেমন করেই হোক পারি;—কিন্তু আমার কথা কইবার ভঙ্গী দেখে লোক হাসে, মুখ ফিরোয়। তাই আমি মুখের কথা বন্ধ করেছি—আমার কথার দেবতার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছি! তিনি বাইরের দিকে কারও সঙ্গে কথা বলেন না—অন্তরের মধ্যে যিনি আছেন, কেবল তাঁরই সঙ্গে কথা বলেন। তাই আমিও বাক্যহীন নই—তাই আমিও বাক্‌দেবতাকে প্রণাম করলাম।

আমি বোবা নই—তোতলা, ভয়ানক তোতলা। একটা কথা কইতে গেলে আমার আধ ঘণ্টা লেগে যায়, আর এমন মুখ-বিকৃতি হয় যে, তা দেখে অতি বড় গম্ভীর লোকেরও হাসি আপনি ফেটে বেরোয়। তাই বড় লজ্জায় বাল্যকাল থেকেই কথা বন্ধ করেছি।

সে আজ অনেক দিনের কথা—একদিন আর্শির সুমুখে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল। সেই হতে আমার কথা বন্ধ সে কি বিশ্রী দৃশ্য! এতখানি জিভ বেরিয়ে পড়েছে!—অমন যে বালিকার কচি মুখখানি, একেবারে সৃষ্টিছাড়া কদাকার ভাব ধরেছে! সুন্দর বস্তু কুৎসিত হলে কি এতই কুৎসিত হতে হয়? ওগো সৌন্দর্য্যের দেবতা, তুমি আমায় এত দয়া করেছিলে বলেই কি বাক্‌দেবতা তোমায় বিদ্রূপ করবার জন্ত আমায় এমন করেছেন!

যখন চুপ করে আছি তখন আমার সমস্ত বাহিরটা ত' বেশ কথা বলে। আলোর জগতে আমার সমস্ত দেহের প্রকাশটা এত সুন্দর, আর শব্দ-জগতে আমি এত কুৎসিত কেন? আর যদিই বা আমায় ভগবান শব্দ-জগতে কুৎসিত করলেন, কিন্তু সেই কুরূপটা আলোকের জগতেও দেখা দিল কেন? কথা বলবার চেষ্টা করলেই আমার সমস্ত স্বরূপ কুরূপে পরিণত হয় কেন? তার চাইতে একেবারে বাক্যহীন স্তব্ধ আকাশের অশোকবনে আমায় বনবাসে পাঠালে না কেন নারায়ণ?

চতুর্দ্দিকে এত কথা, এত সুর এত আনন্দের কলস্বর, তার মাঝখানে বসে আমি একেবারে নির্ব্বাক্‌। আমার প্রাণের মাঝখান থেকে কত না সুর ঐ বাইরের ধ্বনির সঙ্গে মিলবার জন্ত ছটফট করছে! অথচ সেই সুরের সিংহদ্বারে যে বিকটাকার তোতলা দৈত্য বসে আছে তাকে পার হয়ে আমার প্রাণের সেই সুকুমার সুরগুলি বেরুতে পায় না, ভয়ে পিছিয়ে আসে। এ কি অভিশাপ!

*   *   *   *

'কথা কও—ওগো কথা কও।' ওগো বনের পাখী, তুমিও বলছ কথা কও? আর কথার রাজা মানুষের কুলে জন্মগ্রহণ করে আমি অষ্টপ্রহর মনকে বুঝুচ্ছি, 'কথা কয়ো না—কথা কইতে চেষ্টাও কোরো না।' ক্রমাগত অন্তরাত্মাকে বলছি, 'থামো, ওগো থামো,' কিন্তু সে থামতেই চায় না—বাক্যেই যে তার পরম প্রকাশ! সেই প্রকাশ-হারা নিতান্তই একলা মানুষটাকে যে আর সইতে পারছি না। সে অন্ধ নয়, যে,

'বাণী, আমার একটা কথা শোনো!'

প্রাণের অন্ধকারে অমুপায় হয়ে বসে থাকবে। সে মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, যে চুপ করে প্রাণের এক কোণে পড়ে থাকবে। সে যে জড় নয়—সে যে একেবারে চৈতন্ত। তার সমস্তটুকুই যে চঞ্চল—তার সবই যে প্রকাশময়। তাকে আটকে রাখবে কে?

* * * *

ওগো আমার কালীমুখ কলমটি, তোকেই আজ মরণের দ্বারে এসে আশ্রয় করেছি—কারণ আর কথা না কয়ে থাকতে পারছি না। আর চুপ করে থাকলে মরণের পরও শান্তি পাব না। ওগো আমার শুভ্রদেহ কাগজগুলি, তোমাদের শাদা বুকে আমার এই কালো দাগগুলি সযত্নে ধারণ কোরো।—কারণ এ দাগগুলি কালো হলেও যে লিখছে তার বুকখানা চিরদিনই একেবারে রক্তে-রাঙা,—সে যে-কথাগুলি লিখছে, তা অন্ততঃ তার কাছে লালে লাল। এবং আজ এই পরপারে পা বাড়িয়ে সাহস করে বলতে পারছি যে, যাঁর জন্ম লিখছি তিনিও নিশ্চয়ই এগুলিকে রাঙা ফুলের মত আদর করে পায়ে স্থান দিবেন।

* * * *

শুনতে পাই গো, শুনতে পাই। বোবা হয়েছি বটে, কালা হতে পারিনি। কিন্তু শুনতে পাওয়াও যে দুঃখের হতে পারে তা কি কেউ বুঝবে? যা আঘাত করে তা প্রতিঘাতকেও জাগায়, কিন্তু সেই প্রতিঘাত যদি বেরিয়ে যেতে না পারে, তাকে নিজের মধ্যে হজম করা কি যে কষ্ট তা কি কেউ বুঝবে? যে আঘাত জড়ের উপর কর তা হয় প্রতিঘাতের আকারে ফিরে আসে, না হয় সেই জড়বস্তুকে তাতিয়ে দেয়। আমার মনের উপর এই যে রূপ-রস-শব্দের আঘাত আসছে তার বড় প্রকাশটি, তার শব্দের প্রকাশটি আমার নেই। তাই আমার সমস্ত আত্মাটি রাত-দিন উত্তপ্ত হয়েই রয়েছে। এই উত্তাপ সারা দিন সইতে হচ্ছে, অথচ কোনো উপায় নাই। সময় সময় মনে হয় এই বুকের বয়লার হঠাৎ কোন দিন ফেটে গিয়ে সমস্ত জমাট কথাগুলা একেবারে জগতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকেও ভেঙে-চুরে ফেলবে, অন্তকেও বেদনা দেবে।

কথা বলব? কিন্তু কবেকার কথা? প্রথম থেকে আরম্ভ করব? কিন্তু এর প্রথম থেকেই যে তোতলার কথা। প্রথম থেকেই যে আমার প্রাণের প্রকাশটা সরুমুখো ঘড়া হতে জল বেরুনোর মত থমকে থমকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়েছে। আমি যে কথায় তোতলা, কাজে তোতলা, জাগরণে তোতলা, ঘুমেও তোতলা। বাল্যকালে কত দিন, মা যখন ঘুমুচ্ছেন, তখন জেগে বসে হাত-পা-মাথা নেড়ে কত কথাই না বলেছি। মা ঘুমুতেন, শুনতে পেতেন না—কেউ শুনতে পেত না—অথচ আমি অনর্গল তুৎলে তুৎলে বকে যেতাম। দিনের বেলায় কেউ আমায় বেশী বকতে দিত না; তাই রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আপন মনে কথার বাঁধ ভেঙেচুরে ফেলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। কেউ শুনত না তাই রক্ষে, নইলে সেই নিস্তব্ধ রাত্রের সমস্ত আকাশটাও বোধ হয় বিদ্রূপের হাসিতে ভরে উঠত।

* * * *

আমার কৈশোর ও শৈশবের স্মৃতি সমস্তই ভাঙা-ভাঙা। যেন আমার জীবনটাই তুৎলে তুৎলে কথা বলেছে। জাগরণে যখন সংসারের নানান কথায়, আদরে-অনাদরে, আঘাতে-অনাঘাতে আমার বুকে এক রাশ কথা জমে উঠত, তখন আমি তাদের চাপে অজ্ঞানের মত হয়ে যেতাম—আমার নিজের অস্তিত্ব বোধটুকুও থাকত না। তাই আমার জাগরণের বোধটাও ছিল ভাঙা-ভাঙা ছাড়া-ছাড়া। আবার ঘুমিয়ে পড়েও রক্ষে নেই,—স্বপনের মধ্যে কথা জমে উঠলে সে অবস্থাতেও মনে হত আমি কথা কইতে পারছি না। অমনি স্বপন কেটে যেত। আমার জীবনটার মধ্যে একটানা একটা স্রোতই যেন নেই।

* * * *

কই ভাই, বৌ কথা-কও, আজ কোথায় তুমি? আজ তোমার সাড়া নেই কেন? এরই মধ্যে কি তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় এল নাকি? তবে কার সঙ্গে কথা কইব? এই শাদা বোকা পাতাগুলোর সঙ্গে? এদের মুখে যতক্ষণ কালী না পড়ে ততক্ষণ যে এরা বোবার চাইতেও নির্ব্বাক্—একেবারে মড়ার মত শাদা-মুখ। উড়ে গেছ তুমি? বেশ, তবে এদের সঙ্গেই কথা কইব। শোনো গো, তোমরা আমার কলমের মুখেই শোনো। কম্মহীন রোগশয্যায় তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বসলাম। আর কেউ না শোনে, তোমরা অম্লান মুখ মলিন করে তুলে শুনে যাও।

আমি গরীব বামুনের মেয়ে—জন্মে'পর্যন্ত মা-বাপের বুকের বোঝা। একে ত' বাঙালীর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানই মহাপাপের ফল, তার উপর আবার আমি মুখ থাকতে মূক! আমার জন্মনক্ষত্রটা কি জানি না, কিন্তু তার কণ্ঠে 'ফলং বাক্‌রোধঃ' এটা নিশ্চয়ই প্রথম থেকেই সবাই জানতে পেরেছিল। তাই আমি যতই বড় হতে লাগলাম, ততই আমাকে দেখে এবং আমার কথা শুনে সবারই বাক্‌রোধ হয়ে যেত। এমন সুন্দর মেয়ের এমন দশা!

দশা সে কেমন! একেবারে চরম! যাই কেউ বললে, 'মা বাণী, আজ কি দিয়ে ভাত খেয়েছ?'—অমনি বাণীর বাণী বন্ধ, চক্ষু

"আমি ক্রিশ্চান, আমার হাতে ওষুধ খাবে ত' ভাই'?

কপালে উঠল, ঘাড় বেঁকে গেল,—আর দেড় হাত জিভ বেরিয়ে গেল। তার অর্থ যে কি তা কেউ বুঝত কি না জানি না, কিন্তু এখন আমার মনে হয়, আমি না বলতে পারলেও, আমার রুদ্ধ বাক্‌শক্তি জিভ বার করে বুঝিয়ে দিত যে, আমি জিভ দিয়েই ভাত খেয়েছি। ডাল তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না—খেতে হলে জিভ দিয়েই খেতে হয়। কিন্তু হায় রে বোকা শ্রোতারা, তোমরা মজা দেখবার জন্ম আমায় কথা কওয়াতে! আমায় কষ্ট দিয়ে তোমরা আমোদ পেতে! কিন্তু সত্য কথাটা ত' তোমরা বুঝতে না। খাও তোমরাও জিভ দিয়ে, কিন্তু জিভের সেই আসল ব্যবহারটা তোমাদের মনে থাকে না। তাই তোমরা কেবল সেটাকে ব্যবহার কর মুখ-ভ্যাঁচাবার জন্তে—জিভ ভ্যাঁচাবার জন্তে। নাক দিয়ে মানুস নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু মানুষ সেই নাকের সজ্ঞান ব্যবহার করে নাক সেঁটকাবার সময়! এমনি সংসার—আর এমনি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ!

* * * *

হায় রে মানুষের জীবন! এ জীবনে মানুষকে মা-বাপের ঠাট্টাও সহ্য করতে হয়। আমার নাম কি না বাণী। যে বাক্‌শক্তি-হীন হবে তার নাম রাখা হয়েছিল বাণী! এ যেন কালো গুণ্ডাগুণ্ডার নাম রাখা নলিনীমোহন, না হয় কমলকুমার!—এ যেন পদ্মফুলের মত ছেলের নাম রাখা অঘোরকদ্র! এ যেন ধূমাবতীর মত মেয়েমানুষের নাম রাখা ললিতা! এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ের নাম রাখা রাজরাজেশ্বরী!

* * * *

গরীব মানুষের তোতলা মেয়ে, তোতলা কেন, প্রায় বাক্‌শক্তিহীন মেয়ের সব চাইতে ভাবনার কথা বিয়ে হওয়া। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মা-বাপের আমার সেই ভাবনাটাই বাড়তে লাগল। ক্রমশঃ আমিও তা বুঝতে পারলাম—আর নিজের জীবনের উপর ধিক্কার সঞ্চয় করতে লাগলাম। আমার দশ-এগার বছর হতে আরম্ভ হয়ে কত দিন পর্য্যন্ত কত লোক এসে দেখে গিয়েছে, কিন্তু আমার কথা শুনেই যে তারা হাসি চেপে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। সে সবই যে মনে পড়ে! কিন্তু আজ ভাবছি, কি তারা দেখে যেত! বাইরের রূপ দেখে তারা বলত, বাঃ বেশ ত! তারপর কথা বলাতে গিয়ে হাসি চেপে তারা বলত, আহা! কিন্তু তারা ত' কেউ আমায় দেখেনি। দেখবে কি করে? মানুষের যা প্রকৃত প্রকাশ তাই যে আমার নেই—আমি যে বাক্‌শক্তিহীন! ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকলে কি মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়? চোখের ভাষা কি কেউ বোঝে? মানুষের অর্দ্ধেকের বেশী বোঝা-পড়াই যে কান দিয়ে! কান মনে না দিলে সে বাল্যকালে পড়ায় মন দেয় না, কোন জিনিষ বোঝে না—বড় হয়েও কান ধরে টানাটানি না করলে তার মাথাই যে কোনো দিকে এগোয় না!

* * * *

আমি মাথায় যতই বড় হতে লাগলাম, মায়ের আমার মুখখানি ততই ছোট হতে লাগল। আমি ত তখন প্রায় কথা বন্ধ করেছি। সারা দিন ভূতের মত খাটতাম—জেঠী-খুড়ীদের বকুনির সঙ্গে চোখের নোণা জল দিয়ে ভাত খাই, আর মনকে বোঝাই খবরদার, চুপ করে থাক। কিন্তু সেই চুপ করে কাল হল;—বাবা বহুদূর থেকে সম্বন্ধ করে মেয়ে দেখাতে আনতেন, তারা দু'চার কথার পরই আতঙ্কে দূর-দূরান্তে চলে যেত। আমার বিয়ের সম্ভাবনাও ততোধিক দূরে সরে যেত।

* * * *

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি নিকট হতে আমার বিয়ের সম্ভাবনা হল। হায় রে! এত নিকটে থেকে এত দিন ধরে আমায় দেখে, শেষে আমার মত জানোয়ারকেও সে দয়া করে বিয়ে করতে চাইলে! কেন এ দয়া করেছিলে তুমি? দয়া করবার আর মানুষ পাওনি? আমি ত' নির্ব্বাক্‌ নিস্তব্ধ হয়ে এক পাশে পড়ে ছিলাম। আমি ত আমাকে আমার মন-গহনের মধ্যে নির্ব্বাসিত করেছিলাম! সেখানে যা ছিল তা আমারি ছিল—আমার মৌন পাখী, আমার স্রোতহারা নদী, আমার স্তব্ধ আকাশ, আমার অচঞ্চল বাতাস, আমারি মূক লোক-জন আমারি চিরস্তব্ধ তপঃলোক। সেখানে তুমি এলে কেন?—আমি ত তোমায় চাইনি। তোমার দয়া ধর্ম্ম স্নেহ প্রেমের কলরব নিয়ে নিস্তব্ধ দেশে এসে তুমিও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছ—আমিও কোন গুরুতর গভীরতম মৌনতার দেশের যাত্রী হলাম।

* * * *

আমি ডাকিনি তবু সে এল।—সে দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গ্রামের বড় পুকুরটায় জল আনতে গিয়েছিলাম। বৌ হবার পূর্ব্বেই আমায় বৌ হতে হয়েছিল—কারণ, আমার বয়েসের অনেকেরই তখন ছেলে পর্য্যন্ত হয়েছে। তাই জল আনতে হলে গ্রাম্য বধূদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল আমায় তা হতেও বঞ্চিত হতে হয়েছিল। তাই গ্রামপথে লোকসমাগমের পূর্ব্বেই আমায় ঘাটের কাজ সারতে হত।

কলসীতে জল ভরে ফিরে দেখি, লাল আকাশের গায়ে কালো দৈত্যের মত নিজের প্রকাণ্ড দেহটা অঙ্কিত করে কে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম আলো

"বলেছিলেন, তুমি ত' কথা কইলে না, কখনো যে কইবে তারও আশা নেই। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, এরই পাতে ছুটো তোমার মনের কথা লিখে রেখো, আমি তাতেই খুসী হব!"

গাছের মাথাগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছিল মাত্র। আমি চিরদিনই সূর্যোদয় দেখতে ভালবাসি—তাই বাল্যকাল থেকেই ভোরে উঠে কাপড় ছেড়ে জল আনতে যেতাম। ঘাটের পারে সূর্য যখন লাল হয়ে উঠতেন তখন পুকুর-ঘাট হতে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর দিকে চাইতে চাইতে জল নিয়ে বাড়ী আসতাম। আজও তাঁকেই দেখতে উঠেছিলাম। কিন্তু সূর্যমূর্ত্তিকে আবৃত করে আজ কাকে দেখলাম! এ যে আমাদের পাড়ার শম্ভু! ঠাট্টা করে সবাই তাকে শুম্ভ-নিশুম্ভ বলত। মস্ত তার মাথাটা, প্রকাণ্ড তার দেহ; আর সব চাইতে ভয়ঙ্কর তার বড় বড় উঁচু রক্তাভ দুই চক্ষু!

তাকে আমি চিরদিনই ভয় করতাম, কারণ যেমন পাহাড়ের মত কালো গম্ভীর মূর্ত্তি, তেমনি সে স্বল্পভাষী। আপন কাজে সে চিরদিন মুখ গুঁজে লেগে থাকত। বামুনের ছেলে, কিন্তু হেন কাজ ছিল না যা সে না করত। তার অবস্থা ভাল; বাড়ীতে আমলা-ফয়লা দাস-দাসীর অন্ত ছিল না। অথচ সে সারা দিন ভূতের মত খাটে। আর এমনি তার গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ যে হঠাৎ অন্ধকারে শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। পাড়ার সবাই তাকে ভয় করত—আমিও করতাম।

*　*　*　*

সেদিন সেই প্রভাতে সেই শম্ভু আমার সমুখে। আমি এগুবো কি পেছুবো ঠিক করতে না পেরে চুপ করে দাঁড়ালাম। এমন সময় গুরুগম্ভীর আওয়াজ হল, 'উঠে এস বাণী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

কেন যে দাঁড়িয়ে রইলাম তা সে কেমন করে বুঝবে? তার মস্ত মাথাটায় দুনিয়ার সব ঢুকতে পারে কিন্তু সে যে ভয়ঙ্কর এ কথা ঢুকতেই পারে না, একথা সে ভাবতেই পারে না। পারলে সে কি এমন করে নিজেকে সকলের সামনে বার করত? তা হলে আমি যেমন বাক্যরোধ করে নিজেকেও গোপন করতে আরম্ভ করেছি সেও তেমনি নিজের চেহারাটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করত।

আমি উঠে এলাম; সে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু যাই আমি তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছি সে আমার সমুখে দাঁড়িয়ে বললে "বাণী, আমার একটা কথা শোনো!" আমি থর-থর করে কেঁপে উঠলাম। মুখ দিয়ে কি শব্দ বেরুল মনে নেই, কিন্তু কলসীটা কক্ষচ্যুত হয়ে গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়ল। কেন ভয় পেয়েছিলাম? কিসের ভয়? সেও মানুষ, আমিও মানুষ, তবু মানুষকে মানুষের এত ভয়!

শম্ভু পিছিয়ে গিয়ে বললে—"বাণী, তুমি ভয় পেয়েছ—ভয় কি?" ভয় যে কিসের তা এখনো বলতে পারিনে—তবে এইটুকু মনে আছে যে খুব ভয় পেয়েছিলাম। শম্ভুর মুখ লজ্জায় আরো কালো হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বললে, "ভয় নেই, বাণী, আমায় ভয় করবার কোনো কারণ নেই। আমি কেবল এইটুকু জানতে এসেছি যে তোমার শুনছি বিয়ে হচ্ছে না। আমায় তুমি বিয়ে করবে? কথা বলে কাজ নেই, ঘাড় নেড়ে বললেই হবে।"

হায় রে কপাল! আমার কথা বলাকে সেও ভয় করে। তা করুক, আমি যখন অকারণে তার চেহারাকে ভয় করতাম সেই বা কেন সকারণে আমার তোতলা কথাকে ভয় করবে না? হতভাগিনী আমি যখন তার সেই গভীর দয়াকে প্রবল বেগে মাথ নেড়ে অপমান করতে পেরেছিলাম, তখন কেন সে আমাকে বাঘের মত ভয় করে পালিয়ে গেল না? কেন সে আবার এল—বার বার এসে আমার জন্ম মায়ের কাছে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালে?

শম্ভু আমার ঘড়াটায় জল ভরে এনে বললে, "চল তোমার বাড়ীতে দিয়ে আসি।" কি সর্ব্বনাশ! তাকে সঙ্গে করে সারা পথ যেতে হবে! কিন্তু শম্ভু কোন কথা বললে না, আমার ঘড়াটা হাতে ঝুলিয়ে বাড়ীর দিকে চলল। আমিও চোরের মত তার অনুগমন করলাম। উপায় কি? সে যে কোন কথা শুনল না!

*　*　*　*

দয়া! তার দয়ার হাত থেকে কে আমায় বাঁচাবে? কেউ না। মা বাবা সে কথা শুনে নিশ্বাস ফেলে বললেন—"বাঁচা গেল। কারণ শম্ভু সৎপাত্র এবং তার অভিভাবক আর কেউ নেই যে এ বিবাহে বাধা দেবে। তার চেহারাটা ছাড়া সে সর্ব্ব বিষয়েই প্রার্থনীয় পাত্র। অতএব এ সম্বন্ধ ছাড়া যেতে পারে না।"

*　*　*　*

এ সম্বন্ধ ছাড়া যেতে পারে না? তা বটে, কারণ আমি যে কুপাত্রী! কেই বা আমার দিকে চাইবে? কেই বা আমার অকারণ ভয়কে গ্রাহ্য করবে? বাবা চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেলেন। আত্মীয় বন্ধুরা বললেন—"বাঃ, বোবা বাণীর এমন পাত্র জুটল!—কালে কালে কি না দেখতে হবে?"—মা-ই কেবল আমার মুখ দেখে হঠাৎ একদিন আমায় বুকে চেপে ধরে রুদ্ধ স্বরে বললেন "ভয় কি বাণী!"

ভয় যে কি, তা কেমন করে বলব—কিন্তু সে আমার সমস্ত বহিরন্তরকে অধিকার করে বসল, আমি একেবারে বোবা দিলাম। মাঝে মাঝে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে ভয়ঙ্কর শব্দহীন না—না—না—না—ধ্বনিতে ভরে উঠতে লাগল।

সেই না—না—শব্দ কেউ শুনলে না। কেউ শুনলে না বটে কিন্তু যাকে শোনান দরকার একদিন তাকে হঠাৎ সমস্ত তোতলামির বাঁধ ভেঙে শুনিয়ে দিলাম—না—না—না। কিন্তু সেও শুনলে না। তার মস্ত বুকখানার মধ্যে যখন দয়ার প্রবৃত্তি জেগেছিল তখন তাকে কে ঠেকিয়ে রাখবে?

*　*　*　*

ভয়ে আমার ভয় ভেঙে গিয়েছিল। তাই সেদিন দুপুর বেলায় তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার বাড়ীতে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাওয়া-আসা যে আমার ছিল না তা নয়। বাল্যকালে যখন পুজাপার্ব্বণে তাদের বাড়ী ঢাক-ঢোল বেজে উঠত বা যখন তারা কাজে-অকাজে নিমন্ত্রণ করে পাড়া-পড়শীদের ভোজ দিত তখন ভাল কাপড়-চোপড় পরে আমি অনেক দিন তাদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন সবারই বাড়ী যাওয়া ছেড়েছিলাম—তেমনি তাদের বাড়ী যাওয়াও ছেড়েছিলাম।

আজ বিপদে পড়ে অনাহূত হয়েই তার কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, সে দরজার দিকে পেছন করে বিছানায় বসে কি একটা বই পড়ছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সে ফিরে চাইলে। অমনি তার সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

আমি সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে, যা বলবার ইচ্ছে ছিল তাই বলতে গেলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল কেবল একটা আর্ত্তস্বর—একটানা অশ্রুরুদ্ধ না—না—শব্দ!

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখের ওপর তার বিশাল চোখ দুটি রেখে বললে—"তোমার এই ভয় ভাঙাই আমার জীবনের একটি মাত্র কাজ হ'ল। আমি এ বিয়ে করবই। বিয়ের পর তোমার তোতলা রোগ সারাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সারে ভালই, নয় ত আমারও কথা বন্ধ হবে। দেখি তাতেও যদি তোমার ভয় ভাঙে। কেন যে 'তুমি ভয় করছ তা ত জানিনে—হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন তুমি বুঝবে যে আমি ভয়ের জিনিষ নই।"

* * * *

তুমি ভয়ের জিনিষ নও—তুমি যে কিসের জিনিষ তা আজ এই এত দিন পরে মরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড় দেরীতে, প্রিয়তম, বড় বিলম্ব হল। কিন্তু না বোঝাই যে ভাল ছিল। যখন বুঝলাম তখন মৃত্যু যে আমাদের দু'জনার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যে ভুল শুধরে কোন ফল নেই। আমি যে তাকে ইচ্ছে করে ডেকে আনলাম। সে যখন এসেছে তখন ত' আর ছাড়বে না।

* * * *

কি কথার মধ্যে কি কথা লিখেছি কাল। যে কথা বলছিলাম শেষ করি।

আমার কথা কেউ শুনলে না, বিয়ে হয়ে গেল। যাকে সমস্ত বহিরন্তর দিয়ে ভয় করতাম তাকেই বিয়ে করতে হল। তার দয়ার নির্দ্দয়তা হতে নিস্তার পেলাম না। এই দয়াটা যে আর কিছু হতে পারে—এ যে সেই প্রকাণ্ড কালো পর্ব্বতের বুকের নির্ম্মল সলিল—প্রেম-নির্ঝর হতে পারে তা যে কিছুতেই মন বুঝতে চায়নি। তাই বিয়ের পর হতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, ভগবান আমাকে আমার স্বামীর দয়া থেকে মুক্তি দাও। আমার মত অনেক হাবাকালা বোবা ত' জগতে আছে, তাদের এ দয়া সে দেখাল না, দেখাল এই আমাকে? কেন এই অপমান আমি সইব? আমার রূপটুকুকে মাত্র দয়া দেখাবার তার কি অধিকার? আমি সুন্দর হয়েও গরীবের মেয়ে, তাই কি এমন লোককে আমায় বিয়ে করতে হবে? যাকে দেখলে সবাই ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় তাকেই, গরীব বলে তোতলা বলে আমায় বিয়ে করতে হবে? যাকে কেউ ভালবাসতে পারে না তাকে আমাকেই ভালবাসতে হবে? ভগবান! এ দয়া যে আমি চাই না। তার এই ভয়ঙ্কর দয়া থেকে আমায় মুক্ত কর। যাকে সমস্ত দেহে প্রাণে ভয় করি তাকে ভালবাসতে পারব না, তার দয়া আমার সইবে না।

* * * *

বাস্তবিক সে দয়া আমার সইল না? আমার মত পাপীর সে সুধার আগুন সইবে কেন? তাকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই সেই স্বর্গের আগুন আমায় দগ্ধ করলে। ওঃ, আমার পাপের কি শেষ আছে? এ জ্বালা কিসে জুড়াবে?

* * * *

সে আমার জন্ত কি না করেছে? আমায় কলকাতায় নিয়ে এসে আজ পাঁচ ছ বৎসর ধরে আমার মন পাবার জন্ত কি না করেছে সে। আজ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মরণের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বুঝতে পারছি কি রত্ন হেলায় হারালাম! নিজের জীবনও নষ্ট করলাম আর একটি মহৎ প্রাণকেও নিস্ফল করে দিলাম! তিনি আমারই জন্ত জগৎসংসারের সঙ্গে বাক্যের সংস্রব ত্যাগ করেছেন! এই অগ্নির মত তেজস্বী মানুষকে সহ্য করা কি আমার মত খড়ের প্রতিমার কর্ম্ম?

* * * *

ভুল—ভুল—জীবনব্যাপী মতিভ্রম! হায় দেব অগ্নি, বিবাহের দিন তোমার সাক্ষাতে এ কি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা আমায় করিয়ে নিয়েছিলে? স্বামী প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁর দেহ মন প্রাণ সব আমার, আর নষ্টমতি আমি কি প্রতিজ্ঞা করলাম! কেন সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সেই প্রতিজ্ঞা শুনবামাত্র আমার সেই লাল চেলীখানা সত্যি-সত্যি আগুন ধরে লাল হয়ে উঠল না কেন? কেন সেই লাজহোমের সময় আমিও নিজেকে আহুতি দিলাম না কেন—কেন—

* * * *

প্রতিজ্ঞা করলাম, সারা জীবন আর কারও সঙ্গে কথা কইব না। স্বামীর সঙ্গে ত' নয়ই—মা-বাপের সঙ্গেও নয়। যে মহাপ্রাণ মানুষটি এই বাক্যহীনার একটা কথা শুনবার জন্ত উৎসুক হয়ে রইল তাকে আমার তোতলা কথা হতেও চিরজীবনের জন্ত বঞ্চিত করে রাখলাম?

কথা কইব না! বটে! তোমার কথা কওয়াটাও যে কি বীভৎস দৃশ্য তা কি সেই প্রতিজ্ঞার সময় মনে ছিল না? তবে মূঢ়, তোমার কেন তখন মনে হল না, যে, তোমার কথা না-বলাই যে ভাল—মানুষের নয়নসুখকর থাকবার জন্তই যে তোমার বাক্যে সংযমী হওয়া উচিত। স্বামী তোমায় কথা কইতে দেখলেই যে আঁতকে উঠবেন—এই কথাটা মনে রাখনি কেন?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর একটা প্রচণ্ড অভিমানে আমি অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করলাম, কথা কইব না। যেটুকু কথা কইবার শক্তি ছিল তাও চিরদিনের জন্ত অন্তরে বন্ধ করে নির্ব্বাক্ কাঠের পুতুলের মত স্বামীর পিছনে ঘুরতে লাগলাম। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলে গেল—আমি কিন্তু আকার ইঙ্গিতেও নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা অন্ত কোন রকম মনের ভাব কাউকে জানাইনি। সবারই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিজে খেটে মরতাম, আমার যে কি চাই তা কেউ জানতে পারত না।

* * * *

স্বামী লেখাপড়া শেখালেন। সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার। এক পক্ষ কতই না বকে যাচ্ছে—কত উপদেশ, কত অদ্ভুত গল্প, কত ইতিহাস, কত কাব্যকথা ঐ প্রকাণ্ড কালো মাথা থেকে বেরুতো। তা কি সব মনে আছে? তাঁর অনর্গল বক্তৃতার স্রোতের মধ্যে পড়ে কত সময় হাবুডুবু খেয়েছি, হাঁপিয়ে উঠেছি, তব নির্ব্বাক

হয়ে বসে থাকতাম—কখনও তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতাম, কখনও বা ঢুলুনি আসত। তবু তিনি কখনো থামেন নি। যেন তিনি এই নির্ব্বাক্ শ্রোতাটি পেয়ে তাঁর অন্তরের গভীর জ্ঞানের সাগরের উচ্ছ্বাসটাকে উন্মুক্ত করবার সুবিধা পেতেন। বাইরে কেউ ঐ লোকটির কাছে বড় একটা ঘেঁসত না, কিন্তু যে দু'-এক জন ওঁর অন্তরের খবর টের পেয়েছিল তাদের কাছে উনি যে কত লোভনীয় ছিলেন, তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু হায়! সবই এই কাঠের পুতুলের কাছে ব্যর্থ হয়েছিল।

* * * *

কত দিনের কথা আজ মনে পড়ছে—শুয়ে-শুয়ে ঐ বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে কত শত দিনের কথা বিদ্যুতের মত আমার এই মরণোন্মুখ প্রাণটা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি আমায় এই মরক্কো-বাঁধান খাতাখানি কত দিন আগে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি ত' কথা কইলে না—কখনো যে কইবে তারও আশা নেই। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, এরই পাতে দুটো তোমার মনের কথা লিখে যেযো—আমি তাতেই খুসী হব।"

হঠাৎ আজ ক'দিন আগে সেই কথাটা মনে পড়েছে। তাই ক'দিন হতে লিখে যাচ্ছি।—জানি না, শেষ পর্য্যন্ত লিখতে পারব কি না, কিন্তু প্রাণপণে লিখব। তাঁর সঙ্গে কথা না কওয়ার প্রতিজ্ঞা অগ্নি-সাক্ষী করে করেছিলাম—সে প্রতিজ্ঞা রেখেছি। কিন্তু জীবনে যা হল না মরণের পর যেন তিনি আমার খাতাখানার দুতীগিরিতে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারেন, তার উপায় করলাম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি সারা জীবন ধরে করে গেলাম—প্রাণ থাকতেও কাঠের পুতুল থাকার যন্ত্রনা সারা জীবন ভোগ করে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তিনি যেন মনে না করেন যে, তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়নি। তিনি জয়ী হয়েছিলেন—তাঁর জয়-পত্র এই আমি রেখে যাচ্ছি—এইটুকু আমার শেষ সান্ত্বনা।

* * * *

মনে পড়ে এমনি একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। স্বামী কোথা হতে এক-রাশ পাতাসুদ্ধ কদম ফুল এনে বললেন—"এরা তোমারি মত—দূর হতে যখন কালো পাতার মধ্যে ডালে-ডালে দলছিল তখন কত কথাই বলছিল; কিন্তু পেড়ে যাই হাতে করেছি অমনি এদের সর-সর দলগুলি ঝরে যাচ্ছে—সমস্ত দেহটাই এদের কাদার মত হয়ে যাচ্ছে।" তিনি সেই পাতা-ডালসুদ্ধ কদমফুলগুলো ঘরের নানা স্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। শেষে দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললেন,—ডাক্তার বলছিল "এমন করে থাকলে শুধু যে তুমি কথাকে হারাবে তা নয়—হয়ত' প্রাণও হারাবে। তুমি যদি বল, তোমায় তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দি।" আমি কোন কথা না বলে উঠে গেলাম। তিনি আমার ইচ্ছার কোন রকম ইঙ্গিত না পেয়ে সারা দিন কেবল গভীর দৃষ্টিতে আমার অন্তরের খোঁজ নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই বর্ষায় বৃষ্টি-সাগর পার হয়ে আবার এসে উপস্থিত হয়েছে। যা সত্য তা যে কিছুতেই মরে না। সেই দিনকার কথা মনে হয়েছে, তবু প্রাণপণে বলছি, যখন এত দিনই গিয়েছে তখন আর কেন? আর নয়—নয়—

ঐ যে স্তম্ভিতবর্ষণ মেঘের মত মানুষটি আমায় ঘিরে-ঘিরে মাঝে-মাঝে স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে কুশল প্রশ্ন করছে, ওকেই কি আমি এত দিন ভয় করে এসেছি? শুধু ভয় কেন?—তার চাইতেও যা আরও ভয়ঙ্কর, স্বামীকে যা করলে অনন্ত নরক, সেই ঘৃণাই করে এসেছি? ঐ কি সেই মানুষ, যাকে মনে করতাম আমার জীবনের সূর্য্যোদয় এক প্রভাতে রাহুগ্রস্ত করে চির-জীবনের জন্য তাঁকে আমার জীবনাকাশ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে? কৈ আর ত' তা মনে হয় না। এখন যে কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ মানুষটি ত' আমার উষর জীবন-ক্ষেত্রের দিগন্তবিস্তৃত দগ্ধ তাম্র-আকাশের প্রথম মেঘসঞ্চার।

জানি না, কি অশুভ লগ্নে কি অশুভ-দৃষ্টিতে ঐ আমার শ্যামল মেঘকে প্রথম দেখেছিলাম। সেই দৃষ্টির ফল যে কিছুতেই আমায় ছাড়তে চাইল না। ঐ সজল জলদের বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝার সম্ভাবনাই বেশী ভয় দেখিয়েছিল। তার শীতল বারিধারার সম্ভাবনার কথা মনেই উদয় হয়নি। কিন্তু যখন সেই বারিপাত অজস্রধারে আরম্ভ হল, তখন আমার অন্তর-গৃহের সমস্ত জানালা-কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ওগো গুরুগর্জ্জিত মেঘ, ওগো ঘন-গম্ভীর দুর্বোধ অন্ধকার, ওগো ঘনাবৃত গূঢ় স্নেহ, তুমি আমার সেই রুদ্ধ-দুয়ার ভাঙতে পারলে না কেন? কেন তোমার ততখানি শক্তি হল না? আমি বা কেন সেই স্নেহশক্তিকে ঠেলে রাখবার শক্তি পেয়েছিলাম! এখন সেই শক্তিই যে আমায় মরণের দিকে নিয়ে চললো।

* * * *

সময় নেই, আর সময় নেই—আমার সব কথা যে কিছুতেই শেষ হবে না, সে কথা যে কেবলই ভুলে যাচ্ছি। যা লিখতে বসেছি তার আগাগোড়া কিছুরই যে ঠিক থাকছে না। ধীরে ধীরে অচঞ্চল পদে শেষ দিন এগিয়ে আসছে তা বেশ জানতে পারছি। তবু শেষ কথা যে আর শেষ হতেই চায় না। সারা জীবনের রুদ্ধকথার স্রোত যে এই কলম বয়ে বর্ষার ঝর্ণার মত নেমে আসতে চাইছে। এক বার যখন কথার বাঁধ খুলেছে তখন আর কি করে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখব? শেষ হবে না?—শেষ বলা হবে না? নাই বা হল। এই একখানা ছোট খাতায় আমার সমস্ত জীবনটা এঁটে যাবে? আমি এতই ছোট? না না—তা আমি নই। আমিই আজ আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছি। আমি ত আর বোবা রোগাক্রান্ত বিশ-পঁচিশ বৎসরের ছোট মানুষ মাত্র নই—আমি যে লোকে-লোকে কালে কালে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমার নিজের স্পর্শ যে আমি চার দিক থেকে পাচ্ছি। ঐ যে মেঘ থেমে-থেমে আমারই মত রুদ্ধবাক্ হয়ে গুর-গুর করে গুমরুচ্ছে!—ঐ যে বিদ্যুৎ চমকে-চমকে উঠছে ওরও যেন আমারই মত ভাঙা-ভাঙা তোত্‌লা ভাষা—ঐ যে—ঐ যে—

আর এক দিন—কি ভয়ঙ্কর, কি নিষ্ঠুর সেদিন আমি হতে পেরেছিলাম। আমার মধ্যে, ওগো চিরন্তন নারী, ওগো নারায়ণী, তুমি কেমন করে এতটা খুঁজতে পেরেছ? সেদিন সন্ধ্যায় কাজকর্ম সেরে জানালার গরাদে ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় তিনি হঠাৎ একটা বছর চার-পাঁচেকের কালোকোলো ছেলের হাত ধরে আমার ঘরে এসে বললেন, "ওগো ভদ্ররাজ্ঞি, তোমার উপযুক্ত একটি উপহার এনেছি। আমার বোবা-কালার স্কুল থেকে এই ছোট অপরাজিতা ফুলটি আমার বাণীর জন্ত এনেছি। তুমি এর বাণী ফোটাও।"

হঠাৎ আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ইচ্ছে করল, সেই মুহূর্ত্তে হেসে-কেঁদে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ি। কিন্তু তা হ'ল না। কেন হ'ল না? কেন সেদিন তা পারলাম না? তা হলে ত' আজ এ ডাইরী লিখতে হত না। এই বুক-ফাটা রুদ্ধবাক্ অশ্রু ফেলতে হ'ত না।

ক্ষণপরেই মনে হল আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙাবার এ এক মস্ত ফন্দী বার করেন নি তিনি। যাই একথা মনে হওয়া অমনি আমার সমস্ত দেহ-মন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। ছেলেটিও আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে কেঁদে উঠল। সে-ও এ রাক্ষসীকে চিনলে!

ওরে নিষ্ঠুর, ওরে নির্দ্দয়—ওরে আমার অন্তরের পাথরের চাইতেও পাথরের মানুষ, তুই কি করে সেদিন চুপ করে ছিলি! যেদিন তিনি আমার রুদ্ধবাণী না শুনতে পেয়ে আমার চাইতেও যারা হতভাগ্য সেই বোবা-কালাদের কথা ফুটিয়ে তাদের মুখে আমার কথা ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন, সে দিনও তুই একটি কথা দিয়ে তাঁকে আনন্দিত করিস নি আর যেদিন সেই মূক বালককে আমার কোলের কাছে এনে দিলেন সেদিনও তুই নির্ব্বাক ছিলি! ওরে পাষাণ—ওরে—ওরে—

* * * *

এই ঘটনার পর হতে দেখি স্বামীও কথা বন্ধ করলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারও সঙ্গে তিনি আর বাক্যালাপ করতেন না। তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দিনে দিনে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল তিনি ততই বাইরের সঙ্গ ত্যাগ করতে লাগলেন। আমি তাঁর পাশে গেলে, তিনি হয় নিজে চুপ করে পড়েন, না হয় নীরবে আমার হাতে কোনো বইয়ের পাতা খুলে দিয়ে চুপ করে আমার পানে চেয়ে থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কেটে যায়। সংসারের কাজে কেউ ডাকলে আমি উঠে যাই, তার পর ফিরে এসে দেখি সেই পরম একক মানুষটি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছেন!

ওরে ভক্তিহীনা, ওরে উদ্ধতা নারী, কেন তুই নীরবে সেই পায়ে মাথা লুটাতিস না? কে তোকে সেই সামান্ত একটু কাজ করতে মানা করত?

* * * *

নারায়ণ! তুমি নাকি সৃষ্টির আগে একলা ছিলে? কিন্তু সে কি এমনি একলা? তোমার শ্রী, তোমার শক্তি, মা-লক্ষ্মী যদি তোমার পাশে সেই সময় এমনি ভাবে মড়ার চাইতেও মড়া হয়ে, জীবন্ত হয়েও চাঞ্চল্য-হীনা হয়ে পড়ে থাকতেন, তা হলে তোমার নীল চক্ষে কত বেদনা-গভীর হয়ে দেখা দিত দেবতা? হে আদিকবি, যদি তোমার সেই প্রথম সৃষ্টিসঙ্গীতের সময় তোমার বাক্ তোমার বাণী তোমার পাশে মূঢ়-মূক হয়ে পড়ে থাকতেন, সে দুঃখ কি তোমার সইত? তবে এই কপাটবদ্ধ বিশালহৃদয় আমার একমাত্র শ্যামমূর্ত্তি নর-নারায়ণটির তা সইছে কি করে? কি শক্তি তাকে দিয়েছ প্রভু, যে, সে এই অধমাকে এত ভাল বেসেছে অথচ সেই অধমার কাছ থেকে সারা জীবনে একটা ইঙ্গিত বা একটা অক্ষরও সে ভিক্ষে করেও পেলে না? অথচ সে দুঃখ তাকে সইতে হ'ল? কি তার অপরাধ? কেন তার এই শাস্তি? নারায়ণ, তার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ কেড়ে নাও—সে বাঁচুক—সে সুস্থ হোক!

* * * *

যত দিন পেরেছিলাম কোন রকমে দেহটাকে খাড়া রেখেছিলাম। তার পর হঠাৎ কোন্ দিন একেবারে শয্যা গ্রহণ করতে হল ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এইটুকু মনে আছে যে স্বামী দিন-রাত্রি আমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বসে থাকতেন। তাঁর অক্লান্ত সেবার চেষ্টা দেখে কত সময় যে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছি তার ঠিক নেই। তবু তিনি ত' আমায় ত্যাগ করেন নি?

এমনি সময় স্বামী কোথা হতে আর এক জনকে আমার সেবার জন্ত নিয়ে এলেন। স্বামীর কালাবোবার ইস্কুলে নাকি সে কি করত। সে এল সেবা করতে, কিন্তু তার প্রথম করস্পর্শেই আমার বুকের দ্বার খুলে গেল—অমনি সে একেবারে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করলে। কি মধুর তার স্পর্শ! কি মধুর তার সেই প্রথম কথাগুলি!

* * * *

উঃ এ কি জ্বালা!—না, আজ আর কিছু লিখতে পারব না। ভিতর থেকে একটা কাঁপুনি বেরিয়ে আসছে—অথচ বাইরে একটা প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব হচ্ছে।—নাঃ পারলাম না—

* * * *

আহা কি মিষ্টি তার নামটি—সুভাষিণী—মিষ্টি কথা। শুধু কি তার কথাই মিষ্টি, তার সবই মিষ্টি। তার নামের আগে ইংরিজি মিস্ কথাটাও মিষ্টি;—মিস কথাটা বাংলা মিষ্টির আধা-আধি—আধাআধি কেন, তারও বেশী।

প্রথম যেদিন সে আমার সমুখে এসে দাঁড়াল তখনই তাকে দেখে আমার মনটা তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার পর যখন সে বললে—'আমি ক্রিশ্চান, আমার হাতে ওষুধ খাবে ত' ভাই',—তখন আমার মনে হল, কেন কথা বন্ধ করেছি? কেন তার হাত ধরে বলতে পারলাম না, যে তুমি যাই হও তুমি আমার পরমাত্মীয়?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে ঝিকে ডেকে বললে, "তোমায় যখনই ডাকব, এসে ওষুধ খাইয়ে যেও—খাবার দিয়ে যেও। আর বামুন-ঠাকুর যেন সব সময় বাড়ী থাকেন, তাঁকে যেন ডাকলে পাই।"

ঝি বললে, 'বাবু বলে দিয়েছেন, আপনার কথা-মত সবই হবে। বাড়ীর কাজের জন্ত নতুন লোক রাখা হয়েছে।'

* * * *

সুভাকে পেয়ে পর্য্যন্ত সবই আমার নতুন হয়ে গেল। সে ডাক্তারী শিকাতেই জীবন কাটায় নি—তার গিন্নিপণাও চমৎকার!

সবই যেন কলে চলতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়েও অনুভব করতাম তার নিপুণ হাতে পড়ে স্বামী হতে আরম্ভ করে ঝি-চাকর পর্য্যন্ত সবাই যেন কেমন এক রকমের হয়ে গেল। সবই যেন ঘড়িধরা ধরে চলতে লাগল। সুভা এল আমার সেবা করতে, কিন্তু তার সেবার শক্তি রোগীকে ছাড়িয়ে সারা সংসারে ছড়িয়ে পড়ল।

কোথা হতে যে সে এসেছে, ইতিপূর্ব্বে তার কি কাজ ছিল, তার বাপ-পিতামহ কোন্ জগতের মানুষ, কিছুই খোঁজ নিলাম না; সে যেন চিরদিনকার আপনার জন। মায়ের পেটের ভাইবোনও আমার ছিল, সবাইকেই আমি পর করেছিলাম। সকলেই আপন-আপন সংসার নিয়ে ব্যস্ত, চিরদিন আমাকেও উপেক্ষা করে এসেছে, আমিও কাউকে কখনও ডাকিনি! কিন্তু আজ এই মরণের দ্বারে এসে এ কোন্ আপনার জনকে লাভ করলাম? কোথায় এত দিন এ লুকিয়ে ছিল?

* * * *

আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। সুভার সঙ্গে মনে মনে 'মিষ্টিকথা' পাতালাম। স্বামীকেও যা দিতে পারিনি তা আমার মিষ্টিকথাকে দিলাম—তাকে ভাল বাসলাম। ভালবাসতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে। কিন্তু সে আমায় তাই শেখালে—নিজে ভালবেসে প্রাণপণে সবারই যত্ন করে মেয়েমানুষকে যে কি রকম হতে হয় তাই শিখিয়ে মরণোন্মুখ আমায় বাঁচালে। আমার মনে হচ্ছে, যদিই বা আমি এখন মরি তবু যে ক'দিন সংসারে থাকব সে ক'দিন বেঁচেই থাকব। কারণ আমি তাকে দিনে দিনে মাসে মাসে ভালবাসতে পেরে আর সবাইকেও ভালবাসতে পারলাম। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই। আমার স্নেহের উৎসের মুখে যে পাথর চেপে ছিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সুভা দু'হাত দিয়ে জোর করে সেই পাথরখানা তুলে ফেলে দিয়েছে।

বাঁধ ভেঙে গেল কি করে—পাথর সরল কি করে? সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেদিন সন্ধ্যায় চুপ করে শুয়ে আছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চাকর যে আলোটা ঘরে দিয়ে গিয়েছিল সেটাকে কমিয়ে আড়ালে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমুই নি—তবে চোখ বুজে পড়েছিলাম। ক'মাস থেকেই অনুভব করছিলাম যে, ক্রমশই আমার ভাল করে জেগে থাকবার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। একটা তন্দ্রার মত অবস্থা আমায় যখন-তখন এসে আক্রমণ করে। সেই রকম একটা অবস্থায় চুপ করে শুয়েছিলাম।

স্বামী আমার মাথার শিয়রে নীরবে বসে কি করছিলেন—কি আবার করছিলেন?—এই হতভাগিনীর দেহে যদি একটু প্রাণসঞ্চার করতে পারেন সেই আশায় আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম কে এসে দাঁড়াল। এক বার চেয়ে দেখলাম। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোধ হয় আমাদের উভয়কে দেখলে; তার পর, বেশ অনুভব করলাম, সে চেপে-চেপে একটা নিশ্বাস ফেললে। শেষে স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে চুপি চুপি বললে 'আপনি উঠে যান, আমি বসছি।' স্বামী প্রথমটা উঠলেন না—সেও দাঁড়িয়ে রইল। শেষে স্বামী উঠে বাইরে গেলেন, সে আমার পাশে বসল। তার পর হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। সে কি কান্না। সে কি গভীর বেদনায় চাপা কান্না!

ঢুকেছে? আমি আর থাকতে পারলাম না—দুই হাত দিয়ে, আমার যতটুকু জোর ছিল তাই দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে দেখবার চেষ্টা করলাম। সেও যেন আমার প্রশ্ন বুঝলে। কত দিন সে এসেছে তবু চোখে-চোখেও তার সঙ্গে আমি কথা বলিনি। এই তার সঙ্গে—তার সঙ্গে কেন, বিয়ের পরে এই বোধ হয় প্রথম মানুষের সঙ্গে আমার সম্ভাষণ।

সে অশ্রুসিক্তমুখে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, "হতভাগিনি! কি রত্ন তুমি হেলায় হারালে, হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললে তা বুঝলে না। জানি না সেই শেষ দিনে তুমি ঈশ্বরের কাছে কি জবাব দেবে। নিজের ওপর অন্যায় করে অত্যাচার করে অন্য এক জন নির্দ্দোষ নিষ্পাপ মানুষকে এত বড় শাস্তি তুমি দিয়ে গেলে? তোমার জন্য কাঁদব, না তার জন্য কাঁদব, আমি যে বুঝতেই পারছি না। তুমি নিজের কণ্ঠরোধ করেছ, কিন্তু আর-একজনের কণ্ঠই বা কেন এমন করে রুদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছ? সংসারের আর-এক জন প্রিয়জনের কেন হাত-পা হৃদয়-মন জন্মের মত বদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছ? তাকে কেন চিনলে না? কেন তাকে ভালবাসলে না? উঃ তুমি মেয়েমানুষ নও!"

আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনতে লাগলাম। কি জানি কেন তার সেই কথাগুলো আমার অসাড় মনটাকে হঠাৎ তাতিয়ে তুললে, তার কথাগুলো একেবারে জ্বলন্ত অক্ষরে আমার মনে লেখা হয়ে গেল। সে আমার সেবা করতে এসে এই প্রথম তিরস্কার করলে, অথচ তা যেন আমার সমস্ত অন্তর-বাহিরের ওপর তীব্র ওষুধের মত কাজ করলে। কেন সে এ তিরস্কার করলে! কোথায় আঘাত পেয়ে সে এই প্রতিঘাত আমায় করলে?

* * * *

প্রথমটা তার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু তার পর বুঝলাম। আমি যা কখনো সাহস করে ভেবে দেখিনি—যে কথা আমি নিজের কাছে নিজেই গোপন করে রেখেছিলাম, সেই কথা সে আমায় জোর করে বুঝিয়ে দিলে—শুনিয়ে দিলে। সে বুঝিয়ে দিলে যে আমি কেবল আত্মহত্যার পাতকী নই, স্বামিহত্যাও করতে চলেছি। স্বামীর স্নেহের এত নিদর্শন পলে পলে পেয়েও ইচ্ছে করে তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করিনি। এমন করে স্বামীকে দূরে ঠেলে রাখবার আমার অধিকার নেই—ভালবাসাকে এত অপমান করবার কারও অধিকার নেই। তাকে জীবনে পূজা করতেই হবে—নইলে শুধু মৃত্যু নয়, তার চাইতেও ভয়ঙ্কর আরও কিছু ভাগ্যে আছে। তাঁর স্নেহময় মূর্ত্তি আমার প্রাণের দ্বারে প্রতি মুহূর্ত্তে এসে আঘাত করেছে, তাকে ফিরিয়ে আমি নারায়ণকে নির্বাসিত করে মৃত্যুকে এনে অন্তরাসনে বসিয়েছি। আমার নিস্তার নেই—নেই—নেই।

কিন্তু কেন? কে বলে দেবে কেন? হয়তো বাল্যকাল হতে ভালবাসাতে শেখাই আমার হয়নি। কাউকে ভালবাসতে দেখিনি, কারও স্নেহ অনুভব করিনি, কাউকে নিজেও ভালবাসিনি। স্বামী যখন তাঁর অগাধ স্নেহ নিয়ে আমার প্রাণের দরজায় আঘাত করলেন তখন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারিনি—ঘৃণাকে ক্রোধকে অভিমানকে ভেতরে ডেকে নিয়ে সজোরে অন্তরের কপাট বন্ধ করে দিয়েছি। যে অগ্নিকে সাক্ষী করে ঘৃণা আর ক্রোধকে ভেতরে

বুকে প্রবেশ করেছিলেন। আজ তাঁর দহন সারা দেহ-মনে অনুভব হচ্ছে।

* * * *

আমি নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম—আমার সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল।

ব্যর্থ হয়ে গেল? সত্যিই কি তাই? না, তা নয়—আজ এই মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে যে, না তা নয়, আমি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাইনি। মরতে মরতে আমি মরলাম না—আমি বেঁচে গেলাম। ঐ অত বড় বিশাল পর্ব্বতের মত মানুষকেও ভালবাসা যায়—ওকেও বুকে নেওয়া যায়। শুধু পূজা নয়, শুধু ভক্তি নয়, শুধু দূর হতে নমস্কার নয়, নিজেকে একেবারে ঐ মহাপুরুষের স্নেহস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, মিশিয়ে দেওয়া যায়। বেঁচে গেলাম গো বেঁচে গেলাম। ঐ অসিতগিরির বাহু রুক্ষতাকে পাতার শ্যামল শোভায় ফুলের নানা রঙে ভরিয়ে দেওয়া যায়, এ সাহস আমার মিষ্টিকথার মিষ্টি কথায় আমার প্রাণে জোয়ারের মত সজোরে এসেছে। আমি ভয় হতে অভয়ে, অনাশ্রয় হতে আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হলাম। ও আমার সুভাষিণী, ও আমার মিষ্টিকথা, তুমি আমায় বাঁচালে। আমার ধূসর আকাশে ঐ সজল জলদকে নতুন শোভায় জাগিয়ে তুমি আমায় বাঁচালে, ভাই, বাঁচালে। তুমি যাকে ভালবাসতে পার, তাকে কি আর আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি? সে আমার হৃদয়াকাশে এত দিন ভীষণ উষ্ণতা হয়ে বিরাজ করছিল, আজ তোমার অশ্রু-শীতল নিশ্বাসে সে আজ কান্তকোমল শ্যামল মেঘের শোভায় মধুর বর্ষণোন্মুখ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার প্রাণ-চাতক বেঁচে গেল গো, বেঁচে গেল।

এ কি নতুন জীবনস্রোত আমার সমস্ত দেহে প্রবেশ করছে! এও যে আমায় আগুনের মত তাতিয়ে তুললে! আমি কথা কইতে যাচ্ছি, কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে আমার মধ্যে? সারা জীবনের নিজের তৈরি বাঁধ আজ দেখছি শক্ত পাথরের মত হয়ে গিয়েছে। আমি ত পারলাম না। জিভ আমার একেবারে জড় হয়ে গিয়েছে। কোথায় মা বাক্‌দেবি! এক মুহূর্ত্তের জন্ত দয়া কর মা—এক বার তাকে বলতে দাও যে, তোমার জয় হয়েছে—ওগো তোমারই জয়! হায়, যে তোতলাবার শক্তিটুকু ছিল তা থাকলেও বাঁচতাম। তাও যে আমার নেই। কি হবে!—

পারলাম না—পারলাম না—ও ভাই মিষ্টিকথা, কিছুতেই যে পারলাম না। তোমার বাক্‌শক্তি ধার দিতে পার বোন? তা হলে সারা জীবন ধরে তুমিই আমার এই কথাগুলো তাঁর তৃষিত কর্ণে শুনিয়ো। বোলো, আমি তাঁকে শেষ ক'দিন কি যে ভাল বেসেছি তা লিখে যেতে পারব না। মিষ্টিকথা, তোমার মিষ্টি কথায় সু-ভাষায় বোলো যে তাঁর সাধনা নিষ্ফল হয়নি—মহাবীর এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। আমার মরণের পর আমার এই হাত দু'খানা তুমি নিজের হাতে তুলে তাঁর গলায় দিয়ে বোলো, "এই তোমার জয়ের মালা!"

* * * *

পরিয়েছি, আমি নিজে মালা পরিয়েছি। বীরের গলায় তাঁর জয়চিহ্ন দিয়েছি—তার পুরস্কারও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। বাঁচালে—আমায় বাঁচালে—

* * * *

সখি, আর দু'দিন আমায় ধরে রাখ—আর এক দিন—উঃ, এ যে ভয়ঙ্কর আনন্দ—আমার সইছে না যে—

* * * *

আর পারলাম না—প্রিয়তম, আমার কথার শেষ হল না—প্রিয়তম, আমার শেষ কথা আমার মিষ্টিকথার জন্ত রেখে গেলাম। মিষ্টিকথা, তুমি আমার এই ভারটুকু নিও ভাই—আমার কথা তুমি বোলো ভাই—আর যে লিখতে পারছি না—হাত যে কাঁপছে, তবু প্রাণপণে লিখছি—কাল যদি পারি ত'—

*

আর পারলাম না—প্রিয়তম—শেষ কথা শেষ হবে না—সুভা,—শেষ কোরো ভাই—

* * * *

বেঁচে গেলাম—প্রিয়তম বাঁচিয়েছে—আর লিখতে পারব না—কলমটা পড়ে যাচ্ছে—একটু থাম, ওরে—আর একটা—

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মহাকবি দাঁন্তের চিঠি

[দাঁন্তে য়ুরোপের মধ্যযুগের মহাকবি। শেষ ২০ বছর জন্মভূমি ফ্লোরেন্স থেকে নির্ব্বাসিত হন। স্বদেশ ইটালীর ঐক্যশক্তি স্থাপনের মহা কল্পনা তাঁর ছিল। মেকিয়াভেলির অনেক পূর্ব্বে দাঁন্তে ইটালীর ছোটখাট রাজ্যগুলোকে ডাইলুট করে দিয়ে অখণ্ড স্বদেশ গঠন করবার জন্ত সন্ত্রাসবাদী ঘিবেলিন দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দল দুর্ব্বল। নেতা দাঁন্তে নির্ব্বাসিত হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন। পনের বছর এই ভাবে চলে। বন্ধুরা বললেন, ক্ষমা ওরা করতে পারে, যদি কিছু টাকা দেও আর একটা কাগজের মাপ-কাঠি মাথায় করে অনুতপ্ত বিপ্লবীদের মিছিলে যোগ দাও। স্বাধীনচেতা দাঁন্তে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—]

১৩১৬ খৃঃ

যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও প্রীতি ভরে তোমার পত্র গ্রহণ করেছি। ভাল করে পড়লাম। আমার ফ্লোরেন্সে ফেরবার জন্ত তোমার উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের কথা জেনে কৃতার্থ হলাম। নির্ব্বাসিতের মিত্র-লাভ হয় কদাচিৎ। তাই তোমাদের এই আগ্রহে আমি ধন্ত। দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের সুরে আমার উত্তর হ'ল না, তবু তোমার পত্রের এই উত্তর সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার করবার আগে, আন্তরিক অনুরোধ, একটু যত্ন করে পড়ো, একটু সুবিচার করে দেখো।

তোমার ও আমার ভাইপো যে পত্র দিয়েছেন, অন্তান্ত দুই চার জন বন্ধুরা যে চিঠি লিখেছেন, তা থেকে জানতে পারছি যে, সম্প্রতি ফ্লোরেন্সে একটা ইস্তাহার জারি করা হয়েছে, যাতে নির্ব্বাসিতদের ক্ষমা করা হয়েছে। জানতে পেরেছি যে, যদি আমি কিছু টাকা (জরিমানা) দেই আর প্রায়শ্চিত্তের অপমানে রাজি হই, তাহলে আমায় মাপ করা হবে, আর তখুনই আমায় দেশে ফিরতে অনুমতি দেওয়া হবে। এই দুই প্রস্তাবই যেমন ঘৃণিত, তেমনি কুপরামর্শ-জাত। অর্থাৎ যারা আমায় এ-সব কথা জানিয়েছেন, কুপরামর্শজাত বলছি তাদের পক্ষে। তোমার চিঠিতে অবশ্র ঐ সব সর্ত্তের কথা জানাওনি, চিঠিখানিও খুব সুবিবেচনা করে বেশ সাবধানে রচনা করা হয়েছে।

তাহ'লে প্রায় ১৫ বৎসর নির্ব্বাসন দুর্দ্দশার পর এই হ'ল দাঁন্তে আলিঘিরিকে তার জন্মভূমি নগরীতে মহানুভব পুনরাহ্বান! বিশ্ব দুনিয়ায় যে নির্দ্দোষ সুপ্রকাশ, এই তার পুরস্কার! নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাচর্চ্চার শ্রম ও ঘর্ম্মের এই হ'ল বখশিশ। চলতি দর্শনের কথা ছেড়ে দাও; শৃঙ্খলাবদ্ধ বাজপাখীর মত, সিওলো প্রভৃতি হতভাগ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রায়শ্চিত্তের অপমান বরণ করার কোন মানে হয় না। মেনে নিলাম, ওরা আমার কল্যাণই চায়, তবু এই কি বিচার? অন্যায় অত্যাচার সইবার পরও যারা অত্যাচার করেছে তাদেরই দিতে হবে আপনার অর্জ্জিত অর্থ?

না বৎস, এ পন্থায় আমি জন্মনগরীতে ফিরতে চাই না। যদি অন্ত কোন উপায় থাকে, প্রথমে তুমি নিজে, তারপর অন্তরা যদি এমন কোন পন্থা বের করতে পার, যাতে দাঁন্তের যশ ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহলে আমি প্রত্যাবর্ত্তনে শিথিল-প্রযত্ন হব না। কিন্তু যদি ফ্লোরেন্সে প্রবেশের আর কোন পথ না থাকে, তবে ফ্লোরেন্সে প্রবেশ আমি করব না—কখনও! কি বলতে চাও? সূর্য্য-তারকার দিকে চেয়ে থাকবার মত ভুঁই কি আমি কোথাও পাব না? আমারই সহ-নাগরিকদের দৃষ্টিতে অপমানিত ও মর্য্যাদাহীন হয়ে ফ্লোরেন্সে যদি আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তবে কি কোন গগনের তলে বসে অতি মূল্যবান সত্যগুলো আমি চিন্তা করতেও পারব না? একটু রুটি আমি পাব নিশ্চয়ই!

মার্টিন লুথারের চিঠি

[কৃষক-পুত্র মার্টিন লুথার। ১৫১১ খৃষ্টাব্দ। রোমের দেউড়ীতে পৌঁছে ভুঁইয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন—জয় পুণ্য রোম! শহীদদের শোণিতে মহা পবিত্র নগরী। কিন্তু পোপের ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করে হলেন রোমের মহাত্রাস। কাঞ্চন-মূল্যে রোমের ধর্ম্মগুরু পোপ পাপীদের প্রায়শ্চিত্ত বিক্রী করতেন। ১৫১৭, উইটেনবুর্গের ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপক লুথার এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। তৎকালীন পোপ লিও ১০ মকে লুথার লিখলেন—]

উইটেনবুর্গ, ৩০শে মে,
১৫১৮

মহামান্ত ধর্ম্মগুরু,

আমার সম্বন্ধে প্রচারিত দুষ্ট সংবাদ কানে এল। মনে হচ্ছে, কেউ কেউ আপনার কাছে আমার নাম ঘৃণ্য করে তুলেছে। হয়ত তারা বলেছে, মহা ধর্ম্মগুরুর চাবী তথা কর্তৃত্বের ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা আমি করেছি। তাই তারা আমাকে বলছে বিধর্ম্মী, ধর্ম্মের দুষমণ, বিশ্বাসঘাতক—এ ছাড়া আরও শত অপনামে আমায় চিহ্নিত করছে। শুনে আমি মহা ভীত, দেখে আমি বিস্মিত। কিন্তু বিশ্বাসের একমাত্র মহা দুর্গ আমার বিবেক, অপাপবিদ্ধ ও নিরপরাধ —বিবেকে আমার পরম শান্তি বিরাজমান।......

আজ-কাল পোপানুগ্রহের জয়ন্তীর কথা প্রচার করা হচ্ছে।

প্রচারকরা মনে করছেন, আপনার নামের আওতায় সব কিছুই করা যেতে পারে। অবাধে তারা খোলাখুলি অধর্ম্ম ও অপকর্ম্মের শিক্ষাদান করছে। এরা কর্ম্মচারীদের কদাচরণ সম্বন্ধে ক্যানন বিধির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অমান্য করছে। এতে ধর্ম্মগুরুদের ক্ষমতাকে ধাপ্পাবাজী করে তুলেছে—এতে ঘৃণ্য অধর্ম্মাচরণ হচ্ছে।······

তাঁরা সাফল্য লাভ করেছে যথেষ্ট। মিথ্যা ছলনায় জনসাধারণকে শোষিত করে রক্তহীন করে ফেলা হচ্ছে···অত্যাচারীরা দেশের মৃত মধু পানে স্ফীত হচ্ছে। মাত্র আপনার নামের ভয়ে, 'ঢেঁকের' নির্য্যাতন ভয়ে, বিধর্ম্মীর মার্কা পড়বে ভয়ে ঘৃণ্যাচার এড়িয়ে চলছে···অবশ্য একে যদি অত্যাচার দ্বারা বিদ্রোহ ও ভেদের উস্কানী না বলে যদি ঘৃণ্যাচার এড়ান বলা চলে।

চার্চ্চের শ্রেষ্ঠদের কাউকে কাউকে গোপনে আমি সতর্ক করে দিয়েছি। কেউ কেউ এই সমালোচনাকে মর্য্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ একে উপহাস করে তুচ্ছ করেছেন। কেউ কেউ সতর্কবাণীকে নানা ভাবে গ্রহণ করেছে। আপনার নামের ভয় ও সেন্সরের ভয় প্রবল। অবশেষে, আর যখন কিছু করতে পারলাম না, তখন তাদের উন্মাদ আচরণ ক্ষণিকের জন্যও স্তব্ধ করে দিতে আমি সঙ্কল্প করলাম। তাদের উক্তি ও মত সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করলাম। আলোচনা ও বিতর্কের জন্য আমি কিছু প্রস্তাব প্রকাশ করে, যারা অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত মাত্র তাঁদের এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আহ্বান করলাম। আমার প্রস্তাবের মুখবন্ধ থেকে আমার প্রতিপক্ষরা আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে। তবু, এই আগুনে তারা দুনিয়ায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করতে লেগেছে।···

এখন আমি কি করব বলুন? আমার প্রস্তাবগুলো আমি প্রত্যাহার করতে ত পারিনে। অথচ দেখছি ওরা জনপ্রিয়, তাই আমার বিরুদ্ধে মহা ঘৃণাভাব জাগ্রত ওরা করছে। এ যুগে ওরা এমন মহামহা পণ্ডিত যে সেকালের অসামান্য জনপ্রিয় ও যশস্বী সিসেরোকে পর্য্যন্ত কোণঠাসা করতে পারে। আর আমি অশিক্ষিত, মূর্খ ও জ্ঞানবর্জ্জিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মতভেদ-বিচ্ছিন্ন জনসাধারণের সম্মুখে আমার বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে।

এ জন্য অনেকের ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যে, আর প্রতিপক্ষদের শান্ত করবার জন্যে আমার প্রস্তাব বুঝিয়ে বলতে আমি একখানা ছোট-বই প্রকাশ করছি। আত্মরক্ষার জন্যে আপনার নামের অভিভাবকত্বে এবং আপনার রক্ষাচ্ছায়ায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে·········

মহামান্য ধর্ম্মগুরু, আমাকে ও আমার যথাসর্ব্বস্বকে আপনার শ্রীচরণে নিবেদিত করেছি। হয় আমায় তুলে ধরুন, না হয় হত্যা করুন। এখানে সেখানে আমায় আহ্বান করুন, হয় আমার কাজের অনুমোদন করুন, না হয় যথা খুশী আমার কাজ অন্যায় বলে ঘোষণা করুন। আপনার বাক্য আমি আপনার অন্তরস্থ খৃষ্টের বাণী বলেই মেনে নেব। মৃত্যুই যদি আমার যোগ্য হয়, মৃত্যুকে আমি প্রত্যাখ্যান করব না। বিশ্ব—পূর্ণ বিকশিত বিশ্ব প্রভুর। তাঁর চির জয় হোক। আমেন। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করুন। আমেন।

মুঘল-বাদশা বাবরের চিঠি

[মুঘল-বাদশা বাবর মঙ্গোলিয়ান নয়, তুর্কী। ১৫২৫ লড়াইয়ে নিমন্ত্রণে এসে দিল্লীর বাদশা বনে গেলেন। পর বছর তাঁর দ্বারা পরাজিত এক রাজার এক আত্মীয়া বাবরকে বিষ খাইয়ে মারবার যে ষড়যন্ত্র করে, এ সম্পর্কে নিম্নের চিঠিখানি বাবরের আত্মজীবনী "বাবরনামায়" উল্লেখ করা আছে।]

১৩৩ প্রথম রাবির ১৬ই তারিখ, (২১শে ডিসেম্বর, ১৫২৬) শুক্রবারের স্মরণীয় ঘটনার বিবরণী এই—

ইব্রাহিমের ক্ষুপাইতে মা-বুড়ী শুনেছিল যে, হিন্দুস্থানীদের হাতে খাবার আমি খাই। ব্যাপারটা হল, হিন্দুস্থানী খাবার অনেক দিন আমার চোখে পড়েনি দেখে তিন-চার মাস আগে ইব্রাহিমের বাবুর্চ্চিদের ডেকে আনতে হুকুম দেই। ৫০।৬০ জন বাবুর্চ্চির মধ্যে ৪ জনকে রাখি। বুড়ীর কানে যায় সে কথা। আটাওয়া থেকে চাখনদারকে ডেকে পাঠাল। সে এলে কাগজে-মোড়া এক তোলা জহর এক বাঁদীর হাতে তাকে পাঠাল। আহমদ সে জহর দিল আমাদের বাবুর্চ্চিখানায়, হিন্দুস্থানী বাবুর্চ্চিদের হাতে। তাদের প্রতিশ্রুতি দিল যে, যদি কোন মতে জহর খাবারে মিশিয়ে দিতে পারে, তাহলে চার পরগণা বখশিস।

প্রথম বাঁদীটার পেছন-পেছন সেই ক্ষুপাইতে বুড়ী পাঠাল আর একজনকে। দেখছে আমেদের হাতে জহরটা দেয় কি দেয় না। আহমদ রাঁধবার পাত্রে বিষটা না দিয়ে একটা থালায় রেখে দিল। আমার কড়া হুকুম, রান্না হবার পরে রান্নায় সব কিছু উপস্থিত হিন্দুস্থানী বাবুর্চ্চীদের চাখতে বাধ্য করবে চাখনদারেরা। আমাদের হতভাগ্য চাখুনেটা খাওয়া-খাদ্যর বাড়বার সময় কর্ত্তব্যে অবহেলা করে। চীনা মাটির ডিসে পাতলা পাতলা রুটি রেখে কাগজের পুরিয়ার অর্দ্ধেকটা জহর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তার উপর পড়ল মাখন-মাখান কাবাব। এই কাবাবের উপর যদি বিষ ছড়ান হ'ত বা রান্নার পাত্রে যদি বিষ ফেলা হত, তবে 'খুব খারাপই হ'ত। তাল ঠিক করতে না পেরে লোকটা বেশীর ভাগ বাকী জহর চুলার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

শুক্রবার সন্ধ্যার নামাজের পর পাকান মাংস পরিবেশন করা হ'ল। এক ডিশ খরগোসের মাংস খুব খেলাম আর ভাজা গাজর অনেকটা। জহর মেশান হিন্দুস্থানী খাবার কয়েক গাল মুখে দিলাম। কোন মন্দ সোয়াদ পেলাম না। দু' এক গাল কাবাবও খেলাম। তখন শরীরটা কেমন করতে লাগল। আগের দিন খানিকটা কাবাব খেয়েছিলাম। স্বাদ ভাল লাগেনি। ভাবলাম সে জন্যই বোধ হয় গা বমি-বমি করছে। বার বার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ২.৩ বার কাটবমির পর মনে হল, টেবিল-চাদরের উপরই বমি হয়ে যাবে। দেখলাম এ ভাবটা যাচ্ছে না। উঠলাম। হামামে যাবার পথে প্রতিক্ষণ—গা বমি-বমি করতে লাগল। হামামে খুব বমি হল। খাবারের পর কখনও আমার বমি হয় না। সুরাপানের সময়ও হয় না।

সন্দেহ হ'ল। বাবুর্চ্চিদের আটক করলাম। হুকুম দিলাম, বমি এক কুকুরকে খেতে দিয়ে নজর রাখ। পরদিন প্রথম প্রহরে কুকুরটা কতকটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর পেট ফুলে গেল।

লোকে ঢিল ফেললে কুকুর উঠলো না। দুপুর পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় রইল। অবশ্য মরল না। দুই একজন সাহসী পুরুষও ভিসের খাবার খেয়ে পরদিন খুব বমি করল। একজনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। অবশেষে সবাই রেহাই পেল। আপদ এল, সুখের বিষয়, আপদ কেটেও যায়। ভগবান দিলেন আগে নবজন্ম। সেই পরলোক থেকে আমি আবার আসচি। মায়ের গর্ভে আবার আমার জন্ম হ'ল আজ! অসুখ হয়েছিল। বেঁচে গেছি। খোদার মর্জ্জিতে, জীবনের কদর আজ বুঝতে পারছি।"

হুকুম দিলাম খাজাঞ্চি গোলে মহম্মদকে, বাবুর্চ্চির উপর নজর রাখ। ওকে সায়েস্তা করবার জন্ত নিয়ে যাওয়া হলে সে একের পর এক উপয়ের ঘটনা বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করল। সোমবার দরবারের দিন। হুকুম দিলাম আমির উজির গণ্যমান্তদের হাজির থাকতে। দুজন মর্দ্দানা ও দুই জেনানাকে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, এ হুকুমও দিলাম। তারা সব কথা বলে গেল। চাখনদারকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললাম, জীবন্ত অবস্থায় বাবুর্চ্চিটার চামড়া খিঁচে নেওয়া হ'ল। এক জেনানাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হ'ল। আর একটাকে বন্দুকের গুলীতে মেরে ফেলা হল। বুড়ীটাকে পাহারা দিয়ে আবদ্ধ রাখা হ'ল। সে তার নিজের দুষ্কৃতির জন্ত বন্দী—তারও দিন ঘনিয়ে আসচে। শনিবার এক বাটি দুধ খেলাম। রবিবার খেলাম আবক, তাতে খোঁচা কাঁদা গুলে দেওয়া ছিল। সোমবার খোঁচা কাঁদা গুলে দুধ খেলাম, আর একটা কড়া জোলাপ। প্রথম দিন শনিবারের মত দগ্ধ পিত্তের মত অত্যন্ত কাল দাস্ত হল।

খোদা মেহেরবান। কোন ক্ষতি হয় নি। জীবন এত যে মধুময় হতে পারে আগে কখনও বুঝতে পারিনি। সেই যে কথা আছে—

মরণের মুখে পৌঁছলো না যে,
জীবনের কদর বুঝবে কি…"

যখনই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কথা মনে ওঠে, বেসামাল হয়ে পড়ি। নিশ্চয় খোদা আমায় নয়া জীবনের মেহেরবানী করলেন। কি ভাষায় তাঁকে ধন্তবাদ দিব?

ব্যাপারটির আতঙ্ক এত বড় যে ভাষায় প্রকাশ করা না গেলেও ব্যাপারটার অবস্থা ও খুঁটিনাটি নাই লিখলাম। আপনাকে ডেকেই বললাম—"ওদের দিল উৎকণ্ঠায় রেখো না।" খোদা মেহেরবান, আরও দিন হয়ত দেখতে হবে। ভালয় ভালয় সুমঙ্গলে সব কেটে গেল। তোমাদের মনে শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা রেখো না।

গ্যালিলিওর চিঠি

[ষোড়শ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। জন্ম—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৬৪। মৃত্যু—১৬৪২। রাজপুরুষ আর ধর্ম্ম-পুরুষদের সঙ্গে তাঁর কোন দিনই বনেনি। নিজের দূরবীণ তৈরী করে তিনি গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে নূতন গবেষণা যখন সুরু করেন তখন টাস্কানীর গ্র্যাণ্ড ডিউকের সেক্রেটারী বেলিসারিও ভিন্টাকে এই চিঠিখানি লেখেন।]

৩০শে জানুয়ারী, ১৬১০।

আমার দূরবীণে গ্রহ-নক্ষত্র দেখে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তার সম্বন্ধে আমার রচনা ছাপবার জন্ত এখন আমি ভেনিসে আছি। আমার দূরবীণে যা দেখেছি তাতে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ভগবানকে অসংখ্য ধন্তবাদ! অতীতের যুগ যুগ ধরে যা অপ্রকাশিত ছিল, সে সব অদ্ভুত দৃশ্যের প্রথম দর্শক তিনি অনুগ্রহ করে আমায় করেছেন। পূর্ব্বেই আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, চন্দ্র প্রায় পৃথিবীর মতই একটি জ্যোতিষ্ক। যে দূরবীণটা আমার আছে তা খুব ভাল নয়, তবু আমাদের মহামান্ত প্রভুকে তাই দিয়েই যতটা সম্ভব দেখিয়েছি। অবশ্য দেখানটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। এই দূরবীণে চাঁদ ত দেখেছিই, তা ছাড়া আগে যা কখন দেখা যায়নি, এমন অগণিত নক্ষত্র আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে। খালিচোখে যা দেখা যায়, তার দশ গুণ দূরবীণে দেখলাম। ছায়াপথের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে সর্ব্বদাই মতবিরোধ। দূরবীণ সাহায্যে এই ছায়াপথের প্রকৃতিও আমি নির্ণয় করেছি।

কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর হল চারিটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার। এই সব গ্রহের আকার (কক্ষপথে) ও পরস্পরের সম্পর্কে সঠিক গতি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আরও দেখেছি, অন্তান্ত নক্ষত্রের গতি থেকে এদের গতির পার্থক্য আছে। এই গ্রহগুলি অপর একটি অতি বৃহৎ নক্ষত্রের চার দিকে পরিক্রমণ করে, যেমন পরিক্রমণ করে সূর্য্যের চার দিকে বুধ, শুক্র এবং অন্তান্ত জানা গ্রহগুলি। আমার লেখাটি ছাপা হলে আগে বিজ্ঞাপন-স্বরূপ আমি সব দার্শনিক ও গণিতজ্ঞের কাছে পাঠাতে চাই, তার পর এক খণ্ড পাঠাব মহমান্ত (টাস্কানীর) গ্র্যাণ্ডডিউকের (কসিমো ২য়) কাছে। সঙ্গে দেব একটা সুন্দর টেলিস্কোপ, যে দূরবীণে তিনি নিজেই এই সব নূতন নূতন আবিষ্কারের সত্য নিরূপণ করবেন।

—আগামী সংখ্যা থেকে—

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

বিনয় ঘোষ

(তিন)

কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস

মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে শক্তির ও প্রেরণার গিরিনির্ঝরিণী। সকলের অগোচরে, সব কাজ ফেলে রেখে, কত দিন তিনি ছুটে গেছেন মা'র কাছে। যার কেউ নেই, তার মা আছেন। মানুষের আঘাতে অপমানে অকৃতজ্ঞতায় যখন তিনি অবসন্ন বোধ করতেন, তখন মা'র কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন, পথচলার নতুন প্রেরণা সঞ্চয় করতেন। পরিপার্শ্বের দীনতা ও শূন্যতাকে পরিপূর্ণ ক'রে শ্যামল বনশ্রীর মতন বিরাজ করতেন মা। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা, বীরসিংহের সিংহিনী ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের মা, বাংলার মা।

কত দিন কত অভাব, কত অভিযোগ নিয়ে এসে মা'র কাছে তিনি দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অন্তরের অবরুদ্ধ অভিমানের বিক্ষোভ মা'য়ের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মা ব'লে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন ; "মা। তুই বল্ না মা কি করি ?" মা বলতেন : "ন্যায় ও সত্যের পথে দাঁড়িয়ে যা ভাল মনে করবি, তাই করবি বাবা ! তার চেয়ে বড় শাস্ত্র কিছু নেই।" এই হ'ল মাতাপুত্রের কথোপকথনের নমুনা। ছেলেবেলা থেকে এই ভাবে 'তুই' বলে মা'র সঙ্গে কথা বলতেন ঈশ্বরচন্দ্র (১)। মা'র চেয়ে আপনার জন যে আর কেউ নেই, একথা তো সব মা, সব সন্তানই জানেন। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের মা ছিলেন অনন্যা মা। কেবল সন্তানের মা নয়, সাধকেরও মা। সাধারণ সংসারের মা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের মা। মা'য়ের সামনে দাঁড়ালে আর কোন অভাব তিনি বোধ করতেন না। দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আঘাতের বেদনা তিনি ভুলে যেতেন। মা'য়ের উৎসাহের ঝরণাধারায় অবগাহন ক'রে, নতুন শক্তি প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তিনি ফিরে আসতেন কর্মক্ষেত্রে। গ্রাম্যপথের শেষ প্রান্তে খর্বাকৃতি পুত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, মা ভগবতী দেবী পিছন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে 'ডাইনামো' ; পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন তাঁর 'টিচার' ও 'ট্রেনার'। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ্স যেমন তাঁর পুত্রকে ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়তে, বদমেজাজী ঘোড়ার রাশ টানতে, খেলতে দৌড়তে সাঁতার কাটতে, যুদ্ধ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঠাকুরদাসও তেমনি তাঁর পুত্রকে জীবনসংগ্রামের সমস্ত কলাকৌশল হাতে ধ'রে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে সামঞ্জস্যের বিরতি ছাড়া জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছু নয়, এ সত্য ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিখেছিলেন। দরিদ্র পিতা তাঁর দরিদ্র সন্তানকে কেবল হাটি-হাটি-পা-পা ক'রে পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে হাঁটতে শেখাননি। খাল ডোবা নদী সাঁকো ডিঙিয়ে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর অরণ্য পার হয়ে, ক্রোশের পর ক্রোশ পথ কি ক'রে অতিক্রম ক'রে গন্তব্য স্থানে পৌছতে হয়, বাল্যকাল থেকে সে-শিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে, নিজের দু'খানা হাত ও দুটি পা সম্বল ক'রে, মেরুদণ্ড না বেঁকিয়ে, জীবনের প্রতিটি ছোটবড় চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কি ভাবে মুষ্টিযুদ্ধ করতে হয়, ঠাকুরদাস নিজে তা বিলক্ষণ জানতেন ব'লে পুত্রকে শিক্ষা দিতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজের পূর্বরথীদের মতন, অথবা প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ স্বনামধন্য সমসাময়িকদের মতন, ঈশ্বরচন্দ্র রাজার পুত্র বা ধনীর দুলাল ছিলেন না। উনবিংশ

---

(১) আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য "পুরাতন প্রসঙ্গ" গ্রন্থে বলেছেন : "ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে, বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ ছিল না ; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোক দেখান বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সেটা পরিবর্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা'কে ছেলেবেলা হইতে যে 'তুই' সম্বোধন করিতেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার পরিবর্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি।" (পুরাতন প্রসঙ্গ : ১ম ভাগ : ২১৮)

ত্রাব্দীর বাংলার সামাজিক আন্দোলনে পুরোগামী ছিলেন
রা, তাঁরা প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান
লেন। কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার আশ্চর্য ঐতিহাসিক
তিক্রম।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের
য়ে প্রায় ছ'বছরের বড় ছিলেন। দু'জনেই কলকাতার
বান পরিবারের সন্তান। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ
ত্র কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডীর ব্যবসা ক'রে প্রচুর অর্থ
র্জন করেন। প্যারীচাঁদ নিজেও সুদক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন।
গোপাল ঘোষের পিতামহ জগমোহন কলকাতায় হ্যামিল্টন
ম্পানীতে কাজ করতেন এবং পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
নাবাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র
চবিহার রাজের এজেন্ট বা মোক্তারের কাজ ক'রেও প্রচুর
সঞ্চয় করেন। কলকাতা-নিবাসী দেওয়ান রামপ্রসাদ
হের কন্যাকে বিবাহ ক'রে তিনি ঠনঠনিয়া পল্লীর বাড়ীটি
৮।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ) যৌতুক পান। এই বাড়ীতেই
গোপাল ঘোষ ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন (২)।
বন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়
লন। কলকাতার অন্যতম ধনিক ও সম্ভ্রান্ত ঠাকুর-
বারের সন্তান তিনি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। দ্বারকানাথ
পরগণার কলেক্টর ও নিমক এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন।
গঞ্জে তাঁর কয়লার খনি ছিল, রামনগরে চিনির কল ছিল,
কুঠিও ছিল। বিখ্যাত 'কার, ট্যাগোর এ্যাণ্ড কোম্পানী'
'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি (৩)।
জলাল মিত্র শুঁড়ার (বেলেঘাটা) সম্ভ্রান্ত ধনিক মিত্র
বারে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিনি দু'বছরের
ট ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু, ইংরেজী 'ফার্ষ্ট বুক'
তা প্যারীচরণ সরকার কলকাতার চোরবাগানের সঙ্গতি-
সরকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে
ন তিন বছরের ছোট ছিলেন বয়সে। প্যারীচরণের পিতা
রচন্দ্র সরকার কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী থ্যাকার
ম্পানীতে কাজ করতেন এবং জাহাজের রসদ সরবরাহ
তেন (৪)। মাইকেল মধুসূদন বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে
চার বছরের ছোট ছিলেন। মধুসূদনের পিতা রাজ-
নারায়ণ দত্ত তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত
উকিল ছিলেন এবং ওকালতির অর্থে অল্পকালের মধ্যেই তিনি
খিদিরপুরে দোতলা বাড়ী কিনে সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত
ব্যক্তিরূপে গণ্য হন। ইউরোপের 'রিনেইস্যান্সের' ইতিহাসে
দেখা যায়, নতুন বিত্তবানশ্রেণীর মধ্যেই নবযুগের প্রতিভা-
বানদের বিকাশ হয়েছিল। বিত্ত, বিদ্যা ও প্রতিভার বিচিত্র
মিলন হয়েছিল নবজাগরণের যুগে (৫)। আমাদের বাংলা
দেশের নবযুগের ইতিহাসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমকালীন যাঁরা (পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ছোট
বড়, একই Age-Groupএর), কেবল তাঁদের কথাই
বললাম। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ যখন কোম্পানীর
কাগজ ও হুণ্ডীর ব্যবসা করছেন, রামগোপাল ঘোষের পিতা
যখন চীনাবাজারে দোকানদারি ও কোচবিহার-রাজের
মোক্তারি করছেন, দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর
যখন ইংরেজ বণিকদের সমকক্ষ হয়ে বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বাধীন
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বয়ং রামমোহন রায়
তেজারতী কারবার ক'রে কলকাতায় ও গ্রামে প্রচুর ধন-
সম্পত্তি ক্রয় করছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস
কলকাতা শহরের আত্মীয়-পরিচিতের দরজায় দরজায় ঘুরে
বেড়াচ্ছেন, অন্নসংস্থানের জন্য, আশ্রয়ের জন্য। ঠিক একই
সময়ের, অর্থাৎ ১৮০৪-৫-সালের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর
গোড়ার কথা। সেকালের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখলে,
কলকাতা শহরের পথে পথে ভ্রাম্যমান কিশোর বালক
ঠাকুরদাসের এই দৃশ্যই নজরে পড়ে। চলচ্চিত্রের চেয়েও
ইতিহাসের গতি অনেক বেশী চমকপ্রদ মনে হয়।

ঠাকুরদাস জন্মেছিলেন বনমালিপুর গ্রামে। বনমালি-
পুরেই তিনি প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন এবং
গুরুমশায়ের কাছে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়েছিলেন।
বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে চ'লে আসার পর, ঠাকুরদাস ও
কনিষ্ঠ কালিদাস, উভয় দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য তর্কসিদ্ধান্ত
মহাশয় বীরসিংহনিবাসী গ্রহাচার্য পণ্ডিত কেনারাম বাচস্পতিকে
নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যে পণ্ডিতমশাই দুই ভাইকে
বাংলা ভাষা, শুভঙ্করী ও জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র লেখা
শিক্ষা দিয়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করেন।
এদিকে দুর্গা দেবীর পক্ষে টাকু ও চরকায় সুতো কেটে, দুই
পুত্র চার কন্যাসহ নিজের অন্নসংস্থান করা ক্রমেই অসম্ভব
হয়ে ওঠে। ঠাকুরদাস দেখলেন, বীরসিংহে বসে গুরুগৃহে
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আর চলে না। তখন কিশোর
বালক তিনি, বয়স চোদ্দ-পনের বছর। পিতা তীর্থযাত্রী,
কোন খোঁজখবর নেই তাঁর। মা'র কষ্ট সহ্য করতে না
পেরে, ঠাকুরদাস একদিন মা'র কাছে বললেন: "মা,

---

(২) National Magazine, Vol 31, 1919: "Life
Peary Chand Mitra" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১৩২৬ সনের ফাল্গুন-চৈত্র মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ)
নাথ বসু লিখিত "রামগোপাল ঘোষ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক
নাথ বসুর জননীর মাতুল ছিলেন রামগোপাল ঘোষ এবং
কালে তিনি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

(৩) কিশোরীচাঁদ মিত্র: Dwarakanath Tagore:
১।

(৪) শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ: প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত):
কাতা ১৩০১: ১ম পরিচ্ছেদ।

(৫) Alfred Von Martin: Sociology of The
Renaissance (1945): ২১-৪৬।

আমাকে অনুমতি দাও, আমি কলকাতায় যাই।” নতুন যুগের কলকাতা শহর তখন শিক্ষাকেন্দ্র ও জীবিকাকেন্দ্র হয়ে উঠছে। ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রাম থেকে নতুন শহর অভিমুখে উদ্‌যোগীরা যাত্রা করছেন। তাই দেখা যায় কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম থেকে, বিশেষ ক'রে এদিকে নদীয়া, ২৪ পরগণা এবং ওদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের হাওড়া-হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নবযুগের প্রথম পর্বের ভাগ্যবান বিত্তবান্‌ ও প্রতিভাবান্‌দের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন নতুন শহরে। তাঁদের নিয়েই তখনকার কলকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অভিজাত সমাজ গঠিত হয়েছিল। নতুন কলকাতা সহরের আকর্ষণশক্তি তখন কাছাকাছি গ্রাম্য-সমাজের উপর সব চেয়ে প্রবল ছিল দেখা যায়। যে-সব গ্রাম্যসমাজ ভেঙে বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরের নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজ গ'ড়ে উঠেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, তা কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে পঞ্চাশ-ষাট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী গ্রাম্যসমাজ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন ও পথনির্দেশ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের লোক। কলকাতার ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং সামাজিক গতিবিজ্ঞানের ধারাসম্মত।

বীরসিংহ গ্রাম এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন শহরের মাহাত্ম্যের কথা সেখানেও পৌঁছেছিল। ঠাকুরদাস যে সময় কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, সেই সময় থেকে ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের ধীবর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেন। এই অঞ্চলের ধীবর ও মৎস্যব্যবসায়ীরাই প্রধানতঃ কলকাতার ধর্মতলার পাশে খালের ধারে (বর্তমান ক্রীক রো) এসে বসতি স্থাপন করেন। এই খালের সঙ্গে গঙ্গার তখন যোগাযোগ ছিল এবং নৌকা চলাচল করত খালের পথে। মৎস্যব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের পক্ষে খালে নৌকা রেখে পাশে বসতি স্থাপন করার সুবিধা ছিল ব'লে, ক্রমে এইখানে কলকাতার বিখ্যাত “জেলিয়াপাড়া” গ'ড়ে ওঠে (৬)। কলকাতার প্রাচীন বাসন-ব্যবসায়ী ও লোহ-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অনেকে এই সময় ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চল থেকে নতুন শহরে আসেন। ক্ষীরপাই গ্রামে ইংরেজদের ও ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (৭) ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ গ্রাম বেশী দূর নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী দুর্গা দেবী যখন টাকু-চরকায় সুতো কেটে পুত্রকন্যাদের প্রতিপালন করছিলেন, তখন স্থানীয় বণিকরা ইংরেজ ও ফরাসী কুঠিয়ালদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে, তন্তুবায়দের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে তাঁদের সরবরাহ করতেন। এ-অঞ্চলে সুতোর চাহিদা ছিল তখন, এবং ঘরে ঘরে দুর্গা দেবীর মতন অনেক দরিদ্র নিরুপায় স্ত্রীলোক যে সুতো কেটে জীবিকা অর্জন করতেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ক্ষীরপাই-এর কুঠিয়াল সাহেবদের মুখে এবং স্থানীয় তন্তুবায় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মুখে মুখে নতুন কলকাতা শহরের বার্তা যে বীরসিংহ পর্যন্তও পৌঁছেছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ক্ষীরপাই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, কতকটা টাউনের মতন ছিল তখন। বহু সমৃদ্ধ তন্তুবায়-পরিবারের বাস ছিল ক্ষীরপাইএ। ঠাকুরদাসের পক্ষে মা'য়ের চরকায়-কাটা সুতো বিক্রীর জন্য মধ্যে মধ্যে ক্ষীরপাই আসাও অসম্ভব নয়। অন্যান্য অনেক প্রয়োজনে বীরসিংহ থেকে ক্ষীরপাইএ আসতে হ'ত, এখনও আসতে হয়। কলকাতার কথা ঠাকুরদাসের পক্ষে শোনা তাই আদৌ আশ্চর্য নয়।

অবশেষে কলকাতায় আসা স্থির করলেন ঠাকুরদাস। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ-পনের বছর মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম কলকাতায় আসার বিবরণ আমরা জানি। কিন্তু কিভাবে, কার সঙ্গে পায়ে হেঁটে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা শহরে এসেছিলেন, তার কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। ক্ষীরপাই-ঘাটাল অঞ্চলের তন্তুবায়, বণিক ও ধীবররা কলকাতায় যাতায়াত করতেন। তাঁদের সঙ্গে নৌকাপথে ও হাঁটাপথে হয়ত ঠাকুরদাস প্রথমে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে এসে অবতরণ করেছিলেন। ১৮০৪-৫ সালের কথা। তার প্রায় দশ বছর পরে তাঁর বিবাহ হয়, পনের বছর পরে ১৮২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়, এবং পঁচিশ বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গে প্রথম কলকাতা শহরে আসেন। পিতাপুত্রের কালের ব্যবধান বুঝতে হ'লে ঠাকুরদাসের কালের কলকাতা শহরের কথা জানা দরকার।

গ্রাম থেকে কলকাতা তখন দ্রুত শহর হয়ে উঠছে। উইলিয়াম হজেস্‌ সাহেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন গার্ডেন রীচ অঞ্চল ছিল সব চেয়ে অভিজাত পল্লী। গার্ডেন রীচের উদ্যানসংলগ্ন বাড়ী ঘর দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তখন তৈরী হয়েছে এবং তার পাশে এসপ্লানেডের বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থানের প্রান্তে সারবন্দী গৃহশ্রেণী গ'ড়ে উঠেছে। নগরের মধ্যে কোন উন্মুক্ত ভ্রমণোপযোগী স্থানকে “এসপ্লানেড” বলে। দুর্গ ও নগরের প্রান্তস্থিত গৃহশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজদের বেড়াবার জন্য যে খোলা জায়গা ছিল, তার নাম তাই 'এসপ্লানেড' হয়েছে। এসপ্লানেডের প্রান্তে যে-সব বাড়ীঘর তখন তৈরী হয়েছিল,

---

(৬) স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীদের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ। ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৭) District Handbook—Midnapur: W. B. Census 1951 : ভূমিকা ও "ক্ষীরপাই" দ্রষ্টব্য।

তা ছিল কতকটা এখনকার শহরতলীর বাগানবাড়ীর মতন। অনেকটা জায়গা জুড়ে এক একটা বাড়ী, সামনে বাগান বা খোলা জায়গা। এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর ব্যবধান অনেক। কলকাতার কেন্দ্রস্থলের এই রূপ দেখেছিলেন চিত্রকর উইলিয়াম হজেস্, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে (৮)। এসপ্লানেডের আশে-পাশে, দক্ষিণে চৌরঙ্গী, উত্তরে চিৎপুর এবং পূবে একেবারে ধাপা পর্যন্ত, কলকাতা শহরের রূপ অনেকটা গ্রামের মতনই ছিল। মাটির ও খড়ের ঘরবাড়ীই ছিল বেশী। মধ্যে মধ্যে সেকালের ইংরেজ আমলের প্রথম বাঙালী বণিক-পরিবারের দু'-চার খানা বড় বড় বাড়ী ছিল। খড় ও মাটির ঘরের আধিক্যের জন্য কলকাতা শহরে ঘন ঘন ঘরে আগুন লাগত এবং এক-একটা পাড়া আগুনে পুড়ে যেত। কি রকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হ'ত, তা কলকাতার তখনকার দু'-একটি পুলিশ-নোটিশ দেখলে বোঝা যায়। ১৮০০ সালের ১৩ই মে'র এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা পুলিশের ফাষ্ট ক্লার্ক জানান যে, কলকাতা টাউনের মধ্যে কোন বসতবাড়ী, দোকানঘর, গুদামঘর, আস্তানা বা অন্য কিছু কেউ খড় হোগলা গোলপাতা ইত্যাদি কোন অগ্নিদাহ্য জিনিস দিয়ে তৈরী করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় যে টাউনের মধ্যে বাঁশ খড় গরাণকাঠ ইত্যাদি বেশী পরিমাণে কেউ মজুত করতে পারবেন না। যাঁদের বাঁশের বা খড়ের বা কাঠের গোলা আছে, তাঁরা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের দিনের মধ্যে অন্যত্র সব স্থানান্তরিত করবেন (৯)। পুলিশের এই বিজ্ঞপ্তি দেখেই বোঝা যায়, নতুন বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে পর্যন্ত মাটির ও খড়ের ঘরবাড়ী ১৮০০ সালেও কি ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল সাহেবদের মনে! কলকাতা টাউনের সীমানা তখন ছোট ছিল। এই সময় থেকেই কলকাতার নাগরিক উন্নতিসাধন আরম্ভ হয়, ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায়। ঠাকুরদাস ঠিক এই সময় কলকাতা শহরে আসেন। কলকাতা টাউন বেষ্টন ক'রে প্রায় ষাট ফুট চওড়া একটি আট মাইল রাস্তা (সার্কুলার রোড) ওয়েলেসলি তৈরী করেন। হিকি সাহেব বলেছেন যে, এই রাস্তা তৈরীর ফলে কলকাতার পরিবেশ অনেক স্বাস্থ্যকর হয় এবং সাহেবদেরও সকাল সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াবার সুবিধা হয়। রাস্তাঘাট তৈরীর সঙ্গে ওয়েলেসলি নতুন জমকালো 'গভর্ণমেণ্ট হাউস' তৈরীর পরিকল্পনা করেন। তার জন্য পুরানো গভর্ণমেণ্ট হাউস, এবং প্রায় ষোলটি বাড়ী (পাঁচ বছরের বেশী তৈরী নয়) ভেঙে ফেলে জায়গা দখল করা হয়। গঙ্গার ধারে বড় বড় গুদামঘর, কাষ্টমস্ হাউস ও অন্যান্য আফিস তৈরী করা এবং ঘাট বাঁধানোর পরিকল্পনাও তিনি করেন। বারাকপুরে বাগান-বাড়ী, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদিও তিনি তৈরী করতে আরম্ভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং কলেজের জন্য গার্ডেনরীচে উইলিয়াম বার্কের বাড়ীসহ পাঁচখানি বাগানবাড়ী কেনেন। লটারী ক'রে টাকা তুলে কলকাতা শহরের দ্রুত উন্নতির পন্থাও তিনি উদ্ভাবন করেন (১০)।

১৮০৯ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে নিকল্‌স সাহেব কলকাতা শহরের একটা অংশের 'ফিল্ড সার্ভে' করেন। হাতে-লেখা তাঁর এই সার্ভের একটি কপি দেখেছি। তারই শেষে 'পিকচার অফ ক্যালকাটা' ব'লে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে। পেন্সিলে লেখা, প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, কলকাতার বাগানসংলগ্ন বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় যেন গৃহস্থ ভদ্রলোকরা তাতে বাস করেন না, রাজা-মহারাজারা বাস করেন। প্রধানতঃ মধ্য-কলকাতা, অর্থাৎ ট্যাঙ্ক স্কয়ার থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত অঞ্চলের বাড়ীগুলির কথা তিনি বলেছেন। নিকল্‌সের এই বর্ণনা থেকেই ঠাকুরদাসের কালের কলকাতার বাইরের রূপটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার আধুনিক নাগরিক বসতিবহুল ও ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রাসাদবহুল রূপের তখনও বিকাশ হয়নি। বাগানবাড়ী নিয়ে শৌখিন শহরতলীর যে রূপ হয়, কলকাতার বাইরের রূপও তাই ছিল। ছেলেমেয়ে পুকুর নিয়ে খাঁটি ইয়োরোপীয় বাসিন্দার সংখ্যা তখন তিন হাজারের বেশী ছিল না। ধর্মতলা থেকে পূবে ধাপা পর্যন্ত কলকাতার রূপ ছিল গ্রাম্য। ধাপার পাশে বড় বড় নুণের গোলা ছিল এবং নুণ তৈরীর ঘাঁটি ছিল। নুণ তৈরী করত যারা, সেই মলাঙ্গাদের অনেকে বর্তমান মলাঙ্গা লেন অঞ্চলে বসবাস করত (১১)।

কলকাতার সব পথঘাট ও অলিগলির তখনও নামকরণ হয়নি। গ্রামের মতন কলকাতার পথঘাটও বাড়ীঘর পুকুর মসজিদ মন্দির ইঙ্গিত ক'রে বলত লোকে। যেমন "বাদামতলা বা দক্ষিণ রাস্তা" (ক্যামাক ষ্ট্রীট), "কোম্পানী কেরাণী কা বাড়ী কা উত্তর রাস্তা" (লায়ন্স রেঞ্জ), "পুরান বকসীখানা কা রাস্তা" (মিড্‌লটন ষ্ট্রীট), "বৈঠকখানা গোখানা কা রাস্তা" (সার্পেণ্টাইন লেন) "নাচঘর কা উত্তর রাস্তা" (থিয়েটার রোড) ইত্যাদি। ১৮০১ সালের ১লা জুন তারিখের একটি জমিবিলির পাট্টায় দেখা যায়, সেকালের প্রসিদ্ধ বেনিয়ান অক্রুর দত্ত (ওয়েলিংটনের এই দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অন্যতম আদিপ্রবর্তক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন) ওয়েলিংটন অঞ্চলে সতের কাঠা

(৮) William Hodges : Travels in India : London 1794 : ১৩-১৬।

(৯) The Calcutta Monthly Journal : May 1800। "ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণাল" ১৮৮ন লালবাজারস্থ হরকরা প্রেস থেকে প্রকাশিত হ'ত।

(১০) Memoirs of William Hickey : Vol IV (1790-1809) : London, 5th Ed : ২৩৬-২৩৭।

(১১) C. G. Nicholls : Field Book of Survey of a Part of Calcutta : 1809-10-11.

জমি ম্যাথুলুইস নামে কোন সাহেবকে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন এবং পাট্টার মধ্যে জমির সীমানা নির্দেশ করছেন এই ভাবে : পূবে মিসেস ম্যাথুর বাড়ী ও জমি, পশ্চিমে সাধারণের চলাচলের রাস্তা, দক্ষিণে মিসেস হাওয়ার্ডের বাড়ী ও জমি এবং উত্তরে মিষ্টার হিকির সম্পত্তি। পাট্টায় বলা হয়েছে যে এই জমির মধ্যে আস্তাবল, দোকানঘর, গুদামঘর, কোচহাউস, গাছপালা পুকুর ইত্যাদি যা আছে, সব ম্যাথু সাহেব ভোগ করতে পারবেন (১২)। এই পাট্টার ভিতর থেকে ওয়েলিংটন অঞ্চলের রূপ দেড়শ' বছর আগে, ঠাকুরদাসের কালে, কি রকম ছিল, তার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা যখন কলকাতা শহরে আসেন, তখন কলকাতার ইংরেজ-সমাজে বাঙালী বেনিয়ানদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। নিমাইচরণ মল্লিক, হিদারাম (হৃদয়রাম) ব্যানার্জি, অক্রুর দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী বেনিয়ানরা তখনও জীবিত ছিলেন। নিমাইচরণ মল্লিক ছিলেন "ককারেল ট্রেল এ্যাণ্ড কোম্পানীর" বেনিয়ান। বিদেশী কোম্পানীতে এদেশী কেরাণী নিয়োগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এই বেনিয়ানদেরই ছিল (১৩)। হিদারাম ব্যানার্জি ও রঘুনাথ ব্যানার্জি দুই ভাইই বেনিয়ান ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন হিকি সাহেবের বেনিয়ান। উভয়ের কাছেই দায়ে পড়লে হিকি সাহেব বণ্ড দিয়ে টাকা ধার করতেন। এই ভাবে দুই ভাই মিলে হিকির কাছে একবার এত টাকা পাওনা হিসেবে দাবী করেন যে, হিকি হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, এত টাকা ঋণ কোনদিন তিনি বণ্ড দিয়ে গ্রহণ করেননি এবং এর অনেকটাই হ'ল দুই বেনিয়ান ভাইএর কারসাজি। কঠোর ভাষায় হিকি দুই ভাইকে শঠ প্রবঞ্চক ও স্কাউণ্ড্রেল ব'লে কটূক্তি করেছেন (১৪)। হিকি যাই বলুন না কেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেউই তখন সাধুপুরুষ ছিলেন না, হিকি পামার ককারেলেরাও নন, হিদারাম, রঘুনাথ, অক্রুর দত্ত, বারাণসী ঘোষ, নিমাই মল্লিকরাও ন'ন। বাঙালী বেনিয়ানদের যে কি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, তা হিকির স্মৃতিকথায় নিমাই মল্লিক, হিদারাম ব্যানার্জির বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। অক্রুর দত্ত এঁদেরই সমসাময়িক ছিলেন এবং বেনিয়ানি ক'রে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ঠাকুরদাস যখন কলকাতায় আসেন জীবিকার সন্ধানে, তখন এই বাঙালী বেনিয়ানরা সকলেই কলকাতার অবস্থাপন্ন সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। অক্রুর দত্ত ও হিদারাম ব্যানার্জির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ হ'ল, উভয় পরিবারের বংশধরদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবন বিশেষভাবে জড়িত। অক্রুর দত্তের বংশের রাজেন্দ্র দত্ত (হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক এদেশে) বিদ্যাসাগরের শুভার্থী বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত বেনিয়ান হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর বহুবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর ভাড়া ক'রে বাসও করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আমলে বড় বড় জাঁদরেল বেনিয়ানদের যুগ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার সমাজে প্রাচীন কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা ক'রে, তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন।

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে তাঁর এক পরিচিত জ্ঞাতির বাড়ীতে উঠলেন। সভারাম বাচস্পতি নামে তাঁদের এক নিকট জ্ঞাতি আগেই কলকাতায় এসে বসবাস করেছিলেন। সভারামের পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের প্রিয় ছাত্র। তাঁরই অনুগ্রহে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতায় এঁদের পেশা কি ছিল সে-কথা চরিতকাররা কেউ, অথবা বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবনচরিতে কোথাও উল্লেখ করেননি। মনে হয়, সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পুত্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় টোল স্থাপন ক'রে অধ্যাপনা করতেন। ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্টে প্রথম বেতনভুক পণ্ডিত নিযুক্ত হবার পর থেকে, নতুন কলকাতা শহরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি বিদ্বৎসমাজ গ'ড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি অঞ্চলের বিদ্যাকেন্দ্র থেকে অনেক পণ্ডিত কলকাতা শহরে এসে টোল স্থাপন ক'রে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সামান্য ইংরেজী শিখলে সদাগরী হৌসে চাকরী পাওয়া যেত বটে, কিন্তু সংস্কৃতচর্চায় তখনও একেবারে ভাঁটা পড়েনি। সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পুত্রের মতন অনেক পণ্ডিত গ্রামাঞ্চল থেকে এসে কলকাতা শহরে টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে কলকাতায় অনেকে যশস্বী হয়েছিলেন।

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে এই জ্ঞাতির গৃহে উপস্থিত হলেন। কি ক'রে চোদ্দ-পনের বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে বালক সেদিনকার কলকাতার পথে পথে ঘুরে জ্ঞাতিগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে-কথা এখন ভাবা যায় না। তখনকার কলকাতার অধিকাংশ নামগোত্রহীন পথঘাট কি রকম ছিল, তার কিছুটা আভাস আগে দিয়েছি। যানবাহনের

(১২) National Magazine : June 1919 : পাট্টাটির আসল কপি অক্রুর দত্তের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ চারুচন্দ্র দত্তের (প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট নিবাসী) কাছে ছিল। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' প্রকাশ করা হয়।

(১৩) Memoirs of William Hickey : চতুর্থ খণ্ডে নিমাইচরণ মল্লিক, হিদারাম ব্যানার্জি ও রঘুনাথ ব্যানার্জি সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আছে। ১৫ ও ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১৪) হিকি সাহেব লিখেছেন : "....I considered both Hydeeram Bonnagee and his brother Rogonaut Bonnagee to be as errant knaves and scoundrels as ever existed, who had united their crafty abilities to cheat and plunder me in every way they could devise...." (Vol IV, ৩১৫)

অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ঠিকা বেয়ারা ছিল, তাতে চড়া যায় না, চাকরের কাজের জন্য ঠিকা হারে ভাড়া পাওয়া যায়। ঠিকা বেয়ারারা দল বেঁধে এক-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত, কোন সাহেব বিবি কখন তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে, এই ভরসায়। ১৮০০ সালেও এই ঠিকা বেয়ারাদের মজুরীর হার নিয়ে একবার 'ধর্মঘট' হয়েছিল কলকাতায়। পুলিশ ঠিকা বেয়ারাদের মজুরী নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তাই বেয়ারারা কয়েক দিন ঘর থেকে বেরোয়নি। অনেক সাহেবের পাল্কি ছিল, কিন্তু বাঁধা মাইনে দিয়ে তাঁরা বেয়ারা রাখতেন না। পাল্কি চড়ার সময় এই ঠিকা বেয়ারা দিয়ে কাজ চালাতেন এবং অন্যান্য কাজও করিয়ে নিতেন। তাঁদের খুব অসুবিধা হয়েছিল ধর্মঘটের ফলে (১৫)। পালকি ছিল এবং পাল্কির ষ্টাণ্ডও ছিল কলকাতায়। পাল্কি ও ঠিকা বেয়ারাদের ভাড়া যখন বেঁধে দেওয়া হয়, তখন সারা-দিনের জন্য (১৪ ঘণ্টা) পালকির ভাড়া ছিল কলকাতায় চার আনা, আধবেলার জন্য (এক ঘণ্টার বেশী এবং পাঁচ ঘণ্টার কম) দু' আনা। এক ঘণ্টার অল্প সময়ের জন্য এক আনা ভাড়া দিতে হ'ত (১৬)। পালকি ও ঠিকা বেয়ারাদের হার একই ছিল। ঠাকুরদাসের পক্ষে পালকি চড়ে কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব ছিল না। দু' আনা বা চার আনা পয়সার তখন মূল্য ছিল অনেক, যখন কড়ি দিয়ে সাধারণ লোকের কেনা-বেচার কাজ চ'লে যেত। দু' এক পয়সার অভাবে, অনাহারে যিনি অক্রুর দত্ত ও হিদারাম ব্যানার্জির যুগে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, নিজের একমাত্র সম্বল একখানি ভাতখাবার থালা ও একটি জল খাবার ঘটি যিনি নতুন বাজারের দোকানে বিক্রী করবেন স্থির করেছেন, তাঁর পক্ষে পাল্কি ক'রে ঘুরে বেড়ানোর কথা চিন্তা করা, একালের গরীব কেরাণীর সন্তানের পক্ষে ব্যুইক গাড়ীতে চ'ড়ে ঘুরে বেড়ানোর কল্পনার মতন দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। সেকালের পাল্কির বিলাসিতা একালের ব্যুইকের বিলাসিতার চেয়েও অভিজাত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

পাল্কি ছাড়া, ঘোড়া ছিল, একঘোড়ার ও দুই ঘোড়ার নানা রকমের গাড়ী ছিল, এমন কি হাতিও ছিল। কলকাতা শহরে তখন হাতিও চ'লে বেড়াত। ঠাকুরদাস যখন এসেছিলেন তখনও হাতির যুগ একেবারে শেষ হয়নি। হাতি নিলামে বিক্রী হ'ত। হাতির পিঠে হাওদায় ব'সে ধনবানেরা নতুন কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হয়ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন তাঁদের, কিন্তু পিঠে ওঠার কথা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারতেন না। ঘোড়ার সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। হাতি দেখে ভয় পেত ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া, রাইডার সাহেবদের ঘোড়া। হঠাৎ ভয় পেয়ে তারা যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করত কলকাতার পথে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। আতঙ্কিত ঘোড়ার এরকম অনেক উৎপাতের ও এ্যাকসিডেন্টের বিবরণ সেকালের সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। তখনকার ঘোড়ার ট্রাফিকের যুগে অধিকাংশ 'রোড এ্যাকসিডেন্টই' ঘোড়ার উৎপাত-জনিত ছিল। কি রকম দুর্ঘটনা ঘটত, তার দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মধ্যকলকাতায় ড্রামণ্ড সাহেবও হাটম্যান সাহেবের দুটি বিখ্যাত ইংরেজী স্কুল ছিল। এই ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলেই ডিরোজিও শিক্ষা পেয়েছিলেন ১৮০৫-'৬ সালের কথা। একদিন মিষ্টার ও মিসেস হাটম্যান তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন। এমন সময় এসপ্লানেডের কাছে হঠাৎ এক হাতির সামনে প'ড়ে গাড়ীর ঘোড়া বিগড়ে যায় এবং উন্মাদের মতন লাফালাফি ক'রে পাশের কাঁচা ড্রেনের মধ্যে গাড়ী উল্টিয়ে ফেলে দেয় (১৭)। সাহেব বিবি ও তাঁদের তিন পুত্রকন্যার, ড্রেনের মধ্যে প'ড়ে, কি অবস্থা হয়েছিল, তা বর্ণনা না করলেও চলে। হাতি দেখে ভয় না পেলেও, এরকম ঘোড়ার উপদ্রব ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৮৪৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের "সমাচার-চন্দ্রিকা" থেকে আর একটি দুর্ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। চন্দ্রিকার ভাষায় বিবরণটি এই :

"২১ বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যূষে চিতপুর হইতে কৃষক লোকেরা তরিতরকারি ও ফলাদি লইয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থে আসিতেছিল পথিমধ্যে মৃত রাজা রামচাঁদের বাটীর সমীপে এক সাহেবের পাল্কী গাড়ীর চক্রে একজন কৃষক পতিত হওয়াতে তাহার পদে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে সাহেব তাহা দৃষ্ট করিয়া আপন কোচমেনকে অতি বেগে গাড়ি চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন গরীব কৃষক আঘাতী হইয়া ভূমে পতিত থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

১৮৪৩ সালের কথা। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী করছেন। ঠাকুরদাসের কাল নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে, ঠাকুরদাসের কলকাতা বাসের কালে, এরকম দুর্ঘটনা আরও করুণ ভাবে ঘটত এবং অনেক অসহায় গ্রাম্য কৃষককে শহরের পথে সাহেবের ছ্যাকরা গাড়ীর আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে ক্রন্দন করতে হ'ত। ঠাকুরদাসের মতন অসহায় গ্রাম্য বালক, যারা শিক্ষার বা জীবিকার ধাক্কায় কলকাতায় আসতে বাধ্য হ'ত, তাদেরও যে তখনকার

---

(১৫) The Calcutta Monthly Journal : Sept. 1800.

(১৬) The Bengal and Agra Annual Guide & Gazetteer for 1841 Vol I, Part III : ২৫৮। ১৮৪০-'৪১ সালের ভাড়ার হার হলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার [illegible] বেশী তফাৎ কম ছিল না।

(১৭) H. G. Rainey : The Historical & Topographical Sketch of Calcutta (Reprinted from The Englishman's "Saturday Evening Journal"): Cal. 1876 : ১২৫।

কলকাতার জনবিরল ও ট্রাফিক-বিরল পথে কত সাবধানে চলতে হ'ত, তা এই সব দুর্ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সেকালের পত্রিকাদিতে, ঘোড়ার গাড়ীর যুগের কলকাতার যে পরিমাণ দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হ'ত, আজকালকার অটোমোবাইলের যুগের কলকাতাতেও সেরকম হয় না।

সাহেবদের বগি ও পালকি গাড়ীর পাশ কাটিয়ে ঠাকুরদাস যে কত সাবধানে, ভয়ে ভয়ে পথ চ'লে নিকট-জ্ঞাতি ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তার ঠিক নেই। গৃহে উপস্থিত হয়ে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন: "বীরসিংহ থেকে আসছি, রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্র আমি।" ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নিশ্চয় অবাক হয়ে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তুমি কি জন্যে একা-একা কলকাতায় এসেছ? কলকাতা তো গ্রাম নয়, শহর। জানোই তো, খুড়ো-জ্যাঠা পিসি-মাসী কেউ এখানে নেই, এখানে কেউ কাউকে চেনে না, পয়সা না দিলে কিছু পাওয়া যায় না! কলকাতায় কি জন্যে এসেছ? কে তোমাকে এখানে পাঠালে? তোমার বাবা কোথায়?" এ-সব প্রশ্ন ন্যায়ালঙ্কারের পক্ষে করা খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলেন ঠাকুরদাস জানি না। একে জ্ঞাতি, তার উপর ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত, জবাব দেওয়া সহজ নয়। ঠাকুরদাস নিজেদের দুরবস্থার এবং পিতার গৃহত্যাগের সমস্ত কাহিনী বিবৃত ক'রে হয়ত অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে কাতর ভাবে বলেছিলেন; "আমাকে আপনি আশ্রয় দিন এবং উপদেশ দিন, আমি কি করব।" ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল ছিল, অন্নদানও করতেন। তাছাড়া, কলকাতা শহরে এসে তখন যাঁরা চাকরিবাকরি ক'রে বসবাস করতেন, তাঁদের এরকম জ্ঞাতি-আত্মীয় পোষণ করতে হ'ত। গ্রামসম্পর্কে আত্মীয় যাঁরা তাঁরাও এসে নির্বিবাদে কলকাতায় গ্রাম্য খুড়োজ্যাঠার বাড়ীতে উঠে আশ্রয় নিতেন। এটা তখনও সামাজিক রীতি বলেই গণ্য হ'ত। অতএব ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় "সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক", ঠাকুরদাসকে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন।

কিন্তু কি করবেন ঠাকুরদাস? কোন টোলে ভর্তি হয়ে পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়বেন, না অন্য কিছু করবেন? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখনও দু'চারজন আদালতে বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী পেতেন, কিন্তু অন্যান্য আফিসের বা হৌসের চাকরীর জন্য সংস্কৃত বিদ্যার প্রয়োজন হ'ত না কিছু। শিক্ষার জন্য ঠাকুরদাস কলকাতায় আসেন নি। নিশ্চিন্তে টোলচতুষ্পাঠীতে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবেন, সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তা যদি হ'ত, তাহ'লে গ্রামের পণ্ডিত মশায়ের টোলে তিনি আরও কিছুদিন পড়াশুনা করতেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁর ছেলেবেলা থেকেই খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু সমস্ত আগ্রহ ও বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে যেজন্য কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছে, তা টোলে ব'সে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য নয়, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের জন্য। তাই অনেক বিবেচনার পর তিনি স্থির করলেন, যে-বিদ্যা আয়ত্ত করলে সহজে এবং অতি শীঘ্র কিছু অর্থ উপার্জন ক'রে মা-ভাই-বোনদের কষ্ট দূর করা যায়, তাই তিনি করবেন। সেবিদ্যা সংস্কৃতবিদ্যা নয়, "মোটামুটি ইঙ্গরেজী" বিদ্যা। ইংরেজী পড়াই ঠাকুরদাস স্থির করলেন। কিন্তু পড়বেন কোথায়?

ঠাকুরদাস যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ইংরেজী শিক্ষার বেশী স্কুল ছিল না। ফিরিঙ্গীদের কয়েকটি স্কুল ছিল, যেমন চিৎপুরে শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুল, ধর্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল, শিয়ালদহ-বৈঠকখানা অঞ্চলের হাটম্যান সাহেবের স্কুল ইত্যাদি। এছাড়া আরও কয়েকটি স্কুল ছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ফিরিঙ্গী সাহেবরা ইংরেজী শিক্ষার স্কুল খোলার কথা সকলকে জানাতেন। ১৮০৭ সালে এডওয়ার্ড হল্ নামে কোন সাহেব বহুবাজারে এই রকম এক একাডেমী খুলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন (১৮)। এরকম বিজ্ঞাপন প্রায় সেকালের পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সব স্কুল যে ভালভাবে চলত, তা নয়। মেমসাহেবরাও মহিলাদের শিক্ষার জন্য এরকম স্কুল খুলতেন। কিছুদিন চ'লে ছাত্রাভাবে অধিকাংশ স্কুল উঠে যেত। সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরবোর্ণ সাহেবের ও ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের খ্যাতি ছিল খুব। সাধারণত এসব স্কুলে তখনকার ধনিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষা করত। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাল্যকালে শেরবোর্ণের স্কুলে পড়েছেন। ড্রামণ্ডের স্কুলেও অনেক ধনিক বাঙালী বেনিয়ান-নন্দন লেখাপড়া শিখেছেন। ফিরিঙ্গী সাহেব শিক্ষকদের উপর কিছুটা টোলের গুরুমশায়দের প্রভাবও পড়েছিল। কেউ কেউ টোলের পণ্ডিতদের মতন ছাত্রদের কাছ থেকে বার্ষিক বিদায় আদায় করতেন। শেরবোর্ণ সাহেব, শোনা যায়, দুর্গাপূজার সময় বেশ মোটা টাকা বার্ষিক আদায় করতেন ধনিক বাঙালী ছাত্রদের কাছ থেকে। ঠাকুরদাসের পক্ষে এই সব ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কোথায় কার কাছে তিনি ইংরেজী শিখবেন, তাই এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কাজ চলার মতন ইংরেজী জানতেন। তখনকার অধিকাংশ ইংরেজী-জানা লোক তাই জানত এবং তাতেই যথেষ্ট টাকা রোজগার করা সম্ভব হ'ত। যাই হোক, তিনিই ঠাকুরদাসকে ইংরেজী শেখাবেন, এই স্থির হ'ল। ন্যায়ালঙ্কারের অনুরোধে তিনিও রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর শেখাবার সময় কোথায়? যেটুকু ইংরেজী তিনি জানেন, তাই প্রয়োগ করে তিনি নানা উপায়ে অর্থোপার্জনের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ান। দিনের বেলা তাঁর পড়াবার অবকাশ ছিল না। তাই সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে তিনি আসতে বললেন। প্রতিবেশী হলেও

---

(১৮) H. J. Rainey: ঐ, ১২৬।

তখনকার প্রতিবেশীরা পাশাপাশি সংলগ্ন বাড়ীতে বাস করতেন না। সন্ধ্যার সময় ইংরেজী শিখতে যাওয়া, এবং পাঠ শেষ ক'রে রাতে একা-একা আবার ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে ফিরে আসা, ঠাকুরদাসের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। উপায় নেই, ইংরেজী শিখতেই হবে। বিদ্যার দায় নয়, প্রাণের দায়। ঠাকুরদাস রোজ তাই যেতেন। শেরবোর্ণ সাহেবের কাছে নয়, জনৈক শিপ্ সরকারের কাছে। ফিরতে তাঁর বেশ রাত হ'ত। সন্ধ্যার পরেই বাড়তিলোকের, অর্থাৎ স্কন্ধারূঢ় পোষ্যদের ও আশ্রিতদের আহারের পালা শেষ হয়ে যেত। কে বাকি রইল না রইল, তার কোন খোঁজ রাখত না কেউ। ন্যায়ালঙ্কারও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন। জ্ঞাতির খবর নিতেন না। শিপসরকারের বাড়ী থেকে ইংরেজীর পাঠ সাঙ্গ ক'রে ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাস সুপণ্ডিত জ্ঞাতির গৃহে ফিরে রাত্রিতে অনাহারেই কাটাতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। বলবার তো কোন অধিকার ছিল না তাঁর! মাথা গোঁজার আশ্রয় পেয়েছেন, এজেন্ট-দালাল ও বেনিয়ানদের কলকাতা শহরে, এই তো যথেষ্ট!

অনাহারে রাত্রি কাটিয়ে ঠাকুরদাস ক্রমেই শীর্ণ ও দুর্বল হ'তে লাগলেন। ইংরেজীশিক্ষক একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি দিন দিন এরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?" কাঁদ-কাঁদ হয়ে ঠাকুরদাস সব কথা তাঁকে বললেন। যখন কথা হচ্ছিল তখন শিপ্ সরকারের এক আত্মীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি নিজে রেঁধে খেতে পারবে? যদি পার, তাহলে আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি।" প্রস্তাব শুনে ঠাকুরদাস আহ্লাদিত হলেন। পরদিনই থালা ও ঘটিটা নিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সদাশয় জ্ঞাতি ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হ'ল না।

নতুন আশ্রয়দাতার উদারতা যতটা ছিল, সামর্থ্য ততটা ছিল না। দালালি ক'রে সামান্য পয়সা তিনি রোজগার করতেন। কলকাতা শহরে দালালির কাজে তখন বেশ দু' পয়সা ছিল। দালালির অর্থে অনেকেই সে সময় সম্ভ্রান্ত ও ধনিক ব'লে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু সব দালাল সমান ভাগ্যবান ছিলেন না। ঠাকুরদাসের নতুন আশ্রয়দাতার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। প্রতিদিন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোন দিন দেড় প্রহরে, কোন দিন দুই প্রহরে, কোন দিন আড়াই প্রহরে, কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন। তাই নিয়ে কোন দিন বেশ ভাল ভাবে, কোন দিন কষ্টে দু'জনের আহার চলে যেত। কোন দিন দিনের বেলা তাঁর ফেরা হত না। সেদিন ঠাকুরদাস উপবাস ক'রে থাকতেন। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা, উভয়েরই এইভাবে কষ্টের মধ্যে দিন কাটতে থাকল। তার মধ্যেই ঠাকুরদাসের ইংরেজী পড়া চলতে লাগল।

ঠাকুরদাসের সম্বল ছিল একখানি ভাতখাবার থালা ও একটি ছোট ঘটি। আশ্রয়দাতার অবস্থা দেখে তিনি ভাবলেন, থালাখানা বিক্রী ক'রে কিছু পয়সা হাতে রাখা ভাল। এক পয়সার শালপাতা কিনে রাখলে, তাতে দশ বারো দিন ভাত খাওয়া চলবে। থালা না থাকলেও কাজ চ'লে যাবে, কেবল সকল কাজের সহায় ঘটিটা থাকলেই হ'ল। থালা বিক্রীর পয়সা হাতে থাকলে তাই দিয়ে, দিনের বেলা যেদিন কিছু আহার জুটবে না, সেদিন কিছু কিনে খাওয়া যেতে পারে। এত কথা গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে ঠাকুরদাস একদিন থালাখানি নিয়ে নতুন বাজারের কাঁসারিদের দোকানে বিক্রীর জন্য উপস্থিত হলেন। কাঁসারিরা বলল, অচেনা লোকের কাছ থেকে পুরান বাসন তারা কিনতে পারবে না। মধ্যে মধ্যে এরকম না জেনে চোরাই মাল কিনে তারা বড় ফ্যাসাদে পড়েছে। ঠাকুরদাস দোকানে দোকানে ঘুরলেন। কোন দোকানদারই থালা কিনতে রাজী হ'ল না। অবশেষে সামান্য মূলধন সঞ্চয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রে তিনি বাসায় ফিরে এলেন।

কি বিচিত্র কলকাতা শহরে এসেছেন তিনি, ঠাকুরদাস মনে মনে ভাবলেন! কোন দয়া নেই, মায়া-মমতা নেই, বিচার-বিবেচনা নেই! অথচ এখনকার মতন শানবাধানো পাথরের কলকাতা শহর তখনও গ'ড়ে ওঠেনি। তবু শহর শহর, গ্রাম নয় শহর। নিষ্ঠুরতাই শহরের ধর্ম, কোমলতা নয়। কলকাতার পথে পথে অনাহারে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠাকুরদাস, কত বড়লোকের বাড়ীর দিকে, কত দোকানের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। অথচ দেওয়ানির ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার স্রোত ব'য়ে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে! সাহেবদের বাড়ীতে যেমন, তাঁদের কৃপাশ্রিত বাঙালী রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও তেমনি ভোজ চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে। কেবল আতসবাজীর উৎসবেই হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। কলকাতার যে অঞ্চলে ঠাকুরদাস বাস করতেন (বড়বাজার), তার কাছাকাছি অঞ্চলে কেবল দুর্গাপূজার সময় যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হ'ত, তাই দিয়ে ঠাকুরদাসের মতন হাজারটি দুস্থ পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে-পড়িয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে মানুষ করা যেত। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে, জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ীতে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীতে, ঠাকুরবাড়ীতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়ীতে, দুর্গাপূজার সময় নিমন্ত্রিত সাহেবদের নিয়ে যে রকম নাচ গান হল্লা, বাজী পোড়ানোর উৎসব হ'ত, তা ঠাকুরদাস নিশ্চয় তখন দু'-একবার দেখেছেন। দেখে তাঁর কি মনে হ'ত তা তিনি পরবর্তীকালে কাউকেই ব'লে যাননি, এমন কি তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেও না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই ধরণের উৎসব কলকাতা শহরে পূর্ণোদ্যমে চলেছে। সেকালের অনেক ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় এই সব উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আছে (১০)। এই সব উৎসব-প্রাঙ্গণের

(১১) The Morning Post, The Calcutta

আশে-পাশেই ঠাকুরদাস যে কত দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার ঠিক নেই। মধ্যে মধ্যে পথের ধারে খাবারের দোকানের সামনেও যে তিনি ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, পয়সার অভাবে কিছু কিনে খেতে পারতেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ তাঁর ক্ষুধার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখত না, দেখলেও কিছু বলত না। কলকাতা শহর যে!

মানবতার ধর্ম, নতুন শহর কলকাতায়, তখনও অঙ্কুরিত হয়নি। দাসত্বপ্রথার নিষ্ঠুরতার পর্বও তখনও শেষ হয়নি। দাস কেনাবেচা কলকাতা শহরেও চলত এবং দাসদের উপর যে নির্যাতন করা হ'ত, তা অমানুষিক। ঠাকুরদাসের কলকাতায় আসার আট দশ বছর আগেকার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি তখনকার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকা দাসীকে, অসুস্থ ব'লে, কসাইতলার (বেন্টিক স্ট্রীট) একটি বাড়ী থেকে মালিকরা তাড়িয়ে দেন। পাশের স্যাঁতসেঁতে একটি ঘোড়ার আস্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাড়ীর মালিকরা এবং আশপাশের প্রতিবেশীরা মধ্যে মধ্যে আস্তাবলে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতেন। কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ বালিকাটি মারা যায় (২০)। ছোট্ট একটি ঘটনা। ১৭৯২ সালের কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ একই সময়ের অনেক বাবুদের বাড়ীর উৎসবের খবর এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা শহরের অন্তরের খবর পাওয়া যায় এই সব ঘটনা ও সংবাদ থেকে। ঠাকুরদাস যখন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখনও শহরে এই রকমের ঘটনা ঘটত। যে কলকাতা শহরে ক্রীতদাসী বালিকা অসুস্থতার জন্য গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে থেকে, প্রতিবেশীদের চোখের সামনে, মারা যেতে পারে, সেই কলকাতা শহরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস এসেছিলেন, নিজে বাঁচার জন্য এবং মা-ভাই-বোনেদের বাঁচাবার জন্য। প্রায় পঁচিশ বছর পরে এই পিতার সঙ্গেই যে-কলকাতা শহরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম এসেছিলেন, তার সঙ্গেও এই কলকাতার পার্থক্য অনেক।

একদিন মধ্যাহ্নের ঘটনা। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে, দালালবাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যদি শহর দেখতে দেখতে, অন্যমনস্ক হয়ে, খিদের কথা ভোলা যায়! বনেজঙ্গলে খিদের কথা ভোলা যায়, শহরে কখন ভোলা যায় না। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠাকুরদাস ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক দোকানে মুড়িমুড়কি বিক্রী করছেন। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, গ্রামের ছেলে, মুড়িমুড়কির দোকানের সঙ্গে খুবই পরিচিত। ঠাকুরদাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার কথা ব'লে জল চাইলেন। দোকানের স্ত্রীলোকটি ঠিক শহরে ন'ন, তাই শুধু জল না দিয়ে, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাস কি রকম ব্যস্ত হয়ে মুড়কিগুলি খেলেন তা ঐ স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি এড়াল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ বুঝি তুমি কিছু খাওনি বাবা?" "না, মা, এখনও কিছু খাইনি"—ঠাকুরদাস বললেন। "দাঁড়াও বাবা, একটু দাঁড়াও, জল খেও না" বলে তিনি পাশের এক খাবারের দোকান থেকে কিছু দই কিনে এনে, আরও কিছু মুড়কি দিয়ে, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলার করালেন। পরে ঠাকুরদাসের মুখে সব কথা শুনে তিনি বেশ জোর দিয়েই ব'লে দিলেন যে, যেদিন আহার হবে না, সেদিন যেন দোকানে এসে পেট ভরে তিনি ফলার ক'রে যান।

ঘটনাটি পিতার মুখে শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের কি মনে হয়েছিল তা তিনি স্বরচিত জীবনচরিতে লিখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।" মানবসভ্যতার কলঙ্ক, শৃঙ্খলিত স্ত্রীজাতির বহু বন্ধন ও বেদনা দূর করার জন্য সারাজীবন যিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন, তাঁর উক্তি কেবল ভাবপ্রবণের উক্তি নয়। যুক্তিনিষ্ঠ মহানুভব বিদ্যাসাগরের চরিত্রে আর যাই থাকুক, একবিন্দুও উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা ছিল না।

ঠাকুরদাস মধ্যে মধ্যে তাঁর আশ্রয়দাতাকে বলতেন, এবারে আমাকে সামান্য মাসিক বেতনে যে কোন একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিন। কলকাতা শহরে থেকে সব সময় তাঁর মনে হ'ত বীরসিংহ গ্রামের কথা, মা দুর্গাদেবী ও ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা। কিছুদিন পরে মাসিক দু' টাকা বেতনে তিনি এক জায়গায় কাজে নিযুক্ত হলেন। নিজে অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও তিনি বেতনের দুটি টাকা মা'কে পাঠিয়ে দিতেন। এই ভাবে দু' টাকা মাইনের চাকরী ক'রে দু' তিন বছর কেটে গেল। তার মধ্যে কলকাতা শহরের কত শ্রীবৃদ্ধি হ'ল, কত খানাপিনা ভোজ হ'ল, কত বাইনাচ হ'ল, বাজী পুড়ল, আদালতের মামলা মোকদ্দমায় কত দেওয়ান-বেনিয়ানের উপার্জিত অর্থের অপব্যয় হ'তে

Monthly Journal, Calcutta Chronicle প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, এই সব আমোদ-উৎসবের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে।

(২০) Calcutta Chronicle: Sept. 11, 1792: ৮নং লালবাজার থেকে আপজন সাহেব 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ রকম আরও অনেক সংবাদ প্রাচীন পত্রিকা থেকে সংকলন ক'রে দেওয়া যায়।

থাকল, কত বাবুদের বংশধররা খেউড় আর হাফ-আখড়াই শুনে, যাত্রায় নোট প্যালা দিয়ে, মদ্যপান করে, বুলবুলির লড়াই দেখে, উচ্ছন্নে যেতে লাগলেন, তার ঠিক নেই। ঠাকুরদাস দু' টাকা মাইনের চাকরী নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন এবং তাঁর সততায় সন্তুষ্ট হয়ে মালিক বেতন বৃদ্ধি ক'রে দিলেন। দু' টাকা থেকে মাসিক পাঁচ টাকা তাঁর বেতন হ'ল। এমন সময় সংসারত্যাগী রামজয় তর্কভূষণ তীর্থভ্রমণ ক'রে ফিরে এলেন দেশে। এর মধ্যে যে এত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তা কিছুই তিনি জানতেন না। প্রথমে বনমালিপুর গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বীরসিংহে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস কলকাতায় গিয়েছে শুনে, তিনি কলকাতায় তাকে দেখতে এলেন। পিতাপুত্রের মিলন হ'ল বড়বাজারে। পুত্রের মুখে তার কষ্ট-সহিষ্ণুতার কাহিনী শুনে, তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, "বেঁচে থাক বাবা!" রামজয় তর্কভূষণের পুত্র, বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসই বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের কর্ণধার হবার মতন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে হ'তে পারেন? বাংলার সমাজ-রণাঙ্গনে সব চেয়ে বড় বীর যোদ্ধা যিনি, তাঁর ট্রেনারের নিজস্ব ট্রেনিং কলকাতা শহরেই আরম্ভ হয়েছিল।

বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চলে ভাগবতচরণ সিংহ নামে একজন অবস্থাপন্ন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বাস করতেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে একদিন তিনি ঠাকুরদাস সম্বন্ধে সব কথা তাঁকে বললেন। সিংহ মহাশয় শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং বললেন যে এখন থেকে ঠাকুরদাস তাঁর বাড়ীতেই থাকবেন। ভাগবতচরণের আশ্রয়ে থেকে ঠাকুরদাসের আহার-নিদ্রার কষ্টের অবসান হ'ল। "যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন।" সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে তিনি এক স্থানে কাজে নিযুক্ত হলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাইনে হয়েছে শুনে, "তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।" ঠাকুরদাসের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বছর। চোদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। দীর্ঘ আট নয় বছর কঠোর সংগ্রামের পর মাসিক আট টাকা উপার্জনের যখন ক্ষমতা হ'ল ঠাকুরদাসের, তখন তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।

১৮১৪-১৫ সালের কথা। এই সময় থেকে রামমোহন রায় স্থায়িভাবে কলকাতাবাসী হলেন। অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বাংলা ভাষায় প্রথম তাঁর বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল। "আত্মীয় সভা" স্থাপিত হ'ল। ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে রামমোহন পৌত্তলিকতা ও ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হ'ল। হেয়ার সাহেবই সেই প্রস্তাব করলেন। "আত্মীয়সভার" সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব নিয়ে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের গৃহে যাতায়াত করতে লাগলেন। নবযুগের বাংলার মহাবিদ্যালয় "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হ'ল। বালক ডিরোজিও তখন ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমীতে লেখাপড়া শিখছেন। ঠনঠনিয়ার ঘোষ-পরিবারে রামগোপাল ঘোষ তখন জন্মগ্রহণ করেছেন (১৮১৪ সালে)। নিমতলার মিত্র-পরিবারে প্যারীচাঁদ মিত্রেরও জন্ম হয়েছে (১৮১৪ সালে)। এমন সময়, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুরদাস গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করতে গেলেন।

বীরসিংহ গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী জননী ভগবতী দেবীকে পুত্রবধূরূপে দুর্গা দেবী যখন বরণ করছেন, কলকাতা শহরে তখন নবজাগরণের আগমনী সুর শোনা যাচ্ছে। [ক্রমশঃ।

মুসলমানী পতাকায় অর্দ্ধচন্দ্র কেন?

তার অনেকগুলি কারণ আমরা সংগ্রহ করেছি। হয়ত এর মধ্যে যে কোনও একটি বা একাধিক কারণ সত্য কিন্তু আজ নিঃসন্দেহ হয়ে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব।

(১) হজরত মহম্মদ নিজের অলৌকিক শক্তি তাঁর শিষ্যগণকে দেখাবার জন্য না কি একবার চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেন।

(২) চন্দ্র পূর্ণ হওয়ার পরেই হ্রাস পায়, এই কারণেই না কি অর্দ্ধচন্দ্রের প্রয়োজন হয়।

(৩) অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানুষকে আলো দেবার জন্যই না কি এই প্রতীক।

(৪) পৃথিবীর বহু জাতের পতাকাতেই নানা পার্থিব বস্তু আছে। চাঁদের মত পবিত্র, স্বর্গীয় বস্তু প্রদানের কারণ কি তাই?

(৫) খৃঃপূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে মাসিডন-রাজ ফিলিপ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল অবরোধ করেন। রাতের অন্ধকারে ফিলিপের সৈন্যগণ যখন প্রাচীর লঙ্ঘন করতে ব্যস্ত তখনই চাঁদ ওঠে এবং তুরস্ক সৈন্যগণ মাসিডন-রাজকে পরাস্ত করেন। এজন্যই তিনি নাকি পতাকায় চন্দ্র ব্যবহার করেন এবং সেই থেকেই……।

(৬) ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান ২য় মহম্মদ খান রোমকদের পরাজিত করে তাদের জাতীয় পতাকা 'অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন' সহ গ্রহণ করেন। তাই থেকেই সমগ্র মুসলিম জগতে……।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানালে আমরা ধন্যবাদ সহ তা প্রকাশ করব।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

যদিও সাজুক্তেলীকে বলেছি, মধ্যবিত্তদের যৌবনের রঙ্গভূমি, এবং সে-কথা মিথ্যেও নয়, তবুও সেই সঙ্গে যে-কথা না বললে সত্যের অপলাপ হয় তা হ'ল মধ্যবিত্ত কলকাতাকে মর্মে মর্মে জানতে হলে যেতে হবে বাজারে এবং ঘুরতে হবে ট্রামে-বাসে।

যেমন ভগবান নেই মন্দিরে, নেই তীর্থস্থানে, ভগবানকে যেমন পাওয়া যাবে না পুঁথির পাতায়, মন্ত্রেও নেই, মন্ত্রণা থেকেও তিনি অনেক দূরে, ভগবান আছেন যেখানে পাথর ভেঙে কাজের মানুষ বানাচ্ছে পথ, চাষা যেখানে বারো মাস কাটছে ধান, যেখানে মহাকালের চাকা কর্মমুখর, ঘর্ম-মুখ-মানুষদের যেখানে ভাববার সময় নেই, ভগবান আছেন কি নেই, ভগবান আছেন যেমন সত্যিকারের শুধু সেখানেই, তেমনি মধ্যবিত্ত কলকাতা আছে বটে কেরাণীদের কর্মক্ষেত্রে, ফুটবল গ্যালারীতে, সিনেমার কিউ-তে, কিন্তু সেখানে শুধু 'আছে' মাত্র। নামে মাত্র আছে; কিন্তু সত্যিকারের মধ্যবিত্ত জীবন বেঁচে আছে মাছের আর আলু-পটলের বাজারে। এখানে থলি হাতে, ট্যাঁকে শেষ কড়ি সম্বল, অফিস লেট করার সম্ভাবনায় রুদ্ধশ্বাস, কাদা-ছপছপে যাতায়াতের পথে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা মধ্যবিত্ত বাঙালীকে যে দেখে নি, সে দিনের আলোয় তাজমহলের মধ্যে দেখেছে শুধু স্থাপত্য কর্ম, জ্যোৎস্নালোকে দেখে নি মৃত মর্মর পাত্রে টলমল করছে জীবনের অমৃত।

বাজার-প্রসঙ্গেই প্রথম যে-কথা মনে আসে তা হ'ল বাঙালী-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন সহরের কোন বাঙালীরই 'আজ বাংলা কত তারিখ?' জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যেমন এই জায়গায় সব শহরে বাঙালীরই মিল আছে তেমনি আছে বাজার প্রসংগেও। মাছের থলি হাতে বাজারে ঢোকবার ঠিক মুখে আপনার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনার দরকার নেই, মুখ-চেনা হ'লেই হবে, দেখবেন সে ঐ অবস্থায় দেখা হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করে বসেই আছে: 'বাজারে যাচ্ছেন বুঝি?'—শুধু বাজার-প্রসঙ্গেই বা কেন, জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গেও দেখুন, বেলা বারোটা, হাতে সাবান, এমন কি, হয়ত স্নানের মগ সঙ্গে করেও আপনি এলেন কাঁধে গামছা, মাথায় তেল থাবড়াতে থাবড়াতে, এমন সময় যে-বন্ধুটি দেখা করতে এসেছেন, তিনি যিনিই হ'ন, শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালী হ'লেই তাঁর অনিবার্য প্রথম প্রশ্ন হবেই: 'চানে যাচ্ছেন বুঝি?'—ইচ্ছে করে ঠাস ক'রে একটা জবাব দিই। 'না, চানে যাব কেন, ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছি।'

অবশ্য এ-প্রসঙ্গের সম্মুখীন হতে হয় যদি প্রশ্নকর্তা এবং আপনি, দু'জনের কেউই কানের মাথা না খেয়ে থাকেন তবেই। কারণ? কেন, আপনারা কেউ সেই দু'কালার গল্প জানেন না? বাজার যাবার পথে দু'কালার ট্রামে হঠাৎ দেখা। এক-ট্রাম লোক, কাজেই কেউ স্বীকার করতে চান না কানের খাটতা। প্রথম কালা এক রকম নিশ্চিন্ত হ'য়েই জিজ্ঞেস করেন: 'বাজারে যাচ্ছেন বুঝি?' দ্বিতীয় কালা শুনতে পেলেন না, কিন্তু সে-কথা বুঝতে দেবেন কেন, তাই জবাব দিলেন বিজ্ঞের মত: 'না, বাজারে যাচ্ছি।' প্রথম কালার কানে একটি কথা না গেলেও, তিনি যেন শুনতে পেয়েছেন এমন ভাব করে মহাবিজ্ঞের মত এবারে বলেন, 'তাই বলুন, আমি ভাবছি, বাজারে যাচ্ছেন বুঝি!'

বাজারের প্রসঙ্গেই আরেকটি বৈশিষ্ট্যও সমান উল্লেখযোগ্য। এবং এখানেও সব মধ্যবিত্ত বাঙালীই সমান। সেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি গুরু না হ'লেও তার হাস্যকর গুরুত্ব কম নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে, উনিশ শ' চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ, যখন বাজার-দর এখনকার তুলনায় ছিল কিছুই না, এখন যেমন, তখনও তেমনি কিন্তু লোকের এক আর্তনাদ: বাজারে কিছু ছোঁবার উপায় আছে, সব আগুন। সাত টাকা মণ চালের দিন আর ষাট টাকা যখন চালের মণ, দু'সময়েই মধ্যবিত্তদের সমান হাল। এ হচ্ছে গত শীতে, এমন ঠাণ্ডা পিতার জন্মে কখন পড়ে নি, বলবার পর এবারে শীত পড়তে না পড়তেই কাতরানো: 'এবারের শীত-টা বড্ড বেশি না হে?' আসল কথাটা হচ্ছে

মধ্যবিত্ত মন কিছুতেই খুশী নয়; উত্তমেও নয়, অধমেও নয়; মধ্যবিত্ত নয় শুধু, মধ্যবর্তী মন তার। তাই উত্তম এবং অধম,—দু'দলই মধ্যবিত্তদের যখনই সুবিধে পাচ্ছে, তখনই উত্তম-মধ্যম দিয়ে নিচ্ছে, নয়, ছুয়ে নিচ্ছে একটুও দ্বিধা না করে।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি মিল যেখানে, সে ঠিক বাজারে নয়, সে হচ্ছে বাজার করায়। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় যে-কোন লোকের কাজ যদি তার হ'য়ে আপনি করে দিতে চান, তাতে কৃতজ্ঞ বোধ করবে না এমন আহাম্মক স্বনিধনকামী মনুষ্যজাতির এ্যাটমবোমা আবিষ্কারের যুগেও একজনকেও পাবেন না, বলতে পারি এক রকম হলফ করেই। কিন্তু বাড়ীর রান্না করার ঠাকুরকে একবার বলে দেখুন দেখি যে, 'ভাই তোমার কষ্ট করার দরকার নেই, আমিই বাজার করে দিচ্ছি,' বলা শেষ হবার আগেই দেখবেন সে ঠাকুরের আপনার বাড়ীতে হাতা-খুন্তী ধরা সেই মুহূর্তেই শেষ। এখন যারা রান্নার কাজ করে তারা ত' চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে কাজে ঢোকবার সময়ই মাইনে কাপড়-চোপড় কাজের সময়, ক'জন লোক, সব সুবিধে-অসুবিধে শোনবার পর জিজ্ঞেস করে, বাজার কার হাতে? ঠাকুরের হাতে বাজার না থাকলে সে ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে বেহাত।

সব পাষাণই যেমন ঠাকুর নয়, যদিও সব ঠাকুরই পাষাণ, তেমনি সব উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারেই একজন রাঁধবার ঠাকুর থাকলেও সব উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারেরই ঠাকুরের হাতে বাজার নেই। এই সব পরিবারের কর্তাদের পেশা আলাদা কিন্তু নেশা এক: বাজার করা। এঁরা কেউ কেউ হয়ত পরের মুখে প্রায়ই ঝোল খেয়ে থাকেন, বাড়ীর রান্না ঠাকুরে করে বলে, পরের হাতে ঝোল না খেয়েও তাদের উপায় নেই কিন্তু ঝাল এবং ঝোল, দু'য়েরই উপাদান তাদের নিজেদের কেনা চাই। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, সতীদাহ প্রথা যেদিন গেছে, সেদিন এ বিশ্বাসও বিদায় নিয়েছে। কিন্তু স্বামীর বাজার-নৈপুণ্যে যে সতীর সত্যিকারের পুণ্য, আজকালকার গৃহিণীরাও সে কথা অস্বীকার করেন না। এমন কি কোন বৃদ্ধ এখনও কর্মক্ষম আছেন এ কথা এক কথায় বোঝাতে হলে, 'উনি এখনও নিজে বাজার করেন', না ব'লে উপায় নেই।

বাজার-নিপুণ এই ব্যক্তিরা এক একটি চরিত্র। কোন বাজারে গেলে কোন্ জিনিষটি ক'তয় পাওয়া যায়, এ তাঁদের নখদর্পণে। পচা আর টাটকা, ঠিক আর বাড়িয়ে বলা দাম, এক নজর দেখে বলে দেওয়াই এদের বাহাদুরী। কেউ তাদের চেয়ে সস্তায় কোন ভাল জিনিষ নিয়ে গেলে এদের যে আপশোষ, সীতাকে হারিয়ে রামের বিলাপ তার কাছে কিছুই নয়!

সারা দিনের কাজ পড়ে থাকলেও ক্ষতি নেই,—কিন্তু বাজার থেকে ফিরে এসেই বাজারের হিসেব না লিখে ফেলতে পারলে এদের সারা দিনটাই নষ্ট, সমস্ত জীবনই যেন ব্যর্থ। সংসারের সার চিনেছে এরাই।

অন্য দিকে যারা টাকার বাজারে প্রথম পর্যায়, বাজারের টাকা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। এদের স্ত্রীরা সদাই শঙ্কিত। তাদের স্বামীকে জগতে সবাই ঠকাচ্ছে, এই হায় হায় ধ্বনিতে তাদের গৃহ সর্বদাই প্রতিধ্বনিত। দু' টাকার জিনিষ দশ টাকায় কেনে এরা, কোন অনুতাপ না করে। তাতেই তাপমাত্রা বাড়ে সুগৃহিণীর মেজাজের। সেই তাপের ওপর তপ্ত আগুন জোগায় পাশের বাড়ীর গৃহিণীর কর্তার সব চেয়ে সস্তায় সব চেয়ে ভাল জিনিষটি কেনার সালঙ্কার বর্ণনা। শুনে দুঃখের অন্ত থাকে না আর, স্বামীর প্রতি রাগের মাত্রা যত সীমা ছাড়ায় স্বামীর অনুরাগের সীমাও মাত্রাতিরিক্ত মূল্যে কেনা মান ভাঙানোর হার অভিমানের মালা হয়ে ততই দোলে স্ত্রীর গলায়। রাগতে গিয়েও এমন ছেলেমানুষের ওপর যে রাগ করে সে মেয়ে নয়!

কিন্তু সত্যিই কি এরা বোকা?—না। এরা বোকা সাজতে ভালোবাসে। জীবনের হার-জিতের আসল খেলায় এরা এত বার এত জিতে গেছে, এমন অনায়াসে, যে কোথাও কোথাও এরা হারতেই ভালবাসে, বেঁচে যায় কারুর কাছে হার মানতে পারলে। দশ টাকার জিনিষ এরা কেনে একশ' টাকায়। কারুর হাসি তাই এদের জীবনে জোয়ার আনে, কারুর চোখের জল এদের রাত্রিকে করে বিনিদ্র, দিবসকে বিষণ্ণ। কারুর স্মৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে মেসিনগানের সামনে এদের কানে শোনায় যুঁই ফুলের গান। প্রবাসের আকাশ মনে হয় বন্ধুর প্রসন্ন হাসি, নির্বাসনের অন্ধকার দিনগুলোকে মনে হয় প্রিয় নারীর সঙ্গে একদিন সুনিশ্চিত মিলনের মধুর প্রতীক্ষার মত। এ পৃথিবীতে সবাই সবাইকে ঠকাতে চায় না, কেউ কেউ ঠকতেও চায়, তাই মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্যেই বাকী সকলের বাসযোগ্য হ'তে পেরেছে এ-বসুমতী।

দেশবন্ধু, শোনা যায় মেয়ের বিয়েতে লোক খাওয়ানোর জন্যে কত টাকার বাজার করতে হবে জিজ্ঞেস করেছিলেন সরকারকে। মাথা চুলকে সরকার বলেছিল: 'আজ্ঞে পনের হাজার টাকার মত লাগবে।' দেশবন্ধু নাকি হেসে বলেছিলেন, তার জবাবে, 'পনের হাজার ত চুরিই হবে, সব মিলিয়ে কত লাগবে তাই বল।'

মুসুরির ডাল খাব, অথচ পেঁয়াজ দেব না, এর যেমন কোন মানে হয় না, ফুটবল খেলা দেখার নেশা যার সে যেমন মাঠেই যায়, রেডিওতে ধারা-বিবরণী শুনে কিছুতেই পায় না তৃপ্তি, দেশভ্রমণ যার উদ্দেশ্য সে যেমন সাত দিনে উড়োজাহাজে পৃথিবী ভ্রমণ করতে না পারলে মনে করে না মহাভারত অশুদ্ধ। তেমনি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সত্যিকার চেহারা যে দেখতে চায় না সেই বাজারের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে চাকরকে দিয়ে চটপট মাল তুলে নিয়ে ভাবে বাজার করা হল। বাজারে যেতে সকলের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ট্রামে বাসে, পায়ে হেঁটে সকলের সঙ্গে মিশে না গেলে জানা হয় না মধ্যবিত্ত জীবন, সংসারের সত্যের সঙ্গে হয় না সাক্ষাৎ। টলষ্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীস কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তা সম্যক্ জানতে সম্পূর্ণ বইখানাই পড়া দরকার। সে বইএর মার্কিনী চলচ্চিত্র সংস্করণ দেখে বা তার ডাইজেষ্ট পড়ে কখনই তা সম্ভব নয়। দূরকে আরও দূরে ঠেলে নয়, দূরকে নিকট করে তবেই মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। মনে পড়ছে সেই—

উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পারো,
মেসিন পক্ষীরাজে,
যেতে চাও কাদা ছুঁড়ে যেতে পারো,
মোটর যানে তা' সাজে;

সস্তায় হারে ট্র্যামে যেতে চাও—
ট্রেনের টিকিট কাটো,
মানুষকে যদি কাছে পেতে চাও,
সবার সঙ্গে হাঁটো।

সত্যিকারের সৎ বা মহৎ সৃষ্টির অভাবেই আজকের বাংলা সাহিত্যের বাজার নিয়েছে চাল আমলে যাকে বলছি আমরা রম্য রচনা। আসল খাদ্যের দেখা নেই, পরিবেশিত হচ্ছে নিছক চাটনী। বক্তব্যের জায়গায় চুটকী। দুধের বদলে পিটুলি-গোলা। কিন্তু সত্যিকারের জীবন্ত রম্য-রচনার যদি পেতে চান স্বাদ, তাহলে চড়ুন ট্রামে-বাসে। রম্য-রচনা নয় রমনীয় রচনা! এক একটি লোক এক একটি টাইপ। কেউ জন্মেই মারমুখো, কেউ কিছুই গায়ে মাখে না, কেউ গাম্ভীর্যে কালপেঁচা, কেউ রসে টইটুম্বুর। মন্তব্যের শেষ নেই, মতান্তরের আদি। বিশ্বকর্মা থেকে অবর্মার বিশ্ব সব এই 'চব্বিশ জন বসিবে ও চুরাশী জন দাঁড়াইবে'—এরই মধ্যে। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্যে দরকার নেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন; ট্রামে-বাসে রোজই কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড ঘটেছে কখন না কখনই।

এই বাসে করেই আপনার যদি যাতায়াতের অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বাসের কণ্ডাক্টর মাত্রই চীজ্-বিশেষ। শহরের কোন একটি রাস্তায় এসে সে যখন চিল্লাতে থাকে: "রাসবিহারী উতারিয়ে", তখন কি আপনার না মনে হ'য়ে উপায় আছে যে, দেশবিশ্রুত রাসবিহারী বুঝি তার 'ইয়ার' ছিলেন। এই বাস-কণ্ডাক্টর যারা প্রায়ই পাঞ্জাব-তনয়, তাদের সব চেয়ে মারাত্মক উক্তি অবশ্য: "জেনানা হায় বাঁধকে;" মনে হয় যেন এরা আজও রয়েছে পৃথ্বীরাজের যুগে, যখন পরের মেয়ের পাণিগ্রহণের জন্যে তাকে জোর করে বেঁধে নিয়ে গেলেও, মেয়ের বাবা নারীহরণের অভিযোগে পেনাল কোডের নিতেন না শরণ। সত্যি সত্যি বীরভোগ্যা ছিল সেদিন বসুন্ধরা।

ট্রাম আর বাসে যত পার্থক্য, এত তফাৎ তাজমহলের সঙ্গে নেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল ভবনের; রাগবী থেকে লুডো খেলা নয় তার চেয়ে দূরে; অধুনা চলতি বাঙ্গালী লেখকদের স্মৃতিকথার সঙ্গে নেই পুলিশের ডায়রীর বেশি বৈসাদৃশ্য। ট্রাম হচ্ছে কেরাণী, বাস পুরো বোহেমিয়ন; ট্রাম যেন ড্রয়িংরুমে দেখানোর একাঙ্কিকা বাস তার বদলে শিরবাত্রির 'Whole Night performance; বড়লোকের বাড়ীতে বাচ্চাদের সুইমিং পুলের সঙ্গে যদি তুলনা চলে ট্রামের, বাস তাহলে বর্ষার দিনের বেগবান পাহাড়ী-নদী।

লাইন-টানা এক্সারসাইজ বুকে লেখার মত ট্রামগাড়ীর যাতায়াতও বাঁধা রাস্তায়। বাস বেপরোয়া; পুলিশের হাত, মানুষের পা, ল্যাম্পপোষ্টের গা, রাস্তা পেরুন কুকুর-বেড়ালের ছা, টায়ারের হাঁ, অবস্তরণরত যাত্রীর অনবরত 'হাঁ', 'হাঁ',—কিছুতেই তার তোয়াক্কা নেই।

ট্রাম কারেন্টের অভাবে যেমন অচল, তেমনি ষ্ট্রাইকের আণ্ডার-কারেন্টেও মাঝে মাঝেই তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। ট্রামের ঘর-বাড়ী আলো হাওয়া সব আছে, মেরামত হাসপাতাল সব। বাস অচল হলে রাস্তায় পড়ে থাকে, রোদে জলে পোড়ে। ট্রাম বড়লোকদের সাত রাজার ধন এক মাণিক; বাস Self-made ম্যান!

তাই ট্রামের আর বাসের যাত্রায় নয় শুধু যাত্রীতে যাত্রীতে সামা সামান্যই, অমিল অনেক। ডিভাইড এণ্ড রুল;—এই প্রথায় রাজ্য শাসন থেকে ট্রাম গাড়ী সবই চালু করেছে যারা তাদেরই বিজয়-পতাকা হ'ল ইউনিয়ন জ্যাক। ট্রামের ফার্ষ্ট-এর সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়ার তফাৎ হয়ত এক পয়সা কিন্তু মেজাজের ফারাক আসমান-জমীন। সেই কারণেই ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে যত সঙ্কোচ, ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হতে নয় তত লজ্জা। প্রত্যেকটি কথার মানে হয় কিন্তু সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যের কোন অর্থ হয় না, এরকম যতগুলি বক্তব্য ভাষায় চালু আছে তার মধ্যে যে-দু'টির দাবী সর্বাগ্রে, তার একটি হ'ল দেওয়ালের গায়ে: Stick no bills, আর অন্যটি ট্রামের মান্থলীতে: Not Transferable। শুধু মান্থলীতে কেন, রোজই ট্রামের ভীড়ে টিকিট ফাঁকি দেবার ইতিহাস নয় দুর্লভ। ট্রামের কণ্ডাক্টর মাইনের গুণে কি ভদ্রতা জ্ঞানে ভীড় হলেই সরে দাঁড়ায়।

কিন্তু বাসে? ভগবানকে ফাঁকী দেওয়া যত রশক্ত, বিবেককে প্রবঞ্চনা করায় যত অপচেষ্টা বাসের কণ্ডাক্টরকে চোখে ধুলো দিতে যাওয়ার তুলনায় সেগুলি অকিঞ্চিৎকর, নেহাতই বালসুলভ, নিছক অবিমৃষ্যকারিতার বেশি কিছু নয়। শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর ফুটবোর্ডে এক পা এবং কখন শূন্যে কখন ফুটপাথে এক পা দিয়ে, নামবার আগে দেখবেন জানলা গলানো একখানি লোমশ হাত আর শুনবেন নেপথ্য-কণ্ঠ "টিকিট সাব!"

কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া যেমন প্রমাণ হয় না নিয়মের নির্ভ্রান্তি, তেমনি বাসেও একবার এরকম একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মনে মনে জানিয়েছিলাম 'সাবাস!' যখনকার ব্যাপার তখন বাসে মান্থলী চালু ছিল। একটি বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা। মোটা, কালো, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মান্থলীটি দেখানো মাত্র বাঙালী কণ্ডাক্টরটির আপত্তি-ব্যঞ্জক চীৎকার: "এ কি আপনি পরের টিকিট নিয়ে উঠেছেন?" ব'লে আমাদের দিকে তাকিয়ে আস্ফালন! "দেখুন মশাই, ব্যাটা ছেলের নাম লেখা টিকিট আর উনি দেখাচ্ছেন নিজের বলে!"

সঙ্গে সঙ্গে মহিলার গর্জন এলো কানে: "তবে রে!—ড্যাকরা মিনসে, আমার নিজের ছেলের টিকিট, সে হ'ল আমার পর,—আর ওর চোদ্দ পুরুষ আমার কেউ নয়, উনি হলেন আমার আপনার।"—মহিলার গর্জন যত বাড়ে, এক-পা, এক-পা করে কণ্ডাক্টর ততই পশ্চাদপসরণ করে, যাকে বলে গিয়ে সাকসেসফুল রিট্রিট।

ট্রামের যাত্রীরা প্রায়ই বাবু; বাসের মেহনতী মানুষ। ট্রামে যেতে নাকে এসে লাগে ফিরিঙ্গী তন্বুর উৎকট গন্ধ; বাসে পাগল করে গাত্রঘর্মের মিশ্রিত সুবাস। ট্রামে গায়ে গা ঠেকাবার আগেই 'Excuse me!' বাসে পা থেঁৎলে ফেললেও যদি 'উঃ' করে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য: 'অত কষ্ট হ'লে ট্যাক্সী করতে হয়!' বাসে বামাল নিয়ে উঠলে আলাদা টিকিট লাগে তার। ট্রামে ঘোমটা টানা বামার কাছে টিকিট চাওয়াই বারণ। অনেক দূরে আরেক প্রান্তে-বসা তাঁর কর্তাকে খুঁজে বার করা কণ্ডাক্টরের মহৎ কর্তব্য!

ট্রামে আর বাসে সবই গরমিল; মিল শুধু এক মারাত্মক জায়গায়। বাসের মালিক আর ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর, এদের কাউকেই ট্রামে-বাসে চড়তে হয় না কখনও!

রমণীর রচনার কথা ভুলেছিলাম। ট্রামে-বাসে যেতে যেতে এই সব কথা-বার্ত্তাই পথের দুঃখ ভোলায়। যেমন কলকাতার ট্রামে চড়েছে অথচ কাশীদা'র কথা শোনেনি এমন বাঙালী-অবাঙালী নেই বললেই হয়। কাশীর জর্দার চেয়েও বেশি সচল কাশীদা'র মুখের দরজা। অপিস কামাই আছে কাশীদা'র কখন কখন, কিন্তু মুখের কামাই নেই তাঁর কখনই।

যখন যে কথাটি দরকার দুষ্ট সরস্বতী তখনই সেই কথাটিই তাঁর মুখে জোগান। কাশীদা' ট্রামের ফেমাস করেক্টট, কলকাতার লোকেদের কাছে লিজেণ্ডারী ফিগার। তাঁর চতুর্মুখে ছড়ানো অগুন্তি অনির্ব্বচনীয় উক্তির একটি এই মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে: কাশীদা' ট্রামে যেতে যেতে কা'কে যেন বলছেন: "কাল বাড়ীতে ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব, অথচ বড় সাহেব ছুটি দেবে না।" 'কেন?' 'আর কেন, সাহেব বললে, ইংরেজিতে বুঝিয়ে বল what is that!' "তারপর?" "বললুম—বলে ফেললুম। যা থাকে কপালে বলে, ঝুলন পূর্ণিমার ইংরিজি করলুম: 'Divine Honey-moon'!'—সাহেব ছুটি দিতে পথ পেলে না আর।"

জীবনের অনেক ঘটনাই ত' মনে নেই, পরকালের নেই চিন্তা, ইহলোকের কথাও বিস্মৃতপ্রায়; কিন্তু ভুলব না কোন দিন এই ডিভাইন হনিমুন। আর বেঁচে থাক কাশীদা'! শুধু কাশীরাম দাসের কথাই নয়, কাশীদা'র কথাও অমৃত সমান; যে শুনেছে সে পুণ্যবান কি না জানি না কিন্তু ভাগ্যবান নিশ্চয়ই।

অতি তুচ্ছ, এই ট্রামের বুকেই লটকানো একটি নিশানার মধ্যেই সাহেবরা তাদের নিজেদের কবর খুঁড়েছে নিজেদের অজান্তেই। দেখে চমক উঠতে হল একদিন। এত বার সে নিশানা দেখেছি কিন্তু বুকের মধ্যে কখনও বাজেনি এমন করে। সেদিন শাল উনিশ শ' বিয়াল্লিশ, অগষ্ট বিপ্লবের আগুনে রাঙা দিন। সামান্ত ক'টি কথা, কিন্তু অসামান্ত তার প্রভাব। দাঁড়িয়েছিলাম এসপ্লানেডের ঘুমটিতে। দূর থেকে দেখলাম, ট্রাম আসছে। ধর্মতলা-হাওড়ার ট্রাম, গায়ে লেখা: DHUR-HOW!—আমি পড়লাম: "দূর হও"!—মনে পড়ল গান্ধীজীর মুখনিঃসৃত মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র: "Quit India",—ইংরেজ, ভারত ছাড়! [ক্রমশঃ।

'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'-স্মরণিকা

আবু বকর সিদ্দিক

"ক্যালেণ্ডারের পাতায় দেখি পঁচিশে বোশেখ এ কি!
চুপটি করে এখনো বসে আমড়া-কাঠের ঢেঁকি?"
দিগম্বরের হাসি হেসে
দলের নেতা বললে কেশে,—
—"প্ল্যানটিরে মোর দিস্‌নি ফেঁসে;
ভাড়াটে কবি দিক না ঠেঁসে দু'চার লাইন লেখি।
সেই সে কবে নির্ব্বাচনী-দ্বন্দ্ব গেছে কেটে,
গলাটি পুনঃ ঝালাতে হবে কাব্যি কিছু ঘেঁটে।"

হন্তে খসে দলে দলে ছুটেছে চাঁদার তরে,
আনবে টাকা ছলে কলে ঝোলাগুলি ভরে।
মাথায় দলের চিন্তা দড়—
দাতাজী বাবু করিয়া গড়
বলেন লাজে জড়সড়,—
"থিয়েট্রিক্যাল ম্যাটার বড় ওয়াইফ লাইক করে।"
শেঠজী এ দিক বসেন বেঁকে বলেন উচ্চ রবে,—
"ডান্সিং নাহি হোলে হামি যেতে নাহি পারবে।"

পেট্রোম্যাক্স আর কোলাহলে উজ্জ্বল-মুখর গৃহ,
বক্তা মশাই লাফায়ে ঝাঁপায়ে হলেন বীতস্পৃহ।
সঙ্গীত চলে মিহি রবে,
না বুঝেও বোঝেন সবে,
হাওয়ায় দোলে পুষ্পটবে,
আবৃত্তিখান কেমনে হবে—উদর-ভরা প্লীহ।
কবিগুরুর-চিত্রখানায় দেখে না কেহ ফিরে,
রসিক শ্রোতার বদ্ধ আঁখি ওড়না-সাগর-তীরে।

মনের কোণের দিশেহারা যক্ষেক গলি-ঘুঁজি,
সভাপতির বাচন-তীর্থে পেল কি পথ খুঁজি?
জীর্ণ, ছিন্ন সীনের তলে,
নিশির আঁধার, দীঘির জলে,
ঘর্ম্ম-তৈল-ক্লান্ত 'হলে'
আজিকে কবি সাধন-বলে উদয় হবেন বুঝি।
শ্রান্ত বক্তা ভাবেন বসি' আজকের স্পিচখানা
প্রগতিশীল মাসিক দেবে ছাপিয়ে এত জানা।

'নির্ঝরেরি স্বপ্নভঙ্গ' বলতে গিয়ে বুড়ো
নাচেন, কোঁদেন, ভুঁড়ী কাঁপান পক্ককেশা খুড়ো।
টেবিল-চেয়ার চটে ওঠে,
সভাপতির নিদ্রা টোটে,
শেঠের মুখে 'সাবাস' ফোটে,
খুড়ো বেজায় বাহবা লোটে—লাগায় তাড়াহুড়ো।
চক্ষু মেলি দেখি রে, বাস লোক হয়েছে কত।
ফাঁক নেই আর 'হাউস ফুল' সব সিনেমা হলের মত।

প্রয়োজন নেই 'জন্মদিনে' কবির মৃত্যু দেখে,
সঙ্গোপনে চোরের মত এলেম সেখান থেকে।
মরেছ কবি, বেশ হয়েছে—
তোমারে ঘিরে হেসে নেচে,
এমনি করে খ্যাতি বেচে
আমরা সবাই থাকি বেঁচে তোমার বাণী হেঁকে।
ব্যথা তুমি পাবে কবি দেশের তাতে কি?
মানতে হবে সকল ছেড়ে যুগের ধর্ম্মটি।

রমাপদ চৌধুরী

১

ইতিহাসের চেয়ে বিচিত্র উপন্যাস আর নেই। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত নৃশংস হত্যা আর গৌরবময় আত্মত্যাগ, কত রোমাঞ্চকর ঘটনা!

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিষ্ণুপুর অধ্যায় বোধহয় সবচেয়ে চমকপ্রদ। মল্লভূমের রাজধানী বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। মানভূম, বীরভূম, শূরভূম, সেনভূম, ধলভূম, সামন্তভূম, শিখরভূম ও তুঙ্গভূম—এই আটটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেদিনের মল্লভূম সাম্রাজ্য। আর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদিমল্ল রঘুনাথ। তারপর যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করে এসেছেন মল্লবংশের রাজারা। এই বংশেরই উনবিংশতিতম রাজা জগৎমল্ল প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন বিষ্ণুপুরে। এক দিকে খরস্রোত দামোদর আর অন্য দিকে গভীর শালবন, যেন প্রকৃতিই এ রাজ্যকে দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল বহু শতাব্দী ধরে। দিল্লীর সিংহাসনে পাঠান শক্তির অবসান ঘটেছে, অভ্যুত্থান হয়েছে মোগল শক্তির, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা হানাহানি, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্য কোন দিন বিধর্মী নবাবের আনুগত্য স্বীকার করেনি। দিল্লীর কোন বাদশাহ, গৌড়ের কোন সুবেদার নবাব কোন দিন বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা অপহরণের দুঃসাহস দেখায়নি।

দিল্লীর সিংহাসনে যখন বাদশাহ আকবর, তখন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে ছিলেন বীর হাম্বীর। দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারের বাইরে কামানের শ্রেণী গর্জন করে উঠেছিল সেদিন দাউদ খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। দুর্গের উত্তর দিকের পরিখা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল দাউদ খাঁর সৈন্যদের মৃতদেহে। বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পরাজয়ের শোণিতরঞ্জিত স্মৃতি বহন করে আজও টিকে আছে সেই পরিখা, বিষ্ণুপুর অধিবাসীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে তার নাম। পরিখা নয়, 'মুণ্ডমালার ঘাট' হয়ে বেঁচে আছে সেই স্মৃতি। তার পরও একটি শতাব্দী পার হয়ে এসে দেখতে পাই, বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন মল্লবংশের রাজা দুর্জন সিংহ। শৌর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বৈষ্ণব ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীতে, বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয়। বহু অর্থব্যয়ে মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করলেন দুর্জন সিংহ, কিন্তু বিগ্রহ ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। সুতানুটির মিত্রপরিবারের কাছে গচ্ছিত মদনমোহন যবনের অত্যাচার থেকে বাঁচলো, কিন্তু সে বিগ্রহ ফিরিয়ে আনতে পারলেন না রাজা দুর্জন সিংহ। যেমন, রঘুনাথ সিংহকে যবন-যুবতী লালবাঈয়ের লালসার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি তাঁর পাটরাণী চন্দ্রপ্রভা।

লালবাঈ! বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর চরিত্র। আর রাজা রঘুনাথ সিংহের নিষিদ্ধ প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন—লালবাঁধ।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই লালবাঁধ দীঘি থেকে পাওয়া গেল কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নূরজাহান—লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দুশো বছর পরে পৃথিবীর হাল্কা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো।

আজো বোধ হয় বিষ্ণুপুর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্নপ্রাকারে, অলিন্দে পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে, পুবের লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, আর পশ্চিমের যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন যবন-কন্যার প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।

বিষ্ণুপুরের নূরজাহান—এই লালবাঈয়ের জীবন-কাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হবে, ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে।

ভারতের সিংহাসনে তখন আওরঙ্গজেব বাদশাহ গাজী; বাংলার মসনদে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ। উড়িষ্যায় তখনও পাঠান-শক্তির ভস্মাবশেষে ধোঁয়া উঠছে থেকে থেকে, ইংরেজ বণিকের দল কুঠীর পর কুঠী গড়ছে বাংলায়, বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ জলদস্যু, আর বাংলার পশ্চিম প্রান্ত-সীমায় কখনো-সখনো এসে পৌঁছচ্ছে বর্গী-লুঠেরের অত্যাচার।

লালবাঈয়ের জীবন-কাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হবে, আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে, বিবিবাজারের ঈদের মেলায় কালো বোরখায় শরীর-লুকোনো এক রূপসী বাঁদীর পিছনে পিছনে। বিবিবাজারের সওদা হয়ে এসেছিল এক দস্যুলুণ্ঠিত বাঁদী, এসে স্বপ্ন দেখেছিল বেগম হওয়ার।

স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন!

আজও পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে একটা করুণ কান্নার সুর শোনা যায়। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সে দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে অনেকে, সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ভয়ে, বিস্ময়ে, অপার্থিব এক পুলকে।

বিবিবাজারের লোকও হঠাৎ সেদিন এমনি ভাবেই চমকে উঠেছিল। প্রথম বার চমকে উঠেছিল ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয় বার সুদর্শন চেহারার আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

বিবিবাজার তখন জমজমাট। সারা ভারতের চতুর্দ্দিক থেকে লোক এসে জমেছে। কেউ এসেছে সওদা বেচতে, কেউ বা সওদা করতে। পূবে বেগমসাহেবার কবর থেকে পশ্চিমের মতিঝিল অবধি সারি সারি তাঁবু। চাঁদনী রাতে মনে হয় যেন ঘাসের গালিচায় সারি সারি সাদা-পালক পায়রা বসে আছে। আর লোকজনের গুঞ্জরণ তো নয়, যেন অবিশ্রান্ত বকম্ বকম্।

দূর সিন্ধু-উপত্যকা থেকে এক দল বালুচ-সওদাগর এসে জটলা পাকিয়েছে এক দিকে। আঠারো জোড়া উট বসে বসে পিঠের কুঁজ কাঁপিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আর গণগণে আগুনের ওপর ওল্টানো কড়াইয়ের মত বিরাট একখানা তাওয়ায় রুটি সেঁকছে কয়েক জন। কেউ বা উটের দুধ জাল দিচ্ছে।

ওদিকের তাঁবুর পর্দ্দাটা সরিয়ে একজোড়া চোখ উঁকি দিচ্ছিলো বহুক্ষণ থেকে। হাব্সী প্রহরীটা পাক দিয়ে আম গাছের আড়াল হ'তেই কালো বোরখায় সারা শরীর ঢেকে বেরিয়ে এলো সে দ্রুত পায়ে। তারপর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তর-তর করে এগিয়ে গেল মতিঝিলের দিকে।

কি একটা শব্দে যেন ফিরে তাকালো হাব্সীটা। ছুটে এসে দ্রুত অপসৃয়মান কালো বোরখার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। কোমরের ছুরিটা ঝক-ঝক করে উঠলো জ্যোৎস্নায়, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে সশব্দে খাপে ভরে ফেললো ছুরিটা। বীভৎস হাসিতে ভরে উঠলো তার মুখ।

কিন্তু কালো বোরখার মালিক কিছুই জানতে পারলো না। কয়েক পলক ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে একটা উটের আড়ালে। নিঃসন্দিগ্ধ হলো। না, কেউ বোধ হয় লক্ষ্য করেনি তাকে। এবার পথ চিনে চিনে যেতে পারলেই সব কিছু জানতে পারবে। একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় সে। একটি প্রশ্নের উত্তরেই জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

কিন্তু বিবিবাজারে তখনও লোক চলাচল কমেনি। আলো নেবেনি একটিও।

প্রতিটি তাঁবুর সামনে মশাল জ্বলছে দাউ-দাউ করে। আর ও-দিকের দোকানে সারি সারি চিরাগবাতি। আলোয় আলো চতুর্দ্দিক। শুধু মতিঝিলের সড়কের দু'পাশে ঘুমন্ত তাঁবু। মশালের সারি নিবে এসেছে ওদিকে। হট্টগোল যেন একটু কম।

গুন্ গুন্ সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে আসছে একটি মধ্যবয়সী বারাঙ্গনা। সুসজ্জিত স্তিমিত-যৌবন কোন মারবার-নন্দিনী হয়তো। পোষাকে-পরিচ্ছদে ভিন্প্রদেশী বলেই মনে হয়।

কালো বোরখার অচেনা খাতুন দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।—শোন।

ফিরে দাঁড়ালো সেই বারাঙ্গনা।

—ফকিরসাহেবের চবুতরাটা কোন দিকে বলতে পারো? ফিস-ফিস করে প্রশ্ন করলে সে।

কৌতুকের হাসি ফুটলো বারাঙ্গনার মুখে। আপাদমস্তক বোরখার ওপর চোখ বুলিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধে পরা কাচের জলচুড়িগুলো ডানহাতে ঘোরাতে ঘোরাতে জিগ্যেস করলে, কোন ফকিরসাহেব? পেশোয়ারের সুফীবাবা?

—উঁহু। যিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন।

উত্তর শুনে কৌতুকের হাসি হাসলো আবার মারবার-বারাঙ্গনা।

বললে, জ্যোতিষাচার্য্য? যিনি কোষ্ঠীবিচার করেন, সামুদ্রিক গণনা জানেন? ঐ বাঈজী তল্লাট পার হয়ে, রাধামাধব মন্দিরের পাশে। ব'লে পথ দেখিয়ে দিলো সে।

কালো বোরখার রহস্যময়ী বাঁক নিলো সোনারপট্টির দিকে।

তাঁবু, তাঁবু আর তাঁবু। কিন্তু এদিকের তাঁবুগুলো আলোয় ঝলমল। কিংখাবের পর্দ্দা ঝুলছে তাঁবুর দরজায়, সামনে সশস্ত্র নজরদার টহল দিচ্ছে। বাতাসে দুলছে রেশমী রং-ঝলমল পর্দ্দা, আর তারই ফাঁকে দেখা যায় কাশ্মীরী গালিচার ওপর স্বর্ণালঙ্কার বিছিয়ে রেখে খরিদ্দারের সঙ্গে দরদস্তুর করছে শেঠের দল। গন্ধকের পোড়া গন্ধ আসছে থেকে থেকে। সারা ভারত থেকে এসেছে স্বর্ণকারের দল, ঈদের মেলায় বসে খদ্দেরের রুচিমত অলঙ্কার বানিয়ে দিয়ে কয়েকশো মোহর লুঠে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। কয়েকটা তাঁবুতে হীরে জহরতের পসরা সাজানো। সামনে হুঁসিয়ার হাঁকছে বাদশাহী রক্ষী, হাতে তাদের গাদা বন্দুক। বাইরে এক জায়গায় লাঠিয়ালরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের খেয়ালখুশিতে বিশ্বাস নেই হিন্দু বেসাতিদারদের। তাই লাঠিয়ালের দল সঙ্গে এনেছে তারা। রাহাজানি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

হীরে-জহরতের পরেই জীবন্ত জহরতের পসরা। বারোশো বাঈজী আর বারাঙ্গনা আসে বিবিবাজারের ঈদের মেলায়। লক্ষ্ণৌ আর কাশ্মীরের সুরসাধিকা বাঈজী, মারবার আর অযোধ্যার রূপসী বারবধূর দল, দক্ষিণী আর আরাকানী কুহক রতিসঙ্গিনী।

মতিঝিলের ওপারে জানোয়ারবাগ। উটের সারি নিয়ে এসেছে বালুচ সওদাগরের দল, মহীশূর থেকে এসেছে হাতীর সারি।

শিখীনৃত্য

—শ্রীঅমিয় সাধু

মধুলোভী

—শ্রীঅমিয়কুমার নন্দী

—শ্রীরণেন গুহ

সমুদ্র-সৈকতে

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দাশ-গুপ্ত
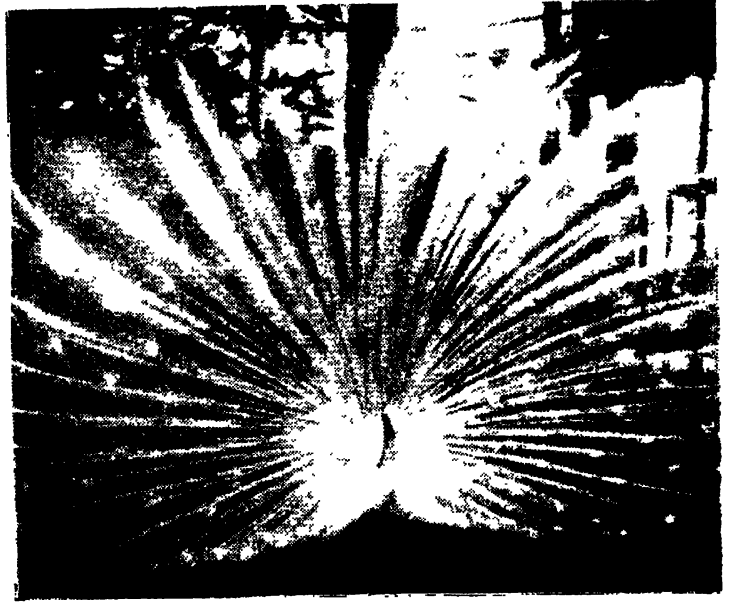
ব্রহ্মকুণ্ড (হরিদ্বার) —শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ

শিবদুর্গা (তাঞ্জোর) —শ্রীএম, এল, ঘোষ

সেণ্ট পল স্কুলের ভিতরে
দার্জ্জিলিং
—শ্রীগোপাল লাহা

কাঞ্চনজঙ্ঘা (রাজভবন থেকে) —শ্রীবিজয় ঘোষ

আরবী সওদাগরের দল এনেছে তেজী ঘোড়া। কাকাতুয়া, ময়না, টিয়া, মুনিয়া। পশুজগতকে পণ্য করে নিয়ে এসেছে দেশবিদেশের বণিকেরা।

মতিঝিলের ওপার থেকে তাদের চীৎকার আর কলরব ভেসে আসে মাঝে মাঝে। আতঙ্কে শিউরে ওঠে অল্পবয়সী বারবনিতার দল। আতর অগুরু, দিলবাহার খুসবু খরিদ করতে করতে চমকে ফিরে তাকায়।

একদল পর্তুগীজ ওদিকে মশলা আর তামাকের দোকান দিয়েছে। তার পাশে ফরাসী বেসাতিদার।

শাল কিংখাব জামদানী জামিয়ার। রেশম আর জহরৎ। বাঈজী আর বারনারী। সারা ভারতের রাজা, বাদশা, বিলাসী ভূস্বামী আর দস্যুপতি ভূঁইয়ারা ছুটে এসেছে বিবিবাজারে। বিলাস-সামগ্রী নিয়ে যাবে শত পরীর মনোরঞ্জনের জন্যে, রূপযৌবনের সন্ধান পেলে কেউ বা তুলে নিয়ে যাবে নিজের হারেমে। ইতরের দল এসেছে এক রাত্রির আনন্দ লুঠে নিয়ে যেতে।

হ্যাঁ, আরেকটা হাট আছে এক প্রান্তে। শুধু বাঈজী আর বারাঙ্গনা নয়, বান্দা আর বাঁদী। যুদ্ধবন্দী আর লুঠতরাজ করে পাওয়া মেয়ে-পুরুষদের আনা হয় বাঁদীবাজারের নিলামে বেচে দিয়ে যাবার জন্যে। জোয়ান চেহারার বান্দাদের কিনে নিয়ে যায় অনেকে, যুবতী বাঁদীদের নিয়ে যায় বিলাসী বণিকের দল। সাধারণ পণ্যের মতই কয়েকটি মোহরের পরিবর্তে আজীবন স্বত্ব বর্তায় তাদের ওপর।

আজীবন স্বত্ব! জীবনে কত মনিবের লালসার ক্ষুধা মিটিয়ে হাটে হাটে বেচা-কেনা হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়বে কে জানে। যৌবন আর স্বাস্থ্য অটুট থাকলে হাটে হাটে দর উঠবে তার, কয়েক বছরের মধ্যে বহু মনিবের হাত বদলে অযোধ্যার বাঁদী হয়তো নিজেকে আবিষ্কার করবে আফগান সওদাগরের ঘরে। বার্দ্ধক্যে কেউ বা পাবে মুক্তি, অর্থাৎ অনাহারে মৃত্যু। তবু পাখীর মত উড়ে পালাতে ভয় পায় তারা, জানে পলাতকা বাঁদীর একমাত্র দণ্ড দাসব্যবসায়ীর কাফ্রী চরের হাতে মৃত্যু। জানে, কোন বাদশাহী আইন তাকে আশ্রয় দেবে না। কাজীর বিচারে সে শুধুই পণ্য, মনিবের আজ্ঞাধীন।

কালো বোরখার রহস্যময়ী সওদা বেচতে আসেনি, সওদা করতে আসেনি। নিজেই এসেছে বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে।

অন্য এক অভিজ্ঞ বাঁদীর কাছে, মনি বানুর কাছে শুনেছে সে বাঁদীজীবনের ভবিষ্যৎ। শুনেছে মনিবের নৃশংস অত্যাচার আর কাফ্রী অনুচরদের নির্দয় ব্যবহারের কথা।

তাই ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহে দাসব্যবসায়ীর কড়া নজর ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কালো বোরখার রহস্যময়ী। আগ্রার হীরাবাঈ তাকে পছন্দ করে গেছে, একশো মোহর কিম্মৎ দিতে স্বীকার করে গেছে। হীরাবাঈ! সেখানেও কি আছে এমনি নির্দয় হাবসী প্রহরী আর খোজা অনুচর? কে জানে। ভবিষ্যৎ জানার উৎসুক আগ্রহে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো সে বাঈজীহাট পার হয়ে।

বারবনিতাদের পল্লী থেকে বীভৎস হাসি ভেসে আসছে মত্তপ কামচারীদের। উগ্র আতরের গন্ধ আর ঝুমঝুম ঝুমঝুম নাচের তালে তালে সুকণ্ঠ সঙ্গীত ভেসে আসছে কোন এক বাঈজীর তাঁবু থেকে।

উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে চকিতে চেয়ে দেখলে সে এক বার। চোখ ঝলসানো রূপযৌবন আর দুর্মূল্য বেশবাস। নূপুরের তালে তালে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ।

দ্রুত পায়ে তাঁবুটা পার হতেই রাধামাধবের মন্দিরটা চোখে পড়লো তার। একটা গাছের ঈষৎ অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো।

হ্যাঁ, ইনিই সেই ফকিরসাহেব। একটা বেদীর ওপর বসে আছেন, আর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নারী-পুরুষ। গ্রাম্যচাষী, শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ, রূপজীবিনী।

জ্যোতিষাচার্য্যের পাশে পুঁথিপত্র, সামনে খড়ি দিয়ে আঁকা শতাকীচক্র। এক জন শ্রেষ্ঠীর কোষ্টিবিচার করছিলেন গণৎকার। তাঁর পিছনে দু'টি মশাল জ্বলছে দাউ-দাউ করে। সামনে কর্পূর-প্রদীপ।

কালো বোরখার রহস্যময়ী গাছের আড়াল থেকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তন্ময় হয়ে।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠলো সকলে। বকের পালকের মত সাদা ধবধবে একটি আরবী ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে এদিকে!

প্রথম বার চমকে উঠেছিল ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয় বার সকলে চমকে উঠলো আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

কে এই সুদর্শন তরুণ? সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান কি সে জানে না? বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

ভয়ে চীৎকার করে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো বারাঙ্গনাপল্লীর মেয়ে-পুরুষ। মুসলমান বাদশাহী রক্ষীর দল পরস্পর কানাকানি করলো, কে এই তরুণ? চেহারা দেখে কাফের বলেই মনে হয়, কিন্তু ও কি জানে না, সম্রাট আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছেন, কোন হিন্দু কাফের দামী ঘোড়ায় চড়তে পাবে না? জানে না, হাতী, পালকি আর মূল্যবান ঘোড়া শুধু বাদশাহের স্বধর্ম্মীদের জন্যে?

তবু কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলো না তারা।

ক্রমশঃ সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার কাছে এগিয়ে এলো, একেবারে জ্যোতিষাচার্য্যের চবুতরার কাছে। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো সকলে। বেশবাস আর তার সুপুরুষ চেহারা দেখেই বুঝলো, কোন রাজবংশের রক্ত বইছে তার ধমনীতে।

চবুতরার সামনে এসে লাফিয়ে মাটিতে নামলো সাদা ঘোড়ার সওয়ার।

জ্যোতিষাচার্য্যও উঠে দাঁড়ালেন। সস্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হল তাঁর মুখ।—রঘুনাথ, তুমি এখানে?

রঘুনাথ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তাকে আলিঙ্গন করলেন জ্যোতিষাচার্য্য।

বললেন, বসো রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের সংবাদ জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি আমি। কি সংবাদ বলো?

রঘুনাথ মৃদু হেসে বললে, আপনার সন্ধানেই এসেছি গুরুদেব, গোপন সংবাদ আছে।

—অপেক্ষা করো রঘুনাথ!

তার পর জ্যোতিষাচার্য্য ইঙ্গিতে জনতাকে বিদায় নিতে বললেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে বিদায় নিলো। কিন্তু কালো বোরখার রহস্যময়ী তখনও গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলো। না, ভবিষ্যৎ

সোনার আংটিতেই নয়। সুন্দর যুবকটির আহবে...। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ। রূপের? যৌবনের? না, অদৃষ্টের!

ধীরে ধীরে মোহগ্রস্তের মত এগিয়ে গেল সে।

সুমধুর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো বোরখার ভেতর থেকে।

—ফকিরসাহেব!

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন জ্যোতিষাচার্য্য আর রঘুনাথ।

—কি চাও মা? জ্যোতিষাচার্য্য প্রশ্ন করলেন সস্নেহে।

উত্তর এলো।—নসীব জানতে চাই ফকিরসাহেব।

—বসো। তোমার করকোষ্ঠী দেখাও মা!

—কিন্তু আমি নজরানা দিতে পারবো না ফকিরসাহেব। দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র আমি, বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে এসেছি।

জ্যোতিষাচার্য্য হাসলেন। বললেন, ভয় নেই মা, বিনা দক্ষিণাতেই তোমার করকোষ্ঠী বিচার করবো আমি।

—মেহেরবান আপনার। উত্তর এলো মৃদুস্বরে।

বোরখার ভেতর থেকে একটি সুডৌল সুন্দর হাত বেরিয়ে এলো। আর সুমিষ্ট কণ্ঠের অনুরোধ এলো, আমাকে স্পর্শ করবেন না ফকিরসাহেব, আমি দরিদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে।

জ্যোতিষাচার্য্যের কানে গেল না তার কথা, তন্ময় নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর ঝুঁকে পড়লো পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর করপুটের ওপর। বিস্ময় আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটলো তাঁর মুখে-চোখে। যবন-কন্যার হস্তরেখার দিকে মাথা নুয়ে পড়লো তাঁর, লক্ষ্য করলেন না কালো বোরখার আড়াল থেকে দুটি মোহগ্রস্ত চোখ একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রূপবান রঘুনাথের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাথা তুললেন জ্যোতিষাচার্য্য। বললেন, রঘুনাথ, এমন অদ্ভুত কররেখা আমি কখনো দেখিনি।

আর যবনকন্যার উদ্দেশ্যে বললেন,—তুমি তো বিধবা নও মা!

—না ফকিরসাহেব, বেওয়া নই আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যোতিষাচার্য্য। বললেন, জীবনে কোন দিন তুমি বিধবা হবে না মা!

—সাদী?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন জ্যোতিষাচার্য্য। বললেন, বিবাহের কথা জানতে চেয়ো না কন্যা।

—ফকিরসাহেব, বাঁদীবাজার থেকে লুকিয়ে এসেছি আপনার কাছে শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায়। হতাশার স্বর ফুটে উঠলো বাঁদীর কণ্ঠস্বরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যোতিষাচার্য্য। বললেন, লগ্নের সপ্তমে বক্র পাপগ্রহদৃষ্ট শনি রয়েছে কন্যা, তোমাকে আজীবন অনূঢ়া থাকতে হবে। কিন্তু, কিন্তু একটি অদ্ভুত রেখা রয়েছে শুক্রের স্থানে, তুমি···

হঠাৎ চুপ করলেন জ্যোতিষাচার্য্য। বললেন, তোমার ললাটের রেখা না দেখলে তো বলা যাবে না কন্যা! যদি আপত্তি না থাকে···

—না ফকিরসাহেব, আপত্তি নেই। শুধু তাব্‌সী নজরদারের চোখ ফাঁকি দেবার জন্যেই বোরখায় মুখ ঢেকেছি আমি।

মুখের ওপর থেকে বোরখা তুলে ধরলো বাঁদী, আর যুবরাজ রঘুনাথ সিংহ স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বাঁদীর মুখের দিকে। এও কি সম্ভব! বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে এসেছে এই যবনকন্যা? এই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপের অদৃষ্টে আছে শুধুই দাসীবৃত্তি? এ তিলোত্তমা কি করে সম্ভব হ'ল যবনের ঘরে? এ যে উর্বশীর যৌবন তার শরীরের ছন্দে!

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো রঘুনাথ।

আর বাঁদীর ললাট-লিখন পরীক্ষা করতে করতে জ্যোতিষাচার্য্য বললেন, তুমি বাঁদী নও কন্যা, রাজরাজেশ্বরীর শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। একটি রাজ্য পরিচালনা করবে তুমি এক দিন। কিন্তু তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।

ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শিউরে উঠলো বাঁদী। উঠে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষাচার্য্যকে কুর্ণিশ করলো সসম্মানে, তার পর মুখের ওপর বোরখা নামিয়ে তরতর করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল বাঁদীবাজারের পথে।

রঘুনাথ তখনও অনিমেষ নয়নে বাঁদীর অপস্রিয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে।

—মিথ্যা ঔৎসুক্য দেখিয়ো না রঘুনাথ। জ্যোতিষাচার্য্য গুরু-গম্ভীর স্বরে সাবধান করলেন।

লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরালো রঘুনাথ। তার পর জ্যোতিষাচার্য্যকে বিষ্ণুপুর-প্রাসাদে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। সাদা ঘোড়ার সওয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে।

২

বিবিবাজার! এ নাম বহু বার শুনেছে লালী। স্বপ্ন দেখেছে বিষণ্ণ-বিকেলের দীঘির ঘাটে বসে বসে, যেন এক অচেনা নবাবজাদা ঘোড়সওয়ার হয়ে এসে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তুলে নিয়ে গেছে তাকে, বেগমের তক্তে বসিয়েছে। তার পর আব্দার ধরেছে যেন লালী, বিবিবাজারে ঈদের হাটে যাবার।

তা শুনে রাজি হয়েছে নবাবজাদা, আদেশ দিয়েছে বিবিবাজারে একটা দিন হবে মিনাবাজার। দেশ-বিদেশের মেয়েরা এসে হাট বসাবে সেদিন, সওদা বেচবে, সওদা করবে শুধু মেয়েরা। কত দেশের রাণী আর রাজকন্যা, শাহজাদী আর বেগমসাহেবা। আর সকলের কৌতূহলী চোখের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে দিয়ে হেসে হেসে হেলে দুলে ঘুরে বেড়াবে লালী। এক দোকান থেকে আরেক দোকানে। রাজ্যের যত হীরে-জহরত, জামিয়ার-জামদানী, শাল আর মসলিনের ওড়না, সব, সব কিনবে সে।

সে স্বপ্ন যে এমন ভাবে সার্থক হবে কে ভেবেছিল!

ঠগী ডাকাতের অত্যাচারের কথা শুনেই এসেছিল এত দিন। জমিদারের ঘরে বান্দা আর বাঁদীও দেখেছে, কিন্তু তারা যে এমন জানোয়ারের মত হাটে বেচা-কেনা হয়, আগে কোন দিন কল্পনাও করেনি।

রহিমগঞ্জের পীরের দরগায় মানত করতে এসেছিল লালীর মা, লালীকে সঙ্গে নিয়ে। দূর দূর গ্রাম থেকে কত লোকই তো এসেছিলো। চলছিল গরুর গাড়ীর সারি। কখন রাত নেমে এসেছে খেয়ালই হয়নি। গল্পগুজবে মেতে গিয়েছিল সবাই।

হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে ফেললো তাদের ঠগী-লুঠেরের দল। বাধা দিতে গিয়ে পুরুষগুলো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, লাঠির বাড়ি খেয়ে। সোনাদানা, মালপত্র যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়ে তাদের দলকে দল চালান দিয়ে দিলো বজরায়। শুধু ছাড়া পেলো অথর্ব্ব বুড়ো-বুড়ীরা।

ঘাটের ঘাট থেকে চম্পারণের কুঠী চম্পারণ থেকে বিবিবাজার। খোজা সর্দারের হাত বদলে এই ঈদের মেলায়।

হিন্দু কাফেরদের ওপর জিজিয়া বসানোর খবর শুনে খুসি হয়েছিল লালী, গ্রামের অন্য সব মুসলমানদের মতই। বাদশাহ গাজী যে দিন ফরমান দিলো, কোন কাফের হাতীতে চড়তে পাবে না, পাল্কী ব্যবহার করতে পাবে না, দামী ঘোড়ায় চড়তে পাবে না, সেদিন অন্য সকলের মত লালীও খুসি হয়েছিল। কিন্তু বাঁদীবাজারে এসে সব ভুল ভেঙে গেল। হিন্দু আর মুসলমান নয়। শুধু দু'টি ধর্ম, ধনী আর দরিদ্র।

তা না হলে মুসলমান ঠগীর হাতে লুঠ হল কেন তাদের সর্বস্ব, মুসলমান নিলামদার কেন কিনে নিলো তাদের চম্পারণের কুঠী থেকে?

আর এই হাবসী প্রহরী, সেও তো মুসলমান। তবে কেন এমন অমানুষিক অত্যাচার করে সে বান্দা আর বাঁদীদের ওপর?

বান্দাছাপের দিনটার কথা মনে পড়লো তার, জ্যোতিষাচার্য্যের চবুতরা থেকে ভীতত্রস্ত পায়ে বাঁদীছাউনীর দিকে ফিরে আসতে আসতে।

সারি সারি তাঁবু আর হোগলার ছাউনী। হাজার হাজার বান্দা আর বাঁদী। এক দিকে হিন্দু আরেক দিকে মুসলমান। কেউ এসেছে যুদ্ধবন্দী হয়ে, জয়ী যোদ্ধার লুঠের মাল হিসাবে, কেউ বা চালান এসেছে ঠগীদের বজরায়। সব এসে মিলেছে একই নিলামদারের হাতে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে, খরিদ্দার এসে নেড়ে-চেড়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, দরদস্তুর করে, চলে যায়। দু'চারজন দু'চারজন করে চলে যায় নতুন মনিবের সঙ্গে।

দুনিয়ায় এত রকম চেহারা আছে জানতো না লালী। জানতো না, পুরুষের চেয়ে খোজাদের দাম বেশী। জানতো না বাঁদীদের রূপ-যৌবনের চেয়ে কৌমার্য্যের দাম বেশী।

নিলামদারের খাস বান্দা খোজাগুলোর চোখ দেখলেও ভয় হয় লালীর। বান্দাছাপের দিনটা মনে পড়লে ভয়ে আঁৎকে ওঠে ও।

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সকলে, আর সামনের একটা জ্বলন্ত চুল্লীতে একরাশ লোহার শিক গরম হয়ে উঠেছিল। তার পর একে একে প্রত্যেকের পায়ে হাবসীটা বান্দাছাপ লাগিয়েছিলো উত্তপ্ত লোহার শলাকা ছুঁইয়ে। যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠেছিল সকলে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কয়েক জন। লালীও।

জ্ঞান হয়ে দেখেছিল, শুধু পায়েই নয়, হাতের বাজুতেও উল্কি এঁকে দিয়েছে কে।

বান্দাছাপ!

মনিবায়ু বলেছিল, এ ছাপ আর কোন দিন মুছবে না লালী। পালিয়ে গেলেও বাদশার আইন ধরে নিয়ে এসে ফিরিয়ে দেবে মালিকের কাছে। আর নয়তো নিলামদারের চরের ছুরি বসবে বুকে।

এই বীভৎস ভবিষ্যতে কোন আশার আলো দেখতে পাবে ভেবেই ফকিরসাহেবের খোঁজে বেরিয়েছিল লালী, অন্ধ বাঁদীর বোরখা ধার নিয়ে।

কিন্তু কি অদ্ভুত কথাই না বললেন ফকিরসাহেব। "অনূঢ়া" শব্দটা এই প্রথম শুনলো লালী, তবু অর্থ বুঝতে অসুবিধে হল না। সাদী নয়, সব বাঁদীর মতই তাকেও হয়তো শরীর বেচতে হবে।

মনিবায়ুর কথাটা মনে পড়লো লালীর।

—এক মনিব সারাজীবন সাথিল, লালী। মনিবায়ু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল। বলেছিল, বাঁদী হয়েও মনিব বদল হবে না এমন সৌভাগ্য কার হয়! যৌবন ফুরালেই অন্য মনিবের কাছে বেচে দেবে, আর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে, কিংবা অকর্মণ্য হয়ে গেলে, বলবে, মুক্তি দিলাম।

মুক্তি অর্থাৎ মৃত্যু।

তার চেয়ে সত্যিই যদি আগ্রার হীরাবাঈ তাকে কিনে নিয়ে যায়!

একশো মোহর দর দিয়ে গেছে হীরাবাঈ! একশো মোহর! এত দাম দিয়ে বাঁদী কেনে না কেউ, মনিবায়ুর কাছে শুনেছে লালী।

কিন্তু তবু লোভ যায়নি নিলামদারের। লালী রূপসী। লালী কুমারী। কৌমার্য্যের মূল্য নাকি আরো অনেক বেশী।

অনিশ্চিত ভাবনায় তন্ময় হয়ে পথ চলছিল লালী। কোন দিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাঁদীছাউনীর কাছে পৌঁছে গেছে সে ততক্ষণে। চকিতচোখে এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে তাঁবুর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে বোরখায় টান পড়লো।

চট্ করে ফিরে দাঁড়ালো সে।

সেই হাবসী প্রহরী! মসীকৃষ্ণ দৈত্যের মত চেহারাটা তাকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে আনলো, মুখে তার বীভৎস লোলুপ হাসি। বাধা দিতে চেষ্টা করলো লালী, কিন্তু দৈত্যের শক্তির কাছে অবশ হয়ে গেল তার সারা শরীর।

এক টানে বোরখা ছিঁড়ে ফেললো হাবসীটা। তারপর দুটি কামার্ত হাতের পীড়নে বুকের কাছে টেনে নিলো লালীকে। তার অবশ শরীরকে দু'হাতে তুলে নিয়ে অন্ধকারের দিকে পা বাড়ালো হাবসী প্রহরী।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো লালী।

মুহূর্তের মধ্যে একটা হট্টগোল শোনা গেল।

বাঁদীছাউনী থেকে ছুটে এলো নিলামদার, খোজা বান্দার দল।

নিলামদারের গম্ভীর ডাক শুনে আলিঙ্গন শিথিল করে দিলো হাবসী। ছিটকে দূরে সরে এলো লালী।

নিলামদার ইশারায় কি যেন বললো খোজা বান্দাদের উদ্দেশে। পরক্ষণেই লোহার শিকল দিয়ে গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো তারা হাবসীটাকে। তারপরে চাবুকের পর চাবুক পড়লো তার পিঠে। রক্তের রেখা ফুটে উঠলো ক্রমে ক্রমে। তবু এতটুকু কাতরোক্তি শোনা গেল না।

নিলামদার বাঁধন খুলে দিতে বললো।

আর তার বাঁধন খুলে দিতেই লালী সে দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

একটা ক্রুর-কুটিল হাসি ফুটে উঠলো হাবসীর মুখে। তর্জনী তুলে শুধু একবার শাসালো সে লালীকে।

মনিবায়ুকে জড়িয়ে ধরে তাঁবুর ভেতর ছুটে পালালো লালী।

[ক্রমশঃ।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো উনচল্লিশ

'এখানকার কথা মানতে হবে।' লাটুকে বললেন একদিন ঠাকুর।

'তবে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।' লাটু বললে সরল মুখে।

তক্ষুনি গোপাল ঘোষের উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর: 'ওরে গোপাল, শোন লেটো কি বলে। বলে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। এখানকার কথা কি বোঝানো যায়?' গোপালকে সাক্ষী মানলেন ঠাকুর: 'তুই বল না, বুঝিয়ে বলবার মত এখানকার কথা?'

কোথায় ঠাকুরের কথায় সায় দেবে, তা নয়, লাটুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল গোপাল। বললে, 'সত্যিই তো। এখানকার কথা আপনি ছাড়া আর কে জানে। তাই দিন না বলে, হাটে দিন না হাঁড়ি ভেঙে।'

'এ তোমার কেমনতরো কথা! আমার দিকে না থেকে তুমি লেটোর দিকে গেলে। তুমিই বলো বিবেচনা করে এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে?'

'এখানকার কথা জানবার জন্যেই তো আমরা সব এসেছি।' গোপাল বললে বিনত হয়ে, 'আমাদের না বললে আমরা জানব কি করে?'

হার মানলেন ঠাকুর। যিনি মধুদাতা তিনি আবার মধুপাতা। বললেন, 'এখন নয়, এখন নয়। এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে বুঝবে সবাই একদিন।'

জগদ্দলের গোপাল ঘোষ। সিঁথির বেণীমাধব পালের দোকান আছে চিনেবাজারে, বুরুশ-ম্যাটিংএর দোকান, সেখানে কাজ করে। বেণী পাল ব্রাহ্ম হলে কি হয়, ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। সেখানেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে। প্রথম দর্শন যেন মর্ম পর্যন্ত পৌঁছুল না। কিন্তু আরেক বার দেখ। সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ হয়ে দেখ। দেখ একবার প্রাণের চক্ষু উন্মীলন করে। গভীর হতে বিচ্ছুরিত যে আনন্দময় জ্যোতি সেই আলোতে চোখ মেলে দেখ এই প্রাণের মানুষকে। পুণ্যপরিপূর্ণ পাবনপুরুষকে। হৃদয়ের মধ্যে নাও সেই গভীরের সঞ্জীবন।

একদিন ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে পড়ল গোপাল। বললে, 'অনেক দিন ধরে যাওয়া-আসা করছি আপনার কাছে, কই, একদিনও ভাবসমাধি হল না। আমার একদিন ভাবসমাধি করিয়ে দিন।'

'তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা।' ঠাকুর বললেন আশ্বাসের সুরে: 'ভাবছিস বুঝি ঐটেই হলেই সব হল! ঐটেই বুঝি সার বস্তু। শোন্ ঠিক-ঠিক ত্যাগ ঠিক-ঠিক বিশ্বাস তার চেয়ে বড় জিনিস। তাকিয়ে ছাখ দিকি নরেন্দরের দিকে। ও সব বড় একটা তার হয় না। কিন্তু ছাখ দেখি কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস!'

আর ঠাকুরের যে ভাবসমাধি হয় তাকে শিবনাথ শাস্ত্রী হিস্টিরিয়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। একদিন সরাসরি ধরলেন তিনি শিবনাথকে। পেটে-মুখে এক হতে হবে তাই লুকোছাপা করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ হে শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বলো? আর বলো নাকি, আমি ও সময়টায় অচৈতন্য হয়ে যাই?' করুণামাখা হাসি হাসলেন ঠাকুর: 'তোমরা ইট-কাঠ-মাটি-টাকা এ সব জড় পদার্থে দিন-রাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎসংসার চৈতন্যময়, তাঁকে দিন-রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন্ দিশি বুদ্ধি তোমার?'

শিবনাথের মুখে কথা সরল না।

যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তারই ধুলো ঝাড়ছি। যে কলসে ছিদ্রের অন্ত নেই তারই মধ্যে জল ভরবার ছশ্চেষ্টা করছি প্রাণপণে। ঘরকে কোথায় বড় করব, তা নয়, জিনিস জমিয়ে জমিয়ে ঘরের জায়গা মারছি।

কণ্ঠাগত প্রাণে সঙ্কুচিত হয়ে নিশ্বাস ফেলবার কায়িক অভ্যাস পালন করছি মাত্র।

জিনিসে-জায়গায় ভরপুর কোথায় আমাদের সেই পরিপূর্ণতা? প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত কোথায় সেই নিত্যনিয়ত? অমৃত যার ছায়া মৃত্যুও যার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাকে পুজো করব?

'তুমি অত নরেন্দর নরেন্দর করো কেন?' নরেনই কিনা অভিযোগ করে। 'অত নরেন্দর নরেন্দর করলে তোমায় যে নরেন্দর মত হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়ে গিয়েছিল মনে নেই?'

বহু কাল রাজ্য ভোগ করে ছেলেদের মধ্যে তা ভাগ করে দিয়ে মহারাজ ভরত প্রব্রজ্যা নিলেন। এলেন পুলহাশ্রমে। আশ্রমের উত্তরে সরিদুত্তমা গণ্ডকী, সুরম্যসলিলা। নদীতীরে বসে একদিন প্রণব জপছেন ভরত, অদূরে সিংহগর্জন শুনতে পেলেন। একটি গর্ভিনী হরিণী জলপান করছিল, দেখলেন, আতঙ্কে নদী পার হয়ে গেল লাফ দিয়ে। গর্ভের শাবক জলে পড়ে ভেসে চলল। কারুণ্যরসবশংবদ হয়ে রাজা হরিণ-শিশুকে তুলে আনলেন জল থেকে। মার খোঁজ করলেন, দেখলেন, নদীর পরপ্রান্তে এক গুহার মধ্যে মরে পড়ে আছে। তখন কি আর করা! হরিণ-শিশুর পালন পোষণ করতে লাগলেন, বৃক ও বাঘের থেকে রক্ষা করতে লাগলেন নিয়ত। শুধু তাই নয়, কখনো কোলে কখনো কাঁধে করে ফিরতে লাগলেন তাকে নিয়ে। শ্যামলঘন কোমল তৃণ আহরণ করে খাওয়ান তাকে হাতে করে, তার গা চুলকে দিয়ে তাকে যত না আরাম দেন নিজে তার চেয়ে শতগুণ বেশি তৃপ্তিলাভ করেন। ভোজনে-শয়নে ভ্রমণে-উপবেশনে ঐ মৃগ-শিশুই তাঁর সতত সঙ্গী। ভগবৎসেবার আর আগ্রহ নেই, সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা শিথিল হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মৃগতৃষ্ণায় কাল কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু দুরন্ত কালকে এড়াবেন কি করে? তখনো সেই মৃগচিন্তা। মৃগচিন্তা করতে করতেই শরীর ত্যাগ করলেন। পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন কাননে।

কথা যখন সুরু হয়েছে, শেষটুকুও শোনো।

হরিণজন্ম নিলে কি হবে, স্মৃতিভ্রংশ হল না ভরতের। পূর্বার্জিত আসক্তির জন্যে অনুতাপ করতে লাগলেন। কি কষ্ট, সেই ঈশ্বরপথ, সেই বীরবর্ত্ম থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি। কাউকে কিছু না বলে চরতে-চরতে চলে এলেন সেই পুলহাশ্রমে। একা-একা ফিরতে লাগলেন, কারু সঙ্গ আশ্রয় করলেন না। কবে মৃগত্বের অবসান হবে তৃষ্ণাপরিপূর্ণ চোখে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সব আগুনই নেবে। জন্মজ্বালার আগুনও নিবল একদিন। পবিত্র তীর্থসলিলে মৃগশরীর ত্যাগ করলেন ভরত।

তার পর?

এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। জাতিস্মর হয়ে জন্মেছেন, জানেন প্রাক্তন জন্মের বিষয়াসক্তির কথা, তাই জড় মূক ও বধিরের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। বাপ অনেক চেষ্টা করল লেখাপড়া শেখাতে, ভস্মে ঘি ঢালা হল। বাপ মরলে মা-ও সহমৃতা হলেন। ভাইয়েরা দূর-ছাই করতে লাগল। খাটাতে লাগল চাকরের কাজে। বৃষের মত পুষ্ট কঠিন শরীর, মাঠে গিয়ে কাদা চটকে জমি পাট করুক। কিন্তু ক্ষেত্র সম কি বিষম এই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত ওর নেই। কুৎসিত দগ্ধ অন্ন খেতে দাও ওকে। তাই ভরত খাচ্ছে অমৃততুল্য করে।

চৌররাজ ভদ্রকালীকে খুশি করবার জন্যে নরবলির আয়োজন করেছে। যূপকাষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এক শিশুকে। কি কৌশলে কে জানে, বাঁধন খসিয়ে পালিয়ে গেল শিশু। খোঁজ খোঁজ, অনুচররা ছুটো-ছুটি করতে লাগল, বলি জোগাড় না হলে কারু ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজতে মিলে গেল জড়ভরতকে। উদ্ধমুখ হয়ে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে। এই যে এই সুলক্ষণ বলি, এটাকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো চণ্ডিকার কাছে। তথাস্তু। স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে মাল্যতিলকে অলঙ্কৃত করে কালীর সামনে বসালো তাকে অধোমুখে। জড়ভরতের মুখে একটা কথা নেই, কাকুতি নেই। কেই বা খড়্গ, কেই বা ঘাতক, কেই বা বলি, কেই বা যূপকাঠ।

তস্কর-পুরোহিত যেই খড়্গ তুলেছে, ভদ্রকালী প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এলেন স্বমূর্তিতে। সেই উত্তোলিত খড়্গ কেড়ে নিয়ে একে-একে সকল ডাকাতের শিরচ্ছেদ করলেন। রক্ত পান করে অন্তর্হিত হলেন প্রতিমার মধ্যে।

যে ব্রহ্মর্ষি পরমহংস, তার সংহার নেই।

তার পর?

আরো আছে। সেইটুকুই সার কথা।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজার নাম রহূগণ। শিবিকা করে যাচ্ছেন, পথিমধ্যে একজন বাহকের দরকার হল। ইক্ষুমতী নদীতীরে মিলে গেল ভরতকে। বলীবর্দের মত ভারবহনে সমর্থ মনে হচ্ছে, এস, পালকিতে কাঁধ দাও। ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। পাছে কোনো প্রাণিহিংসা হয় সে আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে সামনে কিছুটা দেখে-দেখে পথ চলে ভরত। তাই শিবিকার সমতা রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়ল।

রহূগণ গর্জন করে উঠল। সমান হয়ে চলছ না কেন?

প্রধান বাহক বললে, আমরা ঠিক চলেছি। এই নবনিযুক্ত লোকটাই দ্রুত চলছে না। তাই শিবিকা বিষম হয়েছে।

রহূগণ শ্লেষ করে উঠল ভরতকে। তুমি কি শ্রান্ত? তুমি স্থূলও নও দৃঢ়াঙ্গও নয়, তবে তুমি কি জরাগ্রস্ত?

ভরত কথা কইল না।

কিন্তু শিবিকা যেমন অসমান তেমনি।

তুমি কি জীবন্মৃত? রাজা আবার হুঙ্কার ছাড়ল। উপযুক্ত দণ্ড না পেলে তুমি প্রকৃতিস্থ হবে না দেখছি।

এতক্ষণে কথা কইল ভরত। বললে, রাজন, তুমি কা'কে ভার বলো? কেই বা ভারবহনে শ্রান্ত হয়? কেই বা স্থূল বা দৃঢ়? জরাই বা কি? জীবন্মৃতত্বই বা কার? কেই বা দণ্ড দেয়, কেই বা পায়?

ভারবাহীর মুখে এ কি কথা! তাড়াতাড়ি শিবিকা থেকে নেমে এল রহূগণ। শিবিকাবাহক ভরতের পায়ের কাছে মাথা রেখে বললে, মহাত্মন, আপনি কে। কর্ম থেকে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে, দেহের স্থূলতা-কৃশতা আছে ব্যবহারিক জগতে এই তো দেখছি চিরদিন। একে মিথ্যে বলি কি করে? কৃপা করে আমার সন্দেহের নিরসন করুন।

লৌকিক ব্যবহার নিত্যসত্য নয়। বললে জড়ভরত। এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া, ভগবান ভিন্ন সমস্তই অবাস্তব।

ভগবানকে লাভ করব কি করে?

বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া সূর্য-অগ্নির উপাসনা তপস্যা বা যাগযজ্ঞ—এ সব দ্বারা ভগবানকে লাভ করা দুরূহ। সে প্রাপ্তির একমাত্র মূল্য মহতের পদধূলি। মহতের পদধূলি কুড়োও আর সে মূল্যে কিনে নাও বাসুদেবকে।

সেই মহতের পদধূলি দিতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেনের কথায় খুব বিশ্বাস, তাই ভড়কে গেলেন ঠাকুর। তার কথা চিন্তা করতে গেলে তার মত হয়ে যেতে হবে অথচ সে চিন্তা উচ্ছিন্ন করাও যাচ্ছে না। মার কাছে গিয়ে পড়লেন। মা বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাস তাই ওর জন্যে এত আকুলি ব্যাকুলি।

নরনকে গিয়ে ধরলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর কথা আমি মানি না। মা বলেছে তোর ভেতর নারায়ণ দেখি বলেই তোর উপরে টান। যেদিন তা দেখতে না পাব সেদিন তোর মুখও দেখব না রে শালা।'

সেই নরেন এসে আবার শক্ত হাতে ধরেছে ঠাকুরকে। বললে, 'কেমন আপনার মা এইবার দেখব। তাকে বলুন আপনার গলার ব্যথা সারিয়ে দিতে।'

'তোকে বলেছি না যে মন সচ্চিদানন্দে অর্পণ করেছি, তা এই হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে আনতে পারব না।'

'ও সব কথা শুনব না কিছুতেই। বলতেই হবে আপনাকে। সন্তানের ব্যথা হরণ করে না সে কেমন জননী!'

ঠাকুর কথা ক'ন না, আবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি বললে নিশ্চয় শুনবেন।' নরেন আবার তাড়া দিল। 'আপনি কিছু খেতে পাচ্ছেন না এই কষ্ট আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

ওরে ও-সব কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না।'

'আমাদের জন্যে বার করতেই হবে। শুনব না কিছুতেই।' নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, 'যেখানে একটা মুখের কথা বললেই কষ্টের উপশম হয়, কেন আপনি বলবেন না? আপনার জন্যে বলতে বলছি না, আমাদের জন্যে বলুন, আমাদের কষ্টের লাঘবের জন্যে। যাতে অন্ততঃ একটু খেতে পারেন তাই চেয়ে নিন। আপনি খেতে পাচ্ছেন না আর আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছি, এ কষ্ট সহনাতীত।'

ঠাকুর উঠলেন। বললেন, 'দেখি। যখন বলছিস এত করে। দেখি, বলতে পারি কি না।'

নরেনকে একদিন ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন মা'র কাছে টাকাকড়ি চাকরিবাকরি চেয়ে নিতে। ফেরাফিরতি ঠাকুরকে আজ পাঠাচ্ছে নরেন, যাতে স্বচ্ছন্দে দুটি খেতে পারেন তার ক্ষমতার জন্যে।

মহাপ্রাণময়ী রাজরাজেশ্বরী বসে আছেন মন্দিরে। ত্বয়া সর্বমিদং ততম্। সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন। তোমার কাছে কী চাইব মা!

তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্যতমা। তুমি অতিবিস্তীর্ণকান্তি। পর ও অপর উভয়েরই আশ্রয়। তুমিই পরমেশ্বরী। তুমিই ধারণ করছ, পালন করছ, গ্রাস করছ। তুমিই সর্বগ্রাসিনী। আমি যে মুহূর্তে অমৃতায়মান হব আমাকে তুমি তোমার সুস্বাদু আহার্যরূপে গ্রহণ করবে, গ্রাস করবে। আমি মরে অমর হব। মৃত্যুর পঙ্ক থেকে চলেছি সেই অমৃত-অঙ্কে আর কী চাইবার আছে? সুখেও তুমি, অসুখেও তুমি, অশনেও তুমি, অনশনেও তুমি। তুমি "সদসৎ" হয়েও আবার "তৎ পরং যৎ"।

আঙুল দিয়ে গলার ঘা ইঙ্গিত করলেন। বললেন, সরল শিশুর মত: 'মা, এইটের দরুণ কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

মা বুঝি প্রার্থনা শুনলেন। উজ্জ্বলনয়নে হেসে কি যেন বললেন ঠাকুরের কানে-কানে।

মন্দির থেকে ফিরে চললেন ঠাকুর। নরেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এগিয়ে এল। 'কি, বললেন মাকে?' দীপ্তদ্রুত তীরের মতন তার প্রশ্ন।

'বললুম।'

'বললেন?' উৎসাহে প্রফুল্ল হয়ে উঠল নরেন। যখন বলেছেন, বলতে পেরেছেন, মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে কথাটা তখন আর ভাবনা নেই। সুফল অনিবার্য। 'কি বললেন?'

'বললুম, কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

'শুনে মা কি বললেন?'

'তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কেন, তোর একমুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো এদের শতমুখে খাচ্চিস। লজ্জায় আর কথাটি কইতে পারলুম না।'

নরেনের মাথাও হেঁট হল।

সে আর তার বন্ধুরা যে খাচ্ছে সেও ঠাকুরেরই খাওয়া। এক দরজা বন্ধ তো হাজার দরজা খোলা। এক তারা নিবল তো লক্ষ তারায় তাকিয়ে আছে মহারাত্রি।

তুই যে খাচ্ছিস তাইতে আমিও খাচ্ছি। তোর যে সুখ সেইটেই আমার উপভোগ। তোর যে তুষ্টি, তোর যে তৃপ্তি তাইতেই আমার চরিতার্থতা।

'রাজন, এই সংসার এক গহন অটবী।' ভরত যেন্ন বলল রহূগণকে। 'দেহী বণিক, বুদ্ধি নায়ক। নায়ক অসতর্ক হলে ছয় ইন্দ্রিয় ছয় দস্যুরূপে পুণ্যধন লুণ্ঠন করে নেয়। কখনো গহ্বরে এনে ফেলছে কখনো বা তুলছে শৈলশৃঙ্গে। তুমিও বিচরণ করছ এই মায়া-কাননে। অসজ্জিত-আত্মা অর্থাৎ অনাসক্ত হও। কৃতভূতমৈত্র হও, অর্থাৎ সর্বভূতে বন্ধুতা কর। সকল জঞ্জালশৃঙ্খল জ্ঞান-খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করো। ভবাটবী উত্তীর্ণ হয়ে যাও।'

দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করল রহূগণ। বললে, 'মহৎকে নমস্কার, শিশুকে নমস্কার বালককে নমস্কার, যুবককে নমস্কার। যে ব্রাহ্মণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করছে তাকে নমস্কার। তাদের সকলের অনুগ্রহে সকল রাজার কল্যাণ হোক।'

নিম-জল দিয়ে ঠাকুরের গলার ঘা পরিষ্কার করে দিচ্ছে গোপাল।

ভীষণ লাগছে। যন্ত্রণায় ঠাকুর আর্তধ্বনি করে উঠলেন।

ততোধিক যন্ত্রণা গোপালের। হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'তবে থাক, আর ধোয়াব না।'

সে আবার আরেক কষ্ট ঠাকুরের। তার কষ্টে আর সকলে ব্যথা পাচ্ছে এ আবার দুঃসহ। বললেন, 'না না তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ আমার আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

দেহ থেকে মন উঠিয়ে নিলেন নিমেষে। গোপাল ধুয়ে দিতে লাগল। আর আর্তনাদ নেই, বিকৃতিচিহ্ন নেই, মুখমণ্ডলে অমোঘ-অনঘ প্রসন্নতা। অপ্রগলভ শান্তি।

'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' এই ঠাকুরের মূলমন্ত্র। এই যে কষ্টের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দুঃখ আর শরীরের মধ্যে বোঝাপড়া, হে মন, তুমি অসম্পৃক্ত, তুমি স্পর্শদোষশূন্য, তুমি থাকো অখণ্ডিত আনন্দে। ধূমের সঙ্গে কাঠের সঙ্গে সম্বন্ধ, হে অগ্নিশিখা, তুমি অব্যাহত, তুমি সংশ্লেষলেশহীন, তোমাকে কে ছোঁয়, কে তোমাকে মলিন করে!

তাঁতেই লেগে থাকো। দুঃখের পার আছে, সুখই অপার। শরীরের শেষ আছে মনই অফুরন্ত। মরুময়ী তামসী নিশাই মায়া, দিকদিগন্তের অধীশ্বর প্রদীপ্তশক্তি সূর্যই একমাত্র সত্য।

'একই সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়!' এক সাধ করলেই সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করলে একটি সাধও মেটে না। যদি বৃক্ষের মূলে জলসেচন করো বৃক্ষ পুষ্পফলব্যাপ্ত হবে: গোড়া ছেড়ে আর সর্বত্র জল ঢালো কোথায় তোমার বৃক্ষশোভা, কোথায় বা পুষ্পকান্তি। সব ছেড়ে সেই এককে ধরো, মূলকে ধরো, শাখা ছেড়ে শিকড়কে আশ্রয় করো। সেই তোমার সবেধন নীলমণি। তোমার একশ্চন্দ্রঃ।

গোপালের সেবাই ঠাকুর বেশি পছন্দ করেন। ওষুধও সেই খাইয়ে দেয়।

'সেই বুড়ো লোকটা কোথায়?' ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেলেও গোপালের দেখা নেই দেখে ঠাকুর জিগগেস করলেন বিরক্ত হয়ে।

সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এমন কি ঠাকুরের চেয়েও, তাই ঠাকুর তাকে বুড়ো গোপাল বলে ডাকেন। কখনো বা ডাকেন 'মুরুব্বি।'

খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল, কোন্ কানাচে! একজন এসে বললে, 'ঘুমুচ্ছে।'

'আহা,' স্নেহে ও সমবেদনায় ভরে উঠলেন ঠাকুর। 'কত রাত জেগেছে। এখন ঘুমুচ্ছে, আহা, একটু ঘুমুক। তাকে আর জাগিও না।'

ভক্তির দাহেই তাঁর দাহ। তার উপশমেই তাঁর উপশম।

বুড়ো গোপাল একবার তীর্থে যেতে চেয়েছিল। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোমার মন বুঝি এখন তীর্থ-তীর্থ করছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বারে বারেই ইচ্ছেটা আসে ঘুরে-ঘুরে।'

বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ-ভ্রমণ করে তার নাম বহুদক। আর যার ভ্রমণের সাধ মিটে গেছে, এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন করে যে বসেছে, তাকে বলে কুটীচক।

'যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান।' বুড়ো গোপালের দিকে তাকালেন ঠাকুর।

যা আছে আছে, এই মুহূর্তেই আছে, আছে আমার দক্ষিণ হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে। কেন আর গ্রন্থি জটিল করছ, গ্রন্থির পাশেই রয়েছে উন্মোচনের উপায়। তাকিয়ে দেখ একবার চোখ মেলে, সূর্য-চন্দ্রের দিকে নয়, দূরে মেঘ-ছোঁয়া মন্দিরচূড়ার দিকে নয়, তোমার পাশে বসা এই সহজ সুন্দর মানুষটির দিকে, বহুপুষ্পফলোপেত কল্যাণবৃক্ষের দিকে।

'যা চায় তাই কাছে।' বললেন ঠাকুর স্মিতমুখে। 'অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে মরে।'

যেখানে স্বয়ং ঠাকুর বর্তমান সেখানে আবার তীর্থ কি! যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় সেখানে পথ বাড়াবার কি দরকার!

বলরাম বললে, 'তাই গুরু শিষ্যকে বলে চার ধাম করে এস। যখন একবার ঘুরে দেখে যে এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে।'

যাবে কোথায়! যে বিন্দুর থেকে যাত্রা সমাপ্তি-সিন্ধুও যে সেইখানে।

শুধু চিনতে পারে না। কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকোয়। কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছনে ছোটে। নিজ পুত্র ও বালক মনে করে বসুদেবও চিনতে পারেনি শ্রীকৃষ্ণকে।

সন্নিকর্ষই অনাদরের হেতু। যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা ছেড়ে শুদ্ধির জন্যে অন্য তীর্থজলের সন্ধান করে। হাতের শাঁখা দেখতে দর্পণ খুঁজতে বেরোয়।

কিন্তু সাধুই আসল তীর্থ।

'জলময় সকল স্থানই তীর্থ নয়,' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'মৃত্তিকা বা প্রস্তরময় সকল বস্তুই দেবতা নয়। তীর্থ আর দেবতা পবিত্র করে বহু কাল পরে কিন্তু সাধু পবিত্র করে দর্শনমাত্র।'

সমুদ্র অসীম, গভীর-গম্ভীর, কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যে মাধুর্য তা সমুদ্রে কোথায়? ব্রহ্মের চেয়েও সাধু সরস।

দধিমন্থন করছে যশোদা, কৃষ্ণ এসে দণ্ড ধরে বাধা দিল। কোলে তুলে স্তন্যপান করাচ্ছেন, দেখলেন উনুনে দুধ উথলে পড়ছে। অতৃপ্ত শিশুকে জোর করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে যশোদা ছুটে গেল দুধ নামাতে। এসে দেখল ক্রুদ্ধ শিশু শিলাখণ্ড দিয়ে দধিমন্থনের ভাণ্ডটি চূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে ননী চুরি করে এনে নিজে খাচ্ছে, বানরদের খাওয়াচ্ছে।

লাঠি নিয়ে ছেলেকে তাড়া করল যশোদা।

মাকে মারমুখো দেখে কৃষ্ণ ছুট দিলে। যশোদাও পিছু নিল। যোগীদের তপঃপ্রেরিত মন যার মধ্যে প্রবেশ করতে অসমর্থ, চেয়ে দেখ তারই পিছনে কিনা ছুটছে। কিন্তু শিশু তো, কত আর ছুটবে, ধরা পড়ল। মারবার জন্যে লাঠি তুলল যশোদা, কিন্তু দেখল ছেলের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে। তখন মায়া হল। লাঠি ফেলে দিয়ে দড়ি কুড়িয়ে নিলে। দড়ি দিয়ে উদূখলের সঙ্গে বাঁধল কৃষ্ণকে। যার অন্তর বাহির পূর্বপর কিছু নেই, যে নিজেই অন্তর-বাহির পূর্বপর তারই কি না রজ্জুবন্ধন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, দড়িতে কুলোচ্ছে না, বারে-বারেই দু আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। বাড়তি দড়ি জুড়লো গিঁট দিয়ে, তবু দু আঙুল কম। সবাই অবাক মানল। এ কি অঘটন, এ কি অতিমানুষী বিভূতি। কিন্তু যশোদা ছাড়বার পাত্র নয়। আরো দড়ি জুড়লে। পরিশ্রমে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়েছে, কবরী ও মাল্য বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে, তবু নিবৃত্তি নেই। যে করে হোক তোকে বাঁধবই বাঁধব।

তখন কৃষ্ণ মাকে কৃপা করলেন। খিন্নগাত্রা বিস্রস্তকেশা দেখে নিজেই ইচ্ছে করে বাঁধা পড়লেন। বিশ্ব যাঁর বশ তিনি ভক্তেরও বশ। ভক্তিমানদের পক্ষেই তিনি সুখলভ্য। [ক্রমশঃ।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

আমরা নাপিত, বক্তা উচিত,
আমাদের মান সবাই রাখে,
হাতে ভাই রঙতুলি নাই,
তবু তাতে শিল্পী থাকে।
ক্ষুর-কাঁচি আর নরুণ-কাঠি,
সাবান, বুরুশ, ছোট্ট বাটি,
এই পুঁজিতেই পরিপাটি—
রূপ করি দান সমাজটাকে।
নেইকো মোদের জাতের বালাই,
সবারে ছুঁই, সব ঘরে যাই,
পাপী-তাপী সবাই কামাই—
বুদ্ধ নিমাই মহাত্মাকে।
জন্ম-মরণ পর্ব্ব-পারণ যত,
সেথায় মোদের শুচি করা ব্রত,
পুরুত মুখে মন্ত্রপাঠের
আগে-ভাগেই মোদের ডাকে।
ছাদনাতলার ছড়া কাটি—
হিংসুকেরে চটাই;
ছাউনি নেড়ে বরকনেতে
শুভদৃষ্টি ঘটাই;
গ্রন্থি বাঁধি, ভেদ করি না—
ব্রাহ্মণে আর নবশাখে।
ঠাকুর-পুজোর বাসন মাজাই,
পিদিম জ্বালাই, নৈবিদ সাজাই,
কাপড় কোঁচাই, কাঁশি বাজাই—
কাঠি চালাই ঢোলে-ঢাকে।
ছুট্‌ জন্দের ফিকির নানা—
টোট্‌কা ঝাড়-ফুঁক আছে জানা;
বৌরা মোদের হ'ত ধন্য:—
পরিয়ে আল্‌তা পায়দাকে।

২

আমরা ধোপা নেইক চোপা সবার তাড়া খাই,
কাঙাল-ধনীর দাগ তুলে দি এক আছাড়ে ভাই।
তবু এক আছাড়ে ভাই।

যাই নিতুই পাটে
ধুই পুকুর-ঘাটে
যত নোংরা ঘাঁটি
ধুই ময়লা-মাটি।

এক ভাটিতে সাফ, না হ'লে দু' ভাটি দি ভাঁপিয়ে জলে;
বাটু ক'রে নে' কুঁচিয়ে তারে পাটাতে ঠেঙাই।
ক'ষে পাটাতে ঠেঙাই।

সাজো আড়ং বাসি
জল ছিটিয়ে ঠাসি
আধ্‌ ভিজান ক'রে
ঘাসে বিছাই পরে।

মাড় তুলে রঙ আবার ধুয়ে শুকিয়ে নি' তায় আড়ায় থুয়ে;
ভাঁজ ক'রে থাক্‌ ওঠাই ঘরে—করি যে বাছাই।
শেষে করি যে বাছাই।

ভিজে কলপ দিয়ে
মাজি ইস্ত্রি নিয়ে
কাজ ঝটপট সারি
যাই বাবুর বাড়ি।

দেখলে কোথাও ছেঁড়া-কাটা
পাওনাটা যায় আধেক কাটা,
আধপেটা খাই—হেনস্তা পাই
তবু গর্ব্বে ম'রে যাই।
সবার মনের ময়লা তুলতে যামী আসে মোদের ঠাঁই।
ভাই যে আসে মোদের ঠাঁই॥

ডাক্তার শ্রীঅমলকুমার রায়-চৌধুরী

(আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ)

আজকের দিনে ডাঃ শ্রীঅমলকুমার রায়-চৌধুরী দেশ-বিশ্রুত চিকিৎসক। টাকীতে আদি বাড়ী। ৺ভবনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের মেজ ছেলে। বড় ছেলে কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরপাল শ্রীসনৎকুমার রায়-চৌধুরী। সেজ—হিন্দুসংকার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ৺অনিলকুমার রায়-চৌধুরী। ১২৯৯ সালের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ (জুন ১৮৯২) অমলকুমারের জন্ম। ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে শুরু হোল বিদ্যারম্ভ, পরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশান (বহুবাজার শাখা) থেকে। এফ-এতে পেলেন সরকারী স্কলারশিপ। তার পর ডাক্তারী পড়ার সূত্রপাত। এই সময় সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি স্কলারশিপ পেয়েছেন এমনই উজ্জ্বল তাঁর ছাত্রজীবন। তার পর কর্মজীবনের সূত্রপাত আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে। প্রথমে হলেন অ্যানাটমী বিভাগের ডিমন্সট্রেটার, তার পর মেডিসিন বিভাগের সহ-অধ্যাপক, তার পরে ১৯২৮ সালে পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন অধ্যাপক। ১৯৫০ সালে ঐ বিভাগটির তিনি তত্ত্বাবধারক হলেন। সম্প্রতি ১৯৫৫ সালেই—অল্প কিছুদিন আগে ক্যাপ্টেন এস-কে-সেনের পরলোক গমনে অমলকুমার অলঙ্কৃত করলেন আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের আসন।

ডাক্তার শ্রীঅমলকুমার রায়-চৌধুরী

আলোচনার মধ্যেই ডাঃ রায়-চৌধুরী বললেন—সাধনার ভিতরেই সিদ্ধি—কষ্ট ব্যতিরেকে জীবনের পরম সার্থকতা আসে না। দুর্দান্ত পরিশ্রমের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয় জীবনের পরমানন্দ। নিজের কথাই বললেন—আমার প্রথম জীবনে দর্শনী ছিল দু'টাকা আর এই চল্লিশ বছরে সেটা দাঁড়িয়েছে চৌষট্টি টাকায়। অর্থাৎ দু'-চারগুণ নয়—আট-দশগুণ নয়—একেবারে বত্রিশ গুণ বৃদ্ধি। চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে স্ত্রীরোগ, শল্যবিদ্যা নিদানবিজ্ঞানেও এঁর কৃতিত্ব আছে। এই তিনটি শাস্ত্রেই ইনি লাভ করেছেন সুবর্ণপদক। ইনি মনে করেন, নিজে ওই বিদ্যাগুলিতে কৃতী হলে অন্যের উপর বড় একটা নির্ভর করে থাকতে হয় না। একজন রোগী ডাক্তারের কাছে এলেন, একজন ডাক্তারের যদি সব জানা থাকে—তা হলে তিনিই তাঁকে দেখতে পারবেন—রোগীকে বার ঘাট ঘুরে বেড়াতে হবে না। বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতির দু'টি রূপ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত। একটি সুন্দর ও একটি অসুন্দর। প্রথমটি সুফলদায়ী—দ্বিতীয়টি কুফলদায়ী—আগে চিকিৎসাবিদ্যার বিশ্লেষণ এত রকম ছিল না, এখন দেহের প্রত্যেকটি বিভাগ, প্রত্যেকটি ব্যাধি সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা চলছে। এতে একেক-জন একেকটি বিভাগের ভার পেয়েছেন। কাজে কাজেই সুবিধে অনেক, সব দিকে মাথা না ঘামিয়ে কোন একটি বিশেষ দিকে মাথা ঘামালে ফলটা ভালই হয়, কাজে কাজেই এটা কল্যাণকর—ফলপ্রসূ। কুফল প্রসঙ্গে তিনি রোগীর হয়রাণীর কথা উল্লেখ করেন, একজন রোগীকে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, যে কথাটা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অমলকুমারের ব্যবহারটিও যেমনি সুমিষ্ট, মনটিও তেমনি দরদী, জনগণের জন্যেই তিনি যেন উৎসর্গিত, তিনি বলেন, এমন বহু রোগী এসেছে, যাদের পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই কিন্তু ফিরে তারা যায় নি ; আজ অবধি—জোর করেই তিনি বললেন, কোন রোগী আমার কাছ থেকে এসে ফিরে যায় নি। মানুষের জীবনের মূল্য কি অর্থের মাপকাঠি দিয়ে বিচার্য ? মানুষের প্রতি তিনি স্নেহশীলও যতখানি, শ্রদ্ধাবানও ঠিক ততখানিই। তিনি বলেন—বিশ্বাসটাই আসল জিনিষ, বহু রোগী দেখেছি, ধরে এখানে এলেন—অথচ যাবার সময় দেখি, দিব্যি হেঁটে চলে গেলেন। এর মানে কি ?—বিশ্বাস। বিশ্বাসই মানুষের মনে শক্তির উৎস আনে।

তাঁর বিশাল কর্মক্ষমতা শুধু চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাঙালীর অনেক ব্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু জল-ঝড় সহ্য করে এখনো দাঁড়িয়ে আছে দাসার্ণ ব্যাঙ্ক। অমলকুমার এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন এবং এখনও এর পরিচালকমণ্ডলীর একজন হয়ে আছেন। দাশগুপ্ত কোম্পানী গ্রন্থ ব্যবসায়ীদের মধ্যে নামকরা। এই দাশগুপ্তের উপর দিয়ে একবার ঝড়ের লীলা শুরু হোল। অমলকুমার এটিকে গ্রহণ করে, ঝড়ের করালগ্রাস থেকে একে বাঁচিয়ে নিজের অল্প অংশ রেখে এর পূর্বতন অধিকারীদেরই হাতে আবার এর স্বত্ব প্রত্যর্পণ করলেন। তাঁরা যখন আবার তাঁদের প্রতিষ্ঠান ফিরে পেলেন তখন দেখা গেল, এর প্রতিপত্তি এবং সুনাম পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কৃতিত্ব অমলকুমারেরই। যাদবপুর হাসপাতাল ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের সূচনা যেখান থেকে, সেই ক্যালকাটা পলিক্লিনিক লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলীর ইনি চেয়ারম্যান। সম্প্রতি কয়েক বছর আগে ভারতীয় চিকিৎসক অধিবেশনের জয়ন্তীর সময় ইনিই ছিলেন তার সম্বর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান। মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদকের পদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা কাজ করে চলেছেন চৌষট্টি বছর বয়স্ক স্বনামধন্য ডাক্তার অমলকুমার রায়চৌধুরী। কাজ আর কাজ, এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি পড়ে চলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত। পড়ে চলেছেন সেক্সপীয়ার, স্কট্‌স্, মিল্টন। রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য তাঁকে মুগ্ধ করে। ডিটেকটিভ বই পড়তে খুব ভালবাসেন ডাঃ অমল রায়চৌধুরী। কেন না তিনি মনে করেন যে, একটা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষের সাহায্য করে রহস্য-রোমাঞ্চ-পুস্তক। সাহিত্যের প্রতি তাঁর চিরকালের আকর্ষণ—তাই লক্ষ-শত কাজের বেড়াজালের ভিতরে থেকেও নিয়মিত ভাবে পড়ে থাকেন সমগ্র ভারতবর্ষের আজকের দিনের শ্রেষ্ঠতম মাসিক পত্রিকা বসুমতী। আমাদের সম্পাদক তাঁর বিশেষ স্নেহ-ভাজনীয়। ডাঃ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেন, মাসিক বসুমতীর আজকের এই জনপ্রিয়তার মূল তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনা।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সরকার (P. C. Sorcar)

(বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর)

আষাঢ়ের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মেঘলা। সঙ্গে জনৈক অন্তরঙ্গ কবি-বন্ধু। বালিগঞ্জের ডাভির লেন। "ইন্দ্রজাল," যাদু সম্রাটের বাসস্থান বাড়ীটি একটি উঠোনের সাহায্যে দু' ভাগে ভাগ করা—এক দিকে সরকারের বাসভবন ও আর এক দিকে তাঁর কার্যালয়। কার্যালয় বাড়ীটিতে ঢুকে তাঁর কাছে খবর পাঠাতেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো। তিন তলার একটি ঘরে সরকার বসে আছেন। ঘরটি পুরোপুরি অাপিস-ঘর। চেয়ারে সরকার, সামনে সেক্রেটেরিয়েট টেবল্। কয়েকটি আলমারী—কতকগুলিতে ম্যাজিকের সাজ-সরঞ্জাম, কতকগুলিতে আপিসের কাগজপত্র, আর কতকগুলিতে নানাবিধ যাদুগ্রন্থ। নিজের চার পাশে রয়েছে কাগজ-পত্র, টাইপ রাইটার, ডেক্টাফোন প্রভৃতি। প্রত্যহ প্রায় দু'শোখানা ক'রে চিঠির জবাব দেন সরকার। অদ্ভুত লাগল। বিশেষ করে আজকের দিনে। আমাদের দেশের গায়ক-অভিনেতা প্রভৃতি শিল্পীরা খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করলেই তাঁরা নিজেদের কর্তব্য ভুলে যান। কর্তব্য-পরাঙ্মুখ হয়ে পড়েন। আর যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে সরকার এখনো অক্লান্তকর্মী, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন।

টাঙাইলের সরকাররা পুরুষানুক্রমে যাদুবিদ্যাবিশারদ। এই বংশের ষষ্ঠ যাদুকর শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা কুসুমকামিনী দেবী (এঁর পিতৃপুরুষেরাও যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত) ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি পুত্ররত্ন লাভ করলেন। পাঠকদের কি বলে দিতে হবে যে, এই নবজাত শিশুরত্নটিই বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী প্রতুলচন্দ্র সরকার। বাবা ভগবানচন্দ্র শুধু যাদুকরই নন, একজন বিদগ্ধ চিত্রশিল্পীও। ছোট ভাই অতুলচন্দ্রও আজ আর অপরিচিত নন। ইনিও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে-যে বিদ্যার জন্য এঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল বিখ্যাত সেই বিদ্যাতে ইনিও আজ পিছিয়ে নেই; পূর্বপুরুষদের পতাকা বহন করে ইনিও আজ এগিয়ে এসেছেন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে অতুলচন্দ্র যে অসামান্য যাদু প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা যেমনি গৌরবময়, তেমনি বিস্ময়কর।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র প্রতুলচন্দ্র ছাত্রজীবনে সমাপ্তি আনলেন অংকে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে পড়তে ১৯৩[illegible] খৃষ্টাব্দে। তারপর গ্রহণ করলেন যাদুকরের জীবন পুরোপুরি ভাবেই। এঁর প্রথম প্রদর্শনী হয় ময়মনসিংহে স্থানীয় কোন জমিদারের বাড়ীতে, তখন কলেজের ছাত্র—বয়েস তখন যোল। ভারতের বাইরে প্রদর্শনীর জন্যে ইনি প্রথম গেলেন ১৯৩[illegible] খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয়ে। তারপর থেকে আজ বাইশ বছর ধরে চলছে বিশ্বপরিভ্রমণ। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কোটি কোটি নর-নারীর চিত্ত-জয় শ্রদ্ধা-আকর্ষণ। ভগবানের আশীর্বাদের মত বাঙালী যাদুশিল্পীর মাথায় ঝরে পড়তে লাগল সারা বিশ্বের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

তাঁর কোটি কোটি অনুরাগীদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রও একজন। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু এশিয়ার গৌরব বলে শ্রদ্ধা জানালেন বাঙলার গৌরব প্রতুল সরকারকে। পরলোকগত নেপালাধীশের মতে এঁর প্রদর্শনী সম্ভারে পূর্ণ। জার্মাণী সোণার লরেল দিয়ে এঁকে স্বীকার করে নিয়েছে "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর" রূপে। নিউ-ইয়র্ক এঁকে দিয়েছে "ফিনিক্স পুরস্কার" একবার নয় দু'বার। ম্যাজিকে নোবেল পুরস্কাররূপেই বরণীয় এই ফিনিক্স পুরস্কার এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রতুলচন্দ্রই একমাত্র জন যিনি দু'বার এই পুরস্কার পেলেন। হল্যাণ্ড এঁকে দিলে "ট্রিক [illegible]" (১৯৪৬ ও ১৯৫৪)। টোকিওর ম্যাজিসিয়ান্স ক্লাবের [illegible]

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সরকার

সম্মানিত সভ্য—তাঁরা এঁকে উপহার দিলেন একটি পদক। একজন অ-জাপানীর মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী (১৯৩৭)। আমেরিকার আন্তর্জাতিক যাদুকর ভ্রাতৃত্ব সংস্থার ক'লকাতার শাখার নাম এঁরই নামানুসারে "পি-সি-সরকার চক্র" রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, প্যারী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলির বড় বড় যাদু-সংস্থার দ্বারাও ইনি সম্মানিত। ১৯৩৬ সালে ক'লকাতায় ও ১৯৫০ সালে প্যারীতে রাস্তার উপর চোখ বেঁধে

চার জন সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

[চার জন। এক জন, দু' জন নয়, সত্যি সত্যি সমাজের দশ জনের যাঁরা এক জন,—শুধু প্রচার নয়, বিচার বিবেচনা করে, কাজ দেখে, কাণে শুনে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বয়সে সমাজের শীর্ষে আছেন যে সব ব্যক্তি, অথচ জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা পরিচিত নন এমনি সব সত্যিকারের বাঙালী মানুষেরই নামমাত্র বিবরণ, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, ভারতের নানা স্থানে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন মাসিক বসুমতীর বিশেষ প্রতিনিধিগণ। গত দু' বছর ধরে প্রতি মাসে প্রকাশিত এক শত এমনি প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন মাসিক ...ীর পাঠক-পাঠিকারা। সে-প্রতিভার তালিকায় এমন অনেক ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যাঁদের নাম মাত্র মাসিক বসুমতীর পাঠক জানতেন, কিন্তু বিস্তারিত ভাবে তাঁদের পরিচিতি জানা ছিল না হয়ত অনেকেরই। এই কঠিন কর্মটি বাঙলা দেশে কেন, বোধ হয় সারা ভারতেই প্রথম প্রচেষ্টা এবং সেজন্য কৃতিত্ব মাসিক বসুমতীরই প্রাপ্য। এখন থেকে আমরা এই বিভাগটির আরও সম্প্রসারণ করতে মনস্থ করেছি। সেই কারণে শুধু মাসিক বসুমতীর বিশেষ প্রতিনিধিগণ নন, মাসিক বসুমতীর সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকেই আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে সমাজের সর্বক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণী আমাদের দপ্তরে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন। কারণ, আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, বাঙলা দেশে প্রতিভার দারিদ্র্য আজও নেই। অনাদরে, অবহেলায় উপযুক্ত প্রচারের অভাবে অনেকের সঙ্গেই হয়ত জনসাধারণের সংযোগ নেই। প্রকৃত মানুষের অভাব নেই তা' বলে। কি ধরণের বিবরণ আমরা চাই মাসিক বসুমতীর গত দু' বছরের যে কোনও একটি সংখ্যা থেকে তা দেখে নিন। সময়াভাবে, সংযোগের অভাবে এবং আরও নানা অসুবিধায় অনেকের কাছে আমরা যেতে পারছি না। এই সব ব্যক্তির পরিচিতি গ্রহণের ভার আমরা দিলাম মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাগণকে। সম্পাদক, মাসিক বসুমতী, কলিকাতা—১২ এই ঠিকানায় আপনার বিবরণ (অবশ্যই ফটো সহ) পাঠাতে থাকুন। প্রকাশ করা বা না করার অধিকার অবশ্যই সম্পাদকের থাকবে।—স]

সাইকেল চালিয়ে ইনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দেন। লণ্ডন-নিউইয়র্ক-শিকাগোতেও এঁর প্রদর্শনী টেলিভিসনযোগে দেখানো হয়েছে। ১৯৫২ সালে পৃথিবীর ছ'জন শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের মধ্যে সরকারও একজন বলে স্বীকৃত হলেন। ইংরিজী, হিন্দি ও বাঙলা ভাষায় যাদুবিদ্যা-সংশ্লিষ্ট নানা তথ্যপূর্ণ ষোলোখানি বই এঁর লেখা আছে। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলির যাদুবিদ্যা-সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলিতে নিয়মিতই লিখে থাকেন। নিজের সুন্দর গ্রন্থাগারটিও ম্যাজিক ও তার উপকরণাদি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থে সুশোভিত।

যাদুবিদ্যার ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রতুলচন্দ্র বললেন—অথর্ববেদের মতে ভারতেই এই মহাবিদ্যার উদ্ভব। তবে আমাদের ছিল গুরুমুখী বিদ্যা—কাজে কাজেই পূর্বাচার্যদের মহাপ্রস্থানের পর এ বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হতে থাকে—তবে এখনো বেদে-বেদেনীর খেলা, ভানুমতীর খেলা, ভোজবাজী প্রভৃতি খেলাগুলি সেই আদিম ঐতিহ্যেরই অপসৃয়মান চিহ্ন। ইংরেজ এলো—সেই সঙ্গে যাদুবিদ্যা এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল, যন্ত্রের সহযোগে সে প্রতিষ্ঠিত হোল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর। অগ্রগামী বাঙালী যাদুকরদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জাহাঙ্গীরনামায় দেখা যায় যে, এক দল বাঙালী যাদুকর তাদের কৌশলপূর্ণ প্রদর্শনীর দ্বারা মুগ্ধ করেছিল জগজ্জ্যোতি নূরজাহান-বল্লভ ভুবনবিজয়ী জাহাঙ্গীরকে। তার পর আত্মারাম সরকারের নাম ইনি স্মরণ করেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে। শ্রদ্ধা জানান—সত্য ঘোষ, প্রমথ গাঙ্গুলী, গণপতি চক্রবর্তী প্রমুখ খ্যাতিমান যাদুকরদের। বলেন—১৯০০ সালে প্যারীতে যাদু-বিদ্যায় যাবৎ নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন—এই সত্য ঘোষ। বিংশ শতাব্দীর গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্যের পরিপূর্ণ ব্যাপ্তি—আজকের এই পরিবেশে সরকার বলেন—সে-যুগে নিজেদের বিদ্যার রহস্য কেউ প্রকাশ করে যেতেন না, তাতে করে তাঁদের মৃত্যুর পর সেই বিদ্যার প্রচলন ক্রমশঃই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। লোকেও চর্চার অভাব বশতঃ জিনিষটিকে ভুলে যেতে থাকত। এমনি করেই কত বিরাট বিরাট শাস্ত্রের অকাল সমাধি হয়েছে জনসাধারণের মনের মণি-কুটিমে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ যুগের অনুকূল। ইনি বলেন—এর রহস্য যতই প্রকাশ হবে ততই লোকের সহানুভূতি মিশ্রিত আকর্ষণ আপনা থেকে ঝরে পড়বে এই শাস্ত্রের উপর। লোকে যত্নবান হবে এই বিদ্যার ক্রমোন্নতির কাজে—লোকে খুঁজে পাবে উপার্জনের নতুন সন্ধান। এমনি করেই আবার যাদুবিদ্যা দেশের ও জাতির শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই গণ্য হবে। হিপনোটিজম্ ও মেসমারিজম্ প্রসঙ্গে তিনি বললেন—গ্রীসের ঘুমের দেবতা হিপনাস্, সম্যকরূপে মোহিনী মায়ায় ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে দেওয়াই সম্মোহনী-বিদ্যা। ঘুমের দেবতা হিপনাসের নামানুসারেই এই বিদ্যার পরিচিতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই বিদ্যার উদ্ভব। তার পর এই সেদিন গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেসমার সাহেবের আবির্ভাব। তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একে পূর্ণতা দিলেন—তাঁর প্রবর্তিত রূপ মেসমারিজম্ নামেই খ্যাত হোল। ধরতে গেলে দু'টো জিনিষই এক—প্রথম থেকে দ্বিতীয়টা একটু পরিবর্ধিত সংস্করণ।

এই সব আলোচনা হতে হতে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জিগেস

করেই ফেললাম, আচ্ছা, মাসিক বসুমতী কাগজখানি আপনার কি রকম লাগে? কাগজ প্রসঙ্গে প্রতুল বাবু যা বললেন, তার চতুর্গুণ তিনি বললেন কাগজটির সম্পাদক সম্বন্ধে। তাঁর কথাগুলিই আমি তুলে দিচ্ছি—'তিনি যেদিন থেকে বসুমতীর ভার নিলেন সেদিন থেকে সত্যি বলছি সারা ভারতের পত্রিকাগুলির মধ্যে বসুমতী আজ শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এর আজকের এই সার্বজনীন সম্মান সম্পাদকের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। প্রাণতোষ বাবুকে আমি যে কি পরিমাণে শ্রদ্ধা করি হয়তো তিনি তা নিজেই জানেন না। আজকের বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ যে ক'জন তা বলা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। বাঙলার সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় প্রাণতোষ ঘটক এনেছেন যুগান্তর, আধুনিকতা ও একটি মহাতেজা অথচ নিষ্ঠাবান বিপ্লবী মন—চিরকালীন গতানুগতিকতার পর সুদৃপ্ত আত্মপ্রকাশ।'

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

(খ্যাতনামা রবীন্দ্র-সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ)

দস্তিদারদের আদিনিবাস শ্রীহট্টে। বাবা ৺অক্ষয়কুমার দস্তিদার আসাম পুলিশে ইন্‌স্‌পেকটারের কাজ করতেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অনাদিকুমারই বড়, তাঁর নিজের কথায়—"পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে আমিই যুধিষ্ঠির"। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অনাদিকুমারের জন্ম হোল। পুলিশের কাজে বাবাকে সপরিবারে এখানে-ওখানে ঘুরতে হোত। স্বভাবতঃই পড়াশুনায় হোত ব্যাঘাত। সেটা বোধ হয় ১৯১২ কি ১৩, কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ও তখন বালক মাত্র। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তখন হোতা-পুরোধা—কর্ণধার সবই। এই সময়ে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে শান্তিনিকেতনের কথা শুনে অনাদিকুমার ও তাঁর মেজ ভাই ভর্তি হলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঐখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনাদিকুমার উত্তীর্ণ হলেন।

এইবার কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অনাদিকুমার। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাতীত প্রতিভার মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিভা ছিল যে সূচনার মধ্যে দিয়েই তিনি সমাপ্তির ছবি দেখতে পেতেন। সতেরো বছরের কিশোর অনাদিকুমারের মধ্যে দিয়ে তিনি সাফল্যময় অনাগতকে দেখতে পেলেন। টেনে নিলেন অনাদিকুমারকে, সঙ্গীতের সমুদ্রে আর একটি ছোট ঢেউএর সূচনা হোল, কালক্রমে যে ঢেউ বিশাল আকারে মানবের হৃদয়সমুদ্র মথিত করে তুললে। রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' ও 'সকল সুরের কাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন অনাদিকুমার, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষাও চলতে থাকল পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছ থেকে। অনাদিকুমার বীণ বাদনেও অপটু নন। বীণ-বাদনের শিক্ষা তিনি পান পীঠাপুরমের মহারাজার বীণবাদক সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছ থেকে। শান্তিনিকেতনের তখনকার সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে দিনেন্দ্রনাথের সহযোগিতা করে এমনি ভাবে কাটে পাঁচটি বছর। গান আর গান—গানের মধ্যে ডুবে আছেন অনাদিকুমার, কানের মধ্যে গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণী বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, "যদি কেউ আমার কাছে কোন দামী জিনিষ ভিক্ষা চায়, তাকে সব দিয়ে দেব, আমার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সমস্ত—কিন্তু দেব না একমাত্র আমার গান।"

১৯২৫ সালে অনাদিকুমার এলেন ক'লকাতায়। গানকে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একমাত্র বৃত্তি হিসেবে অবলম্বন করে কলকাতায় আসার ইতিহাস প্রথম রচনা করলেন অনাদিকুমার। গান শেখা, শেখানো (রবীন্দ্রসঙ্গীত) দুই-ই চলতে থাকল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সিটি কলেজে আই-এস-সি পড়াও চলতে থাকে। তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অর্থনীতি ও সংস্কৃত ভাষায় বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ছাত্রজীবন শেষ হোল, সাধনার জীবন দ্বিগুণ বেগে সুরু হোল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে অনাদিকুমার গ্রামোফোন কোং লিঃ এর শিক্ষক। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে "গীতবিতান"এর প্রতিষ্ঠা হোল। অনাদিকুমার হলেন ওখানকার অধ্যক্ষ। ১৯৪৯ পর্য্যন্ত ইনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ত্তমানে অনাদিকুমার বিশ্বভারতীর স্বরলিপি সমিতির সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এছাড়া অনাদিকুমার নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন ও নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য-সম্মেলনের উপদেষ্টা সমিতিরও সভ্য। নিঃ বঃ সঙ্গীত সম্মেলন ও আন্তঃকলেজ সঙ্গীত অধিবেশনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম বিচারকের পদও ইনি অলঙ্কৃত করেছেন। দশটা পাঁচটা আফিসের চাকরী, আর অবসর সময় গান শেখানোর পালা। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন অনাদিকুমার। ইনি বলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত আরও সুমোহন হয়ে উঠবে যদি স্বার্থশূন্যভাবে এর মধ্যে কেউ আসতে পারেন, চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক এর মধ্যে ছোঁয়ালেই এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। সরকারেরও উচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া। অবশ্য এখানকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতালয়গুলিকে সরকার সাহায্য করেন ঠিকই কিন্তু সে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। আধুনিক গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে ইনি উত্তর দেন—আধুনিক গান জিনিষটা কি, তাই তো বুঝলুম না, কি তার বক্তব্য সেইটেই তো অস্পষ্ট। যতক্ষণ না তার ছবিটি পরিষ্কার হচ্ছে—ততক্ষণ কি করে বুঝব তার ভবিষ্যৎ কোথায়? তাঁর ছাত্রী বা ছাত্রীস্থানীয়াদের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, গীতা সেন, বেলা ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এঁকে মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে ইনি বলেন যে, সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথের কথা। গানের সুরের ভিতর কথার জাল তিনি বুনেছেন। তিনি নিজে যেন কথা বলছেন তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে। দৈনন্দিন জীবনের সব

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

ক'টি ক্ষেত্রেই তাঁর গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিতরেই অনাদিকুমার খুঁজে পেয়েছেন জীবনকে, দেখতে পেয়েছেন আনন্দকে।

অধ্যাপক ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

(সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

কলকাতা থেকে দক্ষিণ দিক ধরে বারো মাইল গেলে হরিনাভি গ্রাম। এই গ্রামের স্বনামধন্য পণ্ডিত ৺রামানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। ইনি ছিলেন সাধক, এঁর নিষ্ঠার প্রাবল্যে সে যুগের সমস্ত অভিজাত ধনী-সম্প্রদায় অভিভূত হয়েছিলেন—এই বংশের সমস্ত সম্মান প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। পরবর্তী কালে এঁর বংশধরেরা শুধু সেই ধারাটিকে রক্ষা করে চলেছেন। রামানাথের দুই ছেলে—৺অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ—তাঁর সময়কার সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতিষীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ও পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ডি। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার এক অক্ষয় কীর্তি। পশুপতিনাথের দুই ছেলে—গৌরীনাথ ও কৈলাসনাথ। কৈলাসনাথ অঙ্ক এবং পরিসংখ্যান-শাস্ত্রে এম-এ, এল-এল-বি, ডি-ফিল বর্তমানে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের অঙ্ক-শাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাগবাজারের বাড়ীতে গৌরীনাথের জন্ম। প্রথম শিক্ষা শ্যামবাজার এ-ভি স্কুলে। সেই সময় সেখানে অধ্যক্ষ ও সচিব ছিলেন যথাক্রমে ৺জগবন্ধু মোদক এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু। রসরাজের নিবিড় সংস্পর্শে এসে তাঁর পৌত্রাধিক স্নেহে গৌরীনাথের জীবনে সাহিত্যের প্রেরণা আসে—অবশ্য বংশের ধারা তো আছেই। এ-ভি স্কুলের পর ১৯২১ সালে এলেন হিন্দু স্কুলে। স্কুলের পড়া শেষ হ'ল—কলেজ জীবন শুরু হলে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন গৌরীনাথ। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাস করেন ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পি-আর-এস পাশ করেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী। ১৯৩২—৩৮ তিনি স্ফোটবাদ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁর কলেজ জীবনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও তিনি প্রেরণা পেয়েছেন অনেক অধ্যাপকদের কাছে। যেমন ৺শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব গৌরীনাথের

অধ্যাপক ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

জীবনে আজও অনির্বাণ দীপ্তিতে জ্বলছে। সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ব্যতীত গৌরীনাথ নিজেকে ভাবতেই পারেন না। ১৯৩৬ খৃঃ ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ও বাঙলার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ১৯৫০ খৃঃ ইনি চলে গেলেন সংস্কৃত কলেজে। আজও ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ভর্তৃহরির দর্শন অথবা শব্দব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করে 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হলেন। এঁদের প্রবন্ধ সমীক্ষার ভার পড়েছিল ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, অধ্যাপক পি. এল. বৈদ্য প্রমুখ দিক্‌পাল দার্শনিকদের উপর। অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রী হলেন ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী।

পণ্ডিতের বংশে জন্ম, রক্তে রক্তে রয়েছে বিদ্যা দানের ও গ্রহণের ধারা। অধ্যাপনা সম্বন্ধে গৌরীনাথ বলেন—"ছেলেবেলায় স্কুল-জীবনে খেলা করবার সময় যখন দেখতুম চোগা-চাপকানধারী বিরাট বিরাট জ্ঞান-গম্ভীর বিদ্যা সমাহিত অধ্যাপকবৃন্দ প্রেসিডেন্সী কলেজের দালান পার হচ্ছেন তখনই আমার মধ্যে অধ্যাপক হবার একটা বাসনা জাগে। তীব্রতম বাসনা—আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা যা হল। আর আমার আকাঙ্খা ছিল মাত্র একশো টাকা মাইনে। কিশোর তখন—বুঝতুম না—একশো টাকা মাইনের তাৎপর্য কতখানি বা কতটুকু?"—মুগ্ধ হই গৌরীনাথের অসামান্য দৃঢ়তা দেখে। অধ্যাপক তিনি সত্যিই হয়েছেন এবং বহু অধ্যাপকের সৃষ্টিও করেছেন এও তো কম গৌরবের কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছাড়া টোলেও ইনি বিদ্যালাভ করেছেন। হাতিসহরে বাণীকণ্ঠ তর্কবাচস্পতির টোলে—১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই ঘটনা। ন্যায়শাস্ত্র ইনি সুদীর্ঘ কাল ধরে অধ্যয়ন করেছেন মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের কাছে। মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, এবং পণ্ডিত শ্রীতারানাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সংস্পর্শও এঁর অধ্যয়ন জীবনকে সাফল্য ভরপুর করে তুলেছে। কাশীর মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী যখন কলকাতায় ছিলেন সেই সময় দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে গৌরীনাথ এঁর কাছে সূক্ষ্ম ভাবে পড়েছেন পাণিনীয় দর্শন ও ব্যাকরণ, তাঁর অকাল মৃত্যুর পর সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয়ের কাছে আজও তিনি একমনে বৈশেষিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চলেছেন।

সঙ্গীত, খেলাধূলা, ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, অভিনয় ও অভিনয় শেখানো গৌরীনাথের বহুমুখী প্রতিভার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। সভা-সমিতি তো আছেই, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—কবে যে এর হাত থেকে মুক্তি পাব তা জানি না।

বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখনকার শিক্ষায় গলদ এসেছে। উপযুক্ত শিক্ষকের মধ্যেই শিক্ষার সার্থকতা, সংস্কৃত সামান্য জিনিষ নয়—উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন এর শিক্ষাদানের ব্যাপারে। এখনকার শিক্ষা শুধু ডিগ্রীর জন্যে বা ভাল চাকরীর জন্যে, তখন ছাত্রদের গুরুগৃহে থাকার রীতি ছিল, এতে শিষ্য গুরুর নিকটতম সংস্পর্শে এসে গুরুর যা কিছু ভাল, যা কিছু সৎ—নেবার চেষ্টা করত এবং তাতে কৃতকার্য্যও হোত। গুরুগৃহে যে সব নতুন নতুন ছাত্র

আসত, গুরু নিজে সব সময়ে তাদের পড়াতেন না। পুরোনো ছাত্রেরাই তাদের পড়াত। এতে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাও তাদের মধ্যে আসত, তাই তখনকার শিক্ষাধারা এত নিখুঁৎ এবং প্রাণবন্ত ছিল। কৃতী ছাত্র যাঁরা, তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়ান্তরে চলে যান জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্যে—তাই শিক্ষাদানের ভার পড়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্রদের প্রতি। তাদের অপটু শিক্ষাদানের ফলে অনেক সম্ভাবনাও ব্যর্থ হয়ে যায়—যেমন বহু নতুন নতুন ছাত্রদের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার আভাস থাকে কিন্তু যথার্থ গুরুর অভাবে তা বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। এই পদ্ধতি যেমনই মারাত্মক তেমনই ক্ষতিকর। ইনি বলেন, সংস্কৃতের প্রভাব পুরোমাত্রায় এসেছে বাঙলা সাহিত্যে—বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছে সংস্কৃতের উপর। আমাদের দেশে নানা শাস্ত্র—অর্থ কাম আবার ভাস্কর্যবিদ্যা—উদ্ভিদবিদ্যা তলিয়ে দেখ, এর পরিণতি ধর্মে, মুক্তিতে। সংস্কৃতের গতি বরাবরই সহজ সাবলীল, তার আদিকাল থেকেই প্রমাণ আছে। বর্তমানে সরকারও সংস্কৃতের প্রসারকল্পে যত্নবান হয়ে জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নানা জায়গায় সংস্কৃত মহাপাঠশালা—বাঙলা দেশে দু'জায়গায়—কাঁথীতে ও নবদ্বীপে। সংস্কৃতের অধ্যাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, বৃত্তির অনুপাতও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণার জন্যেও বিদ্যার্থীদের সুযোগ-সুবিধে আগেকার থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য-জীবনে গৌরীনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। ব্রাহ্মণ-সন্তান তিনি, এই কথা—এই মন্ত্র—এই বাণী তাঁর মর্মে মর্মে গাঁথা।

যথারীতি গঙ্গাস্নান, পূজার্চনা, ব্রত-পালন, গীতাপাঠ, নিয়মিত নিরামিষ আহার প্রভৃতি আচার গৌরীনাথ আজীবন পালন করে আসছেন। তিনি মনে করেন যে, কোন ধর্মজীবনে আচার-অনুষ্ঠানের স্পর্শপ্রভাব না পড়লে তা সফল হতে পারে না—সে অসম্ভব।

অধ্যাপক গৌরীনাথের বহু ছাত্রের মধ্যে আজ অনেকেই কৃতী। জীবনের বিভিন্ন দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত—মাসিক বসুমতী সম্পাদকও তাঁর বহু ছাত্রের মধ্যে একজন, মাসিক বসুমতীর প্রসঙ্গ তুলতে তিনি বলেন যে, তাঁর ছাত্রের মাসিক-পত্রিকা সম্পাদনা তাঁকে মুগ্ধ করে।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত]

যৌবন-স্মৃতি

শ্রীকালিদাস রায়

মনে পড়ে সখি, সেই বেঁধো ঘর, চাল দিয়ে জল পড়ে,
ছাইভরা সরা রাখিনু মেজের জল শুষিবার তরে।
সারা আঙিনাটি কাদা-জলেভরা আলতা বাঁচানো দায়,
সে কাদা-মাটিতে তোমার হাঁটিতে ইট পাতা ছিল তায়।
পাশের ডোবায় ব্যাঙ ডেকে যায়, একটানা এক সুর,—
মনে পড়ে সই সে গান কতই লেগেছিল সুমধুর!
ঘরের সাঙায় কপোতমিথুন করিত বকবকম।
যবে সারা রাত হ'তো ধারাপাত ঝুপ-ঝুপ ঝম ঝম।
সিক্ত সমীরে যূঁই এর গন্ধ আসিত ঝরোখা-ফাঁকে
সহসা আমারে আঁকড়ি ধরিতে চমকি মেঘের ডাকে।
ছিল আমাদের মলিন শয্যা মেজের উপরে পাতা,
সম্বল ছিল তোমার হাতের সূচে ফুল-তোলা কাঁথা।
ধকধুবায় শাপের আগের অলকায় বরষার
গাঢ়মিলনের মধুর স্বপন ঘিরে ছিল চারি ধার।
সে সুখ-স্বপন-মাঝারে গোপন ছিল মর্ত্যের ক্ষুধা
সে ক্ষুধা মিটাতে ছিল শয্যাতে কনকপাত্রে সুধা।
দোতলার পরে আজি কোঠা ঘরে বিজলি আলোর তেজে,
আলোকিত এই সুখ-পালঙ্কে দুগ্ধধবল শেজে,
সেই রাতিগুলি যত স্মরি তারা তত দেয় হাতছানি,
রামগিরি শিলা কণ্টকে ভরে তুলায় শয্যাখানি।
সেই স্মৃতি আজ বাদলা বাতাসে পারিজাত বাস আনে
সে বাস আজিকে বৃথাই মাতায় জরাজর্জর প্রাণে।
মনে ছিল আশা প্রাণে ভালবাসা দেহে যৌবন তাজা।
যক্ষ ক কুবের প্রেম আমাদের তখন যে ছিল রাজা।
ফিরবে কি আর গৃহকোণে জ্বলা সেই মিটি-মিটি বাতি।
ফিরিবে কি আর হোলীকাপে ভরা প্রেম কাজলের রাতি?

লেখকদের অদ্ভুত খেয়াল (৩)

শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত

সাহিত্য আমরা ভালবাসি; এবং সেই সংগে সাহিত্যিকদেরও। কেন না, সৃষ্টিকর্তা বা কর্তৃদের বাদ দিয়ে একাজ চলবে না; একথা এক কথায় আমাদের বলতেই হবে। সেই স্রষ্টাগণের শিল্পিমনের মধ্যে পাশাপাশি যে একটা খেয়াল-খুশীর মন রয়েছে সে খবর যখন আমরা পাই (অর্থাৎ তাঁর খেয়ালটা কী?) তখন সত্যিই মনে এক বিস্ময়-জিজ্ঞাসা জাগে। এই জানার মধ্য দিয়ে পাঠকের প্রিয় লেখক তাই পাঠকের কাছে এক নতুন জিজ্ঞাসায় আরো প্রিয়তর হয়ে ওঠেন। ভেবে দেখুন কথাটা।

'মাসিক বসুমতী' এ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৭২) লেখকদের কিছু কিছু খেয়াল-খুশীর কথা প্রকাশ করে পাঠকদের উপহার ও আনন্দ দিয়েছেন। আজ আমার জানা কয়েক জন বিখ্যাত লেখকের খেয়ালী-মনের কথা এই প্রসঙ্গে জানালুম।

একালের বহু সাহিত্যিকের দেখা পাবেন কফি-হাউসে বা রেষ্টুরেন্টে। কফি বা চা খেতে আসেন তাঁরা; এবং সেগুলার কিছু আড্ডাও দিয়ে যান। নইলে পরে তাঁদের লেখার আসর জমে না যে। অবশ্য কফি-হাউসে আড্ডা মেরে খাওয়া নয়, ঘরে বসেই কফি খাওয়ার কী অভ্যেসটাই না ছিল অপরাজেয় কথাশিল্পী বালজাকের,—সে খবর আপনারা পেয়েছেন বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যায়, কিন্তু বালজাকের এই কফি খাওয়ার সংগে 'চা' খেয়ে বোধ হয় রীতিমত পাল্লা দিতে পারতেন ডাঃ জনসন। বিখ্যাত ইংরেজ-সাহিত্যিক। লিখবার সময় তাঁরও প্রয়োজন হ'তো গরম চা। চা আর চা! ডাঃ জনসনের গেলো এই। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, বালজাকের খেয়াল-খুশীর শেষ এতেই নয়; শুনেছি তিনি যখন লিখে যেতেন, তখন এক এক পাতা লেখা হয়ে গেলেই তিনি সেগুলি এক এক করে ঘরে ছুঁড়ে ফেলতেন। শুধু তাই নয়, তিনি আবার জামা-কাপড় খুব ঘটা করে পরতেন। নানা রঙের। তবে তাঁর মনে আসবে ভাব। লেখার ভাব। তাঁর বায়নাক্কা কী আর একটু-আধটু!

টমাস কার্লাইল যেমন সামান্ত চিৎকার বা শব্দ সহ্য করতে পারতেন না, তেমনি থ্যাকারেও ছিলেন এই এক দলের। লিখবার সময় মোটে কথা পছন্দ করতেন না তিনি। কেবল চুপচাপ বসে এক মনে লিখে যেতেন। শুধু লেখা আর লেখা। তিনি না কি বলতেন, হৈ-হল্লাতে কি বাপু লেখা আসে?

অনেকে আবার কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়া লিখতে বসতে পারতেন না। বা সে সময়ে (যখন লিখছেন) কেউ এলে সহসা দেখা করতে চাইতেন না। কেন না, তা'তে নাকি অনেকে সেই লেখার খেই হারিয়ে ফেলতেন; ভাবের ঘরে তখন একটু গোলমাল নাকি তা'তে বাধতো। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লিখতে লিখতে দিব্যি উঠে এসে আগন্তুকের সংগে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেছেন। বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। এবং পরে গিয়ে যখন সেই লেখায় হাত দিয়েছেন তখন কিন্তু তাঁর ভাবের ঘরে গোলমাল বাধতো না। কলম ব্যবহারের দিক থেকে তিনি নাকি পেলিক্যান কলমে লিখতে ভালবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখার পাণ্ডুলিপি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, তাঁর আর এক খেয়ালী মন। লেখাটির কয়েকটি অংশ হয়তো সংশোধন করলেন বা কেটে দিলেন, তখন সেই কাটাকুটি অক্ষরগুলি দিয়ে সৃষ্টি করে তুললেন অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি। অনেক লেখক শুধু লিখেই যান, দেখা গেছে লেখা প্রকাশের সময় তিনি আর ধৈর্য ধরে 'ফাইনাল কপি' করতে বসেন না; কাউকে দিয়েই সে কাজটা সেরে নেন। সত্যি দু'বার করে লেখার কপি করার ধৈর্য না থাকাটাই স্বাভাবিক। শুনেছি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রেস কপির এই কাজটা নিজের হাতে করতেন। একালের খ্যাতনামা কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজে হাতে সমস্ত পাণ্ডুলিপি লেখেন! তা'তে তিনি তৃপ্তি পান।

কবিরা নির্জনতা ভালবাসেন। আমাদের আশে-পাশের এই পরিবেশ তাঁদের কথায় কৃত্রিম পরিবেশ। তাই অনেকে খোঁজেন অকৃত্রিম পরিবেশ—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত পরিবেশ। প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন এ দলের। তাঁর মতন নিসর্গপ্রীতি খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ আবার এক স্থানে অনেক দিন অবস্থান করে লিখতে পারতেন না; স্থান বদল করতেন। তাই শান্তিনিকেতনের শ্যামলী, উদয়ন, পুনশ্চ ইত্যাদি গৃহগুলিতে থাকতেন কিছু দিন করে। নির্জন পরিবেশ কবি জীবনানন্দ দাশ ভালবাসতেন। মানুষ-জনও বড় একটা পছন্দ করতেন না তিনি,—সেইজন্য নির্জন কবি আখ্যাও পেয়েছিলেন। কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও গেলে সেখানকার গাছপালা-লতাপাতা-পাখি ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁরই তো হাতে অপূর্ব চরিত্র 'অপু'র সৃষ্টি। আধুনিক কালের আর এক জন কবিকে জানি, তিনি দিনেশ দাস; সময় পেলেই 'আলিপুরের হর্টিকালচারে' ফুলের অপূর্ব পরিবেশে বসে থাকেন কবিতা লেখেন।

ইবসেন। নরওয়ের বিখ্যাত লেখক। উপন্যাস লেখেন তিনি আবার আর এক জন নামকরা খেয়ালী বিচিত্র-খেয়ালী বলতে পারেন। তিনি যখন লিখতেন তখন সে ঘরে জন্তু জানোয়ারদের ছবি টাঙানো না থাকলে নাকি তাঁর লেখা 'মুড' আসতো না। কী বিচিত্র খেয়াল বলুন তো! লেখার 'মুড' আনতে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক এমনি ধারা নানা রকম খেয়ালে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। লেখক কি আর খেয়ালের আশ্রয় নেন না খেয়ালই এসে লেখকের আশ্রয় নেয়।—

[প্রসঙ্গত উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না, আমাদের দেশী বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের খেয়ালের তালিকা কেহ পাঠাইতে উৎসাহী হইতেছেন না।—স]

কামমোহিতা

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

১৭

'মেরীর মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে আবার ফিরে আসতে হল আমাকে'—

বললে আগাথা—'ভিড় হবে সাংঘাতিক। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন সব আসবে। তা তুমি হঠাৎ এখান থেকে চলে যাচ্ছ, কই সে-সম্বন্ধে আমাকে ত একটি কথাও জানাও নি?'

ডালা হাট-করে-খোলা ট্রাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস। নিজের ভয় সম্বন্ধে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতে লাগল সে। ছোট ছেলের মত যেন কি একটা অন্যায় করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—'আমার কিছু কাজ আছে প্যারিসে।'

—'ফিরবে কবে?'

ঠিক এমনি কর্তৃত্বের স্বরেই আগাথা কথা কয় মেরীর সঙ্গে। আগাথা হল আসলে সেই জাতের গভর্নেস, যারা কোন কিছু হাল্কা ভাবে নিতে জানে না।

অধোবদনে জবাব দিলে নিকোলাস। বললে—'এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরব মনে হয়।'

বিছানার উপরে অবিন্যস্ত ছড়ানো জামা-কাপড়, স্যুট, বই-পত্তরের দিকে তর্জনী উদ্যত করল আগাথা। ভৎর্সনার কটাক্ষ নিক্ষেপ করলে নিকোলাসকে।

'আমি এখনও মুক্তপুরুষ। কোন বাঁধনে বাঁধা নই আমি কারুর কাছে'—বললে নিকোলাস।

'কথাটা খোলসা করেই বল না।'

আগাথার কণ্ঠস্বর শুষ্ক রসহীন হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস। একটা ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল, কিন্তু সেই ফাঁদের নিশ্ছিদ্রতায় হঠাৎ যেন একটা পালাবার পথ দেখতে পেলে নিকোলাস। এই অপ্রত্যাশিত সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলে না সে। বললে—'খুব ভাল কথা। যদি সত্যিই শুনতে চাও আগাথা—আমি বলতে গররাজী নই।'

—'কি হয়েছে তোমার'—বললে আগাথা—'কি হয়েছে বল? যে ক'দিন ছিলাম না তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে। বল কি হয়েছে?'

নিকোলাসের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকে দেখছিল আগাথা। চোখের পাতা নেই মেয়েটার। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে নিকোলাস। বললে—'ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছ ত? যাও হাত-মুখ ধুয়ে এস।'

একটু অপ্রতিভ হয়ে আগাথা আর্শীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল একবার। তার পর অসহিষ্ণু হয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললে—'তাইতে এত বীতরাগ তোমার?'

—'তা ছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে। এই যে শুনছি দুবার্গেরা তোমায় একটা মস্ত যৌতুক দিচ্ছে। তাতে ভোর্ধের লোকেরা কী সব বলাবলি করছে, শুনেছ নিশ্চয়?'

—'কার কথা? আমার আর মেরীর বাবার?'

নিকোলাসের আপত্তির কারণটা শুনে এতক্ষণে আশ্বস্ত হল আগাথা। মুখে হাসি দেখা দিল তার।

'আমি অবশ্য সে-সব রটনা বিশ্বাস করি, তা তুমি মনে করো না। তুমি আর মেরীর বাবা'—অবিশ্বাস ভরে শরীরটা একটু দুলিয়ে নিয়ে বললে নিকোলাস—'তাও কি কখনো হয়? না ও-রকম কথা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারো না। ঐ সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করব ততটা বোকা ঠাউরো না আমায়।'

—'বুঝেছি গো, বুঝেছি।'

নির্বোধ পুরুষ, পালিয়ে বাঁচবার একটি মাত্র পথও নিজের হাতে বন্ধ করে দিলে নিকোলাস। মুখ ফসকে বলে ফেলেছে, সেই কথার সূত্রে ফিরে আসার জন্যে মিথ্যে মাথা খুঁড়তে লাগল।

'লোকের রটনার শেষ নেই। আমার অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। যাই হোক, আমি ত মুখের কথা দিয়েছি। বাগ্‌দত্ত হয়েছি।'

নিকোলাসকে ভারী করুণ দেখাচ্ছে। আগাথার মনে হল তার বুক থেকে যেন একটা জগদ্দল বোঝা নেমে গেল।

'এতক্ষণে বুঝলাম তোমার মাথা ব্যথার কারণ'—পুনরাবৃত্তি করলে আগাথা। অলক্ষ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুশীতে হাল্কা হল।

'ভারী অবুঝ পুরুষ তুমি আমার'—বলে বিশ্রী ভাবে তাকে সোহাগ করতে গেল। যেন অশুচি কি একটা তাকে জড়াতে আসছে এই ভাবে পিছনে সরে গেল নিকোলাস। কিন্তু আগাথার মনে আজ কোন ক্ষোভ অভিমান নেই। যেন কত দুষ্টুমির ভঙ্গীতে আদর করে নিকোলাসের গায়ে সে থাবড়া দিলে। বললে—'একটু সইতে পার না তুমি, এমন অবুঝ পুরুষ নিয়ে মেয়ে মানুষ কি ঘর করতে পারে? দুষ্টু, সোনা আমার। তবে তোমার আগাথার মনের জোর দু'জনের সমান। ভেবেছ বুঝি তোমার জন্যে বেলমৎ জমিদারীর লোভ আমি ছাড়তে পারব না? ওগো না। তোমার আমার মধ্যিখানে কোন জমিদারীর

পাঁচিল আমি তুলতে দেবো না। তেমন মেয়ে তোমার আগাথা নয়।'

নিকোলাস যাই বলুক আর যাই বকুক না কেন, আগাথা তার মুঠি কিছুতেই শিথিল হতে দেবে না। আর আশা রইল না নিকোলাসের। হালে আর পানি রইল না।

ও-রকম করে হাসলে কি নোংরা কুৎসিত দেখায় আগাথাকে। ঐ রকম করে নাকের ডগা কুঁচকে বড়ো বড়ো দাঁত বার করে হাসলে। তবু আজ খুব হাসলে আগাথা। অমন করে হাসতে আর কখনো দেখেনি তাকে নিকোলাস, কী অনির্বচনীয় মমতায় আগাথা তার দু'টি বাহু বাড়িয়ে দিলে নিকোলাসের দিকে। ঐ দু'টি বাহুর মুক্তিতে অনিন্দ্য সমর্পণ চেয়ে দেখলে নিকোলাস। আগাথার অবাঞ্ছিত শরীর থেকে যেন একটা বিকশিত প্রেমের নিবেদন আসছে তার দিকে। তবু তা গ্রহণ করলে না নিকোলাস। নিঃশব্দে ফিরিয়ে দিলে।

—'এ সব ঘটনার এক বিন্দুও যে তুমি বিশ্বাস করনি জানি আমি। তবু এ কথা ঠিক যে, লোকের নানা ঘটনায় ভয় পেয়ে গেছলে তুমি। না না আমায় বলতে দাও—বাধা দিও না। একথা তোমাকে বলতে আমার কোন লজ্জা নেই যে আমার জীবনে আজ তুমি ছাড়া আর কেউ নেই—কিছু নেই। মেরীর বাবা যত ভাল মানুষই হন যত আন্তরিক ভাবেই তিনি আমার সম্পত্তি দান করতে চান—আমি তা প্রত্যাখ্যান করব। ও কাহিনীর ইতি করে দিলাম আমি। এ নিয়ে আর মাথা খারাপ করো না। তোমার-আমার মিলনের এ বাধা আমি চিরদিনের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলাম।'

'সত্যিই কি আগাথা ভেঙ্গে ফেললে সব বাধার প্রাচীর? ভাবলে নিকোলাস। তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অন্ততঃ আগাথার মনে আর কোন সংশয়ের কণ্টক রইল না।

'তোমার কি মাথা খারাপ হল আগাথা'—মনের কথা প্রকাশ করতে কথা ঠেলাঠেলি হতে লাগল নিকোলাসের মুখে। বললে—'তুমি ছেড়ে দেবে বললেই হল? তোমার এ রকম আত্মত্যাগে আমি কি করে সহজ মনে সম্মতি দিতে পারি বল? যখন জানি যে আমি নিজে তোমার কিছু দিতে পারব না। দেবার মত কিছু নেই ত আমার। সে ত তুমি জান, কিছু মাত্র দেবার ক্ষমতা নেই আমার।'

তার নিকোলাস যে ধন-সম্পত্তির কথাই বলছে সেই রকমই যে ভাবছে সে—এমনি ভাণ করলে আগাথা। তাই নিকোলাসের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে—'কিছু নেই বলে কেন আমায় দুঃখ দিচ্ছ তুমি? তোমার কিছু নেই আমার সব। আমাদের দু'জনের জগতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কোন কিছুর দরকার নেই।

ছলনাময়ীর মুখে সেই আশ্চর্য হাসি লেগেই আছে, দেখলে নিকোলাস। দুটি হাত আর একবার তার দিকে প্রসারিত করে দিল আগাথা। অক্টোপাশের মত যেন নিকোলাসকে জড়িয়ে ধরতে এল। একটা কদর্য বিভীষিকায় শিউরে উঠল নিকোলাস। ঐ হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করার আগে যদি কোন অস্ত্র দিয়ে সে ঐ হাত দুটোকে কেটে দু'খান করে দিতে পারত'ত বেঁচে যেত চিরদিনের মত।

'তোমায় আমি মিথ্যে বলেছি আগাথা'—যেন আর্তনাদ করে উঠল নিকোলাস—'একটা বিশ্রী বিভীষিকা থেকে পালিয়ে বাবার জন্যে তোমায় আমি মিথ্যে অজুহাত দেখিয়েছিলাম।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো নিকোলাসের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। তা হোক, তবু বলে ফেলে যেন অনেকটা আরাম পেল সে। একটা বোঝা নেমে গেল বুক থেকে। সব চেয়ে চরম আঘাত হানল সে অবশেষে।

শুনে আগাথার শরীর যেন শিথিল হয়ে গেল। অসহায়ের মত হাত দুটি নামিয়ে নিলে। ঘরে ঢোকার পর যে কালো ব্যাগটা চেয়ারে রেখেছিল তা থেকে একখানা রুমাল বের করে ভালো করে নিজের মুখখানা মুছে নিলে আগাথা। তার পর আবার প্রতিবাদী পুরুষের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল শক্তিময়ী। ভাবলে আজ শেষবারের মত ঐ মানুষটার মনের ভয় ঘুচিয়ে দিতে হবে। হয়ত যৌন মিলনের একটা অহেতুকী ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে নিকোলাস। মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘর করার সম্ভাবনা ঘটলে সব পুরুষেরই ঐ এক ভয় জানে আগাথা। অথচ মেয়ে মানুষের কথা ভাবলে পৃথিবীর সব পুরুষের যৌন কামনা ঐ এক বিন্দুতে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে। আগাথার জন্যেই যে তার পুরুষের ভয় তা নয়—সব পুরুষের কাছেই সব মেয়ে যা, আগাথাও তার বেশী কিছু নয়।

শান্ত কণ্ঠে নিজেকে খুলে ধরলে আগাথা। আশ্বাসের স্বরে বললে—'যে ভয়ের কথা তুমি ভাবছ নিকোলাস তা আমি জানি। কিন্তু সে ভয় নেই তোমার আমি বলছি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তোমাদের বাগানে বসে যখন আমায় তুমি নেবে বলেছিলে সেদিনও ত তুমি কোন লুকোচুরি করনি। বরং নিজের কথা বুঝিয়ে বলতে ভগবানের বাণী আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিয়েছিলে—'স্পর্শ করো না আমায়।' আমি তোমার মন জানি। ওগো আমার কাছ থেকে তোমার কোন ভয় নেই। আমি ত তোমায় কত বার বলেছি, আমি কোন কিছুরই প্রত্যাশী নই। শুধু তুমি আমায় আশ্রয় দাও। তোমার ছায়ায় থাকতে দাও আমায়। সেদিনও তোমার কাছে আমি শুধু সেবার অধিকার চেয়েছিলাম। আর তাই না বিশ্বাস করে তুমি এই আংটি নিজের হাতে আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলে।

কী আশ্চর্য কোমল মিনতি বাজতে লাগল আগাথার কণ্ঠস্বরে করুণ মিনতিতে বশ করার কত যত্ন। একটি হাত তুলে আঙুলে সেই আংটি দেখাল আগাথা। এ ক'দিনে নতুন এমন কিছু ঘটেনি তাদের দু'জনের মধ্যে যার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিকোলাস তাকে বর্জন করার কথা ভাবতে পারে। এ কথাটা তাকে বোঝাতে পারবে এমন আত্মবিশ্বাস আছে আগাথার। আর সত্যিই নতুন কিছু ঘটেওনি ত। আগাথার কথার প্রত্যুত্তরে বলবার মত একটা কথাও জোগাল না নিকোলাসের মুখে। বিজয়িনী আগাথা থামল না। তেমনি নরম অনুনয়ের সুরে আবার বললে—'ওগো তোমার সেবা করার অধিকার শুধু ভিক্ষা দাও আমায়। আর কিছু চাই না, শপথ করে বলছি। আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার আগাথার।'

—'সত্যি বলছ? সত্যিই আর কিছু চাও না তুমি?'

যে নিকোলাস প্রাণ খুলে হাসে না কখনো সে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল!

—'আর কিছুর প্রত্যাশী নও? কিন্তু আমি যে ভয়ের কথা বলেছিলাম ঠিক এই কথাটাই আমার মনে ছিল'—

তার পর গলা নীচু পর্দায় নামিয়ে বললে—'কিসের ভয়? সে কী বস্তটা ভেঙে বলবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। সে চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। সে তুমি বুঝবে না। তুমি আর আমি। তোমার আমার মধ্যে যে কোন দিন ও প্রশ্ন উঠতে পারে তা আমি ভাবতে পারি না। ভাবতে পারি না।

মনের ভিতরকার প্রধূমিত বহ্নি যেন তার কথায় জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগল। শান্ত মেজাজের মানুষ যখন হঠাৎ রেগে ওঠে সে অতি সাংঘাতিক হয়। আজকের আগে আর কখনো নিকোলাসের স্বভাবের এই রূঢ় দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আগাথার। একটা দারুণ ঘৃণায় ফেটে পড়ল নিকোলাস। অনেক দিনের চাপা আক্রোশে যেন অগ্ন্যুৎপাতের মত বিদীর্ণ হল।

'তোমার কাছে না যাই, ঘৃণায় তোমায় না ছুঁই, তবু তোমার সঙ্গে আছি এ চিন্তা আমার অসহ্য। একদিন দু'দিন নয়, আমার সমস্ত জীবন তোমার সঙ্গে কাটবে—তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। জানো আগাথা, তার চেয়ে বরং মরে তোমার হাত থেকে বাঁচব।'

আগাথার গলা থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তস্বর শুনলে নিকোলাস। সে যে কি বলতে চায় তার সঠিক মর্মার্থ বুঝেছে আগাথা, তা যেন মনে হল না। তবু আবার অনুনয়ের সুরে বললে—'না না, ও-কথা বলো না। তোমায় হারাতে হবে আমার, ও-কথা মুখে এনো না।'

এখন আর নিকোলাস আত্মবশীভূত নয়। গলার আওয়াজ আরো এক পর্দায় তুলে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বললে—'হারাবে কেন? হারাবার কথা আবার কিসের? কবে পেলে যে হারাবে? যা তোমার অধিকারে ছিল না কোন দিন তা হারাবার আফশোষ হবে কেন? তোমার আমার মধ্যে অনেক আকাশের তফাৎ—অনেক সমুদ্রের ব্যবধান।'

এলোপাথাড়ি আঘাত করতে লাগল নিকোলাস। আর আঘাত না করে উপায়ও নেই তার।

'কেড়ে নিও না'—মিনতির সুরে বললে আগাথা—'সব কেড়ে নিয়ো না আমার কাছ থেকে। অন্ততঃ মধুমতী লেরো'র তারের সেই রাতের মধুস্মৃতিটুকু থাক্ আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে।'

কিছুতেই না—আগাথা তার অধিকার কিছুতেই শিথিল হতে দেবে না। কিন্তু নিকোলাস আজ নির্মম—হৃদয়হীন।

'সত্যি কথাটা আজ তুমি জেনে যাও আগাথা। সে রাতের মত তোমাতে আমাতে এত দূর আর কখনো মনে হয়নি আমার। তোমার আমার মধ্যে হাজার যোজন ব্যবধান।'

কান পেতে যা শুনলে, বুক পেতে যেন মৃত্যু-শেল নিলে আগাথা। বিবর্ণ মুখে ক্লান্ত গলায় শুধু বললে—'তবে সেদিন কেন সম্মতি দিয়েছিলে? কেন শপথ করেছিলে?'

আর বলতে পারলে না আগাথা। বাক্ রোধ হয়ে এল তার। সেই মুহূর্তে আগাথাকে জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারত নিকোলাস। কিন্তু নিজেকে তার যেন খুনী মনে হ'তে লাগল। সে যেন বজ্র মুষ্টিতে একটি দুর্বল প্রাণীর গলা চেপে ধরেছে। নিজের ইচ্ছায় সে মুষ্টি শিথিল করে দিলে নিকোলাস। বললে—'এ অসহ্য আগাথা। এ কি করছি আমি?'

ভয়ার্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নিকোলাস সামনের ঐ অসহায় প্রাণী দেহটার দিকে। ওকে চেনে না কি নিকোলাস? জানে?

'পাগলের মত কী সব বলে ফেলেছি আগাথা। ও আমার মুখেরই কথা। একটিও আমার মনের কথা নয়। যা সব বলেছি তার একটি বর্ণও সত্যি নয়।'

আগাথার সরু কাঁধের পিছনে হাত দিয়ে নিকোলাস তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলে। গলা বুঁজে আসতে শব্দ করে হাঁফ নিতে লাগল আগাথা।

'হঠাৎ একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম আমি। হয়ত এলো-মেলো কিছু বলেও ফেলেছি তোমায়। তুমি বুঝবে যে তোমার ভালর জন্তই আমি বলছিলাম কথাগুলো।'

এতক্ষণ প্রাণহীন পুতলির মত শুনছিল আগাথা। নিকোলাসের মুখে একথা শুনে হঠাৎ অসহ্য রোষে রুদ্রাণী হয়ে উঠল যেন। নিকোলাসের বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে—'আশা করি, এর পর একথা বলবে না যে এতক্ষণ এ ঘরে যে অভিনয় করলে সে-সবই আমারই মঙ্গলের জন্যে।'

দুটি হাত অঞ্জলি করে স্নেহময়ীর রাঙা গাল দুটি ফুলের মত তুলে নিলে নিকোলাস। স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে বললে—'তাকাও আমার দিকে। আমি বলছি আগাথা মুখ তুলে চাও আমার মুখের দিকে। শোন। আমি তোমার জীবনে অনন্ত দুঃখের কারণ হতাম। তুমি আর আমি—আমরা দু' জনে হতাম দু' জনের জল্লাদ। বল, আমি ঠিক বললাম—না ভুল বললাম?'

কান্না-ধরা গলায় বললে আগাথা—'যদি এই তোমার মনে ছিল, তবে তা বুঝতে এত দিন লাগল কেন? বলো এত দিন পরে এ-সব কথা বললে কেন?'

—'দেরী হয়েছে ঠিক। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ, খুব বেশী দেরী করে ফেলিনি আমি। আবার নতুন করে তোমার জীবন রচনা করার পক্ষে খুব বেশী দেরী আজও হয়নি।'

আর একবার আগাথার কাঁধে হাত রেখে নিকোলাস তাকাল তার চোখের দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিলে আগাথা। নিকোলাস যে মৈত্রীর বাবার প্রতি ইংগিত করছে তা বুঝতে পারল না সে।

'আবার নতুন করে? কি বলছ গো তুমি—তোমাকে —ছেড়ে?'

কান্নায় ভেঙে পড়ল আগাথা। তপ্ত অশ্রু বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগল তার শুষ্ক গাল বেয়ে। বেদনায় বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ। হয়ত করুণায়, হয়ত বা লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ল নিকোলাস। তবু আগাথার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। যেন হৃদয়ের কোন তন্ত্রীতে কে আলগা হাতে স্পর্শ করেছে তার। আগাথার হাত ধরে তাকে বিছানার উপর বসাল নিকোলাস। নিজে বসল তার পাশে। তার পর প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—'সত্যিই আমার কারণ আছে, আগাথা। আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার সেই ভীষণ ইচ্ছাশক্তির যূপমূলে বলি হয়েছি আমি। যে ইচ্ছাশক্তি তোমাকে অনমনীয় পশুশক্তির মত যে কোন বাধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করে। তুমি আমার দুর্বল আপত্তি

ঠুয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছ কিন্তু কখনো লক্ষ্য করেছ কি তারা আবার পিছনে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে? যা বললাম সত্যি নয় কি?'

'সত্যি! বুঝতে পারছি আমার দোষ কোথায়!'—লজ্জিত আবেগের সঙ্গে বললে আগাথা।

নিজেকে নির্মম শাস্তি দিতে চেয়েছিল নিকোলাস। তার উপায় আবিষ্কার করেছিল মনে মনে। এত দিনে সে শাস্তির পালটা ভাবলে সে নষ্ট হয়নি। জীবনের ধন কিছুই নষ্ট হয়নি প্রভু! যা সে হতে চায় তাই হবে সে। আজ থেকে হবে অন্য মানুষ।

'আমি ভাল হবো। চলে যাবো তোমার কাছ থেকে—এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করছি। জীবনে আর কোন দিন তুমি আমায় চোখে দেখতে পাবে না। আমার কথা শুনতে পাবে না। শুধু এইটুকু তুমি জেনে যাও যে যেখানে তুমি যাবে সেখানে আমিও যাবো। কোন দিন কোন অবস্থায় তোমা হতে বিচ্ছিন্ন থাকব না মনে মনে।'

আগাথার কথা শুনে আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিলে নিকোলাস। তার জীবনে যাকে সে মৃত বলে মনে করেছিল দেখলে সে মেয়ের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই তার। আগাথার কাছ থেকে সরে বসল নিকোলাস। ক্লান্ত কটু কণ্ঠে বললে—'আর কেন মিছে আগাথা। এবার তোমার বোঝা উচিত যে তোমার আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে। শেষ হয়ে গেছে সব।'

মুখের কথা যেন বর্শার ফলার মত এই অবুঝ মেয়েটার মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চেষ্টা করলে নিকোলাস। মনে কোন প্রীতি দাক্ষিণ্য রাখলে না।

আর কি করে যে বোঝাব যে তোমার আমার খেলার পালা শেষ হয়ে গেল? কত রকম করে ত তোমায় বোঝালাম। আর আমি পারছি না, আমায় ক্ষমা করো আগাথা। এত দিন ধরে আমার প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে তুমি যে লড়াই করেছ তার জন্যে তোমার কাছেই আমার মার্জনা প্রাপ্য। তুমি আমায় ক্ষমা করো আগাথা। দয়া করে মুক্তি দাও।'

একথা শুনে আগাথা বজ্র কঠিন হয়ে দাঁড়াল। চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই দুটি চোখে যেন মকর আগুন ঝক-ঝক করতে লাগল। দুটি ঠোঁট চেপে এক পা এগিয়ে এল আগাথা তার দিকে। তারপর সাপের উদ্যত ফণার কোঁস করে উঠল।

আমি তোমায় ঘৃণা করি না? তোমাকে দেখে আমার বিতৃষ্ণা হয়? কোন্ মেয়ে তোমায় দেখে ঘৃণা না করবে শুনি?

তার কথাটা যে উল্টো করে বুঝলে আগাথা, এ তার ভালই হল ভাবলে নিকোলাস। আগাথা ওকে পাঁকে ঠেলল নামাচ্ছে। এতক্ষণে হার মেনেছে নারী। হেরে যাচ্ছে তা বুঝেছে বলেই না তাকে নিন্দা করতে নেমেছে।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল নিকোলাস—'আমার সম্বন্ধে তোমার ঐ ধারণাই যদি সত্যি হয় আগাথা তবে আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তুমি বেঁচে গেলে। তোমারই ত উল্লসিত হবার কথা।'

জানলার কাছে সরে এসে দাঁড়াল নিকোলাস। নীচে আগাথা তার কাছে এগিয়ে এল বুঝেও মুখ ফিরে তাকাল না সে।

'যে নোংরা জানোয়ারটা তোমার মন ভাঙিয়েছে—ব্যবহার করেছে তোমায় নিজের কার্য্যসিদ্ধির আশায়, আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি সেও পাবে না। তোমার পীরিতের বন্ধু ঐ সালোদের ছেলেটা মেরীকে হাতাতে পারবে না, যত চেষ্টাই করুক।'

একটুও বিচলিতের ভাব দেখাল না নিকোলাস। বললে—'সত্যি বলছ?'

'দেখে নিও'—বলেই চেয়ারের উপর বসে পড়ল আগাথা। আবার ব্যাগের ভেতর রুমাল হাতড়াতে লাগল। অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস। অভিনয় যে শেষ হয়েই গেছে তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেইখানে বসে বললে আগাথা—'আমি চলে যাচ্ছি। আর কোন দিন তোমায় বিরক্ত করব না।'

নিকোলাস ফিরে এল জানলার কাছে। মা বাগান থেকে কখন চলে গেছেন। নির্নিমেষ চোখে লেবুগাছটার দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। তার পর যখন মুখ ফেরালে ততক্ষণে আগাথার চলে যাবার কথা। তার বদলে দেখলে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চোখের মণিতে সংহত করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে আগাথা। চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে—তার নিটোল মুখের ব্যঞ্জনাকে। শেষ বারের মত আগাথা উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে—এগিয়ে এল দরজার দিকে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

—'তোমার এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি কি করতে পারি তা একবার ভেবে দেখার ইচ্ছেও তোমার হয় না? এমনি নির্দয় বটে পুরুষের মন।'

জানলায় কনুইয়ে ভর দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস। আগাথার কথায় কোন সাড়া দিলে না। আগাথা আবার বললে—'আমি যে আত্মহত্যা করতে পারি এ ভয়ও করে না তোমার?'

তবু ফিরে তাকালে না নিকোলাস। যেন অন্ধ বধির হয়ে গেছে। কোন মানুষের কোন কথা তার কানে গেল না কাউকে দেখতেও চাইলে না। যতক্ষণ না স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে আগাথা চলে গেছে ঘর থেকে ততক্ষণ নড়ল না সে। তার পর মুখ মুছল রুমাল বের করে। আগাথা তার দেওয়া আংটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে মেঝেতে, সেটাও কুড়িয়ে নিলে না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে চেয়ে রই পলকহীন চোখে। দেখতে লাগল তার আসল মানুষটাকে।

১৮

প্রাতোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ারই কথা। খা তালিকায় বিশেষ কোন খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল বলেই নয়—খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল অতি সাধারণ ছিম-ছাম। কিন্তু সাধারণকে করে অসাধারণ করে নিতে হয় ডোর্বের লোকেরা তা ক করেই জানে। একজন আত্মীয়া ঠিকই বলেছেন—'ভো মাংসের কথা যদি বলতে হয় একমাত্র ডোর্বেই দেখেছি যেথ

বিষাদের মেঘে থম-থম করছে উৎসবের আকাশ। আহারের টেবিলে আগাথাই কর্ত্রীর আসনটি অলঙ্কৃত করেছে—হুবার্লে পরিবারের সেই ত আজ প্রতিভূ। আগাথাকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন শোকের পাষাণ প্রতিমা। তাই অতিথিরা বিরাট আয়োজন সত্ত্বেও উৎসবের আনন্দ পুরোপুরি আস্বাদনে বিরত হল। শ্রাদ্ধ-বাসরে আজ এই কথাটাই সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে যে মৃতা হুবার্লে-গৃহিণী আগাথাকে সত্যিকার ভালবাসতেন অতি গভীর ভাবে। শোকবতীর বিষাদাচ্ছন্ন চেহারাটি দেখেও আর কারুর মনে কোন সংশয় রইল না। মেরী না আগাথা কে বেশী শোকাহত ডোর্থের লোকজনদের নিকট সেইটাই বিস্ময়কর সমস্যা! অপরের আচরণ বিচার করতে যাওয়া যে কত ভুল পদে পদে আজ তা প্রমাণিত হল। লবণাক্ত চোখের জল যেন এ্যাসিডের মত আগাথার চোখের পাতা খেয়ে দিয়েছে। যদিও একটা দুরারোগ্য চর্মরোগের দরুণ আগাথার চোখ এমনিতেই সব সময় লাল থাকে।

একজন নিমন্ত্রিত মহিলা মন্তব্য করলেন—'যাই হোক আজকের এই শোকের এইটাই সুস্পষ্ট হল যে আগাথার ভাগ্যাকাশে নতুন শুকতারার উদয় সূচনা করছে। অর্থাৎ কি না মেরীর বাবা আগাথাকে খুবই পছন্দ করেন। জীবনের লটারীতে সব চেয়ে কুরূপা মেয়ের ভাগ্যেই দেখছি সব চেয়ে ভাল প্রাইজটা জুটে যায়। নিজের সংসারেই ত কত দেখলাম—মাতাল, হোঁদল-কুৎকুৎ, চোখে পেঁচুটিয়ালা যে কোন পুরুষের সঙ্গেই ঘরের রাঁধুনীরা সটকে পড়ছে। জীবনের ধারাই হয়ত এই রকম। কে জানে হয়ত মাদাম আগাথার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে—মেরীর বাবাও লাভ-লোকসানের খতিয়ানে একেবারে হেরে যাবেন না। আগাথা তাঁর প্রিয় পাত্রী আর বাড়ীতে একজন মেয়ে ছেলেরও ত দরকার। তাছাড়া আগাথাই ত এত দিন এ সংসারের কাণ্ডারী ছিল। পার্থক্য শুধু—এর পর থেকে আর আগাথাকে মাস মাইনা গুণতে হবে না। এ-ব্যবস্থা খুব খারাপ হবে না মেরীর বাবার পক্ষে। আর বুড়ো ক্যামব্রাঁকে যদি একবার পার করে দিতে পারেন তবে ত বেলমং জমিদারীও একেবারে তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে…তাছাড়া এ স্বপ্ন আগাথারও প্রিয় স্বপ্ন…কিন্তু ঐ শোকবতী রমণীর চেহারার দিকে তাকালে এ সম্বন্ধে যতই ভাবা যায়, কেমন যেন একটা সন্দেহের কাঁটা মনে খচ-খচ করে। কে জানে তলে তলে কিছু চলেছে কি না, আমরা উপর থেকে যার আঁচ পাচ্ছি না।'

কিন্তু মহিলাটির নিকট এ-সব ব্যাপারে একটুও অভিনব বিস্ময়কর কিছু নেই। পান সমাপন করে গ্লাসটি নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঠোঁট মুছে পার্শ্ববর্তিনীর কানে আবার ফিস-ফিস করে বললে—'আচ্ছা, মেয়েটার গোপন রহস্যটা কি জানেন কিছু?'

পার্শ্ববর্তিনী তেমনি নীচু গলায় উদ্গত হাসি চেপে উত্তর দিলেন—হয়ত এ অনুশোচনা। আগাথা হুবার্লে-গৃহিণীকে বিষ খাইয়ে মেরেও ফেলতে পারে।'

—'এ নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। চেয়ে দেখুন মেয়েটার দিকে। একটি কণাও দাঁত দিয়ে কাটেনি। আমার ত মনে হয় মেরীর বা মেরীর বাবার প্রাণে আগাথার মত এমন গভীর ভাবে এ শোক বাজেনি।

নীচে যখন আহার-পর্ব চলছিল মেরীর বাবা উপর তলায় কতকগুলো খোলা ড্রয়ার সামনে নিয়ে বসে নানা দলিলপত্র সাজিয়ে রাখছিলেন।

নীচের হলঘর থেকে বহু কণ্ঠের চাপা কথাবার্তার গুঞ্জন আর কাঁটা-চামচ-ডিসের বিচিত্র শব্দঝঙ্কার ভেসে আসছে। ঘর-সংসার নতুন করে ঢেলে সাজাতে মৃত্যুর জুড়ি আর দ্বিতীয়টি নেই। 'আচ্ছা সেই কনট্রাক্টটার কি হল? ওটার ত আর কিছুই করা হয়নি।' ভাবতে বসেন মেরীর বাবা। অনেক দিন অলস জীবন কাটিয়ে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে!

মেয়ে মেরী বাবার সামনে একটি নীচু পা-ওয়ালা চেয়ারে বসে। পাতলা জামার নীচে দুটি পূর্ণকুম্ভের মধ্যিখানে চিঠিটা গোপন করে রেখেছে মেরী। সেই গোপনীয়তার একটা মধুর যন্ত্রণা ক্ষণে ক্ষণে উপভোগ করছে সে। চিঠি আর পড়বার দরকার নেই—চিঠির প্রতিটি ছত্র প্রতিটি কথা তার অন্তরস্থ হয়ে গেছে। পিলস লিখেছে—'নিরীহ মাছির মত নিকোলাস একটা মাকড়সার জালে আটকে পড়েছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্যে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করাই বোধ হয় উচিত ছিল আমার। তবে বরাত ভাল যে মাকড়সাটার জাল ছিঁড়ে গেছে। আর যে মাকড়সার জালই ছিঁড়ে গেল, তারও ত কাজ ফুরোল। তাকে পায়ের তলায় এমনি করে পিষে মেরে ফেলাই উচিত। যাই হোক, তোমাদের ঐ আগাথা সম্বন্ধে খুব সতর্ক, সাবধান থাকবে তুমি। এখনো দু'-এক দিন আমাদের একটু সামলে থাকা উচিত। নিজেদের সুখের জন্যে এখন আমোদ-আহ্লাদে মেতে আত্মহারা হওয়া আমাদের উচিত নয়। তোমার মায়ের স্মৃতির প্রতি আমাদের যথাকর্তব্য সম্মান দেখাতেই হবে। কিন্তু এ ক'দিন তোমায় না দেখে কেমন করে থাকব জানি না, অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ হতে বাধা নেই, যদি আমরা সংযম হারিয়ে না ফেলি। তুমি না আমি, আমাদের মধ্যে কে যে বেশী দুরন্ত জানি না। তিন মিনিটও আমরা ঐ না করে এক সঙ্গে থাকতে পারি না।

…শোন, আমি একটা ব্যবস্থা মনে মনে এঁটে রেখেছি। খাওয়ার পর চলে এসো না আজ নদীর দিকে—প্রাঙ্গণের দেয়ালের পাশে টিউলিপের ছায়ায় নয়—চলে আসবে সোজা নদীর ধারে যেখানে কাঠুরিয়ারা একজোড়া গাছ কেটে বড়ো বড়ো গুঁড়িগুলো ফেলে রেখেছে। কোথায় যাচ্ছ কারুর কাছে গোপন করার দরকার নেই। শুধু ভাল করে গায়ে জামা জড়িয়ে এস।

আমি থাকব বিরহ-নদীর ওপারে। কোথায় আছি একটা মশাল জ্বেলে তাও তোমায় সংকেত করব। তোমার সিগারেটের আগুন ঠিক দেখতে পাব আমি। সাদা উলের কোটটাই গায়ে পরে এস। তাহলেও অন্ধকারে আমার মনের মানুষকে ঠিক চিনে নিতে পারব।

—'তোমার মায়ের কোন্ কোন্ জামা-কাপড়গুলো নিজের জন্যে রাখতে চাও আগাথার সঙ্গে কথা কয়ে নিও মা মেরী। বাকি-গুলো অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব আমি।'

মেয়ে যে তার কথায় কান দিচ্ছে না, তা লক্ষ্য পড়তেই হঠাৎ অধীর হয়ে উঠলেন তিনি। রাগ করে বললেন—'আমার কথায় তুমি কান দিচ্ছ না মেরী!'

—'আমি ও সবের একটাও রাখতে চাই না বাবা! মাদাম আগাথার হয়ত ওগুলো কাজে লাগতে পারে।'

মেরীর চোখে কেমন একটা দুষ্টুমি-ভরা হাসির আলো চিক-চিক করতে লাগল।

'তোমার কাজে লাগবে না—আগাথার লাগবে মানে?'

সাড়া না দিয়েই আগাথা ঘরে ঢুকে পড়েছে দেখে কথার মাঝপথেই থেমে গেলেন মেরীর বাবা। আগাথাকে যেন সগু কবর থেকে উঠে আসা প্রেতিনীর মত দেখাচ্ছে। কেন দেখাচ্ছে তাও ভাল করে জানে মেরী। কিন্তু বাবা কি ভাবছেন তা ঠিক ঠাহর হল না মেরীর।

—'এ আর আমি একটি মুহূর্ত সহ্য করতে পারছি না'—ঘরে ঢুকে বললে আগাথা—'কয়েক মিনিটের জন্যে একটু বাইরে যাও ত মেরী—তোমার বাবার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব আমি।'

—'বাইরে যাব কেন? কি এমন কথা যা আমার সামনে বলতে পার না বাবাকে? অন্ততঃ আজকের দিনে আমি বাবার পাশে থাকব—বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'—

—'অসভ্যতা করো না মা'—বললেন বাবা।

কিন্তু মেয়েকে ঘর থেকে চলে যেতেও বলতে পারলেন না তিনি। মেরীর কথায় আগাথাও বিন্দুমাত্র বীতরাগের ভাব দেখালে না। মায়ের টাকাকড়ির হিসেব মেলাতে মেরীর বাবার পাশে বসল যখন তার মুখে এতটুকু বিচ্যুতির চিহ্ন দেখতে পেল না মেরী। এতটুকু নড়েও বসল না সে। তেমনি স্থাণুর মত বসে রইল নিজের আসনটিতে। হাঁটু জোড়া করে টান-টান হয়ে বসে রইল। বুকের ভাঁজে যে চিঠির কাগজখানি লুকিয়ে রেখেছে সে তার জন্ত উৎকণ্ঠার সীমা নেই তার মনে। সেই কাগজের কোণে কেমন সর-সর করছে বুকটা। যেন একটা গোপন ব্যথার অনুভূতি হচ্ছে যা কাউকে বলতে পারা যায় না।

নীচের থেকে ভেসে আসছিল নানা কণ্ঠের উত্তেজিত শব্দ। হঠাৎ সব-কিছু ছাপিয়ে একটা হাসির হুল্লোড় উঠেই আবার থাদে নেমে গেল। তার পর একটা বক্তৃতার একটানা গম-গম আওয়াজ আসতে লাগল ওপরে।

ওপরের ঘর থেকে তিন জনই শুনতে পেল নীচের অতিথিদের উচ্চ কথাবার্তা। চেয়ার সরানোর ঘড়-ঘড় আওয়াজ। তার পর সারা বাড়ীতে সব চুপচাপ—থম-থমে হয়ে গেল। মেরী এতক্ষণ আগাথার মুখের উপর থেকে একটি বারও চোখ সরায়নি। ঐ মেয়ের হালচাল বুঝে নেবার কোন অভিসন্ধি নয় তার। নিজের মনের দুর্বলতা না ধরা পড়ে সেই জন্যই এই সাবধানটুকু। কোথায় অলক্ষ্যে কে যেন তার ভবিতব্যের ওপর হাত বাড়াচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের ভাগ্যকে জয় করে নিতে হবে তাকে। হতে হবে বীর্যশুল্কা। হতে হবে প্রেমে অশঙ্কিনী। তবু একটা অপরিসীম লজ্জায় মন তার অভিভূত হয়ে পড়ল।

মা আজ নেই। মা কোন দিনই গিলসকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন না—হয়ত বা ঘৃণাই করতেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাদের দু'জনের মিলনের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতেন। মায়ের সম্বন্ধে এ কি ঘৃণ্য চিন্তা করছে সে? লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা হল তার। ভগবানের কাছে মায়ের আত্মার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করতে লাগল মেরী। 'মায়ের দোষ দেখছি তার জন্যে ক্ষমা কোরো আমায়। ভগবান! সর্বজ্ঞ তুমি। তুমি ত জান মাকে আমি কত ভালবাসতাম। মা মারা যেতে আমার মন কতখানি ভেঙে গেছে।'

মাতৃস্নেহের রৌদ্রময় দিনগুলিতে মনকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল মেরী, যখন সে মাকে ছেড়ে থাকতে পারত না।

এক দণ্ডও চোখের আড়াল করতে পারত না তাকে। মায়ের মুখে ত লেগেই ছিল নিত্য অনুযোগ—'মেয়েটা সব সময় আমার আঁচল ধরে থাকবে।'

মাকে ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখতে পারে না মেয়েটা, একথা কে না বলত! তার সেই মাকে গোলাপের মালা দিয়ে হাত বেঁধে দিলে—থুতনির কাছটায় পুরু ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে কফিনে শুইয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে মাটির তলায় চিরকালের জন্যে চাপা দিয়ে দিলে।

আর তার গিলস? মুখে তার একটুও মমতা নেই, মমতা দেখাতেও সে জানে না: কথায় যার এক ফোঁটা মধু নেই। দীর্ঘায়ত যার দুটি কালো চোখ মনে হয় পাথর থেকে কুঁদে তৈরী করেছে ভগবান। সেই গিলসও তার কাছে এলে কত কোমল হয়ে যায়। ঐ চোখের দিকে তাকালে কত রহস্যময় মনে হয়। যেন একটা পাহাড়ের গা কুয়াশায় ভিজে ওঠে।

একদিন রাত্রে ঐ চোখের এক ফোঁটা জলে সমুদ্রের স্বাদ পেয়েছিল মেরী। গিলস বলে, সে কখনো কাঁদে না। তবে কাঁদছে কেন আজ? তার জবাবে গিলস বলেছিল—'তোমার ভালবাসার আনন্দে কাঁদছি মেরী! নইলে চোখে আমার জল আসতে জানে না।'

ঐ ক'টি কথা বলেছিল সে। অতখানি ভালবাসা মেরী কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। তার গিলস বলেছে—'তোমায় ভালবাসি বলেই আমি কাঁদি।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

দু'-এক মুহূর্ত মাত্র

শান্তিকুমার ঘোষ

দু'-এক মুহূর্ত মাত্র সূর্য নিবে এলে
আসে এক অন্ধকার ছায়া ফেলে ফেলে:
পাখি-পাখালির নীড়ে আর্ত কলরব,
[illegible] কি তীব্র ঢেউ খেলে?

পিয়ানোর পাশে মেয়ে তবু স্থির মনে
কালো এক সূর্য দেখে সে টেলিভিশনে:
ক্রমে আকাশের গায়ে ফোটে চেনা তারা,
তখনো মানুষ জাগে সুদূর বীক্ষণে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

দেখুন, কি চমৎকার মিহি ছুঁচের কাজ! যেন মেশিনে বানানো হয়েছে। একেবারে বেলজিয়ামে—যেখানে সেরা লেস তৈরী হয়।

একবার আনন্দ সিংয়ের মুখের দিকে তাকালাম। একবার জিনিষটার দিকে। কত মমতা দিয়ে তিনি হাত রেখেছেন লেসটাতে। মুখে তার কত খুশী-খুশী ভাব।

ব্যাপারটা সবই বুঝলাম। গিন্নীর হাতের তৈরী নিশ্চয়ই। কালিদাস না হয় নেই এ কালে। কিন্তু কিছু উপমা ত দিতেই হবে। না হলে ঠাকুর সাহেবের কাছে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মান থাকে না। কিন্তু কি বলি, কি বলি?

চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। বললাম—বাঃ, কি চমৎকার কাজ! ঠিক আড়াই দিন কা ঝোপড়ার মত।

ভদ্রলোক একটু চোখ তুলে তাকালেন। কি জানি, হয়ত প্রশংসাটা অবিশ্বাস করছেন। অথবা অত প্রকাণ্ড একটা শ্বেত পাথরের ধর্মস্থানের সঙ্গে তুলনাটাকে উনি 'লেগ-পুলিং' অর্থাৎ ঠাট্টা বলে মনে করছেন। তাই একটু টীকা করতে হল।

সামান্য ছুঁচ আর সূতো দিয়ে শ্রীমতী আনন্দ সিং এমনি একখানা সুন্দর জিনিষ বানিয়েছেন। এর একমাত্র তুলনা হচ্ছে আড়াই দিন কা ঝোপড়ার পাথরের জালির কাজ। প্রথমে ছিল একটি পাঠশালা। কিন্তু টড আর কানিংহামের মতে হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের এত বড় সুন্দর নমুনা আর নেই। পৃথিবীতে যত সুন্দর প্রাচীন প্রাসাদ আছে তাদের যে কোনটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এ যেন পাথরের বাড়ী নয়। জমকালো চোখ-ধাঁধানো কারুকার্যে ভরা একখানা পাথরের জড়োয়া গয়না।

না। না। আপনি একটা সামান্য লেসের সম্বন্ধে এ কী বলছেন? এ যে ভীষণ বাড়িয়ে বলা হল। প্রতিবাদ করে বললেন আনন্দ সিং।

কেন? অত বড় আর অত সুন্দর পাঠশালার রাজবাড়ীখানা যদি আড়াই দিনে ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কি বাড়িয়ে বলেছি?

তা, দেখুন বাড়িয়ে বলাটা আমাদের দেশে একটা ক্লাসিক্যাল আর্ট। জাতীয় শিল্পকলা।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—মনে আছে ঝোপড়ার ভাঙ্গা পাথরে খোদাই করা প্রশস্তিটা? তাতে লেখা আছে যে আজমীরের (অজয়মেরুর) রাজা অজয় দেবের ছেলে আজমীরের মাটি তুরস্কদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন? আর কেমন পুরোপুরি লালে লাল হয়ে গিয়েছিল তা-ও লেখা আছে। ঠিক যেমন ভাবে যুদ্ধ জিতে স্বামী ফিরে এলে স্ত্রী লাল কুসুম্ভ রঙের বেশভূষা করে।

ঠাকুর আনন্দ সিংহের সে কথা খুবই মনে আছে। আরো একটা উদাহরণের কথা তাকে জানালাম। দিল্লীতে কুতব মিনারের পাশে মরচেহীন ক্ষয়হীন লোহার স্তম্ভে তার আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কারিগরের নাম নেই। তার বদলে আছে এমন একজন রাজার নাম, যার কথা ইতিহাসের কোন পাতায় পাওয়া যায় না। অথচ তার বীরত্বের বর্ণনার ঘটাখানা দেখুন একবার! তার ক্ষমতার হাওয়ার চোটে দক্ষিণ সাগর এখনো খোসবুয়ে ভরে আছে। তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

অবশ্য হিন্দু, পাঠান, মোগল সব পূর্ব-দেশীদেরই এই রোগটা সমান ভাবে ছিল। এই ঝোপড়াতেই সুলতান আলতামসের বর্ণনা হচ্ছে যে তিনি পৃথিবীর রাজা, মানুষের শ্রেষ্ঠ মাথার অধিকারী, আরব আর পারস্যেরও রাজা। শুধু পৃথিবীটুকু নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হননি। তিনি ছিলেন এ জগতে ঈশ্বরের ছায়া আর ধর্ম ও পৃথিবীর সূর্য্য।

এই আজমীরেই তারাগড় পাহাড়ের পশ্চিমে খুব সুন্দর বৃক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চশমা-উপত্যকা। সেখানে জাহাঙ্গীর চশমা-ই-নুর নামে একটি মহল বানিয়েছিলেন। তাতে লেখা আছে যে, তিনি সপ্তলোকের রাজা, চিত্রগুপ্তের খাতায় তাঁর সব গুণ লিখবার মত জায়গা নেই। (হায়! সে খাতাখানিতেও হয়ত দোষ-গুণ লিখবার জন্য পাতার র‍্যাশন করা আছে) শুধু তাই নয়। তিনি যখন এই জায়গাতে ঝরণার পাশে এলেন তাঁর দয়ায় হঠাৎ জল বইতে সুরু হল আর সেখানকার ধুলো পর্য্যন্ত পরশমণি হয়ে গেল।

আজও ঠিক এমনি করেই মানুষের মাথায় ফুল-বেলপাতা চড়াতে চড়াতে সেটিকে আমরা এমন গরম করে তুলি যে, সত্যিকারের বড় মানুষরাও স্তাবকদের হাতেই নষ্ট হয়ে যান। খোসামোদে দেবতারাই ভুলে যান। মানুষ ত কোন্ ছার! প্রাচ্যের এই প্রাচীন বিষ যে কি সাংঘাতিক চীজ তা বুঝতেন বলেই মহাত্মা এই নামে ডাকলে গান্ধীজী খুসী হতেন না।

খোসামোদ করতে গেলেই বাড়িয়ে বলতে হবে। কে বলে শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না? আরে মশায়! কথায় মন পর্য্যন্ত গলে যায়।

তাই না কি?

বেশ একটা বসন্তের আমেজ দিয়েছে বাতাসে। মরুভূমির নির্জন দেশে আজমীর একটা বেশ বড়-সড় সহর। তার মধ্যে আবার আনা সাগরের আশে-পাশে একেবারে ওয়েসিস অর্থাৎ মরুদ্যান। এ-হেন জায়গায় ঠাকুর আনন্দ সিংহের মত সুরসিক লোকের অতিথি হয়েছি। বসন্তের আমেজ ত এমনিতেই বইবার কথা। হাসিমুখে বললাম—বাঙ্গালী কবিরা মনের দুঃখে গেয়েছেন—

"ও তোর মনের নাগাল পাইলাম না"।

অথচ আপনি, বাহাদুর লোক, শুধু কথাতেই মন গলিয়ে দিতে পারেন।

ভদ্রলোক কথাটার মধ্যে যেন একটা সুদূর দেহি গোছের

চ্যালেঞ্জের গন্ধ পেলেন। একটু গম্ভীর হয়ে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। যেন তলোয়ার শাণ দিচ্ছেন। রাজপুত ত!

না, মশায়রা, হাসবেন না। জানেন ত গোঁফ আর তলোয়ার দুই-ই রাজপুতের বড় হাতিয়ার, বীরত্বের জবর নিশানা। আপনি যদি খাঁটি রাজপুত হন তাহলে গোঁফে হাত রেখে হলফ করলেই হবে, দিব্বি গালতে হবে না!

গোঁফে তা দিতে দিতে ফেলে আসা দিনের পাতাগুলো সরে গেল। আনন্দ সিং ফিরে এলেন তাঁর মেয়ো কলেজে পড়ার মাতাল করা গোঁফহীন দিনগুলিতে। মরুভূমির মাঝখানে এক অজ্ঞাত ঠিকানা (জায়গীর) থেকে সেকেলে বাপ টাকা পাঠায় ভারী হাতে। ছেলে চৌকস কলেজে লেখাপড়া করে সাহেবী কায়দায়। সাহেবী শিক্ষার সঙ্গে একটি সাহেবী রোগও তাকে ধরল। রাজপুত মাতব্বররা না কি এ বস্তুটিকে রোগ বলেই মনে করেন।

অর্থাৎ ঠাকুর আনন্দ সিং প্রেমে পড়লেন। তা-ও বিলেতী কায়দায়, একটি আধা-বিলেতী তরুণীর সঙ্গে। এখানকার রেলোয়ে ওয়ার্কশপের কল্যাণে এ রকম তরুণীর অভাব নেই আজমীরে।

আজ ঠাকুর সাহেবের সযত্নে কামানো ঠোঁটের উপর জাঁকালো গোঁফ ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আধুনিক সেই প্রেমের নেশা গেছে ছুটে, স্বপ্ন গেছে টুটে। কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন যে, বিলেতী আধা-বিলেতী ছোকরাদের সঙ্গে প্রেমের ঘোড়দৌড়ে পাল্লা দেবার জন্ত তিনি এমন একটা রাস্তা বের করে নিয়েছিলেন যে, তার ধার-কাছ দিয়েও তারা ঘেঁষতে পারেনি। এমনি রঙ ফলিয়ে তিনি মেয়েটির রূপ-গুণের তারিফ করে যেতেন যে সে বেচারী যে হেলেন অব ট্রয় থেকে পদ্মিনী অব চিতোর পর্য্যন্ত সবার চেয়েই বেশী রূপসী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

আপন মনে টিপ্পনী কাটলাম—বিউটি ইজ দি লভার্স গিফট—প্রেমিকের উপহার হচ্ছে রূপ।

মাথা নাড়লেন ঠাকুর সাহেব। উঁহু ঠিক হল না। রূপ হচ্ছে চোখের নেশা কিন্তু তার রস যোগাচ্ছে মুখের ভাষা। সেখানেই প্রেমিকের চেয়ে আপনারা সাহিত্যিকরা বেশী স্থবিধে করতে পারেন।

অর্থাৎ সাহিত্যিকরা প্রেমের খেলায় নামলে বাজার মাৎ করতে পারবেন।—বলতে বলতে সুন্দর কাজ-করা আজমীরী নাগরা জুতো-জোড়া পায়ে গলিয়ে নিলাম। যেন সাহিত্যিকদের এই তাজা সুসংবাদটা এখনি জানানো দরকার। জুতো-জোড়াও আজ সকালেই কিনেছিলাম।

তা মোটেই অসম্ভব নয়,—আশ্বাস দিলেন ঠাকুর সাহেব। আর একটু ফোড়নও দিলেন—যদি অবশ্ব কলমের মতন জিবেরও জোর থাকে।

ওই ত গোলমাল করলেন আপনি—খুব একটা আশাভঙ্গের ভাব দেখিয়ে বললাম। কোন জায়গাতেই যখন জোর থাকে না তখনই কলমে জোর হয়। সে জন্তেই ত সাহিত্যিকদের নিন্দে লোকে হাসি-ঠাট্টা করে নির্ভয়ে নির্ভাবনায়। তা যাক্ সে কথা। বলি,—এই গরীয়সী বিদ্যেটা কোন্ গুরুর কাছে শিখেছিলেন তা একবার চুপি চুপি বলুন না আমায়। এই মরুভূমির দেশে আনন্দ সিং না হয় একজনই ফুলে ফুলে মুকুলিত হয়েছিল। কিন্তু আমার বাংলা মুলুকে চার দিকেই লোকে প্রেমে পড়বার জন্ত তৈরী হয়ে থাকে। একবার আপনার গুরুজীর ঠিকানাটা বাৎলে দিন। তার পর আর আমার পসার মারে কে? সার্পেন্টাইন ল্যানে ভাল ব্যল-বারান্দাওলা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নোটিশ লটকে দেব—

প্রেম-সাগর কার্য্যালয়।

পুষ্কর তীর্থে প্রাপ্ত স্বপ্নাদ্য মন্ত্র।

কিন্তু আনন্দ সিং আমায় একেবারে নিরাশ করলেন। তার বিদ্যাটা শুধু রাজা-রাজড়াদের দরবারে শোনা কাহিনী থেকে শেখা। খোসামোদ আর বাড়িয়ে বলার দরবারী বিদ্যাটা তিনি প্রেমের কারবারে খাটিয়ে অঢেল মুনাফা মেরেছিলেন।

হেসে তিনি শুধু একটা কবিতা আওড়ালেন। এইটি ছিল তার মূল মন্ত্র:—

আগর শাহ রোজরা গোয়াদ শব অস্ত্ ইন্।
বিবায়দ গুফ্‌ৎ বিনম্ মাহ্ ই পরবিন্।

অর্থাৎ

রাজা যদি বলে—দিন হয়ে গেছে রাত।
বলো—চন্দ্র তারা করে জৌলুষে মাত।

ভয়ানক নিরাশ হলাম। ওঃ, শুধু এইটুকু? এই বিদ্যা ত অফিসে ওই খাটাশমুখো র‍্যাস্কেলটা পর্যন্ত তার 'বসে'র কাছে চালিয়ে চালিয়ে ভাল রিপোর্ট পেয়ে আসছে। ওতে কি আর কাজ হবে?

হয়, মশাই, হয়! অফিসে 'বস' আর ঘরে বৌ—এ দুই-ই একই চীজ, মশাই। একই আসমানের চিড়িয়া। শুধু একটু রঙ চড়ানোর ফারাক—এই যা।

সবিনয়ে স্বীকার করলাম। তবে বললাম যে, আমরা সামান্ত প্রাণীরাও আমাদের খুদে কর্তাদের মন ভেজাবার জন্ত বাড়িয়ে বলে থাকি। পাশের বাড়ীর বিনা ভাড়ার রোয়াকে বসে রাজা উজীর মারাতেও কম যাই না।

আনন্দ সিং মানতে রাজী হলেন না। আপনারা লড়াই করেন না, আমাদের সঙ্গে পুরুষালীতে পাল্লা দেবেন কি করে? বলুন ত, রাস্তা দিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী চলে যাচ্ছে; তার কি বর্ণনা আপনারা ইয়ার বকশিদের মধ্যে বসে দেবেন?

ভাববার জন্ত অপেক্ষা করলাম না এক মুহূর্ত্তও। ছেলেবেলায় একটা পত্রিকায় কার্টুন দেখেছিলাম। পাড়ার একটি মেয়ে বাটুল ছাতা হাতে করে চলেছে। কবি গলির মোড়ে রোয়াকে বসে—

ময়ূরপঙ্খী তনু,
ময়ূরের মত পেখম মেলেছে
দেখিয়া উতলা হনু।

'হনু' কথাটার উপর দু'রকম মানে চাপিয়ে সেই পত্রিকায় একটা মারাত্মক রকম ঠাট্টার ছবি এঁকেছিল। ছবিটা মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। আজকের আলাপের মধ্যে বাড়িয়ে বলার বিদ্যায় বাঙালীকে এই রাজপুত বীর যে চ্যালেঞ্জ দিলেন তার জবাবে চটপট এই বর্ণনাটাই ঝেড়ে দিলাম।

হ্যাঁ, ভারী ত বললেন, স্যার! আপনার কর্ম নয়। আপনারা একটু বেশী পশ্চিম-ঘেঁষা হয়ে গেছেন। বিলেতী লেখাপড়া অনেক দিন ধরে শিখেছেন কি না। তবে এই শুনুন, আমি কি বলতাম:—

জ্বলে পুড়ে খাক পরাণ আমার
তুমি হলে কাশ্মীর।
যেথা গেলে পাখা পালক গজায়
কেটে ভাজা মুর্গীর।

অবাক করলেন আনন্দ সিং। যশোরে বসে এক কালে শাহজাদা খুররমের দরবারে যশোর আর কাশ্মীরের আবহাওয়া নিয়ে তুলনা হয়েছিল। সেখানে মৌলানা উর্ফির একটা ফরাসী কবিতা ঝেড়ে একজন খয়েরখান্ কাশ্মীরের হয়ে বাজী মাৎ করেছিলেন। সেই কবিতার ছায়া নিয়ে আজ আনন্দ সিং‌ও টেক্কা দিলেন।

ঠাকুর সাহেবের মনে ততক্ষণে রঙ লেগেছে। তিনি একটার পর একটা কবিতা আউড়ে যেতে লাগলেন। কবি কে তা জানা নেই; কিন্তু তার ভাব আর ভাষার ছটা প্রেমে পড়বার জন্য তৈরী তরুণীদের মন কতখানি ভোলাবে তা পাঠিকারা বিচার করে দেখুন।

চাঁদ কি গোলাই লেকর সাপ কা সা পৈচ ও খুম।
ঘাস কি পাত্তি কি চালকি খের থুড়াৎ বৈশ ও কম।
বৈদ-ই মজনুন কি নজকৎ, বৈল কে বাল কী কুন্তী
বাঁকপন তুম কা—নেবুমি গুল-ই-কোহ্‌সর কী।

• • • •

আগ্ কা তন বুন গয়া ঔর নুর কী মুরত বনী।
শক্‌ল্ ঔরৎ কী বনী কিয়া মোহনী সুরৎ বনী।
চাঁদ থেকে নিয়েছ সুডৌল সর্প হতে তনুর বঙ্কিমা
তৃণ হতে লাবণ্য বিকাশ কম বেশী সুন্দরের সীমা।
আইভির কমনীয় শোভা লতা সম বঙ্কিম বল্লরী
পাহাড়ীয়া গোলাপের বিভা ময়ূরের বর্ণালী লহরী।

• • • •

অনলে ভরানো দেহলতা আনন্দের ছবি একখানি
রমণীয় মূরতি তোমার দরশনে হয়রণ মানি।

হায় বিশ শতকের সাদা-মাঠা লেপা-পোঁছা ইংরেজী কবিতা! হায় রবি ঠাকুরের পরের যুগের বাংলা কবিতা! তোমরা এ যুগে প্রেয়সীর চোখে সুরমা লাগান ত দূরের কথা, তার চোখে সান-গ্লাস এঁটে দিয়েছ। যাতে রামধনুর মায়া সহজে তার নজরে না আসে।

এই দুঃখটি নিবেদন করলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি এখনো ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নতুন প্রেমের কবিতা কি বের হচ্ছে তার খবর রাখেন।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললাম,—কিন্তু এমন অবস্থাও কি কখনো এসেছিল—যখন এ অস্ত্রে আর শানায়নি?

হেসে ঠাকুর সাহেব জবাব দিলেন—হ্যা, একবার খুব মান-অভিমানের পালা হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু তখনো আমি হরেক রকম চেষ্টার মধ্যে এই বিদ্যাকেও হাতে রেখেছিলাম। বলেছিলাম;

হিমানী দিয়েছে শীতলতা
দেবদারু কঠিনতা ভরা;
লৌহ সম কঠিন হৃদয়
হয়ে গেল পাথরেতে গড়া।

বাঃ, বাঃ। এতও ছিল পেটে পেটে? এক কালে রাধা নামে সাধা বাঁশী কৃষ্ণের হাতে যেমন লীলাভরে বাজত ঠিক তেমনি [illegible] এর পূর্বপুরুষদের হাতে মজাসে তরোয়াল খেলত। সে লীলা[illegible] এখন শ্রীমানের হাত থেকে ফিরে এসে ঠেকেছে।

তা, প্রেমের দায় যে প্রাণের দায়ের চেয়েও বেশী।

শুধু তাই নয়। লাউ-কুমড়োর ঘ্যাট খেকো বাঙালীর ধাতে যে বাড়াবাড়িটা বেশী দূর সম্ভব নয় তাও মানতে হবে। [illegible] ত থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। ওর মধ্যে কোথায় পাব কাশ্মীরী কোফতার সোয়াদ আর মুর্গী মুশল্লমের তার?

এই কর্মী ছাঁটাই, ইনকালাব আর গণ-বিক্ষোভের বাজারে কোন্ বাঙ্গালী বাদশার হারেমের নাম-লুকানো কবিদের মত লিখতে পারবে?

গর গবাহ আয়দ সমিপে পিরহন স্ব এ চমন।
তুর্‌চে রা দিল দর-উ-নে গিলে চুঁ গুল বস্‌-এ গুফত।

প্রভাতের বায়ু যদি বয়ে আনে কাঁচুলি সুরভি তব।
হিয়ার কোরক বিকশি উঠিবে—কুঞ্জে কুসুম নব।

এক মনে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়ছিলাম। হঠাৎ রাস্তার একটা ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজে মুখ তুললাম। পাহাড়-প্রমাণ এক টাঙ্গাওয়ালা তড়াক করে তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। একেবারে নিজের স্ত্রীর ভাইয়ের পত্নীর ভ্রাতৃপ্রবর এই ঘোটক মহারাজকে হেঁকে গালাগাল দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তিন মিনিটের মধ্যে তিন মাইল পথ আনা সাগরে যদি সাহেবান সোয়ারদের আমি না পৌঁছে দিতে পারি তাহলে আমি যেন দিল্লীর মসনদে না বসতে পারি!

আর সামলাতে না পেরে বাপ-ঠাকুর্দার নিজস্ব বাংলাতে বলে ফেললাম—সাবাস টাঙ্গাওয়ালা। দিল্লীর মসনদ তোমার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

দিল্লীর মসনদে কেন, যে মহাকালের হাতে মসনদ আর মহারথীরা সমান ভাবে খেলার পুতুল সে মহাকাল কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। আজ এখানে বসে ঠাকুর সাহেবের আধুনিক প্রেমের খেলার কাহিনী শুনে মনে মনে হেসেছি। ছেলেবেলায় আরো একটা প্রেমের গল্প শুনে রাজোয়ারার কাহিনীর দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে হচ্ছে রাজোয়ারার প্রথম বীর, মেবারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা রাওয়ের প্রেমের খেলা। সহজ সরল মেঠো বাঁশীর সুরের মত।

উদয়পুর থেকে দশ মাইল দূরে একলিঙ্গ মহাদেবের পূজার গাঁয়ে শিশু বাপ্পাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার বাবা ছিলেন রাজা; কিন্তু শত্রুরা তাকে মেরে ফেলেছে। মা লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন এখানে। শিশু রাজপুত্র মায়ের ছেলে হয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু তাতে কি হবে? আগুন যদি সত্যি আগুন হয় তা কি কখনো ছাই-চাপা থাকে? সকাল-সন্ধ্যে গরু-চরানর ফাঁকে ফাঁকে বাপ্পা রাখালরাজা হয়ে বসল। রাখালরা তার সব কিছু ভাল দেখে, সব হুকুম তামিল করে।

ঝুলন পূর্ণিমার দিন এল। সব ছেলে-মেয়েরাই ঝুলাতে ঝুলে খেলা করবে। কিন্তু দেবতার মন্দিরের কুঞ্জবনে। গাঁয়ের

রাজার মেয়ে এসেছে। এসেছে সব সখীরা, সব মেয়েরা। কিন্তু রশি আনেনি কেউ। এখন কি করে?

বাপ্পা বেড়াতে এসেছে কুঞ্জবনে। মেয়েরা সবাই ওকে ধরল—দাও রশি যোগাড় করে। না হলে যে ঝুলন হয় না।

বাপ্পা রাজী হল। সে রশি এনে দেবে। প্রাণ ভরে ঝুলে মজা করতে পারো। কিন্তু তার আগে একটা খেলা খেলতে হবে আমার সঙ্গে।

রাজকন্যা শুধোল—কি সে খেলা?

রাখালরাজা উত্তর দিল—এমন বেশী কিছু নয়। শুধু বিয়ে-বিয়ে খেলা

সবাই রাজী হয়ে গেল। বাপ্পার চাদর আর রাজকন্যার ওড়নাতে পড়ল গেরো। ওরা দু'জনে আর এক দুই করে ছ'শ জন মেয়ে হাত ধরাধরি করে গাছের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে নাচল। বিয়ে বলতে ওরা শুধু ওইটুকুই বুঝত, ওইটুকুই জানত। আশা মিটিয়ে তারা গাছের চার দিকে ঘুর ঘুর করে হাত ধরে নাচল। তার পর সুরু হল ঝুলন। সাঁঝে সবাই ফিরে গেল বাড়ী। সবই গেল ভুলে।

বাপ্পার সাথী রাখাল বালকরা কথা দিল যে তারা কেউ একথা ফাঁস করে দেবে না।

এদিকে বাপ্পা যে গাইদের চরাতে নিয়ে যায় তার মধ্যে সেরা ধুংলি গাইটা সন্ধ্যাবেলা এক ফোঁটাও দুধ দেয় না। গাঁও বুড়োরা বলেন বাপ্পা চুরি করে দুধ খায়। কিন্তু বাপ্পা কি কখনো চুরি করতে পারে? সে নিজেই গাইটার উপর কড়া নজর রাখল। দেখল যে ঝোপঝাপ পেরিয়ে গাই কখন চুপিসাড়ে চলে আসে একটি শিবলিঙ্গের কাছে। তার বাঁট থেকে মহাদেবের মাথায় ঝরতে থাকে দুধ আপনা থেকে।

কাছেই এক মহাপুরুষ ছিলেন ধ্যানমগ্ন। বাপ্পা তাঁর ধ্যান ভাঙ্গাল, খবর পেল এক দিব্য জীবনের। সাধুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিল। তিনি ত জানতেন যে এ ছেলে রাখাল নয়, রাজপুত্র। ভারতের সব চেয়ে বড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে একে দিয়ে।

দীক্ষা নেবার পর বাপ্পা স্বপ্নে পেলেন ভগবতী ভবানীর আবির্ভাব। বাঘে চড়ে লাল বস্ত্র পরে এলেন মা ভবানী। বর্শা, তীর আর ধনুক দিলেন বাপ্পাকে। আর দিলেন বিশ্বকর্মার তৈরী দুদিকে ধার-দেওয়া তলোয়ার। শুধু তলোয়ারের ওজনই ছিল আট জন মানুষের সমান।

মহাপুরুষের পৃথিবীর কাজ শেষ হয়ে গেল। তার পর দিন ভোরে তিনি দেহ রক্ষা করবেন। তার আগেই বাপ্পাকে শিবলিঙ্গের কাছে আসতে বললেন।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে বাপ্পা ঠিক সেই ভোরেই ঘুম থেকে উঠলেন দেরীতে। মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আর মিলল না। তার বদলে শূন্যে দেখলেন অপ্সরারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রের রথ। তাতে বসে আছেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন,—বৎস, উপরের দিকে তাকাও—যত পার উপরের দিকে। উঁচুতে তাকাতে তাকাতে বাপ্পা অন্য মানুষদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বড় হয়ে গেলেন।

অবাক হয়ে বাপ্পা ঘরে গিয়ে মাকে সব কথা জানালেন। জানলেন তার কাছে যে বাপ্পা শুধু রাখালের ছেলে নয়, রাজার ছেলে। তার মা হচ্ছেন রাজার ঝিয়ারী। শুনে বাপ্পা প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি আর গরু চরাবেন না, মানুষের মত ভাগ্যের সন্ধান করবেন।

এদিকে রাজকন্যার বিয়ের সময় এল। কিন্তু কোষ্ঠী-বিচার করে পুরোহিত বললেন,—মহা সর্বনাশ, এ মেয়ের যে এর মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেছে।

ধমক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা স্বীকার করলেন যে খেলার ছলে গাছের তলায় তার পুতুল খেলার বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু তারি সঙ্গে নয়; গাঁয়ের ছ'শো মেয়ের সঙ্গে। হাতে হাত ধরা, গাটছড়া বাঁধা, গাছের চার দিকে সপ্তপদী—পাণিগ্রহণের বাকী রইল কি?

বাপ্পা পালালেন তার শৈশবের আশ্রয় ছেড়ে। ছ'শো বিয়ে-করা বৌয়ের বাপের গ্রাম ছেড়ে। চিতোরে এসে মামার রাজ্যে মাথা গুঁজলেন। ক্রমে সেখানেই রাজা হয়ে বসলেন। কিন্তু তার ছেলেবেলায় খেলার ছলে বিয়ে-করা বৌদের ভোলেননি।

কিন্তু রাজস্থানের প্রেমের কাহিনী তার পুরুষের প্রেম নিয়ে নয়। নারীই সেখানে মহীয়সী। রাজোয়ারায় নারীই হচ্ছে রাজসী।

স্বাধীন হিন্দু-সম্রাট পৃথ্বীরাজ, ঘোরীর সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে সব সামন্তদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কি কৌশলে যুদ্ধ করবেন তা বিচার করবার জন্য অন্দর মহলে সংযুক্তার কাছে গেলেন। সংযুক্তা তাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সারা পৃথিবীতে যেখানেই নারী তার নিজের স্বাধীনতা, নিজের অধিকার পায়নি সেখানকার নারীর মনের কথা। তিনি বলেছিলেন,—"মেয়েদের কাছে কে বা পরামর্শ চায়? পৃথিবী মনে করে যে, তাদের বুদ্ধি নেই। তারা যখন সত্য বাণী বলে তখনো কেউ তাতে কান পাতে না।···বিজ্ঞ জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি গুণতে পারে বই দেখে, কিন্তু নারীর পুঁথির তারা কিছুই জানে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমরা তোমাদের সঙ্গে সমান ভাবে সয়ে যাই। আমরা হচ্ছি সরোবর, আর তোমরা হচ্ছ হাঁস! আমরা না থাকলে তোমরা আর কি?"

এই হাঁসের কথায় মনে পড়ল আর এক রাজসী রাজকন্যার কথা। বাদশা আওরঙ্গজেবের প্রতাপ যখন সব চেয়ে বেশী তখন তিনি চেয়ে পাঠালেন রূপনগরের রূপসী রাজকন্যাকে। মাড়োয়ারের ছোট এক রাজত্ব হচ্ছে রূপনগর। সাধ্য কি তার দিল্লীশ্বরের হুকুম অমান্য করার! তার উপর তলবের সঙ্গে এল দু' হাজার ঘোড়সোয়ার। বাদশার বেগম যিনি হবেন তার উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে বৈ কি।

কিন্তু রূপনগরী এই বিয়েকে কেমন সম্মান বলে মনে করলেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ পড়ে সব বাঙালী জানে। রাজস্থানে তখন মেবারের রাণা রাজসিংহের বীরত্বের জয়গান চলছে ঘরে ঘরে। তিনি কি আসবেন না এই অসহায়া রাজকন্যাকে রক্ষা করতে? এ-কথা সত্যি যে, অম্বরের মত বড় রাজাও দিল্লীর হারেমে মেয়ে পাঠিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু যদি কোন রাজপুত-নারী তার বংশের সম্মান, হিন্দু নারীর ধর্ম রক্ষা করবার জন্য আশ্রয়-ভিক্ষা করে রাজপুত-বীর কি সে আশ্রয় দেবেন না?

"রাজহংসী কি বকের সঙ্গিনী হবে ? বিশুদ্ধ বংশের রাজপুতানী কি বাঁদরমুখো বর্বরের বৌ হবে ?"

রূপসীও যে বসুন্ধরার মত বীরভোগ্যা, সে কথাও রূপনগরী তার গোপন আমন্ত্রণে জানিয়ে দিলেন। রাণা রাজসিংহের বীরত্বের কীর্তিতে রাজকন্যা মুগ্ধ হয়ে আগে থেকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করে রেখেছিলেন। বহু দিনের পরিচয় নয়, প্রথম দর্শনে নয়, শুধু বীরত্বের কথা শ্রবণেই যে প্রেম, সে প্রেম রাজপুতানীর পক্ষেই সহজ, স্বাভাবিক।

বীরপূজায় তার সৃষ্টি, বীরত্ব দিয়ে তার সাজ।

শেখ সাদীর একটা কবিতা আছে—

চুন জান-ই-হিন্দি কাশে দার আশিকি মর্দানা নেস্ত।

শক তাউ বার্ক শাম-ই-কুস্তা কার-ই-হার পরোয়ানা নেস্ত।

ভালবাসাতে হিন্দু মেয়েদের মত এত সাহসী আর কেউ নেই। সব পতঙ্গই ত আর নিবে-যাওয়া মোমবাত্তির আগুনে পুড়ে মরতে পারে না ?

কিন্তু সে মোমবাতি যখন আঁধার ঘরে কামনার শিখা জ্বালিয়ে জেগে থাকে তখনো রাজপুত-নারীর সাহসের অভাব থাকে না। অম্বরের আঁধার প্রায় শিষমহলে মোমবাতি জ্বালিয়ে কাচের মধ্যে তার হাজার হাজার ছায়া দেখতে দেখতে এমনি একটা কাহিনী মনে পড়েছিল।

জয়সিংহ হাড়া (হর) বংশের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। জয়পুরী কাছোয়ারা মোগলের সভ্যতার রস পেয়েছে। দিল্লীর মারফৎ পেয়েছে সারা দুনিয়ার হাল-ফ্যাসনের সুন্দরীদের হাব-ভাব, পোষাক-আশাক। আশাক কথাটার মানে ধরে নিলাম প্রেমের ধরণ। প্রেমের ধরণ বস্তুটা যে কি তা মোগল হারেমের রূপসীরা খুব ভাল করেই জানতেন।

কিন্তু রাজপুত অন্দর মহলের মহিলারাই বা কম যাবেন কেন ? হিন্দু শাস্ত্রেও ত প্রিয় প্রসাধন বলে একটা বিদ্যা আছে। তার উপর আছে দিল্লীর আমদানী নতুন ধরণ-ধারণ। জয়পুরের সুন্দরীরা তাদের লেহ্‌ঙ্গার ঝুল ছেঁটে ফেলতে লাগলেন। ক্যা বেশরম কী বাত।

রঙীন ঘাগরার নিচের সুঠাম চরণের কিঙ্কিণী আব্রু থেকে ছাড়া পেয়ে অম্বরের মার্বেলের মেঝেতে ঝমঝম বাজতে লাগল। বিনা বাধায়, পুরুষের মনে ঝঙ্কার তুলে।

জয়সিংহ তার নতুন রাণীর ঘাগরার লম্বা ঝুল নিয়ে ঠাট্টা সুরু করলেন। জয়পুরের সুন্দরীরা তাদের রূপ দেখাতে জানে, মন ভোলাতে জানে। কোটার সুন্দরী কি পিছনে পড়ে থাকবেন ?

এই না বলে তিনি কাঁচি তুললেন ঘাগরা ছাঁটবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রাণী তুললেন—কি ? অভিমান নয়, নয়ন-বাণ নয়, এমন কি গোসা-ঘর পর্য্যন্ত নয়। সোজাসুজি তার স্বামীরই তলোয়ার। শাসিয়ে দিলেন যে আবার যদি কোন দিন পতিদেবতা তার মান-ইজ্জত নিয়ে বেয়াদবী করেন তাহলে তিনি হাড়ে হাড়ে তাকে সমঝিয়ে দেবেন যে অম্বরের পুরুষের ছুরি চালানর চেয়ে কোটার মেয়ের তলোয়ার চালানর বাহাদুরী অনেক অনেক বেশী।

গণোরের রাণী তার স্বামীর কাছে পরলোকে চলে গেলেন এমনি ভাবে বীর মহিমায়। একের পর এক করে পাঁচটি দুর্গ তিনি হারালেন। পাঠান সৈন্যদের কিছুতেই রুখতে পারলেন না। তার স্বামী এর মধ্যেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। নর্মদা-তীরে শেষ ঘাঁটিতেও যখন তার হার হল, পাঠান সেনাপতি প্রস্তাব পাঠালেন যে যুদ্ধ ত শেষই হয়ে গেছে। এখন রাণী তার দেশ আর খানের হৃদয়ে রাজত্ব করলেই সব দিক রক্ষা হয়। হাতে হাতে উত্তর পাবার জন্য খান নিজে রাজবাড়ীর নিচের তলায় অপেক্ষা করছিলেন। কাজেই রাজী নই, এই জবাবে কোন লাভ নেই।

রাণী রাজী হলেন। শুধু তাই নয়; খানের যুদ্ধে আর নারীর প্রতি ব্যবহারে বীরত্ব দেখান দুইয়েরই প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন। আরো লিখলেন যে, এ-হেন শিভ্যালরীতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। খানকে তিনি বরণ করবেন স্বামিরূপে। নিজে হাতে তাকে বিয়ের পোষাক সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। বর বেশে আসুন খান। বরনারী তাকে ছাদের উপর উপযুক্ত ভাবে জাঁক জমকের মধ্যে বরণ করবেন। রাণীর সঙ্গে বিয়েতে রাজার যোগ্য ভাবেই আয়োজন করতে হবে। এ দেশে সাধারণ রাজপুতানীর আটপৌরে পোষাকই যে রাজপোষাকের মত ঝলমল করে।

মাত্র দু'টি ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। বিয়ের আয়োজন এর মধ্যেই সেরে নিতে হবে। হাতে সময় যত কম, জাঁকজমক ঠিক ততই বেশী। নহবতের বাজনার সুরে দু' দলই যুদ্ধের বাজনার কথা ভুলে গেল। বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাণী প্রেমে পড়েছেন। তার নিজে হাতে পাঠানো পোষাক, গণোরের রাজবংশের সব দামী জহরৎ পরে ছাতে উঠে এলেন খান। হঠাৎ পাওয়া প্রেমে, বীরত্বের প্রশংসায় এমনিতেই দিশেহারা ছিলেন তিনি। রাণীর রূপ দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সুরসিকা, কথায় পটু নাগরীর মোহিনী প্রভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কোথা দিয়ে ঘণ্টাগুলো যেন নিমেষের মত কেটে যেতে লাগল।

এদিকে খানের গা গরম হয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন যে প্রেমের তাপ এরকমই হয়। যুদ্ধে জয় করে রাজ্য লাভ করার চেয়ে বীরত্বে মন ভুলিয়ে সে রাজ্যের রাণীকে লাভ করা—সে যে অনেক বেশী বাহাদুরী। পৃথিবীতে আর কোন বীর এ-হেন প্রেম পাবার মত কপাল করেছিল ? খান দেহে মনে গরম হয়ে উঠলেন।

মাতাল-করা সরবতে আর দরকার নেই। মন গেছে উতলা হয়ে; শরীরে জ্বলে উঠেছে আগুন। এখন ঠাণ্ডা খাবার জলই যথেষ্ট।

কুজো থেকে দেওয়া হল ঠাণ্ডা জল; ঝালর-দেওয়া পাখা দিয়ে সখীরা বাতাস করতে লাগল জোরে। বাসর-শয্যা যে তৈরী।

খান তাড়াতাড়ি তার বরবেশ খুলে ফেলতে লাগলেন। এ কি বাসরে দোসরের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হওয়া! মিলন-রাত্রির পরম লগ্ন কি এলো এখন ?

হ্যাঁ এলো বৈ কি। একই পথে গেলেন দু' জনে। একই সময়ে। গরম আর সইতে না পেরে খান বরবেশ জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু ততক্ষণে সে পোষাকের কাজ খুব ভাল ভাবেই এগিয়ে গেছে। রাণীও তার বধূবেশ খসিয়ে ফেললেন। গম্ভীর ভাবে বললেন, তোমায় এখন জানিয়ে দিচ্ছি, খান, যে তোমার সময় হয়ে এল। আমাদের মিলন আর আমাদের বিচ্ছেদ একই সময়ে সুরু হবে। এই পোষাকে বিষ মাখান আছে। বিষের জ্বালায় তুমি

এখনি মরবে। আর এই আমিও চললাম আমার স্বামীর কাছে।

কেউ কথা কইবার আগে, বাধা দেবার আগে রাণী দুর্গের চূড়া থেকে নীচে নর্মদার জলে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলেন। খানও বিষের জ্বালায় মারা গেলেন। তার কবর ভূপাল যাবার পথে এখনো দেখা যায়। লোকে বলে এই কবরে সিন্নি দিলে এখনো না কি জ্বরের জ্বালা সেরে যায়।

দূরে শ্যামল বাংলা দেশে বসে পাঠিকারা হয়ত এই পর্যন্ত পড়ে এই লেখাটা পাশে সরিয়ে রাখবেন। মুচকি হেসে বলবেন—যত সব গাঁজা গল্প। বন্ধুরা এখনি বলছেন—যত রাজা-রাজড়ার আজগুবী কাণ্ড নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে সুরু করেছি। যে সময়কার সঠিক ইতিহাস জানানো গল্পের মধ্যে মিশিয়ে হারিয়ে গেছে সে সময় নিয়ে নাড়াচাড়ার কোন মানে হয় না। যে রাজা রাজড়ারা অতীতের বস্তু তাদের নিয়ে আর টানাটানি কেন? একশ বছরের উপর ধরে বাংলা সাহিত্য রাজস্থানের গান গেয়েছে। এখনো, এই গণতন্ত্রের যুগে আর কেন?

আমিও বলি তাই। আমারো এক মত। তবু একটা জবাব দিই। পাড়ার পাইকিরী রোয়াকে বসে রাজা-উজীর মারা ত আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাধনা। আমিও ত সেই রাজা-উজীরই মারছি। তফাতের মধ্যে রোয়াকে বসার বদলে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ান, পাষাণে কান পেতে তার অতীতের গুমরে-ওঠা কান্না শোনা। চিরকালের রাজোয়ারার রাজসী কাহিনী আজকের দিনের পটভূমিকায় নতুন করে বলা। এক হাজার বছর পরে দেশ আবার স্বাধীন হল। নতুন পথে নতুন জগতে তার যাত্রা। আজ আমাদের কতো দরকার প্রতাপ আর শক্তের নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে ভাই ভাই এক ঠাঁই দাঁড়ান। কতো দরকার সোয়াই জয়সিংহের মত বাইরের পৃথিবীর সব নতুন বিদ্যাকে নিজেদের দেশে টেনে আনা, পদ্মিনীর মত দেশের বিপদে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি দেওয়া। একদিন দেশ ছিল শুধু রাজার মাথা ব্যথা, আজ সেটা আমাদের সকলের সমান দায়িত্ব। ত্যাগে আর সাধনায় সবাকার ধন। যে গুণ, যে বীরত্ব আমরা দেখেছি শুধু রাজা-রাণীদের মধ্যে তাকে পেতে হবে আমাদের সকলের মধ্যে। জনসাধারণই এই যুগে রাজা রাণী।

দিল্লী কলকাতার রাস্তাঘাট মানুষের চেহারা দিনের পর দিন বদলিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন ঘর-বাড়ী কারবার মাথা তুলে আকাশের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। নিওন আলোতে অমাবস্যার রাত আলোময়। আমি এখানে যশলমীরের সীমাহারা মরুর মধ্যে পথ খুঁজে চলেছি। এখনি আঁধার নামবে রাশি রাশি বালিয়াড়ির মধ্যে বাসর জাগতে।

পঁচাত্তর মাইল দূরে ভারতের শেষ রেলষ্টেশন। পিছনে পশ্চিমের দিকে হলদে পাথরের বিরাট যশলমীর দুর্গ। যেন আকাশের গায়ে আঁকা ছবি। তার চূড়ায় রাজবাড়ীর সীঁথিতে সিন্দুর মাখিয়ে সূর্য্য অস্ত গেল।

শেষ রাতে প্রথম আলোর রেখা জাগতে দেখেছিলাম এভারেষ্টে। মানুষের ভাঙা-গড়া খেলা তুচ্ছ করে হিমালয় অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্য্যে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ আর কুয়াশার মায়া তাকে ঢেকে রাখতে পারবে না।

দিনশেষের প্রথম আঁধারের মধ্যে অনুভব করলাম মরুভূমিকে। মানুষের লোভ, হিংসা হানাহানির কত ঘটনা হয়ে গেছে এই বালির বুকে। তবু তার শান্তি আর আভরণহীন রূপকে নষ্ট করতে পারেনি কেউ। মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা থেকে মধ্যযুগের আধো অসভ্যতা পর্য্যন্ত উটের পিঠে পশরা নিয়ে ক্যারাভান চলেছে; ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বীরবেশে বর। ছুটে চলেছে হিংসায় উন্মত্ত সেনাদল। সে যাত্রার কথা মরুভূমি নিমেষে ভুলে আবার ধ্যানে ডুবে গেছে।

মানুষ কিন্তু ভোলেনি এই মরুদেশের বীরগাথাকে। তার বীর আর বীরাঙ্গনাদের। তাই ত বার বার ছুটে আসি এখানে। ভাঙা দেউলে আর দুর্গের দেওয়ালে, মরুর বাউরের কোণে কান পেতে শুনি তাদের বাণী। দু' হাতে অঞ্জলি পেতে তুলে নিতে চাই তাদের প্রাণরসের ধারা। সে রসে নতুন জীবন পাবে আমার স্বাধীন দেশের নতুন নর-নারী। সাধারণ জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের কাহিনীও হবে মহিমময়ী—রাজসী।

সমাপ্ত

মেঘলা আকাশ

পারমিতা মিত্র

মেদুর আকাশ, কান্নার দিন, রাত নিঃঝুম।
তারাদের চোখে তন্দ্রাজড়িমা যুগান্ত ঘুম।
গানের পাখীরা নীলিম-স্বপ্নে মেঘে ফেরার,
রিম ঝিম রিম মেঘ-মল্লার সুরু এবার।
শ্রাবণের নেশা পাতার সবুজে। আষাঢ়ের ঢল
নবান্ন-সোনা মাঠের স্বপ্নে। ঢেউ টল-মল
পানকৌড়ির টুপ-টুপ ডুবে। বিহঙ্গ-মন
জলসিঁড়ি-মেঘে উধাও। আকাশে নীল-নির্জন।
ঝড়ের পাখীরা অসীমে বিলীন মল্লার তানে।

[উপন্যাস]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপে বসে বয়োজ্যেষ্ঠ সত্য ঘোষালের সঙ্গে গল্প করছিলেন পশুপতি। গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে, স্কুল এখন বন্ধ। সুতরাং গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ বেলায় পশুপতির এখন প্রচুর অবসর। অত্যন্ত আদরের ভগিনী রাধা ভাগ্যহারা হয়ে সংসারে ফিরে আসায় বর্ষীয়ান্ সত্য ঘোষালের দেহ মন যেন এক সঙ্গে ভেঙে পড়েছে। বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগে না, মেয়েটাকে দেখলেই বুকখানা যেন দমে যায়, কথা বার হয় না মুখ দিয়ে। তার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসলে, আর পশুপতিকে পেলে তিনি অনেকটা শান্তি পান। হাজার হোক, পশুপতি পণ্ডিত লোক, শাস্ত্র পুরাণের প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করেন, শুনতেও ভাল লাগে। দেখতে দেখতে গ্রামের লোকও এসে জোটে। চাষের ব্যাপারে গ্রামের চাষী মজুরদের সঙ্গেও অন্নবিত্তের সংশ্রব এঁদের থাকায়—ফুরসদ পেলে তারাও আসে। নিম্নশ্রেণীর লোক হলেও, চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসবার জন্য আলাদা মাদুর জাতীয় 'ঝাঁতাল' নামক বস্তু গুটানো থাকে, এরা এসে নিজেই পেতে বসে। কর্তৃপক্ষের কেউ তামাকের ডেলা নিক্ষেপ করেন এদের দিকে; এদের বুঝতে ভুল হয় না, তৎক্ষণাৎ সেই ডেলা থেকে দরকার মত অংশটুকু কেটে নিয়ে ডলাই মলাই করে কলিকায় ভরে। দাওয়ার এক পাশে থাকে আগুনের মালসা; বাসের আকারে শুষ্ক বিল-ঘুঁটে ও তুষের সাহায্যে তার মধ্যে আগুনকে জীইয়ে রাখা হয়। পল্লী অঞ্চলে চণ্ডীমণ্ডপের এটিই একটি বিশিষ্ট উপাদান এবং এই ভাবে তামাক সাজাটিও সুপরিচিত। লোকসংখ্যার অনুপাতে এক সঙ্গে তিন চারিটি কলিকা প্রস্তুত করা হয় এবং মজলিসে হাতে হাতে ফিরতে থাকে। বলা বাহুল্য, নিম্নশ্রেণীর অভ্যাগতেরাও এই মধুর তাম্রকূট সেবায় বঞ্চিত হয় না।

পশুপতি ইদানীং নানা প্রকার আধ্যাত্মিক কথা তুলে সত্য ঘোষালের শোক তপ্ত অন্তরে শান্তিধারা বর্ষণের চেষ্টা করেন এবং তাঁকে বলেন: রাধুকেও এমনি করে বোঝাবেন। আপনাকে বলাই বাহুল্য, অভিভাবকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন মেয়েকে এমন ঘরে দিতে, তার অদৃষ্ট মন্দ হলেও যেন আবার গলগ্রহ না হয়, কিম্বা পথে এসে না দাঁড়ায়। আপনি গোড়াতেই ভুল করেছিলেন, একান্নবর্তী কোন বড় সংসার দেখে রাধুকে দেবার চেষ্টাই করেন নি। সাবেক সংসার থেকে পৃথক হয়ে ছেলে বেরিয়ে এসে নূতন সংসার পেতে বসেছে, ভালো উপার্জনও করছে, এই দেখেই আপনি ভুলে গেলেন। জামায়ের অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাধুকে চোখে অন্ধকার দেখতে হলো, আপনাকেই ছুটে গিয়ে নিয়ে আসতে হলো। কিন্তু গোড়াতেই ছিল দাদা আপনারই দোষ।

বিস্ময়ের সুরে সত্য ঘোষাল বলে ওঠেন: আমার দোষ! তুমি এ কথা বলছ পশু?

পশুপতি বলতে লাগলেন: হ্যাঁ দাদা, যেটা সত্য তাই বলছি। রাধু যদি উপযুক্ত শিক্ষা পেত, স্বামীর ঘরে গিয়েই আগে স্বামীর ভুল ভেঙে দিত, জোর করে বলত—বিয়ের আগে ঝগড়া করে আলাদা হয়েছিলে, এখন বিয়ে যখন করেছ,—আবার সেখানে ফিরে চল ঝগড়াঝাঁটি সব মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু রাধু তা করেনি, ভাঙা সংসারও মিলে মিশে এক হয়নি। তাহলে আজ তাকে তোমার গলগ্রহ হতে হবে কেন? তবে এখনো হয়ত মিটমাট করা যায়—কিন্তু সেটা খুব শক্ত।

সত্য ঘোষাল জোর গলায় বললেন: সে অসম্ভব—হতে পারে না, ও কথা ছেড়ে দাও ভায়া! এখন মেয়েটা যাতে এখানে থেকে শান্তি পায়, যে জ্বালায় দিন-রাত জ্বলছে, তার একটু উপশম হয়—সেইটে করতে হবে।

পশুপতি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: দেখুন, দুঃখ জ্বালা হচ্ছে আমাদের নিত্য সাথী। সংসারে থাকতে হলে এর দহন সইতেই হবে। তবে আমরা ত সব দিকেই হিসাব করে চলি, কাজেই এই জ্বালার মধ্যেই কিছুটা আরাম খুঁজে নিয়ে শান্তি পেতে চাই। তখন সত্যই মনে হয়, যে দুঃখ জ্বালা জীবনে উপভোগ করেছি, তার কিছু সার্থকতা হয়ত আছে। এই জন্যই সংসারে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে অভ্যস্ত হই। শেষ পর্যন্ত আমরা যদি এই লড়াইকে ফতে করতে পারি, তাহলে দুঃখ জ্বালার আর ভয় থাকে না—কেন না, আমরা তাকে জয় করে ফেলেছি। এই সময়কার আনন্দ সত্যই উপভোগ্য, এর তুলনা নেই। রাধুকে তাই সেদিন বোঝাচ্ছিলুম—'দুঃখ জ্বালা অনেক পাবে মা, কিন্তু শক্ত হয়ে সইতে হবে। এগুলো মনকে অনেক রকমে নাড়া দিয়ে বিরক্ত করে তুলবে, হয়ত আশার কোন আলোও দেখাবে, কিন্তু তোমাকে স্থির হয়ে থাকতে হবে, ভগবান যে দণ্ড দিয়েছেন, তাঁরই দান ভেবে সইতে হবে। এর পর দেখবে, তিনি নিজেই আনন্দময় হয়ে তোমার দেহ মন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশ ও সমাজের বড় বড় মহীয়সী মহিলাদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে, অল্প বয়সে বৈধব্যের জ্বালা ভোগ করেও তাঁরা আনন্দময়ীরূপে দেশ ও জাতির কত কল্যাণ করে গেছেন, আনন্দ দিয়েছেন।' এখন দাদা, রাধুকেও আপনি সংসারে এমন করে লিপ্ত করে দিন, ও জানুক—তার জীবনের যা কিছু কর্তব্য এদের সেবায়, এদের অভাব দুঃখ মোচন করে আনন্দ দেওয়ায়।

পশুপতি এই ভাবে উপদেশ দিচ্ছেন ; চণ্ডীমণ্ডপে প্রথমে ছিলেন সত্য ঘোষাল ও পশুপতি, পরে এলেন পাড়ার আরও অনেকে—চাষী মজুররাও দু-চার জন এসে জুটেছে। পশুপতির কথাগুলি সকলেই নিবিষ্ট মনে শুনছে। এমন সময় একটু তফাতে রাস্তাটার বাঁকের মুখ থেকে মিলিত কণ্ঠের স্বর শোনা গেল : ওগো হালদার মশাই—

শব্দ শুনে পশুপতি হালদার মুখের কথা বন্ধ করে সামনের দিকে তাকালেন। গ্রামের দুই প্রৌঢ় ব্যক্তি শিবরাম ও নরহরি তখন আরো একটু এগিয়ে এসে চেঁচাচ্ছিল : চেয়ে দেখেন ত—কে এসেছে ?

পশুপতির সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সকলেই দেখলেন—হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি এক যুবক অবলীলাক্রমে সুবৃহৎ একটি সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছে।

চেয়ে চেয়ে দেখবার মত চেহারা বটে ! এমন সুশ্রী শ্রীমান্ সর্বাঙ্গসুন্দর যুবা এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। পশুপতি প্রথম দৃষ্টিতেই চিনলেও, সত্য ঘোষাল বা পাড়ার বাসিন্দারা স্থির করতে পারেন নি যে, পশুপতি হালদারের পুত্র ললিতই দীর্ঘকাল পরে স্বগ্রামে উপস্থিত হয়েছে। তবে যে দু'টি লোক আগে থেকেই চীৎকার করছিল, পথেই আলাপ করে তার পরিচয়টি জেনেছিল। আর, প্রবাস থেকে গ্রামের ছেলে নিরাপদে গ্রামে এসেছে শুনে পশুপতির বিশেষ আহ্লাদ হবে ভেবেই তারা গ্রাম্য পরিভাষায় মিলিতকণ্ঠে খবরটির আভাস দিচ্ছিল।

চলার পথ, আশে পাশের ঘর-বাড়ী, আর সামনের চণ্ডীমণ্ডপটির দিকে চাইতে চাইতে ললিত ধীরে ধীরেই আসছিল। সিঁড়ির কাছে এসে সে সলজ্জ ও বিস্মিত গ্রামবাসীদের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুটকেশটি নামিয়ে রেখে প্রথমেই ভূমিষ্ঠ হয়ে পিতাকে প্রণাম করল। তার পর সত্য ঘোষাল এবং অন্যান্য কতিপয় বর্ষীয়ান গ্রামবাসীকে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল : আমি ললিত। আপনাদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি—আমাকে চিনতে পারেন নি।

পশুপতি বললেন : কি করে চিনবেন বল ? বারো তেরো বছর বয়সে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলে, তার পর আর একটা যুগ কেটে গেছে ; চেনা কি সহজ কথা !

সত্য ঘোষাল মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন : পথের ওপর নজর পড়তেই আমার মনেও এমনি একটা সন্দেহ হয়েছিল ; মনে মনে ভাবছিলুম, এমনি সময়—

ললিত বলল : আপনাকে আমি কিন্তু চিনেছি জেঠামণি—রাধার আপনি মামা বাবু !

সত্য ঘোষাল ধরাগলায় বললেন : আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক বাবা, সুখী হও, মনস্কামনা পূর্ণ হোক। তোমাদের ছেলেবেলার খেলা, ঝগড়াঝাঁটি, চড়িভাতি, হৈ-হুল্লোড়—সবই মনে পড়ছে। দেবী আর রাধি ছিল তোমা-অন্ত প্রাণ—ওদের 'ললিতদা' ডাক এখনো যেন কানে বাজছে। সে খেলাঘর নেই, কিন্তু খালি জমিন পড়ে আছে, সে দিকে তাকালেই তোমাদের কথা মনে জেগে ওঠে। রাধি এখনো তার মায়া কাটাতে পারেনি, বাইরের দিকে এলেই সদাই হাসিখুসি, আবুদে মেয়ে কি দশা হয়েছে, সব ত শুনেছ ? এখন এক মুঠো ভাতের কাঙাল হয়ে সেই মামার বাড়ীর ওপরেই ভর করতে হয়েছে—বরাত, বরাত !

সত্য ঘোষালের কথাগুলি শুনতে শুনতে ললিতের চোখ দু'টি ছল-ছল করতে থাকে, গলার স্বর গাঢ় হয়ে ওঠে, আর্তকণ্ঠে সে বলতে লাগল : কিন্তু আমারও এমনি বরাত, রাধার বিয়ের খবরটিও পাইনি। সেদিন বাবার চিঠিতে জানলুম, স্বামীকে হারিয়ে সে আবার মামার বাড়ী ফিরেছে। এ খবর পেয়ে আর থাকতে পারলুম না, আসবার খবর না দিয়েই—

পুত্রের আকস্মিক আগমনে পশুপতি বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন উপলক্ষটি বুঝে বললেন : তাহলে আমার চিঠি পেয়েই চলে এসেছ বল ? কিন্তু এত ব্যস্ত না হয়ে চিঠি পাঠালেও পারতে।

ললিত বলল : অপরাধ নেবেন না বাবা, রাধার ব্যাপারে আমার মনে হলো, আমাকে যেন পর করে রাখা হয়েছে। তার বিয়ে হলো, সে খবরটিও আমি পেলাম না, জানি না আরো কত খবর—

সত্য ঘোষাল বললেন : রাধার বিয়ের সময় তার খেলার সাথীদের আনবার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পড়ার ক্ষতি হবার ভয়ে তোমার বাবাই আপত্তি করেছিলেন। বড় আশা ছিল—বগলা সপরিবারে আসবে, কিন্তু তারাও আসতে পারেনি। এ জন্যে রাধার কি দুঃখ ! দেখা ত হবেই, সব শুনবে'খন।

পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠে সস্নেহে পুত্রকে বললেন : বাড়ী চল, হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হও, সারা রাত ত—

ললিতও সবিনয়ে বলল : আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ীতে ভীষণ ভীড় ছিল, সারা রাত বসেই কাটিয়েছি, ঘুমাতে পারিনি। চলুন।

হাতের ব্যাগটি মেঝের উপর রেখে ললিত এতক্ষণ কথা বলছিল। এখন হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিল। পশুপতি জনৈক চাষীকে লক্ষ্য করে বললেন : গোপীনাথ, এটা নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দাও ত।

আদেশটি শুনেই শশব্যস্ত ভাবে যেন কৃতার্থ হয়ে সে ব্যক্তি ব্যাগটি নেবার জন্যে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার আগেই ললিত সেটি তুলে নিয়েছিল। গোপীনাথকে তৎপর দেখে স্নিগ্ধ স্বরে সে বলল : না, না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না—আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি। বামুনের ছেলে হলেও ভারি জিনিস বইতে আমি ভয় পাইনে, আর সে সামর্থও যখন আছে।

ললিতের কথাগুলি অনেকেরই অন্তর স্পর্শ করল, সত্য ঘোষাল সহর্ষে বললেন : বেশ, বাবা বেশ। এই ত মানুষের মত কথা। জানো বাবাজী, এই গ্রামে সবার চেয়ে আমার বয়স বেশী, কিন্তু দৈহিক খাটা-খাটুনিতে সবাই আমার নীচে।

পিতার পিছু পিছু ললিত বাড়ীর দিকে চলল। গ্রাম্য প্রতি-বেশীরাও গৃহাভিমুখী হলেন। কেবল কৃষী-মজুর কয়জন চণ্ডী-মণ্ডপ থেকে নীচে উঠানে নেমে পরামর্শ করতে লাগল যে, এত বেলায় হালদার মশায়ের ছেলে এলেন, উনিও বামুনপণ্ডিত মানুষ, ভাতে-ভাত আর দুধ-কলা হলেই যথেষ্ট, কিন্তু জোয়ান ছেলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ত করা চাই।

তাদো—এমনি, কে কি দিয়ে অবিলম্বে হালদার মশায়ের বাড়ীতে হাজির হবে। যেতে যেতে এরা বলতে থাকে: সংসারে মা-ঠাকরুণ ত নেই—ওনাদেরই সব করতে কর্মাতে হয়। কত কাল পরে ছেলে এসেছেন—তাঁর তরে সেবা যত্ন করাও ত গাঁয়ের মনিষ্যির কাজ গো! মোরা কি চুপ করে থাকতি পারি? চল চল।

হালদার ঠাকুরের বাড়ীতে বহু দিন পরে তাঁর ছেলে এসেছেন, বাড়ীতে মা-ঠাকরুণ নেই; তাহলেও তারা যখন একই পাড়ায় রয়েছে, ঠাকুরকে দেখাশোনা ত তাদেরই দায়—একটা বড় রকমের কর্তব্য। কাজেই, যার বাড়ীতে বা ক্ষেতে-খামারে, পুকুরে ঠাকুরদের সেবার লাগাবার মত যা যা আছে—পটোল, ঝিঙে, ফুটি, কাঁকুড়, শাকসব্জী, মাছ, দুধ এই সব, তাড়াতাড়ি যোগাড় করে আনবার জন্ম এরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটল। পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত কৃষী-সমাজও পল্লীর গৌরবস্বরূপ উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি দেশের এই দুর্দিনেও এমনি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন।

আহারাদির পর পশুপতি শয্যায় আশ্রয় নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এর আগেই তিনি পাশের ঘরে ললিতকে বলে গেছেন—'সারা রাত গাড়ীতে যখন ঘুম হয়নি, খানিকটা ঘুমিয়ে নাও আগে, তার পর যাদের সঙ্গে দেখা-শোনা করা দরকার—যেও।' কিন্তু তিনি ঘুমালেও ললিতের চোখে ঘুম আসেনি, সে জানালায় বসে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে চেষ্টা করছিল, কাছেই কি কি পরিচিত স্থান আছে—এখান থেকে দেখা যায়, আর দেবীর সঙ্গে সেই স্থানগুলিতে সে খেলা করত।

কিন্তু স্থানগুলির অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও, ললিতের মনে হয়—প্রত্যেকটি চেনা জায়গা, এখন হয়ত তার ওপর গাছ-পালা হয়েছে; আগে যেটা খালি পড়ে ছিল—এখানে সেখানে বাগান হয়েছে, কোনখানে বা গরুর গোয়াল উঠেছে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানটি এত দিন পরে দেখেও সে চিনেছে। দেবীকে নিয়ে এই সব জায়গায় কত ছুটাছুটি করেছে, কত রকমের কত খেলা। একটি একটি করে অতীতের কথা ললিতের মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনটি বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে—বর্তমানের কথা ভেবে। সে ত আবার ফিরে এসেছে, পরিচিত জানালার গরাদের উপর মুখখানা রেখে সবই দেখছে; কিন্তু দেবী এখন কোথায়? সেও যদি আজ এখানে থাকত, এই জানালায় এসে তার পাশটিতে বসত তাহলে—

'ললিতদা?'

ঘরের দরজার কাছ থেকে নারীর কোমল কণ্ঠের এই ডাকটি শুনে ললিত শিউরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, একটি মেয়ে দরজার এক পাশের চৌকাঠটি ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার চুলপাড় একখানি কাপড়, তার আঁচলটা ঘোমটার মত করে সীমন্ত পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, মুখের কিছুটা দেখা যাচ্ছে! অতীতের চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল ললিত, কল্পনায় কত দৃশ্যই সে দেখছিল, অকস্মাৎ এই বাস্তবদৃশ্য চোখে পড়তে সচকিত হয়ে ললিত জিজ্ঞাসা করল: কে?

মূর্তি এগিয়ে এসে জানালায় উপবিষ্ট ললিতের সামনেই মেঝের উপর ঢিপ করে মাথা ঠুকে বলল: আমাকে চিনতে পারলে না ললিতদা'? জানালায় বসে চেয়ে চেয়ে ত সব দেখছিলে, চিনতে পার কি না—তার মধ্যে রাধাকে মনে পড়ল না?

উৎফুল্ল হয়ে জানালা থেকে উঠে তক্তপোষে বিছানো বিছানার উপর বসতে বসতে ললিত বলল: ওহো—তুমিই তাহলে রাধা? দেখ কাণ্ড—বাবার চিঠিতে তোমার কথা পড়ে মনটা এমনি খারাপ হয়ে গেল যে, আর সেখানে তিষ্ঠুতে পারলুম না, কোন খবর না দিয়েই চলে এলুম! কোথায় আমি যাব তোমাকে দেখতে, তা নয়—তুমিই আগে এলে, আর—আমি কি না তোমাকে চিনতেও পারিনি! এরকম কাণ্ড কখনো দেখেছ?

মুখ টিপে হেসে রাধা বলল: ও এমন হয়—কত কাল পরে দেখা বল দেখি, মাঝে কতগুলো বছর চলে গেছে, দেখা-শোনা দূরে থাক—এক-আধখানা চিঠিও কেউ কাউকে লেখেনি, এতে কি হঠাৎ দেখে চেনা যায়?

ললিত বলল: আমাকে ত তোমরা সবাই মিলে পর করে রেখেছ। এত দিন একাটি সেখানে কাটিয়েছি। এই দেখ না, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমাকে একখানা চিঠিতেও কেউ খবরটা দেয়নি! বাবার চিঠিতে সেদিন খবর পেলুম—কি বিশ্রী বল ত? চিঠিতে সব জেনে আমার মনে যে কি কষ্ট হয়েছিল—তা আর কি বলি? রাতে ঘুমুতে পারিনি। ঐ জানালায় বসে বাইরে চেয়ে চেয়ে আগেকার সেই সব কথা ভাবছিলুম, খেলা করিছি, ভাব করিছি, আড়ি দিয়েছি, ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু তবুও কত আনন্দে থাকতুম! আবার সেই আগেকার দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

রাধা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল: সে দিন আর এ জীবনে আসবে না ললিতদা'! ঐ যে দেবী—গাঁয়ের কথা একেবারে ভুলে গেছে, ওদের কেউ কোন খবর আমাদের রাখে? তোমার সঙ্গে ত দেবীর কত ভাব ছিল, একটু চোখের আড়াল হলে কি ছটফটানি! কিন্তু এখন একেবারে চুপ! তোমাকে চিঠিপত্র কিছু দেয়?

মুখখানা ম্লান করে ললিত বলল: কিচ্ছু না! আমি ত চিঠি দিয়েছিলুম, কিন্তু তার জবাব কি পেয়েছি? বাবাকে দেবীর কথা লিখতে জানালেন—এখন খালি পড়াশোনা কর, ওরাও পড়াশোনা করছে। এখন চিঠি লেখালিখি ঠিক নয়। সেই জন্যে ত চিঠি লিখি না।

: আচ্ছা, দেবীকে তোমার মনে আছে? দেখলে চিনতে পার?

: তুমি বলছ কি? দেবীকে আমার মনে নেই! জানো, চোখ বুজলেই তাকে দেখতে পাই!

প্রশ্নের জবাবটি শুনে রাধা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে, বিস্ময়ে মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। তাকে নির্বাক্‌ দেখে ললিত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গলায় একটু জোর দিয়ে বলতে থাকে: চুপ করে রইলে যে—বিশ্বাস হলো না? জানো, সারা রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি দেবীকে স্বপ্নে দেখি! কত কথা হয়, দু'জনে হাত ধরাধরি করে কত জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াই। তাহলেই বল—তাকে ভুলতে পারি?

রাধা বলে : ভারি তাজ্জবের কথা ত ! স্বপ্নে দেবীকে দেখ, তার সঙ্গে বেড়াও, গল্প কর—বা ! তাহলে ত তুমি দিব্যি আছ ললিতদা' ! ওদিকে, দেবীও যদি এমনি করে তোমাকে স্বপ্নে দেখে, তাহলে ত—

রাধার কথায় বাধা দিয়ে ললিত বলল : এ হচ্ছে এক রকম সাধনা—বুঝেছ ? প্রিয়জনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও, যদি তাকে একাগ্রচিত্তে ভাবা যায়, তার মূর্তি—চেহারা মন থেকে না মুছতে চায়, তাহলে আমাদের অবচেতন মন জুড়ে সে ত থাকবেই। জানো, আমাদের ছেলেবেলাকার ভালবাসা বাজে নয়, মিছে নয়, ছেলেখেলা নয়। তুমি ত জানো, শুনেওছ—হরগৌরীর মন্দিরে আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে হরগৌরীকে বলেছি—যেন আমাদেরও এমনি মিলন হয়। ছেলেবেলার সে কথা আমি কোন দিন ভুলিনি।

: তুমি ত ভোলনি বুঝছি, কিন্তু দেবী যদি ভুলে যায় ? সে যদি তোমার কথা মনে না রাখে ?

: সে হতেই পারে না ; তবে আমি কিসের সাধনা করছি ? আমাকে সে ভুলতে পারে না।

ললিতের মুখে দৃঢ়তার ভঙ্গি দেখে রাধা পুনরায় বিস্ময়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাকে নিরুত্তর দেখে ললিত বলল : বুঝতে পারছি, আমার কথাগুলো তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা আমি তোমাকে এমন কতকগুলি জিনিস দেখাব, তুমি তাহলে বুঝতে পারবে—আমি বাজে কথা বলি না। কাশীতে গিয়ে অবধি আমি দেবীকে নিয়ে কি রকম সাধনা করেছি, তাও বুঝতে পারবে। অথচ, বাবার কথারও আমি অবাধ্য হইনি—পড়াশোনায় ফাঁকি দিইনি। যদিও আমি ওখানকার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশতাম না, তবুও ওখানে আমি ভাল ছেলে বলেই সুনাম পেয়েছি। সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতরা আমাকে দেখলেই বলেন—সত্য যুগের ছেলে।

রাধা বলল : কি জিনিস সব দেখাবে বললে ?

তাড়াতাড়ি উঠে ললিত বলল : দেখাচ্ছি। দেখ, আমার মনটা ভারি ভুলো—খালি খালি ভুলে যাই। দেবীর কথা হলেই এ রকম হয়। দাঁড়াও সুটকেসটা আমি—ওরই মধ্যে সেগুলো আছে।

ঘরের দেওয়ালের দিকে থাক দিয়ে সাজানো সেরাটপ দেওয়া তোরঙ্গগুলির উপর ললিতের প্রকাণ্ড সুটকেসটি ছিল। সেটি সেখান থেকে তুলে বিছানায় এনে রাখল ; গায়ের ফতুয়ার পকেট থেকে চাবিটি বার করে তালাটি খুলতেই বিগত পরিমিত একই আকারের বোর্ডে আঁকা ছবির বাণ্ডিলগুলি দেখা গেল। বেছে বেছে বিভিন্ন বাণ্ডিল থেকে কিছু-কিছু আঁকা ছবি রাধার সামনে বিছানার উপর বিছিয়ে দিয়ে ললিত বলল : যার ছবি তাকে ত পাচ্ছি না—তুমিই দেখ।

সামনে সাজানো ছবিগুলি এক একখানি তুলে রাধা দেখতে থাকে। দেবীর শৈশব কালের সেই বয়সের ছবি—যখন ললিতের সঙ্গে তার নানা রকম খেলা-ধুলা চলত। যদিও তখনকার ছবিগুলি খুব সুন্দর বা চোখে লাগবার মত হয়নি, তথাপি ছবি দেখেই চেনা যায় যে—মেয়েটি আর কেউ নয়, দেবী। বিস্মিত হয়ে চোখ দুটো বড় করে ললিতের দিকে চেয়ে রাধা বলে : তুমি এঁকেছ ললিতদা' ? কি করে আঁকলে বল না ? ওখানে গিয়ে ছবি আঁকার বিদ্যে শিখেছিলে বুঝি কোন ইস্কুলে গিয়ে ?

মুখখানা বিকৃত করে ললিত বলে : দূর ! ইস্কুলে গিয়ে আবার আঁকা শিখলুম কবে ? এ সব আমার নিজের আঁকা, অবিশ্যি দেবীর যে ফটোখানা পেয়েছিলাম—সেইটিই হচ্ছে আমার আদর্শ, তাই দেখে এই ছবি এঁকেছি।

ললিত পর পর সাজিয়ে দেয় ছবিগুলি—রাধার সুবিধার জন্য। পরের ছবি দেখে সে আরো বেশী রকম বিস্মিত হয়ে ওঠে—এ ছবিতে আঁকা দেবীর চেহারা দেখলে মনে হয়, তার বয়স যেন তিন চার বছর বেড়ে গেছে। রাধা বিস্ময়োল্লাসে গলায় জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : ওমা, একি ? দেবীর বয়স এত বেড়ে গেছে। কিন্তু সে কলকাতায়, তুমি কাশীতে, দেখা সাক্ষাৎ নেই—কি করে তবে বয়েস বাড়িয়ে আঁকলে তার ছবি ? ভারি আশ্চর্য্য ত !

ললিত বলল : তবে বলছিলাম কি ? সে কলকাতায় গেলেও, আমি ত তাকে ভুলে যাইনি ? বললুম না আমার বুকের মধ্যে তাকে ধরে রেখেছি—চোখ বুজলেই দেখতে পাই, রাতে ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে তাকে দেখি। আমি কি ভাবতুম জানো—আমার বয়স যেমন বাড়ছে বছরে বছরে, সেও ত তেমনি বড় হচ্ছে ; সেই ভেবে বয়স বাড়িয়ে তার ছবি এঁকেছি।

এমনি করে পরে আঁকা ছবিগুলিও ললিত রাধাকে দেখায়। রাধার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে ; মনে মনে ভাবে—এ কি অদ্ভুত মানুষ ললিত দা, এমন তো কখনো শুনিনি ! চোখে না দেখে, শুধু অনুমান করে বয়স বাড়িয়ে ছবি আঁকা ! সত্যিই, ললিতদা' বাড়িয়ে কিছু বলেনি—সাধনা ছাড়া এ সব হয় না। শেষের ছবিগুলি দেখতে দেখতে রাধা মুখখানি ম্লান করে বলল : ইচ্ছে করছে ছবিগুলি নিয়ে কলকাতায় যাই—দেবীকে দেখাই, তার বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি ঠিক হয়েছে কি না ! কিন্তু সে ত হবার নয়—সেদিকটা যে এখন অন্ধকার !

কথাটা ধরেই ললিত জিজ্ঞাসা করল : কেন—অন্ধকার বলবার মানে ? হবার নয় বললে কেন, এক দিন ত হবেই—তবে ?

রাধা বলল : এমনি বলছিলুম। দেবীর বাবা ত গিয়ে অবধি গাঁয়ের খোঁজখবর রাখেন না ; দেবী কিম্বা রাণী গ্রামের কাউকে কোন চিঠিপত্রও দেয় না। তোমার বাবাকেই যা কালে ভদ্রে কখনো কিছু কিছু খবর দিয়েছেন। তাতেও না কি দেমাক দেখিয়েছিলেন শুনতে পাই। তাঁর এত কাজ যে নিজের গাঁয়ের খবর রাখেন, তার অবসরও নেই ! মেয়েরাও দিনরাত পড়া নিয়ে আছে, তিনি তাদের আধুনিকা না করে ছাড়বেন না। তাহলে এখন বোঝ—তোমার দেবী আধুনিকা হচ্ছেন।

ললিত একাগ্রমনে কথাগুলি শুনছিল, শেষের 'আধুনিকা' কথাটার উপর জোর দিয়ে রাধা বলতে, সেও গলায় জোর দিয়ে বলল : সে ত ভাল কথা গো, যদি সে আধুনিকা হতে পারে। আধুনিকা হওয়াকে তোমরা কি খারাপ বলতে চাও ? আধুনিকা মেয়ে বলতে কি তোমরা সেই সব মেয়েদের বোঝ—যারা সাজ-পোষাকের বাহার তুলে হল্লোড় করে বেড়ায় ? না, তা নয়—আধুনিকা বলতে আমি তাকেই বুঝি—মনের জোরে যে নতুন কিছু করে তাক লাগিয়ে দেয় ; নিজের মনে যেটি ভাল ভাবে, তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে ;

নিজের বুদ্ধিতে যে ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বুঝে নিতে পারে; সেই ত সত্যিকার আধুনিকা।

কথাগুলি রাধার ভাল লাগল না; মৃদু হেসে বলল: শুনিছি, তুমিও অনেক পড়া-শোনা করে পণ্ডিত হয়েছ, আধুনিকা মেয়েদের সম্বন্ধে তাই ওকালতি করলে; কিন্তু এখানে সবাই জানে, খুব লেখা-পড়া শিখে লজ্জা-সরম কাটিয়ে যারা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, গুরুজনদের কোন তোয়াক্কাই রাখে না—তারাই হচ্ছে আধুনিকা।

ললিত মৃদু হেসে বলল: এ নিয়ে তর্ক করে ফল নেই। দেবীর সম্বন্ধে তুই যাই বল না কেন, আমি কিন্তু মনে মনে জেনে রেখেছি, লেখা-পড়া শিখে খুব যদি বিদুষীও সে হয়, আমাদের ছেলে-বয়সের সে-সব কথা কিছুতেই সে ভুলবে না।

রাধা বলল: তাহলে এক কাজ কর ললিতদা', কলকাতায় নিজে গিয়ে ওদের সংগে দেখা কর। তোমাকে দেখলে দেবী কি বলে, তোমার সম্বন্ধে তার মনের কি ভাব, নিজে জেনে এস। আর যদি দেখ—তোমার কথা মনে নেই, ভুলে গেছে, তখন ছবিগুলি তাকে দেখাবে, তাহলেই—

রাধার কথায় বাধা দিয়ে ললিত বলল: না, আমি নিজে থেকে ওদের খোঁজ-খবর নিই, বাবা সেটা পছন্দ করেন না। বাবার অমতে আমি কিছু করতে চাই না। তবে বাবাকে এক বার কলকাতায় যাবার কথা বলব; কেন না, এ পর্য্যন্ত কখনো কলকাতা আমার দেখা হয়নি। যদি বলেন, তাহলে রথ দেখা আর কলা বেচা দুটো কাজই হবে—কি বল?

একটু মুচকি হেসে রাধা বলল: রসিকতাও জান দেখছি! আমি এতক্ষণ ভাবছিলুম, পশ্চিমে-পাহাড়ে দেশে থেকে মনটাকেও পাথর করে ফেলেছ—দেবী ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু জানো না, কিন্তু দেখছি—তা নয়!

ললিত বলল: তা যদি বল—এক দিক দিয়ে আমিও আধুনিক। কথা অনেক জানি, কিন্তু সেগুলি স্থান-কাল-পাত্র বুঝে হিসেব করে বলি। কথার মত কথা শুনলে জবাব দিই, নতুবা মুখ বুজিয়ে থাকি, আমি যতদূর জানি, আর মনে হয়—দেবীর স্বভাবটিও এমনি, আর সেও এমনি আধুনিকা।

রাধা বলল: সে হিসেব ত করিনি; কিন্তু একই মানুষকে নিয়ে একই ভাবে তোমার মত কাউকে বাপু ঘ্যানোর ঘ্যানোর করতে দেখিনি। এসে অবধিই ত খালি—দেবী, দেবী, দেবী। বলি, এই যে এতগুলো ছবি এঁকেছ, সবই ত দেখছি দেবীর! দেবী ছাড়া গাঁয়ের আর কোন ছেলে মেয়ের সঙ্গে মেশোনি কোন দিন? চেন না আর কাউকে? কই, তাদের কারও ছবি ত একখানাও দেখতে পেলুম না? ভেবেছিলুম, হয়ত আমার ছবিও অন্ততঃ একখানা এঁকেছ দেখব! কিন্তু পোড়া কপাল আমার—সে গুড়ে বালি!

ললিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর ধীরে ধীরে বলল: এর জন্যে আমাকে তুমি বৃথাই দুষছ! গোড়াতেই ত বলেছি, এ আমার সাধনা। দেবী ছাড়া আর কারও ছবি আমি আঁকতে পারি না—কিছুতেই না; তাহলে আমার সাধনা যে পণ্ড হবে।

রাধা একটু উৎক হয়ে জিজ্ঞাসা করল: কেন?

ললিত এর উত্তর দিল: জানো, রাবণ সীতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অশোক-বনে লুকিয়ে রাখেন, তার পর সীতার জন্যে রাম-রাবণে লড়াই বাধে, আর রাবণের সেরা সেরা সেনাপতিরা একে একে রামের হাতে প্রাণ দিতে থাকে; তখন নিরুপায় হয়ে রাবণ অকাল নিদ্রা থেকে দুর্দ্ধর্ষ ভাই কুম্ভকর্ণকে না জাগিয়ে আর পারলেন না। কুম্ভকর্ণ তখন রাবণকে বললেন—এত সব হাঙ্গামায় কি দরকার ছিল দাদা! তুমি ত পরম মায়াবী, ইচ্ছা করলেই রামরূপ ধরে সীতাকে ভোগ করতে পারতে! সে কথা শুনে রাবণ উত্তর দিলেন—'কথাটা বলেছ ঠিক, কিন্তু ভাই ভাবনায় চিন্তায় আর ভোগে এখন আমার পক্ষে ওটা সম্ভব নয়! রাম-মূর্ত্তি ধরতে হলে রামের রূপ নিয়ে সাধনা করতে হয়, কিন্তু সেই সাধনার শক্তি যে আমি হারিয়ে ফেলিছি ভাই!' আমিও তাই বলি—যারই ছবি এভাবে আঁকতে বসবো, তারই মূর্ত্তি আমাকে ধ্যান করতে হবে। কিন্তু এক দেবী ছাড়া আর কারও মূর্ত্তি আমি কি ধ্যান করতে পারি—না উচিত? দেবী যে আমার সমস্ত অন্তরটা জুড়ে বসে আছে, সেখানে অন্যের স্থান ত নেই। সেই জন্যই আর কারও ছবির কথা আমি ভাবিনি।

রাধারও সমস্ত অন্তরটি কেঁপে ওঠল: সত্যই ত—ললিতদা' কত বড় কথা বলেছেন! তাঁর মনে-প্রাণে চলেছে দেবীর জন্যে সাধনা, সেখানে কি তিনি আর কাউকে স্থান দিতে পারেন? পরক্ষণে রাধা আঁচলটি গলায় দিয়ে পূর্ব্ববৎ মেঝের উপর মাথাটি ঠেকিয়ে প্রণাম করতে করতে বলল: আবার তোমাকে প্রণাম করছি ললিতদা', তুমি মস্ত জ্ঞানের কথা বলেছ; এখন বুঝছি—সত্যই তুমি সাধনা কর, তুমি সত্যিকার সাধক, তোমার এই মহা সাধনা সার্থক হোক।

[ক্রমশঃ।

আমার এ ক্ষুদ্র দীপখানি

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

আমার এ ক্ষুদ্র দীপখানি,
বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ল'য়ে, সংকোচের লজ্জা মনে মানি
তুলে দিনু আজি তব হাতে।
এ দীপের আলো দিয়ে উৎসবের রাতে—
জানি মনে, মিটিবে না কোন প্রয়োজন:
ব্যর্থ করে দিবে সে যে—সে রাতের সর্ব্ব আয়োজন।
তা'র চেয়ে ভাই—
গৃহকোণে দিও এ'রে ঠাঁই।
যতটুকু সাধ্য এ'র আলো দিয়ে যদি দিবে যায়,—
রহিবে না ক্ষোভ মনে—লভিবে না অসম্মান তা'য়।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

(৪)

বিদ্যাসমবায় : বিশ্বভারতী

ইতিপূর্বে নানা সময়ে জাপানের মনীষী ওকাকুরা, প্রতীচ্যের শিল্পী রোদেনষ্টাইন, জার্মাণীর পণ্ডিত কাইজারলিং ইত্যাদির সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটেছে; কবি বিলেত ও আমেরিকা ঘুরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন, ভাবুক ও আদর্শবাদী নানা মহলে নানা বিষয়ে আলাপ হয়েছে; আমেরিকা থেকে পত্রে জগদানন্দ বাবুকে লিখছেন (১৯১৩)—"আমার ইচ্ছা ওখানে (শান্তিনিকেতনে) দুই একজন যোগ্য লোক এক-একটি ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন তাহলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। এখানে কয়েক জন খুব ভালো বাঙালী ছাত্র বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করছেন …আমি যদি এঁদের মত লোক দিয়ে ওখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি তাহলে সেটা ক্রমশ খুব বড়ো হয়ে উঠতে পারে। এইটেই আমার অনেক দিনের সংকল্প—জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া চাই—সেই হাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিত ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে।" এই সময়কার আরেকখানি পত্রে লিখেছেন,—"মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?"

অতঃপর ১৩২২ সনে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন,—"আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।"

"জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।" এই জ্ঞানের দানসত্রে নিম্নসাধারণের জন্য ব্যবস্থা থাকা যে কত প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে কবি বলেছেন,—"এমন কথা যারা বলে নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে; তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালীর পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।"

জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র প্রসারণের প্রতি কবির মনের অভিমুখীনতা একটি বিশেষ ঘটনার বেগের সঙ্গে বাস্তবতা কার্যে পরিণত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী আশ্রমে তাঁর আশানুরূপ প্রশস্ততর সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্র না পেয়ে স্বগ্রামে গিয়ে টোল খুলবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গবেষণার সুযোগ দিয়ে আশ্রমে ফিরিয়ে আনবার কথা ভাবতে থাকেন। এই থেকে তাঁর মনে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ক্রমে আরো পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি সে সময় 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে বলেন,—

"…আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।"

"আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্শি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিক ভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"

"পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে: এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে

আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। লইবার জন্ম অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্মও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্য ভাবে লইতেও পারিব।"

১৩২৬ সনে কবি লেখেন,—"মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।"

প্রায় চৌদ্দ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের আদর্শ ব্যাখ্যা ক'রে 'শিক্ষার বিকীরণ' নামক বক্তৃতা দেওয়ার কালে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের উদাহরণ দেখিয়ে কবি বলেছিলেন—"পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই; সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেন না, এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।" (শিক্ষার বিকীরণ ১১৩৩)।

১৩২৫ সনের (১১১৮) ২২শে আশ্বিন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে "অনেকগুলি গুজরাটি ব্যবসায়ী কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কবি তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথম তাঁহার 'বিশ্বভারতী' পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। শান্তিনিকেতন ভারতীয় নানা জাতির মিলনভূমি হইবে, এই আদর্শ সকলকেই যেন উৎসাহিত করিল।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ৪১১) অতঃপর ঐ সনেই আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের পরদিন ৮ই পৌষে টেনিস গ্রাউণ্ডে 'বিশ্বভারতী'র প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়।

'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন, "বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন অধ্যাপনা শুরু হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। ব্রাউনিং-এর বহু দুরূহ কবিতা এই সময়ে তাঁহার কাছে আমাদের পড়া। এণ্ড্রুস্ পড়াইতেন সমালোচনা, ম্যাথু আর্নলডের প্রবন্ধাবলীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি আলোচনা করিতেন ইংরেজি সাহিত্য। বিধুশেখর ভট্টাচার্য যাঁহার উদ্যোগে এই বিভাগ খোলা হয়, তিনি পড়ান হিন্দুদর্শন, শ্রীযুক্ত ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির নামক একজন সিংহলদেশীয় ভিক্ষু বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রথীন্দ্রনাথ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মৈথিলী পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র পাণিনির ব্যাকরণ পড়ান। ...জ্ঞানানুশীলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলাবিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা হইল।...রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন, 'বিশ্বভারতী, যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।' সুরেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও নন্দলাল এই ত্রয়ীর যোগে কলাভবনের পত্তন হইল।...

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রেরা সংগীত শিখিত অজিতকুমার চক্রবর্তী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট। রবীন্দ্রনাথের গানই ছাত্রেরা শিখিত।...দুই জন হিন্দুস্থানী মুসলমান ওস্তাদ আনানো হয়।...সেই হইতেই মার্গ সংগীতের প্রবর্তনা।...তারপরে আসেন মহারাষ্ট্র যুবক ভীমরাও।... আমাদের আলোচ্য পর্বে আসিলেন নকুলেশ্বর গোস্বামী।...বাংলা দেশের ওস্তাদী গানের ধারা মিলিত হইল উত্তর-ভারতের মার্গ সংগীতের সঙ্গে।... বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্য প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। ত্রিপুরা হইতে বুদ্ধিমন্ত সিং নামে বিখ্যাত এক নৃত্যশিল্পীকে আনানো হয়। (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ৩য় খণ্ড পৃ ২০-২১)

ইতিমধ্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকে বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে কবির ও শান্তিনিকেতনের যোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কেবল ভারতবর্ষের সীমায় বিশ্বভারতীর কাজ সীমাবদ্ধ রইল না। কবি লিখছেন,—"ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ।" (বিশ্বভারতী ১৩৪২)

শুধু পুঁথিপত্রে নিবদ্ধ বিদ্যাসমবায় নয়, সংস্কৃতির জীবন্ত বাহক বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের 'চিত্তসমবায়' ঘটাবার কথাও কবির কাছে অপরিহার্য ব'লে উদ্ভাবিত হল। তিনি বললেন,—"কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের উপাসনার বিনিময় হবে না।" হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার আমন্ত্রণ ছেড়ে—বিশ্বভারতীতে এলেন আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি। প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর ১৩২৮ সনের "৮ই পৌষ প্রাতে শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-সভা হইল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন অলংকৃত করিলেন। এই সভায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত হইল এবং বিশ্বভারতীর জন্ম যে বিধান (Constitution) প্রণীত হইয়াছিল তাহা গৃহীত হইল।" (রবীন্দ্রজীবনী) বাইরে বিশ্বভারতীর আদর্শ মনীষীদের কাছে কী ধারণা জাগিয়েছিল, আচার্য শীলের ভাষণের মধ্যে তা অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন,—

"এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক-বালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৫১, ১৩২৮) এ প্রসঙ্গেই আচার্য শীল শান্তিপূর্ণ এক আদর্শ বিশ্বসমাজ গঠনের কার্যকর ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,—"সর্ব মুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। এদের এই Mass Life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।"

"যদি Social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না।"—"আজ-কাল য়ুরোপে Group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে Political organization, economic organization, এ সবই Group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যা পূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে ষ্টেটের Centralization ও Organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও Group Principal দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সে জন্যে বলছি না যে town life-কে develop করবে না; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে (ভূমির সঙ্গে owner-ship-এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual owner-ship-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে Large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energy-কে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায় প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে! এমনি ভাবে economic organization-এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ এত নিম্নস্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organization-এর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজন সাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে স্টেট, রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইনষ্টিট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই ষ্টাডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা Coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।" (বিশ্বভারতী পৃ ১৬৫-৬৬, ১৩২৮)

এর পরে যথারীতি বিশ্বভারতীর কাজ চলতে থাকে। আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর বার্ষিক উৎসবে কবির ভাষণে পরে-পরে যা প্রকাশ পায়, তার থেকে দু'চার কথা নিয়ে সংকলিত করে দেওয়া গেল।—"সেবা করবার, ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে।"

"আজকের দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সংস্কৃতির ও সর্বদেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদের সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে।" (বিশ্বভারতী ১৩২৯)

"এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম—যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, জলধারা সকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।"…

"আমাদের শাস্ত্রে বলে অবিদ্যা অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানিনে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন।

"সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে, এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে এই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে।" (বিশ্বভারতী ১৩৩২)

"ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা।"

১৯১২ সনে (১৩১৯) সুরুলের কুঠিবাড়িখানি কবি রায়পুরের কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের নিকট থেকে ক্রয় করেন। দশ বছর পরে ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সেখানে মিঃ এলমহার্ষ্ট "গ্রাম-পুনর্গঠন কেন্দ্র" স্থাপন করিলেন। এক দল কর্মী নিয়ে তিনি স্বাবলম্বনের আদর্শে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও বিশেষ করে কৃষির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। কিছুদিন পরে তিনি আমেরিকায় চলে গেলে শান্তিনিকেতনের সন্তোষকুমার মজুমদার এসে ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সন অবধি এ প্রতিষ্ঠান চালনা করেন। তাঁর সময়ে শান্তিনিকেতনে 'শিক্ষাসত্রে'র পত্তন হয়। পরে তা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়ে অদ্যাবধি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের ছেলেরা স্বল্প ব্যয়ে এ বিভাগে থেকে ম্যাট্রিক অবধি এখন শিক্ষা পেতে পারে। পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষারীতি-শিক্ষণের জন্য 'শিক্ষাচর্চা' নামক আরেকটি বিভাগ এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। প্রধানত এলমহার্ষ্টের অর্থেই শ্রীনিকেতনের ব্যয় নির্বাহিত হয়ে এসেছে বহুদিন ধ'রে। পল্লীর শিক্ষার সঙ্গে পল্লীশিল্প ও পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজও শ্রীনিকেতনের কর্মসূচীর অন্যতম বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রতিষ্ঠানের 'নীতি' ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন,—"পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবী কালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে, তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টি-কাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে এবং আমাদের ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে।...

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দ-প্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে।" ১৩৪৫ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এর মধ্যে তাঁর মনের মূলগত সেই সমবায় যোগে সর্বাঙ্গীন বিকাশের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ ক'রে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও তাঁর এ আদর্শকে সক্রিয় করতে চান। এলমহার্ষ্ট সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—

"It should be India to lead the way towards co-operation for life, fuller and more abundant life, both spiritual and material, because the memory of such a life in the past is not yet dead, and the will to sacrifice material acquisition for the persuit of high ideals and spiritual gain is perhaps more alive in the soil of India to-day than anywhere else in the wide world."

শ্রীনিকেতনের কাজ বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেন স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ। রথীন্দ্রনাথ বহু দিন এর কর্ণধার ছিলেন। স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যও পর-পর সে কাজে ব্রতী হন। বর্তমানে শ্রীনিকেতনেরই প্রাক্তন সেই প্রথম কর্মীদলের অন্যতম সভ্য শ্রীধীরানন্দ রায়ের উপর সে ভার ন্যস্ত আছে। এখানে নানা সময়ের মধ্য দিয়ে নানা কাজের প্রবর্তনা হয়। সমবায় স্বাস্থ্য-সমিতির কাজটি আশে-পাশের গ্রামাঞ্চল ও বোলপুর সহরে বিশেষ প্রসার লাভ করে। শিশু ও মাতৃমঙ্গল বিভাগটি নূতন যুক্ত হয়েছে—পল্লীসংস্কার বিভাগের সঙ্গে ব্রতীবালক দলের কাজও চলছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা শ্রীনিকেতনে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্বোধন হয় ১৯২৯ সনে; পরের বৎসর ১৯৩০ সনেও শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের সম্মেলনেও কবি যোগদান করেন।

আর্থিক দিকেও সকলের সমবায়ী শক্তিতে ধনসম্পদ সৃষ্টি করে তোলবার চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে 'ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়েছে। কুটিরশিল্প বিভাগে সাধারণ শ্রেণীর বহু লোক, তাঁত, কাঠ, চামড়া ও মাটির কাজ শিখে নিচ্ছে। গ্রামের তাঁতীরা 'শিল্পভবনে'র সাহায্যে কাপড় বুনে জীবিকা উপার্জন করছে। গৃহস্থঘরের মেয়েরাও নানা রকম শিল্পচর্চা করবার সুযোগ পাচ্ছে শ্রীনিকেতনের সংস্রবে থেকে। বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও সেখানে হয়েছে। কবি বলেছিলেন—"এখনকার কালের সাধনা লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে, সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। নিজেকে পঙ্গু ক'রে ভাল হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনো-একটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।" শ্রীনিকেতনের মধ্যে দিয়ে কবির সে কথারই সার্থকতা প্রতিপন্নের চেষ্টা সুগোচর হচ্ছে। সকল কথার শেষে কবি এই শ্রীনিকেতনের ক্ষেত্রেও বলেছেন,—"মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরুক রাখতে পারি।" বিদ্যাচর্চার দ্বারা চিত্তসম্পদই হোক, আর, অর্থ ও কৃষিশিল্পাদি চর্চা দ্বারা বিত্তসম্পদই হোক,—যে ভাবে যেদিক দিয়েই যত সৃষ্টি বা উপার্জন হোক না কেন, সে সবই সমবায় আদর্শে সমাজের সকলের কাজে লাগা চাই। তবেই তার দ্বারা সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হতে পারে। যার যেদিক দিয়ে শক্তির বিকাশ সম্ভব, সে তার শক্তিকে

সেই দিক দিয়েই সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করবে। সমাজও তার জন্ম উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে তৎপর থাকলে সেখানে আর ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরোধ-বাধার কারণ থাকে না। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যে মানুষের শক্তি বিকাশের সেই সমবায়যুক্ত সর্বমুখী বিকাশের পথ সৃজনের প্রয়াস করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ দু'জায়গায় মিলিয়ে বিশ্বভারতীতে আজ নানা বিষয় শিক্ষার নানা বিভাগ রয়েছে। নানা দেশের নানা জাতির লোকই তা শিখতে পারে। সামাজিক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পরম লক্ষ্য সাধনের জন্ম বিশ্বভারতীর উদ্বোধনের দিনে বিশ্বসমাজের সকলকে আহ্বান জানিয়ে কবি যেদিন উচ্চারণ করলেন—"আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা," সেদিন কেবল ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা নয়, সকল দেশের সমাজ ও সভ্যতার জন্যই শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার দ্বার সকল দিকে প্রসারিত হল। বিদ্যালয়ের জন্ম বিদেশের দান গ্রহণে যে-কবি আগে অস্বীকৃত হয়েছেন, পরে তিনি নিজেই দেশে দেশে তা সংগ্রহ করে ফিরেছেন। (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ: ৪৩১) এক কালের তপোবনের বিশেষ আদর্শ ও কর্মপ্রণালী নূতন ও আধুনিকতর এই বিশ্বপরিবেশগত বিস্তীর্ণ বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এসে স্বভাবতই নানা দিকে পরিবর্তিত হতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া, নৃত্যগীত, সামাজিক ব্যবহার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, ভাষা ও শিক্ষার বিষয়ে পরস্পর আদান-প্রদানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উদারতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বৈদেশিক পণ্ডিত, ভ্রমণকারী, পরিদর্শক, ছাত্র ও অতিথি ইত্যাদি কত লোকের যাতায়াত ঘটতে শুরু হল। এঁদের মধ্যে স্থায়ী ভাবে এলেন এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন ও এলমহার্স্ট। কবি এঁদের পেয়ে বলেছেন—"আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্ম অনেক করছি,—আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করেছি আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এ ত আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান।" (বিশ্বভারতী পৃ ১১২-১৩)

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা সার্থকতা পাবে সেখানেই, যেখানে দেশী ও বিদেশী সকলেই অনুভব করবেন, এটি সকলেরই ঘর। বিদেশীর কাছে এ আশ্রম সে রকম ঘরোয়া আবহাওয়াই জোগাতে পেরেছে। তাঁরা এখানকার সম্বন্ধে বলেছেন,—

"Life was lived in common, in comradeship." এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন, "Children would imbibe education as they imbibe food." (See Santiniketan P. 9)

আজ পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনের রূপটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। পুরোনো লোকজন কমে গেছে। বাড়িঘরের চেহারাও গেছে পাল্টে। নূতন দিনের পরিচয় বিচিত্র। তার 'ভবন'-গুলির কথা জানা দরকার। বিশ্বভারতীর শুরু থেকেই 'বিদ্যা-ভবনে'র কাজ চলে আসছে। প্রথম অধ্যক্ষ হন শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী; পরে তাঁর স্থলবর্তী হন শ্রীক্ষিতিমোহন সেন; বর্তমানে ডা: প্রবোধচন্দ্র বাগচী সে কাজের ভার নিয়ে আছেন। আশ্রমের প্রাচীনতম ভবন 'শান্তিনিকেতনে' অর্থাৎ পুরানো 'গেষ্ট হাউসে' বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় অফিস-অংশ এখন অবস্থিত।

১৩২৬ সনে 'শিক্ষাভবন' নামে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হন স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সূত্রে শান্তিনিকেতনের নিয়মানুগত্যতার সম্বন্ধ স্বভাবতই সৃষ্টি হয়। কেবল পরীক্ষায় পাশ করার দিকেই একান্ত ভাবে ঝোঁক না বাড়ে, কবি এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকে সতর্ক থাকতে বলেন। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ডা: ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীঅনিলকুমার চন্দ বিলাত থেকে কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এলে, পরে পরে দু'জনেই কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। বর্তমানে অধ্যক্ষ আছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়।

বিদ্যাভবনের ধারায় বহির্ভারতের সাংস্কৃতিক যোগের প্রত্যক্ষ কেন্দ্র সর্বপ্রথম গড়ে উঠল 'চীন ভবনে'। চীনা সংস্কৃতির চর্চা করে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৩৩৪ সনে অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের উদ্যোগে; তিনিই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেখানে পরিচালক পদে বৃত আছেন।

হিন্দি সাহিত্যের পঠন-পাঠন, গবেষণা ও প্রচারের উদ্দেশে 'হিন্দিভবন' স্থাপিত হল ১৩৩৮ সনের ১৬ জানুয়ারী। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ-এর ভিত্তি-স্থাপয়িতা। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডা: হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। ত্রৈমাসিক হিন্দী 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'খানি তাঁর সম্পাদনায় এখান থেকে আগে প্রকাশিত হত। এখন এ ভবনের কার্যভার অর্পিত হয়েছে শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী'র উপর।

'কলাভবনে'র কথা আগে বলা হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল বসু কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। সেখানে পরিচালনার ভার নিয়েছেন সম্প্রতি শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ।

'সংগীত-ভবনে'রও সূত্রপাত হয় বহু আগে। নূতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল থেকে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের অধ্যক্ষতাতে এ বিভাগের কাজ চলে আসছে।

গুরুদেব আশ্রমের ছাত্রীনিবাসটির নাম দেন 'শ্রীভবন'। ১৩৩৪ সনের জুলাইতে নূতন বাড়িতে ঐ নামেই গুরুদেবের উপস্থিতিতে শ্রীভবনের গৃহপ্রবেশ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর আগে 'দ্বারিক'-গৃহে এ ভবনটি অবস্থিত ছিল। তখন বহু দিন শ্রীমতী হেমবালা সেন এর পরিচালনা করেন। শ্রীমতী স্নেহলতা সেন ছিলেন প্রথম পরিদর্শিকা, বর্তমানে পরিদর্শিকা রয়েছেন শ্রীমতী সুধা দেবী।

'গ্রন্থ-সদন' অতি প্রাচীন। আশ্রমের মিলনকেন্দ্র বলা যায় একে। বাড়ির বৈঠকখানার মতো ঘরে-বাইরে সকলেরই এটিতে প্রত্যহ আনাগোনা চলছে। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র কাল থেকে এর কাজ চলে আসছে। 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হওয়ার সময় গ্রন্থা-গারটি বিস্তৃত পরিণত হয়। পুরোনো দিনের শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করার পরে এর অধ্যক্ষপদে আসীন রয়েছেন এখন শ্রীবিমলকুমার দত্ত।

'রবীন্দ্র-সদন' কবির প্রয়াণের পরে যথারীতি নামকরণ ক'রে স্থাপিত হয় ১৩৪১ সনে। তখন থেকে রথীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচালনাতেই এ বিভাগ রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ ও অনুশীলনের কাজ সম্পাদন করে আসছে। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

'বিনয়-ভবন' বিভাগটিতে শিক্ষক-শিক্ষণ-এর কাজ চলছে

সাত আট বছর হল, শ্রীক্ষিতীশ রায়ের পরিচালনায় সে কাজ শুরু হয়। বর্তমান অধ্যক্ষ আছেন শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হওয়ার সমকালে 'রতনকুঠি'র ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৩৩০ সনের নববর্ষের দিনটিতে। বোম্বাইয়ের পার্সী স্যর রতন টাটা পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন বিদেশী অধ্যাপকদের বাসের ব্যবস্থার জন্য। তাঁর নামেই এ গৃহের নামকরণ হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সী-অধ্যাপক ডা: তারাপুরওয়ালা এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইনি পরে বিশ্বভারতীতে 'জরথুস্ট্রে'র ধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। প্রসঙ্গত বলা যায় আরো পরে কবি জীবিত থাকতেই, 'জৈন' ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার কাজে একদল ছাত্র সঙ্গে ক'রে আচার্য মুনী জিনবিজয়জী কিছু দিন আশ্রমে কাটিয়ে যান। 'বাগান-বাড়ি'তে তাঁদের বাসস্থান ছিল। কবির মৃত্যুর পরে, এই গৃহেই 'সংস্কার-ভবন' নামক একটি সাময়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে। আশ্রমের ও বাহিরের গরিব ও দুর্গত-সাধারণ এখানে থেকে শিক্ষালাভ করত। তিন বছর পরে 'সংস্কারভবনে'র কাজ স্থানান্তরিত হলে কলেজ বিভাগের গরিব ছাত্ররা এ বাড়িতে থাকতে পায়। আরো পরে এটি আশ্রমের সাধারণ কর্মীদের আবাসে পরিণত হয়েছিল। লোকের মুখে তখনো নাম চলিত ছিল 'সংস্কার-ভবন'ই। গৃহটি অল্পদিন হল ভেঙে ফেলা হয়েছে।

'দীনবন্ধু ভবন' স্বর্গত এণ্ড্রুজ সাহেবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে নির্মিত হয়েছে ১৩৫০ সনে। খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ এখান থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মিস্ মার্জারি সাইক্স্ এ কাজ ১৩৭৮ সন থেকেই শুরু করেন। বর্তমানে এই বিভাগটি বিদ্যাভবনের অন্তর্গত হয়ে আছে।

'গ্রন্থনবিভাগ'-এর প্রধান কেন্দ্র এখন শান্তিনিকেতনেই অবস্থিত। শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস এ বিভাগের প্রথম পরিচালক। বর্তমানে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের অধ্যক্ষতায় কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে উভয় কেন্দ্রেই এর কাজ চলছে।

আশ্রমের চিকিৎসা বিভাগ 'আরোগ্য সদন'-এর নামকরণ হয় আশ্রমের প্রিয় সুহৃদ স্বর্গত পিয়ার্সন সাহেবের নামে। ১৩৭৮ সনে এ বিভাগটি নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ডা: শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর পরিচালনা করছেন।

আশ্রমে সকল বিভাগের চেয়ে পুরানো আদিবিভাগটি হল 'পাঠভবন'। এর প্রথম অধ্যক্ষ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বর্তমানে এর পরিচালনার ভার আশ্রমেরই প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনিরঞ্জন সরকারের হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

পাঠভবনের ছাত্রদের মধ্যে যারা ছাত্রাবাসে থাকে, তাদের পক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী, সকালে সন্ধ্যায় আবৃত্তি করবার মন্ত্র এবং দৈনিক কর্মসূচী নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিশ্বভারতী পাঠভবন ছাত্রাবাসের পালনীয় নিয়মাবলী

১। প্রাতে উঠিবার ঘণ্টা পড়িবামাত্র প্রত্যেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাইনে সমবেত হইবে।

২। ইহার পর যথাক্রমে ঘরঝাঁট, শয্যা গুছাইয়া রাখা, ব্যায়াম প্রভৃতি সময় মত করিবে।

৩। প্রত্যেককে নিজ নিজ কাপড় পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে মেলিয়া দিতে হইবে এবং শুকানো কাপড় যথাসময়ে তুলিয়া রাখিতে হইবে।

৪। বৈতালিকের ঘণ্টা পড়িবামাত্র সকলে নির্দিষ্টস্থানে শান্ত ও সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়াইবে।

৫। ক্লাসের সময় কোনো অবকাশপ্রাপ্ত ছাত্র পাঠচর্চার স্থান বা তাহার আশে-পাশে যেন বা গোলমাল করিবে না।

৬। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার বিছানা, বই ও কাপড়-চোপড় যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

৭। পড়িতে বসিবার ঘণ্টা (Study hour) পড়িবার পর কোনো সুস্থ ছাত্র অধিনায়কের বিনা অনুমতিতে পড়িবার ঘরের বাহিরে থাকিতে পারিবে না।

৮। কোনো অধ্যাপক বা অতিথি কোনো ছাত্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে ছাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনিবে।

৯। প্রত্যেক ছাত্র নিজ সম্পত্তির তালিকা রাখিবে। কিছু হারাইলে গৃহাধ্যক্ষকে জানাইবে। গৃহাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ কোনো দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বা দান করিতে পারিবে না।

১০। কোনো ছাত্রই নিজের নিকট টাকা কড়ি বা কোন মূল্যবান দ্রব্য রাখিতে পারিবে না। সেগুলি গৃহাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

১১। গৃহাধ্যক্ষের অনুমতি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সম্পাদক বা সম্পাদিকার অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমের সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবে না। (নির্দিষ্ট সীমানা :—উত্তরে : উত্তরায়ণের সোজা রাস্তা, পশ্চিমে : সঙ্গীত-ভবন ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তা, পূর্বে : পান্থশালার সামনের রাস্তা থেকে শান্তিনিকেতনের প্রধান ফটক, দক্ষিণে : গুরুপল্লীর সামনের রাস্তা)। নিজ ছাত্রাবাস ভিন্ন অপর কোনো ছাত্রাবাস, খাওয়ার সময় ছাড়া রান্নাঘর এবং খেলার সময় ছাড়া খেলার মাঠও নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। কোনো সুস্থ ছাত্র হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে রোগী দেখিতে যাইতে পারিবে না।

১৩। সকল ছাত্রকেই বিকালের খেলার লাইনে উপস্থিত থাকিয়া খেলায় যোগদান করিতে হইবে।

১৪। সান্ধ্যোপাসনার প্রথম ঘণ্টা পড়িবা মাত্র সকলে হাতমুখ ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উপাসনা স্থলে যাইবে ও শান্তভাবে উপাসনায় বসিবে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে সকলে নিঃশব্দে পড়িবার ঘরে চলিয়া যাইবে।

১৫। বিনোদন পর্বে যে যে বিনোদনের ব্যবস্থা হয় তাহাতে এবং ছাত্রগণ পরিচালিত অনুষ্ঠানে সকলেই উপস্থিত থাকিবে। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এগুলি হইতে কেহই অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে না।

১৬। রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে সকলেই হাত-পা ধুইয়া শয্যায় যাইবে। শুইবার ঘণ্টা পড়িবার পরই সকলে শুইয়া পড়িবে।

১৭। প্রত্যহ প্রাতে প্রথম যখন দেখা হইবে, অধ্যাপক, অতিথি ও পরস্পরকে যথোচিত অভিবাদন করিবে। ক্লাস আরম্ভ হইলে অধ্যাপক আসা মাত্র দাঁড়াইয়া নমস্কার করিতে হইবে। অধিনায়ক ও গৃহনায়ক ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা রক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন।

"মনে রাখিও এ বিদ্যালয় তোমরাই গড়িতেছ এবং বিদ্যালয় নিয়ম পালন প্রভৃতি সব বিষয়ে তোমাদের সাহায্য চায়। সর্বপ্রকার ভদ্র আচরণ বিদ্যালয় তোমাদের নিকট আশা করে।"

মন্ত্র

প্রাতঃকালীন—ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অর্থ—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহজাল হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

সায়ংকালীন—ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অর্থ—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন, সেই দেবতাকে নমস্কার করি।

শান্তিনিকেতনের কর্মপরিধি অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। কবির চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে রূপ নিতে গিয়ে বাস্তবে এর কর্মবিভাগগুলি এবং কতকাংশে এখানকার জীবনযাত্রাও প্রয়োজনীয় পরিণতিলাভের উপযুক্ত যথেষ্ট সময় পায়নি। সকলের মধ্যে স্থায়ী সংহতির সুব্যবস্থাও তাই সর্বত্র গড়ে ওঠেনি। সাময়িক অবস্থানকারী বাইরের লোকের চোখে যে ত্রুটি ধরা পড়েনি, কবির দৃষ্টিতে তা পড়েছিল। তিনি বলেছেন, "এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক ক'রে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।" (বিশ্বভারতী ১৩৪২) ভুল ত্রুটি সব শুধরে যাবে, যদি কবির মূল প্রেরণায় সকলের দৃষ্টি একান্ত নিবদ্ধ থাকে। সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার সেই হচ্ছে সুচির লক্ষ্য; সর্বোত্তম সিদ্ধিও আনবে তাতেই—চাই সকলের পক্ষে সমবায়-মূলক সর্বাঙ্গীন বিকাশ। কবির সেই কথাই কেবল স্মরণীয়,—"মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ—আমি জেগে আছি।" আর, শান্তিনিকেতনের ভিতরে বাইরে সকল জায়গার লোকেই জানবেন প্রধান যেটি বাণী—কবি বলে গেছেন,—"এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।" (বিশ্বভারতী ১৩৪৫) সমাজের সকলের সর্বাঙ্গীন বিকাশ চেয়ে সকলকেই প্রীতির সঙ্গে এখানে গ্রহণ করতে হবে।

সমাপ্ত

ফাঁকি মারা

শ্রীনিখিল মৈত্র

লড়াইয়ের বাজারে কন্ট্রোল, রেশন, এ. আর. পি. সিভিক-গার্ডের মত "ও শাইন বয়" ও অকস্মাৎ জন্মলাভ করে, হঠাৎ অবশ্য আছে। আর সরকারী নির্দেশে জনসাধারণের অর্থে, গেজেটের পাতায় ও সংবাদপত্রের স্তম্ভে জন্মবার্তা ঘোষিত করে আত্মপ্রকাশ করে, যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় হাজার হাজার মিত্র সেনা অধ্যুষিত কলিকাতা শহরে জুতা পালিশের কুটীর-শিল্প কখন কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করল তার খবর কোনও ঐতিহাসিক রাখেন নি। কিছু দিনের মধ্যেই কিন্তু "জো" বা "জনির" রেগুলেশন বুটজুতো সমেত পা টানাটানি করতে কুটীরশিল্পীদের দেখা যেত। সেদিন চৌরঙ্গী এলাকায় এরাই বোধ করি ছিল সব থেকে নির্ভীক নিঃশঙ্কচিত্ত ভারতীয়।

লড়াইয়ের পর শান্তি। বোমা, বন্দুক, কোট, কম্বল ফেলে জোদের স্বদেশ যাত্রা; স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে "জনি"দের বিদায় এ শিল্পের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছিল। এখন কলিকাতার কর্মব্যস্ত সাধারণ নাগরিক বিদেশী পল্টনের স্থান নিয়েছে। অপরিসর জনাকীর্ণ ফুটপাথে ত্রিভঙ্গমুরারিরূপে জুতো-পালিশের আনন্দ প্রতিদিন হাজারে হাজারে লোক উপভোগ করছেন। কলিকাতার সাহেব পাড়া থেকে শিল্প এখন মধ্যবিত্ত পল্লী বা বস্তী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভ্রাম্যমান পালিশকারের দল তারকেশ্বর, বনগাঁ বা ব্যাণ্ডেল লোকালেও যাতায়াত করে।

কলিকাতার রাস্তায় বে-আইনী ভাবে দোকান পসার সাজাবার অপরাধে ত্রাসসৃষ্টিকারী হল্লা সকাল-বিকেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে উনুনশুদ্ধ মামলেট নির্মাতা, দুই দশকের আগে তৈরী পরিত্যক্ত ব্লেড, ব্রাশ, পেষ্ট, সাবান বিক্রেতা ও গোলাব রেওড়ী ঘুগনিদানা পরিবেশককে লরীতে পুরে চালান করে! জুতো পালিশওয়ালাদের কিন্তু এ বেড়াজালে পড়তে হয় না। আইনের চোখে তাদের অধিকার স্বীকৃত।

হোয়াইটওয়ে লেডল নয়—হোয়াইটসম্যান হাউসের পাশ দিয়ে হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের দিকে চলেছি। দু'পাশ থেকে জুতোকে নতুন, তকতকে, ঝকঝকে করার সাদর আমন্ত্রণ। সামনে কাঁচিশিল্প কুলোকে ঘিরে বেশ একটা ভীড় জমে উঠেছে। আর এগোনো গেল না। ভবিষ্যৎ জীবনকে কুলোর মারফতে জানার অধীর আগ্রহে কয়েক জন উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করছেন। পাশেই এক ভদ্রলোক জুতো পালিশ-দানে পা বাড়িয়ে দিয়ে পাতকাশোভা বর্দ্ধন এবং গণৎকারের বিদ্যা পরখ দু'কাজ একই সঙ্গে করছেন। ও শাইন বয়কে গম্ভীর ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন: "দেখ, ফাঁকি মেরো না। ছ আনা পয়সা দেব; কাজ ভাল চাই।" ছেলেটি হেসে বলল: "ববুজি হিন্দুস্থান হয়া, তব সে সব কোই ফাঁকি দেতা। আর আপনি আমাকে খালি ছ' আনাই দেবেন। সুতরাং ফাঁকি আমি মারবই।"

ডোঙ্গারগড়ের ডাকবাংলো

সোমেন্দ্রনাথ রায়

গল্পটা আমি শুনেছিলাম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড মিষ্টার কুগার্টসের কাছে।

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। মধ্যপ্রদেশে শীতকালে এমন বৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু একে আমি বাঙালী, তায় নতুন এসেছি এ অঞ্চলে। কাজেই চারি দিকের নির্জনতা আর প্রচণ্ড শীতের ভেতর ঝড়-বৃষ্টির দাপট ঠিক সুস্থ মনে নিতে পারছিলাম না। ষ্টেশনের ফার্ষ্ট ক্লাশ ওয়েটিং-রুম খুলিয়ে প্রকাণ্ড টেবিলটার ওপরে বিছানা পেতে কম্বল-মুড়ি দিয়ে শোবার উদ্যোগ করছিলাম। ঘরের অবশিষ্ট সঙ্গী মিষ্টার কুগার্টস বাথরুমে গিয়েছিলেন। খানিক পরে শুনতে পেলাম বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। বুঝলাম, বেরিয়ে এলেন গার্ড সায়েব মুখ-হাত ধুয়ে, ও-পাশে বেতের আরাম-চেয়ারে শোবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

হঠাৎ অস্ফুট একটি চীৎকার শুনে চমকে তাকালাম পিছনে। দেখি, দেওয়ালে টাঙানো আমার ওভারকোটটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। চোখে ভয়কাতর বিহ্বল দৃষ্টি। বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কি হল মিষ্টার কুগার্টস? কি দেখছেন অমন করে?'

প্রথমটা কথা সরল না তাঁর মুখ থেকে। তার পর জড়িত স্বরে বললেন, 'ওটা কার ওভারকোট?'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কেন? ওটা তো আমারই ওভারকোট। এতক্ষণ আমার গায়ে ছিল খেয়াল করেন নি?'

অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন মিষ্টার কুগার্টস। বললেন, 'সত্যিই ওটা আপনার তো?'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বাথরুমে বসে এতক্ষণ কি নেশা করছিলেন?'

আমার বিরক্তি গায়ে না মেখে উনি বললেন, 'দোহাই আপনার, ওটাকে মুড়ে মাথার নিচে রেখে দিন। আমি ঠিক সহ্য করতে পারছি না ওটাকে। দোহাই আপনার, উঠুন এক বার।'

ভালো ফ্যাসাদে পড়া গেল। ভাবলাম, একটা ভয়কাতুরে মাতালের সঙ্গে সারা রাত কাটাতে হবে নাকি? তার পর কুগার্টসের মুখ-চোখের চেহারা দেখে বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। ওভারকোটটা মুড়ে বালিশের তলায় রেখে প্রশ্ন করলাম, 'কি ব্যাপার মিষ্টার কুগার্টস? ওভারকোটটা কি দোষ করল?'

দাঁড়ান বলছি। একটু সুস্থ হয়ে নিই আগে। আরাম-চেয়ারে বসে প্রভিসান-বক্স খুলে বোতলের পানীয় মুখে লাগিয়ে ঢক-ঢক করে খেয়ে নিলেন তিনি কিছুটা। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, 'আপনি এ অঞ্চলে নতুন এসেছেন, কাজেই খেয়াল করেছেন কি না বলতে পারি না। ডোঙ্গারগড় ষ্টেশন ছাড়িয়ে একটু দূরে রেলওয়ে লাইনের ধারেই একটা লাল রঙের বাংলো দেখেছেন? আজ-কাল অবশ্য বাংলো বলে চেনা মুসকিল। এত ঝোপ-ঝাড় গজিয়েছে চারি দিকে, আর বাড়িটার দুরবস্থা এমন যে, ওর বয়েস মাত্র দশ বছর, একথা ভাবা শক্ত। ওটা ছিল ডাকবাংলো। বছর তিনেক আগে এমনি এক জানুয়ারীর ঝড়জলের রাত্রে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। তখন এ লাইনে প্রথম এসেছি।'

ডোঙ্গারগড়ে ডিউটি শেষ করে হাত-ঘড়িতে দেখি রাত একটা বাজে। গুডস্‌-ট্রেন নিয়ে এসেছি। কাজেই প্লাটফর্মে একটা ভেণ্ডার পর্যন্ত নেই। সকালের আগে কোন ট্রেন নেই বলে যে যার ডেরায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তা ছাড়া সে রকম দুর্যোগময় শীতের রাতে অত্যন্ত প্রয়োজনেও ঘরের বাইরে আসতে ইতস্ততঃ করে মানুষ। ধাক্কাধাক্কি করে আপার ক্লাশ ওয়েটিং-রুম খোলাতে পারলাম না। ষ্টেশন মাষ্টার চলে গেছে কোয়ার্টার্সে। এ-এস-এম দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং-শেডে গিজ-গিজ করছে প্যাসেঞ্জার থেকে সুরু করে কুলি-মজুর, ভিখিরি, এমন কি দুটো বেওয়ারিশ গরু পর্য্যন্ত! কোথায় আশ্রয় নিই এই দুর্যোগে? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল আগের বার দিনের বেলা এ পথে আসার সময় একটু দূরেই লাইনের ধারে একটা বাংলো দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। সেখানে হয়ত আশ্রয় পাওয়া গেলেও যেতে পারে। বেয়ারা নানকু প্রভিসান-বক্স কোন রকমে একাই গাড়ি থেকে নামিয়ে চুপচাপ শেডের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছিল। তাকে ডেকে বললাম, 'আমি ডাকবাংলোয় যাচ্ছি। সে যেন কোন কুলিকে জাগিয়ে প্রভিসান-বক্স নিয়ে তাড়াতাড়ি আসে।'

বেশী পথ নয়। ষ্টেশন থেকে নেমে সোজা রাস্তা ধরে মিনিট দুই পথ হেঁটে পাওয়া গেল বাংলো। কেমন অগোছালো শ্রীহীন লনটা। হাতের সিগন্যাল-ল্যাম্পের আলোয় দেখলাম, সামনের খোলা বারান্দায় ইতস্ততঃ ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ইঁদুরের মাটি, সঞ্চিত ময়লা। দরজার গায়ে মাকড়সার জাল বুনেছে। মনে হয়, এ বাড়িটা ব্যবহার হয় না বিশেষ। যাই হোক, সে সব ভাববার সময় ছিল না আমার। বাইরে যেমন শীত, তেমনি অঝোরে নেমেছে বর্ষা। মনে হচ্ছে একটা ভিজে কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখেছে কেউ আকাশটা। তার সঙ্গে সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়ার ঝাপট। এ রকম সময়ে গায়ের ভিজে ম্যাকিনটস খুলে কম্বল-মুড়ি দিয়ে আগুন পোয়াতে পারলে সব চেয়ে ভাল হত। তাই আশ্রয় পাওয়া মাত্র আর ইতস্ততঃ না করে ধাক্কা দিলাম দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল পাল্লা দুটো।

প্রথমটা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হল না। তার পর চোখে সয়ে গেলে আবিষ্কার করলাম, বাইরের মতই অগোছালো অপরিচ্ছন্ন

একটা হলে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। মাঝখানে একটা টেবিলের চারি পাশে খানকয়েক চেয়ার। কিন্তু সে টেবিল বা চেয়ার যে বহু কাল ব্যবহার হয়নি, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পুরু হয়ে জমে আছে ধূলো ফার্নিচারের ওপরে। কেমন একটা অস্বস্তিকর দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগল। পচা-গলা কোন জন্তু-জানোয়ার আশে-পাশে থাকলে যেমন একটা বদ্ গন্ধে ভরে যায় বাতাস; তেমনি মনে হচ্ছিল ঘরের বাতাসে। হয়ত পরিত্যক্ত বাড়ি দেখে শিয়াল-কুকুরে কোন জন্তু মেরে থাকবে, ভাবলাম আমি।

যাই হোক, বেশী চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি ম্যাকিনটস খুলে চেয়ারের গায়ে রাখলাম। টেবিলের ধূলো ঝেড়ে বসবার চেষ্টা করা বৃথা। চেয়ারগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম, বসবার বেতের আসন জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে গেছে। কতক জায়গা উইয়ে খেয়েছে বলে মনে হল। পাশের ঘরে কোন ব্যবস্থা আছে কি না ভেবে ধাক্কা দিলাম দরজায়। সম্পূর্ণ বন্ধ ঘর। খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দুর্গন্ধটা যেন বেড়ে গেল অনেক পরিমাণে। সে ঘরেও একটা টেবিল আর তার পাশে আরাম-চেয়ার রয়েছে দেখে এগিয়ে গেলাম। হলের টেবিল থেকে সিগনাল-ল্যাম্পটা এনে এ ঘরে টেবিলে রেখে দেখি, দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝুলছে একটা কালো ওভারকোট। বেশ দামী কাপড়ের কোট, সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় আমেরিকান পদস্থ সৈনিকদের গায়ে যেমন দেখা যেত। কাঁধের কাছে ব্রোঞ্জের ডানা-মেলা ঈগল মার্কা ব্যাজটা চিক-চিক করে উঠল ল্যাম্পের আলোয়।

কেমন একটা কৌতূহল অনুভব করলাম ওভারকোটটা দেখে। কাছে গিয়ে খুলে নিলাম সেটাকে হুক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে একটা শব্দ হল পেছনে। চমকে পিছন ফিরে দেখি, কিছুই না। মনে হয়েছিল যেন কেউ আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলল ফোঁস করে। কাঁধের ওপর ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শও যেন পেলাম। কিন্তু পিছন ফিরে কাউকে না দেখে ভাবলাম, সম্ভবতঃ সেটা আমার মনের ভুল। নার্ভাস প্রকৃতির না হলেও দুর্যোগের রাত্তে এই পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাবার সময় নিজের নিঃসঙ্গ অবস্থা কল্পনা করলে দুঃসাহসী ব্যক্তির মনও কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়।

কোটটা নেড়ে-চেড়ে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, পকেটে একটা তিন সেলের ব্যাটারি টর্চ রয়েছে। হাতে নিয়ে দেখি, সাধারণ টর্চ নয় সেটা। মিলিটারী অফিসারদের লাল, সবুজ ও সাদা সিগন্যাল দেবার যে টর্চ দেওয়া হত, সেই ধরণের টর্চ এটি। ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্যে আলোর কাছে নিয়ে এলাম সেটা। মর্চে ধরে গেছে টর্চে। ভেতরের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। খুলে পরীক্ষা করব ভাবছি। খস-খস শব্দ হল পেছনে। চেয়ে ভাল বুঝতে পারলাম না প্রথমটায়। তার পর হঠাৎ খেয়াল হল, ব্র্যাকেটের হুকে আগের মত টাঙানো রয়েছে ওভারকোটটা। অথচ আমি সেটা আরাম-চেয়ারের গায়ে রেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে কেমন একটা ঠাণ্ডা শির-শিরে অনুভূতি নেমে গেল। ঘেমে উঠল কপালটা। খানিক দাঁড়িয়ে মনে একটু সাহস ফিরে এলে ভাবলাম, আসলে হয় ত' হুকেতে কোটটা আমিই টাঙিয়ে রেখেছি। তার পর টর্চ পরীক্ষা করতে এসে আর খেয়াল নেই।

তবু মনের অস্বস্তিটা গেল না। দেহের পাঁচটা ইন্দ্রিয় ছাড়াও আর একটা যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, তাই দিয়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম, কেউ যেন অলক্ষ্যে থেকে আমার কার্য-কলাপ কুটিল-কটাক্ষে লক্ষ্য করছে। হলের প্রান্তে বাইরের দরজাটা খুলে রেখে এসেছিলাম। ভিজে হাওয়ার ঝাপটে তার পাল্লা দুটো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে নড়ছিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় খবরের কাগজগুলো সরে যাচ্ছিল এ-পাশ থেকে ও-পাশে। ঝড়ের হাওয়া কোন দুর্লক্ষ্য ফুটো দিয়ে সোঁ-সোঁ শব্দ করে উঠছিল মুমূর্ষুর গোঙানির মত। মনটা এই পরিবেশে বেশী দুর্বল হয়ে পড়তে পারে ভেবে জোর করে হেসে উঠে দুর্ভাবনার ভার নামাতে চেষ্টা করলাম মন থেকে, কিন্তু একটি বার মাত্র হো-হো করেই আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল সে হাসি। আমার মুখের হাসি থামিয়ে কে যেন দ্বিগুণ চতুর্গুণ জোরে হো-হো করে হেসে উঠল। আর সেই হাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে এ-ঘর ও-ঘরের হল, এমন কি বাইরের অশান্ত প্রকৃতিতে পর্যন্ত রক্ত-জলকরা ভয়ের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। আমার হাতের টর্চটা পড়ে গেল মেঝেয়। তার শব্দে চমকে না উঠলে সে মুহূর্তে মূর্ছা যাওয়াও বিচিত্র ছিল না আমার পক্ষে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম কয়েকটা মিনিট। টর্চটা কুড়িয়ে নেবার ক্ষমতাও ছিল না যেন। তার পর হঠাৎ খেয়াল হল, আরে, কি ছেলেমানুষিই না করছি! আমার হাসির স্বর শূন্য ঘরের দেওয়ালে প্রতিহত হয়েই এই বিচিত্র প্রতিধ্বনির সৃষ্টি, এটা আগেই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। একথা মনে করার পর অনেকটা সাহস পেলাম বুকে। ধীরে ধীরে টর্চটা কুড়িয়ে আরাম-চেয়ারটাকে শব্দ করে এক পাশে টেনে আনলাম। তারপর ধপ করে বসে পড়লাম।

রাত দুটো বেজে গিয়েছিল। উদ্বেগে, উত্তেজনায়, পরিশ্রমে ভেঙে আসছিল সর্ব শরীর। কিন্তু চোখ বুজতে সাহস হচ্ছিল না কেন যেন। সেই যে বিদেহী কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করে ভয় পেয়েছিলাম খানিক আগে, সে কথাই ঘুরে-ফিরে আচ্ছন্ন করছিল চিন্তা, প্রভাবিত করছিল স্নায়ু, চোখ বন্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। নানক্ এখনও আসছে না। আর এক জন মানুষের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল আমার। মনের সেই নিঃসঙ্গ ভয়কাতর অবস্থা কাটাবার জন্যে পকেট হাতড়ে দেশলাই আর সিগার-কেস বার করলাম। মুখে চুরুট লাগিয়ে দেশলাই কাঠি বাক্সে ঘসেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কেউ যেন চাপা গলায় হেসে উঠল ঘরের মধ্যে। শিউরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে হাতের জ্বলন্ত কাঠি পড়ে যাচ্ছিল। প্রাণপণ বলে ধরে রইলাম সেটা। ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল হাতটা।

তার পর, বোধ হয় মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় দু'-তিনটে কাঠি খরচ করে চুরুট ধরিয়েছি সবে, শুনলাম আবার সেই হাসি এবারে বেশ জোরে। আর ভুল হবার কথা নয়। বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। রক্ত জমে যায় এখনো সে হাসির শব্দ স্মরণ করলে। নিজের হৃৎপিণ্ডের দুপদাপ শব্দ নিজের কানেই বাজতে লাগল অসম ছন্দে। আমার বিস্ফারিত দৃষ্টি আটকে গেল ব্র্যাকেটের হুকে টাঙানো কালো ওভারকোটটার দিকে। হুক থেকে খুলে মাটি থেকে তিন ফুট আন্দাজ ওপরে

শূন্যে ঝুলে রইল সেটা নিস্পন্দ ভাবে। ঠিক যেন কেউ ধরে রেখেছে সেটা। অথচ আমার চোখের সামনে সেই কোট ছাড়া সামান্য একটু ধোঁয়াটে অস্তিত্বও নেই অপর কিছুর।

ধীরে ধীরে ফুলে উঠল কোটটা। যেন কেউ গায়ে পরে নিল সেটা। হাত দুটো ঝুলে রইল পাশে। পট-পট করে বন্ধ হয়ে গেল বোতাম-ঘরে বোতামগুলো। একটা হাতা পকেটের কাছে এগিয়ে এল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম নড়ে-চড়ে উঠল পকেটের কাপড়। তার পর হতাশ ভঙ্গীতে ঝাঁকুনি দিল হাতাটা।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছিল হাঁটু দুটো। এখন বেশ কল্পনা করতে পারি, আমার দু' চোখের মণি বোধ হয় কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সম্পূর্ণ। চুরুট খসে পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে। নিঃশ্বাস ফেলার সাহসটুকুও বুঝি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ ভাবে।

সেই নিরালম্ব ভৌতিক-কোট তার পর ফিরল আমার দিকে। একটা কি দেড়টা মিনিট ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে বোধ করি ভাল করে লক্ষ্য করল আমাকে। তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

অনুভব করতে পারছিলাম, শুধু সর্বাঙ্গের লোমই নয়, মাথার চুলগুলোও খাড়া হয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড ভয়ে। বোধশক্তি প্রায় লুপ্ত। নিজেকে দু' পায়ের ওপর দাঁড় করাবার মত ক্ষমতা একটুও ছিল না সে-সময়ে। টেবিলের পাশ দিয়ে আমার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল সেই কোট। তার পর হাতা দুটো উদ্যত ভঙ্গীতে আমার দিকে উঁচিয়ে লাফিয়ে আমার গলা ধরবে বলে দাঁড়িয়েছে স্থির হয়ে, এমন সময়ে অমানুষিক বলে চেয়ার থেকে উঠে ছিটকে এক পাশে সরে গেলাম। আর তখনি শুনতে পেলাম সেই আগের হাসি।

ঠিক যেন গলানো সীসে কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল মগজে। স্বপ্নের ঘোরে মানুষ যেমন ছোটে, আমার মন তেমনই পরিত্রাহি ছুটে পালাতে চাইছিল এই মৃত্যুপুরী থেকে। কিন্তু পা দুটো বশে ছিল না আর। তা ছাড়া চোখ দুটোকে সেই কোট ছেড়ে অন্য কিছুতে যে নিবদ্ধ করব, তেমন ক্ষমতা ছিল না।

ঝাঁকি দিয়ে ফিরে দাঁড়াল সেই কোট। টেবিলের ও-প্রান্ত থেকে ঘুরে আবার এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। প্রতিরোধ-শক্তি তখন আর একটুও অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা নেই আত্মরক্ষার। নিজের অজ্ঞাতসারে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলাম ঈশ্বরকে স্মরণ করে। হাতটা গিয়ে ঠেকল পকেটে-রাখা সেই মরচে-ধরা মিলিটারি সিগন্যাল টর্চটায়। এক ঝটকায় সেটা বুক-পকেট থেকে বার করে নিয়ে প্রাণপণ বলে ছুঁড়ে মারলাম সেই কোটটার দিকে। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুনতে পেলাম হলের খোলা দরজার প্রান্তে। 'সায়েব, সায়েব, হাম লোক আয়া হ্যায়।'

'চেতনা হারাবার আগের মুহূর্তে দেখেছিলাম, দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত লুফে নিয়েছিল আমার ছোঁড়া টর্চটা সেই ভৌতিক-কোট। সেটা পকেটে পুরে ধীর পদক্ষেপে ব্র্যাকেটের কাছে গিয়ে আবার চুপসে গিয়ে ঝুলে রইল হুকে। আমার গোঙানী শুনে নানকু আর জনা দুয়েক লোক যখন ঘরে ঢুকল, তখন আমি অচৈতন্য।

পরে শুনেছিলাম, মিলিটারী পারপাসে তৈরী হয়েছিল সেই ডাকবাংলো। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এক জন আমেরিকান মিলিটারী অফিসারের মৃত্যুর পর থেকে ও-বাড়িতে দিনের বেলা পর্যন্ত ঢোকা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি ওই বাড়িতে গেছি শুনে ষ্টেশনের কুলিরা নানকুকে ভয় দেখায়। তার ফলে প্রভুভক্ত বেয়ারা প্রচুর টাকা বকশিস কবুল করে দুজন মাত্র পোর্টার সংগ্রহ করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিল আমার খোঁজে।

গল্প শেষ করে চুপ করে রইলেন মিষ্টার কুগার্টস্ কিছুক্ষণ। শিউরে উঠল এক বার তাঁর দেহ, বোধ করি পূর্বের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা স্মরণ করে। তার পর এক চুমুক পানীয় গলায় ঢেলে বললেন, 'সেই থেকে ঝোলানো ওভারকোট দেখলেই আমার বুকের স্পন্দন থেমে যায় যেন। কিছুতে ঠিক রাখতে পারি না নিজেকে।'

জোনাকি

সুশীলকুমার গুপ্ত

দিনের উৎসব শেষে স্তব্ধতা ও ক্লান্তি নামে ধীরে
দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে ; আলোকের আশ্চর্য্য মজুর
কাজের সংগ্রাম ক'রে ফিরে যায় রাত্রির কুটীরে ;
ছায়া পায় অন্ধকারে অবরুদ্ধ স্বপ্ন, প্রেম, সুর।

তখন জোনাকিগুলি নীলাভ স্বপ্নের দীপ জ্বেলে
পৃথিবীর মাঠে-ঘরে খুঁজে ফেরে হারানো সুখের
উজ্জ্বল রেখার কাব্য, অন্ধকার স্রোত ঠেলে ঠেলে
নিয়ে যেতে চায় বুঝি কোন স্বপ্ন সীমান্তে ভোরের !

নির্জ্জন জীবন এক জেগে উঠে জোনাকির ডাকে
ঝিঁঝিঁদের শব্দে করে বেদনার অপূর্ব্ব কীর্ত্তন,
শিশিরে ফুলের বুকে বিচিত্র কাহিনী লিখে রাখে,
জাগায় ধূলায়-ঘাসে উপেক্ষিত মনের ক্রন্দন।

জানি, জানি,—নিশান্তের তীব্র রৌদ্রে এ সব জোনাকি
কোথায় হারিয়ে যায়। তবুও যখন শুব্ধ রাতে
ফেরে না পথিক সূর্য্য শত ডাকে, নয় তুচ্ছ ফাঁকি
জোনাকির এ প্রসঙ্গ জীবনের নৈশ-কবিতাতে।

জোনাকির ভিড়ে ফেরে দিনে যত লুপ্ত হল যারা,
স্মৃতির আশ্চর্য্য পথে মৃত্যুহীন প্রাণের ইশারা।

রাত্রির অতিথি

আশু চট্টোপাধ্যায়

মধ্য-রাত্রি অতীত হয়ে গেছে। শরীরে এবং মনে ক্লান্তি অনুভব করলাম। দুই হাত মাথার উপর প্রসারিত করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই বার বিশ্রামের সময় হয়েছে, ঘুমের সমুদ্রে স্নান করে আবার সজীব হয়ে ওঠা যাবে।

বাইরে মসীকৃষ্ণ রাতে পথের আলোগুলো মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, কি শীত, ওরা নিদ্রামগ্ন সহরের অতন্দ্র প্রহরী, সকলের ধন-প্রাণ রক্ষা করছে। দূরে একটা রিক্সার শব্দ শোনা গেল, বোধ হয় কোনও প্রমোদ-বিলাসী গৃহে ফিরছেন।

বসবার ঘরের আলোটা নিবাবার জন্ত সুইচে হাত দিয়েছি, এমন সময় স্পষ্ট মনে হল, রিক্সাটি আমারই বাড়ির সদর দরজায় এসে থামল এবং তার পরই কড়া নাড়ার শব্দ হল। আলো আর নেবানো হল না, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, এত রাত্রে কে আবার জ্বালাতন করতে এল! নিশ্চয়ই প্রয়োজন বা বিপদ গুরুতর। তাড়াতাড়ি নিচে এসে নিজেই দরজা খুলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, দরজার সামনে জনহীন রাস্তায় গ্যাসের স্তিমিত আলোয় একা দাঁড়িয়ে সুলতা।

কোনো কথা বললাম না। অন্ত ব্যক্তি হলে ওখানেই হয়ত উচ্চ স্বরেই বলে উঠত, "এ কি লতা, কি অশোভন কাণ্ড, এত রাত্রে একা এসেছ, তুমি বিবাহিতা, স্বামি-পুত্র রয়েছে। এ কি কাণ্ড! কি হয়েছে বল ত?" কিন্তু আমি কোনো কথা বলিনি, কাজটার অশোভনতার কথা বোঝবার মত বুদ্ধি সুলতার নিশ্চয়ই ছিল, তবু সে এসেছে বা তাকে আসতে হয়েছে। এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। হয়ত স্বামীর সাংঘাতিক অসুখ, জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, মধ্য-রাত্রিতেই বাড়াবাড়ি হয় অনেক অসুখের। কিংবা হয়ত, স্বামী এখনো বাড়ি ফেরেনি, এদিকে ছেলেটি হয়ত অসুখে যায় যায়। কিন্তু তাই যদি হবে, ডাক্তারের কাছে না গিয়ে অত দূর থেকে আমার এখানে আসবার কি মানে? হয়ত হাতে টাকা নেই। যাই হোক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-সব চিন্তার কোনো মানে হয় না, যখন উপরে গিয়ে সুলতাকে বসালেই তার কাছ থেকে সব খবর পাওয়া যাবে। তাকে কিছুই বলতে হল না। সদর দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠতে লাগলাম তখন সে আমার পিছু-পিছু উঠে এল নিঃশব্দ পায়ে।

বসবার ঘরের তীক্ষ্ণ আলোয় তাকে লক্ষ্য করে আরও বিস্মিত হলাম। চোখ বসে গেছে, গালও। মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে! মাথার এক রাশ চুল এখনো ঘাড়ের উপর স্তূপীকৃত, যেন সন্ধ্যার অরণ্য-স্বপ্ন। কিন্তু ঐ-চোখ এক দিন কত লোকের নিদ্রা হরণ করেছে! ঘরের মাঝখানে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল সে বুঝি এখনই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে। তার দিকে একটা 'আরাম-চেয়ার টেনে এনে বললাম, "বস।"

তখনো তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম, "বস, বস লতা! আগে একটু বিশ্রাম করে নাও, তার পর সব কথা শুনব। একটু চা বা কফি খাবে কি? তাহলে স্টোভটা জ্বালিয়ে করে দি।"

সুলতা কোন কথা না বলে চেয়ারে তার শীর্ণ শরীরটা এলিয়ে দিল। এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করিনি, এখন দেখে মর্মাহত হলাম, তার শরীরে মাংসের যেন লেশমাত্র ছিল না।

সেই সুলতার যে এমন দশা হয়েছে কে জানত? অনেক দিন তার খোঁজ-খবর রাখিনি, নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। অবশ্য বিয়ের পর দেখে এসেছিলাম সে সুখেই ছিল। তার পর পুত্রের অন্নপ্রাশনের উৎসব-প্রাঙ্গণে তাকে হাস্য-মুখরিত দেখেছি। স্বামী হরপ্রসাদ রূপে-গুণে দেবদুর্লভ না হলেও ফেলনা নয়। সংসারে অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব ছিল না। সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে সে বঞ্চিত হয়নি। তবু এমন হতশ্রী সে কেমন করে হল এবং আজ এমন কি বিপদ ঘটল, যে লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে আমার কাছে এত রাত্রে ছুটে এসেছে?

আমার আতিথেয়তার নিমন্ত্রণে সে কোনো সাড়া না দিয়ে চুপ করেই বসে রইল। যেন ঐ চেয়ারটিতে অমনি নীরবে বসে থাকবার জন্তই সে এখন এখানে এসেছে।

আমি তাকে বিন্দুমাত্র তাড়া না দিয়ে নিপুণ হস্তের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরালাম। গন্ধ নাকে যেতেই সে যেন একবার চকিত হয়ে আমার দিকে তাকাল, কারণ ঐ বালকান সোবানি সিগারেট পরিচিত-মণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র আমিই খেতাম, ও গন্ধের সঙ্গে আমার সত্তা জড়িত ছিল। হয়ত চেনা গন্ধ ওকে আগেকার অনেক কথাই মনে পড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবু সে কোনও কথা বলল না, অন্তমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার সে-দৃষ্টি আমার অসহ্য মনে

হল, সে-চাওয়া যেন অন্য জগতের। আমি সহসা উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটটি শেষ করলাম।

তার পর ফিরে দেখি, সে সেই চেয়ারের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর নিঃশ্বাস পড়ছে এবং তার সঙ্গে বুক ওঠা-নামা করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, রাত তখন একটা।

একবার মনে হল, তাকে তখনি জাগিয়ে দি এবং তার পর বাড়ি চলে যেতে বলি। এ কি রকম ভদ্রতা যে রাত দুপুরে এক জন পুরুষের বাড়ীতে একা এসে একটি মেয়ে এই ভাবে ঘুমুতে সুরু করবে! যে-প্রয়োজনের খাতিরে তাকে এ ভাবে আসতে হয়েছে সেটা বলার ত প্রয়োজনে ছিল? জাগিয়ে দেবার জন্য কাছেও গেলাম। তার পর ভাবলাম থাক, কাজ নেই, একটু ঘুমিয়ে নিক। এখনি ত আর ভোর হয়ে যাচ্ছে না। তা ছাড়া এখানে আসার দায়িত্ব ত তার, আমি ত তাকে ডেকে আনিনি।

কিন্তু এমন মুস্কিলে আর কখনো পড়েছি বলে ত মনে পড়ে না? ও যদি অমনি ভাবে সারা রাত ওখানে বসে ঘুমোয় তাহলে ওর কত দূর যাবে আসবে জানি না, কিন্তু সকালে চাকরদের সামনে আমি লজ্জায় পড়ব! কিন্তু এতটা কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যে সুলতার হবে এ আমি আশঙ্কা করিনি। যে-কথা বলবার জন্য এতটা পথ ছুটে এল সে-কথা না বলেই এই ভাবে ঘুমিয়ে পড়া এক অদ্ভুত কাণ্ড! এ আমি সমর্থন করতে পারছিলাম না। যদিও আমিই তাকে আগে বিশ্রাম করতে বলেছিলাম।

কিন্তু ও হয়ত ইচ্ছে করে ঘুমোয় নি, অজস্র ক্লান্তির ভারে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবলাম, কিছুক্ষণ ঘুমোক, তার পর তুলে দেব। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলাম। তার পর আরও একটা ধরালাম। রাত দেড়টা বাজল, তখনো সুলতার জাগবার লক্ষণ নেই, নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমোচ্ছে, শ্লথ দেহ চেয়ারে ছড়িয়ে রয়েছে। একটা হাত চেয়ারের হাতলে, একটা হাত কোলে।

ঘাড়টা কাত করে চেয়ারের পিছনে রেখে নিশ্চিন্ত আরামে সুলতা ঘুমুচ্ছে, যেন নিজের ঘরের বিছানা। খোঁপাটা ভেঙে চুলগুলো বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ছাড়া এই মহানিশায় বোধ হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ কোথাও জেগে নেই, সকলেই দিবসের কর্মক্লান্তি ঘোচাচ্ছে, পরদিনের প্রাণ ধারণের মর্মান্তিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুলতা হয়ত কয়েক রাত্রির নিদ্রাহীনতা পুষিয়ে নিচ্ছে। থাক, কি হবে ওকে ডেকে তুলে মিছামিছি কষ্ট দিয়ে? খানিক পরে নিজেই উঠবে প্রয়োজনের খাতিরে, ইতিমধ্যে দেহ-মনের শ্রান্তিটা কাটিয়ে নিক।

আমি বরং একটু চা তৈরী করি, আমার চোখে ত ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এতে সময়টা কাটবে ভাল। এই ভেবে ধীরে-সুস্থে স্টোভটা ধরালাম। তার পর চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে মেঝের এক পাশে বসে ধীরে-সুস্থে চা প্রস্তুত করলাম। দু'টি কাপে

চা ঢেলে সুলতার কাছে গিয়ে এবার তাকে বার বার ডাকতে লাগলাম। তাতেও যখন সে জাগল না, তখন চেয়ার ধরে নাড়া দিতে লাগলাম, প্রথমে মৃদু ভাবে, তার পর জোরে। এবার সে চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল, সে দৃষ্টি যেন গোধূলির মত ধূসর, ম্লান।

বললাম, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ লতা, ভোর হয়ে আসছে। ঘুম ছাড়াবার জন্তে চা তৈরী করেছি। দাঁড়াও আনছি, খেয়ে নিয়ে এই বার আমায় বল, কি হয়েছে। তোমায় আবার বাড়ী ফিরতে হবে।"

গিয়ে কাপ দু'টি নিয়ে এলাম, তার পর দেখলাম পাশ ফিরে বসে সুলতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্ত আরামে। আমি চিত্রার্পিতের মত দু'হাতে দু'টি কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তার পর ভাবলাম, দূর হোক গে, ছাই! ও না খায় না খাবে, এত কষ্ট করে তৈরী করলাম, আমিই চায়ের সদ্ব্যবহার করি। এই ভেবে বেশ আরামের সঙ্গে চায়ে চুমুক দিতে লাগলাম।

কাপটা নামিয়ে রেখে অষ্টম সিগারেটটি ধরিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনটে। আর ভোর হতে বিলম্ব নেই। সুলতাকে জাগাবার চেষ্টা করা বৃথা, বরং ওর বাড়ি গিয়ে জেনে আসা ভাল ব্যাপারটা কি। তাঁরা থানায় খবর দেবার আগে আমি উপস্থিত হতে পারলে হাঙ্গামা বাড়ে না। কিন্তু সদর দরজা বন্ধ করবে কে? চাকরদের জাগানো চলে না, সুলতা জাগবে না। তার পর উপায়টা চট করে মাথায় এল। একটা তালা নিয়ে নিচে গেলাম এবং সদর দরজায় সেটি লাগিয়ে রাস্তায় পা দিলাম।

তখন পূর্ব্ব-দিগন্তে আলোর ছোঁয়াচ লেগেছে, দু'-এক জন পথচারীর দর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সুলতা আর কিছুক্ষণ পরেই হয় ত' উঠবে। তার পর নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে যা হোক করে মানিয়ে নেবে। হন-হন করে পা চালিয়ে দিলাম, তার পর একটা রিক্সা মিলে গেল। তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বসে জোরে চালাতে বললাম।

আমার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা সুলতাদের বাড়ির কাছে যেতেই প্রমাণিত হয়ে গেল। সদর দরজা খোলা, রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখলাম, উঠানের পাশে দাওয়ায় অনেক ব্যক্তি বসে রয়েছেন, সুলতার স্বামী হরপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে অধোবদনে মাথায় হাত দিয়ে।

আমি উঠানে গিয়ে দাঁড়াতে সে এগিয়ে এসে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনাকে এত রাত্রে, অত দূরে কে খবর দিয়ে এল?"

"খবর ত আমিই দিতে এলাম।" হেসে উত্তর দিলাম।

"কিসের খবর?"

"সুলতার।"

"আপনি সুলতার খবর দিতে এসেছেন?" হরপ্রসাদের কণ্ঠে বিস্ময় আর বাগ মানছে না।

ততক্ষণে দাওয়ার সকলে উঠে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, আমি যেন কি অপরূপ বিস্ময়কর সংবাদ বহন করে এনেছি। তাঁদের বিস্ময় দেখে আমিও স্তম্ভিত হলাম। সারা রাত্রি সুলতার দেখা নেই, অথচ তারই খবর দিতে এসেছি বলায় সকলে বিস্মিত হয়েছে!

তাই, আমিও বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "আমি সুলতার খবর দিতে আসব না, ত কে আসবে? সে যে আমার ঘরে চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছে।"

সহসা বজ্রপাত হলেও বোধ হয় সকলে এতটা বিচলিত হত না। কিন্তু হরপ্রসাদ নিঃশব্দে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, "আসুন ভাই, ঘরের ভিতরে আসুন।"

হয়ত সকলের সামনে সে পারিবারিক গোপনীয় ঘটনার আলোচনা করতে চায় না। তাই তার পিছু পিছু ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হলাম। একটি তক্তাপোষের উপর মোটা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে সুলতা ঠিক তেমনি কুঁকড়ে শুয়ে আছে, ঠিক সেই রকমই চুলগুলো বুকের উপর ছড়িয়ে আছে, একটি শীর্ণ হাত তাকিয়ার এক প্রান্তে, অপর হাত কোলের উপর। মুখ তেমনি বিবর্ণ, কালো।

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

হরপ্রসাদ বলল, "কিছু দিন ধরে সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে সুলতা মানসিক রোগগ্রস্তের মত ব্যবহার করছিল। জানি না, কোথায় তার এই অশান্তির মূল, আমি কাজ নিয়ে এত দূর ব্যস্ত ছিলাম যে, তার সব খবর সব সময় রাখতে পারিনি। তার পর আজ রাত বারোটার পর পোড়া গন্ধে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, তার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে। বাইরের ওই পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন, ডাক্তারও ডেকে আনা হয়েছিল, কিন্তু সুলতাকে রাখা গেল না।"

এই বলে সে নিঃশব্দে সেই তক্তাপোষেরই এক প্রান্তে বসে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে বিমনা হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার ঘরে সুলতা এখন কি করছে?

প্রার্থনা

নীলিমা দাশগুপ্তা

আকাশে আলো যদিও নেবে, তবু
হৃদয়ে এক নিপুণ-শিখা জ্বলে,
উর্দ্ধমুখী সে জ্যোতি যেন কভু
নেবে না, যেন তরল কালো-জলে
একটি তারা ছায়ার ঘরে ফোটে;
একটি আশা জ্যোতির্ময়ী ভাষা

জীবনে যেন নিদ্রা ভেঙে ওঠে,
বিছিয়ে রাখে অপার ভালবাসা।
জীবন জুড়ে জন্মাচারা কাজে
একটি সুর সবার কাছে চেনা,
কাজ ভুলোনো সে গান যেন বাজে
যখন হাটে বন্ধ বেচা-কেনা।

কিরণদা'র গল্প

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

দিন পূর্ব্বে বাঙলা দেশের ছোটো-বড়ো সকল পত্র-পত্রিকাতেই আপনারা ঐ বিপ্লবী নায়ক কিরণদা'র মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চয় পেয়েছেন। কোনো কোনো পত্রিকায় তাঁর সংক্ষেপিত জীবনীও লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড়ো এক জন দেশনেতার আসল মর্ম্মের ছবিটির ওপরই মোটে আলোকপাত করা হয়নি। আজ ঐ তা-বড় তা-বড় দেশনায়কদের মাঝখানে আমরা তাঁর কথা ভুলে যাই, কিন্তু যারা ঠিক তাঁর আসল পরিচয়টুকু পেয়েছে তারা তাঁর নাম কোন দিন ভুলবে না।

সারা জীবনটি কিরণদা'র কেটেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। উপেন-বারীনের সেই মাণিকতলার বোমার প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে সর্ব্বশেষ গণ-অভ্যুত্থান বিয়াল্লিশের দিন পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে তিলে তিলে দান করে গেছেন। সারা জীবনটাই কেটেছে জেলের ভেতর। অধুনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদে সম্মানিত অরুণচন্দ্র গুহ হতে আরম্ভ করে বহু খ্যাতিমান্ এবং অখ্যাতিমান্ রাজনীতিকরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, এবং তাঁরা সসম্ভ্রমে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই মহামানবটিকে ....

মোড় ঘুরল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল। এত দিন ধরে দেশের কাজ করেছেন সব—রুই-কাতলা থেকে শুরু করে চুনো-পুঁটি পর্য্যন্ত সবাই হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করলেন গদি কাড়াকাড়ি নিয়ে। এত দিন ধরে নানা দুঃখে কেটেছে, এবার একটু ভোগের ইচ্ছা স্বাভাবিক। তাই বরদাস্ত করতে হয়। কিন্তু কিরণদা'? কিরণদা'কে দেখা গেল এই উৎসব থেকে বহু দূরে। এই হৈ-হুল্লোড়ের আওতা থেকে বহু পূর্ব্বেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সবাই মনে করল এবার বুঝি তিনি ছুটি নিচ্ছেন। তাই অনেকে গিয়ে জিগ্যেস করল: "কিরণদা', এবার কী আপনার কাজ ফুরোল?"

কিরণদা' মৃদু হাসেন। সেই মধুর হাসি। বহু লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নে সে হাসি যেন অণুমাত্রও ম্লান হয়নি।

সবাই বলল: "এই খানেই কী কাজের শেষ?"

কিরণদা' মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন: "রামোঃ, এই বারেই ত আসল কাজের শুরু। এত দিন ত কাদা-মাটি জোগাড় করা হল, এই বারই ত প্রতিমা নির্ম্মাণ।"

এই কিরণদা'কে নিয়ে ক্লাশে গল্প বলছিলেন, প্রিন্সিপাল জি. সি. মজুমদার। প্রথমে পরিচয়ের কথা বললেন: যখন উনি দৌলতপুরের আশ্রমে, তখনই প্রথম পরিচয় হয় আমাদের সঙ্গে। গুটি কয়েক ছেলে বসে আছে, আমরাও গিয়ে দাঁড়ালুম। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আয়—এসেছিস, বোস্। ওপাশের গাঙের ধার হতে ঠাণ্ডা ঝির্-ঝিরে বাতাস বয়ে আসছে। আশ্রমের গাছ-গুলির পাতা থির্-থির্ করে কাঁপছে। সেই রমণীয় মুহূর্ত্তটিতে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

উনি উপনিষদের কী একটা বোঝাচ্ছিলেন। বোঝান শেষ হলে বললেন: "কী রে, এক বার বেড়াতে এলি বুঝি?"

আমরা সলজ্জ হয়ে বললাম: "হঁ—এখন যাই। আবার কাল আসব।"

কিন্তু কে আর কথা শোনে, এর পর উনি ধরে বসলেন: "এসেছিস্ যখন, একটু মিষ্টি খেয়ে যা। খানিকটা মিষ্টি দিয়ে গেছে অমুক।" এই বলে হাসতে লাগলেন।

এর পর কিছু দিন বাদে বিপ্লবের ছায়া দেখা দিল সারা দেশময়। কিরণদা' বন্দী হলেন। কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে যে অসংখ্য কিরণদা'র সৃষ্টি করে গেছেন, সে-কথা কী কেউ টের পেয়েছে? তাই প্রথম চোটে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট খুব খানিকটা নাজেহাল হল।...

এর পর বহু দিন কেটেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে। বাঙলা দেশ ভাগাভাগি হয়ে আধখানা হয়েছে পাকিস্থান, আধখানা হিন্দুস্থান। ইতিমধ্যে নানা পরিবর্ত্তন হয়েছে। দৌলতপুর কলেজ ছেড়ে, এ কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এসেছি। মফঃস্বলেই পড়ে আছি, কচিৎ কলকাতায় যাওয়া-আসা ঘটে। চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে পরিচয় আরো কচিৎ।

এমন সময় ক'লকাতার একটি রাস্তায় কিরণদা'র সঙ্গে দেখা। কিরণদা' হেসে বললেন: "কোথায় আছিস্—ভালো আছিস্ ত?"

সব কথা খুলে বললুম। উনি বললেন: "কলেজ কী রকম চলছে, ভালো ত?"

আমি বললুম: "আমার কথা বাদ দিন। আপনার খবর কী বলুন?"

প্রশ্ন শুনে সেই হাসি হাসলেন কিরণদা'। মহাদেবের মত পবিত্র হাসি। তার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন: "কী আর করি বল, ছেলেগুলোকে নিয়ে একটা লাইব্রেরী তৈরী করেছি। ওরা সব পড়াশুনো করে—জানিস্ তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অশিক্ষাই আমাদের সব চেয়ে বড়ো শত্রু—ওকে দূর না করতে পারলে চলবে না। তাই এই কাজে নেমে পড়লুম। তা' ছাড়া বুড়ো-সুড়ো হয়েছি—আর ক'দিন বা বাঁচব—'অমুক তমুক' ওদের এখন সব ভোগ করবার ইচ্ছে—তাই মন্ত্রী-টন্ত্রী হল—আমি বাবা দিব্যি আছি—কী বলিস্?"

কী বলব, সত্যই আমি ভেবে পেলুম না। এত বড়ো স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষকে কী দিয়ে ব্যক্ত করব? তাই তাঁর দু'পায়ে মাথা নুইয়ে, পায়ের ধূলো মাথায় দিলাম। বহু লোকের সঙ্গেই আমার জীবনে পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু এমন নিস্পৃহ লোক আর আমার চোখে পড়ল না। দেশকে ভালবাসা ছাড়া, তাঁর আর আলাদা কোন জীবন ছিল না। তিনিই প্রকৃত দেশপ্রেমিক

এই কিরণদা'র আরো নানা গল্প প্রিন্সিপ্যালের মুখে শুনেছি। যতই শুনেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। গত ডিসেম্বরের প্রথমের দিকে আমরা সব টেষ্টপরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি—এমন সময় খবরের কাগজের এক কোণায় খবর পেলাম, কিরণ মুখার্জ্জী অসুস্থ। তার পর আরো কিছু দিন কেটে গেল। ডিসেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি। টেষ্ট পরীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভোরবেলা কলঘর থেকে বেরিয়ে আসছি—কয়েক জন হোষ্টেলের বন্ধু খবরের কাগজটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল: "এই দেখ্—কিরণদা' আর এ জগতে নেই!"

বাইরে তাকালাম। শীতকালের সকাল। ঘাসে ঘাসে শিশিরের পরশ। আকাশে হাল্কা মেঘ। নির্ম্মল অরুণালোক। শালিকের কিচির-মিচির। মনে হল, কিরণদা' মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর সেই নির্ম্মল পবিত্র হাসিটি মিশে রয়েছে যেন এই শীতের স্নিগ্ধ সকালটুকুতে। আমাদের ওপর সেইটিই হল তাঁর আশীর্ব্বাদ।

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

শ্রীমতী শকুন্তলা বর্ম্মা বললেন, "চলিয়ে, আজ আপকো Lunatic Asylum মে লে যাউঙ্গি।"

বিস্মিত হওয়ার ভাণ ক'রে আমি বললাম, "কেন? আপনি আমাকে পাগল মনে ক'রেছেন নাকি?"

উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন শকুন্তলা। তার পর বললেন, "আপনারা—বাংগালীরা বহুৎ মজা কোরকে হাসাইতে পারেন।"

বাঙালী জাতির প্রতি শকুন্তলার এই compliment সস্মিত মুখে স্বীকার ক'রলাম।

কথা হ'চ্ছিল শকুন্তলার সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে ব'সে। পশ্চিমের এই সহরে মাত্র মাস খানেক হ'ল আমরা এসেছি। স্বামীর চাকুরী স্থল—বদলী হ'য়ে এখানে এসেছেন। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত এক জন ভদ্রলোক শকুন্তলাদের এই মস্ত-বড় বাড়ীর একটা portion ভাড়া নিয়ে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন। শকুন্তলার স্বামী মণিলাল বর্ম্মা এক জন বড় ইঞ্জিনীয়ার।

শকুন্তলার বাঙালী-প্রীতি আছে বেশ। অনেক দিন আগে কলকাতায়ও নাকি তিনি কিছু দিন ছিলেন। বাংলা কথা শকুন্তলা বুঝতে পারেন, যদিও বলতে পারেন না। অনেক সময়ই তিনি আমার সঙ্গে আধা-বাংলা আর আধা-হিন্দী কথা বলেন। কাছে-পিঠে বাঙালী বিশেষ কেউ না থাকায় শকুন্তলার এই অপূর্ব্ব বাংলা কথাই আমার বেশ লাগে।

এর পর শকুন্তলা বললেন যে, "এখানকার পাগলা-গারদের ডাক্তার মৈত্র, তিনিও বাঙালী—ডাক্তার মৈত্র ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শকুন্তলার আলাপ আছে। আজ তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শ্রীমতী মৈত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন এবং পাগলা-গারদের নানা রকম মনোভাবের পাগলীদের দেখার সুবিধা ক'রে দেবেন।

আমি সম্মতি জানালাম, "বেশ।"

এই নাতিদীর্ঘ সুশ্রী মহিলাটির সব কিছুতেই উৎসাহ প্রচুর। যেমন কথায়, তেমনি কাজে। বিকেল হতেই তাঁর মোটরে আমাকে নিয়ে চললেন পাগলা-গারদ অভিমুখে।

পাগলা-গারদের সন্নিকটেই ডাক্তার মৈত্রের আবাস। শ্রীমতী মৈত্রের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুসী হ'লাম। নাম তাঁর মণিকা। বেশ প্রীতিপ্রদ কথাবার্ত্তা তাঁর। চা-মিষ্টান্নে মণিকা মৈত্র আতিথ্যের ত্রুটি রাখলেন না। তার পর শকুন্তলার অনুরোধে তিনি আমাদের নিয়ে চ'ললেন দু'-একটি পাগলী দেখাতে।

প্রথমে মণিকা আমাদের দেখালেন এই দেশীয়া একটি প্রৌঢ়া মহিলাকে। আপন মনে অনুচ্চ কণ্ঠে কী সব ব'কে যাচ্ছে। আমাদের গ্রাহ্যও ক'রল না। মণিকা বললেন, "ওর স্বামী, ছেলে-মেয়ে সব আছে, কিন্তু ওর ধারণা ও অনাথা বিধবা। আর তারা সবাই জোর-জুলুম ক'রে ওর টিপসই নিয়ে ওর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নিতে চায়।"

এর পর মণিকা আমাদের নিয়ে লোহার গরাদে-দেওয়া এক বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলাম, বারান্দায় একটা টুলের উপর ব'সে আছে একটি অতি সুন্দরী মহিলা। হাঁ, মুগ্ধ হ'য়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার মতন সুন্দরী বটে। আর কী দীর্ঘ ও ঘন-কালো চুলের রাশি তার এলানো র'য়েছে! আমি মণিকাকে বললাম, "কী সুন্দর ওকে দেখতে—না? দেখে হিংসে হয়।"

একটু উঁচু গলায় বোধ হয় কথাটা ব'লে ফেলেছিলাম, শুনতে পেয়ে মহিলাটি খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। ভারি মিষ্টি তার হাসির আওয়াজ! তার পর টুল ছেড়ে উঠে একটু এগিয়ে এসে বলল, "না, না, কক্ষণো কাউকে হিংসে ক'রবেন না। পরের হিংসে ক'রলে নিজের মন্দ হয়। আমি জয়াকে হিংসে ক'রেছিলাম ব'লেই তো পারিজাত চ'লে গেল। নন্দন-বনের পারিজাত! জয়াকে চেনেন তো? ওঃ, চেনেন না? তাহ'লে আসুন না—এসে বসুন, সব বলি।"

আমরা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রলাম। মণিকা নিম্ন কণ্ঠে বললেন, "তা চলুন ব'সিগে। কিছু ক'রবে না—তেমন সাংঘাতিক পাগল ও এখন নয়।"

বারান্দার বাইরে এখানে-ওখানে সাজানো অনেকগুলি ফুলের টবে একটা মালি ঝারি ক'রে জল দিচ্ছিল। মণিকা তাকে ডেকে বারান্দার গরাদের দরজা ঠেলে খুলে দিতে আর খান চারেক চেয়ার এনে দিতে বললেন। মালি দরজা খুলে দিয়ে চ'লে গেলে আমরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ চওড়া বারান্দা। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মালিটা চারখানা বেতের হাল্কা চেয়ার এনে পেতে দিয়ে গেল। আমি এতক্ষণ সেই তন্বী গৌরবর্ণা মহিলাটির সুস্মিত মুখের পানে চেয়ে দেখছিলাম। মণিকাও এবার তার দিকে চেয়ে বললেন, "এই চেয়ারে এসে বসুন ইন্দ্রাণী দেবী।" তার পর আমাদের দু'জনকে ব'সতে ব'লে মণিকাও বসলেন।

আমিই প্রথম কথা বললাম, "আপনার নাম ইন্দ্রাণী?"

ইন্দ্রাণী বলল, "হ্যাঁ। আপনি আমাকে খুব সুন্দরী বলছিলেন না?—সবাই তাই বলে। আমার ঠাকুমা বলতেন, 'রূপে যেন ইন্দ্রাণী!' তাই আমার নামও রেখেছিলেন ইন্দ্রাণী। হ্যাঁ আপনাদের জয়ার কথা বলব বলছিলাম না? তাহ'লে গোড়া থেকেই বলি শুনুন।

"বেদব্যাসপুর চেনেন? চেনেন না? কেন? কলকাতা থেকে বেশী দূরে তো নয়—এক দিনেই যাওয়া-আসা করা যায়। তা সেই বেদব্যাসপুরের মেয়ে ছিলাম আমি আর জয়া। অনেক বছর আগের কথা থেকে—আমাদের সেই শৈশবের, কৈশোরের কথা থেকে সুরু ক'রছি। তা সেই বেদব্যাসপুরের মেয়ে ছিলাম আমি আর জয়া। জয়া ছিল সামান্য গেরস্ত ঘরের মেয়ে, তবে

ওর বাবার কাপড়ের দোকান ছিল, তাতে ওদের সংসার ক্রমশঃ সচ্ছল হ'য়ে উঠছিল। আর আমি ছিলাম গ্রামের জমিদার-বাড়ীর মেয়ে। যদিও আমার বাবা জমিদার ছিলেন, তবে জমিদারীর আয়ের চাইতে তাঁর ঋণই হ'চ্ছিল বেশী। কারণ, অনেক সরিকের মধ্যে ভাগ হ'য়ে সম্পত্তি ক'মে গিয়েছিল। তার উপর জমিদারী 'চাল' বজায় রেখে খরচ করা—পুণ্যাহের দিনে প্রজাদের খাওয়ানোর প্রচুর আয়োজন করা—এই সবের পর রাজস্ব দেওয়ার সময় তাঁকে ধার ক'রতে হ'ত। তাহ'লেও আমি ছিলাম জমিদার-বাড়ীর মেয়ে—তাতে আবার একমাত্র মেয়ে।

"আমরা এক বোন, দু' ভাই। হ্যাঁ, কী বলছিলাম—যদিও আমার ঠাকুরদাদার ও বাবার আমলের মস্ত-বড় বাড়ীর অনেক ঘর-বারান্দা এমন ভেঙ্গে-চুরে গেছে যে বাস করা যায় না। আমাদের অংশের যে ঘরগুলোতে আমরা থাকি তারও দেয়ালের পলস্তারা খ'সে গেছে, মেঝের সিমেন্ট উঠে গেছে। আমাদের প্রকাণ্ড পুকুরের জলে শেওলা, পানা জন্মিয়ে জল ছেয়ে গেছে, শান-বাঁধা ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে যাওয়ায় খেজুর গাছ কেটে ঘাটে নাবার পৈঠে করা হ'য়েছে, তবু তো আমি জমিদার-বাড়ীর মেয়ে—তার উপর এমন রূপসী মেয়ে? আর জয়াটা হ'ল কালো, কুটকি। আর এমন হাবলী, যে, আমি ওকে প্রকাশ্যে এত যে তাচ্ছিল্য করি, জয়া না ব'লে জগদম্বা ব'লে ডাকি, তা সে গায়ে মাখে না। বোকার মতন একটু হেসে যা বলি তাই মেনে নেয়। আবার আমি যদি একটু হেসে ওর সঙ্গে কথা বলি তো কৃতার্থ হ'য়ে যায়। সেই জয়া!

"গ্রামের ইস্কুলে আমি কিছু দিন প'ড়েছিলাম। জয়াও তখন প'ড়ত। তার পর জমিদার-বাড়ীর মেয়ের ইস্কুল যাওয়া ভালো দেখায় না বলে ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। তা ব'লে ভাববেন না যেন কিছুই আমি পড়িনি। ইংরেজি বেশী পড়িনি, তবে বাংলা···মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, তার পর বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী, তাছাড়া নবীন সেন, হেমচন্দ্র, মাইকেল, কত আর বলব—এঁদের সব্বাইকার বই সেই বয়সেই সব প'ড়ে ফেলেছি।

"তার পর নানা জায়গায় আমার বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে লাগল। ঠাকুমা, বাবা, মা সবাই বলতেন, বড় ঘরে, খুব ভালো বর দেখে আমার বিয়ে দেবেন। আর আমি তো সর্ব্বক্ষণই সাজ-সজ্জা ক'রে আয়নায় নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম। আর মনে মনে নিশ্চিন্ত জানতাম, রূপকথার রাজপুত্রের মতই রূপে-গুণে বর হবে আমার। কিন্তু ভালো ভালো সম্বন্ধ এলে কী হবে—শুধু পাত্রীর রূপ থাকলে কী হবে—আমাদের বহু দিন মেরামত-না-করা বাড়ী-ঘর দেখে, আর তাদের দাবী মত পণ-যৌতুক দিতে বাবাকে অসমর্থ জেনে কোনও পাত্রের অভিভাবকই বিয়ে দিতে রাজী হ'ল না।

"এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনলাম, জয়ার মামারা জয়ার বিয়ে ঠিক ক'রেছে। পাত্র ক্যাম্বেল পাশ ডাক্তার। জয়ার মা-বাবা জয়াকে নিয়ে জয়ার মামাবাড়ী চ'লে গেল। দিন-কয়েক পরেই আবার শুনলাম বিয়ে হ'য়ে জয়া ফিরে এসেছে, ওর বরও এসেছে।

"জয়ার মা এসে একদিন সবিনয়ে আমাকে বর দেখার আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু আমি যাব তাদের বাড়ী বর দেখতে? তার চেয়ে মাকে ব'লে জয়াকে আর তার বরকে আমাদের বাড়ী দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'রলাম। এল ওরা দু'জনে আমাদের বাড়ী।

"জয়ার বরকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'লাম। ঠিক অবহেলা করার মতো নয়। চেহারাও সুশ্রী, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। কথাবার্ত্তাও বেশ মার্জ্জিত। এ-ও লক্ষ্য করলাম, কালো খুটকি জয়াটাকে ওর মতন ছেলে ভালোও বাসে! একটু ঈর্ষা জাগল মনে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। তখুনি মনে মনে হেসে ভাবলাম, আমার বর হবে বনেদি বড় লোকের ছেলে—রূপে, বিদ্যায় জয়ার বরের চাইতে হবে অনেক শ্রেষ্ঠ। এমন সুন্দরী মেয়ে আমি!···মিশরের রাণী সুন্দরী ক্লিয়োপেট্রার চাইতে আমি কম সুন্দরী নই!"

গৌরবময়ী রাণীর মতো সুন্দর গ্রীবা বাঁকিয়ে ঋজু দেহে ইন্দ্রাণী ব'সে রইল একটুক্ষণ। তার পর আবার চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "ক'দিন পরে জয়া তার বরের সঙ্গে চ'লে গেল। আর আমার দিন কাটতে লাগল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

"এদিকে বাবা আমার খুব ভালো বিয়ে দেওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে মাঝারি-ভালো বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু তাদেরও অসম্ভব যৌতুকের দাবী দেখে পিছোতে বাধ্য হ'লেন।

"অবশেষে আমার বিয়ে স্থির হ'ল আমাদের গ্রামেরই কাছাকাছি অন্য এক গ্রামের ছেলের সঙ্গে। বংশ তাদের ভালোই, তবে পড়ন্ত অবস্থা। ছেলে কলকাতার কী-একটা আপিসের কেরাণী।

"আশাভঙ্গের মনঃক্ষোভ নিয়ে বিয়ে হ'য়ে গেল। আমিও দিন কতক পরেই বরের সঙ্গে কলকাতায় চ'লে এলাম। তবু খুব বেশী দুঃখিত হ'লাম না। গ্রাম ছেড়ে এসে সহরের বৈচিত্র্য ভালোই লাগল। তা ছাড়া আমার কৃশকায় কেরাণী স্বামীটি সাধ্যাতিরিক্ত খরচ ক'রে আমার মতন স্ত্রীকে সুখে, আরামে রাখার চেষ্টা ক'রত। আমার প্রসন্নতা পাবার জন্য দামি সৌখিন নানা উপহার এনে দিত।

"এমনি ভাবে কেটে গেল দু'বছর। তার পর আমার কোলে এল আমার খোকা। কী সুন্দর সে—যেন আকাশ থেকে খ'সে-পড়া এক-টুকরো চাঁদ! খোকাকে পেয়ে আমি বিশ্ব-সংসার ভুলে গেলাম—ভুলে গেলাম আমার মনে যতটুকু ছিল অপ্রাপ্তির বেদনা। সমস্ত মন আমার মাধুর্য্যে ভ'রে গেল—সুধারসে সিক্ত হ'য়ে গেল আমার অন্তর। কী? আপনারা ভাবছেন আমার বাড়াবাড়ি? প্রথম মা হ'লে সব মায়েরই অমন মনে হয়।—তা হবে। তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা' কবিতায় খোকার মা তার খোকাকে ব'লছে,—

'সব দেবতার আদরের ধন, নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে, এসেছিস আনন্দস্রোতে
নূতন হ'য়ে মায়ের বুকে বিলসি।'

"কবিগুরু পুরুষ হ'য়ে মায়েদের মনের কথা কী ক'রে জেনেছিলেন!

"তার পর খোকার নাম রাখতে মহা সমস্যায় প'ড়লাম। বেছে বেছে যত সুন্দর নাম রাখি, কোনটাই আমার খোকার

যোগ্য মনে হয় না। শেষে নাম রাখলাম পারিজাত কুসুম। স্বর্গের ফুল—ইন্দ্রাণীর প্রিয় পুষ্প!

"এর মধ্যে আমার স্বামীর চাকরীর কিছু উন্নতি হ'য়ে কলকাতা থেকে বদলী হ'য়ে কয়েক জায়গায় দু'-এক বছর ক'রে থেকে শেষে আমরা এলাম এই সহরে। আমার পারিজাত তখন বারো বছরের। ও-ই আমার একমাত্র সন্তান। ও-ই আমার স্নেহ-সরোবরে একটিমাত্র প্রস্ফুটিত পদ্ম। ও-ই আমার জীবনের আনন্দ-ধন—আশঙ্কার ধন!—সর্ব্বদাই ভয়ে মরি, কখন বুঝি কী অকল্যাণ হয় ওর!

"এখানে আসার কিছু দিন পর কী-একটা অনুষ্ঠান-সভায় জয়ার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেল। হঠাৎ দেখা হওয়ায় দু'জনেই আশ্চর্য্য আর খুসী হ'লাম। জয়া তোঁ আরো বেশী খুসীতে গদগদ হ'য়ে উঠল। কত দিন এসেছি কোথায় থাকি সব জেনে নিল। তার পর দিনই বিকেলে জয়া ট্যাক্সী করে আমার ওখানে গিয়ে উপস্থিত। আমাদের সবাইকে জয়া নিজের বাড়ী নিয়ে গেল।

"জয়ার বাড়ী এসে আমি অবাক হয়ে গেলাম। নানা আসবাব-পত্রে সাজানো-গোছানো বাড়ী। ঝি-চাকর রয়েছে। জয়ার গা-ভরা গয়না, পরেছে মিহি তাঁতের সাড়ী। একটা ক্যাম্বেল-পাশ গ্রাম্য ডাক্তারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল, কী করে এত সচ্ছলতা হওয়া সম্ভব হ'ল?"
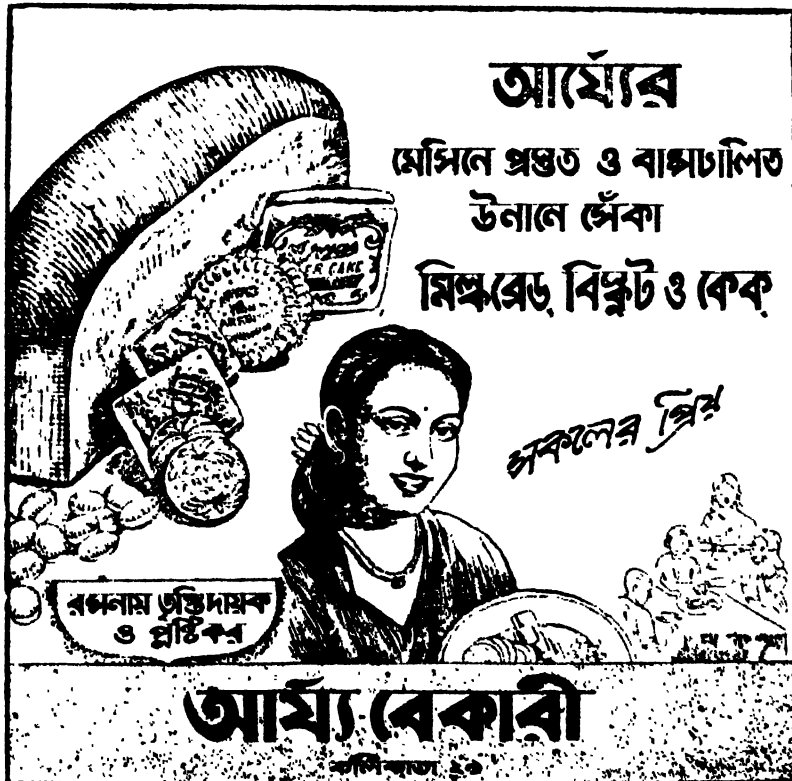
"জয়া নিজে থেকেই বলল, ওর স্বামী বিভাস আগে গ্রামেই ডাক্তারি করত বটে, কিন্তু টাকা-পয়সা তেমন কিছুই পেত না। ওদের এক আত্মীয় এখানে থাকতেন। তাঁরই কথা মত বিভাস এখানে এসে প্র্যাক্টিস্ সুরু করে। পরে সেই আত্মীয়টি তাঁর ওষুধের দোকানের অংশীদার করে নেন বিভাসকে। তাই থেকেই ক্রমে এতটা হয়েছে। কথাচ্ছলে জয়া এ-কথাও জানাল যে, একখানা মোটরও তাদের আছে। কিন্তু সেটা সর্ব্বদাই বিভাসের দরকারে লাগে ব'লে জয়া বড় একটা ব্যবহার করতে পায় না। দেখে-শুনে মনটা টন্‌টন্ করছিল বটে, তবু মনটা খুসী রইল এই ভেবে যে আমার ছেলের মতন ছেলে জয়ার নেই! জয়ারও একটি মাত্র মেয়ে—আমার খোকারই বয়সী। দেখতে ঐ জয়ারই মত। মুখখানা বোকা-বোকা। আর কথা বলে, কী রকম তার আড়ষ্ট উচ্চারণ!

"দায়-সারা গোছের ক'রে জয়ার মেয়েকে একটু আদর করলাম। জয়া তো আমার ননী-কোমল খোকাকে কোলে টেনে আদর ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"রাত্রে না খাইয়ে জয়া আমাদের যেতে দেবে না। থাকতে হ'ল। রাত্রে বিভাসও এল। দেখলাম তারও আকৃতি-প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন হয়েছে। দেখলে হঠাৎ সমীহ হয়।

"এর পর যাওয়া-আসা প্রায়ই চলতে লাগল। আমি না গেলেও জয়া এসে নিয়ে যায়। আমার উপর শৈশবের সেই আনুগত্য ওর এখনও আছে। কিন্তু আমার মন টন্-টন্ করে এই ভেবে যে, আমি জমিদার-বাড়ীর মেয়ে, রূপে ইন্দ্রাণীতুল্য—আমার সংসারে আর্থিক

অনটন—যদিও আমার স্বামী এখনো যথাসাধ্য আমার বিলাসের উপকরণ যোগাচ্ছেন। আর সেই অতি-সাধারণ মেয়ে জয়া, তার সংসারে এই প্রাচুর্য্য!

"মাস ছয়েক কেটে গেল। একদিন জয়া চিঠি লিখে পাঠাল, বিকেলে তার ওখানে আমাদের যেতে। খোকা গেল না। খোকার স্কুলের এক বন্ধু খোকাকে আর ক'টি ছেলেকে সেদিন সন্ধ্যের কোন বড় হোটেলে নাকি খাওয়াবে—খোকা তাই গেল না। উনিও বাড়ীতে রইলেন। আমি একাই রিক্সা ক'রে জয়ার বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখি, জয়া নানা খাবার তৈরী ক'রছে—রাধাবল্লভী কচুরি, মাংসের সিঙ্গাড়া, ছানার পায়েস। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, 'কী ব্যাপার?' জয়া বলল, আজ তার বিয়ের দিন, তাই আমাকে ডেকেছে। আমি মুখে বললাম, তাই নাকি? আগে আমায় বলিস্ নি তো···কিছু উপহার আনা হ'ল না! মনে মনে বললাম, বুড়ো বয়সে বিবাহ-বার্ষিকী! পয়সা থাকলে কত ঢংই আসে।

"খাবার তৈরী শেষ হ'য়ে এসেছিল। থালা-বাটিতে প্রচুর খাবার সাজিয়ে জয়া আমাকে খেতে দিল। ক্ষিধে নেই, অজুহাতে কিছুই প্রায় খেলাম না। জয়া তাদের খাবার-টেবিলে বিভাসের আর ওর নিজের জন্তে খাবার-দাবার সাজিয়ে রাখল। তার পর আমাকে একটু ব'সতে ব'লে নতুন একখানা জরিপাড় শাদা শাড়ী হাতে নিয়ে স্নানঘরে গেল গা ধুতে। আমি ব'সে ব'সে নানা কথা ভাবছি। ভাবতে ভাবতে হিংসে-সাপটা যেন মনের মধ্যে ফণা তুলল। কী দুর্বুদ্ধি এল মনে—মনে প'ড়ল কিছু দিন আগে দেখেছি ও পাশের সরু বারান্দায় কতকগুলো শিশি-বোতলের সঙ্গে poison লেখা একটা বোতল র'য়েছে···' ইন্দ্রানীর চোখ-মুখ অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিস-ফিস ক'রে বলতে লাগল, চার দিকে চেয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই, চুপি চুপি উঠে গিয়ে সেই বিষের শিশি থেকে শাদা গুঁড়ো ঢেলে এনে টেবিলের সেই ছানার পায়েসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। তার পর পালিয়ে চ'লে এলাম বাড়ী। ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর চ'ড়তে লাগল ইন্দ্রানীর, বলতে লাগল, "তার পর কী হ'ল জানেন? তার পর আমার খোকা তার মা'কে খুঁজতে জয়ার বাড়ী গেল।" সবেগে চেয়ার ঠেলে দিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ ক'রে পূর্ণ উন্মাদিনীর মতো দু'হাত বাড়িয়ে, যেন সামনের কারো গলা-টিপে ধরার ভঙ্গীতে বলতে লাগল, "জয়া রাক্ষুসীকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব···."

মণিকা তাড়াতাড়ি উঠে তাকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে তার পিঠে হাত রাখলেন। এক জন পরিচারিকাকে ডেকে ইন্দ্রাণীর ভার তাকে দিয়ে আমাদের নিয়ে মণিকা বাইরে এলেন। বৃষ্টিহীন আষাঢ়ের দীর্ঘ দিন শেষ হ'য়ে তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। সূর্য্যাস্তের রাঙা রঙ আকাশে তখনো ছড়ানো। মেঘের মাথায় সোনার ছটা। একটু ঝিরঝিরে হাওয়ায় রজনীগন্ধা আর বেলফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এসে আমার বিকল মনকে আবার স্বাভাবিক ও স্নিগ্ধ ক'রে দিল।

পাগলাখানার সুবিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম, "কি আশ্চর্য্য! পরের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে এল—আর সেই খাবার খেয়ে ওরই ছেলে মর'ল!"

মণিকা বললেন, "তা নয়, ঐখানেই ওঁর মনের বিকার। আসলে উনি জয়ার বাড়ী খাবারে বিষ মিশিয়ে দেননি। ওঁর ছেলেও সে খাবার খায়নি। ঐ যে বললেন, ওঁর ছেলের এক বন্ধু হোটেলে খাওয়াবে বন্ধুদের? সেই হোটেলের খাবার খেয়েই সব ক'টি ছেলে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। হাসপাতালেও পাঠানো হয়েছিল ছেলে ক'টিকে। তার মধ্যে ওঁর ছেলে আর অন্য একটি ছেলে মারা যায়। বাকি ছেলেরা পরে সুস্থ হ'য়ে ওঠে। এ ঘটনা বছর দুই আগের। ছেলে মারা যাওয়াতে উনি পাগল হ'য়ে যান। তখন থেকেই ওঁর ধারণা, উনি জয়ার বাড়ীতে খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন—আর সেই খাবার খেয়েই ওঁর ছেলে মারা গেছে। কেন যে ওঁর মনে এই ধারণা জন্মাল!···হয়তো কোনো দিন ওঁর অবচেতন মনে বিষ মিশিয়ে দেবার ইচ্ছা জেগেছিল। এখন মানসিক বিকারে ধারণা জন্মেছে বিষ দিয়েছিলেন। কী জানি, মনোবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলে!"

কথা বলতে বলতে আমরা শকুন্তলার মোটরের কাছে পৌঁছলাম। তার পর মণিকা মৈত্রকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম। শকুন্তলা গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

কি নাম রাখি ওর?

শ্রীকামিনীকুমার রায়

আমাদের শাস্ত্রে 'নামকরণ' দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। পদ্ধতিকারগণ ইহার জন্য বিভিন্ন কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন। শিশুর জন্মের পর দশ রাত্রি কিংবা শত রাত্রি অতীত হইলে, অথবা বৎসর পূর্ণ হইলে নামকরণ করিতে হয়। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় শিশুর নামকরণও হইয়া থাকে। ইহাও অশাস্ত্রীয় নয়, কারণ, মুখ্যকালে যে-সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় নাই, গৌণকালে, অর্থাৎ পরবর্তী সংস্কার-দিবসে তাহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। লৌকিক আচার অনুসারে অনেকে জন্মদিনে, ষেটেরার রাত্রিতে, অশৌচান্তের পরাহে এবং অন্যান্য দিনেও নবজাতকের নাম রাখিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দুইটি নাম রাখা হয়,—একটি ডাক নাম, আর একটি যে নামে শিশু উত্তরকালে বৈষয়িক ও সামাজিক-জীবনে খ্যাত হইবে। জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্র অনুযায়ী জাতকের নামের আদ্য অক্ষর কি হইবে, শাস্ত্রে তাহারও নির্দেশ আছে। দুইটি নাম কল্পনা করিয়া খড়ি দ্বারা তাহা প্রস্তরাদিতে লেখা হয়, এবং তাহার উপর দুইটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। যে নামটির উপরিস্থিত প্রদীপ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেই নামটিই গ্রহণ করা হয় এবং তাহা কৃতমঙ্গল ও নববস্ত্রাবৃত শিশুর কর্ণকুহরে শুনাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণ লোক এত সব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া না যাইয়া জানা-শুনা নাম হইতে একটি বাছিয়া লয় এবং সামান্য অদল-বদল করিয়া কিংবা না করিয়াই সেই নামে সন্তানকে অভিহিত করে।

আমরা আমাদের সন্তানের যে নাম রাখি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাহা নামধারীর পরিণত বয়সের আকৃতি-প্রকৃতি বা গুণপণার কোনও পরিচয় বহন করে না। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, উপরোক্ত যে বয়সে আমরা শিশুর নামকরণ করি, সেই বয়সে তাহার দেহ-মনের এমন কোন বিকাশ লাভ ঘটে না,—যাহা হইতে আমরা তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে একটুকুও কল্পনা করিতে পারি। এই জন্য নামের উপর অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করেন না এবং 'নামে কি-বা আসে যায়, গোলাপকে যে-নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, উহার সুগন্ধের কোনও তারতম্য ঘটিবে না',—সেক্সপীয়রের এই বহু-পরিচিত উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া ইহারা নামকে শুধুমাত্র নাম এবং তাহা গুণবাচক নহে (non-connotative) বলিয়াই মনে করেন। 'কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন'—আমাদের দেশের এই লোককথার মধ্যেও এই ইঙ্গিতই প্রচ্ছন্ন আছে যে, নামের মধ্যে নামধারীর স্বরূপ খুঁজিতে যাইও না, সেরূপ করিলে প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সংসার-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও দেখিতে পাই, 'সত্যব্রত' নাম থাকিলেই নামধারী যে সর্বদা সত্য কথা বলেন, তাহা নহে; আবার অনেক 'রাণীবালার'ও রাজার জীবন-সঙ্গিনী হওয়া ত দূরের কথা, পর্ণকুটীরেও দিন চলে না। সময় সময় এমন অনেক রেখা দেবী, লীনা দেবীর আমরা সাক্ষাৎ পাই, ট্রাম-বাসের দ্বি-আসনেও যাঁহাদের স্থান সংকুলান হয় না; অনেক রাধিকারমণদেরও সেই অবস্থা। সমরেন্দ্র যাঁহার নাম, সামান্য পাতা নড়িবার শব্দেও তিনি আঁতকে উঠেন। রবির দ্যুতি এক 'রবীন্দ্রনাথে'ই দেখা গিয়াছে; কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশী মিলে না।

মনে হয়, আর্য-ঋষিগণ জাতকের বিকাশবৃদ্ধি ও রূপগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পরিণত বয়সে তাহাদের নামকরণ করিতেন। কারণ, আমরা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যে-সকল নাম অনেকগুলিই পাই, তাহাদের নামধারীর আকৃতি-প্রকৃতির দ্যোতক। আরও দেখা যায়, তখন জাতক শুধু তাহার পিতা-মাতা বা গুরুর দেওয়া নামেই পরিচিত হইত না, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ কার্য-সম্পাদন ও প্রতিভার বিকাশ দ্বারা সে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইত। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্তমানে অধিকাংশ স্থলেই নাম আর নামধারীর স্বরূপ প্রকাশ করে না,—যতখানি করে নামকর্তার রুচি ও প্রবৃত্তির প্রকাশ;—তাহার জ্ঞান-বিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ঘাটন। এই বিষয়ে আমরা এখানে একটু বিস্তৃত ভাবে বলিব।

সাধারণ লোক নামকরণের ক্ষেত্রে প্রায়ই সংস্কারলব্ধ কতগুলি রীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদের একটি হইতেছে,—দেবতার নামে বা সেই নামের যোগাযোগে সন্তানের নাম রাখা। ইহা দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহারা মনে করে। সন্তানকে দেবতার নামে ডাকার ভিতর দিয়া এক দিকে যেমন পরোক্ষ ভাবে ভগবানের নামকীর্তন করা হয়, অপর দিকে তেমনি সন্তানকে দেবতার নামাশ্রিত করিয়া সকল রকম আপদ-বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষার ব্যবস্থাও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভগবানের নামজপ সাধন-মার্গের একটি প্রধান সোপান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ত একটি মূলতত্ত্বই হইল,—

> 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।'

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহে মানুষ কত পাপ করে, নামজপের দ্বারা সেই পাপের ক্ষালন হয়। তাই 'জীবে দয়া, নামে রুচি' ধর্মজগতের একটি বড় কথা। আমাদের ভাষা রামায়ণেও এই 'নামে রুচি' জন্মাইবার জন্য কম চেষ্টা করা হয় নাই,—এই রামায়ণের মূল সুরই হইতেছে—'এক বার রামনাম শত পাপ হরে। মনুষ্যেরই শক্তি কি এত পাপ করে।' কিন্তু শত চিন্তা ভাবনায় জর্জরিত, সদা কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে এক স্থানে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া নামজপের অবসর কোথায়? আবার উঠিতে-বসিতে, চলিতে-ফিরিতে যখন-তখন ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিলেও 'অধার্মিকেরা' ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িবে কেন? তাই দেবতার নামে সন্তানের নাম রাখার মধ্যে সাধারণ মানুষের পুণ্যলাভের, তথা ভবসিন্ধু পার হইবার একটা গোপন ইচ্ছা যে না আছে, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

সাধারণের বিশ্বাস, দেবতার কৃপা ছাড়া কখনো সন্তান লাভ ঘটে না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে,—'পুত্রোৎসব দেবের বরে, লক্ষ্মীপূজা ঘরে ঘরে।' এই সন্তান-লাভের জন্য মানুষ তাহার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে কত যাগযজ্ঞ, পূজা-ব্রতের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেবতার দুয়ারে সে মাথা কুটিয়াছে, হত্যা দিয়াছে, যুগে যুগে কত কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়া গিয়াছে! কত তুকতাক, কত প্রক্রিয়ার সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! আমাদের বেদ-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, আমাদের ব্রতকথা, রূপকথা সে-সকল কাহিনীতে ভরপুর। দেবতা মানুষের জন্য সব কিছু করেন, করিতে পারেন;

এক দিকে তিনি যেমন পুত্র দেন, কলত্র দেন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন, অপর দিকে তেমনি তাঁহার বিরূপতা হইতে সব কিছু যায়, অঘটন ঘটে, অভাবনীয় বিপদ আসিয়া দেখা দেয়। এই রূপ মনোভাব হইতেই অনেকে তাহাদের স্নেহের সন্তানকে দেবতার নামের বর্মে, দেবতার নামের বাতুস্পর্শে রক্ষা করিতে চান; তাহাকে দেবতার চরণে, দেবতার সেবায় দেবতার ব্রতে উৎসর্গ করিয়া দেন।

আমাদের সমাজে দেবতার নামাশ্রিত কত অদ্ভুত বিচিত্র নাম যে মানুষের আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে হয়, দেবতার নামেই মানুষের নাম সর্বাধিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়,—অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, কৃষ্ণ, কালী, হরি, হর—দেবতার এইরূপ একটি মাত্র নাম রাখিয়াই যেন পিতা-মাতা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না,—অনেকে একই দেবতার একাধিক নামের সমন্বয়ে শিশুর নামকরণ করেন;—যেমন, কৃষ্ণগোপাল, রামকৃষ্ণ, হরশঙ্কর, কালীতারা ইত্যাদি। কতকগুলি নামের গঠনে আবার শৈব ও শাক্তের মিলন পরিলক্ষিত হয়, যেমন,—তারাশঙ্কর, শিবকালী, অন্নদাশঙ্কর। আবার কতকগুলি নামের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের সমন্বয় ঘটিয়াছে, যেমন—হরিহর, হরমাধব, শিবরাম। তেমনি আবার কতকগুলি নাম শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ভঞ্জন করে,—যেমন কালীকৃষ্ণ, কালীনারায়ণ। এই শ্রেণীর নামকরণে নামকর্তা যেন শিব এবং শক্তি, বিষ্ণু এবং শিব, শক্তি এবং বিষ্ণু উভয়কেই সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, অথবা যেই শিব সেই শক্তি, সেই শক্তি সেই বিষ্ণু, যেই বিষ্ণু সেই শিব এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কতকগুলি নামের মধ্যে সন্তানকে ভগবানের শ্রীপদে, তাঁহার সেবায় যেন উৎসর্গ করা হইয়াছে, যেমন,—দুর্গাপদ, কালীচরণ, শিবদাস, কৃষ্ণপ্রসাদ হরিদাসী ইত্যাদি। মনে হয়, চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে নামকরণে এই দাস্যভাবটি বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন,—জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্তরা আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাদের মতে—মানুষ শুধু ভগবানেরই দাস নহে,—তাঁহার ভক্তেরও দাস, সে দীনেরও দীন। গোপীপদরেণু, অকিঞ্চন দাস, কাঙ্গালীচরণ, প্রভৃতি নামগুলি সেই মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করে। রাধামাধব, নন্দগোপাল, ব্রজদুলাল, গোপিকাবিলাস এই শ্রেণীর নামগুলির মধ্যেও কৃষ্ণভক্তির প্রভাব আছে, বলা যায়।

শুধু বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যেই নহে,—অবাঙ্গালী এবং অ-হিন্দুদের মধ্যেও পৌরাণিক চরিত্র বা ঠাকুর দেবতার নামে সন্তানের নাম রাখিতে দেখা যায়। নটরাজন্, গোপালন্, বৈদ্যনাথন্, শঙ্করন্, শিবরাজন্,—মাদ্রাজীদের মধ্যে ত এই শ্রেণীর নামের ছড়াছড়ি। রামপূজন্, শিবভজন, সীতারাম, পুরুষোত্তম, রামভোলা, রামশরণ, রামকিঙ্কর, ভুবনেশ্বরপ্রসাদ, বাসুদেব, প্রভৃতি নাম উত্তর-ভারতে বহু-প্রচলিত। সে অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যেও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কমলা, দুর্গা, মীরা, ইন্দ্রা, চন্দ্রা প্রভৃতি নাম অধিক শুনা যায়। মুসলমানদের মধ্যেও মহম্মদ আলী, গোলাম মহম্মদ, গোলামালী, আহম্মদ আলী, আল্লাবক্স, খোদাবক্স, আবদুল, রহিম,—এই ধরণের নামই অধিক জনপ্রিয়।

রাখহরি, থাকপ্রসাদ, থাকমণি, স্থিরধর, অমর, মৃত্যুঞ্জয়—এই শ্রেণীর নামগুলির মধ্যে দেবতার নাম প্রত্যক্ষ ভাবে উচ্চারিত না হইলেও সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য মৃতবৎসা জননীদের যেন একটা তীব্র আকুলতা, ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। অনেকে অন্য বিবিধ সংস্কারাত্মক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, এখনো যে না করেন সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একটির পর একটি সোনার চাঁদ শিশুকে হারাইয়া মৃতবৎসারা মনে করিতেন,—সন্তান-ভাগ্য তাঁহাদের নাই। তাই তাঁহারা শেষে কোনও সন্তান হওয়া মাত্রই তাহা কোনও সন্তানবতীকে দান করিয়া দিতেন এবং আবার কড়ি, ক্ষুদ ইত্যাদি দ্বারা কিনিয়া লইতেন। সাধারণতঃ শিক্ষিতা উচ্চশ্রেণীর মহিলারা নিজেদের সন্তানের অকল্যাণ হইবে মনে করিয়া এইরূপ দান-বিক্রয়ে সম্মত হইতেন না; এজন্য মৃতবৎসারা প্রায়ই অন্ত্যজ রমণীদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। দানধন, এককড়ি, পাঁচকড়ি, ক্ষুদিরাম, বেচারাম, কেনারাম, এই সকল নামের উদ্ভব এক কালে হয়তো ঐ ভাবেই হইয়াছিল।

শাস্ত্রীয় নামকরণে সন্তানের দুইটি নাম রাখা বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সামবেদীয় এবং যজুর্বেদীয় পদ্ধতিকারগণ 'দেশাচার' বলিয়া ইহা মানিয়া লইয়াছেন এবং ঋগ্বেদীয় পদ্ধতিতেও সন্তানের একটি গুপ্ত নামকরণ এবং আর একটি প্রকাশ্য নামকরণের কথা বলা হইয়াছে। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আমরা সন্তানের যে দুইটি নাম রাখি, তাহার একটি ডাক নাম আর একটি যে-নামে সে দেশ-বিদেশে, সংসার-জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। আমাদের সমাজে হৃদয়ানন্দ, গৃহের আনন্দ অনেক শিশুকে হাবা, বোকা, ঘ্যাঁদা, পচা, পাগলা, গুয়ে, গোবরা, হাবলা, ক্যাবলা, প্রভৃতি তুচ্ছ নামে ডাকা হয়। এইরূপ ডাক নামের প্রধানতঃ তিনটি কারণ বলা যাইতে পারে:—একটি স্নেহের আতিশয্য। অপরটি—নাম শুনিয়াই যমের অরুচি হইবে, অতি তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞানে তিনি জননীর বুকের ধনে হাত বাড়াইবেন না—এইরূপ আদিম মনোভাব হইতেও ঐ শ্রেণীর তাচ্ছিল্যমাখা ডাক নামের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। ঐ নামগুলির মধ্যে যেন মৃতবৎসা জননীদের এই আকুতিই ধ্বনিত হইতেছে, 'ওগো মরণ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ত তোমার অনেক আছে, তুমি এই দুঃখিনীদের সামান্য ধন 'হ্যাদা' 'ঘ্যাঁদা'কে ছিনাইয়া লইও না।' কিন্তু আমাদের সমাজে স্পষ্টই দেখিতে পাই, এইরূপ তুচ্ছ ডাক নাম যে শুধু মৃতবৎসাদের সন্তানকেই দেওয়া হয়, তাহা নহে,—বহুসন্তান-পরিবারেও ইহাদের আদর কম নয়। তাই মনে হয়, শুধু যমের অরুচি ধরাইবার জন্যই নয়, ঐরূপ নামকরণের অন্য কারণও আছে। আদিম মানুষের ধ্যান-ধারণার মধ্যে তাহার যেন একটি সূত্র পাওয়া যায়। পূর্বে কুনজর বা কুদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ও দেবতার অস্তিত্বে এবং তাহাদের অনিষ্টকারী ক্ষমতায় লোকের বিশ্বাস ছিল, এখনো যে সে বিশ্বাস একেবারে অপনীত হইয়াছে তাহা নহে। ঐ সকল কুনজুরে মানুষ ও দেবতার কুদৃষ্টি নাকি স্বভাবতঃই সুন্দর নামের সুন্দর শিশুদের উপর পড়িয়া তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিত। ডাইনীদের ভয়ও কম ছিল না। এই সমস্ত কুদেবতা, কুমানুষ এবং ডাইনীদের দৃষ্টি যে কখন কাহার উপর পড়িবে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না, তাই সাধারণ লোক

সন্তানের যথার্থ নাম ভাঁড়াইয়া একটা যা'তা' বিসদৃশ ডাক-নামে তাহার পরিচয় দিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, কুদৃষ্টি যদি প্রথমেই অন্য কোন বস্তুতে ব্যাহত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত লক্ষ্য বস্তুর উহা আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। অনেক পিতামাতা গৌরাঙ্গী কন্যার 'কৃষ্ণা' নাম রাখেন এবং উন্নতনাসা সুন্দর মুখ বালককে 'খ্যাঁদা' নামে ডাকেন। আদিম মানুষের মনোবৃত্তি লইয়া বিচার করিলে বলা যাইতে পারে, কুদৃষ্টির প্রভাব প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যেই হয়তো এক কালে সন্তানকে ঐরূপ বিসদৃশ নামের বর্ম পরাইবার রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিজ্ঞানের যুগে কুনজুরে দেবতারা 'কৃষ্ণা' বা 'খ্যাঁদা' নামের আবরণে এক গৌরাঙ্গীকে বা এক তিল-ফুল-জিনি নাসা বালককে দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবে—এইরূপ মনোভাব লইয়া কেহ ঐরূপ নাম রাখেন কি না, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমান যুগে নামকে অনেকে শুদ্ধমাত্র নামই মনে করেন এবং তাহা তাঁহাদের বিশেষ কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য বহন করে না।

সন্তান যতই কাম্য হউক না কেন, অধিক সন্তানের জনক-জননী হওয়া আবার কেহই বড় পছন্দ করেন না, পূর্বেও করিতেন না। উহা অনেক সময় বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে পুত্রকন্যার প্রবল বন্যার মুখে সেকালে কোন কোন মাতা-পিতা তাঁহাদের সন্তানের, বিশেষ করিয়া কন্যা সন্তানের আন্না, (আর না), আন্নাকালী (আর দিও না মা কালী), ক্ষান্তি, ক্ষান্তমণি (জন্মে ক্ষান্ত হও) চায়না (আর চাই না), ইতি (এই শেষ)—এইরূপ নামকরণ করিয়া সে বন্যা রোধ করিতে চাহিতেন। এখনো পল্লীগ্রামে বহু-সন্তান-দরিদ্র-পরিবারে এইরূপ নাম বিরল নহে।

অনেকে মহাপুরুষদের, পুরাণ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের এবং জাতির জ্ঞানী-গুণীজনের নামে সন্তানের নাম রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনোগত ভাব হয়তো এই যে, সন্তানকে যাঁহার নাম দেওয়া হইল, উত্তরকালে সে তাঁহারই ন্যায় গুণসম্পন্ন ও যশস্বী হইবে। পিতা-মাতা সন্তানের শুধু দীর্ঘজীবনই কামনা করেন না, সে জ্ঞানী-গুণী হইয়া বংশের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক, ইহাও তাঁহারা চান। তাই আমরা আমাদের সমাজে সেকাল ও একালের এত সব লোকপ্রসিদ্ধ অবিস্মরণীয় নামের সমারোহ দেখিতে পাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, সীতা, সাবিত্রী, রাম, বুদ্ধ, অশোক, কালিদাস, গৌরাঙ্গ, রামপ্রসাদ, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র—ইহারা প্রত্যেকেই ইহাদের যুগে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে একক ছিলেন। কিন্তু আজ এই সকল নামের কত কত লোক বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া বাঙ্গালীর কোন না কোন গৃহে অপর দশ জনের মতই কালযাপন করিতেছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নামকরণে সাধারণ লোকের মনের উপর নবজাতকের জন্মক্ষণ, জন্মবার, জন্মতিথি এবং জন্মকালের ঘটনাও কম প্রভাব বিস্তার করে না। প্রাতঃকালে কাহারো জন্ম হইলে প্রভাত, উষাকালে হইলে উষা, রাত্রিতে হইলে রজনী, যামিনী, নিশীথে হইলে নিশীথ, দিবাভাগে হইলে দিননাথ, দিনেশ, সন্ধ্যায় হইলে সন্ধ্যা, সূর্য উঠিতেছে সময়ে হইলে অরুণা, অরুণকুমার,—এইরূপ নাম রাখা হইয়াছে, দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পূর্ণিমাতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক শিশু পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্র, বুদ্ধপূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতম, জন্মাষ্টমীতে বাসুদেব, দুর্গাপূজার দিনে দুর্গাপদ, আখ্যালাভ করে। মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করিলে অনেক জননী তাঁহার পুত্র সন্তানকে মংলা এবং কন্যা সন্তানকে মংলী, সোমবারে জন্মগ্রহণ করিলে সোমবারী, বুধবারে করিলে বুধু এবং রবিবারে করিলে রবি নাম দিয়া থাকেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে বা কোনও বিপ্লবের যুগে ভূমিষ্ঠ হইয়া বিপ্লবকুমার নামপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন শিশুরও অভাব নাই। বৃদ্ধ বয়সে একটি কন্যাসন্তান লাভ করিয়া এক পিতা তাহার নাম রাখিয়াছেন 'অবেলা'। গোরা, গুর্খা, পল্টন, মহাজন—এই ধরণের ডাকনামেরও ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে, শিশুর জন্মকালে সেই সেই বাড়ীতে বা সেই সেই অঞ্চলে যথাক্রমে কোনও গোরা, গুর্খা, পল্টন বা মহাজনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং সেই কারণেই ঐরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। এই সকলের যে ব্যতিক্রম না আছে, তাহা নহে। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষ যে সংস্কারের অনুবর্তী হইয়া এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকে তাহার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইল।

কখনো বা সাধারণ মানুষ বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া প্রকৃতি-রাজ্যের সহজদৃষ্ট ফল-ফুল, নদী, চন্দ্র-সূর্য-তারা প্রভৃতির নামে সন্তানের নাম রাখিয়া থাকে। এই শ্রেণীর নামের অন্ত নাই। দেশের নামেও অনেক নাম রাখা হয়, যেমন,—বঙ্গচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র, বঙ্গবালা। বেদ, গীতা, মহাভারত আজ আর মহাগ্রন্থ মাত্র নহে, বাঙ্গালীর সংসারে ইহারা বেদানন্দ, বেদবালা, গীতা, মহাভারতচন্দ্র প্রভৃতি নামে নর-নারীরূপে সংসারধর্ম পালন করিতেছে। ঋষিরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। আমরাও আমাদের গৃহ-সংসারে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করি।

অনেকে বাঙ্গালীর নামের নাথ, চন্দ্র, কিশোর, কুমার, মোহন, ভূষণ, তারণ, হরণ, রমণ, বরণ, রঞ্জন, ভঞ্জন, কান্ত, কান্তি প্রভৃতি অংশগুলিকে নিরর্থক মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে চান এবং অনেকে ইতিমধ্যে পরিত্যাগও করিয়াছেন। অনেকে কিন্তু আবার এইগুলিকে তাঁহাদের নামের ভূষণ-রূপে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াও আসিতেছেন। যেমন কোনও পরিবারে দেখা যায়, তাঁহাদের সকলেই 'নারায়ণ' ভূষণে ভূষিত, যেমন—হরেন্দ্রনারায়ণ, মহেন্দ্র-নারায়ণ, এই ভাবেই পুরুষানুক্রমে নামকরণ চলিয়াছে। কোনও পরিবারের সকলেই আবার 'রঞ্জন'-প্রিয়, যেমন—অসিতরঞ্জন, নিশীথরঞ্জন। আবার এইরূপও দেখা যায়, কোনও পরিবারের এক পুরুষের সকলেই 'তোষ' এবং পরবর্তী পুরুষের সকলেই 'প্রসাদ'। যেমন স্বনামধন্য আশুতোষের পুত্রগণ সকলেই 'প্রসাদ'-পুষ্ট, আবার তাঁহাদের পুত্রগণ ঠাকুরদাদার 'তোষ'এ বিভূষিত। কোনও পরিবারের ভূষণ কয়েক পুরুষ 'মোহনই' চলিয়াছে, আবার কোনও পরিবারে বা 'নাথ,' কোনও পরিবারে বা 'কান্তি'; কোনও পরিবারে বা সকল নামধারীরই আগু অক্ষর এক, যেমন অমিত, অনিল, অমর। কোথাও সকলের নামের শেষেই 'ইন্দ্র'—যেমন মহীন্দ্র, যোগীন্দ্র, শচীন্দ্র। কিন্তু এই সকল বৈশিষ্ট্যের যে ব্যতিক্রম দেখা যায় না, তাহা নহে। একই পরিবারের কেহ হয়তো 'যামিনীমোহন', কেহ হয়তো 'সুধাংশুকিরণ' কেহ বা 'অরুণকুমার।' এই যে ভূষণপ্রিয়তা—এই যে 'অবান্তর' এবং 'বাহুল্যের' দিকে ঝোঁক—ইহা বাঙ্গালীর শিল্পি-মনেরই পরিচয় প্রদান করে।

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য জীবনের সর্বস্তরে পরিস্ফুট। তাহার নামের গঠনেও এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। রসাল পলিমাটির দেশে বাঙ্গালীর জন্ম, সে সব-কিছুই রসঘন, সৌন্দর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতে চায়। সে যাহা কিছু করে, শুধু বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদেই করে না, বিনা প্রয়োজনের সৃষ্টিতেও সে তাহার রিক্ত জীবন-পাত্র ভরিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়। কুমার কুজা গড়ে, তাহার উপর দুইটা ফুলপাতা আঁকিয়া দেয়; ইহাতে জলের স্বাদ বাড়ে না, কুজাও অধিক মজবুত হয় না। কুজার প্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উহা নিরর্থক, তবু কুমার তাহার উপর ঐটুকু কারুকার্য করিতে ছাড়ে না। নামকরণের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী শুধু প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য করে না, বিনা প্রয়োজনেও সেই নামকে সে নানা ভূষণে বিভূষিত, বিশেষিত করে। তাহার শিল্প-নৈপুণ্য এমনি যে, কোন্‌টি নামের ভূষণ, আর কোন্‌টি মূল অবয়ব-তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ধরা যায় না। দুই বা ততোধিক শব্দের যোগাযোগে সে এমনি সুকৌশলে এক একটি নামের সৃষ্টি করে যে, তাহারা প্রায়ই এক একটি অখণ্ড সৌন্দর্য মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া, সন্ধি সমাস ভাঙ্গিয়া উহাদের অর্থ ও সৌন্দর্য নিরূপণ করিতে চান, তাঁহারা ব্যর্থমনোরথ হন।

শুধু সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রেই নয়, বাঙ্গালীর অনেক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যেও তাহার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাহার জুতার দোকান 'চরণকমলেষু', 'পদবল্লভ'; পুস্তকের দোকান 'জিজ্ঞাসা'; তাহার আবাস-বাটী 'স্বপ্ন-সায়র', 'সন্ধ্যার কুলায়।'

ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যেও নামকরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সেগুলির উপর শিল্পি-মনের প্রভাব অল্পই আছে; যতখানি আছে বৈষয়িক ও সামাজিক প্রয়োজনের ছাপ। বোম্বাই প্রদেশে জৈন, আর্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপাধি বা পদবী ছাড়া নামের দুইটি অংশ দেখা যায়; কিন্তু উহারা বাঙ্গালীদের নামের ন্যায় একীভূত হইয়া সার্থক শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করে নাই। নামের ঐ দুই অংশের প্রথমটি হয় নিজের নাম, আর দ্বিতীয়টি থাকে পিতার নাম। যেমন চিমণলাল জেসিংভাই-এর পুত্রের নাম চিনুভাই চিমণলাল এবং ইহার পুত্রের নাম আবার অশ্বিনভাই চিনুভাই। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যেমন—পুরুমল কেবলরামণির পুত্রের নাম রামপুরুমল কেবলরামণি। লাহোরের হরিসিং মিস্ত্রীর পুত্র হইতেছে জীবনসেন

হবিলিং মিস্ত্রী। দেখা যাইতেছে, নামকরণে ইহারা অনেকেই একটা চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, ইহারা ইহাদের নামের দ্বিতীয় অংশটিতে দেয় পিতার নাম। মাদ্রাজের কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে আবার বিপরীত নিয়ম দেখা যায়, তাহারা পিতার নামটি দেয় প্রথমে, এবং নিজের নামটি দেয় পরে, যেমন, কৃষ্ণচেটিয়ারের পুত্রের নাম কৃষ্ণনারায়ণ; কে, বেঙ্কটরমণের পুত্রের নাম বেঙ্কটরমণ নটরাজন। ইহারা বর্তমানে নামের প্রথম অংশটিতে পিতার সম্পূর্ণ নাম না দিয়া সেই নামের আদ্য অক্ষরটি মাত্র উল্লেখ করে, যেমন, এল, গোপালকৃষ্ণ আয়েঙ্গারের পুত্রের নাম জি, রামমূর্তি,—জি এখানে পিতা গোপালকৃষ্ণের নামের আদ্য অক্ষর। অনেক সময় স্থানের নামও প্রথম অংশে রাখিয়া জাতকের নামকরণ করা হয়—যেমন, থাঙ্গাভেলু পিল্লাই-এর পুত্র হইতেছে থাঙ্গাভেলু পদ্মনাভন্।

উড়িষ্যার ভূঁইয়াদের মধ্যে পিতামহের নামে বংশের প্রথম পুত্রসন্তানের এবং প্রপিতামহের নামে দ্বিতীয় সন্তানের নামকরণ করা হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, সকল প্রদেশেই প্রায় সকল জাতির মধ্যেই সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে অনেকে কতকগুলি সংস্কারমূলক রীতি অনুসরণ করিয়া চলেন, অন্ততঃ এক কালে চলিতেন। বর্তমানে একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ চলিয়াছে,—সামাজিক, পারিবারিক বা ধর্মীয় কোন রীতি বা সংস্কারকেই আজ আর কেহ বড় আমল দিতে চান না।

উচ্চশিক্ষিত সমাজেই এই স্বাতন্ত্র্যবোধ অধিক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পর দেশ-বিদেশের শিক্ষায় শিক্ষিত পিতামাতার চিত্তে যে প্রশ্নটি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাহা হইতেছে,—'কি নাম রাখি ওর'? তাঁহাদের আভিজাত্য এবং স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে গড্ডলিকা-প্রবাহে চলিতে বাধা দেয়। একটা নূতন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু রাখিতে হইবে। যে-নামই তাঁহাদের মনে আসে, তাহাই পুরাতন বলিয়া ঠেকে, নূতন মনোমত কোন নাম তাঁহারা আর খুঁজিয়া পান না। অনেক রক্ত জল করিয়া যদিই বা একটি রাখিলেন, দুই দিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল,—তাঁহাদের একান্ত আয়াসলব্ধ এই নামটি ইতিমধ্যেই আর একজনের হইয়া গিয়াছে বা আছে। নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার তখন আর কিছু থাকে না; তাঁহারা দুঃখিত ও বিরক্ত হন, অনেক সময় নামটিই পাল্টাইয়া ফেলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না, পরিবর্তিত নামটিও আবার আর একজনের হইয়া যায়। ইঁহাদের অনেকেই ইচ্ছা করেন, সন্তানের এমন একটি নাম রাখিবেন, যাহা হইবে একেবারে নূতন, ভূ ভারতে যাহা আর কাহারো থাকিবে না। কিন্তু মুস্কিল এই, কোম্পানীর নাম বা ট্রেড মার্ক ইত্যাদি যেমন আইনের বলে রেজেষ্ট্রী করিয়া নিজস্ব করিয়া লওয়া যায়, সন্তানের নামের উপর এখনো তেমন রেজেষ্ট্রীকরণ চলে না। তাই সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে যে সব নাম ধরা পড়িবার কথা নয়, অথবা তাহাদের সংস্কারে ও রুচিতে যে সব নাম বাধে, ইহাদের কেহ কেহ সন্তানের সেইরূপ অনন্যসাধারণ নাম রাখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই ধরণের বিচিত্র নামের এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: কৃষ্ণ সেন, কিউই বসু, ওয়েসিস বল, আইরিন গুহ, আইভিলতা চৌধুরী, এ্যানাবেল গুপ্ত, আকাশকলি রায়, অনতিক্রমণীয় চক্রবর্তী, বজোড়েনডুন গুহ, মণিহারময়ী সেন, নবনীতকোমলা কর, মধুগীতি রায়, সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল, সশচীনন্দন গোপীজনবল্লভ সাহা। আমরা একটি পরিবারের তিন ভ্রাতার নাম পরিমলতর, উল্লাসকর ও সুখসাগর বলিয়া জানি, আর একটি পরিবারের তিন ভ্রাতা ও ইঁহাদের এক ভগিনীর নামের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। ইঁহাদের কুলপদবীটি গোপন রাখিয়াই নামগুলি শুনাইতেছি: প্রীতিধ্বজ প্রস্তরবক্ষ, মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ, কপিধ্বজ-কপাটবক্ষ: ভগিনীটি হইতেছেন, সরোবরে সুশোভিত প্রফুল্লনলিনী। কিন্তু এই শ্রেণীর নামের জন্য নামধারীকে পাড়া-প্রতিবেশী এবং স্কুল-কলেজের সহপাঠীদের নিকট কিছুকাল কিছুটা ঠাট্টা-বিদ্রুপ সহ্য করিতে হইলেও, প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবনে ইহাদিগকে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সেখানে 'সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল' এস্ পাল, 'কপিধ্বজ-কপাটবক্ষ রায়' কে কে রায়, 'অনতিক্রমণীয় চক্রবর্তী' এ, চক্রবর্তী, এইরূপ সংক্ষিপ্ত নামেই পরিচিত ও সম্মানিত হন। কখনো বা ইহারা চক্রবর্তী সাহেব, রায়-সাহেব, এইরূপ নামখ্যাত হইয়াও বহু শত লোকের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করেন। পক্ষান্তরে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিলে এইরূপ নামের জন্য নামধারীকে একটু বিব্রত বোধ করিতে হয় বৈ কি!

আশ্চর্য্য সমন্বয়ের দেশ এই বাংলা দেশ;—এখানে সর্বধর্ম সমন্বয়মূর্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণের যেমন আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত-বিশ্বের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদের শিক্ষিত সমাজেও আজ সেই সমন্বয়ের ব্যাপারই চলিতেছে। নামকরণের ক্ষেত্রে তাই এক দিকে যেমন লোপামুদ্রা, প্রজ্ঞা, পারমিতা, অবলোকিতেশ্বর, দীপঙ্কর, পার্থসারথি, রুণু ঝুনু, লীনা, রিণা প্রভৃতি আদৃত হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি লেনিন, ষ্ট্যালিন, হিটলার, হেলেনা, মিন্টু, পিন্টু, লিন্টু, আইভি, আইরিন প্রভৃতি ক্রমে স্থান করিয়া লইতেছে। দেখা যায়, একই জননীর স্নেহছায়াতলে বসিয়া মিন্টু আর মীনা একই থালা হইতে মাটন চপ ও বেগুনী খাইতেছে। সমন্বয়মূর্তি বাঙ্গালীর ইহাতে ভাবিবার বা ভীত হইবার কিছু নাই।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

গত মাঘ সংখ্যায় মাসিক বসুমতীতে বিজলীর ৩৮ সংখ্যা পর্য্যন্ত লেখার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। এবারকার কাহিনী আরম্ভ হয়েছে ৩১ সংখ্যার লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে। এ সংখ্যার কালবৈশাখী বলছে—'মানুষ আজ জগৎকে শান্তির বাঁধনে বাঁধবার জন্য কতই না বুদ্ধির কসরৎ দেখাচ্ছে। কিন্তু শান্তি বন্ধনে নয়—মুক্তিতে। জগৎ-প্রকৃতি মানুষের বুদ্ধিকে হারিয়ে দিয়ে চলেছে দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্য দিয়ে, মহামারীর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়ে, জলপ্লাবনের প্রলয় স্রোতে গা ভাসিয়ে। এই বিরাট ধ্বংসের মাঝে নব সৃষ্টি জেগে উঠবে তখনই—যখন প্রকৃতির শক্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে মানুষ জয়লাভ করবে।'

কালবৈশাখীর সুরে খবর আছে গ্রীকবাহিনী ও তাদের বোমার ঘায়ে কেমালী তুর্কী সৈন্যরা নাজেহাল; কোপেনহেগেনের তারের খবরের উদ্ধৃতি—'প্রায় দশ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট নর-নারী মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের ঠেকাবার জন্য সৈন্যবেষ্টনী পড়েছে। ঘাস-পাতা খেয়ে অনশনক্লিষ্টরা কলেরায় মরছে।' এ তো গেল সেদিনের মস্কো! খুলনার খবরেও এই ঘাস-পাতা আহার, অনশনের জ্বালায় কন্যাবিক্রয়, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রাভাব! আইরিশ জাতীয় সভার (Dail Aireann) বন্দীমুক্তির জন্য চোখ-রাঙানীর সম্বাদ।

এ সংখ্যার প্রধান লেখা 'সাধনা' ও 'মফঃস্বলের চিঠি'। সুর এবং বক্তব্য বিজলীরই চির-পরিচিত কথা। এ সংখ্যার উল্লেখ ও উদ্ধৃতির যোগ্য লেখা হচ্ছে—"কঙ্গরেসের রঙ্গরস"—আমাদের বোম্বাইএর সংবাদদাতার স্বপ্নলব্ধ রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ। বসুমতীর রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার উপভোগের জন্য লেখাটি ও তৎকালীন কংগ্রেসী চিত্র প্রায় সমস্তটাই উদ্ধৃত করা গেল।

"আজ-কাল জাতীয় সমিতির কোনও সভাতেই প্রায় সংবাদপত্রের রিপোর্টারদিগকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না—অথচ সাধারণে জানতে উৎসুক ব্যাপারখানা কি হলো, তাই কাগজ চালানোর খাতিরে স্বপ্নলব্ধ রিপোর্ট প্রকাশ করতে হয়।"

বোম্বাইএর একটি সুন্দর হলে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয়-সমিতির অধিবেশন হয়ে গেল। চারি দিকে শান্তিসেনা কড়া-পাহারা দিচ্ছে—মুরুব্বি, মাতব্বর এবং ব্যস্তবাগীশের দল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে, আজ ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। আমাদের শান্তিময় সংগ্রামের বড় বড় সেনাপতিরা একে একে এলেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আসতেই হাততালি পড়ে গেল। প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী আসামাত্র সকলে শান্ত শিষ্ট পড়ুয়াদের মত দাঁড়িয়ে উঠলেন। সকলেই প্রায় খাদীর ইউনিফর্ম সজ্জিত। খাদীর কাপড়, পাঞ্জাবী অথবা কোট এবং মাথায় টুপি। কেবল হিন্দু বাঙালীদের মাথায় টুপি ছিল না—আর মহিলাবৃন্দের মধ্যেও কেহ গান্ধী টুপি পরেন নি। তবে মাথায় টাক ঢাকবার জন্য কেউ কেউ বাঙালীদের টুপি পরার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। যাঁরা এখনও সাহেবী ফ্যাসন ছাড়তে পারেন নি তাঁরা খাদীর প্যাণ্ট, কোট এবং টাই তৈরী করেনিয়েছিলেন। মৌলানা সৌকৎআলীর অঙ্গ আচ্ছাদনের জন্য খাদী ব্যবহার করাতে বাজারে বোধ হয় খাদীর কিছু টান পড়েছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই এইবার 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে' সজ্জিত হয়েছেন।

প্রথম মন্তব্য পাশ হলো, আমাদের রাজপুত্র এদেশে এলে তাঁকে কোন রকমের সম্বর্দ্ধনা না করা। রাজার বাবা ডিউক মহোদয়ের মত তাঁকেও বুঝিয়ে দেওয়া যে ভারত কি চায়—ফাঁকা তোয়াজ নয়, বাজে হুজুগ নয়, চায় মনুষ্যত্ব, চায় স্বাধীনতা, চায় শয়তানীর সংস্রব ত্যাগ। মন্তব্যটা পাশ করা হলো একটা "কিন্তু" রেখে। ব্যক্তিগত ভাবে তার রাজকীয় প্রসঙ্গের (person of His Royal Highness) উপর কোন ক্রোধ-বিদ্বেষ নাই। কেবল তিনি একটা দুষ্ট আমলাতন্ত্রের হয়ে আসছেন বলেই আমাদের এই গোসা। কোন কোন সভ্য বললেন, শেষের কথাগুলি বলার কোন দরকার নাই—কারণ ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর বা তিম্বক্টুর রাজপুত্র ও ভদ্রলোক হিসাবে সকলেই আমাদের আদরণীয়; সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

দুই নম্বর মন্তব্যে বেজোয়াদার নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য সমস্ত জাতিকে ধন্যবাদ দেওয়া হ'লো এবং বোম্বাইয়ে বসে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিরা অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার এবং লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে দান করার প্রশংসা-সূচক মন্তব্য পাশ করলেন। বোম্বাইয়ের শেঠজীরা না দিলে এত টাকা নিশ্চয়ই হতো না—এজন্য ভারতবাসী সকলেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্বরাজলাভ, খিলাফৎ এবং পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী-কাপড় বর্জ্জন এবং দেশী-কাপড় তৈরী ও প্রচলন করার মন্তব্য সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লো। কেউ কেউ তারিখ ধরে দেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি করলেন—কেউ বললেন, জাতীয় স্কুলের ছেলেদের কেবল চরকা কাটাবে, বেচারারা মূর্খ হয়ে থাকবে—কিন্তু কারও আপত্তি টিঁকলো না। এমন কি তিন মাস সময়টা এক মাস বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাও বিফল হ'লো।

এক ভদ্রলোক [illegible] প্রস্তাব করবেন বলছিলেন যে, সব কাজ ছেড়ে কলাগাছের চাষ করো, কলার পাতা পরো আর কলা খাও। তা'হলেই জীবনের মূল সমস্যা খাওয়া-পরার স্বরাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর পাশের বন্ধুটি কাপড় পরা উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব আনবেন বলে ভয় দেখানোতে তিনি বিরক্ত হলেন। মিলের মালিকরা পাছে কাপড়ের দাম বাড়ান—এই জন্য তাঁদের উপর একটু চোখ রাঙিয়েও রাখা হ'লো, আর যারা বিলিতী সুতো ও কাপড়ের ব্যবসা করে তাদের শাসিয়ে দেওয়া হ'লো—ঐ বদকর্ম্মটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। বিলিতী কাপড় বেচে টাকার গাদায় বসে এত দিন যাঁরা গরীব বেচারা উকিল-ব্যারিষ্টারদের গালাগালি করছিলেন—আজ তাঁদের কি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা!

তিন নম্বর মন্তব্যে গঞ্জিকা এবং মদিরাসেবীর উপাসনা পরিত্যাগের বন্দোবস্ত। এক জন সভ্য নেপথ্যে স্বগত ভাবে বলছিলেন, দয়াময় গান্ধীজী যদি একটা জাতীয় মদের পবিত্রতার বিধান দিতেন—তা'হলে লুকিয়ে সেই অপকর্ম্মটা করতে হ'তো না। আমাদের পরম কারুণিক সরকার বাহাদুর মদ্যপানের উপকারিতা দেশের লোককে বোঝাচ্ছেন। ক্রমে ক্রমে মদ্যপান ত্যাগ না করে হঠাৎ করলে অত্যন্ত অন্যায় হবে এবং আমাদের রিফর্ম কাউন্সিলের দেশী মন্ত্রীদের বেতনের টাকা কম পড়বে—তা'তে স্বায়ত্ত শাসন লাভে বাধা পড়বে। এই কথাটা বুঝে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ব্বের অভ্যাসটি বজায় রেখে দেশের স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করছেন, যদিও মেথর-ডোম আদি নীচ জাতিগণ মদ ছেড়ে দিয়ে দেশের উন্নতি পথে বাধা দিচ্ছে। ধন্য ইংরাজি শিক্ষার মহিমা!

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মদ বন্ধ করার জন্য তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে—দু'-এক জায়গায় হয়েছেও—কিন্তু পাছে সরকার বাহাদুর কি মনে করেন, এই ভেবে আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ধুরন্ধরগণ এখনও সাহস পাচ্ছেন না। যারা মদ বেচে দু' পয়সা করতো সে বেচারাদের ব'লে দেওয়া হ'লো ঐ কাজ ছেড়ে দিতে। হায়, হায় এই বার non-violent গুলির আড্ডাগুলি উঠে যাবে।

তার পর চার নম্বর মন্তব্যে যারা অত্যাচার সইতে না পেরে—মারামারি করেছে তাদের ধমকে দেওয়া হ'লো—আর যারা গুলী না খেয়ে মরেছে তাদের পরিবারবর্গকে অভিনন্দন করা হ'লো। বলা হ'লো—"জেলে যাও, চুপচাপ অত্যাচার সহ্য কর—দুঃখের ভিতর দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্যের বিকাশ—এই যে এত অত্যাচার, এই তো স্বাধীনতার নিকট আগমন সূচনা করছে—অতএব ভয় পেও না, খুব ফুর্ত্তিসে জেল খাটো।" যুক্তপ্রদেশের এবং মাদ্রাজের কর্ম্মীরা বলেন এখনই civil disobedience করতে—কিন্তু ঠিক হ'লো, স্বদেশী কাপড় চলনের বন্দোবস্তটা হ'লেই ইংরেজের অন্যায় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হবে।

পাঁচ নম্বর মন্তব্যে—নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয়-সমিতি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে বোকা হয়ে বসে থাকলেন। অনেক সভ্যের ইচ্ছা ছিল এই সংগ্রাম সময়ে ১৫ দিন অন্তর নিখিল ভারতীয় সমিতির মিটিং হয়। সভ্যদের যাতায়াতের খরচটা দেওয়া হয় আর খাওয়া দাওয়ার যেরূপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ছিল—সেটা বরাবর বজায় থাকে। এটা হ'লে ভারি সুবিধা হতো, বোম্বাই-এর লোক [illegible] বসে বসে গোটা কতক মন্তব্য পাশ করতে পারলেই দেশটা উদ্ধার হয়ে যেতো। আর আসাম, পাঞ্জাব, প্রভৃতি দূর দেশের সভ্যগণ কেবল ট্রেনেই থাকতো—এরূপ প্রস্তাব কেন যে গৃহীত হ'লো না—বুঝতে পারা গেল না।

অনেকের ভয় হয়েছিল কার্য্যকরী-সমিতির নবরত্নের হাতে সমস্ত ক্ষমতা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তা'হলে তাঁদের আর ডাক পড়বে না। কেউ কেউ বললেন, এই যুদ্ধের সময় গান্ধী মহারাজকে dictator করে ছেড়ে দাও। এ প্রস্তাবের মূলে খানিকটা সত্য প্রকাশের সাহস ছিল।

ছয় নম্বর মন্তব্যে যে সকল প্রদেশ বা জেলা বেজওয়াদার নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে পারেন নি—তাঁদের উঠে-পড়ে লাগতে বলা হ'লো। বোম্বাই তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে বলে নাকে তেল দিয়ে বেচারাদের ঘুমুতে দেওয়া হ'লো না।

সাত নম্বর মন্তব্যে ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের নীতি নির্দ্ধারিত হয়। মৌলানা সৌকত আলী ঝড়ের মত এক বক্তৃতায় ভারতের পাশাপাশি জাতিগণের মধ্যে মিত্রতার পরামর্শ দিলেন। পরবর্ত্তী সভায় এ-সম্বন্ধে শেষ কথা ঠিক হবে স্থির হ'লো।

আট নম্বর মন্তব্যে—কার্য্যকরী-সমিতির নবরত্নের নির্ব্বাচন। মহাত্মা গান্ধী, লজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন, মহম্মদ আলী, কেলকর, আজমল খাঁ, বেঙ্কটাপ্পা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পেটেল—নির্ব্বাচিত হলেন। মহাত্মা ফার্ষ্ট হলেন, লজপৎ এক ভোটে সেকেণ্ড, চিত্তরঞ্জনের আর দুই ভোট কম। মহম্মদ আলী তাঁর চেয়ে আরও দুই ভোট কম।

বৈষ্ণবী বিনয় করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জনের এই পরাজয়, মহাত্মা নিজেকে ভোট দিলেও চিত্তরঞ্জন নিজেকে ভোট দেন নাই। তিনি যদি নিজেকে উপযুক্ত মনে না করেন, পদ প্রত্যাখ্যান করাই তাঁর উচিত ছিল না কি? বাংলার আর দুই জন প্রতিনিধি—এক জন কানঘেঁষে নির্ব্বাচিত আর এক জন মেকী—শোনা যায় গেঁয়ো যোগীকে ভিখ দেয় নাই। শ্রীযুত লজপৎ রায় ও মহম্মদ আলী সাহেবেরও দু'-এক জন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অভাব নাই দেখা গেল।

মাদ্রাজ ও বঙ্গের নির্ব্বাচন নিয়ে নালিশ উঠলো—বঙ্গের উকিল হলেন এক জন পাঞ্জাবী। তাঁর বক্তৃতা শুনে লোকে তাঁর বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। যাঁরা এত উদ্যোগ করে দেশের উপকারের জন্য বোম্বাই পর্য্যন্ত গাড়ীভাড়া দিয়ে ছুটেছিলেন এবং অর্জ্জুনের মত শিখণ্ডী সামনে রেখে যুদ্ধ করছিলেন—তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লো না—নেতারা ঠিক করলেন, গোলমালে মনোযোগ না দিয়ে দেশের কাজ করগে। কিন্তু তাঁদের এটুকু বুদ্ধি নাই—যে নিখিল ভারতীয় সমিতির সভ্য না হ'লে দেশ উদ্ধার করা যায় না এবং এই সব স্বদেশ-সেবকদের দ্বারা দেশ উদ্ধার হয় তো হোক, না হয় তো হয়ে কাজ নেই; এই ন্যায়সঙ্গত আবদারে কর্ণপাত করলেন না—এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সভায় একটা জিনিস দেখা গেল, যে দেশে কাজ যত কম হচ্ছে সে দেশের প্রতিনিধিরা তত বেশি বক্তৃতা করেন; এবং জনকয়েক inevitable speaker আছেন—যাঁরা প্রতি মন্তব্যের উপর কিছু না কিছু বক্তৃতা করবেনই। স্বরাজের ১৪৪ ধারায়

এঁদের মুখ বুজে করায় বোধ হয় কোনো উপায় নেই। বাংলা, বিহার এবং আসামের কেউ বড় একটা বক্তৃতা করেন নাই। তবে বঙ্গদেশের দু'-এক জন মুখ চুলকানি থামাবার জন্য দু'-এক কথা বলেছিলেন। কয়েক জন বক্তার দৌরাত্ম্যে বহু সভ্য সভাগৃহ ত্যাগ করে পাশের Refreshment Room-এ ক্রমাগত যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন বঙ্গদেশের এক জন ছোকরা প্রতিনিধি। তিনি নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয়-সমিতির বন্দোবস্তে প্রীত হয়ে রিজোলিউশন করেছিলেন যথাসাধ্য রিফ্রেশমেন্ট-রুম থেকে দেশের জন্য কাজের শক্তিসঞ্চয় করতে হবে এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রস্তাব সকল সভ্য কর্তৃক সমান ভাবে সমর্থিত হয়েছিল। এই সভ্যটির নাম শুনা গেল, আমাদেরই বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই একমাত্র প্রতিনিধি, যিনি সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক হয়েও কোনও বক্তৃতা না করেও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে একটি রেজোলিউশন পাশ করাতে পেরেছিলেন। বঙ্গদেশ তাঁকে ভারত-সভায় পাঠিয়ে কি বিবেচনার কাজই করেছেন!

শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব মহাশয় বৃদ্ধ গুরু মহাশয়ের মত তাঁর ছাত্রদিগকে কারণে-অকারণে শাসন করার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বিলিতি নজীর দেখিয়ে স্বাধীনতা লাভের পথ বাৎলে দিলেন—অতঃপর পরস্পর গা-চাটাচাটি রীতি অনুসারে বক্তৃতা-সাগর পণ্ডিত রামভুজের সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব মৌলানা মহম্মদ আলীর আপত্তি সত্ত্বেও গৃহীত হ'লো। গান্ধী মহারাজ এবং চিত্তরঞ্জনের মিলনের দৃঢ়তা দেখিয়ে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয়-সভা কুম্ভকর্ণের পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়ে গেলেন।

সে-দিন পরাধীন ভারতে আশু স্বরাজ লাভের আশায় 'রঙ্গরসের যে রঙ্গরস' চলিতেছিল আজ স্বাধীন দীর্ণ ভারতেও তাহারই আর এক নমুনা দেখা যাইতেছে এই দুইটি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য এত বড় "স্বপ্নলব্ধ রিপোর্ট" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম। তখন সংগ্রামী কংগ্রেসের সে চিত্রে একা শ্রীনেহরুর সুনাম ভাঙাইয়া স্বাধীনতার তরী চলিত না, তখনকার কার্য্যকরী-সমিতির নবরত্নের নির্ব্বাচন যে বড় বড় নেতাদের লইয়া হইত তাঁহারা এক এক জন দিকপাল, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাজন—মহাত্মা গান্ধী, আজমল খাঁ, লজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন, পাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেলকর মহম্মদ আলী, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? তখন তাহার মেকী হইলেও কংগ্রেসে প্রাণ ছিল, দুঃখ বরণের সাহস ও দৈর্য্য ছিল, মানুষ তখন মোটা মাহিনা, পদবৃদ্ধি ও গদীর মাথায় অমানুষে পরিণত হয় নাই। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরসিক শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের লিখিত এই "রঙ্গরসের রঙ্গরস" শীর্ষক লেখাটিতে অপূর্ব্ব ব্যঙ্গচ্ছলে তখনকার কংগ্রেসী নেতৃত্বের যে ছবিটি আঁকা হইয়াছে তাহা একেবারে অনবদ্য। বিজলীর পাতায় উপেন্দ্রনাথের পরই ব্যঙ্গ সাহিত্যে ছিল নলিনীকান্তের স্থান। এত প্রচুর হাস্যরসের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার চরিত্রে যে পরমার্থের টান ছিল, তাহারই তাড়সে তিনি এখন পণ্ডিচারীর গোয়ালে জাবর কাটিতেছেন। দিলীপই গাভীশালা ত্যাগ করিয়াছেন, নলিনী ভায়া এখনও করেন নাই।

তার পর এই ২৯শ সংখ্যা বিজলীর পরিচিতি শেষ করি এ সংখ্যার দু'-দফা "কাজের কথা" উদ্ধৃত করে। দু'টি লেখাতেই কর্ম্মযোগের প্রয়োজনীয় সূত্র আছে।

কাজের কথা

মরণপথে বিকারের ঘোর

মরাটা আমাদের এমন মুখস্থ হয়ে হয়ে সহজ হয়ে গেছে যে, আমাদের পাকে-প্রকারে মরায়ই পায়। মরবারই আয়োজনের রকমারিকে আমরা জীবন বলে ভুল করি। আজ বলে নয়, বহু কাল ধরে আমরা এই রকমে উল্টে-পাল্টে নতুন নতুন মরণ মরবার সখের খেয়ালে জীবনের ঘরে দেউলে মেরে আসছি। ছোট থেকে যত বড় বড় জীবনের মধ্যে যাও না কেন, তার মূলে দেখতে পাবে একত্ব, আর মরণের মূলে ঐ একত্বের বিস্মরণ ও ভেদ। নিজের গাঁ থেকে, দশ ঘর বন্ধু থেকে, মানুষ থেকে তুমি নিজেকে ভিন্ন করে নিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালে অন্ন-বস্ত্র অভাবে তুমি শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাবে। আবার যত বেশি বেশি লোকের সঙ্গে প্রেমের বাঁধনে মিলতে পারবে—স্ব-স্ব গ্রাম, সমাজ, স্বজাতিকে আপন করতে পারবে ততই শক্তিমান হয়ে জীবনের সূত্র খুঁজে পাবে। আমরা মরণ-পথের যাত্রী ছিলাম বলে জাতি-বর্ণ-গোত্র হিসাবে আচারে-বিহারে, স্পর্শে কত ভেদই না সৃষ্টি করেছি! কী জীবনে কী জাতীয় ব্যক্তি-জীবনে আমরা ধনে-সম্পদে, শক্তিতে, ধর্ম্মে সমৃদ্ধি পাবার আশায় সহজেই ত্যাগ ত্যাগ করে এখনও মরণ-ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠি, কৃচ্ছ্রসাধনকে শক্তি বলে ভুল করি, দারিদ্র্য ব্রতে কৌপীন ধারণে আমরা সিদ্ধহস্ত। এ দুর্ভিক্ষ পীড়িতের ভগবানও উপবাসে খুসী।

কাজের কথা

গোজামিলের কাজ

মানুষের কি ব্যক্তিগত জীবনে আর কি জাতীয় জীবনে কাজ ততই খাঁটি হয় যত জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়। লক্ষ্যহারা জাতই গোঁজামিল দিয়ে দিয়ে চলে। যদি ঠিক জানি কলকাতা থেকে চাটগাঁ যাব, তাহ'লে সোজা রাস্তাও বেরোয় আর সহজ উপায় অর্থাৎ যানবাহনও জোটে। আর যদি যাবার চুলোর ঠিক না থাকে, তা' হলে প্রথম তো এ গলি সে গলি হাতড়ে-হাতড়ে পাগলের মত চলতে হয়; তার পর গরুর গাড়ী চড়ে চলতে চলতে সামনে হঠাৎ নদী বা সাগর আসে; তখন ঘাটে বসে নৌকার খোঁজ পড়ে, নৌকা মেলে তো ওপারে গিয়ে কোথায় গাড়ী জোটে তা' জানা থাকে না। এই রকম হয়রাণ হতে হতে লক্ষ্য ও গন্তব্য স্থির স্থির করা এক বিষম দায়। মনহারা বুদ্ধিহারা আত্মহারা জাত দিশেহারা দশায় পদে পদে আন্দাজী গোঁজামিল দিয়ে দিয়ে জো-সো করে এগুবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে। সাত শ' বছর ধরে যাদের মরে থাকা অভ্যাস তাদের পক্ষে বাঁচাটাই একটা পেল্লায় রকম অনিশ্চিত অজানা আজব ব্যাপার, তার নেই সহজ চিরাভ্যস্ত মরণের চেয়ে ঢের কঠিন।

৪০ সংখ্যা বিজলী প্রকাশিত হয় ৩রা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩২৮ সালে, ইংরাজি ১৯শে আগষ্ট, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে।

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত
RP. 130-X52 BG

এ সংখ্যার কালবৈশাখীতে ছিল—"গন্তব্য পথ জটিল ও ভীষণতর হয় তখনই, যখন অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে অন্ধ। তখন বুদ্ধির যষ্টিখানি মাত্র সম্বল করে তাকে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হয়। দৃষ্টিহীনতার ফলে তখন হয়ে পড়ে পদে পদে অনিবার্য্য ভুল, অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি, অপ্রয়োজনীয় সংঘাত। পূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছতে' হলে, হে মানুষ, তোমাকে তোমার নিজের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আর সে পরিচয়ের জন্য তোমাকে পেতে হবে অন্তর্দৃষ্টি।"

তখন আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আগতপ্রায়। সে সময়ের আইরিশ ইতিহাস বড় শিক্ষাপ্রদ। বিজলী এ হপ্তায় খবর দিচ্ছে—আইরিশ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টরূপে ডি ভ্যালেরা লয়েড জর্জের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন সেখানা গেলিক ভাষায় লেখা চিঠির অনুবাদ বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই চিঠিতে আছে যে ডেল ইরাণ ও আইরিশ জনগণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব মত ডোমিনিয়ন স্বত্ব লাভ করে তুষ্ট হতে পারে না। আয়র্লণ্ড স্বাধীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধুরূপে থাকতে চায়। স্বাধীন আয়র্লণ্ড আবশ্যক মত ইংরাজের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধোপকরণ, রেলওয়ে সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলন সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত রফা করতে প্রস্তুত আছে। ডি ভ্যালেরা আরও বলেছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ আয়র্লণ্ডে সখ্য স্থাপিত হতে পারে যদি ইংরাজ মাঝে পড়ে গোলযোগ না ঘটায়।

এই চিঠির জবাবে লয়েড জর্জ জানান যে, আয়র্লণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার না করে যে একেবারে পৃথক হয়ে যেতে চান তা' বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই সমর্থন করতে পারেন না। লয়েড জর্জ যা' তখন মেনে নেন নাই ঘটনাচক্রে সেই স্বতন্ত্রতাই আয়র্লণ্ড ব্রিটেন ও ইংলণ্ডের মাঝে ঘটে গেল। উত্তর আয়র্লণ্ড কিন্তু বৃটিশ প্ররোচনায় আইরিশ রিপাবলিকের পর হয়েই কণ্টক হয়েই পাকা হয়ে গেল। দেখা যাক, খণ্ডিত পঞ্চনদ ও বাংলার অদৃষ্টে ভিন্ন বিধিলিপি বিধাতা লিখেছেন কিনা।

৪০ সংখ্যা বিজলীর প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে—"নব জগৎ রচনার ইঙ্গিত" আর "স্বরাজের রূপ"। পাশ্চাত্যের মনস্বিনী মেয়ে এভেলিন আণ্ডারহিল হিবার্ট জার্ণালের এপ্রিল সংখ্যায় "মানুষের জীবনে শক্তির মূল" শীর্ষক এক চিন্তা-গভীর লেখা লিখেছিলেন, বিজলী সেই লেখা অবলম্বনে নব রচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এভেলিন লিখেছিলেন, "এখনকার জগৎ যেন বায়ুরোগের রুগী, তার জীবনের লক্ষ্য নেই, শক্তি নেই ; এই দেখ যেন বিরাট আজগুবি রকম একটা ওলটপালট করতে পারলেই সে সুখী, আবার পরক্ষণেই দেখ যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—যেন কোন গতিকে এক ঘুম ঘুমাতে পারলেই বাঁচে। * * * এ রোগ সমাজে নেই, আছে জনে জনে মানুষের মাঝে। * * * মানুষ সবটুকু জীবনের শক্তিতে জীবনটি তার ভরে প্রাণময় করে তুলতে পারে নি। তার জীবনের অনেকখানি মরে নিস্তেজ হয়ে আছে—এই হলো ব্যাধি।

আমাদের এই ছোট মনের গভীর জগতের চেয়েও ব্যাপক শক্তিময় আরও সত্য এক জগত আছে, তার সঙ্গে মানুষ আপন সত্তার নাড়ীর টানে বাধা ; এই জড় ভোগের জীবনে কিন্তু সে সত্তার পরম ক্ষুধা মিটতে পায় না। We are being starved at the source—আমাদের অন্তরের পরম মূল তার অন্নে বঞ্চিত বলেই এ জীবন এত দিনও শক্তিহারা।

বামো (Bochme) একজন জার্মাণ ঋষি, সামান্য মুচীর ছেলে সে, ভগবানের কৃপায় জগতের মূল সত্য দেখতে পেয়ে আপ্তকাম হয়েছিল। তার লেখা থেকে কুমারী এভেলিন উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছেন, —যখন মানুষকে দেখি, তার মাঝে দেখি ত্রিলোক বর্ত্তমান, প্রথম স্থূল জড়ের জগৎ যার মাঝে বেদনা দ্বন্দ্ব—মূক দেহবৃত্তির লোক। তার পরে শক্তির প্রাণময় অগ্নিলোক, যে শক্তি এই জড়দেহকে ধারণ করে ও চালায় ; আর সব শেষে জ্যোতির্লোক বা মানুষের মাঝে সত্য সুন্দর ও পরম শক্তির অখণ্ড ঘর। এ হচ্ছে হিন্দু-দর্শনের ত্রিগুণের কথা, কুমারী এভেলিন ফরাসী লেখক ডাঃ গেলের কথা তুলেও দেখাচ্ছেন জীবের ঐ ত্রিধা রূপ, basal substance vital dynamism and psychic principle—সেই একই কথা।

মানুষকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, এর চেয়ে ঢের বড় পূর্ণতর জীবন আছে, এই জ্ঞান এই বিশ্বাস এলে তার পর শক্তিকে উর্দ্ধগামী করে জনে জনে সে জ্যোতির্লোকের দুয়ার খুলতে হবে, বার্মোও বলেছেন—To hurness our fiery energies to the service of the Light."

লেখাটি অপূর্ব্ব। সত্যের দোষ-গুণ, সে সত্যের বাহিরের রূপ, রূপটা বড় নয়, বড় অন্তরের ভাগবত জীবন। তখন এক অপূর্ব্ব তপস্যামগ্ন মানুষ শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া আমাদের জীবন চলিতেছে। সকলেরই হৃদয়ে অটল বিশ্বাস, মনে অনুপম স্বপ্ন এক আগুসভ্য নূতন সৃষ্টির,—পৃথিবীর বুকে বিজ্ঞান-শক্তির রচা এক নব বৃন্দাবনের। শ্রীঅরবিন্দ আজ ইহলোকে নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে, মানব-মনের চিরবাঞ্ছিত মর্ত্তে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন আছে—ধীরে ধীরে নানা বাধা দৈন্য শঙ্কা বেদনার মাধ্যমে রূপ লইতেছে। এই আশাই মানুষকে অমর করিয়া রাখে, এই নব নব আনন্দমঠের সাধনাই মানব প্রগতিকে অনন্ত যাত্রার কণ্টকিত পথের যাত্রী করিয়া রাখে।

"স্বরাজের রূপ" লেখাটির অকাট্য বক্তব্য আজও এই দীর্ণ ফাটা চৌচির স্বাধীন ভারতেও খাটে, কতখানি খাটে তা' পাঠক-পাঠিকা বাজিয়ে নেবেন বলেই লেখাটির মূল অংশ উদ্ধৃত করছি। গান্ধীজী তখন ঘোষণা করেছেন ডিসেম্বরের পরই স্বরাজ আসবে। স্বরাজের রূপ লেখাটি বলছে—"ডিসেম্বরের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রটি কি রূপ নিয়ে ফুটে উঠে আমাদের চোখ জুড়িয়ে মন-প্রাণ ঠাণ্ডা করে দেবে, সেটা জেনে নেবার কৌতূহল অনেকেরই হয়েছে। নেতারা আপন আপন খামখেয়াল ও মেজাজ মাফিক মাঝে মাঝে বাচ্য দিয়ে গড়ে স্বরাজের এক একটা নমুনা আমাদের চোখের সামনে ধরছেন বটে ; কিন্তু তা' এমনি অস্পষ্ট যে, ভাল করে ব্যাপারটা কেউ বুঝে উঠতে—পারছে না। অনেকে তাই অত-শতের মধ্যে না গিয়ে স্বরাজ স্বরাজ, বলেই জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। বরিশালে বিপিনচন্দ্র একটা কাঠামোর মত কিছু খাড়া করতে চেয়েছিলেন। বোম্বাইয়ে পার্শীদের মজলিসে মহাত্মা গান্ধী Dominion self Government-এর রূপ দেখিয়ে বলেছিলেন—আমাদের স্বরাজ হবে এই ধরণেরই একটা সৌখিন

পরগাছা। কংগ্রেস গড়তে চাইছে A state within the state—দেখে শুনে আমাদের লেগে গেছে ধন্দ।

আসল কথা হচ্ছে আমরা কি চাই? আমলাতন্ত্র উচ্ছেদ যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব দুঃখ দৈন্য রাতারাতি কিছু ঘুচে যাবে না যদি অধিকতর মঙ্গলপ্রদ অনুষ্ঠান আমরা গড়ে তুলতে না পারি। বিপ্লব সে Violent-ই হোক non Violent থাকুক—একটা জাতির চরম লক্ষ্য হতে পারে না। সমষ্টিগত ভাবে একটা জাতি চায় সুখে-সম্পদে থাকতে, তার প্রত্যেক নর-নারীকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যে শক্তিতে পূর্ণতর করে গড়ে তুলতে।

* * * কিন্তু আজ যদি বুভুক্ষু, বস্ত্রহীন স্বাস্থ্যহীন শক্তিহীন নরনারীকে বলা যায় যে, স্বরাজ তারা পাবে, কিন্তু তা' পেতে হলে পেটের ক্ষুধা কমিয়ে বস্ত্রের বালাই ঘুচিয়ে, ঔষধের আবর্জনা দূরে সরিয়ে এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দিয়ে তাদের তৃপ্ত ও তুষ্ট থাকতে হবে—তা'হলে সেই আদর্শ স্বরাজকে বৈরাগীর আখড়া মনে করে লোকে দূর থেকে প্রণাম করেই বিদায় গ্রহণ করবে। ভোগের ভিতর দিয়ে নয়—ত্যাগের ভিতর দিয়েই স্বরাজ পেতে হবে—কথাটা খাসা শোনায়। কিন্তু একঘেয়ে নির্মম দুঃখ ছাড়া এই অভিশপ্ত জাতি আর কিছু কি ভোগ করেছে যে, আজ বৈরাগ্য-সাধনে তার মুক্তির ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে?"

এইরূপ অনবদ্য প্রাণকাড়া ভাষায় ও যুক্তিতে 'স্বরাজের রূপ' পুরা দুই কলম জুড়ে চলেছে। আজও রাষ্ট্র-কর্ণধারদের মুখে অনুরূপ ত্যাগের কথা আমরা শুনতে পাই, আজও রাজনৈতিক মুক্তি পেয়ে ও দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী ঘাঁট ও অখাদ্য খাওয়ান, আজও শ্রমক্লান্ত দুঃস্থ কুলীর দলকে ও কৃষককুলকে দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শ্রীনেহরু ডাক দেন দুঃখ বরণ করতে ও শ্রম দান করতে। দুঃখী মানুষকে দুঃখ দেবার জন্য ও ত্যাগধর্ম শিখিবার জন্য শ্রীবিনোবা ভেক নিয়েছেন। এ-সব লেখার তাই আজও দাম আছে।

এ সংখ্যার উনপঞ্চাশী উপেন ভায়ার লেখনী নিঃসৃত অমৃতমাখা উনপঞ্চাশী বড়ই উপভোগ্য। একটু তার পরিবেশন না করে থাকা যায় না।

"ভায়া হে, একটু একটু আফিং খেও; যোগ বল, সিদ্ধাই বল, সুর-অপ্সর-গন্ধর্ব্ব লোকবল সব ঐ কালো মাণিকের প্রসাদে হয়। আমার দেখো, সকাল ৭টার পর চতুর্ব্বর্গ আমার করতলে আমলকবৎ বিরাজ করে।

* * * হঠাৎ চড়াৎ করে কপাল ফেটে কি একটি অবনীন্দ্রী প্যাটার্ণের আকর্ণ-বিস্তৃত ঢুলু ঢুলু চোখ বেরিয়ে পড়লো। বাপ্! যাকে বলে ত্রিনেত্র। তার কাছে কি কিছু গোপন রাখবার জ্যোটি আছে, একেবারে 'কুলের কথা বলে দেব গো' গোছের তার অমোঘ দৃষ্টি।

দেখলাম ভায়া, তোমাদের ঐ যে সব বড় ছোট মেঝো সেঝো লাট বেলাট ওরা মানুষ নয়, ভগবানের বহু মায়া একাধারে নর রূপ ধরে লাট হয়েছেন। লাট মানে একটি পুষ্পক রথ! চড়া দূরে থাক একবার ও-রথ ছুঁলেই সটান দিব্যলোক প্রয়াণ। গোলোক, নোলোক কুবের লোক, যশোলোক ভূর্ভুব জমিদারী লোক বেতন-লোক কোন লোক তার পর তোমার মুখের চুমকুড়ির কাছে আয়ত্তাধীন নয়? দেখলাম লাট হচ্ছেন একটি কল্পতরু, যা চাও—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এমন কি মদ মাৎসর্য্য অবধি চাওয়া মাত্রে হয়। ঠিক আতসবাজীর ফুলঝুরীর মত কত রূপেই যে লাট পদটিকে দেখলাম! সে যেন ঠিক একগাছি মোটা তেল-চকচকে গাঁঠবাঁধাই মজবুদ বাঁশ, একজন চাপরাশী কসমের চোগোপ্পা লোক তা' এক বার করে উঁচিয়ে ধরছে আর হেঁকে বলছে—"লম্বা পড় পড় যাওরে ভেইয়া", আর অমনি পলকে লাখ লাখ লোক সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ছে। শুধু লাট নয়, বাঙ্গা উজীর নেতা দেশপতি এই রকম করে এ বংশের একশ' জাত নাম। মানুষ যেদিন আপনাকে অবিশ্বাস করেছে সেই দিন থেকে নিজেকে মেরে গোষাসি বার করবার জন্যে এর জন্ম। তার পর দেখলাম লাট নেই, তাঁর আসনে একটা জমাট অমানিশার গাম্ভীর্য্য বিরাজ করছে, কার বাপের সাধ্যি কাছে এগোয়? মা কালীকে যেমন পাঁঠা দিয়ে পূজো দিতে হয়, এঁকে তেমনি সেলাম কুর্ণিস দিয়ে পূজো দিতে হয়। সেলামে এর বিশ্বভুক ক্ষুধা। তার পরই সে অন্ধকার ফেটে লাল সিঁদূরে এক কালবৈশাখী কৃপার জ্যোতি ফুটলো, এও লাটবিভূতি লাটেরই বিগ্রহান্তর। সে রক্ত-আলো যুগপৎ প্রাণে অগাধ ভরসা ও অসীম ভয়ের উদয় করে, সে জ্যোতির্ব্রহ্ম রাখতেও পারে, মারতেও তাঁর সমান কৃপা। ফট করে অমনি পর্দা পাল্টে গেল, দেখি কি, আহা! যেন সে সামনে একটা রাগবৈধরী রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকা বিরাজ করছে। সব সহজ সেখানে বাঁকা, সব প্রকাশ সেখানে গোপন, আওয়াজ সেখানে মনের কথা ঢাকবার জন্যে। তার পর পুনরপি নূতন বিভূতি—চোখ ধাঁধিয়ে মন ঘুলিয়ে বুদ্ধি বিপর্য্যয় করে ঘন ঘন রূপ পরিবর্ত্তন হতে লাগলো। এই একটা উঁচু মাউণ্ট এভারেষ্ট পরমপদ, আবার একটা বত্রিশ ঘোড়ার দিকপ্রকম্পী গাড়ী, এই দেখো আইনের রক্তবীজ যত টুকরো কর তত স্বাধীন জীব—টিপে মারলেও মরে না। এই তার পরই দেখো এক জোড়া বত্রিশ পাকে পাকানো ছুঁচোল পেট-বাগে সই করা গুঁতোয়-গুঁতোয় গোছের সিং; পরক্ষণেই প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ, যার চাবি রূপোর ও গোলাকার—বড় মানুষের হাতে।

শেষে সব শেষ করে যা' দেখলাম, সেইটিই হচ্ছে দিব্যদর্শন, সেইটিই লাটগিরির নির্ব্বিকল্প আসল সার রূপ। সে যেন এক জাঁদরেলী গোছের অচল ভারী গরুর গাড়ী, দেশ ভরা মানুষ তার পিছনে লগি-লাগা নিয়ে হাট হাট করে তাড়া করছে আর সে দিব্য আরামে নির্ব্বিকার গুগলী গাড়ীতে গুড়ি গুড়ি সটান উল্টো দিকে চলেছে। আমেরিকা থেকে জগতের পাঁদাড় এই ভারত ভূমি অবধি সব জায়গায় এক একটি ঐ রকম অচলায়তন জীবন-রথ নিয়ে মানুষ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর! সবাই বহু কষ্টের পর সোজা দিকে যাই একটু বাঁকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, অমনি দেখো ছ'বার ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে আবার যে কে সেই।"

বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গে উপেনের তুলনা নাই। এই উনপঞ্চাশীতে উপেনের কল্পনা শক্তিরও অনুপম খেলা দেখা যায়। লাট পদের এই নানামুখী বহুভঙ্গিম রূপ আশা করি আমাদের দেশের বড় রসিক লাটসাহেবেরা বুঝে দেখবেন। ঐ পদে বাঙ্গাল আছেন হরেন্দ্র বাবু, দিবাকর, কে এম মুন্সীর ন্যায় মহৎ মানুষরাও। তাঁরা অন্তরে অন্তরে বুঝন, দেশসেবার লোভে কোন খানায় তাঁরা

পা দিয়ে আপাদমস্তক পঙ্কলিপ্ত হচ্ছেন। তার পর এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখা—"অরবিন্দের সাধন সত্য" সেই সাধের জন্ম-কাহিনী ১৫ই আগষ্ট লেখা—পণ্ডিচেরীতে বসে স্বাধীনতাই সাহিত্য সৃষ্টি।

সে দিন পণ্ডিচেরীর সমুদ্র-সৈকতে বসে আশার যে মহান স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানে তা' বাস্তব ভেঙে গেছে। সে স্বপ্ন কিন্তু অমর, তাঁর তপোজ্জ্বল দৃষ্টি ব্যর্থ হবার নয়। আসছে সে দিন যখন এই মর্ত্যচারিতে লিখিত হয়ে ফলে যাবে। ঐ লেখা কিছু উদ্ধৃত করি—"ভগবান এবার জীব হবেন, জীব এবার ভগবান হবে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝে সোনার সিঁড়ি ভেঙে গেছিল, সে সিঁড়ি এবার গড়ে উঠে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে আনন্দের বাঁধনে এক করে দেবে। তোমরা দু'-একজন অবতার দেখেছ, যোগে মুক্ত ও আনন্দ সিদ্ধির শান্ত মানুষ দেখেছ। কিন্তু সব মানুষে অনন্ত, তার মধুর পূর্ণতায় ফুটতে পারে তা' কি কখনও ভাবতে পার? সেই দুঃসাধ্য সাধনের দিন এবার এসেছে। এতটুকু দেহ এতটুকু প্রাণ-মন এই চোদ্দ পোয়া মানুষই মানুষ নয়—* * * সে তো অনন্তের আধার—জগতের সেই পরম-শরণ সত্য-বেদ এই আধারেই লেখা।

* * * সেই ভূর্ভুব সত্য তপোলোকব্যাপী তোমার বৃহৎ অখণ্ড অন্তরটাই নারায়ণ, বাহিরে তুমি তার ইঙ্গিত মাত্র।"

সমস্ত লেখাটিতে আছে উপনিষদের যুগে, শ্রীচৈতন্য যীশুর যুগে তন্ত্রের যুগে একে একে মানুষের তিন ধাম মন, হৃদয়, প্রাণ রূপান্তরে দেবত্ব লাভ করে দীপ্ত হয়েছিল, এবার এই তিন স্তর ও জড় দেহে পূর্ণ করে পূর্ণ ভগবান জাগবেন।

এ এক অনন্তর আশার কথা। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীনতা লাভের উৎসবে নিজের জন্মদিনে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মুদ্রিত বাণীতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন—দুই বঙ্গ এক হবে ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে—এই দেশবিভাগ সুনিশ্চিত ভাবে দূর হবে, তাহা ব্যতীত দেশের কল্যাণ নাই। শুধু বাংলার বা ভারতের নহে; মানুষের সহিত মানুষের ঐক্য ও মিলনের সকল অন্তরায়, বিভেদ ও কণ্টক নিঃশেষে উৎপাটিত ও নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য ঈশাণ কোণে কালবৈশাখীর কৃষ্ণ ও রক্ত-মেঘ চাপ বাঁধিতেছে। দেখা যাক, বিপন্ন মানব-পরিবার এ প্রলয়-ঝঞ্ঝা এড়াইতে পারে অথবা তাহাতে মাথা নত করিয়া যুগশক্তির সে শোধনকারী পাবন প্লাবন শিরোধার্য্য করিতে হয়।

বিজলী যে যুগ সৃষ্টির ছিল মহাশঙ্খ তার আর কত নিদর্শন দেব। কালপুরুষের হাতে সে শঙ্খ আজও বাজছে, সে শঙ্খ বেজেই চলবে যাবৎ পূর্ণ মানব-মুক্তি। বিজলীর এই ৪০ সংখ্যাটি এবার পরিচয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়ে চলেছে, এ সংখ্যা সব লেখাই মৃতের বুকে স্পন্দন জাগায়। চিঠির ঝাঁপীতে এবার 'ভারতী'তে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'নিরুপদ্রব অসহযোগিতা' প্রবন্ধে তৃতীয় দফা নিয়ে বিজলীর এই সংখ্যায় আলোচনা আছে। বিজলী লেখকের লেখা উদ্ধৃত করে বলছে—"স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কত ছিদ্রাই যে বান্ধব আত্মার হয়েছে সে কথা মনে হলে ক্ষোভে লজ্জায় ধিক্কারে প্রাণটা অস্থির হয়ে ওঠে। কি সব সোনার চাঁদ ছেলে! ভগবান আপন হাতে তাদের কপালে মনুষ্য-মর্য্যাদার রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছিলেন।"

তারা যে সোনার চাঁদ ছেলে আর তাদের কপালে যে লেখক ঠাকুর রাজটিকা টিক্ টিক্ করছে দেখতে পেলেন সেটা ঐ উপদ্রবের কল্যাণেই তো? অমন করে কাঁচা মাথাগুলো দেশের দরুণ দিতে পেরেছিল বলেই তো তারা মানুষ। আর আজ দেশে মহাত্মাজীর চেলা-চামুণ্ডারা নিরুপদ্রব সহযোগিতা ছেড়ে যে অশান্তির সৃষ্টি করেছেন ও'তে বাঙ নতুন দলের টিপাটিপ খাচ্ছে না? না, শাক্ত মতে নয় বলে বৈষ্ণব মতে সেগুলো হলো কুমড়ো বলি। * * *

আজ যে রাজপথে দাঁড়িয়ে খোলা হাওয়ায় স্বরাজের বুকনি দেওয়া সহজ হয়েছে, দেশবাসীকে আজ দেশের মমতায় একটু-আধটু নড়ে চড়ে, তা' কিন্তু ঐ ক'টা কাঁচা মাথার দরুণই। * * * আমাদের সেই রসাতল যাত্রার কুলুজী গাইতে গিয়ে লেখক ধর্ম্মের যা রূপ দেখিয়েছেন, তাতে রাধেকৃষ্ণ ও হরিনাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ভগবান কবে এমন নিরুদ নিরামিষ হয়ে গেলেন তা' টপ করে ধরা কঠিন। কালী ঠাকুরের ডান হাতে ওটা কি ঝলছে, দাদা, একবার বলতে পার?

"গীতা মানুষকে যা' করাতে চায় তা নিষ্ঠুর বটে কিন্তু ঘাতক নয়, কঠিন বটে কিন্তু নিষ্ঠুর নয়।" যেমন কুমড়ো বলি, না? বলিও বটে, নিষ্ঠুর নয়। তা' হলে কুরুদের দলের তাজা তাজা জোয়ানগুলো কি সবাই কুমড়ো ছিল? * * *

আমরা নিরীহ ও সাত্ত্বিক হয়ে গেলে ইংরেজ যে লজ্জায় হেঁট-বদন হয়ে পেটে দু'টো কিল মেরে পেটের ক্ষিদে পেটে রেখে বাড়ী চলে যাবে, তাই কি লেখক ঠাকুরের বোধ হয়? * * * যা করে ভারত স্বাধীন হবে তা' তো বঙ্কিমের সুজলাং সুফলাং গান বাঁধা থেকে ভিক্ষে মেগে, বোমা মেরে অসহযোগ করে ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। নেতা ছাড়া সমস্ত মুক্তি-সংগ্রামটায় একটা নিজস্ব জীবন আছে, এ সব ঘটনা ও লোকজন তারই প্রকাশ ও ভঙ্গী মাত্র।"

দীর্ঘ এই চিঠির মূল কথা এখনও খাটে। শ্রীনেহরু এই সেদিন শ্রীমুখে বলে গেলেছেন, যুদ্ধ বাধলেও ভারত যুদ্ধ করবে না, অহিংস থাকবে। মহাত্মাজীর কৌপীন ও দণ্ডের প্রেতাত্মা এখনও এই আণবিক যুগে, স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক সমাজবাদী লোক-কল্যাণী রাষ্ট্রের স্কন্ধে চেপে আছে। প্রেতাত্মা চিরদিনই নিশি-ডাকে ভুলিয়ে মানুষকে নিয়ে যায় খালে-বিলে ভাগাড়ে ডুবিয়ে মারার জন্য। এ সংখ্যার "কাজের কথা"র শিরোনামাই তার পরিচয়—"লোক দেখানো ভিক্টিবিয়াই কি কাজ?" খুলনা জেলায় যখন দীনা মা-বোনেরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে ঘরের কোণে আছে তখন বিলাতী-বস্ত্র পোড়ানোর বিরুদ্ধে এই "কাজের কথা" লিখিত হয়েছিল। যারা বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করে হাত-তালি পাচ্ছে তারা যদি নিজের মা-বোনদের উলঙ্গ রেখে এ কাজ করতো তা'হলে বাহাদুরী তবু না হয় দেওয়া যেতো।

সে দিন বিজলীর আগুনের অক্ষরে প্রাণ-জাগানো ভাষায় যে লেখা এসেছিল তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল জাতির রাজনীতিক মুক্তি—পরাধীনতার বন্ধন ছেদন। সে কাজ সমাধা হয়ে গেছে অগ্নিশিশুদের আত্মদানে, সুভাষের হুঙ্কারে এবং ইম্ফলের পথে বৃটিশ ভারত আক্রমণে ও মহাত্মাজীর "ভারত ছাড়" ঘোষণায় সশস্ত্র বিপ্লবের পাশাপাশি এক অনুপূরক ধারায় প্রবাহিত নিরস্ত্র চ্যালেঞ্জের চাপে। এত করেও ভারতের শৃঙ্খল-মুক্তি আসতো

না যদি মহাকালের দুর্ব্বার আঘাতে দ্বিতীয় মহাসমরের নাটকীয় অবসানে সাত সমুদ্র তের নদীব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা অসম্ভব হয়ে না উঠতো। অর্দ্ধ পৃথিবীর হিটলার অনুরাগী উৎপীড়িত মানুষ চেয়েছিল অন্ধ মোহে বর্ত্তমান নরখাদক সভ্যতার উৎপাদক-রূপে হিটলারেরই জয়। শুধু এক ধ্যানমগ্ন ত্রিকালদর্শী মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন হিটলারের অনিবার্য্য পতন ও মিত্রশক্তির জয়। হিটলার আজ অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর মত আকাশে বিলীন আর অবলুপ্তির প্রচণ্ড আঘাতে দূর প্রক্ষিপ্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘটেছে অবসান, সে নিদারুণ বিপর্য্যয়ের মাঝে আমাদের ভারত-জননীর বীর সন্তান সুভাষেরও ঘটেছে অন্তর্দ্ধান। আজ শ্রীনেহরু ভারতের রাষ্ট্রতরীর কর্ণধার। তাঁর অপূর্ব্ব নেতৃত্ব শক্তি কাজ করছে আংশিক মুক্ত ভারতের পূর্ণতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির অর্জ্জনে ও বিপুলতর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের দৈবী মহান নীতির প্রতিষ্ঠায়। তিনিই আজ যুগদেবতার হস্তের আণবিক অস্ত্র—human atom bomb! ষ্ট্যালিনের রাশিয়া কম্যুনিজমের মার্ক্সবাদের পথে জীবন-সত্যের পরীক্ষা রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে অর্দ্ধ পৃথিবীর সর্ব্বহারাদের মানব কল্যাণের নেতৃত্ব দিয়ে শেষ করেছেন। শ্রীনেহরু ও নয়াচীনের ইঙ্গিতে আজ এসেছে এক পরিবর্ত্তন, সশস্ত্র সর্ব্ববিধ্বংসী বিপ্লবের চাপে জাতি পরিবারে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন ছেড়ে বুলগানীনের আপোষকামী নূতন রাশিয়া সহ অবস্থিতির নীতি গ্রহণ করেছে। এ গ্রহণ ও স্বীকৃতির ফলে যুদ্ধের আণবিক ধ্বংস এড়ানো যাবে কি না এখনও তা' মহাকালের নিগূঢ় রহস্যে আবৃত। আজ কিন্তু শ্রীনেহরুর অগ্রগতির পিছনে সমগ্র (অখণ্ড হউক, দ্বিখণ্ড হউক) ভারতের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। শ্রীনেহরুর কাটি-বিচ্যুতি বড় নয়, তাঁর লোককল্যাণের নূতনত্ব অভিনবত্ব বড়, মানুষ ইতিহাসের গতি পাল্টে নিয়ে চলেছে আজ সব দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা পরিহার করে মিলনের একচ্ছত্র মানব-রাষ্ট্র গঠনের পথে। এ স্বর্ণারোহণের মহাযাত্রা সফল হোক।

আমি ভালবাসি না

শ্রীশান্তিভূষণ রায়

আমি তোমায় ভালবাসি না।
না, আমি তোমায় ভালবাসি না।
তথাপি আমি দুঃখ পাই
তোমার অনুপস্থিতে।
এবং হিংসা করি
তোমার উপরিস্থিত উজ্জ্বল নীল আকাশের
শান্ত তারাদের,
যারা তোমায় দেখতে পায় এবং
আনন্দ উপভোগ করে।
আমি তোমায় ভালবাসি না।
তথাপি কেন জানি না
তোমার প্রতিটি কাজ
আমার নিকট মনে হয়
উত্তমরূপে সমাধা হয়েছে।
এবং প্রায়শই নীরবতায়
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি আর ভাবি
আমি যা কিছু ভালবাসি
তারা ঠিক তোমার মতো নয়।
আমি তোমায় ভালবাসি না।
তথাপি যখন তুমি চলে যাও
আমি শব্দকে ঘৃণা করি (যদিও তারা বলবে প্রিয়)
কেন না সুরের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশব্দকে
সে ভেঙ্গে দেয় এবং
আমার মন হতে অপসৃত হয়
তোমার সুরেলা কণ্ঠ।

আমি তোমায় ভালবাসি না।
তথাপি তোমার ব্যক্ত আঁখি
তাদের গভীরতা উজ্জ্বলতা এবং
নীল অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গী নিয়ে
আমার এবং মধ্য-রাত্রির
স্বর্গীয় আভায় উদয় হয়।
যদিও অনুরূপ কোন আঁখি
আমি দেখিনি আজও।
আমি জানি,
আমি ভালবাসি না তোমায়।
তথাপি হায়! অপর সবাই
কদাচিৎ বিশ্বাস করে
আমার অপক্ষপাত সরল হৃদয়কে।
এবং প্রায়শই আমি
তাদের সেই বাঁকা-হাসি
ধরে ফেলি।
যখনি তারা আমায় দেখে
স্থির দৃষ্টিতে আমি আছি তাকিয়ে
যেখানেই তুমি গেছ।

রাণা বসু

মনোরঞ্জন সেনের সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তী তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে আপনি পরিচারিকা সুধার হত্যার তদন্তের ভার নিলেন ?

মনোরঞ্জন বাবু বললেন : এ খবর আপনি পেলেন কী কোরে ?

: ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনের কাছেই পেয়েছি। আমি এখন তাঁর অফিস হয়েই আসছি। যাই হোক, আপনি কাজে সফল হন এ কামনাই করি।

মনোরঞ্জন বাবু বললেন : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার কোন কাজে সাফল্যের বিষয়ে আপনি সন্দেহ রাখেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, মুচকি হেসে বললেন : একটু যে সন্দেহ না রাখি তা নয়।

ঘটনাটা হোল : বাড়িতে থাকতেন ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর পরিচারিকা সুধা। মাঘের এক শীতের সন্ধ্যায় সুধাকে বাড়িতে রেখে ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী তাঁদের এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যান। বাড়ি ফিরে দেখেন সুধাকে কে যেন খুন কোরে রেখে গেছে। কিছু জিনিসপত্তরও পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশ ব্যাপারটার কোন রকম সুরাহা করতে না পেরে লালবাজার ডিটেকটিভ বিভাগে খবর দেয়, তারপর তদন্তের ভার আপনার ওপরেই আসে। ব্যাপারটা যে জটিল তাতে সন্দেহ নেই। হত্যাস্থলের স্থানীয় থানার অফিসারের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে। তদন্তের ব্যাপারে ভদ্রলোক যদি তেমন কিছু নেই মনে করতেন তাহলে আর কখনোই এত দূর এগুতেন না।

: যাক আপনার কাছে বিষয়টার কিছু ইংগিত পেলুম, ধন্যবাদ। আর নয় আজ উঠি, বলে মনোরঞ্জন বাবু বিদায় চাইলেন।

: উঠতে যখন চাইছেন তখন আর আপনাকে আটকাবো না, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি : তাহলে হত্যার তদন্ত কবে থেকে সুরু করছেন ?

: হাতে কয়েকটা কাজ আছে সেগুলো শেষ কোরেই…।

ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন : চব্বিশ ঘণ্টা তো এর ভেতরই কেটে গেছে, আর এ ব্যাপারে এক একটা ঘণ্টা কাটা মানেই অনেক অনেক দেরী।

মনোরঞ্জন বাবু বললেন : কথাটা খুব সত্যি। আচ্ছা, আপনি তো সুধার লাশ দেখেছেন। দেখে কী মনে হোল ? আপনার কাছে আগে থেকে একটু শোনা থাকলে কাজের অনেক সুবিধে হবে।

: মাথায় সাঙ্ঘাতিক আঘাতই মৃত্যুর কারণ। সুধা ছিল যুবতী, বলবতী—সে যে প্রতিপক্ষকে ভালো রকম বাধা দিয়েছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু মাথাতেই নয় তার দেহের নানা অংশে অনেক আঘাত ছিল—যে লোহার রড দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছিলো তা প্রায় ইঞ্চি দেড়েক চওড়া হবে। যতদূর শুনেছি সে লোহার রড এখনও পাওয়া যায়নি। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গত রাত্তিরের আগের রাত্তির ন'টা থেকে দশটার ভেতর সুধা মারা গেছে।

: মাথায় ঐ আঘাতের জন্যেই অত তাড়াতাড়ি মারা গেছে।

: মরেছে মানে—কয়েক মিনিটের ভেতর মরেছে। বিশেষ কোরে একটা আঘাত তো সাংঘাতিক ছিল।

: আঘাত দেখে মনে হয় কী হত্যাকারী বেশ শক্তিশালী ছিল ?

: নিশ্চয়ই। আর পুরুষ না হয়ে হত্যাকারী যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহলেও সে বেশ শক্তিশালিনী।

মনোরঞ্জন বাবুর আর বিশেষ জানার ইচ্ছে ছিল না। আধ-ঘণ্টার ভেতরই তিনি সার্জেণ্ট ব্রুককে নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করলেন। পথে কিছুটা সময় লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে কাটে, কারণ সেখানে হত্যা ব্যাপারটির আর যেটুকু খবর পান। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মনোরঞ্জন বাবু পূর্বব্যবস্থানুসারেই সুধার মৃতদেহটি লক্ষ্য করতে লাগলেন !

মাঝারি আকারের বাড়ি। বাড়ির বাসিন্দারা সে সময় কেউ বাড়িতে ছিলেন না। কারণ এরকম একটা হত্যাকাণ্ডের পর আর তাঁদের বাড়িতে থাকার মতন সাহস ছিল না। কাছেই (মাইল দুয়েক দূরে) এক প্রতিবেশীর বাড়িতে তাঁরা ছিলেন। সার্জেণ্ট ব্রুক বললেন : হত্যাকাণ্ডের পর বাড়ি বা ঘরের কোন জিনিস সরানো বা হাত দেওয়া হয়নি—কারণ পুলিশের নির্দেশ ছিল যতক্ষণ না তাদের সবরকম অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষ না হয়, ততক্ষণ কেউই বাড়ির বা ঘরের কোন জিনিস সরাতে বা হাত দিতে পারবেন না।

রান্নাঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে আঁকা এক সীমাবদ্ধ রেখা নির্দেশ কোরে ব্রুক বললেন : এখানেই নিহত অবস্থায় মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছিলো। মৃতার বাঁ-হাতখানা ছিল বুকের তলায় রাখা, ডান হাত ছড়ানো আর মুখখানা ছিল মাটির দিকে গোঁজড়ানো।

রান্নাঘরের সে-সময় যা অবস্থা ছিল, তা দেখলেই ভয় করে। ঘরের জিনিসপত্তর চতুর্দিকে ছড়ানো। ছড়ানো জিনিসপত্তরের ভেতর একটা দোয়াত ও ব্লটিং পেপার দেখা গেল।

: ওখানে একটা আধলেখা চিঠি পড়ে রয়েছে না ?

: হ্যাঁ।

: অন্যান্য কাগজের সঙ্গে ওটা নিয়ে আসুন না।

মহাজিজ্ঞাসা নিয়ে মনোরঞ্জন বাবু চিঠিখানা মিঃ ব্রুকের হাত থেকে গ্রহণ করলেন। চিঠিখানা কালি ও রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। মৃতা চিঠিখানা লিখছিল মোহিনী নামে এক মহিলার কাছে।

বাড়ির কর্তা দেবকুমার মিত্র মোহিনী সম্পর্কে পুলিশের কাছে

এই কথা জানিয়েছেন : মোহিনী হোল পরিচারিকা সুধার এক বান্ধবী—হিন্দু বিধবা—ভবানীপুর অঞ্চলে এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি কাজ করে।

চিঠিটার ভেতর হত্যা বিষয়ে কোন ইংগিত-ই পাওয়া গেল না। চিঠিটা হঠাৎ-ই একটা আধলেখা শব্দে এসে শেষ হয়েছে। এই থেকে বোধ হয় : সুধা বাইরে কোন শব্দ শুনে শংকিত বা সচকিত হয়ে পড়ে অথবা সে-সময় বাইরের কেউ রান্নাঘরে প্রবেশ করে।

থানার প্রহরীটিকে মনোরঞ্জন বাবু বললেন : ঠিক আছে, সার্জেণ্ট। বর্তমানে আমি এই রকম একটা কিছু খুঁজছিলুম। এখন ঘর-বাড়ির চারদিক একটু দেখতে চাই।

বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে মনোরঞ্জন বাবু ঘরের চারদিক দেখতে লাগলেন। ঘরের জানলাগুলো তখনও ভালো ভাবে বন্ধ ছিল। বাসের ঘর থেকে রান্নাঘরে যাওয়া যায় এই রকম দু' ঘরের ভেতর একটা দরজা ছিল। এই দু' ঘরে যাতায়াতের দরজাটা কোন রকম বন্ধ নয় খোলাই, সুতরাং অনায়াসে যে কেউ এক ঘর থেকে অপর ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

মনোরঞ্জন বাবু বললেন : সুধা বেশ সাহসীই ছিল। মনে ভয় থাকলে নিশ্চয়ই সে রান্নাঘরের দিক থেকে দরজায় শিকল টেনে দিতো। নির্ভয়ে সে চিঠি লেখা সুরু কোরেছিলো। তারপর তার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা হঠাৎ-ই। : মিঃ ক্রক, হারানো জিনিস-পত্তরের তালিকাটা দেখি একবার।

তালিকাটা মনোরঞ্জন বাবুর দিকে এগিয়ে ধরে ক্রক বললেন : এই নিন।

তালিকাটা দেখতে দেখতে মনোরঞ্জন বাবু বললেন : এই নির্মম হত্যার কাছে নিখোঁজ জিনিসগুলো তো কিছুই নয়, অতি সামান্য। লক্ষীর ঝাঁপির ত্রিশ টাকার সঙ্গে নিখোঁজ জিনিসগুলোর দাম একত্র করলে বড় জোর পাঁচশো টাকা হবে।

মনোরঞ্জন বাবু আরও বললেন : এবার বাড়ির কর্তা-গিন্নির সঙ্গে দেখা হলে ভালো হোত। আচ্ছা মিঃ ক্রক, আপনি বরং আমাদের জিপটা কোরেই ওদের ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসুন না, আর আমি ততক্ষণ এখানে একটু অপেক্ষা করি।

অনেক অনুসন্ধানের পরও এক রান্নাঘর ছাড়া আর কোথাও এক বিন্দু রক্তের চিহ্ন দেখা গেল না। বাড়ির বাসের ঘরের জিনিসপত্তর সামান্যই একটু এদিক-ওদিক হয়েছে। ঘরের ডেস্কের দেরাজটা খোলা—দেরাজের জিনিসপত্তর এদিক-ওদিক ছড়ানো—ডেস্কের খাপের ভেতর যে সব কাগজপত্তর ছিল সেগুলো ঠিক ভাবেই রাখা আছে।

ঘরে ঢোকবার প্রধান দরজায় চাবি লাগানো ছিল। সুতরাং বাইরের কাউকে চাবি ছাড়া ঘরে ঢুকতে হলে অন্য কোন পথে প্রবেশ করতে হয়। হত্যা যা ঘটেছে তার চেয়ে এ ব্যাপারটা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ ব্যাপারে মনোরঞ্জন বাবু বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। তিনি দেখলেন—একটা জানলা ছাড়া বাকী একতলার সমস্ত ঘরের জানলাগুলো বন্ধ।

এখন যদি কেউ পেছনের দরজা বা খোলা জানলা দিয়ে বাড়িতে ঢোকে,—তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে তা'হলে সুধা নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাবে। কারণ রান্নাঘরের দরজার ঠিক সামনা-সামনি ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এ ব্যাপারে তাহলে এটা ঠিক, সুধা চিঠি লিখতে লিখতে ওপরে যে উঠে আসছিল তাকে দেখতে পেয়েছে—আগন্তুক তা জেনে সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরে ঢুকে সুধাকে আক্রমণ করে—আক্রমণ ও প্রচণ্ড আঘাতের পরেই সুধার মৃত্যু ঘটেছে।

হত্যাকারী নিশ্চয়ই দেবকুমার বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে মোটর কোরে বাড়ির বাইরে যেতে লক্ষ্য কোরেছিল, সে জানতো বাড়িতে সুধাই শুধু একলা আছে। ভেতরে ঢুকলে যদি কেউ তার আসাকে বাধা দেয় এইজন্যে হাতে একটা লোহার রড নিয়ে প্রস্তুত হয়েই বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল। তাহলে এখন প্রশ্ন তোল : আগন্তুক কোথায় রডটি পেলই বা কোথায় আর সুধাকে হত্যা করার পর রডটি গেলই বা কোথায় ?

এই সময় দেবকুমার বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন সার্জেণ্ট ক্রক। দেবকুমারের বয়েস ত্রিশের নীচে নয়,—কিছু ওপর ; গৌরবর্ণ, মোটাসোটা—নন্দদুলাল ধরণের শরীর। দেবকুমার বাবুর স্ত্রী কমলা দেবী বয়েসের ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট, স্বাস্থ্যও স্বামীর মতন নয়। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁদের দু'জনকে দেখে মনে হোল তাঁরা বিশেষ ভীত।

মনোরঞ্জন বাবু বললেন : দেবকুমার বাবু, আপনাকে এ রকম বিরক্ত করার জন্যে আমি খুব দুঃখিত। আপনি, আপনার স্ত্রী পুলিশের কাছে যে বিবরণী পেশ কোরেছেন তা আমি পেয়েছি, কিন্তু সেটা একবার আপনাদের সামনাসামনি পড়ে মিলিয়ে নিতে চাই। এখন আপনাদের পেশ করা বিস্তারিত বিবরণীটি আমি পড়ছি—এর সঙ্গে আপনাদের আর কিছু যোগ করার বা বদলানোর থাকলে বলবেন।

দেবকুমার বাবু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি থানায় যে বিবরণী লিপিবদ্ধ কোরে এসেছিলেন মনোরঞ্জন বাবু তা পড়তে লাগলেন ও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে থাকলেন।

সুধার বয়েস হয়েছিল বাইশ আর সে আপনার কাছে পরিচারিকার কাজ করছিল গত দু' বছর ধরে ! আপনার এখানে কাজ কোরে সে খুশীই ছিল। সে যেমন খাটিয়ে ছিল তেমনি সৎও ছিল। তার সম্বন্ধে যতদূর জানেন তাতে

বলেছিলেন যে, সেদিনের সন্ধ্যায় আপনি ও কমলা দেবী আপনার বন্ধু অনন্ত দেব ও তাঁর স্ত্রী পারুল দেবীর বাড়ি যাবেন—ফিরতে রাত্তির এগারোটা হবে, সেই কারণে অত রাত্তির পর্যন্ত তার অপেক্ষা কোরে বসে থাকার কোন দরকার নেই।

এ কথা সবই সত্যি : দেবকুমার বাবু বললেন।

: আপনি ৮-৪০ মিনিটে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন?

কমলা দেবী বললেন : না, না।

দেবকুমার বাবুও বললেন : না! আমি ৮-১৫ বলেছিলুম, পুলিশ অফিসারটি লিখতে ভুল কোরেছেন। আমার অনন্ত দেবের বাড়িতে সাড়ে আটটার ভেতর পৌঁছানোর কথা ছিল। আমার বাড়ি থেকে তাঁদের বাড়ি প্রায় পৌনে দু' মাইল হবে।

মনোরঞ্জন বাবু সঙ্গে সঙ্গে সময় সংক্রান্ত ভুলটি সংশোধন কোরে নিলেন।

: আপনারা এগারোটা পর্যন্ত দেব পরিবারের সঙ্গে ব্রিজ খেলে তারপর বাড়ির দিকে রওনা হন। বাড়ির কাছ বরাবর এসে একতলা ও দু'তলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে দেখে অনুমান করেন সুধা তখনও জেগে আছে। গ্যারেজে গাড়ি রেখে দরজা খুলে বাইরের ঘরে ঢুকতেই আপনি দেখেন ডেস্কের ওপর রাখা জিনিসগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরে রাখা জিনিসগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো দেখে কমলা দেবী সুধার নাম ধরে ডাকতে থাকেন। দু'চারবার ডাকার পর সুধার সাড়া না পেয়ে আপনারা দু'জনেই বেশ ভীত হয়ে পড়েন। আপনি রান্নাঘরে তার খোঁজে গিয়ে দেখেন সে নিহত অবস্থায় পড়ে আছে—

কমলা দেবী রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে থাকেন। দেবকুমার বাবু স্ত্রীকে অধীর হতে বারণ করেন।

: এখন আপনি বা কমলা দেবী আপনাদের লিপিবদ্ধ বিবরণীতে আর কিছু যোগ করতে চান?

দেবকুমার বাবু বললেন : না। তিনি আরও বললেন : জানতে পেরেছেন নিশ্চয়ই আমরা আর সে রাত্তিরে বাড়িতে কেউ শুইনি বা থাকিনি। আমার স্ত্রী এত ভয় পান ও মুষড়ে পড়েন যে, আমি অনন্ত বাবুকে ফোন কোরে জানতে চাই যে সে রাত্তিরের মতন আমাদের দু'জনের স্থান তাঁর বাড়িতে হবে কি না? তারপর কিছু চুরি গিয়েছে কি না দেখার পর থানায় হারানো জিনিসের একটা তালিকা পেশ করি।

ঘটনার দিন রাত্তিরে আপনারা যে অনন্ত বাবুর ওখানে গিয়েছিলেন একথা সুধা ও অনন্ত বাবু ছাড়া আর কী কেউ জানতেন?

: আর কে জানবেন বলুন? অনন্ত বাবুর ওখানে সে রাত্তিরে ব্রিজ খেলতে যাব, এটাই ঠিক হয় সন্ধ্যে নাগাদ। সেদিন অফিসের ছুটির পর আমি অনন্ত বাবুর বাড়ি যাই, তারপর তিনি সে রাত্তিরে তাঁর ওখানে তাস খেলার নিমন্ত্রণ আমাদের জানান। আমার যতদূর মনে পড়ে এ কথা সুধাকেও রাত্তির সাড়ে সাতটার আগে জানাতে পারিনি।

: আপনার বাড়িতে সুধা ছাড়া অন্য কেউ ঝি বা চাকর আছে?

: আবার আসে ফের ভোর হবার। পুলিশ তাকে দেখেছে।

: বলরামকে আপনি বিশ্বাসী মনে করেন?

: নিঃসন্দেহে।

: আপনারা সে রাত্তিরে যে অনন্ত বাবুর বাড়ি যাবেন, একথা কী বলরাম জানতো?

: বলরামের তো জানার কোন কারণ নেই। আমি যখন বাড়িতে যাবার কথা বলি তখন সে, সে রাত্তিরের রান্না শেষ কোরে চলে গেছে। আর তাছাড়া অনন্ত বাবুর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যখন সে রাত্তিরে তাঁর বাড়িতে আবার ফের আসার কথা ওঠে, তখন তিনি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ সেখানে ছিলেন না।

: লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা যে ত্রিশ টাকা খোয়া গেছে তার ভেতর কী ত্রিশখানাই এক টাকার নোট ছিল?

: হ্যাঁ।

: ত্রিশখানা নোটই যে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা ছিল, তার কী কোন প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

: না। কারণ ঝাঁপিতে রোজ সিকি, দুয়ানি কোরে ফেলে যখনই টাকাখানেক হয়ে দাঁড়াতো তখনই আমার স্ত্রী রেজকীগুলোকে টাকা কোরে নোট কোরে ঝাঁপিতে তুলে রাখতেন।

তারপর মনোরঞ্জন বাবু হারানো জিনিস-পত্তরগুলোর বিষয়ে আর দু-চারটে প্রশ্ন কোরেই সার্জেন্ট ব্রুককে সে স্থান ত্যাগ করার জন্যে জিপ ঠিক করতে বললেন। এ তদন্ত সুরু করার আগে ডাক্তার চক্রবর্তী যে মন্তব্য কোরেছিলেন মনোরঞ্জন বাবু এখন সে কথা বেশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন।

কোন অভাবগ্রস্ত লোক (এক কথায় বেকার) হয়তো টাকার জন্যে এ খুন করতে পারে। যে অর্থের প্রয়োজনে খুন করবে সে নিলে 'ক্যাশ' টাকাই নেবে, কিন্তু কখনই কোন জিনিসপত্তরে হাত দেবে না, কারণ এটা সকলেই জানে 'ক্যাশ' টাকা ছাড়া অন্য কিছু অপহরণ করা বিপজ্জনক—চোরাই মাল বাজারে বিক্রী করতে গেলেই ষোল আনা ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

জিপের দিকে এগুতে এগুতে মনোরঞ্জন বাবু সার্জেন্ট ব্রুককে বললেন : এ হত্যার পেছনে অনেক রহস্য লুকানো আছে, সুতরাং আসল ব্যাপার বের করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

সার্জেন্ট ব্রুক বললেন : আসল ব্যাপার জানতে যে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে, তা আমারও মনে হয়েছে। বলরাম সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? দেবকুমার বাবু যা বললেন তাতে বলরাম তখন বাড়িতেই ছিল না, আর বলরাম কিছু করলে ত্রিশ টাকাই চুরি করবে—কোনমতেই সে বাড়ির কোন জিনিসে হাত দেবে না।

: এ ব্যাপারে বলরামকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কিছু নেই বলেই আমি মনে করি।

এরপর মনোরঞ্জন বাবু বাগানের চারদিক দেখতে লাগলেন। বাগানের চারপাশ লোহার কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা। বাগানের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তিনি যেন একটা বিলেতী গাছের (Chrysanthemam) কাছে থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : মস্ত একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেছে। দেখুন, এই

লক্ষ লক্ষ লোকের দৈনিক চাহিদা মেটায়

ব্রুক বণ্ড চা!

অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে

ব্রুক বণ্ড চা

বেশী লোকে কেনেন!

হত্যার ব্যাপারটি প্রেমঘটিত নয়। গত রাত্তের আগের রাত্তে অর্থাৎ যে রাত্তিরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে, সেদিন আপনি তাকে বলেছিলেন যে, সেদিনের সন্ধ্যায় আপনি ও কমলা দেবী আপনার বন্ধু অনন্ত দেব ও তাঁর স্ত্রী পারুল দেবীর বাড়ি যাবেন—ফিরতে রাত্তির এগারোটা হবে, সেই কারণে অত রাত্তির পর্যন্ত তার অপেক্ষা কোরে বসে থাকার কোন দরকার নেই।

এ কথা সবই সত্যি : দেবকুমার বাবু বললেন।

: আপনি ৮-৫০ মিনিটে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ?

কমলা দেবী বললেন : না, না।

দেবকুমার বাবুও বললেন : না। আমি ৮-১৫ বলেছিলুম, পুলিশ অফিসারটি লিখতে ভুল কোরেছেন। আমার অনন্ত দেবের বাড়িতে সাড়ে আটটার ভেতর পৌছানোর কথা ছিল। আমার বাড়ি থেকে তাঁদের বাড়ি প্রায় পৌনে দু' মাইল হবে।

মনোরঞ্জন বাবু সঙ্গে সঙ্গে সময় সংক্রান্ত ভুলটি সংশোধন কোরে নিলেন।

: আপনারা এগারোটা পর্যন্ত দেব পরিবারের সঙ্গে ব্রিজ খেলে তারপর বাড়ির দিকে রওনা হন। বাড়ির কাছ বরাবর এসে একতলা ও দু'তলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে দেখে অনুমান করেন সুধা তখনও জেগে আছে। গ্যারেজে গাড়ি রেখে দরজা খুলে বাইরের ঘরে ঢুকতেই আপনি দেখেন ডেস্কের ওপর রাখা জিনিসগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরে রাখা জিনিসগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো দেখে কমলা দেবী সুধার নাম ধরে ডাকতে থাকেন। দু'চারবার ডাকার পর সুধার সাড়া না পেয়ে আপনারা দু'জনেই বেশ ভীত হয়ে পড়েন। আপনি রান্নাঘরে তার খোঁজে গিয়ে দেখেন সে নিহত অবস্থায় পড়ে আছে—

কমলা দেবী রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে থাকেন। দেবকুমার বাবু স্ত্রীকে অধীর হতে বারণ করেন।

: এমন আপনি বা কমলা দেবী আপনাদের লিপিবদ্ধ বিবরণীতে আর কিছু যোগ করতে চান ?

দেবকুমার বাবু বল্লেন : না। তিনি আরও বল্লেন : জানতে পেরেছেন নিশ্চয়ই আমরা আর সে রাত্তিরে বাড়িতে কেউ শুইনি বা থাকিনি। আমার স্ত্রী এত ভয় পান ও মুষড়ে পড়েন যে, আমি অনন্ত বাবুকে ফোন কোরে জানতে চাই যে সে রাত্তিরের মতন আমাদের দু'জনের স্থান তাঁর বাড়িতে হবে কি না ? তারপর কিছু চুরি গিয়েছে কি না দেখার পর থানায় হারানো জিনিসের একটা তালিকা পেশ করি।

ঘটনার দিন রাত্তিরে আপনারা যে অনন্ত বাবুর ওখানে গিয়েছিলেন একথা সুধা ও অনন্ত বাবু ছাড়া আর কী কেউ জানতেন ?

: আর কে জানবেন বলুন ? অনন্ত বাবুর ওখানে সে রাত্তিরে ব্রিজ খেলতে যাব, এটাই ঠিক হয় সন্ধ্যে নাগাদ। সেদিন অফিসের ছুটির পর আমি অনন্ত বাবুর বাড়ি যাই, তারপর তিনি সে রাত্তিরে তাঁর ওখানে তাস খেলার নিমন্ত্রণ আমাদের জানান। আমার যতদূর মনে পড়ে এ কথা সুধাকেও রাত্তির সাড়ে সাতটার আগে জানাতে পারিনি।

: আপনার বাড়িতে সুধা ছাড়া অন্য কেউ ঝি বা চাকর আছে ?

: বলরাম বলে আমার একজন রান্না করার লোক আছে। আটটার ভেতর সে রাত্তিরের রান্না শেষ কোরে বাসায় চলে যায় আবার আসে ফের ভোর ছটায়। পুলিশ তাকে দেখেছে।

: বলরামকে আপনি বিশ্বাসী মনে করেন ?

: নিঃসন্দেহে।

: আপনারা সে রাত্তিরে যে অনন্ত বাবুর বাড়ি যাবেন, একথা কী বলরাম জানতো ?

: বলরামের তো জানার কোন কারণ নেই। আমি যখন বাড়িতে যাবার কথা বলি তখন সে, সে রাত্তিরের রান্না শেষ কোরে চলে গেছে। আর তাছাড়া অনন্ত বাবুর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যখন সে রাত্তিরে তাঁর বাড়িতে আবার ফের আসার কথা ওঠে, তখন তিনি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ সেখানে ছিলেন না।

: লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা যে ত্রিশ টাকা খোয়া গেছে তার ভেতর কী ত্রিশখানাই এক টাকার নোট ছিল ?

: হ্যাঁ।

: ত্রিশখানা নোটই যে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা ছিল, তার কী কোন প্রমাণ আপনি দিতে পারেন ?

: না। কারণ ঝাঁপিতে রোজ সিকি, দুয়ানি কোরে ফেলে যখনই টাকাখানেক হয়ে দাঁড়াতো তখনই আমার স্ত্রী রেজকীগুলোকে টাকা কোরে গেঁথে ঝাঁপিতে তুলে রাখতেন।

তারপর মনোরঞ্জন বাবু হারানো জিনিস-পত্তরগুলোর বিষয়ে আর দু-চারটে প্রশ্ন কোরেই সার্জেণ্ট ক্রককে সে স্থান ত্যাগ করার জন্যে জিপ ঠিক করতে বললেন। এ তদন্ত সুরু করার আগে ডাক্তার চক্রবর্তী যে মন্তব্য কোরেছিলেন মনোরঞ্জন বাবু এখন সে-কথা বেশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন।

কোন অভাবগ্রস্ত লোক (এক কথায় বেকার) হয়তো টাকার জন্যে এ খুন করতে পারে। যে অর্থের প্রয়োজনে খুন করবে সে নিলে 'ক্যাশ' টাকাই নেবে, কিন্তু কখনই কোন জিনিসপত্তরে হাত দেবে না, কারণ এটা সকলেই জানে 'ক্যাশ' টাকা ছাড়া অন্য কিছু অপহরণ করা বিপজ্জনক—চোরাই মাল বাজারে বিক্রী করতে গেলেই যোল আনা ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

জিপের দিকে এগুতে এগুতে মনোরঞ্জন বাবু সার্জেণ্ট ক্রককে বললেন : এ হত্যার পেছনে অনেক রহস্য লুকানো আছে, সুতরাং আসল ব্যাপার বের করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

সার্জেণ্ট ক্রক বললেন : আসল ব্যাপার জানতে যে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে, তা আমারও মনে হয়েছে। বলরাম সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ? দেবকুমার বাবু যা বললেন তাতে বলরাম তখন বাড়িতেই ছিল না, আর বলরাম কিছু করলে ত্রিশ টাকাই চুরি করবে—কোনমতেই সে বাড়ির কোন জিনিসে হাত দেবে না।

: এ ব্যাপারে বলরামকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কিছু নেই বলেই আমি মনে করি।

এরপর মনোরঞ্জন বাবু বাগানের চারদিক দেখতে লাগলেন। বাগানের চারপাশ লোহার কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা। বাগানের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তিনি যেন একটা বিলেতী গাছের (Chrysanthemam) কাছে থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : মস্ত একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেছে। দেখুন, এই

লক্ষ লক্ষ লোকের
দৈনিক চাহিদা মেটায়
ব্রুক বণ্ড চা!

গাছটাকে খাড়া রাখবার জন্যে এখানে একটা লোহার খোঁটা দেওয়া ছিল। এই লোহার খোঁটাটাকেই উপড়ে নিয়ে হত্যার কাজে লাগানো হয়েছে—দেখছেন না গাছের তলটায় কতটা মাটি ওপড়ানো!

আবেগে ক্রক বলে উঠলেন: দেখছি, আপনি ঠিক বের কোরেছেন তো!

: সুধাকে এই লোহার রডটা দিয়েই হত্যা করা হয়েছে, আর হত্যার পর রডটা নিশ্চয়ই বাগানের কোথাও না কোথাও আছে।

রডটাকে তাঁরা দু'জনে মিলেই খুব খুঁজলেন, কিন্তু বাগানের ভেতর তা কোথাও দেখা গেল না। হতাশ হয়ে মনোরঞ্জন বাবু ক্রককে বললেন: একবার ভবানীপুরের মোহিনীর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

সেদিন বিকেলেই তাঁরা মোহিনীর সঙ্গে দেখা করলেন।

কথায় কথায় মনোরঞ্জন বাবু মোহিনীকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার বান্ধবী কী দেবকুমার বাবুর বাড়িতে কাজ কোরে সন্তুষ্ট ছিল?

: ও বাড়িতে কাজ কোরে ও বরাবরই খুব সন্তুষ্ট ছিল। মরার ক'দিন আগেও যখন তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে, তখনও সে ও-বাড়ির কর্তা-গিন্নির বিষয় কত সুখ্যেত করেছে।

: তার সঙ্গে কারুর কী ভালোবাসা ছিল বলে তুমি জান?

: এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারি না—তবে এটুকু বলতে পারি, সে মাঝে মাঝে কাপড়টা, টাকাটা কোথা থেকে যেন পেত। ভালোবাসার কেউ দিয়েছে বলে জিজ্ঞেস করলে মুখ চেপে ধরতো।

মুচকি হেসে মনোরঞ্জন বাবু বললেন: বুঝেছি।

ক্রক মনোরঞ্জন বাবুকে বললেন: এখানের কাজ তো শেষ হোল—চলুন এবার হারানো জিনিসগুলোর খোঁজ করি।

সারাদিন হারানো জিনিসগুলো খোঁজার কাজে কেটে শেষকালে সন্ধান মিললো। দেবকুমার মিত্রের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে পদ্মপুকুরের জলে হারানো জিনিসগুলোই শুধু পাওয়া গেল না, তাদের সঙ্গেই পাওয়া গেল লোহার সেই রডটা।

ক্রক মনোরঞ্জন বাবুকে বললেন: এখন আমাদের কাজ হোল, যে জিনিসগুলো পুকুরের জলের তলায় লুকিয়ে রেখেছে তাকে বের করা।

: দেবকুমার বাবু যে গাড়িটা ব্যবহার করেন, তা কী আপনি দেখেছেন?

: হ্যাঁ—46 মডেল।

: মডেল 46 হোক বা আর যাই হোক গাড়িটার দ্রুততা (speed) কিন্তু খুব বেশী। এখন একবার গাড়িটা নিয়ে অনন্ত বাবুর বাড়ি পর্যন্ত ঘুরে এলে হয় না?

ক্রক পুলিশ জিপের হুইল (wheel) ধরে বসলেন। কয়েক মুহূর্তের ভেতরই গাড়ি পথ ধরে ছুটে চলতে লাগলো।

এগুতে এগুতে মনোরঞ্জন বাবু ক্রককে বললেন: আরও জোরে।

মনোরঞ্জন সেন ঘড়ি খুলে সময় রাখতে লাগলেন। দু'-মিনিট দশ সেকেণ্ডের ভেতরই তাঁরা অনন্ত বাবুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলেন। পৌঁছে তিনি ক্রককে বললেন: আমরা এই দু'-মিনিট দশ সেকেণ্ডে পৌনে দু' মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি। এখন এই দু' মিনিট দশ সেকেণ্ডের সঙ্গে আর দেড় মিনিট যোগ করুন। দেড় মিনিট যোগ করতে বলছি কারণ যাবার পথটা উঁচু। এখন এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজ শেষ কোরে আবার ফিরে আসতে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের বেশী লাগে না।

কয়েক মিনিট চুপ-চাপ কাটলে পর আবার মনোরঞ্জন বাবু বললেন: রূপোর জিনিস চুরি কোরে কখনই কোন চোর পুকুরের জলে লুকিয়ে রাখবে না। জিনিসগুলো পুকুরের জলে লুকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যই হোল: চুরি ও হত্যার একটা আকার বা রূপ দেওয়া।

ক্রক বললেন: আপনি যা বলছেন তাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করি কী কোরে। বাজীর একটা হাত খেলতে খেলতে দেবকুমার বাবু কী কোরে খেলা ছেড়ে বাইরে পনেরো বা কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট কোরে আসতে পারেন?

: অনন্ত বাবুর কাছে গেলেই এখুনি এ ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে।

বাড়িতে সে সময় অনন্ত বাবু ছিলেন না, তবে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী পারুল দেবী ছিলেন।

মনোরঞ্জন বাবু শ্রীমতী পারুল দেবীকেই বললেন: আমি আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্নের জবাবের আশায় এসেছি। কিছু মনে না কোরে যদি জবাব দেন তো খুশী হব।

: আপনাদের বাড়িতে সেদিন খেলতে এসে খেলার ভেতর কী দেবকুমার বাবু একবারও ওঠেন নি?

উত্তরে পারুল দেবী বললেন: এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমায় 'স্কোর শীটস' (Score Sheets) দেখতে হয়।

'স্কোর শীট্‌স' দেখতে দেখতে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন: মনে পড়েছে। খেলতে খেলতে একবারই দেবকুমার বাবু খেলা ছেড়ে উঠে বাইরে গিয়েছিলেন। প্রথম হাত খেলার সময় তিনি পেন্সিলের সীস ভেঙে ফেলেন। আমি আর একটা পেন্সিল এনে দিতে চাইলে তিনি বললেন: পেন্সিল আনার আর দরকার নেই—আমার পকেটে ফাউণ্টেন পেন আছে।

: বাজীর দ্বিতীয় হাতে আমি ও আমার স্বামী জয়ী হই এবং তখন...(হ্যাঁ, বেশ মনে পড়েছে) দেখি দেবকুমার বাবুর হাতের আঙুল কলমের কালিতে কালি হয়ে গেছে। কারণ, কলমটা তখন 'লিক' করছিল। তাঁর স্ত্রী 'কল' পান। দেবকুমার বাবু বললেন: হাত ধুয়ে না এলে তিনি কিছুতেই খেলায় অংশ নিতে পারেন না।

মনোরঞ্জন বাবু বলে উঠলেন: আর বলতে হবে না...এরপর তিনি হাত ধুতে গিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসেন।

: হাত ধুয়ে ফিরতে তাঁর কতক্ষণ লেগেছিলো?

: তার ঘড়ি-ধরা সময় বলতে পারি না, তবে এটুকু বলতে পারি, মিনিট কুড়ি পরে তিনি ফিরেছিলেন।

: দেবকুমার বাবু যখন ফিরলেন, তখন আপনাদের কী সে হাত খেলা হয়ে গিয়েছিলো ?—আর ফিরলেন যখন, তখন দেখলেন কী তাঁর হাত ধোওয়া ?

শ্রীমতী পারুল দেবী বললেন : সেটাই মজার। কারণ, যখন তিনি হাত ধুয়ে ফিরলেন তখনও দেখলুম তাঁর হাতের আঙুলগুলোতে রয়েছে আগের মতই কালিমাখার দাগ। তাঁকে আঙুলের কালি না ওঠার কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন : কলঘরে সাবান ছিল না, শুধু জলেই যেটুকু উঠেছে।

জবাবে মনোরঞ্জন বাবু যে খুশী হয়েছেন তা বোঝা গেল, কিন্তু আসল জিনিসের পুরোপুরি হদিস তিনি তখনও পান নি।

মনোরঞ্জন বাবু ক্রককে বললেন : আমার দৃঢ় ধারণা, দেবকুমার বাবুই সুধাকে হত্যা কোরেছেন : কারণ তিনিই একমাত্র লোক যিনি তাঁর বাড়ির কোথায় কী আছে তা ভালোরকম জানেন, সুতরাং খুব অল্প সময়ের ভেতর এক জনকে হত্যা কোরে ফিরে আসা তাঁর পক্ষে এমন কিছু নয়।

: এখান থেকে বাড়ি যেতে হলে তাঁর নিজের গাড়িতে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, সুতরাং তিনি যখন গেলেন তখন এখানের কেউই কী তাঁর গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাননি ?

: গাড়ির ষ্টার্টের (start) আওয়াজ সব সময় যে শোনা যাবে তার কী কোন মানে আছে। বের হবার সময় তিনি গাড়িটা কিছু দূর নিয়ে গিয়ে তার পর এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়েছিলেন—আর ফেরার সময় দূর থেকে একটু আগেই সুইচটা অফ (switch off) কোরে নিয়ে গাড়ির 'মোমেনটামে'র (momentum) ওপর অনন্ত বাবুর বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। আমার মনে হয় তিনি এই সব পরিকল্পনা দুপুর থেকেই কোরে রেখেছিলেন।

: হত্যার কারণ কী বলে আপনার মনে হয় ?

: নিছক প্রেম-ঘটিত।

: ঘটনাটা যদি প্রেম-ঘটিতই হয় তাহলে দেবকুমার বাবুর স্ত্রী কমলা দেবী এ ব্যাপারে কিছু জানেন-ই।

: কমলা দেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেই আপনারা এ ব্যাপারটা সবিস্তারে জানতে পারবেন।

: আপনি কী বছর দুয়েকের ভেতর কখনো স্বামীকে বাড়িতে একলা রেখে বাপের বাড়ি বা আর কোথাও গিয়ে কিছুদিন ছিলেন ?

: না। তবে ছ'মাস আগে আমার একটা শক্ত রোগ হয়েছিলো, সেই সময় আমি ওঁকে রেখে পাঁচ হপ্তা হাসপাতালে গিয়েছিলুম।

মনোরঞ্জন বাবু বললেন : এবার হত্যার আসল ব্যাপারটা যে কী, তা আপনারা বেশ বুঝতে পারছেন।

একটু থেমে মনোরঞ্জন বাবু এবার শ্রীমতী কমলা দেবীকে বললেন : আচ্ছা, সেদিন রাত্তিরে আপনার স্বামী যে স্যুটটা (suit) পরে অনন্ত বাবুর বাড়ি গেছলেন সেটা কী একবার দেখাতে পারেন ?

কমলা দেবী উত্তরে বললেন : সে স্যুট বাড়ির আলনাতেই আছে।

মনোরঞ্জন বাবু তখন কমলা দেবীকে স্যুটটা আনতে বললেন। আনা হলে তিনি স্যুটটার সমস্ত অংশ ভালো ভাবে নজর দিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দেখলেন প্যান্টের একটা পায়ে বেশ খানিকটা রক্ত লাগার চিহ্ন।

ক্রক বললেন : রক্ত।

দেবকুমার বাবু কখন এসে দরজার দাঁড়িয়ে সব-কিছু লক্ষ্য করছিলেন, এতক্ষণ কারুরই তা নজরে পড়েনি। হঠাৎ মনোরঞ্জন বাবুর চোখ দেবকুমার বাবুর ওপর পড়তেই তিনি বলে উঠলেন : এই যে দেবকুমার বাবু……

কথা শেষ হবার আগেই দেবকুমার বাবু সজোরে ঘরের দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে অদৃশ্য হলেন। মনোরঞ্জন বাবুও সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলে যখন মনোরঞ্জন বাবু দেবকুমার বাবুর কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন তার দু' সেকেণ্ড আগেই দেবকুমার বাবু পিস্তলের গুলী দিয়ে নিজেই নিজের কপাল বিদ্ধ কোরেছেন।

ক্রক দেবকুমার বাবুর নাড়ি স্পর্শ কোরে বললেন : প্রাণ নেই, মৃত।

কারোর মুখে আর কোন কথা নেই—সকলেই স্তব্ধ। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভংগ কোরে মনোরঞ্জন সেন বললেন : মৃত্যুই দেব বাবুর স্বীকারোক্তি। যান মি: ক্রক আপনি ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স ও থানায় খবর দিন আর আমি ততক্ষণ হতভাগ্য ভদ্রমহিলাকে দেখি।*

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া।

আলোর আলো

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবার চোখে কালো তুমি—আমার চোখে ভাল,
সবার চোখে আঁধার তুমি—আমার চোখে আলো।
সবার কাণে বেসুরো বাজো—সবার কাণে ছন্দহীন,
আমার কাণে ছন্দময়ী—সুরের রাণী, সুরের বীণ।
সবার চোখে নিরাশা তুমি আমার চোখে আশা,
তোমায় হেরি নীরব সবাই আমার কণ্ঠে ভাষা।

লোকের চোখে দীপ্তিহীনা—আমার চোখে দীপ্তিময়ী,
যতই হেরি অবাক হ'য়ে তোমার পানে তাকিয়ে রই।
ও আমার ছায়া-ছানা, রঙিনী মোর আইভিলতা,
আবেগ আমার কলসে ওঠে কইলে তোমার সঙ্গে কথা।
হৃদয়পদ্মে রূপের তোমার জানাই লক্ষ নমস্কার,
পরাণভরে স্মরণ করি তাই তো তোমায় বারংবার।

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর কোন দেশেরই দাবার চারটে রাজা নেই, কোন-কালেই ছিল না। তা হলে 'চতুরাজী' বা 'চার রাজা' বলে যে খেলা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, তার খেলার ধরণ আজকের তাস খেলার ধরণ থেকে ভিন্ন হলেও—সে যে এক রকম তাস খেলা সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। এবং এই তাস খেলার প্রচলন যে, ভারতবর্ষেই সব থেকে আগে ছিল এবং এখান থেকে আরব দেশের মারফৎ ইয়োরোপে প্রসারিত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ করবার যে কোন কারণ নেই তা গত সংখ্যায় কিছু বলেছি। বাকিটুকু এই সংখ্যায় নিবেদন করছি।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে তিন জোড়া পুরানো তাস আছে। তার মধ্যে এক জোড়া তাসের দশটি স্যুট, অপর দুটির আটটি করে স্যুট। প্রত্যেক স্যুটে বারোখানি করে তাস আছে। দু'খানি করে ছবি-তাস (coat cards, honour cards) এবং বাকি দশখানি ইংরেজী তাসের মত এক (টেক্কা) থেকে দশ পর্য্যন্ত চিহ্নিত। প্রত্যেক জোড়ার তাসই আকারে গোল এবং ব্যাসে ২¼″ থেকে ২⅞″ ইঞ্চি। তাসগুলি হাতে নিলে প্রথমেই মনে হবে কাঠের তৈরি, কিন্তু আসলে ক্যাম্বিসের (canvas) উপর কড়া করে বার্ণিশ লাগানো বলেই ও রকম মনে হয়। তাসের উপরকার ছবি এবং চিহ্নগুলি হাতে আঁকা। মিঃ উইলিয়াম এণ্ড্ চ্যাটো বলেন: এই তাস দেখে তাঁর মনে হয় যে, তাস তৈরির ব্যবসা হিন্দুস্তানে জীবিকা হিসাবে কোন এক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল।

এই তিন জোড়া তাসের এক জোড়া (আট-স্যুটের তাসের এক জোড়া) ১৮১৫ সালে গুন্টুরের (Guntoor) এক ব্রাহ্মণ ক্যাপ্টেন ডি. ক্রমলিন স্মিথকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন: এ তাস জোড়া তাঁদের পরিবারে বংশপরম্পরায় স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে এবং তাঁর ধারণা এই তাস জোড়ার বয়স হাজার বছরেরও বেশী। তবে তিনি জানতেন না, এই তাসের সেট পুরো ছিল কি না কিংবা এতে আরো দুটো স্যুট ছিল কি না। ঐ তাস তিনি যখন উপহার দেন তখনকার চলতি তাসের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য ছিল না এবং কেমন করে এ তাস নিয়ে খেলতে হয় তাও তিনি জানতেন না বা এমন কোন পুঁথি তিনি পান নি বা দেখেন নি যাতে এই তাস খেলার পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

এই তাস জোড়ায় মোট ৯৬ খানা তাস আসে—১৬ খানি ছবি-তাস, বাকিগুলি সাধারণ (এক থেকে দশ চিহ্নিত)। প্রত্যেক স্যুটে রাজা হাতীর পিঠে আসীন। ছয়টি স্যুটে উজীর আছেন ঘোড়ার পিঠে, বাকি দু'টি স্যুটের নীল রঙের যে স্যুটে একটি লাল রঙের কৌটার মধ্যে হলদে আছে—তাতে উজীর আছেন বাঘের পিঠে এবং সাদা রঙের স্যুটে যাতে একটি দানবীয় মুখ আছে তাতে উজীর আছেন ষাঁড়ের পিঠে।

দ্বিতীয় আট-স্যুটওয়ালা তাসে রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। পাঁচটি স্যুটে উজীর আছেন ঘোড়ার পিঠে। বাকি তিনটির একটিতে উজীর আছেন হাতীর উপর, একটিতে আছেন এক কুঁজ-ওয়ালা উটের উপর এবং বাকিটিতে আছেন ষাঁড়ের উপর। যদিও প্রথম আট-স্যুটওয়ালা তাসের প্রতীকের সঙ্গে দ্বিতীয় আট-স্যুটের তাসের প্রতীকের কিছু পার্থক্য আছে, তা হলেও বেশ বোঝা যায় যে, এই দুই জোড়া তাস দিয়ে একই খেলা সম্ভব। এই দুই আট-স্যুটের তাস হল এই রকম:

১

	রং	চিহ্ন
(১)	শেওলা	একটি বাটিতে আনারসের মত একটি ফল বসানো আছে
(২)	কালো	মাঝখানে সাদাওয়ালা একটি লাল কৌটা
(৩)	বাদামী	এক খানা তরোয়াল
(৪)	সাদা	একটি দানবীয় মুখ
(৫)	সবুজ	হাতলহীন ছাতার মত একটি জিনিষ
(৬)	নীল	মাঝখানে হলদেওয়ালা একটি লাল কৌটা
(৭)	লাল	বিন্দুবিশিষ্ট সামান্তরিক
(৮)	হলদে	ডিম্বাকার প্রতীক

২

	রং	চিহ্ন
(১)	হলদে	একটি ফুল
(২)	কালো	মাঝখানে সাদা-ওয়ালা একটি লাল কৌটা
(৩)	লাল	একখানা তরোয়াল
(৪)	লাল	মানুষের মাথা
(৫)	বাদামী	অস্পষ্ট (কি চিহ্ন বুঝা যায় না)
(৬)	সবুজ	একটি গোলাকার কৌটা
(৭)	সবুজ	বিন্দুবিশিষ্ট সামান্তরিক
(৮)	হলদে	অস্পষ্ট (কি চিহ্ন বুঝা যায় না)

দশ স্যুটওয়ালা তাস হচ্ছে এই রকম:

	রং	চিহ্ন
(১)	লাল	একটি মাছ
(২)	হলদে	একটি কূর্ম্ম
(৩)	সোনালী	একটি শূকর
(৪)	সবুজ	একটি সিংহ
(৫)	বাদামী-সবুজ	একটি মানুষের মাথা
(৬)	লাল	একটি কুঠার
(৭)	বাদামী-সবুজ	একটি বানর
(৮)	হাল্কা বাদামী	একটি ছাগল
(৯)	ইটলি লাল	একটি ছাতা
(১০)	সবুজ	একটি সাদা ঘোড়া, জিন এবং লাগাম লাগানো।

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিকে দশ-স্যুটওয়ালা তাসজোড়া উপহার দিয়েছিলেন স্যর জন ম্যালকম (Sir John Malcolm). এই তাসের প্রত্যেক স্যুটে বারোখানি করে তাস আছে। এবং প্রত্যেক তাসে হিন্দুদের দশ অবতারের এক একটি অবতারের প্রতীক আছে। এখানে প্রত্যেক স্যুটের রাজা হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু, সিংহাসনে বসে আছেন। কেবল দু'টি স্যুটে সঙ্গে আছেন একটি নারী। উজীর আছেন সাদা ঘোড়ার পিঠে।

দশ অবতারের বর্ণনা থেকে এই দশ-স্যুটের তাসের উপরের প্রতীকগুলির ব্যাখ্যা পরিষ্কার হবে। কেবল আট এবং ন'নম্বরের স্যুটের ছবির সঙ্গে (ছাগল এবং ছাতা) হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত অষ্টম এবং নবম অবতারের সঠিক মিল নেই। তা হয়ত নেই, কিন্তু এক জন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন: "as truth is more strange than fiction, one of the packets consisting of Ten Suits (উপরে বর্ণিত স্যুট নয়, অন্য আর একটি) certainly does represent the Ten Avatars or incarnations of the Vistnou or Vishnava, sect..The suits are: (1) The Fish, (2) The Tortoise, (3) The Boar, (4) The Lion, (5) The Monkey, (6) The Hatchet, (7) The Umbrella (or Bow), (8) The Goat, (9) The Boodh, (10) The Horse. The Dwarf of the 5th Avatar is substituted by the Monkey; The Bow and Arrows of the 7th by the Chattashal or Umbrella, which gives precisely the same outline; and the Goat there, as often elsewhere, takes the place of the Plough. The Parallelogram, Sword, Flower and Vase, answer to the Carreau, Espada, Club, and Copa of the European suits: The Barrel (?), The Garland and two Kinds of Chakra (quoit) complete the set." হিন্দুদের দশ অবতার হচ্ছেন: ১ মৎস্য, ২ কূর্ম, ৩ বরাহ, ৪ নরসিংহ, ৫ বামন, ৬ পরশুরাম, ৭ শ্রীরামচন্দ্র, ৮ শ্রীকৃষ্ণ, ৯ বুদ্ধ, ১০ কল্কী।

অনেকের মতে দশ অবতার-চিহ্নিত তাস সাধারণত: খেলার জন্ম ব্যবহৃত হত না এবং এই মতের সমর্থনে ও-দেশের এক জন বিশেষজ্ঞ বলেন: The marks in the pack consisting of ten suits, representing the incarnations of Vichnow, I am of opinion that those cards are not such as either are or were generally used for the purpose of gaming, but are to be classed with those emblematic cards which have, at different periods, being devised in Europe for the purpose of insinuating knowledge into the minds of ingenious youth by way of pastime."

Calcutta Magazine (1815)-এ Hindostanee Cards নামে প্রকাশিত লেখার বিবরণের সঙ্গে ফরাসী খেলা l'Ombre a trois—three handed ombre খেলার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষের খেলায় আটটি স্যুট আছে এবং ছ'জন বা তিন জনে খেলতো। যখন তিন জনে খেলা হত তখন ৪ খানা করে তাস দেওয়া হত। ইয়োরোপের চার-স্যুটের খেলায় তাস থাকে ৪০ খানা, দশ, নয় এবং আটগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। এখানে তাস দেওয়া হয় তিনখানা করে। Ombre খেলায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন Spadillo, Basto, Matador, Punto, ইত্যাদি তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ইয়োরোপের দেশগুলি স্পেন থেকে এই খেলা শিখেছে। এবং একথা এখন স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আরব থেকে তাসখেলা স্পেনেই প্রথম যায়।

আট-স্যুটের ভারতীয় তাসগুলির পরস্পরের মধ্যে অল্প কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও সাধারণ ভাবে এই তাসের সঙ্গে ইয়োরোপের পুরনো অনেক তাসের সঙ্গে যে মিল আছে একথা ইয়োরোপের প্রাচীন যে তাসের নমুনা এখনও পাওয়া যায় তার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে * প্রভেদের কারণ হিসাবে

* "In the early European Cards, which have cups, swords, pieces of money and clubs or maces for the marks of the four suits, the sword and piece of money of the Hindostanee cards are readily identified, and if we are to suppose that in these cards certain emblems of Vichnou were formerly represented—but which are not to be found on the ordinary Playing Cards or on those displaying the ten incarnations of Vichnou—it would not be difficult to account for the cups and clubs and maces; for according to Dr. Frederick Creutzer, the mace or the club is frequently to be seen in one of the hands of Vichnou; and Count von Hammer-Purgstal remarks that "the sword, the club and the cup are frequent emblems in the Eastern Ritual. As the marks in European suits, cups or chalices, swords, money and clubs, have been supposed to represent the four principal classes of men in European states, to wit, Churchmen, Swordsmen or feudal nobility, Moniedmen, merchants or traders; and Clubmen, workmen or labourers; —it is just as easy to run a parallel in the form of superior suits of one of the pack of Hindostanee Cards.

The pack is composed of ninety six cards, divided into eight suits. In each suit are

বলা যায় যে, এক দেশের প্রতীকমূলক কিংবা ধর্মবিষয়ক কোন জিনিষ যখন অন্য দেশে বাহিত হয় তখন সব সময় যে দেশ থেকে এগুলি নিয়ে যাওয়া হয়, সেই দেশে ঐ জিনিষ বা প্রতীকগুলি যে রূপে এবং ব্যাখ্যায় প্রচলিত থাকে, ঠিক সেই রূপ এবং ব্যাখ্যা যে দেশে বাহিত হয় সে দেশের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। ভারতীয় তাসের প্রতীকের সঙ্গে ইয়োরোপে প্রচলিত তাসের প্রতীকের এবং ব্যাখ্যার পার্থক্য সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। দুই দেশের তাসের অনেক প্রতীকের মধ্যে বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকলেও তাদের অর্থভেদের মূল কারণও এই।

ডাঃ হাণ্ট সম্পাদিত 'Dictionary, Hindostanee and English'-এ 'তাজ' শব্দের অধীনে উপরে বর্ণিত আট-স্যুটওয়ালা

---

two court cards, the King and the Wuzeer. The common cards, like those of Europe, bear the spots from which the suits are named, and are ten in number. Four suits are named, superior (Beshbur) and four the inferior (Kumbur).

Superior suits

Taj-(a crown)
Soofed-(white, i.e. a silver coin fig. the moon)
Shumsher-(a sabre)
Gholam-(a slave)

Inferior suits

Chung-(a harp)
Soorkh-(red, i. e. gold coin, fig. the sun)
Burat (a royal diploma, assignment)
Quimash-(merchandise)]

"There may be found *Taj*, a crown, royalty; *soofed*, silver money, merchants; *Shumsher*, a sword, fightingmen, seapoys; and *Gholam*, a slave, the coolies both of hill and plain. It may not be unnecessary here to observe that the four great historical castes of the Hindoos are, (1) Brahmins, priests, (2) Chetryas, soldiers, (3) Vaisyas, tradesmen and artificers; and (4) Sudras, slaves and the lowest class of labourers."

"The four divisions of Hindoos, viz, the priests, soldiers, merchants, and labourers, appear to have existed in every human society, at a certain stage of civilization; but in India alone have they been maintained for *several thousand years* with prescriptive vigour." (Sir John Malcolm—Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. i. p. 65, 1824)

তাসের বর্ণনা আছে। Calcutta Magazine-এ বর্ণিত বিবরণে বলা হয়েছে যে, কোন এক সুলতানের মহিষী স্বামীর দাড়ি ছেঁড়ার বদ অভ্যাস দূর করবার জন্য এই খেলার উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এর নাম ছিল গুঞ্জিফু (Gunjeefu)। গুঞ্জিফু কথাটি ফার্সী। কিন্তু পূর্ব্বে আলোচিত বৃত্তান্ত এবং ডাঃ হাণ্টের আভিধানিক শব্দ 'তাজ' থেকে একথা ধরে নেওয়া যায় যে, 'তাজ' কথাটির অর্থ হচ্ছে মুকুট, এবং আমরা দেখেছি বহু জিনিষে (বিশেষ করে মুদ্রায়) রাজার প্রতীক হিসাবে মুকুট ব্যবহৃত হয় এবং হয়েছে—সুতরাং হিন্দুদের তাসের সঙ্গে মুকুটের যে সম্বন্ধের কথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি (রাজারা এই খেলা খেলতেন) তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে তাস খেলা যে Four Kings নামে প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

একটি ব্যাপার হয়ত আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তাস আরব কর্ত্তৃক ইয়োরোপে প্রসারিত হলেও, (স্পেনের মারফৎ) আরব্যোপন্যাসের কোন কাহিনীতেই তাসের কোন উল্লেখ নেই। অনেকে বলেন, যখন এই কাহিনীগুলি সঙ্কলিত হয় তখন তাস খেলা আরবে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

অনেকে আবার বলেন, ইয়োরোপে প্রচলিত প্রাচীন তাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক তাসের মিল আছে বলেই একথা নিশ্চিত ভাবে কেমন করে বলা যাবে যে, তাসের জন্ম পূর্ব্বদেশে (ভারতবর্ষে)? এমনও ত' হতে পারে যে তাস ইয়োরোপ থেকে পূর্ব্বে এসেছে। এর উত্তরে উদ্ধৃত করছি : "Card playing appears to be a very common amusement in Hindostan. I could remind or perhaps inform the fashionable gamesters of St. James's Street, that before England ever saw a dice-box, many a main has been won and lost under a palm-tree, in Malacca, by the half-naked Malays, with wooden and painted dice; and that he could not pass through a bazaar in this Country (Hindostan) without seeing many parties playing with cards, most cheaply supplied to them by leaves of the cocoa-nut or palm-tree, dried, and their distinctive characters traced with an iron style....At the corner of every street you may see the Gentoo-beares gambling over chalked-out squares, with small stones for men, and with wooden dice; or coolies playing with Cards of the palm-leaf. Nay, in a Pagoda under the very shadow of the idol, I have seen Brahmins playing with regular packs of Chinese Cards."—Fireside Travellers at Home.

চীন দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে তাস খেলা প্রচলিত ছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত চীনা অভিধান—Ching-tsze-tung-এ বর্ণিত আছে যে, ১১২০ খৃষ্টাব্দে Seun-po-র রাজত্বের

সময় Teen-tsze-pae (তাস) প্রথম আবিষ্কৃত হয় কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে Kaou-tsung-এর রাজত্বকালে। প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে—Seun-po-র অসংখ্য রক্ষিতাদের চিত্তবিনোদনের জন্য তাস খেলা আবিষ্কৃত হয়। M. Abel Remusat বোধ হয় চীনা অভিধানের বর্ণনার উপর নির্ভর করেই বলেছিলেন যে, চীনারা ১১২০ খৃষ্টাব্দে তাস আবিষ্কার করে। Mons. Leber কিন্তু বলেন, তাসের জন্মস্থান ভারতবর্ষেই। ইয়োরোপের মত চীনারাও ভারতীয় তাসের আকৃতি এবং প্রতীকের কিছু অদল-বদল করে এবং নতুন ধরণের খেলা চালু করে। চীনে তাসের সাধারণ নাম হচ্ছে Che-pae যার শব্দগত অর্থ হচ্ছে কাগজের টিকিট (paper-tickets) কিন্তু প্রথমে নাকি বলা হত Ya-pae অর্থাৎ হাড়ের টিকিট। চীনে ভিন্ন নামে বহু রকমের তাস প্রচলিত ছিল এবং তার মধ্যে একটির নাম হচ্ছে—Keu-ma-paou, যা হচ্ছে চীনে দাবার নাম এবং যাতে রথ, ঘোড়া এবং বন্দুকের প্রতীক আছে। এই অধ্যায়ের সুরুতে আমি বলেছিলাম যে, তাস খেলা দাবা থেকেই উৎসারিত রয়েছে, তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে এই Keu-ma-paou.

তাস ইয়োরোপে প্রথম প্রচলিত হয় নি এবং তাস খেলা ইউরোপের আবিষ্কার নয়, এই কথা বলবার জন্যই উপরের এত কথা বলতে হল। তাস ভারতবর্ষের খেলা।

কিন্তু আমার এই নিবন্ধের মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে জুয়া আপনি খেলুন না, শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে হারতেই হবে। তাস খেলার উদ্দেশ্য যখন কেবলমাত্র অবসর বিনোদন তখন তা মোটেই দোষণীয় নয়, একথা আমি পূর্ব্বে বলেছি—কিন্তু তাস যখন জুয়ার মাধ্যম হয় তখন তা মারাত্মক। জুয়া খেললে মানুষের নৈতিক চরিত্র যে নষ্ট হয় একথা বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী নর-নারীকে বিশ্বাস করানো কঠিন। তাঁরা বলেন, আনন্দলাভের জন্য যা কিছুই করা যাক না কেন, তাতে কোন অন্যায় হয় না। অর্থাৎ এই আনন্দলাভ—তা যে কোন প্রকারেই হোক, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এখন দেখতে হবে, কার কিসে কি ধরণের আনন্দ লাভ হয়—কিন্তু এ কথাও ত' সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে যে, আমাকে আনন্দ দেবার জন্য আর এক জন নিরানন্দে না ভোগে? সমাজে বাস করে আমার যদি এই কাম্যই হয় যে সকল আনন্দ কেবল আমারই হোক, তা হ'লে আমার মত লোক সমাজের অপরের কাছে কতখানি কাম্য একথা পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলে যে জবাব পাব, তাতে আমি যদি মানুষ হই তা হলে আর যেখানেই হোক, সমাজে অন্ততঃ তার পরে মুখ দেখাতে লজ্জা পাব।

অবসর বিনোদনের জন্য তাস খেলাতেও অনেকের আপত্তি আছে। তাঁরা বলেন, আমাদের আয়ু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং জীবনের অমূল্য সময় এমনি ভাবে নষ্ট না করে যাতে দেশের, দশের, সমাজের উপকার হয় এমন কাজ করো তাতেই আনন্দ পাবে। নীতির দিক থেকে, যুক্তির দিক থেকে এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই—কিন্তু তবুও কিছু বলবার আছে বৈ কি! এ কথা ত অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের জীবনে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে। সারাদিন কাজ করে রাত্রে একান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমতে যাওয়া—পরদিন ভোর থেকে আবার সেই ঘুম না-আসা পর্য্যন্ত কাজ করা, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। নিজেকে কাজ করার উপযুক্ত রাখার জন্যেই তার জীবনে বৈচিত্র্য চাই, চিত্তবিনোদনের অবসর চাই, উপলক্ষ্য চাই—নইলে একঘেয়ে কাজ করতে করতে মানুষ এক দিন বিকল পুরনো যন্ত্রের মত অকেজো হয়ে পড়বে, মানুষ বলে তার কোন পরিচয় থাকবে না। কিন্তু চিত্তবিনোদনের নামে মানুষ পাপকে, অন্যায় আচরণকে আশ্রয় করেছে বলেই আজকের মানুষের জীবনে কোন শান্তি নেই, অবসরও নেই। সর্ব্বনাশ হয়েছে এইখানে। এবং এ কথাও ত ঠিক যে, মানুষের জীবন কেবলমাত্র আহার-বিহার আর ব্যসনের মাধ্যম নয়। মানুষের জীবনের অর্থ এর চেয়ে ব্যাপক।

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই পরিশ্রম করতে হয় এবং হবে কিন্তু কেবলমাত্র জীবন-ধারণ মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হলে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানের জন্ম হত না কোন কালেই। অবসর বিনোদনের মুহূর্ত্তে শিল্পের জন্ম হয়েছে, সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে, দেহের বিভিন্ন ছন্দ-ভঙ্গিমায় রূপ নিয়েছে মনের কথা নৃত্যের রূপে। অনুশীলন আর পরীক্ষা নিরীক্ষায় জন্ম নিয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান। কিন্তু জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে ব'লেই তাতেই মানুষের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হবে এবং অবসর বিনোদনের অধিকার থাকবে না সাধারণ মানুষের এমন কথা বলা যেমন অন্যায়, তেমনি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নেই বলে কিংবা কম প্রয়োজন আছে বলে সমস্ত জীবনকে ব্যসন আর বিহারের মধ্যে প্রসারিত করা ততোধিক অন্যায় ত' বটেই; উপরন্তু সমাজ-বিরোধী আচরণ। [ক্রমশঃ।

বিটোফেনের প্রথম প্রেম

গাইয়ে-বাজিয়েদের জগতের কথা বাদ দেই, তার বাইরেও বিটোফেনের নাম শোনেন নি এমন ব্যক্তির সংখ্যা বিরল। কিন্তু শিল্পীর জীবন-কথা জানবার মত সুযোগ হয়তো হয়নি অনেকেরই। প্রথম প্রেমের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখি, বিটোফেন ভালবেসেছেন জীবনে অসংখ্য বার অনেক জনকে। জীবনের পথ চলতে চলতে কত রাজার ঘরণী, ধনীর দুলালী, দরিদ্রের কন্যা তাঁকে ভালবেসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ঐ যে বলে না, 'প্রথম জীবনে যে দিয়েছে মনে দোলা, তারে তো যায় না ভোলা।' তাই।

১৮০৫ সালের গোড়ার দিকের কথা। বসন্তের সুরু সবে। বিটোফেন তখন ভিয়েনার ভাবলিভ নামে এক গণ্ডগ্রামে বাস করছেন। মাথায় ঘুরছে Violin Concerto, দি ফোর্থ সিমফনি আর Leonora No. 3র গৎগুলো। অঞ্চলের সকলেই জানে, বিটোফেন রয়েছে সেখানে। বলে, ম্যাড মিউজিসিয়ান ফ্রম ভিয়েনা। নিজের বাড়ীর সামনেই থাকতেন Flohberger বলে এক পরিবার। পরিবারে শুধু কর্ত্তা আর তার কন্যা। কন্যার নাম লিসা। কর্ত্তা মাতাল, দুশ্চরিত্র। কন্যা সুন্দরী অতএব···।

দিনের পর দিন সমানে বিটোফেন হাজিরা দিয়েছেন সেই গৃহে। ছলে-কৌশলে পেতে চেষ্টা করেছেন লিসার ভালবাসা। কিন্তু চিত্রটি বিয়োগান্ত। লিসা সর্ব্বদাই অস্বীকার করেছে বিটোফেনের ভালবাসা। সারা জীবন এই ক্ষত বিটোফেন বুকে পুষে নিয়ে বেড়িয়েছেন।

নীলাঞ্জন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

ছোট একটা বৌভাতের আয়োজন সমরেশকে করতেই হয়েছিল। পল্লীসমাজে সেটা আবশ্যিক। নববধূর হাতে সমাজ অন্নগ্রহণ না করা পর্যন্ত বধূ সমাজে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় না।

কিন্তু এই উপলক্ষ্যে সমরেশ যে আয়োজন করেছিলেন তা 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র। দু'শো জনের ভোজ্য ফেলে-ছড়িয়ে-নষ্ট করে একশো জনে উপভোগ করার যে রীতি প্রচলিত আছে, সমরেশের বাড়িতে তার ব্যতিক্রম হল।

লোকে খেলে প্রচুর। নানা জায়গা থেকে নানা বিখ্যাত সমরেশ অনেক চেষ্টা, যত্ন এবং ব্যয় করে এনেছিলেন। সে জিনিস এদিকে অনেকে চোখেই হয়তো দেখেনি। কোনো ও ছিল না। যারা উপস্থিত তারা পরিতৃপ্তি সহকারে খেলে, পরিবারের অনুপস্থিত ব্যক্তি এমন কি অভ্যাসন্ন জনটির জন্যেও বাঁধা বেঁধে নিয়ে গেল! সমরেশ প্রত্যেকটি পাতের সামনে নিজে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেককে আকণ্ঠ ভোজন করালেন। তাঁর সেই শান্ত, গম্ভীর এবং বিনীত মূর্তির দিকে চেয়ে অনেকে এক মুহূর্তের জন্যে খাওয়া ভুলে গেল। কিন্তু তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে এতটুকু জিনিস নষ্ট হতে পেল না।

এতে কেউ খুশি হল, কেউ বা হল না। হরসুন্দরী নিজেই তো খুশি হলেন না। ওঁদের পরস্পরের সম্বন্ধে ভিতরের মনোভাব যাই হোক, বাইরে সামাজিকতার দিক থেকে কোনো ত্রুটি হরসুন্দরী পছন্দ করতেন না। সুতরাং তিনি নিজে ভোরেই স্নান এবং পূজার্চনা সেরে কর্মবাড়িতে উপস্থিত হলেন। এবং একটু বেলা হতেই মেয়েরা এবং আরও একটু বেলা হতে শৈলেশ এসে উপস্থিত হলেন।

অন্তরাল থেকে খাওয়ানো-দাওয়ানো লক্ষ্য করে হরসুন্দরী উদ্বিগ্ন ভাবে সমরেশকে ডেকে পাঠালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা, নিমন্ত্রিতদের পেট ভরেছে তো?

বিস্মিত ভাবে সমরেশ উত্তর দিলেন, পেট ভরবে না কেন? প্রত্যেককে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছি। এ কথা মনে হল কেন?

—কারও পাতে কিছু পড়ে রইল না কি না, তাই।

সমরেশের দৃঢ় সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা খেলে গেল। বললেন, আমি অপচয় পছন্দ করি না।

এবারে হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, ওকে অপচয় বলে না বাবা! ওতেই কৃতীর পরিচয়।

কথাটা শুনে সমরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিমাতার দিকে এক বার চাইলেন। হরসুন্দরী কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বলে চললেন—তা সে যাই হোক, এখনও কত লোক খেতে রইল?

—আর বোধ হয় খুব বেশি লোক নেই।

হরসুন্দরী বিস্মিত ভাবে বললেন, সে কি! খুব বেশি লোক খেলে বলে তো মনে হল না?

—শতখানেক হবে।

—মোটে! গ্রাম ষোলআনা কি বলা হয়নি?

—না। বেশি ধুমধাম করতে ইচ্ছা হল না। সমরেশ যেন লজ্জিত ভাবে মুখ নামালে।

কিন্তু তা লক্ষ্য করেও হরসুন্দরীর মুখ প্রসন্ন হল না। বললেন, তা বললে কি হয় বাবা! যে-বাড়ির যা দস্তুর। আমাদের বাড়িতে নিতান্ত তুচ্ছ ক্রিয়া-কর্মেও গ্রাম ষোলোআনা নিমন্ত্রণ করা হয়। এতটুকু বয়সে এ বাড়িতে এসেছি। তখন থেকে তাই দেখে আসছি। কাজটা ভালো করনি বাবা!

হরসুন্দরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। পরক্ষণেই যেন সমস্ত অপ্রসন্নতা ঝেড়ে ফেলে বললেন, যাক গে, সে যা হবার হয়ে গেছে কিন্তু হাড়ি-বাগদী-মুচি এদের বলা হয়েছে তো?

সমরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন: তাদেরও বলতে হয় নাকি?

এবারে হরসুন্দরী যেন রেগেই গেলেন। কিন্তু তবু অপ্রসন্ন মুখে যথাসাধ্য হাসি টেনে বললেন, হায় আমার পোড়া কপাল নেমন্তন্নর ফর্দ কে করেছে শুনি? ইন্দির পণ্ডিত?

সমরেশ সাড়া দিতে পারলে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

হরসুন্দরী বললেন, কিন্তু পণ্ডিতেরও তো দোষ নয়। ফর্দে ওদের নাম থাকে না। সবাই জানে, কাজে-কর্মে ওদের নেমন্তন্ন থাকবেই। তোমারও জানা উচিত ছিল। এখন করা যায় কি চাল-ডাল তরি-তরকারী আছে? না, যেমন নিক্তির ওজনে খাওয়ালে, আয়োজনও তেমনি নিক্তির ওজনে করেছ?

—কত লোক হবে?

—ধর শ'দুই।

সমরেশ হিসাব করে বললেন, শ'দুই লোকের বোধ হয়—

বাধা দিয়ে হরসুন্দরী বললেন, বুঝতে পেরেছি। ওরে কে আছিস, ম্যানেজার বাবুকে একবার খবর দে তো।

রামপ্রসাদ তখনই এসে দাঁড়ালেন।

হরসুন্দরী বললেন, ভারী একটু ভুল হয়ে গেছে ম্যানেজার বাবু! আমার হাড়ি-বাগদী প্রজাদের বলা হয়নি। আমার ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র এনে রেঁধে, খাইয়ে দিয়ে তবে আপনি যাবেন।

তার পর একটা আশ্চর্য ভঙ্গীতে হেসে সমরেশকে বললেন ওদের খাওয়ার সময় তুমি যেন বাবা, সামনে গিয়ে দাঁড়িও না। বাবারা আমার খায় বেশি। তুমি সামনে থাকলে হয়তো

খুকীর নতুন ফ্রক
ও, মা, এ যে নতুন ফ্রক!
হুঁ, দেখ খুকী যেন খারাপ না হ'য়ে যায়।
স্কুলে যাচ্ছে
স্কুলে
এস আমরা খেলি!
না, আমার নতুন ফ্রক খারাপ হ'য়ে যাবে যে।
তিন মাস পরে
তোমার ফ্রক যে সব ফেঁসে গেছে, খুকী!
আমি ত সাবধান ছিলাম মা!
আমিই কাচি।
মাপ করবেন,...
সানলাইট সাবানে কাপড় না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে হয়ে যায়।
মা:
উনি ঠিকই বলেছেন! এখন আমি সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনায় কাচি, আমার কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে, তাতে পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
Rs 10,000 Reward!
GUARANTEED
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে

তাদের পেট ভরবে না। ওরা খালি পেটে বাড়ি ফিরলে আমি ভয়ানক কষ্ট পাব।

রামপ্রসাদ নিঃশব্দে উভয়ের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। হরসুন্দরী বিজয়-গর্বে বোধ করি ভাঁড়ারের দিকেই পা বাড়ালেন।

শান্ত কণ্ঠে সমরেশ ডাকলেন, মা!

বহুকাল পরে সমরেশ এই প্রথম হরসুন্দরীকে মা বলে ডাকলেন।

হরসুন্দরী ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবি?

সমরেশ বললেন, শৈলর খাওয়া হয়েছে? না হয়ে থাকলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসতাম।

—সে তো দিনে খায় না বাবা!

—একেবারেই না?

—কোনো দিন হয়তো সামান্য ফল-টল খায়। কি মোটা হয়ে গেছে দেখিস নি?

সমরেশ একটু চিন্তা করে বললে, তাহলে রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া যাবে?

—রাত্রের কথা রাত্রে হবে! এখন তুই আমার সঙ্গে আয় দিকিনি! আমার ভাঁড়ারের এক পাশেই তোর জন্যে জায়গা করে দিচ্ছি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সকাল থেকে দাঁতে দানাটিও কাটিসনি।

তিনি চলে গেলেন। সমরেশ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে পরাজিত যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে বোধ করি ভাঁড়ারের দিকেই গেল।

যে হরসুন্দরীকে সমরেশের মনে আছে, এক মুহূর্তেই সমরেশ বুঝলেন, এ সে হরসুন্দরী নয়। তখন সমরেশ বালক মাত্র। মানুষের সম্বন্ধে তার কতটুকুই বা জ্ঞান! হরসুন্দরীও তখন বধূমাত্র। তাঁর মাথা এবং মন উভয়ই গুণ্ঠনাবৃত। তখনও তাঁর চরিত্র পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

এখন বুঝলেন, হরসুন্দরী সাধারণ স্ত্রীলোক নন। তাঁর মন সাধারণ পুরুষের চেয়ে বলিষ্ঠ, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণতর। কত সহজে হরসুন্দরী তাকে হারিয়ে দিয়ে গেলেন!

ওঁর বিহ্বল-বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে হরসুন্দরী তার মনের অবস্থা অনুমান করলেন। মুখে কিছুই প্রকাশ না করলেও তিনি যে মনে মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন, তা বলাই বাহুল্য। এবং সেই আত্মপ্রসাদের ছাপ যজ্ঞবাড়ির অসংখ্য কাজের মধ্যেও তাঁর প্রত্যেকটি দৃপ্ত পদক্ষেপে, স্পর্ধিত আচরণে এবং সুমিষ্ট বাক্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

হরসুন্দরীর কাজ যখন মিটল তখন রাত্রি ন'টার কম নয়। ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবিটা নিয়ে কি করবেন এক মুহূর্ত নিঃশব্দে যেন তাই ভাবলেন। শেষে নিজের আঁচলেই বেঁধে সমরেশের এক মাত্র ভৃত্য কেষ্টর দিকে চাইলেন।

কেষ্ট হারিকেনটা নিয়ে ওঁরই অদূরে দাঁড়িয়েছিল। গিন্নিমার ইশারাতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

শান্ত কণ্ঠে হরসুন্দরী বললেন, তোর মনিবকে বলিস চাবিটা আমার কাছেই রইল। ভাঁড়ারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে আমাকে কাল একবার আসতে হবে।

কেষ্টর বলার কিছু ছিল না। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে শুধু।

এমন সময় অরুন্ধতী নম্রপদে সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে ফুলশয্যার বেশ। ডান হাতে একটি শ্বেতপাথরের গেলাসে সরবৎ। সুন্দরী না হলেও ভারি মিষ্টি মুখ।

সেই মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্নকণ্ঠে হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, কি মা?

অস্ফুট কণ্ঠে অরুন্ধতী উত্তর দিলে, আপনার সরবৎ এনেছি।

—সরবৎ?—হরসুন্দরী হেসে বললেন,—কি হবে?

—সমস্ত দিন কিছুই খাননি আপনি।—অরুন্ধতী কোনো মতে বললে।

—খাইনি? কে বললে তোমাকে?—হরসুন্দরীর কণ্ঠে সুতীক্ষ্ণ কৌতূহল।

—কেউ বলেনি। আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি।

হরসুন্দরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তার পর ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ডান হাতে চিবুকটা তুলে ধরে বললেন, এ তো তোমার লক্ষ্য করার কথা নয় মা! লক্ষ্য যে কে করেছে তাও আমি জানি। কিন্তু যে সমস্ত দিন কিছু খেতে পারিনি, সেই কারণেই এখনও খেতে পারব না। বাড়ি ফিরে স্নান না করে কিছুই মুখে দিতে পারব না। কিছু মনে কোর না মা, কাল সকালেই আমি আবার আসব। তুমি ওপরে যাও মা!

তার পর কেষ্টকে বললেন, আলোটা নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবি চল তো বাবা! বলে কেষ্টকে নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো ওঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে অরুন্ধতী গেলাস হাতে করে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়িতেই আড়ালে বোধ করি তার বাপের বাড়ির ঝি দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটে এসে অরুন্ধতীর হাত থেকে সরবতের গেলাসটা নিলে। তার পরিচিত মুখের দিকে চেয়ে অরুন্ধতী যেন একটু আশ্বস্ত হল।

ফিস-ফিস করে বললে, এখানকার সবাই যেন কি রকম, না রে? এত ভয় করছে আমার!

ঝি'টি ওদের বাড়িতে অনেক দিন থেকে আছে। অরুন্ধতীকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। এ বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নেই জেনে বিশেষ ভাবে তাকেই সে জন্যে পাঠান হয়েছে। ভয় যে তারও করছে না, তা নয়। এতক্ষণ তবু লোক-জনে জমজমাট ছিল। এখন সবাই চলে গেছে। বাড়ি নিঃঝুম।

তবু অরুন্ধতীকে সাহস দেবার জন্যে বললে: ভয় আবার কি! চল তোমাকে শোবার ঘরে দিয়ে আসি।

বলে তার কম্পিত দেহটাকে যেন টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসিয়ে দিলে। বললে, তোমার মুখ দেখলে বনের পশুও মুগ্ধ হয় দিদিমণি! ভয় কি? জামাই বাবু পাশের ঘরেই রয়েছেন, এখনই আসবেন। আমি যাই। ভয় পেও না। জামাই বাবুর সঙ্গে হেসে কথা বোল যেন। বলেই চলে গেল।

অরুন্ধতী খাটে পা ঝুলিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘড়ির দোলকের তালে তালে তার বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে।

কতক্ষণ বসে রইল সে। সমরেশ আর আসেন না। পাশের

ঘরে তাঁরও যেন চিন্তার শেষ নেই। মনকে যেন তিনি কিছুতে ফুলশয্যার উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারছেন না।

অবশেষে, রাত তখন কত কে জানে, এমন সময় উভয় ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গোড়ায় সমরেশ এসে দাঁড়ালেন। সেইখান থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এখনও শোওনি তুমি?

অরুন্ধতীর বোধ করি একটু তন্দ্রা এসেছিল। চমকে চোখ মেলে চাইলে। অত দূরে অস্পষ্ট আলোয় তাঁর দিকে চেয়ে ভয়ে তার মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে গেল।

সমরেশ আবার বললেন, শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে। ভয় নেই। আমি পাশের ঘরেই রয়েছি। এই দরজাটা খোলাই রইল।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের মতো নিরেট কঠিন মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অরুন্ধতী স্তব্ধ ভাবে আরও কতক্ষণ বসে রইল, তা সে নিজেও জানে না। ভয়ে, দুঃখে তার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। তার পরে এক সময় সেই পুষ্পাস্তীর্ণ প্রশস্ত খাটে একা শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতে। ভুতুড়ে বাড়িতে রাতে যেমন গা-ছমছম করে, তেমনি গা-ছমছম করতে লাগল অরুন্ধতীর। পাশের ঘরে যেন খুট-খুট শব্দ করছে। কে যেন খুব চুপি চুপি চলাফেরা করছে।

কে চলাফেরা করছে? তার স্বামী? সমরেশ?

অরুন্ধতীর মনে হয় তিনি নয়। ওই পায়ের শব্দ যেন মানুষের পদশব্দের মতো নয়। মনে হয়, এই পোড়ো বাড়িতে একটা প্রেত ছাদ থেকে নিচের বারান্দা পর্যন্ত তদারক করে বেড়াচ্ছে। ভয়ে অরুন্ধতীর সমস্ত দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায়। বুকের স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসে।

ঝি'টা কোন্ ঘরে শুয়েছে, কে জানে? এ বাড়ির ঘরগুলো যেন কিছুতে তার আয়ত্ত হয় না। একবার ভাবলে, খুঁজে খুঁজে তারই ঘরে গিয়ে শোওয়া যাক। কিন্তু সাহস হল না। ভয় হল, কিছুতে ঝির ঘরটা সে খুঁজে পাবে না। সারা রাত এই গোলক-ধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হবে। সুতরাং নিঃশব্দে পড়েই রইল।

তার পরে, ঘুম ঠিক নয়, কখন একটু বোধ করি তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ মনে হল, তার মাথার শিয়রে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের প্রদীপটা আগেই নিবে গেছে।

ভয়ে অরুন্ধতী প্রায় চীৎকার করে উঠল : কে গো?

—আমি।—সমরেশের শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

কিন্তু অরুন্ধতী যেন সে স্বর চিনতে পারলে না। ধড়মড় করে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

—আমি। চিনতে পারছ না?

এতক্ষণে অরুন্ধতী চিনতে পারল। মাথার ঘোমটাটা একটুখানি টেনে দিলে। একটুখানি যেন সে আশ্বস্তও হল। সমরেশকে সে ভয় পায়, কিন্তু এই বাড়িতে রাতে একা থাকতে আরও ভয় করে।

—একটু বসি তোমার খাটে।

অরুন্ধতী খাটের এক প্রান্তে সরে গিয়ে সমরেশকে বসবার জন্তে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিলে। ওর ভয় সমরেশের দৃষ্টি এড়াল না। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে তোমার ভয় করছে?

অরুন্ধতী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ।

সমরেশ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সবাই আমাকে ভয় পায়। কেন জানি না, সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। তোমার ভয় পাওয়াও বিচিত্র নয়।

একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু তাদের যা চলে তোমার তো তা চলে না। তুমি এলে এ-বাড়ির গৃহিণী হয়ে। বলতে গেলে আমাকে নিয়েই তোমার গৃহ। তোমার তো আমাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সমরেশ থামলেন। এতগুলো কথা একসঙ্গে তিনি বোধ হয় বহু কাল বলেন নি। সুতরাং দম নেবার জন্তে একটুখানি থামলেন। তার পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কথা বুঝতে পারছ?

অরুন্ধতী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। কথাটা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এটা আদেশ না আবেদন কণ্ঠস্বর থেকে সেটা সে সঠিক ধরতে পারলে না।

সমরেশ তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলেন, এ বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই। তোমার সঙ্গীর খুব অভাব হবে। আমি ভাবছি, বলে কি যে ভাবছেন সেটাই বোধ করি পুনরায় ভাবতে বসলেন। বললেন, তোমার সঙ্গের ঝি'টি শুনেছি পুরোনো ঝি।

অরুন্ধতী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। সমরেশ যে কথাও বলেন এই প্রথম টের পেয়ে অন্ধকারে বড় বড় চোখ মেলে সে ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

—মনে হয়, তোমাকে ভালোও বাসে খুব।

অরুন্ধতী আবার সায় দিলে।

—শুনেছি, ও-ই তোমাকে মানুষ করেছে।

প্রিয়জনের প্রসঙ্গে অরুন্ধতীর কণ্ঠে স্বর ফুটল: হ্যাঁ।

—ও এখানে থাকতে পারে না? বিধবা, কিন্তু ছেলে-মেয়ে আছে কি?

—না।

—তাহলে এখানে থাকার কোনোই তো অসুবিধা নেই।

—না।

—তাহলে জিগ্যেস কোর তো ওর মত আছে কি না?

—করব।

—করে কাল সকালেই আমাকে জানিও। কেমন?

—আচ্ছা।

সমরেশ আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে লাগলেন, আর কিছু বলার আছে কি না। কথা বলা তাঁর কাছে বিরক্তিকর ব্যাপার। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা তিনি বলেন না। কথা বলায় যে আনন্দও থাকতে পারে, এই প্রথম যেন তার আভাস পেলেন।

কিন্তু আর কোনো কথা তাঁর মনে পড়ল না। বললেন, এই জন্তেই তোমার ঘুম ভাঙালাম। শুয়ে পড়। রাত বোধ হয় আর বেশি বাকি নেই।

সমরেশ পাশের ঘরে চলে গেলেন। [ক্রমশঃ।

আপনার সৌন্দর্য্য রক্ষায় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

মোটা হবার ভয়ে অনেকে খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করেন। অনেকেরই ধারণা, স্লিম ফিগার, স্বাস্থ্য এবং গায়ের রঙ ইত্যাদি যথাযথ রাখার জন্ত ডায়েট কন্ট্রোল না কি অনিবার্য। ধারণাটির পেছনে কিন্তু কোনও সত্যই নেই। আসলে আমরা যা খাই, ক্যালসিয়ম, প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বো-হাইড্রেট আমরা তাই-ই।

দি ইউথ ভিটামিন-সি—দাঁতের বেদনায়, গাঁটের ব্যথায়, ঠাণ্ডা লেগে, চুল উঠে যাওয়ায়, গায়ের চামড়া ফেটে যাওয়ায় আপনি ছুটে যান ডাক্তারের কাছে। কিন্তু আপনার কি একবারও মনে হয়েছে এখুনি এই মুহূর্তে ডাক্তারের চেয়েও যে জিনিসটি আপনার দরকার হচ্ছে তা হোল 'ভিটামিন-সি'। আপনার, আমার শরীরে প্রত্যহ দু'শো মিলিগ্রাম করে 'ভিটামিন-সি'এর প্রয়োজন। কমলালেবু বা পাতি জাতীয় অন্তান্ত লেবুতে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে আছে এই ভিটামিন। দামেও তা' সস্তা। রান্না করলে কমে যাবে, সে ভয় নেই। সুতরাং দৈনিক কমপক্ষে এক গ্লাস করে সরবৎ (লেবুর)। মৃতসঞ্জীবনী সুরার কাজ করবে তা।

দি গ্লামার ভিটামিন-এ—রাতে যদি আপনি কম দেখেন, যদি গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যায়, কি সামান্ত কারণেই পেটের গোলমালে ভোগেন, সর্দ্দি-কাশি শুরু হয়তো জানবেন যে, শরীরে 'ভিটামিন-এ'র অভাব পড়েছে আপনার। দুধ, মাছ, দই, ছানার খাবার কি সস্তা বা টাটকা ফল আপনার শরীরের সে অভাব অনায়াসেই পুরণ করতে পারে।

দি হ্যাপিনেস ভিটামিন-বি—খুব তাড়াতাড়ি চটে যান, খিদে নেই আপনার, মেজাজ সব সময়েই সপ্তমে চড়ে থাকে, হজমের গোলমাল, মাথাধরা কি নিউরাইটিস, নিউরালজিয়ার জন্ত আপনার দরকার পড়েছে 'ভিটামিন-বি'র। পুষ্টির অভাব, ষ্টেরিলিটি বা সন্তান-উৎপাদনে অসমর্থার জন্তও প্রয়োজন এর। গম, গমজাত দ্রব্য, যব, বার্লি ইত্যাদি বস্তু থেকে আপনি তা পেয়েও যাবেন অনায়াসেই।

দি সানসাইন ভিটামিন-ডি আর সেক্স ভিটামিন-ই এর প্রয়োজনও আমাদের দেহে অনেক। দাঁত ক্ষয়ে যায় ভিটামিন ডি-এর কমতিতে। শীতকালে চামড়া যে চড়-চড় করে, ঠোঁট ফাটে সেও একই কারণে। দৈনিক অন্তত দু'টি হাজার ইউনিট 'ভিটামিন-ডি আমাদের দরকার এবং শুনলে খুসী হবেন যে, এর বেশীর ভাগটাই আমরা পাই রৌদ্র থেকে। বাচ্চা যদি রোগা হয়, কি বিকলাঙ্গ হয়, কি একেবারেই না হয় তো বুঝবেন 'ভিটামিন-ই'য়ের অভাব পড়েছে মায়ের। গম, লিভার, ডিম, লেটুস শাক খেতে দিন সে ক্ষেত্রে।

পরিশেষে বলছি, খাওয়া-দাওয়া কখনো কোনও কারণে কমাবেন না। ইট, ড্রিঙ্ক এণ্ড বি বিউটিফুল।

বিপর্যয়

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

দুই

রায়েদের কোন্ এক খাস-পুষ্করিণীর পাড়ে এক সুপ্রাচীন আমগাছে এবার নাকি খুব আম হয়েছে। ও অঞ্চলের গোমস্তা এসে সদরের নায়েব মশায়কে খবরটা দিল। নায়েবের সুপুষ্ট পাকা গোঁফ, কিন্তু মাথার চুল বারো আনা কাঁচা। সবাই বলে ওঁর মাথা পাকবার আগেই মুখ পেকেছে।

গোমস্তাকে ধমক দিয়ে নায়েব বললেন, "আম পাকার খবর দেওয়ায় তোমার যে ভারি মাথাব্যথা দেখছি।" গোমস্তারও ঠিক এই ভয় ছিল। সচরাচর খাসের জমির কোনো গাছে আম হলে, সে কথা গোমস্তারা গোপন করে। আমগুলি পাড়িয়ে গৃহজাত ক'রে সদরে খবর পাঠায়, এ বছর ভয়ানক অজন্মা। এ ঠিক তার উল্টা। কাজেই এমন সাধুতায় লোক সন্দেহ তো করবেই। আসলে গোমস্তার একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল, সেটা পরে প্রকাশ পাবে

গোমস্তাদের পক্ষে সরাসরি জমিদার বাবুদের সঙ্গে সাক্ষাতের রেওয়াজ নেই। এ সম্বন্ধে জমিদাররা তখনও মোগল সম্রাটদের প্রথা চালাচ্ছিলেন। কাজেই গোমস্তার পক্ষে বসন্তর সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন হ'ল। কিন্তু দমবার পাত্র ইনি ন'ন। ছোটবাবুর ছড়ির শখ আছে। কাঁটায় ভরা ময়না গাছের ঝোপ থেকে গোটা তিন চার সোজা দেখে ডাল কাটিয়ে নিলেন নিজের বরকন্দাজকে দিয়ে। তার পর গায়ের দু'-চার জায়গায় একটু ভ্যারেণ্ডা গাছের আঠা ঘসে দিয়ে দাগড়া দাগড়া লাল জখমের মতো ক'রে, ডাল তিনটি নিয়ে চললেন ছোটবাবুর কামরার দিকে।

সদর নায়েব রুপার-ডাঁটি-বাঁধানো চশমার ওপর থেকে মুখ তুলে জিগ্যেস করলেন, "কোথা যাও?"

গোমস্তা বলল, "আজ্ঞে ছোটবাবুর জন্যে গোটা তিনেক লাঠি এনেছিলাম, দিয়ে আসতে চাই।"

সদর নায়েব আর কিছু বললেন না, শুধু পাকা গোঁফ ফুলিয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, "হুঁ"।

বসন্ত লাঠি পেয়ে ভারি খুশি। "আরে, এ যে দেখছি ময়নার ডাল। তুমি পেলে কোথায় গোমস্তা মশায়?"

গোমস্তা ভ্যারেণ্ডার আঠাজনিত গায়ের লাল দাগ দেখিয়ে অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলে গেল, "হুজুরের জন্যে নিজে গিয়ে কেটে এনেছি। গায়ের নানা স্থানে ছ'ড়ে গিয়েছে, এই দেখুন। কিন্তু তাতে কি। হুজুর অন্নদাতা মনিব।"

বসন্ত বলল, "আহা, এত কষ্ট ক'রে আনতে গেলে কেন?"

বাস্, আর যায় কোথা? হুজুরের মন গলেছে। গোমস্তা বসল মেঝের ওপর, আমের খবর না দিয়ে সে যাবে না।

বসন্ত জিগ্যেস করল, "তার পর, ও অঞ্চলের খবর কি গোমস্তা মশায়? আমাদের সু-শাসনে বাঘে-গোরুতে এখনো এক-ঘাটে জল খাচ্ছে তো?"

"আজ্ঞে তা খাচ্ছে, তবে বেশী দিন আর নয়।"

"বলো কি! কেন?"

"দীনু নাপিত মাতৃশ্রাদ্ধ করল এমন ঘটা ক'রে—বামুন-কায়েতদের হার মানিয়ে দিল। শ্বশুরের বিষয় পেয়ে বেটার মাটিতে আর পা পড়ছে না।"

"তা সে যদি নিজের পয়সায় ঘটা ক'রে মাতৃশ্রাদ্ধ করে, তাতে দোষ কি গোমস্তা মশায়?"

"ছোট জাত যে! নাপিত! বামুন-কায়েতদের যা শোভা পায়, ছোট জাতদের তা কি পায় হুজুর? শাস্ত্রে আছে, ছোট জাতের প্রতাপ ভগবান সহ্য করেন না।" তার পর বামন-অবতার, শম্বর অসুর বধ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে গোমস্তা শেষে বলল, "তাই দেখুন, দীনু বেটার পাপে এবার তেমন আম হয়নি।"

বসন্ত বলল, "তা হয় নি বটে। কিন্তু তার মধ্যে তোমাদের ঐ দীনু নাপতের কারসাজি ছিল, সেটা তো জানা ছিল না। এখন উপায়? বেটা ঘটা ক'রে মায়ের শ্রাদ্ধ করায় এবার আম হল না। ঘটা ক'রে বেটা যদি আবার বাপের শ্রাদ্ধ করে তা হলে তো ধানও হবে না। তখন কি হবে?"

"তার জন্যে চিন্তা করবেন না হুজুর! অতি দর্পে হতা লঙ্কা। ভগবান সইবেন না নাপতের দর্প। তা ছাড়া হুজুরদের খাস জমিতে লক্ষ্মীর দৃষ্টি রয়েছে যে।"

"রয়েছে নাকি?"

"নেই আবার! এই দেখুন না কেন, এবার কোথাও আম নেই, অথচ হুজুরদের খাসপুকুরের পাড়ে সেই বুড়ো আমগাছটাতে কি কম আম হয়েছে এবার? তবে তা আর বুঝি থাকে না।"

"কেন? থাকে না কেন? নাপতে বেটার কোনো কারসাজি বুঝি?"

"আজ্ঞে না। পাকলডাঙার বাবু বলছেন, ও আমগাছ তাঁর। জন চারেক নগদি শুনছি আজ বিকেলেই আমগুলা পেড়ে নিয়ে যাবে।"

"কে? পাকলডাঙার নরেন? তার বুঝি আজ-কাল এই সব বদবুদ্ধি হচ্ছে? ও গাছ কাদের, তুমি ঠিক জানো?"

"তা আর জানি না, আজ্ঞে! তা'ছাড়া জানাজানির

দরকার কি, সেটেলমেণ্টের রেকর্ড নক্সা দেখলেই সব গোল মিটে যাবে।"

"আচ্ছা। তাহলে যাও, নায়েব মশাইকে বলো ম্যাপ আর রেকর্ড নিয়ে এসে এখুনি আমায় দেখাতে। গাছ যদি আমাদের হয়, তা'হলে আজ বিকেলে আমি নিজে গিয়ে আম পেড়ে আনব। তুমি সেখানে থাকবে, বুঝলে?"

"যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। কিন্তু হুজুর, নায়েব মশাই আমার কথা শুনবেন না, আমার ওপর বিরক্ত হয়ে আছেন।"

"আচ্ছা, আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।"

গোমস্তার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। সে কি আর কালবিলম্ব করে? নমস্কার ক'রে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বসন্তর হুকুম মতো নায়েব এলেন রেকর্ড-নক্সা নিয়ে। সমস্ত দেখা হলে নায়েব বললেন, "গাছ আমাদেরই। তবে, সামান্য ক'টা আমের জন্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা করা ঠিক নয়, তাও টোকো আম।"

"টোকো আম? চেখে দেখেছিলেন নাকি? না, কথামালার শেয়ালের মতো ভাবলেন টোকো? আজ বিকেলে গিয়ে নিজে দেখে আসব টোকো না মিষ্টি।"

নায়েব মাথা চুলকে বললেন, "এ তুচ্ছ কাজের জন্যে হুজুরের নিজে যাবার দরকার কি? একটা দরোয়ান পাঠিয়ে দিলেই তো চুকে যায়।"

"নিজের গাছের আম টোকো কি মিষ্টি তাও চাখাতে হবে দরোয়ান দিয়ে। হায় হায় নায়েব মশাই, জমিদারদের তো এমনিতেই সুনাম নেই, তাঁরা ঘুমিয়ে উঠে জিরোন। বাবু কি করছেন জিগ্যেস করলে উত্তর আসে, বাবু এখন দুলছেন, দোলা শেষ হলে স্নান করবেন। এত বদনামেও আপনি সুখী নন? পর-নির্ভরতার আর একটি নমুনা যোগ করতে চান? বাবু কি করছেন? না, দরোয়ানকে দিয়ে আম চাখাচ্ছেন।"

নায়েব আর কিছু বলতে পারলেন না। তুচ্ছ কারণে একটা বিপর্যয় যাতে না ঘটে, তিনি তারই জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু বিধাতা যখন বিপর্যয় ঘটাবার জন্যে কোমর বাঁধেন, তখন সামান্য নায়েবের সাধ্য কি সেটা এড়াবার!

আম পাকার খবরটা গোমস্তা নিঃস্বার্থ ভাবে দেয়নি। সে গিয়েছিল পারুলডাঙার এক গোমস্তার ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে। পারুলডাঙার গোমস্তা তাকে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেছে, "মড়াপোড়া বামুনের মেয়ে আমরা ঘরে তুলি না।" অপমানিত রায়েদের গোমস্তা তাই বেনামী চিঠি দিয়েছে পারুলডাঙার জমিদার নরেন বাবুকে যে, এই খাস-পুষ্করিণীর পাড়ের আমগাছ তাঁদেরি, কিন্তু রায় জমিদাররা জবরদস্তি আম পাড়বার উদ্যোগ করছে, তাই এখন থেকে আম পাহারা দেবার ব্যবস্থা হওয়া চাই। নরেন বাবু চিঠি পাওয়া মাত্রই জন চারেক লাঠিয়াল মোতায়েন ক'রে দিয়েছেন আমগাছ তলায়। গাছ কার ভেবে দেখবার দরকার নেই, ফল ঘরে এলেই হল। রায়েদের গোমস্তা কৌশল ক'রে বসন্তকে খবরটা দিয়ে এল। এখন উভয় পক্ষে একটা দাঙ্গা বাধুক, মরুক বেটারা।

রায়েদের সঙ্গে পারুলডাঙার বিরোধ আজ নতুন নয়, যদিও পারুলডাঙার জমিদার নরেন আর বসন্ত ছিল সমবয়েসী এবং ছেলেবেলায় দু'জনে ছিল দু'জনের খেলার সাথী। জমিদারি করতে গেলে বাল্যবন্ধুত্ব টেঁকে না, সামান্য বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি হয়। নির্বিরোধ হেমন্ত কখনো এ সবের মধ্যে ছিলেন না, তাই পারুলডাঙার রাগ ছিল বসন্তর ওপর। অথচ তাঁর অন্তরে অন্তরে এই বসন্তর জন্যেই এমন স্নেহাকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল যার সন্ধানে স্বয়ং বসন্তও রাখত না। নরেনের একমাত্র সহোদরা নীরজার জন্যে যখন পাত্রান্বেষণ চলছে তখন ঘটককে ডেকে নির্দেশ দিয়েছিল নরেন, যদি রায়েদের বসন্তর সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করতে পারো, প্রচুর পুরস্কার পাবে। কথাটা যারা শুনেছিল, নীরজাও তাদের এক জন। কিন্তু তাঁর অন্তরে কি ভাব জেগেছিল তা তিনিই জানেন। বসন্ত শুনে বলেছিল, "ওরে বাপ রে, পারুলডাঙার সেই ঝগড়াটে মেয়েটা! ছেলেবেলা পেয়ারার ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়। তার ভাগে একটা পেয়ারা কম দিয়েছিলাম। সেও আমার সঙ্গে গাছে উঠে পেয়ারা পেড়েছিল। তা, যদি মিষ্টি কথায় পেয়ারা চাইত, একটা কেন, পাঁচটা পেয়ারা তাকে বেশি দিতাম। তা নয়, লড়াই করতে এল। এমন জোরে আমার নাক খামচে দিলে, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তখন মেয়াত্তি ক'রে নিজের শাড়ি ছিঁড়ে নাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে এল। আমি একটা থাপ্পড় মেরে চলে আসি।"

শ্রোতা ছিলাম আমি। বললাম, "খুব পৌরুষের কাজই করেছ। মেয়েটা রাগের মাথায় তোমায় মেরেছিল। ভুল বুঝতে পেরে

তোমায় সেবা করতে এল, তুমি তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে এলে! বাঃ!"

বসন্ত বলল, "নাকের ওপর ভুরে-শাড়ির ব্যাণ্ডেজ দেখলে বাবা আমায় আস্ত পুঁতে ফেলতেন, মেয়েটার সে খেয়াল ছিল না।"

বসন্তর আপত্তিতে বিয়ের কথা আর এগোয়নি, তা ছাড়া তার সেই প্রবল হুঙ্কার, "দাদা থাকতে আমি করব বিয়ে!"—এর পর আর কোনো কথাই চলে না।

আম্রপর্ব নিয়ে একটা অপ্রীতিকর কিছু হয়, এই ভেবে রায়েদের নায়েব এসে আভার শরণাপন্ন হলেন। সেদিন ছিল একটা ছুটিবার, কেরাণী-জীবনের দুর্লভ সৌভাগ্যের দিন। অপরাহ্নে দিবানিদ্রার সম্ভাবনায় মনটা ছিল প্রফুল্ল, এমন সময় এই হাঙ্গামা! বিরক্ত হলাম।

আভা বললে, "ছোটদা'কে থামাতে হবে। আমি একলা মেয়েমানুষ, পারব না। তুমি চলো আমার সঙ্গে।"

গৃহিণীর ছোটদা'টিকে থামানো আমার মতো দশটি লোকেরও কর্ম নয়। তবু যেতে হল তার সঙ্গে। সকলের কাছে নির্জীব কেরাণী হলেও নিজের স্ত্রীর কাছে তো বীরত্বের অভিমান বিসর্জন দেওয়া যায় না।

আমাদের আসতে দেখেই বসন্ত চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে জিগ্যেস করল, "কী গো, কী মতলব ক'রে এসেছ ছুটিতে? তোমরাও বুঝি চেখে এসেছ, ও গাছের আম টক?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে জিগ্যেস করলাম, "কি চাঁচা হচ্ছে? ছড়ি বুঝি? কেন তোমার এক এবং অদ্বিতীয় ভূতনাথ গেল কোথা?"

বসন্ত বলল, "ওঃ জান না বুঝি? ভূতনাথ গেছে তার 'ভাশে'। আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেছে।"

ভূতনাথ বসন্তর বেয়ারা, খানসামা এবং কর্ণধার। ছেলেবেলা থেকে তাকে পালন করেছে। বাঙাল দেশে তার বাড়ী। তুমি ছাড়া তবলাকে ধারণা করা যায়, কিন্তু ভূতনাথ ছাড়া বসন্তকে কল্পনা করা কঠিন।

বললাম, "তাহলে তোমার তো বেজায় মুস্কিল।" বাধা দিয়ে আভা বললে, "ছোটদা', কি হবে তোমার ও আমে? সাধ্য সাধনা করলেও তো তুমি কোনো দিন ফল খাও না। বলো, আমার যখন লিভার খারাপ হবে তখন ফল খাবো।"

মৃদু হেসে বসন্ত বলল, "সে কথা সত্যি। তাছাড়া, জানিস তো আমি গীতার কত বড় ভক্ত! গীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবান বলেছেন, 'মা ফলেষু কদাচ ন'। তাহলে আমি ফল খাই কেমন করে?"

আভা বললে, "তবে? এই সামান্য টোকো আমের লোভ তুমি ছাড়তে পারলে না?"

উগ্র স্বরে বসন্ত বলল, "তুই তার বুঝবি কি! তুই মেয়েমানুষ, বারো হাত কাপড়েও তোর কাছা নেই, ও আমে আমাদের অধিকার।"

আমি বললাম, "ও তুচ্ছ আম।"

বসন্ত যে ছড়ি চাঁচছিল সেটা আমার দিকে তুলে বলল, "জিনিষটা তুচ্ছ হলেও অধিকারটা বৃহৎ।"

আমি বললাম, "বেশ তো। পারুলডাঙাকে সে কথা লিখে জানিয়ে দাও।"

গোঁয়ার বসন্ত উত্তর দিল, "হে মসীজীবী, মুসাবিদার দরকার হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।"

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, আভা বাধা দিয়ে আমার হাত ধরে জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসতে আসতে বললে, "চলো, বাড়ী চলো। আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই। মুসাবিদাতেও বিদ্যাবুদ্ধির দরকার করে। কেরাণী হবার বিদ্যাও যার নেই, তাকে বোঝাতে আসা পণ্ডশ্রম।"

স্ত্রীর হস্তধৃত হ'য়ে নাটকীয় ভাবে আমি নিষ্ক্রান্ত হলাম। কিন্তু ভারাক্রান্ত মনে কাটল সারাটা দিন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই পাল্কী ক'রে নিয়ে এল বসন্তকে একেবারে আমাদের বাড়ী। মাথার পিছনে নিদারুণ রক্তাক্ত জখম, বসন্ত অজ্ঞান অচৈতন্য। পিছু-পিছু এল রায়েদের সেই গোমস্তা, যে দিয়েছিল বসন্তকে আমের খবর। বসন্তের নির্দেশ মতো গিয়েছিল পিছু পিছু, যা হয়েছে সব দেখেছে।

তারই মুখে সমস্ত শুনলাম। বসন্ত গিয়েছিল একা, লাঠি হাতে। পাইক বরকন্দাজ তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, বসন্ত হাঁকিয়ে দিয়েছে। আম গাছের উপর যেতেই পারুলডাঙার বাবু আর তার চার জন লেঠেল একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করল।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "পারুলডাঙার বাবু, মানে নরেন? সে-ও এসেছিল?"

গোমস্তাকে জেরা ক'রে জানা গেল, এ সমস্ত কারসাজি তাঁরই। কৌশলে তিনিই খবরটা পারুলডাঙা-ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, বসন্ত স্বয়ং যাচ্ছে আমগাছের তদারকে।

গোমস্তা বলল "সার্থক লাঠিখেলা বটে ছোটবাবুর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সবাইকে পুকুরপাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এ গাছের ফল তোমরা যদি ছোঁও, মাথাটি এখানে রেখে যেতে হবে। আজ তারই একটু নমুনা দেখিয়ে দিলাম। আমাকে হুকুম দিলেন, যাও তোমার লোক নিয়ে এসো। আম পাড়িয়ে বাড়ী পৌঁছে দিও। নরেনকে আমি চিনি। সে আর বাধা দেবে না। কি বল নরেন?—নরেন বাবু বললেন, তোমার লাঠির হাত যে এমন পাকা হয়েছে, জানতাম না। আমাদের পাঁচ জনকে তুমি একাই হটিয়ে দিলে, সাবাস!—বাড়ী ফেরবার জন্যে ছোটবাবু যেমন পিছনে ফিরেছেন, অমনি নরেন বাবুর একটা হিন্দুস্থানী লেঠেল চুপি চুপি কোন্ ফাঁকে এসে পিছন থেকে ছোটবাবুর মাথায় মারল এক লাঠির ঘা। পড়ে যেতে যেতে ছোটবাবু বললেন, "ওরে কে আছিস, আমায় আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দে। নরেন, আর কেউ না পাঠায়, তুমিই পাঠিয়ে দিও।"

আমি বললাম, "কী সর্বনাশ! তার পর?"

গোমস্তা বলল, "নরেন বাবু পাল্কীতে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় এই অঘটন ঘটল। তড়াক্ ক'রে লাঠি-হাতে তিনি ছুটে এলেন, চীৎকার করে বললেন, "ভজুয়া, কার হুকুমে তুই মারলি?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই নরেন বাবু ভজুয়াকে মারলেন এক লাঠির ঘা। 'বাপ' বলে সে বেটা পড়ে গেল মাটিতে। নরেন বাবু নিজের পাল্কীতে ছোটবাবুকে তুলে দিয়ে পাল্কী-বেহারাদের হুকুম দিলেন,

'যা, বাবুর বোনের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।' পাল্কী-বেয়ারাগুলো ছোটবাবুকে নামিয়ে দিয়েই পাল্কী নিয়ে সরে পড়েছে। তাদের সঙ্গে ছুটে আসতে আমার প্রাণ বেরোবার উপক্রম হয়েছে হুজুর!"

আমি বললাম, "তুমিই এটি বাধিয়ে দিলে বাপধন। কী লাভ হ'ল তোমার এতে?"

গোমস্তা জিভ্ কেটে, আকাশের দিকে চেয়ে, জোড় হাত ক'রে বলল, "গোবিন্দ, গোবিন্দ! আমি অধমের অধম, আমার কী ক্ষমতা। সকলি গোবিন্দের ইচ্ছা।"

ক্রন্দনমুখরা গৃহিণীকে বললাম, "দেখ আভা, অজ্ঞান হ'য়ে যাবার আগে পর্যন্ত এ জ্ঞান বসন্তর ছিল যে সে মুখে যাই বলুক, আমরা ছাড়া এই ঘোর বিপদে দেখবার লোক তার আর কেউ নেই। ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।"

গ্রামের একমাত্র ডাক্তার মতিলাল এসে চশমা এঁটে দু'টা লণ্ঠনের আলোতে বসন্তর মাথার জখম দেখে চমকে উঠলেন। "ওরে বাস্ রে! এমন জখম আমি বাপের জন্মে দেখিনি। মাঠাকরুণ, একটু জল খাবো!" আভার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে চক্‌-চক্‌ ক'রে খেয়ে ফেললেন। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের অবস্থা আরো কাহিল বলে মনে হল।

আমি জিগ্যেস করলাম, "কী পরামর্শ দেন ডাক্তার বাবু?"

"কল্‌কেত্তা, কল্‌কেত্তা, এখুনি কল্‌কেত্তা। এর চিকিৎসা আমার বাবাও করতে পারবে না এখানে। বাঁচাতে চাও যদি, এখুনি কল্‌কেত্তা।"

হেমন্ত ছুটে এলেন চশমার কাচ মুছতে মুছতে। অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন তিনি। আমার হাত দু'টি ধরে বললেন, "ভাই, ওকে এক্ষুণি কলকাতায় নিয়ে যাও। ওকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে, সে তোমরাই।" আভাকে বললেন, "কাঁদিস নি আভা, এখন কান্নার সময় নয়। এ-সব ব্যাপারে আমি অপটু, কিন্তু তোরা আছিস আমার ভরসা। টাকার জন্যে ভাবিস নি, যখন টাকার দরকার হবে চেয়ে নিবি।" আমাকে বললেন, "আমি যে টাকা হাতের কাছে পেয়েছি তাই নিয়ে এসেছি। এই নাও একশো টাকা। ওকে কলকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।"

আভাকে বললেন, "ওর প্রাণ আছে তোরই হাতে। তুই ওকে সেবা ক'রে বাঁচা।"

আমার এক বন্ধু ডাক্তার, কলকাতায় তাঁর একটি ছোট্ট নার্সিং-হোম আছে। অস্ত্র-চিকিৎসায় নাম আছে তাঁর। অজ্ঞান বসন্তকে নিয়ে আসা হল সেই রাতেই তাঁর নার্সিং-হোমে। কী উদ্বেগে সে রাতটা কাটল মনে থাকবে চিরদিন। আভা রইলেন রোগীর কাছে। ডাক্তার দয়া ক'রে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। একজন নার্স ও রইল আভার সাহায্যে। আমি স্থান ক'রে নিলাম আমাদের আপিসের বাবুদের এক মেসে। ডেলিপ্যাসেঞ্জারি গেল বেঁচে।

হেমন্ত মাঝে মাঝে এক জন দরোয়ান সঙ্গে ক'রে আসতেন ছোট ভাইকে দেখতে। বসন্তর অবস্থা দেখে এমনি অস্থির হ'য়ে উঠতেন যে, তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে পড়ত। ডাক্তার অপ্রসন্ন হতেন রোগীর ঘরে এমন গোলমাল দেখে। আভা বুঝিয়ে দিলে, হেমন্তর কষ্ট ক'রে আসবার দরকার নেই, চিঠি লিখে তাঁকে রোগীর অবস্থা প্রত্যহ জানিয়ে দেওয়া হবে। চিকিৎসা ও সেবার কোনো ত্রুটি হচ্ছে না।

ওদিকে প্রচুর ধুমধামের সঙ্গে মামলা রুজু হয়ে গেল। হেমন্তকে কেউ পরামর্শ জিগ্যেস করবার দরকার বোধ করল না। যা করবার নায়েব-গোমস্তারাই সব করতে লাগল। অবহেলিত দারোগা বাবু এখন বৈঠকখানায় আসন জুড়ে বসলেন। পোলাওয়ের সঙ্গে কুক্কুটমাংসের কালিয়া সরবরাহের ভার নিলেন সদ্‌ব্রাহ্মণ নায়েব বাবু নিজে। পারুলডাঙার বাবুকে খুনের চার্জে'ই ফেলা হবে কি গুরুতর জখমের, সেটা নির্ভর করতে লাগল বসন্তর পরমায়ু ও তার সহোদরার সেবার ওপর।

অন্তঃপুরের কলহরতা দূরসম্পর্কীয়ারা পূর্বের মতো কলহেই ব্যাপৃতা হয়ে রইলেন, লাইব্রেরী-ঘরে পাঠনিরত হেমন্ত প্রত্যহ ডাকঘরে গিয়ে ধর্ণা দিতে লাগলেন চিঠির জন্তে, আর এদিকে বসন্তকে নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল যমে আর মানুষে।

বার দুই তিন পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল বসন্তর জবানবন্দী নেবার প্রয়াসে, কিন্তু আভার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে পালাতে পথ পাননি দারোগারা।

এম্‌নি ক'রে মাস খানেক গেল। আভার অলঙ্কারগুলি একে একে নিঃশেষিত হ'ল ভাইয়ের চিকিৎসায়। আমিও ধার কোরে আনতে গেলাম যত টাকা ধার পাওয়া যায়। হেমন্ত বলেছিলেন, খরচের টাকা চেয়ে নিও। তার পর অন্যমনস্ক মানুষ, ভুলে বসে আছেন টাকার কথা। "চেয়ে নিও"

বললেও তো সত্যি সত্যি চাওয়া যায় না, আত্মসম্মানে বাধে। আর তাঁর আমলাতন্ত্র মামলা নিয়ে এমনি উন্মত্ত যে, রোগীর চিকিৎসার কথা আর কারো মনে নেই।

কিন্তু আরো বিরক্ত হচ্ছিলেন মনে মনে ওদের আচরণে। আমাকে বলতেন, "দেখছ ওদের কাণ্ড! টাকা পাঠাবার কথা একেবারে ভুলেই বসে আছে, অথচ তোমার হুকুম, চাইতে পাবো না। না জানি, তুমি কি মনে করছ।"

আমি বিশ্লেষণ ক'রে বললাম, "এখানে 'তুমি' শব্দটা তোমার শ্বশুরবাড়ীর প্রতীক, অর্থাৎ তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁরা কি মনে করতেন! স্বামী হিসেবে 'তুমি' শব্দটা প্রয়োগ করোনি, কেন না, তুমিও যা মনে করছ, আমিও তাই মনে করছি, মানে, টাকার কথাটা ওরা সবাই ভুলে মেরে দিয়েছে।"

আভা বললেন, "ইস্, মনোবিকলনে তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা তো! এবার থেকে আমায় ভয়েই মরতে হবে।"

"তার মানে আমি যা বিশ্লেষণ করলাম, সেটা সত্যি ব'লে স্বীকার করলে। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোনো। সাধারণতঃ স্বামীর চেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীরা লোক খারাপ হয়। তাদের উদারতা কম, দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ, এবং বরপক্ষীয় বলে Superiority Complex খুব বেশি। সুতরাং—"

বাধা দিয়ে আভা বললেন, "খবরদার! তুমি আমার শাশুড়ীর সম্বন্ধে কিছু বলতে পাবে না। শ্বশুরকে আমি দেখিনি, কিন্তু শাশুড়ীকে জানি। তুমি তাঁর কোনো গুণ পাওনি, তুমি তাঁর ছেলে হবার যোগ্যই নও।—"

এবার বাধা দিয়ে আমি বললাম, "তা জানি, তা জানি শতাধিক বার তুমি তা বলেছ। কাজেই, তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে গেলে। এখন চুপ করো।"

গৃহিণী বললেন, "আমি তো চুপ করেই আছি।" এবং তিনি যে চুপ করে আছেন তার প্রমাণস্বরূপ বাড়া এক ঘণ্টা ধরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তর আক্কেলের অভাব, দ্বিতীয় ভ্রাতা বসন্তর হঠকারিতা এবং আমার সর্বকার্যে শোচনীয় অপটুতা বারংবার উল্লেখ ক'রে বললেন। সমস্ত পরিস্থিতিটার সমষ্টিগত বিচার করলে না হেমন্ত, না বসন্ত, না আমার পক্ষে সেটাকে গৌরবময় বলা চলবে। আমাদের বাঙালী সমাজ ছাড়া বাকির বিশ্বে কেউই একে আমাদের পুরুষ মানুষদের পক্ষে খুব গৌরবময় বলবে না। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতিকে নমস্কার, এই যে দীর্ঘ সময়টি আমি চুপ করে চোখ বুজে অতিবাহিত করলাম এর সঙ্গে কোনো কাল্পনিক স্বর্গসুখের বিনিময় করতেও আমি পারতাম না। জানি না, একথা আর কেউ বুঝবে কি না, কিন্তু যে বাঙালী সে নিশ্চয় বুঝবে।

যাই হোক, ভগবানের অসীম দয়া, অবশেষে একদিন বসন্তর জ্ঞান ফিরে এল। সম্বিত ফিরে পেয়েই সে নানা কথা জিগ্যেস করতে চাইল, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছেন তার কথা কওয়া বারণ। আভার ঠোঁটের তর্জনী হেলানো শাসনের ইঙ্গিতে তার কথা বলা আর হ'ত না, কেবল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকত মুখের পানে।

একদিন ডাক্তার বন্ধু ব'লে গেলেন, আর ভয় নেই। ভয়ের সীমানা পার হয়ে বসন্ত এখন নির্ভাবনার তীরে উপনীত হয়েছে। আমি সানন্দে হেমন্তকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম। [ক্রমশঃ।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে ক্লোরোফিলের জীবাণু এবং গন্ধনাশকারী কার্য্যকারিতার তীব্র সমালোচনা নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গবেষক এবং বিজ্ঞানী মহলের এক বৃহৎ অংশ সংবাদপত্রে বহুল-প্রচারিত ক্লোরোফিলের গুণাবলীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সর্ব্ব-সমর্থিত না হওয়ার দরুণ ক্লোরোফিলের যে মর্য্যাদাহানি ঘটেছিল, সাম্প্রতিক এক গবেষণার ফলাফলে আশা করা যাচ্ছে তার কিছুটা পুনরুদ্ধার হবে। টেডিংটনের ডিপার্টমেণ্ট অফ সায়াণ্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের রাসায়নিক গবেষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ক্লোরোফিল বাতাস থেকে সামান্য কিছু পরিমাণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নিঃসন্দেহাতীতরূপে আমরা বিশ্বাস করতে পারি, ক্লোরোফিলের সামান্য গন্ধনাশক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।

এই আবিষ্কার ক্লোরোফিল ব্যবহারের নতুন কয়েকটি দিকও খুলে দিয়েছে। ধাতব দ্রব্যাদি বাতাসের হাইড্রোজেন সালফাইডের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উক্ত ধাতুর সালফাইডে পরিণত হয়, তাই ঐ সব পদার্থও ক্লোরোফিল সমন্বিত কাগজের আবরণ দিয়ে সংরক্ষণের চিন্তাও অনেকে করছেন। এই ভাবে আবরিত হলে দেখা গেছে, যথেষ্ট পরিমাণে হাইড্রোজেন সালফাইড যুক্ত বাতাসেও, রূপা এবং তামার দ্রব্যাদির ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। দোকানের 'শো'-কেসে প্রদর্শনের জন্যও ধাতব দ্রব্যাদি এই প্রকার কাগজের ওপর রাখা যেতে পারে।

* * * *

মাটীর তলা দিয়ে পাইপ-লাইন প্রত্যেক সহরেই জল সরবরাহ করে। এই সব পাইপ যাতে ধাতব ক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জলকে বাইরের সংস্পর্শে এনে অস্বাস্থ্যকর করে না তোলে, তার দিকে সহর-কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখেন। মাটীর তলাকার পাইপ-লাইনকে ক্ষয় নিরোধ করবার জন্য বিজ্ঞানী মহলেও চেষ্টার অন্ত নেই।

ঐতিহাসিক প্রাচীন সহর সমূহের খননকার্য্য, সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ে গবেষণার এক নতুন পথ নির্দ্দেশ করেছে। হাকেটে (ইয়র্ক) এর একটি স্থানে খননের ফলে অত্যন্ত ভালো অবস্থায় সংরক্ষিত কয়েকটি লোহার দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে এবং টেডিংটনের রাসায়নিক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এর কারণ নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে ঐ স্থানের মাটীতে ট্যানিন জাতীয় একটি পদার্থের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করেছেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ট্যানিন সত্যই মাটীর তলাকার ধাতুক্ষয় অনেকাংশে রোধ করতে পারে। আরেকটি প্রাচীন স্থানেও খননের ফলে অক্ষত ধাতব দ্রব্যাদির সহিত ট্যানিনের উপস্থিতি,—এই পদার্থের ক্ষয়রোধক কার্য্যক্ষমতার সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, অদূর ভবিষ্যতে ট্যানিনের সাহায্যে মাটির তলাকার পাইপ-লাইন ক্ষয়নিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

* * * *

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য চেষ্টা করছেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রটির পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়াতে হয়ে গেছে এবং একে সর্ব্বপ্রথম নিউ সাউথ ওয়েলসের বরফ-ঢাকা পাহাড়ে, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বাঁধ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। মহাজাগতিক রশ্মির পতনের সংখ্যা সহজেই গণনা করার জন্য এই যন্ত্রটির সঙ্গে একটি তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন গাইগার কাউণ্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। ঐ পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে সুড়ঙ্গের মধ্যে এই সংখ্যা গণনার দ্বারা জমির ভর নিরূপণ করা সম্ভব, তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এর ব্যবহারের দ্বারা তাঁরা প্রচুর সময় ও অর্থের অপব্যয় রোধ করতে সমর্থ হবেন।

* * *

ওয়াশিংটনে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির একটি সভায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মৌলিক পদার্থটির আণবিক সংখ্যা ১০১ এবং এটি প্লুটোনিয়াম অথবা ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী ভারী। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সীবর্গের পরিচালনায় সাইক্লোট্রনে এই পদার্থটির সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা রুশীয় বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিভের নাম অনুসারে এই নবাবিষ্কৃত পদার্থটির নামকরণ করা হয়েছে, মেণ্ডেলেভিয়াম। আণবিক শক্তি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ কোন সাহায্য এই পদার্থ থেকে না পাওয়া গেলেও,—আণবিক জগৎ সন্ধানে জ্ঞান লাভের জন্য এই আবিষ্কারের মূল্য খুবই বেশী।

* * *

গাড়ীতে বসে একটু গল্প করা অথবা মন দিয়ে রেডিও শোনার উপায় নেই, বাতাসের শব্দ আপনাকে বিরক্ত করবেই। এই বিরক্তিকর শব্দ নীরব করবার জন্য, শিকাগোর, আমেরিকান হোমক্র্যাফট কোং একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। ঐ যন্ত্র যে কোন চলন্ত যন্ত্রযানে শ্রুতিকটু বাতাসের শব্দকে খুব হাল্কা ফিস-ফিস শব্দে পরিণত করতে পারে, সুতরাং এর সাহায্যে আপনি মোটরে বসেই আরাম করে গাড়ীর রেডিও থেকে গানবাজনা উপভোগ করতে পারবেন। বাতাসের শব্দ নিবারক এই যন্ত্র মরিচাহীন লোহা দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ার জন্য দেখতেও বেশ সুন্দর এবং একে গাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করাও খুবই সহজ কাজ।

* * *

সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

এই বিপুল আয়োজনের প্রধান অংশ অধিকার করেছিল,—বিজ্ঞান-প্রদর্শনী। বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনীর সংখ্যা একত্র ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক কালে ক'লকাতাতে এতো বড় বিজ্ঞান-প্রদর্শনী আর হয়নি। একসঙ্গে বিজ্ঞানের, বিভিন্ন শাখার এই রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন আগে কোন সময়েই ক'লকাতাতে হয়েছে কি না সন্দেহ হয়। প্রদর্শনীর সময়কাল দৈনিক মাত্র ৩ ঘণ্টা, ভালো ভাবে দেখলে ২।৩ দিনেও সম্পূর্ণ প্রদর্শনীটি দেখা সম্ভব বলে মনে হয় না। বিজ্ঞান-প্রদর্শনীটি রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি ১টি শাখায় বিভক্ত।

প্রবেশ-পথের দক্ষিণ দিকে প্রথমেই রসায়ন বিভাগ,—এই ঐতিহাসিক গবেষণাগারের এক অংশেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করেছিলেন,—এই স্থানই ছিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মস্থল। এই উভয় বিজ্ঞানীই সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। রসায়ন বিভাগের প্রবেশ-পথে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক আয়োজনের নমুনা ধারে-কাছে পেলাম না। বেকার ল্যাবরেটরীতে কেবল মাত্র আচার্য্য বোসের short wave generator and detector প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের গৌরবময় ইতিহাসে আচার্য্য বোসের ভূমিকার গুরুত্ব স্মরণ করে তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা উদ্যোক্তাদের একান্ত উচিত ছিল।

রসায়ন বিভাগের প্রদর্শনীটি মোটামুটি বেশ ভালই লাগলো। রসায়নেতিহাসের প্রদর্শনীটি খুবই অভিনব, এবং এ ধরণের আয়োজন ক'লকাতাতে বোধ হয় এই সর্ব্ব প্রথম। কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় যে প্রাচীন ভারতীয় রসায়নেতিহাস প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে, এই প্রদর্শনীটি সম্পাদিত হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে। বিজ্ঞান ও সভ্যতা পারস্পরিক সহায়তার ওপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার গর্ব্ব আমরা করি কিন্তু ঐতিহ্যময় বিজ্ঞানেতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। সুতরাং এই বিশেষ অংশের জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ সকলের প্রশংসাভাজন হবেন। এ ছাড়া রসায়ন বিভাগের প্রদর্শনীর মধ্যে ডাঃ সহায়রাম বসু কৃত একটি ঔষধের নমুনা এবং ডাঃ নির্ম্মলেন্দু রায় এবং ডাঃ গৃহপতি মিত্র কর্তৃক ভারতীয় বেরিল থেকে বেরিলিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতির প্রদর্শনী খুবই উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রায় ও ডাঃ মিত্র উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারের অন্যতম অবদান, তাই শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর মূল্য অনেক বেশী। এই পদ্ধতি কার্য্যকরী করার প্রধান সুবিধা যে, এর জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ভারতবর্ষেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

প্রদর্শনীটির অন্যান্য বিভাগও বেশ চিত্তাকর্ষক। তাদের বিভিন্ন শাখার তথ্য পরিবেশনের আয়োজন থেকে মনে হয়, এর থেকে দর্শক-সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। অবশ্য, সমগ্র প্রদর্শনীটির বিভিন্ন বিভাগে যন্ত্রপাতির সমারোহ যথেষ্ট বেশী হওয়ায় জন্য অনেক ক্ষেত্রে এর মূল্য সাধারণ দর্শকের কাছে কমে গেছে। ভূগোল বিভাগের প্রথম কক্ষেই যে ভাবে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি আঁকবার চেষ্টা হয়েছে তা সম্বর্দ্ধনার যোগ্য। শারীরতত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্ব বিভাগদ্বয় যদিও প্রবেশ-দ্বার থেকে অনেক দূরে, তবু প্রদর্শনীর আকর্ষণী শক্তিতে সেখানেও জনসমাগম কম হচ্ছে না।

শারীরতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীসমূহ Nutrition বিভাগে অবস্থিত এবং সাধারণ লোকের কাছে এই বিভাগের আকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এই অংশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, তাদের প্রকৃতি এবং প্রয়োজন সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বয়স অনুপাতে বিভিন্ন ব্যক্তির কি ধরণের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন যে কতো বেশী, তা দর্শক-সাধারণের জানবার আগ্রহ থেকেই উপলব্ধি করা গেল। বহুমূত্র রোগের কারণাবলীর প্রদর্শনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সত্যি কথা বলতে কি, গ্যামাক্সিন কি ভাবে তৈরী হয় অথবা ক্লাউডস্ চেম্বারের প্রদর্শনীর চেয়ে এই ধরণের জ্ঞানবর্দ্ধক তথ্যাবলী পরিবেশনের সার্থকতা সাধারণ দর্শকের কাছে অনেক বেশী।

শারীরতত্ত্বের Experimental বিভাগে, একটি জীবন্ত বিড়ালের রক্তচাপ রেকর্ড করার প্রদর্শনীটি খুবই নির্ম্মম। গবেষণা বা শিক্ষার খাতিরে প্রাণিহত্যা করা চলতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রদর্শনীর খাতিরে একটি অসহায় প্রাণীর ওপর অকথ্য অত্যাচার খুবই পীড়াদায়ক! তাছাড়া এই প্রদর্শনীটির মূল্যও এমন কিছুই নয়, যার থেকে দর্শকরা কোন বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যাই হোক, সব দিক দিয়ে বিচার করলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, শারীরতত্ত্ব বিভাগের প্রদর্শনী সমূহ যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে।

পরিশেষে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ বিষয়ে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন বোধ করছি। পৃথিবীতে এক কোষের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই এককোষী এ্যামিবা আজ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এই বিরাট প্রাণিময় জগতের সৃষ্টি ঘটিয়েছে। এই বিভাগের প্রথম কক্ষেই বিরাজ করছে 'এ্যামিবা থেকে মানুষ' এই ক্রমবিকাশের নমুনা ও স্বরূপ। জীবনকে সর্ব্বপ্রথম আশ্রয় দিয়েছিল জীবকোষ, কিন্তু জীবনের অগ্রগতির গবেষণায় উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের মারাত্মক আঘাতে সেই ধাত্রী জীবকোষ আজ বিপন্ন। এই বিভাগ তাই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সতর্কবাণী ঘোষণা করছে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিরুদ্ধে। অপর একটি কক্ষে মানুষের উপকারী এবং অপকারী পোকা-মাকড় সমূহের প্রদর্শনীগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, এই কলেজে অপেক্ষাকৃত পরে সম্প্রসারিত হয়েছে, তবু সাফল্যের বিচারে মনে হয়, সমগ্র অনুষ্ঠানে এ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

কম-বেশী ১০টি বিভাগ সমন্বিত সাম্প্রতিক কালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর এই ব্যাপক সমাবেশ এবং তৎসঙ্গে মূল্যবান কলাপ্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য কর্ম্মকর্তারা সর্ব্বশ্রেণীর দর্শক-সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

খগেন্দ্রনাথ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবন-সংগ্রাম, রবীন্দ্র-কাব্য।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র—শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক। জন্ম—দর্জিপাড়ার মিত্র-বংশে। শিশু-সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক 'ভুবনেশ্বরী পদক' পুরস্কার লাভ (১৩৬০)। গ্রন্থ—মহাত্মা গান্ধী, রূপতৃষ্ণা (উপ); অনুবাদ গ্রন্থ রেজারেকশান, আমার ছেলেবেলা, পৃথিবীর পথে, যৌবনস্মৃতি (গোর্কি), গোর্কির ডায়েরী, গোর্কির ছোট গল্প, টুর্গেনিভের ছোট গল্প, আমার জীবন (ইসাডোরা ডানকান); (কিশোর পাঠ্য)—লাষ্ট ডেজ অফ পমপেই, হাঞ্চ ব্যাক অফ নৎরদাম, বেনহুর, আঙ্কল টমস কেবিন, ফোর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্সি, ব্ল্যাক অ্যারো, মানচু সেনের অ্যাডভেঞ্চার, কিং সোলেমনস্ মাইন, ছোটদের গোর্কির মা, গোর্কির ছেলেবেলা, ছোটদের বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন, চীনদেশের রূপকথা, ভুতুড়ে পাখি, এ টেল অফ টু সিটিজ, সিংহের থাবা, লাল ফৌজের কীর্তি কাহিনী ইত্যাদি।

খায়রননেছা খাতুন—শিক্ষাব্রতিনী। জন্ম—পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের মুন্সীবাড়ী। গ্রন্থ—সতীর পতিভক্তি।

খোন্দকার নজীর উদ্দীন আহম্মদ—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—খাতক (সাপ্তাহিক, ফরিদপুর পাংসা)।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—সাময়িক পত্রসেবী ও গ্রন্থকার। কর্ম—শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটর। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনা—বাঙ্গালা গেজেটি প্রেস বা আপিস (১৮১৮—ইহাই বাঙালী স্থাপিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র)। প্রকাশক—বাঙ্গালা গেজেটি (প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, ১৮১৮, ১৪ই মে হইতে ১ই জুলাই)। গ্রন্থ—Grammar, in English and Bengali (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৭), দ্রব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসার্ণব (১৮২০?); সম্পাদিত গ্রন্থ—অন্নদামঙ্গল (১৮১৬), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮২০)।

গঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—উচিত বক্তৃতা (পাক্ষিক, মুর্শিদাবাদ, ১৮৭৪)।

গঙ্গাচরণ সেন—সাময়িক পত্রসেবী। জন্ম—যশোহর। সম্পাদক—গোয়ালপাড়া হিতৈষিণী (সাপ্তাহিক, গোয়ালপাড়া, ১৮৭৬-৭৮)।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—পণ্ডিত। জন্ম—হালিসহর কুমারহট্ট গ্রামে। মৃত্যু—১৮৪৪ জুন। কর্ম—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪০)। গ্রন্থ—সেতুসংগ্রহ (১৮৩৫), খোসগল্পসার (১৮৩১)।

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। অধ্যাপক। সম্পাদক—নববিভাকর (সাপ্তাহিক, ১২৮৬-১২৯৩)।

গঙ্গানারায়ণ—গ্রন্থকার। জন্ম—কিশোরগঞ্জের যাত্রিখরে। গ্রন্থ—ভাস্কর-পরাভব, শুক-সংবাদ, লবকুশের চরিত্র।

গঙ্গানারায়ণ প্রধান—কবি। জন্ম—১২৫৪ বঙ্গ তমলুকের বৈষ্ণবচক গ্রামে। মৃত্যু—১৩০০। কাব্যগ্রন্থ—কাব্যকদম্ব (১২৮৭ বঙ্গ)।

গঙ্গারাম বিদ্যাবাচস্পতি—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—দশকুমার চরিত (পদ্যানুবাদ)।

গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—কালনায় বাকুলিয়ায়। মৃত্যু—১৮৬৬ খৃঃ জানুয়ারি। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণের কনিষ্ঠা কন্যা বরাঙ্গী দেবীকে বিবাহ করেন। কাব্যগ্রন্থ—চিত্তসন্তোষিণী (১৮৬৩), কৃষ্ণবিলাস (১৮৬৪), ঋতুদর্পণ (১৮৬৪)।

গরীবুল্লা—মুসলমান কবি। জন্ম—দক্ষিণরায় বালিয়া হাফেজপুর। জীবৎকাল—১৭১২ খৃঃ। কাব্যগ্রন্থ—ইউসুফ-জুলেখা, আমীর হামজা।

গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ। গ্রন্থ—গোধন, লক্ষ্মী (নাটক), উমা ও রমা।

গিরিশচন্দ্র বসু, আচার্য—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৫৩, ২১এ অক্টোবর বর্ধমান জেলায় বেড়ুগ্রামে। মৃত্যু—১৯৩১, ১লা জানুয়ারি। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ—বঙ্গবাসী কলেজ (১৮৮৭), কৃষি গেজেট প্রকাশক (১৮৮৫)। গ্রন্থ—ভূতত্ত্ব (১৮৮১), বিলাতের পত্র (১৮৮৩), ইউরোপ ভ্রমণ (১২৯১), ইংরেজ-চরিত বা জন বুল, ১ম (১২৯২), ২য় (১২৯৩), উদ্ভিদ-জ্ঞান, ১ম (১৩০০), ২য় (১৩০২): পাঠ্য পুস্তক—কৃষিসোপান (১৮৮১), কৃষিপরিচয় (১৮৯০), প্রকৃতি-পরিচয় (১৮৯১), কৃষি-দর্শন (১৮৯৮)।

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহের আশুজিয়া। গ্রন্থ—প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য—গীতিকার। জন্ম—টাঙ্গাইলের কুটরীয়া গ্রামে। গ্রন্থ—কুসুমাঞ্জলি (গীত)।

গিরিশচন্দ্র সেন—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—মহিলা (মাসিক, ১৩০২)।

গিরীন চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—আন্দামান, ১৯১৬। প্রতিষ্ঠাতা—পূরবী পাবলিশার্স। গ্রন্থ—মানুষ কি করে হলো, ইতিহাসের গল্প, অমর ভারত গড়লো যাঁরা, রুশ বিপ্লব, সোনার দেশ সোভিয়েট, নূতন চীনের নূতন জীবন, সফল স্বপ্ন (অনুবাদ), রক্তে লেখা।

গিরীন্দ্রকুমার সেন। অধ্যাপক। গ্রন্থ—ধনবিজ্ঞান।

গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী—সাহিত্য-সেবিকা। সম্পাদিকা—ধোলপুর (রাজপুতনার সমাজ-চিত্র)।

গিরীন্দ্রনাথ দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—অবসর-মেদিনী, কবিতাবল্লরী, সংক্ষিপ্ত মাতৃজীবন, The Brahman and Kayasthas of Bengal, History of the Hatwa Raj.

গিরীন্দ্র বেদান্তরত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহের নেত্রকোণা শিবপুর। গ্রন্থ—জন্মান্তর-তত্ত্ব।

গীতা বসু—মহিলা সাহিত্যিক। গ্রন্থ—চৈতী ফসল। সম্পাদিকা—মহিলা মহল (পাক্ষিক, ১৩৫৬)।

গুরুচরণ সরকার—কবি। জন্ম—পাবনার মালঞ্চি গ্রামে। গ্রন্থ—রাধাকৃষ্ণ লীলা।

গোপালচন্দ্র কবিকুসুম—কবি। জন্ম—যশোহরের লক্ষ্মীপাশায়। কাব্যগ্রন্থ—কুসুমিকা, কমলবাসিনী, মনোখালির ইতিহাস।

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮২৩, ২৪-পরগনা ন-পাড়ায়। মৃত্যু—১৯২৭। যাত্রাদলের পালার জন্ত বহু গীতাদি রচনা। গ্রন্থ—পঞ্চপ্রসূন, ২ খণ্ড, নপাড়াদর্পণ, পদাবলী।

গোপালচন্দ্র দত্ত—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—কল্পনা-লতিকা (মাসিক, ১২৮৬)।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—নির্বাণ-কানন ও জ্ঞান, জগতের সহিত মানবের সম্বন্ধ।

গোপালচন্দ্র বসু-বর্মা—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—ভারতবর্ষীয় আর্য-পত্রিকা (মাসিক, ১২৮২)।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। সম্পাদক—জ্ঞান ও বিজ্ঞান (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ)।

গোপালচন্দ্র সেন—দার্শনিক। জন্ম—১৮১৬ কলিকাতা। গ্রন্থ—দর্শনপরিচয় (১৩৪৬)।

গোপাল হালদার—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০৮, ২৮এ মাঘ বিক্রমপুরের বিদগাঁও গ্রাম। মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও কর্মী। গ্রন্থ—একদা (১৯৩৯), সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙ্গে লেখা, এযুগের যুদ্ধ, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, বাংলা-সাহিত্যের রূপরেখা, ভাঙন, স্রোতের দীপ, অন্ত দিন, পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তেরশ' পঞ্চাশ, ধূলিকণা, ভূমিকা (১২৬১) প্রভৃতি।

গোপীমোহন সর্বাধিকারী—কবি। জন্ম—রাধানগর। গীতিনাট্য—ভক্তিতরঙ্গিণী, শ্রীকৃষ্ণতরঙ্গলীলা, ধ্রুবচরিত্র।

গোপী ভট্টাচার্য—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৩৩২, ২৫এ অগ্রহায়ণ। গ্রন্থ—যাযাবরী (উপ)। সম্পাদক—উদয়শ্রী (মাসিক)।

গোপেন দত্ত। গ্রন্থ—বাংলা সংক্ষেপ লিপি।

গোপেন্দ্রলাল রায়। জন্ম—পাবনা কালাচাঁদপাড়া। গ্রন্থ—মুস্তাকা কামালপাশা।

গোপেশচন্দ্র দত্ত—কবি। জন্ম—১৩২৫, ১১এ জ্যৈষ্ঠ মৈমনসিংহ কালিকাপুর। গ্রন্থ—মধুমঞ্জরী (১৩৪১), বনবাঁশরী (১৩৪৬)।

গোবিন্দচন্দ্র গুহ—সাংবাদিক। জন্ম—মৈমনসিংহ। কর্ম—শিক্ষকতা, হার্ডিঞ্জ স্কুল। সম্পাদক—বিদ্যোন্নতিসাধিনী (মাসিক, ১৮৬৫, সেরপুর, মৈমনসিংহ)।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ বড়হিত গ্রামে। গ্রন্থ—পুবাইল কাহিনী, কবিতা-রত্নাবলী, রামলীলা।

গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ। জন্ম—পাবনার পোতাজিয়ার নন্দী-বংশে। গ্রন্থ—মৃন্ময়ী, লীলাবতী, অষ্টাদশবিদ্যা।

গোবিন্দরাম দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—সতীরঞ্জন।

গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী—সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্ম—১২৫৫, ২৩এ অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১২৮৮, ১৮ই শ্রাবণ। গ্রন্থ—বঙ্গবালা (উপ), Pericles Prince of Tyre-এর সংস্কৃতানুবাদ।

গোলোকচন্দ্র মজুমদার—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার বড়হিত। কাব্যগ্রন্থ—কবিতামুকুর, কাব্য ও কবিতা।

গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়)—পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দীতে মহীপাল দীঘির নিকট স্থানে। মৃত্যু—১৮৩০। গ্রন্থ—হিতোপদেশ (১৮০১)।

গোলাম নবী, সৈয়দ—গ্রন্থ—রসলীন, অঙ্গদর্পণ (১৭৩৭ খৃঃ), রসপ্রবোধ।

গৌতম সেন। গ্রন্থ—মদনানন্দের দার্জিলিং যাত্রা, যুগবহ্নি, ধারাবাহিক, প্রিয়া ও জননী, প্রিয়া ও মানসী, ধূসর ধরণী, পল্লবের চার অধ্যায় (শচীন বসু সহ)।

গৌরকিশোর কর। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ, কথাবলী, বলিদান, সরলা ও স্বচ্ছস্ফটিক।

গৌরচন্দ্র নাথ। জন্ম—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—স্যার আশুতোষ।

গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—পার্লবাক (ঐ), মাদাম কুরী (ঐ)।

গৌরগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—সন্ধ্যাতারা ও বুকের ঋণ।

গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ কার্তিক বর্ধমান জেলার মেজেডিহী গ্রামে। পিতা—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ম—সাহিত্যসেবা, সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ, উপন্যাস—বিজয়ী প্রেমিক, পরকীয়া, হে নারী রহস্যময়ী, বিপ্লবী তরুণী, বিজন নদীর তীরে; বঙ্কিমের গল্প, ৩ খণ্ড, মিথিলায় ভগবান (নাটক); কাব্য—পথের গান, অবাক, প্রবঞ্চিতা; কিশোর সাহিত্য—জীবন জেগেছে যার, যুদ্ধ জয়ের পর, দুর্যোগের মাঝে, বিশ্বজিতের বিশ্বজয়, নীলসাগরের পারে, দৈত্যে ও মানুষে, মামাতো ভাই, নীলাচলের রাজকুমার, স্বর্গের দেবতা, কালগ্রাসে কালযবন, পুরাণের আলো, পুরাণের গল্প, ছোটদের কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মহারণ, কলিকা, বঙ্গ আমার জননী আমার, সুভাষচন্দ্র।

গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত, স্বামী মহারাজ। জন্ম—যশোহর জেলায়। মৃত্যু—১৩৫১ ৮ই জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থ—কৃপাকুসুমাঞ্জলি (১৩৪২), সাধনকুসুমাঞ্জলি (১৩৪৭), শ্রীগুরুতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি (১৩৪৭), শ্রীশ্রীনীলাতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি (১৩৪৮), শ্রীগুরুবৈষ্ণবভক্তি কুসুমাঞ্জলি (১৩৪৭)।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। জন্ম—১৩২০। গ্রন্থ—ছোটদের টয়লার্স অফ দি সী, ছোটদের লাষ্ট ডেজ অফ দি মোহিক্যান্স, ছোটদের চিলড্রেন অফ দি নিউ ফরেষ্ট, ধূসর পথের ধুলো (উপন্যাস)।

গৌরীশঙ্কর রায়—উৎকল-প্রবাসী সাংবাদিক। প্রতিষ্ঠাতা—কটক টাউন হল, 'উৎকল-দীপিকা' সংবাদপত্র। ইনি আধুনিক উৎকলের স্রষ্টা নামে খ্যাত। সম্পাদক—উৎকল-দীপিকা (উৎকলের প্রথম সংবাদপত্র)।

গৌরীহর মিত্র। জন্ম—১৯০১ সেপ্টেম্বর মাসে বীরভূম জেলায় সিউড়ীতে। মৃত্যু—১৯৪৭ অক্টোবর। বিখ্যাত 'রতন লাইব্রেরীর' কর্ণধার। গ্রন্থ—বীরভূমের ইতিহাস ১ম (১৯৩৬), ২য়

(১১৩৮), ভারত-কথা, চরিতকীর্তন *(১১৪১), বিজ্ঞানের বাহাদুরি, জ্ঞানের জাহাজ, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম—নদীয়া জেলার বাঘআঁচড়া। গ্রন্থ—(শিশুপাঠ্য) ভূতের খেলা, স্বদেশ রেণু, কীর্তিসখা।

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। জন্ম—মৈমনসিংহের বাড়ুরী গ্রামে। মৃত্যু—১১৫১। গ্রন্থ—সত্যের সন্ধান।

চন্দ্রভূষণ শর্মামণ্ডল—কবি। জন্ম—১২৭০ বর্ধমান জেলার যোগুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৭। গ্রন্থ—প্রবাদ-পদ্ম, তবে আমার হবে কি ? পত্রোত্তরাষ্টক কাব্য, মনোরমা ধারাপাত।

চন্দ্রশেখর কর। গ্রন্থ—অনাথ বালক, ছ' আনাজ, পল্লীর আলো, পাপের পরিণাম, সুরবালা।

চন্দ্রশেখর বসু। জন্ম—১২৪০। মৃত্যু—১২১২ বঙ্গ। গ্রন্থ—বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি।

চন্দ্রাবতী—মহিলা কবি। জন্ম—১৫৫০ খৃঃ মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে পাতুয়ারিয়া গ্রামে। পিতা—দ্বিজ বংশীদাস ভট্টাচার্য। মাতা—সুলোচনা। গীতিগ্রন্থ—রামায়ণ, মহুয়া (কাব্য), কেনারাম, মনসামঙ্গল (১৫৭৫)।

চরণদাস ঘোষ। জন্ম—১৮১৫ খৃঃ ২১ মে বর্ধমান জেলার বাইতিপাড়া গ্রামে। প্রথম মুদ্রিত রচনা কবিতা 'স্বপ্নের আলো' (বাঁশরী পত্রিকায়)। এশিয়্যানি পত্রিকায় বহু ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—উপন্যাস—নিরক্ষর, দান, নাগরিকা, কামরূপ, জেপান্তর, ছন্নছাড়া, হিঁদুর বউ, মণ্টুর মা ; গল্প—সুহাস। সম্পাদক—পাঠশালা (মাসিক, ১৩১৬ বঙ্গ ভাদ্র—১৩৬০ বঙ্গ শ্রাবণ)।

চারুচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। ভারতীয় সিবিল সার্ভিসে কর্ম। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত। গ্রন্থ—কুরুক্ষেত্র, দেবাকু, মায়া।

চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে। গ্রন্থ—Studies in Hindu thought.

চারুচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭১। মৃত্যু—১৩৫৭ বঙ্গ ২০এ বৈশাখ। গ্রন্থ—নারী (পাশ্চাত্য সমাজ ও হিন্দু সমাজ)।

চারুচন্দ্র রায়। জন্ম—যশোহর জেলায় বনগ্রামে। সম্পাদক—পল্লীবার্তা।

চারুচন্দ্র রায়। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—কমলাকান্তের পত্র, কালনিদ্রা, বটপদ, জ্যাকামী, চন্দননগরের যুদ্ধ, শরৎ সমালোচনা, শেষ প্রশ্ন, আত্মজীবনী, Le commerce particulier des Francais an Bengali, my literary reminiscences.

চারুবালা দেবী। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ। গ্রন্থ—মল্লিকা (১১১৩)।

চিত্তরঞ্জন দেব—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩২১ বঙ্গ ফরিদপুর জেলায় অলগ্রামে। গ্রন্থ—পল্লীগীত ও পূর্ববঙ্গ, সোনালী আলো (উপ)।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১৮। ১৬ই অগ্রহায়ণ মৈমনসিংহের নেত্রকোনা গ্রামে। গ্রন্থ—নেতাজীর

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। জন্ম—ফরিদপুর। সম্পাদক—উদয়ন (ত্রৈমাসিক, ১৩৫৫)।

চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা জেলায় বেজগাঁও সন্নিমার। গ্রন্থ—একমেবাদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

চিন্ময়ী দেবী। সম্পাদিকা—বঙ্গনারী (মৈমনসিংহের প্রথম মহিলা পত্র, ১৩৩০)।

ছমিরুদ্দীন আহম্মদ। গ্রন্থ—ইসলাম ইতিবৃত্ত।

ছলিম সেখ—পল্লীকবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার সিংহের বাঙ্গালা। গ্রন্থ—বাদসার তামসা।

জগচ্চন্দ্র রায়। জন্ম—পাবনা জেলার বোয়ালমারি। গ্রন্থ—ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিধান, গৃহ-চিকিৎসা।

জগৎচন্দ্র চৌধুরী—পল্লীকবি। জন্ম—মৈমনসিংহের বওলা গ্রামে। মৃত্যু—১১২৬। গ্রন্থ—মনসামঙ্গল।

জগৎতারিণী দেবী—মহিলা কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৭৩। মৃত্যু—১৩৩২, ৩১ জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুর জেলায় কাড়গ্রামে। ইনি 'দুঃখিনী স্ত্রীলোক', 'দীনা বচম্বিত্রী', 'বনবাসিনী' ছদ্মনামে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেন। গ্রন্থ—বালিকা বিকাশ, শোভা, বাসিফুল, সঙ্কট, অশোকবনে সীতা, বনফুল।

জগৎমোহিনী দেবী। জন্ম—১১শ শতাব্দীর শেষ পাদে। মৃত্যু—মেদিনীপুর কেরাণীটোলায়। খৃষ্টধর্মাবলম্বিনী। শিক্ষা—ভারতে ও বিলাতে। গ্রন্থ—ইংলণ্ডে সাত মাস।

জগদানন্দ ঠাকুর—কবি। জন্ম—১৮শ শতকীর প্রথম পাদে (১৭১০-২০) বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের ঠাকুর পরিবারে। মৃত্যু—১৭৮২ খৃঃ (আনু)। গ্রন্থ—পদাবলী।

জগদ্বন্ধু প্রভু—সাধক কবি। জন্ম—১২৭৫, শকের ১৭ই বৈশাখ মুর্শিদাবাদ জেলায় ডাহাপাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—চন্দ্রপাতা, হরিকথা, শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্তন, পদাবলী, বিবিধ সঙ্গীত, ত্রিকালগ্রন্থ।

জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। জন্ম—মৈমনসিংহ। সম্পাদক—বিজ্ঞাপনী (সাপ্তাহিক, মৈমনসিংহের সর্বপ্রথম সাময়িক পত্র, ১৮৬৬)।

জগন্নাথ দাশ। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের ধানিশ্বর। গ্রন্থ—দুর্গাপুরাণ, নিগম, হাড়মালা।

জগন্নাথ সিংহ—গীতিকার। জন্ম—সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজবংশে। গ্রন্থ—জগদ্ধাত্রী গীতাবলী।

জনেন্দ্রনাথ প্রধান। জন্ম—১২১০ বঙ্গ মেদিনীপুরের বৈষ্ণবচক গ্রামে। পিতা—পার্বতীচরণ প্রধান। গ্রন্থ—সোফিয়া বেগম, সম্বন্ধ নির্ণয় (লালমোহন বিদ্যানিধিকৃত) গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদের বংশধারা।

জনমেজয় মিত্র—কবি। ইনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা। গ্রন্থ—নারদপুরাণোক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা (১২৬১), মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুক্রমণিকা (১২৬৬), সঙ্গীত-রসার্ণব (১২৬৭)।

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। জন্ম—১১১৮ পাবনা জেলায় জমিয়তা গ্রামে। গ্রন্থ—বাস্তির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ, জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ; অনুবাদ গ্রন্থ—গ্রেট হাঙ্গার (জোহান বয়ার), পাওয়ার অফ এ লাই (ঐ), কিরকিবাকক, পিনোসিয়া। [ক্রমশঃ।

শিকারী-জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

মাঘ মাসের মাঝামাঝি—শহর থেকে শীত বিদায় নিলেও পল্লীর বুকে তখনও বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে।

নীরদবরণের বেজায় অভিলাষ আমার শিকার দেখা—।

একদিন ভোরে এসেই প্রথম উক্তি—আপনার শিকারের খবর শুনে—মাইরি বলছি—আর থাকতে পাল্লাম না।

ইনি বৃটিশ আমলের রাজবন্দী, সে সময় লালগোলা থানার এলাকায় অন্তরীণ ছিলেন। লক্ষ্মণ যেমন সীতাকে গণ্ডী দিয়ে গিয়েছিলেন, তদানীন্তন সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এঁরও চার দিকে একটা দাগ টেনে দিয়েছিলেন—তাই বাধ্য হয়ে নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই তাঁকে ঘোরাফেরা করতে হোত।

এঁর সম্বন্ধে আর একটা কথা না বল্‌লে চরিত্রের কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাজবন্দী হলেও, তাঁর প্রাণের রসকস শুকিয়ে যায়নি—"ফূর্ত্তির প্রাণ গড়ের মাঠ" গোছের আড্ডাধারী লোক—স্থানে অস্থানে চোখ ঘুরিয়ে তাঁর চটুল মুখে "মাইরি আর কী" বুলিটা হরদম লেগেই আছে। এই দারুণ শীতে ওষ্ঠদ্বয় ফেটে চৌচির—হাসতেও পারেন না, ঠোঁট দুটি গোল করে কথা বল্‌তে হয়—বিস্তারের উপায় নেই।

আর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি সাঙ্গ করে, অন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন আমাদের সুধীর রায়—ওরফে বেণু বাবু—সম্বন্ধে আমার বড়কুটুম। ইনি ধেনু চরান না বটে তবে গোঠে গোঠে বেণু বাজিয়ে বেড়ান। পকেটে বাঁশের বাঁশীটা পড়েই থাকত। সম্প্রতি শ্বশুরের দ্বিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করে দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছেন। "হনিমুন ট্রিপে" বেরিয়ে মাসাবধি কাল আমার এখানেই সস্ত্রীক অতিথি। শুধু স্ত্রীর ভারই গ্রহণ করেন নি, তার ওপরে শিকারের বাতিকটাও তার স্কন্ধে নতুন ভর করেছে। দর্শনে এম্ এ, তবে ইনি শুধু শিকার-দর্শন করেই ক্ষান্ত হ'ন না। দ্বিচক্র যানে বন্দুকটা ভাল করে বেঁধে নিয়ে প্রায়ই বেরিয়ে যান—আর আশে-পাশে হরিতাল, ঘুঘু, শামকোল, খয়রা, মাণিকযোড় প্রভৃতি অনায়াসলভ্য খাদ্য-পক্ষীগুলি সংগ্রহ করে আবার সেগুলি সাইকেলের ডাণ্ডায় বেঁধে সানন্দে ফিরে আসেন। রান্নার পর উপাদেয় ভোজ্যগুলি উত্তম মধ্যম ভোজনান্তে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

সদর দরজায় পাটহাতীটা সুগম্ভীর বৃংহণে জানিয়ে দিলে শিকারে যাবার জন্যে সেও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারপরই সকলের হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ—দেওয়ান-সরাইয়ের দিকে বন্য বরাহ শিকারে যাত্রা!

চেপে বসেই নীরদবরণ জান্‌তে চাইলে—কোথায় যাচ্ছেন—বলুন না মাইরি!

—তোমার সীমানা পেরিয়ে।

প্রথমটা নীরদবরণের খুঁতখুঁতে ভাব—তার পরেই বৃটিশ—কী আর হবে মাইরি, থানায় হাজিরা দিয়েই এসেছি—। আর জানলেই বা—ডোণ্ট কেয়ার্!

বেণু বাবুর অধরে মৃদু হাস্য। নীরদবরণের কণ্ঠে রুদ্র-করুণ রসের সংমিশ্রণ তিনি নীরবে উপভোগ করে যাচ্ছিলেন। দার্শনিক মানুষ কি না, ওঁদের ধাঁচই আলাদা।

রাণা প্রতাপ যেমন তরবারি স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন—'যত দিন না চিতোর উদ্ধার হয়, তত দিন তৃণপত্রে ভক্ষণ করবো'—তেমনি যাত্রাকালে নীরদের সঙ্গে কথায় কথায় আমিও প্রতিজ্ঞা করে বসলাম—'যতক্ষণ না বন্য বরাহ শিকার হয়, ততক্ষণ কদলীপত্রে ভক্ষণ করবো।'

—মাইরি আর কী—আজকে যদি নাই হয়? হাসতে গিয়ে নীরদবরণ ঠোঁট চেপে ধরে। তার সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি—উ-হু-হু-হু।

—বেশ তো, যদ্দিন না হয়, কলাপাতায় খাব—তার হয়েছে কী?

নীরদবরণের ঠোঁট ফাটার দুর্ব্বলতা নিয়ে কাতুকুতু দেবার চেষ্টায় হাত বাড়ালাম।

—মাইরি, নেমে যাব বলছি।

যাই হোক, পাঁচমিশেলী গল্প-গুজবে আমরা দেওয়ান-সরাই কাছারীতে এসে গেলাম।

—চাল, ডাল, দধি, সন্দেশ, ছোটখাটো একটি নধর ছাগ-বৎস প্রভৃতি যোগাড়ের জন্যে হাতীর উপর থেকেই তখনকার মত দশ টাকার দু'খানা নোট ফেলে দিয়ে কর্ম্মচারীকে বললাম—রান্নাবান্না করে রেখো, ফিরে এসেই যেন ছুটো খেতে পাই। আর ভাখো, কলাপাতাও আনিয়ে রেখো, কি জানি যদি—

কথা ক'টি শেষ না করেই নীরদবরণের প্রতি আমার সস্মিত দৃষ্টিপাত।

কাছারী-বাড়ীর সামনের মাঠটা পেরোলেই জঙ্গল। সেখানেই শুয়োরের আড্ডা। প্রায়ই খবর আসে, ফল, মূল, তরি-তরকারী, জমীর ফসল, ওরা সব নির্ম্মূল করে চলে যায়—ভীষণ অত্যাচার!

সেখানে অনেক সাঁওতালের বাস—তবুও নির্ব্বংশ হওয়া দূরের কথা—শুয়োরের পাল দিন দিন বেড়েই চলেছে। কাছারীর পাইক-মৌলাকে বিশ-পঁচিশ জন ভাল তীরন্দাজ সাঁওতাল ডেকে আন্‌তে বলেই আমরা এগিয়ে গেলাম। নীরদবরণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললাম—অগ্নিযুগে তুমি আর কী ছাই বিক্রম দেখালে? এই মৌলা কি বছর তালাক দেয় আর টাটকা নিকে করে আনে—দেখ ত' এখনো কেমন চাঙ্গা হয়ে আছে। এটা চৌথা নম্বর—বুঝলে মাইডিয়ার?—বেহেস্তের পথ তার আটকায় কেডা?

—তাহলে খুব কৰিৎকর্ম্মা লোক বলতে হ'বে, মাইরি!

বেণু বাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—"

ইতিমধ্যে মাঠ পার হ'য়ে জঙ্গল ভেঙ্গে হাতী এগিয়ে যায়—কিছু দূর অগ্রসর হতেই মনে হ'ল, অনেকগুলো জানোয়ার একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল—উপর থেকে কিছুই দেখা গেল না। জঙ্গল নড়া দেখে আন্দাজে গুলী করবার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও করিনি—কী জানি যদি না লাগে তাহ'লেই ভড়কে গিয়ে শিকার দেশ-ছাড়া হয়ে যাবে!

দূর থেকে দেখা গেল শুয়োরগুলো ছুটে একটা অড়হর-ক্ষেতে

করলাম। পথিমধ্যে সাঁওতালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—পুরোভাগে মৌলা।

হাতীর সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে সাঁওতালেরাও ছুটতে থাকে। লাগছিল মন্দ নয়। মাইল দেড়েক পথ পার হয়ে সেখানে পৌঁছুবার আগেই দেখি, শূয়োরগুলো আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড মাঠ পার হয়ে দূরে এক খড়ের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

নীরদবরণের মুখে বিরক্তির চিহ্ন—ভ্রূভঙ্গী করে বলে উঠলো—"শূয়ারকা বাচ্চা বড় জ্বালাতন সুরু করলে মাইরি।"

—সাবাস্ ব্রাদার—গালাগালির এমন একটা যথার্থ প্রয়োগ ইতিপূর্ব্বে শুনিনি।

বেণু বাবুরও অসীম উৎসাহ—না-না:—আজকে এর একটা শেষ বিহিত না করে বাড়ী ফেরা যাবে না।

—জরুর—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—কি বল, শ্যালকপ্রবর?

—জানেন জামাই বাবু—আপন শালাকে শালা বলার দরুণ একজনকে হাইকোর্টে দশ টাকা ফাইন দিতে হয়েছিল?

—তা হোক—নীরদবরণের দেখাদেখি আমারও যথাস্থানে মধুর বাক্য প্রয়োগ করার ইচ্ছেটা বেজায় প্রবল হোল!

বললাম—একটু ভুল হয়ে গেছে—আজ থেকে আর সাধু ভাষায় সম্বোধন না করে খাঁটি দিশী বুলিতেই তোকে ডাকব—ফাইন দিতে হয়, সে'ও ভি আচ্ছা!

খড়ের জঙ্গলটা বেশী বড় নয়—যেখান থেকে সুরু হয়েছে—তার কিছুটা আগেই আমি নেমেই বিপরীত দিকে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীরদবরণ একদিন অনধিকার চর্চ্চা করেছিল—পাখীমারা বন্দুক দিয়ে নাকি কখনই বাঘ, শূয়োর শীকার করা যায় না—তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার জন্যেই ডাকগানটাই সঙ্গে নিয়েছিলাম। নেমে আসবার সময় বলে এলাম—হাতীটা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আসুক আর সাঁওতালেরা যেন দু'ধার দিয়ে এগিয়ে আসে।

ছোট, বড়, মাঝারী, সব সাইজের শূয়োর আণ্ডাবাচ্চা সমেত বেরিয়ে আসতেই আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। পনেরো বিশ হাত দূর দিয়ে একটার পর একটা ছুটে যায়, সব চেয়ে ধাড়ীটাকে মারব বলে বন্দুক ওঠাতেই দেখি, বেশ প্রকাণ্ড আর একটা দাঁতাল খড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, তীরের মত সোজা আমাকেই আক্রমণ করলে। বন্দুকের দুই নলেই 'লিথেল বুলেট' ভরা। ট্রিগার টিপলাম—ক্যাপ চটকে গেল—শুধু একটা 'খট্' শব্দ।

সর্ব্বনাশ!

সেই ভীষণ দাঁতাল মাত্র দু'-তিন হাত দূরে—আমি চট্ করে উঠেই লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেলাম। শূয়োরের গোঁ—ছেড়ে কথা বলে না—সামান্ত গিয়েই বিপুল দেহটা ঘুরিয়ে আবার তাড়া করবার আগেই আমার অপর গুলী তাকে শুইয়ে দিলে।

হস্তিপৃষ্ঠের আরোহীরা এগিয়ে আসে। বেণু বাবুর মহা উল্লাস, নীরদবরণেরও তাই—তবে অনেকটা সংযত—কারণ বেশী হাসাহাসির উপায় নেই—নচেৎ ঠোঁটের যা অবস্থা—হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলবেন।

অতঃপর উভয়ের হস্তিপৃষ্ঠ হতে অবতরণ ও নিবিষ্টচিত্তে শিকার সন্দর্শন।

—মাইরি, এত বড় প্যাঁচালো দাঁত আমি জীবনে দেখিনি—

—তুমি দেখবে কোত্থেকে? আমি এতগুলো শূয়োর মেরেছি—এত বড় দাঁত আমারই চোখে পড়েনি। গুলীটা ফস্কে গেলেই—হিরণ্যকশিপুর মত আমারও উদর ঐ দন্তাঘাতে আজ দু'ফাঁক হয়ে যেত।

—ওঃ, আজ কী বাঁচাটাই বাঁচলেম, মাইরি, সত্যি কথা বলতে কী—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শূয়োর যে রকম তেড়ে এল—ভাবলাম আর বুঝি রক্ষে নেই—আমার গাত্রকম্প উপস্থিত!

—কম্পন থেমেছে?—না আছে এখনও?

সুড়সুড়ি দেবার গোপন ইচ্ছায় আবার হাত চালিয়ে দিলাম।

—মাইরি আর কী—

তড়াক করে লাফিয়ে নীরদবরণের প্রতিদ্বন্দ্বের সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত পশ্চাদপসরণ।

সাঁওতালদের বলে দিলাম—এটাকে আমাদের সঙ্গে ব'য়ে নিয়ে আয়—লালগোলায় দেখিয়ে তোরা নিয়ে যাবি। দাঁত দু'টো কেটে আমায় দিস্। আজ তোদের খুব ফলার পাকবে, না রে? তার সঙ্গে কয়েক-গণ্ডা তাড়ির ঠিলি—কী বলিস্?

কালোমাড়ি সমেত দন্ত বিকশিত ক'রে তক্ষুণি তারা রাজী!

নীরদবরণ আর বেণু বাবুকে বললাম—আমরা পাঁচ-ছ' মাইল

এদিকে এসে পড়েছি—এখান থেকে লালগোলা দু' মাইলেরও কম। ফেরা যাক—কি বল? আর দেওয়ান-সরাইয়ে গিয়ে কাজ নেই।

বেণু বাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই নীরদবরণের ঘোরতর আপত্তি—

—উটি হবেক না মাইরি—নিরামিষ শিকারে আমি নেই। পাঁঠার ঝোল-ভাত না খেয়ে এ শর্মা এক পাও নড়বে না।

নীরদবরণের আর একটি বিশেষ গুণ—লিকলিকে শরীর হলেও, সে একটা ছোটখাটো আস্ত পাঁঠা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে ফেলত। সে বিষয়ে লালগোলায় তার একটা বেশ সুনামও রটে গিয়েছিল। সবাই আশ্চর্য্য হত, ঐ রোগা প্যান্‌পেনে চেহারায় এতগুলি খাদ্য কোথায় রাখে!

তাকে বুঝিয়ে বললাম—এখান থেকে অদ্দূর হেঁটে যাবে—তা যাও—কিন্তু পেট বোঝাই হ'লে আবার ফিরে আসবে কেমন করে?

—মাইরি আর কি! পাশের এই বাঁশঝাড় থেকে দুটো তলতা বাঁশ কেটে রণপায় চলে যাব—আবার ঠিক তেমনি করেই ফিরে আসব—তাসখেলার আড্ডায় আপনার দরবারে ঠিক সন্ধ্যায় দর্শন পাবেন।

দেওয়ান-সরাইয়ের অন্ন আমাদের জুটল না—যখন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত মুহুরীকে আমাদের আহারের পরিপাটি বন্দোবস্তের ভার দিচ্ছিলাম—অলক্ষ্যে ভগবান হেসেছিলেন কি না কে জানে!

হাতীর খাবারের জন্যে ডালপালা কাটতে মাহুতের কাছে সব সময় ধারালো একটা দা থাকেই। তাই নিয়ে সাঁওতালরা গেল বাঁশ কাটতে। আমাদের মাইরি বাবুটিও ঝটিতি অনুগমন করলে—তার রণপা তৈরী করবার জন্যে। স্বদেশীযুগে সব রকম শিক্ষারই সে তালিম নিয়েছিল। এদিকে আমি, আমার সম্বন্ধী দুজনেই গাছতলায় আশ্রয় নিলাম। আড়বাঁশীটায় মুখ লাগাতেই বেণুর হাত দু'টো নামিয়ে দিয়ে বললাম—"আর বাঁশী বাজায়ো না শ্যাম। এটা তোমার ব্রজধাম নয়—যে কেউ ছুটে আসবে!"

এমন সময় সাঁওতালেরা মাহুতের কাছে দড়ি চাইতেই সে হাওদার তলা থেকে এক গাছা মোটা দড়ি বের করে দিলে। তাই দিয়ে ঐ বন্য বরাহের চারপা মোটা বাঁশের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তারা পাল্কীর মত স্কন্ধে নিয়ে এগিয়ে চলে। ওদিকে নীরদবরণের পা' আর ভূমিস্পর্শ করে না—পাঁচ ফুটের মানুষ এখন দশ ফুট দাঁড়িয়েছে। রণপায় দাঁড়িয়েই সে বিদায় চাইলে—

—পেটে দাবানল জ্বলছে, মাইরি—বাই—আজ আর অংশীদার-টার নেই—গোটাটাই উড়িয়ে দিয়ে আসি।

নীরদবরণের সাধু প্রস্তাবে চমৎকৃত হলাম বৈ কি! তাকে আশীর্ব্বাদ দিলাম—

—যাও—তাই যাও, ভালোয় ভালোয় আবার বহাল তবিয়তে ফিরে এসো! তবে আমাদের জন্যে একটু আলাদা সরিয়ে নিবেদন করে খেও—নইলে হজম হ'বে না—বলে দিচ্ছি।

—লোহা হজম করে ফেলব—তুচ্ছ একটা পাঁঠা—হুঁ:—কী যে বলেন, মাইরি! উঃ—বেলা যে একটা—আর না:—এবার চলি—গুড ডে।

নিমেষে রণপা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমাদেরও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ ও পুনর্যাত্রা।

দ্রুত হাতী চালিয়ে আমরা সাঁওতালদের পেছনেই চলতে থাকি। বেলা দুটো। লালগোলা হাইস্কুলের সামনে শিকার আসতেই মহা হুলস্থুল! মাষ্টার আর ছেলের দল ক্লাস ছেড়ে হুড় হুড় করে বন্যার জলের মত বেরিয়ে এল।

ছাত্রদের ঠেকিয়ে রাখা দায়। মাষ্টাররা যতই তাড়া দিয়ে তাদের ক্লাসে ঢোকাতে চায়—তাদের নড়বার নামটি নেই—ছাড় পাওয়া গরু আর যেন গোয়ালে ঢুকতে চায় না।

ক্রমে শিক্ষকেরাও ছেলেদের দলেই ভিড়ে গেলেন—দেখলাম, তাঁদের সখও কোনো অংশে কম নয়। হেডপণ্ডিত মশাই তির্য্যক্ ভঙ্গীতে তাঁর শিখায় ক্রমাগত হাত বুলিয়ে চলেছেন—তাঁর মধ্যেও একটা বিপুল আলোড়ন—সমগ্র পাণিনি মন্থন করেও কি বলা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না—সহসা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে পক্ষীশাবকের চিঁ চিঁ ডাক শোনা গেল—অভূত তদ্ভাবে "চ্বি" প্রত্যয় করে আর্কফলা দুলিয়ে একটি কথা বলে ফেললেন—শিকারীভূত!

শেষটায় বেরিয়ে এলেন স্কুলের শ্রদ্ধেয় হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মজুমদার। আধ্যাত্মিকতায় ইনি যথেষ্ট অগ্রণী—সব সময় জপ তপ ধ্যান ধারণা নিয়েই থাকতেন—কখনও বা গোটা রাত তারামন্দিরে বা শ্মশানেই কাটিয়ে দিতেন। আমি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম—তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত। মুর্শিদাবাদবাসী যাঁরা ঐ পথের পথিক, সকলেই তাঁকে জানতেন। বন্ধুবর কবি নজরুলও প্রায়ই তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতো।

তিনিও ছেলেদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা না দিয়ে আমায় লক্ষ্য করে বললেন—তোমার জ্বালায় আজকে আর ক্লাস নেওয়া চলে না—ছুটী দি', কি বল?

হাতীর উপর থেকেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে উত্তর দিলাম—যা' আপনার অভিরুচি—এখানে আমার মন্তব্য কিছু নেই। সংবাদটি তড়িৎ-প্রবাহের মত ছেলেদের কাছে ছড়িয়ে পড়তেই দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের মধ্যে সে কী মহা আনন্দ-কল্লোল।

মাষ্টার মশাইকে পুনরায় সম্বোধন করে বললাম—আজ বরাহ-অবতার নিধন করেছি—একবার চেয়ে দেখুন, স্যর!

চেয়ে দেখা দূরে থাক—তাঁর চক্ষু মুদ্রিত—যেন কোন ধ্যানের রাজ্যে তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কে কাকে মারে?—ও ত' মরেই ছিল—তুমি উপলক্ষ মাত্র—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

দার্শনিক বেণুর মুখে এতক্ষণ পরে আর একটি কথা শোনা গেল—তা ঠিক।

আমি বললাম,—সে কী স্যর, ওই বিশ্বরূপ দর্শন-টর্শন আমার ধাতে সইবে না!

এবার তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন—

—তোমার ধাতেই সইবে—তুমি নিজেকে জান না।—যাক—কিছু দিন লীলা-খেলা করে নাও, আবার তোমাকে আসল পথে আসতে হবেই।

লজ্জানতা —শ্রীডি, কে, মিত্র

মৃণালিনী —শ্রীশ্যামল দত্ত

মা সি ক ব সু ম তী র

—আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি—

শাদার আর কালোর যতখানি করা সম্ভব তা করেছে এযাবৎ কাল মাসিক বসুমতী। প্রতি মাসে আট পাতা ভর্ত্তি সেরা সেরা ফটো, ছোট বড় নানা সাইজের, কথাটি না কয়ে ছেপে গেছে। কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন শেষ হয়ে যায়ই। আবার সেই প্রায়-শূন্য কলসী ভরে নিতে হয়। তাই কয়েক মাস ধ'রে ডাক পড়েছে আবার নতুন ছবির জন্য। ভাল ভাল ছবিগুলি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার আপনাদের ছবি আবার নতুন ছবি পাঠাবার দিন সমাগত। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হোন। ছবি যেন একঘেয়ে না হয়। আলোর কম-বেশী; প্রিন্টের গোলমাল না থাকে। ছবির সাইজ বড় হয়। আগে নিজের ছবিগুলিকে নিজেই বাছাই করুন। পরে সেই বাছাই করা সব চেয়ে সেরা সেরা ছবিগুলি মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠিয়ে দিন। কদাচ যেন ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু এবং ফটোগ্রাফারের নাম-ধাম দিতে ভুলবেন না। এমন ছবি পাঠান, যা দেখে পাঠক-পাঠিকার চোখ জুড়োয়, আপনারও ছবি তোলা সার্থক মনে হয়; মাসিক বসুমতীর ঐতিহ্যও বজায় থাকে।

ছবির জন্য আবার ডাক পড়েছে, স্মরণ রাখুন।

কা-মন্দিরের প্রবেশ পথ —শ্রী অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে

আলোকচিত্র—বসুমতী

পুতুলের বিয়ে —মোহনচাঁদ বিশ্বাস

প্রলয় নাচন নাচলে যখন

বাংলা দেশেও যে নটরাজের মূর্তি পাওয়া যায় নি এমন নয়। তবে এলিফাণ্টা কি চিদাম্বরমের মূর্তি থেকে তার প্রভেদ অনেক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture এ উল্লেখ করেছেন,'বাখরগঞ্জ জেলার কাশীপুরের নটরাজ বা নটেশের তাণ্ডব-মূর্তির কথা। বাংলার সেন রাজাদের তাম্রমুদ্রাতেও এই মূর্তির দেখা পাওয়া গেছে। প্রভেদের কথা যা বলছিলাম, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের একটি উক্তি সে সম্পর্কে উদ্ধৃত করি, 'নটরাজ শিবের প্রতিমা বাংলা দেশে সুপ্রচুর।···কিন্তু দশ ও দ্বাদশ হস্ত এই ধরণের নটরাজ-শিবের প্রতিমা এ পর্যন্ত বাংলা দেশের বাহিরে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় নৃত্যপর শিবের যত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সবই দশ হস্ত এবং তাঁহার লক্ষণ ও লাঞ্ছন-সন্নিবেশ পুরোপুরি মৎস্যপুরাণের বর্ণনানুযায়ী। দক্ষিণ-ভারতীয় চতুর্হস্ত নটরাজ শিবপ্রতিমার শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুরুষটিকে দেখা যায়—বাংলা দেশে তাহার চিহ্নও নাই।···বাংলার মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা এবং দুই হাতে করতলের নৃত্যের তাল রাখা হইয়াছে। শিব যে নৃত্য ও সঙ্গীতরাজ, ইহা দেখানোও যেন এই প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্য।'

সুতরাং এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলায় নটরাজ এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাংলার কবিগুরু তাই সেই নটরাজের মূর্তি কল্পনা করে গেয়েছেন,—

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জনে,
নটরাজ নৃত্য করে উন্মুখর অশান্ত পবনে।

বা, নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে!
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে!

এই প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানি।

পারস্য দেশে সঙ্গীত

প্রবাদ আছে, জেমসিদ বা জীয়ামসিদ পারস্যে সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। পারস্য-লেখক নিজামী পারস্যের নানা সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখে গেছেন। হিন্দুস্থানের শিল্পী আমির বলেছেন, খশ্রু-পারভিজের রাজত্বের আগে পারস্য-সঙ্গীতে সাতটি প্রধান মোকামের প্রচলন ছিল। স্যর উইলিয়ম জোন্স ৮৪টি মোকাম বা ঠাটের (modes) কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই ৮৪টি মোকাম পারসিক শিল্পীরা, "distribute, according to an idea of locality, into twelve rooms, twenty-four recesses, and forty-eight angels or corners." দেশের নামানুযায়ী রাগের নাম আছে ভারতেও, আছে গ্রীকদেরও। যেমন ইস্পাহান, ইরাক, হিজাজ, প্রভৃতি।

পারস্যে মুসলমানদের অভিযানের ফলে কৃষ্টিমূলক বহু গ্রন্থ নষ্ট হয়। সঙ্গীত সম্পর্কে গ্রন্থাদি নষ্ট হলেও কয়েকটি যা রক্ষা পেয়েছে সেই সম্পর্কে স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলছেন, It would appear that, when the Mussalmans conquered Persia Saad, the son of Abu-wokhas wrote to Omar, to be allowed to send a number of books to him,···that the only

musical work now known to exist in the Persian language is one entitled 'Heela Imaeli'. etc। মহম্মদের পর দ্বিতীয় খালিফের (ওমর) কাছে আবু বকরের পুত্র সাদ কয়েকখানি পুস্তক (সঙ্গীত সম্পর্কীয় এ কথা বলা বাহুল্য) পাঠাবার অনুমতি চেয়েছিল, এগুলিই সেই গ্রন্থ।

এ সম্পর্কে আরও নানা কথা জানাবার আগ্রহ রইলো আগামী বারে।

স্বরলিপি পদ্ধতি বৈদিক যুগে সৃষ্ট

প্রমাণের অভাব নেই। বৈদিক মন্ত্রগুলিতে স্বরের যে চিহ্ন বা স্বর-সংকেত পাওয়া যায় তা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি বৈদিক স্বরের এই নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। ঋগ্বেদের স্বরোচ্চারণ রীতিকে সামবেদ-সংহিতা, অথর্ববেদ-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-বেদ সংহিতা, বাজসনেয়ী-সংহিতা প্রভৃতিতে অনুসরণ করা হয়েছে।

সাম গানে স্বরের মাত্রা ও বিভাগ,

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূ র্ধা নং দি বো অ র তিং পৃ থি ব্যা

১— স্বরিত, ২— উদাত্ত এবং ৩— অনুদাত্ত।

সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চিকের ১৬শ অধ্যায়ের একটি মন্ত্রে স্বর-নির্দেশের নিদর্শন,

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ভদ্রোভদ্রয়াসচমানআগাৎ
১ ২ ২ ২ ৩ক ২র ৩ ২
স্বসারঞ্জারোঅভ্যেতিপশ্চাৎ।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ১ ২
রুশদ্ভির্বর্ণৈরভিরামমস্থাৎ।

এ সম্পর্কে আগামী বারে আরও কিছু জানানো যাবে।

কণ্ঠসঙ্গীত না বাদ্যযন্ত্র কোন্‌টি আগে?

এ' নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে আলোচনার অন্ত নেই। গ্রন্থের পার্সি বাক তাঁর A History of Music বইয়ে বলছেন, দেশী সঙ্গীতের উৎপত্তির আগে বাদ্যযুগের সৃষ্টি হয়েছে। এক, জে, ক্রোয়েষ্টার বলছেন, বাদ্যযন্ত্রের বয়স মাত্র দু'শ বছর। কার্ল প্রেইরিন্দার বলছেন, ইউরোপে বাদ্যযন্ত্রের বয়স প্রায় ২৫,০০০ বছর। অবশ্য তিনি এর মধ্যে প্রস্তর-যুগকে এনেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ভারতবর্ষের পুরো ইতিহাস পাওয়া গেলে এ কথা খুব সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে, ভারতবর্ষ ইউরোপের অনেক সভ্যতা থেকেই অনেক প্রাচীন এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের নিশানা সেখানেও মিলবে। অজন্তা, অমরাবতী কি সাঁচীতে যে ছবি আমরা আজও দেখছি তার মধ্যে বহু প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের ছবি আমরা দেখছি। এমন কি, আধুনিক সেতার, বেহালা কি রবাব জাতীয় যন্ত্রের মতই নানা যন্ত্রের প্রতিকৃতি রয়েছে সেখানে। গান-বাজনার জলসার ছবিও রয়েছে কয়েকটি। সাঁচীর ভাস্কর্যে এক রকম বীণা রয়েছে যার সঙ্গে প্রাচীন রোমের সভ্যতায় Tibae নামক একটি বাদ্যযন্ত্রের হুবহু মিল পাওয়া যাবে। পারস্যের 'কুয়ানুন' যন্ত্রের ছবি পাওয়া যাবে অমরাবতীর গায়ের কাত্যায়নী বীণায়। মূর সভ্যতায় Rebec নামক একটি যন্ত্র রয়েছে যার রূপ হচ্ছে আমাদের রবাব। কণ্ঠসঙ্গীত আগে, না যন্ত্রসঙ্গীত আগে, এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। এখুনিই হঠাৎ কিছু তাই বলা যাবে না। উভয়েই বহু প্রাচীন এবং আমাদের মনে হয়, ভারতের মাটিতে উভয়েরই জন্ম।

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক (৪) আশুতোষ দেববাহাদুর (সাতু বাবু)

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণার ইতিহাসে বাংলার জমিদারগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা সঙ্গীতে সবিশেষ আগ্রহী, বিদগ্ধজন তাঁদেরই নাম মাত্র আমরা প্রকাশ করছি প্রতি মাসে। কলকাতার বিডনষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ জমিদার আশুতোষ দেব একজন সঙ্গীতের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। বরোদা থেকে প্রসিদ্ধ গায়ক মৌলাবক্সকে তিনি কলকাতায় আনেন এবং এক গানের জলসায় এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দেন। কলকাতার শিবনারায়ণ, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, কাল্কাপ্রসাদ মিশ্র, জুয়ালাপ্রসাদ মিশ্র, মুরাদালী খাঁ প্রভৃতি তাঁর গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করতেন এবং সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি গানের জলসা বসত। প্রসিদ্ধ গায়ক কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের 'সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম' প্রকাশের জন্য তিনি তিন সহস্র টাকা দান করেন। গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়াল গাইয়ে আহম্মদ খাঁকে কলকাতায় আনার গৌরব তাঁর। এই সঙ্গে মৌলাবক্সও আসেন। দিল্লী-নিবাসী খেয়ালী বন্ধে খাঁর সঙ্গীতও একই দিনে পরিবেশিত হয়। শুধু বড় বড় নিমন্ত্রিতগণ নয়, বহু জনসাধারণও এই গান শুনতে আসেন। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১টা অবধি সহস্রাধিক লোক এই জলসায় মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকেন।

রেকর্ড-পরিচয়

"হিজমাষ্টার্স ভয়েস"

কীর্তনের সুরের সঙ্গে বাঙ্গালীর নাড়ির টান আছে। আর বাঙ্গালী ছাড়া কারো কণ্ঠে কীর্তনের সুর খোলে না। এই পরম বৈশিষ্ট্যময় কীর্তনের ছড়াছড়ি ছিল তারাশঙ্করের 'রাইকমল' বাণী চিত্রে। স্বয়ং পঙ্কজ মল্লিক নিউ থিয়েটার্সের এই জনপ্রিয় চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুখের বিষয়, 'রাইকমল' চিত্রের গানগুলি 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে: P 11929—'দেখে এলাম তারে সখি' এবং 'যদি তোর হৃদ-যমুনা'। N 76013—'পোড়া বিধি আমার বাদী হল' এবং 'মন্দির ত্যজি যাব'। N 76012—"অল্প বয়স মোর" এবং "বঁধু অনেক কাঁদায়ে"। N 76014—"বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের" এবং "বিদগ্ধ যৌবন"। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডে প্রকাশিত অন্যান্য গানের মধ্যে আছে N 82652—কবি শৈলেন রায় রচিত "অঙ্গ মুকুতা কেন" এবং "মন বিহঙ্গ রে"—গেয়েছেন

সুরসাগর জগন্ময় মিত্র। দুটি চমৎকার আধুনিক গান। N 82653 —কুমারী বাণী ঘোষাল 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে' গেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। এবারের দুটি আধুনিক গানও সুরের মায়ায় অনবদ্য।—"জাগো জাগো বসুমাতা" এবং "সন্ধ্যামণি কনক-চাঁপা"। N82654—শিল্পী হিসাবে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক গানের জন্য স্বনামধন্য। এ রেকর্ডখানিতেও তাঁর দু'খানি আধুনিক গান—"মনের বনে বনে" এবং "আকাশ মাটি যেথায় করে দিবানিশি জল্পনা।" N 82655 শ্যামল মিত্রের বিখ্যাত আধুনিক গান—"ও শিমূল বন" এবং "যদি ডাকো এপার হতে।" 'অপরাধী' চিত্রের গান, গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় "ছিল সুর ছিল গান" এবং "আমি নিশীথের মায়া।"

কলম্বিয়া

G E 24759 ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে রাগপ্রধান গানও যে কত সুন্দর হয়, তার প্রমাণ এই গান দু'খানি "আমায় তুমি ভুলতে পারো" এবং "রুমা ঝুমাঝুম বাদল ঝরে।" সম্প্রতিক কালে সঙ্গীতমুখর যে সব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'শাপমোচন' চিত্রটি তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ওস্তাদ ডি, ডি, পলুস্কর এই সর্বপ্রথম কোন বাংলা ছবিতে গেয়েছেন। গানটি "কলিয়ান্ সঙ্গ করত' G E: 30291। এই চিত্রটির সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন —'শোন, বন্ধু শোন।' এই গানটি 'গাঁয়ের বধূ'-র গায়কের উপযুক্ত গান। অপর পৃষ্ঠায় আছে 'বসে আছি পথ চেয়ে'—C E 30289। আর দু'খানি গানও হেমন্তের গাওয়া "সুরের আকাশে তুমি" এবং "ঝড় উঠেছে।" হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আর একটি উজ্জ্বল কীর্তি 'নাগিন' চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা। এবার এই চিত্রটির দু'টি সর্বজনপ্রিয় গানের সুর হারমোনিয়ামে বাজিয়েছেন বিখ্যাত যন্ত্রী ডি বুলসরা। সুর "মনডোলে" এবং 'মেরা দিল ইয়ে পুকারে আযা।' এটি এইচ এম-ভি রেকর্ড N 87533।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

এই কথাটা ধরে রাখিস, মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে॥
অভয়মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে॥
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে মরিস্ নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে নিতে মরণ-আঘাত খেতেই হবে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

II সা -া রা | পা পা -ধা I পা পধা -না | সনা ধপা -া I
এ ই ক থা টা ০ ধ রে০ ০ রা খি০ স্

I পা -ধা ধপা | মা পা -রসা I সা সা -রা | রা গা -া I
মু ক্ তি তো রে ০০ পে তে ই হ বে ০

I পা ধা -া | ধসা র্সা -া I র্সরা র্সা -া | না ধা -না I
যে প থ্ গে০ ছে ০ পা০ রে র্ পা নে ০

I পা ধা -নধা | পা পা -পা I পা পা -া | ধা না -ধপা I
সে প ০০ থে তো র্ যে তে ই হ বে ০০

I পা -ধা ধপা | মা গা -রসা I সা সা -রা | রা গা -া II
মু ক্ তি তো রে ০০ পে তে ই হ বে ০

II মপা মপা -গা | পা পা -ধা I ধা -র্সা র্সা | র্সা র্র্সা -া I
অ ভং য়্ ম নে ০ ক ণ্ ঠ ছা ড়ি ০

I র্সা -া র্রা | র্রা র্সর্রা -র্গা I গর্রা র্সা -র্র্সা | না ধা -না I
গা ন্ গে য়ে তুং ই দি বি ০০ পা ড়ি ০

I পা ধা -া | র্সা র্সা -া I র্সর্রা র্র্সা -া | র্সনা ধা-না I
খু শি ০ হ য়ে ০ ঝং ড়ে র্ হাও য়ায়্

I পা -া ধা | পা পা -পা I পা পা -া | ধা না -ধপা I
ঢে উ যে তো রে ০ খে তে ই হ বে ০০

I পা -ধা ধপা | মা গা -রসা I সা সা -রা | রা গা -া II
মু ক্ তি তো রে ০০ পে তে ই হ বে ০

II সা সা -ধ্া | সা সা -রা I রা গা -া | গা গা -মা I
পা কে র্ ঘো রে ০ ঘো রা য়্ য দি ০

I গপা গা -া | রা রা -গরা I সা সা -গপা | পা রসা -া I
ছু টি ০ তো রে ০০ পে তে ০ই হ বে০ ০

I পা ধা -া | ধর্সা র্সা -া I র্সর্রা র্সা -া | না ধা -না I
চ লা র্ পং থে ০ কাঁ০ -টা ০ থা কে ০

I পা ধা -নধা | পা পা -পা I পা পা -া | ধা না -া I
দ লে ০০ তো মা য়্ যে তে ই হ বে ০

I মপা মপা -গা | পা পা -ধা I ধা -র্সা র্সা | র্সা র্র্সা -া I
সু খে০ র্ আ শ। ০ আঁ ক্ ড়ে ল য়ে ০

I র্সা র্রা -া | র্রা র্সর্রা -র্গা I গর্রা র্সা র্র্সা | না ধা না I
ম রি স্ নে তুং ই ভ য়ে ০০ ভ য়ে ০

I পা ধা -া | ধর্সা র্সা -া I র্সর্রা র্র্সা -া | না ধা -না I
জী ব ন্ কে০ তো র্ ভং রে ০ নি তে ০

I ধপা ধা -নধা | পা পা -পা I পা পা -া | ধা না -ধপা I
ম র ণ্ আ ঘা ত্ খে তে ই হ বে ০০

I পা -ধা ধপা | মা গা -রসা I সা সা -রা | রা গা -া II II
মু ক্ তি তো রে ০০ পে তে ই হ বে ০

—(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

আমার কথা (৭)

(বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

শান্ত, সৌম্য, নিরভিমানী, চরম উদাসীন ব্রহ্মজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ। বেশ দৃঢ় দেহ, বার্ধক্যের নামাবলীর ছোঁয়া সেখানে তুচ্ছ। তালুমাথার চার দিকে অল্পশুভ্র কেশ, অল্প-শুভ্র শ্মশ্রু, দেহে শুভ্রহাত গেঞ্জী, পরনে নীলবর্ণের লুঙ্গী। সর্বাঙ্গেই পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর মুখে ফুটে উঠল বিনয় ও সরলতার ছবি। তাঁকে একটা ফুলের তোড়া দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি তোড়া হাতে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "আপনারা বসেন, আমি এ-ফুল আমার 'মা'কে দিয়ে আসি, মার আসন আছে।"

—"আপনার সঙ্গে কথা বলার তো সুযোগ হয় না—আমরা ধন্য। আপনার কোন অসুবিধা হলো না তো?"

—"না না, কিসের অসুবিধা! আপনারা আসছেন আমিই ধন্য। গুরুর বারণ আছে—শুক্রবার বিশ্রাম। আজ যন্ত্র হাত দেই না। আমি কখনও সময় নষ্ট হতে দেই না। এতক্ষণ লিখছিলাম, চোখ দিয়ে জলও পড়ছে। উঠব উঠব ভাবছিলাম, এমন সময় আসলেন। যেদিন মাথাটা ভাল থাকে সেদিন লেখাপড়া করি। মাঝে মাঝে আমি বলি, ওরা লেখে। বয়স তো কম হয় নাই—ছিয়াশী বছর।"—বলেই একটু হাসলেন।

তিনি শরীরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "তা সত্যি, শরীর কিছুটা দুর্বল। তবে মনের জোর আছে। মনটা শুদ্ধ কর বাবা, (তাঁর সম্বোধন কখনো আপনি কখনো তুমি) এই দেহ তো অপবিত্র।" নিজের দু'টো চোখ অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "এই দুইটা চোখ না, ভিতরে আরও দুইটা আছে। সেগুলি দিয়া ভিতরের দিকে দেখ। আগে নিজেরে জানতে হবে, নিজেরে জানাই বড় কাজ। আমি এখনও নিজেরে জানতে পারি নাই। মানুষ হও বাবা, মানুষ হও। কিন্তু আমার কাছে আইছেন, কি দিয়া খাতির করব"—বলেই একটু ইতস্ততঃ বোধ করে বাইরের দিকে ক্ষণেকের জন্যে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, "আচ্ছা, আপনি সেদিন বলেছিলেন যে, আশীষকে বীণা শেখাবেন না, কেন? আরেক বার বলেছিলেন, বীণা বাজালে আপনি মরে যাবেন।"

তিনি একটু ভেবে বললেন, "একটা কথা কি জানেন, বীণা আমার গুরুদেবের বংশের জিনিষ। বীণা বড় সাংঘাতিক জিনিষ—এ বংশ নষ্ট করে দেয়। দবীর খাঁ তো বলে, তার বংশে আর বীণা শিখাবে না। (যে দবীর খাঁ একদিন ভারতে বীণাবাদক বলে পরিচিত ছিলেন, তিনি আজ বোধ করি সে জন্যেই বীণা ছেড়ে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীত ধরেছেন) বীণা রাখা যায় না। তবে আমার কাছে 'সুর-শৃঙ্গার' আছে, রবাব আছে, রুদ্রবীণা আছে, আরও অনেক আছে। সুর-শৃঙ্গারও কিন্তু বীণার থেকে কোন অংশে কম না।"

—বললাম, "এখন তো বেহালার তেমন প্রচলন দেখা যায় না।"

তিনি বললেন, "কিছু কিছু তো আছেই। বাল্মীন রাবণের জিনিষ। ইউরোপের ওরা নাম দিল ভায়োলিন। আমরা বলি বেহালা। ওদের টাকার দেশ। ওদের দেশে এক একটা বেহালার দাম লাখ টাকাও আছে, আবার চারশ'-পাঁচশ', আরো কমেও পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দেড় টাকা, দু'টাকায় আগে পাওয়া যেত।"

"আপনার শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

তাঁকে এবার বেশ চিন্তামগ্ন দেখা গেল। পরে বললেন, "শিষ্য তো কতই আছে কিন্তু শিখে আর কয় জন? তবে পাঁচ জনই আছে—তার মধ্যে মাইহারের মহারাজই প্রধান। তাছাড়া, জামাই ছেলে, তিমিরবরণ—সে অবশ্যি এখন দূরে দূরেই থাকে। তবে মেয়ে অন্নপূর্ণার কথা আলাদা।"

"ওনার কথা কিছু বলুন। উনি কেন বাজান না?"

তিনি বললেন, "ও এখন একা একাই সাধনা করে। কাছে কোন লোক এলে বন্ধ করে দেয়। ওর বাজনা মানুষের জন্য না। গন্ধর্ব কি জানেন তো? বলেই প্রাণখোলা হাসলেন।

—বললাম, "দেবগায়ক!"

—"হ্যাঁ, নারদ, কিন্নর এঁরাও ছিলেন দেবগায়ক। ওর বাজনাও দেবতাদের জন্য। আড়াই বছর থেকে ওকে শিক্ষা দেই। ওর মার ইচ্ছা ছিল ছেলে হোক, হলো মেয়ে। তাই ওকে দেখতে পারত না। আমিই ওকে দেখতাম। আমার কাছেই থাকত, আমার কাছেই ও শিখেছে। ওর বাজনা সব থেকে সুন্দর।"

—বললাম, "তার গান যদি কেউ চুরি করে শুনে?"

—তিনি বলেন, "শুনতে পারে তবে এটা ভাল না।"

"অনেকে বলেন যে, আপনার দাদা আফতাবউদ্দিন খাঁ সঙ্গীত সাধনা করতেন তবে হয়তো আপনার চেয়েও বড় হতেন।"

—"সেটা ঠিক বলা যায় না। সে তো আমার কাছেও শিখতে চেয়েছে। কিন্তু পারছে কৈ। তবে তার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল সিদ্ধ পুরুষ—নিজের ভাব থেকেই গাইতেন। দোতারা বাজাতেন বাঁশীতেও ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু কারো কাছে শিখেন নাই। আর গ্রামে এ-সব কে সাধনা করে শিখে। আমাদের দেশের যে মালসী গান, ভাসান গান এদের কোন রাগ-রাগিণী নাই।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

যখন যেটা আসে গাইল। দাদা একবার আমার কাছেও এসেছিলেন। তখনই দেখেছি ঠিক ভাবে রাগ-রাগিণী ধরে রাখতে পারছেন না।"

"রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে কিছু বলেন।"

ঠাকুরের নাম শুনেই তিনি স্থির, ধ্যানমুখী হয়ে গেলেন। তাঁর উদ্দেশে দু'-হাত তুলে প্রণাম করে বললেন, "আমি তখন ছোট। কলিকাতায় তখন কোন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হলেই যাইতাম। কলেজ ষ্ট্রীটের ঐ দিকে ব্রাহ্মসমাজের ঐখানে গেলাম। অনেকেই আছেন, কেশব সেনও আছেন। দেখলাম ঠাকুর অল্প একটু কাপড় পরে পাগলের মতো নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। সবাই পাগল বলল। আহা! কি রূপ! তখন তো কিছু বুঝতাম না। বিবেকানন্দের ভাইয়ের কাছে তখন গান শিখতাম। 'মা'কে আমি বরানগরে পেয়েছি। আর ঠাকুরকে পেয়েছি বেদান্ত মঠে। সে দিন বরানগর থেকে কয় জন আসছিল। আমি তাদের বলেছি আমায় মন্দিরের ভিতরে বাজাতে দিতে হবে—আমি 'মা'কে শুনাব। দেখেছি তারা বাইরে অনেক লোকের আয়োজন করছে। শেষে কি আর করি…।"

"আপনি সেদিন রঙমহলে বলেছিলেন ঠুংরী আপনি বাজান না। যাকে আপনি বাজারে নামাতে…"

তিনি আমার কথা শেষ করতে আর দিলেন না।

চট্ করে বললেন, "হ্যাঁ, খারাপ তো বলি নাই। ঠুংরী তো মুসলমান আমলের, খেয়ালও। তবে যদি কেউ গায় আমি তো খারাপ বলি না। ওটা বড় হাল্কা, শুদ্ধ রাগ-রাগিণী কম। আমার ওস্তাদ এটা আমাকে শিখান নাই। আমি যখন গুরুর কাছে যাই তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন, 'জৌলুস চাও না ভগবান চাও?' যদি জৌলুস চাও তবে ঠুংরী-গজল ধরণের গান গেয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারবে—দেখ কোনটা চাও?' আমি বললাম, ভগবান! তিনি তখন বললেন, 'তবে তোমাকে হিন্দুদের দেব-দেবীর রাগ-রাগিণী শিখতে হবে।' ধ্রুপদ অর্থাৎ ধ্রুবপদ। গুরুদেব আমাকে দেবদেবীর স্তবস্তুতির জিনিষ দিয়েছেন। ব্রহ্মার জিনিষ-এর উপর ওস্তাদী চলে না। আমি শুব জিনিষ শিখছি। তাই বাজাতে চেষ্টা করি। এখন আর বাজার কই শিখাই শুধু। মা জগজ্জননী, আহা! আমি ভৈরবী বাজিয়ে তিন বার 'মা'র দেখা পেয়েছি। আমি মাকেই ডাকি। অনেক সময় ঘুমের মধ্যে আৎকা (হঠাৎ) মা—বলে ডেকে উঠি। কোঠায় যারা থাকে তারা শুনে ভয় পেয়ে যায়। আমি কিন্তু টেরও পাই না।"

বললাম, "যদি কিছু মনে না করেন। আচ্ছা, যখন আপনি মার দেখা পান তখন কি রকম দেখেন, কি রকম আপনি অনুভব করেছেন?"

তিনি মৃদু হাসলেন। একটু পরেই কি যেন ভেবে বললেন, "সেটা আর বলব না। ছায়ার মতন 'মা' এসেছেন, আমি দেখেছি। এইটুকুই বললাম, আর বলব না।"

"আপনার উপর মার অনেক আশীর্বাদ আছে।"

তিনি উন্মনা হয়েছিলেন। একথা শুনা মাত্রই বললেন,

"ধর্ম সম্বন্ধে আপনার কি মত? আপনি কি নামাজ করেন?"

তিনি জোর দিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি। আমি রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি। আমি হজে গেছি আবার হিন্দুদের মন্দিরেও যাই। আমাকে হিন্দুও বলতে পারেন না, মুসলমানও বলতে পারেন না। আমার কোন জাতি নাই, ধর্ম নাই। আমার 'মা' আছেন আর আছে 'সুর'—আর আমার কিছু নাই। আমি সুরের উপাসনা করি। আমি স্বর্গও চাই না নরকও, নরকই তো বলে? নরকও চাই না, চাই শুধু তোমারে। মানুষ যে ভাবে তাঁকে ধরা দেন। আমি তো পাগল।"

তিনি এবার দু'হাত নেড়ে আবৃত্তি করলেন,—

'আমি চাহি না স্বর্গ
চাহি না নরক,
চাহি শুধু তোমারে।'

এই আমার ধর্ম।

চাই শুধু তোমারে। জাত ধর্ম দিয়া কি হইব। আর জাতের কথা যদি বলেন তবে বলি ছোটবেলায় তো দেখেছি আমাদের কি ভাবে হিন্দুরা, ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করছে। আমাদের ছায়া দেখলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতো। ছায়া পায়ে পড়লে স্নান করতো। যদি হুকাতে মুখ দিছি তবে হুকা ফেলে দিছে। জীবনে এতো শিক্ষা পাইছি।" তিনি আনন্দের সঙ্গে বললেন, "এখন আমি ব্রাহ্মণের (রবিশঙ্করের) সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়া দিছি। আমার কোন জাতি নাই।"

—"এখন এ-সব অনেক কমছে। এতো সব কুসংস্কার অশিক্ষার ফল।"

তিনি বললেন, "ঠিক তাও না, ব্রাহ্মণেরাই তখন শিক্ষিত ছিলেন।"

—বললাম, "পাকিস্তান হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আপনি কি উপলব্ধি করেন? আবার কি এক হবে?"

তিনি আনন্দের সঙ্গে বললেন, "এক হলেই ভাল হয় না কি? কি দেশ ছিল! আপনারা যে এখানে আছেন দেশের জন্য প্রাণটা কি কাঁদে না? যাইতে ইচ্ছা করে না?"…

—বললাম, "ঋষি অরবিন্দ তো এক সময় বলেছেন, ১৯৫৭ সালে দুই দেশ এক হয়ে যাবে।"

তিনি ঋষির উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, "তাঁরা মহাপুরুষ। তিনি যদি বলে থাকেন তবে হবে নিশ্চয়।"

বললাম, "তিনি তো বলেছেন, ভারতে বর্তমানে আপনিই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করতে পারেন।

—"বললে হবে। আমি তাঁর কাছে গেছি। আমি যখন তাঁর কাছে গেছিলাম তখন তিনি আমাকে দেখেই বললেন, 'আরে এ তো আমাদের দলের লোক! এত দিন কোথায় ছিল! এত দিন আস নাই কেন।' আমরা পাশাপাশি কোঠায় ছিলাম। সাত দিন বাজিয়েছি, আনন্দও পেয়েছি। তখন গৌরীপুরের বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও ছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন আশ্রম থেকে আমাকে ডেকেছিল। আমি গেছিলাম। তাঁর শরীর থেকে জ্যোতি বাইর হইতেছিল। আমি ফুল দিলাম পায়ে, নমস্কার করে চলে আসলাম।"

কথাগুলো বলতে বলতে তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। ক্ষণকাল নীরবতার পর আবার পাকিস্তান প্রসঙ্গ উঠতেই বললাম, "সাধারণ লোকের মধ্যে কোন গোলমাল নেই।"

—তিনি বললেন, "কুমিল্লায় দেখলাম কিছু তো বুঝা যায় না"

"কেন ঢাকাতেও গোলমাল নাই। আমারে ওরা বলছিল পাকিস্তানে থাকতে। ৫০,০০০ হাজার টাকা দিয়া বাড়ী কইরা দিবে। এবার ঢাকা রেডিওতে বাজাইছি। গভর্ণর পার্টি দিছিল—টাকাও দিছে। এরা তো চায় আমি যেন পাকিস্তানে থাকি। আমি বলছি, কি করতে? মেয়ে, জামাই, ছেলে সব ভারতে আমি এখানে কি করব। জন্মভূমি-তীর্থভূমি।"

বললাম, "উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বড় ভাল লাগে।"

তিনি যেন আপন মন পেয়ে গেলেন। বললেন, "সে তো ভাল বাবা—সেটাই তো আসল। যে সঙ্গীত ভালবাসে না সে তো মানুষ না। সে মানুষকে খুনও করতে পারে।"

আশীষকুমার বারান্দায় পায়চারী করছিল। তাকে দেখেই খাঁ সায়েব বললেন, "এ্যাই আশীষকুমার, ওর বয়স বেশী নাই—চৌদ্দ বছর। তবে শরীরের বাড় বেশী। আমি ওকে বাইরে মিশতে দেই না। বাড়ীতেই পড়ে। কাশী ইন্‌ভারসিটির ডবল এম্ এ মাষ্টার আছে। তার কাছেই পড়াশুনা করে। মাষ্টার আবার আমারও শিষ্য। চাইর বছর মাইহারে বাজনা শিখে। আলি আকবরও মেট্রিক পাশ করছে। আমার তো ইচ্ছা ছিল বি-এ পর্য্যন্ত পড়ুক। ওর ইচ্ছা ছিল না। আমিও আর জোর করি নাই। বাজনাই যখন শিখতে চায় বাজনাই শিখুক। আমারে আবার নাতি এরা বড় ভয় করে। আমি বড় কঠিন গুরু। এরা আমার কাছে আদর পায় না, আমিও এদের পাই না। অনেকেই কিন্তু আমার কাছে শিখতে এসে ভয় পায়। কিছুদিন শিখেই চলে যায়। আমি কিন্তু এদের মারিও না। আমার কাছে এসে এরা পেচ্ছাব পর্য্যন্ত করে দেয়। (হাসি) আদর পায় ওর মার কাছে। বাজনা শিখার কাজে আমি গাফিলতি পছন্দ করি না। সঙ্গীত সাধনার জিনিষ। আমি সঙ্গীত শিখাতে অনেক সময় নিই। রাজাকে তো আট ঘণ্টা শিখাতাম। আমার আবার ব্যাণ্ডও আছে। অনাথ ছেলে নিয়া করছি।"

কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, "আমি আবার মাংস-টাংস খাই না। নাতিদের জন্য হাড্ডি নিয়া আসি। তার সুপ খাইতে দিই। আমি নিজেই বাজারে যাই। মাইহারের মহারাজ আমাকে অনেক জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে আছে গরু-ভইস পঞ্চাশটা, পাখী অনেক—ভৃঙ্গরাজ, ময়না, কবুতর আরও অনেক রকমের পাখী আছে। সাপে আবার পাখী খাইয়া ফেলে। অনেক পাখী কমে গেছে। আমার আবার ফুলের বাগানও আছে। আমি নিজেই মাটি কোপাই, ঘাসও কাটি। এই দেখেন, হাতে সব কড় পড়ে গেছে। তিন জন মালীও আছে। অনেক ফুল হয় বাগানে। ফলের বাগানও আছে। নানান রকমের ফল। বড়ই (কুল), কাশীর পেয়ারা, লেবু, অনেক রকমের কাগজী, সরবতী—সব আছে। গরীব লোকের অসুখ-বিসুখ হলে আমার কাছে আসে, আমি তাদের রস দেই বিনা পয়সায়। রোজই দেই। কত পদের আমগাছও লাগাইছি—খেতে পারি কৈ। ছেলেরা সব খেয়ে ফেলে। এখন তো এদের সুবিধাই হয়েছে। আমি তো নেই। এখন তো দু' গুটি আম বের হয়েছে—সব শেষ করবে। আমি বলি এদের, ক' বলি যখন খেতে ইচ্ছা হয় আমার কাছে এসো আমি রস খাইয়ে দেব—চুরি করো না। চুরি করা অন্যায়।"

তিনি বললেন, "বাড়ীটাকে একেবারে বন করে রেখেছি আমি যখন যাই তখন চার দিক হইতে পাখী আসে, বুছু অনেকগুলি সব লাইন দিয়া বসে, বিড়াল আছে ছয়টা—এরাও বসে. আমি এদের দিয়া তবে খাই।"

বললাম, "আপনার বাড়ীর সাপগুলি সম্বন্ধে কিছু বলেন।"

তিনি বললেন, "আমি যে বাড়ীতে থাকি সেখানে সাপ ছেড়ে দেই। আমাগো দেশে যারে পানস কয়, ওই যে যার ফণা আছে এত বড়, সেই সাপ তিনটা ছাড়াইলাম। যখন আমি বাজাই তখ তিনটা নাকি চুপ করে থাকে—আবার চলে যায়। এরা কাছে অনিষ্ট করে না। এখন নাকি শুনছি, আবার তিনটা বেজী, যারে নেউল কয়, সেগুলি আসছে।"

বললাম, "সাপ-বেজীতে ঝগড়া করে না?"

"ভগবান যেন এ আমায় না দেখান—এ-সব অবস্থি আমি দেখিনি, আমার স্ত্রী দেখেছে। ওহো! আমার আবার দুইটে ঘুঘুও আছে। ওই যে যারে আমাদের দেশে কি বলে। ওই দেশে আবার ঘুঘু পাওয়া যায় না। কি সুন্দর ডাক! প্রহরে প্রহরে ডাকে। (হাসতে হাসতে বললেন) সুন্দর ডাক না? আমার কাছে খুব ভাল লাগে। ঘুঘু—ঘু ঘু করে ডাকে।"

বললাম, "আপনার বাড়ীটাকে একেবারে তীর্থক্ষেত্র করে রেখেছেন। বাড়ীর নামও শান্তিকুটীর।"

তিনি হেসে বললেন, "ও আমার বাড়ীর নামও জানেন দেখছি। এখন আমার বাড়ী ঐ নামে আর নেই। এখন নাম দিয়েছি, 'মদিনা মহেল শান্তিকুটীর'।" তিনি এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "মুসলমানদের নিয়ম আছে স্ত্রীকে অবহেলা করলে তার কাছ থিকা (থেকে) মাফ লইতে হয়। পাঁচ টাকা দিয়াও ক্ষমা পাওয়া যায়, জমিদারী দিয়াও পাওয়া যায়। আমি ক্ষমা চেয়েছি, স্ত্রী আমাকে ক্ষমাও করেছে। আমার যা ছিল সব দিছি। নয় হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাও দিছি। বাড়ীটাও দিছি। আমার স্ত্রীর নাম মদনমঞ্জরী। মদিনা থেকে এসে মদন থেকে মদিনা করেছি। আমার আর কিছু নাই—এই লুঙ্গী আর গেঞ্জী। বেশ আছি। বাজনা আছে। তার পর আর যদি কাউকে ভালবাসি তবে সে আমার মেয়ে অন্নপূর্ণা। আমার আর কিছু নাই। বাড়ীটার দাম এখন অনেক। ইউরোপের টাকা দিয়া করছিলাম।"

বললাম, "আপনার অভাব কি? আপনি তো 'আলম'।"

তিনি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার ডাক-নাম আলম। আলম মানে জগৎ, এই পৃথিবী।" তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে বললেন, "আমার স্ত্রীকে আরেকটা জিনিষ দিয়েছি। ওর নামে একটা সুর সৃষ্টি করে দিয়েছি। নাম দিয়েছি 'মদনমঞ্জরী'। একটা রচনাও আছে?

"সুহত চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী।
পিকরয়নী মনহরণী চম্পকবরণী।—অস্থায়ী
অধরণ বিম্বধর দশনন নাসিকা।
ভ্রূকুটি ধনু তনু ঝগক তমনী।—অন্তরা

সুহত—শোভা ও সুন্দর; পিকরয়নী—কোকিলের মত শব্দ; অধরণ—শরীর, বিম্ব, বেলের মতন স্তন। দশনন—সাপ, সাপের ফণার মতন নাক। মদনমঞ্জরী হিন্দোল, কেদারা, বিলাবল, মিশ্রিত করে 'মদনমঞ্জরী' করা হয়েছে।

বললাম, "এখন কটা রাগ আর কটা রাগিণী আছে?"

"শাস্ত্রে তো আছে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী। এদের আবার ভার্য্যা আছে। তাঁদের আবার বংশও আছে। তবে আরও কত সৃষ্টি হচ্ছে। রবিশঙ্কর, আলি আকবর এরা তো সৃষ্টি করছে। আমি তো এখনও শিখি। "আমি ব্রহ্মার সুর, নারদের সুর বাজাই। এর আর বদলও হয় না, সৃষ্টিও হয় না।"

বললাম—"আপনার স্ত্রী বাজাতে পারেন?"

"কারো কাছে শিখে নাই। তবে নিজে নিজেই…। আমার জন্য এরা অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমার জীবন বড় কষ্টের। ছোটবেলায় বাড়ী ছেড়েছি। কলিকাতায় ফুটপাতে থেকে গঙ্গার জল খেয়েছি। তার পর ঘুরে ঘুরে গুরু পেয়েছি—শিখেছি। তার পর অনেক বছর পর বাড়ী গেছি। বাবা ত আমার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করে ফেলেছিলেন। মা আমারে খুব ভাল বাসত। আমার বিয়ে আবার অল্প বয়সেই হয়েছিল। এদিকে আমার স্ত্রী একবার আমার অনুপস্থিতিতে গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করছিল। যখন বাড়ী গেছি মা আমায় ছাড়লে না। মাকে বললাম অনেক কিছু শিখে আসছি। মা আমায় চেপে ধরল। বললে, 'আমি এই বুকের দুধের দাবী এবার আর ছাড়ব না। তুই আমার অনেক কষ্ট দিয়েছিস।' আমার তখন বেশ বয়স হয়েছে। আমি তা স্বীকার করলাম। বললাম, মা, কি করে প্রায়শ্চিত্ত করব? মা বললেন, তুই যখন অনেক কিছু শিখে আসছিস তবে এবারের মত তোকে ক্ষমা করলাম। তবে আমার একটা আদেশ তোকে পালন করতে হবে। গ্রামে একটা পুকুর, মসজিদ, ইস্কুল করতে হবে।" খাঁ সাহেব দুঃখ করে বললেন, "তখন ব্রাহ্মণরা হিন্দুরা তাদের পুকুরে যেতে দিত না অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ছায়া দেখলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলত। ছায়া মাড়ালে স্নান করত। মা বললেন, টাকা রোজগার করে এসব করলে চলবে না। হিন্দুদের হবিষ্যির মত একটা মাত্র কাপড় পড়তে হবে, হাতে কুশাসন নিতে হবে। সেটাই মাটিতে বিছায়ে ঘুমাতে হবে। আর আলুনা সিদ্ধ ভাত খেয়ে ভিক্ষা করে সেই অর্থ দিয়া এসব করতে হবে।' আমি মাথা পেতে সে আদেশ নিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত করেছিও। সেই ভিক্ষা তুলতে সেই সময় শিবপুর থেকে কুমিল্লায় গেছি। হিন্দুরা তাদের স্কুলে মুসলমানদের পড়তে দিত না। তাদের জন্যে ইস্কুল তৈরী করে দিছি। কিন্তু ওরা রাখতে পারল না—বড় দলাদলি। কৃষকরাও ছেলে পড়াতে চায় না। ছেলেরা স্কুল চলে যায় তখন ক্ষেতে তামাক সেজে দেবে কে?"

তিনি আবার বললেন, "মসজিদের সংস্কার দরকার। টাকা আলাদা করে রাখছি। বর্ষাতে দেশে যাব। তখনই সুবিধা। নৌকা করে যাওয়া যায়।"

এখানেও এরা কি যে দিছে বিছানায় পালঙের উপর ঘুম হয় না। কত বলি শোনে না। আমি গরীব—চাটাইয়ের উপর কেঁথা দিলে ভাল ঘুম হয়। এই শরীর মাটির মাটিতেই ভাল থাকে।

বললাম,—সঙ্গীত বড়ই ভাল লাগে। তাঁর কণ্ঠ ও আক্ষেপে ভরে এল। তিনি বললেন, "বাবা আমি আর কি জানি। কিছুই জানি না। তানসেন দীপক গাইতেন আগুন জ্বলতো। আমিও দীপক জানি, মল্লার জানি। কিন্তু আমার বাজনায় আগুনও জ্বলে না মেঘও নামে না। গান গেয়ে যে আগুন জ্বালানো যায়, মেঘ নামানো যায়, এটা রূপকথা নয়, সত্যি কথা। অনেকে বিশ্বাস করে না।" "আপনি এখন রেওয়াজ করেন রোজ?"

"আর করি কোথায়? চল্লিশ বছর হয় ছেড়ে দিয়েছি। সময়ও পাই না। সকালে বাগানে কাজ করি। তার পর দশটা পর্য্যন্ত ক্লাশ নেই। আমি কখনও সময় নষ্ট হতে দেই না।"

"একটা প্রশ্ন করছি কিছু মনে করবেন না। এই যে আপনি আসরে বাজাচ্ছেন এতে আপনার খারাপ লাগে না?"

"লাগে না—নিশ্চয় লাগে। আমার একটুও ইচ্ছা করে না বাজাতে। কিন্তু কি করব। আমারও সংসার দেখতে হয়, খেতে হয়। মহারাজার ভাণ্ডার হতে দু'শ টাকা পাই। এ দিয়ে আমার চাকরদের বেতনও হয় না। ছয় জন চাকর ত্রিশ টাকা করে এদের মাইনা। আরও কত খরচ আছে। জমি আছে তা-ই চলে আর কি।"

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। আর সময় নেওয়া যায় না। আমরা আবার প্রণাম জানিয়ে উঠে পড়লাম।

কেনা কাটা

বাজার-দর নিয়মিত থাকে না কোন সংবাদপত্রে

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিয়মিত কয়েকটি বিভাগ থাকে প্রতি-নিয়তই। প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের পাতা খুললেই পাবেন আইন-আদালতের কথা, রেসে কোন্ কোন্ ঘোড়া ছুটছে, কে ফার্স্ট প্রাইজ পাবেই, এ্যাক্রোপে'লিশ না আওয়ার বাবু কার চান্স বেশী, গঙ্গায় কখন জোয়ার কখন-ভাঁটা, ঘটনা আর দুর্ঘটনা, সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তি, আবহাওয়ার খবরাখবর, বেতার জগতের পাতা ছেঁড়া, নিয়মিত সিনেমা জগতের সমাচার, হারাণ-প্রাপ্তি অবধি। শুধু আমাদের নজর নেই নিয়মিত বাজার-দর পরিবেশনার প্রতি। নিয়মিত তো নয়ই, মাত্র দু'-একটি দেশী সংবাদপত্রেই বাজার-দরের কথা থাকে মাঝে মাঝে। তাও সম্পূর্ণ খবর নয়। আংশিক বড় বড় খবর মাত্র। টাটার শেয়ারের দাম, ইণ্ডিয়ান আয়রণের পারচেস ভ্যালু, সিন্ধিয়া ষ্টীম কি টিটাগড় পেপার মিলের কাগজের দাম কত কমলো আর উঠলো এই খবর। ডিসকাউণ্ট আর রিবেট, কমিশন শুধু মাত্র। পার্সেণ্ট কষা ডিভিডেণ্ডের খবর। অথচ এজন্ত দেশবাসীর অসুবিধার অন্ত নেই। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বাজারের দাম অবশ্যই বিস্তারিত ভাবে সংবাদপত্রে পরিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। সরিষার তেলের দাম কলকাতায় আজ কত, সে খবর বীরভূমের কোনও দোকানদার জানবে নচেৎ কি ভাবে—। হলুদ, লঙ্কা, জিরে, লবঙ্গ, পোস্তদানা, সরিষা, কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে কয়লা, সিমেণ্ট, লোহা অবধি সব কিছুর প্রাত্যহিক দর প্রকাশ করবার রীতি গ্রহণ করুন এ দেশের সংবাদপত্র প্রকাশকগণ, এই নিবেদন। দেশবাসীর উপকারে পূর্ব্বে কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিকে নিয়মিত বাজার-দর ছাপা হোত।

জাত-ব্যবসা

শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের সব প্রদেশেই, এমন কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রত্যেক জাতের মধ্যে কোন কোন বিশেষ ব্যবসা আজও সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাংলা দেশে কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকর, পটুয়া, মণিকার ও স্বর্ণ-শিল্পী, স্বর্ণ-বণিক, গন্ধ-বণিক, মৎস্য ব্যবসায়ী ও ধীবরশ্রেণী থেকে শুরু করে রজক, নাপিত, ডোম, মেথর, পশু-পাখীর কারবারী, সদ্‌গোপ, কর্মকার, চর্ম্মকার প্রভৃতি আজও দেখা যাবে। সমাজের চারি ভাগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁদের নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করেছেন প্রায় শতাংশই। বৈশ্য-সম্প্রদায়ের আংশিক নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করলেও শূদ্র-সম্প্রদায় প্রায়ই এখনো তাঁদের সম্প্রদায়গত এবং বংশপরম্পরায় অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যার অনুশীলন পরিত্যাগ করেন নি। ভাল এবং মন্দ এ ব্যবস্থার দুই দিক সম্পর্কেই নানা বিচার-বিবেচনা করেছেন দেশের নানা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা। পণ্ডিত ও দার্শনিক রাসেল বলছেন, 'ধরুন কোনও চিত্র-ব্যবসায়ী কি পূজারী-ব্রাহ্মণের চারিটি সন্তান। যজমানের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না হয় ব্রাহ্মণের বা যদি পৃষ্ঠপোষকের অভাব ঘটে চিত্রকরের, তবে চারিটি সন্তানই পিতার ব্যবসা গ্রহণ করলে সমাজে দারিদ্র্য কঠোর হবে। অপর দিকে পারম্পরিক পারিবারিক উৎকর্ষতায় ঐ বিশেষ বিদ্যা আরও অধিক সাফল্য-মণ্ডিত হবে।' আমরাও এই কথাই বলি। বংশগত ব্যবসা পুরো পরিত্যাগ না করে কম পক্ষে পরিবারস্থ এক জনেরও সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

অল্প খরচায় ব্যবসা—বই

পুস্তক প্রকাশ—ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি এক ফর্মা আকারের একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করতে যদি চান, তাহলে প্রথমেই ভাবুন কত কপি ছাপবেন। ধরুন ১১০০ কপি। প্রথমেই ২২০০ কপি কি তার চেয়েও বেশী ছাপার দায়িত্ব নেবেন না। মোটামুটি কি রকম কি খরচা লাগতে পারে দেখুন। খরচা লাগবে যাতে যাতে—কাগজের দাম, ছাপার খরচা ফর্মা-পিছু, বাঁধাই,

বাঁধাইয়ের জন্ত বোর্ড কি কাপড়, কভার আলাদা ছাপার খরচ, কভারের ডিজাইন, লেটারিং ইত্যাদি করানোর জন্ত আর্টিষ্টের প্রাপ্য, কভারের জন্ত ব্লক করার খরচা (ক'টি কালার হবে। ট্রাই কালার, চার কালার কি দু'কালার তারই ওপর কভার ছাপার খরচা নির্ভর করবে।) কালি কভার ছাপার জন্ত, লেখকের দক্ষিণা (তাও নির্ভর করে লেখকের অভিজ্ঞতা, নাম, বাজারে বইয়ের কাটতি এবং পুস্তকের বিষয়ের ওপর), বিজ্ঞাপনের জন্ত খরচ, বই ভিঃ পি করার খরচ, আনা-নেওয়ার জন্ত খরচ, দোকানদার অর্থাৎ যিনি পুস্তক বিক্রয় করবেন তাঁর কমিশন, ইত্যাদিই মোটামুটি বই ছাপার খরচ। বইয়ের দামের মোটামুটি একটা হিসাব হল, ফর্ম্মা-পিছু চার আনা। ঠিক মত বই বিক্রি হলে এতে বেশ ভালই লাভ থাকবে।

হেডফোনে ক, খ—পাঠকের চিঠি

ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের মতই 'নব্' ঘোরালেই 'ক' আসবে আবার 'খ' ও আসবে।

আকাশ-তারটিকে একটু উঁচু করে খাটাবেন। ঐ আকাশ-তারটিকে নিয়ে ·0003 ভেরিএবল কনডেন্সারের এক প্রান্তে লাগান। আর এক প্রান্তে লাগান কৃষ্টালের এক প্রান্ত। এবার কনডেন্সারের দু'প্রান্তে একটি 'কয়েল' লাগান। 'কয়েল'টা একটা দেড় ইঞ্চি বা ১" কাঠের রুলারে ২৮ থেকে ৩২ গেজ সরু ইনস্যুলেশন তার দিয়ে কয়েল করে নেবেন। এবারে কতটা কয়েলিং করবেন? প্রথমে ১" লম্বা কয়েলিং করবেন? প্রথমে ১" লম্বা কয়েলিং করবার পর দুটো মুখ রেখে আবার আধ ইঞ্চি কয়েলিং করুন। এই রকম ভাবে ৪" কয়েলিং হয়ে গেলেই থেমে যাবেন। আর দরকার হবে না। ১" পরিমাণ কয়েকটি ওতে লাগিয়ে দিন। তার পরে কৃষ্টালের অপর প্রান্তটি ফোনের একটিতে লাগান।

মাটি থেকে একটা তার নিয়ে ·0005 ভেরিএবল কণ্ডেন্সারের এক প্রান্তে লাগান আর অপর প্রান্তটি সোজা ফোনের বাকী অংশের সংগে লাগিয়ে দিন। এবারে দু'টো নব্ই আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকুন। দেখবেন এক জায়গায় 'ক' হচ্ছে। আর সমস্ত (নব্ দু'টো) ঘুরিয়েও যদি ধরা না যায় তাহলে বুঝবেন, কয়েলের কিছু দোষ আছে। হ্যাঁ, হেডফোন সেটের বা ফোনের কোন অংশ যেন (নবের অংশ) মেঝে বা দেহের সংগে ঠেকে না থাকে (এই তার বা স্ক্রু)।

এবারে কয়েলটা ½" বাড়িয়ে দিন। এই রকম পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে এক জায়গায় ঠিক হয়ে যাবেই।

আর একটা জিনিষ বাকী রইলো। সেটা হচ্ছে, মোটা তারের যে কোন একটি 'কয়েল' নিয়ে আকাশ-তার আর মাটির তারের যোগ করে দেখুন কি অবস্থা হয়। যদি 'ক' আর একটু জোর হয় তাহলে আর একটা লাগিয়ে দেখুন ; আমার মনে হয়, বেশ ভালই ফল দেবে। ইতি—প্রদীপকুমার অধিকারী দলুইগাছা, সিংগুর, হুগলী।

যদি ব্যবসা করতে নামেন ?

তাহলে শুধু ক্যাপিটাল নয়, আরও কিছু গুণ থাকা দরকার। প্রায়ই আমাদের দপ্তরে নানা চিঠি-পত্র আসে। প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিরই মর্ম্ম হোল, ব্যবসা করতে চাই কিন্তু মূলধন কম। কি করে, কি ব্যবসায় লাগতে পারি জানান। তাই বলছি, ব্যবসা করতে গেলে শুধু যে মূলধনই দরকার তা নয়, আরও অন্ত মূলধনও আপনার থাকা চাই। ব্যবসা পরিচালনার জন্ত খুব বেশী উপস্থিত-বুদ্ধি, ধৈর্য্য, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, লোককে ইমপ্রেস্ করার মত চেহারা, কথাবার্ত্তা, আদব-কায়দা এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদও, সততা, ন্যায়বোধ, স্থিরচিত্ত, সাহস, সাধারণ জ্ঞান, ইত্যাদি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়াও হিসাব-নিকাশ, পত্রাদি লিখন, অর্ডার সংগ্রহ, মার্কেট ষ্টাডি, বিজ্ঞাপন দেবার নানা আধুনিক পদ্ধতি, সমব্যবসায়ীদের নানা চেষ্টা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা, অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং কি করে তাঁদের দ্বারা অধিক কাজ পাওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে ধারণা, শেয়ার বাজারের খবর, সংবাদপত্রের এমন সব ঘটনা যার ওপর বাজার-দর নির্ভর করবে সে সম্পর্কেও সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যবসায়ে উন্নতি করতে গেলে এগুলি অতি অবশ্য প্রয়োজন।

অল্প খরচার ব্যবসা—মৎস্য চাষ

যুদ্ধের বাজারে, এমন কি যুদ্ধোত্তর দিনগুলিতে এমন দিনও গেছে যখন ১৮০৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা মণ দরেও ভাল মাছ পাওয়া যায়নি। সে সময় কলকাতা এবং তার আশে-পাশের ভেড়ীর মালিকগণ প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন। আজও এ ব্যবসায়ে পয়সা আছে প্রচুর এবং বহু অবাঙালী এ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করে অন্ত প্রদেশে পাঠাচ্ছেন নিয়মিত।

কলকাতার আশে-পাশে দশ-বারো মাইলের মধ্যে জলা নীচু
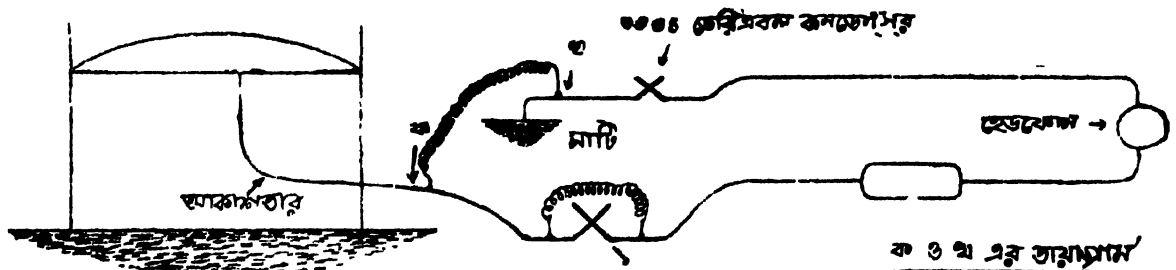
হেডফোনে ক ও খ'র ডায়াগ্রাম

জমি এখনো ১৫০৲—২০০, টাকা বিঘায় পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমি একেবারে না কিনে লীজও নিতে পারেন। দশ বিঘে জমি নিয়ে প্রারম্ভিক কাজ শুরু করতে পারেন। ভেড়ীর আশে-পাশে চাষ-বাস করেও প্রচুর পয়সা রোজগার করা অসম্ভব নয়।

১ম বর্ষ আয়　　ব্যয়

এক বৎসরে লাভ—১০০০৲　　দু'টি পুষ্করিণী খননের জন্য—৪০০০৲

এক দফা পোনা মাছ বিক্রয়　　মাছের ডিম বা পোনা— ৬০০৲

—১০০০৲　　ভেড়ীর ধারে গাছপালা

——————　　কলা, ইক্ষু, হলুদ ইত্যাদি—১০০০৲

৫৬০০৲

২য় বর্ষে আয়

পোনা মাছ (ওজন প্রায় /।॰ সের) গাছ প্রভৃতির— ৫০০৲

বিক্রয়— ২০০০৲　　মালির মাহিনা দু'জন— ১৫০০৲

অন্যান্য— ৫০০৲　　পুনরায় চারা ছাড়া— ৬০০৲

০৲

এর পর প্রতি বৎসর ক্রমে লাভের অঙ্ক বাড়বে

৩য় বর্ষ আয়　　ব্যয়

পোনা প্রায় /১ সের হবে—৩০০০৲　　পোনার চারা— ৬০০৲

ফল ইত্যাদি— ১০০০৲　　সংরক্ষণ— ১৫

এই ভাবে এই ব্যবসা ঠিক মত চালাতে পারলে ক্রমেই অধিক লাভ পাওয়া যাবে। মাছের চাষ বা পুকুর সংরক্ষণের কাজে দু'জন মালী এবং এক জন মৎস্যচাষী রাখাও দরকার।

বিজ্ঞাপন, প্রচার প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা

এই তিনটি দ্রব্যের সমন্বয় ঘটে না প্রায়ই আমাদের দেশে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনদাতাগণ খুব কমই প্রচার প্রতিষ্ঠান বা এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীগুলির সাহায্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। পত্র-পত্রিকাগুলিতে এঁরা নিজেরাই বিজ্ঞাপন পাঠান। কখন কখন পত্র-পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষই নিজেদের লোক পাঠিয়ে বিজ্ঞাপনের পাতা-প্রতি যে মূল্য আছে তার ওপর উচ্চহারে কমিশন দিয়ে এই সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন আদায় করেন। এই উভয় প্রকার ব্যবস্থার ফলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন বিজ্ঞাপনী এজেন্টগণ। এবং খুব সম্ভব এই কারণটিতেই আমাদের দেশে ভাল এ্যাডভ্যার্টাইজিং এজেন্সী যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠছে না। ডি, জে, কিমার, ওয়াল্টার টমসন কি গ্রান্টের মত দেশী প্রচার-প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে না। পত্র-পত্রিকাগুলিকেও নিজেদের সম্মান যথেষ্ট খর্ব করতে হয়। মাসের শেষ ক'টি দিন কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন কর্তৃপক্ষদের খেয়াল-খুসীর ওপর নির্ভর করেই সাময়িক পত্রকে প্রকাশ স্থগিত রাখতে হয়। মোট কথা, বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তা প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে মিডিয়াম্যান হিসেবে এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী যত দিন না স্বীকৃত হচ্ছে তত দিন এসব বিষয়ে কোনও প্রতিকার হবে না। বিজ্ঞাপন-শিল্পও উন্নত হবে না।

—বিবেকানন্দ-স্তোত্র—

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

'হাতে-খড়ি'

১

ছ' বছরে পড়েছে নরেন।
এইবার হয় 'হাতে-খড়ি';
'রাম-খড়ি' হাতে নিয়ে
যায় পাঠশালে।
শেষে এই 'রাম-খড়ি'টাই
সর্বনেশে 'রাম-দা'তে পরিণত হয়!
খড়ি শেষে 'খাঁড়া' হয়ে
ঊনবিংশ শতাব্দীর
তর্কপ্রিয় পৃথিবীর
বাক্যরোধ কোরে তবে ছাড়ে!

*　　　*　　　*

যাই হো'ক সবে 'হাতে-খড়ি',
মাটি-কোপানোর শব্দ শুধু।
বাগানের বহু দেরী,
তবু
যেন তার গন্ধ ভেসে আসে!
বিরাট বনস্পতিটার
পদধ্বনি যেন শোনা যায়!
অনাগত সমুদ্রের
অনাহত হিল্লোল-কল্লোল
অনাগত বিবেকানন্দের
ব্রহ্মকদ্র মত্ততার লীলা
আবছায়া যেন দেখা যায়!

*　　　*　　　*　　　*

"The seed is becoming the plant ;
A grain of sand never becomes....
All the possibilities of a future tree
Are in that seed ;
All the possibilities of a future man
Are in the little baby ;
All the possibilities of any future life
Are in the germ....
Every evolution
Presupposes an involution.
Nothing can be evolved
Which is not already there....
If a man is an evolution of the mollusc,
Then the perfect man,
The Buddha-man,
The Christ-man
Was involved in the mollusc."*

তাই,
সব চেয়ে মজাদার স্বামিজীর বাল্যলীলাটাই।

২

মোটামুটি বাংলাদেশে ছেলে দুই শ্রেণী,—
'সুশীল' ও 'বেণী'।
'ঐক্য-বাক্য' শুধু যারা পড়ে,
প্রথম বেঞ্চিতে বসে যারা,
কপালে থাকে না 'কাটা-দাগ,'
ভুলেও ওঠে না 'মগ্‌ডালে',
—তাদেরই 'সুশীল' বলা চলে।
'ঐক্য-বাক্য' শেষ ক'রে সমাজের বুকে
সোনার 'মেডেল' হ'য়ে
'মাণিক্যে'র মত এরা জ্বলে!

---

* "বীজই এক দিন বৃক্ষে পরিণত হয়, এক কণা বালি কখনো হয় না।···

ঐ বীজের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। ছোটো ছেলের মধ্যেই ভবিষ্যৎ মানুষের সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত। সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে ঐ বীজের মধ্যেই থাকে।···প্রত্যেক ক্রমবিকাশের গোড়াতেই একটা ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া আছে। যে জিনিসটা আগে থাকতে নেই, তার কখনো ক্রমবিকাশ হ'তে পারেনা।······

মানুষ যদি কোনো কোমলাঙ্গ জন্তু-বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তাহ'লে যা'রা মানুষের মত মানুষ, যেমন বুদ্ধদেব, যীশু খৃষ্ট, তাঁরাও তাহ'লে ঐ জন্তুতেই সঙ্কুচিত অবস্থায় বর্তমান ছিলেন।"

—(জ্ঞানযোগ)

বন্ধঘরে থাকে এরা,
ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যায়!
গো-বেচারা, শান্ত অতি
বেঁচে আছে কি না বোঝা দায়!
আপিসেতে সাহেবের ডান হাত এরা।
পরিবার নিয়ে এরা তাসখেলা করে!
"মিন্-মিনে ভিন্-ভিনে ছেঁড়া ছাতা" জাতে!
সমাজে যশস্বী হন বংশবৃদ্ধি ক'রে!

* * *

আর যারা 'বেণী'
শেষ বেঞ্চিতে বসে তা'রা,
ইস্কুলেতে দেরি ক'রে আসে,
কপালে কাটার দাগ থাকে,
এক লাফে ওঠে মগডালে,
দুম্-দাম্ ক'রে দোল খায়!
সমাজ তটস্থ থাকে এদের জ্বালায়!
এরা জাতে "খোলা তলোয়ার"!
কুচি-কুচি ক'রে সব কাটে!
অনন্ত আকাশে এরা থাকে,
ছেঁড়া-পাখা নিয়ে ঠেলে ঝড়-ঝাপ্‌টাকে।
এরা অকস্মাৎ
বজ্রের গর্জন নিয়ে যুদ্ধ-বোমার মত ফাটে!
ঠিক 'avalanche'*-এর ঠাটে
দুনিয়া-কাঁপিয়ে এরা বীর-দর্পে হাঁটে!
পৃথিবীতে জ্যান্ত থেকে এরা
একটা কাণ্ড ক'রে তবে ছাড়ে!

* * *

'সুশীল-বেণী'র কথা শুনে রাখা ভালো,
স্বামিজীর বাল্যলীলা বোঝা সোজা হবে।

৩

পাঠশালে যা শেখায়
ছেলে তার বেশী কিছু শেখে।
'ঐক্য বাক্য' ছাড়া আরও 'বাক্য' তার মুখে শোনা যায়!
সেই বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ
পাঠশালা ছাড়ালেন পিতা বিশ্বনাথ।
বাড়ীতে শিক্ষক রেখে দিয়ে
অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন।

৪

বই না ছুঁয়েই
চিৎ হয়ে চোখ বুঁজে পাঠ সারা হয়,
—এমন মজার কথা শুনেছো কি কেউ?
অথচ সে পড়া দেয় ঠিক নির্ভুল!
এটা যেন অনেকটা ভূতুড়ে ব্যাপার!
তবে শোনো, কায়দাটা শোনো একবার,—
শিক্ষক ব'লে দেন,—"পড়া ক'রে রেখো।"
তারপর দেওয়া-পড়া একটু বুঝিয়ে দেন তিনি।
তৎক্ষণে চিৎপাত্ হ'য়ে
চোখ বুঁজে, কান দুটো যত পারে ক'রে খাড়া করে!
ধ্যান-করা মন কিনা,
যা' ধরে তা' মোক্ষম ধরে!
তারপর?
তারপর দিন সেটা অবিকল বমি করে দেয়!
বেশী বই পড়ে কী টা হবে?
তার চেয়ে ফুল নিয়ে
গঙ্গা-মা'কে পুজো করা ভালো।
তাইতো নরেন মাঝে মাঝে
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গিয়ে 'গঙ্গা পুজো' করে।
পুজো-শেষে সন্ধ্যেবেলা কলার খোলায়
প্রদীপ ভাসিয়ে বলে—"গঙ্গা মা' কী জয়!" [ক্রমশঃ।

* পড়ন্ত পাহাড়ের চাই।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সাত

ঘটনাটা যেমনই আকস্মিক, তেমনি অভাবিত।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রহরোত্তীর্ণ নিশাকাশের এক প্রান্তে জেগেচে যেন হঠাৎ চক্ষু মেলে ত্রয়োদশীর শশিকলা বঙ্কিম ভঙ্গীতে ভাঙা-ভাঙা মেঘের গা ছুঁয়ে।

আর সহসা যেন সেই আলোয় রাত্রির প্রথম যাম অতিক্রান্ত ঘুমন্ত পৃথিবী চক্ষুরুন্মীলন করেচে। জেগে উঠেচে দিগন্ত-প্রসারী কৃষ্ণ-সাগরের নিথর কালো জল।

সেই সঙ্গে মৃদু মৃদু বায়ুভরে হিল্লোলিত হয় কৃষ্ণ-সাগরের তীরবর্তী শর ও হোগলা-বন।

আর সামনেই ঋজু একখানি ইস্পাতের তরবারির মত অকুণ্ঠিত নির্ভীক পথ রোধ করে দণ্ডায়মান অপরিচিত সূর্যকান্ত।

সেই মৃদু চন্দ্রালোকে বারেকের জন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শশাংকশেখর পথরোধকারী সূর্যকান্তর দিকে। মুহূর্তের জন্ত তার খরদৃষ্টি বুলিয়ে নিল সূর্যকান্তর সর্ব অবয়বে।

তার পরই কৌতূহলী শশাংকশেখর লাফিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে সামনাসামনি দাঁড়াল ভূপৃষ্ঠে।

তুমি সূর্যকান্ত?

হাঁ।

আবার সূর্যকান্তর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল শশাংক।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। বয়স ত্রিশোত্তীর্ণ বলেই অনুমান হয়। চওড়া বক্ষপট, দীর্ঘ বাহু, উন্নত নাসা। তারই ঠিক নিচে একজোড়া দুই প্রান্তে সরু পাকানো গোঁফ।

চোখের তারায় শাণিত ছোরার ঝকঝকে দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদ করচে। পরিধানে মালকোচা-আঁটা ধুতি ও বেনিয়ান। কোমরে বন্ধনী উড়নী, মাথায় রেশমী পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ। পায়ে জরির নাগরা।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল শশাংশেখর! নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমেই সূর্যকান্ত কথা বললে।

আমার সঙ্গে?

হাঁ।

কিন্তু তোমাকে ত আমি চিনতে পারচি না! কখনো এখানে পূর্বে তোমাকে দেখেচি বলেও ত মনে পড়চে না?

না। তুমি আমাকে চিনবে না শশাংকশেখর! কারণ, ইতিপূর্বে সত্যিই কখনো তুমি আমায় দেখনি, তা ছাড়া এখানে আমি থাকিও না। তুমিই বোধ হয় জমিদার রাজশেখর রায়ের পুত্র?

হাঁ। কিন্তু—

শশাংকর কথা শেষ হবার পূর্বেই সূর্যকান্ত বললে, তুমিই বোধ হয় গত রাত্রে বুলন্ত শাড়ী ধরে বাগান-বাড়ির দোতলার ছাদে উঠেছিলে?

তুমি দেখেচো?

দেখেচি এবং একদিন নয়, পর পর দুই রাত্রে দেখেচি। দূর থেকে সে সময় অস্পষ্ট ভাবে তোমাকে না চিনতে পারলেও অনুমান করেছিলাম তোমাকে, পরে অনুসরণ করি জমিদার-বাড়ি পর্যন্ত, যে তুমিই। আর এ-ও বুঝেচি, কেন রাত্রে বাগান-বাড়িতে যাও তুমি।

তুমি জান?

হ্যাঁ। চন্দ্রার কাছেই তুমি যাও—আর—

সূর্যকান্তর বক্তব্য শেষ হলো না, আচম্কা ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে শশাংক তার বজ্রের মত মুষ্টিতে সূর্যকান্তর গলার কাছে পরিধেয় বেনিয়ানের প্রান্ত চেপে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সত্যি করে বল কে, কে তুমি, কি তোমার সত্য পরিচয়?

প্রথমটায় আচম্কা আক্রান্ত হ'য়ে সূর্যকান্ত মুহূর্তের জন্ত একটু হকচকিয়ে গেলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঝট্‌কা দিয়ে শশাংকর মুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চাপা কণ্ঠে হেসে ওঠে। চন্দ্রালোকে তার দাঁতগুলো যেন ঝিকিয়ে ওঠে।

অত্যন্ত শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বলে, দাঁড়াও! দাঁড়াও হে শশাংকশেখর! অত ব্যস্ত হয়ো না। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। সূর্যকান্ত ক্ষিপ্র তৎপরতায় তার হাত থেকে নিজেকে অবলীলাক্রমে মুক্ত করে নিতেই শশাংক বুঝেছিল, প্রতিপক্ষ নেহাৎ হেলা-ফেলার বস্তু নয়, যথেষ্টই শরীরে সে শক্তি রাখে। তাই এবারে সে নিজেও সতর্ক হ'য়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সূর্যকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি জানতে চাও তুমি বল?

বুঝতেই পারচো গত দু' রাত্রি আমি তোমাকে, তোমার সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করেচি।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারচি, কিন্তু বক্তব্যটা তোমার জানতে পারি কি?

চন্দ্রাকে তুমি ভালবাস?

সে প্রশ্নে তোমার প্রয়োজন?

যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।

মুহূর্ত কাল শশাংক যেন কী ভাবল। তার পর বললে, হাঁ, ভালবাসি।

হুঁ! দেখচি আমার অনুমান তাহ'লে মিথ্যা নয়। যাক্, শোন শশাংক, চন্দ্রার জীবন-পথ থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে।

সূর্যকান্ত!

শোন, শোন। প্রাণের মায়া যদি তোমার থাকে ত এখনো বলচি, চন্দ্রার আসন থেকে তুমি সরে দাঁড়ালে বুদ্ধিরই পরিচয় দেবে।

হুঁ! আর—আর যদি না সরে দাঁড়াই?

একটু আগে বললাম ত। শোন শশাংক, একই আকাশে যেমন দু'টি চন্দ্র থাকতে পারে না, তেমনি এ পৃথিবীতেও চন্দ্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী দু'জন থাকতে পারে না। থাকবেও না।

সূর্যকান্ত!

হাঁ, হয় চন্দ্রা আমার হবে নচেৎ তোমার হবে। তাই বলছিলাম, চন্দ্রার জীবন-পথ থেকে হয় তুমি সরে দাঁড়াবে, না হয় সড়ে দাঁড়াবো আমি। হয় আমি না হয় তুমি। দু'জনের আমাদের একজনকে যেতে হবেই।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন শশাংকর কাছে স্বচ্ছ পরিষ্কার হ'য়ে যায়।
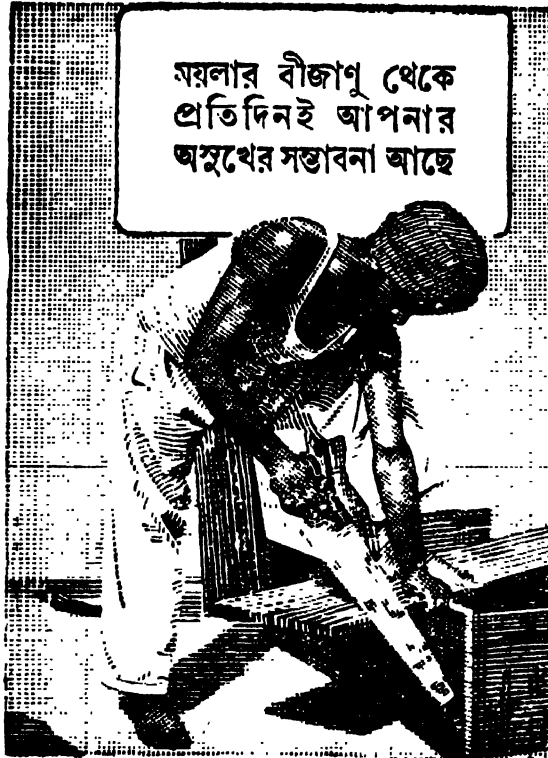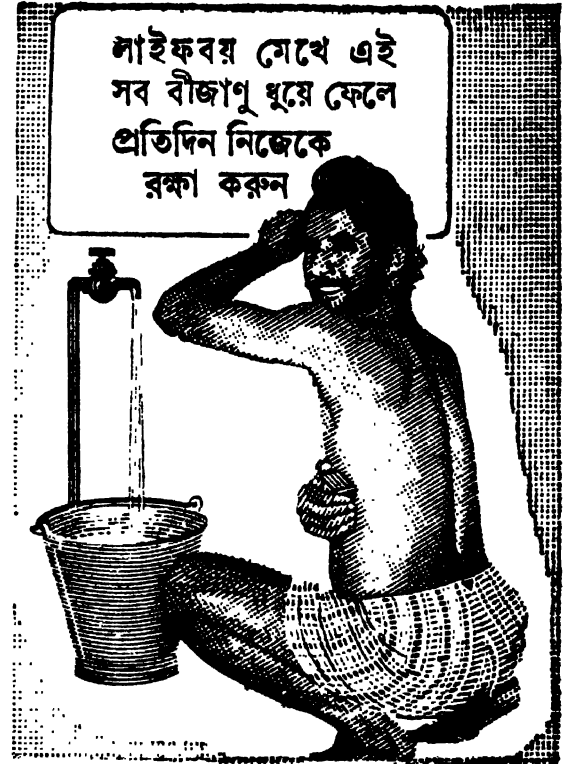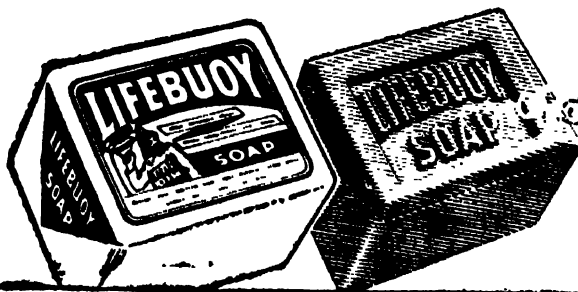
সূর্যকান্তও তারই মত চন্দ্রার প্রেমাভিলাষী।

কিন্তু কে এই সূর্যকান্ত? কি এর সত্য পরিচয়? হঠাৎ ও কোথা থেকেই বা ধূমকেতুর মত তার সামনে এসে উদয় হলো?

আমার বক্তব্যটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার স্পষ্ট হয়েছে তোমার কাছে শশাংকশেখর! সূর্যকান্ত আবার বলে ওঠে।

হাঁ, বুঝেচি বৈ কি।

তাহ'লে?

তাহ'লে তোমাকেই জেনো সরে দাঁড়াতে হবে।

হুঁ। তাহলে বুঝচি ভাল কথায় তুমি বুঝ মানবে না। বলতে বলতে ঈষৎ যেন হেলে দাঁড়াল সূর্যকান্ত। তারপর আরো স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, বৃথা প্রাণক্ষয়ে আমার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না শশাংক! কিন্তু তুমিই আমাকে বাধ্য করালে—বলতে বলতে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চকিতে কটিবন্ধনী থেকে একখানি তীক্ষ্ণধার সূচাগ্র ছুরিকা বের করে মুহূর্তে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল সূর্যকান্ত। চন্দ্রালোকে ছুরিকার ইস্পাতের তীক্ষ্ণধার ফলাটা যেন ভয়াবহ জিঘাংসায় ঝিক্‌-ঝিক্ করে উঠলো।

চক্ষের পলকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শশাংকও দু'পা পিছনে হেঁটে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। তার চোখের সতর্ক শাণিত দৃষ্টি সূর্যকান্তর হস্তধৃত ধারালো ছুরিকার উপরে স্থির নিবদ্ধ হলো।

শশাংকশেখর! এই শেষ বার বলচি, এখনো ভেবে দেখো।

শশাংক কোন আর জবাব দেয় না, শুধু দেহটা তার ঋজু সরল হ'য়ে অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের মুহূর্তটির জন্য সতর্ক হ'য়ে থাকে।

হঠাৎ এগিয়ে এলো সূর্যকান্ত।

নিরস্ত্র শশাংকশেখর! সে জানে, সামান্যতম অসতর্ক হলেই ঐ উদ্যত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তার রক্তদর্শন করবে। যুধ্যমান দু'টি ক্রুদ্ধ সিংহ যেন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজচে।

স্বল্পচন্দ্রালোকিত আকাশ-পথে একটা রাতজাগা পাখী ডানার শব্দ তুলে কঁ কঁ করে বিচিত্র ডাক ডেকে উড়ে গেল।

বায়ুহিল্লোলে শর ও হোগলা-বন বারেকের জন্য সর-সর করে শব্দায়িত হ'য়ে উঠলো।

দু'জনে কখনো এগিয়ে যায়, কখনো দু'পা পেছিয়ে যায়।

ঝাঁপিয়ে পড়লো হঠাৎ সূর্যকান্ত শশাংকর উপরে। মুহূর্তে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বাম পাশে একটু হেলে পড়ায় ছুরিকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বটে, তার পর ধারালো অগ্রভাগ শশাংকর বাম বাহুমূল ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করে গেল, এবং শশাংক সেই মুহূর্তটিকে ফসকে যেতে দিল না। সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় সূর্যকান্তর ছুরিকা সমেত দক্ষিণ বাহুটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে একটা প্রচণ্ড মোচড় দিতেই বেদনার্ত একটা শব্দ করে উঠলো সূর্যকান্ত। তার শিথিল মুষ্টি হতে ছুরিকাটা মাটিতে পড়ে গেল।

এবারে আর কোন অস্ত্র নয়। পরস্পরের দৈহিক শক্তি। দু'জনে দু'জনকে জাপটে ধরলো। মল্লযুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেল সেই নির্জন মধ্য-নিশীথে কৃষ্ণসাগরের তীরে।

প্রায় মিনিট দশেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর হঠাৎ এক সময় শশাংক সূর্যকান্তকে মাটিতে ফেলে তার বক্ষের উপরে উঠে বসে গলাটা টিপে ধরল। সূর্যকান্ত! এবারে যদি তোমাকে আমি হত্যা করি? চাপা কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সূর্যকান্ত বললে, করতে পারো হত্যা।

কিন্তু না। অযথা প্রাণক্ষয় আমি করি না। তোমাকে আমি মুক্তিই দেবো।

তোমার খুসী।

মুক্তিই তোমাকে আমি দেবো, তবে এই শেষ বারের মতই। তবে এ-ও মনে রেখো, দ্বিতীয় বার এ তল্লাটে যদি কখনো তোমার ছায়া পর্যন্ত দেখি, সেদিন আর তোমাকে ক্ষমা করবো না। বলতে বলতে গলার কাছে পরিধেয় জামার প্রান্তটা ধরে এক হেঁচকা টানে সূর্যকান্তকে এনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

যাও। এ তল্লাটে যেন আর কখনো না তোমাকে দেখি। আর একটা কথা শুনে যাও। বন্দুকের নিশানা আমার অব্যর্থ। শব্দভেদী বাণের মতই আমার নিশানা লক্ষ্য ভেদ করে।

শশাংকর কথাটা বোধ হয় শেষ হলো না, এক লাফে হঠাৎ সূর্যকান্ত গিয়ে কৃষ্ণসাগরের অথৈ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, নিস্তব্ধ কৃষ্ণসাগরের জলরাশি আলোড়িত হ'য়ে চারি দিকে জলকণা ছিটকে গেল। তার পর সব আবার স্তব্ধ।

মুহূর্ত কাল শশাংক চন্দ্রালোকিত কৃষ্ণসাগরের দিকে তাকিয়ে রইলো কিন্তু কিছুই সে আর দেখতে পেল না। কৃষ্ণসাগরের অথৈ জলরাশি যেন সূর্যকান্তকে গ্রাস করে নিয়েছে। সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলিত বীচিভঙ্গে লীলায়িত দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণসাগরের কালো জল!

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত ঘটে গেল।

শশাংকশেখর ফিরে তাকাল এবং তাকাতেই নজরে পড়ল, অদূরে তখনও পড়ে আছে সূর্যকান্তর সেই ধারালো ছুরিকাটা। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল মাটি থেকে ছুরিকাটা শশাংক।

ছুরিকার বাঁটটি ভারি সুন্দর! সাদা হাতীর দাঁতে তৈরী। ছুরিকাটা কোমরে গুঁজে এগিয়ে গেল শশাংক অল্প দূরেই দণ্ডায়মান তার শিক্ষিত প্রিয় অশ্বের সামনে। অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হ'য়ে ইঙ্গিত করতেই অশ্ব তার গন্তব্য পথে ছুটলো।

চন্দ্রার চোখে সে রাত্রে ঘুম ছিল না। কেবলই সে একবার ঘর আর একবার ছাদ করছিল অধীর উৎকণ্ঠায়। এখনো আসচে না কেন শেখর! এত ত দেরি হবার কথা নয়! ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে হেলে পড়েচে। রাত্রি তৃতীয় যামের পথে।

তবে কি শেখর আজ আসবে না? কিন্তু সে ত তা বলে যায়নি? তবে সে এখনো আসচে না কেন? কেন এত বিলম্ব করচে? এমন সময় শোনা গেল সেই প্রিয় মধুর ডাকটি।

চন্দ্রা! চন্দ্রা!

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছাদ থেকে শাড়ী ঝুলিয়ে দিল চন্দ্রা নীচে। একটু পরেই উঠে এলো শেখর ছাদে।

চন্দ্রা!

শেখর! এত দেরি হলো যে?

চল ঘরে চল, বলচি সব।

দু'জনে এসে চন্দ্রার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করল। এবং কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষের প্রদীপালোকে শেখরের গাত্রবস্ত্রের

দিকে দৃষ্টি পড়তেই অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রা, রক্ত! রক্ত কিসের শেখর?

রক্ত?

হাঁ, তোমার জামায়।

শশাংক এবার নিজের গাত্রবস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যিই ত। গাত্রবস্ত্রের অনেকখানি রক্তে ভিজে লাল হয়ে গিয়েচে।

উত্তেজনার মধ্যে এতক্ষণ সে টেরও পায়নি, নজরেও তার পড়েনি যে আহত হয়েচে সে সূর্যকান্তর হাতে।

দেখি! দেখি! এগিয়ে এলো উৎকণ্ঠায় চন্দ্রা শশাংকর অতি নিকটে। এবং দেখা গেল, ক্ষতটা নেহাৎ একেবারে ছোট নয়, বেশ খানিকটা কেটে গেছে।

সর্বনাশ! এ কি? কেমন করে আহত হলে শেখর!

মৃদু অশ্বাসের কণ্ঠে শশাংক বলে, না, না—ও কিছু নয়।

কিছু নয় মানে? দাঁড়াও, দাঁড়াও—

নিজের পরিধেয় রেশমী শাড়ীর অঞ্চলের প্রান্তভাগ হাতে তুলে নিয়ে শশাংক কোন রকম বাধা দেবার পূর্বেই ফস্ করে খানিকটা ছিঁড়ে ফেলল চন্দ্রা।

ও কি! ও কি করলে, শাড়ীটা ছিঁড়লে?

শশাংকর সে কথার জবাব না দিয়ে সেই ছিন্ন শাড়ীর অংশটি কক্ষমধ্যস্থিত কলসের জলে সিক্ত করে এগিয়ে এলো চন্দ্রা।

বোস! বোস।

পালঙ্কের উপরে শশাংককে বসিয়ে সুনিপুণ হাতে শশাংকর হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল চন্দ্রা।

কি করে অমন আহত হলে বল ত? চন্দ্রা আবার জিজ্ঞাসা করে।

ও কিছু না।

কিছু না মানে? কী হয়েছে?

উঁহু! তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারচি নিশ্চয়ই কিছু ঘটেচে। কী হয়েচে বল?

সংক্ষেপে তখন শশাংক ক্ষণপূর্বের পথিমধ্যের সূর্যকান্তর সঙ্গে সংঘাতের ব্যাপারটা খুলে বলল চন্দ্রাকে।

চন্দ্রা স্তম্ভিত নির্বাক্।

এবারে শশাংক ডাকে, চন্দ্রা!

চন্দ্রা যেন সে ডাকে চমকে ওঠে, বলে, য়্যাঁ!

সূর্যকান্তকে তুমি চেন?

হাঁ! মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় চন্দ্রা। কে! কে সূর্যকান্ত! আজ নয় শেখর! আর একদিন তোমাকে সব বলবো।

বিস্মিত শশাংক চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আর একদিন বলবে?

হাঁ।

কিন্তু ওর কথা ত কই কখনো আগে তুমি আমাকে বলনি চন্দ্রা!

না।

ক্ষণকাল শশাংক অতঃপর যেন কি ভাবে। তারপর আবার চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে, চন্দ্রা!

বল।

আমার একটা কথার জবাব দেবে চন্দ্রা!

চন্দ্রা প্রত্যুত্তরে কেবল শশাংকর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

জবাব দেবে? বল? এত দিন তোমার পূর্ব-পরিচয় কখনো আমি জানতে চাই নি। কোথা থেকে কেমন করে এই বাগান-বাড়িতে তুমি এলে। কত দিন তুমি এখানে আছো! ঐ সরযূই বা তোমার কে? এ-সব কথা জানবার জন্ত আজ যদি আমার কৌতূহল হয়ে থাকে তার কি জবাব পাবো না?

আমার জীবনের অনেক কথা আমি নিজেই স্পষ্ট করে জানি না। আজ পর্যন্ত কারো কাছে জবাবও পাইনি! এখানে আসবার আগে পর্যন্ত যেটুকু জানি তাও এমন অস্পষ্ট যে, তোমার কৌতূহল মেটাতে পারবো কি না জানি না।

তোমার মা-বাবা কে?

জানি না।

জানো না?

না।

কখনো শোনও নি তাদের সম্পর্কে কোন কথা?

না!

এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?

জায়গাটার নাম জানি না, বলতে তাই পারবো না তোমায়। তবে শুনেছিলাম সেটা ছোট একটা শহর—পশ্চিমে।

সেখানে তুমি কোথায় থাকতে?

এমনিই একটা বদ্ধ বাড়িতে। প্রায় এমনিই বন্দিনী অবস্থায়।

আশ্চর্য! তারপর!

তারপর কি শেখর!

সেখানে তুমি ছাড়া আর কে কে থাকত?

কিন্তু আজ নয় শেখর! কাল রাত্রে এসো, বলবো। ঐ দেখ চেয়ে দেখো, পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসচে। এখুনি হয়ত সরযূ উঠে পড়বে। তুমি এবারে যাও!

শশাংক তাড়াতাড়ি জানালা-পথে চেয়ে দেখলো সত্যিই ত! রাতের আকাশ ইতিমধ্যে কখন এক সময় ফিকে হয়ে

এসেচে ও টের পায়নি। সত্যি! বড্ড দেরি হয়ে গেছে আজ।

তাড়াতাড়ি শশাংক উঠে দাঁড়াল। এবং পূর্বের মতই শাড়ী ধরে ঝুলতে ঝুলতে নীচে এসে নেমে অশ্বারূঢ় হলো।

অশ্বশালায় অশ্বকে ছেড়ে দিয়ে শশাংক যখন নিজের শয়ন কক্ষে এসে প্রবেশ করল, পূর্বাকাশ-প্রান্তে তখন অত্যাসন্ন প্রভাতের প্রথম রাঙা আভাসের ছোপ ধরেচে।

ক্লান্ত শশাংশ সোজা গিয়ে শয্যার উপরে গা এলিয়ে দিল। ঘুম ভাঙল বেলায় মাধবীর ডাকে। দাদা, অ-দাদা! আজ কত ঘুমুবে বল ত! সারা রাত কি জেগে থাকো না কি যে আজ-কাল এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাও?

আঃ মাধু, কেন বিরক্ত করচিস বল ত! একটু কী ঘুমতেও দিবি না? শশাংক পাশ ফিরে আবার শোবার চেষ্টা করতেই মাধবীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কানে এলো, ও কি দাদা, তোমার হাতে কী হয়েচে?

এবারে তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে বসে শশাংক। একেবারে মনে ছিল না কথাটা। বাম বাহুমূলে নজর পড়তেই দেখল, গত রাত্রের চন্দ্রার সযত্নে বেঁধে দেওয়া তারই ছিন্ন আকাশ-নীল রঙের রেশমী শাড়ীর বন্ধনটা তেমনিই রয়েচে। হঠাৎ যেন কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে শশাংক। মাধবীর প্রশ্নের জবাবে কি বলবে, বুঝে উঠতে পারে না।

মাধবী আরো একটু এগিয়ে এসেচে ততক্ষণে। বলে, কী হয়েচে দাদা!

ও কিছু না, কাল রাত্রে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ কেমন পা হড়কে পড়ে গিয়ে হাতটা একটু কেটে গিয়েছিল। হ্যাঁ রে, মা এখন কোথায় রে? পুজার ঘরে বুঝি?

প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবার চেষ্টা করলো শশাংক। কিন্তু মাধবী তখন একদৃষ্টে দেখছিল তার দাদার বাহুমূলে সেই বিচিত্র বর্ণের রেশমী কাপড়ের বন্ধনটা।

শশাংকরও সে দিকে নজর পড়ে।

ছিঃ ছিঃ, মনের ভুলে কি বোকামীই না সে করেচে! কথাটা একেবারে মনেই ছিল না। তা ছাড়া এই সাত সকালেই যে মাধু মুখপুড়ী এসে ঘরে ঢুকবে, তাই কি ও জানত না কি?

দেখি। দেখি কতখানি কেটেছে! এগিয়ে আসে আরো কাছে মাধবী।

হাত দিয়ে বন্ধনটা ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে শশাংক বলে, না, না, ও এমন কিছু না, তুই যা ত! নীচে যা, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসচি, আমাকে খেতে দিবি!

না। আমি দেখবো—দেখি—

বলচি বিশেষ কিছু না! মাধবীকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে শশাংক।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা জিনিষ মাধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেচে। শশাংকর মুখে ঠিক ওষ্ঠের ধারে একটি লাল চিহ্ন।

তোমার ঠোঁটের পাশে ও লাল দাগ কিসের দাদা?

লাল দাগ! এবারে যেন আরো বেশী চমকে ওঠে শশাংক মাধবীর প্রশ্নে। কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাপড়ের খুঁট দিয়ে দাগটা ঘষে-মুছে নিয়ে সে দিকে নজর দিতেই শশাংক নিজের মনেই চমকে ওঠে!

কি সর্বনাশ! এ যে চন্দ্রার কপালের কুমকুমের টিপের ছোপ লেগেচে তার ওষ্ঠ-প্রান্তে এবং মনে পড়ে বিদায়ের প্রাক্কালে চন্দ্রাকে বক্ষের উপর নিবিড় করে টেনে নিয়ে যে ওষ্ঠে-ওষ্ঠে প্রীতি ও প্রেম জানিয়েছিল খুব সম্ভবত ও তারই চিহ্ন!

উঃ, কী কুক্ষণেই যে আজ তার নিদ্রাভঙ্গ হয়েচে! খিঁচিয়ে ওঠে বোনকে শশাংক, মুখপুড়ী সাত সকালে তোর কি আর কোন কাজ নেই?

এবারে আর মাধবী কেন যেন কোন তর্ক তুলল না। নিঃশব্দে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। শশাংক একটা আরামের নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবল, যাক্! আপাততঃ ফাঁড়া কাটল।

মাধবী ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই ক্ষিপ্র হস্তে শশাংক ক্ষত-স্থানের উপর থেকে চন্দ্রার তারই ছিন্ন শাড়ী দিয়ে দেওয়া বন্ধনটা খুলে ফেলে। এবং চন্দ্রার শাড়ীর সেই ছিন্ন টুকরোটা পালঙ্কের গদীর তলায় গুঁজে রেখে ঘরের দেওয়ালে প্রলম্বিত প্রমাণ আর্শীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে লাগলো আর কোথায়ও রাত্রির অভিসারের চিহ্ন চোখে-মুখে আছে কি না।

আর্শীর প্রতিবিম্বর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভাবতে

গিয়ে হঠাৎ নিঃশব্দ হাসিতে মুখখানা ভরে যায়। মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি বহু-পরিচিত পংক্তি।

সিন্দুরের দাগ দেখি সর্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে।

মনোমুকুরে ভেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে একখানি প্রিয় মুখচন্দ্রিমা। হরিণী সদৃশ জল-ছলো-ছলো কালো দুটি নয়ন। টানা বঙ্কিম দুটি ভ্রূ। মধ্যস্থলে তার রক্ত কুকুমের টিপ। যেন সন্ধ্যাকাশের শুকতারাটি। চারু কপোলখানির পাশে-পাশে চূর্ণ কুন্তলের দু'-একটি নেমেছে লতিয়ে লতিয়ে। বাম গণ্ডের 'পরে ছোট্ট কালো তিলটি।

চন্দ্রা! তার চন্দ্রা! মনোলোকের স্বপ্নচারিণী!

ভাবতে ভাবতে গভীর সুখাবেশে শশাংকর সারা অঙ্গ যেন ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হ'তে থাকে। বরষার প্রথম বারিসিঞ্চন স্পর্শে কদম্বের মত আবেশে, পুলকে শিহরিত হয় যেন সর্ব দেহ তার।

আপনা থেকেই মুদিত হয়ে আছে আবেশে অনুরাগে দু'টি চক্ষু তার।

আর ঠিক ঐ সময়টিতে আপন কক্ষে পালঙ্কের 'পরে সারা রাত্রি জাগরণের পর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল চন্দ্রা। প্রিয়তমের নিবিড় কোমল দুটি বাহু-বন্ধনের মধ্যে যেন নিজেকে এলিয়ে দিয়েচে সে!

ঘরের প্রদীপ নিবু-নিবু! কনক চাঁপার গন্ধ নিয়ে বাতায়ন-পথে আসছে রাত্রির বাতাস।

শেখর! শেখর! শেখর! তার শেখর।

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় যেন ঘরের প্রদীপ-শিখাটি গেল দপ্‌ করে নিবে। সোঁ-সোঁ করে ছুটে এলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা। মুহূর্তে কক্ষ হ'য়ে গেল অন্ধকার।

চেঁচিয়ে উঠলো চন্দ্রা, শেখর! শেখর! কোথায়? কোথায় তুমি? একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল চন্দ্রার।

হ্যাঁ লা, তোর হয়েচে কি বল ত আজ-কাল? এত বেলা হ'য়ে গেল এখনো উঠবার নাম নেই ঘুম থেকে!

তাকিয়ে দেখলো চন্দ্রা সামনে দাঁড়িয়ে সরযূ!

সরযূ তাকে ডাকচে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল চন্দ্রা।

তোর ব্যাপারটা কি? আজ-কাল কি সারা রাত ঘুমাস না না কি?

বড্ড বেলা হয়ে গেছে সরযূ, না?

ওটা কি? বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে একটা রক্তাক্ত জামা মেঝে থেকে তুলে নিল হাতে সরযূ।

এ কার জামা? এতে এত রক্তই বা এলো কি করে?

সর্বনাশ! চন্দ্রা ফ্যাল-ফ্যাল্ করে সরযূর হস্তধৃত জামাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। শেখরের জামা; রক্ত লেগেছিল বলে গত রাত্রে সে এক প্রকার জোর করেই শেখরের গা থেকে খুলে নিয়েছিল; তার পর এক সময় ভুলে গেছে জামাটা সরিয়ে রাখতে।

সরযূ চন্দ্রার মুখের দিকে তাকায়। চন্দ্রা নির্বাক্।

[ক্রমশঃ।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১০

এ রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। সারা সুলতানপুর সরগরম হয়ে উঠলো।

সর্ব্বত্র সেই এক আলোচনা!—এ রকম নিষ্ঠুর ভাবে কে হত্যা করলে রঞ্জনকে?

কত লোক কত কথা বললে।

কয়লাকুঠির আগের আমলের লোক যারা—তারা দোষ দিলে কয়লাকুঠির। বললে, মাঠের ধান আর পুকুরের মাছ নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হ'তো আমাদের আমলে, কিন্তু এরকম নিষ্ঠুর কাজ কেউ কখনও করতো না। মানুষের ধর্ম্মভয় ছিল।

কিন্তু রঞ্জন ছেলেমানুষ—তার সঙ্গে কার কি হ'লো?

অনেকের ধারণা—তিন-তিনটে কয়লা-কুঠির মালিক তার বাবা—দেবু চাটুজ্যে, টাকা পয়সা নিয়ে কারবার করে কত লক্ষপতি কোটিপতি মহাজনের সঙ্গে, তাদেরই কারও সঙ্গে কিছু হয়েছে হয়ত। এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড হয়ত-বা তারই পরিণাম।

আবার কেউ কেউ বললে, বড়লোকের ছেলে, কলকাতায় থাকে, কার সঙ্গে কি শত্রুতা করেছে কে জানে, যার ফলে—দিলে জীবনটাকে শেষ করে।

কেউ বললে, রঞ্জন নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, এর মধ্যে নারী-ঘটিত ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে—এ-কথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

পরাশর পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে উঠলো কিন্তু অন্য কথা।

বুড়ো শিবের বাড়ীর পাশেই পরাশরের চতুষ্পাঠী। নামেই চতুষ্পাঠী। আসলে কিন্তু পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের আড্ডাঘর।

পরাশর পণ্ডিত-মানুষ। অন্তত নিজে সে সেই কথা বলে। কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ—এমনি আরও কি কি সব উপাধি তার আছে। পরাশর বলে, নিজের মুখে সে-সব কথা যে-ব্যক্তি প্রচার করে সে মূর্খ।

প্রাচীন কালের মুনি-ঋষির মত মাথায় বড় বড় চুল, মুখে এক-মুখ দাড়ি-গোঁফ—পরাশর এই কয়লাকুঠির দেশে এসেছিল বাঁকুড়া জেলার কোন্ এক গ্রাম থেকে বরপক্ষের পুরোহিত হয়ে। তার পর সে কেমন করে' এখানে থেকে গেল—সে এক বিচিত্র কাহিনী! এই প্রসঙ্গে সে কথা জেনে রাখা ভাল।

কয়লাকুঠির জমজমাট অবস্থা তখন সবে শুরু হয়েছে। পরাশর দেখলে এখানে সবই আছে, নেই শুধু একটি চতুষ্পাঠী। মনে তার বাসনা জাগলো, একটি চতুষ্পাঠী খুলে অর্থ উপার্জ্জন করবার। বরযাত্রীরা চলে গেল, বর-কনে বিদায় হ'লো, পরাশর কিন্তু রয়ে গেল সুলতানপুরে।

বুড়ো শিব পেরিয়ে যাচ্ছিল গ্রামে পথ দিয়ে। পাশেই রুদ্রেশ্বরের মন্দির। নাটমন্দিরে প্রণাম করে' মাথা তুলতেই দেখে, চুলদাড়িওলা একজন লোক বসে বসে গান গাইছে। ভেবেছিল, বিবাগী কোনও সাধু-সন্ন্যাসী হবে হয়ত'। গানের ভাব শুনে মনে হ'লো বাঙালী।

বুড়ো শিব জিজ্ঞাসা করলে, এখানে বসে কেন বাবা?

পরাশর বললে : আপনাদের এ গ্রামটি আমার ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

বুড়ো শিবের বাড়ী—অবারিত দ্বার! তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হয়ে গেল—পরাশর বুড়ো শিবের বাড়ীতেই থাকবে, খাবে যত দিন না তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'তে দেরি হ'লো না। চতুষ্পাঠীর জন্য ভাল একখানি ঘরের সন্ধান করতে লাগলো বুড়ো শিব।

মনের মত ঘর কিন্তু পাওয়া যাচ্ছিল না! কথায় কথায় বুড়ো শিব একদিন বললে, চতুষ্পাঠী এখানে চলবে না পরাশর!

পরাশর বললে, আর কয়েকটা দিন দেখা যাক্, ঘর যদি না-ই পাওয়া যায়, তোমাকে আর বেশি দিন কষ্ট দেবো না। দেশে চলে যাব। আমি বুঝতে পেরেছি।

কথাটা কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা। পরাশর যদি সারা জীবন তার বাড়ীতে থাকে, খায়, তবু সে তাকে একটি কথাও বলবে না! এই তার স্বভাব। অথচ এত দিন একসঙ্গে থেকেও পরাশর তাকে চিনতে পারলে না! বুড়ো শিব আহত হ'লো, বললে, সেই ভালো।

এমন দিনে একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটে গেল। বুড়ো শিবের পাশের বাড়ীতে থাকে মদন।

মদন আচার্য্য।—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছোকরা, মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, বিয়ে করেছিল, বৌ মরে গেছে। বাড়ীতে একমাত্র বিধবা বোন—দু'বেলা রান্না করে দেয়, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্মের ভার তারই ওপর। মদনের পৈতৃক জমিজমা কিছু আছে, পুকুর আছে, বাগান আছে, তাইতেই তার দিন চলে যায়, উপার্জ্জনের ভাবনা ভাবতে হয় না। দিবা-রাত্রি আড্ডা মেরে হৈ-হৈ করে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন সকালে বুড়ো শিব তার বাইরের ঘরে বসে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময় মদন এসে খবর দিলে—কাল রাত্রে তার বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে। এ রকম ছোটখাটো চুরি আজ-কাল অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। একটু সাবধানে থাকবেন।

বুড়ো শিব বললে, কত দেশ থেকে কত রকমের কত মানুষ এসেছে কলিয়ারীতে কাজ করতে। চুরি তো হবেই। কি চুরি হ'লো তোমার?

মদন বললে, সোনার বোতাম। জামাতে লাগানোই ছিল, খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

—জামা কোথায় রেখেছিলে?

—জানলার পাশে হুকে টাঙিয়ে। ময়লা জামা, ভেবেছিলাম কাচতে দেবো।

বুড়ো শিব জিজ্ঞাসা করলে, জামা আর বোতাম নিয়ে গেল, আর কিছু নিলে না?

মদন বললে: জামা নেয়নি। রাস্তার ধারে ওই যে জানলাটা—ওই জানলার ফাঁকে হাত গলিয়ে, নয় তো খোঁচা মেরে জামাটা টেনে বের করেছে, তারপর বোতামগুলো খুলে নিয়ে জামাটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। জামা নেবে কেমন করে? পরলেই ধরে ফেলবো তো!

পরাশর সব শুনছিল, এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। এইবার সে মদনকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকলে। বললে, এইখানে বোসো।

মদন বসলো মেঝের ওপর।

পরাশর বুড়ো শিবের মুখের পানে তাকালে। জিজ্ঞাসা করলে: চক্ খড়ি আছে বাড়ীতে?

বুড়ো শিব বললে, বোধ হয়, নেই।

পরাশর বললে, একটা কাগজ আর পেন্সিল?

তা আছে। বলে বুড়ো শিব এক টুকরো সাদা কাগজ আর একটা পেন্সিল এনে দিলে।

পেন্সিল দিয়ে কাগজটার ওপর পরাশর কতকগুলো কি সব হিজিবিজি কাটলে, অঙ্ক করলে, তারপর মদনের দিকে তাকিয়ে বললে, চট্ করে একটি ফুলের নাম বল।

বুড়ো শিবের বাড়ীর উঠোনে একটা জবার গাছে কয়েকটা ফুল ফুটেছিল, মদন সেই দিকে তাকিয়ে বললে, জবা।

পরাশর চোখ বুজে কি যেন ভাবলে। তারপর তেমনি ধ্যানস্থ হয়েই বলতে লাগলো, তোমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিক কি দক্ষিণদিক ঠিক বুঝতে পারছি না—সেইখানে তোমার জামার বোতামটি রয়েছে—আমি দেখতে পাচ্ছি। ও জিনিস কেউ নেয়নি। ওটি তুমি ফিরে পাবে। তিন দিনের ভেতর যদি না পাও, তখন আবার আমার কাছে এসো। কি করতে হবে আমি বলে দেবো।

পরাশর চোখ খুলে চাইলে।

বুড়ো শিব বললে, এ-সব বিদ্যেও তুমি জানো না কি?

পরাশর বললে, জানি। হাত দেখে ভাগ্যগণনা করতে পারি।

তবে আর কি! তুমি তো মানুষের হাত দেখে রোজগার করতে পারবে। এই বলে বুড়ো শিব হো-হো করে হাসতে লাগলো।

শেষ পর্য্যন্ত হ'লোও তাই।

তিন-চার দিন পরে, একদিন বিকেলবেলা মদন এলো হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটতে ছুটতে বুড়ো শিবের বৈঠকখানায়। বললে: পেয়েছি। আমার বোতামগুলো পাওয়া গেছে।

বলেই পরাশরের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বিস্ময়-বিস্ফুর চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে পেলে?

—আপনি ঠিক যা' বলেছিলেন, তাই হলো।'

মদন আবার তার পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত মাথায় ঠেকালে। বললে, দিদি যে ঘরখানায় থাকে, তার পূবদিকের দেয়ালে একটা তাকের ওপর মাটির একটা ভাঁড়ের ভেতর ছিল। সোনার জিনিস, দিদি জামা থেকে খুলে কোন্ সময় সেই ভাঁড়ে ফেলে রেখেছিল তার মনেই ছিল না। দিদির এমনি ভোলা মন—এই যে চেঁচামেচি করছি, তা' সে দিকে সে কানই দিচ্ছে না। আপন মনে বকছে আর ঘরের কাজ করে যাচ্ছে। তার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের গালাগালি দিচ্ছে দিন-রাত। আজ হঠাৎ সেই ভাঁড়ে হাত পড়তেই বোতামগুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এই নে তোর বোতাম। আমিই খুলে রেখে ভুলে গিয়েছিলাম। এমনিই পোড়া মন আমার! তা মনেরই বা দোষ কি? আমার সেই দেওর-ছোঁড়া—

বাস্, আরম্ভ হয়ে গেল দেওরকে গালাগালি।

পরাশরকে দেখা মদনের যেন আর শেষই হয় না। একদৃষ্টে তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, আর বলে, আপনি হাত দেখতে জানেন?

—জানি।

—ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন?

—পারি।

মদন বললে, বলুন আমি আপনার কি উপকার করতে পারি?

পরাশর বললে, আমার বড় ইচ্ছে—এইখানে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খুলবো। তার জন্যে ভাল একটি ঘর দেখে দাও।

মদন বললে, আসুন আপনি আমার সঙ্গে। আমার বাইরের ঘরখানা বেশ বড়। ওইখানেই চতুষ্পাঠী খুলবেন। আমার বাড়ীতেই খাবেন, আমার বাড়ীতেই থাকবেন।

পরাশরও ঠিক তাই যেন চাচ্ছিল মনে মনে।

বুড়ো শিব বাড়ী ছিল না। ফিরে এসে দেখলে, পরাশর চলে গেছে মদনের বাড়ীতে।

এমনি করেই হলো পরাশর পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর সূত্রপাত।

আমজুড়ির বাজার থেকে সাইনবোর্ড এলো। সাইনবোর্ড টাঙানো হ'লো মদনের বৈঠকখানায়। ছাত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা চলতে লাগলো, কিন্তু ছাত্র জুটলো না একটিও। বুড়ো শিব যা বলেছিল তাই সত্য হ'লো।

মদনের ইচ্ছা কিন্তু অন্য রকম। সে চায় না যে চতুষ্পাঠী হোক্।

মদন তখন প্রাণপণে প্রচার করে বেড়াচ্ছে—পরাশর পণ্ডিত একজন অসাধারণ জ্যোতিষী। হাত দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব-কিছু বলে দিতে পারেন, চুরি ধরে দিতে পারেন, ভূত ছাড়াতে পারেন,—অর্থাৎ তিনি পারেন না এরকম কোনও কাজ নেই পৃথিবীতে।

বহু দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে লোক আসতে লাগলো পরাশরের কাছে। যার কাছে যা পেলে মদন ছাড়লে না আদায় করতে। রোজগার বেশ ভালই হ'তে লাগলো।

চতুষ্পাঠীর কথা পরাশর ভুলে গেল। সাইনবোর্ডটা শুধু টাঙানো রইলো মদনের বৈঠকখানায়।

সেই তখন থেকেই পরাশর-পণ্ডিত রয়ে গেছে সুলতানপুরে। বিয়ে-থা করেনি, কাজেই তার দেশে যাবার প্রয়োজনও হয়নি।

পরাশরের পসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারায় জৌলুসও যেন বেড়েছে। পরনে গৈরিক বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে মস্ত বড় গোল একটা সিঁদূরের ফোঁটা, পায়ে খড়ম। দেখলে মনে হয় কাপালিক।

সকালে বা সন্ধ্যায় কেউ যদি কিছু গণনা করবার জন্য আসে তো তাকে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়।

ঘরে খিল্ বন্ধ করে পরাশর নাকি আজ-কাল পুজো-আহ্নিক করে। সেদিন সকালে আহ্নিক সেরে পরাশর তার ঘরের খিল্ খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখে, এরই মধ্যে অনেকেই সেখানে এসে জুটেছে এবং আলোচনা চলেছে রঞ্জনের মৃত্যু নিয়ে।

অধীর আগ্রহে মদন অপেক্ষা করছিল। পরাশর বেরিয়ে আসতেই সব কথা তাকে জানানো হলো।

মদন মুখুজ্যে পুকুরে গিয়েছিল। নিজের চোখে সব দেখে এসেছে। আরও যারা সেখানে উপস্থিত ছিল সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী।

পরাশর কিছুক্ষণ চোখ বুজে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, তার পর চোখ খুলে বললে, হুঁ, দেখলাম।

মদন জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখলে দাদা?

পরাশর বললে: তোমরা যা দেখেছো। পিতার পাপে পুত্রের মৃত্যু।

লোকজনের ভিড়ের ভেতর থেকে কে এক জন বলে উঠলো, কিন্তু দেবু চাটুজ্যে লোক তো খুব ভালো! যখনই যাই, দশ টাকার কম চাঁদা দেয় না! আমাদের ক্লাবের জন্যে একবার নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল।

হারু তাকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে। বললে, তুই থাম্। বেশি চাঁদা দিলেই ভাল লোক হয় না। এই কথা বলেই হারু এগিয়ে এলো পরাশরের কাছে। বললে, সীতারাম মুখুজ্যের মেয়ের সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তার পর কিসের যেন একটা ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে বিয়েটা ভেঙে গেল। সেই রাগে সীতারাম এই কাণ্ডটা করে ফেললে না তো?

পরাশর বললে, দেখে যা বাবা, চুপচাপ করে সব দেখে যা। কে কি করলে না করলে এই নিয়ে নিজেরা মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

এই বলে তখনকার মত সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে পরাশর বললে, যা তোরা, এখন আমাকে একটু নিরিবিলি থাকতে দে।

এমন কথা পরাশর কোনো দিন বলে না। লোকজনকে তাড়িয়ে দেওয়া দূরের কথা, বরং তাদের ডেকে এনে কাছে বসায়, কত গল্প করে, বয়সের তারতম্য ঘুচিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে রসিকতা করে—এই তার স্বভাব।

পরাশর আজ কেন এ-কথা বললে—আর কেউ না বুঝুক—মদন ঠিক বুঝেছিল। তাই সে হারুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে, আজ সন্ধ্যেবেলা ঠিক দেখবি—পরাশরদা' বলে দেবে—রঞ্জনকে কে মেরেছে। সবাইকে না বলুক—আমাকে বলবে। আর এ-সব কাজ নিরিবিলি না হ'লে হয় না।

পরাশরকে নিরিবিলি থাকতে দিয়ে সবাই চলে গেল। গেল না শুধু হারু।

হারুর নিজের যা ধারণা—সে-কথা না জানিয়ে সে যায় কেমন করে?

মদন বললে, তুই কি বসবি নাকি একটু?

হারু বললে, না, যাচ্ছি।

এই বলে সে মদনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসলো একটা চাটাই-এর ওপর। বললে, মালাকে দেখেছিস? • সীতারাম মুখুজ্যের মেয়েকে?

মদন বললে, দেখেছি। ভারি সুন্দরী।

হারু বললে, ওই রঞ্জনের সঙ্গে ওকে আমি দেখেছি মুখুজ্যে-পুকুরে একটা গাছের তলায় বসে বসে হাসছে আর গল্প করছে। তিন দিন দেখেছি।

মদন বললে, শুনেছি রঞ্জনের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, আবার ভেঙে গেছে। দেবু চাটুজ্যেই ভেঙে দিয়েছে।

হারু বললে, দেবে না? সীতারাম মুখুজ্যের আছে কি?

মদন বললে, অথচ বিয়ের আগে দু'জনে চুটিয়ে প্রেম করলে!

হারু বললে, আর সেই রাগে সীতারাম দিলে রঞ্জনকে শেষ করে। এইটিই হচ্ছে খাঁটি সত্যি কথা। এই আমি বলে রাখলাম তোকে।

মদন বললে, আচ্ছা দেখি না পরাশরদা' কি বলে!

মুখে বললে বটে, কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করতে সে পারলে না। সারাটা দিন সে টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়ালো সারা গ্রামে। যেখানে গেল সেইখানেই শুনলে রঞ্জনের মৃত্যুর কথা! আর সেই খানেই সে তার মন্তব্য প্রকাশ করলে একান্ত সঙ্গোপনে এবং সেই-দিনই সন্ধ্যায় শাখায়-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে এই কথাই সর্বত্র প্রচারিত হলো যে, রঞ্জনকে হত্যা করেছে সীতারাম মুখুজ্যে।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কোনো দিনই হবে না, সেই ছেলে তার সুন্দরী যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে—এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখে কোন্ বাপ সহ্য করতে পারে?

সুতরাং সীতারাম অন্যায় কিছু করে নাই। [ক্রমশঃ।

সুভো ঠাকুর

সুভো ঠাকুরের দেড় হাজার বছরের মত নিশ্চিন্ততার নৈমিষারণ্যে উড়ে যাওয়া না হলেও—দেড় দিনেরও আগে নিঃসন্দেহে উড়ে গেল ও'র সে দেড় হাজার টাকা!

পরের দিন ট্রেন ধরার কয়েক ঘণ্টা আগেই আবিষ্কৃত হোলো যে, গত চব্বিশ ঘণ্টা পুরো হওয়ার পূর্ব্বেই কর্পূরের মতই উবে গেছে ও'র সব-কিছু।

'নেড়া বেলতলায় দু'বার যায় না' এই প্রবাদ বাক্যটিকে, দু'হাতে তুড়ো দিতে দিতে, ও' দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে বম্বের পথে পা বাড়িয়েছে তখন। অর্থাৎ অতগুলো টাকা পাওয়া সত্ত্বেও, এই বম্বে যাবার আগের মুহূর্ত্তে, ও'র আর্থিক অবস্থা যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্ই শুধু নয়—এমন কি ও'র স্ত্রীকে সংসার-খরচ বাবদ যে টাকাটা দিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিল, তাও এখোনো দেওয়া হয়ে ওঠেনি! এবং যা দেখা যাচ্ছে—তাতে শেষ অবধি 'কিছু' দেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠবে, তারও সম্ভাবনা নেহাৎ-ই সামান্য।

সুশীল গুপ্তর অফিসে সাধে কি আর প্রফুল্ল বাবু বাজি ধরেছিলেন—যে দেশ ছেড়ে সাড়ে তিন বছরের জন্যে যাওয়া তো দূরের কথা, আপাতত কোলকাতা ছেড়ে যাওয়াই ওর হয় কিনা সন্দেহ! হাতে টাকা পেলেই তো ঐ কিউরিওর নামে, যত ভাঙা আর বাজে মাল কেনার শনি ঘাড়ে চেপে—সে তো খতম না হওয়া অবধি ওকে ছাড়বে না। রেলের টিকিটখানা বাঁধা রেখেই হয়তো জিনিষ কিনে বসবে—তো যাবে কি করে?

যাই হোক, ও' কিন্তু এবার মাণিক, কুমার, আন্তিক মিশ্র, মায় রামচরণ অবধি যে, ও'দের পোকার সারির মত, রেলকি পাওনাদার রোজ পিল্ পিল্ করছিল চার ধারে, তাদের মিটিয়ে দিয়েছে বিলকুল।

—কিন্তু সে আর কত?

সে তো খুব বেশি হলে হয়তো হবে সব শুদ্ধ—শ ছয়েক টাকার মত! বাকি ন'শ টাকা কি হোলো?

তা কি করবে?...এবারে যে ও' ভারত সরকারের ধ্বজাধারী হ'য়ে চলেছে কি না! আনুষ্ঠানিক নৈশ-ভোজে, অর্থাৎ ফরমাল ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণ চোলে তখন পরবে কি? তাই তো গরম কাপড়ের কালো-কিঙ্কিঙ্কে একটা সেরুওয়ানি না নিলেই নয়—ডিনার-জ্যাকেটের নানা ফ্যাসাদ, তার চেয়ে আমাদের সেরওয়ানি আর চুড়িদারে সত্যিই অনেক হাঙ্গামা কম। উপরন্তু স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় পোষাক হিসেবে ওটা তো জাতেও উঠে গেছে। এমন কি, সাহেবি খানা-পিনার পুরোদস্তুর পঙ্ক্তি-ভোজেও উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে আজ-কাল। আর তাই তো ও' 'গোলাম মহম্মদে' সেরওয়ানির অর্ডার দিয়ে রেখেছিল শুরুতেই। খালি অর্থাভাবে ছাড়িয়ে নিতে পারিনি—এই যা!

ইজিপ্টে তো আর সেরওয়ানি কিনতে পাবে না? এমন কি মার্কিণ মুলুকেও মিলবে না ও চিজ! অগত্যা, উপায় কি ছিল ও'র? কিন্তু কে জানতো সেই গরম কাপড়ের একটি মাত্র কালো-কিঙ্কিঙ্কের বদলে কড়কড়ে তিনশ টাকা গলে যাবে?

আচ্ছা ধরাই যাক—স্বদেশীয় সেরওয়ানির সোহাগে ঐ তিনশ টাকা ও' না হয় জলেই দিল, তবু তো ও'র বাকি থাকে এখনো ছ'শ' টাকা—সেটা গেল কোথায়? অন্তত সেটা তো ও'র স্ত্রীর হাতে সংসারের জন্যে তুলে দিতে পারতো!

আদতে, আসল কথাই তো এখোনো গা-ঢাকা দিয়ে এই ছ'শর মধ্যেই...ও'র শিল্প-সংগ্রহের জন্য বাংলা দেশের অতীত বালুচর শাড়ীর অতি পুরাতন নমুনা কিনেছে ঐ ছ'শর মধ্যে থেকে পাঁচশ টাকায়। আর হাতে, বাকি আছে মাত্র একশ টাকা—আর তাই কিনা ঠিক কোরেছে, চোখ-কান বুঁজে ধরে দিয়ে যাবে ও' ব্রাহ্মণীর হাতে!

ইস্, মুখে রক্ত উঠিয়ে জোগাড় করা ঐ টাকাগুলো দিয়ে, কি না, নির্ব্বিবাদে মুর্শিদাবাদের 'বালুচর শাড়ীর' ছেঁড়া নেকড়ার মত ঐ নমুনাগুলো কিনে ফেললো! একবার ফিরেও ভাবল

না—স্ত্রী আর মেয়েটার কথা, তাদের ভবিষ্যৎ ? কি কোরে চলবে ওদের ? ও' যখন থাকবে না, কে চালাবে ওদের খরচ ? আচ্ছা, কিনলই যখন শাড়ী তখন একটু ভালো দেখে কিনলে ক্ষতি ছিল কি কিছু ? দরকার হোলে না হয় এক-আধটা দিন বেচারা বৌটা পার দিয়ে বেরোতে পারতো লোক-সমাজে ! কিন্তু তার জো আছে কি হবার ? সুভো ঠাকুরের কাছে—ছোঃ, নতুন জিনিষ—সে তো নিতান্তই ছি-ছির বস্তু। যত রাজ্যের রিপু করা, পুরোনো, ছেঁড়া কিম্বা ফেঁসে-যাওয়া জিনিষ হোলে, তবে তো ওর কাছে তার মূল্য ! আর তাই কিনবে কি না ও' নতুনের চেয়ে চার ডবল দাম দিয়ে !

সত্যি, বিচিত্র এই পৃথিবী—আর বিচিত্রতর তার অধিবাসী এই মানুষ !···কোথায় লোকে স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্তে অর্থাভাবে অনেক সময় চুরি করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না দেখা গেছে, আর সেখানে—ও' কি না, এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও—ও'র স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্তে একান্ত আবশ্যকীয় আর্থিক ব্যবস্থার বদলে পয়সা হাতে পেয়েই, নিরুদ্বেগ এমনিতরই বাজে আর বাতিল বস্তুতে অজস্র অর্থ ব্যয় করছে এখনো ? মদ না-খেয়েও মাতাল। রেস না-খেলেও ফতুর ! তাই ত এক একবার সন্দেহ জাগে—ও' নয় মনুষ্য সমাজের অন্তরগত নিতান্তই হৃদয়হীন, একটি অতি-নিকৃষ্ট নমুনা—অথবা নিশ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ !—যার স্থান, সংসারে না হোয়ে—সত্যিই হওয়া উচিত ছিল উন্মাদাশ্রমে।

কিন্তু সুভো ঠাকুরকে বুঝতে পারা মুস্কিল ! শুধুই কি মুস্কিল ? মূর্ত্তিমান মুস্কিল-আসানের চেয়ে মুস্কিল ! একটা একান্ত দুর্বোধ্য দুরূহ রচনা যেন—জেম্‌স জয়েস এর ইউলিসিস্‌ ? না তার চেয়ে বেশি—অনেক বেশি জটিল, আর তাল-গোল পাকানো যেন মহাদেবের জটিল জটাজাল ! তবু, ওর সম্পর্কে যে কোনো লোক সটাং শপথ কোরে বলতে পারে—যে, হৃদয়-হীন জীবের নিকৃষ্টতম নমুনা নির্ঘাৎ ও নয়। অথচ আদর্শের জন্তে, আবশ্যক হোলে, শীতল-শোণিতে হত্যা করার কঠিন হৃদয়ও কোথায় যেন লুকোনো আছে ওর মধ্যে ! সৌন্দর্য্যের একটু আভাস, একটুকু ইসারায়, উন্মাদনার আল্পস পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সর্ব্বদা আরোহণ কোরে উন্মত্ত হয়ে মন আবার ওর মত প্রকৃতিস্থ স্থির-বুদ্ধি লোকও সাধারণতঃ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল !

যাই হোক, দেখা-না-দেখায় মেশা যে বিদ্যুল্লতার মত, ও' যে পাগল অপাগলে মেশা একটি বর্ডার লাইন বস্তু—এ বিষয় কোনই সন্দেহ ছিল না—এমন কি ও'র নিজেরও এ বিষয় সন্দেহ ছিল না মোটেই। কিন্তু, সে দিন ও'-ও অবাক হোয়ে গেল ! বাড়ি ফিরে দেখে,—যে, ওর ফ্ল্যাটটা সবার অগোচরে আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে আজ একেবারে পুরো দস্তুর উন্মাদ-আশ্রমে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যেন—ওর মত বর্ডার লাইনে আর হুমড়ি খেয়ে নেই ! লোকে হয়তো বলবে—এ ব্যাপার এক পক্ষে ভাল ! আবশ্যক হোলে চিকিৎসার্থে পয়সা দিয়ে অন্তত্র আর যেতে হবে না একে··· ভবিষ্যৎ-এ দরকারে-অদরকারে ফ্ল্যাটটাই তো রইল উন্মাদাশ্রম হোয়ে !—তা না হোলে এ রকম তুমুল কাণ্ড হয় কি কোরে !···

ছেঁড়া ধূড়ধূড়ে একগাদা বালুচর শাড়ি বগলদাবাই কোরে,' আর সন্ত-কেনা সিগারেটের টিনটা মুঠোয় পুরে—ও' তখন ফ্ল্যাটের দরজায় পা দিয়েই শুনলো, গিন্নির সকরুণ আক্ষেপময় কণ্ঠস্বর। তার পর ঘরে ঢুকে দেখে—এক দিকে লুণ্ঠিতা সতীসাধ্বী ক্রন্দনাবেগে বেপথু বেতসলতার মতই ব্যাকুল, আর অন্য দিকে হাঁ কোরে' হতবাক্‌ কন্যারত্ন কাষ্ঠপুত্তলিকা প্রায় দণ্ডায়মান। দীপক আর মিনতি—নিশ্চিৎ ব্লাডপ্রেসার মনে কোরে' মাঝে মাঝে ও'র চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সারা ঘরকে তখন চৌবাচ্চার চাতালে পরিণত কোরেছে। তার উপর চলেছে আবার ঘন ঘন হাত-পাখার হাওয়া। পড়শীরা, অর্থাৎ আশ-পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা—যথারীতি হানা দিয়েছেন। তার পর যত দোষ নন্দ ঘোষ সুভো ঠাকুরের আগুশ্রাদ্ধ অন্তে—তা'র এরকম দায়িত্বহীনতায় আগা-পাশতলা শাপান্ত করছেন সবাই। আর মাঝে মাঝে বেচারা বৌটার উপর সান্ত্বনার শান্তিবারি নিক্ষেপণ কোরে, দরদ দেখাবার নামে দাম্পত্য কলহ আর ভাবী অশান্তির পাকাপোক্ত মৌরসি পাটার একটা অতি উত্তম গোড়া-পত্তনের ব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে উদ্‌ব্যস্ত !

[ক্রমশঃ।

ডি. এচ. লরেন্স

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আর্থারের শিক্ষানবীশীর পালা শেষ হ'ল, মিন্টনের খনিতে একটা বিদ্যুতের কারখানায় কাজ পেল সে। রোজগার তার অতি সামান্য, তবে উন্নতির আশা রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু ভারী দুরন্ত ও বড়ো চঞ্চল। মদ খায় না কিম্বা জুয়াও খেলে না, তবু কেমন যেন নানা রকমের বিপদ-আপদ ওর লেগেই আছে। কখনও বা বনে খরগোস শিকার করতে যায় চুপে চুপে চোরের মত, কোন দিন বা রাত্রে বাড়ি না এসে সারা রাত নটিংহামেই কাটায়, আবার কোন দিন বেস্টউড-এর খালে ঝাঁপ দিতে গিয়ে তাল ঠিক রাখতে পারে না, খালের তলাকার পাথর আর টিনে লেগে ওর বুক ছ'ড়ে একাকার হয়ে যায়।

কাজে যোগ দেবার পর কয়েক মাসের বেশী হয়নি, একদিন রাত্রে আর্থার বাড়ি ফিরে এলো না। সকাল বেলা খাবার সময় পল জিজ্ঞেস করলে, 'আর্থার কোথায়, জানো মা?'

মা বললেন, 'আমি ত' জানি না।'

'ও একটা আস্ত গাধা।' পল বললে, 'তাও যদি কোন কাজের কাজ করত, কিছু বলতাম না। কিন্তু তা ত' নয়। হয়ত তাসের আড্ডা থেকে উঠে আসতে পারল না, কিম্বা স্কেটিং খেলার মাঠ থেকে কোন মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল, তাও নিতান্ত নিরীহ ভদ্রলোকের মত—আর ওতেই তার আর বাড়ি ফিরে আসা হ'ল না। অমন বোকা আর নেই।'

মা বললেন, 'তাই বলে ও যদি আমাদের সবাইকে লজ্জা দেবার মত কিছু করে বসে সেটাই বুঝি ভাল হবে?'

—'তা'হলে আমি অন্তত: তাকে ঢের বেশী সম্মান করব।' পল বললে।

মা একটু ধমকের সুরে বললেন, 'আমার কিন্তু খুব সন্দেহ রয়েছে তাতে'

খাবার খেতে লাগলেন দু'জনে। খেতে খেতে পল আবার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে ভয়ঙ্কর ভালবাস, তাই নয়?'

—'ও কথা কেন?'

—'লোকে বলে মেয়েরা ছোটটিকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসে।'

—'মেয়েরা বাসতে পারে, আমি বাসি নে। আমার বিরক্ত লাগে ওকে নিয়ে।'

—'সত্যি তুমি চাও ও ভাল ছেলে হোক্?'

—'ওর মধ্যে পুরুষ মানুষের জ্ঞানগম্যি কিছু জন্মাক, এইটুকু চাই বই কি।'

পলের মেজাজ ভারী রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। তাকে নিয়েও মা প্রায়ই বিরক্ত হয়ে উঠতেন। মা দেখতেন, ওর জীবন থেকে সূর্য্যালোক ঝরে যাচ্ছে, দেখে তাঁর মহা অস্বস্তি লাগত।

তাঁদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ডার্বি থেকে চিঠি নিয়ে ডাকপিয়ন এল। মিসেস মোরেল ঠিকানাটা দেখবার জন্যে চোখের কসরৎ করতে লাগলেন।

'দাও গো, কানা মেয়ে।' বলে পল চিঠিটা ছিনিয়ে নিল তাঁর হাত থেকে। মা চমকে উঠে ওর কান মুলে দিতে গেলেন। পল বললে, 'তোমার ছেলের চিঠি গো, আর্থারের।'

মিসেস মোরেল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী? লিখেছে কী?'

পল পড়ল: 'মা গো, আমি হঠাৎ কেমন একটা বোকামি করে ফেলেছি। তুমি যদি এসে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও ত' ভাল হয়। কাল কাজে না গিয়ে আমি জ্যাক্ ব্রেডন-এর সঙ্গে এখানে আসি,'এসে সৈন্যদলে নাম লেখাই। জ্যাক্ বললে,—ওই টুলের ওপর বসে বসে কাজ করতে টুলই শুধু ক্ষয়ে যায়, ও কাজ তার ভাল লাগে না, আর আমিও যেমন বোকা, ওর সঙ্গে চলে এলাম।

'আমি রাজার নুন খেয়েছি, তবু তুমি যদি এসে বলো, তা'হলে ওরা হয়ত আমাকে ছেড়ে দেবে। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই এমন কাজ করে ফেলেছি। আমার ভাল লাগে না সৈন্যদলে থাকতে। মা গো, তোমাকে আমি চিরকাল শুধু কষ্টই দিচ্ছি। এবার আমাকে বাঁচিয়ে দাও, তা'হলে সত্যি বলছি আমি ভেবেচিন্তে বিবেচনা করে চলব।'...

মিসেস মোরেল দোলা-চেয়ারটায় বসে পড়লেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'এই ত' বেশ হয়েছে—থাকো এইবার।'

পলও বললে, 'হ্যাঁ, থাকুক।'

তার পর দু'জনেই চুপচাপ। মা হাত দু'টি জামার মধ্যে মুঠো ক'রে ধরে চিন্তাকুল, গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। একবার আচমকা বলে উঠলেন, 'ঘেন্না ধরে যায় আমার। উঃ!'

পলের বিরক্তি ধরে আসছিল ক্রমশঃ, সে বললে, 'হয়েছে, তুমি আবার এই নিয়ে মন খারাপ করে বসে থেকো না যেন।'

ছেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মা বলে উঠলেন, 'না, আশীর্বাদ বলে মেনে নেব আর কি!'

ছেলেও সমানে জবাব দিলে, 'তাই বলে অমন হা-হুতাশ করবারও কিছু হয়নি—যেন আস্ত একখানা বিয়োগান্ত নাটক।'

মা বার বার বলতে লাগলেন, 'কী হাবা! কী ভীষণ বোকা ছেলেটা!'

পল খোঁচা দিয়ে বললে, 'তা সৈন্যের পোশাকে ওকে ভালই মানাবে।'

মা তেতে উঠে ওর দিকে চাইলেন, বললেন, 'তা হবে, কিন্তু আমার চোখে নয়।'

—'ওর উচিত একটা ঘোড়সওয়ার সৈন্যদলে যাওয়া। তা'হলে ওর জীবনটা খাসা কাটবে, আর ওকে দেখাবেও একটা কেউ-কেটার মত।'

'হ্যাঁ, কেউ-কেটা বটেই ত'! একটা সাধারণ সৈন্য।'

পল বললে, 'কিন্তু মা, আমিও ত' একটা সাধারণ কেরানী।'

মা আহত হয়ে বললেন, 'সেই ঢের, বাছা!'

'মানে?'

'মানে, কেরানী হলেও অন্ততঃ সে মানুষ, লাল কোট-পরা একটা পদার্থ নয়।'

'তা লাল কোট পরতে আমার আপত্তি নেই—কিম্বা ঘন নীল, তাতেই আমায় মানাবে ভালো। আমার উপর বেশী মুরুব্বিয়ানা ফলাতে না এলেই হ'ল।'

মায়ের কান ওর কথার দিকে ছিল না। তিনি বললেন, 'সবে একটু উন্নতির আশা দেখা গিয়েছিল, হয়ত উন্নতি করতও কাজে, হঠাৎ গিয়ে সারা জীবনের জন্যে এই ভাবে নিজেকে নষ্ট করল। অপদার্থ আর কা'কে বলে! এর পর ওকে দিয়ে আর কি হবে, বলো?'

পল বললে, 'এর ফলে ও পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠতে পারে।'

মা বললেন, 'মানুষ হবে না ছাই! ওর মধ্যে যেটুকু পদার্থ আছে, তাও ওরা চেঁচেপুঁছে শেষ করে দেবে। একটা সৈন্য, সাধারণ সৈন্য একটা—চীৎকারের শব্দ শুনে নড়ে-চড়ে ওঠে এমনি একটা দেহ মাত্র। কী চমৎকার!'

পল বললে, 'তুমি এতটা উতলা হয়ে উঠছ যে কেন, সে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি ত' বুঝবেই না। আমি বুঝি!' চেয়ারে হেলান দিয়ে মা বসে রইলেন। এক হাতে তাঁর চিবুকটি ন্যস্ত, অন্য হাত দিয়ে তিনি কনুইটি ধরে রয়েছেন, রাগে আর আত্মগ্লানিতে তাঁর মন উপচে পড়ছে।

পল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ডার্বিতে যাবে নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিছু হবে না ওতে।'

—'সে আমি দেখব।'

—'থাকতে দাও না কেন ওকে? ও ত' তাই চায়।'

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বটে, ও কী চায় সেটা আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো?'

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মা প্রথম ট্রেনেই ডার্বি যাত্রা করলেন। সেখানে ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল, সৈন্যদলের অধ্যক্ষের সঙ্গেও দেখা করলেন তিনি। কিন্তু ফল হ'ল না কিছুই।

সন্ধ্যেবেলা মোরেল খেতে বসেছিল, মিসেস মোরেল হঠাৎ বললেন, 'আজ আমাকে ডার্বি যেতে হয়েছিল।'

মোরেল চোখ তুলে চাইল। তার কালো মুখের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে শাদা রঙ উঁকি দিচ্ছে। সে বললে, 'গিয়েছিলে নাকি? যাবার কারণটি কি?'

'ওই আর্থার।'

'ও! তা কী করল সে আবার?'

'সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে শুধু, আর কিছু নয়।' মোরেল হাতের ছুরি নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। বললে, 'বলো কী! এ কিছুতেই হতে পারে না।'

'কালকেই অ্যালডার শট-এ চলে যাচ্ছে ও।'

'তাই ত'। আশ্চর্য্য বটে!' এক মুহূর্ত কি ভেবে মোরেল একবার 'হুঁ' বলে, তারপর আবার মন দিল খাওয়ার দিকে। হঠাৎ গভীর রাগে তার মুখের পেশীগুলো কুঁচকে উঠল। বললে, 'আশা করি আমার বাড়িতে আর পা দেবে না ও।'

'ও কী কথা!' মিসেস মোরেল চীৎকার করে উঠলেন, 'অমন কথা বলে নাকি কেউ?'

'হ্যাঁ, আমি বলি। যে বোকা হতভাগা সৈন্য হবার জন্যে পালিয়ে যায়, নিজের ভার তার নিজেরই নেওয়া উচিত। আমি আর তার জন্যে কিছু করব না।'

মা বললেন, 'কত কিছু তুমি করে ফেলেছ যেন।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মদের দোকানে ঢুকতে মোরেলের লজ্জা করছিল।
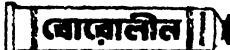
পল বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'গিয়েছিলে নাকি মা?'

—'গিয়েছিলাম।'

—'দেখা করতে পেরেছিলে ওর সঙ্গে ?'

—'হ্যা।'

—'কী বলল ?'

—'আমি চলে আসার সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।'

—'হুঁ !'

—'আমিও তাই করলাম, কাজেই তোমার অমন 'হুঁ' বলার কোন মানে বুঝিনে আমি।'

ছেলের জন্তে মিসেস মোরেলের মন যেন জলে-পুড়ে যেতে লাগল। সেনাদল ওর ভাল লাগবে না, তিনি জানতেন। সত্যি তার ভালও লাগছিল না। ওখানকার কড়া নিয়ম-কানুন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার কাছে।

তবু খানিকটা গর্ব করেই পলের কাছে তিনি বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার বলছিল, ওর চেহারার মধ্যে ভারী একটা সৌষ্ঠব আছে, সব কিছু একেবারে নিখুঁৎ। প্রত্যেকটা মাপ ঠিক ঠিক মিলে গেছে। দেখেছ ত' তুমিও, সত্যি ও দেখতে ভালো।"

'দেখতে ও খুবই ভালো, কিন্তু তাহলেও উইলিয়মের মত মেয়েদের টানতে পারে না ও, কী বলো ?'

'না। ও হ'ল অন্য জাতের মানুষ। অনেকটা ওর বাপের মত, দায়িত্ববোধ একেবারেই নেই।'

মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে পল এখন ওয়াইলি ফার্মে বেশী যাতায়াত করত না। শরৎকালে প্রাসাদে ছাত্রদের কাজের যে প্রদর্শনী হ'ল তাতে দু'খানা ছবি দিল পল—একখানা জল-রঙে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর একখানা তৈলচিত্রে আঁকা স্থির মূর্তি। দু'খানা ছবিই প্রথম পুরস্কার পেল। পলের মন উত্তেজনায় ছেয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে পল বললে, 'বলো ত' মা, দেখি তুমি কেমন জানতে পারো। বলো ত' কী পেয়েছি ছবি দু'টির জন্তে।' ছেলের চোখের দিকে চেয়ে মা বুঝলেন ওর খুশির কথা। তাঁরও মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'কী করে আমি জানব, বলো ?'

—'ওই কাচের বাসনগুলোর জন্তে প্রথম পুরস্কার।'

—'বটে !'

—'আর ওয়াইলি ফার্মের ওখানে আঁকা স্কেচটার জন্তেও প্রথম পুরস্কার।'

—'দুটোই প্রথম ?'

—'হ্যা।'

—'হুঁ।' কোন কথা না বললেও মায়ের চোখে-মুখে ফুটে উঠল আনন্দের গোলাপী আভা।

পল বললে, 'বেশ ভালো নয়, মা !'

—'হাঁ, নিশ্চয়ই।'

—'তুমি কেন প্রশংসা করে আমাকে আকাশে তুলছ না ?'

মা হেসে উঠলেন, বললেন, 'তা'হলে আবার যে কষ্ট করে তোমাকে নীচে টেনে নামাতে হবে আমাকেই।'

কিন্তু তবু আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মন। উইলিয়ম খেলাধূলায় যত পুরস্কার পেয়েছিল সব এনে তাঁকেই দিয়েছিল। সেগুলো সযত্নে রক্ষিত ছিল তাঁর কাছে, উইলিয়মের মৃত্যুকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। আর্থার দেখতে সুন্দর,—অন্ততঃ বেশ নিখুঁৎ একটি চেহারা—তার উপর—মন স্নেহে উক, সেও হয়ত ভবিষ্যতে ভালোই করবে। কিন্তু পল স্বনামধন্য হতে চলেছে। পলের উপর মায়ের গভীর বিশ্বাস, আরও গভীর এই জন্তে যে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওর নিজের কোন ধারণাই নেই, যে কত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে ওর মধ্যে। মায়ের মনে হতে লাগল জীবনের কাছ থেকে যেন অনেক কিছু পাবার অঙ্গীকার তাঁর মিলেছে. নিজেকে পূর্ণতররূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মিটবে। একেবারে ব্যর্থ হবে না তাঁর এত দিনকার সংগ্রাম।

পলের অজান্তে মা কয়েক বার প্রদর্শনী দেখতে প্রাসাদে গিয়েছিল। লম্বা ঘরটা জুড়ে নানা রকমের ছবি, মা ঘুরে ঘুরে সব দেখেছেন। ছবিগুলো ভালো বটে, কিন্তু তাঁর নিজের পরিতৃপ্তির জন্তে যে জিনিসটুকুর প্রয়োজন, সেটুকু ওদের মধ্যে নেই। কয়েকটা ছবি দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়েছে, এত ভালো সেগুলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের দোষ বার করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। তারপর হঠাৎ যেন একটা আচমকা আঘাতে তাঁর বুক কেঁপে উঠেছে। ওই ত' টাঙানো রয়েছে পলের ছবিখানা। এ তাঁর একান্ত পরিচিত, যেন মনের পটে আঁকা এই ছবি।

'নাম : পল্ মোরেল। প্রথম পুরস্কার।

এইখানে জনতার চোখের সামনে, যে প্রাসাদের গ্যালারীতে কত ছবি জীবনে তিনি দেখেছেন তারই দেয়ালে টাঙানো ছবিখানা দেখে তাঁর অবাক লাগে। চার দিক চেয়ে মা দেখেন, ঐ ছবিখানার সামনে আবার গিয়ে দাঁড়াতে কেউ তাঁকে দেখে ফেলল কি না।

কিন্তু আজ তাঁর গর্বের সীমা নেই। যে সব মেয়েরা পরিপাটী সাজসজ্জা করে এসেছে, তাদের দেখে মা ভাবেন : হুঁ, দেখতে তোমরা চমৎকারই বটে—কিন্তু তোমাদের ছেলে কি আর প্রাসাদের প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে !

মা হাঁটতে থাকেন। নটিংহামে তাঁর মত গৌরবান্বিত মহিলা আজ আর দুটি নেই। পল ভাবে, এতদিনে মায়ের জন্তে সত্যিই সে কিছুই করেছে, তা সে যত সামান্যই না কেন হোক্। তার সব কাজ শুধু তার একার নয়, তার মায়েরও।

একদিন প্রাসাদের ফটক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে মিরিয়ামের সঙ্গে পলের দেখা হয়ে গেল। আগের রবিবারে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পল ভাবেনি মিরিয়ামের সঙ্গে শহরে কোন দিন এমনি দেখা হবে। মিরিয়াম আসছিল আর একটি মেয়ের সঙ্গে, সে মেয়েটির চেহারা চোখে লাগবার মত, পিঙ্গল চুল, মুখের ভাব একটু বিষণ্ণ, চলা-ফেরায় যেন খানিকটা বেপরোয়া ভাব। মিরিয়াম নীচু হয়ে ভাবতে ভাবতে পথ চলে। এ মেয়েটির পাশে তাকে অদ্ভুত বেমানান রকমের বেঁটে দেখাচ্ছিল। মিরিয়াম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল পলের দিকে। পলের চোখ ছিল অপরিচিতা মেয়েটির মুখের উপর, কিন্তু সে মেয়েটি তার দিকে চোখ তুলেও চাইল না। মিরিয়াম দেখল, পলের ভেতরকার পুরুষ-মানুষটি মাথা তুলে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

পল বললে, 'বাঃ, তুমি ত' আমাকে বলো নি যে তুমি শহরে আসবে।'

মিরিয়াম যেন প্রায় অপরাধ স্বীকারের সুরে বললে, 'না, আমি বাবার সঙ্গে এসেছিলাম বাজারে।'

পল ওর সঙ্গীর দিকে চাইল। মিরিয়াম নীরস গলায় বললে, 'মিসেস ডয়েস। এঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম একদিন।' কিঞ্চিৎ বিচলিত মনে হ'ল তাকে, বললে, 'ক্লারা পলকে চেন না তুমি?'

পলের সঙ্গে করমর্দ্দন করতে গিয়ে মিসেস ডয়েস বললেন, 'হাঁ, দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।' তাঁর কথায় বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ পেল না। তাঁর ধূসর চোখ দু'টি যেন সর্ব্বদাই কা'কে বিদ্রূপ করছে; ত্বক শাদা মধুর মত মসৃণ, খাবার মুখটি নিমীলিত নয়, উপরের ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটটি দেখে বুঝে ওঠা কঠিন যে, ওটা গোটা পুরুষজাতির প্রতি তার অবজ্ঞা না চুম্বন পাবার জন্মে আগ্রহ,—যদিও মনে হয় প্রথমটাই। মাথাটি পিছনের দিক থেকে সে হেলিয়ে চলে, যেন গভীর অবজ্ঞাভরে সবার কাছ থেকে, সমস্ত পুরুষদের কাছ থেকেও, দূরে চলে এসেছে সে। কালো লোমওয়ালা একটা মস্ত বাহারে টুপি তার মাথায়, তার সাদাসিধে পোশাকের মধ্যেও এমন একটু কৃত্রিমতা আছে যাতে তাকে একটা ভণ্ডি থলের মত মনে হয়। স্পষ্টই সে দরিদ্র, রুচি বলতেও তার এমন কিছু নেই। সে তুলনায় মিরিয়াম অনেক পরিপাটী।

পল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় দেখেছেন আমাকে?'

মেয়েটির ভাব দেখে মনে হ'ল উত্তর দেবার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও সে রাজী নয়। তারপর বললে, 'লুই ট্যাভার্স-এর সঙ্গে বেড়াতে দেখেছি।'

লুই পলদের কারখানার একটি মেয়ে। পল বললে, 'লুইকে চেনেন নাকি আপনি?'

মেয়েটি উত্তর দিল না। পল মিলিয়ামের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

—'প্রাসাদে।'

—'কোন্ ট্রেনে বাড়ি ফিরবে?'

—'বাবার সঙ্গে গাড়িতে ফিরব। তুমি এলে বেশ ভালো হ'ত। কখন তোমার ছুটি?'

—'রাত আটটার আগে নয়। তুমি ত' জানই সব, কী জঘন্য।' আর কথা না বাড়িয়ে মেয়ে দু'টি এগিয়ে চলল।

পলের মনে পড়ল ক্লারা ডয়েস মিসেস লীভার্স-এর এক পুরোন বন্ধুর মেয়ে। মিরিয়াম তাকে খুঁজে বের করেছিল এই জন্মে যে, এক সময় সে জর্ডনের কারখানায় তত্ত্বাবধায়িকার কাজ করত, আর তার স্বামী বক্সটার ডয়েস ছিল কারখানার কর্ম্মকার, বিকলাঙ্গদের যন্ত্রপাতির জন্ম লোহার জিনিসপত্র তাকেই তৈরি করতে হ'ত। ক্লারার মধ্যে দিয়ে মিরিয়াম যেন পেত জর্ডনের দোকানের সংস্পর্শ, এতে পলের অবস্থা সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্টতর হয়ে উঠত। কিন্তু মিসেস ডয়েস স্বামীকে ত্যাগ করে নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধির কথা সবাই বলত। শুনে পল খানিকটা কৌতূহল অনুভব করেছিল।

বাক্সটার ডয়েসকেও সে জানত: লোকটাকে তার একটুও ভালো লাগত না। লোকটার বয়স একত্রিশ কিম্বা বত্রিশ হবে।
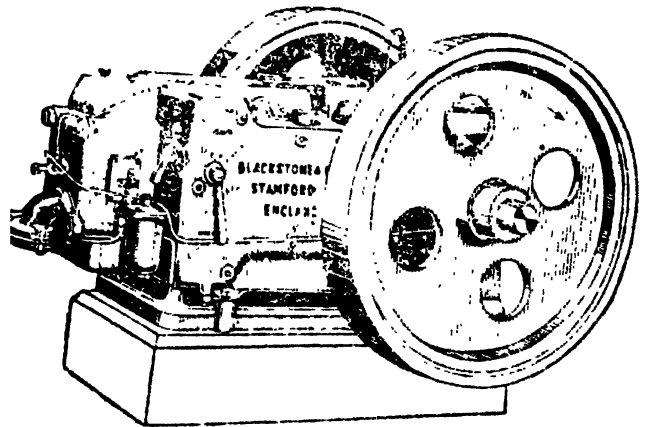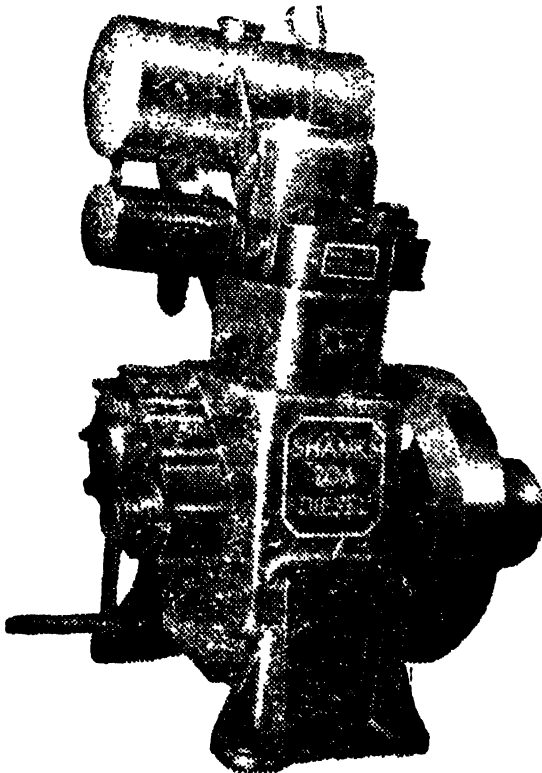
মাঝে মাঝে পল যে ঘরে বসে কাজ করত, সে ঘরেও সে আসত। বেশ জোয়ান, সুপুষ্ট দেহ, দেখে চোখে লাগবার মত সুপুরুষ। এর স্ত্রী আর ওর মধ্যে কোথায় একটা বিশেষ সাদৃশ্য যেন ছিল। তারও গায়ের রঙ তেমনি শাদা, বেশ পরিষ্কার, সোনালী আভা তাতে। চুল হালকা বাদামী, গোঁফের রঙ সোনালী। আর চলাফেরায় তেমনি একটা বেপরোয়া ভাব। কিন্তু ওইখান থেকেই ওদের গরমিল সুরু। বাস্লটারের চোখ কালো আর কটায় মেশানো, দৃষ্টি চঞ্চল, যেন ওর মধ্যে স্থিরতার লেশমাত্র নেই। চোখ দু'টি ঈষৎ বিস্ফারিত, তার উপর চোখের পাতা এমন ভাবে ঝুলে রয়েছে, তাতে নিদারুণ অবজ্ঞার মত কিছু প্রকাশ পায়। তার মুখও অস্থিরচিত্ত মানুষের মুখের মত। তার সমস্ত চলন-বলন মিলিয়ে কেমন একটা আহত উদ্যত প্রতিরোধের ভাব, যেন যে কেউ তার ব্যবহারের সমালোচনা করবে, তাকেই সে এক ঘুষিতে ঠাণ্ডা করে দিতে প্রস্তুত—আর তার আসল কারণ হয়ত এই যে, নিজেকেও নিজে সে খুব বাহবা দিতে পারত না।

প্রথম দিন থেকেই পলকে সে খারাপ চোখে দেখল। পল তার শিল্পিসুলভ, নৈর্ব্যক্তিক, প্রখর দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে মহা রাগ হ'ল তার। তর্জন করে বললে, 'কী অমন হাঁ করে দেখছ হে, তুমি?'

পল চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু বাস্লটার আবার চেঁচিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বললেন, 'ছেড়ে দাও ওকে।' মিঃ প্যাপলওয়ার্থের গলার সুরে তাঁর অভ্যস্ত শ্লেষ, তাঁর বলবার অর্থ হ'ল—ও একটা অপদার্থ, ওর বদভ্যাস ছাড়তে পারে না, তাই।

সেই দিন থেকে যতবার ওই লোকটা এসেছে, ততবারই পল কৌতূহল-ভরা চোখে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করেছে। সেই লোহার কারিগর, তার দিকে চাইবার আগেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে। ডয়েসের মেজাজ তাই উগ্র হয়ে উঠেছিল। ওরা দু'জনে নীরবে একে অন্যকে অবজ্ঞা করে চলত।

ক্লারা ডয়েসের ছেলেপুলে ছিল না। স্বামীকে ছেড়ে যখন সে চলে যায়, তখনই তাদের অভ্যস্ত নীড় ভেঙে গিয়েছিল, ক্লারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তার মায়ের গৃহে। ডয়েস থাকত তার বোনের বাড়ি। সে বাড়িতে বোনের এক ননদ থাকত, ওই মেয়েটি—তার নাম লুই ট্র্যাভার্স—আজকাল ডয়েসের সঙ্গিনী, পল কি করে একথা জানতে পেরেছিল। মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু ভারী অসভ্য আর বেহায়া, ছেলেদের নিয়ে ঠাট্টা করে অথচ সে যখন বাড়ি ফেরে তখন পল যদি তার সঙ্গে ষ্টেশন অবধি যায় তখন খুশিতে সে ডগমগ হয়ে ওঠে।

এর পর যেদিন মিরিয়ামের সঙ্গে দেখা হ'ল পলের, সেদিন শনিবার সন্ধ্যা। মিরিয়ামদের বাড়ির বসবার ঘরে দিব্যি একটি আগুন জ্বলছে, আর মিরিয়াম অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। বাড়ির অন্য সবাই, মিরিয়ামের বাবা, মা, ছোট ছেলেমেয়েরা, বেড়াতে গেছে, বসবার ঘরে আজ তারা দু'জনেই শুধু। লম্বা হলঘর, ছাদটি নীচু, মৃদু একটি উষ্ণতা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সারাটি ঘর জুড়ে। ঘরের দেয়ালে পলের আঁকা তিনটি ছোট ছবি, চিমনির থাকের উপর পলের একখানা ফটো। টেবিলের উপর পুরোন রোজউড-এর পিয়ানোর মাথায় রঙিন পাতা-ভরা কাচের পাত্র। পল বসে আছে লম্বা চেয়ারটাতে, মিরিয়াম তার পায়ের কাছে চিমনির পাশে কার্পেটটার উপর গুটিশুটি হয়ে বসে আছে। যেন ভক্তের মত হাঁটু গেড়ে বসেছে সে, চিমনির আগুনের উষ্ণ আভা তার সুন্দর, ভাব-মগ্ন মুখের উপর এসে পড়েছে।

শান্ত সুরে মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল মিসেস ডয়েসকে, 'কেমন লাগল তোমার?'

পল বললে, 'খুব মিশুক বলে মনে হ'ল না কিন্তু।'

মিরিয়ামের গলার সুর গভীর হয়ে এলো, সে বললে, 'মিশুক নয়, কিন্তু মার্জ্জিত, কেমন? তাই মনে হয় নি কি তোমার?'

'হাঁ, চেহারায়। কিন্তু রুচি ওর বিন্দুমাত্রও নেই। ওর কোন কোন জিনিস আমার ভাল লেগেছে। আচ্ছা, ওর মেজাজ কি খুব রুক্ষ?'

'তা নয়। আমার মনে হয়, ওর মন-মেজাজ খুশি নেই।'

'কেন, কী নিয়ে?'

'কেন আর ক। ওই রকম একটা লোকের সঙ্গে সারা জীবনের জন্যে বাঁধা হয়ে থাকতে তোমারই কেমন লাগত, বলো ত'?'

'যদি এত শীগগির ওর বিতৃষ্ণা এসে গেল, তা'হলে ওকে করল কেন বিয়ে?'

'তুমি ত' বলবেই, কেন করল।' মিরিয়াম তিক্তকণ্ঠে বলল।

পল বললে, 'আমার ধারণা ছিল ওর মধ্যে সংগ্রাম করে বাঁচার প্রবৃত্তি আছে। স্বামীর সঙ্গে খাপ খেয়ে ও চলতে পারবে।'

মিরিয়াম মাথা নীচু করল, 'কেন, ও কথা ভাববার কি কারণ হ'ল তোমার?' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তার জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে।

পল বললে, 'ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখো—তীব্র আবেগের চিহ্ন বহন করে ওই মুখের জন্ম। আর তার গলার ভঙ্গীটি'—বলে ক্লারার অনুকরণে মাথাটি পিছনের দিকে হেলিয়ে সে দেখালে।

মিরিয়াম আরও নীচু করল মাথা। অখণ্ড নীরবতা কয়েক মুহূর্ত্ত অবধি বিরাজ করতে লাগল, আর পল সেই অবসরে ক্লারার কথা ভাবতে বসল। মিরিয়াম আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওর মধ্যে কয়েকটা জিনিস যা তোমার ভালো লেগেছে, সেগুলো কি?'

'জানি না। ওর গায়ের রঙ আর—কী জানো—ওর—ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা উগ্রতা, একটা তীব্রতা আছে। ওকে আমি দেখেছি শিল্পীর চোখে, আর কিছু নয়।'

'হ্যাঁ।'

পলের ভারী অদ্ভুত লাগল, মিরিয়াম অমন ভাবে গুটিসুটি হয়ে চিন্তাকুল মুখে বসে আছে কেন? বিরক্তির সঞ্চার হ'ল তার মনে, সে বললে, 'ওকে সত্যি ভালো লাগে কি তোমার ঠিক ক'রে বলো ত'?' মিরিয়াম তার গভীর কালো, বিস্মিত চোখ দু'টি তুলে পলের দিকে চাইল, বললে, 'লাগে।'

'কিছুতেই নয়। ওকে ভালো লাগতে পারে না তোমার।'

'তবে কী?' মিরিয়াম আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

'কী? তা জানি নি। এইটুকু জানি ওকে তোমার ভাল লাগে বোধ হয় শুধু পুরুষ মানুষদের উপর ওর জাতক্রোধ দেখে।'

এই হয়ত মিসেস ডয়েসকে পলের নিজের ভালো লাগবার

অন্যতম কারণ, কিন্তু সে কথা পলের মনেও এলো না। দু'জনেই চুপচাপ। পলের ভ্রূ বার বার কুঁচকে উঠতে লাগল, এ এখন তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ মিরিয়ামের সঙ্গে থাকা কালে। মিরিয়ামের বার বার ইচ্ছে করতে লাগল পলের ঐ কুঞ্চিত ভ্রূর উপর হাত বুলিয়ে ওকে সমান করে দেয়, পলের ঐ ভ্রূ-কুঞ্চনকে তার বড় ভয়। মনে হয়, এই পল মোরেল তার নিজের মানুষ নয়, এ যেন তার মুখের উপর অন্য কার ছাপ।

কাচের পাত্রে সাজানো পাতাগুলোর মধ্যে ঘন লাল রঙের বেরী ফল ছিল কয়েকটা। পল হাত বাড়িয়ে এক-গোছা ফল ছিঁড়ে নিলো। বললে, 'এই লাল বেরী ফলগুলো চুলে পরলে তোমাকে দেখাবে যেন যাদুকরী কিম্বা যোগিনীর মত। কেন: তুমি কোন দিন আনন্দে মেতে উঠবে বলে মনে হয় না কেন?'

মিরিয়াম হাসল। তার হাসিতে অনাবৃত কান্নার শব্দ। বললে, 'কী করে জানব।'

পল তার সবল উষ্ণ হাতে বেরী ফলগুলোকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত লাফালুফি করছিল। বললে, 'কেন তুমি প্রাণ খুলে হাসতে পার না? তোমার হাসি যেন হাসিই নয়। কোন অদ্ভুত বা বিশ্রী জিনিস দেখে যদিও বা তুমি হেসে ওঠ, মনে হয় সে হাসি যেন আঘাত করছে গিয়ে তোমাকেই।'

মাথা নীচু করে রইল মিরিয়াম, যেন পলের কাছ থেকে ভৎর্সনা শুনছে সে। পল বলতে লাগল, 'আমি চাই আমাকে দেখে অন্ততঃ একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুমি অনর্গল হেসে ওঠ। আমার মনে হয় এতেও কী যেন খুলে যাবে, আগল টুটে যাবে কোন দিক দিয়ে।'

মিরিয়ামের অন্তর্দ্বন্দ্ব তার চোখে ফুটে উঠল। ভয়ে ভয়ে সে বললে, 'কিন্তু তোমাকে দেখে আমি হাসি বই কি—কত বার হেসেছি।'

'কক্ষনো নয়। সে হাসি যেন একটা প্রবল চেষ্টার ফল—তোমার হাসি দেখে আমার কান্না পেতে থাকে। সে হাসি ফুটিয়ে তোলে শুধু তোমার গভীর যন্ত্রণাকে। সে হাসি দেখে আমার হৃদয় শঙ্কিত হয়ে ওঠে—আমি ভাবতে বসি।'

মিরিয়াম হতাশের মত আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বললে, 'সত্যি বলছি, আমি চাই না এমন হয়।'

পল চীৎকার করে বললে, 'আমি তোমার কাছে এলে, আমিই সব সময় কেমন চলে যাই মাটির পৃথিবী ছেড়ে সটান ভাব-রাজ্যে।'

মিরিয়াম চুপ করে রইল। সে ভাবছিল, যদি তাই, তবে কেন তুমি অন্য রকম হতে পার না! পল তার সঙ্কুচিত চিন্তামগ্ন মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বসে রইল, মনে হতে লাগল এ যেন তার সত্তাকে দু'টুক্‌রো করে ফেলতে চাইছে। বললে, 'আর তাও ভাবি, এটা শরৎকাল, এ সময়টাতে সবারই মনের ভাব হয় বিদেহী আত্মার মত।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তাদের দু'জনার মধ্যে এই যে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এসেছে, এর স্পর্শে মিরিয়ামের হৃদয় যেন থরথর করে কেঁপে উঠতে লাগল। পলের চোখ দু'টি আরও কালো হয়ে উঠেছে, দেখে মনে হয় সে চোখের গভীরতা যেন গভীরতম কূপের সমতুল্য, পলকে আজ দেখাচ্ছে ভারী সুন্দর। করুণ হতাশার সুরে পল বললে, 'তুমি আমাকে ঠেলে দিতে চাও কায়াহীন ভাবের রাজ্যে। আমি ত' অমন কায়াহীন হয়ে বাঁচতে চাই না।'

মিরিয়াম সামান্য শব্দ করে মুখের নীচে থেকে আঙুলটি উঠিয়ে নিয়ে যেন প্রতিবাদের ভঙ্গীতে পলের দিকে ফিরে তাকাল। তা' হলেও তার আত্মার প্রতিচ্ছবি পড়েছে তার গভীর কালো চোখ দু'টিতে, তার সর্ব্ব অবয়বে ফুটে উঠেছে সেই একই আকুল আকাঙ্ক্ষার আবেদন। যদি নিতান্ত ভাবময় বিশুদ্ধতার প্রতীক রূপে ওকে চুম্বন করা সম্ভব হ'ত, তা'হলে পল তা করত। কিন্তু এমন উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চুম্বন করা পলের পক্ষে অসম্ভব—এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও মিরিয়াম রাখেনি। মিরিয়ামের কামনা সারাক্ষণ পলের দিকে চেয়ে জ্বলতে থাকত।

পল অল্প একটু হাসল। বললে, 'যাক সে কথা। ওই ফরাসী বইটা আনো। চলো, কিছু পড়াশোনা করা যাক্।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য

একান্তে

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কাছাকাছি তুমি আরেকটু সরে বসো,
আরও কাছাকাছি হলেই বা ক্ষতি কি?
কানে ফিস্-ফিস্ তোমাকে দু'কথা বলবো
কাছে সরে এস, ব্যবধানে তুমি রবে কি?
এখানে ত নেই দোষ-ধরা কোন চাহনি
সমাজের নেই এখানে শকুনি-লক্ষ্য
কিংবা নেই ত' ভীরু শংকিত বকুনি
তবে কি লজ্জা জুড়েছে তোমার বক্ষ?
ঝিলিমিল কোন বাঁকা-স্রোতা নদীতীরে
এসো না, দু'জনে সন্ধ্যার সংলাপে
নিরিবিলি বাঁধি কথার বিনুনি উপরে,
আকাশে খেয়ালী তারা মিটি-মিটি কাঁপে।

তোমার সিক্ত চুল নিয়ে মধু বায়
বলে গেল : কত সুন্দর মধুছন্দা
যেন ভালো লাগে : তোমাকেই বনছায়
আরও সুন্দর : খোঁপাতে রজনী-গন্ধা।
তোমার নয়নে দ্বিতীয়ার চাঁদ-আঁকা,
বিজলী সহসা বিজন কাননে এসে,
আলো দিয়ে গেল, দুই চোখে ভালোবেসে,
আজ ভালো লাগে, শুধু মধুনামে ডাকা।
কাছে এসে বসো লজ্জিতা ভীরু কপোতা
চুপি চুপি কানে একটা কথাই বলবো
সমাজে বাঁধন থাক না প্রচুর ক্ষতি কি?
যুগান্তকারী আমরা দু'জনে চলবো।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জনৈকা গৃহবধুর ডায়েরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মনোদা দেবী

কয়েক দিন পরেই দাদা মহাশয়ের ছুটী ফুরাইয়া আসিল, সকলেই যে যাঁহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। আমরাও যথাসময়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ঢাকাতে সকালের দিকে ৪ জন মাষ্টার আসিত সকল ছাত্রদের পড়াইতে। প্রায় ৪ জন করিয়া এক এক জন মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসিত। ছোট দিদি (সুমতি), ছোট কাকী, আমি ও সুনীতি, আমরা এক মাষ্টারের কাছেই সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িতাম। পড়াশুনা বেশ ভাল ভাবেই চালাইয়া যাইতাম, ইহাতে বাসার মাষ্টার, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও মাষ্টারগণ আমাকে খুব স্নেহ করিয়া পড়াশুনায় সাহায্য করিয়া দিতেন। সার্ কে. জি. গুপ্তের পিতা শ্রীযুত কালীনারায়ণ রায় আমাদের ছোটর দল লইয়া খেলিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (ডাক নাম পানি বাবু) তিনি আমার ঠাকুর খুড়োর (শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেন) সমবয়সী ও প্রিয় বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহারা উভয়েই ঠিক নিজ সহোদরের ন্যায় ব্যবহার ও আদান-প্রদান করিতেন, সেই সূত্রেই আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে অতি সুন্দর একটী সহজ-সরল অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিগড় পড়িয়া উঠিয়া যত দিন ঠাকুর-খুড়া ও পানি কাকা জীবিত ছিলেন কখনও তাহা শিথিল হয় নাই। সার, কে, জি, গুপ্তের দ্বিতীয় কন্যা হেমকুসুম আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড ছিল কিছু দিন। ঢাকাতে কালীনারায়ণ বাবুর নিজের মস্ত বড় বাড়ী ছিল। বহু দিন সে বাড়ীতে আমরা ছোটর দল যাইয়া খেলাধূলা করিতাম। কালীনারায়ণ বাবু আমাদের লইয়া বেশ খেলায় মত্ত হইয়া যাইতেন।

কালীনারায়ণ বাবু অতি সৎ ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। মস্তবড় জমীদার হইলেও তিনি অতি সহজ-সরল ভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতার ধার ধারিতেন না। কালীনারায়ণ বাবুর দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ সেন ঢাকাতেই পড়াশুনা করিতেন এবং তার এক খুড়তুত ভাই সত্যপ্রসাদ সেনও কালীনারায়ণ বাবুর বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহারা মাঝে-মাঝে আমাদের ছোট দলের মধ্যে খেলায় হামলা দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কালীনারায়ণ বাবু সেটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করিতেন না, কারণ আমরা সকলেই ছোট ছোট মানুষ আর উহারা ১৪।১৫ বৎসরের ছেলে। উহাদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই পারিয়া উঠিব না। এদিকে সন্ধ্যার পরক্ষণেই সবাইকে হাতমুখ ধুইয়া প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইত এবং প্রার্থনাতে পড়াইবার শিক্ষক আসিত যে যার পড়িবার ঘরে চলিয়া যাইত। এই ভাবে কত ছুটিতে আমরা বহু বন্ধু মিলিয়া কালীনারায়ণ বাবুর বাড়ীখানাকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলিতাম। পানি কাকা ছিলেন অতি সহজ সরল স্ফূর্তিবাজ লোক; কত শত কথার মধ্য দিয়া, এবং নানারূপ হরবোলা ডাকের মধ্য দিয়া নানারূপ বিচিত্র শব্দ করিয়া আমাদের ছোটদের একেবারে মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি অতি উচ্চদরের চিত্রকর ছিলেন। সীতার বনবাস, প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক ইত্যাদি করিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া নাটক অভিনয়ের জন্য একটি ষ্টেজ তৈয়ার করিলেন এবং নিজ হাতেই নাকি বহু 'সিনারী' অতি নিপুণতার সহিত চিত্র করিয়া ফেলিলেন। সকলেই ঐ সকল চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, শতকণ্ঠে অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। সীতার বনবাস নাটকে বাল্মীকি তপোবনের চিত্রটি যেন আজও আমার বক্ষে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কি অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত সেই বাল্মীকির তপোবন! তারপর লক্ষ্মণ যখন সত্য ঘটনা সীতার নিকট উদ্ঘাটন করিয়া অর্থাৎ এই তপোবন শুধু তাকে দেখাইতে আনে নাই জন্মের মত সীতাকে এখানে রাখিয়া যাইতে আসিয়াছে; সে চিত্র যে কি দুঃখজনক, হৃদয়-বিদারক ব্যাপার তাহা মনে হইলে এখনও যেন সত্য সত্যই কান্না আসিয়া যায়। এই চিত্রটি দেখিয়া বহু স্ত্রী পুরুষরাই কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। আমাদের ছোটর দলে ত কথাই নাই; প্রহ্লাদ চরিত্রে প্রহ্লাদের অপরিসীম অটল ঈশ্বরভক্তি এবং তার পিতৃ কর্ত্তৃক অপরিসীম লাঞ্ছনা ও মৃত্যু ঘটাবার জন্য কত মর্ম্মান্তিক চেষ্টা! কিন্তু তবু প্রহ্লাদের অটল অচল ঈশ্বরে ভক্তি! শৈশব মনে এই ঘটনাটা চক্ষে দেখিলে মনে একটি বিশুদ্ধ ভাবের উদয় না হইয়াই পারে না। ষ্টেজের মধ্যে জীবন্ত অতিকায় হাতী আসিল, মাহুতটি হাতীর ঘাড়ের উপর। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া নিষ্পেষিত করিবার পিতার আদেশ! ছোট ছিলাম, মনটা যেন একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। হাতীটিও জীবন্ত সে কথারও ভুল নাই। কিছুতেই এই অলীক থিয়েটারটিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া যেন লইতে পারিতেছিলাম না। পানি কাকার সৌজন্যে জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম থিয়েটারের নাম শুনিলাম ও থিয়েটার দেখিলাম। শুধু আমি কেন, অনেক স্ত্রী-পুরুষই এই প্রথম নাট্যাভিনয় দেখিলেন। পানি কাকা ছিলেন সাদাসিধে সদানন্দ পুরুষ, বিলাসিতা বলিয়া তাঁহার কোন বালাই ছিল না। সদানন্দ পিতার সদানন্দ পুত্রই ছিলেন তিনি। ব্রাহ্ম সমাজের লোক বলিয়া আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিভিন্নতা দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনের ঢাকার হুলী খেলা ও হুলীর রঙ মাখান অপূর্ব্ব বেশ। রঙ্গে রঙ্গে বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত নাক মুখ মাথা পানি কাকাকে চেনা যাইত না।

হলীর দিনে রাস্তা দিয়া হৈ-চৈ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন ঠাকুর খুড়াও ঠান্‌খুড়ীর উদ্দেশ্যে, তাহা করাই ছিল বিশেষ করিয়া পানিকাকার লক্ষ্যস্থল। পানি কাকার দুই পকেট ভরা আবীর কুমকুম্‌ দুই বিশাল বগলে গোলা রঙের দুটি বোতল, বোতলের মুখ ছিল নারিকেল শলায় বন্ধ করা তাহাতে ছিট্‌কাইয়া ছিট্‌কাইয়া রঙ দিতে খুব সুবিধা হইত। তাহাতেও তাহার তৃপ্তি ছিল না—হাতে করিয়া লইয়া আসিতেন মস্ত বড় গোলা রঙ এক ঘটা। ঠাকুর খুড়াও সোরগোল শুনিয়াই অফিস-রুমে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে ডাক হাঁক চলিতে চালিল, দাদামহাশয় উচ্চস্বরে উমেশ! উমেশ! বলিয়া বাহিরে আসিবার জন্য ডাক দিতে লাগিলেন! কিন্তু পানি কাকাও এক মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিলেন না—তাড়াতাড়ি হাতের ঘটি ও বগলের বোতল দু'টি ঠাকুর-খুড়ার অফিস-রুমের দুয়ারে নামাইয়া রাখিয়াই বিশাল হাতে পায়ের জোরে ঘরের দরজাখানাকে ধাক্কা দিতেই দুয়ারের খিলখানা দুই টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং ঘরে ঢুকিয়াই ঠাকুর-খুড়াকে হাতে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। আমরা ছোটর দলও মহোল্লাসে মত্ত হইয়া গেলাম। পানি কাকার চতুর্থ বোনের বিবাহের কথাটিও বেশ মনে পড়িতেছে।

বিমলা পিসিমার বিবাহ বিক্রমপুরে হেলীরবাগ গ্রামের স্বনামধন্য দুর্গামোহন দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন দাশগুপ্তের সহিত স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে মহাসমারোহে ব্রাহ্মমতে বিমলা পিসিমার বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন খুব সুসজ্জিত এক ল্যাণ্ড গাড়ীতে করিয়া বর এবং বরযাত্রীরা যথাসময়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল। বিবাহ-সভায় উভয় পক্ষেরই বহু লোক জন উপস্থিত হইল। যথারীতি গান-বাজনা ও সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি বেশ চলিতেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের পুরোহিত যথাসময়ে তার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এদিকে প্যান্ট কোট পরা বর ও আসিয়া বিবাহ সভায় দাঁড়াইয়া গেলেন, সভার লোক জন সবাই সতৃষ্ণ নয়নে সদ্য বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার জামাইকে দেখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সেদিনে বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার ছেলে গণ্ডায় ২ মিলিত না, দু' একটি মাত্র পাওয়া যাইত। হঠাৎ দেখা গেল কালীনারায়ণ বাবু তাঁহার ড্রইং রুমে ঢুকিয়াই ক্ষণকাল পরেই একখানা মূল্যবান গরদের ধুতি ও একটি গরদের কোট লইয়া সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও হাত বাড়াইয়া ঐ সবগুলি ভাবী জামাতার দিকে আগাইয়া ধরিলেন, এদিকে এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই যেন একটু আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। দুর্গামোহন দাশও পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু

কিছুই বলিলেন না। সত্যরঞ্জন কিন্তু স্মিত হাস্তে তার ভাবী শ্বশুরের হাত হইতে একটি একটি করিয়া লইয়া সভার মধ্যেই পরিধান করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে ইহা কোনরূপেই অসভ্যতার পর্য্যায়ে পড়িত না অর্থাৎ কাপড় বদলাইতে কক্ষান্তরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সত্যরঞ্জন ছিল অতিশয় বলিষ্ঠ অর্থাৎ খুব মোটাসোটা। কোটটি গায়ে দিতেই দেখা গেল কোটের নীচের দিকের কয়েকটা বোতাম বন্ধ করা যাইতেছিল না, ইহাতে সভার অনেকেই মুখ টিপিয়া একটু ২ হাসিতেছিল। ইহাও আমার খুব মনে আছে। ভাবী জামাই যে এই ভাবে খুসী হইয়া তাঁর দেওয়া বর-বেশটি গ্রহণ করিল ইহাতে সভাস্থ সকলে ও কালীনারায়ণ বাবু খুবই খুসী হইলেন, তখনকার দিনের ছেলেরা বিলাত গেলেই একটি 'চীজ' হইয়া দেশে ফিরিত, কিন্তু সত্যরঞ্জন খুব খাঁটী ভাবেই সকল বিপদ-মুক্ত হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিলেন। কালীনারায়ণ বাবু ব্রাহ্ম হইলেও তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁর ছেলে-মেয়েদের বৈদ্যবংশেই বিবাহের আদান-প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় তখনও জাত্যভিমানকে নিঃসংশয়ে উড়াইয়া দিবার মত শক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। আর একটি কথাও খুব মনে পড়ে, দিদিমা এত গোঁড়া হিন্দুয়ানী ভাবাপন্ন হইয়াও কালীনারায়ণ বাবুর স্ত্রী যখনই আমাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্ত নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিতেন তখনই দেখিতাম দিদিমা ও পানি কাকার মা এক পাথরে বসিয়াই খাওয়া-দাওয়া করিতেন। নিরামিষ খাইতেন দু'জনেই, কারণ—দিদিমার বিধবা পুত্রবধূ ও পানি কাকার মার ছিল বিধবা কন্যা। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে এক পাত্রে বসিয়া খাওয়ার প্রচলন ছিল মেয়েদের মধ্যে। যত দিন দাদা মহাশয় দিদিমা জীবিত ছিলেন তত দিন পর্য্যন্ত দেশের বাড়ীর আমের আচার, মোরব্বা, আমচুর ও ক্ষীরের আমসত্ত্ব সকল ছেলেদের জন্ত পার্শ্বেল করিয়া পাঠাইয়া দিতেন, তখনই দেখিতাম পানি কাকার পার্শ্বেলটির ওজন সকলের চেয়ে বেশী করিয়া দেওয়া হইত। পর যে এমন করিয়া আপন হইয়া যাইতে পারে তাহা এই সর্ব্বপ্রথম জানিলাম ও বুঝিলাম।

আমাদের এই বাংলা বাজারের বাসার সম্মুখে একটু অপরিসর জমি ছিল, সেই চত্বরটুকুতে বিকাল বেলা একটি আনন্দের মজলিস্ বসিয়া যাইত। ইজিচেয়ার ও চেয়ারে ঐ স্থানটুকু সাজাইয়া রাখা হইত প্রত্যহ। দাদামহাশয় অফিস হইতে ফেরার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঐ চত্বরখানাতে আসিয়া বসিতেন ও ক্রমে ক্রমে ২।১ জন করিয়া লোকজনের আবির্ভাব হইতে থাকিত। তন্মধ্যে দেখিতাম আমাদের সামনের রাস্তার উপরে বড় গেটের উপরের একটি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং প্রসন্নকুমার বিস্তারত্ন। ইঁহারা প্রায় প্রতিদিনই উপস্থিত থাকিতেন কোন কোন দিন রামসুন্দর বসাক (বাল্যশিক্ষা রচয়িতা) আসিতেন, কোন কোন দিন ঢাকার সুগায়ক চন্দ্রনাথ রায় (আমার মার কাকা) এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ভগবান সেতারীর আবির্ভাবও হইত। যেদিন চন্দ্রনাথ রায়ের সুমধুর কণ্ঠে চারি দিক ভরিয়া উঠিত সেদিন ছোটর দল সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত; বিশেষ করিয়া আমার পিস্তুত ভাই ছোট দাদা রাজেন্দ্র-ভূষণ গুপ্ত খুবই মাতিয়া যাইতেন এবং ঐ গানের পদ, সুর, তাল, মানকে আয়ত্তে আনিতে খুব চেষ্টা করিতে থাকিতেন, ছোট দাদার গানের উপর বেশ একটু অধিকার ছিল এবং বেশ গান করিবার ক্ষমতাও ছিল। এদিকে ভগবান সেতারীর বাজনায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যাইত চারি ধারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চত্বরখানা অপরিসর ছিল, তাই অন্যান্য লোকজনরা দালানের সিঁড়ির উপরেই দাঁড়াইয়া কেহ বা বসিয়া গান ও সেতার বাজনা শুনিত। আমি কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সেতার বাজনার মূলগত মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার মত জ্ঞানলাভ করি নাই অর্থাৎ টুং-টাং ও ঝন্‌ঝনানের বাহারকে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু চন্দ্রনাথ রায়ের গানে বিমুগ্ধ হইয়া যাইতাম। চন্দ্রনাথ রায়ের গান সমাপ্তির পরেও যেন কিছুক্ষণ তার গলার সুমধুর স্বরের রেশটুকু চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত। দাদামহাশয় ছিলেন আনন্দপ্রিয়, তাঁহার নামের সঙ্গে মনের খুবই সাদৃশ্য ছিল। আমোদ উৎসবের সময় তিনি অবসর করিয়া আমাদের সকলকে গাড়ী করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। ঢাকার সুবিখ্যাত বনবিহার, একরামপুর ইত্যাদি স্থানের ঝুলন, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমীর মিছিলের ত কথাই ছিল না। তাহা ছাড়া ঢাকার গণি মিঞা নবাবের মহরমের নিমন্ত্রণেও আমাদের ছোটদের লইয়া হুসনী দালানে যাইতেও তাঁহার দ্বিধা ছিল না।

মহরমের সুন্দর তাজিয়া দেখিয়া আমরা খুব আনন্দ পাইতাম। সেখানে মাঠের মধ্যে সেদিন গরীব-দুঃখীদের খিচুড়ী খাওয়ান হইত। হাজার হাজার লোক সেদিন পেট ভরিয়া খাইয়া যাইত, হুসনী দালানের কাছে মাঠের মধ্যে বসিয়া। মার কাছে মহরমের ঘটনাটি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, সেই নির্ম্মম ঘটনার দিনটিকে সেদিন মনে পড়িয়া যাইত। এখন হিন্দু মুসলমানে বিবাদমান ঝগড়া-ঝাটি, খুনা-খুনির কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই ও জানিতেছি, তখন কিন্তু সে সবের বিন্দুমাত্রও কেহ শুনিতে বা জানিতে পারে নাই। কিন্তু তখন ঐ মুসলমানের মধ্যে দু'টি ভাগ ছিল শিয়া ও সুন্নী, তাদের মধ্যে খুব বিবাদ বিসম্বাদ চলিত তাহা ছোট কালেও আমরা বেশ শুনিতে পাইতাম। নবাব গণি মিঞার বাড়ী হইতে তার বাগানের রকমারী বহু ফল ঝুড়ি ভরিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিত তাহা খুব মনে পড়ে। আর মনে পড়ে রমনার মাঠে নবাবের চিড়িয়াখানা। যখন সবাই মিলিয়া দেখিতে যাইতাম, কত জীব-জন্তুর সমাবেশ; কত রকম পাখী, বানর, বাঘ, সিংহ। বিশেষ করিয়া সেই চিড়িয়াখানার মাঠ জুড়িয়া যখন বিরাট উটপাখীগুলি দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তখন খুবই আনন্দ পাইতাম। তার পরে বাঁধান বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে দেখিতাম কত লাল, সাদা, কালো রং-বেরংয়ের মাছের খেলা, আমরা সেই চৌবাচ্চার জলে 'খই' ছিটাইয়া দিতাম তৎক্ষণাৎই দেখিতাম মাছগুলি জলের মধ্যে থাকিয়াই যেন আমাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িত, আমরাও ঐ তামসা দেখার জন্ত বেশী বেশী 'খই' ছিটাইয়া দিতাম। বাঁদরদেরও প্রচুর কলা দিতাম ও উহাদের নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া খুব আনন্দ পাইতাম। গণি মিঞার বড় ছেলের আবার একটি ভিন্ন বাগান ছিল, তাহা ঐ চিড়িয়াখানার কাছাকাছিই ছিল, সে বাগানে কত ফুল ও ফলের গাছ তার যেন আর অন্ত ছিল না। সে বাগানে 'পান্থ-পাদপ' গাছ ছিল একটু খোঁচা দিলেই পরিষ্কার জল বাহির হইত। একটি কৃত্রিম পাহাড়ও ছিল, আমরা

সে পাহাড়ে দৌড়াইয়া ছুটিয়া যাইতাম, কে কাহার আগে যাইব এই ছিল মনের ভাব। কালের স্রোতে আজ কিন্তু সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও আর সেই চিড়িয়াখানা বা ফুলের ও ফলের বাগানের কোন কিছুই দেখিতে পাইলাম না—শুধু আছে, মাঠ! মাঠ! মাঠ! ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখাও ছিল একটি অতি বড় রকমের আনন্দের আস্বাদন। জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই দলে দলে বাবুরা ও ছোট ছেলে-মেয়েরা হাতীর পিঠে চড়িয়া রাস্তার উপরে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইত। সে সব হাতী প্রায়ই ভাড়া-করা হাতী। মাঝে ২ বড়লোকদের নিজের নিজের হাতীও রাস্তায় বাহির হইত। দাদামহাশয় কিন্তু সে সময় হাতী ভাড়া করিয়া ছোটদের আনন্দ দিতেও কসুর করিতেন না। যতক্ষণ জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির না হয় ততক্ষণই ঐসব হাতী রাস্তায় চলিতে পারিত, মিছিল বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই রাস্তা-ঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। সে সময় হাতী, গাড়ী, ঘোড়া কিছুই রাস্তায় চলাচল করিতে পারিত না।

ক্রমে জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইতে থাকিত। সে মিছিলের কত যে রকমারী রূপ ছিল তাহার যথোচিত রূপে বর্ণনা করার মত ক্ষমতা আমার নাই। মিছিলে পুর্ব্বগামী শোভাযাত্রা ছিল শত শত হাতীর মন্থর গমনে চলিয়া যাওয়া, তাদের গায়ের মূল্যবান এক একখানা সোনার জরি শাল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, প্রতি হাতীর শালের চার কোণ ধরিয়া চলিত চারটি লোক! হাতীর কপালে সোনা-রূপা জহরতের জৌলসের যেন অন্ত ছিল না। কোন কোন অতিকায় হাতীর সুদীর্ঘ দুই দাঁতের উপরে একখানা সোনার ছোট চৌকী বাঁধিয়া তদুপরি ছোট একটি ছেলেকে বসাইয়া দিয়া শোভা যাত্রার শোভাটিকে আরো যেন চমৎকৃত করিয়া দিত। আমাদের ছোটদের কিন্তু ঐ ছোট ছেলেটির জন্ত খুবই ভাবনা হইত। এই সবই হাতী ও ছেলের শিক্ষার গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন আর অতশত বুদ্ধি-বিবেচনা আমাদের ছিল কই? এইরূপে শত ২ হাতী চলার পর চলিতে থাকিত—রকমারী জরির পোষাকে আবৃত ঘোড়ার শোভাযাত্রা তাহাও শত শত। কপালে সোনা, রূপা, জরির কারুকার্য্যময় মুকুট ও সীঁথি। তার পরে অনেক অনেক খাট অর্থাৎ চৌকা ধরণের এক একটি খাটের মত তদুপরি এক একটি ফুলের বাগান ইত্যাদি যথা পদ্মবনে হস্তীর দলন, গাছের উপর উল্লুকের দোল খাওয়া কত কত অপরূপ দৃশ্যই না চলিতে থাকিত।

তার পরে আসিত বড় চৌকী তাহা ছিল অতিকায় ও খুব উঁচু উঁচু চৌকীতে কত যে চিত্র ও অভিনয় চলিত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দ্রৌপদীর মস্তকহীন পুত্রদের দেহ কোলে বিলাপ, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান, রাবণের সীতা হরণ, জটায়ুপক্ষী নিধন, ইত্যাদি। আবার গ্রীস দেশের কৃত্রিম ঘোড়া হইতে সৈন্ত আবির্ভাব ও যুদ্ধের অভিনয় চলিত। এদিকে আবার চলিত সমস্ত বৎসরের উভয় পক্ষের অর্থাৎ মিছিল বাহির হইত এক দিন নবাবপুর-আলাদের তরফ হইতে এক দিন বাহির হইত ইশলামপুর-আলাদের তরফ হইতে। প্রথম যে দলের মিছিল বাহির হইত সে দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের মিছিল বেশী ভাল হইত ইহার আবার ভাগ-বাঁটয়া থাকিত। এক বৎসর একদল আগে একদল পিছে এই ভাবেই মিছিলের শোভাযাত্রা চলিত—প্রতি বৎসর, উভ[য়] দলের বাৎসরিক সাংসারিক কেলেঙ্কারী-কেচ্ছাও অভিনয় করি[য়া] আনন্দ উপভোগ করিতে কসুর করিত না, যেমন শাশুড়ী বৌর চু[ল] ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; আবার বৌ তার বৃদ্ধা শাশুরীর গালে ঠোনা দিতেছে, মায়ের ছেলে-মেয়েকে ঠেঙ্গাইতেছে ইত্যাদি রকমারি অভিনয়। সেদিনের জন্মাষ্টমী মিছিল দেখিবার জন্ত কত গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোকজনের সমাগম হইত। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতেও লোকজন আসিয়া আত্মীয়স্বজনের বাড়ী উঠিয়া তাহাকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলিত। তা ছাড়া, বুড়ীগঙ্গায় ছোট-বড় বিপুল সংখ্যায় নৌকা সারিবদ্ধ ভাবে নঙ্গর গাড়িয়া থাকিত ও যথাসময়ে মিছিল দেখিতে নৌকা হইতে বাহির হইয়া মিছিল দেখিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিত। বলা বাহুল্য, ঐসব আরোহীরা দৈনিক হিসাবে ভাড়া করিয়া লইত। কখন কখন নির্দ্দিষ্ট দিনে মিছিল বাহির হইতে পারিত না নানা কারণে, যেমন প্রবল বারিপাত ইত্যাদিতে মিছিল বাহির হওয়ার সম্ভব হইত না; ইহাতে দূরাগত বিশেষ করিয়া যাহারা নৌকা ভাড়া করিয়া মিছিল দেখিতে আসিত তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইত, কিন্তু তারা ঐসব তুচ্ছ করিয়াও বহু অর্থ ব্যয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িত না। তখন মানুষের মনে যেন আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তিটা বেশী ছিল, এখন সেই আনন্দই নানা ভাবে রূপান্তরিত হইয়া আনন্দের ভাবধারায় বদল হইয়া গিয়াছে। এখন যারা ঐ সব কাহিনী শুনিবে তাহারা তখনকার দিনের ঐ সব আনন্দের ব্যাপারকে নিতান্তই অজ্ঞজনসুলভ ব্যাপার বলিয়া নির্দেশ করিবে। [ক্রমশঃ।

প্লট

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত শ্রীমান বল্টু এসে প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত কোরে তুললে।—"এ কি রে, ঘরে এত কাগজ ছড়ানো কেন? ঘর সাফ করছিস বুঝি? যাক, তবু ভাল, এত দিনে সুবুদ্ধি হয়েছে। ঐ বাজে খাতা-কাগজগুলো বেচলে তবু কালীর দামটা উঠবে তোর।"

—"মানে?" রীতিমত অবাক হই ওর কথায়।

—"মানে আবার কি? খাতা, কাগজ, কালী কিনে কত পয়সা কত সময় নষ্ট করে দাগ টেনেছিলি তার কিছুটা উসুল হবে তোর।"

—"কে বললে তোকে ওগুলো আমি বেচবো?"

—"কে আবার বলবে? না বেচলে শুধু শুধু এই সব বাজে কাগজ ঘরময় ছড়িয়েছিস কেন? আর্ট-একজিবিসনের মত এখানে তো আর লেখার একজিবিসন হচ্ছে না।"

বল্টু কথাটা শেষ করে বিজ্ঞের মত তাকাল।—"বাজে-কাগজ! জানিস ঐ বাজে-কাগজ সম্পাদক মশাই নিজে চেয়ে পাঠিয়েছেন?"

—"বাজে-কাগজ চেয়েছেন? কেন, সহরে, কি আজ-কাল কেরাসিনের অভাব হয়েছে?"

—"দেখ বল্টু, বার বার বাজে-কাগজ বাজে-কাগজ বলে আমার মাথা গরম করে দিসনে। সম্পাদক মশাই আমার লেখা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। বিশ্বাস না হয় এই চিঠি দেখ।"

বিস্ময়ে বল্টুর মুখটা কাটা পটলের মত হাঁ হয়ে গেল।—"কই দেখি চিঠি।" চিলের মত ছো মেরে চিঠিখানা তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে তাচ্ছিল্যের সংগে চিঠিটা টেবিলে আছড়ে ফেলে দিয়ে টেনে টেনে বললে, "ও: চাঁদা চাই। তাই অত···"

—"মানে?"

—"মানে কিছুই না, মানে টাকা, মানে পত্রিকার প্রাণ।"

—"রাখ তোর মানে। কি বলতে চাস শুনি?"

—"বলতে চাই যে, লোকটার সিনেমা দেখার টাকার বড় অভাব, তাই পত্রিকা বার করবার বায়না নিয়েছে।"

—"দেখ বল্টু, বুঝে-সুঝে কথা বলবি, ভদ্রলোকের নামে যা-তা বলবি নে।"

—"তোকেও বলি, বুঝে-সুঝে বিল্টু বলে ডাকবি। এমন বুদ্ধি না হলে লোকটা গল্প ছাপার লোভ দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারে?"

—"দেখ বল্টু হয়ে বিল্টু, লোকটা লোকটা করবি না ভদ্রলোককে।"

—"হ্যাঃ ভারি ভদ্রলোক। ভিক্ষে করছে তাকে আবার···" অবজ্ঞায় নাক তোলে সে।

—"ভিক্ষে নয়, টাকা চাইছেন, বদলে বই দেবেন।"

—"ও একই কথা, তোমার মত গবেট গল্প-পাগলারা ঐ সব ভাঁওতায় ভুলে ঘরের টাকা পরকে দিয়ে হিজিবিজি ছাপায়।"

রাগে আমি বোধ হয় বেগুনি হয়ে যাই।

বল্টু আবার বললে, "শোন, তোকে একটা গল্প বলি, যদি তোর তাতে একটুও উপকার হয়। আমার দাদাকে তো জানিস। ঐ তোর মত হিজিবিজি লিখে কাগজ আর সময় নষ্ট করা অভ্যাস। তবে তোর মত লেখাগুলো ঘরে না থেকে বাইরে ছাপার অক্ষরে দেখা যায়। যাই হোক, যখন খান পনের গল্প জমা হয়েছে তখন এক ভদ্রলোক দাদাকে বললেন, মশাই বই বার করুন, তবে তো নাম হবে, নইলে জীবন ভোর লিখে যান কেউ জানাতেও পারবে না আপনার নাম।"

দাদা খুব খুশী। বললে, "কে ছাপবে, সে বড় হাঙ্গাম।"

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আরে মশাই, আপনার আবার কিসের হাঙ্গাম। লেখাগুলো আর চেকে সই করে দিয়ে তোফা ঘুম দিতে থাকুন, মাস খানেক পরে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন, সারা বইয়ের দোকানে আপনার বই লোকের মুখে মুখে আপনার নাম। তারপর ঝনঝন কেবল টাকা, শুধু গুণে নেবার কষ্টটুকু মাত্র আপনার।"

—"কত খরচ পড়বে?" দাদার আর তর সয় না।

—"কত আর? তিনশো টাকাতে অনায়াসে একখানা বই হয়ে যাবে।" ব্যস দাদাকে আর পায় কে? সংগে সংগে তিনশো টাকার চেক এবং গল্পগুলি ভদ্রলোকের হাতে সমর্পণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, দিন পনের পরে এসে ছাপার কিছুটা দেখিয়ে যাবেন।

পনের দিন পরে তিনি এলেন, তবে বই নিয়ে নয়। বললেন, "ইয়ে হয়েছে হিসাব করতে একটু ভুল হয়েছে, তিনশোর গোলটার ওপর দাঁড়িটা বসানোই ভুল হয়েছে।"

দাদা কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকে দেখে দয়া করে তিনি খুলে বললেন, "ছয়শোর জায়গায় তিনশো ধরা হয়েছে। কেবল একটা দাঁড়ির ভুল, এমন মারাত্মক কিছু নয়।"

দাদা বললে "তাই তো ছয়শো? অত টাকা কি"—

—"ব্যস ব্যস ব্যস্ত হবেন না, এখুনি তিনশো নয়, আজ দিন দু'শ, বাকীটা ডেলিভারী দেবার সময় নিয়ে যাবো। যান মশাই, আর দেরী করবেন না, কত ঘুরতে হবে আমাকে। আপনার আর কি কষ্ট বলুন না। যা কিছু সব তো আমার ঘাড়ে, কোথায় সস্তায় কাগজ, কোথায় ভাল বাঁধাই, কোথায় আর্টিষ্ট সব তো এই শর্মার দায়। হ্যাঁ দেখুন, আসবার সময় একটু চায়ের কথাটাও বলে দেবেন।"

তার পর মাস খানেক কেটে গেছে—তাঁর আর পাত্তা নেই। দাদা ঘর-বার করতে করতে একজোড়া জুতোই ক্ষইয়ে ফেলেছেন। এমন সময় আবার তিনি এলেন। উস্কো-খুস্কো চেহারা শুকনো মুখ, ধপ করে চেয়ারে বসে মাথার চুলগুলো খামচে ধরে মাথা নামিয়ে বসে রইলেন বহুক্ষণ। দাদা তো রকম-সকম দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে—

হঠাৎ ঘাড় তুলে দাদার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনি আমাকে বাঁচান। আপনি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

—"আরে করেন কি? কি হয়েছে আগে বলুন।"

—"বলছি সব কথা বলছি—তার আগে আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়ান।" প্রায় কেঁদেই ফেলেন, এমনি অবস্থা।

শুধু জল তো দেওয়া যায় না, কাজেই জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, "আমার মন বলছে, আপনিই এর ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

কি ব্যাপার? না, কোথায় যেন তাঁর টাকা আটকে যাওয়ায় তিনি মহা মুস্কিলে পড়েছেন, এদিকে মাসের প্রথম, কর্মচারীদের মাইনে না দিলে কাজ করবে না, অথচ প্রেসে বহু অর্ডার—কাজেই এখুনি চারশো টাকা না দিলে সব অচল।

দাদার প্রাণ পরের দুঃখে কেঁদে উঠলো। নিজের অবস্থার কথা ভুলে টাকা আনতে চললেন। ভদ্রলোক পেছন থেকে বললেন, "দেখুন চেক দেবেন না, ক্যাশই ভাল—আর হ্যাঁ, আপনার বইয়ের দরুণ যে একশো বাকী আছে সেটাও যোগ করে পুরো পাঁচশো দিলে ভাল হয়।'

পরকে আলো দেখাতে দাদা নিজে অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকেন। বহু কষ্টে মাস পাঁচ বাদে বই নিয়ে ভদ্রলোক এলেন। হাসি মুখে বললেন—"নিন মশাই আপনার বই। এর জন্যে আমায় কি কম পরিশ্রম হয়েছে! সব দায় তো আমারই।'

দাদা যেন হাতে স্বর্গ পেল। প্রায় ছুটে এসে বইখানা হাতে নিয়ে থতমত খেয়ে বললে, "একখানি চড়!"

—"আরে মশাই, ঐ নামের জোরেই আপনার বই বাজারে হু হু করে কেটে যাবে। যাক্, আমার আর সময় নেই। এখন একশোটি টাকা দিয়ে দিন চলে যাই।"

—"আবার একশো? দাদার মুখটা লম্বা হয়ে গেল।

—"ধারটা পুরো পাঁচশো লিখে রাখুন আর বাকীটা বইয়ের, এই সহজ কথাটা বুঝতে—" ভদ্রলোক নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে কথাটা আর শেষ করলেন না। শুনলি তো সব, কাজেই তোকে সাবধান করছি।"

আমি বললুম, "বই তো কেটেছে বাজারে?"

"—হ্যাঁ তা কেটেছে বই কি। পোকাতে কেটেছে।"

"—কেন, দোকানে দিলেই তো—"

—"তা কি দেওয়া হয়নি? সেই খানকতক বই দোকানে দিতেই চিঠি মারফৎ যে হারে চড়ের আমদানী হোল যে, বাধ্য হয়ে তাকে ঘরেই বন্ধ রাখতে হোল। তাই তোকে—"

—তোর দাদার যা হয়েছে সেটা সবার হবে এমন কি মানে আছে। যা যা নিজের চরকায় তেল দিগে যা, কাজ হবে।"

—"ঐ রাবিশ পত্রিকা যদি বাজারে বার হয়, তাহলে আমাকে একশো বার বল্টু বলে ডাকিস, আপত্তি কোরবো না।"

কথাটা বলেই সে মুখে বল্টু এঁটে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। আর সময় নষ্ট না করে ছড়ানো কাগজের মাঝে ধ্যানে বসার মত বসে ভাবছি প্লটের কথা, হঠাৎ রাস্তায় ভীষণ গোলমাল শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জানলা বন্ধ করবার জন্তে জানলার কাছে গিয়ে দেখি, রাস্তার এক ধারে একটি মোটর-বাইক কাত হয়ে পড়ে আছে আর একটি তরুণী সেই মাত্র ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আরে রাম, মেয়েটির সাড়ীর আঁচলটা কাঁধ অবধি আর ওঠেনি, কোমরের কাছে এসেই থেমে গেছে। বিরক্ত হয়ে দৃষ্টি ফেরাতে নজরে পোড়লো একটি যুবক আমাদের বলাইয়ের সংগে কি সব বলছে। মেয়েটিকে চাপা দিয়ে এখন নিজের দোষ ঢাকছেন আর কি।

গলা চড়িয়ে বল্লুম "এই বলাই, আচ্ছা করে ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দে। গাড়ী চালাতে জানে না, গাড়ী চড়ার সখ আছে ষোল আনা। পথচলতি মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি করার জন্তেই ওদের গাড়ী চালানো।"

পিছন থেকে তুষার বললে, "কাকে কি বলছো দাদা?"

—"বলছি ঐ হাঁদারামকে। গাড়ী চালাতে জানে না, দিচ্ছিল এখনি এক জনকে চাপা।"

—"বাঃ, চাপা দেবে কেন?" তুষার সুর টেনে বললে।

—"দেবে কেন মানে? আমি এই মাত্র দেখলুম, ভদ্রমহিলা ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে উঠলেন। তুই কি বলতে চাস, উনি বেরালের মত ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন?"

—"আহা, আগে আমার কথাটা শোন, তার পর মন্তব্য কোরো। ঐ মেয়েটি বাইকের ব্যাক সিটে আঁচল উড়িয়ে বসেছিলেন। উড়ন্ত আঁচলটা কেমন কোরে চাকার মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে প্রচণ্ড টানের সংগে সংগে ভদ্রমহিলা রাস্তায় চিৎপাত। আঁচলটা ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে রক্ষা, নইলে আরো কি যে হোত!"

—"ওঃ, তাই নাকি? তবে, ঠিক আছে, যেমন সখ তেমনি শাস্তি।"

—"ব্যস, ঐ মন্তব্য করেই সব শেষ করবে নাকি? যাও দেখে এস গিয়ে ততক্ষণে আমার মাথায় প্লট এসে গেছে—তাড়াতাড়ি স্বস্থানে বসতে বসতে বলি, আর দেরী নয়, পালাবে।"

—"পালাবে কেন? কারুকে চাপা তো দাওনি, যে ভয়ে পালাবে।"

—"আ-হা, তুই জানিস না—পালায় পালায়, একটু দেরী হলে সব পালিয়ে যায়।"

—"তুষার রাগ করে বললে "কি যে আবোল-তাবোল বোকছো?"

—"আঃ মেয়েটা জ্বালালে। ধর, তোর মাথায় একটা প্লট এসেছে, তুই যদি তাড়াতাড়ি সেটা না লিখে ফেলিস—"

বাধা দিয়ে তুষার বললে, "আমার মাথার সঙ্গে ওদের কি সম্বন্ধ? রাখো তোমার প্লট, আমি যাই দেখিগে।"

—"সবটা শোনই না বাপু, প্লট মানে গল্পের কাঠামো। ধর, তুই একটা গল্পের প্লট পেলি তখুনি যদি না লিখিস ভুলে যাবি তো?"

—"আমি এক বার যা শুনি তা কিছুতেই ভুলি না।"

—"নাঃ তোর বুদ্ধিটা দেখছি বড় মোটা। আচ্ছা, সমুদ্রে ঢেউ ওঠে আবার তা মিলিয়ে যায় কি না?"

—"সমুদ্র আর মাথা এক নাকি? কি যে বল দাদা, তার মাথা-মুণ্ড নেই।"

—"এক নয়? তুই বললেই আমি মেনে নোব? সমুদ্রের যেমন কূল-কিনারা নেই, ব্রেনেরও তেমনি কূল-কিনারা নেই। ব্রেনটাও সমুদ্রের মতই, বুঝলি কিছু?"

—"না দাদা, ও-সব কিছু বুঝি না। তোমার কথায়ই কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তুমি যদি পাও তাই দেখো। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চললুম।"

"আঃ তুই কি কেরাণী? তাড়াহুড়ো করে পেটে যা হোক কিছু দিলেই হোল? যা বলছি ধীরে-সুস্থে শুনে নে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। মাথা আর সমুদ্র এই দুইয়েরই তুলনা নেই, এইটুকু মাথা, তার ভেতর কত কথা থাকে ভাব তো। আমার এই মাথা মানে ব্রেণ থেকে কত গল্পই না বার হয়েছে এবং হচ্ছে—আর সমুদ্রও অতল—কাজেই এই দুয়েরই মিল—এই বলাই, তুই আবার কি চাস? কথার মাঝখানে তোদের যত কাজের তাড়া। যা ভাগ এখান থেকে।"

বলাই থতমত খেয়ে বললে "দিদিকে এক বার—"

—"না, ও এখন যাবে না, যেতে পারবে না—আরে, তুই যাচ্ছিস কেন? সবটা শুনে নে।"

—"আমার কথা শেষ হবার আগেই তুষার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, সেখান থেকে বললে, "দাদা আসল সমুদ্র জানি না, কিন্তু তোমার কথার সমুদ্রে পড়ে আমার ব্রেণটা যে ভাবে হাঁক-পাঁক করছে আর কিছুক্ষণ থাকলেই একেবারে ডুবে যাবে।"

কথাটা বলেই রোজার হাত থেকে ভূত পালানোর মত ছুট দিলে। "বয়েই গেল! আমার আর কি? শুনলে তোরই জ্ঞান বাড়তো। যাক, এখন গল্পটি আগে লিখি।"

অবনীন্দ্র-চরিতম্

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের প্রাচীরগাত্রে বা তুলোট-কাগজে এতদিন আমরা যে সব চিত্রের নমুনা দেখেছি, সে সমস্তই ভারতীয় "লেপী"-রীতির নমুনা। পুরাতন ভারতবর্ষ ঐ "লেপী"-রীতির চেয়ে বড়ো-টেক্‌নিকে এর আগে কোনোদিন আঁক্‌তে বা পৌঁছতে পারেনি। ঐখানেই খতম্ হয়ে গিয়েছিল তার বিচিত্রণ-শিল্পকর্ম। এবং সেই জন্যেই ভারত-শিল্পী তার বিশাল মনের অধীরতা নিয়ে সার্থকতা খুঁজে বেড়িয়েছে মূর্ত্তিগঠনের মধ্যে, স্থাপত্যের মধ্যে। এই বিষয়ে "বিষ্ণুধর্মোত্তরম্" বা "শুক্রনীতিসার" এখন প্রমাণ হয়ে রয়েছে। Tempera painting-এর এই গণ্ডী ছাড়িয়ে আমাদের দেশে এই প্রথম শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরই নবতা নিয়ে আসেন প্রয়োগ-নৈপুণ্যে। "লেপী"-রীতির বাইরে, তাই নতুন টেকনিকের পথে আমার গুরুদেবের যাত্রা হয় সুরু। গাছপালা, মানুষ, খরগোস,—ঐ পোষা কাকা পায়রাটি—ঐ যারা দীপ্যমান রূপ—তারা হয়ে দাঁড়াল চিত্র-যজ্ঞের উপকরণ—মাত্র, প্রয়োজন মত তারা ব্যবহৃত হতে লাগল ছবিতে। যা "দেখেছেন" গুরুদেব,—সেইটিকে ফোটাতেই রূপগুলি যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল কাগজের উপরে, অনেকটা মনিবকে ঘিরে কর্মচারীদের দেখনভালি ব্যস্ততার মত। ওরা চিত্রকে বর্ণ-ঘন করল বটে, ভূষণ পরাল বটে, কিন্তু সম্পত্তি হল না। ঐ বর্ণমান রূপগুলি আন্তরীক্ষিক (Spatial) ভেদের মধ্য দিয়ে, বিপুলতর ছন্দের মধ্য দিয়ে নিমিত্তি সহচর হয়ে রইল এক অখণ্ড চিত্রের,—"যা দেখেছি"—সেই প্রজ্ঞার। শ্রীমান্ গুরুদেবের গোড়ার কথাটি মনে রেখো—শিল্পীর দর্শন, আর যোগীর দর্শনের মধ্যে তফাৎ আছে, তারতম্য আছে। গুরুদেবের কলম থেকে একটু ঋণ করি। অনেক জিনিষ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

"...জেগে-দেখার দৃষ্টি, ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতে তো পারে না, যতক্ষণ না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে। এই জন্যেই কবিতা, সঙ্গীত, ছবি, এ সবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ-কানের সাধারণ দেখা শোনার চালচলনের বিপর্য্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই।..." (বাগে: P. 28)

"...প্রতিভা রূপের জগতে যে সমস্ত অঘটন ব্যাপার ঘটিয়েছে তার মধ্যে কত দৃষ্টান্ত দেবো? একটা ঘটনা যা ঘটেছে রূপজগতে তার কথা বলি। রূপের জগতে বসে মানুষ পাখী আঁকে—যুগের পর যুগ যায়—কল্পনার পাখী, গাছের পাখী, ডালের পাখী রঙে-রেখায় ধরে রূপ-বিষয়ে ধীমান্ মানুষ। বসা পাখী হয়, ভাসা পাখী হয়, ঘুমন্ত পাখী হয়; চলন্ত পাখী হয় না, দূর আকাশের উড়ন্ত পাখী হয় না। ধীমানের হাতের রেখা হার মানে, রঙ হার মানে,—যুগে যুগে এই পাখীকে ছবিতে ধরতে। ডানা মেলানো পাখী হয়, কিন্তু নীলপটে সে স্থির-নিশ্চল-যেন লাগিয়ে দেওয়া-ভাবে থাকে। হঠাৎ কোন দেশে একদিন একজন প্রতিভাবান এল—হয়তো ছিল সে নিউটনের মতোই বালকমাত্র হয়তো বা ছিল সুলেমান বাদশার মত প্রকাণ্ড শক্তিমান—উড়ন্ত পাখীকে তুলির একটি টানে ছবির আকাশে উড়িয়ে দিয়ে গেল সে। যেমন আলোর কম্পন বিজ্ঞান-জগতে, রূপের জগতে এই উড়ন্ত পাখীর ডানায় ওঠা-পড়া বুঝিয়ে জীবন্ত রেখার একটু কম্পন একটা মস্ত আবিষ্কার,—রেখা প্রাণ পেল।" (বাগে: P. 261/2)

শ্রীমান্, রূপের এই দর্শন বা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে রূপদক্ষ যখন বর্ণিকার কারসাজিতে, ভঙ্গিতে, বা লীলাক্ষেপে কাগজের উপর এনে ফেলে রূপাতীত একটি কম্পন, দোলা, গতি বা ভাব তখনি রূপগুলো যেন এক লহমায়, যাদু মন্ত্রেই যেন সংহৃত হয়ে, অপরূপ হয়ে ওঠে; দীপ হাতে ঢুকে পড়ে, ঐ আলোক-রূপের বাইরে যিনি থাকেন, তাঁর ঘরে; সৃষ্টি করে ফেলে একখানি "চিত্র"। এই নানাবর্ণ শবলিত, বহুমুদ্রা-বা-করণ-বিহ্বলিত, রূপভেদ-প্রমাণাদি-কণ্টকিত কাগজখানি হয়ে ওঠে "চিত্র", বলতে পারো "বিচিত্র", বলতে পারো "অদ্ভুত"।—এই পর্য্যন্ত গেল ভারত-শিল্প বিষয়ক লৌকিক বা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

কিন্তু শ্রীমান, এই যে "চিত্র"-টি সৃষ্টি হল, তার মধ্যে আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার; সেগুলি না থাকলে গন্ধর্ব-ভারত বা আমার গুরুদেব, তাকে চিত্রই বলবেন না। কেন বলি শোনো। আর তাও বলি, তোমায় যদি না শোনাই, তাহলে, আমার পাওয়া ঐ গুরুর-হাতে-গড়া রূপ-বধূটির সীঁথির সীমানায় সিঁদূর পরানোটুকু বাকি থেকে যাবে।

শ্রীমান্, ছবিখানিকে তো তুমি লিখলে, শাস্ত্রমত ষড়ঙ্গের যোজনাও না হয় করলে, যাকে বলে পুরোদস্তুর ঘাম তেল মাখিয়ে ছাড়লে,—তবুও আশ্চর্যের কথা, গুরুদেব ১১৩৭ সালের পর থেকে আর বললেন না,—ঐ ছবিটা "চিত্র" হয়ে গেল। সে এক গল্প।

গুরুদেবের তখন বাগেশ্বরী লেকচারস্ ইত্যাদি শিল্প-প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়েছেন সে সব তত্ত্বকথার রচনা। যাত্রা পালাগান লেখায় উদয়াস্ত মহাব্যস্ত। ছবিও মাঝে মাঝে আঁকেন, তবে কেবলি বলেন—"শিষ্য, আঙুল revolt করেছে, তুলি ধরতে আর পারিনে।" mask-আঁকার স্রোত থেমে গেছে, সুরু হয়েছে কাটুম কুটুম। আবার আমিও তখন মহাব্যস্ত। বিয়ে হয়ে গেছে। ডেঁপোমির অন্ত নেই, মোটর হাঁকিয়ে বেড়াই। 'কাদম্বরী'—রসে ভরপুর। জোড়াসাঁকোয় যাওয়া হয়নি অনেক দিন।

একদিন এক ঘটনার ফেরে মহা আনন্দে আমি লাফাতে লাফাতে সকাল বেলায় গুরুদেবের কাছে এসে হাজির। তখন তিনি একতলায় দক্ষিণের বারান্দায় পুব ধাটালে বাগানের সিঁড়ির ধাপে বসে ছেনি-হাতুড়ি চালিয়ে ঠুক ঠুক করে কালো পাথরের বিঘৎ-খানেক একটি কচ্ছপ তৈরী করছিলেন। কোথায় হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছেন কষ্টিপাথরের এই নোড়া আর মাটি থাবড়িয়ে বসে গেছেন

নতুন খেলায়। উঁর "বখেটে"—নাম হ'লে কি হবে, বৃহৎ-শিশু ছিলেন আমার গুরুদেব।

প্রণাম করতেই একবার ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন আমাকে, তার পরে কচ্ছপটিকে হাতে নিয়ে, কপাল নাচিয়ে, হাসিটিকে ঠোঁটে দুমড়িয়ে বললেন—

"দেখেছিস, খাসা কাটা হ'য়ে গেছে রে,…কচ্ছপের দাঁড়া,…যেন বর্ম এঁটে খাড়া হয়ে উঠেছে। চলতে চাইছে। আমায় দেখছি এবার পুরীর সমুদ্দুরের ধারে যেতে হল।"

সত্যিই, গুরুলোকের মুখে এমন আবোল-তাবোল কথা শুনলে হকচকিয়ে যেতে হয়। কৌতুক-কম্পিত ওষ্ঠে আওড়াই—

"কচ্ছপ…পুরী?…

"এই দ্যাখনা,…এবার কচ্ছপটার পিঠে একটা…2000 B.C… কি বলিস্…নরুণ দিয়ে কেটে লিখেদি। আর তার পরে পুরীতে গিয়ে এই কূর্ম-অবতারটিকে পাথারের জলে দিই ছেড়ে। জলের লাবণ্য মেখে ওটা ফুলতে থাকুক। তারপর একদিন …4000 A.D তে…বুঝেছিস্…প্রত্নতাত্ত্বিকদের চোখ টাটিয়ে …অবনঠাকুরের…কমঠ বাবাজী পিঠ জাগিয়ে ভেসে উঠবেন।" বলেই…একঠুক্। আর তারপরেই—

"ঐ যাঃ, দুয়ের ফুটকিটাই উড়ে গেল। হল না; আমার কূর্মটির অবতার হওয়া হোলো না। কপালে নেই। হ'তে চায় না। তাহ'লে,…এখন থাকো বাপু গিয়ে…আমার বাদ্‌লা বাবুর পোর্টম্যান্টোয়।"

মেঝের উপর পা ছড়িয়ে হাসতে থাকি। এতও পাগলামি খেলে গুরুদেবের মাথায়! হাস্য থামিয়ে, দেহ ফিরিয়ে বলেন—

"ছোটুবাবু তো বড় একটা হাসেন না। আজ হল কি তোর…বলি…।"—

"হাসব না? আজ আমায় হাসিতে পেয়েছে। একজনকে নিয়ে আজ সারা সকাল গুমরে গুমরে হেসেছি, আবার এখানে এসে আর একজনকে নিয়ে…। কোথায় রবিদাদাকে কিঞ্চিৎমাৎ করে গর্ব্বে লাফাতে লাফাতে এলুম খবর দিতে, না, এসেই দেখি, কষ্টিপাথরের এক কচ্ছপ অবতার হ'য়ে চলেছেন, পুরীর সমুদ্দুরে নাইতে।" রবিদা'র নাম উঠতেই, ছেনি-হাতুড়ি রেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন গুরুদেব। কপালে ভুরু তুলে বল্লেন,—

"চল উপরে চল্। রবিকা'র সঙ্গে আবার কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে এলি, দেখি। এইতো সেদিন রবিকা বল্লেন, 'অবন্ তোমার চেলাটি একটি বৃশ্চিক।"

পাথরের কুঁচিতে ভরে গিয়েছিল জামরঙের লুঙ্গি, সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলে সাদা পিরাণের বুকপকেট থেকে বর্মা চুরুট বার ক'রে, ধরিয়ে, বাক্যব্যয় না ক'রে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন গুরুদেব।

শ্রীমান্, আমার এই আজগুবী খোসগল্পের রহস্যটি যে কোথায়, খোলসা ক'রে না বললে তুমি বুঝবে না। রবিঠাকুর, অবনঠাকুর আর প্রবোধ ঠাকুর—এই ত্রিভুজের মধ্যে কিছুদিন ধরে তখন একটা মিষ্টি সাহিত্যিক পরিপ্রশ্ন চলছিল। কিন্তু তার উত্তরোত্তর আঘাতটি লেগেছিল গুরুদেবের শিষ্য-স্নেহাতুর অঙ্গে! ঘটনাটি এই:—

'কুমারসম্ভব' অনুবাদ করে গৃহবিবাদের পরে যখন রবিঠাকুরের কাছে প্রথম প্রবোধ ঠাকুর যায়, তখন তিনি খুসী হন এবং পাণ্ডুলিপিখানি রেখে নিয়ে অনেক জায়গায় শোধন করে দেন। সেই সময়ে তিনি তাকে আদেশ দেন শ্রীবাণভট্টের "কাদম্বরী"র অনুবাদ করতে: কাদম্বরীর অনুবাদ পড়ে তিনি মহাখুসী হন, এমন কি স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট লিখে পাঠিয়ে দেন—প্রবোধ ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঐ সার্টিফিকেটটিই হয়ে দাঁড়ায় প্রবোধ ঠাকুরের এক সমস্যা! মাথায় তার পোকা নড়ে উঠে, যখন সে তাতে লেখা রয়েছে ছাখে,—"মাঝে মাঝে দু'-চারটে প্রাকৃত বাংলাশব্দ অতিরিক্ত গ্রাম্য হয়েছে।" প্রবোধ ঠাকুরের প্রথমে দুঃখ হয়, মনমরা হয়ে পড়ে, তার পরে আসে অপূর্ব এক অভিমান। একে কি প্রশস্তিপত্র-সংলিখন বলে? এ যে মাখনভরা দুধে এক ফোঁটা চোণা ফেলে দেওয়ার মত; এ যে পূর্ণাঙ্গ মানুষের গায়ে এক আনা পরিমাণ খিত্রের দৌর্ভাগ্য! কিন্তু মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। গরগর প্রাণে গুরুদেবের কাছে সে সরাসরি হাজির হয়ে যায়। অভিমানের কাহিনী শুনে গুরুদেব তো একেবারে খাপ্পা। বলেন—

"ভাখ, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস্। রবিকা'র কাছে যদি শিখতে চাস্ তো সেখানেই ভেসে পড়্। আমার কাছে আর ছবি লিখতে আসিস্ নি। ছেলেগুলোর মাথা মুড়োতে রবিকা'র হাত একেবারে ক্ষুর-সিদ্ধ। দুঃখু করিস নি। আমাকেও একদিন বলেছিলেন—"অবন, বেশ ছবি আঁকছিলে, আবার কলম ধরেছ কেন? লেখাটেখাগুলো ছাড়ো।" কই, আমি কি ছাড়তে পেরেছি? ওরে, লেখাটা যে লিখতেই হবে, ছবিটা যে আঁকতেই হবে,—এ আবার কোন্ দেশী কথা! যখন ওগুলো আসবে, তখন যে তোকে করতেই হবে। এই যে উনি ষাট বছর বয়সে ছবি আঁকতে বসেছেন, কই অবনপটুয়া তো তাঁর কাছে গিয়ে বলছে না—"কি ছাই আঁকছ রবিকা,' আঁকা ছেড়ে লেখা চালাও।"…বেশ করেছিস্, দু'-একটা গ্রাম্য শব্দ না হয় ব্যবহারই করেছিস্, তা সেগুলোকে না কেটে দিয়ে উনি কেন ঐ ফলাওয়ালা সার্টিফিকেট লট্‌কালেন? যাস্‌নে রবিকা'র কাছে। প্রুফগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। আর তা ছাড়া—বাণভট্ট ছিলেন ছবি আঁকিয়ে সাহিত্যিক,—উনি বুঝেছিস্ আমার ঘরের লোক।"

শ্রীমান্ বুঝতে পারছ, এই পরাণ পোড়নি অভিনয় কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। শিষ্যকে কেউ টুকেছে, সহ্য করতে পারতেন না গুরুদেব। যাক্, তিনি তো কাদম্বরীর প্রুফ নিয়ে পড়লেন! প্রুফ দেখে পাঠিয়ে দেন, আর ফারসি ছাঁদে উপরে লিখে দেন—'গ্রাম্যশব্দ নেই।' এদিকে রবিদা' শুনেছেন,—অবনের কাণ্ড; শুনেছেন অবন কিনা শিষ্যের প্রুফ দেখছে। আর হাসে কত? একদা তিনি গুরুদেবের কাছে প্রথামত মুচকি হেসে বললেন—"অবন, তোমার চেলাটি একটি বৃশ্চিক।"

শ্রীমান্, "বৃশ্চিক"-খেতাব পাওয়াটা মনোরম বা সুখদ হতেই পারে না। আমিও তাই তক্কে তক্কে ফিরি। একটা পাল্টকিলে পাল্টার তালে থাকি। বেজায় একগুঁয়ে ছিলুম ছেলেবেলায়। এই পর্যন্ত গেল ঘটনা।

এই ঘটনার মধ্যে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই, যা সত্যিই, ছবির ব্যাপারে লাগ হয়। তবু এই Remote Cause-এর সূত্র ধরে যা ঘটল, সেইটিই আমার কাছে আজো আলো-দেখার মত বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে।

গুরুদেব বারান্দায় সিংহাসনে এসে বসলেন; চুরুটটার মুখে আর একবার ভালো করে আগুন দিয়ে বললেন—

"আবার কি ফ্যাসাদ বাধালি বল্। রবিকা-কে কিস্তিমাৎ···
সে আবার কি করে হয়?"

ঘুৰিয়ে ছিলুম আমি। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কুলকুল করে হেসে বলি—

"রবিঠাকুরকে আজ এইমাত্র "দুর্দ্দর্শং" বলে এসেছি।"

লম্বা আঙুলের বন্ধনে চুরুট রইল বন্দী, কাঠের কেদারায় এলিয়ে পড়ল হাসকুটে মাথা, বললেন—

"কি বললি? দুর্দ্দর্শ? একেবারে রূপে আঘাত দিয়েছিস্ রবির। এইবার আমার সামলে। আর তোর রক্ষে নেই।"

বন্যাস্রোতে আমি উত্তর দিই—

"বল্‌ব না? একশবার বল্‌ব। আমাকে কেন উনি 'গ্রাম্য' বলতে গেলেন? "সভ্যতার সঙ্কট" নামে এই আর্টিক্‌লটা লিখেছেন রবিদা। দুর্দ্দান্ত article। পড়তে গিয়ে দেখি "তং দুর্দ্দর্শং··· গুহাহিতং"···(কঠোপনিষৎ)—কথাটা লেখা রয়েছে। আর দুর্দ্দর্শং-এর মানে করা হয়েছে "অদৃশ্য"। ব্যস্, আজ সকালে উঠেই বাগান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। পৌঁছে গেলুম 'শশিভিলায়' —ঐ যেখানে প্রশান্ত মহলানাবিশ মহাশয় থাকেন। দোতলার হলঘরের পাশে ঐ দক্ষিণের ঘরটায় জানলার ধারে ইজিচেয়ারে বসে তখন ভুরু নাচাচ্ছিলেন রবিদা'। দেখেই বললেন—

"অসময়ে উদয় কেন? নীচে তোকে কেউ আটকালো না? নেমুর নাতি না হলে দেখা দিতুম না। বস্ পালঙ্কে বস্।"
(শ্রীসৌতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—আমার ছোটঠাকুর্দ্দা—নেমু—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবনের বন্ধু)
প্রণাম সেরে অসমসাহসে বলি—

"আপনি একটা মস্ত ভুল করেছেন 'সভ্যতার সঙ্কট'—প্রবন্ধে। দুর্দ্দর্শ' এর মানে কি কখনও অদৃশ্য হয়? তাহলে ঈশ্বরকে দর্শনই হয় না। আপনার গুহাহিতটি যে দুঃখে দর্শনীয় হয়েই রয়েছেন; তিনি আবার অদৃশ্য বা অদর্শনীয় হতে যাবেন কোন্ লজ্জায়?"

আমার দিকে চেয়ে বিরাট চোখে স্নেহ ঝরিয়ে রবিদা বললেন "লিখেছি না কি রে? তা হবে হয়ত। লিখে ফেলেছি। ছাপার অক্ষরে আর বদ্‌লাতে পারা যাবে না।"

আমি বললুম—"কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে। আর না যদি যায়, তাহলে তিনি আপনার কাছে অদৃশ্য হয়েই থাকুন, আর আমার কাছে,—রবিদা'র মতই—হয়ে থাকুন দুর্দ্দর্শং।" এই বলে, মায়ের-পাঠানো ক্যাটেলিয়ার বাটন হোলটি তাঁকে দিয়ে, প্রণামান্তে সোজা চলে এসেছি এখানে।"

শ্রীমান, আমার এই ডেঁপো ডাঁই-পিঁপড়ে কথা-ও-কাহিনী শুনে পা যোড়া দিয়ে হেসে উঠলেন গুরুদেব। চুরুটে দুটো টান দিয়ে বললেন—"আর কিছু বলিস্ নি তো? যাক্, রক্ষে। আর, আচ্ছা আহাম্মুখ ত তুই। যে উপাধিটা আমার পাওয়া উচিত ছিল—এই কালো কষ্টিপাথরের, এই আটবাঁকা অবনঠাকুরের, তুই artist হয়ে কি না সেটা চড়িয়ে এলি রবি ঠাকুরের portrait-এ, —দেশের দশের মধ্যে যিনি বিখ্যাত সুদর্শন। যাক্, তোর ফক্কড়ির ফাঁকিটাই এবারের মত তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। রবিকা'কে বুঝিয়ে দেব'খন।"

এই পর্য্যন্ত গেল আমার হামবড়াই গল্প। কিন্তু শ্রীমান্, কে তখন জান্‌ত সংস্কৃতের বড়াইটাই হবে আমার কাল! প্র্যাক্‌টিক্যাল প্যাঁচে ফেলবেন গুরুদেব! দুপুরবেলায় বাড়ী ফিরে আসি। কাঁচা বয়সের উঠ্‌তি মন—নাচছে আর দুল্‌ছে। হঠাৎ বিকেলবেলায় গুরুদেব টেলিফোন করলেন আমায়—"শিগ্‌গীর চলে আয়।"

যখন এলুম, তখন সন্ধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। দক্ষিণের বারান্দায় একটিমাত্র জ্বলছে চল্লিশবাতি লাইট। তারি নীচে গগনঠাকুরের আসনটিতে দেখি, গুরুদেব স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। নিস্তাল পুরী। হৈ চৈ নেই, বাড়ীর সকলে বোধ হয় বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমি যেতেই আমাকে বললেন,—গম্ভীর ভাষণ,—

"ভাখ, দুপুর থেকেই তোর ঐ দুর্দ্দর্শং কথাটি আমাকে বড় ভাবাচ্ছে। ছবির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গুণীরা কি ভেবেছিলেন, সেটা উদ্ধার করতে হবে আমাদের। স্থাপত্যের উপর, মূর্ত্তির উপর অনেক কিছু পাওয়া যায় সংস্কৃতে, কিন্তু স্রেফ ছবি সম্বন্ধে সামান্য যা কিছু পাওয়া যায়, তাতে মন ওঠে না! "চিত্রদীপ"ও দেখছি, 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্'ও দেখছি। তুই সংস্কৃত নিয়ে ঘাঁটছিস্—এ বিষয়েও তোকেই সন্ধান করতে হবে। অনেক কিছু দুর্দ্দর্শং হয়ে আছে ছবির রাজ্যে। তুই পারবি, এই এক কাজ তোকে দিলুম।"

উত্তর জোগালো না মুখে। এটি শাস্তি, না দান; পরীক্ষা, না মান! শ্রীমান, কি গুরুভার বোঝাই না মাথায় নিয়ে সে রাত্রে আমি ফিরেছিলুম বাড়ীতে। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকি, তাঁকে বলি, এই ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাতে। আর সত্যিই, ঝিকুট নাড়িয়ে বোঝা মাথায় তুলে দিলেই যে বোঝা বয়ে বেড়াব, সে বয়স আমার তখন নয়। ওহে, আমার তখন বিবাহ হয়ে গেছে, বৌ ভাবতে ভাবতেই প্রাণ আঁইঢাই, ছবির শাস্ত্র কে তখন অত ভাবে বলো? হঠাৎ, কিছুদিন পরেই, একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করি। গুরুদেবকে জানাই। তিনি তো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—

"পেয়েছি রে পেয়েছি; মিল হয়ে গেছে। তাই বলি, পুজোর সম্বন্ধটা না থাকলে সত্যিই ত ছবি হবে না। ওরে, এ যে নতুন দিগ্‌দর্শন। ছোটুবাবু, এই হচ্ছে ছবির universal language, চিরদিনের ভাষা। এর টেকনিকও হবে আলাদা। হতেই হবে আলাদা। এই ভাখো, আবার রঙ সাজিয়ে, বসে, আমায় পরখ করে দেখতে হবে। কিন্তু আঙুলগুলো যে revolt করেছে।"

[ক্রমশঃ।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জেনেভা সম্মেলনের পটভূমি—

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইতে হইতেই জেনেভার বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের বড় কর্ত্তাদের ১৮ই জুলাই (১৯৫৫) আরম্ভ হইয়া ২১শে জুলাই কিম্বা তাহার এক দিন কি দুই দিন পরে সম্ভবতঃ শেষ হইয়াই যাইবে। তখন এই প্রবন্ধের কি সার্থকতা থাকিবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। এই সম্মেলন সার্থক হইবে কি না তাহা অনুমান করা হয়ত সম্ভব নয়। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়া বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। সম্মেলনের জন্য আয়োজন যে সন্তোষজনক এবং আশাপ্রদই হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সম্মেলনের সংগঠন, কর্ম্মপদ্ধতি এবং কর্ম্মসূচী লইয়া নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ার যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্মসূচীর ব্যাপারে যে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সম্মেলন সম্পর্কে আশাপ্রদ মনোভাব সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণের জন্য যদি ছোট কর্ত্তাদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইত তাহা হইলে ঐখানেই রচিত হইত সম্মেলনের সমাধি। 'হয় ষোল আনা-ই চাই, না হয় কিছুই চাই না' এরূপ মনোভাবও কোন পক্ষই প্রদর্শন করেন নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সানফ্রান্সিস্কোতে সমবেত বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এক মত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, বড় কর্ত্তাদের এই সম্মেলনের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী রচনা করা হইবে না। বিশ্বের মন কষাকষি দূর করিতে সাহায্য করিতে পারে এইরূপ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে চারি জন বড়কর্ত্তার যে-কেহ প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু একজন যাহা উত্থাপন করিবেন তাহা গ্রহণ করিতে অন্যান্য সকলের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। তবে একই বিষয় যাহাতে দুই বার উত্থাপিত না হয়, তাহার জন্য এবং সময়ের সাশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি যে সকল বিষয় উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন সেগুলি উল্লেখ করিবেন।

জেনেভা সম্মেলন চারি দিন হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু সম্মেলনের সময় প্রয়োজন হইলে আরও এক দিন কি দুই দিন বৃদ্ধি করিতে রাশিয়ার অভিপ্রায়ও পশ্চিমী শক্তিত্রয় মানিয়া লইয়াছেন। সম্মেলনের জন্য আর কোন প্রস্তুতি বৈঠকের অনুষ্ঠান না করা সম্পর্কেও বৃহৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রিচতুষ্টয় একমত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার। অতঃপর বড়কর্ত্তারা পর্য্যায়ক্রমে সভাপতি হইবেন। আলোচনা হইবে বড়কর্ত্তাদের মধ্যেই। তবে, পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের পর্য্যায়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক বড়কর্ত্তার সঙ্গে প্রায় শতাধিক সদস্য থাকিবেন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে থাকিবেন উচ্চপদস্থ কূটনীতিবিদ, সামরিক অফিসার, আইনজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদ। বিশ্বের মন কষাকষির কারণগুলির সংখ্যা, তাহাদের জটিলতা ও গুরুত্ব এবং যে-অল্প সময়ের মধ্যে এইগুলির আলোচনা শেষ করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিলে বড়কর্ত্তাদের আলোচনায় সাহায্য করিবার জন্য এই সকল বিশেষজ্ঞকে যে কঠোর শ্রম করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মাণী হইতেও পর্য্যবেক্ষক প্রতিনিধি দল সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া প্রকাশ।

জেনেভা সম্মেলনের আয়োজন যে সন্তোষজনক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মসূচীকে যে নিয়মতন্ত্রের কোন বৈঠকের নিকট বাঁধা দেওয়া হয় নাই, ইহাও সম্মেলন সম্পর্কে আশাপ্রদ আবহাওয়াই সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সম্মেলনে পশ্চিমী শক্তিত্রয় কি কি বিষয় উত্থাপন করিবেন, এই প্রশ্নের গুরুত্ব আদৌ উপেক্ষার বিষয় নয়। সম্মেলনে রাশিয়া কি নীতি গ্রহণ করিবে, তাহার কিছু না কিছু আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিত্রয় সম্বন্ধে একথা বোধ হয় বলা চলে না। মার্শাল বুলগানিন সম্মেলনে কি নীতি গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়। তিনি হয়ত বলিবেন যে, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধাগুলি দূর করিবার জন্য রাশিয়া শুধু উৎকণ্ঠিতই নয়, কার্য্য দ্বারাও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ রাশিয়া প্রমাণ করিয়াছে এবং যে-সকল সমস্যা শান্তির অন্তরায় সেগুলির মীমাংসা করিতেও রাশিয়া প্রস্তুত। এখন এই আগ্রহ প্রমাণ করিবার দায়িত্ব পশ্চিমী শক্তিবর্গের। জেনেভা সম্মেলনে ইহা-ই রাশিয়ার নীতি হইবে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। কিন্তু পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের কি নীতি হইবে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের নীতি যে আমরা জানি না তাহা নয়। কিন্তু জেনেভা সম্মেলনে পুরাতন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য নূতন কোন নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ কোন আভাষ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এ সম্পর্কে ফ্রান্সের 'Le Monde' পত্রিকা লিখিয়াছেন, "It is probable that the three Ministers have tried hard to give

their conversation a much more positive conclusion, and the impression is indeed confirmed anew that the West has no new ideas to put forward on the great problems at issue between the two blocs." এ কথা বোধ হয় খুবই ঠিক যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় যদি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন নীতির পরিচয় দিতে না পারেন তাহা হইলে জেনেভা সম্মেলন আর একটি বার্লিন সম্মেলনে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪) পরিণত হইতে পারে।

পশ্চিমী শক্তিত্রয় প্যারীচুক্তি অনুমোদনের পর শক্তিশালী হইয়া রাশিয়ার সহিত আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। জেনেভা সম্মেলনের পূর্ব্বে তাঁহাদের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, অথবা এ কথা বলিলেই ঠিক হয় যে, তাঁহাদের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জেনেভা সম্মেলনের আয়োজন করিতে তাঁহারা রাজী হইয়াছেন। প্যারীচুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে, পশ্চিম জার্ম্মাণী সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া উত্তর আটলান্টিক চুক্তি পরিষদে আসন গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমীশক্তিত্রয় যে শক্তিশালী হইয়াই রাশিয়ার সহিত আলোচনা করিবার জন্য জেনেভা যাইতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আলাপ আলোচনার পথে কোন মীমাংসায় তাঁহারা যদি না আসিতে পারেন, তবে আলাপ-আলোচনার পথে মীমাংসার জন্য নয়, যুদ্ধ করিবার জন্যই পশ্চিমী শক্তিত্রয় শক্তিশালী হইতে চাহিয়াছেন, এই অভিযোগের কি সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন? রাশিয়াও অবশ্য শক্তিশালী হইয়াছে। মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূতাবাসে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে গত ৪ঠা জুলাই (১৯৫৫) রুশ কমু্যনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছেন, "Russia is going to Geneva from a position of strength and not because of any weakness." অর্থাৎ রাশিয়া শক্তিশালী হইয়াই জেনেভায় যাইতেছে, দুর্ব্বল বলিয়া নয়। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এই উক্তির উত্তরে ৬ই জুলাই (১৯৫৫) ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, "সোভিয়েট রাশিয়া দুর্ব্বল বলিয়া জেনেভা সম্মেলনে যাইতেছে, মার্কিণ সরকারের কোন কর্ম্মচারী এমন কথা বলেন নাই। পৃথিবীতে রাশিয়া যে একটি বৃহৎ সামরিক শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একথা স্বীকার করে।" মঃ ক্রুশেভ উক্ত বক্তৃতায় আরও বলিয়াছেন যে, "সমমর্য্যাদা-সম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে যদি আমাদের সঙ্গে আপনারা সততা ও আন্তরিকতার সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে জেনেভা সম্মেলন হইতে ফল পাওয়া যাইবেই।" প্রেঃ আইসেনহাওয়ারও উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, "আপোষ ও সৌহার্দ্দ্যের মনোভাব লইয়া সততার সহিত নিজের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা সম্মেলনে যাইতেছে।" মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষের এই আগ্রহ সত্ত্বেও সম্মেলনে কি কি বিষয় উত্থাপন করা হইবে তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

জেনেভা সম্মেলনে রাশিয়া কি কি বিষয় উত্থাপন করিতে পারে তাহার আভাস অবশ্য কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, যদিও পশ্চিমী-শক্তিত্রয় সম্পর্কে ঠিক একথা বোধ হয় বলা চলে না। অনেকে মনে করেন, নিরস্ত্রীকরণ এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা এই দুইটি বিষয়কে জেনেভা সম্মেলনে রাশিয়া প্রধান স্থান দিবে। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ই ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের প্রশ্নের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত। খুব সম্ভব ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের প্রশ্নকে পশ্চিমীশক্তিত্রয় মুখ্য স্থান প্রদান করিবেন। কিন্তু নিরপেক্ষ জার্ম্মাণীর দাবী রাশিয়া বর্জ্জন করিবে কি? নিরপেক্ষ জার্ম্মাণীর প্রশ্ন সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিত্রয় আলোচনা করিতে রাজী হইবেন কি? অনেকে মনে করেন, জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অর্থাৎ অষ্ট্রিয়ার মত নিরপেক্ষতা রাশিয়া দাবী করিবে না। নিরস্ত্রীকরণ এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্তোষজনক চুক্তি সম্ভব হইলে অস্ত্রসজ্জিত জার্ম্মাণী হইতে বিপদের আশঙ্কা কম হইবে বলিয়া রাশিয়া মনে করিবে কি? জার্ম্মাণীর সমস্যা এখন আর শুধু বৃহৎ চতুঃশক্তির সমস্যা নয়। অস্ত্রসজ্জিত অখণ্ড জার্ম্মাণী কি করিবে তাহা বলা কঠিন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর চেন্সেলার ডাঃ এডেনুয়েরের রাশিয়ার সহিত আলোচনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কবে মস্কো যাইবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। জেনেভায় পশ্চিমী শক্তিত্রয় তাঁহার জন্য কি কি সুবিধা আদায় করিতে পারেন, তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। রাশিয়া এশিয়ার সমস্যাও আলোচনা করিতে চাহিবেন বলিয়া মনে হয়। এশিয়ার সমস্যা বলিতে ফরমোসা চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পিকিং গবর্ণমেণ্টকে স্থান দানের প্রশ্নই প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে। পশ্চিমীশক্তিত্রয় এই দুইটি সমস্যা আলোচনা করিতে রাজী হইবেন কি? তা ছাড়া রাশিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সম্পর্কেও আলোচনা করিতে চাহিবেন। এ ব্যাপারে সামরিক বাধা-নিষেধই প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিত্রয় উহা তুলিয়া লইতে রাজী হইবেন কি?

পশ্চিমী শক্তিত্রয় কি কি বিষয় আলোচনা করিতে চাহিবেন তাহা বলা কঠিন। আন্তর্জ্জাতিক মন কষাকষি দূর করিবার জন্য অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠনের উপরেই তাঁহারা হয়ত বিশেষ জোর দিবেন। বার্লিন সম্মেলনে উত্থাপিত অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে ইডেন পরিকল্পনাই হয়ত মুখ্যস্থান গ্রহণ করিবে। এই পরিকল্পনায় জার্ম্মাণী হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের কোন কথা নাই। নিরস্ত্রীকরণ ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা চুক্তির প্রশ্নে পশ্চিমী শক্তিত্রয় হয়ত পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্যা উত্থাপন করিবেন। অর্থাৎ এই দেশগুলির গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন দাবী করিবেন। কিন্তু রাশিয়া ইহাতে রাজী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের পক্ষ হইতে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের প্রশ্নও উত্থাপিত হইতে পারে। উহার পাল্টা জবাবে রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্রের প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বিস্ময়ের বিষয় না-ও হইতে পারে। বিশেষতঃ এশিয়ার ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-সকল সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেগুলির প্রশ্ন নিরস্ত্রীকরণ ও ইউরোপীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে রাশিয়া অবশ্যই উত্থাপন করিবেন। বিশ্ব শান্তির খাতিরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সকল সামরিক ঘাঁটি হইতে চলিয়া আসিবে, ইহা আশা করা অসম্ভব। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে জেনেভা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আশা করা যে খুবই কঠিন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে

হয়! কিন্তু এই সম্মেলন অন্ত কোনরূপে সার্থক হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

এক সময়ে পরমাণু অস্ত্র ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া। প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল উহারই হুমকী দেখাইতেন। পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে রাশিয়া। অতঃপর চলিতেছে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা। অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা এখন এক অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অচল অবস্থা হইতে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সম্পর্কের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবার সূচনা দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার অবসান ঘটিতে পারে এক যুদ্ধের পথে আর এক আলাপ-আলোচনার পথে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধবিরতির চুক্তি দ্বারা। একথা অনস্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মাত্র দুইটি বৃহৎ সামরিক শক্তি আছে—একটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর একটি সোভিয়েট রাশিয়া। যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটি সামরিক শক্তি যদি অপর সামরিক শক্তিকে নিরস্ত্র করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্যাপক ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভে একটি সামরিক শক্তি অপর সামরিক শক্তিকে নিরস্ত্র করিতে পারিবে, ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং ব্যাপক ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই যুদ্ধবিরতি হওয়া আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস, জেনেভা সম্মেলনের উদ্দেশ্যও তাহাই। এই পথে যে প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমী শক্তিবর্গ শক্তিশালী হইয়া রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা শক্তিশালী হইয়াই জেনেভায় যাইতেছেন। কিন্তু রাশিয়াও দুর্ব্বল হইয়া জেনেভায় যাইতেছে না। শক্তিশালী হইয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না জেনেভায় হইবে তাহার পরীক্ষা।

জেনেভা সম্মেলনের সাফল্য বলিতে যদি আমরা সমস্ত রকম সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান বুঝি, তাহা হইলে জেনেভা সম্মেলনে এই ধরণের সাফল্য অর্জ্জিত হওয়ার কোন আশা নাই। কিন্তু জেনেভা সম্মেলনের সাফল্য বলিতে উহাই একমাত্র সাফল্য বুঝায় বলিয়া আমরা মনে করি না। জেনেভা সম্মেলনে যদি নিরস্ত্রীকরণ এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনার সূত্র সম্পর্কে একটা মতৈক্য হয় এবং এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্ত এশিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গসহ বৃহৎ চতুঃশক্তির আলোচনা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহাই যে জেনেভা সম্মেলনের একটা বৃহৎ সাফল্য হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। উহার ফলে বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যে আরও আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হইবে এবং এশিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গের সহিতও তাঁহারা সমবেত হইতে পারিবেন। ইহাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের

তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং সশস্ত্র যুদ্ধের আশঙ্কাও আরও দূরে সরিয়া যাইবে। বড় বড় সমস্যার কোন সমাধান জেনেভায় হইবে না বলিয়াই মনে হয়। তবে বর্ত্তমানে এই যে অচল অবস্থা বা প্রাক্‌যুদ্ধ যুদ্ধবিরতি চলিতেছে তাহাকে যদি দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা হয়, তবে তাহা-ই হইবে জেনেভা সম্মেলনের সাফল্য। রাশিয়া সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিরা মনে করেন, উহা রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের কৌশল মাত্র। তাঁহারা এই সহাবস্থান নীতি হয়ত মানিয়া লইবেন না। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সহাবস্থান নীতিই যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহাই হইবে জেনেভা সম্মেলনের সাফল্য। পরমাণু যুদ্ধ যে সম্ভব নয়, এসম্বন্ধে বৃহৎ চতুঃশক্তিই বোধ হয় একমত। কিন্তু শান্তিও যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে এক বিকল্প থাকে যুদ্ধ এড়ানো। যুদ্ধ করাও সম্ভব নয়, মীমাংসা করাও সম্ভব নয়, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে জেনেভা সম্মেলন যদি বিপজ্জনক মনকষাকষির লাঘব করিয়া যুদ্ধ এড়াইবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে উহাই হইবে জেনেভা সম্মেলনের সাফল্য।

নেহরুজীর রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপ সফর—

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু যে-সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব তাঁহার চীন ভ্রমণ অপেক্ষা একটুকুও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁহার চীন ভ্রমণ হইতেই সহ-অবস্থানের পঞ্চনীতি প্রচারের সুরু। তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় খুব বেশী ভুল বলা হয় না। ৭ই জুন (১৯৫৫) তিনি মস্কো পৌঁছেন। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণান্তে তিনি রোম হইয়া ৮ই জুলাই (১৯৫৫) তিনি বৃটেনে পৌঁছেন। তিনি ১০ই জুলাই কায়রোর পথে ভারতাভিমুখে রওনা হন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। আমরা মোটামুটি ভাবে তাঁহার ভ্রমণের ফলাফল এখানে আলোচনা করিব।

জওহরলালজী ৭ই জুন মস্কো পৌঁছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ৮ই জুন বুলগানিন ও মলোটভের সহিত তাঁহার প্রথম দফা আলোচনা হয়। ১০ই জুন তিনি রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সমাবেশে বক্তৃতা দেন। এই দিনই ক্রেমলিন প্রাসাদে বুলগানিনের সহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহার আলোচনা হয়। অতঃপর আরম্ভ হয় তাঁহার রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন। তাঁহার ষ্ট্যালিনগ্রাড এবং বিভিন্ন সোভিয়েট রিপাবলিক পরিদর্শনের উল্লেখ করার স্থানও এখানে আমরা পাইব না। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া তিনি ২১শে জুন মস্কো প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐদিন সর্ব্বপ্রথম মস্কোতে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের সহিত তাঁহার চূড়ান্ত আলোচনা শেষ হয় ২২শে জুন এবং ভারত ও রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। পনের দিনব্যাপী রাশিয়া ভ্রমণের পর ২৩শে জুন তিনি পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসতে পৌঁছেন। জওহরলালজীর রাশিয়া ভ্রমণ এবং রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিনের সহিত যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেহরু বুলগানিন যুক্ত ঘোষণায় সহাবস্থানের পঞ্চনীতির উপর ভারত ও রাশিয়া উভয়দেশের আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পঞ্চনীতির উপর রাশিয়ার আস্থা জ্ঞাপনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্য কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, এই পঞ্চনীতির অন্যতম নীতি। কমিনফর্ম্মের বিলোপ সাধন করা হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে লণ্ডন বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের পক্ষ হইতে নেহরু-বুলগানিন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কমিনফর্ম্ম বিলোপ করা হইবে কি না, জওহরলালজীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলেন, "কমিনফর্ম্মের নেতৃবর্গ এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কি করিবেন, তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন। তবে অন্যান্য দেশে কমিনফর্ম্মের কার্য্যকলাপ যথেষ্ট সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।" সহাবস্থানের পঞ্চনীতি রাশিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় ইহা আশা করা খুবই স্বাভাবিক যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির মারফৎ অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কমিনফর্ম্ম কোন হস্তক্ষেপ করিবে না। জওহরলালজীর উল্লিখিত উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি এই কারণেই বোধ হয় কমিনফর্ম্মের বিলোপ সম্বন্ধে সোভিয়েট নেতাদের সহিত আলোচনা করেন নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের সহাবস্থানের পঞ্চনীতি গ্রহণ যে জওহরলালজীর শ্রেষ্ঠ কূটনীতি সে-কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। গত বৎসর এই রকম সময়েই ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান মন্ত্রী এক যুক্ত ঘোষণায় সর্ব্বপ্রথম শান্তির জন্য সহাবস্থানের পঞ্চনীতির অভিযান আরম্ভ করেন। ইহার পর আরও অনেক দেশ, বোধ হয় ত্রিশটির কম হইবে না, এই পঞ্চনীতিকে গ্রহণ করিয়াছে। রুশ-যুগোশ্লাভ যুক্ত ঘোষণাও এই পঞ্চনীতির ছাঁচেই ঢালা।

জওহরলালজী ২৩শে জুন (১৯৫৫) ওয়ারস'তে পৌঁছেন। তিন দিন আলোচনার পর ২৫শে জুন ভারত ও পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় সহ অবস্থানের পঞ্চনীতি স্বীকার করিয়া এক যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। পোল্যাণ্ডের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহাবস্থানের পঞ্চনীতি তাহার নিরাপত্তার পক্ষে যে একান্তই প্রয়োজন, সে-কথা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। পোল্যাণ্ডের প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যদি সহাবস্থানের পঞ্চনীতি মানিয়া না চলেন, তবে আবার তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। পোল্যাণ্ড হইতে জওহরলালজী ২৬শে জুন ভিয়েনায় (অষ্ট্রিয়া) পৌঁছেন। অষ্ট্রিয়া হইতে তিনি বেলগ্রেডে (যুগোশ্লাভিয়া) পৌঁছেন ৩০শে জুন। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ যুগোশ্লাভিয়ায় অবস্থান করিয়া বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ৬ই জুলাই (১৯৫৫) রাত্রে জওহরলালজী ও মার্শাল টিটো একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। নয়াদিল্লীতে একটি যুক্ত ঘোষণায় তাঁহারা স্বাক্ষর করিবার সাত মাসের মধ্যে ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্ত ঘোষণা। বোধ হয় আসন্ন জেনেভা সম্মেলনের কথা বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা এই দ্বিতীয় যুক্তবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। যুগোশ্লাভিয়া হইতে জওহরলালজী ৭ই জুলাই রোমে পৌঁছেন। তিনি পোপের সহিতও সাক্ষাৎ করেন এবং প্রায় ২০ মিনিট কাল তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরুজী

বলেন যে, গোয়া সমস্যাটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, এ বিষয়ে পোপ তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন।

৮ই জুলাই নেহরুজী রোম হইতে লণ্ডন যাত্রা করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেনের সহিত আলোচনায় তিনি তাঁহার রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সফর হইতে লব্ধ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। প্রকাশ, তিনি বলেন পূর্ব্বের তুলনায় বিশ্বশান্তির আশা উজ্জ্বলতর হইয়াছে। নেহরুজীর এই সফরের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বোচ্চ স্তরে বৃহৎ চতুঃশক্তির সম্মেলনের প্রস্তুতি চলিবার সময় তিনি রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি পরিদর্শন করেন। রুশ রাষ্ট্রনায়কদের সহিত আলোচনায় জেনেভা সম্মেলনে রাশিয়া কি নীতি গ্রহণ করিবে তাহার আভাস যে তিনি পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জানাইয়াছেন। জেনেভা সম্মেলনে রাশিয়ার কি নীতি হইবে সে সম্বন্ধে তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তিনি কি জানাইয়াছেন তাহা অবশ্য কিছুই প্রকাশ নাই। কিন্তু কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে লণ্ডন বিমান-ঘাঁটিতে সাংবাদিকদিগকে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জেনেভা সম্মেলনে বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান হইয়া যাইবে, ইহা তিনি আশা করেন না। তবে বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য পন্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার এই অনুমানই সত্য পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা।

ইন্দোচীনে সঙ্কট—

ভিয়েটনাম কমিশনের যে-তৃতীয় অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট গত ২৫শে জুন (১৯৫৫) প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যুদ্ধবিরতি চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিরতি-পরিদর্শক কমিশন এখনও তদন্ত করিতেছেন। জওহরলালজী এবং পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী যে যুক্তবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দোচীনের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। জেনেভা চুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার পথে যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কথা এই বিবৃতিতে তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শুধু ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়, সাধারণ ভাবে সুদূর-প্রাচ্যে এবং পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও জেনেভা চুক্তি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারত, পোল্যাণ্ড এবং কানাডা এই তিনটি রাষ্ট্র লইয়া আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিরতি-পরিদর্শক কমিশন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত বিবৃতিতে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। দক্ষিণ ভিয়েটনামের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নো দিন দিয়েম নির্ব্বাচনের বিরোধী। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ভিয়েটনামে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। উহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আলোচনা আরম্ভ করিবার যে প্রস্তাব উত্তর ভিয়েটনাম করিয়াছিল, তিনি তাহাকে মোটেই আমল দিতেছেন না। তাঁহার কথা এই যে, জেনেভা চুক্তিতে দক্ষিণ ভিয়েটনাম স্বাক্ষর করে নাই, স্বাক্ষর করিয়াছে ফ্রান্স। সুতরাং জেনেভা চুক্তি দক্ষিণ ভিয়েটনামের উপর বাধ্যকর নহে। এই মনোভাব তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। সমগ্র ভিয়েটনামে নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে শুধু দক্ষিণ ভিয়েটনামে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা তিনি করিতেছেন।

ডাঃ হো-চি-মীন এবং চৌ-এন-লাই এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা চুক্তিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহাদের এই অভিযোগ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করিয়াও এ কথা বলিতে পারা যায় যে, জেনেভা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মোটেই খুসী হয় নাই। মিঃ ডালেস 'মেসিভ রিটালিয়েশনে'র হুমকী দিয়াছিলেন, একথাও মনে না পড়িয়া পারে না। সিয়াটো চুক্তিতে দক্ষিণ ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ ভিয়েটনামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ দিয়েম মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সমর্থন এবং সাহায্য পাইতেছেন। মিঃ দিয়েম এবং কাম্বোডিয়ার রাজার সহিত মিঃ ডালেসের আলোচনার পর হইতে অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। ভিয়েটনামে সাধারণ নির্ব্বাচন হইলে কম্যুনিষ্টরাই জয়লাভ করিবে এবং সমগ্র ভিয়েটনাম কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যাইবে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের এই আশঙ্কাই নির্ব্বাচনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। তাঁহারা অবশ্যই বলিতে পারেন যে, মিঃ দিয়েমকে আমরা বুঝাইতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে তো আমরা বাধ্য করিতে পারি না। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতেই যে তিনি নির্ব্বাচনের বিরোধী হইয়াছেন, এই ধারণাও সহজে দূর হওয়া সম্ভব নয়। জেনেভায় বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলনে রাশিয়া হয়ত ইন্দোচীনের সমস্যা উত্থাপন করিবে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীন সম্পর্কে আলোচনায় রাজী হইবে বলিয়া মনে হয় না। আলোচনা হইলেও মীমাংসার কোন আশা নাই।

১৩ই জুলাই, ১৯৫৫।

—আগামী সংখ্যায় রূপালী পর্দার কাহিনী—

স্কা রা মু স্

মূল লেখক—র‍্যাফায়েল সাবাটিনী

ছোটদের আসর

শচীন্দ্র মজুমদার

কথাটা বেশ কঠিন ও নিহিতার্থে অত্যন্ত গভীর হলেও তোমাদের এখন থেকে একটু ভাসা-ভাসা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মনুষ্যত্ব সাধনার দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারত ও ইওরোপের একটি মূল বিভেদ আছে। ইওরোপের ওরা সমষ্টিকে ওপরে তুলতে চায়। আমাদের সাধনায় ব্যক্তিগত পরিণাম সাধন। সমষ্টির উন্নতির উপায়টি অন্যের আরোপ করা, অর্থাৎ তার প্রয়োগটি বাহ্যিক। সুতরাং তার ফল সামান্যই হয় এবং হয়ও না। ক্ষুধা পেলে তোমাকে নিজেই খেতে হয়, আর কেউ তোমার হয়ে খেয়ে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারে না। এ বিফলতার কারণে আধুনিক ইওরোপীয় সাধকেরাই বলছেন যে, এ পথটা ভুল। ভারতীয় সাধনবিধিতে ক্ষুধা যেমন তোমার, ক্ষুধা শান্ত করবার উপায়ও তেমনি তুমি নিজে।

এ পথে হয়তো এক হাজার বছরে এক জন মানুষের পূর্ণ ঊর্দ্ধ পরিণাম ঘটে, কিন্তু ঘটে অনিবার্য রূপে। বার বার তা ঘটেছে। জগতের যতো মহা সাধকদের তাই এশিয়াতেই উদয় হয়েছে। সাধনায় ভারতীয় ও সমগ্র এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীটা একই। যেখানে পূর্ণ ঊর্দ্ধ পরিণাম ঘটে না, সেখানেও ব্যক্তিগত সাধনায় ঊর্দ্ধ পরিণামের নিম্নতর সোপানগুলি অতিক্রম করলেও মানব সমাজ পুষ্ট ও যান্ত্রিক জীবন হতে মুক্ত হয়।

সর্বপ্রথমে আত্মসাধনার ভিত্তি রোপণ করতে হয়। বাইরের কপাট বন্ধ করে অন্তরের দুয়ারটি খুলে দিতে হয়। জেনে রাখো যে, তোমার দৈনন্দিন শক্তিটা মাপা-জোপা একটুখানি। কিন্তু প্রতিটি দিন তুমি নানা অপব্যবহার করে সেটুকু অপচয় করছো। কলের জলের নলে যদি কয়েকটা সূক্ষ্ম ছিদ্রও থাকে, তাহলে জল চুইয়ে পড়ে গিয়ে শক্তি অপহরণ করে জলধারাটাকে ক্ষীণ করে। ছিদ্র বড়ো হলে ধারাটা আর থাকে না। পূর্ণ শক্তি নিয়োগ না করলে আত্মসাধনা করা অসম্ভব। তাই তোমার জীবনধারায় অপচয়ের ছোট-বড়ো সব ছিদ্রগুলো আগে বন্ধ করতে হয়। আমাদের জ্ঞানগুরুরা পাঁচটি ছিদ্র নিরূপণ করে গেছেন: অতিভোজন, বাচালতা, বৃথা প্রয়াস, জনসঙ্গ ও আলস্য। সচেতন থাকলেই তোমার ঘুমঘোর ভেঙে যাবে, সচেতন হও। এই বিষম ছিদ্রগুলি বন্ধ করে তোমাকে তেজের পথে যাত্রা করতে হবে। তেজ তোমার সবখানি, তোমার সমগ্র জীবনকে নৈবেদ্য চায়; তোমার ছিটে-ফোঁটা চাল, কলা নারকেলনাড়ুর নৈবেদ্য সে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবে। আমাদের মেয়েরা দেবতার কাছে কোনো মানত সওয়া পাঁচ আনার বেশি পূজার প্রতিশ্রুতি দেন না। নীরব দেবতাকে হয়তো পাঁচ পয়সা থেকে সওয়া পাঁচ আনার হরির লুঠ দিলে যথেষ্ট হয়। কিন্তু তোমার অন্তরস্থিত তেজ জীবন্ত দেবতা, তার সাধনায় তোমার সবটুকুকে লুঠ দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের গান আছে, "আপনি অবশ হলে বল দিবি তুই কারে!" পরের মঙ্গল করাটা আপাতত তুমি মুলতুবি রাখো। পরের ভালো কেউ করতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, পর নিজের ভালো করার ক্ষেত্র। যখন তোমার দৃষ্টি করুণায় ও বুক ভালবাসায় পূর্ণ হবে কেবল তখনই পরের সেবা করা সত্য, মহিমময়। কিন্তু তুমি নিজে শক্তিমান ও ভালো হলে তোমার আবেষ্টনও স্বতঃই শক্তিমান ও ভালো হয়ে উঠবে। দক্ষিণেশ্বর ও শান্তিনিকেতন তো মাপা-জোপা একটুখানি স্থান, কিন্তু সেখানকার শক্তির সাধনা সারা ভারতবর্ষটাকে শক্তির ছটা দিয়ে ছেয়ে দিয়েছিলো। কতো শতাব্দীর আগের জয়দেব—কেন্দুলির ও নদীয়ার আগুন মরে গিয়ে আজও ছাই হয়ে যায়নি। যে সে আগুন তাপতে আকুল হয়, তাপতে জানে সে সেটাকে এখনো পায়। শঙ্করাচার্যের যোশী মঠ আজও বর্তমান।

ভালো হওয়া গুরুতম সাধনা; তার দায়িত্ব বিষম। ভালো হওয়া মানে হিংসা, ঘৃণা, লালসা, ক্রোধ, দ্বেষ, কাম, লোভ, পরশ্রী-কাতরতা ইত্যাদিকে আত্মতেজে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া এবং সেই শূন্য স্থানটাকে ন্যায়পরতা, দাক্ষিণ্য, সৌন্দর্য, ভালোবাসা, করুণা দিয়ে পূর্ণ করা। সত্তার উচ্চ স্তরে ক্রমাগত আরোহণ করে চরম স্তরটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ভালো হওয়া, ভালোবাসা সামান্য একটুকু জীবজীবনেও ভালোবাসা বিস্তার করে দেওয়া। আমাদের আজকের সংসারে ভালোবাসার দায়িত্বটা সব চেয়েও বড়ো, তেমনি কঠিন সে দায়িত্ব বহন করা। এ সাধনা স্বার্থচিন্তা নয়, অল্প থেকে ভূমায় গিয়ে পড়া। অল্পেই সুখের আভাস, দুঃখ ক্লেশ জরা মৃত্যু, ভূমায় পরমানন্দ। ভূমায় অমর অজেয় জীবন।

এই ভয়ঙ্কর জটিল ক্রুর সংসারে তোমার আত্মরক্ষা করবার উপায় কি? যা তোমার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে সেটা আগে পরীক্ষা করে দেখে নাও। বিনা পরীক্ষায় কোন কিছু স্বীকার করে নিও না।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করেছিলেন। যদি তুমি নিজের কোনো ভগ্নাংশের নিরিখে সে পরীক্ষা করো, যেমন তোমার পাকস্থলীর ক্ষুধা, তাহলে বিভ্রান্ত দিশাহারা হয়ে কুহকে জড়িয়ে যাবে। তোমার চারি দিকে ভগ্নাংশ চিন্তার ইন্দ্রজাল পাতা। যদি তোমার সমগ্রতা, সম্ভাব্য পরিণামের আদর্শ দিয়ে পরীক্ষা করো, তাহলে আকর্ষক বস্তু বা আইডিয়ার মূল্য নিরূপণ করতে পারবে। সত্য তোমার চোখের সামনে রূপায়িত হয়ে উঠবে। এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে মনের নয়, নিজের চেতনার শরণ নিও। এই চেতনাই তোমার মনের মানুষ, তোমার বিপদের হরি; সে তোমাকে পথ দেখাবে। ডাকতে ডাকতে এ হরি অনিবার্য ভাবে সাড়া দেয়। আর কাউকে নিজের গুরু বলে স্বীকার করো না।

আমি যা বলছি তার একটি অক্ষরও তোমরা কেউ বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করো না। আমি করিনি, আজও করি না। প্রত্যেকটি কথা তোমার আত্ম-পর্যবেক্ষণ এবং চেতনার হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে পরীক্ষা করে নিও। এ আত্মসাধনার প্রণালীতে চোখ বন্ধ করে কোন কিছু মেনে নেবার স্থান নেই।

মনে রেখো যে, ভিড়ের তুমি নও, যূথের তুমি নও, তুমি একান্ত ভাবে তোমার নিজের। ভিড় পৃথিবীর সভ্যতা গড়েনি, সংস্কৃতি গড়েনি; গড়বেও না কোন কালে। মাঝে মাঝে মানব-সমাজে মহাপুরুষের উদয় হয়, তাঁরাই ভিড়ের ওপর কালপ্রবাহের ওপর পদচিহ্ন রেখে যান। তুমি জনপ্রবাহ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নীরব হও; আত্মস্থ হও; মাথা খাড়া করে রাখো; স্বরূপ-সন্ধানী সাধক হও; প্রতিটি দিবসকে নিরলস কর্ম দিয়ে ভরাট করে তোলো। কারণ তোমাকে লড়তে হবে, ভালো বাসতে হবে, জয় করতে হবে—আত্মজয়, যা' জীবনে শ্রেষ্ঠতম কর্ম। এই ঘৃণাভরা সংসারে ভালোবাসবার গুরুতর দায়িত্বটা তোমার।

বাংলা দেশের দেহটা আজ জীর্ণ। কিন্তু বাংলার সাধক-পরম্পরা জয়দেব, চণ্ডীদাস, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ তার যে হৃৎপিণ্ডটি নির্মাণ করে গেছেন সেটি অবিকৃত অবস্থাতেই আছে, সেটা জরাগ্রস্ত জীর্ণ হওয়া অসম্ভব কথা। ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু এখানে-ওখানে একটু-আধটু আভাস দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বাঙালীর সাধনায় ব্যাঘাত ঘটেনি, সেটা লোপ পায়নি। এই বর্বরতার অভিযানের যুগেও সেটি ফল্গু-ধারার মতো অন্তঃশিলা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, না হলে আমার হৃদয়ে এসে সেটা ঘা দেয় কেন? সাধনা নিভৃত নীরব। আবার তোমাদের ভেতর থেকেই মহাসাধকের উদয় হবে। বাংলা দেশকে কালে কালে বারে বারে তার বিপুল ঋষি-ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। এ পৈত্রিক ঋণভার তোমার। এ আত্মসাধনায় নিমজ্জিত হয়ে গেলে তুমি বলতে পারবে যে, তোমার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'

কবে? বাংলার সর্বস্বের জাসপাল তোমরা, সে উত্তর তোমরা দেবে।

"আমার যদি একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ।'—তুমি আপনাকে মহান বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান হইবে।"

—বিবেকানন্দ

ভুতুড়ে সুতোর কাটিম

যাদুকর এ, সি, সরকার

ভুতুড়ে সুতোর কাটিম!—খেলাটার নামের সঙ্গে ভুতুড়ে কথাটা জুড়ে দিয়েছি বটে কিন্তু আসলে এ ভৌতিককাণ্ড বা ভুতুড়ে ব্যাপার মোটেই নয়। এ হচ্ছে একটা যাদুর খেলা। ম্যাজিক দেখানোর জন্যে পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরেছি। নানা দেশে দেখেছি নানা রকমের যাদুর খেলা—নিজেও যে কত রকমের কত খেলা দেখিয়েছি, তা আর বলে শেষ করা যাবে না। এই সুতোর কাটিমের খেলাটা দেখেছিলাম জাপানের ইয়কোহোমা সহরে এক
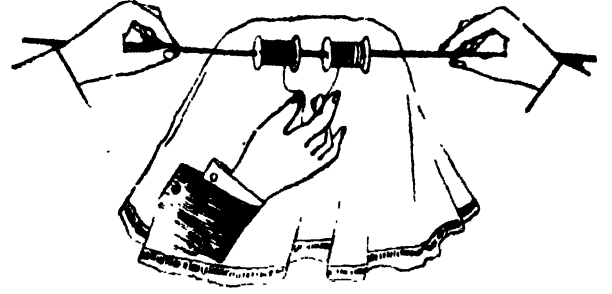
জাপানী যাদুকরের কাছে। 'অকটাগন থিয়েটারের' ডান পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তারই এক বাড়ীর দোতলায় থাকতেন তখন এই যাদুকর। নাম তার যোশিদা।

যাদুকর যোশিদা তাঁর 'তেজিনা'* বা যাদুর খেলা আরম্ভ করলেন এই 'সুতোর কাটিমের তেজী' দিয়ে। তাঁর হাতে দুটো সুতোর কাটিম। কাঠের ছোট কাটিম তাতে সুতো জড়ানো। একটাতে লাল সুতো আর অন্যটাতে কালো সুতো। এইবার যোশিদা একটা লম্বা অথচ সরু লোহার রড নিয়ে এসে কাটিম দুটোর ফুটোর ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে দুই জন দর্শককে দিয়ে দিলো রড টার দুই প্রান্ত; আর সবাইকে ভাল ভাবে দেখে রাখতে অনুরোধ করলো যে, কোন রঙের কাটিমটা কোন দিকে আছে। সবাই দেখলাম, ডান দিকে আছে কালো কাটিম আর বাঁ দিকে লাল। একটা রুমাল চেয়ে নিয়ে যোশিদা এইবার চাপা দিল কাটিম দুটোকে, আর রুমালের নীচে হাত নিয়ে কাটিম দুটোতে হাত বুলোতে বুলোতে মন্ত্র পড়তে লাগল অনুচ্চ স্বরে। অল্পক্ষণ পরে ওয়ান—টু—থ্রি বলে রুমালটা সরিয়ে নিল সে। সবাই অবাক হয়ে দেখলাম তার অদ্ভুত কীর্তি। ডান দিককার লাল কাটিম চলে গেছে বাঁ দিকে আর বাঁ দিকের কালো কাটিম চলে এসেছে ডান দিকে! এর পরে যোশিদা রড থেকে কাটিম দুটোকে খুলে এনে ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে। দর্শকেরা নানা ভাবে পরীক্ষা করেও কোন কৌশল খুঁজে পেলেন না কাটিমের মধ্যে। আর খুঁজে পাবেনই বা কেমন করে! কৌশল যা কিছু ছিল তা তো ছিল খেলার প্রথম দিকে। কি, বুঝলে না? খেলার প্রথম দিকে যদি কাটিম দুটো পরীক্ষা করা হত তবে কী দেখা যেতো জানো? দেখা যেতো যে, একটা লালসুতোর কাটিমের লাল সুতোর ওপরে কিছুটা কালো সুতো জড়িয়ে রাখা হয়েছে—যাতে সেটাকে কালো সুতোর কাটিম বলে মনে হয়। এমনি করেই কালো সুতোর ওপরে লাল সুতো জড়িয়ে করা হয়েছে লাল কাটিম। দূর থেকে দেখে এ কারসাজি বোঝা খুবই কঠিন। রুমাল চাপা দিয়ে কাটিমে হাত বুলিয়ে মন্ত্র পড়ার সময়ই কৌশলে এই দুই কাটিমের ছদ্মবেশ খুলে নিয়েছিল যোশিদা। ছদ্মবেশ খুলে যেতেই ভোল গিয়ে ছিলো পাল্টে আর দর্শকেরা অবাক হয়েছিলেন সুতোর কাটিমের স্থান পরিবর্তন দেখে। আশা করি একটু অভ্যাস করে তোমরাও দেখাতে পারবে এ খেলাটা।

---

* জাপানী ভাষায় যাদুবিদ্যাকে বলে "তেজিনা"

২

—আচ্ছা, এবার ভালো করে তাকাও, তাহলে দেখতে পাবে সুন্দর সাজানো-গোছানো বসবার ঘর একটা। যে ঘরটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি হুবহু তেমনি ঘর। আয়নার সামনে যখন আমি এ ঘরটায় চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়াই, তখন এর ভিতর এমনি একটা ঘর দেখতে পাই। ঘর গরম করবার জন্য যেখানটায় আগুন জ্বালান হয় কেবল তার পিছনটা দেখতে পাই না। আমার খুব ইচ্ছা হয় ওর পিছনটায় কি আছে তা দেখবার। শীতকালে ওদের ঘরেও আগুন জ্বলে কি না সেটা দেখতে চাই। এই ঘরে যা যা আছে আয়না-ঘরেও সব ঠিক তাই আছে, কেবল লেখাগুলো সব উল্টো। কি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? সত্যি বলছি, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। একখানা বই আয়নার সামনে তুলে ধরে দেখেছি, লেখাগুলো সব উল্টো। আচ্ছা কিটি! তোমায় যদি আয়নার ভিতরের ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়—তাহলে খুব মজা হয় না? কিন্তু আমি ভাবছি ওখানে গেলে তোমায় দুধ খেতে দেবে তো? কে জানে ওদের দুধ আমাদের মত কি না! আর একটা কথা বলি শোনো, যদি আমাদের বসবার ঘরের দরজাটা খুলে রাখা যায় তাহলে ওদের বাড়ী যাবার রাস্তাটা দেখা যায়। সে রাস্তাটা ঠিক আমাদের রাস্তার মত অবশ্য যত দূর দেখা যায়—যেখানটা দেখা যায় না সেখানটা কি রকম তা কি করে বলবো। যদি এক বার আয়নার ভিতরের ঘরটায় ঢোকা যেত, আমি নিশ্চয় জানি ওখানে অনেক মজার মজার জিনিস আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কি করে ঢোকা যাবে? আচ্ছা কিটি! ধরে নেওয়া যাক ওখানে ঢোকার রাস্তা রয়েছে, আরো ধরে নেওয়া যাক আয়নাটা নরম তুলতুলে হয়ে গেছে, অনায়াসে ওর ভিতর ঢোকা যায়—তার পর—ও মা এ কি অবাক কাণ্ড! এ তো বেশ ঢোকা যাচ্ছে! আয়না কোথায়? এ তো আবছা কুয়াসা, সমস্ত আয়নাটা গলে গেছে যেন—আর সঙ্গে সঙ্গে এলিস তার মধ্যে ঢুকে পড়লো, তার পরেই উঁচু থেকে লাফ দিয়ে নীচে ঘরের মেঝেতে পড়লো, পা ঠেকলো মাটিতে।

ইন্দিরা দেবী

এই তো সেই আয়না-ঘর, যার কথা এতক্ষণ ধরে কিটির সঙ্গে হচ্ছিল। এলিস চোখ বড় করে চারি দিকে তাকালো। দেখতে চাইলো আগুন জ্বালার জায়গা আছে কি না। হ্যাঁ আছে বৈ কি! বাঃ মজা করে অনেকক্ষণ বসা যাবে। বাড়ীতে তো আর অনেকক্ষণ বসা যায় না। আর এখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকা যাবে। আর বাড়ীর সকলে আয়নার ভিতর দিয়ে দেখবে আর হিংসে করবে, তা করুকগে, বয়ে গেল। তারা তো আর এখানে এসে চোখ রাঙাতে পারবে না।

এই বার এলিস আরো ভালো করে তাকালো। এত দিন তার ঘর থেকে যা দেখছিল এই বার যা দেখছে তার সঙ্গে মিল নেই। দেয়ালের ধারে ছবিগুলো সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আর দেয়াল-ঘড়িটার মুখ যেন একটা থরথুরে বুড়োর মত তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ঘরদোর তো গোছান নয় মোটে। দাবা খেলার ঘুঁটিগুলো ছাইগাদার পাশে ধুলো-কালি মেখে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কিন্তু তার পরে যে ঘটনা ঘটলো তাতে এলিসের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। হাতে-পায়ে ভর করে উপুড় হয়ে সে দেখতে লাগলো। দাবার ঘুঁটিগুলো সচল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব ঘুঁটিগুলো জোড়া হয়ে ঘুরছে। প্রথমে লাল টুকটুকে রাজা-রাণীকে দেখে এলিসের মুখ থেকে আপনি কথা বেরিয়ে এলো, কিন্তু ওরা যদি শুনতে পায়—তাই এলিস খুব আস্তে আস্তে বললে: ও মা রাজারাণী!

তার পর আবার একজোড়া সাদা রাজা-রাণী। আবার একটু ঘুরে আরো দু'জনকে দেখা গেল হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। এলিসের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল—যদি সে কিছু মন্তর জানতো তাহলে নিশ্চয় ও ওদের সঙ্গে ঘুরতো। কিন্তু ওর ভয় হচ্ছিল যদি তারা ওকে দেখতে পায়, তাহলে ওরা আগের মত পড়ে থাকবে। হঠাৎ একটা আওয়াজ হতেই এলিস টেবিলের দিকে তাকালো—আরে, সাদা দু'টো সৈন্য মারামারি করছে যে!

তার পর আবার না জানি কি হবে, এলিস এ কথা ভাবতে ভাবতে চললো। সেই সাদা রাণী ব্যস্ত হয়ে রাজাকে পাশ কাটিয়ে সেদিকে ছুটে গেল। রাণী এত তাড়াতাড়ি আর জোরে যাচ্ছিল যে ধাক্কা খেয়ে রাজা ছাইএর গাদায় পড়ে গেল। নাকে-মুখে একগাদা ছাই, কোথাও বাকি নেই, রাজার খুব রাগ হলো তবু সব ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

দু'টো সৈন্য মারামারি করছে, রাজা ছাইগাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আর রাণী ব্যস্ত হয়ে ছুটছে—এই রকম দৃশ্য দেখে একটু সাহায্য করবার জন্য এলিসের খুব ইচ্ছা হলো। টেবিলের উপর যেখানে মারামারি হচ্ছিল সে জায়গাটা অনেক উঁচু; সেই জন্য রাণী তার উপর কি করে উঠবে ভেবেই পাচ্ছিল না, তাই দেখে এলিসের ভারী মায়া হলো—আহা বেচারা! তাই আস্তে আস্তে তুলে রাণীকে টেবিলের উপর উঠিয়ে দিল।

তাড়াতাড়ি তুলে আনাতে হাওয়ায় রাণীর তো দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। দু'-তিন মিনিট হাঁফিয়ে নিয়ে সেই ঝগড়ুদের এক জনকে টেনে নিয়ে এলো, তার পর ভালো করে বসে রাজার দিকে তাকিয়ে বললে: যা ঝড় উঠেছে সাবধানে থেকো, কখন উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলা যায় না।

রাণীর কথা শুনে রাজা ভয়ে ভয়ে ছাইগাদার দিকে তাকালো, তার পর বললে : কোথায় ঝড় ?

রাণী তখনও জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না, তবুও কষ্ট করে বললে : ঝ—ড়, এই মাত্র আমায় উড়িয়ে নিয়ে এলো। দেখ, তুমি যখন আসবে—সাবধানে এসো, ঝড়ের মু'খে পড়ো না যেন।

রাজা ছাইগাদার পাশ থেকে টেবিলের দিকে গুটি-গুটি এগিয়ে চললো। রাজার আস্তে আস্তে যাওয়ার ধরণ দেখে এলিস ভাবলো—রাজার টেবিলের কাছে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে যাবে। তাই ওর খুব মমতা হলো আর রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে : কিছু ঘাবড়িও না, আমি এখনি তোমায় টেবিলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। ভয় পেও না কিন্তু।

কিন্তু রাজার রকম দেখে মনে হলো না যে সে কথা তার কানে গেছে অথবা তাকে দেখতে পেয়েছে।

এলিস তাকে খুব আস্তে আস্তে ধরে আলগোছে টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। রাণীকে যত তাড়াতাড়ি এনেছিল, রাজাকে তা করলো না। তার আরো ইচ্ছা হচ্ছিল রাজার গায়ের ছাইগুলো পরিষ্কার করে দিতে, কিন্তু রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে সে ইচ্ছা আর রইল না। রাজাকে যখন টেবিলের কাছে আনছিল, তখনি তার মুখ বিবর্ণ হয়ে আসছিল, আর চোখ দু'টো গোল হয়ে বড় হয়ে গিয়েছিল, মুখটা হাঁ হয়েছিল, কিন্তু ভয়ে কান্না বেরোচ্ছিল না।

এই অবস্থা দেখে প্রথমে এলিসের খুব হাসি পাচ্ছিল। রাজা তার কথা শুনতে পাবে না একথা ভুলে গিয়ে সে বললে দেখ, ও-রকম চোখ-মুখের চেহারা করো না, দেখলে আমার হাসি পায়—আবার মুখের হাঁটা অত বড় করেছ কেন ? ছাইগুলো মুখের ভিতর ঢুকবে, তা খেয়াল নেই ?

কিন্তু কথা বলে লাভ কি ? রাজার চোখ-মুখের চেহারার একটুও পরিবর্ত্তন হলো না।

যাই হোক, এলিস তাকে তো টেবিলে বসিয়ে দিতেই, রাজা মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে টেবিলে পড়ে গেল। নড়ন-চড়ন নেই দেখে এলিসের খুব ভয় হয়ে গেলো। ঘরের চারি দিকে কোথাও জল আছে কি না, এলিস তা দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথায় জল—একটা কালির বোতল রয়েছে। অগত্যা তাই মুখে ঢালবে এই ভেবে এলিস হাতে করে ফিরে এলো। ও মা! এরই মধ্যে রাজা উঠে বসে রাণীর কানে কানে কথা বলতে শুরু করেছে!

প্রথমটা বুঝতে না পারলেও ভালো করে কান খাড়া করে শুনলো—রাজা বলছে : জানো রাণী! ভয়ে আমার মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত সোজা হয়ে উঠেছিল, তখন যা ভয় পেয়েছিলাম, সে কথা জীবনে ভুলবো না।

রাণী উত্তর দিল : ভুলবে না বই কি! এখনি যদি খাতা খুলে তাতে লিখে রাখো—তাহলে হয়তো মনে থাকতে পারে।

রাণীর কথায় রাজা সায় দিল আর পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটা খাতা বার করে তাতে খস খস করে পেনসিল দিয়ে লিখতে আরম্ভ করলো।

রাজাকে লিখতে দেখে এলিসের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি এলো। পিছন থেকে গিয়ে রাজার পেনসিলের উপরটা ধরে নিজের খেয়াল মত লিখে যেতে লাগলো। রাজা ভাবলো, আরে পেনসিলের কি হলো; এমন বিগড়ে গেল কেন ? কিন্তু অনেক করেও পেনসিলকে যখন বাগ মানাতে পারলো না, তখন রাজা বিরক্ত হয়ে বললে,, এ বিচ্ছিরী পেনসিলে আমার দরকার নেই, আরো সরু পেনসিল আমার চাই। এ পেনসিলটা যা ইচ্ছে তাই লিখে যাচ্ছে, এটা কোনো কাজের নয়।

রাণী রাজার কাছ থেকে খাতাখানা চেয়ে নিয়ে দেখলো তাতে লেখা রয়েছে : "সাদা ঘোড়সওয়ার যেখানটা রয়েছে সেখান থেকে কখন পড়বে ঠিক নেই—"।

রাণী তো অবাক!

এ আবার কি ধরণের ডায়েরী লেখা ?

এলিস ততক্ষণে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসেছে। রাজার অবস্থা দেখে তখনও সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কখন আবার রাজা মুখ থুবড়ে পড়ে—এই জন্ম।

কাছেই সে কালির বোতলটা রেখে দিয়েছে, কখন হয়তো কাজে লাগবে। হঠাৎ চোখ পড়লো এলিসের টেবিলের এক ধারে—মোটা-সোটা বাঁধানো একটা খাতার উপর। যেই দেখা অমনি এলিস খাতাখানা খুলে বসলো! গোটা গোটা অক্ষরে ঝকঝকে লেখা। কিন্তু পড়া যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন এলিস পড়তে পারলো না, তখন হঠাৎ তার মনে হলো, সে তো আয়না-ঘরে বসে আছে। তাই আয়না-ঘরের লেখা আয়নার সামনে ধরলে পড়া যাবে।

সত্যই তাই। পাতাগুলো যেই আয়নার সামনে ধরা হলো তখন লেখাগুলো আর আজগুবি বলে মনে হলো না। বাড়ীতে বইতে যে রকম সে পড়ে, ঠিক সেই রকম সোজা লেখা। এলিস ভাবলো না জানি এতে কত মজার মজার লেখা আছে—তাই টেবিলের ধারে চেয়ারটা টেনে নিয়ে মাথা হেঁট করে পড়তে বসলো। কিন্তু পড়লে তো কোনও-মানে হচ্ছে না। এ যে আজে-বাজে যা তা হ-য-ব-র-ল। বার বার করে পড়েও সেই একই ব্যাপার, কোন কথারই অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক কষ্ট করে এটুকু বুঝতে পারলো যে, অদ্ভুত একটা জীবের হাতে কে যেন মারা গিয়েছিল তাই নিয়ে কবিতা। * [ক্রমশঃ।

তোমার পাশে নাও

শ্রীঅরুণা নন্দী

আকাশচারী তোমরা পাখী এবার ফিরে চাও।
নয়ন দু'টি বড্ড চতুর জানো না কি তাও ?
দুয়ার ধরে দেখছি কত তোমার অভিযান,
তোমার ডানা ঝাপটে তুমি 'খ'য়ে আগুয়ান।
আমায় বলো 'খ'য়ের দূত ওপারে কোন্ দেশ!
শিশুরা সব পড়ছে বলো, কোন সে পরিবেশ!
শাসন দিয়ে সেথায় কি গো সকাল সন্ধ্যেবেলা
শিশুর মন ভাঙছে বুড়ো মারছে ছুঁড়ে ঢেলা।
হাঁপিয়ে গেছি পারি না আর আমায় নিয়ে যাও
নীল আকাশে, এবার পাখী তোমার পাশে নাও।

---

* Lewis Carroll-র এক লেখা Through the Looking glass and what Alice found there বইয়ের অনুবাদ।

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

ক্রিকেটের দুই শক্তিশালী দল অষ্ট্রেলিয়া আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। অষ্ট্রেলিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে এসে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচে তিনটিতে জয়লাভ করেছে এবং অপর তিনটি খেলায় অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ১ম টেষ্ট ম্যাচ—জামাইকার অন্তর্গত কিংষ্টন মাঠে প্রথম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দল ৯ উইকেটে জয়লাভ করেছে। ৬ দিনের টেষ্ট মাত্র সাড়ে চার দিনে শেষ হয়েছে। ২৬০ রাণে পিছিয়ে থেকে দৃঢ়তার সংগে খেলতে লাগলো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের নবাগত তরুণ খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট ম্যাচ খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে কৃতিত্বপূর্ণ ১০৪ রাণ করলো। সর্ব্বশুদ্ধ ২য় ইনিংসে ২৭৫ রাণ করে মাত্র ১৫ রাণে এগিয়ে রইলো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইঃ ২০ রাণ করে ৯ উইকেটে জয়লাভ করলো। অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস—৫১৫ (৯ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস ২৫৯; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস—২৭৫ অষ্ট্রেলিয়া ১ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড ২০। ২য় টেষ্ট ম্যাচ—ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে ছ'দিনব্যাপী দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের খেলা আরম্ভ হোল। প্রথম খেলায় পরাজিত হয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের সজাগ দৃষ্টি দিয়ে খেলতে হ'চ্ছিল। লিণ্ডওয়ালের মারাত্মক বোলিং-এ ৬টি উইকেট পড়লো ২য় ইনিংসে। কিন্তু অসীম দৃঢ়তায় উইকস এবং ওয়ালকট যথাক্রমে ১৩৯ ও ১২৬ রাণ করতে সক্ষম হোল। প্রথম ইনিংস শেষ হোল ৩৮২ রাণে।

৩য় টেষ্ট ম্যাচ—জর্জ টাউনে আরম্ভ হোল তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ। নির্দ্ধারিত সময় ৬ দিন। তার দু'দিন পূর্ব্বেই খেলা শেষ হোল। অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করলো ৮ উইকেটে। এ জয়লাভের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার মিলার ও বিনাউডকে প্রশংসা করতে হয়। বিনাউডের ১৫ রাণে ৪টি উইকেট লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে কোন পক্ষের কোন খেলোয়াড়ই শতাধিক রাণ সংগ্রহ করতে পারেননি। তাছাড়া এ খেলার মত পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের খেলায় এত কম রাণ সংগ্রহ হয়নি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস ১৮২। অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস—২৫৭; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস—২০৭; অষ্ট্রেলিয়া ১৩৩ (২ উইঃ)

৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ—তিনটি খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া দল দুটিতে জয়লাভ করেছে, আর এ খেলায় কোন ক্রমে ড্র করতে পারলেই 'রাবার' লাভ তাদেরই হবে। আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করলে পরবর্তী খেলার উপর সমস্ত নির্ভর করবে। তাই এ খেলার গুরুত্ব অনেক বেশী। দুই দলের খেলোয়াড়দের অসীম মনোবল। এ খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ষ্টলমেয়ার অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না। অধিনায়কের গুরু দায়িত্বের ভার পড়লো কুশলী খেলোয়াড় এ্যাটকিনসনের উপর।

৫ম টেষ্ট ম্যাচ—আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া দল "রাবার" লাভ করেছে। খেলায় মাঝে আর তেমন কোন আকর্ষণ নেই। তবুও ক্রিকেট-ক্রীড়ামোদীদের আশা যদি শেষ পর্য্যন্ত এ টেষ্ট ম্যাচটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জেতে। কিংস টাউন মাঠ। যেখানে প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সেইখানেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট ম্যাচে এক ইনিংস ৮২ রাণে পরাজিত হোল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এ্যাসেট হচ্ছে "ত্রি ডব্লিউ" (ওয়েল, উইকস ও ওয়ালকট) এঁদের মত প্রতিভাবান ব্যাটস্‌ম্যান থাকা সত্বেও বেশী রাণ তুলতে সক্ষম হন নি। যে ব্যাটিং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ম্যাক জেতায় একমাত্র ভরসা সে ব্যাটিংএর সমস্ত চাতুরী নষ্ট করে দিয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার কুশলী বোলাররা। ওয়ালকট, উইকস্‌, এটকিনসন্‌ নিজ দলকে যতদূর সাধ্য সাহায্য করছেন কিন্তু পরাজয় রোধ করতে পারেন নি। তাছাড়া ওয়েলের ব্যাটিং-এ ব্যর্থতা ও বোলারদের ব্যর্থতার জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

ইংলণ্ড বনাম সাউথ-আফ্রিকা

১ম টেষ্ট—ট্রেণ্ট ব্রিজে ইংলণ্ড ও সাউথ আফ্রিকায় ১ম টেষ্টে ইংলণ্ড দল টসে জয়লাভ করে ব্যাট করতে যায়। প্রথম দিকে রাণ-সংখ্যা সাউথ-আফ্রিকা দলের নিপুণ ফিল্ডিং-এর জন্য অত্যন্ত মন্থর গতিতে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত ৩৩৪ রাণে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংস সমাপ্ত হয়।

(ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—৩০৪; সাউথ আফ্রিকা ১ম ইনিংস ১৮১; দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৮) ১ ইনিংস ৫ রাণে পরাজিত।

দ্বিতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংসে জয়লাভের পর লর্ডস মাঠে টসে জয়লাভ করে অধিনায়ক পিটার মে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। তিন ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়রা মাত্র ১৩৩ রাণে প্রথম ইনিংস সমাপ্ত করতে বাধ্য হন এডকক ও গর্ডাড-এর, মারাত্মক বোলিং-এ।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—১৩৩; সাউথ-আফ্রিকা ১ম ইনিংস—৩০৪; ইংলণ্ড ২য় ইনিংস—৩৫৩; সাউথ-আফ্রিকা ২য় ইনিংস—১১১। (৭১ রাণে সাউথ আফ্রিকা পরাজিত)।

টমাস কাপ

১৯৪৮ সাল। স্যার জর্জ টমাস আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনের সভাপতি ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের হাতে একটি উপহার দিলেন। স্যার টমাসের নাম অনুসারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হোল টমাস কাপ। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলার বিজয়ী ছোট্ট দেশ মালয়। পর পর তিন বারই টমাস কাপ বিজয়ী হোল মালয়। এবারে আন্ত-রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার বিজয়ী ডেনমার্ককে মালয় এবার শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে। ৭ হাজার দর্শক চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলাটি উপভোগ করেছে। টমাস কাপে এবারে ভারতীয় দল আন্তঃ-আঞ্চলিক সেমিফাইনাল খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফাইনাল খেলায় ডেনমার্কের কাছে ৩—৬ খেলায় হার স্বীকার করেছে। ভারত ও ডেনমার্কের সিঙ্গলস্‌ খেলায় এন, নাটেকার ১৫—৮ ও ১৫—৩ পয়েণ্টে ডেনমার্কের স্কারুপকে পরাজিত করে। পবেরো (ডেনমার্ক) ১৮—১৪ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে টি এন শেঠকে পরাজিত করেন।

ভারতের চ্যাম্পিয়ান কৃষ্ণণ ও ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড় বেকারের মধ্যে প্রথম সেটটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হয়েছিল।

ফুটবল

কলকাতা মাঠের ফুটবল তার বিরাট উন্মাদনা নিয়ে দর্শকের প্রাণে জাগিয়েছে সাড়া। ফিরতি ম্যাচের খেলা শেষ হতে প্রায় এক মাস মত সময় লাগবে। আগষ্টে শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে। কলকাতা মাঠের ফুটবল নিয়ে প্রতি বছরই কিছু না কিছু গোলমাল হয়েছে। রেফারী নিগ্রহ, খেলোয়াড়দের লাঞ্ছনা, ক্লাব-তাঁবুতে উপদ্রব, মাঠের উপর ঢিল, জুতো ছোড়ার নিদর্শন প্রচুর আছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মোহনবাগান ও রাজস্থানের খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল হওয়ায় অধিনায়ক মান্না অফ্ সাইড সম্পর্কে আপত্তি জানালে মোহনবাগান-পাগল দর্শকগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। আর এ বিক্ষোভ চরম রূপ ধারণ করে শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি স্থগিত হয়। আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ খেলাটি পুনর্ব্বার হবে বলে জানিয়েছেন। মহমেডান ক্লাব শেষ পর্য্যন্ত তাদের অপরাজিত আখ্যা ধরে রাখতে পারে নি। এরিয়ান্সের কাছে তাদের প্রথম পরাজয়। তবে মহমেডান দল ইষ্টবেঙ্গল ও রাজস্থান দলকে হারিয়ে তাদের আসন লীগকোঠার শীর্ষের দিকে তুলেছিল। প্রথম ডিভিসন লীগের খেলায় পর পর পাঁচটি দল মাত্র সামান্য ব্যবধানে রয়েছেন। কার ভাগ্যে লীগের সম্মান লাভ হয় তা এখন পূর্ব্ব থেকে বলা অসম্ভব। তবে বর্ষা যদি বেশী করে হয় তাহলে রাজস্থান দলের অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়ে পড়বে। কারণ, রাজস্থান দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বহিরাগত। শুকনো মাঠে তাদের খেলার যতখানি নৈপুণ্য দেখা যায় ভিজে মাঠে ঠিক তত সুবিধা করতে পারেন না রাজস্থানের খেলোয়াড়রা। মোহনবাগান, মহমেডান, এরিয়ান্স, ইষ্টবেঙ্গল ও রাজস্থান দল লীগপাল্লায় সমান তালে চলতে চেষ্টা করছেন। তরুণ খেলোয়াড় পুষ্ট লীগের অন্যান দলগুলি বড় বড় দলের কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিচ্ছে। কলকাতার ফুটবল মান এবারে অন্য যে কোন বারের তুলনায় অনেক নীচে নেমে গেল।

এ মাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল মোহনবাগান ও মহামেডান দলের। নিতান্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত অবস্থায় মোহনবাগানকে পরাজিত হতে হয়েছে ২-১ গোলে। মোহনবাগানের দু'টি গোলের জন্য দায়ী করা যায় যথাক্রমে গোলকীপার ও ব্যাক্ মান্নাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোহনবাগান দলের ১০ জন খেলোয়াড় প্রাণপণ করিয়া খেলায় খেলাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কিন্তু খেলা শেষ হবার ১ মিনিট পূর্ব্বে নিতান্ত ভাগ্য বিপর্য্যয়ের দরুণ মোহনবাগানকে পরাজিত হতে হয়েছে। তবে এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান দল শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

টেনিস

বিশ্বের প্রাচীন উইম্বলডনের ৬১তম খেলা শেষ হ'ল। সাফল্যের মুকুট পরলেন আমেরিকা। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই তাদের সফলতাই প্রমাণ করে দিয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

এবারের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় ৩৫টি দেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ২৫০ জন খেলোয়াড়।

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফ্যাইনালে আমেরিকার টনি ট্রাবার্ট ৬-৩, ৭-৫ ও ৬-১ গেমে কাট নেলসন (ডেনমার্ক)কে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফ্যাইনালে বিজয়ীর মুকুট পরেছেন আমেরিকার লুইস ব্রাউ। স্বদেশের কনিষ্ঠ খেলোয়াড় বেভারলি বেকার ফ্লিটজকে ৭-৫ ও ৮-৬ পয়েন্টে পরাজিত করে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে মিস ব্রাউ পর পর তিন বার চ্যাম্পিয়ন হলেন।

পুরুষদের ডাবলস্ ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার রেক্স হার্ডউইগ ও লুইস হোড ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে স্বদেশের নীল ফ্রেজার ও কেন রোজওয়ালকে পরাজিত করে।

মহিলাদের ডাবলস ফ্যাইনালে বৃটেনের সাফল্য। মিস মর্টিমার ও শীলকক ৭-৫ ও ৬-১ গেমে নিজ দেশের মিস ব্লুমার ও ওয়ার্ডকে পরাজিত করেন। মিস মর্টিমার এ বছরই ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান সিপ লাভ করেছেন। মিক্সড ডাবলস ফ্যাইনালে আমেরিকার ভি সেক্সাস ও মিস ডোরিস হার্ট আর্জ্জেণ্টিনার ইন মোরিয়া ও আমেরিকার লুই ব্রাউকে পরাজিত করেন ৮-৬, ২-৬ ও ৬-৩ পয়েণ্টে।

এবারের উইম্বলডন টনি ট্রাবার্টের কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক। কোন সেট না হারিয়ে ট্রাবার্টের এ কৃতিত্ব উইম্বলডন খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

ভারতের তিন জন খেলোয়াড় এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সর্ব্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন অধিনায়ক নরেশকুমার বিশ্বের ১৬ জন কৃতী খেলোয়াড়দের মাঝে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। চতুর্থ রাউণ্ডে ট্রাবার্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। আর ভারতের অপর তরুণ খেলোয়াড় কৃষ্ণণ চিলির খেলোয়াড় লুইস আয়লার কাছে তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হন। ভারতের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি রিতা দেভার দ্বিতীয় রাউণ্ডে দক্ষিণ-আফ্রিকার হেজেল রেডিক স্মিথের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

বর্শা ছোঁড়া (জেভলিন থ্রো)

বর্শা ছোঁড়া ইতিহাস অতি প্রাচীন। গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসে বর্শা নিক্ষেপ অর্থাৎ 'জেভলিন থ্রো' (Javeline Throw) একটি প্রধানতম অঙ্গ ছিল।

গ্রীস সিটি ষ্টেটসে বিভক্ত ছিল। দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে রাজকীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যে এই বর্শা ছোড়া অলিম্পিক গেমসে স্থান পেয়েছিলো।

বর্তমান কালে বর্শা নিক্ষেপ স্পোর্টসের একটি বিশিষ্ট অংগ। বর্শা নিক্ষেপে খেলোয়াড়ের বর্শা নিক্ষেপের উপর সাফল্য লাভ নির্ভর করে, এর জন্যে হাতের জোর প্রয়োজন কিন্তু হাতের অধিক জোর দিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করলে বেশী দূর অগ্রসর হয় না। যে হাত দিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করবে তার গলনার উপর সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে। এমন ভাবে হাতটি ছুঁড়তে হবে যাতে অযথা শক্তির অপব্যয় হয় না।

বর্শা ছুড়তে গেলে সমস্ত দেহের ভারকেন্দ্রের উপর নির্ভর করে। বর্শা নিক্ষেপের একটি সীমানা দেওয়া থাকে। কিছু দূর থেকে ছুটে এসে বর্শা নিক্ষেপ করলে অধিক দূর যায়। বর্শা নিক্ষেপের সময় খেলোয়াড়দের স্মরণ রাখতে হবে, যেন মাথার সোজাসুজি নিক্ষেপ না করেন। খেলোয়াড় যেন সর্ব সময়ে মনে রাখেন, তাকে দূর পাল্লা অতিক্রম করতে হবে। বর্শা নিক্ষেপের পর যে স্থানে পড়বে সেইটেই দূরত্ব বলে ধরা হবে। বর্শা হাতে ধরা আর হাতে নিয়ে দৌড়ানর উপর খেলোয়াড়দের প্রচুর সাফল্য নির্ভর করছে।

মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহের শোচনীয় অপচয়

কীর্তির অপচয় বোধ হয় বাংলার বিধিলিপি! খণ্ডাবার যেন সাধ্য নেই কারও। পুরুষানুক্রমে তো দূরের কথা, এদেশে এক-পুরুষেই সব কীর্তির অবসান হয়ে যায়। যে দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ নির্বিবাদে নিলামে ওঠে, ঐতিহাসিক দেবালয়ের ইটের পাঁজর ভেঙ্গে পাকা রাস্তা তৈরী হয়, সে-দেশের ভাগ্যের লিখন "জাতীয় অপমৃত্যু" ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কলকাতা শহরের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটে ও ফুটপাথে যাঁরা চোখ মেলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁরাই জানেন, বাংলা দেশের কীর্তিমানদের কীর্তিচিহ্ন কত নিবিষ্ট অলিগলির ভিতর দিয়ে, কত প্রকাণ্ড নিলাম-ঘরের দরজা পার হয়ে, শেষ পর্যন্ত বৈঠকখানায়, জানবাজারে ও পটলডাঙার রেলিঙে এসে উপস্থিত হয়। হঠাৎ দেখবেন, কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ অজস্র কাগজের আবর্জনার মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সেই গ্রন্থখানির কোন বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁর এক বিখ্যাত বন্ধুকে উপহার দিয়েছিলেন। বুঝতে দেরী হয় না, কারও ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ থেকে বইখানি কোন রকমে তানা মেলে ফুটপাথে এসেছে। এই ভাবে বাংলা দেশের কত মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহের যে অপচয় হয়েছে তার হিসেব নেই। সারা-জীবন ধ'রে বহু অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করে যাঁরা এই ধরণের মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন, তাঁরা যদি ঘুণাক্ষরেও কোন দিন তাঁদের সংগ্রহের এই শোচনীয় পরিণতির কথা জানতে পারতেন, তাহলে সেই অর্থ দি'য়ে নিশ্চয় বই না কিনে, বাইনাচে ও বারোয়ারী পূজায় খরচ করে যেতেন। জানি না, আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট, এই ধরণের মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহের অপচয়কে জাতীয় অপচয় মনে মনে করেন কি না, এবং সেগুলি রক্ষা করা জাতীয় কর্তব্য ব'লে বিবেচনা করেন কি না?

কয়েকটি গ্রন্থসংগ্রহের কথা

ভারত গবর্ণমেণ্টের জাতীয় গ্রন্থাগারে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে, এই রকম ব্যক্তিগত মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ কয়েকটি রক্ষিত আছে। কিন্তু আমরা জানি, যা রক্ষিত হয়নি, তার সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। অনেক মূল্যবান সংগ্রহ এখনও রক্ষা করা যায়, কিন্তু সে দিকে কারও দৃষ্টি আছে ব'লে মনে হয় না। এর জন্ত দেশের যে কি মারাত্মক ক্ষতি হ'চ্ছে, তা আজও সরকার ও দেশবাসী সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারছেন না। যখন তা পারবেন, তখন ক্ষতিপূরণ করার কোন উপায়ই থাকবে না। বাংলা দেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের যে-সব গ্রন্থ-সংগ্রহ ছিল, তার অধিকাংশই আজ নেই, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবু এখনও "রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরী" বা "বর্ধমানের মহারাজাদের রাজ-লাইব্রেরী" ইত্যাদির মতন যে সব গ্রন্থ-সংগ্রহ রয়েছে, গবর্ণমেণ্টের উচিত সেগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা এবং রক্ষা করা। বিগত দুই শত বছরের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান এই সব গ্রন্থাগারের প্রাচীন পত্র-পত্রিকা ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদির মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। আজ হয়ত মালিকদের অনেকের পক্ষে এই সব গ্রন্থ-সংগ্রহ বিনামূল্যে দান ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য দিয়ে সরকারের উচিত এই সব পারিবারিক গ্রন্থাগার অবিলম্বে কিনে নেওয়া। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের জন্ত অনেক অর্থ অনেক কাজে জাতীয় সরকার ব্যয় করছেন। তার সামান্ত অংশ যদি তাঁরা দেশের বিদ্যোৎসাহীদের উপকারের জন্ত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্জীবনের জন্ত ব্যয় করেন, তাহ'লে বোধ হয় খুব অন্যায় করা হয় না। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাংলা সাহিত্যের "ডাক্তার"

আমাদের দেশে আজও ডাক্তারের যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু সে হ'ল চিকিৎসক ডাক্তার, ইংরেজীতে যাঁদের ফিজিসিয়ান বলা হয়। আমরা যে ডাক্তারের কথা বলছি, তাঁরা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডি, ফিল্" ডাক্তার। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনস্থ করেছেন, (পি, এইচ, ডি তুলে দিয়ে) যে "ডি, ফিল" ডাক্তারের সংখ্যা দ্রুত-হারে বর্ধিত করবেন। তাই কয়েক বছরের মধ্যে, প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যে, গবেষকের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। যাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই দেখা যায়, গবেষণা করছেন। কি নিয়ে গবেষণা করছেন, জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে, কেউ বলেন ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম নিয়ে, কেউ শরৎচন্দ্র নিয়ে, কেউ বা আধুনিক কবিদের নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। বিশ্ববিদ্যালয় কাউকে বঙ্কিমচন্দ্রের ডাক্তার, কাউকে ভারতচন্দ্রের ডাক্তার, কাউকে মুকুন্দরামের ডাক্তার বানিয়ে দিচ্ছেন। কোন রকমে গলদ্ঘর্ম হয়ে, 'ইহাও হয়, উহাও হয়' গোছের একটি জবরজং প্রবন্ধ লিখে দিলেই ডি, ফিল বা "ডক্টর" হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ডক্টরের সংখ্যা যদি এই হারে বাড়তে থাকে, তাহ'লে রুগীর চেয়ে, অর্থাৎ সাহিত্যিকের চেয়ে সাহিত্যের ডক্টরের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাহলে পরবর্তী গবেষকদের গবেষণার জন্ত আর কিছু বাকি থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীকুমার সুকুমার বাবুরা বাংলা সাহিত্যের এই ডক্টরদের সম্বন্ধে একটু "ধীরে" নীতি অবলম্বন করবেন কি?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বই

অনেকেই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বই প্রকাশ করেন, কিন্তু কি বই প্রকাশ করেন, তা বিশ্বের কেউ জানেন না। তাই নাকি নিয়ম। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বই এমন ভাবে প্রকাশিত হবে যা বিশ্বের কেউ জানবে না। স্বয়ং প্রিন্টারও জানেন না, কি বই ছাপা হয় না হয়, বা আগে হয়েছে! বিজ্ঞাপন দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বইয়ের ইজ্জত নষ্ট হয়। এরকম ধারণা আরও অনেক বিদ্বৎসভার আছে, যেমন এসিয়াটিক সোসাইটির। বই ছেপে আলমারীতে ও শেল্‌ফে রাখা হয় এবং দু'চার-জন এজেন্টের কাছে খুশী হ'লে পাঠানো হয়। তারপর যথারীতি বই পোকায় খায়। খাবারই কথা। খাবার জিনিস পেলে কে না খায়? অতঃপর আলমারী থেকে বাইরের ডাষ্টবিনে জীর্ণ বইগুলি আবর্জনার মতন ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যে বৃহত্তর বিশ্ব আছে, তার বাসিন্দারা কোন দিন জানতেও পারেন না, কি জ্ঞানগর্ভ বই তাঁরা প্রকাশ করছেন না করছেন। বাজেটে লাভ-ক্ষতির সময় ক্ষতির অঙ্ক বড় হয়ে যথানিয়মে বসে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজ পর্যন্ত যত বই ছাপা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির শতকরা ৫০ কপি ক'রে নষ্ট হয়েছে (যে ভাবেই হোক)। একথা সেদিন একজন ওয়াকেফ্‌হাল ব্যক্তি বেশ জোর দিয়েই বললেন। আমরা ঠিক অতটা ওয়াকেফ্‌হাল নই। সেই জন্য আমরা বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগের কার্যকলাপ তদন্তের জন্য 'কমিশন' নিয়োগ করা হোক। কমিশনের প্রধান তদন্তের বিষয় হবে—কি কি বই, কোন্ কোন্ সময়, ছাপা হয়েছে? কত সংখ্যা ছাপা হয়েছে? তার মধ্যে কত যথামূল্যে বিক্রী হয়েছে এবং বাকি বই কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থও আমরা জনসাধারণের অর্থ ব'লে মনে করি এবং সে-অর্থের অপব্যয় হোক, নিশ্চয় কেউ তা চান না। আরও একটি কথা আমরা জানতে চাই। বহু মূল্যবান বই যা এখন ছাপা নেই (out of print), তা নতুন ক'রে পুনর্মুদ্রিত করা হ'চ্ছে না কেন, এবং চোরাবাজারে তা দশগুণ মূল্যে বিক্রী করার সুযোগ দেওয়া হ'চ্ছে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কি বই ছাপা নেই এবং তার মধ্যে কোন্‌গুলি রিপ্রিন্ট করা উচিত, সে-সম্বন্ধেও অবিলম্বে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা গ্রন্থের বিদেশী ভাষায় অনুবাদ

কিছু কাল আগে বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ও সমালোচক ষ্টীফেন স্পেনডার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধনা-সভায় ভারতীয় গ্রন্থাদির য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অনুবাদের ভাষা যদি আধুনিক না হয় তাহ'লে সে অনুবাদের কোনও মূল্য থাকবে না। যেমন এলিজাবেথীয় বা ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজী ভাষায় যদি কোনো গ্রন্থ রচিত হয় তাহলে একালের পাঠকের পক্ষে তা রুচিকর হবে না, সুতরাং এদিনের পাঠকের জন্য চাই এদিনের ভাষা। ভারতের অন্য প্রদেশের কথা জানি না, হাতের কাছে বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ। বাঙালী সাহিত্যিকগণ রচিত কিছু গ্রন্থ যে ইংরাজী বা অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় নি তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমন কি তারাশঙ্কর, মানিক বা কল্লোলযুগীয় সাহিত্যিকগণের কয়েকটি ছোট গল্পের অনুবাদও হয়েছে, কিন্তু সেগুলি যথোচিত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কাদায় কাঁলো সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সভায় দুঃখ করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকেও পশ্চিম তেমন জানে না আজ উৎকৃষ্ট অনুবাদের অভাবে। অথচ কলিকাতার ফুটপাথেও ম্যাকমিলন কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস ও নাটক বিক্রী হয়ে থাকে। আধুনিক সাহিত্যকারদের গ্রন্থাবলীর অনুবাদের ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী হওয়ায় তা বিদেশী পাঠকের চোখে পড়েনি। মনোজ বসু রাশিয়া থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, রাশিয়ায় ভারতীয় লেখকের গ্রন্থাবলীর কিছু অনুবাদ আছে কিন্তু বাঙালীর কিছু নেই। পৃথিবীর সাহিত্য মানচিত্রে কি বাংলার স্থান থাকবে না? অথচ কূপ-অধিবাসী দাম্ভিক ভেকরাজের মত আমরা মূল্যবান সাহিত্য-সম্পদের অধিকারী বলে সভা-সমিতিতে অনেক গর্ব প্রকাশ করি। আজ বাংলা দেশে উপযুক্ত সাহিত্য-সংস্থা বা লিটারারি একাডেমি নেই। সাহিত্যিকগণ আত্মকেন্দ্রিক অহমিকায় আত্মসমাহিত, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া তাঁদের পক্ষে বোধ করি অসম্ভব। সরকারী আকাদেমীর উন্নাসিকতায় অনেক সাহিত্যিককে হরিজন জ্ঞান করা হয়। আকাদেমীর পবিত্র মন্দিরের শুচিতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে সাহিত্য-পাণ্ডারা সন্ত্রস্ত। এই অবস্থায় বিদেশে বাংলা সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করা কি একান্ত অসম্ভব? ভারতীয় সাহিত্যের শীলমোহর গায়ে এঁটে অপর প্রদেশের অক্ষম রচনা জয়মাল্য অর্জন করছে, এদিকে বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকবৃন্দ পিঠক বণ্টনের ভার কার হাতে দেওয়া যায় সেই চিন্তায় আকুল। আত্ম-কলহের আত্মঘাতী পথ পরিহার করে বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের এই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানাই।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ইতিপূর্বে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দুই খণ্ড বঙ্গানুবাদ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি উক্ত গ্রন্থের সংক্ষেপিত সহজবোধ্য সংস্করণ। মূল গ্রন্থের অংশ এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হয়নি। অতি সহজে কৌটিল্যের রাজনীতি এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত এই গ্রন্থের চতুর্দশটি পরিচ্ছেদ এই সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করায় আমরা আনন্দিত। এই গ্রন্থের প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিসার্স লিঃ, মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় অপূর্ব নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দান করেছেন, তাই তাঁর 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' বা 'বাংলার লোক-সাহিত্য' আজ বাংলা-সাহিত্যে ছুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে দীর্ঘ দিন গবেষণা করে তিনি তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস" রচনা করেছেন। সমগ্র নাট্য-সাহিত্যকে আদিযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করে এই তিন যুগের বিপুল নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্যশালার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং বিভিন্ন নাট্যকারের রচনাশৈলী, রীতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি মনোরম ভাষায় আলোচনা করেছেন। বাংলা-সাহিত্যের বিশিষ্ট নাট্যকারদের সম্পর্কে এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিচ্ছদও এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাত্রা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে প্রাচীন যাত্রা এবং নবীন যাত্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনাটিও উল্লেখযোগ্য, প্রকাশক—এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। দাম পনের টাকা মাত্র।

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা বিভাগে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটির ভেতর সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের নিবেদন, বলাকার জন্ম-কথা, বলাকার ছন্দ, গ্রন্থ ভূমিকা, কবিতা ব্যাখ্যা এই পাঁচটি আলোচনা স্থান লাভ করেছে। বইটির কথা অনেকেই জানেন এবং সম্প্রতি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে! 'বলাকা' কাব্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকা ও ছাত্রছাত্রী মহলে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থের প্রকাশক, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলকাতা-১২। দাম: চার টাকা।

শরৎচন্দ্র

সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবে ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম সর্বজন-পরিচিত। আলোচ্য 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটিতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত সাহিত্যের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি নতুন নয়। প্রায় দশ বছর আগে এর প্রথম সংস্করণ বের হয় এবং যে গ্রন্থটি হাতে নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি সেটি এর সপ্তম সংস্করণ। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন: পূর্ব প্রবন্ধগুলি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়াছি ও এই সংস্করণে 'চন্দ্রনাথ' ও 'নববিধান' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইল। এই বহুপঠিত সুখ্যাত গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। শরৎ-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা ও ছাত্র-ছাত্রী মহলে বইখানি আগের মতই সমাদর লাভ করুক, এই আশাই করি। প্রকাশক: এ মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২।

প্রিয়া ও পৃথিবী

অচিন্ত্যকুমারের কবি প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় তাঁর 'অমাবস্যা'। পরে তাঁর 'প্রিয়া ও পৃথিবী' এবং পুস্তিকাকারে 'আমরা' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বছর কবি পক্ষে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং 'প্রিয়া ও পৃথিবীর' নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এই কাব্যগ্রন্থে 'প্রিয়া ও পৃথিবী' এবং 'আমরা'র কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতাগুলি ছাড়াও কয়েকটি নূতন কবিতা সংযোজিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য কীর্তির বিচারে 'প্রিয়া ও পৃথিবী'র এক মূল্যবান অংশ আছে। কল্লোল যুগীয় সাহিত্য নায়কের কবিমানস 'প্রিয়া ও পৃথিবী'তে সমুজ্জ্বল। এই সুমুদ্রিত কবিতা বইটির দাম দু' টাকা।

মুক্তাভস্ম

গঙ্গার তীর পর্যন্ত চন্দনধামের সীমানা। ওদিকে রেল লাইন, এই লাইন গেছে কলকাতায়। চন্দনধামের সদর মহলে ডায়নামোর আলোয় বিদ্যুৎ জ্বলে, শহরের পথে ধুলো উড়িয়ে ল্যাণ্ডো চলে—একশো বিঘে জমির ওপর চন্দনধাম। বাংলার সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যতম, মাননীয় অনঙ্গমোহন মুখার্জি এই চন্দনধামের জমিদার কর্তা। ক্ষয়িষ্ণু পরিবার, গন্ড-গৌরব, আছে শুধু জৌলুষ। বিরাট পরিবার, যৌথ পরিবারের সব কিছু শিথিল হয়ে পড়েছে, কর্তা আছেন নামে। বধূদের অলঙ্কার বেচে বার বাড়িতে নাচের মাইফেল চলে। কলকাতা থেকে বাইজী আসে। জমিদারী হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই শেষ বারের মত বাবুরা নাচগানের মাইফেল বসিয়েছেন। ১৩৬২ সালের পয়লা বৈশাখ আসন্ন, সেদিন হবে জমিদারীর উচ্ছেদ। নাচঘরে বসে মাঝে মাঝে সেই কথা স্মরণ করে শিউরে ওঠেন অনঙ্গমোহন। তারপর একদিন শোনো চন্দনধামের আকাশে কামান গর্জন, ডিনামাইট ফাটছে, কাপড়ের কল বসবে। কোন এক ঘরে লুকিয়ে ছিলেন অনঙ্গমোহন, মায়া কাটাতে পারেন নি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কুলীরা আবিষ্কার করলো তাঁর মৃতকল্প দেহ। বৃহৎ উপন্যাস মুক্তভস্মের লেখক প্রাণতোষ ঘটক "আকাশ-পাতালে"র খ্যাতিতেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদালাভ করেছেন। আঙ্গিক, কাহিনীতে ও চরিত্র চিত্রণের কুশলী লেখক অনন্যসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক "আকাশ-পাতালে" যে নূতন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন আজ তা সার্থক ও সফল হয়েছে। অনেক অনুগামী তাঁর প্রদর্শিত পথে আজ বিচরণ করছেন, "মুক্তাভস্মে'র কাহিনী আর পটভূমি তাঁদের আর একটি পথ খুলে দিল। খুঁটি-নাটি তথ্যের এমন যথাযথ পরিবেশন সচরাচর চোখে পড়ে। জাপানী ঘাসের সরু কাঠির মাদুরে মণ্ডিত মলাট। প্রকাশক, ক্যালকাটা বুক ক্লাব—দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা 'নাভানা'র শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালায় চতুর্থ গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে কবি শ্রীবিষ্ণু দের তাঁরই উর্বশী ও

অর্পিত ও নাম রেখেছি কোমল গান্ধার কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে নিজের ভালো লাগা কয়েকটি কবিতা বেছে দিয়েছেন, এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি অনুবাদও এই শ্রেষ্ঠ কবিতায় স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোর রচনাকাল মোটামুটি ১৯২৬ থেকে ১৯৫৫। শ্রীযুত দে যে একজন সুখ্যাত ও সুপরিচিত কবি তা বলাই বাহুল্য। তাঁর এই শ্রেষ্ঠ কবিতা-গ্রন্থটি কাব্যরসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকারা সানন্দে গ্রহণ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু হোল শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের প্রচ্ছদ। দাম: চার টাকা।

কাজী নজরুল

কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (হুগলী) দীর্ঘ কুড়ি বছর কবির স্নেহসান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কোন আলোচনাই এখনো বিশেষ ভাবে হয়নি। 'কাজী নজরুল' গ্রন্থটির ভেতর বাল্যকথা, পল্টনে ও পরে কলকাতায়, বিচারালয়ে কাজী নজরুল, কারাজীবন, বাঁকুড়া ও হুগলীতে কাজী নজরুল, কৃষ্ণনগরের জীবন, নজরুলের চোখে ভারতীয় মুসলমান, ব্যক্তিজীবনে নজরুল, দরদী নজরুল, কাজী নজরুলের ধর্মপ্রবণতা বিষয়ে রচনাগুলো স্থান পেয়েছে। গ্রন্থ পাঠের শেষে নজরুল সম্পর্কে বহু কথাই জানা যায়। প্রকাশক: দেবদত্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা-৩২। দাম: তিন টাকা।

বাংলা ভাষার ভূমিকা

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক এই গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক শুভময় বসু বিশেষ যত্ন সহকারে এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সুনীতিকুমার বা আচার্য বিজয়চন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ দুটি আজ দুষ্প্রাপ্য। তাই শব্দতত্ত্ব, ধ্বনি প্রসঙ্গ, ব্যাকরণ বিধি প্রভৃতি বিষয়ক সহজ-পাঠ্য আলোচনা এবং 'সাধারণ কল্প' ও রূপতত্ত্ব' পরিচ্ছেদ দুটি বিশেষ মূল্যবান হয়েছে। একক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থটির দাম আড়াই টাকা মাত্র।

অনুষ্টুপ ছন্দ

সরোজকুমার রায়চৌধুরী স্বকীয় প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস "অনুষ্টুপ ছন্দে"র পটভূমি বিগতকালের বাংলা, কালাপানি পার হওয়া তখন নিষিদ্ধ। প্রাচীন রক্ষণশীলেরা, আর নবীন মতবাদের সংঘাত সমুজ্জ্বল প্রেমের কাহিনী "অনুষ্টুপ ছন্দ"। ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র বিশ্লেষণ ও মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিপুণ সাহিত্যকারের রচনা গুণে অনবদ্য হয়েছে। প্রকাশক—মেসার্স ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং। দাম চার টাকা মাত্র।

বনহরিণী

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের নবতম গল্পগ্রন্থ 'বনহরিণী' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ইতিপূর্বে তাঁর আরো তিন-খানি গল্পগ্রন্থ বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হয়েছে। আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে 'বনহরিণী'র সুনির্বাচিত গল্পগুলি অন্তরকে স্পর্শ করে। কুশলী লেখকের রচনায় সাম্প্রতিক মনোধর্ম বা মানস প্রবণতার সকল লক্ষণই বর্তমান। লেখক বৈচিত্র্যের সাধক, তাই তাঁর গল্পে মানব-জীবনের ক্লেশদগ্ধ চিত্র এমন সার্থকতা লাভ করেছে। 'বিরহ-মিলন কথা' গল্পটিতে প্রেমের প্রকাশ এবং বৈচিত্র্য অতীন্দ্রিয়তা এবং চিরন্তনত্ব বিচিত্র বর্ণসম্পাতে সমুজ্জ্বল। অন্নদা মুন্সী কৃত বহুবর্ণের প্রচ্ছদমণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রকাশক নবভারতী, দাম আড়াই টাকা।

ছায়ামারীচ

লেখকের ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি উপন্যাস পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। 'ছায়ামারীচ' উপন্যাসে সুধীরঞ্জনের কাহিনীর পটভূমি সাগরপার নয়, এই কলকাতা শহরের সিনেমা জগৎ আর একটি নৈশ ক্লাব। সোনার হরিণ সিনেমার মোহে অনেক আধুনিকা মোহগ্রস্ত হচ্ছেন, ফল ভালো হয় কি না জানা নেই, এই উপন্যাসের নায়িকা হৈমন্তীর জীবনে সোনার হরিণ কি নিদারুণ পরিহাস করেছে লেখকের সুনিপুণ চরিত্র চিত্রণে তা সার্থকতা লাভ করেছে। প্রকাশক বেঙ্গল পাব্লিসার্স, দাম তিন টাকা মাত্র।

বন্ধু-পত্নী

রূঢ় বাস্তবের নিরাভরণ ছবি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনায় অপরূপ ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়। তাঁর সাম্প্রতিক গল্প-গ্রন্থ 'বন্ধু-পত্নী'তে 'বন্ধুপত্নী', 'মঙ্গলগ্রহ', দৃষ্টি, তারিণীর বাড়িবদল, মেয়ে শাসন ও দুপুরে গল্প প্রভৃতি ছটি গল্প সংকলিত হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যথা ও বেদনার জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটির প্রকাশক নাভানা লিমিটেড, দাম আড়াই টাকা মাত্র।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প

বহু গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে নতুন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। 'শ্রেষ্ঠ', 'সরস', 'স্বনির্বাচিত' —এই ধরণের সিরিজে সাধারণত লেখক-লেখিকার পুরনো বই থেকেই বাছাই গল্প থাকে দেখা গেছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্পের প্রায় আধাআধিই নতুন। গ্রন্থটিতে মোট উনিশটি গল্প আছে। কাগজ, ছাপা, প্রচ্ছদের দিক থেকে গ্রন্থের দাম চার টাকা কমই বলবো। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা—৭।

মাধবীর জন্য

প্রতিভা বসুর মাধবীর জন্য গ্রন্থটি একটি গল্প-সংকলন। বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি গল্প বইয়ের আকারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রায় বারো বছর আগে লেখিকার 'মাধবীর জন্য' নামে একটি গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছিল। এই মাধবীর জন্য বইটির সঙ্গে তার একমাত্র নামের মিল ও সেই নামের গল্পটি ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নেই। কেন না, এই বইয়ের আর বাকী ছটি গল্পই নতুন। প্রকাশক: নাভানা, কলকাতা ১৩। দাম: আড়াই টাকা।

[অনিবার্য্য কারণ বশতঃ 'তুয়া-তুহয়া' উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।—লেখক]

উদয়ভানু

বহুমূল্য রত্নহার হাতে-হাতে লাভ! প্রহরী চরিতার্থ হয়ে হাসিমুখে ফিরে গেছে আপন কাজে। ফটকের ধারে গিয়ে বসেছে এক প্রস্তরখণ্ডে, কোন্ এক পশুমূর্ত্তির ভগ্নাংশে। জমিদার কৃষ্ণরামের বহু সখের দুই মৌনরক্ষী ছিল ফটকের দু'পাশে। বারেন্দ্র-ভাস্করের নিখুঁত শিল্পসৃষ্টি, প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেছিলেন কৃষ্ণরাম। সযত্নে রেখেছিলেন প্রধান তোরণদ্বারে। পশুরাজ সিংহের প্রস্তরমূর্ত্তি। একটি কে বা কারা অপহরণ করেছে। অন্যটি ভগ্নপ্রায়। নখদন্তের চিহ্ন নেই, কেশর বিলুপ্ত। অবহেলায় অনাদরে হতশ্রী এখন। পাঠান প্রহরী বড়ই খুশী। পাহারা আর পায়চারীর বাঁধাধরা কাজে ইতি দিয়ে আনন্দাতিশয্যে ব'সে পড়েছে পাথরের ঢিপিতে। রেশমী রুমালে জড়ানো রত্নহার নাড়াচাড়া করছে, দেখছে বার বার চোখের কাছে তুলে। হাতে যেন এক রাজ্য পেয়েছে, দেখতে দেখতে হাসছে লোভাতুর হাসি। শিরস্ত্রাণ আর গাদা-বন্দুকটা পায়ের কাছে প'ড়ে আছে। আকাশে বিজলী ঝলকায়, বজ্রপাত হয় আমোদরের তীরে, শোঁ-শোঁ বাতাস চলছে তীরের বেগে—পাঠানের খেয়াল হয় না। মন আর মেজাজ তার নেই আর আগের মত। চোখে নেই সেই কুটিল কটাক্ষ। মুখের হিংস্র রেখা ক'টা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে?

একসঙ্গে অনেক মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট গুঞ্জন আসে। মেঘ ডাকার ঘন ঘন শব্দে প্রহরীর কানে যায় না কিছু। ক্রমে শব্দ নিকট থেকে নিকটতর হয়। অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসে ঐ ঐকতান। রত্নহার দেখতে দেখতে যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে। আদেখলার ঘটি হয়েছে আর কি!

একখানি সুসজ্জিত পাল্কী, ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় বনপথ ধরে চলেছে ভীষণ গতিতে। বৃক্ষতল ছাড়া এমন কোন আশ্রয় নেই কাছাকাছি, যেখানে বৃষ্টির ধারা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পাল্কীখানি সুসজ্জিত। নীল রেশমের আস্তরণে ঢাকা, জরির ঝালর ঝুলছে চতুর্দ্দিকে। পাল্কীর সম্মুখে ও পিছনে বাহক প্রায় বিশ জন। পাল্কী-বেয়ারার দল ছড়া কাটছে গম্ভীর সুরে। যেন যুদ্ধে যাওয়ার রণসঙ্গীত। কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকলো আবার! বিদ্যুতের হলুদ-আঁচল দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল কালো মেঘের আড়ালে।

বন্দুক-হাতে উঠে দাঁড়ালো প্রহরী। রত্নহার লুকিয়ে ফেলেছে বুকে, লৌহবর্ম্মের অন্দরে। সজাগ দৃষ্টি হেনে দেখছে ইদিক-সিদিক। শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে নিয়েছে মাথায়। হাওয়া চলেছে ঝড়ের বেগে। বহুদূরে কোথায় বর্ষণ শুরু হয়েছে, বাতাস তাই জল-শীতল। গাছের শিখর মাটি স্পর্শ করে হাওয়ার দৌরাত্ম্যে। শুষ্কশাখা ভেঙ্গে পড়ে মড়মড়িয়ে। মাটির বুক থেকে ধূলির সর্পিল রেখা চক্রাকারে পাক খেতে খেতে আকাশপথে ছোটে। মেঘের গর্জ্জন আর বাতাসের দাপাদাপিতে বিধাতার প্রকৃতি যেন কত কত যুগ বাদে আজ আবার অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পাখীর পালখ উড়ছে বাতাসের মুখে। ঝরাপাতা উড়ছে চৈত্রদিনের। মূলচ্যুত বৃক্ষ যদি পড়ে! শিকড়-ছেঁড়া গাছ আঁকড়ে-ধরা মাটির অক্টোপাশ থেকে যদি মুক্তি পায় প্রচণ্ড বাতাসে!

পাল্কী-বেয়ারাদের দেহ রক্তাক্ত। বনপথ ধ'রে চলতে হয় ঊর্দ্ধশ্বাসে, বন্যগাছের কাঁটায় দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। লতাগুল্মের কণ্টক পায়ে বিঁধেছে। দিনের আলো, দস্যু-ডাকাতের ভয় তত নয়, ভয় বন্য পশুর। ঝড়ের আভাস পেয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে। শূয়োর, নেকড়ে আর বনবিড়াল ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে অন্ধকার বন-জঙ্গলে।

হাওয়ার দাপটে যেন সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না পাঠান, পদস্খলন হয়। পাল্কীখানি বনের পথ ত্যাগ করে মেঠো পথ ধ'রেছে। শিরস্ত্রাণের আড়ালে প্রহরীর চক্ষু পলকহীন হয়। পাল্কী যে এদিকেই আসে। তোরণ-ফটক লক্ষ্য রেখে উজানের তরীর মত দ্রুত এগোয়।

হাতের গাদা-বন্দুক সাবধানে ধরে প্রহরী, ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে যাতে ঘোড়া দাগা যায়! নয়তো বন্দুক ধরাধরি করতে করতেই আরেক পক্ষের গুলীতে হয়তো উড়ে যাবে শিরস্ত্রাণ। বাতাসের নিদারুণ বেগে নিজেকে যেন সামলাতে পারে না প্রহরী। ক্ষণেক আরও দেখে প্রহরী যেন চিনতে পারে, এ কাদের পাল্কী। বন্দুক সংযত করতে হয় তৎক্ষণাৎ।

পাইক-পেয়াদা ছিল পাল্কীর সহযাত্রী। ধূলিঝটিকায় বনের পথ হারিয়ে পিছিয়েছিল। পতাকাবাহী এক পাইক তোরণ-ফটকের কাছে পৌঁছে প্রহরীকে সেলাম দেয়। বাহকেরা ঘাসের প'রে নামিয়ে রাখে পাল্কীখানি। ঝড়ের বেগে ঝালর ঝুলানো রেশমী আচ্ছাদনের আঁচল উড়তে থাকে। দেখা যায়, পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ। পাল্কীর গায়ে আলিম্পন। পদ্ম, স্বস্তিকা, আর চক্র আঁকা। পাল্কীর হাতলে রূপার পাত জড়ান।

সেলাম ফিরিয়ে দেয় প্রহরী। পাইক-পেয়াদা সাহস ভরে আরও খানিক এগোয়। বলে,—সেখজী, এ পাল্কী গোপীমোহন চৌধুরীর। এই ঝড়টুকু না সামলালে আর তো আগানো যায় না। পাল্কীতে চৌধুরীর বেটি আছে। সেখজী, তুমি যদি এখন মাথা বাঁচিয়ে রক্ষে কর।

ওপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো প্রহরী। মান্দারণে গোপীমোহন চৌধুরীর নামের বড় কদর। চৌধুরী এ তল্লাটের সকলের চেয়ে বড় বেণে। ছত্রিক, দেশ, সজ্য আর রাউত এই চার আশ্রমের বেণেরাই গোপীমোহনকে প্রধান মানে। মান্দারণের বেণে ও ব্যবসাদারেরা চৌধুরীকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে।

প্রহরীর সম্মতি পেয়েছে, পাইক-পেয়াদা আহ্লাদে আটখানা হয়ে পাল্কীর বেয়ারাদের বলে,—ভাই সব, সেপাই মুখে পরোয়ানা দিয়ে দিয়েছে। পাল্কী বাঁচাও এখন।

একটা অস্পষ্ট কলরোল, চলন্ত গুঞ্জন। কৃষ্ণরামের ভাঙা দেউলের দুয়োরে এসে থেমে যায়। গলদ্‌ঘর্ম্ম বেয়ারার দল হাঁক ছেড়ে বাঁচে। বন্য লতাগুল্মের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত দেহে জ্বালা ধরেছে। তাজা রক্তের সঙ্গে মিশেছে ঘর্ম্মধারা। তাই জ্বলছে।

রুদ্ধদ্বার পাল্কী। ভিতরে গালিচা বিছানো। হাতের কাছে ময়ূরপঙ্খের হাতপাখা, তবুও যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসে। পাল্কীর এক পাল্লা ধীরে ধীরে সরিয়ে দেখলো চৌধুরীর মেয়ে। সম্মুখে এক মুক্ত দ্বার দেখে পাল্কী ত্যাগ ক'রে নামলো আর চকিতের মধ্যে মিলিয়ে গেল ভাঙা দেউলের মধ্যে।

গোপীমোহনের মেয়ের নাম আনন্দকুমারী। শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী। জ্যোৎস্নাময়ী নদীর মত আনন্দকুমারীও সুসজ্জিতা। এক লহমায় দেখা গেল, আনন্দময়ীর পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির তারা-ফুল। হীরা-মুক্তা খচিত কাঁচলী, ঢাকাই শাড়ীর আড়াল থেকে ঝকমক করলো। জ্যোৎস্না-রাতের নদীতে যেমন চাকচিক্য, আনন্দকুমারীর শরীরেও তাই। জল-রঙ ঢাকাই শাড়ীর মাঝে মাঝে মতির চিকিমিকি, এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে তার চালচিত্তির খোঁপায় জড়িয়ে আছে।

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরলো। টুপ-টাপ শব্দে। অদূরে বর্ষণ শুরু হয়েছে কোথায়, থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে। ধূলায় ধূসর আস্তরণে দিগন্ত যেন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমোদরের অপর তীরে বেগুনী-কালো রেখা। মেঘ নেমেছে।

জমিদার কৃষ্ণরামের ভাঙা-দেউলে না আছে দেউটি, না আছে দেবতা। জীর্ণ এক প্রস্তরবেদী ছাড়া অন্য কিছুই নেই। দেউলের সংলগ্ন দেউড়ি, অন্দরের প্রবেশ-দ্বার। দেউলে কত কাল মানুষের পদার্পণ নেই, আনন্দকুমারীর অবস্থা হয় যেন ন যযৌ, ন তস্থৌ। ঝড়ের হাওয়ায় আঁচল উড়ে যায়।

এই দেউলে কৃষ্ণরাম রাম-খোদার আরাধনা করতেন। কৃষ্ণরাম নিজে হিন্দু, কিন্তু আসমানী ছিল মুসলমানী। রূপসী আসমানের মন রাখতে যুগপৎ রাম এবং খোদাকে ভজনা করতেন কৃষ্ণরাম। দেউলের গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণ, ইদের চাঁদ আর পদ্ম, পাশাপাশি। ত্রিশূল আর তরোয়াল।

শুধু ঝড় নয়। প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমেছে। পিপাসার্ত্ত পৃথিবী ধারাস্নানে সিক্ত হয়। দিনান্তেই ঘোরতর অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে যেন দিগ্‌বিদিক্‌।

ভাঙা-দেউলের ভেতরে নিশ্ছিদ্র তমসা। অশ্বত্থের চারা শিকড় ছড়িয়েছে। দুর্য্যোগে আশ্রয় যদি বা মিললো, আনন্দকুমারী কি এক ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকেন এই ঘন আঁধারে।

—কে ভাই তুমি?

মিহি-মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনেও প্রথমে চমকে ওঠে আনন্দকুমারী। বিশ্বাস হয় না যেন নিজের কানকে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে যত দূর দৃষ্টি যায় দেখে।

—এসো, কোন ভয় নাই।

আনন্দকুমারী শব্দ অনুসরণ করে। সভয় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। কয়েক পা যেতে না যেতে কার কোমল করপল্লবের শীতল স্পর্শ লাগে আনন্দকুমারীর নিটোল বাহুতে। সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে যেন।

—কে?

আনন্দকুমারী ভীতিকাতর কণ্ঠে শুধোলেন। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। বাষ্পরুদ্ধ স্বর।

মৃদু মৃদু হাসির তরঙ্গ ছড়ালো ঘন আঁধারে। হাসি চাপলো কোন্ ছায়াময়ী! বললো,—তুমি কে, তাই বল?

হাতের পরশে আনন্দকুমারী বোঝে এ-ও এক পুরনারী। স্বস্তির শ্বাস ফেলে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে। আনন্দকুমারী বললে,—আমি? আমি বাদলা-দিনের অতিথি। আমার নাম আনন্দকুমারী। আর তুমি?

ঝড় উঠতে, বৃষ্টি ঝরতে বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর কক্ষের বাতায়নে মুখ রেখে উদাসী চোখে চেয়ে ছিলেন। আকাশের ডাকাডাকি আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস চলতে রাজকুমারী কেমন যেন উন্মনা হয়ে থাকেন। ফেলে-আসা-দিনের সঙ্গে ছেড়ে-আসা আপন জনদের মুখও যেন ভেসে উঠেছিল! মনের চোখে। বিন্ধ্যবাসিনীর সহসা চোখে পড়েছিল তোরণ-ফটক পেরিয়ে আসছে একখানি সুসজ্জিত পাল্কী। কার পাল্কী কে জানে, দেখে না কত খুশী হন রাজকন্যা। ভাবেন, আসছে হয়তো কোন' কাছের মানুষ। আসছে হয়তো খোঁজ-খবর করতে।

—আমি?

আত্ম-পরিচয় দিতে যেন সঙ্কোচ হয় বিন্ধ্যবাসিনীর।

কি যেন বলতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ব্যক্ত করতে পারেন না। স্ত্রীলোকের পরিচয় স্বামী। সমাজ প্রতিবন্ধক, পতির নাম মুখে আনা না কি অশাস্ত্রীয়। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—বাহিরে দারুণ বর্ষা, এ দেউলে অধিকক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়। আমার অনুগামী হও, অন্দরে চল। তার পর যা হয় একটা পরিচয় দেওয়া যাবে।

কথার শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। রাজকুমারী অন্দর অভিমুখে চললেন। ছায়ার মত অনুসরণ করে আনন্দকুমারী। ভয়ে ভয়ে চলে।

কড়কড়িয়ে গর্জ্জে উঠছে জলভরা মেঘ। যত না বর্ষায়, তত না গর্জ্জায়। তাড়িতালোকের হলুদ-আঁচল ক্ষণপ্রকাশ, তবুও চোখে যেন ধাঁধা লাগে। চোখ ঝলসে যায়। নিদাঘ ঝটিকার মহারবে সারা মান্দারণ গ্রাম যেন মুখর হয়ে ওঠে। প্রবল বৃষ্টিধারার শব্দে যেন প্রলয়-ছন্দ।

আনন্দকুমারী দেখলেন, এই বিশাল গৃহ কালগ্রাসে বিধ্বস্ত। মানুষের বাসের অযোগ্য। জীর্ণ দেওয়াল-প্রাচীর। ভগ্ন সোপানাবলী। দালানে-উঠানে আগাছা জন্মেছে। শুধু কোথা থেকে ভেসে আসছে কে জানে, ধূপ-ধূনার পবিত্র সুগন্ধ!

অন্দরের এক দালানে এসে একে অন্যকে দেখলেন। পরস্পরের চোখে নেমেছে বিস্ময়ের ঘোর।

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—এই আমার বাসস্থান। সাতগাঁয়ের জমিদার, কুলীনকুলতিলক আমার স্বামী।

আর কোন কথা মুখে আসে না। রাজকুমারীর রাত-জাগা চোখের চাউনি আনত হয়। মুখ যেন হয় লজ্জা-লাল।

গোপীমোহনের কন্যা আনন্দকুমারীও সুন্দরী। শান্ত, গভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী। কিন্তু কষ্টক্লিষ্টা বিন্ধ্যবাসিনীর মুখখানি যেন আরও বেশী ঢলো-ঢলো। তাঁর চক্ষু দু'টি কেমন যেন আবেগময়। কাজলের চিহ্ন নেই, তবুও যেন কাজল-কালো। আকাশের কালো মেঘের মত রুক্ষ কেশরাশি কোমর ছাপিয়ে নেমেছে।

—স্বামী মৃত না জীবিত? আনন্দকুমারী প্রশ্ন করলে ব্যগ্র কৌতূহলে।

ঈষৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন বিন্ধ্যবাসিনী। বলেন,—জীবিত। তিনি সাতগাঁয়েই থাকেন।

আনন্দকুমারী বলে,—তবে সীঁথিতে সিঁদুর নাই কেন? গায়ে একখানা গয়নাও তো দেখি না!

কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকছে। গুমরে গুমরে উঠছে আকাশ। কত দূরের বিদ্যুতের আলো, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

একটা জোরালো বজ্রপাতের শব্দে কানে হাত তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। শব্দের আধিক্যে চম্‌কে চম্‌কে উঠলেন। প্রবল বৃষ্টিধারা, মুঠো-মুঠো বৃষ্টি রেণু ছড়ালো রাজকুমারীর চোখে-মুখে। ধূপ-ধুনার সুগন্ধ ভাসছে ভিজে বাতাসে।

কপালের 'পরে নেমে-আসা রুক্ষ চুলের স্তবক। বড় বেশী কোঁকড়ানো, কুন্তলগুলি গোলাকার। এক গুচ্ছ চুল সরিয়ে দিয়ে রাজকুমারী নকল হেসে বলেন,—তুমি এই দুর্য্যোগে কোথায় চললে? অভিসারে?

ঢাকাই শাড়ীর আঁচল চেপে আনন্দকুমারী মুখের হাসি গোপন করলে। বললে,—তোমাদের মান্দারণে একটা মানুষের মত মানুষ আছে নাকি যে, অভিসারে বেরিয়ে কুল নষ্ট করি! কথার শেষে ক্ষণেক থেমে আবার বলে,—শৈলেশ্বরের মন্দিরে গেছিলাম। ফিরতে ফিরতে ভীষণ ঝড় উঠলো। এই নাও শৈলেশ্বরের পূজার বিল্বপাতা। কপালে ঠেকাও, অদৃষ্ট ফিরে যাবে।

কথা বলতে বলতে বস্ত্রাঞ্চল খুলতে থাকে আনন্দকুমারী। সচন্দন বিল্বপত্র আছে আঁচলে বাঁধা।

বিন্ধ্যবাসিনী হাসলেন দুঃখের ক্ষীণ হাসি। অদৃষ্ট ফিরে যাওয়ার কথা শুনে হয়তো হাসলেন। বললেন,—শৈলেশ্বরের নাম আমি জানি, কখনও দেখি নাই। আমাকে একদিন দেখাও তো পূজা দিয়ে আসি। বৃষ্টির রেণু উড়ে আসে রাশি রাশি। বাতাসে এখনও ঝড়ের বেগ। শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া চলেছে।

—একা যাওয়া-আসা কর, ভয় হয় না? বিন্ধ্যবাসিনী সহাস্যে বললেন। আনন্দকুমারীর বক্ষবাস সরিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন হীরামুক্তা খচিত কাঁচলীর রত্নশোভা। নবপরিচিতার একখানি

আনন্দকুমারী বলে,—ভয়? হাঁ, তা ভয় হয় বৈ কি! আমাকে তুমি নিরস্ত্র মনে ক'র? এই দেখো!

কথার শেষে আনন্দকুমারী কাঁচুলীর মধ্য থেকে বের করলে মণিময় কোষপূর্ণ একটি ছুরিকা। আবার যথাস্থানে রাখলো সন্তর্পণে।

প্রলয় ছন্দে বৃষ্টিপাত চলেছে। দূরের বনভূমি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। নিদাঘ-তপ্ত মাটির তৃষা যেন মিটে না। মুষলধারার শব্দে কান পাতা দায়!

—শৈলেশ্বর কি জাগ্রত? রাজকুমারীর কণ্ঠে যেন অদম্য কৌতূহল। বললেন,—শৈলেশ্বরকে দেখার ইচ্ছা খুব, কে-ই বা দেখায়? হাঁ ভাই, সে মন্দির কত দূরে?

এক ঝলক শীতল-সিক্ত বাতাস উড়ে আসে। আনন্দকুমারীর পরিচ্ছন্ন মিহি ঢাকাই শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে দেয়। মুখে-চোখে জলরেণুর স্পর্শ লাগে। চৌধুরীর কন্যার উদ্ধত ভাবভঙ্গী এত বর্ষণেও কেন কে জানে শান্ত হয় না।

আনন্দকুমারী বলে,—শৈলেশ্বর জাগ্রত, তবে হয়তো ধুতুরার গুণে সদাই আচ্ছন্ন থাকেন। শিবঠাকুরের আর এক নাম আশুতোষ, তাই অল্প আরাধনাতেই শৈলেশ্বর মুখ তুলে চান। কৃপা করেন।

কপালে যুক্ত দুই কর ঠেকালেন বিন্ধ্যবাসিনী। অদেখা দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। বললেন,—আমার তো শিবদর্শনে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ফটকে পাঠান প্রহরী, সে-ই বাধা দেবে।

—তুমি আমার সহযাত্রী হও। গোপীমোহন চৌধুরীর মেয়েকে বাধা দেয় এমন পাঠান এখনও মাতৃগর্ভে। আমি ফের আগামী কাল প্রাতে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাবো, তোমাকেও সঙ্গে নেবো। আপত্তি যদি না কর'—

স্মিতহাসি ফোটে রাজকুমারীর রক্তিম অধরে। খুশীর অস্ফুট হাসি। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—চল ঘরে যাই। এখানে বড় বেশী বর্ষার দাপাদাপি। তোমার এমন সাজসজ্জা, বৃষ্টিজলে বুঝি বা নষ্ট হয়! প্রহরী যদি বাধা না দেয়, আমার যেতে আপত্তি কি?

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেন রাজকন্যা। আনন্দকুমারীও সঙ্গে চলে। ঝড়ের বেগ চলার গতি রোধ করতে চায়।

আনন্দকুমারী বলে,—শৈলেশ্বর আছেন, গোপেশ্বরও আছেন। যদি যাও তো দুই শিবেরই দর্শন পাবে। গোপেশ্বরও কম জাগ্রত নন।

গোঘাট থেকে কামারপুকুরের পথের বাম দিকে কাঁটালি গ্রাম। কাঁটালিতে শৈলেশ্বরের মন্দির। গড় মান্দারণের কয়েক পোয়া উত্তরে কামারপুকুর। কাঁটালিতে যেমন শৈলেশ্বর আছেন কামারপুকুরে তেমন কর্ম্মকারদের পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে গোপেশ্বর শিব সংস্থাপিত। এই পুণ্যক্ষেত্রে অসংখ্য অরণ্যাবৃত মৃৎস্তূপ ও বহু বিলুপ্তপ্রায় দুর্গপ্রাকার সুদূর অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করে।

—বৌ!

কে ডাকলো পিছন থেকে? পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শুনে বিন্ধ্যবাসিনী দৃষ্টি ফিরালেন।

যশোদা বললে,—বৌ, ইনি কে গা? কোথা থেকে এলেন এ ঘনঘটা বর্ষায়?

বিন্ধ্যবাসিনী সহাস্যে বললেন,—বাদলা-দিনের অতিথি। আমার সই। ভাখ যশো, দেখে দেখে চোখের জ্বালা জুড়িয়ে নে। কত রূপ দেখেছিস্!

—তোমার নাম কি মা? বিমুগ্ধ সুরে বললে পরিচারিকা। সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বললে।

—আমার নাম আনন্দকুমারী।

আনমনে কথা বলে চৌধুরীর মেয়ে। কথায় তার মন নেই। ভগ্নগৃহের ইদিক-সিদিক দেখছে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। চোখে উদ্ধত দৃষ্টি। স্ফীত বক্ষ। সগর্ব্ব প্রতিটি পদক্ষেপ।

—নামটি যেমন রূপও কি তেমনি! দেখলে সত্যিই চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

যশোদার কথা কারও কানে পৌঁছয় না। রাজকুমারী গৃহের দ্বিতলে ওঠার অন্ধকার সোপানে উঠেছেন। আনন্দকুমারীও তাঁর পশ্চাতে। পরিচারিকার দৃষ্টিপথ থেকে দু'জনেই অদৃশ্য। যশোদা ভাবে, এই ঘনঘটার দিনে আকাশ থেকে নেমে এলো কি মেঘকন্যা? এমন উলুর বনে মুক্তা ছড়ালো কে? পুজারী ব্রাহ্মণ আসতে মনে মনে একটুও খুশী হয়নি যশোদা, এই নবাগতাকে দেখে পরম আহ্লাদ হয় তার। অব্যক্ত ক্রোধের ছায়া মুখ থেকে যেন মুছে যায়।

কোথায় বজ্রপাত হয়। মেঘের গম্ভীর নিনাদে চমকে চমকে ওঠে যশোদা। উঠানে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দালানে। বিদ্যুৎ ঝলসানোর ভয়ে দেওয়ালের আড়ালে থাকে।

ঝম-ঝম বর্ষার নৃত্য চলেছে উঠানে। মুষলধারা নামছে আকাশ থেকে। মাটির সংঘর্ষণে ছড়িয়ে ছিটকে পড়ছে বৃষ্টির জল; রাশি রাশি হীরার কুচি যেন, উঠানের চত্বরে ছড়িয়ে পড়ছে। উঠানের ধারে ধূলিম্লান আগাছার বন হত হারিয়েছিল। জলের ধারায় লুকানো-সবুজ আবার দেখা দিয়েছে। ধারাবর্ষণ দেখতে দেখতে যশোদা কেমন যেন অন্যমনা হয়ে আছে। কি ভাবছে কে জানে, উঠানে চোখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ছে না চোখের।

—তালপাতার ছাতা আছে দাসী?

কথা শুনে মুখে আবার বিরক্তির রেখা ফুটলো যশোদার কপালে। ফিরেও দেখলো না। বললে,—ছাতা নাই, উঠানে তালপাতা জড় করা আছে।

—ত্রিসন্ধ্যার পুজা শেষ হয়েছে?

পুজারী চন্দ্রকান্ত, কথা বললেন মেঘের মত গম্ভীর কণ্ঠে। আবার বললেন,—আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'ল, এখনই আমাকে যাত্রা করতে হয়। বাহিরে অতিবর্ষণ, তা হোক।

প্রথমে অবাক মানে যশোদা। বৃষ্টির গতি দেখে ব্রাহ্মণের কথা যেন তার বিশ্বাস হয় না। যশোদা বলে,—মাথায় যে বাজ পড়বে ঠাকুর! গাছ-গাছড়া ঝড়ে ভেঙে পড়বে!

—তেমন কোন পাপকার্য্য কদাপি করি নাই। চন্দ্রকান্ত সামান্য হাসলেন কথার শেষে। বললেন,—কার অভিশাপে?

এতক্ষণে ফিরে তাকালো যশোদা। উঠানের হীরার খেলা দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনে ছিল সে। অবিরাম ধারাপাত দেখে। ফিরে তাকিয়ে বললে,—অত-শত জানি না ঠাকুর! যেতে হয় যাও না কেনে! বলতে হয় আমি বলেছি। এ দুঃসময়ে কেউ ঘরের বার হয় না, তাই তো জানি!

—সিধা-নৈবেদ্য আমার প্রাপ্য। আমি তবে ল'য়ে যাই? চন্দ্রকান্ত কথা বলেন নম্রধীর স্বরে। ব্যগ্র চোখে কা'কে যেন খুঁজতে থাকেন। কা'কে যেন দেখতে চান। দালানের সংলগ্ন কক্ষসমূহ লক্ষ্য করেন। অন্ধকার সোপান, শূন্য কক্ষ—যাকে দেখতে অভিলাষী হন কোথাও তার সন্ধান মেলে না। ব্রাহ্মণের ক্ষুব্ধদৃষ্টি বৃথাই চঞ্চল হয়।

তাচ্ছিল্যপূর্ণ মুখভঙ্গী পরিচারিকার। কথার সুরে ব্যঙ্গ মাখিয়ে বলে,—বামুন বাদল যান, দক্ষিণে পেলেই যান। সিদে-নৈবিদ্যি, দক্ষিণা, সবই যখন মিলেছে তখন তুমিও ঠাকুর আজকের মত মানে মানে বিদেয় হও।

উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতায় চন্দ্রকান্ত যেন ঈষৎ অধীর হয়ে আছেন। নিকলুষ ও পবিত্র মন তাঁর। শিক্ষাদান ও যাজনিক কাজেই কালাতিপাত করেন। সমাজ ও সংসারের প্রতি চন্দ্রকান্ত নিস্পৃহ। তবুও যেন আজ মনের একাগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হয়। মানসচক্ষে বার বার সেই শুভ্রবসনা রূপবতীর দেহলাবণ্য সুখস্বপ্নের মত জেগে ওঠে। চন্দ্রকান্তর মনের লাগাম যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়। কিন্তু মুখে যে কোন কথা ব্যক্ত করা যায় না!

—দাসী, তুমি বড় রূঢ়, তোমাতে দয়া-মায়ার লেশ মাত্র নাই। সদাই কি তুমি এমন উগ্ররূপে থাকো?

ব্রাহ্মণ বললেন ধীরে ধীরে। অভিযোগের সুরে। পরিচারিকা যাতে আহত না হয় তাই মৃদু হাসির সঙ্গে কথাগুলি বলেন। বলেন,—বিনা আচ্ছাদনে এই বিপর্যয়ে পথ চলা কি সম্ভব, তুমিই বল?

কোন উত্তর নেই যশোদার মুখে। বিস্ফারিত চোখ ফিরিয়ে ব্রাহ্মণকে একবার দেখলো মাত্র। ক্ষণেক দাঁড়িয়ে তরতরিয়ে উঠানে নেমে চললো। মুষলধারার বর্ষণ পরিচারিকার মাথায়। যে দিকে স্তূপীকৃত তাল আর নারকেলের পাতা সেদিকে চলে। দু'-এক খণ্ড তালপত্র তুলে আনে, প্রবল বৃষ্টিপাতে যেন স্নান সেরে ফিরলো। বললে,—ঠাকুর, আমাকে এই জলে ভেজালে তুমি! নাও, তোমার আচ্ছাদন নাও। দয়া আর মায়া কি শুধু বামুন জাতেরই আছে?

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হন মনে। ধারাস্নানে পরিচারিকার সর্ব্বদেহ ভিজতে দেখে মনে মনে লজ্জানুভব করেন।

যশোদা থামে না। বলে,—দেখো ঠাকুর, কোন সুখ নেই! এই জনহীন দেশে থেকে থেকে মনটা যেন ধুকপুক করছে দিন-রাত্তির! আমাদের জমিদারের দেওয়া শাস্তি শুধু কি ঐ বৌ ভোগ করছে? আমিও হাড়ে হাড়ে ভুগছি। কোথায় ঘরে ব'সে চরকা ঘুরিয়ে সুতো কেটে হেসে-খেলে দিন কাটবে, তা নয়, মরতে এয়েছি এই পোড়া দেশে!

বৃষ্টির জল নয়, ব্রাহ্মণ লক্ষ্য করলেন পরিচারিকার দুই চোখ সত্যিই অশ্রুসজল। মুখে ব্যঙ্গ বা তাচ্ছিল্যের পরিবর্ত্তে ব্যথার কাতরতা যেন। চন্দ্রকান্ত ভাবছিলেন, সুখের অভাব মানুষের শান্ত রূপ বিনষ্ট করে। মনের কষ্টে মানুষ হয় রুক্ষ-রুদ্র। আত্মজন-বিরহের ম্লানছায়া নামে না কি মানবমুখে!

চন্দ্রকান্ত বললেন,—তোমাদের জমিদার কৃষ্ণরামের নাম এ দেশে কেহ উচ্চারণ করে না। শুনা যায়, তিনি না কি কুলীনের কুলীন, ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলতিলক আচার্য্য, হা হতোহস্মি!

থান কাপড়ের আঁচলে বৃষ্টির জল না চোখের জল মুছতে মুছতে হঠাৎ ব্রাহ্মণের অতি নিকটে এগিয়ে আসে যশোদা। যেন কান্নার করুণ সুরে কথা বলে। পরিচারিকা বলে,—আমাদের জমিদারের তিরিশটা বে, কাকেও নেয়, কাকেও নেয় না। ধর্ম্মের নামে এটা অধর্ম্ম নয় তোমাদের শাস্ত্রে?

বিবাহের সংখ্যা শুনে বিস্ময়ে ক্ষীণ হাসলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—বল্লাল সেনের মত ক'জন রাজা-বাদশার খেয়ালে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজটাই উচ্ছন্নে গেল আর কি! হায়, রাঢ় ও বারেন্দ্রর কি মন্দ ভাগ্য!

যশোদা চোখের জল মোছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে,—এয়োস্ত্রী, মাছ-ভাত মুখে দেয় না। চুলে তেল-সিঁদুর ছোঁয়ায় না, গায়ে একটা গয়না তোলে না। মুখে হাসি নেই, থাকে যেন বিবাগীর মত। তবু যা হোক কে এক চৌধুরীদের মেয়ে আসতে মুখে একটু হাসি ফুটলো।

—চৌধুরীদের মেয়ে! বললেন চন্দ্রকান্ত। পদতলের ভূমিতে চক্ষু নত করলেন। ঈষৎ চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন যেন। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন,—চৌধুরীদের মেয়ে! কে? আনন্দকুমারী নয় তো?

—মরি মরি, তার রূপের কি বাহার! যশোদা কথা বলে প্রসন্ন কণ্ঠে। বলে,—যেমন রূপ, তেমন রঙ। যেন রূপবতিনী। দেখলেও চক্ষু জুড়ায়।

বজ্রাহত হ'লেও হয়তো কেউ এত বেশী স্তব্ধ হয় না। চন্দ্রকান্তর যেন অন্য এক মূর্ত্তি হয়। ঘোর দুশ্চিন্তায় যেন তিনি নীরব, নিস্পন্দ। শ্বাস পড়ে কি না পড়ে।

—রাম-খোদার দেউলে চৌধুরীদের পাল্কী লেগেছে। পরিচারিকার কথায় নেই আর সেই করুণ কান্নার সুর। যশোদা বলে,—পাল্কী বয়ে এনেছে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক। সঙ্গে আছে পাইক-সেপাই।

—আমি তবে বিদায় লই। বলতে বলতে চন্দ্রকান্ত দ্রুত দালান ত্যাগ করলেন। তাঁর মনের সকল সুখ যেন বিনষ্ট হয়েছে। কি এক দুশ্চিন্তার ঘূর্ণীতে মস্তিষ্ক যেন ঘূর্ণায়মান! ব্রাহ্মণের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে দূর থেকে। চন্দ্রকান্ত যেতে যেতে স্বগতোক্তি করলেন,—আনন্দকুমারী, তোমার নারী-জন্ম শোভা পায় না। পুরুষের কাজ গুপ্তচরবৃত্তি!

জমিদার কৃষ্ণরামের জীর্ণ, বিধ্বস্ত, ভগ্ন-আলয় যেন হেসে উঠলো আজ। রূপের আলোয় হেসে উঠলো। অপ্সরী কিন্নরীর রূপ-জৌলুসে। গৃহের দ্বিতলের একটি কক্ষ তখন দুই পূর্ণলাবণ্য-ললনার রূপসৌন্দর্য্যে শুধু আলোকময় নয়, দুই সখ্যপরিচিতার কথোপকথন ও পরিহাস-প্রগল্‌ভতায় হাস্যময়। আনন্দকুমারীর কাঁচুলীর হীরা-মুক্তার দীপ্তি, পরিচ্ছদের মিহি ঢাকাইয়ের রাশি রাশি রূপালী জরির তারা-ফুল, কক্ষমধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব মোহ বিস্তার করে!

কথায় কথায় যে যার আত্মকথা ব্যক্ত করে। একে অন্যকে প্রশ্ন করে। যে উত্তর দেয় সেই আবার প্রশ্ন করে। হাসি, কৌতুক আর পরিহাসের বিনিময় চলতে থাকে।

এটি বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষ। পালঙ্কের দুই প্রান্তে দু'জন। এক দিকে নিরাভরণা, সদ্যস্নাতা, মুক্তকেশা রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। আরেক প্রান্তে সুবেশা, নানালঙ্কারভূষিতা চৌধুরীকন্যা আনন্দকুমারী।

কক্ষের দ্বার বাতায়নমুক্ত। জলকণাবাহী বাতাস তরঙ্গ-হিল্লোল তোলে কক্ষমধ্যে। ঝড়ের বেগে উড়ে যায় বুকের আঁচল।

—সই, এমন একা-একা আছো, ভয় পাও না? সহাস্যে, কিছু বা কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আনন্দকুমারী।

রাজকন্যার দৃষ্টি মুক্ত বাতায়নের বাইরে। কক্ষ থেকে দেখা যায়, বর্ষাপ্লুত আমোদরের উদ্দাম রূপ। নদীর স্বচ্ছ জল এখন ঘোলাটে লাল। দুরন্ত গতিবেগ আমোদরের। কোথাও উচ্ছ্বাস, কোথাও প্রবাহ, কোথাও চক্রাকার ঘূর্ণী।

প্রশ্নের উত্তর নেই। বিন্ধ্যবাসিনীর দৃষ্টি ফিরে না। পলকহীন চোখে দেখছেন কি যেন! দেখতে দেখতে বাক্যরহিত, নিস্তব্ধ, গম্ভীর। চক্ষুও যেন পলকহীন। কেন কে জানে, হতাশার শ্বাস ফেললেন রাজকন্যা।

চৌধুরীর মেয়ে বললেন,—কথা নাই কেন? অত আগ্রহে দেখো কি?

আরেকটি হতাশ-শ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। আমোদরের তীর থেকে চোখ ফিরলো না। দেখতে দেখতে আপন মনে বললেন,—তবে কি পূজা শেষ হয়েছে! ব্রাহ্মণ কি চলে গেলেন! এই ঝড়-জলে!

—কে?

সূক্ষ্ম দুই ভ্রূ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন আনন্দকুমারী। কি এক গুপ্তরহস্যের সন্ধান মিলেছে যেন। বললেন,—কে তাই দেখি। কথা বলতে বলতে পালঙ্ক ছেড়ে খোলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিন্ধ্যবাসিনী নিরুৎসাহের সঙ্গে বললেন,—নারায়ণের পূজারী! হয়তো তিনসন্ধ্যের পূজা শেষ হ'তে চতুষ্পাঠীতে ফিরছেন!

আনন্দকুমারীও দেখলেন। নদীতীরের আঁকাবাঁকা পথ, সারি সারি গাছের ছায়াঢাকা পথ ধ'রে অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এক সবল-সুঠাম পুরুষ। তালপাতার আচ্ছাদন মাথায়। কাঁধে সিধার আধার!

—চন্দ্রকান্ত!

—চন্দ্রকান্ত!

দু'জনে প্রায় সমস্বরে ব্রাহ্মণের নামোচ্চারণ করে। নিরাশার আক্ষেপ ফুটলো যেন দুই নারীকণ্ঠে। আনন্দকুমারী যুক্ত কর কপালে স্পর্শ করলেন ঐ দূরগামীর উদ্দেশে। বললেন,—চন্দ্রকান্ত তবে এই গৃহেই ছিলেন। আমার অনুমান মিথ্যা হয় না।

বিন্ধ্যবাসিনী সহজ-সরল কণ্ঠে বললেন,—ঐ ব্রাহ্মণ কি সই তোমার পরিচিত?

হাঁ, না কিছুই বললেন না আনন্দকুমারী। তার স্ফীত-বক্ষ

আরও যেন ক্ষীত হয়। চৌধুরীর মেয়ে ফিস-ফিস কথা বলে,—আমার আশা বৃথা হয়নি তবে। অনুমানও ভুল নয়।

চন্দ্রকান্তর নাম আর আকৃতি রাজকন্তার মনে যেন আবার আলোড়ন তুললো। কথা আর আলাপে মগ্ন থেকে মনে ছিল না কিছু। বিন্ধ্যবাসিনী ভুলেছিলেন যেন। রাজকন্তা বললেন,—কিসের আশা সই ?

—আশা! বললো আর খিল-খিল হাসতে থাকলো আনন্দকুমারী। সর্ব্বদেহে হাসির জোয়ার তুলে হাসতে হাসতে বিন্ধ্যবাসিনীর কানের কাছে মুখ এনে বললে,—আশা! ভালবাসার আশা! দেখো সই, নিন্দুকদের কানে যেন কথাটা ফাঁস ক'র না।

কেমন যেন অসহ্য জ্বালা ধরলো বিন্ধ্যবাসিনীর বুকের মাঝে। ঈর্ষা না মাৎসর্য্যের জ্বালা বোঝা যায় না, রাজকন্তার কানে যেন বিষ ঢাললো কে! বিন্ধ্যবাসিনীর ঢলো-ঢলো মুখখানি যেন আরক্তিম হয়। আনন্দকুমারীর নির্লাজ হাসি শুনতে ভাল লাগে না যেন। মনে যেন তুফান উঠেছে, কিন্তু মুখে কোন প্রকাশ নেই। রাজকন্তা কেমন যেন বিমনার মত তাকিয়ে থাকেন। হতাশ চাউনী চোখে।

—বৃষ্টি ধ'রেছে সই, ঝড়ও থেমেছে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সহজ কণ্ঠে কথা বলে আনন্দকুমারী। বলে,—এখন তবে আমি যাই ?

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে কথা নেই। নীরব নিস্পন্দ যেন। ঘুম ভেঙে গেছে, স্বপ্ন যেন মধ্যপথে খেই হারালো। কেমন এক অসহ্য জ্বালায় বুক যেন জ্বলছে ধিকি-ধিকি। পলকহীন দৃষ্টি, তবুও সমুখের কিছুই দেখা যায় না। বাক্‌শক্তি থাকে না যেন।

—যাবে সই ? কোথায় যাবে ?

কত কষ্টে যেন কথা বললেন রাজকন্তা। কেমন যেন জড়তাপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

কে সাড়া দেয়! কেউ কোথাও নেই। আনন্দকুমারী শব্দহীন পদে চুপিসাড়ে কখন কক্ষ ত্যাগ ক'রে গেছে। আমোদরের ঘোলাটে-লাল জলের আবর্ত্ত দেখছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরীর মেয়েকে দেখতে না পেয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অন্ধকার সোপানের কাছে অগ্রসর হন। কোথায় কে, বর্ষাদিনের চঞ্চলা ঝরণার মত ছুটতে ছুটতে নেমে গেছে আনন্দকুমারী। অতিথির পরিচর্য্যা করতে মন চায় না আর। বিদায় কালে সাদর আপ্যায়ন জানাতে আর ইচ্ছা হয় না। ত্রিতলের দালান থেকে রাজকন্তা দেখলেন, একখানি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত পাল্কী, নীল-রেশমের আবরণে আচ্ছাদিত—তোরণ-ফটক পেরিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। পাল্কী-বেহারাদের কণ্ঠগুঞ্জনের প্রতিধ্বনি সিক্ত হাওয়ায়।

বিন্ধ্যবাসিনী হতাশ দৃষ্টি তোলেন মেঘমুক্ত আকাশে। চাতক পাখী উড়ছে তারস্বরে ডাকতে ডাকতে। চাতক ডাকছে—ফটিক জল!

আপন কক্ষে ফিরে রাজকুমারী পালঙ্কে লুটিয়ে পড়লেন অবশ ক্লান্ত দেহে। এক-রাশ স্নিগ্ধ বাতাস এসে এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর রুক্ষমুক্ত কেশরাশি।

আকাশে চাতকের ডাক। আর পাল্কীবাহকদের হুঙ্কার প্রতিধ্বনি।

[ক্রমশঃ।

এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, ও-ডি কোলন্

দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রোভান্স প্রদেশের COTE D' AZUR-এর উপত্যকায় আড়াই হাজার একর জুড়ে রয়েছে এক ফুলের বাগান, যেখানে তৈরী হয় পৃথিবীর সেরা সেরা সেন্ট। হাজারে হাজারে সেখানে প্রত্যহ ফুটে থাকে গোলাপ, জেরানিয়াম, পপি, রোজমারী, ল্যাভেণ্ডার, জেসমীন আরও কত সব সুগন্ধি ফুলের রাণীরা। সেন্ট তৈরী এক অতি প্রাচীন শিল্প। রোম থেকে বাগদাদ, গ্রীস থেকে স্পেন, ভারত, চীন, জাপান সব দেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতেই এর ছাপ রয়ে গেছে। সেই বিরাট বাগানের পাশেই ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় কারখানা Grasse। ১৮২০ সালে যার জন্ম। Grasse-এর ফ্যাক্টরীতে বংশপরম্পরায় কাজ করে আসছে সেই পুরোনো কর্মচারীদেরই বংশধরগণ। কারণ, ট্রেড-সিক্রেট না ফাঁস হয়ে যায়।

গোলাপের পাপড়ি এ্যালকহলে ভিজিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ জারিয়ে সেন্ট তৈরী করার প্রথা আজ আর নেই সেখানে। তার বদলে এসেছে ষ্টীম চেম্বার, বয়েলার, ষ্টোরেজ, হালফ্যাসানের আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ল্যাবোরেটারি।

গোলাপের মতই সুন্দর ছোট ছোট মেয়ে ফুল তোলে Grasse-এর বাগানে। তারপর সেই ফুলগুলি থেকে পাপড়ি খসিয়ে নেওয়া হয় সযত্নে। বয়লারে উত্তাপ আর চাপ দিয়ে তখন সেই পাপড়ি থেকে বার করে নেওয়া হয় সুগন্ধটুকু এবং পাইপে করে তাই চালান দেওয়া হয় ল্যাবোরেটারিতে। তারপর কত ফিলট্রেশন, কত ডেসিকেশন আর ইভাপোরেশন! টেষ্ট-টিউব, ফয়েল, ফ্লিটারিং ফ্লাস্ক, প্যান, বেসিনস আর ডেসিকেটরের ছড়াছড়ি। সে তথ্য আমার জানা নেই। কারোরই জানা নেই। তা' ট্রেড-সিক্রেট।

পৃথিবী জুড়ে নানা দ্রব্য আসছে Grasse-এ। আবিসিনিয়া থেকে বাক্সো হর্ণসে করে Cwet Cat-এর Gland Secretion আসছে, তিব্বত থেকে যাচ্ছে পুরুষ হরিণের গ্রাণ্ড থেকে নির্গত একটা জলীয় বস্তু, ইস্রায়েল আর আরব পাঠাচ্ছে গামরেজিন, ভেনেজুয়েলা আর ব্রাজিল পাঠাচ্ছে কুমারিন পাউডার, ভারত পাঠাচ্ছে সুগন্ধি চন্দন, সিসিলি আর প্যারাগুয়ে যথাক্রমে পাঠাচ্ছে Orrisroot আর Pethygrass।

এই সমস্ত সংগ্রহ থেকে তৈরী হচ্ছে এনডিয়ারিং, চ্যানেল, ৪৭১১, কিস্‌মিনট্, চিপরী, ইভনিং ইন প্যারিস। ক্লিয়োপেট্রা, মহারাণী বর্দ্ধমান, কানন দেবী থেকে অড্রে হেপবার্ণের ড্রেসিং-টেবলে আর হাণ্ডব্যাগে শোভা পেয়ে আসছে তারা।

রঙ্গপট

অভিনয়-শাস্ত্রের নানা দিক—মেমারি অফ ইমোশন

গত সংখ্যায় কনসেনট্রেশন প্রসঙ্গ শেষ করেছি। এবারে যে প্রসঙ্গ তুলছি সেটি অভিনয়-শাস্ত্রের দ্বিতীয় শিক্ষা। কিন্তু দ্বিতীয় শিক্ষা হলে কি হবে, এটি খুবই শক্ত। অভ্যাস করা তো কঠিন বটেই এবং সেই অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করা আরও শক্ত। পৃথিবীর বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই এই মেমারি অফ ইমোশনের থিয়োরী ফলো করেন। যথাযথ ভাবে তা' মেনে চলেন।

সে কথা থাক, এখন এই মেমারি অফ ইমোশন কি, তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাঙলা নাটকের কথাই ধরা যাক, ধরুন, 'শ্যামলী' নাটকের সেই অংশ যেখানে উত্তমকুমার অনিলের ভূমিকায় বিবাহ করে ঘরে নিয়ে আসছেন তাঁর মূকবধির স্ত্রী শ্যামলীকে। এক দিকে ঘরে মায়ের কথা, অপর দিকে নিজের ন্যায়বোধ, মনুষ্যত্ব, আরও এক দিকে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি একটা করুণামিশ্রিত ভালবাসা, কিছু বিরক্তি, ক্রোধও, হতাশ ভাব, কর্তব্য ইত্যাদি মিশিয়ে অপূর্ব হবে তাঁর অভিনয়। এখন এ অভিনয় উত্তমকুমার কি করে করবেন? কোথায় পাবেন সেই আলো, সেই চেতনা, সেই ভাব, তেমনি বাচনভঙ্গী? কি করে নিজেকে অনিলের প্রকৃত অবস্থায় তুলে আনবেন? নিজের উত্তমকুমারের সত্তাকে নিশ্চেতন করে দিয়ে অনিল-সত্তাকে তুলে ধরবেন তার ওপরে? নিজে অনিল সাজবেন না অনিল হয়ে যাবেন। এই যে হয়ে যাওয়া, এ কি করে সম্ভব? কি করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনে সম্ভব হবে নিজেকে অভিনীত অংশের সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়ার? এবার আসুন বায়াবয়ের দৃশ্যপাতের শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদে। চারু দত্ত আত্মরক্ষার জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে বসে বলে যাচ্ছেন তাঁর জীবনের বিগত দিনের স্মৃতিকথা। একটু একটু করে রক্ত ক্ষরে পড়ছে পুরাতন ক্ষত থেকে। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে কখন ইতিমধ্যে। সমস্ত পৃথিবী ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন পারিপার্শ্বিক। ভুলে গেছেন তাঁর সামনের মানুষটিকেও। তিনি অভিনয় করছেন। জীবনে একবার সত্যি সত্যি যা' করে গেছেন সেই স্মৃতির রোমন্থন করছেন তিনি। অবগাহন করছেন পুরানো প্রসঙ্গে। চেতনা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নিশ্চেতন মনের গভীরে লুকায়িত অতীত ভেসে উঠছে ওপরে, বর্তমান তলিয়ে গেছে নীচে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিনয়টি তিনি করলেন। ঠিক এমনি হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনেও তার অভিনীত অংশের সঙ্গে মিল থাকা কোনও না কোনও ঘটনা মনের গহনে থাকেই। শুধু মনে করে আনতে হবে সেই স্মৃতি। অভিনীত অংশের ছাঁচে ফেলে সাজিয়ে নিতে হবে তা'। ভাসিয়ে তুলতে হবে অতীতকে, ডুবিয়ে ধরতে হবে বর্তমান। ধরুন সেই বিখ্যাত নাটকাংশ, ভগবান, তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি···। ভগবানের কাছে চ্যালেঞ্জ করবার মত ঘটনা সকলেরই জীবনে দু-একটা ঘটে বৈ কি। আরও সহজ করে বলি। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মন যেন একটা লাইব্রেরী। শুধু ঘটনা আর তার স্মৃতির পাঠাগার। ক্যাটালগ করে তাকে সাজিয়ে আলমারী ভরা রয়েছে। যখন যা ইচ্ছা টেনে নিয়ে তাবি থেকে যেকানেক খুঁজে যিনি অভিনয় করতে পারবেন, তিনিই সত্যিকার অভিনেতা, সত্যিকার অভিনেত্রী।

আগেই বলেছি, বৈজ্ঞানিকের আছে মাইক্রোস্কোপ, শিল্পীর আছে তুলি, রঙ আর ক্যানভাস কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর শুধু আছে দেহ। তাতে সংযোজনা করলাম স্মৃতি। শুধু স্মৃতি নয়, স্মৃতির পাঠাগার।

মেমারি অফ ইমোশনের প্রসঙ্গে জনৈক বিখ্যাত রুশ অভিনেতা বলছেন, we have a special memory for feelings, which works unconsciously by itself, for itself. উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলছেন, In a certain city there lived a couple who had been married for 25 years. ..He had proposed to her one fine summer morning when they were walking in a cucumber patch. Being nervous, as nice young people are apt to be under the circumstances, they would stop occasionally, pick a cucumber and eat it, enjoynig very much its aroma taste ..they made the happiest decision of their lives, between two mouthful of cucumbers, so to speak.

শশার বাগানের সেই ঘটনা, সেই কুড়িয়ে লুকিয়ে শশা খাওয়ার কথাটি ভবিষ্যৎ জীবনে সেদিনের সেই গৃহিণী গল্প করেন নিজের মেয়ের কাছে। বিয়ের আগের দিনের সেই ঘটনার কথা। এদিকে যখনই সেই পরিবারে কর্তা-গিন্নীর মধ্যে কোনও ঝগড়া হয়, তখনই

বুদ্ধিমতী কন্যা এক-প্লেট শশা কেটে রাখতো বুড়ো-বুড়ির সামনে। হাসির রোল উঠত। বিদ্বেষের মেঘ কেটে জমে উঠতো আনন্দের আসর।

এই হোল মেমারি অব ইমোশন। এ যার নেই তিনি যতই হাত-পা নাড়ুন, চিৎকার করুন, মুখে এক্সপ্রেশন দিন, ষ্টেজ কাঁপিয়ে লাফাতে থাকুন, সত্যিকার অভিনেতা অভিনেত্রী কখনও হতে পারবেন না।

মিকির রৌপ্যজয়ন্তী হয়ে গেছে!

১৯২৭ সাল। আজ থেকে প্রায় আটাশ বছর আগে মিকির প্রথম ছবি 'Plane Crazy' দেখা দিল। সেই বছরই এল 'Steam poat Willie' ওয়াল্টার ডিজনের প্রথম কার্টুন ছবি শব্দসহ। সেদিনের সেই সদ্যোজাত শিশু মিকির সঙ্গে আজকের যৌবনপ্রাপ্ত মিকির 'Fantasia' কি 'Jack and the Bean- stalk' টেকনিকালারে দেখুন মিলিয়ে। কত পরিবর্তন! মিকি আজ কার না প্রিয়? লক্ষপতি থেকে ফকির, কর্ণেল থেকে পাহারাদার, ব্যাঙ্কার থেকে ব্যবসাদার, মিকিকে না ভালবাসে কে? ভারতবাসীদের প্রতিও লক্ষ্য রয়েছে মিকির। দেখুন না হিন্দুস্থানীতে কি লিখে এনেছে সে আপনাদের জন্ত।

ওয়াল্ট ডিজনে

আভা গার্ডনার কে?

আভা গার্ডনার কিন্তু নিজের বয়স কমিয়ে বলেন না। বলেন, I am thirty-two—the second oldest actress at the studios. You know what they call me there? Mother Gardner! অর্থাৎ তাঁর বয়স বত্রিশ। বয়সের দিক থেকে হলিউডে তিনি দ্বিতীয়া। হলিউডে তাঁর চলতি নাম 'মাদার গার্ডনার'। বিশ্বাস করুন বা না করুন। তিনি নিজের অভিনয়-ক্ষমতার কথা স্বীকার করেন না। বলেন, I am not an actress, I am only in this for the money. বলুন না কথাটা ঠিক?

আভা গার্ডনার

আভা গার্ডনারের জন্ম হয়—১৯২২ সালের খ্রীষ্টমাস ইভে। নর্থ ক্যারোলিনের স্মিথফিল্ড নামক জায়গায়। বাবা ছিলেন এক চুরুট কোম্পানীর মালিক। তবু সংসারে দারিদ্র্য ছিলই। স্কুলের প্রথম দিনটির কথা আভা প্রায়ই বলেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর নাম, ধাম, পিতৃ-পরিচয়। Ah'm Avah Gah-dunh from Smithfield, No'th C'alinuh, প্রথম আলাপে এমনি তোতলাতে থাকেন আভা।

কেরাণী হবেন বলে আভা একটা সেক্রেটারীয়াল ওয়ার্কসের কোর্স নেন। কিন্তু তাঁর ভগিনীপতি ছিলেন এক জন পেশাদার ফটোগ্রাফার। চাকরী খুঁজতে আভা যখন নিউইয়র্কে এল তখন তিনি আভার কয়েকটি ছবি তুলে হলিউডে পাঠিয়ে দেন। সেই ছবিগুলি এত সুন্দর হয় যে, শুধুমাত্র ছবিগুলি দেখেই কনট্রাক্ট পেলেন আভা। তার পরের ইতিহাস তো আপনার আমার সকলের জানা।

১৯৪২ সালে আভা বিবাহ করেন প্রথম। দ্বিতীয় বিবাহ এক সঙ্গীতজ্ঞকে ঠিক দু'বছর পরেই। নভেম্বর, ১৯৫১ তে তিনি পুনরায় বিবাহ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত গায়ক ফ্রাঙ্কসিনট্রাকে।

ঝড়ের পরে

বড় ভাই সামান্য অবস্থা থেকে আজ প্রচুর পয়সা রোজগার করছেন! কাপড়ের কল করেছেন। মেজ ভাই সেই কাপড়ের কলে দাদার ডান হাত। ছোট ভাই পড়ছে ডাক্তারী। এমন সময় এক দিন হঠাৎ বড় ভাই একেবারে কথা দিয়ে এলেন এক জন দরিদ্র ভদ্রলোকের কন্যাকে নিজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল। ছোট ভাইটির বড় বৌদি-অন্ত প্রাণ। বৌদি চা না বানিয়ে দিলে তিনি খাবেন না। হাতে করে জলখাবার না পৌঁছে দিলে তা তিনি গ্রহণ করবেন না। স্বাভাবিক নিয়মেই বড় বৌ ছোট ঠাকুরপোর বিয়ের পর বৌকে নির্দেশ দিলেন, সব কাজ হাতে তুলে নেবার জন্ত। ছোট বৌয়ের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের সুযোগ গ্রহণ করে ঝগড়াটা আরও বাড়িয়ে তুলে দিলেন মেজো বৌ। স্বামীর কানে নানা রকম কথাও তুলতে লাগলেন বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তিন ভাইয়ের শক্ত করে গড়া ইমারত ভাঙল না। ঝড়ের পরে যখন আবার হাসল পৃথিবী তখনই এল এক সুখবর, নতুন আগন্তুক আসছে বাড়ীতে। ছোট বৌয়ের সন্তান সম্ভাবনার কথা জানা গেল। অতএব হাসতে হাসতে সপরিবারে বাড়ী আসুন এবার।

এ ছবির সব চেয়ে সমৃদ্ধ দিক হচ্ছে অভিনয়। অভিনয়াংশে ছবি বিশ্বাস আর মলিনা দেবীর নাম সর্বাগ্রেই করতে হয়। মেজ বৌয়ের অভিনয়ে রেণুকা তো এসব চিরকালই ভাল করেন। প্রণতি ঘোষের অভিনয়ও মন্দ নয়। ফটোগ্রাফীর দিকটা মন্দ নয়। প্রণতি ঘোষের দু' একটি ক্লোজ আপ ভালই উঠেছে। সঙ্গীতাংশ মাঝামাঝি। অন্যান্য সব কিছুতেই মারাত্মক রকমের কোনও ত্রুটি চোখে পড়ল না বড় একটা।

বিধিলিপি

কটকজলের প্রসিদ্ধ জমিদার শচীকান্ত মুখোপাধ্যায় সাত বছর বিয়ে হওয়া সত্বেও নিঃসন্তান। বিপদ কখনও একা আসে না। জমিদার পুত্রবধূর ছেলে না হওয়ার শোক বুকে করেই পড়লেন অসুখে। ম্যালেঞ্জাইটিসে হারালেন দৃষ্টিশক্তি। জমিদার-মাতা পুত্রবধূর এই অন্ধ হওয়ার রটনা করলেন যে, যদি তার কদাচ সন্তান হয় তো সে সন্তান হবে মায়েরই মত অন্ধ। অতএব তিনি ছেলের বিয়ে দিতে চাইলেন ফের। কিন্তু ছেলে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। নায়েব মুকুন্দর পরামর্শমত জমিদার-গৃহিণী শচীকান্তকে মহালে পাঠিয়ে সেই অবসরে পুত্রবধূকে পাঠালেন তাঁর ভাইয়ের বাড়ী কাঞ্চনপুরে। এদিকে কলকাতায় তারই বহু দিন আগের 'গঙ্গাজল' সইয়ের মেয়ের সঙ্গে তলায় তলায় বিয়ের যোগাড়ও চলতে লাগল নায়েব মুকুন্দর মারফৎ। এদিকে ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে শকুন্তলা (জমিদার পুত্রবধূ) সন্তান-সম্ভবা হল। ওদিকে গঙ্গাস্নানে গিয়ে শচীর মা সমস্ত দেখে-শুনে একেবারে বিয়ের পাকা কথা করে বসল। 'গঙ্গাজল' সইয়ের মেয়ে সন্ধ্যার পরিচয় হল শচীকান্তর সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে বিনিময় হল নানা কথা। সন্ধ্যা ভালবাসে প্রশান্ত বলে বিপদ হোষ্টেলের একটি ছাত্রকে। শচী সন্ধ্যাকে স্বীকার করল 'বোন' বলে। এদিকে কটকজলে ফিরে এসে শচীর মা শচীকে সব কথা খুলে বললেন। জানালেন, সন্ধ্যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা। শচী কিছুতেই রাজী নয় দেখে অন্নজল ত্যাগ করলেন তিনি। মায়ের প্রাণ বাঁচাতে এক মস্ত জমিদারী চাল চালাল শচীকান্ত। প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় বাড়ী ঠিক করে বিয়ের আসরে গিয়ে হাজির। ওদিকে কলেজের হোষ্টেলের ছেলেদের কাছে খবর পেয়ে শকুন্তলা ভাইয়ের সঙ্গে এসে হাজির হল বিবাহ-আসরে। তার পর ঘটল মিল। সন্ধ্যার সঙ্গে প্রশান্তর। শকুন্তলার সঙ্গে শচীকান্তর। জমিদার-গৃহিণীর সঙ্গে নবাগত শকুন্তলার সন্তানের। দুঃখ ভুলে গিয়ে হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ।
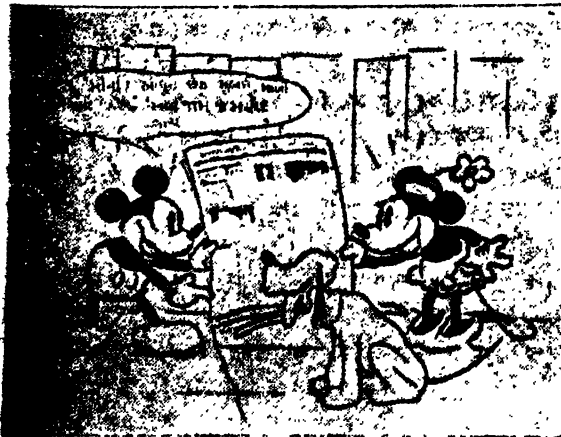
মিকি মাউস হিন্দুস্থানীতে কি বলছে দেখুন!

অভিনয়ে প্রথমেই সন্ধ্যারাণী আর উত্তমকুমারের নাম করব। কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রেণুকা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেকেই এক একটি টাইপ চরিত্রে ভালই অভিনয় করেছেন। ষ্টেথিসকোপ বুকে ঝুলিয়ে সারাবাড়ী তোলপাড় করে তা' খুঁজে বেড়ানোটা কিন্তু আজ আর যথেষ্ট হাসির উদ্রেক করে না। ডাক্তারের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের একটি দৃশ্য মন্দ হয় নি। সেটের কাজ খুব ভাল হয়েছে দেখলাম। ফটোগ্রাফী তো একেবারে প্রথম শ্রেণীর। আউটডোর স্যুটিংএর কাজও খুব পাকাহাতে তোলা। ক্যামেরা ট্রিকগুলি ভালই হয়েছে।

জয় মা কালী বোর্ডিং

জয় মা কালী বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা পাঁচ বন্ধু হোটেলের খাবার ব্যবস্থা, ঘরের অব্যবস্থা আর সহ্য না করতে পেরে ঠিক করলে একখানা বাড়ী ভাড়া করতে হবে। পাঁচ বন্ধুর তিন জন চাকুরে আর দু'জন বেকার। বেকারেরা বেরোল বাড়ীর খোঁজে। বাড়ী পাওয়া গেল। কিন্তু পরিবার অর্থাৎ ফ্যামিলীম্যান ছাড়া সে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে না কিছুতেই। অতএব যারা বেকার তারা সাজল বউ। আর যারা চাকুরে তারা স্বামী। এক জন বাড়তি। কিন্তু সেই বাড়ীর গৃহস্বামী, যিনি নাকি সর্বদাই ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন আর তাঁর গৃহিণী ভুগছেন চোখের দোষে। খালি সুস্থ আছে গৃহস্বামীর কন্যা। একমাত্র কন্যা, অবিবাহিতা, তায় সুন্দরী, অল্পবয়স্কা। সুতরাং একে একে ছেলে হবার জন্যে বড় বৌ এবং ভাইয়ের বিয়ের উপলক্ষে ছোট বৌ বাড়ী ছাড়ল। পঞ্চপাণ্ডবের এক জন দ্রৌপদীর প্রেমে পড়েছেন। পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এরি মধ্যে ঘটনাটা গড়িয়েছে অনেকখানি। ঢাকার চিটাগুড় ব্যবসায়ী (ভানু ব্যানার্জীর পিতা), জমিদার (কল্যাণের বাবা) এসেছেন কলকাতার সেই ১০নং আমীর এ্যাভিন্যুতে। তার পর যা ঘটে। ছাতা পেটা খেলেন ভানু বাবু। কান মলা আর বকুনী জুটলো কল্যাণের। পরিশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ। কল্যাণের সঙ্গে বিয়ে হল গৃহস্বামীর কন্যারূপী তপতী ঘোষের। হাসির ছবিতে ভীড় কম নয়, তাঁদের যাঁদের দেখা মাত্রই দর্শকগণের হাসি পায়। ভানু, তুলসী লাহিড়ী, সাধন, অনুপকুমার, জহর, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি, আশু, অজিত, জয়া প্রভৃতি সকলেই রয়েছেন। ছবি বিশ্বাস, রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী, গুরুদাস আছেন বয়োবৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভূমিকায়। এবং ছবিটিকে জমিয়ে তুলতে সাহায্যই করেছেন এঁরা। তপতী ঘোষ সম্প্রতি কয়েকটি ছবিতে ছোট-বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ ছবির প্রায় সবটাই জুড়ে আছেন তিনি। মাষ্টার সুখেন ভালই করেছে। পরিচালক সাধন সরকারের স্বপক্ষে বলবার আছে অনেক কিছু। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই এ ছবিতে একাই একশ। সারাক্ষণ তিনি দর্শকগণকে হাসিয়েছেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

খেলোয়াড় হ'তে হলে খেলা না জানলে চলবে কেন? নিখুঁত খেলা না দেখাতে পারলে তো আর লোকের কাছে বাহবা পাওয়া

যায় না। কাজেই খেলা জানা চাই বেশ ভাল রকম। কত রকম খেলা আছে তো। সচ্চিদানন্দ সেন-মজুমদারের তৈরী "খেলা"র কথাই ধরা যাক। এই "খেলা"রই "খেলোয়াড়" তৈরী করছেন পিপলস্ পিকচার্স। "খেলোয়াড়"কে দেখা যাবে এক দিন শহরের ছবির পর্দায়। মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড় অনিল দে, এই ব্যাপারে খুব খাটাখাটি করছেন।

দৃষ্টিভঙ্গী তো আর সকলের সমান নয়! পারিজাত থিয়েটারের যোগাড় করা শিল্পীদের দৃষ্টি যে কেমন হবে, ভঙ্গী না দেখে বলা খুবই কঠিন। যাঁরা আছেন, অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে, বেশীর ভাগই অবশ্য নামকরা। মলিনা, সাবিত্রী, পাহাড়ী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নির্মলকুমার, সকলেই প্রায় পরিচিত। শিল্পী কাবেরী বসু একেবারে নায়িকা হ'য়ে যোগ দিয়েছেন ঐ শিল্পী মহলে। "গানে মোর ইন্দ্রধনু"র সুরকার অনুপম ঘটক এবার নতুন "দৃষ্টি"তে সুরে তাঁর রামধনু রচনা কোরবেন।

'বনফুল' লিখেছেন "ভীমপলশ্রী"র ইতিহাস। প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের মতে ভীমপলশ্রী বেলা তৃতীয় প্রহরে গাওয়ার উপযোগী একটি সুর। সেই সুরকে কেন্দ্র কোরেই হয়ত এ, এন, সি প্রোডাকসন্স গড়ে তুলছেন এই ছবিখানি। চিত্ত বসুর পরিচালনায় এই "ভীমপলশ্রী" ছবিখানিতে, সুরকার অনুপম ঘটক হয়ত ভীমপলশ্রী সুরকেই ছবিখানির প্রধান অঙ্গ কোরে তোলবার চেষ্টা কোরছেন। চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান কোনো এক দিন বেলা তৃতীয় প্রহরে শহরের সিনেমা হাউসগুলিতে ঐ সুর প্রথম শোনাবেন।

রাজা শ্রীবৎস আর রাণী চিন্তার দুঃখময় পৌরাণিক কাহিনী ছবির পর্দায় দেখাবেন এবার এম, জি, ফিল্মস। পরিচালক ফণী বর্মা "শ্রীবৎস চিন্তা" ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ, গঙ্গাপদ, তুলসী, জহর রায়, সন্ধ্যারাণী, অনুভা, সুদীপ্তা, পদ্মা প্রভৃতি শিল্পীরা ছবিখানিতে আন্তরিক ভাবে সাহায্য কোরছেন। করুণ থেকে করুণতর করার ভার নিয়েছেন সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়।

মহাপুরুষদের জীবনী, বই প'ড়ে শেখা এক রকম আর সেই পড়া গল্পের, ছবি দেখে শেখা, আর এক রকম। রামকৃষ্ণদেবের জীবনীর সঙ্গে প্রায় সকলেরই পরিচয় আছে, তবু সেই জীবনীটি ছবির আকারে তুলে ধরার আলাদা সার্থকতা আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তাই "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ"কে খুব ভাল কোরে জানবার সুযোগ দেবেন এবার ভারত কথাচিত্রম্। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, সুপ্রভা মুখার্জ্জী প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রাভিনেতার সন্ধান পাওয়া যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্রটি কিন্তু অভিনয় কোরবেন নাম না জানা কোনো এক অভিনেতা।
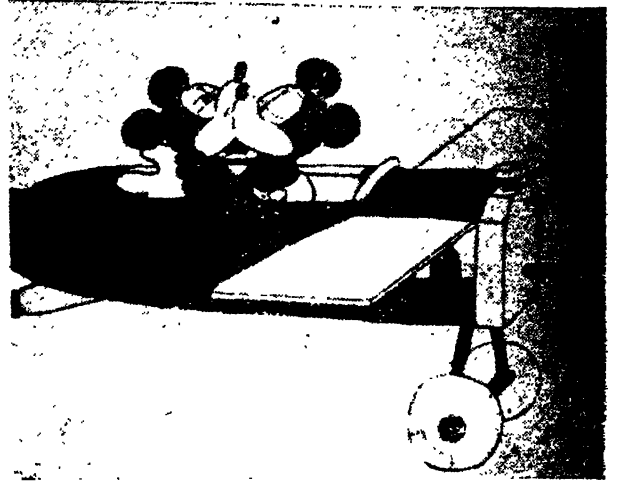
'Plane Crazy' ছবির একাংশ। মিকি মাউসের গোড়ার দিকে এ ছবি তোলা হয়। ছবিটি চিত্রজগতে বিশেষ সাড়া এনেছিল।

"শুভলগ্ন" আসার এখনও দেরী আছে। মলিনা, ছায়া, প্রণতি, শোভা সেন, নির্মলকুমার, তপতী ঘোষ, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ, গুরুদাস প্রভৃতি শিল্পীদের সহযোগিতায় এই "শুভলগ্ন" আসবে শহরে। ক্রীপ কর্পোরেশন সেই কারণে ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিয়োতে খুব ব্যস্ত। ঐ সব শিল্পীদের পরিচালনা কোরে "শুভলগ্ন" গ'ড়ে তোলার ভার নিয়েছেন নামকরা পরিচালক মধু বোস।

চারুচিত্র প্রোডাকসন্সের হ'য়ে পরিচালক অজয় কর শরৎচন্দ্রের "পরেশ"কে চিত্ররূপ দেওয়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। চিত্রনাট্যে সহযোগিতা কোরছেন জ্যোতির্ময় রায়, সংলাপে সজনীকান্ত দাস ও সুর সংযোজনায় অনুপম ঘটক। এই ছবিখানির আসল কাজের তাগিদে পাহাড়ী, নির্মলকুমার, কমল মিত্র, মঞ্জু, শোভা সেন, সাবিত্রী, মলিনা প্রভৃতি অনেক শিল্পীরা ভিড় জমিয়েছেন।

চৌরঙ্গী, কলেজ ষ্ট্রীট ইত্যাদি বড় বড় রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে রোজই ডবল ডেকারকে চলতে দেখা যায়। ঐ রকম একখানা বিরাট ভারি বপু "ডবল ডেকার"কে এবার ছবির পর্দায় তুলে আনবেন রূপচিত্রম নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই "ডবল ডেকার" এর প্যাসেঞ্জার সব সিনেমার শিল্পীরা। এরই পুরোনো একটি ইতিহাস লিখেছেন অশ্বঘোষ। এইবার একে একে হয়ত রাস্তা ছেড়ে পর্দায় উঠবে, থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ী, মোটর বাইক, ঠেলা গাড়ী, গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী, ঠুন্ ঠুন্ রিক্সা, বেবী ট্যাক্সি, জলযান, ব্যোমযান আরও কত কি! আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

প্রচ্ছদ-পট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কোনারকের হস্তিমূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আলোকচিত্র—শ্রীশান্তিনাথ মুখোপাধ্যায় গৃহীত

উদ্বাস্তু সমাগমের কারণ

"গত ১২ই জুলাই শ্রীনগরে পশ্চিমাঞ্চলের পুনর্ব্বাসন-মন্ত্রীদের সম্মেলনে সভাপতির আসন হইতে কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমন সম্পর্কে যে দুইটি খাঁটি কথা বলিয়াছেন, তেমন কথা ভারতের শাসকবর্গের কাহাকেও এ-পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া বলিতে আমরা শুনি নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শুধু সমগ্র পরিবারের জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য পাওয়ার জন্য এবং ক্যাম্প ও কলোনীর ভীড়ের মধ্যে বাস করিবার জন্য হাজার হাজার নর-নারী বালক-বালিকা নিজেদের বাসভূমি, জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় এবং নিজেদের সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ার স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন না হইলে উদ্বাস্তুর আগমন চলিতেই থাকিবে। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের বাস করার উপযোগী হইয়া রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইবে, এইরূপ কোন আশা তাঁহার মনের কোণে স্থান পাইয়াছে কি? দিল্লী-চুক্তি দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের কোনই সুবিধা হয় নাই। অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বাস্তুর আগমন চলিতেই থাকিবে। ভারতের শাসকবর্গেরও ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নতুবা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের সুব্যবস্থা হওয়াও সম্ভব নয়।" —দৈনিক বসুমতী।

আমরা কে ও কি?

"স্বাধীনতা লাভের পরে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে অনেককেই অনেক সময় এইরূপ মন্তব্য করিতে দেখা যায় যে, ইহাই যদি না হইল তাহা হইলে কিসের স্বাধীনতা? কিন্তু নিজেদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপারে এই আলোচনা তেমন প্রবল হয় না। রাস্তায় আমের খোসা, কলার খোসা যেখানে-সেখানে ফেলিয়া প্রতিদিন কত লোক যে কত পথচারীর বিপদ ঘটাইতেছেন, নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা না ফেলিয়া অযথা রাস্তা নোংরা করিতেছেন, কাগজে ময়লা জড়াইয়া না দেখিয়া পথিকের মাথায় ছুঁড়িতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করে? বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ, রাত্রিকালে বিনা আলোয় সাইকেল চড়া, ঢিল মারিয়া ল্যাম্প-পোষ্ট বা আলোর কাচ নষ্ট করা, ট্রাম-বাসের গদি কাটা, নাম খোদাই করা, দেয়ালের গায়ে পানের পিক্ ফেলা, আলকাতরা, কালি বা গোবর দিয়া নূতন চূণকাম-করা বাড়ী বিশ্রী করিয়া দেওয়া ইত্যাদি কত প্রকারের অসতর্কতা ও অশিষ্টতা যে আমাদের জীবনে আছে তাহা কাহারো অজানা নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে খবর বাহির হইয়াছিল যে, নূতন বরকে ঠাট্টা করিতে গিয়া কয়েকটি মেয়ে রসগোল্লার মধ্যে আলপিন পুরিয়া বরকে উহা গিলিয়া ফেলিতে বলিয়াছিলেন, বর তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছেন। এখন আবার কাটিহার হইতে খবর আসিয়াছে যে, বরের গলায় ব্যাঙের মালা পরাইয়া ঠাট্টা করায় বরযাত্রীরা চটিয়া যায়, কিন্তু রসিকপ্রবরেরা তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া বরযাত্রীদেরও সেই মালা পরাইবার হুমকি দেখাইলে যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, তাহাতে বকাবকি ও কটূক্তি-বিনিময় এত তিক্ত হইয়া উঠে যে, বর কনেকে তাহার সহিত লইয়া যাইতে অস্বীকার করে। অবশেষে পুলিশ ডাকা হয়। আদিম, অসভ্য যুগের এই সকল বর্ব্বরতা এখনও দূর হইতেছে না কেন? কন্যাপক্ষের দান-সামগ্রীর অপ্রাচুর্য্যে, পাল-পার্ব্বণে তত্ত্বের জিনিসপত্রে অল্পজৌলুসের অভিযোগে এখনও বধূ-নির্যাতন ও তাহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চলে কেন? সামাজিক ব্যাপারে অসামাজিকতা, অশিষ্টাচার, রসিকতার নামে বদরসিকতা বা মারাত্মক আচরণেরও নিশ্চয়ই অবসান হওয়া উচিত।"—যুগান্তর।

শৈল-বিহার

"গ্রীষ্মকালে মন্ত্রীদের শৈলবিহার আগে হইতেই শুরু হইয়াছিল, এবার সরকারী কর্মচারীদের পালা। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তর প্ল্যানিং কমিশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন, পাঁচ শত টাকার কম মাইনে পায় এমন প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর কোনো না কোনো শৈলাবাসে ছুটি কাটাইতে সমর্থ হওয়া উচিত। খরচা বেশী হইবে না—এই বিশ-ত্রিশ লাখ। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে সমস্ত সহস্র সহস্র সরকারী কর্মচারী উপকৃত হইবেন, তাঁহাদিগকে ঈর্ষা করিব এমন অনুদার আমরা নই। অধিক সংখ্যক লোক বৎসরের পর বৎসর শৈলবিহারে গেলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকতর অর্থোপার্জনের সুযোগ পাইবেন, ইহাও ভাল কথা। কিন্তু কল্যাণরাষ্ট্র সম্বন্ধে অনেকের মনে এই ধারণা এখনো বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, উহার কল্যাণ কোনো শ্রেণীবিশেষের জন্য নয়, উহার আশীর্বাদে সূর্যের রৌদ্র, আকাশের বায়ু ও বৃষ্টির জলের মত সকলের সমান অধিকার। এই ধারণা একেবারে মিথ্যা না

হইলে এমন সন্দেহ অন্যায় নয় যে, শুধু এক শ্রেণীর কর্মচারীদের কোনো বিশেষ সুবিধা দানের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসাম্যের ইঙ্গিত আছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

গিয়াংসি দিবস উপলক্ষে

"সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ব্যারাকপুরের গোর্খা রাইফেল বাহিনী গত ৬ই জুলাই তারিখটি 'গিয়াংসি দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন করিয়াছে। এই উপলক্ষে ব্যারাকপুরে একটি মেলা এবং বিবিধ আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। "গিয়াংসি দিবসের" ইতিহাসটি নিম্নরূপ। গত ১৯০৩ সালে বৃটিশ সেনাপতি ইয়ং হাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে এক দল সৈন্য তিব্বতের উপর আক্রমণ চালাইয়া গিয়াংসির দুর্গটি দখল করে। বৃটিশ যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তিব্বতে যে অভিযান চালান হইয়াছিল, তাহাতে "ভারতীয় সেনা-বাহিনী"র কয়েকটি গোর্খা বাহিনীও যুক্ত ছিল। গোর্খ বাহিনীর এই তিব্বত আক্রমণের ঘটনাটি মোটেই কোন মহান বা গৌরবোজ্জ্বল কাজ নয়। বৃটিশের পররাজ্য গ্রাসের সঙ্গে "ভারতীয় সেনাবাহিনী" নামধারী সৈন্যদলের একটি গোর্খা অংশ যে তাহাতে যুক্ত ছিল, তাহাই পরম লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। তখন হয়ত ইহার প্রতি-বিধানের উপযুক্ত সময় আসে নাই। কিন্তু আজ কেন স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের স্বাধীন সৈন্যবাহিনী সেই কলঙ্ক-মলিন কাজকে উপলক্ষ করিয়া ঘটা করিয়া উৎসব অনুষ্ঠান করে, সেই পররাজ্য গ্রাসের অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জীবিত কয়েক জনকে সাদরে আহ্বান করিয়া সম্মান ও অভ্যর্থনা জানায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য!" —স্বাধীনতা।

রেলমন্ত্রীর কলিকাতা আগমন

"রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কলিকাতা আসিয়াছিলেন। উত্তর-কলিকাতা কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি বাঙ্গালীর সুখ্যাতিতে মুখে তুবড়ী ছুটাইয়াছেন কিন্তু কাজে এই দুই দিনে অনেক অনিষ্ট পাকা করিয়া গিয়াছেন। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বিরাট জনসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। ঐ সভায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেবজ্যোতি বর্ম্মণকে নাগরিক প্রতিনিধিরূপে রেলমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ তো করেনই নাই, তাঁহারা কখন দেখা করিবেন জানিতে চাহিলে তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। বারাসত-বসিরহাট রেল সম্বন্ধে তিনি একটা মৌখিক আশ্বাস মাত্র দিয়া গিয়াছেন, নূতন লাইন তৈরি না হওয়া পর্য্যন্ত পুরানো লাইনটি চালু রাখিবার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের কলিকাতা আফিসগুলি তুলিয়া দেওয়া সম্বন্ধেও কোন সুস্পষ্ট কার্য্যকরী ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাঙ্গালী কত অসহায় হইয়া পড়িতেছে এই সব ঘটনায় তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

নিজের চরকায় তৈল দে

"আজ আমাদের শান্তির অগ্রদূত প্রধান মন্ত্রী মহোদয় দেশ-বিদেশে যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়া শান্তির বার্ত্তা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার নিজের শাসিত দেশে অর্থোপার্জ্জনের লালসায় চুয়াল্লিশ ইঞ্চি দশ গজ নামধারী অসাধু কোম্পানি মানুষকে ভেজাল খাওয়াইয়া তিলে তিলে হত্যা করিয়া মাত্র হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়া রেহাই পাইতেছে! বাঙলার কবির বড় দুঃখে রচিত গানটি এই সময় গাইলে ঠিক মানায়—"

"একবার ঘরের পানে তাকা
এ যে কফ-ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর মাখা!"

—ফরিদপুর সংবাদ।

সিউড়ীতে বিজলী-ব্যবস্থা

"'খাবা ভাত খা'—না আঁচাব কোথা?—সিউড়ীর ইলেকট্রিক কোম্পানি সরকারী জঠরে এল, আশা করিয়াছিলাম তাহার জনমের মহালগ্নে আর যাই হোক, সুচারু হাসির মত,—স্বচ্ছন্দ আলোর হয়তো কোন অভাব হইব না। কিন্তু ভগবান নারাজ, আমাদের ভাগ্য খারাপ! আজও ভোল্টেজ কখনও ঠিক নয়; বহু বাম ফিউজ (রাস্তার), অনেক পোষ্ট পথিকের চলাচলের পক্ষে আতঙ্কজনক, বাড়ীতে ফ্যান চলে না, রেডিওর অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়! আমরা ভাবি অন্নদাশঙ্করের কথায়:

"তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর ওপর রাগ করো
আর, তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো'
তার বেলায়?—"

—বীরভূম বার্ত্তা।

ডাক বিভাগের গাফিলতি

"সহরে টেলিগ্রাম বিলির ব্যাপারে ইদানীং কতিপয় গুরুতর অভিযোগ আমাদের কাছে আসিয়াছে। আমরা মাত্র একটি অভিযোগ জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি। গত ১১|৬|৫৫ ইং তারিখে সকাল ১০ টায় করিমগঞ্জ, 'রমণী রায়' খলাছড়া, ৪নং ওয়ার্ড" ঠিকানায় একখানা এক্সপ্রেস রিপ্লাই পেইড টেলিগ্রাম কানপুর হইতে আসে। রমণী বাবুর জামাতা তাঁহার অসুস্থ পুত্রের অবস্থা টেলিগ্রামে জানিবার জন্য উক্ত এক্সপ্রেস টেলি পাঠান। কিন্তু উক্ত টেলিগ্রাম ঐদিন তো বিলি করা হয়ই নাই, পর দিন বিকাল ২টায় উক্ত টেলিগ্রাম মালিককে দেওয়া হয়। ২৮ ঘণ্টা দেরিতে উক্ত টেলিগ্রাম বিলির কারণ লিখিতে গিয়া পিওন লিখিয়াছে "মালিক পরিচয় করিতে পারি নাই।" পুরাপুরি ঠিকানা আছে, তদুপরি রমণী রায় বহু বৎসরের বাসিন্দা। বড় রাস্তার উপরে তাঁহার একটা ষ্টুডিও আছে। কিন্তু তবু পিওন মালিক পরিচয় করিতে পারে নাই?" —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

যক্ষ্মার প্রসার

"পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও দেশের দারিদ্র্যতার জন্য যক্ষ্মা রোগের প্রসার ঘটিতেছে। অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশও এই রোগ বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। সারা ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে এক জন করিয়া লোক এই রোগে মারা যায়। বহুদূরে জ্ঞান

যায়, বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে শতকরা প্রায় ১জন, ছোট ছোট সহরে শতকরা ১ হইতে ৩ জন এবং বড় সহর আর কলকারখানা সন্নিহিত অঞ্চলে শতকরা ৩ হইতে ৮ জন লোক যক্ষায় ভুগিতেছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই যক্ষারোগীর সংখ্যা ৭৫ হাজার দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আসার ফলে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা সহর-মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই এই রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" —নীহার (কাঁথি)

বাঙলায় সর্পদংশন

"প্রতি বৎসর সুদূর পল্লীগ্রামে ও মফঃস্বলে বহু লোক সর্পাঘাতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাংলা দেশেই নাকি সর্পাঘাতে মৃত্যু সর্ব্বাধিক বলিয়া প্রকাশিত। আজ এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। জনসাধারণ সর্পাঘাতের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত না থাকায় সাধারণতঃ সনাতন পদ্ধতি অনুসারে ওঝা ঝাড়ফুঁকের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে 'এ্যান্টিভেনম' ইনজেকশান প্রচলিত আছে, উহা সাধারণতঃ খরচ-সাপেক্ষ ও উহার সাফল্য সম্পর্কেও অনেক চিকিৎসকও সংশয়াপন্ন। বৈজ্ঞানিকগণ কয়েকটি হাইড্রোজেন বোমার-দ্বারা বিশ্ব ধ্বংসের আস্ফালন করিতে পারেন অথচ সর্পবিষ হ'তে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়!" —ভাগীরথী (কালনা)।

পৈশাচিক দৃশ্য

"গত সোমবার সহরের ষ্টেশন-রোডে এক পৈশাচিক দৃশ্য মানুষ দেখিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে একটি লোকের হাতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া একখানি ট্রাকের পিছনে আটকাইয়া ট্রাকখানি জোরে চালান হয় এবং হাত-বাঁধা অবস্থায় লোকটি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া চিৎকার করিয়া ট্রাকের পশ্চাতে দৌড়াইতে বাধ্য হয়। এই ভাবে ষ্টেশন হইতে রবীন্দ্রনাথ সিকদারের বাসা পর্য্যন্ত আসিলে ট্রাকটিকে থামিতে বাধ্য করা হয় এবং লোকটিকে মুক্ত করা মাত্র ট্রাকের ড্রাইভার ও আরোহিগণ পলাইয়া যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, এই হতভাগ্য লোকটিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া কয়েক জন ড্রাইভার তাহার শাস্তির এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। লোকটিকে সন্দেহ করিয়া তাহারা ধরে ও বেদম প্রহার করে এবং এই ভাবে সহরের পথে ট্রাকের পিছনে বাঁধিয়া সহর প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা করে। ইহারা নাকি ঘটনার দুই-এক দিন পূর্ব্বে অপর এক ব্যক্তিকে চোর সন্দেহে তাহার গলায় গরম লোহার শিক দিয়া পোড়াইয়া দেয়। এই সকল ড্রাইভারদের এত দুঃসাহস সহরের উপর আসিল কোথা হইতে? চোর সন্দেহে শাস্তির এই অভিনব পন্থা সাংঘাতিক কথা! গুণ্ডা-দমন আইন কেবল মহানগরী কলিকাতা রক্ষার জন্যই রহিয়াছে আর মফঃস্বলের জন্য আছে নীতি ও আদর্শের বুলি।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

সুদখোরের অত্যাচার

"জামসেদপুরের নাগরিক জীবনে সুদখোরী এক চরম অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিতান্ত পরিচিত ক্ষেত্রে এই সুদের হিসাব প্রতি মাসে টাকায় এক আনা অর্থাৎ বাৎসরিক শতকরা ৭২ টাকা হইলেও সাধারণতঃ এই রেট প্রতি মাসে টাকায় দুই আনা হইতে চার আনা। অবশ্য আইনকে ফাঁকি দিবার জন্য এই সব সুদখোরদের যথোপযুক্ত ছাপা রসিদ বহি ইত্যাদি রহিয়াছে। যে কোন কারখানার গেটে দাঁড়াইলে ইহাদের প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্য প্রত্যক্ষ করা যায়। আর ইহাদের সংখ্যাও বিরাট। স্থানীয় মহকুমা শাসকের অফিসে ইহাদের দীর্ঘ তালিকা দেখিলে ভয়াবহ বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কি এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না?"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

শোক-সংবাদ

ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় গত ২১শে জুন বুধবার অপরাহ্ণে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ১৯০৬ সালে এল এম এস ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইহার পরে তিনি এম আর সি ও জি (লণ্ডন) ও এফ এস এম এফ (বেঙ্গল) ডিগ্রীতে ভূষিত হন। তিনি স্যার কেদারনাথ দাসের ছাত্র ছিলেন এবং চিকিৎসক সমাজে স্বীয় প্রতিভায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে প্রথমে তিনি বি এম এস এ যোগদান করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি ইহা ত্যাগ করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গত ৬ই জুলাই বুধবার সকাল ৭-১৫ মিঃ সময় গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব 'আর্ট এণ্ড ক্রাফ্‌টের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার বাসভবনে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর তৃতীয় পুত্র। ১৯২৩ সালে চক্রবর্ত্তী অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার (মসুলিপটম) কলা বিভাগের পরিচালকরূপে যোগদান করেন।, উক্ত স্থানে দুই বৎসর কাজ করার পর তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। পর বৎসর তিনি সরকারী আর্ট স্কুলের (বর্ত্তমান কলেজ) প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি উক্ত কলেজেরই অস্থায়ী অধ্যক্ষরূপেও কাজ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী পলিটেকনিকের কলা বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে কাজ করেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদ ও প্রচার-দপ্তরের প্রকাশ বিভাগের প্রধান শিল্পীর পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

পত্রিকা সমালোচনা

জ্যৈষ্ঠ (১৩৬২) সংখ্যায় 'রঙ্গপট' বিভাগে অভিনয়-শাস্ত্রের নানা দিক সম্বন্ধে যে আলোচনা সুরু করেছেন—সত্যই অতুলনীয়। ওটার অভাব এতো প্রবল যে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত পাঠক-পাঠিকার তরফ থেকে আরো বিস্তারিত ভাবে ক্রমশঃ আলোচনা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 'রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের হিড়িক' এর মতো নির্ভীক জিজ্ঞাসা পত্রিকার সুষ্ঠুতারই পরিচায়ক। 'সেক্সপীয়র প্রসঙ্গ' ও 'অল্প খরচায় ব্যবসা' আরো একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে পাঠক-পাঠিকার অশেষ উপকার সাধন করুন। 'তিন খণ্ডের সূচী'র আমিও সমর্থন করি। কারণ, অসুবিধাটা তো বড় কম ভোগ করি না। শ্রীমিত্রা চট্টরাজ। গ্রাঃ নং 50524. পুরন্দরপুর, বাঁকুড়া।

আমার মনে হয়, 'মাসিক বসুমতী' বাংলা—তথা ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত এবং শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। আসর গরম করবার ক্ষমতা এর সর্বজন-স্বীকৃত। কারণ, এর মধ্যে এমন কতকগুলি বিভাগ রয়েছে যা আধুনিক যুবক, যুবতী থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। বসুমতী আমাদের খুবই আনন্দ দেয় আর আনন্দ দেয় বলেই গত ছ' বছর ধরে আমরা এর নিয়মিত পাঠক। বড়দের তো বটেই, এমন কি বাড়ীর পাঁচ বছরের বাচ্চাটাও আপনাদের সুপরিকল্পিত রং-বেরঙের প্রচ্ছদ পট দেখে ছুটে আসে। মাস কবে শেষ হবে, আবার কবে নূতন বসুমতী পাব, এই আশায় হাঁ করে পথ চেয়ে বসে থাকি। খেলার বিভাগ আবার খুলেছেন, এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের পত্রিকা ক্রমশঃ উন্নতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করুক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, গ্রাম ভোটগ্রাম, জেলা হুগলী।

এই বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "দ্বিতীয় মহাযুগে পায়রা" (২০৮ পাতায়) নামক সংগ্রহটিতে দেখিলাম যে, লেখা রহিয়াছে পায়রা-দিগকে "ভিক্টোরিয়া ক্রশের" বদলে "Dickin Medal" দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু উহাতেই দেখিলাম যে, "উইন কি" নামক পায়রাটিকে প্রথম "চিকিন মেডাল" দেওয়া হইয়াছে। Dickin Medal কে বাংলায় "ডিকিন মেডালের" পরিবর্তে "চিকিন মেডাল" লেখা হইয়াছে কেন? ইহা কি ছাপার ভুল না ছুটোই আলাদা কথা, তাহা জানাইবেন। "প্রতাপ সিংহ" যদি প্রতাপই হন, তবে লেখক কেন প্রতাপকে কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, দয়া করিয়া তাহা জানাইবেন। কতেনগরের লেখক বিক্রমাদিত্যের আসল নাম কি? দয়া করিয়া তাহা জানাইবেন। কুমারী বিষ্ণুপ্রিয়া সিংহ, নস্কর পাড়া রোড, ঘুশুড়ী, হাওড়া।

[ছাপার ভুল। ডিকিন মেডেলই হবে। কোন ছদ্মনামধারী লেখকের আসল নাম আমরা সাধারণ্যে ব্যক্ত করতে পারি না।—স]

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু (মাসিক বসুমতী)

মাসিক বসুমতী বিবিধ রকমের বিষয়ের ওপর রচনা-সম্ভারে কাগজটি সমৃদ্ধ। এতে সকল রকম রুচির খোরাক আছে। উপন্যাসগুলি আরও একটু বেশি করে থাকলে ভালো হয়। বিদ্যাসাগরের ওপর ধারাবাহিক প্রবন্ধটি মূল্যবান। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রী মানবেন্দ্র পাল রচিত 'বাধা' গল্পটি নতুন ধরণের। খুব ভালো লাগলো। দীপিকা সান্যাল (কালনা)

[আমাদের উপন্যাস রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।—স]

১৩৬১ সনের পৌষ মাসের "মাসিক বসুমতী"তে দেবেশ দাশ লিখিত "রাজসী" নামক প্রবন্ধে ৪২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "মহবৎ খান ছিলেন খাঁটি মেবারী। রাণা প্রতাপের বড় ভাই সাগর সিংহের ছেলে মহীপৎ। * * তিনি ধর্ম্মও ছেড়েছিলেন, আর দেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।" কিন্তু "An Advanced History of India"তে (First edition 1946, reprinted 1948) ৪৮১ পৃষ্ঠায় Dr Kalikinkar Dutta লিখেছেন যে "An Afghan by birth, Mahabat Khan held only a 'mansab' of 500 in the beginning of Jahangir's reign." আমার মনে হয়, কালীকিঙ্কর দত্ত যা লিখেছেন, সেটাই ঠিক, কেন না মহবৎ খান সম্বন্ধে ঐ মত আমি আরও অনেক ইতিহাস বইতে দেখেছি। শ্রীসতীকিঙ্কর চন্দ্র। (মেদিনীপুর)।

"মাসিক বসুমতী"র প্রত্যেক পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে "মাসিক বসুমতী" কথাটি মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহা অসুবিধা জনক, যেহেতু নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি খুঁজিয়া লইতে কষ্ট হয়। অন্যান্য মাসিক পত্রিকার ন্যায় যদি বাম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে "মাসিক বসুমতী" ও দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ ইত্যাদির নাম উল্লিখিত হয় তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকাদের খুব সুবিধা হয় ও কষ্টের লাঘব হয়। প্রস্তাবটি আশা করি, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মজুমদার। হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

[আপনার প্রস্তাব আমাদের বিবেচনাধীন আছে।—স]

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত দেবেশ দাশের 'রাজসী' প্রবন্ধে ২৮৩ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের নীচের দিকে রয়েছে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির আর দুর্য্যোধন দু'জনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন•••শ্রীকৃষ্ণ ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলেন যুধিষ্ঠিরকে। ওটা যুধিষ্ঠিরের স্থানে অর্জ্জুন হবে। মহাভারতে রয়েছে, যুদ্ধের আগে অর্জ্জুন আর দুর্য্যোধন গিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে। শ্রীরাধাবিনোদ মাহান্তো, গ্রাহক নং (এম ৫০৬০৫)

[লেখকের এই ভুল শোধনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।—স]

"পাঠক-পাঠিকার চিঠি" বিভাগ প্রবর্ত্তন করিয়া পাঠক-সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগটি আপনাদের নির্দ্দিষ্ট সূচীপত্রের মধ্যে স্থান দিলে বিশেষ উপকার হয়। কারণ, এই বিভাগ বৈশাখ মাসের সংখ্যায় পুস্তকের বিজ্ঞাপন বিভাগের মধ্যে থাকায় এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শেষের পাতায় অর্থাৎ separately পাতায় প্রকাশের জন্য বই বাঁধাই করার সময় বাদ পড়িয়া যাইবে। "পাঠক-পাঠিকার চিঠি" বিভাগের মধ্যে অনেক কিছু জানিবার ও

লেখবার থাকে। শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায় গ্রাহক নং (৪৮১৮০) আমতা' হাওড়া।

[আপনার প্রস্তাব আমাদের বিবেচনাধীন আছে।—স]

মাসিক বসুমতীর চার জনে যাঁরা ভারতে আছেন এমন বাঙালীর পরিচয়ই পাই, কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যাঁরা আছেন তাঁদের পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত। যদি আপনাদের প্রতিনিধির পক্ষে পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে কোন পাকিস্তানের বাসিন্দাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পরিচয় সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা কবি জসিমউদ্দিন থেকে সুরু করে ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ শহিদুল্লা, বিজ্ঞানী ডাঃ কুদরতই খুদা, নেতা আপ্রকউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাণকুমার সেন সম্পর্কে সমান উৎসুক। মাসিক বসুমতীতে অনুবাদ লেখা থাকেই। অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য থেকে বাংলা ভাষাতে অনুবাদ-গ্রন্থ খুবই কম পাওয়া যায়। উর্দ্দু ও হিন্দি থেকে কয়েকখানা বই অনুবাদ করা হোয়েছে; অথচ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, মারাঠী এবং আমাদের প্রতিবেশী অসমিয়া, ওড়িয়া ভাষা থেকে কোন অনুবাদ দেখি না। মাসিক বসুমতীতে যদি ভারতীয় ভাষা থেকে অনুবাদ-উপন্যাস, ছোট গল্প প্রকাশ করেন তাহ'লে এ বিষয়ে আপনারা অগ্রণী হোয়ে থাকবেন। 'খেলা-ধূলা' এবং 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগ চালু হওয়ায় অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বৈদ্যনাথ মৈত্র (এম ৪৮১১০) পাট্রাতু, হাজারীবাগ।

[পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কৃতী বাঙালীর পরিচয় চার জন বিভাগে নিশ্চয়ই প্রকাশ করা হবে। এজন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীদের নিকট থেকে সহযোগ প্রার্থনা করি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে বাঙলায় অনুবাদ-গল্প ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হবে।—স]

যৌনতত্ত্বের লেখা ও আলোচনা

মাসিক বসুমতীর আমি একজন নিয়মিত পাঠিকা। সামনে হকার আছে বলেই গ্রাহিকা হই নাই। শীগগির বই পেয়ে যাই। গ্রাহিকা না হলেও মাসিক বসুমতীর যে কোন বিভাগে যোগদান করার অধিকার আছে। বসুমতীতে প্রায় সব রকমের রচনা বাহির হয়। কিন্তু শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে কোন কিছু প্রকাশ করেন না। যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কচিৎ দু'-একবার প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যৌন-বিজ্ঞানের নাম শুনলে অনেকে নাক সিঁটকিয়ে উঠেন কিন্তু যৌন-বিজ্ঞান আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার বস্তু। যৌন-বিজ্ঞানে অজ্ঞতা থাকার জন্য অনেক কুমারীর জীবনে বিষময় ফল ঘটে গেছে। আশা করি আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না। যৌন-শারীর-বিজ্ঞান (Sex physiology) সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একটা বইও চোখে পড়ল না। আপনি পাঠক-পাঠিকার চিঠি কলমে জানাবেন কি? অনেকেরই বিশেষ উপকার হবে আশা করি। মায়ারাণী পাল। মেদিনীপুর টাউন)।

[যৌনতত্ত্বের লেখা প্রকাশ করতে হ'লে পাঠক-পাঠিকার মতামত মানতে হয় নিয়মিত। আপনি হয়তো জানেন না, বাঙলা ভাষায় অধুনা অনেকগুলি যৌনবিষয়ক সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। যে কোন পাঠাগারের পুস্তক-তালিকা দেখলেই দেখতে পাবেন। —স]

শান্তিনিকেতনের ভাস্কর্যমূর্ত্তি

কৌতূহলী আছি, যদি সন্দেহ নিরসন করতে পারেন তো বাধিত হই। শান্তিনিকেতনে রাস্তার ধারেই একটি মূর্ত্তি আছে সাঁওতাল-দম্পতির। পুরুষটির কাঁধে বাঁক ঝোলানো এবং তাতে তাদের শিশু সন্তান বসে। আমার যতো দূর ধারণা যে, ঐ মূর্ত্তিটি একটি ঝড়ে পড়ে-যাওয়া গাছের উপর প্লাষ্টার করা এবং একজন নামী শিল্পীরই কীর্ত্তি এটা। কিন্তু অনেকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই বলছেন যে মূর্ত্তিটি নিছকই মূর্ত্তি হিসেবেই তৈরী। কোনও কিছুর উপর প্লাষ্টার করা নয়। যাই হোক, এ বিষয়ে যদি কিছু জানাতে পারেন তো বাধিত হবো। "সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা" খুব ভাল লাগছে। 'রাক্ষসী', 'চিত্র-বিচিত্র' 'বিবেকানন্দ স্তোত্র,' 'অবনীন্দ্র-চরিতম্' প্রভৃতি লেখাগুলি কবে বই আকারে বের হবে সেই প্রত্যাশায় আছি। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রাঃ নং ৪৮৪১৪।

[এ মূর্ত্তিটি সম্পর্কে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিচালকদের সঙ্গে পত্রালাপ করুন। রাক্ষসী শীঘ্র প্রকাশিত হবে। অন্যান্য লেখাগুলি আগে শেষ হোক।—স]

হুইলার ষ্টলে মাসিক বসুমতী

এ, এইচ, হুইলার ষ্টলে অনেক ভাল ভাল পত্রিকা থাকে। থাকে না একমাত্র বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা মাসিক বসুমতী—আমার মনে হয়, "বসুমতী" যদি ষ্টলে থাকে তবে সব পত্রিকার আগেই বসুমতীর বিক্রী হবে বেশী। এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়কে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। বহু দিন যাবৎ বসুমতীতে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই, একখানা ভাল নাটক বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশের নিবেদন জানাইয়া পত্র শেষ করিলাম। শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায়, পরিচালক—কালাচাঁদ লাইব্রেরী, মেদিনীপুর।

[রেল-ষ্টেশনের ষ্টলে বসুমতী না পেয়ে আপনার মত অনেকেই অভিযোগ করেন। হুইলারের ষ্টলে মাসিক বসুমতী না পাওয়ার কারণ আছে। হুইলার কমিশন চান অসাধারণ ও অধিক। অবিক্রীত পত্রিকা জীর্ণ অবস্থায় ফেরৎ দেন। আমরা মনে করি, বাঙলা সাময়িক পত্রিকা বিক্রয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি নেই হুইলারের। নাটকের পাঠক নেই।—স]

কারাবরণের প্রতিবাদ

গত বৈশাখ সংখ্যায় সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমার যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে, তার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমার কারাবরণের যে কথা আপনি লিখেছেন, তা ঠিক নয়। আমার নামে অভিযোগ করা হয়েছিল ঠিকই, জনৈক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে দণ্ডিতও করেছিলেন; কিন্তু মাননীয় বিচারপতি কে, সি চন্দ্র সে দণ্ডাদেশ নাকচ করে পুনর্বিচারের নির্দ্দেশ দেন। দু'-তিন দিন পুনর্বিচারের প্রহসন চলবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে আদালতে দরখাস্ত করে এ মামলা আর না চালাবার আবেদন করা হয় এবং মামলা উঠিয়ে নেওয়া হয়। দয়া করে আমার এই চিঠিখানি প্রকাশিত করে বাধিত করবেন।

—সুনীলকুমার ধর, (কলিকাতা—২৮)

[প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাদেশের সংবাদই আমরা পাই। তত:পর দণ্ড নাকচ হওয়ার সংবাদ জানা ছিল না।—স]

পেখম ধরে কে ? ময়ূর না ময়ূরী ?

মাসিক বসুমতীর "পাঠক-পাঠিকার-চিঠি" শীর্ষক বিভাগের দ্বারা পাঠকবর্গ যে বিশেষ ভাবে উপকৃত, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আপনার পত্রিকার মাধ্যমে বহু জটিল সমস্যার সমাধান পেয়ে পাঠকবর্গ ধন্য হবে। আশা করি, আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর মাসিক বসুমতীর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করে আমাকে ও পাঠক-পাঠিকাকে উপকৃত করতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

"ময়ূর ও ময়ূরীর মধ্যে পেখম ধরে কে ?"

আমার জানা আছে যে, পশু-পক্ষীর মধ্যে পুরুষ জাতিই অধিকতর সুন্দর, কিন্তু ময়ূরের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। কিন্তু ছোট বেলায় বইতে ছবি দেখেছি, পেখম ধরে দাঁড়িয়ে আছে—নীচে লেখা "ময়ূর"। এ বিষয় নিয়ে আমি বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর দুই রকমই পাওয়া গেছে। কতক লোকে বলে ময়ূর দেখতে সুন্দর, তারই দীর্ঘ পুচ্ছ আছে, সেই-ই পেখম ধরে। আবার অনেকেই বলে ময়ূরীই দেখতে সুন্দর এবং তারাই পেখম ধরে। শ্রীনারায়ণচন্দ্র নন্দী (47828)। ইকড়া, বর্দ্ধমান।

[উত্তর কখনও দুই রকমের হয় না। যাই হোক, নিশ্চিত জানবেন, ময়ূর পেখম ধরে, ময়ূরীর পেখম থাকে না।—স]

ধর্ম ও দর্শনের সাময়িক পত্র

আমি "মাসিক বসুমতী"র নিয়মিত পাঠক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, বাঙলা দেশের যে ৩.৪ খানি উচ্চাঙ্গের ধর্ম ও দর্শনমূলক মাসিক বা দ্বৈমাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, পর পর ১, ২, ৩, ৪ করিয়া সাজাইয়া দিয়া আগামী "বসুমতী"তে (পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে) প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব। শিবকুমার দাশগুপ্ত ১১এ, হরলাল দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৪

[বাঙলা দেশে উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্রিকাই অধিক নেই। ধর্ম ও দর্শনের পত্র-পত্রিকা দূরের কথা। একমাত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি মনে হয় উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিচেরী আশ্রমের 'বর্ত্তিকা,' ব্রহ্ম-বেদান্ত-আশ্রমের 'বিশ্ববাণী'র নাম করছি।—স]

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাংলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা ছড়িয়ে আছে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ায়। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাব। গত সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব ; সে জন্য বর্ত্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন-লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

I shall thank you to enlist me as a subscriber for one year beginning with the first issue of the current volume of the Bengali Monthly Magazine "Basumati" and send all issues already published by V. P. P. covering one year's subscription per return to me at the above address.

Mrs. Sukumari Dey.
Navsari (Surat.)

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা প্রেরিত হইল। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—শ্রীমুরারিমোহন মৈত্র। বিলাসপুর, সি, পি।

আপনার মাসিক বসুমতী পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য বাৎসরিক সমুহ চাঁদা পাঠাইলাম। চলতি সনের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক পত্রিকাটি পাঠাইবেন। ইতি—গঙ্গাধর মান্না, বনমালি চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুর।

Sent Rs 5/ Five only. বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চার মাসের চাঁদা পাঁচ টাকা দেওয়া হইল। আমি পুনরায় মাসিকের চাঁদা পাঠাইতেছি। Mol M. Islam বীরভূম।

With reference to your Card No. 47440 d/ 27. 6. 55. I am remitting herewith Rs. 15/- being my annual subscription for the monthly Basumati. Please acknowledge receipt and send the Monthly Basumati regularly.

M. Das. Jabbalpur. U. P.

মহাশয়, আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে এক বৎসরের জন্য চাঁদা পাঠাইলাম। আমার গ্রাহক নম্বর ৩৩৭০ শ্রী বি, এন, দাস। মানভূম।

মাসিক বসুমতীর জন্য ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৭৷০ সাড়ে সাত টাকা মনি অর্ডার করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিয়মিত ভাবে পত্রিকাখানি ডাকযোগে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি।—শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠাগার, কৈচর, বর্দ্ধমান।

Half-yearly subscription remitted. Delay is due to closer for Summer Vacation. Bhebia High School. 24 Pargs. Subs. No 40796

বসুমতীর ষাণ্মাসিক সভ্য হইবার জন্য ৭৷০ পাঠাইলাম। যদি বৈশাখ সংখ্যা পাঠাইতে পারেন, তবে বৈশাখ হইতেই গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। শ্রীশ্যামসুন্দর কাঞ্জিলাল, হাজারীবাগ।

মহাশয়, গ্রাহক নং ৩১৭১৩ ৫, ৭, ৫৫, জন্য এই বছরের মাসিক বসুমতীর ১৭৲ টাকা পাঠাইলাম। আমার নূতন ঠিকানা দয়া করিয়া লিখিয়া লইবেন। বাণী রায়, নিউ দিল্লী-১৩।

গ্রাহিকা হইবার জন্য ১৫৲ টাকা চাঁদা পাঠাইলাম। শ্রীমতী সরযু ঘোষ, নিউ দিল্লী।

জগৎ জোড়া পাখীর মেল

শ্রীগোপাল ঘোষ অঙ্কিত

মাসিক বসুমতী
শ্রাবণ, ১৩৫২

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৪শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬২] (স্থাপিত ১৩২৯) [প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "কালীঘরের সাম্‌নে শিখ্‌রা বলেছিল,—ঈশ্বর দয়াময়। আমি বললাম,—দয়া কাদের উপর? শিখ্‌রা বললে,—কেন মহারাজ! আমাদের সকলেরই উপর। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্ত এতো জিনিষ তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা কচ্চেন। আমি বললাম,—তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন,—তা এতে কি বাহাদুরী? আমরা সকলে তাঁর ছেলে, ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখছেন—তা তিনি দেখবেন না তো বামুনপাড়ার লোক এসে দেখবে? তবে কি তাঁকে দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ তাঁকে সবই বলতে হয়। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়, আমরা খুব দূরের লোক—পরের ছেলে।"

"কি অবস্থাই গেছে! কোয়ার সিং সাধুভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ করলে। গিয়ে দেখলাম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসলে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। যাই জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা বসতে গেলাম। ভাবলাম অত খবরে কাজ কি! তার পর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বলতে বলতে আমি আগে খেতে লাগলাম। সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগলো শুনতে পেলাম—আরে, এ কেয়ারে!"

"চানকের পল্টনের ভিতর ইংরেজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম করলে। কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, ইংরেজের রাজ্য, তাই ইংরেজকে সেলাম করতে হয়।"

"গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হলো, খানিক খেলাম। মণি মল্লিকের বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলাম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না এলো।"

"ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায় ধ্যান কচ্চি, দেখালে—প্রথম দেখালে অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে; তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দোফরাশ, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শান্‌কি, তাতে ভাত রয়েছে। শান্‌কিতে করে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সেই শান্‌কির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল্লো। সেই শান্‌কি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে ছুটি দিয়ে গেলো! আমিও একটু আস্বাদ করলাম। মা দেখালেন,—এক বই দুই নাই! সেই সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন! তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।"

যুগপুরুষ

বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

চার

জন্ম ও বাল্যকাল

"শকাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক-
ীর প্রথম সন্তান।" শকাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, ইংরেজী
০ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর। বাংলা ১২২৭ সন।

বীরসিংহ গ্রামের নামকরণ কে করেছিল, কেন করেছিল, জানা না। নবযুগের বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর ও পুরুষসিংহের
ি গরীয়সী জন্মভূমি-রূপে ধন্য হবার জন্যই কি গ্রামের নাম
ল বীরসিংহ?

বেলা দ্বিপ্রহরে জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। নবযুগের তখন
ঃকাল, দ্বিপ্রহর নয়। শুধু বাংলায় নয়, সারা বিশ্বে এক বৈপ্লবিক
গের সূর্যোদয় হচ্ছে তখন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।
৭ সালে পৃথিবীর প্রথম লৌহপোত তৈরী হয়েছিল। কিন্তু
১ সালে পৃথিবীর প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোত তৈরী হয় (১)।
থই তখন মানুষের চলাচলের প্রধান পথ, দেশ থেকে দেশান্তরে
অন্যতম পথ। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথও জলপথ।
থে তখনও লৌহ রেলপথ স্থাপিত হয়নি, বাষ্পীয় রেলগাড়ীর
আসেনি। তাই প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোতের আবির্ভাব
বীর ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র
লেন, ১৮২১ সালে এই ঘটনা ঘটল পৃথিবীতে। এক বছরের
চন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে যখন হাটি-হাটি-পা-পা ক'রে চলতে লাগলেন,
র প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোত তখন সমুদ্রপথে নতুন অভিযান
শুরু করল। এ-অভিযান আগের তুলনায় অনেক বেশী গতিশীল।
ীয় যুগে নতুন পথ চলার এই হ'ল সূচনা। বাষ্পীয় লৌহপোত
পথের প্রথম পথিক। আমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র এই নতুন
শীল যুগপথের প্রথম পথিক। আমাদের স্থিতিশীল সমাজে
তিনিই প্রথম গতিশীল বাষ্পীয় লৌহপোত। উভয়েরই তাই বোধ
হয় একই সময়ে আবির্ভাব।

বাষ্পীয় লৌহপোতের সঙ্গে জন্ম হ'ল "স্বাধীন বাণিজ্যনীতির" (Free Trade-এর)। অর্থনীতির ঐতিহাসিকেরা বলেন, ১৮২০ সালই হ'ল স্বাধীন বাণিজ্যনীতির জন্মকাল (২)। ১৮২০ সালে লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা অবাধ বাণিজ্যের পথে যাবতীয় বাধাবিপত্তি অপসারণের জন্য পার্লামেন্টে আবেদন করেন। ঐতিহাসিক আবেদন। নবযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অবাধ বাণিজ্যনীতির রাষ্ট্রিক স্বীকৃতিও একটা যুগান্তকারী ঘটনা। তার পর দেশ থেকে দেশান্তরে বাণিজ্যের বাধাবন্ধনহীন জয়যাত্রার শুরু। দেশের ধন-দৌলতের আদানপ্রদান ও জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির সূচনাও তখন থেকে। ১৮২০ সালের আগে যন্ত্রযুগের যে সব চেয়ে বড় কাজ, উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজ, তার সূত্রপাতই হয়নি বলা চলে। লণ্ডনে বা ল্যাঙ্কাশায়ারে পেশাদার যন্ত্রনির্মাতাদের বা ম্যানুফ্যাকচারারদের আবির্ভাবই হয়নি ১৮২০ সালের আগে। ১৮২০ সালের পর থেকে তাঁদের আবির্ভাব শুরু হয়েছে (৩)। যন্ত্র দিয়ে উৎপাদন-যন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে যেদিন থেকে, সেই দিন থেকে প্রকৃত শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) সূচনা হয়েছে।

---

(১) "...the first iron ship was built in
7, and the first iron steamship in 1821."
umford : Technics and Civilisation : P. 164)

(২) "It is customary to date the movement for free trade from 1820, the year in which the merchants of London presented a Petition for Free Trade; and it is true that after that year free trade doctrine made headway in the country." (C. R. Fay : Great Britain, From Adam Smith to the Present Day : London 1947 : P. 44)

(৩) ..."it was not until the 1820's that professional machine-making firms began to appear in any number either in London or in Lancashire." (Maurice Dobb : Studies in the Development of Capitalism : London 1947 : P. 295)

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সঙ্গে এই সব ঘটনাবলীর যোগাযোগ আপাত-দৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও, ঠিক তা নয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অথবা সামাজিক নীতি প্রবর্তনের তথাকথিত আকস্মিকতারও একটা ইতিহাস আছে। বাইরে থেকে যা আকস্মিক ব'লে মনে হয়, আসলে তা আকস্মিক নয়। ষ্টীমবোট বা বাষ্পীয়-পোত আরও এক শতাব্দী আগে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়নি, অবাধ বাণিজ্যনীতিও প্রবর্তিত হয়নি। তার জন্য একটা সুদীর্ঘ প্রস্তুতির পর্ব থাকা প্রয়োজন, একটা সামাজিক অভাববোধ ও তাগিদের চাপ থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি, অভাববোধ ও তাগিদ থেকেই চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় এবং সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাই থেকে নতুন আবিষ্কারের ইঙ্গিত ও প্রেরণা পান। শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্র ইংলণ্ডে অনেক আগে থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল, মৌলিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও হচ্ছিল, কিন্তু তবু যতদিন না শিল্পোদ্যোগীরা যন্ত্র নিয়ে উৎপাদন-যন্ত্র নির্মাণের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সামাজিক তাগিদের চাপে, ততদিন প্রকৃত শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে এই ঘটনাগুলি কতকটা যেন একসঙ্গে ঘটতে আরম্ভ করল। তার কারণ একটির সঙ্গে অন্যটির যোগসূত্র আছে। বাষ্পীয় লৌহপোতের সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। অবাধ বাণিজ্যনীতি ভিন্ন সেই প্রসার সম্ভব নয়। আবার অবাধ বাণিজ্যনীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হ'লে বাণিজ্যের সামগ্রীর প্রয়োজন। বাণিজ্যের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে হ'লে যন্ত্রশিল্পের বিস্তার প্রয়োজন এবং তার জন্য আবার উৎপাদন-যন্ত্র নির্মাণ করা দরকার। এইভাবে প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, দেখা যায়। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যখন এই ঘটনাগুলি ঘটছে, তখন এক নতুন যুগের সূচনা হ'চ্ছে এবং পুরাতন যুগ অস্ত যাচ্ছে। তার প্রভাব কোন একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। প্রাকৃতিক প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাইরের অন্যান্য দেশেও তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এক নতুন সমাজ ও নতুন জীবন গড়ার চেতনা জাগছে মানুষের মনে। এই পরিবেশে নতুন নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করছে, দেশে দেশে আমাদের দেশেও এই সময় নবযুগের সব নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আগে বিদেশীরা এসে এখানে নতুন জীবনের সঙ্গে, নতুন যুগের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু রচনা করেছিলেন। বিশ্বের অগ্রগতির বার্তাবাহক হয়ে এসেছিলেন তাঁরা। হয়ত অগ্রগতির ক্ষেত্র প্রস্তুতের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা আসেননি, নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁরা যে এসেছিলেন এবং পরোক্ষে দৌত্যগিরি করেছিলেন নবযুগের, এইটাই বড় কথা। সেই দিক থেকে বিচার করলে, আমাদের দেশেও, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে যে নবযুগের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নবযুগের ভারতপথিক রামমোহন রায় এইরকম এক প্রস্তুতির পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু তিনি ন'ন, আরও অনেকে যাঁরা এই সময় জন্মেছিলেন তাঁরাও নতুন যুগের নতুন মানুষের অগ্রগতির পথ তৈরী করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন নবযুগের উদ্‌যোগপর্বের সমাপ্তির শুভক্ষণে। এই শুভক্ষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ বলেই একথা বলা প্রয়োজন। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ' বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করতেন, তা'হলে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হ'তে পারতেন না। অন্য কোন ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ হ'ত, ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়ও হয়ত হতেন, কিন্তু বাংলার বিদ্যাসাগর তিনি কখনই হতেন না। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ' বছর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে বিদ্রোহী যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর হয়ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব'লে পরিচিত হতেন। কিন্তু ১৮২০ সালের এক বিশেষ ঐতিহাসিক শুভক্ষণে, বীরসিংহ গ্রামে, যে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, তিনিই বাংলার বিদ্যাসাগর-রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন পশ্চিমবাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তখন গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত ধাত্রীরা ছিল, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিজ্ঞান বিকাশ হয়নি। গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী খুব যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন, তাও নয়। ঠাকুরদাস তখন পুরো দশ টাকাও মাইনা পান না। তখনকার টাকার ক্রয়শক্তি অনেক বেশী থাকলেও, আট টাকায় অতবড় পরিবারের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চালানো সম্ভব হ'ত না। পরিবারের সকলের দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থান সম্ভব হ'ত কি না সন্দেহ। সংসারে চিরদিন সমস্ত দুঃখকষ্টের প্রধান ভারটা মেয়েরাই মুখ বুজে সহ্য করেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ ক'রে এরকম অনেক কষ্ট ভগবতী দেবীকে হাসিমুখে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। শাশুড়ী দুর্গা দেবীর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়েও, দরিদ্র পরিবারের অনেক বাঙালীবধূর মতন তিনি অনাহারে ও অল্পাহারে হয়ত আত্মপীড়ন করেছেন গর্ভাবস্থায়। পরিমিত খাদ্যই যাঁর অদৃষ্টে জুটত না, তাঁর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য যে কত দুর্লভ ছিল তা সহজেই ভাবা যায়। বিশ্রাম বা আরাম কোনটাই তিনি ভোগ করার অবকাশ পাননি। তাই গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী স্বভাবতঃই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল এবং তিনি প্রায় উন্মাদের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। দরিদ্র সংসারে, সুখাদ্য ও সুচিকিৎসার অভাবে কত সন্তানসম্ভবা জননীর যে আজও এরকম হয়, তার ঠিক নেই।

গ্রামে তখন হাসপাতালও ছিল না, আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকরাও ছিলেন না। ভাগ্যবিধাতা জ্যোতিষীরা ছিলেন, অশিক্ষিত ধাত্রী ও কবিরাজরা ছিলেন। গ্রামবৃদ্ধদের মতামতই বিশেষজ্ঞদের মতামতের মতন পালনীয়। বিশেষ ক'রে প্রসূতির ব্যাপারে গাইনাকোলজিষ্টের বদলে তখন গ্রামবৃদ্ধারাই ছিলেন ডিক্টেটর। দুর্গা দেবী সাধ্যমতো টোটকা করেছিলেন। তাতে যখন কোন ফল হ'ল না, তখন গ্রামবৃদ্ধারা যথারীতি রায় দিলেন যে, তাঁর পুত্রবধূ ভগবতী দেবীকে হয় ভূতে পেয়েছে, না হয় ডাইনীতে পেয়েছে। বীরসিংহ গ্রামে কেন, তখন কলকাতা শহরেও যথেষ্ট ভূতপ্রেত-ডাইনীর বাস ছিল। ধীরে ধীরে গ্যাসের আলোয়, বিদ্যুতের আলোয় ও লোকবসতির চাপে তারা অন্তর্ধান করেছে। তার সঙ্গে পেশাদার ওঝারাও বিদায় নিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে বাংলা-দেশের গ্রামে ভূতপ্রেত-ডাইনীর দৌরাত্ম্য ছিল খুব বেশী এবং গ্রাম্য ওঝাদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ভগবতী দেবীর ভূত ঝাড়াবার জন্য ওঝাদের ডাকা হ'ল। কিন্তু ভূত কিছুতেই নামল না। বীরসিংহের

কাছে উদয়গঞ্জ গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি বাস করতেন। রোগনির্ণয়ের জন্য তিনিও এলেন এবং তাঁর জন্য কোষ্ঠী-বিচার ক'রে বললেন যে রোগও নেই, ভূতপ্রেতও কিছু নেই, মাতৃগর্ভে এক মহাপুরুষ আছেন, তাঁরই বিভূতির প্রকাশ হচ্ছে এইভাবে।

ভগবতী দেবীর গর্ভে ভূত আছে, কি মহাপুরুষ আছে, তাই নিয়ে বিচার গণনা, ঝাড়ফুঁক, তুকতাকের পালা ক্রমে শেষ হ'ল। অবশেষে ১২২৭ সনের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভূমিষ্ঠ হলেন যিনি, তিনি ভূতও ন'ন, মহাপুরুষও ন'ন, অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান, শীর্ণকায় মানবশিশু।

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তীর্থপর্যটনকালে কেদার পাহাড়ে নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর বংশে একজন সুপুত্রের জন্ম হবে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের পর তিনি সেই কথা স্মরণ ক'রে নাতির নাম রেখেছিলেন 'ঈশ্বর'। কোন মানুষের নাম রেখে তিনি খুশী হননি। তার চেয়েও লক্ষণীয় হ'ল, অসংখ্য দেবতার মধ্যে একজন কোন দেবতার দাস ব'লেও তিনি তাঁর পৌত্রকে পরিচিত করতে চাননি। একেবারে সোজাসুজি 'ঈশ্বর' নাম রেখেছিলেন। কোন নির্দিষ্ট গুণশক্তিসম্পন্ন দেবতার নাম নয়, অফুরন্ত শক্তির আধার, উৎস ও প্রতিমূর্তি, দুর্ধর্ষ রামজয়ের কল্পনারাজ্যের যে 'ঈশ্বর'; নবজাত শিশুপৌত্রের নাম হ'ল তাই। রামজয়ের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল, কিন্তু সে স্বপ্নের গুণে নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের গুণে। ঈশ্বরের কল্পনাকে তিনি মানবিক রূপ দিয়েছিলেন 'চন্দ্র' যোগ ক'রে। ঈশ্বর নয় শুধু, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কল্পনার ঈশ্বরের মতন প্রবল শক্তি নিয়ে, রক্তমাংসে গড়া শিশুপৌত্রটি ভবিষ্যতে একদিন মানুষের সমাজে আবির্ভূত হবে, বাস্তব-জীবনে, এই হয়ত মনে মনে তাঁর ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি তাঁর পৌত্রের ডাকনাম রেখেছিলেন 'ঈশ্বর' এবং সামাজিক নাম 'ঈশ্বরচন্দ্র'। তা যদি না হ'ত, তাহ'লে তিনি পরিহাস ক'রে এই ঈশ্বরকে 'এঁড়ে বাছুর' ব'লে ডাকতেন না। ঈশ্বর নামের মধ্যে রামজয় যে দুর্বার শক্তি কল্পনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সেই শক্তিরই প্রকাশ হয়েছিল। কেদার পাহাড়ের নিশীথকালের স্বপ্ন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে, বাংলার সমাজে, প্রখর দিবালোকে।

মাতৃগর্ভ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস গৃহে ছিলেন না। বীরসিংহের আধ ক্রোশ দূরে কোমরগঞ্জ গ্রামের হাটে গিয়েছিলেন। শনি-মঙ্গলবারে কোমরগঞ্জের হাট বসত। রামজয় হাটের দিকে যাচ্ছিলেন ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরের জন্মসংবাদ দেবার জন্য। যাবার পথে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদাসের দেখা হ'তে তিনি বললেন: "আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" সেই সময় তাঁদের বাড়ীতে একটি গাই গরু গর্ভিণী ছিল। তারও প্রসব হবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য রামজয়ের কথা শুনে ঠাকুরদাস ভাবলেন, গাই গরুটির বোধ হয় এঁড়ে বাছুর হয়েছে। বাছুর দেখার জন্য ঠাকুরদাস যখন গোয়ালঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন রামজয় একগাল হেসে বললেন: "ওদিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমাকে এঁড়ে বাছুর দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই ব'লে তিনি আঁতুড়ঘরে নিয়ে গিয়ে নবজাত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন।

স্বরচিত জীবনচরিতে এই কাহিনীর উল্লেখ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন: "এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন—'ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।' জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

পিতামহের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনে তা প্রমাণ করেছিলেন। এঁড়ে গরুর একগুঁয়েমিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পদে পদে প্রতিটি কাজে যত তিনি বাধা পেতেন, তত তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠতো। গোঁড়ামির উদ্ধত ভ্রূভঙ্গির সামনে তাঁর সহজ সরল ধুতি-চাদর-চটি-পরা বাঙালীর মূর্তিটি বজ্রের মতন কঠোর হয়ে উঠতো, উন্নত ললাটের তলায় অপ্রশস্ত চিবুকটি নিরাপস নির্মম রূপ ধারণ করত। ক্ষমার অযোগ্য যে তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করতেন না। অন্যায় সহ্য করা তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধ ব'লে মনে করতেন। দয়ার পাত্র যে নয়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একবিন্দু বারিও তাকে দান করেননি কোনদিন। তাঁর দয়া চরমভোগীর বদান্যতার বিলাসিতা ছিল না। তাঁর ঐতিহাসিক উইল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আজীবন ভোগী সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে স্বনামধন্য হয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মতন সত্যকার আদর্শ ত্যাগীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

যুক্তিহীন সনাতন অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামির স্পর্ধিত আস্ফালনের বিরুদ্ধে আজীবন যে দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয় নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছেন, ছেলেবেলায় তাঁকে পরিহাস ক'রে 'এঁড়ে বাছুর' বলা ভুল হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও তা জানতেন ব'লে মনে হয়। তা না হলে, শেষ জীবনে নিজের জীবনচরিত রচনার সময়, তার অসমাপ্ত কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি এই পরিহাসের কাহিনীটুকু উল্লেখ ক'রে এমন ভাবে মন্তব্য করা প্রয়োজনবোধ করতেন না।

১৮৫৫ সালে, ৩৫ বছর বয়সে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন এদেশের শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। শিশুদের নীতিশিক্ষা দেবার জন্য তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পাঠ রচনা ক'রে সংযোজন করেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের একটি পাঠে (১৯ পাঠ) গোপালের, আর একটি পাঠে রাখালের (২০ পাঠ) গল্প আছে। বাঙালী মাত্রেই গল্প দু'টি জানেন।

"গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।...গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়: পাঠশালায় গিয়া

আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

"খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা খেলিবার সময় ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।"

গোপালের গল্পের পর রাখালের গল্প আছে। গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। গোপাল যা করে না, রাখাল ঠিক তাই করে। গোপাল সুবোধ, রাখাল দুষ্টু। তাই, "রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।"

বাংলাদেশে গোপালের অভাব নেই। শুধু গোপাল নয়, এদেশ নাড়ুগোপালের দেশ। এদেশের লোকের ধারণা, ব'সে ব'সে হাত ঘুরুলেই নাড়ু পাওয়া যায়, নইলে নাড়ু পাওয়া যায় না। গোপাল ও নাড়ুগোপাল পথেঘাটে অনেক দেখা যায়। স্কুল কলেজের গোপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাল, কর্মক্ষেত্রের গোপাল, সংসারের গোপাল—নানা রকমের গোপাল আছে বাংলাদেশে। রাখালেরও অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজ গোপালদের যতটা নয়, রাখালদের উপযোগী তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই বোধ হয় রাখালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী কথা ঈশ্বরচন্দ্র বলেন নি। কেবল এইটুকু বলেছেন: "যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।" কিন্তু রাখালেরা আর কিছু 'করিতে পারিবে, কি না পারিবে,' সে-সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি।

এদেশের দুরন্ত রাখালদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনের গোপন কোণে কোথায় যেন গভীর সহানুভূতি লুকানো ছিল, যা বাইরে সহজে প্রকাশ পেত না। গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনেরও সাদৃশ্য ছিল অনেক বেশী। একথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন।" পিতা যদি বলতেন, স্নান করো, তিনি বলতেন, স্নান করব না। যদি বলতেন, খাও, তিনি বলতেন, খাব না। যদি বলতেন, পরিষ্কার কাপড় পর, তিনি বলতেন, ময়লা কাপড় পরব। প্রচণ্ড গোঁ ছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। তাই পিতা ঠাকুরদাস তাঁর দুরন্তপণায় অতিষ্ঠ হয়ে মধ্যে মধ্যে অন্তদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে বলতেন: "এই যে দেখছেন, ইনিই সেই এঁড়ে বাছুর! আমার পিতা পরিহাসছলে হয়ত নাতিকে এই ব'লে ডেকেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিহাস ঋষিবাক্যের মতন সত্য হয়েছে।"

গোপালের তুলনায় রাখালের সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন: "নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরিবাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট-অবাধ্য-অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্ম অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

বহুকাল পরে বীরসিংহের ভগবতী দেবীর আর এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা আবার নতুন ক'রে পূর্ণ করেছিলেন। নবদ্বীপের নিমাই, আর বীরসিংহের ঈশ্বর, বাংলার ইতিহাসের দুই স্বতন্ত্র যুগসন্ধিক্ষণের দুই আদর্শ যুগপুরুষ।

গোপালের মতন সুবোধ বালকদের চেয়ে রাখালের মতন দুরন্ত বালকদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মমতা ও আস্থা বেশী ছাড়া যে কম ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর নিজের কর্মজীবন থেকেও পাওয়া যায়। তিনি নিজে যখন অধ্যাপনা করতেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তখন ছাত্রদের অপরাধপ্রবণতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেও, তাদের দুরন্তপণাকে কোনদিন তিনি সেকালের গুরু-মহাশয়দের মতন কঠোর দণ্ড দিয়ে দমন করতেন না। এসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের দু'-একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৮৫১-১৮৫৮ সন) তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ঝগড়া মারামারি হ'ত। মারামারির সময় ইট-পাটকেল ছোঁড়া হ'ত। সেকালের ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা ক'রে যাঁরা কথায় কথায় একালের ছাত্রদের অনেক বেশী দুর্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খল ব'লে অভিযোগ করেন, তাঁদের কাছে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তটি দাখিল করছি। হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজ তখন একই প্রাঙ্গণে, সংলগ্ন গৃহে ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছাদের উপর ইট-পাটকেল সংগ্রহ ক'রে রাখত এবং মারামারির সময় সেগুলি উপর থেকে হিন্দুস্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ত। মারামারির ফলে অনেক ছাত্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যেত। এক-এক সময় এত গুরুতর মারামারি হ'ত যে থানা থেকে পুলিশ এসে হাজির হ'ত। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি—"সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত" —লিখেছেন, তিনি তখন কি করতেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোন্ পক্ষের জিত্ হয়, কোন্ পক্ষের হার হয়। জানি না, গোপালের আদর্শে মানুষ, একালের কলেজের অধ্যক্ষ বা স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে ক'জনের এরকম দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি আছে, ছাত্রদের চরিত্র যাচাই করার? গোপাল ও রাখালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের সেই বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি ছিল। তাই ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়িতেও তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য হারাতেন না। যখন এমন গুরুতর মারামারি পর্যন্ত হ'ত যে গোপালের মতন সুবোধ ছেলেরা, বিকেল চারটায় ছুটির পরেও, বাড়ী যেতে পারত না, ক্লাসে জড়সড় হয়ে ব'সে থাকত ভয়ে এবং পুলিশ এসে তাদের মাথা আগ্‌লে বাইরে পথে বা'র করে দিত, তখনও অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর

মহাশয় এতটুকু বিচলিত হতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ইট-পাটকেল সহযোগে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ দেখতেন। কাহিনীটি বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্ন (সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাকালে ছাত্র ছিলেন) তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন (৪)। হরিশচন্দ্র লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখতেন, কোন্ পক্ষের জিত হয় এবং কোন্ পক্ষের হার হয়।" বিজয়ী রাখালদের তিনি পুরস্কার দিতেন কি না, সেকথা তাঁর বন্ধুপুত্র ও প্রিয় ছাত্র হরিশচন্দ্র উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিরস্কার যে করতেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্লাসের দুষ্টু ছেলেদের সকলের সামনে শাস্তি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। যে কোন অপরাধের জন্যই হোক, ক্লাসের অন্যান্য সহপাঠীদের সামনে কোন ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। তাতে কিশোর বালকদের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে এবং ক্রমাগত আঘাত লাগার ফলে বালকের সেই বোধশক্তিও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে সেই বালকের অন্তর্নিহিত মানবচরিত্রের পূর্ণবিকাশ হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের যুগে, একালের শিক্ষাবিদরা এসব কথা জানেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার জন্মকালে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই নীতি আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। "যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না"—একথা বর্ণপরিচয়ের পাঠকদের কাছে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করলেও, কখনও তিনি রাখালের মতন দুরন্ত বালকদের অবহেলা বা অপমান করতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে দিতেন, ছেলেদের যেন কখনও এইভাবে শাস্তি দেওয়া না হয়। তখনকার দিনে শিক্ষকরা ছাত্রদের এই ধরণের শাস্তি দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। বালকরা যে সব ছোট ছোট ভবিষ্যতের মানুষ, তাদের মধ্যেও যে মানবিক মান-অপমানবোধ আছে, সে সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না শিক্ষকদের। তখনকার কথা তো বহু দূরের কথা, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে একালে আমাদের ছাত্রজীবনেও দেখেছি, শিক্ষকরা নির্বিচারে ছাত্রদের দণ্ড দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরই প্রথম এদেশের রাখালদের মানুষ ব'লে বিবেচনা করেন এবং শিক্ষকদেরও বিবেচনা করতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন ক'রে একবার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে (শ্যামপুকুর শাখা) একটি ঘটনা ঘটে। মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একবার একটি ছেলেকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। খবরটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছতে তিনি তৎক্ষণাৎ চটি পায়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাদুড়বাগান থেকে শ্যামপুকুর হেঁটে চ'লে যান। খবর পেয়ে এত দূর বিচলিত হয়েছিলেন তিনি যে, পালকী ডেকে পালকীতে চ'ড়ে যাবারও সময় হয়নি তাঁর। স্কুলে পৌঁছে তিনি প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠান এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁকে তখনই পদচ্যুত করেন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা, এমন কি প্রতিবেশীরা পর্যন্ত, তাঁকে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করেন, শান্ত হয়ে, সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা ক'রে, সিদ্ধান্ত করার জন্য। তিনি অটল রইলেন। কয়েকজন শিক্ষক পদত্যাগ করবেন ব'লে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তাতেও তিনি বিচলিত হলেন না। তাঁদের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ ক'রে তিনি পরদিন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করলেন (৫)।

সামান্য ঘটনা! কিন্তু এরকম সামান্য ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই মানবচরিত্রের অসামান্য দিক উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একজন দুরন্ত রাখালের অপমানের জন্য বিদ্যাসাগর অবিচলিত চিত্তে এত দূর পর্যন্ত করেছিলেন, এবং তাও যৌবনে নয়, শেষজীবনে। মানুষ—তা সে যত ক্ষুদ্র, যত নগণ্য মানুষই হোক—বিদ্যাসাগরের কাছে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় মানুষ। সেই মানুষকে যখন কেউ অপমান করত, তখন রাগে তিনি দিশাহারা হয়ে যেতেন। রাখালদের মতন দুরন্ত বালকদেরও যে আত্মসম্মানবোধ আছে এবং তাদের সেই বোধ যে সস্নেহে জাগিয়ে তোলা উচিত, নির্দয়ের মতন দমন করা উচিত নয়, একথা বিদ্যাসাগর বুঝতেন এবং অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিশেষ করে শিক্ষকদের। শিক্ষার ক্ষেত্রে সারাজীবন তিনি এই নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। সুবোধ গোপালদের নয় শুধু, দুরন্ত রাখালদের মানুষ ক'রে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মতন, বিদ্যাসাগরও বুঝেছিলেন যে গোপালের মতন সুবোধ ছেলেগুলি পাশ ক'রে ভাল চাকরিবাকরি পায় এবং বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ করে, কিন্তু রাখালের মতন দুষ্ট ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। তাই বোধ হয় রাখালের জীবনীলেখক, তাঁর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের পাঠের মধ্যে রাখালের নানাবিধ দুষ্টামির বিবরণ দিয়ে, কেবল এইটুকু বলেছেন, "যে রাখালের মত হইবে সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।" তিনি এমন কথা বলেন নি, "যে রাখালের মত হইবে সে মানুষ হইতে পারিবে না।" বর্ণপরিচয়ের পঞ্চমবর্ষীয় পাঠকদের কাছে লেখাপড়া সম্বন্ধেও এর চেয়ে বেশী কিছু বলা যায় না, বলা উচিতও নয়। তা না হ'লে বিদ্যাসাগর মহাশয় হয়ত লিখতেন: "যে রাখালের মত হইবে, সে পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিবে না।"

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মতন সুবোধ ছেলে ছিলেন না, রাখালের মতন দুরন্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং বিদ্যার সাগর উপাধিও পেয়েছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ ছিল খুব। এই একটি বিষয়ে ছাড়া, আর কোন বিষয়ে গোপালের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করা হ'ল। বীরসিংহে সনাতন সরকার নামে এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পাত্তাড়ি বগলে ক'রে সনাতনের পাঠশালায় যাতায়াত করতে লাগলেন।

---

(৪) শ্রীহরিশচন্দ্র কবিরত্ন: সেকালের সংস্কৃত কলেজ: প্রবাসী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩২।

(৫) Nagendra Nath Gupta: Noble Lives (Hind Kitabs, 1950): PP. 25-27. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মেট্রোপলিটন স্কুলের যখন ছাত্র ছিলেন, তখন এই ঘটনাটি ঘটে। তিনি তাঁর "Noble Lives" নামক ইংরেজী গ্রন্থে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এই কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন।

সনাতন মাষ্টার খুব প্রহারপটু ছিলেন। সেকালের গুরুমশায়রা সকলেই প্রায় তাই ছিলেন। তাঁর প্রহারের দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে ঠাকুরদাস পুত্রের জন্ত অন্ত একজন গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বীরসিংহে বাস করতেন। তিনি স্বকৃত ভঙ্গকুলীন ছিলেন এবং কৌলীন্তের কল্যাণে বহুবিবাহ ক'রে পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে বাস করতেন, গ্রামে থাকতেন না। গুরুগিরির গুণ ছিল তাঁর, কিন্তু কৌলীন্তের ব্যবসায়ে অন্নচিন্তা দূর করা অনেক বেশী সহজ ব'লে, তিনি পাঠশালার দিকে মন দেননি। ঠাকুরদাস অনুসন্ধান ক'রে তাঁকে বীরসিংহে নিয়ে আসেন। পাঠশালা স্থাপন ক'রে কালীকান্ত গুরুমশায় হন।

ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্তের পাঠশালায় ভর্তি হন। "গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না, সকলের আগে পাঠশালায় যায়।" গোপালের মতন ঈশ্বরচন্দ্র তা যেতেন না। পাঠশালায় যাবার পথে তিনি খেলা করতেন এবং গ্রামবাসীদের নানাভাবে উত্যক্ত ক'রে তুলতেন। প্রতিবেশী মথুরামোহন মণ্ডলের মা পার্বতী ও স্ত্রী সুভদ্রাকে বিরক্ত করবার জন্য তিনি রোজ পাঠশালায় যাবার সময় তাঁদের বাড়ীর দরজার সামনে ময়লা ফেলে যেতেন। শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ছোটখাট সংগ্রাম বলা চলে। মণ্ডলের জননী ও গিন্নী উভয়েই যে খুব বিরক্ত হতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ভয় দেখাতেন এই ব'লে যে, দুর্গা দেবী ও কালীকান্তের কাছে ঈশ্বরের এই আচরণের কথা জানাবেন। একগুঁয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জিদ্ ও বিরক্ত করার বাসনা তাতে যে আরও উদ্দীপিত হ'ত, তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।" বাস্তবিকই তাই। গুরুমশায় বা পিতামহীর কাছে নালিশের ভয়ে তিনি একটুও বিচলিত হতেন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরও বেশী উপদ্রব করতেন। মথুর মণ্ডলের বৃদ্ধ পিতা দুরন্ত ঈশ্বরকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বালকের দুরন্তপণার মধ্যে প্রতিভার আভাষ পেয়ে মধ্যে মধ্যে তিনি পুত্রবধূকে বলতেন: "ঈশ্বরকে খবরদার কিছু ব'লো না, ওর দুষ্টুমি মা'য়ের মতন সহ্য ক'রো। দেখো, ঈশ্বর একদিন মানুষের মতন মানুষ হবে।"

গ্রামের প্রতিবেশীরা নয় শুধু, নিরীহ গাছপালারাও মুখ বুজে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উপদ্রব সহ্য করত। প্রকৃতির সহ্যগুণ অসীম। পিতামহী বা গুরুমশায়ের কাছে নালিশেরও কোন ভয় নেই সেখানে। দুরন্তপণার অবাধ স্বাধীনতা ও সুযোগ সেখানে পাওয়া যায়। পাঠশালার পথে ধানের ক্ষেতে ও যবের ক্ষেতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিচরণ করতে যেতেন। পাকা ধানের ছড়া ও যবের ছড়া তুলে তুলে চিবুতেন। একবার ধানের সুঙা আটকে প্রায় মরণাপন্ন হয়েছিলেন। পিতামহী চিৎ ক'রে কোলে ফেলে অনেক কষ্টে সেই সুঙা বার ক'রে দিয়ে প্রাণ বাঁচান। এত দুরন্ত ছিলেন তিনি। রাখাল বেচারার গুরু হবার যোগ্য।

ধানগাছও যাঁর কাছে রেহাই পেত না, তাঁর কাছে আম জাম কাঁঠাল গাছের যে কি অবস্থা হ'ত, তা কল্পনা করা যায় না। বীরসিংহ গ্রামের গাছপালা দেখে আজও সেই কথা বার বার মনে হয়। গ্রামের মধ্যে ও আশ-পাশে কত সব প্রাচীন গাছপালা যে আছে, তার ঠিকানা নেই। দেখে বয়স বোঝা যায় না, কিন্তু কত বয়স্ক তারা! তালগাছে তাল ফলতেই তো তিনপুরুষ লাগে। পাঁচ-ছয় পুরুষের আম-জাম-কাঁঠাল গাছ, কতই তো আছে গ্রামে! বীরসিংহেও আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের দুরন্তপণার নীরব সাক্ষী তারা। যদি তারা কথা বলতে পারত, তাহলে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দুষ্টুমির সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে এখানে আমি লিপিবদ্ধ করতে পারতাম। সেই সব গাছতলায় বসেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, বীরসিংহ গ্রামে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার কোন স্মৃতিকথা শুনিনি। কেবল অনুভব করেছি তাঁর ছেলেবেলার চঞ্চলতা। বীরসিংহের মাটিতে, মাঠে-ঘাটে, গাছের ডালে ডালে, বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পায়ের চিহ্ন আঁকা রয়েছে মনে হয়েছে। সমস্ত বীরসিংহ গ্রাম জুড়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দৌরাত্ম্যের পদধ্বনি আজও যেন শোনা যায়। গ্রাম প্রায় সেই গ্রামই আছে, বাংলার অন্যান্য আরও অনেক গ্রামের মতন। পরিবর্তনের ঝড় ব'য়ে গেছে অনেক, কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মণ্ডলরা, গুটিরা, সকলেই আছেন। আরও অনেক পরিবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দরিদ্র গ্রাম, মেহনতী মানুষের বাস বেশী। ধনিক জমিদারের কোন প্রাসাদের চিহ্ন নেই কোথাও, বীরসিংহ গ্রামে। আভিজাত্যের ভগ্নস্তূপ বা অস্তমিত জৌলুস কোথাও কৌতূহলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বাঁকুড় রায় ধর্মঠাকুরের আর শীতলানন্দ শিবের প্রাচীন দেবালয় আছে। আর আছে মাটির ঘর, মাটির গৃহ, যে-ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন, যে-গৃহে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। বাংলার নিজস্ব ঘর, নিজস্ব গৃহ, বাংলার প্রকৃতির উপাদানে তৈরী। কৃত্রিমতা নেই তার মধ্যে। গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ সেই শ্রেণীর মানুষ, মাটির সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ যাদের গভীর। তাঁরা কৃষক, তাঁরা জেলে, তাঁরা বাগদী। বীরসিংহে তাঁদের বাসই বেশী। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ-প্রধান গ্রাম নয় বীরসিংহ। অধিকাংশ গ্রামবাসী দরিদ্র হলেও, খাঁটি মানুষ তাঁরা। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় এই দরিদ্র খাঁটি মানুষগুলির মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কৃষক জেলে বাগদীর ছেলেরাই ছিল তাঁর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, দৌরাত্ম্যের সহচর। কোন ধনীর দুলাল তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যবোধে ছেলেবেলা থেকে তাই তাঁর মনে কোন হীনহীনতার আত্মগ্লানিকর ভাবের উদয় হয়নি। নিজে তিনি যেমন দরিদ্র ছিলেন, তাঁর সঙ্গীরাও তেমনি দরিদ্র ছিল। সাহচর্যের ফলে কোন রকম আত্মগ্লানি বোধ করার সুযোগ ছিল না তাঁর। তাই পরিণত জীবনে তিনি তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে, সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষ হয়ে গ'ড়ে উঠেছিলেন।

এই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা না জানলে বা বুঝলে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মহত্ত্বের প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ব'লে মনে হয় না।

নাগরিক পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য যেমন বিকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, গ্রাম্য পরিবেশে তা সাধারণত করে না। তার কারণ, সামাজিক স্তরে ওঠা-নামার শক্তিগুলি শহরের মধ্যে, গ্রামের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয়। বিজ্ঞানীরা যাকে সামাজিক "এলিভেটার" বলেন (social elevators), শহরেই তার প্রাধান্ত

বিদ্যাসাগর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি আমাদের নর-নারায়ণ, তুমি আমাদের ঋষির ঋষি,
তুমিই বাঙলা, তুমিই বাঙালী, আমরা রয়েছি তোমাতে মিশি'।
তুমি আমাদের গিরি হিমালয়, তোমার বুকের গঙ্গাধারা—
সব কৃষ্টির সৃষ্টি করেছে যে ভূমি আছিল গুল্মে হারা।
সু-উচ্চ শাল, অশথ বিশাল,—অগ্নি-গর্ভ হে মহাশমী,
তেজঃপুঞ্জ হে মহামানব, জাতির জনক, তোমারে নমি।

হে অনমনীয় বিরাট পুরুষ, সবায়ে দিয়াছ যা হীন হেয়,
পরিহার তুমি যতনে করেছ যাহা শিবেতর যা নয় শ্রেয়।
তেজস্বিতায় একা সহস্র, কারো ভ্রূকুটিতে হওনি ভীত,
সব দুর্নীতি সব দুর্গতি, করিতে চেয়েছ দূরীকৃত।
কল্যাণকৃৎ হে প্রবর্ত্তক, ভয়াল দয়াল গুরুর গুরু,
তব পদ-বক্ষ অভিষেকে হল এ জাতির জয়যাত্রা শুরু।

অনুভূতি তব ছিল কি নিবিড়! সদাই ব্যথিত দুখীর দুখে,
পর যে তোমার কে ছিল?—জানি না সমুধার বাস উদার বুকে।
স্বর্গ চাহনি—তুমি চাহিয়াছ—স্বর্গ করিতে জন্মভূমি,
দেবতাকে ভাল বাস কি বাস না মানুষকে ভাল বেসেছ তুমি।
দয়ার্দ্র-হৃদি মনীষী মহান্ স্রষ্টারে নিতি প্রণাম করি,
জ্ঞান-সুন্দর সৃষ্টিকে তাঁর ভাল বাসিয়াছ হৃদয় ভরি।

তুমি বিস্ময়, তুমি আশ্রয়, স্মরি বল পাই শান্তি লভি,
এ ভূমে কয়লাখনির মাঝারে, ও চিন্তামণি অসম্ভবই।
সাগর মোদের আমরা তা জানি, নিজেকে যতই ক্ষুদ্র ভাবি—
বাড়বানলের সাথে খেলা করি, জীবনামৃতে মোদের দাবী!
তুমি সঞ্চারী শক্তি হে গুরু, তব অনর্ঘ আশীষ বহি
বাঙালী হউক জগতের গুরু, বাঙালী হউক সর্ব্বজয়ী।

বেশী। তাই শহরে সমাজে উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে ওঠা-নামার গতি (vertical mobility) অনেক বেশী তীব্র। উত্থানের ও পতনের বেগও বেশী। শহরের বৈশিষ্ট্যই তাই বৈষম্য, আধুনিক শহরের (৬)। এই বৈষম্যের মধ্যে কোন বালক-চরিত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় না, হ'তে পারে না। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ পদে-পদে ব্যাহত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে সামাজিক পরিবেশে জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, বৈষম্যের চেয়ে সাম্যই ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন রকম বৈষম্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিশেষ ক'রে বীরসিংহের অনাড়ম্বর পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। সুস্থ, সবল ও সাধারণ মানুষের সাহচর্য্যেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল মনই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সম্বল ও সম্পদ।

কলকাতা শহরের তখনকার কোন স্কুলে, ধনিক রাজা-মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের পুত্রদের সঙ্গে যদি তিনি বিনা বেতনে লেখাপড়া শিখতেন ছেলেবেলায়, তাহ'লে তিনি যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ হলেও, এ রকম সুস্থ ও সবল মনের মালিক হতেন কি না সন্দেহ! গুরুমশায় কালীকান্তের পাঠশালায় যাবার পথে যদি তিনি গ্রামের গদাধরদের সঙ্গে হাডু-ডু-ডু না খেলতেন, মথুর মণ্ডলের মতন সরল প্রতিবেশীদের বিরক্ত করার স্বাধীনতা না পেতেন, মাঠে মাঠে আর ধানক্ষেতে যদৃচ্ছা স্বাধীন ভাবে ঘুরে না বেড়াতেন, দুরন্ত রাখালের মতন, তাহ'লে তিনি পরিণত জীবনে হয়ত অন্য কোন স্বনামধন্য পুরুষ হতেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হ'তে পারতেন না। [ক্রমশঃ।

(৬) বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন শহরের এই বৈষম্য সম্বন্ধে বলেছেন : "It (শহর) is a real coincidentia oppositorum, or the place of coexistence of the greatest contrasts and contact of people of most opposite social status, standards, capacities, occupations, religious, mores, manners and what not." (Sorokin & Zimmerman : Principles of Rural-Urban Sociology : N. Y. 1929 : P. 48)

শহরে সমাজের উচ্চ-নিম্নস্তরের উত্থান-পতন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Sorokin ; Social Mobility : chaps 8, 9.

(ঋষি রাজনারায়ণ বসুর চিঠি)

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত)

কলিকাতা, ৪৫নং বেনেটোলা লেন,
১৩ই চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

পরম পূজনীয় মহাশয়েষু, প্রীতিপূর্ব্বক প্রণাম—

সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্দ্রিক হইয়াছেন! তিনি কোনখানে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে "পিতা নোসি" এই প্রার্থনা দ্বারা আরম্ভ করেন। পরশ্ব দিবস বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং গতকল্য দরবারের দলের সহিত পদ্মকুটীরে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। প্রণয়াস্পদ প্রতাপচন্দ্র বলিলেন। * * * * প্রেম না হইলে কেহ কথা শুনে না। অন্য অপেক্ষা দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি লোকের এক্ষণে প্রেম হইয়াছে, ঐক্য সাধনার্থ তাঁহার কথা এখন শুনিবে। দেখিলাম মতনিষ্ঠার জন্য দরবারের দলের প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের খুব শ্রদ্ধা আছে। পরশ্ব দিবস সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকুমারের বাসায় পাঁচ-ছয়টি বাছা বাছা যুবক ব্রাহ্মের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে হাফেজের একটি মেস্রা আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। "তাঁহার সৌন্দর্য্যে অবগুণ্ঠন অথবা যবনিকা নাই কিন্তু যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর রাস্তার ধূলির প্রতি লক্ষ্য করিবে।" রাস্তার ধূলির বিষয় অনেক বলিলাম। আর বলিলাম যে যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত হইয়াও মধুগর্ভ পুষ্প দিকে ধাবিত হয় তেমনি আত্মা পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয়। আত্মার এই স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা (Natural instincts of the soul) চালিত হইয়া যে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম্মজীবন, দর্শন দ্বারা যাহা আরম্ভ হয় তাহা যথার্থ ধর্ম্মজীবন নহে। তবে দর্শনের কোন কোন বিষয়ে উপকারিত্ব আছে। ধর্ম্মের সোপান এইরূপ সাজাইয়া বলিলাম।

(১) ঈশ্বরের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক আকর্ষণ। যেমন নব মধুমক্ষিকা ইত্যাদি—

(২) এই আকর্ষণজনিত ব্যাকুলতা—

(৩) পাপ দমন। এমনি করিয়া ইহাতে লাগা যেন জীবন মৃত্যুর ব্যাপার। মোহ ও পাপই রাস্তার ধূলি।

(৪) ধূলি অপসরণ ও ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে আত্মার নিকটে প্রকাশ—

(৫) পরমাত্মাতে আত্মার রমণ। "যথা প্রিয়া স্ত্রী" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদ। কিন্তু এই মধুর ভাবের বিকৃতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই বিকৃতি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রবল।

সকলেই আমার কথাতে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই কথোপকথনে শ্বেতকেশ শ্রদ্ধেয় মহলানবিশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

অদ্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেওঘর যাত্রা করিব। কলিকাতায় আসিলেই আমার শারীরিক অসুখ ও লোকের নিকট যাতায়াতে কষ্ট হয়। এক-একবার অনুতাপ হয় যে কেন আসিলাম, তথাপি আপনি আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই আসিব। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে এবং অন্য বন্ধুদিগের সহিত দেখা না করিলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন, এইজন্য তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইলাম। তবু অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি রহিল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

(পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিত)

দেবগৃহ
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ৫৮।

পরম সুহৃদ্বরেষু, প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

আপনার ২৭শে জ্যৈষ্ঠের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের পীড়ার সময় আপনি যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত যাহা দিয়াছেন তাহা অতি কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলাম। আপনি ৮ই ফাল্গুন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমি এক সপ্তাহ পরে এখান হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি যখন চুঁচুড়ায় গিয়া পৌঁছিলাম তখন দেখি বিষাদ সকলের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ও সমস্ত বাটীতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আমি যেদিন পৌঁছিলাম শ্রীমতের পীড়া সেই দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম তাঁহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া হুগলীর সিভিল সার্জ্জনকে ডাকা হইয়াছে। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন তিনি আসিয়া পৌঁছেন নাই। অনেক পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি শনিবার দিবস চুঁচুড়ায় পৌঁছি। শ্রীমৎ রবিবার ও সোমবার দিবস অচেতনপ্রায়

ছিলেন। কেবল যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নিকট যাইতেছে না। মঙ্গলবার দিবস চৈতন্য লাভ করিয়াই আমাকে উপরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দূরে বসিলাম কিন্তু তিনি যে খাটে শুইয়াছিলেন তাহার উপর আসিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃ অতি ক্ষীণ। আমি কিঞ্চিৎ দূর হইতেও ভাল দেখিতে পাই না। খাটের উপর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া যখন তাঁহার শরীরের ভয়ানক শীর্ণতা অনুভব করিলাম তখন আমি আঁতকিয়া উঠিলাম। হায়! হায়! বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রক্ষিত সেই মধুর কান্তি ও লাবণ্য এক্ষণে কোথায়? সে সময় একটি আর্ত্তনাদ অবশ্য আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইত কিন্তু কোন প্রকার অস্থিরতা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ডাক্তারের নিষেধ স্মরণ হইল, আর আমি সামলাইয়া গেলাম। যিনি আমাকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন তাঁহাকে যাইবার সময় আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম যে যতদূর পারি সুস্থিরতা রক্ষা করিব। খাটের উপর যাইবামাত্র শ্রীমৎ আমার হাত তাঁহার হাতের ভিতর রাখিতে বলিলেন। আমার হাত ধারণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে "আমি এক্ষণে দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ" দিবা-রাত্রির গতি অনুভব করিতে পারি না।—"ন দিবা ন রাত্রিঃ শিব এব কেবলঃ।" আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি। এই কথা বলাতে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। তাঁহার প্রিয়তমের স্মরণে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। অন্তিম সময়ে সেই প্রিয়তমই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। বিদায় হইবার সময় তাঁহার পদধূলি লইলাম। সেই সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম হয়তো তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না—তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিময় মস্তিষ্ক লইয়া নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়! হায়! এ জীবনের "Guide, philosopher and friend" "পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও সুহৃৎ" চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীমৎ উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ সুদরাইলে পর (তখনও জীবনের বিশেষ আশা নাই) পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এক দিন তাঁহার হাতের একটি লেখা আমাকে দেখিতে দিলেন। হস্তাক্ষর কিছু অস্পষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতে আদোবে লিখিতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তলিপি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম আর তাহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহা দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলাম। উহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল "আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্ত্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; তাহা এক্ষণে সকল প্রকার রাসায়নিক পদার্থাগার হইয়াছে। আমার আত্মা এক্ষণে সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং'এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারে কোন কষ্ট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি।" আমি এই লেখা পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম যে শ্রীমৎকে বলিবেন যে এ অবস্থাতে তাঁহার মনের শক্তি দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।

ইতি—

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

(নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু—

আপনার ১৬ই অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম।··· ··· ··· কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেওঘরে আইসেন। তাঁহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরল। যে একদিন এখানে ছিলেন তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের সঙ্গে তিনি এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত নহে এবং যাহা অবলম্বন জন্য ব্রাহ্মেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাঁহাকে রাখিতে পারেন না আর তাঁহারও তাহাতে থাকা উচিত হয় না। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া একটি নূতন হিন্দু সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত অসঙ্গত দোষ অপনীত হয় এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আমি অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের (ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে আমি হিন্দু সম্প্রদায় জ্ঞান করি) একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম সত্ত্বে যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাঁহাকেও সেরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মত বিভেদ সত্ত্বেও আমি ঐরূপ জ্ঞান করি। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, সকল মনুষ্য একমতাবলম্বী হইবে।

স্নেহশীল

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পূর্ব্বজ বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই ১৮৯৩) প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার কার্য্যবিবরণ ও প্রবন্ধাদি সকলই ইংরেজীতে লিখিত হইত। পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই সভা ইংরেজীতে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সভার কার্য্য বঙ্গভাষায় সম্পাদন করিবার অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৯৩ তারিখের সভায় পঠিত হয়।]

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের
সভাপতি মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য **Bengal Academy of Literature** পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম, লিওটার্ড সাহেব পরিষদের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য আমার এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত রূপ উন্নতি-সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই মত ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গবর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আর অন্য কোন উপলক্ষে

ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে। আমি ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না, তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালায় পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্য্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্ত কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে, অতএব উহার কার্য্য কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে। অধিক লেখা বাহুল্য। বশম্বদ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

আচার্য্য রায়ের নিকট লিখিত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

[বিজ্ঞান-কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে]

সিনেট হাউস, ২৫শে জুন, ১৯১২

প্রিয় ডাঃ রায়,

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন আপনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্ম কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তখন আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, শীঘ্রই হয়ত বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্ম ব্যবস্থাও হইবে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছে এবং আপনার ও আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থবিদ্যার ও আর একটি রসায়ন-শাস্ত্রের,—দুইটি অধ্যাপক-পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, আমরা এই ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। গত শনিবার আমি সিনেটের সম্মুখে যে বিবৃতি দিয়াছি, তাহাতে এ সব বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে। উহার একটি নকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম রসায়নাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্ম আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহ্বান করিতেছি। আমার বিশ্বাস আছে যে, আপনি এই পদ গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, আমি এরূপ ব্যবস্থা করিব, যাহাতে আর্থিক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। আপনি ফিরিয়া আসিলেই, আপনার সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পরিকল্পনা গঠন করিব এবং যত শীঘ্র সম্ভব উহা কাযে পরিণত করার চেষ্টা করিব। আপনি যদি ফিরিবার পূর্বে গ্রেট-ব্রিটেন ও ইউরোপের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার দেখিয়া আসেন, তবে কাজের সুবিধা হইবে।

আপনাকে "সি, আই, ই," উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি, কিন্তু আমি মনে করি যে, ইহা দশ বৎসর পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন এবং ইংলণ্ড ভ্রমণে আপনার উপকার হইয়াছে। ভবদীয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা শরৎচন্দ্রকে)

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শরৎ, শুনেছি তোমার সম্মানার্থ সভ্যদলে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেছে। দেশে এমন দারুণ দুর্দিন, এ সময়ে অন্য কোনো প্রয়োজনের জন্যে অর্থ দাবী করা উচিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখ হরণ। আমিও উপযুক্তভাবে সেজন্য চেষ্টা করছি — কলকাতায় এই উদ্যোগে একটা কিছু [illegible] কথা চলছে-

(১)

এই উপায়ে কিছু উপার্জন হবে আশা করি। তোমার জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকলে যা কিছু একত্র করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই দুঃস্থদের সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি এই ইচ্ছাকে সে উপায় রাখে কি। ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

(কবির জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লিখিত)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

পাওনা কখনও কখনও মারা গেলেও, পাওনাদাররা কখনই মারা যায় না। অন্তত আমার বিশ্বাস হ'ল তাই। মর-জগতে এক তারাই শুধু অমর। মধ্যবিত্তের সংসারে দার পরিগ্রহের পর বাকী থাকে পাওনাদারের নিগ্রহ। সংসার আছে কিন্তু পাওনাদার নেই, এ যেন টাকা রোজগার আছে, কিন্তু তার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা নেই। মহাজনরা যে-পথে এগিয়েছেন সেই পথই নাকি পথ। সে-কথা আর বলতে! যে-কোন দায়ে, যে-কোন বেকায়দায়, মহাজনদেরই পায়ে ত' মধ্যবিত্ত পরিবারের জনে জনে মাথা মুড়োন!

জগতের চেয়ে বাস্তব কিছু না থাকলেও অনেক জগজ্জয়ী দার্শনিক বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তেমনি পাওনাদার 'বাজে লোক' হ'তে পারে, কিন্তু 'ধার' খাঁটি বস্তু। ধার ছাড়া উদ্ধারের আশা কম। এবং ভালো করে ভেবে দেখলে, দেখতেন, ধার করার মধ্যে নেই কোন লজ্জা। থাকলে সাহেবরা তাকে বলত না 'ক্রেডিট'। ব্যবসা আছে অথচ বাজারে ক্রেডিট নেই, এ যেন মা-বাপ-ভাই-বোন নিয়ে সংসার আছে, কিন্তু নিজের 'পরিবার' নেই।

'র‍্যাশন'-প্রথা যেদিন উঠে গেলো সেদিন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল শহরের সব মধ্যবিত্ত-ঘরে। তাদের কাছে র‍্যাশনের দোকানের সুখের চালের চেয়ে মুদির দোকানের ধারের সোয়াস্তিই ছিল বেশি কাম্য। কিন্তু একটা কথা তারা প্রথম উত্তেজনার মুখে ভাবতেই ভুলে গিয়েছিল। র‍্যাশনের দোকানে যেমন ভয়াবহ পরিস্থিতি 'নগদা-কারবারে', তেমনি র‍্যাশন যত দিন চালু ছিলো তখন সে-কারুর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ান যেত এই বলে: 'যে টাকা ক'টা না দিলে আজ র‍্যাশন আসবে না'; র‍্যাশন যত দিন ছিলো তত দিন এই অপারেশন সাকসেসফুল ছিলো। মুদির দোকানে আবার বাকী রাখা চলছে বটে,—সেই সঙ্গে ধার আনবার বাদ-বাকী রাস্তা অব্যাহত বাধাও আর চলছে না মোটে। এই থেকেই সেই বহু-প্রমাণিত সত্য আরেক বার প্রমাণ হচ্ছে। সব মঙ্গলের মধ্যেই অমঙ্গলের বীজ নিহিত আছে।

পৃথিবীতে এমন লোক আজও আছে যারা হাসিমুখে শুধু মরতে নয়, বাঁচতেও জানে; মৃত্যুভয় নেই তাদের, তবুও ধার-কে তারা যমের মত ভয় করে। তারা ধার নেবে না, 'ধার' দেবেও না। জীবনের রাজপথে তারা চোখের দু'পাশ-ঢাকা ঘোড়ার মত রাস্তা চলতে চায়। একটু এধার-ওধারও পছন্দ নয় তাদের। বাঁধা-মাইনের শেকলে বাঁধা। মাইনে পেলেই যা'র যা পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আগেই চুকিয়ে তবেই তাদের পরের পদক্ষেপ। তাই তাদের উত্তেজনাও কম, আক্ষেপও অল্প। ইনস্যুরেন্স পলিশি থেকে রিটায়ার-পরবর্তী জীবনের প্ল্যান সব তাদের ছক-কাটা। বাড়ীর প্ল্যান থেকে ছেলের ভবিষ্যৎ কর্ম-সংস্থান, মেয়ের বিয়ে, মাকে তীর্থদর্শন করানো,—সব কিছু ছবির মত পর পর সাজানো, ফুলের মত ফোটানো। এরা কৃতী, কৃতবিদ্য, কীর্তিমান। সংসারের সং-এদের মধ্যে সার চিনেছে এরাই।

'সুখী কে?'—বকের এ-প্রশ্নে যুধিষ্ঠির নাকি বলেছিলেন, অঋণী অবস্থায় নিজ-কুটীরে যিনি শাকান্নে তৃপ্ত,—তিনিই যথার্থ সুখী। এ-কথায় বক সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হয়েছিলেন, কিন্তু আজকে আর হতেন না। বক নয়, কোন বক-ধার্মিকের'পক্ষেও এত বড় মিথ্যে কথাটা বলা আজ অসম্ভব হত। শাকের কথা ছেড়ে দিন; শুধু অন্নের জন্যেই এখন স্বয়ং অন্নপূর্ণার ঋণ করা ছাড়া উপায় নেই, কাজেই বাকীটা হ'ত ধারের বোঝার ওপর শাকের আঁটি—শাক নয়।

রবীন্দ্রনাথের সব গানেরই নাকি একটি আপাত-অর্থ এবং আরেকটি গভীরতর অর্থ থাকে। আপাত-অর্থে সে-গান একজন নারী বলতে পারে আরেক জন পুরুষকে। পুরুষ বলতে পারে নারীকে। আর গভীরতর অর্থে রবীন্দ্রনাথের সব গানই ভগবানকে উদ্দেশ করে রচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি গান অন্তত খুঁজে পেয়েছি যার তৃতীয় একটি গভীরতম অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সেই গান হ'ল:—

"অনেক দিন ত' ছিলেম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী..."

এ-গান মধ্যবিত্তদের 'ন্যাশন্যাল এন্থেম' হওয়ার যোগ্য। মধ্যবিত্তরা যে প্রায়ই যা দেয় তার চেয়ে অনেক বেশী নেয়, এ-কথা তার প্রতিবেশীর মত আর কে জানে!

অন্য বাঙ্গালী লেখকদের কথা না হয় বাদই দিলাম, রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যেও একটিও জাত-পাওনাদারের চরিত্র অনুপস্থিত। কিন্তু পাওনাদারদের যেমন এক-একজন এক এক রকম টাইপ, তেমনি ধার নেওয়ারও একটা চরিত্র আছে।

ধার দেওয়াই যাদের জীবিকা তারাই জাতে আদি, অনাদি, অকৃত্রিম মহাজন। আবার ধার নেওয়াই একমাত্র জীবিকা যাদের, অর্থাৎ ধার-ই যাদের রোজগার তারাও মহাজন না হতে পারে, কিন্তু মহৎ লোক নিশ্চয়ই। এদের নিয়েই জগৎ চলছে। সেই—দেবে আর নেবে, মিলিবে মেলাবে যাবে না ফিরে!

এই মহাজনরা একটু ছোট-বড় ইতর-বিশেষ হলেও, 'টাইপ' এদের এক। এরা টাকা দিতে জানে, টাকা নিতে জানে। আসল টাকার চেয়ে সুদের ওপরই এদের প্রথম লক্ষ্য। টাকা দেওয়ার সময় এরা সুদ কেটে নেয়, আসলের চেয়ে বেশি টাকা সুদে উশুল হ'য়ে যাওয়ার পর এরা আসলের জন্যে মামলার ভয় দেখায়। বাড়ী-ঘর গয়না-জমি বন্ধক রেখে, না পেলে গ্যারেন্টর পেলেও এদের কাছে টাকা পাওয়া চলে। কিছু না পেলে শুধু লোক দেখে এরা দেয়, তার পর রাস্তায়-ঘাটে বাড়ীতে আপিসে লাঞ্ছনা আর লাঠির ভয় দেখিয়ে এরা আদায় করে সুদ, আদালতে এরা যায় না, কেন না আদালতে গেলে সুদের মহিমায় অধমর্ণের পরে, আগে 'জেল' হবার সম্ভাবনা এদেরই। কারণ আইন বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিষ। বে-আইনি কিছু করতে হ'লে আইন জানা চাই সর্বাগ্রে। আর আদালত বড় কঠিন ঠাঁই; আদালতে যাবার ভয় দেখালে তবেই আদালতে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যায়। আদালতে গেলে কিন্তু আর বাঁচা যায় না,—অধমর্ণ-উত্তমর্ণ কারুরই না।

এরা নয়। এরা ছাড়াও আছে পাওনাদার। তারাই অসংখ্য, অনন্ত, ব্যাপ্ত-সর্বচরাচর। তারা প্রত্যেকে বিশিষ্ট, দুর্লভ, বিচিত্র চিজ্। মহাজন যেন সেই ভগবান,—এক এবং সর্বশক্তিমান; আর এরা তেত্রিশ কোটি দেবতা; কেউ মহাদেবের মত বেলপাতায় তুষ্ট; কেউ মা কালীর মত, অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটি হলেই,—আর রক্ষে নেই।

এই সব পাওনাদাররা কেউ বাড়ীওলা, কেউ মুদি, গয়লা বা ধোপা, কেউ মনোহারী দোকানের মালিক, কেউ বন্ধু, কেউ ডাক্তার, কেউ উকীল, কেউ কাপড়ওলা, কেউ নেহাৎই চাকর—ঠাকুর, আবার কেউ মেয়ের বিবাহে পাত্রপক্ষের কর্তা।

এরা কেউ গলায় গামছা দেয়, আবার কেউ টাকা ফেরৎ চাওয়ার কথা মুখে আনতে পারে না। বাড়ী থেকে উচ্ছেদের নোটিশ হাতে আসে একজন। আরেক জন টাকা দিয়ে অন্য বাড়ীতে উঠে যেতে সাহায্য করে,—"যা গেছে তা গেছে, আর কেন যায়"—এই সান্ত্বনায় ভোলায় নিজের মনকে।

বন্ধু যারা আছে, তাদের মধ্যে টাকার কথা এলেই কারুর কারুর আর দেখা নেই! কেউ কেউ টাকা ধার না দেবার শপথ আছে বলে পথ মেরে রাগে। কেউ দিয়ে যায়,—অজস্র আছে বলে, ফেরৎ পাবার সময় যাকে দিয়েছিল তার দেখা না পেলে মনে করে, 'এখন পারছে না, পারলেই দিয়ে দেবে।'

এদের মধ্যে এক দল আছে, যারা টাকার গল্প করবে, একে দিয়েছি, ওকে দিয়েছি বলে, তারপর দেবার সময় বলবে, 'ক'দিন আগে চাইতে পারলে না?'—এবং তারপরেও আছে; তারপর সবাইকে বলে বেড়াবে, 'অমুক বড় কষ্টে আছে, এই ত' আমার কাছে এসেছিল ধারের জন্যে।'

এই বিচিত্র রকমের মিত্রদের মধ্যে সাবধান শুধু 'একধরণ' থেকে! এরা গায়ে পড়ে এসে টাকা ধার দেয়; একবার নয় বার বার। টাকার কথা তুলতে গেলেই চাপা দেয়; যেন এ তার লজ্জা, যে নিয়েছে তার কিছুই নয়। এদের থেকে একশো হাত দূরে। না হ'লে অদূর ভবিষ্যতেই আছে আদালত; এবং সে বিবাদ শুধু কাঞ্চন নিয়ে নয়। তার সঙ্গে 'কামিনী'র নামও জড়ায়।

ধার করার মধ্যে একটা লজ্জা অতি অবশ্যই লুকান আছে। কিন্তু আমাদের আজকের সমাজে সেটা শুধু টাকা ধার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন, অনেক সময়ে আমি সে-কথা ভেবে কোন সদুত্তর পাই নি। ওদের আইনে ভিক্ষে করা ক্রাইম; ধার করা নয়। আমাদের সমাজে ভিক্ষে করায় লজ্জা নেই, ধার করায় আছে। ধার করায় যদি লজ্জা থাকে, ধার দেওয়াতেও থাকা উচিত ছিল। ভিক্ষে চাওয়া যে আইনে বারণ, ভিক্ষে দেওয়াও সে আইনে নিশ্চয়ই ক্রাইম। ধারের বেলায় কিন্তু ধার করাতেই যা-কিছু লজ্জা! —ধার দেওয়া?—সে হ'ল ব্যবসা। অর্থাৎ পতিতাদের রাখো সমাজের বাইরে; কিন্তু পতিতাদের কাছে নিত্য যাতায়াত যার, তাকে কর সমাজপতি।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, মায় যারা সোনারূপোর দোকান দিয়ে করে 'বন্ধকী'র কারবার, কেউ ধার না নিলে তাদের কী হাল হত তাই ভাবি। তাহ'লে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আসল সত্য হ'ল সেই পুরানো কথা। অর্থাৎ একজনকে মেরে ফেললে তা হয় হত্যা, কিন্তু হাজার-হাজার হত্যা করলে তা হয় ধর্মযুদ্ধ। এক-আধ টাকা ধার করার মধ্যেই লজ্জা; কিন্তু world-bank থেকে ধার নিয়ে আসতে পারলে আপনি প্রথম শ্রেণীর ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট।

যদি বলেন ধার নেবার মধ্যে নেই লজ্জা, এক-আধ টাকা নেবার মধ্যেও নেই; লজ্জা হচ্ছে সেটা সময়ে ফেরৎ না দিতে পারার মধ্যেই। তাহ'লে বলব, সে লজ্জাও এই টাকাটা এক-আধ টাকার অংক বলেই। লাখ-লাখ টাকা ফেরৎ দিতে না পেরে ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করছে, তাতে মামলা আছে, কিন্তু লজ্জা কোথায়? ব্যবসার সাইনবোর্ড নাম পালটাচ্ছে পাওনাদারের হাত থেকে আইন সম্মত উপায়ে বাঁচতে, তাতে মামলাই বা হচ্ছে কোথায়, লজ্জাই বা পাচ্ছে কে? আগে দৈবাৎ কখনও ব্যাঙ্ক 'ফেল' পড়লে, সে একটা খবর হ'ত; ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা আইনের চেয়ে বেশী শাস্তি পেতেন নিজের বিবেকের হাতে। তাঁরা সমাজে বেরুতে লজ্জা পেতেন। অন্ততঃ পাবলিক কেরিয়ার শেষ হ'য়ে যেত তাঁদের। কিন্তু আজ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ছে এ-বেলা, ও-বেলা। তাতে আর না হয় খবর না হয় কর্মকর্তাদের লজ্জা। বরং যে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়েছে তারই ওপর সকলে আজ-কাল bank করে বেশী। আজকের যুদ্ধোত্তর কলকাতায় সেই ত' সত্যিকারের Public Man, Public Money নিয়ে যে পারে অবাধে ছিনি-মিনি খেলতে। 'চক্ষুলজ্জা' বস্তুটা এখনও যদি এদের মধ্যে কারুর

কাকর থেকে থাকে, ত', তা' এড়াবার জন্তে দরকার নেই হু'কান কাটার ; কারণ তাদের সেই 'বাজে' লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্তেই ত' বেরিয়েছে গগলস, না কি কী বলে যেন ওকে ?— Sun glass !

'ঐতিহ্য', 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' কিংবা ইংরেজি করেই বলি (মাতৃভাষার চেয়ে সাহেবদের ভাষায় বললেই মোসাহেবদের বুঝতে সুবিধে হয় কী না !) ভারতীয় 'ট্র্যাডিশন,'—যা বলেই চিল্লাই না কেন, আমাদের আজকের 'ট্র্যাডিশন' ধার করা 'ট্র্যাডিশন'। আমাদের ভাষা, আমাদের পোষাক, আমাদের পেশা, আমাদের চিন্তা, আমাদের নেশা, আমাদের ঘর-বাড়ী সাজানো এমন কি আমাদের আশা,—সবই ধার করা।

হ'তে পারে পরাধীনতার জন্তেই আমাদের এই হাল। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাও যে পুরোটা অর্জিত নয় ; তার অনেকটাই ধার করা। তাই স্বাধীনতা ধার দিয়ে যাবার সময়, সুদ হিসেবে আগেই ভারতবর্ষের খানিকটা কেটে দিয়ে, ইংরেজরা এ-দেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করে তবে গেছে।

পাওনাদার এবং দেনদারের সম্পর্ক সব সময়ই বিরস নয় ; কখনও কখনও রসের সম্পর্কও বটে। মার্ক টোয়েন একবার তাঁর প্রতিবেশীর লাইব্রেরী থেকে বই ধার চান একখানা। প্রতিবেশীটি রসিক। মার্ক টোয়েন কী করেন, দেখা যাক,—এই ভেবে খানিকটা মজা করবার জন্তেই যেন বললেন : 'আমার লাইব্রেরীর কড়া নিয়ম হ'ল এই যে, এখানকার বই যে পড়তে চাইবে তাকে আমার এখানে বসে পড়তে হবে।' মার্কিণ সাহিত্যের রসস্রষ্টা কিছু না বলে চলে এলেন। কয়েক দিন বাদে প্রতিবেশীটি এসেছেন মার্ক টোয়েনের কাছে তাঁর ঘাসকাটার যন্ত্রটি ধার চাইতে। বোধ হয় বই-এর ব্যাপার ভুলে গেছিলেন এত দিনে। কিন্তু মার্ক টোয়েন ভোলেন নি। তিনি বললেন, 'আমার এখানে নিয়ম হচ্ছে, যে আমার ঘাস-কাটার যন্ত্র ধার নেবে তাকে আমার বাগানেরই ঘাস কাটতে হবে !'

বই-ধারের কথায় মনে পড়ল, পরের বই যে ধার নিয়ে আসতে পারে না সে বই-ই পড়ে না। বই কেনে ধনবানে কিন্তু বই ধারে জ্ঞানবানে। আজ পর্যন্ত কি পাবলিক কি প্রাইভেট, বই ধার না দিয়ে এলে কোন লাইব্রেরীর পক্ষেই অসম্ভব। এবং পৃথিবীতে বহু লোক Poor Mathematician কিন্তু প্রায়ই ভাল Book keeper !

আমাদের দেশে দুর্লভ নয় সুলভ বই-ও একজনে কেনে, কিন্তু ধার করে পড়ে অন্তত দশ জন। পত্র-পত্রিকার ললাটেও সেই একই ভাগ্য। ফলে এক এডিশন বাংলা বই কাটতেই জগতে বহু Edison জন্মে কাজ করে মরে যায়, তবুও।···বই ধার কেন, আমাদের ট্রামের এবং লোক্যাল ট্রেনের মান্থলী টিকিটও ত' ধার করেই চলছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী, ধার নিয়ে না ফেরৎ হচ্ছে—দেশলাই। সিগারেট চাইলে দিতে হয় ; ম্যাচবক্স চেয়ে নিয়ে Matchless করবার পর ফেরৎ না দিয়ে ধরা পড়লে তাতে বড় জোর আছে হেঁ-হেঁ করে হাসি, না আছে লজ্জা, না আছে অপরাধ।

পাওনাদার এবং দেনদার, এদের সব সময়ই শার্দুল-মেষ সম্পর্ক নয়। অর্থাৎ সব সময়ই গলায় গামছা দেবার নেই সুযোগ। পাওনাদার এবং দেনদারে সাক্ষাৎ প্রায়ই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

দুই বন্ধু মেসে থাকে। পড়েছে তিন মাসের। এক বিকেলে তারা যাবে খেলা দেখতে, ঠিক সেই সময়ই মেঘে মেঘে বজ্রাঘাত। মেসের ম্যানেজার খবর করেছেন। একজন বিরসচিত্তে বললে : খেলাটা মাটি করলে আজ। বন্ধুটি আশ্বস্ত করবার জন্তে জবাব দিল : আসছি। ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখল, 'হুণ্ডি' রেডি। সাড়ে সাতচল্লিশ টাকা বাকী পড়েছিল। এখন 'হুণ্ডি'-তে আনা লেখা যায় না বলে, সাতচল্লিশ টাকার 'হুণ্ডি'-তে সই দিতে বলল ম্যানেজার। যাকে সই করতে বলল, সে একটি চিজ। সে বলল : আট আনা আপনি ছেড়ে দেবেন কেন শুধু শুধু, ওটাকে আটচল্লিশ টাকা করুন। আটচল্লিশ টাকার নতুন হুণ্ডিতে সই করে এবারে সেই চিজটি বলল : আমি-ই বা আট আনা বেশী দিই কেন,—ওই বেশী আট আনাটা আমায় ক্যাশ দিয়ে দিন। এবং সত্যি সত্যি নগদ আধুলি নিয়ে বন্ধুর কাছে ফিরে আসবার পর সেদিন আর সেই বন্ধুর কাছে মেস-ম্যানেজারের ডাক এলো না,—তার বাকীর জন্যে !

কিন্তু সব সময়ই হাওড়া ইউনিয়ন যে 'বগী'-টিম হ'বে এ কেমন কথা ? মোহনবাগানেরও অন্তত এক-আধবার জেতা চাই ত'। তেমনি পাওনাদারও আছে যে, যত বড় ল্যাজে-খেলান ধড়ীবাজ হ'ক না কেন, তাকেও মাঝে মাঝে 'দ'-য়ে মজায় বৈ কি ! যেমন সেই দেনদার নাছোড়বান্দা পাওনাদারকে এড়াতে না পেরে দিলে দেড়শ' টাকার চেক। ব্যাঙ্কে একশ' চল্লিশ টাকা আছে মাত্র, কাজেই 'চেক' ফেরত যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই তবে দিলে। কিন্তু এ-পাওনাদার সে-পাওনাদার নয়। ব্যাঙ্কের কেরাণীর কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নিল, আছে একশ' চল্লিশ। পকেট থেকে কুড়ি টাকা বার করে দেনদারের একাউন্টে জমা করে, বার করে নিয়ে গেল দেড়শ' টাকা। দেনদার পান চিবুতে চিবুতে যখন এল 'ব্যাঙ্কে তখন Better late than never,—নয়, তখন : Capital better never than late !

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ক'লকাতার মধ্যবিত্তকে উপদেশ দেওয়া সহজ, ধার কোর না। যেমন সহজ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে চাকরী পাবার আশা। শুনেছি কে একজন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকত। ভেতরে ঢুকত না কখনও। তার পর এক দিন এক্সচেঞ্জের সব চেয়ে বড় কর্তা যিনি, বেরুবার পথে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই ? জবাব এল : আজ্ঞে আপনার সঙ্গে আমার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ করতে চাই।—এর উত্তরে বড় কর্তা কী বলেছিলেন জানি না, কিন্তু এটুকু জানি মানুষের যিনি স্রষ্টা, সেই জীবন-বিধাতা আজকে আর এ প্রস্তাবে 'না' করতেন না।

যে-কলকাতায় মধ্যবিত্ত পরিবারের রোজগার মাসিক দু'শ' টাকা ; আর যেখানে দু'খানা ঘরের ভাড়া ষাট টাকা বে-আইনী সেলামীর বদলে সেখানে ছ'মাসের ভাড়া অগ্রিম আদায়ের আছে আইনের ফাঁক ; তিন পোয়া জলে এক ছটাক দুধের (বাকীটা ওজনের গরমিল) দাম এক টাকা যেখানে, ইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাতে গেলেও যেখানে ইস্কুলের মাষ্টারকে প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়, মাছের সের যেখানে সাড়ে তিন টাকা,—সেখানে হয় ভিক্ষে না হয় ধার,—এ-ছাড়া গত্যন্তর কী ?

তার পর অবশ্য ধারও এক সময়ে আর পাওয়া যায় না,—এধার-ওধার কোথাও হাত পেতে নয়। তখন ?—তখন সেই করুণ নাটকের

পুনরাবৃত্তি হয় গ্যাসপোষ্টের তলায় তলায় সন্ধ্যার অন্ধকার কালো না হ'য়ে আসতেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিল শুধু পতিতা; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাস্তায় বেরিয়েছে যারা তারা অর্ধ-পতিতা।

এদের নিয়ে হাসি-মস্করা ঠাট্টা হয়; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুণা করা যায় সবই। হয়ত সামাজিক নীতির সতর্ক অনুশাসন-বাণীও করা যায় উচ্চারণ। কিন্তু ফল হয় না তাতে। কারণ, যে-সমাজ মেয়েদের সম্মান করতে ভুলে গেছে; বিয়ের পণ দিয়ে তবে যাদের আজও পার করতে হয় বিবাহের বৈতরণী, তাদের তরী যদি মাঝপথে ডোবে, তার জন্মে তাদের দায় কতটুকু?—যত দায়িত্ব সমাজের হাল ধরে যারা বসে আছে, তাদের তুলনায়।

পঙ্কিলতায় এই আশ্রয় নিতে বাধ্য করিয়েছি ত' আমরাই। ম্যাসাজ হোম বন্ধ করা যায় আইন করে; পতিতা বৃত্তি নিরোধের সুরু করা যায় আন্দোলন,—কিন্তু চোরা গলি আর সর্পিল অন্ধকারে পাপের অতল অতলান্তিকে তবুও ঠেকানো যায় না নিমজ্জন। কারণ, পেটের ক্ষুধা মেটানো অনিবার্যতার কাছে আরেক জনের দেহের ক্ষুধা মেটানোর লজ্জা নয় বড়।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছে, বিধবা বিবাহ আইন-সম্মত হয়েও সাধারণের হৃদয়ে পায় নি অধিকার। মধ্যবিত্ত মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ আজও বন্ধ। পণপ্রথা কিন্তু তেমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে যারা পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে পাততে চেয়েছে সংসার,—তাদের মূলধনহীন জীবন নির্মূল হয়ে যাবার আগে,—তাদের মা-বোন-বৌদেরই এসে দাঁড়াতে হচ্ছে পথে। আর সব দেশে সব মেয়েই জানে ঘর থেকে পথে গিয়ে একবার দাঁড়ালে ঘরে আর ফেরা যায় না। পেটের আগুনে সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারণ দারিদ্র্যই একমাত্র পাপ—আর কোন পাপ আজকে আর পাপ নয়।

অভিশপ্ত এই সমাজ ভাগ হয়ে গেছে দু' ভাগে। তার দু' তলায় যারা থাকে তারা পিয়ানো বাজায়, রেফ্রিজারেটরে জল খায়, ঘর সাজায় সোফা কৌচে। নীচের তলার খবর রাখে না তারা। নীচের তলা একেবারে ধ্বসে গেলে তারাও যে ধ্বংস হবে, একথা বোঝায় কে? ওপরের তলায় 'নীরো' তাই তখনও বেহালা বাজায়, নীচের তলায় 'রোমে' যখন আগুন লাগে। কিন্তু আর কত দিন? চোখের ওপর ভাসছে Great Dictator-এর শেষ দৃশ্য। মানুষের হাতে নির্যাতিত মানুষ মাটি থেকে মাথা তুলে দেখছে ঈশান কোণে মেঘ। তার বেদনার্ত চোখে জ্বলে উঠল আলো। বিপ্লবের মেঘ। এবারে ঝড় আসছে। এই ছবি ভেসে আসছে চোখের ওপর, আর আওড়াচ্ছি মনে মনে:—

দু' মুঠো ভাতের জন্য
আমরা করব মা-বৌ-বোনেরে পণ্য;
তোমরা লুঠবে হীরা-জহরৎ-পান্না,
আর না!
জেনো নিশ্চয় জিতব এবার হার না—
আর না!

এই কথা বলছিলাম আদিত্য দে'কে এক দিন। আদিত্য দে শুনে হাসলে। বললো: তাহলে আমার কথা তোমাকে বলি; ঠিক আমার নয় দুর্গার।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। সেই ত' এ কাহিনীর শেষ কথা; আদিত্য-দুর্গার কথা। তার আগে বাকী আছে দুর্গা-নীলমণির কাহিনী। সে-কাব্য সুরু করেছি মাত্র। সেই সুরু শেষ করলে তবে ত' শেষটা সুরু করতে পারব। বই সুরু করার আগে যেমন ভূমিকা সারা করা। মেইন ফিচার দেখানো আরম্ভ যেমন নিউজ রীল দেখানো শেষ হ'লে। রাত হ'য়ে যাবার আগেই যেমন সন্ধ্যে দেওয়া!

[ক্রমশঃ।

বুনোহাঁস, বালিহাঁস আর পাতিহাঁস

বাকিংহাম প্যালেস থেকে কলকাতার গ্র্যাণ্ড, ফিরপো কি বোম্বাইয়ের তাজ, দিল্লীর ইম্পিরিয়াল, এ্যামবাসাডর হোটেলে ফাউল না হলে লাঞ্চ কি ডিনার সম্পূর্ণ হয় না, জমে না ক্যাবারে কি ব্যাঙ্কোয়ে! কলকাতার ঘরমুখো বাঙালীর রেস্তোরাঁমুখো আনন্দের স্বাদে অনেকখানি জুড়ে থাকে ফাউল কাটলেটের ওপর ডবল-হাফ কাপ চা। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হল এই যে, এশিয়া, ইউরোপ আর উত্তর-আমেরিকা থেকে বুনোহাঁস, বালিহাঁস আর পাতিহাঁসের বংশ ক্রমে লোপ পাচ্ছে। Severn নদীর ওপর Gloucestershire-এ ব্রিষ্টলের নীচে উত্তরে বৃটেন বানিয়েছে এই সব হাঁস সংরক্ষণের জন্ম এক গবেষণাগার। পিটার স্কট বলে একজন পশুবিজ্ঞানী সেখানকার কর্মকর্তা। মাইলের পর মাইল জায়গা রাখা হয়েছে এই সব বুনো, বালি আর পাতিহাঁসের স্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানান জাতের হাঁস এখানে বছরের বিশেষ বিশেষ সময় উড়ে আসে। ল্যাবরেটারীতে সে-সব সম্পর্কে রিপোর্ট রাখা হয় নিয়মিত। এই হংস-সংরক্ষণ সমিতি কিন্তু সরকারী কিংবা আধা-সরকারী নয়। সভ্য-সভ্যাদের দানের টাকাতেই সমিতির কাজ চলে। বর্তমান সভ্য-সংখ্যা আড়াই হাজার। সভাপতি ফিল্ড মার্শাল লর্ড আলানব্রুক। কয়েক মাইল পড়ো জমি পাওয়া গেছে পুরানো Berkeley ষ্টেটের কাছ থেকে।

সেপ্টেম্বরের ১৫ই কি ১৬ই দেখা দেবেন আমেরিকার অতিথি পাখীটি প্রথম। তার পর আসবে তাদের মিশন। ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রতি বৎসর প্রায় চার হাজার হাঁস আসে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে। ডিসেম্বরের শেষে শেষ হবে মরশুম।

এ সমিতির সভ্য আপনিও হতে পারেন। ঠিকানা—The Wildfowl Trust, New Grounds, Slimbridge, Gloucestershire, Bristol

মনোজ বসু

(১)

চীন দেখে এসেছি, রাশিয়ায় চললাম। এই দেখুন, বিসমোল্লায় গলদ! রাশিয়া বলি কেন, রাশিয়া আর কতটুকু জায়গা, যাচ্ছি সোবিয়েত দেশে। ষোল শরিকের একমালি দেশ; সবাই সমান তেজিয়ান—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। একান্নবর্তী আছেন নিজ নিজ সুবিধা বিবেচনায়; বনিবনাও না হলে পৃথক হতে বাধা নেই। রাশিয়া হলেন সেই ষোলর একটি। এই সব বড় শরিক ছাড়াও মেজো-ছোট রকম-বেরকমের বৃত্তিভোগীরা রয়েছেন। বিজ্ঞজনদের ধরুন, জলের মতন বস্তুটা জিলিপির মতন প্যাঁচ খেলিয়ে খেলিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

বিস্তর খবর শুনেছেন রাশিয়া সম্বন্ধে। আপনি বলে কেন, পাঁচ বছরের শিশুটা অবধি বুকনি ছাড়ে। মহাশয়েরা পণ ধরে আছেন—আপনি কানে ছিপি আঁটলেও তাঁরা না শুনিয়ে ছাড়বেন না। গাঁটের পয়সায় বই কাগজ ছেপে বিশ্বজন-হিতায় বাড়ি বাড়ি পাঠাচ্ছেন—তার পাঁচটা উনুন ধরানো কর্মে আত্মদান করেও একটা অন্তত যদি নজর সুমুখে হাজির হয়! লোহার পর্দায় দেশটির চতুর্দিক ঘেরা, ভিতরে রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা। চীন দেখে এসে আমার কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। আহা, দেখেই আসি না কেন—কোন সব জীব-জন্তু নরমূর্তিতে তথায় বিচরণ করছে। মোলাকাত করে আসি।

আর সেই যেমন হয়ে আসছে—সেটা ভাবব, ঘুরে ফিরে তাই কিনা ঘটে যাবে! আমার এক দৈত্য তাঁবেদার আছে, বুঝলেন। আলাদিনের যেমনটা ছিল। অহরহ সে হুকুম তামিল করে বেড়ায়। হুকুমটা আবার মুখ ফুটেও বলতে হয় না, মনে মনে মতলব করলেই হল। রাগও হয় এই নিয়ে। আরে দূর, হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, এবং দু-চার ঘটি চোখের পানি বিহনে জীবন নিতান্তই আলুনি। ওগুলোও চাই।

যাকগে, যাকগে। ধান ভানতে শিবের গীত শুরু হয়ে গেল! 'চীন দেখে এলাম' বইটা পড়েছেন নাকি? গল্প-উপন্যাস নয়—পড়তেই হবে, এমন কিছু নয়! ধরে নিচ্ছি, আপনার ভবনে এই সব আজেবাজে বইয়ের ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। অতএব কিঞ্চিৎ ফলাও করে বলতে হবে। পড়তে মনন না হয় তো বাদ দিয়ে যান। উপন্যাসের ভিতরে প্রাকৃতিক বর্ণনা অথবা মনোবিশ্লেষণ এসে পড়লে যেমন করে থাকেন।

পিকিনের সম্মেলনে সোবিয়েত থেকে গুণিজনদের এক দল গিয়েছিল। দলনেতা অ্যানিসিমভ জাঁদরেল পণ্ডিত—এবং কি আশ্চর্য, লেখকও। লেখাপড়া জানলে তো লিখতে পারে না। কিন্তু একাধারে দুধ খায় তামাকও খায়—সেই মানুষটা দেখলাম। দোস্তি জমে গেল অচিরে। সেটা যে ঠোঁটে-বুলানো হাসির দোস্তি নয়—মালুম হল মস্কোয় ওঁদের খাস এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ক'দিনই বা দেখা, কিন্তু পুরোপুরি মনে রেখেছেন। কথাবার্তাগুলোও। সেই সব বলতে লাগলেন। একটা জিনিষই চেপে গেলেন শুধু। অথবা ভুলে মেরেছেন। কিন্তু নিমন্ত্রণের ব্যাপার—উনি ভুললেও তো আমরা ভুলতে পারিনে।

তলস্তয়ের কথা উঠেছিল পিকিন হোটেলে আলোচনার মধ্যে। দাবি তুললাম, ব্যক্তিটি শুধুমাত্র আপনাদেরই ষোলআনা নন; আমাদেরও হিস্যা আছে। আমাদের ভালবাসার মানুষ। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের (ইংরেজের বুলি কপচে যাকে বলে থাকেন—সিপাহি বিদ্রোহ) শোধ নিচ্ছে অসবার্ন চুবানব্বই জন সিপাহিকে গুলী করে মেরে—তলস্তয় লিখলেন, ধন্য ঈশ্বর! কি এলেমদার বানিয়েছ ওদের, কেমন শান্তচিত্তে বিচার-বিবেচনা অন্তে চুরানব্বইটা মানুষ খুন করছে। লিখলেন, দেখ দেখ কি তাজ্জব—ত্রিশ হাজার দুষ্ট বেণে বিশ কোটি সাহসী স্বাধীনতাকামীদের পায়ে পিষছে। দুদিনের এমন বন্ধুকে পর ভাবতে পারি?

বেশ তো, বেশ তো—অ্যানিসিমভ ঢালাও নিমন্ত্রণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। একশ' বছর পূরে যাচ্ছে তলস্তয়ের। জাঁকিয়ে উৎসব করব। কাজটা হল সাহিত্যিকদের—দুনিয়ার এখানে-সেখানে যত আমরা কলমবাজ আছি, তলস্তয়ের নামে, আসুন, এক জায়গায় মিলে ফুর্তি-ফার্তি করি। ভারত থেকে অনেক জনকে চাই।

প্রস্তাব মাত্রেই কামরায় সমবেত সমুদয় মস্তক একসঙ্গে কাত হয়ে সমস্বরে সাধু সাধু রব নিয়ে উঠল। দেশে ফিরেছি, তখনও ঐ নিমন্ত্রণ মাথায় ঘুরছে। কাগজ দেখে একদা লাফিয়ে উঠলাম—সিকি ইঞ্চির সরু সংবাদ বেরিয়েছে, তলস্তয়-শতবার্ষিকীর জন্য কমিটি বানানো হল। আর কি, পাশপোর্টের জোগাড় দেখতে হয় এবার! আমার আন্তর্জাতিক পাশপোর্টে ইউ. এস. এস. আর—চারটি মাত্র অক্ষর ঢুকিয়ে দেওয়া। কর্তাদের বেশি খাটনি হবে না।

কিন্তু নিরীহ ঐ চারটি অক্ষর লাইনবন্দি দাঁড়িয়ে গেলেই নাকি শেল-শূল-গদা-চক্র। ওঁরা বরঞ্চ যমালয়ের ছাড়পত্র দেবেন, রাশিয়ার নয়। যতেক ভালমানুষ লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়ে ফিরে আসে।

যমালয়ের জন্য তত আমার তাড়া নেই, রাশিয়াটা আগে। জনৈক ঘড়েল ব্যক্তিকে ধরলাম। তিনি বুদ্ধি দিলেন, শুধো দরখাস্তে হবে না হে! উপরতলায় ঘুরতে হবে; অমুককে গিয়ে ধরো।

বলে তো দিলেন। কিন্তু আমি এক গোত্রছাড়া মানুষ—রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঘর-বারাণ্ডা গোলকধাঁধা আমার কাছে; কা'কে ধরলে কি হয়, এই তত্ত্বে নিতান্ত আনাড়ি। কোন পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াই উপরতলার উক্ত মহামান্যটির সামনে? সাহিত্যিক বলতে ওঁরা কয়েকটিকে চেনেন, দরবারে যাঁদের নিয়মিত হাজিরা। তাঁরা দায়েবেদায়ে কবিতা লেখেন, বক্তৃতা ছাড়েন। নিতান্তই গোনাগুনতি, লিস্টিভুক্ত—সরকারি বার্ষিক রিপোর্টে সেই ক'টি নাম পাবেন। সেই লিস্টির শেষে একটা 'ইত্যাদি'ও নেই যে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে সরকার-জানিত বলে মনে মনে আত্মপ্রসাদ নেবো।

এমনিতরো তা-না না-না করে, দু-পা এগিয়ে দেড় পা পেছিয়ে—যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়লাম অবশেষে একদিন। কি বলব, মানুষ সব এমন ভালো! জাঁদরেল অফিসার—লোকে কত রকম ভয়-দেখানো কথা বলে—মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

রাশিয়ায় যাবেন, নেমন্তন্ন এলো নাকি ?

আসব-আসব করছে। ঝামেলাগুলো চুকিয়ে দিন। এলেই যাতে চাকরটা কাঁধে ফেলে—থুড়ি, পাশপোর্টটা পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়তে পারি।

দরখাস্ত করে দিনগে, হয়ে যাবে। আপনারা যাবেন—এতে আর কথা কি ?

অভয় পেয়ে দরখাস্ত ছাড়লাম। এক মাস যায়, দু'মাস যায়। সেই ঘড়েল মশায় বললেন, হয়ে যাবে বলেছে—কবে হবে, দিনলগ্ন ধরে তো বলে দেয় নি! লাল-ফিতের গাঁট ছাড়াতে অমন এক-জন্ম দু-জন্ম কাবার হয়ে যায়।

পুনশ্চ অতএব রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেওয়া গেল। এবারে অত উঁচু হিমালয়-চূড়ায় নয়—মাঝ বরাবর, ধরুন বিন্ধ্যশৃঙ্গে।

হাঁ-না একটা কিছু বলে দিন মশায়। জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে কত কাল রাখবেন ?

বিন্ধ্যমশায় বললেন, পাশপোর্ট কবে হয়ে আছে। না কাড়ছেন না দেখে আমরাই খবর দেবো ভাবছিলাম। বসুন, নিয়ে যান।

ভাবি তাজ্জব। ইংরেজ বিদায় হবার পর সরকারি-লোক রাতারাতি খোলস ফেলে ভদ্রলোক হয়েছেন। রামা-শ্যামাদের চেয়ারে বসিয়ে ছুটোছুটি করে কাজ চুকিয়ে দেন। এবং একেবারে মুফতে।

পাশপোর্ট বাক্সবন্দি করে উদ্বেগ বেড়ে গেল। চিঠি আসে-আসে, তবু আসে না। দেশে ঘরে যেন জল-বিছুটি মারছে, ডাক-পিওনের পাগড়ি দেখলেই মন আকাশের প্লেন ধরতে ওড়ে। এলো অবশেষে নিমন্ত্রণের চিঠি নয়, বোমার মতো বিষম এক খবর—ষ্টালিনের মৃত্যু। সে কি ব্যাপার, অতদিন পরে গিয়েও আঁচ পেয়ে এসেছি। সে কথা বলতে বলতে দোভাষি মেয়েটির চোখ চকচক করে উঠত। কনকনে শীতের রাত, বরফ পড়ছে—তার মধ্যে লাখ লাখ মানুষের জনতা ক্রেমলিনের সামনে রেড-স্কোয়ার ও রেভলুশোন স্কোয়ারে মুক্ত আকাশের নিচে। মেয়ে আছে, পুরুষ আছে, বাচ্চা আছে, বুড়ো আছে। একটা গোটা জাত বাপ হারিয়েছে যেন—হাউ-হাউ করে কাঁদছে, লজ্জা নেই সংযম নেই। সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছি, ফুল চাই একটা-দুটো। ফুল পাওয়া যায় না তো কাগজের ফুল দিয়েই তর্পণ।

ষ্টালিনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মতলব বানচাল হল। তলস্তয়ের উৎসবটাও একরকম নমো-নমো করে সারল নিজ দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার যে হাত কামড়ানোর অবস্থা! ঘরে বসে দিনের পর দিন যাচ্ছে। পাশপোর্টের মেয়াদ কমছে। মেয়াদ কমছে জীবনেরও। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি হুকুমের দৈত্যবর ? যা ভাবি, তা ঘটে কই ?

হেন কালে কানে এলো দাওয়াত এসেছে সোবিয়েত থেকে। এটা একেবারে আলাদা ব্যাপার। সোবিয়েতের সংস্কৃতি-বিভাগ—যার নাম হল ভোক্স—ভারতের গুণীজ্ঞানীদের দেশ দেখতে ডেকেছেন। মানুষ বাছাই করছেন ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতি-সমিতি। পশ্চিম-বাংলায় তার শাখা আছে—এখানকার ভাগে ফেলেছে চার জন। শাখাধীশরা তেড়েফুড়ে চারের জায়গায় একেবারে পুরো ডজন নাম পাঠিয়ে বসলেন। এবং অধমের নাম এগারো নম্বরে। গুণ নেই জ্ঞান নেই—এবং এ দুটো না হলেও অনুকল্পে যা দিয়ে কাজ চলে, ধনও নেই এর অধিক অতএব কি করে সম্ভবে ? গতিক দাঁড়াচ্ছে এখন, আমার উপরের অন্তত ছয় ব্যক্তির যাওয়া পণ্ড হবে কোন না কোন গতিকে। এই ধরুন, অসুখ করল কারো, কিম্বা ছেলে (বা ছেলের মা) কাঁদছে ভীষণ ভাবে, অথবা পাশপোর্ট মিলল না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবেই আমার ডাক পড়বে। এত জনের উপর যুগপৎ এত উৎপাত—পাপ কলিযুগে ইচ্ছাশক্তির উপর এতদূর ভরসা রাখা যায় না। পাশপোর্ট অতএব বাক্সবন্দি থাকুক যথারীতি—নাড়াচাড়া করবার গরজ দেখিনে।

কী তাজ্জব! বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লই শেষ অবধি! একচক্ষু হরিণ কিনা, এ পথটা নজরে আসেনি : শাখারা যা করবার করলেন, বম্বের কেন্দ্রীয় দপ্তর তদুপরি সারা ভারত থেকে ন'টি প্রাণী বাছাই করে নিলেন। অধম তার ভিতরে। অত দূরে কি করে নাম পৌঁছে গিয়েছে—কেউ বড় থাকবে, লোকটা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই লিখলেও চীনের বইটা হাই তুলতে তুলতে কোন গতিকে শেষ করা যায়। দাও পাঠিয়ে তাকে, দেখা যাক—সোভিয়েত নিয়েই বা কি লেখে।

প্রাতঃকালে দুই বন্ধু এসে খবর দিলেন, গাঁটরি বাঁধুন—মাঝে আর কয়েকটা দিন মাত্র। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গরম জামা বানাও শীত ঠেকাবার জন্য, মোটাসোটা খাতা বাঁধিয়ে নাও লেখায় ভরাট করে এনে ভালমানুষ পাঠকদের জ্বালাতন করবার জন্য। সকলের চেয়ে দরকারি বস্তু—মাথায় মাখবার তিলের তেল। নারিকেল তেল নিয়ে গিয়ে পিকিনে কী জব্দ! গরম করে গালিয়ে মাথায় ঢালতে না ঢালতে জমে আবার কাঠ হয়ে যায়। আর মস্কো-লেনিনগ্রাদের শীত, যা শুনেছি, পিকিনের পিতামহ।

ট্রেনে দিল্লি। চার বঙ্গনন্দন চলেছি একসঙ্গে। আমি ছাড়া বাকি তিনজন ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার—জ্ঞান মজুমদার; দাঁতের ডাক্তার—অরুণ গাঙ্গুলি। আর একজন নিতান্তই কাগজে ডাক্তার, একটা ফোড়া কাটারও বিদ্যা নেই। সেই মহাশয় হলেন ধীরেন সেন।

[ডায়েরি]

রেলগাড়ি—রাত্রি ১১টা।

ছুটছি। বর্ধমান পার হয়ে এসেছি। আর তিনজন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—কোদাড়ে-কুড়ুলে মেঘ বলে আমাদের পাড়াগাঁয়ে। দু-পাঁচটা তারা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারারা ছুটছে। ছাড়বে না আমায়, কিছুতে ছেড়ে দেবে না। দেশ-দেশান্তর চলেছি, ওরাও ছুটল সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ এই রাত্রিটুকু আছে। নিষ্ঠুর নিষুপ্ত পৃথিবীতে আজকে আমার কেউ নেই ঐ তারা কয়েকটি ছাড়া।

ছোট্ট বয়সে তারা দেখতাম। এক তারা ক্যারাব্যারা, দুই তারা পথহারা, তিন তারা আপাশায়, চার তারায় নেই দোষ··· তারপর তারা দেখিনে আর। শহরের ইটের স্তূপের আড়ালে কখন তারা ওঠে, কাজের মানুষ আমরা—ফুরসৎ কখন তারা দেখে সময় নষ্ট করবার ? আজকে এই অনেক দূর চলেছি—প্রতিটি

মিনিটে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে নিজভূমি ও চেনা মানুষদের সঙ্গে। ছোট্ট বয়সটা সঙ্কুচিত হয়ে রেলের কামরার আধ-অন্ধকারে যেন প্রবীণ গণ্যমান্য মানুষটাকে চুপি-চুপি একটুখানি দেখতে এসেছে।

রেললাইনের ধারে ধারে জল জমে আছে, ম্লান জ্যোৎস্নায় নজরে আসছে। গাছের ছায়া পড়েছে জলে। আর দূরবিস্তৃত ধানবন। ঝোপেঝাপে-ঢাকা ঘর-বাড়ি পলক না ফেলতে পার হয়ে যাচ্ছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে তারা আশা-উল্লাস দুঃখ-ব্যথা ভুলে গিয়ে রাত্রির এই মধ্যযামে। আমার চিরকালের-চেনা মানুষগুলির ঘরের পাশ দিয়ে নতুন দেশে চললাম। যাচ্ছি ভাই, সেই তাদের সঙ্গেও একটু চেনা-পরিচয় করে আমি।

ষ্টেশন মাঝে মাঝে। সাঁ-সাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছি। জোয়ালো আলো সেই সময়টুকু। আবার ঘোলা-ঘোলা জ্যোৎস্না। আজ আমি বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রাণ পরিপূর্ণ করে মাঠ-ঘাট, ধানবন, ঘর-বাড়ি, জল-আকাশ, আকাশের তারা দেখে নিচ্ছি।

কয়লার দেশে এসে গেলাম। বড় বড় চোঙা, কপিকল, পাহাড়ের মতন কয়লার স্তূপ···

পরদিন, বেলা ১১টা।

ভারতবর্ষকে চোখের উপর দেখতে দেখতে যাচ্ছি। চাষী চাষ করছে। খোলার ঘরের গ্রাম—ঘরের পাশে গরু শুয়ে আলস্যে জাবর কাটছে। গাছের ছায়ায় কাটা-ধান স্তূপাকার করে রেখেছে। শাখাবিস্তারী ছত্রছায় আমবাগান। অড়হর-ক্ষেত, ক্ষেতে হলদে ফুলের সাগর। মহিষ দৌড়চ্ছে—ল্যাংটো ছেলে দৌড়চ্ছে তারা পিছু-পিছু। তীব্রগতিতে রেলগাড়ি যাচ্ছে, ডায়েরির লেখা বড্ড ট্যারাবাঁকা। ষ্টেশনের নামটাও পড়ে নিতে পারলাম না, হুশ করে এমনি ভাবে বেরিয়ে গেল। বড় দীঘি ষ্টেশনের পাশে; ছেলেমেয়েরা স্নান করছে, জল ঝাঁপাচ্ছে। ভেড়ার পাল। গঙ্গা ডানদিকে—হঠাৎ একবার বর্ষার গঙ্গার রূপালি জলধারা ঝিকমিকিয়ে উঠল। ভোল পাল্টে গেছে চারিদিককার। জোয়ার আর অড়হরের ক্ষেত। চাষীদের মাথায় পাগড়ি। এক-মানুষ দেড়-মানুষ সমান কাশের বন।

আমার কামরার অপর তিন সহযাত্রী বিবিধ বিতর্কে মেতেছেন। বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁরা—মানুষের অধিগত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায়-শাখায় তাঁদের বিচরণ। তাঁরা বাঁ-দিকে—আর ডাইনে গাড়ির জানলার ওপারে ভারতের লক্ষকোটির সাধারণ দিনগত জীবনযাত্রা। একদিন আমিও অমনি কত সহজ ছিলাম, তাই ভাবি। গাছের ছায়ায় পথ-চলতি মানুষেরা বসে বসে জিরোচ্ছে, কতদিন ধূলোর মধ্যে আমিও পা অমনি করে ছড়িয়ে বসেছি। আজকে আলাদা, ওরা সব তটস্থ হয়ে উঠবে আমি কাছাকাছি গেলে। স্তবুথবু ভদ্রলোক হয়ে যাবে। অনেক দূর চলেছি—পৃথিবীর এক দূরপ্রান্তে। আরও যাবো কোথায় না জানি—মহাব্যোমে বায়ুভূত হয়ে ঘুরব না কি করব! তারই পয়লা কিস্তি হল শহরবাসী ও গণ্যমান্য হয়ে গিয়ে মানুষজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। একেবারে সমস্ত ছেড়ে যাবার প্রাথমিক ভূমিকা।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে ভারী দরের অনেকের সঙ্গে দেখা, এক ট্রেনে যাচ্ছি। বিধু সেনগুপ্ত এবং আনন্দবাজারের অশোক সরকার, কানাই সরকার মশায়েরা। প্ল্যাটফরমের উপরেই বিজয়ার কোলাকুলি। অরুণ গুহ মশায়ও যাচ্ছেন—এই সেদিন অবধি আমাদের বিস্তর ভালবাসার অরুণদা। এখন মন্ত্রী হয়েছেন, অতএব কোলাকুলি না করে নমস্কারে তিনি বিজয়া সারলেন।

ঠিক দুপুরবেলা। গ্রামের পর গ্রাম ছুটছে পিছন মুখো। এবারে পোড়ো-জমি, পলাশবন। ন্যাড়া-বটগাছ মাঝখানে। ছাগলের পাল চরছে। কাঠের আঁটি কাঁখে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে রেলগাড়ির দিকে চেয়ে—গলায় বাহারের রূপার হাঁসুলি।

ভিতরে নানান আলোচনা তুমুল হয়ে উঠেছে—বেদ-উপনিষদ, দেশি-বিদেশি দর্শন, ডাক্তারি—আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি···আর ওদিকে আমতলায় ছোট্ট একটুকু কবর, খানাখন্দ, অজস্র নিমগাছের জঙ্গল। কয়েকটি গ্রামবৃদ্ধ ছাতা নিয়ে চলছে কোন দিকে; ঝাঁকা মাথায় জনকয়েক গল্পগুজব করছে। বক উড়ছে ধানবনের উপর দিয়ে। লাইনের ধারে ঝিলের জলে কুমুদবন—মুদিত কুমুদরা মাথা জাগিয়ে আছে, জল দেখবার জো নেই। এদিকে-ওদিকে বাবলাবন, বট, নিম, কত রকমের ঝোপঝাড়। সমস্ত হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গিয়ে অনেক—অনেক দূরের ডোবাঘাটা দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে। পাকিস্তানের ভিতরে ছোট্ট গ্রামটি—আমার বাল্য-কৈশোর আজও সেখানে এলোমেলো ছড়ানো আছে। [ক্রমশঃ।

[অনিবার্য্য কারণ বশতঃ 'ভুয়া-ভুঁইয়া' উপন্যাসের নাম পরিবর্ত্তন করা হয়েছে।—লেখক]

রাজায় রাজায়

উদয়ভানু

আনন্দকুমারীর অলঙ্কার-ঝঙ্কার যেন কানে বাজতে থাকে রাজকন্যার!

সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত, এক ঝলক তপ্ত আগুনের মত চৌধুরীকন্যা, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এসে যেন তোলপাড় ক'রে দিয়ে যায়। আনন্দকুমারীর অপূর্ব্ব রূপরাশি, প্রস্ফুটিত যৌবনের ঐশ্বর্য্য; রত্নাভরণের পারিপাট্য; পরিধানের পরিচ্ছন্ন মিহি ঢাকাই শাড়ী আর জরির কাঁচুলীর উজ্জ্বল শোভায় বিন্ধ্যবাসিনীর যেন দৃষ্টিবিভ্রম হয়! চোখ দুটি থেকে থেকে জ্বলতে থাকে! সূক্ষ্ম ও লালাভ ওষ্ঠাধর দংশন করেন কখনও। এক ঝলক আগুনের কাছে নিজেকে মনে হয় যেন নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা। বর্ষাশেষের শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে যেন শীত-শীত করে। রাজকন্যার আলুলায়িত রুক্ষ চুলের বোঝা বাতাসে চঞ্চল হয়। কেমন যেন বিরক্তির সঙ্গে এলো চুলের এলো খোঁপা বাঁধলেন ধীরে ধীরে। কেশের বোঝা যেন অসহনীয় মনে হয়। কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে ছোট ছোট খোপ। একটি কুলঙ্গী থেকে দর্পণ তুলে ধরলেন সমুখে। দেখলেন, মুখের সেই শ্রী যেন ঘুচে গেছে। চোখের কোলে কালিমা। শুভ্র-লাল দেহবর্ণ দেখায় যেন পাংশু ও রক্তহীন। দৌর্ব্বল্যে শিথিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কেন কে জানে, একটি হতাশ-শ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। দর্পণ রেখে দিলেন যথাস্থানে। মুক্ত বাতায়নের ধারে আত্মগোপন ক'রে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন অবশ পায়ে। সম্মুখে সুবিশাল বালিয়াড়ি, বৃষ্টিজলে জমাট বেঁধে দেখায় যেন প্রস্তরবৎ। জল-ছলছল আমোদর আপন বেগে ব'য়ে চলেছে। বর্ষাজলে নদীর জল যেন গেরুয়া রঙ ধরেছে। কূল ছাপিয়ে বর্ষার নদী তরঙ্গহিল্লোলে যেন মুখর হয়ে আছে।

মুছে-আসা ঝাপসা বনপথ আবার নয়নগোচর হয়। আকাশের নীল, শ্যামল বনাঞ্চল, খরবেগ আমোদরের—ঘন-ঘটায় কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছিল। নদীর সিক্ত বালিয়াড়িতে কাঁচা রৌদ্ররেখা পড়েছে। নিস্তেজ সূর্য্যের ইশারা নীল মেঘমালার আড়ালে। বাদল-শেষের পাখীর ডাক শোনা যায় পথে-প্রান্তরে। কাক আর শালিখ ডাকাডাকি করছে।

আর এখন বৃষ্টি ঝরবে না আকাশ থেকে। দিগ্ দিগন্ত কাঁপিয়ে মেঘ ডাকবে না আর। দুয়োর-কপাট বন্ধ রাখতে হবে না। কাকের ডাক শুনে যাই হোক খুশীর হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বুকে ঈর্ষা আর বিদ্বেষের দাহ, তবুও অল্প একটু হাসি ফুটলো মুখে। কেমন যেন রহস্য আর কৌতূহলমিশ্রিত অব্যক্ত হাসি! শাড়ীর আঁচল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোমরে জড়িয়ে ফেললেন। নধর-নিটোল কটি ও নিতম্ব স্পষ্টতর হয় যেন।

—অ বৌ!

কক্ষের বাহির থেকে ডাক দেয় পরিচারিকা, নাতিউচ্চ কণ্ঠে।

সাড়াশব্দ মেলে না। ডাকের সাড়া মেলে না। আবার তাই ডাক পড়লো,—বৌ ঘরে আছো না কি?

তবুও সাড়া নেই। অগত্যা পরিচারিকা দুয়োর পেরিয়ে দেখলো, কক্ষের এক কোণে জমিদারনন্দিনী। মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো যশোদা; বললে,—ভাখো বাছা, দিন-রাত্তির জাকরা আর ভাল লাগে না আমার! আমাদের জমিদারটি তেমন মানুষই নয় যে এই বনবাদাড়ের দেশে এসে মানভঞ্জন করবে তোমার! সোয়াগ দেখিয়ে তোমাকে খাওয়াতে আসবে!

বিন্ধ্যবাসিনী অতৃপ্ত হাসির সঙ্গে বললেন,—ঝাঁটা মারো সোয়াগের মুখে! সোহাগ কে চায়? তুমি তো আছো, আমার আবার ভাবনা কি?

পরিচারিকার হাতে জলের ঘটি, থালিকাপাত্রে আহার্য্য সামগ্রী নারায়ণের প্রসাদী ফলমূল, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ। যশোদা বললে,—সদাক্ষণ তোমার এই গোমড়া মুখ আর আমার ভাল লাগে না!

ক্ষীণ হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আঁচল চেপে মুখ মুছতে মুছতে বললেন,—আমার মুখখানাই যে অমনি ধারার। পোড়া মুখে কি হাসি মানায়? হাসি কা'কে বলে তা কি জানি ছাই?

যশোদা যেন আর রাগ চাপতে পারে না। চাপা হাসি তার মুখে, অথচ যেন ক্রোধের মুখভঙ্গী। হাসি আর রাগ সংযত ক'রে বললে,—এগুলো এখন খেয়ে নাও দেখি! বান্না-বান্না হতে অনেক দেরী।

—আমি রাক্ষসীর মত গোগ্রাসে গিলবো, আর তুমি? রাজকন্যা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কথা বললেন। বললেন,—তুমি কি অনাহারে থাকবে না কি? আয়, ভাগাভাগি ক'রে দু'জনায় খাই।

—আমার তরে তোমাকে ভাবতে হবে না বৌ!

—আমার তরেও তবে ভাবতে হবে না কা'কেও।

খেঁকিয়ে উঠলো যেন পরিচারিকা। বললে—খাবো গো খাবো। না খেয়ে কি বেঁচে থাকা যায়?

দুই বাহুর সবল বন্ধনে বাঁধা পড়লো দাসী। বিন্ধ্যবাসিনী তাকে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—খেতে আমি পারি, যদি একটা কথা রাখিস।

ড্যাবা-ড্যাবা চোখ ক'রলো দাসী। বললে,—কথাটা কি তাই শুনি আগে।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—রাখবি তো যশো ? বল আগে অমত করবি না ?

—আগে-ভাগে কথা দিতে পারবোনি ভাই ! বিষ-টিষ এনে দিতে হবে না কি ?

হাসি আর খুশীর ঝিলিক খেলে যায় রাজকুমারীর চোখে-মুখে। সহাস্যে বলেন,—চল, পাড়া ঘুরে আসি। কাছাকাছি যাবো, ভয় নেই তোর।

খানিক ভাবলো যশোদা। কক্ষের উপরিস্থিত কড়ি-বরগায় চোখ তুললো। ভেবে ভেবে বললে,—প্রহরী যে বাধ সাধবে ! বাধা দেবে ?

—আর যদি বাধা না দেয় ?

—তাতে আর আপত্তি কি আমার ! এটা তো তোমাদের সাতগাঁ নয় যে পাড়া-প্রতিবেশীর চোখকে ডরাবো ? লাজ-লজ্জাকে ভয় ক'রবো !

—তবে দে খাই। সত্যিই আর থাকতে পারছি না যেন ! ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে বুক-পেট।

কথা বলতে বলতে খাবারের পাত্র স্বহস্তে গ্রহণ করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নিজে কিছু মুখে দেওয়ার আগে সহসা একটি ক্ষীরের ছাঁচ দাসীর মুখে পুরে দিলেন সজোরে।

হেই হেই করলো পরিচারিকা। কিন্তু সে নিরুপায়। মুখের মধ্যে ছাঁচ পুরে দেওয়া হয়েছে তার।

যৎকিঞ্চিৎ কি যেন মুখে তুললেন রাজকুমারী, এমন সময়ে দূরে কোথায় খোল আর করতালের মৃদু-মন্দ ধ্বনি বাজলো। 'হরি হরি বল' ডাক শোনা গেল অস্পষ্ট।

—কিসের বাদ্যি বল্ তো বৌ ?

মুখের খাদ্য চর্বণ করতে করতে বললে যশোদা। বললে,—হরিসঙ্কীর্তন ব'লে মনে হয় ! আজ কি বোষ্টমদের কোন পরব আছে না কি ?

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভাবেন যেন কত কি ! চিন্তার রেখা ফুটলো তাঁর অপ্রশস্ত কপালে। বললেন, —জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-পূজা নয়তো আজ ? এই বোশেখেই তাঁর জন্মদিন।

—হরিই জানেন। বললে দাসী, ঠোঁট উলটে।

হরিনাম কীর্ত্তনের অবিরাম ধ্বনি যেন নিকটে এগিয়ে আসছে। শ্রীখোল আর করতালের সুরেল ঝঙ্কার যেন নেমে আসছে আকাশ থেকে মাটিতে। আমোদরের তীরদেশ থেকে যেন শব্দ আসে, শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে ভাসতে ভাসতে। ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠছে মহাশূন্যে।

দাসীর হাতে আরও কিছু ফল-মিষ্টান্ন তুলে দিলেন রাজকন্যা। নিজেও গলাধঃকরণ করলেন কিছু কিছু। জলপান করলেন প্রায় এক-ঘটি। ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা নিবারণ ক'রে পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেললেন।

—পাড়া ঘুরতে বেরুবে, আমাকে রান্না-বান্না করতে হবে নি ? যশোদা ঈষৎ ভাবালু কণ্ঠে কথা বললে,—ফিরতে যদি বেলা গড়িয়ে যায়, তখন ?

—তা যায় যাক। রাজকুমারী কথার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী প্রকাশ করলেন। বললেন,—এক-হাঁড়ি ভাত ফোটাতে কতক্ষণ ? সেই সঙ্গে ক'টা শজীও সেদ্ধ হয়ে যাবে। খাবো তো ভাতে-ভাত, তার তরে এত ভাবনার কি আছে !

—খাবি তো বৌ ? স্নেহভরা কথার স্বর পরিচারিকার। বলে,—এই তো কেমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের মত কথা ! তা নয়, না-খাওয়া না-দাওয়া, চুলে তেল নেই—চোখে যে আর দেখা যায় না !

মৃদু মৃদু হাসলেন রাজকুমারী। টোল প'ড়লো দুই গোলাপী কপোলে। বললেন,—আর বিলম্ব নয় দাসী, চল্ যাই।

—প্রহরীকে বলতে হবে না ? যাই বললেই কি যাওয়া যায় ?

—তুই তবে ব'লে আয়। আমি গিয়ে দাঁড়াই পুকুর-ঘাটে।

—যাবে কোন্ দিকে তাই শুনি ?

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভাবতে ভাবতে বলেন,—দীঘির ধার দিয়ে দিয়ে যাবো খানিক। এই চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে থেকে যেন হাঁফ ধরছে আমার !

—পাড়া-প্রতিবেশী যে দেখতে পাবে ? দুর্নাম ছড়াবে। বলবে, জমিদার কেষ্টরামের স্ত্রী পাড়া-বেড়ানী !

—সে ভয় নাই। বললেন রাজকন্যা। কোমরের কাপড় এঁটে বাঁধতে বাঁধতে বললেন,—একখান তসরের চাদরে ঢেকে নেবো মুখ। মাথায় ঘোমটা থাকবে। দেখেও কেউ ঠাওরাতে পারবে না। ভাববে, কে না কে !

—আবার যদি ঝড়-জল আসে ? দুর্য্যোগ হয় ?

সম্ভাব্য ভীতির ছায়া ঘনায় পরিচারিকার মুখে।

রাজকুমারী বললেন,—শোন্ না কেন, কাক ডাকছে। আর জল হবে না এখন।

—তবে তাই চল'। তুমি পুকুর-ঘাটে যাও, আমি প্রহরীকে জানিয়ে আসি ততক্ষণে। কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় যশোদা। দালানে পা দিয়ে বললে,—প্রহরী সায় দেয় তো বাঁচি।

অলক্ষ্যে থেকে মিটি-মিটি হাসলেন রাজকুমারী। কেমন যেন দুষ্টামির হাসি। নিজের মনেই বললেন,—তোমাদের পাঠান প্রহরীকে ওষুধ আগেই খাইয়েছি। তাতেই কাজ হবে।

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান ! পাঠান প্রহরী তখন আনন্দে অধীর হয়ে আছে। অভাবী জন, ভাত-কাপড়ের রেস্ত নেই। চালচুলোর বালাই নেই। ছেঁড়া-চাটাই তার শয্যা। অন্ন-কাঙালী বললেই হয়। সে পেয়েছে হাজার টাকার মতির হার !

যশোদা প্রহরীর কাছে গিয়ে বলে,—জমিদারণীকে নিয়ে যাচ্ছি কাছেই এক দেব-দেউলে। যাবো আর আসবো। অমত করবে না কি ?

আকাশে চোখ তুললো পাঠান। বড় জটিল প্রস্তাব করেছে যে দাসী ! খাঁচার পাখীর পায়ের শিকলী কেটে দিতে বলছে ! বন্দুকের কুঁদোয় দু'হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকলো চুপচাপ।

—প্রহরী, তুমি জবাব দাও না কেন ? কি এত ভাবছো আকাশ-পাতাল ? অধৈর্য্যের স্বরে বললে যশোদা। কাতরকণ্ঠে।

বললে,—আমাকে তোমার প্রত্যয় হয় না? আমি কি জমিদারের মাইনে খাই না? ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নেই আমার?

—বেইমানী করবি না তো তুই? আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ পাঠানের দৃষ্টিপথে আসে, ভগ্নগৃহের ছাদে এক আকাশ-পরী। জমিদারের বেগম, প্রহরীর মনিবনী। সাঁজোয়া পোষাকের ভেতরে, ঠিক বুকের কাছে, খচ্‌খচ বিঁধছে যে-বহুমূল্য রত্নহার! পাঠানের দৃষ্টি নত হয়ে যায় ঐ গুণ্ঠনবতীকে দেখে। পাঠান বললে,—ঠিক হ্যায়! বেইমানী করবি তো দেখছিস এই বন্দুক, একটা গুলীতে—

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো পরিচারিকা। বুক দুরদুরিয়ে উঠলো। শ্বাস প'ড়লো না কতক্ষণ। বললে,—জান থাকতে নয়। যদি না মরি তো তোমার কোন ভয় নেই। কথার শেষে ফিরলো দাসী। চললো কাঁপা-কাঁপা পায়ে।

রূপালী রৌদ্রের স্পর্শ লেগেছে গাছের শিখরে। ঘনঘোর বর্ষণের পর ছিটে-ফোঁটা আলো! সূর্য্যের রশ্মি যেন ভিজে স্যাঁতসেঁতে। গৃহের ছাদেও রৌদ্ররেখা পড়েছে। জমিদারের বেগমও বাদ যায়নি। কাঁচা রোদে বিন্ধ্যবাসিনীর তসরের গাত্রাবরণ ঝলমল করে।

দেখা দিয়েছেন রাজকন্যা। সশরীরে। তাঁকে চোখে দেখে যদি মনে পড়ে পাঠানের, রত্নহার লাভের কৃতজ্ঞতায় যদি আর অসম্মত না হয়, সেই আশায় বিন্ধ্যবাসিনী ছাদে দাঁড়িয়ে দেখা দিলেন।

পাঠান কুর্নিশ শুরু করলো, একের পর এক। নতুন সূর্য্যালোকে তার সাঁজোয়া পোষাক চিকচিকিয়ে ওঠে।

খোল আর করতালের ঘন ঘন শব্দে মুখর হ'তে থাকে আমোদরের তীর—নদীর বালিয়াড়ি। কাকচিল বসতে পায় না কোথাও। একটি জনতা, যেন আর্ত্ত চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে।

রাজকুমারী ভাবলেন, হয়তো নগর সঙ্কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। হরিনামের প্রতিধ্বনি আকাশে আর বাতাসে।

দীঘির তীর ধ'রে, পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে বিন্ধ্যবাসিনী সভয় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন। সহগামিনী পরিচারিকা যশোদা যেন পদে পদে ভীতা হয়। পাঠান প্রহরীর ভীতিপ্রদর্শনের কথাগুলি বার বার মনে পড়ে। বন্দুকের গুলীর ভয়ে গায়ে যেন তার কাঁটা দেয়।

পথের এক দিকে বিস্তীর্ণ আসমানদীঘি, অন্য দিকে বালুকাবেলার শেষে জল-ছলছল আমোদর—কুলু-কুলু শব্দে প্রবহমান। যতদূর দৃষ্টি চলে তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নেই। কিন্তু সে বন শুধু দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নয়—কেবল স্থানে স্থানে উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড জুড়ে আছে। বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা দেখায় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী। বালুকাস্তূপগুলির অধোভাগে ঝাটি, বনঝাউ আর বনপুষ্পবৃক্ষ। কোথাও কোথাও মানুষ-প্রমাণ কাশ মাথা তুলেছে।

বিন্ধ্যবাসিনী ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে দ্রুত পায়ে অগ্রসর হন। নদীর জল কোথাও স্থির-গম্ভীর, কোথাও ঘূর্ণাবর্ত্ত, কোথাও জলরাশি মধ্যে ভৈরব কল্লোল। জলোচ্ছ্বাসে তটদেশে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয়; সৈকতভূমি হয় জলপ্লাবিত।

যতদূর দৃষ্টি যায় রাজকুমারী দেখেন, কোথাও গ্রাম নেই, মনুষ্য নেই, আহার্য্য নেই। আসমান আর আমোদরের থৈ-থৈ জল!

—কোথায় চললে বৌ? আমার যে ভয়-ভয় করে!

পরিচারিকার ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরে দেখলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চলার গতি সংযত করলেন। হাঁফ ছেড়ে বললেন,—দীঘির শেষ বরাবর চল না। দেখা যাক্ সেথায় কি আছে।

—বাঘের মুখে পড়বে না কি বৌ? তোমার সাহস তো দেখি কম নয়? যশোদা ভয়ে ভয়ে কথা বলে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে পর্য্যন্ত ভয় পায় সে। সাপের ফোঁসফোঁসানি শোনে যেন কানে। দুর্য্যোগ-শেষের বাতাসে শোঁ-শোঁ শব্দ!

রাজকন্যা বললেন,—ভাগ্যে যদি থাকে বাঘের সাক্ষাৎ, কে খণ্ডাবে?

অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে আর অবগুণ্ঠনের আবরণে বিন্ধ্যবাসিনীর অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। কাজল-কালো চোখে অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময় কটাক্ষ। কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ ও বাহুযুগল যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চাঞ্চল্যে মুক্ত হয়ে গেছে এলোচুলের এলো-খোঁপা। মুক্তকেশ আর তসরের উত্তরীয়ে স্কন্ধদেশ প্রায় অদৃশ্য, শুধু শুভ্র বাহুযুগলের নিটোল গঠন কিছু কিছু দেখা যায়।

—সাপে যদি দংশায়?

—তা-ও ভাগ্যের লেখন বলতে হবে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। যেন কি এক আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে রাজকন্যার দেহ-মন। ভয় আর আশঙ্কাকে যেন জয় করেছেন।

—নদীর তীরে অত ভীড় কেন? দেখো দেখো, কত মানুষ, কত গোল আর কত শিঙে!

কথার শেষে দাঁড়িয়ে পড়লো যশোদা। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলো। দেখলো, নদী-সৈকতে একটি ক্ষুদ্র জনতা। কোন এক আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা নাচানাচি করছে অবিরাম। 'হরি হরি বল' ধ্বনিতে মাতিয়ে তুলেছে যেন নদী-তীর।

—ওরা কা'রা? অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, নদী-তীরে দৃষ্টি রেখে।

পরিচারিকা বললে,—কেউ হয়তো মরেছে! তবে এত মেইয়াদের ভীড় কেন?

রাজকন্যা পথক্লান্তিতে শ্রান্ত। ক্লান্ত চোখে দেখেন তিনি। দেখা যায়, কীর্ত্তনীয়াদের কাছাকাছি নারীদের এক জটলা। সধবা এয়োস্ত্রীদের সমাগম। সলজ্জায় তারা দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। রাজকুমারী বলেন,—দাসী, যা দেখে আয়। আমি আছি এই গাছের ছায়ায়।

—একা-একা যেতে আমি ডরাই, তুমিও কেন চল' না? দাসীর কথায় যেন ভয়ার্ত্ত সুর। বললে,—কেউ চিনবে না তোমাকে। মুখ-চোখ ঢেকে চল' না কেন?

—তবে তাই চল'।

কেমন যেন অনিচ্ছায় পা চালালেন বিন্ধ্যবাসিনী। কণ্টকাকীর্ণ

ভূমিখণ্ড। যখন-তখন কাঁটা বিঁধছে পায়ে। নীরবে কাঁটা তুলে ফেলে আবার চলতে থাকেন তিনি। বালির স্তূপে ঢাকা প'ড়েছে ফণী-মনসার শাখা। অজ্ঞাতে কাঁটা বিঁধে যায় পায়ে। মনসার কাঁটা। পদতল ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবুও মুখে কিছু প্রকাশ করেন না রাজকন্যা। কি এক আবিষ্কারের নেশায় যেন অধীর হয়ে আছেন।

জনতার কাছে এগিয়ে যেন শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। দুই চক্ষু মুদিত ক'রে ফিসফিসিয়ে বললেন,—চল্ দাসী, এখান থেকে পালাই। চোখে আমি দেখতে পারি না যেন।

জনতার মধ্যস্থলে এক মুমূর্ষু। লোল চর্ম, অশীতিপর বৃদ্ধ, শেষ শয্যায় শায়িত। মৃত্যুপথযাত্রীর দৃষ্টি মহাশূন্যে নিবদ্ধ। চক্ষু-তারকা স্থির ও অচঞ্চল। অন্তর্জলী হবে বৃদ্ধের, মুমূর্ষুর নিম্নাঙ্গ নদীতে নিমজ্জিত করা হবে পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য। বৃদ্ধের অন্তিমকাল যে সমুপস্থিত!

মান্দারণের কোন' এক গৃহে পাঁচটি কন্যা বর্তমান। দেবীবরের নিয়মে মেলী-কুলীন-কন্যা অবশ্যই করণীয় কুলীনপাত্রে অর্পিত হবে, যদি তার আজীবন বিবাহ না হয় তবুও শ্রোত্রিয় অথবা বংশজের ঘরে তার বিবাহ হ'তে পারবে না। অথচ কুলরক্ষা করতে হবে যেন-তেন। সেই হেতু এক মহাপ্রস্থানের পথিক, অশীতিপর বৃদ্ধের করে সময় সময় বহুসংখ্যক কন্যা সম্প্রদান করতে হয়। মেলী কুলীন শ্রীনাথাচার্য্য এ নিয়মের প্রচলন করেছেন! পাত্রাভাবে যে কুলবালাদের আর ইহজন্মে পাত্র জুটবে না। তদুপরি বঙ্গদেশে পাত্র-সংখ্যা নিতান্তই অল্প আর কন্যা-সংখ্যার আধিক্য। অথচ ষোড়শোপচারে পূজা না পেলে কোন কুলীন-সন্তান তাঁর করণীয় ঘরে বিবাহ করতে সম্মত হন না।

লোলচর্ম বৃদ্ধকে দেখে দেখে শিউরে শিউরে ওঠেন রাজকন্যা। লক্ষ্য করেন, এয়োস্ত্রীদের মধ্যে পাঁচ জন অনূঢ়া। তাদের মধ্যে কারও বয়স ত্রিশ, কারও বিশ, কেউ সপ্তদশী, কেউ পঞ্চদশী, কেউ বা মাত্র দশমবর্ষীয়া।

পরিচারিকা বললে,—ঐ বুড়ার সঙ্গে ঐ কুমারীদের বিয়া হবে। দেখবে না বৌ?

—না এখনই চল' এই স্থান ত্যাগ করি।

রাজকুমারী ফিরতে চাইলেন। চোখে যেন দেখা যায় না এই অপকর্ম! বৃদ্ধের আশ-পাশে কন্যাকর্ত্তার দেয় দ্রব্যাদি সজ্জিত। মুমূর্ষুকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্য করছে কীর্তনীয়ার দল। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করছে, 'হরি হরি বল'। দ্রব্যসম্ভের মধ্যে আছে, বস্ত্রজোড়; লগ্নপত্র, কন্যার বস্ত্র, নবসুন্দরের বস্ত্র, কোটালের বস্ত্র। টাকার তোড়ায় আছে পাত্রদক্ষিণা; পুরোহিতের প্রাপ্য; কুলপালকের পুরস্কার; পাত্র আশীর্বাদী; কুলদায়িনীর প্রণামী; গুরুপ্রণামী ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোর পাত্রাভাব। কুলবালাদের দুর্দশার অন্ত নেই। শুভ-পরিণয় ব্যতীত জীবনরক্ষা করা যায় না। তাই এক ঘরের পঞ্চকন্যার বিবাহ হবে একটি প্রবৃদ্ধের সঙ্গে। কপালে সুখভোগ না থাকে, সীমন্ত সিন্দুর বিহীন থাকবে না আর।

পরিচারিকা যশোদার দু' চোখে দরদর অশ্রু। ঐ পঞ্চকন্যার ভবিষ্যৎ কি, ভাগ্যে কি আছে কে জানে! বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্য সমুপস্থিত হবে। দাসী না কেঁদে যেন পারে না। বার বার দেখে ঐ পঞ্চকন্যাকে, দেখে তাদের অসাধারণ রূপ-যৌবন। দেখে তাদের ভাগ্যের পরিহাস। আঁচলে চোখ মুছে ফিরে তাকিয়ে দাসী দেখলো, জমিদারপত্নী অনেক দূরে এগিয়েছে। একটি তপ্তশ্বাস ফেলে সেও চললো!

নদীর তীরের পায়ে-চলা আঁকা-বাঁকা ও সঙ্কীর্ণ পথ ধ'রে অতি দ্রুত এগিয়ে চললেন রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। আর ফিরেও তাকালেন না। পঞ্চকন্যার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মন যেন তাঁর ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে।

—অ বৌ! অ জমিদার-গিন্নী! যশোদা ডাক দেয় পেছন থেকে।

রাজকন্যার কান নেই কারও কথায়। লজ্জা-নম্র পদক্ষেপে তিনি আগেই অগ্রসর হয়েছেন! তসরের উত্তরীয়ে তাঁর ঊর্দ্ধাঙ্গ আচ্ছাদিত।

—অ বৌ, আর কত দূরে নিয়ে যাবে গো?

যশোদা শুধোয় সহজ সরল সুরে। বলে,—ওদিকে যে বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম। বৌদ্ধরা যদি কোন রকমে জানতে পায় তুমি ব্রাহ্মণের মেইয়া, রক্ষা থাকবে না আর। নয় তাদের সঙ্গে যেতে হবে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে, আর তা নয়তো জানে মারা পড়তে হবে। থাকতে হবে বন্দিনী হয়ে।

—কোথায় সঙ্ঘারাম? উগ্র কৌতূহলের সঙ্গে কথা বলেন রাজকন্যা।

—পথে যেতে যেতে দেখতে পাবে! ভয় করবে না তোমার?

ড্যাবা-ড্যাবা চোখে বললে যশোদা।

—যার কপাল পুড়েছে তার আবার ভয় কিসে?

চলতে চলতে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—শুনেছি বৌদ্ধরা মেয়েজাতকে বড় শ্রদ্ধাভক্তি করে। তবে আর ভয় কিসের?

পায়ে-চলা আঁকাবাঁকা, সঙ্কীর্ণ পথ। পথের দু'পাশে বৃক্ষশ্রেণী। তাল, নারিকেল আর খেজুর গাছের সারি। মেহেদীর ঝোপ। বনঝাউয়ের জটলা। যেন সবুজ পর্দা ঝুলছে একটানা। ঘাসফুল ফুটেছে পথের এখানে-সেখানে। ফড়িং উড়ছে ফুলে ফুলে।

পরিচারিকা বললে দুঃখভারাক্রান্ত সুরে,—কুলীন মেইয়াদের কি দুর্দ্দশা দেখলে বৌ? দেখে চোখ ফেটে জল আসে যেন!

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকন্যা। পায়ে কাঁটা আর কাঁকর বিঁধছে, খেয়াল হয় না। জীবন পণ ক'রে চলেছেন যেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলছেন একেক বার। বললেন,—কুলীন-ঘরের মেয়ের বৃথা জন্ম! বরাতে শুধুই দুঃখকষ্ট! স্বোয়ামীর সোয়াগ-আদর কা'কে বলে জানতে পায় না। স্বোয়ামীর মুখ দেখতে পায় না বছরান্তে! ঘর করতে পায় না! বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—আমার বরাতই বা কি? পোড়াকপাল বৈ তো কিছুই নয়।

—কোথায় চললে বৌ? এ পথের কি শেষ আছে? চল' ফেরা যাক এখন। যশোদা চলতে চলতে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে। শ্রান্তির ছায়া নেমেছে তার মুখে।

রাজকুমারীর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর। বললেন,—দীঘির পেষাপেষি গিয়ে ফেরা যাবে দাসী! আর কতটুকুই বা!

কি এক আবিষ্কারের নেশা যেন পেয়ে ব'সেছে রাজকন্যাকে। অদম্য কৌতূহল আর উৎসাহ তাঁর।

আসমানদীঘি আকাশের মতই যেন বহুবিস্তৃত। আকাশের হয়তো শেষ আছে, কিন্তু দীঘির যেন শেষ নেই! যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু জল আর জল। শেওলা-সবুজ সুগভীর জল। যেন সুষুপ্তি-সুস্থির। কচিৎ দু'একটি বৃহৎ মৎস্য লাফিয়ে উঠছে কোথাও কোথাও। সশব্দে।

আশা! ভালবাসার আশা!

আনন্দকুমারীর এই কথা ক'টি বারে বারে কানে বাজে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। চৌধুরীকন্যার কথা তো নয়, যেন দম্ভোক্তি। শুধু কথা নয়, আনন্দকুমারীর অলঙ্কারের ঝনংকারও কানে লেগে আছে। চোখে ভেসে উঠছে তার রূপ-যৌবনের লাবণ্য, তার পোষাক-পরিচ্ছদ। ঈর্ষা আর বিদ্বেষের জ্বালায় রাজকন্যা থেকে থেকে বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। চন্দ্রকান্ত কি সত্যিই ঐ মূর্তিমতী আগুনের প্রেমাস্পদ! কে জানে! পায়ের কাঁটা তুলে ফেলা যায়, কিন্তু বুকের কাঁটা কে তুলবে? ক্ষণে ক্ষণে খচখচ করে যেন রাজকন্যার বুকে।

—দাসী, কার আটচালা বল্ তো?

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলতে বলতে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন; ব্যগ্রচোখে তাকিয়ে।

—কে জানে কার।

—বসতি নেই না কি? যা না, দেখে আয় না। আমি আছি এখানে।

কথার শেষে এক অতিবৃহৎ মহীরুহের ছায়াতলে একটি মাটির ঢিপিতে ব'সে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী।

কিছু দূরে বাঁশঝাড়। ঘন বাঁশবন। তেঁতুল আর সজিনার শাখা মাথা তুলেছে আকাশে।

থেকে থেকে ঝড়ের হাওয়া বইছে। রাজকন্যার তসরের গাত্রাবরণের আঁচল উড়ে যায়। মহীরুহের শাখায় শাখায় পাখীর কলকাকলী। কাঠবিড়ালীর লম্ফ-ঝম্ফ। এখানে-সেখানে বন্য লতাগুল্ম। বনঝাউয়ের ঝোপ।

শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের মধুর ধ্বনি ভেসে আসে কোথা থেকে? দেবভাষায় কারা যেন গান ধরেছে সামসুরে? কাছাকাছি কোথাও কোন দেবালয় আছে না কি! উড়ু-উড়ু বাতাসে পবিত্র সুগন্ধ। হোমাগ্নিতে কেউ হয়তো গব্যঘৃত আহুতি দেয়। দূরস্থিত আটচালার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। আটচালার চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর—মাটির দেওয়াল। প্রাচীরগাত্রে আলপনা আঁকা। যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষায় থাকেন রাজকন্যা। মাঝে মাঝে গা ছম-ছম করে তাঁর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে। সাপখোপ থাকে যদি কোথাও! অতর্কিতে যদি দংশন করে?

সুস্বাগতম্!

কার গম্ভীরকণ্ঠে যেন চেতনা লাভ করলেন আপনাতে আপনি আত্মহারা বিন্ধ্যবাসিনী। লুপ্তজ্ঞান ফিরে পেলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, সেই অভাবনীয়কে। যুক্ত দুই কর, বিনম্র মুখাকৃতি, ভাবগম্ভীর চোখে যেন আকুল আহ্বানের ইশারা। রাজকন্যা সলজ্জায় দেখলেন, চন্দ্রকান্ত কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। চন্দ্রকান্ত মৃদু হাসির সঙ্গে পুনরায় বললেন,—সুস্বাগতম্!

মাটির ঢিপিতে ব'সেছিলেন রাজকন্যা। শ্রান্তদেহে। মনুষ্যকণ্ঠ শোনামাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন তৎক্ষণাৎ। বুক আর পিঠের বসন সামলে নেন। মুখে যেন কোন কথা আসে না। অভিভূত দৃষ্টি যেন চোখে। বিন্ধ্যবাসিনী চক্ষু নামিয়ে ভূমির প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করেন ক্ষণেকের মধ্যে। কত উৎসাহ, কত প্রতীক্ষা, কত আগ্রহ, কত কৌতূহল—সব যেন উবে গেল কর্পূরের মত। দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আর ভয় যেন গ্রাস করলো। আনত মুখ আর তুলতে পারলেন না। মাথার গুণ্ঠন ঈষৎ টেনে দিলেন ভ্রূযুগলের পরে। প্রথম দৃষ্টিতে বিন্ধ্যবাসিনী দেখে নিয়েছেন—চন্দ্রকান্তর সৌম্যকান্তি। প্রশস্ত ললাটে চন্দনরেখা; বিশাল বক্ষে শুভ্র উপবীত; করাঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরীয়; পরিধানে পট্টবস্ত্র; পদদ্বয়ে কাষ্ঠপাদুকা।

চন্দ্রকান্ত স্মিতহাসি হাসলেন। বললেন,—মহাশয়ার দুঃসাহস প্রশংসার্হ। কিন্তু এ স্থান অত্যন্ত ভয়াবহ! শ্বাপদের ভয় শুধু নাই, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের অনাচারের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। মদীয় কুটীরে চলুন, এই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সতর্ক্ষণ সর্বিত আছে আপনার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধবে না। ঐ আমার বাসস্থল।

ব্রাহ্মণ কথার মাঝে নিজের প্রতি নির্দেশ করলেন। বক্ষে হাত ছোঁয়ালেন।

—দাসীকে দেখি না কেন? সে কোথায়?

মিহিমিষ্টি কথার সুর রাজকন্যার। লজ্জানম্র ভঙ্গিমা। আনতদৃষ্টি।

চন্দ্রকান্ত রমণীর দুই পায়ে চোখ রেখে বললেন,—দাসী সেখানে আছে। তার মুখে শুনে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি আমি। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তায়।

মহীরুহের সিক্ত শাখা-পল্লব থেকে টুপটুপ জল পড়ছে এখনও, শুষ্কপত্রের স্তূপে। বনভূমির নৈঃশব্দ ভঙ্গ হয় থেকে থেকে।

চন্দ্রকান্ত আগে, বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর পশ্চাতে। ধীরে ধীরে, জল-কাদা মাড়িয়ে, দু'জনে এগিয়ে চললেন সাবধানে। মাটির পিচ্ছিলতা বড় বেশী যেন।

চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করলেন,—কোন্ কার্য্য কারণে এই দিকে আগমন? জানতে ইচ্ছা হয়।

ক্ষণেক নিরুত্তর থাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কি অভিমত ব্যক্ত করবেন, চিন্তা করলেন হয়তো। কণ্ঠ-তালু বিশুষ্ক, বাক্যের যেন স্ফুরণ হয় না। তদুপরি অপরিসীম লজ্জা-সঙ্কোচে যেন বুক দুরু-দুরু করে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—বাধা থাকে তো না বলেন।

সঙ্কোচ বোধ করলেন রাজকন্যা। ভাবলেন, বলবেন কি বলবেন না। ইতস্ততের মধ্যে ব'লে ফেললেন,—মহাশয়ের দর্শন অভিপ্রায়ে।

কপালে রেখা ফুটলো ব্রাহ্মণের। চোখের পলক পড়লো না। কেমন বিস্ময়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করলেন না। নীরবে চললেন আগে আগে।

পিছন থেকে লক্ষ্য করেন বিন্ধ্যবাসিনী। ব্রাহ্মণকে দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ব্রাহ্মণের সৌম্যকান্তি, বলিষ্ঠ বাহু, বৃষ-স্কন্ধ, ক্ষীণ কটি। মাথার শিখায় নীল অপরাজিতা।

রাজকন্যার কথায় ব্রাহ্মণ খুশী হন না অখুশী হন, অনুমানে বোঝা গেল না।

আটচালার দুয়োরের কাছাকাছি পৌঁছে চন্দ্রকান্ত বলেন,—এই আমার টোল চতুষ্পাঠী যাই বলেন।

কোথায় কা'রা মন্ত্রপাঠ করছে যেন বৈদিক ভাষায়। মন্ত্রের উচ্চারণে, সুরে ও বিরতিতে অসম সমতা। একসঙ্গে বহু জনের কণ্ঠ, কিন্তু সুর অত্যন্ত কোমল। যেন শিশুকণ্ঠ।

ফিস-ফিস কথা বললেন রাজকন্যা। সাগ্রহে বললেন,—এ সময়ে পূজার মন্ত্র কেন? কি তিথি আজ? কার পূজা?

অস্ফুট হাসলেন চন্দ্রকান্ত। আটচালার দাওয়ায় পদার্পণ ক'রে সহাস্যে বললেন,—অন্য কোন দেবদেবীর পূজা নয়, বাগ্দেবীর অর্চনা। ছাত্রশিষ্যদের দৈনন্দিন পাঠের সময় এখন। তারাই পাঠ করছে তাদের অধ্যেয়।

—আমাদের আসায় পাঠে বিঘ্ন হবে হয়তো? বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি কথা বললেন অবগুণ্ঠনের মধ্যে থেকে। গুণ্ঠন আরও কিঞ্চিৎ টানলেন, প্রায় নাসিকাগ্রে।

আটচালার একটি শূন্য কক্ষে পূর্ব্বেই এসে বসেছিল পরিচারিকা। সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—এই স্থানে কোন কলরব নাই, আপনারা অধিষ্ঠান করুন। পথ-ক্লান্তি লাঘব করুন।

কক্ষের মধ্যস্থলে ছিল একটি তক্তাপোষ। ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে আবৃত। দেওয়ালে কয়েকখানি চিত্রপট, মানচিত্র। দশ অবতারের হস্তাঙ্কিত পট আর বঙ্গভূমির মানচিত্র। বাঙলার একেক স্থানের নাম মানচিত্রের বুকে। নগর-নগরী নদ-নদীর নাম। কক্ষের এক প্রান্তে একটি জলচৌকীতে স্তূপীকৃত পুঁথি। লাল শালু জড়ানো। সত্ত কার করস্পর্শ পড়েছে, তাই যেন কিছু অগোছালো। কয়েকটি পুঁথির শালুর আবরণ উন্মোচিত দেখা যায়। কক্ষের এক দেওয়ালে সারি সারি খড়্গ, প্রলম্বিত। কোনটি পশুচ্ছেদক, কোনটি মনুষ্যচ্ছেদক। বঙ্গদেশজাত অসি, তীক্ষ্ণচ্ছেদভেদে পটু। যেমন তীক্ষ্ণ, তেমন দৃঢ় লঘুভার ও সুলক্ষণযুক্ত। প্রতিটি খড়্গের অঙ্গে অঙ্কচিহ্ন। কোনটিতে স্বর্ণরেখা, কোনটিতে রৌপ্যরেখা। সর্পফণা, লাঙ্গলাগ্র, অশ্বখুর ও চক্ষুচিহ্নযুক্ত যুদ্ধাস্ত্রগুলিতে দিবালোকের চাকচিক্য।

—এটি কি অস্ত্রাগার? অত অস্ত্র কেন? অস্ত্রশিক্ষা দেন না কি? রাজকুমারী যেন ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললেন।

ইদিক সিদিক দেখলেন চন্দ্রকান্ত। সশঙ্কচিত্তে বললেন,—বিধর্ম্মীদের অত্যাচার আর অনাচারে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ বর্ত্তমানে অতিষ্ঠ হয়ে আছে! বিশেষতঃ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের হিংস্রতা আর সহ্য করা যায় না। এ তরবারির পরিবর্ত্তে তরবারি চালনায় বঙ্গদেশবাসী যে অপারগ নয়, তারই প্রমাণ। বৌদ্ধগণ জানে না আমাদের আদর্শ, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

—অস্ত্রগুলিতে রক্তের ছাপ কেন?

রাজকন্যার যেন অদম্য কৌতূহল! কণ্ঠ আবেগময়।

ব্রাহ্মণ ক্ষীণহাস্য সহকারে বলেন,—শত্রুর রুধিররেখা।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজকুমারী। পরিচারিকা যশোদাও যেন চমকে উঠলো। দু'জন মুণ্ডিতমস্তক কিশোর ব্রহ্মচারী কক্ষে প্রবেশ করলো সসম্ভ্রমে। তাদের একজনের দুই হাতে কদলীপত্র। পাতায় ফল আর মিষ্টান্ন। আম, জাম, জামরুল আর চিনি-সন্দেশ। অন্য জনের হাতে জলপাত্র!

চন্দ্রকান্ত বললেন মিনতির সুরে,—আপনারা ভক্ষণ করেন তো বাধিত হই। এ দরিদ্রের আবাসে আর অধিক কিছুই নাই।

লজ্জানুভব করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অপ্রস্তুত হ'লেন। ব্রাহ্মণের কথার প্রতিবাদ জানাতে পারলেন না যেন। পাত্রগুলি আর আহার্য্যপূর্ণ কদলীপত্র তক্তাপোষে রেখে নির্ব্বাক্ ব্রহ্মচারীদ্বয় কক্ষ ত্যাগ ক'রলো।

ব্রাহ্মণ আবার বলেন,—আমি আছি অন্যত্র। আমার সমুখে হয়তো আহারে অসুবিধা হবে।

কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। কক্ষের দ্বার দীর্ঘ নয়, তাই কথঞ্চিৎ অবনত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হন।

—একটি নিবেদন ছিল।

লজ্জা ঘুচিয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। অবগুণ্ঠন আবার নাসিকাগ্রে টানলেন কথার শেষে।

—ব্যক্ত করুন নির্ভয়ে। দ্বিধার কিছুই নাই।

কথা বলতে বলতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন চন্দ্রকান্ত। নির্ব্বিকার মুখাকৃতি তাঁর! সামান্য আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ পায় না যেন।

বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলেন,—মহাশয় কি চৌধুরী কন্যাকে জানেন? পরিচয় আছে গোপীমোহন চৌধুরীর মেয়ে আনন্দকুমারীর সঙ্গে?

প্রশ্ন শুনে ক্ষণেক নীরব হন চন্দ্রকান্ত। উপবীত করাঙ্গুলিতে বেষ্টন করতে করতে বলেন,—হাঁ, পরিচয় আছে বটে, তবে কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। ঐ আনন্দকুমারী কিছুকাল পূর্ব্বে—

কথা থামালেন ব্রাহ্মণ, কেন কে জানে! লজ্জার অরুণ-আভা খেললো তাঁর মুখাবয়বে।

অধৈর্য্যে অস্থির হন রাজকুমারী। শ্বাস রুদ্ধ হয় যেন তাঁর। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—বক্তব্য শেষ করলেন না কেন?

লজ্জানম্র স্মিতহাসি হাসলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—বাধা কিছুই নাই। তবে কথাটি যেন পাঁচ কানে না যায়!

—অঙ্গীকার, কেউ জানবে না। নিশ্চিন্ত হোন আপনি।

আবার ইদিক-সিদিক দেখলেন চন্দ্রকান্ত। সলজ্জায় বললেন,—গোপীমোহনের অদৃষ্ট মন্দ, তাই আনন্দকুমারীর মত কন্যা লাভ করেছে! এমনই নির্লজ্জ যে, আমার সমীপে সে স্পষ্ট বিবাহের প্রস্তাব করে।

—আপনি অসম্মত কেন?

—জাতিভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। তদ্ব্যতীত আমি বিবাহের পক্ষপাতীও নয়। ঘোর অভাব, সংসার প্রতিপালনের ক্ষমতা আমার নাই। তদুপরি আনন্দকুমারী বড়ই প্রগলভা!

প্রসন্ন হাসি গোপন করলেন রাজকুমারী। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন যেন এতক্ষণে।

—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত আছো না কি?

আটচালার বাহির থেকে কে ডাক দেয় জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে। কোন এক পরিচিত কণ্ঠ শুনে তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করলেন ব্রাহ্মণ। ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যায় তার মুখভাবে। প্রশস্ত কপালে চিন্তারেখা। যাত্রাকালে বললেন,—কা'কে আবার হত্যা করলে

কে জানে! গোকুলানন্দ যেন দিন দিন অসুরে পরিণত হ'তে চলেছে!

ব্রাহ্মণের স্বগতোক্তিতে বক্ষ দুরু-দুরু করে জমিদারনন্দিনীর। কে আবার কা'কে হত্যা করলো! খুনোখুনি, হাতাহাতি, রক্তারক্তি যেন সহ্য করতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। চোখে দেখা দূরের কথা, কানে শুনতেও ভীতা হন যৎপরোনাস্তি।

ক্ষুধার তাড়নায় কি না, কি জানি পরিচারিকা একে একে সকল আহার্যই শেষ করলে। কারও অনুরোধের অপেক্ষা করে না সে। রাজকন্যা যৎকিঞ্চিৎ মুখে তোলেন। অবশিষ্টাংশ যেমনকার তেমনি থাকে।

চন্দ্রকান্ত আটচালার প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলেন রুধিরসিক্ত গোকুলানন্দ। তার বস্ত্রে ও উপবীতে রক্তচিহ্ন। দুই হাতও রক্তাক্ত। শরীরের স্থানে স্থানে রক্তলাল রেখা। গোকুলানন্দর এক হাতে একটি ছিন্নমুণ্ড! রক্তাপ্লুত! তাঁর ঘর্মাক্ত মুখে পৈশাচিক উল্লাস। শত্রু-জয়ের হাসি।

—পাঁচ জন ব্রাহ্মণের পরিবর্তে এক জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি। দেখে পরিতৃপ্ত হও চন্দ্রকান্ত! তোমার টোলে উৎসবের ব্যবস্থা কর। গোকুলানন্দ কথা বলেন সহাস্যে। সহজ কণ্ঠে।

চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় চন্দ্রকান্তর। নির্বাক, নিষ্পলকের মত তিনি দেখেন, গোকুলানন্দের হস্তধৃত কাটামুণ্ড। এখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি।

গোকুলানন্দ বললেন,—যাতে বিশ্বাস হয় তোমার, তাই এ বস্তুটি আনয়ন করেছি। নতুবা ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আমোদরের গর্ভে নিপাতিত করতাম। তুমি উৎসবের ব্যবস্থা কর, আমি যাই, এর একটা সদ্গতি করি গে। আমোদরের জলেই নিক্ষেপ করি, কি বল'?

চন্দ্রকান্ত কোন কথা বললেন না, কেবল সম্মতিসূচক মুখভঙ্গী করলেন। ওপরে নীচে মাথা দোলালেন।

গোকুলানন্দ অট্টহাসি হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো বাতাসে।

—আর কালক্ষেপ নয়, আপনারা এ স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করুন। একজন সিদ্ধাচার্যের জীবন নাশ হয়েছে!

চন্দ্রকান্তর কথায় শিউরে শিউরে উঠলেন রাজকন্যা। তক্তাপোষ ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে আর আশঙ্কায় বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে যায়। বক্ষে যেন কাঁপন লাগে তাঁর। বাক্য সরে না মুখে।

চন্দ্রকান্ত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন যেন। তাঁর চোখে কিসের ঘোর কে জানে! বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ-সৌন্দর্য দেখেন কি?

—পথে কোন ভয় আছে কি? পরিচারিকা উদ্বেগপূর্ণ সুরে প্রশ্ন করলে।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—দুই জন ব্রহ্মচারী যাক আপনাদের সঙ্গে। আপনারা বিপদের সীমানা অতিক্রম করলে ব্রহ্মচারীরা ফিরে আসবে।

ভীতচকিতা রাজকুমারী একবার যেন দেখে নেন যেন। দেখেন সরল সুঠাম চন্দ্রকান্তকে। অজ্ঞানের মত বললেন,—প্রণাম! তবে যাই এখন?

—হ্যাঁ। আর অপেক্ষা নয়। আগামী কল্য প্রাতে সাক্ষাৎ মিলবে পুনরায়। আপনাদের পড়ার ব্যবস্থা যেন সম্পূর্ণ থাকে।

আর কোন কথা বললেন না বিন্ধ্যবাসিনী। অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আটচালার বাহির-পথ ধরলেন।

চন্দ্রকান্তর ছাত্রদিগকে কিন্তু ফিরতে হয় না কোন মতেই। বারদুয়ারীর দাওয়ায় বসে পাঠ গ্রহণ করে তারা। পুরানো ছাত্ররা পাঠ দেয় তাদের। ছাত্রদিগের কেউ কেউ চারি বেদ ও বেদান্ত কণ্ঠস্থ করে। কেউ মীমাংসা, কেউ সাংখ্য, কেউ ন্যায় মুখস্থ করে। কেউ স্মৃতি আর কেউ কাব্যালঙ্কার রপ্ত করে। দ্বাদশবর্ষীয় কয়েক জন বালক বর্ণজ্ঞান ও লিখন শিক্ষা অভ্যাস করে।

চন্দ্রকান্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন আটচালার বাহির-পথপানে। জমিদারনন্দিনীকে আর দেখা যায় না। ধীর মন্থরগতিতে বিন্ধ্যবাসিনী তখন বেশ কিছু দূরে এগিয়েছেন। তাঁর পশ্চাতে পরিচারিকা। সর্বশেষে চলেছে দু'জন মুণ্ডিত-মস্তক ব্রহ্মচারী। সূর্যের প্রখর আলোয় তাদের হস্তস্থিত ক্ষুরধার মুক্ত-অস্ত্র চিকচিকিয়ে ওঠে। মুক্ত কৃপাণ!

[ক্রমশঃ।

—প্রচ্ছদ-পট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে মাসিক বসুমতীর জনৈকা অনুরাগী পাঠিকার আলোক-চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি কনক দত্ত গৃহীত।

শ্রীহরিহর শেঠ

[বিদ্যোৎসাহী, একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ও গবেষক]

বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যভূষণ, কৃতীনিধি, শিক্ষাবন্ধু, দেশশ্রী প্রমুখ এত সুন্দর সুন্দর সম্মানসূচক উপাধি থাকতেও হরিহর শেঠ মহাশয় পছন্দ করেন, "কূপমণ্ডুক" উপাধিটিই সব চেয়ে বেশী। এর কারণ প্রসঙ্গে তিনি জবাব দেন, চন্দননগরই তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা। কাজকর্মের ফাঁকে যেখানেই তিনি অবসর পেয়েছেন সেইখানেই তিনি সেবা করেছেন চন্দননগরকে নানা ভাবে। তাঁর এই অসাধারণ চন্দননগর-প্রীতি দেখে কোন বিখ্যাত মনীষী তাঁকে এই উপাধিটি দিয়েছিলেন। চন্দননগর সেবার জন্যে এই উপাধি পেয়েছেন বলে এর মূল্য এঁর কাছে এত বড় এত বিশাল, এত মোহনীয়। শেঠ মহাশয়ের জীবনে চন্দননগরের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। চন্দননগরের সম্মান তাঁর সম্মান—চন্দননগরের অপমান তাঁর অপমান।

শ্রীহরিহর শেঠ
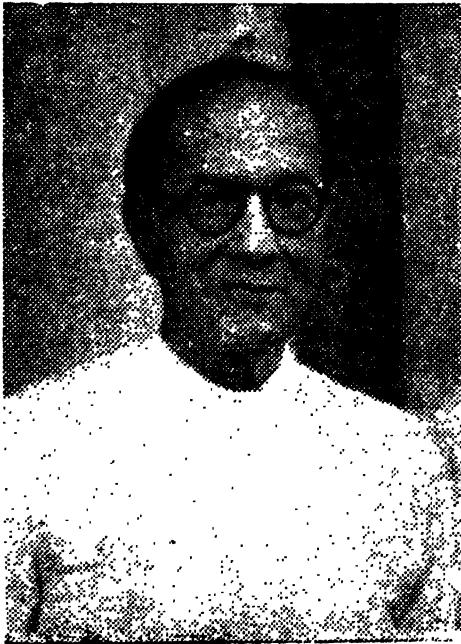
আজ থেকে দু'শো বছর পিছিয়ে যেতে হবে সে এক বিরাট যুগ—একটা শাসনতন্ত্রের অবসান—আর এক শাসনতন্ত্রের উত্থান। নবাবী আমলের পর বাণিজ্য-দূতের আবির্ভাব—নিশাবসানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সেই মানদণ্ড রাজদণ্ডের আকার ধারণ করল। একটা যুগ-যুগব্যাপী সভ্যতার সন্ধিক্ষণ। স্থলপথে এগিয়ে আসছেন লর্ড ক্লাইভ। মীরজাফরের সহায়তায় সিরাজকে ধ্বংস করতে—কেড়ে নিতে তার হাত থেকে রাজত্ব—বসাতে মীরজাফরকে গদীতে। ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই জলপথে এগিয়ে আসছেন কর্ণেল ওয়াটসান—টাইগার, কেন্ট, সলসব্যারী জাহাজগুলি আসছে তাঁর সুচতুর অধিনায়কতায়। একদিনে তাঁরা অধিকার করলেন চন্দননগর। ওয়াটসান ফিরে গেলেন—দেশে গিয়ে এই নির্লজ্জ অভিযানের স্মৃতি পাথরের মধ্যে চিরজীবন্ত করে সাজিয়ে রাখলেন। সু-উচ্চ ওয়েষ্ট মিনষ্টার য়্যাবে বিরাট হলের প্রায় চার তলা সমান উঁচু একটি কুলুঙ্গিতে। তার পর আজ কত কাল অতীত হয়ে গেছে, কত কাহিনী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। বহু কাল পরে ওই চন্দননগরেরই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও গবেষক হরিহর শেঠ মহাশয়ের হাতে এল "ভূপ্রদক্ষিণ" বইখানি। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে, "দেখে এলাম চন্দননগরকে চেনে বেঁধে রেখেছে" আকৃষ্ট করল মাতৃভক্ত সন্তানকে। হরিহর শেঠ সেখান থেকে সেই প্রস্তর-মূর্তিটির ছবি তুলিয়ে আনালেন। খরচ পড়ল দু' গিনি, অবশ্য ভারা বাঁধতে হয়েছিল। ছবিটিতে কর্ণেল ওয়াটসান মাঝখানে ও দু' পাশে বন্দী চন্দননগর ও বন্দী কলকাতা, কর্ণেল কলকাতাকে মুক্ত করছেন, কলকাতার অনুপম কান্তি, আর চন্দননগরকে চেনে বাঁধা হয়েছে। তার আকৃতি দুর্মনের মত দেখাচ্ছে।

চন্দননগরের সর্বজন-সম্মানিত ব্যক্তি ৺নিত্যগোপাল শেঠ মহাশয়ের বড় ছেলে হরিহর শেঠ ১২৮৫ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করলেন চন্দননগরের পালপাড়ার বাড়ীতে। বারো-তেরো বছর বয়স থেকে সাহিত্যের অনুপ্রেরণা তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। এই সময় "সখা" ও মাদ্রাজের ইংরিজী মাসিক "Progress"-এ তিনি লিখতেন। বাবার বার্ধক্যের জন্যে রিপণ কলেজে এফ-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে ব্যবসায়-জগতে তাঁকে আসতে হয়। সেই সময় এঁর প্রথম বই "অভিশাপ" প্রকাশিত হয়। তখন এঁর বয়স বাইশ। সেটা ১৯০০ সাল।

ব্যবসায়ে হরিহর বাবু স্থায়িভাবে রইলেন না, কিছু কাল পরে ব্যবসায়-জগৎ ছেড়ে পুরোপুরি ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন জনসেবায়, লোকহিতকর কার্য্যে চন্দননগরের উন্নতিকল্পে, সাহিত্যের প্রসারকল্পে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রহস্য-কাহিনী সারা জীবনে প্রায় শ'চারেক লিখেছেন। তাঁর বহু গ্রন্থও সুধী-সমাজে আদৃত হয়েছে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থগুলির মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে "চন্দননগর-পরিচয়," "কলিকাতা পরিচয়" ও "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়," এক এক বইয়ের জন্যে তাঁকে প্রায় শ'খানেক বই ঘাঁটতে হয়েছে।

ফরাসীরা বাঙলা দেশে কোন্ স্থান সর্বপ্রথম অধিকার করেন, হরিহর শেঠই তা প্রথমে আবিষ্কার করেন। অনেকে পুরাতন ফেরাটিকেই সেই স্থান বলে ভুল করেন। ফোটোগ্রাফী বিদ্যাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত, কাচের Dry plate বা ফিল্মের পরিবর্তে "পেপার নেগেটিভ" বা কাগজের নেগেটিভের তিনিই আবিষ্কর্তা। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর

জন্মতারিখ নিয়েও অনেক মতদ্বৈধতা ছিল—ইনিই তার সত্যতা প্রকাশ করেন। অর্ধ শতাব্দী আগেকার জাতীয় আন্দোলনের কথা মনে পড়ে হরিহর শেঠের—মনে পড়ে চন্দননগরের গৌরব কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসুর চমকপ্রদ দেশসেবার নিঃস্বার্থ কাহিনী।

জীবনে নিজ অর্থ ব্যয় করে কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানাদি যে কত প্রতিষ্ঠা করেছেন, কত সাহায্য করেছেন শিক্ষাপ্রদ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকশিত হবার সময়ে হরিহর বাবুর কর্মজীবনের সেটি একটি অনুকরণীয় অধ্যায়। ছেলেদের জন্যে "নিত্যগোপাল অবৈতনিক বিদ্যালয়—" মেয়েদের জন্যে "অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়" (অঘোরচন্দ্র তাঁর মেজ কাকা) চন্দননগর পুস্তকালয়ের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ টাকা দান, মা কৃষ্ণভামিনীর নামে "কৃষ্ণভামিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির" কাকীমা তারকদাসীর নামে "তারকদাসী নারী-কল্যাণ-সদন" প্রভৃতি হরিহর বাবুরই অক্ষয় কীর্তি—হুগলী জেলা এবং সম্ভবতঃ বর্ধমান বিভাগের মধ্যে মেয়েদের জন্যে এই প্রথম উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়। এখানে মৃৎশিল্প, তুলির কাজ, রোগীর পরিচর্য্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, চর্মশিল্প, রাষ্ট্রনীতি, স্বাবলম্বন স্বাস্থ্যরক্ষাদিও শেখানো হয়। এর জন্যে তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। সৎকাজে ব্যয় করবার জন্য তাঁর কাকীমা তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে যান—সেই টাকা তিনি দরিদ্রদের চিকিৎসা, দরিদ্রদের শিক্ষা ও পুরস্ত্রীদের শিক্ষার জন্যে ব্যয় করেন।

চন্দননগরের "নিত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির" এর শ্রীবৃদ্ধির জন্যে ইনি খরচ করেছেন প্রায় পৌণে এক লক্ষ টাকা। এ ছাড়া ১৩২৬ সালে চালের অগ্নিমূল্যের সময় গরীবদের জন্যে একটি "চাউল সরবরাহ সমিতি", এই সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় প্রতিকারকল্পে একটি মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির প্রতিষ্ঠা পিতামহ শম্ভুচন্দ্রের নামানুসারে "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে সহরের তিন দিকে তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, অতিথি-নারায়ণের সেবার জন্যে "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে একটি অতিথিশালা, জলাভাব দূর করার জন্যে সহরের কয়েক জায়গায় নলকূপ নির্মাণ প্রভৃতি মহৎ কার্যাগুলির মধ্যেও হরিহর শেঠ চিরদিনই বেঁচে থাকবেন।

জনগণের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানে ইনি সমাসীন। চন্দননগর পৌরসভার "মেয়র" পদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। রবীন্দ্র-মানসের ইনি সভাপতি—মুক্ত চন্দননগরের শাসক-সংস্থার ইনি প্রথম প্রেসিডেন্ট—এ ছাড়া কত উল্লেখ করব—সারা জীবনই তিনি কাটিয়েছেন জনগণের মধ্যে দিয়ে চন্দননগরের পূজা করে। ১৯২৭ সালে ফরাসী সরকার ব্রিটিশ "নাইটে" এর অনুরূপ "শিভালিয়ার দি লা লিজিয়ন দি অনার" সম্মানে ভূষিত করলেন। পরের বছরের ফরাসী সরকারের সর্বোচ্চ অ্যাকাডেমিক সম্মান "অফিসার দি এল ইনসট্রাকসান পাবলিক" সম্মানও তাঁর উপর বর্ষিত হোল।

কৃষিবিদ্যাতেও তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। তাঁর বাড়ীর আসবাবপত্র সমস্ত নিজের বাগান থেকে কাঠ কেটে তৈরী করা। শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত—এক সময়ে একটি "টেকনিক্যাল স্কুল" তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকারের সহানুভূতি তিনি পাননি।

চন্দননগরবাসীর রচনা প্রায় পাঁচশ' খানি বই এবং তা ছাড়া বহু রক্ষণীয় দ্রব্যাদি নিয়ে তিনি একটি সংগ্রহশালার পরিকল্পনা করেছিলেন—এর প্রতিষ্ঠা বাবদ সরকার কর্তৃক দু' লক্ষ টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও কোন দিকেই কিছু হোল না। হরিহর শেঠ মহাশয়ের জীবনে এটি একটি করুণতম অধ্যায়। রাজনীতি জগতে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতি পছন্দ করেন না হরিহর শেঠ—তিনি বলেন দলাদলির মধ্যে দিয়ে জাতির একতা নষ্ট হয়ে যায়, তাতে সমষ্টিগত কল্যাণের বিঘ্ন ঘটে। নিজের ব্যবসায় জীবন সম্বন্ধে হরিহর শেঠ বলেন—"একবার যুদ্ধের সময় একটি পয়সা না ঢেলে—বিনা পরিশ্রমে লোহার ব্যবসায়ে আমি ছ'-সাত লক্ষ টাকা উপার্জন করেছি।"

"মাসিক বসুমতী"র প্রসঙ্গে বললেন: "মাসিক বসুমতী" আমি বহুকাল ধরে পড়ে আসছি, তুমি জিগেস করছ বলে যে বলছি তা নয়। সত্যিই বসুমতী আমি ভালবাসি—ভালবাসি তার দ্রব্যসম্ভারকে, সম্মান করি তার অপ্রতিহত জয়াভিযানকে, স্নেহ করি তার সুযোগ্যতম সম্পাদক—চন্দননগরের গৌরব পরম স্নেহভাজন আমাদের প্রাণতোষকে।

দীর্ঘ সাতাত্তর বছরের জীবনে বহু মনীষীর সংস্পর্শে হরিহর বাবু এসেছেন—সেই নামগুলিই শুধু করলে পাতা ভরে যাবে, এখনো তাঁর কর্মজীবন অনলস বেগে এগিয়ে চলেছে। সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা অবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন শেঠ মহাশয়।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আবরণে রেল-লাইন অন্ধকার, দু'ধারে ফাঁকা সুবিস্তীর্ণ মেঠোপথ রেলের বাঁশরী ধ্বনির মধ্যে দিয়েও আমার কানে ভেসে ভেসে আসছিল—তাঁর স্নেহপূর্ণ বিদায় সম্ভাষণ—"আবার কিন্তু এসো ভাই!"

অগ্নিযুগের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯৩০-এর ৯ই সেপ্টেম্বর। দমদম জেলে Civil disobedience-এর অপরাধে অভিযুক্ত বন্দীরা মহাসমারোহে পালন করবেন বাঘা যতীন স্মরণোৎসব। সভাপতি হবেন, Civil disobedience Committee-র প্রথম ডিক্টেটর, বাংলার এক প্রবীণ নেতা। সন্ধ্যা সমাগত। সভা এবার সুরু হবে। সভাপতি জেল-সুপারের ঘরে গিয়ে প্রথমে টেলিফোন করলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্যকে, "আজ উত্তরপাড়ায় গিয়েছিলেন ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কে?"

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে প্রশ্নকারী শুধালেন—"অসুখ কি খুব বাড়াবাড়ি?"

আবার ডাক্তার বাবুর উত্তর শোনা গেল—"শুধু বাড়াবাড়ি নয়, আজ রাত দশটা নাগাদ মারা যাবে ছেলেটি!"

প্রশ্ন হোলো—"কোনো উপায় করতে পারলেন না?"

গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তার বাবু বললেন—"I'm sorry, it's too late. কিন্তু আপনার পরিচয়টা—"

বাধা দিয়ে প্রশ্নকারী অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—"যাকে দেখতে গিয়েছিলেন আমি তার বাবা।"

তারের ওপারে অস্ফুটে শোনা গেল—"সর্বনাশ! আপনিই—"

তার আগেই ফোন ছেড়ে দিয়েছেন উদ্দিষ্ট লোকটি, ধীর মন্থরপদে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন সভাপতি। মুখে চিরাচরিত মৃদু হাসির রেখা। এক ঘণ্টার বেশি তীব্রভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে নিজের 'সেল'-এ ফিরে এলেন। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। রোজ প্রাতে উঠে গীতাপাঠ ক'রে ডায়েরি লেখা তাঁর অভ্যাস। সেদিনও বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হোলো না। কেবল ডায়েরিতে একটি লাইন যুক্ত হোলো: 'দেবু কাল রাতে মারা গেছে।' পরদিন সকালেই বন্ধুরা তাঁর বাড়ী থেকে এই মর্মান্তিক সংবাদ পেলেন। সারা'দিন কারো সাহস হোলো না এ দুঃসংবাদ জানাবার। সন্ধ্যায় সকলে একে একে তাঁর সেল-এ এসে নির্বাক্ নতমস্তকে বসে আছেন। তিনি একবার তাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"তোমরা যা বলতে এসেছ, কাল রাত্তিরেই সে খবর পেয়েছি আমি।" বন্ধুরা একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। তিনি আবার বললেন—"এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, জন্মমৃত্যু অতি স্বাভাবিক সত্য। তা ছাড়া আমরা মৃত্যু নিয়ে খেলা করছি, মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি কত লোককে। নিজের সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ পেলে চলবে কেন? দুঃখ পেয়েছি অন্য কারণে। আমার সন্তান রোগের যন্ত্রণায় ভুগে বিছানায় মারা গেল, দেশের কাজ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে না!"—এই আশ্চর্য সংযত মানুষটিই আজীবন বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ। এই একটি ঘটনাই তাঁর চরিত্রের সাক্ষ্যস্বরূপ। জীবন এবং কর্মকে তিনি কখনোই পৃথক করে দেখেন নি। কর্মের মহত্তর আহ্বানে বলি দিয়েছেন সুখদুঃখসংকুল জীবনকে।

অমরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী একটি উপন্যাস। উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ চট্টোপাধ্যায়-বংশে ১৮৮০ সালের ১লা জুলাই তাঁর জন্ম। উত্তরকালে যে বলিষ্ঠ ঋজুগঠন এবং সৌম্যদর্শন তাঁকে সর্বত্র দশজনের মধ্যে একজন ক'রে রেখেছিল প্রথম আবির্ভাবেই তার প্রকাশ। শৈশবে তিনি মাতা এবং পিতৃস্বসার কাছে ঘুমপাড়ানি গানের বদলে শুনেছেন হেমচন্দ্রের ভারতবিলাপ বা 'কত কাল পরে বল ভারত রে'; তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র উত্তরপাড়া এবং ভাগলপুর। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে ক্রিকেট, টেনিস বা বাইচ খেলায় অমরেন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল, আর ছিল নাটকের প্রতি। স্কুলের শিক্ষা শেষ ক'রে তিনি এলেন কলকাতায়, ভর্তি হলেন ডাফ্ কলেজে। এখানেই তাঁর জীবনের নবদিগন্ত খুলে গেল। অধ্যাপক হিফেন্‌স্ সাহেবের পরোপকারিতা এবং উচ্চ-নীচ নিরপেক্ষতা তাঁকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করলে। এই কলেজে বহু পরবর্তী কালে বিখ্যাত সহপাঠীর সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ছিলেন উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। গিরীন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় আমেরিকায় পালিয়ে যান আর অপর দু'জন বন্ধুও সংসার ত্যাগ করেন। উপেন্দ্র আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে দ্বীপান্তর ভোগ করেন, হৃষীকেশ বর্তমানে হরিদ্বারে ভোলানন্দগিরির আশ্রমে বিখ্যাত বিশুদ্ধানন্দ স্বামী। তিন বন্ধুই চলে যাওয়ায় অমরেন্দ্রের পড়াশোনা ভালো লাগতো না। এই সময় জাপান থেকে রমাকান্ত রায় নামে এক ভদ্রলোক এসে ছাত্রদের কাছে স্বাধীন জাপানের কথা ব'লে ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্যে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথকে অনুরূপ উপদেশ দান করলেন। এর পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় ছাত্রদের মনে আলোড়ন জেগেছিল। ১৮৯৭ সালে বিডন্ স্কোয়ার কংগ্রেসে অমরেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে স্বদেশসেবার প্রেরণা অনুভূত হয়। অবশেষে ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট টাউনহলে বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলনের সমর্থনে যে ঐতিহাসিক সভা হয় তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার বন্যায় তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে তাঁর সম্পর্কে ছেদ পড়লো বি-এ পাশ করার পরেই। সুরেন্দ্রনাথ যেখানেই বক্তৃতা করতে যেতেন অমরেন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতেন। ক্রমে তাঁর সংগে অমরেন্দ্রনাথের পরিচয় হোলো, তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনের দায়িত্ব দিলেন তাঁর ওপর। স্বদেশীতে সেই প্রথম দীক্ষা। ইতিমধ্যে তাঁর বিবাহের আহ্বান এলো। তিনি সে আহ্বান উপেক্ষা করলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের কুষ্টির সূত্রগুলি অবহেলা করতে পারলেন না। সকল কাজে জননীর আদেশ তিনি শিরোধার্য করেছেন। তিনি বললেন "দেশের সেবার সংগে গৃহকেও সেবা করবে না কেন? গৃহও তো দেশের একাংশ।" সুতরাং দ্বার-ভাঙারাজের শেষ বাঙালী ম্যানেজারের কন্যার সংগে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হোলো। অমরেন্দ্রনাথের পত্নী তখন পিত্রালয়ে। বয়স বারো বৎসর—নাবালিকা বললেই হয়—এসব বিষয়ে বিচার-বোধহীন, যখন তাঁর স্বামী স্বদেশমুক্তির উন্মাদ বন্যায় ভেসে গেলেন।

উত্তরপাড়া শিল্পসমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রে অমরেন্দ্রনাথ ছ'টি তাঁত বসালেন এবং স্বদেশী খদ্দরের কাপড় মাথায় ক'রে বাড়ী বাড়ী ফেরী ক'রে বেড়াতে লাগলেন। পরবর্তী কালে এই শিল্পসমিতিই কলেজ ষ্ট্রীটে বিখ্যাত 'শ্রমজীবী সমবায়ে' রূপান্তরিত হয়—যেখানে তখনকার কালে সমস্ত বিপ্লবীরা গোপনে মিলিত হ'তেন। এর পর উপেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিয়ে যান এবং অরবিন্দ তাঁকে বিপ্লবের জন্যে অর্থসংগ্রহের ভার দেন। এই অর্থসংগ্রহে আর একজনের সংগে তাঁর পরিচয় হয়, তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন এবং রাজেন্দ্রনাথ (মিছরী বাবু) পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অমরেন্দ্রকে উৎসাহিত করলেন।

১৯১০-এ অরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার পর পাঁচ বছর তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিপ্লব কর্মের সংগে যুক্ত থাকেন। এই সময় বাঘা যতীন, বিপিন ও প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ

প্রভৃতির সংগে শ্রমজীবী সমবায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হওয়ায় বিশেষতঃ তাঁর প্রত্যক্ষ অনুচরদ্বয় বসন্ত ও মন্মথ বিশ্বাসের মধ্যে প্রথম জন লাহোরে হার্ডিঞ্জ বোমা মামলায় ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ করলে পুলিশের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। ইতিমধ্যে জার্মাণী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকেই অজ্ঞাতবাসে যেতে হয়। এই অজ্ঞাতবাসের জীবন-ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি রোমাঞ্চকর! কি করে চন্দননগরে পুলিশের বৃত্ত ভেদ ক'রে তিলজলা-কেবিনে, সেখান থেকে গৌহাটি ডিব্রুগড় পেরিয়ে 'বাবা বইচিত্তর সি' এর কাছে অমৃতপান ক'রে পঞ্চক'কারে শিখ হ'য়ে গেলেন, তারপর আবার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ক'রে কনৌজ, ঝাঁসী, গোয়ালিয়র, হরিদ্বার, অমৃতসর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর পদব্রজে ভ্রমণ করলেন, সে এক উপন্যাসের কাহিনী। প্রায় সাত আট বছর তিনি অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, হুলিয়ায় তাঁর নামে সরকারী পুরস্কারের মাত্রা বিশ হাজার পর্যন্ত ওঠে, কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও কেউ তাঁর সন্ধান পায়নি। দক্ষিণ-ভারতে সর্বত্র তিনি 'পাঞ্জাবী সাধু' ব'লে পরিচিত ছিলেন এবং এই সময় বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি 'Lectures by a Punjabi Sadhu' নামে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠানো হয়। চন্দননগরের 'Standard Bearers' পত্রিকার বিপ্লবী বারীন ঘোষ মতিলাল রায় প্রমুখ প্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেখে তিনি পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন।

বাংলায় ফিরে তিনি 'চেরী' প্রেসের সংগে সংযুক্ত হ'ন এবং 'আত্মশক্তি' পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করেন। ক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়, তিনি বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে তাঁকে 'স্বরাজ পার্টি' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে শাঁখারীটোলা ডাকাতির ব্যাপারে সন্দেহ ক্রমে পুলিশ তাঁকে সদলবলে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৬ সালে তিনি ও উপেন্দ্রনাথ জেল থেকে মুক্ত হ'ন। সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে 'কমিসংঘে'র সভাপতিত্বে বরণ করেন। ইতিমধ্যে 'Council Election'এ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রায়-বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত ক'রে নির্বাচিত হ'ন। এর পর জে. সি. সেনগুপ্ত Civil Disobedience Committee গঠন করে ব্রহ্মদেশে কারারুদ্ধ হওয়ায় তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'ন এবং ১৯৩০এ আবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৫ সালে তাঁরই উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে বিডন স্কোয়ারে নিখিল ভারত কৃষি-প্রদর্শনী হয়। এই সময়েই তিনি Congress Nationalist Partyর পক্ষ থেকে কুমার বীরেন্দ্রনাথ খাঁকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত ক'রে বর্ধমান বিভাগ থেকে নির্বাচিত হ'ন। ১৯০৫ থেকে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত সকল বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংগে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সভার সভ্য হিসেবে তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, কিন্তু তাঁদের সংসর্গজাত অভিজ্ঞতা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পূর্বেই ১৯৪৮ সালে দুরারোগ্য থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েন।

বর্তমানে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ শরীর নিয়েও স্থানীয় এবং প্রাদেশিক বহু সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত আছেন। তাঁর প্রায় অশীতিপর বার্ধক্যেও তাঁর মনে কোনো বলিরেখা পড়েনি। নব জীবনের স্বপ্নে এবং নবীন মানবতার প্রতিষ্ঠায় তিনি চির-তরুণ। "নিঃস্ব হ'লেও আমি রিক্ত নই। আজীবন যে স্বদেশের কল্যাণ কামনা করেছি, আগামী ভবিষ্যতে হয়তো তার মঙ্গল আরো সুনিশ্চিত হ'বে। আমার এই স্বাস্থ্যহীন জীবনে হয়তো সে সুদিন দেখে যাবার অবসর হ'বে না, তবু স্বদেশকে স্বাধীন দেখে গেলাম, নিজেদের কর্মফল এ জীবনেই উপভোগ ক'রে গেলাম, এই সার্থকতাটুকুই আমাদের মত বিপ্লবী-জীবনের ভিত্তি"—বলতে বলতে আবেগ-প্রবণ হ'য়ে উঠলেন অমরেন্দ্রনাথ।

অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত

(স্কটিশ চার্চ কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক)

রামবাগানের দত্তবংশ তাঁদের মহান অবদানের জন্তে ইতিহাস-বিখ্যাত। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত—বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেও যাঁর অবদান কম নয়। বাংলার মহিলা-কবিকুলের বরেণ্যা প্রতিনিধি তরু দত্তও এই বংশেরই মেয়ে। অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্তও এই বংশের সুযোগ্য বংশধর। অধ্যাপক দত্তের ঠাকুরদাদা ছিলেন ৺উমেশচন্দ্র দত্ত। যিনি ক'লকাতার তদানীন্তন পৌরসভার পৌরপাল (ভাইস-চেয়ারম্যান) ছিলেন। বাবা ৺যোগেনচন্দ্র দত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন ও পরে সলিসিটররূপেও সুনাম অর্জন করেন। যোগেনচন্দ্রের চার ছেলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেজ ছেলে সুশীলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। যথাসময়ে সুশীলচন্দ্রের পড়াশুনা আরম্ভ হোল। ছাত্রজীবনের প্রথম দিনটি থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বরাবর যশঃমণ্ডিত সাফল্য অর্জন করে এসেছেন সুশীল দত্ত মহাশয়। স্কলারশিপ পেলেন ম্যাট্রিকুলেশনে; ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি-এ পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ এম-এতেও প্রথম শ্রেণী পেলেন ইংরাজীতেই। তারপর আইন পড়া শুরু হোল। এল-এল-বি

অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত

পরীক্ষায় প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে ১৯২১ সালে ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি হোল।

ছাত্রজীবন শেষ হোল। শুরু হোল কর্মজীবন। ওকালতি বিদ্যায় হাত পাকাতে লাগলেন কলকাতা বিচারাধিকরণের উকীল যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীনে আর্টিকেল ক্লার্করূপে। চেম্বার-পরীক্ষা নিলেন তদানীন্তন অস্থায়ী প্রধান-বিচারপতি বাঙলার বাঘ পূজনীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সগৌরবে সুশীলচন্দ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আইনের বেড়াজাল শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারলে না সুশীলচন্দ্রকে। নিজের ছাত্রজীবন যাঁর কৃতিত্ব মণ্ডিত তাঁকে যে আসতেই হবে আবো হাজার হাজার ছাত্রের মাঝখানে, নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে তাঁদেরই মাঝখানে—নিজের স্বকীয়তা দিয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রকে ভরিয়ে দিতে হবে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-তরঙ্গের মাঝখানে, অধ্যাপক আবির্ভূত হবেন একটি গম্ভীর উদ্দাম ঊর্মির রূপে—আহ্বান এলো সরস্বতীর কুঞ্জবনে। ১৯২৩ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ আরকোয়ার্ট আহ্বান করলেন সুশীলচন্দ্রকে তাঁর মহাবিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে। শিরোধার্য করে নিলেন সুশীলচন্দ্র এই আহ্বানকে। স্কটিশচার্চ কলেজের সঙ্গে তাঁর যে রক্তের টান, নাড়ীর যোগ, অচ্ছেদ্য বন্ধন। ঐ কলেজেই তো তিনি-চারটি বছর গৌরবের সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন ছাত্ররূপে, সেইখানেই এলেন অধ্যাপকের তকমা এঁটে!

১৯২৩ থেকে আজ এই দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে অধ্যাপনা করে আসছেন সুশীলচন্দ্র। খেলার ছলে—কথার ছলে—জ্ঞানদায়িনী অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে এক দিকে তিনি বিতরণ করেছেন—পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বিদ্যা; অপর দিকে নির্মল আনন্দ, এক হাতে তিনি সৃষ্টি করেছেন নব নব আদর্শ, অন্য হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অগণিত কৃতী ছাত্র।

১৯৩৭-৩৮ সালে কলকাতা পৌরসভায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে পৌরসদস্য নির্বাচিত হলেন অধ্যাপক দত্ত। ১৯৪৭ সালে যখন স্কটিশের ইংরাজী বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ক্যামেরণ অবসর গ্রহণ করলেন, সুশীলচন্দ্র অলঙ্কৃত করলেন তাঁর আসন। আজও তিনি সেই আসনে সমাসীন—এই সঙ্গেই তিনি নির্বাচিত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে কলেজীয় প্রতিনিধিরূপে।

অধ্যাপনা ছাড়া সুশীলচন্দ্র আরও বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পঁচিশ বছর ইনি নর্থ ক্লাবের সম্পাদক থাকার পর বর্তমানে ঐ ক্লাবের তিনি সহ-সভাপতি, কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের ইনি অবৈতনিক সহ-সম্পাদক, চৌরঙ্গীর ওয়াই-এম-সি-এর ইনি পরিচালকমণ্ডলী একজন সভ্য, ঐ য়্যাসোসিয়েশনের কলেজ ষ্ট্রীট শাখার ইনি অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ক'লকাতার ডায়োসেসান কাউন্সিলের ইনি একজন সভ্য, দমদমের ক্রায়েষ্ট চার্চ গার্লস্ স্কুলের সুশীলচন্দ্র সভাপতি।

ছাত্রদের মধ্যে আজকের দিনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছে তার কারণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্ত বলেন: এর জন্যে ছাত্রসমাজ দায়ী নয়—দায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় পরিণতি। সমস্ত সমাজজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে যুদ্ধের রাক্ষসী কবলে। ছাত্রসমাজের আর দোষ কি? সাধারণ জ্ঞানের আজ-কাল যে ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার কারণ প্রসঙ্গে সুশীলচন্দ্র বুঝিয়ে দেন যে, পাঠ্যতালিকাই এর জন্যে প্রধান দায়ী, প্রবেশিকাতে আমরা যে রকম গাদা গাদা বই ছেলেদের পড়াই তারা সেটা সহজ ভাবে হজম করতে পারে না, বাধ্য হয়ে তাদের কুঁখিয়ে হজম করতে হয়—অর্থাৎ নোটবুকের সাহায্য নিতে হয়। এই ভাবে প্রবেশিকায় তারা উত্তীর্ণ হোল, হলে হবে কি, নোটবুক পড়া বিদ্যা চিরস্থায়ী তো নয়, অল্পস্থায়ী। কলেজ-জীবনে তাদের প্রায়ই সব কিছু বিস্মরণ হতে লাগল—আর একটা দিক দেখ আগেকার থেকে ধারা এখন বদলানো হোল—নতুন নিয়ম অনুসারে ইংরেজী পড়া আরম্ভ হোল পঞ্চম শ্রেণী থেকে, অথচ ম্যাট্রিকের পাঠ্য তোমরা আগের মতই রেখে দিলে তার আর কিছু পরিবর্তন করলে না, এখন ভাই বোঝ, এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের অবস্থাটা কি রকম হয়? শিক্ষার গলদের অন্য কারণও আছে—অপটু লোকের হাতে দেওয়া হয়েছে শিক্ষাদানের গুরুভার। নিজে শিখলেই যথেষ্ট নয়, অপরকে শেখাবার মত দক্ষতা থাকারও যথেষ্ট দরকার।

সুশীলচন্দ্রের সব চেয়ে ভাল লাগে ভ্রমণ, ভ্রমণ একাধারে দেয় শিক্ষা, দেয় অভিজ্ঞতা, দেয় আনন্দ। আজকাল যে সব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভ্রমণ-ব্যবস্থা করা হচ্ছে এগুলির উপর সুশীল বাবুর সমর্থন আছে প্রবল। শিকার, ছবি তোলা ও গান-বাজনা শোনারও সখ সুশীল বাবুর দারুণ। পড়াশুনা আজও করেন অব্যাহত গতিতে। ইংরাজী সাহিত্যের বর্তমান উপচারগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে থাকেন সুশীল বাবু।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে কথা উঠতে সুশীলচন্দ্র বললেন যে, রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি বহু বার নিবিড় ভাবে এসেছি। একদিন শিশির বাবু (নটগুরু শিশিরকুমার), অরুণ সেন (স্বনামধন্য অধ্যাপক, ৺দীনেশচন্দ্র সেনের ছেলে ও কবি সমর সেনের বাবা) ও আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে আছি—একটি ইংরেজী নাটক পড়ছেন রবীন্দ্রনাথ, পড়াটি শেষ হতে আমায় বললেন—তোর তো ইংরিজী ভাষায় বংশগত অধিকার, এই ইংরিজীটা কি রকম বল দেখি—আজও সুশীলচন্দ্র পরমতম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন গুরুদেবের সেই স্নিগ্ধ আশীর্বাণীটি। কবিগুরুর ইংরাজী উচ্চারণ অধ্যাপক সুশীলচন্দ্রকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করে।

অধ্যাপক দত্তের পত্নী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তও একজন সুপরিচিতা দেশসেবিকা, বিধানসভার সদস্যা ও প্রদেশ-কংগ্রেসের মহিলা কমিটির চেয়ারম্যান।

বিদায়ের সময়ে সুশীল বাবু সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছাইদানিতে পিষতে পিষতে হাসি-মুখে বললেন—আমার সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি—আমার ছাত্ররা আমাকে খুব ভালবাসে—স্নেহময় অধ্যাপকের এই কথায় আমার মত তাঁর নগণ্যতম ছাত্রও নম্র, কৃতজ্ঞ, মুগ্ধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গের বাহিরে মুষ্টিমেয় যে কয়েক জন বাঙ্গালী নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও চারিত্র্যগুণে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৭০ সালে শান্তিপুরের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। শ্রী শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র

গোপালচন্দ্র ১৮৮৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় আসেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। এফ. এ পড়িবার সময় মেট্রোপলিটন কলেজে বিদ্যাসাগরের মহান ব্যক্তিত্ব সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হন। গোপাল বাবু প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সংগে বি. এ ও এম. এ পাস করেন। অধ্যক্ষ টনি ও অধ্যাপক পার্সিভালের প্রিয় ছাত্র গোপালচন্দ্র বিনা আবেদনে কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মাত্র ২১ বৎসর বয়সের এই নবনিযুক্ত অধ্যাপকটি অল্প দিনে তাঁহার ব্রহ্ম-তেজ, বাগ্মিতা তেজস্বিতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষ, সহকর্ম্মী ও ছাত্র-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল কৃষ্ণনগর কলেজ, রাজসাহী কলেজ, ঢাকা কলেজ, র‍্যাভেন্স কলেজ প্রভৃতিতে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষার্ধ (১৯০৪—১৯২৮) কাটে র‍্যাভেন্স কলেজে। উড়িষ্যার উচ্চশিক্ষিত সকলেই প্রায় তাঁহার ছাত্র। উড়িষ্যার তিন পুরুষের গুরু তিনি। কটকের বহু জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সাহায্য স্মরণীয়। বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা ৺কটকচণ্ডীর পূজা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতির সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয় প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই মানিত ও জানিত যে, গোপাল বাবু তাঁহাদের গুরু ও বন্ধু। অবসর গ্রহণের পরেও অতি বৃদ্ধ বয়সে গোপাল বাবু বালিগঞ্জ অঞ্চলের বহু জনহিতকর ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন।

তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, সরল ব্যবহার, সাহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব অনেকের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। "ছেলে মানুষ হয় কিসে?" তার উত্তরে তিনি বলেন, "আগে নিজে মানুষ হও, তার পর ছেলেকে বালগোপাল জ্ঞানে সেবা কর।" প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র-সম্মিলনীতে তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা এক দিক দিয়া যেমন আমাদের মনকে স্পর্শ করে তেমনি বক্তার জীবনাদর্শকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। তিনি বলেন, যে যুগে ছাত্রদের অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ কিন্তু তাহারা জানিত ও মানিত "মাতৃদেবো ভব" "পিতৃদেবো ভব" ও "আচার্য্যদেবো ভব।" তখন আদর্শানুরাগ ছিল গভীর ও আন্তরিক। তখন ছাত্রদের অধ্যয়নই ছিল তপস্যা। আদর্শের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যে তখন ফাঁকি ছিল না। যুগ পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কিন্তু আদর্শ ছাড়া একটা হাত এগিয়ে চলতে পারে না। আবার আদর্শ নির্ব্বাচনে প্রবীণ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেবল উচ্চাদর্শই শেষ কথা নয়, তাহার প্রতি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা চাই। ফ্যাশান আসে ও চলে যায় তাহার ভিত্তি রুচির উপর; তাই তাহার আয়ু বড় ক্ষীণ। কিন্তু আদর্শ গড়িয়া উঠে নীতির উপর। তাহার জন্য চাই সজাগ মন। সেই ধরিয়া দিতে পারে আদর্শের মধ্যে ফাঁকি আছে কি না। মনকে সজাগ রাখিতে হইবে। মহৎ উদ্দেশ্য, ঐকান্তিকতা ও শ্রদ্ধা লইয়া অগ্রসর হইলে জয় হইবেই। আজকের দুর্দ্দশার দিনে বাঙ্গালীর এই কথাগুলিকে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো চল্লিশ

বাগবাজারের চুনীলাল বোস সাধু দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। অন্তত একবার গঙ্গার ধারটা ঘুরে আসে। জটা-ভস্ম দেখলেই সঙ্গ নেয়। কোন জটায় জলধারা আছে, কোন ভস্মে বা স্বর্ণখণ্ড তা কে জানে! কিন্তু যত জটা দেখে সব কেশভার যত ভস্ম দেখে সব দগ্ধাবশেষ।

কে একজন বললে, যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাও রাসমণির কালীবাড়ীতে যাও।

সে আবার কোথায়?

শুধু ঠিকানা জানলেই চলবে না, পথও জানা চাই। তাবার অক্ষরে ঠিকানা তো লেখা আছে কিন্তু পথ কই অন্ধকারে?

আহিরীটোলা থেকে নৌকো পাবে জোয়ারের সময়। দক্ষিণেশ্বরের উত্তরের ঘাটে নামবে। ভাড়া পাঁচ পয়সা।

তবু কি তক্ষুণি-তক্ষুণি যাওয়া যায়? ঘাট থেকে কত নৌকো ছাড়ে, কত জোয়ারের নিমন্ত্রণ আসে তবু সময় হয় না। কি করে হবে? তুমি যখন ডাকবে তখনই তো সময়। তার আগে আর লগ্ন নেই।

কত দিন পরে এল সেই শুভযোগ। আফিসের ছুটি, দুপুরের জোয়ার, মনিব্যাগে পাঁচটি পয়সা এবং সর্বোপরি মন। মন যদি দূরে থাকে কান শোনে না হাজার ডাকে।

ঘাটে নেমেই এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। যেমন সাধারণ লোকের প্রার্থনা তাই আন্দাজ করে ব্রহ্মচারী জিগগেস করলে, 'কি, ওষুধ চাই?'

'না। পরমহংসদেবের দর্শন চাই।'

'ঐ আছেন কোণের ঘরে। কিন্তু তাঁর কাছে কি?'

'কিছু নয়। শুধু দর্শন।'

ঠাকুরের ঘরে উত্তরের দিকে একখানি বেঞ্চি, তাতে গুটিসুটি বসল এসে চুনীলাল। ঠাকুর তাকে আপন জনের মত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায় থাকে, কি কাজ করে, কত মাইনে, কে কে আছে তার সংসারে, এই সব ঘরোয়া কথা। প্রেমভক্তি বিবেক-বৈরাগ্যের কথা নয়, সর্বদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি যে ঈশ্বরে সে ঈশ্বর-কথা নয়। অথচ একটুও ফাঁকা-ফাঁকা লাগল না, মনে হল না আসার কথা। সব যেন এক নিমেষে সরল করে দিলেন, লঘু করে দিলেন। আপন জন কি আর মুখের কথায় হওয়া যায়? আমার আপন জন হবেন অথচ আমার খুঁটিনাটি সব জানবেন না, তা কি হতে পারে? মুখের কথায় যখন মনের মধু এসে মেশে তখনই তো আপন জন।

চুনীলালের মনে হল, এই তো ভূ-ভাবভঞ্জন সর্বলোক-স্বভাবত বন্ধু। অজ্ঞান-সঙ্কটে পরজ্যোতি।

যাবার সময় মিছরি প্রসাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, আবার এসো।

বৈরাগ্য এল চুনীলালের মনে। এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাল আপিসে। বাড়ি থেকে সটকান দিলে। কাশী-বৃন্দাবন করলে ক'দিন, পরে হরিদ্বার-হৃষীকেশ। কিন্তু হৃষীকেশ হৃদিস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কই? মর্কট-বৈরাগ্যের অবসান হল, ফিরে এল কলকাতা।

এসে দেখল চাকরিটি গেছে। মিউনিসিপাল আফিসে কাজ করে, যত সামান্যই হোক তাইতেই তো সংসারের পালন-পোষণ। বৈরাগ্য গেছে যাক, চাকরিটি যায় কেন?

ধরাধরি করে চাকরিতে ফের বহাল হল চুনীলাল। এবার তোমার পদপ্রান্তে বহাল করো।

বলরামের বাড়ির লাগোয়া পশ্চিমেই চুনীলালের বাসা। ঠাকুর বলে দিলেন বলরামকে, যেন চুনীলালকে নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। শুধু চুনীলাল কেন, যত ভক্ত জোগাড় করতে পারে, সবাইকে নৌকো করে নিয়ে আসে বলরাম। অন্য দিন না হোক অন্তত রবিবার। কত গরিব লোক আছে, দশটি পয়সা যোগাড় করাও যাদের কষ্ট, বলরাম তাদের এপারের কাণ্ডারী। ওপারের কর্ণধারের কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

চুনীলালকে পাড়ার লোকে বলে বড়লোকের পেটোয়া, যেহেতু ঠাকুরের ইঙ্গিতে সে বলরামের নৌকোর সোয়ারী। লোক না পোক! লোকের কথায় আমি কি এই সরল পথপরায়ণ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব?

তবু, কে জানে কেন, যোগাভ্যাসের দিকে মন গেল চুনীলালের। পুঁটে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসে আসন-প্রাণায়াম করতে লাগল। লাভের মধ্যে হল এই, হাঁপানি সুরু হয়ে গেল। কাজ কামাই, ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ। টানটা কম পড়তে একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর তাকে বকে উঠলেন, 'তোমাদের ও-সব কেন? তোমরা গৃহী, ও-সব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। তোমাদের শুধু বিশ্বাসভক্তি। ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। দেখো, ও-সব কাজ আর কোরো না।'

কি করে জানলেন তার যোগের কথা, তার রোগের কথা?

আর, কি আশ্চর্য, তিন মাত্রা ওষুধ খেয়েই তার অসুখ সেরে গেল!

'জ্বরে আর দশমূল পাচন চলবে না এ যুগে', বললেন ঠাকুর,

'এখন কিভার মিকশ্চার।' যোগ-প্রাণায়াম নয়, এ যুগে শুধু নারদীয় ভক্তি। অকারণের অবারণের ভালোবাসা।

বড় সাধ চুনীলালের—ঠাকুরের কিছু সেবা করে। কিন্তু বড় গরিব, কিছু ভোগরাগ করার সামর্থ্য নেই। মনের ফুল তুমি নিচ্ছ তা জানি কিন্তু তোমাকে যে বনের ফুলও দিতে ইচ্ছা করে। শুধু ভাব নয় কিছু একটা দ্রব্য দিতে ইচ্ছা করে। দেখতে ইচ্ছা করে তোমার মুখে আত্মভোলা শিশুর আহ্লাদ।

মাষ্টার মশায়ের কাছে ঠাকুর একটা টুল চেয়েছিলেন, সেদিন চুনীলাল সেখানে ছিল। ঠাকুর বললেন, 'একটা টুল কিনে আনবে এখানকার জন্যে। কত নেবে?'

'দু'-তিন টাকার মধ্যে।' বললে মাষ্টার।

'এত? একটা জলপিঁড়ির দাম যদি বারো আনা, তবে অত হবে কেন?'

'না, না, বেশি হবে না।' মাষ্টার চাপা দিতে চাইল কথাটা।

মাষ্টারের কাছে চেয়েছেন, চুনীলাল কি করে কেনে? তা ছাড়া দু'-তিন টাকা খরচ করবার মত তো তার সঙ্গতি নেই।

ঠাকুর বুঝলেন ভক্তের মনের ব্যথা। বললেন, 'ধাতু-পাত্রে তো জল খেতে পারি না। তুমি এখানকার জন্যে একটা কাচের গ্লাশ এনে দিও।'

কৃতার্থ হল চুনীলাল। কৃতকৃতার্থ। মনের ব্যথাটুকুই শুধু জানবে, হরণ-পূরণের কোনো ব্যবস্থা করবে না। তুমি তবে কেমনতরো আত্মজন?

প্রণবোচ্চারণে অধিকার নেই চুনীলালের, এ আরেক দুঃখ। তাও ঠাকুর জল করে দিলেন। বললেন, 'প্রণবে কি দরকার? ভগবানের যে কোনো একটা নাম ধরো, তাই জপ করো, উচ্চারণ করো।'

এই তো সরল পথপরায়ণ ধর্ম। এই তো ক্রান্তদর্শন। এই তো বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

ঈশ্বরের হাত নেই, কিন্তু সমস্ত কিছু রচনা করেন, গ্রহণ করেন। পা নেই কিন্তু সর্বব্যাপক বলে সমধিক বেগবান। চোখ নেই তাই দেখেন অনিমেষে, কান নেই তাই শোনেন অনিরুদ্ধ। অন্তঃকরণ নেই তবু সমস্ত জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করেন। অথচ তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন কারও সাধ্য নেই। সনাতন সর্বোত্তম ও সর্বত্রপূর্ণ বলে তিনি পুরুষ। এবং পরমপুরুষ।

'যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিত।' মাষ্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই চোখে ভাবে নয়, দেখলাম চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, যেন তোমাকেও দেখলাম। আর চুনীলাল এখানে আনাগোনা করছে, তুমি করছ, তাতে উদ্দীপন হয়েছে।'

উদ্দীপিত করতে পারছে ঠাকুরকে এমন লোক চুনীলাল।

'আচ্ছা এ অসুখটা কত দিনে সারবে বলতে পারো?' কাশীপুরের বাড়িতে এসে জিগগেস করলেন একদিন।

'তা একটু সময় নেবে।' যেন প্রবোধ দিল মাষ্টার।

'কত?' নিরীহ শিশুর মত তাকালেন ঠাকুর।

'এই পাঁচ ছ' মাস।'

'বলো কি?' অধীর হয়ে আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। 'এত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন এত ভাবসমাধি, তবে আবার এই অসুখ কেন?'

'উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।'

'কি বলো তো?' ঠাকুরের চোখে প্রশান্তির প্রসন্নদীপ্তি ফুটে উঠল।

'একটা শুধু বলতে পারি, আপনি সাকার থেকে নিরাকারে যাচ্ছেন। বিদ্যার 'আমি' পর্যন্ত থাকছে না। লোকশিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ। কা'কে আর কি বলব। সব রামময় দেখছি। কিন্তু দেখ না এই বড় বাড়িটা ভাড়া হয়েছে বলে কত লোক আসছে। শুধু কথা শুনতে চায়।' হাসলেন ঠাকুর। 'আমি কি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইনবোর্ড দিয়ে বসেছি যে অমুক সময় লেকচার হবে?'

সেই বাগবিন্যাসবিশারদ পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন। যে বলি-হস্তীর পদমর্দনে ধর্ম নিঃশেষপ্রায় হতে চলেছে সেই প্রমত্ত মাতঙ্গমথনের অঙ্কুশস্বরূপ হয়ে সে আবির্ভূত হয়েছে। মোহনিদ্রাতুর দেশের জাগ্রত চৈতন্য।

'আচ্ছা মশাই আপনি গেরুয়া পরেন কেন?' কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন একজন।

'শ্রীমদবধূত গুরুপ্রসাদাৎ।'

'বাইরের রঙের চেয়ে ভিতরের রঙ কি ভালো নয়?'

'না। বাইরে রঙ করুন আর না করুন, ভিতর একেবারে শাদা রাখতে হবে। যদি ভিতরে রঙ লেগে যায় তাকে বৈরাগ্যের জলে ধুয়ে ফেলাই ভালো।'

'এ মলিন পোষাক পরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে আপনার লজ্জা করে না?'

হাসল কৃষ্ণানন্দ। 'এ যে অযাচকের পরিচ্ছদ। যাচ্ঞাহীন ব্যক্তি নির্ভীক, ভুজবীর্যসম্পন্ন, আনন্দময়।'

'কিন্তু আপনি তো দান সংগ্রহ করেন শুনেছি।'

'সে আমার নিজের জন্যে নয়, ভারতের হিতের জন্যে। এখানে স্বয়ং ভারতই যাচক, ভারতই দাতা।'

'কিছু সুবিধে আছে গৈরিক পরে?'

'যখন শাদা কাপড় পরতাম তখন আবার জামা লাগত, জুতো লাগত, না হলে পরিচ্ছদ পরিপূর্ণ হত না। এখন গৈরিক বস্ত্রখণ্ড একাই স্বসম্পূর্ণ। জুতো জামার দরকার হয় না। মাত্র কৌপীন পরলেই মনে হয় পূর্ণ পরিচ্ছদ পরে আছি।'

'শুধু এইটুকু লাভ?'

'না আরো আছে। আগের দিনে ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা যাঁরা গহন বনে বা গিরিগুহায় থাকতেন তাঁরা গিরিমাটীতে বসন বাড়িয়ে নিতেন। গায়ে মাটি মাখলে কি হয় জানো বোধ হয়? শরীর থেকে যে তৈজসপদার্থ নিত্য বেরিয়ে যাচ্ছে তা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তাতে শরীরের ওজোগুণ বাড়ে আত্মাতে সমাধি করবার শক্তি বাড়ে। গৈরিক বসন পরলে সেই গিরিমৃত্তিকার স্পর্শে সাধনার্থীর দেহ বলশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং গেরুয়া সাজের জন্যে নয় কাজের জন্যে।'

সেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। তার পর লিখছে তার কাগজে, 'ধর্মপ্রচারকে':

"ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন? ইনি

পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য্য ইঁহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত চলাচলশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনীকাঞ্চনকে বস্তুতঃই কায়েন-মনসা-বাচা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্ব্যয় তাঁহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোনো পাপগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয়, এবং ইহা দ্বারা তাঁহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্তগ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংশ্রবে ও তাঁহার উপদেশগুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে।...”

সেই সব কথাই হৃৎকর্ণরসায়ন কথা। সেই সব কথা শ্রবণই অবিদ্যা নিবৃত্তির পথ, শুদ্ধা রতিভক্তি সংক্রমণের পথ। একমনসোবৃত্তি স্বাভাবিকী যে ভক্তি, যে ভক্তি অনিমিত্তা তা সিদ্ধির থেকে মুক্তির থেকেও গরীয়সী।

যারা আমার পদসেবাপরায়ণ, বললেন শ্রীহরি, তারা ‘আমার সঙ্গে একাত্মতাও ইচ্ছা করে না।

দেখ দেখ আমার রুচির প্রসন্ন মুখ, আমার অরুণলোচন, আমার দিব্যতরঙ্গ শোভা আর ইচ্ছামত বাক্যালাপ করো আমার সঙ্গে।

‘দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।’ মাষ্টারকে বললেন ঠাকুর, ‘আর আর কত কথা বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে, কিন্তু পারছি না।’

তুমি যদি না কও আমরা কইব। আমরা কইব আর তুমি শুনবে। তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে, সেই কপিলজননী দেবহূতি স্তব করেছিল ভগবানের, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ। আর যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে তারাই প্রকৃত তাপস। তারাই ঠিক ঠিক হোম ও তীর্থস্নান করেছে। তারাই যথার্থ সদাচারী, তাদেরই সার্থক বেদাধ্যয়ন।

একশো একচল্লিশ

দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলায় হনুমানের পাল চুপ করে বসে আছে। যেন কত ভালোমানুষ। যেন সর্ববিষয়ে বীতরাগ। কিন্তু আসল মতলবখানা হচ্ছে, কোন গৃহস্থের চালে-বাগানে ঝপ করে লাফিয়ে পড়বে। চালে হয়তো ফলে আছে লাউ-কুমড়ো, বাগানে হয়তো কলা-বেগুন। এই মর্কট-ধ্যান, মর্কট-বৈরাগ্য দিয়ে কি হবে? কেশব সেনকে একদিন বলেওছিলেন ঠাকুর: ‘তোমাদের ওখানে অনেকের ধ্যান দেখলাম সেই হনুমানের ধ্যানের মত।’

তন্ময় হয়ে যাও, তদেকান্তচিত্ত হও। আবেশেই তো আছ সারা ক্ষণ। হয় ধনের আবেশ, নয় মানের আবেশ নয়তো গূঢ়তর কামনার আবেশ। এবার নতুন আবেশে চলে এস, ঈশ্বর-আবেশে। কালকূটকুম্ভ আলোড়ন করে বারে-বারে পান করেছ, মেটেনি তৃষ্ণা, এবার ঈশ্বর-সরোবরে অবগাহন কর। তোমার চিত্ততল আবৃত করেই সেই অমৃতের পয়োধি।

‘আচ্ছা, ধ্যানের কি নিয়ম? কোথায় ধ্যান করব?’ জিগগেস করল মণি মল্লিক।

‘কেন, হৃদয়ে।’ মুখের উপর জবাব দিলেন ঠাকুর। ‘হৃদয়ই ডঙ্কাপেটা জায়গা। নয়তো সহস্রারে। এসব বৈধী ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। তাকে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় দৃষ্টি রাখতে হয় কপালে। জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।’

‘আর সাকার ধ্যান?’

‘তাকে বলে বিষ্ণুযোগ। দৃষ্টি নাসাগ্রে। অর্ধেক জগতে অর্ধেক অন্তরে।’

একটু কি দুরূহ লাগছে?

ঠাকুর হাসলেন। জল করে দিলেন। বললেন, ‘ও সব শাস্ত্রবিধি। যাদের রাগভক্তি হয়েছে, যেখানে খুশি সেখানেই তারা ধ্যান করতে পারে। সব স্থানই তো তাঁর, কোথায় তিনি নেই? গঙ্গা যেমন পবিত্র তেমনি অগঙ্গাও পবিত্র। বলির কাছে এসে যখন তিন পায়ে নারায়ণ স্বর্গ মর্ত পাতাল ঢাকলেন, তখন কি আর কোনো জায়গা বাকি ছিল?’

প্রহ্লাদের পৌত্র এই বলি। সমুদ্রমন্থনের পর অমৃত নিয়ে যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হল সেই যুদ্ধে বলি মারা পড়ল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। বেঁচে উঠে প্রতিজ্ঞা করল, এই পরাজয়ের শোধ নিতে হবে। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সুরু করল, সেই যজ্ঞ থেকে উঠল এক মহারথ। শুক্রাচার্য মহাশঙ্খ এনে দিলেন। সেই শঙ্খ বাজিয়ে বিপুল অসুরবাহিনী নিয়ে ইন্দ্রপুরী অবরোধ করল বলি। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বললেন, স্বয়ং শ্রীহরি ছাড়া কেউ নিরস্ত করতে পারবে না বলিকে।

উপায়?

ভগবানের জন্মের জন্যে অপেক্ষা করো। যতক্ষণ তিনি জন্মলাভ না করেন অদৃশ্য হয়ে থাকো।

দেবতারা অদৃশ্য হলেন। বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করল।

দেবমাতা অদিতি অনাথার মত কাঁদতে বসল। অরণ্য থেকে আশ্রমে ফিরে এলে স্বামীকে বললে তাঁর দৈন্যের কথা। কশ্যপ বললেন, সর্বভূতভয়াবহ জগদাত্মা বাসুদেবের আরাধনা করো। ভগবদ্ভক্তিই অমোঘ, নিশ্চিত ফলপ্রদ।

দ্বাদশাহ পয়োব্রত উদ্‌যাপন করল অদিতি। অখিললোকপাল শ্রীহরি দেখা দিলেন। পুত্রহারা জননী প্রীতিবিহ্বল হয়ে স্তব করতে লাগল। শ্রীহরি বললেন, ‘বিক্রম দ্বারা অসুরদের জয় করা যাবে না। আমি জন্মাব তোমার পুত্র হয়ে। তোমার পুত্র হয়ে জন্মে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। এই দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কাউকে প্রকাশ কোরো না।’

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে অদিতির গর্ভে জন্ম নিল বামনদেব। নর্মদার উত্তরতটে ভৃগুকচ্ছে যজ্ঞ করছিল বলি, সেখানে এসে উপস্থিত হল। এ কি অভিনব মূর্তি! এগিয়ে এসে তার পা ধুয়ে দিল বলি। দেখতে খর্ব অথচ কি তেজোব্যঞ্জক! বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ। পা-ধোয়া জল মাথায় ধরে বলি বললে, আজ আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হল, কুল পবিত্র হল। যথাবিধি হুত হল অগ্নি, তুমি আপনার ক্ষুদ্র পদন্যাসে ধন্য হল। আপনার পাদোদকে ধুয়ে গেল পাপনিবহ। হে বটু, যা ইচ্ছা করেন তাই প্রার্থনা করুন। গো-কাঞ্চন গৃহ-গ্রাম অন্ন-পেয় বিপ্রকন্যা হস্তী অশ্ব—যা আপনার অভিলাষ চেয়ে নিন।

'তোমার বাক্য সুনৃত, তোমারই কুলের উপযুক্ত।' বললে বামন। 'তোমাদের বংশে এমন নিঃস্বত্ব কৃপণ কেউ জন্মায়নি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাউকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার প্রার্থনা সামান্য। এই পদের পরিমিত তিন পদ ভূমি শুধু প্রার্থনা করি।'

বলি হাসল। বললে, 'তোমার বুদ্ধি বালকের মত। এ তুমি কী চাইলে? আমার কাছে একবার চাইলে আর কারু কাছে ফের চাইতে হয় বলে শুনিনি। অন্তত জীবিকা ধারণের মত ভূমি নাও।'

'তৃষ্ণার কি অন্ত আছে? সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েও পৃথু অসন্তুষ্ট।' বামনও হাসল। বললে, 'সুখী কে? যদৃচ্ছালাভে যে তুষ্ট সেই সুখী। যার সন্তোষ নেই ত্রিভুবন লাভ করেও সে অসুখী। তিন পদ ভূমিতেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। অতিরিক্তে আমার লালসা নেই। বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্।'

'তবে তাই হোক।'

ভূমি দান করতে উদ্যত হয়েছে বলি, শুক্রাচার্য ছুটে এলেন। বললেন, 'এ বামনরূপী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু ছাড়া কেউ নয়। তোমার স্থান শ্রী যশ বিদ্যা সমস্ত ছিনিয়ে নিতে এসেছে। ছিনিয়ে নিয়ে সব দিয়ে দেবে ইন্দ্রকে।'

বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে রইল বলি

'বিষ্ণুকে সর্বস্ব দিয়ে তুমি বাঁচবে কি করে? শোনো। যে দানে দাতার জীবিকা বিপন্ন হয় সে দান প্রশংসনীয় নয়।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলি বললে, 'দেব বলে কথা ফিরিয়ে নেব কি করে? আশ্বাসিত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা যত ভয় করি সর্বদুঃখ-আকর দারিদ্র্যকে তত ভয় করি না। না স্থানচ্যুতিকে, না বা মৃত্যুকে। যাচকের অভিলাষ পূরণে যদি দৈন্যও আসে উদারচেতা পুরুষের পক্ষে তা শোভাস্বরূপ। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হোন বা শত্রুই হোন, তাঁর প্রার্থিত ভূমি তাঁকে দান করব।'

ক্রুদ্ধ হলেন দৈত্যগুরু। অভিশাপ দিয়ে ফেললেন। 'তুমি আমার শাসন অতিক্রম করলে, তোমার সর্বনাশ হবে!'

সত্য থেকে স্খলিত হল না বলি। তার স্ত্রী বিন্ধ্যাবলী সুবর্ণ কুম্ভে জল নিয়ে এল। সেই জলে বলি বামনের দু' পা ধুয়ে দিলে। ধুয়ে দিয়ে সেই বিশ্বপাবন জল মাথায় ধরল।

সহসা ব্রাহ্মণ বটুর দেহে ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব আবির্ভূত হল। এক পা ফেলে সমস্ত মর্ত ও আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। দ্বিতীয় পা স্বর্গ ঢেকে মহর্লোক ও তপোলোকের উপর সত্যলোক পর্যন্ত প্রসারিত হল। এখন তৃতীয় পায়ের জন্যে স্থান দাও।

বামন গর্জন করে উঠল। 'নিজেকে আঢ্য মনে করে খুব অঙ্গীকার করেছিলে। এখন প্রতারক হলে। সুতরাং নরকে প্রবেশ করো।'

'হে উত্তমশ্লোক,' স্নিগ্ধহাস্যে বললে তখন বলি, 'শুধু অপযশেই আমার ভয়। সেই অপযশ ঘটতে দেব না। স্থানের অভাব হবে কেন? আমার মাথাই সেই স্থান। আপনার তৃতীয় পা রাখুন আমার এই মাথার উপর।'

'পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।' ঈশান মুখুজ্জেকে বলছেন ঠাকুর, 'লোকে না হয় জানুক ঈশান এখন পাগল হয়েছে। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক করো।'

পাগল নয় কে! কেউ কামের জন্যে পাগল, কেউ নামের জন্যে। কেউ পদের জন্যে কেউ সম্পদের জন্যে। কয়েক জন না হয় ঈশ্বরের জন্যে পাগল হল! আর সব পাগলদের মধ্যে হানাহানি মারামারি, কিন্তু আমিও ভক্ত তুমিও ভক্ত, জলে জলাকার।

ঈশানের দুর্জয় বিশ্বাস। বলে, 'একবার যখন দুর্গানাম করে বেরিয়েছি, আর আমার ভয় কি! শূলহস্তে শূলপাণি আমার সঙ্গে আছে।'

'তোমার খুব বিশ্বাস।' বললেন ঠাকুর। 'আমাদের কিন্তু অত নেই।'

সকলে হেসে উঠল।

'কি বলো, শুধু বিশ্বাস থাকলেই হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগুনের সঙ্গে বায়ুর যেমন প্রীতি, তেমনি বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাকুলতার। শিশুর বিশ্বাস আর মায়ের ব্যাকুলতা।

'অহঙ্কারের দরুণই আমাদের বিশ্বাস কম।' বললে ঈশান। 'কাক ভুশণ্ডীও প্রথমে মানেনি রামচন্দ্রকে। সপ্তলোক বেড়িয়ে এসে দেখলে কিছুতেই নিস্তার নেই রামের থেকে। তখন নিজে ধরা দিল। রামের শরণাগত হল।'

শরণাগতি তো বীর্যহীনের নিষ্ক্রিয়তা নয়, শরণাগতি হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে ধরা। রোক করে জোর করে ধরা। যে এগিয়ে গিয়ে ধরে সেই তো পুরুষপ্রবীর।

'তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না।' ঠাকুর সাবধান করে দিলেন ঈশানকে। 'বিষয়ী লোক দেখলেই পিছু নেয়। যেমন মরা গরু দেখলেই শকুনি এসে ভিড় করে। আর, বিষয়ী লোকদের কথা বোলো না। কোনো পদার্থ নেই। যেন গোবরের ঝোড়া।'

খুব সালিশি-মোড়লি করে ঈশান, তাকে সবাই মানে-গোণে। পাঁচটা লোকের যদি উপকার হয় তারই সে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

'তোমার ও ভাবনায় কাজ কি? ও সবের জন্যে অন্য থাকের লোক আছে। তোমার এখন সময় হয়েছে, তুমি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দাও। লঙ্কায় রাবণ মরে তো মরুক, বেহুলা কেন কেঁদে আকুল হবে?'

ঘোড়ার গাড়ি করে ঠাকুর যাচ্ছেন ঈশানের বাড়ি। বাবুরাম আর মাষ্টার মশাইও চলেছে। শীতকাল। ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কাণ-ঢাকা টুপি আর মশলার থলে নিয়েছে সঙ্গে করে।

বৈঠকখানায় ঈশানের ছেলে শ্রীশের সঙ্গে দেখা। এণ্ট্রান্স ও এফ-এ-তে প্রথম হয়েছে। এখন এম-এ আর ল পাশ করে ওকালতি করছে আলিপুরে। বিদ্বান অথচ বিনয়ের প্রতিমূর্তি। দেখলে মনে হবে সংসারে আর সব জ্ঞানী-গুণীর কাছে তিনিই একমাত্র অজ্ঞ।

'তুমি কি করো গা?'

'আজ্ঞে, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি। ওকালতি করি।'

'বলে কি গো?' মাষ্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। 'এমন লোকের ওকালতি?' শেষে বললেন, 'হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে পাবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে।'

শ্রীশের ক'টা প্রশ্ন আছে।

কর্মভার কমবে কিসে?

ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে-হতে। যতই এগোবে ততই লঘু হবে, মুক্ত হবে। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পুঁটলি বেঁধেছিলে তারই গ্রন্থি-মোচন করে পাল করে উড়িয়ে দেবে নৌকোয়।

সংসারে থেকে তাঁর দিকে এগোই কি করে?

শুধু অভ্যাসযোগে। প্রথমটা কাষ্ঠ-আড়ষ্ট মনে হবে বটে কিন্তু ক্রমশই রপ্ত-মুখস্থ হয়ে যাবে। অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। ভূমি-কর্ষণেই মেঘবর্ষণ।

কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকবার সময় কই?

এটা একটা খাঁটি কথা বলেছ। তিনি সময় করে না দিলে কিছুই হবার নয়। ছেলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে মাকে বলেছিল, মা, আমার যখন খিদে পাবে তখন আমাকে জাগিয়ে দিস। মা বললেন, খিদেই তোমাকে জাগাবে। আমাকে জাগাতে হবে না।

তাই একবার খিদে যদি জাগে তাহলেই সফলমনোরথ।

'কি করবে? কিছুই করবার নেই। শুধু তাঁর পায়ে সব ঢেলে দাও, বিলিয়ে দাও। যা ভালো হয় করুন। আমি নাবালক, আমি ভালো-মন্দের কী বুঝি!'

কিন্তু ঈশ্বরের নাম নিলেই বা ভালো ফল হয় কোথায়?

'বলো কি? বীজ পড়ামাত্রই কি গাছ দেখা দেয়? আগে গাছ, তবে তো ফুল-ফল।'

তবু বপন করো এই নাম-বীজ। বীজের মধ্যেই নিগূঢ় হয়ে আছে নিরুদ্ধ হয়ে আছে বনস্পতি। তুমি জানো না তোমার আয়তন। তোমার পরিমাণ-পরিসর। হৃদয়ের উর্বর ক্ষেত্রে ফেল একবার এই বীজবিন্দু। দেখ কাকে বলে অসাধ্যসাধন। অফল-ফলন।

'আহা, সেই ছেলেটির গল্পটা বলো না!' ঈশানকে অনুরোধ করলেন ঠাকুর।

একটি ছোট ছেলে কোত্থেকে খবর পেয়েছে ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক। তখন সে ঈশ্বরকে একখানা চিঠি লিখলে। ঠিকানা দিলে স্বর্গ। চিঠি লিখে ফেলে দিল ডাকবাক্সে।

'দেখলে তো! একেই বলে বিশ্বাস। একেই বলে সরলতা। বালকের বিশ্বাস আর বালকের সরলতা।'

ডাকবাক্স তো একটা নয়, তেত্রিশ কোটি ডাকবাক্স। তেত্রিশ কোটি দেবতা। চিঠি পৌঁছুনো নিয়ে কথা। গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা গাঁয়ের ডাকবাক্সেই ফেল বা হেড পোষ্ট অফিস বা জি পি-ও-তেই ফেল ঠিকানা ঠিক লেখা থাকলে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে। শুধু ভক্তির টিকিটটি এঁটে দিও। দু একবার বেয়ারিং হয়ে পৌঁছুতে পারে, শেষকালে বেশি বেয়ারিং দেখলে রিফিউজ করে দেবে। টিকিটটি এঁটে দেওয়াই শান্তি। যখন ব্যাকুলতার ভাষায় লিখেছ তোমার চিঠি, বিশ্বাস করে ফেলে দিয়েছ তোমার নিকটতম ডাকবাক্সে আর তাতে ভক্তির টিকিটটি এঁটে দিয়েছ, তখন আর ভাবনা নেই, তোমার চিঠি পৌঁছেছে ঠিক-জায়গায়। এবার অপেক্ষা করো, এই এল বলে তাঁর প্রত্যুত্তর।

জানো না বুঝি, তিনিও গুণাতীত বালক। বালকে-বালকে বন্ধুত্ব। তুমিও বালক হয়ে যাও।

কালীপ্রসাদ সেদিন এসে খুব আনন্দের কথা বললে। আনন্দই যদি মুখ্য তবে তার মধ্যে আবার শ্রেণীভাগ কি? যার যাতে আনন্দ!

ঠাকুর বললেন, 'তাই বলে ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক?'

দেখ কে বেশি টেঁকসই। স্থানে-কালে কে বেশি পরিব্যাপ্ত। কে নিরবচ্ছিন্ন। কে শান্তিক্লান্তিহীন।

কালী বললে, 'তাঁর শক্তিই তো সব। সেই শক্তিতেই ব্রহ্মানন্দ, সেই শক্তিতেই বিষয়ানন্দ।'

ঠাকুর বললেন, 'সে কি? সন্তান লাভের শক্তি আর ঈশ্বর লাভের শক্তি কি এক?'

কালী বুদ্ধগয়া থেকে ফিরেছে। তাই সব সময় আনন্দের কথা কইছে আনন্দের ধ্যান করছে। সুখই যখন আমার উদ্দেশ্য তখন অল্প সুখে তুচ্ছ সুখে আমার সুখ কি! আমি যে সুখের চেয়েও আরো-সুখ চাই। সুখ মানেই তো আরো-সুখ। আরো-সুখ মানেই তো অধিকতম সুখ। সেই অধিকতমই তো ঈশ্বর।

শ্রাবস্তীতে এক নবদম্পতী বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে। নবীনা বধূ পরিবেশন করছে স্বহস্তে। স্বামী বুদ্ধের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার আতুর দৃষ্টি স্ত্রীর দিকে। বুদ্ধ তার মনের কথা টের পেয়েছেন। বলছেন তাকে, কামনার সমান আগুন নেই, দ্বেষের সমান পাপ নেই, পঞ্চস্কন্ধের সমান দুঃখ নেই, শান্তি বা নির্বাণের সমান সুখ নেই।

পঞ্চস্কন্ধ কি? রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর বেদনা। জীব এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছে হেরে গিয়েছে যুদ্ধে। বার বার তিন বার। সামান্য কাশীগ্রাম নিয়ে যুদ্ধ। তা হলে কি হয়, পরাজয়ের লজ্জায় অনশন সুরু করেছে প্রসেনজিৎ। বুদ্ধ শুনতে পেলেন অনশনের কথা। বললেন, 'জয় বৈরিতা প্রসব করে, পরাজিত বাস করে দুঃখে, মর্মদাহে। যে জয়-পরাজয়ের অতীত তারই অক্ষুণ্ণ শান্তি।'

কাশীপুরের বাগানবাড়ির ভাড়া পঁয়ষট্টি টাকা। তার পর রাঁধুনে বামুন রাখতে হয়েছে, আবার একটি ঝি। অনেক খরচ হচ্ছে।

ঠাকুর বললেন মহেন্দ্র সরকারকে, 'বড় খরচা হচ্ছে।'

'তা হলেই দেখ।' সরকার হাসল, 'কাঞ্চন চাই।'

ঠাকুর নরেনের দিকে তাকালেন। ইচ্ছে সে একটা সমুচিত উত্তর দেয়।

'শুধু কাঞ্চন? কামিনীও দরকার।'

রাজেন ডাক্তার বললে, 'রান্নার জন্যে অন্তত।'

'দেখলে?'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু বড় জঞ্জাল।'

'জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।'

'টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলেই তবে বিদ্যার সংসার।'

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ঠাকুর যেন একটু ভালো আছেন। রাজেন ডাক্তার ভারি খুশি। বললে, 'সেরে উঠে আপনার কিন্তু হোমিওপ্যাথি করতে হবে। নইলে বেঁচে থেকে লাভ কি?' [ক্রমশঃ।

[আচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর সাম্প্রতিক চিত্র—শ্রীগোপাল ঘোষ অঙ্কিত]

শিকারী-জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

পুরী বন বিভাগ—খুর্দ্দা রোড থেকে ৬১ মাইল দূরে। বালুগাঁ ষ্টেশনে ট্রেণ থামতেই তড়িৎ রায় চেঁচিয়ে উঠলো—ঐ যে ঝাণ্ডা সমেত আমাদের পক্ষীরাজ!

—অর্থাৎ—?

—ঐ যে ট্রেলার নিয়ে 'জীপ' দাঁড়িয়ে।

সেখান থেকে বাবরার বিশ্রামাগার উনিশ মাইল। আমরা তিন জনে ডাকবাংলোয় উঠলাম—আমি, বিক্রম সিং আর তড়িৎ রায়। চাকর বামুন ত' আছেই। সেখানে কিছুই মেলে না—তাই বেশী করে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, নুণ, তেল মশলা—সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হয়েছিল। আর কিছু ড্রাই ফ্রুট। মাছ মাংস ত' মেলেই না—এক শিকারের হরিণ ছাড়া।

তড়িৎ আর বিক্রম শিকারে আমার শিষ্য। তারা দু'জনেই আমাকে গুরুদেব বলে ডাকে। চাঁদমারিতে ওদের শতকরা নিরেনব্বইটা গুলী Bull's Eye বিদ্ধ করে। দু'জনেই সমান—এ বলে আমায় দ্যাখ—ও বলে আমায় দ্যাখ, কিন্তু জঙ্গলে তারা এই এসেছে প্রথম।

শিকার করবার কথা পরদিন—তবু সেই সন্ধ্যায় আমরা জঙ্গলটার হাব-ভাব, পরিস্থিতি, Animal track প্রভৃতি দেখবার জন্যে জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বলাই বাহুল্য, তিন জনের হাতেই Gun-Light ফিট করা তিনটে রাইফেল, কারণ, বিনা অস্ত্রে জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোরাফেরা করা যায় না।

Tiger Track এর উপরেই আমি কড়া নজর রেখেছিলাম। বাঘের থাবা দেখলেই শিকারীরা ঠিক বুঝে নেয়—নূতন কী পুরনো পদচিহ্ন। অর্থাৎ মহাপ্রভু হালে সে পথ দিয়ে গিয়েছেন, —না বহু পূর্ব্বে এ দিকটায় এসেছিলেন। আবার সেই পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যায়, বাঘটা বড় কি মাঝারি, না ছোট।

আমাদের স্থির ছিল, বাইসন কিম্বা বাঘ ছাড়া প্রথমে হরিণ

দেখলেও শিকার করবে না—কিন্তু হরিণই শিকার করতে বাধ্য করলে।

জীপ 'কার' রেখে আমরা জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। টর্চটা এধার-ওধার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অগ্রসর হতেই ৬০।৭০ গজ দূরে দেখা গেল স-শৃঙ্গ বৃহৎ spotted deer.

তড়িৎ তড়াক করে লাফিয়ে বলে উঠ্‌ল—একটা হরিণ না মারলে তো মাংস খাওয়া চলবে না—

বিক্রমের কিম্ভিবকিম্বাী জিজ্ঞাসা—মারবো:, এ্যা:—মারবো তা:হলে ?

আমাদের পূর্ব-সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল—তাকে ঠ্যালা দিয়ে বললাম—মারো, মারো, শীগ্‌গির মারো !

মারো বললেই তো তিনি তাঁর পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারেন না—দম নেওয়া চাইতো !

Target Practice এ শরীরটাকে আলগা করে যেমন Breath control করে নেওয়া হয়, তিনিও তেমনি দম নিয়ে একবার বন্ধ করেন, ছেড়ে দিয়ে আবার নেন—দু'-তিন বার এই রকম কসরৎ চলতে থাকে !

—আরে, মারো ভাই মারো—পালিয়ে যাবে যে ! একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

"তা যাক্" কথাটি তিনি দাঁত চেপে, চোখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন—তা' যি—এ্যা—এ্যা—ক্ !

জোরালো Torch Lightএর উজ্জ্বল আলোতে এক-জোড়া নীল চক্ষু দেখা যায়। হরিণটার মরণ ঘনিয়ে এসেছিল। তাকে যে মরতেই হবে, তাই বুঝি সে তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। এটা হরিণ জাতের পক্ষে নিয়মের ব্যতিক্রম বলতে হবে বৈ কি !

ইতিমধ্যে বিক্রম সিং অনেকটা স্থির হয়ে এলেও তার বিক্রম অসহ্য হয়ে উঠলো। পাঁয়তারা আর শেষ হয় না।

—আর দেরী করলে, বন্দুক কেড়ে নিয়ে আমিই সট্ করবো। বলতেই তিনি আর একবার নিঃশ্বাস টেনে ট্রিগার টিপলেন।

Lovely shot ! যবনিকা পতনের মতই হরিণটা তখুনি টপ করে পড়ে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখলাম, দুই চোখের ঠিক মধ্যস্থলে ললাটে গুলীটা লেগেছে।

বিক্রমের মহা আনন্দে লম্ফ প্রদান। কে এমন জীবনে প্রথম জঙ্গলে ঢুকেই শিকার পেয়ে যায় !

তারপর এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করি—ধবধবে জ্যোৎস্নায় স্নান করে চারি দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে খুব সাবধানে পথ চলি। ফিরে আসবার পথে, একটা ছোট নালা পার হয়ে আমরা জীপে উঠব। জঙ্গলের Fire lineএ সেটা মেলে এসেছি। এমন সময় দেখি একটা চিতে বাঘ থাবা পেতে বসে নালায় জল খাচ্ছে। টর্চের আলো পড়তেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখেই চমকে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গুলী—ব্যস—খতম্।

আমার বারণ করবার আগেই—তড়িৎ, বিক্রম দুজনেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। বাঘের মুখে টর্চ ফেলেই বিক্রম চীৎকার করে উঠল—খুলি উড়ে গ্যাছে, গুরুদেব !

—এটা তোমার টার্গেট প্রাক্‌টিস নয়—বাঘ দেখা আর গুলী, এক লহমায় হয়ে গেল, দেখলে তো ! তোমার হরিণটা যে কেন এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল—এইটাই আশ্চর্য্য ! হয়ত নিজের জীবন দিয়ে তোমাকে প্রথম উৎসাহ দিয়ে গেল। নইলে, এমনটা ত' হয় না, ভাগ্যে বোকা হরিণ পেয়েছিলে, তাই রক্ষে ! হ্যাঁ, আর এক কথা—গুলী করেই পড়ে-যাওয়া বাঘ-ভালুকের কাছে ছুটে যেও না। আগে মরেছে কি না দেখে, আর এক গুলী চালিয়ে, তবে শিকারের কাছে যাবে। তড়িৎ মস্তক কণ্ডুয়ন করে বলে—বিক্রমদা' শিকার পেলেন—গুরুদেবও বাদ গেলেন না—আমার কপালেই শুধু অষ্টরম্ভা !

—আজকে ত' আমাদের শিকারের কথা নয়।—মেঘ না চাইতেই জল।—যে রকম দেখছি—গণ্ডা-গণ্ডা বাঘ, হরিণ, বাইসন—অনেক কিছুই বন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া যাবে। দুঃখ কিসের ? কাল তোমারই First chance—এখন হরিণ আর বাঘটাকে তুলে আনতে হবে—সেই চিন্তায় ডুবে গেলাম—লোকজন নেই—ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে চার জন মিলে বাঘটাকে টেনে-হিঁচড়ে জীপে তোলা গেল। বাকী থাকল হরিণ !

কাছে আসতেই বিক্রম আর একবার বিক্রম দেখালে। হরিণটা ভারই কি না—বহনের ভার তার উপরেই বেশীর ভাগ ছেড়ে দিলাম। সেও দু'হাতে শিং দুটো ধরে সমানে টানতে থাকে—সামনের পা দুটো তড়িৎ আর পেছনের দুটো আমি ধরতেই—ড্রাইভার তার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় হরিণের পেট-পিঠে চেপে তাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিলে।

বাঘের পাশে হরিণটাকে ধপাস করে ফেলতেই বিক্রমকে বললাম—শিকার করেছি অনেক—কিন্তু বয়ে আনার সৌভাগ্য কোনও দিন হয়নি—তোমার দৌলতে সেটাও হয়ে গেল।

বিক্রমের কবিত্ব জেগে যায়—হরিণ আর বাঘে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—পাশাপাশি কেমন মানিয়েছে বলুন তো ?

তড়িৎ সংশোধনী প্রস্তাব তোলে—বর্ত্তমানে হরিণ আমাদেরই খাদ্য—আর আমরাই তার খাদক—অচিরাৎ প্রমাণ পাবেন।

—আর আমার বাঘটাকে তোমরা আমলেই আনতে চাও না—কেমন ? বাঘ-মানুষেও যে ঠিক একই সম্বন্ধ—

সেই রাত্রে আমরা যখন বাংলোয় পৌঁছলাম—দেখি, তখন বারোটার ঘরে ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটা এক হয়ে মুহূর্ত্তের জন্যে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। ডাকবাংলোর উড়িয়া ভৃত্যটি তখনো জেগে। কোনও বিষয়ে উত্তেজিত হলেই তার তোতলামি বেড়ে যায়—বাঘ দেখেই সে যেন বলতে চাইল—খুব ব-ব-ব-ব-বড়া বাঘ-অ। মা-মা-মা-মারিছন্তি—ইয়া-বা-বা-বা। বাস-বাস-বাস—বা-স—থামো ! কৈ রে—কে আছিস—খাবার টাবার দে।

পরদিন সকালে চটপট্ বেরিয়ে পড়লাম। তড়িতের প্রাণে বিপুল আনন্দ—বিক্রমেরও তাই। কাল জঙ্গলে যে সব নমুনা স্বচক্ষে দেখে এসেছে—তাতে কোনও জানোয়ার চোখের সামনে পড়লে তড়িৎ ছেড়ে কথা বলবে না—কারণ সেদিন যে তারই পালা।

এধার-ওধার চারি দিক খোঁজাখুজি চলতে থাকে—বেলা তখন পাঁচটা কী সাড়ে পাঁচটা হবে—দেখা গেল একদল বাইসন। তড়িৎ সটান তার বন্দুক তুলে তাক্ করবার মুখেই থামিয়ে দিলাম—ও সব ছোট শিংওয়ালা বাইসনের উপর শক্তি দেখিয়ে কাজ নেই—ছেড়ে দাও—

প্রথম চেষ্টাতেই বাধা পেয়ে তড়িৎ ক্ষুব্ধ। বেশ, তাই হোক্—

কিন্তু যদি বড় না পাওয়া যায়—আপনার সাধের বন্দুকটি আর খুঁজে পাবেন না।

—সে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কাজের সময় বন্দুকই আমায় ঠিক খুঁজে নেবে, তুমি তো আচ্ছা সাকরেদ হে, অস্ত্র কেড়ে নিতে চাও! এ গুরু-মারা বিদ্যে শিখলে কোথায়?

—আপনাকে কাহিল করার ওই একমাত্র মহৌষধ। সেদিন আর কিছুই পাওয়া গেল না।

এমনি করেই মাসের এক-তৃতীয়াংশ দিন বিফলে কেটে গেল। এ কী হোল? জানোয়ারগুলো সবাই ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে, আর কোথাও ক্যাম্প করেছে না কি? কাঁকে কাঁকে দু'-একটা হরিণ বহুদূরে ক্বচিৎ দেখা গেলেও আবার তখুনি যে কোথায় ডুব মারে খুঁজলেও পাওয়া যায় না।

তবে আশ্চর্য্য হইনি। এমন অনেক বার দেখেছি। যেখানে শুয়োরের প্রধান আড্ডা দিনের পর দিন নাজেহাল হয়েও সেখানে একটিরও সন্ধান মেলেনি।

যে মাসের দুর্দ্দান্ত গরম—দিন-রাত জঙ্গলে জঙ্গলে হেঁটে কখনও বা উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়ে জীপে ঘুরে বেড়ানোর অসহ্য কষ্ট ত' আছেই, তার উপরেও নিরাশা ও ব্যর্থতার দুঃখ দেহ-মনকে কেমন যেন অবসন্ন করে তুলেছে।

শরতের মেঘের মত নিষ্ফল আক্রোশে তড়িৎ আপন মনেই গর্জ্জে ওঠে, আর যত কিছু দোষ আমার স্কন্ধে চাপিয়ে সে যেন নিশ্চিন্ত হতে চায়।

—হাতের শিকার ছেড়ে দিলে এমনি দুদ্দশাই হয়! বিক্রমও তার সঙ্গে যোগ দেয়! একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!

আমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও আবার ঝগড়া বেধে যায়—বিক্রম তড়িৎকে আরও উস্কে দেয়—তুই ভারী অপয়া—তোকে First chance নিয়েই যত কিছু গোলমাল।

আমিই আবার মধ্যস্থ হয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দিই—

—দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অত ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই। বহু ধৈর্য্য।

—ধৈর্য্য যে আর মানতে চায় না, গুরুদেব!

আমাদের ত' কথাই নেই—আপনি নিজের দিকেই একবার চেয়ে দেখুন না। শরীর যে আধখানা হয়ে গেল, মুখখানায় কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

—যা' এখনও আছে, তারই বা দাম দেয় কে? শেষটায়, দশ দিনের দিন মরুমালঞ্চেও ফুল ফুটলো।

এবার বিক্রমের হাতে ষ্টিয়ারিং। তড়িৎ পাশে, পেছনে আমি। রাত প্রায় দশটা।

এখান থেকেই ইষ্টার্ণঘাট পর্ব্বতমালা আরম্ভ হয়েছে। কোনওটা আড়াই হাজার ফুট, কোথাও বা তিন হাজার ফুট উঁচু। দূর থেকে সেই মৌন গিরিশৃঙ্গরাজি দেখে মনে হয় যেন কোন অজানা রহস্তে ঢাকা যুগ-যুগান্তের ঘনীভূত ইতিহাস—এক একটি যেন নির্ব্বাক্ বিস্ময়। বাইসন এ দিকটায় পাওয়া যায় আর আমরা দশ দিন যাবৎ এখানেই আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছি। বাইসন জলাভূমিতে থাকে না—বা যেখানে বেশী বৃষ্টি হয়, সেখানেও মেলে না—শুকনো জায়গাই এরা বেশীর ভাগ পছন্দ করে।

জীপে যেতে যেতে দেখা গেল, একটা টিলার উপর বেশ বড় একটা শিং-ওয়ালা বাইসন ঘরে দাঁড়িয়েছে। বিক্রম সিং ড্রাইভ করার দরুণ প্রথমটা দেখতে পায়নি। বাঁ হাত দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরতেই মোটর তখুনি "ঘ্যাস" করে থেমে গেল। পেছন থেকে তড়িৎকে তুড়ি দিয়ে ইসারা করতেই সে বন্দুক তুলে ধরলে।

আমি টর্চ জ্বেলে বাইসনের গায়ে ফেলতেই সে পেছন ফিরে সরে পড়বার চেষ্টা করলে। তড়িতের ত্বরিত "ফায়ার।" একটু টাল খেয়ে বাইসনটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জোর বাতাসে বাঁশঝাড়ে যেমন কঞ্চিতে কঞ্চিতে ঠোকাঠুকি লেগে একটা শব্দ হয়, তেমনি "খুড়ুক্, খুড়ুক্" আওয়াজ আমাদের কানে এল। আমরাও সজাগ—খরতর দৃষ্টি,—নিশ্বাস বন্ধ করে খুব সতর্কভাবে সঙ্গে চেয়ে অপেক্ষা করছি—এমন সময় মনে হ'ল, খুরের ডগায় ভর দিয়ে যেন কোনও জানোয়ার এগিয়ে আসছে। কিন্তু একটু পরেই শব্দটা থেমে গেল—অন্য কোনো জন্তু বা বাইসন দেখা গেল না।

তড়িতের মুখে বর্ষণোন্মুখ আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘ। প্রশ্নবাণে তাকে জর্জ্জরিত করে দিলাম—গুলীটা কোন angle এ Travel করেছে?—upwords না downwords? Solid না Soft nose Bullet?

সে-ও প্রশ্নের যথাক্রমে উত্তর দিয়ে যায়—upwords মেরেছি এবং Solid গুলী চালিয়েছি।

আমি তাকে ভরসা দিয়ে বললাম—তুমি যা বলছো, তা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে নাইন্‌টি পার্সেণ্ট চান্স—কাল সকালেই তোমার শিকার মিলবে।

সান্ত্বনা-বাক্যে তড়িৎ ভুলবে কেন? সে বেজায় বিমর্ষ—ঘোরতর মুহ্যমান। বন্দুকটি পাশে রেখে একদম গুম হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা আমরা মোটরে চুপ চাপ বসে—কারও মুখে কথাটি নেই।

ফিরে আসবার পথে বিক্রম জীপ চালিয়ে নিয়ে যায়—টর্চ ফেলে চারি দিকে আমারও চোখ চারি দিকে ঘুরতে থাকে—হঠাৎ একটা অতিকায় বাইসনকে নালা থেকে উঠেই রাস্তা পার হতে দেখা গেল।

—Stop! তার পর Gun light জ্বেলেই এক গুলী।

সে সামনের দুই পা মুড়ে শিং দুটো নীচু করে মাটীর বুকে রাখলে—যেন ভগবানের কাছে মাথা খুঁড়ে শেষ নিবেদন করতে চায়—কোন্ অপরাধে তার এই শাস্তি!

আমি আর এক গুলী চালাতেই সেটা চিৎ হয়ে গেল—একটা পাহাড় ধ্বসে গেলে যেমন নির্জ্জন বনভূমিতে শব্দ হয়—তেমনি সেই বৃহদাকার জন্তুর পতনে চতুর্দ্দিক যেন কেঁপে উঠলো।

আমরা তিন জনেই রাইফেল হাতে ছুটে গিয়ে টর্চের আলোয় দেখলাম, আমার প্রথম গুলীটা তার বাঁ দিকের কাঁধে লেগে এপার-ওপার হয়ে গেছে, দ্বিতীয় গুলী তার কলেজাকে ফুটো করে দিয়েছে।

রাত এগারোটা। এত বড় জন্তুর শিরশ্ছেদ করে নিয়ে যাবার উপায় নেই। ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম।

গাড়ী চালাবার সময় বিক্রম বলে—কেয়াবাৎ গুরুদেব—মোটরের

ষ্টীয়ারিং আমার হাতে কিন্তু আমার মনের ষ্টীয়ারিং পড়ে আছে আপনার শিকারে—কি অদ্ভুত Instantaneous deadly Shot—এ একটা সাধনা—দেখবার মত।

তড়িংও সায় দিয়ে বলে—ছেড়ে দাও, ওঁর ব্যাপারই আলাদা—আমাদের এখনও অনেক দিন এপ্রেন্টিসি করতে হবে। একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না বিক্রমদা'—তুমি যা বলেছো—তা বর্ণে বর্ণে সত্যি—আমি খুব অপয়া—unlucky

আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল, দেখছি! তাকে বুঝিয়ে বলি—আগে ত্যাখো—কাল সকালে তোমার শিকারটা পাওয়া যায় কি না—তারপর যত পারো শোকসভা বসিও।

—সে কপাল আমার নয়—আর-বলেই একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস। ডাকবাংলোয় ফিরে এসে কিছু মুখে দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম।

তখন রাত ছটো। ঘরের এক কোণে মিটমিটে মোমবাতি জলছে—কে যেন মশারি তুলে আমার মাথায় হাত দিতেই আমি চমকে উঠে মানুষটাকে চেপে ধরলাম। দেখি—বিবর্ণ শুষ্কমুখে আমাদের তড়িং রায়। শয্যায় বসেই জিজ্ঞেস করলাম—কী হে? কোনও শিকারের খবর আছে না কি?

—না গুরুদেব! বাইসনকে ঠিক লেগেছে তো? পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কী বলেন?

প্রথমটা অবাক হ'লাম। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম—তোমাকে পঞ্চাশ বার একই কথা বলেছি—আর বলতে পারবো না। ফের যদি বিরক্ত কর তোমারই একদিন কী আমারই একদিন—বেরোও বলছি।

সে'ও মশারিটা গুঁজে দিয়ে তখুনি চম্পট। ভোরে উঠেই শুনি, তড়িং সারা রাত ছটফট করেছে, ঘুমোয় নি। তাকে ডেকে বললাম—কাল রাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কী কুকাণ্ড করলে বলতো?—আমার ইচ্ছে হয় তোমায় হত্যা করে তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো করি।

—অত ভালবেসে কাজ নেই, গুরুদেব!

বেলা আটটায় আমরা লোকজন, বড় একটা ধারালো ছুরি, কুড়ুল, করাত নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এবার ট্রেলারও সঙ্গে নেওয়া হ'ল। কুলীদের পেছনে বসিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। তড়িতের মুখে ক্ষীণ আশা—ফুটেও যেন ফুটতে চায় না!

আমি যেখানে বাইসন মেরেছিলাম—সেখানে পৌঁছুতেই কুলীরা সব নেমে গেল। সাদা খড়িমাটীর দাগ দিয়ে মাথা ও বুকের কতটুকু চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে সেটা বার বার তাদের বুঝিয়ে দিলাম। মাংস ছাড়িয়ে মাথাটা যেন তুলে নেওয়া হয়—Tanneryতে পাঠিয়ে 'ষ্টাফ' করিয়ে নেব।

ট্রেলার ওখানেই খুলে দিয়ে আবার বিক্রম গাড়ী হাঁকিয়ে চলে। যেখানে তড়িং প্রথম বাইসনটাকে গুলী করেছিল—সেখানে 'কার' থামতেই আমরাও সব ঝাঁপিয়ে নেমে পড়লাম।

এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজির পর প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দেখা গেল তড়িতের গুলী-খাওয়া সেই বাইসন মরে পড়ে আছে। তড়িতের শিরায় শিরায় তখন তড়িং-প্রবাহ। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চীৎকার করে সে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। হবেই তো—এটা যে তার অপ্রত্যাশিত প্রথম শিকার! তার পরেই আমার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

তাঁকে বাহবা দিয়ে বললাম—ভো ভো ভক্ত শিষ্য, তোমার জয় হোক! আজকে রাত্রে তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না নিশ্চয়ই, কী বল?

কোথায় গুলী লেগেছে দেখবার জন্যে বাইসনটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়লাম।

তড়িতের চোখে-মুখে কৃতিত্বের গর্ব্ব, মহা আস্ফালন করে বলে যায়—দেখলেন গুরুদেব, আপনার উপদেশ কেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আপনি না একদিন ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, দাঁড়ানো বা ছুটন্ত অবস্থায়, পেছনে, সামনে, কোথায় কী ভাবে shot করতে হয়!—শুধু পরীক্ষায় পাশ করি নি—Full marks চাই!

—শুধু Full marks নিয়েই খুসী? আরো কিছু বেশী চাওয়া উচিত ছিল। জান তো? জনৈক পরীক্ষক একবার কাগজ দেখবার সময় এত দিলদরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন যে, একশ'র মধ্যে একশ' দশ নম্বর দিয়ে বসেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিলেন—"এতনা আচ্ছা লিখা—যো ঘরসে আউর দশ নম্বর বাক্সি দে দিয়া"—

সহাস্যে তড়িতের পিঠ ঠুকে বলি—Bravo তড়িং, তুমি বাহাদুর—What a sharp wonderful shot! এই দেখ বিক্রমাদিত্য, ওই অবস্থায় ঠিক এইখানে গুলী না লাগলে কোনো জানোয়ার পড়ে না। আমিও একবার আলিপুর দুয়ারে এক-জোড়া বুনো মোষ মেরেছিলাম—একটা অবিশ্যি সামনাসামনি আর একটার পেছনে ঠিক এমনি জায়গায় গুলী লেগেছিল। তার পরের দিন সেই শিকার-পাওয়া গেল—ঠিক আজকের মত। তাদের অর্দ্ধবৃত্তাকার চওড়া শিংগুলো খুব বড় আর দেখবার মত। সে ছুটোর মাথা "ষ্টাফ" করিয়ে আমার কলকাতার বাড়ীতে টাঙ্গানো আছে।

বাহুর মাংসপেশী ফুলিয়ে বিক্রমের প্রশ্ন—আচ্ছা গুরুদেব, শুনেছি ওখানে অনেক হাতী পাওয়া যায়?

—আর বল কেন? ওখানেই বন্যহস্তী মারবারও সুযোগ এসেছিল। গণ্ডাখানেক গুণ্ডাহাতী নিধনের পাশও পেয়েছিলাম, তবুও ওর মধ্যে আমি স্বয়ং যাইনি—আমার সঙ্গের শিকারী বন্ধুরাই সেটা কাজে লাগিয়ে দিলে। পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি, হাতী কেমন লাটুর মত ঘুরে পড়ে যায়। মরবার সময় কী যে একটা মর্ম্মভেদী বৃংহণ—উঃ—হাতী দেখলেই কী জানি কেন সিদ্ধিদাতা গণেশের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে!

এ-সব কথা তড়িতের কানে প্রবেশ করছিল কি না কে জানে! সে বন্দুক সমেত হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে—ও-সব-ঠাকুর-দেবতা মাথায় থাকুন, আমার এই বাইসনটাকে নিয়ে কী করব, তাই এখন বলে দিন!
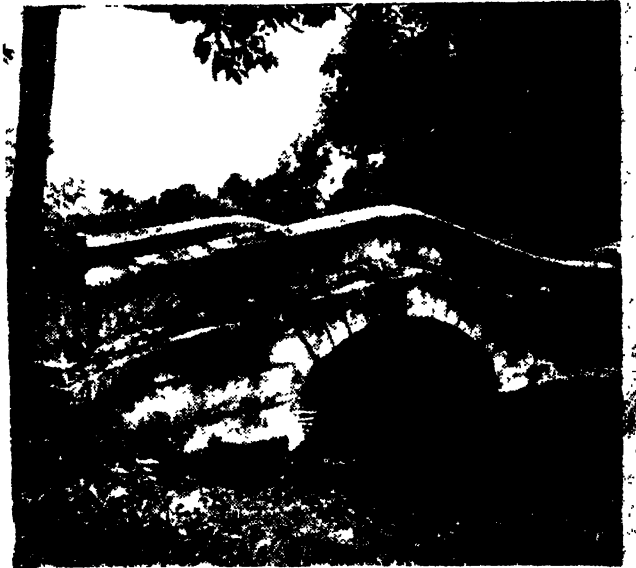
সাঁকো

—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

ছায়া

—অরুণচন্দ্র দাশগুপ্ত

-সুজাতা সান্যাল

—শিবশঙ্কর আচার্য্য

আনন্দ-মেলা

-বিপিনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ওরা কাজ করে
—গীতা সরকার

জুম্মা মসজিদ
—চরিতা দাশগুপ্তা

—শ্রীসুনীল জানা

মাঝির তরণ

মাসিক বসুমতী
[শ্রাবণ, ১৩৬২]

নারী

—শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্ত অঙ্কিত
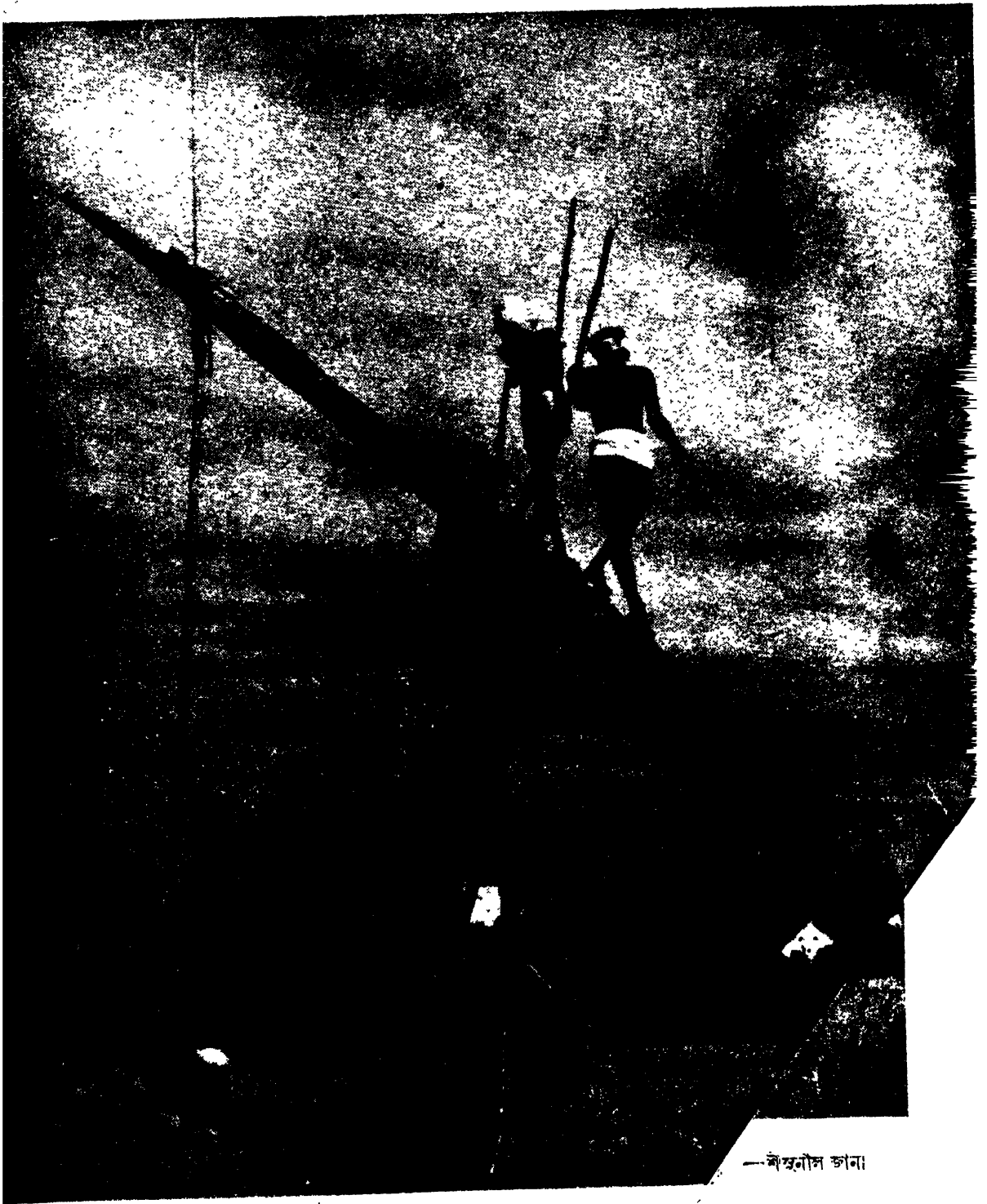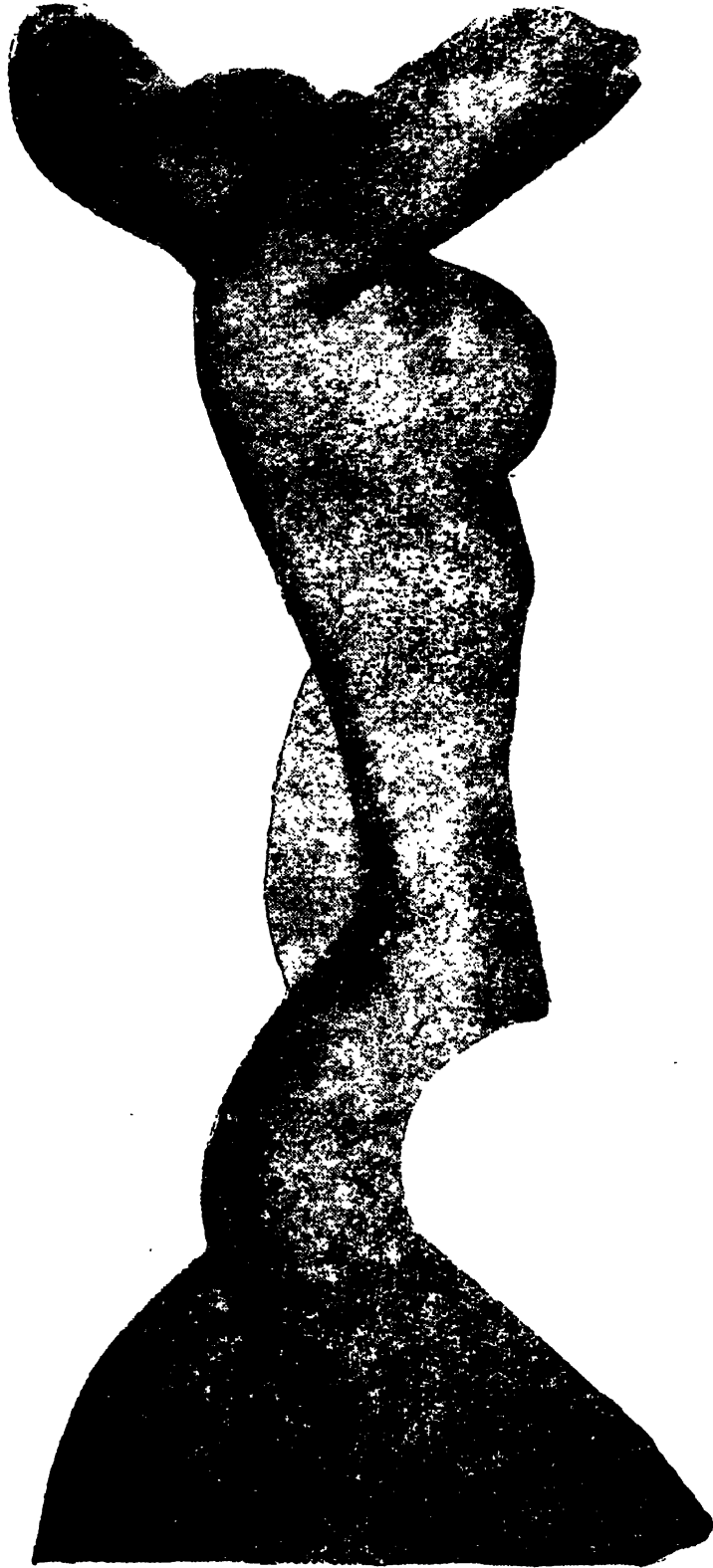
ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক

১৯

'এ কথা তোমার মনে হয়নি যে, মেয়ে তোমার সেই ছোকরার সঙ্গে অভিনয় করতে যেতে পারে ?'

মেরীর বাবা নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন দেখে আগাথা বিস্মিত হল। তবু কথাটা জুড়িয়ে যেতে দিলে না সে। বললে—'তবে কোথায় যেতে পারে ভাব তুমি ? বল, আর কোথায় ?'

নিজের অপার অজ্ঞতা ঢাকবার কোন চেষ্টাই নেই মানুষটার। একটু কাঁধ দুলিয়ে ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন—'তা বলে সে ছেলেটার সঙ্গে যে আজ যায়নি তা নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি। ওর মায়ের আজ শেষকৃত্য হল। আজকে সন্ধ্যায় আমার মেয়ে কোন অসৎ আচরণ করতে পারে তা আমি বিশ্বাস করতেই পারি না।'

দু'জনে খাওয়ার টেবিলে নিবিবিলি কথা হচ্ছিল। অপরিচিত লোক হঠাৎ দেখলে স্বতঃই ভাবতে পারে যে, ওরা দুটিতে বহুদিনের বিবাহিত দম্পতী। খাবার সময় কোন কথা হয়নি দু'জনের। এখন সব গুছিয়ে নিতে নিতে আগাথা কথাটা পাড়লে।

'এসো না আমার সঙ্গে বাঁধের কাছে। ওখানে ঐ টিউলিপ গাছের নীচে তোমার জোড় মাণিককে দেখিয়ে দি'।'

পুরো এক গেলাস মদ গিলে নিয়ে যেন কত অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়ালেন মেরীর বাবা।

'না, না তা হতেই পারে না।' বললেন উঠতে উঠতে—'আর ওসব আমার না জানাই ভাল।'

'আর আমি যদি এসে বলি যে দু'জনকে আমি হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি, বিশ্বাস করবে ত আমার কথায় ? বলো, করবে ত বিশ্বাস ?'

এ কথায় সাড়া দিলেন না তিনি। মৌন মুখে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আজকের রাতটুকু বড়ো গুমোট-গরম। জানলার শার্সিগুলো খুলতে পারলে একটু আরাম হত। কিন্তু সে হবার নয়। যে বাড়ীতে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সেখানে এত তাড়াতাড়ি শোকের চিহ্ন সরিয়ে ফেললে ভারী অশোভন ঠেকবে লোকের চোখে। সারা বাড়ীর এই নিঝুম নীরবতা সহ্য হচ্ছিল না, তাই কথা কইছিলেন আগাথার সঙ্গে! নইলে কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার।

আগাথা জানে, এই লোকটার কাছে তার কিছুই গোপন নেই। কথায় কথায় সেই প্রিয় নামটি কত বার সে উচ্চারণ করেছে এর কাছে। সেই হতশ্রী ছোকরার সঙ্গে তার সব গোপন মিলনের খবর জানে এই লোকটা, যে নোংরা প্রাণীটা তার সমস্ত জীবনের উপর একটা অমার্জনীয় দাগ রেখে দিয়ে গেল।

হলঘর অবধি ভাবী মন্থর পায়ে এলেন মেরীর বাবা। আর এগোলেন না। সেখান থেকে ভারী কোটটা কাঁধের ওপর তুলে নিলে আগাথা।

মেরীর বাবার দিকে চেয়ে ব্যগ্র জেদী কণ্ঠে বললে—'যদি ধরতে পারি তাদের দু'জনকে বলো, বিশ্বাস করবে কি না আমার মুখের কথা ?'

এ কথারও কোন জবাব পেলে না দেখে কাচের দরজাটায় সশব্দে আক্রোশে বন্ধ করে দিলে আগাথা। তারপর বাইরের আধ-অন্ধকার সমুদ্র-মন্থন করতে অদৃশ্য হল।

ঠিকই বলেছে মেরীর বাবা। ঘরের বাইরেও আজ হাওয়ার লেশ নেই। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর অবধি সাদা কাঁকরের পথটা ম্লান জ্যোৎস্নালোকে পড়ে আছে। যেন আকাশের দুগ্ধ-শুভ্র ছায়াপথের একটা অংশ মাটীর পৃথিবীতেও বিস্তৃত হয়ে এসেছে। এই রাত্রির নক্ষত্র-স্পন্দিত আকাশের নীচে একটা পূর্ণ জোয়ারের প্লাবনে আর একবার জেগে উঠেছে মগ্ন জাহাজটা। কুয়াশা আর গৃহছাদের উপরে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গীর্জার চূড়া। এই মনোরম রাত্রির পটভূমিকায় ছায়াচ্ছন্ন একটি নিভৃত আশ্রয়ে দুটি তরুণ প্রাণের বিমুগ্ধ যৌবন কী অধীর আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে তা স্মরণ করা মাত্রই আগাথার রক্তে শিহরণ লাগল। সেই আনন্দের স্বর্গে হানা দিবে সে—পূর্ণতার ভাণ্ডারে করবে চোরা-ডাকাতি। ওখানে ছায়া যত নিবিড়, রস যত গভীর,—মিলন যত মধুর, ততোধিক অসূয়া এই মেয়েটির মনে।

অত কাছে যাওয়া অবধি সেই ছায়ায় কোন হঠাৎ সাড়া পেলে না আগাথা। ভাবলে, হয়ত বা আসঙ্গমগ্ন ঐ দুটি নরনারী বিমুগ্ধতায় স্থান কাল পাত্র ভুলে বসে আছে।

কেন এল সে ? এই অন্ধকারে হোঁচট খেতে কেন সে এল ? ভাবলে আগাথা। এর চেয়ে ঐ প্রোজ্জ্বল আলোয় ঘরের ভিতর বসে থাকাই তার ভাল ছিল। ঐ নির্জন ঘরে একটি অলস বিগত-যৌবন পুরুষের কামনার ধন হয়ে বসে থাকাই বোধ হয় তার ভাল ছিল। মনে মনে শত কামনা করেও যে পুরুষ একটি বার সাহস করে হাত বাড়ায় না। এই মুগ্ধ রাত্রির মুহূর্ত কটি থাকনা ওদের দেবতার দান। জীবন যখন ফুরিয়ে যাবে, মৃত্যু এসে দাঁড়াবে শিয়রে, তখনও এই দুটি প্রাণ এই রাত্রির মধুর স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত হয়ে দেবতাকে শত বার প্রণাম করবে। বলবে,—তোমার করুণা ঈশ্বর জীবনে এত আনন্দ পেয়েছি।

একবার ইতস্ততঃ করলে আগাথা। কিন্তু তার প্রবৃত্তিরই জিত হল। বন্য পশুর মত অন্ধ আবেগে সে তার প্রবৃত্তির পথে ছুটে

গিয়েছে চিরকাল—পথের কোন বাধাই কখনো চোখ চেয়ে দেখেও নিরস্ত হয়নি। কিন্তু আজ আগাথার মনে কোন মিথ্যা মোহ ছিল না। বিজয়িনী হবার নিশ্চিত স্পর্দা ছিল না মনে।

টিউলিপ গাছের কাছ বরাবর এসে দাঁড়াল আগাথা। শাখায় শাখায় পাতাদের মৃদু স্পন্দিত মর্মর যেন নিশীথিনীর নিশ্বাসে শিহরিত হচ্ছে প্রকৃতি।

ঘাসের মখমলেতে আজ আর কাউকে চোখে পড়ল না আগাথার। তবে কি আজ তারা অন্য কোথায় অভিসারে গেল?

'আমায় খুঁজছ না কি মাদাম?'

একটা পরিহাস-তরল কণ্ঠে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে আগাথা!

'আমায় দেখতে পাচ্ছ না মাদাম? তোমায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে।'

এই যে আমি এখানে, এই এলডার গাছগুলোর কাছে।

মেরী তাকে দেখে ফেলবার আগে যদি পালিয়ে যেতে পারত, ত অনেক লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত আগাথা। কিন্তু, তা ত হবার নয়। অপরের সুখ লুকিয়ে দেখতে চাওয়াই ত স্বভাব—অপরের সুখে কাঁটা না দিতে পারলে মনে তৃপ্তি পায় না আগাথা।

'এই যে মাদাম—এই যে গুঁড়ির ওপর বসে আছি আমি।'

একলা মেয়েটাকে এতক্ষণে দেখতে পেলে আগাথা। বসে আছে যেন বিবর্তিনী হরিণী। আপন গন্ধের ইঙ্গিত পাঠিয়ে বনের হাওয়ায়। যে গন্ধের পথ ধরে আসবে বনমৃগ মধুর বল্লসের লোভে।

—'আমার পাশে এসে বসো মাদাম!'

—'কি ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে নদীর দিক থেকে। তুমি দেখছি ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবে।'

—'ঠাণ্ডা আবার কোথায়? ঐ আগুনে শরীর আমার তেতে রয়েছে।'

—'আগুন? আগুন আবার কোথায়?'

—'ঐ ত। নদীর ওপারে।'

ওপারে তাকিয়ে দেখলে আগাথা। নিবন্ত আগুনের শেষ শিখা ক'টি দপ করে জ্বলে উঠে প্রায় নিবে গেল। আবার তখনি নতুন শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

'অত দূর থেকে গায়ে কখনো আগুনের তাত লাগে? তোমার গায়ের তাপ পাচ্ছি গা ঠেকিয়ে।'

এই মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভরা যৌবনের ঝলকানি সহ্য করতে পারে না আগাথা।

নিজের দিকে তাকিয়ে হিংসায় তার গা জ্বলে যায়।

আর একটা কথাও কইলে না মেরী। মেয়েটা যেন এক ফোঁটা নির্বোধ শিশু। শিশুর মতই হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন নিয়ে অন্ধকারে কত রকম ভঙ্গী করেছে মেয়েটা। প্রথমে কিছু না বুঝলেও বুঝতে দেরী হল না আগাথার। যতটা বোকা অর্বাচীন ভেবেছিল তাকে, তত বোকা নয় মেরী। ওপারে একটা জ্বলন্ত শাখা নাড়ছে কে। ওপারের ঐ নির্বাপিত আগুন আর ম্লান আভায় রেখাম্বিত শরীরটা কার'তা দেখতে না পেলেও বুঝতে বাকি রইল না আগাথার। জ্বলন্ত শাখার ঝলকানির চেয়ে দ্যুতিময় নিশ্চয় ঐ ছেলেটির শরীর। হঠাৎ আগুনটা বিহঙ্গ-চূড়ার মত ঊর্ধ বাহুতে জ্বলে উঠতেই চকিতের জন্য যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে আগাথা। প্রাণের নিরুদ্ধ উল্লাসে দুটি হাত একবার এপারের দিকে প্রসারিত করলে গিলস। তারপর একটা অন্ধকারের প্লাবনে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

একটা অচিন্ত্য অনুভূতির আচম্বিত ধাক্কায় যেন জেগে উঠল আগাথা। তবে কি এমনি করে শোকের রজনী যাপন করছে তারা? ইচ্ছা করে বরণ করছে এই বিরহ? আজকের এই শোকের রাত্রে তাদের দু'জনের ব্যগ্র মিলনের মাঝখানে থাকুক শাণিত বাধা। বয়ে যাক দারুণ বিরহের নদী মর্মরিত কাশবনে! কঠিন উপলে কলকাকলিতে। তবু এই বিরহের পটভূমিকায় আজকের মত এমন নিবিড় করে আর কোন দিন তারা পায়নি দুজনে দুজনকে। ঐ নক্ষত্র খচিত আকাশ, এই বৃক্ষলতা, সেই অবধ্য মানস গোচর দৃষ্টিসত্তা, তাদের সমস্ত পিতৃ-পিতামহ পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি—সকলের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন এমন প্রাণে প্রাণে আর কোন দিন বোধ করেনি তারা।

যেন একটা ভয়ার্ত প্রাণী ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরাল দিয়ে পালিয়ে গেল, এমনি ডালপালার শব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল মেরী। দেখলে তার মাদাম আগাথার চিহ্ন মাত্র নেই।

ড্রয়িং-রুমে ফিরে এসে আগাথা দেখলে, মেরীর বাবা সেইখানেই স্থাণু হয়ে বসে আছেন, যেখানে তাঁকে রেখে দিয়ে গিয়েছিল সে। বসে বসে একটি সিগার খাচ্ছেন। তার নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে একটা পচা তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে নির্বিকল্প মুখে বসে কিসের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে মানুষটি, তাই একবার ভাবলে আগাথা। কিন্তু মুখ তুললেন না তিনি। চোখের ঘামে ভেজা ভারী পাতাগুলো অবধি নড়ল না যেন এমনি সমাহিত ভাব। আগাথা ঘরে এসেছে। এখন তার দিকে চোখ তুলে তাকানো চলবে না, তা জানেন বলেই বোধ করি অমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

তার কাছে না বসে আগাথা যদি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয় তাতে কি আপত্তি আছে ওর? একবার জিজ্ঞেসাও করলে আগাথা। বড়ো ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

—'মেরীর সঙ্গে দেখা হল?'

মুখে কিছু, না বলে শুধু মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালে আগাথা।

—'একা ছিল?'

উত্তর দিতে ক'বার ইতস্ততঃ করলে আগাথা। যা দেখে এল নিজের চোখে তার যদি সত্য বিবরণ দেয় সে, তবে ত ঐ দুটি ছেলে-মেয়ের অপরিসীম প্রশংসাই করে ফেলবে আগাথা। তাই যেন অনেকটা মোহাচ্ছন্নের মতই জবাব দিলে।

'একলাও বলতে পার। আবার একলা নাও বলতে পার।'

এ কথা শুনে মেরীর বাবা নিরুত্তর রইলেন। এই মেয়েটিকে চাপ দিয়ে ও বিষয়ে কিছু জানতে চাইবার ঔৎসুক্য রইল না। তবু অনেকক্ষণ পরে যখন কথা কইলেন যেন কত ক্লান্ত মৃদু স্বরে বললেন—'যা অবস্থা হল, তাতে মনে হয় আমাদের দুজনের—'

দরজার চাবী ঘোরাতে যাচ্ছিল আগাথা। এ কথা শুনে সেই অবস্থাতেই মুখ ফিরে তাকাল। বললে—'ঐ ছোকরার সঙ্গে

নিজের মেয়েকে এই ভাবে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছে নাকি তোমার? কথার সুরে যেন তাই বোধ হচ্ছে।'

আর কোন সাড়া দিলেন না তিনি। তখন আগাথার পালা পড়ল। অনেক রকম করে আগাথা তাকে বোঝাতে লাগল। এরই মধ্যে তাড়াতাড়ি করা কি লোকচক্ষে ভাল দেখাবে? এখনো অবধি অশৌচ কাটেনি। সন্তমৃতার কবরে মাটী ত এখনো তাদের চোখের জলে নরম হয়ে রয়েছে।

সন্তবিরহী স্বামি-স্ত্রীর নামোল্লেখ শুনে হাত দিয়ে আগাথাকে নিবারণ করলেন। বললেন—'আমার জুলিয়া। আহা, জুলিয়ার কথা আর আমায় মনে করিয়ে দিও না আগাথা। তার ত কাজ ফুরোল। সে ত শান্তিতে ঘুমিয়েছে। কিন্তু আমাদের ত মুক্তি নেই। আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করতেই হবে। কালই ত ডাক্তার সাঁলো বলছিলেন আমায়—'যা করতে চান মঁসিয়ে দুবার্ণে, সন্তসত্তই সেরে ফেলা ভাল। তাই নয় কি?' লোকটির চোখ দেখে ওর মনের ভাবনার কিছুটা আঁচ পেলাম যেন।'

শুনে আগাথা শুধু অসহিষ্ণুর মত কাঁধ দুটোকে একটু নাড়া দিলে। ডাক্তার সাঁলো কেমন মানুষ, তার ধারণা কি, তা জানতে আর বাকি নেই।

কিন্তু মেরীর বাবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন না। বললেন—'ভারী সাবধানী আদর্শবাদী মানুষ ডাক্তার। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ওর দ্বিধার অন্ত নেই। তবুও এ সহরে ওর মত মানুষ আর একটিও নেই যাকে বিশ্বাস করে নির্ভর করা যায়, তা আমি হলপ করে বলতে পারি। সারা দুনিয়ায় ওরা সংখ্যায় নগণ্য। বিধাতা যেন এক মুঠো বিশ্বাসী মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই খুঁজে পেতে চিনে নিতে কষ্ট হয়। মনুষ্য জাতির ওপর তোমার ত ঘৃণার অবধি নেই আগাথা! কিন্তু কথাটা কি জানো, কখনো কখনো মানুষকে বিশ্বাস করতেই হয়। না করলে চলে না।'

যেন অনেকটা অভ্যাসের বশেই আবেগ-প্রবণ বাক্যস্রোত মাঝ-পথে সামলে নিলেন। স্বামীর এই ধরণের ভাব-প্রবাহে আচমকা অন্ত কথার ঢিল ফেলে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করার নেশা ছিল স্ত্রীর। এ দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। মনে পড়তেই আকাশচারী ভাবনাকে গুটিয়ে নিলেন দুবার্ণে। যেন দু'কান ভরে শুনতে পেলেন স্ত্রীর সেই তীক্ষ্ণ অনুযোগ—'শিকারে যাওয়ার কোটটা ধোপার বাড়ীতে দেবার কথা দিব্যি ভুলে বসে আছ ত? বেশ হয়েছে।'

মনে পড়ল সেই নিত্য অনুযোগী কণ্ঠ চিরকালের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে। আজ আর তার কথায় বাধা দেবার কেউ নেই। যত খুসী কথা বলতে পারেন তিনি। নিজেকে যেমন করে যতক্ষণ ধরে ব্যক্ত করতে পারেন, কেউ তাকে নিরস্ত পর্যন্ত করবার নেই। মনে পড়তেই সাহস হল। একটু যেন বিব্রত ভাবে আগাথাকে উদ্দেশ করে বললেন—'সন্ত-সত্তই ভাল, কি বল? ও দেরী করে লাভ কি?'

দরজার মুখ থেকে এতক্ষণে ঘরের ভিতর সরে এল আগাথা। বললে—'তাহলে ঐ বিয়ের কথাই তুলছ ত? আমিও তাহলে জিজ্ঞেস করি। ঐ ডাক্তার সাঁলোর ছেলেটার সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর রাখ কি দয়া করে? ও ছোকরা কেমন তার কোন অস্পষ্ট ধারণা আছে?'

'সে যেমনই হোক, আমার মা মেরী তাকে ভালবাসে এইটুকুই আমি খবর রাখি। ও বয়সের ছোকরাদের রকমই এক। ভেতর আবার পছন্দ অপছন্দ?'

যেন কত গোপনীয় কি বলছে, এমনি ভাবে একেবারে ফিস করে বললে আগাথা—

'তুমি জান না তাই বলছ। ও ছেলেটা একেবারে অপছন্দ আমি যে নিজে কিছু কিছু জানি ওর ব্যাপার-স্যাপারের।'

'বল। কি জান বলো?'

দেওয়ালে হেলান দিয়ে খুব একটা কর্তৃত্বের ভাব দেখিয়ে দাঁ ছিল আগাথা। যেন নিজের মনঃশক্তির জোর দেখাবে এই লোক ওপর। গিলসের সঙ্গে মেরীর বিয়ে হতে পারে, এ নিয়তির বিধা সে উলটে দিতে চায় নিজের ইচ্ছার জোরে। কিন্তু আগাথা জ সে হারতে বসেছে। ভাগ্যের পাশা খেলায় ঘুঁটি যেমন চলেছে তা হার তার অনিবার্য। তবু সহজে ছাড়বার মেয়ে সে নয়।

'কি বলে বোঝাব তোমায় সে-সব? জিনিষগুলো ভাল নয়, অবধি বলতে পারি—মানে ভারী খারাপ আর কি—।'

যে সব কথা বললে এই মানুষটার মন ভাঙবে, তা বলতে আর জোর পাচ্ছে না আগাথা। তাই তার গলায় অবজ্ঞার ঔদাস্যের ভাব বেশী প্রকাশ পেল।

'বলো না, কি সব?'

মানুষটা আজ যেন জিদ ধরে বসেছে। না শুনে ছাড়বে না।

শরীর-মন বড়ো অবসন্ন লাগে আগাথার। ক্লান্ত কপাল উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে কোন রকমে সাদা গলায় বলতে চায়-'অবশ্য কোন প্রমাণ নেই আমার হাতে।'

ঐ অবধি বলেই থেমে যায়। আর সেই মুহূর্তে জীবনের চ পরাজয়ের মুখোমুখী দাঁড়ায় আগাথা। চারি পাশের ধোঁয়ার কুয়াশ মধ্যে বসে থাকা মানুষটি যেন নিশ্চল পাষাণ-স্তূপ। শুধু বয় কুঞ্চিত ভারী পাতার নীচে চোখের মণি দুটি তার জল-জল কর থাকে। তাকে দেখে মস্ত কোলা ব্যাঙের কথা মনে পড়ে আগাথার

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে মেরীর থমকে থামার শব্দ প দু'জনে। পর মুহূর্তেই দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করে দেখা দেয় মেরী ঘরের ভিতরে আগাথাকে বাবার সঙ্গে একলা দেখে তখুনি দর বন্ধ করে দেয় সে। মেরীর অপসৃয়মান লঘু পায়ের ধ্বনি কা পেতে অনেকক্ষণ ধরে শোনে তার গভর্ণেস মাদাম আগাথা।

'এত দিনে আমার প্রয়োজন ফুরোল। এই সপ্তাহেই আমা বিদায় দেবার ব্যবস্থা করে দাও তুমি।'

এতক্ষণে যেন সাড় এল মানুষটার। নড়ে-চড়ে একেবারে উ দাঁড়ালেন তিনি।—'তুমি কি পাগল হলে আগাথা? এ তোমা কি খেয়াল?'

—'আমি নয়, পাগল হয়েছ তুমি। আমার যে ছাত্রী তা বিয়ে হয়ে গেলে, আমার আর এখানে পড়ে থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে?'

তার কথা শুনে ছাইদানিতে সিগারেটটা ফেলে রেখে থপ-থ করে এগিয়ে এলেন তিনি আগাথার দিকে।

'আজই জুলিয়ার শেষকৃত্য সেরে এসেছি আমরা। মনে আমা যা আছে তা আজ সন্ধ্যায় নাই বা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে তুমি আগাথা? আমি জানি, জুলিয়া আমার ইচ্ছাতেই সানন্দে সা

দেবে। জুলিয়ার মনে মনে ইচ্ছাও ছিল তাই। আমি কিসের কথা বলছি তা বুঝতে তোমার ভুল হবে না আগাথা! সে কথা তুমিও জান। তবু তোমাকে এটুকু আশ্বাস আমি দিয়ে রাখছি যে, তোমার জীবনের কোন বদল হবে না এ বাড়ীতে। এমন কি, যদি তোমার তাই ইচ্ছে হয়, এখন যে-ঘরে থাকছ, শুচ্ছ সেই ঘরেই থাকতে শুতে পারবে। আমি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করব না।'

একটি বার থেমে আরো নীচু গলায় বললেন—'তোমার কাছে কোন কিছুই দাবী করব না আমি। যত দিন না তুমি স্বেচ্ছায় তুলে দেবে, তত দিন তোমার গা অবধি ছোঁব না আমি, এই শপথ করছি তোমার কাছে। এখন যেমন আছ তখনও তেমনি সহজ ভাবে থাকবে এ বাড়ীতে। আমি কোন দাবী-দাওয়া করব না তোমার ওপর, যত দিন না তুমি ইচ্ছা করে আমার কিছুতে অধিকার চাও। তত দিন আমার মেয়ের মতই থাকবে তুমি'—

কথাটা শুনে একটা ডুকরে ওঠা কান্না আগাথার গলায় এসে আটকে গেল। যেদিন তার মুখের ওপর নিকোলাস বলেছিল—'তোমার কথা ভাবলে বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়', সেদিনও এমনি একটা কান্না পাথরের টুকরোর মত তার গলায় বেধে গিয়েছিল। তবু আজ সারা মন দিয়ে সে মেরীর বাবার কথায় না বলতে পারলে না। কোথায় যেন একটা নীরব সম্মতির ঝঙ্কার উঠতে লাগল। ভালই হল ভাবলে আগাথা। তবু ত একেবারে তার মানলে না সে—হলে না পুরোপুরি নিষ্ফল।

তার জীবনের যে পরাজয় হৃদয়ের রক্তে রাঙা তার কথা কেউ জানবে না। সবাই জানবে ডুবার্ণের ঘরে ঐ কুৎসিত মেয়েটা সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল। এত দিন ঐ মেয়েটার গভর্ণেস ছিল সে। এর পরে এই ঘরের ঘরণী হয়ে মাথা তুলে বেড়াতে পারবে আগাথা তার মায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে।

আজ রাতে যে মেয়েটা তাকে এমন করে পরিহাসে বিড়ম্বিত করলে তার জীবনের আগামী সব দিন-রাত্রির উপর একটা অশুভ গ্রহের মত ভর করে থাকবে আগাথা। তার সমস্ত সুখে কাঁটার মত বিঁধে থাকবে।

আগাথার উত্তর শোনার জন্যে পল পল করে সময় গুণছিলেন মেরীর বাবা। অনেকক্ষণ অবধি একটি আপত্তির গুঞ্জরও যখন শুনতে পেলেন না, তখন আবো সাহস সঞ্চয় করে বললেন—

'এতক্ষণ যা বললাম তা মনে রাখার কোন দরকার নেই আগাথা! আমাদের দু'জনের অত তাড়াতাড়ি করার কোন তাগিদ নেই। আমি চাই যে আমার কথায় সায় দেবার আগে সব দিক বেশ ভাল করে বিবেচনা করে দেখবে তুমি। হঠাৎ একটা উত্তর আমিও চাই না। মেরী মার বিয়ে হওয়া অবধি তোমাকে তার খুব প্রয়োজন হবে। তার খাওয়া-পরা এটা-ওটার ওপর তোমাকেই ত লক্ষ্য রাখতে হবে। তুমি হবে তার দেখা শুনার মানুষ। কথাটা কি জানো আগাথা, তোমার বয়সের মেয়ে মানুষরা যাকে সুখ বলে লোভ করে, আসল সুখ তা নয়। অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয় না যাদের সংসারে তারাই সুখী। সমাজে মান-সম্মান নিয়ে বাস করতে পারাটাতেই সুখ—'

তার কথায় বাধা দিলে আগাথা। বললে—'কি ভুলো মন দেখেছ আমার—তোমার কথাটা এক দম ভুলে বসে আছি—'

আগাথার কথা শুনে বড়ো দুঃখে মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়ল ডুবার্ণের। তাঁর সংসারে আগাথা শুধু একটা শূন্য স্থানই পূর্ণ করছে না। কোন ফাঁকে সেই মৃতা মেয়ে মানুষটির স্বভাব-প্রকৃতি অবধি আগাথায় এসে বর্তিয়েছে।

আগাথা চলে যাবার পর আলোর ধারে গিয়ে বসলেন তিনি। একা একা কত কি ভাবলেন নিজের মনে। আঠার বছর বয়স হল। এ বয়সে কি আর পুত্র সন্তান হবার আশা আছে না কি? ডাক্তার সাঁলোর সঙ্গে একবার আলাপ করতে পারলে মন্দ হয় না। আবার ভাবলেন কি দরকার আর ও সবের। জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে নিয়তির কাছে অঞ্জলি পেতে অতিরিক্ত কিছু পাবার লোভ না করাই ভাল। এ বয়সে আর ছেলের বাপ হওয়ার আশা করাই মিথ্যে।

ও সব চাওয়া-পাওয়ার থাক না হিসেব। ঠিক এই মুহূর্তে লোভের অঙ্কটাই কষে দেখলেন তিনি। বেলমত জমিদারীর মালিকানা, যার সেই মেয়েকে বিয়ে করলে রাজত্ব রাজকন্যা দুই-ই তার মুঠিগত হবে।

সেই লোভের আগুনে দুটি চোখ চক-চক করতে লাগল।

২০

—'লোভ যে হয়নি তা বলব না বাছা'—সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই মা বলছিলেন নিকোলাসকে—'খুবই হয়েছিল লোভ কিন্তু সেই লোভের বঁড়শী আমার গলায় আটকে ফেলতে পারেনি মেয়েটা।'

আগামী কাল সকালেই নিকোলাসের প্যারিসে যাবার কথা। ঘরের আলোর নীচেতেই খেতে বসছিল সে। মা নিজে যত্ন করে তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে একটি বৌ নিয়ে আসবেন ঘরে আর সেই সঙ্গে মস্ত একটি জমিদারী আসবে তার সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাতে, মনের এই সযত্ন-সঞ্চিত আশা যে ভাবে খান খান হয়ে গেল, তাতে মায়ের মন যে ভেঙ্গে পড়েনি এই মস্ত বড়ো সান্ত্বনা রইল নিকোলাসের।

'মেয়েটা আমার রান্নাঘরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই, মন আমার কু বুঝেছিল। ওর সব আশা ভেস্তে যাচ্ছে বলেই যে মেয়েটা ছুটতে ছুটতে এসেছে তা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। আমাদের মায়ে-ছেলের যে তাতে ভালই হল তাও ঠিক। হঠাৎ কি করে যে আমার চোখটা ফুটল ভেবে তুই নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছিস, না রে নিকোলাস? তোর মা বোধ হয় পাগলই হয়ে গিয়েছিল, নয়ত কি করে ভাবতে পেরেছিলাম যে, ঐ মেয়ে মানুষটার সঙ্গে সুখে ঘর করতে পারব ছেলেকে নিয়ে। আর শুধু কি তাই—ওর দয়ার অন্ন মুখে রুচত কি করে আমার? কিন্তু সেও সহ্য হত কিন্তু তোর মত ভাল মানুষ ছেলেকে ও ডাইনী এক হপ্তায় একেবারে গিলে খেয়ে ফেলত, সে আমি চোখ চেয়ে দেখতাম কি করে মা হয়ে? তোরও বাছা একটু শক্ত হওয়া উচিত ছিল। এক-একটা মেয়ে মানুষ আছে, পুরুষে ধাক্কা না দিলে যাদের চৈতন্য হয় না।'

আপন মনে ফিস-ফিস করে বললে নিকোলাস—'ধাক্কা দিতে আমিও কসুর করিনি মা! এমন কঠিন ধাক্কা দিয়েছি যা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।'

কিন্তু মার কান অবধি পৌঁছায় তেমন উঁচু গলায় বললে না

নিকোলাস। ঐ তার মা। বুড়ো বয়সের চালসে-ধরা চোখের দৃষ্টি যতটুকু যায় ততটুকুই তার সংসার। সেই মাকে ছেলে হয়ে এর বেশী আর কি বলতে পারে নিকোলাস? সংসারে যারা তাকে ভালবাসলে তাদের দুই হাতে হৃদয়ের অমৃত ঢেলে দিলে নিকোলাস। আর যারা তার ভিতরের স্নিগ্ধ মানুষটিকে বেদনায় শরবিদ্ধ করতে চায় তাদের দুঃখ না দিয়ে তার উপায় কি?

—'ভারী মুষড়ে পড়েছে নিশ্চয় মেয়েটা। গীর্জে থেকে যখন বেরিয়ে আসছিল, সাহস করে ওর দিকে তাকাতে পারিনি বটে, কিন্তু ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল একবার ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখি।'

ছেলের মুখোমুখী বসলেন মা। যত্ন করে ছেলের পনীর কেটে দিলেন।

শান্ত কণ্ঠে বললে নিকোলাস—'দু' চোখের জল শুকোতে ওর দেরী হবে না মা! দুবার্ণেদের ঘরে বিয়ের কনে হয়ে ঢুকলেই—'

—'ও মা তাই নাকি?'—মার চোখে এক-আকাশ বিস্ময় ভরে উঠল—'বলিস কি রে? দুবার্ণে বুড়োকেই বিয়ে করবে মেয়েটা? তাও হতে পারে বটে, কথাটা তুই খুব মন্দ বলিসনি বাছা!'

ছেলের কথাটা মনে ধরে গেল মায়ের।

—'সত্যি যদি ঐ বুড়োটাকে গাঁথতে পারে আগাথা ত একটা বারুদস্তূপ জ্বলতে বাকি থাকবে শুধু! এ আমি তোকে বলে দিলাম গিলস। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কি জঘন্য খেলাটাই না খেললে মেয়েটা বল ত?'

—'কি আবার করবে ও? যাই করুক, আমাদের ভালো বই মন্দ হবে না মা!'

টেবিলের ওপর ছেলের হাতখানা আলগা থির ভাবে পড়ে আছে দেখলেন মা। ভালো হবে বৈ কি। তাঁর সংসারে সব ভালো হতেই হবে। ছেলের দিকে নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে মায়ের মনে কত ভাবনার তোলপাড় হতে লাগল। এক সময় বললেন—'ঐ সাঁলোদের ছেলেটার কথা ভাবছি আমি। মেরীর সঙ্গে গিলসের বিয়েটা ভাঙতে যদি না পারে ত ঐ মেয়েটা গিলসের পথে চিরকাল কাঁটা হয়ে থাকবে। দোর গোড়ায় শত্রু নিয়ে ওকে ঘর করতে হবে।'

আপন মনে মাথা নাড়লে নিকোলাস।

—'তা আর পারবে না মা! বিয়ে ওদের নিয়তির বিধান। এত দিন পরে তা আর উলটাতে পারবে না আগাথা। তবে ওদের দু'জনের প্রেম, ওদের ভালবাসার সংসার নষ্ট করে দিতে সারাজীবন চেষ্টার কসুর করবে না ও রকম মেয়ে।'

—'তুমি বাছা আর ও রকম ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে অশান্তি করো না মনে মনে।'

—'সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা! ও পথে আর আমি কোন দিনই হাঁটব না। তা তুমি দেখে নিয়ো।'

পকেটে হাত দিয়ে আলতো আঙুলে চিঠিখানা স্পর্শ করলে নিকোলাস। দিনের বেলা গিলস ওকে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্যারিসে যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলাটুকু বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারবে না—মার্জনা চেয়েছে গিলস। সে যেন কিছু মনে না করে। প্যারিসে দেখা ত হবেই শীগগির। কিছু বইপত্তর জামা-কাপড় তার সেখানে পড়ে আছে। প্যারিসে অবশ্য থাকতে যাবে না সে। জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়েই ডোর্মে ফিরে আসবে সে সত্ত-সত্ত। জানুয়ারী মাসে তাদের বিয়ের তারিখ স্থির হয়েছে। বিয়ের পর মেরীকে নিয়ে তারা বেলুজে সংসার পাতবে। তার মেরীরও ইচ্ছে তাই।

যেন স্বগত স্বরেই বললে নিকোলাস—'মানুষে আর পোকামাকড়ে বিভেদ বড়ো অল্পই দেখছি সংসারে।'

—'কি বললি?'

—'গিলস আর আমি—আমরা দু'জনেই গুটি থেকে বেরিয়ে পড়েছি মা!'

—'কি যে তুই এলোমেলো বকিস বাছা, মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারব না।'

আর কথা বাড়ালে না নিকোলাস। বাইরের ঐ তিমির রাত্রির কোলে মৌনমুখর আকাশ পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এল তার মনের জগতে। উঠে পড়ল নিকোলাস। হাত পেতে মার কাছে দরজার চাবীটা চাইলে সে।

—'কাল সকালে চলে যাবি, আজকের সন্ধ্যেটুকুও ঐ গিলসের সঙ্গে না কাটালে চলে না তোর? তার চেয়ে থাক না বাবা মায়ের কাছে।'

—'না মা না।'—শুকনো গলায় বললে নিকোলাস—'গিলস গেছে তার মেরীর কাছে। আমি একটু ফাঁকায় ঘুরে আসব একা-একা।'

তবে আর কি? রাত গভীর হতে থাকবে। রোজকার মত বুড়ী মা জেগে শুয়ে থাকবে পথ চেয়ে।

মায়ের মিনতি কানে তুললে না নিকোলাস। জেদী গলায় বললে—'চাবিটা দাও আমার হাতে।'

চিরকাল যেমন করে আসছেন আজও তেমনি ছেলের কথায় হাত নেড়ে অসম্মতি জানালেন মা। মায়ের এই বীতরাগের চেহারাটা অনেক দিনের জানা। তাই বুঝতেও দেরী হল না তার। টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে মায়ের মুখোমুখী দাঁড়ালে নিকোলাস। দৃপ্ত পুরুষভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বললে—'কই দাও। দাও চাবিটা আমার হাতে। দেরী করছ কেন মা?'

অমন নরম ভালোমানুষ ছেলেটাকে হঠাৎ কত মস্ত দেখাচ্ছে। কত সরল ঋজু তেজীয়ান। তার সামনে ছেলের এই রকম মেজাজ আগে কখনো দেখেনি মা। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে।

বিড়-বিড় করে বললেন—'কি হল তোর আজকে? অমনি করে কি মায়ের সঙ্গে কথা কয় বাবা? তা ছাড়া চাবী তোর নয়—চাবি আমার।'

'তোমার? তাই বুঝি ভেবে রেগেছ মনে মনে। তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, এ বাড়ী তোমার নয়—এ বাড়ী আমার।'

শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না মা। সমস্ত শরীরটা এলিয়ে আসতেই বসে পড়লেন চেয়ারে। ছেলের আপাদমস্তক বার বার করে খুঁজে দেখতে লাগলেন।

—হা আমার পোড়া কপাল! তাই বুঝি? তাই বুঝি?'

—'কেন মিছিমিছি আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ মা?'

—'কোথায় যেন রাখলাম চাবিটা'—তবু যেন কত ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

—'তোমার ঢিলে জামাটার পকেটে আছে দেখো।'

পকেটে হাত দিয়ে বার কয়েক হাতড়ালেন মা। তার পর চাবিটা বার করে যখন ছেলেকে দিলেন, থর-থর করে কাঁপতে লাগল শীর্ণ হাতখানা।

মায়ের হাত থেকে চাবিটা যেন ছিনিয়েই নিলে নিকোলাস।

দরজা অবধি মা তার পিছু পিছু এলেন। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন—'আটাশ বছর বয়েস হ'ল ছেলের, আর ত সেই ছোট খোকাটি নেই আমার নিকোলাস। এখন সে মস্ত পুরুষ মানুষ। তা হোক—তবু বাইরে যাবার আগে বুড়ো মাকে একটা আদরের চুমু দিয়ে যাবি ত বাবা!'

মাথার উপর অন্ধকার নীল আকাশে দুগ্ধ-শুভ্র ছায়াপথ। সম্মুখে প্রসারিত দীর্ঘায়িত পথটিকে মনে হচ্ছে যেন আকাশের ছায়াপথেরই একটানা ধারা। আকাশ পৃথিবীর মধ্যে আজ কোথাও কোন ছেদ নাই, বিরতি নেই। নির্জন সেই পথে একাকী হেঁটে যাচ্ছে সে। কানে বাজছে নিজেরই পদধ্বনি। আকাশ পৃথিবী জোড়া নিস্তব্ধতার পটভূমিকায় সেই একটি ধ্বনিরই ওঠাপড়া। আজ এই নির্জনতায় কোন সঙ্গীর লোভ নেই তার। এমন কি গিলসকেও তার মন চাইছে না। সম্পূর্ণ একা—একাকীই আজ নিজেকে ভালো লাগছে। কি একটা অস্ফুট অতৃপ্তি, গোপন পিপাসা সমস্ত হৃদয়কে তৃসিত করে তুলেছে। সারা পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য সাম্রাজ্যের অধিকারেও হৃদয়ের সেই তৃষ্ণা মিটবে না। এ তৃষ্ণায় বড়ো বেদনা। এ তৃষ্ণা তার একান্ত আপনার।

কী এক অব্যক্ত করুণ মধুরতা, বিধুর মমতা সমস্ত অন্তরখানিকে ভরে তুলেছে। নয়নে নয়নে তার যত পরিচয় ফুটে উঠেছে, সব আজ লোক-লোকনের অগোচর। কিন্তু তা দেখবার নেই এই নির্জন রাতের নিভৃত অবকাশে। বোধহীন হৃদয়হীন ঐ নক্ষত্রগুলীর নীচে যে বিপুল জলরাশি সমুদ্র শয়নে শুয়ে আছে, তারই মত বিপুল ব্যাপ্তিতে সমস্ত অন্তরখানি জুড়ে আছে সেই মধুর করুণা-সিন্ধু।

যতদূর দৃষ্টি চলে সমস্ত আকাশখানি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে পাইনের বন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সেই বনস্পতির ভিড়ে হঠাৎ একটা ফাঁক পড়ল। তারই পিছনে মস্ত একখানা আকাশের রূপ চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। মাথা ঘুরিয়ে তাকালে। তাকিয়ে দেখলে নীচু গৃহছাদের উপর জেগে-থাকা গীর্জাটির বিরাট অন্ধকার রূপ—যেন নীল সমুদ্রের চেয়ে আরো নীল এক আকাশ সমুদ্রের তটলগ্ন গতিহারা একখানি কৃষ্ণ ছবি। ঐ মস্ত আকাশের বিরাটত্বের কাছে মানুষ প্রাণীকে কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। তবু সেই তুচ্ছতাকে পরাভূত করে, সব সামান্যতাকে জয় করে মানুষ এক মহৎ স্বপ্নকে আকাশমুখী করে তুলে ধরেছে। যে মহান স্বর্গপ্রীতি তাদের হৃদয়কে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরিত করে, সেই সুন্দর ভালবাসাই ঐ গীর্জার রূপে দেখায় অন্তরে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস সেই আকাশের নীচে। তার পর আবার সুরু করলে পথ চলা ... শেষে পৌঁছে সেই নিরিবিলি প্রাচীর-গাত্রে উঠে বসল সে।

বসল আর তার নরজন্ম ভোলা ... চেনা মানুষটা তার অচেনা হয়ে গেল। তার জানা সংসারে যেখানে যত প্রিয় পরিচিত মানুষ, তারা আর তার আপনার রইল না। বিশ্ব-জগতের গভীর বিস্তৃত সমুদ্র-শয্যায় ঐ গীর্জার মতই দোসরহীন তার অস্তিত্ব থর-থর করতে লাগল।

মনে হোল, ঐ নির্জনতায় কার সঙ্গে অভিসারে এসেছে তার হৃদয়! কে সে, তা তার প্রাণ-সত্তাই জানে, সেখানে আর কাউকেই সে জানে না, চায় না!

অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

সমাপ্ত

ছাপাখা —রেবতীভূষণ ঘোষ অঙ্কিত

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

২

বোবার কথা মধ্য-পথে থামিয়া গিয়াছে। এখন এই ডাইরি শেষ করিবার ভার যাহার উপর পড়িল সে বোবা নয়। তথাপি মনে হয় যে, বোবা হইতে পারিলেই বুঝি হতভাগিনী বাণীর শেষ বাণী সকলকে জানাইতে পারিতাম। তাহার প্রাণের মধ্যে এই কথাগুলা লিখিবার যে প্রচণ্ড একটা চেষ্টা, যে প্রাণান্তকর তাগিদ ছিল আমার মধ্যে—তাহা কিরূপে আসিবে? মরণের প্রপাতের মুখে তাহার প্রাণের স্রোত যতই অগ্রসর হইতেছিল ততই প্রাণপণে সে আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাই তাহার লেখার মধ্যে যে ভাষার বাঁধভাঙ্গা ভাবের স্রোত অন্ততঃ আমি অনুভব করিয়াছি, অন্যে তাহা অনুভব করিবে কি না জানি না। কিন্তু আমার প্রাণেও সেই মরণোন্মুখ প্রিয়জনের শেষ জীবনে প্রচণ্ড তরঙ্গ লাগিয়াছে। তাই তার শেষ অনুরোধ রাখিতে বসিলাম।

* * * *

কিন্তু কেন আমি এ ভার গ্রহণ করিলাম? সে কথা নাই বা লিখিলাম। যাহা আমার নিতান্তই আপনার কথা সে কথা এই ডাইরিতে লিখিয়া যাইবার প্রয়োজন কি? আমার কথা ত' বাণীর কথা নয়? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি যে, দিনের পর দিন, কিংবা যেদিন অবসর মত ইহাতে যাহা কিছু লিখিব তাহা বাণীর কথাই লিখিব? যাঁহার জন্য ইহা লিখিতেছি তিনিও যেন বাণীর কথা বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করেন। বাণীর শেষ ইচ্ছানুসারে তিনিই ইহা আমার হস্তে দিয়াছেন—অতএব বাণীর কথাই ইহার কথা।

* * * *

বাণীকে কত দিন পরে আজ স্বপ্নে দেখিলাম। কি সুন্দর তার এখনকার মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তিই কি চিরদিন তিনি দেখিয়াছিলেন? তাই কি সারা জীবন নির্ব্বাক্ এই মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া অন্তরে-বাহিরে ধ্যানমুগ্ধের মত থাকিতেন? এ মূর্ত্তি যে সব দিয়া—ধর্ম্ম দিয়া, কর্ম্ম দিয়া, জ্ঞান দিয়া মুক্তি দিয়া ভালবাসিবার। তাই বুঝি সেই প্রথম দিন হইতেই সেই রোগকাতর অনতিলুপ্ত শোভা মুখখানির দিকে আমার সমস্ত প্রাণ ঢলিয়া পড়িয়াছিল? আমিও বুঝি না দেখিয়াও জীবিত বাণীর মুখে এই সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছিলাম?

বাণীও স্বপ্নে এই ডাইরিখানাই যেন আমার হস্তে তুলিয়া দিল। কোন কথাই সে বলে নাই। তাহার মুখে ছিল সেই চির-পরিচিত নির্ব্বাক্ ভাব। কিন্তু তার স্বপ্নের চক্ষু দুইটি কি যে আমায় নিবেদন করিয়াছিল, তাহা কেবল আমি জানি।

বলিব বাণি, বলিব—তোমার কথা শেষ না করিয়া থামিব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

* * * *

বাণীর এ ভার সে স্বয়ং দিবার পূর্ব্বেই আমি লইয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে যখন এই ডাইরি লিখিতে আরম্ভ করে তখন হইতে প্রতিদিনই ইহা পড়িয়াছি। সে তাহা জানিতে পারে নাই। এবং অন্ততঃ এই সামান্য ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া যে তাহার মধ্যে একটা মধুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহা দেখিয়া ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহার মনে পরম অনুতাপকে জাগাইতে পারিয়া মনে মনে কত বার বলিয়াছি, "ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর, ওগো বেদনার মূর্ত্তি, ওগো যীশু, তুমি এই অকৃতজ্ঞ সংসারের জন্য যে বেদনা সহ্য করিয়াছ, সেই পরম স্নেহের, পরম ভালবাসার বেদনা আমার মধ্যে জাগাইয়া দিয়া আমাকেও বাঁচাইয়াছ, আর এই জীবন্মৃত নারীকেও বাঁচাইলে। আমার মধ্য দিয়া এই যে স্নেহ ইহার দিকে ধাবিত হইতেছে ইহা ত তোমারই প্রভু!"

* * * *

বাণী ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে যাইতেছিল—ভয়ঙ্কর নরকাগ্নি তাহাকে চিরদিন ঘিরিয়া দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু মূঢ় মূক নারী তাহা ত বুঝিতে পারে নাই! তাই সে এই রসাতলের অগ্নিকে তাহার আত্মার শক্তির উত্তাপ মনে করিয়া বসিয়াছিল। তাই সে পলে পলে দগ্ধ হইয়া শেষে কোথায় চলিয়া গেল! কিন্তু শেষ কয় দিন হে দয়াল, তুমি সেই গ্যালিলী সাগরের ঝড়ের মত তার এই আগুনের ঝড়কে থামাইয়া দেও নাই কি? দিয়াছিলে বই কি, তাই তোমার পদে কোটি কোটি প্রণাম!

* * * *

আজ কেন জানি না, কেবলই মনে হইতেছে, কেন এ ভার আমার হস্তে আসিল? দয়াময় যীশু, আমি তোমার ক্ষুদ্রশক্তি দাসানুদাসী। আমার কতটুকু ক্ষমতা? তুমি ত সবই জান অন্তর্য্যামী! তবে কেন বাণীর স্বামীর হাত দিয়া এই আগুনভরা মহা সুরাপাত্র আমার হাতে দিলে? এ ভার আমায় কেন? তোমার পবিত্র পানপাত্রের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকরণের ভার সহ্য করার ক্ষমতাও যে আমার নাই। আমি যে ইহাকে সহিতে পারিতেছি না নাথ!

* * * *

সহিতে পারি না—তবু এ ভার লইতেই হইবে, এমনি তোমার কঠিন আদেশ! যেদিন দেখিলাম যে, একটি ক্ষুদ্র চাঁপা ফুলের উপর—মৃত বাণীর বুকের উপর পড়িয়া ঐ অত-বড় ধীরতার পর্ব্বতও বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়; সেই মহামুহূর্ত্তে আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আমি ভুলিয়া গেলাম যে, তিনি বিধর্ম্মী, তিনি পৌত্তলিক, তিনি অন্য জগতের মানুষ। তখন এইটুকুই কেবল মনে হইয়াছিল যে তিনিও মানুষ, আমিও নারী।

সে কি আমি ভুল করিয়াছিলাম প্রভু! যদি ভুল করিয়া থাকি সে ভুলও ত' তোমারই;—আমি তোমারই ভুলে ভুলিয়া থাকিব। তোমারই ভুল যেন আমার পরম সত্য হয়। দয়াময়, সেই সত্যটুকু হতে আমায় চ্যুত করো না।

* * * *

আমি তাকে বাণীর কথাই বলিতেছি। এ আমার কথা নয়—আমার কথা নয়। এই যে আমার সমস্ত প্রাণ-মন ভরিয়া সেই নির্ব্বাক্ নিশ্চল মানুষটির মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে, এ প্রাণ ত' আর আমার নয়। বাণী আমার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে—তিনি যেন না বুঝেন যে, এ সমস্ত আমার কথা। এই যে দিনে দিনে আমি চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে তাঁহাকেই ঘিরিতেছি এও সেই যীশু-ক্রোড়গতা বাণী—আর কেহ নয়—নয়—নয়—

আমি কি নিজের সহিত বঞ্চনা করিতেছি? তাহা যদি হয় তাহা হইলে এ লেখা বন্ধ করাই ভাল। কিন্তু তিনি ত আর এক দিনও আমায় ডাকিলেন না, তিনি যে আর ইহা দেখিতে চাহিবেন, তাহারও সম্ভাবনা কৈ? বাণীর মাথার শিয়র হইতে এই খাতাখানি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া আর ত কোন দিন ইহাকে তাঁহার মনে পড়ে নাই। তবে আর ভয় কি? যদি বাণীর কথা বলিতে গিয়া ভুলিয়া নিজের কথাও বলিয়া ফেলি, তাহাতে এতই কি অন্যায় হইবে? কৈ আজ কত দিন হইল তিনি ত আমায় ডাকিয়া পাঠান নাই? তাঁর বোবা-কালার ইস্কুলে কত বার গিয়াছি, তাঁহার দাস-দাসীর নিকট তাঁহার খবর লইয়া আসিয়াছি—তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া দিনের মধ্যে কত বার যাতায়াত করিতেছি, এক বারও কি আমি তাঁহার চোখে পড়ি নাই—এক বারও আমায় তাঁহার মনে পড়িল না!—থাম থাম—এ কি লিখিতেছি?

* * * *

সর্ব্বনাশ! এ কি দেখিয়া আসিলাম! তিনি কি হইয়া গিয়াছেন—এই মাস দু'য়েকের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন! আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। নাই বা তিনি আমায় ডাকিলেন, তবু ত' আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। আর চুপ করিয়া থাকিলে সে বাঁচিবে না। বাণীর আত্মা যে আমার শয়নে-স্বপনে তিরস্কার করিতেছে। গত রাত্রেও সে যে আমার হাত ধরিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়া গেল!

ওগো আমার মিষ্টিকথা, ওগো আমার দ্বিতীয় আত্মা, তুমি আমার সবটুকু অধিকার করিয়া এ কি অত্যাচার আরম্ভ করিলে? শয়নে-স্বপনে এ কোন দিকে আমায় টানিতেছ, কোন দিকে লইয়া চলিয়াছ? আমি গরীব ক্রিশ্চানের মেয়ে, আমায় এ কোন প্রলোভনের দিকে লইয়া চলিয়াছ? থাম—ওগো থাম।

* * * *

প্রলোভন! ইহাই কি সেই পেলেষ্টাইনের বিজন-গহনের মহা-পরীক্ষার চিরকালের নূতন সংস্করণ? তবে আর নয়—এইখানেই থামিতে হইবে। প্রলোভন—তার পর গভীর অতলে পতন—তার পর মহামৃত্যু।

* * * *

না—না—না, ইহা প্রলোভন নয়। যদি প্রলোভনই হইবে তবে এতখানি আত্ম-বিস্মৃতি দেখা দিল কেন? কেন আমি ক্রমাগতই আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছি? আমি যে তাহাকে দেখিলে, তাহার সেই স্তম্ভিতাশ্রু অন্ধকার, নির্ব্বাক মুখখানি দেখিলে সব ভুলিয়া যাই। কেন তখন আমার দেশ-কাল-পাত্র-সমাজ কিছুই মনে থাকে না?

কে তুমি আমার অন্তরে বসিয়া আমায় সব ভুলাইতেছ? ওগো থাম। এমনি করিয়া আমায় অধিকার করিও না। আমায় আপনাকে বুঝিতে দাও—দেখিবার অবসর দাও। আমায় এমন পাগলের মত ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইও না। এতখানি প্রচণ্ড চাঞ্চল্য আমার সহিতেছে না যে!

* * * *

প্রলোভন! কখনই নয়। কি তাহার আছে? সে দেখিতে সুন্দর নয়—সে বিধর্ম্মী। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সবই আমার অপরিচিত। তবে কেন সে আমার এতখানি আপনার হইল! তাহাকে প্রথম যেদিন—সে আজ কত দিন হইল। কিন্তু সে দিনের সেই প্রথম মানুষ-মাত্র-দর্শন আজিও ভুলি নাই ত? সেই মূক-বধির বিদ্যালয়ে বোবার মধ্যে বোবা হইয়া যে দয়ায় কোমল, স্নেহে অতল কালো-সাগরের মত যে মুখখানা দেখিয়াছিলাম আজিও ত' সে মূর্ত্তি আমার নয়ন হইতে মুছিয়া যায় নাই? আমি ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে সেই কেবল মানুষটিকেই দেখিয়া আসিতেছি—তার পর সেই স্বেচ্ছামূক মৃত নারীর শিয়রাধিষ্ঠিত ধ্যানমগ্ন প্রেমিকের মুখেও আমার সেই প্রথম-দৃষ্ট মানুষটিকেই দেখিয়াছি: আর আজ আশ্রয়হারা পরম একক গৃহকোণগত মানুষটির মুখেও সেই তাহাকেই দেখিতেছি। তবে ভুল আমার কোন্খানে? নাই নাই ভুল কোথাও নাই, ভুল কখনো হয় নাই। ওরে ভীরু, ওরে সন্দেহী, আর দ্বিধা করিস্ না। তোর প্রাণের ভিতরকার মানুষের দৃষ্টি ভুল করে নাই, ভুল দেখে নাই। কারণ এ যে তোর দৃষ্টি নয়। এ যে তারই দৃষ্টি যিনি সেই মূর্খ ফ্যারিসিদের উপর পরম করুণায় চাহিয়া চরম যন্ত্রণার সময়ও বলিয়াছিলেন, "পিতঃ, ইহাদের ক্ষমা কর, আমার এই বেদনা যেন ইহাদের শেষ প্রায়শ্চিত্ত হয়।" এ যে সেই দয়ালের দৃষ্টি! ওরে ভয় নাই, এই যে দর্শনের অনুভূতি তোর সারা প্রাণকে অধিকার করিয়াছে ইহা সেই জীবের হৃদয়বাসী দয়াল প্রভুর নয়ন সম্পাতের অনুভূতি।

* * * *

না, আর স্থির থাকা নয়। আমার সেই দয়ার কালো সাগর, স্নেহের অতল সাগর যে জমিয়া কালো পাথরের মত হইয়া যাইতেছে! ইহাকে যে গলাইতেই হইবে। ধর্ম্মের বাধা কর্ম্মের বাধা সমাজের বাধা মানিব না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাজের নিয়ম ত' মানুষের জন্য হইয়াছে, মানুষ ত' তাহাদের জন্য নয়। মানুষ যে সব নিয়মের উপরে। সব ছাড়াইয়া সব গণ্ডির উর্দ্ধেও যে মানুষের অনেকখানি আছে। আমার ক্ষমতা থাকিতে যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার অন্তরের দেবতা যে আবার ক্রুশ-বিদ্ধ হইবেন। তাহাকে আবার আমার মধ্যে মরণ যন্ত্রণা সহিতে দিব? না প্রভু না, তা পারিব না। জাগো, প্রভু জাগো তুমি আমার মাঝে। তোমার পুনরুত্থান এই ক্ষুদ্র নারীহৃদয়ে আবার আমি

দেখি। সব বন্ধন সব বাধা চূর্ণ করিয়া ওগো মহাব্যথিত, তোমার বেদনা-কাতর পুনকম্পিত মুখখানি আমার অন্তরে দেখাও। জাগো, নাথ, জাগো।

* * * *

ওরে নারী-অভিমান থাম—থাম। সে তোরে লইল না, কিন্তু তারে তোর চাই। নহিলে জাগ্রত বীতর ক্রন্দন থামিবে না, কিছুতেই থামিবে না। তোর কিছুরই পাইবার আশা নাই—নাই বা থাকিল? কি পাইয়াছিলেন তিনি—যিনি আপনার হৃদয়ের রক্তে তৃষিত জগৎকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন? তোরও কিছুই পাইবার অধিকার নাই। না, তোকে কিছুতেই কিছু পাইতে দিব না—

* * * *

বহু দিন, উঃ কত দিন পরে—আজ আমি একি পাইলাম? কি এ?—ওরে ভিখারী, ওরে কাঙ্গাল, তোর ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়াছে ত? পাথর গলিয়াছে, সে হাসিয়াছে—আজিকার তার সেই হাসিটুকুই তোর পরম লাভ।

তুমি ধন্য প্রভু! এই যেটুকু দিয়া এই কাঙ্গালের ভিক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিলে তাহাতেই তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে। সব অভিমান সব অহংকার চূর্ণ করিয়া সেইটুকুকে পরম লাভ বলিয়া স্বীকার করিবে।

* * * *

ঐ যাঃ! এ সব কি লিখিয়াছি! মাথামুণ্ডু এ সব কি? এ যে সবই আমার কথা! বোবার ডাইরিতে এ সব কার কলরব? আমি কি সেই হতভাগিনী বাণীর পূর্ণবাণী হইতে পারিয়াছি? কৈ না!

* * * *

না কেন? হাঁ—এ সব তারই কথা। সেই বাণীই আমার অন্তর্গত হইয়া তাহার স্বামীকে ধীরে ধীরে সুস্থ করিতেছে। নাহ'লে আমার কি আছে? না আছে রূপ, না আছে গুণ। আর সর্বাপেক্ষা বড় কথা আমি যে ভিন্ন জগতের ভিন্ন আচারের ভিন্ন ধর্ম্মের মানুষ। কিন্তু তবু সে আমাকে পাইয়া ধীরে ধীরে আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে কেন? সে আমার মধ্যে কি দেখিতেছে, কাহাকে দেখিতেছে? সেও ত তাহার সমাজকে মানে নাই—সেও ত তাহার গৃহ, তাহার সময় তাহার সমস্তই এই রূপগুণহীনা ক্রিশ্চান নারীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইল—অন্তরঙ্গ করিয়া লইল? সেও তাহার আচার-ধর্ম্মের কঠিন বন্ধনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশাল মানব ধর্ম্মের উদার আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইল! সেও ত' আমায় কেবল মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তাহার সকল কর্ম্মের সকল চিন্তার সমান অংশ দিয়া সেও ত' আমায় অতিমানুষের দেশে লইয়া গিয়াছে।

* * * *

বিবাহ? সেই চিরপুরাতন বাঁধাবাঁধি। সে কথা কেন আমার মনে উঠিতেছে? সেও ত' তাহা চাহে না। সে মাত্র আমাকে চায়—আমার সমাজ-ধর্ম্ম-আচার নিয়ম-বদ্ধ এই দেহটা ত সে চায় না। দেহ? দেহ ত' তাহার কাছে অতি তুচ্ছ! এই রক্তমাংসের জড়বস্তু? ছিঃ ছিঃ, ইহা কি ঐ কেবল মানুষটিকে কি নিবেদন করিবার যোগ্য? না না, সে তাহা কখনও চাহে নাই, আমিও তাহা কখনই তাহাকে নিবেদন করি নাই। আমি যেখানে তাহার সহিত মিলিয়াছি সেখানে দেহ নাই এবং দেহাধিকৃত ধর্ম্ম-অর্থ কিছুই নাই। আমি যে এখন কেবল সেই স্বর্গগতার আত্মা—আমি যে সেই বাণীরই পরপারের বাণী। আমার এখন দেহ নাই, মন নাই, আশা নাই, ভিক্ষা নাই। আমি কি কাঙ্গাল? আমি যে সেই রাজরাজেশ্বরের কন্যা! আমায় যে চাহিবে সে আমার এই অশুচি কুৎসিত দেহটাকে চাহিবে কেন?

* * * *

বহু দিন পরে—কত মাস কত বর্ষ পরে ঠিক মনে নাই, আজ বাণীর এই স্বহস্ত রচিত কথার-মালাখানি সাহস করিয়া তাঁহার হস্তে দিতে চলিয়াছি। আর ভয় নাই। তুষার-গিরি গলিয়া করুণার সাগরে পরিণত হইয়াছে। আমার জীবনের সাধনা সফল হইয়াছে। তিনি সুস্থ হইয়াছেন। আজ প্রভাতে তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখিলাম তিনি স্নান করিয়া যুক্তকরে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন—দর-বিগলিত ধারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতেছে। বুঝিলাম, আবার তাঁহার মধ্যে চিরন্তন মানুষ জাগিয়াছেন—আমার প্রভু তাঁহার হৃদয়ে আবার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বাণীর রচিত এবং আমার খচিত এই কথার হার তাঁহার গলে পরাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। তিনি, কি জানি কেন, অসম্পূর্ণবিস্থায় ইহা আমার হাতে সম্পূর্ণ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। জানি না, বাণীর মালা শেষ হইয়াছে কি না—কিন্তু আমার যাহা কিছু ছিল—সবই ইহাতে গাঁথিয়াছি। ইহাতেও যদি ইহা পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা পূর্ণ করা আমার সাধ্যাতীত।

এখন যাহার বস্তু, যাহার জন্য বাণী তাহার হৃদয়ের হৃদয় শোণিতের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত দিয়া এই কথার ফুলগুলি রাঙ্গাইয়া মালা গাঁথিয়াছিল, সেই মালাগাছি আমার হৃদয়ের পুষ্পে শেষ করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। এখন আমার একটি মাত্র প্রশ্ন,—ওগো আমার কেবল-মানুষ, তুমি বল, বাণীর এই মালা কি শেষ হইয়াছে? আমার এই সাধনা কি সিদ্ধ হইয়াছে?—তোমার বাণীর অর্দ্ধগ্রথিত মালা কি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি?

* * * *

৩

আমার এই মালাখানি দান করিয়া, ওগো সুভাষিণি—ওগো দয়াময়ি!—ওগো বাণীর পূর্ণ বাণী!—ওগো আমার চিরপ্রিয়ার প্রিয়ম্বদা! ওগো বাণীর মিষ্টিকথা, তুমি এই দীন দরিদ্রকে রাজা করিলে—আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিলে। তোমাকেও প্রণাম, তোমার মধ্যেও যিনি পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন—প্রেমমূর্ত্তি সেই নর-নারায়ণকে প্রণাম। সেই বিশ্বপ্রিয়া শ্রীবাক্‌রূপিণী নারায়ণীকে প্রণাম। আমি এই মালার শেষ ফুলটি নত শিরে লক্ষ প্রণামের সহিত ইহাতে যোগ করিয়া দিলাম।—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

সমাপ্ত

সৌন্দর্যময়ী
মৎস্যকন্যা

দ্বিধা হৃদয়

সুনীল ঘোষ

আমার সামনে খাটের উপর বুক পর্যন্ত শাদা চাদর-ঢাকা যে মহিলাটি নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁকে দেখে আপনি নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হবেন। চোখ দুটি নিমীলিত হলেও ভ্রূ, ঠোঁট, নাক, কপাল এবং চুলের বিন্যাসেই ওঁর সৌন্দর্য স্বপ্রকাশ। প্রথম দর্শনেই হৃদয়ে ছাপ রাখার মত মুখশ্রী। চাদর সরিয়ে সুডৌল শুভ্র দুটি বাহুর নীচে দামী ব্রোকেড-জড়ানো ওঁর নরম সুষম দেহটাও দেখতে পারেন। মূর্তিটা দীর্ঘকাল সজীব হয়ে থাকবে সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়। যদি ইচ্ছে হয় স্পর্শ করুন। না, কোন সাড়া পাবেন না। ওঁর শুকনো অধর-ওষ্ঠ আর কখনও রসে টলটলিয়ে উঠবে না। ওঁর পাণ্ডুর গাল দুটো মিনিটে মিনিটে আরও ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। ওঁর চোখের যবনিকা আর কোন দিন উত্তোলিত হবে না। কারণ, কয়েক ঘণ্টা আগে উনি সকলের অলক্ষ্যে এক রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে রাত্রির অন্ধকারে এক-মুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে কেন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সে কথা ভাবতে বসলে সত্যি আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, ভালবাসা, হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ দেওয়া-নেওয়া সব একাকার হয়ে জমাট মেঘের মত আমার শুভ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। মানুষের উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে, কারণ মানুষ হল 'সবার উপরে সত্য।' কিন্তু এত আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে খটকা লাগে। মানুষ বোধ হয় সবাই মানুষ নয়। তাহলে গোড়া থেকেই বলি।

১৯৪২ সালে বোমার ভিড়িকে গোটা কলকাতাটাই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। নিতান্তই বাইরে যাবার জায়গা নেই বলে কলকাতায় আটক থেকে আমরা অদৃষ্টের মুণ্ডপাত করছি এমনি দুর্দিনে আমাদের ফাঁকা-হওয়া দোতলাটা হঠাৎ ভাড়া হয়ে গেল। সে যে কি আনন্দ তা মুখে বলার নয়। শহরে লোক নেই, জন নেই, হাসি আড্ডা সমাজ সামাজিকতা নেই—দিন যেন কাটছিল না। এ অবস্থায় বাড়ীতে নতুন মানুষের আবির্ভাব মস্ত সৌভাগ্য বই কি!

আমাদের নতুন ভাড়াটেরা সংখ্যায় মাত্র তিন জন—দুটি পুরুষ এবং একটি নারী। স্বামী, স্ত্রী আর তাঁদের অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু। জানালায় সুন্দর সুন্দর পর্দা আর বারান্দায় দামী সাড়ী দেখে বুঝলাম ওঁরা সৌখীন এবং স্বচ্ছল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে তেতলার ঘরে বসে গদ্য কবিতার শেষ দুটি লাইনের জন্য শব্দানুসন্ধান করতে করতে যখন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছি, ঠিক সেই সময় দোতলার ঘর থেকে নারীকণ্ঠের গান ভেসে এসে আমায় চমকে দিল। কান পেতে শুনলাম, এসরাজের ঝঙ্কারে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে এক নারী তার একান্ত প্রিয়জনের গলায় 'হার মানা হার' পরাতে চাইছেন। ভীরু নম্র অথচ স্পষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর। ব্ল্যাক আউটের ঘোমটা-ঢাকা কালো নিথর রাত্রি। সুরের একঘেয়ে অনুবৃত্তি বাতাসে কেমন একটা আবেগময় কম্পন সৃষ্টি করেছে। নেশার মত অভিভূত হয়ে পড়লাম।

ছোট বোন মিলির কাছে শুনলাম, নতুন ভাড়াটেদের গৃহিণী না কি সুন্দরী, সামাজিক আর সঙ্গীত-রসিক। নামটিও বেশ মিষ্টি—পারুল চৌধুরী। পশ্চিমের মীরাট শহরের মেয়ে। বিয়ের পর জীবনে এই প্রথম কলকাতায় এসেছেন। স্বামী পরেশ চৌধুরী এবং তাঁরই বন্ধু অজিত সরকার দু'জনেই মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর। জিজ্ঞাসা করলাম: এই বোমা-বন্দুকের হিড়িকে কলকাতায় আসতে ভয় করল না?

: কি আর করবেন, মা বাবা বেঁচে নেই, স্বামী ছাড়া কার কাছে থাকবেন!

পরদিন বিকেলে দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল। মিলির কথাই ঠিক। পারুল চৌধুরী সত্যি ভারী সুশ্রী। বাড়ীর গৃহিণী শুনে ভেবেছিলাম মোটাসোটা গোলগাল কেউ হবেন। কিন্তু সে আমার ভুল ধারণা। বয়স উনিশ কুড়ির বেশী নয়, আর মুখে এমন একটা সরল কোমলতার ছাপ রয়েছে যে প্রথম চোখে কিশোরী বলে ভুল হতে পারে। পুরুষদের মধ্যে একজনের সাহেবী পোষাক অপর জনের ধুতি-চাদর। বুঝলাম না মিঃ চৌধুরী কে। চেহারায় ওঁরা দু'জনেই মিসেস চৌধুরীর স্বামী হবার যোগ্যতা রাখেন।

আমি তখন সবে কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছি। কবিতা টবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। সুন্দরী নারী সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এত কাল আমার ধারণা ছিল, বিবাহিতা নারী আমার রোমাণ্টিক চেতনার সীমা অতিক্রম করে গেছে। পারুল চৌধুরীকে দেখে বুঝলাম, হৃদয়ে বুদবুদ সৃষ্টির ক্ষমতা কুমারী মেয়ের চেয়ে বিবাহিতা মেয়ের কম নয়!

দিন তিনেক বাদে একটা সিনেমায় যাবার ঘটনা নিয়ে আলাপ পরিচয় হল। বিকেলে মিলিকে সঙ্গে নিয়ে ওঁদের সিনেমায় যাবার কথা ছিল কিন্তু পরেশ বাবু সংবাদ পাঠিয়েছেন, বিকেলে আসতে পারবেন না। টিকিটগুলো নষ্ট হবে। তাই মিসেস চৌধুরীর অনুরোধে আমিই ওদের সঙ্গী হলাম।

পারুল চৌধুরীর চেহারাটা যেমন সুন্দর, ব্যবহারটাও তেমনি মার্জিত

এবং মধুর। স্নেহশীল কোমল মন ওঁর। বয়সে প্রায় সমান হলেও আমায় ছোট ভাই বানিয়ে ফেললেন। বিবাহিতা নারীর এ এক ভারী সুবিধা। সীঁথিতে সিন্দুর চড়লেই অপরের উপর অভিভাবকত্ব করার অধিকার পেয়ে যান। যাই হোক, পারুলদি'কে কিন্তু আমার সত্যিই ভাল লাগল। এক দিনে আমরা দুজনের মনের এত কাছাকাছি এসে গেছি যে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

আমাদের সম্পর্কে রসও ছিল রঙও ছিল। কারণ, উনি আমার 'দিদি' হয়েছেন বউদি' থেকে। আর সমবয়সী বউদি'রা যে ঠাকুরপোদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন সে কথা কারও অজানা নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। সুন্দরী বুদ্ধিমতী স্নেহশীল নারী কত তাড়াতাড়ি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে বুঝলাম। আমার তরুণ রোমান্টিক মনে তিনি যে গভীর রেখাপাত করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পারুলদি'র সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হলেও বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে তখনও কিন্তু আমার আলাপ হয়নি এবং দু'জনের মধ্যে কে যে মিঃ চৌধুরী, তাও জানতাম না, আর তার প্রয়োজন কখনও বোধ করিনি।

সে দিন পারুলদি' উল কিনতে দিয়েছিলেন। ধর্মতলা থেকে উল কিনে যখন বাসায় ফিরলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। দোতলায় পারুলদি'র ঘরের জানলার কাছে প্রায় অন্যমনস্ক ভাবে ভিতরে তাকাতেই লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। ঘরে আলো জ্বলছে। সোফার গদিতে পারুলদি' বসে আছেন পা ছড়িয়ে আর তারই হাতলে বসে সেই স্যুটপরা ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরটাই পারুলদি'র মুখখানাকে আড়াল করে ছিল, তাই তিনি আমায় দেখতে পাননি। কোন মতে পা টিপে টিপে তেতলায় উঠে হাফ ছেড়ে বাঁচি। যাক, এত দিনে মিষ্টার চৌধুরীকে চিনলাম। পারুলদি'কে এমন আদর-সোহাগ করার অধিকার একটিমাত্র লোকেরই আছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই লোকটাকে একটু যেন ঈর্ষাও করেছিলাম মনে মনে কিন্তু তখন আমার বয়স কম। ক্ষুদ্র ঈর্ষা-বোধের চেয়ে রোমান্সের দিকেই মনের ঝোঁক ছিল বেশী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁদের দাম্পত্য প্রণয়ের এই প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস আমার কাছে অনাবিল সুন্দর এবং স্বর্গীয় হয়ে উঠল। ভাবলাম, রাত্রে একটা ভালো কবিতা রচনা করে পারুলদি'র এই প্রণয় মুহূর্তটিকে চিরন্তন করে রাখব। মানুষের যৌবন অনন্ত নয়, প্রণয়ের উচ্ছ্বাসও ক্ষণস্থায়ী। যে দিন এই আসঙ্গলিপ্সা স্তিমিত হয়ে আসবে, সেদিন এই কবিতার লাইনগুলো যেন আজকের স্মৃতিটাকে জীবন্ত করে পারস্পরিক আকর্ষণকে তীব্রতর করতে পারে।

সন্ধ্যা ঘুরে গেলে নীচে নামলাম। পারুলদি'র ঘরে চায়ের আসর বসেছে। তিনি আমার হাত থেকে উলের মোড়কটা নিয়ে বললেন, বাঃ! চমৎকার হয়েছে।

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে পারুলদি'র সঙ্গে উল সম্বন্ধেই দু'-একটা কথার বিনিময় হল। দেখলাম, ভদ্রলোক একটু গম্ভীর, কথা কম বলেন। হঠাৎ পারুলদি' উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একখানা সরকারী খামে মোড়া চিঠি এনে টেবলে রেখে ভদ্রলোককে বললেন: ওগো, তোমার একটা চিঠি এসেছে।

তাকিয়ে দেখলাম, খামের উপর লেখা রয়েছে "মিঃ এ সরকার। এম-এ এল-এল-বি, মিলিটারী কণ্ট্রাকটরস।"

আমি বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম। তবে কি মিলি আমায় ভুল সংবাদ দিয়েছে? পারুলদি' কি আসলে মিসেস সরকার? কিন্তু তা তো নয়। লেটারবক্সে ওঁর নাম মিসেস চৌধুরীই লেখা আছে।

রাত্রে মিলিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, পারুলদি' মিসেস চৌধুরীই এবং স্যুটপরা ভদ্রলোক মিঃ সরকার—পরেশ বাবুর বন্ধু এবং পার্টনার। মিলিকে কিছু বললাম না। রাত্রে কবিতা লেখা মাথায় উঠল। শেষে ঘুমই আসতে চায় না। বিকেলে যা দেখেছি তা যদি দৃষ্টি-বিভ্রম না হয় তাহলে এর মধ্যে কোথায় যেন একটা কিন্তু আছে, যা আমার সংস্কারকে নাড়া দিয়েছে।

রুশো থেকে মার্কস পর্যন্ত নানা মনীষীর কিছু কিছু তত্ত্ব পাঠ করে আমি তখন উগ্র মানবতাবাদী। কোন সংস্কারের প্রতিই আমার কোন মোহ থাকবার কথা নয়। তবুও বার বার যখন সেই সংস্কারের খোঁচা খেতে লাগলাম তখন হঠাৎ সচেতন হয়ে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, যা দেখেছি তা মোটেই মারাত্মক ঘটনা নয়। মানুষকে তার সমস্ত দুর্বলতা দিয়েই বিচার করতে হবে। কোন পুরুষ তার পরিচিত বান্ধবীকে যদি দুর্বল মুহূর্তে আপন করতে যায় তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। সতীত্ব পবিত্রতা—এ সব হল অন্তরের জিনিস। সেখানে সাচ্চা থাকাই হচ্ছে আসল কথা। সেখানে নিশ্চয়ই পারুলদি' খাঁটি আছেন। এ চিন্তায় মন শান্ত হল। কারণ পারুলদি'কে ছোট ভাবতে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। পারুলদি'কে আমি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম এই ক'দিনে। আমাদের দুই ভাই-বোনকে তিনি একান্ত আপন জন করে নিয়েছেন তাঁর সরস মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে। কি করে তাকে খারাপ ভাবি?

পরদিন বিকেলের দিকে পারুলদি'র ডাক শুনে নীচে এসে দেখি, পরেশ বাবু খালি গায়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। মাথার কাছে পাখা চলছে পুরোদমে আর পারুলদি' তাঁর শিয়রে বসে চুলে বিলি কাটছেন বিষণ্ণ মুখে। আমায় দেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন: তোমার দাদার বড্ড অসুখ। ডাক্তার ডাকতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পরেশ বাবু বিছানায় উঠে বসলেন। হাসতে হাসতে বললেন: দূর পাগল, অসুখ না হাতী—

: হ্যা তাই বই কি! অসুখ না হলে এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার লোক তুমি? এই তো বললে মাথা ধরেছে।

টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ল পারুলদি'র গাল বেয়ে। পরেশদা' দুই হাতে তাকে বেষ্টন করে কাছে টানতেই পারুলদি' তাঁর বুকে মুখ লুকোলেন। তাঁর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে পরেশদা' আমায় বললেন, তোমার দিদিটি একেবারে খুকুমণি, আবার ছিঁচ কাঁদুনেও।

কথাটা মিথ্যা নয়। পরিণত বয়সের কোন মেয়ে অপর লোকের সামনে ও ভাবে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে তার আদর কুড়োতে পারত কি-না সন্দেহ আছে। এ শুধু পারুলদি'র দ্বারাই সম্ভব, কারণ ওঁর মনটা খুব সরল।

বললাম: ডাক্তার ডাকব?

: আরে দূর। তার চেয়ে চল আজ সিনেমা দেখে আসি। মিলিকেও ডাকো।

প্রস্তাবটা কানে যেতেই পারুলদি' মুখ তুলে বললেন: থাক, আজ আর সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে পল্টুর (আমার নাম) সঙ্গে বসে গল্প-গুজব কর। আমি চা বানিয়ে আনি।

কিন্তু পরেশদা'র পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত সিনেমায়ই যেতে হল।

গেল না শুধু মিলি। না গিয়ে ভালই করেছিল। সারাক্ষণ পারুলদি' পরেশদা'র শরীর সম্বন্ধে এমন ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, ছবিটা আমরা কেউই উপভোগ করতে পারিনি। তা সত্ত্বেও আমি খুশী হয়েছিলাম। পারুলদি' যে তাঁর স্বামীকে কতখানি ভালবাসেন সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করে দেখলাম; মনের উপর পড়া গত কালের কালো দাগটা একদম ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু আমি সন্দেহমুক্ত হলেও চারি দিকে যে একটা সন্দেহের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে সেটা টের পেলাম কয়েক দিনের মধ্যেই। আমার মত আরও অনেকেই না কি পারুলদি'কে অজিত বাবুর সঙ্গে অসতর্ক মুহূর্তে দেখে ফেলেছে। তাতে মোটেই বিস্মিত হইনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় পারস্পারিক সম্পর্ক আছে। কারণ পারুলদি'র মনটা এমন কোমল এবং স্পর্শকাতর যে, কেউ তার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালে তিনি তাকে শূন্য হাতে ফেরাতে পারেন না। আর অজিত বাবু যে ওঁকে কতখানি কামনা করেন, সে তো নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু মনে মনে এ বিশ্বাসও আমার দৃঢ় ছিল যে, পারুলদি'র বহির্জগতে অজিতদা' যতটুকু অধিকারই পেয়ে থাকুন, তাঁর অন্তর্জগতে প্রবেশের অধিকার কোন কালেই পাবে না। সেখানে পরেশদা'র আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। পরেশদা' এ কথা ভাল ভাবে জানেন বলেই অনায়াসে অজিত বাবুকে নিজের গৃহে স্থান দিতে পেরেছেন। কাজেই ওসব কানাঘুষো আমার বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। আমি পারুলদি'কে আগের মতই শ্রদ্ধা করতে লাগলাম আর অজিত বাবুর প্রতি তাঁর দুর্বলতাকে মানসিক সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলাম।

কয়েক দিন বাদে শুনলাম, পরেশদা' বড় একটা কণ্ট্রাক্ট আদায়ের চেষ্টায় দিল্লী যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পরই গাড়ী। ষ্টেশনে তুলতে যেতে হবে।

যাবার সময় প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে পারুলদি' এমন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন যে, আমি তাজ্জব বনে গেলাম। মাত্র পনেরো দিনের জন্য স্বামীকে দূরদেশে পাঠাতে লেখাপড়া-জানা মেয়ে এত কাতর হয় তা জানতাম না। অজিত বাবু তাকে সামলাতেই পারেন না।

ফেরবার সময় এক-ট্যাক্সিতে এলাম। অজিত বাবু আর পারুলদি' পেছনের আসনে আর আমি ড্রাইভারের পাশে। সারা ক্ষণ চুপ-চাপ। ভাবছিলাম পারুলদি' কি ছেলেমানুষ! প্ল্যাটফরমে 'সিন' তৈরী করে ফেলেছিলেন। এখনও বোধ হয় কাঁদছেন। উৎসুক ভাবে পেছনে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। তিনি অজিত বাবুর বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে তাঁরই বুকে মুখ রেখে সম্ভবত বিরহের প্রথম ধাক্কা সামলে নিচ্ছেন।

কেমন যেন লাগল মনটায়। একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? পরক্ষণেই নিজেকে বোঝালাম এ আমারই চিত্তের অনুদারতা। কোথাও কিছু অপ্রচলিত ঘটনা দেখলেই আঁতকে উঠি। পরেশদা' তো দিব্যি নির্বিকার ভাবে নিজের বউকে বন্ধুর জিম্মায় রেখে বিদেশে চলে গেলেন। তিনি কি তাঁর স্ত্রী এবং বন্ধুকে চেনেন না? নিশ্চয়ই চেনেন এবং ওদের সম্পর্কের উপর এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেন না। পরেশদা' কশো-মার্কসের অনুগামী না হয়েও দেখছি আমার চেয়ে অনেক উঁচু দরের লোক। শেষ পর্য্যন্ত আমি পরেশদা'কে ঈর্ষা করতে সুরু করলাম।

আমাদের বাসার লোকেরা এবার দস্তুর মত চটেছেন বোঝা গেল। বন্ধুর কাছে নিজের বউকে রেখে যাবার অবিমৃষ্যকারিতা তারা বরদাস্ত করতে পারছেন না; বিশেষ করে যে স্ত্রীকে প্রায় বাড়ীশুদ্ধ সকলেই বন্ধুর কণ্ঠলগ্না হতে দেখেছে। মিলির উপর হুকুম হল সে যেন ওদের সঙ্গে মেলামেশা না করে। সঙ্গদোষ বলেও তো একটা কথা আছে।

পরেশদা' চলে যাবার পর লক্ষ্য করলাম, অজিতদা' সারা দিন বাড়ীতেই থাকেন আর বিকেলে রোজ দু'জনে বেড়াতে বেরোন সেজে-গুজে। ফেরেন বেশ রাত করে ট্যাক্সিতে। অর্থাৎ পারুলদি'কে অজিতদা' একেবারে পুরোপুরি দখলিকার করে বসেছেন। বেড়াতে বেরোবার সময় অবশ্য রোজই মিলির ডাক পড়ে কিন্তু পরীক্ষার অজুহাতে সে ওদের সঙ্গে যায় না। বাসার লোকেরা ছ্যা ছ্যা করতে লাগল। উনি ভদ্রঘরের মেয়ে কি না এবং পরেশদা'র সঙ্গে আদৌ ওঁর বিবাহ হয়েছে কি না তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিল। আমার জ্যাঠামশাই তো বাড়ী বদলের কথাই চিন্তা করতে লাগলেন।

কানাঘুষো গালগল্প দাবানলের মত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল পাড়ার লোকের মধ্যে। চায়ের দোকানে আমাকে ঘিরে সমবয়সী পাড়ার ছেলেরা পারুলদি'র সম্বন্ধে যে সব অশ্লীল মন্তব্য এবং ইঙ্গিত করতে লাগল তা প্রকাশ করা যায় না। ওরা সকলেই নাকি প্রত্যক্ষদর্শী। সবাই বলল বিয়ে-ফিয়ে ওসব গাঁজা। যুদ্ধের কনট্রাকটারীতে কাঁচা পয়সা লুঠে দুই বন্ধুতে মিলে 'মেয়েমানুষ' রেখেছে। আমি ওদের আক্রমণের হাত থেকে পারুলদি'কে বাঁচাতে পারলাম না। কারণ ওরা স্বচক্ষে যতটুকু দেখেছে সেটুকু আমি অনুমান করতে পারি, ততটুকুতে এ ধরণের কুৎসা তৈরী করা মোটেই অসম্ভব নয়।

এত কুৎসা শুনেও আমি কিন্তু টললাম না। কারণ আমি হচ্ছি আদর্শবাদী। উদারতায় পরেশদা'কেও হার মানাবার সঙ্কল্প করেছি মনে মনে।

সে দিন সন্ধ্যায় অন্যমনস্ক ভাবে দোতলায় উঠে শুনি পারুলদি'র ঘরে এসরাজ বাজছে। অনেক দিন পারুলদি'র গান শুনিনি। তাই সাগ্রহে দরজার সামনে এগিয়ে গেলাম। খাটের উপর একলা বসে এসরাজ বাজাচ্ছেন। আমায় দেখে ডাকলেন।

ঘরে ঢুকে অজিতদা'কে না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: অজিতদা নেই?

: কেন, অজিতদা' থাকলে আমার কাছে আসতে নেই?—পারুলদি' রূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। আমি বিস্মিত এবং বিব্রত হলাম। উনি যে একটু ক্রুদ্ধ তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি কিন্তু কারণটা বুঝতে পারলাম না।

হেসে বললাম: তা কেন হবে, এমনিই জিজ্ঞাসা করেছি।

: তাই তো হয়েছে। আমি সব বুঝি ভাই! তোমাদের বাসার কেউ আজ-কাল আমার সঙ্গে কথা কয় না, এমন কি মিলিও দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কেন, তা আমি জানি। তাই অজিতকে আজ হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছি।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। আমি যে ওদের দলে নই সে কথাটা পারুলদি' কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।

: আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি। নিজের ভাই-বোন নেই, তাই তোমাকে আর মিলিকে আপন করে নিয়েছিলাম। যতই মন্দ হই সেই সম্পর্কের মর্যাদা কখনও আমার দ্বারা নষ্ট হত না। যাক, তোমরা যখন আমায় চাও না তখন এখানে আর থাকব না। তোমার পরেশদা' ফিরে এলেই বাসা বদল করে চলে যাব।

কথাটা শেষ করে পারুলদি' এমন করুণ ভাবে কেঁদে ফেললেন যে, আমার মন একদম খারাপ হয়ে গেল।

: এ সব আপনি কি বলছেন পারুলদি'? সত্যি, আমি কিছু জানি না। আপনার উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে আর আপনার সম্বন্ধে আমার মনে অন্তত কোন খারাপ সন্দেহ কখনও জাগেনি। লোকে যা বলে তাতেই মাথা নেড়ে সায় দেবার মত শিক্ষা আমার নয়।

: কি বলে লোকে?—পারুলদি' তাঁর ভেজা চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

প্রশ্নের জবাব দিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি আমার হাত ধরে বললেন: কি বলে? বল বল—

: কি আবার বলবে। এক বাড়ীতে সম্পর্ক-বর্জিত দুটি নারী-পুরুষকে থাকতে দেখে ওদের সন্দেহ হয়। হাজার হলেও দীর্ঘদিনের সংস্কার কাটাতে সময় লাগে তো! ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবার মত সরল মন তো সকলের নয়। তাতে আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? প্রথম যখন মেয়েরা ব্লাউস পরত তখন দেশের লোক তাদের ম্লেচ্ছ বলে এক-ঘরে করেছিল। তাই বলে সত্যিই তো আর ব্লাউস পরা অন্যায় হয়নি?

: তুমি আমায় সন্দেহ কর না?

: না।

: আর যদি ওদের কথাই সত্যি হয়?

আমার বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠল। পারুলদি'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, উনি দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে কাঁপছেন থর থর করে।

: তাতেই বা আমার কি আসে-যায়?

: আমার অধঃপতন দেখে দুঃখ পাবে না?

একটু ভেবে বললাম: অত তলিয়ে ভাববার অবকাশ নেই। তা ছাড়া লোকে যাকে অধঃপতন মনে করে, আমি তাকে অধঃপতন না-ও মনে করতে পারি। মানুষের সম্পর্ককে আমি হৃদয় দিয়ে বিচার করব, সংস্কার দিয়ে নয়।

: তাহলে তোমার কাছে অকপটেই স্বীকার করছি—আমি অজিতকে ভালবাসি।

মাথাটা ঝন-ঝন করে উঠল। ভাল যে বাসেন সে তো আমি আগেই জানতাম। তবু ওঁর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনালো।

: আমার বুকে তোমার পরেশদা' যতখানি স্থান জুড়ে আছেন, অজিত ঠিক ততখানি জুড়ে আছে। আমি ওঁদের কাউকে ছেড়ে বাঁচব না—বলতে পার, আমি ওঁদের দু'জনেরই পত্নী। তোমার পরেশদা'ও জানেন। আমার অস্তিত্বের প্রতি বিন্দুকে ভালবাসে অজিত। ওকে কি করে বিমুখ করব? আমি মানুষ, পাষাণ নই। ওঁদের দুজনকে ভালবেসে যদি সুখী হই তাতে অন্যায়টা কোথায়? সকলের জীবনে হয়ত এমন ঘটে না, আমার জীবনে ঘটেছে। তাই বলে সত্যকে অস্বীকার করে মিথ্যা নিয়ে ঘর করতে হবে, তার কি মানে আছে? আমার এই ভালবাসাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যদি লোকালয়ের বাইরে গিয়ে বাস করতে হয় তাই করব, তবু আমি আমার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে পিষে মারব না।

স্তব্ধ চিত্তে শুনলাম পারুলদি'র প্রণয় কাহিনী। লোক যে কথা কুৎসার আকারে রটায়, তিনি সেটার সত্য স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। ঘটনাটা একই, তফাৎ শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। জিনিষটা ন্যায় কি অন্যায়, তা আমিও ঠিক ভেবে উঠতে পারলাম না। তবে এটা ঠিক যে ভালবাসা হল মানুষের মহৎ ধর্ম। সেটা কখনও অন্যায় হতে পারে না। পরেশদা'র জ্ঞাতসারেই যদি এই প্রেম জন্মে থাকে আর তাতে যদি পরেশদা' আপত্তি না করেন, তাহলে পারুলদি'কে নিষ্পাপ বলতেই বা ক্ষতি কি? এতে অন্যায় অথবা পাপ থাকলে পরেশদা'ই নিজের স্ত্রীকে সংযত করতেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবে দেখলাম, কাজটা অসামাজিক হতে পারে, অন্যায় নয় কিছুতেই। মানুষের হৃদয় পায়রার খোপ নয় যে, সেখানে একজনের বেশী দু'জনের স্থান হবে না। হৃদয় হচ্ছে সীমাহীন। আকাশের মত সর্বব্যাপী। সেখানে বহু মানুষের একত্রে স্থান হতে পারে। একটি নারী দুটি পুরুষকে ভালবাসলে সমাজের কতটুকু ক্ষতি হয় জানি না, মানবতার কোন ক্ষতি নেই। দুটি প্রেমিকের নিবিড় ভালবাসার মধ্যে পারুলদি'র জীবন যদি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে সেই মহান প্রাপ্তি। পারুলদি' আমার কাছে এমন দৃঢ় কণ্ঠে নিজের এই অপ্রচলিত ভালবাসার কথা প্রকাশ করে আরও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলেন। চৌধুরী-দম্পতির চরিত্রে সত্যিই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখছি।

পরদিন সকালে পরেশদা' ফিরে এলেন। পারুলদি'র মুখে আর হাসি ধরে না। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। দিন তিনেক বাদে আমি এক চাকরী পেয়ে চলে গেলাম মাদ্রাজ। পরের ডাকে মিলির চিঠিতে জানতে পারলাম পারুলদি'রা আমাদের বাসা ছেড়ে অন্য কোথায় চলে গেছেন। যাবার সময় পারুলদি'র চোখে জল দেখে মিলিও না কি কেঁদে ফেলেছিল। শুনে আশ্বস্ত হলাম।

এর পর দীর্ঘকাল আর ওঁদের খবর রাখিনি। কারণ, আমি সেই থেকে স্থায়িভাবে মাদ্রাজে চাকরী করছি। ছুটিছাটায় দুই-একদিনের জন্য কলকাতায় আসি বটে, তবে পারুলদি'দের খোঁজ করার মত অবকাশ পাই না। তা ছাড়া ওঁদের কথা আমার মনেও থাকে না। এক কালে ওঁদের সঙ্গে আমার যে খুব আত্মীয়তা ছিল, সে কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি।

যুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের এক শনিবারে বে-অফ বেঙ্গলের পাড়ে মেরিণ হোটেলের ব্যালকনিতে বসে সমুদ্র দেখছিলাম। হঠাৎ কানের কাছে বাঙলা কথা শুনে তাকিয়ে দেখি, একটি বাঙালী-দম্পতি তাদের সদ্য হাঁটতে শেখা ছেলেকে নিয়ে একটি টেবল দখল করেছেন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমাদের সেই অজিত বাবু!

চেহারাটা বিশেষ পাল্টায়নি। পাশের মহিলা এবং শিশুটি কে?

: তবে কি অজিতদা' বিয়ে করেছেন ? পারুলদি'র তাহলে কি হল ? যাই হোক, এই দূর দেশে এত দিনের পুরোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ না করে থাকতে পারব না।

সামনে গিয়ে বললাম : চিনতে পারেন ?

অজিতদা' এবং সঙ্গের ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসু 'ভাবে আমার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলোতে লাগলেন।

: সেই পার্ল ষ্ট্রীটের বাসায়—পারুলদি'—পরেশদা'—

: হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, পণ্টু ! মাই গুডনেস, তুমি এখানে এলে কি করে ? বস বস।

চেয়ারে বসে বললাম : আমি তো আজ প্রায় ছ'বছর এখানে জাহাজঘাটায় চাকরী করি।

: আই সি। আমরা এসেছি বেড়াতে। কেপ কামারিন পর্যন্ত যাবো। এখানে রয়ে গেলাম তিন দিনের জন্য। সি ইজ মাই ওয়াইফ মঞ্জু আর আমার ছেলে শঙ্কর।

নমস্কার করলাম। অসংখ্য প্রশ্ন ভীড় করে এলো আমার মনে। এমন কথা তো ছিল না।

: পরেশদা'রা কোথায় ?

অজিত বাবু হঠাৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন : দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল। কোন খবর তার রাখি না। জানো, সে ছিল ঠগ আর স্ত্রীলোকটি বারবনিতা। দু'জনে মিলে যুক্তি করে আমাকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠকিয়েছে।

: বলেন কি অজিতদা' !

: ঠিক বলছি। তোমাদের বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল কাজই করেছিলে।

বাচ্চা ছেলেটা চেঁচামেচি করছিল। অজিতদা'র স্ত্রী বললেন : ওগো তোমরা এখানে বস, আমি খোকনকে নিয়ে সমুদ্রের ধার থেকে একটু ঘুরে আসি।

তিনি চলে যেতে আমি বললাম : আপনার কথা শুনে ভারী আশ্চর্য্য লাগছে অজিতদা'। আপনি ওদের থেকে আলাদা হয়ে আছেন ভাবতেই অদ্ভূত লাগে।

: লাগতে পারে, তবে ভদ্রলোকের পক্ষে বেশী দিন জোচ্চোর আর বেশ্যার সঙ্গে একবাড়ীতে বাস করা সম্ভব নয়। তুমি জান, পারুল স্বেচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে বছরের পর বছর কাটিয়েছে।

জানতাম, কিন্তু স্বয়ং অজিতদা'র কাছে তার এমন কুৎসিত ব্যাখ্যা শুনতে হবে ভাবিনি।

: কিন্তু কেন ? সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও তার এ কুপ্রবৃত্তি কেন হল ?

: আমার টাকার লোভে। পরেশ রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় আমার টাকায় ব্যবসা করতে চেয়েছিল। এমনি পেতে পাছে অসুবিধা হয়, তাই নিজের বউকে দিয়ে —কি আর বলব ভাই, তুমি ছেলেমানুষ। পারুলকে সত্যিই ভালবাসতাম কিন্তু যেদিন দেখলাম ও আসলে পরেশেরই ক্রীড়নক সে দিন থেকে আমার সব মোহ কেটে গেছে। আমার সঙ্গে ও আগাগোড়া ছলনা করেছে। আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল পরেশের কেরিয়ার তৈরী করা। যাক, খুব বেঁচে গেছি। পঞ্চাশ হাজারের উপর দিয়েই ধাক্কাটা গেছে, আমার আত্মাকে অবদমিত করতে পারেনি। এখন আমি লক্ষ্ণৌতে প্র্যাকটিস করছি। বউ-ছেলে নিয়ে বেশ শান্তিতেই আছি।

ঘটনাটা সবই শুনলাম। পরেশদা' না কি কলকাতায় এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-পরিবারের একমাত্র ছেলে। প্রথম যৌবনে বাড়ী-ঘর বেচে ফাটকা বাজারে সর্বস্ব খুইয়ে দেনার দায়ে মীরাটে এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। পারুলদি'র সঙ্গে সেখানেই তাঁর বিয়ে হয়। তার পর পারুলদি'র গহনাগাটি বেচে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের আশায়। সেখানেই অজিতদা'র সঙ্গে তাঁদের পরিচয়। অজিতদা' তখন সবে পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। পরেশদা'র আগ্রহে তিনি তার ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করেন। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে পারুলদি'র একটা মুখ্য ভূমিকা ছিল। অজিতদা' ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ বুঝতেন না আর পারুলদি' তাঁকে এমন অভিভূত করে রেখেছিলেন যে, ওসব বোঝবার চেষ্টা অথবা অবকাশও তাঁর ছিল না। লক্ষ্ণৌ থেকে ওঁরা কলকাতায় আসেন বড় ব্যবসার আশায়। তিন বছর তাঁরা কলকাতায় একত্রে বাস করেন। ইতিমধ্যে অজিতদা'র মা মারা যাওয়ায় তাকে মাস ছ'য়েক লক্ষ্ণৌ গিয়ে থাকতে হয়। ফিরে এসে তিনি দেখতে পান যে, পরেশদা' কায়দা করে ব্যবসা বে-হাত করে ফেলেছেন। পারুলদি' তখন কলকাতায় ছিলেন না এবং কোথায় যে আছেন সে-কথা পরেশদা' কিছুতেই স্পষ্ট করে বললেন না। অজিতদা'র মনে দারুণ সন্দেহ হল। তাঁর দুই-একজন বন্ধু-বান্ধব আগেই তাকে সতর্ক করেছিল। এখন বুঝলেন, তাদের কথাই ঠিক। পরেশদা তার বউয়ের বিনিময়ে অজিতদা'র কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করে নিয়েছেন। কাজ ফুরিয়েছে। এবার অজিতদা'র বিদায়ের পালা। লজ্জায়, ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে অজিতদার মাথা হেঁট হয়ে গেল। সেই থেকে তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরে ওকালতি করছেন। ওদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন না।

: তবে মাঝে মাঝে উড়ো খবর পাই। পরেশ না কি প্রকাণ্ড বড়লোক হয়েছে। কলকাতায় তার অগাধ সম্পত্তি। প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়। শুনছি না কি শেরিফ হবে আসছে বার।

: আর পারুলদি' ?

: মাঝে শুনেছিলাম, তার না কি মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অত আত্ম-সচেতন, অমন অভিনয়পটু মেয়ে কি কখনও পাগল হয় ? পাগলামির ভাণ করে আর কারও সর্বনাশ করছে বোধ হয়। যাক, ও-সব বাজে কথা, তোমাদের বাসার সকলে ভাল আছেন ? জ্যাঠামশাই ?

: সব ভাল।

অজিতদা' আর তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রাত্রে মেসে ফিরলাম। অজিতদা' আমার পুরোনো স্মৃতির বাঁধ অকস্মাৎ অপসারণ করেছেন। কত কথাই মনে পড়তে লাগল। পারুলদি'র এসরাজ বাজিয়ে গান গাওয়া, আদর করে কাছে বসিয়ে খাওয়ানো, তাঁর অভিমান, ভাবপ্রবণতা, হাসি, অশ্রু। মনে পড়ল, তিনি বলেছিলেন অজিতদা'কে ছেড়ে কিছুতেই বাঁচবেন না আর অজিতদা'র প্রতি তার ভালোবাসাকে লালন করবার জন্য লোকালয়ের বাইরে গিয়েও বাস করতে প্রস্তুত। সবই মিথ্যে ? সবই অভিনয় ?

শুধু অজিতদা'র কাছ থেকে টাকা আদায়ের ফন্দি? এর বাইরের সরলতা এবং কোমলতার আড়ালে এই নীচ ব্যবসা-বুদ্ধি? বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। তবু অবিশ্বাসই বা করব কি করে? অজিতদা' তো বাইরের লোক নন?

ভাবতে ভাবতে শেষে মনে হল, অজিতদা'র টাকা খোয়া গেছে। তাই হয়ত তিনি সত্য-মিথ্যায় বানানো একটা কাহিনী বলে নিজের গায়ের ঝাল মেটালেন। এবার কলিকাতায় গিয়ে আসল ব্যাপারটা জানতে হবে। পারুলদি'কে অত নীচে নামাতে মন আমার কিছুতেই সায় দেয় না।

পরের বার কলকাতায় গিয়ে টেলিফোন-গাইড দেখে পরেশদা'র অফিসের ঠিকানা যোগাড় করলাম। সত্যিই তিনি বিরাট বড়লোক হয়েছেন। চার-পাঁচটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কৃতী পুরুষ সন্দেহ নেই। অজিতদা'র কথা সত্য হলেও স্বীকার করতে হবে যে, ওই পুঁজি নিয়ে মাত্র পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এত বড় ব্যবসা ফাঁদা প্রতিভার পরিচায়ক। পরেশদা'র উপর আমার শ্রদ্ধা হল।

সে দিন তিনি অফিসে ছিলেন না। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে গেলাম বাসায়। বাড়ী দেখে আমার তো চক্ষু স্থির! তিনি যে মস্ত ধনী তা শুধু বাড়ীটা দেখেই লোকে বুঝতে পারবে। গেট দিয়ে ঢোকবার সময় বুকের মধ্যে গুরু-গুরু করে উঠল। কে জানে পরেশদা' যদি না চিনতে পারেন? কবে কোন এক বিশ্রী বাসায় বাস করার সময় আমার সঙ্গে পড়শীর আত্মীয়তা হয়েছিল, সে কথা আজ এত সৌভাগ্যের দিনে মনে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু পারুলদি' নিশ্চয়ই চিনবেন, অবশ্য সত্যি যদি তিনি পাগল না হয়ে থাকেন।

পোর্টিকোর নীচে দাঁড়াতেই একজন অতি সুসজ্জিত সুন্দরী মহিলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো মোটরে উঠলেন। তাঁর সাজপোষাকের চাকচিক্যে চোখ ঝলসে গেল! পরিবেশে উগ্র সেন্টের গন্ধ। যেন এক ঝলক আলো আমার চোখের উপর দিয়ে ছিটকে গেল। কে? নিশ্চয়ই পারুলদি' অথবা পরেশদা'র কোন ধনী বান্ধবী।

: কা'কে চাই?

চমকে তাকিয়ে দেখি, বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

: পরেশদা' আছেন? পরেশ বাবু?

বেয়ারা আমায় ভাল করে দেখে বলল: আজ্ঞে না, তিনি তো এখনও ফেরেননি?

: তাঁর স্ত্রী?

বেয়ারা এবার আরও খুঁটিয়ে আমার আপাদ-মস্তকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

: তিনি তো এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন আপনার সামনে দিয়ে।

আমার বুকটা ছাঁত করে উঠল: কে? পারুলদি'—মানে—আমার সামনে দিয়ে—

: ও বুঝেছি! আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি এখানে থাকেন না।

: কোথায় থাকেন? পারুলদি,' মানে পরেশদা'র স্ত্রী—

: আজ প্রায় দু' বছর তিনি দমদমের বাড়ীতে আছেন। শরীর খারাপ কি না।

: আর পরেশদা'?

: সাহেব আর ছোট মেম-সাহেব এখানেই থাকেন।

বুঝলাম। পারুলদি' পরেশদা'কেও হারিয়েছেন। কিন্তু কেন?

: পারুলদি'র কি অসুখ?

: তা তো স্যার জানি না। শুনতে পাই না কি মাথার দোষ হয়েছে। আপনি তাঁর কেউ হন বোধ হয়?

: আমি তাঁর সম্পর্কীয় ভাই।

আত্মীয়তার কথা শুনে বেয়ারা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হল। বলল: আপনি এত দিন এ-সব জানতেন না?

: দূরদেশে থাকি, তাছাড়া আপন ভাই তো নই। তাই এত কথা জানতাম না।

: দমদম রোডের এই ঠিকানায় গিয়ে দেখা করে আসুন কিন্তু দোহাই আপনার, সাহেবকে যেন বলবেন না কার কাছে ঠিকানা পেলেন। উনি বড় রাগ করেন বাইরের লোক গিয়ে না কি বড় মেমসাহেবের অসুস্থ শরীরেও বিরক্ত করে।

: কখনও বলব না! তুমি আমার অনেক উপকার করলে ভাই!

পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে গুঁজে দিলাম। একটা নিদারুণ নৈরাশ্য এবং অবসাদ আমায় পেয়ে বসল। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা বিরাট ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। কিছুই ভেবে নিতে পারলাম না।

পরদিন বিকেলে দমদম রোডে গিয়ে খুঁজে বার করলাম পারুলদি'র ঠিকানা। ফাঁকা জায়গার উপর পুরোনো ছোট বাড়ী একটা। সম্ভবত: আগে কারও বাগানবাড়ী ছিল। ভিতরে ঢুকতেই একটা চাকর এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই? মিথ্যে করে বললাম: পরেশ বাবুর কাছ থেকে এসেছি। মাইজীর সঙ্গে দেখা করব।

বারান্দার একটা চেয়ারে সে আমায় বসতে দিল। আমি অধীর আগ্রহে প্রতি মুহূর্তে পারুলদি'র প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। মনে ভয় এবং সন্দেহ। কে জানে, পারুলদি' হয়ত আলুথালু বেশে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আমার সামনে এসে বিকট অট্টহাস্য করবেন, বিড়বিড়িয়ে আবোল-তাবোল বকবেন।

কিন্তু পারুলদি' এলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে। পরনে ছাপা সাড়ী, গায়ে ক্রেপের ব্লাউজ, পায়ে স্যাণ্ডাল। চুলগুলো এলোখোঁপায় জড়ানো। চেহারাটা আগের মতই আছে তবে মুখখানা কেমন যেন নীরস, শুকনো। চোখ দুটি নিষ্প্রভ। অসম্ভব, ওর মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়নি, অন্তত এই মুহূর্তে উনি সুস্থই আছেন।

কাছাকাছি আসতেই আমার বুকের মধ্যে একটা আবেগের ঝড় উঠল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ম্লানমুখে একটা হাসির দীপ্তি দেখা দিল।

: পলটু—চিনতেই পারছিলাম না। এ ক' বছরে এত বড় হয়ে গেছ! এত দিন বাদে বুঝি দিদিকে মনে পড়ল?

এ তো পাগলের প্রলাপ নয়, প্রিয়জনের স্নেহ সম্ভাষণ। খটকা লাগল আমার।

: মনে রোজই পড়ে পারুলদি,' তবে এখানে তো থাকি না, তাই দেখে যেতে পারিনি।

: কার কাছে খবর পেলে, আমি এখানে আছি?

: কাল পরেশদা'র বাসায় গিয়েছিলাম।

: ওঃ, পারুলদি'র ঠোঁটে ম্লান হাসির আভা মিলিয়ে গেল : নতুন বউদির সঙ্গে আলাপ হল বোধ করি ? আর শুনলে আমি পাগল হয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছি ?

তাঁর কণ্ঠের ব্যঙ্গ আমাকে চমকে দিল। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোথায় গেল পারুলদি'র মুখের সেই কোমল দ্যুতি ? সেই সজীব সরসতা ?

বললাম : পরেশদা'র সঙ্গে দেখা হয়নি। বেয়ারার কাছে আপনার শরীর খারাপের সংবাদ এবং ঠিকানা পেয়েছি।

: শরীর খারাপ বটে, তবে, মাথা আমার ঠিক আছে। পাগল এখনও হইনি—হওয়া উচিত ছিল।—পারুলদি'র ঠোঁটে একটা শ্লেষের হাসি ঝলকে উঠল।

সত্যি তাই। পারুলদি'র শরীর সুস্থ থাক বা না থাক, মস্তিষ্ক যে সম্পূর্ণ সুস্থ সেটা বুঝতে আমার বিশেষ দেরী হল না।

তার পর কুশল প্রশ্নের বিনিময়। পারুলদি বললেন : আমাকে এখানে এ ভাবে দেখে তোমার আশ্চর্য লাগছে না ?

লাগছে বই কি। মনের মধ্যে কি অদম্য কৌতূহল তা তো বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সে সব প্রশ্ন তুলতে আমার সঙ্কোচ লাগছিল। পারুলদি'র হৃদয় যে ব্যথিত তাতে আর সন্দেহ কি ? নতুন করে সেই ব্যথার জায়গায় ঘাঁটাঘাঁটি করতে দ্বিধা বোধ করছিলাম।

: এত দিন বাদে এলে, আজ এখানে থেকে যাও। দুই ভাই-বোনে সারা রাত বসে গল্প করব।

সে কি সম্ভব ? আমি ভাবতে লাগলাম।

: জানো, আজ দেড় বছর মুখ বুজে পড়ে আছি এই পাষাণপুরীতে। দুটো কথা কইব এমন লোকও নেই। একেবারে একা। তোমায় দেখে অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে। তোমাকে কাছে বসিয়ে খাওয়াবো, গল্প করব, ঘুম পাড়াবো ছোট ভাইটির মত। যেতে আজ দিচ্ছি না।

আমিও যেতে চাই না। পারুলদি'র এই কাকুতির মধ্যে একটা হাহাকার আমার মনটাকে ভাবপ্রবণ করে তুলল।

: গান শুনবে ? এসরাজ বাজিয়ে গাইব সেই আগেকার মত ? না থাক, গলাটা একদম গেছে। তার চেয়ে চা বানিয়ে আনি, উঠোনে বসে গল্প করা যাবে।

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে উঠোনে বসে বললাম : পারুলদি', কিছুই বুঝতে পারছি না। সবই কেমন ভোজবাজির মত লাগছে।

তাঁর মুখখানা আরও কালো আরও করুণ হয়ে উঠল। গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বললেন : তুমি তো বাইরের লোক ভাই ! নিজের অতীত বর্তমান ভাবতে বসলে নিজেই আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি।

: মাস কয়েক আগে মাদ্রাজে আমার সঙ্গে অজিতদা'র দেখা হয়েছিল। মনে হল তিনি আপনাদের উপর দারুণ চটা।

: কি বলল সে ?—পারুলদি অধীর আগ্রহে তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাঁর গলার স্বর বাষ্পাচ্ছন্ন।

: যা বললেন, তা শ্রুতিকটু।

: কিন্তু সব সত্যি।

: অসম্ভব'!

: কিছু অসম্ভব নয়। পৃথিবীতে সবই সম্ভব। জানো ভাই, এই বসুন্ধরা হচ্ছে বীরভোগ্যা। যারা দুর্বল যারা সরল যারা সৎ এখানে তাদের কোন স্থান নেই। সেটা আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি। তাই আমার আর বাঁচতে সাধ নেই। অনেক দিন বিষের পাত্র মুখে তুলেছি। গিলতে সাহস হয়নি। অর্থাৎ আমরা মৃত্যুরও অযোগ্য।

কি বলছেন পারুলদি' ?

: ঠিক বলছি। তোমার অজিতদা' যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমাকে তার কাছে উৎসর্গ করে তোমার পরেশদা' তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা সত্যি নয়। আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। আমি তাকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করেছিলাম। একদিনও টের পাইনি, আর একজন পেছনে দাঁড়িয়ে তার স্বার্থের কলকাঠি নেড়ে আমাকে পেশাদার রূপোপজীবিনী বানাচ্ছে।

: তাহলে পরেশদা'—

: হাঁ। তোমার পরেশদা' মানুষ নয়, ভগবান। তিনি আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে একেবারে তছনছ করে দিয়েছেন। আজ আমার জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

স্বার্থের খাতিরে মানুষ হীন কাজ করে। পরেশদা'ও করতে পারেন। তাতে আমি খুব চমকাই না। কিন্তু পারুলদি'র অজ্ঞাতে কি করে তিনি পারুলদি'কে বন্ধুর কাছে বাঁধা রেখেছিলেন, সেইটাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

বললাম : এ ষড়যন্ত্র আপনি একদম জানতে পারেন নি ?

: জেনেছি সব শেষ হয়ে যাবার পর। তখন জেনেও আর কোন লাভ নেই। জীবনটা তার আগেই পঙ্গু হয়ে গেছে কি না।

: কি রকম ?—আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

: তাহলে গোড়া থেকেই বলতে হয়। ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে মীরাটে দাদুর কাছে থাকতাম। ওখানে আমাদের তু'পুরুষের বাস। যে বার আই, এ পাশ করি সেবার দাদুর খুব অসুখ। আমার বিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ো করে তোমার পরেশদা'র সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে মাস দেড়েকের মধ্যে তিনি মারা যান। তোমার পরেশদা' মীরাটে নতুন। তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না। ওঁর মাসিমার পরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের দীর্ঘকালের পরিচয়। সেই সূত্রে বিয়েটা ঘটে যায়। বিয়েতে আমি ভারী সুখী হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কখনও সামান্য মনোমালিন্যও হয়নি। একমাত্র দুঃখ ছিল তিনি বেকার। চাকরী তিনি করতে চাইতেন না। ব্যবসায়ের দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক। শুনলাম আগেও নাকি ব্যবসাই করতেন। ওঁকে মনমরা দেখলে আমার বড় কষ্ট হত। শেষে আমিই বললাম, গহনাগাটি এবং বাড়ী-ঘর বেচে ব্যবসায়ের টাকা সংগ্রহ কর। প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, শেষে রাজি হলেন। ব্যবসায়ের লোভে মীরাট ছেড়ে আমরা এলাম লক্ষ্ণৌ। তখন যুদ্ধ চলছে। কন্ট্রাক্টরী করে বেশ সংসার চলত। তিনি প্রায়ই আপশোস করে বলতেন, আরও বেশী টাকা পেলে উনি রাতারাতি বড়লোক হতে পারতেন। টাকার দিকে আমার অত লোভ না থাকলেও

ওঁর আপশোষ শুনে শুনে আমারও আপশোষ হত। তারপর একদিন তোমার অজিতদা'কে নিয়ে এলেন আমাদের বাসায়। প্রথম দিনেই তার চোখে যে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেছিলাম তাতে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেদিন থেকে তোমার অজিতদা' নিয়মিত আসতে লাগলেন আমাদের বাসায় এবং কিছু দিন পরে প্রায় সারা দিন আমার সহিত কাটাতে লাগলেন। উনি কাজেকর্মে রাত্রের আগে বাসায় ফিরতে পারতেন না। কাজেই অজিতের সহিত আমার সারা দিন বেশ কাটত। এত ঘনিষ্ঠতা ভাল কি মন্দ তা বোঝার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। বিয়ের আগে আমার জীবনে কোন প্রেম অথবা রোমান্সের সুযোগ হয়নি। বিয়েটা হয়েছিল এত মামুলী ভাবে যে রোমান্সের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কাজেই সেদিকে আমার কিছুটা বুভুক্ষা ছিল। অজিত আমার সেই দুর্বল জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। আমি জানি, সে আমায় কি প্রচণ্ড ভালবাসত। আমার জন্য সে দিনের পর দিন তপস্যা করেছে। শেষে অন্তরের সমস্ত প্রতিরোধ অতিক্রম করে একদিন তার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা বাইরের লোকের দৃষ্টি এড়ায়নি কিন্তু তোমার পরেশদা' একেবারে উদাসীন নির্বিকার! বরং অজিতের সঙ্গে আমার এই অন্তরঙ্গতায় তিনি যেন খুশী হতেন। তাঁরই আগ্রহে অজিতের সঙ্গে আমি আগ্রা দিল্লী বেড়িয়ে এসেছি। তাঁর অনুপস্থিতিতে অজিত থাকত আমার কাছে রাতের পর রাত। ভাবতাম, স্বামী আমার খুব উদার খুব উঁচু দরের মানুষ। কাজেই অজিতের সঙ্গে আমার এই অস্বাভাবিক সম্পর্কে প্রথম দিকে যে দ্বিধা ছিল সেটা কেটে গেল ধীরে ধীরে। সেই সময় হঠাৎ বাসার ঝি বললে আমি না কি মা হয়েছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস আনন্দ উত্তেজনায় অধীর হয়ে গোপনে গোপনে দাই ডাকিয়ে পরীক্ষা করালাম। সত্যিই আমি অন্তঃসত্ত্বা। খুব আনন্দ হয়েছিল কিন্তু কথাটা শুনে তোমার পরেশদা'র মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি এত তাড়াতাড়ি সন্তান চান না। কারণ, তখন তাঁর একটু টানাটানি যাচ্ছিল। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা হলে আমার না কি সমস্ত চার্ম উবে যাবে। সেও তিনি চান না। ভারী বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। যে এসেছে তাকে প্রাণ ধরে বিদায় দেব কি করে? আমার সাহস হয় না, মনও নারাজ। শেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে কলকাতায় এসে নিজের সন্তানকে অঙ্কুরেই শেষ করে গেলাম। অজিত এসব কিছু জানত না। আমি ইচ্ছে করেই গোপন করেছিলাম। লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে আবার যেমন চলছিল চলতে লাগল। বাইরের লোক কিছু জানতে পারল না কিন্তু মাঝে মাঝে একটা নিদারুণ অপরাধ বোধ আমাকে কুরে কুরে খেতো। সেই অদেখা সন্তান নির্জন মুহূর্তে কানের কাছে এসে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত। নিঃসঙ্গতা এড়াবার জন্য অজিতকে আমি মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া হতে দিতাম না।

আমরা তখন গভীর প্রেমে আবদ্ধ। তোমার পরেশদা' জানত সব এবং মাঝে মাঝে অজিত এবং আমার প্রণয় নিয়ে হাল্কা ঠাট্টা রসিকতাও করেছে কিন্তু কখনও কোন বিরূপ মন্তব্য করেনি। মনে হত আমাদের এই ভালবাসাকে সে উপভোগ করে। আমার দিকে তার কর্তব্য অথবা ভালবাসার ঘাটতি কখনও লক্ষ্য করিনি। ফলে তোমার পরেশদা'র প্রতি আমার অনুরাগ শ্রদ্ধার পথে একটা বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছিল।

তার পর লক্ষ্ণৌ থেকে এলাম কলকাতায়। তোমাদের বাসা ছেড়ে আমরা ভবানীপুরের বাসায় উঠে গিছলাম। দু' বছর ছিলাম সেখানে একত্রে। হঠাৎ অজিতের মা বাবা যেতে তাকে লক্ষ্ণৌ যেতে হল। ইতিমধ্যে তোমার পরেশদা'র নতুন বাড়ী শেষ হয়ে গেছে। গৃহপ্রবেশ করে আমরা একদিন উঠে গেলাম সেখানে। নতুন বাড়ীতে পরেশের এক বিধবা পিসিমা এসে বসলেন অভিভাবিকা হিসাবে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের অজুহাতে তোমার পরেশদা' হঠাৎ আমায় দার্জিলিং পাঠিয়ে দিলেন। মাস চারেক বাদে কলকাতায় ফিরে শুনলাম, অজিত না কি চিরকালের মত আমাদের সংস্রব ছেড়ে গেছে। পিসিমা বললেন, তোমার পরেশদা'র সঙ্গে তার নাকি ভীষণ ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। আমি একেবারে গাছ থেকে পড়লাম। এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর। আমি আরও ভাবছিলাম কলকাতায় ফিরেই অজিতকে এখানে আসতে লিখব। তাকে দেখবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়েছিল। তোমার পরেশদা'কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার স্ত্রীকে যে অপমান করে, তার আমি মুখদর্শন করি না। ব্যবসায়ের কথায় মনোমালিন্য হয়েছিল। তাই নিয়ে সে তোমার সম্বন্ধে কুৎসা করছিল। বললাম, অজিত আজই এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, আর কখনও এসো না। পারুল তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, তাই তোমার মুখটা আমি ঘুষিয়ে ভাঙলাম না। অন্য কেউ হলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারত না। তোমার জানা উচিত, পারুল তোমায় যতই ভালবাসুক সে আমার স্ত্রী, আমার বক্ষ, আমার মাংস, আমার প্রাণ। আমার তখন প্রচণ্ড বেগে মাথা ঘুরছে। চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলাম। জেগে দেখি, তোমার পরেশদা'র কোলে শুয়ে আছি। অবিশ্বাস করলাম না, যদিও কথাটা প্রায় অবিশ্বাস্যই ছিল। আমি অজিতের হৃদয়টাকে দেখেছি বছরের পর বছর। জানতাম সে কতখানি ভালবাসে আমায়। তবু কি জানি কেন নীরব হয়ে রইলাম।

সারা দিন একা-একা। কোন কাজকর্ম নেই। মন খারাপ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। অজিতের চকিত অবস্থিতির ফলে এত কাল সময়কে আমি ধরতে পারতাম না। এখন সময় আমাকে এমন চেপে ধরে যে বেরুবার পথ পাই না। এদিকে বাড়ীতে নতুন অভিভাবিকা পরেশের পিসিমা আমার ছেলে হয় না বলে প্রায়ই আপশোষ করতেন। প্রথম দিকে কান দিই নি। শেষে একদিন মনে হল কথাটা তো

মিথ্যা নয়। দিন দিন কথাটা প্রশ্নের আকারে দেখা দিল আমার মনে। সেই কবে চার পাঁচ বছর আগে আমি জননী হতে গিয়েছিলাম, তার পর কই আর তো কখনও সন্তান আসেনি আমার বুকে। আহা, সেই বাচ্চাটা থাকলে আজ কত বড়টা হত! সারাদিন তাকে নিয়েই কাটানো যেত। সেই অদেখা সন্তানের জন্য চোখ ফেটে জল আসত। অতৃপ্ত মাতৃত্ব আমার হৃদয়ে কামনার লেলিহান শিখা জাগিয়ে তুলল। ছেলে চাই। মনে হল এত কাল নিজের অজ্ঞাতেই যে জননীত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি সে সম্ভবত আমার কোন দৈহিক গোলযোগের ফল। সকলকে গোপন করে একদিন এক লেডি ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি আমায় পরীক্ষা করে অতীত ইতিহাস শুনতে চাইলেন। অনিচ্ছা সত্বেও অপারেশনের কথাটা প্রকাশ করতে হল। আবও পরীক্ষা করতে হবে বলে সেদিন তিনি আমায় বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে তার বেয়ারা একটা খামে মোড়া চিঠি দিয়ে গেল। পড়ে দেখলাম, এ জন্মে আমি আর মা হতে পারব না। আগের বারের অপারেশনের সময় সন্তান হত্যার পর আমাকে বেশ সুপরিকল্পিত ভাবে বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়েছে।

হতাশায়, রাগে, উত্তেজনায়, আক্রোশে আমি জ্ঞান হারালাম। রাত্রে উনি যখন শুতে এলেন, আমি বললাম, তুমি আমার এ সর্বনাশ কেন করলে? উনি বিস্ময়ের ভাণ করে বললেন, কি সর্বনাশ করেছি? বললাম, আমায় বন্ধ্যা করেছ। উনি বললেন, কার কাছে শুনলে? ডাক্তারের কাছে। আমি আজ পরীক্ষা করাতে গিয়েছিলাম। উনি ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন আমাকে ভস্ম করে দিতে চান। শেষে বললেন, যা করেছি সকলের মঙ্গলের জন্যই করেছি। এ না করে উপায় ছিল না। তোমার সন্তানের পিতা কে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম না আর ভবিষ্যতে ও সমস্যা থেকে চিরকালের মত মুক্তি চেয়েছিলাম।

আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মনে হল যেন একটি অতি হিংস্র জানোয়ার নখ এবং দাঁত বার করে আমাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছে। তাহলে ওর উদারতা এবং ঔদাসীন্য সবই পরিকল্পিত। এত দিন ও আমাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা নীরবে চরিতার্থ করে এসেছে আর আমি নিশ্চিন্ত মনে এতবড় শত্রুর সঙ্গে দিনের পর দিন ঘর করে যাচ্ছি। আমার প্রতি ওর কোন মায়া নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই অথচ মিথ্যা সোহাগ দিয়ে এত কাল কেমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মনটাকে। আশ্চর্য্য! উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলাম: শয়তান!

চাকর-বাকর ছুটে এলো। উনি তাড়াতাড়ি আমায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন। চাকর-বাকর ফিরে গেল।

উনি বললেন: ছেলেমানুষী করছ কেন? ওরা কি ভাবল বল ত। আর এতে এত উত্তেজিত হবার কি আছে? ছেলেপুলে হলে তুমিই বিব্রত হতে। ভেবে দেখো আমি কোন অন্যায় করিনি। বরং তোমাকে একটা বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়েছি।

: এ ভাবে পঙ্গু করে না বাঁচিয়ে একেবারে মেরে ফেললেই পারতে। তা ছাড়া এতই যদি তোমার সন্দেহ তাহলে অজিতের সঙ্গে আমায় মিশতে দিলে কেন? আর কেনই বা এ সন্দেহের কথা এত কাল গোপন রেখেছিলে?

: আমি কারও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি না। আই এ্যাম এ ডেমোক্র্যাট আউট এণ্ড আউট।

: তাহলে আমায় বন্ধ্যা করালে কেন? সে তো আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। যদি অপরের সঙ্গে প্রেম করার বাধা দেবার কারণ না থাকে, তাহলে অপরের সন্তানের জননী হতে দিতেই বা তোমার এত বাধা কিসের?—আমি বিদ্রূপের সুরে বললাম।

: কারণ, তোমাকে বন্ধ্যা না করলে তুমি আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে। জোর করে আমার উপর জারজ সন্তানের পিতৃত্ব চাপিয়ে দিতে।

উঃ, কি সাংঘাতিক মানুষ! আমি তখন এত উত্তেজিত যে কি করেছিলাম মনে নেই। সকালে দেখি, আমার মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চাকর-বাকর ফিসফিসিয়ে আমায় আঙুল দেখাচ্ছে।

সেই দিনই অজিতকে একটা চিঠি লিখে জানালাম: এত কাল তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে, এবার তাই দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। অবিলম্বে আমায় নিয়ে যাও। এখন থেকে আমি শুধু তোমার। চিঠি পেয়েই চলে এসো। পরেশের সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের ইতি হয়েছে।

ভেবেছিলাম অজিতের হাত ধরে এই বাড়ী ত্যাগ করে আমি পরেশের উপর শেষ প্রতিশোধ গ্রহণ করব। সেই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। ফেরৎ ডাকেই চিঠির উত্তর এলো। কোন সম্বোধন নেই। শুধু এইটুকু লেখা আছে যে, আমার ব্যবহার দেখে সে তাজ্জব বনে গেছে। আমাকে সে ভোগ করেছে। সেজন্য মূল্যও দিতে হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর কেন? এবার যেন আমি কোন নতুন খরিদ্দারের সন্ধান করি। আমি নাকি নিজের দেহ দান করে পরেশের প্রতারণায় সাহায্য করেছি। অর্থাৎ আমি পরেশের নিয়োজিত বারবনিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। আমাকে ভালবাসার খেসারৎ অজিতকেও দিতে হয়েছে। আমি দিয়েছি জীবন আর সে দিল অর্থ।

চিঠিটা টেবলের উপর ছিল। বিকেলে খুঁজতে গিয়ে দেখি, নেই। রাত্রে তোমার পরেশদা বললেন, চিঠিটা নাকি তাঁর পিসিমার হাতে পড়েছে এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

: তাই বলছিলাম, আপাতত তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাক। মিছিমিছি নিন্দা-কুৎসা শুনে লাভ কি?

বললাম: সেই ভাল। তোমার সঙ্গে আর আমি থাকব না। তুমি মানুষ নও, তুমি নির্মম নিষ্ঠুর পশু। রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় তুমি মানুষ খুন করতেও পেছপা হও না। তুমি ক্রিমিনাল—তুমি আমার পেটের সন্তানকে খুন করেছ।

পরেশ বলল: তুমি এখন উত্তেজিত। এসব আলোচনা থাক। আজই দমদমের বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

: তাই দাও, তাই দাও। তোমার সান্নিধ্যের জ্বালা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

সেই থেকে এখানে আছি। আমার এক দূর সম্পর্কের মাসিমাও আছেন আমার সঙ্গে। তিনি অসুস্থ। নীচে নামতে পারেন না।

শুনতে পাই, আমাকে নাকি পাগল বলে রটাচ্ছে ওরা। না রটালে বিচারপতির কন্যাকে বিয়ে করা একটু কঠিন হত কি না!

শুনে মনে মনে হাসি। মাঝে মাঝে শুধু অস্তিত্বের জন্ম আমার কষ্ট হয়। ঈশ্বর জানেন, আমি মনের অগোচরেও তার সঙ্গে কখনও ছলনা করিনি। অর্থের লেনদেনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক কোন কালে ছিল না। আমি তাকে সত্যিই ভালবাসতাম। যদি কখনও দেখা হয় এ-কথা তাকে বোলো। এখনও সেই ভালবাসা আমার পরম সম্পদ।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পারুলদি' থামলেন। বাতাস থমথম করতে লাগল একটা স্তব্ধ বেদনায়। বলবের কড়া আলোয় উজ্জ্বল তার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এমন বীভৎস কাহিনী আগে শুনিনি।

: তাই বলছিলাম এ পৃথিবী আমাদের জন্ম নয়, তোমার পরেশদা'দের জন্ম। অনেক সময় মনে হয় এই রিক্ত শূন্ম জীবন আর বয়ে বেড়াবার কি মানে হয়! পৃথিবীতে কারও কোন কাজে তো লাগতে পারলাম না বরং অস্তিত্বের অনেক ক্ষতি করেছি। এখনও দীর্ঘকাল ধরে সেই সব অতীত স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে ভাবলে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠি। যখন মরব, কেউ দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না। অনাদৃত অবহেলিত কলঙ্কের জীবন আমার!

পারুলদি' কথা শেষ করতে পারলেন না। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

বললাম: পারুলদি,' কেন মিছিমিছি কাঁদছেন? আপনার জীবনে যত বড় বিপর্যয়ই ঘটুক, এখনও অনেক লোক আছে, যারা আপনাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। অন্তত আমি সেই দলের। সব কথা শুনলে অস্তিত্বদা'র ভুল ধারণাও হয়ত দূর হবে। আপনি এমন হতাশ মনমরা হয়ে যাচ্ছেন কেন?

পারুলদি' কান্নায় ভাঙা গলায় উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন: আমি এই পাষাণপুরী থেকে মুক্তি চাই। এর আবহাওয়া বিষাক্ত। যখন ভাবি যে আমি এখনও এরই তত্ত্বাবধানে আছি, তখন আমার মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাব কোথায়? বাপ-মাকে আগেই খেয়েছি। মীরাটের বাড়ী ওঁর ব্যবসায়ের বন্দে লেগেছে, নিজের বলতে কেউ নেই, কিছু নেই। তুমি আমার ভাই। আমাকে নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে মাদ্রাজে? দুই ভাই-বোনে থাকব। লেখাপড়া জানি, চাকরী একটা পেয়ে যেতে পারি। নেবে, নেবে আমায়?

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে একটু ঘাবড়ে গেলাম। মনে হল, উচ্ছ্বাসের মুখে বলা। তাই তেমন গুরুত্ব না দিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললাম: বেশ তো। আপনিও ভাবুন, আমিও ভেবে দেখি। তার পর যা হয় করা যাবে।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার অশ্রুসিক্ত মুখখানা: বেশ, আজ আর তাহলে তোমায় আটকে রাখব না। খেয়ে-দেয়ে বাসায় ফিরে যাও। সারা রাত ভাবো। কাল দুপুরে এসে খবর দিয়ে যেও।

: তাই ভাল।

খেয়ে-দেয়ে রাত ন'টার সময় বিদায় নিলাম। পারুলদি'র প্রস্তাবে সত্যিই আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করিনি। কারণ ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। তা ছাড়া পারুলদি'কে নিয়ে গেলে সেখানকার লোক ভাই-বোন বলে বিশ্বাসই করবে না আর পরেশদা'ও ছেড়ে কথা কইবেন বলে মনে হয় না। কারণ, তাতে তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগবে। আমাদের বাড়ীর লোকরাও রাজি হবেন না! আমার মনে পারুলদি'র জন্ম যত দরদ আর সহানুভূতিই থাক অন্যেরা একেবারে সুবিধা-অসুবিধার বাস্তব দৃষ্টি দিয়েই সব কিছু বিচার করবে।

পরদিন সকালে সংবাদপত্র খুলে দেখি, একটা পরিচিত লোকের ছবি বেরিয়েছে। আরে, এ যে আমাদের পরেশদা'! গভর্ণমেন্ট ওঁকে এবার কলকাতার শেরিফ নিয়োগ করেছেন। সেই সূত্রে পরেশদা'র একটা সংক্ষিপ্ত জীবনীও ছাপা হয়েছে। আগ্রহের সঙ্গে পড়ে দেখলাম, উনি নাকি "তরুণ বাঙালী শিল্পপতি"। মাত্র সামান্ত কিছু পুঁজি নিয়ে ব্যবসা সুরু করে ক'বছরে বিপুল সাফল্য অর্জন করে প্রমাণ করেছেন যে, বাঙালীরা ব্যবসাও করতে পারে। পরেশদা' নাকি ভারী বদান্ত। গোপনে গোপনে বহু অর্থ দান করেন। অর্থাৎ সব দিক দিয়ে তিনি প্রায় মহাপুরুষ। শেষের প্যারাগ্রাফে লেখা রয়েছে ওঁর সুযোগ্য পত্নী মিসেস নোরা চৌধুরীও একজন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা। স্বামি-পরিত্যক্ত নারীদের জন্ম গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে 'হোম' খুলেছেন, ইনি তার একজন পরিচালিকা। উনি নাকি বিচারপতি বসন্ত হাজরার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

পড়ে হাসতে পারলাম না। কারণ আমি জানি আগামী কাল পরেশদা'র এই পরিচয়ই বাঙালী জাতের কাছে সত্য হয়ে উঠবে। পারুলদি' পাগলই প্রতিপন্ন হবেন।

দুপুরে পারুলদি'র কাছে যাবার কথা ছিল কিন্তু বাড়ীর কাজে হঠাৎ দু'দিনের জন্ম চুঁচুড়া যাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিন দুপুরে ফিরে দেখি, পারুলদি'র কাছ থেকে একটা চিঠি এসে পড়ে আছে।

"পণ্ট,

ভয় পেলে ভাই? সত্যিই কি আর নিজের বোঝাটা তোমার উপর চাপাতাম? না ভাই, নিজের জন্ম আর কাউকে কখনও কষ্ট দেব না। দেখলাম, পৃথিবীতে আমার সত্যি কেউ নেই। তোমরা সুখী হও—দিদির আশীর্বাদ।

তোমার পারুলদি'।'

তাড়াতাড়ি করে দমদমে গিয়ে দেখি, বাড়ীর গেটে পুলিশ। কি ব্যাপার! উদ্বিগ্ন ভাবে ভিতরে প্রবেশ করতেই পরেশদা'র সঙ্গে মুখোমুখি।

: কি হে পণ্টু, কার কাছে খবর পেলে?

: কিসের খবর?

: তোমার পারুলদি' কাল রাত্রে মারা গেছেন। একসেনট্রিক মেয়েমানুষ। মাথার দোষ। এ আমি জানতাম। যাক, তুমি এসেছ ভালই হল। দিদির সংকারটা ছোট ভাইকেই করতে হবে। কিছু লোকজন জোগাড় করে আনো।

: পারুলদি' মারা গেছেন!

চাপা-গলায় পরেশদা' বললেন: হ্যাঁ সুইসাইড। ভাববার কিছু নেই। পুলিশ পাশ করে দিয়েছে। এই নাও একশ' টা টাকা। ভাল করে সাজিয়ে-গুজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যেও। আমার কর্মচারী দুই একজন রইল। তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আবার এখনই একটা জরুরী এনগেজমেণ্ট আছে রাজভবনে! চলি, কেমন? কাল এসো। শ্রাদ্ধ-পিণ্ডির ব্যবস্থা করতে হবে তো।

তাড়াতাড়ি তিনি মোটরে গিয়ে উঠলেন।

অভিযান

মাধুরী রায়

["অভিযান" নাটকটির আখ্যানবস্তু কলহন বিরচিত "রাজতরঙ্গিণী" থেকে নেওয়া হ'য়েছে। যে কয়টি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করা হ'য়েছে, তাদের উদ্দেশ্য মূল চরিত্রের বিকাশ সাধন করা, সত্যের অপলাপ নয়। —লেখিকা]

প্রস্তাবনা

বহু শতাব্দীর আগের কথা। বল-দর্পিত কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় মগধ, কনৌজ, মালব, গুর্জরাট, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত পদানত ক'রে বিদ্রোহী গৌড়ের উদ্ধত মস্তককে আনত করবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু বেপরোয়া দেশটার সঙ্গে মুখোমুখি শক্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে হয়তো বা সন্দেহ জাগলো, তাই তিনি বীরের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ছলের পথ ধরলেন। গৌড়েশ্বরকে আমন্ত্রণ জানানো হোল কাশ্মীর পরিদর্শনে, গৃহদেবতা পরিহাস-কেশবের নামে নিরাপত্তার শপথ জানালেন মুক্তাপীড়। সরল গৌড়েশ্বর নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করলেন কাশ্মীরে। ত্রিগামীতে পৌঁছাতেই খ'সে পড়লো ছদ্মবন্ধুর ভণ্ডামীর মুখোশ। মুক্তাপীড়ের নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারালেন গৌড়ের অধীশ্বর।

এই নিদারুণ বার্ত্তা গৌড়ে এসে পৌঁছালো। সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েশ্বরের ক্ষুদ্র দেহরক্ষী দল মৃত্যুপণ ক'রে যাত্রা করলো এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে। শ্রীনগরের পথে এক দিন তাদের দেখা গেল তীর্থযাত্রীর বেশে। এই নব-তীর্থযাত্রী দল পথের দুর্গম বাধাকে মানেনি, দুর্দ্দিনের অশ্রুজল-ধারা মাথা পেতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তারা মৃত্যুর অভিসারে। তারা জানতো আর ফিরবে না, কিন্তু তবু তারা এসেছিল সুদূর বঙ্গ থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, গৌড়বাসীরা কোন দিন অন্যায়কে নির্ব্বিবাদে মেনে নেয় না—সে অন্যায়কারী মানুষই হোক, বা দেবতার প্রতিভূই হোক্। তাই পরিহাস-কেশবের মূর্ত্তিকে চূর্ণ ক'রে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই অসম সাহসিকের দল। মুহূর্ত্তে দেববিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়লো; সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কাশ্মীরী সৈন্য এসে ঘিরে ফেললো মন্দির-প্রাঙ্গণ। তবু গৌড়ের সেই মর্য্যাদা-বাহকেরা হার মানলো না, শেষ নিশ্বাস ফেলবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তারা তাদের প্রতিবাদ জানিয়ে গেল অসির ঝনৎকারে। কিন্তু হায়, মৃত্যুপণে যে দেবমূর্ত্তিকে তারা ধূলায় মিশিয়ে দিল, জেনে গেল না যে তা পরিহাস-কেশবের বিগ্রহ নয়, সে মূর্ত্তি রামস্বামী বিষ্ণুর।

এই রক্তাক্ত ইতিহাস কাশ্মীর ও গৌড়ের মধ্যে সৃষ্টি করলো তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষের অকূল সমুদ্র। মুক্তাপীড়ের অন্তমিকা যে অন্যায়ের সৃষ্টি ক'রেছিল তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না কাশ্মীরের অগণিত জনসাধারণের। তবু বিদ্বেষ-বিষ সংক্রামিত হোল অগণিত হৃদয়ে,—গৌড় হোল শত্রুরাজ্য।

এমনিই হ'য়ে থাকে, এমনিই হ'য়ে আসছে চির কাল। জনসাধারণের অজ্ঞতা আর সরলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাদর্পীরা এমনি ক'রেই রচনা করে থাকে ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়গুলি।

তার পর চলে গেছে আরও কত কাল। মুক্তাপীড়ের মৃত্যু হয়েছে, সংকুচিত হয়ে এসেছে তাঁর রাজ্যের আয়তন। এমন দিনে সমগ্র কাশ্মীর আবার এক দিন উৎসব-মত্ত হয়ে উঠলো, আনন্দের সাড়া জাগলো দিকে দিকে: মুক্তাপীড়ের পৌত্র তরুণ জয়াপীড় অভিষিক্ত হবেন কাশ্মীরের সিংহাসনে। কিন্তু কাশ্মীরীদের প্রাণপ্রিয় এই তরুণ কুমারের খেয়ালের অন্ত নেই। সহসা উৎসব-আনন্দ বন্ধ হয়ে গেল নবীন অধিপতির আদেশে। প্রাসাদের ভোগ-বিলাসময় জীবনকে পশ্চাতে রেখে সুরু হোল তাঁর নব-অভিযান।

১ম দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীর রাজপ্রাসাদের উদ্যান।

কাল—অপরাহ্ন।

(কাশ্মীরের তরুণ অধিপতি জয়াপীড় মর্ম্মর বেদীতে বসিয়া বন্ধু সুমিত্রের সহিত কথা বলিতেছে)

সুমিত্র। বন্ধু, সত্যিই তুমি সবাইকে অবাক করেছ! বুড়ো মন্ত্রীমশাই তো রীতিমতো চ'টে গেছেন। আর চটবার কথাও। কাঞ্চী, কোশল, মগধ থেকে সুরু ক'রে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের এমন একটি বড় রাজ্য বাকি নেই, যেখানকার রাজকন্যাদের সঙ্গে তোমার বিবাহ-প্রস্তাব আসেনি! অথচ তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ,—বিয়ে করবো না।

জয়াপীড়। (সহাস্যে) মূলেই তুমি ভুল ক'রে ব'সে আছ বন্ধু! প্রথমতঃ, সব রাজ্য প্রস্তাব পাঠায় নি, অন্ততঃ গৌড় পাঠায়নি। আর দ্বিতীয়তঃ, বিয়ে করবো না ব'লে পণ কিছু করিনি আমি। আমি শুধু ব'লেছি যে, রাজা হ'য়ে কায়েমী আসনে বসবার আগে নিজের যোগ্যতাকে আমি যাচাই ক'রে নেব। একটা দুঃসাহসিক অভিযানের ঝড়-ঝঞ্ঝায় নেমে আমি দেখতে চাই যে, আমার মধ্যে এমন শক্তি সত্যিই আছে কি না—যার বলে আমি কাশ্মীরের এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের অধিনায়কের পদ দাবী করতে পারি। আর দশটা রাজার মত ভোগবিলাসের জীবন আমি ঘৃণা করি সুমিত্র!

সুমিত্র। অদ্ভুত সব খেয়াল তোমার জয়াপীড়! কিন্তু প্রবল-পরাক্রান্ত যে রাজাধিরাজের পদতলে আসমুদ্র-হিমাচল নতি জানিয়েছিল সেই বীরশ্রেষ্ঠ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের বংশধরের শাসন-যোগ্যতা আছে কি না, তার জন্য শক্তিপরীক্ষা দিতে হবে? এ যে নিতান্ত হাস্যকর কথা!

জয়াপীড়। পূর্ব্বপুরুষের মহিমা নিয়ে গর্ব্ব ক'রে যারা নিজেকে বড় হওয়ার পথ থেকে সরিয়ে রাখে, আমি তাদের দলের নই সুমিত্র!

সুমিত্র। বেশ, তোমার এ অভিযানের রূপটা কেমন হবে তার একটু আভাস পেতে পারি কি? (সহাস্যে) তা হোলে মরচে-ধরা তরোয়ালটায় নূতন ক'রে শাণ দিয়ে নিই।

জয়াপীড়। শাণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না বন্ধু, এ যে হবে আমার নিঃসঙ্গ অভিযান।

সুমিত্র। (বিস্ময়ে) এবার আমাকেও তুমি অবাক করলে

বন্ধু! (একটু থামিয়া) তুমিও কি বুদ্ধদেবের মত নূতন কোন সত্য প্রচার করবে না কি?

জয়াপীড়। (সহাস্যে) না হে বন্ধু, না। নিতান্ত সাধারণ মানুষ আমি, সাধারণের মাঝেই হবে আমার অভিযান। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) আমার পরিকল্পনার কথা তোমাকে খুলে বলছি সব, কিন্তু তার আগে তোমায় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সে কথা কাউকে বলতে পারবে না,—প্রাসাদের পুরজনদের না, রাজ্যের প্রধানদেরও না।

সুমিত্র। (জয়াপীড়কে স্পর্শ করিয়া) বেশ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

জয়াপীড়। সুমিত্র, আমি গৌড়ে যাবো।

সুমিত্র। (চমকাইয়া) গৌড়ে?—শত্রুর দেশে? জয়াপীড়, তুমি কি—

জয়াপীড়। (বাধা দিয়া সহাস্যে) না বন্ধু, পাগল হইনি। (গম্ভীর ভাবে পদচারণা করিতে করিতে) গৌড় দেখবার সাধ আমার বহু দিনের। তাল-তমাল-বেষ্টিত সে স্নিগ্ধশ্যামল ভূমি আমার কৈশোরের সমস্ত স্বপ্নকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। আজও যখন কোন উৎসব-সন্ধ্যায় পরিহাস-কেশবের মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াই, তখনই আমার মনে প'ড়ে যায় সেই দুর্জ্জয় বীরদলের কথা—যারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে ছুটে এসেছিল এত দূর। পথের বাধা-বিঘ্ন তারা মানেনি, অগণিত কাশ্মীরীর অস্ত্রকে তারা অবহেলা ক'রেছে। মুক্তাপীড়ের দম্ভ আর অচল যে দেবতার নামে মিথ্যা শপথ হয় তার মিথ্যা মহিমাকে একই আঘাতে তারা ধূলিসাৎ করতে চেয়েছে। সবাই বলে বঙ্গভূমি পলিমাটির দেশ, কিন্তু সে নরম জমিতে এমন অদ্ভুত বীরত্বের জন্ম কি করে হয়, সে আমার কাছে এক পরম বিস্ময়! (আবেগ ভরে সুমিত্রের হাত জড়াইয়া ধরিয়া) ওদেশে আমি যাবোই সুমিত্র!

সুমিত্র। (হাত ছাড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে) বেশ, তা হোলে সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জার আদেশ দাও। প্রমাণ হ'য়ে যাক্ যে এই কাশ্মীর—যার নীল পাহাড়, নীল হ্রদে নীলকান্ত মণির দীপ্তি, যার বাতাস লবঙ্গফুলের গন্ধে মদির, যার অঙ্গন আঙুরলতায় আচ্ছন্ন, যার ইতিহাস বীরশ্রেষ্ঠদের বিজয় গৌরবে উজ্জ্বল, সেই স্বর্গভূমির অধিবাসীরা বেশী বীর, না সুদূর পূবের কোন এক জলাভূমির অর্দ্ধ-অনার্য্যরা বেশী বীর।

জয়াপীড়। তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছ সুমিত্র! মনে রেখো, যে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ প্রতিবেশীর উপর পীড়ন করতে শেখায় তা দেশপ্রেম নয়, বীরত্বও নয়। পিতামহ মুক্তাপীড় গৌড়েশ্বরকে মিথ্যা আশ্বাসে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁকে হত্যা ক'রে শুধু নিজের বীরত্বে নয়, সমস্ত কাশ্মীরী জাতির ললাটে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আমি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, আমি জগতকে দেখাতে চাই যে, সকলে যতটুকু জেনেছেন ততটুকুই কাশ্মীরীদের আসল পরিচয় নয়।

সুমিত্র। (অনুতপ্ত ভাবে) আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু!

জয়াপীড়। (সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া) ছি, ছি, ক্ষমার কথা কেন বলছো? তুমি যে আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। তাইতো সে কথা সবাইর কাছে গোপন করেছি, সে কথা একমাত্র তোমার কাছেই গোপন করা চলবে না। রাজ্যের সবাই যখন জানবে তাদের নূতন রাজা আজও খেয়ালে মৃগয়া অভিযানে বেরিয়েছে তখন একমাত্র তুমিই জানবে যে জয়াপীড়ের অভিযান গৌড়ের পথে।

সুমিত্র। আমি কি তোমার এ অভিযানের সঙ্গী হোতে পারি না?

জয়াপীড়। তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না সুমিত্র! আমার এ অভিযানে তোমাকে নিতে চাইছি না শুধু এই কারণে যে, আমি জানি তুমি সঙ্গে গেলে তোমার ভালোবাসা, তোমার শৌর্য্য দিয়ে সব-কিছু বিপদ থেকে আমাকে তুমি আড়াল করে রাখবে। তা হোলে তো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না?

সুমিত্র। (দুঃখিত ভাবে) বেশ, নাই বা আমায় সঙ্গে নিলে। (কোষ হইতে খড়্গ খুলিয়া) কিন্তু আশা করি, আমার দেওয়া এ খড়্গখানা সঙ্গে নিতে অস্বীকার করবে না? এটি আমার পিতৃদত্ত অস্ত্র, আমার কাছে পরম পবিত্র বস্তু। এ অস্ত্র বহু যোদ্ধার মান রেখেছে। আজ আমার পরম বন্ধুকে দিচ্ছি শুধু তার আত্মরক্ষার জন্য নয়, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যও।

জয়াপীড়। (স্মিতমুখে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া) তুমি অভিমান করেছ সুমিত্র, আমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কাও জেগেছে তোমার মনে। কিন্তু তুমি তো জান, তোমার বন্ধু ভীরু নয় আর নির্ব্বোধের মত

চরিত্র

পুরুষ

জয়াপীড়	কাশ্মীরের তরুণ অধিপতি।
সুমিত্র	জয়াপীড়ের বন্ধু।
জয়ন্তদেব	গৌড়ের অধিপতি।
চিরঞ্জীব	গৌড়ের গুপ্তচর-বিভাগের অধ্যক্ষ।
প্রতিহারী	
১ম নাগরিক, ২য় নাগরিক, ৩য় নাগরিক	গৌড়ের নাগরিকবৃন্দ।
গ্রামবাসী	নন্দনপুরের অধিবাসী।
উদাসী বা বাউল	

স্ত্রী

সুচিত্রা	গৌড়ের রাণী।
কল্যাণী	গৌড়ের রাজকন্যা।
বাসন্তী, মালিনী, চিত্রা	কল্যাণীর সখীবৃন্দ।
কমলা	প্রধানা দেবদাসী।
ভবানী, ছায়া	কমলার সহচরী।
গ্রামবাসীর স্ত্রী,	তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী।

আত্মপরিচয়েও যাচ্ছি না আমি, আমি যাব সাধারণ এক বণিকের ছদ্মবেশে। তবু তোমার দেওয়া বন্ধুত্বের এ নিদর্শন আমি পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলাম, এ আমার যাত্রাপথের চিরসাথী হ'য়ে থাকবে।

২য় দৃশ্য

স্থান—গৌড়ের রাজপথ। কাল—সন্ধ্যা।

(এক দল নাগরিক একটি বাউলকে ঘিরিয়া গান শুনিতেছে। কেহ কেহ কিছুটা শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে, আবার নূতন পথচারী আসিয়া দাঁড়াইতেছে। গান আরম্ভ হওয়ার একটু পরে ছদ্মবেশী জয়াপীড়ের প্রবেশ ও মুগ্ধ ভাবে গীত শ্রবণ)

জয়াপীড়। (গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) বাঃ, কি চমৎকার! এ গানের নাম কি ভাই?

[গায়ক ও অন্যান্য পথচারীর একে একে প্রস্থান।

১ম নাগরিক। এ যে বাউল-গান, তাও জান না? তুমি বুঝি ভিনদেশী?

জয়াপীড়। হাঁ, এই দেশে আমি এই প্রথম এলাম। এখানে এসে যা দেখছি, যা শুনছি তা সবই এত ভালো লাগছে যে, মনে হয় যেন সমস্ত দেশটার সঙ্গেই আমি ভালোবাসায় প'ড়ে গেছি। কাল উজান বেয়ে মস্ত নদীটা পার হওয়ার সময় মাঝির মুখে শুনলাম ভাটিয়ালী গান আর আজ শুনলাম এই বাউল-গান, কি মধুর!

২য় নাগরিক। (১ম নাগরিককে) ভাটিয়ালী আর বাউল শুনেই এমন ডগমগ ভাব,—এ কোন্ দেশের লোক হে দাদা? (জয়াপীড়কে) তোমাদের দেশের লোকেরা কি গাইতে জানে না?

জয়াপীড়। গাইতে জানে, কিন্তু সে দরবারী গান। সে গান তাল-লয়ের বাঁধনে আটকে থাকে, পাষাণ দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফেরে তার আভিজাত্য। তানপুরা হাতে, পাগড়ি-আঁটা ওস্তাদজির মতই তার গুরু-গম্ভীর রূপ। এই উদাসী বাউল বা চাষী, মাঝিদের মত খোলা প্রাণের ভাষা তো তা নয়। তাই এমন সহজ সুরে, সহজ আনন্দে খোলা আকাশ-বাতাসে তা ছড়িয়ে পড়ে না।

১ম নাগরিক। বাঃ, বেশ সুন্দর ক'রে কথা বল তো তুমি, তোমার দেশ কোথায় ভাই?

জয়াপীড়। আমার দেশ? সে অনেক, অ—নেক দূরে, সে তুমি চিনবে না ভাই! কিন্তু তার আগে বলো তো আমায়, ওই যে পূব দিকে মস্ত দেউলদ্বারে শত শত সোনার প্রদীপ জ্বলছে, মণিখচিত ঝলমলে কপাটগুলি আকাশের চাঁদ-তারাকে পর্য্যন্ত লজ্জা দিচ্ছে,—ওখানে কিসের উৎসব?

১ম নাগরিক। ও যে কার্ত্তিকের মন্দির, ওখানকার উৎসব তো নিত্যকার। রোজ সন্ধ্যায় দেবদাসীদের নাচ-গান হয় ওখানে। আজ প্রধানা দেবদাসী কমলার আরতি-নৃত্য হবে। যাবে তুমি বিদেশী? চলো, আমরাও যাচ্ছি।

জয়াপীড়। (আপন মনে) কি অসঙ্কোচে এরা এক মুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণ অচেনাকে আপন ক'রে নিতে পারে! আশ্চর্য্য!

২য় নাগরিক। অত ভাবছো কি হে? ভয় পেয়ে গেলে না কি?

১ম নাগরিক। ভয় কেন পাবে? (জয়াপীড়কে) তুমি যে দেশেরই লোক হও না কেন ভাই, যে মুহূর্ত্ত থেকে তুমি গৌড়ভূমিতে পা দিয়েছ, সে মুহূর্ত্ত থেকেই তুমি আমাদের অতিথি। আজ পর্য্যন্ত গৌড় কোন দিন আতিথ্য-ধর্ম্মের অপমান করেনি। কাশ্মীররাজ এক দিন অতিথি গৌড়েশ্বরকে হত্যা করেছে, কিন্তু তবু গৌড় কোন দিন আতিথ্য-ধর্ম্মকে হত্যা করতে পারেনি। (জয়াপীড়ের পরিবর্ত্তিত মুখভাবে চমকাইয়া) ও কি বিদেশী! তোমার মুখ এমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল কেন? তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো?

জয়াপীড়। (বিবর্ণমুখে) না, অসুস্থ নয় ঠিক, একটু ক্লান্ত বোধ করছি। আর ভাবছি, রাতের আশ্রয়ের জন্য একটা পান্থশালার সন্ধান কোথায় পাবো।

১ম নাগরিক। ওঃ! সে জন্য তোমার এত ভাবনা? (২য় নাগরিককে) এই উদয়, তোর সেই কে আত্মীয় যেন একটা পান্থশালার মালিক?

২য় নাগরিক। (গম্ভীর ভাবে) তিনি যে আমার আপন শ্বশুরের সাক্ষাৎ ভায়রাভাই।

১ম। নাগরিক (সহাস্যে) ওই তো, তা'হোলে আর ভাবনা কি? উদয়ের আপন শ্বশুরের সাক্ষাৎ ভায়রাভাই-ই যখন র'য়েছেন। তা ছাড়া, আমাদের ঘরের দুয়ারও তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে। (নেপথ্যে আরতির বাজনা) ওই বুঝি আরতি সুরু হ'য়ে গেল। শীগ্‌গির চলো, চল রে উদয়।

[সকলের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

স্থান—কার্ত্তিকেয়ের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

কাল—রাত্রি।

(কমলা আরতি-নৃত্য করিতেছে। কমলার সখী ছায়া বিগ্রহের কাছে চামর দুলাইতেছে, ভবানী মাঝে মাঝে ধূপদানে ধূপ দিতেছে। প্রাঙ্গণে আসীন অন্যান্য ভক্ত দর্শকদের মধ্যে ১ম ও ২য় নাগরিকের সঙ্গে জয়াপীড়কে দেখা গেল। জয়াপীড় তন্ময় ভাবে নৃত্য দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর উদ্দেশ্যে পিছন দিকে ডান হাত বাড়াইয়া পরক্ষণেই চমকাইয়া উঠিয়া হাত গুটাইয়া অপরাধী ভাবে চারি দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে, ব্যাপারটা কেহ লক্ষ্য করিল কি না। কিন্তু জয়াপীড়ের অজ্ঞাতে এক জন তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল—সে দেবদাসী কমলা। নৃত্য শেষ হইল)

সমবেত ভক্তগণ। জয় কার্ত্তিকেয়ের জয়, জয় দেব-সেনাপতি! (প্রণাম ও একে একে প্রস্থান। নাগরিকদ্বয়ের সহিত জয়াপীড়ও প্রস্থান করিল। কমলা ক্লান্ত ভাবে বসিয়া পড়িয়া নূপুর খুলিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে উৎসুক ভাবে জয়াপীড়ের প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া পরে কি একটু ভাবিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল)

কমলা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ছায়া, শোন্?

(ছায়া চামর ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিতেছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া চলিয়া আসিল। ভবানী কাজের ফাঁকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল)

কমলা। নাগরিকদের সঙ্গে আজকে যে নূতন আগন্তুকটি এসেছিলেন তাঁকে লক্ষ্য করেছিলি?—দীর্ঘকায়, রক্ত-গৌরবর্ণ, হাতে মণিময় বালা?

ছায়া। লক্ষ্য করেছি বই কি, লক্ষ্যে পড়বার মতই চেহারা যে! পোষাক দেখে মনে হোল, উনি কোন বিদেশী বণিক হবেন।

কমলা। হ্যাঁ, শোন্, খুব দ্রুত পায়ে চ'লে যা, এই বিদেশীকে অনুসরণ করতে হবে। যেই মাত্র বিদেশীকে একলা পাবি তখনই তাকে বলবি,—হ্যাঁ, আমার নাম ক'রে বলবি যে দেবদাসী কমলা ভীষণ বিপদে প'ড়ে আপনার সাহায্যপ্রার্থী। কি বিপদ জানতে চাইলে বলবি যে তুই কিছু জানিস না। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা চাই। পারবি তো ?

ছায়া। কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো।

[প্রস্থান।

ভবানী। (কিছুটা আগাইয়া আসিয়া সবিদ্রূপে)—তোমার মহিমা তুমিই জানো গো! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিল) জয় কুমার, জয় ষড়ানন!

কমলা। (সহাস্যে) আমাকে বলছিস ভবানী!

ভবানী। (সবেগে মাথা নাড়িয়া) উঁহু।

কমলা। উঁহু বললে কি হবে। বুদ্ধিটা আমার আর দশ জনের চেয়ে অনেকটাই ধারালো। চোখেও যেমন ঝাপসা দেখি না, কানেও তেমন অস্পষ্ট শুনি না। আর এজন্যই তো কৌশল ক'রে ওই বিদেশী বণিককে ডেকে পাঠালাম। উনি কে, অনুমান করতে পারছিস কিছু ?

ভবানী। একেবারেই না।

কমলা। উনি ছদ্মবেশী কোনও রাজা বা রাজপুত্র।

ভবানী। কল্পনার দৌড়টা তোমার বড় বেশী।

কমলা। কল্পনা নয়, বাস্তব ছবিটাই আমার তোদের চেয়ে বেশী। বিদেশীর হাতে মণিখচিত বালা লক্ষ্য করেছিলি ?

ভবানী। মনে হোচ্ছে যেন দেখেছি, কিন্তু তাতেই তাকে রাজা ঠাওরাবার মত পাগলামী মনে জাগেনি। ধনী বণিক নানা দেশ থেকে গৌড়ে অহরহই আসছে, যাচ্ছে।

কমলা। কিন্তু তারা কি এমন মণিখচিত অলঙ্কার প'রে আসে ? যার তুল্য-মূল্যের একটি মণিও হয়তো গৌড়ের কোষাগারে মিলবে না। মণিমুক্তো সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে তাই এক পলকের দৃষ্টিতে বুঝে নিয়েছি যে, এগুলো শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্য।

ভবানী। (বিস্ময়ে) বল কি গো ?

কমলা। আরও লক্ষ্য করেছিস কি, বিদেশী কয়েক বার পিছন দিকে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বাড়িয়ে পরে চমকে উঠেছেন ?

ভবানী। এখন মনে হোচ্ছে হয়তো বা দেখেছি, কিন্তু তার আবার কি অর্থ আবিষ্কার করলে ?

কমলা। এই খানেই তোদের সঙ্গে আমার পার্থক্য ভবানী, তোরা শুধু চোখ দিয়েই দেখিস, সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়ে বিচার করিস না।

ভবানী। আরে তাই যদি পারতাম, তা হোলে তো আমরাও জনে জনে বিদুষী নাম কিনতাম,—তোমার কদরও তা হোলে ক'মে যেত। কিন্তু সত্যিই বল তো পিছন দিকে হাত বাড়ানোর মধ্যে কি অর্থ আবার তুমি দেখতে পেলে ?

কমলা। (বিরক্তিভরে) গৌড়েশ্বরের রাজসভায় কি কোন দিন যাসনি ? দেখিস নি কি পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা তাম্বুল-করঙ্কবাহিনীর দিকে উনি হাত বাড়িয়ে দেন বার বার পাণ-মশল্লা নেওয়ার জন্য ?

ভবানী। (গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গিতে) তাই তো গো, কি বুদ্ধি তোমার! এ তো তবে রাজা না হ'য়ে যায় না। রাজার মত চেহারা, রাজার মত অভ্যাস, রাজার মত গহনা,—এ নির্ঘাৎ রাজা।

কমলা। আচ্ছা ভবানী, এ দেবদাসীর জীবন তোর ভালো লাগে ?

ভবানী। আরে বাবা, ভালো না লেগে উপায় আছে ? দেবতার শাপ লাগবে যে।

কমলা। ভবানী, তোর কি গঙ্গা দেবীর কথা মনে আছে ?

ভবানী। তা আবার নেই ? উনি তো এক সময়ে প্রধানা দেবদাসী ছিলেন, পঞ্চ গৌড় তাঁর রূপে গুণে মন্ত্রমুগ্ধ ছিল। তার পর এই তো সেদিন তাকে ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে দেখলাম।

কমলা। কিন্তু সেদিন সেই রূপহীনা জরাগ্রস্তের মৃত্যুশয্যার পাশে আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এক ফোঁটা চোখের জলও কেউ ফেলেনি একবার সেই শিল্পিশ্রেষ্ঠার মৃত্যুতে। ভবানী, এই তো আমাদের শেষ পরিণতি!

ভবানী। এ নিয়ে আর দুঃখ করে কি লাভ বলো ? এই-ই আমাদের অদৃষ্ট।

কমলা। কিন্তু ভবানী, মনে ক'রে দ্যাখ, হঠাৎ যদি তুই এ বন্দী-জীবন থেকে ছাড়া পাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাস, যদি কোনও দূর দেশের রাণীর সম্মান পেয়ে যাস তা হোলে কেমন হয় ?

ভবানী। কেন আমাদের রাজকন্যা কল্যাণী দেবীর স্বয়ংবর-সভা হবে না কি শীগ্‌গির ? কিন্তু শুনতে পাই, উনি না কি আবার পণ করে ব'সে আছেন বীর্য্যশুল্কা হবেন। খাঁটি বীরত্বের পরিচয় যে দেবে তারই গলায় মালা পরিয়ে দেবেন, তা সে রাজাই হোক বা চাষাই হোক।

কমলা। (অসহিষ্ণু ভাবে) ওরে না, না,—তা নয়। আর কল্যাণী দেবীর কি সখীর অভাব ? তোকে নিতে যাবেন কোন দুঃখে ? (একটু থামিয়া) আমি বলছি আমারই কথা। ধর ভাগ্যক্রমে হঠাৎ যদি কোন দেশের রাণীগিরি পেয়ে যাই ?

ভবানী। (বিপুল বিস্ময়ে) তুমি রাণী হবে ? ও মা, আমি কোথা যাবো গো ? আমি যে তা হোলে মহারাণী কমলার প্রধানা সখী হবো। (একটু থামিয়া কমলার কাছে আগাইয়া আসিয়া অনুনয়ের সুরে) কিন্তু সখী, তখন যেন আর নাচতে ব'লো না, কোমরের বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি।

কমলা। (হাসিয়া) ভালো ক'রে কিছু না বুঝেই চেঁচাতে সুরু করলি। (হঠাৎ দুয়ারের দিকে দৃষ্টি পড়িল) চুপ, ওই বুঝি ছায়া আসছে সেই বিদেশীকে সঙ্গে নিয়ে।

(ছায়া ও জয়াপীড়ের প্রবেশ)

জয়াপীড়। ভদ্রে, আপনি আমায় স্মরণ ক'রেছেন ?

কমলা। হ্যাঁ আর্য্য, আসন গ্রহণ করুন।

জয়াপীড়। কিন্তু বিপদের কোনও লক্ষণ তো এখানে দেখছি না, আপনার সহচরীও এ সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক্। আর আমি তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, এই দেশে সম্পূর্ণ নূতন আমি, কি ভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি!

কমলা। কেন, আপনার গোপন অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করেই তো সাহায্য করতে পারেন বিদেশী-রাজ! (জয়াপীড়কে চমকাইতে দেখিয়া) ও কি, চমকে উঠলেন যে ? আপনার ছদ্মবেশে ত্রুটি র'য়ে গেছে যথেষ্ট, রাজকীয় অভ্যাসগুলিও বদলাতে পারেন নি।

জয়াপীড়। (কিছুক্ষণ নত মস্তকে ভাবিয়া) বুঝতে পারছি আপনি অসামান্য চতুরা, কিন্তু জানবেন, শুধু অনুমানকে ভিত্তি ক'রে কোন কিছু সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত করা যায় না।

কমলা। কিন্তু আপনার হাতের ওই বালা দু'টি যদি গুপ্তচর বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তা হোলেও চরম সিদ্ধান্তের কিছু বাকি থাকবে কি ?

জয়াপীড়। (বিচলিত ভাবে উত্তরীয় দ্বারা বালা দু'টি ঢাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে অনুচ্চ স্বরে) এ আমার পিতৃদত্ত বালা, এ আমার খুলবার নিয়ম নেই, কোন মতেই খুলতে পারি না।

কমলা। (বিদ্রূপের স্বরে) ও কি, ভয় পেয়েছেন ?

জয়াপীড়। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া উচ্চস্বরে) জীবনে ভয়ের সঙ্গে 'পরিচয় আমার হয়নি। কোনও অন্যায় অভিপ্রায় নিয়েও আসিনি এদেশে।

কমলা। (ঈষৎ রুক্ষভাবে) কি অভিপ্রায় নিয়ে এসেছেন সে কৈফিয়ৎ নগররক্ষকের কাছে দেবেন। আর এ কথাও সবাই জানে যে, কোন মিত্ররাজ্যে ঢুকবার জন্য ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয় না। (ছায়ার দিকে ফিরিয়া) ছায়া, তূর্যধ্বনি নগররক্ষীদের সঙ্কেত জানা।

জয়াপীড়। (গমনোদ্যত ছায়াকে বাধা দিয়া) না, এখনি যেও না, একটু অপেক্ষা কর। (কমলার দিকে ফিরিয়া) যদিও আপনার এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ বুঝতে পারছি না, তবু মিনতি ক'রে বলছি যে, নগররক্ষকের হাতে আমাকে ধরিয়ে দেবেন না। তা হোলে যে মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি তা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

কমলা। (স্মিতমুখে, স্নিগ্ধকণ্ঠে) আপনি উত্তেজিত হবেন না, স্থির হ'য়ে বসুন। জানবেন, দেবদাসী কমলা আপনার সহায় থাকলে আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেলেও রক্ষী দল বা গুপ্তচররা কিছু করতে পারবে না। আপনি এখনি মুক্তি পেতে পারেন, কিন্তু সর্ত্ত-সাপেক্ষে।

জয়াপীড়। সর্ত্ত ?

কমলা। হ্যাঁ, দু'টি সর্ত্ত মানলে আপনি মুক্তি পেতে পাবেন। প্রথমটি হোল আপনার রাজ্যটির নাম প্রকাশ ক'রে আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করা। আর দ্বিতীয়টি হোল,—ভবানী, দ্বিতীয় সর্ত্তটি বুঝিয়ে বলতে পারবি ?

ভবানী (উচ্ছ্বসিত ভাবে) কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো। এতক্ষণে তোমার কথার সব মানে বুঝতে পেরেছি গো! (জয়াপীড়ের প্রতি) আর্য্য, দ্বিতীয় সর্ত্তটি হোল আপনাকে এখনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে যে আমাদের সখী কমলা দেবীকে আপনার রাজ্যের রাণীরূপে বরণ ক'রে নেবেন। (জয়াপীড় বিস্মিত ভাবে কমলার পানে তাকাইল) আরও আছে শুনুন, আমাকে রাণীর প্রধানা সখী করতে হবে, আর ছায়াকেও ছোটখাট একটা সহচরীর পদ বা অমনি কিছু ক'রে দিতে হবে। কি, রাজি ?

জয়াপীড়। (সবিস্ময়ে নতমুখী কমলার পানে চাহিয়া)। সত্যিই কি এসব আপনার সর্ত্ত ?

ভবানী। সত্য হ'য়ে থাকলেই বা এত অবাক হওয়ার কি আছে ?

জয়াপীড়। অবাক হবো না ? নগরীর শ্রেষ্ঠা শিল্পী, বিদুষী শ্রেষ্ঠা কমলা দেবী এক জন পরদেশীর কাছে শুধু নিজের সম্মানকেই হারাতে বসেন নি, সমগ্র গৌড়ের নারী-সমাজের গৌরবকে বিপন্ন করেছেন।

কমলা। (মুখ তুলিয়া অস্ফুট স্বরে, প্রায় নিজের মনে)। আমার সম্মানে গৌড়ের সম্মান ?

জয়াপীড়। (কমলার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ছায়ার কাছে গিয়া)—যাও, ডেকে আন তোমাদের নগররক্ষককে, প্রহরী দলকে,— আমি প্রস্তুত। কোন বীরত্বময় অভিযানে নিজের শক্তিকে যাচাই করবার সঙ্কল্প নিয়ে এ দেশে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগে নিজের পরিচয় প্রকাশ করবো না, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে সঙ্কল্প আমার ব্যর্থ হোতে চললো।

কমলা। (যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া তাড়াতাড়ি জয়াপীড়ের কাছে আসিয়া) আর্য্য, আপনি মুক্ত ! মনে করুন এতক্ষণ যা শুনেছেন তা দেবদাসী কমলার পরিহাস মাত্র, সত্য নয়। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ; যত দিন পর্য্যন্ত আপনি স্বেচ্ছায় নিজ পরিচয় গৌড়েশ্বরকে না দেবেন তত দিন পর্য্যন্ত আমি যে আভাসটুকু পেয়েছি আপনার পরিচয় সম্বন্ধে, তা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। আরও একটা কথা জেনে যান,—আমি যে দেবসেনাপতির দেবদাসী, সেই পরিচয়ই আজ থেকে হবে আমার শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব।

জয়াপীড়। (কমলাকে করযোড়ে নমস্কার জানাইয়া) আপনার এ পরিচয় আমার চিরদিন মনে থাকবে দেবি !

[প্রস্থান।

কমলা। (কিছুক্ষণ জয়াপীড়ের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া সহসা ব্যাকুল ভাবে ফিরিয়া) ওরে ভবানী, ওরে ও ছায়া, সমস্ত প্রদীপগুলি নিবিয়ে দে, আমি আজ অন্ধকারে বসে বসে দেবতার ধ্যান করবো।

(ছায়া ও ভবানী বিগ্রহের কাছের একটি প্রদীপ ছাড়া অপরগুলি নিবাইয়া দিতে লাগিল, ঘরটি অন্ধকার হইয়া আসিল। কমলা জানু পাতিয়া করজোড়ে মুদিত চোখে ধ্যানস্থ হইল)

৪র্থ দৃশ্য

স্থান—রাজপথ

কাল—প্রভাত

(কথা বলিতে বলিতে ১ম ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। তুই ঠিক শুনেছিস উদয় ! সত্যিই ঢাটড়া পিটিয়ে ঘোষণা ক'রেছে ?

২য় নাগরিক। ঠিক শুনিনি তো কি ? আমি কি একা শুনেছি ? (আঙ্গুলের কর গুণিয়া) আমি শুনেছি, আমার বউ শুনেছে, আমার শ্বশুর—

১ম নাগরিক। (বাধা দিয়া) থাক্ বাপু, থাক্, আর গুষ্টিগোত্রের হিসেব দিতে হবে না, আমি বিশ্বাস ক'রেছি। এখন ভালো ক'রে গুছিয়ে ঘোষণাটা কি, ব'লে ফাল্ তো ?

২য় নাগরিক। ঘোষণা ক'রেছে যে, নগরের উত্তর সীমান্তে হঠাৎ এক ভীষণ সিংহের উৎপাত সুরু হ'য়েছে। যে বীর সিংহটাকে মেরে জনপদবাসীর আতঙ্ক দূর করতে পারবে মহারাজ জয়ন্তদেব তাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

১ম নাগরিক। (সবিস্ময়ে) বিং শ তি স হ স্র ?

(৩য় নাগরিকের প্রবেশ)

৩য় নাগরিক। লাভের অঙ্কটা বেশী ব'লেই মনে হোচ্ছে না ? হ্যাঁ, তোমার আমার মত সাধারণ লোকের প্রাণের মূল্য কতই বা,—বড় জোর চল্লিশ, পঞ্চাশ মুদ্রা। আর চাষাভূষারা যদি কেউ এগিয়ে আসে তবে তো কথাই নেই, লাভের উপর লাভ, ওদের প্রাণের দাম আমাদের চেয়েও কম তো !

১ম নাগরিক। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল আবার। কতক্ষণ এর আবোল-তাবোল বকুনী চলবে কে জানে ? (৩য় নাগরিককে) অত লাভেরই যখন আশা, তখন এগিয়ে গিয়ে দেখলেই পার ! এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি ক'রে লাভ কি ?

৩য় নাগরিক। উঁহু, আমরা তো যেতে পারি না। মূল্যটা ধার্য্য হ'য়েছে রাজপুরুষদের, তারাই যাক্।

২য় নাগরিক। ওই ভাখো, কারা আবার মোটঘাট নিয়ে এদিক পানেই আস্ছে।

(মোটঘাট লইয়া গ্রামবাসী ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ। স্ত্রী মোট নামাইয়া ক্লান্ত ভাবে বসিয়া পড়িল)

স্ত্রী। আর পারছি না গো, দু'দিন দু'রাত ধরে হাঁটছি, তবু পথের যেন আর শেষ নেই !

গ্রামবাসী। আর কি, এই তো এসে গেছি,—এই তো গৌড়ের রাজপথ।

১ম নাগরিক। তোমরা কোথা থেকে এলে ভাই ?

গ্রামবাসী। সে কথা আর ব'লো না, সে—ঐ নন্দনপুর।

২য় নাগরিক। নন্দনপুর তো উত্তর-সীমান্তে, ওখানেই না সিংহের উৎপাত আরম্ভ হ'য়েছে ?

গ্রামবাসী। শুধু আরম্ভ হওয়া ! শেষ ক'রে আনলো সব। নন্দনপুর, ভদ্রেশ্বর, দেবনগর,—দশ-বারোটা গ্রাম যে শ্মশান হ'য়ে গেল,—ঘরে বাতি দিতে লোক নেই।

১ম নাগরিক। বল কি হে, এত লোক মেরেছে, মেরেছে তো আট-দশ জনকে, আর সব তো পালিয়েছে।

২য় নাগরিক। গ্রামরক্ষীরা কি করছে ?

স্ত্রী। তারা আর কি করবে বলো ! এ যে সাক্ষাৎ দেবীদুর্গার বাহনটি গো ! তা নইলে সেই যে এক রাতে রক্ষীরা সব বর্শা ছুঁড়ে মেরেছি মেরেছি ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো তখন সবাই মশাল জ্বেলে গিয়ে দেখলো—কোথায় বা সিংহ, কোথায় বা কি, রামদাস রজকের গাধাটা ছটফট করছে। দৈবী ব্যাপার না হোলে এমন হয় ?

(৩য় নাগরিক হাসিয়া উঠাতে সকলে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল)

গ্রামবাসী। এ কি, তুমি হাসছো যে ?

৩য় নাগরিক। হাসছি এই ভেবে যে, যেখানে গুটি-কয় শেয়াল পাঠালেই চলতো সেখানে মা দুর্গা কষ্ট করে বাহনটিকে না পাঠালেও পারতেন।

স্ত্রী। মানুষের বিপদ নিয়ে ঠাট্টা করে, এ আবার কেমন ধারার লোক গো ?

১ম নাগরিক। ওর কথা ধ'রো না, ও পাগল।

৩য় নাগরিক। সংসারে সত্য কথা বলার মজাই এইখানে—পাগল বল্তে হয়।

২য় নাগরিক। ও খুড়ো, অত বাজে ব'কে লাভ কি ? তার চেয়ে তুমি বরং ঘুমিয়ে থাক গিয়ে।

৩য় নাগরিক। হাঁ, তাই যাই। না ঘুমিয়ে আর করবো কি, সমস্ত দেশটার আবহাওয়াই যে প্রচুর নিদ্রারসে ভরা। তবে মাঝে মাঝে না কি আবার বেখাপ্পা রকমের ঝড়ো হাওয়া বয়, তখন না কি দাবানলের আগুনও জ্বলে ওঠে কিন্তু সে আর আমার চোখে পড়লো না। [প্রস্থান।

(খড়্গ হস্তে জয়াপীড়ের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। এ কি বিদেশী, কোথায় যাচ্ছ ?

জয়াপীড়। কেন, ঘোষণা শোননি ? নন্দনপুর যাচ্ছি।

গ্রামবাসী ও স্ত্রী। (সমস্বরে) নন্দনপুর ?

১ম নাগরিক। (জয়াপীড়ের হাত ধরিয়া) তুমি পাগল হয়েছ ? এই এরা সব নন্দনপুর থেকে পালিয়ে এসেছে। ওখানকার সমস্ত জনপদ শ্মশান হয়ে গেছে, রক্ষীরা পর্য্যন্ত ভয়ে দিশাহারা। আর সেখানে তুমি একা এই একটিমাত্র অস্ত্র সম্বল ক'রে যেতে চাইছ কোন্ সাহসে ?

জয়াপীড়। আমাকে বাধা দিও না ভাই ! আমার জীবনে পরম লগ্ন এসেছে, এ সুযোগকে আমি হারাতে পারি না কোন মতেই।

(হাত ছাড়াইয়া প্রস্থানোদ্যত)

২য় নাগরিক। (ডাকিয়া) ওহে, ও বিদেশী বীর, পুরস্কারের লোভে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যাচ্ছ যাও, আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি পুরস্কারটা পেয়েই যাও, তখন যেন আমাদের কথা ভুলে যেও না।

জয়াপীড়। (ফিরিয়া তাকাইয়া) কিন্তু আমি যে পুরস্কারের লোভে যাচ্ছি তা তো ভাগ করে দেওয়ার নয়, তাকে শুধু অনুভবে বুঝতে হয়।

[প্রস্থান।

স্ত্রী। আহা, কার বাছা রে ! বিদেশে বেঘোরে প্রাণটা হারাবে !

[পট পরিবর্ত্তন]

৫ম দৃশ্য

স্থান—গৌড়ের প্রাসাদকক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

(রাজা জয়ন্তদেব রাণী স্মিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন এবং পরে আসন গ্রহণ করিলেন। তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।)

জয়ন্ত। সেই তো মুস্কিল হ'য়েছে স্মিতা, সিংহটাকে হত্যা করার দাবী শুধু এক জন দু'জন করছে না, করছে অনেকেই। যে কাহুরিয়ারা মৃত পশুটাকে বহন করে এনেছে, তারা বলছে যে তারাই দলবদ্ধ ভাবে সিংহটাকে হত্যা ক'রেছে। আবার নন্দনপুরের গ্রামরক্ষী দলের অধিনায়ক বলছে, তার অস্ত্রেই সিংহটার মৃত্যু ঘটেছে। পরে আবার শোনা গেল, মল্লবীর নাগাদিত্যই না কি পশুটাকে নিহত করেছে।

সুহিতা। পরম-ভট্টারকের গুপ্তচর বিভাগ কি ঘুমিয়ে আছে?

জয়ন্ত। না না, তাদের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। তাদের উপরেই ব্যাপারটা সমাধানের ভার প'ড়েছে, আর তারা যে তা যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করবে এ বিশ্বাসও আমার আছে। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এই যে প্রতিহারী, কি সংবাদ?

(প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

প্রতিহারী। মহারাজ, গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ চিরঞ্জীব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

জয়ন্ত। তাকে এইখানে আসতে বলো।

[প্রতিহারীর অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

(চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

জয়ন্ত। কি সংবাদ চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। মহারাজ, সমস্ত রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, প্রকৃত বীরের সন্ধানও আমরা পেয়েছি।

জয়ন্ত। সব ঘটনা খুলে বল।

চিরঞ্জীব। আমাদের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে সকলেই একে একে স্বীকার করতে বাধ্য হোল যে, তারা কেউ সিংহটার নিধনকারী নয়। কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটতে গিয়ে মৃত অবস্থায়ই সিংহটাকে আবিষ্কার করে। সে যা হোক্, এদিকে গুপ্তচর প্রসেনজিৎ যখন পশুটার অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন পরীক্ষা করছিল তখন হঠাৎ তার মুখবিবর থেকে বেরিয়ে পড়লো একটি মণিময় বালা। (বস্ত্রখণ্ড জড়িত বালা খুলিয়া দেখাইল)

রাজা ও রাণী। (সমস্বরে) মণিময় বালা!

চিরঞ্জীব। হাঁ, আর এই বালাতেই দেবভাষায় অধিকারীর নাম খোদিত আছে—যা থেকে তার পরিচয়ও প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে।

জয়ন্ত। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে) দেখি, দেখি? (বালা লইয়া এক মুহূর্ত্ত দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন ও পরে চিরঞ্জীবকে প্রত্যর্পণ করিলেন) জয়াপীড় বিনয়াদিত্য! সে কি, কাশ্মীরের নবীন অধিপতি আমার রাজ্যে?

চিরঞ্জীব। হাঁ মহারাজ! ইতিমধ্যে নাগরিকদের সাহায্যে তাঁকে আহত অবস্থায় ধরে ফেলাও সম্ভব হ'য়েছে। এখন কি আদেশ, তাই জানতে এসেছি।

জয়ন্ত। এখনই ওঁকে রাজোচিত মর্য্যাদায় প্রাসাদে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।

চিরঞ্জীব। কিন্তু মহারাজ, উনি শত্রুরাজ্যের অধিপতি, সন্দেহ জনক তাঁর এই ছদ্মবেশে আগমন!

জয়ন্ত। সন্দেহ জিনিষটাকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে তোমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিকেও তা আচ্ছন্ন করেছে চিরঞ্জীব! শত্রুতাকে বংশানুক্রমিক ভাবে পুষে রাখা মহতের লক্ষণ নয়; আমি শুনেছি কাশ্মীরের এই তরুণ অধিপতি মহানুভব। তুমি যাও, আমার আদেশ পালনের ব্যবস্থা কর।

(অভিবাদন করিয়া চিরঞ্জীব প্রস্থানোদ্যত, জয়ন্ত তাহাকে আবার ডাকিলেন)

জয়ন্ত। হ্যাঁ, আমার আরেকটি আজ্ঞা শোন। ভিষগাচার্য্যকে এখনই প্রাসাদে উপস্থিত হবার নির্দেশ জানাবে।

চিরঞ্জীব। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। (চঞ্চল ভাবে পদচারণা করিতে করিতে নিজ মনে) জয়াপীড় আমার রাজ্যে, ছদ্মবেশে! কিন্তু কেন?

সুহিতা। আর্য্যপুত্র, আপনি খুবই বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছেন।

জয়ন্ত। হবো না সুহিতা, এই নিয়ে মস্ত একটা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হোতে পারে।

সুহিতা। সে পরিবর্ত্তনটা শুভের দিকে হওয়াই তো সম্ভব। নইলে প্রকৃতই যদি কাশ্মীর-রাজের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য থাকতো তাহোলে গৌড়ের খবরাখবর নেওয়ার জন্য সাধারণ গুপ্তচরদেরই উনি পাঠাতেন। এত বড় বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে নিজে আসতেন না।

জয়ন্ত। সে কথা সত্য মহাদেবি, কিন্তু তবু মনে নানা প্রশ্ন জাগে। চিরঞ্জীবের মত সন্দেহ নয়, প্রশ্ন।

(প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

প্রতিহারী। মহারাজ! তোরণদ্বারে কাশ্মীররাজ পরম-ভট্টারক জয়াপীড় বিনয়াদিত্য উপস্থিত হ'য়েছেন।

জয়ন্ত। তাঁকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো।

(অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান ও জয়াপীড়কে লইয়া পুনঃ প্রবেশ। জয়াপীড়ের দক্ষিণ স্কন্ধে রক্তাক্ত উত্তরীয়ের খণ্ড জড়ানো। জয়াপীড়ের প্রবেশ মুহূর্ত্তে রাণী অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে রাজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল)

জয়ন্ত। (প্রসারিত হস্তে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া) কাশ্মীরের তরুণ অধিপতি, নিজ জীবন বিপন্ন করে যে বিভীষিকার হাত থেকে তুমি সবাইকে রক্ষা করেছ তার জন্য গৌড়বাসীদের হয়ে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই। (রাণীর দিকে ফিরিয়া) মহাদেবি, অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে চলো।

সুহিতা। সুস্বাগতম্ কাশ্মীররাজ! (তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী রাণীর ইঙ্গিতে আগাইয়া আসিলে তাহার পাত্র হইতে মাল্য-চন্দন লইয়া বরণের উদ্যোগ)

জয়াপীড়। (সবিনয়ে পিছু সরিয়া) আমাকে মার্জ্জনা করবেন। যদি আমি এ অভ্যর্থনার যোগ্য না হয়ে থাকি, যদি আমার কোন গূঢ় অভিসন্ধি থেকে থাকে?

জয়ন্ত। তবে সে বিচার আমি রাজসভায় করবো, এখানে নয়। এখানে আমার পরিচয়, আমি গৃহী, এখানে গৃহীরূপে আমার কর্ত্তব্য ক্লান্ত অতিথির পরিচর্য্যা করা, তাঁর অভিসন্ধি নিয়ে বিতর্ক নয়।

জয়াপীড়। মহারাজ! আমি হার মানলাম। ভেবেছিলাম, স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে আমার এ অভিযানের কথা আপনাকে জানিয়ে অতীতের তিক্ততার কথা ভুলে যেতে অনুরোধ করবো কিন্তু ছদ্মবেশ আমার ধরা পড়ে গেল। বাইরের ছদ্মবেশ যারা ধরে ফেলেছে কৃতিত্ব তাদের নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য আপনার বিশ্বাসের দৃষ্টি, এক নিমেষেই আমার মনের সত্য রূপকে তা চিনে ফেলেছে।

(চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

চিরঞ্জীব। মহারাজ ভিষগাচার্য্য চিকিৎসার আনুষঙ্গিক নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

। কাশ্মীররাজ, তোমার চিকিৎসা ও বিশ্রামের প্রয়োজন, তার পর তোমার অভিযানের উদ্দেশ্য শুনবো।

জয়াপীড়। না, না, মহারাজ আমাকে আগে শেষ করতে দিন। এখন আর আপনার কাছে সব কথা খুলে বলতে বাধা নেই। (একটু থামিয়া) অতীতে গৌড়ের প্রতি যে অবিচার হয়েছিল তার ফল ভোগ কাশ্মীরও ক'রেছে। গৌড়বাসীরা সহ্য ক'রেছে বেদনা আর কাশ্মীরীরা ভোগ ক'রেছে কলঙ্কের হীনতা। তাই অভিষেকের পরেই বেরিয়ে পড়লাম অতীতের সেই ভুলের ইতিহাসের রূপ বদলে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। হয়তো কাশ্মীরের অধিপতিরূপে আপনার সঙ্গে মিত্রতা সূচক কূটনৈতিক বন্ধন স্থাপন করা চলতো, কিন্তু তাতে অন্তরের যোগসূত্র গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হোত না। তাই ছদ্মবেশের প্রয়োজন হোল। ভাবলাম, আমার এ নব অভিযানে গৌড়ের হৃদয় জয় করবো, আর সঙ্গে সঙ্গে যাচাই ক'রে দেখবো নিজের শক্তি ও মনোবলকে। তাই নিঃসঙ্গ বেরিয়ে পড়লাম।

জয়ন্ত। তুমি সম্পূর্ণ জয়ী হ'য়েছ জয়াপীড়, জয়যুক্ত হয়েছে তোমার ভালোবাসার অভিযান। কিন্তু এত পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। একের অপরাধে অপরকে দায়ী করবার মত সঙ্কীর্ণতা গৌড়বাসীদের নেই।

জয়াপীড়। এসে তাই দেখলাম। দেখলাম এদেশের মুক্ত নীল আকাশ আর উদার সবুজ মাঠের মত এদেশের লোকদের মনও সহজ-সুন্দর। বিদেশী অতিথিকে আশ্রয় দিতে তাদের কুটীর-দ্বার যেমন অবারিত থাকে তেমনি তাদের মহান অধিপতির প্রাসাদ-দ্বারও খুলে যায়; এমন কি তাকে শত্রুরাজ্যের জেনেও।

জয়ন্ত। আমার মনেও একটু দ্বিধা ছিল জয়াপীড়! কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার শোণিতসিক্ত ওই বাহুমূলে আমার দৃষ্টি পড়লো সে মুহূর্তেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হোল। বুঝলাম,—যে বাহু এক দিন আর্ত্ত জনগণের পরিত্রাণের জন্য উত্তোলিত হ'য়েছে তা কখনই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারে না। (চিরঞ্জীবের দিকে ফিরিয়া)—চিরঞ্জীব, রাজ-অতিথির যোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।

চিরঞ্জীব। (জয়াপীড়ের প্রতি) আসুন মহাভাগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়ন্ত। (রাণীর প্রতি)—মহাদেবি, তুমি কল্যাণীকে নিয়ে অতিথি পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করো। আর শোন, কল্যাণীকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রো তার সেই বীর্য্যশুল্কা হবার বাসনা এখনও অটুট আছে কি না।

[সুস্মিতার প্রস্থান।

জয়ন্ত। (আপন মনে) কাশ্মীররাজ, তোমার অভিনব অভিযানের মত অভিনব রূপেই আমি তোমাকে বন্দী করবো এবার।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বিশ্রামগৃহ। কাল—সন্ধ্যা।

(কল্যাণী একটি উঁচু বেদীতে বসিয়া ছবি আঁকিতেছে, পাশে বাসন্তী মালা গাঁথিতেছে, নীচের আরেকটি আসনে বসিয়া মালিনী বীণা বাজাইয়া মেঘমল্লার গাহিতেছে।)

(গান থামিয়া গেলে কল্যাণী তুলি ফেলিয়া দিল)

কল্যাণী। এই যা, কি করলাম।

মালিনী। কি হোল?

বাসন্তী। সখী অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের চিত্র আঁকতে গিয়ে তোর সুরের ধাক্কায় তাকে মেয়ে বানিয়ে ফেললো।

কল্যাণী। ভুল কি খুব বেশী ক'রেছি? দেশটা তো প্রায় প্রমীলার দেশ হ'য়েই দাঁড়িয়েছে, অর্জ্জুন কোথায়?

বাসন্তী। বল কি সখী? এদিকে বীরদের কোলাহলে যে রাজধানীতে কান পাতা দায় হ'য়েছে। পশুহত্যাকারী পশুপতির দল সব! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এ কি চিত্রা! এত উত্তেজিত ভাব তোর, কি খবর নিয়ে এলি রে?

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। ওরে বাসন্তী, ওরে ও মালিনী, সখীর পণ যে সফল হোতে চললো। তোরা শাঁখ বাজা, উলুধ্বনি দে।

বাসন্তী। ব্যাপারটা কি? খুলেই বল্ না।

চিত্রা। ওরে খুলে বলতেই তো মহাদেবী আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বলছি শোন্।

(মালিনী ও বাসন্তী চিত্রাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

চিত্রা। (কল্যাণীর উদ্দেশ্যে) শোন্ সখী—সে এক বিদেশী বীর, কন্দর্পের মত তাঁর রূপ, কার্ত্তিকের মত তাঁর শৌর্য্য, সেই নাকি সিংহটাকে হত্যা করেছে।

বাসন্তী ও মালিনী। তার পর?

চিত্রা। তার পর সেই ছদ্মবেশী বীরের পরিচয় প্রকাশ হ'য়ে পড়লো।

কল্যাণী। কে উনি?

চিত্রা। কাশ্মীরের তরুণ অধিপতি জয়াপীড় বিনয়াদিত্য।

কল্যাণী। সে কি!

চিত্রা। হ্যাঁ, আরও শোন; এই সিংহদমনকারী নাকি অতীতের শত্রুতার ইতিহাসটাকে মুছে দেওয়ার জন্য একক অভিযানে বেরিয়েছেন, এমনি তাঁর দুঃসাহস!

কল্যাণী। দুঃসাহস নয়, অপূর্ব্ব সাহস।

চিত্রা। মহাদেবী ও পরম-ভট্টারকের অভিমত এই যে, বীর বরণের এমন সুযোগ হয়তো জীবনে আর পাবে না।

কল্যাণী। তাঁদের অনুমান সত্য।

বাসন্তী। সে কি সখী? আমরা আরও ভেবেছিলাম কোনও দিগ্বিজয়ী বীর দিগ্বিজয় করতে করতে আমাদের সখী কল্যাণী দেবীকে এসে বিজয় ক'রে নিয়ে যাবেন।

কল্যাণী—শুধু বাহুবলকে যদি বীরত্বের নাম দিতে চাও, তবে তো বনের হিংস্র পশুরাই সব চেয়ে বড় বীর।

চিত্রা। এ কাশ্মীরী বীরের বাহুবলও কম নয়, কিন্তু সে শক্তি দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়, পীড়নের জন্য নয়-বীরের বাহুমূলে দেখবে তার রক্তাক্ত স্বাক্ষর।

(সুস্মিতার প্রবেশ)

সুস্মিতা। কল্যাণী, তোমার মতামত স্থির করবার অবকাশের জন্য আমি চিত্রাকে দিয়ে আগেই তোমাকে সব খবর পাঠিয়েছি। বল, তুমি পারবে কি, এ বীরের মর্য্যাদা রক্ষা করতে?

কল্যাণী। (নতমস্তকে) তুমি আশীর্ব্বাদ করো জননি !

সুচিত্রা। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি। (সখীদের দিকে ফিরিয়া) ওরে, তোরা রাজ-অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন কর।

[প্রস্থান।

(সখীরা ব্যস্ত ভাবে চিত্রের উপকরণ সরাইয়া বেদী সুসজ্জিত করিতে লাগিল। কঙ্কবাহিনী আসিয়া রৌপ্যথালে প্রদীপ ও ফুল-চন্দন রাখিয়া গেল। কল্যাণী থালা হইতে একটি লীলাকমল তুলিয়া লইল। এই সমস্ত কাজের ফাঁকে তাহাদের কথা চলিতে লাগিল)

বাসন্তী। তা হোলে প্রমীলার দেশে সত্যিই অর্জ্জুনের আবির্ভাব হোল ? (গাঁথা মালাটি তুলিয়া কল্যাণীকে পরাইয়া দিতে দিতে) আজকের মালা গাঁথা সার্থক হোল। নাও সখি, তোমার অর্জ্জুনের গলায় পরিয়ে দিও।

চিত্রা। কিন্তু কাশ্মীর দেশটা বড় দূর। তার চেয়ে আমি বলি কি সখি, দেশের কোন ছোট-খাট এক বীর—এই ধর মল্লবীর নাগাদিত্য,—এদের কারুর গলায়ই মালা দিয়ে ফেল না কেন ? যেমন বিশাল ভুঁড়ি, তেমনিই গোঁফের ঘনঘটা। চমৎকার !

(কল্যাণী ছদ্ম কোপে চিত্রার দিকে লীলাকমল ছুড়িয়া দিল। চিত্রা সহাস্যে তাহা আবার কুড়াইয়া কল্যাণীর হাতে দিল।)

বাসন্তী। এই চুপ চুপ, ওই যে সবাই আসছে !

(সখীরা কল্যাণীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া শঙ্খ ও পুষ্পথালি লইয়া অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াইল)

(সুচিত্রা, জয়ন্ত ও জয়াপীড়ের প্রবেশ ও আসন গ্রহণ)

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ। প্রাসাদ-তোরণে অগণিত নগরবাসী সমবেত হয়েছে। তারা সকলেই সিংহ-নিধনকারী বীরের পরিচয় জানবার জন্য উৎসুক।

জয়ন্ত। তাদের কাছে ঘোষণা ক'রে দাও যে, কাশ্মীররাজ মহাবল জয়াপীড় বিনয়াদিত্যই সিংহের আতঙ্ক থেকে জনপদবাসীদের রক্ষা করেছেন।

জয়াপীড়। আর এ কথাও ঘোষণা করতে ব'লে দিন গৌড়েশ্বর, সে পুরস্কারের বিংশতি সহস্র মুদ্রা দরিদ্র নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

(সুচিত্রা উঠিয়া আসিয়া জয়ন্তর কানে কানে কিছু বলিল)

জয়ন্ত। আরেকটি ঘোষণা তোমার সম্মতির অপেক্ষা রাখে কাশ্মীররাজ !

জয়াপীড়। (বিস্ময়ে) কি সে ঘোষণা ?

জয়ন্ত। সেই ঘোষণার মর্ম্ম হবে এই যে, মুদ্রার মূল্যে কাশ্মীর-রাজের বীরত্বের যোগ্য সম্মান দেওয়া যায় না, তাই হৃদয়ের মূল্যে গৌড়বাসীরা তা দিতে ইচ্ছুক : আমার কন্যা কল্যাণী হবে, সারা গৌড়ের এই ভালবাসা ও শুভেচ্ছার প্রতীক। বলো, তুমি সম্মত ?

(সুচিত্রা কল্যাণীকে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল)

জয়াপীড়। (একবার কল্যাণীর দিকে তাকাইয়া মাথা নত করিল) আমি সম্মত।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

(এবার সখীরা শঙ্খধ্বনি করিয়া কল্যাণীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া অগ্রসর হইল। পুষ্পথালি হইতে মালা লইয়া কল্যাণী জয়াপীড়ের কণ্ঠে মাল্যদান করিল)

জয়ন্ত। গৌড় ও কাশ্মীরের এ মিলন যেন চিরস্থায়ী হয়। (নেপথ্য হইতে জয়ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল,—জয় গৌড়েশ্বরের জয় ! জয় কাশ্মীরাধিপতির জয় ! গৌড় ও কাশ্মীরের মিলন চিরস্থায়ী হোক্ !)

যবনিকা পতন

কমলা

বারি দেবী

লক্ষ্মীর মত ঝলমলে রূপ দেখে নবজাতা কন্যার নাম যখন তার পিতৃদেব রাখলেন কমলা—পিতামহী ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—ও নাম কেন রাখলি বাবা! কমলা নামে বড় দুঃখ, এ আমি অনেক দেখেছি রে! পুত্র তাঁর সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন,—নামের দোষ কিছু নয় মা! যে যেমন ভাগ্য নিয়ে আসে। এমন ফোটা পদ্মফুলের নাম কমলা ছাড়া আর কিছু মানায় না যে মা!

হায় অন্ধ পিতৃস্নেহ! সূতিকাগারেই প্রসূতির জীবনান্ত হল। চোখের জল মুছে অবনী বাবু সদ্যজাতা কন্যার একাধারে পিতা-মাতা হবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য রূপ। পাঁচ বছরের কমলকলিকে বৃদ্ধা মাতার হাতে সঁপে দিয়ে, মাত্র তিন দিনের নোটিশে, অজানা পথে যাত্রা করতে হল তাঁকে। কয়েক দিন বুক চাপড়ে, দুর্ভাগা মেয়েটাকে অভিসম্পাত করে কাঁদলেন বৃদ্ধা, তার পর শোকদগ্ধ বুকে তাকেই টেনে নিলেন,—জলমগ্ন ব্যক্তির খড়কুটোটা টেনে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করার মত।

ষোল বছরের কমলা। ষোল কলায় পূর্ণচন্দ্রের মত গঙ্গার ঘাট আলো করে দাঁড়িয়েছিলো। কপালে গঙ্গাস্নানের সাক্ষ্যস্বরূপ শ্বেত-চন্দনের টিকা। ঠাকুমা তখন আবক্ষ গঙ্গায় দাঁড়িয়ে জপ করছেন।

গরদের থান-পরা একজন গৌরাঙ্গী বর্ষীয়সী মহিলা ওর চিবুকটি ধরে জিজ্ঞেস করেন,—কাদের মেয়ে বাছা তুমি? আহা সাক্ষাৎ যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ, সঙ্গে কে এসেছেন তোমার?

ততক্ষণে বৃদ্ধা জল থেকে উঠে এসেছেন। কমলা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ঐ যে আমার ঠাকুমা।

—আপনার নাতনি? ও মা, কি রূপ গো!

ঐ রূপই আছে মা! জন্ম হতেই বাপ-মা সব হারিয়েছে। এখন শ্মশান জাগিয়ে ওকে নিয়ে বসে আছি আমি। নিশ্বাস ফেলে জবাব দেন বৃদ্ধা।

—আহা! সমবেদনা জানান মহিলাটি।

তার পর ধীরে ধীরে উভয়ের পরিচয়-বিনিময়ে জানা যায়, পালটি ঘর। মহিলার সেজ ছেলেটি ওকালতি পাশ করে প্র্যাক্টিস সুরু করেছে, তার জন্য তিনি খুঁজছেন একটি পদ্মিনী গোছের মেয়ে। কত সম্বন্ধ এলো গেলো, কিন্তু পছন্দসই মেয়ে পাওয়া যায়নি আজও। এত দিনে বুঝি ভগবান মেলালেন। বৃদ্ধা তো হাতে স্বর্গ পেলেন, প্রস্তাব শুনে। তবে সরোদনে জানালেন—বাপ তো অল্প বয়সেই গেছে। বরপণ দেবার মত পুঁজি কিছু তো নেই তাঁর।

প্রয়োজন হল না। লাখ কথা না হতেই বিয়ে হয়ে গেলো। বউ দেখে, সবাই একবাক্যে বললে—হ্যাঁ, পদ্মিনী বলা চলে বটে! কিন্তু হায়! অমন চাঁদপানা কপালটার ভেতর শুধু ছাই চাপা ছিলো তা কে জানতো? এক মাসও গেলো না,—এক দিনের কলেরায় অমন জোয়ান ছেলের জীবনদীপ নিবে গেল। হতভাগিনী মেয়েটির আঁধার জীবনাকাশে সূর্য উদয় হতে না হতেই কাল রাহু গ্রাস করলো তাকে!

বুকফাটা হাহাকারে শাশুড়ী-ঠাকুরাণী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। উচ্চ কণ্ঠে বিলাপের সাথে বলতে থাকেন,—ওরে, লক্ষ্মী ভেবে কি অপয়া অলক্ষ্মীকে ঘরে এনেছিলাম গো! ওর নিশ্বাসে আমার সুখের সংসারে আগুন লাগলো রে!

এক-বাড়ি লোক,—বিয়ে উপলক্ষে আসা মাসি-পিসির দল, তখনও গিস্-গিস্ করছে বাড়ীতে। তাঁরাও ইনিয়ে-বিনিয়ে শোকপর্ব্বে যোগ দিলেন,—অমন জলজ্বলে চেহারা বড় অলুক্ষণে হয়, মা গো, সিঁদুরটা যেন কপালে ঠিকরে পড়তো,—এ তো লক্ষ্মীর মত শান্ত রূপ নয়,—এ যেন মা মনসার সর্ব্বনাশা রূপ!

রূপ-অভিশপ্তা মেয়েটার বোধ হয় তখন কোনো অনুভূতি ছিলো না। সে ঠাকুমার বুকের ভেতর তার অলুক্ষণে পোড়া মুখখানা লুকিয়ে, থর থর করে কাঁপছিলো,—ক্রন্দন-ঐকতানে যোগ দিতে পারেনি।

শোকের আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেলো, রইলো তার দাহজ্বালা। —আর সেই দাহজ্বালা জ্বালাময়ী বাক্যবাণরূপে দিন-রাত দহন করতে লাগলো কমলাকে।

কমলার বড় ও মেজ জা ওকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলে, তুই কি নিয়ে দিন কাটাবি ভাই? আমাদের ছেলে-মেয়েগুলোকে মানুষ কর! ওদের নিয়ে ভুলে থাক্ নিজের দুরদৃষ্টকে—না, কাকা তো ভিন্ন নয়, ওরা তোরই ছেলে-মেয়ে।

শাশুড়ী পিসশাশুড়ী বলেন,—বেঁধেবেড়ে পাঁচজনকে খাওয়াও, কাজে মন থাকলে মনে আর কোনো কুচিন্তা আসবে না। আর ঠাকুরঘরটির ভার তোমার ওপরই রইলো,—প্রাণপণে ঠাকুরসেবা করো, সমস্ত পাপ কেটে গিয়ে আসছে জন্মে সুখী হবে।

মানে, এক কথায় বিনা মাইনের রাঁধুনী, দাসী, সেবিকা সব কিছু একাধারে। নিঃশব্দে মেনে নেয় কমলা, সকলকার মতবাদগুলো।

এক প্রহর রাত থাকতে শয্যাত্যাগ করে, স্নানান্তে ঠাকুরঘরের পাট সেরে, পাকশালায় বিধবা পিসিমার সাথে রান্নায় যোগ দেয় কমলা।—তার পর ছেলেদের খাওয়ানো নাওয়ানো, অন্যান্য ফাই-ফরমাসে সময় সময় হাঁপিয়ে ওঠে ভাগ্যাহতা মেয়েটি। তৈলহীন রুক্ষ-চুলের রাশ অযত্নে পিঠের ওপর লুটোপুটি খায়। পরনে তার সরু কালোপাড় শাড়ী, দু'গাছি সোনার চুড়ি হাতে,—কিন্তু এতেও তো পোড়া রূপ চাপা পড়ে না! শাশুড়ী ওর পানে চেয়ে চেয়ে শিউরে ওঠেন,—মনে মনে বলেন—বাবা, রূপ নয় তো! যেন এক-খাপরা আগুন! কে জানে কখন কা'কে পুড়িয়ে মারবে!

এতগুলো লোকের মাঝে শুধু সদয় ব্যবহার পেতো কমলা, ছোট দেওর তরুণ ডাক্তার তপনের কাছে। সে যখন ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষার

হিমসিম খাচ্ছে,—তখন মাঝে মাঝে তপন তাকে ডেকে আনতো নিজের ঘরে. ওকে বোলতো,—একটু সুস্থ হয়ে বোসো তো বৌদি! দেহটা তো, মেশিন নয়। দিন-রাত তাকে অমন বেপরোয়া ভাবে চালালে সে মারা পড়বে যে!

নতমুখে খানিকটা দাঁড়ায় কমলা। এমন দরদভরা কথা তো তাকে কেউ বলে না! কিন্তু উপায় বা আছে কি? সে তো আর মানুষ নয়—একটি অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র!

মৃদু স্বরে বলে,—সে ভয় আমার নেই ঠাকুরপো! মরণই বোধ হয় আমাকে দেখলে ভয় পাবে। আচ্ছা যাই এখন, ছেলেদের খাবার সময় হলো।

চাপা গর্জ্জনে বলে তপন: হোক্ গে সময়, যাদের ছেলে-মেয়ে তারা দেখো গে সিনেমায় বসে ফুর্ত্তি করছেন। আর তুমি? ... সবার মন জুগিয়ে বেড়াচ্ছ রাঁধুনী ও চাকরাণী সেজে। ... নিরীহ হতে যেও না বৌদি! তোমারও জীবনের একটা ... আছে, তার দাবী তুমি ছেড়ো না।

কমলা মুখ তুলে চায় ওর পানে, দু'চোখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছায়া! অস্ফুটস্বরে বলে সে,—ও-সব কথা আমাকে শুনিও না ঠাকুরপো! দোহাই তোমার। বলতে বলতে দু'চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ছুটে পালায় থেকে।

কিন্তু তপনের মনে শান্তি নেই। অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়েটি শুধু পরের দাসীপণা করে জীবনটা বাজে খরচ করে ফেলবে? এ কেমন কথা? ভালো ভালো বই এনে দেয় তপন কমলাকে। বলে, পাঁচটা বাজে কাজের সঙ্গে বই পড়া কাজটাও করো বৌদি! একটু শান্তি পাবে মনে।

ম্যাট্রিক পাশ করেছিলো কমলা। সাহিত্যের প্রতিও ছিলো তার বিশেষ অনুরাগ। দেবরকে জানায় অন্তরের কৃতজ্ঞতা, মনে মনে শ্রদ্ধা করে ওকে।

সেদিন স্নান সেরে আসনে বসে হাঁক দেয় তপন। ভাত দাও পিসিমা! ভাতের থালা আনলো কমলা। তপন পরিহাস করে বলে,—এ কি? অন্নহস্তে একেবারে অন্নপূর্ণার উদয় যে? আজ হঠাৎ তোমার আবির্ভাব?—কথা থামিয়ে কমলার মুখের পানে চেয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে,—একি বৌদি? তোমার মুখ অত শুকনো কেন? শরীর খারাপ নাকি?

সে কথার জবাব না দিয়ে বলে কমলা:—আজ একাদশী কি না, পিসিমা বুড়োমানুষ আগুন তাতে আসেননি, সেজন্য আমিই তোমায় ভাত দিতে এলাম।

ও! তাই তুমি একাদশী করে পঞ্চাশ জনের পিণ্ডির ব্যবস্থা করতে হেঁসেলে ঢুকেছো? চিৎকার করে জবাব দেয় তপন।

—হয়েছে কি? এত চেঁচামেচি কিসের? বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন গৃহিণী। কমলা থালা নামিয়ে দিয়ে ম্লান মুখে যায় রান্নাঘরে।

তপন রাগে গজরাতে গজরাতে বলে,—তোমাদের মনে কি একটু দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই মা? একাদশীর উপোস বলে সবাইকার বিশ্রাম আছে; নেই খালি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সমান চিৎকারে জবাব দেন গৃহিণী—কার কথা বলছিস তুই? সোয়ান মেয়ে, তার ওপর কপাল পোড়া, এ খাটুনিতে ওর কিছু ক্ষতি হবে না। আর ওর জন্য চিন্তা করতে তোমাকে হবে না, সে ভার আমার।

বটে? আমি বুঝি বাড়ীর কেউ নই? ন্যায়-অন্যায় কিছু বলার অধিকার আমার নেই? সবেগে ভাতের থালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে গেলো তপন, মায়ের শত অনুরোধেও আর বসলো না খেতে। কথাটা সামান্য হলেও, সকলকার মুখে মুখে অসামান্য আকার ধারণ করে, কমলার উদ্দেশে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হতে লাগলো! শ্বশ্রুমাতা কমলাকে ডেকে কঠোর স্বরে বললেন:—দেখো বৌমা! তোমার সব কুমতলব আমি বুঝেছি। ভালো চাও তো নিজের আচরণ সংযত করো।

জলভরা চোখ দু'টি তুলে বলে কমলা:—আমি কি দোষ করেছি মা?

করনি আবার কি? কার মুখে হাত চাপা দেবে শুনি? সেদিন তপনকে লাগিয়ে-ভাঙিয়ে যে কেলেঙ্কারিটা করলে! ছি! ছি! কি ঘেন্না! আর এক কথা, বিধবা মেয়ের অত রূপ থাকা বড় বিপদ, তার চেয়ে ও আপদ যত কমে যায়, তোমার পক্ষে তত মঙ্গল।

কমলার মেঘের মত কালো চুলের রাশ নাপিত ডাকিয়ে তিনি কাটিয়ে দিলেন। হাত খালি করে থান কাপড় পরিয়ে, বউকে যতখানি সম্ভব কুরূপা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রূপ কমলো কই? শ্বেত-মর্ম্মর দিয়ে গড়া যেন একখানি বিষাদ-প্রতিমা! রূপের আছে নব নব বিকাশ! কমলার এ-রূপ দরদী অন্তরকে আরো ব্যাকুল করে তোলে। তপন রাগ করে ঘরের দরজা বন্ধ করলো,—বাড়ী শুদ্ধ সকলকার সঙ্গে তার বাক্যালাপ বন্ধ।

এত কাণ্ডের পরও আবার স্বাভাবিক খাতে দিনের স্রোতগুলো বয়ে যেতে লাগলো! সে দিন সন্ধ্যায়—নিজের ছোট ঘরখানিতে শুয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলো কমলা। দিন তিনেক হল তার জ্বর হয়েছে, বিধবা মানুষ, সেবা-যত্ন বা ওষুধের তেমন প্রয়োজন নেই। একলাই পড়ে আছে ক'দিন। বাড়ীর একটি ছোট ছেলের মুখে সে খবর শুনে, ছুটে এলো তপন ওর ঘরে। সুইচ টিপে আলো জেলে ডাকে,—বৌদি! ও বৌদি!

চমকে উঠে বসে কমলা। ভয়ার্ত্ত চোখ দুটি মেলে বলে:—কি ঠাকুরপো?—

কেমন আছ? তোমার এত জ্বর, আমি তো জানি না! তা ওষুধপত্তর কিছু পেয়েছো?

মুখ নিচু করে নীরবে বসে থাকে কমলা।

তপন এগিয়ে এসে বসে ওর পাশে,—কপালে হাত দিয়ে বলে,—ইস গা'টা যে পুড়ে যাচ্ছে। শুয়ে পড় তো!—

কমলার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিলো—কাতর স্বরে বলে:—তুমি যাও ঠাকুরপো! আমার প্রতি সমবেদনা দেখানো তোমার পক্ষে যে মহা অপরাধ! বলতে বলতে সে হাঁপাতে থাকে।

তপন ওকে ধরে শুইয়ে দেয়। তার পর কুঁজো থেকে জল এনে চোখে মাথায় কপালে বুলিয়ে দিয়ে, পাখার বাতাস করতে করতে বলে,—আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না বৌদি! পাঁচ জনের জঘন্য নীচ মনের সহায়তা করতে অন্ততঃ আমাকে বোলো না।

—কার নীচু মন রে? বলতে বলতে ঘরে এসে দাঁড়ান গৃহকর্ত্রী।

তপন রোষ ভরে বলে,—তোমাদের,—বাড়ীশুদ্ধ সবাইকার।

কি, এত বড় কথা? জানিস এ বাড়ী আমার নামে! এখুনি বিদেয় করে দিতে পারি তোদের। আর কি কুক্ষণেই দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুসেছিলাম যে, একটাকে ছুবলে খেয়েও ওর আশ মেটেনি, আরেকটাকে খাবার যোগাড় করছে!

তপন রাগে থর-থর করে কাঁপতে থাকে, চিৎকার করে বলে,—তোমার বাড়ী, বাড়ী নিয়েই তুমি থাকো মা! এই আমি চললাম বাড়ী ছেড়ে।

তার পর কমলার হাত ধরে টেনে নামিয়ে ওকে বলে,—তুমিও এসো বৌদি আমার সঙ্গে, আমি সম্মানের সঙ্গে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবো আমার ঘরে। এ জগতে তুমিই হবে আমার একমাত্র আপন জন।

কমলা হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে কম্পিত স্বরে বলে,—আমায় মাপ করো ঠাকুরপো! আমি বড় অসুস্থ। তার পর আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

ঝড়ের মত বেগে তপন বেরিয়ে যায় বাড়ী ছেড়ে। বৌকে অভিসম্পাত করতে করতে শাশুড়ী বলে যান—ও-মুখ আর দেখাসনি কাউকে!

পরদিন সকালে কমলাকে আর পাওয়া যায় না বাড়ীতে। তপনও সেই কাল সন্ধ্যায় গেছে আর ফেরেনি। খোঁজাখুঁজি করে লোক জানাজানির দরকার নেই, সবাই চেপে যায় কথাটা। পাঁচ জনকে জানানো হয়, বৌ ঠাকুমার কাছে গেছে। তপন অবশ্য বেলা দশটার আগেই বাড়ী ফিরে এলো, হস্পিটালে যেতে হবে। বাড়ীতে এসেই কমলা নেই শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করে—তার খোঁজ-খবর কিছু নেওয়া হয়েছিলো?

মা কেঁদে জবাব দেন,—আমরা ভাবলাম, তোর সঙ্গেই গেছে, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তবে এ-সব কেলেঙ্কারির কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো, লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হবে।

ঘৃণায় বিকৃত কণ্ঠে বলে তপন—বাড়ীর লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করেছো তোমরা, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চললাম আমি।

ত্বরিত হস্তে একটি স্যুটকেশে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে বেরিয়ে যায় তপন পলাতকার সন্ধানে। সারা কলকাতাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো তপন, তার পর ছুটলো, দেশ ছেড়ে দেশান্তরে।

এর পর এলো যুদ্ধের বিভীষিকা,—এলো বেয়াল্লিশের মন্বন্তর! শূন্য মন নিয়ে ফিরলো তপন কলকাতায়। নিজেকে উৎসর্গ করলো জনকল্যাণের মহৎ কর্ম্মের মাঝে। হাজার হাজার আর্ত্তের চিকিৎসা ও সেবার মাঝে আত্মনিয়োগ করে, মনের নিদারুণ জ্বালা ভুলতে চেষ্টা করে। হাজার হাজার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর মাঝে খুঁজে বেড়ায় সেই ভাগ্যহতা মেয়েটির কাতর মুখচ্ছবিখানি! যুদ্ধ থামলো, এলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশে দেশে জ্বলে উঠলো বিদ্বেষের দাবাগ্নি! প্রথম নরমেধ যজ্ঞের পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে, চারি দিকে তখন কিছুটা শান্তি স্থাপন হয়েছে, যদিও গুপ্ত হত্যা তখনও বর্ত্তমান।

তপনের বড় বোন থাকেন লাহোরে। একটি মাত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তপন এসেছে, মা-ভাইয়েরা, ভ্রাতৃবধূরাও এসেছেন। বিবাহ-পর্ব্ব চুকে গেছে, আত্মীয়-স্বজন সকলে বিদায় নিয়েছেন, অমিয়ার বিশেষ অনুরোধে পিত্রালয়ের গোষ্ঠী কয়েক দিন থেকে গেছেন। আশে-পাশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, ওদের পাড়ায় এখনও প্রকাশ্য ভাবে কিছু না হলেও গরম ভাব চলেছে।

সেদিন ঘরে ভারি গুমোট, তপন বাগানে পাইচারী করছিলো। রাত প্রায় নটা, সহসা একজন বোরখা-ঢাকা রমণী চুপিসাড়ে এসে ওর হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিলে! বিস্মিত ভাবে তপন রাস্তার গ্যাসের আলোতে পড়ে কাগজখানি—লেখা ছিল,—"এই মুহূর্ত্তে আপনারা আমার সঙ্গে চলে আসুন, আর দু'-তিন ঘণ্টা পরেই এপাড়ায় বিপদ আসবে।"

তপন মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যেতে হবে?

রমণী চুপি চুপি বলে, নিরাপদ জায়গায়। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি বাঙালীর মেয়ে।

তপন বলে, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।

সে ক্ষিপ্রপদে ভেতরে চলে যায়, খানিকটা পরামর্শ করার পর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াই সকলে স্থির করে ফেলে। মূল্যবান অলঙ্কার ও টাকা সঙ্গে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলে গোরতর সন্দেহ, ও আশঙ্কা-দুরু-দুরু বক্ষে রমণীর সঙ্গে চলতে থাকে। পোড়ো বাগানের দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীর আড়ালে আড়ালে স্ত্রীলোকটি চললো ওদের পথ দেখিয়ে। কিছুক্ষণ পরে একটি বিরাট বাড়ীর সংলগ্ন একটি সুসজ্জিত বাগানে প্রবেশ করলো পথপ্রদর্শিকা। তারপর সে কোথায়

অন্তর্হিত হয়ে গেলো, পরিবর্তে এগিয়ে এলো একজন দীর্ঘাকার সুদর্শন যুবক, ওদের সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করে বললো, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন এখানে, রাত্রিটা কেটে গেলে আমি নিরাপদ স্থানে রেখে আসবো আপনাদের। তারপর মৃদু হেসে বলে, তপন বাবু, আসুন আমার সঙ্গে।

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে নিজের নাম শুনে পরমাশ্চর্য্য ভাবে তপন তাঁর সঙ্গে ঘরের বাইরে যায়। যুবকটি দরজায় তালা বন্ধ করে তপনকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে। বিরাট দরদালান, মূল্যমান আসবাবে সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য ভবন, দেখলে মনে হয় কোনো খানদানী ঘর! কিন্তু বাড়ীটা জনশূন্য, শুধু দু'চারজন ভৃত্য ছাড়া!

একটি সুসজ্জিত কক্ষে যুবকটি তপনকে এসে বসালো,—তারপর ওর দিকে চেয়ে সহাস্যে বলে—: ভারি আশ্চর্য্য লাগছে আপনার না? তবে বেশীক্ষণ আর আপনাকে গোলকধাঁধার মধ্যে থাকতে হবে না।

যুবকটি পাশের ঘরের পর্দাটি সরিয়ে দিতেই বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। তপনের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো!

তপন ভীষণ চমকে ওঠে, কে এ? স্বপ্ন দেখছি না কি? না, স্বপ্ন নয়; তার সামনে দাঁড়িয়ে কমলা! পরনে তার রক্তবর্ণের শাড়ী, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করছে: সিঁথিতে বঙ্কিম রেখা, কপালে কুঙ্কুমের টিপটি জ্বলছে! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি! অস্ফুট স্বরে বলে তপন,—: বৌদি? কমলা তুমি? তুমি কোথা থেকে এলে? কোথায় ছিলে এত দিন? আমি দেশ-দেশান্তরে কত খুঁজেছি তোমায়!!

কমলা ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে, কাতর স্বরে বলে,—সব বলছি ঠাকুরপো, শুধু বলো, আজ এ বেশে দেখে ঘৃণা করনি তো আমায়?

দু'হাতে ওর হাত দু'টি ধরে বলে তপন, তুমি তো আমাকে জানো বৌদি! তোমার দুঃখ দুর্দ্দশা আমাকেও কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া দিয়েছে!

তোমার মূল্য কেউ দেয়নি বৌদি! যে মহামূল্য রত্ন এক দিন আমরা ঝেঁটিয়ে পথের ধূলায় ফেলে দিয়েছিলাম, কোনো জহুরী যদি তাকে কুড়িয়ে নিয়ে মুকুটমণি করে থাকেন, এতে আমাদের কিছু বলবার তো মুখ নেই বৌদি!

—তবে এইটুকু ভেবে অবাক হয়েছি যে, যারা তোমার প্রতি করেছে অমানুষিক অত্যাচার, আজ তুমিই করলে তাদের প্রাণরক্ষা!

হাসতে হাসতে জবাব দেয় কমলা,—ভগবান রক্ষা করেছেন ঠাকুরপো, আর বাকি কৃতিত্ব পেতে পারেন এই ভদ্রলোকটি।

তপন যুক্তকরে নমস্কার করে বলে,—ওঃ! কি অকৃতজ্ঞ আমি, আপনার সঙ্গে পরিচয়ই হয়নি এতক্ষণ।

যুবক হেসে জবাব দেয়, পরিচয় না থাকলেও জ্যেষ্ঠের অধিকার ছাড়তে রাজী নই আমি। এ অধম, আপনার বৌদির স্বামী অর্থাৎ আপনার দাদা, মহম্মদ-কবীর খান। আপনার বৌদি আপনাকে দেবতা বলে আমার কাছে আপনার পরিচয় বহু বার দিয়েছেন,—আজ সেই দেবতাকে দর্শন করে সত্যই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি!

তপন উঠে দাঁড়িয়ে কবীরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বলে,—আর আমায় লজ্জা দিও না ভাই! এসো দুই ভায়ে লক্ষ লক্ষ বিপথগামী ভায়েদের ধ্বংস-পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করি।

ঘরের ভেতর যখন মানব ধর্ম্মের চরম বিকাশের আনন্দে ক'টি প্রাণীর মহাভাবাচ্ছন্ন অবস্থা, বাইরে তখন সেই মানবের দানবীয় রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে নরঘাতী তাণ্ডব লীলায়!—"আল্লাহো, আকবর," ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত, বহুমানব-কণ্ঠের ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদে, অপরিসীম লজ্জায় ঘৃণায় বেদনায় থর-থর, করে কাঁপতে থাকে ঘরের মহাপ্রাণ ক'টি!

কবীর বলে, আপনারা ভাই-বোনে কথা বলুন। আমি যত দূর সম্ভব সকলকে অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা গোপনে করেছি, তবে কি জানেন, সকলে আমাকে বিশ্বাস করেনি, সেজন্য হয়তো এখন তাদের জীবন বিপন্ন হয়েছে,—দেখি, কত দূর কি করতে পারি। মুস্কিল হয়েছে, একলা আমার পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

কবীর অস্থির পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

কমলার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলে তপন,—এবারে বলো বৌদি, তোমার কথা।

অধোবদনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে কমলা,—তার পর বলে যায়, —সেদিন তোমরা চলে যাওয়ার পর মনে আসে দারুণ বিতৃষ্ণা। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে বাড়ী ছেড়ে চলে যাই গঙ্গার ঘাটে, মা গঙ্গার বুকে বিসর্জ্জন দিলাম এই অপয়া দেহটাকে!

দূরে একটি বজরার ছাদে নিদ্রাহীন ভাবে বসেছিলেন উনি, সব দেখতে পান। নিজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় তোলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন! পরদিন, আমি সুস্থ হলে পর উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় পৌঁছে দেবেন? কিন্তু কি বলবো? কোথায় যাবো? আমি শুধু কাঁদতে লাগলাম।

উনি বুঝলেন আমার অবস্থা,—জানতে চাইলেন, আমি মরতে চাই কেন? জানালাম নিজের সব কথা। আর জানালাম তোমার কথা। যদি তোমাকে একটু খবর দিতে পারা যায়, তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না জানি!

উনি বললেন,—অমন মানবজীবন, বিশ্বের হিতে লাগিয়ে তাকে সার্থক করতে পারেন, তাকে নষ্ট করবার কোনো অধিকার নেই আপনার। নিজের ওপর আর ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখুন, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এত বড় বিশ্বে আপনার স্থান তিনিই নির্বাচন করে দেবেন।

ওঁর কথায় মনে ভারি বল পেলাম। আবার বাঁচতে ইচ্ছা হল। তোমার সংবাদ উনি গোপনে নিলেন, কিন্তু জানা গেল তুমি বাড়ী ছেড়ে কোথায় গেছ, কেউ জানে না। কবীরের বাবা, এখানকার এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর ঐ ছেলেটি ছাড়া কেউ ছিলো না। উনি তখন শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশোনা করছেন, ঐ সময় ওর বাবা হঠাৎ মারা যান। বাবার মৃত্যুতে উনি মনে বড় আঘাত পেলেন। বাড়ীতে এলেন, কিন্তু মন বড় চঞ্চল, সেজন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে সময় আমি গঙ্গায় ডুব দিই, উনি সে সময় বজরা করে গঙ্গার বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে।

পেলাম তাঁর পায়ে স্থান। বাপুজীর পূতচরণ স্পর্শে পেলাম নব জীবন, ভুলে গেলাম আমার পূর্ব্ব-জীবনের গ্লানি। আশ্রমে বহু সেবক-সেবিকার সঙ্গে আমি পরম শান্তিতে বাস করতে লাগলাম।

এর পর এলো যুদ্ধ, এলো দুর্ভিক্ষ, সকলকার সঙ্গে আমি আর কবীরও বাপুজীর নির্দ্দেশ মত জনসেবায় নিজেদের নিয়োগ করে জীবনে পেলাম পরম সার্থকতা। জগতে বাঁচার আনন্দ তখন উপলব্ধি করেছিলাম। দীর্ঘকাল কবীরকে দেখলাম, দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি ঠাকুরপো! হিন্দু, মুসলমান সকল গণ্ডির উর্দ্ধে ঐ মানুষটির প্রকৃত স্বরূপ তোমাকে ঠিক বোঝাতে আমি পারবো না, এক কথায়, পরম সত্যনিষ্ঠা ও নিজের সাধুতা দ্বারা উনি মহাত্মাজীর পরম স্নেহের পাত্র হতে পেরেছিলেন, আশ্রমের সকলেই ওঁকে খুবই ভালবাসতেন।

জানি না, এই ভাগ্যহীনার মাঝে উনি কি পেয়েছিলেন? কিম্বা ওঁর দয়ালু চিত্ত হয়তো অনাথার প্রতি করুণার দুর্ব্বলতা বশতঃ একদিন তিনি আমার সকল ভার গ্রহণ করতে চাইলেন,—অবশ্য মুসলমান বলে যদি আমার কোনো আপত্তি না থাকে। মুসলমান? না ঠাকুরপো, তখন মনে হয়েছিলো, দেবতার কি কোনো বিশেষ জাত থাকে? আমার প্রথম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলে তুমি! আমার জন্য তুমি যে কত অপমান সহ্য করেছিলে, প্রতিদিন কৃতজ্ঞ-চিত্তে আমি স্মরণ করেছি তোমাকে। তারপর,···আমার চরম দুর্দ্দিনে, দেবতার মত মহৎ হৃদয় নিয়ে যিনি আমাকে সকল বিপদ মুক্ত করে হাত ধরে নিয়ে গেলেন আমাকে এক নতুন জগতে, নবজীবনের পথে, তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার স্পর্দ্ধা আমার কোন দিনই ছিলো না। মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, এই বছর খানেক হল বাস করছি এখানে। ক'দিন আগে সামনের রাস্তায় তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, অনুসন্ধান করে জানলাম, তোমরা এসেছো এখানে। প্রতিদিন নানা রকম খবর শুনে আমি বড় ভয় পেলাম, ওঁকে জানালাম সব কথা। উনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন হাঙ্গামা থামাবার; কিন্তু এ বিদ্বেষের আগুন সহজে নিববে না—তাই সামনের পথ ছেড়ে উনি গোপনে কাজ করছেন। আজ ওঁরই নির্দ্দেশ মত আমি গিয়েছিলাম তোমাদের আনতে। এবারে বলো ঠাকুরপো, আমি কি অন্যায় করেছি? তোমার বৌ, ছেলেমেয়ে তারা সব কোথায়? আমাকে একটু দূর থেকে দেখাবে তো?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তপন জবাব দিলো,—যোগ্য স্থানে তোমার প্রতিষ্ঠা দেখে আমার বুক আজ আনন্দে ভরে উঠেছে বৌদি! যিনি তোমার আঁধার-জীবনে দিয়েছেন আলোর সন্ধান, তাঁকে আত্মদান করে তুমি অন্যায় করনি; বরং দিয়েছো তাঁর যোগ্য মর্য্যাদা। আর যাদের দেখতে চাইছো, আপাততঃ তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি, ভবিষ্যতে যদি সে সৌভাগ্য হয়, তার ভাগ তোমাকে দিতেও ভুল হবে না জেনো। গলায় আঁচল জড়িয়ে কমলা সহসা উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ওঠে, তার পর তপনের পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে করতে বলে,—আমাকে ক্ষমা কর ঠাকুরপো, মনে হয় তোমার সকল সুখ আমিই নষ্ট করেছি।

তপনেরও দু' চোখে তখন বাঁধভাঙ্গা অশ্রুধারা নেমেছে। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে, কমলার দু' হাত ধরে তুলে বসায়। তার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—তোমার কোনো দোষ নেই বৌদি! আমি মনে-প্রাণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও। আমি তোমাদেরই রইলাম, যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে ডাকতে সঙ্কোচ বোধ কোরো না। স্বার্থপর অন্তরটা শুধু গুমরে কেঁদে বলেছিলো,—এ রত্ন পাবার জন্য আমিও তো দীর্ঘকাল ধরে করলাম একাগ্র সাধনা, তবে তার সমাপ্তি ঘটলো কেন নিদারুণ ব্যর্থতার মাঝে? হায় সমাজ! হায় সংস্কার!

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

বাঁশুরিয়া

কেল্লার সামনে বেথুন কলেজের পাশে
ফুটপাথে পড়েছে মধ্যাহ্নিন রৌদ্রের আভাস।
মন্থরিত হচ্ছে শিমুলের আরক্ত প্রদাহে
নগরীর আরক্ত উচ্ছ্বাস।
ঝরে পড়েছে শীতশেষের শুষ্ক পত্রপালি
ঈষৎ উত্তপ্ত রাজপথে।
ছল-ছল করছে সেখানে কৃষ্ণবর্ণ পীচের ঢালাই—
উঠছে সূক্ষ্ম ধূপের ধোঁয়ার মত একটি করুণ
ক্লান্ত বাঁশীর সুর।
কে সে বাঁশুরিয়া যাকে ঘিরে ধরেছে
ছোটখাট একটি জনতা?
কে? এ কে? কেউ বলছে—
একে দেখেছি হাওড়া পোলের উপর
কেউ বা বলছে—দেখেছি সেদিন ভবানীপুরে।
কিন্তু সমস্ত জিজ্ঞাসা আর ঔৎসুক্যকে ছাপিয়ে
বাজছে একটি নিরাসক্ত সুর—
ভৈরবী থেকে ভৈঁরো—
বেহাগ পেরিয়ে খাম্বাজ
পূরবী আর পলশ্রী
জ্বলে উঠছে জয়জয়ন্তীতে আর মিইয়ে পড়ছে পিলুতে
একটু ভীরু সুরের পর্দ্দায় ঢাকা পড়েছে
নাগরিক সভ্যতার উলঙ্গ আকাশ—
ইট কাঠ মিনারের কণ্টকে কণ্টকিত।
ছড়িয়ে পড়েছে একটি মিঠে রাগিণীর সুগন্ধ ধূপ—
যা শহুরে বাতাসের নিশ্বাসকে করছে সুরভিত।
বুলিয়ে দিচ্ছে এক মোলায়েম আদর এক সুস্নিগ্ধ প্রলেপ
কর্মব্যস্ত মধ্যাহ্নিনের সমস্ত অবাঞ্ছিত উত্তেজনায়
প্রয়োজনের চাবুক-মারা পিঠের রক্তাক্ত চামড়ায় থমকে দাঁড়ালাম—
কে এ? বাজিয়েছে এমন বাঁশী?

নির্মেঘ নীল আকাশের নীচে—বৈরাগিণী গঙ্গার তটসীমায় ?
ঘুমে ঢুলে পড়েছে নাগরিক সভ্যতার বিষ সর্পের রক্তচক্ষু।
কে এ ? যাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এই জনতা
পুষ্পিত কিংশুকের রক্তাতপছায়ায় ?
দেখলাম—জীবনে যা ভুলব না—
মাথায় দড়ি দিয়ে পাকানো চুলের জট
খাড়া হয়ে উঠেছে সাপের মত,
কৃষ্ণদেহ অস্থিসার—এক বুভুক্ষু ভিখারী
এক কুষ্ঠরোগী—
দু'টি ঠোঁট নেই—ঝুলে পড়েছে দু'পাটি দাঁত,
নাক নেই—শুধু একটি বড় ফুটো—
সেখানে গলিয়ে দিয়েছে বাঁশীর মুখ—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে নির্গত হচ্ছে সুরের ঝলক,
শীর্ণ মাস-খসে-যাওয়া আঙুলে আঙুলে
স্পন্দিত হচ্ছে কোন অক্লান্ত কৌশল,—
হাপরের মত হাঁপাচ্ছে তার বুকের পাটা,
চোখ দু'টি নত,—
বাজাচ্ছে বাঁশরী—নূতন বাঁশরী।
এক অভিনব বাঁশুরিয়া—

দম্পতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-ঘেঁষা ফুটপাথ—
নির্জন বড় নির্জন।
বর্ষায় এ পথে পেয়েছি নব নীপের স্বাদ
ঝরা বকুলের পুষ্পিত অভিনন্দন।
শান্ত স্নিগ্ধ একটি পথের নিরলতায়—
ছাত্র-ছাত্রীদের কলকথায়
নানা রঙের ছোপ-ধরা বৈকালের এক অবকাশে
গিয়েছিলাম ঐ পথে, চলেছিলাম ফুটপাথের পাশে পাশে।
দেখলাম একটি মেয়েকে, এক ভিখারী মেয়েকে
বৃষ্টি-ধোয়া স্নিগ্ধ পরিবেশে ফুটে আছে একটি
ক্লান্ত-কোমল কালো জুঁই
এলানো রুখু চুল—হাতে কাচের নীল চুড়ি গুটি দুই
মেঘলা দিনের পটভূমিকার এক বিষণ্ণ বুভুক্ষাকে
যেন রেখেছে এঁকে।
আবার একদিন—ফাল্গুনের শীত-শীত সকালে
প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রীটেও যখন নূতন পাতাগুলি
কাঁপছে পুরোনো ডালে ডালে
মধুর আর মদির স্মৃতির মত প্রথম বসন্তের রোদে
শিরশিরে বাতাসের গায়ে-পড়া আমোদে
দেখলাম ভিখারিণীর নূতন সঙ্গীটিকে
কালো সুতো গলায় একটি ভিখারী
কালো আর সিকলিকে।
ভুলিয়েছে দু'জনের হালকা ক্ষুধা
কোন অলজ্জ্য নিয়তির মত—
চিরন্তনী বুভুক্ষার এক অমোঘ মধুর সুধা।
তাদের বিবাহের সূত্র বাঁধা হয়নি কোন হোমাগ্নির সম্মুখে—
পুরোহিতের স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টির আশীর্বাণী
পড়েনি তাদের কারো মুখে।

বছরের চাকা ঘুরে গেল। এক বার দুই বার তিন বার
উঠল গ্রীষ্মের রৌদ্র-প্রখর খরধার
আবার পড়ল চোখে সেই দম্পতিকে
ধূলোয় ঘুমানো এক শিশুর পাশে বসা ভিখারী ও
সেই কালো মেয়েটিকে
দু'জনেরই অঙ্গ ছাপিয়ে পড়ছে এক অলস ঔদাস্য
জল ঝরে-যাওয়া শরৎকালীন মেঘের নৈরাশ্য—
আর সমস্ত কিছুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক স্তিমিত অট্টহাস্য।

শিয়ালদহের কমলকুঁড়ি

একটি শিশু—মানাত সে শুধু রাজার ঘরে,—
সে ধরেছে ভিক্ষাপাত্র কলকাতা সহরে।
দু'চোখ নীল কাচের মণি যেন,
প্রবাল দিয়ে গড়া অধর যেন,
রুখু চুলের বাশি—নীল অপরাজিতা রাশি
বৃন্ত-ছেঁড়া পাপড়ি ওড়ে দুরন্ত বাতাসে
দু'টি গালের নিখুঁত গোলা রৌদ্রালোকে হাসে।
শিয়ালদহ ষ্টেশন কাছে লোকের আনাগোনা
কেউ দেখে না পথে পড়ে এমন চাঁদের কোণা ?
এখনো গোল হাতের রাঙা মুঠি,
এখনো নীল সরল আঁখি দু'টি।
অপাপ মনে তার, নাই কোনই হাহাকার
ভিক্ষাপাত্র সামনে পাতা সেটাই গেছে ভুলে,
পথের ব্যাপার দেখে শুধু অবাক দৃষ্টি তুলে।
কে বসাল পথে ওকে কোন্ সে লোভী মন ?
কে শেখাল ভিক্ষাস্বরে গাইতে অনুক্ষণ ?
কে আছে ওর লুকিয়ে আশে-পাশে ?
পাপের ভরা ভরায় কি আশ্বাসে ?
নগ্ন দু'টি হাতে—ওর মগ্ন চেতনাতে—
কোন নিয়তি বিষাক্ত হয় সর্পিল নিশ্বাসে
যৌবন ওর নামবে না কি শৈশব বিশ্বাসে ?
দশটি রাস্তায় রাস্তাবাজার ট্রামের কণ্ডাক্টার—
পারাপারের আশায় আজো অপার সার্কুলার।
রাজার রাস্তার বাসায় এমন নগর কলিকাতা
রাজার মেয়ের ছড়াছড়ি কি আর এমন কথা!
স্মৃতির সরণীতে, সে কি নামবে ধরণীতে,—
স্বর্গ থেকে স্বর্গকন্যা নীলাভ জোছনাতে
ভিক্ষাপাত্র ভরে আসুক সুধা, কোমল হাতে।*

* দেবী আসনের মহিলা কবি-সম্মেলনে পঠিত।

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 284-X52 BG
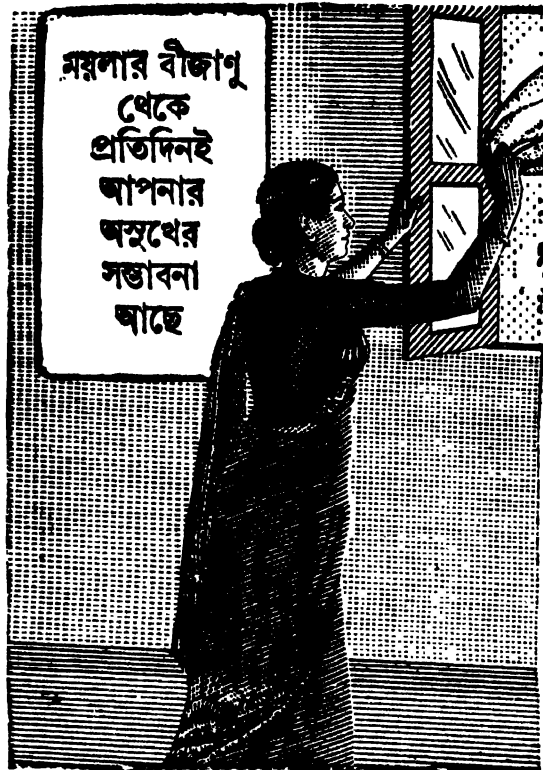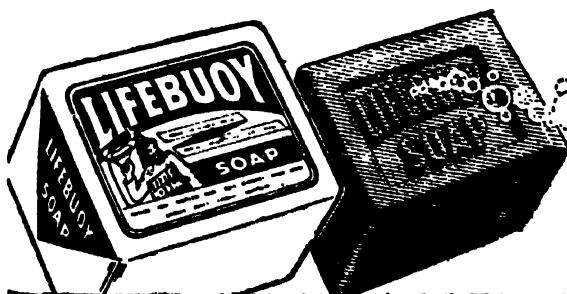
সুভো ঠাকুর

এক দিন না এক দিন ঠিক এ-কাণ্ড না হোলেও, এমনি ধারা যে একটা কাণ্ড হবে, তা যে কোনো লোকই আঁচ করতে পারতো !···

হবে না ? নিত্য সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে ফিস-ফিস ফুস-ফাস। নিশ্চয়, আদেশ-উপদেশ-ইঙ্গিতের যেন আর অন্ত নেই !

প্রথমেই তো চা খাবার ছুতোয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে শ্রীমান মাণিক এসে হাজির হবেন—"ও বৌদি, এক পেয়ালা চা হবে ?" তার পর বৌদির আনা ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে না দিতেই বলতে শুরু করবে—"সুভোদা'কে ছাড়ছেন না তো ? কিছুতেই ছাড়বেন না। আটিষ্ট মানুষ, ওরা বনের হরিণ, এক বার ছাড়া পেলে আর রক্ষা আছে ?"

ও'র বৌদি এর উত্তরে বলেন—"যদি ছাড়া পেলে রক্ষা না থাকে তবে আমি তো আর রক্ষাকালী নই, যে রক্ষা করতে পারব ?"

মাণিক তখন নিষ্ঠাবান দেবর লক্ষ্মণের মতই বোলে ওঠে—"সে কি বৌদি ? আপনারো তো একটা কর্ত্তব্য আছে ? যাব বললেই যেতে দেবেন আপনি ?···এক বছর দু'বছর নয়, সাড়ে তিন-তিন বছর ! তার মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটতে পারে, আর বিশেষ কোরে ঐ মেলেচ্ছ মুলুকে ! সেখানে মানুষকে উজবুক বানিয়ে ছেড়ে দেয় মেয়েরা।"

ও'র বৌদির মনে মাণিকের উক্তিগুলো যুক্তিযুক্ত মালুম হলেও মোটেও রুচিকর মনে হয় নি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দেয়—"যদি মানুষকে ঐ সব মুলুকে উজবুক বানায়, আর মানুষ যদি অত সহজেই উজবুক বনেই, তবে সে-মানুষের উজবুক বনাই উচিত।"

এর পর আর এক ফ্ল্যাট থেকে দত্ত সাহেব, তথা বড় বাবু এসে হাজিরা দেন। এবং শুধু হাজিরা দিয়েই ক্ষান্ত নন, মাণিকের কথায় যেন ফিনিশিং টাচ্ দিতেই হুমকি মারেন—"না, না, ও-সব চলবে না···কিছুতেই ছাড়বেন না। ও'কে ছাড়লে কি আর রক্ষে আছে ? নিশ্চিত আর একটা বৌ নিয়ে হাজির হবে।"

উত্তরে আরতি দেবী এবার ঘোমটাটা আলগোছে একটু এগিয়ে এনে যদিও বলেছিলেন—"আর একটা বৌ নিয়ে আসলে তো ভালই হবে, সতীনের সঙ্গে মিলে-মিশে ঘর করব। এ-যুগে একটা নতুন এক্সপিরিয়ান্স ! কেন, আগের যুগের কুলীন ব্রাহ্মণীদের গোটা পঞ্চাশেক সতীন থাকতো, সে জায়গায় আমার না হয় হবে মোটে একটা !"

আরতি দেবী মুখে যতই উড়িয়ে দান না কেন, আজকের এই রকম মহামারী ব্যাপারের আস্ত-ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কিন্তু সেই তখন থেকেই···

সঙ্গে যাওয়ার বায়না যে আরতি দেবী সুভো ঠাকুরের কাছে একদম করেন নি—তা নয়। কিন্তু সুভো ঠাকুর সে-বায়নার জ্বলন্ত বহ্নিতে গোড়াতেই এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে নিঃশেষে নিবিয়ে দিয়ে বলেছিল—"কোথায় টাকা ? টাকা থাকলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবার চেষ্টা করা যেতো। গভরমেণ্ট অতগুলো জায়গায় এক্জিবিশান করবার জন্যে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর কোরেছে—এ ছাড়া, ভুললে চলবে না যে, সঙ্গে আছে আরো দু'জন সহকর্ম্মী এবং ঐ পর্ব্বত-প্রমাণ লটবহর ! উপরন্তু সরকারি টাকার একটি আধলাও এখানে হাতে পাওয়া যাবে না···আর, ছোটো মেয়ে নিয়ে মিড্‌ল্ ইষ্টের মরুভূমি, কোথায় সাউথ অ্যামেরিকার অজানা রাজত্বে ঘোরাঘুরি করা, কি চারটিখানি কথা ? অসুখ-বিসুখ হোলে, এক্জিবিশান করব ? না মেয়ের সেবা করব ? তাছাড়া এখন সপরিবারে গেলে সবাই বলবে—পাবলিকের পয়সায় খুব হরির লুঠ চলেছে। এমনিতেই তো কত লোকে কত কথা বলছে। তার উপর স্ত্রী-কন্যা সহ গেলে কি আর বাঁচবার অবস্থা থাকবে ?"

আরতি দেবী এর পর স্বামীর কথাগুলো ন্যায়সঙ্গত মনে কোরে, এ ব্যাপারে আর কথা না ওঠালেও মনে মনে এ কয় দিন নিত্য গুমরেছেন···কিন্তু শঙ্কর হালদারের অকস্মাৎ আবির্ভাব না হোলে, সে গুমরে মরা মন অচিরাৎ গুমরে গুমরেই গুম্-খুন হোতো। আজকের মত এই অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ কখনো সম্ভব হোতো কি ? আজ,

এমন কি স্বভো ঠাকুরও প্রথমে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে নিজেই তো নিছক ভ্যাবাচাকা মেরে গেছিল—পরে না হয়, ধীরে ধীরে যখন যুক্তিপূর্ণ আন্দাজের আলো ফেললো চারধারে, তখন ব্যাপারটা যেন ধরতে পারলো অনেকখানি···

কিন্তু মিনতি দেবী না বললে, শঙ্কর হালদারের আগমন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি ও'—আর সত্যি সত্যি কাণ্ড তো বাধিয়ে গেছে শঙ্কর হালদারই !—পাঁজি দেখে, কখন এসে ঘোষণা করে গেছে যে, রাহু কেতু আর বৃহস্পতির যে সঞ্চার হয়েছে তাতে স্বভো ঠাকুরের অতীব অশুভ ফল সূচিত হয়েছে এ-বছরের বৈশাখ থেকে। এমন কি, কোনো কোনো পঞ্জিকায় রাশিগত বর্ষফলে—দূর বিদেশ যাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ বলে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছে। ভাল যাত্রা হোলেই নাকি মাঝপথে ভরা-ডুবি।

শঙ্কর হালদার শঙ্কর মাছের চাবুকের মতই উপযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সজোরে চাওর কোরে ফ্ল্যাটের সকলকে বিশেষ কোরে আরতি দেবীকে এই রকম তিষ্টিবিক ফিটস-এর মধ্যে ফেলে সরে পড়েছেন কোন ফাঁকে এবং ঠিক সেই ফাঁকেই তো হাজির হয়েছে এসে স্বয়ং স্বভো ঠাকুর!

তাইতো হঠাৎ ঘরের মধ্যে ও'র এই আবির্ভাবে তখন ছত্রভঙ্গ হোলো মজলিস-মহল ! ওর স্ত্রী, তথা আরতি দেবীও উঠে বসেছেন তখন শয্যা ছেড়ে !

স্বভো ঠাকুর মনে মনে ভাবতে শুরু করেছে ও'র স্ত্রীর নিশ্চিত ফিটের ব্যারাম ছিল ! হয়তো সগৌরবে বিবাহের পূর্ব্বে পিত্রালয়ে হয়েও গেছে দু'-চার বার তা। কিন্তু সেই পুরাতন রোগের নতুন আবির্ভাবে ও' যেন সত্যিই ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অন্যমনস্ক। এমন সময় ওর স্ত্রী দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"ওগো শুনছো, বিদেশ যাওয়া তোমার হবে না—কিছুতেই হবে না—আমি যেতে দেব না তোমায়।"

অবাক স্বভো ঠাকুর, বলে কি ? লোরেটোয়-পড়া বিংশ শতাব্দীর মেয়ের মুখে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পৌরাণিক ভাষণে ও' কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ! ও'র স্ত্রীর মুখে এ আবার কি কথা ? এতো দিন তো ও'র সঙ্গে বিদেশ যাত্রার বায়না-ই শুনে এসেছে এক নাগাড়ে। বহু কষ্টে বহু যুক্তি দিয়ে যা থেকে নিবৃত্ত করেছে ও'কে। কিন্তু আজ এই যাত্রার প্রাক্কালে 'যেতে নাহি দিব' বোলে পথ আগলে দাঁড়ানো এই ভঙ্গি—এর জন্যে তো ও' মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নাছোড়-বান্দা ও'র স্ত্রী, তখন বলে চলেছে—"এ বছরে তোমায় আর যেতে দেওয়া হবে না। শঙ্কর বাবু এসেছিলেন, পাঁজি দেখে বলেছেন—এ-বছর তোমার সাঙ্ঘাতিক খারাপ। ভাল যাত্রা অর্থাৎ বিদেশ যাত্রা এখন কিছুতেই উচিত নয় তোমার।"

আজকের রাত্রির ট্রেণেই ও' যাচ্ছে—আর আচ্ছা বিপদেই পড়লো এই যাবার আগে। মেয়ে মাত্রেই কি কুসংস্কারপূর্ণ—তা সে কি অতীত যুগের আর কি এ যুগের ! একটু আঁচড় মারলেই জর্জ্জেট আর লোরেটোর তলা থেকে দাঁত বের কোরে বেরিয়ে পড়ে সেই আদিম অবুঝ নারী······কিন্তু জিনিস-পত্তর গোছাতেও যে এখনো অনেক বাকি ! কাল রাত্রিতে ও'র স্ত্রী নামে মাত্র গুছিয়েছে—আসলে কিছুই ক'রেনি—কিন্তু কি কোরে বোঝায় এখন ও'কে ? অবুঝদের যুক্তি দিয়ে বোঝানোও তো মুস্কিল ! পাজি শঙ্করটা আচ্ছা পাঁজি-ই দেখিয়ে গেল···এমন সময় হঠাৎ আচমকা একটা উপস্থিত-বুদ্ধি চমকে উঠলো ও'র মাথায়। ও' তখন পরিস্থিতি বজায় রেখে গম্ভীর গলায় ও'র স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললো—"শাস্ত্রে আছে—'মানুষ করলে যা হয় দোষণীয়, ঠাকুর করলে তা' হয় লীলা।' তুমি কি জানো না, দেবেন্দ্র-ভবনের দেবশিশুদের গায়ে পাঁজি-পুঁথির গণনা লাগে না ?"

যাকে বলে—ইমিউনড্—তাই। ঠাকুররা তাদের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে রচনা কোরে চলে পঞ্জিকা, পঞ্জিকা অনুযায়ী যাত্রা করে না তারা কস্মিন্ কালেও—এই হচ্ছে তাদের কুল-প্রথা। এ ছাড়া ধরলুমই না হয় শুভ ঠাকুরের সময় খারাপ এ বছর, কিন্তু শুভ এবং অশুভর নাগালের বাইরে যে স্বভো ঠাকুর সে তো সময় ভাল আর খারাপের উর্দ্ধে নয় কি ?—অন্তত বানান অনুযায়ী তো উর্দ্ধে—এটা তোমার মত শিক্ষিতা মেয়ের মনে রাখা উচিত ছিল।

জিনিস-পত্রের অবিলম্বে গোছগাছ করতে আদেশ দিয়ে ও'র স্ত্রীকে আবার বললে—আজই রাত্তিরের ট্রেণে ও' যাচ্ছে, এর কোন অন্যথা নেই।

যাই হোক, শঙ্করের মুখে ছাই দিয়ে, আর প্রফুল্ল বাবুকে বাজিতে হারিয়ে, আজ স্বভো ঠাকুর ঠিক সময় হাজির হ'য়ে গেছে হাওড়া ষ্টেশনে। সত্যি সত্যিই ও'কে কোলকাতার মায়া কাটাতে হোলো এবার। কোলকাতার সঙ্গে কালকেশিয়ানদের বাঁধনের শুধু আলগা কাপড়ের টান নয়, কলজের টান। এই কলজের টানে টেম্পরারি ড্যাস টেনে ও'কে বেরোতে হচ্ছে এবার বহুদিনের জন্যেই তো। বার বার বহু বার কোলকাতা ছেড়ে অন্য জায়গার বাসিন্দে বলতে যাচ্ছে বলে শাসিয়েছে, ঠিক ততবারই পরাজয়ের গ্লানি গায় মেখে আবার গুটি গুটি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে কোলকাতার কোলে। বেচারা অজিতদা'র কথা মনে পড়ে যায় ও'র। সেই শীর্ণ দেহ নিয়ে বাসবিহারী য়্যাভিনিউর সেই ছোট্ট ঘরটিতে চিৎকার কোরে কবিতা পড়ার মত আবেগময় উচ্চারণে আউড়ে উঠতো—'নাথিং লাইক্ ক্যালকাটা।' আজ এই কোলকাতা ছেড়ে চলে যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ও'র-ও দু'-হাত তুলে অজিতদা'র ভঙ্গিতে সেই রকম চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল—'নাথিং লাইক ক্যালকাটা।' কোলকাতার প্রাসাদ থেকে পেভ্‌মেণ্ট, টিউবওয়েল থেকে মনুমেণ্ট—সমস্ত কোলকাতাটাই মনে হয় যেন ও'র করতলগত। ও' যেন কোলকাতার বুকের উপর বসা এ-যুগের কল্কি অবতার!—কোলকাতায় যেখানে যে কোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ও' সব সময় যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনি সাবলীল। তা সে ছেঁড়া চটি কিম্বা জরির নাগরা, লংক্লথের পাঞ্জাবী কিম্বা নয়ন-সুখের ধুতি—যাই পরে চলুক না কেন, কিচ্ছু আসে যায় না। কোলকাতায় ওর পয়সা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি : চা, সিগারেট, খাবার, এমন কি চাইলে রিক্সা থেকে ট্যাক্সি সবই তো ও' পায় ধারে—এমনি ক্রেডিট্ ও'র ! এ ছাড়া আমোদ-আহ্লাদের দরকার হোলে বিনা পয়সায় সবই তো পাওয়া যায় এখানে। এক এক পাড়ায় এক এক রকম আড্ডা। কোথাও সাহিত্য, কোথাও শিল্প, কোথাও পলিটিক্স, কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও কালোয়াতি জলসা, কোথাও ভজন অথবা কীর্ত্তন—কিছুই দুষ্প্রাপ্য নয় ! মেজাজ অনুযায়ী হাজির হোয়ে গেলেই হোলো, অবাধ গতি সর্ব্বত্র।

ট্রেণ ছাড়বার এই আগের মুহূর্ত্তে, কম্পার্টমেন্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও'র মনে হোলো—বনের পাখী কত বার এমনিতর ঘর-ছাড়ানো শিষ্ মেরে ও'কে বের করে নিয়ে গেছে খাঁচার বাইরে। আজ আবার যেন বনের পাখীর শিষ শুনে, খাঁচার পাখী অজানা উদার আকাশে মেলে দিতে চলেছে তার পাখ্না। স্বচ্ছন্দের সোনার পিঞ্জর শূন্য রইল পড়ে। ও'তো স্নেহের শিকল নিজেই কেটেছে দাঁত দিয়ে দিয়ে। রইল পড়ে স্ত্রী, রইল পড়ে কন্যা, রইল এখানকার নীড়। রইল পড়ে কোলকাতা, ও'র সব কিছু। ও'-ই শুধু শিকল ছিঁড়ে জাত-যাযাবর নেমে এলো পথের ধূলায় ধূলোট করতে। এসেছে ও'র বন্ধুরা—এসেছে ওর শ্বশুরবাড়ির লোক—শ্যালক-শ্যালিকা, ও'র স্ত্রী, ওর কন্যা, কিন্তু ও'র কাছে এ সব কিছুই স্পষ্ট নয় যেন—অস্পষ্ট ছায়ার মতই মনে হতে লাগল, ও'দের সকলকে। প্ল্যাটফর্ম্মে সেই বিরাট জনতা—তাদের চিৎকার, হৈ-হৈ, সব কিছুই ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে যেন ও'র মনের কাছে!

ঘণ্টা তো আগেই বেজে গেছে। হ্যাঁচকা টান মেরে রেলটা চলতে শুরু করতেই নিশ্বাস ফেলে ও' মনে মনে উচ্চারণ করল—

"এ মাঙ্ক ইজ্ পিওর গ্ল্যাট্ গোল্ড,

—ওয়াটার ইজ্ পিওর গ্ল্যাট্ ফ্লোড্।"

উপরোক্ত উক্তি সহকারে ও'র এ নিশ্বাস, মুক্তির নিশ্বাস, না দীর্ঘনিশ্বাস—এ কথা কে বলবে?

ট্রেণের গতিতে তখন লেগেছে ছন্দ! লোহার নির্দিষ্ট রেল-পথ—তারই সঙ্গে রেলের চাকার সঙ্ঘর্ষে বিচিত্র সুখ-সম্ভাষণ ছন্দিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে···

ও'র কামরায় আরো দু'টি যাত্রী চলেছেন বম্বে—কর্ম্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। দু'টিই বাঙ্গালী। হাব-ভাবে মনে হয় ওঁরা দু'টিতে পূর্ব্ব হতেই পরিচিত। বার্থ রিজার্ভ করা ছিল এঁদের আগের থেকেই। যেখানে সুভো ঠাকুরই তো উড়ে এসে জুড়ে বসা। বার্থ রিজার্ভ নেই, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নেই, কিন্তু খালি পেয়ে দখল কোরে বসল কি না অন্যতম লোয়ার বার্থখানা, দিব্যি আরামসে। তার পর ইণ্টার ক্লাশের টিকিটটা কে, পি, সেকেণ্ড ক্লাশে চেঞ্জ কোরে এনে দিল এক ফাঁকে—একেবারে যাকে বলে তোফা—তাই! তা নইলে এই বাজারে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিম্বা রিজার্ভেশান শেষ মুহূর্ত্তে মেলা কি সম্ভব?

ও'র চমক ভাঙ্গে—দেখে ভদ্রলোক দু'টি কখোন বাতি নিবিয়ে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছেন। ও'র কি কিছু হুঁস ছিল সে দিকে?

জটায়ু পক্ষীর বিস্তৃত কালো পক্ষের মত বিশালকায় রাত্রি—কালো আর অন্ধকার! সে সীমাহীন অন্ধকার অনন্তের মধ্যে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ জলন্ত নীবারের কণার মত উড়োচ্ছে কে যেন মহাকালের কুলোয় কোরে—উড়্‌কি ধানের মুড়কির মতই উড়ছে যেন ও'রা চার ধারে। তারি তলায়, হ্রস্ব শ্বাস ট্রেণের গতি, ছুটে চলেছে—শেষ নেই, শ্রান্তি নেই, ও'র মনে হোলো—জেম্‌স্ জিন্‌স্-এর মিষ্টিরিয়াস ইউনিভার্স-এর একটা পাতা যেন ঐ অন্ধকার আকাশে কেউ আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়ে গেছে বুঝি? তারায় তারায় তারি কথা যেন লেখা—আর ট্রেণের কামরায় দুলতে দুলতে ও' যেন তা আবার পড়তে শুরু কোরেছে।

তার আবার অস্তিত্ব! ঘর-সংসার, মান-অপমান, কৃতকার্য্যতা, অকৃতকার্য্যতা, উচ্চাভিলাষ, প্রেম, বিচ্ছেদ, শোক, মৃত্যু, কত না বিচিত্র ঘটনার ঘূর্ণিপাক!—সে সব ঘটনা উল্লেখ করারও উপযুক্ত নয়, তাকেই কি না কল্পনার কারখানায় অতিরঞ্জিত কোরে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ম্যাগ্‌নিফাই কোরে, কোটি কোটি গুণ বড় কোরেছে, তার পর মাকড়সার জালের মত নিজের রচিত সেই জালে জড়িয়ে যন্ত্রণায় কেমন ছটফট করছে···ও' অকস্মাৎ নিজে নিজেই হেসে উঠলো। সেই ছোট্টো রেলের কামরার মধ্যে হঠাৎ সে-হাসি প্রতিধ্বনিত হোয়ে বিকট শোনালো। রেলের চাকার আওয়াজ ছাপিয়ে সে হাসির দমক, পিন্-ফুটে ফেটে-পড়া প্রকাণ্ড বেলুনের হঠাৎ-নির্গত-বায়ু-স্বরের মত বিকম্পিত হোলো চারি ধারে। পাথর-চাপা কান্নার মত হাসির পোষাকে বেরিয়ে এসেছে যেন সমগ্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে ও'র অভিযোগ! ও' নিজের অজ্ঞাতে কখোন যে ভেসে উঠেছে, কখোন যে এমনিতর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে—ও' যেন ঠিক নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। ততক্ষণে ও'র সহযাত্রীদের মধ্যে এক জন, এই অচমকা অট্টহাস্যে ঘুমন্ত অবস্থায় উপরের বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়লো নিচে। অপরটি ঘুমের ঘোরেই দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে দেয়ালময় হাতড়াতে লেগেছে বাতির সুইচ!

শেষ অবধি ঘরে যখন বাতি জ্বলে উঠলো, তখন ভদ্রলোক-দ্বয় দেখলেন—কই কোথাও তো কেউ নেই! কেবল সামনের লোয়ার বার্থে সেই অপর ভদ্রলোকটি অর্থাৎ কি না সুভো ঠাকুর—খোলা জানালায় একটা কনুই রেখে, আর সেই হাতের চেটোতেই ও'র মাথার ভার রেখে, চোখ-বোঁজা অবস্থায় হেলান দিয়ে এলিয়ে রয়েছে বসে—নিশ্চুপ নির্বিকার! ঘুমুচ্ছে কি জেগে, বোঝবার জো টি নেই। ও'রা দু'জনে তখন অবাক শুধু নয়—চক্ষু ছানা-বড়া সহকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! সাহস কোরে ভদ্রলোককে তথা সুভো ঠাকুরকে যে ডেকে তুলবে, জিগেস করবে কিছু, তাও যেন পেরে উঠছে না। এর পর অনেক কষ্টে অনেক পাঁয়তাড়ার পর দু'জনের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই সাহস সঞ্চয় কোরে ওকে জাগিয়ে তোলার অছিলায় অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে শুধোলেন—"ও মশাই, শুনছেন···"

সুভো ঠাকুর এবার আচম্‌কা জেগে ওঠার ভঙ্গিতে চমকে উঠে ঘুমের ঘোরেই যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—"য়্যাঁ···আজ্ঞে···শুনেছি···কি শুনেছি?"

নেহাৎ নিরিমিস্যি নিরীহ ভদ্রলোক দু'টি চাকরীতে যোগ দিতে চলেছেন বম্বে—'পাত্তর-টাত্তর'-এর ধারে-কাছে দিয়েও চলা-ফেরা নৈব নৈব চ। শ্বশুরালয় থেকে ছোটো শ্যালিকা যে বিস্কুটের টিনে রাত্তিরের খাবার—লুচি, আলুর দম আর কে, সি, দাশের রসগোল্লা দিয়েছে—সেই তো মাত্র সম্বল! আর সেই সম্বল নিঃশেষ ক'রে ঘুমিয়েছেন এই তো কিছুক্ষণ!—তাঁরা দু'জনেই সুভো ঠাকুরের ঐরূপ অবাক আকাশ থেকে পড়া অবস্থা দেখে এ-ও'র দিকে পরস্পর বিস্ফারিত চোখে চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। তাঁদের হাবভাবে মনে হোলো—এই ঘটনায় তাঁরা সত্যিই ভড়কে গেছেন শুধু নয়, দস্তুর মত ভয়ও পেয়েছেন। আজ-কাল রেলে কত রকম গুণ্ডামি-চোটামি আর খুনখারাবি চলছে, যার খবর তো আকছার খবরের কাগজে পড়ে,

যায়। বিশেষ ক'রে যত হাঙ্গামা তো এই উঁচু ক্লাশের কামরাগুলোয় …তার উপর ওঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকটি আবার বাধিয়েছেন এক ফ্যাসাদ—গিন্নির ফরমাশ অনুযায়ী তাঁর বাপের বাড়ি থেকে তাগা, রুলি, মটরমালা, যত রাজ্যের ভারি ভারি সোনার জিনিসগুলো সঙ্গে নিয়ে চলেছেন এবার। তবে, রেলের পাশ না থাকলে আরামের আর গুলজার করা বড় বড় ইণ্টার ক্লাশ ফেলে কে মরতে এই ছোট্ট সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে আসতে যায়?

ওদের, অর্থাৎ ঐ দুই ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা শুনতে শুনতে সুভো ঠাকুর সত্যিই তখন মনে মনে লাল, নীল, সবুজ হ'য়ে উঠছিল লজ্জায়—কারণ, বাইরের নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের বিরাট পরিব্যাপ্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল ওঁকে জেমস জিন্স-এর 'মিষ্টিরিয়াস ইউনিভার্সে'র কথা আর যার সীমাহীনতার বিপুল পটভূমিকায় ওঁর নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার নিতান্ত এই ব্যক্তিগত দুঃখের অথবা অসুবিধার অতি সামান্যতা—ওরকম অসামান্য হাসিতে রূপ না পেলে, এরূপ অঘটন-ঘটন কখনই ঘটত না আর এই নিরীহ নিদ্রিত ভদ্রলোকদ্বয়ের কপালে খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁচা-ঘুম-ভাঙা রূপ এই দুর্ভোগও দেখা দিত না নিশ্চিত। কিন্তু ওদের এই দুর্ভোগ দূরীভূত করবার এখন তো আর কিছু উপায় নেই! তাই নিরুপায় ও' এবার গায়ের চাদরটা আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে সটান হোয়ে শুয়ে পড়েছে, আর চোখ বন্ধ কোরে দিব্যি শুনছে, ঐ দুই ভদ্রলোকের ফিস-ফিস কথোপকথন। এমন কি স্পষ্ট শুনলো—ওর নামেই ওঁরা তখন বলাবলি শুরু করেছেন—এ ভদ্রলোকের নামটা জানা গেল না তো—বিছানা-টিছানা নেই, কিচ্ছু নেই, শেষ মুহূর্ত্তে এসে সটান নিচের বাঙ্কটা দখল কোরে শুয়ে পড়লো?…চেহারায় মনে হয় ঠিক যেন কাপালিক—জবা ফুলের মত লাল চোখ… নিশ্চয়ই 'কারণ-বারি' পান কোরেছে। তা নৈলে যা দু'-একটা কথা বলছিল, তাও কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল দেখছিলেন না?

এমন সময় ওদের মধ্যে এক জন জিগেস করলেন—"আচ্ছা, ঐ যে লোকজন, মেয়েছেলেরা এসেছিল, ওঁরা কারা?"

এর উত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠটি বললেন—"বুঝলেন না, বাবার শিষ্য-শিষ্যা ওঁরা—এ দরের কাপালিক নিশ্চয়ই না হলে সেকেণ্ড ক্লাশে ট্রাভেল করে?…"

এর পর অপর ভদ্রলোকটি লাফিয়ে উঠে বললেন—"ঠিক বলেছেন, নিশ্চয়ই বড় দরের তান্ত্রিক, এই তান্ত্রিকদের অনেক সময় পিশাচসিদ্ধি থাকে…"

বয়োজ্যেষ্ঠটি এবার বললেন—"সে আর বলতে, দস্তুরমত সেই পিশাচের হাসিই আমার কানে গেছে, আরে, আমরা বীরভূম তারাপীঠের লোক, তান্ত্রিক বামাচারী দেখে দেখে…"

সকাল হয়ে গেছে। সকালের আলোয় সুভো ঠাকুরের আপাদমস্তক আচ্ছাদিত, টুটেন্ খামেনের মামির মতই মনে হয় যেন। ও' নড়ন-চড়নটি না কোরে সেই শায়িত অবস্থা থেকেই চাদরের একটা কোণ ঈষৎ ফাঁক কোরে উঁকি মেরে দেখলো—ওর ঠিক উলটো দিকে, তলাকার বাঙ্কেই ওঁরা দু' কোণে দু'জন কি সুন্দর বসা অবস্থাতেই ঘাড় নেতিয়ে ঢুলে ঢুলে পড়ছেন ঘুমের ঘোরে। সেই ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ চমকে চমকেও উঠছেন যেন আবার। গাড়ির আচমকা হ্যাচকা টানে সে চমকানি, না স্বপ্নের মধ্যে লৌকিক অথবা অ-লৌকিক কোনো বস্তুর আবির্ভাবে ঐ অবস্থায় তা আন্দাজ করা সুকঠিন হোলেও, সুভো ঠাকুর দস্তুর মত আন্দাজ করল যে, সারা রাত নির্ঘাৎ বেচারারা জেগেই কাটিয়েছে, আর তারই মোটামুটি যোগফলে সকাল বেলায় বাঙ্কের দু'দিকে দু'জনে ঐ বিচিত্ররূপে বিরাজমান। ওঁর আপশোসের সীমা রইল না, দুঃখিত হোলো, লজ্জিত হোলো ওদের দু'জনের এই অবস্থায়। ঘরের বাতিটা তখন দিনের আলোয় মুখ-না-ধোয়া বাসি মুখে দাঁত বের করে ফ্যাকাশে হাসি হাসছে যেন!

সুভো ঠাকুর এবার উঠে বাতিটা নিবিয়ে দিল। ষ্টেশনে ষ্টেশনে দিশী-বিদেশী রিফেসমেণ্ট রুমের খানসামাগুলো মাথায় ধড়া-চুড়ো চাপিয়ে তখন দিশেহারা হোয়ে ছোটাছুটি করছে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ জানলার গরাদের উপর মুখ-থুবড়ে উচ্চৈঃস্বরে টি, কিম্বা ব্রেকফাষ্ট চাই জানতে ব্যস্ত! এই রকম কোনো একটা চিৎকারেই বোধ হয় ভদ্রলোক দু'টি এবার আর এক বার চমকে দোলা খেয়ে জেগে উঠলেন। তার পর সকালের আলো দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। ওঁরা উঠেই দু'জনে মিলে হঠাৎ বিছানা-পত্তর বাঁধাবাঁধি শুরু করে দিয়েছেন—যেন সেই ষ্টেশনেই নেমে যাবেন এমনি একখানা ভাব।

সুভো ঠাকুরের ঘুম তো অনেকক্ষণই ভেঙে গেছিল—সারা রাত্রি আলো জ্বালা থাকলেও ও' এবার আলিস্যি ভেঙে যখন

কল্পমালি কি না সগৌরবে জেগে উঠলো. তখন বুঝলো, গত রাত্রিতে নেহাত-ই সুখ-নিদ্রা ঘটেছে ওঁর—শরীরটা ঝরঝরে। বেশ ভালই লাগছে তো আপাতত।

সেই ভদ্রলোক দু'টি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—খোলা বিছানা গুটিয়ে হোল্ডলে পোরা, জিনিসপত্তর বাঁধা-ছাঁদা করা, যেন এই ষ্টেশনেই নেমে পড়ার উদ্যোগ। সুভো ঠাকুর এবার অবাক হয়েই জিগ্যেস করে—"কৌতূহল মার্জ্জনা করবেন, আপনাদের বম্বে যাবার কথা না?···বম্বে পৌঁছতে এখোনো তো এক রাত্তির আরো।"

এর উত্তরে ভদ্রলোক-দ্বয়ের মধ্যে এক জন বললেন···"না, বম্বেই যাচ্ছি, তবে কি না পাশের কামরাটা একদম খালি যাচ্ছে, তাই···"

সুভো ঠাকুর এবার অল্প নড়ে-চড়ে, ঈষৎ অপ্রতিভ হওয়ার ভঙ্গিতে বললে—"এখানে কি আপনাদের খুব ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছিল আপনাদের? আমি তো কিছু অসুবিধের কারণ হইনি?"

ভদ্রলোক দু'জন এক সঙ্গেই হৈ-হৈ কোরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"না—না—মোটেই নয়—আপনি কেন আমাদের অসুবিধের কারণ হতে যাবেন? তবে কি না পাশের কামরাটা একেবারে খালি যাচ্ছে দেখে এলুম···"

সুভো ঠাকুর তো ঘুম ভাঙলেও শুয়েছিল অনেকক্ষণ—আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া থাকলেও, তারি এক কোণের ফাঁক থেকে ঐ দু'জন সহযাত্রীদের অনেক আগেই সকালের আলো, ঐ তো প্রথম নজর করেছিল। এমন কি, এই কিছুক্ষণ আগেও তো ও' দেখছিল—ওঁর চোখের সামনে তলাকার বাঙ্কে, দু'জনে একসঙ্গে বসে বসে ঢুলে ঢুলে পড়ছিল। তখন ঐ তো কামরার আলো নিবিয়ে আবার এসে শুলো। তা ওঁরা গাড়ি থেকে নামল কখন—যে পাশের কামরা খালি যাচ্ছে দেখতে পেলো? ওঁর বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এই ঘটনার জন্য দায়ী কে? ও' মনে মনে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত কোরে বার বার কুণ্ঠিত হোয়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগল। ও' মনে মনে ওদের নেমে যেতে বারণ করবার জন্যে বার কয়েক উসখুশ করে উঠলো! ওঁর ইচ্ছে করছিল—ওদের সার্ট-এর এক একটা কোণ চেপে আটকে রাখে দু'জনকে। কেন যে মরতে ও রকম একটা অসহায় হাসির দমক—দমকা হাওয়ার মত ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল ওঁর মুখ থেকে, কেন যে অন্তরের সেই একান্ত অনুভূতিকে ও' চাপতে পারেনি, তার সঠিক কারণ ও' কিছুতেই ধরতে পারল না! এক-একবার ওঁর ইচ্ছে করল ওঁদের সত্য ঘটনাটা বলে দেয়, যাতে বেচারাদের আর কষ্ট করে অন্য কম্পার্টমেণ্টে উঠে যাবার দরকার হয় না। কিন্তু দেখা গেল —কাজের মধ্যে ও' শুধু ঘুরে জানলার দিকে মুখ কোরে বসা ছাড়া, আর কিছুই করে উঠতে পারল না। কম্পার্টমেণ্টে একা পড়ে রইল ওই কেবল। আর ওঁরা ততক্ষণে একে একে কুলির মারফৎ জিনিস-পত্তর নামিয়ে নেমে পড়লো। নামবার আগে শেষ বারের মত সুভো ঠাকুরের ঘুম-ভাঙা চেহারাটা আর এক বার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে নিল—অবিকল তান্ত্রিক সাধুর মতই দেখতে সে চেহারা—ইয়া দাড়ি, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া মাথায় একমাথা চুল, তার উপর গায়ে আজানুলম্বিত গেরুয়া রং-এর পাঞ্জাবী আর পরনে—ধুতিটাই লুঙ্গির মত কোরে পরা! যেন কামরূপ-কামাখ্যা থেকে নেমে এসেই এক সিদ্ধ-তান্ত্রিক উঠেছেন এসে এই ট্রেণে।

ওঁরা প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে অন্য কামরায় চলে গেছে—চলে গেছে দৃষ্টির অগোচরে। কামরায় সুভো ঠাকুর ছাড়া রইল না আর কেউ।

ট্রেণ আবার রুদ্ধ শ্বাসে চলতে শুরু করে দিয়েছে তখন। গাছপালা টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলো মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ওঁর মুখের উপর দিয়েই ওঁর চোখের অগোচরে চলে যেতে লাগল। আগের ষ্টেশনে কেনা কয়েকটা বাংলা আর য়্যামেরিকান ম্যাগাজিন ও' মাঝে মাঝে তার থেকে এক-আধখানা টেনে দেখতে শুরু কোরেছে—প্রবন্ধ থেকে বিজ্ঞাপন, ছবির প্রদর্শনীর খবরাখবর ইত্যাদি। দেখতে দেখতে সকাল হাজির হোয়ে যায় কখন দুপুরে। দুপুর গড়িয়ে যায় সন্ধ্যায়। তার পর সেই সন্ধ্যাও হাজির হ'য়ে যায় রাত্রে। কিন্তু সেই রাত্রি-ও যে কখন হাজির হ'য়ে গেল সকালে, তা'র হদিশ-ই হোলো না ওঁর। অথচ পৌঁছে গেছে তখন কল্যাণ!

দু' রাত্তির ট্রেণের কামরায় বিলকুল বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে হাজির হোতে চোলেছে বম্বে—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো পৌঁছে যাবে বম্বে। শুরু হোয়ে গেছে ইলেকট্রিক ট্রেণ!—কিন্তু ঠিকানা? ঠিকানা? বম্বেতে যেখানে গিয়ে উঠবে তার ঠিকানা?···য়্যাঃ. ঠিকানাটাই তো তাড়াহুড়োয় রহমান সাহেবের কাছ থেকে নিতে ভুলে গেছে ও'! কি হবে? ও' মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়ল। সঙ্গে তো মাত্তর ক'টা টাকা পুঁজি! আর ঐ ক'টা টাকায় আপাতত চালাতে হবে যত দিন না কে, পি, সি' আর রহমান সাহেব আসেন। এখন উপায়?···ও' চেষ্টা করতে লাগল, আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, এলোপাথাড়ি মনের প্রত্যেকটা দেরাজ হাটকাতে লাগল যদি কোথাও কোনো কোণে-টোনে খুঁজে পায় সেই ঠিকানাটার একটু ইসারা কিম্বা একটুখানি ইঙ্গিত!··· নেপিয়ান সি রোড, হ্যাঁ, নেপিয়ান সি রোড-ই তো—এবার মনে পড়ে গেছে। তার উপর মনে পড়ে যায় রহমান সাহেব গল্প করেছিলেন—বাড়ির সামনেই মিউজিয়াম। ডান পাশে, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি। তলায় বম্বে আর্ট সোসাইটির স্টলে। আর আর্টিষ্ট এণ্ড ফাণ্ডের অফিস। বাড়ির কর্ত্তা বম্বের বিখ্যাত সি, সি, আই অর্থাৎ ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারী!

কোলকাতার ছেলে হোয়ে এর পরও যদি হদিস করতে না পারা যায়, তবে গরুর গাড়ি চাপা পড়াই উচিত। [ক্রমশঃ।

বিদ্যাসাগর

যাঁরা অতীতের জড়-বাধা লঙ্ঘন ক'রে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটি সব চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন, তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ ক'রে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব চেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলার পথ প্রস্তুত ক'রে গেছেন।—রবীন্দ্রনাথ।

রমাপদ চৌধুরী

৩

হীরাবাঈয়ের ঘাঘরাতে তখন ঘুঙুর বেজে চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। মোহরের পর মোহর ঝরে পড়ছে সোনার রেকাবীতে। আসমানী ওড়নার গায়ে সলমা আর চুমকি চমক দেয়। ওড়না নয়, যেন নীল আসমানের গায়ে তারার ঝিকিমিকি। নারেঙ্গী রঙের আঙিয়ার গায়ে কাশ্মীরী কল্কার ছন্দ নাচে যৌবন অঙ্গের তালে তালে। সুর্মা চোখের হঠাৎ হাতছানি লোভ জাগায়। রক্ত নাচায়। নাচের ঘূর্ণি ওঠে হীরাবাঈয়ের চঞ্চল পায়ে, ঘুঙুরের বোল ফোটে ঝুমুরঝুম ঝুমুরঝুম। আর কোকিলকণ্ঠে গজল গানের রেশ নেশা ছড়ায় সুরাবিভোর চোখে।

বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম লাল মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন হীরাবাঈয়ের স্বচ্ছন্দ শরীরের দিকে। হাতে গজদন্তের কারুকার্য করা ফর্সির নল।

তামাকে আতরের ছিটে দিয়ে সরে গেল হুকাবরদার। হীরাবাঈয়ের খাস বাঁদীর ইশারায় সোনার সানকিতে এলো বাগদাদী সুরা।

মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারী শোভা সিংহের চোখ জুড়ে আসছে তখন। বামন চেহারার ভাঁড়টা তালে তালে বিচিত্র ভঙ্গী করছে।

—অ্যাই! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন শোভা সিংহ।

তার পর আবার ঝিমিয়ে পড়ে অস্ফুটে বললেন, কমবক্ত!

সারেঙ্গীর সুরের মূর্চ্ছনা আর নাচের ঘূর্ণী হঠাৎ থেমে পড়লো।

শোভা সিংহের কাছে এসে বসলো হীরাবাঈ। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বললে, আমার ইনাম, রাজাবাহাদুর!

—রাজাবাহাদুর? হো-হো করে হেসে উঠলেন বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম।

নিজেই যাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলেন হীরাবাঈয়ের জলসায় সেই শোভা সিংহ কি না রাজাবাহাদুর! পরগণা চিতোয়া বরদার সামান্য ভূমিপতি হল রাজাবাহাদুর, রাজা কৃষ্ণরাম সামনে বসে থাকতে?

হীরাবাঈ অপাঙ্গে তাকিয়ে একটা মধুর কটাক্ষ হানলে বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দিকে।

বললে, আপনার কাছে আর কি ইনাম চাইবো মহারাজবা! আপনি এসেছেন এ গরীবখানায় এই তো ইনাম।

খুশির হাসি ফুটলো কৃষ্ণরামের চোখে।

রাজা কৃষ্ণরামকে মহারাজবাহাদুর বলছে বাঈজী। শোভা সিংহকে বলুক রাজাবাহাদুর।

নেশার চোখে হাত তুলে কৃষ্ণরাম অস্ফুটে বললেন, জহুরী বুলাও।

জহুরী বোধ হয় হাজির ছিল পর্দার আড়ালে।

আখরোট কাঠের পেটিটা নিয়ে এসে সামনে রাখলো সে। তার পর সেটা খুলে ফেলতেই ঝাড়লণ্ঠনের তীব্র আলোয় ঝলমল করে উঠলো হীরে-পান্নার সুন্দর একটি চন্দ্রহার।

হাত বাড়িয়ে সেটা চোখের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রইলেন শোভা সিং, তার পর হীরাবাঈকে পরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, ঠিক হায়, এই নাও ইনাম।

বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম চিৎকার করে উঠলেন, খবরদার! ব'লে ইশারা করলেন জহুরীকে।

জহুরী ছুটে গেল। কৃষ্ণরাম বললেন, ও হার আমার, আমি ইনাম দেবো হীরাকে! হীরাকে হীরা ইনাম দেবো!

জহুরী হেসে বললে, তা হলে নিলাম হোক হুজুর!

—হাঁ, নিলাম! শোভা সিংহ তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বললেন।

রাজা কৃষ্ণরাম ঘাড় নেড়ে বললেন, কায়েম! ব'লে সোনার রেকাবীতে পাঁচটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন।

দশটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন শোভা সিংহ।

একটি মোহর একশো মোহরের প্রতিশ্রুতি। রাজ্যে ফিরে গিয়ে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেবার বাক্‌দান। কিন্তু নিলামের নেশায় তখন দু'জনেই বুঁদ হয়ে গেছেন।

নিলামের দর উঠছে তো উঠছেই।

রেশমী থলী থেকে এক মুঠো মোহর বের করে ছুঁড়ে দিলেন রাজা কৃষ্ণরাম।

শোভা সিংহ ছুঁড়ে দিলেন সমস্ত থলীটাই।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন রাজা কৃষ্ণরাম।

ডাক ছাড়লেন, জামিন!

নেশা ছেড়ে গেল শোভা সিংহের। অপমানে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে এত বড়ো অপমান? শোভা সিংহকে জামিন দিতে হবে কোন শ্রেষ্ঠী এনে? মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারী শোভা সিংহের প্রতিশ্রুতিই কি জামিন নয়?

হীরাবাঈ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো।

—হীরা কি কসুর করলো রাজাবাহাদুর!

—কসুর? ক্রোধান্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন শোভা সিংহ।

আর হো-হো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন রাজা কৃষ্ণরাম। সে হাসি জ্বালা ধরিয়ে দিলো শোভা সিংহের সর্বাঙ্গে। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে এ অপমানের।

বিবিবাজার ছেড়ে ঘোড়া ছুটলো। মেদিনীপুর নয়, উড়িষ্যার পথে। রহিম খাঁ। শোভা সিংহ মনে মনে বললেন, পাঠান রহিম খাঁ আমার বন্ধু, মোগলের দাস রাজা কৃষ্ণরামকে এ অপমানের মূল্য দিতে হবে একদিন।

শোভা সিংহ যখন ঘোড়া ছুটিয়ে উড়িষ্যার পথে চলেছেন, তখন বিষ্ণুপুরের যুবরাজ রঘুনাথ সিংহ তার সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দামোদরের তীর ঘেঁষে চলেছে বনবিষ্ণুপুরের পথে।

ক্ষণেকের জন্য দেখা রূপসী মুসলমানীকে কিছুতেই যেন মন থেকে দূর করতে পারছে না রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে লোভ জেগে ওঠে, বাঁদীবাজারে ফিরে গিয়ে কালো বোরখার তিলোত্তমাকে কিনে আনতে ইচ্ছে হয়।

পরমুহূর্তেই লোভ দমন করতে হয়। বিধর্মী নারীর প্রতি লোভ হিন্দু যুবরাজের পক্ষে অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। রঘুনাথ নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যিই কি অন্যায়? বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বিষ্ণুপুরের কাছে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে, মানুষকে মানুষ বলেই জেনেছে রঘুনাথ। শ্রীচৈতন্যদেব তো যবনকে শিষ্যত্ব দিতে অস্বীকার করেন নি। আর মদন-মোহনের কাছে প্রেমই সারবস্তু, প্রেমই সত্য।

তবে কি বিবিবাজারের অনিন্দ্যসুন্দরী এক বাঁদীর প্রেমে আবদ্ধ হ'ল রঘুনাথ?

অপরিচিতা রূপসীর কথা ভাবতে ভাবতেই মোহগ্রস্তের মত ছুটে চলেছিলো রঘুনাথ। অকস্মাৎ চোখে পড়লো এক-সারি রাজহাঁস তীব্র গতিতে ভেসে চলেছে খরস্রোত দামোদরের বুকে।

ঘোড়ার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলো রঘুনাথ। রাজহাঁসের দল স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রঘুনাথ সবিস্ময়ে দেখলো, রাজহাঁস নয়, এক বহর বজরা ভেসে চলেছে সুশুভ্র পাল তুলে। দেখলো, একটি সুসজ্জিত মধুকরকে কেন্দ্র করে চলেছে রাজবল্লভ, সমুদ্রফেনা আর ময়ূরচূড়। তারও সামনে কয়েকটি বালাম, সারেঙ্গা আর স্লুপ। মধুকরের কাহনে রক্তমখমল গালিচা পাতা, গুদস্তা আর ইসকায় রূপোর পাত। আর পালের গায়ে বর্দ্ধমানরাজের প্রতীকচিহ্ন।

বজরার কোমল শয্যায় মখমলের উপাধানে গা এলিয়ে কৃষ্ণরাম তখন গল্প শুনছিলেন আলাপনীর কাছে।

মধুকরের ওপর থেকে হঠাৎ কৃষ্ণরাম দেখতে পেলেন সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে। দূর থেকে আরোহীকে চিনতে পারলেন না রাজা কৃষ্ণরাম। কিন্তু মোগলরাজ্যের বুকের ওপর এই দুর্মূল্য আরবী ঘোড়ায় চড়ার দুঃসাহস যার তাকে যবন বলে মনে হ'ল না। বেশবাস দেখে স্বধর্মী বঙ্গবাসী বলেই মনে হ'ল তাঁর।

আলাপনী এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি কৃষ্ণরামের মন তার কাহিনীর সূত্র হারিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সাদা ঘোড়ার সওয়ারের দিকে।

হঠাৎ রাজা কৃষ্ণরামের বিস্মিত চোখে চোখ পড়তেই গল্প থামালো আলাপনী। নিজের মনেই কি এতক্ষণ গল্প বলে চলেছিল সে? কৃষ্ণরাম শুনছেন না তার কাহিনী?

আহত চোখ তুলে আবার তাকালো সে। গল্প বলার চাতুর্য্যের জন্যে তার খ্যাতি দেশব্যাপী। ত্রিপুরারাজের আমন্ত্রণে গিয়ে কৃষ্ণরাম রাজদরবারে দেখা পেয়েছিলেন তার, এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মুখে কাহিনী শুনে যে, নিজের দরবারের সম্পদ বাড়িয়েছিলেন তাকে ত্রিপুরারাজের কাছ থেকে উপহার চেয়ে। আর কাশীর মহোৎসবে সারা ভারতের রাজপরিবার থেকে এসেছিল দক্ষ আলাপনীর দল। তাদের মধ্যে গল্প বলার অপূর্ব্ব কৌশলের জন্যে যার নাম ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে, দণ্ডের পর দণ্ড যে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখতো, সেই আলাপনীর কাহিনীর সূত্র হারিয়ে কৃষ্ণরাম বিস্মিত চোখে কার দিকে তাকিয়ে আছেন?

গল্প থামতেই কৃষ্ণরামের তন্ময়তা ভাঙলো। বললেন, কাদম্বরী। সওয়ারকে দেখে হিন্দু মনে হয় যেন?

কাদম্বরী সায় দিলো তাঁর কথায়।—হাঁ, মহারাজ!

কৃষ্ণরাম বললেন, বহরদারকে বলো, ওঁকে আমার মধুকরে আমন্ত্রণ জানাতে।

কাদম্বরী উঠে এসে হুকুম জানালো বহরদারকে, যার তত্ত্বাবধানে চলছিলো সমগ্র নৌকোর বহর।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বালাম ছুটলো তীরের দিকে, বহরদারের হুকুমে। আর ঘাটে এসে নোঙর ফেললো কৃষ্ণরামের মধুকর।

তীর থেকে মধুকরে উঠে এলো রঘুনাথ, কৃষ্ণরামের আমন্ত্রণে। সসম্মানে কুর্নিশ করে রঘুনাথকে কৃষ্ণরামের কাছে নিয়ে গেল কাদম্বরী।

পরিচয় পেয়ে রঘুনাথকে পাশে বসালেন কৃষ্ণরাম।

তার পর সুরার পাত্র এগিয়ে দিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর সহাস্যে বিবৃত করলেন শোভা সিংহের ঔদ্ধত্য।

বললেন, উচ্চাশার কোন সীমা নেই রঘুনাথ! মেদিনীপুরের সামান্য ভূমিপতি শোভা সিংহ, রাজা হবার স্বপ্ন দেখে। জহরতের নিলাম ডাকে রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

রঘুনাথ বিচলিত বোধ করলো বিবিবাজারে হীরাবাঈয়ের মুজরার ঘটনা শুনে।

বিবিবাজারের ইতিহাসও তো এমনি এক ঘটনা থেকেই।

দায়ুদ খাঁ ফিরছিলেন আগ্রা থেকে। পাল্কীতে ছিল তাঁর বেগম। আর তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে, সামনে পিছনে পাইক বরকন্দাজ। হঠাৎ গতিবেগ থামলো পাল্কীর। লাগাম টেনে ধরতে হল দায়ুদ খাঁকে।

পথ বোধ করে চলেছেন অযোধ্যার নবাব। হাতীর পিঠে চড়ে ছত্রের মেলায় চলেছেন তিনি।

বেগম উষ্মা প্রকাশ করলো বাঁদীর কাছে, বাঁদী জানালো, বেগম সাহেবা রুষ্ট হয়েছেন। আত্মাভিমানে আঘাত লাগলো দায়ুদ খাঁর।

জেদের বশবর্ত্তী হয়ে বললেন, পাল্কী ঘোরাও। ছত্রের মেলায় যাবো আমরাও।

সঙ্গে সঙ্গে খবর রটে গেল। ছত্রের মেলায় যত হাতী এসেছে সব কিনে ফেলবেন দায়ুদ খাঁ।

সে খবর শুনলেন অযোধ্যার নবাব। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি। পাঠান দায়ুদ খাঁ কিনবে ছত্রের হাতী? নিলামদারকে ডেকে বললেন, দায়ুদ খাঁ যেন একটা হাতীও কিনতে না পায়।

নিলামদারের বেকাবাঁতে সেদিনও এমনি মোহরের পর মোহর জমেছিল। কিন্তু অযোধ্যার নবাবের কাছে হার মেনেছিলেন দায়ুদ খাঁ। অপমানে রাগে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে।

এসে পত্তন করেছিলেন বিবিবাজার। অথচ সেই বিবিবাজারই চলে গেল আলমগীরের রাজত্বে। পাঠান দায়ুদ খাঁর সাম্রাজ্য সঙ্কীর্ণ হতে হতে কোন রকমে টিকে রইলো শুধু উড়িষ্যায়।

তাই রঘুনাথ বললে, অতঙ্কারের পতন অনিবার্য। দায়ুদ খাঁর মত শোভা সিংহকেও নিঃস্ব হতে হবে একদিন!

কৃষ্ণরাম বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন, তা নয় রঘুনাথ! আমি ভাবছি বাংলার কথা। সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বিষ্ণুপুরই চিরকাল স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর সবই মোগলের পদানত। মোগল বাদশার অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওদিকে পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচার, এদিকে মোগলের। এ সময়ে সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে, যথাসাধ্য মোগল অত্যাচারও কমাতে হবে সদ্ভাবের সুযোগ নিয়ে। এ সময়ে যদি শোভা সিংহ বিদ্রোহ করে...

—বিদ্রোহ? চমকে উঠলো রঘুনাথ।

কৃষ্ণরাম বললেন, হাঁ রঘুনাথ, আমি খবর পেয়েছি শোভা সিংহ বিবিবাজার থেকে উড়িষ্যার পথে চলেছে। সম্ভবতঃ রহিম খাঁর সন্ধানে। পাঠান রহিম খাঁ মোগলের শত্রু, তার শিবিরের দিকে চলেছে শোভা সিংহ। কিন্তু এক জন হিন্দু ভূমিপতিও যদি বিদ্রোহ করে, তা হলে পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচার বেড়ে যাবে, আর শায়েস্তা খাঁ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে আসবে চট্টগ্রাম থেকে।

রঘুনাথ হেসে বললে, চট্টগ্রাম? চট্টগ্রাম অধিকার করেছে শায়েস্তা খাঁ! খবর পেয়েছি, চট্টগ্রাম এখন ইসলামাবাদ। পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুরা বিতাড়িত হয়েছে।

কৃষ্ণরাম বললেন, সত্য হলে শুভ সংবাদ। হিংস্রপশুর অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে বাংলার সীমান্তবাসীরা। কিন্তু এ সাফল্য সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে রঘুনাথ, শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে বাংলার হিন্দু প্রজার উপর শায়েস্তা খাঁর সমস্ত নৃশংসতা নেমে আসবে।

রঘুনাথ হেসে বললে, শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে সে বিদ্রোহ দমনের ভার নিলাম আমি রাজা কৃষ্ণরাম!

তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলো রঘুনাথ।

৪

শোভা সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিজ্ঞা করলো রঘুনাথ।

নিয়তি গোপনে হাসলো তার প্রতিজ্ঞা শুনে।

রঘুনাথ স্বপ্নেও ভাবেনি, এই আকস্মিক প্রতিশ্রুতির জন্যে অনুশোচনা হবে তার। ভাবেনি, এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

খুশি মনে বিষ্ণুপুরে ফিরে এলো রঘুনাথ।

মদনমোহনের মন্দিরে এসে দাঁড়ালো।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সমস্ত মন বিষাদে ভরে গেল রঘুনাথের। পিতা দুর্জন সিংহের ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর মদনমোহনের মন্দির প্রাণহীন পড়ে আছে তখনও।

মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কায় মদনমোহন বিগ্রহকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দুর্জন সিংহ। সুতানুটির এক সম্ভ্রান্ত-পরিবারের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন সে বিগ্রহ। কিন্তু মদনমোহনের মন্দির সম্পূর্ণ হয়েও প্রাণহীন পড়ে রইলো বিগ্রহের অভাবে।

তবে কি মদনমোহন ফিরে আসবেন না বিষ্ণুপুরে?

- যুবরাজ।

বিগ্রহহীন মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে চমকে উঠলো রঘুনাথ।

দেখলে, এক জন পত্রবাহক দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অপেক্ষায়।

হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি দিলো সে রঘুনাথকে, যথারীতি নতমস্তকে বললে, শোভা সিংহের কন্যার কাছ থেকে এই চিঠি নিয়ে এসেছি যুবরাজ! এ চিঠি আপনার হাতে গোপনে পৌঁছে দিতে বলেছেন কুমারী চন্দ্রপ্রভা।

বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠলো রঘুনাথের কপালে। শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা গোপনে চিঠি লিখেছে রঘুনাথকে?

চিঠি পড়ে আরও বিস্মিত হলো রঘুনাথ। কিশোরী চন্দ্রপ্রভার করুণ মিনতিতে ভরা চিঠি!

বড়ো বিচলিত বোধ করলো সে। এ কি অদ্ভুত আমন্ত্রণ!

ধীরে ধীরে সঙ্গীতকক্ষে এসে ঢুকলো। দ্বাররক্ষীকে বললো, রামশঙ্করকে খবর দাও, আর নিতাই নাক্ষিরকে।

বলে তানপুরাটা কাছে টেনে নিলো। টুং টাং টুং টাং করে বোল ফুটলো, কিন্তু মনের মত তান খুঁজে পাচ্ছে না যেন রঘুনাথ! ক্ষণে ক্ষণে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় এসে মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। কি এক অনাস্বাদিত পুলক!

তানপুরা সরিয়ে রেখে আবার চন্দ্রপ্রভার চিঠিটা খুলে পড়লো রঘুনাথ। অপরূপ ছন্দময় এক টুকরো চিঠি, প্রতিটি অক্ষরে যেন কোমল কিশোরী-মনের স্পর্শ।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল এক রূপসী বাঁদীকে দেখে জীবনে প্রথম নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলো, কিন্তু সে রূপের ঝলকে ছিল দাহ, ছিলো এক অবোধ্য বেদনা। কিন্তু চন্দ্রপ্রভার চিঠি যেন চন্দনধূপের স্নিগ্ধ সুগন্ধ। যৌবনজ্বালার শরীরে জ্বালাহর প্রলেপ যেন।

পরক্ষণেই সন্দেহ উঁকি দিলো রঘুনাথের মনে। এ চিঠি কৃত্রিম নয় তো? শোভা সিংহ কৌশলে হয়তো বন্দী করতে চায় বিষ্ণুপুর-যুবরাজকে, কে জানে?

অন্যমনস্ক ভাবে আবার তানপুরা তুলতে যাচ্ছিলো রঘুনাথ, হঠাৎ সম্মুখের সুবৃহৎ আয়নায় রামশঙ্করের সুপুরুষ চেহারার প্রতিচ্ছবি পড়লো।

—এসো রামশঙ্কর! ফিরে তাকিয়ে মৃদু হেসে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে কাছে বসতে বললো রঘুনাথ। রামশঙ্করের পিছনে পিছনে নিতাই নাজির আর বৃন্দাবন নাজিরও এসে বসলো।

রঘুনাথ তানপুরার তারে টুং টাং টুং টাং সুর তুলতে তুলতে জিগ্যেস করলো, দিল্লীর খবর পেয়েছো রামশঙ্কর?

রামশঙ্কর হাসলো।—পেয়েছি যুবরাজ! সঙ্গীত-সরস্বতীকে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিদায় দিতে চান আওরঙ্গজেব।

রঘুনাথ হেসে বললো, সুখবর রামশঙ্কর! এই সুযোগ, সঙ্গীত-সরস্বতী এবার হয়তো বিষ্ণুপুরে এসে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ?

রামশঙ্কর হাসলো, হ্যাঁ রাজি হয়েছেন দিল্লী ছেড়ে বিষ্ণুপুরে আসতে। ওস্তাদ পীর বক্সও আসতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু···

বাকী কথাটুকু বলতে বিব্রত বোধ করলো রামশঙ্কর। কি ভাবে বলবে কথাটা! রাজ্যের অবস্থা তো অজ্ঞাত নয় তার কাছে। তা ছাড়া যে বেতন একমাত্র আলমগীরের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য কি করে তা বহন করবে?

রঘুনাথ বুঝতে পারলো, কেন এ সঙ্কোচ।

বললো, থামলে কেন রামশঙ্কর, বলো, কি দক্ষিণা চেয়েছেন তাঁরা?

রামশঙ্কর লজ্জিত ভাবে বললো, মাসিক পাঁচশো টাকা চেয়েছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

রঘুনাথ হেসে বললো, রামশঙ্কর, মল্লশিবের পুজোয় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারে বিষ্ণুপুর, তা হলে সঙ্গীত-সরস্বতীর পুজোয় সামান্য হাজার টাকা দিতে পারবে না? লোক পাঠাও রামশঙ্কর, আমন্ত্রণ জানাও তাঁদের।

নিতাই নাজির খুশি হয়ে বললে, সে ভার আমিই নিলাম, কিন্তু এখন একটা গান সুরু করুন, যুবরাজ!

রঘুনাথ হাসলে।—রামশঙ্করের সামনে আমাকে গান গাইতে বলো না নিতাই। দেবদত্ত কণ্ঠের কাছে আমার গান সুরের অপমান।

রামশঙ্কর ক্ষুব্ধ হলো। বললে, এ ভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না যুবরাজ!

রঘুনাথ রামশঙ্করকে তানপুরা এগিয়ে দিয়ে বললে, না রামশঙ্কর, তুমিই গাও। আমার মন আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে? কিন্তু কেন? প্রশ্ন করতে পারলো না কেউই। অথচ সে কথা প্রকাশ করে বলতে পারলে হয়তো গোপন হৃদয়ের যন্ত্রণার লাঘব হ'ত, হয়তো স্বস্তি পেতো রঘুনাথ।...

বিবিবাজারের কালো বোরখার রহস্যময়ীর চটুল চোখ মনে পড়লো। পরক্ষণেই মনে পড়লো শোভা সিংহের কিশোরী কন্যা চন্দ্রপ্রভার চিঠির কথা।

রঘুনাথের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা দেখতে পেলো রামশঙ্কর। তার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যেই হয়তো তানপুরাটা তুলে নিলো রামশঙ্কর। ধীরে ধীরে সুরের মূর্চ্ছনায় ভরে গেল সমস্ত পরিবেশ।

গান সুরু করলো রামশঙ্কর।—অজ্ঞান-তম-নিকরে গাঢময়ি পতিতে···

গান শেষ করে রামশঙ্কর দেখলে, ক্লান্ত রঘুনাথের কপালে স্বেদ-বিন্দুর মালা ফুটে উঠেছে। সামনের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রঘুনাথ।

মৃদু হেসে নিতাই এবং বৃন্দাবনকে ইশারা করলো রামশঙ্কর, তারপর ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলো।

৫

প্রাসাদের বাইরে এসে যমুনাবাঁধের পাড়ে গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসলো তিন বন্ধু। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, নিতাই নাজির আর বৃন্দাবন নাজির।

তিন জনই বয়সে তরুণ। কিন্তু রাজ্যের স্বপ্ন তাদের চোখে। মল্লবীরের রাজত্ব এই বন-বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের প্লাবন আনতে হবে। শুধু অস্ত্রের শক্তি নয়, সুরের বন্যাতেও যেন চতুর্দিকে ভেসে যায় বিষ্ণুপুরের খ্যাতি।

আর এত দিন পরে সে সুযোগ বুঝি ঘটলো। রাজা দুর্জ্জন সিংহ রোগশয্যায়, রাজ-কবিরাজ গোপনে হতাশা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যুবরাজ রঘুনাথ সিংহাসন পাবেন কিছু দিনের মধ্যেই। তখন, তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ রঘুনাথের চেষ্টায় নিঃসন্দেহে নতুন জোয়ার আসবে সঙ্গীতের পৃথিবীতে।

নিতাই নাজির বললে, নিশ্চয়। দেখলে না বৃন্দাবন, পাঁচ পাঁচশো টাকা মাসোহারার কথা শুনেও এতটুকু বিচলিত হলেন না যুবরাজ।

রামশঙ্কর মাথা নাড়লে নিতাই নাজিরের কথায় সম্মতি জানিয়ে। তার পর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সেই জন্যেই বড়ো ভয় হয় নিতাই।

—ভয়? বিস্মিত হ'ল বৃন্দাবন।

রামশঙ্কর বিষণ্ণ হাসি হাসলো। বললো হাঁ, বৃন্দাবন, ভয় হয়। রাজ্যের অবস্থা তো কারও অজানা নয়! সুতানুটীর মিত্র-বাড়ীতে মদনমোহনের বিগ্রহকে নাকি সরিয়ে রাখা হয়েছে মুসলমানের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যে। রাজ্যের প্রজারা সে কথা বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু বৃন্দাবন, সে গুজব মিথ্যা।

—মিথ্যা? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললে নিতাই নাজির।

রামশঙ্কর হাসলে।—আসল কথা কি জানো নিতাই? মদনমোহনকে বন্ধক রাখা হয়েছে, ঋণ শোধ করতে পারছেন না বিষ্ণুপুররাজ, তাই মদনমোহনের মন্দির শূন্য পড়ে আছে।

বৃন্দাবন ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু যুবরাজ সিংহাসন পেলে এ ঋণ শোধ করে দেবেন। ওঁর মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান যুবরাজ—মল্লবংশের গৌরব, বিষ্ণুপুরের গৌরব।

রামশঙ্কর বললে, বড়ো ভয় হয় বৃন্দাবন, সিংহাসন পেয়ে যখন রাজকোষের দৈন্য চোখে পড়বে, তখন হয়তো অত্যাচারী হয়ে উঠবেন যুবরাজ, কিংবা অমিতব্যয়ী আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবেন। এক কথায় উনি ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্সকে আনাতে বললেন, কিন্তু এ তো বিচক্ষণতা নয় বৃন্দাবন! যুবরাজের উচিত ছিল রাণীমার পরামর্শ গ্রহণ করা, উচিত ছিল দেওয়ানজীর অনুমতি গ্রহণ করা।

বৃন্দাবন উত্তর দিলো, মিথ্যা দুশ্চিন্তা তোমার রামশঙ্কর, যুবরাজ সঙ্গীতের ভক্ত বলেই এত সহজে রাজি হয়েছেন, বিষয়ান্তরে হয়তো এত সহজে সম্মতি দিতেন না।

রামশঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কি জানি! শুনেছি বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার সঙ্গে যুবরাজের বিবাহ দিতে চান রাণীমা।

—বর্দ্ধমানরাজের কন্যা? বিস্ময় প্রকাশ করলো নিতাই, বললে, মল্লবংশে কি কন্যাদান করবেন কৃষ্ণরাম? রামশঙ্কর বললে, জ্যোতিষাচার্য্য বিবিবাজারের মেলা থেকে বিষ্ণুপুরে আসবেন, তার পর কন্যার কোষ্ঠীবিচার করে যদি সম্মতি দেন তবেই প্রস্তাব পাঠাবেন রাণীমা! আর, রাজনীতিতে সব বিবাহই সম্ভব নিতাই!

জ্যোতিষাচার্য্যের গণনা! জ্যোতিষাচার্য্যের কোষ্ঠীবিচার!

বিষ্ণুপুরের জ্যোতিষীবংশের গণনাকে বড়ো ভয় পায় রামশঙ্কর। বড়ো নির্দ্দয় সে গণনা। বড়ো বেশী অভ্রান্ত।

দূরে বিড়াই নদীর তীরে দৈবজ্ঞপল্লী চাকদহের আকাশে তখন মৃদু মৃদু ঢোলকের আওয়াজ উঠছে। আর যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠছে জ্বলে জ্বলে।

সে দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল রামশঙ্কর। দৈবজ্ঞের গণনায় ভুল ছিল না সেদিন। ভুল অর্থ বুঝেছিলেন মল্লরাজ বীর হাম্বীর। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ, আর বিষ্ণু দৈবজ্ঞ সেদিন রাজসভায় রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিচার করতে করতে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

বলেছিলেন, মহারাজ! বিষ্ণুপুর-রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে চলেছে বহুমূল্য রত্ন। ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান রত্নৈশ্বর্য্য আজ সন্ধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম করে চলেছে, এ ঐশ্বর্য্য বিষ্ণুপুর-রাজ্য কোন দিন ভোগ করে নি, সারা ভারতে এ রত্নের তুলনা মিলবে না।

বীর হাম্বীর বিচলিত হয়ে উঠলেন সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে। দৈবজ্ঞদের বিদায় দিয়ে বিশ্রামকক্ষে চলে গেলেন বীর হাম্বীর, বিশ্রামকক্ষ থেকে অন্দর মহলে।

দাসীদের পরিচর্য্যা অসহ্য মনে হল তাঁর। রাণী সুদক্ষিণার মধুর হাস্য দেখে বিরক্ত বোধ করলেন। ন্যায় আর অন্যায়ের দ্বন্দ্ব চলেছে তখন তাঁর মনে

তুলনাহীন রত্ন-ঐশ্বর্য্য! কল্পনার চোখে বীর হাম্বীর দেখলেন দু'হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মণিমুক্তা মাণিক্য, হীরে আর জহরৎ বিলিয়ে দিচ্ছেন তিনি অন্দর মহলের দাসীদের উদ্দেশ্যে। আর সবচেয়ে মূল্যবান কণ্ঠহারটি যেন পরিয়ে দিচ্ছেন রাণী সুদক্ষিণার গলায়।

বিচলিত মনে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ দেহরক্ষীর উদ্দেশে ডাক ছাড়লেন রাজা বীর হাম্বীর।

দেহরক্ষী ছুটে এলো।

বীর হাম্বীর বললেন, পঞ্চাশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে তৈরী হতে বলো।

বলেই ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠলেন বীর হাম্বীর।

প্রাসাদের সকলে বিস্মিত হয়ে দেখলো জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন বীর হাম্বীর, আর তাঁর পিছনে পিছনে পঞ্চাশ জন

দস্যুর লোভ জেগে উঠেছে তখন তাঁর উষ্ণ রক্তে। দৈবজ্ঞের নির্দেশ অভ্রান্ত—জগতের শ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনের লোভে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন বীর হাম্বীর, রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের দিকে।

নির্দ্দিষ্ট পথের পাশে গোপনে বসে রইলো পঞ্চাশ জন অনুচর। রত্নের প্রতীক্ষায়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো : কিন্তু কোন পথিকের দেখা নেই। তবে কি দৈবজ্ঞের গণনা ভুল?

তরবারি বের করে প্রতিজ্ঞা করলেন বীর হাম্বীর, জ্যোতিষীর গণনা ভুল প্রমাণিত হলে এই তরবারিই তার শাস্তি দেবে। আর গণনা যদি সত্য হয়, তা হলে এই তরবারিই সে রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে, রাজকোষের সম্পদ বাড়াবে!

অধৈর্য্য আবেগ চেপে গোপনে বসে থাকেন মল্লরাজ, প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়ে আসে।

হঠাৎ এক-সারি ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন বীর হাম্বীর। তিনটি গরুর গাড়ী এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ঈপ্সিত রত্ন কি থাকতে পারে এই দরিদ্র যাত্রীদের কাছে? কে জানে হয়তো দস্যুর সন্দেহ নিরসনের জন্যেই এই দারিদ্র্যের ছদ্মবেশ!

আনন্দে অধীর হয়ে বীর হাম্বীর অনুচরদের ইশারা করলেন। চতুর্দ্দিক থেকে বজ্র গর্জ্জনে লাফিয়ে পড়লো অনুচররা।

রত্নপেটিকার সঙ্গে আরোহীদেরও বন্দী করে নিয়ে এলেন মল্লরাজ বীর হাম্বীর।

কিন্তু প্রাসাদে এসে সে পেটিকার আবরণ উন্মোচন করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

রত্ন? হাঁ, অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার। হীরে জহরৎ নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য পাণ্ডুলিপি। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা আর টীকা।

বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং নরোত্তম ঠাকুর এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলেছিলেন গৌড়ে।

লজ্জায় অনুশোচনায় শ্রীনিবাসের পদস্পর্শ করে ক্ষমা চাইলেন বীর হাম্বীর। বললেন, গুরুদেব, মার্জ্জনা করুন এ নির্দয় দস্যুকে, পরিত্রাণের পথ দেখান। অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছি সত্য, আমাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা দিন আপনি।

দীক্ষা নিয়েছিলেন বীর হাম্বীর, আর সমগ্র বিষ্ণুপুর-রাজ্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল সেদিন। বিষ্ণুপুরের নাম হয়েছিল গুপ্ত বৃন্দাবন।

কিন্তু দস্যুরাজ বীর হাম্বীর ভক্তিরসে অবগাহন করেও তাঁর মনের পাপ ধুয়ে ফেলতে পারলেন না।

বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, বহু অর্থ ব্যয় করে তৈরি করালেন কালাচাঁদের বিগ্রহ। কিন্তু সে বিগ্রহে প্রাণের সন্ধান পেলেন না তিনি। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অনুসন্ধান করে বেড়ালেন এমন এক মূর্ত্তি যার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ মিলবে।

পরিব্রাজক বীর হাম্বীর হঠাৎ এক দিন খুঁজে পেলেন মদন-মোহনের বিগ্রহ। বৃষভানুপুরে ধরণী ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হয়ে দেখতে পেলেন সেই মনোহর মূর্ত্তি, দেখে মুগ্ধ হলেন বীর হাম্বীর। লোভ জেগে উঠলো তাঁর দস্যুহৃদয়ে।

মদনমোহনকে নিশীথের অন্ধকারে বুকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে এলেন তিনি, এনে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু যে মদনমোহনকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি, সেই মদনমোহন হয়তো অভিমান ভরেই বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে গেলেন!

সুতানুটির মিত্র-পরিবারের কাছে বিগ্রহ গচ্ছিত রাখতে বাধ্য হলেন মল্লবংশধর।

কিন্তু মদনমোহন কি সত্যই আর ফিরবেন না বিষ্ণুপুরে?

অনুশোচনায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রামশঙ্কর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, মদনমোহনকে ফিরিয়ে আনবেন তিনি। সঙ্গীতের দেবতা, সুরের দেবতা মদনমোহনকে ফিরিয়ে আনবেন! বাঁশীর সুর শুনেও কি অভিমানে দূরে থাকতে পারবেন মুরলীধর!

অন্যমনস্ক ভাবে নিতাই মাজিবের হাত থেকে বাঁশী নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন তিনি। আর কল্পনার চোখে দেখলেন, যেন বাঁশীর সুরে ছুটে এসেছে শ্রীরাধিকা, আর শ্রীরাধার পিছনে মুরলীধর।

বাঁশী থামিয়ে হঠাৎ রামশঙ্কর বলে উঠলেন, আসবে, আসবে সে!

—কে আসবে রামশঙ্কর?

পিছন থেকে কে যেন কৌতুকের কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

চমকে ফিরে তাকালো রামশঙ্কর; আবছা অন্ধকারে যমুনাবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্মশ্রু মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বললে, গুরুদেব আপনি?

[ক্রমশঃ।

-বিবেকানন্দ-স্তোত্র-

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

৫

এই 'গঙ্গা-বাই'
স্বামিজীর চিরদিন ছিল !
"কুসংস্কার কি ?—হবে।"
এক-জালা গঙ্গাজল নিয়ে
নইলে কি 'ইউরোপে' যান ?
মাঝে মাঝে এক কৌটা খেয়ে
ঐ শোনো উনি কি বলেন,
"…পাশ্চাত্য জনস্রোতের…
কোটি কোটি মানবের
দ্রুত পদসঞ্চারের" মাঝে,
এক কৌটা গঙ্গাজল খেলে
"মন যেন স্থির হয়ে যেত…।"
এক কৌটাতেই
"…প্রতিদ্বন্দ্বী-সংঘর্ষ…'প্যারিস্'
'নিউইয়র্ক' 'লণ্ডন' 'বার্লিন'…"
অকস্মাৎ "লোপ হয়ে যেত,
আর
শুনতাম—সেই
'হর হর হর',
দেখতাম—সেই
হিমালয়-ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন,…
কল্লোলিনী স্বরতরঙ্গিণী…
হৃদয়ে মস্ত
গর্জে ডাকচেন—
'হর হর হর' !!"

* *

অলৌকিক গঙ্গা-প্রীতি
ঋষির বিশ্বাস নিয়ে পরম উদাত্ত সুরে বলা।

* * *

স্বামিজীর আর একটা theory*
সত্যি মর্মান্তিক !
একদিন জীবন-সন্ধ্যায়
গঙ্গাবক্ষে ব'সে ব'সে
বলছিলেন সন্তানের কাছে,—
"গঙ্গাজল পেটে না ঢোকালে
সুকণ্ঠ হয় না" কেউ গানে !
উৎকট theory এটা
কি মানে তা ভগবান জানে !

* * *

অবিশ্যি শিশুর সুরে বলা ;
কথাটার আগা-পাশ-তলা
শিশুর সারল্যে নিষ্পাপ।

* * *

কিংবা আচার্যের সুরে বলা।
সুপ্ত 'সুর-ব্রহ্ম'টিকে
'সুরেশ্বরী' না জাগালে
কি সুরে সুমিষ্ট হবে গান ?

৬

মাথায় পাগড়ি বেঁধে যে-ছেলেটা সম্রাটের ঠাটে
হুংকার দিয়ে ওঠে একদিন 'চিকাগো'র হাটে,
তারই অঙ্কুর
দেখা গিয়েছিল ঐ সিঁড়ি-ওলা পুজোর দালানে
সর্বোচ্চ সোপানে ব'সে বালক নরেন
রাজা সেজে রাজ্যকে শাসন করেন।
প্রজাগণ আপাততঃ সুখে আছে সব,
কিন্তু এক দস্যু তাঁকে ফেলেছে চিন্তায়।
রাজাদেশে দস্যু আসে রাজ-সভা মাঝে।
"রক্ষিগণ ! দুরাত্মার কর মুণ্ডচ্ছেদ।"
—বিচারান্তে ক্রুদ্ধ রাজা করেন আদেশ।
সম্রাট-আদেশ পেয়ে, কিংবা কিছু আগে
রক্ষী দল দুরাত্মাকে পাকড়াতে যায় ;
অকস্মাৎ দস্যু এক ভড়কানি দিয়ে
পট্ করে পিছলে পালায়।
সভাসদ করে—"হায় হায় !"

* * *

তখন দুপুর বেলা, বাড়ি নিঝ্ঝুম,
সারা দিন খেটে সব দিচ্ছিল ঘুম।
এমন সময় দস্যু ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে
বারো জন রক্ষী ছোটে তার পশ্চাতে !
যে যেখানে ছিল শুয়ে ঘুম থেকে জেগে
ফুলো-চোখ নিয়ে ছোটে সাঙ্ঘাতিক বেগে !
দস্যু ছোটে প্রাণভয়ে, রক্ষী ততোধিক,
পেছনে অজস্র 'গাঁট্টা', শিলাবৃষ্টি যেন !

* মত।

৭

আর,

নরেন কি করে ?

সর্বোচ্চ সোপান থেকে লাফ মারে নাকি ?

—না।

চুপ ক'রে ব'সে ব'সে সিংহাসন থেকে

সব কিছু দেখে আর হাসে মনে মনে।

পৃথিবীতে বিশ্রী কোলাহল।

আরো বিশ্রী আমাদের মনে।

খবরদার সিংহাসন ছেড়ে

যেওনা কো মত্ততার হাটে;

দূর থেকে শুধু দেখে যেয়ো,

ব'সে থেকো তোমার আসনে,

ভেবো সবই দু'দিনের খেলা,

পারো যদি হেসো মনে মনে।

৮

"আরে হতভাগা

ফুঁ লাগা না জোরে,

খুব ক'সে ধোঁয়া সাব কর;

এত কম 'গ্যাস' হ'লে সহরেতে আলো হয় নাকি ?"

*　　*　　*

পুরোনো রস্তার মত ক'রি,

মেটে হাঁড়ি, খড়কুটো নিয়ে

'গ্যাস-ঘরে' দাঁড়ির উঠোনে

'গ্যাস বাবু' ডমকি মারেন,

হাত দু'টো জাপটে ঠিক 'চিকাগোর 'পোজে'।

চাপা ঠোঁটে প্রতিজ্ঞাটা দৃঢ় হয়ে থাকে,—

অন্ধকার ঠেলে ফেলে সেকোনেই তাকে

"আলো দিতে হবে সারা কোলকাতাটাকে।"

৯

আর,

ধোঁয়া দিতে হবে ঐ বামাচারী সমাজের মুখে;

যে-ধোঁয়ায় মুছে যায় আলু-পটলের সীমারেখা।

তাই,

যে হুঁকোটা মুসলমান খায়

তাগ্ বুঝে ক'রে দেয় টান্।

"কি হচ্ছে নরেন ?"

গায়ে আসে সমাজের মরচেপড়া ভোঁতা প্রশ্নবাণ!

প্রশ্ন শুনে ধোঁয়া ছাড়ে অম্লান বদনে!

মনে ভাব—"ঐ তো উত্তর!

আপাততঃ ধোঁয়া দিই,

বড় হ'লে দেবো লাথি-ঝ্যাটা।"

—"কি হচ্ছে নরেন ?"

"হয়নি কিছুই

যদিও উচিত ছিল একটা কিছু হওয়া।

তোমরা যে বল 'জাত যায়',

কৈ গেল জাত ?

গেল কোথা দিয়ে ?

মিছিমিছি শুধু ধোঁকা দাও!

কোনো কিছু চলে গেলে সব দেখা যায় সাদাচোখে

শুধু বাদ জাতের বেলায় ?

—কেন ?"

*　　*

—আঃ বাঁচলো!

প্রশ্নের জবাব চাই, তা' না ছোঁড়া আরো

তীক্ষ্ণতর প্রশ্ন নিয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে এলো ?

যা' বলি তা মন দিয়ে 'সুবীরের' মত

শুনে যাবে,—তা' না,

দেখি লম্বা কথা কাটে!

আর

চক্ষু বুঁজে তৌবাতে বিশ্রী ধোঁয়া ছাড়ে!

—জাত গেল যায়!

*　　*

শুধু হাত জাত ?

'মুসলমান-হুঁকোটা'র বিছছিরি গন্ধে

প্রথমতঃ চোখ জ্বলে, দ্বিতীয়তঃ নাক,

সব শেষে সমাজের জাত জ্বলে যায়!

*　　*　　*

বলি আর কেন ?

এইবার কাছা খুলে দাও বিউগিল!

ওর কাছে দৌরাত্মিকা বেশি,

তাপ-দমনুকে জাল-পুড়ে

একেবারে ছাই হতে হবে।

*　　*　　*

"I am go ng away ."

দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে নিয়ে

দণ্ডী সেজেছেন সাধু

পাড়ি দিচ্ছেন হিমালয়ে।

সমাজ প্রশ্ন করে,—"কবে ফিরছেন ?"

তাণ্ডব-প্রিয় শিব ত্রিশূল উঁচান,—

"I shall never come

Until I can

Burst on society

Like a bomb

And make it follow me

Like a dog."*

[ক্রমশঃ।

* "আমি চললাম; যত দিন না সমাজের মাথায় বোমার মত ফেটে পড়তে পারছি আর তাকে কুকুরের মত বশীভূত করতে না পারছি, তত দিন আমি আর ফিরছি না।"

বাংলার শীতলপাটি

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

শিল্পবস্তু হিসেবে শীতলপাটি যে পুরানো দিনের, সে কথা ইতস্ততঃ ছড়ানো বিভিন্ন উল্লেখের ভেতর দিয়ে বোঝা যায়। পাথরের মতো, কালের কবলিত না হয়ে দীর্ঘকাল টিকে থাকার মতো জিনিষ এ নয়, সেজন্যে বেশী পুরানো পাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। নবাবী বা মুসলমানী আমলে এ দেশের পাটির একটা বিশেষ কদর ছিল। জানা যায়, তখন ভাল জিনিষ ২০০৲।২৫০৲ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রী হত। এরও আগেকার যুগে চীন দেশ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের বৃত্তান্তের মধ্যে পাটি সম্বন্ধে এক স্থানে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক একটা সংবাদ পাওয়া যায়। টলেমী এবং এক জন রোমকের প্রদত্ত চীন দেশের বাণিজ্য-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, চৈনিকরা "কিরাদিয়া" রাজ্য থেকে তেজপাতা ও "দ্রাক্ষাপাতার মতো পাটি" এনে বিক্রয় করতো। "কিরাদিয়া" অনেকের মতে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য ও শ্রীহট্ট জেলার সন্নিহিত অঞ্চল। তেজপাতার উল্লেখও এখানে সবিশেষ অর্থব্যঞ্জক। বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ শ্রীহট্টের শীতলপাটি যে সেই অতীতেও সুপরিচিত ছিল, এমন একটা অনুমান খুব অসংগত হবে না। ঘরে-বাইরে শীতলপাটির এই প্রশংসা তখনকার চেয়ে এদিনেও বড় কম নয়। এ কথাটার যাথার্থ্য নিরূপিত করা যাবে, গত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত কয়েকটি দেশী ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বিবরণের মধ্য দিয়ে। গ্লাসগোর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শীতলপাটি বিশেষরূপে আদৃত হয়েছিল। এর কোমল-মসৃণ গা বেয়ে যেতে সাপও নাকি পিছলে পড়তো। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার এক কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীতে তখনকার গড়পড়তা ৷৹ আট আনা থেকে ১০৲ টাকা দামের পাটির দিনে শ্রীহট্টের ধুলীজুরা গ্রামের শ্রীযদুরাম দাসের তৈরী একখানা পাটি উচ্চ প্রশংসিত ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়। এবং সেখানা ৯০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। তারই কাছাকাছি সময়ে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধরণের কারুশিল্প ও হাতের কাজের জিনিষের সংগ্রহ নিয়ে একটা বড় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও বাংলার সম্মান রক্ষার আংশিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল আজকের লাঞ্ছিত এই শীতলপাটির ওপর।

বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল—ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট, পাটি তৈয়ারীর জায়গা। ফরিদপুর ও শ্রীহট্টের পাটিই সমধিক খ্যাতি-সম্পন্ন—বিশেষত শেষোক্ত জেলার। শ্রীহট্টে এক সময় হাতীর দাঁতের নিপুণ কারুকার্য খচিত পাটি প্রস্তুত হত। সোনার তার, গুটিকামালা ইত্যাদি দিয়ে সেগুলো অলংকৃত করা হত। ভাল জিনিষের ৩০০৲ থেকে ৬০০৲ টাকা পর্যন্ত দাম উঠতো। "খণ্ডকার" নামে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব কাজ সাধারণত সীমাবদ্ধ ছিল। এ শতকের গোড়ার দিকেও কিছু কিছু এ জাতীয় কাজ হত বলে জানা যায়। দিল্লীর প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা সেখানকার শিল্পীর তৈরী একটি হাতীর দাঁতের পাটি পাঠিয়েছিলেন। শীতলপাটির শিল্প সব জড়িয়েও টিকে ছিল এবং মোটামুটি ভালই চলছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের নানা দুর্যোগের ঝাপটায় আজ এ-ও এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন। জলজ বেত জাতীয় লতা বিশেষত শ্রীহট্ট অঞ্চলে "মুরাতা" নামে এক ধরণের গুল্ম শীতলপাটির প্রধান উপাদান। নল, "নেউলা" বা চাছা বাঁশ ইত্যাদি থেকে এ-জিনিষ প্রস্তুত করা সম্ভব হলেও উৎকর্ষ আরাম বা চাহিদার দিক থেকে "মুরাতা" বেতের পাটির স্থান সব কিছুর ওপরে।

শিল্পটা সম্প্রদায় বা গণ্ডীবিশেষে আটকা থাকায় সেখানে কাজের উৎকর্ষ সাধনের একটা সুযোগ থেকে যেত। শ্রীহট্টে "পাটিয়াল"দের মধ্যে এবং ফরিদপুর অঞ্চলে প্রধানত নমঃশূদ্রদের মধ্যে এই শিল্প আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-বাংলায় বহু স্থানে পাটি-বোনার কাজ কেবলমাত্র মেয়েদের মধ্যে সীমিত থাকত এবং সামাজিক ভাবে, বিবাহের সময় কাজের গুণানুসারে তাদের বরপক্ষের নিকট পণের টাকার কম-বেশি হত বলে জানা যায়। সাধারণত কোণাকুণি চেহারার বুনানি সর্বত্র আপাতদৃষ্টিতে এক চেহারার মনে হলেও, পাটির আভিজাত্য নির্ভর করে এর নক্সা বা নমুনা এবং এর চিকণ কাজ বা সূক্ষ্মতার
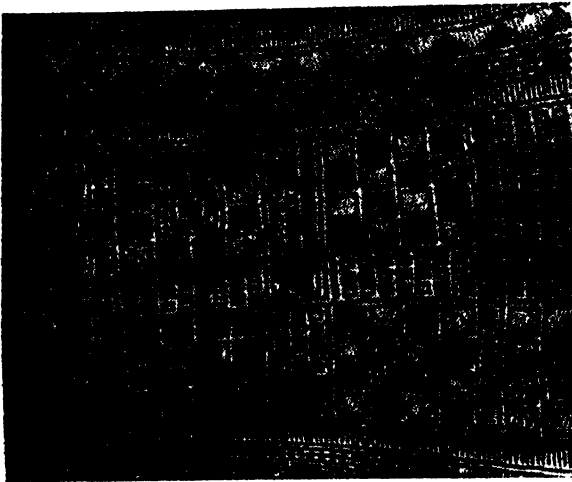
জ্যামিতিক নক্সা-সম্বলিত শীতলপাটি
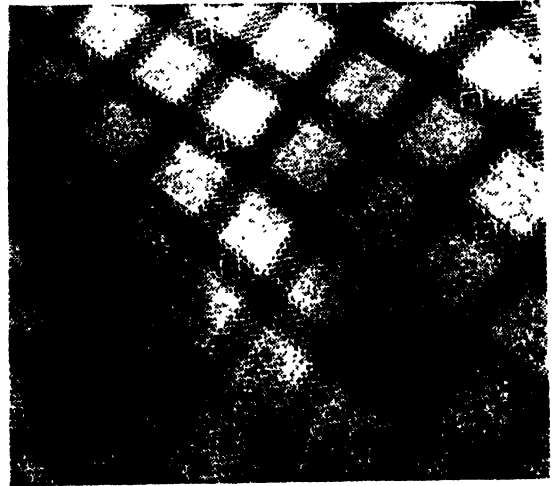
"আসমানতারা" বা চৌকোণা ঘরওয়ালা পাটি

ওপর। এমন পাটিও পাওয়া যেত, বেশি দিন নয়, বছর দশ বারো আগেও, যেখানে পাটিয়ালকে এক ইঞ্চি পরিসর স্থানের মধ্যে গোলখানার ওপর বেত ব্যবহার করতে দেখা যেত। আরেক ধরণের সূক্ষ্ম কাজ দেখা যেত যেখানে এক হাত দেড় হাত বাঁশের চোঙার মধ্যে মাঝারি বা বেশ বড় পাটি অনায়াসেই গুটিয়ে রাখা চলতো। ডিজাইন বা নমুনার মধ্যে দিয়েও পাটিয়ালের সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্য বা সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশ পেত। অনেক কারিগরই যে কোনও ধরণের নমুনা, অক্ষর বা সংখ্যা পাটির ওপর তুলে দিতে পারতেন এবং এখনও কিছুটা পারেন। সাধারণতঃ, বরফি-কাটা ঘর বা "আসমানতারা", হাতী, ফুল, মসজিদ ইত্যাদি ধরণের নক্সার ব্যবহার বেশি দেখা যেত। শোবার বা বসবার জন্যে সাধারণ মাপের ছাড়াও, বিবাহ, যাত্রা বা অন্য কোনও ধরণের বড় আসরের জন্যে বড় ধরণের ২০।২৫ হাত লম্বা পাটি বা "শপ" বোনা হত। রঙ-করা বেত দিয়ে দাবা, পাশা ইত্যাদি নানা খেলার ছকও তোলা হত, যাতে বসা এবং খেলা দুই-ই এক সাথে চলতো। জানা যায়, ইউরোপীয়দের মধ্যেও পাটির খুব কদর এক সময় হয়েছিল এবং বসবার উদ্দেশ্য ছাড়াও দেওয়াল বা মেঝে মুড়বার জন্যে এদের মধ্যে পাটির ব্যবহার বেশ চালু হয়েছিল।

শিল্প হিসেবে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে শীতলপাটি যে সমৃদ্ধিশালী ছিল; বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগে পর্য্যন্ত এ যে সে সমৃদ্ধি অটুট রাখতে পেরেছিল, সে খবর আমরা সরকারী ও বে-সরকারী বিভিন্ন বিবরণী থেকে জানতে পারি। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলা থেকে প্রায় ৪০০০ টাকার পাটি রপ্তানী হয়েছিল, যেটা সে সময়ের গড়পড়তা দামের তুলনায় খুবই আস্থা ও সৌভাগ্যসূচক। তার পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ ও তৎপূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড়ের হিসাবেও দেখা যায়, সে সময় প্রায় ১২০ মণ পাটি বিক্রীত হয়েছিল।

প্রায় বছর পনেরো পূর্বে শ্রীহট্টের সংগঠনমূলক কর্ম্মকেন্দ্র "বিদ্যাশ্রমে"র তরফে এই শিল্পের সম্বন্ধে একটা বে-সরকারী তদন্ত চালানো হয়। রিপোর্টে জানা গেছে, জেলার দুটো বড় বিক্রয়কেন্দ্র দাসের বাজার ও বালিগঞ্জ—যেখানে আগে প্রতি হাটে এক সময় যথাক্রমে প্রায় ৬০০৲ টাকা ও ৩০০০৲ টাকার কেনা-বেচা হত, সেখানে তখন বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ আশংকাজনক ভাবে কমতে আরম্ভ করেছে। ইটা, পরগণা চৌয়াল্লিশ এবং করিমগঞ্জ মহকুমার কতকগুলি স্থান যেগুলি উৎপাদনের বড় বড় কেন্দ্র বলে স্বীকৃত, সে-সব জায়গার সংগৃহীত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রবীণ বা বয়োবৃদ্ধেরাই সাধারণতঃ এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, নবীনেরা শিল্পের সংকটাপন্ন অবস্থা অনুমান করে এই শিল্পের প্রতি উদাসীন এবং অন্যবিধ বৃত্তির প্রতি তারা অধিক আকৃষ্ট। নিপুণ কারিগরেরাও ভাল কাজের চাহিদা না থাকায় মোটা বা মাঝারি কাজেই লিপ্ত থাকেন এবং মিহি কাজ সবই ভুলবার পথে। দেশের অন্য অঞ্চলগুলোর অবস্থাও একই রকম। ফরিদপুরে সাতৈর বা ভূষণা এলাকায় যে দুর্দশার ছায়াপাত হতে আরম্ভ হয়েছিল, সেটা কেনা-বেচার অবস্থা থেকেই প্রতীয়মান হয়। সংকটের প্রথম ধাক্কাটা এসেছিল সস্তা সতরঞ্চী ও সিংগাপুরী মাদুরের ভেতর দিয়ে। সেই সংকট আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে বছর পাঁচেকের মধ্যে। দেশ বিভাগ এবং তৎপরবর্তী বাণিজ্যিক অবরোধ আজ এই শিল্পের টুঁটি চেপে ধরেছে। কারিগর, শিল্পনৈপুণ্য আর কাঁচা মাল—সব কিছু থাকা সত্ত্বেও, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এ শিল্প আজ সকলের চোখের সামনে তলিয়ে যাচ্ছে। পরানুকৃতির যে কদর্য ছাপ আমাদের সমাজ-জীবনকে কলংকিত করেছে, বিদেশী মাদুর ও ভেলভেট দিয়ে ঘর সাজাবার দীনতা যখন থেকে আমাদের পেয়ে বসেছে, তখনই এর দুর্দশার সূত্রপাত হয়ে গেছে। ইতিহাসের কুটিল গতিতে আজ তারই করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি মাত্র। বিয়ের লগ্নে আজ পাটির বদলে মাদ্রাজী মাদুরের চাহিদা অনেক বেশি। আগে বড় বড় এক এক জন আড়তদার যেখানে গরমের দিনের আরম্ভে তিন চার শত পাটি অনায়াসে বেচতে পারতো, আজ সব মিলিয়ে বছরে চল্লিশখানা পাটি বেচতেও তাদের অসম্ভব বেগ পেতে হচ্ছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আবেগ যথারূপে চালিত করা গেলেও হয়তো কিছু কাজ হত—সম্ভব হত এ-মুমূর্ষু শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা। কলকাতার আশে-পাশে, বেলেঘাটা, কাঁচড়াপাড়া ও অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু পাটি উৎপাদনের চেষ্টা নাকি চলছে। তবে সুসংবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মপন্থার অভাবে ফল যে আশানুরূপ হচ্ছে না, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মধ্যের যত বাধাই থাকুক না কেন, সরকারী দাক্ষিণ্য, কার্য্যকরী পরিকল্পনা এবং দেশের লোকের যথোচিত আগ্রহ থাকলে প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়া খুবই সম্ভব বলে মনে হয়।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করুন

শ্রীমতী ছবি গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকটিকিট জমানো যে বড় একটা সখ (hobby) এ কথা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। এ সখের প্রথমেই বলা হয়—"The King of hobbies and the hobby of Kings." সারা পৃথিবীর সমস্ত ডাকটিকিট জমানো সাধারণের পক্ষে দূরের কথা—রাজা মহারাজাদের পক্ষেও বেশ কঠিন—যেমন সময় ও শ্রমের দরকার তেমনি অর্থও কম লাগে না। George V ও VI বিশেষ করে পঞ্চম জর্জের collection বা সংগ্রহ বিখ্যাত। রুমানিয়ার রাজা ex-king Carol ও মিশরের ex-king Farouk এর সংগ্রহও জগদ্বিখ্যাত। পঞ্চম জর্জ যখন বালক ছিলেন তখন থেকে সারা পৃথিবীর সমস্ত ডাকটিকিট, envelops, post cards জমাতে সুরু করেন। কিন্তু ক'দিন পরে দেখলেন এ ভাবে জমানো ভীষণ ব্যাপার! 'কমনওয়েলথ'এর ডাকটিকিট জমাতে সুরু করলেন। তাই আধুনিক মত হচ্ছে নিজের পছন্দমত বিষয় নিয়ে ডাকটিকিট জমানো, আজ-কাল ডাকটিকিটে কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বনজ সম্পদ (পশু, পাখী, মাছ, সরীসৃপ, ইত্যাদি) নানাজাতীয় ফুল, খেলাধূলা, ধর্ম ইত্যাদি অনেক কিছু থাকে—যার যেমন খুসী বেছে নিয়ে জমালে অল্প সময়ে অনেক জিনিষও জানা যায়, সংগ্রহও ভাল হয়, দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট পেতে হলে যাঁরা দেশ-বিদেশের সাথে চিঠি আদান-প্রদান করেন তাঁদের সাথে বা বিদেশে আত্মীয়-বন্ধু থাকলে তাদের কাছ থেকে কিছু ডাকটিকিট যোগাড় হয়। তাছাড়া নিজের Duplicate গুলো আর কারুর সাথে বদলেও যোগাড় করা যায়, এর পরও একটা কথা বাকী থেকে যায়—সব টিকিট কি আর এমনি যোগাড় হয়! কিছু কিনতেই হয়—তা না হ'লে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংগ্রহ হয় না। আবার সুন্দর সংগ্রহ হলেই সব হয়ে গেল তা নয়, সব টিকিটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও জানা চাই। লিখে রাখা চাই।

ইংলণ্ডের কোন এক স্কুলে একদিন ইনস্পেক্টর এসেছেন স্কুল পরিদর্শন করতে। তিনি একটি ছোট ক্লাশে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞান কতটুকু হ'ল জানবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, তোমরা কি 'এরোপ্লেন' দেখেছ?'

ক্লাশের প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে জবাব দিল যে, তারা 'এরোপ্লেন' দেখেছে। ইনস্পেক্টর বললেন—"ওহো, তোমরা দেখেছ? আচ্ছা বেশ, কে প্রথম এরোপ্লেন তৈরী করেন?" এবারও সমস্বরে সবাই জবাব দিল। "তাই বুঝি! আচ্ছা, কত রকমের 'এরোপ্লেন' আছে বল ত?"

সব চুপ। শুধু ছোট একটি ছেলে কোণের এক বেঞ্চ থেকে হাত তুলল, তার পর সেই ছেলেটি যা বললে তা শুনে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন খুবই অবাক হলেন। ছেলেটি যেন বিমান-বিশারদ! সংক্ষেপে:—পৃথিবীতে বেশ কয়েক রকমের বিমান আছে। Beauforts, B—29, Constellations, Dakota, Do—x, Falkner, Handley—Page, Hawker, Henkler, Hurricane, Jet, Lockheed, Lodestars Shooting star, Spitfire, Super- [illegible] Vampire Viking, Willys-knights ইত্যাদি আরও বলে Helicopter এ এসে থেমে গেল। ইনস্পেক্টর মহাখুসী। বিস্মিতও কম হননি। বললেন—"তুমি অত নাম কি করে জানলে?"

"স্যার, আমি ডাকটিকিট সংগ্রহ করি। আর শুধু 'এরোপ্লেনের' ছবি দেওয়া ডাকটিকিটই জমাচ্ছি।"

Fabio Signorini নামে এক জন ইতালীয় ছেলে—বয়স তার ১৫ বছর। বাড়ী হ'ল Sant' Alessandroতে। সেখানকার পোষ্ট অফিসের নাম Volterra—এক দিন Fabioর স্কুলের ভূগোলের শিক্ষয়িত্রী তার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন, "তোমাদের কাছে কি সচিত্র পোষ্টকার্ড আছে? যার কাছে যত রকমের আছে একদিন নিয়ে এস—তোমাদের ভূগোল পড়ানোর সময় দরকার হবে।" পরদিন প্রায় সবাই একগাদা সচিত্র পোষ্টকার্ড নিয়ে এল। Fabio শিক্ষয়িত্রীর কাছে এসে ম্লান মুখে দাঁড়াল। শিক্ষয়িত্রী কিছু বলার আগেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শিক্ষয়িত্রী তাকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁদছ কেন?"—"আমার কাছে একটিও ও ধরণের কার্ড নেই।" ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আরও যা বলল, সংক্ষেপে:—ওর বাবা নয় বছর আগে যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, কিন্তু আজও তার কোন খবর পায়নি। তাকে কার্ড পাঠাবার মত কেউ নেই। শিক্ষয়িত্রী তাকে বললেন—"তুমি মিলানের কোন কাগজে তোমার এই কথাগুলি লিখে দাও।" ছেলেটি তাই লিখলে, কাগজে Fabioর কথা বের হবার দুই সপ্তাহ পরে দু'-একখানা কার্ড এল। ২০দিনে সে ৫০,০০০ বিভিন্ন ধরণের কার্ড পেল—ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স ও আমেরিকা থেকে, Voltera ডাকঘরে এজন্য এক জন অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করা হলো—শুধু Fabioর ডাক পৌঁছে দেবার জন্য। কত সচিত্র পোষ্টকার্ড যে হ'ল তাছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহও কম হয়নি!

কিন্তু ডাকটিকিট জমাতে হ'লে কোন একটি বিষয় বেছে নিয়েই জমানো ভাল। যেমন এরোপ্লেনের ডাকটিকিট জমালে খুব কম খরচে বেশ ভাল সংগ্রহ (Collection) হয়। ১০০ কি ২০০ টিকিটের একটি প্যাকেট কিনে জমাতে সুরু করা ভাল। এখানে মনে রাখতে হবে, সর্বপ্রথম কোথায় বিমানের ডাক সুরু হয়। ১৯১১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী আমাদের এই ভারতবর্ষেই প্রথম বিমান ডাক সুরু হয়। এই বিমানের চালক এক জন ফরাসী Monsieur Pequet এবং সর্বপ্রথম ডাক যায় এলাহাবাদ থেকে নৈনী অবধি—দূরত্ব ছয় মাইল। সেই যুগে এই কাজ যে এক মহা দুঃসাহসের কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই। সারা পৃথিবীতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। এক আমেরিকান কাগজ লিখেছিল—"This daring experiment carried out in the land of bullock carts." (!) Religious theme in Philately এই বিভাগে—The Bible, The Papel state, Religious history এ কয়টি ভাগে জমালে সেই collection খারাপ হবে না।

Postal Zoo:—ডাকটিকিটে যে সমস্ত জীবজন্তু,

পোকা মাকড়, মাছ, সরীসৃপ ইত্যাদির ছবি দেওয়া থাকে তা যদি জমানো যায়—তাহলে চমৎকার Philatelic Zoo হয়ে যায়। কত জীবজন্তুর নাম জানা যায়, ইতিহাস জানা যায়। Royal Antelope দেখলে পণ্ডিত Roussaর কথা মনে হবে, জেব্রা দেখলে আফ্রিকার কথা মনে হবে নিশ্চয়ই, গণ্ডার—কি অদ্ভুত জীব যে! যদি কখনও এর সামনে পড়ে যেতে হয়? জীরাফ গলা উঁচু করে যেন নিজের দীর্ঘাকৃতিকে আরও চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আমাদের দেশে ১৯৫১ জানুয়ারী যে বিশেষ ডাকটিকিট বের হয়েছিল তাতে দেখা যায় Stegodon Ganesaর ছবি, অনেক টিকিট আছে হাতীর ছবি দেওয়া—সব চাইতে বোধ হয় হাতীকে বেশী সম্মান দেখান হয়েছে। ফুলের ছবি দেওয়া ডাকটিকিটও কম নেই, সে ভাবে জমালেও চমৎকার হবে ও কম সময়ে হবে।

আমেরিকার একজন বিখ্যাত Philatelist নাম তাঁর Herbert Rosen, তিনি Adventures in stamps এই সিরিজ নাম দিয়ে ফিল্ম তৈরী করেছেন (35 mm—Colour filmstrips, released by Cambridge Productions, New York City. প্রথম ছবি "the story of the Panama Canal") এই ফিল্ম যে শুধু Philatelistদের সাহায্য করবে তা নয়। যে সব ফিল্ম তৈরী হয়েছে, যেমন—Railroading in Stampdom, Discovery and Exploration of the North Pole, American history viewed through Stamps, Radio Philatelia, History of Aviation, stamps causes wars and revolution ইত্যাদি।

Postal Museums দেশ-বিদেশে যত আছে তার মধ্যে Switzerland এর মত একটিও নাই। আদর্শস্থানীয় এই মিউজিয়াম, এখানে উল্লেখ করলে আশা করি অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের জাতীয় সংগ্রহ (National Collection) থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য টিকিট হারিয়ে এবং চুরি হয়ে গেছে। গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসে (Republic Day) যে টিকিট বের হয়েছে তাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সব কাজ উল্লেখযোগ্য তাই দেখান হয়েছে, এর আগে অর্থাৎ ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারীর Republic-Dayর যে ক'খানা টিকিট বের হয়েছিল তা দেখে বিদেশী Philatelistরা বলে দিলেন "Match box Labeles."

নিজেদের দেশের ডাকটিকিট জমানো সব চাইতে ভাল। কিন্তু আমাদের মত সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ collection করা বেশ কঠিন, দুষ্প্রাপ্য টিকিট যা রয়েছে, তা সংগ্রহ করতে অর্থ ও শ্রমই যাবে, আমাদের দেশের দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট প্রায় সবই বিদেশে। আমরা অনেকে শুধু ডাকটিকিট জমিয়ে যাচ্ছি—ইতিহাস কিছুই জানি না। "এক পয়সার টিকিটে যে হাতীর ছবি রয়েছে তার কি কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে?" অত খবর জানবার আগ্রহ কোথায়? কিন্তু একটু খোঁজ করলে জানা যায় যে, ঐ হাতীর ছবিটি অজন্তার একটি স্তম্ভ থেকে তোলা, এমনি ভাবে দুই পয়সা দামের টিকিটে কোণারকের রথাকৃতি সূর্যমন্দিরের ঘোড়ার ছবি। হাজার বছর আগে এই প্রসিদ্ধ মন্দির তৈরী হয়েছিল। এমনি সুন্দর সুন্দর সব খবর পাওয়া যায় ঐ টুকরো রঙীন কাগজগুলো থেকে, আরও একটু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, এক পয়সার ঐ টিকিটের ছবি পুণার কুমারী বীরমতী ডি যাদব এঁকেছেন অজন্তা প্যানেলের ছবি থেকে, তিন আনা দামের টিকিটের ছবি এঁকেছেন কলকাতার শ্রীমতী করুণা সাহা—সাঁচী তোরণের ছবি থেকে।

ডাকটিকিট জমালেই হয় না, তার পরিচয় জেনে লিখে রাখতে হয়, নিজের উপকারও হয়, অন্যদেরও উপকার হয়।

ছোটদের আসর
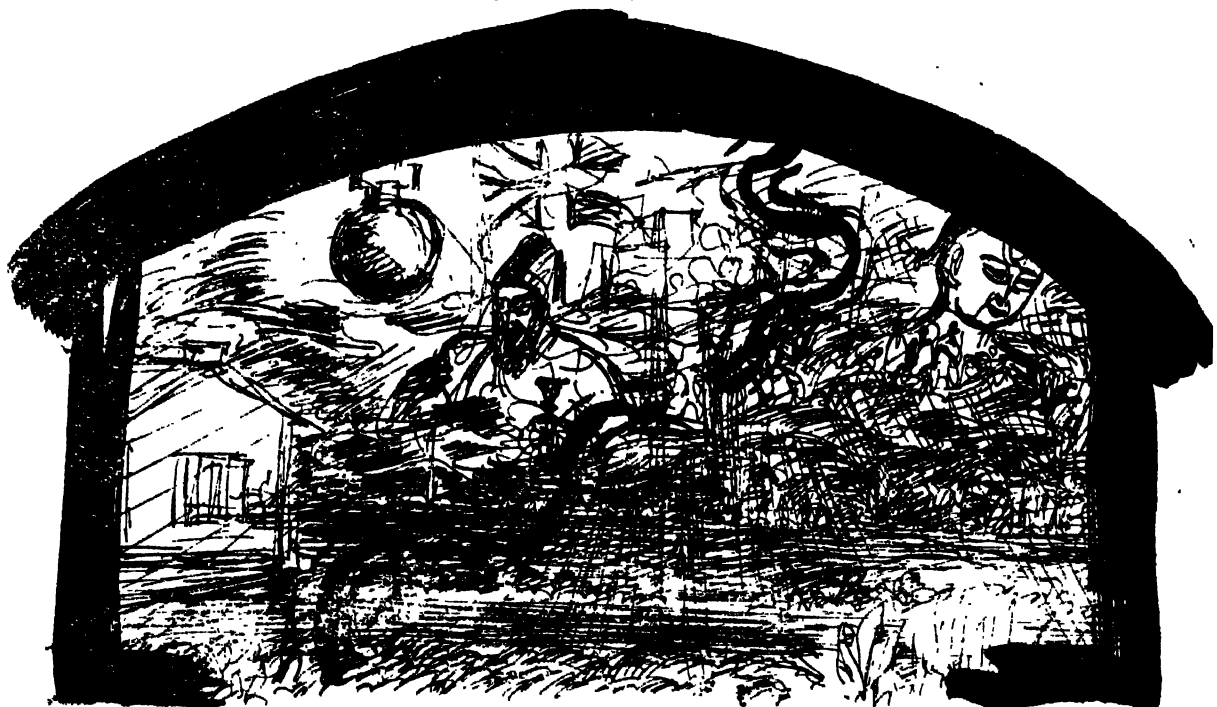
১৫

দেশ ভ্রমণ আমি বিস্তর করেছি। সামান্য কিছু ঘটতে-না ঘটতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়িনে। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চা খেতে গিয়েছি, ওদিকে গাড়ি আমার বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছে, বিদেশে-বিভুঁইয়ে মণি-ব্যাগ চুরি যাওয়াতে আমি কপর্দক হীন, ইতালির এক রেস্তোরাঁয় দুই দলে ছোরা-ছুরি হচ্ছে— আমি নির্জীব বাচ্চা এক কোণে দেয়ালের চূণকামের মত হয়ে গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছি—এ সব ঘটনা আমার জীবনে একাধিক বার ঘটেছে। কিন্তু এবার সুয়েজ বন্দরে, আবুল আসফিয়ার পাল্লায় পড়ে যে বিপদে পড়লুম তার সঙ্গে অন্য কোনো গর্দিশের তুলনা হয় না।

আমাদের জাহাজ তার আপন পথে চলে গিয়েছে। আমরা এখানে আটকা পড়েছি হেলথ সার্টিফিকেট নেই বলে। তা হলে এখানকার কোনো হোটেলে উঠতে হয় এবং প্রতি জাহাজে ধন্না দিতে হয়, আমাদের জায়গা দেবে কি না! খুব সম্ভব দেবে না। কারণ সেই পোড়ারমুখো হেলথ সার্টিফিকেট না থাকলে জাহাজেও উঠতে দেয় না। এস্থলে 'জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ' নয়, এখানে 'জলে সাপ, ডাঙায়ও সাপ।'

জাপানী আক্রমণের সময় একটা গাঁইয়া গান শুনেছিলুম,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোমা পড়ে জাপানী
বোমা-ভরা কালো সাপ
ব্রিটিশে কয় 'বাপ রে, বাপ!'

তাই মনে হল জাপানীরা যেন জলে ডাঙায়, উভয়ত: হেলথ-সার্টিফিকেটের সাপ ফেলে গেছে।

আর ডাঙার হোটেলে থাকতে দেবেই বা ক'দিন? আমাদের ট্যাঁকে যা কড়ি তার খবর হোটেল-ওলা ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পেরে নিশ্চয়ই আমাদের 'দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাবো কোথায়, খাবো কি? তখন অবস্থা হবে সুয়েজ বন্দরের ধনী-গরীব সক্কলের কাছে ভিখ মাঙবার। কিন্তু কেউ কিছু দেবে কি? রেল-ইষ্টিশানে

সৈয়দ মুজতবা আলী

যখন কেউ এসে বলে 'মশাই, মণিব্যাগ চুরি গিয়েছে; চার গণ্ডা পয়সা দিন বাড়ির ইষ্টিশানে যেতে পারবো,' তখন কি কেউ শোনা মাত্রই পয়সা ঢালে?

ইয়া আল্লা, এ কোথায় ফেললে, বাবা? এ যেন অকূল সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপবাস!

মানুষ যখন ভেবে ভেবে কোনো কিছুর কূল-কিনারা করতে পারে না তখন অন্যের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে। পল-পার্সিকে নিয়ে ফিরে গেলুম আবুল আসফিয়ার কাছে।

তিনি দেখি ঠিক সেই মুহূর্তেই পোর্ট-অফিসারকে শুধাচ্ছেন, 'তা হলে হেলথ সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া যায়?'

এ যেন পাগলের প্রশ্ন! হেলথ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যায় আপন দেশে: এখানে পাবো কি করে?'

তাই আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যখন অফিসার বললেন, 'কেন, ঐ তো পাশের দফতরে।'

তাহলে এতক্ষণ ধরে এ-সব টানা-হ্যাঁচড়ার কি ছিল প্রয়োজন? ভালো করে শোনার পূর্বেই আমরা সব ক'টি প্রাণী ছুট দিলুম সেই দফতরের দিকে। জলের সাপ, ডাঙার সাপ, সা-রে-গা-মার জাপানী সাপ সব কটা যেন তখন এক জোটে আমাদের তাড়া লাগিয়েছে।

দফতরের দরওয়াজা খোলাই ছিল। দেখি, এক বিরাট-বপু ভদ্রলোক ছোট্ট একখানা চেয়ারে তাঁর বিশাল কলেবর গুঁজে-পুরে টেবিলের উপর পা দু'খানি তুলে ঘুমুচ্ছেন। আমরা অট্টরোল করে না ঢুকলে নিশ্চয়ই তাঁর নাকের ফরফরানি শুনতে পেতুম। আমাদের, 'হেলথ সার্টিফিকেট', 'হেলথ সার্টিফিকেট', 'প্লীজ', 'প্লীজ' এই উৎকট সমবেত সঙ্গীত—অবশ্য ইয়োরোপীয় সঙ্গীত যার এক সপ্তকে বাজে তোড়ী অন্য সপ্তকে পূরবী—শুনে ভদ্রলোক চেয়ার-শুদ্ধ লাফ মেরে উঠলেন।

শতকরা নিরানব্বুই জন যাত্রী হেলথ সার্টিফিকেট নিয়েই বন্দরে নামে। সুতরাং এ ভদ্রলোকের শতকরা নিরানব্বুই ঘণ্টাই কাটে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। তাই আমরা কি বেদনায় কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছি, সেটা বুঝতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগল।

তাঁর ভাষা আমরা বুঝিনে, তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন না। তৎসত্ত্বেও যে মারাত্মক দু:সংবাদ তিনি দিলেন তার সরল প্রাঞ্জল অর্থ, যে-ডাক্তার আমাদের পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেবেন তিনি বাড়ী চলে গেছেন।

গোটা সাতেক ভাষায় তখন যে আর্তরব উঠলো তাকে বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—

ঐ য-যা!

ফরাসীরা বলেছিল, 'মঁ দিয়ো, মঁ দিয়ো!'
জর্মনরা বলেছিল, 'হের গট্, হের গট্!'
ইরাণি বলেছিল, 'ইয়াল্লা, ইয়া খুদা!'
আর কে কি বলেছিল, মনে নেই।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণা, আল্লাতালার বেহদ্ মেহেরবাণী, রাখে কেষ্ট মারে কে, গড্ সাদ ধন্যবাদ, শুনি অফিসার বলছেন, 'কিন্তু আপনারা যখন বহাল তবিয়তে, দিব্য ঘোরা-ফেরা করছেন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান। সার্টিফিকেট আমিই দেব। এই নিন ফর্ম। ফিল্ অপ্ করুন।' বলেই এক-তাড়া বিজী গোলাপী বাদামী ফরম আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে

হল, আহা কী সুন্দর ! যেন ইস্কুলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, আর সব ক'টাতে লেখা আছে আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি।

শকুনির পাল যে রকম মড়ার উপর পড়ে, আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই 'গাজী মিয়ার বস্তানির' উপর। উহুঁ, ভুল উপমা হল, বীভৎস রসের উপমা দিতে আলঙ্কারিকরা বারণ করেছেন। তাহলে বলি, ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দেবার অধিকার পেলে মা যে রকম নাকচের ফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উৎসাহে, উত্তেজনায় আমাদের সব্বাইকার মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফর্মে প্রশ্ন, 'কোন্ সালে তোমার জন্ম ?' কিছুতেই মনে পড়ছে না, ১৮০৪—না ১৭০৪ ? প্রশ্ন, 'কোন্ বন্দরে জাহাজ ধরেছ ?' বেবাক ভুলে গিয়েছি, হংকং না তিব্বত। প্রশ্ন, 'যাবে কোথায় ?' হায়, হায়, টাকের বাকি আড়াই গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললুম, তবু কিছুতেই মনে পড়ছে না, শনিগ্রহে না ধ্রুবতারায়।

তা সে যাকগে, আমরা কি লিখেছিলুম। তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরে জানলুম, সেই সহৃদয় অপিসারটি ইংরিজি পড়তে পারেন না।

ঝপাঝপ বেগনি ষ্ট্যাম্প মেরে তিনি আমাদের গণ্ডা আড়াই সার্টিফিকেট ঝেড়ে দিলেন। আমরা সেগুলো বসরাই গোলাপের মত বুকে গুঁজে খোলা-খোঁয়াড়ের গোরুর মত বন্দরের আপিস থেকে সুসুড়ুৎ করে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলুম। এখন আমরা ইচ্ছে করলে কেপ্ কম্রিন যেতে পারি, ইচ্ছে না করলে কোথাও যাবো না।

পল বললে, 'স্যর, কি লিখতে কি লিখেছি, কিচ্ছুটি জানিনে।'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু পরোয়া করো না, ভাই ! আম্মো তদ্বৎ !'

ফরাসী রমণী হেসে বললেন, 'মসিয়ো পল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতো, তুমি বকরী না মানুষ ?' তা হলে আমি প্রথম খানিকটে ব্যা ব্যা করে নিতুম তার পর আপন মনে খানিকটে ফরাসী বলে নিয়ে দেখতুম কোন্টা ভালো শোনাচ্ছে, এবং সেই হিসেবে লিখে দিতুম বকরী না মানুষ।'

তার পর খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য বকরীর সম্ভাবনাই ছিল বেশী।'

আমার বুকে বড্ড বাজলো ! নিজের প্রতি এ যে অতিশয় অহেতুক অশ্রদ্ধা। বললুম, 'মাদ্‌মোয়াজেল, বরঞ্চ 'কোকিল' লিখলে আমি আপত্তি জানাতুম না। আপনার মধুর কণ্ঠ—'

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে ; থ্যাঙ্কু্য !'

ততক্ষণে রেল-ষ্টেশনের কাছে এসে পৌঁছেছি। দূর থেকে দেখি, ট্রেণ দাঁড়িয়ে। আমরা পা চালালুম। কিন্তু গেটের কাছে আসতে না আসতেই ট্রেণখানা 'ধ্যাং, ধ্যাং' করে যেন আমাদের ঠাট্টা করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং একটা লোক—চেনা-চেনা মনে হল—আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিদায় জানালে, তার পর যেন কত না বিরহ বেদনাতুর সেই ভাবে দু'হাতের উল্টো দিক দিয়ে অদৃশ্য অশ্রু মুছলে।

এ মস্করার অর্থ কি ?

শুনলুম, আজ সন্ধ্যায় কাইরো যাবার শেষ ট্রেণ এই চলে গেল। কাল সকালের ট্রেণ ধরলে কাইরো মাথায় থাকুন সঈদ বন্দরে পৌঁছতে পারবো না, অর্থাৎ নির্ঘাৎ জাহাজ মিস করবো। এই শেষ ট্রেণ ছিল আমাদের শেষ ভরসা।

এ দুঃসংবাদ শুনে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

কিন্তু ভগবান মানুষকে নিয়ে এ রকম লীলা-খেলা করেন কেন ? সেই যদি সুয়েজ বন্দরে আটক হতে হ'ল, সেই যদি বোট মিস করতে হল তবে ঐ হেলথ সার্টিফিকেটের প্রথম খোঁয়াড়ে আটকা পড়লেই হ'ত ! সে কাঁচা কাটিয়ে এসে এখানে আবার কানমলা খাবার কি প্রয়োজন ছিল ?

শুনেছি, কোনো কোনো জেলার ফাঁসির আসামীকে নাকি গারদের দরজা সামান্য খুলে রেখে জেল থেকে পালাবার সুযোগ দেয়। আসামী ভাবে, জেলার বেখেয়ালে দরজা খুলে রেখে গিয়েছে। তার পর অনেক গা ঢাকা দিয়ে, একে এড়িয়ে, ওকে বাঁচিয়ে যখন সে জেলের বাইরে মুক্ত বাতাসে এসে ভাবে সে বেঁচে গেছে, ঠিক তখনই তাকে জাবড়ে ধরে দুই পাহারওলা—সঙ্গে জেলার। জেলার তাকে চুমো খেয়ে বলে, 'ভাই, জীবন কত দুঃখে ভরা ! তার থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে, কাল ভোরে। আত্মাহুখের মত সে-নিষ্কৃতি থেকে এই হেয় নিষ্কৃতির চেষ্টা তুমি কেন করছিলে, সখা ?'

পরদিন তার ফাঁসী হয়।

আমার মনে হয়, ফাঁসীর চেয়েও ঐ যে জেলের বাইরে ধরা-পড়া সেটা অনেক কঠোর, কঠিন, নির্মম।

কারণ মৃত্যু, সে তো কিছু কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা নয়। ডাক্তাররাও বলেন, রোগে মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু ঠিক প্রাণত্যাগ করার সময় মানুষ কোনো বেদনা অনুভব করে না।

তাই গুরুদেব বলেছেন,—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয় !"

ঠিক সেই রকমই এক মহাপুরুষ—হিটলারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে

চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে এবং ফাঁসীর হুকুম হয়—জেলে বসে কবিতা লিখেছিলেন,

ভু কানস্ট্ উন্স্ ড্রুষ্ ডেস্ টডেস্ ট্রাবেন্
ট্রয়েমেস্ত্ ফ্যুরেন্
উন্ট্ মাখস্ট উন্স আউফ আইন্মাল ফ্রাই,

তুমি আমাদের মৃত্যুর দ্বার দিয়ে হাতে ধরে নিয়ে চল।
—আমরা যেন স্বপ্নে চলেছি—
হঠাৎ দেখি, আমরা স্বাধীন।

এ বই ছোটদের জন্য লেখা। তারা হয়তো শুধবে, মৃত্যুর কথা তাদের শোনাচ্ছি কেন? আমার মনে হয়, শোনানো উচিত। সাধারণত বড়রা ছোটদের যত আহাম্মুখ মনে করেন আমি বুড়ো হয়েও সে রকম ভাবিনে।

আমার যখন বয়স তেরো, তখন আমার সব চেয়ে ছোট ভাই বছর দুয়েক বয়সে মারা যায়। ভারী সুন্দর ছেলে ছিল সে। আমার কোলে বসতে বড্ড ভালোবাসত। ঐ দু' বছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরে থাকতো আর আমি বাড়ীর লনে পাক লাগাতুম। মাঝে মাঝে সে খল খল করে হেসে উঠতো আর মা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন কিন্তু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক্, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

এক দিন সে চলে গেল।

আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম।

তখন আমায় কেউ বুঝিয়ে বলেনি, মৃত্যু কাকে বলে? তার অর্থ যদি আমাকে তখন কেউ বুঝিয়ে বলতো তবে বেদনা লাঘব হ'তো!

বড়রা ভাবেন, ছোটদের বেদনাবোধ কম। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তোমরা যারা আমার বই পড়ছো, তোমাদের কেউই কি ভাই-বোন হারাও নি? সে বুঝবে।

কবিগুরুর ছোট ভাই-বোন ছিল না। তাই বিস্ময়ে মানি, তিনি কি করে লিখলেন,—

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চলে
যায় কোথা সেই স্বর্গপারে।
বল তো কাকা
সত্যি তা কি একেবারে?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।
তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।*

---

* শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১০৮ পৃঃ।

এই কাকাটি সত্যই ছোট ছেলের বেদনা বুঝতেন।

কিন্তু মূল কথা থেকে কত দূরে এসে পড়েছি। তাই মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথা বলে মূল কথায় ফিরে যাই। ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস। তাই আমি জানি, আমি যখন মরণের সিংহদ্বার পার হব তখন দেখব, বাবা, ঠাকুরদা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা, আরো কত শত ঊর্ধ্ব-পুরুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে নেবার জন্য। এবং জানি, জানি, নিশ্চয় জানি, তাঁদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে। তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হয়, যখন মনের চোখে ছবি দেখি, আমার এই ছোট ভাই, একদা টলটলায়মান পায়ে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাঁকে আপনজনের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য, তার কোলে ওঠার জন্য। সে তো ও-লোকে গিয়েছিল মায়ের বহু পূর্বে।

আমি যখন সে-লোকে যাবো তখন ভগবান শুধাবেন, 'তুমি কি চাও?' আমি তৎক্ষণাৎ বলবো, 'একখানা বাইসিকেল।' পাওয়া-মাত্রই তাতে ভাইকে রডে চড়িয়ে স্বর্গের লনে চক্কর লাগাবো। সে খল-খল করে হাসবে। মা দেখবে, কিন্তু কক্খনো বলবে না, 'থাক্, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

* * * *

অতএব সব বিপদ থেকেই নিষ্কৃতি আছে। গাড়ি গেছে তো গেছে তাতে ভয় পাবার অত কি?

দেখি, আবুল আস্‌ফিয়া নেই।

আমাদের এই অকূল সমুদ্র আর অন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়ে লোকটা পালালো না কি?

ষ্টেশনের বাইরে তার খোঁজ করতে এসে দেখি, তিনি এক জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রসালাপ আরম্ভ করেছেন। অনুমান করলুম তিনি ট্যাক্সি-যোগে কাইরো পৌঁছবার চেষ্টাতে আছেন।

কিন্তু ট্যাক্সিওলাটা আমাদের মজ্জমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছে এবং যা দর হাঁকছে তা দিয়ে দু'খানি নূতন ট্যাক্সি কেনা যায়।

আবুল আস্‌ফিয়া তাকে বহুতর ধর্মের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, ততোধিক ভারত মিশরীয় মৈত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন এবং সর্বশেষে তিনি মুসলমান সেও মুসলমান, সে-সত্যের দোহাই কসম খেলেন কিন্তু ট্যাক্সিওলাটি ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে খাঁটি দুর্যোধন। বিনা যুদ্ধে সে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি এগোবে না।

আবুল আস্‌ফিয়ার চোখে-মুখে কিন্তু কোনো উষ্মার লক্ষণ নেই। ভৃগু-পদাহত তিতিক্ষু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি তখন চললেন হেলথ আপিসের দিকে। আমিও পিছু নিলুম।

সেই বিরাট-বপু ভদ্রলোক যিনি আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রথম ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবারে তাঁকে জাগাতে গিয়ে আবুল আসফিয়াকে রীতিমত বেগ পেতে হ'ল।

তাঁকে তখন তিনি যা বললেন, তার সরল অর্থ, তিনি ডাকাতকে ডরান না, ডাকাত বন্দুক উঁচালে তিনিও বন্দুক তুলতে জানেন, কিন্তু এ-রকম বন্দুকহীন ডাকাতির বিরুদ্ধে লড়বার মত হাতিয়ার

তো তাঁর নেই। অবশ্য তিনি থাবড়ান নি, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই ; তবে কি না অফিসারটি যদি একটু সাহায্য করেন তবে আমাদের উপকার হয়, তাঁরও পুণ্য হয়।

অফিসার বললেন, 'চলুন'।

তিনি ট্যাক্‌সিওলাদের সঙ্গে দু'চারটি কথা বলেই আমাদের জানালেন কত দিতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল, গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে যা লাগতো, ট্যাক্‌সিতে তাই লাগবে। আমরা তাতেই খুশী। কাইরো তো পৌঁছব, পোর্টসঈদে তো জাহাজ ধরতে পারবো, তবে আর ভাবনা কি ?

আমরা হুড়মুড় করে দু'খানা ট্যাক্‌সিতে কাঁটাল-বোঝাই হয়ে গেলুম।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠবার সময় বললুম, 'আপনি আমাদের জন্য এতখানি করলেন। সত্যই আপনার দয়ার শরীর।'

তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে যা বললেন, তা শুনে আমি অবাক। তার অর্থ, তাঁর শরীর আদপেই দয়ার শরীর নয়। তিনি কিছুমাত্র পরোপকার করেননি। আমরা এক পাল ভিখিরী যদি সুয়েজ বন্দরে আটকা পড়ে যাই তবে শেষ পর্যন্ত তাদেরই ঘাড়ে পড়বো। আমাদের তাড়াতে পেরে তিনি বেঁচে গেছেন—ইত্যাদি।

আমি আপত্তি জানিয়ে মোটরে বসে ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা কি—বহু দিন পূর্বেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার এক চিত্রকর বন্ধু, বিনোদবিহারী এক দিন তাঁর দূরবীণটি ধার নিলে—বেচারী চোখে দেখতে পেত কম। কয়েক দিন পরে সেটা ফেরৎ দিতে গেলে দিনু বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম দেখলে ?'

'আজ্ঞে, চমৎকার !' বিনোদ এত দূরের জিনিস এর আগে কখনো দেখতে পায়নি।

'তবে ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। লোকে বড্ড জ্বালাতন করে। আজ এটা এ চায়, কাল ওটা ও চায়, পরশু ওটা সে চায়। আমি পেরে উঠিনে। তোমার কাছেই ওটা থাক্।'

বিনোদ একাধিক বার চেষ্টা করেও সে দূরবীণ ফেরৎ দিতে পারেনি।

এই হ'ল খানদানী লোকের পরোপকার করার পদ্ধতি। সে দেখায়, যেন সে আদপেই পরোপকার করেনি। নিতান্ত নিজের মঙ্গলের জন্য, আগাগোড়া সে স্বার্থপরের মত কাজ করে।

বুঝলুম, এ অফিসারটিও দিনু বাবুর স্বগোত্র। ইচ্ছে করেই 'স্বগোত্র' শব্দটি ব্যবহার করলুম। আমার বিশ্বাস, ইহ-সংসারের যাবতীয় ভদ্রলোক একই গোত্রের—তা তাঁরা ব্রাহ্মণ হন আর চণ্ডাল হন, হিন্দু হন আর মুসলমান হন, কাফ্রী হন আর নর্ডিক হন।

ততক্ষণে আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে।

[ক্রমশঃ।

৩

অনেক চেষ্টা করেও এলিস লেখার একটি বর্ণও বুঝতে পারলো না। সব হিজি-বিজি। অনেক চেষ্টার পর এইটুকু বুঝতে পারলো, যেন কে কা'কে মেরেছে, সেই কথাটাই লেখা আছে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো এমন ভাবে সময় নষ্ট করা তার ভুল হয়েছে। আবার তো তাকে ফিরে যেতে হবে যেখান থেকে এসেছিল সেইখানে। এ-কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ভাবলো, একটা ঘরে অতক্ষণ থাকা ঠিক হয়নি—আরো তো কত দেখবার আছে। বাগানটাই দেখা হয়নি। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সিঁড়িতে যে একটা একটা ধাপে নামছে, তা নয়। সিঁড়ির রেলিং-এ হাত রেখে সর-সর করে নেমে গেল। এত তাড়াতাড়ি নামলো যে পায়ের পাতা মাটি ছুঁলো না।

এবার ঘরের বাইরে এসে চার দিক ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলো কাছেই মস্ত বাগান। একটু দূরেই একটা পাহাড়। এলিসের মনে হলো, যদি পাহাড়ে উঠতে পারে তাহলে বাগানটাকে বেশ ভালো করে দেখা যাবে। ঐ তো একটা রাস্তাও দেখা যাচ্ছে, ওই পাহাড়ের দিকে গেছে বলেই তো মনে হচ্ছে। ঐ রাস্তায়ই যাওয়া যাক। এলিস সেই রাস্তা ধরে পাহাড়ের দিকে চললো। খানিক দূর এগোতেই পথটা একটা মোড় নিয়ে বেঁকে গেছে। আবার খানিক দূর এগোতেই একটা বাঁক—তার পর আর একটা—আবার একটা—বাঁকের যেন শেষ নেই। এলিসের মনে হলো এ তো রাস্তা নয়, এ যেন বোতলের ছিপি খুলবার স্ক্রু। যাই হোক, এই বাঁকটা ধরে গেলে নিশ্চয় পাহাড়ে পৌঁছনো যাবে—এই মনে করে এলিস এক-পা যেন ছুটে চললো। কিন্তু কই না তো! এ যে আবার সেই সিঁড়ি আর ঘর—যেখান থেকে সে বেরিয়েছিল। তাহলে এতখানি পরিশ্রম সব বৃথা ? কিন্তু এলিস অত সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়, দমবার মেয়ে নয়। এবার সে সোজা ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। কিন্তু এখানেও বাঁকের পর বাঁক—আবার যেকে সেই! কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে আবার সেই ঘরে এসে দাঁড়াতে হলো। এবার এলিসের ভারী রাগ হলো। ঘরটার দিকে খানিক কটমট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রাগে

ইন্দিরা দেবী

গজগজ করে বলে উঠলো : বার বার এখানে ঘুরে-ফিরে আসতে হচ্ছে বটে, কিন্তু ঘরে আর ঢুকছি না। ঘরে ঢুকলেই আবার আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের বাড়ী ফিরে যেতে হবে। সব না দেখে, এক পা এখান থেকে নড়ছি না। আবার সামনের রাস্তা ধরে এলিস এগিয়ে গেলো—এবারেও অনেকগুলি মোড় পার হতে হলো, তবু এবার এলিস একটুও থামলো না, একটার পর একটা মোড় পার হয়ে চললো। অনেকখানি রাস্তা, অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তবু থামবার নাম নেই। এবার পাহাড়টাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। আরো খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সামনে দেখা গেল এক টুকরো জমি—তার মাঝখানে একটা উইলো গাছ, আর তাকে ঘিরে ছোট ছোট ডেইজি ফুলের গাছ। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল—আর লম্বা ডালওয়ালা ফুলভরা গাছগুলো হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল। এলিসের খুব ভালো লাগছিল আর তার ইচ্ছা হচ্ছিল এদের সঙ্গে কথা বলতে—কিন্তু তা কি সম্ভব? গাছেরা কি কথা বলতে পারে?

—'হ্যাঁ পারে বৈ কি। কথা বলবার মত লোক পেলেই আমরা কথা বলি।'

এলিস তো অবাক!

সত্যি সত্যি তার সামনে লম্বা ফুলগাছ বাতাসে দোল খেতে খেতে ঐ কথা ক'টা বলছিল। এলিস ব্যাপার দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল—খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বার হলো না। অনেক চেষ্টা করে কিছুক্ষণ পরে যখন কথা বলতে পারলো তখন ভয়ে ভয়ে বললে সব গাছেরা কথা বলতে পারে? বাতাসে দুলতে দুলতে আবার লম্বা লিলি ফুলের গাছ বললে; হ্যাঁ পারে বৈ কি! তোমার চেয়ে ভালই পারে, তোমার চেয়ে আরো জোরে কথা বলতে পারে।

এমন সময় গোলাপ গাছ বলে উঠলো, আগে কথা বলতে আমাদের ভদ্রতায় বাধে। তুমি যখন কথা বলছিলে গায়ে পড়ে তখন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার পর তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম যে, মুখখানা খুব খারাপ নয়, বুদ্ধিটা যতই মোটা হোক। বুদ্ধিটা বড় বেশী রকমের মোটা—তবে গায়ের রংটা ফর্সা তাই রক্ষে—গোলাপের কথা শেষ না হতে হতে লিলি বললে; ওঃ ভারী ত রং তবু যদি আমার পাপড়ীর মত হতো।

এলিসের এরকম খুঁত ধরা আলোচনা ভাল লাগলো না। সে আস্তে আস্তে বললে: আচ্ছা, এই তেপান্তর মাঠে তোমাদের যখন প্রথম পুঁতে দেওয়া হয়েছিল—আশে-পাশে কেউ নেই—কে তোমাদের দেখা-শোনা করবে—এ-সব ভেবে তোমাদের ভয় করেনি?

গোলাপ বললে: না রে, ভয় করবে কেন? আমাদের মাঝখানে লম্বা ঝাঁগড়া গাছটা দেখতে পাচ্ছ? সে কি আর অমনি দাঁড়িয়ে আছে?

এলিস বললে: সত্যিকারের বিপদ হলে ও তোমাদের কি করে বাঁচাবে?

গোলাপ বললে: ওঃ, তা জানো না বুঝি? খুব জোর করে আওয়াজ করতে পারে।

ছোট্ট একটা ডেইজি ওদের কথা শুনছিল—সে ফোড়ন কেটে বললে: তুমি তো কিছুই জানো না দেখছি, এ গাছের ডালগুলো সব কথা বলতে জানে। আর একটা বাচ্চা ডেইজি বললে: ও মা! এটাও তোমার জানা ছিল না বুঝি?

ওর কথা শেষ না হতেই অনেকগুলো ডেইজি একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কী ভীষণ চেঁচামেচি, কান পাতা দায়!

এমন সময় লিলি গাছ চেঁচিয়ে বলে উঠলো: এই চুপ! রাগে তার গা কাঁপছিল। হাওয়াতে দুলতে দুলতে এ-পাশ ও-পাশ মাটিতে ঠেকছিল। এলিসের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে: ওদের ধরতে পাচ্ছি না তাই, না হলে এক একটার গলা টিপে ধরতাম।

এলিস তাকে শান্ত করবার জন্য বললে, ওরা ছেলেমানুষ—তুমি কিছু মনে করো না। তার পর ডেইজিদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে: এই, তোমরা যদি আবার আওয়াজটি করেছ, তবে তোমাদের এক একটিকে গাছ থেকে ছিঁড়ে নেবো।

যেমনি এই কথা শোনা অমনি ডেইজির দল একেবারে চুপ। শুধু চুপ—ভয়ে তাদের লাল রং সাদা হয়ে গেল।

লিলি ডেইজিদের দুর্দ্দশা দেখে ভারী খুশী—বললে: ঠিক হয়েছে। এরা যখন কথা বলে সব একসঙ্গে—ভারী পাজী হয়েছে সব!

এলিসের এবার লিলির সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছা হলো! সে বললে: আচ্ছা ভাই, তুমি এত মিষ্টি কথা কি করে বলো? এর আগে আমি অনেক বাগানে গেছি, অনেক ফুলগাছ দেখেছি কিন্তু তাদের কাউকে কখনও কথা বলতে শুনিনি। লিলি খুসী হলো কথা শুনে—তারপর একটু মুরুব্বী চালে মাথা হেলিয়ে বললে: এইখানটায় এই মাটীর উপর একবার হাত রাখো দেখি—তাহলে বুঝতে পারবে কেন আমরা কথা বলি।

এলিস তার কথা মত মাটীতে হাত রাখলো—বললে: এ তো ভয়ানক শক্ত জমি, কিন্তু তার সঙ্গে তোমাদের কথা বলার সম্পর্ক কি?

লিলি বললে: দেখো বেশীর ভাগ বাগানের মাটী খুব নরম। এত নরম যে সেখানে গাছগুলো সব ঘুমিয়ে পড়ে।

এলিসের কথাটা ভালো লাগলো, বললে: হ্যা, এ কথাটা আমি একবারও ভাবিনি।

গোলাপ এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, এইবার মাথা উঁচু করে বললে: ভাববে কোথা থেকে তুমি? মাথায় বুদ্ধি কি কিছু আছে তোমার?

পাশেই ছিল একটা বেগুনী রং-এর ফুলের গাছ—সে আবার গোলাপকেও ছাড়িয়ে গেল। ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে: ও-রকম বোকা চেহারা আমি আর দু'টি দেখিনি। লিলি ও-রকম কথা পছন্দ করলো না। সে বললে: চুপ করো, পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে তোমার দেখা হয়ে গেছে কি না। সারা বছর তো পাপড়ীর তলে মাথা গুঁজে নাক ডাকাও। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর তো কিছু রাখো না, তবু ফস করে বলে বসলে ও-রকম বোকা চেহারা দু'টি দেখিনি।

এলিস জিজ্ঞাসা করলে: আচ্ছা, আমি ছাড়া আর কোনো লোক এ বাগানের আশে-পাশে আছে কি?

গোলাপ বললে: মাত্র আর একজন আছে, যে তোমার মত ঘুরে বেড়াতে পারে।

এলিসের এ-কথা শুনে খুব আনন্দ হলো। বললে: আমার মত দেখতে কি? তাহলে আমার মত একটি ছোট্ট মেয়ে বাগানের কাছাকাছি কোথাও আছে?

গোলাপ বললে: আছে বৈ কি—তোমার মতই দেখতে বিচ্ছিরি বিকৃত, তবে তোমার চেয়ে তার রং অনেক বেশী লালচে। লিলিও

তার কথায় সায় দিয়ে বললে : হ্যাঁ হ্যাঁ, তার দেহের গড়ন তোমার চাইতে ভালো। গোলাপ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে : মন খারাপ করো না, তোমার আর কি দোষ বলো—গায়ের রং তো আর চিরকাল সমান থাকে না ?

এলিসের এ ধরণের কথাবার্ত্তা ভাল লাগছিল না। কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্য বললে : সে কি এখানে আসে ?

গোলাপ বললে : আসে বৈ কি ! আমার তো মনে হয় এখনি আসবে আর তোমার সঙ্গে দেখাও হবে। তবে তার গায়ে কিন্তু কাঁটা রয়েছে, সাবধানে থেকো।

এলিসের কৌতূহল হলো। সে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁটা কি বলছো ?

গোলাপ জবাব দিলে, কাঁটা গায়ে নয় মাথায় রয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল তোমার মাথাতেও কাঁটা দেখতে পাবো। আমি মনে করতুম তোমাদের মত যারা তাদের সবাইর মাথায় বুঝি কাঁটা থাকে।

এমনি সময় বাগানের এক পাশে ছোট্ট একটা ফুলগাছ বলে উঠলো : ঐ তো সে আসছে, ঐ তো তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, বাঁধানো রাস্তা ধরে সে আসছে, তাই খট্‌-খট্‌ আওয়াজ হচ্ছে।

এলিস চারি ধারে তাকালো—একটু বাদে দেখতে পেলো—রাস্তা ধরে যে আসছে সে সেই লালরাণী ছাড়া আর কেউ নয়। একেই তো সে ছাইএর গাদার পাশে পড়ে থাকতে দেখেছিল। কিন্তু এখন তো অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এবার তো তাকে এলিসের চেয়েও লম্বা মনে হচ্ছে।

গোলাপ তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে : ও, তুমি অবাক হচ্ছো ? ভাবছো একে তুমি আগে দেখেছিলে আর—সে আজকে কি করে অত লম্বা হয়ে গেল ! খোলা হাওয়াতে বেড়ালে তুমিও এর মত লম্বা হয়ে যেতে পারতে।

ফুলদের সঙ্গে কথা বলতে এলিসের মন্দ লাগছিল না। কিন্তু তাহলেও তার মনে হলো রাণীর সঙ্গে কথা বলতে আরো ভালো লাগবে। তাই ভেবে সে গোলাপকে বললে : যাই ভাই, এবার রাণীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

গোলাপ বললে : ওঃ, তুমি দেখা করতে যাবে এই রাস্তা ধরে ! আমার কথা যদি শোনো, তাহলে উল্টো রাস্তায় যাও।

এলিস ভাবলে গোলাপ নিশ্চয় ঠাট্টা করছে। উল্টো রাস্তা ধরে গেলে কি করে দেখা হতে পারে ? তাই সে গোলাপের কথা না শুনে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো।

কিন্তু কি অবাক কাণ্ড ! রাণী কোথায় ? অনেকক্ষণ এ-ধার ও-ধার তাকাতে দেখতে পেলো অনেক দূরে দাঁড়িয়ে রাণী।

এলিস নিজের ভুল বুঝতে পারলো, এইবার সে গোলাপের কথা মত উল্টো রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। খানিক পরে সে গিয়ে একবারে হাজির হলো রাণীর সামনে। চার দিকে তাকিয়ে রাণী বললে : তুমি কোথা থেকে আসছো, যাচ্ছই বা কোথায় ? দেখ, এদিকে তাকাও, ভালো করে কথার জবাব দাও, ও-রকম আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করো না এই বলে রাণী শাসিয়ে উঠলো।

প্রথমটা এলিস হকচকিয়ে গেল। এ তো ছাইগাদায় পড়েছিল, রাণী যে তাকে অমন শাসাতে পারবে তা তার কল্পনাতেও আসেনি। রাণী যা যা বললে এলিস তাই মেনে নিলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে : পাহাড় দেখতে এসে আমার পথ হারিয়ে গেছে।

রাণী আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলো : তোমার আবার রাস্তা কোথায় ? এখানে যত পথ-ঘাট দেখতে পাচ্ছ সব আমার। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি এখানে এলে কি করতে ?

এলিস কথার-জবাব দেবার আগে রাণী আবার বললে : রাণীদের সঙ্গে কথা বলবার আগে কুর্ণিশ করতে হয়, তাও জানো না ?

এবার রাণীর গলার আওয়াজ অনেকটা নরম হয়েছে।

এলিস তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে শুধু বিড়্‌বিড় করে বললে : এর পর বাড়ী গিয়ে কোনও দিন খাবারের টেবিলে বসতে যদি দেরী হয়, তাহলে সবার কাছে কুর্ণিশ করে মাপ চেয়ে নেবো।

রাণীকে দেখে মনে হলো না যে, সে এলিসের কথা বলছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে : এবার আমার কথার জবাব দাও, আর কথা বলবার সময় আরেকটু বড় করে হাঁ করবে, আর সব সময় বলবে হুজুরাইন, মহারাণী !* [ক্রমশঃ।

অসাধারণ পরিশ্রমের একটি কাহিনী

যতীন্দ্রনাথ পাল

গভীর রাত !

ভবানীপুরের একটি বাড়ির একখানি-ঘরে আলো জ্বলছে। সে ঘরে একটি যুবক ছাড়া আর কেউ নেই। বসে বসে পড়ছেন তিনি। এত রাত অবধি কি পড়ছেন তিনি, এত কি পড়া ?

দেখছো না, অধ্যয়নে ডুবে গেছেন তিনি !

হ্যাঁ, তা তো দেখছি, কিন্তু রাত তো অনেক হলো, আর কতক্ষণ পড়বেন উনি, কখন পড়া শেষ হবে ওঁর ?

তা তো জানি না, তবে মনে হচ্ছে, ওঁর পড়া শেষ হোয়ে এল।

দু'খানা বই-এর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন তিনি। একটানা অনেক ঘণ্টা পড়ে নিশ্চয়ই খুব অবসন্ন হোয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ পরেই তিনি নিদ্রাভিভূত হোলেন। ঘরে আলো কিন্তু জ্বলতে লাগলো।

ঘণ্টা দুই পরে ঘুম ভাঙলো তাঁর। আবার সুরু হোল পড়া। পড়া চলল সকালবেলা পর্য্যন্ত !

সকালে এক বার স্নানাহারের জন্যে বাইরে যাওয়া আর রাত্রে খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্যে ঘর থেকে বের হওয়া, এ ছাড়া দিন-রাত্রি ঐ ঘরে আবদ্ধ হোয়ে থাকা। দিন-রাত্রির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৮ ঘণ্টা কেটে যায় পড়তে-পড়তে। বিছানায় শোওয়া আর হয় না তাঁর। খুব ঘুম পেলে বই-এর উপর মাথা রেখে খানিকক্ষণ ঘুমোন। দিন-রাত্রি কেটে যায় এই ভাবে।

আড়াই মাস এই রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হোল যুবকটিকে এল-এ পাশ করবার জন্যে। পরীক্ষার ফল বেরুবার পর দেখা গেল, মোট ৫১ টাকা বৃত্তি পেয়েছেন তিনি। তোমাদের হয়তো জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, এত মেহনত কেন করতে গেলেন যুবকটি ?

তাঁর এক বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে দেড় বছরের বেশি নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারেন নি তিনি। তাই আড়াই মাস তাঁকে পাঠের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে হয়েছিল।

এত পরিশ্রম করা কিন্তু ভাল নয়, যুবকটি কী অসামান্য পরিশ্রম করেছিলেন, শুধু তার পরিচয় দেবার জন্যই এই কাহিনীটি বললাম।

এই যুবকটি হলেন স্বনামধন্য মহাপুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

* Lewis Carroll-এর লেখা Through the Looking-glass and what Alice found there গ্রন্থের অনুবাদ।

নিজেকে গড়ো

শচীন্দ্র মজুমদার

দেহ-গঠন

তোমার দেহটিকে গড়ে তোলা আত্মসাধনার প্রথম সোপান। দেহ-গঠনকে আমি দু'টো ভাগে ভাগ করবো। প্রথমটি সাধারণ মানুষের সাধারণ দেহ নির্মাণ করা। দ্বিতীয়টি, উচ্চতর মানুষের উচ্চতর দেহসাধনা করা। প্রথমটিকে আমি শরীরচর্চা বলবো, যার নানা উপায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এ উপায়ে দেহ-গঠন করা যায় বটে, কিন্তু উচ্চতর সম্যক্ স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। দ্বিতীয় উপায়টি আমাদের নিজস্ব। তার নাম কায়াসাধন। এটি স্বরূপ সন্ধানের অঙ্গ এবং উচ্চতর সম্যক্ স্বাস্থ্য লাভ করবার একমাত্র উপায়। এ তত্ত্বটি আমাদের দেশে খুব কম লোকেই জানে, এবং পাশ্চাত্য দেশে সেটি অজ্ঞাত। এই বইতে আমি শরীরচর্চার কথাটাই আলোচনা করবো, কারণ কায়াসাধনা ভিন্নতর এবং উচ্চতর বিষয়। মানুষের দেহটা স্বভাবে উৎকর্ষপ্রবণ, প্রাণধর্মের কারণে আপনিই গড়ে ওঠে, তাতে তোমার চেতনার প্রয়োজন হয় না। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম হলেও আধুনিক জটিল সভ্যতার প্রভাবে এই সহজ ধর্মটিও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সে কারণে প্রাণধর্মের সহজ সঙ্গত বিকাশের জন্য দেহকে বাহ্যিক উপায়ে কিছু সাহায্য করলে গঠনের ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। এ কাজটা যতোটা কঠিন বলে মনে হয়, তা নয়। সাংসারিক অবস্থা একটু অনুকূল হলে সকলেই নিজের দেহ গড়ে নিতে পারে। কেন না, এ কাজে প্রকৃতি সদা-সর্বদা সাহায্য করতে তৎপর। মানুষের জীবনচক্রের কয়েকটি পর্যায় আছে, দেহ সে পর্যায় অনুসরণ করে চলে। বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ, পূরণ, পরিণতি, অবনতি ও মৃত্যু সেই পর্যায়। দেহের এই গতিতে পূরণ পর্যন্ত আরোহণ; পরিণতিতে স্থিতি, তার পর অবরোহণ।

তুমি যে ভাবে দেহ গঠন করবে তার মাত্র আরোহণের অংশটুকুর সহিত সম্পর্ক। জন্ম-মুহূর্ত থেকে প্রথম যৌবনের কাল পর্যন্ত দেহ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের পথ ধরে চলে। যাদের খাদ্যের অভাব আছে এমন ছেলেদেরও প্রাকৃতিক বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের ক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে থাকে না। অবশ্য, অন্যের তুলনায় সে ক্রিয়াটার গতি শ্লথ হয়ে যায়। মোট কথা, খাদ্য দেহ-গঠনের নিয়ামক হলেও একমাত্র নিয়ামক নয়। খাদ্য জলবায়ু আবেষ্টন প্রভৃতির প্রভাবের সহিত মিশে গিয়ে উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। সে সব জটিল কথা এখন তোমার জানার প্রয়োজন নেই। এইটুকু জেনে রাখো যে, আবেষ্টন যদি অনুকূল না হয় তাহলে দেহ ও মন কোনোটাই মজবুত হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। বাঙালী-সংসারে ইচ্ছানুরূপ আবেষ্টন গড়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব কথা। কিন্তু বয়স বাড়লে সহজেই মনের উপযুক্ত আবেষ্টন গড়ে নেওয়া যায়।

দেহ তো নিজের নিয়মে বাড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে আমাদের ছেলেদের জীবনীশক্তি বা প্রাণ-প্রাচুর্য [illegible] বাড়ে, এমন কথা বলতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতুম। দেহে যদি প্রাণের প্রাচুর্য না রইলো সে-দেহ বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন দেহধারীর বেঁচে থাকাটা একটা ঝঞ্ঝাট। জীবনীশক্তি না থাকলে জীবনের পূর্ণ স্বাদ পাওয়া অসম্ভব। যার জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ সে দিনের বেলাতেও অন্ধকার দেখে। কোন বিশেষ একটা বস্তু থেকে আমরা প্রাণপ্রাচুর্য পাইনে। সেটি যে কি বস্তু তা কোন সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যায় না। খাদ্য, আলো, বাতাস, সূর্যকিরণ, আবাসের পরিসর প্রভৃতির সমন্বয়ে প্রাণপ্রাচুর্যের প্রকাশ। এ সকলের কোন একটা উপকরণের অভাব হলে জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। দুর্দশাপন্ন বাঙালী-জীবনে এই সকল মূল উপকরণের অভাবটা ভয়াবহ। শহরবাসীদের খাদ্যের মতো আলো বাতাস সূর্যকিরণ পাওয়া অর্থবলের ওপর নির্ভর করে। আবাসের উচিত পরিসর পাওয়া খুবই অর্থসাপেক্ষ। কাজেই জীবনীশক্তির প্রধান প্রধান উৎসগুলি হতে শহরবাসী বাঙালী বঞ্চিত। পল্লীগ্রামে আলো বাতাস সূর্যকিরণ আবাসের পরিসর আছে, কিন্তু দারিদ্র্য ও অযত্নের কারণে আমাদের পল্লীগ্রামগুলি বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। তার ওপর ব্যাপক খাদ্যাভাব, কাজেই, আমাদের জাতির জীবন কি করে সবল হতে পারে? এ সকল সমস্যার সমাধান করার কর্তারা অজ্ঞ।

তোমার দেহটি ভারি মজার জিনিস। দীর্ঘতম কাল বেঁচে থাকবার প্রয়াসে তার কৌশলের আর ইয়ত্তা নেই। তোমার চেতনার অজ্ঞাতে সে তোমাকে রক্ষা করবার জন্য, তোমাকে পূর্ণ করবার জন্য নিত্য-নিয়ত নিদ্রা জাগরণে কতো কি করে চলেছে। সুতরাং তোমার পরমতম মিত্র দেহ বেচারাকে তোমার একটু দয়া করা, একটু শ্রদ্ধা করা উচিত। চেতনা দিয়ে সাহায্য করতে পারলে তো কথাই নেই। নীরব হয়ে থাকা সুস্থ দেহের ধর্ম, সেই জন্যই তোমার দেহের অস্তিত্বের বিষয়ে কোনো উপলব্ধি নেই। পিঠ বলে তোমার দেহে যে একটা দেশ আছে, তা তুমি স্বাস্থ্যের অবস্থায় অনুভব করতে পারো না। কিন্তু সেটা যখন বেদনায় চীৎকার করে ওঠে তখন তাকে চিনতে পারো। এই নীরব দেহটার বিষয়ে সামান্য একটু সচেতন হওয়া ভালো। কল্পনা বলে নিজের দেহ ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখো। দেখবে যে তোমার প্রাণের আধার দেহটির মতো তোমার এমন বিশ্বস্ত বন্ধু আর বিশ্বসংসারে নেই। তোমার জীবধর্ম, তোমার মানুষ-ধর্ম, তোমার সব কিছু ওইটুকু পাত্রটির ভেতর ন্যস্ত হয়ে আছে। তোমার সকল প্রকাশে সে তোমার একমাত্র সহায়। সেই জন্য আমাদের প্রাচীন আচার্যেরা বলতেন :—

শরীরং সর্ববিদ্যানাং শরীরং সর্বদেবতাঃ।
শরীরং সর্বতীর্থানি গুরুভক্তিঃ সুলভ্যতে॥

তোমার দেহটি তোমার জন্য কি করেছে সে কাহিনীটা একটু মোটামুটি জেনে রাখা মন্দ কথা নয়। তোমার জন্মকালে সে নির্মম নিষ্কলুষ ছিলো। কিন্তু জন্মাবার পরই সে আমাদের সভ্যজগতের রোগ ও মৃত্যুপ্রবণতার প্রভাবের ভেতর গিয়ে পড়লো। জগতের লক্ষ লক্ষ আঁতুড় ঘরের, এক থেকে তিন বছর বয়সের শিশু অপহৃত হোল। কিন্তু প্রাণধর্ম দিয়ে সে তোমাকে রক্ষা করে বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের পথে অগ্রসর করে দিলে। তোমাকে দাঁড়াতে, টাল সামলাতে, দৌড়তে শেখালে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের, কেন্দ্র

সব এক এক করে উন্মেষ করে দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য স্থাপন করে দিলে। তুমি ভাবছো, সে কালে তোমার কেবল খেলা আর দুরন্ত ছিলো ; কিন্তু তা নয়। খেলা ও দুরন্তপনা দিয়ে সে তোমাকে সবল ও কর্মঠ করে তুলতে লাগলো। তোমার মনকে করলে অনুসন্ধিৎসু ; মনের এ পিপাসা মেটাতে গিয়ে মস্তিষ্কে তোমার অনেকগুলি দরজা খুলে গেলো। দেহ তোমার এক দিকে যেমন দ্রুত গতিতে গঠনের কাজ করে চলেছে, তেমনি বারে বারে উৎকর্ষের অনেক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং সে যুদ্ধে বার বার জয়ী হয়েছে। বার বার সে তোমাকে রক্ষা করেছে। যতোটুকু তুমি চোখে দেখতে পেয়েছ সেটা দেহের বাহ্যিক উৎকর্ষ। কিন্তু তোমার অন্তরে নিত্য নব নব শক্তির স্ফুরণ হয়েছে ; দেহ তার প্রকৃতিগত গুণ দিয়ে এই সকল শক্তিগুলির সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। তৃণ একত্র করে যেমন হাতি বেঁধে রাখবার কাছি তৈরী হয়, সব শক্তি একত্র হয়ে তেমনি তোমাকে সংসারকে আয়ত্ত করবার বল দেয়। দেহ বার বার পুরাতন আর জীর্ণ যা তা ফেলে দিয়ে নূতন উপাদানের দ্বারা ক্ষয় পূরণ করছে। এই নূতন উপাদান প্রগতিশীল। বলবত্তরকে দিয়ে পুরাতন স্থানটা পূর্ণ হয়।

কৈশোরের কালটা পেরিয়েও তোমার মনে হবে যে, খেলার উদ্দীপনাই তোমার জীবনের বড়ো কথা, সবল খেলা-খেলা মন ; তুমি খেলছো বেশি, দেহের ক্রিয়া তোমার মনের ক্রিয়াকে চাপা দিয়ে রেখেছে। যতো দিন দেহ বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ-প্রবণ ততো দিন খেলার ক্রিয়া বেশি হবেই। কারণ, তোমাকে কেবল শক্তিমান সক্ষম করাটাই দেহের একমাত্র লক্ষ্য নয়, যতো দৈহিক বিপদের সম্ভাবনা আছে সেগুলো অতিক্রম করে যাওয়াটাও সেই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। নিত্য-নিরন্তর পরিশ্রম করে রোগপ্রবণতার সঙ্গে যুদ্ধ করে আনুমানিক একুশ বছর বয়সে দেহ তোমাকে রোগপ্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়। এতোদিন কাল ধরে তোমার অন্তরে রোগকে বাধা দেবার বিপুল শক্তি গঠন করে, যার জোরে তুমি সংসারে অবলীলায় চলাফেরা করো।

কিন্তু দেহের কাজ চিরদিনই মুখ্য হয়ে থাকে না। মন তার চেয়ে বড়ো, তার চেয়ে জোরালো। কাজেই দেহকে স্বরাজ্য ছেড়ে দিয়ে মনের অধীন হতে হয়। কৈশোর আরম্ভ হতেই তোমার অন্তরে মনটি নিজের আসন অধিকার করবার জন্য দ্বন্দ্ব করে এসেছে। যদি তোমার দেহের উৎকর্ষ যথাযথ হয়ে থাকে তাহলে প্রায় উনিশ বছর বয়সে মন স্বাধিকার লাভ করে এবং তুমি যতো বড়ো হবে মনের অধিকার ও প্রভাব ততো ব্যাপক, ততো গভীর হবে। অবশ্য জৈব দেহটা নিজের কাজ করে যাবে, কিন্তু সে কাজের ভালো-মন্দ সম্পূর্ণ ভাবে মনের ওপর নির্ভর করবে। তোমার দেহটি মনের ভৃত্য, মনের বাহ্যিক ছবি হয়ে উঠবে। মনের ধরণে তোমার দেহ পশুর মতো, কিংবা প্রকৃত মানুষের মতো হতে বাধ্য। এই জন্যই কোন মানুষ মানবাকারে পশু, আবার কেউ এমন মানুষ, যার কাছে আমাদের মাথা আপনিই সম্ভ্রমে লুটিয়ে পড়ে। এর পর উৎকর্ষের আর একটি সোপান আছে। পণ্ডিতদের মতে আনুমানিক বাইশ বছর বয়সে তোমার দেহ ও মনের পরিণতির আরম্ভ। উনিশ থেকে বাইশ বছর বয়স জীবনের একটি গুরুতর সন্ধিকাল। তার পর বছর পঁয়ত্রিশ বয়স পর্যন্ত দেহ ও মনের পূরণের কাল, পরিণত অবস্থা আসে তারপর, এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর মানুষ পরিণতির শিখরে ওঠে। এটাকে আমরা প্রৌঢ় অবস্থা বলি। প্রৌঢ় বয়স একেবারেই বার্দ্ধক্যের প্রথম রূপ নয়, এ বয়সটা পরিপক্ক অবস্থা, তুমি তখন পূর্ণ শক্তিতে উপচে পড়ো। পঞ্চান্ন বছরটাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমানা বলা যায় ; তার পর দেহ জরাগ্রস্ত অবতরণ করতে আরম্ভ করে, মৃত্যু তার শেষ সোপান। এ অবতরণ মনের নয়, তা মনে রেখো। মনের কথা যথাস্থানে আলোচনা করবো।

মানুষের প্রথম পঁয়ত্রিশ বৎসরের যে কাহিনী সেটা সাধারণ মানুষের সাধারণ অবস্থা। গোড়াতেই বলেছি যে, প্রকৃতি মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা স্তর পর্যন্ত গঠন করে পরিত্যাগ করে। সৃষ্টি রক্ষা করা প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই আংশিক ভাবে গঠিত মানুষ সে উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য সচেষ্ট। তাই এই সীমা পার হয়ে দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিবর্তন প্রাপ্ত হতে গেলে তোমাকে নিজের ভাস্কর হতে হবে। সে কথাটা আগেই বলেছি।

মানুষের দুটো আয়তন। একটা মাপা যায়, অন্যটা মাপা তো যায়ই না, বরং সাধনায় সেটা অপরিমেয় হতে পারে। আমাদের শাস্ত্র বলে যে, মানুষ বিপুল বিশ্বের একটি ছোট সংস্করণ, যা বিশ্বে আছে তা মানুষের ভেতরেও বর্তমান। তুমি দুটো জগৎ, দেহটায় তুমি দৃশ্যমান। তোমার অন্তর্লোকে আর একটি জগৎ ; সেটা অদৃশ্য। একা তুমি সেটা পূর্ণ করে দেখাতে সক্ষম হতে পারো। তোমার বাইরের ও অন্তরের জগতে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত, যা তোমাকেই ব্যক্ত করে তুলতে হয় এবং তা করতে পারলে তুমি আর প্রকৃতির শাসনাধীন হয়ে থাকবে না। সে কথাটা অন্য।

খেলা যে তোমার স্বতঃসঞ্জাত প্রেরণা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সে প্রেরণাটি ক্রমশঃ মন্থর হতে হতে লোপ পায়। মনের ক্রমিক আয়তন বৃদ্ধি তার কারণ। কাজেই বাইশ বছরটি প্রাকৃতিক খেলার ইচ্ছার উর্দ্ধতম সীমানা বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু মানুষে মানুষে তার তারতম্য হয়। অনেকের এর পরেই খেলা থেমে যায়। যাদের থামে না তাদের খেলার ইচ্ছাটি বাল্য ও কিশোর বয়সের মতো উদ্দাম হয়ে থাকে না। তার পর যতো বয়স বাড়ে ততোই আর খেলায় সাড়া দিতে চায় না।

খেলা মূল জিনিস। ব্যায়াম তার প্রকারভেদ। দুটোরই উদ্দেশ্য এক। ব্যায়ামে খেলার প্রসারতা নেই, সেটা খেলার চোলাই করা বলেই ব্যায়ামের প্রতিক্রিয়া দ্রুত। খেলা যেমন সরস, ব্যায়াম তেমনি শুকনো—অবশ্য প্রথম অবস্থায়। খেলার হাতে-হাতে ফল। সে-ফল স্ফূর্তি, আনন্দ, দেহ সম্প্রসারণ জনিত ক্লান্তির আরাম। ব্যায়ামের উদ্দেশ্যটা না বুঝলে তার শুষ্কতার জন্য অনেক ছেলে ব্যায়াম করতে পারে না। সেই জন্য খেলা যেমন ব্যাপক, ব্যায়ামের প্রসার তেমনি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। কৌশলময় ব্যায়াম আয়ত্ত করতে পারলে আমরা আনন্দ অনুভব করি। অভ্যাসে মানুষ সব করতে পারে বলেই ব্যায়াম সাধনা করা সম্ভব হয়।

খেলা ও ব্যায়ামের নানা রূপ আছে। এই বিভিন্নতার ভেতর দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরণের উপকার পাই। মূলে খেলা জীবনধর্মী ; সীমার বাইরে সেটা অপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক। খেলার মোটামুটি তিনটি রূপ : দেহগঠন, আনন্দ ও সংঘর্ষ। ব্যায়ামেরও তাই। সংঘর্ষমূলক খেলা ও ব্যায়ামের কারণে ও দুটোর প্রতিযোগিতা গড়ে

। অপরের শক্তি ও কৌশলকে নিজের শক্তি ও কৌশল দিয়ে জয় করার প্রতিযোগিতায় আনন্দ। এই জয় করার প্রেরণা ও স্বভাবটি গড়ে তোলা জীবনের পক্ষে মহা মূল্যবান, যেহেতু আমাদের জীবন সংগ্রামে সংঘর্ষণে পূর্ণ, তাতে জয়ী হবার অফুরন্ত উত্তম না থাকলে বাঁচাটাই অসার্থক হয়। খেলার ক্ষেত্রে অপরাজেয় হবার স্বভাব গড়ে তোলা সহজ বলেই খেলার দাম আছে। কিন্তু সেই স্বভাবটা খেলার আঙিনায় ত্যাগ করে এসে জীবনে প্রবেশ করা একেবারেই ঠিক নয়। সেটাকে আমরণ সঙ্গী করে রাখা দরকার। খেলা ও সংঘর্ষণ মূলক ব্যায়ামের আর একটি মহৎ গুণ— Recovery শিক্ষা করা। তার মানে: খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফল নির্ণীত হয় না। হারা খেলা প্রতিজ্ঞার দ্বারা জয়ে পরিণত হয়। তাকেই আমরা Recovery বলি। জীবনেও এ গুণটির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োগ আছে। জীবনের খেলাতেও জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত জয়-পরাজয় নির্ণীত হয় না। প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমাদের জীবনের অনেক হারা খেলাও জয় করতে হয়। জীবন-শিল্পের সেটি একটি প্রধান অঙ্গ।

পরিমাণে মাপাজোপা অথচ আবিষ্ট হয়ে খেলাটা দামী জিনিষ। মাত্রাশূন্য খেলাটা ঘোরতর অপচয়। খেলা ও ব্যায়ামের বিশেষ দোষ এই যে, অধিক অভ্যাস, অত্যধিক তন্ময়তায় মনের বিনাশ হয়। এর চেয়ে আর কোনো বড় ক্ষতি মানুষের হতে পারে না। অত্যধিক খেলায় মানুষের অনুভব করবার শক্তিটা লোপ পায়, বাহ্যিক বিষয়ে মন আটকে থাকে। ছেলে বয়সের খেলার প্রেরণা পরিণত বয়সে আরোপ করার ফল বিষময়। অত্যধিক অভ্যাস ও তন্ময়তার কারণে প্রতিযোগিতামূলক খেলা অত্যন্ত খারাপ জিনিষ। ক্রমাগত প্রতিযোগিতা মনকে খুব আবদ্ধ করে রাখে। সে অনুশীলন মনকে আর কোন কাজ করতে দেয় না; তাতে মন উৎকর্ষ লাভ না করে সঙ্কুচিত, দুর্বল হয়ে যায়, বাহ্যিকতাই তার স্বধর্ম হয়ে ওঠে। সমাজে এ রকম মানুষের কানাকড়ি মূল্য নেই। সব চেয়ে বিষম কথা, আত্মবিস্মৃত খেলোয়াড়ী অন্নোপার্জন করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে। অধিক দিন দলগত খেলা খেললে (Team games) বিবর্তন সাধনা করা অসম্ভব হয়।

এই সমগ্র বইটায় আমি যা লিখেছি তার একটি কথাও আমার অনুভব ও অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের অনুভবের কিছু কথা তোমাদের বলতে হয়। আমার বর্তমান বয়স একষট্টি বছর। আমার খেলা ও ব্যায়ামের কাল হামাগুড়ি দিতে শেখার অবস্থা থেকে ছেচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। আটত্রিশ বছর বয়সে একবার পেটের একটা রোগ হওয়া ছাড়া দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছরে আমার একদিন মাথাও ধরেনি। পোলো এবং ল্যাক্রস (Lacrosse) ছাড়া পৃথিবীতে এমন খেলা নেই যার দৈহিক অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। যৌবন মানুষের ক'দিন থাকে? ছেচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পূর্ণ যৌবনে আমার অধিকার ছিলো। ভারতবর্ষের ব্যায়ামী-সমাজে ও বিদেশে আমার নাম অজ্ঞাত নয়।

কোন অভ্যাসের চরম ফল কি, তা সারা জীবন ধরে পর্যবেক্ষণ না করলে জানা যায় না। আমি নিজেকে এবং অসংখ্য ব্যায়ামীদের পর্যবেক্ষণ করে আসছি, সুতরাং আমি এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলতে পারি। আমার অটুট স্বাস্থ্য ছিলো, অন্তর-সম্ভব দৈহিক বল ছিলো, এ ছাড়া ছেচল্লিশ বছরে আমি আর কিছুর দেখা পাইনি। আমার না ছিলো মন, না ছিলো অনুভব। বোধ করি পূর্বসংস্কারের কারণে আমার ধর্ম, আর্ট, সাহিত্য প্রভৃতিতে একটু টান ছিলো, আর ছিলো অদম্য পাঠস্পৃহা। এরাই আমার পরিত্রাতা হরি। খেলায় ও ব্যায়ামের নেশায় অভিভূত হয়ে আমি অন্নোপার্জনের গভীর প্রয়োজনের কথাটা উচিত সময়ে বুঝতে সক্ষম হয়নি। আমি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কালটির অপচয় করেছি। তবুও আমার হরি আমাকে বাঁচিয়েছেন। জীবন-সন্ধ্যায় এসে তবুও ক'টা দিন আত্মসন্ধান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ ঘটনা আমার জীবনে আকস্মিক। এমন ঘটনা আমি আর কোন খেলোয়াড় বা ব্যায়ামীর পক্ষে হতে দেখিনি। আমার উদাহরণটি মনে রেখে তোমরা সাবধান হয়ো, সংযমী হয়ো। আমার মতো অপচয়ের দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের না হয়। আমার মতো যেন নিরন্তর নিজেকে বলতে না হয়, "তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া!" এ বিষয়ে আমি পৃথিবীর লোককে সাবধান করেছি। আজ বেশি করে আমার হৃদয়ের সকল আকুলতা দিয়ে তোমাদের সাবধান করে গেলুম। ভগবান প্রচুর করে দু'হাতে আমাকে সকল শক্তির আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, খেলতে গিয়ে জীবনে যা কাম্য তা আমি সব নষ্ট করেছি।

প্রতিযোগিতা মূলক খেলা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে, এবং দলগত খেলায়, যাকে টীম গেমস বলে, সীমা না লঙ্ঘন করো তা দেখতে হবে। জীবন সঙ্গত খেলা ও ব্যায়ামের আশ্রয় নাও। জীবনটা সংগ্রাম দিয়ে পরিপূর্ণ। তুমি না চাইলেও বার বার তোমাকে আক্রান্ত হতেই হবে। আক্রান্ত হয়ে ভেবে-চিন্তে তা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার চেয়ে আক্রান্ত হবার পূর্বে আক্রমণ করাটাই তোমার পক্ষে উচিত কথা। একটা চলতি কথা আছে, যে প্রথমে আক্রমণ করে সে আক্রমণের মুহূর্তেই লড়াইয়ের অর্দ্ধেকটা জিতে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে হলে পরীক্ষার দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে সেটাকেই আক্রমণ করা উচিত পথ। জীবনের সকল কর্মে আক্রামক হতে হবে। আক্রামক হওয়াটাই জীবন-শিল্পে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। সাধারণ খেলোয়াড়কে দেখো, সে হয়তো দু'ঘণ্টা ফুটবল খেলতে বা আড়াই মণ বারবেল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, কিন্তু ওইটুকুর বাইরে তার দেহে সহনশীলতা নেই, তার দেহ বজ্র-কঠিন নয়। তা যদি না তোল শুধু ঘরের অন্ন ধ্বংস করবার জন্য দেহ গড়বার বিন্দুমাত্র দরকারও নেই। সে-দেহ শুধু বাপ মায়ের নয়, সমাজেরও বোঝা। বাতনাড়ী প্রকরণের শক্তির উৎকর্ষ সাধন ও সঞ্চয় করা খেলা ও ব্যায়ামের বুনিয়াদি লক্ষ্য। কিন্তু আধুনিক খেলোয়াড় ও ব্যায়ামী আর কিছু না করুক সে শক্তিটুকু আগেই ক্ষয় করে বসে থাকে। খেলা ও ব্যায়াম পরিণত বয়সের অনেক হৃদরোগের মূল। অল্প খেলা ও ব্যায়ামে বাতনাড়ী প্রকরণের শক্তির এবং দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির উৎকর্ষ হয়, মাত্রা ছাড়ালে বিপরীত ফল হয়। তোমার প্রতিদিনের শক্তির কথা আগেই বলেছি, সেটা কোন রকমেই নষ্ট বা অপচয় করা উচিত নয়। যে দেহে সহনশীলতা ও বাতনাড়ী প্রকরণের শক্তি নেই, সে দেহ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে নিদারুণ কষ্ট দেয়।

খেলোয়াড় ও পহলবানী দেহ অত্যন্ত আরামপ্রিয়, সুতরাং অত্যন্ত

অকেজো। জীবনের সকল জাগ্রত মুহূর্তে পৈশিক টানের ভাব একটু না থাকলে, পেশীগুলি ক্রিয়াশীল না হলে কর্ম, সহনশীলতা, বায়ুনাড়ীর শক্তি কোন রকমেই বৃদ্ধি পায় না। এর চমৎকার উদাহরণ দেখতে চাও তো কোন গ্রামে গিয়ে চাষীদের দেখে এসো। তাদের আর যা না থাক, এ সকল উদ্যমে গুণগুলির কোন অভাব নেই এবং সে দিক দিয়ে তারা তথাকথিত ভদ্রলোকদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, খেলা ও ব্যায়ামের পৈশিক টান ক্ষণিক, জীবনের প্রয়োজনের জন্যে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের জাতিগত একটা দারুণ অভাব আছে। শুধু বাঙালী কেনো, পঞ্জাবের বাইরে সব ভারতীয় জাতিদের মধ্যে এই অভাবটি পরিস্ফুট। আমরা কঠোর দৈহিক সংঘর্ষণ করতে পারিনে। দৈহিক সংঘর্ষণ আমরা এড়িয়ে চলি বলে আমাদের খেলাগুলোও সংঘর্ষণমূলক নয়। আজকাল আমাদের সব খেলা ও ব্যায়ামের পদ্ধতিগুলি ইউরোপীয় হয়ে গেছে, তাহলেও রগবীর মতো যে খেলায় দৈহিক সংঘর্ষণই প্রাণ তা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। খেলা ব্যক্তিগত বা দলগত যাই হোক না কেনো, তাতে এই মূল অভাবটা লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের যৌবনকালে ফুটবল খেলাটা সংঘর্ষণমূলক ছিলো। আমাদের পূর্বে যারা ফুটবল খেলতো, তাদের খেলাটা ছিলো যুদ্ধ। কোমল-দেহ কোমল-প্রাণ ছেলেদের তাতে স্থান ছিলো না। এখন খেলার বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে ফুটবল ভিন্ন ধরণের কৌশলময় খেলায় পরিণত হয়ে গেছে। বেফারীর বাঁশী গায়ে-গা দেওয়ার বিষয়ে সদা সতর্ক। আমরা নিত্য চোখে সরষে ফুল দেখতে অভ্যস্ত ছিলুম বলে এখনকার খেলা আমাদের মাখম খাওয়ার মতো একটা কিছু বলে মনে হয়; মনে ধরে না। সে যা হোক, এ খেলাতেও আক্রামকতা আছে যথেষ্ট, কিন্তু দলের সহায় আছে বলে সেটা ব্যক্তিগত আক্রামকতার গুণের মতো সতেজ ও স্বতন্ত্র হয় না। আমার মনে হয়, রগবী ফুটবল গ্রহণ করতে পারলে আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হোত। কথাটি আমাদের দেশের চমৎকার চরিত্র গঠনকারী আক্রামক খেলা, এবং সেটা ফুটবলের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইউরোপীয় প্রভাবের কারণে সেটা গাঁয়ো ও ইতর জনের খেলা বলে পরিগণিত হয়েছে।

যা প্রকৃত ভাবে সংঘর্ষণ-পরায়ণ দেহ এবং তেজঃ ও নির্ভীক মন তৈরী করে সেগুলো খেলার আকারে আক্রামক ব্যায়াম। তাতে ব্যক্তিগত সাধনাই আসল কথা, নিজের ভরসা নিজেই হওয়া পূর্ণ ভাবে বাঁচতে গেলে তা তোমাকে হতেই হবে। নিজেকে গড়তে গেলে দলগত অনুশীলন কাজে লাগে না, ব্যক্তিগত সাধনাটাই বড়ো। উচ্চতর সকল সাধনা ব্যক্তিগত।

আক্রামক ব্যায়ামে এক দিকে তুমি একা, অন্য দিকে তোমার বিপক্ষ। তাকে আয়ত্ত করতে তোমার পিছন পানে চাইবার অবসর মুহূর্ত অবসর নেই। যা কিছু তোমার কর্তব্য তা তখনি তখনি ভেবে নিয়ে কাজে পরিণত করতে হবে। তোমার সংস্কার এমন হওয়া প্রয়োজন যে, বিপক্ষের সামান্য মাত্র ইঙ্গিতে সেটা সাড়া দেয় এবং তোমাকে ঠিক পথে চালিত করে। অভ্যাসে এই গুণটি বেশ আয়ত্ত হয়। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কি করতে হবে, তা তোমার মন তখনই বলে দেবে। অভ্যাসের দ্বারা তোমার আত্মপ্রকাশের বিস্ময়কর পরিণতি হবে এবং বিশিষ্ট একটা মনোভাব একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী শেষ পর্যন্ত তোমার প্রাণধর্মের অঙ্গ হয়ে খেলা ও ব্যায়ামের সামান্য পরিধিটা অতিক্রম করে সব বিষয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। এই ছোট্ট বস্তুর ভেতর দিয়ে বড়টাকে পাওয়াই হোল খেলার চরমতম লাভ।

আক্রামক ব্যায়ামের দুটি রূপ। প্রথম, যেখানে তোমার বিপক্ষ কোন জড়বস্তু, যা কেবল নিজের ভার দিয়ে তোমার কৌশল ও শক্তিকে বাধা দেয়, যথা ভার তোলা। দ্বিতীয়, যেখানে বিপক্ষটি মানুষ। এই বিপক্ষটি সব চেয়ে জটিল, সব চেয়ে সাংঘাতিক। এই নিদারুণ বিপক্ষটি সারাটি জীবন তোমাকে ঘিরে তোমার পথ আগলে থাকবেন। মানুষ যে বিপক্ষ, তার দেহ তো আছেই, অর্থাৎ তার দেহগত ভাবটাই শুধু বড় কথা নয়। কেননা তার দেহের শক্তি, ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা ইত্যাদি তোমার বিপক্ষাচরণ করবে না, সেগুলো তার মনের ক্রিয়া, কৌশল, সাহস ও চাতুর্য প্রভৃতি মানসিক গুণের সহিত যুক্ত হয়ে প্রখর হয়ে উঠবে। যে বিপক্ষ, তার দৈহিক সকল গুণগুলিকে মানসিক নানা গুণের সহিত সমন্বিত করে, তোমার বিরুদ্ধে চালিত করে, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুর্বার। তোমার নিজের দেহ-মনের সকল গুণ যদি সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত না হয়, তাহলে তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

[ক্রমশঃ।

মনুষ্যের কর্তব্য কি ?

"মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য আপন জীবিকা-নির্বাহ ও প্রার্থনীয় প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায়স্বরূপ অবলম্বন করেন। অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে। আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারা যায়।···যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারে, সে সর্বলোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব এবং অল্প পরিশ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমন বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিব।"

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখকের অদ্ভুত খেয়াল (৪)

সুলতা কর

শ্রেষ্ঠ লেখকদের কত বিশেষত্ব থাকে, তাঁদের কত রকম খেয়াল থাকে। ইংরাজী সাহিত্যে বিখ্যাত লেখক টমাস্ কার্লাইলের নাম তোমরা শুনেছ। তাঁর লেখা "French Revolution"এর মত বই পৃথিবীতে কমই আছে।

এই বিখ্যাত লেখকের খুব কম বয়স থেকেই এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। একটুও গোলমাল তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একটু জোরে শব্দ শুনলেই অস্থির হয়ে উঠতেন।

হয়ত তিনি লিখতে বসেছেন, এমন সময় রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল, কিংবা কোন এক নিরীহ ফেরিওলা জিনিষের নাম বলে চীৎকার করল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল। কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন। হয়ত কোন দিন ভোরবেলা চা খাওয়া শেষ করে পড়বার ঘরে বসেছেন এমন সময় দূরে কারও বাড়ীর বাগানের দুটো মোরগ ডেকে উঠল। কার্লাইলের লেখা আধ-পথে থেমে গেল। ভ্রূকুটি করে বিরক্তির সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন, রচনা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এমন কি পিয়ানোর টুং-টাং মিষ্ট শব্দও তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

একবার তিনি কোন এক ছোট ষ্টেশনের কিছু দূরে এক বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"বন্ধু, এই বাড়ীতে যত দিন ছিলাম তত দিন আমি এক লাইনও লিখতে পারিনি। সেই বাড়ীতে যদি আমাকে বহু দিন কাটাতে হত তাহলে আমি কখনও লেখক হতে পারতাম না। কারণ, যত বার ট্রেণের হুইশিল্ শুনতাম, তত বার মনে হত বুঝি আমার মাথার শির ছিঁড়ে গেল, মনে হত রাস্তায় হাজার হাজার পাগলা কুকুর বুঝি একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। এ অবস্থায় কোন ভাব মনে আসা অসম্ভব। সেই বাড়ী ছেড়ে আসবার পর তবে আমার রচনার ক্ষমতা ফিরে এল।"

যখন লেখক হিসাবে কার্লাইলের খুব বেশী নাম হয়নি, অর্থ উপার্জ্জনও হয়নি, তখন থেকে তাঁর মনে একটি প্রবল ইচ্ছা ছিল। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"প্রিয় বন্ধু,—আমার জীবনের সব চেয়ে বড় একটি ইচ্ছা তোমাকে জানাচ্ছি। যদি কখনও আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে পারি, তাহলে সর্ব্বপ্রথম সেই অর্থ দিয়ে আমি আমার বাড়ীর নির্জ্জন অংশে একটি শব্দবিহীন (Sund Proof) ঘর তৈরী করাব। সেই ঘরে আমি একা সারা দিন পড়ব আর লিখব। বাইরের সামান্য শব্দও সে ঘর থেকে শোনা যাবে না। যে পরিচারিকা আমার খাবার আনবে ও নিয়ে যাবে, সে হবে মূক ও বধির।"

কার্লাইলের মনের এই ইচ্ছা মিটতে বেশী সময় লাগেনি। খুব অল্প বয়সেই লেখক বলে তাঁর নাম হল, প্রচুর অর্থাগম হল।

তখন তিনি লণ্ডনের একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ছিলেন। টাকা হাতে আসতেই তিনি সেই বাড়ীতে তাঁর মনোমত শব্দবিহীন পড়বার ঘর তৈরী করালেন।

সমস্ত জীবন সেই ঘরে বসে লেখাপড়া করলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ...

অতি সাধারণ ছিল, কিন্তু তিনি সারা জীবন সে বাড়ী ছাড়লেন না, তার কারণ শব্দবিহীন পড়বার ঘরের আকর্ষণ। অবশ্য মূক-বধির পরিচারিকা তাঁর ঘরে খাবার দিত না। তিনি নিজেই খাবার ঘরে এসে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসে খেতেন, মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করতেন। কিন্তু নিঃস্তব্ধতাপ্রিয় লেখক খাবার সময়ও খুব কম কথা বলতেন। তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুরাও তাঁর স্বভাব জানতেন বলে খাবার টেবিলে খুব কম কথা বলতেন। যাতে তাঁর মনের শান্তি নষ্ট না হয়, সেই ভাবে খাওয়া-দাওয়া শেষ হত।

বিখ্যাত লেখক হিসাবে তাঁর নাম হবার পর কবি টেনিসন্, কবি ব্রাউনিং, ডিকেন্স, এমার্সন্, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, এমনি সব সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। কিন্তু আলাপ কথা ঘটে উঠত না। নির্ব্বাক কার্লাইল চুপ করে শুনে যেতেন, অন্যেরা যতক্ষণ পারেন কথা বলে শেষে থেমে যেতেন। তাঁর এই সব খেয়ালের জন্য তিনি খুব কম লোকেরই প্রিয় হতে পেরেছিলেন। কিন্তু যাঁরা কার্লাইলকে বুঝতেন তাঁরা এই নির্ব্বাক্ লেখকের সঙ্গ বিশেষ ভাবে উপভোগ করতেন।

একবার কবি টেনিসন্ কার্লাইলের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় আলাপ করতে এলেন। কার্লাইল বাড়ীর খাবার-ঘরে বসে তামাক-ভরা পাইপ টানছিলেন। সে-ঘরে আর কেউ ছিল না। টেনিসন্ ঘরে ঢুকে করমর্দ্দন করে পাশের চেয়ারে বসলেন। কার্লাইল একবার মাত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে এক-মনে তামাক-ভরা পাইপ টেনে যেতে লাগলেন। তখন তাঁর মনে একটি রচনার ভাব এসেছে। কাজেই অতিথির সঙ্গে কোন কথা বললেন না। পাইপের পর পাইপ টেনে যেতে লাগলেন, আর ছাদের দিকে তাকিয়ে রচনার ভাব ভেবে যেতে লাগলেন। এ দিকে কবি টেনিসনেরও ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতেই একটি সুন্দর কবিতার ভাব মনে এসেছে। এক-মনে তিনিও তাই ভেবে চলেছেন। তিনি যে কার্লাইলের পাশে বসে আছেন তাই ভুলে গেছেন। তিনি একটিও কথা বলছেন না।

সময় কেটে যাচ্ছে। পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নির্ব্বাক কবি, নির্ব্বাক্ লেখক পাশাপাশি চুপ করে বসে ভেবে চলেছেন। শেষে যখন এক ঘণ্টা কাটল, তখন দু'জনেরই জ্ঞান ফিরে এল। টেনিসন্ হাসিমুখে উঠে কার্লাইলের হাত ধরে সাদরে করমর্দ্দন করে বললেন—"বন্ধু, আজকের সন্ধ্যাটি তোমার আতিথ্যে বড় সুন্দর কাটল।"

কার্লাইলও সাদরে করমর্দ্দন করে জানালেন যে, টেনিসনের সঙ্গে এই সন্ধ্যাটি তাঁর খুব সুখে কেটেছে। টেনিসন্ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কবি ও লেখকদের এমনি সব অদ্ভুত খেয়াল থাকে বলেই তাঁরা সুন্দর কবিতা, সুন্দর রচনা আমাদের উপহার দিতে পারেন। সাধারণের মাপকাঠি দিয়ে তাঁদের চরিত্র বিচার করা ...
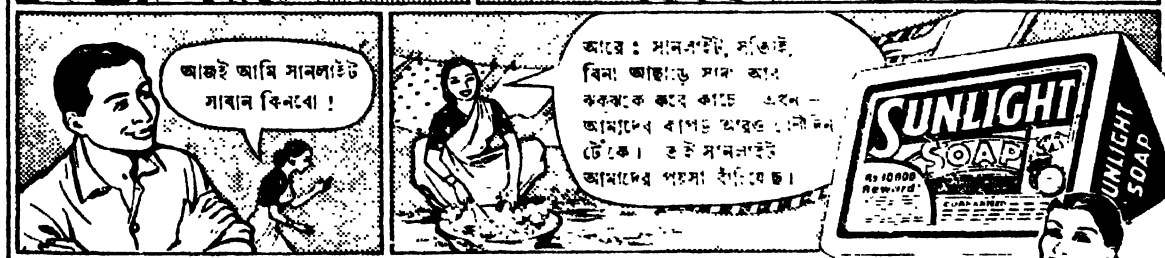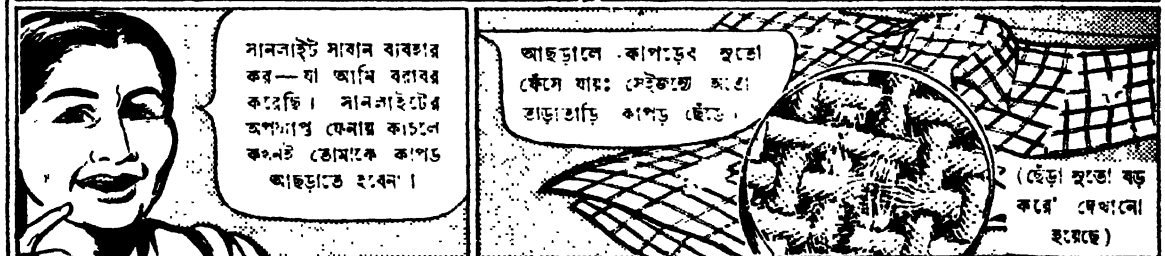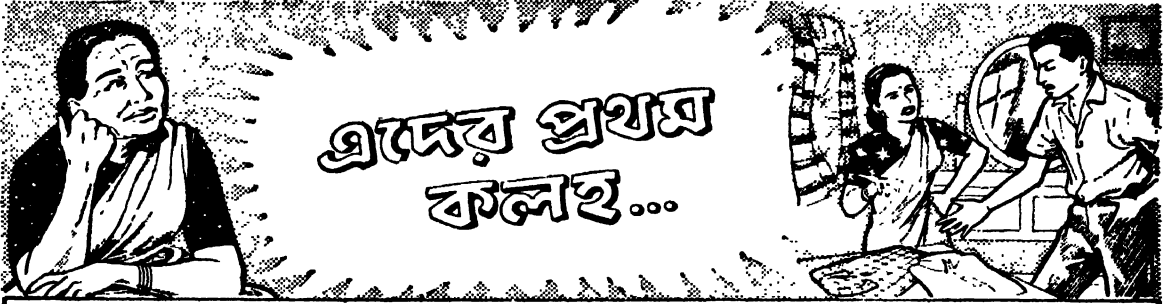
যতীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর-পরিবর্তন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

পরিণত বয়সের কবিতায় যতীন্দ্রনাথের সুর-পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকট হইয়াছে তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টি-পরিবর্তনের মধ্যেও। এ-ক্ষেত্রেও সর্বত্রই যে তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত এ-কথা বলা যায় না; তাঁহার পূর্ববর্তী দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহু স্থলে প্রস্ফুট,—কিন্তু তাঁহারই ভাঁজে ভাঁজে নূতন রঙের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রকৃতির সম্বন্ধে কবির যে একটা অচেতন আকর্ষণ তাহা ঢাকা পড়িয়াছিল তাঁহার সচেতন অবিশ্বাস এবং বিরূপতায়। কবির 'মরুমায়া'য় দেখিয়াছি, 'শাওন-রাতি' কবিতায় শ্রাবণের নির্ঝরকে কবি 'অন্ধ অনন্তের ক্রন্দন-ছন্দের সান্ত্বনা-গান' বলিয়াছেন; আকাশের মেঘের গুরু গুরু ডাককে গগন-অরণ্যে শাবক-হারা বাঘিনীর গর্জন বলিয়া মনে করিয়াছেন, বিদ্যুতের ঝলসানিকে বেদেনী মেয়ের হাতে নাগিনীর নৃত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'সায়ম্'-এ আসিয়া যখন সেই 'শাওনিয়া' সম্বন্ধেই 'একতারার গান' শুনি—

> শাওন এল ওই
> থৈ-থৈ শাওন এল ওই!
> পথহারা বৈরাগী রে তোর
> একতারাটা কই?
> থৈ-থৈ শাওন এল ওই!
> ফুলভরা কোন্ ভুল আঙিনায়
> হায় রে ও বাউল!
> ভিখ্ মাগনে গিইছিলি তুই
> কোন্ ভাঙনের কূল!
> থৈ-থৈ শাওন এল ওই!
> ... ...
> কোন্ কালো চোখের বাদলে
> ভিজল গেরু' বাস?
> কোন শেফালির শাখায় বেঁধে
> শুকিয়ে নিতে চাস?
> থৈ-থৈ শাওন এল ওই!
> ... ...
> বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে
> বাদল ঝরোঝর,
> বকুল-বীথির ফুল-বাদলে
> ভিজ্‌ল কি অন্তর!
> থৈ-থৈ শাওন এল ওই!
> ... ...
> শাওন গাঙের ভাঙন্ বেয়ে
> ঘট ভরি কাঁখে
> কোন্ বিজলী ডেকে গেল
> ঘোমটারি ফাঁকে!
> থৈ-থৈ শাওন এল ওই!

তখন কবির চোখের দৃষ্টি-পরিবর্তন এবং কণ্ঠের সুর পরিবর্তনকে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না।

প্রকৃতি পাছে রূপের মোহে ফেলিয়া কবি-মনকে তত্ত্ব-বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে এবং যে মঙ্গলময় বিশ্ব-চৈতন্যের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ তাহারই নিকট পরাজয় স্বীকার করাইয়া দেয় এই জন্য কবির মন সর্বদাই ছিল 'সতর্ক' কোনও অসতর্ক মুহূর্তে 'টোপ' গিলিয়া ফেলিবার ভয়ে কবি প্রকৃতির বাহিরের রূপটাকেও কোনও দিন নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করতে পারেন নাই। কিন্তু জীবনের হেমন্ত-সন্ধ্যায় বাহিরের হেমন্ত-সন্ধ্যার মাঠ কবিচিত্তকে রূপানুরাগে ব্যাকুল করিয়াছিল।—

> সবুজ্ সৃষ্টির ক্ষেতে ফুলে ফুলে শেষ পেতে
> বিপথিক রশ্মিরা শুয়েছে,
> শ্যামলী আলুর লতা কুন্তলালুলায়িতা
> সাঁঝ নেয়ে সন্ধ্যা গা ধুয়েছে,—
> হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু!
> ... ...
> মাঠে মাঠে পাকা ধান অঘ্রাণী আঘ্রাণ
> কার আশা পথপানে তুলছে?
> দ্বিতীয়ার চাঁদখানি কাস্তের আধখানি
> কোন্ কৃষাণীর মুঠে দুলছে?
> হেমন্ত সন্ধ্যার-বন্ধু!

কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রকৃতির যে এমন রূপ আছে তাহা তিনি যৌবনে দেখিতেও পান নাই, উপভোগও করিতে পারেন নাই: এই রূপ তাঁহার চোখে মায়াময় অঞ্জন বুলাইয়া দিল জীবনের হেমন্ত ঋতুতে। যৌবনে তিনি সুন্দরকে স্বীকারই করেন নাই—আর সন্ধান করিবেন কি। কিন্তু—

> বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি
> বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
> হেমন্ত-সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
> কোন্ সুন্দরে করি সন্ধান!—
> হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু!

তাই দেখিতে পাওয়া যায়, কবির জীবনে সবই বিপরীত—সবই যেন সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। যখন মানুষের মনে থাকে রূপ-লোলুপতা তখন কবির মনভরা ছিল রূপ-বিমুখতা, আর যখন মানুষের দৃষ্টির ক্রমবর্ধমান ধূসরতায় জাগিতে থাকে রূপ-বিমুখতা —তখন কবির মনে নামিল রূপ-লোলুপতা। কবি নিজেও এই ব্যতিক্রম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই নিজেই বলিতেছেন,—

> রবি না বসিতে পাটে মন ছুটে চলে মাঠে,
> এ জীবনে সবই যে ব্যতিক্রম,—
> হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু,
> বন্ধু গো মরমীয়া বন্ধু!

'ত্রিযামা'র বহু কবিতার মধ্যে রহিয়াছে এই রূপানুরাগের স্ফুট অস্ফুট প্রকাশ। যৌবনে কবি এক বার শীতকে তাঁহার আরাধ্যদেব শঙ্করের সহিত অভিন্ন করিয়া কি বলিষ্ঠ মনে আহ্বান জানাইয়াছিলেন প্রলয়যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দান করিতে ('শীত', 'মরীচিকা',) ; কিন্তু সেই কবিই 'ত্রিযামা'র 'হিমভূমি' কবিতার মধ্যে শীতে যেন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছেন। আর্তকণ্ঠে যেন বলিতেছেন—

এত শীত,—
আমার অন্তরে এত শীত !
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্তমান
অবলুপ্ত,—
হিমাচ্ছন্ন যোজক প্রমাণ।

চারি দিকের এত শীত যেন কবিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,—সেই আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়া যেন ঈষৎ বাসনার উন্মেষ একবার ফাল্গুনের কিশোর দেবতা সুন্দরের জন্য :—

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ
কিশোর ফাল্গুন,—কত দূর ?
সুতীক্ষ্ণ সায়কাঘাতে তার
কুহু বলি' চমকি উঠিছে কোন্
বেদনা-বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রপারী দ্বীপান্তর বন।
... ...
নারিকেল-কুঞ্জতলে
গন্ধবিনিময় চলে
চন্দনে ও এলায়,
সাধে ঢেউ সারাবেলা আতপ্ত বেলায়।

'ত্রিযামা'র 'নববর্ষের সূর্য' কবিতার মধ্যে একদিকে দেখিতে পাই কবি বলিতেছেন, যে নববর্ষের উৎসবের অর্থ সময়ের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে একটি খড়ি দিয়া দাগ কাটিয়া দেওয়া : সে দাগের তাৎপর্য এই,—'মহাশূন্যে নিবদ্ধ বন্ধন চক্রপথে' 'দুর্ভাগিনী ধরিত্রী'র যে ঘুরিয়া মরা তাহারই একটি 'শুভ পহেলা বৈশাখ' এই ক্ষণটি : আবার অন্যদিকে দেখিতেছি সবিতা দেবের বর্ণনায় তাঁহার রশ্মিসমূহের মধ্যে যে বিশ্বব্যাপী বন্ধন রহিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিয়া কবি বলিতেছেন,—'নববর্ষে তব মুখে শুনিবারে নবতর বন্ধনের গীতা আমিও উন্মুখ আজি।' প্রভাতী ভ্রমণ সারা হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে হইতেছে, তাহার এই প্রভাতী সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অসীম শূন্যের মধ্যে সেই সবিতৃদেবেরও ঘটিতেছে সংক্রমণ—মীন হইতে মেষে সংক্রমণ—এবং কবির জ্ঞানের অন্তরালে 'কোন্ নক্ষত্রের দেশে বিশাখা মিলিছে চন্দ্রমায়' ;—কবি জানেন না 'কোন্ দুঃসাহসী' অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিয়া 'তব করে বাঁধিছে বৈশাখী রাখী'। কিন্তু কবি সে সকলের সন্ধানের জন্য তেমন ব্যগ্র নহেন,—

আমি শুধু জানি,—
আমার মাঠের শেষে
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বলিজীর্ণ শাখে
আতাম্র নবীন নব পল্লবের ফাঁকে
কাল তব দেখিছি উদয়।
আজও তারি পানে আছি চেয়ে,
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বুক বেয়ে
দেখিব তোমার
স্নান পাদ হাতে পরস্পর—
নিঃশব্দ সঞ্চার।

ইহার ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় ধর্মবোধাশ্রিত ঐতিহ্যের সহিত কবির যে একটা নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখিতে পাই, এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিতও কবি-হৃদয়ের যে একটা সুকোমল এবং সুগভীর বন্ধন প্রকাশ পাইয়াছে কবির প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে তাহা দুর্লভ। 'সায়ম্'-এর 'সুন্দর' কবিতাটিতে দেখি, অন্তরতম সুন্দরকে তিনি 'অশ্রুজলের কমল নব' বলিয়াছেন। এই সুন্দরের কমল 'কত বরষার অশ্রু-থিতানো পঙ্ক শয়নে' কবির অন্তরের অন্তরে যেন 'সিন্ধু-অঙ্কে লক্ষ্মী-সম' যুগ যুগ ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিল : কিন্তু সমস্ত জলভার ভেদ করিয়া আপন মৃণালে এই সুন্দরের কমল যেদিন কবির বুকে জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই কৈশোর-যৌবনের প্রভাত বেলাতেও—

ভাগ্য আমার,—সেদিন মেঘের
কালো গহন উষার মুখে !

কিন্তু আজ যেন মনে হয়, কৈশোর-যৌবনের দিনে সুন্দর-কমলের প্রকাশ ক্ষণে কবি চিত্তের সেই যে মেঘ-গুণ্ঠিত পরিবেশ—আজ যেন তাহা কবিচিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। সেইজন্যই শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাকুল বাসনার অস্পষ্ট উন্মেষ দেখিতে পাই—

ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
আনন্দরূপে ফুটিবে না কি ?
সজল এ চোখে ব্যথিত না করে
হাস্য-উজ্জল মোহন আঁখি ?
মঙ্গল প্রভাতে আলোকের দল
ফুটিলো অরুণ মর্মকোষে,—
কত সাধনার সুন্দর পেয়ে
কাঁদিয়া কাঁদাবো কর্মদোষে।

ইহার সহিত আমরা কবির পূর্ব-স্বীকৃতি তাঁহার জীবনে সবই যে ব্যতিক্রম,—বসন্তে, বর্ষায় সুন্দরের মিনতি ও আহ্বান পুরুষ-কর্কশতায় প্রত্যাখ্যানের পর হেমন্ত-সন্ধ্যায় আবার তাঁহার 'সুন্দরের সন্ধান'—এই সব যদি মিলাইয়া লই তাহা হইলে আমরা বোধ হয় যতীন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিবর্তন ও পরিণতির যাথার্থ্যকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

'সায়ম্'-এর 'কুরঙ্গিণী' কবিতার মধ্যেও কবি-চিত্তের গভীর গহনেরও একটি স্বীকৃতি-সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে পারি—কবির মনোমরুর মধ্যেই একটি বাসনার 'চিরপিয়াসী' 'চিরতৃষিতা' কুরঙ্গিণী ক্ষণে ক্ষণে চরণের 'রিনিকি রিনি' সুরে কবিকে সচকিত করিয়া দিত। কবি বিশ্বের আকাশ জোড়া রুদ্রবহ্নিরই স্তুতি গাহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই মনোমরুবাসিনী কুরঙ্গিণী—

দীপ্ত নভের রুদ্র রুদ্রক
খেয়াল-সুখে
আসে আর যায় যে বীজ ছড়ায়
সহস্র করে বালুর বুকে
তারি অংকুর খুঁটিয়া খেয়ে,
দিগদিগন্তে চলিতে ধেয়ে,
অন্তরপথে মরু-মরুতের
অজানা জলের গন্ধ পেয়ে।

কবি বলিতেছেন, তাঁহার জীবন-মরুভূমিতে মনের গহনচারী অস্ফুট বাসনা-হরিণীর এই মরীচিকার তৃষ্ণা নিত্যই ব্যর্থ হইয়াছে, এবং ব্যর্থ যে হইবারই কথা! মরীচিকার অস্তিত্বে আশ্বাস বা আশা ত' মানুষের জীবনের তন্দ্রাজাত চৈতসিক চাঞ্চল্য মাত্র। জীবনের নটরাজ রুদ্রের ভালে যে অনির্বাণ বহ্নিশিখা জ্বলে তাহাই সত্য, তাঁহার জটাজালের নীচে যে গঙ্গার কুলু কুলু নাদের মিথ্যা কল্পনা তাহা নিদ্রিত রুদ্রই সহ্য করেন—জাগ্রত রুদ্র নহে, 'দিগম্বরের গ্রন্থি কসিয়া' সেই রুদ্র-দেবতা যখন দিগন্তরে জাগিয়া বসেন, তখন তাঁহার ললাট হইতে শুধু অগ্নিই ক্ষরিয়া পড়ে এবং 'মরীচিকা-জাল ছিঁড়িয়া পড়ে'; কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবিচিত্তের হৈমন্তিক গোধূলিতে সেই মরুবিহারিণী হরিণীর জন্যই কি করুণা!

হে মরুমৃগ,
যতদূর চাই মরীচিকা নাই,
এ মরুরে তাই ডাকিলে কি গো?
শস্য-শ্যামল সজল বনের
হরিণী তুমি,
কবে কি কারণে করিলে বরণ
ধূসর ঊষর এ মরুভূমি?

এখানে এই কথাটিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, কবির 'ধূসর ঊষর মরুভূমি'র মধ্যে যে 'শস্যশ্যামল সজল বনের' এক হরিণী জলের পিপাসা এবং স্বপ্ন লইয়া ফিরিয়া বেড়াইত তাহার সম্বন্ধে জীবনের প্রথম অর্ধে যেন কবি তেমন অবহিতই ছিলেন না,—সেই হরিণীর চিরতৃষা এবং চির-আশা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং অসীম দরদবোধ তাহাও ফুটিয়া উঠিয়াছে এই 'সায়ম্'-কালে। কবি তাঁহার কবিতায় অবশ্য বলিয়াছেন, 'বুকের মাঝার শুনি না ত' আর তব চরণের রিনিক-ঝিনি'; কিন্তু মরুবনবিহারিণী এক হরিণীর চরণের 'রিনিক ঝিনি' একদিন যে কবি ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাইতেন আমরা সে-কথাটা তাঁহার 'সায়ম্'-এ আসিয়াই জানিতে পারিলাম। 'সায়ম্'-চেতনায় জাগত এই কুরঙ্গীর সঙ্গে কবির এই যে চিত্ত-কারুণ্যের যোগ ইহার সহিত আমরা এক করিয়া লইতে পারি এই 'সায়ম্'-কালেরই আহ্বান 'ভ্রমরে'র প্রতি।—

কত গো ভ্রমর কত—
সে অতৃপ্তের তৃষা মিটাতে কি
শুকাল পদ্মদহ?
'ফটিক জলের' ক্ষীণ আবেদন,
কুহু কুহু কুহু পিকের বেদন,
আজও কি সহসা সে ক্ষ্যাপার চোখে
বিদ্যুদ্দাম আনে?
কালবৈশাখী মাতনে মাতিয়া
তবে সে শান্তি মানে?
নিদাঘ যে আজি সুদুঃসহ—
শ্যামল দেশের বারতা বন্ধু
শ্রবণে আমার গুঞ্জরহ। (ভ্রমর সায়ম্)

আজ যে 'নিদাঘ' এমন করিয়া 'সুদুঃসহ' হইয়া উঠিয়াছে এবং ভ্রমরের কাছে শ্যামলদেশের বারতার গুঞ্জরণ শুনিবার জন্য এতখানি আকুলতা দেখা দিয়াছে যতীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে ইহাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

কবির এই চিত্ত-পরিবর্তনের প্রসঙ্গে 'ত্রিযামা'র 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটিও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। নিজের যৌবনকে কবি উপভোগ করিতে পারেন নাই; সেই বেদনা এবং ক্ষোভ তাঁহার চিত্তকে বার্ধক্যে শুধু শুষ্ক নয়, ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পরিণত বয়সে জীবনের 'কুমার দেবতা' যৌবনকে কবি 'পূজা-অর্ঘ্য' বা 'স্নেহ-শুভাশিষ' জানাইতে চাহিয়াছেন নিজের তনয়-তনয়াকে অবলম্বন করিয়া। তাই দেখি—

কত দিন পরে মোর ভাঙা ঘরে
ফিরে এলি কি রে যৌবন?
ফাটা ইটে কাঠে তাই ফুটে উঠে
বেলি চামেলির ফুলবন।
... ...
দাঁড়াইয়ে আজি জীবনসীমায়
তনয়-তনয়া তনু সুষমায়
হেরি নবেশে
তব কল্যাণরূপ,
ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
আরতি গন্ধধূপ।
রাতের মুকুলে কুণ্ঠিত লাজ,
প্রভাত পুষ্পে ফুটিয়াছে আজ
অন্তর ছাড়ি দাঁড়ায়েছে আসি
বাহিরে,
অঙ্গনে পথে কুটীরে দাওয়ায়—
তোরি উত্তরী উড়িছে হাওয়ায়,
ওরে চঞ্চল লীলাবিহ্বল
ফিরিছ কি গান গাহি' রে!

প্রথম জীবনে কবি দুঃখের সত্যজীবনকে কেবলই অতিক্রম করিয়া সুখবিলাসের চারিদিকে যে আবেশ ও আয়োজন লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধেই এত তিক্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, জীবনের সম্বন্ধে কাটা-ছাঁটা 'হক্' কথা শুনাইয়া দিবার একটা দুর্বার আগ্রহই কবিচিত্তকে প্রায় সবখানি অধিকার করিয়াছিল। দুঃখকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জীবনকে কবি গভীর ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারেন নাই। নৈরাশ্যবাদের যুক্তাযুক্তমোদিত গতি মৃত্যুর পথে—কবি তাই জীবনকে কোনও গভীর আকর্ষণে টানিয়া রাখিতে চান নাই—জীবনের বৃন্তে মরণের ফুলকেই একমাত্র সার্থক পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। জীবনের প্রতি আবার যখন কবিচিত্তের বেদনাময় গভীর আকর্ষণ

দেখা দিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে যন্ত্রণাদায়ক দুঃখবোধের অন্ততঃ সাময়িক উপশম ঘটিয়াছে। জীবনের প্রতি এই মায়াময় গভীর আকর্ষণ সুস্পষ্ট কবির 'ত্রিযামা'র ভিতরকার 'কাঁদে কিশলয়' কবিতাটির ভিতরে। সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণপ্রবাহের কমকান্তি এই নব কিশলয়। পাণ্ডু পাতার পাশে কাঁদিয়া ওঠে নব কিশলয়, 'দখিণার ঝড়ে পাছে খ'সে পড়ে'—এই তাহার বেদনা, তাই জীবনরসের প্রথম বিকাশ কিশলয় আশপাশের পাণ্ডুপাতাকেই বাহুপাশে বাঁধে—আর জীবনের আশঙ্কায় কাঁদে। এ যেন প্রেম-বৈচিত্ত্যে জীবনের গাঢ়-আলিঙ্গনের মধ্যেই জীবনের বুকে মুখ লুকাইয়া 'কাঁদে কিশলয়'!—সে কাঁদে আর—

কহে কিশলয়,—এই অবেলায়
পারি কি বিদায় দিতে ?
ভবিষ্যতের তীর্থপথের
গৈরিক গোধূলিতে ?
এখনি ও পথে যেওনাকো নামি
হে মোর অতীত, হে মম আগামী,
এখানে বৃন্তে বাঁধা আছি আমি,
—কাঁদে কিশলয়।

তরুণ কিশলয় তরুর তলার ঝরাপাতাদের দিকে তাকায়, আর শঙ্কা জাগে—তাহার নিজের অঙ্গের যে শ্যামসজ্জা তাহাই বা ক'দিনের তাহা কে জানে! জীবনের নীলে মরণের পীতবসন জড়াইয়া যে তাহার সাজ—তাহা কি শুধু একটা ক্ষণ-অস্তিত্বের পরে চির-বিস্মরণ বরণ করিয়া লইতে? নবীন জীবনের কিশলয় উদাসী বেলায় মর্মর বাতায়নে বসিয়া পাণ্ডুপাতার বৃন্তে নিজের মর্মের ধ্বনি শোনে ; আর—

কুহু কুহু রবে কুহরে কোকিল,
সবনে শিহরে গগনের নীল,
ফুটে আঁখিকোণে শিশিরের কণা :
—কাঁদে কিশলয়।

এই কিশলয় যে কোন্ জীবনের প্রতীক এবং কোন্ বেদনায় নিজের মনেই অশ্রুসজল তাহা চমৎকার ফুটিয়াছে কবিতাটির শেষ স্তবকে।—

যৌবন বঁধু অধরের মধু
মাগিছে ওষ্ঠপুটে,
ক্ষণে অক্ষণে দখিণ পবনে
বুকের কাঁচুলি ছুটে।
একে একে একে স্বর্গে উঠে দীপ,
সখীরা পরিল জোনাকির টীপ,
পাণ্ডু পাতার মুকুর সমুখে
কাঁদে কিশলয় :
শ্যাম-সমাকুল কুন্তল তার তুলে বাঁধে আর
কাঁদে কিশলয়।

দার্শনিক মহলে 'নৈরাশ্যবাদে'র বিরুদ্ধে যত যুক্তিতর্ক রহিয়াছে তাহার ভিতরে সেরা যুক্তি হইল এই যে, মানুষ যে এই জীবনটিকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, পাকে পাকে ইহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, ইহাই প্রমাণ করে, সব জড়াইয়া জীবন দুঃখের নয়, আনন্দের,—ত্যাজ্য নয়, আকর্ষণের। কবি যতীন্দ্রনাথও নিজের কবি-অনুভূতির মধ্যেও স্থানে স্থানে এই সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'ত্রিযামা'র 'রোগশয্যায়' কবিতাটিতে তাই দেখিতেছি, কবির দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের সকল দৃশ্য ও ঘটনাই দুঃখের ও কষ্টের রূপ লইয়া দেখা দিতেছে—মানুষের দেবতাকে দেখিতেছেন—'গণ্ডকীর খরস্রোতে গড়াতে গড়াতে অনয়ন অশ্রবণ হস্তপদ নাই'—কিন্তু তথাপি কবি অন্তরের গভীরে অনুভব করিয়াছেন,—

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চ'লে যেতে হবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই ?
মনে হয়—সবই ভালবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি ;
অন্তরে-অন্তরে
বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার—
রোগ শোক দৈন্যেরও পিয়াসী।
... ...
আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু-মদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায়-তারায়।

জীবনের নেশা মানুষকে এমন করিয়া পাইয়া বসে বলিয়াই ত দুঃখ-মৃত্যুর মদিরাকে সে ভুলিয়া থাকিতে চায়—প্রাত্যহিক দৈন্য-দুঃখকে ভুলিয়া থাকিতে চায় উৎসবের বেহিসাবী আনন্দে। সেই উৎসবের আহ্বান কবিও অনুভব করিয়াছেন তাঁহার জীবনে—এবং সেই দিন তিনিও বলিয়াছেন,—

এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর-সুন্দরী নবীনা-নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
যৌবনে গরবে অলঙ্কারে।
... ...
ভুলি' নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়। (উৎসব, ত্রিযামা)

জীবনের প্রতি মানুষের যে গভীর আকর্ষণ তাহার স্বাভাবিক পরিণতি সৌন্দর্যে এবং প্রেমে। মানুষের রূপমুগ্ধতা ত শুধু চোখের অনুকূলবেদনীয়ত্বই নয়, তাহার সঙ্গে মিলন ঘটে চিত্ত-বিস্ফারক্রূপ বিস্ময়বোধের, উভয় মিলিয়া সৃষ্টি করে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতির। মানুষের ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্যানুভূতির ক্রম-পরিণতি প্রেমে। এই প্রেমের পরিণতি আবার ব্যক্তিচেতনার ক্রমঘনীভবনে। এই চেতনার ক্রমঘনীভবনে যে অনুকূলবেদনীয় স্পন্দন তাহার ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত জীবনের স্বাদনীয়তা। চেতনার এই স্বাভমান ক্রমঘনীভবন আপনা হইতেই বহন করে একটি গভীর মূল্য, সেই মূল্যই জীবননিষ্ঠ মনে প্রেয়ঃ প্রেমকে আস্তে আস্তে করিয়া তোলে শ্রেয়ঃ। তখন প্রেমের মূল্যেই নির্ধারিত হয় জীবনের সকল মূল্য। প্রেম কবিমাত্রেরই শ্রেয়োবোধের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়, ইহার মূল কারণ সত্যকার কবিমাত্রের জীবন-নিষ্ঠা ও জীবন-প্রীতি। কবি যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করিলাম, পরিণত বয়সে জীবনের প্রতি আকর্ষণ যত বাড়িয়া গিয়াছে ততই কবির রূপতৃষ্ণা প্রকাশ পাইয়াছে—কবির মনে দেখা দিয়াছে সুন্দরের আহ্বান। সুন্দর গভীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে প্রেমে। এই প্রেমকে কবি তাহার প্রত্যক্ষরূপে আর পাইলেন না, পাইলেন প্রেমের স্মৃতিরূপে। সেই প্রেমস্মৃতিই কবি-চেতনাকে ঘনীভূত করিয়া পরম শ্রেয়োবোধে রূপান্তরিত হইয়াছে ; প্রেম তখন কবির পরম দয়িত—চির-প্রার্থিত দেবতা ; প্রেমেই তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধি। এ অবস্থায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার প্রেমের আলম্বন তাঁহার মর্ত্যের প্রিয়াই কবি-হৃদয়ে দেবীরূপে উদ্ভাসিতা হইয়াছেন। প্রিয়ার এই দেবী-রূপায়ণে যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম অনেকখানি রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাই প্রিয়ার বর্ণনায় দেখিতে পাই—

আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে ?
... ...
কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে ?
গুঞ্জনে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
... ...
আমরা দু'জনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা !
... ...
অসীমের পথে নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি'—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি ! (বোঝা, সায়ম্)

নিজেদের প্রেমলীলার মধ্য দিয়া কবি এখানে নিখিল বিশ্বের নিত্যকায়ের প্রেমলীলাকেই উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন, অথবা বলা যাইতে পারে, নিখিল প্রেমের নিঃসীম বিস্তৃতির মধ্যে কবি নিজের প্রেমকে গভীর করিয়া উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিয়াছেন। 'সায়ম্'-এর 'বরনারী' কবিতায়—

শূন্যকুম্ভ সম
শূন্য জীবন মম
কাঁখে তুলে' নদীকূলে এলে বরনারী :—
কেন নামিলে না নীরে ?
বেলা প'ড়ে এল ধীরে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি' আঁখিবারি।

প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রেমময়ী নারীর সেই 'শাশ্বতী' রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং কবির প্রেমানুভূতির গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে বড় কোমল এবং করুণ রূপে শেষ পংক্তি কয়েকটির ভিতর দিয়া,—

ভাঙা ফুটো শূন্য হই,
যেথা সেথা প'ড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ি, সহিতে তা পারি।
তোমার অশ্রুভার
বার বার বহিবার
শকতি নাহি যে আর—শোন বরনারী।

'সায়ম্'-এর 'মন্ত্রহীন' কবিতায় দেখিতে পাই গভীরতায় এবং ব্যাপ্তিতে এই প্রেমেরই শ্রেয়োবোধে ক্রম-উর্ধ্বায়ন। বার্ধক্যে মন্ত্র দীক্ষা এবং ধর্মাচরণের প্রশ্ন উঠিলে কবি স্বীকার করিয়াছেন, সাধারণ তীর্থ, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রচর্চা কিছুই তিনি জীবনে করেন নাই, কিন্তু তথাপি জীবনে তিনি দেবতাহীন বা দীক্ষাহীন নন,—প্রেমই তাঁহার জীবন-দেবতা, প্রিয়ার কাছেই সেই দেবতার আরাধনায় দীক্ষা লাভ।—

তবু শোন সখি, গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আমার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয় নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম— হে আমার কাম
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম !

প্রেমকে এই কবিতার ভিতরে কবি এত গভীর করিয়া দেখিয়াছেন যে সে তাহার 'নিকষিত হেম'রূপে এবং নিঃসীম ব্যাপ্তিতে এবং অনন্তের স্পর্শ-গভীরতায় মর্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আস্তে আস্তে বৃন্দাবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাই জীবনে অতি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিলেন, তিনি মন্ত্রহীন নন,—তিনি নাস্তিক নন।

বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপহ্রদে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি বেড়াই,—
বিশ্বাস নাই সকলে কহে।
তোমারি মিলন আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয় বন্ধু,
কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি'।

জীবনের সকল প্রেমানুভূতির ভিতর দিয়া সেই অসীম-প্রেম-স্বরূপের আভাস পাওয়া গিয়াছে—হৃদয় মন সেই পরিপূর্ণ প্রেমানুভূতির জন্য চিরতৃষিত,—কিন্তু জীবনে সেই অধরার ধরা মেলে নাই। জীবনভরা এই 'না-পাওয়ার ব্যথা'কে কবি অশ্রু দ্বারা মালা গাঁথিয়া লইয়াছেন, এবং নিজের প্রিয়াকে লইয়া দু'জনে মিলিয়া সেই মালাই জপ করেন।

একদিন কবি 'অজানাটা অজানাই' এবং আসলে তাহা কোথাও নাই—এই কথাই বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'অধরা'কে ধরার চেষ্টাকে বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন ; কিন্তু কবি বিশ্বের সব কিছুকে অস্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত প্রেমকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না,—আর সেই প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই কবির জীবনে স্বীকৃতি লাভ করিল বহু-অস্বীকৃত 'অধরা'।

প্রেম যখন যৌবনে 'অঙ্গধারী' ছিল কবি তখন তাহাকে সুস্থ মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই,—কিন্তু তাহার পরে জীবনে প্রেমকে তিনি পূজা করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন স্মৃতির বেদীতে তাহার 'অনঙ্গ'রূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া। ভাল প্রেমের কবিতা তাই যতীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখিতে পাইলাম 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'য়। সেই প্রেমের কবিতার উপজীব্য মুখ্যরূপে স্মৃতি এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়িত ভ্রষ্টলগ্ন পূজারীর ঈষৎ অনুশোচনা। কিন্তু স্মৃতির প্রতিই কবির যে নিবিড় আকর্ষণ তাহার ভিতর দিয়া একটা সত্যকার মানসিক উপভোগের আবেগ বাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

তোমার যৌবন গেছে,
তবু আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময়।
আজি ঐ তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।
কপালে পড়েছে-আঁকা
বিদায়-রথের চাকা
কুসুমকেতন,
রূপের ভিটার 'পরে
আঁখি মোর খুঁটে মরে
কী হারা রতন ? (শপথ ভঙ্গ, ত্রিযামা)

প্রভৃতির ভিতরে শুধুমাত্র একটা স্মৃতির রোমন্থন-স্পৃহাই ব্যক্ত হয় নাই, ইহার ভিতর দিয়া যথার্থ জীবনানুরাগই বাঙ্ক্ষিত হইয়া ওঠে। 'ত্রিযামা'-রূপেও 'বকুল-তলীর ঘাটে' কবি যখন বলিতেছেন,—

সকাল হইতে সে অপরূপার
ধেয়ানে ঘনালো সন্ধ্যা আমায়,
রূপনদীতীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,

তখন এই 'নিরাশার আশ্বাসে'র ভিতর দিয়াই কবির রূপানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অপরূপার কৈশোর এবং যৌবন লীলা স্মরণ করিয়া কবি সেখানে বলিতেছেন,—

শতছিন্ন সে চিহ্নের মালা,
বক্ষে শুকালো মোর—
বকুলতলীর ঘাটের পবন
বকুলগন্ধে ভোর।

তখন মনে হয়, কবির বক্ষের সেই শুকনো মালা এখনও একেবারে নির্গন্ধ হইয়া যায় নাই,—বকুলতলীর ঘাটের পবনে বকুল গন্ধের সঙ্গে তাঁহার বুকের শুকনো মালার গন্ধও মিশিয়া রহিয়াছে। চোখ মেলিয়া আজ আর যাহাকে দেখার সম্ভাবনা নাই কবি চোখ বুজিয়া আজ তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রিয়ার ভস্মমাখা চাচর কেশ, ত্রিবলিটানা ললাটদেশ, গেরুয়া চীনাংশুক এবং বুকভরা রুদ্রাক্ষের বৈরাগিণী মূর্তির অন্তরালে এক যৌবন-নির্বাসিতা অভিমানিনী বক্ষবিরহিণী আকৃতিও যেন তাহার 'ক'বির জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে; কবির অধীর আগ্রহ—

ধেয়ানে তাই নয়ন বুঁজি'
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি,
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি
গিয়েছ খোয়া কবির প্রিয়া।
ক্ষমা এ লীলা নিঠুরতম
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্বাসনে কাঁদিছে যে,
নবঘনঘন বিরহ-ভরে
যে প্রিয়া তার কবিরে স্মরে,
বিভ্রষ্ট-বলয় করে
কবরী নাহি বাঁধিছে যে, (মনোরমা, ত্রিযামা)

কিন্তু এই সন্ধ্যার সন্ন্যাসিনীর মধ্য দিয়াই কবি তাঁহার মনোরমাকে ফিরিয়া পাইতে চান,—

সন্ন্যাসিনী তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—
লুপ্তকাক ভস্মভেরী
দেউল,—সে কি শূন্য-বেদী?
দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে আর
হারানো মনোরমারে তার। (ঐ)

'ত্রিযামা'র প্রথম কবিতা 'ঘুমের সাথী'র ভিতরে কবি এই 'মনোরমা'কেই তাহার চিরদিনের ঘুমের সাথী—চিরজাগ্রত-সঙ্গিনী এবং চিরস্বপ্ন-সঙ্গিনী করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ত্রিযামা'র 'নির্বাসন' কবিতায় কালিদাসের মেঘদূতের ছোঁয়া লাগিয়াছে, সেখানে শুধু 'অপলাপ হতে বেঁচে থাক্ প্রেম প্রতিভা নির্বাসন' এই কথাটাই বড় হইয়া ওঠে নাই,—সেখানে গভীর হইয়া উঠিয়াছে নির্বাসিত প্রেমের নবতর মহিমা।

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে!

এই নির্বাসনের পিছনেও কবির একটা আশাবাদ জীবনের নূতন পটভূমি এবং পরিপ্রেক্ষি সৃষ্টি করিয়াছে। সে আশাবাদ রূপ লাভ করিয়াছে কবির 'ভোরের স্বপ্ন' (ত্রিযামা) কবিতায়, যেখানে কবি বলিয়াছেন—

এ প্রেম-হোম-ভস্মটিকা
হবে গো মম ললাট-লিখা
মরণ-পারে আগামী জনমে।
মিলনকামী তুমি ও আমি বাঁধিব ফিরে' ঘর
ধরণী-মাঝে নূতন সাজে নবীন বধূবর।

জীবনে এই প্রেমের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কবি প্রেমের সব দিক সম্বন্ধেই যেন সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার 'মা' কবিতাটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। এ ক্ষেত্রেও কবি যদিও বলিয়াছেন,—

শুষ্কতরুর ভগ্নশাখায়
কাঠ-ঠোকরার ঠোকর সম
মায়ের মহিমা পাবে কি বাখিতে
মাতৃনাম এ কণ্ঠে মম?
অরূপার রূপে মায়ের স্বরূপ
ফুটায়ে তুলি যে সে ভাষা কোথা?
কোলাহল তুলে' চেতনার মূলে
ভাঙে কালিন্দী কলস্রোতা।

কিন্তু মায়ের 'ষোড়শী' মূর্তির উপাসনা আর সম্ভব না হইলেও 'ধূমাবতী' রূপে তাঁহার উপাসনার জন্য যে কবি-হৃদয়ের বাসনা তাহা পূর্বালোচিত কবিতাগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমাসক্তির সহিত কবির জীবনাসক্তি জাগ্রত হইয়াছে—জীবনাসক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে দেহাসক্তিতেও—তাহারই প্রমাণ কবির 'জংশন ষ্টেশনে' (সায়ম্) কবিতায়। সেখানে কবি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার 'দেহ' ও 'জীবে'র অনাদি যুগল-প্রেমের কথা। এই প্রেমের মধ্যেই ত অতিগাঢ়তার জন্য প্রেম-বৈচিত্ত্য; তাই দেখি—

তবু ছুঁয়ে হবে ছাড়াছাড়ি!
এই যে জীবন রাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দু'জনে
দু'জকোড়ে দু'জ কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,—
এ রজনী হবে ভোর।

পরক্ষণেই এই যুগল প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের ভিতরকার 'জীব'কে কবি শঙ্কর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, দেহ তাঁহার 'সতী'; জীবনের যজ্ঞ যেদিন পণ্ড হইয়া যাইবে—

প্রবেশমূল্য লাগবে না!
১৫,০০১ টাকা
জিতুন!
প্রথম পুরস্কার...
২০,০০১৲ টাকা*
দ্বিতীয় পুরস্কার...
৫,০০১৲ টাকা
* প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা বিজেতাগণ যৌথভাবে কোনও একটি শিশু হাসপাতাল বা ওয়ার্ডে আরও ২০,০০১৲ টাকা দান করবার সুযোগ লাভ করবেন।
আরও ২০,০০১৲ টাকা
দান করা হবে
ডাল্‌ডা কুইজ্‌
প্রতিযোগিতায়
শেষ তারিখঃ
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
প্রত্যেক সমাধানের সঙ্গে ডাল্‌ডা টিনের অভগ্ন শীল সমেত উপরের একটি সম্পূর্ণ ঢাকনা পাঠাতে ভুলবেন না।
আপনাকে কি করতে হবে
যে দোকানদারের কাছে আপনি ডাল্‌ডা কেনেন তার কাছ থেকে একখানি প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্ এবং তাতে যে ১৮টি সহজ বাক্য দেওয়া আছে সেগুলি পূরণ করুন। যদি আপনার উত্তরগুলি, বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে তবে আপনি একটি পুরস্কার পাবেন। এতে কোনও প্রবেশমূল্য নেই—কেবল প্রত্যেক প্রবেশপত্রের সঙ্গে ডাল্‌ডা মার্কা বনস্পতির ৫ পাউণ্ড টিনের উপরের ঢাকনাখানি পাঠালেই হবে। একটি ১০ পাঃ টিনের উপরের ঢাকনার সঙ্গে আপনি দুটি সমাধান পাঠাতে পারবেন।
DALDA
ডাল্‌ডা
সকলেই যোগদান ক'রতে পারবেন (বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূর রাজ্যের অধিবাসীগণ ছাড়া)।
ডাল্‌ডা বিক্রেতার কাছ থেকে আজই প্রবেশপত্র চেয়ে নিন

দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

আমরা এতক্ষণ নানা ভাবে কবি যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম্'এর পর হইতে কবি-মানসের পরিবর্তন বা পরিণতি লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার সুন্দর-বিদ্রোহী মনে সুন্দরের আসঙ্গ-স্পৃহা দেখিলাম, রুদ্র রোমাণ্টিক বিরোধী মনে নব রোমাণ্টিকতার আমেজ লক্ষ্য করিলাম, প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এক দিকে গভীর জীবনাসক্তি দেখিলাম, অন্যদিকে প্রেমের ঊর্ধ্বায়নে প্রেমের উপরে অনন্তের স্পর্শ এবং তাহারই ভিতর দিয়া বৃন্দাবনের স্পর্শ পর্যন্ত লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু মনে হয়, এই সকল জাতীয় মনোধর্মের পরিবর্তনের পিছনে আছে একটি মৌলিক পরিবর্তন। পূর্বে আমরা যেমন লক্ষ্য করিয়াছি, প্রথম বয়সেই কবির জীবনে দেখা দিয়াছিল জড় ও চেতনের মধ্যে একটা আপোষহীন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কবি স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যে জড়ই সত্য—চেতনের এই জড় হইতেই উদ্ভব এবং জড়েই পুনরায় লয়। জড়ই যদি সত্য হয়—তবে চেতনার মিথ্যাত্বের সঙ্গেই ত প্রেমেরও মিথ্যাত্ব অনস্বীকার্য। তাই কবি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—

প্রেম ব'লে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিলাইলে সব সমাধান পাই।
(মরীচিকা, ঘুমের ঘোরে, ১ম ঝোঁকে)

কিন্তু পরিণত বয়সে কবির এই মৌলিক ধারণারই পরিবর্তন ঘটিল, তিনি আবার নূতন সমাধান লাভ করিলেন এবং সেই সমাধানে জড় আসিয়া চেতনায়ই লীন হইতে চাহিতেছে—অন্ততঃ জড়ে আসিয়া নূতন করিয়া চেতনার ঝাঁজ লাগিতেছে। 'নিশান্তিকা'র 'সমাধান' কবিতায় রহিয়াছে সেই মৌলিক পরিবর্তনেরই অকপট স্বীকৃতি। আজ কবি বুঝিতেছেন, জীবনব্যাপী একটা বিশ্বগ্রাসী পিপাসাই যেন সমগ্র জীবনটিকে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের ভিতরকার অনির্বাণ পিপাসাকেই তিনি জীবনভরা অনির্বাণ দাবদাহ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। অন্তরের সেই যে অনির্বাণ পিপাসা তাহাই ত জীবনের প্রেম—সেই প্রেমই সমগ্র জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—"প্রেম ব'লে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ?
যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিল নির্বাপণ,
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু নাই,
চেতনার কূলে বসি' চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

কবিতাটির শেষ করিয়াছেন কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসে।—

তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতনে ও জড়ে কাঁদে গলা ধ'রে,
দরদী নাহিকো কেউ।

এই 'নাই' কথাটি এখানে অনস্তিত্ববাচক নহে—একটা গভীর 'দরদী' অস্তিত্বকে সর্বদেহমন দিয়া অত্যন্ত ভাবে জড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা। কবি তাহাকে তেমন গভীর করিয়া পান নাই—তাহাই যেন তাঁহার সমগ্র জীবনের বেদনাময় অভিযোগ, এ-অভিযোগের সঙ্গে গভীর আসক্তি এবং অপ্রাপ্তির অভিমান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। শেষের দিকের অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে এই অপ্রাপ্তির অভিমান, কিন্তু সেই অপ্রাপ্তির পশ্চাতে পূর্বে যে রূঢ় অস্বীকৃতি—যে অসদ্ভাবাত্বের ঘোষণা আমরা দেখিয়াছি, এখানে তাহা আর দেখিতেছি না। 'সায়ম্'-এর 'নাস্তিক' কবিতার মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কবির নাস্তিকতার ভোল বদলাইয়া গিয়াছে।

আমরা কবির প্রথম ও মধ্যজীবনের কাব্যে লক্ষ্য করিয়াছি, সেখানে কবির যে নাস্তিকতা তাহা তাঁহার চিত্তের কোনও সংশয়-জাত নহে,—বিশুদ্ধ অবিশ্বাস-জাত। কিন্তু সেই অবিশ্বাসই 'সায়ম্'-এর পর হইতে দেখা দিয়াছে চিত্ত-সংশয়রূপে। সেই সংশয়ই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বন্ধুর অস্তিত্বকে। এই 'নাস্তিক' কবিতায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি কবির কতগুলি জিজ্ঞাসা—

এ জীবনে যত নাতে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবই হ'ল কি সঞ্চিত?
শৈশব কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ শক্তি আশা প্রেম কল্পনা মোহন
সকলই কি গেছে ভাসি সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস পুণ্যস্নানে ছুটি যার তীরে?
শ্বাস রোধি' ডুব দিয়ে, মাথা তুলে' চাব,—
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাব?
মরণোপ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন
ফিরে দিবে নগ্নকান্ত শিশুর জীবন?
... ...
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী?

এই জাতীয় সংশয়াচ্ছন্ন জীবন-জিজ্ঞাসা পূর্বে দেখা যায় না। এখানে যাহা যাহা প্রশ্ন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা দেখিতে পাই এক-দিকের একটা অসংশয়িত সমাধানবোধ—সে সমাধান সবই অস্তি-দ্যোতক। যতীন্দ্রনাথেরও পূর্বে এ-জাতীয় সংশয়ঘন প্রশ্ন ছিল না এই জন্য যে, তাঁহারই মনে এ-বিষয়ে দৃঢ় অবিশ্বাসের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল। এই সংশয়দোলায়িত চিত্ত হইতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়াছে বিদ্রোহের বদলে বিলাপের ধ্বনি—

সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালীর দুঃখ মোর কারে বা জানাই!
আমার কাটিবে কাল চির তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।
তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, বায়ু অগ্নি ব্যোম্,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা কিছু তুমি,—শুধু আমি ছাড়া!

মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরাণ-বন্ধু থাকিয়াও নাই।

ইহা ব্যঙ্গের উপহাসের ফুৎকারে 'বন্ধু'র অস্তিত্বকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নয়—সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে একটা অপ্রাপ্তির বেদনা এখানে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে আস্তে আস্তে দেখিতে পাইলাম, 'জীবন-মরুক্ষেত্রে শ্রীমদ্‌ভাগবত-গীতার রচয়িতা কবিই জীবন-কুরুক্ষেত্রে রচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারই বাঙলা অনুবাদ করিলেন এবং অনুবাদকৃত পাপ-পুণ্য সকলই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতার শ্রদ্ধাশীল পাঠক ছিলেন; কিন্তু 'মরীচিকা' হইতে 'মরুমায়া' পর্যন্ত কবিতার যুগে যতীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রভক্তি অনেকখানি ছিল যেন শ্রীরাবণের শ্রীরাম-ভক্তি। বাঙলা রামায়ণ মতে রাবণ শ্রীরামের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সে ভক্তি শ্রীরামের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া পুষ্পবর্ষণে নয়, শ্রীরামের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তীক্ষ্ণশরবর্ষণে। এক দিক হইতে বিচার করিলে যতীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার উপরে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভাবদৃষ্টি প্রকাশ করিতে যতীন্দ্রনাথ বহু স্থলে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রসিদ্ধ কবিতাকেই বিষয়বস্তু এবং ছন্দ উভয়তঃই গ্রহণ করিয়াছেন; বহু কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টি স্মরণ রাখিয়াই সেই পটভূমিকার উপরে নিজের মনের রেখা ও রঙ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পংক্তি যতীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। যতীন্দ্রনাথের 'ছাতার কথা' কবিতাটির মধ্যে জয়দেব চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস', 'দুই বিঘা জমি' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি কবিতা অপূর্ব কৌশলে মিশিয়া থাকিয়া বিচিত্র রসাস্বাদ দান করিয়াছে। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, 'সায়ম্'-এর পূর্ব পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথে আর রবীন্দ্রনাথে কোথাও মিল নাই—দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া দুঃখের কালো দাগটাকে নির্ভেজাল কালো বলিয়া চোখের সামনে ধরিবার জন্যই যেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ। জীবনদর্শনে জড় ও চেতনের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি চেতনাশ্রয়ী,—যতীন্দ্রনাথ কাব্যজীবনের প্রথমার্ধে জড়াশ্রয়ী; উভয়ের ভিতরে মৌলিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে এইখানে। কিন্তু 'সায়ম' হইতে সেই জড়াশ্রয়ের বজ্রমুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিলীকৃত—এবং সেই শিথিলীকরণের ক্রমপরিণতি চেতনাশ্রয়ের দিকে ঝোঁকে। এই ঝোঁকের আরম্ভ হইতেই রবীন্দ্রধর্মের সহিত যতীন্দ্রধর্মের মিলমিশ এখানে সেখানে লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'সায়ম'-এর পর হইতে কবির মানস-পরিবর্তনের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি একটু লক্ষ্য করিলেই তাহার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের সহিত যতীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। এই সাধর্ম্যের সহিত এক করিয়া পড়া যাইতে পারে 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবাচক যতীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা। শ্রদ্ধা যে শুধু 'সধর্মী'র প্রতি প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহা নয়, যে 'সধর্মী' নয় তাঁহারও মহৎ হইতে কোনও বাধা নাই—সে মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেও কোনও বাধা নাই। তাই 'সায়ম্'-এর 'রবি-প্রণাম' কবিতায় যখন দেখি—

সেই অহঙ্কারে আজ
ভুলিয়া আসন্ন লাজ
আমরা সাঁঝের পাখী তব
"জয়তু প্রসন্ন রবি
পাখীর প্রাণের কবি!"
ক্ষীণকণ্ঠ ঊর্ধ্বে তুলি' কব।
এ পল্লবে রক্তমাখা
যে পাখী ঝাপটে পাখা
বন্ধন-বেদনে অবিরাম,
ছিন্ন তার ওষ্ঠপুটে
যে গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম।

তখন বুঝিতে পারি কবি স্বধর্ম এবং রবীন্দ্র-ধর্মের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন; তবু নিজের ওষ্ঠপুটে ক্রন্দন-গান ছাড়া আর কিছু না জানিলেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দের গান তিনি সানন্দেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহার পরে 'ত্রিযামা'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় যখন দেখি—

তবু আজ একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
হেরি মুগ্ধমনে:—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মুক্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়াছে ধরা
যৌবনের রাগে,
সেখানে উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে!

তখন রবীন্দ্রধর্মের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, ইহার সহিত কবি যতীন্দ্রনাথের মানস-পরিবর্তনের কিছু যোগ আছে। রবীন্দ্র-প্রশস্তি গাহিতে গিয়া কবি যেখানে বলিলেন,—

তুমিই ত এ নিখিলে দিকে দিকে লিখে দিলে
রসের মুরতি,
তোমারি চঞ্চল সুরে স্থিরতার অন্তঃপুরে
বাণী মূর্তিমতী।

তখন নিখিলের 'রসের মুরতি'র দিকে কবিচিত্তের একটা সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে কি? রবীন্দ্রনাথ যখন আর মরদেহে আমাদের মধ্যে রহিলেন না, যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, অমর কবি তখনও আমাদের মধ্যেই আছেন। কিন্তু কোন্ রূপে?

উঠিছে ঝিল্লীর গান তরুর মর্মর তান
নদী-কলস্বর।
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে
সঙ্গীত উদার,
সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লক্ষ মনে
জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র-পর্ণে
প্রস্ফুট আলোকে।
পবিত্র সত তাব নক্ষত্রমৌন তমিস্রার
নক্ষত্র-পুলকে।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই বর্ণনাও অনেকখানি রবীন্দ্রধর্মের প্রতি আনুগত্য বহন করিতেছে।

শেষ বয়সে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসবাদী হিন্দুর সর্বপ্রিয় শাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যে ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন তাহা যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনই মহাত্মা গান্ধীর বাণী হইতে বাণী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার যে কবিতায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় মনে হয়। যতীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই গান্ধীবাদী ছিলেন। তিনি চরকা-তাঁতের আন্দোলনের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কলিকাতা বা তাহার উপকণ্ঠে দেখা গিয়াছে অনেক সাহিত্য-বাসরেও তিনি এক পাশে বসিয়া এক মনে তকলীতে সূতা কাটিতেন। কিন্তু গান্ধীবাদকে তিনি যে ঠিক কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বোঝা শক্ত। কারণ, গান্ধীবাদ প্রথমাবধিই একটা আস্তিক্য বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি—যতীন্দ্রনাথের প্রথমাবধি এই আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। সুতরাং মনে হয়, গান্ধীবাদের যে অংশের প্রতি যতীন্দ্রনাথের মনের বিশেষ আকর্ষণ—তাহা হইল গান্ধীজীর চারিত্রিক সারল্য, সততা এবং অকপটতা; আর গান্ধীবাদের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল দেশের অবজ্ঞাত, বঞ্চিত এবং নিপীড়িত জনগণের জন্য যে দরদ ও নূতন আশা-আদর্শ তাহার সহিতও কবি যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মনের গভীর মিল ছিল। কিন্তু গান্ধীদর্শনের আস্তিক্যবাদের দিকটার প্রতি কবি প্রথম জীবনে উদাসীন ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শেষ জীবনে কবিতায় এই গান্ধী-বাণীকে কবি যখন প্রচার করিবার উদ্যম গ্রহণ করিলেন তখন গান্ধী-বাণী হইতে কবির নির্বাচন লক্ষ্য করিতে হইবে। যেরূপ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত তিনি এই সময়ে গান্ধীজীর আস্তিক্য-বাদী বাণী সকল অনুবাদ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়—এই বাণীর সহিত কবি-মনের একটা নিগূঢ় যোগ এই যুগে গড়িয়া না উঠিলে এই জাতীয় বাণীর নির্বাচন এবং এই ভাষায় তাহার রূপায়ণ—কোনটাই সম্ভব হইত না। 'গান্ধী-বাণী-কণিকা'র একটি কবিতায় দেখিতে পাই—

প্রত্যক্ষের মত প্রত্যয়
জন্মেছে অন্তরে,
তার ইচ্ছায় দোলা না লাগিলে
পাতাটিও নাহি নড়ে।
প্রতি নিশ্বাস সহ
বুক ভ'রে মোরা কবি যে গ্রহণ
তাঁহারি অনুগ্রহ। (পৃঃ ৪)

বলা যাইতে পারে, ইহা নিছক গান্ধীবাণী, যতীন্দ্রবাণী নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, শেষ জীবনে যখন কবির এই জাতীয় বাণীর প্রতি এতটা শ্রদ্ধা দেখা যাইতেছে তখন সেই বাণীর ভিতরকার সত্যের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অন্য একটি বাণীর অনুবাদে দেখি,—

তাইতো শাস্ত্রে বলেছে এ সবই
তাঁরি লীলা মায়া ছল,
'অস্তি' বলিতে শুধু সেই এক,
মোরা 'নাস্তি'র দল।
নাস্তি মোদের অস্তি হবার
সাধ যদি জাগে তবে
কণ্ঠ মিলাও সে লীলাময়ের
মোহন বংশীরবে। (পৃঃ ৭)

কিন্তু এই জাতীয় কথা শুনিবামাত্র কবি যে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত ভাবে 'মারমুখ' হইয়া উঠিতেন তাহা আমরা বিস্তারিত ভাবেই দেখিয়া আসিয়াছি। কবির শেষ জীবনের কবিতায় আমরা চেতনার স্বীকৃতির ভিতর দিয়া প্রেমের জয়গান করিতে দেখিয়াছি ('সমাধান', নিশান্তিকা); এই সত্যটিকে কবি আরও স্পষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন একটি গান্ধী-বাণীকে অবলম্বন করিয়া।—

'অণু'র সাথে অণু'র যাই
'সংসক্তি' আছে তো তাই
বেঁধেছে দানা অন্ধ জড়চয়,
হইলে সংশক্তিহারা
মুহূর্তেকে মরুসাহারা
হইবে ধরা চূর্ণরেণুময়।
তেমনি ভাই যে বন্ধনে
চেতনা বাঁধা চেতনা সনে
সে বন্ধনই ধরে যে প্রেমনাম,
এই প্রেমেরই সাধনা জীবে
শিবের সাথে মিলায়ে দিবে,
পুরাবে তার মহৎ পরিণাম। (পৃঃ ২৬)

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জনৈকা গৃহবধুর ডায়েরী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোদা দেবী

এদিকে আর এক ব্যাপার দাঁড়াইল। সেনজী (ভগিনীপতি) ব্রাহ্ম-সমাজ-ঘেঁষা হইয়া পড়িলেন, প্রতি রবিবারেই ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন, তাহা ছাড়া অন্য দিনও ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে কসুর করিতেন না। আমিও তাঁহার সঙ্গ লইয়া প্রায়ই ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতাম। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্কুলের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং চন্দ্রনাথ রায়ের সুমধুর গান শোনা, তাহা ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশাবলীও বেশ মনোযোগের সহিত শুনিতাম। এদিকে একদিন সেনজী ঠাকুর-চাকরদের বলিয়া দিলেন যে, তিনি আর আমিষ খাইবেন না। ক্রমে একথা মার কানে না দিলেই উপায় নাই বলিয়া কাঙ্গাইলা ভাই ও ঠাকুর মার কাছে যাইয়া বলিল, 'জামাই বাবু মাছ খায় না ও খাইবে না। মা সে কথা নিঃশব্দে কয়েক দিন হজম করিলেন, কিন্তু বেশী দিন কথাটা অজ্ঞাত রহিল না—দিদিমার কানে ঐ কথা পৌঁছাইল। দিদিমা মার উপর মহা রাগান্বিতা হইয়া খুব তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও বিষম কান্না-কাটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দাদামহাশয় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া দিদিমার রাগ যেন আরো বাড়িয়া গেল, দিদিমার মনে হইতে লাগিল, দাদামহাশয় ও মার সহায়তা পাইয়াই সেনজী এত বড় গুরুতর কাজে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে। তিনি সেনজীর খাওয়ার কাছে বসিয়া ঠাকুরকে বলিয়া এক-বাটি মাছ আনাইয়া মাছ সহ ভাত সেনজীর মুখে গুঁজিয়া দিতে অশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে আসিয়া শয্যা লইলেন, ও বাবার নাম ধরিয়া কান্না-কাটি সুরু করিয়া দিলেন। একেই বিধবা পুত্রবধূর নিরামিষ খাওয়া ইত্যাদির জ্বালায় তিনি জ্বলিতেছিলেন তাহার উপর আবার এই নূতন উপসর্গ দেখা দিল। প্রমদাকে হয়ত আর মাছ খাইতে দিবে না, এই দুশ্চিন্তায় দিদিমা আরো যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। যখন দেখিলেন, সেনজীকে আর মাছ খাওয়ান যাইবে না তখন দিদির মাছ খাওয়াটা যেন অটুট থাকে সে বিষয়ে দিদিমা বদ্ধ-পরিকর হইয়া মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ করিলেন। ঠাকুর-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া দাদামহাশয়, মা ও ছেলের দলের উপরে হামলা চালাইয়া মনের দারুণ ক্ষোভ মিটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তার পর একদিন সেনজীর হাতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন: "দেখ তুমি ত' আমার কথা রাখিলে না—কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার প্রমদাকে মাছ খাইতে কিছুতেই বারণ করিতে পারিবে না।"

সেনজী তখন হাসিয়া বলিলেন "সে ভয় নাই—আপনার নাতনীর মাছ খাওয়ার কোনই বাধা ঘটিবে না।" একথা শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়া ঠাকুর-চাকরদের বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন, যাহাতে সেনজীর খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা না হয় এবং মাকে বলিয়া দিলেন দুধ ও ঘির বরাদ্দ যেন বেশী করিয়া দেওয়া হয়। সেনজী বহু কাল পর্য্যন্ত নিরামিষ খাওয়া চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার চক্ষুর অসুখ দেখা দিলে বিশিষ্ট ডাক্তারগণ ব্যবস্থা দিলেন, প্রতিদিন একটি করিয়া টাটকা কই মাছের মাথা খাওয়ার। আর উপায় কি? চক্ষুর কাছে সব মনের ইচ্ছাকেই বলি দিয়া সেনজী পুনরায় মাছ খাইতে আরম্ভ করিলেন, দিদিমা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ঢাকার বাসায় হঠাৎ একদিন দাদামহাশয়ের কি এক খেয়াল চাপিয়া গেল, সন্ধ্যা-সম্মিলনে সেই ছোট্ট চত্বরখানাতেই আমাদের স্কিপিং করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, সে স্কিপিং-এ মাত্র তিন জন প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া গেলাম, ছোট দাদা (রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত) ছোট কাকা (ধনেশচন্দ্র সেন) এবং আমি। সর্ব্ব প্রথমেই বয়সে বড় হিসাবে ডাক পড়িল ছোট দাদার, ছোট দাদা ত খুব গর্ব্বিত ভাবে যাইয়া আসরে দেখা দিলেন ও স্কিপিং-এর দড়িখানা হাতে লইয়া কয়েক বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্কিপিং করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ও খুব গায়ের জোরে হাই জাম্পের মত খুব উঁচুতে পদদ্বয় তুলিয়া মাত্র কয়েক বার দড়িখানা ঘুরাইতেই পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন। তার পর বয়স হিসাবে ছোট কাকা খেলার আসরে আসিলেন ও নিয়ম মাফিক স্কিপিং-এর দড়ি ঘুরাইয়া ২৫ বার পর্য্যন্ত স্কিপিং করিয়া দড়ি আটকাইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার পালা আসিতেই সবাই অতি উৎসুক চিত্তে আমার দিকে চাহিতে এবং মনে করিতে লাগিল, এই মেয়ে আর কতটুকুই বা স্কিপিং করিতে পারিবে। এতগুলি লোক-সমাগমে বিশেষ করিয়া ছোট দাদা, ছোট কাকার অসমর্থতায় আমার বুকের মধ্যে কেমন একটু নড়া-চড়া দিয়া উঠিল, কিন্তু ভয় পাইলাম না। এই স্কিপিং-এর এক শত বার দড়ি ঘুরান ছিল নির্দ্দিষ্ট। ছোট দাদা ত ১০।১২ লাফেই কুপোকাৎ, ছোট কাকা ২৫ বারে, এবার আমি কি করি, ইহাই হইল সকলের দ্রষ্টব্য। আমি ত নিয়মমাফিক স্কিপিং-এর দড়িখানা হাতে লইয়াই পা দু'খানা মাটি হইতে অল্প অল্প উঠাইয়া দ্রুত বেগে স্কিপিং করিয়া যাইতে লাগিলাম, সকলেই সংখ্যা গণনায় মনোনিবেশ করিল, আমার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না, আমি সহজ ভাবেই স্কিপিং-এর দড়ি ঘুরাইয়া যথারীতি স্কিপিং করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমি যেন কিসের উন্মাদনায় সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই ভাবে যখন একশ' হইয়া আরো পঁচিশের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন চারিদিক হইতে থাম্ থাম ধ্বনি শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল, আমি ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম এবং সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। একটা হাসির রব বহিয়া চলিল। অবশ্য আমার এই সাফল্যে ছোট দাদা, ছোট কাকা, কেহই অসুখী ছিলেন না। মূল কথা, আমি স্কুলে স্কিপিং করিতে করিতে রীতিমত পাকা খেলোয়াড় হইয়া গিয়াছিলাম এবং স্কুলেও স্কিপিং-এর প্রতিযোগিতায় অনেকেই আমাকে আঁটিয়া উঠিত না। ছোট দাদা ও ছোট কাকা ১০।১৫টা লাফ-ঝাঁপ দিয়াই

ভাবিয়াছিলেন তাঁরা বেশ স্কিপিং-এ ওস্তাদ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্কিপিং করার আদত নিয়মই জানিতেন না।

ছোটবেলার কথার যেন অন্ত নাই, তার মধ্যে মনে পড়ে ছোট দাদা ও বড় দাদার মারামারি করিবার কথাও। কখন কখন সামান্য একটু কথার তর্কে বাগ্‌বিতণ্ডায় দু'ভাইর মধ্যে খুব লড়াই লাগিয়া যাইত,—অপর ছেলের দলেরা ও অফিসের কোন কোন বাবুরা এই লড়াইয়ে খুব যেন আনন্দ উপভোগ করিত, কোথায় দু'ভাইকে ছাড়াইয়া শান্ত করিবে, তার বদলে সকলে যেন এক মজা পাইয়া যাইত। আমার কিন্তু অত্যন্ত ভয় ও কান্না পাইত। কখন কখন এই মারামারির সময় ছোট দাদা, বড় দাদার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেন আবার পরক্ষণেই দেখিতাম বড় দাদা ছোট দাদাকে নীচে ফেলিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। এই ভাবে দু'ভাইর মল্লযুদ্ধ চলিত এবং দর্শকরা ইহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া বাহবা দিয়া চলিত, আমি সে সময় ছুটিয়া যাইয়া মার কাছে সব বলা মাত্রই মা উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই দু'ভাই সরিয়া পড়িত। মা ছোট দাদাকে টানিয়া উপরে লইয়া যাইয়া গায়ের ধুলা, বালি, ঘাম মুছাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে থাকিতেন। বৎসরে ঐরূপ ঘটনা দু'চার বার ঘটিয়া যাইত, তাহা বেশ মনে পড়ে। দু'ভাইর মধ্যে বয়সের ব্যবধান এবং বয়সও কম ছিল। তাই সবাই তামাসা দেখিত। মনে পড়ে ইস্কুল স্কুলের অতিকায় সাদা ধপধপে একটি ভেড়ার কথা। ভেড়াটি ছিল যেমন বলবান তেমন বুদ্ধিমান। স্কুলে যখন টিফিনের ঘণ্টা পড়িত সে তখন দৌড়াইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া যাইত, সেখানে মেয়েরা কটি বিস্কুট লজ ইত্যাদি কিনিবার জন্য ভীড় করিত, কিন্তু আশ্চর্য ছিল কটিওয়ালী, লজওয়ালীর ঝুড়ির কাছে সে কিছুতেই ভিড়িত না। যেই মেয়েদের কেনা আরম্ভ হইত অমনই সে প্রত্যেক মেয়ের নিকট হইতে একটু একটু অংশ গ্রহণ করিতে থাকিত, অর্থাৎ যে যে মেয়ে খাবার কিনিত তার একটু কিছু অংশ ঐ অতিকায় ভেড়াটিকে না দিলে সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ক্রেতাকে আক্রমণ করিতে যাইত, সুতরাং ভয়ে ভয়ে সবাই একটু একটু অংশ ভেড়াটিকে দিত। একদিন কিন্তু একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। বহু লোকের কেনা-কাটার মধ্যে একটি মেয়ে তার খাবারের অংশ না দিয়াই এক ফাঁকে চলিয়া যাইতেছিল, কতক দূর চলিয়া যাওয়ার পরই দেখা গেল, ভেড়াটি অতি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে ইহা দেখিয়া সকলেরই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। দেখা গেল সেই মেয়েটিকে অর্থাৎ যে খাবারের অংশ ভেড়াকে না দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, তাকে গুঁতা দিয়া মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উঠিতে গেলেই পুনরায় গুঁতা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা মেয়ের দল ছুটিয়া গেলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করিতে আমরা যাইয়াই সর্ব্বপ্রথমেই ঐ

মেয়েটির হাতের খাবার হইতে একটু অংশ লইয়া ভেড়াটাকে দেওয়া মাত্রই সে আবার উর্দ্ধশ্বাসে তার গন্তব্য স্থান রুটিওয়ালীর ঝুড়ির কাছে অর্থাৎ কেনাকাটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গেল, সবাই এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। আরো আশ্চর্য এই যে, মেয়েটিকে ফেলিয়া দিয়া কিন্তু তার খাবারটাকে গ্রহণ করিল না, তাকে তার প্রাপ্য অংশ দেয় এই তার মনোভাবখানা। কেমন করিয়া যে একটি পশু তার প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে এক বিন্দু ভুল করিত না তাহাই দেখিবার। বড় হইয়া লোকমুখে শুনিয়াছিলাম ভেড়া, খাসী বা পাঁঠার অতিরিক্ত চর্বি শরীরে জন্মিলে তারা বেশী দিন জীবিত থাকে না। জানি না ঐ বলিষ্ঠ ভেড়াটি কত কাল জীবিত ছিল!

ইডেনে পড়িবার সময় আর একটি বন্ধুর কথাও লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। নতুবা ইডেন স্কুলের লীলাখেলার একটা অংশ বাদ পড়িয়া যায়। সে ছিল ইডেন স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস, মিসেস ট্রান্সবেরীর ছোট কন্যা লীনা, বয়সে আমাদের অপেক্ষা বেশ বড় ছিল, বোধ হয় ১৩।১৪ হইবে। উহারা স্কুলবাড়ীর উপর তলায় থাকিত, নিচে স্কুল বসিত, বাড়ীখানা খুবই বড় ছিল। সময় সময় উপর তলা হইতে লীনার আবির্ভাব হইত, এবং আমাদের ক্লাশের উপর দিয়া তার মায়ের কাছে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে দু'-একটি কথার আদান-প্রদান চলিত। সে বাংলা কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিল, এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে ক্রমে যখন ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল তখন বুঝিতে পারিলাম লীনা আমাদের মত শান্তশিষ্ট গো-বেচারী নয়, বেশ দুষ্টু বুদ্ধি তার মাথায় খেলে, সে কখন কখনও অলক্ষিতে মাথার উপরে সজোরে টোকা মারিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। আবার পিছন হইতে আমার কাপড়ের আঁচলখানা মাথায় ঘোমটার মত করিয়া ফেলিয়া দিয়াই দেছুট ও একটু দূরে দাঁড়াইয়া খুব হী-হী করিয়া হাসিতে থাকিত। তাছাড়া টিফিনের সময় আসিয়া আমাদের খাবারের অংশ চাহিয়া লইত, আমরা সবাই খুব খুসী হইয়া তাকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়া দিতে কসুর করিতাম না। ক্রমে তার দুষ্টবুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিল। আমি ও উর্ম্মিলা ছিলাম সহজ সরল বুদ্ধির মানুষ, চারুও বেশ দুষ্টনীতে আমাদের অপেক্ষা প্রখর ছিল, লীনা ও চারুতে মিলিয়া বেশ এক খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ঢাকাতে তখন এক কি দু' পয়সায় মস্ত-বড় এক একখানা গেণ্ডেরি অর্থাৎ ইক্ষু পাওয়া যাইত। আমরা ঐ ইক্ষু ২।৩ জনে মিলিয়া মিশিয়া কিনিয়া লইয়া যাইতাম; কেন না অত বড় একখানা ইক্ষু একজনে খাওয়া অসম্ভব ছিল। ইক্ষুওয়ালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই উহা আমাদের টুকরা টুকরা করিয়া দিত এবং খাওয়ার সুবিধার জন্য মাঝখান দিয়া কাঁড়িয়া দু'ভাগ করিয়া দিত, তাতে খাওয়ার পক্ষে খুব সুবিধা হইত। চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া যাইতাম সবাই এবং যে-যার ইচ্ছামত ইক্ষুখণ্ড লইয়া খাইতে থাকিতাম। ইহাতে কিন্তু একটু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া পড়িল অর্থাৎ ইক্ষুর আগার দিককার খণ্ডগুলি জমিয়া যাইত এবং সেগুলি পরে কেহই খাইতে চাহিত না। লীনা আর চারুতে মিলিয়া বেশ একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল অর্থাৎ ইক্ষু লইবার সময় তার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে এবং হাতড়াইয়া আখখান ধরিতে যাইতে প্রথমেই যেখানা হাতের স্পর্শে আসিবে সেখানাই তাকে খাইতে হইবে, বেশ কথা! "সাদা মনে কাদা নাই"—উহাদের কথামতই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল, আমাদের আখ তুলিবার সময় চোখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল, উহাদের বেলায়ও আমরা উহাদের চোখ বন্ধ করিয়া দিতে লাগিলাম কিন্তু আশ্চর্য্য, দেখা গেল প্রতিবারেই লীনা ও চারুর হাতে ভাল ভাল আখের খণ্ড উঠিতে লাগিল আর উর্ম্মিলা ও আমার হাতে যত সব আগার দিকের আখ উঠিতে লাগিল, এইরূপ বার'বার আমি ও উর্ম্মিলা ঠকিয়া যাইতেছিলাম, লীনা ও চারু ত উল্লাসে হী-হী করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকিত। আমরা কিন্তু পরে উহাদের এই অসাধু দুষ্টুমীকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমরা চোখ বন্ধ অবস্থায় যখনই ইক্ষুখণ্ড লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতাম তখন লীনা আর চারুতে পরামর্শ করিয়া আমাদের আখের খণ্ড তুলিবার সময় অতি আস্তে আস্তে খারাপ আখ-খণ্ডগুলি আমাদের হাতের সামনে আগাইয়া দিত, আমরা সে দুষ্টুমী বুঝিতে না পারিয়াই প্রতিবারেই ঐরূপ ঠকিয়া যাইতেছিলাম। পরে যখন উহাদের দুষ্টুমীপণা বুঝিতে পারিলাম তখন আমরা বেশ সাবধান হইয়া গেলাম কিন্তু উহাদের ঠকাইবার মত প্রবৃত্তি আমাদের হইত না। স্কুলে যাইয়া 'টক্' (মাণিকের ভাষায় খাট্টা) খাওয়ায় যেন ছিল এক মহা আনন্দের ব্যাপার! চাপরাশি-প্যাদারা সকালে বাজার করিয়া আনিয়া ভাঁড়ার ঘরে রাখা মাত্রই সে ঘরে ঢুকিয়া কচি-কচি আমের থোপা হইতে আম লইয়া 'দায়ে'-খোসা ছাড়াইতে বসিয়া যাইতাম ও উহাতে বেশ নুণ-লঙ্কা মাখিয়া কাগজে মুড়িয়া জামার মধ্যে ভরিয়া সকলের অজ্ঞাতে স্কুলে লইয়া যাইতাম ও বন্ধুদের লইয়া কত মহানন্দেই না সেই আমের টুকরাগুলির সদ্ব্যবহার করিতাম। আমের দিন না হইলে একদলা তেঁতুল নুণ-লঙ্কায় জারিত করিয়া গোপনে লইয়া যাইতেও ছাড়িতাম না। বর্ত্তমানে "মাণিক বাবাজীর" বনজঙ্গল খুঁজিয়া 'খাট্টা'র অনুসন্ধান ইহাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। আমরা 'খাট্টা'র ভক্ত হইয়াছিলাম ৮।৯ বৎসর বয়সে আর মাণিক খাট্টার ভক্ত মাত্র ১। বৎসর বয়স হইতেই!

এই বাংলা বাজারের বাসায় থাকা কালীন কলিকাতা হইতে ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ড বেলী ও তাঁর পত্নী ঢাকা সফরে আসিয়াছিলেন।

—মিনটু চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

এবারও তাঁহার সঙ্গের কেরাণীবৃন্দের খাওয়ার ভার লইলেন দাদা মহাশয় নিজেই; এখানে বলিয়া রাখি যে, দিদিমা এবার আর ঐ খাওয়া-দাওয়ার বিষয় নিয়ে 'টুঁ' শব্দটিও করিলেন না। বেশ ভাল ভাবেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যেই ঐ নিমন্ত্রণ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। কি যেন বাধা-বিঘ্নে ইডেন স্কুলের বাৎসরিক প্রাইজ দুই বৎসর বন্ধ ছিল। এবার লাট-দম্পতীর আগমন-উপলক্ষ্যে তাদের দ্বারাই প্রাইজগুলি বিতরণ করা ঠিক হইয়া গেল। প্রত্যেক মেয়ের অভিভাবককে সে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হইল স্কুলে। যথাসময়ে ছাত্রী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত হইলে, প্রাইজ বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। যাহারা প্রাইজ পাইবে, তাহারা ত' মহা আনন্দিত, বিশেষ করিয়া আমাদের মত ছোট দলের। ক্রমে উপরের ক্লাশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাইজ বিতরণ কার্য্য চলিতে লাগিল। প্রত্যেক ক্লাশেই যোগ্যতা-অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চার জনকেই প্রাইজ দেওয়া হইতেছিল। আমি সে বার পঞ্চম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে ১ম হইয়া প্রমোশন পাইয়াছি। তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রচলন ছিল, অর্থাৎ আমরা তখন আর ৪ বৎসর পড়ার পরেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার মত যোগ্যতা লাভ করিতাম এবং এখনকার দিনের ছেলে-মেয়েদের মতই এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারিতাম, ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়সেই আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারিতাম। ক্লাশে আমিই সকলের ছোট ছিলাম। যাক্ "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাহিয়া চলিলেও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে একটু নিরাশার কালো মেঘ। যথাসময়ে প্রাইজ বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। আমি মহা আনন্দে ২ বৎসরের অনেকগুলি প্রাইজ লইয়া ঘরে ফিরিলাম। সেই প্রাইজের নানা দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে ছোটদের প্রথম মাসিক পত্রিকা 'সখা' (প্রমদাচরণ সেন) পাইয়া খুবই উৎফুল্ল হইয়া গিয়াছিলাম। দাদা মহাশয় মহাখুসী হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "তুই আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিস।" প্রাইজগুলি ছিল লেখাপড়া, খেলা, উপস্থিত থাকা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য, ভাগ্যক্রমে এই সব কয়টাই আমি পাইয়া গেলাম। বাড়ীর সকলেই খুসী হইল এবং বলিতে লাগিল, এমন দৌড়-ঝাঁপ দেওয়া মেয়েটা ত প্রাইজগুলি সবই লইয়া আসিল!

এইরূপ মহা আনন্দের মধ্যে চলার পরেই একদিন দাদামহাশয় একখানা খামে-ভরা চিঠি দিয়া আমাকে বলিলেন, ক্লাশের শিক্ষয়িত্রীর কাছে যেন এখানা দিই, আর কোন কথাই বলিলেন না, বোধ হয় কথাটা বলিতে তাঁহারও একটু বাধ-বাধ লাগিতেছিল। লেফাপায় চিঠিখানা বন্ধ করা ছিল। তবে মনে পড়ে মা একদিন বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই দাদামহাশয়কে ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে এবং তখন আমাদের সবাইকে গ্রামের বাড়ীতে যাইতে হইবে। কিন্তু ঐ কথাটার গুরুত্ব তখন যেন মোটেই মনের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে নাই; সে দিন দাদামহাশয়ের চিঠিখানা হাতে লইতেই যেন কেন মনটা দমিয়া গেল। মনের ভয়টাকে চাপা দিয়া চিঠিখানা যথাসময়ে শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া দিলাম। শিক্ষয়িত্রী চিঠিখানা পড়িয়া যেন একটু বিষন্ন মনে দেরাজে রাখিয়া দিলেন। তখন ক্লাশ চলিতেছে, সে সময় অন্য বিষয়ের অবতারণা করা সমীচীন বোধ করিলেন না। আমি যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিখানার মর্ম্ম সবাইকে জানাইয়া দিলেন আমার শিক্ষয়িত্রী উর্ম্মিলার মা। মা ইতিপূর্ব্বে যতটা যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন প্রায় তাহাই ঠিক এবং ইহাতে আরো একটু লিখা ছিল যে স্কুল হইতে আমার নামটি যেন তুলিয়া দেওয়া হয়, বাস! সবই বুঝিলাম, সকলেও বুঝিয়া গেল আমার ইডেন স্কুলে পড়া 'খতম' হইয়া গেল! মনটা যেন গুমুরিয়া উঠিল, চারি দিকে স্কুলের বন্ধু বান্ধবীরা ও স্কুলের মাষ্টার-পণ্ডিত সবাই যেন দুঃখিত। আমি স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, সবাই যেন জড় হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মতিম বক্সী পণ্ডিত মহাশয় বাংলা বাজারে আমাদের বাসার অতি নিকটে থাকিতেন। তখন আমি মাঝে মাঝে তাঁহাদের বাসায় যাইতাম, কিন্তু যখনই যাইতাম দেখিতাম তিনি অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় মেয়ে কমলা এবং পুত্র সন্তানকে তিরস্কার করিতেছেন। স্কুলের সবাই তাঁহার ধার দিয়াও সহজে কেহ কেহ ঘেঁষিত না, কিন্তু আশ্চর্য ছিল, আমি যখনই ব্যাকরণখানা হাতে লইয়া বড়-গম্ভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার পাশে যাইয়া দাঁড়াইতাম, তিনি সস্নেহে আমাকে সুন্দর ভাবে আমার সকল অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে কোন দিনও একটুও কার্পণ্য করেন নাই। আজ আমি স্কুল হইতে চলিয়া যাইতেছি জানিয়া অতি স্নেহের সহিত আমার হাতখানা তাঁহার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কিন্তু মেয়েরা দল এবং মাষ্টার প্রভৃতি কেন জানি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

এদিকে ইডেনের সাদা ধপধপে অতি বলবান্ অশ্বযুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া স্কুলের গেটে দাঁড়াইয়া গেল। কারণ স্কুল ছুটি হইয়া গিয়াছে। একবার স্কুলবাড়ীখানার দিকে চাহিলাম, খেলাধূলার মাঠখানাকে যেন চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম, মস্ত বড় মাঠ, তার এক কোণে ফুলের বাগান, কত শত শত ফুলে সজ্জিত ফুলের বাগানখানা; একটু দূরেই মস্ত বড় একটি নোণা ফলের গাছে সংলগ্ন সাধের দোলনাখানা। যে দোলনায় প্রতিদিন শিক্ষয়িত্রীর জ্ঞাত, অজ্ঞাতসারে আসিয়া দোল খাইয়া যাইতাম, সবই যেন দেখিতে দেখিতে চোখের নিকট হইতে দূরে দূরান্তে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। একেবারেই যেন শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আমার শিক্ষয়িত্রী দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন; সকলেরই চক্ষু জলে ভারাক্রান্ত, একটু দূরে দেখিলাম লীনাও দাঁড়াইয়া রুমালে চোখ মুছিতেছে। এদিকে এক আশ্চর্য্য, সেই ভেড়োটা আসিয়া উপস্থিত! সে ভাবিল এত লোকজন যখন উপস্থিত তখন নিশ্চয়ই খুব বড় একটা কেনা-বেচা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। অত বিষাদের মধ্যেও ভেড়োটির কথা মনে হইয়া একটু হাসিও পাইয়া গেল! যথাসময়ে সকলের শুভাশীর্ব্বাদ ও সমবয়সীদের ভালবাসার বাক্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়া সবাই আমাকে ইডেনের গাড়ীতে জন্মের মত তুলিয়া দিল। মনে পড়ে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া খুব কাঁদিয়াছিলাম, যতক্ষণ স্কুলবাড়ীখানা দেখা গেল অনিমেষে চাহিয়া রহিলাম। যথাসময়ে গাড়ীখানা প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম ও যতক্ষণ দেখা গেল ঘোড়া ও গাড়ীখানার দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিলাম। ঘোড়া তো আর আমার মনের ব্যথা কিছুই বুঝিল না, কেবল পরদিন পথচলার সময় যদি প্রতিদিনের অভ্যাস বশে তাদের পাগুলি একবার এদিকে চালিত হইয়া যায়! তখন বুঝিবে পরদিন তাদের ঘাড় হইতে কিছু ভারের লাঘব হইয়া গিয়াছে! ধীরে মন্থর গতিতে বাড়ীতে ঢুকিয়াই শয্যাশায়ী হইলাম, বালিশে মাথা রাখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলাম, মা আসিয়া তাড়াতাড়ি আমার পাশে বসিয়া অনেক সান্ত্বনার কথায় আমার দুঃখটাকে লাঘব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই আমাদের গ্রামের বাড়ীতে আসিতে হইল। [ক্রমশঃ।

শিশু-অপরাধীর মনোজগতে

দীপালি গোস্বামী

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যাকে বলি শিশু-অপরাধী, চলতি ভাষায় তাদের বলি খারাপ ছেলে। খারাপ ছেলে আর দুষ্টু ছেলে এক নয়। খারাপ ছেলের অপরাধকে প্রায়ই বাপ-মা স্নেহে অন্ধ হয়ে ভাবেন দুরন্তপণা। কিন্তু একটা হচ্ছে অস্বাভাবিক শিশুর বিকৃত মনোভাবের অন্যায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ, আর অন্যটা হচ্ছে শিশুর স্বাভাবিক প্রাণ-প্রাচুর্য্যের উচ্ছ্বাস। দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। খারাপ ছেলের অপরাধ নানা ধরণের হতে পারে। প্রথম প্রথম তা হয়ত বাপ-মা বা স্কুল-ডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধে একটু বেশী রকম বিদ্রোহী, কিন্তু শিশুদের এই বিদ্রোহী ভাবের মধ্যেই থাকে ভবিষ্যতের নানা মারাত্মক অপরাধের সূচনা। শিশু-অপরাধীর মধ্যেই আছে সাংঘাতিক ভবিষ্যৎ অপরাধীর সম্ভাবনা, তাই খারাপ ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে একেবারে গোড়া থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

একটি পরিবারে পাঁচটি শিশু আছে। এদেরই মধ্যে একটি শিশু কেমন করে অন্য ভাই-বোনদের থেকে ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে ওঠে, তার শিশু-মন সব মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলে হয়ে ওঠে বিকৃত আর কেমন করেই বা সেই অস্বাভাবিক শিশুর মধ্যে ভবিষ্যৎ অপরাধীর সম্ভাবনা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়, মনোবিজ্ঞানের এ এক জটিল রহস্য! কুসন্তান সংসারের অভিশাপ। সন্তানকে ঘিরে মায়ের যে মধুর স্বপ্ন, সে স্বপ্নকে সার্থক করতে হ'লে মাকে জানতে হবে কেমন করে কিসের প্রভাবে একটি স্বাভাবিক শিশুর মনের গতি অপরাধের পথে মোড় নেয়। খারাপ ছেলের মনের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝলে হয়ত অনেক ছেলেই ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশের হাত থেকে সময় মত রক্ষা পেত।

পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি কেমন, সেই প্রশ্ন আসে প্রথমেই। কেন না, তার উপরেই নির্ভর করে শিশুর আদর-অনাদর। ধনীর গৃহের কথা আলাদা। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘরে শিশুরা নানা সমস্যাপীড়িত, বাপ-মার কাছে প্রথম প্রথম পায় শুধু অবহেলা ও বিতৃষ্ণা। ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ বা বিত্তহীন শ্রেণীর অর্থনৈতিক পটভূমিকায় অনাহূত সন্তানের পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এর চেয়ে সমাদর পাওয়া সম্ভব নয়। বাপ-মার কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে ছোট্ট শিশুর অবচেতন মনে পড়ে গভীর দাগ। তার পর যথাযোগ্য স্নেহের অভাবে তার স্নেহকাঙ্গাল মনের ক্ষোভ মানসিক ক্রমবিকাশে আনে আলোড়ন ও ধীরে ধীরে তার মানসিক বিকাশ হয় বাধাপ্রাপ্ত।

সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মর্য্যাদা-সম্পন্ন পরিবারের শিশুরা সাধারণতঃ কমই খারাপ হয়। পারিবারিক সংহতি জিনিষটিরও শিশুর জীবনে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। মৃত্যু, রোগ বা গৃহবিবাদ যে গৃহের সংহতি ভেঙ্গে দিয়েছে, সে গৃহে শিশুর উপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষা-দীক্ষা হওয়া কঠিন। বাপ-মার মধ্যে কোন একজনের অভাবে শিশুর মানসিক বৃদ্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। যে শিশুর অকালে বাপ মারা গিয়েছে, অথবা ছোটবেলা থেকে যে শিশু মাতৃহারা, গৃহবিবাদের ফলে যে শিশুর বাপ-মা পৃথক বাস করছে, যক্ষ্মা প্রভৃতি কোন কঠিন রোগ বা উন্মাদ-রোগগ্রস্ত বাপ অথবা মা যে শিশুর গৃহ হতে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাসপাতালে আছে, সেই সব শিশুদের মানসিক বৃদ্ধিতে আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে। এই ধরণের অস্বাভাবিক সংসারে পালিত শিশুদের মধ্যে আবার মেয়েরাই বেশী বিকৃত-স্বভাব হয়, কারণ মেয়েদের আত্মকেন্দ্রিক স্বভাব তাদের ছেলেদের চেয়ে বেশী স্পর্শকাতর করে আর তাদের সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে সংসারের যে কোন অস্বাভাবিকত্ব বেশী করে বেদনাবোধ আনে। এই বেদনা বোধ থেকে আসে একটা ব্যর্থতার অনুভূতি, একটা পলায়নী মনোবৃত্তি যা অপরাধের পথে নিজের প্রকাশ খোঁজে।

অভাবের সংসারে দারিদ্র্য, অভাব অনটন নিয়েই অশান্তি। সংসারের এই সব অশান্তি বাপ-মা যতই শিশুর চোখের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করুন না, শিশুর স্পর্শকাতর মনে সব অশান্তির খবর ধরা পড়ে, আর তাতে শিশুর মনের উপর Stain পড়ে যথেষ্ট। এ রকম অবস্থায় প্রায়ই শিশুরা পরিচিত বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ক্রমাগত নিজের তুলনা করতে ও একটা হীনতা বোধে পীড়িত হতে থাকে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা সঙ্গত নয়।

শিশুর কথা ভেবে বাপ-মার উচিত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখা। শিশু যদি বাপ-মায়ের মধ্যে রোজ ঝগড়াঝাঁটি দেখে, তাহলে তার মনে একটা বিপর্য্যয় আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে অপরাধের পথে ঠেলে দেবে। বাড়ীর অশান্তি ভুলে থাকার জন্য শিশু হয়ত বাইরের আপাতমধুর জিনিসে ক্ষণিক সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াবে। শিশুর চারি ধারের জগতকে আনন্দময় ও মধুর করে তোলার দায়িত্ব তার বাপ-মার। গৃহ শিশুকে কাছেই টানবে, শিশুকে যেন সে দূরে ঠেলে না দেয়।

পারিবারিক প্রভাব ছাড়াও শিশুর জীবনে বংশগত প্রভাবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অপরাধীর বংশগত বিচার করলে অনেক সময়ই দেখা যায়, তার পূর্ব্বপুরুষে কেউ কোন রকম অপরাধমূলক কাজ করেছে। একই পরিবারে একাধিক লোক নানা রকম অন্যায় করে গেছে, এমনও দেখা যায়। এর জন্য দায়ী কিছুটা বংশের রক্ত আর কিছুটা পারস্পরিক প্রভাব। যে ছেলে বাপের দেরাজ ভেঙ্গে পয়সা চুরি করে, তার বংশতালিকা ঘাঁটলে দেখা যাবে, হয়ত তার কোন পূর্ব্বপুরুষ কাউকে খুন করে জেলে গেছে অথবা মদে-জুয়াতে জীবন কাটিয়ে গেছে। এই ধরণের বে-আইনী বা সমাজবিরুদ্ধ জীবন কাটানোর তৃষ্ণা বংশানুক্রমে দূর ভবিষ্যতে এমনি ভাবেই আসে কোন দুর্ভাগ্য বংশধরের মধ্যে আর তার স্বাভাবিক সত্তা বিকৃত হতে থাকে পূর্ব্বপুরুষের পাপের প্রভাবে। মাতাল পূর্ব্বপুরুষের বংশধর যে মাতালই হবে, এমন কোন কথা নেই। রক্তের মধ্য দিয়ে অপরাধের ডাক যদি সে শোনেই, তবে মাতালই না হয়ে হয়ত জালিয়াতও হতে পারে সে ছেলে, কিংবা সম্পূর্ণ অন্য ধরণেরও কোন অসামাজিক কাজের মধ্যে অভিব্যক্তি খুঁজে বেড়াতে পারে তার অসামাজিক প্রবৃত্তি।

শিশুর জীবনে দলগত প্রভাবও অত্যন্ত গভীর। গণচেতনার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল প্রায় প্রতি পল্লীতেই ব্যায়াম-সমিতি জনকল্যাণ সমিতি, বালকসঙ্ঘ প্রভৃতি ছোট-বড় সব বয়সী ছেলে মেয়েদের উপযোগী দল বিশেষ বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠেছে। এই সব মহৎ আদর্শে গঠিত দলে কিন্তু খারাপ ছেলেদের কমই দেখতে পাওয়া যায়। এরা নিজেদের সাধারণ ছেলেদের চেয়ে অনেক চালাক ভাবে, যদিও এদের চরিত্রের মূলে আছে অপদার্থতা ও হীনতা বোধ। অন্য দশ জন শিশুর চেয়ে এরা বুদ্ধিতে, পড়াশুনায়, কাজকর্মে ও খেলাধূলায় অনেক নিচে। এর ফলে এদের মনের মধ্যে আসে একটা অনিশ্চয়তা ও নিরাশার আতঙ্ক। প্রতিযোগিতায় অন্য ছেলেদের সঙ্গে না পেরে এদের মন ভরে যায় একটা ব্যর্থতাবোধে এবং যতই এই ব্যর্থতাবোধ তীব্র হতে থাকে, ততই এরা অন্য দশ জন স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। এর ফলে এরা যে কোন রকম সমিতি, সঙ্ঘ বা দলে হয় বে-মানান। এই জন্য পাড়ার কিশোর-সমিতি বা ছেলে পিলেদের খেলার দলে শিশু যদি মিলে-মিশে থাকতে না পেরে দল ছেড়ে দেয়, বাপ-মার উচিত সে বিষয়ে অবহিত হওয়া।

খারাপ ছেলেদের মধ্যে একটি কাজ প্রায় সকলকেই করতে দেখা যায়। সেটি সিনেমা দেখা। আর্থিক অবস্থা যতই খারাপ

হোক না কেন, এই সব ছেলেরা প্রায়ই সিনেমা দেখবে। সিনেমা দেখার প্রচণ্ড নেশায় এই সব ছেলেরা মায়ের আলমারী ভেঙ্গে পয়সা চুরি করে, স্কুল পালিয়ে বেত খায়, তবুও নেশা ছাড়তে পারে না। সিনেমার নেশা অবশ্য স্বাভাবিক কিশোরের বাড়ন্ত বয়সে হয়েই থাকে। বয়সের এটা ধর্ম্ম। তবুও, সব কিছুরই সীমা আছে, আর সেই সীমারেখাটি অতিক্রম করলেই শিশুর অভিভাবককে বিপদ বুঝতে হবে। চুরির পয়সায় লুকিয়ে সিনেমা দেখার জন্য শিশুকে শাস্তি দেবার আগে বাপ-মাকে দেখতে হবে, এই সিনেমা দেখার অন্তরালে শিশুর মনে কি ভাব রয়েছে। এ মনোভাব একটা অস্থিরতার লক্ষণ, যার থেকে সৃষ্টি হয় পলায়নী মনোবৃত্তি। চারি পাশের বাস্তব জগতে এরা মনের মত কিছু না পেয়ে শেষে অতৃপ্ত মন নিয়ে আনন্দ খুঁজতে যায় ছায়া-ছবির পর্দ্দায়।

সিনেমা দেখা ছাড়া এই সব ছেলেদের আর একটি প্রিয় বস্তু হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় খেলা অথবা ছোট ছোট দল পাকিয়ে রাস্তায় আড্ডা দেওয়া। এরা খেলার মাঠে গিয়ে অন্য দশটা ছেলের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলে না, কেন না তাতে একটা নিয়মের মধ্যে আসতে হয়। নিয়মের বাইরে যাওয়াতেই এদের আনন্দ। রাস্তায় খেলে বা আড্ডা দিয়ে, অভদ্র মন্তব্য করে পথচারীদের বিরক্তি উদ্রেক করাতেই এদের তৃপ্তি। এদের মধ্যে যে উদ্দেশ্যহীনতা, তার পরিণাম ভয়াবহ। একটা কিছু করতে হবে, তারই এলো-মেলো খোঁজ করে বেড়ায় এদের অতৃপ্ত মন। বাড়ীর কাজকর্ম্মে কোন-রকম সাহায্য করা,স্কুলের পড়াশুনা তৈরী করা বা স্বাভাবিক খেলাধূলার মধ্যে এরা কাজ খুঁজে পায় না। আর মনের মত কাজ খুঁজতে গিয়েই সৃষ্টি হয় খারাপ ছেলেদের নিজস্ব দলের। এই দলে (gang) পড়াটিই সব চেয়ে সাঙ্ঘাতিক।

এই দলগুলির গোড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হবার নির্দ্দিষ্ট কিছু কারণ না থাকলেও পরে কিন্তু এগুলি হয় নানা রকম দুষ্কর্ম্মের আড্ডা। ছোট-খাট দুষ্কর্ম্ম থেকে ক্রমে ক্রমেই বড় বড় মারাত্মক ধরণের দুষ্কর্ম্মে উন্নতিলাভ করতে থাকে এরা। এই দলগুলি তিন প্রকারে ছেলেদের নষ্ট করে থাকে। দলে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য কখন কখন কোন ছেলে গুরুতর কিছু অন্যায় করে দলপতিকে নিজের কেরামতি দেখায়। আবার, দলে আসবার পর দলে টিকে থাকবার জন্যই শুধু অন্যায় কাজ করে চলে। যাতে দলে নিজের স্থান অটুট থাকে ও বিতাড়িত হতে না হয়, তার জন্য হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশুকে ক্রমাগত দুষ্কর্ম্ম করে যেতে হয়। তৃতীয়তঃ, দলে নিজের গৌরব বাড়ানোর জন্য দুষ্কর্ম্ম করে বাহাদুরী নিতেও শিশুকে প্রায়ই দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে, যে শিশু অন্যথায় ছোট ছোট অন্যায়ের মাত্রা ছাড়াতে সাহস পেত না, দলে পড়লে সে ছেলে অন্যায়ের শেষ সীমায় অবলীলাক্রমে পৌঁছাবে। শিশু কোন দলে মিশছে না মিশছে, সে দিকে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

অনেক সময় গরীবের ঘরের ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় কাগজ ফেরী করে বা জুতোয় কালি লাগিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করে থাকে। ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মার উচিত তাকে এই সব কাজ করতে না দেওয়া। এই ধরণের কাজ (street trades) যা সন্ধ্যার অন্ধকারে বা ভোর রাত্রের আলো-আঁধারিতে ছেলেদের করতে হয়, তা তাদের পক্ষে অনুচিত। অন্ধকারের একটা প্রলোভন আছে, পৃথিবীর সব পাপ সে সময় জাগ্রত হয়। সন্ধ্যায় অন্ধকারে কাগজ ফেরী করতে গিয়ে অন্ধকার গলিতে অসতর্ক পথিকের ঘড়ি আংটি ছিনিয়ে নিয়েছে কিশোর হকার, এমন ঘটনা বিরল নয়।

স্কুলের প্রভাবও শিশুর জীবনে আর একটি গুরুতর প্রভাব। খারাপ ছেলেদের কাছে স্কুল হচ্ছে একটা অসন্তোষ, অকৃতকার্য্যতা অশান্তি ও ব্যর্থতার প্রতীক। খারাপ ছেলেরা ক্লাসে কম নম্বর পায়, বছরের শেষে প্রমোশন পায় না ও স্কুল পালায়। শিশুমনে ব্যর্থতার অনুভূতি যেখানে, সেখানেই ক্রমে আসবে একটা বিদ্রোহী ভাব। বিদ্রোহী ভাবের দরুণ শিশু হয়ে ওঠে বেপরোয়া—সে তখন স্কুলে ডিসিপ্লিন ভাঙতে দ্বিধা করে না, অন্য ছেলেদের মারধর করে ভয় দেখিয়ে গুণ্ডামি করে, মাষ্টারকে ভেংচি কাটে, বেয়াড়া ভাবে কথা বলে ও নানা প্রকার অবাধ্যপণা করে।

স্কুল ঘটিত অপরাধের মধ্যে বেশীর ভাগই আত্মরক্ষামূলক। স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখাকে আত্মরক্ষামূলক অপরাধ বলা যেতে পারে। স্কুল তার কাছে একটা অতি আতঙ্কজনক পদার্থ। সেখানে আছে শাসনের ভয়, আছে অকৃতকার্য্যতা ও ব্যর্থতার ভয়; যার থেকে সৃষ্ট হয় পলায়নী মনোবৃত্তি। স্কুল পালিয়ে শিশু তাই স্কুলের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। আবার কখন কখন আরেক ধরণের মনোভাব দেখা যায় শিশুদের মধ্যে। নিজের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীতে সে অনেক সময় দেখে, সে স্বাভাবিক ও উচিত কাজই করেছে, কেবল বড়রা তাকে বুঝতে না পেরে তার প্রতি ঘোর অবিচার করছে। বাপ-মার দেরাজ ভেঙ্গে পয়সা চুরি থেকে বড় বড় মারাত্মক চুরি ও নৈতিক শিথিলতাকে নিরপেক্ষ শ্রেণীর অপরাধ বলে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। মায়ের গয়না চুরি করে বেচে সোনার ঘড়ি পেন নিজের জন্য কেনাকে সে ছেলে কোন মতেই অন্যায় ভাবতে পারে না। মা যখন স্বেচ্ছায় টাকা দেবেন না, তখন কৌশলে টাকা আদায় ছাড়া উপায় নেই।

এই সব ছেলেদের প্রতি দায়িত্ব স্কুলেরও কম নয়। খারাপ ছেলেদের বাড়ীতে খারাপ রিপোর্ট পাঠানো বা স্কুল থেকে তাড়ানোর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবার আগে টিচারদের উচিত সে ছেলেটির মনের ভাব সহৃদয়তার সঙ্গে বোঝা। স্কুলের পক্ষ থেকে চাই যত্ন ও সহানুভূতি। যে যে বিষয়ে ছেলেটি কম নম্বর পাচ্ছে, সেই বিষয়গুলিকে টিচারের আরো যত্ন নিতে হবে। স্কুলের প্রতি আতঙ্কের ভাব দূর করতে হলে টিচারকে শাসনের মাত্রা কমিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে এই সব ছেলেদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন রকম অঙ্গহানি থাকলে সে সব ছেলে সর্ব্বদা একটা হীনতাবোধে বিষণ্ণ হয়ে থাকে ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে পারতপক্ষে না মিশে একাকী থাকতে ভালবাসে। টিচারদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এই সব অঙ্গহানিগ্রস্ত ছেলে অকারণ হীনতাবোধে পীড়িত না হয়। যাতে সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে কুণ্ঠিত না হয়, সেদিকে স্কুল ও ছেলের মায়েদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, হীনতাবোধ থেকেই শিশু-মনে আসে বিকৃত মনোবৃত্তি, আর তাই থেকেই হয় ভবিষ্যৎ অপরাধের সূচনা।

সর্ব্বশেষে, শিশুর নিজের ব্যক্তিত্বের কথাও উল্লেখযোগ্য। শিশুর চরিত্র নিয়ন্ত্রণের পক্ষে পারিবারিক প্রভাব, বংশগত প্রভাব, দল বা সমাজগত প্রভাব ও স্কুলের দায়িত্ব, এ সব ছাড়াও শিশুর নিজের দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মন্দ ছেলেদের সকলের

মধ্যেই একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, সেটা বুদ্ধিহীনতা। এই সব ছেলেরা কেউ জড়বুদ্ধি, কেউ অল্পবুদ্ধি হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ শিশুর চেয়ে অনেক কম হয় এদের বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে যখন জীবনের অন্যান্য ভাবনা চিন্তা ও দায়িত্বের বোঝা শিশুর মনে চাপে, তখনই শিশুর মনে সুরু হয় জটিল পরিবর্ত্তন।

বাইরের প্রলোভনকে দমন করতে হলে যে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন, তা থাকে শুধু উন্নত ধরণের মনে। অল্পবুদ্ধি ছেলে সে বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা করা উচিত, কোনটা আপাতমধুর হলেও করা উচিত নয়, এটা বেছে ঠিক করবার ক্ষমতা এই সব ছেলেদের নেই। আবার কোন দুষ্কর্ম্ম করেও এরা সাধারণতঃ সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে, কেন না কোন দুষ্কর্ম্ম করে গোপন করতে পারারও মধ্যে আছে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয়। স্বাভাবিক শিশুরা কোন কিছুতে নিরাশ হলে সে বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে অন্য দিকে মন দেয়। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বনিবনা না হলে একটি সাধারণ শিশু হয়ত বাড়ীতে বসে ভাই-বোনদের সঙ্গে খেলবে, অথবা গল্পের বই পড়ে অবসর যাপন করবে, কিন্তু কোন মতেই কুসঙ্গে পড়বে না বা খারাপ কাজও করবে না। অথচ একটি মন্দ ছেলে এ রকম ক্ষেত্রে সহজে ব্যাপারটি ছাড়বে না, বরং দল পাকিয়ে পাড়ার ছেলেদের মারপিট করবে ও পাড়ায় নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে। খারাপ ছেলের একটি বিশেষ লক্ষণই হচ্ছে এই নাছোড়বান্দা ভাব। সিনেমা দেখার ইচ্ছে হলে একটি সাধারণ ছেলে হয়ত মায়ের কাছে পয়সা চাইবে এবং সে পয়সা না পেলে অভিমানও করবে। কিন্তু একটি খারাপ ছেলে এ রকম ক্ষেত্রে শুধু অভিমানই করবে না, তার জেদ চেপে যাবে এই ব্যাপারে এবং বাপের পকেট থেকে পয়সা চুরি করে বা মায়ের দেরাজ খুলে, যে করেই হোক পয়সা জোগাড় করে সে সিনেমা দেখবেই। সংসারে আনন্দের উৎস যার যার অন্তরেই। বাইরের জগতে শুধু আনন্দ খুঁজে বেড়ায় যে ছেলে, অন্তরে যার কোন ঐশ্বর্য্য নেই, তার ভবিষ্যৎ বাঁকা পথ নেবেই।

এক এক ছেলের এক এক ধরণের ব্যক্তিত্ব। কারো সঙ্গে কারো বেশী মিল নেই, তবুও প্রত্যেকেরই চরিত্রমূলে রয়েছে এক ভিত্তি, সে ভিত্তি সততা, সংযম ও দৃঢ়তা। এক ধরণের অস্বাভাবিক মনোবিকারগ্রস্ত (psychopathic personality) ছেলে দেখতে পাওয়া যায়। এসব ছেলেরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়, এরা ঝোঁকের মাথায় প্রবৃত্তির বশে দুষ্কর্ম্ম করে ফেলে। বিগত অভিজ্ঞতা এদের কোনই সংশিক্ষা দিতে পারে না। নিজেদের দুষ্কর্ম্মের জন্য সুবিধা মত অজুহাত এরা সব সময়ই খুঁজে পায়, সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে, এমন কি যখন এদের পক্ষে সত্য কথা বলা নিজেদের স্বার্থের দিক দিয়ে প্রয়োজন, তখনও এরা মিথ্যা বলে। এরা যে সব সময়ই অপরাধ করে, তা নয়। তবে এরা হঠাৎ কোন্ মুহূর্ত্তে যে অপরাধ করে বসবে, তা কেউ বলতে পারে না। এই সব ছেলে এমনিতে চুরি বা গুণ্ডামি করবে না, মুহূর্ত্তের ঝোঁকে অপরাধ করে, আগে থেকে প্ল্যান করে গুছিয়ে অপরাধ করে না। এই সব ছেলের বাইরে বেশ স্বাভাবিক, ডাক্তারী মতে এদের ঠিক পাগলও বলা যায় না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এদের বিকারগ্রস্ত

বলাই উচিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুদের অস্বাভাবিক ব্যবহারের মূলে কোন একটি বিশেষ কারণ থাকে না। নানা বিচিত্র ও পরস্পর মিশ্রিত প্রভাবে শিশুর মধ্যে কখনও কখনও আসে এক অস্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া আর দৈনন্দিন জীবনে নানা অপরাধের মধ্যে হয় তারই এক বিকৃত প্রকাশ। একটি ছোট ছেলে দেখতে দেখতে চোখের সামনে খারাপ হয়ে ওঠে। বাইরের প্রভাব তার ক্ষতি করে অনেক সময়; কিন্তু তার সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় নিজেরই চরিত্রগত দোষে। তার নিজের মনের গতি নিয়তির মতই হয় অপ্রতিরোধ্য আর সেই বিকৃত মনের গতি নানা বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাবের সঙ্গে মিশে তার জীবনে আনে ভবিষ্যৎ অপরাধের সূচনা, প্রশস্ত করে জেলের দরজা, আনে সেই সঙ্গে জীবনে ধ্বংস।

ব্যর্থ বেদনা

কৃষ্ণসুচিত্রা মিত্র

হসপিটালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সোমালী। মাঝে মাঝে বিরাম হচ্ছিল যন্ত্রণার কষ্টনা যাতে সহ্যের সীমা অতীত হয়ে না যায়। কিন্তু বেচারী সোমা! শারীরিক কষ্ট যেই তাকে রেহাই দিচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা অমনি মাথা চাড়া দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করছে। বাড়ী থেকে আসবার সময় সুবীর নার্ভাস হয়ে গেলে তাকে সোমালী আশ্বাস দিয়ে বলেছিল: এত ভয় পাও কেন? পৃথিবীতে এটা কি নতুনত্ব, সকলেই কি আর মারা যায়? কিন্তু আজ সুবীর পাশে নেই বলে কি সেই আশ্বাস-বাক্য ভুলে গিয়ে দুর্বলতা এসে পড়েছে মনের মাঝে? একটা অসহায় করুণ ভাব তাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আশে-পাশে তার একটাও চেনা মুখ নেই। একটা আত্মীয়-স্বজন, মা, কাকী কিংবা স্বজাতিও কি ছাই কাছে আছে, যাকে আপন বলে কাছে টেনে নিয়ে সোমালী কষ্ট ভুলবার চেষ্টা করবে?

৮নং বেডের পেশেন্ট পাঞ্জাবী মহিলাটি হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের রোগিণীরা যারা তার স্বজাতি তারা নিজ নিজ শয্যা থেকে সমস্বরে সান্ত্বনা দিতে থাকে। হকচকিয়ে সোমালী নিজের যন্ত্রণাটা ভুলে যায়। অত বড় হোমরা চেহারা নিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদে কি করে, সোমালী তা ভেবে পায় না। কিন্তু একবার ইচ্ছা করে সেও অমনি করে কেঁদে ওঠে, তাহলে হয়তো তার যন্ত্রণাটা কিছু উপশম হবে, কিন্তু ছিঃ-ছিঃ!

৮নং পেশেন্ট কেন কাঁদে, তা সোমালী বুঝতে পারে না। হাসপাতালে আসা এই তার প্রথম। যদিও তার থাকবার কথা মেটার্নিটি ওয়ার্ডে কিন্তু সেখানে একান্ত স্থানাভাব, আর সোমালী নিতান্ত হেঁজিপেঁজি নয়, তার স্বামী সুবীর একজন জবরদস্ত অফিসার, তাই তাকে আপাতত ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে জায়গা দেওয়া হয়েছে, সময় মত তাকে নিয়ে যাওয়া হবে লেবার রুমে। আবার আসবে এখানে। ইয়োরোপীয়ান্ ওয়ার্ডের বিশেষত্ব অনেক। যদিও আপাতত এটা সার্ব্বজনীন তবু নামের গুণে এর একটি বিশিষ্ট আভিজাত্য আছে। সুব্যবস্থা আছে খাওয়া, শোওয়া আর পরিচর্য্যার।

উঃ, মা গো আঃ—অস্ফুট কণ্ঠে সোমালী কাতরে ওঠে, প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে মাথার দিকের লোহার রেলিং। মাথায় কার স্নেহস্পর্শ লাগে! সোমালীর মনে হয় ওর মানুষ-করা পিসিমা বুঝি এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না, শ্বেতশুভ্র শুশ্রূষাকারিণী। মুখে সুন্দর মিষ্টি হাসি। সিষ্টার গ্রীণ। স্বামী তার অফিসার তবু সে সেবাব্রতই জীবনের ধর্ম্ম করে নিয়েছে। মিষ্টি করে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে: বহোত দরদ হোতা হ্যায়?

সেইক্ষণে তাকে পরম আত্মীয় বলে মনে হয় সোমালীর। তার হাত দু'টি চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বলে: জী বহোত:

মিসেস গ্রীণ সোমালীকে সাবধানে পরীক্ষা করে মিষ্টি হেসে বলে: ঘবড়ানা মত, থোড়া দরদ হোকর বাস—সব কুছ আ—রা—ম···

মৃদু হেসে চলে গেল মিসেস গ্রীণ। তার খুটখুট ধ্বনি কান পেতে শুনলো সোমালী। অসহায় ভাবে চেয়ে রইল তার গমনপথের দিকে। কেউ নেই সোমালীর, এমনি করে বারে বারে তাকে অসহায় করে ফেলে গেছে সকলেই। অভিমানে সোমালী ফুঁপিয়ে ওঠে। মিসেস্ গ্রীণ ফিরে আসে। সঙ্গে ষ্ট্রেচারবাহী দু'জন ওয়ার্ডবয়। সকলে তার দিকেই দেখছে ভুলে যায় সোমালী। সেও যে ছোট্ট মেয়েটি নয়, বেশ বয়স্থা তাও আর মনে থাকে না। মিসেস গ্রীণের হাত ধরে বলে: আপ ভী আইয়ে মেরা সাথ? মিষ্টি হেসে সিষ্টার জানায়, ডিউটির সময় ওয়ার্ড ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম নেই তাদের। ভয় কি, সিষ্টার জোন্স, সিষ্টার ষ্টকিং আরো অনেকে আছে তাকে দেখবে।

সোমালী হতাশ ভাবে শুনে গেল গ্রীণের কথা। ষ্ট্রেচারে করে তাকে আস্তে আস্তে নিয়ে গেল লেবার রুমে। ভয়ে ভাবনায় সোমালী এতটুকু হয়ে ওঠে। সে তো অবোধ বালিকা নয়, তাই এ পথে পার হওয়ার যে বিষম গণ্ডীটুকু তার খেসারত কতখানি বোঝে তাই আশঙ্কা হচ্ছে। হয়ত তার শোনা হবে না কচিকণ্ঠের কাকলী, মা হবার আগে হয়তো মৃত্যু তাকেই ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তার নিজের মা-বাবার কাছে। ইচ্ছে হচ্ছে সুবীরকে একবার দেখতে, আর—আর সেই রণজিৎকে। তাকেও একবার শেষ দেখা দেখতে সাধ যায় বৈ কি। রণজিৎকে সে আজও ভোলেনি, ভুলতে গেলে বেশী করে মনে পড়ে যায়—এমনি তার চেহারা, এমনিই সুন্দর তার ব্যবহার। তাই ভুলবার চেষ্টা ছেড়ে তার ভাবনাই ছেড়ে দিয়েছে সোমালী।

উঃ—সোমালী ছটফট করে ওঠে।

··· ··· ···

আবার ফিরে এলো সোমালী নিজের বেডটিতে। এবার তার পাশে একটা ছোট দোলনাও রাখা হোল নব আগন্তুকটির জন্য। সাউথ ব্লকটি চঞ্চল হয়ে উঠল তার আগমনে।

ডিউটি চেঞ্জ হয়ে মিসেস গ্রীণের স্থানে এসেছে মিষ্টার জোন্স। লালকম্বলে মোড়া ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলছে। সব বেডের কাছে ঘুরিয়ে আনছে। ৭নং বলে, বড়িয়া লড়ক্যা···৮নং মর্ফিয়ায় অচেতন। তার অপারেশন হয়ে গেছে। ৫নং ফিরিঙ্গী মেমসাহেব নাকি-সুরে গদগদ হয়ে বলে—হাউ লাভলি···

সোমালী চোখ বুজে ভাবে। সুবীর এসে খোঁজ করে গেছে। ভিজিটার্স আওয়ারে ও তখন লেবার রুমে। বেচারী সুবীর, সারা রাত্রি হয়তো দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারবে না।

সুসংবাদটা জানতে পারলে উৎকণ্ঠা ছেড়ে পরমানন্দে রাত্রিটা কাটতো সুবীরের।

সুবীরকে কানে কানে জানাতে ইচ্ছা করছিল সোমালীর। তার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। সোমালীর যন্ত্রণাও সার্থক হয়েছে। সুবীর তাকে ভালবাসে, শুধু—সোমালীও ভালবাসে কিন্তু আরেক জনকেও সোমালী ভালবাসে। একসঙ্গে দু'জনকে কি ভালবাসা যায়? সে কি প্রেম? অত-শত ভাবে না, তবু দু'জনকেই ভালবাসে সোমালী। রণজিৎকেই সে বিয়ে করত যদি অত বড় বাধার সম্মুখীন না হোত, আবার সুবীর যদি তাকে আশ্রয় ও মর্য্যাদা না দিত তবে হয়তো আজীবন গভর্ণেসগিরি করেই কাটিয়ে দিতো সে।

সুবীরের বোনের পাশের বাড়ীতে একটা বাচ্চার দেখা-শোনার ভার নিয়ে মাস কতক দেখাশোনা করবার পর সুবীর আর সোমালীর আলাপ হয়। রণজিৎ-এর পর আর কারো সঙ্গে পরিচয় করবার ইচ্ছে না থাকলেও সুবীরের সারা জীবনের পরিচর্য্যার ভার সে নেয়।

ভেবে দেখে সে, কৃচ্ছ্রসাধনের কোন দরকার নেই। যার কথা ভেবে সে এত কাতর, সে হয়তো ছোট বোন শৈলানীকে নিয়ে আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পেয়ে সোমালীকে ভুলে গেছে আর তার সারা জীবনের জন্য পড়ে আছে শুধু মাত্র শূন্য স্মৃতি। তার চেয়ে এই সুবীর ভালো। তাকে ভরে তুলেছে আদর মর্য্যাদা আর সম্মান দিয়ে। মর্য্যাদা যথেষ্টই ছিল তবু সেই মর্য্যাদা তার বাবা মিষ্টার মুখার্জীই একদিন ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছেন।

রণজিৎ-এর সঙ্গে সোমালীর আলাপ কলেজের পথে। গাড়ী না আসায় সোমালী দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, রণজিৎ তাকে সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। নিজের গাড়ীতে নয়, ট্রামে।

যদিও আগে আলাপ ছিল না, তবু চেহারার মাঝে একটা এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাকে সবার চক্ষে মর্য্যাদা দেয়। এত জনের মাঝখানে তার ওপরই যে নির্ভর করে থাকা যায়, এটা অবচেতন মন থেকে বলে দিয়েছিল সোমালীর অন্তর।

রণজিৎ তাকে পৌঁছতে এসে দেখে ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জী সাহেব মোটর য়্যাকসিডেণ্ট-এ আহত, ছোট মেয়ে শৈলানীও তাই, দু'জনে হসপিটালে, ড্রাইভার মৃতপ্রায়। সোমালীকে সঙ্গে করে রণজিৎ হসপিটালে ছোটে, জানাশোনা ডাক্তারের ছাড়পত্র নিয়ে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে। তার পর বেশ যাতায়াত চলে চিকিৎসা সূত্রে। রণজিৎ এর পর ভর্ত্তি হয় ডাক্তারী পড়বার জন্য মেডিকেল কলেজে।

ঘটনা ঘটে যায় খুবই দ্রুত। সোমালী আর রণজিৎ দু'টি হৃদয় খুব কাছাকাছি এসে পড়ে।

মুখার্জ্জী সাহেব রণজিৎকে বিলেত গিয়ে পাশ করে আসতে প্ররোচনা দেন। উচ্চাভিলাষে মন নেচে ওঠে, রণজিৎ সোমালীকে আশ্বাস দিয়ে সাগর পার হতে চায়, কিন্তু তার আগে মুখার্জ্জী সাহেবের কাছ থেকে সোমালীকে প্রার্থনা করে। তিনি হেসে জানান, আগে ফিরে এসো, তার পর। রণজিৎ আশান্বিত হয়ে সোমালীর কাছে বিদায় চায়। দু'টি বিরহী হৃদয় অনেক দিনের অদর্শনে কাতর হয়ে ওঠে। তবু শেষ অবধি আশায় কাটে।

কিন্তু এর পর সোমালীর বুকে শেলাঘাত করে তার বাবা মিঃ মুখার্জ্জী। অপমানে জর্জ্জরিত হয়ে সে অজ্ঞান হয়ে যায়, তার পর পালিয়ে আসে বাড়ী ছেড়ে। মিঃ মুখার্জ্জী তার বাবা হলেও মিসেস মুখার্জ্জী, যিনি শৈলানীর মা, তিনি তার মা নন। সোমালীর মা সেই, যিনি তাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছেন। সোমালী তার গর্ভাবস্থায় তাঁর বিয়ে হয়। একথা আর কেউ জানতো না, তাই সে জন্মাবার পর তার মা তাকে কলকাতায় পড়াবার জন্য মিঃ মুখার্জ্জীর কাছেই পাঠিয়ে দেন। এর পর তার মা বিধবা হয়ে কাশী চলে যান অল্প বয়সেই। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় জ্ঞাতি-বোন অহল্যার যে সর্ব্বনাশ করেছেন, তার বিয়ে দিয়ে ও বাকী জীবনের ভার নিয়ে তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। সোমালী তাকে বাবা বলায় মিসেস মুখার্জ্জীর আপত্তি ছিল, কিন্তু সে আপত্তি তাঁর টিকলো না বেশী দিন, শৈলানীর জন্ম দিতে গিয়ে তিনি মারা গেলেন। সোমালী তখন বছর পাঁচেকের মেয়ে।

তার পর আর দারপরিগ্রহ করেন নি মিঃ মুখার্জ্জী। দুই মেয়ে নিয়ে তাঁর জীবন কাটালেন। রণজিৎকে তাঁর খুব পছন্দ ছিল। তিনি চাইলেন শৈলানীর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে আর সোমালীর সঙ্গে বন্ধুপুত্র অমিয়র, য়্যাটর্ণীশিপ পাশ করে বেরিয়েছে সবে। বিস্ময়াভিভূত সোমালী আপত্তি জানাতে মুখার্জ্জী সাহেব তাকে তার জন্মকাহিনী বলে দিলেন ক্রোধান্ধ হয়ে।

সোমালী পালিয়ে গেল বাড়ী ছেড়ে। অসহ্য বেদনায় তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সব চেয়ে যে আপন সেই সব চেয়ে বড় তার শত্রু, এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে?

বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে। সোমালীর চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। আর অতীত কেন? কেন এই চিন্তা? এই কচি দুটো হাত দিয়ে অতীতের অন্ধকার মুছে তার বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ সোনালী আলোয় ভরে তুলবে সোমালী।

ঘুম আসে না, মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। সিষ্টার লক্ষ্য করে তার অস্থিরতা। একটা মর্ফিয়া এনে ইঞ্জেকসন করে দেয় তার বাহুতে। সোমালী ঘুমিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে।

ভোরবেলা জাগিয়ে তোলে তাকে। গা স্পঞ্জ করানো হবে। দেবে চা' কফি। আয়াটা বাঙালী। নাম মুকুল। অল্পবয়সী সে আর খুব সপ্রতিভ। সোমালীর গা স্পঞ্জ করাতে করাতে বলে আজ সি. এম. ও আসবেন। প্রত্যেক মাসেই আসেন। খুব ভদ্র তাঁর ব্যবহার।

এর আগে ছিলেন সিনা সাহেব উঃ সে যে কি বদখত লোক কি বলব। ইনি খুব ভাল, বয়স বেশী নয়, বিয়েও করেন নি আর চেহারাও চমৎকার! মুকুল ঘটকীর মত যেন পাত্রের রূপগুণ বর্ণনা করে চলে। সোমালী চুপচাপ শুনে যায় ওর কথা। চেয়ে দেখে আয়া আর মেথরাণীদের ন্যাপকিন আর ডুশিটের হিসাব। ডিউটী চেঞ্জ হচ্ছে। তাই হিসাব দিয়ে যাচ্ছে অন্য আয়াদের।

ন'টা বাজে বড় ঘড়িটায়। টেম্পারেচর নেওয়া আর ওষুধ খাওয়ানো শেষ হয়ে গেছে। এখন দীর্ঘ অবসর। সোমালী ভাবছে সুবীরকে।

অফিস-ফেরত সুবীর যখন আসবে তখন কি খুশীই না হয়ে উঠবে সোমালীকে সুস্থ থাকতে দেখে। ও-সত্য ও চেয়েছিল সোমালীর মত ছোট একটা মেয়ে আর সোমালী বলেছিল: সুবীরের মত ছোট্ট একটা ছেলে। জিতেছে সে-ই।

সিঁড়িতে অনেকগুলি পদধ্বনি। সোমালী দরজার দিকে চায়। চীফ মেডিকেল অফিসার আসছেন। সঙ্গে হসপিটালের অন্যান্য ডাক্তাররা আছেন। সোমালী চমকে ওঠে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চীফ মেডিকেল অফিসার, লম্বা, ফর্সা চেহারা পুরু কালো মোটা শেলের চশমা, চুল পিছনে ওল্টানো। চলনে দীপ্ত ভাব। এ যে বড় পরিচিত। এ চেহারা যে তার মানসপটে খোদাই করা আছে! বয়সের ছাপ পড়ে একটা গাম্ভীর্য্য ভাব তার সুশ্রী চেহারাতে আরো মাধুর্য্য এনে দিয়েছে।

সোমালীর বেডের কাছে এসে দাঁড়াতেই, আত্মবিস্মৃত হয়ে সে ডাকলো, রণজিৎ···

সি, এম, ও মুখ তুলে চাইলেন। কালো ফ্রেমের ভেতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন পেশেণ্ট সোমালীর দিকে। শিউরে উঠলো সোমালী, কি তীব্র অবজ্ঞা—বাচ্চাটাকে এগিয়ে এসে দেখলেন, তার পর সোমালীর দিকে চাইলেন স্মিত হাস্যে শান্ত দৃষ্টিতে: আর ইউ-ওয়েল নাউ!···

অপরিচয়ের ভঙ্গী। একজন সাধারণ পেশেণ্ট সে আর রণজিৎ সি, এম, ও।

রণজিৎ-এর অবহেলার ভঙ্গী সোমালীর হৃদয়ের পুরানো ব্যথাকে খুঁচিয়ে তুললো। সোমালীকে দেখে পাশের বেডে যথাপূর্ব্ব নিয়ম মত দাঁড়ালো। সোমালী কেঁদে উঠল আস্তে আস্তে। না হয় সে শৈলানীকে বিয়ে করেছে, কিন্তু সোমালীকে কি ভুলে গেছে? কই সোমালী তো তাকে একটুও ভোলেনি!

মুখ দিয়ে হয়তো অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি বেরিয়েছিল। সিষ্টার ছুটে এলো। সোমালীর না কি বড় পেন হচ্ছে'আবার—নার্স একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল।

সি, এম, ও সবগুলি বেড পরিদর্শন করলেন। না চেয়েও বুঝলেন সোমালীর দুটি চোখ তার পিছনে পিছনে ঘুরছে। বুঝলেন সোমালীর ফলস্ পেন। তাঁর এই অবহেলাই ঐ চোখের জলের কারণ। কিন্তু তিনিই বা কি করতে পারেন ঐ অভিমানী ভাবপ্রবণ মেয়েটির জন্য? যাকে লাভ করার আশায় দেশ ছেড়ে বিদেশ গেলেন, সেখানে বসে জানলেন যে সে তার আশা ছেড়ে অন্য একটি প্রেমাস্পদকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। খবরটা জানিয়েছিলেন মুখার্জ্জী সাহেব, আরো জানিয়েছিলেন যে, শৈলানী আছে—আছে অতুল সম্পত্তি, সোমালীর ক্ষতি তিনি এদের দিয়ে পূর্ণ করবেন, যদি রণজিৎ অনুমতি করে। কিন্তু কিছুই চায়নি সে। এত সহজে সোমালীকে ভোলা সম্ভব হয়নি তার। আজ আর মায়া-কান্নার ছলনা কেন?

সি, এম, ও একবার তাকে দেখলেন। সোমালী মুখ ঢেকেছে চাদরে। ঘৃণা সইতে পারবে না আর। তার কলঙ্কই এ ঘৃণার কারণ সে বুঝেছে। সুবীরের দেওয়া ব্যথা তার সার্থক হয়েছে, তাকে মর্য্যাদা দিয়েছে, কিন্তু এ ব্যথা তাকে ব্যর্থ বেদনার জ্বালা দিচ্ছে, এ সহ্য করার শক্তি তার নেই।

চাদরের তলায় মুখ ঢেকেও বুঝলো সোমালী, সি, এম, ও চলে গেল পরিদর্শন শেষ করে। চলে গেল আর সব ডাক্তারেরাও! কাঠের সিঁড়িতে শব্দ তুলে মিলিয়ে গেল পদধ্বনি তাদের। সোমালী নতুন বেদনায় কেঁদে উঠলো নতুন করে।

শ্রীমা সারদেশ্বরী জননী

শ্রীউমা মজুমদার

শ্রীমা সারদেশ্বরী জননি!
মাতা তুমি, শ্রীরামকৃষ্ণ-ঘরণী;
সাধনার বলে লভেছ পরম-স্বামী,
রমণীরত্ন! স্বামি-পথ-অনুগামী।
দেবী তুমি, জননী তুমি, ধাত্রী;
শ্বশুর-কুলে উজ্জ্বল দীপ-দাত্রী।
রীতি না মানিয়া সবার অশ্রু মুছালে,
জগন্মাতা, জাতের আড়াল ঘুচালে।
নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেছ জননি,
নীরব তোমার পুণ্য-জীবন-কাহিনী।

সত্যি সত্যিই তাজা !
কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চটপট্ বিলি করার নিখুঁত ব্যবস্থা থাকায় ব্রুক বণ্ড চা বাগান থেকে সদ্যতোলা চায়ের মত তাজা থাকে।
ষোলআনাই খাঁটি !
মোড়কে পুরে সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে ধুলো-বালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না।
Brooke Bond Tea
Brooke Bond
Tea
বুঝেসুঝে কিনুন ও পয়সা বাঁচান !
ভুলে যাবেন না যে ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন।
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে কেনেন !
BB 64 TB
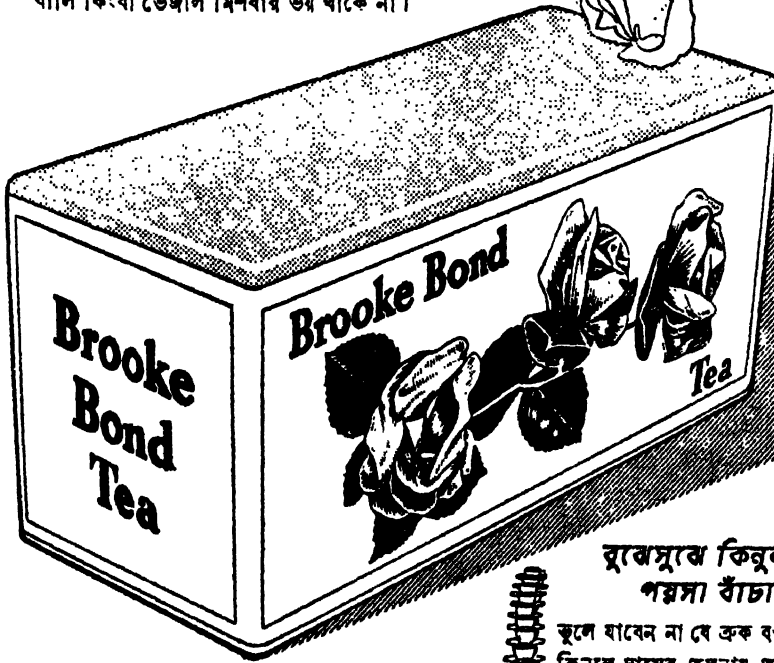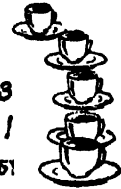
[উপন্যাস]   শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

বহু দিন পরে গ্রামে এসে ললিত গ্রামাঞ্চলের সকল সমাজেই যথাযথ ভাবে আদর স্নেহ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করল। অপরাহ্নে চণ্ডীমণ্ডপে এখন জনসমাগম অনেক অধিক হয়; ললিত সেখানে সকলের সামনে কাশীর কথা বলে। যদিও ললিতের কাশীর জীবনযাত্রায় বেশীর ভাগ সময় দেবীর চিত্রচর্চায় অতিবাহিত হয়েছে, তাহলেও তার প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য কাশী সম্বন্ধে শোনা কথা কোনটিই ভুলে নাই, সেগুলি গুছিয়ে বলে যায়; শ্রোতারা অবাক হয়ে শোনেন। যেমন, রামাপুরায় এক অগ্নিহোত্রী-পরিবার আছেন, সেই বংশের যিনি কর্তা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত—পুরুষানুক্রমে এঁরা বাড়ীর অগ্নিহোত্র গৃহে বরাবর অগ্নি রক্ষা করে আসছেন। একজন ভবঘুরে ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বৈদ্যবিদ্যা শিক্ষা করে কোনও প্রতিষ্ঠা পান না; তিনি শেষে—যেষামন্যগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ—এই সাধুবাক্যের অনুসরণ করে সপরিবার কাশীবাসী হন। রাত্রি শেষ হতেই তাঁর সাধনা চলে—সে কি কঠোর সাধনা, সমস্ত দিন সস্ত্রীক গঙ্গার ঘাটে ইষ্ট অর্চনার পর, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দেন। সায়াহ্নে বাড়ী ফিরে আহার করেন। সারা দিনের মধ্যে যত আকর্ষণই আসুক, স্বার্থের দিকে তাকান না। সন্ধ্যার পর সায়ংকৃত্য সেরে, বাইরের ছোট ঘরখানিতে এসে বসেন—উপার্জনের আশায়। আশ্চর্য এই যে, দেখতে দেখতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে; ঘরে লোক ধরে না—সবাই প্রার্থী রীতিমত দর্শনী দিয়ে কবিরাজ মশাইকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। সারারাত ধরে রোগীর বাড়ী-বাড়ী তিনি চিকিৎসা করতে যান, প্রত্যেকেই বসে থাকে প্রতীক্ষায়। প্রথমে পাঁওদলে বেরুতেন রোগী দেখতে, তার পর পাল্কী এলো, শেষে ল্যাণ্ডো জুড়ি। তাঁর বিশাল ঔষধালয়ের সামনে বিশিষ্ট প্রার্থীদের গাড়ী পাল্কী সারি দিয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গার উপর নিজস্ব প্রাসাদতুল্য সুউচ্চ অট্টালিকা তাঁর নাম ঘোষণা করে। সবার ধারণা, শুধু সাধনার বলেই তিনি অল্প দিনে এত বড় হয়েছেন!

এমনি কথা গল্প দিব্যি ভণিতা করে ললিত বলে, তন্ময় হয়ে সকলে শোনে—ভদ্র অভদ্র, সুধী সজ্জন, চাষী শ্রমিক—বিভিন্ন সমাজের লোক সব। সেই সঙ্গে কাশীখণ্ড থেকে এক একটি উপাখ্যান শুনিয়ে তাঁদের প্রচুর আনন্দ দেয়। সত্য ঘোষাল হুঁকায় সুখ-টান দিয়ে পাশে উপবিষ্ট পশুপতিকে বলেন: শুনছ হে পশু, কাশীতে থেকে ছেলে তোমার সত্যিই লায়েক হয়েছে; একেই কয়—স্থান-মাহাত্ম্যে।

পশুপতি বলেন: সেইজন্যেই ত অনেক ভেবে-চিন্তে ওকে কাশীধামে পাঠাই বিদ্যানুশীলন করতে। সংস্কৃতে তিনটে পরীক্ষা দিয়ে বাবাজী ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখন শেষ পরীক্ষাটিই বাকি। যদি ওর মুখে সংস্কৃত শ্লোক শোনেন ত···

একটা নিশ্বাস ফেলে সত্য ঘোষাল বলেন: কি হবে বল বেণা-বনে মুক্তো ছড়িয়ে—তার চেয়ে এই ভাল।

কিন্তু বাড়ীতে বেণা-বনেই ললিতকে স্বতন্ত্র ভাবে মুক্তো ছড়াতে হচ্ছে ইদানীং। ছবির যে বৃহৎ বাণ্ডিল এনেছিল সঙ্গে করে ললিত, সে সবই দেখা শেষ হয়ে গেছে রাধার। ললিতের কাছেও সেগুলি ক্রমশঃ পুরানো মনে হয়। তাই ললিত স্থির করে—নবপরিকল্পনায় দেবীর ছবি নূতন করে আঁকবে। রাধার কাছেও কথাটা তোলে: আচ্ছা, ঐ যে সব ছবি এঁকেছি, দেবীর বয়স ত এখন ওর চেয়েও বেড়ে গেছে?

মুখ টিপে হেসে রাধা বলে: তা ত বেড়েছেই। তুমি বাড়ছ, আমি বাড়ছি, আর দেবী বুঝি বাড়ছে না?

উত্তেজিত ভাবে ললিত বলে উঠল: ঠিক বলেছ, ঐ ছবিগুলোর মধ্যেই ডুবেছিলুম বলে, এটা আমার মাথায় আসেনি। এখন দেবীর বয়স ঠিক করে ছবি আঁকবার একটা উপায় আছে। কিন্তু সেটি তোমার হাতে, তুমি মনে কর ত হয়।

রাধার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে; সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ললিতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল: আমি মনে করলেই হয় যদি, তবে চুপ করে আছ কেন? বলই না—আমাকে কি করতে হবে শুনি?

ললিত বলল: শুনবে? আচ্ছা, ছেলেবেলার খেলাঘরের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে? খেলতে খেলতে একদিন কথা ওঠে, আমাদের তিন জনের মধ্যে মাথায় কে বড়? তখনি সার দিয়ে তিন জনে দাঁড়াই, আমি হলাম সবার চেয়ে এক বিঘত মাপে বড়, আর তোমরা দু'জনে হলে সমান সমান—মনে পড়ে?

উৎসাহের সুরে রাধা বলে উঠল: পড়ে—খুব পড়ে। তাই নিয়ে দেবীর কি রাগ—আমাকে নিয়ে মাপা কেন?

ললিত বলল: দেখ, দেবীও এখন মাথায় তোমার মতন হয়েছে, শুনেছিলুম—তোমাদের বয়সও সমান। তাহলে তোমাকে সামনে রেখেই দেবীর চেহারা সম্পর্কে একটা structural আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে। তুমি যেমন রোজ খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে আসছ, তেমনি আসবে—লক্ষ্মীটি!

রাধা একটু গম্ভীর হয়ে বলল: তোমার এ খেলা চমৎকার! আবার ছেলেবেলাকার খেলাঘরের কথা মনে পড়ছে। তখনো দেবীর ওপরেই তোমার যত কিছু টান ছিল, এখনো দেখছি। পাকে-প্রকারে তাই করতে চাও, দেবী এখানে না থাকলেও। কিন্তু আমি তোমার

কি করেছি ! বারে বারে আমাকে এ ভাবে হেনস্তা আর অপমান করে তোমার কি লাভ বল ত শুনি ?

ললিত থতমত হয়ে অপরাধীর মত মুখখানার ভঙ্গি করে বলতে লাগল : আমার মনে পড়ে, দেবীর সঙ্গে বেশী মিশতুম বলে তুমি রাগ করতে, জোর করে এক একদিন আমাকে ধরে নিয়ে যেতে, কিন্তু দেবীও ছিল নাছোড়বান্দা—এই নিয়ে কত ঝগড়া ! তবে ছেলেবেলার সেই সব কথা তুলে এখন দুঃখ করা কি তোমারও ছেলেমানুষী নয় ? আচ্ছা, একটা কাজ করব, তোমারও না হয় একখানা ছবি—

এ পর্যন্ত বলেই ললিত হঠাৎ থেমে গেল। রাধা জিজ্ঞাসা করল : থামলে যে—কি হলো ?

ললিত বলল : তোমার ছবি তোলায় ত আবার নানান ফ্যাসাদ, তুমি চাও—দেবীর মত ছেলেবেলাকার ছবি আঁকাতে। কিন্তু আগেই ত বলেছি, সে হবে না। জান ত, ছবি আঁকায় আমি আনাড়ি, কোন শিক্ষা পাইনি। তবে যদি বল কি করে ওসব এঁকেছি, সে হচ্ছে ধ্যানের ব্যাপার ; আর কেউ বুঝবে না। কিন্তু তুমি ত অবুঝ নও, তুমি ত জানো—দেবী ছাড়া আর কোন মেয়েকে আমি ধ্যানে আনতে পারি না। তবে তুমি যদি বল, একদিন সময় করে এখানে এস, আমি সত্য সত্য তোমার এখনকার ছবি একখানা এঁকে দেব। তার পর, এবার দেবীর যে ছবি কল্পনায় আঁকব, তার সঙ্গে কালিদাসের কাব্যের নায়িকাদের ভাবভঙ্গি থাকবে, কবির কথাগুলোও ছবির নিচে লিখে দেব।

রাধা বুঝল, দেবীর চিন্তায় এখনো ললিত তন্ময় হয়ে আছে। দেবী ছাড়া আর কিছু সে জানে না। অগত্যা তাকে বলতে হলো—বেশ, এর মধ্যে একদিন এখানে বসব, তুমি আমার ছবি এঁকে দিও। আমি সেখানা যত্ন করে রাখব। আর, আমাকে দেখে দেবীর জন্যে ছবি যে ভাবে আঁকতে চাও—এঁকো, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।

উৎফুল্ল হয়ে ললিত বলল : এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মতন কথা। বেশ, তুমি স্থির হয়ে একটু দাঁড়াও ত, আমি গোটাকতক রেখা টেনে স্ট্রাকচারটা ঠিক করে ফেলি।

ললিতের নির্দেশ মত রাধা ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ললিতও তার আঁকার সাজ-সরঞ্জামগুলি বার করে তৈরী হয়ে বসল।

১১

আগেই বলা হয়েছে, নিত্যানন্দ চৌধুরী ও অরবিন্দ রায় নামে দু'জন আধুনিক ধনী শিল্পপতির আহ্বানে দেবী ও রাণীর পিতা, পশুপতির পরম বন্ধু বগলাপদ কলকাতায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সরকারী পণ্য সরবরাহের ব্যাপারে যোগ দেন এবং সম্বৎসরের মধ্যেই 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে ওঠেন। নিত্যানন্দ বাবুর পুত্র অজিত ও কন্যা অরুণা এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসায় রাণীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, বগলাপদ বাবু এভাবে বিখ্যাত ধনী ও তাঁর মুরুব্বীস্থানীয় নিত্যানন্দ চৌধুরীর ছেলে-মেয়েকে তাঁর বাড়ীতে যেচে আসতে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং স্ত্রীকে বলে দেন, আদর আপ্যায়নে ছেলে-মেয়ে দু'টিকে যেন আপনার করে নেন। দেবী তখন প্রবল জ্বরে ভুগছিল ; রাণীর সঙ্গেই ভাই-বোনের ভাব হয়ে গেল। রাণীকেও তাঁরা নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আদর যত্নে অভিভূত করে দেন।

নিত্যানন্দ বাবুর বিরাট বাড়ী, ব্যয়বহুল সমৃদ্ধ পরিবেশ, বহু দাসদাসী সত্ত্বেও গৃহিণী অভাবে গৃহস্বামীর দৃষ্টিতে সবই যেন এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও শোভাহীন। তাঁর বর্ষীয়সী বিধবা ভগিনীকে দূরসম্পর্কের কতিপয় আশ্রিতা আত্মীয়া এবং পাচক, পাচিকা ও দাস-দাসীদের নিয়ে ভ্রাতার রুচি-প্রবৃত্তি অনুসারে বাহ্যিক আধুনিক আদব-কায়দা বজায় রেখে, এক কথায় যাকে বলা যায়—'রাজার হালে' সংসারটি চালাতে হয়। কোথায়ও কোন দিক দিয়ে পাণ থেকে একটু চুণ খসলেই মুস্কিল। প্রথম দিনেই রাণীকে দেখে নিত্যানন্দ বাবু মনে মনে একটা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন, কিন্তু বগলার তাৎকালীন অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে, ভবিষ্যতের খাতে সেই কল্পনাটিকে মুলতুবী রাখতে অগত্যা বাধ্য হন। তবে বগলা বাবুর কন্যা ও পরিবারবর্গ যে তাঁর আত্মীয়দের সম্মান, তাঁদের প্রতি যেন আদর-যত্নের ত্রুটি হয় না—এই ভাবে জরুরী নির্দেশ দিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে সতর্ক ও সচেতন করে রাখেন। তাঁরই নির্দেশে বগলাকেও কন্যাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত ও উৎসাহী হোতে হয়। সেই সময়ই ও-বাড়ীর ভ্রাতা-ভগিনীর দেখাদেখি এ-বাড়ীতে রাণীও পায়রা নিয়ে নূতন ধরণের বায়সাধ্য খেলায় মেতে ওঠে ; এমন কি, দেবী সেরে উঠলে তাকেও এই খেলায় যোগ দিতে প্রলুব্ধ করে ; অজিত এবং অরুণার সঙ্গেও ক্রমে দেবীর আলাপ-পরিচয় হয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্র-কন্যার আদর্শে নিত্যানন্দ বাবু বগলাপদর কন্যাদের উচ্চ শিক্ষায় প্রবর্তিত করেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের

জন্ম দেবীর স্কুলে যাওয়া হয় না, সে মায়ের কাছেই পাঠাভ্যাস করে। রাণী কিন্তু অজিতের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত পদে শিক্ষার পথে এগিয়ে চলে। একটা মাত্র বছরের আড়াআড়িতে তিন জনেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অজিত দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। অরুণা ও রাণী পর বছর পরীক্ষা দেয়; ফল বেরুলে দেখা গেল যে, অরুণা কোন রকমে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে, রাণী কিন্তু মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বৃত্তি লাভের যোগ্যতা পেয়েছে। নিত্যানন্দ বাবু অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন রাণীর সম্বন্ধে।

বগলাপদর তখন অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। বাড়ী, গাড়ী, মান, সম্ভ্রম, লোকজন, সেই সঙ্গে প্রচুর উপার্জন তাঁকে ভাগ্যবান বলে চিহ্নিত করেছে। এখন নিত্যানন্দ বাবু মনের মধ্যে মুলতুবী কল্পনাটি স্পষ্ট করে বলেন বগলাপদকে: তিনিও এমনি একটা উচ্চ আশার দিকে বরাবর লক্ষ্য রেখেছিলেন। সে আশা এত সহজে এভাবে ফলবতী হওয়ায় এবং নিত্যানন্দ বাবুর পক্ষ থেকেই শুভ প্রস্তাবটি আসায়, তাঁর আর আনন্দ ধরে না। অবশ্য, তখন পূর্ণোৎসাহে উচ্চ শিক্ষা লাভের সাধনা চালাবার কথা, প্রয়োজন বুঝলে পাত্র-পাত্রীর বিদেশ যাত্রাও অসম্ভব নয়, সুতরাং বিবাহ ব্যবস্থা বহু দূরে। তথাপি, এমন একটি সম্ভাবনা এবং সে সম্বন্ধে কথাটা ওঠাকেই উপলক্ষ করে দুই বাড়ীতে পর পর দুটো বড় রকমের ভোজ হয়ে যায়। সে সময় কিন্তু বগলাপদ ওরফে বোগলা সাহেব পল্লী-বন্ধু পশুপতিকে স্মরণ করাও প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরং তিনি এখন অতিমাত্রায় ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন যে, পশুপতির মত পল্লীগ্রামবাসী সেকেলে প্রকৃতির আহাম্মুখ ধরণের মানুষটির সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতার কথা এই বিশিষ্ট ধনী সমাজে কোন প্রকারে যাতে জানাজানি না হয়।

পক্ষান্তরে, পত্নী সুলোচনা দেবী প্রায়ই স্বামীকে তাড়া দিতেন, গ্রামের সঙ্গে পূর্বের মধুর সম্পর্কটা যাতে বজায় থাকে, মাঝে মাঝে পশুপতি বাবুকে চিঠিপত্র লিখে ওঁদের খোঁজ খবর নিতে বলেন, তাঁর সইয়ের পরলোক গমনের পর কি ভাবে ওঁদের সংসার চলছে, ললিতের পড়া-শোনা কত দূর এগিয়েছে, পাড়ার সকলে কে কেমন আছে, এ সব জানতেও যে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। সই বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু সইয়ের অভাবে কাউকে কিছু লিখতে মন চায় না, তাই স্বামীকেই বলেন। গ্রামের ব্যাপারে স্বামীর মনোবৃত্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। স্ত্রী এখনো দেশের কথা ভুলেন নাই, সেজন্য বগলাপদ মনে মনে খুবই বিরক্ত হন; স্ত্রীকে সেজন্য নিজেদের বর্তমান পরিবেশের কথা ভেবে দেশের কথা ভুলবার জন্যে নানা যুক্তি দেন, স্ত্রী কিন্তু প্রতিবাদ তুলে স্বামীর যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে দেন। অগত্যা তাঁকে নিজের পেঁচোয়া বুদ্ধিতে মিথ্যার ব্যাপার সাজিয়ে ধাপ্পা দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে উপযাচক হয়ে দেশের কথা নিজের মনগড়া করে শুনিয়ে দেন পশুপতির লেখা চিঠিকেই উপলক্ষ করে।

কন্যা রাণীকে স্বামী যে এ যুগের আধুনিকা মেয়ে তৈরী করবার জন্য কলেজে পড়াচ্ছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর এর পিছনে নিত্যানন্দ বাবুর রীতিমত প্ররোচনা রয়েছে জেনে সুলোচনা দেবী সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। কেন না, নিত্যানন্দ বাবুর পুত্র অজিতের সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথা এক রকম পাকা হয়ে আছে। তিনি কেবল এই ভেবে ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে মাথা খোঁড়েন যে, দেবী সে সময় অসুখে পড়েছিল—অজিতের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ তখন হয়নি, তাহলে হয়ত বড় বলে তারই ওপরে ও পক্ষের প্রথমে নজর পড়ে যেত। তিনি সাশ্রুলোচনে ঠাকুরের উদ্দেশে বলেন—এই জন্যেই কথা আছে, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! ভাগ্যিস, দেবী তখন অসুখে পড়েছিল! অসুখের পর দেবীর পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হওয়ায়, স্বামী মনে মনে প্রফুল্ল হলেও সুলোচনা দেবী কিন্তু অতীতের কথা—গ্রামের হরগৌরী মন্দিরে দুই সইয়ের সর্বসমক্ষে স্ব স্ব ছেলেমেয়েকে উপলক্ষ করে বাগদানের কথা ভুলেন নাই। ঠাকুরঘরে ইষ্টের সামনে বসে পূজা আহ্নিকের পর তিনি প্রায়ই গ্রামের সেই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে স্বামীর সুমতি প্রার্থনা করেন। অথচ, দেবীর পূর্বস্মৃতির উদ্ধার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন। তার কারণ, যদি অতীতের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় স্বামীকে একান্তই উদাসীন দেখা যায়, কিম্বা ও পক্ষও বিশেষ আগ্রহান্বিত না থাকেন, তাহলে আগে থেকে দেবীকে অতীত সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য ব্যস্ত না করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ দেবীর পূর্বস্মৃতি লাভে সহায়তা করতে স্বামী এ সংসারের প্রত্যেককে বিশেষ ভাবে নিষেধ করে রেখেছেন। তবে ইদানীং শিক্ষাপ্রাপ্তি ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই দেবীর বিনষ্ট পূর্বস্মৃতি যে একটু একটু করে বিকশিত হচ্ছে, তিনি সেটা লক্ষ্য করেছেন। তাই ইদানীং অনেক ভেবে চিন্তেই তিনি ভবিতব্যের উপর নির্ভর করে এ ব্যাপারটির নিষ্পত্তির ভার ছেড়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

কিন্তু নিত্যানন্দ বাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে এ বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, উভয় বাড়ীর পুত্র-কন্যাদের বয়সও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, ললিত মোটামুটি ভাবে বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, সেই সময় নিত্যানন্দ বাবু অজিতকে চার্টার্ড একাউন্টেন্সিপ শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন। রাণী তখন আই, এ পরীক্ষাতেও বৃত্তিলাভ করে স্কটিসচার্চ কলেজে বি, এ পড়বার জন্য যোগ দিয়েছে। দেবীও বাড়ীতে মায়ের কাছে বাংলা পড়ে, শাস্ত্র পুরাণের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিতা হয়েছে। তার পর রাণীর কাছে ম্যাট্রিকের বই সব পড়ে প্রাইভেটে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হয়ে বাংলায় বিশেষ পটুতার জন্য লেটার পেয়েছে। ললিতের ভগিনী অরুণা বছর খানেক আই, এ ক্লাসে পড়ে তার পর কলেজ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। এদিকে তার বিশেষ অনুরাগ দেখে নিত্যানন্দ বাবু বাধা দেন নাই। ললিতের বিলাত যাত্রার পরেও বিকালে দুই বাড়ী থেকে পায়রা নিয়ে এদের খেলা সমান ভাবেই চলতে থাকে, বরং আরো কিছু উৎকর্ষ হয়। এই সময় আর একটা ব্যাপার যেন বাঁধাধরা পরিকল্পনার মতই উপস্থিত হয়ে দু'টি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রচনা করল।

আগেই বলা হয়েছে, অরবিন্দ রায় নামে আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিত্যানন্দ বাবুর সহকর্মী থাকায় বগলাপদ তাঁরও সঙ্গে কর্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট হন। নিত্যানন্দ বাবুর বিশাল বসতবাড়ীর নিকটেই অরবিন্দ বাবুও তাঁর অট্টালিকা নির্মাণ করান। উভয় বন্ধুর কর্মশালা চৌরঙ্গী অঞ্চলে নিজস্ব বাড়ীতে কেতাদুরস্ত ভাবে চলে আসছিল। বগলাও যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুই মুরুব্বীর আদর্শে তাঁদের আফিসের কাছে নিজেরও স্বতন্ত্র কার্যালয় নির্মাণে উদ্যত হন, সেই সময় অরবিন্দ বাবু তাঁকে বাধা দিলেন। তার কারণ,

ওঁর এক মাত্র ছেলে শশাঙ্ক আর এক ভাগনে প্রশান্ত ইউরোপে রয়েছে। ছেলের ক্ষয় রোগ, এখানে এলেই বাড়ে, তাই সুইজারল্যাণ্ডে একটা নার্সিং-হোমে তাকে রেখেছেন। ভাগনে প্রশান্ত ইংলণ্ডে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং তথা স্থপতিশিল্প শিখছে। প্রশান্ত কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এলে ইমারত নির্মাণের ব্যবসায় তিনি আরম্ভ করবেন। এ-সব সরবরাহ ব্যাপারে লেগে থাকতে তাঁর আর ইচ্ছা নেই। তাই তিনি বগলাপদকে বলেন : আমিও সস্ত্রীক ইউরোপে যাব ঠিক করেছি। আমার স্ত্রী ছেলেকে দেখবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। আমারও দেখা দরকার, প্রশান্ত ছেলেটার পড়াশোনা কি রকম হোচ্ছে। কাজেই আমাকে হয়ত কিছু বেশী দিন ও দেশে থাকতে হবে। আর, আপনারা ত জানেন, সরবরাহের কাজ আমি বন্ধ করে নূতন কাজ করতে চাই। কাজেই, আমার অফিস চালু অবস্থায় নিয়ে আপনি নিজেই মালিক হয়ে চালাতে পারেন। খরচপত্র করে নাই বা আলাদা অফিসের পত্তন করলেন।

অরবিন্দ বাবুর প্রস্তাবটি বগলাপদর মনে লাগে। তিনি তখন অরবিন্দ বাবুর চলতি অফিসের মালপত্র সাজ-সরঞ্জাম সব সুবিধা দরে কিনে নিয়ে এবং দেনা-পাওনার দিক দিয়েও একটা বন্দোবস্ত করে, তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন। অরবিন্দ বাবুর প্রাপ্য টাকা সমস্তই চুকিয়ে দিলেন। বাড়ীর দরুণ ভাড়ার একটা হার নির্দিষ্ট রইল, অরবিন্দ লিখলে সে টাকা বিদেশে পাঠাবেন, নতুবা তাঁর কাছেই জমা থাকবে, ফিরে এসে নেবেন। নিত্যানন্দ বাবু স্বয়ং মধ্যস্থ থেকে এই ব্যবস্থা পাকা করে দিলেন।

অজিতের বিলাত যাত্রার অল্প কয়েক দিন পরেই নিত্যানন্দ বাবু ভাগনে প্রশান্তকে নিয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউর বসত বাড়ীতে ফিরে এলেন। নিত্যানন্দ ও বগলাপদ এ পর্যন্ত তাঁর কোন চিঠি পাননি। অরবিন্দ স্বয়ং সে দুটি খবর দিলেন, শুনে তাঁরা যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তাঁর পুত্র শশাঙ্ক সেখানে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যায়, তারই কিছু দিন পরে একটা মোটর দুর্ঘটনায় তাঁরা স্বামি-স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে তিনি বেঁচে ওঠেন, কিন্তু স্ত্রী সেখানেই দেহ রাখেন। সেই থেকে তাঁরও বুকের অবস্থা ভাল নয়—যে কোন মুহূর্তে তাঁরও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হোতে পারে। এখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা—ভাগনে প্রশান্ত বেশ কৃতবিদ্য হয়েছে, তিনি নূতন করে ইমারত তৈরীর কারবার করবেন বলেই প্রশান্তকে ঐ সম্পর্কে বিলডিং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিখতে বিলেতে রাখেন। ওখানকার কলেজ থেকে ও পাস করেছে। এখন ও যদি কাজ-কারবার করে, নিত্যানন্দ ও বগলা বাবু দুজন মাথার উপর থেকে ওকে চালাবেন। এর জন্যে উপস্থিত আলাদা অফিসের দরকার নেই, এখানকার বাড়ী থেকেই ও বিজনেস চালাতে পারে, যেমন বগলা বাবু ও বাড়ীতে যেমন অফিস চালাচ্ছেন, চালিয়ে যান

উভয়েই অরবিন্দ বাবুকে সান্ত্বনা দিলেন। নিত্যানন্দ বাবুর সঙ্গে অরবিন্দের আত্মীয়তা থাকায়, নিত্যানন্দের কন্যা অরুণাও সেখানে এসে সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের তিন জনকেই বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। প্রশান্ত অজিতের চেয়ে বছর চারেকের বড় এবং অজিতের

মতই উন্নত দেহ সুপুরুষ। বিশেষতঃ, ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকায়, তাকে হঠাৎ দেখলে সাহেব বলেই ভ্রম হয়। তাই অরুণা ঠাট্টা করে তাকে বলে: প্রশান্ত-দা, তুমি অনেক দিন ওদেশে থেকে ঠিক সাহেব হয়ে এসেছ, এখন দিন-কতক ও পোষাক ছেড়ে ধুতি-চাদর পরতে সুরু কর।

প্রশান্ত প্রস্তাবটা শুনে জিজ্ঞাসা করে: কোন উদ্দেশ্য আছে না কি—যার জন্যে বহু দিনের অভ্যাস বদলাতে হবে?

অরুণা একটু মুচকে হেসে বলে: নিশ্চয়ই! আমাদের যে নতুন কাকাবাবুটির সঙ্গে প্রথম আলাপ হোল, ওঁর বাড়ীতে ত এখনো যাওনি! সেখানে অপূর্ব ছ'টি কন্যারত্ন আছে। একটির সঙ্গে দাদার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে, আর একটি যেন তোমার জন্যেই এত দিন সাধনা করছিল; সেটিই বড়, আর ছোটটির চেয়েও রূপসী! তবে কিন্তু ভারি রক্ষণশীলা, ঠিক যেন কালিদাসের শকুন্তলা: আমি জোর করে বলতে পারি, প্রথম তাকে দেখলেই—রাজা দুষ্মন্তের মত তোমারও অবস্থা হবে।

অরুণার কথা বগলাপদ, অরবিন্দ ও নিত্যানন্দ তিন জনেই উপভোগ করে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করেন। এর পর অরুণা সহাস্যে ওঁদের পানে চেয়ে বলে—আপনারা বসুন, আমি এখনি চা জলখাবার আনছি, আর দেবীদি' সম্বন্ধে আমি যা বললুম, আপনারা সেটার কথাও ভাবুন। প্রশান্তদা', তুমি ভিতরে চল, আমাদের একটা নতুন খেলা তোমাকে দেখাব।

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অরুণা প্রশান্তকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। বগলাপদ নিত্যানন্দ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপার কি দাদা? আপনার মেয়ের কথা শুনে মনে হলো, যেন ও ব্যাপারটা পাকা করে রেখেছে!

অরবিন্দ বললেন: আপনার সঙ্গে আমাদের এখন যে রকম ঘনিষ্ঠতা, আর—আপনার এক মেয়ের সঙ্গে যদি অজিতের বিয়ের কথা পাকা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার অপর মেয়েটিকে না দেখেই আমি কথা দিচ্ছি—প্রশান্তর জন্যে আমি তাকে আপনার কাছে ভিক্ষা চাইব।

বগলাপদ খুবই সঙ্কুচিত ও অপ্রস্তুতের মত হয়ে বললেন: এ আপনি কি বলছেন? আমি যে শুনে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ছি। আমার কন্যাকে যদি আপনি কৃপা করে গ্রহণ করেন, সে ত আমারই পরম সৌভাগ্য!

নিত্যানন্দ প্রসঙ্গটির নিষ্পত্তি করে দিলেন: আমি গোড়া থেকেই মেয়ে দুটিকে দেখে ঠিক করে রাখি। অজিতের চেয়ে প্রশান্ত দু'বছরের বড়, বড়টিই ওকে মানাবে। বাড়ীতে অরুর সঙ্গে প্রায়ই আমাদের কথা হোত কি না!

এই সময় চা ও জলখাবার এসে পড়ল। সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে এর পর আরও আলোচনা চলল।

ওদিকে অরুণা প্রশান্তকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তাদের পারাবত দৌত্য সম্পর্কে নতুন ধরণের খেলা দেখাল। প্রশান্ত পারাবত খেলার কথা শুনেছিল, কিন্তু কখনো দেখেনি। অরুণা বলল: এর মজা তোমাকে দেখাচ্ছি, আমাদের খেলার ঠিক সময় হয়েছে। এই পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে আমি ছেড়ে দেব, আর দেখবে একটু পরে ও-বাড়ী থেকে রাণীর লেখা আমার পত্রের জবাব নিয়ে পায়রা ফিরে আসবে।

প্রশান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, অরুণার কাণ্ড দেখে, তার মুখ থেকে প্রশ্ন উঠল: সত্যি?

অরুণা বলল: আবার একটা মজা করা যাক তোমাকে নিয়ে। ঐ বড় বোন দেবীর নামে তুমি একখানা পত্র লেখ, সব ত শুনলে, যা তোমার ইচ্ছা তাই লেখ, সেটাও দাদার পায়রার পায়ে বেঁধে দিই; একসঙ্গে উড়বে, একসঙ্গেই জবাব আসবে।

যেমন প্রস্তাব, সেই মত কাজ হয়। প্রশান্ত দেবীর কথা রাণীর মুখে শুনেই প্রলুব্ধ হয়েছিল, এখন অনাহূত ভাবে পরিচয় দেওয়ায় একটা মজাও আছে বৈ কি! পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করে রাণীর দেওয়া কাগজে কয়েক লাইন লিখেই সেখানা মুড়ে রাণীর হাতে দিল; রাণী তাকে মাদুলীর আকারে এনে অপর পারাবতটির পায়ে বাঁধতে লাগল। এর পর কি ভাবে পায়রা ছাড়তে হবে, সেটি দেখিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই দু'জনে পায়রা দু'টিকে আকাশ পথে উড়িয়ে দিল।

একটা মধুর শব্দ করে পাশাপাশি দু'টি পায়রা উত্তর দিকে যুগপৎ উড়ে চলল।

[ক্রমশঃ।

বাইশে শ্রাবণ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যখনি আকাশে দেখি সঞ্চারী তমিস্রা ধেয়ে আসে
অনেক জোনাকী-মন উর্দ্ধমুখী চলায় উন্মনা
ক্ষতকীর্ণ জীবনেতে স্নিগ্ধস্বাদ শান্তির আবাসে
অন্তর আলয় চায়, তখন তোমারে স্মরি প্রতীক-প্রেরণা।
অবাক-বিস্ময়ে আজো দেখি, আলোর সারথি সূর্য্য
অঢেল প্রাণের স্রোত ছন্দের সংলাপে একা ঢালে—
এ সূর্য্য হয় না মলিন, সময়ের চিহ্ন ধার্য্য
হয় না এখানে, চিরদিন দীপ্ততেজে একা তাই জ্বলে।

সীমিত প্রাণের কক্ষে অসীমের ছন্দ বুনে বুনে
অনেক গভীর তথ্যে প্রজ্ঞার পরাগ মেখে মনে
ছড়ালে সৌরভী প্রমা। জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর
এখনো অনেক ক্ষ্যাপা একা খোঁজে 'পরশ-পাথর':
তুমি সে পরশমণি, আজো যার অমেয় তৃষার
ধ্যানের ধেয়ানে মন সূর্য্যমুখী আরতি সাজায়।
স্মৃতির স্মারকচিহ্ন ছায়াসঙ্গী কায়ার মতন
সুরের সুবর্ণ কলি সঞ্চারিয়া পূর্ণ করে মন।
বুঝি তাই "মৃত্যুস্নানে শুচি করি' বিশ্বের জীবন"
প্রাণের উজানগঙ্গা নেমে এসে ভরালো চেতন।
তোমাতে আশ্রয়ী হোক মালিন্যের সমস্ত সঞ্চয়
হে রবীন্দ্র! চিরদিন আলো দিয়ো, জেলে রেখো সৃষ্টির বিস্ময়।

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
রেক্সোনা
ক্যাডিল্যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
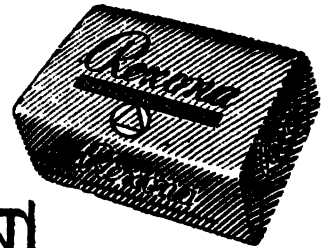
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

'হ্যাঁ।' মিরিয়াম বলল গভীর স্বরে, প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা কিম্বা শক্তি, কোনটাই যেন তার নেই। উঠে গিয়ে সে বইগুলো নিয়ে এলো। তার হাত দু'টি লাল, যেন কাঁপছে, দেখে পলের দুঃখ হ'ল। তার ইচ্ছে হ'ল ওকে সান্ত্বনা দিতে, ওকে চুম্বন করতে। কিন্তু সাহস হ'ল না—কিসের বাধা যেন তার সামনে। তার চুম্বন হবে মিরিয়ামের প্রতি গভীর অন্যায়! দশটা অবধি তারা পড়াশোনা করল, তার পর দু'জনে গেল রান্নাঘরে। সেখানে মিরিয়ামের মা-বাবা ছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্যে পলের স্বাভাবিক উৎফুল্ল ভাব আবার ফিরে এলো। পলের চোখ ছিল কালো, তার মধ্যে থেকে একটি দ্যুতি ফুটে বেরুত। লোককে গভীরভাবে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল ওর।

তার পর পল যখন বাইসাইকেল আনবার জন্যে গোলা-ঘরে গেল, দেখল সাইকেলের সামনের চাকাটা ফুটো হয়ে গেছে। মিরিয়ামকে বলল, 'একটা বালতিতে করে একটু জল নিয়ে এসো। আমার দেরি হবে, এটাকে সারিয়ে নিয়ে যেতে হবে ত'।'

হারিকেনের আলোটা জ্বালিয়ে পল তার কোটটা খুলে ফেলল। তার পর সাইকেলটাকে উলটো করে তুলে তাড়াতাড়ি লেগে গেল কাজে। মিরিয়াম জলের পাত্র নিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখতে লাগল। পল যখন হাত দিয়ে কোন কিছু করে, মিরিয়ামের ভাল লাগে তা দেখতে। রোগা হলেও পলের চেহারা বেশ সবল, তার ব্যস্ততার মধ্যেও তার স্বাভাবিকত্বটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে। কাজে মগ্ন হয়ে গেলে পল যেন তাকেও ভুলে যায়। পলকে মিরিয়াম ভালবাসে, সে ভালবাসার মধ্যে ডুবে যায় যেন সে। তার মন চায় দুই বাহু পলের দু'পাশে প্রসারিত করে দিতে। পলকে আলিঙ্গন করবার আকাঙ্ক্ষা তার সর্বদাই জাগে—কিন্তু শুধু যতক্ষণ পল তাকে চায় না, ততক্ষণ।

'দেখেছ?' পল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, 'এর চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারতে তুমি?'

মিরিয়াম হেসে উঠে বললে, 'না।'

পল গা-ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পিঠ মিরিয়ামের দিকে ফেরানো। মিরিয়াম নিজের দু'টি হাত রাখলে ওর পিঠে, তাড়াতাড়ি পিঠে একবার হাত বুলিয়ে হাত নামিয়ে নিলে, বললে, 'কী চমৎকার তুমি!'

পল হাসল। মিরিয়ামের গলা শুনে তার মনে ঘৃণার সঞ্চার হ'ল। ওর হাতের স্পর্শে তার দেহের সমস্ত রক্তে যেন আগুনের ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল। কিন্তু মিরিয়াম এর মধ্যে পলকে চিনে উঠতে পারল না—পল যেন তার কাছে সাধারণ একটা বস্তু। সে যে পুরুষ, এই বিশেষ পরিচয় মিরিয়ামের কোন দিন জানা হ'ল না।

সাইকেলের আলোটা জ্বালল পল, সেটাকে একবার গোলা-ঘরের মাটিতে ঠুকে পরখ করে নিল 'টায়ারগুলো' ঠিক আছে কি না, তার পর কোট পরে বোতাম আঁটতে লাগল। বলল, 'ঠিক আছে এবার।'

সাইকেলের ব্রেকগুলো ভাঙা ছিল, মিরিয়াম তা' জানত। সে ব্রেকগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলোকে সারিয়েছিলে নাকি?'

'না।'

'কেন, সারালে না কেন?'

'পেছনের ব্রেকটা খানিকটা আটকানো যায়।'

'কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয় এটা।'

'আমি পা বাড়িয়ে দিতে পারি।'

'কিন্তু ওটা সারিয়ে নেওয়াই ত' ভাল ছিল, আমার মনে হয়।' তার মন কিছুতেই প্রবোধ মানছিল না।

'ও কিছু নয়। কাল চায়ের সময় এসো, এডগারকে নিয়ে।'

'সত্যি আসব?'

'হ্যাঁ, এসো। চারটে নাগাদ এসো। আমি আসব তোমাদের নিয়ে যেতে।'

'খুব ভালো কথা।'

মিরিয়াম খুশি হয়ে উঠল। বাইরের উঠান পেরিয়ে দু'জনে ফটকের কাছে গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়াল। পল চেয়ে দেখল, রান্নাঘরের খোলা পর্দাবিহীন জানালার মধ্যে দিয়ে মিঃ লীভার্স আর মিসেস লীভার্সের মাথা দুটি ওখানকার উষ্ণ আভার মধ্যে শোভা পাচ্ছে! আরাম আর আনন্দের পরিচয় এখানে। এদিকে সামনের পাইন-গাছে ঢাকা রাস্তাটি গাঢ় অন্ধকারে লীন হয়ে রয়েছে।

সাইকেলে লাফিয়ে উঠে পল বললে, 'কাল অবধি'...

'সাবধানে যেয়ো কিন্তু।' মিরিয়ামের কণ্ঠে অনুনয়ের স্বর।

'হ্যাঁ।' অন্ধকারের ভিতর থেকে পলের কথা ভেসে এলো। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে মিরিয়াম দেখল, পলের সাইকেলের বাতি থেকে যে আলো মাটিতে পড়েছে, চলতে চলতে একেবারে সে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মিরিয়াম ফিরে এলো ঘরে। বনের উপর কালপুরুষের নক্ষত্রমালা ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছে, পেছনে তার কুকুরটা মিটমিট করে জ্বলছে, পুরোপুরি প্রকাশ হবার সাধ্য যেন ওর নেই। বাকী সারা পৃথিবীই অন্ধকার। চারিদিক নিঃঝুম, শুধু গোয়ালে বাঁধা গরুগুলোর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া। সে রাত্রে

মিরিয়াম প্রার্থনা জানাল পলের নিরাপত্তার জন্ত। পল চলে গেলে প্রায়ই সে তার জন্তে শঙ্কায় আকুল হয়ে ওঠে, সে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছতে পারল কি না ভেবে তার দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না।

পলের সাইকেল পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামল। রাস্তা পিচ্ছিল, তাই সাইকেলকে তার খুশি মত চলতে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এর পরের বার যখন আরও গভীর খাড়াই বেয়ে সাইকেলটা নামল, তখন ভারী খুশি হয়ে উঠল পল, নিজের মনেই বলল, 'বেশ চলেছ, বাবা!' পথটি বিপজ্জনক গভীর অন্ধকারে এঁকে-বেঁকে নীচে নেমেছে, ওরই মধ্যে মদ চোলাইকারীদের গাড়ি চলেছে, তাদের গাড়োয়ানগুলো ঘুমে নিমগ্ন। সাইকেলখানা যেন এক একবার তার নীচে থেকে ফসকে পড়ে যাচ্ছে, এ অনুভবটি ভারী ভালো লাগল পলের। বেপরোয়া হয়ে ওঠা যেন পুরুষ মানুষের পক্ষে মেয়েদের উপর প্রতিশোধ নেবার একটা উপায়। পুরুষ যখন ভাবে মেয়েটির কাছে তার কোন মূল্য নেই, তখন ওই মেয়েটিকে একেবারে বঞ্চিত করবার জন্তে সে যেন নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে যায়।

সাইকেলখানা বেগে চলেছে। চলতে চলতে পল দেখল হ্রদের বুকে তারাগুলো যেন ফড়িং-এর মত নেচে উঠছে, হ্রদের কালো বুকে ওরা যেন রূপোর টুকরো। তার পর বাড়িতে উঠবার লম্বা চড়াই।

টেবিলের উপর বেরী ফুল আর পাতাগুলো মায়ের দিকে ফেলে দিয়ে পল বললে, 'দেখ, মা?'

একবার চোখ তুলে মা শুধু বললেন, 'হুঁ।' তার পর আবার তাঁর মন সরে গেল দূরে। অন্যান্য দিনের মত আজও তিনি একা বসে বই পড়ছিলেন।

'খুব সুন্দর, নয়?'

'হ্যাঁ।'

পল বুঝল, মা তার উপর বিরক্ত হয়েছেন। কয়েক মিনিট পরে আবার বলল, 'কালকে এডগার আর মিরিয়ামকে চা খেতে বলেছি।'

মা জবাব দিলেন না।

'তোমার আপত্তি নেই ত' কিছু?'

মা তবু চুপ করে রইলেন।

'কী বলো?'

'তুমি জানো আমার আপত্তি আছে কি নেই।'

'তোমার আপত্তির কোন কারণ ত' দেখতে পাইনে আমি। ও-বাড়িতে আমি কত বার খেয়ে আসি।'

'তা খেয়ে আস বই কী।'

'তবে ওদের চা খেতে আসতে বলায় তোমার আপত্তি কেন?'

'কা'কে চা খেতে আপত্তি করছি আমি?'

'তবে কেন, কেন তুমি অমন মুখ হাঁড়ি করে ব'সে রয়েছ?'

'থাক্, চুপ করো এবার। তুমি বলেছ ওকে আসতে, সেই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই ও আসবে।'

মায়ের উপর ভারী রাগ হ'ল পলের। সে জানত, মায়ের আপত্তি শুধু মিরিয়ামের বেলায়। জুতো-জোড়া ছুঁড়ে ফেলে সে শুতে গেল।

পরের দিন বিকেলবেলা পল তার নিমন্ত্রিতদের এগিয়ে গিয়ে আনতে গেল। যখন দেখল ওরা আসছে, তখন খুশি হয়ে উঠল তার মন। তারা বাড়ি এসে পৌঁছল যখন, তখন প্রায় চারটে বাজে। রবিবারের বিকেল, বাড়ি-ঘর-দোর সাফ-সুফ করা হয়েছে, চারিদিক শান্ত নিথর। মিসেস মোরেল তাঁর কালো জামা আর কালো 'এপ্রন্' পরে বসে-ছিলেন, অতিথিদের দেখে উঠে এগিয়ে এলেন। এড্‌গারের সঙ্গে আন্তরিক হৃদ্যতা নিয়ে কথা কইলেন তিনি, কিন্তু মিরিয়ামের সঙ্গে যেন নিতান্ত আপত্তি সত্ত্বেও মামুলি সুরে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন মাত্র। কিন্তু পলের চোখে মিরিয়ামকে আজ তার বাদামী রঙের কাশ্মিরী জামার সাজে ভারী ভালো লাগল।

চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে-গোছাতে মাকে পল সাহায্য করতে লাগল। মিরিয়াম এটুকু কাজে লাগতে পারলে আনন্দের সঙ্গে তা করত, কিন্তু ভয়ে ভয়ে সে বসে রইল। নিজেদের বাড়ির জন্যে পল বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করত। তার মনে হ'ত, এ বাড়ির কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য এখন গড়ে উঠেছে। অবশ্য চেয়ারগুলো হাল্কা কাঠের তৈরি, সোফাটা পুরোন। কিন্তু কার্পেট আর কুশনগুলো ভারী আরামের, সাজানো ছবিগুলিতে সুরুচির পরিচয় মেলে, সব কিছুতেই একটা সারল্যের ভাব, আর প্রচুর বই আছে বাড়িতে। নিজের বাড়ির জন্যে একটুও লজ্জা অনুভব করত না পল, মিরিয়ামও করত না তাদের বাড়ির জন্যে। দু'টি বাড়িই ভালো, যেমন হওয়া উচিত তেমনি, দু'টি বাড়িই মধুর আর উষ্ণ। নিজেদের টেবিলটার জন্যেও গর্ব ছিল পলের। চীনামাটির বাসনগুলো সুন্দর, টেবিল-ঢাকা কাপড়টিও চমৎকার। চামচগুলি অবশ্য রূপোর নয়, কিম্বা ছুরিগুলির বাঁটও হাতীর দাঁতের তৈরি নয়। কিন্তু তাতে যায় আসে না কিছু, দেখতে ওরা সবই চমৎকার। ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মোরেল গৃহস্থালীটিকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়েছেন। এ বাড়ির কোন কিছুই বেমানান নয়।

মিরিয়াম কিছুক্ষণ বইপত্রের কথা নিয়ে গল্প করল, তার নিত্যকার গল্প এটা। কিন্তু মিসেস মোরেলের দিক থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না, তিনি একটু পরেই এড্‌গারের দিকে ফিরে কথা কইতে আরম্ভ করলেন।

গির্জ্জেতে মিসেস মোরেলের বসবার জায়গাটিতে এড্‌গার আর মিরিয়াম প্রথম প্রথম যেত। মোরেলদের গির্জ্জেয় যাবার বালাই ছিল না, মদের দোকানকেই তাঁর বেশী পছন্দ। মিসেস মোরেল ছোট্ট একটি অধিনায়িকার মত, তাঁর আসনের সামনের দিকটায় বসে থাকতেন। পল বসত অন্য মাথাটায়। মিরিয়াম প্রথমটায় বসত ঠিক পলের পাশে। তখন গির্জ্জেটাও ছিল ঠিক বাড়ির মত। সুন্দর জায়গাটি, বসবার জায়গাগুলিতে ঈষৎ অন্ধকার, গির্জ্জের থামগুলি সরু, চমৎকার দেখতে নক্সাকাটা ফুলে ফুলে ভরতি। ছোটবেলা থেকেই পল যাদের দেখে এসেছে, তারা একই লোক চিরদিন একই জায়গায় এসে বসে। এখানে মিরিয়ামের পাশে, মায়ের সান্নিধ্যে ঘন্টা দেড়েক বসে থাকা কী মধুর, মন যেন জুড়িয়ে যেতে চায়, যেন মনে হয় এই দেবস্থানের গোপন মন্ত্রে তার দুটি ভালবাসা এক হয়ে গেয়ে মিশেছে। তখন মুহূর্ত্তে তার মন খুশির উষ্ণতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, ধর্ম্মভাবের কোন প্রেরণা যেন সে পায়। গির্জ্জেয় প্রার্থনা শেষ হয়ে যাবার পর মিরিয়ামকে নিয়ে পল বাড়ি ফিরে আসে। মিসেস মোরেল বাকী সন্ধ্যাটা কাটান তাঁর পুরোন বন্ধু মিসেস বার্ণাস-এর সঙ্গে। রবিবার সন্ধ্যায় এড্‌গার আর মিরিয়ামের সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পলের মন যেন কোন তীব্র সঞ্জীবনরস পান করে জাগ্রত হয়ে ওঠে। কোন দিন খনির পাশ দিয়ে রাত্রিবেলা, আলোকিত বাতি-ঘরের ধার বেয়ে, কালো উঁচু কয়লার স্তূপ আর সারি সারি কয়লার গাড়ি দেখতে দেখতে, ছায়ার মত যে চাকাগুলো ধীরে ধীরে ঘুরছে, তার সামনে দিয়ে যেতে যেতে পলের শুধুই মনে পড়তে থাকে এই বুঝি মিরিয়াম ফিরে আসে তার কাছে সে অনুভূতি বেদনার মতই তীব্র, তেমনি অসহ্য।

মিরিয়ামকে বেশী দিন মোরেলদের জায়গায় বসতে হয়নি। তার বাবা আবার নিজেদের জন্যে একটি জায়গা ঠিক করলেন। মোরেলদের বসবার জায়গার ঠিক বিপরীত দিকে, ছোট গ্যালারীটির নীচে ছিল তাদের আসন। পল আর তার মা যখন আসতেন গির্জ্জেয়, তখন লীভার্সদের আসনটি রোজই শূন্য থাকত। পলের আশঙ্কা হ'ত, হয়ত মিরিয়াম আজ আর আসবে না—তাদের বাড়ি এত দূরে আর অনেক রবিবারে বৃষ্টিও লেগে থাকত। তার পর হয়ত অনেক্ষণই দেরি করে, মিরিয়াম এসে ঢুকত—তার দীর্ঘ পদক্ষেপ, আনতশির, তার ঘন সবুজ মখমলের টুপির নীচে ঢাকা মুখখানি, সবই পলের কত পরিচিত। সামনের দিকে যতক্ষণ সে বসে থাকত, তার মুখখানি থাকত ছায়ায় ঢাকা। তবু সুতীব্র আগ্রহ নিয়ে পল চেয়ে থাকত, মিরিয়ামকে ওখানে দেখতে পাবার আনন্দে তার সমস্ত অন্তর যেন আলোড়িত হতে থাকত।

মা রয়েছেন তার পাশে, কিন্তু সে অনুভবের তুলনায় এ যেন অন্য ধরণের এক আবেশ, এর আনন্দ আর গৌরব সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ যেন অনেক বেশী আশ্চর্য্য, এর মধ্যে সাধারণ মানবিকতার স্পর্শ অনেক অল্প, এর আকুলতা যেন বেদনার ছোঁয়া লেগে সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, যেন যে-ধন সে চায়, কিছুতেই সে তাকে ধরা দেবে না।

এই সময়ে পলের মনে প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগতে সুরু করেছিল। এখন পলের বয়স একুশ, মিরিয়ামের কুড়ি। এবারকার বসন্তকালটাকে মিরিয়ামের সত্যি সত্যিই ভয় লাগছিল, এ সময়ে পল উদ্দাম হয়ে উঠে বার বার তাকে আঘাত করে বসে। মিরিয়ামের গভীরতম বিশ্বাসগুলিকে নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়াই যেন এখন তার সব চেয়ে বড়ো কাজ। এড্‌গার এটা উপভোগ করত। তার বরাবরই সমালোচনার স্বভাব, আবেগে আকুল হয়ে ওঠা তার ধাতে নেই। কিন্তু মিরিয়ামের প্রাণ, তার চলাফেরা, তার জীবনের গভীরতম অনুভূতিগুলি এই ধর্ম্মবিশ্বাসকে ঘিরে। পল, যাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে, সে যখন তার ছুরির ফলার মত শাণিত বুদ্ধি দিয়ে এই ধর্ম্মবিশ্বাসকে তন্ন তন্ন করে দেখতে যেত, তখন সূক্ষ্ম একটি মর্ম্মপীড়া অনুভব করত মিরিয়াম। কিন্তু পল তাকে রেহাই দিত না। সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠত। আর ওরা দু'জনে যখন একা থাকত, তখন পল যেন আরও হিংস্র হয়ে দাঁড়াত, যেন মিরিয়ামের আত্মার টুঁটি টিপে সে তাকে হত্যা করতে চায়—আঘাতে মিরিয়ামের বিশ্বাসগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, রক্তহীন দেহের মত মিরিয়ামের চেতনা যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে চাইত।

পল চলে গেলে মিসেস মোরেল মনে মনে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, 'ভারী খুশি ও—আমার কাছ থেকে ওকে টেনে নিয়ে

গেছে, তাই ওর খুশির আর সীমা নেই। ও ত' সামান্য মেয়ে নয় যে আমার প্রাপ্য অংশটুকু রেখে নিজে নেবে; ও যে সবটাকেই গ্রাস করতে চায়। ও চায়, যেন পলের সারা অন্তরটাকে ও শুষে নেয়, তার নিজস্ব বলতে কিছু যেন আর বাকী না থাকে। ওর পাশে থাকলে পল আর কোন দিন নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখবে না—তার সবটুকু ও নিঃশেষে শোষণ করবে।' এমনি ধরণের নানা চিন্তায় মায়ের মন তোলপাড় করতে লাগল, দুঃসহ দ্বন্দ্ব আর গভীর বিরক্তিতে তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠল।

এদিকে পল মিরিয়ামকে এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবার পথে যন্ত্রণায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। সে দ্রুত হাটছে, কখনও বা ঠোঁট কামড়াচ্ছে, হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ। সামনে একটা বেড়ায় ঠেকে গিয়ে কয়েক মিনিট সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সামনে অন্ধকার যেন নীচু হয়ে নেমে গেছে, তার উপরের দিকে কোঁটা কোঁটা বাতির আলো, আর একেবারে নীচে কয়লার খাদের জ্বলন্ত আভা। সব কিছু যেন বিস্ময়কর ভয়ঙ্কর ঠেকছে চারিদিকের সব কিছুকে। কেন তার এই দ্বন্দ্ব, এই উদ্‌ভ্রান্তি, যেন তার নড়বার শক্তিটুকু অবধি লুপ্ত হয়ে গেছে? কেন তার মা বাড়িতে বসে এই মর্মপীড়া অনুভব করছেন? মা যে গভীর মর্মপীড়া অনুভব করছেন পল জানত, কিন্তু কেন? কেন মায়ের কথা মনে হলেই মিরিয়ামের উপর তার বিতৃষ্ণা জাগে, কেন মিরিয়ামের প্রতি এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চায় তার মন? মিরিয়াম যদি মায়ের মনঃপীড়ার কারণ হয়, তাহলে মিরিয়ামের উপর সে বিরূপ হয়ে ওঠে—অবলীলাক্রমে মিরিয়ামকে সে ঘৃণা করে। কেন মিরিয়াম তাকে এমন ক'রে তোলে যেন নিজের উপর তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, যেন সে অস্থির, অনির্দ্দিষ্ট কোন বস্তু, যেন অনাবৃত রাত্রি আর আকাশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার মত কোন আবরণই তার নেই। কী বিপুল বিতৃষ্ণা মিরিয়ামের প্রতি এক একবার তার জাগে। আর তার পরই বিগলিত কারুণ্যের অজস্র ধারায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সহসা পল আবার এগিয়ে চললো, দৌড়তে সুরু করল বাড়ির দিকে। তার মুখের উপর গভীর যন্ত্রণার ছাপ মায়ের চোখে পড়ল, কিন্তু তিনি কথা বললেন না। নিজের প্রয়োজনেই মাকে কথা কওয়াবার দরকার পলের ছিল। তখন মিসেস মোরেল ছেলের উপর রাগ করে উঠলেন, 'কী দরকার ছিল তার মিরিয়ামের সঙ্গে অত দূর পর্য্যন্ত যাবার।'

গভীর নৈরাশ্যে পল শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কেন মা, ওকে তুমি দেখতে পার না?'

'আমিই কি ছাই জানি!' মিসেস মোরেল যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, 'যাতে ওকে আমার ভাল লাগে তার জন্যে আমি কম চেষ্টা করেছি! বার বার চেষ্টা করি, তবু পারি না।'

আর এই দু'জনের মধ্যে প'ড়ে পলের জীবন হয়ে উঠল রুক্ষ, কোন দিকেই তার আশা করবার মত কিছু রইল না।

সব চেয়ে খারাপ বসন্তকাল। পলের মেজাজ তখন ঘন ঘন বদলায়, সে যেন রুক্ষ, তীব্র, কঠিন হয়ে ওঠে। পল স্থির করল এ সময়টা মিরিয়ামের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তবু মনে মনে পল জানে মিরিয়াম কখন তার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকে। মা দেখেন, ছেলে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে। সে তার কাজ করতে পারে না, কোন কাজেই তার মন বসে না। যেন ওয়াইলি ফার্ম-এর দিকে কোন অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে টানছে। যখন-তখন টুপিটি মাথায় দিয়ে কোন কথা না বলে সে বেরিয়ে পড়ে। মা বোঝেন, ছেলে চললো। পথে বেরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পল। আবার মিরিয়ামের কাছে এসেই সে কঠিন হয়ে ওঠে।

মার্চ মাসে একদিন নেদার হ্রদের পাড়ে পল শুয়ে আছে, মিরিয়াম বসে তার পাশে। ভারী ঝকমকে, রোদ্দুরে আর নীলে মেশানো একটি দিন। বড়ো বড়ো মেঘ মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, কী উজ্জ্বল তাদের আভা, তাদের ছায়াগুলো জলের বুকের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে সরে যাচ্ছে। আকাশের ফাঁকা জায়গাগুলি নির্মল, নীল, ঘন শীতলতা দিয়ে যেন তৈরি ওরা। পুরনো ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পল উপরের দিকে চেয়েছিল। মিরিয়ামের দিকে চোখ চেয়ে দেখতেও যেন অসহ্য বোধ হচ্ছিল তার। মিরিয়াম তাকে চায় বলে মনে হয়, আর সে দেয় বাধা—সারাক্ষণ সে যেন বাধা দিয়েই চলেছে। মিরিয়ামকে তার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, সমস্ত আকুলতা ধরে দেবার কামনা এখনও তার মনে জাগছে, তবু সে একান্ত অক্ষম। পলের কেমন মনে হয় মিরিয়াম তাকে, পলকে, চায় না, চায় শুধু দেহের বাইরে তার আত্মাটাকে টেনে নিয়ে যেতে। তাদের দু'জনার মেলামেশার মধ্যে দিয়ে কোন অদৃশ্য পথে তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত গতিবেগকে মিরিয়াম যেন নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়েছে। তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে মিরিয়াম চায় না—সে চায় না তারা দু'জন হয়; একটি পুরুষ, আর একটি নারী। সে শুধু পলের সত্তাকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিতে চায়। এই ভাবনা পলকে আকুল ক'রে তোলে, সে যেন পাগল হয়ে যায়। সেই পাগলামিরও একটা মোহ আছে, কোন কোন ওষুধ খেলে যেমন হয়।

মাইকেল-এঞ্জেলোর কথা নিয়ে পল আলোচনা করছিল। তার কথা শুনতে শুনতে মিরিয়ামের মনে হ'ল যেন সে প্রাণের চরম রহস্য, জীবনের গূঢ়তম তত্ত্বকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করছে। গভীর পবিত্রতৃপ্তিতে তার মন ভরে গেল। কিন্তু শেষকালে তার ভয় করতে লাগল। ওই পল শুয়ে আছে। তার অনুসন্ধানী মন ঔৎসুক্যে তীব্রতম অনুভূতির স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে, তার গলার স্বর যেন সাধারণ মানুষের মত নয়, কেমন একটানা সুর, যেন স্বপ্নের ঘোরে কে কথা কইছে। শুনে মিরিয়াম ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 'আর বোলো না,' পলের কপালে নিজের হাতখানা রেখে সে যেন মিনতির সুরে বললে তাকে।

পল স্থির হয়ে শুয়েছিল, নড়বার শক্তি তার নেই বললেই হয়। দেহটাকে সে যেন উপেক্ষা করে নীচে রেখে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কেন? বিরক্তি লাগছে তোমার?'

—'হাঁ। আর এতে তোমাকেও কেমন ক্ষয় করে ফেলে।'

পল বুঝল, একটু হাসল মাত্র। বলল, 'তবু ত' তুমি চাও যেন আমি এই নিয়েই থাকি।'

গলা নিতান্ত খাটো ক'রে মিরিয়াম বলল, 'আমি ত' তা চাই না।'

—'না। যখন তুমি অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছ, আর এর বোঝা তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন আর চাও না বটে। কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে, তোমার মন আমার কাছে এই জিনিসটাই চায়। আর বোধ হয় আমিও একেই চাই।' তার অভ্যস্ত ভারী গলায় পল বলতে লাগল, 'তোমার খুশির জন্যে যেটুকু আমি নিজের মধ্যে থেকে টেনে বের করে দিতে পারি তা না চেয়ে যদি শুধু আমাকেই তুমি চাইতে পারতে।'

—'আমি!' মিরিয়াম আহতের মত চীৎকার ক'রে বললে, 'কেন, কখন, কোন্ দিন তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছ আমার কাছে, আমায় গ্রহণ করবার জন্যে।'

—'দেখছি, আমারই দোষ।' পল ধীরে ধীরে বললে। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল, বসে আজে-বাজে গল্প করতে লাগল। নিজেকে একান্ত তুচ্ছ, নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল তার। এর জন্যে মিরিয়ামের উপর অস্পষ্ট একটা বিতৃষ্ণা জাগল তার মনে, আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝতে বাকী রইল না যে, নিজের অপরাধও তার সমান'। কিন্তু তাই বলে মিরিয়ামের উপর বিতৃষ্ণাকে সে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারল না।

এই সময়টাতে একদিন সন্ধ্যাবেলা পল মিরিয়ামকে নিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরছিল। এ দিকের মাঠটা বনের প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে, তারই পাশে দাঁড়িয়েছিল দু'জনে, বিদায় নেবার ক্ষমতাটুকুও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছিল। আকাশে তারাগুলি ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের রাশি আরো ঘন হয়ে এলো। পশ্চিম আকাশে তাদের প্রিয় নক্ষত্র কালপুরুষ মাঝে মাঝে তাদের চোখে পড়তে লাগল। তার ফুটে-ওঠা তারার মণিগুলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ঝলমল করে উঠছে, কালপুরুষের কুকুরটা যেন নীচু হয়ে মেঘের রাশি ঠেলে দৌড়োচ্ছে বলে মনে হয়।

আকাশের অগণিত তারার মেলার মাঝখানে কালপুরুষ নক্ষত্রমালার তাৎপর্য্য ওদের দু'জনার কাছে সকলের চেয়ে বেশী। কত গভীর রহস্যময় অনুভবের মুহূর্তে ওই তারকাপুঞ্জের দিকে চেয়ে রয়েছে দু'জনে, থাকতে থাকতে মনে হয়েছে ওদের নিজেদের জীবন যেন মিলিয়ে গেছে ওর প্রতিটি তারার স্পন্দনের সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় পলের মন বিষণ্ণ, পীড়িত—আজ কালপুরুষকে তার মনে হচ্ছে শুধু সাধারণ একটি নক্ষত্রমালা মাত্র। তার দ্যুতি, তার আকর্ষণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে আজ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মিরিয়াম তার সঙ্গীর চালচলন ভালো করে লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে দেবার মত কোন কথাই পল বলল না। শুধু যাবার সময় হ'লে মুখে বিরক্তির ভ্রূকুটি নিয়ে ঘনায়মান মেঘরাশির দিকে চেয়ে রইল, ওই মেঘপুঞ্জের পেছনে সেই বিরাট নক্ষত্রমালা তখন আকাশের পথ বেয়ে ভেসে চলেছে।

পরের দিন পলদের বাড়িতে কিসের উৎসব, তাতে মিরিয়ামের আসার কথা। পল বললে, 'আমি তোমায় আর নিয়ে যেতে আসব না।'

মিরিয়াম ধীরে ধীরে বললে, 'তাই হবে। বেড়াতে এখন আর মজা নেই।'

'তার জন্যে নয়, ওরা চায় না বলে। ওরা বলাবলি করে, ওদের চেয়ে তোমার জন্যে আমার দরদ বেশী। কিন্তু তুমি ত' জানো, তুমি নিশ্চয়ই জানো—এ শুধু বন্ধুত্ব। তাই নয়?'

মিরিয়াম আশ্চর্য হ'ল, তার অন্তর পলের জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল কত চেষ্টা করেই না সে এই কথাগুলি বলেছে! পাছে তার জন্যে পলকে আরও কোন হীনতা, আরো দৈন্য স্বীকার করতে হয়, এই ভয়ে মিরিয়াম তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে চলে এলো। যেতে যেতে ঝির-ঝিরে বৃষ্টির ধারায় তার মুখ ধুয়ে যেতে লাগল। অন্তরে গভীরে তার আজ আঘাত লেগেছে, মনে মনে তার পলের উপর এই ভেবে ঘৃণা হতে লাগল যে, গুরুজনের কথা শুনে যে-কোন দিকেই ও ভেসে যেতে পারে। আর অন্তরের অন্তস্তলে নিজেরও অজ্ঞাতে মিরিয়াম অনুভব করতে পারল, পল এবার তাকে এড়িয়ে দূরে সরে যেতে চাইছে। বাইরে একথা সে কিছুতেই স্বীকার করবে না মনে মনে পলের উপর অনুকম্পা জাগল তার।

এই সময় জর্ডনের কারখানায় পল অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠল। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ চাকরি ছেড়ে নিজের ব্যবসা খুলতে গেলেন পল জর্ডনের কাছে রয়ে গেল, তার উন্নতি হ'ল পরিদর্শকের পদে সব কিছু ভালোয় ভালোয় গেলে বছরের শেষে তার মাইনে ত্রিশ শিলিং করে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়ে রইল।

তবু শুক্রবার রাত্রে মিরিয়াম প্রায়ই আসত, তার ফরাসী পড়া দেখে নিতে। পল আর আগের মত ঘন ঘন ওয়াইলি ফার্মে যেত না। পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে ভেবে মিরিয়ামের আক্ষেপের সীমা থাকত না। তাছাড়া যতই বিসম্বাদ থাকুক না দু'জনার, দু'জনেই একসঙ্গে থাকতে ভালবাসত। তাই একসঙ্গে বসে তারা বালজাক্-এর বই পড়ত, রচনা লিখত, আর নিজের সাংস্কৃতিক আলোচনায় নিজেরাই মশগুল হয়ে উঠত।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য।

আপোষ

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র

এখানে রাত্রির শেষ ধীরে ধীরে সরে যায় আঁধারের ডানা
আকাশের নীল দেহে জেগে থাকে অপ্রতিভ নিবু নিবু তারা,
পৃথিবীর ঘুম ভাঙে দিকে দিকে দেখা যায় আলোর ইসারা
নিশ্চিন্ত মনের দ্বারে রুক্সির অবাস্তব মোহ দিয়ে যায় হানা।
দিও প্রভাতী রোদ লতা-পুষ্পে তৃণ-গুল্মে রচে শিল্পকলা,
দিও মধুপ দল উড়ে যায় ফুলে ফুলে শোনাইয়া ভোরের সেতার,
তবুও হৃদয়-মাঝে জেগে বার্থতার শব্দ হীন তীব্র হাহাকার
উচ্ছিত স্বপ্নের স্রোতে ধীরে ধীরে সুরু হয় জীবনের গলিপথ চলা।
চিত্তের পর্ব্বত-শীর্ষে জমাট বেঁধেছে যত মৌন-মূক দুঃখের বরফ
হিমবাহ রূপ নিয়ে ধ্বসে পড়ে ক্ষয়ে যায় হৃদয়ের ক্ষুদ্র উপত্যকা,
তুষার-নদীর জলে বয়ে যায় সিক্ত করে অশ্রুজল আঁখির তারকা;
তবুও এখানে আছে আশা বেদনার মাঝে আপোষের প্রাচীন হরফ।
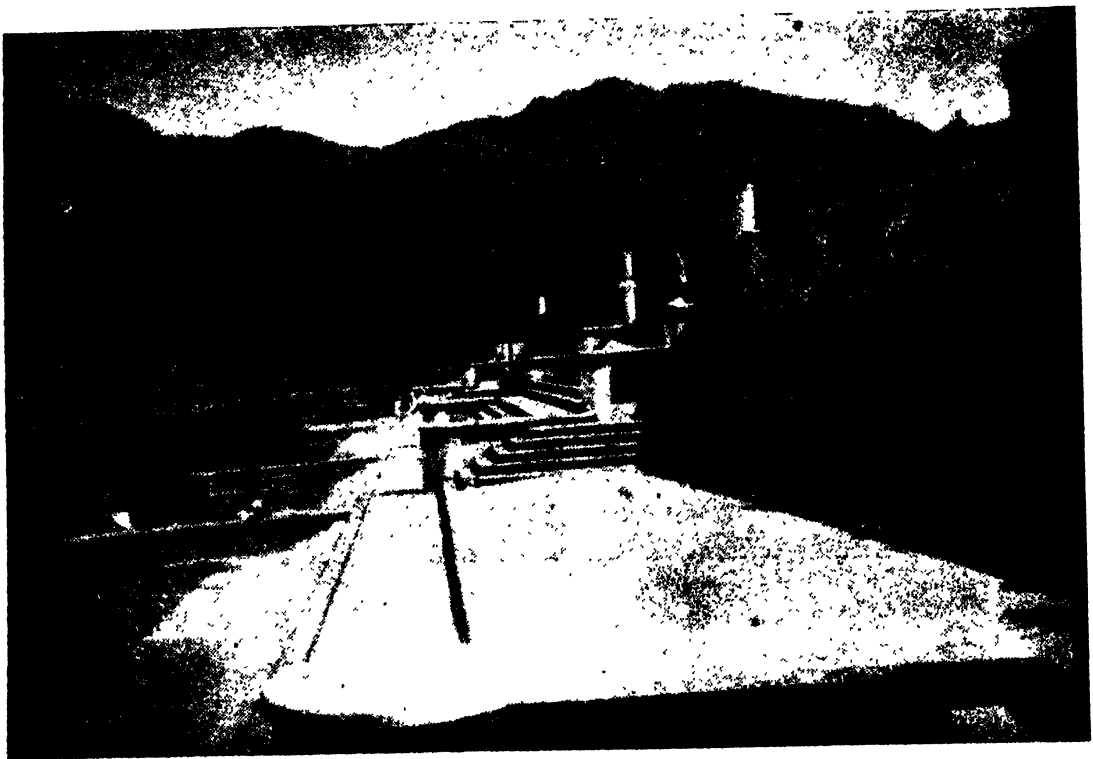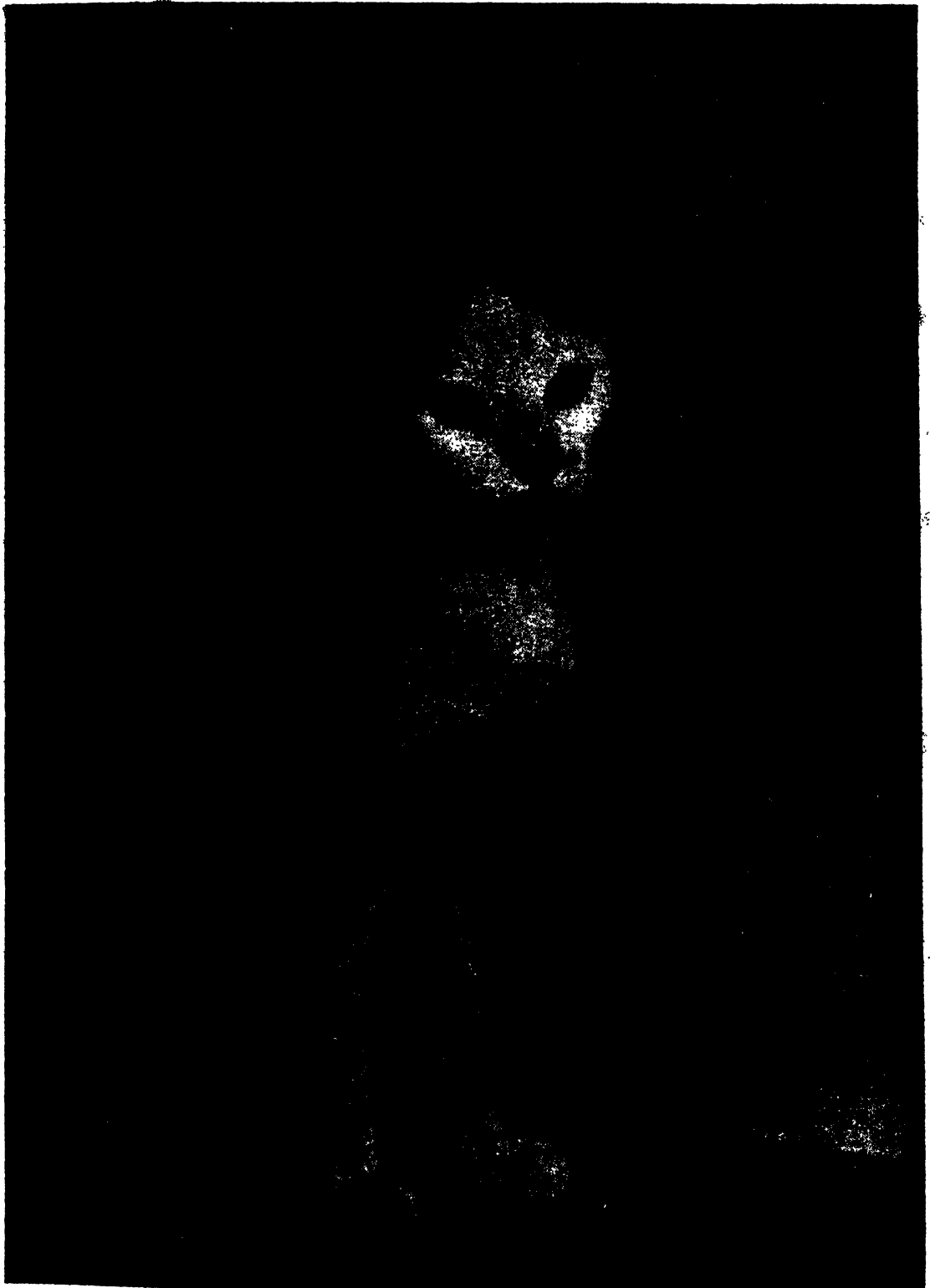
ক্যাকো চান।

—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

পরমপুরুষ
বিদ্যাসাগর

ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল নির্ম্মিত ও
বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতায়
সম্প্রতি স্থাপিত

আলোকচিত্র—মৃণালিনা ঘোড়ই

কলিকাতায়, গোলদীঘির মূর্ত্তি
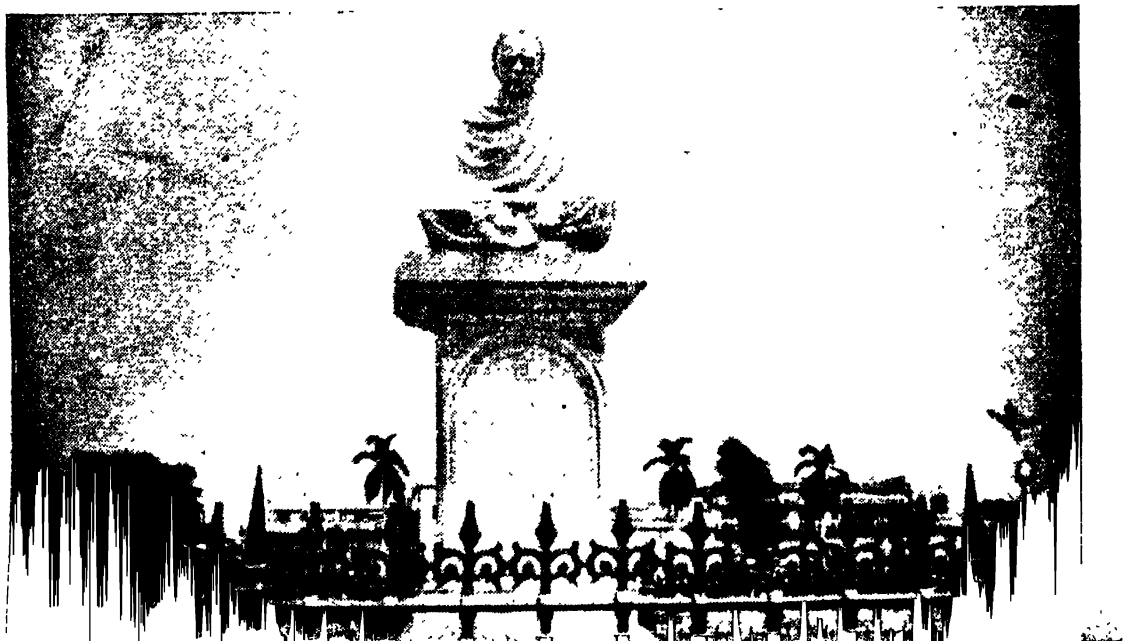
এই যা, আঙুলটা কেটে গেল!

দেখি দেখি, শীগ্‌গির 'ডেটল'টা দেখি!

খালি চোখে যদি কখনও একবার দেখতে পেতেন যে আমাদের চারদিকে কত অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে, তবে এতটুকু কাটা-ছড়াও কখনো তুচ্ছ করতেন না। এই অদৃশ্য জীবাণুগুলির বেশিরভাগই আবার রোগের বিষ ছড়ায়। এমন কি, সামান্য একটা আলপিনের খোঁচার মতন ছোট্ট কাটাকেও এরা বিষিয়ে তুলতে পারে। নিজেকে ও বাড়ীর সবাইকে এসব বিষাক্ত জীবাণুর হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে 'ডেটল' ব্যবহার করুন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নিরাপদ ব'লে প্রসবের সময় ডাক্তাররা 'ডেটল' ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য ব'লে মনে করেন, কেননা প্রসবপথে কোথাও এতটুকু কেটে-ছড়ে গেলে তা বিষিয়ে উঠতে পারে—প্রসূতির সূতিকাজ্বর হয়ে মারাত্মক অবস্থা দেখা দিতে পারে, এমন কি বন্ধ্যা হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

প্রতিকারের চেয়েই প্রতিরোধ করা ভালো

বাড়ীতে সব সময় 'ডেটল' রাখবেন

যাতে দরকার হ'লেই সবাই হাতের গোড়ায় পায়। হাতমুখ ধোয়া কি বাড়ীর জিনিষপত্তর ধোয়ামোছায় 'ডেটল' ব্যবহার করবেন (রুগীর ঘরে 'স্প্রে' ক'রে ছিটিয়ে দেবেন)। ঘরের মেঝে বা নর্দমায় ময়লা জমে দুর্গন্ধ বেরুলে 'ডেটল' ছিটিয়ে দেবেন, নইলে অসুখবিসুখ হতে পারে।

দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলো করবার সময় ছোটদের হামেশাই কেটেছড়ে যায়। কাটা জায়গা 'ডেটল' দিয়ে ধুয়ে দিন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নিরাপদ জীবাণুনাশক—গন্ধটিও ভালো। সুস্থ থাকার জন্যে ছেলেমেয়েদের 'ডেটল' ব্যবহার করতে শিখিয়ে দিন, দেখবেন খুব সহজেই ওদের স্বাস্থ্যরক্ষায় 'ডেটল' ব্যবহার করা অভ্যেস হয়ে যাবে।

দাড়ি কামানোর জলে 'ডেটল' মিশিয়ে নিন। কেটে গেলে 'ডেটল'-এর জলে তা আর বিষিয়ে ওঠার ভয় থাকে না। গলা ব্যথা কি গলা খুসখুসিতে জলে 'ডেটল' মিশিয়ে কুলি করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

বিনামূল্যে "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" পুস্তিকাটির জন্য

আ্যাটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ডিপার্টমেন্ট এফ বি-২, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা-১ ঠিকানায় চিঠি লিখুন।
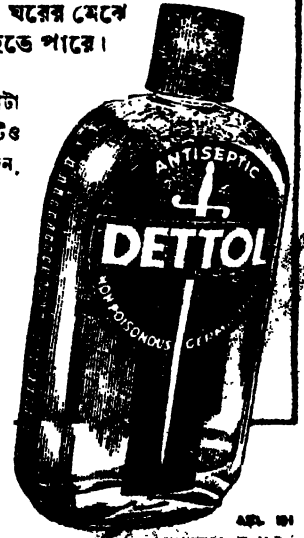
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আট

কৃষ্ণসাগরের জমিদার রাজশেখর রায়ের একমাত্র পুত্র শশাঙ্কশেখরের বিবাহ। উৎসবের বাঁশী তাই বাজতে শুরু করেছে ক দিন আগে থেকেই।

সপ্তাহ পূর্বে যে উৎসবের মাঙ্গলিক শুরু হয়েছে পরবর্তী সপ্তাহটা চলবে তা। এবং শুধু কৃষ্ণসাগরেই নয়, নিশিন্দপুরের চৌধুরীদেরও শুরু হয়েছে উৎসব।

চৌধুরীদের বড় তরফ নিশানাথ চৌধুরীর বড় আদরের একমাত্র কন্যা স্বর্ণময়ী। নয়নের মণি। অধিক বয়সে ঠাকুরের দোরে ধন্না দিয়ে ঐ সন্তান হয় এবং স্বর্ণময়ীর যখন মাত্র দুই বৎসর বয়স তখন স্বর্ণময়ী-জননী রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ একদিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় দ্বিগুণ স্নেহে মাতৃহারা শিশুটিকে বক্ষের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছিলেন নিশানাথ। বৃদ্ধা জননী বসুধারা দেবী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন শুভানুধ্যায়ীদের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ আর করেননি।

না। আর সংসারে নয়। স্ত্রীভাগ্যই যদি তার থাকবে তবে এই অকালে আকস্মিক ভাবে স্ত্রী রাজলক্ষ্মী এমনি করে বিদায় নেবে কেন!

তা ছাড়া স্বর্ণ! সোনার পুতুলী স্বর্ণময়ী সে যে ছিল লক্ষ্মীর বড় আদরের ধন। মৃত্যুর মুহূর্ত পূর্বেও লক্ষ্মীর জ্ঞান ছিল। সেই সময়কার লক্ষ্মীর কথাগুলো ত আজও ভুলতে পারেননি নিশানাথ।

ঘরের মধ্যে মিটি-মিটি প্রদীপ জ্বলছে। রাত্রি তৃতীয় যাম। রোগিণীর কক্ষে আর কেউ নেই। একমাত্র শিয়রের ধারে বসে নিশানাথ।

ওগো! মৃত্যুপথযাত্রিণীর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন নিশানাথ: লক্ষ্মী।

দেখি। আমার দিকে চাও ত!

নিশানাথ তাকালেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, বল।

ও কি! তোমার চোখে জল!

কই না ত!

তুমি চোখের জল ফেললে আমার স্বর্ণর চোখের জল কে মুছাবে বল ত? আমি যে তাহলে স্বর্গে গিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। দুর্বল কম্পিত হস্তে রাজলক্ষ্মী স্বামীর চোখের অশ্রু মুছে নিলেন। তার পর আবার বললেন, আমি জানি তুমি থাকতে স্বর্ণর কোন অযত্ন হবে না। তবু একটা কথা বলে যাই স্বর্ণর ভার তুমি আর কারো হাতে দিও না। বল দেবে না ত?

স্বর্ণকে আনবো? একবার দেখবে?

না থাক। তোমার কাছেই ত ওকে রেখে যাচ্ছি—

তাই নিশানাথ রাজলক্ষ্মীর শূন্য জায়গায় আর কাউকেই এনে বসাতে পারেননি। আর সেই স্বর্ণরই আজ বিবাহ।

শয়নকক্ষে রাজলক্ষ্মীর তৈলচিত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একাকী নিশানাথ, লক্ষ্মী! তুমি আজ কোথায় কত দূরে জানি না। কিন্তু যেখানেই থাকো স্বর্ণকে তোমার আশীর্বাদ করো। আজ তার বিবাহ। আশীর্বাদ করো লক্ষ্মী, সে যেন সুখী হয়। তোমার গচ্ছিত ধন এত দিন আমি বুকে করে আগলে রেখেছিলাম, আজ থেকে আরেক জনের হাতে তুলে দিচ্ছি—সে যেন সুখী হয়, এইটুকু শুধু দেখো।

ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজতে বাজতে এসে থেমে গেল।

বাবা!

ফিরে তাকালেন নিশানাথ।

স্বর্ণময়ী! তাঁর নয়নের মণি স্বর্ণপ্রতিমা স্বর্ণময়ী! সোনালী চুমকী বসানো, সোনালী জরিপাড় লাল বেনারসী শাড়ী পরিধানে। হাতে কঙ্কণ, হাঙ্গরমুখী বালা, চুড়ি, বাজুবন্ধ, কনক কেয়ূর, সীঁথি মৌড়। এলো খোঁপায় গোঁজা সোনার কাজললতা। স্বর্ণময়ীর সত্যিই স্বর্ণ-প্রতিমার মত রঙ। চোখের কোলে কাজল, কপালে চন্দন-তিলক। হাতে রুপার রেকাবীতে সকাল বেলার জলখাবার নিয়ে পিতাকে খুঁজতে খুঁজতে স্বর্ণময়ী এই কক্ষে এসে হাজির হয়েছে।

কেন মা?

সেই সকাল থেকে কোথায় ছিলে বল ত! সারা বাড়ী খুঁজে খুঁজে তোমাকে পাই না।

আজ বাদে কাল ত তুই পরের ঘরে চললি মা! তার পর যে কে এমনি করে খুঁজে খুঁজে রোজ এই বুড়ো বাপকে খাওয়াবে, তাই ভাবছি মা!

স্বর্ণময়ীর দুটি চক্ষে জল এসে যায়।

ও কি রে! অমনি চোখে জল এসে গেল? আয়। আয়—কাছে আয়।

খাবারের রেকাবীটা সামনে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি স্বর্ণময়ী বলে, তুমি খাও বাবা! আমি তোমার সরবতটা নিয়ে আসি। বলতে বলতে দ্রুত পদবিক্ষেপে ঘর ছেড়ে চলে যায় স্বর্ণ।

নিশানাথ বুঝতে পারেন চোখের জল গোপন করতেই অমনি করে ও পালাল।

ডাকলেন, স্বর্ণ! শোন মা! শোন।…

নূপুরের শব্দ কেবল অলিন্দে মিলিয়ে গেল।

কুলগুরু জনার্দন শর্মা এসেছেন কাশী থেকে, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে বিবাহের মন্ত্র পড়াবেন। নিজে করবেন হোম।

জলপান করে নিশানাথ বহির্বাটিতে চললেন জনার্দনের কক্ষে।

অন্দর ও বহির্মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে একটি বোষ্টমী একতারা বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গাইছিল:

কাল আসচে হর নিতে গৌরী
শোন! শোন গিরি,
পরাণ আমি কেমন করে রাখি—

থমকে দাঁড়ালেন নিশানাথ।

তাঁর পুরীও আঁধার করে তার গৌরী কাল চলে যাবে।

কক্ষে অলিন্দে আর তার ঝুমুর ঝুমুর নূপুর ধ্বনি শোনা যাবে না। শোনা যাবে না আর তার মধুমাখা ডাকটি, বাবা!

কি নিষ্ঠুর বিধান!

নিরন্তর কি আশঙ্কা, কি স্নেহ, সব কিছু নিঃশেষে পশ্চাতে ফেলে

গেলে যাবে তার স্বর্ণময়ী পরের ঘরে। কেমন করে তিনি থাকবেন? কি নিয়ে কাটবে তাঁর এই শূন্য পুরীতে।

অজ্ঞাতেই চোখের কোল দু'টি নিশানাথের জলে ভরে আসে।

বোষ্টমী তখন গাইছে :—

কেমন করে উমা ছেড়ে থাকবো ঘরে গিরি—

বল! বল শুনি!

হঠাৎ যেন কার মৃদু স্পর্শে চমকে ফিরে তাকালেন নিশানাথ।

নিশানাথ!

দেখলেন সামনেই দাঁড়িয়ে সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ কুলগুরু জনার্দন শর্মা।

চল নিশানাথ। আমার কক্ষে চল! মন খুব উতলা হয়েছে, তাই না?

স্বর্ণকে ছেড়ে এই শূন্য পুরীতে কেমন করে থাকবো গুরুদেব?

এই যে নিয়ম নিশানাথ! কন্যা-সন্তান, সে যে অন্যের সম্পত্তি। জন্ম হতে তার বিবাহের পূর্ব পর্যন্তই তুমি তার রক্ষক ও পালনকর্তা মাত্র।

নিষ্ঠুর এ বিধান গুরুদেব।

মৃদু হাসলেন জনার্দন শর্মা। বললেন, সুখ, দুঃখ, বন্ধন, মুক্তি, আকর্ষণ, বিকর্ষণ এই নিয়েই ত সংসার। তা ছাড়া নারী, ওরা হচ্ছে অমর দীপ, এক সংসার থেকে অন্য সংসারে দীপ জ্বালাতেই ত ওরা জন্মেছে, স্বয়ং মহামায়ার অংশ, এমনিই ওদের মায়া। না যায় ওদের বাঁধা, না যায় ওদের ছাড়া। ওরা নিজেও কাঁদে, পরকেও কাঁদায়।

সবই বুঝি গুরুদেব! কিন্তু মনকে যে কিছুতেই বোঝাতে পারচি না। স্বর্ণময়ী মা আমার শ্বশুরবাড়ী যাবে, ঘর আমার অন্ধকার হয়ে যাবে।

সই! সই! সই! ওলো সই স্বর্ণ!

চুপটি করে বাপের সামনে থেকে পালিয়ে এসে স্বর্ণময়ী দক্ষিণের ঘরের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

সই শ্রীমতীর ডাকে ফিরে তাকাল।

কি হয়েচে সই? এমন আনন্দের দিনে, আকাশে-বাতাসে শুধু যখন সানাইয়ের সুর গান ও কাজল-চোখে অশ্রু কেন সই?

শ্রীমতী আরো একটু এগিয়ে এলো।

এতক্ষণে বুঝি আসবার সময় হলো শ্রীমতী তোর?

কি করি ভাই! আসবো বললেই ত আসা যায় না। জানিস ত সই, বুড়ো অন্ধ বাপ আমার। আমি না খাইয়ে দিলে তার খাওয়া হয় না। খাইয়ে-দাইয়ে তবে ত আসবো?

স্বর্ণর আবার মনে পড়ে যায়, তার বাপ অন্ধ নন বটে, তবু সমস্ত কিছু স্বর্ণর না করে দিলে চলে না। বাড়ী-ভর্তি লোক, তবু স্বর্ণই নিজে সব কিছু করে তার বাপের। বাইরে অমন দোর্দণ্ড প্রবল প্রতাপ লোকটা, অন্দরে একেবারে শিশুর চাইতেও অসহায়। খাবার [illegible] খাবার কথা, এমন কি নিজের সময় সময় নিজের কথাও তাকে স্মরণ [illegible] দিতে হয়।

সে চলে গেলে কে দেখবে তাকে?

এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এলো বসুধারার, স্বর্ণ! [illegible] স্বর্ণ!

অশীতিবর্ষীয়া পিতামহী বসুধারা ডাকছেন স্বর্ণময়ীকে।

ঠাকুমা ডাকচেন? চল শুনে আসি, কেন।

সইকে নিয়ে স্বর্ণময়ী ঘর থেকে বের হয়ে দালান পার হয়ে বসুধারার ঘরে এসে ঢুকল। অশীতিপর বৃদ্ধা আজও সোজা হয়ে চলেন। দেহের চর্ম লোল হয়ে গিয়েছে, মুখে বয়সের বলিরেখা, তবু তাকে দেখলে বোঝা যায়, একদা কি রূপই না ছিল ঐ দেহে!

পূজার ঘর থেকে সবে বোধ হয় ফিরেছেন, পরিধানে শুভ্র-গরদ। সর্বাঙ্গ দিয়ে বেরুচ্ছে স্নিগ্ধ ধূপ ও চন্দন-সুরভি।

আমাকে ডাকছিলে ঠাকুমা?

ডেকে ডেকে গলা আমার ধরে গেল, কোথায় ছিলি বল ত?

পাশের ঘরেই ত ছিলাম!

হ্যাঁ রে, নিশিকান্ত কি বাড়ীতে নেই? সকাল থেকে ত তাকে দেখচি না?

বাবা বোধ হয় গুরুদেবের ঘরে আছেন

এই যে শ্রীমতী এসেছিস! আজ তোর বাড়ী যাসনি মা! সইকে তোর সাজিয়ে-গুছিয়ে দিবি।

বাইরে এমন সময় শঙ্খ ও উলুধ্বনি শোনা গেল

অধিবাস! অধিবাসের তত্ত্ব এসেছে ছেলের বাড়ী থেকে! এ বাড়ীর পুরাতন দাসী বক্সী ঘরে এসে ঢুকল; ঠাকুমা, পিসিমা তোমাকে ডাকচেন, অধিবাসের তত্ত্ব এলো
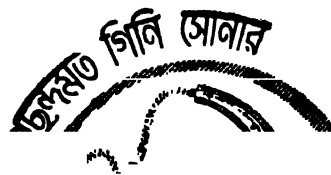
যা তুই বক্সী, আমি আসচি।

বসুধারার মনে পড়ে, পুরন্দর কথা। সাজানো সংসার ফেলে,

থায় কপালে সিন্দুর দিয়ে, পায়ে আলতা পরে অকালে চলে গেল র বুড়ো মাগী তিনি আজও মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন।

নইলে একমাত্র মেয়ের বিয়ে তার, আজ ত তারই সব দেখবার থা!

যা শ্রীমতী, স্বর্ণকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আন।

চল সই! স্বর্ণর হাত ধরে টানে শ্রীমতী।

না। মৃদু আপত্তি জানায় স্বর্ণময়ী।

না কি রে। ওলো আর লজ্জায় কাজ নেই। চল! চল— ক প্রকার জোর করেই টানতে টানতে নিয়ে গেল শ্রীমতী র্ণময়ীকে।

ফুলে-ফুলে বাগান-বাড়ীর দ্বিতলের মেঝেতে পড়ে তখনও কাঁদ- ল চন্দ্রা।

সরযুর তিরস্কারের প্রতিটি তীক্ষ্ণ শব্দবাণ এখনো তার সঙ্গে যেন ক্ষরণ করছে।

কার এ রক্তমাখা বস্ত্র শুনি?

সরযুর প্রশ্নে পাষাণ-মূর্তির মতই যেন প্রথমটায় দাঁড়িয়ে থাকে া। কি জবাব দেবে?

কি, মুখে যে একেবারে শব্দটি নেই? কথাটা আমার মেয়ের নে যাচ্ছে না, না?

তথাপি চন্দ্রা নিশ্চপ।

চন্দ্রা!

আর চুপ করে থেকে কি লাভ? তাই মাথাটা নিচু করে নিম্ন ঠে চন্দ্রা জবাব দেয়, সে এসেছিল।

কে? কে এসেছিল?

জানিস ত তুই!

এত করে সেদিন তোকে বললাম, তবু তুই তার সঙ্গে মিশেছিস? বি বলেই তবে কি তুই পণ করেছিস? ওরে, কেন তুই বুঝতে রছিস না রাজা বাবু রাজশেখর রায় সাক্ষাৎ যম?

নামটা শোনা মাত্রই যেন চন্দ্রা চমকে ওঠে। বলে, কি! কি ম বললি সরযু।

রাজশেখর রায়!

কিন্তু তাঁর তার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক? তোকে বলিনি সেদিন ও যে রাজশেখরেরই একমাত্র লে শশাঙ্কশেখর।

রাজশেখরের ছেলে শশাঙ্কশেখর!...

বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন বছর বার তের আগেকার একটা ত্রির স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে চন্দ্রার। কতই বা বয়স হবে ন তার, মাত্র আট কি নয়। তার বেশী নয়। তবু—তবু স্পষ্টই র সে রাত্রের কথা তার মনে আছে।

শহরের প্রান্তে একেবারে বাড়ীটা। উপরে দু'খানা ঘর। চ দু'খানা ঘর। উপরেরই একখানা ঘরে সর্বদা বন্দিনীর থাকত চন্দ্রা। বাড়ী থেকে বেরুবার কোন উপায় ছিল না র। জ্ঞান হওয়া অবধি সে সেই বাড়ীর ঘরগুলোকেই মাত্র রছিল।

বয়স আন্দাজে দেহের গড়নটা একটু বাড়তিই ছিল চন্দ্রার। আট নয় বছর বয়েসের সময় তাকে বারো তের বৎসরের কিশোরীর মতই দেখাত।

বাড়ীটার মধ্যে প্রাণী বলতে ছিল তিন জন। দাই-মা পদমা। দরোয়ান নাথথু সিং ও সে নিজে। মধ্যে মধ্যে আসত সূর্যকান্ত। সূর্যকান্ত এসে একদিন দু'দিনের বেশী কখনো থাকত না।

সূর্যকান্ত ও বাড়ীতে এলেই ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতো কিন্তু কেন যেন চন্দ্রার সূর্যকান্তকে একেবারেই ভাল লাগত না। বিশেষ করে সূর্যকান্তর চোখ দুটোর কথা মনে পড়লেই ওর গায়ের ভিতরটা যেন কেমন শির-শির করে উঠতো। সাধ্যমত তাই সূর্যকান্তকে চন্দ্রা এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করত।

কিন্তু যে রাত্রের কথা আজও ওর মনে আছে, সে রাত্রে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে, ওর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে দাই-মা পদমা, সূর্যকান্ত ও আর একটি নারী! সেই নারীর হাতে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। হাতের প্রদীপটি ঘুমন্ত চন্দ্রার মুখের কাছে ধরে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে সেই নারী ওর মুখের দিকেই হয়ত তাকিয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সদ্য-ঘুম-ভাঙ্গা চোখে আধো-জাগা আধো-ঘুমন্ত মনে সেই নারীরই হস্তধৃত প্রদীপের আলোয় অর্ধাবগুণ্ঠনের তলায় তার যে মুখচ্ছবিখানি দেখেছিল চন্দ্রা আজো যেন তা স্মৃতির পটে অক্ষয় হয়ে আছে।

ঠিক ঐ মুখখানিই যেন ইতিপূর্বে আরো কত বার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছে। আধো-আলো আধো-ছায়ার মত যার কিছুটা স্পষ্ট কিছুটা অস্পষ্ট।

হয়ত ঘুমের মধ্যে তেমনই স্বপ্নই ও দেখছে এই ভেবে চোখের পাতা বুজিয়ে নিয়েছিল। এবং যখন ভাবচে আবার চোখ খুলবে কি খুলবে না এমন সময় হঠাৎ পদশব্দে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে, সর্বাগ্রে সেই নারী, পশ্চাতে দাই-মা পদমা ও তার পশ্চাতে সূর্যকান্ত ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি চন্দ্রা শয্যার উপরে যেমন উঠে বসেচে তার শয়ন-ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হ'য়ে গেল। রাত্রে তার শয়ন-ঘরের দরজা বাইরে থেকে অমনিই বন্ধ থাকত। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি চন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল তার নিজের ঘর ও পাশের ঘরের মধ্যবর্তী জানালাটার সামনে। জানালার কবাট দুটোও ও-পাশ থেকে বন্ধ। পাশের ঘরে কা'রা যেন ফিস-ফিস করে চাপা কণ্ঠে কথাবার্তা বলচে।

কান পেতে দাঁড়াল চন্দ্রা জানালার বন্ধ কবাটের গায়ে।

দাই-মার কণ্ঠস্বর ওর কানে এলো, দেখা ত হলো, এবারে চলে যাও! আজ-কালকের মধ্যেই রাজা বাবুর আসবার কথা আছে। কখন এসে পড়বেন কেউ জানে না। হঠাৎ যদি এসে পড়েন ত সর্বনাশ হবে!

না। আমি ওকে না নিয়ে যাবো না পদ্মা!

ক্ষেপেচো তুমি, তাহ'লে রাজশেখর রায়কে তুমি চেন না।

প্রত্যুত্তরে শোনা গেল, চিনি না আমি! আমার জীবনের শনি, আর রাজশেখর রায়কে আমি চিনি না?

এমন সময় কে যেন দ্রুত পদে ঘরে এসে প্রবেশ করে বললে, সর্বনাশ হয়েছে! রাজশেখর রায়!...

দাই-মা পদ্মার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, পালাও। পালাও—তার পর শোনা গেল কতকগুলো দ্রুত পদশব্দ।

হঠাৎ যেন বাড়ীটা একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তার পর কোথা থেকে যে কি হলো। অন্ধকারে তার ঘরের মধ্যে কে যেন এসে প্রবেশ করল। তাকে সোজা একেবারে কাঁধে তুলে নিয়ে নীচে চলে এসে ঘোড়ার পিঠে তাকে তুলে নিজেও উঠে বসল সেই ঘোড়ার পিঠে। তার পর ছুটাল সেই ঘোড়া অন্ধকারে।

ঝড়ের মত ঘণ্টা চারেক ঘোড়া ছুটিয়ে লোকটা তাকে এই বাড়ীতে এনে সরযূর হাতে তুলে দিল। সেই থেকেই সে এখানে। আর আজও সে ভেবে পায়নি, কে সেই নারী, কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কেনই বা নিয়ে এসেছে, কেনই বা এমনি করে এই দীর্ঘ কয় বৎসর ধরে নজরবন্দী করে রেখেছে। তবে কি! তবে কি সে ঐ রাজশেখরই?

রাজশেখর রায়ই তাকে এমনি করে বন্দিনী করে রেখেছে! কিন্তু কেন? কেন?

আর! আর সেই রাজশেখরেরই ছেলে শশাঙ্কশেখর। আর সেই শেখরকেই দিয়েছে সে মন প্রাণ সব নিঃশেষে। এ সরযূ কি শোনাল তাকে! সরযূ তাকে কি শোনাল!

সানাই বাজছে।

নিশ্চিন্দপুরের চৌধুরী-বাড়ী আজ যেন আলোয় আলোয় ঝলমল করছে।

রক্তরাঙা বেনারসী শাড়ী পরিধানে, তাতে সোনার জরীর ফুল। কপালে চন্দন-তিলক। সর্বাঙ্গে জড়োয়ার রত্ন আভরণ।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় বিবাহশয্যায় স্বর্ণময়ীকে যেন ইন্দ্রাণীর মতই দেখাচ্ছে। সই শ্রীমতী, স্বর্ণময়ীর চিবুকটি ধরে একটু নাড়া দিয়ে বললে, সত্যি সই, তোর রূপে মেয়েমানুষ আমি, আমারই যে মাথা ঘুরে যাচ্ছে ভাই, ভাবচি সে বেচারীর না জানি আজ কি দশাই হবে!

সখীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে স্বর্ণময়ী বলে, কী হচ্ছে!

শ্রীমতী গুন্ গুন্ করে গেয়ে ওঠে,

মনে হয় সই ও রূপ-সাগরে
আমিই মরি লো ডুবে।

বাইরে এমন সময় একটা অস্পষ্ট গোলমাল শোনা গেল, বর এসেছে, বর এসেছে!

সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠে ওঠে মিলিত উলুধ্বনি. উলু! উলু! উলু! আর তারই সঙ্গে যোগ দেয় বহু শঙ্খধ্বনি।

বর এসেচে! বর এসেচে!

ঘরের মধ্যে স্বর্ণময়ীকে ঘিরে এতক্ষণ যে সব কিশোরী যুবতীর দল ছিল তারা ছুটে যায় অলিন্দের দিকে, কলরব করে বোধ হয় বর দেখতেই।

কি সই! যাবি না! চল একবার লুকিয়ে দেখবি! শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর হাত ধরে আকর্ষণ করে! কিন্তু স্বর্ণ সইয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে ওরে, তুই যা!

ওলো আমি ত যাবোই! তুইও আয়!

না। তোর দেখবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তুই দেখগে যা!

হ্যালো হ্যাঁ! পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ! চল। চল ভিড়ের মধ্যে কেউ টের পাবে না। না হয় আমি আড়াল করেই রাখবো তোকে।

না!

ফের না? চল বলছি—হাত ধরে টেনে তোলে শ্রীমতী স্বর্ণময়ীকে।

আঃ, কি হচ্ছে ছাড়। ছাড় বলছি!

না। তোকে যেতেই হবে! চল—চল!

এক প্রকার জোর করেই হাত ধরে টানতে টানতে শ্রীমতী অলিন্দের দিকে নিয়ে চলে স্বর্ণময়ীকে।

হঠাৎ পরনের শাড়ীতে পা বেধে গিয়ে হোঁচট্ খায় স্বর্ণ এবং উঃ, করে বসে পড়ে। খোঁপা থেকে সোনার কাজললতাটা এক পাশে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ে।

কি হলো! কি হলো সই!

হোঁচট খেয়ে বাঁ পায়ের আঙুলের একটা নখ উঠে গিয়েছে। আলতা-রাঙানো পায়ে রক্তের ধারা মিশে যায়। সর্বনাশ! এ যে রক্ত! শিউরে উঠে শ্রীমতী।

অমন করছিস কেন? একটু না হয় কেটে গিয়ে রক্তই পড়েছে। কি হয়েচে তাতে?

অলিন্দে বর দেখতে আর যাওয়া হয় না।

ফিরে আসে দু'জনেই আবার ঘরে। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেয় সচেতনে শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর। কিন্তু চোখে জল ভরে আসে শ্রীমতীর। এ কি হলো! আজকের দিনে এ কি অমঙ্গল।

সখীর ছলো ছলো চোখের দিকে নজর পড়তেই স্বর্ণময়ী বলে ওঠে, ওকি সই! কাঁদছিস কেন?

আমাকে ক্ষমা কর সই! মুখপুড়ি আমি, কি করতে কি করে ফেললাম।

কি হয়েছে তাতে? না হয় একটু আঙুলটা কেটেই গিয়েছে। মুখে শ্রীমতীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেও নিজের মনের মধ্যে কিন্তু স্বর্ণর অদৃশ্য একটা কাঁটা খচ্-খচ্ করতে থাকে!

তাই ত। একি হলো!

অনাঘ্রাত অক্ষত নিজেকে সে একজনের চরণে নিবেদন করবে বলেই না মনে মনে সেই শুভলগ্নটির প্রতীক্ষায় ছিল। এ কোথা থেকে কি হলো?

এমন সময় বাইরে পিতামহী বসুধারার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এ কি! কাজললতাটা এখানে পড়ে কেন?

চমকে ওঠে স্বর্ণময়ী। তাই ত হোঁচট্ খেয়ে পড়বার সময় খোঁপা থেকে কাজললতাটা যে ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিল খেয়ালই ত ছিল না তার।

স্বর্ণময়ী ও শ্রীমতী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, আর ঠিক সেই সময় ঘরে এসে প্রবেশ করলেন পিতামহী বসুধারা! হাতে তার সোনার কাজললতাটা।

তিনি ডাকলেন, স্বর্ণ!

[ক্রমশঃ।

অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে চারটি প্রাণীর জীবনধারা এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। তা যদি না হ'ত তাহ'লে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনেত্রী লেনোর কি ভাবে এলাইন অ্য গাভ্রিলাকের কাছে এসে এমন আন্তরিক আবেদন জানাতো?

আর লা-তুর-দ্য অঁদ্রে মরোয়া, যে অসিচালনার অ, আ, ক, খ, জানতো না সে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম অসিধারী নোয়েলকে (উদ্ধত মার্কুই অ্য মেনেস) দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করত কি করে? স্বয়ং রাণী মেরী আঁতোনেতের আপনজন এই মেইন!

অপ্রতিহত মার্কুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়ে তেমন সতর্ক ছিলেন না। সেদিন স্যাটো অ্য মেনেসের প্রাঙ্গণে তাঁর সঙ্গে অভিজাত বংশোদ্ভূত আরো তিন সহচর ছিলেন, তাঁরাও নিহত হ'তেন যদি রাণীর রক্ষীদলের শেভলিয়ে অ্য সারবিলেন এসে না বাধা দিতেন।

অতিশয় বিরক্ত হয়ে রাণী নোয়েলকে ডেকে পাঠালেন, তার পর অতি কঠোর কণ্ঠে বললেন: "তুমি যে আমার অমাত্যদের হত্যা করে বেড়াবে তা আমি সইবো না, এখন যা সময় তাতে অমাত্যমণ্ডলীর সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।" এই বলে রাণী তার গায়ে কয়েকটি পুস্তিকা ছুঁড়ে দিলেন: মার্কাস ব্রুটাস এই ছদ্ম নামে Liberty, Equality, Fraternity (সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা) শীর্ষক এই পুস্তিকা রচিত হয়েছে।

রাণী বললেন: "গত কাল আমার বালিশের তলায় দেখি একটা পুস্তিকা কে রেখে দিয়েছে, আর সম্রাট তাঁর ব্রেকফাষ্ট টেবলেও এমনই একটি পুস্তিকা পেয়েছেন।" কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো রাণী আঁতোনেতের, তিনি বললেন: "ওরা যে কি চায় জানি না, কেন লেখে এই সব?"

পুস্তিকাটি পকেটে রেখে নোয়েল বললেন: "ওরা চায় আমাদের জমি, আমাদের মাথা, আর আমাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব। তুমি এই সব মার্কস ব্রুটাসদের নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ো না, লোকটা যেই হোক্, আমি নিজে তাকে ঠাণ্ডা করবো।"

কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলেন রাণী আঁতোনেত।

"আর একটা কথা মনে এসেছে, সেই জন্য তোমাকে ডেকেছি নোয়েল।" প্রাসাদের নৃত্যশালার চমকপ্রদ অলিন্দে নোয়েলকে ডেকে নিয়ে গেলেন রাণী আঁতোনেত। নীচে একদল তরুণীকে একজন দক্ষ নৃত্যশিক্ষক নাচ শেখাচ্ছেন। সদ্বংশজাতা, সুশীলা, এবং গুণবতী অষ্টাদশী মেয়েরাই এই দোগাতার অধিকারিণী।

রাণী স্পষ্ট করে বললেন: "তুমি একজন মার্কুই, পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত যুবক। একদিন হয়ত অসিখেলাতেই তোমার জীবন শেষ হ'বে, ফ্রান্সের প্রাচীনতম পরিবারের যদি এই ভাবে বংশলোপ ঘটে তাহ'লে দুঃখের আর সীমা থাকবে না।"

নোয়েলের চাটুকারিত্বের অর্থ এই যে, রাজবংশীয় এই মনোহারিণী আত্মীয়ার প্রণয়ে হতাশ হয়েই সে আজো অকৃতদার হয়ে আছে। অতিশয় সম্ভ্রম সহকারে অভিবাদন জানিয়ে নোয়েল বলল—"তুমিই আমার পাত্রী নির্বাচন করে দাও।"

অপরূপ লাবণ্যবতী একটি তরুণীকে দেখালেন রাণী। বললেন: "আমার ত' মনে হয় এই মেয়েটিকে তোমার মনে ধরবে।"

মেয়েটি উপরে উঠে এল, তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইল নোয়েল। রাণী মেয়েটিকে বললেন : "এলাইন, এই ছেলেটি মার্কুই দ্য মেনেস। মার্কুই তোমার প্রতি অনুরক্ত, আর আমাকে সেই কথাটুকু জানাতে অনুরোধ করেছেন।" তার পর নোয়েলের দিকে তাকিয়ে সস্মিত ভঙ্গীতে বললেন : "এই মেয়েটির নাম এলাইন দ্য গাব্রিলাক্।"

নোয়েল মেয়েটির সুন্দর করপল্লবে অভিবাদন জানিয়ে বললেন : "চমৎকার নাচ আপনার, নিশ্চয়ই গান করতেও পারেন ?"

কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল : "অতি সামান্যই পারি।" মেয়েটির চোখে কিন্তু দুষ্টুমি ভরা।

সে বলল···"ভালো রাঁধতে পারি না বটে তবে দাবা খেলতে পারি ভালো, আর 'স্নেক ল্যাডার' (সাপ এবং মই) পারি আরো ভালো। তবে বারো বছর বয়সে আলজেব্রার অঙ্ক কসা ছেড়ে দিয়েছি।"

রাণী খুসী হয়ে বললেন—"মেয়েটি বেশ তেজোময়ী। বুঝলে!" হেসে নোয়েল বলে—"তাই ত' দেখছি।" তার পর মেয়েটিকে বলল—"যত দিন প্যারীতে আছি তত দিন কি আপনার খিদমতে থাকতে পারি ?"

"বাবাকে বলব, তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যখন বাড়ি যাবো তখন তাঁকে বলে দেখব।"

দৃঢ় গলায় রাণী বললেন : "আমি তোমার বাবাকে চিঠি দেব। আমার একান্ত বাসনা যে, তোমাদের দু'জনের প্রীতির বাঁধন সুদৃঢ় হোক্।"

ঠিক সেই মুহূর্তে প্যারীর পথে তরুণ আঁদ্রে মরোস্না আপেলা আননা এক পল্লীবালার কোমল গণ্ডে চুম্বনরেখা এঁকে দিল। উভয়েই 'এক খড়ের গাড়ির যাত্রী। এদিকে গাড়ির সামনের আসনে বসে সংশয়হীন বাপ নিদ্রাতুর হয়ে ঢুলছিল। মৃদুস্বরে আঁদ্রে বলে—"বিদায় ক্যাম্পিসো!" তার পর এক লাফে পথিপার্শ্বস্থ এক ঘোড়ায় চড়ে ছুটে পালালো।

আঁদ্রে এক অপরিচ্ছন্ন ভ্রাম্যমান রঙ্গশালার গাড়ির পাশে যখন পৌঁছালো তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। একটা ওয়াগনের ভেতর ঢুকে মৃদু গলায় আঁদ্রে বলে "লেনোর, প্রিয়তম, আমি এসেছি। তোমার পদপ্রান্তে সেবক হাজির। দেখো বেলুনে চড়ে একেবারে স্পেনে পৌঁছেছিলাম।"

বিছানার ওপর যে উঠে বসলো সে কিন্তু লেনোর নয়। আঁদ্রে পালায়, চীৎকার করে বলে—"লেনোর, কোথায় তুমি ?"

একটা ওয়াগনের গায়ে লেখা আছে Binet Presente Ses Comedians Celebres (বিনের খ্যাতনামা নাট্যদল) সেখান থেকে একজন তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি উঠে এল,—লোকটি বিনে স্বয়ং। আঁদ্রেকে দেখে সে মৃদুগলায় বলে—"বোধ হয় তোমার জন্য অপেক্ষা করে বেচারী হায়রাণ হয়ে গেছে। তাই আর তাকে আপন করতে তুমি পারলে না। মঙ্গলবার অন্য জনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।"

বিশ্রী গালাগাল দিয়ে আঁদ্রে আবার ঘোড়ার রেকাবে পা দেয়।

যে গাড়িটিতে লেনোর আর ভ্যানো চলেছে তার পরিচালকের মুখে কেমন একটা উদ্ধত ভঙ্গী। এই ধনী ব্যক্তিটির সঙ্গেই লেনোরের বিবাহ স্থির হয়েছে লেনোরের অঙ্গে শুভ্র পোষাক, ভ্যানোর উপহার হীরকখচিত ব্রেসলেট পেয়ে সে আনন্দে আকুল হয়ে উঠেছে। স্থূলাঙ্গ ব্যক্তিটি লেনোরকে নিবিড় বাহুর বাঁধনে বেঁধেছে।

ঠিক সেই সময় কোচোয়ানের উদ্ধত মুখ গাড়ির ফাঁকে দেখা গেল—লেনোর তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে "তুমি !"

মধুর ভঙ্গীতে হেসে আঁদ্রে বলে—"কেমন আছো, বন্ধু !"

"ভালো আছি কোচোয়ান !"

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ভ্যানো বলে ওঠে—"গাড়ি থামাও।"

আঁদ্রে বলে—"ধৈর্য ধরুন ! আমরা এসে গেছি। লেনোরের বিয়ে হবে, না খুকী !"

ভ্যানো চীৎকার করে ওঠে—"তুমি কে হে ?"

গির্জার দোরগোড়ায় পৌঁছে কোচবাক্স থেকে নামার উদ্যোগ করে আঁদ্রে বলে—"আমিও অনেক সময় ভাবি, আমি কে ?" তার পর গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে বললে: "লোকে আমাকে আঁদ্রে মবোয়া বলে ডাকে।" তার পর সম্ভ্রম সহকারে অভিবাদন জানিয়ে সরে এসে দাঁড়ায়।

বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিতা লেনোরের প্রতি তাকিয়ে আঁদ্রে বলে—"ভারী চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু, তবে এই বিবাহের ব্যাপারে আমার একটু সন্দেহ আছে।" এই পর্যন্ত বলে লেনোরকে কাছে টেনে নিয়ে আবেগভরে চুম্বনে অভিষিক্ত করে আঁদ্রে।

বাহুবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে অতি মৃদু গলায় লেনোর বলে, "কিন্তু আমার নতুন বর—"

আঁদ্রে হেসে জবাব দেয়—"তিনি আর এ অঞ্চলে নেই।"

শূন্য আসনের দিকে লক্ষ্য করে লেনোর তার পর হাতের দ্যুতিমান ব্রেসলেটের পানে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—"ওকে কিন্তু আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

আঁদ্রে বলল—"এইবার তোমাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবো। আমার বন্ধু ফিলিপে দ্য ভ্যালমোরিণকে বলেছি দুপুরের মধ্যে আংটি নিয়ে হাজির হতে। সেই আমার নিতবর।"

এল কিন্তু একটি ছোট্ট ছেলে, আঁদ্রে গির্জার দ্বারপ্রান্তে প্রায় পৌঁছবে এমন সময় ছেলেটি এসে বলল—"আপনি যদি ম'সিয়ে আঁদ্রে হ'ন তাহলে এখনই বাড়ি চলে যান, বাড়িতে বড় বিপদ।"

আঁদ্রে ছুটলো গাড়ির দিকে,—তার পর গাড়িতে উঠে চেঁচায়—"হঠাৎ বে-কায়দায় পড়েছি, তোমাকে আপন করে পেতে তাই আরো একটু দেরী হবে। ভয় পেও না বন্ধু !"

অতি দ্রুতগতিতে দ্য ভ্যালমোরিণের বাড়ি পৌঁছে ভিতরে যেতেই ফিলিপের মা মাদাম দ্য ভ্যালমোরিন ওকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: "ভগবান সদয়, তুমি এসে পড়েছ ! রাজার পাইক-পেয়াদারা ফিলিপেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। চার দিক খুঁজে দেখলো—সে নিরাপদ বটে কিন্তু ওরা নজর রেখেছে।"

অত্যন্ত ভয় পেয়ে আঁদ্রে বলল—"সে কোথায় ?"

কোচম্যানের পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়তেই উদ্বিগ্নচিত্তে প্রশ্ন—"এ কি ! আঁদ্রে, তুমিও কি বিপদে পড়েছ নাকি ?"

"এখনও ঠিক পড়িনি, তবে পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। বাইরে গাড়িতে একটি মহিলাকে বসিয়ে রেখেছি, তাঁর মেজাজ প্রতি মিনিটেই চড়ছে।"

ম'সিয়ে ডি ভ্যালমোরিণ সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন, তাঁর পিছনে ফিলিপে, আঁদ্রে এই ফিলিপের সঙ্গে সহোদরের মত মানুষ হয়েছে। ফিলিপে ছেলেটি মহাতেজা এবং অভিমানী।

আঁদ্রে উদ্বেগভরে প্রশ্ন করে—"ব্যাপার কি ?"

"ওরা ধরতে পেরেছে আমিই এসব লিখেছি, আমিই মারাকাস ব্রুটাস।" এই বলে সে আঁদ্রের হাতে "Liberty, Equality, Fraternity" নামাঙ্কিত বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা কয়েক খণ্ড দিল।

ফিলিপে পুনরায় বলে—"আজ সারা প্যারিসে এই পুস্তিকা ছড়ানো রয়েছে, এমন কি রাণীর শয়নকক্ষেও কয়েকখানি কপি রাখা হয়েছে,—অভিজাত শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আজ আমরা হাজারে হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি।"

ম'সিয়ে ভ্যালমোরিণ বললেন—"গরীব হলেও অভিজাত বংশে আমার জন্ম, তোমার দেহেও তাই রক্ত, এই পুস্তিকায় তীব্র রাজদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে।"

ফিলিপে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে—"বাবা ! তুমি বুঝবে না,— আঁদ্রে পুস্তিকাটির পাতাগুলি উল্টিয়ে দেখছিল, তার দিকে ফিরে ফিলিপে বললে—"তোমার কি ধারণা ! কি মত ?"

আঁদ্রে মৃদু গলায় বলল—"ব্যাকরণ আর বিরামচিহ্ন ঠিক মত হয়নি।"

ফিলিপে রেগে ওঠে—"কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার। সব কিছু লঘু ভাবে নেওয়া চলে না।"

হতাশভরা কণ্ঠে মাদাম বললেন—"এখন কি হবে বাবা ?"

কোচম্যানের পোসাক গা থেকে খুলে ফিলিপের হাতে দিয়ে আঁদ্রে বলে—"মার্কাস ব্রুটাস অবিলম্বে গা ঢাকা দিক। নাও পোষাকটা পরে ফেলো।" তার পর কোচম্যানের টুপি আর চাবুক তার হাতে দিয়ে বলল—"বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বুক ফুলিয়ে বাইরে চলে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ো। কেউ কিছু প্রশ্ন করবে না শুধু গাড়ির ভিতরকার মহিলাটি কিছু বলতে পারেন। এমন কি ক্ষেপেও উঠতে পারেন। তুমি কিন্তু তাকে ফরেষ্ট অব্ বোডরীতে নিয়ে যাবে। কাছে টাকা আছে ?"

মাথা নাড়লো ফিলিপে। আঁদ্রে বললে—"রাস্তার মাইল-পোষ্টের কাছে রাত ন'টায় তোমার সঙ্গে দেখা করবো। যাও পালাও।"

আবেগভরে মাকে জড়িয়ে ধরল ফিলিপে। তার পর ম'সিয়ে ভ্যালমোরিণের দিকে তাকিয়ে বলল—"বাবা, আমাকে মার্জনা করো। আমি অতি দুঃখিত।"

বৃদ্ধ তাঁর মূল্যবান তরবারি কোমর থেকে খুলে নিয়ে তুলে ধরলেন, তরবারির উপর অঙ্কিত পারিবারিক চিহ্ন সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ছেলের হাতে তরবারি দিয়ে বৃদ্ধ ভ্যালমোরিণ বললেন—"এই পবিত্র তরবারির সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখো।"

ছেলে চলে যাওয়ার পর ভ্যালমোরিণ কম্পিতকণ্ঠে আঁদ্রেকে বললেন—"ওর বয়স বড় কম, তুমি লক্ষ্য রেখো বাবা!"

আঁদ্রে প্রতিজ্ঞা করলো—"নিশ্চয়ই, আপনি আমাকে সারাজীবন সাহায্য করেছেন। আর টাকা! টাকার জন্য আমি এখনই আমার এটর্নী কেবিয়ানের কাছে যাচ্ছি।"

এক মুহূর্তের জন্যও মনে হল না আঁদ্রের যে এটর্নী বছরে একবার মাত্র মোটা টাকা ভাতা হিসাবে দেন। আঁদ্রের অজ্ঞাতপরিচয় পিতার দান। ঘরে ঢুকতেই ক্ষৌরকর্মরত বৃদ্ধ কেবিয়ান ওর অনুরোধ সোজা প্রত্যাখ্যান করে বললেন: "এই বার থেকে ভাতা দেওয়া বন্ধ হল, সেই ভদ্রলোক আর কিছু দিতে পারবেন না।"

নাপিতকে সরিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে ক্ষুরটা কেড়ে নিয়ে শাণ দিতে দিতে আঁদ্রে বলল—"তাহ'লে আমাকেই স্বয়ং সেই ভদ্রলোকের কাছে ছুটতে হবে। তাঁর নাম।"

কেবিয়ান কিছুতেই সে নাম প্রকাশ করতে রাজী হলেন না—তখন উত্তেজিত আঁদ্রে বলল—"ত্রিশ বছর ধরে প্রচুর টাকা আমাকে দেওয়া হয়েছে, পিতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করিনি আমি। এখন আমার টাকার প্রয়োজন, এই উচ্ছৃঙ্খল মানুষটির মুখোস খোলার সময় হয়েছে।"

তারপর সহসা কেবিয়ানের গলার কাছে ক্ষুর এনে আঁদ্রে জোর গলায় বলে ওঠে—"কে সেই ব্যক্তি?"

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বৃদ্ধ অস্পষ্টকণ্ঠে বলে—"গাব্রিলাক, কাউণ্ট ডি গাব্রিলাক! নরমাণ্ডি! দিয়েপের কাছে মানর ডি গাব্রিলাক তাঁর ঠিকানা।"

একটা ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ে আঁদ্রে সেই সন্ধ্যায় অরণ্যাঞ্চলে ফিলিপের সঙ্গে দেখা করলো। ফিলিপে বলল—"লেনোর ভীষণ চটে গেছে, গাড়ি থেকে নেমে পালিয়েছে!"

আঁদ্রে চটে যেতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিলিপে বলে—"আমি আবার তোমাকে পথে বসালাম।"

আশ্চর্য! এইবার কিন্তু ফিলিপের অনুতাপে হেসে উঠল আঁদ্রে, বলল—"আরো অনেক কাজ আছে।" তার পর ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে বলে "চলো গাব্রিলাক যেতে হবে।"

ভোর হয়ে গেছে, ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আঁদ্রে, এমন সময় কোথা থেকে তীব্র বেগে একটা গাড়ি এসে কাদা ছিটিয়ে গেল, সারা গায়ে কাদা মেখে আঁদ্রে বলে ওঠে—"আমার গায়ে কি বিশ্রী কাদা লাগল!"

গাড়ির ভিতর থেকে একখানি সুন্দর মুখ হেসে উঠে বলে—"ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা!" এই বলে তার রুমালটা আঁদ্রের দিকে এগিয়ে দেয়। গাড়ি চলে গেল।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই ওরা দেখে গাড়ির একটা চাকা খুলে গেছে। আর সেই মেয়েটি একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আঁদ্রের মনটা হঠাৎ খুসীতে ভরে ওঠে। সে সুর করে বলে—"পথের ধারে ডায়নাকে হারিয়েছি কিন্তু বিধাতার কি করুণা, এখন খানার ধারে পেলাম আফ্রোদিতি।" আমার নাম আঁদ্রে মরো, আপনার কিছু সাহায্য করতে পারি?"

... এ্যালকেমিষ্টদের ঘোষণার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের সম্বন্ধ
কিন্তু দূরে
কেমব্রিজের গণিতের অধ্যাপক ডাঃ আইজাক বারো,
ঘোড়ার
পষ্টার মশাই!) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে,
এগিয়ে যায়।
চেয়ে অনেক প্রতিভাশালী গণিত-বিজ্ঞানীর
করে মনে মনে ...
...াই ১৬৬৯ সালে তিনি তাঁর এই অসাধারণ
দেখছি শুধু রোমাণ্টিক
লুকাসিয়ান অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ
মুহূর্ত আসে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই কোচ...
...পকের পদ গ্রহণ করবার অনেক
মেরামতি শেষ হয়েছে।"
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে সমাদৃত
মেয়েটি মধুর গলায় বলে—"বিদায় ক...
...ষ্ঠিত হওয়ার পরে
যেতে হবে।"
—অনুচুলা

কোচম্যান মেয়েটিকে দরজা খুলে ভেতরে বসিয়ে দেয়।

কিন্তু বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, অপর দরজা দিয়ে আঁদ্রেও এসে হাজির।

অতি মৃদু গলায় আঁদ্রে বলে—"চেঁচিও না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি!—আমার জীবনে এসে আবার যে তুমি কি জাতি কি নাম ধর, কোথায় বসতি কর, না জানিয়ে চলে যাবে সে চলবে না।" তার পর মেয়েটির হাতটি ধরে কররেখা পরীক্ষার ছলে বলে—"তুমি বাড়ি ফিরছ, দেখা করতে যাচ্ছ"—

"বাবার সঙ্গে।" তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে মেয়েটি।

হস্তরেখা দেখার কপট অভিনয়ের অবকাশে গাড়ির দরজায় অঙ্কিত শীলটা নজরে পড়ে আঁদ্রের। সে বলে—"তোমার বাবা কাউণ্ট"—

ততক্ষণে দরজায় অঙ্কিত নামটা পড়ে ফেলেছে আঁদ্রে। বজ্রাহত কণ্ঠে বলে আঁদ্রে—"ডি গাব্রিলাক!"

"ঠিক বলেছ!" সানন্দে বলে ওঠে মেয়েটি। "আমি, আমি এলাইন ডি গাব্রিলাক আমার বাবা কাউণ্ট ডি গাব্রিলাক।"

আঁদ্রের মুখের বিস্ময়-বিমূঢ় চাহনি লক্ষ্য করে মেয়েটি বলল—"কিন্তু তোমার মুখখানি এত ম্লান হয়ে এল কেন, শরীরটা কি তেমন সুস্থ নেই?"

মানর ডি গাব্রিলাকের বিশাল চত্বরে এসে গাড়ি থামলো। মেয়েটি আগ্রহভরে বলে ওঠে—"এসো একটু বিশ্রাম করে যাও, আমার বাবা তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই ভারী খুসী হবেন।"

ধীরে ধীরে যেন সচেতন হল। এলাইনের অনুসরণ করে আঁদ্রে। এই বাড়ি এলাইনের বাবার, এই বাড়ি আঁদ্রের পিতৃদেবের। আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল আঁদ্রে, সহসা এলাইনের বুকফাটা শোকোচ্ছ্বাসে তার চৈতন্য হল। সারা বাড়ি শোকে মগ্ন। শবাধারের পাশে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে। পুরোহিত প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করছেন।

ক্রন্দনাতুর এলাইন শবাধারের পাশে বসে প্রার্থনা জানায়।

আর বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, সন্তপ্ত আঁদ্রে মৃত পিতার গর্বোদ্ধত মুখের শান্তিময় ভঙ্গীর পানে তাকিয়ে থাকে। তার অন্তর অতিশয় বিচলিত। তারপর দুর্বোধ্য মুখভঙ্গী করে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আঁদ্রে।

[শেষাংশ আগামী সংখ্যায়।

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

যে গাড়িটিতে লেনোর আর ভ্যানো চলেছে তার পরি
মুখে কেমন একটা উদ্ধত ভঙ্গী। এই ধনী ব্যক্তিটির সঙ্গেই
বিবাহ স্থির হয়েছে লেনোরের অঙ্গে শুভ্র পোষাক, ভ্যা
হীরকখচিত ব্রেসলেট পেয়ে সে আনন্দে আকুল হয়ে
ব্যক্তিটি লেনোরকে নিবিড় বাহুর বাঁধনে বেঁধেছে। ...রতরঙ্গ ধরা পড়েছে
ঠিক সেই সময় কোচোয়ানের উদ্ধত মুখ অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন
গেল—লেনোর তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে "তুমি... এফ বার্ক, এবং তাঁকে
মধুর ভঙ্গীতে হেসে আঁদ্রে বলে—"...ওয়েলথ সায়াণ্টিফিক এ্যাণ্ড
"ভালো আছি কোচোয়ান।" ...জসন। এই ধরণের একটি আবিষ্কারের
ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ভ্যা... নি।

...ক তাঁর এই পর্যবেক্ষণ প্রতি সেকেণ্ডে ২২ মেগাসাইকলস্ ফ্রিকোয়েন্সিতে চালাচ্ছিলেন এবং ঘটনাচক্রেই বলতে পারেন তাঁর টেলিস্কোপের এক অংশে বিরাজ করছিল বৃহস্পতি গ্রহ। হঠাৎ পাওয়া গেল ভাসা ভাসা বেতারতরঙ্গের সঙ্কেত, যার সময়কাল মাত্র ১ সেকেণ্ড; এই অভিনব তথ্যকে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করবার জন্য আরও এক মাসের বেশী সময় বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ অনুসরণ করে পর্যবেক্ষণ চালান হয়। তরঙ্গের সময়কাল অত্যন্ত কম হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একটি গণ্ডীবদ্ধ কেন্দ্র থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ঐ বেতার-তরঙ্গের অবস্থিতির সন্ধান কেবলমাত্র ঐ একবারই তিন দিন ধরে পাওয়া গিয়েছে।

* * * *

আপনারা সকলেই দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। দীর্ঘ জীবন যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের জীবনী বিচার করে দীর্ঘ জীবনের কারণাকারণ নির্দ্ধারণ করছেন সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, রাশিয়ার খারকভ অঞ্চলের গোর্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, রিসার্চ ইনস্টিটিউট্ অফ বায়োলজি ৯০ বছর এবং তার উর্দ্ধের বয়স্ক সমস্ত সোবিয়েত নাগরিকের দীর্ঘ জীবনের একটি নির্ঘণ্ট চয়ন করেছেন।

এই নির্ঘণ্ট থেকে জানা গিয়েছে, সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রায় ৪০,০০০ লোকের বয়স ৯০ বছরের ওপরে এবং এর মধ্যে প্রায় ৫৫০০ জন লোকের বয়স ১০০ থেকে ১১০ এর মধ্যে। ৭১৭ জনের বয়স আরও বেশী এবং এই সমস্ত বুড়ো-বুড়ীদের মধ্যে বুড়ীদের সংখ্যাই শতকরা ৭৫ ভাগ। কেবলমাত্র একটি পরিবারের কথাই আপনাদের বলছি, মহম্মদ ইজ্জোভ বাস করেন আজারবাইজান গ্রামে। তাঁর বয়স ১৩৭ বছর, তাঁর স্ত্রীর বয়স ১২০ বছর এবং কন্যাও ১০০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, এই নির্ণীত ফলাফল জীবন ও দেহবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের সমাধান ঘটিয়ে দীর্ঘ জীবন লাভের বৈজ্ঞানিক কারণাকারণ নির্দ্ধারণ করে এই বিষয়ের গবেষণা সুসম্প্রসারিত করবে।

* * * *

সমুদ্রের তলদেশের পরীক্ষাকার্য্য সহজসাধ্য করবার জন্য বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক প্রকার নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন! রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের উদ্ভাবক এবং পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এর দ্বারা সমুদ্রের তলদেশের মাটি বা জমা তলানির ঘনত্ব ও অন্যান্য গুণাবলী জলের সঞ্চালন না ঘটিয়ে পরিমাণ করা যাবে। এই নতুন যন্ত্রটি এক ধরণের পেনিট্রোমিটার (Penetrometer) এবং সমুদ্রের তলদেশের ব্যবহার ছাড়াও জমির উপর উঁচু রাস্তা নির্মাণের বিভিন্ন কাজেও একে ব্যবহার করা সম্ভব।

* * *

জাহাজে লাইফ-বেল্টের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী, কিন্তু যে লাইফ-বেল্টের প্রচলন আছে তা সব সময়ে প্রয়োজন মতো কাজে আসে না। এতে মাথাকে আশ্রয় দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই, যার ফলে জ্ঞানহীন মানুষের পক্ষে এর আশ্রয় নেওয়া অনেক সময় মারাত্মক হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই লাইফ-বেল্ট যে ব্যবহার করবে, সোজা থাকবার জন্য তাকে নিজে চেষ্টা করতে হবে। গত মহাযুদ্ধের সময়ই এই লাইফ-বেল্টের অসুবিধা দেখা গিয়েছিল, তাই ব্রিটিশ নেভী এক নতুন ধরণের লাইফ-বেল্টের প্রচলন করেছেন। নতুন ধরণের এই লাইফ-বেল্টের আকৃতি এমন ভাবে নির্ম্মাণ করা হয় যাতে নির্ভরশীল ব্যক্তির দেহ ও মাথা সর্ব্বদাই জলের ওপরে থাকে। লোকটি যদি অচেতন হন এবং কোন দুর্ঘটনায় তাঁর মাথা জলের মধ্যে নেমে যায়, তাহলে ঐ নতুন ধরণের লাইফ-বেল্টটি নিজের থেকে ঘুরে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করে দেয় যাতে আশ্রয়প্রার্থী তার পিঠের মাঝখানে উঠে আসেন।

* * *

নির্ভুল কাঁটার উত্তরে সময়কে বেঁধে দেবার চেষ্টা সমগ্র জগতেই চলেছে—অনেকেই চেষ্টা করছেন আণবিক ঘড়ি নির্ম্মাণ করবার, যার সময় পরিমাণের ক্ষমতা অস্বাভাবিক। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, ম্যাসাচুটেকস্ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজির, নিউক্লিয়ার ল্যাবোরেটরীর ডিরেক্টার ডাঃ জেরল্ড জ্যাচারিয়াস একটি অভিনব আণবিক ঘড়ি নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হয়েছেন, যার সময় পরিমাণ করবার ক্ষমতা খুবই বেশী। ঐ ঘড়িটি যদি ২ হাজার বছর ধরে চলে তাহলে তাতে মাত্র আধ সেকেণ্ড সময় ভুল হবার সম্ভবনা থাকে। এ ধরণের ঘড়ির একটি সম্পূর্ণ নির্ভুল মডেল তিনি নির্ম্মাণ করেছেন এবং সর্ব্বসাধারণ যাতে এই ধরণের ঘড়ির ব্যবহারের দ্বারা উপকৃত হতে পারে তার চেষ্টাও চলেছে। শোনা যাচ্ছে, বোষ্টন অঞ্চলের কোন একটি কোম্পানী এই ঘড়ি প্রস্তুত করা আরম্ভ করেছে এবং খুব শীঘ্রই একে বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠান হবে।

এই আবিষ্কারের আর একটি দিক আছে—যার আকর্ষণ ও মূল্য বিজ্ঞানী-সমাজকে চঞ্চল করে তুলেছে। এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটির দ্বারা আবিষ্কারক এমন কয়েকটি পরীক্ষা বা গবেষণাকার্য্য চালাতে সক্ষম হবেন, যা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যেমন ডাঃ জেরল্ড আশা করছেন যে, এর দ্বারা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের 'রিলেটিভিটির সাধারণ মতবাদ' পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। এই মতবাদ অনুসারে স্থানের পরিবর্ত্তনে কালেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। অর্থাৎ একটা পাহাড়ের মাথায় এবং তলায় যদি দু'টো ঘড়ি থাকে তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য দু'টি ঘড়িতে দু'রকম সময় জ্ঞাপন করবে। ডাঃ

জেরল্ড মনে করেন, আগামী বছরেই তাঁর আবিষ্কৃত ঘড়ির সাহায্যে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে এই পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

সময়-নির্ণয়কারী যন্ত্রটির প্রচলনের সঙ্গে অনেকেই আশা করেছেন, বিজ্ঞান ও মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবর্ত্তন আসবে। এই আণবিক ঘড়ি 'সিজিয়াম এ্যাটমিক ফ্রিকোয়েন্সি ষ্টাণ্ডার্ড' অনুসারে সময় নিরূপণ করে।

স্যার আইজাক নিউটন

সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন ১৬৪২ সালে যিশুখৃষ্টের জন্মদিবসে ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা আবার বিয়ে করায় নিউটনের বাল্যকাল তাঁর ঠাকুমার তত্ত্বাবধানে কেটেছিল। অত্যন্ত কম বয়স থেকেই যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এবং এই বিষয়ে বিচক্ষণ কার্য্যকলাপ আগামী দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিত। প্রতিবেশীরা তাঁর ঠাকুমাকে বলতেন, নিউটন বড় হয়ে একজন মস্ত নামকরা যন্ত্রবিদ্ হবে, তার প্রশংসায় সকলেই হবে পঞ্চমুখ। ঠাকুমার তিনি মুখ রক্ষা করেছিলেন, প্রতিবেশী ও শুভাকাঙ্খীদের অনুমান সফল হয়েছিল—বর্ত্তমান কালের স্রষ্টা বিজ্ঞানীদের তালিকায় তাঁর নাম সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। বাল্যকালে নিউটন একটি জলঘড়ি এবং একটি সূর্য্যঘড়ি নির্ম্মাণ করেছিলেন, সূর্য্যঘড়িটি আজও তাঁদের প্রাচীন বাড়ীতে সময় নিরূপণ করে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানীর স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে।

মা'র দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুকালে নিউটনের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। মার আদেশে এই সময় তাঁকে কিছু দিন খামারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়, কিন্তু পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখে কয়েক বছর পরেই তাঁকে তাঁর মা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেন।

বিজ্ঞানী নিউটনের প্রতিভার বিকাশ এইবার আরম্ভ হলো। তিনি সমগ্র জগতে বিশ্বের সঠিক পরিচয় জানিয়েছেন, আবিষ্কার করেছেন আলোকের প্রকৃতি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন জন মহামানবের চিন্তা ও গবেষণার উত্তর-সাধক-রূপে তিনি বিজ্ঞান-জগতের এক নতুন রূপ কল্পনা করেছিলেন। বিজ্ঞানী ডেসকার্টেসের গবেষণার সঙ্গে পরিচয় করে তিনি লাভ করেছিলেন 'এ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রীর' জ্ঞান, বিজ্ঞানী কেপলারের কাছে গ্রহণ করেছিলেন গ্রহের গতির মূল সূত্রত্রয় এবং গ্যালিলিওর কাছে গতির নিয়মাবলী। এই গতির নিয়মাবলীই তাঁর গতিবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। আরও দু'টি বিদ্যার প্রতি নিউটনের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। প্রথমটি হলো এ্যালকেমি এবং দ্বিতীয়টি থিওলজী বা ঈশ্বরতত্ত্ব। আজকের বিজ্ঞানের কাছে এ্যালকেমির কোন মূল্যই নেই, কিন্তু নিউটনের যুগে রসায়নবিদ্যা রূপেই এর পরিচয় ছিল। তাই নিউটন একে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি এর পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করে নিজে দেখতেন এ্যালকেমিষ্টদের ঘোষণার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের সম্বন্ধ কতখানি। কেমব্রিজের গণিতের অধ্যাপক ডাঃ আইজাক বারলো, (নিউটনের মাষ্টার মশাই) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কেমব্রিজে তাঁর চেয়ে অনেক প্রতিভাশালী গণিত-বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছে; তাই ১৬৬৯ সালে তিনি তাঁর এই অসাধারণ ছাত্রের জন্য গণিতের লুকাসিয়ান অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করলেন।

১৬৬৯ সালে এই অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার অনেক আগেই নিউটন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে সমাদৃত হয়েছেন। ১৬৬৭ সালে ট্রিনিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছেন আলোক-তরঙ্গের ওপর, আলোচনা করেছেন তাঁর নিজের মতবাদের, ১৬৬৮ সালে তিনি একটি প্রতিফলক টেলিস্কোপ নির্ম্মাণ করে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহের পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন,—উদ্দেশ্য তাঁর আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী সমগ্র বিশ্বে পালিত হয় কি না তাই দেখা। এই সময়ের মধ্যে ক্যালকুলাসের উন্নয়নেও তাঁর দানের পরিমাণ ছিল অসাধারণ। নিউটনের বিখ্যাত রচনাবলী 'Principia' ছাপা হয়েছিল ১৬৮৭ সালে।

বিজ্ঞানের সর্ব্বশাখায় অসামান্য দানের কথা চিন্তা করেই নিউটনকে বলা হয় সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ১৬৮৯ সালে তিনি পার্লামেণ্টে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, প্রায় এক বছর এখানে সভ্য থাকা কালীন কোন দিনই বক্তৃতা দেন নি! ১৬৯৬ সালে তিনি ইংলণ্ডের টাকশালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তাঁর কাজ হলো দেশের মুদ্রা সংস্কার করা—এই কাজের জন্যই ১৭০৫ সালে রাণী এ্যান তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, তাঁর গবেষণাপ্রসূত অসাধারণ দানের জন্য নাইটের সম্মান না পেয়ে রাজ-কোষাগারের কর্ম্মচারিরূপে এই সম্মান লাভ করলেন,—এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা!

১৭০১-১৭০২ সালে নিউটন আবার পার্লামেণ্টে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ১৭০৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৭২৭ সাল পর্য্যন্ত পুনর্নির্ব্বাচিত হয়ে মৃত্যুকাল অবধি এই মহাসম্মান জনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

নিউটন বলেছিলেন,—"I do not know what I may appear to the World; but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea shore, and directing myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me." যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য কথা। জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নিউটনের কুড়োনো উপলখণ্ডের পরিমাণ ও মূল্য, বিজ্ঞান-জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয়।

এবারে খেলা-ধুলার কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ ত্রুটিটি সংশোধন করে দিই। টমাস কাপের নিয়ে উইম্বেলডন টেনিসের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার জন্ম আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আর মহিলা বিভাগের উইম্বেলডন বিজয়ীর পক্ষে যে উল্লেখ করা আছে, এ নিয়ে তিনি পর পর তিন বার চ্যাম্পিয়ান হলেন, এ স্থানে ইতিপূর্ব্বে তিনি পর পর তিন বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন (৪৮, ৪৯, ৫০ সালে)। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্ম দুঃখিত।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড বনাম সাউথ-আফ্রিকা

তৃতীয় টেষ্ট—ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড ও সাউথ-আফ্রিকা দলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের খেলা সুরুতে ইংলণ্ড দলকে বিপর্য্যয়ের মুখোমুখী হতে হয়। পরিত্রাতারূপে দেখা যায় প্রথম দিনে ডেনিস কম্পটনকে। প্রথম দিনের শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড দল ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রাণ করে। শেষ পর্য্যন্ত ঐ দিন কম্পটন আউট না হয়ে ১৫৫ রাণ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংলণ্ড দল ২৮৪ রাণের বিনিময়ে সমস্ত উইকেট হারায়। সাউথ-আফ্রিকা দল ঐ দিন ব্যাট করতে নেমে ৪টি উইকেটের বিনিময়ে ১৯৯ রাণ করে। তৃতীয় দিনের খেলায় ওয়েট এবং উইন্সলারের শতাধিক রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্য্যন্ত প্রথম ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ-আফ্রিকা দল ৮ উইকেটে ৫২১ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করে। ঐ দিন শেষ পর্য্যন্ত ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২য় ইনিংসে ইংলণ্ড দল ১৫০ রাণ করে। শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড দলের ৩৮১ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে টাইসনের মারাত্মক বোলিং কার্য্যকরী হলেও শেষ পর্য্যন্ত সাউথ-আফ্রিকা দল ৭ উইকেটে ১৪৫ রাণ সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংলণ্ড এ খেলায় ৩ উইকেটে পরাজিত হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুই দলের অধিনায়ক তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস ২৮৪, দ্বিতীয় ইনিংস ৩৮১।

সাউথ-আফ্রিকা প্রথম ইনিংস ৫২১, ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দ্বিতীয় ইনিংস ৭ উইকেটে ১৪৫ ডিক্লেয়ার্ড। সাউথ-আফ্রিকা দল তিন উইকেটে জয়ী।

চতুর্থ টেষ্ট—চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচের খেলায় সাউথ-আফ্রিকা দল ১ম ইনিংসে মাত্র ১৭১ রাণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এর প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড দল তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা ১৯১ রাণে শেষ করে। ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক মে ও কম্পটনের ৪৭ ও ৬১ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সাউথ-আফ্রিকা দল ৫০০ রাণ করতে সমর্থ হয়। ম্যাকগু ১৩৩, উইনস্লোর ১১৬, গডার্ড ও কিথের ৭৪ ও ৭৩ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ইংলণ্ড দল ২৫৬ রাণে সকলে আউট হয়ে যায়। অধিনায়ক পিটার মে মাত্র তিন রাণের জন্ম সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত হন। তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ সাউথ-আফ্রিকা দলের জয়লাভ কৃতিত্বপূর্ণ। আগামী খেলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে বলে আশা করা যায়।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—১৯১, দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রথম ইনিংস—১৭১, দ্বিতীয় ইনিংস ৫০০।

ফুটবল

ক'লকাতা মাঠে ১ম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবারের মোহনবাগান দলের লীগ বিজয় কৃতিত্বপূর্ণ। এইবার নিয়ে মোহনবাগান দল ৬ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হোল। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৯, ৪৩, ৪৪, ৫১, ৫৪ সালে মোহনবাগান দল প্রথম ডিভিসনে লীগে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছিলো। এবারে মোহনবাগানকে লীগ বিজয় করতে পুলিশকে ৭-১, ১-০, খিদিরপুর ১-০, ১-০, জর্জ টেলিগ্রাফ ১-০, ০-০ বি-এন-আর ৩-১, ১-০, অরোরা ৩-০, ৩-২, রেল দল ০-১, ১-০ মহঃ স্পোর্টিং ০-০, ১-২ কালীঘাট ২-০, ২-০, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৪-০, ১-১ রাজস্থান ১-১, ১-১ এরিয়ান্স ০-০, ০-০, উয়ারী ০-১, ১-০, ইষ্টবেঙ্গল ১-১, ২-০ গোলে পরাজিত করে লীগ বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছে।

এবারে কলকাতা মাঠের খেলায় ঠিক মত মান বজায় থাকেনি। ছোট ছোট দল বড় বড় দলগুলিকে সহজেই নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে! এতে বেশ বোঝা যায়, কলকাতা মাঠের ফুটবলের মান দিন দিন অবনমিত হচ্ছে। লীগ পাল্লায় শেষ পর্য্যন্ত অরোরা দলকে নেমে যেতে হল।

এবারে দ্বিতীয় ডিভিসনের খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত লীগ পাল্লায় হাওড়ার ইণ্টারন্যাশনাল দল বালী প্রতিভার সংগে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে লীগ পাল্লায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য হোল। এবারে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ানের গৌরব অর্জ্জন করলো বালী প্রতিভা। আগামী বারে বালী প্রতিভাকে প্রথম ডিভিসনে খেলতে দেখা যাবে।

আন্দোলন করুন

ক'লকাতা মাঠের ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের বর্ষার সময় ভেজা আর চ্যারিটি ম্যাচ ও গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলির টিকিট না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হওয়া বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। প্রতিবারই ফুটবল মরশুমে ষ্টেডিয়ামের কথা উঠছে আর ধামা চাপা পড়ছে। তাই এবার যখন ষ্টেডিয়ামের কথা উঠেছে, জল্পনা-কল্পনা কিছুটা এগিয়েছে তখন ক্রীড়ামোদীদের অনুরোধ করি তাড়াতাড়ি ষ্টেডিয়াম হওয়ার জন্যে আন্দোলন করুন।

ক'লকাতা ফুটবল মাঠ পরিপূর্ণ কয়েকটি জনপ্রিয় দলের খেলায়, কিন্তু এই সমস্ত দলের মধ্যে কয়েকটি দলের নাম পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। কারণ, এর মধ্যে প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ও রাজস্থান দলের নাম অচিরেই পরিবর্ত্তন করার জন্ম আন্দোলন করুন।

এ আন্দোলনের জন্ম নিজে চিন্তা করে দেখুন, এ যুক্তি ন্যায়সঙ্গত কি না। আশা করি প্রতিটি ক্রীড়ামোদী এ কথার সমর্থন করবেন।

টুক্‌রো খবর

কিছু দিন পূর্ব্বে রাশিয়ান ফুটবল দল ভারত সফর করে গেছে। এবার ভারতীয় দল রাশিয়া সফরে ১৫ই আগষ্ট রওনা হবে। ২২ জন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। অধিনায়ক হয়েছেন ভারতের প্রথিতযশা খেলোয়াড় শৈলেন মান্না। আর সহঃ-অধিনায়ক হয়েছেন আমেদ খাঁ। রাশিয়া সফরে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণ—গোল—এস শেঠ (বাংলা), সঞ্জীব (বোম্বাই); রাঃ ব্যাক্—আজিজ (হায়দ্রাবাদ), সোমান (বোম্বাই); লেঃ ব্যাক—মান্না (অধিনায়ক বাংলা) লতিফ (হায়দ্রাবাদ); রাঃ হাঃ ব্যাক্—চন্দন সিং (বাংলা); রতন সেন (বাংলা); সেণ্টার হাফ ব্যাক—সালাম (বাংলা); সালভি (বোম্বাই), লেঃ হাঃ ব্যাক্—জোসেফ ক্রীষ্টি (মহীশূর), নূর মহম্মদ (হায়দ্রাবাদ); রাইট-আউট—কানাইয়ান (বাংলা), গিরীশ রজ (ইষ্ট পি); রাইট ইন—সায়েক (হায়দ্রাবাদ), আমেদ খাঁ (সহঃ অধিনায়ক বাংলা), সেণ্টার ফরোয়ার্ড—এস ঘোষ (বাংলা); এমলন ম্যাক্সবি (বোম্বাই); লেফট ইন—পূরণ বাহাদুর (সার্ভিসেস); এ ত্রাগঞ্জ (বোম্বাই); লেফট আউট—এস রায় (বাংলা), জে, এণ্টনি (মহীশূর)।

নিউজিল্যাণ্ড সফরকারী দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স দল এ পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা খেলেছে, তার প্রত্যেকটিতে জয়লাভ করেছে। প্রথম টেষ্টে ওয়াণ্ডারার্স দল ৩-২ গোলে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। দিল্লী সফরকারী দলের মধ্যে কয়েক জন প্রখ্যাত খেলোয়াড় আছেন।

* * * *

নর্দ্দামটনসায়ার ও ল্যাঙ্কাসায়ার দলের খেলায় নর্দ্দামটনসায়ারের পক্ষে সুব্বারাও ২৬০ রাণ করে নট আউট থাকেন। এ মরশুমে সুব্বারাওয়ের ব্যক্তিগত ২৬০ রাণই সর্ব্বোচ্চ রাণ। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে আর্ণাল্ড হোমার ডার্বিশায়ারের পক্ষে ২২৭ রাণ করেছিলেন।

রোইঙ্ (নৌকা বাইচ)

রোয়িং দেখতে পাবেন দক্ষিণ-কলকাতার লেকে। লেকের শীতল হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন রোইঙের দৃশ্য। সুঠাম ভঙ্গীতে বৈঠা-চালনা আবার আমেজে বোটকে ছেড়ে দেওয়া। Practice-এর সময় এ রকম চললেও প্রতিযোগিতার সময় থাকে তুমুল উত্তেজনা। তবে অনুশীলনের সময় বড় একটা আলস্য কোন খেলোয়াড়ের আসতে দেখা যায় না। আধুনিক কালের রোয়িং-এর বোট আর বৈঠা চালনা পদ্ধতি খানিকটা বিজাতীয় অনুকরণে। এর মধ্যে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ছাপ প্রায় পুরোপুরি।

নদী-মাতৃক দেশ বাংলা। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে আছে নৌকা বাইচ। যদিও ক্রমে ক্রমে বাইচ বিলুপ্তির পথে চলে আসছে, তবুও আধুনিক কালের রোইঙের সঙ্গে নৌকা বাইচের তফাৎ প্রচুর। বাইচের নৌকার কারুকার্য্য বহন করতো সেকালের লোক-শিল্পকে। আর এ বাইচ প্রতিযোগিতার জন্য এক ধরণের বিশেষ নৌকা প্রস্তুত হোত। সে নৌকাকে বলা হোত 'সরঙ্গা'। নৌকার দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে বসে বৈঠা টানত। রোইঙের বৈঠা যেমন যুক্ত থাকে, সে রকম বাইচের বৈঠা যুক্ত থাকতো না। নৌকার আকার অনুযায়ী পাইকের সংখ্যা ঠিক হোত।

বাংলা দেশে এক কালে জমিদারদের প্রতাপ ছিল প্রচুর। তখন তাঁদের বিলাসের একটি অঙ্গ ছিল এই বাইচ। আর তার নাম ছিল নৌকাবিলাস। গান-বাজনার আয়োজন হোত প্রচুর। গান-বাজনার তালে তালে চলত বৈঠা। এক অপূর্ব্ব পরিবেশ! আবার প্রতিযোগিতার সময় রক্তারক্তির প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

বর্ষার সময় বাংলার নদী যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো তখন একমাত্র নৌকাই চলাচলের প্রধান যান। তাই এর সংগে বাংলার মানুষের যোগসূত্র অস্থিতে, মজ্জায়।

মনসা পূজার পরদিন বৈকাল হইতে নৌকা বাইচের প্রথম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোত। নৌকা বাইচের স্থানকে বলা হোত 'খলি'। বাইচের নৌকা চলাচলের পক্ষে গভীর নদী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

বাইচের প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানের মত কাপ, মেডেল পুরস্কার দেওয়া না হলেও পুরস্কার দেওয়ার একটা রীতি ছিল।

বাংলার পল্লীজীবনের এক বিরাট উন্মাদনা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির অতল গহ্বরের স্পর্শ লাভ করেছে।

শ্রাবণে

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ

শ্রাবণের ধারা বহে ঝর-ঝর গগনের বুক ভাসি;
কোথাও নাহিকো ক্ষণেক বিরাম উন্মাদ জলরাশি।
একে-একে করি ডুবিতে লাগিল পথ-ঘাট-মাঠ সব,
মাঝে মাঝে ওঠে বিজলীর হাসি ধ্বনিয়া ভীষণ রব।

তাণ্ডব সাজে সাজিয়া প্রকৃতি ছুটিছে অধীর বেগে;
ভীম-ভৈরব বেগেতে আবার উঠিল পবন জেগে।
জমাট বাঁধিয়া উঠিল আকাশ কৃষ্ণ-বরণ মেঘে;
না জানি বুঝি বা প্রলয় আজিকে নামিবে ভীষণ বেগে।

পথিক আজিকে আপন কাজেতে না হয় বাহির পথে।
পশু-পাখী যত ফিরিছে সতত দূর-দূরান্তর হ'তে;
স্থান খুঁজে নিতে আপন-আপন ব্যস্ত আজিকে তারা
শত ভেক-কুল আনন্দে আকুল ডেকে ডেকে হয় সারা।

কচিৎ মাঠের পথেতে কৃষাণ চলেছে অটল বেগে;
দৃকপাত নাই কোন দিকে তার কেবলই চলেছে আগে।
কিছু দূর গিয়ে থমকি দাঁড়ায়ে দেখিল ধানের ক্ষেতে,
ভরে গেছে জল, করে টলমল, আনন্দে ওঠে সে মেতে।

অবনীন্দ্র-চরিতম্

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

শ্রীমান, এই কিছু বছর আগে, জোড়াসাঁকোয়, অবনীন্দ্র-স্মৃতি-সভায় কিছু লিখিং পড়তে হয়েছিল আমাকে ; সেখানে ধরতাই করেছিলুম—'চিত্র' শব্দটি সম্বন্ধে ! প্রশংসা পেয়েছিলুম আধুনিক চিত্র-সমাজপতি শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট থেকে। কিন্তু তখন তাঁকে জানানো হয়নি, অবকাশ পাইনি, এই আবিষ্কারের ইতিকথাটি। ঐ আবিষ্কারের মূলেও রয়েছেন আমার গুরুদেব, আর তাঁর রূপসন্ধানী দৃষ্টি। এমন না হলে কি আর, গুরুদেবকে বলি রশ্মিধর গন্ধর্ব। ছবিশাস্ত্র বিষয়ে এমন ভালবেসে তলিয়ে ভাবতে আর কোনো চিত্র-পাগলকে আমি দেখিনি।

ঐ চিত্র শব্দটির অর্থ সংগ্রহের পরেও অনেক শব্দের ব্যূহ ভাঙবার কত চেষ্টাই না গুরুদেব করেছেন। তার ফলাফল তোমার কাছে নিবেদন করবার বাসনা রইল, কিন্তু এখন ঐ 'চিত্র' শব্দটির কুল ফুটিয়ে দিলেই গুরুদেবের পরবর্ত্তী কাজের গুণগৌরব, তার উদাত্তত্ব, সহজেই ধরা পড়ে যাবে তোমার চোখে।

পাণিনির উদ্ভব-যুগে চয়নার্থক চিঞ্ ধাতুর ব্যুৎপত্তি থেকেই আমরা সকলে 'চিত্রং' শব্দটিকে চিনেছি এবং কর্ত্তা ও কর্মের ইচ্ছায় অর্থ পেয়েছি—"নানাকর-লেখ্য," এবং "অদ্ভুত"। বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি ! এই অদ্ভুতত্বের দাবীই আমাদের বাংলা, তথা ভারত, তথা western art-এর আধুনিক শিল্পধারাকে আশ্রয় করে রয়েছে। চিত্র হতে গেলেই নাকি তাকে অদ্ভুত, কিম্ভূত, এমনি একটা কিছু হতে হবে ; অর্থাৎ এমনটি হতে হবে যা কখনও হয়নি ; যা একেবারে সৃষ্টিছাড়া, যা উদ্ভট বলেই অপরূপ। এই ধারণা আমরা এখনও পোষণ করি। কিন্তু হায় কপাল, বৈয়াকরণেরা প্রমাদ ঘটান নি "চিত্র" অর্থে "অদ্ভুত" এই প্রতিশব্দটির ব্যবহার কোরে ; প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃতি—গ্রাম্যখেলা খেলেছে ঐ প্রাচীন বৈদিক শব্দটিকে নিয়ে। শ্রীমান, বলতে দ্বিধা নেই, 'অদ্ভুত' কথাটির অর্থ তোমরা যাই কর না কেন, ওর আসল মানেই হচ্ছে "মহৎ"। Aristotle-এর "wonder" নয় ; একেবারে "মহৎ"। আরো উদারমনের অনুধ্যান। নিঘণ্টু সাফ বলে দিয়েছেন—"অদ্ভুতং-মহন্নামৈতৎ" (নিঘং ৩, ৩, ২৩)। এই হচ্ছে আদিম ও অকৃত্রিম বৈদিক অর্থ। এদিকে "চিত্রং" শব্দটিকে, নিরুক্তকার যাস্কমুনি, পূজা এবং নিশামনার্থক চায় ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করে অর্থ করেছেন—মংহনীয় বা বর্ধনীয়, মহনীয় বা পূজনীয়, শ্রবণীয় ও দর্শনীয়। অতএব শুদ্ধ ভারতীয় পন্থায় একখানি ছবিকে বিচার করে দেখতে হলে, আমাদের আগুন্ত দেখতে হবে ছবিটিতে মহত্ত্বের, পূজনীয়ত্বের, শ্রবণীয়তার ও দর্শনীয়তার পদপাত হয়েছে কি না। চলতি তুলিতে 'অদ্ভুত' কিছু আঁকলে,—হ'য়ে উঠতে পারে সেটি লোকশিল্প, কমার্শিয়াল বা decorative ড্রইং, চোখ-ভুলোনো বা চোখ-ঝলসানো এমন একটা কিছু, কিন্তু তার ভাগ্যে ভারতবর্ষের "ভরত"-ঘরের "চিত্র" হওয়াটি হোলো না ! কপট্-প্রজ্ঞা ঐ মায়ার (art) সন্ধান তাতে কিছু থাকতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ণতার আশীর্বাদ তাতে নেই। অমর হয় না সে সব ছবি।

শ্রীমান, যদি লক্ষ্য করে থাকো, তাহলে দেখতে পাবে, গুরুদেবের পরিণত বয়সের সমস্ত চিত্রেই এই পূজ্য ও পুণ্য স্পর্শ লেগে রয়েছে—ঢেউএ যেন কাঁপছে। আমি যে রকম ক'রে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, গুরুদেবের রচনায় কোথাও তেমন বৈয়াকরণ-বৃত্তি ঘটেনি বটে, কিন্তু নীচের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বুঝতে পারবে, পরিণাম-রমণীয় নিত্যপুষ্পিত বয়সে কোন পরমপদে তাঁর চিত্র-ভাবনা তাঁকে,—নিয়ে চলেছিল।—

"ছেলেছোকরারা আঁকে দেখবে—দেয়ালি পট, ঝাড়লণ্ঠন, একটু রঙ রেখা, ভুলে গেল তাতেই। তারপর এল রসের প্রৌঢ়তা, যেমন মোগল আমলের আর্টের মধ্যে দেখি ; তাদের রঙ, সাজসজ্জা, সে কি বাহার ! তার পর সেই বাহার থেকে পৌঁছল গিয়ে,—রসের আরো উঁচু ধাপে আর্ট, তবে এল বাইরের রঙচঙছুট ছবি সমস্ত, যেন মেঘলা দিনের ছায়া, স্নিগ্ধ গম্ভীর। আর্টের এই কয়টি সোপান মাড়াতে হবে, তবে হয়ত আর্টিষ্ট বলাতে পারব নিজেকে।" (জোড়া পৃঃ, ৬৯)

শ্রীমান্, গুরুদেব এমনি করেই ছবি-লিখতে শেখাতেন। তারি নমুনা একটু দিলুম। নিজে যেমন করে বাচ্চা পাখীকে মানুষ করতে শিখেছিলেন, সেই রকম পদ্ধতিতেই তাঁর গুরুগিরি শিষ্যদের মানুষ করেছে, শিল্পের অন্নকণা গিলিয়ে দিয়েছে কণ্ঠায়, নক্ষত্রের ভাষা ফলিয়েছে শিশিরের জলে। এই জন্যেই, আমার কাছে আমার গুরুদেব আজ হয়ে রয়েছেন—এক অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া, পূজনীয়, উন্মাদিত চিত্র-গন্ধর্ব।

অনেকক্ষণ বকেছি। এখন দুপুর হতে চলেছে। রূপ, চক্ষুঃ,

শিল্প, ও চিত্র-সম্বন্ধে কেতাদুরস্ত কুট্কচালি আলোচনা এইখানেই শেষ করা যাক। "দর্শন" তো দেখা ; কেমন করে রূপে রসে রঙে, ফলিয়ে, সেটিকে দেখাতে হয়, কাল সেই নিয়ে আলোচনা করা যাবে—যাকে বলে গুরুদেবের "ডাক্তারি।"

আমার চোখে শ্রীমান, গুরুদেবের অনেক ছবিই এখন ভাসছে। তাদের প্রত্যেকটিকে জড়িয়ে কিছু না কিছু বলবার জন্যে ছটফট করছে জিহ্বা আর ওষ্ঠ ; কিন্তু কত বলব বলো। তাঁর ছবিগুলিকে সামনে না ধরে কিছু কি ফলিয়ে বলা যায়? ভাষার বাচালতা বা স্নেহ দিয়ে যতই না কেন সৃষ্টি করি চিত্রের বর্ণমালা, জানি, কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারব না সে ছবি। তবু বিদায়ের আগে গুরুদেবের একটি ছোট্ট ছবির কথা বলে যাই ;—

ছবিটির নাম—Flower Offering (1943-45)।

একটি মেয়ে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে চলেছে। কোরা-শাড়ীর ঘোমটা-ঘেরা একটি অল্পবয়সী মুখ, হাতে এক-থালা শাদা ফুল। Torso পরিমাণ ছবি, নেই দেহোন্নতির পরামর্শ। ব্যস্। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, ঐ অতি সাধারণ বাংলা মেয়েটি—রূপসী বলা চলে না তাকে কোনোমতেই,—ভোরের বেলায় ফুলের নিবেদন নিয়ে চলেছে,—না-জানি কোন দেবতার দেউলে। একটু সেরুলিয়ান্ ব্লু, একটু ইণ্ডিগো, একটু ইয়েলো-ওকার-দিয়ে-গড়া পুষ্পপাত্র থেকে আমি যেন বেশ সৌরভ পাচ্ছি পুণ্যহৃদয়ের মত ঐ অপাপবিদ্ধ শুভ্র ফুলগুলির ; আমি যেন শুনতে পাচ্ছি, ল্যাভেণ্ডার গ্রে মুখখানির মৌনমোহন ভাষা ; কনীনিকা কাঁপিয়ে দু'টি চোখের লজ্জা যেন বলছে—

> "দেবতা, আমার পুজো যেন তার কাছে পৌঁছয় !
> কোথায় সে? তাকে আমার ভালবাসা দিও।"

আর আমার নিজের কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো, শ্রীমান্? ইচ্ছে করছে,—জাতীয় সংগ্রহালয় থেকে ঐ ছবিটিকে সাফসুফ তসরুপ করে, আমার গৃহদেবতার মন্দিরে,—টাঙিয়ে রাখি। আমার বাংলা দেশের সমগ্র স্বাধীনাধারা যেন এমনি করেই প্রভাতে ফুল নিয়ে যান, এই প্রার্থনা করতে চাইছে মন। আর ছাখো, ওর কপালের ললাটিকায় ঐ যেন চন্দনের ধূলিনৃত্যটি উল্লসিত হয়ে উঠেছে,...আহা, সেটি যেন চেতনা-বিহ্বল চিহ্নহীন এক আর্টিস্টের অলক্ষ্য চুম্বন এবং আশীর্বাদ।

ছবির ছায়-গুণের কথায় চতুর্মুখ হয়ে লাভ কি? শ্রীমান্, ছবিটি দেখো ;—দেখো শিল্পীর সহজাত নৈপুণ্য।

গভীর বেদনায় আমি তাই বুঝতে পেরেছি,—এই চোখ দিয়ে রূপ-দেখার সার্থকতা। শ্রীমান, পাখীর পালকের উপর হাত বোলালেই, বা পাখীর কতকগুলি Pen and Ink স্কেচ্ করলেই পাখীর তাবং-তত্ত্ব বা তাবং-ভঙ্গিং বুঝতে বা করতে পারা যায় না ; পাখী কী চোখে আমাকে দেখছে, বা জগংকে গ্রহণ করছে, সেই তেবাং মনোভূমিতেও পৌঁছতে হবে রূপদক্ষকে। তবেই সে পারবে,—বিবিধ কৃতির মধ্য দিয়ে, ঐ একটি পাখীকে বিশ্বের পক্ষী-প্রতীকের রূপ দিতে। সেই বিদ্যাই অর্জন করতে চায় শিল্পরসিক, সেই বিদ্যাই জানতেন আমাদের গুরুদেব ; এবং সেই বিদ্যাটিতে পারংগম হয়েছিলেন তিনি, যিনি একদিন পুরাকালে ব্রহ্মার (Vedic) মূর্তি গড়েছিলেন, যিনি একদিন গড়েছিলেন বুদ্ধের স্তিমিত-তারা ভূমিস্পর্শিনী মূর্তি (সারনাথ)।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

রূপের কথা সাঙ্গ ক'রে এবার নিজেই বসে বসে অবাক্ হয়ে ভাবছি, আর হাসছি,—গুরুদেবকে চোখে দেখে কে বলবে—যে তাঁর পেটে পেটে এত বিদ্যে !

আলখাল্লা, জোব্বা ইত্যাদি গায়ে চড়ানো,—'বড় বাড়ীর' তখন একটা রেওয়াজ ছিল, সকলেই পরত। আর যাই বলো তাই বলো শ্রীমান, গুরুদেবের ঐ ঢিলেঢালা জোব্বাটার অন্তর থেকে অন্ততঃ পক্ষে বিদ্যেটা জৌলুসের মত ঠিক্‌রে জাহির হয়ে পড়ত না। উনি যে একটি বিদ্বান মানুষ, এ ধারণাটাই, তখনকার দিনের অনেকের মাথার মধ্যে ছিল না ; থাক্‌লেও দ্বিধান্বিত ভাবে ছিল। আর গুরুদেবও ছিলেন তেমনি। ছিটেফোঁটাও কোথাও গাম্ভীর্য নেই গড়নে! একেবারে প্রহসন! সমস্ত দেহটিই যেন একটি শ্লেষ-বঙ্কিম হাস্য। রবিঠাকুরের নাথখানের বেলায় সকলে সমীহ ক'রে বলতেন—"কীর্তি" ;—কিন্তু অবন ঠাকুরের বেলায় তুড়ি উড়িয়ে বলতেন, "দেখেছ হে,—কাণ্ডটা?" কারণ,—অভিনয়ে হাসির পার্টে অবন সেরা—রবিঠাকুর ফেলিওর : আর প্রেমের পার্টে অবন জিরো, রবিঠাকুর ফুলমার্ক !

শ্রীমান্, সত্যিই ওঁকে দেখে কে বলবে, যে ওঁর পেটে পেটে এত বিদ্যে, আর ওঁর বুদ্ধির কুঁড়িতে কুঁড়িতে সংগঠন চলেছে এক শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের! অথচ এই মানুষটিরই, এই বড়লোকের ঘরের ছেলেটিরই শুনতে পাই শ্রীমান, চিরদিনের সখ ছিল ডাক্তার হবার। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁর কোন সম্বন্ধই নেই, সেই অবনপটুয়ার একদিন সখ ছিল কি না, ডাক্তার হবার।—ওঃ হোঃ—মিস্ত্রি হবার। এও আর একটি হাস্য !

এই ডাক্তার হবার, মিস্ত্রি হবার—উৎস কোথায়, যদি জানতে চাও, তাহলে গুরুদেবের "আপন কথা"—বইখানি উল্টিয়ে দেখো। রবিবিশ্ব তাঁর এই মনের খবর জানত কি না, জানি না, কিন্তু বাড়ীর সকলেই আজো জানে, গুরুদেবের এই ডাক্তার হবার মিস্ত্রি হবার সখের কথা। এই দু'টি অপূর্ণ বাসনা থেকেই তিনি যুগান্তরে লাভ ক'রেছিলেন ছবির রাজ্যের ডাক্তারগিরি-বিদ্যে মিস্ত্রিগিরি-বিদ্যে। হাসির রসের স্থায়িভাবের ভিতর দিয়ে এবার ছবি এঁকে চলতে থাকুক মন।

ঐ নীলমাধব বাবুই—যিনি বাড়ীর ডাক্তার,—তিনি ছিলেন অবন ঠাকুরের ছেলেবেলাকার স্বপন-ডাক্তার। রোগ থাকুক বা নাই থাকুক, রুগী দেখতে আসতেই হোতো তাঁকে! আসতেন ঠিক সকাল ন'টায়, কোনাদিন এতটুকু অদলবদল নেই পোষাকের, গলায় চাদর, বুকে মোটা সোনার চেন। ঝকঝক করছে। তিনি আসতেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসতো বেতের চেয়ার ; আর যেই সরে যেতেন—চেয়ারখানিও যেত সরে। আর ঐ ছাখো বাব্বা,—তাঁর হাতে এক বাঘ-মুখো ছড়ি ;—বাঘের চোখ দুটোয় ছোট ছোট লাল-লাল জ্বলছে মাণিক। কী খাতিরই না ছিল ডাক্তার বাবুর। শুধু ঐ বড় ডাক্তার কেলী সাহেব সঙ্গে থাক্‌লেই তাঁকে যা হোক একটু খাটতে-খুটতে হোতো,—কে বলবে তখন

তিনি নীলমাধব ডাক্তার। একেবারে বুঝেছিস্ রে—ঘরের মানুষটি আর মজার মানুষটি। ডাক্তারের জন্তে পান, জল, তামাক। রোগী বাড়ীতে না-ই থাকুক, দক্ষিণের বারান্দার গল্প-রসিকদের রোগ নির্ণয় ক'রে একটু হেসে তিনি চলে যেতেন, অন্ত রোগী দেখতে।

কিন্তু ডাক্তার হওয়া অবুর হয় না। বড হ'য়ে ইচ্ছে থাকলেও অবুর হয় না।' তখনকার দিনের বঙ্গসংসার ছিল অন্ত ধাঁচের। "বলি, অবু ডাক্তার হবে কেন? ও কেন রোগীর বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরতে যাবে! ওর অভাবটা কিসের?" সাবেকী মেয়েরা সকলেই শুনেছেন, নতুন নতুন বীজাণু বেরুচ্ছে! "কী জানি বাবা, কখন কী রোগ নিয়ে আসবে এই পাঁচপুরুষের ভিটেতে!"

কিন্তু ১৯২৬ সালে ছবি-শাস্ত্রের উপর বাগেশ্বরী লেকচারস দিতে দিতেই গুরুদেব অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত পেয়ে গেলেন ডাক্তারি-খেতাব। আনন্দের হুল্লোড় যখন থামল, তখন প্রায় দুপুরের ঝোঁকে, জোড়াসাঁকোয় উদয় হলুম। টাইটেল্ পাবার পর না-জানি গুরুদেবের মন-মেজাজ আবার কেমন হয়েছে! আদব কায়দার সমীহ বা আদাব জানিয়ে কী যে বলব, মনে মনে মহড়া করতে করতে যখন ধীর পায়ে উদয় হলুম, তখন দেখি গুরুদেব সনাতন কাষ্ঠ-কেদারায় বসে "মমতাজ"-বিবির ছবি আঁকছেন। প্রণাম করতেই দপ্ করে তিনি বললেন—

"সাজাহান"-এর ছবি এঁকে তিন-তিনটে মেডেল পেয়েছিলুম রে। এবার শিষ্য, ছবি না এঁকেই, হ'য়ে গেলুম ডাক্তার। ওষুধ-বিষুধের ডাক্তার নয়—কলের ডাক্তার, রং-এর ডাক্তার। লেকচার না মারলে বুঝেছিস—আজকাল ছবির আর্টিষ্ট হয় না। ছবির আমার ওরা বুঝলই না কিছুই, কর্তবটাও বুঝল না।···পিদ্দিমের এক ফুঁয়ে হ'য়ে উঠেছি এক নীলমাধব কেয়াবাৎ ডাক্তার।"

আমি বলি—"তা, ও রকমের লেখাটা—চারটিখানি কথা নাকি!" ঠোঁট দু'টিকে তৃতীয়ার চাঁদের মত বাঁকিয়ে বললেন—

"কথাই হ'য়ে রইল। কিন্তু তোদের হাতে গিয়ে কি এখন ওটা পড়ছে? দেখিস্, পুস্তকাকারে,—ও তোদের পড়তে পড়তে, ততদিনে আমি টেঁসে যাব!"

আমি বলি—"কী যে বলেন আপনি! ওরা আগে আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে,—তবেই না, বাধ্য হয়েছে খেতাব দিতে।"

হেসে উঠলেন গুরুদেব। "মমতাজ" বিবি-কে পাশের টেবিলের উপর রেখে গুড় গুড় করে আলবোলায় দু'টান টেনে বললেন, "তখন ছবি এঁকে মেডেল পেয়েছিলুম। এবার, কথা বেচে পদক পেলুম। মনে হয়, কোথায় যেন ছবিতে আমার গলদ হয়েছে।"

তারপরে দুটো আঙুলবাঁকা হাত আর দুটো আঙুলবাঁকা পা সামনের দিকে সটান করে দিয়ে, গা-মোড়ান স্বস্তির একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—

"ছবির ডাক্তার হলুম, ছোটুবাবু,—ডাক্তার না হয়ে; সখ ছিল ডাক্তার হব। এখন no fear of blood,operating table; বল্ দেখি, এখন ডাক্তারের প্রথম কাজ কি?"

চুপ করে থাকি। নিজেই গুরুদেব বলেন—"সাহস! আমার কাজ এখন তোদের মধ্যে সাহস ভরে দেওয়া। এখন থেকে আমার ছুটির কাজ! ছবির ডাক্তার হওয়া!"

অনেক দিন পর্যন্ত "ছবির ডাক্তার হওয়া"—ব্যাপারটার সঠিক অর্থ গ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু কানে লেগে রয়েছিল এই কথাটি। তারপর একদিন আমার উপর দিয়ে যে ধক্কোলটা গেল, তাতে বুঝেছি এই ডাক্তারীর বহরটা। হেসো না যেন। কারণ এতে হাসির ব্যাপার থাকলেও সেটা মোড়া থাকবে ছবির ব্যাপারে।

আমার তখন সবে বিবাহ হয়েছে; গুরুদেব খুব খুসী। আর আমিও তখন মনের আনন্দে একটা প্রকাণ্ড Pastel-এর ছবি আঁকছি। গুরুদেবকে একবার জানিয়েছিলুম যে আঁকছি, কিন্তু এতটা বুঝতে পারিনি যে, তিনি স্বশরীরে একদিন বেলা দশটায় আমার "নিজের ঘরে" হঠাৎ আবির্ভাব হবেন। কী কাণ্ড বলত? ছোটোকুটিতে যে ঘর দুটিতে আমি লেখাপড়া নামীয় ফষ্টি-নষ্টি নিয়ে থাকতুম, তার প্রবেশপথ ছিল মাত্র একটি। তার দ্বার বন্ধ করে দিলেই দোতলায় আমি জগৎ-ছাড়া। সেই দ্বারটিতে টোকার আঘাত শুনে, যেই খুলেছি, অম্নি দেখি গুরুদেব! সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বুনো খরগোষের লোমের রঙের একটা আলখাল্লা পরণে, কালো ফিতে পাড হাতে মাথা-বাঁকা লাঠি। আর গুরুদেবের দীর্ঘ দেহ-যষ্টির উপর, যেন বসানো রয়েছে একটি দাড়িহীন যাজ্ঞবল্ক্যের মাথা। পিছনে পড়েছে শ্রাবণদিনের ভিজে রোদ্দুরের আভা। শ্রীমান্ তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখো, কাচের ভিতর দিয়ে এক এক সময় কী মোহন-বাগানী খেলাই না খেলে যায় সূর্যের রৌদ্র। অসামান্ত হয় তার effect। রূপকে ক'রে তোলে অরূপ, বা অপরূপ।

গুরুদেবের হাত থেকে বর্মা চুরুটটি নিয়ে নিলুম। বারান্দায় উঠলেন গুরুদেব। তাঁকে নিয়ে যে কী করব ভেবেই পাই না। ঘরের মধ্যে বসালুম। "বড়বাড়ীর" মানুষ, এসেছেন "ছোট-বাড়ীতে"। অভাবনীয়! কিন্তু আমার এ ঘর student-এর ঘর। অবিশ্যি, সেখানে আমার পোষাক-ঘরও ছিল—বেশ লম্বা।—আর সেই পোষাক ঘরেই,—ছবির প্রকাণ্ড কাঠের বোর্ডখানা ঠেস লাগিয়ে আঁকছিলুম—ঐ সাড়ে সাত ফুটি প্যাষ্টেলের ছবি। বাবাকে, মাকে নেহাৎই খবর দেওয়া দরকার—যে গুরুদেব এসেছেন; কিন্তু গুরুদেব ধপাস্ করে একটা কৌচের মধ্যে বসে পড়ে বললেন—

"না রে, ওদের খবর দিসনি। এখনি চলে যাব। কেন ওদের ব্যস্ত করবি? আর একদিন এসে বুঝেছিস তোর মায়ের হাতের ঐ "মুগ্তির" মোয়াটা নিয়ে পালিয়ে যাবো। আজ, কিন্তু তোর ছবিটা দেখতে এলুম!"

আমার তখন এক পুরাতন ভৃত্য ছিল—নাম "দানসিং"। আলমোরার হুঁসিয়ার আদমি। সে দৌড়েছে ইতিমধ্যে—আর এনেও ফেলেছে পিতৃভৃত্য "হরসিং"-এর কাছ থেকে দুটো 4 Band ডিলুক্স কোরোনা (Corona)। কী চাকরই না ছিল সে সব জমানায়। চাকর চকচকে ক'রে রাখে মনিবদের বিনয়, আর মনিবদের শ্রদ্ধা চক্চকে করে রাখে চাকরদের। তবেই না হয় চাকর! রূপোর সিগারকেস থেকে একটি চুরুট তুলে নিলেন গুরুদেব। চারপাশমুড়ি—ভালো ক'রে সেটিকে ধরিয়ে দিলে সম্ভ্রম-নত দানসিং। তার পরে গুরুদেব উঠলেন আমার ছবির কীর্ত্তি দেখতে। দেখলেন। তার পর হঠাৎ—

"তোর আইডিয়াটা ভালো ঠেকছে রে। আমার বাংলার মেয়েদের কী কম রূপ। ওতেই হবে,—পার করতে যাসনি কখনো ডাচ

ইস্কুলে,—বুঝেছিস আমার কথাটা। দরকার নেই আমাদের কতকগুলো থকথকে মাংসপিণ্ডের নাগা সৌন্দর্য এঁকে। দরকার নেই আমাদের ও ধরণের মডেলের। বুঝেছিস্। এখন—দে, দেখি—একটু অবার্ণ ইয়েলো। ফাঁকি চলবে না বাপু, আঁকবার সময়। যখন সমস্ত খাটুনি শেষ হয়, তখন আসে—ফাঁকির কাজের বেলা।"

Le Franc-এর বাক্স খুলে তখ্‌খুনি অবার্ণ ইয়েলোর stickটা তুলে দিলুম তাঁর হাতে। দু' একটা হাইলাইট দিয়ে stickটা সম্পূর্ণ ঘসে দিলেন সাড়ীতে। দু'-তিন মিনিটের খাটুনি। আর তার মধ্যেই বলছেন "ছোটো ছবি আঁকতে শিখেছিলি, এবার বড় ছবি আঁকতে শেখ। ওর technique আলাদা? ছোট ছবিতে ওয়াশের ভিতরে যা ধ'রে রাখতে হয়, বড় ছবিতে প্রমাণ-মত রঙের পর্দ্দায় পর্দ্দায় সেটাকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হয়। আর বুঝেছিস্—দিয়েও, প্রত্যেক পর্দ্দায় রেখার ডিজাইন এঁকে তার পাশে ধুপছায়া টেনে দিতে হয়। তাই আমি দিচ্ছি। দেখ।"

বলব কি শ্রীমান্, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্রমে কেঁপে উঠল সেই গঙ্গাজলী লালপেড়ে কোরা সাড়ী।

আঁকতে আঁকতে বললেন—"কাংড়া স্কুলের technique-এর ফ্ল্যাট কাজে তোরা ভুলে থাকিস্ নে। আরো উঠিয়ে নিবি, মেজে দিবি, রঙের পর্দ্দা। এখনকার depth charge আলাদা।"

তারপরেই একটু অদ্ভুত হাস্য ছড়িয়ে বললেন—"আর্টের যৌবন আর শৈশবের মধ্যে constitution-এর তফাৎ রয়েছে, সে তারতম্য তোদের জানতে হবে। ভাঁটির টানে,—নেই এখন আমরা। এখন "হিলারী"—জাহাজ জোয়ার-জলে ছুটেছে।" ("হিলারী"—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ষ্টীমারে চড়ে বেড়াতেন)।

কথাটুকু ব'লেই, নিজের হাতে যেটুকু এঁকেছিলেন, সেটুকু হাতের তেলো দিয়ে মেজে দিয়ে বললেন—"গরম হ'য়ে উঠেছে রঙ। লাবণ্য দিয়ে, বুঝলি শিষ্য একটু ধুইয়ে দিলুম।"

[ক্রমশঃ।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর পরিসংখ্যা

রাজ্য ও জেলা	মোট জনসংখ্যা (হাজারের অঙ্কে)	মোট উদ্বাস্তু (হাজারের অঙ্কে)	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে উদ্বাস্তুর শতকরা	প্রতি বর্গমাইলে বসতির ঘনতা
পশ্চিমবঙ্গ	২৪,৮১০	২০,৯৯	+ ৮'২	৭৯৯
বর্দ্ধমান	২,১৯২	৯৬	+ ৪'৪	৮১০
বীরভূম	১,০৬৭	১২	+ ১'১	৬১২
বাঁকুড়া	১,৩১৯	৯	+ ০'৭	৫৯৮
মেদিনীপুর	৩,৩৫৯	৩৪	+ ১'০	৬৩৯
হুগলী	১,৫৫৪	৫১	+ ৩'৩	১,২৮৬
হাওড়া	১,৬১১	৬১	+ ৩'৮	২,৮৭৭
২৪ পরগণা	৪,৬০৯	৫২৭	+ ১১'৪	৮১৭
কলিকাতা	২,৫৪৯	৪৩৩	+ ১৭'০	৭৮,৮৫৮
নদীয়া	১,১৪৫	৪২৭	+ ৩৭'৩	৭৫৯
মুর্শিদাবাদ	১,৭১৬	৫৯	+ ৩'৪	৮২৮
মালদহ	৯৩৮	৬০	+ ৬'৪	৬৭৪
পশ্চিম-দিনাজপুর	৭২১	১১৬	+ ১৬'০	৫২০
জলপাইগুড়ি	৯১৪	৯৯	+ ১০'৮	৩৮৫
দার্জ্জিলিঙ	৪৪৫	১৬	+ ৩'৫	৩৭১
কুচবিহার	৬৭১	১০০	+ ১৪'৯	৫০৭

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১১

তিন দিন পরের ঘটনা।

রঞ্জনের মৃত্যু নিয়ে আলোচনা তখনও চলছে। সে দিন সবে তখন সন্ধ্যা। পরাশরের চতুষ্পাঠীতে আড্ডা রীতিমত জমে উঠেছে। এমন সময় খবর এসে পৌঁছোলো—সীতারাম মুখুজ্যেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

মদন বললে,—হলো তো! দাদা আগেই বলেছিল।

দাদা—মানে পরাশর দাদা। সে তখন ঘরের ভেতর খিল বন্ধ করে আহ্নিকে বসেছে।

মদন তাকে খবরটা দেবার জন্য বন্ধ দরজায় টোকা মারতে লাগলো। দাদা! দাদা!

ভেতর থেকে পরাশর বললে,—কে?

—আমি মদন।

—কি বলছিস?

—দোরটা একবার খোলো।

গাঁজার কলকেয় তখন সে সবে মাত্র আগুন দিয়েছে। দোর খোলে কেমন করে? মাটির ধুনুচিতে খানিকটা ধূপ ফেলে দিয়ে কষে হাওয়া করতে করতে বললে, এখন খুলতে পারবো না। কি বলবি বল্।

মদন বললে—সীতারাম মুখুজ্যেকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে।

পরাশর বললে,—জানি।

মদন ফিরে এসে আড্ডায় বসলো।—শুনলি? পরাশরদা' সব জানে।

—তা জানুক। কিন্তু যে-কথাটা জানবার জন্যে আড্ডাধারীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে সেটা অন্য কথা।

খবরটা যে এনেছিল, তাকে তখন তারা ধরে বসেছে: কি রকম ভাবে নিয়ে গেল? কোমরে দড়ি বেঁধে? হাতে হাতকড়া দিয়ে?

লোকটা বললে,—না।

কথাটা কারও পছন্দ হ'লো না। বললে: ধেৎ! তুই দখিসনি তাহ'লে।

লোকটা সঙ্কটা-ভৈরবীর নামে শপথ করে বললে, সে দেখেছে। হাওয়াগাড়ীতে চড়িয়ে জামজুড়ি থানায় নিয়ে গেল। সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাবে তা সে জানে না।

কিন্তু তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

—সীতারাম মুখুজ্যের মেয়ে মালাকে দেখলি?

—দেখলাম।

—কি করছিল?

—কাঁদছিল।

—মালার মা কি করছিল?

—সে-ও কাঁদছিল।

—আর কেউ ছিল না সেখানে?

—বহুৎ লোক ছিল বাবু! পুলিশ দেখে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল।

বলতে বলতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটা চেনা লোকের কথা। বললে,—বাবু চলে যাবার পর ছুটতে ছুটতে গেলেন তোমাদের ওই বুড়ো শিব বাবু!

মদন বললে,—দ্যাখ তো জিতু, বুড়ো শিব বাড়ীতে আছে কি না।

বুড়ো শিবের খবর আনবার জন্যে জিতু উঠে গেল। আর ঠিক সেই সময় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'লো হারু।

এই হারুর উৎসাহই যেন সব চেয়ে বেশি। হারুই সর্ব্বপ্রথম বলেছিল সীতারাম খুন করেছে রঞ্জনকে।

সীতারাম মুখুজ্যের ওপর তার যে কোনো রকম রাগ বা আক্রোশ আছে তা নয়। মালা আর রঞ্জনকে মুখুজ্যে-পুকুরে নিভৃতে আলাপ করতে দেখেছে হয়ত। তার পর বাকিটা সে কল্পনা করে নিয়েছে।

আজ তার সেই কল্পনা সত্য হয়েছে। শুনে অবধি কেমন যেন একটা পৈশাচিক আনন্দে অধীর হয়ে হারু ছুটে বেড়াচ্ছে একটা বাইকে চড়ে। সুলতানপুর এখন আর ছোট জায়গা নয়। কোথায় সীতারাম মুখুজ্যের বাড়ী, আর কোথায় দেব্ চাটুজ্যের বাংলো! বাইক ছাড়া তাড়াতাড়ি যাওয়াও যায় না।

হারু এসেই জিজ্ঞাসা করলে,—কোথায় পাঠালি জিতুকে?

মদন বললে,—বুড়ো শিব ওখানে গিয়েছিল শুনলাম, তাই সে বাড়ীতে আছে কি না—

কথাটা হারু তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে,—আমি সব ঘুরে এসেছি, আমার কাছে শোন্।

শোনবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে বসলো।

হারু বলে যেতে লাগলো: সীতারাম মুখুজ্যের বাড়ীতে পুলিশ এসেছে শুনেই তো বুঝলাম—বাস্, হয়ে গেছে। কলিয়ারীর আপিস—ছুটি কিছুতেই দিতে চায় না। বললাম রইলো তোমার আপিস, কাল দেখা হবে। ধনীরাম-পিওনের বাইকটা ছিল হাতের কাছে। চড়ে বসতেই হাঁ-হাঁ করে উঠলো ধনীরাম। বললাম, রাখ তোর হাঁ-হাঁ, কাল ঠিক দশটায় ফেরত যদি না পাস্ তখন বলবি। ব্যাটা গজরাতে লাগলো বসে বসে। আমি তো সটান্ একেবারে সীতারাম মুখুজ্যের বাড়ী। গিয়ে দেখি সব ভোঁ ভোঁ। মুখুজ্যেকে নিয়ে চলে গেছে।

মদন বাধা দিলে। কেমন করে নিয়ে গেল? হাতকড়া পরিয়ে? কিন্তু বলতে পারলে না।

হারু লাফিয়ে উঠলো!—হাতকড়া পরাবে কি রকম? অত বড় লোকটাকে হাতকড়া পরাবে? আর সীতারাম মুখুজ্যেই যে বঞ্চনকে খুন করেছে তা-ই-বা কে বললে?

মদন এইবার চেঁচিয়ে উঠলো। বললে,—তুই বলেছিস।

হারু বললে,—বলেছি বেশ করেছি। এখন আবার বলছি মুখুজ্যে খুন করেনি।

মদন বললে, তুই বললে তো হবে না। আমাদের দাদা যতক্ষণ না বলছে ততক্ষণ বিশ্বাসই করবো না।—যাক্, তুই কি দেখে এলি তাই বল্। বুড়ো শিবকে দেখলি?

নিশ্চয় দেখলাম। হারু বললে, বুড়ো শিবকে দেখলাম, মালাকে দেখলাম। মালা কাঁদছিল, বুড়ো শিব বললে, কাঁদিস্‌নে মা, আমি তোর বাবাকে জামিনে খালাস্ করে আনছি আজ। আর তা ছাড়া মিথ্যা কখনও জয় হয় না মা! কিছু হবে না দেখে নিস্।

মদন জিজ্ঞাসা করলে,—তুই তখন কোথায় ছিলি?

হারু বললে,—বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওদের দরজায়। মালা আমাকে দেখতে পেলে। কাছে এগিয়ে এসে বললে,—ভাখো দাকুদা, আমাদের কি রকম বিপদ ভাখো।

মদন হাসতে হাসতে বললে,—তাই বল! বুঝতে পেরেছি কেন তোর মত বদলে গেল।

হারু ভেংচি কেটে বললে,—বুঝতে পেরেছি! কি বুঝতে পেরেছিস?

মদন বললে,—মালা তোর সঙ্গে কথা বলেছে, বাস, মুণ্ডুটি অমনি ঘুরে গেছে!

যারা বসেছিল সেখানে, সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

হারু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, যাক, তবে আর বলবো না!

মদন বললে,—না, আর হাসবো না। তার পর কি হ'লো বল্।

হারু বললে: তার পর গেলাম দেবু চাটুজ্যের ওখানে।

দেবু চাটুজ্যে এসেছে। কারও সঙ্গে দেখা করছে না। কারও সঙ্গে মানে আমাদের মত গ্রামের লোকের সঙ্গে। দেখলাম—বড় বড় কয়েকটা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় লোক সব দেখা করতে এসেছে হয়ত। আমি 'সুধীর' 'সুধীর' বলে ডাকতে ডাকতে সোজা চলে গেলাম ভেতরে। সুধীর বেরিয়ে এলো। মুখখানি শুকনো। বললে, বোস। বললাম, না বসবো না, খবর নিতে এলাম। সুধীর বললে, খবর আর কি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। রঞ্জনের যেখানে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, বাবু সেই রাজার বাড়ী হয়ে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে বিয়ের একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করেই এসেছেন। এখানে এসেই তো বাস এই অবস্থা। জিজ্ঞাসা করলাম—বলি হাঁ রে সুধীর, পুলিশ আজ সীতারাম মুখুজ্যেকে ধরে নিয়ে গেল কেন? সুধীর বললে, ও-সব পুলিশের ব্যাপার, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছিস ভাই! পুলিশ যাকে সন্দেহ করবে তাকেই ধরবে। তবে বাবুর তো টাকার অভাব নেই, তার ওপর ওই একটি মাত্র ছেলে, বাবু বলছেন—যত টাকা খরচ হয় হবে—কে মেরেছে, কেন মেরেছে,—বের করা চাই-ই। কলকাতা থেকে পাঁচ জন খুব বড় বড় ডিটেক্‌টিভ আসছে কাল দুপুরের ট্রেণে।

ডিটেক্‌টিভের নাম শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো: ডিটেক্‌টিভ! সেই যেমন ডিটেক্‌টিভ নভেলে পড়েছি—তেমনি?

হারু বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ডিটেক্‌টিভ। সুলতানপুর এখন আর সে সুলতানপুর নয়। এখন এটা হচ্ছে গিয়ে রীতিমত টাউন।

—কি রে, কিসেব গুলতানি হচ্ছে তোদের? কে খুঁজতে গিয়েছিলি আমাকে?

সবাই তাকিয়ে দেখলে, বুড়ো শিব।

মদন বললে,—আমি পাঠিয়েছিলাম জিতুকে।

—কেন?

হারু বললে,—আসুন, ভেতরে এসে বসুন। বলছি।

বুড়ো শিব ভেতরে এসে বসলো। বললে,—বল বাবা তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই। এক্ষুণি আমাকে যেতে হবে একবার দেবু চাটুজ্যের ওখানে তার পরে আবার সীতারামের বাড়ী। পরাশর কোথায়

মদন বললে,—আহ্নিকে বসেছে।

হারু বললে,—আচ্ছা শিবু কাকা, পুলিশের কি ধারণা—মুখুজ্যে মশাই খুন করেছে রঞ্জনকে?

বুড়ো শিব বললে,—নিশ্চয়ই। পুলিশের ধারণা, দেবু চাটুজ্যের ধারণা, নইলে সীতারামের মত মানুষকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারে কখনও? আগে জানতে পারিনি, খবর পেয়ে গেলাম যখন, তখন নিয়ে চলে গেছে। মেয়েদের কাছে শুনলাম—অপমান অসম্মান কিছু করেনি—ভাল করেই নিয়ে গেছে। কিন্তু ছি ছি ছি ছি! সীতারাম মুখুজ্যে—তোরা জানিসনে, তোরা তখন হয়ত জন্মাসনি, আমাদের এই সুলতানপুরের ওরাই ছিল একচ্ছত্র রাজা—দেবু চাটুজ্যের মতন দুটো তিনটে দেবু চাটুজ্যেকে ওরা কিনে ফেলতে পারতো, সেই সীতারাম আজ হলো কি না খুনী আসামী! অত বড় লোকটাকে হাজতে নিয়ে গিয়ে রাখবে! না না—আমার আর সময় নেই বাবা, আমি একবার যাব দেবু চাটুজ্যের [illegible] রাত পর সকাল হ'লেই ছুটবো আদালতে, দেখি যদি জামিনে খালাস করে আনতে পারি। তোরা আমাকে কি [illegible] ডেকেছিলি বাবা?

মদন বললে,—এই কথাটাই জানতে চেয়েছিলাম।

বুড়ো শিব উঠে দাঁড়ালো। হারুর দিকে তাকিয়ে বললে,—তুই গিয়েছিলি সেখানে?

হারু বললে,—দেখিতে গিয়েছিলাম। তখন নিয়ে চলে গেছে।

বুড়ো শিব বললে—আমিও দেখতে পাইনি। মেয়েটা বললে, যাবার সময় সীতারাম বলে গেছে—মিথ্যা কখনও জয়ী হয় না; ভগবান আছেন। আর বলেছে, বুড়ো শিবকে খবর দিস। [illegible] তদারক করবার লোক তো নেই, আমাকেই দেখতে হবে।

চলে যাবার আগে আবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে—সীতারাম কি রকম মানুষ তোরা তো জানিস।

হারু বললে,—নিশ্চয় জানি। মামলা-মোকদ্দমা তদ্বির-তদারক করবার জন্যে দরকার যদি হয় তো তুমি আমাকে সঙ্গে নিতে পার শিবু কাকা!

বুড়ো শিব বললে,—না বাবা তার দরকার হবে না! তবে বলা যায় না—পরে যদি দরকার হয় তো তখন ডাকবো।

এই বলে বুড়ো শিব চলে গেল।

লোকে প্রথমে বুঝতেই পারেনি—এত লোক থাকতে সীতারামকে ধরলে কেন? তার মেয়ের সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ের সম্বন্ধ না হয় ভেঙেই গেছে, তাই বলে রঞ্জনকে এমন নৃশংস ভাবে হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবার মত মানুষ তো সীতারাম নয়!

মিথ্যা একটা সন্দেহের উপর নির্ভর করে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। সকলেরই ধারণা ছিল—বুড়ো শিব তার হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলেই জামিন মঞ্জুর হয়ে যাবে।

কিন্তু হতাশ হয়ে বুড়ো শিব ফিরে এলো—জামিন মঞ্জুর হলো না।

সবাই অবাক হয়ে গেল—তাহ'লে কি সীতারাম মুখুজ্যে সত্যিই অপরাধী?

এদিকে তার বাড়ীতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মালা কাঁদছে। কাঞ্চন কাঁদছে।

—হে ঠাকুর, তুমি তো অন্তর্যামী, তুমি তো জানো সে নির্দোষ, তবে কেন এ বিড়ম্বনা!

বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরটি আজ-কাল সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া। বাবা বাস করছেন অট্টালিকায়। কিন্তু ভোগরাগের ব্যবস্থা সেই আগে যেমনটি ছিল এখনও তেমনি আছে। পূজারী ব্রাহ্মণ দুপুরে ফুলের একটি সাজি হাতে নিয়ে আসে, বেলপাতা আর কয়েকটি আতপ চাল ছিটিয়ে দিয়ে মন্ত্র আউড়ে পুজো সেরে দোরের শিকল টেনে দিয়ে চলে যায়। সারা দিন সারা রাত বাবা তেমনি অন্ধকার ঘরের ভেতর বন্ধই থাকেন। আবার তাঁর দরজা খোলা হয় পরের দিন—দুপুরে।

বাবার নাট-মন্দির কিন্তু বিকেল না হ'তেই জম-জমাট হয়ে ওঠে। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা বসে। রাত্রে চলে যাত্রার রিহার্শাল।

অনেক দিন পরে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের দরজা খোলা হ'তে

সকালে। বুড়ো শিব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করিয়ে দিলে।

তার পরেই চললো বাবা রুদ্রেশ্বরের সাড়ম্বর পূজা-অর্চনা। ঢাক বাজলো, শিঙা বাজলো, কাড়ানাকাড়ার শব্দে মানুষের কানে তালা লাগবার উপক্রম হলো।

কাঞ্চন ও মালা—পট্টবস্ত্র-পরিহিতা দুই মা ও মেয়ে, স্নান করে মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে ভক্তিমতী দুই পূজারিণী পায়ে হেঁটে এলো রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে। তাদের দেখবার জন্যে সুলতানপুরের পথে লোক জড়ো হয়ে গেল। এক জন এই গ্রামেরই বৌ, এক জন মেয়ে। তবু অনেকে তাদের কোনো দিন চোখে দেখেনি।

এসেই তারা কৃতাঞ্জলিপুটে গড়াগড়ি দিয়ে পড়লো বাবার মন্দিরে। দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়াতে লাগলো।

পরের দিন হলো সঙ্কটা-ভৈরবীর পূজা।

সঙ্কটতারিণী মা সঙ্কটা-ভৈরবী শ্মশান-চারিণী। মধ্য রাত্রে মার পূজার বিধি। তাই হ'লো।

আগে মানুষের এতটুকু দুঃখে সঙ্কটে সঙ্কটতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়তো। আজ-কাল কি যে হয়েছে, অনেক বড় বড় বিপদে-সঙ্কটেও সঙ্কটাভৈরবীর নামও উচ্চারণ করে না কেউ! মন্দিরে যাবার পথটা তাই আগাছার ঝোপে-জঙ্গলে ভরে গেছে। মন্দিরের ফাটলে ফাটলে গাছ গজিয়েছে।

লোক লাগিয়ে সব কিছু পরিষ্কার করা হলো। সন্ধ্যে থেকে বড় বড় প্যাট্রোম্যাক্স বাতি জ্বললো। সারা রাত ধরে পূজা চললো, আতুর দুঃখীদের অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করা হলো।

সবাই জয়জয়কার করতে লাগলো সীতারাম মুখুজ্যের।

সীতারাম কিন্তু তখন জেলের হাজতে। বুড়ো শিবের চেষ্টার ত্রুটি নাই।

কলকাতা থেকে বড় ব্যারিষ্টার আনালে। মামলায় দিনের পর দিন পড়তে লাগলো।

কাঞ্চন বললে, আমার যথাসর্বস্ব যায় যাক্, আমরা পথে গিয়ে দাঁড়াবো তাও ভালো, মালার বাবাকে নিয়ে আসুন।

[ক্রমশঃ।

বর্ষায়ণ

শ্রীশান্তি পাল

আকাশের কোলে চপলা চমকে—
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে হিয়া,
এ ঘোর শাঙনে ছুটে আনমনে
কা'র বিরহিণী প্রিয়া?

ডাকিছে ডাহুক, কাঁদে বন-টিয়া
চাতক বাবুই উড়িছে ভিজিয়া,
জোনাকীর পাখা পড়িছে খসিয়া
আলোর ঝলকি দিয়া;
আকাশের কোলে চপলা চমকে—
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে হিয়া।

বকুল-মালতী বাদলের জলে
টুপ-টাপ ঝরে বনবীথি তলে,
ঘাসে ঘাসে তারা চুপি চুপি বলে—
এলো ভরা শাঙনীয়া;
আকাশের কোলে চপলা চমকে—
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে হিয়া।

খেজুর-পাতার মাথালটি পরি'
কিষাণ মেয়েরা কা'র মুখ স্মরি',
আঙিনার বুক ঝলমল করি'
দাঁড়াইল থমকিয়া;
আকাশের কোলে চপলা চমকে—
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে হিয়া।

বেতসের বনে প'ড়ে গেলো সাড়া,
কদম-কেতকী হ'ল রেণুহারা,
ছুটে চলে গাঙে থর-থর-ধারা
বায়ু উঠে উলসিয়া;
আকাশের কোলে চপলা চমকে—
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে হিয়া।

চারি দিক ঘিরে এলো মসী-কালো,
কেন ভাঙা ঘরে মিছা দীপ জ্বালো?
একা মল্লার গাই—তাই ভালো
পাশে নাই দরদিয়া;
আকাশের কোলে চপলা চমকে—
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে হিয়া।

কেনা কাটা

অল্প খরচায় ব্যবসা

অল্প খরচায় ব্যবসা করা প্রসঙ্গে আমাদের দপ্তরে প্রায়ই নানা চিঠি-পত্র আসে। সকলেরই ইচ্ছা বিভাগটিতে আরও সম্প্রসারিত ভাবে এই বিষয়ে আলোচনা হোক। সেই জন্যই গত দু'-তিন মাস আমরা অল্প খরচায় ব্যবসার উপর বিশেষ জোর দিয়েছি, আশা করি তা' দেখেছেন। সাধারণ দোকানপত্র করা কি নানা রকম আমদানী-রপ্তানীর ছোট ছোট ব্যবসার পরিবর্তে আজকের এই বিরাট মন্দার দিনে জমির কাজ করাই নিরাপদ। এই জন্যই আমরা চাষবাসের প্রতি বেশী নজর দিয়েছি।

এ মাসে পেঁয়াজ চাষ সম্পর্কে আলোচনা করছি। পেঁয়াজ বিশেষ করে বাঙলা দেশে এর চাষ খুব কমই হয়, অথচ সারা ভারতবর্ষে বাঙলা দেশেই সব চেয়ে বেশী পরিমাণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়।

পেঁয়াজের চাষ অতি লাভজনক ব্যবসায়। পেঁয়াজের আরও একটা সুবিধা আছে। পেঁয়াজ বছরে দু'বার ফলে। এই জন্য পেঁয়াজের নামও দু'প্রকার। ভাতি পেঁয়াজ আর কালী পেঁয়াজ। বৈশাখ মাস থেকেই পেঁয়াজের চাষ আরম্ভ। জমিটিকে বেশ চাষ দিয়ে ভাল করে তাতে ছাইয়ের আর গোবরের সার দিতে হবে। জমি এমনি করে তৈরী করা হয়ে গেলে পর জমির পাশে পাশে জোয়ান-মউরীর খুপি দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাতি পেঁয়াজের চাষ করতে হয়। ভাদ্র মাসের মধ্যেই সে পেঁয়াজ পেকে যায়। তখন তা উপড়ে ফেলতে হয়। কালী পেঁয়াজ আবার ভাদ্র মাসেই বসাতে হয়। অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাস নাগাদ পেঁয়াজকলি দেখা দেয়। গাছ পেকে নতপ্রায় হলে বুঝতে হবে যে, পেঁয়াজ পেকেছে এবার। তখন তা' তুলে ফেলতে হবে।

ব্যয়	আয়
বিঘা-প্রতি জমির খাজনা—১০	শাক বিক্রয়ের আয়—১০
কমপক্ষে ৫ বার চাষ দেওয়ার জন্য খরচাদি—২০	বিঘা-প্রতি ৫০ মণ পেঁয়াজ হয় এই হিসাবে এবং সারা বছরের গড়পড়তা দাম ধরে মোট আয়—৪০০
সার প্রভৃতির খরচ, জল বহন, সেচন, পেঁয়াজ তোলাই প্রভৃতি এক বিঘার হিসাবে—১০	
মোট খরচ— ৪০	মোট আয়—৪১০

(প্রতি বিঘায়)

স্থান-কাল হিসাবে এই আয়ের কম-বেশী হওয়া খুবই সম্ভব। পেঁয়াজে পোকা লেগে, বেশী জলে বা অন্যান্য নানা কারণে কিছু ফসল নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। তবু বলছি যে, এ ব্যবসাটি অত্যন্ত লাভজনক।

কুটীর-শিল্প যদি সরকারী টাকা পায় ?

কুটীর-শিল্পের প্রতি নজর পড়েছে সরকারের। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই এদিকে সম্প্রতি নজর দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কুটীর-শিল্পের প্রসার ও তার পুনরুজ্জীবনের জন্য রাজ্য-সরকার দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় আট কোটি টাকা ব্যয় করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এই আট কোটি টাকার মধ্যে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলিতে কুটীর-শিল্পের উন্নয়নের জন্য তিন কোটি টাকা, তাঁত-শিল্পের জন্য দুই কোটি টাকা এবং খাদি, তালগুড়, খয়ের, মাদুর, বেতের ঝুড়ি বা বাক্স তৈয়ারী প্রভৃতি ছোট ছোট শিল্পের বৃদ্ধির জন্য বাকী তিন কোটি টাকা খরচ করা হবে, এমনি প্রস্তাব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে চিন্তা করছেন বলে জানা গেছে। কুটীর-শিল্প সম্প্রসারণের কাজে সরকারী টাকার অপব্যয় এর আগে আমরা হতে দেখেছি। শুধু

প্রচার বিভাগের আর বিনা মূল্যে সার দেওয়ার কাজেই আমরা এই খয়রাতী সীমাবদ্ধ থাকতে শুনেছি। এবারে যেন আর তা' না হয়। যে ক'টি শিল্পের নাম করা হয়েছে এ ছাড়াও মৃৎশিল্প, কাঁসার বাসন-শিল্প, শোলার কাজ, দড়ির কাজ, কাঠের যন্ত্রপাতি, খেলনা, শিল্প ইত্যাদিও যেন বাদ না যায়। টাকা যেন সত্যিকারের কুটীর-শিল্পীর কাছে গিয়ে পৌঁছয়। তাদের দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। এই অনুরোধ।

কেন ইনসিওর করবেন ?

ইনসিওর বা বীমা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একথা জানিয়ে রাখছি যে, ভাববেন না যেন এই আলোচনা কোনও নতুন বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির তোষামুদি, পরন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর কারণ। জীবনের সর্ববিভাগে যে আদর্শ সর্বজনীন এবং যাহা নিঃস্বার্থ সঞ্চয়ের প্রেরণা যোগায় এই আদর্শের সন্ধান করিবার জন্য মানুষ সর্বদাই ব্যস্ত। যেখানে সে লাভ করিয়া ও তাহা উপভোগ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহে সেখানে সে নির্দয় অন্যভাগী ও স্বার্থপর, অথবা সে অসভ্য এবং পাশবিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করে। এই কারণে আমি বাঙলা দেশে সমবায় বীমা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টাকে সোৎসাহে অভিনন্দন করিয়াছিলাম। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের স্বরাজের মূলমন্ত্র হইতেছে—আমাদের সকল বীমা ব্যবসায় ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহে করা, দেশীয় শিল্পসমূহকে সাহায্য করা, স্বদেশী কাপড় ও জিনিসপত্র ব্যবহার করা ইত্যাদি।

—মহাত্মা গান্ধী।

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা দেশের কতখানি উপকার হইতেছে এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা কত বড় ক্ষতি হইতেছে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।··সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এখানকার বীমার ক্ষেত্র জুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু এখন দেশীয় প্রচেষ্টাকে এই জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বীমা ব্যবসায়ে তাহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছে—সুভাষচন্দ্র।

আপনার যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, যদি আপনার দেশবাসীর উপর আস্থা থাকে তাহা হইলে আপনি দেশীয় ছোট বীমা কোম্পানী-গুলিকে উৎসাহ দিতে পারিবেন। —বিধানচন্দ্র রায়।

ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই সকল রকম স্বদেশী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিবে। এই কারণে আমরা সকল ভারতীয় বীমা কোম্পানীকেও সমর্থন করি। ইহারা হয়ত দেশীয় শিল্পের উন্নতি-কারক যন্ত্র হইতে পারে।—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

এমন কি তিনি (চিত্তরঞ্জন দাশ) নিজের ধনাঢ্যতা অপেক্ষা দারিদ্র্যতা পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার দেশের জন্য অর্থকামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাণ সঞ্চার ও উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং বীমাক্ষেত্রকে আদৌ অবহেলা করেন নাই।—বাসন্তী দেবী।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিলম্বে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে ভারতীয় কোম্পানী সমূহকে ভীষণ প্রতিবন্ধকের মধ্যে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হয়। তথাপি কোনও কালে কিছু না হওয়া অপেক্ষা উহা অনেক ভাল। যখন তাহারা (দেশী কোম্পানীগুলি) কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল তখন সে ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অধীনে সুরক্ষিত ভাবে ছিল এবং প্রচুর সঙ্গতিসম্পন্ন এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা প্রচেষ্টার পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে আমি আবেদন করিতেছি, যেন তাহারা ভারতীয় বীমা
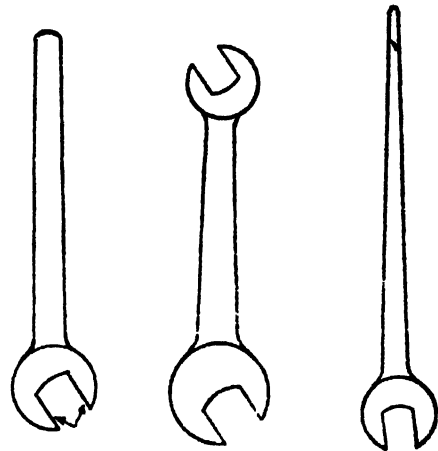
১। স্প্যানার—নাট-বোল্ট খোলার যন্ত্র। একমুখো দু'মুখো আর লম্বা হাতা।
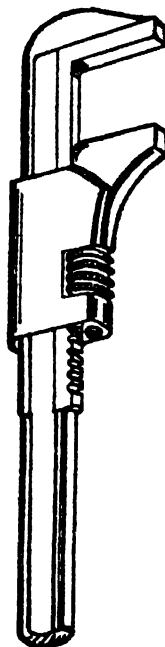
২। অ্যাডজাষ্টেবল স্প্যানার—সুবিধে মত সাইজের নাট-বোল্ট খোলা যাবে যেমন দরকার।

৩। রিং-স্প্যানার—ওপরে বসে নীচের কোনও জায়গার কোনও নাট-বোল্ট খুলতে লাগবে। মোটরে বেশী কাজে লাগে।
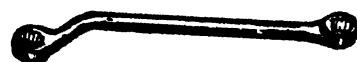
৪। ডাম্বেল স্প্যানার—দু'মুখো ডাম্বেলের মত দেখতে। একসঙ্গে ভারী ভারী কাজ চলবে।

কোম্পানী সমূহকে সমর্থন করিতে থাকেন যাহাতে সেগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে।—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

...জীবন বীমা না করা একটা পাপ।...আমি বাস্তবিকই বিশ্বাস করি যে, কথাটা সত্য—কেন না ইহার তাৎপর্য পরস্পরের সহযোগিতা মনের শান্তি, অপরের সহিত নিজের দুর্ভাগ্য বণ্টন করিয়া লওয়া। যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে তাহার কল্যাণ হউক।—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বীমার স্বপক্ষে আবেদন নিয়ে এতগুলি মনীষীর যুক্তি আর আবেদন উপস্থাপিত করলাম : বীমা সত্যই মানুষের জীবনে বিশেষ করে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী, উচ্চমধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সরকারী-বে-সরকারী কি আধা-সরকারী কর্মচারীর পক্ষে অপরিহার্য। বীমা আজ আর মারা যাবার কোনও ভয় নেই। ব্যাঙ্কের মত (অবশ্য ব্যাঙ্কও এখন আর ফেল হওয়া প্রায় অসম্ভব)। সময়ে অসময়ে লালবাতি জ্বলবে না। নিয়মমাফিক কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান আপনার আখেরে কাজে লাগবেই। বাঙলা দেশে বম্বে মিউচুয়াল, হিন্দুস্থান, মেট্রোপলিটান, ন্যাশানাল ইত্যাদি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জীবন-বীমা, সম্পত্তি-বীমা, গাড়ী, মালপত্র জাতগুদাম থেকে কন্যার বিবাহের জন্য অবধি আপনি ইনসিওর করিয়ে রাখতে পারেন। শেষ কথা, বীমা আপনার এবং আপনার পরিবারের রক্ষাকবচ।

ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা সবিস্তারে করবার ইচ্ছা আমাদের রইল। প্রস্তাবনা হিসাবে মনীষীদের বক্তব্য পেশ করলাম।

বাঙালী শিল্পীর আঁকা পোষ্টকার্ড ছবি

দু'-একটি ছাড়া এমন দেশী কোম্পানী দেখেছি বলে তো মনে হয় না—যাঁরা বিজ্ঞাপনের এই সহজ অথচ শক্তিশালী মাধ্যমটির সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ। পোষ্টকার্ড যাতে করে দৈনিক শত শত চিঠি নানা প্রকার খবরাখবর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে, এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে তা'তে কোনই বৈচিত্র্য নেই আজও। অথচ কিছুই খরচ নয়। ভাল একজন আর্টিষ্টকে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দিলেই তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে, একটা ভাল ডিজাইন কি লেটারিং করে দেবেন নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে আমরা নন্দলাল, অতুল বসু, অন্নদা মুন্সী, রমেন চক্রবর্তী, শুভো ঠাকুর, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রভৃতির নাম করলাম। একটু ভাল কাগজ আর দুই কি তিন কালারে ছাপার জন্য যা খরচ। এর চেয়ে ঢের বেশী খরচ তারা অন্য ভাবে করেন! সেই একই ডিজাইন আবার ইচ্ছা করলে লেটার হেডেও ছাপা যায়। কোম্পানীর নিজস্ব খামেও সেই লেটারিং লাগাতে পারেন! সব কিছুই করা সম্ভব, আসলে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের এদিকে বড় একটা নজর নেই। পোষ্টকার্ড একটা রাখতে হয় তাই রাখেন। তাতে ছাপার হরফে লেখা থাকে কোম্পানীর নাম আর ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর বড় জোর কি কি জিনিস পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে। তাও কদাচিৎ।

আমরা তো পরামর্শ দিলাম, দেখা যাক এবার ক'জনের চোখ এদিকে পড়ে। কসমেটিকস, গহনা, পোষাক, নানা সৌখীন দ্রব্য তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠানগুলির তো এখুনি এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

যন্ত্রপাতির পরিচয়

যন্ত্রপাতির পরিচয় আগেই আমরা শুরু করেছি। দু'-এক মাস বন্ধ রাখার ফলে মাসিক বসুমতীর বেশ কয়েক জন পাঠক-পাঠিকা পত্র সহযোগে আমাদের তাগাদা দেন, 'কেনা-কাটা' বিভাগে যেন আবার যন্ত্রপাতির সচিত্র বিবরণ ছাপা হয়। তাই আমরা মনস্থ করেছি যে, এবার থেকে প্রতি মাসেই কারিগরী প্রতিষ্ঠানের উপযোগী ছোট ছোট নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যা আপনার আমার প্রাত্যহিক কাজে লাগা খুবই সম্ভব। যাতে করে বাড়ীর সামান্য মেরামতী কাজ, মোটর গাড়ী রিপেয়ার প্রাথমিক ভাবে আপনি নিজেই করতে পারেন, সেই সব যন্ত্রপাতির পরিচয়ই ছাপা হবে। এ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাগণের অধিক কোনও জ্ঞাতব্য থাকলে মাসিক বসুমতীর দপ্তরে সে সম্পর্কে রিপ্লাই কার্ড বা খাম সহযোগে জানালে সে সম্পর্কে আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

Spanners বা নাট-বোল্ট খোলা বা লাগানোর যন্ত্র

Spanner বা নাট-বোল্ট খোলার যন্ত্র নানান সাইজের তো হয়ই। হয়ত নানা রকমের। সাধারণ ভাবে একমুখো বা Single Ended, দু'মুখো বা Double ended আর তৃতীয়টি হল Prong-ended বা 'Podger'। Podger স্প্যানারের শেষ দিকটা অপেক্ষাকৃত বেশী লম্বা। শেষটা গোল। ব্যাসটা কমে আসে ততই যতই একে ঘোরানো যায়। হ্যাণ্ডলটাতেও জোর পাওয়া যায় বেশী। ষ্টীল-প্লেট, (বিশেষ করে যেখানে দু'খানা প্লেটে একসঙ্গে কাজ করতে হয়।) ট্যাঙ্কের কাজ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

Adjustable Spanner—ইচ্ছা মত নাট-বোল্ট খোলা বা লাগানো যাবে। যে কোন সাইজেরই হোক না কেন। চিত্রটির সাহায্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, যে স্প্যানারটি দু' ভাগে বিভক্ত। একটা ফিক্সড আর একটা ইচ্ছামত সামনে বা পেছনে টেনে আনা বা ঠেলা দেওয়া চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিক্সড পার্টটির গায়ে স্ক্রু করে এঁটে দেওয়াও চলে। ফলে নাট-বোল্টের সাইজের যা মাপ তাই এতে করে নেওয়া সম্ভব। জিনিষটি খুবই সুবিধা জনক। কাজ করতেও যথেষ্ট আরাম পাওয়া যায়।

Ring Spanner—প্রত্যেক দিকেই রিং রয়েছে ছবিতে দেখছেন। সেই জন্যই নাম। ওপরে বসে যেমন ধরুন মোটর গাড়ীর ভেতরের কোনও নাট-বোল্ট খুলতে চান সেই জন্যই একটা সাইড একটু নীচু অপরটির চেয়ে।

'Dumb-bell' Spanner—ডাম্বেলের মতই দেখতে। কোনও পাইপের ওপরে বসে বা কোনও বয়লারের মাথায় উঠে খুব সুবিধাজনক ভাবে এতে কাজ করা চলে। এখন এই ডাম্বেল স্প্যানারের খুব ব্যবহার হচ্ছে।

এ ছাড়াও সকেট স্প্যানার, বক্স স্প্যানার ইত্যাদি নানা জাতীয় স্প্যানার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের কাজে লাগে নানা ভাবে।

নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

সাত

পালকিতে করে সকালেই হরসুন্দরী এলেন।

পরনে একখানি মটকার থান। সত্মস্নানান্তে চুলগুলি পিঠের কাছে গেরো বাঁধা। মাথায় আধ-ঘোমটা। এ-গ্রামে তিনি লজ্জা করতে পারেন, এমন লোক বেশি নেই। শুধু অভ্যাস বশেই ঘোমটা দেওয়া।

সমরেশ নিচে দাঁড়িয়ে বাগানে মজুর খাটাচ্ছিলেন। বাগান ফুলের নয়। ফুলের উপর তাঁর প্রীতি কম। তিনি ফলের প্রত্যাশী,—তা সে আম-কাঁটালই হোক, আর লাউ-কুমড়োই হোক। ওদিকে যে জায়গাটা পড়ে আছে, সেখানে তরকারীর চাষ করার সংকল্প করেছেন।

হরসুন্দরীকে দেখে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু হরসুন্দরী তাঁর দিকে পিছন ফিরেও চাইলেন না। অথচ তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন।

হেসে বললেন, তোমাকে নয় বাবা! ভাঁড়ারটা বৌমাকে বুঝিয়ে দিয়ে চাবিটা তাঁর হাতে দেবার জন্যেই সকালে আবার আসতে হল। বলেই দ্রুত পদে অন্দরে চলে গেলেন।

সমরেশ তাঁর এই সকালে আসার কারণ শুনে এবং ব্যস্ততা দেখে হেসে ফেললেন। দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে শীর্ণ সূক্ষ্ম এক-ফালি হাসি। কৃপণের বজ্রমুষ্টির ফাঁক দিয়ে গলে-পড়া অনিচ্ছুক দানের মতো।

বহু কাল পরে, কত কাল পরে তা সমরেশের স্মরণ নেই, সমরেশ হাসলেন। মন্দ লাগে না তো! সমস্ত দেহের স্নায়ু-শিরায় একটা খুশির বিদ্যুচ্চমক বইয়ে দিয়ে ঠোঁটে জ্বলে উঠল সেই খুশির আলো। মন্দ লাগে না তো!

সমরেশ আর একবার হাসলেন, স্পষ্টতর হাসি। আরও এক বার, এবারে আরও স্পষ্ট,—হাসির শব্দ যেন কানে শুনতে পেলেন। শুনে চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠাধর পুনরায় দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে গেল।

লোকেরা যেখানে কাজ করছিল, আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। কেউ তার হাসি দেখতে পায়নি। তথাপি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমরেশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি হেসেছিলেন, ক'বার ফিরে ফিরে সেদিকে চাইলেন। যেন দোষ ওই মাটির। ওরই নিচে বুঝি হাসির বিদ্যুৎ লুকোন ছিল। সমরেশ গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর দেহে তা চকিতে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

সমরেশ গোবিন্দ হাসেন না। এ নয় যে, তাঁকে হাসতে নেই, হাসা একটা অপরাধ। হাসতে তিনি পারেন না, হাসি তাঁর আসে না। শৈলেশ গোবিন্দকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে ব্যর্থকাম হয়ে যেদিন তিনি ঘর ছাড়েন, তার পর থেকে কোনো দিন তিনি হাসেন নি। কেউ কোনো দিন তাঁকে হাসতে দেখেনি,—তিনি নিজেও না। আশ্চর্যের বিষয়, হাসবার কোনো উপলক্ষ্যই তাঁর জীবনে আসেনি। তাঁর সামনে কত লোক হেসেছে,—আড্ডায় নয়, আড্ডা তিনি কখনোই দেননি,—এমনি প্রতিদিনের লেন-দেনের ব্যাপারে হেসেছে, তিনি সবিস্ময়ে ভেবেছেন, এর মধ্যে হাসবার কি আছে? ও হাসে কেন?

সমরেশের হাসি আসে না। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও ঊর্ধ্বকালের মধ্যে একদিনও আসেনি। আজ প্রথম এল।

কেন এল? হরসুন্দরীর কথার মধ্যে হাসির কি ছিল? তিনি তো ওঁর দিকে ফিরেও চাননি? অনেক চিন্তা করে, অনেক চেষ্টা করেও তার উত্তর সমরেশ খুঁজে পেলেন না।

এদিকে অযত্নবর্ধিত কয়েকটা আম, জাম এবং নারিকেলের গাছ আগে থেকেই ছিল,—সমরেশ বাড়ি করবার আগে থেকেই। আমগুলো অবশ্য বেশ বড় বড় হত। কিন্তু এমন টক যে, মুখে দেয় কার সাধ্য! কিন্তু পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে এ আমেরও নিস্তার ছিল না। ঢিল মেরে মেরে এই আমই তারা পাড়ত এবং লবণ ও লঙ্কা সহযোগে এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে টাকনা দিত যে, মনে হত এমন সুস্বাদু আম ভূ-ভারতে কোথাও নেই।

জাম এবং নারিকেলের সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু যে-কারণেই হোক, এই গাছ ক'টির উপর জমিদারদের কখনই দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা নিজেরা ফল পেড়ে নিয়ে যেতেন না। ছেলেরা পাড়লে তাদেরও নিষেধ করতেন না। সুতরাং গাছের মালিক যিনিই হন, ফলের মালিক ছিল পাড়ার ছেলেরা।

সমরেশ বাড়ি করার সময় গাছগুলিকে কাটেন নি। এক ধারে রয়ে গেল। কেবল ছেলেরা এর উপস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

তারই নিচে একখানি ছোট বেঞ্চি পেতে ছায়ায় বসে সমরেশ লোকদের কাজ-কর্ম দেখতেন। এ কাজটা জমিদারোচিত নয়। জমিদার প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে পারে, নির্যাতন করতেও পারে। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটায় না কখনও। কিন্তু সমরেশ এত বড় জমিদার-বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেও,—শুধু এক্ষেত্রে নয়, কোনো ক্ষেত্রেই,—জমিদারোচিত গুণের পরিচয় কেউ তাঁর কাছ থেকে পায় নি। লোকে পরিহাস করে বলত, বেণে।

তিনি গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পেতে নিজে বসে থেকে মজুর খাটাতেন। নিঃশব্দে তাদের কাজকর্ম দেখতেন। কিন্তু নির্দেশ দিতেন কদাচিৎ। অথচ তিনি নিজেও জানতেন এবং মজুররাও বুঝত, ওই নিঃশব্দে বসে থাকাটাই যথেষ্ট। মজুররা কেউ মাথা তোলবার পর্যন্ত সময় পেত না। কেউ পিছন ফিরে তাঁর দিকে এক বার চেয়ে দেখতেও সাহস করত না। হাত চলত সমস্ত ক্ষণ অবিশ্রান্ত। যেই জমিদার-বাড়ির পেটা-ঘড়িটায় ঢং-ঢং করে

এগারোটা বাজত, মুখ তুলত তখন। ধূলা-কাদা-মাখা বাঁ হাত দিয়ে ললাটের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

কিন্তু শুধু এই নয়, জমিদারের সঙ্গে আরও একটা পার্থক্য তাঁর ছিল।

জমিদার-বাড়ির কাজ সেরে ঘণ্টাখানেক তাদের মজুরীর জন্যে বসে থাকতে হয় সেরেস্তায়। কোনো দিন পায়, কোনো দিন পায় না। এখানে কিন্তু সে নিয়ম নেই। কাজ চুকলে তারা হাত-পায়ের ধূলা-মাটি ধোয়ারও অবসর পায় না।

সমরেশ তাঁর থলিটি নিয়েই বসে থাকেন। প্রত্যেকের পাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে বাড়ির ভিতরে চলে যান। লোকেরাও পাশের পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ি চলে যায়।

আরও পার্থক্য আছে। জমিদার-বাড়িতে প্রয়োজনের সময় চার আনা আট আনা অগ্রিম মজুরীও পাওয়া যায়। এখানে সে সুবিধা নেই। কেউ কোনো দিন মুখ ফুটে চাইতেও সাহস করেনি। আকারে-ইঙ্গিতে জানালে সমরেশ তা লক্ষ্য করেন না। তাঁর কাছে নিগ্রহও নেই, অনুগ্রহও নেই। তাছাড়া জমিদার-বাড়ির কাজে শক্ত-সমর্থ, রোগা-পটকা সকলেরই ঠাঁই আছে। কেউ বা বেশি কাজ করে, কেউ কম। সমরেশের কারবার শুধু শক্ত-সমর্থ লোকগুলির সঙ্গে। তাদের তিনি মজুরী কিছু বেশি দেন, কাজ কিন্তু তারও বেশি আদায় করে নেন। সময়ের নিরিখ অবশ্য একই রকম: সকাল ছ'টা থেকে এগারোটা, ফের দু'টো থেকে সন্ধ্যা ছ'টা।

অভ্যস্ত বেঞ্চটিতে বসে সমরেশ অনেক কথা ভাবতে লাগলেন। এও একটা তাঁর কাছে নতুন জিনিস। তিনি কাজের মানুষ। কাজ করেন। বসে বসে ভাবার অভ্যাস কম। মানে, বলগা ছেড়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবার অভ্যাসটা।

অনেকক্ষণ নানা কথা নানা ভাবে ভেবে হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মজুরদের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোরা কাজ কর বাবা, আমি একটু পরেই আসছি।

সে কণ্ঠস্বরে মজুররা চমকে উঠল। সমরেশের কণ্ঠস্বর তারা এত কম শুনেছে যে, চমকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমরেশ কি বললেন তার মানে বোঝার আগেই সমরেশ হন-হন করে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

হরসুন্দরী তখন অরুন্ধতীকে নিয়ে পড়েছেন। ওদের বড় ঘরে একখানি সুদৃশ্য কার্পেটের আসনের উপর হরসুন্দরী বসে। পাশেই মেঝের উপর অরুন্ধতী নতমুখে বসে। হরসুন্দরী তাকে প্রায় কোলের কাছে টেনে এনেছেন। বলছিলেন—

কালকে কতটুকু সময়ের জন্যেই বা তোমাকে দেখা! কাজের বাড়ির ভিড়ে মাথা তোলবার সময় পাইনি। সেইটুকুন দেখাতেই তোমার মুখখানি বড় ভালো লেগেছে। ভাঁড়ার বুঝিয়ে দেওয়াটা বাজে কথা মা, আসলে তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি গল্প করবার জন্যেই আসা। এখানে কেমন লাগছে বল তো বৌমা?

অরুন্ধতীর বলার কিছুই ছিল না। পাড়াগাঁয়ে সাধারণত
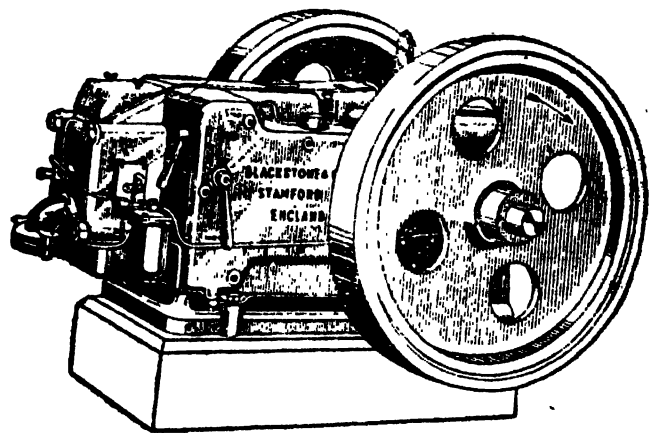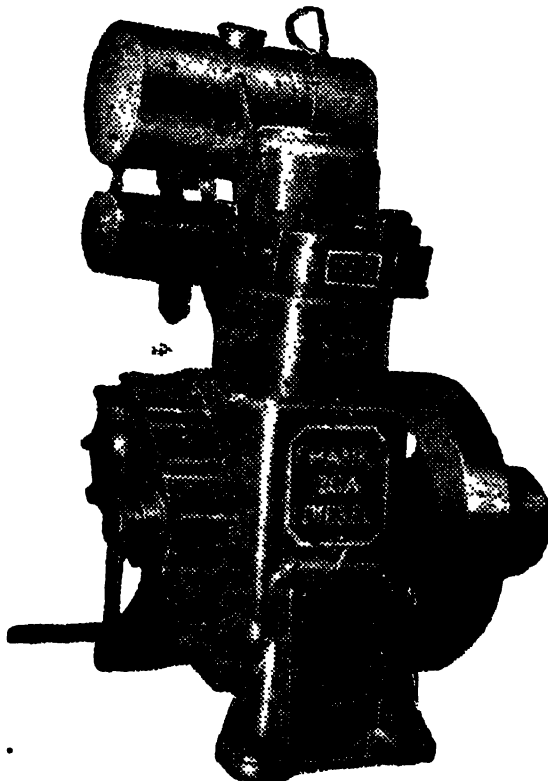
মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয়, নানা কারণে অরুন্ধতীর বয়স তার চেয়ে কিছু বেশি হয়েছিল। বেশি হয়েছিল বলেই বুঝি সমরেশকে এমনতর ভয় করছিল। এ ভয় নববধূর প্রথম মিলনের ভয় নয়। এ ভয় অন্য রকমের। মনে হচ্ছে, ওই মানুষটির উপর থেকে এ ভয় তার কোনো দিনই কাটবে না। ইহজীবনে না।

আরও আশ্চর্যের কথা, যে ভয় তার সমরেশকে, ঠিক তেমনিতর ভয় করছে তার এই মহিলাটিকেও। খুব মিষ্টি করে ইনি কথা বলছেন, আদর করে কাছে টেনেও নিয়েছেন। তবু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি যেন কেমন-কেমন। চোখের স্বর এবং কথার সুর যেন পৃথক। দু'টি পৃথক পথের যাত্রী। সমরেশের মতো ইনিও যেন নিজের চারি দিকে স্পর্ধা এবং কাঠিন্যের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। কাছে যাওয়ার কোনো পথ উন্মুক্ত নেই।

কিন্তু এসব কথা বলা যায় না। এবং বুঝিয়ে বলার সাধ্যও অরুন্ধতীর নেই। এ যেন বলবার কথাও নয়, শুধু অনুভব করবার। নিতান্ত দুর্ভাগ্য যাদের তারাই বোধ হয় এঁদের সংস্পর্শে আসে। এবং আসামাত্রই যেন একটা রকমের বিদ্যুৎ চোখের ভিতর দিয়ে সর্বদেহে, সমস্ত স্নায়ু-উপশিরায় খেলে যায়।

অরুন্ধতী নতনেত্রে নিঃশব্দে বসে রইল। উত্তর দিলে না। কিন্তু তাতে হরসুন্দরীর কথার স্রোত বন্ধ হল না। কি কথা তিনি নববধূকে বলবেন, গত রাত্রি থেকেই তা তিনি গুছিয়ে স্থির করে রেখেছেন। বলতে লাগলেন :

—বিশ্বাস কর মা, তোমার মিষ্টি মুখখানা দেখে গিয়ে পর্যন্ত কাল সারা রাত্রি চোখের দুই পাতা এক করতে পারিনি। কি যে কষ্ট হতে লাগল, সে আর বুঝিয়ে বলবার নয়।

অরুন্ধতী এবারে চোখ তুলে সবিস্ময়ে ওঁর দিকে চাইলে। মিষ্টি মুখ দেখার কী এমন কষ্ট, ওঁর মুখ দেখে তাই বুঝি সে বুঝতে চাইল। হরসুন্দরী চকিতে এক বার ওর দিকে চেয়ে নিয়েই বলে চললেন :

—ঠাকুরকে ডেকে বললাম, এমন সুন্দর মুখ যার ঠাকুর, কেন তাকে এমন শাস্তি দিলে? কেন তাকে এ বাড়িতে আনলে? এমন মিষ্টি মেয়ের চাল কি শেষ পর্যন্ত তুমি এই বাড়িতে মাপালে?

হরসুন্দরীর কণ্ঠস্বর কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে এল। তাঁর সমস্ত কথা বোঝবার বয়স অরুন্ধতীর হয়নি। কিন্তু অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তার কচি মনকে স্পর্শ করলে। সে কোমল দৃষ্টিতে হরসুন্দরীর দিকে চাইলে। হরসুন্দরী বলেই চললেন :

তুমি তো জান না বৌমা, সমরেশ বারান্দায় দাঁড়ালে অত দূরের রাস্তায় পর্যন্ত লোকচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সব বাড়িরই বেড়ার ধারে রঙিন ফড়িং ধরবার জন্যে ছেলেরা ভিড় করে। এ বাড়ির দিকে চাও, একটি ছোটো ছেলের মুখ দেখতে পাবে না। ও যে চেঁচামেচি করে, কি কাউকে মারধোর করে তাও নয় বৌমা! বরং নিঃশব্দে একা-একাই কাটায়। বরং আমার ছোট ছেলের সে দোষ আছে, কিন্তু বড় ছেলের নেই। কিন্তু কি যে আছে ওর চোখে, লোকে ওর সামনে দিয়ে যেতেও ভয় পায়!

অরুন্ধতী ওঁর কথাগুলো যেন গিলছে।

হরসুন্দরী আর ওর দিকে চাইছেনই না। অন্য দিকে চেয়ে আপন মনে কখনও দ্রুতবেগে, কখনও ধীরে ধীরে বলে চলেছেন :

—সেই যে করে ছোট ভাইকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল, সে কথাটা কেউ যেন ভুলতে পারছে না। আমি সে-কথা মনেই করি না বৌমা! ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী বলে হেসেই উড়িয়ে দিই। আমার কাছে শৈলেশও যা, সমরও তাই। পেটে না ধরলেও সেই আমার বড় ছেলে। কিন্তু ভুলতে পারে না লোকে, আর ভুলতে পারে না ও নিজে। সেই অতিভয়ঙ্কর কাজটা রয়ে গেছে ওর নিজেরই চোখের চাউনিতে। পরকে দোষ দিই কি করে বল?

হরসুন্দরী থামলেন। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অরুন্ধতীর চোখ স্থির, মুখে যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই, সমস্ত শরীর কণ্টকিত।

মনে মনে হরসুন্দরী খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন,—তাই তো ভাবি বৌমা,—একদিন নয়, দু'দিন নয়,—সারা জীবন, একা, এই এত বাড়িতে এমন লোকের সঙ্গে তুমি কাটাবে কি করে? এ কী শাস্তি ঠাকুর তোমাকে দিলে?

হরসুন্দরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—বেয়াই মশাই কাজটা ভালো করেন নি মা! তিনি নিজেও নিশ্চয় এ-সব কথা জানেন। না জানলেও, দূরে তো নয়, কারও কাছে জেনেও নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর নাকি উপায় ছিল না। সুদে-আসলে দেনা না কি অনেক হয়ে গিয়েছিল! ও কি কম পিশাচ! ওর হাতে এক বার পড়লে তার আর নিস্তার নেই!

কুণ্ঠিত ভাবে ঠাকুর ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে একখানি শ্বেত পাথরের রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টি এবং আর এক হাতে একটি শ্বেত পাথরের গ্লাসে সরবৎ। ভক্তিভরে সেগুলি সে হরসুন্দরীর পাশে নামিয়ে দিলে।

হরসুন্দরী চট করে মুখ তুলে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে এ-সব দিতে তোমাকে কে বললে ঠাকুর?

ভয়ে জড়সড় ঠাকুর জোড় হাতে নিবেদন করলে, আজ্ঞে বাবু।

—বাবু!—হরসুন্দরী অবাক হয়ে বললেন,—তিনি তো ও-দিকের মাঠে মজুর খাটাচ্ছেন দেখে এলাম!

ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, আজ্ঞে না। তিনি অনেকক্ষণ থেকেই ও-ঘরে বসে আছেন। বলে বাঁ হাত দিয়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

হরসুন্দরীর ঠোঁটের কোণে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা হাসির বিদ্যুৎ একবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। বেশ জোরে জোরেই বললেন, তোমার বাবু কি জানেন না, প্রাতঃসন্ধ্যা না করে আমি জল খাইনে?

এর উত্তর ঠাকুরকে আর দিতে হল না। স্বয়ং সমরেশ দ্বারপ্রান্তে করযোড়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আহ্নিক তো তোমার কখন হয়ে গেছে মা!

সমরেশ ওঁর সিক্ত উন্মুক্ত কেশ এবং পরিধেয়ের দিকে চাইলেন। সেই দৃষ্টিই হরসুন্দরীর কাছে যথেষ্ট। তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তা দেখে সমরেশ বললেন, পেটে না ধরলেও আমি তো তোমার বড় ছেলে। কাল সমস্ত দিন কি খাটুনীই খাটলে! অথচ মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি। আজ বড় ছেলের বাড়িতে একটু মিষ্টি-মুখ করে যেতে হবে।

সমরেশ আবার দু'টি হাত যোড় করলে।

হরসুন্দরীর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তাদের কথাবার্তার সবটা

না হলেও শেষের উপাদেয় অংশটার সবই সমরেশ পাশের ঘরে বসে শুনেছেন। ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে তাঁর এক মিনিটের অর্ধেক সময়ও লাগল না। মনে মনে তিনি কোমর বেঁধে ফেলেছেন।

হাঃ হাঃ, করে মধুর হেসে বললেন, ওরে পাগল ছেলে! গেলেই কি মা আপন হয়, নইলে হয় না?

বলে সরবতের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে বললেন, কিন্তু সে কথা বলবার জন্যে আসা। বৌমা কাল দিনে আমার ওখানে খাবেন।

সমরেশের হাত যোড় করাই ছিল। বললে, তার জন্যে কারও অনুমতি নেওয়ার তো দরকার নেই মা!

—জানি।—হরসুন্দরী অনিশ্চিত ভাবে হাসলেন। ঠিক বুঝতে পারলেন না সমরেশ কোন পথে চলেছেন। বললেন,—আর তুই তো মাছ-মাংস খাসনে শুনেছি। তা হোক, আমার নিরিমিষ হেঁসেলে আমরা মা-বেটায় একসঙ্গে খাব। কি বলিস?

—সেইটেই বোধ হয় সম্ভব হবে না মা!

—কেন?—হরসুন্দরীর দৃষ্টি অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

—শরীরটা কেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। কাল যে কেমন থাকব বুঝতে পারছি না।

হরসুন্দরী ওঁর দিকে চেয়ে দেখলেন, ওঁর মুখ আরক্ত। চোখও যেন ছল-ছল করছে। জ্বরই বোধ হচ্ছে।

তবু সুনিশ্চিত হবার জন্যে ডাকলেন, ইদিকে আয় তো দেখি।

সমরেশ শান্ত ছেলের মতো হরসুন্দরীর পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন। হরসুন্দরী হাতের উলটা পিঠ দিয়ে ওঁর ললাট স্পর্শ করেই চমকে উঠলেন:

—উঃ! জ্বর যে খুব বেশি মনে হচ্ছে! থার্মোমিটারটা আন তো বৌমা!

সমরেশ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থার্মোমিটার এ বাড়িতে নেই। তার কোনো দরকার হয়নি কখনও। জ্বর আমার কখনও হয় না। এটাও বোধ হয় জ্বর নয়।

—জ্বর নয় কি রে! গা যে বেশ গরম!

—হ্যাঁ। জ্বর নয়। একটু গা-গরম আর কি। জ্বর আমার হয় না।

হরসুন্দরীও উঠলেন। বললেন, পশ্চিম মুলুকে জ্বর কখনও হয়নি বলে কি এই ম্যালেরিয়ার দেশেও জ্বর হতে নেই? তুই আর ঘুরে ঘুরে বেড়াস না। চুপ করে শুয়ে পড়। বৌমা ডাক্তারকে একটু খবর দাও। কিম্বা থাক, আমিই গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্বর! বেশ জ্বর! বলে দরজায় গিয়ে পা বাড়ালেন।

যেতে যেতে বললেন, জ্বরটা যদি ছেড়ে যায়, আমি সকালেই পালকি পাঠাব। নইলে দুপুর বেলায়। সন্ধ্যা বেলায় খবর নোব সমর কেমন রইল।

সমরেশ দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই অরুন্ধতী পিছন ফিরে ঘোমটা দিয়ে বসে ছিল। এখন সেই অবস্থাতেই হরসুন্দরীর পিছু-পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সমরেশ নিঃশব্দে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু হাসলেন না। কি যেন তিনি ভাবছিলেন।

গা-গরম নয়, জ্বরই। খাঁটি ম্যালেরিয়া বলেই ডাক্তারের সন্দেহ। বস্তুতঃ, খালি-গায়ে যখন সমরেশ ঘুরছিলেন, তখনই দেহের উত্তাপ

একশো'র বেশি। ডাক্তার দেখে গিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিলেন। পথ্য দুধ-সাগু আর সারা দিন শুয়ে থাকা।

কিন্তু অরুন্ধতী রোগীর সেবা করা দূরে থাক্, ঘরে ঢুকতেই ভয় পায়। ওর বাপের বাড়ির ঝি লক্ষ্মী ওকে ঠেলে ঠেলে রোগীর ঘরে পাঠায়। কলের পুতুলের মতো অরুন্ধতী রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু রোগী নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। তাঁর যে কোনো কষ্ট হচ্ছে, তাঁর যে কিছুরই প্রয়োজন আছে, বোঝবার উপায় নেই।

ঔষধ দিলে হাঁ করেন। কিন্তু সেটা কটু, না তিক্ত, না কষা, রোগীর মুখ দেখে অনুমান করা অসাধ্য। তার পরে একটু জল দিলে খান। না দিলেও কিছুই বলেন না। দু'টি ঠোঁট আবার বন্ধ হয়ে যায়।

অরুন্ধতী অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভয় পায়। 'ও কি ব্রহ্ম পিশাচ!' হরসুন্দরীর এই কথাটা তখন থেকে ওর কানে কেবলই বেজে চলেছে। পিশাচ কেমন ও জানে না। কিন্তু সমরেশকে ও সুস্থ অবস্থায় দেখেছে। অসুস্থ অবস্থাতেও দেখছে। একমাত্র দেহ এবং কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোথাও যেন মানুষের সঙ্গে ওঁর মিল নেই। মানুষের সুখ-দুঃখের বোধ আছে। আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি আছে। স্নেহ-ভালোবাসাও আছে। কিন্তু ওই যে লোকটি চোখ বন্ধ করে খাটে শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছেন,—কে জানে ঘুমুচ্ছেন, না জেগে আছেন,—ওঁর বোধ করি এ-সব কোনো কিছুরই বালাই নেই। এমন কি, বুঝি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভালো লাগা মন্দ লাগার পর্যন্ত বালাই নেই। ওঁর কাছে কুইনিন এবং খোলের সরবতের স্বাদ যেন একই।

প্রসঙ্গছলে হরসুন্দরী আভাস দিয়ে গেলেন, বাল্যকালে সমরেশ নাকি তাঁর ছোট ভাইকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলেন,—পারেননি। কিন্তু, অরুন্ধতীর মনে হয়, সেই খুনেটা ওঁর ভিতরে যেন রয়েই গেছে। ওঁর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারই ছোবাটা মাঝে মাঝে ঝক-মক করে ওঠে, আর দুই দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধারে তারই বদ্ধ মুঠিটা।

বিচিত্র নয়, সকল মানুষ ওঁকে এড়িয়ে চলে। হিংস্র জন্তুর সামনে তার শিকার যেমন অসাড় অবশ হয়ে যায়, ওঁর সামনে দাঁড়ালে অরুন্ধতীর সর্বদেহ অসাড় হয়ে যায়। সকল মানুষেরই বোধ হয় সেই অবস্থা ঘটে। সুতরাং এড়িয়ে চলবে না তো কি?

অথচ আশ্চর্য, ভগবান ওঁকে কী অপূর্ব সুন্দর করেই না সৃষ্টি করেছেন! যাকে বলে শালপ্রাংশু মহাভুজ। তেমনি দেহের কান্তি!

কিন্তু অত রূপও কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না,—না নারীকে, না পুরুষকে। সকলকে যেন ছিটকে দূরে সরিয়ে দেয়। কাউকে কাছে আসতে দেয় না। কেউ কাছে আসতে চায়ও না বুঝি।

আশ্চর্য মানুষ! শুধু জাগ্রত অবস্থাতেই নয়, ঘুমন্ত অবস্থাতেও অরুন্ধতীর ওঁর কাছে দাঁড়াতে গা ছম-ছম করে। ওঁর সামনে অরুন্ধতীর কেমন যেন ধাঁধা লাগে। বাঘের সামনে মানুষের যেমন ধাঁধা লাগে তেমনি বোধ হয়।

জাগ্রত অবস্থায় সমরেশের চোখের দৃষ্টি যেন দূরে কোথায় নিবদ্ধ থাকে। অরুন্ধতীর ভ্রম হয় যেন ঘুমন্ত মানুষের চোখ। আর ওঁর মুদ্রিত চোখ দেখে সন্দেহ হয় মানুষটি জেগেই আছেন বুঝি।

এই ধরণের একটি রোগীকে নিয়ে অরুন্ধতীর দিনটা কোনো রকমে কাটল। সন্ধ্যা হতেই তার বুকের ভিতরটা গুর-গুর করতে লাগল। এই ঘরে এমনি রোগীর সঙ্গে সে রাত কাটাবে কেমন করে, এই কথাটা যতই ভাবে বুকের কাঁপুনী ততই যেন বেড়ে চলে।

তার ভীত-বিবর্ণ মুখ এক সময়ে লক্ষ্মীর চোখে পড়তে লক্ষ্মী চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মুখ-চোখ অমন শুকনো কেন দিদিমণি? তোমার আবার জ্বর এল না কি?

অরুন্ধতী যেন স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে অবলম্বনের এক-গাছি কুটো পেলে। শুষ্ক কণ্ঠে বললে, কি জানি লক্ষ্মী, শরীরটা কেমন যেন করছে!

—তবেই হয়েছে! কি বিদ্ঘুটে দেশ যে বাবা! পা দিতে না দিতেই জ্বর! দেখি তোমার কপালটা?

কপালে হাত দিয়ে গরম বিশেষ ঠেকল না। তবু লক্ষ্মীর ভয় গেল না। এই নির্বান্ধব পুরীতে একমাত্র যাঁর ভরসা তিনি ওই খাটে শুয়ে নিজেই জ্বরে ধুঁকছেন। তার উপর অরুন্ধতীর যদি কিছু হয়, তাহলে তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে।

একটু ভেবে বললে, রাত্রে আর কিছু খেও না দিদিমণি!

তাতে অরুন্ধতীর আপত্তি নেই। সাগ্রহে বললে, আমিও তাই ভাবছি লক্ষ্মী! রাত্রিটা উপোস দেওয়াই ভালো।

—একটু দুধ খেও বরং।—আবার একটু ভেবে লক্ষ্মী বললে—সেই ভালো।

অরুন্ধতীর ব্যবস্থা হল। কিন্তু অরুন্ধতী কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ওঁর কাছে কে থাকবে?

সে একটা সমস্যা সন্দেহ নেই।

একটু চিন্তা করে লক্ষ্মী বললে, ওই যে ছোঁড়াটা, কি যেন ওর নাম?

—কেষ্ট।

—হাঁ! ওকেই ভুজুং-ভাজুং দিয়ে রাখতে হবে। তা ছাড়া আর উপায় কি?

অরুন্ধতীর জ্বর নয়। কিন্তু একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হলেও এই আশ্বাসের পরে তার উত্তাপে চক্ষুর পলকে স্বাভাবিকে নেমে আসত। খুশি হয়ে বললে, সেই ভালো।

[ক্রমশঃ।

প্রেম ও বিরহ

আলোক মুখোপাধ্যায়

প্রেম কহে—'হে বিরহ, তুমি কি নিঠুর'!
বিরহ কহিল—'তোমা' করি সুমধুর।

কোণারকের ভাস্কর্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য

কোণারকের স্থাপনার কোনও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রায় নেই। শুধু অনুমানের ওপর ভর করে, পুরীর মন্দিরের রোজনামচা মাদলা-পঞ্জী, গঙ্গারাজাদের তাম্রলিপি আর আইন-ই-আকবরী নেড়ে বলতে হয় যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে রাজা নরসিংহ দেব এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু সে সমস্যা আমাদের নয়, তা' পুরাতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিকগণের আলোচনার বিষয়বস্তু। আমাদের বক্তব্য—কোণারকের মন্দিরের গায়ের নৃত্য, গীত ও বাদ্যরতা নারীমূর্ত্তিগুলি সম্পর্কে। বিশিষ্ট শিল্পী পার্সি ব্রাউন এ সম্পর্কে বলেছেন, These indicate emergence of a particular phase of Hinduism Known as Tantraism। মিথ্যা না-ও হতে পারে। তন্ত্রের প্রসারের গুপ্ত ইচ্ছা থাকলেও থাকতে পারে এই মূর্ত্তিগুলোর মধ্যে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু তাঁর 'কোণারকের বিবরণ' গ্রন্থে বলেছেন, মন্দিরগাত্রে রুচি-বিগর্হিত মূর্তিগুলি দর্শকের অন্তর্দৃষ্টির উদ্বোধক। অসম্ভব নয়। কোণারকে সঙ্গীতেরও অভাব নেই। পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তিদের নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গী, নৃত্যশীল শিবও চতুর্মুখ ভৈরব, টিকটিকি চিহ্নিত নটীরা অন্যান্য নারীদের মত রাণীর দাসী হয়ে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাথে নৃত্য-গীতে ভরপুর। কোণারককে সূর্যের গীতিচঞ্চল রথরূপে কল্পনা করে যে সুবৃহৎ চক্র নির্ম্মিত করা হয়, তারও অক্ষাগ্র, অর ও নেমিতে অসংখ্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যরতা নারী ও নটীদের প্রতিমূর্তি খোদাই করা রয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত সুবিশাল মহাসমুদ্রকে সামনে রেখে মহাকালের ঝড়ঝঞ্ঝা, কত রাজার, রাজত্বের উত্থান-পতনকে পেছনে ফেলে ভগ্নপ্রায় অবস্থাতেও এই শিল্প-সুষমা এখনও

স্বরলিপি বৈদিক যুগে সৃষ্ট

'আজ্য দোহম্'—সামকে বর্তমান লৌকিক স্বরের সাহায্যেও প্রকাশ করা সম্ভব।

২র   ২র   ২র   ২র৩ ৪র ৫   ২র৩ ৪র ৫
হাউ   হাউ   হাউ। আজ্যা দো হম্   আজ্য দো হম্।
সা-সা, সা-সা, সা-সা,। সা-নি   ধ-প   স-নি ধ- প
২র৩   ৪র   ৫   ২র   ২র   ২   ১
আজ্য   দো   হম্। মূর্দ্ধা নং দা ই। বাS ৩ অ র।
সা-নি   ধ-   প   সা-রিS রি রি রি   সাS নি রি রি
২   ৩   ৪   ৫
তি   পৃ   থি   ব্যাঃ।
সা   নি   ধ   প।

এই সামে ২৭টি পর্বন্ বা সাঙ্গীতিক অংশ আছে। মাত্র সাতটির স্বরসঙ্কেত দেখানো হল স্থানাভাব বশতঃ। অনেকের মতে সামগানে মাত্র তিনটি স্বর ছিল। নি সা রি। অনেকে আবার নি সা রি সা মা অথবা নি সা রি গা মা পা স্বরেরও কথা বলেন। দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী রামস্বামী একটি প্রবন্ধে (Samagana—Journal of the Music Academy, Vol, V 1934.) এই কথাটি সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। যাই হোক, এ থেকে এই প্রমাণিত হল যে, স্বরলিপি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিক যুগেই।

ধনুর্যন্ত্র ও বেহালা

বেদে বর্ণিত কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের কথা এর আগেই নানা প্রসঙ্গে বলেছি। দুন্দুভি, ক্ষোণী, কর্করি প্রভৃতি নানাজাতীয় চামড়া, রেশম, তার ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রের কথা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে।, এ সব ছাড়াও অথর্ববেদে ৪র্থ কাণ্ডে ৬৯ সূক্তে ২

অধ্যায়ে 'বক্র' নামক একটি যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। "যস্ত আস্যাং পঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধিধ্বনঃ" (৪র্থ শ্লোক)। সায়ন এর ভাষ্য লেখবার প্রাক্কালে বলেছেন, 'যে স্থাং বক্রাং বক্রীভূতাদ্ (অধি) অধিজ্যাদ্ ধ্বনঃ আস্যাং ধনুর্যন্ত্রেণ পুরুষশরীরে প্রাক্ষিপৎ।" অনেকের মতে, এই 'বক্র' ধনুর্যন্ত্রই পরে বেহালা বা 'বাজুলীন' বাদ্যযন্ত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই 'বক্র' বাদ্যযন্ত্র 'ধনুর্যন্ত্র' এরই নামান্তর মাত্র, এ-কথাও অনেকে বলেন। বৈদিক সাহিত্যে ধনুর্যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে অনেক স্থানে। ধনু যেমন শত্রুনাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হত ও ধনুর জ্যায়ে শর যোজনা করে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হত, তেমনি ধনুর জ্যায়ে শব্দ সৃষ্টি করে (টঙ্কারধ্বনি দ্বারা) শত্রুদলের মনে ত্রাসের সঞ্চারও করা হত। এই জ্যা-শব্দই সংস্কৃত রূপ নিয়ে পরবর্তী সময়ে সাঙ্গীতিক স্বরের প্রকাশক হয়েছিল এবং বেহালাতেও তাই পাওয়া যায়।

তন্ত্রে বীণার বিবরণ

বীণার সম্পর্কে অনেক কিছু এর আগেই বলেছি। এবারে বীণা প্রসঙ্গেই কিছু অন্য আলোচনা করা যাক। তন্ত্রে বীণার উল্লেখ রয়েছে একাধিক বার। ডাঃ এম কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন, of the thirty two yamalatantras, some treat music and the passages are worth quotation...in it we find a succinct description of 16 musical instruments...etc.

যামলতন্ত্রে বীণা সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে,—

চতুর্বিধানাং বীণানাং লক্ষণং তন্ত্রীলক্ষণম্।
কিন্নরস্বরযন্ত্রাদি লক্ষণং মেললক্ষণম্॥

অর্থাৎ চার রকম বীণার লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া 'উড্ডীশমহামন্ত্রোদয়' তন্ত্রে ষোলটি অধ্যায়ে ষোল রকম বাদ্যযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই ষোল রকম যন্ত্রের নাম— তালনিলয়, সপ্তরি, পত্তন, মণ্ডল, ভেরিবিম্ব, তিমিল, থৃথুক, মিথক্কথা, ডমরু, মুরর, অঙ্গুলিস্ফোট, আলমণি, রাবণহস্তক, উদ্বস্ত, ঘোষাবতী, ব্রহ্মক। শৈব, পঞ্চরাত্র, শক্তি, যামল ও উড্ডীনতন্ত্রে বীণার কথা আছে। ১৯শ সংখ্যক যামলতন্ত্রটির নামই বীণাতন্ত্র। বীণাতন্ত্রে উল্লেখ আছে,—

একোনবিংশং বীণাখ্যতন্ত্রং লক্ষ-প্রমাণকম্।
নাদব্রহ্মানন্দসিদ্ধির্যেন সিধ্যতি বৈ নৃণাম্॥

চতুর্বিধানাং বীণানাং লক্ষণং তন্ত্রীলক্ষণম্।
কিন্নরস্বরযন্ত্রাদি লক্ষণং মেললক্ষণম্॥
ষড়্গীতাদিপ্রকথনমুৎপত্তিস্থানবর্ণনম্।
এবমাদীনি কীর্ত্যন্তে যস্মিন তন্ত্রে সহস্রশঃ॥

ভারতের সঙ্গীত-সাধক (৩)—সুরদাস

আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়—সুরদাসের পিতা রামদাস ছিলেন আকবরের রাজসভার সঙ্গীতকার। সুরদাসও সে সভায় সঙ্গীত-সাধনা করেছেন, এমন অনুমানও অনেকে করেন। সে যাই হোক, ধারণা হয় যে, ১৫শ থেকে ১৬শ সম্বৎ অর্থাৎ ইংরেজী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভক্তকবি গায়ক সুরদাসের জন্ম হয়। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ। তাঁর বংশ-পরিচয়ঃ

জগৎ-ব্রহ্মরাও
|
চন্দ বা চাঁদকবি
|
গুণচন্দ্র
|
শীলচন্দ্র
|
হরিচন্দ্র
|
রামদাস বা রামচন্দ্র
|
সুরদাস

অর্থাৎ সুরদাস চাঁদকবির বংশধর। তিনি অন্ধ ছিলেন। জন্মান্ধ ছিলেন কিনা জানা যায় না। সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় শিক্ষা পিতার নিকটে। পিতা রামদাসের মৃত্যুর পর তিনি ভজন গান লিখতে সুরু করেন। এই সময়ই 'সুরস্বামী' এই ছদ্মনামে 'নলদময়ন্তী' নাকি তিনিই রচনা করেন। ভাগবত-পুরাণের অনুবাদক সন্তদাসও নাকি তিনিই। সুরসাগর নামেও একাধিক ভজন রচনা করা আছে তাঁর। গোকুলে রাজদরবারে থাকা কালে ইংরাজী ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

'দৃষ্টকুট' গ্রন্থে তাঁর ভগবৎ-দর্শন সম্পর্কে চমৎকার একটি প্রবাদ আছে। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তখন তাঁর ছয় পুত্রই মৃত। দিন-রাত আপন মনে শুধু ভগবানের নামগান করেন আর বলেন, 'কেন আর রেখেছিস এ জগতে।' অন্ধ বলে এই সময় তাঁর কথা টুকে নেবার জন্য একজন লেখক ছিলেন। যখন লেখক কাছে না থাকতেন সুরদাস দেখতেন তাঁর পাশে বসে কে যেন তাঁর গান টুকে নিচ্ছে। যেই হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেন সেই অদৃশ্য হাত সরে যেত। সুরদাস নিজেই বলছেন, 'আমাকে দুর্ব্বল জানিয়া তুমি আমার হাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তোমার উদ্দেশ্য—আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া মনে করিব। কিন্তু জানিয়া রাখিও যে, তুমি যত দিন না আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে, তত দিন আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিব না।'

এক তুলসীদাস ভিন্ন এত উচ্চাঙ্গের ভাব সচরাচর আর লক্ষ্য হয় না।

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত রেকর্ডের মধ্যে অনেকগুলি ভালো ভালো গান, কৌতুক ও যন্ত্রসঙ্গীত বেরিয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেলঃ "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"—N 82656—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জাগায়, তাঁর এবারের গান দুটি—"জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পার" এবং "এখনো

আকাশে চাঁদ" গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা এবং শিল্পীই এতে সুর যোজনা করেছেন। সত্যই সুন্দর হয়েছে গান দু'টি। N 82657—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের গাওয়া, শ্যামল গুপ্তের রচনা, দু'টি সুন্দর আধুনিক গান—"কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্নঝরা" এবং "আকাশ যদি না অতো সুদূর হতো" সুর দিয়েছেন—নচিকেতা ঘোষ। N 82658—সম্প্রতি 'নাগিন' চিত্রটির অনেক গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। তারই দু'টি গানের সুরে রচিত দু'খানি বাংলা গান "মন দোলে মোর প্রাণ দোলে" এবং "অভিমানিনী জানে না"—গেয়েছেন কুমারী ইলা চক্রবর্ত্তী। রচনা পবিত্র মিত্র। সুরের মাধুর্যে মোহ সৃষ্টি করে। N 76015—'বিধিলিপি' চিত্রের গান—"অন্তরে আজ কে পাঠালে" এবং "পৃথিবী তোমার সুন্দর"—গেয়েছেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মৃণাল চক্রবর্ত্তী। N 76016—"বিধিলিপি" চিত্রের আরও দু'টি গান—"ঘুম যাবে নিঝুম রাতে" "রাগে মুখ বাঁকানো।" গেয়েছেন—গায়ত্রী বসু আর প্রশান্তকুমার। N 76017—'কৃষ্ণ-সুদামা' বাণী চিত্রের গান—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"হরিদর্শন অভিলাষী" এবং "ঘনঘোর বরিষণে।" N 76018—শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে 'কৃষ্ণ-সুদামা' চিত্রের গান, "নীল যমুনায় তমাল-বনে" শ্যামল মিত্র ও প্রতিমা ব্যানার্জির গাওয়া "জয় জয় গোবিন্দ।" ভক্তিরসাপ্লুত কণ্ঠে সুন্দর গান। কলম্বিয়া GE 24760—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সুরের ইন্দ্রজাল 'অগ্নিপরীক্ষা' চিত্রের গানে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। তার এবারের গান দু'টির রচয়িতাও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর সুর—অনুপম ঘটক—যারা 'অগ্নিপরীক্ষা'র "গানে মোর ইন্দ্রধনু" গানটি সৃষ্টি করেছিলেন। এবারের গান হল—"গানে তোমায় আজ ভোলাবো" আর "আমি শুনি ওগো শুধু শুনি"। এ গান শুনে ভোলা যায় না। GE 24761—মিন্টু দাশগুপ্তের বিখ্যাত কৌতুক-গীতি—"মুখুজ্জে বনাম সরকার" সকলেরই ভালো লাগবে। বিখ্যাত ব্যঙ্গরসিক 'অ-কু-ব' বিরচিত এই গাথাটি সাম্প্রতিক কালের একটি বিশিষ্ট রচনা বলে বিবেচিত হবে। কৌতুকের মাধ্যমে ব্যঙ্গরস পরিবেশনে অজিতকৃষ্ণ বসুর নাম বর্ত্তমানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুর-সংযোগে সে রসের বৃদ্ধিই ঘটেছে। GE 30292—'জয় মা কালী বোর্ডিং' চিত্রের গান—শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে—'তারার চোখে ঘুম নেমেছে,' গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে 'তোমার চোখে বল জানল কি ?' GE 30293—শ্যামলী মিত্র ও গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে—"এই নিরালায় পান পিয়ালায়" এবং "ভ্রমর-শাকী আঙুরবনে" দু'টিই "জয় মা কালী বোর্ডিং" চিত্রের। GE 30294—'কৃষ্ণ-সুদামা' চিত্রের গান—রবীন মজুমদারের কণ্ঠে—"হরিদর্শন অভিলাষী" এবং "দীপশিখা তুমি"। GE 25830—অমর সিং জসওয়াল এর ক্লারিওনেট। নাগিন চিত্রের দু'টি গানের সুর।

আমার কথা (৮)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

প্রতি বছর জন্মাষ্টমী আমার জন্মদিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জন্ম আমার ৯ই ভাদ্র ১৩০১। স্থান ৯, নম্বর মদন ঘোষ লেন, কলিকাতা। বাবার নাম স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দে। মা রত্নমালা দে। আমি যে অন্ধ, একথা নতুন কোরে বলার প্রয়োজন হয় না, তবে আমি জন্মান্ধ নই। বারো বছর প্রকৃতির রূপ বেশ দু' চোখ দিয়ে দেখেছিলুম, জানতেও পারিনি যে ঐ চোখ দিয়ে আর আমি দেখতে পাব না আমার প্রিয়জনদের, রূপ-রস-গন্ধ-ভরা শ্যামল পৃথিবীকে। বৌবাজার স্কুলে তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। পড়তে পড়তে বোধ করতে লাগলুম, চোখে দুটোয় কেমন যেন সব ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। আর মাঝে মাঝে হচ্ছে দু'চোখে ভীষণ যন্ত্রণা। সে সময়ে শহরের নামী সব চোখের ডাক্তার তাঁরা সকলেই আমার চোখ দেখলেন, চিকিৎসা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না—দু' মাসের ভেতর আমার চোখ দু'টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল—আমি অন্ধ হলুম।

ছোটবেলা থেকেই আমার খুব মিষ্টি গলা ছিল। শুনে শুনে বেশ গান গাইতে পারতুম। চোখ দু'টি যখন গেল, দেখছি আর কোন পথ নেই, তখন সঙ্গীতকেই জীবনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলুম। আমার আগে আমাদের বংশে আর কেউ গানের চর্চা করেন নি, তবে আমার পর বংশের অনেকেই গান-বাজনা করে থাকেন।

বেশ মনে পড়ে, সে মাসটিও ছিল ভাদ্র, যেদিন আমি গুরুর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম গান শিখবো বলে। বয়েস তখন আমার আঠারো। সেকালের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক স্বর্গীয়

শশিভূষণ দে মশায় আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু। তাঁর কাছে আমি পাঁচ বছর খেয়াল শিখি। খেয়ালের শিক্ষা শেষ করে টপ্পা শেখার জন্যে গুরু খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম পূজনীয় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁর কাছেই আমার টপ্পার শিক্ষা। এর পর আমি সঙ্গীত বিষয়ে বহুজনের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করি। তাঁদের ভেতর কয়েক জন হলেন করমতুল্লা, শানি মহারাজ, মহম্মদ দবীর খাঁ প্রভৃতি।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন দিবস থেকেই তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অতীতের সে মধুর সম্পর্ক আজও ছিন্ন হয়নি। যেদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের স্থাপনা হোল সেদিন আমিই দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে একখানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলুম সেদিনকার কলকাতা বেতার কেন্দ্রের শ্রোতৃবৃন্দকে। প্রথম গেয়েছিলেন স্বর্গীয় দীনু ঠাকুর। বিশ্বকবির রচিত একখানা গান গেয়ে তিনি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

আমার রেকর্ড একমাত্র হিজ মাষ্টার্স ভয়েস ছাড়া আমি কখনও কোথাও করিনি। আঠারো বছর বয়সে আমার গানের রেকর্ড বাজারে বের হয়। ডিসেম্বর মাস। প্রথম রেকর্ড, একখানি ব্রহ্মসংগীত।

'আর চলে না
চলে না মা গো তোমা বিনা দিন চলে না।'

গান ছাড়াও আমার জীবনের অন্যতম শখ হোল অভিনয় করা। আজ পর্য্যন্ত আমি বহু বার নানা মঞ্চে অভিনয় করেছি। বসন্তলীলায় বসন্তদূতের ভূমিকাই হোল আমার প্রথম মঞ্চ-অভিনয়। এই অভিনয় আমি করেছিলুম শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর অ্যালফ্রেড থিয়েটারে।

অভিনয় বস্তুটিকে আমি কত যে ভালোবাসি তার একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ করি অত্যুক্তি করা হবে না। নিজে অভিনয় করতে করতে অনুভব করতে লাগলুম কলকাতা শহরে রঙ্গালয়ের খুব অভাব। সে অভাব পূরণের জন্য জায়গা খুঁজে এক দিন এক রঙ্গালয়ের ভিত্তি স্থাপন করলুম। কালে সেই রঙ্গমঞ্চটির নাম হয় 'রঙমহল।' 'রঙমহল' সে নাম আজও বহন করে চলেছে তবে তার মালিক আজ আর আমি নই। অর্থের অভাবে যখন দেখলুম আর আমি রঙমহলকে চালাতে পারছি না, তখন আমার বড় সাধের রঙমহলকে তুলে দিতে হোল অন্যের হাতে। রঙ্গালয় ছাড়াও আমি একটি বই প্রযোজনা করেছিলুম। হয়তো মাসিক বসুমতীর বহু পাঠক-পাঠিকাই সে খবর রাখেন। যে বইখানি আমি নিজ অর্থব্যয়ে তুলেছিলুম তার নাম 'পূরবী'।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ছাড়াও আমি রূপালী পর্দার বুকে বহু বার ধরা দিয়েছি। রূপালী পর্দার বুকে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ শ্রীদেবকীকুমার বসুর চণ্ডীদাসে। রূপালী পর্দায় অভিনয় করা ছাড়াও আমি বহু ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজও করেছি। সব ক'টির নাম দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করি। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হিন্দী ছবি সীতা, সোনার সংসার, বোম্বের লিডর অব দি সিটি, তমন্না ইত্যাদি থেকে সর্বশেষ রাণী পর্যন্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত গানগুলি আমার বড় প্রিয়। তাঁর রচিত বহু গান আমি গেয়েছি। কবি খুশী হয়ে আমায় ডাকেন 'গায়ক কবি' বলে। আমার ছাত্র-ছাত্রীর অভাব নেই। তবে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন যেমন—বলাই ভট্টাচার্য (আমার প্রথম ছাত্র), প্রণব দে, প্রভাস দে, প্রবোধ দে (মানা বা মান্না দে নামেই প্রসিদ্ধ) প্রভৃতি।

বর্তমানে আমি ভূপেন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। দীর্ঘদিন সঙ্গীতের সাধনা করে যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছি তার কিছুটা এখানে যদি নিবেদন করি, তাহলে বোধ করি খুব অন্যায় কিছু হবে না। গান শিখতে হলে শিক্ষার্থীকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় বহু গানের স্কুল দেখা যায়, কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের ভেতর এ জিনিসটার অভাব অনুভব করেছি। দেশে গানের চর্চা যে বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তেমন কেউ উৎসাহ নিচ্ছেন না দেখে ভয় হয় গান বস্তুটি কিছু দিনের ভেতর রসাতলে না চলে যায়। আধুনিক সঙ্গীত বলতে যদি কিছুকে স্বীকার করতে হয় তাহলে আমি রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু তো দেখি না। আমাদের ঘরের নিজস্ব সম্পদ হোল কীর্তন। কীর্তনের অমন মধুর গান আর হয় না। হয়তো এর ভেতর রাগ-রাগিণী তেমন কিছু না থাকতে পারে তবুও বলবো কীর্তনের মতন জিনিস নেই। কণ্ঠসঙ্গীত সব থেকে কঠিন জিনিস। যন্ত্রসঙ্গীতে দু'টি হাত ও দু'টি হাতের দশটি আঙুলের সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে কণ্ঠই হোল সর্বস্ব। যন্ত্রে সা-রে প্রভৃতি স্বরগুলোর ভেতর বেশ একটা ব্যবধান আছে, কিন্তু কণ্ঠে তা নেই। যেখান থেকে 'সা' সেখান থেকেই 'রে' 'গা' ইত্যাদি। তাই আমার মনে হয়, কণ্ঠসঙ্গীত সব থেকে কঠিন জিনিস আর সেই জন্যে কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যাপারে সাধকের বহু

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জেনেভা সম্মেলনের সাফল্যের স্বরূপ—

জেনেভার প্যালেস্ অব্ নেশান্সে গত ১৮ই জুলাই হইতে ২৩শে জুলাই (১৯৫৫) পর্য্যন্ত ছয় দিন ধরিয়া বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রনায়কদের যে-সম্মেলন হইয়া গেল তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার এবং যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছে, প্রায় সকলেই এ-কথা স্বীকার করিয়াছেন। এই সাফল্যের স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইলে এই সম্মেলন হইতে বিশ্ববাসী কি কি প্রত্যাশা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। এই সম্মেলনে অলৌকিক কিছু ঘটিবে, গত দশ বৎসরে যে-সকল বিশ্বসমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রনায়কদের কয়েক দিনের আলোচনাতেই সে-গুলির সমাধান হইয়া যাইবে, এতখানি প্রত্যাশা না করিলে জেনেভা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এ-কথা বলিতে বাধা নাই। বৃহৎ চারি জন রাষ্ট্রনায়ক যে একসঙ্গে সমবেত হইতে পারিয়াছেন এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহাও বড় কম সাফল্য নয়। যদিও প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি ও আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সম্মেলনে এই দুইটি বিষয় আর উল্লেখ করা হয় নাই। সম্মেলনের আবহাওয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সৌহার্দ্দপূর্ণ ছিল, কোন তীব্র কটাক্ষ দ্বারা বিষাক্ত হইয়া উঠে নাই, ইহাও বড় কম কথা নয়। সম্মেলনের পর দেশে ফিরিয়া যাইয়াও চারি জন বৃহৎ রাষ্ট্রনায়ক যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেও কাহারও উপর কোন দোষারোপ করা হয় নাই, ইহাও একটা শুভ লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে বৈ কি! তথাপি এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কোন সমস্যারই কোন সমাধান হয় নাই, সমস্যা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে। সমাধানের আশা করাও অবশ্য সম্ভব ছিল না। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়ার যে ভালর দিকে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ-কথা অনস্বীকার্য্য। সম্মেলন ব্যর্থ হয় নাই। চারি জন বৃহৎ রাষ্ট্রনায়ক ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও জার্ম্মাণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র সচিবদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটিতে আলোচিত হওয়া সম্পর্কেও তাঁহাদের মতৈক্য হইয়াছে। পররাষ্ট্র-সচিবগণ কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা সম্পর্কেও আলোচনা করিবেন।

সম্মেলনের কর্ম্মসূচী সম্পর্কে সহজেই এবং দ্রুততার সহিতই চারি জন বৃহৎ রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে মতৈক্য সাধিত হয়। সুদূর প্রাচ্য এই কর্ম্মসূচীর মধ্যে স্থান পায় নাই। সম্মেলনের জন্য যে চারি দফা কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারিত হয় তাহাতে প্রথমে স্থান পায় ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন। কর্ম্মসূচীর আর তিনটি বিষয় নির্দ্ধারিত হয় ইউরোপীয় নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কর্ম্মসূচী সম্পর্কে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনকেই মুখ্যস্থান প্রদান করেন। তাঁহাদের কথা এই যে, জার্ম্মাণীকে দ্বিধা-বিভক্ত রাখিয়া ইউরোপীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। রুশ প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বলেন যে, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি শিবিরের বিলোপ সাধন এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের ভিতর দিয়া জার্ম্মাণ সমস্যার স্বতঃই সমাধান হইবে। এই মতভেদ সত্ত্বেও জার্ম্মাণ সমস্যা কর্ম্মসূচীর শীর্ষস্থান লাভ করা পশ্চিমী শক্তিবর্গের জয় সূচনা করিলেও আলোচনা ও মীমাংসার জন্য রাশিয়ার আগ্রহের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। জার্ম্মাণীর প্রশ্ন লইয়াই যে সম্মেলন ব্যর্থ হয় নাই এবং কর্ম্মসূচীর পারম্পর্য্য সম্পর্কে যে মতৈক্য হওয়া সম্ভব হয়, ইহা সম্মেলনের প্রারম্ভিক একটা শুভ লক্ষণ বলিয়া যেমন গণ্য হইয়াছে, তেমনি এই শুভ লক্ষণের প্রভাব যে সম্মেলনের শেষ পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। সম্মেলনের গতিধারা আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচনার তৃতীয় দিবসেও জার্ম্মাণী সম্পর্কে কোন মতৈক্য হওয়া সম্ভব হয় নাই এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কেও মতভেদ অব্যাহত থাকে। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ঘোষণা করা হয় যে, গবর্ণমেণ্টের অধিনায়কগণ কর্ম্মসূচীর প্রথম দফা অর্থাৎ জার্ম্মাণী সম্পর্কে মীমাংসার অপেক্ষা না করিয়াই দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা চালাইয়া যাইবেন। সম্মেলনের তৃতীয় দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের প্রস্তাব ছিল যে, জার্ম্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করা হইবে, স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন হইতে দেওয়া হইবে এবং উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদানের স্বাধীনতা দিতে হইবে, তবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ জার্ম্মাণী সম্পর্কে রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় গ্যারাণ্টি দিবেন। অন্য দিকে রাশিয়ার প্রস্তাব ছিল যে, ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত উহা অপেক্ষা করিতে পারে এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হইলে জার্ম্মাণীর কোনও শক্তিশিবিরে

আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল দুই দিন আলোচনার পরও তাহাই অব্যাহত থাকে।

সম্মেলনের তৃতীয় দিবসে (২০শে জুলাই বুধবার) বৃহৎ রাষ্ট্র-নায়ক-চতুষ্টয় জার্ম্মাণী ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে প্রস্তাব রচনার জন্য পররাষ্ট্র-সচিবদের উপর ভার অর্পণ করিতে সম্মত হন। স্যার এণ্টনী ইডেন যে-চারি দফা প্রস্তাব করেন উহার ভিত্তিতে এই প্রস্তাব রচিত হওয়া সম্পর্কেও তাঁহারা একমত হন। এই চারিটি প্রস্তাবের একটি হইল, ইউরোপীয় নিরাপত্তার দিক হইতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করা। ইউরোপের নিরাপত্তা অথবা ইউরোপের অংশবিশেষের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিবেচনা করা দ্বিতীয় প্রস্তাব। জার্ম্মাণী এবং তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সীমা ও পরিদর্শন সম্পর্কে বিবেচনা করা। অসামরিক অঞ্চল গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করা চতুর্থ প্রস্তাব। তৃতীয় দিনের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল কর্ম্মসূচীর দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। পূর্ব্বদিন (১৯শে জুলাই) রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই, অচল অবস্থা দেখা দেয়। এই অচল অবস্থার অবসানের জন্য বৃহৎ পররাষ্ট্র-মন্ত্রিগণ ২০শে জুলাই প্রাতে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করিয়াও কোন সমাধানে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই ব্যর্থতার পর রাষ্ট্রপ্রধানগণ বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনার অগ্রগতি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হয়। পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্র-প্রধানত্রয় পরোক্ষেও দ্বিধা-বিভক্ত জার্ম্মাণী অব্যাহত রাখা স্বীকৃত হইতে পারে এইরূপ কোন নিরাপত্তা পরিকল্পনা আলোচনা করিতেও রাজী হন না। তাঁহারা রাশিয়াকে গ্যারাণ্টি দেওয়ার কথা পুনরায় উত্থাপন করেন। কিন্তু রাশিয়া অধিকতর বাস্তব কিছু ব্যতীত শুধু গ্যারাণ্টিতে রাজী হইতে অস্বীকৃত হয়। অবশেষে রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে পুনরায় পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের নিকট প্রেরণ করেন। সুতরাং জার্ম্মাণী ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে প্রস্তাব রচনার ভার পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের উপর অর্পিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই একথা উল্লেখ করিয়াছি।

সম্মেলনের চতুর্থ দিনের (২১শে জুলাই) বৈঠকে কর্ম্মসূচীর তৃতীয় বিষয় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা হয়। জার্ম্মাণীর একীকরণ এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা এই দুইটি সমস্যা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ আলোচনা কি ভাবে চলিবে সে-সম্পর্কে বৃহৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের রচিত একটি খসড়াও রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। জার্ম্মাণীর একীকরণ, না ইউরোপীয় সমস্যা প্রথমে আলোচিত হইবে, এই বিষয়টি ছাড়া আর সকল বিষয়েই পররাষ্ট্র-সচিবগণ একমত হন। এই দিনের বৈঠকে দুইটি ঘোষণার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন ঘোষণা করেন যে, এখন বৃটেনও হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিতেছে। প্রেঃ আইসেন হাওয়ার অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন যে, রাশিয়া অথবা চতুঃশক্তির অপর কেহ যদি তাঁহাদের সামরিক শক্তির স্বরূপ প্রকাশ করিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে আমেরিকাও তাহার সামরিক শক্তির স্বরূপ প্রকাশ করিতে রাজী থাকিবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সামরিক কাঠামোর সম্পূর্ণ তথ্য বিনিময়ের প্রস্তাব করিয়া তিনি বলেন যে, রাশিয়া যদি মার্কিণ বিমান বহরকে আকাশ হইতে রাশিয়ার সমগ্র সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির ফটো তুলিতে দেয়, তাহা হইলে আমেরিকাও রুশবিমান বহরকেও সেই সুবিধা দিবে। মার্শাল বুলগানিন প্রস্তাব করেন যে, অস্ত্রহ্রাসের পথে প্রথম পাদক্ষেপ হিসাবে পরমাণু ও হাইড্রোজেন অস্ত্রাদির পরীক্ষা বন্ধ করিতে হইবে। তিনি আটলাণ্টিক চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি ও ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তিরও প্রস্তাব করেন।

সম্মেলনের পঞ্চম দিবসে (২২শে জুলাই) রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে কর্ম্মসূচীর চতুর্থ বিষয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই দিন সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, জার্ম্মাণী, ইউরোপীয় নিরাপত্তা এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র-সচিব স্তরে আলোচনা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও সম্মেলনের শেষ দিন ২৩শে জুলাই প্রাতে চারি রাষ্ট্রপ্রধান যখন তাঁহাদের গোপন অধিবেশনে মিলিত হইলেন তখনও পাঁচটি বিষয়ে মতৈক্য হওয়া বাকী রহিয়াছে। এই পাঁচটি বিষয় এখানে উদ্ধৃত হইল:—(১) পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দাবী অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনকে ইউরোপীয় নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব্বে স্থান দেওয়া হইবে, না, রাশিয়ার দাবী অনুযায়ী ইউরোপীয় নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। (২) সম্মেলনে উপস্থাপিত বিভিন্ন নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব রাশিয়ার দাবী অনুযায়ী বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠকে আলোচিত হইবে, না, পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দাবী অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটিতে আলোচিত হইবে। (৩) অক্টোবর মাসে (১৯৫৫) যে চারি বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন হইবে তাহাতে রাশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় জার্ম্মাণীই প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রিত হইবে, না, পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শুধু পশ্চিম জার্ম্মাণীই আমন্ত্রিত হইবে। (৪) উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক পরমাণু অস্ত্র বর্জ্জনের জন্য রাশিয়ার প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণের সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না। (৫) পরিদর্শনের প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের প্রস্তাব ভাবী নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার অঙ্গীভূত হইবে কি না। এই পাঁচটি বিষয় ব্যতীত সোভিয়েট-মার্কিণ সামরিক শক্তির বিবরণ বিনিময় সম্পর্কে প্রেঃ আইসেন হাওয়ারের প্রস্তাব এবং রুশসীমান্তের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী পরস্পর পরিদর্শন সম্পর্কে স্যার এণ্টনী ইডেনের প্রস্তাব সম্পর্কে রাশিয়ার উত্তর দান তখনও বাকী। ইহা হইতেই সম্মেলনের শেষ দিনের বৈঠকের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। পররাষ্ট্র-সচিবদের স্তরে চারি দিন ধরিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যে অচল অবস্থা চলিতেছিল শেষ দিন রাষ্ট্রপ্রধানগণ দুইটি বৈঠকে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পর উহার অবসান ঘটান, সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য হইয়া সম্মেলনের সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি হয়।

প্রথমে মতৈক্য হয় নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে। মার্শাল বুলগানিন পররাষ্ট্র সচিবদের অক্টোবর বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার দাবী পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটিতে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের

প্রস্তাব গ্রহণ করায় এই বিষয়ে মতৈক্য হয়। মার্কিণ-সোভিয়েট সামরিক তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য প্রেঃ আইসেন হাওয়ারের প্রস্তাবও এই সাব-কমিটিতে আলোচিত হইবে। সর্বশেষে মতৈক্য হয় ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা প্রস্তাব সম্পর্কে। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে একই সঙ্গে আলোচনা করা হইবে, পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের এই আপোষ প্রস্তাব মার্শাল বুলগানিন গ্রহণ করায় সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা সম্পর্কে মতৈক্য হয়। পররাষ্ট্র-সচিবদের অক্টোবর সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে আমন্ত্রণ করা সম্পর্কে এইরূপ মীমাংসা করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সহিত আলোচনা করার ভার পররাষ্ট্র-সচিবদের উপর অর্পিত হইল।

জেনেভায় চারি বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের গতিধারা, অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে যে-আলোচনা এখানে আমরা করিলাম, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মূল সমস্যাগুলি যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে, সমাধানের পথে এইগুলি একটুকুও অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা সম্মেলনের ফলাফল, সাফল্য বা ব্যর্থতা বিচার করিতে গেলে খুবই ভুল করা হইবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া যাঁহারা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলেন ঠাণ্ডা যুদ্ধের সেই সেনানায়কগণ আন্তর্জ্জাতিক মন কষাকষি দূর করিবার জন্য, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিরূপে সহযোগিতা করা সম্ভব, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য ছয় দিনব্যাপী শান্তিপূর্ণ আলোচনায় মিলিত হইতে পারিয়াছেন, ইহা-ই এই সম্মেলনের বড় রকম সাফল্য। যে পরিস্থিতি তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছিল, জেনেভা সম্মেলনে তাঁহারা মিলিত হইতে পারায় উহা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মেলনের আরম্ভ যাহাতে ভাল ভাবে হয়, সে সম্পর্কে গোড়া হইতেই তাঁহাদের মধ্যে আগ্রহ ছিল, সম্মেলন চলার সময় এই আগ্রহ তাঁহাদের অব্যাহত ছিল এবং সম্মেলনের শেষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা বিদায় লইয়াছেন। বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধান যে নির্দ্দেশনামা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আপোষের আবরণে বিভেদগুলিকে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে, একথা মনে করিলেও ভুল হইবে না। অক্টোবর মাসে (১৯৫৫) বৃহৎ পররাষ্ট্র অভিবাদন যে বৈঠক হইবে তাহাতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান খুব সহজ হইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। এ সম্পর্কে একাধিক বৈঠকের প্রয়োজন হইবে। ২৯শে আগষ্ট (১৯৫৫) নিউইয়র্কে সাব-কমিটির যে অধিবেশন হইবে তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানও বড় সহজ হইবে না। তথাপি জেনেভা সম্মেলনের ফলে ইউরোপে মন কষাকষি হ্রাস পাইবে এবং মীমাংসা না হইলেও স্থিতাবস্থা বজায় থাকার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ারও আশা করা যায়।

পরমাণু-শক্তি সম্মেলন—

৮ই আগষ্ট (১৯৫৫) জেনেভায় ৭৩টি দেশের প্রতিনিধিদের বারো দিনব্যাপী পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু-শক্তির নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সময় বিজ্ঞানীদের লইয়া এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে ৩রা আগষ্ট হইতে ৫ই আগষ্ট (১৯৫৫) পর্যান্ত লণ্ডনে পরমাণু বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের শেষের দিনের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ভাবী যুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের ফলে উহাতে কোটি মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বিশ্বের গভর্ণমেণ্ট সমূহকে শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ সমূহ সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। লণ্ডনের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আইনষ্টাইন এবং সাত জন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরিত পরমাণু-যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণীকে উপলক্ষ করিয়া। আইনষ্টাইন মৃত্যুশয্যায় এই সতর্কবাণীতে স্বাক্ষর দান করেন। এই সতর্কবাণীর উদ্যোক্তা আইনষ্টাইন এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল। ৯ই জুলাই (১৯৫৫) বার্ট্রাণ্ড রাসেল লণ্ডনে হয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সতর্কবাণী প্রকাশ করেন।

জেনেভায় ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ হোমী ভাবার সভাপতিত্বে পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামী ২০ বৎসরে হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড শক্তি বশীভূত করিয়া মানুষের বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা চিরদিনের জন্য মিটানো হইবে।

ডাঃ হোমি ভাবা তাঁহার অভিভাষণে এই আশ্বাস দেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই নূতন আণবিক স্বর্ণযুগের সূচনা হইবে। তাঁহার এই আশ্বাস যদি সফল হয় তাহা হইলে মানব জাতির যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরমাণু শক্তির ধ্বংস সাধনের ক্ষমতা যেমন অসীম তেমনি মানব জাতির কল্যাণ করিবার ক্ষমতাও যে উহার সীমাহীন তাহার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পরমাণু শক্তিকে ধ্বংসের অস্ত্র তৈয়ার করিবার কাজেই শুধু নিয়োজিত করা হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সর্ব্বপ্রথম হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বর্ষণের পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দশ বৎসরে পরমাণু বোমার উন্নতিই শুধু সাধিত হয় নাই, পরমাণু বোমা অপেক্ষাও বহু গুণে ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরমাণু অস্ত্র এখন আর শুধু কোনও একটি রাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার হইবে না, সে-সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই। পরমাণু যুদ্ধের পরিণাম যে ব্যাপক ধ্বংস সে-সম্বন্ধেও কোন মতভেদ নাই। তথাপি পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইয়াছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধগুলির সমাধান যদি না হয়, উহার জন্য যুদ্ধ যদি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে মানব-কল্যাণের জন্য পরমাণু শক্তির প্রয়োগ পদ্ধতি উৎকর্ষতা লাভ করিলেও উহার কল্যাণময় ফলভোগ করিবার জন্য কেহই আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা সত্ত্বেও মানব জাতির ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইহা মনে করিবার মত নিরাশাবাদী আমরা নই। জেনেভায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের প্রভাব সম্পর্কে অত্যধিক আশাবাদীও আমরা নই। বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি যদি শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই পরমাণু শক্তির মানব-কল্যাণের প্রয়োগের ভবিষ্যৎ দিগন্ত আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। গত জুলাই মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই সাফল্যের অগ্রগতি যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলেই শুধু শান্তির জন্য পরমাণু সম্মেলনের সাফল্য কার্য্যকরী হইতে পারিবে।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ—

সরকারী মার্কিণ বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং গত ২৯শে জুলাই (১৯৫৫), এই পরিকল্পনা প্রেঃ আইসেন হাওয়ারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ জেমস হাগেটি ২২শে জুলাই তারিখে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে এই সংবাদ প্রকাশ করেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ সৃষ্টি অবিমিশ্র আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হইবে কি না, না উহার মধ্যে কোন সামরিক সম্ভাবনাও লুক্কায়িত রহিয়াছে, বিশ্ববাসীর মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৯৪৫ সালের ২রা আগষ্ট পটসডামে বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন শেষ হওয়ার কয়েক দিন পরেই ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় সর্ব্বপ্রথম পরমাণু বোমা বর্ষিত হয়। উহার দশ বৎসর পর জেনেভায় বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন শেষ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ সৃষ্টির পরিকল্পনা ঘোষণা, একেবারেই তাৎপর্য্যহীন, একথা বলা যায় না। পরমাণু বিভাজনের প্রচেষ্টার সাফল্যে এক দিকে এই পরমাণু-শক্তিকে মানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হওয়ার আশা যেমন দেখা দিয়াছে তেমনি এই আশা অপেক্ষাও গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বিরাট ধ্বংসের কাজে উহার নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনায়।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহগুলি আকারে হইবে প্রায় ফুটবলের মত। ঐগুলি দুই শত হইতে তিন শত মাইল ঊর্দ্ধে থাকিয়া ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে প্রতি ৯০ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ উহারা ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণ করিয়া নামিয়া আসিবে এবং লয়প্রাপ্ত হইবে। পার্থিব মণ্ডলের আওতার বাহিরে অবিরাম পর্য্যবেক্ষণ চালানোই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং উহা দ্বারা যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে সেগুলি পৃথিবীর সমস্ত দেশকেই এমন কি রাশিয়াকেও সরবরাহ করা হইবে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির গবেষণায় রাশিয়া যে পিছনে পড়িয়া আছে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। এমন কি, ঊর্দ্ধাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়ার ব্যাপারে রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আগেই সাফল্যলাভ করিতে পারে, এমন আশঙ্কাও যে করা হয় নাই, তাহাও নয়। রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ আকারে আরও কিছু বড় হইতে পারে। আন্তঃগ্রহ চলাচল সংক্রান্ত সোভিয়েট কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক সেডভ বলিয়াছেন যে, "সোভিয়েট উপগ্রহ অদূর ভবিষ্যতেই ছাড়া হইবে, তবে ঠিক তারিখটা আমি বলিব না।" আমেরিকার আগে, না পরে ছাড়া হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি মৃদু হাসিয়া বলেন, ভবিষ্যতে উহা প্রমাণিত হইবে। মার্কিণ উপগ্রহ আন্তর্জ্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসর ১৯৫৭-৫৮ উপলক্ষে ছাড়া হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আন্তর্জ্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসর ১৯৫৭ সালের জুলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিবে। ১৮৮২-৮৩ এই এক বৎসর উত্তর মেরুতে পর্য্যবেক্ষণ চালাইবার জন্য ১৮৭৯ সালে আন্তর্জ্জাতিক মেটিরোলজিক্যাল কমিটি গঠিত হয়। উক্ত ১৮৮২-৮২ বৎসরটি প্রথম আন্তর্জ্জাতিক মেরু বৎসর নাম লাভ করে। উহার ৫০ বৎসর পর ১৯৩২-৩৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক মেরু বৎসর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৫৭-৫৮ সালে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক মেরু বৎসর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এবং উহার নাম রাখা হয় আন্তর্জ্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক রকম আন্তঃমহাদেশিক ব্যালিষ্টিক মিসিল (missile) তৈয়ারীর চেষ্টা করিতেছে। উহার মার্কিণ নাম 'absolute weapon' বা I. B. M. উহা এক রকম স্বয়ংচালিত রকেট। প্রথম পর্য্যায়ে উহার আকার বাস্কেট বল অপেক্ষা বড় হইবে না। পরে উহা বৃহত্তর আকারে নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক সুবিধা প্রদান করিবে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি উহারই প্রথম পর্য্যায় কি না, তাহা কে বলিবে?

১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৫ ॥

সমালোচকদের পশ্চাদপসরণ

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিষয় ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে—সাহিত্যের সমালোচকরা ক্রমেই পশ্চাদপসরণ করছেন। ক্রিটিকদের এই 'রিট্রীট', সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুভ কি অশুভ, তা নিয়ে বিচার করব না আমরা। তবে সম্পূর্ণ শুভ এবং একেবারে অশুভ, কোনটাই যে নয়, এ কথা ঠিক। একেবারে অশুভ নয়, তার কারণ, সাহিত্য-সমালোচনার নামে সাধারণতঃ যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়, তা হয় খেউড়, না হয় প্রশস্তিবাচন। আর যাই হোক, তা সমালোচনা নয়। তাতে উদীয়মান সাহিত্যিকরা, অনেক সময় অবিচারের অপমানে নিরুৎসাহ হন এবং তাঁদের স্বাধীন সাহিত্য-সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। তার ফলে সাহিত্যের ক্ষতি হয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, সমালোচকদের পশ্চাদপসরণ শুভ লক্ষণ বলতে হয়। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা দিক আছে। বহু লেখকের এবং একাধিক শক্তিশালী লেখকের সাহিত্য-সাধনার ফলে, সাহিত্যক্ষেত্র যখন সরগরম হয়ে ওঠে (সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে হয়েছে), তখন প্রত্যেক সাহিত্যিকই মনে মনে চান যে, তাঁর সাহিত্যের কেউ যথার্থ মূল্য যাচাই করুন। আমরা সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকে এই অভিযোগ শুনেছি যে, সাহিত্যের সমালোচনা হয় না, মূল্য যাচাই হয় না, আলোচনা হয় না ইত্যাদি, এবং তা না হ'লে তাঁরা কি ক'রে প্রকৃত পথের নির্দেশ পাবেন, কি ত্রুটি হচ্ছে না-হচ্ছে বুঝবেন! এ-অভিযোগ যথার্থ অভিযোগ। কিন্তু যাঁরা মুখে এ-কথা বলেন, তাঁরাই আবার কার্যক্ষেত্রে সমালোচনা করলে, সমালোচককে এই দৃষ্টিতে দেখেন না। তাঁকে ভুল বোঝেন এবং তার ফলে সাহিত্যিকে-সাহিত্যিকে মনোমালিন্য ঘটে। এই মনোমালিন্যের আশঙ্কাই সমালোচকদের মনে এত প্রবল হয়ে উঠেছে সম্প্রতি যে তাঁরা অনেকেই সাহিত্য সমালোচনা করা, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সাহিত্যের, এক রকম on principle, ছেড়ে দিয়েছেন। সমালোচকদের জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা এই কথাই বলেন। কিন্তু এ-সমস্যা তো সব সময় ছিল, এবং তার জন্ম কোন দিন সমালোচকরা বিদায় নেন নি। এখনই বা বিদায় নিচ্ছেন কেন? আমাদের মনে হয়, তার প্রধান কারণ, সাহিত্যের গোষ্ঠী-আধিপত্য ও গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ। সাহিত্যের গোষ্ঠী বা চক্র চিরদিনই ছিল, কিন্তু তখন তাকে ভয় করার বিশেষ কারণ ছিল। সম্প্রতি যে সব সাহিত্যচক্র গড়ে উঠছে তার বৈশিষ্ট্য হ'ল, সেগুলি শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম (যেমন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদি) কেন্দ্র করে দলের মতন তার প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিও প্রবল। তাই প্রত্যেকেই চান (যাঁরা দলভুক্ত নন), দলগুলিকে এড়িয়ে চলতে এবং বোলতার চাকে অনর্থক ঢিল না মারতে। এই কারণে সুস্থ সমালোচনা ও আলোচনা সম্প্রতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। সাহিত্যিকদের কোন সভাও যে আর দীর্ঘকাল বাংলা দেশে হয় না, তারও কারণ তাই। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের যত উজ্জ্বল সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, এই দুর্বলতা যত দিন না সে কাটিয়ে উঠবে তত দিন তার কোন ভবিষ্যৎ আছে ব'লে মনে হয় না। এতে প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই ক্ষতি হচ্ছে, ছোট বড় সকলেরই এবং সাধারণ ভাবে সাহিত্যেরও যে অপকার হচ্ছে তা অপূরণীয়। নেতাবুনেরা সজোরে অষ্টপ্রহর কীর্তন করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং প্রকৃত শক্তিশালী লেখকরা ন্যায্য ও প্রাপ্য প্রেরণা পাচ্ছেন না। বিচারশীল পাঠকরা নীরবে এর বিচার করছেন ঠিকই এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিচারই স্থায়ী হবে, চিরকাল তাই হয়েছে। ক্ষণিকের কীর্তনীয়ারা কোন দিনই সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী হয়নি। কিন্তু তবু মনে হয়, দলগত হীনতা ত্যাগ করলে হয়ত এই বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। সাহিত্যের সমালোচনাও হতে পারে।

বিজ্ঞাপনের অতিরঞ্জন

আমরা কিছু কাল পূর্বে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় অতিরঞ্জন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলাম। আমাদের দেশে যখন বিজ্ঞাপনের শৈশবাবস্থা ছিল, তখন তার কারণও ছিল, পাঠক সাধারণ সেদিন পর্যন্ত বাংলা বই কেনার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন না। তাই উপহার হিসাবে অতি সুলভ মূল্যে বহু মূল্যবান সাহিত্য সম্পদ বিক্রীত হ'ত। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত সুলভ মূল্যের গ্রন্থাবলী ও তার জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপন আজো অনেকের স্মরণে আছে। কিন্তু ইদানীং অসত্যকথন, আত্মপ্রচারের নির্লজ্জ চেষ্টা, মেকীকে আসল হিসাবে চালানোর অপচেষ্টা যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অতীতে কোনো বিখ্যাত গ্রন্থকারের কোনো গ্রন্থ যদি বহুল আলোচিত হয়ে থাকে তাহ'লে বর্তমান কালে প্রকাশিত সাহিত্যিক তস্করতায় অভিযুক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে সেই কথা ব্যবহার করাও আর এক জাতীয় অসাধুতা। আচার্য যদুনাথ পর্যন্ত সেদিন এই জাতীয় বিজ্ঞাপনকে 'বিজ্ঞাপনের মাতলামি' বলে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আমাদের এক বিশিষ্ট সহযোগী দৈনিক সম্প্রতি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা বার বার বাংলা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে লেখক এবং প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সদ্গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য।

পরিচয় দেওয়া উচিত, সমালোচনার অংশ-বিশেষও উদ্ধৃত করা উচিত, গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলা যায়, কিন্তু কোনো গ্রন্থ বা কোনো লেখক যে অন্য গ্রন্থ বা গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা মহৎ এ তুলনামূলক আলোচনার ভার পাঠক সাধারণের ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হয়। বিজ্ঞাপনের অসংযত ভাষা লেখক বা প্রকাশককে সাধারণের চোখে হেয় হাস্যাস্পদ করে তোলে, এই কথা বোঝার সময় হয়েছে।

সাহিত্যের সঙ্কলন-গ্রন্থ

মাছের তেলে মাছ ভাজার নীতি ব্যবসায়ের সকল ক্ষেত্রে যেমন আছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে থাকবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই সঙ্কলন-গ্রন্থ সেই নীতিরই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা, পাঠকদের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা যায় না। খুবই প্রয়োজন আছে। বিশেষ ক'রে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকার বিবিধ রচনার একটি বা একাধিক সঙ্কলন-গ্রন্থ থাকা উচিত। এমন অনেক পাঠক আছেন, যাঁরা আর্থিক অভাবের জন্য অর্থব্যয় ক'রে তাঁদের প্রিয় লেখকদের সমস্ত বই কিনে পড়তে পারেন না। সে ক্ষেত্রে সেই সব লেখকদের সুনির্বাচিত রচনার সঙ্কলনগ্রন্থ পাঠকসমাজের খুব বড় একটা অভাব পূরণ করে। কিন্তু সমস্যা হ'ল, সেই সঙ্কলনটি করবেন কে? অর্থাৎ রচনা নির্বাচন কে করবেন? একজন লেখকের ক্ষেত্রে এ-সমস্যা খুব জটিল নয়। লেখক নিজে যদি করেন, তাহ'লে সব চেয়ে ভাল হয় এবং তার মূল্যও থাকে। একজন লেখকের ক্ষেত্রে যে কোন সাহিত্য বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সমালোচক ও সম্পাদকও করতে পারেন, তাতে ক্ষতি হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে সেই সমালোচক বা সম্পাদকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখককে বিচার করবার সুবিধা হয়। তারও একটা সাহিত্যিক মূল্য থাকে।

কিন্তু সব চেয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যা হ'ল, বিভিন্ন লেখকের একজাতীয় রচনার সঙ্কলন প্রকাশ করা। যেমন বিভিন্ন কবির আধুনিক কাব্য-সঙ্কলন, গল্পলেখকদের গল্পসঙ্কলন, কি অন্যান্য রচনা-সঙ্কলন ইত্যাদি। সাধারণতঃ এ রকম ক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তি, সমালোচক বা সম্পাদককে দিয়ে এই ধরণের সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত নয়। সাহিত্যক্ষেত্রের দলাদলি, ব্যক্তিগত প্রীতি ও বিদ্বেষ, এই জাতীয় সঙ্কলনকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট ক'রে তোলে। সেই জন্য প্রকাশকদের উচিত, এই জাতীয় সঙ্কলন-গ্রন্থের সম্পাদনার ভার একজনের উপর না দিয়ে, একটি সম্পাদকমণ্ডলীর উপর দেওয়া। মণ্ডলী নির্বাচনে দেখা উচিত, যাতে বিভিন্ন আদর্শের বা ভাবধারার লোক তার মধ্যে থাকেন। একমাত্র এই পদ্ধতিতে, সুযোগ্য সম্পাদক-মণ্ডলীর সাহায্যেই, বিভিন্ন লেখকের একজাতীয় রচনার সঙ্কলন-গ্রন্থ ইয়োরোপের প্রকাশকরা প্রকাশ ক'রে থাকেন। এবং সেই জন্যই পাঠকরা তার সাহিত্যিক মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হন না। একজন ব্যক্তি, তিনি যেই হন না কেন, যদি বহু লেখকের একজাতীয় রচনা সঙ্কলনের দায়িত্ব নেন, তাহ'লে হাজার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। সাহিত্যের বিচারবুদ্ধি কোন একজন বোদ্ধার একচেটিয়া নয়। তা ছাড়া, যিনি বিচার করবেন, তাঁর নিজস্ব সঙ্কীর্ণ দল আছে, মোসাহেব আছে এবং বিদ্বেষের পাত্ররাও আছে। সুতরাং তিনি একা কখনই সুস্থ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন না। সেই জন্য দেখা যায়, একজন ব্যক্তির সম্পাদিত এই ধরণের সঙ্কলন-গ্রন্থের মধ্যে সঙ্কীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠীগত বিকৃত মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে এবং সঙ্কলনের কোন সাহিত্যিক মূল্য থাকে না। বুদ্ধিমান পাঠকরা অবশ্য তা বই খুলেই বুঝতে পারেন এবং তার যথোচিত দক্ষিণা দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার কারণ, এই জাতীয় সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে পাঠকদের অপমান ছাড়া আর কিছু করা হয় না। পাঠকদের সামনে তর্জনী তুলে বলা হয় যেন: "আমি যা বলছি তাই ঠিক, আপনারা যা বলেন ও ভাবেন, তা ঠিক নয়।" প্রকাশকদের তাই সব সময় উচিত, বহু লেখকের একজাতীয় রচনা নিয়ে যে সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে, তার সম্পাদনার ভার কোন একজন ব্যক্তির উপর না দিয়ে, একটি সুযোগ্য সম্পাদকমণ্ডলীর উপর সেই দায়িত্ব দেওয়া। একমাত্র তাহ'লেই সেই সঙ্কলনের সাহিত্যিক মূল্য থাকা সম্ভবপর। তা না হ'লে, তা প্রকাশ করা অর্থের অপব্যয় করা এবং সাহিত্যের অপকার করা ছাড়া কিছু নয়।

সাহিত্যের "পাবলিসিটি ভ্যান্"

সে দিন একজন খ্যাতনামা প্রকাশক বলছিলেন, বইয়ের প্রচারের জন্য "স্পেশ্যাল ট্রেনের" ব্যবস্থা করা যায় কি না। খুব ভাল আইডিয়া, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন। সকলে মিলে ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও, আসল পাঠকদের কাছে বইয়ের খবর প্রচার করা স্পেশ্যাল ট্রেন পাঠিয়ে সম্ভব হবে কি না বলা কঠিন। খরচ অনুপাতে কাজ হবে ব'লে মনে হয় না। তার চেয়ে, আমাদের মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের প্রকাশকরা মিলে যদি একটি পাবলিসিটি ভ্যান্ তৈরী করেন এবং শহর ও শহরতলীর মধ্যবিত্ত পাঠকদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, বইয়ের খবর প্রচার করার ব্যবস্থা করেন, তাহলে অনেক বেশী কাজ হয়। ভ্যানের চারি দিকে কাচের শো-কেসে নতুন সব বই সাজানো থাকবে, ভিতর থেকে একজন বইয়ের বার্তা মাইকে প্রচার করবেন এবং আর একজন বই সংক্রান্ত প্রকাশকদের প্রচারপত্রাদি বিলি করবেন। ছুটির দিনে, সকালে-বিকালে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘুরে এই ভাবে বইয়ের প্রচার করলে, খুব সহজেই মধ্যবিত্ত পাঠকদের বইয়ের খবর জানানো সম্ভব হবে এবং তাঁদের কৌতূহল উদ্রেক করাও কঠিন হবে না। এ কাজ সব প্রকাশকরাই মিলে-মিশে স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কোন অন্তরায় এখানে থাকা উচিত নয়, কারণ প্রত্যেক নতুন বাংলা বইয়েরই এই ভাবে প্রচার করা হবে, তা সে যে-প্রকাশকেরই হোক, বা যে লেখকের লেখাই হোক। এই ভাবে যদি প্রকাশকরা বাংলা বইয়ের প্রচারের দিকে মন দেন, এবং পাঠকদের বই-পড়া ও বই-কেনা সম্বন্ধে সজাগ করতে পারেন, তাহ'লে আজ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা যে-হারে বাড়ছে (স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে), তাতে যে কোন সুপাঠ্য বাংলা বইয়ের অন্ততঃ পাঁচ হাজার ক্রেতা-পাঠক হতে পারে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের উপকারিতা আছে। কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাঠকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ যতটা কাজ করে, পরোক্ষ বার্তা পরিবেশন তা করে না। ইয়োরোপের বড় বড় প্রকাশকরা তাঁদের

প্রতিষ্ঠানের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, তাতেও বইয়ের প্রচার সম্বন্ধে তাঁরা এই কথা বলেছেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের চেয়ে ডাকযোগে পরিচয় পত্র পাঠকদের কাছে পাঠানো (Direct Mailing) আরও বেশী ফলপ্রদ হয় বইয়ের ক্ষেত্রে। আমরা যে পাবলিসিটি ভ্যানের কথা বললাম, তাতে পাঠকদের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ সংযোগের কাজ, আরও ভাল ভাবে হ'তে পারে। কিন্তু একজন প্রকাশকের পক্ষে একাজ করা কঠিন, এবং সম্ভব হলেও করা উচিত নয়। কাজটাই এমন যে, সকলে মিলে-মিশে না করলে, উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

প্রতাপাদিত্য

১৩০৩ সালে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী বঙ্গগৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এই জীবনী রচনা করেন, সেই সময় গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও কয়েকটি সংস্করণ হয়। এত দিন পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির এই প্রাচীন এবং মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ করলেন। বহু দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক নথীপত্র সংগ্রহ করে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী এই গ্রন্থটি রচনা করেন। আজ স্বাধীন ভারতে নূতন চোখে ইতিহাস দেখার সুযোগ এসেছে, সেই মুহূর্তে এই ঐতিহাসিক বঙ্গবীরের জীবনী আমাদের জানা প্রয়োজন। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটির মূল্য দুই টাকা মাত্র।

নিরীক্ষা

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্যিক নিবন্ধ এবং সমালোচনা সাহিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু বিভিন্ন ধরণের,—ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকজন যা কিছু চোখে পড়ে তারই রেখাচিত্র। লঘুরচনা বা রম্যরচনার পর্যায়ে এই প্রবন্ধগুলি পড়ে না, গভীর তত্ত্ব এবং জটিল বিষয়বস্তুর সরস এবং সরল আলোচনাই লেখকের লক্ষ্য এবং সেই দুরূহ কর্মে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। বিভিন্ন মেজাজে রচিত এই ক্ষুদ্রাকৃতি প্রবন্ধাবলী নিঃসন্দেহে জনসমাদর লাভ করবে। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, দাম চার টাকা মাত্র।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

সহজ বাংলা ভাষায় শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অধিক সংখ্যক গ্রন্থ নেই। তাই মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব" গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে। মনের মূলধন, মনের বিকাশ, শিক্ষার পথ, পদ্ধতি ও পাত্র এবং নিজ্ঞান-মানস ও শিক্ষা-তত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই বৃহৎ গ্রন্থটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পক্ষে সমান উপযোগী। অপ্রয়োজনীয় কথায় ভারাক্রান্ত না করে সহজ ও সরল ভঙ্গীতে লেখক মনোবিজ্ঞানের মৌলিক ও আধুনিকতম তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করেছেন। পরিশেষে পরিভাষা ও 'গ্রন্থপঞ্জী সংযুক্ত হওয়ার পাঠক বিশেষ উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিসার্স, কলিকাতা। দাম সাড়ে সাত টাকা।

পালা-বদল

নাভানা পর পর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের গৌরবভাগী হয়েছেন। সম্প্রতি তাঁরা অমিয় চক্রবর্তীর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'পালা-বদল' প্রকাশ করেছেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী কিছু কাল ধরে মার্কিণ মুলুকে অধ্যাপনাকর্মে ব্যস্ত আছেন, (বর্তমানে অবশ্য তিনি স্বদেশে আছেন।) এই কাব্যগ্রন্থে কবির প্রবাস-জীবনের ছাপ আছে। প্রকাশের কাছাকাছি এসে কবি 'পালা-বদলে'র পালা এসেছে বুঝেছেন। তাই বহুদিনের বাঙালী দূরবাসীর চোখে-দেখা জগতের অপরূপ প্রতিফলন 'পালা-বদল'। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 'পালা বদল' এক বিশিষ্ট সংযোজন। সুমুদ্রিত এই কাব্যগ্রন্থের দাম—দু' টাকা মাত্র।

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্যে' পদাবলী-সাহিত্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, শেখর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির কাব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চণ্ডীদাস সম্পর্কে কোনও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই গ্রন্থে নেই, তার কারণ তাঁর কথা গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। লেখকের ভাষা মনোরম, বিশ্লেষণভঙ্গী সরল। প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স, ১১৯নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ছয় টাকা।

ঠিক-ঠিকানা

১৩৬১-র শারদীয় বসুমতীতে শৈলজানন্দের এই সম্পূর্ণ উপন্যাসটি "চক্রান্ত" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি মেসার্স ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী শৈলজানন্দের এই উপন্যাসটি প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘকাল পরে কুশলী লেখক শৈলজানন্দ আবার সাহিত্য-জগতে ফিরে এসেছেন। দক্ষ শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় তাঁর রচনায় বর্তমান। সামান্য কয়েকটি কথায় অপরূপ রেখাচিত্র রচনার কৃতিত্ব আছে শৈলজানন্দের। তাঁর এই নতুন উপন্যাস জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। শিল্পী অজিত গুপ্তের প্রচ্ছদভূষণ অপূর্ব হয়েছে। সুমুদ্রিত এই উপন্যাসের দাম ছ' টাকা মাত্র।

হাসি ও অশ্রু

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি সাম্প্রতিক সরস গল্পের সংকলন-গ্রন্থ 'হাসি ও অশ্রু'। প্রবীণ সাহিত্যশিল্পীর নিপুণ রচনা-কৌশলে কয়েকটি পরিচিত চরিত্রের জীবনের করুণ ও মধুর চিত্র অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে। গল্পগুলিতে বিভূতিভূষণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বর্তমান। ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত ছবিগুলিও প্রশংসনীয়। এই মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক মেসার্স বেঙ্গল পাবলিসার্স লিঃ, দাম তিন টাকা।

ইন্দ্রজাল

যাদুকর পি. সি. সরকার বিদেশের যাদুকৌশল বিশেষতঃ যন্ত্রপ্রধান ও রাসায়নিক যাদুবিদ্যা সংগ্রহ করে এনে এদেশের উপযোগী সাজপোষাকে সে সমস্তকে বিভূষিত করে সহজ সরল ভাষায়

নানা রকম যাদুবিদ্যার গোপন তথ্যগুলো এত কাল বিভিন্ন পত্রিকায় ও বিভিন্ন ভাষায় বইয়েব আকারে প্রকাশ করে যাদুবিদ্যানুরাগীদেব মনোরঞ্জন করেছেন। বাঙলা ভাষায় ম্যাজিক সম্পর্কিত বই নেই বললেই চলে। 'ইন্দ্রজালে'র প্রথম খণ্ডে যাদুকর সরকার প্রায় একশ' ম্যাজিকের কৌশল লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রত্যেকটি খেলাই তিনি চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়ায় বইখানির মূল্য যে অনেকখানি বেড়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রজালের ভূমিকায় যাদুকর সরকার লিখেছেন: 'ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসায়ী যাদুকরদিগের উপযোগী বহুবিধ যাদুবিদ্যা সংযোজিত হইল।' দাম; পাঁচ টাকা। প্রকাশক: ইন্দ্রজাল কার্যালয় ১২।৩-এ জামির লেন, ক'লকাতা—১৩।

Rotary's Thirty Five years in Calcutta

১৯০৫ সালে রোটারী ক্লাব স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ সালে ক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা রোটারী ক্লাবের পঁয়ত্রিশ বছরের (১৯২০-৫৫) এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটির ভেতর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ক'লকাতায় রোটারী ক্লাবের ইতিহাস পড়ার শেষে পাঠক জানতে পারবেন ক্লাবের সদস্যবর্গের আদর্শ। "Thoughtfulness of others is the basis of service, Helpfulness to others is its expression and together they constitute Rotary ideal of service." বইটি আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা ও বহু চিত্রে শোভিত।

আসা-যাওয়ার পথের ধারে

নতুন একটি প্রকাশক প্রজ্ঞা-প্রকাশনী। 'জ্ঞান ও বুদ্ধির জগত থেকে রসঘন সাহিত্য-সম্ভার পরিবেশনই প্রজ্ঞা-প্রকাশনীর সংকল্প।' আলোচ্য গ্রন্থটি প্রজ্ঞা-প্রকাশনীর প্রথম বই। অনুবীক্ষণের পথ ধরেও রসলোকে পৌঁছানো যায়, এ সন্ধান মেলে ডাঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের লিপিকুশলতায়। বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি যশস্বী। কেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমাকে নিয়েই ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের অনুপম সৃষ্টি আসা যাওয়ার পথের ধারে। 'যুগান্তর' সাময়িকীতে রচনাটি যখন ধারাবাহিক ভাবে বের হচ্ছিল তখন অনেকেই রচনাটি প'ড়ে সুখ্যাতি করেছিলেন, এখন গ্রন্থের আকারে বইটি বের হয়েছে। দাম: দু' টাকা। প্রকাশ হয়েছে: ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, ক'লকাতা—৪।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল আজকের কবি নন, তিনি প্রাচীন। 'গাঁয়ের মাটির গান' কবির ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা স্থান লাভ করেছে এবং প্রতিটি কবিতাই কবির রচনার গুণে সার্থক হয়ে উঠেছে। সব-এর ছাপা, কাগজ খুবই সুন্দর। প্রচ্ছদ-চিত্র অঙ্কন: শ্রীসুনীল পাল। প্রকাশ করেছেন: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, ক'লকাতা। দাম: দু' টাকা।

চিত্রে নবদ্বীপ—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় সংকলিত এই মূল্যবান গ্রন্থে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বলিত নয়টি দ্বীপের সচিত্র বিবরণ দেওয়া হয়েছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের ভূমিকাটি মূল্যবান। অনেকগুলি চিত্র এবং মানচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণে দেওয়া হয়েছে। দাম, লেখা নেই। মহাকবির গল্প—জোনাকি সংকলিত এবং সাহিত্যায়ন কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাকবির গল্প' কবি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। অনেকগুলি প্রচলিত কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন 'জোনাকি'। দাম: এক টাকা বার আনা। ফুটলো কুসুম—কোরীয় সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ 'শুকনো বনে ফুটলো কুসুম' নামক গ্রন্থ মূল কোরীয় ভাষা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করেন হং-জীয়ং-য়ু। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ফরাসী থেকে সেই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। দাম দু' টাকা। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোঃ লিঃ। পৃথিবী চলে—গল্প বলার ভঙ্গীতে দুরূহ বিশ্বপরিচয় বর্ণনা করেছেন কালীপ্রসাদ বসু (হোমশিখা-কৃষ্ণনগর)। প্রথমখণ্ডে 'আকাশ' সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান বেঙ্গল পাবলিসার্স। দাম দু' টাকা মাত্র। বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—সারা পৃথিবীর মধ্যে এক আফ্রিকা-খণ্ড বাদে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণ অব্যাহত গতিতে চলেছে। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বিশেষ যত্ন সহকারে তারই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন "বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে। গ্রন্থটির ২য় সংস্করণে অনেক নূতন তথ্য যোগ করা হয়েছে। প্রকাশক—মেসার্স এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ—দাম সাড়ে তিন টাকা। রেবেকা দাফনে দ্যু মরিয়ের রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'রেবেকা'র শ্রীমতী শিউলি মজুমদার কৃত বঙ্গানুবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার প্রমাণ এই নূতন সংস্করণ। এই সংস্করণে অনুবাদটি আরো মার্জিত হয়েছে। ম্যাণ্ডারলে বাসিনী রেবেকার জটিল কাহিনীর সরস বঙ্গানুবাদ সহজসাধ্য কর্ম নয়, লেখিকা সেই কর্মে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোরম। প্রকাশক—সাহিত্যায়ন লিঃ, দাম পাঁচ টাকা। নয়া ইতিহাস—কিছুদিন আগে ভারত সরকার সাহিত্যিকদের কাছে গণশিক্ষার জন্যে কিছু সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামীর 'নয়া ইতিহাস' গণশিক্ষা সাহিত্য হিসেবে ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে। দাম: এক টাকা। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা—১২। মিহি ও মোটা—ইন্দ্রনাথ এই ছদ্মনামে জনৈক লেখকের কয়েকটি লঘু প্রবন্ধের সমষ্টি 'মিহি ও মোটা' নামে প্রকাশ করেছেন মেসার্স ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং লিঃ। এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে মোট এগারোটি প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। রচনাগুলিতে লেখকের বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। রম্য রচনার ব্যাকরণ অনুসরণ না করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধ অকারণ তথ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, যথা 'তনু ও অতনু' এবং 'কে বড়ো'। ইন্দ্রনাথের রচনায় কিন্তু শক্তির ছাপ আছে তাঁর দৃষ্টিভংগির মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির দাম—দু' টাকা মাত্র।

রঙ্গপট

অভিনয়-শাস্ত্রের নানা দিক—ড্রামাটিক এ্যাকশন (নাটকীয় সংঘাত)

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মাইকেলের কথা বলছি। আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তাঁর সেই বিখ্যাত লাইনটি, নাইনটি নাইন পার্সেণ্ট পারসপিরেশন, ওয়ান পার্সেণ্ট ইনসপিরেশন। অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই ভাগ জীবনটাই হতাশা, বেদনা আর রিক্ততায় ভরা শুধু এক ভাগ, মাত্র এক ভাগ আশার বর্তিকা হাতে এগিয়ে চলেছি। মাইকেলের সেই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা ভাবুন। চিন্তা করুন কি বিরাট প্রতিভা উপযুক্ত প্রকাশের পথ না পেয়ে চিৎকার করছে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে, আই সি দ্য ডিসটাণ্ট এ্যালবিয়নস শোর। এক মোহর দিয়ে চুল ছেঁটেছি। অপর দিকে মিসেস সিডানসের সেই বিখ্যাত প্রবচন,

> Here's the smell of the blood still ; all
> the perfumes of Arabia will not sweeten this
> little hand Oh ! Oh ! Oh !

সারা আটলাণ্টিকের জল দিয়ে কি মুছবে না সেই রক্তের চিহ্ন? রক্তের গন্ধ কি যাবে না সারা ইরাক, ইরাণ, বসোরার সুগন্ধি দিয়ে? আপনার কি শুনতে ইচ্ছা হয় না ডেভিড গ্যারিকের কণ্ঠস্বর? যে কণ্ঠস্বর 'রিচার্ড থ্রি'তে বলছে,—

> Slave ! I have set my life upon a cast.
> And I will stand the hazard of the die.

জেফারসন, বুথ কি এ্যালেন টেরীর কণ্ঠস্বর কি আর শুনতে পারেন? পারেন না। সেই কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য শুধু নয় সেই অভিনয় দেখবার জন্ম আপনার যে এই আর্তি, তারই কারণ হল ড্রামাটিক এ্যাকশন বা সেই নাটকীয় মুহূর্তটি যা একবার একজন সক্ষম ভাবে করতে পেরেছে। তাই আপনি আবার দেখতে চান?

একটি বৃক্ষ কল্পনা করুন, বলছেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের একজন প্রবীণ অভিনয়-শিক্ষক, Look at the tree. It is the protagonist of all arts ; it is an ideal structure of dramatic action. Upward movement and side way resistance, balance and growth.

সত্যিই তাই। ভারসাম্য আর জীবনী-শক্তির এক বিকাশই ড্রামাটিক এ্যাকশন। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড হল আইডিয়া বা ভাব, শাখা-প্রশাখা হল সেই ভাববিস্তারের সহায়ক চরিত্র আর কায এবং তৃতীয় অর্থাৎ এই দু'টির সমন্বয়ে যে জীবন্ত চিত্রটি দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাকে এক করে দিয়ে গেল, তাই হল ড্রামাটিক এ্যাকশন। পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নেই, কোনও শিক্ষক তা শিখিয়ে দিতে পারে না, কোনও ফরমূলা আপনাকে ড্রামাটিক এ্যাকশন কি, তা বুঝিয়ে দিতে পারবে না। শুধু এইটুকু জানি, নিজের মধ্যেই তার বিকাশ হওয়া সম্ভব। এবং সেই বিকাশ হওয়ার জন্য চাই সম্যক্ দৃষ্টি, ভাব আর চেতনা। উপলব্ধি করতে হবে অভিনীত বস্তুর আখ্যান ভাগকে এবং সেই স্তরে তুলে আনতে হবে নিজকে। বার বার চেষ্টা করে। রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে।

উদাহরণ দিই, To be or not to be...। এতে ন'টি বাক্য বা Sentence রয়েছে। কিন্তু সেই ন'টি বাক্যই একই ড্রামাটিক এ্যাকশনের অন্তর্ভুক্ত। কি সেই এ্যাকশন? কি ভাব? কি সূত্র? কেন, কবি নিজেই বলে দিয়েছেন, টু বি অর নট টু বি। এই তো সূত্র। মনে মনে সেই ভাব এনে ফেলুন। নিজেকে 'টু বি অর নট টু বি' অবস্থায় বসান। শিশির বাবু যেমন বসিয়েছেন নাইনটি নাইন পার্সেণ্ট পারসপিরেসন, ওয়ান পার্সেণ্ট ইনসপিরেসনের আসনে। মাইকেলের সেই ভাব চুরি করেছেন। হয়তো একদিনে হয়নি। দিনের পর দিন সাধনা করতে করতে হঠাৎ একদিন বুঝতে পেরেছেন, পরশ পাথরটি পাওয়া গেছে।

কিন্তু ড্রামাটিক এ্যাকশন মানে শুধু ভাবসহ আবৃত্তি নয়। আরও কিছু। সেই বৃক্ষের কথা ভাবুন। বিদেশী সমালোচক বলছেন, The recitation is the foliage of a tree without the trunk and branches. আবৃত্তি শুধু লতা, কাণ্ডহীন, মূলহীন।

ড্রামাটিক এ্যাকশন আবার কখনও একা হয় না। অপর পক্ষের প্রতিও তাই আপনার তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ জ্ঞাননেত্রটি খোলা রাখতে হবে। দেখতে হবে সেই চরিত্রটি কিরূপ শক্তিশালী। অপর পক্ষের অভিনেতার scopeই বা কতটুকু! না হলে নাটক ঝুলে যাবে।

এর জন্যেও বার বার প্রয়োজন হয় রিহার্সালের।

অড্রে হেপবার্ণ

নাম পাল্টাতে কিছুতেই রাজী হলেন না অড্রে। পরিচালক মশায় যুক্তি দেখালেন, ক্যাথেরিন হেপবার্ণের সঙ্গে জনসাধারণ গুলিয়ে ফেলবে তাকে। 'নো ইফ ইউ ওয়াণ্ট মি, ইউ মাষ্ট টেক্ মাই নেম্ এ্যাজ ইট ষ্ট্যাণ্ডস' উত্তর দিলেন অড্রে।

মাত্র ২৪শ বৎসর বয়সে চিত্রজগতে খ্যাতির যে শিখরে তিনি আরোহণ করেছেন সামান্য কয়েকটি ছবির মাধ্যমে হলিউডে এ দৃষ্টান্ত বিরল। ব্রাসেলসে তাঁর জন্ম। পিতা ইংরাজ ব্যবসায়ী, মাতা ডাচ ব্যারণেস্। যুদ্ধের সময় ডাইভোর্স হয় অদ্রের মায়ের। মেয়েকে নিয়ে তিনি চলে আসেন হল্যাণ্ডের আর্ণহেমে। শেষ সময়ে খুব কষ্টেই কেটেছে দিন। "Our main diet was endive,"—সে সব দিনের দুঃখের বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেই একথা বলেছেন অদ্রে।

অদ্রে হেপবার্ণ

১৯৪৮ সালে অদ্রে আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে। এসে কাজের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন চতুর্দ্দিকে। The secret people, young wives' Tale আর Lavender hill mob প্রভৃতি কয়েকটি মিউজিক্যাল কমেডিতে বৃথাই পর পর কাজ করে গেলেন।

তার পর এল তাঁর সৌভাগ্য। Ondine আর Roman Holidayর অদ্রের অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

নিজের রূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অদ্রে বলেছেন, I am not beautiful. But listed separately, I have a few good features. শরীরের আয়তনের চেয়ে পায়ের পাতা তার একটু বড়। Billy wilder নামে একজন পরিচালক রহস্য করে বলেছেন, Audrey will make bosoms a thing of the past আর the Sure, golden slippered tread of a star বলেছেন আর একজন সমালোচক।

বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র গেল বহুজনের কাছে। অদ্রের সঙ্গে জেমস হ্যানসনের শুভ-বিবাহ। আবার নিমন্ত্রণ-পত্র বাতিলের খবরও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। অদ্রে উত্তর দিলেন, It would have been Unfair to marry—I was in love with acting।

উইলিয়ম হোল্ডেন 'সাব্রিনা'তে অভিনয় করেছেন যিনি অদ্রের সঙ্গে তিনি তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, People love her on and off the screen for the same reasons—a kind of orderliness and formality.

অদ্রেকে জিজ্ঞাসা করলেন একজন সাংবাদিক, কি গুণে আপনি চিত্রজগতের এত ওপরে উঠলেন এত অল্প দিনে?

Knowing myself. Learning what I can do, and avoiding what I can't learning to do without things, also. উত্তর দিলেন অদ্রে।

বিরাট ভবিষ্যৎ, অসংখ্য সম্ভাবনা নিয়ে সামনে পড়ে আছে তাঁর।

শুধু পোষাকের পরিবর্তনই নয়

পর পর বেশ কয়েকটি বাঙলা ছবিতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে, একই নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন ছবিতে ঘন ঘন পোষাক পরিবর্তন করানো যেন একটা রেওয়াজ হয়ে আসছে। নায়কের পরনে আজ ট্রপিক্যালের স্যুট, কাল গ্যাবার্ডিনের, পরশু ওর্স্টেড স্যুটিঙ, তার পরদিন ইটালীয়ান সাজ। যেন আমরা শুধু ছবিতে নায়কের ড্রেস পাল্টানোই দেখতে গেছি। খুব পপুলার অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের বেলাতেই এগুলো বেশী ঘটে। তাদেরই সাজিয়ে-গুজিয়ে দর্শকদের সামনে ধরার এবং তারই সাহায্যে বাজী মাৎ করার একটা অপচেষ্টা করেন পরিচালক মশাই। কিন্তু আজ সময়ে দেওয়ার দিন এসেছে, তাই বলছি, শুধু পোষাকের পরিবর্তনই নয়, আরো আরো অনেক কিছু আমরা চাই বাঙলা দেশের চিত্রশিল্পের কাছ থেকে। ভাল ফটোগ্রাফী, উৎকৃষ্ট গল্প, উন্নততর সেট সেটিঙ, কষ্টিউম, রেকর্ডিং, (শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়ে আসর মাৎ করা নয়। ভজন কি কীর্ত্তন দিয়েও না।) মেকআপ, টেকনিক, আউটডোর স্যুটিঙ, এডিটিঙ, অভিনয়, ষ্টীলের কাজ থেকে পাবলিসিটি অবধি। অভিনেতা অভিনেত্রীগণকেও বলি, পোষাক পরিবর্তন অত ঘন ঘন না ক'রে অভিনয় কিসে একঘেয়ে না হয়ে যথাযথ হবে সে দিকে আরও বেশী করে নজর দিন। কোন্ নায়ক বা কোন্ নায়িকা কোন কোন পোষাকে কেমন দেখতে হন—শুধু মাত্র তা দেখতে কেউই চান না। অভিনয় কত রকমের দেখা যায়, শুধু সেটুকুই দর্শকের দ্রষ্টব্য। পোষাক পরিচ্ছদ সামাজিক ছবিতে নিতান্তই গৌণ।

প্রশ্ন

আদর্শের সঙ্গে অর্থের সংগ্রাম নতুন নয়। বিচিত্র নয় সংগ্রাম দারিদ্র্যের সঙ্গে মনুষ্যত্বের। কিন্তু কে জিতবে সেই সংগ্রামে? যে বঞ্চনা করে সকলকে উঠল সমাজের ওপরে সে, না যে আদর্শকে বুকে ধরে তলিয়ে গেল নীচে, অভাবের তাড়নায় হল জর্জ্জরিত, নিষ্পেষিত জিত হবে তারই? এই প্রশ্ন। তারই সমাধান একটি বিরহ-মধুর গল্পকে আশ্রয় করে ভেসে এই প্রশ্ন। তারই সমাধান একটি বিরহ-মধুর উচ্চল পর্দায়। শেয়ার বাজারে প্রচুর টাকার আসলে কোনও ভিত্তি নেই। দাম পড়ে গেলেই শেয়ারের, সঙ্গে সঙ্গে দাম কমে যাবে শেয়ার হোলডারেরও। প্রবীরকুমার তেমনি এক ধনী শেয়ার বাজারের এজেন্টের সন্তান। ঘটনাটা সুরু হল সেই দিন যেদিন কনভোকেশনে ডিপ্লোমা আনতে ক্যাপ, গাউন আর গাউন চড়িয়ে যাচ্ছেন প্রবীরকুমার। শেয়ারের দাম চড় চড় করে পড়তে লাগল হঠাৎ। আকস্মিক এই ধাক্কা সহ্য না করতে পেরে মারা গেলেন প্রবীরকুমারের বাবা। এরই পাশে পাশে এক বৃদ্ধ খেয়ালী অধ্যাপককে ঘিরে একটি মিষ্টি প্রেমের উপাখ্যান 'শকুন্তলা' নাটকের আদর্শকে সামনে রেখে এগুচ্ছে। অরুন্ধতী সেই কাহিনীর নায়িকা। পিতা প্রচুর ধনী ব্যক্তি। বাবার মৃত্যুর পর প্রবীরকুমার একে একে ব্যাঙ্কের সমস্ত জমানো টাকা মায় ভদ্রাসন অবধি বিক্রি করে পিতার ঋণ শোধ করে পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। অবস্থার পরিবর্তনে ভালবাসা কিন্তু মরল না। প্রবীরকুমারের অবস্থা শেষে একদিন এমন হল যে, ষ্টেট বাসের কণ্ডাকটারির সাহায্য

চাকরীই তাকে নিতে হল। সেই বাসেই একদিন দেখা হল অরুন্ধতীর সঙ্গে। গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়ে বাসেই বাড়ী ফিরতে হচ্ছিল তাকে। তার পর চিরাচরিত ভাবে মিলন। ঘটনাটিকে জোরালো করে তোলবার জন্ম দীপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অরুন্ধতীর বিবাহের একটা চেষ্টা, তপতী ঘোষকে এবং তার স্বামী বিকাশ রায়কে দেন এবং জামাইবাবু বিশেষ করে বিকাশ রায়কে একটি কৃপণ, অর্থলোলুপ, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারী এমনি ভাবে দেখানো হয়েছে। পরিচালক সংবাদ মুখার্জ্জীর কাছ থেকে এ সকল ছবি পেয়ে সত্যিই খুসী হয়েছি। পরিচালনাতেও তার মারাত্মক রকমের কোনও ত্রুটি নেই। ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের দৃশ্যগুলি বাংলা ছবিতে নতুন এবং ১০০১, ৬৩২ প্রভৃতি নামে বাইকে করে ডাকাতিতে বেশ একটা ভাল হাসির খোরাক রয়েছে। ৭২০ নম্বর কণ্ডাক্টারের আমাদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। অভিনয়ে প্রথমেই ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল এবং শোভা সেনের নাম করব। অরুন্ধতীর অভিনয়ও বেশ ভালো হয়েছে। তার প্রথম গানটি তার কণ্ঠে বেশ স্থান-কাল হিসাব করে লাগানো হয়নি। নবাগত প্রবীরকুমার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি আর তার মধ্যে নকল করার একটা প্রচেষ্টা দেখেছি মাঝে মাঝে। বিকাশ রায়ের অভিনয় মন্দ লাগে নি। দু'একটি দৃশ্যে তপতী ঘোষের অভিনয় যথাযথ হয়েছে। বৃদ্ধ অধ্যাপকের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল বেশ প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। ছবির অন্যান্য দিক যেমন ফটোগ্রাফী, সেট-সেটিং কি রেকর্ডিংয়ের কাজ মোটামুটি ভালই হয়েছে।

হ্রদ

কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে 'হ্রদ'। পাগলা গারদের একটি বিশেষ কক্ষ জুড়ে সমস্ত ছবিটি মোটামুটি দেখানো হয়েছে। মাঝে মাঝে ফ্লাশব্যাকে অস্পষ্টাকার বর্ণে কোনও ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি আর শেষে একটা মিলনান্তের চেষ্টাতেই যা গল্পটি পাগলা গারদ ছেড়ে বাইরে এসেছে। স্মৃতিভ্রংশ ঘটল বাণীব্রতর। কারণ মায়ের মৃত্যু। তার দাদা ছাদ থেকে তার মায়ের পড়ার জন্য সেই দায়ী, (সামান্য কুকুরে তাড়া করিয়ে মৃত্যু ঘটানোয় গল্পটির ভিত্তি আলগা হয়ে গেছে)। এর পর পিতৃ-মাতৃহীন এই শিশুটি বড় হল একলা (এখানেও সেই এক কথা) এবং যদিও বা বড় হল কিন্তু মনে পেল চরম এক আঘাত! তার মধ্যে নাকি পাগলামীর বীজ লুকিয়ে আছে, তাই কেউ ভালবাসতে চায় না তাকে। নীলা বলে একটি মেয়ের প্রবঞ্চনায় এ সত্যটি আরও কঠোর ভাবে প্রকাশিত হল বাণীব্রতের চোখে। ঠিক সেই সময়ই দেওঘরে বাণীব্রতের দ্বিতীয় ভালবাসা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা নীলা আর তার স্বামীর সঙ্গে। জীবনের মধুভরা স্বপ্ন বুঝি আবার ভেঙ্গে যায়, এই ভয়ে এক রাত্রে রিভলবার হাতে দেখা দিল বাণীব্রত। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নীলার স্বামী। নীলা পেছনে লুকিয়ে (কিন্তু নীলা রিভলবার হাতে নামল কেন? বাণীব্রত তার স্বামীকে গভীর রাত্রে খুন করতে আসবে এ-কথা তো জানার নয় তার। রাত্রে দরজা খুলে দিতে এলেন স্বামী আর স্ত্রীর হাতে অস্ত্র যে বড় বেমানান।) নেমে এল। একটা খুন হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণীব্রত হল পাগল। তারপর বহু সাধ্য-সাধনা (কিন্তু এই চিকিৎসাটি করাচ্ছেন কে? কেন?) চিকিৎসা একদিন সারল বটে রোগ! বিপরীত এক ধাক্কা খেয়ে ফিরে পেল বাণীব্রত স্মৃতিশক্তি। হসপিটালের এক নার্স ডোরা ভালবাস[illegible] বাণীব্রতকে সেবা করতে এসে। এ ভালবাসা এতখানি গভীর [illegible] হাসপাতাল থেকে বাণীব্রতকে নিয়ে ডোরা পালাল এক ভূতুড়ে বাড়ীতে (কি গোঁজামিল!)। শেষে চিরাচরিত ভাবে গল্পের সমা[illegible] হল মিলনে। বাণীব্রতের সঙ্গে দেওঘরের সেই মেয়ে সুদক্ষিণার এরই পাশে পাশে ডাক্তার অসিতবরণের সঙ্গেও সুদক্ষিণা[illegible] (সন্ধ্যারাণীর) এক মৌন প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এ[illegible] অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে নতুনত্ব তা' [illegible] বলিয়া পারব দুরূহ কাহিনী সত্য করা হয়েছে অর্থাৎ Snake Pit নামক একখানি ইংরেজী বই এবং সামান্য অংশ Spell Boun[illegible] নামক অপর একখানি বইয়ের থেকে ধার (বাংলা দেশে নামী নামী কাগজের চিত্রসমালোচকেরা অনেকেই কেন যে এটুকু ধরলে[illegible] না! তবে কি দুষ্কর ...!) নেওয়া তবু গল্পের মধ্যে ক[illegible] অসঙ্গতি! অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই মনে আসছে উত্তমকুমার ও সন্ধ্যারাণীর কথা অসিতবরণের কথা [illegible] উত্তমকুমারের অভিনয় খুবই ভালো লেগেছে। সন্ধ্যারাণী আ[illegible] অসিতবরণ তার পরেই জায়গা পেতে পারেন। মায়ের ভূমিকা[illegible] সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের করবার কিছু ছিল না। ডাক্তারের ভূমিকা[illegible] ছবি বিশ্বাস মানিয়ে গেছেন। ডোরা দত্তের ভূমিকায় সুমনা[illegible] অভিনয়টা একটু খাপছাড়া (দোষ অংশ গল্পের) গোছের হয়েছে তবু মন্দ লাগেনি। সেট-সেটিংয়ের কাজ কিন্তু খুব উচ্চাঙ্গে[illegible] হয়নি। টর্চ ফেলবার সময় (ডাকবাংলোর কথা বলছি দেওয়ালের আঁকা ইট আর চুনবালি খসার কাজ স্পষ্ট বোঝ[illegible] যাচ্ছিল। এগুলোর সম্পর্কে আরও চিন্তা করা দরকার। আব[illegible] সঙ্গীতের কাজটা মোটামুটি ঠিকঠাক এগিয়ে নিয়ে যেতেই সাহায্য করেছে। গান ক'খানি না দিলেই যেন এ জাতীয় ছবির পক্ষে হ[illegible] ভালো। ডোরা করেই যেন স্বরলিপি, বেহালা ইত্যাদি আন[illegible] হয়েছে মনে হয় ছবির মধ্যে। ছবির আরম্ভটি সুন্দর। এক জ[illegible] পাগলাকে পাগলা-গারদে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে টেনে হিঁচড়ে। পাগলদের দৃশ্যগুলিতে একা জহর রায়ই একশো অন্য সকলেও দর্শকগণকে যথেষ্ট হাসিয়েছেন। ফটোগ্রাফী শব্দগ্রহণ ইত্যাদি এ ছবির মন্দ হয়নি। তবে এডিটিংটা ভা[illegible] হয়নি বলেই মনে হয়। অনেক অসামঞ্জস্য রয়েছে। অসিতবর[illegible] একবার বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে কথা বলতে বলতে ভুল 'বক' ফেলে ফের শুধরে নিলেন, সেটা কি করে রয়ে গেল!

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সারা পৃথিবীটাই যখন তিনশো' কোটি বছর ধরে শূন্যে দোল খাচ্ছে তখন সেই পৃথিবীরই মানুষ যারা, তাদের দোল খাওয়ার নেশা হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য নয়। দোলনায় দোল খাওয়া বেশ ভাল লাগে ছোটবেলায়। কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো দড়িতে বেঁধে

দোলনায় দোল খেয়ে খেয়ে খোকা ঘুমায় পড়ে কেমন আরামে! ঝুলন-দোলায় দুলেছিলেন বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম। এবার "নাগর দোলা" দোলাবেন এস. বি. প্রোডাকসন্স। দোলায় উঠবেন উত্তম, সাবিত্রী, সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ, মিনতি, মেনকা প্রভৃতি শিল্পীরা। দোলা তদারক করবেন অমল বসু। "নাগর দোলা"র দোল দেখে শেষে দর্শকদের মাথা ঘুরে উঠবে কি না কে জানে?

"গড়ের মাঠ" অর্থাৎ যাকে বলা হয় কেল্লার মাঠ। সেই মাঠের ওপর শুধু সৈন্যরা করবে কুচকাওয়াজ, বসবে সেখানে বড় বড় মেসিন-গান, যুদ্ধের দামামা বাজবে সারা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। কিন্তু যুদ্ধ ত আর রোজই লেগে থাকে না! অবসর সময়ে সেখানে ফুটবল, টেনিস হকী খেলাও মরশুম পড়ে। সেই মাঠে এবার পরিচিত শিল্পীরা শহরের সুদৃশ্য বাড়ীঘর ছেড়ে, অভিনয় করবার জন্য নামছেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন সুমিত্রা, সুপ্রভা, দীপ্তি, রেণুকা, দীপক, জীবেন এবং আরও অনেকে। এই "গড়ের মাঠ" এ অভিনয়ের ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন আজ প্রোডাকসন্স। বিষয়বস্তুটি পরিকল্পনা কোরেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

"হাতছানি" নামটা শুনলেই মনে পড়ে মরীচিকার কথা। তৃষ্ণার্ত হ'য়ে মরীচিকার হাতছানিতে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে কত প্রাণ! চিত্রাঞ্জলি পিকচার্স এবার সেই "হাতছানি"র পাল্লায় পড়েছেন। ছবি তুলতে তুলতে এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প কোরেছেন পশুপতি কুণ্ডুর পরিচালনায়। দেখে-শুনে, পথ বুঝে, না চললে আসল জায়গায় পৌছানো কঠিন হ'য়ে উঠবে। অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, অপর্ণা, সবিতা, কবিতা, ভানু, নৃপতি, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি শিল্পীরাই জানেন কার এই "হাতছানি"।

ধূলার ধরণীতে বসেই এক দিন "ধূলার ধরণী" ছবি দেখতে হবে। আয়নায় মুখ দেখা আর কি! যাকে বলে প্রতিবিম্ব। ধরণীর যে অংশটি ক্যামেরায় তুলবেন রূপমায়া প্রতিষ্ঠান, সেখানে ভিড় কোরে এসে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছেন সন্ধ্যারাণী অসিতবরণ, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ, মলিনা, সবিতা প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীরা। শিল্পীদের পরিচালনা করছেন অর্দ্ধেন্দু সেন। "ধূলার ধরণী" ছবিখানিতেই প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী ফুটে উঠবে বোলে শোনা যাচ্ছে শিল্পীদেরই প্রতিবিম্বগুলি আসলে দেখতে হবে বেশীর ভাগ।

ছবির নামকরণ করা নিয়ে যেন কোনও রকম বাধা-বিপত্তি নাই। আধুনিক যুগে পুরোনো কাঠামোয় নাম রাখা কারুর যেন মনঃপূত হয় না। যা যত বেশী আধুনিক হবে, তাকে নিয়ে ততই মাতামাতি কোরবে আধুনিক যুগের লোকেরা। "শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক" নামটি বেশ মুখরোচক। অন্ততঃ পোষ্টারে এই আধুনিক ছবির নাম দেখে, দিন কতক ভিড় জমাটা আশ্চর্য্য নয়! তার ওপর ছবিখানা ভাল হ'লে ত সোনায় সোহাগা। জমবে না বলি কেমন কোরে? ছবিতে নেমেছেন সুমিত্রা, অনুভা, উত্তম, বসন্ত, রবি। আবার সুরের ঢেউ তুলেছেন অনুপম ঘটক। জমা না জমাটা অনেকাংশে নিতাই ভট্টাচার্য্যের কাহিনীর ওপর নির্ভর করছে।

"স্রোত" এর মুখে ভেসে চলেছেন সিনেমা-জগতের নামকরা শিল্পী বিকাশ, রবীন, কমল মিত্র, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। ওলট-পালট খেতে খেতে তাঁদের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে, তারই প্রকাণ্ড কাহিনি ইতিহাস লিখে নিজেই সামলাচ্ছেন কাহিনীকার অলোক মুখোপাধ্যায়। এ. এস. প্রোডাকসন্সের এই "স্রোত" ছবিখানির প্রযোজনার ভার নিয়েছেন সুনীল ভট্টাচার্য্য।

"কীর্ত্তিগড়"এর কীর্ত্তি সবার কাছে প্রচলন করবার জন্য জি, আর, পিকচার্স আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। এঁদের সাহায্য কোরছেন সন্ধ্যারাণী, অনুভা, রাণী গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিকাশ, নির্মলকুমার, উৎপল দত্ত প্রভৃতি শিল্পীরা। অনুপম ঘটকের সুর-সংযোজনায় সঙ্গীত-মুখর হ'য়ে উঠবে "কীর্ত্তিগড়"।

অনেক দিন আগে মিনার্ভা থিয়েটারে "আত্মদর্শন" নামে একখানি নাটক বহু দিন ধ'রে অভিনীত হ'য়েছিল। সেই নাটকখানির চিত্ররূপ দিচ্ছেন রূপচিত্রম নামে একটি প্রতিষ্ঠান। কমল, গুরুদাস, শিশির, বিমান, নমিতা, শিপ্রা, সবিতা, তপতী প্রভৃতি শিল্পীরাই "আত্মদর্শন" নাটকের পুরোনো রূপ বজায় রাখবেন বোলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নেপথ্য সঙ্গীতে ইতিমধ্যে জনপ্রিয় শিল্পীদের নাম প্রচার করা হয়েছে, যেমন হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, প্রতিমা, সাবিত্রী ও মৃণাল চক্রবর্ত্তী। দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়!

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

জনপ্রিয় শিল্পী রবীন মজুমদার

১৯৩৯ সাল। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-সংসদের বাৎসরিক সম্মেলন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন পরলোকগত শিল্পী স্রষ্টা প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। উদ্বোধনী গাইলেন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর (বিজ্ঞান) একটি ছাত্র। সংসদের সেই তখন যুগ্ম-সচিব। খানিক বাদে বড়ুয়া সাহেব জলযোগ করছেন, সেই সময় আর একটি ছেলে এসে গায়ক-ছেলেটিকে বলে গেল—"বড়ুয়া সাহেব তোমায় ডাকছেন"—গায়ক বড়ুয়া সাহেবের সামনে যেতেই তিনি নিভৃতে নিয়ে গেলেন সেই গায়কটিকে—তাকে বললেন, নামবে তুমি সিনেমায়? ছেলেটি বিস্মিত হতবাক্। বড়ুয়া সাহেবের "দেবদাস" সবে শেষ হয়েছে—বাজার জমজমাট—প্রমথেশচন্দ্রকে দর্শক সাধারণ স্বীকার করে নিয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক হিসেবে। সেই প্রমথেশচন্দ্রের কাছ থেকে অযাচিত আহ্বান! সেদিনকার সেই ছেলেটি আজকের অমিয় কণ্ঠের অধিকারী সুদর্শন প্রাণবান শিল্পী রবীন মজুমদার।

হুগলী জেলার চোপা গ্রামের শ্রীঅমূল্যকুমার মজুমদারের মেজ ছেলে রবীন্দ্রনাথ মজুমদার মুর্শিদাবাদে ১৯১৭ সালের বড় দিনের সময় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে সসম্মানে বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছোটবেলা থেকে ছিল শিল্পী হবার সখ—সঙ্গীতশিল্পী এবং অভিনয়-শিল্পী দুই-ই তার উপর পেয়েছিলেন ভগবান দত্ত একখানি সুর-নির্ঝর কণ্ঠ। গায়ক হিসেবে নামটি আগেই ছড়ায়, গান তিনি যে খুব বেশী বাঁধাধরার মধ্যে শিখেছিলেন তা নয়। কিছু দিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন দিনাজপুরের নীরেন নিয়োগীর কাছে। বাবার ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার—কিন্তু হয়ে পড়লেন শিল্পীই—আবাল্য বাসনার হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতিরূপে দেখা দিল প্রমথেশ বড়ুয়ার আহ্বান। ইতিমধ্যে ঘটল আর এক ঘটনা—একদিন এমনি বাড়ীতে বসে রবীন বাবু গান গাইছেন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এন টির কর্মসচিব বীরেন দাশ। তিনি গান শুনে

প্রমথেশচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন, প্রমথেশচন্দ্র তখন এন-টি ছেড়েছেন। "শাপমুক্তি"র তোড়জোড় চলছিল। তার আগে কলেজে তিনিও রবীন বাবুর গান শুনেছেন। কথা হয়েছিল রবীন বাবুর পরীক্ষা হবার পর বড়ুয়া-সাহেবের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। বীরেন দাশ নিয়ে গেলেন বড়ুয়ার কাছে বসাবোডের দিকে একটি বাড়ীতে। শাপমুক্তির গানের মহলা চলছিল, সঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন অনুপম ঘটক, রবীন বাবুর গান শোনা হোল—সানন্দে গৃহীত হলেন কণ্ঠশিল্পী রবীন মজুমদার—সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বড়ুয়া তাঁকে নিয়ে গেলেন ষ্টুডিওতে, সেখানে ক্যামেরা-সাউণ্ড সব দিক দিয়েই তাঁকে পরীক্ষা করা হোল। বিশ্বকবির "দেবতার গ্রাস" থেকে খানিকটা আবৃত্তি করলেন রবীন বাবু। সব দিক দিয়েই উত্তীর্ণ হলেন। চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদারকে "শাপমুক্তি"র নায়করূপে নির্বাচিত করা হয়েছিল। দত্ত চৌধুরীর তাঁর মুখে কণ্ঠ দেবার কথা ছিল। সুশীল বাবুর পরিবর্তে নায়করূপে দেখা দিলেন রবীন বাবু। অন্যের কণ্ঠের প্রয়োজন তো হলই না, উপরন্তু তাঁর জন্যে আরো দুটো গান বাড়িয়ে দেওয়া হোল। গানগুলি লিখেছিলেন স্বর্গীয় কবি অজয় ভট্টাচার্য। জনতা উৎসাহিত হৃদয়ে গ্রহণ করে নিলে নবাগত সুদর্শন অভিনেতা সুকণ্ঠ রবীন মজুমদারকে। তারপর থেকে আজ পনেরো বছর ধরে নিজের যশ ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে একটির পর একটি ছবিতে অভিনয় করে চলেছেন রবীন মজুমদার। তাঁর অভিনীত চিত্রগুলির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হবে এবং গাওয়া রেকর্ডও হবে প্রায় চল্লিশখানি। মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন ১৯৫২ সালে রঙমহলে। 'সেই তিমিরে' তারপর দূরভাষিণী—বর্তমানে উল্কা-এর মধ্যে বিশেষ অভিনয়ে চরিত্রহীনে দিবাকর, চিরকুমার সভায় পূর্ণ, সিরাজদ্দৌলা মীরণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি রবীন বাবু ফুটিয়ে তুলেছেন।

কোন্ কোন্ পরিচালকের পরিচালনা ভাল লাগে? কোন্ কোন্ চিত্রশিল্পীর চিত্রগ্রহণ আনন্দ দেয়? কোন্ কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় মুগ্ধ করে? কোন্ সঙ্গীত পরিচালকের পরিচালনায় গান গেয়ে আরাম পেয়েছেন? কোন্ নায়িকার অভিনয় তৃপ্তি দেয়? এই সব জাতীয় প্রশ্ন করায় একটি কথায় রবীন বাবু উত্তর দেন—এগুলো কিন্তু বড় ডেলিকেট কোয়েশ্চান, অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি—কার নাম করতে, কার নাম বাদ দেব? তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে সে বড় বিশ্রী ব্যাপার। বিশেষ ভাবে বড়ুয়া সাহেব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন মজুমদার বলেন—বড়ুয়া এক কথায় একটি অপূর্ব প্রতিভার আশ্চর্য উদাহরণ, নানা দিকে তাঁর প্রতিভা পরিব্যাপ্ত ছিল। চিত্র সম্পাদনা, চিত্র গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বর্ণনার অতীত। সঙ্গীতে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য—তাঁর দক্ষতা ছিল অভূতপূর্ব। বিলিতি গান শুনতে শুনতে সঙ্গে সঙ্গে তার নোটেশান করে দিতেন—পিয়ানো, তবলার কথা বাদই দিন। অভিনয় শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটি পদ্ধতি ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল একটি অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে রবীন বাবু বলেন—বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তির আগমনে এর দূষিত পদার্থগুলি দূর হয়ে যাচ্ছে এবং একটি সর্বজনীন কল্যাণের মিঠেল স্পর্শ যেন দূর থেকে ভেসে আসছে ক্রমশঃই, সেই পরম পরশ যেন আরো কাছে আসছে। এ জগতে আগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আগে অনেক অভিভাবক চিত্রে যোগদান পছন্দ করতেন না কিন্তু বর্তমানে মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল দলায় ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকেরা দেখতে পেয়েছেন, এর ভিতরকার রূপ বুঝতে পেরেছেন যে এটা শুধুসেই গবাক্ষ নয়, সৃষ্টির বাতায়নও সেই গবাক্ষকে মোহনীয় করে তুলতে পারে।

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে বেতারে গান এবং অভিনয়ও করছেন রবীন মজুমদার। বর্তমানে তাঁর অনাগত চিত্রগুলির মধ্যে দেবী মালিনী, ছায়াপথ, মহানিশা, কল্প প্রভৃতি ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। রবীন বাবু অবসর কাটান দিশী-বিদেশী ছবি দেখে ও এদেশী-ওদেশী সাহিত্য-গ্রন্থগুলি পড়ে। আমিও সুযোগ পেলুম "মাসিক বসুমতী কাগজখানা কি রকম লাগে রবীন বাবু"? খুব ভাল লাগে ভাই, আর তার উপর আমার মা মাসিক বসুমতীর ভীষণ অনুরাগিণী—মাসিক বসুমতী তাঁর পড়া চাই-ই। ভবিষ্যতে প্রযোজক হবার বাসনাও রবীন বাবুর আছে।

আজ রবিবার। দুপুর থেকে "উল্কা" অভিনয়। আসর গুটোতে হয়। আসতে আসতে সাক্ষাৎকার ছাড়ি। দেশের শিল্পীকে দেশবাসী নানা রকম দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করবে। আমি—আমি কোন দিক দিয়ে করব? আমি সুনামধন্য অভিনেতা রবীন মজুমদারকে দেখতে পাব তাঁর স্বভাবসুলভ সহজ আন্তরিকতার মধ্যে। সুদর্শন, সঙ্গীতজ্ঞ রবীন মজুমদারকে চিনতে পারব তাঁর অমায়িক হাসিটির সাহায্যে—যেটি সাধারণত তাঁর মুখে মাখানো থাকে। হাসিটি যেমনই মিষ্টি তেমনই নরম, তেমনই টাটকা

জনপ্রিয় শিল্পী রবীন মজুমদার

১৫ই আগষ্ট প্রসঙ্গে

"কিন্তু এদিন শুধু উৎসব আর আনন্দের দিন নয়, আত্মানুসন্ধানেরও দিন। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই স্বরাজ ও স্বাধিকারের শেষ কথা নয় ; উহা একটা ধাপ, একটা পদক্ষেপ মাত্র। দেশের অগণিত দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন মানুষের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য, তাহাদের একটু মাথা গুঁজিবার স্থান করিয়া দিবার জন্যই আমরা চাহিয়াছিলাম স্বাধীনতা। বিদেশী অধীনতাই ছিল এ স্বপ্ন সার্থক করার পথে সব চেয়ে বড় বাধা। সে বাধা দূর হইয়াছে। সুতরাং আসল লক্ষ্যে আমরা কতটুকু পৌঁছাইয়াছি, পৌঁছাইতে পারিয়াছি এবং পৌঁছাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আজ বিচার করিবার উপযুক্ত সময়। জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে অর্থহীন, এ সত্য আজ আমরা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই জনগণের সেই আর্থিক স্বাধীনতাকে কি ভাবে কত শীঘ্র কার্য্যে রূপ দেওয়া যায়, তাহাই আজ দেশের সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যা রাষ্ট্রনেতারাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বড় বড় পরিকল্পনারও কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সমস্যা সমাধান করিতে যে দ্রুত গতি প্রয়োজন, যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রয়োজন, যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ প্রবৃত্তি প্রয়োজন—তাহা কি আজো দেখা যাইতেছে ?" —দৈনিক বসুমতী।

রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য কি ?

"দিল্লী দূর বলিয়া যে হিন্দী প্রবাদ আছে তাহা আজকাল হিন্দীর চেয়ে অন্য ভাষাতেই বেশী শোনা যায়। দক্ষিণ-ভারতের বহু কৃতী সন্তান এখন দিল্লীতে নানা মসনদের অধিকারী, তবু ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা অভিযোগ থাকা অসম্ভব নয় যে, দেশের রাজধানীর সঙ্গে তাহাদের সংযোগ যেন দূরের। হায়দরাবাদের কাছাকাছি যে রাষ্ট্রপতিনিলয়ম্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা ঐ মনোভাবের দূরীকরণে সহায়ক হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি এখন শাসনতান্ত্রিক, আর হায়দরাবাদ হইতেও শাসন পরিচালিত হইবে না, কিন্তু বৎসরের মধ্যে কিছু দিন যদি রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ-ভারতে বাস করেন এবং ওই দিকের অভাব-অভিযোগ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং স্বকর্ণে শ্রবণ করেন, তবে দিল্লীর সঙ্গে দক্ষিণের সম্বন্ধ স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতর হইবার সুযোগ পাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, দেশের কোন অংশ যেন মনে করিতে না পায় যে, রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ার জন্য সে অবহেলিত হইতেছে। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতীকস্বরূপ এবং তিনি যতই বিভিন্ন অঞ্চলের সান্নিধ্যে আসিবেন ততই ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

গোয়া ছাড়ো

"ভারতীয় সত্যাগ্রহিগণ অহিংস জানিয়াই পর্তুগীজ দুর্বৃত্তগণ আরও হিংস্রতায় উন্মত্ত হইবার সাহস পাইয়াছে। তাহাদের এই দুঃসাহস অনতিবিলম্বেই চূর্ণ করিতে হইবে। সত্যাগ্রহের পথ দুঃখের পথ ও আত্মনিগ্রহের পথ। কিন্তু শান্তিপূর্ণ অহিংস সত্যাগ্রহীদের একটি জীবন নষ্ট করিলেও তাহা ক্ষমা করা হইবে না। উন্মত্ত পর্তুগাল যেন তাহা মনে রাখে। পর্তুগীজ সরকার গোয়ার অধিবাসী তথা ভারতবাসীদিগকেও হিংসায় প্ররোচিত করিতেছেন। বিশ্ববাসীকে আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতে বলিতেছি। ইহার পরে যদি কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্বও পর্তুগীজ সরকারের—ভারতবাসীর নহে। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে একজন মহিলাকেও আহত করা হইয়াছে। ইহার পরিণতি কোথায় গিয়া পৌঁছিতে পারে, তাহাও পূর্ব্বাহ্নেই ভাবিয়া রাখা আবশ্যক। ১৫ই আগষ্টের সত্যাগ্রহ দ্বারা গোয়া, দমন ও দিউ-এর অধিবাসীদের বৈদেশিক শাসন-কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করার আন্দোলন দৃঢ় হইল। সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদের সংগ্রাম কেবল ভারতবর্ষেই ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদের সংগ্রাম নয়, এই প্রচেষ্টা বিশ্বের সকল মানবের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশ মাত্র। গোয়ার গুলীবর্ষণে আজ ভারতের ঘরে ঘরে সত্যাগ্রহীদের পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজনের মনে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জাগিয়াছে, তাহাতেই পর্তুগীজদের বিদায়ের দিন আসন্ন হইবে। যে সকল আত্মোৎসর্গকারী বীর এই অহিংস সত্যাগ্রহে আত্মদান করিয়া গোয়ার মুক্তি সুনিশ্চিত করিয়াছেন, সেই বীরদলের উদ্দেশে সমস্ত ভারত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। পর্তুগীজ সরকার গুলীবর্ষণ দ্বারা তাহাদের ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করিয়াছে—গোয়ার মুক্তি মেসিনগানে ঠেকানো যাইবে না, উহা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য।" —যুগান্তর।

বেকার-বিরোধী অভিযান

"সরকারী তদন্ত কমিটির হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশন এলেকায় (টালিগঞ্জ বাদে) বেকার-সংখ্যা ৩৭৮৪০০ ; প্রতি তিন জন

কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে একজন বেকার; খাদ্যদপ্তরের ছাঁটাই কর্মচারীদের বহুসংখ্যক আজও কর্মহীন; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে নিযুক্ত ১৩,৩০০০ কর্মচারীর মধ্যে ১০৫,৮৪৯ জনের বেতন ২১ টাকা হইতে ৬০ টাকার মধ্যে, গত তিন বৎসর শুধু চটকলেই শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে ৪০,০০০, জীবিকা ও জীবনযাত্রার খরচ বাড়িয়াছে চার গুণ। সরকারী বিবরণীরই এই ভয়াবহ পটভূমিকায় অমার্জনীয় সরকারী উদাসীনতার বিরুদ্ধে দলমত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে আন্দোলনের আহ্বান জানাইয়াছেন, সারা পশ্চিম-বাংলার মেহনতী মানুষ তাহাতে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিয়া আগাইয়া আসিবেন, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।" —স্বাধীনতা।

ইণ্ডিয়া অফিস-লাইব্রেরী

"ইণ্ডিয়া অফিস-লাইব্রেরী কার সম্পত্তি? এ মীমাংসা এখনও শেষ হয় নাই। ইংরেজরা এখন বলিতেছে ওটা তাদের এবং এই লাইব্রেরী লণ্ডনে থাকিবে। ইণ্ডিয়া অফিস-লাইব্রেরী যে অবিভক্ত ভারতের সম্পত্তি ইহার প্রমাণ ভারত সরকারের কাগজপত্র হইতেই পাওয়া গিয়াছে। লাইব্রেরীটি ভারত সরকারের, এই মর্মে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চিঠি বাহির হইয়াছে। এবার ভারত সরকার আরও জোর করিয়া লাইব্রেরীটি ভারতে আনিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন। পাকিস্থান এই লাইব্রেরীর উপর ভাগ বসাইতে চাহিতেছে। ইহা অবিভক্ত ভারতের সম্পত্তি, সেই হিসাবে অবিভক্ত ভারতের উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্তমান ভারত উহার মালিক। পাকিস্থান বড় জোর ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা চাহিতে পারে। পাকিস্থানের নিকট ভারতের ৩০০ কোটি টাকা পাওনা আছে, উহা শোধ আরম্ভ করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে, পাকিস্থান কিস্তি খেলাপ করিয়াছে। লাইব্রেরীর ক্ষতিপূরণ বাবদ উহার খানিকটা আমরা ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত সাম্রাজ্য ছাড়িয়াছেন কিন্তু ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীটি ছাড়িতে তাঁহারা রাজী নহেন, এমনই এই লাইব্রেরীটির গুরুত্ব! ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তার প্রায় সবই এই লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ২,২০,৬১৫, পাণ্ডুলিপি ২০,৪৪৪, প্রাচীন মুদ্রা কয়েক হাজার, ঐতিহাসিক দলিল, গ্রামোফোন রেকর্ড, কাপড়ের নমুনা প্রভৃতিও অজস্র। ১৮৬৮ সালে উহার বর্তমান লণ্ডনস্থ বাড়ী তৈরি হয়। খরচ পড়ে ৫,৮৮,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭০ লক্ষ টাকার উপর। তখন ঠিক হয় যে, লাইব্রেরীটির বাড়ীর মালিক হইবেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উহা ব্যবহার করা হইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর লাইব্রেরীটি কি করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বৃটেন, ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিরা উহাতে ছিলেন। ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিরা একটি বৈঠকেও যোগ দেন নাই, বৃটিশ প্রতিনিধিরা রিপোর্ট দিয়াছেন, যেহেতু লাইব্রেরীটি লইয়া ভারত ও পাকিস্থান মারামারি করিবে, সেই হেতু উহা লণ্ডনেই থাক। সেটা ১৯৪৮ সাল। সাত বৎসর দিবানিদ্রার পর মৌলানা আজাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। পেয়ালা হাতে লইয়া ওমর খৈয়াম হয়, কিন্তু রাজ্যের কল্যাণ হয় না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

প্রাণ দান—প্রাণ বিক্রয়—প্রাণ বিনিময়

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

যে ধন এবং জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তাহা পরের উপকারার্থে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য উৎসর্গ অর্থাৎ দান করিয়া থাকেন। নশ্বর জীবনদানের কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে দেওয়া হইল। বৃত্রাসুর নামক জনৈক অসুর অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র জানিতে পারেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্র নামক অস্ত্র ব্যতীত বৃত্রাসুরকে বধ করা যাইবে না। দেবরাজ সন্দিগ্ধচিত্তে দধীচির নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট বলিলেন—মুনিবর! দুর্বৃত্ত বৃত্রাসুরের অত্যাচারে আজ দেবগণ স্বর্গচ্যুত। আপনার অস্থি-নির্মিত বজ্র ব্যতীত এই দুরন্ত অসুরকে বিনাশ করা যাইবে না। দধীচি মুনি ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনিবা মাত্র দেবগণের উপকারার্থে আত্মজীবন দানে কৃতসংকল্প হইয়া বলিলেন যে—নশ্বর অস্থিপঞ্জর পরহিতার্থে বিশেষতঃ দেবকার্য্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই বলিয়া দধীচি মুনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পবিত্র অস্থি দিয়ে বজ্রাস্ত্র নির্মিত হইল। ইন্দ্রদেব সেই বজ্র দিয়া বৃত্রাসুরকে নিধন করিয়া দেবগণকে নিষ্কণ্টক করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিলেন। ইহারই নাম প্রাণদান। শৃঙ্খলিতা ভারতমাতার অগ্নিযুগের ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন প্রমুখ বীর বঙ্গসন্তানগণ দেশের জন্য হাসিমুখে কেহ বা ফাঁসিকাষ্ঠে, কেহ বা স্বহস্তে, কেহ বা সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান করিতে একটুকুও পশ্চাৎপদ হন নাই। এই প্রাণদানের দেশে যদি কেহ সর্ব্বদা প্রাণের ভয়ে দিবা-রাত্রি রক্ষিপরিবেষ্টিত থাকিয়া প্রাণদানের স্পর্দ্ধা করে তবে মনে হয় ইহারা যাত্রার অভিনেতা।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

বাঙলা ভাষার সরকারী স্বীকৃতি

"বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে এই মাসের সর্বাধিক আনন্দের সংবাদ, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার কালে (৩০ জুলাই) বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের ঘরোয়া সরকারী কাজে অতঃপর বাংলা ভাষা যতদূর সম্ভব ব্যবহৃত হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আমলে মুখ্যসচিব শ্রীসুকুমার সেনের বিশেষ চেষ্টায় কয়েক বৎসর পূর্বে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রদেশ-শাসন হাতফেরত ঘটায় সে উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অনেক তোড়জোড়ের ফলে শাসন-সংক্রান্ত কয়েকটি বিভাগের পরিভাষা প্রস্তুত হয়। উৎসাহের অভাবে সম্ভবতঃ সেগুলি তাকে তোলা আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিধান-পরিষদে ও বিধান-সভায় সভ্যগণের বক্তৃতাদি মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত চালু আছে, এবং নূতন সংবিধান অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইলে সেনেট সিণ্ডিকেটের সভ্যগণের ভাষণও (বাংলা ভাষায় প্রদত্ত হইলে) বাংলাতেই ছাপা হইতেছে। তথাপি মা এত দিন সংমায়ের পর্যায়েই ছিলেন, আশা হইতেছে, অতঃপর তিনি যথার্থ মাতৃত্বে বৃতা হইবেন। এত কাল প্রধান অসুবিধা ছিল পরিভাষার, ভারত ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের উদ্যমে-উৎসাহে সংস্কৃতমূলক সর্বভারতীয় পরিভাষা রচনার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। সুনীতিকুমার যাহাকে "ভয়াবহ" এবং জওহরলাল "নৈরাশ্যজনক" বলিয়াছেন, সেই নাগপুরীয় পরিভাষাই আর চরম নয়, তাহার পর অনেক জল অনেক নদীপথে প্রবাহিত হইয়াছে। বাংলার জহ্নু বিধানচন্দ্রের শাসনে কলিকাতার মা-গঙ্গা এত দিন অবরুদ্ধা ছিলেন, এইবার তিনি তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভ করিলে হতভাগ্য সগর-বংশীয়েরা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিধানচন্দ্রের উক্তিতে কোনও দ্বিধা নাই, তিনি বলিয়াছেন, "সমস্ত প্রকার কাজকর্ম বাংলায় হইবে।"

—শনিবারের চিঠি (কলিকাতা)

ধামাচাপা

"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস-প্রধানকে আর গোয়ালপাড়া গিয়া আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস-প্রধানের সহিত মিলিতে হয় নাই। তাঁহারা মহানগরীতে আসিয়া মহাসমারোহে অভিনন্দন লইয়া গিয়াছেন এবং মধুর বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন। কারণ, আসামের আবহাওয়া খারাপ। "বঙ্গাল খেদা" তথায় পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ব্যক্তিদ্বয়ও এই খেদার হাত হইতে যে অব্যাহতি পাইবেন না, ইহা অসমীয়াগণ সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া শাসাইয়া দিয়াছে। সুতরাং মিলন ও আলোচনার প্রশস্ত স্থান হইয়াছে কলিকাতা, অথচ ঘটনাস্থল হইল গোয়ালপাড়া। ধামাচাপা ও মিথ্যা আশ্বাসে এই ভাবে কত কাল যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

আসানসোলের দুর্ঘটনা!

"আসানসোলে মোটর দুর্ঘটনার কথা কাগজে বহু বার লেখা হয়েছে—লেখা হয়েছে জনবহুল কিংবা সরু রাস্তায় ড্রাইভারদের ফুলস্পীডে দ্বিধাহীন গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার কথা। এবং ফলে দুর্ঘটনার জন্য তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী হন। সম্প্রতি সেই সমস্ত নির্মম মোটর-চালকদের বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযোগ পাওয়া গেল। ধাদকার দিকে যেতে আধুনিক সভ্যতা-বিরোধী, আলোকশূন্য ভয়াবহ, জীর্ণ, অপ্রশস্ত চলাচল অযোগ্য আসানসোলের কলঙ্কস্বরূপ যে গুহাপথটি রয়েছে—সেখান দিয়ে মোটর-চালকেরা (গাড়ির গতি কমাবার আইন থাকা সত্ত্বেও) সবেগে মোটর নিয়ে চলে যায়। অথচ যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু চালকেরা নির্ব্বিকার! তাই বলে কি পুলিশের কর্ত্তারাও হাত গুটিয়ে থাকবেন? কিংবা A. A. B.?"

—বঙ্গবাণী।

ক সে স্বাধীনতা?

"কোটি কোটি ভারতবাসী দীর্ঘ আট বৎসর পরেও প্রশ্ন করিতেছে—কি সে স্বাধীনতা?—যাহার আস্বাদ পাইলাম না; যাহার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিলাম না! দরিদ্র দেশবাসী ধীরে ধীরে আরও দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ কর্ম্মক্ষম বেকারের দল কাজের আশায় পাগলের মতন ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে, কোটি কোটি ভূমিহীন, গৃহহীন কৃষক ও শ্রমিক অবসাদ হতাশার মধ্যে দিন যাপন করিতেছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্বস্ব আহুতি দিয়া মধ্যবিত্তের দল নিঃস্ব হইয়া বসিয়া আছে। এই মধ্যবিত্তের দলকে নিঃশেষ করিবার ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা প্রায় সার্থক হইয়া আসিল। পথ ও আদর্শভ্রষ্ট শাসকের দল দেশের জনগণের স্বার্থকে বিক্রয় করিয়াছে—ধনী ও বণিকের নিকট। আজ এই শুভদিনে দেশে শোষণহীন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আবার নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের মহান নেতা গান্ধীজীর আদর্শের শাসনহীন শোষণহীন রামরাজ্য স্থাপনের জন্য সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আদর্শহীন স্বার্থপর জনস্বার্থ-বিরোধী শাসকের দলকে—দেশের স্বার্থকে বিক্রয় ও বিপন্ন করিতে দেওয়া চলিবে না। শোষণহীন সাম্যবাদ স্বাধীন ভারতবর্ষ পৃথিবীকে পথ প্রদর্শন করিবে—অন্ধকারাচ্ছন্ন রণক্লান্ত পৃথিবীকে আশার আলো দেখাইবে। জয় হিন্দ!" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

অনাহারের কাজ

"কয়েক জন পৌরসদস্যের অসার উক্তি অবগত হইয়া শুধু হাসিই পায় না, উপরন্তু তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা হারাইতে হয়। পৌরসভার কর্মীদের বেতন বাকী রাখিয়া, পূর্ববর্তী বোর্ড হইতে বাকী ঠিকাদারের দেনা পূরেই দেওয়া হউক, এই আবদার (যদিও কয়েক বার কয়েক হাজার টাকা এই বোর্ডের কার্য্যকালে দেওয়া হইয়াছে।) যেমন হাস্যকর তেমনি অসার। এই বিপুল অঙ্কের দেনা একদিনেই হয় নাই, দীর্ঘ কাল ধরিয়া জমিয়াছে। যখন তাহা এতদিন ধরিয়া পুরা শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই এবং ঠিকাদারও অপেক্ষা করিয়াছে, সুতরাং তাহারই পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া পৌর-কর্মীরা স্ত্রীপুত্র সহ না খাইয়া কাজ করিবে কি প্রকারে? যাঁহারা এই প্রস্তাব করেন তাঁহারা কয় দিন না খাইয়া থাকিতে পারেন?"

—আসানসোল হিতৈষী।

স্বদেশী যুগের পরে

"ভারতের মুক্ত পরিবেশে এই অশোভন দৃশ্য বা ঘটনা বিরল নহে। অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা ভুলিয়া আজ আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি, বর্তমান জাতীয় দৈন্যের প্রতি হয় আমরা উদাসীন, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তাহা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করি। বলা বাহুল্য, স্বার্থের তাগিদেই বাক্যের ধূম্রজাল রচনা করিয়া আসল ঘটনাকে চাপা দেওয়ার মত কুশলী ব্যক্তির অভাব এদেশে কখনও হয় নাই। স্বদেশী ব্রত গ্রহণের স্মরণ-অনুষ্ঠানের ও ভারতের অষ্টম বার্ষিকী স্বাধীনতা দিবসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আজ সেদিনের সেই আত্ম-প্রত্যয় জাতি ফিরিয়া পাইবে কি না জানি না, তবে জাগ্রত জাতির 'মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া' এই খেলাও আর বেশী দিন চলিবে না, তাহাও নির্মম সত্য। ১৯০৫ সালের রাজকীয় ঘোষণাকে ব্যর্থ করিয়া জাতি যে ঐক্য ও সংহতির পরিচয় দিয়াছিল নিঃসন্দেহে তাহা গৌরবের। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই বৃটিশ সরকারই মুসলিম লীগের কূটচক্রান্তের সহায়তায় ভারতবর্ষকে খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত করিয়া ভারতের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করিয়াছে। জাতি বিচ্ছেদের কথা ভুলিয়া খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা গ্রহণ করিল বটে—কিন্তু স্বাধীন ভারত সেই দংশন হইতে আজ আট বৎসরেও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। ছিন্নমূল শরণার্থী-সমস্যা—বেকার-সমস্যা, অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা ভারতের প্রতি বৃটিশের বিশ্বাসঘাতকতাই ধিক্কার জানাইতেছে না—ভারতের অষ্টম বার্ষিকী স্বাধীনতা দিবসের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানকেও আজ ম্লান মনে হইতেছে।" —বীরভূমবার্ত্তা।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-সমস্যা

"মিল শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করে থাকে। এই ভাবে আন্দোলন করে মিল শ্রমিকদের কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সনের সেন্সাসে দেখা গিয়াছে, ট্রাইবিউনালের মাধ্যমে কলের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকের আয় সম্পর্কে ১৯৪৭-৪৮ সন পর্য্যন্ত কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। বাংলার কৃষকদের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। কিন্তু তাদের কি করে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব সে দিকে কোনই নজর নেই। কৃষকদের এখনও কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন হওয়া সম্ভব নয় বলে তাদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। ১৯৪০ সনের ল্যাণ্ডরেভিনিউ কমিশনের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার কৃষক-পরিবারের গড় আয় ৮০৬, তাদের দেনার পরিমাণ দেখা যাচ্ছে ১৯৭ টাকা; পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ জন হিসাবে
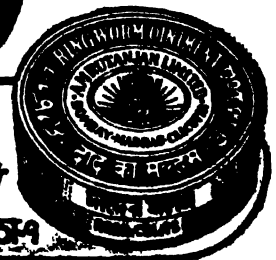
ধরে দেখা যায়, জন-প্রতি আয় মাত্র ৮ টাকা। নিম্নে বিভিন্ন জেলার আয়-ব্যয় ও দেনার হিসাব দেওয়া হলো।

জেলা	বার্ষিক গড় আয়	গড় ব্যয়	গড় দেনা
বর্দ্ধমান	১৫৬ + ৬	১৯৭ + ৭	২১৯ + ১৩
বাঁকুড়া	৮৬ + ৬	১৬৯ + ১২	১৪৪ + ১৭
নদীয়া	১৪১ + ৬	১৬৩ + ৬	১৯৯ + ১৫

"কৃষকদের এই আর্থিক অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দেশের ভূমিসমস্যাই এ জন্য বিশেষ করে দায়ী। কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য নেই, লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না হওয়ার দরুন জমির উপর যে অতিরিক্ত চাপ এসে পড়ে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অপর দিকে উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমিগুলো ধীরে ধীরে ও ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি চাষ করে কৃষকদের পক্ষে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। এ জন্যই দেনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষককুল নিজেদের জমিটুকু মহাজনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন যে ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে তাতেও বাংলার কৃষকদের আর্থিক উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই। ৩৩ একর জমি জমিদারের হাতে গচ্ছিত রেখে অতিরিক্ত যে জমি সরকারের হাতে আসবে তা সারা বাংলার কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেও কৃষকদের জীবন ধারণের মত জমি মিলতে পারে না। কারণ, কৃষকদের ন্যূনতম পরিমাণ জমি বণ্টন করার মত জমি সরকারের হাতে আসেনি।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

সাধারণ মধ্যবিত্ত কোন্ পথে ?

"বড়ো কথা লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর রাখা শুধু অশোভনই নহে, তা "অব্যাপারেষু ব্যাপারঃ।" রামপুরহাট সহরে শ্রাবণের ধারার সহিত তাল রাখিয়া, মাছ ও অন্যান্য তরীতরকারীর দর দিন দিন ছাপাইয়া উঠিতেছে। চাউলের বাজার চড়া। এই মহকুমার অনেক স্থানে সময়োপযোগী চাষের বৃষ্টি না হওয়ায়, আবাদও সুচারু ভাবে চলিতেছে না। মজুরের দরও অত্যধিক, বীজের অবস্থাও সুবিধা নহে। সুতরাং সাধারণ জনগণের মনে বর্ষা-মঙ্গলের গানও দানা বাঁধিতেছে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড কোথাও কোথাও আবার ম্যালেরিয়াও দেখা দিয়াছে। ঔষধের মূল্যও কমে নাই। চিকিৎসকের দর্শনীও বৃদ্ধির দিকে। সাধারণ মধ্যবিত্তের যে "প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্ত" হইবার ব্যবস্থা !"

—রাঢ়দীপিকা।

গভীর উদ্বেগ

"পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এখনও দলে দলে হিন্দুরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পলাইয়া আসিতেছে। গভীর উদ্বেগের বিষয়, সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় সেদিন দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গের শেষ হিন্দুটি ভারতে চলিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই উদ্বাস্ত আগমন বোধ হয় শেষ হইবে না। প্রশ্ন উঠিবে—কেন হিন্দুগণকে নিজ বাসভূমি হইতে উৎখাত হইতে হইতেছে ? সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করিতে পাকিস্থান যে সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহাই তাহার সুস্পষ্ট উত্তর। কিন্তু এরকম তো কথা ছিল না ? ভারত দ্বিখণ্ডিত করার সময় কংগ্রেস ও লীগ উভয়কেই তো স্বীকার করিতে হইয়াছিল সংখ্যালঘুগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিতে উভয়েই বাধ্য। ভারত কথা রাখিয়াছে। পাকিস্থান পারিল না। ভারতে মুসলমানগণ আজ হিন্দুদের সহিত শুধু যে তুল্য অধিকার ভোগ করিতেছে তাহা নয়, ভারত শাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি কাজেই তাহারা কর্ত্তৃত্ব করিবারও সমধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ছত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থায়িভাবে যাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি তো একজন গোঁড়া মুসলমান। পাকিস্থানের কোন গোঁড়া হিন্দু তো দূরের কথা, কোন অত্যুদার হিন্দুও কি কোন দিন এরূপ কোন একটা পদ প্রত্যাশা করিতে পারে ?"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

শোক-সংবাদ

টমাস ম্যান

গত ১২ই আগষ্ট রাত্রিতে জার্মাণ-লেখক টমাস ম্যান পরলোক গমন করিয়াছেন। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ জার্মাণ-লেখক টমাস ম্যান তাঁহার প্রথম উপন্যাস "বাডেনব্রুক্স" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে সারা বিশ্বে খ্যাতিলাভ করেন। শুধু জার্মাণীতে তাঁহার প্রথম উপন্যাসের দশ লক্ষাধিক কপি বিক্রয় হয়। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইবার পর মিঃ ম্যান নাৎসী শাসনের সময় জার্মাণী হইতে বহিস্কৃত হন। গত জুন মাসে তাঁহার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। মিঃ ম্যান ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী ও সেনেটের বিশিষ্ট সদস্যের পুত্র। কিশোর বয়সে তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছাত্র হিসাবে ভাল ছিলেন না এবং স্কুলের শিক্ষাও সম্পূর্ণ করেন নাই। জার্মাণ বাহিনীতে তিন মাস বাধ্যতামূলক চাকরি করার পর তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়া বরখাস্ত করা হয়। মিঃ ম্যান এক বীমা কোম্পানীতে কেরাণীর চাকরী পান। কিন্তু ইহা ত্যাগ করিয়া মিউনিকে ভবঘুরের জীবনযাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন। কয়েকটি ছোট গল্প লিখিবার পর তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস রচনা করেন এবং অল্প বয়সে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত তাঁহার কারবালা ট্যাঙ্ক লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। দাশগুপ্ত গত ছয় মাস যাবৎ কঠিন যকৃৎপীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবং দুই কন্যা বর্তমান। মৃত্যুকালে দাশগুপ্তের বয়স ছিল ৫২ বৎসর। সাংবাদিকতা ছাড়া দাশগুপ্ত কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীতারকনাথ চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

মুসলমানী পতাকায় অর্দ্ধচন্দ্র কেন ?

চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া আদিম সমাজ মাস গণনা করিত। প্রতি আটাশ দিন পর আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, অতএব এই হিসাবে আটাশ দিনেই মাস ধরা হইত। ইহাকে চান্দ্র মাস বলে। যে সকল জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম কতকগুলি সংস্কার এখনও পালন করিয়া চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে এখনও চান্দ্র মাস গণনার রীতি প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও ইহুদি জাতি অন্যতম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বিশেষতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি সূর্য্যের রাশিচক্র পরিভ্রমণের কাল দ্বারা মাস ও বৎসর গণনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এখনও কোন কোন অঞ্চলে চান্দ্র মাস গণনার রীতি প্রচলিত থাকিলেও সাধারণতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব বশতঃ সূর্য্যের রাশিচক্র পরিভ্রমণের কাল দ্বারাই বর্ত্তমানে মাস ও বৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা যে মাস গণনা করা হয়, তাহাকে সৌর মাস বলে। মুসলমান ও ইহুদি জাতির এই সম্পর্কিত এখনও প্রাচীনতর রীতিটি পালন করিবার প্রধান কারণ এই যে, মরুভূমির দেশে এই উভয় ধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। মরুভূমিতে দিবা অপেক্ষা রাত্রি এবং সেই সূত্রেই সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রই অধিকতর আকর্ষণীয়। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি মধ্য এশিয়ার কোন শীত-প্রধান দেশে উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে এক দিকে ভারতবর্ষ ও অপর দিকে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। শীত-প্রধান দেশে রাত্রি অপেক্ষা দিবা এবং সেই সূত্রে চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়া থাকে। সেই জন্য সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রভাব কালক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিবার ফলে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই আজ চান্দ্র মাস গণনার প্রাচীনতর রীতিটির পরিবর্ত্তে সৌর মাস গণনার আধুনিকতর রীতিটি গৃহীত হইয়াছে। মুসলমান জাতি এই বিষয়ে এখনও প্রাচীনতর রীতিটি পালন করিয়া তাহার সংস্কৃতিতে চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। এই সূত্রেই মুসলমানদিগের জাতীয় পতাকা চন্দ্র-চিহ্নিত হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের চিত্র সূর্য্যের চিত্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, সুতরাং অর্ধচন্দ্রের চিত্রই তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের দিক দিয়াও অর্ধচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয়।—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। বেতালা।

যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কে লেখা

আমার জনৈক বন্ধু (মাসিক বসুমতীর গ্রাহক) কিছুদিন পূর্ব্বে যৌন বিষয়ক কোন পত্রিকার গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমিও এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর "মাসিক বসুমতীর" অন্যান্য অপরিহার্য্য বিভাগের মধ্যে ঐ যৌন-সম্পর্কীয় লেখার প্রয়োজনীয়তা বা অভাব অনুভব করি। যৌন-সাহিত্য এ দেশে সব চেয়ে অবহেলিত অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব চেয়ে আলোচ্য এবং প্রয়োজ্য বিষয় হইতেছে ইহাই। রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির নোণা জলে সাঁতরাইয়া ফিরিতেছে নরনারী......তাদের পিপাসার্ত্ত হৃদয় যৌনজীবনের সুপেয় জলেরই আস্বাদ পাইবার জন্য, একথা ভুলিলে চলিবে না। যৌন-অজ্ঞতার ফলে দেশের ক্ষতির পরিমাণও অপরিসীম, তার আলোচনাও বিস্তৃত।......যাক্ মাসিক বসুমতীর মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ইহার অপরাপর বিভাগের সঙ্গে এই প্রস্তাবিত বিভাগটির সংযোজনা করিয়া পত্রিকাটি সর্ব্বাঙ্গভাবে অলঙ্কৃত করিবেন আশা করি। আরও আশা করি, আমার বন্ধু-বান্ধবীদের ঐকান্তিক অনুমোদন। ইতি এস আহামদ আলী গ্রাঃ নং ৫০৪৭৩ শিকরভোড় (বর্দ্ধমান)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত চিঠি—ভ্রম-সংশোধন

মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব বঙ্কবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্রখানি আপনার সম্পাদিত মাসিক বসুমতীর ১৩৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। কিন্তু উহার পাদটীকায় বঙ্কবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলে মজুমদার উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। অতএব অনতিবিলম্বে সংশোধিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।—শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। (কলিকাতা—৬)

সেনপত্র চাই

আপনাকে, 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগটি খোলার জন্যে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স যাবার (কোনোরূপ বদল না করে) সরাসরি কোনো রেলপথ আছে কী? যদি নিতান্তই থাকে—তাহলে ইংলিস চ্যানেল কেমন করে পার হয়? দয়া করে এর উত্তর দিলে খুশী হব। সুবোধ ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প মধ্যে মধ্যে বসুমতীতে বেরুলে ভাল হয়। ইতি—রেবতীরঞ্জন। (এম ৭৩২৮) হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।

[প্রথমোক্ত বিষয়টির জন্য আপনি ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস, ২নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ঠিকানায় পত্রালাপ করতে পারেন। শ্রীঘোষ ও গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁদের লেখা পাওয়া গেলেই প্রকাশিত হবে।—স]

"ভুঁয়া-ভুঁইয়া" থেকে "রাজায়-রাজায়" কেন ?

এবারের আষাঢ় সংখ্যায় মাসিক বসুমতীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেটা চোখে পড়লো, সেটা হচ্ছে ছদ্মবেশী ঔপন্যাসিক 'উদয়ভানু'র জনপ্রিয় উপন্যাস 'ভুঁয়া-ভুঁইয়ার' নতুন নামকরণ 'রাজায়-রাজায়'।

শুধু আমারই নয়, আমার পরিচিত মাসিক বসুমতীর অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাদের মনে এই "অনিবার্য্য কারণ বশতঃ" নতুন নামকরণের ব্যাপারটা দস্তুর মত কৌতূহলের সৃষ্টি কোরেছে। আমার কিন্তু নতুন নামকরণটা খুব ভালো লাগেনি। কেন যে লাগেনি, তাও খুঁটিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারব না। এ-নামটার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব বোধ হচ্ছে; ওজনটা আগের তুলনায় কিছুটা হাল্কা লাগছে যেন। যে মিষ্টিক পটভূমিকা নিয়ে উপন্যাসটা বেড়ে উঠছে, তার যে একটা অপূর্ব্ব পৌরাণিক আভিজাত্য আছে, কথোপকথনে, বাহ্য প্রকৃতিকে টেনে এনে নায়িকার অন্তঃপ্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে Shakespearean পদ্ধতিতে পরিবেশ তৈরী করার কৌশলে যে একটা বনেদীয়ানা আছে, তার উপযুক্ত নামকরণ হয়েছিল 'ভুয়া-ভুঁইয়ায়'।

শব্দ মূলতঃ ধ্বনিদেহ। শুধু শব্দার্থ নিয়েই ভাষা নয়। 'ভুয়া-ভুঁইয়া' শব্দটার যে ধ্বনি তার সঙ্গে উপন্যাসের ভাষার এবং মূল সুরের বড় মিল ছিল। প্রাচীন অভিজাত বংশের অপ্রচলিত অথচ হৃদয়গ্রাহী আভিজাত্যের মত কথাটারও একটা ধ্বনিগত মর্য্যাদা ছিল। যাই হোক, লেখক যা ভাল বুঝেছেন, কোরেছেন। "অনিবার্য্য কারণ বশতঃ" আমি যে এতখানি মন্তব্য করলাম, তার জন্যে ক্ষমা কোরবেন। এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণিত হয় যে আমি 'ভুয়া-ভুঁইয়া'র ভুয়াভক্ত নই। বাস্তবিক উপন্যাসটা বড় অদ্ভুত লাগছে। ভাব, ভাষা, চরিত্র, ঘটনা, সব একাকার হয়ে গিয়ে উপন্যাসের মূল সুরকে জমজমাট কোরে তুলেছে। জায়গায় জায়গায় একেবারে কবিতা পড়ছি বলে বোধ হয়। কোথাও ভুয়া romanticism নেই। বাঙালী মনকে চাঙ্গা করতে গেলে এই রকম উগ্র খাদ্যেরই দরকার; তার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। অধ্যাপিকা সুধীরা নাগ, ৫১ বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা।

['বাজায়-বাজায়' নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ার কারণ "ভুয়া-ভুঁইয়া" নামের প্রায় অনুকরণে অন্য একটি বাঙলা উপন্যাস সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালী নাকি অনুকরণপ্রিয়। যাই হোক, একাধিক গ্রন্থের এক জাতীয় নামকরণ সাহিত্যিকসুলভ নয়, এজন্যই নামটির পরিবর্ত্তন করা হ'ল। উপন্যাসটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে, এজন্য ধন্যবাদ। —স]

রাজসী—সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য

আমাদের মাসিক বসুমতীতে শ্রীসতীকিঙ্কর দত্ত মহবৎ খান সম্বন্ধে বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'রাজসীতে' প্রথমে রাজপুত কাহিনী অনুসারে ও কবি-প্রসিদ্ধি অবলম্বন করে মহবৎকে মেবারী রাজপুত ও রাণাপ্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে দেখান হয়েছে। 'রাজসী' ঐতিহাসিক প্রবন্ধ নয়, রম্য রচনা। কাজেই যে বর্ণনা ও যে কাহিনী পাঠকের কাছে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও কল্পনার বিকাশে রম্য হয়ে উঠবে তাকেই আশ্রয় করে লেখা হয়েছে। কিন্তু 'রাজসী'তে রম্যতার জন্য ঐতিহাসিক সত্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। ওই অধ্যায়েরই শেষের দিকে বলা হয়েছে যে, আসলে মহবৎ খান ছিলেন ইরাণী, শিরাজ সহরের লোক ও রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রাজপুত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করার মাধ্যমে। শ্রীসতীকিঙ্কর দত্ত ডাঃ কালীকিঙ্কর দত্তের Advanced History of India থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন তাও সঠিক নয়। মোগল দরবারের ওমরাহদের সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 'মাসির-উল-উমরা'র উল্লেখ 'রাজসীতে' এই প্রসঙ্গে করা হয়েছিল। তার তৃতীয় খণ্ডে ৩৮৫ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে যে, মহবতের বাবা কাইয়ুর বেগ সপরিবারে ভাগ্যান্বেষণে ইরাণের শিরাজ থেকে কাবুলে আসেন। কাবুল সে সময় মোগল ভারতবর্ষের অংশ ছিল। কাজেই মহবৎ (পূর্ব নাম জমানা বেগ) আফগান হতে পারেন না। তিনি পাঁচশ'র মনসবদার ছিলেন আকবরের রাজত্ব কালে অর্থাৎ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের আগে। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মনসব ছিল তিন হাজারী অর্থাৎ সে যুগে এক জন বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যখন মোগল সাম্রাজ্যের খান্‌খানান্ ও শিপাহশালার হন তখনো তাঁর মনসব ছিল সাত হাজারী। তিনি মেবার যুদ্ধে বিশেষ সক্রিয় অংশ নেন। পত্রলেখক রাজপুত পণ্ডিত শ্যামলদাস কবিরাজের "বীর বিনোদ" বইটি পড়তে পারেন। তবু রাজপুত চারণরা কেন মহবৎকে মেবারী বীর বলে গান করতেন? ইরাণের কবিশ্রেষ্ঠ ফিরদৌসী 'শাহনামা'তে যে জন্য পারস্য-বিজয়ী গ্রীক আলেকজাণ্ডারকে পারস্য সম্রাটের অজানা স্ত্রীর পুত্র বলে বর্ণনা করেছেন সে জন্য। অর্থাৎ মেবারী বলেই মেবারকে হারাতে পেরেছেন এই আত্মপ্রসাদ! 'রাজসী'তে ও রাজস্থান সম্বন্ধে এর আগের বই 'রাজোয়ারা'তে যেখানেই ইতিহাস ও কাহিনীতে অমিল বা ঝগড়া রয়েছে তা খুলে বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যকে খুঁজে বের করবার জন্য বিভিন্ন ভাষার পুরানো রচনাকে বিচার করা হয়েছে। তাকে স্বীকার করে তার উপর রম্য রচনার রঙ দেওয়া হয়েছে। তাই "মেবারীদের মত আমারও চোখে মহবৎ রাজপুতই বটে।...যার বীরত্বে আছে চমক আর জীবনে আছে রোমান্স, সেই হচ্ছে রাজপুত।"

—শ্রীদেবেশ দাশ, নিউ দিল্লী।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন

কোন্ সংখ্যায় মনে পড়িতেছে না, তবে কয়েক মাস আগে মাসিক বসুমতীর সাহিত্য পরিচয় বিভাগে দেখিয়াছিলাম, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণের আয়োজন কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় করিতেছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নিউ এজ পাবলিশার্সের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাঁহারা নাকি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছেন। ইহা বোধ হয় মাস ছয়েক আগের কথা। সেই হইতে প্রতি সংখ্যাতে একই প্রতিশ্রুতি। যাক্ সে কথা। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থগুলির কি 'পুনর্মূষিক ভব'র দশা প্রাপ্ত হইল? বিজ্ঞাপনে না দেখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি উত্তর পাইব। আর একটা কথা। এমন এমন গ্রন্থ আছে যেগুলির নাম শুনিয়া অনেক পাঠক কিনিতে চাহে। কিন্তু প্রকাশক কে, না জানায় তাহাদের হতাশ হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ রামগতি ন্যায়রত্নের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ। তার পর, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকরাজির বিজ্ঞাপন কি মাসিক, দৈনিকে দিতে নাই?
—শ্রীকালীপদ সিংহ। রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম।

'নিজেকে গড়ো'র লেখকের ঠিকানা

আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। আপনার মাসিক বসুমতীর 'ছোটদের আসরের' অন্তর্গত 'নিজেকে গড়ো' প্রবন্ধটি আমার চমৎকার লাগিয়াছে। আমি লেখকের সহিত পত্রালাপ করিতে ইচ্ছুক। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লেখক শচীন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ঠিকানা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।—সরোজকুমার মেত্যো, শ্যামসাগর, বর্ধমান।

[লেখক জীবিত নেই; লেখক এলাহাবাদের বাসিন্দা ছিলেন।—স]

সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা সম্পর্কে

গত ১৩৬২ সনের বৈশাখ মাসের মাসিক বসুমতীতে 'সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা' শীর্ষক যে সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে কান্তিচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে একটি ভুল সংবাদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। কান্তিচন্দ্র ঘোষ বঙ্গীয় আইন-সভার রিপোর্টার ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি লাইব্রেরিয়ান পদে কখনও কাজ করেন নাই। রিপোর্টাররূপে কিছু দিন কাজ করার পর ১৯২৫ খৃঃ হইতে তিনি ঐ অফিসের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট (Senior Superintendent) পদে কাজ করিতেছিলেন। তৎপরে ১৯৩৭ খৃঃ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের (Bengali Legislative Assembly) এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী বা সহ-সচিব পদে কিছুদিন কাজ করার পর উক্ত অফিসের রেজিষ্ট্রার (Registrar) পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পেন্‌সন্‌ কাল অবধি ঐ পদেই কাজ করিতেছিলেন। আমি ১৯৩০ খৃঃ হইতে তাঁহার সহিত একই অফিসে কাজ করার সুযোগ লাভ করি।—শ্রীঅমিয়কণ্ঠ নিয়োগী। সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ও পরিষৎ।

মহিলাদের জীবনী চাই

বাঙলার বাহিরেও মাসিক বসুমতী প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে আমরা সকলে অতি আগ্রহ সহকারে মাসিক বসুমতী পড়ি। "যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। "চিত্র-বিচিত্র", "কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী" ও "সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা" বেশ ভাল লেগেছে। আমার মনে হয়, মহিলা বিভাগে যদি বিশিষ্টা মহিলাদের জীবনী প্রকাশ করেন, তা হলে মহিলা বিভাগটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।—অঞ্জলি ঘোষ (এম ৪৭১৭১) নাগপুর।

[প্রতি সংখ্যায় যাতে একেক জন মহীয়সী মহিলার জীবনী প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা সচেষ্ট হবো। পাঠক-পাঠিকার পক্ষ থেকেও লেখা আহ্বান করছি।—স]

পত্রিকা সমালোচনা

সাহিত্যের সর্ব শাখায় সমৃদ্ধ কোন মাসিক পত্রিকার নাম করিতে হইলে সর্বাগ্রে মাসিক বসুমতীরই করিতে হয়। গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ-সাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য প্রত্যেকটি বিষয়ে এর বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। ভাবিয়া অবাক হই যে, আপনার পত্রিকায় পাঁচটি জীবন-চরিত ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্যে আপনি প্রশংসা পেতে পারেন। 'বিবেকানন্দ-স্তোত্রে'র পরিবেশটি পবিত্র গম্ভীর ও একটি জ্যোতির সুষমায় ঘেরা। তিনি স্বামিজীকে অনুভব করেছেন অন্তর দিয়ে। সেজন্য স্বামিজীর সেই উগ্রতেজা সন্ন্যাস আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক নোতুন আলোকে। বুদ্ধদেব-দর্শন পরিচ্ছেদটি ভারি ভাল লেগেছে। 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর' নানা তথ্যপূর্ণ। তবে সাহিত্যিক মল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মল্যই বেশী। 'আয়স্তু সর্বতঃ স্বাহা' ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এর লেখক রবীন্দ্রনাথের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই লেখাটির প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ অনুভব করি। উদয়ভানুর উপন্যাস "রাস্তায়-রাস্তায়" আমার ভালই লাগছে। উপন্যাসটির পটভূমিকা বিস্তৃত। চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে। ঘটনায় নাটকীয় মুহূর্ত পরিস্ফুটনে লেখকের কৃতিত্ব অপরিসীম। লেখকের আসল নাম জানিতে ইচ্ছা করি।—মিত্রা বসু। C/o Capt. S. C. Som. Ranaghat. Nadia.

['রাস্তায়-রাস্তায়' উপন্যাসের লেখক বর্তমানে নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন না।—স]

মাসিক বসুমতী ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এতে বহু বিভাগ থাকায়, যে যেমন লোক, সে তেমন উপাদান খুঁজে পায়। সেই জন্য ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সকলেই মাসিক বসুমতী আদরের সঙ্গে পড়ে। সাহিত্য, শিল্প, খেলাধুলা, সঙ্গীত, ব্যবসা, সিনেমা প্রত্যেক বিভাগই সুন্দর। আপনার "কেনাকাটা" বিভাগটিকে আরও উন্নত করে তুলুন। তিন পৃষ্ঠায় মন ভরছে না। যে সব ছেলে-মেয়েরা বেকার হয়ে আছে, তারা নিশ্চয়ই ঐ থেকে পথ খুঁজে পাবে। টেলিফোনে কথা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ছাপিয়ে আপনি ধন্যবাদের পাত্র হয়ে আছেন। ঐ রকম আরও অনেক জিনিষ আছে, যা আমরা বুঝি না অথচ মাসিক বসুমতী থেকে সংগ্রহ করি।—লিপি রায় (তমলুক)

মাসিক বসুমতীর দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যে তার দামও বেড়েছে, ইদানীং মাসিক বসুমতীর কয়েকখানা পাতা ওলটালেই টের পাওয়া যায়, কি ভাবে উত্তরোত্তর নতুন নতুন বিভাগের প্রচলন করা হয়েছে। নতুন 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগটি পাঠক-পাঠিকার কাছে খুবই আদরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের নিজেদের মতামত, পরস্পর আলোচনা প্রভৃতি প্রকাশের এবং নানা দিকের জিজ্ঞাস্য বিষয় জানবার এবং শেখবার সুযোগ পেয়ে। শুধু তাই নয়, রচনার দিক দিয়েও বেশ কিছু কিছু নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'ছোটদের আসরে' শচীন্দ্র মজুমদারের 'নিজেকে গড়ো' রচনাটি তার ছোট্ট একটি প্রমাণ। সত্যিই আজকের যুগে ওটির বিশেষ প্রয়োজন। আমার আসল বক্তব্য—'রঙ্গপট' বিভাগে অভিনয়-শাস্ত্রের নানা দিকের আলোচনার বিষয় নিয়ে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'অভিনয় শাস্ত্রের নানা দিক'-এর যে আলোচনা সুরু হয়েছে, তা থেকে অভিনয়-ইচ্ছুক সকল লোকই যে কি ভাবে শিক্ষিত ও উপকৃত হবেন এই নাট্য আন্দোলনের যুগে, তা কতব্য নয়। অভিনয়-শিল্পী হওয়ার প্রারম্ভেই যে প্রয়োজন হয় অভিনয় শাস্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া, তার টেকনিকের দিকটা জানা, সে সুযোগ আমাদের নেই। তাই আমরা অনেকেই পাড়ার ঘরের ছোট ছোট

অপেশাদার প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি) অভিনয় করি (১) না জেনে (২) না বুঝে (৩) না পড়ে। এখন এই তিন 'না' (অভাব) এর কারণ ভাল ভাবে তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে এই অভাবের মূলে কোন জিনিষটির প্রকৃত অভাব। তাহলে এখন সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অভিনেতা বা পরিচালকের প্রাথমিক কর্তব্য অভিনয় শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া। কিন্তু আমাদের এই বাংলা দেশে অভিনয় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা (যে ভাবে বসুমতীতে করা হচ্ছে) কোন বাংলা পুস্তক পাওয়া যায় কি না এবং ঘরে ঘরে তার প্রচার আছে কি না জানি না। যদি না-ও থাকে, খেদ নাই. সম্প্রতি বসুমতীই সে অভাব পূরণের ভার নিয়েছে। জনসাধারণকে উপকৃত ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই বসুমতীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং ওটাই বসুমতীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বসুমতীর পাদপূরণগুলি। ঐগুলি একাধারে যেমন সংবাদবাহক, কৌতুকাবহ তেমনি অপর দিকে জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক।—শ্রীকুমার শ্রীমানী ১৪, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৩৬।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাংলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা ছড়িয়ে আছে বাংলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ায়। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাব। গত সংখ্যার পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব; সেজন্য বর্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন-লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হ'তে চাই। এ দেশ থেকে আনাতে হ'লে Sea-Mail Postage সমেত সডাক বার্ষিক চাঁদার হার এবং কি উপায়ে চাঁদা পাঠাবো জানালে বাধিত হব। British Postal Order Cross ক'রে পাঠালে আপনাদের সুবিধা হবে কি? Air-Mail Book-Post-এ ডাক-মাশুল কি পড়ে?—গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নিকোলাস রোড, ম্যাঞ্চেষ্টার—২১, ইংল্যাণ্ড।

Will you please send the Monthly Basumati per V. P. P. to the following address and oblige?—A. L. Chrestien. Supdt. C. E. Z. Mission School, Howrah.

I beg to advise please send me Monthly Basumati for current year by V. P. P. to my address.—J. C. Bose (Engineer). Purtabpore Sugar Fy. N. E. Rly.

Please enlist our name as subscriber and send the copy per V. P. P.—Hostel Supdt. Women's Co-Opperative Industrial Home Ltd. Kamarhati, 24 Pargs.

আগামী এক বছরের জন্য আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন। বল্লভপুর।

I agree to your sending copy of M. Basumati by V. P. P.—M. M. Rakshit. Tapti Road, E. Khandesh.

Please enlist the Hd. Master, B. N. High School, Anandpur as one of the annual subscribers.—Keonjhar, Orissa.

আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করি। কপি পাঠাইবেন V. P. P. যোগে।—শ্রীমতী ইলা রায়। পূর্বাচল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা হইতে চাই। V. P. P. দ্বারা এই সপ্তাহের মধ্যে কাগজ পাঠাইবেন।—মিসেস শান্তি মুখোপাধ্যায়। Shiva-Kutiram, Kathgorasahi, Orissa.

Monthly Basumati to be sent by V. P. P. for one year.—মিসেস প্রতিভা গুপ্ত। হিন্দুস্থান সোপ বিল্ডিং ইয়ার্ড, গান্ধীগ্রাম, বিশাখাপটম্।

Rs. 15/- being the subscription for a year is sent herewith. Please enlist me as a subscriber. —Protima Sengupta. Bejjhnagar, Nagpur. M. P.

Sending the yearly subscription.—Genl. Secy. Aviation Club. Borjhar, Air Port Assam.

আগামী ১৩৬২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আমার গ্রাহিকা-মূল্য পাঠাইলাম। আগামী বৎসর বৈশাখ মাসে আবার আমার গ্রাহিকা-মূল্য পাঠাইব।—শ্রীমতী দেবীরাণী ভট্টাচার্য্য। পালপাড়া, চন্দননগর, হুগলী।

বসুমতী পত্রিকার নূতন গ্রাহিকা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—রমারাণী মিত্র। পাখাটোলী, মুজাফরপুর।

আমি ষাণ্মাসিক চাঁদার হার হিসাবে চাঁদা পাঠাইলাম। আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী কল্পনা দত্ত। হাজারীবাগ রোড, রাঁচী।

Remitting herewith subscription for your magazine—শ্রীমতী রেখা পাঠক। শিবসাগর, আসাম।

Please enroll my name as a subscriber of your journal and let me know my subs. number. —Mukulrani Purakayastha. Bagbari, Cachar, Assam.

ঝিলম নদীর তীর

॥ যাযাবর ॥

[দশম মুদ্রণ যন্ত্রস্থ]

যাযাবর-এর সর্বাধুনিক রচনা "ঝিলম নদীর তীর"। এ-বইতে কাশ্মীরের সমসাময়িক ইতিহাস তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে এক অপরূপ রূপকথার কাহিনীর মতোই বিবৃত করা হয়েছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলবার মতো একখানা বই। দাম—মাত্র দু' টাকা।

॥ যাযাবর ॥

দৃষ্টিপাত (বিংশতি মুদ্রণ) ৩৷৷০
জনান্তিক (একাদশ মুদ্রণ) ৪৲

॥ বুদ্ধদেব বসু ॥

তিথিডোর (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৮৲
উত্তরতিরিশ — ৪৲
ধূসর গোধূলি — ৪৲
— ১৷৷০
অন্য কোনখানে — ২৲

শিশু শিক্ষায় নবযুগ!

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর

পড়তে মজা

দিয়েই ছোটদের যুক্তাক্ষরের আগে পর্যন্ত যা কিছু সব পড়তে শেখান।

মূল্য—মাত্র ১৸০

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

উপনায়ন (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) ৩৲
দুঃস্বপ্নের দ্বীপ — ২৸০
কালোছায়া — ২৲
হানাবাড়ি — ২৷৷০/৩৲
মৃত্তিকা — ৩৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর একমাত্র প্রবন্ধের বই

বৃষ্টি এল

"গ্রন্থ পার্বণ" নামক নতুন বহু-আলোচিত প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়ে পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরলো। ২৲
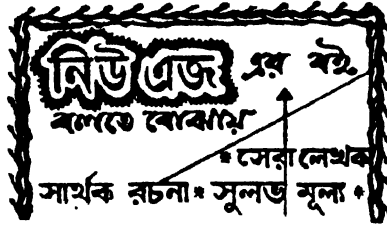
কত অজানারে

শঙ্কর

ওল্ড পোষ্ট আপিস ষ্ট্রীটে নিজের আদালতি কর্মক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন আর বিচিত্র চরিত্র সংগ্রহ করে লেখক এক অনবদ্য কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বাংলাসাহিত্যে এ-চরিত্রগুলি যেমন নতুন, এদের চরিত্র-চিত্রণও তেমনি নিপুণ। এই আখ্যানবস্তু নিয়ে সাহিত্য-রচনা বাঙলা ভাষায় এই প্রথম। 'টেম্পল চেম্বার' নাম দিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় বহু পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়েছিল। দাম ৪৷৷০

রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য

বুদ্ধদেব বসু

এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু তিনটি প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা, রবীন্দ্র-নাথের কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের সম্বন্ধ নিরূপণ এবং সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের পট-ভূমিকায় তাঁর মূল্য বিচার। সচ্ছন্দ, সুখ-পাঠ্য রচনা এবং সাহিত্যসমালোচনার ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সংযোজন। দাম ৩৷৷

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

॥ শিবনাথ শাস্ত্রী ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে এক "রেনেশাঁস"-এর আবির্ভাব হয় তারই কাহিনী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর এই মূল্যবান গ্রন্থটি এখন আমরা প্রকাশ করলাম। মূল্য—৫৲

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম

॥ পঞ্চম মুদ্রণ বার হচ্ছে ॥

"সাহেব বিবি গোলাম" বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। একখানি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এত আন্দোলন ইদানীং কালের ইতিহাসে পূর্বে আর কখনও হয়নি। কাব্যে রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" সামাজিক উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের "শেষপ্রশ্ন" ইতিপূর্বে এমনি প্রশংসা আর বিরুদ্ধাচরণের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসে "সাহেব বিবি গোলাম"ও বর্তমান কালের সর্বাধিক আন্দোলন-ধন্য গ্রন্থ। দাম ৬৷৷০

॥ ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥

দেশে বিদেশে [নবম মুদ্রণ] ৫৲
চাচা কাহিনী (সপ্তম মুদ্রণ) ৩৲

॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥

আমার দেখা রাশিয়া (২য় সং) ৩৲

॥ সুবোধ ঘোষ ॥

কিংবদন্তীর দেশে — ৫৲

॥ ধীরাজ ভট্টাচার্য ॥

যখন পুলিশ ছিলাম — ৩৷৷০
২য় মুদ্রণ

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ॥

ছন্দপতন — ২৷৷০

॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ॥

নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ — ৩৷৷০

॥ শিবরাম চক্রবর্তীর ॥

বিচিত্ররূপিণী — ২৷৷০

এজেন্সি

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

॥ আসর ॥—২৷৷০

নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাসিক বসুমতী বিক্রয়ের এজেণ্ট হওয়ার নিয়মাবলী

খবরের কাগজওয়ালাদের হাজারে কদাচ বিশ্বাস করবেন না। আর আমাদের সম্পর্কেও যেন ভাববেন না যে, কথাটা আমরা বাড়িয়ে বলছি। আসলে মাসিক বসুমতীর এক খণ্ড অফিস-কপি রাখাও সময় সময় আমাদের পক্ষে শক্ত হয়। সেই কারণে আমরা ঠিক করেছি, যাতে মাসিক বসুমতী ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের পাঠক-পাঠিকার হাতে গিয়ে পৌছয়, সেজন্য আরও অধিক সংখ্যায় এজেণ্ট নিয়োগ করা হবে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, করাচী থেকে কোহিমা যেখানে যে কারণে বাঙালীর পত্তন ঘটেছে, সেখানেই শিকড় নামিয়ে বসেছে মাসিক বসুমতী। আপনার পরিবারস্থ লোকজনের মধ্যে আরও একজনের বৃদ্ধি ঘটেছে। সে হচ্ছে মাসিক বসুমতী।

এজেণ্ট হবার আইন-কানুন

(১) স্থানীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বিক্রেতাগণের নাম ও ঠিকানা সহ আপনি নিজে কোন্ সাময়িকপত্র কত সংখ্যা বিক্রয় করেন তার সঠিক সংবাদ।

(২) আপনি অপর কোন্ কোন্ সাময়িকপত্রের এজেণ্ট রয়েছেন ? কত দিন ?

(৩) কমপক্ষে কত কপি কাগজ আপনি চান ? দশ কপির কমে কোনও এজেন্সি দেওয়া যাবে না।

(৪) সিকিউরিটি হিসাবে প্রতি কপি মাসিক বসুমতীর জন্য এক টাকা আট আনা করে জমা দিতে হবে।

(৫) কমিশন প্রতি কপির জন্য তিন আনা।

(৬) অবিক্রীত কোনও কপিই আমরা ফেরৎ নেব না।

এজেন্সীর জন্য ম্যানেজার, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় যোগাযোগ স্থাপন করুন। আপনার পুরো নাম, ঠিকানা, নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম, ব্যাঙ্ক রেফারেন্স সহ।

স্বপনের মোহজাল রচে
হিমকল্যা
আয়ুর্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।
পামিকোকো
মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।
ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
মহোপকারী
কেশতৈল।
যৌবনগন্ধা
অনুপম
সুরভি নির্য্যাস।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪
নিত্য প্রসাধনের সার্থকতায় প্রতিটি অপরিহার্য . . —
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৪শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬২] (স্থাপিত ১৩২৯) [প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কি না ?—তাই মা হাত ধরে আছেন। এতটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না।"

"ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আলপথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আল্-পথ,—চ'লে গেলে পাছে পড়ে যায়, সে জন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে ; আর বড় ছেলেটি সেয়ানা ব'লে নিজেই বাপের হাত ধরে সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে সেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে—আর অমনি টিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠলো ! সেই রকম মা যার হাত ধরেছে, তার আর ভয় নেই ; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে—হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে।"

"মন কুড়িয়ে এক ক'রে যাই এনেছি, আর অমনি 'মা'র মূর্ত্তি এসে সামনে দাঁড়াল !—তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে আগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না ! যতবার মন থেকে সব জিনিষ তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি তত বারই ঐরূপ হয় ! শেষে ভেবে চিন্তে, মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে 'অসি' ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্ত্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম ! তখন মনে আর কিছুই রহিল না :—হু হু করে একেবারে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিলু।"

"যে অবস্থায় সাধারণ জীবের পৌঁছিলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থাকে শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তেমনি পড়ে যায়, সেইখানে ছ'মাস ছিলুম ! কখন্ কোন্ দিক্ দিয়ে যে দিন আসত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না ! মরা মানুষের নাকে-মুখে যেমন মাছি ঢোকে, তেমনি ঢুকতো, কিন্তু সাড় হ'ত না। চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল ; হয়ত অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁস হয় নাই ! শরীরটে কি আর থাকত ?—এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল ; আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মা'র অনেক কাজ এখনও বাকি আছে,—এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে ! তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁস আনবার চেষ্টা করত। একটু হুঁস হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত ! এই রকমে কোন দিন একটু-আধটু পেটে যেত, কোন দিন যেতো না। এই ভাবে ছ মাস গেছে ! তার পর এই অবস্থার কত দিন পরে শুনতে পেলুম, মা'র কথা—'ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্ !' তারপর অসুখ হ'ল—রক্ত আমাশয়, পেটে খুব মোচোড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ মাস ভোগা-ভুগো তবে শরীরে একটু একটু ক'রে মন নাবলো—সাধারণ মানুষের মত হুঁস এলো ! নতুবা থাকত থাকত মন আপনা আপনি ছুটে গিয়ে সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত !"

টিকাদার শ্রীবৈদ্যনাথ

চিত্রলেখা

বসন্তের মহামারী যখন দেশবাসীকে ভীত-ত্রস্ত করিয়া বাধ্যতা-মূলক টিকা লওয়াইতে বাধ্য করে, যখন বিংশ শতাব্দীর মাইক-ফিট্-ভ্যানে করিয়া পাড়ায়-বে-পাড়ায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশনের ছলে টিকা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেয়, পথে-ঘাটে-বাজারে যখন টিকাদার টেবিল সাজাইয়া পথচারীকে টিকা লইতে বাধ্য করে, তখন মনে পড়িয়া যায়, আজও ইহার প্রয়োজন যে কত্টা চিকিৎসা-সম্মত, তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রচার তহবিলে এই ভীষণ মারাত্মক রোগ হইতে নিজেকে রক্ষার উপায় সাধারণে প্রচার করিতে কত অর্থই না ব্যয় হয়, তথাপিও অজ্ঞতার অন্ধকার এখনও কাটিয়া যায় নাই। সংস্কার মানুষকে এইরূপ অন্ধই করে!

ইংরাজ শাসনের যত-কিছুই কলঙ্ক থাক, তাহারা যে আমাদের দেশের কিছু উপকারও করিয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বাংলা দেশে টিকা দেওয়া প্রথম প্রবর্তন হয়, তখন এই বিদেশী চিকিৎসা-ধারাকে কেহই মানিয়া লন নাই। উপরন্তু ইহা যে ৺শীতলা মাতার কোপানলে আহুতি দিবে, তাহাই ছিল সে সময়কার দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে সৃষ্ট হইয়াছিল এক দল হাতুড়ে হাম-বসন্ত-চিকিৎসক, যাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোনও জ্ঞান ছিল না, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে লাল শালুর পুঁটলির মধ্য হইতে বিরাট-নয়না সিন্দুর-নিমজ্জিতা ভীষণ আকৃতির ৺শীতলা-মুখ শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ-বধূদের মনে যুগপৎ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে ৺মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা চলিত। সেদিন যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া টিকা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছিলেন—শ্রীবৈদ্যনাথ তাঁহাদের কর্ণধার। কতরূপ সামাজিক বাধা, জনমতের শ্লেষ, ধর্মের অভিশাপ মাথায় লইয়া আজ হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে দ্বারে দ্বারে তাঁহাকে ঘুরিয়া এই প্রচার-কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহা আজ গল্পের কথা হইলেও সেই দিনের প্রচেষ্টা আজ কত সার্থক হইতে চলিল, তাহা দেখিবার ও কত শত শত নর-নারী এই মহামারী হইতে বাঁচিল, তাহাও উপলব্ধি করিবার। কাজ না করিয়া আমরা যখন বর্তমানে উপাধি ও সম্মানের মোহে অন্ধ, তখন এক শত বৎসর পূর্বে কোন এক অখ্যাত চিকিৎসক একান্ত দেশাত্মবোধে তাঁহার কর্মক্লান্ত জীবনের শেষেও সরকারী "রায়বাহাদুর" উপাধি হেলায় অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তখনকার দিনের বাঙ্গালীর একটি চরিত্র-চিত্রও পাওয়া যায়। শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্ম M. B. (Gold Medalist) Dy. Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, Govt. of Bengal জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্তমান ১১নং পল্লীর অক্রুর দত্ত লেনে। পুরাতন কলিকাতায় এই পল্লীটির একটি বিশেষ স্থান আছে। পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থে সংক্ষেপে তাহার রূপ দেওয়া হইল।

কলিকাতার সন্নিবেশ-স্থান ভাগীরথী-তীরে সমতল ধান্যক্ষেত্র, জলাভূমি এবং স্থানে স্থানে বন-জঙ্গল-পরিবেষ্টিত তৃণ-পত্রাচ্ছাদিত মৃন্ময় গৃহ-সমষ্টি মাত্র ছিল। স্বাধীনতার মুক্তি-সংগ্রামে দেশবরেণ্যদের পদধূলিধন্য "ওয়েলিংটন স্কোয়ার" এর অপর নাম 'গোলপুকুর' অর্থাৎ ঐ স্থানটি এক গোলাকৃতি পুকুরের নাম এখনও বহন করিতেছে। এই এলাকাটিতে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জির আবাসস্থল। শহীদ শ্রীসন্তোষকুমার মিত্রের জন্মস্থান এই অক্রুর দত্ত লেনে। ৺যোগেশচন্দ্র দত্ত, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়দের কণ্ঠে এই পল্লী মুখরিত। পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্লাইভ পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলের প্রজাগণের অনেক জমি ক্রয় করিয়া নেন। সেই জমির উপর বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এই কাজ শেষ হয় ১৭৭৩ সনে। ব্রহ্ম বংশের উত্তরাধিকারীদের নিকট যে উর্দুতে সহি করা (Pattah No 664) পাট্টা নং ৬৬৪ পাওয়া যায়, সেটি প্রমাণ করে যে, ৺বলরাম ব্রহ্ম ২৪শে ডিসেম্বর ১৭৬৭ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং'র নিকট হইতে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন। তাঁহার গৃহটির বৃহৎ দালান এবং দু'-একটি ছোট ছোট ইটের দ্বারা মাটির গাঁথুনির দেওয়াল সযত্নে রক্ষিত আছে, পুরাকালের অট্টালিকা নির্মাণ-দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে। আধুনিক কায়দায় যে সব বাড়ী আজ দেখা যায়, ভূমিকম্পে বা দৈব-দুর্বিপাকে সেগুলির ক্ষতি হইলেও, এই মাটির গাঁথনির দেওয়ালটির একটু ফাটলও আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

এই স্যাঁতসেঁতে জলাভূমির উপরে গৃহ নির্মাণ সূত্রে চতুর্দিক হইতে কোটি কোটি মণ মৃত্তিকা আনীত হয়, কিন্তু এই নগরীতে বাস করিয়া রোগের প্রকোপে প্রথম অগণিত দেশী ও য়ুরোপীয়দের প্রাণ গিয়াছে। অক্রুর দত্ত লেনের প্রকাণ্ড জায়গা লইয়া সেই খোলার ঘরগুলি আজও পুরানো দিনের সাক্ষ্য হিসাবে বর্তমান। কলিকাতার ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল ঐতিহাসিক মনোহারিতার স্মৃতি লোকের মন হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে এবং পুরাতন ভূমির ও স্থানের চিহ্ন সকল পরিবর্তনের স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে। বাবু বলরাম ব্রহ্মের পৌত্র শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্ম ১৮৪৭ সনে মেডিক্যাল কলেজ হইতে সসম্মানে এম-বি পাশ করেন। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে একটি বৃহদাকার স্বর্ণ-পদকে (সার্জ্জারীতে) সম্মানিত হন। পুরানো সার্টিফিকেটে assessor এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রফেসরদের ও সরকারী এক্সামিনারের সহি-করা তকমার ও স্বর্ণ পদকের সহিত এখনকার মেডিক্যাল ডিগ্রীর ও পদকের কতই না প্রভেদ! তিনি পাশ করিয়া চিটাগঞ্জ সরকারী ডিস্পেন্সারির ভারপ্রাপ্ত অফিসার হইয়া W. B. Beatson, officiating civil surgeon এর অধীনে ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। [vide Judicial memo no. 1536 D/ 19. 7. 1847 from the Secretary to the Govt. of Bengal] Deputy Governor of Bengal তাঁহাকে Dr. J. Baker, Medical charge of Civil Station of Noakolly-র অধীনে কাজ করার নির্দেশ দেন এবং ১৮৫৬ সনে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের sub-assistant surgeon-এর পদে বহাল করেন। তাঁহার ৩৭ বৎসর সরকারী কর্মকালে চিটাগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া এবং ১০ বৎসর বাঙ্গলার অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে সভ্যতার আলোক যখন প্রবেশ করে নাই, তখন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে টিকা দেওয়া প্রচলন করেন। অজ্ঞ পল্লীবাসীরা বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক

রোগ হইতে কি ভাবে বাঁচিতে ও জনসাধারণকে বাঁচাইতে পারে, তাহাদের অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক কু-সংস্কার দূর করার জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত রিপোর্ট হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

১৮৫১-৫২ সনে বাবু বৈদ্যনাথ ব্রহ্মের চিটাগঙ্গ ডিসপেন্সারী সম্বন্ধে রিপোর্ট :—

"...In spite of the deeprooted prejudice and credutity of the Natives on the one hand, and the extreme jealousy of the boidoes (who try their utmost to injure the usefulness of the Institution) on the other, the dispensary is daily acquiring popularity, not only in the city but all around the country, as people from the distance of two or three days journey usually come for relief..." vide *Half yearly Reports of the Govt. Charitable Dispensaries* available under 01088 in the National Library, Cal—27.

Calcutta Gazette D/ 17. 1. 1866 *and Vaccination Report for the Years* 1869-74 হইতে উদ্ধৃত :—

এমন সব গ্রামে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বৈদ্যনাথ ব্রহ্মকে যাইতে হয়, যেখানে না আছে গাড়ী, না আছে ঘোড়া। ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্যন্ত দৈনিক হাঁটিয়াই পরিদর্শন কার্য সারিতে হয়। পরিদর্শন ছাড়াও টিকা লওয়াইতে প্রবর্তিত করার ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতা অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগন্তুক অফিসারকে হঠাৎ দেখিয়া যখন ঘরে ঘরে দরজা যায় বন্ধ হইয়া, জবাব দিবার বা কোনও উপদেশ শুনিবার জন্য একটি ছোট শিশুকে পর্যন্ত মাতা যখন সচকিতে সরাইয়া লইতে ব্যস্ত, তখন সত্যই সুপারিন্টেনডেন্ট মহাশয়কে কি অসাধ্য সাধন করিতে হয়, কত দূর ব্যক্তিত্ব,—বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা জ্ঞান থাকিলে তাহা সম্ভব, একটি ঘটনায় তাহা উল্লেখযোগ্য : নদীয়া জেলার প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন টিকা লওয়াকে আসুরিক চিকিৎসা বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহা যে হিন্দুধর্মের একান্ত বিরোধী কর্ম ও ইহার প্রচারে ৺শীতলামাতাকে অপমানের ও কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত করা হইতেছে, এই মত যখন চতুর্দিকে প্রচার করিতেছেন, তখনই পটভূমিকায় অকস্মাৎ আবির্ভাব হইল শ্রীবৈদ্যনাথের। নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার দ্বারা কি ভাবে প্রভাবান্বিত হন, তখনকার বিবরণী হইতে আমরা এইরূপ পাই :—

"Considering the high estimation in which Nuddea is every where held in Lower Bengal as the chief seat of all theological learning, the position this year gained in inducing the Pundits to accept Vaccination is one which constitutes quite an era in the progress of Vaccination in India. In the classical repository of ancient learning, the Pundits who give their interpretation to all questions bearing directly or indirectly on Hinduism exercise a widely spread influence on the whole of the surrounding country.

In his report Babu Buddynath Brohmo states that on the 4th March, Brojonath Biddyaratna, first Pundit of Nuddea, led the way by having his children Vaccinated...Babu Buddynath Brohmo had been sub-assistant surgeon of Krishnaghar for some time and was consequently personally acquainted with some of the Pundits, while to others he was known by reputation."

মজার কথা এই যে, যখনই পণ্ডিতপ্রবর পুত্রকে টিকা দিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টান্তে নদীয়ার সমস্ত পণ্ডিত-সমাজে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, সকলেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন।

অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল 'জনাই'এর বিখ্যাত মুখার্জি-পরিবারে। "This year Deputy Superintendent Baboo Buddynath Brohmo got an educated gentleman, Baboo Wooma charan Mitter of Boxa, near Jonye and others, to use their influence with the Mookerjee Baboos, and Vaccinator Ramgopal Mitter besieged them with his constant importunities. The consequence was that after 3 months' persistent efforts the vaccinators succeeded in bringing them round. When this was known, all the surrounding villages quietly followed their example and accepted vaccination." (As per extract from a report on the Vaccination Proceedings, 1874)

Marquis of Dalhousi, Colvin, Cayley বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনকালে বাবু বৈদ্যনাথ ব্রহ্মের এই যে দেশসেবার প্রচেষ্টা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন. তদানীন্তন বাঙ্গলা সরকারের সাহায্যে দপ্তরে. তিনি ৩৭ বৎসর সরকারী কার্য করেন। তাঁহার কার্যের স্বীকৃতি ও নানা প্রশংসা কলিকাতা গেজেট-এর সাপ্লিমেন্ট ১৭ই জানুয়ারী ১৮৬৬, পৃষ্ঠা ৮, ৩৪, ৩৫, ২০ এবং ভ্যাকসিনেসন ডিপার্টমেন্ট-এর মেমো নং ১০৭ to H. M. Macpherson হইতে দেখা যায়। মেমো নং ৫৫ কলিকাতা ২০শে আগষ্ট ১৮৭৭ হইতে জানা যায় যে, সরকার তাঁহার কার্যের জন্য "রায়বাহাদুর" উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রীবৈদ্যনাথ ইংরাজের এই উপাধি সানন্দে প্রত্যাখ্যান করিয়া Governor-Generalকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

"Your memorialist, too, was deemed worthy of the title (Rai Bahadur) and would have been honoured with if had be cared for it···The title was however offered to your memorialist and by him declined with grateful thanks."

শ্রীশ্রীতারকেশ্বর তীর্থ কত কালের ?

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অনাদিলিঙ্গ ৺তারকেশ্বরের উৎপত্তি-কাল ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। তবে তীর্থবিশেষে কত কাল ধরিয়া দেবতার আবির্ভাব ঘটে, তাহা নির্ধারণ করা যাইতে পারে। দিগন্ত-বিশ্রুত-মহিমা শ্রীতারকনাথের বর্তমান তীর্থ কত কাল হইতে বাঙ্গলার যাত্রিগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, নানা গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে তাহার আলোচনা হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক আলোচনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবতা ও তাঁহার মাহাত্ম্যকে স্পর্শ করে না—ইহা লেখা বাহুল্য মাত্র। ৺তারকেশ্বরের বিস্তীর্ণ দেবোত্তর সম্পত্তির দলিল-পত্র হইতে তীর্থোৎপত্তির আনুমানিক কাল অনায়াসে নির্ণয় করা যাইত। দুঃখের বিষয়, মূল প্রমাণপত্র কিছুই বিদ্যমান নাই। কেবল শতাধিক বৎসর যাবৎ "রাজা ভারামল্ল রায়" প্রদত্ত একটি সনদ দেবোত্তর সম্পত্তির প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পাঠ সুবিদিত হইলেও পুনর্মুদ্রিত হইল :—

স্বস্তি সকলমঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরঠাকুরচরণযুগলেষু—

দেবদত্তজমিপত্রমিদং কার্যানঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দুই-গ্রাম জোতশম্ভু, ভক্তপুর জমি শাকিস্তনা হদ্দ মতদুদ দৌড়জাত জোত করিবে পার তাহা জোত করিবে—সেবাৎ শ্রীযুত মায়াগিরি ধূম্রপান মোহন্তীকে নিযুক্ত থাকিয়া ভুঞ্জিয়া যোতাবা শ্রীশ্রীসেবা করহ এ সকল জমির খাজনা সহিত দায় নাস্তি। ইতি সন ৭৮৫ সাল, ১০ই চৈত্র। (স্বাক্ষর নাগরী) শ্রীরাজা ভারামল্ল রায় ॥

হুগলীর জজকোর্টে বিখ্যাত তারকেশ্বর মামলায় এই সনদ দাখিল হইয়াছিল এবং জজসাহেব নিষ্পত্তি করেন যে, সনদের প্রকৃত তারিখ ১৭৮৫ বিক্রমাব্দ (অর্থাৎ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ)। অর্থাৎ তারিখের পাঠ ব্যতীত সনদের অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই নিষ্পত্তি সম্প্রতি এক জন সাহিত্যিককেও বিভ্রান্ত করিয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। বিদ্যালয়ের আসন হইতে ঐতিহাসিক গবেষণার এই ব্যঙ্গচিত্র অতীব শোচনীয়! সনদটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম—ইহাতে ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই এবং একই সনদে দেবতা ও মোহন্ত উভয়কে সম্বোধন করা হইয়াছে। "সন ৭৮৫ সাল" কোন প্রকারেই বিক্রমাব্দ কিম্বা শকাব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না—ইহা বঙ্গাব্দ উল্লেখের চিরপ্রচলিত পরিভাষা। ৭৮৫ সনে বঙ্গাব্দের উৎপত্তিই হয় নাই, কৃত্রিমকারী তাহা জানিতেন না। ৺সতীশগিরি তজ্জন্য ইহা শকাব্দ অনুমান করিয়া মায়া গিরির সম্বন্ধে "৺তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব" গ্রন্থে লেখাইয়াছিলেন (২য় সং, চৈত্র ১৩২৮, পৃঃ ১০০) :—

সম্বৎ ৮৫৫ বর্ষে দৈববশে।

বঙ্গভূমে আগমন ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥

সতীশ গিরির শকাব্দ-অনুমান ও জজ সাহেবের বিক্রমাব্দ অনুমান উভয়ই ভ্রমাত্মক। বরং "সন ১০৮৫ সাল" পাঠ করিলে মায়া গিরি প্রভৃতির অভ্যুদয়কালের সহিত মোটামুটি সামঞ্জস্য হইতে পারে—কিন্তু কৃত্রিমতার সমাধান হয় না।

তারকেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ ১২০৯ সালে মোহন্ত মোহন গিরি বর্দ্ধমান কালেক্টরীতে দাখিল করেন, এই বিবরণ বা তায়দাদ অধুনা হুগলী কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। (১৯৩১ নং)। ইহা জজ সাহেবের গোচরে আসিলে সনদের তারিখ বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হইতে পারিত না। তায়দাদে তিনটি দানপত্রের উল্লেখ আছে—(১) ভারামল্ল রাজা কর্তৃক ৺(মা)য়াগির ধূম্রপানকে প্রদত্ত, (২) "কৃত্তিচন্দ্র" কর্তৃক বলভদ্রগীরকে প্রদত্ত এবং (৩) চিত্রসেন কর্তৃক "শীবচন্দ্র"গীরকে প্রদত্ত। কিন্তু মোহন্ত কোন দানপত্রেরই নকল দাখিল করিতে পারেন নাই—কারণ পূর্ব্বতন মোহন্ত ফতেগিরি মসাট-নিবাসী পঞ্চানন সরকারের নিকট সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ বিক্রমাব্দ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকালের (খৃঃ ১৭০৩-৩৮) শেষভাগে পড়ে—তৎকালে ভারামল্ল ও মায়াগিরি নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন না। ১২০৯ সালে দেবোত্তর সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলে দীর্ঘজীবী মোহন্ত মোহন গিরি একটি মূল্যবান জওয়াব দাখিল করেন। তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল :—"দেবাদিদেব ৺তারকেশ্বর শীবঠাকুরজী অনাদিলিঙ্গ ৺মায়াগীরি ধূম্রপাণ উদাসীনকে ক্রিপা করাতে…এই স্থান জঙ্গল ও ব্যাঘ্রভাল্লুকাদি…তৎকালে ঐ সকল স্থানের রাজা ৺ভারামল্ল্য রায়…সন ৭৮৫ সালে এক সনন্দ দেন ও তৎপরে রাজা জগৎ রায় মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তিলকচাঁদ প্রভৃতি…।" মোহন্তের তালিকা এই—মায়াগিরি, বলভদ্র, শিবানন্দ, অরুণাচল, প্রসাদ ও "আমার গুরু ৺পরশুরাম গীরি"। পরশুরামের গুরুভাই ফতেগিরি দ্বন্দ্ব করিয়া সমস্ত দলীলপত্র আয়ত্ত করেন। ১২১৩ সালের ৩২ আষাঢ় ডাকাইতি হইয়া তাহা সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়—"কেবল রায় ভারামল্লার ৭৮৫ সালের আড়দৌড় মহস্তে বন্দী এক কেত্তা সনন্দ" রক্ষা পায়!! ডাকাইতীর পর ১২১৩ সনেই সনন্দটি জাল করা হইয়াছিল অনুমান করা যায়। বৃদ্ধ মোহন্তের উক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে, তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা জগৎ রায়ের রাজত্বকালের (বঙ্গাব্দ ১০৯১-১১০৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা।

পরশুরাম গিরির সহিত ফতে গিরির ১১৯৮ সালে বর্দ্ধমানে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে মোহন্তের তালিকা পাওয়া যায় এইরূপ :—সমুদ্রনাথ গিরি—যমুনা গিরি—লছমন গিরি—অরুণাচল—প্রসাদ—পরশুরাম। সুতরাং মোহন্তদের মুদ্রিত তালিকা বিশুদ্ধ নহে। ভারামল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বিষ্ণুদাসই প্রথম বালিগড়ি পরগণার জমীদার ছিলেন—তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তদনুসারে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রাজা বিষ্ণুদাসের অভ্যুদয়কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পড়ে। ইহার সমর্থনকারী উৎকৃষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১) "সাবেক জমিদার রাজা বিষ্ণুদাস" বালিগড়ী পরগণায় চাঁদপুর গ্রামে "ঘটম রায়"কে ৭১০ বিঘা খানাবাটী দান করিয়াছিলেন—১২০৯ সালে দখলকার বিনোদ সিং প্রভৃতি তাঁহার "৭।৮ পুরুষ" অধস্তন ছিলেন (হুগলী কালেক্টরীর ৬৪৮৫নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। এতদনুসারে রাজা বিষ্ণুদাসের রাজত্বকাল ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরে যাইবে না। (২) বালিগড়ীর "বিষ্টদাস" ঐ পরগণার অন্তর্গত খলিসানি গ্রামে

কর্পূর সিংহরায়কে ৩৬৩ কাঠা পরিমাণ "বাস্তু" ও বাগান ও গং" খানাবাটী করিয়া দিয়াছিলেন—১২০১ সালে দখলকার গৌরাঙ্গ ও "বদ্দীনাথ" দানগ্রহীতার অধস্তন "আট-দশ পুরুষ" (ঐ, ২৬৫১১ নং তায়দাদ)। পুরুষ গণনা এস্থলে আনুমানিক হইলেও বিষ্ণুদাসকে কিছুতেই ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরে টানিয়া আনা যায় না। বিষ্ণুদাসের আরও দানপত্রের উল্লেখ আছে (ঐ, ২৮৫১০ নং তায়দাদ)। বাহুল্য বোধে বিবরণ দেওয়া গেল না। এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, ৺তারকেশ্বরের প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি রাজা বিষ্ণুদাস প্রদত্ত নহে, তাঁহার ভ্রাতা ভারামল্ল প্রদত্ত। "ভারামল্ল রায়" প্রদত্ত অপর একটি দানপত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১১২৮২ নং তায়দাদ)—দানগ্রহীতা রাম গিরি নামক এক সন্ন্যাসী বটে। সুতরাং অনুমান হয়, রাজা বিষ্ণুদাসের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসিভক্ত ভারামল্ল কিছু কাল জমীদার ছিলেন এবং সেই সময়েই ৺তারকেশ্বর মায়া গিরিকে কৃপা করিয়াছিলেন।

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ দাস রচিত "শিবায়ন" গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। এই কবি প্রসিদ্ধ শিবায়ন-রচয়িতা রামেশ্বরের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ববর্তী এবং খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম পাদে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির বংশধরদের নিকট অনেক দলীলপত্র অদ্যাপি রক্ষিত আছে। আমরা একটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি। ভুরশীটের রাজা নরনারায়ণ রায় কবির প্রপৌত্র বাসুদেব রায়কে মহত্রাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন (হাওড়া কালেক্টরীর ৪৩০৫৮ নং তায়দাদ)। উক্ত বাসুদেব ১১৫১ সালে জীবিত ছিলেন না। অপর দিকে রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ঠিক ১০৯১—১১১৮ সাল। সুতরাং বাসুদেবের প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণের প্রথম অভ্যুদয়-কাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের পরে যাইবে না। কাব্যরচনা কালে কবির প্রথম যৌবন—কারণ, তাঁহার দুই পক্ষে সাত পুত্রের মধ্যে প্রথম দুই পুত্রের (জগন্নাথ ও বলরামের) মাত্র নামোল্লেখ কাব্যটির শেষ ভাগে দৃষ্ট হয়। এই শিবায়ন-কাব্যে তারকেশ্বরের নাম আছে। ব্রহ্মকপাল হস্তে কালভৈরব সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাওয়া যায় :—

> "দেখি শশিভূষণ চাপলেশ্বর বন্দে।
> তমোলিপ্তে চক্রেশ্বর বন্দিল আনন্দে॥
> ভদ্রেশ্বর জলেশ্বর বন্দি সিদ্ধীশ্বরে।
> বন্দিল তারকেশ্বর পর্ব্বতগহ্বরে॥"

(পরিষদের ২৮২৮ সং পুঁথির ৩০১১ পত্র) (মুদ্রিত সং, পৃঃ ৪১)

বলা বাহুল্য, এই তারকেশ্বর কাশীধামের অন্যতম শিব নহেন। তখনও কালভৈরব কাশী যান নাই। সিদ্ধীশ্বর সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ "সিদ্ধনাথ" শিব :—

> গুমগড় অন্তর্গত রেএাপোতা ধাম
> সিদ্ধনাথ স্বয়ম্ভুর সত্য অধিষ্ঠান।

(তারকেশ্বরশিবতত্ত্ব, পৃঃ ৮৮)

কবির বাসস্থান আমতার নিকটবর্ত্তী রসপুর গ্রাম। তাঁহার পক্ষে তারকেশ্বরের প্রথম আবিষ্কারবার্ত্তা সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কবির বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তখনও তারকেশ্বর "পর্ব্বত-গহ্বরে" জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্য স্থানে অবস্থিত ছিল। পরে ভারামল্ল—মায়া গিরির সময়ে ঐ পর্ব্বত-গহ্বরই লোকপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থে পরিণত হয়। সুতরাং মায়া গিরির পূর্ব্বেও তারকেশ্বরের অস্তিত্ব শিষ্টসমাজে অজ্ঞাত ছিল না। এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের ফলে তারকেশ্বর ঘটিত প্রচলিত প্রবাদের অনেকাংশ অমূলক প্রতিপন্ন হয়। কালভৈরবের গম্যস্থানরূপে কল্পনা করিয়া কবি সূচনা করিতেছেন, তাঁহার রচনাকালের অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই অনাদিলিঙ্গ সাধক-সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত ছিল।

ভারী ভারী কানের দুল কি ইয়ারিং পরা ভাল নয়

দেখতে যে ভাল না লাগে, সে কথা বলব না। সত্যিই ভারী ভারী গয়না পরলে অনেক অনেক মেয়েকে চমৎকার মানায়। সোনার দাম কিঞ্চিৎ কমে গিয়ে আবার পুরানো আমলের সব ফ্যাসান ফিরে আসছে। কিন্তু কানের গয়নার বেলায় আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নচেৎ কঙ্কণ, চুড়, বালা থেকে মাথার মুকুট অবধি যদি আপনার সাধ্যে কুলায় তো নিশ্চিন্ত মনে পরুন। ব্রিটিশ জার্ণাল অব প্লাষ্টিক সাজ্জারী সম্প্রতি এমন কয়েকটা খবর দিয়েছেন, যাতে এ নিয়ে চারি দিকে গবেষণার কাজ অবধি চলছে। কানে ভারী দুল কি মাকড়ি পরলে কানের অভ্যন্তরে গহনে অতি ধীরে রক্তপাত হয়। ফলে কানের ছোট ছোট শিরা নষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কালা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয় এ থেকে। তাই বলছি, ভারী ভারী গয়না অন্তত কানে পরবেন না।

শশিশেখর বসু

পশ্চিমে এক বিখ্যাত রাজার প্রাসাদে সুসজ্জিত কামরায় এক জনের পত্রবাহকরূপে অপেক্ষা করছি একলা। এমন সময় শঙ্খধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। রাজহর্ম্যে একলা থাকলে বালককে মাঝে মাঝে চমকাতে হয়। রাজার বাৎসরিক আয় এক ক্রোর, আর আমার পকেটে পয়সা মাত্র আট আনা, স্কুলের ছুটি হলে লুকিয়ে গোলডন্ বার্ডসআই সিগারেট খাব।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি! একটি লম্বা সুন্দর সুপুরুষ নাগা সাধু ঘরে ঢুকে শাঁখ বাজাতে বাজাতে হলদে সিল্ক-মণ্ডিত সোফায় বসলেন। সেটাতেই মহারাজ বাহাদুরের বসবার কথা। সাধুর হাতে বৈরাগ্যের ভয়াবহ অস্ত্র ত্রিশূল। বন্দুকধারী গার্ড নাগা বাবাকে রোখে, এমন সাধ্য নেই।

হিজ হাইনেস ঢোকবার আগে তাঁর স্পেশাল খাওবাস "সরকার বাহাদুর" থেকে থিয়েটারের মতন "বেগে প্রস্থান" করলো। আমি তো সাধুটাকে গ্রাহ্যও করি নাই। হিজ হাইনেস ঢুকে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। শাঁখের হুংহুংকার শাসনে আবার উঠে দাঁড়ালেন! মহারাজ পণ্ডিত ব্যক্তি, গীত-বাদ্যে পারদর্শী, সংস্কৃত, ইংরাজী, পারস্য ভাষায় বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, কাউন্সিলের মেম্বার। বক্তৃতায় পটু, ভারতের প্রধান ধর্মসভার প্রেসিডেণ্ট, অপিয়ম কমিশনের মেম্বার, সাহেব-মেমের সঙ্গে টেনিস, বিলিয়ার্ডস খেলেন, শিকার-করা পাখি খান। বিবিধ টাইটেলে ভূষিত। লর্ড ডফরিন্ তাঁর অতিথি হয়েছিলেন, নেপালে বড়লাটের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন। বিলাতের টাইমস, ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ তাঁর প্রশংসা ছাপে, ফটো বের করে। বলতে চান কি তাঁর কুসংস্কার আছে? তাঁর হাতে যা চিঠি দেবার ছিল দিয়ে, পালিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যোগীর সঙ্গে কিছু পরামর্শ হয়েছিল নিশ্চয়।

রাত্রি একটার সময় খটাখট্ খটাখট্ ঘোড়সওয়ার এসে সকলকে বলে গেল "সরকার বাহাদুর গায়েব।"

গোটা পঁচিশ লণ্ঠন নিয়ে সরকার বাহাদুরকে পাওয়া গেল এক প্রকাণ্ড গাছতলায়। সেখানে দু'টো সাধু বসে আগুন পোয়াচ্ছে, কিন্তু তিনটা ধুনি জ্বলছে। মহারাজকে ধরে-বেঁধে প্যালেসে আনা হল। এক জন উচ্চপদস্থ অফিসার ঐ দুই সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ সাধু বাবা! ই তিসরা ধুনি কিসকা হৈ?" সাধুরা মুচকে হেসে প্যালেসের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কথায় ও ইসারায় বোঝাল, "মহারাজা বাহাদুরের! এঁকে আমরা চল্লিশ বছর ছাড়ার পর ডেকেচি। ওঁর রাজা হবার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। সখ মিটেছে। এই চল্লিশ বছর ওঁর ধুনি আমরা জ্বালিয়ে রেখেছি।"

মহারাজও বলেছিলেন সকলকে "হামরা বোলাইট হুয়া।" পশ্চিমা লোকদের মুখ গম্ভীর হলো। বাঙ্গালীরা হাসি চেপে ফেলল না, কারণ বাঙ্গালীরা টিটকারি ব্যঙ্গে পশ্চিমাদের কাছে প্রকাশ করে "আমরা খুব চালাক।"

চালাকি যথাস্থান দিয়ে বেরিয়ে গেল এক দিন পরেই। চল্লিশ ঘর বাঙ্গালী কেঁদে গড়াগড়ি, "খাব কি! বাঁচবো কি করে, চাকরি গেল?" কলকাতার বড় বড় ব্যবহারাজীব টেলিগ্রাম পাঠালেন ম্যানেজারকে, "আমাদের বিটেনার, মাহিনা বজায় থাকবে তো?" "ব্যাংক অফ অমুক" টেলিগ্রাম করলো, "পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি ইনভ্যালিড। পেমেণ্ট ষ্টপট্।" এক সাধুই এই ঘোর কোলাহল বাধাল! এবার গোড়ার কথা বলি খোলসা করে।

ঘটনার দিন সকালে একটি আবার বাঙ্গালী সাধু এলেন,—ইনি অসংবৃত নহেন। কি চাই? আমাদের কানে কানে যা বললেন শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। তবু "চালাক" সেজে জিজ্ঞাসা করলাম, "কবে?" আমার উপহাস কি রকম বেসুরো হ'ল। সাধু উত্তর দিল "কবে?—মলেন বলে!"

রাত্রি দুপুরে আবার খটাখট নিশানযুক্ত বর্শাধারী সওয়ার দলে দলে এসে চিৎকার করছে "সরকার বাহাদুর কে ইন্তকাল হুয়া"। ডাঃ বসুল, ডাঃ কোটস প্রায়ই থাকতো, কিন্তু সে দিন কেউ ছিল না। দলে দলে সাহেবরা থানেসে এল, একটা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কমিশনার অফ ডিভিসন, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, প্ল্যানটার দল, অন্য রাজাদের প্রতিনিধিতে সহরটা ভরে গেল। কলকাতার কাগজে ব্ল্যাক্ বর্ডারের বাহার কি! সাধু আমাকে বলেছিল, এ সংবাদও ছাপা হয়েছিল অকারণে। পুণা, বম্বে, মাদ্রাজ, টানজোর, লাহোর, বেনারস থেকে চিঠি পেলাম সে বাঙ্গালী সাধুর নাম-ধাম পাঠাবে, আমাদের সাধুর দৈর্ঘ্য জেনে নেব। সে সাধু ও অন্যান্য সব সাধু হঠাৎ উবে গেল। কোন চিঠির উত্তর দি নেই।

আমার তখন গোঁফ ওঠে নাই,—সাধুতে বিশ্বাস নেই, এখন আছে কি না (আশী বছরে গোঁফ সুপক্ক হলে) এই গল্প থেকে বুঝবেন। রাজার মৃত্যুর পূর্বেকার অনেক চমকপ্রদ ঘটনা বলি—পাশের একটা প্রকাণ্ড 'বাংলোতে' গাদা-খানিক নাগা বাবাজী। শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে তারা ভোজ খায়, আমরা দাঁড়িয়ে ছেলের দল দেখি। তারাই রাঁধে, বাসন মাজে; গোটা কতক সুন্দরী সেবাদাসী ছিল, তারা কেবল ক্লাস ওয়ান্ সাধুদের রাত্রে পা টিপতো। [অবান্তর একটা গল্প এখানে চট করে বলে নি। একটি গুণ্ডা গোছের বাঙ্গালীর এক সহরে এফিশেনসি বারে পড়ে মাইনে বাড়ছে না। একটি ন্যাংগা বাবা মন্দিরে বাস করতে এলেন। রটে গেল স্ত্রী বাবার পায়ে তেল মালিশ করলে স্বামীর মাইনে বাড়বে। বৌটি নাছোড়-বান্দা। স্বামী হাতে একটা কৌতকা নিয়ে সস্ত্রীক তেলমাখাতে সাধুর কাছে গেলেন। খোট্টা নাগা, বাঙ্গালী 'বাবা'কে দেখে, বলল, "আজ আমার পা কামড়ায় নেই"। সাধু আরও উবাচ—"চরণ-কমলন্যাসযোগ: তৈলং দূরস্থিতং" অথচ তেল তখন টাকায় সাড়ে চার সের।]

বাঙ্গালী বৌ-ঝিরা এই দেবদাসীওয়ালা সাধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। বাঙ্গালী ম্যানেজার উঠে যেতে বললে, কারণ সাধুরা রাজার চাকর নয়, রাজার কোন বাড়িতে থাকবার অধিকার নেই। তারা গিয়ে সোজা মহারাজ বাহাদুরকে বললে। ইংরেজ প্যালেস সুপারইন্‌টেনডেন্টকে মহারাজা হুকুম দিলেন, "আলটু পার্ল প্যালেস"!" সাধুরা শাঁক বাজিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ জানাল।

সাধুরা "পার্ল প্যালেসে" খেত পায়েস, লুচি, দুধ, মেওয়া, কলা, নারকোল, মাখানা, চিঁড়ে, দৈ, ঘি! ভাণ্ডার ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদ্যসম্ভার আসতো।

খাবার সময় ঢাক-ঢোল ঘণ্টা বাজতো, ধূনা পুড়তো, গান হতো,—বৈরাগ্যের মহাবাণী!

"জগ মগ জ্যোতি
অবধপুর বাজা,
শংখ, সারং ঘণ্টা
পাখাউজ বাজা!"

বসন লোচনে যদি এমন ঐশ্বর্য তবে কেন ময়লা নোট হাতে নিয়ে ন-হাতী দশ-হাতী, চোয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ করে মরে মরি?

সাহেব ইনজিনিয়ারের তৈরি সে কি সুন্দর নয় লক্ষ টাকার প্রাসাদ! "নবমদে ঢং! নরমদে ঢং!" ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সাধুরা "পার্ল প্যালেসে" উঠে গেল, যাবার সময় আমাদের ঘণ্টা বাজিয়ে গান গেয়ে অভিসম্পাত দিয়ে গেল; তাদের "দৈবশক্তি" আমার চিরকাল মনে থাকবে:—

"গঙ্গোত্রী ছোড়ে বাদরি
যমুনোত্রী ছোড়ে রং
রাজা বেচারী ক্যেয়া করে
সাধু বাজওয়ে শঙ্খ!"

তারপর দিন কমলা বাগমতী দুই নদীর বন্যার জলে বাঙ্গালীর বাড়িগুলো ভাসিয়ে দিল। দুই দিন এক রাত্রি তক্তার উপর জলে সদলবলে ভেসেছিলাম। তার পর সেই রাজার সেপাইরাই উদ্ধার করল।

সেই সেপাইরা আবার সব সাধুভক্ত। আমাদের "পাপ হয়েছে" বলল। এক জন বাঙ্গালা দেশে ছিল, বলল, "অঙ্গ্ থৈলি কে পানি পিজিয়ে"; সে বাঙ্গলা দেশে সাধুর কপনি-ধোয়া জল খাওয়া প্রথা জানে। 'থৈলি' মানে কপনি।

কুম্ভ-দুর্ঘটনার পর কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, "বাঙ্গালী খুব কম মরেছে", অতি অল্পই বাঙ্গালী নারী-পুরুষ ত্রিশূল আঘাতে কলকাতায় এসেছেন। রেলে ভিড়ে চোট লাগা তার চেয়ে বেশী। পশ্চিমারাই বেশী মরেছেন, নারী-পুরুষ। বোধ হয় তাই-ই হবে; কারণ বাঙ্গালী শীত-কাতুরে, সাধু-চরণে অনেক চিত্ত নিবিষ্ট নয়। কিন্তু আবার বিবেকানন্দ রোডে বারান্দায় বসে দোতলা থেকে যে দৃশ্য দেখি, তাতে মনে হয় সাধু-চরণ স্পর্শের স্বর্গীয় সুখ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বেশ জাগরিত হচ্ছে, কুম্ভ ও হিন্দুস্থানীর সংসর্গে এসে।

ভোঁ করে বিবেকানন্দ রোডে শাঁখ বাজল। গৃহশূন্য কোন পশ্চিমা আলুওয়ালী বোধ হ'ল যেন ফুটপাথে আবার প্রসব করেছেন এক সন্তান। কিন্তু তা নয়, হঠাৎ কানে এল ঢং ঘণ্টার আওয়াজ। "বামন সাধু যাচ্ছে"! চিৎকার উঠল। খাড়াই তার আড়াই ফুট বা তিন ফুট। জটাজুটধারী, ছাই মাখা, "অংগ্ থৈলি" পরা, গায়ে ছোট পকেটবালা কোট। হাতে লাঠি। আগে আগে এক লম্বা সাধু শাঁক বাজাচ্ছেন, পেছু পেছু আর এক সাধু ঘণ্টা পিটছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ছুটে খোট্টা বামন সাধুর পায়ের ধুলো নিলে। টাকাটা-সিকেটা পকেটে গুঁজে দিচ্ছে। আফিস বেশে বাঙ্গালী বাবুরা বসস্ট্যাণ্ড ছেড়ে ছুটে পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। এই সাধুর দৈনিক আয় ৮০ টাকা, আই, টি, ফ্রি! শীতলামায়ীর মন্দিরে একথা শুনলাম। সামনে পেছুতে দুই ষণ্ডামর্ক সাধু পাহারা দিচ্ছে, পাছে বেঁটে বাবাজীর পকেট মারে কেউ। বিবেকানন্দ রোডে তা ছাড়া (এখান দিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ গিয়েছিলেন বলে) হরদম কনেষ্টবল ঘুরছে। তারাও সাধুভক্ত। টিকিট কলেকটরও কেউ ষ্টেসনে সাধুদের টিকিট চায় না। অফিস টাইম, যাকে সাহেবরা "রস আওয়ার্স" বলে, হচ্ছে রোজকারের সময়। জানালা খুলে বাঙ্গালী মা লক্ষ্মীরা দেখে নমস্কার করছেন, "রেমো! যা যা, সিকিটা বাবাকে দিয়ে আয়।" রাজকৃষ্ণ রায়ের "বামন-ভিক্ষা" পড়ে মনে ভাবছেন চার আনায় সাক্ষাৎ অবতার দেখছি।

আর একটি ঠিক ঐ রকম বামন টিফিন ক্যারিয়ার হাতে রোজ যায়, তার পায়ের ধুলো কেউ নেয় না বা টাকা দেয় না। কত পঙ্গু ফুটপাথে পড়ে আছে; ছাই মাখে না জটা পরে না বলে কেউ ফিরে চায় না। জটা ও ছাইয়ে শিব সাজলেই আমরা মানুষকে ভয় খাই। মনে করি সত্যই শিব!

কুম্ভে দৈবশক্তিশালী নাগা আসছেন শুনে শুনে চৈতন্যহীনা নারীর নাগানুরাগ জন্মায়, এবং শিবানুরাগে পরিণত হয়। ভক্তিতে ভুলে যান যে, রক্ত-মাংসের শরীর সাধু গাঁজায় বিকৃত মস্তিষ্ক। হেন পাপানুষ্ঠান নেই যা গাঁজা-মদে হয় না,—প্রাণনাশ, সতীত্ব নাশ। মূঢ়া নাগা-পদরজ আকাঙ্ক্ষায় পদদলিত হয়ে বা ত্রিশূলাঘাতে আত্মজীবন দানে প্রস্তুত।

কলকাতায় এক বিখ্যাত ব্যক্তির অসুখে তিন বছর পূর্বে একটি পাহাড়ী বাবা ডাকা হয়েছিল। কথাটি কাগজে বেরিয়েছিল। বিশ্বাসে মনস্তুষ্টি হয়, মন ঠাণ্ডা হলে ব্যাধির কিছু উপশম সম্ভব। আমাদেরও বাড়িতে পশ্চিমে দেওয়ানা তাকিয়া পীরের প্রসাদ আনা হয়েছিল। রোগযন্ত্রণায় সব কুসংস্কার পালন হয়। তা বলে সুস্থ শরীরে স্থির চিত্তে পদরজ নিতে গিয়ে বৈরাগ্যে প্রাণটা দেব? ভাওল সন্ন্যাসীর ধুনির কাছে ঢাকায় কত বাঙ্গালী রোগমুক্ত হবার জন্য হাত পেতে ছাই নিত। তাঁকে হাতী করে বন্ধ্যা নারীর চিকিৎসার জন্যও একবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আমাদের বাড়ি পশ্চিমের এক বিখ্যাত সহরে, অনেক বাঙ্গালী গেরুয়াধারীকে স্থান দেওয়া হত! আলাদা প্রায়-সংলগ্ন "বাংলো" তাদের জন্য ছিল। পশ্চিমে যাঁরা কোন দানশীল রাজাধিরাজের সংস্রবে থেকেছেন তাঁদের সহস্র সাধু সম্পর্কে আসতেই হবে। ভক্তিও করতে হয় বৈ কি! রাজ-আশ্রয়ে বাস করে সেই বাঙ্গালীদের এই অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। একটি খোট্টা সাধুকেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নাম "মিরচা বাবা"। তিনি দু'বেলা দু' থালা গাছ থেকে পাড়া কাঁচা লংকা খেতেন। আর কিছু নয়। আমরা দেখে আশ্চর্য্য হতাম।
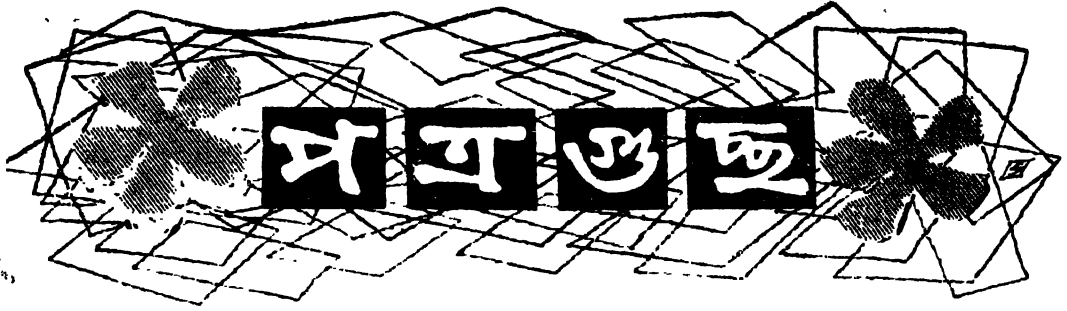
মার্কাস অরেলিয়াসের চিঠি

[মার্কাস অরেলিয়াস রোমসম্রাট বলে যত প্রসিদ্ধ নন, তত প্রসিদ্ধ তাঁর দার্শনিক চিন্তা বা Meditation-এর জন্য। লুসিয়াস ভেরাস ও মার্কাস অরেলিয়াস দুই ভাই। রোম সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধান করেন মার্কাস ইটালীতে বসে, আর লুসিয়াস প্রাচ্যখণ্ডে পার্থিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেন। অবশ্য সে যুদ্ধ-জয়ের কৃতিত্ব লুসিয়াসের নয়, কৃতিত্ব সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ এভিডিয়াস কেসিয়াসের। রোমে বীরের সম্বর্ধনা যখন লুসিয়াস পেল, তখন কেসিয়াস দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তাই না শুনে লুসিয়াস মার্কাসকে সতর্কপত্র দিলেন। উত্তরে মার্কাস যা লিখলেন, তা অমর!]

লুসিয়াসের চিঠি

১৬৬ খৃষ্টাব্দ

এভিডিয়াস কেসিয়াস সম্রাট হতে চায়, আমার অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে। আমার ঠাকুরদা'র আমলে, তোমার পিতারও আমলে তার মতলব ঐরকমই দেখা গেছল। তার উপর নজর রাখো, এই ইচ্ছে। আমরা যা করি, কিছুতেই সে খুশী নয়। অনেক অস্ত্র-সম্পদ সংগ্রহ করছে। আমাদের চিঠি পেলে হাসে। তোমায় বলে দার্শনিক-বুড়ি। আমায় বলে উচ্ছৃঙ্খল মূর্খ। কি করা যায় ভেবে দেখ। লোকটাকে দেখতে পারি না। সৈন্যরা যাকে দেখতে চায় আর যার কথা শুনতে চায়, তাকে যদি তুমি সৈন্য-শিবিরে রেখে দাও, খুব সাবধান, নতুবা তোমার স্বার্থ ও সন্তানদের স্বার্থ নষ্ট করে ফেলবে।

মার্কাসের উত্তর

১৬৬ খৃষ্টাব্দ

তোমার চিঠি পড়লাম। সম্রাটের চিঠির মত চিঠি নয়, এক জন বিচলিত-বুদ্ধি মানুষের চিঠি। কালের প্রথার সঙ্গে এ খাপ খায় না। ভগবান যদি ঠিকই করে থাকেন যে, কেসিয়াস সম্রাট হবে, ইচ্ছে করলেও তাকে হত্যা আমরা করতে পারব না। বোধ হয় মনে আছে তোমার ঠাকুদ্দার কথা—"কেউ তার উত্তরাধিকারীকে হত্যা করতে পারে না?" আর যদি ভগবান তাকে সম্রাট করতে না চান, আমাদের কঠোর পন্থা ছাড়াও সে অদৃষ্টের ফাঁদে পড়ে যাবে। আর, তাকে আমরা বিশ্বাসঘাতকও বলতে পারছি না। কেউ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি। সৈন্যরা তাকে যে ভালবাসে, এ ত তুমি নিজেই বলছ। আর এক কথা, মহাদ্রোহের বিচারের প্রকৃতিই এই যে, অপরাধ প্রমাণিত হলেও জনসাধারণ মনে করে অপরাধী প্রভুত্বের বলি মাত্র। কাজেই ও নিজের পথেই চলুক না। লোকটা ভাল সেনাপতি, কড়া, সাহসী। সত্যি কথা বলতে কি, সরকার তাকে ছাড়তে পারে না। তোমার ইঙ্গিত, তাকে হত্যা করে আমার সন্তানদের কল্যাণ নিরাপদ করি। না, না, তা হতে পারে না। আমার সন্তানদের চাইতেও যদি এভিডিয়াস বেশী ভালবাসার পাত্র হয়, যদি সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমার সন্তানদের চাইতেও কেসিয়াসের বেঁচে থাকা বেশী প্রয়োজন, তবে আমার সন্তানরাই না হয় মরল!

জোয়ান অব আর্কের চিঠি

[জোয়ান অব আর্ক বিখ্যাত ফরাসী কৃষাণ-তরুণী। ভলটেয়ার বলতেন সিংহিনী নারী। শিলার বলতেন রুদ্রাণী। আনাতোল ফ্রাঁস বলতেন, মধ্য যুগের ধর্মযাজকদের যন্ত্র। মার্কটোয়েন বলতেন, শুদ্ধা রূপসী যুবতী। বার্ণার্ড শ বলতেন, প্রথমা আধুনিকা নারী। ইংরেজরা তখন ফ্রান্সকে পরাজিত করেছে। দেশ বিপন্ন। নারী চার্লসের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আমি ইংরেজদের তাড়াব। রাজা রাজী হলেন। নাইটরা তাঁর সঙ্গী হলেন। ইংরেজ ওর্লিন্স অবরোধ করেছে। অবরোধ ভাঙ্গল, ইংরেজ হটল। জনরব প্রচারিত হ'ল গাঁয়ে গাঁয়ে, অদ্ভুত নারী, সঙ্গী তার এক দল বীর, যাদের পরনে সাদা পোষাক, যারা কাল ঘোড়ার সওয়ার, যাদের অস্ত্র কুঠার যার প্রার্থনা করে বিজয়। ইংরেজের দখল-করা গ্রামের পর গ্রাম আর লড়াই করল না। ওর্লিন্স অবরোধ-মুক্ত করবার আগে—তিনি ইংরেজদের এই পত্র লিখেছিলেন—]

"যিশু মেরী"

১৪২৯ খৃঃ

তুমি ইংল্যাণ্ডের রাজা, আর তুমি বেডফোর্ডের ডিউক। তোমরা বল তোমরাই ফ্রান্স-রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি। তুমি উইলিয়ম দা লা পোল, সাফোকের ডিউক, জন ট্যালবট, আর তুমি টমাস লর্ড স্কেলস, যারা ঐ বেডফোর্ডের সহকারী লেফটেন্যান্ট বলে নিজেদের বলে থাক—

স্বর্গাধিপের কাছে মাথা নীচু কর। ফ্রান্সের যে সব ভাল ভাল সহর তোমরা দখল করেছ, তাদের মর্য্যাদাহানি করেছ, সে-সব নগরীর চাবী ভগবান যে কুমারী নারী কাছে পাঠিয়েছেন, তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। ভগবানের আদেশে সে এসেছে রাজ-পরিবারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। আত্মসমর্পণ যদি কর, যদি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাও, আর যা হরণ করেছ তার মূল্য যদি দাও তবে সন্ধি করতে সে প্রস্তুত। আর তোমরা তীরন্দাজ, ভদ্রলোক ও সর্বস্তরের সৈনিক,

তোমরাও ভগবানের নাম করে স্বদেশে ফিরে যাও। যদি না যাও, শীগ্‌গিরই কুমারীর দেখা পাবে, সে তোমাদের মহাক্ষতি সাধন করবে।

ইংলণ্ডের রাজা, আমি যা চাই তা পালন করতে তুমি যদি অসম্মত হও, তাহ'লে, সামরিক প্রধান আমি, যেখানে তোমাদের লোক দেখতে পাব, তাদের ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—তাদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য করব। তারা যদি আমার কথা শুনতে অসম্মত হয়, তাদের আমি হত্যা করব। স্বর্গাধিপ আমায় এখানে পাঠিয়েছেন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের ফ্রান্স রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে। এ সন্দেহ তোমরা করো না যে, মেরীর তনয়, স্বর্গাধিপ ভগবান ফ্রান্স রাজ্য তোমাদের দিবেন না। ফ্রান্স প্রকৃত উত্তরাধিকারী চার্লসেরই থাকবে। ভগবানের এই ইচ্ছা কুমারীর মারফত চার্লসের কাছে এ কথাই প্রকাশিত হয়েছে। মহৎ অনুচর দল নিয়ে চার্লস প্যারিতে প্রবেশ করবেন।

ভগবান ও কুমারীর এই বার্ত্তা যদি তোমরা বিশ্বাস না কর—যেখানে পাব আমরা তোমাদের নিপাত করব। যদি তোমরা বশ্যতা স্বীকার না কর তবে তোমাদের এমন নিপাত হবে "hahay" ফ্রান্স হাজার বছর প্রত্যক্ষ করেনি। এ কথা ভাল করেই জেনে রেখো যে, কুমারীকে ভগবান এমন শক্তি দিবেন যে, তোমরা তার আর তার বীরোত্তমদের বিক্রম সহ্য করতে পারবে না।

হে বেডফোর্ডের ডিউক! শ্রীকুমারী অনুরোধ করছেন, শ্রীকুমারী চান যে, তুমি আপন সর্বনাশ ডেকে এনো না। যদি সম্মত হও, তবে তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে, খৃষ্টান ধর্ম্মে যে মহৎ কাজ আর কখন হয় নাই, ফরাসীরা যেখানে যেখানে সে কার্য্যে সম্পাদন করবে, সেখানে সেখানে তার অনুগমন করতে পারবে। অর্লিন্স নগরীতে তোমরা সন্ধি করবে কি না জবাব দাও। যদি না দাও উত্তর, মনে রেখো তোমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকবে না।

[ইংরেজরা চিঠির জবাব দিল না। বললে ডাইনী। ক্ষুদ্র এক দল নিয়ে জেনি ইংরেজদের হারিয়ে দিল। তিন মাস পর (১৪২৯, ১৭ জুন) জেনি চার্লসকে ফ্রান্সের রাজা বলে ঘোষণা করল। এই অভিষেকের সুযোগে ইংরেজ এনে ফেলল আরও সৈন্য। পরাজিত হ'লে হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে চার্লস কুমারী জেনিকে ইংরেজের কাছে বিক্রয় করল। ৫০।৬০ জন পুরুত আর বিচারক করলে এই নারীর বিচার। অভিযোগ, মেয়ে হয়ে পুরুষ সেজে ফিরে, দৈববাণী শুনে, দেবদর্শন পায়, চিঠির শিরোনামায় লেখে "যিশু ও মেরীর" নাম। অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কারাগারে পুরুষের বেশে থাকতে দেখে, দণ্ড হয় মৃত্যু। বীর নারীর মাথায় চড়াল তারা উঁচু কাগজের তাজ তার ওপর লেখা রইল—Heretie, Relapsed, Apostate Idolater," ১৪৩১, ৩০শে মে এই মহীয়সী বীর নারীকে ওরা পুড়িয়ে মারল। তার অর্দ্ধদগ্ধ উলঙ্গ শব অগ্নি থেকে বের করে নিয়ে তার নারীদেহ বর্ব্বরের মত চার দিকে দেখিয়ে বেড়াল। যাতে এই প্রাণময়ী সমগ্র ফ্রান্সের প্রাণকে জাগিয়ে তুলতে না পারে, তার জন্য বর্ব্বররা শ্রীকুমারীর চিতাভস্ম সিন নদীর জলে ছড়িয়ে দিল।]

রাণী এলিজাবেথের চিঠি

বন্দিনী স্কচ-রাণী মেরীর নিকট

[ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর শত্রুতা বিশ্ববিখ্যাত। অধিকতর রূপবতী মেরীর সম্মোহনে পুরুষরা পাগল হ'ত। এলিজাবেথের হিংসা সেই জন্য—সে'ও ত নারী! তবু দুই জনে লোকদেখান ভালবাসার অভাব নেই। উপহার বিনিময়েরও অন্ত ছিল না। "প্রাণের বোনটি"কে হৃৎপিণ্ড আকারের এক হীরক উপহার পাঠাল এলিজাবেথ। মেরী সে বার ফেরত দিল। এলিজাবেথ মেরীকে বন্দী করল, কিন্তু কারাগারে স্নেহপূর্ণ চিঠি লিখতে লাগল। বোনকে কেটে ফেলবার এক বছর আগে এলিজাবেথ নিজের ছবি পাঠাল মেরীকে আর এই চিঠিখানা…]

১৫৮৬ খৃঃ

ধনী প্রত্যহ সংগ্রহ করে ধনের পর ধন। এক-থলি মুদ্রা, তার পর আর এক থলি, আরও এক থলি, থলি আর শেষ হয় না। ইতিপূর্ব্বে কত উপকার আমার করেছ, কত ভালবেসেছ, আজ সে উপকার ও ভালবাসা বেড়ে চলেছে আশা আর আকাঙ্ক্ষায়। যা চেয়েছ তা চাইবার মত নয়। এতে তোমার আকাঙ্ক্ষার তুচ্ছ জিনিষটার দাম বেড়ে গেছে। আমার ছবির অন্তরে তোমার প্রতি সদ্ভাব পোষণ করছে বাইরের মুখে রূপেও তার প্রকাশ। নিবারিত করতে চাইলেও আদেশে বিলম্ব আমি করিনি, আমি দিতে চেয়েছি প্রথমে, শেষে দানমঞ্জুর করিনি। আমার এই অন্তর তোমার সামনে হাজির করতে লজ্জা আমার কখনও হবে না। উপহার দিতে হয়ত লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মন? মন তোমার কাছে দাঁড় করাতে কখনও লজ্জা আমার হবে না। চিত্রের মাধুর্য্য থেকে, রং হয়ত মলিন হয়ে যাবে কালে ও আবহাওয়ায়, হয়ত হঠাৎ বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে যাবে। কিন্তু মন? কালের দ্রুতগামী পক্ষ দুটো ওকে পিছু ফেলতে পারবে না, ঘন কৃষ্ণ মেঘজাল নীচু নেমে এসে ওকে তমসাবৃত করতে পারবে না, দৈব তার পিচ্ছিল পদক্ষেপ দিয়ে ওর উচ্ছেদ করতে পারবে না।

এ কথার প্রমাণ বড় একটা হয়ত পাবে না। প্রমাণ করবার সুযোগও খুবই কম মিলেছে। তবু কুকুরেরও দিন আসে। হয়ত এমন দিন আসবে, যখন আজ যা কথায় লিখছি তা কাজে ব্যক্ত করবার সময় আমি পাব।

আন্তরিক অনুরোধ, যখন আমার চিত্রের দিকে চাইবে, তখন যেন অনুগ্রহ করে মনে রেখো যে, তোমার সামনে একটা দেহের বাহিরের ছায়া মাত্র দাঁড়িয়ে। আমার অন্তরের বড় আকাঙ্ক্ষা, আমার এই দেহ প্রায়ই যেন তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। এতে হয় তোমায় একটু আনন্দ দিতে পারব, আমারও উপকার হবে ঢের……তোমায় একটু বিরক্ত করলাম বলে ভয় হচ্ছে। এই বার সবিনয় ধন্যবাদান্তে পত্র শেষ করি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি তোমার কল্যাণ করুন, তোমায় আনন্দ দেন, রাজ্যের মঙ্গল হোক, আমিও সুখী হই। হ্যাট ফিল্ড থেকে আজ মে মাসের ১ম দিনে এই পত্র লিখা হ'ল।

তোমার অতি দীন ভগিনী
এলিজাবেথ

স্কটল্যাণ্ডের ৬ষ্ঠ জেম্‌সের নিকট রাণী এলিজাবেথের চিঠি

[ইংলণ্ডের কারাপিঞ্জরে বন্দিনী রাণী মেরীর নিকট আপনার ছবি পাঠাবার পর ১ বৎসর কেটে গেছে (১৫৮৭ খৃঃ) মেরীর চক্রান্তে হত্যাকারীরা তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদেরও হত্যা করেছে। বার বার মেরী পালাবার চেষ্টা করেছে, বার বার এলিজাবেথের কৌশলী গুপ্তচররা সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। তার পর এলিজাবেথকে হত্যা করে জেল থেকে পালাবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। মেরীর বিচার হয়। অভিযোগ রাজদ্রোহ। বিচার ব্যবস্থা এলিজাবেথ সমর্থন করতে না পারলেও তাঁকে মেরীর মৃত্যু পরোয়ানা স্বাক্ষর করতে হয়। এলিজাবেথ যে হত্যা-দণ্ড মকুব করেন, বোধ হয় ইচ্ছে করেই হত্যার পর তা জারি করা হয়। এর কয় দিন পরে এলিজাবেথ মেরীর পুত্র ৬ষ্ঠ জেম্‌সকে লিখলেন—]

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৮৭

স্নেহের ভাই,

আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল তাতে মন যে আমার কি অভিভূত, একথা অনুভব করতে না পারলেও বোধ হয় তুমি তা মান। আমার এই আত্মীয়টিকে পাঠাচ্ছি। এরই মধ্যে তোমার কিছু অনুগ্রহ ইনি পেয়েছেন। আমার কলমের পক্ষে যা বলা শক্ত, সে সম্বন্ধে ইনি তোমায় সদুপদেশ দিবেন। ভগবান জানেন, আরও অনেকে জানে যে, এ ব্যাপারে আমার কোনও দোষ নেই। আমায় বিশ্বাস কর। কোন জীবিত প্রাণী বা প্রিন্সের ভয়ে ন্যায় কাজ করে অস্বীকার করবার মত ছোট মন আমার নয়। আমি অত হীনবংশের মেয়ে নই, ঘৃণিত মন নিয়েও আমি চলি না। ছদ্মবেশ রাজধর্ম্ম নয়, আমার কাজ কখনও আমি গোপন করব না, বরং যা মনের ভাব তা খুলেই বলব। বিশ্বাস কর। আমি জানি এ (শাস্তি) অন্যায় হয়নি, তবু যদি শাস্তি দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য হত, তবে অন্যের কাঁধে দোষ চাপাতাম না। পত্রবাহকের কাছে ঘটনা তুমি শুনো। মনে রেখো আমার চাইতে এমন স্নেহময়ী আত্মীয়া, এমন প্রিয় বন্ধু পৃথিবীতে তোমার নাই—তোমাকে ও তোমার রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য আমার চাইতে আর কেউ সযত্ন দৃষ্টি দিবে না। তাড়াতাড়ি তোমায় বিরক্ত করলাম, ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তোমার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক।

তোমার প্রিয় ভগিনী
এলিজাব আর।

৬ষ্ঠ জেমসের উত্তর

[রাণী মেরীর মৃত্যুদণ্ডে স্কচ-জাত ক্ষেপে উঠেছিল। মেরীর শত্রুরাও এলিজাবেথকে ছি-ছি করেছিল। কিন্তু ২১ বছরের যুবক জেম্‌স এলিজাবেথের চিঠি পেয়ে খুসী হল। মায়ের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের মসনদ পাবার কণ্টক দূর হল বলে সে এলিজাবেথের অপরাধ, অপরাধ বলেই গণ্য না করে লিখল—]

১৫৮৭

মাদাম ও প্রিয় বোন,

আপনার পত্র ও পত্রবাহক দূত ও ভৃত্য রবার্ট ক্যারের মারফৎ একটা শোচনীয় ঘটনার দায়িত্ব থেকে আপনাকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। আপনার পদমর্য্যাদা, আপনার নারীত্ব, মৃতার প্রতি আপনার দীর্ঘ দিনের সদ্ভাব ও শোণিত সম্পর্ক আপনার নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হবার বহু বিশিষ্ট প্রমাণ। এসব বিবেচনা করে এই ব্যাপারে আপনার নিষ্কলঙ্ক অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে আপনার প্রতি অবিচার করতে আমি সাহস করি না। বরং আমি আশা করি যে, আপনার ভবিষ্যৎ মানপ্রদ আচরণে বিশ্বজগৎ একই প্রকার পূর্ণ সুবিচার করবে। আমার দিক দিয়ে বলতে গেলে, আমার বাসনা আপনি এই বার সর্ব্বতোভাবে আমায় এখন পূর্ণ সন্তোষ প্রদান করবেন, যাতে এই দ্বীপ-রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হবে, যাতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হবে আর পূর্ব্বে আমি আপনার যেমন অতিস্নেহাস্পদ ছিলাম, তেমনই স্নেহাস্পদ করে আমায় বাধিত করবেন।

[অস্বাক্ষরিত]

[এর পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে স্কচরাজ ৬ষ্ঠ জেমস হয়েছিলেন ইংলণ্ডের রাজা ১ম জেমস। এর পর স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড এক রাজ্য হয়ে গেছল]

মাদাম দা পম্পাডোরের চিঠি

[ছোটবেলা ওকে জোয়ান ফিস্‌. বলে ডাকত। প্রথম থেকেই পেয়েছিল রূপ-বিলাসিনীর পাঠ। পেয়েছিল উচ্চ শিক্ষা, পেয়েছিল ধনী স্বামী। কিন্তু এক বুড়ী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল—তরুণী হবে রাজ-রক্ষিতা। রাজার খোঁজ পড়ে। বিলাসিনী মহলের সে হয় রাণী। ১৭৪৪ খৃঃ ফ্রান্সের রাজা ১৫শ লুইকে নারী যাদু করল এক নাচের আসরে। নারী স্বামীকে বিদায় দিয়ে রাজবাড়ী গিয়ে নাম নিল মার্কুস দা পম্পাডোর। প্রেম তার অন্তর স্পর্শ করত না। কামনা ছিল তার অত্যুচ্চ। রাজার সব চিঠি-পত্র সে খুলত। রাজ্যের মন্ত্রীরা পহেলা তারই কাছে এসে দাঁড়াত। তার সম্মতি ছাড়া কিছু হবার জো ছিল না। দেশের সেনাপতি, বিদেশের কূটনৈতিক এদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান সে করত। লেখক এল, শিল্পী এল, ভলটেয়ারও এসে তার প্রিয় পাত্র হল। আবার নারী তার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে লাগল গরীব মেয়েদের, বুড়োদের, নষ্ট গ্রামবাসীদের জন্য। রাজ্যের সংসার সব গ্রাস করে ফেলে কুহকিনী, আর অন্তরে অন্তরে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করে। তাই ধর্ম্মগুরু পোপ ১৪শ বেনে ডিক্‌টের কাছে লিখছেন—]

১৭৫২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে মতলব আমার ছিল, সেকথা বিস্তারিত বলে আর লাভ নেই। রাজার জন্য মাত্র রেখেছিলাম কৃতজ্ঞতা আর সুপবিত্র ভালবাসা। রাজাকে আমার মনের কথা বললাম, শোর বোন-এর ডক্টরদের ডেকে পরামর্শ করতে, তাঁর কনফেসারকে (যে পুরোহিত পাপ স্বীকার করান) ডাকিয়ে যাতে তিনি অন্যান্য যাজকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন তার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার আর পাপ নেই। তাঁর কাছে কাছে থাকব, অথচ কেউ পাপ করছি বলে সন্দেহ করতে পারবে না, এর জন্য কোন না কোন ব্যবস্থা করার দরকার ছিল। রাজা ত আমার মন জানেন, তিনি জানেন যে আমার যা সঙ্কল্প হয়েছে, তা থেকে বিচ্যুত করা অসম্ভব, তাই আমার আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করলেন। ধর্ম্ম-বিচক্ষণরা এলেন। ফাদার পেরু সো কে লিখলেন। তিনি রাজাকে বললেন—সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে হবে।

রাজা উত্তরে বললেন, সে অসম্ভব। যাতে জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, রাজার নিজের জন্য নয়, আমার মনের তৃপ্তির জন্য। তিনি বললেন, তাঁর সুখশান্তির পক্ষে, তাঁর ব্যাপার বিষয় পরিচালনের পক্ষে আমি অপরিহার্য্য। রাজাদের মুখের উপর সত্য ও স্পষ্ট কথা বলা কত দামী, আর কেউ তা পারে না, আমি ছাড়া। রাজার সঙ্গ থেকে বিচ্যুত করবার জন্য ফাদার কিন্তু তাঁর জবানীর নড়চড় করলেন না। সোব বোনের ব্যবস্থাদাতারা হয়ত একটা ব্যবস্থা দিতে পারতেন, কিন্তু যেসুইটরা সম্মতি দিতে অসম্মত হ'ল। এই সময় রাজার ও ধর্ম্মের কল্যাণকামী অনেককে বলেছিলাম যে, ফাদার পেরু সো যদি রাজাকে স্যাকরামেণ্টের দ্বারা সংযত করতে না পারেন তবে তিনি এমন জীবন যাপন করবেন যাতে কারু মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এদের মত আমি বদলাতে পারিনি। এর একটু পড়েই দেখলাম আমার ভুল হয়নি।

দুঃখ ও বিপদ আমার পিছু-পিছু চলে। সৌভাগ্যের চরমেও দুঃখ। স্পষ্ট বুঝতে পারি এ জগতে যা দেখতে ভাল, তাতেই আসে না সুখ! আমারও সম্পদের অভাব নাই, তবু সুখ পাই নি। ভুলে থাকবার জন্য কত কি করেছি, আনন্দও পেয়েছি, আজ আর তা ভাল লাগে না। ও সব থেকে অন্তরে এই বিশ্বাস হয়েছে—সব সুখ ভগবানে, আর সুখ নাই। ফাদার স্যাসি গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেন একথা। তাঁকে লিখলাম,-মনের সব কথা অকপটে তাঁর কাছে নিবেদন করলাম। সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৫৬ জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত আমার আন্তরিকতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তিনি গোপনে সন্ধান করতে লাগলেন, তার পর বললেন, স্বামীকে চিঠি লেখ। নিজেই চিঠির মুসাবিদা করে দিলেন। স্বামী আর আমার মুখদর্শন করতে চাইলেন না।

লোক দেখাবার জন্যে ফাদারের কথায় রাণীর অন্তঃপুরে চাকরী নেবার জন্য আমায় দরখাস্ত করতে হয়েছে। আমার ঘরে ওঠবার সিঁড়ি অপসারিত করতে তিনি বাধ্য করেছেন। সাধারণ পাশের ঘর দিয়ে ছাড়া রাজা আর আমার ঘরে আসেন না। মোট কথা, কি কি ভাবে আমায় চলতে হবে তার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা ফাদার করে দেলেন, আমিও যথাযথ ভাবে তা পালন করলাম।

এই সব অদল-বদলে রাজদরবারে ও নগরে বেশ চাঞ্চল্য হ'ল। প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মচঞ্চল দল বাধা দেবার উদ্যোগ করল। তারা ফাদার স্যাসিকে আক্রমণ করল। ফাদার আমায় জানালেন, যত দিন আমি রাজদরবারে থাকব আমার স্যাক্রামেণ্ট তাঁর দ্বারা হবে না। যে সব পরীক্ষার ব্যবস্থা তিনি আমার জন্য করেছেন, রাজার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে ভিন্নরূপ হয়েছে, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তির কথা তাকে বললাম। তিনি শেষে আমায় জানালেন যে, কমতে দি টুলোকে যখন দুনিয়ায় আনা হ'ল, তখন রাজার কনফেসারকে জনতা ঠাট্টা করেছিল, অনুরূপ দুর্দশায় পড়বার ইচ্ছা তাঁর নাই। এ যুক্তির আর উত্তর দেবার আমার ছিল না। আমার কর্ত্তব্য পূর্ণ করবার জন্য আমি যে সত্যি সত্যি ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে চলেছি, ষড়যন্ত্র বা কোন মতলবের উদ্দেশ্য যে আমার নাই, একথা প্রতিপন্ন করবার জন্য যত যুক্তি সবই শেষ করলাম আমার কর্ত্তব্য সমাপনের জন্য। এর পর তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। ঘৃণিত ৫ই জানুয়ারী এসে পড়ল, গত বছরের মত সেই একই রকমের চক্রান্ত চলতে লাগল। রাজা আপনার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আন্তরিকতা প্রতিপন্ন করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। একই আন্তরিকতা প্রতিপন্ন করবার জন্য যথাসাধ্য করলেন। একই মতলবের ক্রিয়া চলল, একই উত্তর উচ্চারিত হ'ল—খৃষ্টানের কর্ত্তব্য পালনের আন্তরিক ইচ্ছা রাজার। সে ইচ্ছা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হ'ল। সংবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে তারা যদি কাজ করত তাহলে সে ভ্রম থেকে রাজাকে উদ্ধার করা যেত। যখন তাঁকে বঞ্চিত করা হ'ল, অল্প কয় দিন পর রাজা ফিরে গেলেন সেই ভ্রমে।

ফাদার স্যাসির পরিচালনে ১৮ মাস যে মহাসংযম প্রদর্শন করেছি, তার পর আমার বুকখানা ভেঙ্গে গেল। এক জনের উপর আমার বিশ্বাস ছিল, তখন আমি তাঁর পরামর্শ নিলাম। শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে আমার দুঃখ দূর করবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। তাঁর এক বন্ধু, একজন abbe, তাঁরই মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান আর এক জনকে আমার অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন। এই ভদ্রলোকও তাঁর মতনই পরামর্শ দেবার যোগ্য। দু'জনাই সিদ্ধান্ত করলেন যে, কষ্টবরণের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করাতে বাধ্য করাতে পারে, আমার আচরণে তার প্রয়োজন নাই। ফলে আমার কনফেসর, আরও কিছু দিন পর অবিচারের অবসান করলেন। স্যাক্রামেণ্টের সম্মুখীন হতে আমার অনুমতি দিলেন। আমার সম্বন্ধে যে সব ঘৃণিত অপবাদ প্রচার করা হয়েছে, confessor পাছে তাতে নজর দেন, সেজন্য আমার সাবধান হওয়া যে প্রয়োজন, অন্তরে অন্তরে এই ব্যথা অনুভব করলেও, আমার অন্তরের পক্ষে তা হয়ে পড়ল মহা সান্ত্বনার কথা।

[পোপ ক্ষমা করুন বা না করুন মাদাম দি পম্পাডোর পূর্ব্বের মতই রাজা লুইকে পরিচালিত করতে লাগল। তার বুদ্ধি ফ্রান্সের কাল হ'ল। তার বুদ্ধিতে রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'ল। ঐতিহাসিকরা বললেন, তিন পেটিকোটে (রুশিয়ায় এলিজাবেথ, মেরিয়া থেরেশা, আর মাদাম দি পম্পাডোর) সর্ব্বনাশকর ৭ বছরের লড়াই এনে ফেলল। অতিক্রান্ত মাদাম ৪২ বছর বয়সে যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিল, তার স্থলাভিষিক্ত হল মাদাম দু ব্যারি।]

রূপ-অরূপ

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের পথে ধাপে ধাপে কার যাত্রা এগিয়ে চলে
কোন্ সে ছন্দে স্পন্দিত হৃদি আলোকিত শতদলে ?
ভবচক্রের আবর্ত্তনে জীবন-চক্র মেগে
গতি তার কভু বেগবান্ কভু মন্থর অবহেলে।

কায়া যে মিলায় ছায়ার মাঝারে বেদনার মায়া রূপ
পরাণ তৃপ্তি লভে নিঃশেষ যবে হয় দেহ-ধূপ,
দিবস-রজনী ভবসাগর-তটে বার-বার জাগে
জ্যোতির্মহিমা অনন্ত কাল দীপ্ত আপন রাগে।

সুনীল ঘোষ

লঙ্কাদ্বীপের নাম জানেন না এমন লোক ভারতবর্ষে কেউ নেই। রামের লঙ্কা বিজয়ের উপাখ্যানই রামায়ণ। রাম যখন তাঁর বানর-সেনানী নিয়ে লঙ্কা জয় করেন, তখন সেখানকার সমৃদ্ধি ছিল অযোধ্যার চেয়েও বেশী। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণলঙ্কা। রাবণের প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঐশ্বর্যের যে বর্ণনা আমরা বিভিন্ন রামায়ণে পেয়ে থাকি তা থেকেই সহজে অনুমান করা যায়, দেশটায় কি প্রাচুর্য ছিল! সেই লঙ্কাদ্বীপের আধুনিক নাম সিংহল। বাঙলার বিজয় সিংহ নাকি "হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়" সে দেশের নাম বদলে নিজের নামটা জুড়ে দেন। এর ঐতিহাসিক তথ্য, প্রমাণ এখনও অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। ভূগোলবিদরা বলেন যে, বহু সহস্র বছর আগে সিংহল ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আস্তে আস্তে সমুদ্র তাকে পৃথক্ করেছে। রামায়ণে যে সেতুবন্ধের উল্লেখ আছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তৎকালে ভারত এবং সিংহলের মধ্যবর্তী সমুদ্র ছিল আরও সঙ্কীর্ণ এবং অগভীর। নইলে কাঠবিড়ালীর মত ক্ষুদ্র জীব সমুদ্রবন্ধনে সাহায্য করতে পারত কি না সন্দেহ আছে।

কিন্তু এ সব হল প্রাচীন ইতিহাস। বর্তমানে এই দ্বীপের সঙ্গে ভারতের ব্যবধান অনেক বেশী। ভারতের দক্ষিণে ভারত-সাগরের উপর অবস্থিত সিংহলদ্বীপের বর্তমান আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪৩০ কিলোমিটার (এক কিলোমিটার হচ্ছে এক মাইলের আট ভাগের পাঁচ ভাগ) এবং প্রস্থে ২২৫ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ। তার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই কৃষিজীবী।

রামায়ণের যুগে সিংহল বিজয়ের পেছনে রামের কোন সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি ছিল না। পত্নী-হরণের প্রতিশোধ নিতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং রাবণকে পরাজিত করে সেখানকার রাজ্যপাট স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু এ যুগে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা রামের মত অমন ভাল মানুষ নয়। ইউরোপ থেকে সুদূর প্রাচ্যে যাবার রাস্তায় পড়ে বলে দ্বীপটি বার বার সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্তুগীজরা এই দ্বীপটি দখল করে, কিন্তু পরে ওলন্দাজরা ওটা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের মত সিংহলও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। অবশ্য কোন বারেই সিংহলীরা বিনা যুদ্ধে বিদেশীর কাছে আত্মবিক্রয় করেনি। সেই সব মুক্তি-সংগ্রামে বার বার সেখানকার সহর এবং গ্রাম ধ্বংস হয়েছে এবং লোক মারা গেছে হাজারে হাজারে। সেই সব প্রাচীন ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখনও যে সব মন্দির এবং প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায়, সিংহলের শিক্ষা-সংস্কৃতির স্তর অত্যন্ত উঁচু ছিল।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিংহল ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস লাভ করে, কিন্তু তাতে সিংহলে বৃটেনের প্রাধান্য কিছু ক্ষুণ্ণ হয়নি। আগেকার মত এখনও সিংহলের সমস্ত খনি এবং চা ও রবার-বাগিচার মালিকানা ইংরাজদের হাতেই আছে। সিংহলের মন্ত্রিসভা এখনও বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃকই নিযুক্ত হয় এবং বিদায়ী মন্ত্রিসভা সেই গভর্ণর জেনারেলের কাছেই পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। বলা বাহুল্য, গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের ভার ইংল্যাণ্ডের রাণীর।

সিংহলের রাজধানীর নাম কলম্বো। দ্বাদশ শতাব্দীতে কেলানী গঙ্গানদীর মোহনায় আরবরা কালাম্বু নামে একটি বন্দর নির্মাণ করে। সেই নামানুসারেই রাজধানীর নামকরণ হয়। পর্তুগীজরা সেই নাম বদলে ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের সম্মানার্থে সহরের নাম দেয় কলম্বো।

কলম্বোর দৈর্ঘ্য প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার। সমুদ্রের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য সমুদ্রের পাড় ধরে মজবুত কংক্রীটের দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারী চমৎকার সে দৃশ্য! সেখানে নানা দেশের অসংখ্য প্রকারের জাহাজ নোঙর গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্রের ধারেই সারি সারি মাল-গুদাম। মাঝে মাঝে মাল ওঠানো-নামানোর জন্য দুই-একটা ক্রেণও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি বেশীর ভাগই ব্যবহৃত হয় না। মাল ওঠানো-নামানোর কাজটা করে কুলীরা। সিংহলে যন্ত্রের চেয়ে মানুষের শ্রমের মূল্য অনেক কম। কাজেই ক্রেণ ব্যবহারের চেয়ে কুলী ব্যবহার করা বেশী লাভজনক।

সিংহলের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্যের বেশীর ভাগই চলে কলম্বো বন্দরের মাধ্যমে। নারকোল এবং নারকোল-জাত দ্রব্যাদি, চা এবং রবারই সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ দখল করে আছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে চা-উৎপাদক দেশ হিসাবে সিংহলের স্থান ভারতের পরেই। রবার উৎপাদনে তার স্থান তৃতীয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যথাক্রমে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া।

সিংহলের সর্ববৃহৎ নগরী কলম্বোর লোকসংখ্যা সাড়ে ৩ লক্ষের মত। বন্দরের ঠিক পাশেই ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। জায়গাটার নাম ফোর্ট অর্থাৎ দুর্গ। পর্তুগীজ আমলে এইখানে তাদের সৈন্যরা থাকত বলে ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। সিনেট, প্রতিনিধি পরিষদ, সরকারী দপ্তর কেন্দ্রীয় পোষ্টঅফিস—সবই এই ফোর্টে। এই এলাকায় অনেক গীর্জাও আছে। সব চেয়ে নামকরা গীর্জাটি হচ্ছে ওলন্দাজ শাসনের আমলে তাদের দ্বারা তৈরী। সহরের ঠিক মাঝখানে একটা পুরাতন মীনারের উপর প্রকাণ্ড ঘড়ি। এই এলাকার রাস্তাঘাট অনেকটা আমাদের ড্যালহৌসী এলাকার মত সদাই কর্মব্যস্ত। দামী দামী নানা ধরণের মোটর গাড়ীর পাশে পাশেই দেখবেন চলেছে মালবোঝাই গরুর গাড়ী, ভারী মোট কাঁধে মুটে এবং যাত্রী-বোঝাই রিক্সা এবং দোতলা বাস।

ফোর্টের উত্তরে শ্লেভ আয়র্ল্যাণ্ড অর্থাৎ ক্রীতদাসদের দ্বীপ। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রীতদাসদের সারা দিন সহরে খাটিয়ে সন্ধ্যার পর এখানে এনে মজুত করে রাখা হত। ঠিক এর পাশেই সহরের শ্রমিকশ্রেণীর বাস। নাম তার 'পেটা' অথবা কালো সহর। খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘর সব। তাতে জানলার বালাই নেই। ঠিক কলকাতার বস্তির মত। শ্রমিকদের আসবাব পত্র বলতে আছে ছেঁড়া মাদুর আর কাঁথা। মাটিতেই সবাই খায়-শোয়। একটা ছোট ঘরে ১০।১২ জন লোকও বাস করে। অধিবাসীরা অধিকাংশই ধোপা, নাপিত, হোটেলের বয়, কুমোর, কামার, ছুতার ইত্যাদি।

ফোর্টের দক্ষিণে ভারত-সাগরের তীর বেয়ে রয়েছে ধনীদের পাড়া। সেখানে রাস্তাগুলো সোজা এবং চওড়া চওড়া। বড় বড়

হোটেল, প্রাসাদ সব ছড়িয়ে রয়েছে চারি দিকে। এখানে কাটু ইম্বল নামে অদ্ভুত এক রকম বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। রাত্রে এই গাছের পাতাগুলো ভাঁজ হয়ে যায় এবং সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেগুলো সোজা হয়ে ওঠে এবং তার ভিতর থেকে টপ-টপ করে জল পড়ে পথিকদের মাথার ওপর।

সিংহল কৃষিকার্য্যের পক্ষে অতি মূল্যবান জায়গা হলেও অধিকাংশ কৃষকেরই পেটে অন্ন নেই। দীর্ঘ কাল বৃটিশ শাসন এবং শোষণের ফলেই আজ এই দশা। চা এবং রবার-মালিকরা (সবাই ইংরাজ) কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে সেই জমিতে চা এবং রবারের বাগিচা বানিয়েছেন। তাই কৃষকদের চষবার মত জমিই নেই, আর থাকলেও এত কম যে, তাতে সংসার চলে না। সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় যে, ক্যাণ্ডী, নুয়াওয়ারা এলিয়ামাটালে এবং বাতুল্লা জেলায় ৮ লক্ষ কৃষকের মধ্যে ২ লক্ষ কৃষকের কোন জমিই নেই। অধিকাংশ জমির মালিকই বিদেশী চা-মালিকরা এবং সেই জমি চাস করে জমির আসল সিংহলী মালিকের বংশধরেরা।

সিংহলী কৃষকের দুর্দশার অন্ত নেই! ভারতবর্ষের মতই আজও সেখানে অতি আদিম পদ্ধতিতে চাষ-বাস হয়। কাঠের লাঙ্গল আর জরাজীর্ণ মোষ। সার বলে কোন বস্তু নেই। কখনও বৃষ্টির অভাব, কখনও অতিবৃষ্টি। এত বাধা অতিক্রম করে ফসল ফলানো কত যে কঠিন, তা আমাদের দেশের লোকের না জানার কথা নয়। বলা বাহুল্য, কৃষকরা অধিকাংশই নিরক্ষর।

ভারতের মত সিংহলেও জাতিভেদ প্রথা চালু আছে। ধোপার ছেলেকে চিরকাল কাপড় কেচেই যেতে হবে, আর নাপিতের ছেলে চিরকাল দাড়িই কামাবে। অন্য কোন পেশায় তার যাওয়ার উপায় সহজ নয়। বর্ণশ্রেষ্ঠদের নাম বেল্লালা। তারাই সমস্ত জমি-জমা কলকারখানার মালিক। কামার ছুতোররা হল শূদ্রবংশ। ধোপাদের বলা হয় রাদর। সব চেয়ে ছোট জাত হল পারিয়া অর্থাৎ অচ্ছুৎ। বিদেশী শাসক ও শোষকরা সযত্নে এই জাতিভেদ বজায় রেখে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রেখেছে। সিংহলীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে সেটা ছিল মস্ত অন্তরায়।

সিংহলের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়! গত বছর নারকেল-জাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ১৯৫২ সালের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পায় এবং নারকোলের শাঁস রপ্তানী হ্রাস পায় শতকরা ৫০ ভাগ। ফলে সেখানে দারুণ মন্দা। রবারের রপ্তানীও ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। চাষীর দুর্দশার আর অন্ত নেই। এই সুযোগে রবার-বাগিচার বৃটিশ মালিকরা শ্রমিকদের মজুরী কাটছেন বেপরোয়া ভাবে। আমেরিকানদের নকল রবার সিংহলের রবারের বাজারকে দারুণ আঘাত করেছে। অবস্থা এত খারাপ যে, সিংহলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কোটেলওয়ালা সাহেব আমেরিকার একান্ত অনুগত ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আমেরিকার নিষেধ অমান্য করে চীনের কাছে রবার বিক্রয় করছেন। বর্তমানে চীন সিংহল থেকে সব চেয়ে বেশী রবার এবং নারকোল তেল কেনে। তার বদলে চীন ১৯৫৩ সালের প্রথম ৮ মাসে সিংহলে ৩০ লক্ষ টন চাল বেচেছে, কারণ সেখানে চালের বড় অভাব। বৃটিশ রবার আর চা-মালিকরা সেখানে আর ধান চাষের জমি বেশী রাখেনি বলেই এই অবস্থা।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সিংহলের শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ মাদ্রাজী। পুরুষানুক্রমে তারা সেই দেশে বাস করছে এবং সেইটাই হয়ে উঠেছে তাদের দেশ, কিন্তু সম্প্রতি সরকারী নীতির ব্যর্থতায় সেখানে মন্দা দেখা দেওয়ায় প্রধান মন্ত্রী কোটেলওয়ালা সেই সমস্ত ভারতীয় শ্রমিকদের বিতাড়ন করে স্থানীয় বেকার সমস্যা সমাধানের ফন্দী এঁটেছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা এই অপকর্ম থেকে বিরত হননি। কারণ, এই কার্য্যে আমেরিকা তার সহায়তা করছে। স্থানীয় সমস্ত ভারতবিদ্বেষী আন্দোলনের পেছনে আছে স্থানীয় মার্কিণ দূতাবাস। হাজার হাজার টাকা খরচ করে তারা ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক ইস্তাহার ছাপিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মনে ভারত-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি মার্কিণ দূতাবাসের এই জঘন্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েও ফল পান নি। কারণ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

তাই বলছিলাম, একদা যে স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য্যের বর্ণনায় এদেশের শ্রেষ্ঠ কবি পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, শ্বেতাঙ্গ জলদস্যু এবং শয়তানদের হাতে পড়ে সেই সোনার লঙ্কা আজ সত্যিই শ্মশান! হনুমান তার লেজের আগুনে লঙ্কার আর কতটুকু দাহন করেছিল? এ যুগের ইংরাজ-হনুমানরা দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে!

মধুমক্ষিকা আর মধু

ভল্লুক হল মধুমক্ষিকার সব-চেয়ে বড় শত্রু। অদ্ভুত এক উপায়ে ভল্লুক ভাঙ্গে মৌচাক। রাতের অন্ধকারে মৌমাছিরা যখন চোখে ভাল দেখতে পায় না, তখন যে গাছে রয়েছে মৌচাক সেই গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেয় ভল্লুক। মৌমাছিরা ভাবে [illegible] শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কালো ভল্লুক তখনও গাছ নেড়ে যায়। মৌমাছিরা সমস্ত ভাণ্ডার ভর্ত্তি করে মধু নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী হয়ে যায় তার। তখন সেই ভল্লুক মজা করে…। তার পর তো বুঝতেই পারছেন।

কালো জিনিষকে তাই বড় ভয় করে মধুমক্ষিকা। কালো কিছু দেখলেই ক্ষেপে যায়। আর এক বার রেগে গেলে তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। চোখ, মুখ, নাক যেখানে পাবে সেখানেই কামড়ে দেবে। বিষের শেষ-বিন্দুটি অবধি ঢেলে দেবে। হুল তার ছুঁচের চেয়ে তীক্ষ্ণ, ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। অমোঘ, অব্যর্থ।

মধুর চাষ সব-চেয়ে বেশী হয় কানাডায়। সেখানকার বন-সংরক্ষণ বিভাগ এ সম্পর্কে সবিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। প্রচুর অর্থ রোজগারও হয় বটে।

ভিক্টোরিয়া ক্রস

বৃটিশ কমনওয়েলথে বীরত্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান ভিক্টোরিয়া ক্রস। কেবলমাত্র কমনওয়েলথেই নয়, তার বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বীরত্বের এই প্রতীকটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যাঁরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, সকলের চোখেই তাঁরা সম্মানার্হ এবং শ্রদ্ধার পাত্র—তা তিনি যে দেশেরই লোক হ'ন না কেন। ভিক্টোরিয়া ক্রস পদকটি কিন্তু দেখতে তেমন কিছু নয়, অতি সাধারণ ব্রোঞ্জের তৈরী একটা ক্রস, সহজে নজরেও পড়ে না; কিন্তু কমনওয়েলথে সৈন্যদের বা প্রাক্তন সৈনিকদের কোন অনুষ্ঠান হ'লে এর অধিকারীরা সেদিন এই পদকটি নিজের পোষাকের বাঁ দিকে ঝোলাবেনই!

অন্য কোন সম্মানই এর পর্য্যায়ে পড়ে না। কারণ, ভিক্টোরিয়া ক্রস যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হয়, তার একটু বিশেষত্ব আছে। যুদ্ধে তো সব সৈনিকই প্রাণ দেয়, কিন্তু তাদের সকলকে তো আর এই সম্মান দেওয়া হয় না? ভিক্টোরিয়া ক্রস পেতে হলে এমন কাজ করতে হবে, যার ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বহু লোকের জীবন রক্ষা পাবে এবং তাতে যদি নিজের জীবন বিপন্ন হয়, তা গ্রাহ্য করা চলবে না। কেবল বীরত্ব এবং ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে নিযুক্ত থেকেও সহযোদ্ধাদের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

১৮৫৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বীর সৈনিকদের এই পদক দানে সম্মানিত করার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নিজে সমস্ত ঘটনার প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার পর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে এই পদক দিয়ে সম্মানিত করতেন। ফাঁকি দিয়ে সুপারিশ ধরে তাঁর কাছ থেকে এই পদক আদায় করার উপায় ছিল না।

যে ব্রোঞ্জ দিয়ে এই পদক তৈরী করা হয় তার মূল্য হয়ত দু' পেনির মত, কিন্তু সম্মানের দিক থেকে তা সকলের শ্রেষ্ঠ। এই অল্প দামের পদকটি হারালে ঠিক ঐ রকম আর একটি সংগ্রহ করা ভয়ানক মুস্কিল! প্রথমে সেবাস্তোপোলে রুশদের কাছ থেকে দখল করা একটা কামানের ব্রোঞ্জ থেকে এই পদক তৈরী করা হত, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে এই ধাতু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বিশেষ ভাবে প্রস্তুত এক নূতন ধাতুতে এই ক্রস তৈরী করা হয়। যদি কেউ ভিক্টোরিয়া ক্রস হারিয়ে ফেলে, তা হলে পুনরায় আর একটি পেতে হলে একটি রয়াল-কমিশন বসাতে হবে এবং রাজা বা রাণীর নেতৃত্বে ঐ কমিশন বিশেষ ভাবে তদন্ত করার পর আর একটি পদক প্রদানের আদেশ দেবেন।

ভিক্টোরিয়া ক্রস যাঁরা পান তাঁদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় না থাকলেও এমন একটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়, যা কোন ক্লাব বা সমিতির সদস্যদের পরস্পরের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। যদি খবর পাওয়া যায়, কোন ভি. সি (অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া ক্রসের অধিকারী) বিপদে পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভি. সি-রা তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হবেন—তা তিনি পরিচিতই হ'ন আর অপরিচিতই হ'ন।

মাত্র তিন জন দুই বার এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কর্ণেল আর্থার মার্টিন লীক (১৯০২ ও ১৯১৮), ক্যাপ্টেন নোয়েল চ্যাভেস (১৯১৬ ও ১৯১৭) এবং নিউজিল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন চার্লস উফসে (১৯৪১ ও ১৯৪২)। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন সামরিক ডাক্তার ছিলেন।

ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্য্যন্ত ১৩৪৬ খানি প্রদত্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৬৪ খানি বৃটিশ আর্মির লোকদের (১৭০ জন গ্রহণের পূর্ব্বেই মৃত), ১১৮ খানি বৃটিশ নৌ-বাহিনীর লোকদের (২৪ জন গ্রহণের পূর্ব্বেই মৃত), বৃটিশ বিমানবহরের লোকদের ৩১ খানি (১৩ জন গ্রহণের পূর্ব্বেই মৃত), দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় আর্মির লোকেরা ১১১ খানি ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছে (২৪ জন গ্রহণের পূর্ব্বেই মারা গিয়েছে)। দু'-চারটি ক্ষেত্রে একই পরিবারের দুই-তিন জনকে তাদের বীরত্বের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ভিক্টোরিয়া ক্রস দেওয়া হয়েছে।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এই পদককে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি বে-সামরিক নর-নারীদের পর্য্যন্ত এই পদক প্রাপ্তির সুযোগ দিয়েছিলেন। তার ফলে চার জন বে-সামরিক ব্যক্তি এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

ভিক্টোরিয়া ক্রসের অধিকারীদের বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁরা কোন অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরাসরি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

গাঁয়ের-মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

ভাদুই ফসল তোল্ রে ঘরে
ভাদুই ফসল তোল্,
জিরেন দিয়ে পাল্টা চাষে
ও ভাই, দে ক'ষে লাঙল।

ছায়ের সারে গোবর সারে,
মাঠে মাঠে ছড়িয়ে যা রে;—
ছিঁচ্‌নি মেরে ছিঁচের জলে
ভ'রে নে তোর জোল্।
ও ভাই, দে ক'ষে লাঙল।

দো-আঁস মাটি সেথায় পাবি,
সেথায় আলু বসিয়ে যাবি,
ভেলীর নালা গোড়েন ক'রে
ছিটিয়ে যা রে খোল।
ও ভাই, দে ক'ষে লাঙল।

নজর রাখিস দাঁড়ার জলে,
খিতোয় নাক' মাটির তলে;
ফসল গোটা পাবি না রে
সব পচে হবে ঢোল।
ও ভাই, দে ক'ষে লাঙল।

বিনয় ঘোষ

পাঁচ

বাল্যকালের সমাজ

বাংলার হাজার হাজার বৈচিত্র্যহীন গ্রামের মতন বীরসিংহও একটি। বার মাসে তের পার্বণের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে একটানা জীবনের ধারা ব'য়ে যায়। বৎসরান্তে একবার ধর্মঠাকুরের গাজনের সময় সকল শ্রেণীর গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। গাজনই হ'ল এ-অঞ্চলের সব চেয়ে বড় উৎসব। গ্রামের পর গ্রাম উৎসবের জনরবে মুখর হয়ে ওঠে। উৎসব শেষ হয়ে যায়। আবার সেই গতানুগতিকতার বিষণ্ণতা ছেয়ে ফেলে গ্রাম। সূর্য ডোবে, আর ঘুমিয়ে পড়ে গ্রাম।

তুলসীতলায় প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা দেন ভগবতী দেবী। মনে মনে হয়ত বলেন: "আমার ঈশ্বরকে একটু সুবুদ্ধি দিও জগদীশ্বর! একটু ধীর-স্থির ক'রো তাকে।" ঈশ্বরের কথা কি ঈশ্বর শোনেন?

ঈশ্বর তখন মাঠে-মাঠে দাপাদাপি ছুটোপাটি ক'রে ঘরে ফিরেছে হয়ত, গুটিদের আর মণ্ডলদের ছেলেদের সঙ্গে। উপদ্রুত ও নির্যাতিত প্রতিবেশীরা এসেছে তার পিছন-পিছন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ, রক্তমাংসের বালক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ থাকারই কথা! কার মুর্গীতে ধান খেয়ে গেল, কার বকরীতে নটেগাছটি মুড়িয়ে দিলে, তাই নিয়ে যে গ্রামসমাজে খণ্ডপ্রলয় বেধে যায়, সেখানে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উৎপাতে যে ফরিয়াদীরা বাড়ীর সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়াবে, অন্ততঃ তর্কভূষণ মহাশয়কে তাদের নালিশটুকু জানাবার জন্য, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রামজয় ও দুর্গা দেবী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন প্রতিদিন। কেউ খুশী হয়, কেউ হয় না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষও দেখা যায় গ্রামের মধ্যে। কারও কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গ্রাম-বৃদ্ধরা ধৈর্য ধ'রে সহ্য করতে বলেন। অনেক বালকের অনেক চাপল্য দেখেছেন তাঁরা। ঈশ্বরের বালকসুলভ চাপল্যের মধ্যে যে শক্তির প্রাচুর্য উপ্‌ছে পড়ে, তা সামান্য শক্তি নয়,—এ যেন তাঁরা বহুদর্শীর স্বাভাবিক বোধশক্তি দিয়ে বুঝতে পারেন।

সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাটির প্রদীপ জ্বেলে দুর্গা দেবী দুরন্ত নাতিটিকে ডাক দিয়ে বলেন—পড়তে ব'স। ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসেন। কি পড়বেন? ছাপা বই কোথায় তখন? বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, এসব তো তখনও লেখা হয়নি। যিনি লিখবেন, তিনিই তো মাটির প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসছেন, পিতামহীর আদেশে। কি পড়বেন তিনি? কোন্ পাঠ্যপুস্তক, বালকদের পাঠোপযোগী তখনও ছাপা হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, বাংলাদেশের ছাপাখানারও বাল্যকাল বলা চলে।

লেখাপড়ার লেখাটাই ছিল তখন আসল, পড়াটা ছিল নকল। অর্থাৎ আবৃত্তি, পুঁথির পাঠাভ্যাস। অক্ষরের উপর দাগা বুলিয়ে লেখা অভ্যাস করতে হ'ত, আর আবৃত্তি ক'রে মুখস্থ করতে হ'ত পুঁথির পাঠ। প্রথমে তালপাতে লেখা আরম্ভ করতে হ'ত, তার পর লেখায় উন্নতি হ'লে কলাপাতে। ছোট একটি বসবার আসনে বা মাদুরে তালপাতা জড়িয়ে নিয়ে গুরুমশায়ের পাঠশালায় যেতে হ'ত। তাকে পাততাড়ি বলত। পাঠশালায় যেমন, বাড়ীতেও তেমনি, পাততাড়ি বগলে ক'রে পড়তে বসতে হ'ত।

তখন ছেলেদের মাথায় বড় বড় চুল রাখবার প্রথা ছিল। কিশোর ও যুবক ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মতন দীর্ঘ কেশ শোভা পেত। ছেলেরা অনেক বয়স পর্যন্ত হাতে রুপোর বালা পরত। ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার কোন ছবি নেই, থাকা সম্ভবও নয়। থাকলে হয়ত দেখা যেত, তখনকার সামাজিক প্রথা মতন, তাঁর মাথাতেও বড় বড় চুল ছিল এবং পিতামহী দুর্গা দেবী সেই চুল চুড়ো ক'রে ঝুঁটি বেঁধে দিতেন। কোন কোন ছেলের মাথার ঝুঁটিতে রুপোর বকুল-ফুল বেঁধে দেওয়া হ'ত এবং হাতে থাকত রুপোর বালা। তখনকার প্রায় সকল স্তরের মধ্যবিত্ত গৃহের ছেলেদের এই ছিল বাল্যকালের বেশ। রামজয় ও দুর্গা দেবী তাঁদের আদরের জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে যে এ ছাড়া অন্য কোন আধুনিক বেশে সাজিয়ে রাখতেন তা মনে হয় না। বিশেষ ক'রে, গ্রাম্যসমাজে, বালকদের এ বেশ ছাড়া অন্য বেশ তখন দেখা যেত না।

মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, পাততাড়ি বগলে ক'রে, ছোট একখানি ধুতি প'রে (হাফ্‌প্যান্টের যুগ তখনও আসেনি), বালক ঈশ্বরচন্দ্র যাতায়াত করতেন কালীকান্তের পাঠশালায়। যাতায়াতের পথে,

যত প্রকারে সম্ভব প্রতিবেশীদের উপদ্রব করতেন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কপাটি খেলতেন ডাণ্ডাগুলি খেলতেন কুস্তী করতেন। আম, জাম পেয়ারা লিচু গাছ থেকে ইচ্ছামতন ছিঁড়ে খেতেন। এ সব প্রায় তাঁর দৈনন্দিন রীতি ছিল বাল্যকালের। ভয় ব'লে বিশেষ কিছু ছিল না। জীবন্ত বা মৃত কোন ভূতের ভয়েই তিনি অভিভূত হননি কোনদিন। এদিক থেকে, মল্লযুদ্ধে ভাল্লুকবিজয়ী দুর্জয় রামজয়ের সুযোগ্য পৌত্র ছিলেন তিনি।

প্রতিবেশীদের আপত্তি বা ভর্ৎসনাতে স্বভাবতঃই তিনি বিচলিত হতেন না। তা ছাড়া, যে কোন আদেশ বা নিষেধ তাঁর উপর আরোপ করা হচ্ছে বুঝতে পারলে, তিনি ছেলেবেলা থেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, এবং ঠিক তার বিপরীত কিছু না ক'রে যেন স্বস্তি পেতেন না। অধিকাংশ সময় তাই উল্টো কথা ব'লে তাঁকে দিয়ে সোজা কাজ করাতে হত। [illegible] এই কৌশলেই তাঁকে মানুষ করতেন।

এ হেন ঈশ্বর যে প্রতিবেশীদের গুরুতর আপত্তিতে কি রকম আচরণ করতেন, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। বাধা পেলেই, সেই বাধাকে লঙ্ঘন করার জন্য তাঁর জিদ বেড়ে যেত। শুধু ছেলেবেলার নয় এটা ছিল তাঁর সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় কেবল তার আভাস পাওয়া যেত তাঁর দুর্বিনীত দুরন্তপনার মধ্যে। মণ্ডলদের গিন্নীকে জ্বালাতন ক'রো না বললে, পরদিন আরও বেশী ক'রে জ্বালাতন করার মতলব করতেন তিনি। গাছের আম পেড়ে খেও না বললে, হয়ত তাঁর ইচ্ছা করত, আম গাছটাকেই উপড়ে ফেলে দিতে। এই ছিল তাঁর প্রকৃতি। স্বাভাবিক ইচ্ছাপূরণে বাধা দিলে বালকের সমগ্র সত্তা বিদ্রোহ করত। মনে হয়, যেন কোন বাধা, কোন শাসন তিনি সুবোধ বালক গোপালের মতন মাথা হেঁট ক'রে নীরবে মেনে নেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নি।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের রাখাল বেচারা, যদি তার জীবনী-লেখকের এই জীবনকাহিনী জানত, তাহলে লজ্জায় সে-ও অধোবদন হয়ে থাকত নিশ্চয়।

ইতিহাস কোন একটি স্থানের সীমানার মধ্যে, অথবা কোন একজন ব্যক্তির জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেতিহাসও নয়। কালের ধারাই হ'ল ইতিহাস। একই সময়ে, একই কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনের উপর দিয়ে ইতিহাসের স্রোত বয়ে যায়—কালস্রোত ও ঘটনাস্রোত। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালেও বয়ে গেছে। সেই স্রোতের তরঙ্গের তারতম্য থাকে, কালভেদে, স্থানভেদে, পাত্রভেদে—সাদৃশ্যও থাকে। সেই সব তারতম্য ও সাদৃশ্য বিচার ক'রে সব কিছু নিয়ে সমগ্র ইতিহাসের যাত্রাপথ আঁকা বাঁকা উঁচু নিচু গতিচ্ছন্দে প্রকাশিত হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের এই সমগ্র গতিশীল রূপটি ধরবার জন্য, ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে, বীরসিংহ গ্রাম থেকে আমাদের ইংলণ্ডের লণ্ডন সহরে পর্যন্ত দৃষ্টি মেলাতে হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল, কেবল বীরসিংহে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সমসাময়িক আরও অনেক ব্যক্তির বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে আরম্ভ অথবা শেষ হয়েছিল। সকলেই তাঁরা বীরসিংহে জন্মান নি। বীরসিংহ থেকে দূরে অন্যান্য গ্রামে তাঁরা জন্মেছেন অথবা কলকাতা শহরে। ঘটনাস্রোতও কেবল বীরসিংহে আবদ্ধ হয়ে ছিল না। অন্যান্য স্থানের উপর দিয়েও বয়ে গিয়েছিল। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল কেবল বীরসিংহের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে আসেনি, আরও অনেকের জীবনে এসেছিল। তাঁদের সকলের কথা ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে জানবার দরকার নেই। কিন্তু যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁর জীবনের ধারাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছেন ঘটনার অন্তরালে, নবযুগের ঐতিহাসিক কর্মক্ষেত্র কলকাতা শহরে এসে যাঁরা কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তাঁদের কথা বার বার নানা [illegible]। না জানলে যেন তাঁকেও সম্পূর্ণ জানা হয় না।

[illegible] বিভিন্ন কোণ থেকে [illegible] চরিত্রটি যেমন ফুটে [illegible] এই বক্তব্যটা তাই। বিভিন্ন জীবনের ঘটনার আ[illegible] বিশেষ জীবন তার সমগ্রতা নিয়ে যেমন দৃষ্টির উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তেমন আর কিছুতেই হয় না।

বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রতিবেশীদের উপদ্রব করছেন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়ছেন, তখন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরও প্রায় তাই করছিলেন কলকাতা শহরে। তবে বীরসিংহের সঙ্গে কলকাতা শহরের যেমন পার্থক্য ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের উপদ্রবের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের উপদ্রবেরও তেমনি পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় বছর তিনেকের বড় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় ভর্তি হন, দেবেন্দ্রনাথ তখন রামমোহন রায়ের "অ্যাংলো-হিন্দু" স্কুলে ভর্তি হন। রাম-মোহনের স্কুলটি ছিল হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে। রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় দেবেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। প্রতি শনিবার বেলা দু'টোর সময় স্কুলের ছুটি হ'লে দেবেন্দ্রনাথ রমাপ্রসাদের সঙ্গে যেতেন রামমোহনের মাণিকতলার বাগানে। সেখানে গিয়ে তিনি খুব উপদ্রব করতেন। বাগানের গাছ থেকে লিচু ছিঁড়ে, কড়াইশুঁটি ভেঙ্গে, তিনি মনের সুখে খেতেন। বীরসিংহের মণ্ডলদের বাগান নয়, স্বয়ং রামমোহন রায়ের কলকাতার বাড়ীর বাগান। মনের সুখে খাবারই কথা। একদিন রামমোহন বললেন দেবেন্দ্রনাথকে—"ব্রাদার! রৌদ্রে [illegible] ক'রে বেড়াও কেন, এখানে ব'সো। যত লিচু খেতে পার এখানে ব'সে খাও।" মালীকে ডেকে তিনি লিচু পেড়ে দিতে বললেন। থালা ভরা লিচু এল, দেবেন্দ্রনাথ মহানন্দে খেলেন (১)। সামনে লোভনীয় লিচুর থাল,

---

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত : শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত : (কলিকাতা ১৩১৮) : পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামমোহন রায় যে "ব্রাদার" ব'লে সম্বোধন করতেন, তা ইংরেজী কথা নয়। ফারসী "বিরাদর" কথার অর্থ হ'ল 'ভাই'। ইংরেজী "ব্রাদার" ও ফারসী "বিরাদর" কথার ধ্বনি ও অর্থ এক রকম।

পাশে রমণীয়চরিত্র যুগগুরু রামমোহন রায়। বাংলাদেশে ক'জনের বাল্যজীবনে এরকম দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেছে? দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটেছিল। এই বাল্যস্মৃতি সারাজীবন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃদদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দু'জনের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্যে কত পার্থক্যই যে ছিল, কল্পনা করা যায় না। গ্রাম্যসমাজের কূপের মধ্যে, মণ্ডুক-পরিবেষ্টিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের দিনগুলি কেটেছে। দেবেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে, রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্যে, বর্দ্ধিষ্ণু কলকাতা শহরে, উদারতার সমুদ্রতীরে।

বীরসিংহ থেকে দূরে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে ১৮২০ সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী বন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। বয়সে দুই বন্ধু কয়েক মাসের ছোট বড় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়তেন, অক্ষয়কুমার তখন গুরুচরণ গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যারম্ভ ক'রে, আমিউদ্দীন মুন্সীর কাছে ফারসী শিখছেন এবং গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে সংস্কৃত পড়ছেন। দু'জনের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেকালের সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের ফারসী শিখতে হ'ত চাকরীর জন্য। অক্ষয়কুমার সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতামহ বর্ধমান রাজবাড়ীতে কর্মচারী ছিলেন এবং পিতা টালির নালার কেশিয়ারী ও দারোগাগিরি করতেন। ফারসী তাঁকে সেইজন্য শিখতে হয়েছিল (২)। ঈশ্বরচন্দ্রের সে সমস্যা ছিল না। তিনি ছিলেন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করে, অধ্যাপনা ক'রে জীবন যাপন করাই ছিল তাঁদের পরিবারের আদর্শ। তাই ফারসী শিক্ষার তাঁর প্রয়োজন হয়নি। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় এক বয়সে একই সময়ে কলকাতা শহরে এসেছিলেন। তার অনেক পরে দু'জনে কর্মজীবনে মিলিত হয়েছিলেন, কলকাতা শহরেই। বীরসিংহ ও চুপী গ্রামের এই দুই বালকই পরবর্তী জীবনে বাংলা গদ্যভাষাকে আধুনিক সাহিত্যের ভাষারূপে গ'ড়ে তুলেছিলেন।

কলকাতা শহরের দক্ষিণে রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোতা ইত্যাদি গ্রামে সেকালে বেশ প্রসিদ্ধ একটি বিদ্যাসমাজ গ'ড়ে উঠেছিল, স্থানীয় জমিদারদের পোষকতায়। এই বিদ্যাসমাজের পরিবেশে ১৮২০ সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়ছেন, দ্বারকানাথও তখন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ও আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে পড়ছেন। তাঁর আর একজন সুহৃদ্ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাশে রাজপুর গ্রামে ১৮২২ সালে জন্মেছিলেন। মাথায় ঝুটি বেঁধে, পাততাড়ি বগলে ক'রে তিনিও পাঠশালায় যেতেন, ঈশ্বরচন্দ্রের মতন। প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের

(২) নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত (১২৯৪ সন)।

চেয়ে তিন চার বছরের বড় ছিলেন। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে তাঁরও বাল্যকাল পাঠশালায় ও টোলে প'ড়ে কেটেছিল। বিদ্যাভূষণ বিদ্যারত্ন, তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে এসে মিলিত হয়েছিলেন, কলকাতা শহরে(৩)।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন বছর তিনেকের শিশু, নবযুগমন্ত্রের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও তখন চৌদ্দ পনের বছরের কিশোর। ড্রামণ্ডের ধর্মতলা এ্যাকাডেমিতে পাঠ শেষ ক'রে তিনি স্কুল ছেড়েছেন ১৪ বছর বয়সে দু'তিন বছর চাকরি ক'রে, ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন(৪)। পাততাড়ি বগলে ক'রে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তখন সবেমাত্র বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালায় যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক হরচন্দ্র ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলেই তখন হিন্দু কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন তখন।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন তালপাতা থেকে কলাপাতায় লেখা আরম্ভ করেছেন। সকল রকমের বাংলা অক্ষর লিখতে, নাম লিখতে চিঠিপত্রাদি লিখতে শিখছেন তিনি। শুভঙ্করের অঙ্ক শিখছেন, নামতা মুখস্থ করছেন। কালীকান্তর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে দাগা বুলোচ্ছেন। বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালায় যখন এই শিক্ষা চলেছে, তখন কলকাতা শহরে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল দলের ভাবী নায়কদের শিক্ষা দিচ্ছেন। গুরুমশায় কালীকান্ত তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন শুভঙ্কর, আর নবীন বাংলার তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন বেকন, হিউম, লক্, পেইনের নতুন সমাজ-দর্শন ও জীবনদর্শন। ইতিহাসে একই সময়ে এইসব ঘটনা ঘটছে। বীরসিংহ গ্রামে ও কলকাতা শহরে। ১৮২৬ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে।

শুভঙ্করের দেশে বেকন, হিউম, লক্, টম পেইনের আবির্ভাব হয়েছে, একথা গুরুমহাশয় কালীকান্ত বা তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেউই জানতেন না। ডিরোজিও বা তাঁর ছাত্ররাও তখন জানতেন না যে বেকন, হিউম, লক্, পেইনের আদর্শের সুযোগ্য ধারক ও বাহক বাংলার এক অখ্যাতগ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালায় শুভঙ্করের অঙ্ক

(৩) হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (১৯০৯ সাল)। জীবনচরিতের "বাল্যজীবন" অংশ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বরচিত।

(৪) হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগ-তারিখ, তাঁর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস ১৮২৮ সাল ব'লে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ ১৮২৭ সালও বলেন। কিন্তু ১৩ই মে, ১৮২৬ সালের "সমাচার-দর্পণ" পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়: "ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন···"। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (১ম খণ্ড) গ্রন্থের "ডিরোজিও" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

করছেন এবং পত্রলেখা লিখছেন। নবযুগের আদর্শের নতুন মহাতীর্থ কলকাতা মহানগরের মহাপাঠশালার একই প্রাঙ্গণে তখনও তাঁদের মিলন হয়নি।

কলকাতা শহরের সমাজ তখন কোন্ পথে চলেছে? বাঙালী সমাজ?

বাংলার সমাজবিন্যাসে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে এর মধ্যে এবং তার শেষ হয়নি, তখনও হ'চ্ছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ ও ১৮২৫ সালে "কলিকাতা কমলালয়" ও "নববাবুবিলাস" নামে দু'খানি বই লেখেন। ব্যঙ্গরচনা হলেও, বাঙালী সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের যে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে তাঁর রচনার মধ্যে, তা খুবই মূল্যবান।

"কলিকাতা কমলালয়ের" মধ্যে বিষয়ী ভদ্রলোকদের তিনটি ধারাতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, "অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করিয়া থাকেন," এবং "অপূর্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পাল্কী বা অপূর্ব শকটারোহণে কর্মস্থানে গমন করেন"। দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত লোক, "অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন"। রীতিনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার প্রায় একই, "কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।" তৃতীয় ধারাকে ভবানীচরণ "দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক" বলেছেন এবং চারিত্রিক ধারা এদেরও প্রায় একরকম ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, "কেবল আহার ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম করিয়া থাকেন"। এছাড়া, "অসাধারণ ভাগ্যবান" বলে আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর কথা ভবানীচরণ বলেছেন, "ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমিদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়"(৫)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, কলকাতা শহরে, বাঙালী সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর বিকাশ হ'চ্ছে কিভাবে, তার মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়, 'কলিকাতা কমলালয়ে'র এই বিশ্লেষণ থেকে। প্রধানত: এখানে বিষয়ী ভদ্রলোকদের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা চাকরিবাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে বিত্তবান ও ভদ্রলোক, দুইই হয়েছেন, তাঁদের কথা। এ এক নতুন ধরনের সমাজবিন্যাস। এরকম সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। বিষয়কর্মে ধনসঞ্চয় করলে সামাজিক উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তখন। যেমন আমাদের দেশে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, কি অন্যান্য বণিকশ্রেণী কোনদিনই ব্রাহ্মণবৈদ্যের মতন সামাজিক মর্যাদা পাননি। সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা মধ্যযুগে ছিল কুলগত বা বংশগত, বিত্তগত নয়। নবযুগের শ্রেণীমর্যাদা যখন বিত্তগত হ'ল, তখন আমাদের শ্রেণীবিন্যাসের ধারারও পরিবর্তন হ'ল(৬)। পরিহাসছলে হলেও, এই নতুন সমাজবিন্যাসের ধারার ইঙ্গিত করেছেন ভবানীচরণ, তাঁর "নববাবুবিলাস" গ্রন্থে এইভাবে: "ধন্য ধন্য ধার্মিক ধর্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্টনিবারক সংপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া···কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···(৭)।" এই ধনাঢ্যদের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণ মন্তব্য করেছেন, "ইহারা অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত"। একশ'বছর আগেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এই শ্রেণীর ধনিকদের সামাজিক প্রতিপত্তির কথা কল্পনা করা যেতনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্যাসে ভাঙন ধরেছিল। বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের যুগের আবির্ভাব হয়েছিল। নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক উচ্ছিষ্টভোগী ছিলেন তাঁরা। এমনকি, প্রথমযুগের ইংরেজ শাসক ও বণিকরা পর্যন্ত ইতিহাসে "নবাব" বলে পরিচিত হয়ে আছেন। মুসলমান নবাবদের আমল পলাশীর যুদ্ধের পর শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন ইংরেজ ও বাঙালী নবাবদের আমল তারপর আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে এই ইংরেজ-বাঙালী হঠাৎ-নবাবদের আমিরীর যুগ অস্তাচলে গেল। বিলীয়মান নবাবদের বংশবৃক্ষে ভদ্রলোক ও বাবুনামে বিভিন্ন স্তরের মধ্যবিত্তশ্রেণী পল্লবিত হয়ে উঠল।

তবু ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে ও বাল্যজীবনে, কলকাতার বাঙালী সমাজে, একেবারেই যে সেই অস্তগামী বিকৃত নবাবী কালচারের কোন জেরই ছিল না, তা নয়। তার ভগ্নাবশেষ যথেষ্ট ছিল। ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দে'র দুই প্রসিদ্ধ পুত্র সাতুবাবু ও লাটুবাবুর বিবাহ হয়। গবর্ণমেন্ট গেজেটে ইশ্‌তেহার দিয়ে রামদুলাল সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। "ইংলণ্ডীয় সাহেবদের" জন্য দু'দিন নির্ধারিত হয় এবং জানানো হয় যেন "ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া" সাহেবরা "নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন।" চারদিন ঠিক হয় "আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের" জন্য এবং "তাঁহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন," এ রকম ব্যবস্থা করা হয়।

১৮২০ সালে রামরত্ন মল্লিকও তাঁর পুত্রের বিবাহ দেন। সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়, "এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই।" বিবাহে যে রকম সমারোহ হয় তাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে হইতে পারে না।" লোকের মুখে মুখে কেবল বিবাহের কথাই

---

(৫) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কলিকাতা কমলালয়: "রঞ্জন পাবলিশিং হাউস" কর্তৃক "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায়" পুনর্মুদ্রিত।

(৬) Alfred Von Martin: Sociology of the Renaissance (London 1945): ৫—১ পৃষ্ঠা।

(৭) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: নববাবুবিলাস: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায়" পুনর্মুদ্রিত।

শোনা যেত। "সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই (৮)।"

হিন্দু উৎসব-পার্বণেরও একটা নতুন ইঙ্গবঙ্গ রূপ তৈরী হয়েছিল। দুর্গোৎসবে সাহেবরা যেতেন, বাইজীর নাচ ও খানাপিনা হ'ত তাঁদের জন্য। নবাবী আমলের বংশানুক্রমিক আভিজাত্য যাঁরা তখনও ছাড়তে পারেন নি, এবং নতুন সামাজিক মর্যাদার দিনেও যখন সেই ী আভিজাত্য কিছুটা বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল, তখন লী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেকেই খানাপিনা ও বাইজী হ সাহেবদের আপ্যায়িত করতেন। অতিথি-আপ্যায়নের জিক রীতি ছিল তাই, বিশেষ ক'রে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী সমাজে। লের ধনিকরা হোটেলে খানাপিনা নৃত্যসহ আমন্ত্রিতদের ায়ন ক'রে থাকেন। সেকালে যখন হোটেলের তেমন প্রতিষ্ঠা ও র হয়নি, তখন ধনিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের গৃহে বা নবাড়ীতে ঐ একই প্রথায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করতেন।

১৮২৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ র করেন। তাতে তিনি অনেক "ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীর- ক নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন ইয়া পরিতৃপ্ত" করেছিলেন এবং "ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম ও ইংলণ্ডীয় বাদ্যশ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে" সাহেবরা যথেষ্ট আমোদ ছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানারকম সং সেজেছিল এবং "তাহার একজন গো বেশ ধারণপূর্বক ঘাস চর্বণাদি করিল (৯)।"

১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস (Fanny Parkes) নামে ন মহিলা কলকাতা শহরে এসে কিছুদিন ছিলেন এবং তখনকার জ ও বাঙালী অভিজাত মহলে মেলামেশা করেছিলেন। াকার কলকাতার পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"Calcutta gay in those days"—গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রচুর পার্টি —"Parties numerous at the Government ise"—এবং এদেশী ধনিকদের গৃহে ভোজসভা ও বলনাচও হ'ত —"Fancy and dinner balls amongst the abitants." ১৮২৩ সালের মে মাসে রামমোহন রায়ের াতে একটি ভোজসভা হয়েছিল। সেই সভার বর্ণনা দিয়েছেন ন এইভাবে: "সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একজন ধনী বাঙালী রামমোহন রায়ের বাড়ীতে ভোজসভায় গিয়েছিলাম। প্রচুর া দিয়ে বাড়ী ও বাগান সাজান হয়েছিল, বাজীও যথেষ্ট পোড়ানো ছিল। গৃহের বিভিন্ন কক্ষে নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। ভোজ হবার পর ভারতীয় জাদুকররা নানারকম মজার খেলা দেখাল; তরবারি গিলে ফেললে, কেউ বা মুখ দিয়ে আগুন ও ধোঁয়া করলে। একজন ডানপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, বাঁ পা পিছন থেকে ঘুরিয়ে কাঁধে আটকে দিল।" আর একজন ধনী লী বাবুর বাড়ীর দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে ফ্যানি লিখেছেন যে উৎসবে বহু ব আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং 'গাণ্টার এ্যাণ্ড হুপার' কোম্পানী র খাদ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন। বরফের সঙ্গে ফরাসী মদ্য তাঁদের পান করতে দেওয়া হয়েছিল। দলে দলে নর্তকীরা বিভিন্ন কক্ষে নাচগান করছিল, হিন্দুস্থানী গান(১০)।

কলকাতা শহরের প্রকাশ্য উৎসবেও নর্তকীরা তখন নেচে বেড়াত বলে মনে হয়। ১৮২২ সালে কলকাতা শহরের একটি চড়ক উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি পার্কস। স্বচক্ষে তিনি উৎসবটি দেখে লিখেছেন: "সন্ধ্যার দিকে কালীঘাটের পথে বাগ গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা হলাম। দেখলাম, পথের দু'ধারে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে। বিচিত্র সাজগোজ ক'রে সব চড়ক পার্বণ দেখতে এসেছে। পিঠে হুক বিঁধিয়ে সন্ন্যাসীরা সব পাক খাবে, তার তোড়জোড় চলেছে। বৈরাগী সাধুও ছিল অনেক। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই উৎসবটি খুব প্রিয় দেখা যায়। কেরাঞ্চি গাড়ীতে চড়ে দলে দলে নর্তকীরা এসেছে, গহনাগাটি ও ঝলমলে রঙিন সাজপোসাক পরে। তাদের সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক বাবুরাও এসেছেন। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, চড়কের এই দৃশ্য দেখার জন্য। কলকাতার সেনাবিভাগ থেকে চারিদিকে সেণ্ট্রী মোতায়েন করা হয়েছে, ভিড় ঠেকাবার জন্য(১১)।"

১৮২২-২৩ সালের কথা। ঈশ্বরচন্দ্র তখন তিন বছরের শিশু। গামের গুটি ও মণ্ডলদের কোলেপিঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছেন। বীরসিংহে ধর্মঠাকুরের গাজন তিনিও ছেলেবেলায় দেখেছেন, কিন্তু ফ্যানি পার্কস কালীঘাটে যে গাজন দেখেছিলেন, সে রকম গাজন নয়। কলকাতার ধনিক ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে, উৎসব পার্বণের যে ইয়োরোপীয় রূপান্তর হচ্ছিল, মল্লিকদের বাড়ী রাসলীলায় যে সাহেব বিবিদের নাচ হ'ত, তা তাঁর কলকাতাবাসী অন্যান্য সহকর্মী ও বন্ধুদের ছেলেবেলায় দেখবার সুযোগ হলেও, তাঁর হয়নি। দরিদ্র ধীবর ও চাষীপ্রধান গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল, ছেলেবেলাও কেটেছিল তাদেরই সাহচর্যে। দুর্গোৎসব তিনিও দেখেছিলেন, কিন্তু গামছা ও চিঁড়েমুড়ির ফলার সহযোগে। 'গাণ্টার এ্যাণ্ড হুপার' কোম্পানীর ফরাসী মদ্য (বরফসহ) পরিবেশন দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। নিকী বা নাম্নিজান নর্তকীদের হিন্দুস্থানী রীতির নাচ দেখারও তাঁর সুযোগ হয়নি। হাজার টাকা কি ছিল তাদের। দরিদ্র গ্রামের সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করেও "Catalani of the East"-দের নাচানো সম্ভব ছিল না। গাঁয়ের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট নতুন আনকোরা ধুতি শাড়ী পরে, উৎসব প্রাঙ্গণে হাত ধরাধরি ক'রে নাচত এবং পূজান্তে ইক্ষুখণ্ড প্রসাদ পেলেই প্রচুর আনন্দ পেত। দুষ্টবুদ্ধি ঈশ্বর তাতেই খুশী হতেন। রামদুলাল দে ও রূপলাল মল্লিকরা তখন গ্রামে বাস করতেন না। গ্রাম ছেড়ে তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে নতুন শহরে এসেছেন এবং ধনোপার্জনের সমস্ত অভিনব সুযোগ গ্রহণ ক'রে ধনকুবের হয়েছেন। ছাতুবাবু ও লাটুবাবুদের বিবাহ তাই আর গ্রামে হওয়া সম্ভব নয় এবং হলেও তাতে হাতির পিঠে হাওদায় চ'ড়ে শোভাযাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু ইংরেজী, আরবী, মোগলাই ও হিন্দু রীতিতে অভ্যর্থনা করা বা ঐশ্বর্যের

---

(৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড থেকে গৃহীত।

(৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ঐ

(১০) Fanny Parkes: Wanderings of a Pilgrim in search of the picturesque etc: 2 Vols (London 1850) Vol I, Ch. 4.

(১১) Fanny Parkes: ঐ, তৃতীয় অধ্যায়।

খেলা দেখানো সম্ভব নয়। এসব কিছুই দেখেন নি ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায়। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজিয়ে, পাল্কী চ'ড়ে, বরযাত্রা তিনি দেখেছেন, কিন্তু তার আরবী-মোগলাই বা ইয়োরোপীয় রূপ কি রকম হ'তে পারে, তা দেখার সুযোগ তাঁর হয়নি।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহর বেশী দূর নয়। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল, আট বছর ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে কাটিয়েছেন। সম্পূর্ণ ছেলেবেলা। নতুন শহরের গল্প গ্রামের লোকের মুখে, বিশেষ ক'রে পিতা ঠাকুরদাসের মুখে, তিনি নিশ্চয় বহুবার শুনেছেন। ঠাকুরদাস যখন মধ্যে মধ্যে কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরতেন, তখন তাঁর মুখ থেকে তিনি রূপকথার মতন কলকাতার কথা শুনতেন। নতুন যুগের, নতুন আজব শহরের রূপকথা।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কলকাতার যে সামাজিক চিত্র এর মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা আংশিক চিত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ফ্যানি পার্কস্ বর্ণিত নাচগান-পান-মশগুল কলকাতার অন্তরালে আর একটি কলকাতাও সঙ্গে সঙ্গে গ'ড়ে উঠছিল। নবযুগের নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতি-কেন্দ্র, নতুন জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালকে পুরোপুরি "রামমোহনের যুগ" বলা যায়। রামমোহনের স্থায়ী বসবাসের পর থেকে কলকাতা শহরে এই যুগের অভ্যুদয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই রামমোহন নবযুগের ঐতিহাসিক দিক্‌নির্ণয়ের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম "বেদান্তগ্রন্থ" (১৮১৫) তিনি প্রকাশ করেছেন। বিচার বিতর্কও আরম্ভ করেছেন পূর্ণোদ্যমে—"উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার" (১৮১৬-'১৭), "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" (১৮১৭), "গোস্বামীর সহিত বিচার" (১৮১৮), "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" (১৮১৮ ও ১৮১৯), "কবিতাকারের সহিত বিচার" (১৮২০), "সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার" (১৮২০) ইত্যাদি। কেবল ভোজসভা নয়, তার সঙ্গে এই সব বিচার বিতর্কের সভাও শুরু হয়েছে। যুগপথিক রামমোহন নতুন যুগের পথনির্দেশ করতে আরম্ভ করেছেন।

নতুন মহাবিদ্যালয় "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিরোজিও ১৮২৬ সাল থেকে তার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ইয়ং-বেঙ্গল দল তাঁর কাছে নবযুগের নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। ভোজসভার নাচ-গান-হল্লা থেকে দূরে, পটলডাঙ্গার কলেজগৃহে, ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, বেকন্-লক্-হিউমের জীবন-দর্শন ও সমাজ-দর্শন নিয়ে বিতর্কসভা বসছে।

বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। মেঘ জমছে কলকাতার আকাশে। বিদ্রোহের মেঘ।

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হ'চ্ছে। ১৮২১ সালে কলকাতা শহরে একটি "সংস্কৃত কলেজ" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। ১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বহুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। কোম্পানীর ডিরেক্টররা এদেশবাসীর শিক্ষার জন্ত সামান্ত যে অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তা সেকালের সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যয় করা হবে এবং যুগোপযোগী নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হবে না, এই আশঙ্কা ক'রে রামমোহন, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে, ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর, বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন (১২)। ইংরেজরা তাঁদের শাসন ও শোষণের স্বার্থে চেয়েছিলেন, এদেশের লোকের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত না দিতে। সেই স্বার্থ থেকেই তাঁরা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। রামমোহনের সেরকম কোন স্বার্থ ছিল না, থাকার কথাও নয়। তাঁর একমাত্র স্বার্থ ছিল, পশ্চিমের দ্বার খুলে যাওয়ায়, নতুন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য-দর্শনের যে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সকলের সহজলভ্য হয়েছিল, এদেশের শিক্ষার্থীদের তার মণিরত্ন আহরণের সুযোগ দেওয়া। ইংরেজরা চেয়েছিলেন, ঘুমন্ত জাতির ঘুম না ভাঙিয়ে যাতে কার্য উদ্ধার করা যায় তাই করতে। রামমোহন চেয়েছিলেন, প্রথমে ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙাতে, নতুন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোকস্পর্শে তাদের জাগিয়ে তুলতে। তাই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৬ সালের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ গোলদীঘির নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করে, হিন্দু কলেজ ও স্কুল-সহ। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন ছ'বছর বয়স। বীরসিংহে কালীকান্তের পাঠশালায় তিনি পড়ছেন। কলকাতার গোলদীঘিতে তখন জাতীয় জাগরণযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি চলেছে।

এর মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্যম্পশ্যারাও প্রথম সূর্যের আলোক দেখেছেন। স্ত্রীশিক্ষার কথাও আলোচনা হ'চ্ছে কলকাতা শহরে। কলকাতার ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি হিন্দু কন্যাদের শিক্ষার জন্ম ১৮১৯ সালে "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। মিস্ কুক ইংলণ্ড থেকে এদেশে আসার পর ১৮২১ সালে "Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity"—এই নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। কুমারী কুক প্রথম একজন বাঙালী শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন (১৩)। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বলিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব স্কুলের নাম ছিল—জুভেনাইল স্কুল, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল—

---

(১২) Address from Rammohan Roy to the Governor-General protesting against the establishment of the Calcutta Sanscrit College (Dec. 11. 1823);

Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India (A selection from records): ED. by J. K. Majumdar: ২৫০-২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) Lushington: The History, Design and Present state of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta. (Calcutta, Hindostanee Press, 1824): ১৮৫—১৯১ পৃষ্ঠা, এবং ১৯২—২০৭ পৃষ্ঠা।

"named after the place in which the Ladies reside"—(১৪)।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য, জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে, "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে। ইতিহাস থেকে অনেক হিন্দু বিদুষী মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার ক'রে, স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নয়, লেখক তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। লেখক কোন বিদেশী পুরুষ বা মহিলা ন'ন। ড্রামণ্ড বা শেরবোর্ণের স্কুলে বা হিন্দু কলেজে শিক্ষিতও ন'ন। এদেশেরই একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

কলকাতার অন্তঃপুরে তখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকরা আলাপ-আলোচনা করছেন। গৌরমোহন তাঁর পুস্তকের "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অধ্যায়ে তার চমৎকার নমুনা দিয়েছেন, একেবারে দেশী ভাষায় (১৫):

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে ; কেন না এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাযকর্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা।—ইত্যাদি।

(১৪) The Calcutta Journal : March 11. 1822.

(১৫) গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার : স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক। ১৮২৪ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা)।

কলকাতার অন্তঃপুরে এই কথাবার্তা হচ্ছে। কলকাতার বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা হ'চ্ছে। ভোজসভায় নাচগান হ'চ্ছে, রাসলীলায় সাহেববিবিরাও নৃত্য করছেন। একেশ্বরবাদের পক্ষে এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন পূর্ণোদ্যমে বিচারবিতর্ক আরম্ভ করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের বৈঠকখানায় এবং গোলদীঘিতে বেকন, লক্, হিউম, পেইনের বিতর্কসভা বসেছে।

এদিকেও বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তর পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের। গুরুমহাশয় কালীকান্ত "সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।" তাঁর পাঠশালায় ছাত্রেরা "অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত।" এজন্য তিনি "উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" ঈশ্বরচন্দ্রও অল্প সময়ে উত্তমরূপে শিক্ষা করতে পেরেছিলেন।

পাঠশালার পাঠ শেষ হয়ে গেল। কালীকান্ত একদিন ঠাকুরদাসকে বললেন—"আমার পাঠশালায় যা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরের তা হয়েছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়।"

[ক্রমশঃ।

"...পলাশীর লড়াইএর কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইসিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।"

[পূর্ব-প্রকাশিতেব পব]

নীলকণ্ঠ

যতই হাস্যকর হ'ক সেই বিজ্ঞাপন, একমাত্র তারই সঙ্গে তুলনা চলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব আগের কলকাতার সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতাব বিপুল পরিবর্তনের। সেই,—যে সচিত্র বিজ্ঞাপন, যাতে ধুঁকছে এমন একটি লোককে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এত বড় করা হয়েছে যে, সে অনায়াসে হাতীকে এক হাতে তুলে নিয়েছে মাথার ওপর; অর্থাৎ শুধু বোঝাবার জন্তে যে ঔষধ খেতে মিছেই বলা নয়; এমন একটি ওষুধের কথা সত্যি সত্যি বলা এখানে যা খাওয়ার আগের অবস্থার সঙ্গে খাওয়ার পরের অবস্থার এমনই বিষম পার্থক্য! আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপের মতই যেন কিসের ছোঁয়ায় রাতারাতি বদলে গেছে কলকাতা।

কিন্তু আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপে শুধুই কি বিস্ময় ছিল? না, সেই আশ্চর্য আলোর আরেক দিকে পড়েছিল বেদনার ছায়া। প্রদীপ পাবার আগে যে ছিল নিঃস্ব, প্রদীপ হাতে আসবার পর সমস্ত পৃথিবী মুঠোয় পেয়েও সেই মানুষ তবু কেন তা-হ'লে নিজেকে মনে করেছে নিঃসহায়? সব পাবার পরেও কিছু না পাওয়ার ট্রাজেডীর আগুনেই সকল কালে আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপ হয়েছে আলো! স্বপ্নাতীত সাফল্যের ছেলে-ভুলোন রূপকথার অংশে নেই সেই আশ্চর্যের ইঙ্গিত। সমস্ত সাফল্যেব শেষে যে অকারণ নির্মম ব্যর্থতা বোধ, তাতেই সে করেছে বিস্মিত, বিমূঢ়। আত্মীয়-রক্তে কলুষিত কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন থেকে জয়ী হয়ে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আসন্ন মুহূর্তেও, সংগ্রাম-সাঙ্গ সেই স্বর্ণ-সন্ধ্যায় যুধিষ্ঠিরের চোখের কোণে চিক্‌চিক্‌ করে উঠেছিল, গভীর আনন্দ নয় সুগভীর বেদনা। আলেক্যাণ্ডাব ভূমারথি মাস্টেরিয়ার্স দিগ্বিজয়ের প্রান্তে এসে দিক হারানোর চিরন্তন ট্রাজেডী। মানুষের নির্মম নিয়তি। প্রকৃতির দুরন্ত পরিহাস!

কলকাতা যত না রাতারাতি বদলেছে, তার চেয়েও মেক-আপ বদলেছে তারাই অনেক তাড়াতাড়ি যারা রাতকে দিন আর দিনকে রাত করার জেনেছে মন্তর। চোরা-গলির অন্ধকার পথে যাতায়াত করতে করতে কোন্ সময়ে তারা বড় রাস্তায় বানিয়েছে বাড়ি, যার ছাদ থেকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় আকাশকে। তারপর যেতে-আসতে এক সময়ে আবার সেই যে পিছল পথে মুখ-থবড়ে পড়েছে, আর পারেনি উঠে দাঁড়াতে। আর পারেনি সেই সঙ্গেই এবং আর কোন দিন পারবেও না উঠে দাঁড়াতে এই অবাক-সহর কলকাতা; পারবে না সে আর সুস্থ হ'তে, সহজ হ'তে স্বাভাবিক হ'তে; পারবে না আর সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াতে। ক্ষয়ের 'ঘুণ' ধরিয়ে দিয়ে গেছে তার শিরদাঁড়াতে যুদ্ধের বিষ।

যুদ্ধে যাদের জীবন গেছে, বেঁচে গেছে তারা। যারা বেঁচে আছে জীবন-যুদ্ধে তারাই আজ মার খাচ্ছে, যুদ্ধের জীবনকালে নিজেদের অবস্থা গুছিয়ে নিয়েছে যারা, তাদের হাতে। শাণ-বাঁধানো শহরের পাষাণে নিজের হাতে খোদাই করে দিয়েছে সেই কথাই এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সেই করেছে কলকাতার হৃদয় হরণ।

উনিশশ' পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত কলকাতা ছিলো কেরাণীর শহর। সে শহরের ঘুম ভাঙতো সকাল দশটায়; রাত ন'টায় ফের ঘুম আসত তার চোখে। ঢিলে-ঢালা, হাইতোলা, অলস, অনন্ত অবসরের একমাত্র কাজ ছিল আড্ডা। সে-কলকাতার উদ্বেগ ছিল অল্প; উত্তেজনা ছিল অনুপস্থিত। রসদের অভাব হয়নি তখনও মর্মান্তিক; তাই রসের গল্পে মজে ছিল যারা, তারা বেশ ছিল। উনচল্লিশ সালে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে গৃহাঙ্গন হয়েছে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ; কিন্তু তখনও বেশ কাটছে কলকাতায়; আবেশ কাটছে না তখনও। ঘুম ভাঙবার আগের মুহূর্তে আবার ভালো করে চাদর মুড়ি দেবার মত। তার পর একদিন ঘুম ভাঙল কুম্ভকর্ণের; 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেছে চতুর্দিকে। ভারত-ভাগ্য-বিধাতা তখনও ইংরেজ। তাঁরা যুদ্ধের সাজ দিতে গেল ভারতবর্ষকে। কিন্তু বাধ্য হলেও বধ্য হ'তে চাইল না এবার কংগ্রেস। দু'-এর টানাটানির মাঝে পড়ে এ-দেশের মানসচিত্র হ'ল বিচিত্র। তারই প্রতিক্রিয়ায় কলকাতা সৈনিক সাজতে গিয়ে সং সাজল। প্রতিরোধ-উপকরণের অভাবে, পরাজয়ের পর পরাজয়ের সঙ্গে তাল রাখা সাফল্যমণ্ডিত পশ্চাদপসরণের লজ্জা ঢাকতে গ্যাস বাতির কাচের

করা হ'ল কালো। ঘরের জানলায় মারা হল কাগজ। সার্কাসের ক্লাউনের অভাবে এলো এ-আর-পি-রা। লোকে বললে, এ-আর-পি নয় এয়ার্কি। পোষ্টার পড়ল দেওয়ালে-দেওয়ালে; দেশরক্ষার আহ্বান। লোকে বললে: পোষ্টার নয় ইস্পাষ্টার।

দশটার আগে ঘুম ভাঙ্গতো না যে শহরের, ভোর পাঁচটার আগেই জেগে উঠল সে। শঙ্খধ্বনিতে নয়; সাইরেণের শব্দে। নিশীথ কলকাতার কালো রাতের পাথায় ভর করে হেঁকে গেল 'বজ্রগর্ভ মেঘ' এক। স্পীটফায়ার, ভ্যাম্পায়ার, যেমন তাদের নাম তেমনি তাদের আওয়াজ। কিন্তু শূন্য-কুম্ভ নয় তারা; বরং পূর্ণগর্ভ; পূর্ণবজ্র-গর্ভ।

র‍্যাশনের থলি-হাতে সদ্যোজাতরা শুরু করল জীবন। রূপোর চামচ নিয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য হয়েছিল যাদের তারাও কাঠ-খড়-কেরাসিনের খবর করতে রোদে পুড়তে লাগল, ভিজতে লাগল জলে।

রকে বসে নরক গুলজার করত যারা তারাও দাসত্বের স্বর্গে উন্নীত হল যুদ্ধের কৃপায়। তার পর এক দিন 'খাকী'-দের দেখা গেল কোলকাতায়। জানা গেল সব চেয়ে সিভিল এ-শহরও আর নয়,—সিভিলিয়ানদের। 'নিখাকীর মা'-রা যেমন কিছুই খায় না, তেমনি 'খাকী'-পরাদের দেখা গেল অখাদ্য বলে নেই কিছুতে বীতস্পৃহ; অগম্য বলে নেই কোনও জায়গায় যাওয়ার বাধা। দূর থেকে দেখলেই পথ ছেড়ে দেয় সবাই। খেঁকী কুত্তার মতই, 'খাকী'-কুর্তা যাদের গায়ে তারা কখন কী করে বসে তার ঠিক কি।

হলিউড-মার্কা ছবি দেখেই মার্কিণ-জীবনের সঙ্গে আমাদের ছিল যেটুকু পরিচয়; হলিউডের আনন্দোলি উৎসবের সত্যিকারের চেহারা দেখা গেল যুদ্ধের কলকাতায়। মার্কিণ জীবনের, তার উর্দ্ধশ্বাস জীবনযাত্রার জয়ধ্বনি করল কলকাতা। অনুকরণের সহজ পথ ধরে এল অধঃপতনের দ্রুত নীচে নামা। ভদ্র পোষাক ত্যাগ করে অর্দ্ধ-পোষাকে আবরণ হীনের চেয়ে উলঙ্গ হলাম বেশি। বুশ-সার্ট, ট্রাউজার আর স্লিপার অঙ্গের ভূষণ; এ্যমেরিকান সিগারেট ঠোঁটের কোণে। জোড়াতালি ইংরেজির অর্দ্ধস্ফুট উচ্চারণ মুখের ভাষণ। দু' পা যাবার জন্তে তখন বাস নয়, ট্যাক্সী। মুখে দেবার জন্তে ঘরের রান্না নয় হোটেলের কেবিন। কারণ মার্কিণ-জীবনের আদিতে এবং অন্তে একই কথারই পুনরাগমন: স্পীড। পরাধীন-গোলাম থেকে তখনও আমরা স্বাধীন-বাঁদর হইনি। মধ্য পথে এলো এ্যামেরিকান সৈন্ত; গ্যাবাডিনের জৌলুষ দিয়ে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল চোখ। ইংরেজ আমাদের করে রেখেছিল অনুর্বর। মার্কিণরা আমাদের করে রেখে গেল বর্বর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় জীবন সুরু করল যে-তরুণেরা;—অর্থাৎ লাইফ ষ্টার্ট করল যারা তারা জীবনের আরম্ভেই আপষ্টার্ট হয়ে গেল।

বিশ লক্ষ লোকের শহর এই কলকাতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হয়েছে ষাট-সত্তর লক্ষ লোকের। কিন্তু তারা লক্ষ্যহীন প্রায় সবাই; উদ্দেশ্যহীন; উত্তমবিহীন জড়পিণ্ড। মধ্যবিত্ত বাঙালীর আজকের দিনটাই যে শুধু খারাপ তা নয় আগামী কালটাও তার অনিশ্চিত,—সত্যিকারের খারাপ খবর হচ্ছে তাই।

যুদ্ধের জৌলুষ আজ নেই। কাঁচা-টাকা উবে গেছে পাকা-ঘুঘুদের পাকে-চক্রান্তে। মধ্যবিত্ত-বাড়ীর ছেলেরা আবার বসতে সুরু করেছে রকে। উদ্বাস্তরা এসেছে পঞ্চাশ টাকার বাড়ীতে দেড়শ' টাকা ভাড়া দিতে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ছিল বিয়ের সমস্তা; আজ তারা বাপের সংসার চালাতে হয়েছে বহু জনের কাছে অন্যায় বলি। সরকার বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের আকাশ-কল্পনায় বেশি মশগুল। বড়লোকেরা আশায় আছে আরেকটি যুদ্ধের; একদম তলার লোকরা,—সব চেয়ে নিশ্চিন্ত। তাদেরই জন্তে গণনাট্য থেকে গণ-আন্দোলন সব। তাদের ভয় নেই। কোনও দিন যদি ভয় থেকেও থাকে, ভবিষ্যতে আর থাকবে না কিছুতেই।

মধ্যরাত্রি থেকে ভোর পর্যন্ত পানোন্মত্ততার পর যে অবসাদ অনিবার্য, একমাত্র তারই সঙ্গে তুলনা চলে যুদ্ধ-পরবর্তী কলকাতার। তাই কলকাতার প্রতিটি ছায়াচিত্র-প্রেক্ষাগৃহের সামনে এখনও লম্বা 'কিউ'। কিউ নয় শুধু, আমার কাছে তা একটা মস্ত 'q'-ও বটে; যথার্থ প্রকাণ্ড question; বিরাট জিজ্ঞাসা। সিনেমায় আর রেস্তরাঁয় দর্শন-ভোজন-বিলাসের এই ব্যবস্থা জোগাচ্ছে কে?

জিজ্ঞেস করেছিলাম একজনকে। ভদ্রলোক রোজ খেতে আসতেন হোটেলে। একা। তাঁকে বললাম: বাড়ীর সবাইকে বঞ্চিত করে আপনি রোজ এখানে খান;—আপনাকে গুলী করা উচিত।—ভদ্রলোক বললেন: বুঝি; কিন্তু নিরুপায়। বাড়ীর সকলকে নিয়ে এখানে খাওয়া কালোবাজারের টাকায় ছাড়া অসম্ভব। বাড়ীতে যা খাওয়া জোটে সে খাওয়া খেয়ে আপিসের হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটা সম্ভব নয়। আমার রোজগারেই যখন সংসার নির্ভর তখন অন্ত আর পাঁচজনকে না-মারবার জন্তেই আমায় বেঁচে থাকতে হবে। তাই, দুধের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে একদম ছোট বাচ্চাটার কথাটা মনে পড়ে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে, মাসের শেষে ঐ ক'টা টাকা নিয়ে যেতে না পারলে—

ভদ্রলোকের গলা ভারী হয়ে আসে। আর ঘাঁটাই না। ওই রকম এক জন নয় অনেক জনেরই হোটেলে বসে খেতে খেতে চোখের জলে খাবার ভেসে যায়। সে-খাবার শুধু বিস্বাদ হয় না; বিষ হয়ে যায়!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কলকাতাকে দিয়েছে ভালো খাবারের স্বাদ; ভালো পোষাকের সন্ধান; আর মন্দ মেয়ের সান্নিধ্য। তার জন্তে শুধু টাকায় কুলোয় নি; প্রয়োজন হয়েছে কালো টাকার। কালো বাজার আলো করেছে কলকাতার মধ্যরাত্রি। তার 'দিন'-কে করেছে কর্মব্যস্ত, নিদ্রা-কে ব্যাহত; ঘরের চিন্তাকে অপসারিত।

অথচ আশ্চর্য এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'দাগ' রইবে না বাংলা সাহিত্যে। যেন তা ঘটে নি। হয় নি তের শ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ; দেশ-ভাগ হয়ে পথে এসে দাঁড়ায় নি পূর্ববঙ্গের মানুষেরা সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে; পশ্চিম-বাঙলার ফুটপাথে, ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, বস্তির অন্ধকারে উদ্বাস্তু কলোনীর আজ-এখান কাল-ওখানকার অনিশ্চিত ভিখিরীর আখড়ায়।

বিশ্বপ্রেমে মশগুল বাংলা সাহিত্য নিজের দেশের কথা বললে নিজেকে মনে করে প্রাদেশিক ভাবাপন্ন; স্বজাতির কথা ভাবলে তার আন্তর্জাতিক সাহিত্যের জাতে ওঠায় বাধা পড়ে। বাইরে প্রতিপত্তি চাই তার; ঘরে হোক না চাল-বাড়ন্ত। যে-খবর বলতে চায় না খবর; চিত্রে যা উপস্থিত হয়েও সবাক নয়; চলচ্চিত্রে যা সবাক হবার চেষ্টাতেই সেন্সরড্; বেতারে যা বললে তাল কেটে যায় শান্তির, গ্রামোফোনে রেকর্ড হবার নয় যা; সাহিত্যেই তার একমাত্র আশ্রয়; সকল কালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে নিজের দেশ ও কালের কথা বলবার স্পর্ধা রাখেন শুধু ভারতী। মূঢ়-মূক-নির্বাকজনের মুখে জোগান চিরকালের ভাষা। তাই

মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য বাংলা দেশের বেদনায়ও আনন্দে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়; নয় অণুপরিমাণ উত্তেজিত। এ সাহিত্য সজীবও নয়, সত্যও নয়, এ-সাহিত্য বোবা এবং বধির।

বাসে যেতে যেতে মন্তব্য শুনেছি: আজ-কালকার ছাত্ররা কী হয়েছে! বলতে পারিনি মার খাবার আশঙ্কায় যে, আজ-কালকার মাষ্টার-মশাইরাও যা হয়েছেন! কিন্তু তা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি থেকে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা, সবে হাঁটতে শিখেছে যারা, তাদের কথাও বলছি, ক'জন সুস্থ জীবনের দেখেছে চেহারা? মনে পড়ছে, পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর কথা। ব্যাঙ্কের কেরানী; বিধবা বোন, তার ছেলে-মেয়ে, নিজের ভাই-বোন-মা নিয়ে শুধু বিচিত্র নয়, বিরাট সংসার! বিদেশী ব্যাঙ্কের একটু মানুষের মত মাইনেতেও কুলোয় না সকলের, একার রোজগারের কুলায় এতগুলি মুখ ক্ষিদেয় হাঁ করে থাকে! সন্ধ্যের পর বেরুতে হয় কাচের কারখানায়; রাত দশটায় ছুটি মেলে যখন, তখন বাড়ী ফেরার পথে অবাক হয়ে শোনে আকাশ-বাণীতে রবীন্দ্রনাথের গান: 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।' তাকিয়ে দেখে আকাশে, অনেক, অনেক উঁচুতে সত্যি সত্যি পূর্ণিমার গোল চাঁদ; হাসছেও। কিন্তু চাঁদের হাসি নয় সে; সে হাসি চার্লি চ্যাপলিনের,—পরের দুঃখে আমরা যারা মুখ টিপে হাসি, আমরা কোন দিন বুঝবো না চার্লিকে; কারণ নিজের দুঃখকে সে পরের হাসি করেছে।

কয়লার অভাবে পুরানো চেয়ার ভেঙে তার কাঠ দিয়ে সেদিন রান্না হচ্ছে আমার প্রতিবেশীটির বাড়ীতে। এমন সময় খবর এল, কয়লা পাওয়া যাচ্ছে কাছের এক দোকানে। আড়াই সের মাথা-পিছু। অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য, অসম্ভব সুখের এক সু-খবর। যেন স্বর্গ মিলেছে হাতের মুঠোয়। দৌড়ে যেতে যেতেও দোকানে পঞ্চাশ-সাট জনের লম্বা সারি হয়ে গেছে। খাওয়া বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু আপিসের খাতা নয়। তাই ভদ্রলোক তিনটি ভাইপোকে থলি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন যখন, তখন কিউ আরও লম্বা হয়েছে বিশ হাত, কয়লার আশা তখন আরো বাহান্ন হাত জলের তলায়। তবুও সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলেন আপিস থেকে। কিন্তু ভাইপোরা ফেরেনি তখনও। তারপর অবশ্য একসময়ে ফিরে এল তারা। এক জন আড়াই সের কয়লা নিয়ে, অন্য দু'জন খালি হাতে। তাদের বাড়ি একটা, মুখ যতগুলিই হোক, কাজেই কয়লাও আড়াই সের হয়েছে বরাদ্দ। কয়লা থেকে হীরের নাকি জন্ম। হবে হয়ত! কত হীরের টুকরো ছেলে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় এমনই কয়লা আর চাল-ডাল-চিনির জোগাড়ে হারিয়ে গেল, সে খবর আজকের কলকাতা যখন অনেক পুরানো হবে, প্রাচীন হবে আধুনিক কলকাতা, তার কেশে ধরবে পাক, তখন সেই অতি-বৃদ্ধ কলকাতার ইতিহাসে থাকবে না লেখা। কারণ, যুদ্ধের এবং জীবনের ইতিহাস একই। যারা জিতলো এবং যারা হেরে গেল, ইতিহাস তাদের জন্যে। কিন্তু যারা এই জেতা আর হারার, এই হার-জিত খেলার রসদ জোগাতে গিয়ে নিজেরা গেল হারিয়ে তারা কোন দিন ইতিহাস হয় না। তারা ইতিহাসের নয়, তারা সকল কালেই উপহাসের পাত্র।

মনে পড়ছে রোল্যাণ্ড রোডের বিরাট কারখানার হেড-অপিসের সেই তরুণ কেরানীর কথা। পাশের ঘর থেকে শুনছিলাম, কার সঙ্গে কথা বলছে। কে যেন জিজ্ঞেস করল: 'খেয়ে আসেন নি?' 'না'। ছোট জবাব। 'যান গিয়ে খেয়ে আসুন কিছু?' জবাব যে দেবে সে এবারে যা বলল, কোন দিন ভুলব না সে-কথা। 'অনেক দিনই ত' এমন না খেয়ে আসি। মাসের মধ্যে পনের দিন কিছু না খেয়ে আসা ত' ডাল-ভাতের মত হয়ে গেছে আমার কাছে।' অনেক সময়ে এখন ভাবি, মধ্যবিত্ত বাঙালী কেরানী ভাতের সঙ্গে নুণ নিয়ে খেতে বসে কোন দুখে! ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে তার যে চোখের জল প্রতি 'গেরাসের' সঙ্গে মেশে, সেই চোখের জল কী কিছু কম লবণাক্ত?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় যাদের কৈশোর জাত হ'ল তারাই এ-যুগের সবচেয়ে হতভাগ্য ছেলে-মেয়ে। চোখের ওপর তারা যে-সব জিনিষ দেখল চোখের আড়ালেই সে-সব জিনিষ চিরকাল হয়ে এসেছে; সে-সব জিনিসকে মানুষ চিরকাল মনের আড়াল করে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধ শুধু জীবন-নাট্যের ওপর মৃত্যুর যবনিকা মাত্র নয়; যুদ্ধ সাধারণ লোকের চোখের ওপর থেকে লজ্জা-অপসারণের সব চেয়ে বড় সহায়। মৃত্যুর কালো পর্দা নেমে আসা নয় শুধু, যারা বেঁচে আছে তাদের চোখের পর্দা চিরকালের মত উঠিয়ে দেওয়াও যুদ্ধেরই অবদান;—**A war-product.**

মাত্র কয়েক দিন আগের ঘটনা। দক্ষিণ-কলকাতার এক পার্কের পাশেই এক বাড়ীতে বসে আছি। হঠাৎ হৈ-হৈ; তুমুল গণ্ডগোল; প্রচুর হল্লার সঙ্গে পালিয়ে-যাওয়া পায়ের এলোমেলো হুলুস্থুল। পার্কের মালী দৌড়ে এল, যে-বাড়ীতে বসেছিলাম সেখানে। কী হয়েছে? 'ফোন করব থানায়?' 'কেন?'; 'এই দেখুন না দু'দলে ফুটবল খেলতে কী গোলমাল হয়েছে,—বাস! একজন দৌড়ে এসে আমাকে বললে: 'মালি, দরজা খুলে দাও'; আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কেন?' "হাতবোমা তৈরী করব"—শুনুন বাবু।'

যারা শুনছিল তারা হেসে উঠল। যেমন হেসেছিল একদিন অনুমান করতে পারি আদালত-সুদ্ধ সবাই যখন বিদ্যাসাগরের ভুবন তার মাসীকে কানে কানে কথা বলার ছল করে কান কেটে নিয়ে বলেছিল, 'মাসী তুমিই আমার ফাঁসীর কারণ'!

আজকে যারা কথায়-কথায় হাত-বোমা ছোড়ে; হোলির দিন সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে সেই ব্যবহার করতে ভরসা পায় প্রকাশ্য রাজ-পথে, অত্যন্ত পরিচিত মহিলার সঙ্গে ঘরের মধ্যে যার ভগ্নাংশতম ভঙ্গীতে লজ্জা পাওয়ার কথা, বাসে-ট্রামে, বাড়ীর রকে, পাকে, রাস্তায়, রেস্তোরাঁয় সে-সব গর্হিত উক্তি বাহাদুরীর সঙ্গে তারস্বরে হয় উচ্চারিত,—তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সে অভিযোগ আকাশে থুতু দেবার চেষ্টার মত হয়; সে-থুঃ নিজের মুখেই শেষে এসে পড়ে। ভুবনের মাসীর মতই এই বিশ্ব-ভুবন জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের যৌবনকে করেছে বিকৃত; তারুণ্যকে দিয়েছে বিপথ-গমনের লজ্জা; জীবনকে করেছে জীবন-দেবতার ব্যঙ্গ চিত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যা ছিল বেকার যুবকদের আড্ডা দেবার স্বর্গ, আজ সেই রক হয়েছে যুদ্ধের-চাকরী-যাওয়া সিনেমা-ষ্টার হতে চাওয়া ছোকরাদের নরক; যুদ্ধের আগে এ-দেশের সাধারণ মানুষের রুচি ছিল সেখানে শুধু স্থূল; আজ যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সেখানে বিকৃত আর বিগর্হিত-বাসনার, অশোভন, রুচির হুলুস্থুল; যারা আগে শুধু 'বখাটে' ছিল, এই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ তাদের করে তুলেছে বিশ্ব-বখাটে!

Card-Seller's Song—দইওলার গানে, কবি ঠিকই বলেছেন যে যুদ্ধের সময় সব কিছুর দাম বেড়েছে, সব হয়েছে দুর্মূল্য, শুধু মানুষের জীবনের মূল্য ছাড়া! ঠিক; কিন্তু এ'র অতিরিক্তও

যে-কথা ঠিক সে-কথা হ'ল শুধু জীবনের মূল্যও নয়, জীবনকে যা শোভন করে, যা সুন্দর করে, যা ফুলের মত ফোটায়, প্রসন্ন করে বন্ধুর হাসির মত, সেই আদর্শ, ঔচিত্যবোধ, নিঃস্বার্থ নীরব আত্ম-নিয়োগের মূল্যও আজ আর কিছু নেই! যুদ্ধে জীবন যায় তাতে এসে যায় না; কারণ যুদ্ধ থামে কিন্তু জীবন-যুদ্ধ কখনও থামে না। যুদ্ধে যা যায় তা জীবন নয়, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা।

পেটে বোমা মারলে যাদের 'ক' বেরোয় না, যুদ্ধের বোমা পড়তে আরম্ভ হওয়া মাত্রই তারা এগিয়ে এসেছে। 'লক্ষ্মী' স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন লক্ষ্মীছাড়াদের হাতে। টাকার অভাব মানুষকে কোথায় নামায় জানি; কিন্তু টাকার প্রভাব মানুষকে কতদূর অমানুষ করে তাই দেখলাম যুদ্ধের সময়। Money is the root of all evils': যুদ্ধের সুসময়ে কয়েক জন মাত্র মানুষই খুঁজে পেয়েছে সেই root; আর তাই বাকী লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ হয়েছে up-rooted তাদের ভিটে থেকে; বঞ্চিত হয়েছে মুখের 'গেরাস' থেকে; নিজের ঘরের চাল অপরকে তুলে দিয়ে বেরিয়েছে পথে পরের 'অন্ন'-প্রত্যাশী হ'য়ে। তাই যাদের কাছে Money sweeter than honey সেই মুষ্টিমেয় কয়েক জনের কাছে টাকা মধু-র চেয়েও মধুর। কিন্তু বাকী সকলের কাছে Money bitter than human-tears,—টাকা, তাদের কাছে অশ্রুজলের চেয়েও বিস্বাদ।

চালের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে যুদ্ধের কলকাতায় যারা কাঁচা-টাকার পাকা-রাস্তায় এগুবার পেল সাহস, দুঃসাহসী তারা মানবতাবোধের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে বিবেককে গলা টিপে, হৃদয়কে পাথর করে, স্থির-প্রতিজ্ঞ হ'ল: জীবনে দু'টি জিনিষ ছাড়া আর কিছু তারা ছোঁবে না। একটি কামিনী; অপরটি কাঞ্চন।

যুদ্ধ শেষ হবার আগে মার্কিনী সৈন্য এল এদেশে। ডলারের দেশের মানুষের কাছে বিকিয়ে দিল নিজেদের, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান Doll-রা, মার্কিন সৈন্যরা ভারতীয়দের বোধ হয় মানুষ বলে গণ্য করে না,—তাই চোখের ওপরই সবাই দেখতে পেল ব্যালজ্যাকের Droll Stories;—বই পড়বার আর হ'ল না দরকার।

যাদের চোখের ওপর এই নির্লজ্জ পৈশাচিক লীলা পার্কে, ট্যাক্সীতে, প্রকাশ্য রাস্তায়, লেকের পাড়ে নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনা হয়ে উঠল, তারা দশ থেকে আঠারো বছরের মধ্যে; তাদের চোখের ওপর যা ঘটল তা চোখের ওপর থেকে একদিন সরে গেলও বটে, কিন্তু মনের ওপর তারা কি দাগ রেখে গেল? যুদ্ধ-কালের এই বীভৎসতাই চিরকালের মত শিথিল করে দিয়ে গেল তরুণ চরিত্রকে, তাকে ভুলতে শেখাল নীতিবোধ, অশ্রদ্ধা করতে শেখাল সংস্কৃত স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে।

যুদ্ধ থেমে গেল; সৈন্যরা ফিরে গেল; শুধু মুছে গেল না তরুণ-মন থেকে এই নারকীয় উল্লাসের নয়নলোভন ছবি। এই পথ দিয়েই সুযোগ বুঝে এল বোম্বাই-মার্কা ছায়া-ছবি। জার্মান সিলভার যেমন জার্মান নয়; বোম্বাই-আম মানেই বোম্বায়ের নয়; তেমনি বোম্বাই-মার্কা ছবি যে কোন জায়গাতেই হতে পারে; বোম্বাই-মার্কা ছবি বলতে আমরা বুঝি চটুল চিত্র; নাচ-গান-হল্লা; গল্পের নামে উদ্ভট কল্পনা; হাসির নামে গোপাল ভাঁড়ামো; কান্নার নামে পয়সা কামানো। (স্বয়ং পরশুরাম লিখলেও 'রম্য-রচনা' যেমন আসলে 'চুটকী' ছাড়া কিছু নয়!)

যুদ্ধের সময়ে যে-দৃশ্য চোখের ওপর দেখেছিল দশ থেকে আঠারো বছরের তরুণেরা, যুদ্ধ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ছবি হল অদৃশ্য। কিন্তু তখন তরুণ হয়েছে অকাল-বৃদ্ধ। একেবারে জলজ্যান্ত না হ'ক তার কাছাকাছি দৃশ্য নিয়ে এসে হাজির হ'ল বোম্বাই-মার্কা ছবি। তরুণেরা লুফে নিল সে-বস্তু। বরং বলা চলে আরো, তাকে বরণ করে নিল, যেমন করে প্রথম নববধূ বেশে তরুণীকে বরণ করে নেয় ছেলের মা। পারাকে একবার শরীরে ঢুকতে দিলে যেমন তার হাত থেকে আর রেহাই নেই। বেগম পারার বেলাতেও তাই। একবার বরণ করলে সম্বরণ করার আর সাধ্য কী? এলো বেগম, সুরাইয়া, নার্গিস। যে কৌশলে বিশেষ, বিশেষ কামিনীরা চিরকাল ভুলিয়েছে পুরুষকে সেই পথ ধরেই, উজ্জ্বল, উদগ্র রূপ ধরেই এগিয়ে এলো কামিনী কৌশলরা। Hero-worship-এর যুগ পালটে গেল; এল Heroine-worship-এর হুজুগ!

পাপীকে ক্ষমা করতে বলেছেন প্রভু; কিন্তু পাপকে নয়। Sinner-কে ক্ষমা কর; Sin-কে নয়। Sin কেও যদি বা ক্ষমা করা যায়; ক্ষমার অযোগ্য হচ্ছে এই চটুল সিনেমা। সেই সিনেমা-কেও যদি বা ছেড়ে দেওয়া যায়, যাকে কিছুতেই মাফ করা চলে না তা হ'ল যুদ্ধোত্তর কালের, হাল আমলের সিনেমা-পত্রিকা।

রকে বসে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গেই কেবল মাত্র যে ইয়ার্কি সম্ভব সেই অসম্ভব উক্তি সিনেমার পর্দায় 'সংলাপ' বলে জাতির চল বুক ফুলিয়ে যুদ্ধের পর। ঠিক তেমনি যে-সব ছবি যৌবন-সম্মুখে তরুণেরা লুকিয়ে দেখত একা, এখন অনেকের সামনে সেই ছবি, তারই কাছাকাছি ভঙ্গিমার, বিচিত্র বসের চিত্রগুলিকে খুলে ধরছে সিনেমা-পত্রিকা। পতিতাদেরও কিছু লজ্জা আছে; ব্যবসায়ে যেমও ব্যবসার ঘণ্টাগুলো বাদে অল্প সময়ে 'ন্যাকামী' করতে নয় অভ্যস্ত। দেহ দিয়ে তার রোজগার; তাই দেহ-র প্রতি তার কিছু শ্রদ্ধা থাকে অবশিষ্ট। কিন্তু সিনেমার হিরোইন, সবাই নয়, কেউ কেউ যে-ভাবে নিজেদের ছবি তুলে ধরে সিনেমার কাগজের পাতায় তাতে মনে হয় নির্লজ্জতাই বুঝি নারীর ভূষণ! এই সব ভদ্র-সমাজের তরুণীদের সিনেমাবতরণের পর 'বসন' কী রকম হয়, সে-কথা এখানে অনুক্ত থাকাই ভালো।

সিনেমায় আর সিনেমা পত্রিকায় দিনের পর দিন এই ছবি দেখতে দেখতে আজকের মেয়েরা ঠাকুর-দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করছে উত্তম-মধ্যম-অধম 'কুমারদের' সন্দর্শনে। আজকের ছেলের দেবীমূর্তির বদলে ফিল্ম-হিরোইনের বাঁধানো ফটোতে করতে চাইছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

ইতিহাসের পাতায় মোগল বাদশাদের ঠিকুজী-কুষ্ঠি মুখস্থ করতে হ'ত যেমন একদিন নিজের বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলে গিয়ে, আজ তেমনি সিনেমা-ষ্টারেরা কী দিয়ে রাঁধে, চুল বাঁধে কেমন করে, তারই খবর করছে এরা। যিনি বলেছিলেন তিনি বেশ বলেছিলেন যে শীগগিরই এমন দিন আসবে যখন আশ্চর্য হবার নয় দেখলে যে-চুল ছাঁটার সেলুনের উদ্বোধন হচ্ছে এই সাইন-বোর্ড মাথায় করে:

অচিত্রা-সেলুন!—এখানে উত্তম-রূপে চুল ছাঁটা হয়!

কিন্তু সবেরই মূলে সেই 'যুদ্ধ'। যেমন ক্ষয়রোগের মূলে ভাইটালিটির অভাব। এই যুদ্ধের সমষ্টি আজ তারা 'কেউকেটা' হয়ে উঠেছে যুদ্ধের আগে যারা ছিল 'কেউ নয়'-এর দলে। যেমন এই যুদ্ধের আগে যারা ছিলো 'বালা' তারা যুদ্ধের পর সিনেমার কল্যাণে সবাই আজ 'দেবী'!

[ক্রমশঃ।

কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক

(সুবর্ণবণিক সমাজের পুরোধা, হিতব্রতী দেশসেবী)

রাজধানী ক'লকাতা। তারই উত্তর দিকে শুয়ে রয়েছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মেডিক্যাল কলেজ—একশো কুড়ি বছরে পা দিয়েও নিজের কাজ আজও সে ঠিক সমান-ভালেই করে যাচ্ছে। অ্যাভিনিউ থেকেই দেখা যায়, কলেজের গায়ে বড় বড় আখরে লেখা আছে, "রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক চ্যারিটেবল্ ওয়ার্ড"—কলেজের ঠিক সামনের একটি গলিতেই রাজা বাহাদুরের পৈত্রিক ভিটে। কর্তাবাবা ৺নিমাইচরণ মল্লিক, ঠাকুর্দা ৺রামগোপাল মল্লিক। বাবা ৺অদ্বৈতচরণ মল্লিক। ১২৮৫ সালের ৩০শে কার্তিক জন্মগ্রহণ করলেন দেবেন্দ্রনাথের বড় ছেলে কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিক মহাশয়।

১৮৯৫ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কার্তিকচরণ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে শুরু করলেন বাড়ীতে। ক্রমে একনিষ্ঠ অধ্যবসায় এবং অনমনীয় মেধাবলে ধীরে ধীরে আয়ত্তে এনে ফেললেন বিষয়টি। এর পর শুরু হোল কর্মজীবন। আজ অর্ধশতাব্দীও অতিক্রম করে গেছে সেই দিনটি থেকে, কুমারের জীবনে তবুও আজ অবিরাম গতিতে কেবল কাজ আর কাজ।

কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক

১৮৯৭ সালে ল্যাণ্ড ডিভেলাপমেণ্ট শুরু করলেন—বাড়ী তৈরী করে বিক্রী করা। তার পর মার্কিণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে ক'লকাতাতেও ইনি "ফ্ল্যাট সিস্টেম"-এর প্রবর্তন করলেন। ক'লকাতায় এ পদ্ধতির তিনি এক জন অগ্রদূত। প্রথমে পরীক্ষার জন্যে এ ব্যবস্থা অ-ভারতীয়দের জন্যে হোল। তার পর অবাঙালী। তার পর সব শেষে কুমার যখন দেখলেন যে, এতে ভালই হবে, কল্যাণের গঙ্গাই ভেসে আসবে এর ভিতর দিয়ে। তখন তিনি বাঙালীদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা করলেন। বড়বাজার অঞ্চলে প্রায় হাজারখানা ঘর তৈরী করা হোল (১৯০৭—১৬)। এর পরেও ইনি প্রায় পাঁচ শ' ফ্ল্যাট তৈরী করেছেন, সেগুলির ভাড়া ধার্য করা হোল ২০৲।২৫৲ টাকা মাসিক। বর্তমানেও এগিয়ে যাওয়া ভাড়া বাড়ান নি, শুধু মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রেখেই দেবেন্দ্র ম্যান্‌সন্ অদ্বৈত ম্যান্‌সন্ প্রমুখ আরও অনেক ফ্ল্যাটবাড়ী কুমারের কল্যাণময় সৃষ্টিরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১৯২৬ সালে রাজা দেবেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করলেন। মহাগুরু নিপাত হে'ল কুমার কার্তিকচরণের। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধও তখন শেষ হয়ে গেছে। জমির বাজার তখন ধারণ করেছে অগ্নমূর্তি। জমি ছেড়ে কার্তিকচরণ এলেন ব্যবসার জগতে। তবে জমির উন্নয়ন ছাড়লেন না—ছাড়লেন শুধু বাড়ী তৈরী করা। ব্যবসায় জগতেও ইনি সৃষ্টি করেছেন বহু জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান। ঔষধের দিকে এঁর দৃষ্টি পড়ল। ক্লাইভ মেডিক্যাল হল তৈরী করলেন—ওরিয়েণ্ট ল্যাবরেটারী তৈরী করে ম্যালেরিয়ার মিক্সচার ও পেটেণ্ট মেডিসিনও তৈরী করেছিলেন অনেক। ছাপাখানাও করেছিলেন। বঙ্গীয় বিধান-সভার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ডাঃ প্রতাপ গুহরায় যখন একদা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "নায়ক" সম্পাদনা করতেন সেই সময় নায়কের কর্ণধার ছিলেন কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক মহাশয়। জার্মাণী থেকে এজেন্সি নিয়ে (মল্লিক ব্রাণ্ড) "মল্লিক স্যুয়িং মেশিন" নাম দিয়ে সেলাইয়ের কল বাজারে ছাড়লেন ১৯২৮ সালে। ফোটোগ্রাফির উন্নতিকল্পে "ইণ্ডিয়ান ফোটো-পেপার ফিল্ম কোং" প্রতিষ্ঠিত করলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেটি—দুঃখের বিষয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হোল। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আজকের দিনের বিখ্যাত বীমা-প্রতিষ্ঠান "হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের" পরিচালকমণ্ডলীর ইনিও এক্ষণে সদস্য উপদেষ্টা। (১৯২৮ থেকে) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত (১৮০৩) বেঙ্গল বণ্ডেড্ ওয়্যারহাউস্ অ্যাসোসিয়েশানের পরিচালনভার ইনি গ্রহণ করে (১০২৬ থেকে) তাকে আবার রূপ দিলেন নতুন করে—গড়ে তুললেন নব পরিবেশে। জনগণের প্রতি এঁর সহানুভূতি স্মরণীয়। মেডিক্যাল কলেজে—আর-জি-কর কলেজের 'রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক চ্যারিটেবল ওয়ার্ড" এঁর জনসেবারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বহু দাতব্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতিও এঁরই প্রতিষ্ঠিত! শুধু ক'লকাতার মধ্যেই এর কর্মশক্তি সীমাবদ্ধ নয়। ক'লকাতার বাইরেও এঁর কর্মক্ষমতা প্রসার লাভ করেছে। রাজা দেবেন্দ্রনাথ তখন জীবিত। রাজাকে দিয়ে কুমার মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত করালেন একটি কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান। কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্যকল্পে আজও সেই প্রতিষ্ঠান বাঙলার অনুমোদিত ক্লাসরক্ষকের কাছ থেকে নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন।

১৯৩৭ খৃঃ ক'লকাতার অন্যতম পোর্ট কমিশনার হলেন কার্তিকচরণ। নিউআলিপুর অঞ্চলের আজকের যে রূপ তার জন্যেও

দারী কার্তিকচরণ। পোর্ট কমিশনারের কাছ থেকে ঐ জায়গা খরিদ করে জায়গাটিকে তিনিই তার বর্তমান রূপ দেন। ১৯৩৮ সালে কার্তিকচরণ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন।

সুবর্ণবণিক সমাজেও এঁর ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। সুবর্ণবণিক সমাজে ইনি দলপতি। "দলপতি" প্রথার প্রবর্তন করেন এঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নিমাইচরণ মল্লিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সঙ্গে এঁর যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। সুবর্ণবণিক সমাজের দলপতি থাকাতে কার্তিকচরণ প্রায় সমাজের অন্তর্গত এক শতটি পারিবারিক গৃহ-বিবাদের সমাধান করেছেন। জীবনে দান যে ঠিক কত করেছেন, তার সঠিক হিসেব নেই। একটু ভেবে কার্তিকচরণ বলেন—"তা কয়েক লক্ষ টাকা হবে"।

আর কয়েক বছর বাদে আটের কোঠায় পা দেবেন কার্তিকচরণ। সারা জীবন তিনি করে এসেছেন দেশের কাজ, দশের কাজ, সমাজের কাজ। কত সমস্যা মিটিয়েছেন, কত কলহের অবসান করেছেন। কত নিপীড়িত—বঞ্চিত—দুঃখীর করুণ মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। আজও তাঁর কাজের বিরাম নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাঁকে ফাঁকে অবসর পেলেই চিন্তা করেন—পরিকল্পনা করেন—অনুধাবন করেন সর্বজাতীয় মঙ্গলের কথা।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব

(বর্তমান বাঙলার জীবিত জ্যেষ্ঠ য্যাটর্নি)

৺হরেন্দ্রচন্দ্র দেবের ছেলে ও ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের ভাইপো রবীন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৮৭ সালের প্রথম দিনটিতে। স্কুলের পড়া পড়লেন পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশানে (মেন)। ১৯০৪ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ইংরাজীতে এম-এ পাশ করলেন ১৯১০ সালে। ১৯১৬ সালে হলেন য্যাটর্নি। য্যাটর্নি অফিস জি সি চন্দর য্যাণ্ড কোম্পানীতে, তার পর প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল একটানা কাজ করে যাচ্ছেন। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে কত মামলা চালিয়েছেন, কত মামলা জিতিয়েছেন, কত মামলা পরিচালনা করেছেন! কত পরিবর্তন হোল, কত অদল-বদল হোল, কত নতুন নতুন আইন পাশ হোল। বাঙলা দেশের আইনের ক্ষেত্রে কত ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলল, আবার তারই বুক থেকে মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিল নতুন নতুন সৃষ্টির বীজ। কত দিকপাল আইন-রথী ঘুমিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে, আবার কত দিকপাল আইন-রথী পাঞ্চজন্য বাজাতে বাজাতে আবির্ভূত হলেন বাঙলার আইন-জগতেই।

কত দেখেছেন, কত শুনেছেন কত জেনেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় য্যাটর্নি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব। সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন পড়াশুনার মধ্য দিয়ে। ছাত্র-জীবনে প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী-সাহিত্য পড়েছেন, তার মধ্যে আজও বিশেষ ভাবে এঁকে আকৃষ্ট করেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর ম্যাথিউ আর্নাল্ড। কর্ম-জীবনে যখনই লম্বা অবসর পান, বেরিয়ে পড়েন ঘর ছেড়ে। ঘোরেন নানা দেশ—দেখেন কত কিছু, সঞ্চয় করেন জীবন্ত অভিজ্ঞতা। শুধু মামলা দেখেই কর্ম-জীবন কাটান নি রবীন্দ্রচন্দ্র, সেই সঙ্গে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীর ভাবে ইনি জড়িত। ১৯২৫ সাল থেকে ইনকর্পোরেটেড ল' সোসাইটির ইনি সভ্য, বর্তমানে সভাপতি। ডেমোক্রেটিক লইয়ার্স য্যাসোসিয়েশনের ইনি সভাপতি, ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশান অফ সায়েন্সের ইনি আজীবন সভ্য। সারা দিন কাজ করেন অসম্ভব—বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত আপিসে কাজ করেন। তার পর কর্মক্লান্ত দেহের বিশ্রাম নেই, চলে সাহিত্য-চর্চা—ছাত্রজীবনেই এর ইতি হয়নি, আজও জাজ্বল্যমান। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, বনফুল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান দিনের যাযাবর, প্রাণতোষ ঘটক পর্যন্ত রবি বাবুর বিশেষ প্রিয় লেখক। শুধু সাহিত্যচর্চা নয়, সেই সঙ্গে আছে এক সহজাত সাহিত্য ও সাহিত্যিক-প্রীতি। প্রথম জীবনে ৺গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর বিখ্যাত সাহিত্যিক বৈঠকে ইনি নিবিড় ভাবে মেলামেশা করেছেন—সেইখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁর পরিচয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীর ইভনিং ক্লাবও এঁর অগম্য ছিল না, সেইখানেই পরিচয় হয় জলধর সেনের সঙ্গে। তাঁর আর ভালো লাগে বাঙলার সর্বজনপ্রিয় মাসিক পত্র—মাসিক বসুমতী।

আজ সত্তরের কাছে এসে মনে পড়ে অনেকের কথা—কর্ম-জীবনে দিনের পর দিন যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে, সব নাম লিখতে গেলে পত্রিকা ভরে যাবে ; তবু কয়েক জনের নাম এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সহকর্মীদের মধ্যে মনে পড়ে, ভূতপূর্ব শেরিফ স্যার ধীরেন মিত্র ও দত্ত-সেনের ৺সুশীল সেনকে, পূর্বাচার্যদের মধ্যে মনে পড়ে, পূজনীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রিভি-কাউন্সিলার স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র, ব্যারিষ্টার এস, আর, দাশ, বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শিল্পজ্ঞ ও, সি, গাঙ্গুলী, বাঙলার মুকুটহীন রাজা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক, সুপণ্ডিত, সাহিত্য ও সাহিত্যিক-ভক্ত প্রাণ দরদী জমিদার খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। স্যার আশুতোষ, হীরেন্দ্রনাথ ও খগেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বললেন রবীন্দ্রচন্দ্র। খগেন্দ্রনাথের অমায়িক সরলতা এবং নিপীড়িত, দরিদ্র
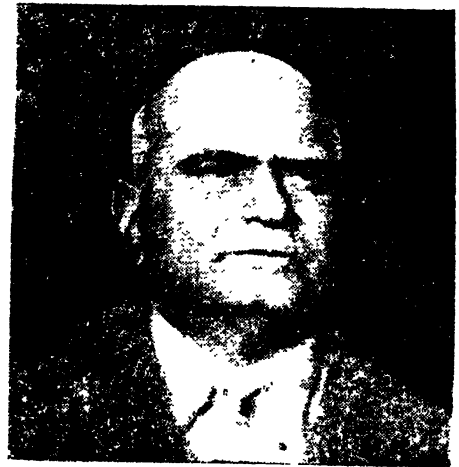
রবীন্দ্রচন্দ্র দেব

ও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত হস্তে দানের কাহিনী আজও রবীন্দ্রচন্দ্রকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে।

এই সব বিদগ্ধ-জনের সাহচর্যে তখনকার আদালতের পরিবেশটিও ছিল স্নিগ্ধ-সুন্দর এবং যথাসম্ভব সংযত। তখনকার দিনে কাজ করে পাওয়া যেত প্রচুর আনন্দ।

সকলের সঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে কলকাতার পরলোকগত পৌরপাল এবং বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের কথা। তাঁর আবাল্য সুহৃদ পরে সহপাঠী এবং তার পর একই সঙ্গে কর্মজীবনে প্রবেশ ও জি-সি-চন্দ্রের অংশীদার হওয়া। এঁদের সঙ্গে জি-সি-চন্দ্রের আরও এক জন অংশীদার ছিলেন তিনি হচ্ছেন কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরপাল বিখ্যাত আইনবিদ ৺বিজয়কুমার বসু।

রবীন্দ্রচন্দ্রের পুত্রত্রয়ও কৃতী। মেজ ছেলে রথীন্দ্রচন্দ্র ব্যারিষ্টার, বড় ও ছোট রণেন্দ্রচন্দ্র ও রমেন্দ্রচন্দ্র দু জনেই য়্যাটর্নি ও ঐ জি-সি-চন্দ্রেরই অন্যতম অংশীদার।

সবার শেষে জিজ্ঞাসা করি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে এখন আইনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনার মত কি? মৃদু হেসে একটু ভেবে সদালাপী মধুভাষী রবীন্দ্রচন্দ্র বললেন—মত একটা আছেই, তবে—তবে—সেটা আমি বলব না।

শ্রীদেবেশ দাশ আই সি এস

(শুধু একজন বাঙ্গালী)

"সরকারী চাকুরে হিসেবে যদি আপনি আমার জীবনী জানতে চান, তাহলে আমি সত্যিই বিব্রত বোধ করব। সাহিত্যিক হিসেবেও তাই। আমার পরিচয়—আমি শুধু একজন বাঙ্গালী।" শ্রীযুত দেবেশ দাশের জীবন-কাহিনী এত দুঃসাহসী, বে-হিসাবী রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরা—ছাত্রজীবনে সব পরীক্ষায় বৃত্তিভোগী

শ্রীদেবেশ দাশ

হওয়া সত্ত্বেও, কর্মজীবনে বাঁধা-ধরা আই, সি, এস, ইস্পাতের কাঠামো সত্ত্বেও যে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

ছেলেবেলায় শ্রীযুত দাশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীম'র ছাত্র ছিলেন। প্রতি রবিবারে শ্রীম'র স্কুলে সংপ্রসঙ্গ সভায় পৃথিবীর সব মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা হ'ত। কিন্তু পূর্ব-বাংলার মেঘনা নদীতীরের এই দুরন্ত ছাত্রকে আকর্ষণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নয়, স্বামিজী। সমাজের লোকাচারের বাধা না মেনে অস্পৃশ্যদের নাইট স্কুলে পড়াতে গেলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যায় স্বেচ্ছাসেবক হলেন। সে যুগের নিষ্ঠাবান খদ্দরধারী ভারতসেবাশ্রম-সংঘের এই ছাত্রসভ্যই যে আজকের দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্ধর্ষ রাজকর্মচারী তা কে মনে করবে?

সংঘের পিছনে সেকালের পুলিশের কৃপাদৃষ্টি ছিল। সেখানকার একজন সভ্যের কি বিলেতে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের যন্ত্র আই-সি-এস হওয়া উচিত হবে? সব সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন শ্রীম'। তিনিই ১৯ বছর বয়সের তপ্তরক্ত এই তরুণকে বোঝালেন যে, অসামান্য মেধা দেখিয়ে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন, তা দিয়ে ইংরেজকেও হারালে দেশেরই মান বাড়ানো হবে। অন্তত একজন ইংরেজকেও আই-সি-এস পরীক্ষায় হারিয়ে দিয়ে নিজে ঢুকতে পারলে গরীব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে থেকে যায়। স্বামিজীর শিক্ষা মনে রেখে আই-সি-এস চাকরীতে ঢুকলে দেশের সেবা করার যে সুযোগ আসবে তা অবহেলার বস্তু নয়। তাই প্রথম খদ্দর ছেড়ে অন্য কাপড় পরে দেবেশ বাবু পুলিশ কমিশনারের অফিসে পাশপোর্ট নিতে চললেন।

পট পরিবর্তন হল, কিন্তু মন পরিবর্তন নয়। স্বচ্ছল পিতার অর্থে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যেতে রাজী হলেন না। নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় এই বঙ্গসন্তান দ্বিতীয় স্থান দখল করে টাটার বৃত্তি নিয়ে বিলেত গেলেন। নিজের উপার্জন থেকে সে অর্থ পরে কড়ায়-ক্রান্তিতে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির পদপ্রান্তে বসে নতুন ভাবে নিজের দেশকে চিনলেন। ইউনিভার্সিটির টার্মের ছুটিতে আর সব ভারতীয় ছাত্র যখন টমাস কুকের তৈরী প্রোগ্রাম নিয়ে প্যারিস-বার্লিন দেখতে যান, তখন তিনি পায়ে হেঁটে বোঁচকা পিঠে গ্রামে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে সারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের অধিকাংশ দেখে বেড়াতেন। বহু জায়গায় তিনি ঘুরেছেন যেখানে আগে কোনো ভারতীয়ই যান নি। তাঁর রচনার মধ্যে যে দুঃসাহসী স্বপ্নদ্রষ্টা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী তার উৎস এইখানেই

চাকরীতে ঢুকলেন। প্রথমেই গেলেন আসামে। সেখানে বনে-পাহাড়ে আদিম জাতিদের মধ্যে তেমন কিছু কাজ না থাকলেও ঘুরে বেড়াতেন। বাঘ বা হাতী রাতে হামলা দিতে পারে। তাই তাঁবুর চারি দিক ঘিরে আগুনের বেড়াজাল দেওয়া হয়েছে শীতের রাতে। সেখানে আগুন পোয়াতে পোয়াতে পাহারা দিচ্ছে গারো, কুকি, রাভা, কাছাড়ীরা। তাঁবুতে না ঘুমিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লেন তরুণ এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার। রোমাঞ্চকর বই কি!

"ইউরোপা" লেখা হল সেই বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বসে। দেবেশ বাবুর সব চেয়ে যত্নে রাখা সম্পদ দেখালেন—"ইউরোপা"

সম্বন্ধে কবিগুরুর একখানা চিঠি। অজানা এই তরুণের লেখা পড়ে রোগ-শয্যায় শুয়ে মুগ্ধ কবির লেখা চিঠি।

সব চেয়ে অল্প বয়সে শিলঙে স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারী হয়েছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ অজানা ও মুরুব্বিহীন এই বাঙ্গালী ১৯৪০-এ বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কেবল নিজের কাজের পরিচয়ে বয়ঃকনিষ্ঠতম আণ্ডার সেক্রেটারী হয়ে বদলী হলেন দিল্লী-সিমলায় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে।

বয়ঃকনিষ্ঠতম ডেপুটী সেক্রেটারী হয়ে শীঘ্রই তিনি কর্মজীবনে উন্নতি লাভ করলেন। স্বাধীনতা লাভের সময়ে সেকালের বৃটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেটের অধীনস্থ সার্ভিস আই-সি-এস প্রভৃতি নতুন করে গড়ার সময়ে তিনি প্রথম ভারতীয় হোম মিনিষ্টার সর্দার প্যাটেলের অধীনে কাজ করেছেন। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারী থাকা কালে কমিশনের সুযোগ্য নির্বাচন ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে বহু অযাচিত প্রশংসা কানে এসেছে।

প্রবাসী-বাঙ্গালীর সমষ্টিগত জীবনে শ্রীযুক্ত দাশের দান খুব বেশী। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, সরকারী চাকরীর নিয়মগত সংকীর্ণ সীমানা সত্ত্বেও ইনি ও সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা দাশ শিলঙ ও দিল্লীতে বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সাহিত্যগত সব প্রচেষ্টাকে সংহত একটা রূপ দিয়েছেন। বহুধাবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক ভাবগুলোর ওপর তাঁদের একতাবদ্ধ হবার চেষ্টা জয়ী হয়েছে। শিলঙে আজকের দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ এক এঁর মত সাহিত্য-প্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে যে নতুন জোয়ার তিনিই এনে দিয়েছেন, সে কথা সবাই জানেন।

বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের কথা যে, শ্রীযুত দাশের বাংলা রচনা হিন্দীতেও প্রচুর সমাদর পাচ্ছে। তাঁর "রাজোয়ারা" হিন্দীতে পাঠ করে মেবারের মহারাণা রাণাপ্রতাপের সময়কার যে ঢাল-তরোয়াল তাঁকে দরবারে উপহার দিয়েছেন, দেশে দেশে সম্প্রীতি সাধনের মহৎ কাজে তাঁর মসী অসির চেয়েও শক্তিশালী হোক বলে যে আশীর্বাদ করেছেন, তা এই কর্মবীর বাঙ্গালীকেই সাজে। শুনে খুব খুশী হলাম, তাঁর পরিচয় শুধু তিনি গর্বভরে দিতে চান যে, তিনি একজন সাধারণ বঙ্গসন্তান মাত্র!

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(প্রবীণ সাহিত্যসেবী)

প্রত্যেক যুগেই স্বল্প কয়েক জন লোক থাকেন, যাঁদের প্রতিভা দশের কাছে যথোচিত স্বীকৃতিবঞ্চিত থাকে;—প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের এক জন বলা চলে নিঃসন্দেহে। একদা কর্মচঞ্চল সাহিত্য-জীবনের অবসানে আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায় জীবন-যাপন করছেন। বার্ধক্য-পীড়িত ক্ষীণ দেহের মধ্যে প্রায় পুরো একটি শতাব্দীকে তিনি ধ'রে রেখেছেন। বার্ধক্য যেমন তাঁর দেহকে নত করেছে, তেমনি বিনয় করেছে মনকে।—জীবনীপ্রসংগ উঠতেই ঘোরতর আপত্তি ক'রে উঠলেন: আমার মত 'তৃণাদপি সুনীচ' জীবনী কি উপযোগিতা বহন করবে? বরং অখ্যাতিই হ'বে পরিষ্কার। Old fossil তো এখন আমি।

—অনুকূল বাবুর জন্ম আজ থেকে পঁচানব্বই বছর পূর্বে, সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই। চার পুরুষে আছেন কলকাতায়। (আপিস) তাঁর মাতুলালয়; পিতৃনিবাস পুরোনো পটলডাঙ্গায়। অতি-শৈশবে দিন কেটেছে পশ্চিমে, দিল্লীতে। ফিরে এসে ভর্তি হ'লেন ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে, তখনকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত দিকে। তার পর হেয়ার-হিন্দুস্কুল ঘুরে সিটি কলেজে এলেন—সুরেন্দ্রনাথের কাছে পড়তে। কিন্তু সাধ আর সাধ্যে চিরদিন বিবাদ। দশ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। চার ভ্রাতার মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যম। এই সময় তাঁদের পরিবার নানা বৈষয়িক গোলযোগে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষয় ব্যাপারে হঠাৎ উদাসীন হ'য়ে পড়ায় অনুকূল বাবুর স্কন্ধে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো—অগত্যা পাঠজীবনের সেইখানেই যবনিকা।

কিন্তু পাঠজীবন শেষ হ'লেই সুরু হোলো সাহিত্যজীবন। তাঁর সাহিত্যজীবন তখনকার বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসের দলিলস্বরূপ। ঠনঠনে থেকে তখন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সমাচার-চন্দ্রিকা' বার হোতো, সাহিত্য-কৃতির সূত্রপাত সেই পত্রিকায়। তার পর লিখলেন তদানীন্তন 'হিন্দুদর্শনে'। বাংলা সাহিত্যে তখন পত্রপত্রিকার যুগ। ক্ষেত্র গুপ্ত মশায় সংবাদপত্র লিখে বেড়াতেন তখন। এক সংগে অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হোতো—পটুয়াটোলা থেকে সাপ্তাহিক 'ভারত-দর্পণ', ডিকসন্ লেন থেকে ভৌগোলিক শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সহচর', চুঁচুড়া থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'সাধারণী'। তা ছাড়াও আছে 'সোমপ্রকাশ', বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন', জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের 'ভারতী' প্রভৃতি। এর অধিকাংশতেই তিনি নিয়মিত উপকরণ যোজনা করেছেন।

এই সময় শ্রীনাথ দাস লেন থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস-এর স্বত্বাধিকারিত্বে 'সময়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রথম অনুকূল বাবু সম্পাদনার সুযোগ পেলেন। এর পরে তিনি স্বয়ং 'প্রতিভা' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করলেন। এই সময়েই বসুমতী প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর প্রথম আলাপ হয়। তাঁর প্রসংগ উঠতেই অনুকূল বাবু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন: কি অসাধারণ পরিশ্রম করতেন উনি আর কতোরকম বাধার সংগে যুদ্ধ ক'রে তাঁকে চলতে হ'য়েছে। অবশ্য তার মূল্য আজ তিনি পেয়েছেন। এর পর তিনি সাপ্তাহিক 'প্রকৃতি'
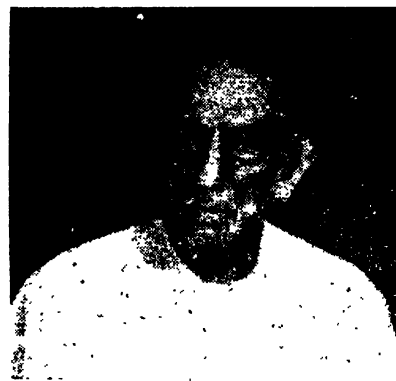
সম্পাদনা করেন। মাসিক নব্য-ভারত সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তার ফলে তখনকার দিনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্রপাত হয়। গোবিন্দ দাস 'প্রকৃতি'তে 'মগের মুলুক' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত করতে থাকেন। তাতে রাজা রাজেন্দ্র এবং ভাওয়ালের দেওয়ান প্রখ্যাত সাহিত্যিক ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষের পারিবারিক কুৎসার ইংগিত থাকে। অনুকূল বাবু যদিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন তবু তাঁর নামে মানহানির মামলা আনা হয়। তখনকার দিনে সাহিত্য-জগতে এই নিয়ে খুব আলোড়ন হয়। বঙ্কিম বাবুর মধ্যস্থতায় সে মামলা কোন ক্রমে মিটে যায়।

ইতিপূর্বে রিপণ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। আর্থিক ক্ষতি'ও অন্যান্য কারণে এই সময় 'হিতবাদী' প্রকাশ স্থগিত রাখার কথা হয়। তখন সাপ্তাহিক 'সুরভি ও পতাকা' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু অনুকূল বাবুকে অনুরোধ করলেন 'হিতবাদী'র দায়িত্বভার গ্রহণ করবার জন্তে। ঢাকার মামলার পর অনুকূল বাবু 'প্রকৃতি' তুলে দিয়েছিলেন, এ আহ্বানে তিনি উৎসাহসবোধ করলেন। 'জবাকুসুম'-এর উপেন্দ্রনাথ সেন যোগেন্দ্র বাবুর সতীর্থ ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যদি অনুকূল বাবু 'হিতবাদী'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে তিনি পত্রিকার সব ব্যয়ভার বহন করতে রাজী আছেন। কিন্তু 'প্রকৃতি'-র মামলার পরে অনুকূল বাবু তাঁর জননীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'ন যে, তিনি আর কখনও সম্পাদকতা করতে পারবেন না। তাই উপেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যবন্ধু 'বঙ্গনিবাসী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে 'হিতবাদী'র সম্পাদনা ভার অর্পণ করেন। স্থির হয়, কালীপ্রসন্ন সম্পাদক থাকবেন এবং অনুকূল বাবু এবং তাঁর বন্ধু বঙ্গবাসী কলেজের তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ যুগ্ম ভাবে কার্য্য নির্বাহ করবেন। হিতবাদীতে প্রত্যেকের স্বত্বও নির্দিষ্ট হ'য়ে থাকে—উপেন সেন আর্থিক সাহায্যকারী ব'লে তাঁর অংশ ছিল সাত আনা, কালীপ্রসন্ন সম্পাদকরূপে পাঁচ আনা, অনুকূল বাবুর অংশ তিন আনা এবং চন্দ্রোদয় মশায়ের এক আনা।

অনুকূল বাবুর জীবন সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের মতো, তার অজ্ঞাত কোটরে শতাব্দীর অলিখিত ইতিহাস আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের তরঙ্গ অতিক্রান্ত যুগে তাঁর জন্ম। তখনকার ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রিক চেতনাকে তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বিদেশী বণিক শক্তির অত্যাচার দেখেছেন Consent Act Ilbert bill এর যুগের লোক তিনি। আবার তাঁর জীবনেই পরপ্রভুত্বের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার সংহত অভ্যুত্থানরূপে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের তিনি একজন প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, আবার তাঁর সময়েই ভারতের যুগসঞ্চিত গ্লানির অবসানে স্বাধীনতার সূর্যোদয়! এক হিসাবে তিনি সত্যিই ত্রিকালদর্শী।

প্রাচীন আমলের বাংলার কথায় অনুকূল বাবু বার বার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করতে লাগলেন। এমন কি, পশ্চিমে রামলীলাতে মুসলমান মসজিদের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা যেতো। কলকাতার মহরমের সময় যেমন হিন্দু-মুসলমান একসংগে শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন তেমনি বিজয়া দশমীতে বাদ পড়তেন না মুসলমানেরা। তখন বিদেশী সাহেবের পদাঘাতে দেশী লোকের প্রাণহানির সংবাদ খুব সুলভ ছিল। চা-বাগানে সাহেব অত্যাচার ক্রমশঃ চরমে ওঠে। কুলি সংগ্রহ করবার জন্ম কয়েক আড়কাঠি নিযুক্ত থাকতো, তারা পশ্চিমের অনেক পুরুষ ও রমণী লোভ দেখিয়ে কলকাতায় এনে Agreement এ সই ক চালান দিতো। 'সুকরমণি'-নামে এই রকম এক কুলিরমণীর ও অত্যাচারের প্রতিবাদে তখন প্রবল আন্দোলন হয়। নাটোরে সময় যে প্রাদেশিক কংগ্রেস হয়, তাতে অনুকূল বাবু এই অত্যাচা প্রতিবাদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ায় সংগে সংগেই প্রচণ্ড ভূমিকম্প সুরু হয় এই ভূমিকম্পে সে বার সমগ্র নাটোর বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়।

হারানো স্মৃতির থলি হাতড়ে এমনি অনেক ঘটনা উপহ দিলেন অনুকূল বাবু। সাহিত্যব্রতীরূপে সে-কালের দিক্‌পালদে অনেকের সংগেই তাঁর প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল। বঙ্কিম বাবু স্বত প্রণোদিত হ'য়ে তাঁকে অপ্রিয় মকদ্দমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যব ক'রে দেন। রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর সাহিত্যসাযুজ্য ছিল, কি সদ্ভাবে নয়। রবীন্দ্রনাথের বাংলাবানানের নবপ্রবর্তন নিয়ে তি 'হিতবাদীতে' প্রায়ই সমালোচনা করতেন। 'কি' এবং 'কী' নি এক বার তিনি 'হিতবাদীতে' রবীন্দ্রনাথকে তীব্র কটাক্ষ করেন। ছাড়া নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রণেতা চন্দ্রনাথ বসু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য স্বামী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, সন্ত দাস প্রভৃতির সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সংগেও তাঁর কয়েক বার সাক্ষাৎ হয়। "কত লোকের সংগে সেকালে পরিচয় ছিল, কিন্তু তাদের প্রভাব খুব বেশি অনুভব করিনি, হয় তো জহুরী নই ব'লে জহর চিনি নি" বললেন অনুকূল বাবু।

অনুকূল বাবু স্বয়ং কতকগুলি পুস্তক রচনা করেছেন—'অশ্রুধারা', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'বিধিপ্রসাদ', 'পলাশীসূচনা,' 'স্বর্ণরেণু', 'ভীষণ প্রতিশোধ', 'সিন্ধুবধ' প্রভৃতি। ইংরেজী পত্রিকায় The yoga and its significance নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচীনপন্থী অনুকূল বাবু খুব নির্ভরশীল নন। তিনি বলেন, "এ কালের সাহিত্য সে যুগের তুলনায় shallow, অগভীর। উপন্যাস ও গল্পের প্লাবনেই সাময়িকপত্রগুলি প্লাবিত, সারগর্ভ প্রবন্ধ বা আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে না।" শুধু সাহিত্যেই নয়, ধর্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি সকল বিষয়েই তিনি রক্ষণশীল মতাবলম্বী। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষতঃ স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ভুলভ্রান্তি দেখে তিনি ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত।

আয়ুর শতাব্দী সীমান্তে দাঁড়িয়েও অনুকূল বাবু এখনও কর্ম্মঠ, সজীব ও সতেজ। নিয়মিত ভ্রমণ করেন। এখনও পত্রপত্রিকায় তাঁর ইতস্ততঃ সারস্বত স্বাক্ষর দেখা যায়। সম্প্রতি তিনি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আদিম আর্যসভ্যতার প্রকৃত অভ্যুত্থানের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যক্তিগত গবেষণায় মগ্ন আছেন। জীবনের গোধূলিবেলায় আজো তাঁর সাহিত্য-সমীক্ষা অব্যাহত। এই কথাটি তাঁকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করিয়ে দিতে গেলে তিনি বিনীত হেসে বললেন, "জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছে লেখনী চালিয়ে। আজ শেষ জীবনেও সেই পুরোনো 'হস্তকণ্ডুয়নবৃত্তি' ছাড়তে পারিনি।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো বিয়াল্লিশ

জ্ঞানীর লক্ষণ কি ?

লক্ষণ দুটি। বললেন ঠাকুর, 'প্রথম, অভিমান থাকবে না, দ্বিতীয়, স্বভাবটি শান্ত হবে।' থেমে আবার বললেন, 'যার মধ্যে এ দুটো লক্ষণ দেখবে, জানবে তার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ।'

পালকিতে করে নন্দ বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। পরনে লাল ফিতে-পাড় ধুতি, পায়ে বার্নিশ-করা কালো চটিজুতো। উঠে এসেছেন উপরের হল-ঘরে।

ঘর তো নয়, পটের হাট। প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠাকুর, ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে পড়লেন। তারপর এই দেখ নৃসিংহমূর্তি। জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণু সর্বগুহাশয়। সেই উদার আধার বিশ্ববিধারক বিষ্ণু। আর দন্তের স্তম্ভ-বিদারক নৃসিংহ।

আহা, হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে রাম আশীর্বাদ করছেন বুঝি। হনুমানের দৃষ্টি রামের পায়ের দিকে। হে নির্মল জ্ঞানচক্ষু, আর কি আশীর্বাদ করবে ! তোমার পাদপদ্মেই যেন মতি শাশ্বতী হয়।

আর এইটি বুঝি বামন ? ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে বলির যজ্ঞে। এক দৃষ্টে তাকে দেখছেন ঠাকুর। লোকব্যাপারকারণ সর্বব্যাপী। প্রকাশিত হয়েও যে ছদ্মবেশী।

তমালশ্যামল কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। রাখাল ছেলেদের সঙ্গে চলেছেন গোষ্ঠে, যমুনাপুলিনে। আর, দেখ, দেখ, রাই রাজা সেজে বসেছে সিংহাসনে। চার'দিকে সখীদের শতদল। সব চেয়ে মজা, কুঞ্জদ্বারে ঐ কোটালটিকে দেখ। চিনতে পেরেছ ? ওটি আমাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়।

এ সব উগ্রমূর্তি রেখেছ কেন ? ধূমাবতী ছিন্নমস্তা বগলা মাতঙ্গী। ও সব মূর্তি রাখলে পুজো দিতে হয়। আর, আহা, এইটি অন্নপূর্ণা। সর্বজনেশ্বরী সর্বদানেশ্বরী কল্যাণী। হে সর্ববরকামদে, ভিক্ষে দাও। অন্ন দাও। যে অন্নে তুষ্টি-পুষ্টি-অনাময় সেই অন্ন দাও। জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যই সেই অন্ন।

সুরেশ মিত্তির ঠাকুরের ভাব নিয়ে বিচিত্র একটা ছবি করিয়েছিল, দিয়েছিল কেশব সেনকে। সেটি দেখছি এখন নন্দ বোসের বাড়িতে।

ঠাকুর চিনতে পারলেন ! বললেন, 'এ সেই সুরেন্দরের পট।'

কে একজন বললে, 'আপনি আছেন এই ছবির মধ্যে।'

'এ হচ্ছে ইদানীং ভাব।' আত্মগত হলেন ঠাকুর, 'এর মধ্যে সবাই আছে।'

ছবির বিষয়বস্তুটি অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভিন্ন-ভিন্ন পথ দিয়ে চলেছে যাত্রীদল। কিন্তু সবাই গিয়ে পৌঁছুচ্ছে সেই চিরস্থিরের সকাশে। অর্থাৎ যত মত তত পথ। কর্ম নানা, বিষয় এক। পথ নানা, লক্ষ্য অভ্রান্ত।

দেখতে যে পাচ্ছ তিনি অনন্ত, তাই তাঁর পথও অন্তহীন। তিনি বিচিত্র তাই তাঁর পথও বহু দিঙ্মুখ। তাঁকে মানলেও তিনি, তাঁকে উড়িয়ে দিলেও তিনি। তাঁর কথা বললেও তিনি, তাঁর কথা চেপে গেলেও তিনি। এক ছাড়া দুই নেই। দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—যত খুশি বাড়িয়ে যাও, সব সেই একক নিয়ে। বাড়ির মধ্যে রয়েছে একজন, কেউ ডাকছে খুড়োমশাই, কেউ ডাকছে মামাবাবু, কেউ ডাকছে মেসোমশাই, কিন্তু লোকটি ঠিক বুঝতে পারছে আমাকেই ডাকছে। ঠিক-ঠিক সাড়া দিচ্ছে। যার যেমন ডাক তার তেমনি সাড়া। কথায় বলে, যেমন গাওনা তেমনি পাওনা। ঐ বারোয়ারি তলার মেলায় দেখনি ? বললেন ঠাকুর, 'কত রকম মূর্তি তৈরি করেছে। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। আবার বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, তাও আছে। নানা মতের লোক নানা মূর্তির কাছে ভিড় করে। যারা বৈষ্ণব তারা যায় রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শাক্ত তারা যায় হরপার্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তাদের লক্ষ্য সীতারাম। আর যাদের ঠাকুরের উপর মন নেই তারা দেখছে ঐ ঝাঁটা-মারা। শুধু তাই নয়, বন্ধুদের ডাকছে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে, ওরে, ও সব কি দেখছিস, এদিকে এসে ছাখ, কেমন তৈরি করেছে মাইরি !'

তেমনি বিষয়ী লোক ডেকে বলছে ভক্তদের, ওদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি দেখছ, এদিকে এসে ভিড় করো, দেখ এই ভূতের নৃত্য !

কিন্তু সারাংশ পরীক্ষা না করে কদলীকাণ্ডে আসক্ত হব না এই বীরত্বই তো ভক্তি।

কাম-কাঞ্চনের সুখ, এই আছে, এই নাই। যে সুখ সারাক্ষণ থাকে না সে সুখ আমি সওদা করতে যাব কেন ? আমি কেন ঠেকে ঠুনকো জিনিস নেব ? এত যাচাই-বাছাই করা আমার অভ্যেস, মাণিক ফেলে কাচ কিনব আমি কোন্ হিসেবে ?

'ভোগান্ত না হলে কি চৈতন্য হয় ?' জিগগেস করলে নন্দ বোস।

'ও এক রকম মত আছে বটে। এ কাদের মত জানো ? যাদের ভোগ করবার ইচ্ছে তাদের। আহা, ভোগ করবে কি ? ঐ তো আমড়া, আঁটি আর চামড়া। খেলেই অম্লশূল।'

'তাহলে চৈতন্য হয় কিসে ?'

'একমাত্র তাঁর কৃপায়।'

'তবে সবাইকে কৃপা করছেন না কেন ?'

'তাঁর খুশি।'

'এ কেমনতরো খুশি ?'

'খুশির আবার এমন-তেমন কি ? খুশি খুশি।'

'তা হলে কি বলব ঈশ্বর পক্ষপাতী ?' জিগগেস করল নন্দ বোস।

'কার উপর পক্ষপাত করবেন ?' ঠাকুরের প্রশান্তমুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। 'সবই তো তিনি। পঞ্চকোটি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, তার মধ্যে দুটো একটা বা কাটিয়ে দিচ্ছেন খুশিমত। সেই মুক্তিতে নিজেই আবার হাততালি দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে।'

'আর তাঁর ইচ্ছেতে আমরা মরছি।'

'তোমরা কোথায় ? সব তিনি। তিনিই মরছেন। তিনিই হয়েছেন।'

'এ স্বরূপ বুঝি কি করে ?'

'মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে কি ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা যায় ? বুঝে কি বা হবে ? নানা খবরে নানা বিচারে কাজ কি। কথাটা আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের উপর একবার ভালোবাসা আসে কিনা তাই দেখ। তুমি তাঁর ভালোবাসার জন, এ যদি একবার তাঁকে বোঝাতে পারো, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। কথাটা আর কিছুই নয়, আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। কত ডাল, কত পাতা এ হিসেবে দরকার কি ?'

নন্দ বোস গদগদ হয়ে তন্ময়ের মত বললেন, 'আমগাছ কোথায় ?'

'আহা, নিত্যবৃক্ষ। শুধু বৃক্ষ ? তিনি কল্পতরু। প্রার্থনা করো, কাঁদো। তরুর মূলে ফল আপনা থেকে খসে পড়বে।'

আমরা কি কাঁদি না ? আমরাও কাঁদি। কিন্তু যে অশ্রু ফেলি সে অশ্রু অমল অশ্রু নয়, আবিল অশ্রু। আকাঙ্ক্ষায় আবিল, ভালোবাসায় অমল নয়।

'নাকের দিক দিয়ে যে চোখের কোণ সে কোণ দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে অনুতাপের অশ্রু আর অন্য প্রান্ত দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে ভালোবাসার।' গঙ্গাধরকে বললেন একদিন ঠাকুর।

'হ্যাঁ রে, ধ্যান করতে করতে চোখে জল এসেছিল ?' জিগগেস করলেন গঙ্গাধরকে : 'প্রার্থনা করতে-করতে ?'

'এসেছিল।'

'তবে আর কি।' তবে আর ভাবনা নেই। কিন্তু কি করে প্রার্থনা করতে হয় জানিস ?'

চুপ করে রইল গঙ্গাধর।

'ছোট ছেলের মত হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে হয়। কাঁদতে হয় অঝোরে। নাছোড়বান্দার মত। বলতে হয়, মা, আমাকে জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি আর কিছুই চাইনে মা! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে ? তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব ?'

কি আশ্চর্য, নিমেষে ঠাকুর ছোট ছেলেটির মতন হয়ে গেলেন। কাঁদতে লাগলেন হাত-পা ছুঁড়ে, কাঁদতে লাগলেন নিরর্গল।

ছোট ছেলেরই ঐশ্বর্য নেই। দারিদ্র্যে সে দীন নয়, নগ্নতায় সে রিক্ত নয়, ধূলিতেও সে শুচিস্নাত। ঐশ্বর্য ছুটতে সুরু করলেই সে সরতে আরম্ভ করে।

'ঐশ্বর্যের স্বভাবই ঐ। ঐ দেখ না যদু মল্লিককে।' বললেন ঠাকুর, 'বেশি ঐশ্বর্য হয়েছে, তাই আজ-কাল আর ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে-আগে বেশ কইত।'

'আচ্ছা মশাই, পরলোক কি আছে ?' নন্দ বোস আবার প্রশ্ন করল।

'থাকলে আছে, না থাকলে নেই। কি দরকার ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ? আধ বোতল মদেই যখন মাতাল হও, শুঁড়ির দোকানের বোতলের হিসেবে দরকার কি ? একটা জন্মেই যখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—'

'তবু যদি বলেন—'

'সোজা কথা, যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হচ্ছে ততক্ষণ বারে-বারে যাতায়াত করতে হবে সংসারে। যতক্ষণ কাঁচা মাটি থাকবে কুমোরের চাকে উঠতে হবে পাক খেতে।'

যতক্ষণ ঘট তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কুম্ভকার রেখে দেবেন দণ্ড-চক্র। যতক্ষণ নদী অনুত্তীর্ণ ততক্ষণ নৌকো ভাসাবেন কর্ণধার।

যখন আমরা চলি তখন এক পা মাটিতে রেখে আরেক পায়ে মাটি ত্যাগ করি। এক পায়ে ত্যাগ আরেক পায়ে গ্রহণ। এমনি করে ধরে আর ছেড়ে, ছেড়ে আর ধরে আমরা এগোই। যতক্ষণ না মেলে আমাদের গন্তব্যস্থল। জোঁক কি করে ? পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে গ্রহণ করে তৃণান্তর। তেমনি প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে ধরছি নবীন দেহ। এক দীপের আলো বহন করেছি • আরেক দীপে। যতক্ষণ না তার মুখখানি দেখি।

তন্তু ছাড়া পটোৎপত্তি অসম্ভব। তেমনি মৃত্যু ছাড়া জন্ম অমূলক।

জীবনটা যখন পেয়েছ তখন সম্ভোগ করে যাবে তো ? আর সে সম্ভোগে সুখ কোথায় যে সম্ভোগে নিশ্চিন্ততা নেই ? সংসারে নিশ্চিন্ত কে ? একমাত্র ভক্তই নিশ্চিন্ত। তারই একমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি। সারাবলোকিনী প্রজ্ঞা। সমস্ত জীবনভোর তার প্রসন্ন বায়ুর দাক্ষিণ্য। অনুকূল হাওয়া দিলে মাঝি কি করে ? কেবল হাল ধরে বসে থেকে তামাক খায়। অনুকূল বায়ুই হচ্ছে ভক্তি। হাল হচ্ছে ঈশ্বর। আর তামাক খাওয়া হচ্ছে জীবনসম্ভোগ।

বারে-বারে আসব। আমার পুলক-পুজাঞ্জলি দিয়ে যাব তোমাকে। শেষে নিজেকে দিয়ে যাব উৎসর্গ করে। তার আগে আমার ছুটি নেই, চাইও না। আমার সমস্ত দৈন্যকে যতক্ষণ না বৈভবরূপে দিতে পারছি তোমার হাতে ততক্ষণ আমারও বিশ্রাম কোথায় ? আমার সমস্ত অপচয়ের পরিপূর্তি তো তুমিই।

তুমি আত্মা, আমার পঞ্চপ্রাণ তার সহচর, শরীর গৃহ, বিবিধ উপভোগরচনাই পূজা, নিদ্রা সমাধিস্থিতি পদসঞ্চার, প্রদক্ষিণবিধি আর আমার সমস্ত বাক্য তোমার স্তোত্র। আর যত কর্ম আমি করছি সমস্ত তোমারই আরাধনা।

কি প্রার্থনা ঠাকুরের অন্তরের ? যদি একটি মানুষেরও দুঃখ মোচন করতে পারি, ঊর্দ্ধগমন পথে যদি একটি আত্মাকেও সাহায্য করতে পারি, আমি জন্ম জন্ম আসব, হোক না তা অতি নীচ জন্ম। সেবাই আমার পরাপূজা। মা, আমাকে বেহুঁস করিস না। সমাধি সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা! আমাকে ডুবিয়ে দিস না মা, আমাকে সন্তরণ করতে দে। সন্তরণেই সিন্ধুতরণ।

অসুখ বেড়েছে, কাউকে কাছে আসতে বারণ, ঠাকুর কাতরস্বরে বলছেন, 'আজ আর কেউ তো এল না ? আজ তো আমি কারুর কাজে লাগলাম না ? আমার এ কষ্ট কি কম গা ?'

সৌরালোকে যে অখিল জগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমাকেই বা কার সন্দেহ? আমিই সেই নিত্যস্ফূর্তিময় নির্মল সদাকাশ। মহামোহান্ধকার থেকে আমিই একমাত্র বিনির্গত। আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমাকেই বা কার সন্দেহ? আমিই অখণ্ড বোধস্বরূপ, আনন্দ, আমিই পরাৎপর ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে স্পর্শ করে না তেমনি সাধ্য কি সংসার-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে?

একটা বেরাল তার বাচ্চা নিয়ে কাশীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই নিয়ে ঠাকুরের মহাভাবনা। একদিন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী এসেছে, তাকে একটু একান্তে টেনে নিলেন ঠাকুর। কুণ্ঠিত মুখে জিগগেস করলেন, 'হাঁ গা, তোমাকে একটা কথা বলব?'

বলুন। আপনি বলবেন তাতে আবার কথা কি! নবগোপালের বউ যেন নিজেই সঙ্কুচিত হল।

'দেখ আমার এখানে একটা বেরাল আছে, তার আবার কতগুলি বাচ্চা—'

মমতাময় কণ্ঠস্বর। তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নবগোপালের স্ত্রী।

'কিন্তু জানো, এখানে মাছ নেই, দুধ নেই। বড় কষ্ট হচ্ছে তাদের। তোমাকে যদি দিই নিয়ে যাবে?'

আপনার দান নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ঘোষপত্নী হাত পাতল।

এততেও হল না। ঠাকুরের মুখে তখনও কুণ্ঠার কুয়াশা লেগে। বললেন, 'নেবে যে, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

না, না, অসুবিধে কি। আমি তো বেরাল ভালোবাসি।

'কিন্তু তোমার বাড়ির কর্তারা যদি অমত করে? যদি কেউ বিরক্ত হয়? যদি কেউ মারে বেরাল-ছানাকে?'

নবগোপালকে ডাকানো হল। সেও যখন সায় দিলে তখন ঠাকুর নিশ্চিন্ত, তখন তাঁর মুখ ভরে উঠল খুশিতে।

এই নবগোপালেরই শেষকালে নাম হয়েছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'। ওরে চল, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে রে, চল বাতাসা নিয়ে আসি।

যেদিন ঠাকুর কল্পতরু হন সেদিন সেখানে নবগোপালও মোতায়েন। রাম দত্ত ছুটে এসে বললে, 'বসে আছেন কি! ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীগগির যান, যা চাইবার চেয়ে নিন এইবেলা।'

নবগোপাল ছুটল। ঠাকুরের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে বললে, 'আমার কি হবে?'

'একটু ধ্যান জপ করতে পারবে?'

বলো পারব, একশো বার পারব, কেন পারব না? কিন্তু নির্ভয়ে নবগোপাল বললে, 'আমার সময় কোথায়? ছাপোষা গেরস্থ লোক সংসারের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—'

'ধ্যান না হোক, একটু একটু জপ করতে পারবে না?'

'তারই বা সময় কই?'

যখন কাছে এসে পড়েছে, কিছু ফল নেবেই সে কুড়িয়ে। তখন ঠাকুর বললেন, 'জপ করতে না পারো, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে? সময়ে-অসময়ে, যখন খুশি, যখন তোমার মনে পড়বে—কোনো বাঁধাধরা নেই—আইন-কানুন নেই—পারবে?'

'তা পারব।'

'তা হলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে।'

সেই থেকে নবগোপালের মুখে শুধু 'জয় রামকৃষ্ণ।' পাড়ার ছেলেরা তার পিছু নেয় আর হাত-তালি দিয়ে বলে 'জয় রামকৃষ্ণ'। আফিস থেকে যখন ফেরে দরজায় বাতাসার ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চাকর। চল, চল, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে, বাতাসা বিলোবে এবার। চল বাতাসা নিয়ে আসি।

ছেলেরা জড় হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় নবগোপালকে। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে নাচে। মুঠো ভরে বাতাসা নেয়।

কালীঘর থেকে প্রসাদ পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল গঙ্গাধর। ঠাকুর তার হাতে একটা পানের খিলি দিলেন। বললেন, 'খা, খাবার পর দুটো একটা খেতে হয়—'

কুণ্ঠিত মুঠি খুলে দিল গঙ্গাধর। ঠাকুর বললেন, 'নরেন একশোটা পান খায়। যা পায় তাই খায়। এত বড়-বড় চোখ, ভিতর দিকে টান। সব নারায়ণময় দেখে। কলকাতায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি-ঘর গাড়িঘোড়া সব নারায়ণময়। তুই তার কাছে যাবি, খুব যাবি আর তার সঙ্গ করবি।'

সেই নরেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাশীপুরের বাড়িতে। ঠাকুরকে সারাক্ষণ দেখবার জন্যে যে বাড়িঘর লেখাপড়া ছেড়ে চলে এসেছে কাশীপুর, সে হঠাৎ কাউকে কিছু বলে না কয়ে চলে গেল উধাও হয়ে! এক দিন যায় দুদিন যায়, কোনো খোঁজ-খবর নেই। শুধু একা যায়নি মনে হচ্ছে, তারক আর কালীপ্রসাদও অনুপস্থিত!

কোথায় গেল, কোথায় গেল নরেন?

[ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কোণারকের একটি মূর্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্রী মদন বসু।

রাজায় রাজায়

উদয়ভানু

গা ছম-ছম করছে বিন্ধ্যবাসিনীর!

আলগা-চুলের খোঁপা জড়িয়ে নিলেন চুপিসাড়ে। চোখে যেন আলো-আঁধারি লাগছে থেকে থেকে। আহ্লাদী-পুতুল রাজকুমারী, সামান্য পথের কষ্টে যেন হিমসিম খেয়ে ওঠেন। ইচ্ছার বোঝার না কি ভার লাগে না, তবুও যেন তাঁর ক্লান্ত মুখশ্রী। পায়ে চলা পথ, আঁকা-বাঁকা। দীঘির ধার-বরাবর, সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে দীঘির শেষ সীমানায়। কাঁটা আর কাঁকর পদে পদে। বিন্ধ্যবাসিনীর বস্ত্রপ্রান্তে রাশি রাশি কাঁটা, বিঁধছে যখন-তখন। নধরনিটোল শুভ্র পা দু'টি বুঝি বা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে! চোরকাঁটা! চোরকাঁটা! চোখে দেখা যায় না, যন্ত্রণায় অনুভব করা যায় সূক্ষ্ম কাঁটার তীব্র দংশন। রক্ত দেখেছেন রাজকুমারী। মনুষ্যরক্ত! পথে আসতে আসতে দেখেছেন বৃষ্টিভেজা পথের ধূলোয় তাজা রক্তের রেখা। গা ছম-ছম করছে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর! কোন্ সিদ্ধাচার্য্যের শোণিতধারা কে জানে! রক্তজবার ছিন্ন পাপড়ি ছড়িয়ে গেছে কে যেন!

—পা চালাও বৌ!

পথ চলতে চলতে কথা বললে পরিচারিকা। ভয়-ভাবনায় ফিসফিস বললে,—খুন-জখম কি চোখে দেখা যায়? জোর-কদমে চল'। ভালয় ভালয় ঘরে ফেরা যায়, তবেই রক্ষে!

আলুলায়িত কেশের বোঝা আর বইতে পারেন না রাজকুমারী। আলগা-চুলের খোঁপা জড়িয়ে নিলেন। চলার গতি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করলেন যেন।

রক্তরেখা কৈ? হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! লাল ফুলের ছিন্ন পাপড়ি কৈ আর দেখা যায় না কেন? ভয়ে ভয়ে ইদিক সিদিক দেখলো পরিচারিকা। শিউরে শিউরে বললে,—এই যে হেথায়! কাটাকাটি হেথাতেই হয়েছে!

অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলো যশোদা। কি যেন দেখালো।

বিন্ধ্যবাসিনীও ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। গা ছম-ছম করছে। হাত-পা যেন হিম হয়ে গেছে। চোখের পলক পড়ছে না কি এক আশঙ্কায়। দেখলেন রাজকুমারী, দীর্ঘ দুই চোখের আড়দৃষ্টিতে দেখলেন, পায়ে-চলা পথের এক কিনারায় ভিজে ঘাস। সবুজ নয়, ঘাসের রঙ ঘোর লাল। ঘন আলতা ছড়িয়েছে কে!

বধ্যভূমি ঐ! চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চক্ষু মুদিত রাখলেন খানিক।

আবার বললে পরিচারিকা,—পা চালাও বৌ! জোর-কদমে চল'

প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস না কি! অস্ফুট সোঁ-সোঁ শব্দ কেন তবে? নিহতের আত্মা কাঁদছে হয়তো। কথা ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মত, তাই হয়তো দুঃখবেদনায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে! পথিকজনের কানে কানে কান্নার সুরে জানিয়ে দিয়ে যায় খড়্গাঘাতের অসহ্য ব্যথা।

সোঁ-সোঁ বাতাস বইছে থেকে থেকে। বর্ষণসিক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে যে!

ঐ দীঘির বুক থেকে পাক খেতে খেতে উঠছে আর ছড়িয়ে পড়ছে হেথায়-সেথায়। দূর থেকে যেন নিকটে আসছে। আবার দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। দীঘির তীরে গাছপালার শাখা আর পল্লব চঞ্চল হয়ে উঠছে।

পা চলে না যেন আর। চোরকাঁটা বিঁধছে পায়ে। পিপীলিকার দংশন-জ্বালার মত জ্বলছে যেন ঠিক। জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্নালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে বিন্ধ্যবাসিনী সলজ্জায় পিছন ফিরে দেখলেন গুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে। কোথায় গেল দুই ব্রহ্মচারী! বিষাক্ত তীরের অতর্কিত আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে নেই তো কোথাও! রাজকুমারী দৃষ্টি চালিয়ে দেখলেন, ব্রহ্মচারী দু'জন ফিরে চলেছে তড়িৎ গতিতে। সহযাত্রিণীরা তাদের আবাসের কাছাকাছি পৌঁছতেই নিশ্চিন্তায় ফিরে চলেছে তারা। বিপদের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে ফিরে চলেছে বিনা বাক্যব্যয়ে।

আসমান-দীঘির বুকে মাছ লাফিয়ে ওঠে। বর্ষাজলে দীঘি এখন যেন কানায় কানায় ভ'রে গেছে। কাকচক্ষু জলে যেন গেরুয়া রঙ ঢেলেছে কে! কাৎলা মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে এখন-তখন। মাথা-ভারী কাৎলা! ঝাঁক-ঝাঁক বাটা মাছ, চক্কর দিয়ে দিয়ে বেড়ায়।

পরিচারিকা বললে,—সামনে বুদ্ধপূর্ণিমা! সেদিন যে কি হয় কে জানে! খণ্ডযুদ্ধ হবে হয়তো! নবাবের রাজত্বে শাসন ঘুচে গেছে! শান্তির বালাই নেই। যার যা খুশী করছে!

বিন্ধ্যবাসিনী কাহিল সুরে বললেন,—যশো, আমার একখান হাত তুই ধর্। ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেছি আমি!

চন্দ্রকান্তর চতুষ্পাঠী দেখে মনে মনে অপরিসীম আনন্দের উন্মেষ হয় রাজকুমারীর। ছাত্রশিষ্য-পরিপূর্ণ চতুষ্পাঠী; পড়ুয়াদের পঠনধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আছে। চন্দ্রকান্তকে মনে হয় যেন এক বিদ্যাকল্পবৃক্ষ। অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন ব্রাহ্মণ। বেদান্ত-অন্ত, শিক্ষাশাস্ত্র, অগণিত গণিত, ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসার মীমাংসা, অসংখ্য সাংখ্য, তন্ত্রমন্ত্র আর কর্কশ ব্যাকরণের জটিলতা যেন সহজ সরল হয়ে গেছে তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে। কিন্তু চতুষ্পাঠীর কক্ষাভ্যন্তরের দেওয়াল-গাত্রে অসংখ্য খড়গ আর

কৃপাণ প্রলম্বিত কেন? তীক্ষ্ণধার অস্ত্র-দেহে রুধিররেখাই বা কেন?

রাজকুমারীর মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও বুঝি শান্তি নেই। কোথাও যে মেলে না সুখশান্তি! সপ্তগ্রামে ঘরোয়া অশান্তি; কৃষ্ণরামের পর্ব্বতপ্রমাণ দাবী আদায়ের নির্লজ্জ প্রতিজ্ঞায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। স্বামীর বাক্যবাণ, বিদ্রূপ মন্তব্য আর দুর্ব্যবহারে অধীর হয়ে পড়েছিলেন যেন। গড়-মান্দারণে নির্ব্বাসন তদনুপাতে শ্রেয়ঃ বলতে হয়। এখানে আর যাই থাক, কটূক্তি আর মন্দ ব্যবহারের অন্তর্জ্বালা নেই। কিন্তু খুন-জখম আছে মান্দারণে, ধর্ম্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আছে, আছে পরধর্ম্ম বিদ্বেষের নগ্ন আত্মপ্রকাশ!

বিন্ধ্যবাসিনীর একখানি হাত ধরলো পরিচারিকা। অনুভব করলো সে-হাত যেন হিমশীতল। যশোদা বললে,—ভয় পেয়েছো তো বৌ! অমন ছুট বলতে যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়াই বা কেন? কেমন ঘরের মেইয়া তুমি, কেমন ঘরের বৌ! খুন-জখম দেখা কি ধাতে সহ্যি হয়?

—মাফ কর যশোদা! আর কখনও ঘরের বার হবো না। দীঘির ঘাটে পা দিয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। শ্রান্ত আর অবসন্নের মত ব'সে পড়লেন দীঘির ঘাটের এক পৈঠায়।

—ব'সলে কেন আবার? বললে পরিচারিকা। বললে,—চল ঘরে চল, জিরেন নেবে চল। .

—আর পা চলছে না ভাই! এখানেই জিরিয়ে নিই খানিক। রাজকুমারী কথা বলেন যেন শুষ্ককণ্ঠে। হয়তো তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছেন তাই বুঝি অস্পষ্ট কথা। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে একেকটি কথা উচ্চারণ করেন যেন অতি কষ্টে। বললেন,—পা ধুয়ে ঘরে যাবো'খন!

কেমন ঘরের মেইয়া তুমি! কেমন ঘরের বৌ!

পরিচারিকার কথা যেন কাণে লাগে বিন্ধ্যবাসিনীর। নিমেষের মধ্যে' স্মরণে আসে, ফেলে-আসা পিত্রালয়। মনে পড়ে, স্নেহময়ী রাজমাতা বিলাসবাসিনীর সৌম্য-শান্ত মুখখানি। মনে পড়ে দুই সহোদরকে। চোখে ভাসে সুতানুটীর মাটি আর আকাশ। ছেড়ে-আসা পিত্রালয়ের কক্ষে কক্ষে যেন ছুটে বেড়ায় রাজকুমারীর বিরহতপ্ত মন। রাজপ্রাসাদের বৃহৎ ও প্রশস্ত গোলাছাদে যেন যেতে ইচ্ছা করে। ছাদে উঠে দেখতে ইচ্ছা হয়, সুতা আর নটীদের বাজার। সদাই জম-জমাট। লোকারণ্যে যেন গম-গম করছে বাজারের অলি-গলি পথ। আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে আছে পণ্যের বাজার।

সুতানুটীর বাজার থেকে কত কে আসে রাজগৃহের অন্দরে। ঝাঁপি-মাথায় আসতো চুড়িওয়ালী। আসতো তসবিরওয়ালী। কাপড়ের বোঝা নিয়ে আসতো তাঁতিনী।

বেলোয়ারী রঙীন চুড়ি কিনতেন রাজকুমারী। হরেক রকমের কাচের চুড়ি, বালা আর কণ্ঠহার। পুঁতির মালা। অভ্রের 'পরে আঁকা বাদশা-বেগমদের তসবির, দেব-দেবীর চিত্র, শাস্ত্র আর উপাখ্যানের রঙদার ছবি। কাচের আয়না। তাঁতের শাড়ী রকম রকম। সুতা, জরি আর মুগাপাড়ের শাড়ী। বেনারসী আর কিংখাব। রূপার খেলনা। হাতীর দাঁতের পুতুল আর মূর্ত্তি। বুড়ীর মাথার পাকা চুল, গোলাপ গাণ্ডারী, কদমা।

অভ্রের 'পরে আঁকা তাজমহল, কুতুবমিনার আর কাশীর মন্দিরধ্বজার চিত্র কিনেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। রাশি রাশি পোড়া-মাটির পুতুল আর খেলনা কিনেছিলেন, কড়ি জমিয়ে। কোথায় যে তাদের হারিয়ে এসেছেন, কে জানে! কোথায় গেল সেই পুতুল-খেলার দিনগুলি?

সুতানুটীর ছবি দৃশ্যপটে ভেসে উঠলেই কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েন রাজকুমারী। সুতানুটীর আকাশ আর বাতাসের সঙ্গে আছে যেন এক মন-মিতালী। যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক সুতানুটীর সঙ্গে।

সপ্তগ্রাম আর গড়মান্দারণে শুধুই বন-জঙ্গল। অরণ্যের পশু আর সরীসৃপের বসতি। পোড়ো-জমি আর খাল-বিল। ক্ষেত-খামার, গড়খাই আর পানাপুকুর। জাঁক-জমক নেই বললেই হয়; গাড়ী-ঘোড়া, কোঠাবাড়ী সচরাচর নজরেই পড়ে না। আর সুতানুটী যেন গুলজার হয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ। বন-জঙ্গল কেটে ফেলছে দিনকে দিন। চাষের জমিতে আর চাষ হয় না, ধানচালের বদলে বেণে আর তাঁতিদের কোঠা উঠছে ফসলী জমিতে। মান্দারণে যেমন খুনোখুনী আর নরহত্যার তাণ্ডবলীলা, সুতানুটীতে তেমন নয়। সেখানে যেন কেবল খোসমেজাজীদের বসবাস—রাজা-উজীর ধনিক-বণিক আর সায়েবসুবোদের আস্তানা। দাঙ্গা আর কাটা-কাটির বদলে গান-তান, গাল-গল্প আর কোলাকুলি।

—চোরকাঁটার উৎপাতে আমি যে ম'লাম!

দীঘির ঘাটের পৈঠায় রাজকুমারী। কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত দুই পা আসমানের জলে ডুবিয়ে রেখেছেন। সুতানুটীতে হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি মনে পড়লে চোখ ফেটে জল আসে তাঁর। মনে হয় যেন এক সুখের স্বপ্ন, ভেঙ্গে গেছে অকস্মাৎ!

—চল বৌ, ঘরে যাই। এই কাঠ-কাটা রোদে আর কত পুড়বে! যশোদা ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মত যেন খাবি খেতে খেতে কথা বলছে। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে যেন। ব্যাজার মুখ।

প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়া বইছে থেকে থেকে। ভয়-ভয় করে, গা ছম-ছম করে বিন্ধ্যবাসিনীর। বাতাস যেন আসে আর কাণে কান্নার সুর শুনিয়ে যায়। আসমান-দীঘির বুক থেকে পাক খেতে খেতে ওঠে আর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

—ভাতে-ভাত চাপিয়ে দে যশো! বেলা আর নেই।

কথা বলতে গিয়ে রাজকুমারী ফিরে দেখলেন, কথা যে শুনবে সে সেখানে নেই। আরও যেন ভীতা হয়ে পড়লেন। এক-আঁজলা জল তুলে চোখে-মুখে ছুঁইয়ে, উঠে পড়লেন পৈঠা থেকে। এখনও যেতে হবে অন্দরে, খাড়া-গাঁথনির সিঁড়ি ভাঙতে হবে। কেন কে জানে, কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছেন বিন্ধ্যবাসিনী। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে কেবলই যেন নিজেকে মনে হয়, অভাগী, আটকপালে, হতভাগিনী। অতি-সুন্দরীর ভাগ্য হয়তো এমনই হয়। সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হয়ে অন্দরে চললেন রাজকুমারী।

—বেগমসাহেবা!

কে যেন ডাকলো পিছন থেকে। পুরুষালি কণ্ঠ।

চিত্রার্পিতের মত সহসা স্থির হয়ে গেলেন রাজকন্যা। আড়নয়নে তাকালেন পিছু পানে।

—বেগমসাহেবা, এক আদমী আপকো ভেট মাঙতা।

ফিরে দেখলেন না রাজকুমারী। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন,—কে? বল এখন আমার ফুরসৎ নেই। কে তার কে, তাই জানি না। যার-তার সম্মুখে আমি বেরোই না। যাকে-তাকে দেখা দিই না। নাম কি?

—জগমোহন।

প্রহরী কথা বলছে ধীরে ধীরে। সসম্ভ্রমে। নম্র স্বরে।

—জগমোহন?

—হাঁ বেগমসাহেবা।

—জগমোহন লেঠেল?

স্বগত করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটলো আঁখিযুগলে। ভ্রু দু'টি কেঁপে উঠলো থর-থর।

—হ্যাঁ লেঠেল আছে। বহুৎ আচ্ছা তাকত আছে। প্রহরী কথায় কথায় কুর্নিশ করে আর কথা বলে।

খানিক চুপচাপ থাকলেন রাজকুমারী। অনড় অটল থাকলেন।

—সুতানুটী থেকে আসছে কি? আমার বাপের বাড়ী থেকে আসছে কি?

—হাঁ বেগমসাহেবা। বহুৎ দূরসে আতা! আপকো ভেট মাঙতা। যাতা নেহি, ভাগ্‌তা নেহি।

—জগমোহন লেঠেল কোথা থেকে এলো?

আবার স্বগতোক্তি করলেন রাজকন্যা। বললেন,—ডেকে দাও তাকে।

কুর্নিশ ঠুকতে ঠুকতে স্থানত্যাগ ক'রলো পাঠান প্রহরী। তার আকৃতি চোখে পড়ে না, দেখা যায় না আসল লোকটিকে। লৌহত্রাণে তার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। কেমন যেন অভিমানে ভিজে গেল বিন্ধ্যবাসিনীর চোখ দু'টি। আনন্দিত হবেন কোথায়, তা নয়, অভিমানের আধিক্যে ক্ষুব্ধ হ'লেন যেন। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমলিয়ে উঠলো। যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলেন অচলার মত।

—রাজকুমারী! জগমোহন লেঠেলের কথার সুরে ব্যথার আবেগ।

—কি ব'লতে চাও বল। বিন্ধ্যবাসিনী অবিচলিতের মত সাড়া দিলেন।

—রাজমাতা পাঠালেন আমাকে। তোমাকে দেখতে পাঠালেন।

জগমোহন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে। জগমোহন লেঠেল হলে কি হবে, তার কথাও কেমন যেন মিহি সুরের। যেন বাষ্পরুদ্ধ! কথা বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে যায়!

আর যেন পিছু ফিরে থাকতে পারলেন না রাজকন্যা। অভিমানী দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন। ফিরে দাঁড়ালেন। কাঁপা-কাঁপা সুরে বললেন,—এখনও বেঁচে আছি জগমোহন! অলক্ষীর কি মরণ হয়? আমি যে মাদারণে আছি কেমনে জানলে?

পরিধানের কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলো জগমোহন। তপ্ত অশ্রুবিন্দু মুছলো। বললে,—আমি যে সাতগাঁয়ে গেছিলাম রাজকুমারী! সাতগাঁ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে রাতারাতি চলে আসছি ছুড়তে পুড়তে। কোথায় কেমন আছো, তাই দেখতে আসছি।

বিন্ধ্যবাসিনীর চোখের জল চিবুকে গড়িয়েছে। বললেন,—বাঘের বাচ্ছা শ্যাল হয়ে আছি জগমোহন! তোমাদের রাজমাতা ভাল আছেন তো? রাজাবাহাদুর? কুমারবাহাদুর? রাণীমায়েরা?

—বিলকুল বহাল তবিয়েতেই আছে! জগমোহন কেঁদে-কেঁদে বলছে না কি! বললে,—তুমিই শুধু কত কষ্টে দিন গুজরাণ করছো!

—কষ্ট আর কি!

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন কত যেন দুঃখে। বললেন,—বেশ আছি মাদারণে। স্বোয়ামী যেমন রেখেছেন তেমনি আছি।

পিত্রালয়ের দূতকে দেখে, জগমোহন লেঠেলকে দেখে, যত বা আনন্দ হয় তত বা দুঃখ হয়। অদ্ভুত এক আবেগে চোখ দু'টি জলতে থাকে যেন! ছলছলিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। বস্ত্রাঞ্চল চোখে তুলতে হয়।

জগমোহন বললে,—রাজমাতা তো মুখে অন্ন তোলেন না! দিন নেই, রাত্তির নেই, কাঁদাকাটা করেন।

—কেন?

—তোমার তরে রাজকুমারী! তেনার যত দুঃখু তা স্রেফ তোমার জন্যে।

দুঃখের ক্ষীণ হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী! শব্দহীন স্মিত হাসি। বললেন,—আমার কথা মনে পড়ে কারও? তাই যদি হয়, তবে আমার কপালে এ দুঃখু কেন?

—তোমার কথা ভাববেনি রাজকুমারী! জগমোহনও কথা বললে মৃদু হেসে। দুঃখের হাসি মুখে ফুটিয়ে। বললে,—তোমার তরে রাজমাতা কত আর্জি করছে তার ঠিক আছে? রাজাবাহাদুর আর কুমারবাহাদুরকে যখন দেখছে তখনই বলছে।

—কি বলেছেন রাজমাতা?

জগমোহন ভেবে ভেবে বললে,—সাতগাঁয়ের জমিদার কেষ্টরামের দাবী যাতে মিটিয়ে দেওয়া হয় সেই কথাই বলছে! বলবার আছে কিছু আর?

—রাজাবাহাদুর কি বলেন?

—রাজাবাহাদুর শান্তিপ্রিয় লোক, তিনি তো মেটামিটি করতেই চান।

—কুমারবাহাদুরের কি ইচ্ছা?

জগমোহন শিউরে উঠলো যেন। বললে,—তেনার কথা আর ব'ল না রাজকুমারী! ছোটকুমার তো অন্য প্রকৃতির মানুষ। হয়তো ব'লে বসবে, সাফ জবাব দিয়ে দেবে যে, এ সব বুজরুকী চলবে না। তাঁর কথা বাদ দাও।

কেমন যেন চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখের চাউনি স্থির হয়ে গেল। এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভূমিতে। খানিকক্ষণ পরে বললেন,—জগমোহন, তুমি সদরে যাও, বিশ্রাম কর'গে। কিছু খানাদানা পাঠিয়ে দিই তোমাকে। আসতে কত কষ্ট হয়েছে!

—না রাজকুমারী, একটুকুও কষ্ট হয়নি। আমার তো কাজই এই। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে কথা বললে জগমোহন। এমন পেশীবহুল বলিষ্ঠ আকৃতি যার, তার চোখে অশ্রুবন্যা! পাষাণের

শরীরে আছে নাকি কোন দুঃখানুভূতি? জগমোহন বললে,—আমার তো কাজই এই রাজকুমারী, আমার আবার কষ্ট কি! তোমাদের হুকুমের দাস আমি, তোমাদের জন্মি জানটাও দিতে পারি।

—জগমোহন!

বিন্ধ্যবাসিনী ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে ডাকলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

—বল' রাজকুমারী। কি হুকুম তাই বল'।

রাজকন্যা বললেন, প্রায়রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—জগমোহন, তুমি সাতগাঁয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ রাজকুমারী। সোৎসাহে বললে জগমোহন।—সাতগাঁ হ'তেই তো সটান এখানে আসছি।

—দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে? দেখা দিয়েছিলেন? কোন কথা হয়েছিল?

বিন্ধ্যবাসিনী কম্পিত কণ্ঠে থেমে থেমে পর পর অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন। কথায় যেন তাঁর অব্যক্ত কৌতূহল। কেমন যেন দ্বিধা-জড়িত ভাবভঙ্গী।

জগমোহন বললে,—কার কথা কও কি জানি! জমিদার কৃষ্ণগ্রামের সঙ্গে দেখা হয়নি, কথা তো দূরের কথা। আমি রাজকুমারী, শুনেছি পাড়া-প্রতিবেশীর মুখে।

—জানাজানি হয়ে গেছে, নয় জগমোহন?

—হ্যাঁ রাজকুমারী, জানতে আর বাকী নেই কারও। তোমাদের সাতগাঁয়ের সকলেই জেনেছে।

নিরুত্তর থাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। খানিক নীরব থেকে বললেন,—তুমি সদরে যাও। মুখ-হাত ধুয়ে কিছু মুখে দাও আগে। জিরেন নাও, ঠাণ্ডা হও।

—বেশ কথা। আমি আছি সদরে। সহজ সুরে কথা বলতে সচেষ্ট হয় জগমোহন। বলে,—তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি ফিরবো না কিন্তু।

হঠাৎ হাসলেন রাজকন্যা। কৌতূহলী হাসি হাসতে হাসতে বললেন,—তোমাদের রাজমাতা কি ভেবেছেন আমি ম'রেছি? বাঘে খেয়েছে আমাকে?

হা-হুতাশ করলো জগমোহন। চোখ বড় ক'রে বললে,—বালাই ষাট্! কি যে বল তুমি! ক্ষণেক থেমে আবার বললে,—রাজকুমারী, তুমি যদি জানতে, যদি দেখতে পেতে রাজমাতার কি হাল হয়েছে! আমি না ফিরলে, গিয়ে তোমার হাল-হকিকৎ না শোনালে হয়তো উপোস ক'রেই থাকবেন।

বুকের মধ্যে কে যেন আঘাত করলো বিন্ধ্যবাসিনীর! উত্তেজনায় কতক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন। দীর্ঘ এক শ্বাস টেনে বললেন,— মা ঠাকরুণকে জানিও, আমি বেশ আছি এখানে। আমার তরে ভাবতে মানা ক'রে দিও। বিয়া দিয়ে পরের ঘরে যখন পাঠিয়েছে তখন—

কাতর হাসি হাসলে জগমোহন। রৌদ্রদগ্ধ কপালে হাত বুলোয় আর হাসে। হাসি থামিয়ে বললে,—তেনা যে তোমার মা রাজকুমারী! মায়ের মন তাঁর, তিনি যা ভাল বুঝবে, করবে। কারও কথা কানে তুলবে না।

বিন্ধ্যবাসিনী মনে হয়তো সান্ত্বনা পান। খুশী হন মনে মনে, অথচ প্রকাশ করেন না।· বলেন,—রাজমাতা কোথেকে জানলেন? আমি যে মাদারণে, কে বললে তাঁকে?

ভূমির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রলো জগমোহন। নিম্নদৃষ্টিতে বললে,—তুমি যে মাদারণে আছো রাজমাতা জানে না। তেনার কানে ওঠেনি। রাজমাতা জানে, তুমি বুঝি বা সাতগাঁয়েই আছো, বন্দী ক'রে রেখেছে তোমাকে।

আবার নির্বাক্ হয়ে পড়লেন রাজকন্যা। ধীর পদে ফিরলেন। দুর্ব্বল রোগিণীর মত চললেন অতি ধীরে। বললেন,—হাত-পা ধুয়ে জিরেন নাও জগমোহন! কিছু মুখে দাও আপাতত। জল খাও।

রাজকন্যা পিছন ফিরতে, সোজা চোখ চালিয়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্তায় দেখে লেঠেল জগমোহন; বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখে। তাঁর আপাদমস্তক দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সোনার বরণ ছিল রাজকুমারীর, পুড়ে যেন আঙার হয়ে গেছে। মোমের মত নধর গড়ন যেন শীর্ণ হয়ে গেছে! সেই অপূর্ব্ব রূপ যেন নেই আর! থাকলেও, সেই চিকণচাকন নেই। ভৈরবীর জটার মত মুক্তকেশী রাজকুমারীর চুলে যেন জট পাকিয়েছে! কালো চুল, তৈল বিনা সোণার রঙ ধ'রেছে।

এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাসে বিন্ধ্যবাসিনীর আলুলায়িত রুক্ষ চুলে তরঙ্গ খেলছে।

রাজকন্যা দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যেতে জগমোহনও পা চালালো। কাপড়ের খুঁটে চোখের প্রান্ত মুছে সদরের দিকে চললো।

সুতানুটীর রাজগৃহে তখন ট্যাম্বুরিণের ঝমাঝম ঝঙ্কারে বিরতি পড়েছে।

রাত্রি গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাবিজকন্যাদের নৃত্যলীলা থেমে যায়। সারেঙ্গী বাজিয়েরা রাজার আদেশে ত্যাগ করে নাচঘর। অন্যান্য বাজকার আর সঙ্গতকারয়াও বিদায় লয়। সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত নাচঘরের ফরাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে এলিয়ে ব'সে থাকে দুই নর্ত্তকী। গীত, বাদ্য আর নৃত্য চ'লেছিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। রাজনির্দ্দেশে ছুটি পেয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন নর্ত্তকীরা খুশীর প্রাবল্যে সুধামাখা হাসি হেসেছিল। চুণী-লাল রাঙা অধরের মিষ্ট হাসি দেখতে দেখতে কালীশঙ্কর যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন! সুসজ্জিত ও সুরম্য নাচঘরে তখন গঙ্গার হাওয়ার স্নিগ্ধ বাতাস খেলা করছে। কিংখাবের পর্দ্দাগুলি নেচে নেচে উঠছে মৃদুমন্দ সমীরণে। তাবিজ মেয়েদের কুঞ্চিত ঘনকুন্তল কপালের 'পরে নাচানাচি করছে! জেড আর অনিন্দ্য পাথরের অলঙ্কারসমূহ নর্ত্তকীদের দেহে চাকচিক্য তুলছে, দেওয়ালগিরির উজ্জ্বল আলোয়। নর্ত্তকীদের কৃষ্ণশোভা ভ্রূযুগ আর মুদিত নয়নপদ্মে যেন ইশারার ইঙ্গিত দেখেছিলেন রাজাবাহাদুর! ঐ লজ্জাভয়হীনাদের মদালস চাউনিতে ছিল যেন আকুল আহ্বানের ব্যাকুলতা।

চুয়ানো মদ্য পান ক'রেছিলেন কালীশঙ্কর। আখরোট আর কাজু দাঁতে কাটতে কাটতে নিজের অজ্ঞাতে পান ক'রেছিলেন অতি অধিক মাত্রায়। খেয়াল ছিল না আসবের প্রক্রিয়ায় চোখে যেন ঝাপসা দেখছিলেন রাজা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল ও গতিহীন হয়েছিল রক্তবর্ণ চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হয়ে থাকে। তাবিজকন্যাদের এক জনের একখানি হাত নিজ হাতে ধারণ ক'রে ব'সেছিলেন কালীশঙ্কর। একেকটি হাত যেন একেকটি শ্বেতপদ্ম, এমনই সুললিত, এমনই

সুকোমল! রাজাবাহাদুর মদির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, নর্ত্তকীদের দেহগঠন। লক্ষ্য করেন ওদের ক্ষীণকটিতে জরির কোমরবন্ধ। রেশমী ঘাগরা বুকের কাছে স্ফীত হয়ে আছে। বুকের খাঁজে ঝুলে প'ড়েছে রাজাবাহাদুরের প্রদত্ত হীরার কণ্ঠহার। ফিরোজা পাথরের দুল দুলছে কাণে। সাপের মত আঁকা-বাঁকা বিনুনীতে জরির বেষ্টন। বিনুনীর শেষ প্রান্তে জরির ট্যাসেল ঝুলছে।

বাদ্যকার, সঙ্গতকার প্রভৃতি অবাঞ্ছিতরা নাচঘর ত্যাগ করতে নর্ত্তকীদের কাছাকাছি এগিয়ে বসেছিলেন রাজাবাহাদুর। নধর নরম দেহের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করা যায় যেন!

—রাজাবাহাদুর!

অস্ফুটে ডাকলো যেন কে। ভয়ে অসাড় হয়ে ডাকলো। কিন্তু কোন সাড়া মিললো না।

—রাজাবাহাদুর!

আবার ডাক পড়লো সভয়ে। সম্ভ্রম আর সঙ্কোচের সুরে। নাচঘরের দুয়োর থেকে ডাক পড়ছে।

ফিরেও দেখলেন না কালীশঙ্কর। তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বললেন,—কোন্ শালা হে তুমি? বেকুব, বদমায়েস!

—আমি হুজুর আপনার অধীনের দেওয়ান।

—দেওয়ানজী! আপনি?

—হাঁ রাজাবাহাদুর।

—মাফ করবেন। আমি কিছু অপ্রকৃতিস্থ আছি। এত রাতে আপনি কি কারণে?

দেওয়ানজীর নিদ্রাজড়িত কণ্ঠ! বললেন,—রাজাবাহাদুর, অন্দরে কি আজ আর ফেরা হবে না?

—আদপেই নয়। মৃদু হাস্য সহকারে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আজ রাতের মত আমি নাচঘরেই থাকতে চাই। নাচঘরের প্রধান দ্বারে যেন পাহারার বন্দোবস্ত থাকে। খাস-খানসামারাও যেন থাকে।

—যথাজ্ঞা। দেওয়ানজী বিনম্র সুরে বলেন,—অন্দরের দরজায় তবে কুলুপ এঁটে দিই? বড়রাণী খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন অন্দর থেকে। আপনার এখনও আহার হয়নি যে!

—বড়রাণী? উমারাণী?

—হাঁ রাজাবাহাদুর।

হঠাৎ অট্টহাসি শুরু করলেন কালীশঙ্কর। নাচঘর কাঁপিয়ে হাসতে থাকলেন। নেশার ঝোঁকে কি না কে জানে, অসংযত হাসির শব্দে ফেটে পড়লেন যেন নিজে। হাসতে হাসতে বললেন,—আজ আমি দিল্লীর বাদশা বনেছি, হারেমে আজ আর ফিরছি না। এখানে ভাল-মন্দ আহারের কিছু অভাব নেই, জানিয়ে দিন আপনাদের বড়রাণীকে।

কথার শেষে রাজা কটাক্ষপাত করলেন, নর্ত্তকীদের চুণী-লাল অধর পানে চোখ বুলালেন।

দেওয়ানজী নাচঘরের দ্বারপ্রান্ত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চকিতের মধ্যে। আর কোন কথা বললেন না। বুঝলেন, রাজা এখন সত্যিই প্রকৃতিস্থ নেই। অসংযত কথা বলতে শুরু করেছেন। হাসছেন উচ্ছৃঙ্খল হাসি।

রাতের কুহেলী। ঘন-কালো আঁধার ছড়িয়েছিল দিকে দিকে। কৃষ্ণ-যবনিকা নেমেছিল যেন আকাশ থেকে। ঝিঁঝি ডাকছিল অবিরাম। আকাশে তারা আর গাছে গাছে জোনাকি জ্বলছিল দপ-দপ। অনেক দূরে কোথায় কেউ ডাকাডাকি করছিল। প্রতিধ্বনি ভাসছিল রাতের কালো হাওয়ায়।

চমকে চমকে ওঠে ঘুমন্ত রাজকুমার শিবশঙ্কর। শিয়রের কাছে বিনিদ্র রাজরাণী, ছেলের মাথায় হাত রেখে ঘুমে ঢুলতে থাকেন। রাজাবাহাদুরের আগমন-প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। রাজা অন্দরে ফিরলে তবেই আহার সারবেন। স্বামীকে খাইয়ে নিজে মুখে তুলবেন। রাতের খাওয়া আর মুখে ওঠে না উমারাণীর! কালীশঙ্করের দেখা মিলে না যে! উগ্র আসবের নেশায় মনে পড়ে না রাজার, কে বা রইলো অনাহারে! তাত্রিক্তকন্যাদের রূপের যাদুতে ভুলে গেছেন হয়তো স্বদার-সংসার!

কৃষ্ণযবনিকা কখন মুছে যায়! রাতের কালো পর্দা স'রে যায় কখন!

ভোরের শুভ্র-শান্ত আলোর স্পর্শ লাগে রাজগৃহের শীর্ষে। চিড়িয়াখানার হরেক রকম পাখী ডাকাডাকি শুরু করে নতুন আলো দেখে। ক্ষুধার্ত্ত পশুদের চিৎকারে পাইক, পেয়াদা, প্রহরী আর খানসামাদের নিদ্রা টুটে যায়। দুয়োরে দুয়োরে গঙ্গাজলের ছিটে পড়লো। কিন্তু নাচঘরের দ্বার এখনও খুললো না!

নাটমন্দিরে পুরোহিত আবাহন-মন্ত্র পাঠ করেন। আবাহনী স্তুতি। প্রথম সন্ধ্যার পূজা-পাঠ চলতে থাকে। তন্ত্রধারক পুঁথি খুলে বসেন। তৈজসপত্র তোলপাড়া করেন ব্রাহ্মণেরা। ধুনুচিতে হাতপাখার বাতাস দেন কেউ। কেউ চন্দন ঘসতে বসেন। ফুল-বিল্বপত্র বাছতে বসেন কেউ।

সদ্যস্নাতা, লালপাড় পট্টবস্ত্রপরিহিতা রাণীরা, সহচারিণী দাসীদের সঙ্গে আসেন একে একে। উমারাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বজয়া। নৈবেদ্যর কুঠরীতে নৈবেদ্য রচনা করতে বসেন তাঁরা। আতপ তণ্ডুল, ফল আর মিষ্টান্নের নৈবেদ্য রচেন একেক জন। তিন জনেই যেন মূক, বাকশক্তিহীনা,—এমনই গম্ভীর!

উমারাণীর ঘুম-ঘুম চোখ। রাতে সুনিদ্রা ছিল না। আহারও ছিল না—তাই যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত-ক্লান্ত। তদুপরি রাজাবাহাদুরের দেখা মেলেনি রাতভোর। রাজার সোহাগ-সম্ভাষণ মেলেনি।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন সর্ব্বমঙ্গলা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—আমরা দু'বোন না হয় চাষেরর মেয়ে, তুমি তো তা নয় পাটরাণী! আমাদের না হয় রূপ-যৌবনের কদর নেই রাজার কাছে, তুমি তো আদরবিবি! তবুও কেন রাজার এমন মতি-গতি? দু'দু'টো মুসলমানীকে কি না ঘরে তুললো!

বেদনার হাসি হাসলেন বড়রাণী। হতাশার হাসি। কি বলতে গিয়ে যেন বলতে পারলেন না। আত্মসংযম করলেন। আরও যেন গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

সর্ব্বমঙ্গলা বললেন,—শুনছি, মুসলমানী দু'টোকে দাম দিয়ে কিনে ফেলেছেন না কি! দামী দামী রত্নহার ওদের পায়ে ঢেলেছেন!

কলা-বউ যেন উমারাণী। সাবগুণ্ঠনা। লজ্জায় নম্রমুখী।

ধীরকণ্ঠে বললেন,—পিরীত যখন জোটে, ফুটকড়াই ফোটে, আর পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে!

খিল্‌-খিল্‌ হাসলেন সর্ব্বমঙ্গলা। যৌবন টলমলিয়ে উঠলো যেন!

—আমার কাশী যদি রাজা হ'তো, তা হ'লে কি এমন দুরাচার চ'লতো!

রাজমাতা কথা বলছেন। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আসেন বিলাসবাসিনী। ফেরার পথে নাটমন্দিরে প্রণাম সারতে আসেন। সঙ্গে দাসী ব্রজবালা।

রাজমাতার কণ্ঠ শুনে রাণীরা যেন নড়ে-চড়ে বসলেন। ভয়ে ভয়ে যে যার কাজে মন দিলেন।

বিলাসবাসিনীর চলাফেরায় হাঁফ ধরছে যেন। অবগাহন স্নান করেছেন, মাথায় জল প'ড়েছে, চোখ দু'টি তাই রক্তবর্ণ ধারণ ক'রেছে। গায়ে ভিজে গেছে তাঁর তসরের কাপড়। হাতে জপের ঝুলি।

আবার কথা বললেন রাজমাতা। জপের ঝুলি ব্রজবালার হাতে দিয়ে বললেন,—ঘরে এমন সব রূপসী বৌ থাকতে কি না মুসলমানীর রূপে ম'জে গেল?

রাণীরা বুঝলেন, কার প্রসঙ্গে এ সকল উক্তি। কেউ কোন' কথা বললেন না। মুখ তুললেন না। যে যার হাতের কাজ করছেন।

বিলাসবাসিনী আবার বললেন,—নারায়ণ! আমার কপাল কেন পুড়লো ব'লতে পারো? জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম'রলো না কেন? এমন জানলে নুণ খাইয়ে মেরে ফেলতুম অমন ছেলেকে।

রাণীরা চমকালেন রাজমাতার কথায়। প্রতিবাদ জানাবেন, তেমন দুঃসাহস আছে না কি কারও?

—মদ আর মেয়েমানুষ বৈ আর কিছু চিনলো না? বিলাসবাসিনীর গম্ভীরকণ্ঠে নাটমন্দির যেন গম-গম করতে থাকে। তিনি বললেন,—মরেও না তো এমন নষ্ট ছেলে! কি পাপ ক'রেছি নারায়ণ?

নারায়ণ নিরুত্তর। মূর্ত্তির চোখ অচঞ্চল। ত্রিলোকের পূজ্য, তবুও যেন দর্পহীন! করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন অপলক।

—আমার কাশী, তার হাঁকডাক, রাগারাগি যতই থাক, সে যদি দরবারের গদীতে ব'সতো! বিলাসবাসিনী আক্ষেপ জানান নির্ব্বাক দেবতাকে।

হাতের কাজ সেরে উঠে পড়লেন উমারাণী। ভাল লাগছে না যেন কানে শুনতে! রাজমাতার অভিযোগ তাঁর বক্ষ-মাঝে তুলেছে আলোড়ন; মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা!

কুমার কাশীশঙ্কর তখন গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছেন, সেই সকাল থেকে। আঙিনায় ঘর বাঁধছে ঘরামির দল। খড়ের চালা বাঁধছে। আড়তদার হয়েছেন ছোটকুমার, তাই আড়তের ঘর বানিয়ে ফেলছেন রাতারাতি!

বৈশাখের সূর্য্যালোক মাথার 'পরে। খেয়াল নেই কাশীশঙ্করের।

—কুমারবাহাদুর!

কার ডাক শুনে কান ফেরালেন কুমার।

—ইংরেজের কুঠি থেকে কে যেন আইচেন। সাক্ষাৎ করতে চান হুজুরের সঙ্গে।

সেরেস্তার এক জন গোমস্তা। কুমারের পিছনে থেকে কথা বলে সভয়ে।

—রামনারাণ না কি?

সোল্লাসে স্বগত করলেন কুমার। নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন! ইংরেজ কুঠীর দেশী দালাল রামনারায়ণের অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন তিনি। তার আগমন প্রত্যাশায়। আজ আসবে, কথা দিয়েছিল যে রামনারায়ণ, ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে। কথা পেয়ে, সম্মতি পেয়ে নিজ কণ্ঠের মুক্তাহার কুমার পরিয়ে দিয়েছিলেন রামনারায়ণকে!

দিবা-রাত্রি কাজ চলেছে ঘর-বাঁধার। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই ঘরামিদের। বাঁশ বাঁধছে, মাটি লেপছে, খড়ের আঁটি চালায় তুলছে। একটা অস্পষ্ট কলগুঞ্জন চ'লেছে কর্ম্মরত ঘরামিদের মধ্যে। কুমারবাহাদুর স্বয়ং কাজের তদারক করছেন, তাই যেন তারা অতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—রামনারায়ণ সুস্বাগতম্?

সদরের এক কক্ষে প্রবেশ ক'রেই সানন্দে বললেন কাশীশঙ্কর।

তক্তাপোষের ফরাসে ব'সেছিল রামনারায়ণ। উঠে দাঁড়ালো। আনত হয়ে দুই হাত কপালে তুলে প্রণাম জানালো। বললে,—পেন্নাম কুমারবাহাদুর!

—নমস্তে রামনারায়ণ!

কুমার দুই বাহু মেলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আগন্তুককে।

—কি হুকুম তাই বলেন।

রামনারায়ণ কথা বললে সাগ্রহে।

—হুকুম নয় রামনারায়ণ! বললেন কাশীশঙ্কর। ফরাসে আসন গ্রহণ ক'রে বললেন,—তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আমি। তুমি আমার পাশে দাঁড়াও। পথ বাৎলাও।

—আমি কি করতে পারি কুমারবাহাদুর?

—বলছি রামনারাণ, তুমি আগে পান-তামাক খাও। কাশীশঙ্কর হেসে হেসে কথা বললেন। হঠাৎ কণ্ঠ সপ্তমে তুলে বললেন,—খানসামারা গেল কোথা সব?

—হুজুর এখানেই আছি। বলেন কি বলবেন।

এক জন ভৃত্য কোথা থেকে এসে দেখা দেয়। তার এক হাতে আলবোলা আর আরেক হাতে রূপোর পানদান। তক্তাপোষের ফরাসের 'পরে নামিয়ে রেখে ভৃত্য বলে,—হুজুরণী শুধোচ্ছিলেন কিছু খাবার-দাবার পাঠাবেন কি?

কাশীশঙ্কর বললেন,—পাঠাবেন বৈ কি! নিশ্চয়ই পাঠাবেন। রামনারাণকে না খাইয়ে ছাড়ছি না আমি।

কেমন যেন কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলো রামনারায়ণ। বললে,—কুমারবাহাদুর, খাওয়া-দাওয়া কেন আবার? গেরস্তকে অনর্থক ব্যস্ত করতে চাই না।

—সে কি কথা রামনারাণ? সবিস্ময়ে বললেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—মিষ্টিমুখ করবে না, তা কখনও হয়?

—কাজের কথা বলুন কুমারবাহাদুর! দেখি আমি যদি কিছু করতে পারি। আলবোলার সর্পিল নটকা মুখে তুললো রামনারায়ণ। কথা থামিয়ে আমীরী টান দিতে থাকলো ঘন ঘন।

—ইংরেজের কুঠীতে আমি যোগানদার হতে চাই রামনারাণ!

অকৃত্রিম বিনয়ের সুরে বললেন কাশীশঙ্কর। তাঁর আসল বক্তব্যটি পেশ ক'রে ফেললেন। বললেন,—শুনি নাকি কুঠীয়ালরা প্রচুর মাল-মশলা কেনা-কাটা করছে কোম্পানীর তরফ থেকে?

—হাঁ কুমারবাহাদুর! তা যা বলেছেন। ধোঁয়া উদ্গিরণ করতে করতে বলে রামনারায়ণ। বলে,—তবে কথা কি জানেন, যোগানদার হওয়া আপনার চাট্টিখানি কথা নয়। ঐ শালা কুঠীয়ালদের হাত করতে হবে সর্বাগ্রে। ওদের মধ্যে যারা সওদার কাজ করে, সেই এজেণ্ট শালারাই হচ্ছে কি না সর্ব্বেসর্ব্বা!

—তাই নাকি রামনারাণ? তার উপায় বাৎলাও তুমি।

রামনারায়ণ আলবোলার গর্ভে মেঘগর্জ্জন তোলে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টান দিয়ে যায় একের পর এক। বেশ কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে টানতে টানতে হঠাৎ বললে,—এজেণ্ট শালারা হুজুর ঘুষ ছাড়া এক পা এগোয় না। কথায় কথায় টাকা গুঁজতে হয় হাতে হাতে। আগাম দাদন দিতে হয়। মাইনে যা পায় তা নামমাত্র। ঘুষ নইলে কথাই কয় না।

—রাজী আছি রামনারাণ!

—তবে হুজুর কথার আর কি আছে? ঘুষ দিতে পারলে কত যোগান দিতে পারেন দিন না কেন।

কথার শেষে আবার মুখনল মুখে তোলে রামনারায়ণ।

কাশীশঙ্কর কেমন যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। স্বপ্ন সার্থক হওয়ার আভাস পেয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। মুখের প্রসন্ন হাসি লুকিয়ে বললেন,—ইংরেজের কুঠীতে কোন্ কোন্ মালের চাহিদা আছে রামনারাণ?

ভেবে ভেবে রামনারায়ণ বলে,—শোরা আর লবণের চাই—এই দু'য়ের চাহিদাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হুজুর! যেখানে যে দরে পাচ্ছে কিনে ফেলছে।

—তার পর?

—তার পর হুজুর ভাল কাপড়, বেনারসী, ঢাকাই মসলিন, পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, এণ্ডী, ক্ষীরোদ।

—তার পর?

—তার পর হুজুর চাল, ডাল, আটা, লবণ, নারকেল, চিঁড়া, ছাতু, তেল, ঘি, চিনি। রামনারায়ণ থেমে থেমে বলে যায়। বলে,—ইংরেজদের স্বেচ্ছদেশে কুমারবাহাদুর ধর্ম্মের লড়াই চলছে বর্ত্তমানে। গোলা-বারুদ তৈরীর কাজের জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি শোরা আর লবণের চাই চালান দিচ্ছে জাহাজে। হপ্তায় হপ্তায় মাল-বোঝাই জাহাজ ছাড়ছে জাহাজঘাটা থেকে।

গ্রেট ব্রিটেনে ধর্ম্মযুদ্ধ চ'লেছে সত্যিই। ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্টাণ্টদের লড়াই উগ্র আকার ধারণ ক'রেছে। আগুন জ্বলছে ইংরেজদের ঘরে ঘরে। পথে পথে যুদ্ধ চলেছে হাতাহাতি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছে দুই দলের মধ্যে। তীরন্দাজদের হাতে উঠেছে টোটাভরা বন্দুক! আগ্নেয়াস্ত্র!

—আমাকে এখন কি করতে হবে রামনারাণ? ঘুষ আমি দিতে রাজী আছি। যত টাকা লাগে।

—ঘুষ দিলেই কুমারবাহাদুর পাট্টায় চুক্তি হয়ে যাবে। আপনিও হুজুর বাঁধা যোগানদার হয়ে যাবেন কোম্পানীর। খাতায় নাম লিখে নেবে তখন। তার পর আমি তো আছিই।

—ঘুষের টাকা কত লাগবে রামনারাণ!

লজ্জার বাধা ঘুচিয়ে ব'লে ফেললেন কাশীশঙ্কর। মাথা চুলকে ব'লে ফেললেন।

ভেবে ভেবে কোন' একটি অঙ্ক স্থির করতে পারে না যেন রামনারায়ণ—কোম্পানীর বাঙালী দালাল। কুঠীয়ালদের বকলম, নিয়োজিত প্রতিনিধি। ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যগ।

অনেক চিন্তার পর কথা বললে,—তা হুজুর, আপনার হাজার পাঁচেক টাকা তো বটেই। ক'জন এজেণ্ট আছে।

—তাতেও রাজী রামনারাণ। বলতে যেন এতটুকু দ্বিধা করলেন না কাশীশঙ্কর। অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললেন। খানিক থেমে বললেন,—টাকা আমি দিতে পারবো না কিন্তুক। ঐ টাকার মোহর দেবো। আকবরী মোহর!

চোখের লোলুপতা লুকাতে দুই চোখ বন্ধ ক'রলো রামনারায়ণ। লোভের দৃষ্টি লুকালো। বললে,—তাই দেবেন কুমারবাহাদুর! কিন্তু ফ্যাক্টরারা যেন জানতে না পারে ঘুণাক্ষরেও। কেউ যেন না জানতে পারে! জানতে পারলে হুজুর আমার এ্যাদ্দিনের চাকরীটা যাবে, হাতে হাত-কড়া পড়বে!

—এক ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেউ জানবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হও। কাশীশঙ্কর চাপা সুরে কথা বলেন ইদিক-সিদিক তাকিয়ে। বলেন,—পাঁচশো মোহর এখনই দিয়ে দিই তোমার হাতে।

—না কুমারবাহাদুর! এমন কাজ করবেন না। চোর-ডাকাতের হাতে শেষে তুলে দেবেন না কি? কেড়েকুড়ে নেবে যে পথে বেরোলেই। অপঘাতে ম'রবো কি আমি?

—তবে উপায়?

ভেবে ভেবে বললে রামনারায়ণ,—ঘোড়সওয়ার পাঠাবেন কুমারবাহাদুর! আমার ঘরে তুলে দিয়ে আসবে।

—তথাস্তু!

কাশীশঙ্কর যেন চিন্তামুক্ত হন। কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। সুস্থির হয়ে বসেন। লক্ষ্মীর কবচ পাঠ করেন মনে মনে। লক্ষ্মী যদি সুপ্রসন্না হন। সদাগরীর বৃত্তি নেবেন রাজকুলোদ্ভব কুমার কাশীশঙ্কর, লক্ষ্মী যদি কৃপা করেন!

—বাবামশাই!

কোমল কিশোরীকণ্ঠের ডাক! আধো-আধো কথা। বনলতা শাড়ীর আঁচল লুটোতে লুটোতে কাশীশঙ্করের কাছে এসে দাঁড়ায়। কি যেন বলতে চায় সে। কানে কানে বলে কাশীশঙ্করের! কি বলে কে জানে!

—গৃহিণীর আহ্বান এসেছে রামনারাণ। কন্যাদূতীকে পাঠানো হয়েছে। সহাস্যে বলতে বলতে তক্তাপোষ থেকে নীচে নামলেন। বললেন,—তুমি যেও না রামনারাণ! আমি অচিরাৎ আসবো। বনলতা, তুমি কথা কও রামনারাণের সঙ্গে। এখানে থাকো আমি যতক্ষণ না আসি।

মৈত্রীর জয়যাত্রা

[প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সোভিয়েট পরিভ্রমণ]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মানুষ মানুষ, যখন যা হোক, সবাই সবার মিতা।
অসাধ্য নয় সারা বসুধায় পাতানো কুটুম্বিতা।
ভালবাসা টানে সব ভালবাসা, দেয় মিতালীর বেড়।
অসীম শক্তি মানব-বুকের মাধ্যাকর্ষণের।
থাকুক বিভেদ, দম্ভ দর্প যতই বৈরীভাব,
মনের মানুষ পেলে সব ভোলে নরের এই স্বভাব।
প্রেম-প্রীতি যার সাথী—
বিদেশ-স্বদেশ সব বান্ধব, সব জাতি তার জ্ঞাতি।

তুমি ভারতের প্রধান মন্ত্রী—সেটা বড় কথা নয়,
মায়া-মমতার মানুষ তুমি যে, এই তব পরিচয়।
তোমার ছিল না ছত্র-চামর, মকর-কিরীট শিরে,
বীর বিজয়ীর বেশে যাও নাই, লক্ষ লোকের ভিড়ে।
ভারতের শুচি ব্রাহ্মণ মন, অন্তর করুণার,
মুনি-ঋষিদের চরণের ধূলি, আশীষ মহাত্মার—
এই তো পাথেয় তব—
গোটা এ বিশ্ব হ'ল আপনার দৃশ্য এ অভিনব!

ইস্পাত আর তুষারের দেশ—শৌর্য্যের সোভিয়েট,
হ'ল হাসি-খুশী ফুলের রাজ্য—অপূর্ব্ব সে ভেট।
লাল দেশ হ'ল ফাগে লাগে লাল, কি যাদু-মন্ত্র হায়?
'ভলগা' এবং 'রূপনারায়ণ' এক হ'ল—চেনা দায়।
কৃষ্ণসাগর কল-কল্লোলে বলে যেন বার বার,
'কৃষ্ণের দেশ হতে আসিয়াছ তোমাকে নমস্কার!'
অতীতের কথা ভুলি—
ভারত এবং সমরখন্দে কি নিবিড় কোলাকুলি!

কোথায় ভারত, কোথা সোভিয়েট? মনে যে হয় না ভিন্ন,
স্বজন জুকভ, মোলাটভ আর ক্রুশেভ বুলগানিন্।
তুমি যে জগন্মঙ্গল ব্রতী, কল্যাণব্রত হৃদি,
শান্তির দূত, বেদন-বন্ধু ভারতের প্রতিনিধি
তব গতি-পথ হাসি-ফুলে মোড়া স্নিগ্ধ ও রমণীয়,
যেথা গেছ, সেই হয়েছে ভারত, সব লোক ভারতীয়।
দেখিলে গর্ব্ব হয়—
এই তো সত্য বিজয়-যাত্রা এই তো দিগ্বিজয়।

—রাতরাণী!

অন্দরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন কুমারবাহাদুর।

মহাশ্বেতা অদূরে দাঁড়িয়ে। কেমন যেন স্তব্ধ শান্ত। মুখে যেন তাঁর দুশ্চিন্তার ছায়া।

—রাতরাণী!

—কুমারবাহাদুর! কাছে এসো আমার! কথা আছে একটা।

কাশীশঙ্কর স্বপ্ন সার্থক হওয়ার আভাস পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে আছেন। পরিহাসের সুরে বললেন,—ঠিক এই ক্ষণে কি কাছে যাওয়ার সময়? সময়-অসময়ের বাছবিচার নাই?

মহাশ্বেতার মুখাকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে হাসি ফোটে না! কেমন যেন ভীতিবিহ্বলতা! কুমার নিকটে যেতে মহাশ্বেতা বললেন,—রাজমাতা মূর্চ্ছা গেছেন নাটমন্দিরে! তুমি এখনই যাও!

—আঃ!

বিরক্তির সুর কাশীশঙ্করের। বললেন,—রাজমাতাকে নিয়ে আর পারি না!

মহাশ্বেতা কুমারের হাত ধরলেন নিজ হাতে। সুমিষ্টকণ্ঠে বললেন,—ছিঃ কুমারবাহাদুর, তিনি তোমার গর্ভধারিণী মা! অমন কথা বলতে আছে কি?

—নাটমন্দিরে যাওয়াই বা কেন অথর্ব্ব শরীরে? মেয়ের দুঃখে মূর্চ্ছা না কি?

—তা জানি না! তুমি এখনই যাও! দুঃখভরা সুরে বললেন মহাশ্বেতা। বললেন,—তুমি যে কেন পরনাক্ষী হও বুঝি না! কৃষ্ণরামের দাবী তো মিটিয়ে দিলেই হয়। বিন্ধ্যবাসিনীও সুখী হয়!

—আমি জীবিত থাকতে নয়।

কাশীশঙ্কর দৃপ্তকণ্ঠে কথা বলে অন্দর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতগতিতে। মহাশ্বেতা শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে রইলেন। স্মরণ করলেন বিপত্তারিণীকে। ইষ্টদেবীকে।

বিন্ধ্যবাসিনী কিছুই জানতে পায় না। পিত্রালয়ের লোক, রাজগৃহের লেঠেল জগমোহনের হঠাৎ দেখা পেয়ে সকল দুঃখ যেন ভুলে যায়। মনের কষ্ট মনে থাকে না। ভাঙা-ভিটায় বন্দিনী রাজকন্যা! পিত্রালয়ের লোককে কাছে পেয়েছে। আনন্দাতিশয্যে জল ঝরছে রাজকুমারীর চোখ থেকে!

বাপের বাড়ীর লোককে খাওয়াতে বসেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। ক'দিন অন্ন জোটেনি জগমোহনের। গোগ্রাসে গিলছে সে। হাপুশ-হুপুশ শব্দে। ভাতের পাহাড় জগমোহনের পাতে!

চোখের জল আঁচলে মুছে বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—কত দিন যে দেখিনি রাজমাকে! বুকের ভেতরটা যেন আই-ঢাই করে

রাজকুমারী জানতে পায় না, তার ভাবনা ভেবে ভেবেই মূর্চ্ছা গেছলেন রাজমাতা! আজ সকালে।

[ক্রমশঃ।

মনোজ বসু

(২)

দিল্লি অনেক দূর। দূর বলেই ভাঁওতা দিয়ে কিঞ্চিৎ পশার জমিয়েছি ঐ জায়গায়। এবেলা-ওবেলা নেমন্তন্ন, সন্ধ্যে হলেই মীটিং। রাজধানীর মানুষ কী ভালোমানুষ গো! সাহিত্যের নামেই গলে যান, ভ্রূ কুঁচকে কষ্টিপাথরে দর ঠুকতে বসেন না।

ওখানে সন্তোষ ঘোষ থাকেন, যার লেখায় আপনারা মসগুল। আমার ভাই। সহোদর কিম্বা খুড়তুতো-জেঠতুতো-মামাতো ইত্যাদি বাজে সম্বন্ধের নয়—ওসবের চেয়ে ঢের ঢের আপন। বউমা এবং বাচ্চারাও সব তেমনি। দিল্লি গেলে অতএব ঐখানে আস্তানা। আস্তানা এমনি অনেক জনেরই। যত মানুষের ঝামেলা বাড়ে, বউমা'টির স্ফূর্তি বেড়ে যায় ততই। খেটে খেটে খেটে সুখ করে নেন। এবার আমায় ঘোরতর দাবড়ি দিয়েছেন। একটা দিন মাত্র আছেন—খবরদার কোনখানে নেমন্তন্ন নেবেন না। নিলেও যাওয়া হবে না, স্পষ্ট কথা।

তবু রেহাই হল না। সোবিয়েত অ্যাম্বাসি সন্ধ্যের পর ডেকেছেন, যাত্রামুখে একসঙ্গে ফুর্তিফার্তি হবে। দিল্লির ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতি-সংঘ এদিকে রাস্তার আধখানা জুড়ে মেরাপ বেঁধেছেন, অধমদের চায়ে বসিয়ে বসিয়ে দিয়ে সেই ঝোঁকে গোটা পাঁচ-সাত বক্তৃতা শোনাবেন। কোন দায়টা এড়ানো চলে বলুন। ভোর থেকে বিষম ছুটোপাটি। ছোটো মার্কারি-ট্রাভেলকে—কাবুলে যাঁরা চালান করছেন; ক'টার সময় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সঠিক অন্ধি-সন্ধি জেনে এসো। ঠিক দুপুরে একবার মীটিঙে যেতে হবে নেতা ও উপনেতা বাছাইয়ের জন্য। মানুষ ঠিকই আছে, কার প্রস্তাব কোন ব্যক্তির সমর্থন কত জন সমস্বরে অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠবে, আগাগোড়া পদ্ধতি ছকে ফেলা আছে। তবু নিয়মমাফিক হাজির হয়ে একটিবার ঘাড় নেড়ে আসা। ঘাড় না নাড়তে চান, চুপ করে বসে থাকবেন—তবে হাজিরাটা চাই।

ইতিমধ্যে নিখুঁত এক ফর্দ হয়ে গেছে, দূর-বিদেশে আরও কোন কোন বস্তু দরকার পড়বে আমার। পেন্সিল তো অতি-অবশ্য চাই—আকাশের অনেক উপরে উঠলে কলমের মুখে ভলকে ভলকে কালি বেরোয়, পেন্সিল তখন অগতির গতি। সন্তোষ বলল, সেটা হবে তার খরচে। অতএব পাঠকসজ্জনদের এই যে খোঁচাখুঁচি করছি, পাপের ভাগ তারও আসে—পেন্সিল-অস্ত্রটার সেই যোগান দিয়েছে।

দেবদাস পাঠক মহোৎসাহে ফর্দ নিয়ে বেরুল। দিল্লির যাবতীয় পথঘাট তার নখদর্পণে। আমার একারই শুধু নয়—ওরা কাশ্মীরে যাচ্ছে তার টুকিটাকি জিনিষ আছে, গৃহস্থের ফরমায়েসও আছে দুটো-একটা। কেনা-কাটা সুবিধা দরেই হল বটে—পেন্সিলে দু-পয়সা কম, মোজায় এক আনা। টাঙায় রিক্সায় ট্রামে টাকা তিনেকের মতো ব্যয় করে নয়াদিল্লি-পুরানো দিল্লির সকল মহল্লা ঘুরে গলদঘর্ম হয়ে এক প্রহর রাত্রে সওদা এনে ফেলল—তা কম নয়, আনা পাঁচ-ছয় মুনাফা করে এসেছে মোটমাট। করিৎকর্মা ছেলে—এত কষ্ট করে এসেও তিলেক বিশ্রাম নয়। জিনিষপত্র গোছাতে লেগে গেল। গুছিয়েও ফেলল চক্ষের নিমিষে। কাবুলে রাত্রিবেলা হিমে ঠোঁটে একটু ক্রিম ঘষব, পেঁটরা খুলে দেখি,—না, জিনিষ ঠিকই দিয়েছে, ক্রিমের বদলে ঢুকিয়ে দিয়েছে বউমার সিঁদুরকৌটা।

শেষ রাতে রওনা। তখন মোটর মেলে না মেলে—অশ্বিনী গুহ মশায় হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের একটা গাড়িতে এরোড্রোম যাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঐ কাগজের পয়লা এডিটার হলেন ধীরেন সেন—তাঁকে তুলে নেবো আত্মীয়ের বাসা থেকে। ঘুম যদি না ভাঙে, তজ্জন্য হরেক ব্যবস্থা। ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কলকব্জার কথা বলা যায় না—সে ঘড়ি ধরুন আজকের রাতে বাজল না। ঘড়ি ছাড়া মানুষও তখন জন পাঁচ-সাত সমকণ্ঠে ভরসা দিলেন, কোন চিন্তা নেই—ঠিক সময়ে তাঁরা তুলে দেবেন। গাড়ির ড্রাইভার বললেন, শেষ রাতে কাগজ নিয়ে ষ্টেশনে ষ্টেশনে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ, ঘাবড়াবেন না। চারটেয় কি বলছেন—বলেন তো একেবারে বারোটায় ঘুম থেকে তুলে দিতে পারি। সন্তোষ নাইট-ডিউটি নিয়ে নিয়েছে। বলে, বেয়ারা পাঠিয়ে দেবো—শিকল ঝনঝনিয়ে জাগিয়ে তুলবে; তার পরে আমি তো এসে যাচ্ছি ঠিক সময়ে।

বারাণ্ডায় শুয়েছি। রাস্তা খানিকটা দূরে। লনের মাথার উপরে আকাশ-ভরা তারা ঝিকমিক করছে।...

ধড়মড় করে উঠে বসলাম এক সময়। সর্বনাশ! সকাল হয়ে গেছে যে! উঁকি দিয়ে দেখি, যাঁরা অভয় দিয়েছিলেন, সমতালে নাসাগর্জন চলছে তাঁদের। কোথায় সন্তোষের বেয়ারা, কোথায় বা ষ্টেশনে কাগজ পৌঁছানোর ড্রাইভার! কাচের জানলা ভেদ করে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফিসের অগণ্য আলো আর রোটারি মেশিনের ক্ষীণ আওয়াজ আসছে শুধু। ঘড়িটাও, যা ভাবা গিয়েছিল—মওকা বুঝে ধর্মঘট করেছে; বেশ একখানা ঝাঁকুনি দেওয়া দরকার। আরে আরে, কি কাণ্ড! মোটে যে এখন আড়াইটে!

তা উঠে পড়েছি যখন, গোছগাছ করে নিই। নিশিরাত্রি এবং কনকনে শীত হলেও দিনমানের স্নানটা চুকিয়ে নিই। পা টিপে টিপে চোরের মতো স্নানঘরে গেলাম—বউমা'টি জেগে না ওঠেন। বেরিয়ে এসে দেখি, যে ভয় করেছিলাম—জলের ঝিরঝিরানিতে বউমা চোখ মুছতে মুছতে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে গরম গরম লুচির বন্দোবস্তে বসে গেছেন।

খেয়ে-দেয়ে মাথার চামড়ায় চিরুণী বুলিয়ে জামাজুতো পরে পা দোলাচ্ছি, তখন একে একে সব উদয় হচ্ছেন। শিকল বাজিয়ে উঠল সন্তোষের বেয়ারা। ড্রাইভার ও গাড়ির যুগপৎ গর্জন উঠল নিচে থেকে। ওবাড়ির শচীন ঘোষ এলেন। সাইকেলে মাছওয়ালারা এসে ঊষালোকে রকমারি মাছের নাম শোনাতে লাগল। ডিউটি সেরে স্বয়ং সন্তোষও তারপর এসে পড়ল।

আমি যাবো এরোড্রোম অবধি।

কি দরকার! রাত জেগে কষ্ট করে এলে—

তাই ভোরের হাওয়ারই দরকার—

ঘরের ভিতরের নাসাগুলো সহসা নিস্তব্ধ। কর্তব্যে সজাগ হয়ে তাঁদের একজন বলে উঠলেন, উঠুন উঠে পড়ুন—যাওয়ার সময় হয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি বলি, ঘুমোন, ঘুমিয়ে পড়ুন—যেমনটা ছিলেন। শব্দসাড়ায় বাচ্চারা জেগে উঠলে যাওয়ার দেরি পড়ে যাবে।

শহর ছাড়িয়ে এসেছি। নির্জন পথ, হুশ করে এক-আধটা মোটর বেরিয়ে যাচ্ছে কদাচিৎ। আলো একটা এখানে, একটা ওখানে—তারাই পাহারাদার। জনমানব নেই কোন দিকে কোজাগরী পূর্ণিমা—জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক হাসছে। তার মধ্যে মৃদু গর্জনে ছুটেছে আমাদের গাড়ি। এ রূপ দেখা হয় না কোন দিন—রাজধানীর এমন রূপ ক'জন দেখেছে?

এরোড্রোমে পৌঁছলাম, তখনও সকাল হয়নি। একে দুয়ে দলের সব এসে জুটছেন। ভাড়া-করা প্লেন—দশ-বিশ মিনিটে; নেহাৎ ফেলে পালাবে না, জেনেবুঝে চা-টা খেয়ে দুলকি চালে আসছেন তাঁরা। রওনায় তাই কিঞ্চিৎ দেরি হল। কাষ্টমসে রীতরক্ষার মতো একটু চোখ বুলিয়ে নিল। ছবি তুলছে; গলায় মালার উপর মালা চড়াচ্ছে। পয়লা সারিতে গিয়ে বসেছি আমি। হাতে কলম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সকলে। তা দেখুন গে—ওতে লজ্জা নেই, আমার এই জাতব্যবসা।

উল্লাস-ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্লেনের দরজা এঁটে দিল। খাঁচার ইঁদুর এখন। কাচের আড়াল থেকে লোকজনের বিদায় অভিনন্দন দেখছি। প্রপেলারের তিন সুদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে প্লেন খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। অতি ভয়ানক রকম গর্জাচ্ছে—কাঁপছে থর-থর করে। ছুটল খানিকটা পাগলের মতো। তার পরে হুশ করে আকাশে উঠে পড়ল।

সফাদরজঙ্গ প্রাচীন মহিমা নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে সেটা বিলীন হয়ে গেল। বিশাল দিল্লি শহর এখন মাত্র সাদা সাদা কতকগুলো স্তূপ। জমির উপর খানিকটা করে চুণ ঢেলে দিয়েছে যেন। তার পরে জঙ্গল—পাহাড় মাথা বাড়িয়েছে জঙ্গল থেকে। দিল্লি যে পাহাড়ের উপর, আকাশে উঠলেই সেটা ভাল করে মালুম হয়।

পাহাড় গেল তো মাঠ—মাঠের আর শেষ নেই। এক একটা জায়গায় অনেকগুলো বাড়িঘর—যেন এটার ঘাড়ে ওটা, এমনি ভাবে গাদা করে রেখেছে। খালগুলো মাঠের এধার-ওধার চিরে চিরে গিয়েছে। এমনি অজস্র ধমনীপথে ক্ষেতে ক্ষেতে জল সরবরাহ হয়। আঁকাবাঁকা বৃহৎ জলধারাও দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে, নদী ওগুলো।

যাচ্ছি এখন সাড়ে ছ'-হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। পাইলটের ঘর থেকে খবর এলো—লাহোর নামব পৌনে-ন'টায়। তার আগে বড়নালার উপর দিয়ে যাব ৭-৫৪ মিনিটে। আকাশে উঠে ভাবনা-চিন্তাও উঁচু দরের হয়ে ওঠে। পদতলে অনেক নিচের মাটি-অঞ্চলে মানুষ নামে একপ্রকার কীট কিলবিল করে বেড়ায়। ঐ দেখতে পাচ্ছেন তাদের গ্রাম—শত খানেক খেলাঘর ছটাক খানেক জায়গায় জড়ো করা! ঘর যাই হোক একটু চোখে দেখছেন, কিন্তু মানুষ নজরে আসবে না। ল্যাবরেটারির অণুবীক্ষণে বীজাণু দেখবার মতন করে দেখতে হবে। গুটি-গুটি রেলগাড়ি চলেছে শুয়োপোকার মতো। খেলনার লাইনের উপর যেন দম-দেওয়া গাড়ি।

বড়নালা এসে পড়ল। কি হিসাব করলে চাঁদ, দু'-মিনিট দেরি হয়ে গেল যে সময় তোমরা লিখে জানিয়েছিলে। শহর ডান দিকে—ঝুঁকে পড়েছি, কিন্তু পলক না ফেলতে পার হয়ে চলে গেলাম। দেখবারই বা কি আছে—অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘরবাড়ি, দালানকোঠা বেশির ভাগ—সকালের রোদে ঝিকমিক করছে, জ্যোতি বেরুচ্ছে। অভ্র যেন গাদা দিয়ে দিয়ে রেখেছে, তেমনি আমার চোখে লাগল।

লাহোর আর একটুখানি পথ, ঢিল ছুড়লে গিয়ে পড়ে—এই গতিক। ১০৫ মাইল মাত্র। একটু এগিয়ে জলাভূমি—এখানে-সেখানে বিস্তর জল জমে আছে। লম্বা লম্বা খাল জলাভূমি ফুঁড়ে জলাশয়ের দিকে চলে গেছে। ঊষর নিঃসীম মাঠের মধ্যে খাল যাচ্ছে দু'-তীরে শ্যামল গালিচা বিছিয়ে দিয়ে।

উড়তে উড়তে আজ দেশের সমগ্র ছবি চোখের উপর এসে গেল। কাঠা চারেকের ছোট্ট বাড়িটুকু মাত্র নয়—এত বড় দেশ আমার, আমারই। ভাবতে আনন্দ লাগে, আকাশ-বিহার অন্তে যে ছোট্ট কুঁড়ের ভিতর আবার ঢুকে পড়ব, সেটা আমার সুবিশাল দেশের, চার কাঠার মধ্যেই তার সীমা নির্দিষ্ট নয়। আজকের মানুষ আমরা পরম ভাগ্যে অনন্ত আকাশে পাখা মেলে উড়তে শিখেছি; উড়তে উড়তে আমি কত বড় দুনিয়ার মানুষ, মালুম পেয়ে যাই।

আঃ, দু-চোখ জুড়িয়ে গেল। এ কি শ্যামাঙ্গিত রূপ আমার দৃষ্টির সুদূর সীমানা জুড়ে! এক ফোঁটা নগ্ন মাটি দেখিনে কোথাও—ফসল আর ফসল। আর দেখছি জল। এখানে জল, ওখানে জল—হরিৎ ফ্রেমে বাঁধাই চৌকো চৌকো কালো জল। নদীর উপর এসে পড়লাম—আঁকাবাঁকা বলেই বোঝা গেল, কাটা-খাল নয়—স্বাভাবিক নদী। বর্ষার জলৈশ্বর্যে ভরপুর হয়ে আছে। নদীর কূলে ঘর-বাড়ি ছিটানো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। প্লেন হঠাৎ খুব নিচুতে চলে এলো। পাকিস্তানে ঢুকছি বোধ হয়; লাহোর দূরবর্তী নয়। স্লিপ এলো—আর মাত্র পঁচিশ মাইল। সে তো নিতান্তই নস্যি।

আরও নিচু হয়েছে প্লেন—নদীর ধারে ধারে ঘর-বাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাভি নদী পার হলাম তবে—ইরাবতী। জলের মধ্যেই যেন বাড়ি-ঘর বসিয়ে দিয়েছে কতকগুলো। আরও—আরও নিচু। এরোড্রোম দেখা যায়। দু-পাশে উঁচু বাঁধ-দেওয়া লম্বা লম্বা খাল সোনালি-পাড় নীল শাড়ির মতন দেখাচ্ছে। বাংলা দেশের মতো খোড়ো-ঘর একটাও নেই, শুধু মাটি-কোঠা। উপর থেকে দেখাচ্ছে বিশাল ধ্বংস-স্তূপের মতো। বেল্ট বাঁধবার আলো ফুটল, নামব এবারে।

যাই বলুন, লাহোর এরোড্রোম দেখে ভক্তি হল না! নিতান্ত সাদামাঠা—অনেক গেঁয়ো এরোড্রোমেও এর চেয়ে ভাল বাড়ি-ঘর, বাহারের আসবাবপত্র। ব্রেক-ফাষ্ট এখানে—মেটুলি চচ্চড়ি আণ্ডার পোচ ইত্যাদি শেষ করে নিরামিষ চপে হাত বাড়িয়েছি, দিল্লির ডাক্তার প্রেমচাঁদ—ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছেন, কি মশায়—উভয় রকমই? শ্রীমতী মদন হাসি-হাসি মুখে কণ্ঠস্বর করুণ করে বললেন, আমার নিরামিষ সমস্ত উনি খেয়ে নিচ্ছেন!

আমিষাশী বলেই নিরামিষ খাইনে—এটা ধরে নেবেন কেন? শুধু আমিষে কে বাঁচতে পারে, দুই রকমই চলে আমাদের।

চল্লিশ মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আবার আকাশে চড়ছি। এঁদের ঘড়ি আধ ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ বারোটা আধ ঘণ্টা আগে বাজে আমাদের চেয়ে।

লাহোর শহর পেরিয়ে আবার মাঠ আর ছোট ছোট গ্রাম। মাঠ, মাঠ, মাঠ। পয়লা দলে ষোল জন চলেছি আমরা। প্লেনে এর বেশি জায়গা হল না। পরের দল দিল্লি পড়ে রইলেন, এই প্লেন ফিরে গিয়ে তাঁদের আনবে। গোড়ার সারিতে আমি—পিছন তাকিয়ে দেখে নিই একবার। ভাব বদলেছে। উত্তম ভোজনের পর জন দুই-তিন ছাড়া সকলেই চোখ বুঁজেছেন। ফুরৎ-ফুরৎ—নাসা-শব্দও শ্রুত হচ্ছে—আমি বাদে বাকি পনের জনের তিরিশটা গহ্বরের ঠিক কোন কোনটা থেকে—সঠিক মালুম পাচ্ছিনে। খবরের কাগজে মুখ গুঁজে আছেন কেউ কেউ, একজন ডিটেকটিভ নবেলে। পড়ছেন না ঘুমুচ্ছেন—কে বলবে!

লম্বা পাড়ি, একেবারে কাবুলে গিয়ে ভুঁই নেবো। দুর্গম পাহাড়ে ঠুকে আগে ভাগে পড়ে যাই তো আলাদা কথা। প্লেন উঁচু—আরও উঁচু উঠে যাচ্ছে। পাশের লোক বললেন, তাকিয়ে দেখুন—খাইবার-পাস গিয়ে পড়ব এখুনি। আর যা ভেবেছিলাম—কলমের কালি বেরিয়ে হাত কালিমাময় হয়ে উঠছে। লেখা চলবে না আর কলমে। আমিও তৈরি—সন্তোষের পেন্সিল বের করে নিয়েছি।

বড় মুসকিল হল তো! রোদ ঝিকমিক করছে প্লেনের পাখার উপরে, নিচে কিন্তু ঘন কুয়াসা। চোখের দূরবীণ চালিয়ে অশেষ কষ্টে দেখা যাচ্ছে—কিছু কিছু কঙ্করময় ভূমি। হরিদ্রাভ। গাছ-পালারও অমনি হলদে ভাব। কুয়াসা'র জন্য বোধ হয়।

চেয়ারটা নামিয়ে দিয়ে একটু তবে আরাম করা যাক। দিব্যি সবাই ঘুমুচ্ছিলেন—তারই মধ্যে কেমন করে যেন কায়দাটা দেখে তড়াক করে উঠে একে একে চেয়ার নামাচ্ছেন। মহানন্দে পুনশ্চ চোখ বুঁজলেন, একা আমিই কেবল চোখের দেখাগুলো টুকে টুকে যাচ্ছি। কি বিপদ, শেষ অবধি আমারও যে ঐ গতিক। চোখ ভেঙে আসছে—এক লাইন লিখছি তো ঘুমিয়ে নিচ্ছি দশ সেকেণ্ড। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন—আলো নেই, মেঘ নেই, জীবচিহ্ন নেই নিচের দিকে—একটানা প্রপেলারের আওয়াজ। লিখবারও নেই আর-কিছু···

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাপ করুন আপনাদের গোলামের গোলামের দশ মিনিটের এই গাফিলতি। দশ মিনিট মানে কিন্তু বিস্তর দূর। তার মধ্যে স্বপ্ন দেখছি আরও দূর-দূরান্তরের। স্বপ্ন কিম্বা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবনা। ধীরেন যেন গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে দিলেন, খালি গায়ে আছেন—ঠাণ্ডা লেগে যাবে। খালি গায়ে মানে কোট খুলে রেখে দিয়েছি, শুধু মাত্র গেঞ্জি ও সার্ট। সত্যিই শীত লাগছে। কোট গায়ে ঢুকিয়ে দেখলাম, কনকন, করছে, ঠাণ্ডা ঢুকে গেছে ওর ভিতরে। সাড়ে-বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি ১৭২ মাইল বেগে। তখত-ই-সুলেমান ঐ দেখুন পায়ের নিচে। খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে এখন। অনেকেই উঠে এসে জানলায় ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছেন। আকাশে ঘুরে ঘুরে সুলুক-সন্ধি সমস্ত আমার জানা—কোন সিট থেকে উত্তম দেখা যায়। নিজের জায়গায় হেলান দিয়ে বসে দিব্যি আমি দেখতে পাচ্ছি।

কুয়াশা কেটে গেছে; উজ্জ্বল রোদ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়। অধিত্যকায় এখানে আলো ওখানে ছায়া। আলো-আঁধারে রহস্যময় রূপ নিয়েছে আমার চারি দিকের দিগব্যাপ্ত পর্বতমালা।

শীত বাড়ছে। গরম কোট-ট্রাউসারে মানাচ্ছে না এখন। উপরে—কত উপরে উঠছি। উঠেই চলেছি। প্লেন বড্ড দুলছে। বে-অব-বেঙ্গলে একবার ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম। জাহাজের কী দুর্গতি! তার সঙ্গে অবশ্য তুলনাই হয় না; তবু দেখি, অনেক জনের মুখ শুকিয়েছে।

দুই পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ পথরেখা। উঁহু, পথ কোথা—শুকনো জলপথ। নির্জলা পথ সাদা দেখাচ্ছে—সহসা করে ঢল নামবে, বিলকুল সব কালো হয়ে যাবে। এখন দেখাচ্ছে, মাঠ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলার পথ পড়ে গেছে। খানিক খানিক কালো দেখাচ্ছে সাদার উপরে, সেটা হল সুদূর পর্বতের কোন ছায়া।

বড্ড দুলছে এখন, ডাইনে বাঁয়ে, উপরে নিচে। লেখা চালানো মুশকিল। ভারি মজা লাগছে, পোঁজল এবং পেন্সিলের সঙ্গে তাবৎ দায়িত্ব পকেটে পুরে এই বয়সে নাগরদোলা চড়ার সুখ পাচ্ছি।

একবার ঢুকে পড়লাম পাইলটের ঘরে। দরজায় লেখা—'ক্রু মেম্বারস ওনলি'। কিন্তু উঁকিঝুঁকির রকম দেখে ওঁরা ডাকছেন, আসুন না, একে একে এসে দেখে যান।

তিন জন আছেন—২'-জন সামনের দিকে, কাচের আড়াল থেকে পথ নিরীখ করছেন। যে-সে কাচ নয়—আমরাও নজর চালিয়ে দেখলাম—চারি দিক একেবারে কুয়াশায় ঢেকে গেছে, অথবা অনেক উঁচুতে উঠে সাদা চোখে যখন নিচের মাটি দেখতে পাচ্ছিনে—তখনও সুস্পষ্ট দেখা চলে ঐ কাচ দিয়ে। একজন ষ্টিয়ারিং-চাকায় হাত দিয়ে আছেন, ঘুরোচ্ছেন একটু-আধটু, দ্বিতীয় জন ম্যাপের সঙ্গে হিসাব করে করে পথ মেলাচ্ছেন। তৃতীয় ব্যক্তি রেডিও-অপারেটার; বাইরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, তাঁর বসবার জায়গায় কাচ দেওয়া নেই বাইরে তাকাবার। যন্ত্র কানে লাগিয়ে যেন ধ্যানে বসে আছেন তিনি।

ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করি, কোন জায়গায় এখন?

পাকিস্তানের চৌহদ্দির মধ্যে এখনো। সুলেমান রেঞ্জের উপর দিয়ে যাচ্ছি।

খাইবার পাস?

যাবোই না সেদিকে। হেসে বললেন, সুলেমানের সিংহাসন ডিঙিয়ে যাবার তাগত হয়েছে—পর্বত কোথায় দয়া করে একটু-আধটু গলিঘুঁজি ছেড়ে দিয়েছেন, সে খোঁজে গরজ কি এখন আমাদের?

হিন্দুকুশে যাবো কখন?

সেদিকে কেন যাবো ঘুরতে?

তাই দেখলাম, সবজান্তারা কেবল ঘরে বসে নেই; দলের সঙ্গেও দু-পাঁচটি বেরিয়ে এসেছেন। তামাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নখাগ্রে তাঁদের। দিল্লি থেকেই আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেছেন, মুখের সামনে দাঁড়াবে হেন শক্তি কোন্ দুঃসাহসীর?

[ক্রমশঃ।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১২

বুড়ো শিব গেল দেবু চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা না পেয়ে ফিরে এলো। অন্য কোনও সময় হ'লে হয়ত' সে আর তার দোর মাড়াতো না, কিন্তু এই বিপদের দিনে রাগ-অভিমান করা সাজে না। তাই সে আবার গেল।

দেখা হয়ত-বা সেদিনও হ'তো না। দেবু চাটুজ্যে কোথায় যেন যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুচ্ছিল। ফটকের সামনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। এমন সময় বুড়ো শিব গিয়ে তাকে ধরলে।

—কাজটা কি ভাল হচ্ছে দেবু ?

—কোন্ কাজটা ?

—সীতারামকে হাজতে পুরে রাখা ?

—তোমার কি ধারণা—সীতারাম মুখুজ্যেকে আমি হাজতে পুরে রেখেছি ?

—কে রেখেছে ?

—পুলিশ।

বুড়ো শিব বললে, তুমি যদি বল পুলিশকে, সীতারামের জামিনটা অন্তত মঞ্জুর হ'তে পারে।

দেবু চাটুজ্যে বললে, আমি বলেছিলাম। পুলিশ কিছুতেই শুনতে চায় না।

—পুলিশ তা'হলে বলতে চায়, সীতারামই তোমার ছেলেকে খুন করিয়েছে ?

অম্লান বদনে দেবু বললে, হ্যাঁ।

বুড়ো শিব আবার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যে ডিটেকটিভ আনিয়েছ, তাঁরা কি বলেন ?

দেবু চাটুজ্যে বললে, তাঁদের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি।

—তা'হলে সীতারাম তত দিন রইলো হাজতে ?

দেবু চাটুজ্যে বললে, আগো বুড়ো শিব, আমার একমাত্র ছেলে মারা গেছে, অসুখ-বিসুখ করে আরও দশ জন মানুষ যেমন মারা যায় তেমনি করে যদি মারা যেতো, আমার বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু দেখছি তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে, নিশ্চয়ই এ আমার কোনও শত্রুর কাজ। পুলিশ আমার সেই শত্রুকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে। নিরীহ একটা ছেলেকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে যে-লোক হত্যা করেছে—সেই হত্যাকারীর সন্ধান করছে তারা; এখন যদি আমি পুলিশের কাজে হাত দিই, যদি বলি—একে ধরো না, ওকে ছেড়ে দাও, তাহ'লে তারা আর কোনও চেষ্টাই করবে না! তাই কি তুমি আমাকে করতে বল ?

বুড়ো শিব কি যেন ভাবছে।

দেবু চাটুজ্যে বললে, বল, চুপ করে' রইলে কেন ?

বুড়ো-শিব বললে, বুঝতে পারছি না কি জবাব দেবো। কিন্তু তুমি তো জানো দেবু, সীতারাম কি রকম মানুষ। তার ওপর তার একটা মান, সম্মান—

চাটুজ্যে বললে, সব জানি। জেনে-শুনেও কিছু করতে পারছি না—এই যা দুঃখ।

বুড়ো শিব বললে, সীতারাম খালাস এক দিন পাবেই। মাঝখান থেকে হবার মধ্যে হ'লো এই যে, ওর মেয়েটার বিয়ে হওয়া মুস্কিল হ'য়ে উঠলো।

—তা আমি কি করবো বল ?

বুড়ো শিব বললে, তুমি বড়লোক হয়েছো বল, তুমি যা করেছো তাই ভালো; সেকথা আর যেই বলুক আমি বলবো না। তোমার উচিত ছিল সীতারামকে এরেষ্ট করবার কথা পুলিশ যখনই বলেছিল, তখনই বারণ করা। তা তুমি করনি, এখনও কিছু করবে না বুঝতে পারছি। যাও তুমি যেখানে যাচ্ছ। মিছেমিছি দেরি করে' দিলাম।

এই বলে যেমন এসেছিল আবার ঠিক তেমনি করেই বাগানের পথ ধরে বুড়ো শিব ফটকের বাইরে চলে গেল।

এত বয়স হয়েছে বুড়ো শিবের, বিয়ে করেনি, কাজেই সংসারের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা কিছু নেই, পরের উপকার করেছে আর মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে। দেশে তখন কয়লার কুঠি ছিল না, গ্রামের লোক গরীব ছিল, মানুষের মনে সুখ ছিল, শান্তি ছিল। এত লোকও ছিল না, এত টাকাও ছিল না, এত অশান্তিও ছিল না। সেই সুলতানপুর গ্রাম, সেই সিঙ্গুল নদী, সেই রুদ্রেশ্বরের মন্দির, সেই সন্ন্যাসীভৈরবী—সবই আছে, অথচ যেন কিছুই নাই! ছোট সুলতানপুর এখন বড় হয়েছে, কিন্তু এত এত লোকজনের গোলমালে সেই সুলতানপুর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে!

সে সুলতানপুরে মানুষে মানুষে ঝগড়া হয়েছে, মারামারি হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে গ্রামে কোনো দিন পুলিশ আসেনি, কেউ কোনো দিন আদালতে যায়নি।

সে সুলতানপুরে এমন করে মানুষ মেরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবার সাহস কোনো দিন কারও হয়নি। আর তার জন্যে সীতারাম মুখুজ্যের মত মানুষ বিনা কারণে এত দিন ধরে হাজত-বাসও করেনি।

দেবু চাটুজ্যের বাড়ী থেকে ফিরে এসে বুড়ো শিবের শুধু এই

কথাই মনে হতে লাগলো। মনে হ'লো তাদের সেই সুলতানপুরই ছিল ভাল।

সীতারামকে সে জামিনে খালাস করে' আনতে পারবে না—এই জ্বালায় সে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলো। অথচ কথাটা সীতারামের স্ত্রীকে জানাবার উপায় নেই। পাগলের মত সে দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে।

সীতারামের বাইবের ঘরে বসে বুড়ো শিব ভাবছিল, সে কি করবে। এমন সময় মালাকে সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চন ঘরে ঢুকলো।

কাঞ্চন বললে, আপনি কলকাতা চলে যান। সেখান থেকে খুব ভাল একজন উকিল নিয়ে আসুন। আমার মনে হচ্ছে, দেবু চাটুজ্যে ওঁকে ইচ্ছে করে' হাজতে পুরে রেখেছে। তা সে যেই রাখুক, এ রকম ভাবে মিছেমিছি একটা মানুষকে কষ্ট দেবার কোনও অধিকার কারও নেই। হয় সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করে' ওঁর বিচার করুক আর নয় তো ছেড়ে দিক্। আপনি একটু কষ্ট করে' আজই চলে যান কলকাতায়।

বুড়ো শিব বললে, সেই ভালো।

কাঞ্চন বললে, আমার কাছে টাকা আছে, আপনি ভাববেন না। মালার বিয়ের জন্যে যে-টাকা মালার বাবা রেখেছে, সেই টাকা খরচ হোক।

বুড়ো শিব বললে, বিয়ের টাকা খরচ করে' দেবে?

কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বলেই তার মনে হ'লো—বলা উচিত হয়নি।

কাঞ্চন জবাব দিলে। বললে, আগে মালার বাবা ফিরে আসুক, তার পর মালার বিয়ে। হতভাগী যে রকম কপাল করে' এসেছে, বিয়ে ওর শেষ পর্য্যন্ত হবে কি না কে জানে?

হঠাৎ একটা কথা বুড়ো শিবের মনে পড়ে গেল। ঠিক যে জায়গায় সে বসে রয়েছে, সেই জায়গায় বসেই কথাটা এক দিন সে বলেছিল। রঞ্জনের সঙ্গে মালার বিয়েটা যেদিন ভেঙ্গে গেল, দেবু চাটুজ্যে নিজের মুখে জানিয়ে গেল—রঞ্জনের বিয়ে সে অন্য জায়গায় দেবার ব্যবস্থা করেছে, সেদিন বুড়ো শিব বলেছিল, রঞ্জনের সঙ্গেই মালার বিয়ে হবে।

ছেলেবেলায় বুড়ো শিব কার কাছে যেন শুনেছিল—কোনও লোক বারো বৎসর যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে আর একটিও মিথ্যা কথা না বলে, তাহ'লে তার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। দৈবাৎ এমন কোনও কথা যদি সে বলেও ফেলে, যা সত্য নয়, ভবিষ্যতে তাও নাকি সত্যে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ভগবান তার মিথ্যা ভাষণের কলঙ্ক মোচন করেন।

কথাটা বুড়ো শিবের মনে গেঁথে গিয়েছিল সেই বাল্যকালেই। তখন থেকে সে তার নিজের জীবনেই এই সত্য পরীক্ষা করছে। মিথ্যা সে আজও বলে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, ভগবান এমন করে এবার তাকে অপ্রস্তুত কেন করলেন কে জানে?

সন্ধ্যায় কলকাতা যাবার ট্রেণ।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হ'য়ে মিনিট-পাঁচেক হেঁটে গেলেই নতুন রেল-ষ্টেশন। ষ্টেশন এখানে ছিল না। কয়লাকুঠির কল্যাণে সবই হয়েছে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। বুড়ো শিব যাচ্ছিল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। সঙ্গে কাঞ্চনের দেওয়া এক হাজার টাকা। মনের অবস্থা খুব খারাপ। উকিল-ব্যারিষ্টার কাউকেই সে চেনে না। কলকাতার পথ-ঘাটও তার অচেনা। শ্যামবাজারে তার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় থাকে। তারই বাড়ীতে গিয়ে উঠবে প্রথমে। তার পর সেখান থেকে তারই সাহায্য নিয়ে যা হোক ব্যবস্থা একটা করবে। এমনি-সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে চলেছে বুড়ো শিব।

—জ্যেঠাবাবু!

হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠে সুমুখে তাকাতেই বুড়ো শিব যাকে দেখলে, তাকে দেখবার আশা সে কোনো দিনই করেনি।

দেখলে সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে রঞ্জন।

বললে, ভাল আছেন?

বুড়ো শিব বললে, আমি তো ভাল আছি বাবা, কিন্তু তুমি?—সত্যিই তুমি তো?

এই বলে বুড়ো শিব হাত বাড়িয়ে রঞ্জনের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলে। দেখে বললে, এত দিন কোথায় ছিলে রঞ্জন?

রঞ্জন বললে, লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমার এক পিসিমার বাড়ী।

—কেন?

—রাজার মেয়েকে বিয়ে করবো না। সে-মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে খবর নিলাম, তবে এলাম।

বুড়ো শিব বললে, এদিকে আমাদের সুলতানপুরে কি হয়েছে তার খবর কিছু নিয়েছ?

রঞ্জন বললে, আজ্ঞে না। সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

বুড়ো শিব বললে, এসো, পথে যেতে যেতে বলছি। আমার আর কলকাতা যাওয়ায় দরকার নেই।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কলকাতায় যাচ্ছিলেন?

বুড়ো শিব বললে, হ্যাঁ বাবা, কলকাতায় যাচ্ছিলাম। তোমারই জন্যে। কিছু দিন ধরে আমাদের সুলতানপুরে যে-সব ঘটনা ঘটছে—সবই ঘটছে তোমার জন্যে। সুলতানপুর একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে।

গ্রামের পথে যেতে যেতে বুড়ো শিব তাকে একটি একটি করে সব কথাই বললে। সবই শুনলে রঞ্জন।

সব চেয়ে দুঃখিত হলো সীতারাম হাজত-বাস করছে শুনে। বললে, ছি ছি, এইটে খুব খারাপ কাজ হয়ে গেছে।

বুড়ো শিব বললে, এর জন্যে তুমি আর তোমার বাবা দায়ী।

রঞ্জন চুপ করে কি যেন ভাবছিল।

বুড়ো শিব বললে, যা হবার তা হয়ে গেছে। তা আর ফেরবার নয়। কিন্তু এর প্রতিকার করতে হবে তোমাকেই।

রঞ্জন বললে, বলুন কেমন করে করব?

এসো বলছি। বলে তাকে নিয়ে গিয়ে তুললে সীতারামের বাড়ীতে।

রঞ্জন বললে, বাড়ী যাব না?

বুড়ো শিব বললে, না। যেমন আছো, এখনও কয়েকটা দিন তেমনি মরে থাকো।

রঞ্জন বললে, তা না হয় রইলাম। কিন্তু যে-লোকটা মারা গেছে, সে লোকটা কে?

বুড়ো শিব বললে, সে-ভাবনা তোমার নয়। সে-ভাবনা পুলিশের। তাছাড়া অনেক টাকা খরচ করে তোমার বাবা ডিটেকটিভ আনিয়েছেন কলকাতা থেকে। যে বুদ্ধি নিয়ে তারা সীতারামকে হাজতে পুরে রেখেছে, সেই বুদ্ধি খরচ করে তারাই খুঁজে বের করুক—যে-লোকটি সত্যিই মারা গেছে, সে-লোকটি কে। [ক্রমশঃ।

মধ্যাহ্নের কুতুব

—মীরেন অধিকারী

রশ্মিজাল

—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
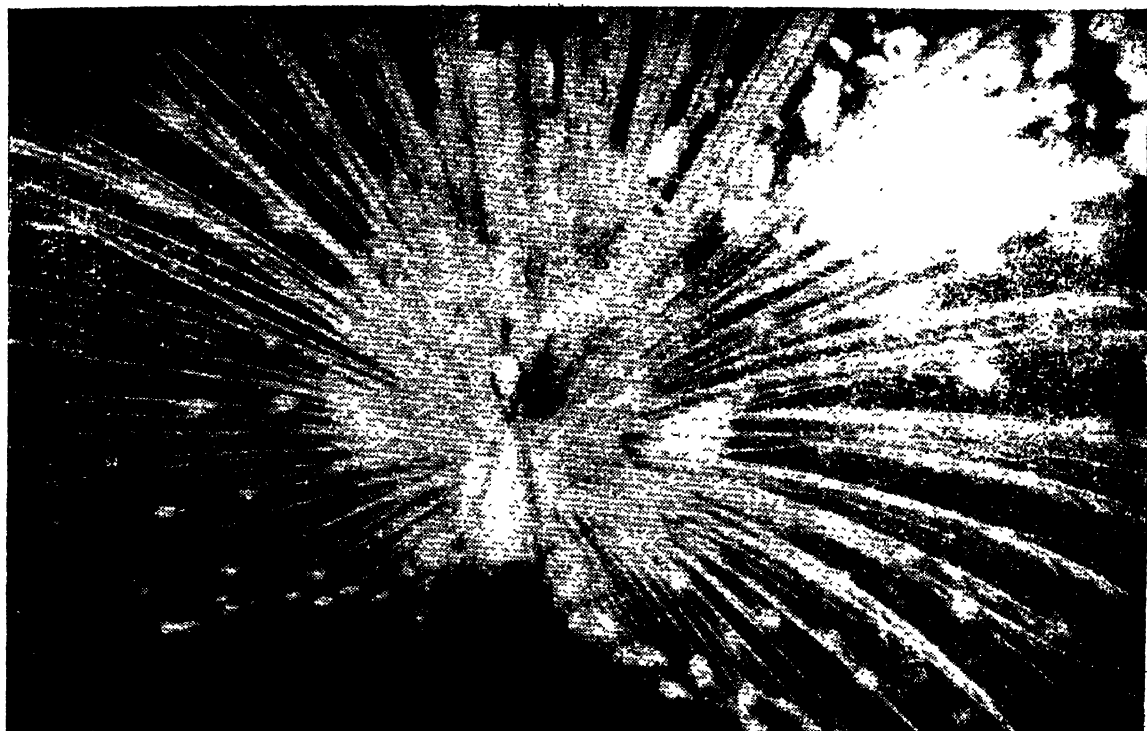
ছায়াছবির বাইরে

মঞ্জু দে —কালীশ মুখোপাধ্যায়

কাবেরী বসু —কান্তি টি থাক্কের

ভীরু খরগোস
—ভবেশ ঘোষ

সাদা ময়ূর —গোপালচন্দ্র গুঁইন

কুমুদ সরোবরে শ্বেতহস্তী —রথীন রায়

সেই মুখখানি —অজিত মিশ্র

কনিকার স্বর্গ-লাভ

ভাস্কর

বিবেকানন্দ রোডের ভজহরি, সরখেল বেলার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, এই উইক-এণ্ডটা স্বর্গে গিয়া কাটাইয়া আসিবে।

কণিকা বলিল, আমিও যাব।

তাহাই স্থির হইল। সেলেশ্চিয়াল এয়ারওয়েজে তিনটা সিট রিজার্ভ করা হইল। যথাসময়ে এক-একটি সুটকেশ হাতে করিয়া ভজহরি, বেলা ও কণিকা এরোড্রোমে পৌঁছিল এবং যথাসময়ে এরোপ্লেনে উঠিয়া স্বর্গে গিয়া নামিল। স্বর্গীয় ভাষা পৃথক্, সুতরাং একটি দোভাষী নিযুক্ত করিতে হইল। টমাস কুকের একটি এজেন্ট দোভাষীর কাজ করিতে এবং তিন দিন উহাদিগকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গের বিভিন্ন স্থান দেখাইবার ভার লইল। এই দোভাষীর সহিত উহারা একটি ছোট অথচ বেশ পরিচ্ছন্ন হোটেল স্থির করিয়া সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া এবং চা-আদি খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল নূতন নগর দেখিতে।

ট্যাক্সিতে বসিয়া দু'পাশের দৃশ্য ভাল দেখা যায় না, তাই তাহারা বাসে চড়িয়া ভ্রমণই স্থির করিল। বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই একখানি বাস আসিয়া থামিল, দোভাষী বলিল, আসুন, উঠে পড়ুন। ভজহরি ও কণিকা চটপট উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বেলা উঠিতে পারিতেছে না দেখিয়া দোভাষী তাড়াতাড়ি নিকটের একটা চায়ের ষ্টল হইতে একটি টুল আনিয়া বাসের সিঁড়ির পাশে রাখিল, এবং তাহার সাহায্যে বেলাও উঠিয়া পড়িল। বেলা দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিল, সিঁড়ি এত উঁচু কেন?

দোভাষী বলিল, স্বর্গের সিঁড়ি যে, উঁচু হবে না?

তার পর তাহারা চার জনে দুই পাশের চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দোভাষী অনর্গল বলিয়া যাইতেছে—ওই যে কাল কুচকুচে প্রকাণ্ড বাড়ী, ওটা যমরাজের বাড়ী।

বেলা বলিল, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

একটু পরেই দোভাষী বলিল, ওই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্যাসের ট্যাঙ্কের মত ট্যাঙ্কওয়ালা বাড়ী—নীল রংয়ের, ওটা বরুণের বাড়ী। ওই ট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে মেঘ ভরা আছে। দরকার মত আর ইচ্ছে মত বরুণদেব কিছু কিছু ছাড়েন। আর ওই যে বিরাট কারখানা আর তার সঙ্গে বিরাট গুদাম, ওটা কি জানেন? ওটা জিলিপির কারখানা।

ভজহরি বলিল, এত বড় জিলিপির কারখানা?

দোভাষী বলিল, হ্যাঁ, দেব-দেবীরা তো ডাল-ভাত খান না, ওঁরা জিলিপি খান।

কণিকা বলিল, সামনে একটা মোড়ে, যেখানে রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে একটু নামলে হয় না? স্বর্গের জিলিপি খেয়ে দেখতুম কেমন।

দোভাষী বলিল, বেশ। আগের ষ্টপেই নামা যাক।

সামনের ষ্টপে ভজহরি নামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আরো দশ-বারটি দেব ও দেবী নামিলেন। উহারা পরস্পরের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। স্বর্গের দেব ও দেবীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এঁরাই সব মর্ত্যের মানুষ, অনেকটা আমাদেরই মত। বেলা ও কণিকা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এঁরাই বুঝি স্বর্গের দেব আর দেবী। আমাদের চেয়ে এমন কি তফাৎ? তবে, হ্যাঁ, এঁদের মধ্যে বুড়ো বা বুড়ী নেই।

একটু দূরেই রেস্তোরাঁ সেলেষ্ট। রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া ভজহরিরা একখানি টেবিলের চারি পাশে গিয়া বসিল। বাস হইতে যে সকল দেব ও দেবীরা নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে পাঁচ ছয় জনও রেস্তোরাঁয় ঢুকিলেন এবং নিকটেই কয়েকখানি চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

ভজহরি দোভাষীকে বলিল, এইবার জিলিপির অর্ডার দিন আর সঙ্গে এক কাপ করে কফি।

জিলিপি আসিল, জন-প্রতি দুইখানি করিয়া। ভজহরি বলিল, আরো খানকয়েক করে হলে ভাল হত।

দোভাষী বলিল, আপাতত এই থাক।

জিলিপি খাওয়া হইতেছে। পাশের টেবিলে দেব ও দেবীরাও জিলিপি খাইতেছেন। একখানা জিলিপি চার-পাঁচ টুকরা করিয়া তাহাই একটু একটু করিয়া খাইতেছেন, সুপুরির কুচির মত। ভজহরি বহিতে পড়িয়াছিল, গড্‌গুরা ঘ্রাণ করেন। এখন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল, এঁরা কত কম খান। শরীরও তেমনি, বুকে-পিঠে এঁটে গেছে, সব যেন এক-এক গাছি প্যাকাটি। ভজহরি বলিল, এঁরা খান না কেন?

দোভাষী বলিল, মানে এঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে কি না, তাই।

—তাই, না খেয়ে থাকতে হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এমন ভাবে চললে, এঁরা কত দিন বাঁচবেন?

—আজ্ঞে, তা বাঁচবেন। দেব-দেবীদের জরা-মৃত্যু নেই, জানেন না?

ও, হ্যাঁ, তা বটে!

আরো দুই-চারিটা কথাবার্তার পর দেখা গেল, জিলিপি ও কফি ফুরাইয়া গিয়াছে। বেলা বলিল, এখন ওঠা যাক। আরো কত দেখবার জিনিস রয়েছে স্বর্গে।

কণিকা বলিল, হ্যাঁ, জামাইবাবু, এখন ওঠা যাক।

রেস্তোরাঁর বেয়ারা বিল লইয়া আসিল, আটখানা জিলিপি কুড়ি টাকা, টিপস্ আড়াই টাকা, মোট সাড়ে বাইশ টাকা।

ভজহরির চক্ষু স্থির! একখানা জিলিপি আড়াই টাকা! ভজহরির বিস্ময়ের কারণ অনুমান করিয়া লইয়া দোভাষী বলিল, অত উতলা হবেন না। আপনাদের মর্ত্যের জীবনযাত্রার মান অতি হীন, তাই এমন আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

—এখানে বুঝি জিলিপি খুব কম তৈরি হয় ?

—কি যে বলেন ? আপনার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে এখান থেকে ফিরবার সময়ে দুই-এক লাখ টন জিলিপি নিয়ে যেতে পারেন।

বেলা বলিল, যেখানে যাবে, সেখানেই তোমার কেবল লাখ-লাখ আর কোটি-কোটি। খাবার প্লেটে তো দুই টুকরো জিলিপি নিয়েই চক্ষু স্থির !

উহারা চার জন রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া পুনরায় বাসে উঠিল। বাঁ দিকে ডান দিকে যত দূর চক্ষু যায়, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ যে দূরে দেখা যায় কুবেরের বাড়ী, সোনার পাত দিয়ে মোড়া। বাড়ীর সামনে পাঁচ শত সশস্ত্র প্রহরী। বাড়ীর চূড়ায় স্বর্গের পতাকা পত-পত করিয়া বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। বহু দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের মত দেখা যাইতেছে। তারই পাশে একটা বিরাট হ্রদ। দোভাষী বলিল, ওটা কৈলাসপাড়া, পাশে ওটা মানস-লেক। ওখানকার জমিদার নীলকণ্ঠ দেব। সবাই ওঁকে ভয় করে, আবার ভক্তিও করে। এঁর একটি ছেলে কার্তিক দেব এ অঞ্চলে খুব পপুলার। প্রকাণ্ড ময়ূরে চড়ে প্রায়ই ঘুরে বেড়ান।

এমনি করিয়া দোভাষীর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে এবং দুই পাশে নূতন নূতন দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা কণিকা বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, ওদিকে প্রকাণ্ড ওটা কি ?

দোভাষী বলিল, ওটাই তো স্বর্গের স্বর্গ। ওর জন্যই নানা দেশ থেকে কত হাজার হাজার লোক এখানে আসে। নাগলোক, প্রেতলোক, মর্ত্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোক থেকে লোকেরা সব আসে শুধু ওই প্রজাপতি-কানন দেখবার জন্য। আগেকার নন্দনকানন সম্পূর্ণ ওভারহল করে এই প্রজাপতি-কানন তৈরী হয়েছে। এর প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং ব্রহ্মা।

আটখানা জিলিপি কুড়ি টাকা, টিপস্ আড়াই টাকা, মোট সাড়ে বাইশ টাকা।

উহারা এতক্ষণে প্রজাপতি কাননের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে একটা প্রকাণ্ড সারকাসের তাঁবু, কিন্তু এত বড় মনে হইতেছে যেন কলকাতার সমস্ত গড়ের মাঠটাই একটি তাঁবু দিয়া ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। মাথার উপরে স্বর্গের ধ্বজা।

ভজহরিরা বাস হইতে নামিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইল। দরজার কাছেই টিকিট-ঘর। প্রবেশ-মূল্য জন-প্রতি আড়াই শত টাকা। ভজহরির পকেটে প্রচুর ট্রাভ্‌লার্স্ চেক মজুদ ছিল, তাহা হইতে একখানা এক হাজার টাকার চেক দোভাষীর হাতে দিল টিকিট কিনিবার জন্য। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া ভজহরি বেলা ও কণিকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি বিরাট ব্যাপার! যেদিকে চোখ ফিরায়, সেই দিকেই চোখ ঝলসাইয়া যায়। অসংখ্য আলো—নানা বর্ণের ছটায় সমস্ত প্যাণ্ডালটা ভরিয়া ফেলিয়াছে। ফ্লুরেসেণ্ট আলোর বাহার যে এমন মনোহর হইতে পারে তাহা চৌরঙ্গীর দুই-চারটা আলো দেখিয়া অনুমান করা অসম্ভব।

কিছুক্ষণ নির্বাক্ হইয়া থাকিবার পর বেলা বলিল, এখন বল, কোন্ দিকে যাবে। কিন্তু এত হাঁটতে আমি পারব না।

দোভাষী বলিল, আপনাদের একটুও হাঁটতে হবে না।

—তবে ?

দোভাষী বলিল, ওই যে দেখছেন রাস্তা, ওর উপরে দু'খানা কার্পেট-মোড়া লোহার শতরঞ্চির মত পাশাপাশি পাতা আছে। ওর একখানা সর্বদা ধীরে ধীরে সামনের দিকে, আর একখানা সর্বদা পিছনের দিকে চলছে। আলগোছে ওর উপরে উঠে দাঁড়ালেই আর হাঁটতে হয় না। ওই লোহার শতরঞ্চিটা সর-সর করে এগিয়ে যায়। অনেকটা লণ্ডনের এস্‌কালেটারের মত।

কণিকা বলিল, বাঃ, ভারি মজা তো !

তাহারা চার জনে আলগোছে একটি রাস্তার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। রাস্তাটা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইতেই দোভাষী বলিল, এখানে একটু নামুন।

সকলেই আলগোছে বাঁ দিকে পা বাড়াইয়া ফুটপাথে আসিল। সেখানে ছিল একটি সুন্দর পুষ্করিণী। তার মাঝে ফুটিয়া আছে সুন্দর নানা বর্ণের পদ্মফুল। আর তার মধ্যে স্নান করিতেছেন দেবীরা। বৃহদাকার অনেকগুলি রুই ও কাতলা মাছ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহাদের লম্বা চেপ্টা নরম মুখ দিয়া দেবীদের গায়ে আলগোছে ঠোকরাইতেছে এবং দেবীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতেছেন।

ভজহরি অবাক হইয়া দেখিতেছে। একটু পরে বেলার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, তা, হ্যাঁ, এবার এগুলো হয় না ? কই দোভাষী বাবু কোথায় গেলেন ?

দোভাষী বলিল, কোথাও যাই নি তো, আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে আছি।

তাহারা অগ্রসর হইল। আর একটি পুষ্করিণী। এখানে স্নান করিতেছেন দেব ও দেবীরা একত্রে। ইহারা একটু দাঁড়াই দেব-দেবীগণের জলকেলি দেখিলেন এবং মুগ্ধ হইলেন।

আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক স্থানে অসংখ্য দে ও দেবী চারি দিক ঘিরিয়া আছেন। মাঝখানে ফরাস পাতা। ও উপরে প্রায় আড়াই শত নর্তকী। তাহাদের মাঝখানে ষ

উর্বশী, চার দিকে চার গজ লম্বা ঘাগরা ছড়াইয়া অপরূপ বেশে বসিয়া আছেন। এখনই আরম্ভ হইবে বিবিধ প্রকার নৃত্য—একক, দুই জনে, তিন জনে, শত জনে এবং আড়াই শত জনে একত্র নাচিবেন।

ভজহরিরা এক পাশে গিয়া একটু ফাঁক বুঝিয়া নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল এই নৃত্যমেলার দিকে। ক্রমশ নৃত্য আরম্ভ হইল, বিবিধ ঢঙে, বিবিধ ভঙ্গীতে। বেলা দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিল, কখন শেষ হবে?

শেষ তো নেই এর। নাচের কি শেষ হয়! আগে আগে মাঝে মাঝে এই-সব আয়োজন হত! জিলিপির দাম বাড়ার পর থেকে নন্-স্টপ আরম্ভ হয়েছে।

বেলা বলিল, মানে, যতই পেটে-পিঠে সেঁটে যাচ্ছে, ততই কলানুরাগ বেড়ে যাচ্ছে।

—এগ্‌জ্যাক্টলি। খিদের জ্বালা ভুলতে হবে তো।

ভজহরি বলিল, ও-সব তত্ত্বকথা থাক। যা দেখতে এসেছ, তাই দেখ।

অনেকক্ষণ বসিয়া তাহারা নৃত্য দেখিল। তার পর কণিকা বলিল। এখন চলুন, আর কোথাও। আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে।

বেলা বলিয়া উঠিল, আমারও!

দোভাষী বলিল, আসুন এই দিকে।

রাস্তায় উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহারা উপস্থিত হইল একটি সরবতের দোকানে। এক এক গ্লাস রামধনু সরবৎ চার জনে তৃপ্তির সহিতই পান করিল। চার গ্লাস সরবতের দাম আঠার টাকা চুকাইয়া দিয়া উহারা আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

এক স্থানে তাহারা দেখিল, সুন্দর একটি ফুলের বাগান। অসংখ্য প্রকার ফুল রূপে, গন্ধে চারি দিক আমোদিত করিয়াছে। এখানকার জলবায়ুর গুণে ফুল ফুটিয়া আর শুকায় না। কোন হট-হাউসের দরকার হয় না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের নানাপ্রকার ফুলের গন্ধ লইতে লইতে তাহারা উন্মনা হইয়া পড়িল। দোভাষী বলিল, চলুন, আরো অনেক দেখবার আছে।

খানিক দূরে গিয়া তাহারা ঢুকিল একটি ফলের বাগানে। কি অপরূপ শোভা! অজস্র ফলে ভরিয়া রহিয়াছে গাছগুলি! আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, পেঁপে, আঙুর, আপেল, প্রভৃতি মর্ত্যের সব ফল তো আছেই। তাছাড়া আরো কত প্রকার নূতন নূতন স্বর্গীয় ফল, তার অনেক নাম দোভাষীও জানে না। বিবিধ প্রকার ফলের বিচিত্র রূপ দেখিতে দেখিতে এবং বিবিধ সুমিষ্ট ঘ্রাণ লইতে লইতে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। এক স্থানে আসিয়া পাকা টলটলে ব্লু-ব্ল্যাক রংয়ের বড় বড় কাল জাম দেখিয়া কণিকা বলিল, জামাইবাবু, গোটাকয়েক জাম কিনুন না? ভজহরি সাড়ে বার টাকা দিয়া দশটি জাম কিনিয়া কণিকার হাতে দিল। কণিকা তাহা হইতে কয়েকটি ভজহরি ও বেলার হাতে দিল। জাম চুষিতে চুষিতে তাহারা ফলের বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সামনেই অপরূপ সাজে সাজানো কলা-কানন। দোভাষী বলিল, এখানে নানা লোকের নানা প্রকার কলার একত্র সমাবেশ দেখতে পাবেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তো আছেই, তা ছাড়া নাগলোক, প্রেতলোক, শুক্রলোক প্রভৃতির বিবিধ কলা সংগৃহীত হয়েছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলাই এখানে আছে। ভজহরিরা কলা-কাননে প্রবেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কত প্রকার কত মূর্তি। গাছ, ফল, ফুল, ল্যাণ্ডস্কেপ, মাছ, জীবজন্তু, পক্ষী, প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় নাই। দেব-দেবীদের কত বিচিত্র চিত্র ও মূর্তি। ছোট, বড়, মাঝারি, সালঙ্কারা সবসনা, অবসনা নানাবিধ চিত্র ও মূর্তি যেন জীবন্ত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই কলাবণ্য। দেখিতে দেখিতে উহারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তাই তো, স্বর্গ না হলে কি এমনটি হয়!

এখান হইতে তাহারা গেল ক্রীড়াসদনে। এখানে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বপ্রকার খেলার আয়োজন করা হইয়াছে। হাডুডু, দাড়িয়াবাঁধা, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হকি, পোলো প্রভৃতি ছাড়া প্রায় পাঁচ শত বিভিন্ন প্রকারের জুয়াখেলার ব্যবস্থাও আছে। ইচ্ছা করিলে যে কেহ একদিনেই সর্বস্ব হারাইয়া পথে বসিতে পারে। বেলা বলিল, এখানে আর বেশীক্ষণ দেরী করে কাজ নেই। চল অন্য দিকে যাই। কণিকাও বলিল, হ্যাঁ, সেই ভাল। আমরা এসেছি একটু বেড়াতে বই তো নয়। এসব খেলাধুলোর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কাজ নেই। ভজহরি বলিল, তা চল। তবে এখানে থাকলেও তোমাদের কোন ভাবনা নেই। ভজহরি সে বান্দাই নয়।

যাহা হউক, উহারা শীঘ্রই ক্রীড়াসদন হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ভজহরি দোভাষীকে বলিল, আর কি কি আছে দেখবার?

—দেখবার অনেক আছে। এক দিনে দুই দিনে কি আর শেষ করতে পারবেন?

সব চেয়ে ভাল দেখবার যা আছে, তাই আগে দেখিয়ে দিন না। আমার আর ভাল লাগছে না, এত টো-টো করতে। হলোই বা স্বর্গ।

আচ্ছা, আপনার বুকের ওই লাইটিং সেটটা আমাকে একটু ধার দিতে পারবেন?

কণিকা বলিল, না রে, এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলেন ?

ভজহরি বলিল, না তা নয়, তবে ভাল জিনিষগুলোই আগে দেখা ভাল নয় কি ?

তাতে আমার আপত্তি নেই।

উহারা ক্রীড়াসদন হইতে বাহির হইয়াই দেখে কৈলাস-পাড়ার কার্তিক দেব প্রকাণ্ড ময়ূরে চড়ে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি কোঁচা ঝুলিয়ে হনহন করে চলেছেন। ভজহরি বলিল, ওঁর কথাই বলছিলেন না আপনি ?

দোভাষী বলিল, হ্যাঁ! উনি চলেছেন প্রজাপতি প্যাভিলিয়ান। আমরাও এখন ওখানেই যাব।

—কি আছে সেখানে ?

—গেলেই দেখতে পাবেন।

সরসরে লোহার শতরঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া তাহারা সর-সর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কি চমৎকার আবহাওয়া! মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে। এখানকার রোদ, বাতাস, আলো সবই কেমন মিষ্টি মিষ্টি! পথ-ঘাট দেব আর দেবীতে ভরা। কেহ একা, কেহ দু'জনে, কেহ দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন বিভিন্ন দিকে। সকলেই সুন্দর আর সুন্দরী, কুৎসিত কুরূপা কেউ নেই। তবে সবাই সরু লিকলিকে, এই যা।

একটু পরেই তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন প্রজাপতি প্যাভেলিয়নের সামনে। বিরাট প্যাভিলিয়ন! চার দিক লাল টকটকে সাটিনে মোড়া প্রাচীর। সম্মুখে বিশাল তোরণ। বিবিধ সজ্জায় সুন্দর করিয়া সাজানো। তোরণের দুই পাশে দুইটি পরম রমণীয় নারীমূর্তি দুই হাত জোড় করিয়া অভ্যাগতদিগকে স্বাগত জানাইতেছে। ভজহরিরা ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল। সমস্ত প্রাঙ্গণটাই বিবিধ বর্ণের এবং বিবিধ প্যাটার্নের মার্বল ও মোজেইক দ্বারা মণ্ডিত। কাচের মত মসৃণ, অতি সাবধানে হাঁটিতে হয়।

একটি অঞ্চলে অসংখ্য গাছ ও ফুলের টব নানা ভঙ্গিতে সাজানো। মাঝে মাঝে এক-জোড়া হাতহীন চেয়ার। কতকগুলি খালি রহিয়াছে, আবার কতকগুলিতে এক জন দেব ও এক জন দেবী বসিয়া আছেন এবং মৃদু আলাপ করিতেছেন। কোন স্থানে বিস্তীর্ণ কার্পেটের উপর কয়েক জন দেব-দেবী মিলিয়া তাস ইত্যাদি খেলিতেছেন। কোন স্থানে ঐরূপ বিস্তীর্ণ কার্পেটের উপর এক পাশে দেবেরা এবং অপর পাশে দেবীরা আসর জমাইয়াছেন গল্পের ও হাসির গুঞ্জনে ও কলরবে। মোটের উপর সব মিলিয়া একটা অতিকায় স্বর্গীয় ক্লাব রচিত হইয়াছে। একটু দূরে অপেক্ষাকৃত দেববিরল একটি অঞ্চল। সাজানো ফুলের গাছের মাঝে মাঝে দেব ও দেবীরা একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা দেখা গেল, একটি তরুণী দেবীর বক্ষঃস্থলে একটি ছোট্ট নীল আলো জ্বলিয়া উঠল। ভজহরি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওর মানে কি ?

দোভাষী বলিল, কোন কোন দেবের হয়তো ইচ্ছা, এই সব দেবীদের কারো সঙ্গে আলাপ করেন, অথচ তিনি সম্মত কি না সেটা বুঝতে না পারলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। সেই জন্য এই সকল দেবীরা কোমরের কাছে আটকানো একটি ছোট্ট-ব্যাটারির সঙ্গে লাগানো দুইটি তারের সঙ্গে দুইটি ছোট্ট বালব ঝুলিয়ে সে দুটো ব্লাউজের বুকের কাছে আটকে রাখেন। একটা ছোট্ট সুইচ আছে। সেটা এক দিকে টিপলে নীল আলো এবং অপর দিকে টিপলে লা[ল] আলো জ্বলে ওঠে। যদি কোন দেব এঁদের কারও দিকে একটু স[...] নয়নে তাকান, তাহলে এঁরা ইচ্ছানুসারে নীল বা লাল আলো জ্বে[লে] দেন। নীল আলোর অর্থ, এসো, আলাপ করি। লাল আ[লোর] অর্থ, থামো, আর এগিও না।

ভজহরি বলিল, একবার দেখব পরখ করে ?

বেলা ফোঁস করিয়া উঠিল, হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ ক[রে] কাজ নেই।

কণিকা বলিল, ও রকম লাইটিং সেট কিনতে পাওয়া যায় ?

বেলা বলিল, কেন, তোমার একটা চাই না কি ?

কণিকা কোন উত্তর দিল না।

আরো খানিকটা ঘোরাঘুরির পর ইহারা একটি মারবেল-মো[ড়া] চত্বরে আসিয়া পৌঁছিল। কি চমৎকার সজ্জা! সমস্ত প্যাভিলিয়[নের] মধ্যে এইটিই যেন সর্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান।

চত্বরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড গোল ঘর। মর্ত্যের রে[লের] টিকিট-ঘরের মত। কিন্তু অপরূপ তার রূপ, আর তার আলোকসজ্জা। নিকটে গিয়া দেখিল, তাই তো এ কি ব্যাপার! গো[ল] ঘরের চারি দিকে ঠিক টিকিট ঘরের কাউন্টারের মত এক এক কাউন্টার। কাউন্টারগুলি পর্যায়ক্রমে ক এবং খ, এই [...] শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি জানালার উপরে নিয়ন আলোয় লে[খা] ক, পরেরটিতে লেখা খ, তার পরেরটি ক, তার পর আবার [খ] ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কাউন্টারের পিছনে একটি সুবেশা মহি[লা]। সামনে বাঁ দিকে টিকিটের খোপ, ডান দিকে টিকিট পাঞ্চ করি[বার] যন্ত্র। প্রত্যেকটি কাউন্টারের সম্মুখে লম্বা কিউ। কিউ-[এর] বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক স্থানে দুই জন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে[ন] এক জন দেব এবং এক জন দেবী।

ভজহরি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিল, এটা বুঝি এরোড্রো[ম] টিকিট-ঘর ? এঁরা সব টিকিট কিনতে এসেছেন কি ?

দোভাষী হাসিয়া বলিল, না।

—তবে ?

একটু দাঁড়ান স্থির হয়ে আর কাউন্টারের দিকে একটু ল[ক্ষ্য] রাখুন, তাহলেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

ভজহরিরা তিন জনেই ঔৎসুক্য ভরা চোখ ও কান কাউন্টা[রের] দিকে নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দোভাষী ইতস্তত ক[রিয়া] বেড়াইতে লাগিল।

একটি ক-কাউন্টারের দিকে মনোনিবেশ করিতেই তাহারা শুনি[তে] পাইল, সম্মুখস্থ দুই জনের মধ্যে যিনি দেব, তাহার দিকে দৃষ্টিপ[াত] করিয়া কাউন্টারের পশ্চাদ্‌বর্তিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার [কি] বলবার আছে ?

দেব পার্শ্বস্থ দেবীকে দেখাইয়া বলিলেন, এঁর প্রতি আম[ার] ভালবাসা পর্বতের চেয়েও উঁচু, সাগরের চেয়েও গভীর—

—থাক, ওতেই হবে। দেবী কি বলেন ?

পার্শ্বস্থ দেবী বলিলেন, আমি অত সব উপমা-টুপমা জানিনে[,] আমি এঁকে ভীষণ ভালবাসি।

কাউন্টারবর্তিনী বলিলেন, বেশ। তার পর দুইটি টিকিট টানি[য়া] বাহির করিয়া তাহাতে ইহাদের নাম ধাম প্রভৃতি লিখিলেন, এ[...]

ঘটাং ঘটাং করিয়া কয়েক বার পাঞ্চিং মেসিনে ঢুকাইয়া এগুলিতে তারিখ বসাইয়া দিলেন। তার পর টিকিট দু'খানি দু'জনের হাতে দিয়া বলিলেন, এখন থেকে আপনারা স্বামি-স্ত্রী। দেব ও দেবী টিকিট দু'খানি লইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

কিন্তু এক ধাপ আগাইয়া গেল। আবার কাউণ্টারবর্তিনীর প্রশ্ন, আবার দেবী ও দেবের পরস্পরের প্রতি প্রেম জ্ঞাপন, আবার ঘটাং ঘটাং, আবার টিকিট লইয়া দেব-দেবীর প্রস্থান। কিউ আর এক ধাপ আগাইয়া গেল।

এবার ইহারা লক্ষ্য করিল খ-কাউণ্টার। কাউণ্টারবর্তিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের ব্যাপার কি ?

দেব বলিলেন, অসহ্য, সিম্পলি ইমপসিবল্। আপনি আর দেরী করবেন না।

দেবী বলিলেন, এমন ভুল কেউ করে ? ওঃ, আমার জীবনটাই—

কাউণ্টারবর্তিনী বলিলেন, ওতেই হবে। তার পর ইহাদের হাত হইতে দুইখানা কার্ড লইয়া ঘটাং ঘটাং করিয়া পাঞ্চ করিয়া, তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, এখন থেকে আপনাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই।

ধন্যবাদ ! এই কথা বলিয়া উঁহারা চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল, দেবীর হাঁটুর কাছে ছোট একটি মেয়ে মায়ের কাপড় ধরিয়া টানিতেছে। দেবী বলিয়া উঠিলেন, আঃ কি জ্বালা ! তার পর কাউণ্টারবর্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এর কি করা যায় ?

কাউণ্টারবর্তিনী বলিলেন, কোলে করে তুলে এদিকে দিন।

মেয়েটিকে কোলে করিয়া দেবী তাহাকে ছোট জানালা দিয়া কাউণ্টারের ভিতর গলাইয়া দিলেন। মেয়েটি একটু কাঁদিয়া উঠিতেই, কাউণ্টারবর্তিনী তাহার হাতে একখানি চকোলেট এবং একটি খেলনা দিয়া বলিলেন, যাও ওদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে। মেয়েটি অগত্যা পূর্ব-আহরিত কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। কাউণ্টারের বাহিরে দেব ও দেবী অন্তর্হিত হইলেন। কিউ আর এক ধাপ আগাইয়া গেল।

ভক্তহরি একটু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিল, মেয়েটির কি হবে ?

দোভাষী ইতিমধ্যে উঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বলিল, ওরা বড় হবে স্বর্গের কসমোপলিটান হোটেলে, তার পর স্থান-কাল-পাত্র বুঝে আবার এমনি কিউতে এসে দাঁড়াবে।

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক ও খ কাউণ্টারের পুরোবর্তী কিউয়ে-দাঁড়ান দেব ও দেবীদের লক্ষ্য করিতেছিল। ভক্তহরি বলিল, ব্যবস্থাটা মোটের উপর নেহাত মন্দ না। কি বল ?

বেলা বলিল, স্বর্গে এসেই দেখি তোমার মাথাটা ঘুরে গেছে। চল না, আমরাও ওই খ-কিউতে গিয়ে দাঁড়াই।

—কি যে বল বেলা ! এত দিনেও তুমি আমায় চিনলে না ?

—ঢের হয়েছে। নাও, এখন কোথাও একটু বিশ্রাম করলে হয়। ঘুরতে ঘুরতে পা যে অবশ হয়ে এল।

দোভাষী বলিল, চলুন একটা হোটেলে ঢুকি ! কিছু খাওয়া-টাওয়া যাক। -আমারও খিদে পেয়েছে।

খানিকটা দূরেই একটি হোটেল ছিল। উহারা চার জনে গিয়া একটি টেবিলে গিয়া বসিল। প্রথমেই উহারা চাহিল—এক এক গ্লাস সরবং। একটি তরুণী দেবী একটি সুদৃশ্য ট্রেতে চার গ্লাস ঠাণ্ডা সরবং আনিয়া উহাদের টেবিলে রাখিল। প্রত্যেক গ্লাসের মধ্যে এক একটি নল। সেই নল দিয়া উহারা একটু একটু করিয়া সরবং খাইতে লাগিল। কণিকা বলিল, আমারও ভীষণ খিদে পেয়েছে, শুধু সরবতে হবে না কিন্তু।

ভক্তহরি বলিল, নিশ্চয়ই। এখনি খাবার অর্ডার দিচ্ছি।

ভক্তহরি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কি কি খাবার ভাল এবং কি কি খাবার অর্ডার দেওয়া যেতে পারে ? দোভাষী তাহাকে জানাইল, স্বর্গে জিলিপিই প্রধান খাদ্য। তবে সাধারণ জিলিপি ছাড়াও জিলিপির ডালনা, জিলিপির বাবি, জিলিপির মোরব্বা, এই সব নানা রকম খাবার আছে। ভক্তহরি দোভাষীকে অনুরোধ করিল, তাহাকেই অর্ডার দিবার জন্য। দোভাষী একটি পরিবেশিকাকে কাছে ডাকিয়া কয়েক প্রকার খাবারের অর্ডার দিল। একটু পরেই একটি একটি করিয়া খাবার সুদৃশ্য ট্রেতে করিয়া টেবিলে আসিয়া পৌছিতে লাগিল, এবং ইহারাও ক্ষুধার বশে সেগুলি সত্বরই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে লাগিল। আহার শেষ হইল। পরিবেশিকা বিল লইয়া আসিল। ভক্তহরি পকেট হইতে পাঁচ শত বিরাশী টাকা বাহির করিয়া দিল। নমস্কার জানাইয়া টাকা লইয়া পরিবেশিকা চলিয়া গেল।

আহারের পর বেলা বলিল, আমি আর নড়তে পারছি নে।

দোভাষী বলিল, বেশ তো, ওই যে এক পাশে বড় বড় সোফা সেটি সাজানো রয়েছে, ওখানে বসে, যতক্ষণ ইচ্ছে বিশ্রাম করুন না।

ভক্তহরি বলিল, আবার একটা লম্বা বিল আসবে না তো ?

—না, না। এখানে বিশ্রামের জন্য ওরা কিছু নেয় না।

উহারা সকলেই সোফায় গিয়া বসিল। দোভাষী একটু পরে বলিল, আমি একটু ঘুরে আসি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা এখানেই বসুন। ভক্তহরি ও বেলা খুবই ক্লান্ত হইয়াছিল; একটু পরেই তাহারা একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কণিক ছেলে মানুষ, অতটা ক্লান্ত হয় নাই।

একটু পরে কণিকা উঠিয়া পড়িল। একটু বেড়াইয়া পায়চারি করিতে করিতে সেই উদ্যানে আসিয়া পড়িল, যেখানে দেব-দেবীর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। ফুলের গাছ এবং অন্যান্য সুদৃশ্য তরুলতায় সাজানো এই উদ্যানটি পরম রমণীয় এখানে আসিলে মন স্বতঃই আনন্দে ভরিয়া উঠে। ঘুরিতে ঘুরিতে কণিকা দেখিতে পাইল একটি কাঁটাল-চাঁপা গাছের নীচে দুইখানি হাত-হীন চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া আছেন একটি দেব ও একটি দেবী। কণিকাকে কয়েক বার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া দেবীটি উঠিয়া আসিলেন এবং কণিকাকে বলিলেন, আপনি কি মর্ত থেকে এসেছেন ?

কণিকা বলিল, আপনি বাংলা জানেন দেখছি।

হ্যাঁ, আমি বাঙালী ছিলাম। স্বামী আর শাশুড়ীর স্নেহ সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছিলাম। তার পরে দেখি ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন স্বর্গে।

—সঙ্গে উনি কে ?

—বন্ধু।

—কত দিনের?

—এই মিনিট দশেকের হবে। ওঁকেই বিয়ে করব ভাবছি। এখান থেকেই একেবারে প্রজাপতি প্যাভিলিয়নের ক-কাউণ্টারে চলে যাব। আপনি বুঝি একা?

কণিকা বলিল, একেবারে একা নই। তবে, হ্যাঁ, একাই বলতে পারেন।

—ও, বুঝেছি।

—আচ্ছা, আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

নিশ্চয়ই। আপনি আমার বাঙালী বোন। স্বর্গে এসে যদি আপনার জন্য কিছু করতে পারি, তাহলে আমার খুব আনন্দই হবে।

—আচ্ছা, আপনার বুকের ওই লাইটিং-সেটটা আমাকে একটু ধার দিতে পারবেন?

—কেন পারব না! আপাতত আমার আর দরকার নেই ওটার।

এই কথা বলিয়া দেবী তাঁহার বুক হইতে লাইটিং-সেটটি খুলিয়া লইয়া কণিকাকে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, ওই যে একটা দেবদারু গাছের সারি দেখছেন, ওই দিকটায় যান। ওদিকে অনেকগুলি দেবকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

কণিকা বলিল, আচ্ছা ভাই আসি। যদি ভাগ্যে থাকে—

—কিচ্ছু ভাববেন না।

কণিকা দেবদারু গাছের দিকে গিয়া দেখিল, সত্যই অনেকগুলি দেব ঘোরা-ফেরা করিতেছেন। অনেকগুলির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হইল, কিন্তু প্রত্যেকটিই লাল আলো দেখিয়া দূরে সরিয়া পড়িলেন। অবশেষে একটি যুবক-দেব নীল আলো দেখিয়া কণিকার নিকটে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল এবং উভয়েই উভয়ের কথা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেল। দুই জনে একত্র গল্প করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত স্থানে উপস্থিত হইল এবং কণিকা পূর্ব্বোক্ত দেবীকে তাহার লাইটিং-সেটটি ফেরৎ দিল। দেবী ইহাদের দুই জনকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা, তাহলে চলুন একসঙ্গেই যাওয়া যাক ক-কাউণ্টারে।

ক-কাউণ্টারের কাজ শেষ করিয়া দু'খানা কার্ড হাতে করিয়া কণিকা এবং তাহার স্বামী সোমদেব হোটেলের দিকে চলিল। তাহাদের নূতন বন্ধু ও বান্ধবী টা-টা বলিয়া বিদায় লইল।

এদিকে ভজহরি ও বেলার তন্দ্রা কাটিয়া গেলে কণিকাকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। দোভাষী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিল, কণিকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে।

দোভাষী বলিল, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। স্বর্গে এমন প্রায়ই হয়, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব ঠিক হয়ে যায়। তবু, আমি দেখছি খোঁজ করে। আপনারা বেশি উতলা হবেন না।

দোভাষী বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে সোজা চলিয়া গেল ক-কাউণ্টারে এবং সেখানেই উঁহাদিগকে দেখিয়া উঁহাদের অজ্ঞাতসারেই উঁহাদের পিছনে পিছনে হোটেলে আসিয়া পৌঁছিল।

ভজহরি ও বেলাকে দেখিয়াই কণিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিল এবং সোমদেবকে বলিল, এঁদের প্রণাম কর। মর্ত্ত্যের লোকদিগকে প্রণাম করিতে সোমদেব একটু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া কণিকা বলিল, এঁরা আমার সব চেয়ে আপনার জন। এঁদের অবমাননা ক'র না। এই কথা শুনিয়া সোমদেব লক্ষ্মীছেলের মত ভজহরি ও বেলাকে প্রণাম করিল।

সোমদেব বলিল, আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে। কণিকাও অবশ্য আমার সঙ্গেই যাবে।

—ও কি আর মর্ত্তে ফিরবে না?

—সে ওর ইচ্ছে।

কণিকা জানাইল, সে এখন মর্ত্তে ফিরিবে না।

সোমদেব ও কণিকা পুনরায় ভজহরি ও বেলাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। বেলা বলিল, এই ছিল তোমার মনে?

কণিকা বলিল, নিয়তি দিদি, নিয়তি। আমার জন্য সবই তো তোমরাই করেছ। আশীর্বাদ ক'র আর ক্ষমা ক'র।

বেলা ও কণিকা আঁচলে চোখ মুছিল। সোমদেব ও কণিকা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ভজহরি বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। বলিল, এ কি ব্যাপার! স্বর্গে যে এমন ব্যাপার ঘটবে, তা কখনো কল্পনা করিনি। কণিকাকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে।

বেলা বলিল, কেন তুমি এত ব্যস্ত আর উদ্বিগ্ন হচ্ছ? মেয়েদের স্বামিলাভ একটা সৌভাগ্য—জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য।

—কিন্তু, এমন হঠাৎ ফুট করে—ফলটা কি ভাল হবে?

তুমি কি করেছিলে, ভুলে গেছ?

—কি করেছিলাম?

—একটা বিধবা অনাথাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে—

—যাও। আর সে তো মর্ত্ত্যে, মাসিমার বাড়ীতে, অনেকটা চেনা-শোনার মধ্যেই—

স্বর্গীয় ব্যাপার মর্ত্ত্য থেকে একটু পৃথক্ ধরণের হবেই। এর জন্য আর মন খারাপ করে কি হবে?

চল, আজই মর্ত্ত্যে ফিরে যাই। এখানে থাকতে আর আমার ইচ্ছে নেই।

বেলা বলিল, শালীর জন্য দেখছি, স্বর্গটাই তোমার কাছে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে!

—ঠিক তা নয়। আমার মনে হচ্ছে কি জান?

—কি?

এই স্বর্গীয় হাওয়া আমাদের গায়েও লাগছে তো। কখন তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে খ-কিউতে দাঁড়াবে, তার ঠিক কি?

বেলা বলিল, সে ভাবনাটা আমার না তোমার?

—যারই হোক, ফল অবিকল এক।

ও-সব কথা ছাড়। এখন দোভাষী মশায়কে জিজ্ঞাসা কর, আর কি দেখবার আছে।

ভজহরি বলিল, সবই তো দেখা হ'ল। কি হবে আর টো-টো করে? চল এবার হোটেলে ফিরি। সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। একটু বিশ্রাম করা যাক।

বেলা বলিল, আচ্ছা, তাই চল।

দোভাষীর সঙ্গে তাহারা হোটেলে ফিরিল। দোভাষী সামান্য কিছু অগ্রিম বখশিস লইয়া বিদায় লইল। বলিয়া গেল, পরদিন সকালেই আবার আসিয়া হাজির হইবে।

বেলা ও ভজহরি কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া ড্রইং রুমে গিয়া বসিল এবং একটি বয়কে ডাকিয়া বলিয়া দিল, তাহাদের ডিনার যেন সকাল সকাল দেওয়া হয়। এ হোটেলটিতে সাধারণত টুরিষ্টরাই থাকেন, সেই জন্য এখানে কয়েক জন বয় বা চাকর আছে, যাহারা অনেকগুলি ভাষায় মোটামুটি কথা বলিতে পারে।

আহারাদি সারিয়া ইহারা শুইতে গেল এবং সারা দিনের ক্লান্তির পর অতি সত্বরই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে মুখ-হাত ধুইয়া যখন ইহারা চায়ের টেবিলে বসিয়াছে, ঠিক তখনই দোভাষী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ইহাদিগকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

চা-পানের পর ইহারা কাপড় চোপড় পরিয়া ড্রইং-রুমে আসিয়া বসিল এবং দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিল, বলুন আজ কোথায় যাবেন ?

দোভাষী বলিল, আপনারাই বলুন। আচ্ছা, স্বর্গের সিনেমা বা থিয়েটার দেখবেন ?

কি আর হবে ও-সব দেখে ? পথের পাশে যেখানে-সেখানে বিজ্ঞাপনের নমুনা যা দেখলাম, তাতেই অনেকটা বোঝা গেছে স্বর্গের আর্টের বর্ত্তমান ধারা। স্বর্গের এমন চমৎকার আবহাওয়া, এর মধ্যে ইচ্ছে করে না বন্ধ ঘরে চুপ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে।

বেলা বলিল, এবেলা আর আমরা বেরুবো না। একটু বিশ্রামই করা যাক। আপনি বরং ওবেলা এক বার আসবেন। তখন যদি ইচ্ছে করে, বেরুনো যাবে।

দোভাষী সম্মত হইয়া বিদায় লইল।

বেলা একখানা ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া দিল। ভজহরি একটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া স্বর্গের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল। উহাদের স্থান হইয়াছে তেতলায়। সুতরাং জানালা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এক দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, একটি চমৎকার বাগান, বোধ হয় নন্দন কানন হইবে। দেবদারু গাছ, পারিজাত ফুলের বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। আর এক দিকে চাহিতে দেখিতে পাইল একটি মনোহারিণী নদী, বোধ হয় মন্দাকিনী। কি চমৎকার ! চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ভজহরি বেলাকে ডাকিয়া বলিল, দেখে যাও, কি চমৎকার নদী ! বেলা বলিল, তুমি দেখ, মর্ত্ত্যে অনেক নদী আমার দেখা আছে।

ভজহরি বলিল, মোট কথা, এবেলা তুমি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠবে না।

—অনেকটা তাই।

ভজহরি জানালায় দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, এমন সময়ে সহসা তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল, দূরে একটি বেগুনী রং-এর বেঁটে ছাতার উপর। স্বর্গের ছাতাগুলি অনেকটা মর্ত্ত্যেরই মত। কণিকার ছাতাও তো ঠিক অমনি বেগুনী রং-এর। কণিকার কথা মনে হইতেই ভজহরি বেশ একটু বিচলিত হইয়া বলিল, জানি না, কণিকা এখন কোথায় কি করছে। কেমন আছে তাই বা কে জানে !

বেলা বলিল, ভালই আছে। নূতন বরের সঙ্গে টো-টো করে বেড়াচ্ছে।

ভজহরি লক্ষ্য করিল, বেগুনী রং-এর বেঁটে ছাতাটি ক্রমশঃ যেন তাহাদেরই হোটেলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর একটু কাছে আসিতেই ভজহরি বেলাকে বলিল, উঠে এসো। দেখ তো ওই মহিলাটি কে ?

বেলা অগত্যা উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল এবং একটুক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই বলিল, মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ও নিশ্চয়ই কণিকা।

আর একটু পরে আর সন্দেহ রহিল না। নিকটে আসিয়া ছাতাটি একটু পিছনের দিকে সরাইয়া উপরের দিকে চাহিতেই কণিকা ভজহরি ও বেলাকে জানালায় দেখিতে পাইল। তার পর তাড়াতাড়ি লিফটে করিয়া উঠিয়া একেবারে উহাদের ড্রইংরুমে ঢুকিয়া ছাতা ও ব্যাগ মেঝেয় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া একখানি সেটির উপরে শুইয়া পড়িল।

বেলা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি ?

—থামো, আমাকে একটু ঘুমুতে দাও।

বেলা ও ভজহরি সরিয়া গেল। কণিকা তখনই গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

বেলা এবং ভজহরি উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া কণিকার নিদ্রাভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বেলা কণিকার নিকট ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইয়া তুলিল এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি ? সোমদেব কোথায় ? রাত্রে ছিলে কোথায় ?

কণিকা বলিল, সব বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।

ভজহরিও একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া কাছে আসিয়া বসিল।

কণিকা বলিল, প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়েই উনি বললেন, চল, একটা রেস্তোরাঁয় যাই। রেস্তোরাঁয় কিছু খাওয়া হ'ল। তার পরই বললে, চল, একটা থিয়েটারে যাই। আমি বললুম, সারা দিন দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে ঘুরেছি, ভয়ানক ক্লান্ত হয়েছি, এখন আর নড়তেও ইচ্ছে করছে না। এখন বরঞ্চ চল, বাড়ী যাই।

—বাড়ী ? কার বাড়ী ?

—আমার আবার বাড়ী কোত্থেকে এল ?

—নিজের বাড়ী নাই হ'ল। কোথাও থাক তো ? সেইখানেই চল।

—আমি কোথাও থাকি-টাকি না। নাও, দেরী হয়ে যাবে, চল একটা থিয়েটারে।

—আমি এখন থিয়েটারে যাব না।

—নিশ্চয়ই যাবে।

—নিশ্চয়ই না।

সোমদেব বলিল, দেখ, গোড়াতেই যখন এমন প্রবল মতভেদ, তখন আর কাজ নেই আমাদের বিয়ে-টিয়ে করে।

সেই ভাল। চল তাহলে প্যাভিলিয়নে।

তার পর আমরা প্যাভিলিয়নে গিয়ে ও কাউণ্টার থেকে দু'খানা বিচ্ছেদ-কার্ড নিয়ে বেরিয়ে এলুম। উনি এক দিকে চলে গেলেন, আমি অন্য দিকে পা বাড়ালুম। পথঘাট চিনি না। হোটেলের

ঠিকানাটাও মনে ছিল না। রাত্রিও ঘনিয়ে এল। তাই প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেই একখানা সোফায় কোন মতে রাতটা কাটিয়ে তার পর জিজ্ঞাসা করতে করতে—উঃ কি ভীষণ মাথা ধরেছে।

বেলার কাছে মাথা ধরার বড়ি ছিল। দুইটি বড়ি খাইয়া কণিকা সুস্থ হইল।

—ভক্তহরি যদি না থাকতো, এখানে বেড়াতে আসা হতো না। এতদিন সংসারের ঝামেলার জন্য কিছুই দেখা হয়নি। আর দু'দিন বাদে তো কাজকর্মে না দেখলে ক্ষতি নেই।

বেলা বলিল কি সুন্দর। মন্দাকিনী নদীতে একটু সাঁতার কাটব আর নৌকায় চড়ে একটু বেড়াব।

—তোমারও দেখছি স্বর্ণের হাওয়া গায়ে লেগেছে। নদী আর নৌকা মর্ত্যেও আছে। এবার ফেরা যাক। দোতলায় এলেই বলে দেব তারে প্লেন সীট রিজার্ভ করতে।

—বেশ তাই হোক।

আহারাদির পর উঁহারা উঁহাদের সামান্য জিনিসপত্র গুছাইয়া ফেলিল। দোতলায় আসিয়া তাহার দ্বারা সীট রিজার্ভ করাইয়া এরোড্রোমে যাবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভক্তহরি পোটলা বিল চুকাইয়া দিল। উঁহারা যখন লিফটে উঠিতেছে তখন কণিকা বলিল, তোমরা নেমে যাও। আমি পরের লিফটেই আসছি। ভক্তহরি ও বেলা লিফটে করিয়া নিচে নামিয়া আসিল। কিন্তু পরের লিফটে কণিকা আসিল না। তার পরের বারেও না।

বেলা চিন্তিত হই। তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল এবং ড্রইং-রুম শোবার ঘর বাথরুম সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল কিন্তু কণিকার খোঁজ পাইল না।

এবার জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নীচে পথের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল কণিকা এক সোনাদের হাসিমুখে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে এবং কণিকা বেলাকে দেখিতে পাইয়া একখানি রুমাল উঁচু করিয়া নাড়িতেছে।

বেলা ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। তাড়াতাড়ি নিচে আসিয়া ভক্তহরিকে সব কথা বলিতেই ভক্তহরি বলিল তাহলে কি করা যায়?

—করা আবার কি যাবে? মনে মনে ওদের আশীর্ব্বাদ করে চল প্লেনে গিয়ে উঠি।

—আচ্ছা ও তো পরে থেকে নামলো কোন্ পথে?

—পিছন দিকে একটা ঘোরান সিঁড়ি আছে দেখ নি?

—তা হবে।

বেলা ও ভক্তহরি প্লেনে উঠিয়া বসিয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দ রোডের বিচালি-গলির বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে।

সিঙ্গাপুরের বৃত্তান্ত

ঐতিহাসিক বলবেন সিঙ্গাপুর এসেছে সিংহপুরা থেকে। সিংহপুরা আলেকজান্ডার দি গ্রেটের এক বংশধর। মালয়ে রাজ্য বিস্তার করতে এসে সিঙ্গাপুরের পত্তন করেন।

রাজনৈতিক বলবেন জায়গাটার ষ্ট্র্যাটেজিক ইমপর্টান্স বা সামরিক গুরুত্বের কথা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ পথ এই সিঙ্গাপুর। লক্ষ লক্ষ টন মাল যাওয়া আসা করছে প্রত্যহ। এ-দেশের ও-দেশের মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, চীফ অব দি জেনারেল ষ্টাফ যাতায়াত করছেন প্রতিনিয়ত।

কিন্তু একজন ভ্রমণকারীর চোখে সিঙ্গাপুর এক স্বতন্ত্র জগৎ। কালাং এয়ার পোর্টে ক্লিফোর্ড পীয়ার দিয়েই নামুন আর কেপেল হার্বারের সিঁড়ি দিয়েই দেশ দেখতে যান বেশ দেখতে পাবেন সিঙ্গাপুর হল এক বাণিজ্য নগর। শুধু মাল যাচ্ছে আর আসছে থাকছে না প্রায়ই শুধু যাওয়া আসার পথে ট্যাক্স দিচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের যেখানেই যান না কেন, আপনি সমুদ্রকে বেশী দূরে ঠেলে দিতে পারবেন না। জায়গাটা ছোট। দেশই। সহরটা দক্ষিণ দিক ঘেঁসে।

সিঙ্গাপুরের অধিবাসী দু রকম। চীনা আর মালয়বাসী। সাধারণ ভাবে এঁরা সবাই ভদ্র, অতিথিবৎসল এবং বন্ধুভাবাপন্ন।

চীনের, আমি সিঙ্গাপুরের কথা বলছি, যদি কাজ করে বেশী তো খেলেও খুব। প্রায়ই তা কিন্তু জুয়া। নানান রকমের। মাজং, হাউসী আরও কত কি।

সিঙ্গাপুরের আছে Bukit Timah—সারা পৃথিবীর গৌরব এক রেসকোর্সের মাঠ। দশটি টাকার বিনিময়ে কোন কোন দিন লক্ষ টাকা বাজি জেতাও নাকি সেখানে বিচিত্র নয়।

সিঙ্গাপুরের আছে বেলুন। হরেক রকমের। আনন্দ হলে তারা বেলুন ওড়ায়। নানা রংয়ের। লাল নীল সবুজ হলদে শাদা।

রাতের সিঙ্গাপুর আরও চমৎকার। সিঙ্গাপুর তখন ভাগ হয়ে যায় তিনটি বৈচিত্র্যময় জগতে। দি নিউ ওয়ার্ল্ড দি হ্যাপী ওয়ার্ল্ড, দি গ্রেট ওয়ার্ল্ড। যার পকেটের দৌড় যেমন, তার জন্য তেমনি ব্যবস্থা।

কয়েকটি টাকার বিনিময়ে এখানকার রেস্তোরাঁয় আপনি আপনার নৈশাহার সেরে নিতে পারেন। ভরা পেটে তার পর হাউসী খেলুন না হয় থিয়েটার দেখুন। কোনও 'ক্যাবারে'তে গিয়ে নাচুন। কি চুপচাপ এক প্লেট আলুভাজা সামনে রেখে কোল্ড বিয়ারের গ্লাসে সিপ করুন, যতক্ষণ না ফাউন্টেন তৈরী হয় আর অবলোকন করুন এক জন লাস্যময়ী চাইনিজ সুন্দরীর নৃত্য (যাঁরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ খবরাখবর রাখেন তাঁরা জেনে রাখুন এ মেয়েদের এরা বলে 'ট্যাক্সী গার্ল') মনোযোগ সহকারে। পরনে তার চিয়ং শ্যাম। অর্থাৎ আঁটসাঁট পোষাক। ট্যাঙ্গো কি কনট্রেক্টের লেটেষ্ট ষ্টেপগুলো তার মুখস্থ।

এরই পাশে পাশে দরিদ্র জনসাধারণও আছে। পৃথিবীর আর সব জায়গার মতই।

আছে মৃত্যু-ঘর। যেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাযাত্রা করে গিয়ে অবস্থান করেন। ট্যাক্স দেন প্রত্যহ। সাড়ে তিন হাত জমির জন্য। যত দিন না ঘনিয়ে আসে মরণ তত দিন পাবেন কড়ি গোণেন। ভরসা ভাল করে গোর দেবে।

তবু বলছি সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুরই। 'নীলনদের জল আবার পান করতে হবে, এত জোর করে যদিও সে আপনাকে আসতে বলবে না। তবু বলছি সিঙ্গাপুর রহস্যময় স্থান। একবার গেলে আবার আপনার সেখানে যেতে মন কেমন করবে।

সৌন্দর্যময়ী
মৎস্যকন্যা

-বিবেকানন্দ-স্তোত্র-

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

১০

এক পাল মক্কেল
বসে আছে বাইরের ঘরে।*
একরাশ তাকিয়ায়
ঠেস দিয়ে বাদশাহী স্বরে
এক কোণে দাড়ি নেড়ে
চিৎকার করে ওটা কে রে,—
"লা-এলাহা এল্লাল্লাহো
মোহাম্মদ রাসুলোল্লাহে" ?
আধ্‌বোজা চোখ দুটো
সুর্মার মৌতাতে ঢোলে ;
যখন চট্‌কা ভাঙ্গে
"ইয়া আল্লা" বোলে হাই তোলে !
অমনি পেঁয়াজ আর
রসুনের গন্ধে মাতায় !
ঘরের লোকেরা সব
নাক টিপে আড়চোখে চায়।

তার পর 'বাপ্' বোলে
যে যার হুঁকোতে মারে টান্।
আঁশ্‌টে গন্ধ যদি
ধোঁয়া খেয়ে দেয় সট্‌কান্।
* * * *
হঠাৎ না-বোলে-কোয়ে
নরেনটা এমন সময়
চট্ কোরে এক লাফে
'চাচা'র কোলেতে উঠে যায়।
'চাচা' তাকে ভালোবাসে
সাথে আনে মণ্ডা-মেঠাই।
এমন বে-আক্কেলে,
বাঁদরটা মুখে পোরে তাই !
নরেনকে কাছে পেয়ে
'চাচা' তার দাড়ি-ঝাড়া মেরে,
সুর্মার ছায়া-ঘেরা
রহস্য-ঘন আঁখি ঠেরে
আফ্‌গান্ কাহিনীর
জরিদার ওড়না ওড়ায়,—
আস্‌মান্-ছোঁয়া ঐ
আফ্‌গাণ্ পাহাড়ের গায়
দস্যু কেমন ছোটে
বিদ্যুৎগামী ঘোড়াটাতে।

রুক্ষ মরুর বুকে
উটেরা কেমন কোরে যা
তাই শুনে নরেনের
কবি-মন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁ
মনের ময়ূর তার
রঙীন প্যাখম্ তুলে না
"আরব্য-রজনীর"
কত ছবি মনে পড়ে তার,
মখ্‌মলি ফেজ্, আর
গুলদার চোস্ত কাবার···
হয়রান্ মুসাফির······
ধূলায় ধূসর বোগদাদ···
নির্জ্জন মস্‌জিদ······
আকাশেতে এক ফালি চাঁদ····
মিনারের বুরুজেতে
মাঝ রাতে বাজছে সানাই·
কবর-খানার নীচে
দুষমন্ কাটছে সুড়ঙ্গ·
গুলজার গুলবাগ,
মজ্‌লিসে মস্‌গুল সব·
রেশ্‌মী রুমাল-আঁটা
কাছা-খোলা বন্দু আরব·
মস্ত পরব আজ
চাঁদনিতে খাসা রোশ্‌নাই·
ফালাও ফরাস্‌টাতে
হাকিম হামেশা তোলে হাই·
বেগমের তাঞ্জাম
রাজপথে দিচ্ছে টহল·
ইরাণীর চোখ দুটো
হরিণীর মত চঞ্চল·
দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে.
সেতারের সকরুণ তান·
মাথায় ফেট্টি-বাঁধা
চোগা-পরা যণ্ডা পাঠান্·
মাঝ রাতে হারেমের
পর্দাটা আধ্‌খানা কাঁ
সুতি ও জর্দার
খোশ্‌বুতে ঘরখানা মাত
দুলছে হাজার-বাতি
বাদশাহী বেলোয়ারী ঝা
বেলদার কিংখাব,
ঐ দেখ বাদশাজাদা
জমকালো জাজিমের
এক কোণা মেজেতে লুটো
নাশ্‌পাতি, নারাঙ্গি
আঁকা তা'তে রেশ্‌মী সুতো

* বিবেকানন্দের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের নামকরা এটর্ণী ছিলেন। তাই তাঁর বৈঠকখানায় সর্বদা মক্কেলরা আসা-যাওয়া করতো।

ভেসে আসে ইরাণীর
প্রণয়-আর্তি—"জাহাপনা !"
গালচের এক পাশে
একপাটি লাল নাগরা না ?

*   *   *   *

রসুন আর তামাকের
তখনো চলেছে অভিযান।
ঘরের লোকেরা সব
নরেনকে দাগছে কামান।
বিশ্বনাথের ছেলে
এমন বে-আক্কেলে, হায় !
ম্লেচ্ছের কোলে চ'ড়ে
বেমালুম জাতটা খোয়ায়।
বাঁদরটা নির্ঘাত
বংশের মুখে দেবে কালি !
ডেঁপোমিতে ওস্তাদ
ছোটোমুখে বড় কথা খালি !
চ্যাংড়ার একশেষ,
দিন-রাত খালি ফাজলামো !
বিবেক বোলে কি কিছু
নেই ওর, আরে রামো রামো !

*   *

নরেন ততক্ষণ
বহুদূর উড়ে চলে গেছে ;
সীমার কবল ছেড়ে
অসীমের আনাচে-কানাচে।
জানে ও যে "Skylark" *
পৃথিবী কি ভালো লাগে তার ?

* চাতক পাখী। [এখানে ইংরেজ কবি Shelleyর বিখ্যাত কবিতাটির উল্লেখ করা হয়েছে, Wordsworthএর নয়। Shelleyর skylark মুক্তিপ্রিয়, বদ্ধ পৃথিবী ছেড়ে হাউই-এর মত কেবলি আকাশে উড়ে যেতে চায় ; words-Worthএর Skylarkএর মত সে মাটি-ঘেঁষা নয়]

বদ্ধ সমাজ থেকে
কোন্ ফাঁকে হয়েছে ফেরার।
সুদূরের সুর এসে
হাত ধরে নিয়ে যায় যা'কে,
নিষেধের বাঁধা বুলি
আর কি বাঁধতে পারে তা'কে ?
আসলে ও "হোমাপাখী" *
ঠাকুরের বাংলা কথায়।
আকাশেই ডিম ফোটে
আকাশেই পাখনা গজায়।
তীব বেগে উড়ে যায়
দুনিয়াকে করে না 'কেয়াব'।

* "বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মা'র দিকে একেবারে চোঁচাঁ দৌড় দেয়,..."

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১ম ভাগ।

[শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে বেদোক্ত এই হোমাপাখীর সঙ্গে তুলনা করতেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইতেন যে, এই শ্রেণীর 'নিত্যসিদ্ধ' ছেলেরা কখনো সংসারে বদ্ধ হয় না, জাগতিক জিনিস এদের বিস্বাদ লাগে, একটু বয়স হ'লেই এদের চৈতন্য হয় আর একলক্ষ্য হ'য়ে ভগবানের দিকে চলে যায়]

আর তাকে বাঁধবে কে,
পেছনে পাখনা আছে তার।
মাটিকে এড়িয়ে যায়
ঢোকে না সে "কাজলের ঘরে" ।*
অসীম আকাশটাকে
খুশিমত আস্বাদ করে।
সাতরঙা আকাশের
রংদার ছোপ লাগে মনে।
অসীমের নীরবতা
মন দিয়ে কান পেতে শোনে।
সেই শুনে মনে হয়
পৃথিবীর কল-কোলাহল,
দু'দিনের মুখরতা
স্বপ্নের মত নিষ্ফল।
এক ফোঁটা বুকে তার
জেগে ওঠে অসীম প্রণয়।
ভালো আরও ভালো লাগে,
বেশ লাগে যারা বেশ নয়।
প্রীতির পরাগ দিয়ে
এই ভাবে বালক নরেন
তামাক আর রসুনের
মাঝখানে টানে হাইফেন্।
ভালো আর মন্দের
অসহ্য ব্যবধানটায়
এই ভাবে দু'জনের
গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে যায়
ভুলে যায় দেশ-কাল,
সাদা-কালো, সবুজ-বাদামী।
তাই যেন মনে হয়
দাড়ি-ওলা-তুমিটাও আমি।
[ক্রমশঃ।

* শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারকে 'কাজলের ঘর' বলে উল্লেখ কোরতেন। অর্থাৎ কাজলের ঘরে বাস করলে যেমন কালির দাগ লাগবেই, তেমনি সংসারে মন অপবিত্র হবেই।

আটাশ বছরের দ্বারকা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আটাশ বছর আজকালকার মানুষের আয়ুর অনেকখানিই, কিন্তু একটি শহরের পক্ষে কিছুই নয়, বিশেষ করে যে শহর পুরানো আর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আশ্রয় করে আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— এই চার যুগ নিয়ে ভারতবর্ষের চার প্রান্তে যে চারটি ধাম তৈরী হইয়াছে—তাদের আয়ুর হিসাব তো এর মধ্যে আসেই না। এই চারটি ধামকে পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তুলে দিয়েছেন আচার্য্য শ্রীশঙ্কর। গোবর্দ্ধন, শৃঙ্গেরী, সারদা ও যোশী মঠ নিয়ে— যথাক্রমে পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা ও উত্তরাখণ্ড, ভারতবর্ষের এই চারটি ধাম, পুণ্যকামীদের চিত্তে অক্ষয় হয়ে আছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকাধামের কথা আজ বলব। আটাশ বছরে এই শহরের কতটুকু পরিবর্ত্তন হয়েছে—তার হিসাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

প্রথমে জেলার কথাই ধরা যাক। আজমীরে বসে একখানা চিঠি লিখেছিলাম বন্ধুকে—তাতে ডাকঘরের সঙ্গে জেলার উল্লেখ করতে গিয়ে মনে দ্বিধা জাগল। প্রথমে লিখলাম—জেলা কাথিয়াবাড়। কেমন সন্দেহ হল—ঠিক লিখছি তো? আটাশ বছরের অস্পষ্ট স্মৃতির গুহায় কাথিয়াবাড় নামটি কুয়াশা-ম্লান হলেও লুপ্ত হয়নি, তবু সন্দেহ জাগল। যেমন ভারতবর্ষের রেলপথ সমূহের শ্রেণীবিন্যাস হয়ে পুরাতন নামগুলি লুপ্ত হয়েছে—তেমনি এক জেলার মধ্যে অন্য জেলা যদি আত্মগোপন করে থাকে? কাছেই ছিল আজমীরের বড় ডাকঘর, সেখানে সন্ধান নিয়ে জানা গেল, সন্দেহ আমার অমূলক নয়, কাথিয়াবাড় আজ সৌরাষ্ট্রের মধ্যে আত্মগোপন করেছে।

কিন্তু দ্বারকাধামের অন্যান্য পরিবর্ত্তন উল্লেখ করার আগে আটাশ বছরের হিসাবটা কেমন করে পেয়ে গেলাম, তার কৌতুককর বৃত্তান্তটুকু বলে রাখি। বহু দিন আগে কয়েক জন বন্ধু মিলে আগ্রা, দিল্লী, আজমীর হয়ে এসেছিলাম দ্বারকাধামে। আমার হিসাবে সালটা ছিল ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯। কিন্তু সন-তারিখের নির্ভুল হিসাব শুধু ইতিহাসকার রাখেন না, তীর্থগুরুরাও তার মাল-মশলা জুগিয়ে দেন। সে অভ্রান্ত প্রমাণ পেলাম পুষ্করতীর্থে এসে।

আজমীরে গাড়ী থেকে নামতেই পুষ্করের পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করল: আপনার পাণ্ডা কে?

: বললাম, পাণ্ডার দরকার নেই। শুধু দর্শন করা।

: বেশ তো, আমাকে সামান্য কিছু দেবেন—কাজকর্ম্ম করিয়ে দেব। পাণ্ডা বলল।

বললাম: আজ তো পুষ্করে যাব না, কাল-পরশু যেতে পারি।

: আমি বাস-ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করব আপনার জন্য—আর কাউকে নেবেন না যেন।

প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ছোট্ট শহর আজমীর—চার দিকে পাহাড়ের প্রাচীরে বন্দী। ওখানকার যা-কিছু দ্রষ্টব্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখা হয়ে যায়। আন্না সরোবর তো প্রায় শুকিয়ে গেছে; এবার ভাল মত বৃষ্টি না হওয়াতে ওর এমন দুরবস্থা! জৈনদের স্বর্ণমন্দির দেখলে মনে হয়, সাধু-সন্তের কল্যাণ-বাণীকে ঐশ্বর্য্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করা হচ্ছে। মুসলমানদের উরস্ শরীফেও কম ঐশ্বর্য্য নাই; কিন্তু অনাথ আতুর জনের নিত্য সেবা-পরিচর্য্যায় সেটি হয়েছে বহতা নদী: আড়াই-দিন-কা ঝোপ্‌ড়ীর গায়ে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যের চিহ্নটা অবশ্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। হিন্দুর বিদ্যা-বিতরণ নাটকে··· উপাসনাগারে পরিবর্ত্তন করার সময় ভক্তগাত্রের দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলিকে বিকলাঙ্গ করার প্রচেষ্টা এর সর্ব্বত্র; তবু আড়াই দিন ধরে যে মেলা বসে—তাতে সর্ব্বসাধারণের মিলনের একটি ভিত্তিভূমি রচনার আভাসও যেন পাওয়া যায়। আর যাদুঘর ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ? সাধারণ মানুষ এ দু'টি জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য্য হবার বস্তু খুঁজে পায় না।

পরের দিন পুষ্করের বাস-ষ্ট্যাণ্ডে নামতেই সেই পাণ্ডা হাসিমুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অন্যেরাই বা ছাড়বে কেন? নাম, ধাম ও বাসস্থান জানবার জন্য তারাও পিছু-পিছু ধাওয়া করল।

ঠিকানা দিলাম শিবপুরের—মাত্র দশ বছর এখানে আছি। পৈত্রিক ভিটা নয় যে খাতা খুলে যজমান ঠিক করে নেবে। তা ছাড়া বহু দিন আগে যখন এখানে আসি—তখন সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবর বিজলীভূষণ বসু। এখানকার যা-কিছু হাঙ্গামা তিনিই ভোগ করেছিলেন। আমি তর্পণ করেছিলাম কি না, অথবা পাণ্ডার খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম কি না, স্মরণ নাই,—পাণ্ডার নাম তো দূরের কথা।

পাণ্ডারা তো ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেল। অবশেষে এক চতুর পাণ্ডা বলল: বাবুজি, আপনার আদিবাস কি শিবপুরেই?

বললাম: না, শান্তিপুরে।

পাণ্ডার নামটি আর উল্লেখ করলাম না, নিজের নামটিও না। শান্তিপুর ছোট গ্রাম নয়। পাড়ার উল্লেখ না করলে কারও সাধ্য হবে না ঠিকানা খুঁজে বার করে।

পাণ্ডা চলে গেল—আমরা চললাম সাবিত্রী পাহাড় অভিমুখে। ফিরে এলাম আড়াই ঘণ্টা বাদে। তখন ইচ্ছা হল স্নান-তর্পণ করবার। আজমীরের পরিচিত পাণ্ডাকে তর্পণের জিনিসপত্র আনবার জন্য টাকা দিলাম।

সে জিনিসপত্র আনতে চলে গেল—আমি পৈঠার উপর বসে তার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইত্যবসরে আরও কয়েক জন পাণ্ডা··· খাতাপত্র নিয়ে আমায় ঘিরে বসল। বহু নাম শুনে যাচ্ছি—আর হাসছি মনে মনে। কিন্তু এক সময়ে চমকে উঠলাম নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে। কৌতূহল ভরে পাণ্ডার হাত থেকে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখি—সেখানে আমারই শ্রীহস্তের স্বাক্ষর রয়েছে। নীচেয় রয়েছে গ্রামের নাম, তার নীচেয় ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সাল। আটাশ বছরের হিসাবে আর কোন ভুল রইল না।

এই আটাশ বছরের হিসাব নিয়ে চললাম দ্বারকায়। রেলপথে অবশ্য হিসাবটা গরমিল হল না। মেহসনা হয়ে বিরাঙ্গাম—তার পর রাজকোট,—দু'বার গাড়ী বদল করতে হল। রাজকোট থেকে সেই পুরাতন রেলপথ—যদিও জামনগর দ্বারকার বদলে এ রেলপথের নাম হয়েছে পশ্চিম-ভারতীয় রেলপথ। দু'ধারে শস্যহীন ভূমি—আকাশ-ছোঁয়া মাঠের শেষ নাই, রূপও নাই। একা জামনগর এই পথের সমস্ত শ্রী সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ট্রেণের গতি তেমনি মন্থর—অখ্যাত ষ্টেশনে তার অবস্থিতিও দীর্ঘকালব্যাপী। ফলে তিনটার গাড়ী সাড়ে পাঁচটার দ্বারকা পৌঁছল।

ষ্টেশনের সামান্য পরিবর্তন চোখে পড়ল, পথের পরিবর্তন সামান্য নয়। আগেকার সেই খোয়া-ওঠা সঙ্কীর্ণ পথের বদলে পীচ-বাঁধানো চওড়া রাস্তা এল কোথা থেকে? আর পথের ধারে বিজলী বাতির স্তম্ভ?

ষ্টেশনটা এখন আর একলা মাঠের মাঝে পড়ে নেই, কয়েকখানি ছোট আর মাঝারি বাড়ী আর একটি সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা হয়েছে তার সঙ্গী। কিছু দূর এসে পথের মাঝখানে ছোট্ট একটু ফুলবাগানের মধ্যে একটি মর্মরমূর্ত্তি চোখে পড়ল। গোলাকার বাগান ঘিরে আসা-যাওয়ার পৃথক্ পথ। এর নির্ম্মাণকার্য্য এখনও শেষ হয়নি। আরও খানিকটা এগিয়ে এলে সামনে পড়ে তোতাদ্রি মঠ। সুদূর পশ্চিমে বাঙ্গালী সাধু প্রতিষ্ঠিত মঠ,—ওর ইতিহাস অন্যত্র বলবার ইচ্ছা রইল।

মঠের ও-পিঠে প্রকাণ্ড একটা সিমেণ্ট-ফ্যাক্টরী,—আলাদা একটা নগরেরই পত্তন হয়েছে। তার উঁচু চিমনী দু'টি দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বার হচ্ছে। তোতাদ্রি মঠ পিছনে ফেলে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল বিরাট গো-শালা, ছোট-মত পাওয়ার হাউস, আরও দু'-চারটে খুচরো বাড়ী। আটাশ বছর আগে ও-সব কিছুই ছিল না, কিন্তু আটাশ বছর আগে যা ছিল—সেই প্রাচীর-ঘেরা পুরী—সে গেল কোথায়? কাছে এসে দেখা গেল—প্রাচীন বাড়ী-ঘর নিয়ে সেকালের পুরীটা ঠিকই আছে, শুধু তার চার পাশের প্রাচীরের আবরণ খসে পড়েছে। পীচ-বাঁধানো চওড়া রাস্তাটা সোজা মন্দিরের দুয়োরে চলে গেছে, আরও দু'-একটি রাস্তার সংস্কার হয়েছে, কিন্তু বহু পুরাতন পথ—পুরাতন বাড়ীর গা ঘেঁষে তেমনি অপরিবর্ত্তিত রয়ে গেছে। সেকালের কেরোসিন আলোর কাষ্ঠস্তম্ভও বিদ্যমান। মানুষ, যান-বাহন, দোকানপাট—সবেরই অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎ।

দূর থেকে সু-উচ্চ মন্দির-চূড়া নজরে পড়ল। সেদিন দেখেছিলাম পীতবর্ণের পতাকা, আজ তাতে তিনটি রঙের সমাবেশ। গোমতী গঙ্গায় স্নান করতে এসে বিস্ময় বাড়ল। কোথায় গোমতীর সেই উর্ম্মিমুখর সোপানচুম্বী দেহ-ভঙ্গিমা! জোয়ারের সময় হলেও কয়েকটি ঘাট মাত্র জলপূর্ণ। মাঝখানের একটি ঘাট তো সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। দূরের কয়েকটি ঘাট বালুপ্রান্তরে মাথা রেখে অতীতের স্মৃতি ধ্যান করছে, যেখানে দ্বারকা-মন্দিরের ছাপ্পান্ন সিঁড়ি গোমতী-গর্ভে নেমে এসেছে—সেখানে জলের চিহ্নমাত্র নাই। শীতকাল বলে ঘাটেও যাত্রী বিরল। সেকালে এই ঘাটে স্নান কিংবা জলস্পর্শের অধিকার লাভের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে দক্ষিণা দিতে হত এক টাকা এক-আনা। বরোদা রাজ্যের মোটা আয় ছিল এটা। আজ মাত্র এক আনা মাশুল দিয়ে যে-কোন যাত্রী এই জলে স্নান-তর্পণ করতে পারে। সেকালে দূর থেকে বিগ্রহ-দর্শনে কোন দক্ষিণা দিতে হ'ত না, কিন্তু মন্দিরের গর্ভ-গৃহে গিয়ে শুধু দ্বারকানাথকে স্পর্শ ও পূজা করার অভিলাষ জানালে সাড়ে আট আনা মাশুল লাগত, সেই সঙ্গে মন্দিরের অন্যান্য বিগ্রহকে পূজা বা স্পর্শ করার জন্য দিতে হত আরও এক টাকা। বেশ মনে আছে, সাড়ে আট আনা দিয়ে আমরা শুধু রণছোড়জীকে স্পর্শ করেছিলাম—অন্যগুলিকে দূর থেকে দর্শন করেছিলাম। এখন কাছে গিয়ে কোন বিগ্রহ স্পর্শ বা পূজা করার অধিকার কারও নাই, শুধু দূর থেকে দর্শন। মন্দিরের গর্ভগৃহে যেখানে বিগ্রহ আছেন—তার সামনের বারান্দায় পূজারীদের বসবার জায়গা—তার সামনে নাটমন্দিরের দু'টি থামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি কাঠের কোমর-সমান উঁচু অবরোধ—যা বেরিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে যাবার সুযোগ কারও নাই। ওই কাঠের অবরোধে (কাউণ্টার বলাই সঙ্গত) দ্বারকানাথের দর্শনী জমে—পূজারীদের হাতে টাকা পয়সা দিতে গেলেও তাঁরা নেন না—ঐ কাঠের ছিদ্রপথে ফেলে দিতে বলেন। ফুল আর মালা দিয়ে তাঁরা দ্বারকানাথের প্রসাদ করে দেন। যাত্রীদের হাতে সেই প্রসাদী ফুল মালা আর তুলসী পাতা এনে দেন।

হঠাৎ দেব-দর্শনের এই আয় বন্ধ হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এক জন জানালেন, দেবতাকে অশুচি স্পর্শ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই প্রথা কায়েম হয়েছে। রাজরাজেশ্বর ঠাকুরের আয় তো কম নয়, তাঁকে হীন জাতির সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করার জন্য এইটুকু ছাড়লে কি-ই বা আসে যায়! হীন জাতি কে? কেন, আজ-কাল হরিজনেরা দেবমন্দির প্রবেশের অধিকার লাভ করেছে—এ কথা কোন্ হিন্দু না জানে? তা ছাড়া যে দেবতা মনের মধ্যে বাস করেন—তাঁর স্পর্শ তো ভক্ত সাধক নিত্যই লাভ করে থাকেন! তাঁকে স্থূল ইন্দ্রিয়লভ্য করে মানুষ কতটুকু ইষ্টলাভ করতে পারে? সুতরাং আয়ের পথ বন্ধ করে দেবতাকে সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করে কারও অধিকার তো হরণ করা হয়নি? একমাত্র যা ক্ষতি হয়েছে অর্থের দিক দিয়ে। তা দ্বারকার যিনি অধীশ্বর—তাঁর অর্থের কি অভাব, ভগবান বিষ্ণু হলেন ঐশ্বর্য্যময়—তিন ভুবন জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য।

সে কথা মিথ্যা নয়। যে ক'দিন এখানে রইলাম—প্রাণ ভরে দেখলাম রাজাধিরাজের ঐশ্বর্য্য-মহিমা। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের চূড়ায় নূতন নূতন পতাকার সমাবেশ—প্রতিদিন দ্বারকানাথের বেশ পরিবর্ত্তন, সিংহাসন থেকে পট্টবস্ত্র, চাঁদোয়া, পোষাক, অলঙ্কার সব-কিছুরই পরিবর্ত্তন চলছে। যেমন মণিমুক্তাখচিত মূল্যবান সে পরিচ্ছদ—তেমনি সোনা, হীরা, পান্নার তৈরী আভরণ।

রোজই কি বেশ বদল হয়? এর মানে কি!

মানে আর কি—যিনি ধনবান—প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনি কি একই পোষাক পরে থাকেন? অসংখ্য ভক্ত—ভক্তি ভরে যদি নিত্য-নূতন উপহার প্রদান করে—সেগুলি শ্রীভগবানের সেবায় না লাগালে তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া হয় না কি? এত অসংখ্য ভক্ত দ্বারকানাথের যে, প্রতিদিন বেশ বদল করিয়েও একটি বছরে প্রত্যেকটি ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। আর মন্দিরে পতাকা তোলার ব্যবস্থাই কি যে-সে করতে পারে! এ তো ভারতবর্ষের অন্য কোন মন্দির নয় যে—সামান্য কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে মন্দির-চূড়ায় নিশান বাঁধা চলবে? এ রীতিমত রাজকীয় ব্যাপার। পাঁচশো ঘর পাণ্ডা আছে দ্বারকায়—সব মিলিয়ে জনসংখ্যা দু' হাজার তো হবেই। এই দু' হাজার লোককে যে দাতা এক দিন ভোজন করাতে পারবে—সেই অধিকার পাবে মন্দিরশীর্ষে পতাকা তুলবার। এ থেকে বোঝা যায়, রাজার সেবকবৃন্দ কি স্বাচ্ছন্দ্যে দিনপাত করেন। যাত্রী নিয়ে এঁরা মারামারি কাড়াকাড়ি করেন না। আটাশ বছর আগে যে সনাতন ব্যবস্থা চালু ছিল—আজও তা আছে। প্রদেশ আর জাতিস্বত্ব নিয়ে এঁদের যজমান। যেমন বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ যাত্রীর স্বত্বে যে পাণ্ডা স্বত্ববান—তার অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ যাত্রী কিংবা বাংলা দেশের ভিন্ন জাতীয় যাত্রীর উপর কোন দাবী

। এতে করে যাত্রীরা বহু হয়রাণির হাত থেকে রেহাই পেলেও, স্থানে যাত্রী-দোহনের যে কলা-কৌশলগুলি পাণ্ডাকুলের পুষ্টিসাধন তার থেকে পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন। অবশ্য নানা আন্দোলনের ধাক্কায় যাত্রী ভুলানোর কৌশল ও জুলুম ক্রমশঃই হ্রাস হয়েছে, এবং পাণ্ডাকে দেবতা জ্ঞান করার দল ক্ষীণ হয়ে আসায় পাণ্ডারা অনেকেই অন্য বৃত্তির সন্ধানে চারি দিকে ছড়িয়েও পড়েছেন।

মন্দির-চত্বরে—কিংবা মন্দিরের চারি পাশে আগে যেমন , বিল্বপত্র, তুলসী ও ফুলের মালা, গোপীতিলকের মাটি, নানা রকমের পট—পুঁথি ইত্যাদি বিক্রি হতো—আজও তা অব্যাহত আছে। মন্দিরের সামনে ও পাশে পথ তেমনি সঙ্কীর্ণ—আঁকা-বাঁকা, দু' ধারে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী, বিবিধ পণ্যের বেসাতি। সেকালের মানুষগুলি হয়তো নাই, কিন্তু বিক্রেয় দ্রব্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। ও-সব দেখলে মনে হয়, তীর্থক্ষেত্রে আবহমান কাল থেকে যে বস্তু ও বিধি প্রচলিত হয়েছে—তা দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল নয়। এক মানুষ বহু কাল থাকে না, কিন্তু বহু কালের রীতির মধ্যে বেঁচে থাকে অমর হয়ে। তীর্থক্ষেত্রে প্রবীণরা উত্তরাধিকার সূত্রে নবীনদের দান করে যান দেবস্থানের ভাল-মন্দ নির্ব্বিশেষে সমস্ত বিধি-বিধান। সে-গুলিতে দেব-মহিমা নিহিত কি না এই প্রশ্ন না করেও—প্রকরণ সমূহের অনুষ্ঠানে যাত্রীরা তীর্থকৃত্য সম্পাদনের সন্তোষ লাভ করে থাকেন।

শহর থেকে যে পথ চলে গেছে দু' মাইল দূরে রুক্মিণী-মন্দিরে এবং সেখান থেকে ওখা অভিমুখে তা প্রশস্ত ও পীচমণ্ডিত হয়েছে; ঐ পথে আজ যাত্রিবাহী বাসের যাতায়াত সুরু হয়েছে—সেদিন একমাত্র ভরসা ছিল। ওখাতে দেবদর্শনে যে এক টাকা মাশুল ছিল—তা পরিবর্ত্তিত হয়ে এক সিকিতে পৌঁছেচে। তবু মাশুলের প্রথা রয়েছে তো? দরিদ্র যাত্রীরা শুধু ভক্তি সম্বল করে ভারতের দূর প্রান্ত থেকে এসে এই সামান্য কড়ি দিতে অবশ্য কাতর হন না, তবু এমনও অনেক অশক্ত আছেন—তাঁদের উপর ওই বিধি প্রয়োগ স্বাধীন ভারতে নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম সমুদ্রের তীরে। মনে আছে, সে বার টাকা এক আনা মাশুল দিয়ে গোমতী গঙ্গায় অবগাহন করে পুণ্য অর্জ্জন করতে পারিনি। প্রতিবাদ করেছিলাম এই জুলুমের বিরুদ্ধে। আমরা সমুদ্রে অবগাহন স্নান করেছিলাম। প্রতিবাদের হেতুটা আজও বেশ মনে আছে। যেদিন অপরাহ্ণে দ্বারকা পৌঁছাই—তার পরের দিন সকালবেলায় গোমতীর ধারে বেড়াতে গিয়েছি—হঠাৎ একটি রোরুদ্যমানা মেয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দু'জন শাস্ত্রী তার দু'হাত ধরে ধমক দিচ্ছে। ব্যাপার কি? মেয়েটি না কি অজ্ঞাতে গোমতীর জল স্পর্শ করেছে। অথচ তার হাতে মাশুল দেওয়ার কোন চিহ্ন নাই। ফাঁকি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করার রীতি নাই বলে প্রহরীরা ওকে পীড়ন করছে মাশুল দেওয়ার জন্যে। মেয়েটি অনুনয় করে জানাচ্ছে—মাশুল দেওয়ার ক্ষমতা ওর নাই। কিন্তু রাজ-কানুনে দয়া বৃত্তির অনুশীলন নিষিদ্ধ, মাশুল ওকে গুণতেই হইবে—সেই জন্য পীড়ন চলছে। অবশেষে এক সহৃদয় দাতা ওর হয়ে মাশুল গুণে দিলেন। শাস্ত্রীরা ছুটে গেল মাটি-ঘরের দিকে এবং অনতিবিলম্বে একটি গোলাকার ছাপ এনে ওই মেয়েটির হাতে এঁকে দিল। ওই ছাপ যত দিন হাতে থাকবে গোমতী গঙ্গার জল স্পর্শ কর, অবগাহন কর কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু মাশুল ফাঁকি দেওয়া চলবে না কোন মতেই। এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে আমরা গোমতী গঙ্গার জল স্পর্শ করিনি।

কিন্তু যেখানে সমুদ্র-স্নান করেছিলাম—সে জায়গাটি গেল কোথায়? কোন দূরে সরে গেছে সমুদ্র? জোয়ারের সময় হয়তো কিছুটা এগিয়ে আসে, ভাঁটার সময়ের তীরভূমি যেন মজা নদীর খাত। সৈকতে পাথর জমছে, শ্যাওলা জমছে। সেই ছোট ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউ-এর অবিরাম উদয়, বিলয় ও গর্জ্জন কই? আরব সমুদ্র কি ভারতবর্ষের তটপ্রান্ত থেকে সরে চলেছে অন্য কোথাও? অথবা পৃথিবীর স্থলভাগের প্রসার বাড়ছে?

কথিত আছে, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করেছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন, সমুদ্রের কূলে হলেও বর্ত্তমান দ্বারকা নাকি সেই মহাভারত-বর্ণিত পুরী নয়। আজও পোরবন্দরের পথে সুদামাপুরী থেকে কিছু দূরে আসল দ্বারকা তীর্থ অনেকে দর্শন করে আসেন। সেখানে নাকি সমারোহ নাই; বাড়ী-ঘর দোকান-পসার তেমন কিছু নাই, দেখে চক্ষু সার্থক হয় এমন মন্দির বা দেবতা নাই—তবু লোকমুখে প্রচারিত হয়ে সেই পুরী আসল নামের গৌরবভাগী হয়েছে। সে যাই হোক, শ্রীশঙ্করাচার্য্য চার ধামে যে চারটি মঠ স্থাপনা করে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন—পশ্চিমে বর্ত্তমান দ্বারকার রণছোড়জীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে সেই মঠ চতুষ্টয়ের অন্যতম মঠ সারদাপীঠ বিদ্যমান। এ থেকে আসল দ্বারকা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন হওয়া বিচিত্র নয়। সমুদ্রের দিক্ পরিবর্ত্তন কিছু আশ্চর্য্যের নয়। আটাশ বছরে সে দ্বারকার তীরভূমি যতখানি পরিত্যাগ করেছে—হাজার হাজার বছরের হিসাব ধরলে সমুদ্র-গর্ভ থেকে বর্ত্তমান শহরের অভ্যুত্থান কিছু অবিশ্বাস্য মনে হবে না। মানুষের মতি পরিবর্ত্তনের মত নদী আর সমুদ্র নিয়তই ভূমি পরিবর্ত্তন করছেই। সাড়ে চারশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব যে পথে গঙ্গা-নদী পার হয়ে পুরুষোত্তম যাত্রা করেছিলেন—সেই পথে কোথায় আজ গঙ্গার প্রবাহ ধারা? আদি সপ্তগ্রামকে পণ্য-বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ বন্দর বলে কে স্বীকার করবে আজ? মায়াপুর আর নবদ্বীপ নিয়ে বিবাদের নিরসন আজও হয়নি। বৃন্দাবনে কালীয়দমনের শুষ্ক খাত ও বাঁধানো ঘাট দেখলে কারও মনে সন্দেহ জাগে না, এইটিই ছিল যমুনা-পুলিন, কিন্তু কোন্ দূরে লীলাময়ী আজ রচনা করেছেন সৈকতভূমি? একদা যমুনাতীরশায়ী দিল্লীর লালকেল্লা আর কুতুবমিনারও সেই সাক্ষ্য দেবে।

দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে অনায়াসে বলা যায়—প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন ঘটছে অহরহ, কোনটি আমরা স্বীকার করি—কোনটি বা করি না। কিন্তু দ্বারকার সমুদ্রতীরে সূর্য্যাস্তের যে শোভা—তার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি।

বালুসৈকতে বসে সূর্য্যাস্ত দেখছি। ফিরে এসেছি আটাশ বছরের সময়ের স্রোত ঠেলে। ফিরে পেয়েছি আটাশ বছর আগেকার রূপ-সন্ধানী রসনিবিষ্ট মনকে। আকাশে রচিত হয়েছে গৌরবের পটভূমি—সারা পশ্চিম আকাশের গায়ে সিঁদূরের ছোপ ধরেছে। সূর্য্যোদয়ের লাল রঙের সঙ্গে এর তফাৎ আছে কি? আছে বই কি।

একটি দিনকে সৌন্দর্য্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি ফুটে ওঠে উদয়-দিগন্তে। কিছুটা সংশয় থাকে তার মধ্যে, মেঘ-বাদলের ছায়াতে সে গৌরব ম্লান হয়ে যাবার ঈষৎ আশঙ্কাও থাকে হয়তো। পূর্ব্ব-দিগন্তের অল্প একটু জায়গা জুড়ে অত্যন্ত সঙ্কোচে সে যেন উঁকি মারে! রংটা তার কাঁচা, তাই বেশী উজ্জ্বল। এবং সে শোভা স্বল্পকাল স্থায়ী। সূর্য্য আকাশে উঠেই শোভা সংবরণ করে নেন। যেন বলেন, বেশীক্ষণ এ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না তোমাদের। তোমরা জাগ্রত-মানুষের দল—কাজের তাড়ায় এই ঐশ্বর্য্যকে নিশ্চয় বিস্মৃত হবে, সুতরাং তোমাদের মনে এই অপরূপ রূপকে স্থায়ী করার চেষ্টা আমি করব না।

কিন্তু অস্ত-দিগন্তের সূর্য্য সে আশঙ্কা পোষণ করেন না। সারা দিন তাঁকে প্রদক্ষিণ করে চলে পৃথিবী। বিদায় কালে পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিয়ে যান, আবার আসব আমি। কাঁচা রঙে মন-ভুলানোর খেলা আমার নয়। আসল রঙে ছবি এঁকে দিলাম মেঘের গায়ে। একটুক্ষণের জন্য নয়—দীর্ঘক্ষণের জন্য। আকাশে এঁকে দিলাম আমার উত্তপ্ত চুম্বন, ব্রীড়াবতী বধূর আরক্ত কপোলের মত আকাশের প্রান্তে ও সীমান্তে জড়িয়ে থাকুক সে সোহাগ। আমি যে ভালবাসি তোমাকে—এ সোহাগ-চিহ্ন তারই প্রতীক। আমি এখনই ডুব দেব বটে সমুদ্রের গর্ভে, কিন্তু সারা রাত্রি ধরে চলবে এই সৌন্দর্য্য-বিলাস।

সত্যই অল্পক্ষণের মধ্যে মিলিয়ে যায় না সেই অপরূপ ঐশ্বর্য্য। পাকা লাল রঙে পশ্চিম-দিগন্ত ভরে উঠেছে। দিগন্তের মাটী লাল নয়, ঊর্দ্ধে যেখানে স্তিমিত-জ্যোতি কিরণ-ধারা লেগে রয়েছে—সেখানটা ঈষৎ নীল, সমুদ্রের গর্ভে যেখানে শত-কোটি তরঙ্গলীলায় চঞ্চল—সেখানটা ঘন নীল—এ দুয়ের মাঝখানটাতে কে যেন আবীর গুলে ছড়িয়ে দিয়েছে। একটানা লাল নয়—সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ—তেমনি তরঙ্গ লালের জমিতে। মেঘের পাটল—ধূমল রেখার 'পরে কিরণ-লেখা চিক্ চিক্ করছে, মেঘের স্তূপে পাহাড় আর নিসর্গদৃশ্য ফুটে ফুটে উঠছে। সূর্য্য প্রজ্বলন্ত অগ্নিগোলকের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছেন তার উপর দিয়ে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে, জলে পড়ছে প্রতিচ্ছায়া···কিন্তু সে রূপকে ধরে রাখার প্রয়াস বৃথা। যে সমুদ্র দেখেনি—তাকে তরঙ্গ, গর্জ্জন, রঙ আর বিস্তার দিয়ে কি বস্তুর সন্নিকটে আনা যায়? রূপের সবটাই তো দৃষ্টিলভ্য নয়; দৃষ্টির নেপথ্যে বসে আছেন যে রসগ্রাহী মন।

গড়াতে গড়াতে সূর্য্য সমুদ্রের জল স্পর্শ করলেন। যেন অগ্নিবর্ণের একটি কুম্ভ উপুড় হয়ে পড়ল সমুদ্রে। দেখতে দেখতে একটি বৃহৎ ডেকচিতে পরিণত হল, দেখতে দেখতে তার আধখানা ভেসে রইল সমুদ্র-জলে। তার পর সেটুকুও টুকরো টুকরো হয়ে ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য্য, তখনই আকাশের বর্ণ-সমারোহ অন্তর্হিত হল না! অত্যন্ত ধীরে তরল অন্ধকারের যবনিকাখানি প্রসারিত হতে লাগল! এমনি করে পাঁচ সাত মিনিট কাটল। আকাশের রঙটুকু মুছে গেল, কিন্তু তীরভূমিতে তখনই অন্ধকার ঘনাল না।

দ্বারকায় সমুদ্রতীরে অপরিবর্ত্তনীয় এই অস্ত-মহিমা, মন্দিরমধ্যেও তেমনি অপরিবর্ত্তনীয় রণছোড়জীর রাজরাজেশ্বর মূর্তি। মন্দির-দ্বার বন্ধ হলেও তাঁর রূপজ্যোতিতে ভুবনের অন্ধকার গাঢ় হয় না, একটু না একটু আলোর ছটা কোথায় যেন লেগে থাকে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়—আটাশ বছর আগে যে মন নিয়ে দ্বারকা-ধামে এসেছিলাম, সে মন যদি পরিবর্ত্তনের রসে সিক্ত না হতো—তা হলে সূর্য্যাস্তের রঙের সঙ্গে দ্বারকাধামের মহিমাকে মিলিয়ে নিত্যকালের রূপময়কে সমস্ত কালের ঊর্দ্ধে সামান্য ক্ষণের জন্যও প্রত্যক্ষ করতে পারতাম কি?

হিমের ফুল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কাচের ঘরের মাঝে ক্রিশানথিমামস্ ফুল বাস করে শীত ঋতু এড়াতে,
উষ্ণ আবেশ বুকে বন্দিত নয় সুখে যেমন খাঁচায় থাকে ভেড়াতে।
কালো আবরণহীন রাত্রি আলোয় লীন—সন্ধ্যাও অম্বর ছড়ানো,
পায় তারা দেখিতেই আবা-মেঘ ঢাকিতেই—
পেচকের আঁখি ঘুমে জড়ানো।
নিশায় যখন বন স্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ তন্দ্রার সীমানায় নিরত, -
কত্র ফুলের চল চঞ্চল প্রেতকূজন গ্রীষ্ম সাথেই হয় বিরত!
রিক্ত পথের পদচিহ্ন পলায় নিয়ে হাল্কা ডানায় শ্বেত দলেতে,
স্বচ্ছ কাচের ঘরে ক্রিশানথিমামস ফুল স্বপ্ন ফোটায় নীল জলেতে।
দীপ্ত মুখের নেয় মিষ্টতা শুষি সব কন্যা যেথায় ঘুমে অধীরা,
নিশ্বাসে স্নিগ্ধ সে চুম্বন চুয়ে পড়ে হিমেল বিভাত থাকে বধিরা।
চিত্র-বিচিত্রিত রামধনু কুহেলীর—পথ তো তাদের ভরা শোভাতে,
তিক্ত তুষার ভরে বাত্রে যে ঝরে পড়ে পূর্ণ তারাই হয় প্রভাতে।

অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলো অমরেশ। ক'দিনের উঁকি-ঝুঁকির পর সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলো।

: নমস্কার।

: নমস্কার।

: আপনি নাকি ছবি আঁকেন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: আপনার ছবি তো মাসিক-সাপ্তাহিকে প্রায়ই দেখা যায়।

: তা যায়। হেসে আবার বলে অমরেশ : আর না দেখা গেলে অন্নের ত' দেখা মেলে না!

: তাই বটে। হেসে ওঠে সে।

কতক্ষণ আর সিঁড়ির বাঁকে কথা বলা যায়! কৌতূহলী দৃষ্টির অভাব নেই তো! তাই দু'জনেই চলি-চলি করছে। এমন সময় আবার থামতে হলো।

: আমার অনেক দিনের সাধ—আমার ছোট ভাইয়ের একটি ছবি আঁকানোর। আমার ভাই হয়ে বাঁচে না কি না! অবশ্য চেহারা আঁকাবার মতো নয়।···লজ্জায় করুণ হয়ে ওঠে সে।

: তাতে কি হয়েছে! আসবেন আমার ফ্ল্যাটে। দু'দিন সময় দিতে হবে কিন্তু।

: কবে আপনার সময় হবে?

: কালকে আসতে পারেন।

: কোন্ সময়ে?

: বিকালের দিকেই সুবিধে হয়।

: আচ্ছা। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না তো?

: জানি। মণিকা নাম তো? আপনার ভাইয়ের নাম বাবলু। অমরেশ হেসেই উত্তর দেয়।

কে জানে কেন, মণিকা সেই হাসিতেই লজ্জা পায়। হুঁ! তাহলে কাল বিকালে আসবো কিন্তু।

: আচ্ছা। ঠিক তাই।

আর 'ঠিক' না হলে উপায়ই বা কি! আশে-পাশের কৌতূহলী দৃষ্টি বিকাল বেলাকেই সন্ধ্যা ক'রে তুলেছে। এক জন পার্শ্বচারিণী তো এগিয়ে এসে সিঁড়ির আলোটা খট্ করে জ্বেলে দিয়ে গেলেন। ভাবখানা এই—অনেকক্ষণ কথা বলছেন। আমরাও বেঁচে আছি। অতএব তাদের বাঁচিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে যায় অমরেশ।

পরদিন বিকালে একেবারে ক্যানভাস এঁটে বসে অমরেশ। ইজেল কাছে টেনে নেয়। রঙে তুলি ডোবায়। বাইরের আকাশে পড়ন্ত রোদের কাঁচা হলুদ রঙ ফুরিয়ে আসে। জাফরাণ রঙ আকাশে। সন্ধ্যা হতে বেশি দেরী নেই। তবে শার্শির ভাঙা কাচে কাগজের তাপ্পির ওপরে একটা চড়াই বসে এখনো কিচ-মিচ করছে। এমনি সময়ে দরজার কড়াটি খুট্-খুট্ ক'রে নড়ে ওঠে।

: আসুন। দরজা খুলে দাঁড়ায় অমরেশ। খোলাই থাকে দরজাটা। কেবল পর্দাটা ফেলে দেয়। মণিকা তার বিবেচনায় একটু স্বস্তিও পায় যেন।

: এই আপনার ষ্টুডিও বুঝি?

: কেবল ষ্টুডিও-ই নয়। ওই ডান দিকে 'কুকার' আছে। ওটা গোসলখানা। এই বাঁ দিকে টেবিল আছে। চেয়ারটা ছিলো। ভেঙে আছে। এটি আমার 'ষ্টাডি,' আর ওদিকটা···

: থাক্। আর বলতে হবে না। বুঝেছি। মণিকা হাসে।

: বুঝেছেন? বাঁচালেন। মাটি থেকে গামছাটা তুলে নিয়ে মুখ মুছে নেয় অমরেশ।

: ও কি? গামছা যে নোংরা!

: আমার মুখটা কি বেশি পরিষ্কার? আর কুঁজোর জলেই তো বেচারি জবজবে হয়েছে। ওখানেও আতার কাজ করেছে। এখানেও না হয়···।

আর বলতে হবে না।

এবারেও বুঝেছেন?

সত্যি আপনি যেন কি! মণিকাকে হাসলে ভালোই দেখায়। অমরেশের তাই মনে হয়

আপনার ভাই কোথায়? বাবলু?

তার কাল থেকে অসুখ করেছে আবার। মলিন হয়ে ওঠে মণিকা।

তাই নাকি? তাহলে···

আপনার সময় আর নষ্ট করবো না। উঠি কেমন? মণিকা যেন কি উত্তর আশা করে। কিন্তু সে উত্তর আর মেলে না।

অমরেশ কিছু বলে না। ঘরও অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলোটা জ্বেলে দিলো অমরেশ। হঠাৎ খেয়াল হয় চড়াইটা নেই। চলে গেছে কখন। আর যাবেই তো এক সময়। তবে এতো তাড়াতাড়ি যাওয়ার কি দরকার ছিলো?

: তাহলে আজ চলি, কেমন?

: আচ্ছা। জোর করেই বলে ওঠে অমরেশ। না, সংকোচ নয়। ওখানেই থাকে দুর্বলতার বীজ।

দু'জনেই উঠে দাঁড়ায়। সান্নিধ্য একেবারে উপেক্ষা করার নয়। থমথমে ঘরটায় তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসও শোনা যায়। মণিকা দরজার মুখে থেমে পড়ে।

মণিকা বলে ওঠে : আপনি দেখছি কেবল ছবি নিয়েই পাগল!' মানুষকে একটু বসতেও বললেন না তো?

মণিকা তাড়াতাড়ি কথার পিঠে অন্য কথা বলে অমরেশের বলা-কথা চাপা দিয়ে দেয়: আমার ভাইকে দেখতে এসেছেন, তাকে দেখবেন না?

অমরেশ মণিকার অনুসরণে পাশের ঘরে যায়। শতছিন্ন কাঁথায় শুয়ে বাবলু। ঘুমিয়ে পড়েছে। উনুনে ভাত চাপিয়েছিল মণিকা। ফেন উথলে পড়ে আগুনে। পোড়া গন্ধ চতুর্দিকে। মণিকা তাড়াতাড়ি ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢেলে দেয় হাঁড়িতে। তার'পর অমরেশের পাশে এসে বসে।

: বাবলু তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গেই তাহলে কথা বলুন।

অনেকক্ষণ অমরেশ চুপ করে থাকে। শেষে ধীরে ধীরে বলে: বাবলুকেই যে দেখতে এসেছি জানলেন কি করে?

: না তা নয়। তবে কি না··· ওই যাঃ, ভাতটা ফুটে গেছে। ফেনটা গেলে নি। আপনি ততক্ষণ পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলুন।

: তাই যাই। অমরেশ প্রকাশ বাবুর কাছে উঠে যায়। যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো না বোধ হয়। অন্ততঃ তার পথচলায় মণিকা সে কথাই ভাবে।

মণিকা ভাতের হাঁড়ি নিয়ে বসে। ফেন গেলেছে অনেকক্ষণ। একটা তরকারিও চাপিয়েছে। মণিকার মন বড় নিঃঝুম। আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে। কানে তার অমরেশের অনেক কথাই ভেসে আসছিল। তবে কথা-হারা গানের সুরের মতো। কি যেন আছে সুরে, অথচ খুঁজে পাওয়া যায় না তার কথাগুলো।

এক সময় মণিকার মনে হয়, অনেকক্ষণ অমরেশ যেন কথা বলে নি। বাবারও সাড়া নেই তো! উঠে এসে দেখে, অমরেশ চলে গেছে। আর বাবা আফিম খেয়ে ঝিমুচ্ছেন। কিছু না বলেই অমরেশ চলে গেল। না, একেবারে কিছু না বলে যায় নি। ওই যে বলেছে—'বাবলুকেই যে দেখতে এসেছি জানলেন কি করে?' ওই কথা ক'টিই তার মূলধন। শব্দগুলো কেবলই মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করতে থাকে। বাবলুর জ্বর ছাড়লো বোধ হয়। কপালে ঘাম। আঁচল দিয়ে ঘামের দানা মুছিয়ে দিয়ে রান্নার বাকি কাজে লেগে যায় মণিকা। সব করছে ঠিক, তবে মনে কেবল সেই কথা ক'টি—'বাবলুকেই যে দেখতে এসেছি জানলেন কি ক'রে?'

কয়েকটি দিন মণিকার সঙ্গে অমরেশের মাঝে মাঝে দেখা হলেও ভালো ক'রে দুটো কথাই বলতে পারে নি। বন্ধুর বাড়ির কাজ করে ফিরতে একটু সন্ধ্যেই হয়ে যায়। আর এসে দেখে মণিকা নেই। প্রকাশ বাবু, বাবলুর সঙ্গে কথা বলে এক সময়ে তাকে চলে আসতেই হয়। ভদ্রলোকের ঘরে আর কতো রাত অবধি থাকা যায়? দেখাও হয় না। আজ অমরেশ বেরোয় নি। মণিকাকে নিশ্চয়ই ধরবে। ঘরের দরজা খুলে পা পোসের ওপরেই বসে থাকে। কেমন করে কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যায় মণিকা সে একবার দেখবে। এই গ্যাঁট হয়ে বসলো সে। কিন্তু বসলেই তো শুধু হয় না, জেগে থাকাও চাই। সেইখানেই বাধ সাধলো। তবে এই যা রক্ষে, মণিকাই ঘুম ভাঙিয়ে ডাক দেয়।

এখানে বসে বসে ঢুলছেন যে বড়ো?

আপনাকে ধরবো বলে। অমরেশ উঠে দাঁড়ায়।

আমাকে ধরবেন? কেন অপরাধ করেছি না কি?

অনেক অপরাধ করেছেন। শীগ গির ঘরের ভিতরে আসুন।

এতো রাতে···! ওদিকে বাবা-বাবলু একা···

ওঁরা দিব্যি আছেন। আপনি এক বারটি আসুন। কোন কথা শুনবো না।

অগত্যা মণিকাকে ঘরে ঢুকতে হলো। কিন্তু ঢুকেই চক্ষু স্থির। ভাঙা টেবলটায় এক-রাশ নতুন শাড়ি।

: এতো শাড়ি পেলেন কোথায়?

: দোকানে। অমরেশ রাগত ভাবেই বলে।

: তা তো বুঝলুম। কিন্তু কা'র জন্য?

: আপনার জন্য।

: আমার জন্য! মণিকা আকাশ থেকে পড়ে যেন।

: সত্যি অপরাধ করে ফেলেছি। এখন তো আর দোকানদার ফেরৎ নেবে না! কি হবে বলুন তো? অমরেশ মণিকার হাব-ভাব দেখে বেশ মুষড়ে পড়ে।

: তার আমি কি জানি! মণিকা গম্ভীর হয়ে যায়।

: তা জানেন না দেখছি। এদিকে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু চা করে খাওয়াবেন?

: এতো রাতে চা?

: সেখানেও অপরাধ করলাম নাকি! বড্ড তেষ্টা!

: ষ্টোভ কোথায়?

: ওই যে ওখানে। অমরেশ আঙুল নেড়ে দেখিয়ে দেয়।

: চিনি-দুধ!

: ওই কৌটোয় মিল্ক-পাউডার আছে আর চিনি ওই ঠোঙায়।

: ঠোঙায় তো চিনি নেই! মণিকা ষ্টোভটা জ্বেলে জল চাপিয়ে দেয়। ষ্টোভ জ্বলার শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে ঘরে।

: চিনি নেই! অমরেশ হতাশ হয়ে পড়ে। তাহলে থাকগে চা।

: আর থেকে কাজ নেই। আমি ওপর থেকে চা করে একেবারে নিয়ে আসছি। ষ্টোভ নিবিয়ে মণিকা গম্ভীর ভাবেই চলে যায়।

সত্যি অমরেশের অন্যায়। অত্যন্ত অন্যায়। এমনি ভাবে এক জন ভদ্রমহিলাকে শাড়ি 'প্রেজেন্ট' করা। তবে বন্ধুর কাছ থেকে অতোগুলো করকরে নোট পেয়ে গেল। বন্ধু কিছু বেশীই দিলো। কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। বেশীক্ষণ আর এই ভাবে গোলমালে থাকতে হয় না। মণিকা চায়ের কাপ হাতে এসে দাঁড়ায়।

: এই নিন্ চা।

: তা নিচ্ছি। কিন্তু সন্ধ্যায় শুনি ট্যুশানি করতে যান। তায় এতো রাত?

: দুটো ট্যুশানি কি না!

: ওদিকে প্রকাশ বাবু একটা ট্যুশানির কথাই বললেন।

: আপনি যেন বাবাকে বলে দেবেন না। একটা ট্যুশানিতে আর বাবার রোজগারে সব চলে না। বাবলুর আবার ওষুধ-ডাক্তার আছে তো। আমারও শাড়ি নেই। বাবাকে বলবেন না যেন। এতো খাটুনির কথা শুনলে বাবা রাগ করবেন।

: খাটুনির কথা তো ঠিকই। অমরেশ এবার বেশ রাশ টেনে ধরে।

: খাটুনি না ছাই। গানের টিউশানিতে আবার খাটুনি! তবে মেয়েটার একটু যদি সুর-জ্ঞান থাকতো।

: আপনি গানও জানেন নাকি!

: না তেমন নয়। তবে সা-রে-গা-মা অবধি পারি। মণিকা হাসে।

: হাসির কথা এটি তো নয়! গান জানা এবং কাউকে না জানিয়ে নতুন টিউশানি করা। প্রকাশ বাবুকে সব বলে দেবো যদি আপনি শাড়িগুলো না নেন।

আমি আপনার দেওয়া শাড়ি নেবো কেন?

আমি আপনার দেওয়া চা খাবো কেন?

চা তো খেয়ে ফেলেছেন। মণিকা হেসে ওঠে।

এখুনি বমি করে ফেরৎ দিয়ে দেবো। অমরেশ এখনও গম্ভীর।

কিন্তু বাবা কি বলবেন?

বাবাকে বলবেন টিউশানি-ওলারা প্রেজেন্ট করেছে।

এই এক সঙ্গে চারখানা?

হুঁ। সে তো বটেই। এবং দেখাও যাচ্ছে তাই।

শুনে বাবা যদি বলেন, সে বাড়িতে আমারও একটা টিউশানি করে দিবি, সংগে বাবলুরও একটা।

বলবেন, আর ভেকেন্সি নেই। অমরেশ এখনও বেশ গম্ভীর।

মণিকা হাসতে গিয়ে করুণ হয়ে ওঠে। ধরা গলায় বলে: আমি একা নতুন শাড়ি পরবো, আর বাবা-বাবলু···তার চাইতে এক কাজ করুন, আপনার বিলটা দিন আমি পাল্টাপাল্টি ক'রে সব ঠিক-ঠিক নিয়ে আসবো।

: সেখানে কি বলে পরিচয় দেবেন? অমরেশ বিচলিত হয়ে বলে ফেলে।

: বলবো ঠিক কথা। আর পরিচয়ের প্রয়োজন কি? সঙ্গে বিল তো থাকবেই। শাড়িগুলো পাট করে নেয় মণিকা। বিলটি নিতেও ভোলে না। দরজার কাছে অমরেশ এগিয়ে দিতে গিয়ে থেমে পড়ে।

: থামলেন কেন আবার? মণিকা অবাক হয়ে যায়।

: কই বললেন না তো, আপনি দোকানে কি বলবেন?

: বন্ধু। মণিকা হাসে।

: তারা বিশ্বাস করবে না।

: আপনি করেন তো, তা হলেই হলো। মণিকা আর দাঁড়ায় না। অমরেশ কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে। বন্ধু···

ওই 'বন্ধু' কথাটি কেমন যেন গোলমেলে। অনেক অগোছালো ভাব ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে। অতীত দিনের 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' ভাবটি তো আর আজ-কাল পাওয়া যায় না। তাই কথাটিকে একটু পরিষ্কার ক'রে নেওয়া চাই-ই। আর চাই বলেই অমরেশ পার্কের বড় নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকে মণিকাকে ধরবে বলে। এমন কি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু'আনার শোনপাপড়িও খেয়ে ফেলেছে কখন! তবু মণিকা আর টিউশানিতে বেরোয় না।

মণিকা যেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওমনি অমরেশ সঙ্গ নেয়।

: এ কি আপনি যে! মণিকা তো অবাক।

: আপনার জন্তই, অমরেশ অবিচলিত।

আমার জন্য?

হ্যা।

কেন?

আপনাকে টিউশানিতে এগিয়ে দেবো বলে।

আপনাকে আবার এগিয়ে দিতে কে বললো? মণিকা দিশেহারা হয়ে

কেউ নয়। আমার মন বলেছে।

তাই বলুন। চলুন তবে মনের কথা মতো। মণিকা রুমালে হাসি ঢাকা দে

তাই চলুন।

তার পর? মণিকা জিজ্ঞাসা করে

অমরেশ বলি-বলি ক'রেও বলে উঠতে পারে না। নীরবেই সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কই কথা বলুন? মণিকা জিজ্ঞাসা করে।

কথা ফুরিয়ে গেছে।

সে তো ভালো কথা নয়। মণিকা না হেসে গম্ভীর হয়ে যায়

নয়ই তো। অমরেশও বেশ গম্ভীর চালে চলতে থাকে।

তবে···?

কিছু নয়। কেবল আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

বেশ!

মনে করুন এক জন পথচারী আমাকে ··

মনে করলাম।

তার পরে···

: তার পরের কথা আর এখন শোনা হয় কোথায়? পথচারীকে থামতে হয়। ওই সামনের বাড়িতেই আমার টিউশানি।

: এতো কাছাকাছি বাড়িতে টিউশানি নেওয়া উচিত হয় নি।

: ভুল করেছি। আর কখনো এমন ভুল হবে না। এখন চলি, কেমন?

: আসুন তবে। অমরেশ পথের মোড়েই থেমে পড়ে।

থেমে পড়তে চাইলেই কি সব ব্যাপারে থামা যায়? সে-কথা অমরেশ খুব বোঝে। তাই থামেও নি। মণিকা টিউশানি থেকে বেরোলেই আবার সঙ্গ নেয়।

এ কি, আপনি এখনও আছেন! মণিকার বিস্ফারিত দৃষ্টি।

আছি বৈ কি। অমরেশের অবিচলিত উত্তর।

ছিলেন কোথায়?

চায়ের দোকানে।

করছিলেন কি?

চা খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম।

কি ভাবছিলেন?

আপনাকে।

আমাকে! কেন বলুন তো? মণিকা উত্তরের আশায় এবারেও উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

এবারেও কিছু বলা হয়ে ওঠে না। অমরেশ তাই টপ ক'রে

লে ওঠে: আপনাকে পড়ার টিউশানি থেকে গানের টিউশানিতে পৌঁছে দেবো বলে।

: তার পর?

: তার পর আপনার আর আপনার ছাত্রীর কণ্ঠসঙ্গীত শুনবো।

: সঙ্গে হারমনিয়াম-সঙ্গীতও শুনবেন না?—বাসায় যান শিগগির।

: আপনাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যাবো।

: ঠিক তো?

: কথা দিচ্ছি। অমরেশ বুকে হাত দিয়েই বলে ওঠে কথাটা। জনে নীরবে পথ চলে। পথটা না ফুরোলেই ভালো ছিলো। কিন্তু সব ইচ্ছাই কি আর পূর্ণ হয়? অমরেশ খুব বোঝে সে-কথা।

: আমি তাহলে যাচ্ছি। মণিকা বলে।

: আমিও যাই।

: এখন ভালোয় ভালোয় আসুন দিকি। সত্যি আপনি যেন ই রকম লোক!

: আর এমন হবে না! অমরেশ পিছন ফিরে চলতে থাকে। চলাকে এক রকম ছোটাই বলে।

মণিকা ভাবে, হয়তো ভালো করলুম না। তবে নতুন টিউশানি অতএব আর কোন যুক্তিই টেকে না।

তাড়াতাড়ি ক'রে চলে আসবে ভেবেছিলো মণিকা। কিন্তু ঠি-উঠি ক'রেও উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। বাড়ির গুরুজনদের রমাসি দু-একটা গানও শোনাতে হয়। নিতান্তই যখন পথে নামে, খন বেশ রাত হয়েছে। একলাই তো চিরকাল সে টিউশানি ক'রে সেছে। একলাই বাড়িতে ফিরেছে। কিন্তু আজকে অমরেশের বিড় সান্নিধ্য কি-যেন রেখে গেছে চার পাশে। যদিও সে এক কম তাড়িয়েই দিয়েছে অমরেশকে, তবু যদি অমরেশ অবাধ্য হয়ে র জন্ত অপেক্ষা করতো! কিন্তু যা হয় নি, যা হতে পারে না, তা য়ে কোন দিনই মণিকার দুঃখ ছিলো না। আজ তার কি হলো কে নে! এতো দিন তার মনে হতো, তারা বড়ই কষ্টে আছে, কিন্তু খে নেই। আজ যেন সব একাকার হয়ে গেছে। এক সময় জেই সে হেসে ফেলে। বা রে, বেশ মজা তো, আমি এমন ক'রে বছি কেন? আমার সঙ্গে কি আর অমরেশের দেখা হবে না! খন কি আর ক্ষমা চেয়ে নিতে পারবো না আমার রূঢ় ব্যবহারের ন্ত? নিশ্চয়ই পাবে নি মণিকা।

আর হাসিও মিলিয়ে গেল। তার মধ্যে এক অব্যক্ত বেদনা ছলিয়ে ওঠে। অমরেশের দেখা পাবে মনে করেই তার ঘরের জায় মৃদু চাপ দেয়। দরজাও খুলে যায়। কিন্তু ঘর অন্ধকার! দেয়ালে হাত চালিয়ে সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে যায় ঘর। কিন্তু র সঙ্গে তার দৃষ্টিপথ অন্ধকার হয়ে ওঠে। সারা ঘরে ছড়ানো নিসপত্র থৈ-থৈ করছে। একটা প্রায়-সমাপ্ত ছবি ছেঁড়াখোঁড়া ছোড়া। অমরেশের চশমাটা মাটিতে লুটোচ্ছে। কাচ দুটো ঙা। ভাঙা চেয়ারটাতেই এক সময় বসে পড়ে মণিকা। চারি দিক স্তব্ধ। কেবল পার্কের কোণের নিম গাছের ঝিলমিলে পাতাগুলো দের গান ছড়িয়ে দেয়। আর ঘরের কোণে কুলঙ্গির ওপরে রী দামওলা ঘড়িটা সমানে টিক্-টিক্-টিক্ ক'রে এগিয়ে চলেছে।

এই ভাবে যে কতক্ষণ মণিকা বসে ছিলো সে-কথা মণিকাই ভালো ক'রে বলতে পারবে না। এক সময় দৃষ্টি পড়ে ঘড়িটার দিকে। দশটা। টিক্-টিক-টিক-টিক। আর কোন কথা নয়। রাত হয়ে গেল অনেক। এবার তো যেতেই হয়। কিন্তু নিদেন একটা তালাচাবি দিয়ে যেতে হয়। সারা ঘর খুঁজেও যখন তালাচাবির হদিশ মিললো না, তখন মণিকা স্থির করে, তাদেরই একটা তালা এনে ঘর বন্ধ ক'রে যাবে। তার পর যা হবার হবে। এই ভেবে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। কিন্তু নিজেদের ঘরের দরজা ঠেলতে গিয়েই চক্ষুস্থির। সামনে অমরেশ। চশমাহীন। ছেঁড়া গেঞ্জী গায়। পরনে লুংগি। খালি গা। মণিকা এই বেশ দেখে কেন জানে না একটু কেঁপে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশ বলে: এতো রাত অবধি আপনার টিউশানি করতে হয় না কি? টিউশানিতে অন্য কিছু আছে বুঝি! বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠস্বর।

: তার জবাব নেবার মালিক আপনি নাকি! আশা করি মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে ভুলে যান নি।

: না ভুলি নি। কেবল ভুল করেছিলাম আপনাকে। অমরেশ হাসে বটে, তবে সে হাসি তার নয়। যেন কোন শিল্পী ক্ষোভ ক'রে হাসি ফোটাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো।

: এখন তাহলে ভুল শুধরে নিজের কাজে যান। আমার পথ ছাড়ুন।

: এই পথ ছেড়ে দিলাম। ভুল ঠিকানায় খবর নিতে এসেছিলাম। এবারেও অমরেশ হাসার চেষ্টা করে।

: এবার থেকে সাবধানে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছবেন।

: ইচ্ছা আছে তাই।

: শুভবুদ্ধি।

: ব্যঙ্গ করছেন! হঠকারিতা আমার জীবনে সম্বল বলে?

: সে খবরে আমার প্রয়োজন নেই। মণিকা জোর দিয়েই কথাগুলো বলে।

এর পর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হঠকারিতার বশবর্তী হয়েও নয়। তাই অমরেশ পথ ছেড়ে দিয়ে নেমে এলো। আর মণিকা দরজা ভেজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাষ্পাকুল চোখ দুটো আর একটু হলেই বাবার কাছে ধরা পড়ছিলো আর কি! মণিকা নিজের বেদনার সঙ্গে বাবলুর যন্ত্রণা মিলিয়ে সব দিক রক্ষে করে নেয়।

এর পর আর দেখা-শোনা না হওয়াই ভালো। অমরেশ ভাবে, মণিকাও ভাবে অদ্ভুত লোক-তো! কথা নেই, বার্তা নেই একেবারে চরিত্র নিয়ে টানাটানি? এমন মানুষের সঙ্গে যে বেশী দিন মিশতে হয় নি, তাই ভাগ্য। কিন্তু একটু ওরই মধ্যে কেমন যেন একটা ভাব থেকে যায়! যা হয়তো অনুভব করা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। আর কা'কেই বা মণিকা সে-কথা বোঝাবে? তার মা-ও তো নেই। থাকার মধ্যে বাবা আছেন। তবে তাঁর সংগে আছেন আফিম। আর বাবলুর কাছে তো সবাই ভালো। অতএব কোন পথ নেই।

তবু ওপর থেকে কারণে অকারণে নিচে নামার সময় মণিকা এক চিলতে দৃষ্টি মেলে দেয় অমরেশের ঘরের দিকে। কিন্তু দেখলে কি

হবে, সেখানে সব সময় তালা ঝুলছে। ওই তালাটার দিকে তাকিয়েই কতো জিজ্ঞাসা ঘুরে যায় মণিকার মনে। তবে কি অমরেশ বাসা ছাড়লো? লোকটা থাকে কোথায়? খায়ই বা কি? হয়তো নতুন কোন ঠিকানার সন্ধান মিলেছে। মণিকার হাসি পায়। কিন্তু ওই জিজ্ঞাসাগুলো ভারি আলতো গোছের। সহজে আর মন ছাড়তে চায় না। তা না ছাড়ুক। মণিকার অনেক কাজ। টিউশানি করা। রান্না-বান্না চারটি করতে তো হয়ই, উপরি আছে বাবলুর সেবা। ওই নিয়েই থাকবে সে। কিন্তু থাকতে পারে কই?

যদিও বা এক সময় অমরেশের দেখা মিললো, তবে সে-দেখা না হওয়াই ছিলো ভালো। সবে টিউশানির মাইনে পেয়ে এটা ওটা কেনার জন্য মণিকা একটু ইচ্ছে করেই দূরে এসেছিলো। মানে ধর্মতলায়। অপরাধের মধ্যে কিছুই নয়। নিতান্তই একটা খালি ট্রাম দেখে উঠতে ইচ্ছে হলো। বেশ খানিক বেড়ানো তো হবে, সঙ্গে বাবলুর আবদারের দুটো-একটা যোগান দেওয়াও যেতে পারে। ক'দিন ধরে সে-ও বায়না ধরেছে ছবি আঁকবে। তার জন্যই রঙ কিনতে দোকানে ঢুকেছিলো মণিকা। আর পাশেই কি না অমরেশ!

অতএব একটু হাসতেও হলো, আমতা-আমতা করে যে দুটো-একটা কথাও হয়নি তাও নয়। কিন্তু পথে নেমেই সর্বনাশ ঘনিয়ে এলো। সেই পুরনো কথাটাই তোলে অমরেশ।

: এদিকে কি কেবল রঙ কিনতেই এসেছিলেন?

: না অভিসারের ধান্দায়ও ছিলাম। যাবেন আমার সঙ্গে?

: আমায় সঙ্গে নিতে আপনার আপত্তি নেই? অমরেশ জিজ্ঞাসা করে।

: থাকতো, যদি না আমার সম্বন্ধে আপনার মধ্যে সন্দেহটা বেশ মোটা-সোটা গোছের হতো। মণিকা হাসে।

: আমি বুঝি কেবল খামকা সন্দেহ করি?

: উঁহু, সে কথা স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বলতে পারবেন না। এখন এখানে ঠায় পথ আটকে দাঁড়াবেন, না বাসায় ফিরবেন বলুন তো?

: ও-বাসায় আর আমি ফিরবো না।

: ও-বাসাটাও জলাঞ্জলি? যাক্, গিয়েও কাজ নেই। তা চশমাটা ভাঙলেন কেন?

: আমার ইচ্ছে।

: সে-ও জলাঞ্জলি যাক। নিদেন কি একটু আপনার এখন চা খেতেও ইচ্ছে করছে না? তাহলেও তো একটা চায়ের দোকানে আশ্রয় পাই।

: চা খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

: ওরে বাপ্‌রে বাপ! শেষে আমার সঙ্গে চা খাওয়াও ছাড়লেন? না, আপনি যথার্থ ধার্ম্মিক লোক বটে! পাঁচ জনের চরিত্র সম্বন্ধে আপনারই সন্দেহ করার অধিকার আছে। মণিকা আর গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে পারে না। হেসেই ফেলে।

: ও কথা আমায় বলবেন না। আপনার চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত করি নি। নিতান্তই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথার কথা ভেবে।

: সেই কথার কথা তো এখনো মনে বেশ পুরু শাঁস রেখে গেছে দেখছি। না, আপনি আর এই পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিড় করবেন না। 'প্লিস।'

: বেশ তো, আমি চলেই যাচ্ছি।

: তাহলে আমাকেও একটু সঙ্গে নিয়ে চলুন দিকি!

কথায় কথায় জনবিরল চৌরঙ্গির পথটাই তারা ধরেছিলো। এখন সামনের নির্জন মাঠটাতেই আশ্রয় নিতে হয়। অমরেশ একটু আলো-আঁধারেই বসতে চেয়েছিলো। কিন্তু মণিকা সে ইচ্ছায় বাদ সাধলো। একেবারে এক ল্যাম্পপোষ্টের তলার বেঞ্চি জুড়ে ঝপ্ ক'রে বসে পড়ে।

: কই একটা-আধটা কথা বলুন?

: আমি কথা বলতে জানি না। এই কথাগুলোও জড়িয়ে ফেলে অমরেশ।

: আমি কিন্তু কথা বলাতে জানি।

: এর আগে অনেককে কথা বলিয়েছিলেন বুঝি?

: হুঁ! সবাইকে। এই ধরুন কলকাতায় অন্তত আশী লক্ষ লোকের বাস। তার অর্দ্ধেক যদি পুরুষ হয় তাহলে প্রায় তাদের সকলের সঙ্গেই আমার ভীষণ ভাব। মণিকা হাসে।

: আপনার সব সময়েই ঠাট্টা।

: সেই তো আমার মস্ত দোষ। আপনার মতো যদি একটু গুরুগম্ভীর হতে পারতাম!

: তাহলে আমার কথাই ছিলো না। অমরেশ বলে।

: কেন?

: আপনি যা কথা বলেন, তাতে সকলেরই আপনাকে ভালোবাসা উচিত।

: ভালোবাসেও তো।

: তাহলে আর আমার প্রয়োজন কি? অমরেশের কঠিন কণ্ঠস্বর।

: সন্দেহ করার জন্য। মণিকা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার পর শুরু করে: প্রথম দিন আপনার ওপর ভারি রাগ হয়েছিলো। জিজ্ঞাসা করলেন এমন ভাবে যে সরল উত্তরটা আর মুখে জোগালো না।

: আমার সরল উত্তরে কাজ নেই। অমরেশ উঠে পড়ে। এবং হন্‌হন্ করেই চলে যায়।

মণিকা একলাই বসে থাকে, এক সময় ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে বাসায় ফেরে।

বেশ আশ্চর্য হয়ে যায় মণিকা রাত দুপুরে তাদের দরজার কড়া নড়তে। প্রকাশ বাবু শশব্যস্ত হয়ে ঘুম হতে উঠে আসেন সঙ্গে সঙ্গে। দরজা খুলেই তারা দু'জনেই অবাক হয়ে যায়। অমরেশ!

: দেখতে এলুম আপনি ঠিক বাসায় ফিরতে পেরেছেন কি না! আমার পৌঁছে দেওয়া অন্তত কর্তব্য ছিলো।

প্রকাশ বাবু হতভম্ব। মণিকাই কোন মতে হাসি চেপে বলে ওঠে: অনেক কর্তব্য করেছেন। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন নিজের ঘরে গিয়ে একটু দয়া ক'রে ঘুমানোর কর্তব্যটা সারুন দিকি!

: কিন্তু খিদে নিয়ে তো আমি ঘুমুতে পারি না?

: না পারলে উপায় নেই। লোকে বলবে কি! যা হয় নিজে ষ্টোভে কিছু করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন গে।

: তাহলে চলি !

: হ্যাঁ, এখন মানে মানে আসুন। মণিকার অস্ফুট কণ্ঠস্বর। এই ভাবে অমরেশকে ফেরাতে হলো। ক্ষিধে পেয়েছে মানুষটার। দুটি খেতে দিতেও পারলো না! কিন্তু···আশ-পাশের বন্ধ দরজাগুলো দেখে যেন মনে হতে থাকে এক একটি নিস্তব্ধ মানুষ। ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কীর্তিকলাপ দেখছে! ওরা বলবে কি! দরজা ভেজিয়ে দেয় মণিকা। এবার আবার বাবার কাছে জবাব দেওয়ার পালা। এবং ভদ্রলোককে কিছু দিতে না পারায় বাকী রাতটুকু আক্ষেপ শুনতে হবে। তার আর উপায় কি! অবশ্য এমনিতেই কি আর ঘুম আসতো মণিকার ?

পরদিন মণিকার আর তর সয় না। সকালেই এক সময় পাঁচ জনের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে অমরেশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ বটে, একটু ঠেলা দিতেই খুলে যায়। দরজা বন্ধ করে শুতেও ভুলেছে অমরেশ। শুধু তাই নয়, ঘুমিয়ে কাদা। ষ্টোভে একটা আলু সেদ্ধ-মতো চাপানো হয়েছিলো তা আর নামানো হয় নি। অথবা ষ্টোভই জ্বালানো হয়নি। তার মধ্যেই ঘুম নেমে এসেছে ওই বড় বড় চোখ দুটোয়। ধন্যি লোক বটে! মণিকার ইচ্ছা যায় সুর করে বলে ওঠে—'এমন লোকটি কোথাও তুমি পাবে নাকো খুঁজে···' কিন্তু ইচ্ছার সমাধি দিয়ে চুপি চুপি পালানোরই স্থির করে। কেবল যাওয়ার সময় দেখে যায় জানালা দিয়ে ঝট্‌ঝটে এক ঝলক রোদ ঘরটায় লুটোপুটি দিচ্ছে। কি সুখী ওই রোদ!

এর পরেই অমরেশ কখন যে উধাও হয়েছে মণিকা ধরতেই পারে নি। যখন ধরলো তখন টিউশানি যাওয়ার সময়। মানে সন্ধ্যা। একেবারেই অনুযোগ তোলে: আপনি বেশ লোক তো!

: কেন ?

: কেন মানে, কাল রাতে অসময়ে খেতে চাইলেন। সকালে এক ফাঁকে আবার কোথায় চলে গেলেন। বাবা আপিস যাওয়ার সময় বলে গেল যেন দুপুরে বেশ করে খাইয়ে দি।

: তা'তে আপনার কি ক্ষতি হলো ?

: আমার ক্ষতি! মণিকার হাসি পায়। আমার ক্ষতির মধ্যে সারা দিন খাওয়া হয়নি আপনার জন্য।

: আমার জন্য! সত্যি বলছেন ? অমরেশ এক রকম দাঁড়িয়েই ওঠে।

: আপনি কেবল আমায় মিথ্যে বলতেই শোনেন বুঝি ?

: না।

: তবে ? মণিকা জিজ্ঞাসা করে।

: আপনি যে কিছুই বলেন নি আজও ?

: কিছু বলি নি বলে কি কিছুই বলা হয় নি ?

: হ্যাঁ, এবারে বলা হয়ে গেল অনেক।

: সত্যি !

: হুঁ।

: আর সন্দেহ নেই। মণিকা জিজ্ঞাসা করে।

: কেবল একটু আছে। সেটিও যাবে-যাবে করছে। অমরেশ এগিয়ে আসে।

: আরে আলো জ্বালুন। মণিকার কথাগুলো ফিসফিসানির মধ্যেই থেমে যায়।

: সন্ধ্যে হলেই রোজ আলো জ্বলে। আজ অন্ধকারই ভালো।

: কিন্তু টিউশানি! অনুযোগ তোলে মণিকা। বাস্তববাদী মেয়ে সে।

: কাল একটা ছোট্ট মিথ্যে বলবে। বলবে অসুখ করেছিলো।

: মিথ্যা কথা বলতে আপনি শেখাচ্ছেন কিন্তু। আর একে কি অসুখ বলে ?

: সমাজের চোখে তাই।

: আর তোমার চোখে ?

: বলতে নেই।

তবু একবার মণিকা জানালা দিয়ে আঁধার আকাশকে মনে মনে বলে, কাউকে বলে দিও না কিন্তু!

আকাশ তো কাউকেই কিছু বলে না!

মা সি ক ব সু ম তী র

—আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি—

শাদায় আর কালোয় যতখানি করা সম্ভব তা করেছে এ যাবৎ কাল মাসিক বসুমতী। প্রতি মাসে আট পাতা ভর্ত্তি সেরা সেরা ফটো, ছোট বড় নানা সাইজের, কথাটি না কয়ে ছেপে গেছে। কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন শেষ হয়ে যায়ই। আবার সেই প্রায়-শূন্য কলসী ভরে নিতে হয়। তাই কয়েক মাস ধ'রে ডাক পড়েছে আবার নতুন ছবির জন্য। ভাল ভাল ছবিগুলি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার আপনাদের ছবি আবার নতুন ছবি পাঠাবার দিন সমাগত। বিষয়-বস্তু নির্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হোন। ছবি যেন একঘেয়ে না হয়। আলোর কম-বেশী; প্রিন্টের গোলমাল না থাকে। ছবির সাইজ বড় হয়। আগে নিজে ছবিগুলিকে নিজেই বাছাই করুন। পরে সেই বাছাই-করা সব চেয়ে সেরা সেরা ছবিগুলি মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠিয়ে দিন। কদাচ যেন ছবির পেছনে ছবির বিষয়-বস্তু এবং ফটোগ্রাফারের নাম-ধাম দিতে ভুলবেন না। এমন ছবি পাঠান, যা দেখে পাঠক-পাঠিকার চোখ জুড়োয়, আপনারও ছবিতোলা সার্থক মনে হয়; মাসিক বসুমতীর ঐতিহ্যও

ছবির জন্য আবার ডাক পড়েছে, স্মরণ রাখুন!

জবাব

বাসব ঠাকুর

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে
পাথর-কাটা শিখতে গিয়েছিলেম
বছর পাঁচেক পরে
মনটা কেঁদে উঠলো দেশে ফিরে আসার তরে
ইওরোপে তখন তীব্র বেগে
যুদ্ধ গেছে লেগে
বিমান হতে পড়ছে বোমা কাঁপছে বসুন্ধরা,
সাগরগুলো সাবমেরিণে ভরা।
কিন্তু দেশের টানে
ভয় ছিল না প্রাণে
তাইতো শেষে কাবগো-শিপে উঠে
বাংলা-মায়ের শ্যামল বুকে এসেছিলেম ছুটে।
বম্বে থেকে রেলে এসে, জোড়াসাঁকোয় গেলে
খাতা-পত্র মেলে
বুঝিয়ে দিলেন ভায়া
ছাড়তে হবে এবার আমায় ভিটে-মাটির মায়া
পুরোনো এক সুদ না দেওয়া দাবে
জায়গা-জমি সব হয়েছে নিলেম।
তাইতো শেষে জমি এবং বাড়ি
মাড়োয়ারী পাওনাদারের হাতেই দিলেম ছাড়ি।
তবু অনেক বড়লোকেই অনেক টাকা দিয়ে
মেয়ের সাথে চেয়েছিলেন দিতে আমার বিয়ে।
কিন্তু তখন মানব জাতির কল্যাণেতেই খালি
ভেবেছিলেম জীবন দেব ঢালি।
সাহেব হয়ে উঠিনি একেবারে
সঙ্গে নিয়ে আসিওনি মেম
যেমন সবাই আনে।
আশা তখন ছিল অনেক প্রাণে
ভেবেছিলেম করবো এমন কিছু
দেউলে হলেও বলবে লোকে হইনি আমি নিচু।
ঘটকরা তাই ফিরে গেছে এসে আমার দ্বারে।
অনেক মেয়ের সাথেই তবু চালাই আমি প্রেম
একলা থাকার ফলে
এই কথাটিই সবাই নাকি বলে।
বছরগুলো ব্যর্থ কাজে মিলিয়ে গেল কত
কিছুই করা হয়নি মনের মত।
যুগ-স্থায়ী মূর্ত্তি গড়ে হয়নি পাথর-কাটা
এখন শুধু ডি, মে, কিমার, বাটা এবং টাটা
ডেকে আমায় পাঠায় মাঝে মাঝে
সময় কেটে যাচ্ছে তাদের মডেল করার কাজে।
কিংবা কোন প্রেক্ষাগৃহের ডেকোরেশন করে
দিনগুলো যায় ভরে।

একলা এখন থাকি সোনারপুরে
শহর থেকে অনেকখানি দূরে।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা ভূতের বাড়ি
বিলাসিতার সঙ্গে আমার আড়ি
সবাই বলে "দেখছো কি ও বিলেত ফেরৎ আরে
কিন্তু থাকে অম্নি করে, তোয়াটে পিটি সেম্।"
অর্থাভাবে অন্নাভাবে দুঃখে ভরা দেশ
তবুও আশা এ দুর্দ্দশার শীঘ্র হবে শেষ
ভাষা দিয়ে, শিল্প দিয়ে যতটুকুন পারি
চেষ্টা আমার চলবে এখন তারি।
চাই না ভেসে চলতে কেবল বংশ নামের ভারে
বংশে আমার থাকে থাকুক বিশ্বব্যাপী ফেম।
দেশ-বিদেশে যাচ্ছে কত লোক
পাবলিসিটি হচ্ছে যাদের ঝোঁক।
পাচ্ছে যারা সরকারী ও বে-সরকারী টাকা
জানি তারা ধূর্ত্ত এবং পাকা।
তাদের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আমার নাই
কাজের ভিতর জীবনটা আজ ডুবিয়ে দিতেই চাই।
অনেক আগেই গিয়ে সাগর পারে
অনেক কিছুই করে এসেছিলেম।
হিতৈষী বন্ধুরা তাই বলছে বারে বারে
আবার চলে যেতে সাগর পারে।
বলছে তারা, "এক কোণাতে মিছেই পড়ে থাকো
এখানে কেউ খাঁটি লোকের কদর বোঝে না কো।"
কিন্তু এখন স্বদেশ ছেড়ে কেমন করে যাই!
মিছামিছি বিদেশ গিয়ে কিই-বা হবে ছাই।
অনেক লোকেই দু'চোখ বুঁজে ঘুরছে মোটরকারে
কিন্তু যারা নগ্ন দেহ, ভগ্ন, অনাহারে
ডাষ্টবিনে খাবার নিয়ে করছে কাড়াকাড়ি
পরতে যারা পায়নি কভু ধুতি কিংবা সাড়ি।
হাতের কাছে পয়সা কিছু পেলে
তাদের সেবার তরেই আমি সবটা দিতেম ঢেলে।
অন্য দেশের রাজা, রাণী, বড় লোকের পাশে
ধন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ যদি আসে
এই আশাতেই কিংবা আরো এম্নি কোনো কাজে
দেশের টাকায় এখন কি আর বিদেশ যাওয়া সাজে?
অন্ধকারের মধ্যে আজো দেশটা আছে পড়ে
তার মাঝে এক নতুন সমাজ তুলতে হবে গড়ে।
আপনি ফুটে ওঠবে যেথায় নবযুগের নীতি
নিবিড় হবে হিন্দু এবং মুসলমানের প্রীতি
বাজবে তখন আশার বাঁশী দুঃখ-বিহীন সুরে।
কি হবে আজ বিলেত এবং আমেরিকায় ঘুরে।

চীনা কুকুরের মাহাত্ম্য

প্রাচীন কালে অসভ্য জাতিদের মধ্যে কুকুর-দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। কুকুরকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। কিন্তু সুসভ্য চীনাজাতিও যে কুকুর-পূজা করত তা কয় জন জানে? চীনা সম্রাটগণ আদর করে এক শ্রেণীর কুকুর পুষতেন এবং তাদের সম্মান ছিল সকলের উপরে। এদের নাম পিকিং কুকুর।

পিকিং কুকুরের জনপ্রিয়তা খুব বেশী না হলেও নেহাৎ কমও নয়। এই শ্রেণীর কুকুর আকারে খুব ছোট হলেও বহু লোক এই কুকুর পছন্দ করে থাকেন। অনেকের অভিমত এই যে, এই চীনা কুকুর অতি প্রাচীন কালের, হাজার হাজার বছর আগেও এই কুকুর চীন দেশের লোকেরা আদর করে পুষতো। কিন্তু কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, সালুকি জাতের কুকুর আরও প্রাচীন। মিশরে পাপিরসের উপর অঙ্কিত চিত্রসমূহের মধ্যে এই সালুকি জাতের কুকুরের মত এক প্রকার প্রাচীন প্রাণীর চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এ হল পণ্ডিতদের তর্কের বিষয়। পিকিং কুকুররা ছিল অত্যন্ত আদুরে। অন্ততঃ পক্ষে চার হাজার বছর ধরে তারা চীনা সম্রাটদের বিছানায় শুয়েছে, খাদ্যের ভাগ পেয়েছে এবং তাঁদের আমোদ-আহ্লাদে অংশ গ্রহণ করেছে। সকল প্রকার উৎসবে তারা উপস্থিত থাকত এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত এবং এ ব্যাপারে তাদের স্থান ছিল সম্রাটপত্নীদেরও অগ্রে। এমন কি, তাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মত মর্য্যাদা এবং বেতন পর্য্যন্ত দেওয়া হত।

ধর্ম্মবিশ্বাসই কুকুরদের এইরূপ সম্মান দেওয়ার কারণ ছিল। পশ্চিমে ভারত থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারা চীনা সম্রাটদের পরিবারভুক্ত ছিল। বুদ্ধের সিংহাসনের রক্ষক ছিল সিংহপ্রতীক। বৌদ্ধদের বিশ্বাস ছিল, সিংহের গর্জ্জনে পাপ কাছে ঘেঁসতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মে অনুপ্রাণিত চীনারা তখন এই সিংহ ও পিকিং কুকুরের মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান করতে চেষ্টা করল এবং লক্ষ্য করলো একমাত্র আকারে ছোট হওয়া ছাড়া আর সব বিষয়ে পিকিং কুকুর ও সিংহের আকৃতির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য বর্তমান। ভাল রকম প্রজনন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পিকিং কুকুরের আকৃতি ও স্বভাব ঠিক ক্ষুদ্রাকৃতি সিংহের মত হয়ে দাঁড়াল। ফলে তারাই চীনা সম্রাটদের সিংহাসনের রক্ষকের স্থান গ্রহণ করলো এবং শেষ পর্য্যন্ত গৃহদেবতায় পরিণত হল।

চীনা সম্রাটের নিযুক্ত খোজাদের উপর এই সিংহাকৃতি পিকিং কুকুর প্রজননের ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হয়েছিল এবং যাদের প্রজনন ফল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়েছিল, তারা বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল। এই কুকুরদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যে, তারা রাজকীয় উৎসবের সময় সম্রাটের অগ্রে গমন করে তাঁর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণার জন্য চীৎকার করতে থাকত। পেছনে সকলে তার অনুসরণ করতো। এই সিংহ মার্কা কুকুরদের কদাচিৎ প্রাসাদের বাইরে দেখা যেত। সম্রাট ছাড়া অন্য কারো তাদের প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাবার হুকুম ছিল না। এই কুকুর অপহরণের চেষ্টা যারা করতো সম্রাট তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্য্যাতন করতেন।

চীনা সম্রাটদের আমলে হাঙ্গরের পাল্কা, পাখীর মেটে, পাখীর মাংস প্রভৃতি তাদের খাদ্য ছিল। রাজপুত্রদের মত তাদের লালন-পালন করা হত। অতি শৈশবে তাদের মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে এনে সম্রাটের উপপত্নীদের মাই-দুধ খাওয়ানো হতো। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাবে পালিত হবার ফলে তারা খানিকটা মানুষের প্রবৃত্তি অর্জ্জন করেছিল। বিশেষজ্ঞরা যাই বলুন, অন্য কোন জাতের কুকুরের মধ্যে এদের মত মানবীয় প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

পিকিং জাতীয় কুকুরদের শিক্ষিত করা খুব সহজ। অনায়াসেই তারা সব বুঝতে পারে। বহু শতাব্দী সভ্য মানুষের সংস্পর্শে থেকে থেকে তারা এই ক্ষমতা অর্জ্জন করেছে। অনেক দেশের, বিশেষতঃ প্রতীচ্যের মানুষ যখন অসভ্য জীবন যাপন করত তখন থেকেই এই কুকুর সভ্যতার আলোকের স্পর্শলাভ করেছে। পিকিং কুকুরের সিংহের মত আকৃতি হওয়া সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা হল এইরূপ:

একটা সিংহ এক বার একটা বানরীর প্রেমে পড়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে আবেদন করলে, আমাদের মিলনের ব্যবস্থা করে দাও ঠাকুর! বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হয়ে সিংহটিকে তার ইচ্ছানুযায়ী আকার ছোট করবার ক্ষমতা প্রদান করলেন। ফলে পিকিং শ্রেণীর কুকুরের সৃষ্টি হল। অনেকে বলেন, সিংহ ও মর্কটের অসম মিলনের ফলেই এই শ্রেণীর জীব সৃষ্টি হয়েছে।

ইংলণ্ডে প্রথম এই কুকুর আমদানী হয় ১৮৬০ সালে। ঐ সময় ফ্রান্স ও বৃটেন পিকিং অবরোধ করে এবং রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠনের সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে এই কুকুরও পায়। পাঁচটি কুকুর তখন প্রাসাদে আত্মহত্যার ফলে মৃত এক রাজকুমারীর দেহ পাহারা দিচ্ছিল। এদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর একটি সাদা বাচ্ছা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়। এই ভাবে চীনা রাজপ্রাসাদের এক অধিবাসী বৃটিশ রাজপ্রাসাদের অধিবাসীতে পরিণত হয়। এই কুকুরটা বার বছর বেঁচেছিল। কুকুরটার নাম ছিল লুটি এবং তার ওজন ছিল ছ' পাউণ্ডেরও কম। সাধারণতঃ এই সব কুকুর ওজনে পাঁচ পাউণ্ড থেকে ষোল পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। এই কুকুরের দামও খুব বেশী।

১৮৯৪ সালে সর্ব্বপ্রথম বৃটেনের চেষ্টাতে এই কুকুর সাধারণ ভাবে প্রদর্শিত হয় এবং তার পর থেকে দ্রুত এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯৮ সালে কেনেল ক্লাব কর্ত্তৃক এগুলি প্রথম শ্রেণীর কুকুর বলে স্বীকৃত হয় এবং তার পর সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় এই কুকুরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

থ্যাঁদা নাক, চ্যাপটা মুখ, গোল-গোল কালো চোখ, চৌকো মাথা, বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টি, ক্ষুদ্র আকৃতি ও সিংহের মত গড়ন—এরাই হ'ল পিকিং কুকুর।

জয়দেব রায়। জন্ম—১৩৩৪, ১১ই আষাঢ়। এম-এ, বি-কম।
গ্রন্থ—রবীন্দ্র-গীতি, বাংলা-সাহিত্যের গ্রন্থ-সঙ্গীত-পরিক্রমা
-সম্পাদক—বাঙলা (মাসিক)।

জয়ন্তী দেবী। জন্ম—১২৮১, আশ্বিন। মৃত্যু—১৯৪৭, ১৪ই
ব্রুয়ারি। গ্রন্থ—মহামিলন, জীবন-মুক্তি।

জহরলাল বসু—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৮৮৭ হুগলী জেলায়
কালী গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪৩। গ্রন্থ—বাংলা গদ্য সাহিত্যের
তিহাস।

জানকীনাথ ঘটক। জন্ম—মৈমনসিংহের টাঙ্গাইলে। কর্ম—
াইনজীবী, মৈমনসিংহ। সম্পাদক—ভারতমিহির (সাপ্তাহিক,
৮৭২), চারুমিহির (ঐ, ১৮৯৪)।

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১২৭০। মৃত্যু—১৩৪৪,
ই নভেম্বর উত্তরপাড়ায়। গ্রন্থ—ভীষ্ম মহাদর্শন, মৃত্যুপদ,
া-বান্ধব, গায়ত্রী, সাহিত্য।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। জন্ম—মৈমনসিংহের টাঙ্গাইল
টরীয়ায়। গ্রন্থ—ঝড়ো হাওয়া (১৯৪৭), দেশবন্ধু (না,
১৪৮), গৌরব উজ্জ্বল বাংলা, ২ ভাগ (১৯৪৯), ঝাঁসী
ণীবাহিনী (১৯৪৯), বিশ্বজয়ী শিশুর খেলা (১৯৫০)।
ম্পাদক—আহুতি (মাসিক, মৈমনসিংহ, ১৩৩৪)।

জাহ্নবীচরণ ভৌমিক—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা জেলায়
বড়াবন গ্রাম। গ্রন্থ—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

জাহানারা আরজু। যুগ্ম-সম্পাদিকা—সুলতানা (পূর্ব-
াকিস্তানের সর্বপ্রথম মহিলা সাপ্তাহিক, ১৯৪৯)।

জিতেন্দ্রনাথ বসু রায়-চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিধির খেলা।

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৯ বঙ্গ,
দীয়া জেলার মাঝের গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫০। গ্রন্থ—অমৃতবাণী,
১ খণ্ড, বড়ু চণ্ডীদাস, ভক্ত রামপ্রসাদ।

জীবনানন্দ দাশ—কবি। মৃত্যু—১৯৫৪, ২২এ অক্টোবর।
গ্রন্থ—ঝরা পালক, বনলতা সেন, ধূসর পাণ্ডুলিপি (কাব্য); মহা-
পৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, শ্রেষ্ঠ কবিতা।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—কবি। জন্ম—চট্টগ্রাম জেলায়। গ্রন্থ—
তপোবন অঞ্জলি, ধ্বন্যালোক।

জীবেন্দ্র সিংহ-রায়। জন্ম ১৩৩২ আষাঢ়। এম-এ। গ্রন্থ—
বড়দের ছোটবেলা (শিশু), অঙ্গীকার (কাব্য), বাংলা অলঙ্কার,
প্রমথ চৌধুরী (সমালোচনা)।

জুলফিকার হায়দার—কবি। গ্রন্থ—ভাঙ্গা তলোয়ার, ফতেহা-ই
দোয়াজ দহম্‌।

জোনাব আলি। জন্ম—হাওড়া জেলায় বালিয়া পরগনার
ধসা গ্রামে। গ্রন্থ—ফজিলতে দরুদ ও জিয়ারতে কবর হাফকাত
দানাত (নিবন্ধ)।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৫২ খৃঃ
যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৩ বঙ্গ ১৫ই
আশ্বিন। 'ভারতী' পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করিতেন। গ্রন্থ—
টাক ডুমা ডুম (নাটিকা, ১৯১০), সাত ভাই চম্পা (ঐ, ১৯১১)।
সম্পাদিকা—বালক (১৮৮৫, এপ্রিল)।

জ্ঞানানন্দ রায়-চৌধুরী। জন্ম—হুগলী জেলার শিমলাগড়
গ্রামে। গ্রন্থ—ধর্মজীবন, উচ্ছ্বাসপঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণচিন্তা, পঞ্চকণা,
পূজনীয় গুরুদাস জীবনী, Five Effusions.

সাহিত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

জ্যোৎস্না চন্দ। সম্পাদিকা—বিজয়িনী (পাবনা, ১৪৫৭
আশ্বিন)।

জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত। সম্পাদিকা—অঞ্জলি ও সাহিত্য
(মাসিক, ১৩৪৩, শ্রাবণ)।

জ্যোতিকুমার—আসল নাম পবিত্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১৩৩৩
বঙ্গ ২৯এ মাঘ। গ্রন্থ—গীতিকুঞ্জ (কা)। সম্পাদক—গীতবাণী
ও মৈত্রী।

জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ—ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। জন্ম—
বর্ধমানের কুলাই গ্রামে। গ্রন্থ—কালোয়ার ইতিহাস। সম্পাদক
প্রসূন (সাপ্তাহিক)।

জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত। জন্ম—১২৮৮। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের
লেখক। গ্রন্থ—কেদারমুক্তী বাটী (১৯৪২)।

জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার। জন্ম—১৩১৩, ১০ই বৈশাখ
নেত্রকোণার কালডোয়ার। গ্রন্থ—স্বভাববাদ, বিজ্ঞানের চিঠি।

জ্যোতির্ময়ী রাণী—মহিলা কবি। জন্ম—প্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী-
বংশে। কাব্যগ্রন্থ—সাজি, মালা।

জ্যোতির্ময়ী দেবী—সাহিত্যসেবিকা। জন্ম—মুঙ্গের কবণ-
চৌরারাজবাটী। গ্রন্থ—(উপন্যাস)—অবসান, মায়ের দান।

তনুজা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১৮৯৮। গ্রন্থ—পাঁচমিশালি,
ঝুমঝুমি।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ—পলাশীর যুদ্ধ, স্মৃতিরঙ্গ।

তাপসরঞ্জন সরকার। জন্ম—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—দরদীবন্ধু।

তারকচন্দ্র রায়। গ্রন্থ—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।

তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—নদীয়ার
কথা।

তারকনাথ দাস—বিপ্লবী সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৮৪, ১৫ই জুন
২৪-পরগনার মাঝিপাড়া গ্রামে। পাঠ্যাবস্থা হইতে ইনি 'অনুশীলন
সমিতি'র সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তখন হইতে বিপ্লবী জীবন যাপন করিতে
আরম্ভ করেন ও 'যুগান্তর' দলের সহিত ঘনিষ্ঠ হন। জাপানে
পলায়ন, তৎপরে আমেরিকা, 'ফ্রি হিন্দুস্তান' নামক এক মুখপত্র
প্রকাশ (১৯০৭, আমেরিকায়)। আমেরিকায় বৈপ্লবিক
আন্দোলনে যোগদান। এ-বি ডিগ্রি লাভ (ওয়াসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়,
১৯১০), ওয়াসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। আমেরিকার নাগরিক
(১৯১৪, জুন)। গ্রন্থ—বিশ্ব রাজনীতির কথা, Is Japan a
Menace to Asia, India in World Politics. সম্পাদক—
Free Hindusthan.

তারকনাথ রায়। জন্ম—১২৮৫ যশোহর জেলার রায়না
গ্রামে। গ্রন্থ—শ্রীগৌরাঙ্গ, উপগুপ্ত, পুরুষোত্তম।

তারক হালদার। জন্ম—১৯০১ আসামে গোয়ালপাড়া জেলার সকেট গ্রামে। ভাটপাড়া-নিবাসী। গ্রন্থ—যাযাবরী (উপ), মহাপুরুষ (না), ভগবান বুদ্ধ। সম্পাদক—উদয়শ্রী।

তারাচরণ শিকদার—নাট্যকার। গ্রন্থ—ভদ্রার্জুন (১৮৫২)।

তারাপ্রসন্ন ঘোষ—কবি। কৃষিতত্ত্ববিদ্, তিস্ন, রাঁচী। গীতি-গ্রন্থ—মাধবী, সুরভি, পুরবী।

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম—১৯১৭, ১৭ই সেপ্টেম্বর দ্বারভাঙ্গার সকরি স্থানে। গ্রন্থ—মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য। সম্পাদক—ঝরণা।

তুলসীমণি দেবী। গ্রন্থ—আয়েসা।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—শিক্ষাব্রতী। গ্রন্থ—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য।

ত্রিভঙ্গ রায়—গল্পকার। গ্রন্থ—রূপকথা, ছুটির চিঠি।

ত্রৈলোক্য চূড়ামণি। সম্পাদক—তত্ত্ববোধ (মাসিক, যশোহর, ১৩০৩)।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—বিপ্লবী নেতা। জন্ম—১২৯৬, ২২এ বৈশাখ মৈমনসিংহ জেলার কালসিয়া গামে। গ্রন্থ—জেলে ত্রিশ বৎসর, গীতায় স্বরাজ।

থাকমণি দেবী—সাহিত্য-সেবিকা। সম্পাদিকা—অনাথিনী (মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্র, আজিমগঞ্জ, ১২৮২ শ্রাবণ)।

দক্ষিণারঞ্জন বসু—সাংবাদিক। গ্রন্থ—মধুরেণ, ছেড়ে-আসা গ্রাম, পোড়ামাটি, শতাব্দীর সূর্য।

দিগন্ত রায়—ডাঃ মদন রাণা দ্রষ্টব্য।

দিনেশ দাস—কবি। জন্ম—১৯১৫, ১৬ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতা। সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। কাব্যগ্রন্থ—কবিতা, ভুখা মিছিল, দিনেশ দাসের কবিতা, অহল্যা।

দিবাকর ঘোষ—কবি। জন্ম—মেদিনীপুর, নন্দনপুর। শিক্ষাব্রতী। গ্রন্থ—শিখারিত, জাগ্রত যৌবন।

দিবাকর শর্মা—সাংবাদিক। গ্রন্থ—বাস্তবিকা, সুচারু মিত্রের ভুল।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। জন্ম—মেদিনীপুর, গ্রন্থ—পদ্মাঙ্কুর (১৮৬৭)।

দীনেশচন্দ্র চৌধুরী। গ্রন্থ—বিনকুমারী।

দীপক চৌধুরী। গ্রন্থ—পাতালে এক ঋতু, শঙ্খবিষ।

দীপিকা দে—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—আধুনিক মেয়ে, বর্মা দেশের মেয়ে, কামরূপের মেয়ে।

দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—আগামী।

দুর্গাচরণ কর—চিকিৎসক। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলিকাতায়। মৃত্যু—১৮৭১। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। বিখ্যাত আর, জি, করের পিতা। গ্রন্থ—স্বর্ণশৃঙ্খল (নাটক), ভিষগবন্ধু, ভৈষজ্যরত্নাবলী।

দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ। জন্ম—১২৭৩, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ঢাকা। মৃত্যু—১৩৫৪, পৌষ, কলিকাতা। গোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপ বক্তৃতা দান। সম্পাদিত গ্রন্থ—উপনিষদাবলী, ব্রহ্মসূত্রের বঙ্গানুবাদ, ভক্তিরসায়ন, বেদান্ত-দর্শন।

দুর্গাদাস সরকার—কবি। জন্ম—১৩৩৪, ১৪ই অগ্রহায়ণ বাঁকুড়া জেলার মেলেড়া গ্রামে। গ্রন্থ—অশোকের সময়ের গ্রাম (ক)।

দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার—কবি। জন্ম—১৯০৪, ডিসেম্বর বীরভূম নলহাটী। শিক্ষকতা। গ্রন্থ—কৃষ্ণকলি (কাব্য), গঙ্গাজল, পদ্মচাকী।

দেবদেব ভট্টাচার্য—ছদ্মনাম দেবাচার্য। গ্রন্থ—বিমুগ্ধা পৃথিবী, সুরের পরশ, ক্যান্টারবেরী টেলস।

দেবনারায়ণ গুপ্ত। গ্রন্থ—দাসীপুত্র, স্বপ্ন ও সমাধি।

দেবপ্রসাদ নাগ-চৌধুরী। জন্ম—১৩৩০, ২৮শে চৈত্র খুলনায়। ছদ্মনাম—"বিশ্বপথিক"। সম্পাদক—কচিপাতা (খুলনা)।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ—নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ।

দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ। কাব্যগ্রন্থ—নূপুর, পঙ্কদল (১৩৩১)।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। জন্ম—১৮৯০। 'সাহিত্য-বিশারদ' (নবদ্বীপ) উপাধি লাভ। গ্রন্থ—ভুলের ফসল, শস্যবপন পঞ্জিকা, ফলের বাগানের কাজ, Grow more food.

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক—উদ্দীপনা (মা, ১৩০৪)।

দেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। গ্রন্থ—সাধনা ও পরমানন্দ।

দেবেশ দাশ—সাহিত্যিক। জন্ম—১৯১১ কলিকাতা। শিক্ষা—বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), টাটা বৃত্তিলাভ করিয়া বিলাত গমন, আই-সি-এস (১৯৩৩)। কর্ম—ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও রাজনীতি বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারী (১৯৩৮—৪২), ডেপুটি সেক্রেটারী (১৯৪৩), আসাম সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ও চীফ সেক্রেটারী (১৯৪৮), কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ বিভাগে যুক্ত সেক্রেটারী (১৯৫১)। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি (১৯৫২)। ও জয়পুর অধিবেশনের মূল সভাপতি (১৯৫৩)। গ্রন্থ—ইয়োরোপা, প্রেমরাগ, রাজোয়ারা, অর্ধেক মানবী তুমি, রোম থেকে রমনা; হিন্দী গ্রন্থ—য়ুরোপা, রজবাড়া, অধখিলি।

দ্বারকানাথ পতিতুণ্ড। জন্ম—১৮৩৩ খৃঃ নদীয়া জেলায় বেদড়া-পাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯১৬। এম-এ, বি-এল। গ্রন্থ—ক্যাথারীনের উপাখ্যান।

দ্বিজ ঈশান—পল্লীকবি। জন্ম—১৭শ শতাব্দী মৈমনসিংহ জেলার নন্দাইল। গীতিগ্রন্থ—চালদারের কন্যা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র। গ্রন্থ—শোণিতাঞ্জলি, স্নেহছায়া।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। জন্ম—১৯০২। লক্ষ্ণৌবাসী। বি-এস্‌সি। গ্লাসগোর ইঞ্জিনিয়ার। সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্। বিলাতে ও জর্মাণীতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দান। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীত শাখার সভাপতি (১৯৩৩-৩৪)। গ্রন্থ—সঙ্গীত-বিকাশ (১৯৪০)।

ধনঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম—১৩১৪, ২৩ আশ্বিন হাওড়া জেলায় দরফপুর। গ্রন্থ—নিশির ডাক।

ধর্মদাস মিত্র। গ্রন্থ—রুধিরে যাদের লাল হয়ে গেল, রক্ত-তিলক।

ধীরাজ ভট্টাচার্য—অভিনেতা। গ্রন্থ—যখন পুলিশ ছিলাম।

ধীরানন্দ ঠাকুর—কবি। জন্ম—বীরভূম জেলায় জগদানন্দপুর। অধ্যাপক। গ্রন্থ—মঞ্জরী (ক), ছন্দসী (ক), বাংলা উচ্চারণ-কোষ, সাহিত্যিকী। সম্পাদিত গ্রন্থ—জগদানন্দ পদাবলী (১৩৬১)।

ধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী। গ্রন্থ—অসহায় পান্থ।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। গ্রন্থ—সুন্দরবনী সভ্যতা।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৩১২ ফরিদপুর বাটিধামারি। এম-এ, আশুতোষ পুরস্কার (১৯২৭), অধ্যাপক, দৌলতপুর কলেজ, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ। গ্রন্থ—কুটিরের গান (কা), নিশান নাও (ঐ), সাহিত্যপ্রবাহ। সম্পাদক—মন্দিরা (মাসিক)।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—বিদ্রোহী।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—লালগোলারাজ। জন্ম—১৩০৪ মুর্শিদাবাদ জেমো রাজবাটী। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও ক্রীড়ামোদীরূপে খ্যাতি লাভ। বিখ্যাত শিকারী। শৈশব হইতেই সাহিত্যানুরাগী। নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—স্পর্শের প্রভাব (১৩৪১), অচল প্রেম (১৩৪৪), চিরন্তনীর জয় (১৩৪১), নীলশাড়ী, শিকারী-জীবন।

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থ—স্বাধীন ভারত ও অর্থ নৈতিক সংগঠন।

নওরোজ গোদা, কাজি। জন্ম—বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট। গ্রন্থ—মঙ্গলকোটের কথা (ইতিহাস)।

নগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। জন্ম—মৈমনসিংহ বেতাগরী। গ্রন্থ—Small Pox (১৯৩৯)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ—রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (১৮৮১)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম-এস-সি। গ্রন্থ—নির্জ্জন মন।

নগেন্দ্রনাথ কর্মকার। সম্পাদক—কৃষক (১৩০৭)।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—লীলাবাস।

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—সাংবাদিক। জন্ম—১৯০৬ ফরিদপুর জেলার কাঁঠালবাড়ী। যুগান্তরে বার্তাবিভাগে কর্ম। গ্রন্থ—রূপযজ্ঞ (নাটিকা, ১৩৩৮)। সম্পাদক—প্রভাতী (মাসিক)।

নগেন্দ্রনাথ রায়। গ্রন্থ—যাবার বেলায়।

নগেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী। জন্ম—১২৮৯, ২৫ কার্ত্তিক চট্টগ্রামের ধূমগ্রামে। গ্রন্থ—সুদখোর ও সওদাগর, চামুণ্ডার শিক্ষা, রসাতলের যাত্রী।

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—বসন্তকুমারের পত্র (১৮৮২), ইন্দুবালা (১৮৮৫)।

নটেন্দ্রভূষণ মজুমদার—কবি। গ্রন্থ—প্রণয় পাগল (১২৯২)।

ননীগোপাল চক্রবর্তী—শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১১ যশোহরে আড়কাঁদী গ্রামে। কিশোর গ্রন্থ—আমার বন্ধু ভাস্কর, শিকারী শশী, লাঠিয়াল রামতনু, রাজা সীতারাম, দুর্গমপথের যাত্রী, আবাদ করলে ফলতো সোনা, ইত্যাদি।

ননীবালা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১২৯৪ খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা। মৃত্যু—১৩৫৭ খিদিরপুর। গ্রন্থ—ভক্তিমুকুল।

নন্দকুমার গোস্বামী। জন্ম—১২৬৮, ৮ই পৌষ মৈমনসিংহ জেলা বানিয়া গ্রাম। কাব্যতীর্থ। গ্রন্থ—বৈষ্ণবোপবাস-ব্রতমীমাংসা ও বৈষ্ণব কণ্ঠরত্নগূঢ় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব, স্বরূপচরিত।

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু। জন্ম—১৮৩৫ নৈহাটী গ্রামে। মৃত্যু—১৮৭২ নৈহাটীতে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, কান্দী স্কুলের হেড পণ্ডিত (১৮৬১)। গ্রন্থ—সংস্কৃত প্রস্তাব (১৮৫৯)। যুগ্ম-সম্পাদক—বৈশেষিক দর্শন (১৮৬১)।

নন্দলাল বিশ্বাস। জন্ম—১৩১৬ নদীয়া জেলার নোকারী গ্রাম। গ্রন্থ—মনের কথা।

নন্দকুমার রায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—ব্যাকরণ-দর্পণ (পদ্য, ১৮৫২), অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক (১৮৫৫)।

নন্দকুমার রায়। জন্ম—মৈমনসিংতের মুমুরদিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—পল্লীগাথা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। জন্ম—১৯০৯ নদীয়া জেলার ভাজনঘাটে। অধ্যাপক, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথের লিটারারী সেক্রেটারী। পরে যুগান্তরের সম্পাদকীয় বিভাগে। গ্রন্থ—ঋতু (ক), মিছে কথা, সুইসাইড, বাংলা-সাহিত্যের ভূমিকা, শতাব্দী ও সাহিত্য, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, জীবন-দ্বন্দ্ব, পায়ে-চলার পথ, যৌবন-জলতরঙ্গ, ঝিলিমিলি, মহানির্বাণ, যৌনবিকার ও যৌনাপরাধ, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ, অনেক রকম, মেরা কহানী।

নন্দলাল সেন—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—বিষবৈরী (১২৮৭)।

নন্দলাল রায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—খেয়াল (পাক্ষিক, ১২৮৬-৮৭)।

নয়নচাঁদ ঘোষ—পল্লীকবি। গীতিকাব্য—কবি চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, মহুয়া।

নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। জন্ম—মৈমনসিংহের কালীপুর গ্রামে। গ্রন্থ—কাশ্মীর ও জম্মু (ভ্রমণ)।

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। গ্রন্থ—গলার কাঁটা।

নরেন্দ্রনাথ দে। গ্রন্থ—হে বিহঙ্গ মোর।

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার—সাহিত্যসেবী। জন্ম—মৈমনসিংহের গাথিহাটা গ্রামে। গ্রন্থ—কালের ডায়েরী, আশীষ, ভীষ্ম, রং কথা, ব্রতকথা। সম্পাদক—সৌরভ (মা. ১৩৩৩)।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জীবনীকার। গ্রন্থ—বৃদ্ধ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র। জন্ম—১২৮১। মৃত্যু—১৩২৫, ১১ই আষাঢ়। গ্রন্থ—রসতরঙ্গিণী, চিকিৎসাকণিকা।

নরেন্দ্রনাথ বসু—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—নলিনী (মা, ১২৮৭)।

নলিনীকুমার ভদ্র। গ্রন্থ—কামসূত্র, বিচিত্র মণিপুর, আদিবাসী বিচিত্র কথা, আসামের অরণ্যচারী, আমাদের পরিচিত প্রতিবেশী।

নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য নিগমানন্দ পরমহংস দ্রষ্টব্য।

নবরাম পণ্ডিত—বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১৮৬৬, আসাম। মৃত্যু—১৮৯৬, ১৬ই জানুয়ারি। গ্রন্থ—নীতিরত্ন, বৌদ্ধালঙ্কার, শিল্পসার, প্রকৃত সুখী কে? প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা, প্রসন্ন হিতোপদেশ, পালি ব্যাকরণ, বুদ্ধপরিচয়।

নবাব সৈয়দ নবাব আলী। জন্ম—১৮৬৩, ডিসেম্বর মৈমনসিংহ জেলার ধনবাড়ী। মৃত্যু—১৩৩৬, ৩রা বৈশাখ। গ্রন্থ—দৌলুদ শরীফ, ঈদল আজহা।

নরেশ গুহ—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৯২৪ মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল। এম-এ। সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। গ্রন্থ—পাটির পরে (অনু,) তপতীর মন (গ,) দুরন্ত দুপুর (ক,)। সহ-সম্পাদক—কবিতা (ত্রৈমাসিক)। যুগ্ম-সম্পাদক—চলচ্চিত্র। [ক্রমশঃ।

ওভারটাইম

শ্রীমতী সুষমা দেবী

দুর্জয় শীতের রাত্রি ! থেকে থেকে হাড়-কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। কুয়াশার ধোঁয়ায় চার দিক অন্ধকার।

দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে পথের দিকে চেয়ে অণিমা সন্ধ্যার সময় থেকে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যখন সে এসে দাঁড়ায়, তখন রাস্তায় অসংখ্য পথিকের আনাগোনা, মোটরের ত্বরিত চলাফেরা আর ট্রাম-বাসের শব্দ একটানাই চলছিল। এখন মানুষের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে, ট্র্যামের ঘড়-ঘড় ঠং-ঠং শব্দ কমে এসেছে, মোটরের ছোটাছুটিও নেই বললেই চলে। অনিমেষের তবু এখনও দেখা নেই ! তার খাবার কখন জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে।

যতদূর দৃষ্টি যায়, অণিমা ঝুঁকে পথের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কোথায় অনিমেষ ? অণিমার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। আজ প্রায় পনেরো দিন ধরে রাতের পর রাত এমনি করে সে স্বামীর আসা-পথ চেয়ে কাটাচ্ছে। দেহে ক্লান্তি এসে যায়, বিষাদে মন ভরে ওঠে। তবুও অনিমেষের ত কষ্ট কিছু মনে হয় না ? অণিমা রাগ করলে, কিছু বলতে গেলে হেসে সে উড়িয়ে দেয়।

ঘর থেকে খুকুর কান্নার আওয়াজ এল। শাশুড়ী ডাকলেন—বৌমা, ঘুমিয়ে পড়লে বুঝি, বাছা ? খুকুমণি যে কেঁদে সারা হল !

অণিমা ছুটে ঘরে চলে আসে, মশারি তুলে বেলফুলের মতো ছোট মেয়েকে দু হাত দিয়ে খাট থেকে নামিয়ে নিয়ে মেঝেতে বসে তাকে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু চিন্তার জাল সমানেই সে বুনে চলে। না, যা হয় কিছু একটা বোঝাপড়া আজ সে করবেই। কেন এমন করে সমানে সহ্য করবে ? কাজের দোহাই এক দিন, দু দিন, না হয় তিন দিন মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু রোজই ঐ এক কথা বললে কে অনিমেষকে বিশ্বাস করবে ? সরকারী অফিসে সে একাই কাজ করে না, পাড়ার আরও অনেকেই করে। তারা ত কই এত রাত করে বাড়ি ফেরে না ? অণিমা এমন বোকা নয় যে অনিমেষ যা বলবে তাই চোখ বুজে বিশ্বাস করে নেবে ?

দুধ খেয়ে খুকু ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে অণিমা আবার গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। মন তার ছটফট করছে, সে শুতে-বসতে পারছে না। আগে ত তার স্বামী এমন ছিল না ? অফিস থেকে সকাল সকাল বাড়ি পালাবার ছুতা সে খুঁজে বেড়াত, বাড়ি ফিরে অণিমাকে এখানে-ওখানে, সিনেমা-থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইত। কত সময়ে অণিমা নিজেই বিরক্ত হয়েছে, স্বামীর উপর রাগ করেছে, আত্মীয়-বন্ধুরা অনিমেষকে স্ত্রৈণ বলে ঠাট্টা করেছে অনিমেষ সে সব হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, অণিমাকে বলেছে—বলুক গে ! এতে আমার রাগ না হয়ে আনন্দই হয়, অণু !

* * * *

বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে শব্দ করে থামল। অণিমা ঝুঁকে দেখল, তার স্বামী গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারের হাতে ভাড়া গুঁজে দিল, তার পর গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগল। সেইখানে দাঁড়িয়েই অণিমা দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। তখনই ছুটে ঘরে গিয়ে সে খাটের উপর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঘুমের ভাণ করে শুয়ে পড়ল।

ঘরে এসে স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে অনিমেষ খাটের মশারি ফাঁক করে দেখল, মেয়েকে নিয়ে সে ঘুমোচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিশ্চিন্ত মনে সে স্নানের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আয়নার সামনে বসে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে শুরু করল, তার পর টুক-টাক শব্দ করল, তবুও অণিমার ঘুম ভাঙল না। তখন অনিমেষ আধুনিক একটা গানের কলি গাইতে গাইতে খেতে চলে গেল।

রাগে অণিমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, ইচ্ছা হল তখনই ঘর ছেড়ে শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। খাওয়া শেষ হলেই অনিমেষ বিছানায় শুতে আসবে। তার কাছে শুতে আর অণিমার প্রবৃত্তি নেই। ও রকম স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই সে শোবে না। খুকুকে সোজা করে শুইয়ে তার গায়ে লেপটা ভালো করে চাপা দিয়ে সে একটা বালিশ নিয়ে খাট থেকে নামল, তার পর ঘরের কোণ থেকে মাদুরটা তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে সেটা পেতে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই অনিমেষ ঘরে এসে আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় ঢুকল। স্ত্রী বিছানায় নেই দেখে চাপা গলায় সে ডাকল—অণু, অণিমা, কোথায় গেলে ? এই ত দেখে গেলাম এখানে শুয়ে ছিলে ?

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কেটে যাবার পরও যখন অণিমা বিছানায় শুতে এল না, তখন ঘুম-চোখে শীতে কাঁপতে কাঁপতে অনিমেষ উঠে পড়ল, বিরক্ত কণ্ঠে বলল—সারা দিন খেটে-খুটে এসে আর পারি না নিত্যি তোমার মান ভঞ্জন করতে ! কোথায় গেলে ?

খাটের তলায়, পাশের দালানে, কোণের ঘরে সর্বত্র খুঁজে স্ত্রীকে কোথাও না পেয়ে বারান্দার দরজাটা সে হড়াস করে খুলে ফেলল। শীতের রাতে খোলা জায়গায় গায়ে শুধু শাড়ীর আঁচল চাপা দিয়ে অণিমা মাদুরের উপর শুয়ে আছে দেখে সে বলে উঠল—এখানে শোবার মানে কী, এটা কি শোবার জায়গা না কি ? ইনফ্লুয়েঞ্জা কি নিউমোনিয়া হলে কিন্তু আমি ডাক্তার দেখাতে পারব না। সারা দিন বাইরে খেটে-খুটে এসে বাড়ীতে যে একটু শান্তি পাব তাও তোমার জ্বালায় হবার উপায় নেই, অণিমা ?

অণিমার সাড়া না পেয়ে অনিমেষ আরও রেগে গেল, বলল—বেশ বুঝতে পারছি তুমি ঘুমোও নি, ঘুমের ভাণ করলে কী হবে ?

অণিমা ফোঁস করে উঠল—আমি ঘুমোই না ঘুমোই, তাতে

তোমার কী? রাত দুপুরে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসা হয়েছে! আমি যেখানে পড়ে থাকি না কেন, তোমার তাতে কী আসে-যায়? তা না হলে আর নিত্যি এমন রাত দুপুরে বাড়ি ফিরতে না। আমি ত ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না, যে যা বলবে তাই বিশ্বাস করে নোব!—স্বামীর দিকে সে পিছন ফিরে শু'ল।

তুমি বিশ্বাস না করলে ত বয়ে গেল! কে তোমাকে বিশ্বাস করতে বলেছে? এতই'যদি তাচ্ছিল্য কর স্বামীকে, বেশ ত কাল থেকে আর বাড়িই ফিরব না। স্বামীকে ত তোমার দরকার নেই, দরকার শুধু স্বামীর টাকার! এবার থেকে তোমার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্কই হবে। কখন সেই সকাল ন'টার সময়ে দুটো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে গেছি, এতক্ষণ পরে ফিরলাম, মন কেমনও করে না তোমার?

—করে নাই ত। কেন করবে? কার জন্যে করবে? আমি ত চোখের মাথা খাইনি? তোমার মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কতখানি মেহনত করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছ! তোমার অফিসের অন্য সকলে সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে, যত কাজের বোঝা থাকে বুঝি তোমারই বেলায়? আমায় কি গঙ্গার মা পেয়েছ, না খুকু পেয়েছ?

—বেশ ত, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, অম্বরকে ডেকে জিজ্ঞেস করো না?

—কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, আমি নিজেই সব জানি। রাত দুপুরে ফিরে চেঁচিয়ে আর পাড়া মাথায় করতে হবে না। মা ও-ঘরে শুয়ে আছেন, এখনই উঠে আসবেন। তুমি শোওগে যাও।

অনিমেষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর মৃদুস্বরে বলল—যাবে না শুতে? এই ঠাণ্ডায় এমনি করে থেকো না, অণু, লক্ষ্মীটি উঠে এসো। সারা রাত এখানে পড়ে থাকলে কাল আর উঠতে হবে না।

না উঠতে পারি, তাতে তোমার কী? হঠাৎ যে দেখছি দরদ উথলে উঠল! যাও শুতে যাও। ও-সব ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না। প্রাণ থেকে যে জিনিষ আসে না, মুখের ভদ্রতা দিয়ে কি তা ঢেকে রাখা যায়?

কিছুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে অনিমেষ রাগ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

• • • • •

মনের জ্বালায় অণিমা ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল, ঘুম তার চোখে এল না। শীতে বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল। অতীতের সুখস্মৃতি একটার পর একটা তার মনে পড়তে লাগল। যে স্বামী অণিমাকে খানিকক্ষণ দেখতে না পেলে পাগল হয়ে যেত, সে এখন কী করে এ রকম হয়ে গেল? সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে এসে এই কি স্বামীর সম্ভাষণ? সে কি জানে না, কী তুষের আগুন অণিমার বুকের ভিতর দিন-রাত ধিকি-ধিকি করে জ্বলছে? সত্যিই কি কাজের জন্যে অনিমেষ এতখানি সময় বাইরে কাটিয়ে আসে, না এর অন্য কোনও কারণ আছে? হতেও পারে, অণিমার মনের এটা নিছক ভুল ধারণা, হয়ত তার স্বামী এখনও তাকে আগেকার মতোই ভালবাসে। নিজের মনের মধ্যে অকারণ এই সব কল্পনা করেই তবে অণিমা কষ্ট পাচ্ছে? জেনে, বুঝে, তবুও কেন তার মনটা. রকম জ্বলছে? এ অশান্তি থেকে কী করে সে উদ্ধার পাবে?

চোখের গরম জল তার গাল বেয়ে পড়তে লাগল। বারান্দার ঠাণ্ডা মেঝের উপর মাদুরে শুয়ে ঠক-ঠক করে সে কাঁপছে। অণিমা আশা করেছিল, সে শুতে না গেলে অনিমেষ ছাড়বে না, জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাবে। কোথায় কী? আজ কত দিন ধরে প্রতি রাত্রে মান-অভিমানের খেলা চলছে। রাতের পর রাত অণিমা এখানে-ওখানে শুয়ে কাটাচ্ছে। তবুও ত কই অনিমেষের জীবনের ধারা এতটুকুও বদলাচ্ছে না? রুটিনের মতো বাঁধা একই ভাবে চলছে!

অণিমা উঠে বসল, রাস্তার দিকে চেয়ে দেখল, কুয়াশার ধোঁয়ায় সব অন্ধকার। হঠাৎ তার কাশি এল, আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে সে কেশে উঠল

ও দিককার বারান্দার দিকের ঘরের দরজা খুলে গেল, শাশুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অণিমাকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—তুমি এত রাত্তিরে এখানে বসে কেন, বৌমা? ঘরে যাও। এমন ঠাণ্ডা পড়েছে যে লেপের ভেতরে শুয়েও হাত-পা আমার গরম হয় না, শীতে মরি। আর তুমি নিশুতি রাতে খোলা গায়ে এখানে বসে আছ? কোলের কচি মেয়েটা রয়েছে, তোমার অসুখ হলে সে-ও রেহাই পাবে না। যাও, উঠে যাও, দেরি কোরো না। নিত্যি তোমাদের এ কেমন ধারা কাণ্ড, বৌমা? ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি যেন লেগেই আছে! মেয়েদের অনেক কিছুই সহ্য করতে হয় মা, অত অধৈর্য হলে চলে না। শীতে কেঁপে মরছি, বুড়ো মানুষকে আর কষ্ট দিও না! বেশ ঘুমটি এসেছিল, তোমার কাশির শব্দে ভেঙে গেল। আবার কখন্ চোখ বুজব, জানি না। যাও, শোও গে।

তবুও অণিমার উঠবার লক্ষণ না দেখে তিনি তার কাছে গিয়ে হাত ধরে ওঠালেন, মমতাপূর্ণ স্বরে বললেন—ছেলে আমার দিন খারাপ ছিল না, মা! তা যদি এখন হয়, তবে আমাদেরই অদৃষ্ট বলতে হবে। সারা দিনের পর তেতে-পুড়ে মানুষ বাড়ি ফেরে

তার সঙ্গে মিষ্টি কথা কইতে হয়। অমন রাগ-রোষ করলে ক্ষতিই হয়।

অণিমাকে তার শোবার ঘরে ঠেলে দিয়ে তিনি বারান্দা থেকে দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন। সারা রাতই মেঝেতে মাদুরে শুয়ে অণিমা কম্বল চাপা দিয়ে পড়ে ছিল, ঘুম তার চোখে একবারও আসেনি। অনিমেষ সমস্তক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে, তার ঘুম একটি বারও ভাঙেনি।

ভোর হতেই খুকু কেঁদে উঠল। তাকে খাট থেকে নামিয়ে এনে অণিমা খাওয়াতে বসল। দুধ খেয়ে একটু খেলা করেই খুকু আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে বুকে দারুণ অভিমান নিয়ে অণিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

অফিস যাবার আগে অনিমেষ উপর থেকে হাঁকল—আমার শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেছে, লাগিয়ে দিতে হবে।

সে দুবার ডাকবার পরই তার মার গলা শোনা গেল—যাও না বৌমা? খোকা ডাকছে। অফিস যাবার সময়ে কাছে হাজির থাকতে হয়, এ আর তোমায় বলে আমি পারি না। কী যে ছাইভস্ম দিন-রাত করো তার ঠিক নেই! যাও, হাতের কাজ ফেলে রেখে চলে যাও।

অণিমা শাশুড়ীর জন্য রান্না করছিল। উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে সে উপরে চলে গেল। অনিমেষ লুঙ্গী পরে খালি গায়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে খাটে শুয়েছিল। স্ত্রীকে দেখে গম্ভীর স্বরে সে বলল—দরকার কী অফিসে গিয়ে? চাকরি যায়, যাকগে। আমার বয়ে গেছে। বাড়ী-শুদ্ধ উপোস করে মরলে তখন যেন কেউ আমার সঙ্গে লাগতে আসে না! আমি ত অফিসে কাজ করি না, আড্ডা দিয়ে বেড়াই, রাত করে বাড়ি ফিরি! বেশ ত, এবার থেকে আর অফিসেই যাব না, দিন-রাত শুয়ে শুয়ে ঘরের কড়িকাঠ গুণব।

দেওয়ালের ঘড়িটায় টং-টং করে দশটা বাজল। অণিমা স্বামীর এত কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল—কী দরকার যেন বলছিলাম? হাতের কাজ ফেলে চলে এলাম। মা আমায় বকছেন, উনি ত পরের মেয়ের দোষ চিরকাল দেখেন, ঘরের ছেলের ত দোষ নেই?···অফিস না গেলে আমার কিছুই এসে-যাবে না, আর উপোস করতেও আমি ভয় পাই না, বছর বছর শিবরাত্তিরের নির্জলা উপোস করি।···চললাম।

অণিমা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে শাড়ীর আঁচলে টান পড়তেই রেগে উঠে সে বলল—সব বিচ্ছিরি! ও-সব ন্যাকামি আধিক্যেতা আমার ভালো লাগে না।

স্বামীর দুষ্টামি-ভরা মুখের দিকে চেয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলল, তার পরই গম্ভীর হয়ে বলল—শাড়ী ছাড়ো। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। জল ফুটে গেল, চাল ছাড়তে হবে।

—বেশ ত, তুমি নীচে যাও না? দেখি, কে আমায় আজ অফিস পাঠাতে পারে!

খাটের বাজুতে অনিমেষের শার্টটা ঝুলছে দেখে অণিমা সেটা নামিয়ে ছুঁচ-সুতো বার করে বোতাম সেলাই করতে বসল। বোতাম লাগানো হয়ে গেলে শার্টটা স্বামীর গায়ের উপর ফেলে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনিমেষ তাকে শুনিয়ে বলে উঠল—দেখো, আজ রাত্তিরে কেমন বাড়ি ফিরি? কিসের জন্যে বাড়ি ফিরব? আসবই ত রোজ দেরি করে! স্ত্রী যার অমন অবুঝ, বাইরে বাইরেই থাকা তার ভালো, তবু খানিক শান্তি পাওয়া যায়···

অণিমা আর শুনতে পেল না। একটু পরেই রান্নাঘরের পাশ দিয়ে জুতার শব্দ করতে করতে অনিমেষ বেরিয়ে গেল।

* * * *

সেই দিনই দুপুরে জামালপুর থেকে টেলিগ্রাম এল, শাশুড়ীর ভাইয়ের কলেরা হয়েছে, খবর পাওয়া মাত্র যেন তিনি জামালপুর রওনা হন। উঠি ত পড়ি করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি কাপড়ের পুঁটলি বাঁধলেন, বাক্স থেকে টাকা বার করলেন, তার পর সাবধানে থাকবার জন্যে অণিমাকে বার বার উপদেশ দিয়ে বাড়ির একমাত্র চাকরটিকে সঙ্গে করে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

খালি বাড়িতে শুধু খুকুকে নিয়ে অণিমার যেন হাঁপ ধরতে লাগল। সে ভেবেছিল কাউকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই সে বাবা-মার কাছে চিত্তরঞ্জন চলে যাবে। সেখানে গিয়ে দিন কতক তাঁদের কাছে থাকলে তার মনটা হয়ত একটু ভালো হবে। কোথায় বা কী! হঠাৎ জামালপুর থেকে টেলিগ্রাম এল, শাশুড়ীকে ধুলো-পায়ে রওনা হতে হল; অণিমার যাওয়া হল না।

সারা দুপুর এঘর-ওঘর করে সে নানা কথা ভাবতে লাগল। মামা-শ্বশুরের অত অসুখ, যদি তিনি না বাঁচেন? শাশুড়ী সেখানে গিয়ে যদি তাঁকে দেখতে না পান? ফিরতে তাঁর কত দিন দেরি হবে, কে জানে?···

বিকাল হলে খুকুকে যথানিয়মে সাজিয়ে-গুছিয়ে অণিমা ঝিয়ের সঙ্গে সামনের মাঠে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল। তার পর সংসারের কাজ সেরে গা ধুয়ে নিত্যকার মতো সে বারান্দায় গিয়ে বসল। একটু পরেই তাদের বাড়ির সামনে পরিচিত ছোট অষ্টিন গাড়ীটা এসে থামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপরে প্রফুল্লর গলা পাওয়া গেল—বৌদি, ভেতরে আসতে পারি?

—এসো না, ঠাকুরপো? আমি সামনের বারান্দায়। বাড়িতে একলাই আছি। মা আজ টেলিগ্রাম পেয়ে জামালপুর চলে গেলেন, মামাবাবুর কলেরা হয়েছে।

প্রফুল্ল বারান্দায় এসে বলল—তাই নাকি? আমি ত কিছু জানতাম না?······তা এই খালি বাড়িতে একলা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ত?

—কষ্ট আবার কী? এ রকম আমার অভ্যেস আছে, প্রফুল্ল ঠাকুরপো! মা ত কত সময়ে এদিকে ওদিকে বেরিয়ে যান, তীর্থ করতে যান। আর আজ-কাল তোমার দাদার ত অফিস থেকে ফিরতে রোজ রাত দুপুর হচ্ছে। বলেন, পাঁচটার পর কাজ করলে ওভারটাইম পাওয়া যায়।

একটু চুপ করে থেকে প্রফুল্ল বলল—বৌদি, সিনেমা কি অন্য কোথাও যাবে? চলো না, নিয়ে যাই। এমনিই ত চুপ করে বাড়িতে একলাটি বসে থাকবে? চলো না, 'নীরা'তে গিয়ে কিছু খেয়ে আসা যাক। তুমি ত বলেছিলে একদিন যাবে? অনিমেষদার আর সময় হয়ে ওঠে না তোমাকে নিয়ে যেতে। চলো, ওখানেই কিছু ভালো-মন্দ পাঞ্জাবী খাবার খেয়ে আসি। বড়মাও আজ নেই, তিনি থাকলে

তোমার হোটেলে খাওয়ার নামে রাগারাগি করতেন! এই হচ্ছে যাকে বলে 'সুবর্ণ সুযোগ'। তুমি আর বাপু অমত কোরো না।

সে কেমন করে হবে, ঠাকুরপো? দেরি হয়ে যাবে যে? খুকু এখনই ফিরবে। তা ছাড়া বাড়ি-ঘর আলগা রেখে কী করে বেরিয়ে যাব? যা কলকাতায় আজ-কাল চোরের উপদ্রব হয়েছে—

হলেই বা? আমরা আর কতক্ষণেরই জন্যে যাব, বৌদি? ঠাকুরকে ঝিকে বলে যাও, বাইরের দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকুক। খুকুকে মাঠ থেকে আনতে বলছি। ওকে যা খাবার খাইয়ে দাও—বলে প্রফুল্ল নীচে নেমে গেল।

অণিমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না, মন তার হু-হু করে জ্বলছে। স্বামীর উপর দুর্জয় অভিমানে সারা দিনই আজ চোখের কোণে জল এসে যাচ্ছে। জ্ঞাতি সম্পর্কের দেওর হলেও প্রফুল্ল ছোট থেকেই তাকে ভালবাসে, সময়ে অসময়ে এসে কত কাজ করে দিয়ে যায়। তার অনুরোধ অণিমা এড়াতে পারল না, 'নীরা'তে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। নীচে নেমে ঝিকে সে ভালো করে বলে দিল খুকুকে দেখতে, তাকে যথাসময়ে খাওয়াতে। তার পর সে প্রফুল্লর সঙ্গে গিয়ে তার গাড়ীতে উঠল।

* * * *

'নীরা'তে ঢুকে কোণের দিকের একটা টেবল দেখে নিয়ে তারা সেখানে গিয়ে বসল। ওয়েটার এলে পরোটা, কাবাব আর আইসক্রীম অর্ডার দিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। ছোট ঘরটি লোকে প্রায় ঠাসা। এ ধরণের জায়গায় অণিমা বড় একটা আসে না। দেখে-শুনে তার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল, আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে সে বসে রইল। প্রফুল্ল তার স্বভাবসুলভ হাসি-ঠাট্টা দিয়ে অণিমার মনটা অন্য দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সে সব অণিমার ভালো লাগল না। দু-একটা কথার যা হয় উত্তর দিয়ে সে ঘরের অন্য লোকদের দেখতে লাগল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রফুল্ল গুম হয়ে গেল, চুপ করে হেঁট হয়ে খেয়ে যেতে লাগল। তাকে চুপ করতে দেখে অণিমার হুঁস হল, সে প্রশ্ন করল—কী হল, প্রফুল্ল ঠাকুরপো? হঠাৎ যে চুপ হয়ে গেলে? খেতে এতই মনোযোগী হয়ে পড়েছ?

—বৌদি, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আজ সাড়ে ছটার সময়ে আমার একটা জরুরি এনগেজমেণ্ট আছে, একেবারে ভুলে গেছলাম।…ও কি? কিছুই ত তুমি খাওনি দেখছি? চটপট খেয়ে নাও, বৌদি!

—আমার জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! তোমার খাওয়া শেষ হলেই আমি উঠব। আমি ত ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি!

দুজনেই নিঃশব্দে খেতে লাগল। খেতে খেতে ঘরের চার দিক দেখতে দেখতে অণিমার চোখ দুটি যেন হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে এল, ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠল। মাথা নীচু করে চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুরপো, ঐ দিকের ঐ টেবলটায় তোমার দাদা বসে আছে না? একটা মাঝবয়েসী মেয়ে খেতে খেতে খুব হাত-মুখ নেড়ে গল্প করছে, আর তোমার দাদা যেন অবাক হয়ে শুনছে! পেছন ফিরে বসে আছে বলে মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। ঐ গ্রে ফ্ল্যানেলের স্যুট পরেই ত আজ অফিস গেছে।

ওয়েটার এসে তাদের প্লেট সরিয়ে নিয়ে আইসক্রীম দিয়ে গেল। সে দিকে অণিমার লক্ষ্যই নেই। শ্যেনদৃষ্টিতে সেই টেবলটার দিকে চেয়ে সে বসে রইল।

প্রফুল্ল বলল—কি জানি, আমি ঠিক ধরতে পারছি না, বৌদি! গ্রে ফ্ল্যানেলের স্যুট এই শীতে দাদা ছাড়া বুঝি আর কেউ পরতে পারে না?

সে সব কথা অণিমার কাণেও গেল না, সে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—আমি ওদের কাছে যাব, ঠাকুরপো? গিয়ে বলব, আমি এসেছি। ও মেয়েটা কে, বলো ত? তুমি আগে কোনও দিন দেখেছ?

না, বৌদি, আমি ওঁকে কোনও দিনও দেখিনি। হয়ত ওঁরা দুজনে এক অফিসেই কাজ করেন।

সেই সময়ে অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে ওয়েটারকে কি বলতে যেতেই তার মুখখানা সম্পূর্ণ দেখা গেল। অণিমা কেমন যেন হয়ে গেল। হঠাৎ প্রফুল্লর একটা হাত চেপে ধরে সে বলল—ঠাকুরপো, আমায় বাড়ী নিয়ে চলো, আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না।

যে আইসক্রীম খেতে অণিমা এত ভালবাসে, সেদিকে সে চেয়েও দেখল না। আইসক্রীম গলে জল হয়ে গেল। বিল মিটিয়ে দিয়ে তারা যখন দরজার দিকে যাচ্ছিল, সেই সময়ে অনিমেষ তাদের দেখতে পেল। অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে চাইতে চাইতে অণিমা 'নীরা' থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরবার সময়ে গাড়ীতে সারা পথ অণিমা গুম হয়ে বসে রইল, প্রফুল্লর সঙ্গে একটা কথাও বলল না। আর প্রফুল্লর নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। কেন মরতে সে বৌদিকে 'নীরা'তে নিয়ে গেছল?

* * * *

অণিমা যখন বাড়ী ফিরল, তার মুখখানা তখন আষাঢ়ের মেঘের মতো থম-থম করছে। বাড়ীতে ঢুকতেই খুকুর চীৎকার তার কানে গেল। ঝি তাকে দুধ খাওয়াতে পারছে না, যুদ্ধ করছে ঐ অতটুকু মেয়েকে নিয়ে। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে, তেল পায়নি বলে তখনও রান্না চড়ায় নি। ভাঁড়ার বার করে দেবার সময়ে অণিমা তেল দিতে ভুলে গেছল। বাড়ীর সমস্ত দরজা হাট করে খোলা, ঝি, ঠাকুর, দুজনের কেউই বন্ধ করেনি। তাড়াতাড়ি শাড়ীটা বদলে অণিমা ঝিনুক-বাটি নিয়ে খুকুকে দুধ খাওয়াতে বসল, তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর ভাঁড়ারের চাবিটা ঝনাৎ করে মেঝেতে ঠাকুরের সামনে ফেলে দিয়ে সে চুপ করে বসল।

না, অনিমেষের সঙ্গে সে আর কিছুতেই ঘর করবে না। স্বামী যার চরিত্রহীন, বেঁচে থেকেই তার কী লাভ? অণিমা মরবেই যেমন করেই হোক তার জীবন শেষ করে দেবে। মায়া-মমতাহীন এই নিষ্ঠুর জগতে কিসের জন্যে বেঁচে থাকবে? কার জন্যে খুকুই তার জীবনের একমাত্র বন্ধন। এ বন্ধনও অণিমা অনায়াসে কেটে ফেলবে। অনিমেষকে সে জব্দ করে ছাড়বে, সবাইকে জানিয়ে দিয়ে যাবে, তার স্বামী কী ভীষণ লোক!

ঝর-ঝর করে অণিমার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। কী ভাগ্য নিয়েই সে পৃথিবীতে এসেছিল! এমন অদৃষ্টও মানুষের হয় নাকি? বেশ ত স্কুলের পড়া শেষ করে সে কলেজে ঢুকেছিল

তখনই তার বিয়ে না দিলে আর বাবা মার চলছিল না! আজ অণিমা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে যাবে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাঁরা কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন! পরের ছেলে কখনও আপন হয়? কোথাকার কে অনিমেষ? কেউ তাকে জানতও না। হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে অণিমার সমস্ত জীবনটাকে একেবারে ওলট-পালট করে দিল!

খাটের উপর ঝুঁকে অণিমা খুকুকে চুমু খেতে লাগল। আজই অণিমার সব শেষ হয়ে যাবে, কাল এমন সময়ে সে আর পৃথিবীতে থাকবে না। খুকু কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলবে। শাশুড়ী খবর পেয়ে জামালপুর থেকে ছুটে আসবেন। আর অনিমেষ? অণিমা তার মুখখানা ভাবতে লাগল, ম্লান হেসে আপন মনে বলল, তার পথ পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

কিন্তু কী করে মরবে সে? কোনও ব্যবস্থাই ত নেই? কী উপায় করা যায়? পুড়ে মরলে কেমন হয়? এ আর এমন কি শক্ত কথা? না, তার চেয়ে ঐ ছোট ঘরটায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুললেই ত হয়? কড়িকাঠটা বেশী উঁচুও নয়। কিন্তু অতখানি লম্বা দড়ি এখনই কোথায় পাওয়া যায়? তার চেয়ে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে একটা দেশলাই জ্বেলে দিলেই সব চুকে যাবে। সেই ভালো।

নীচে গিয়ে অণিমা কয়লার ঘর থেকে কেরোসিন তেলের বোতলটা নিয়ে এল, সেটা জলের ঘরে রেখে এসে সে চিঠি লিখতে বসল। সে লিখল যে নিজের ইচ্ছায় তার জীবন দিচ্ছে, না হলে আবার অনিমেষকে নিয়ে পুলিশে টানাটানি করতে পারে। লেখা হলে চিঠিটা কাগজচাপা চাপা দিয়ে লেখবার টেবলের উপর রেখে দিল।

যাক, আর অণিমা দেরি করে ফেরবার জন্তে স্বামীকে গঞ্জনা দেবে না। তার যা ইচ্ছা হয় সে করুক, আর ত অণিমা দেখতে আসবে না? চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে লাগল।

নিস্তব্ধ বাড়ি। ঝি, ঠাকুর, দুজনেই নীচে। খুকু অগাধে ঘুমোচ্ছে। এই তার সুযোগ। খুকুর বিছানার ধারে গিয়ে আবার অণিমা দাঁড়াল। খুকুর মুখখানি দেখেই তার অশ্রুসাগর নতুন করে উথলে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে সে আপন মনে বলল—খুকু, তোর মা আজ জন্মের মতো চলে যাচ্ছে। বড় হলে জানতেও পারবি না, আমি তোর কে ছিলাম। যদি কোনও দিন তোর মায়ের কথা মনে পড়ে, তা হলে তার কথা ভেবে শুধু দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিস, তাতেই আমি শান্তি পাব।

অণিমার হাত-পা থর-থর করে কাঁপতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ফেলে-আসা ঘরখানার দিকে করুণ দৃষ্টিতে সে চাইল। তাদের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি এই ঘরটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নতুন বৌ হয়ে এসে এই ঘরেই প্রথম সে বসেছিল। এই ঘরেই তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। এখানেই সে অনিমেষের সঙ্গে কথা বলেছিল, এই ঘরেই দুজনে দুজনকে পেয়ে তারা পৃথিবী ভুলে গেছল। আবার এই ঘরেই আজ তাদের সব শেষ!

টলতে টলতে অণিমা স্নানের ঘরের দিকে গেল। সেখানে ঢুকতেই তার মনে পড়ল, দেশলাই আনা হয়নি। আবার ঘরে গিয়ে সে দেশলাই নিয়ে এল। তার পর দরজায় খিল লাগিয়ে কেরোসিনের বোতলটা মাথায় উপুড় করে ঢেলে দিয়ে অণিমা দেশলাইয়ের বাক্স থেকে একটা কাঠি বার করল। ফস করে জ্বেলে কাপড়ে একবার লাগিয়ে দিলেই হয়, হু-হু করে জ্বলে উঠবে।

হঠাৎ স্নানের ঘরের দরজায় দমাদম করে ঘা পড়তে লাগল, সেই সঙ্গেই অনিমেষের গলা পাওয়া গেল—অণিমা, অণিমা, দরজা খোলো, শীগগির খোলো বলছি। ওখানে অত কেরোসিনের গন্ধ কেন?

অণিমা থতমত খেয়ে গেল, দেশলাই জ্বালবার কথা তার মনে পড়ল না। এক হাতে দেশলাইয়ের বাক্স, আর এক হাতে কাঠি নিয়ে চুপ করে সে চোরের মতো দাঁড়িয়ে রইল, খিল খুলল না।

ধাক্কার পর ধাক্কায় পল্‌কা দরজার খিল ভেঙে পড়ল। দরজার ফাঁক দিয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে অনিমেষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অণিমার সর্বাঙ্গ দিয়ে কেরোসিন তেল গড়াচ্ছে, হাতে দেশলাইয়ের বাক্স আর কাঠি। অনিমেষ চেঁচিয়ে উঠল—বেরিয়ে এসো, বলছি, শীগগির এসো।

না, আমি যাব না। কেন মিছিমিছি আমায় বিরক্ত করতে এসেছ? সেখানে যার কাছে ছিলে সেখানেই যাও না? এ সময়ে ত কোনও দিন বাড়ি ফেরো না? আজ আবার এ মর্জি হল কেন? চলে যাও এখান থেকে, আমায় আটকাতে এসো না, বলছি! শেষটুকুতেও কি তুমি আমায় একটু শান্তি পেতে দেবে না?

ভয়ে অনিমেষের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল—তার মানে? কিসের আটকানো?

—মানে যা, তা ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হবে নাকি? দেখে বুঝতে পারছ না?···তুমি এখান থেকে দয়া করে যাও দেখি? তোমার কোনও ভয় নেই, আমি তোমায় বিপদে ফেলব না।

মিনতি করে অনিমেষ বলল—কী ছেলেমানুষি হচ্ছে, অণিমা? কিসের দুঃখে তুমি নিজের প্রাণ নিতে যাচ্ছিলে? আমায় ভালো না বাসলে জোর নেই ত কিছু? কিন্তু খুকু? খুকুর কথাও বুঝি তোমার মনে হয়নি?···এখনও চলে এসো, বলছি। শেষ পর্যন্ত কি তবে পুলিশ ডাকতে হবে?

চক্ষু রক্তবর্ণ করে চেয়ে অণিমা বলল—চলে যাও, বলছি, এক্ষুণি এখান থেকে। লজ্জা করে না আমার সামনে আসতে? নিজের স্ত্রীকে ভুলিয়ে অন্য মেয়ে নিয়ে যে স্ফূর্তি করে বেড়ায়, তেমন স্বামীর আমি মুখ দেখতে চাই না।

স্নানের ঘরের ভিতর ঢুকে অনিমেষ দু' হাত দিয়ে স্ত্রীকে টপ করে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে মেঝেতে শুইয়ে তার পর দরজায় খিল লাগিয়ে দিল।

অণিমা পাগলের মতো হয়ে কাঁদতে লাগল—কেন তুমি আমায় বাধা দিতে এলে? আমি ত তোমার পথ পরিষ্কার করেই দিতে যাচ্ছিলাম? জোর করে কি তুমি আমায় ধরে রাখতে পারবে? তা পারবে না।

স্ত্রীর পাশে মেঝেতে বসে তার হাত দুটি ধরে অনিমেষ বলল—সত্যি বলছি, অণু, আমি চরিত্রহীন নই। কেন তুমি মিছিমিছি আমায় এ রকম সন্দেহ করো? সত্যিই আমি প্রেম করে বাড়ি ফিরতে দেরি করতাম না, দেরি হত অফিসের কাজেরই জন্তে। তার প্রমাণ তোমায় দেখাব বলে আজ সঙ্গে করেই এনেছি।

ওভারটাইমের হিসেবে দেখো, কবে আমি রাত আটটা-ন'টার আগে অফিস থেকে বেরিয়েছি। আর 'নীরা'তে যার সঙ্গে আজ আমাকে চা খেতে দেখেছ, সে আমার মাসতুতো বোন সবিতা, প্রায় আমারই বয়সী। ও মীরাটে থাকে, ইস্কুলে পড়ায়। আমাদের বিয়ের সময়ে ছুটি পায়নি বলে আসতে পারেনি, তাই তুমি দেখোনি। হঠাৎ একটা কী দরকারে দু'তিন দিনের জন্তে কলকাতায় এসেছে, ওর নন্দাইয়ের বাড়ীতে উঠেছে। আজ অফিস থেকে সকাল সকাল উঠে বেরোতেই রাস্তায় ওকে দেখলাম। পথে দাঁড়িয়ে কোথায় কথা বলব বলে 'নীরা'তে চা খাওয়াতে নিয়ে গেছলাম। সেখানে আগে তোমাদের দেখতে পাইনি। দেখতে পেয়ে ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাব ভাবছি, এমন সময়ে তুমি ঝড়ের মতো বেরিয়ে চলে গেলে, আমি কিছু বলবার সময় পেলাম না। তুমি রাগ করো বলে আজ আমি অফিসে জানিয়ে দিয়েছি, ওভারটাইম আর আমি করতে পারব না। সেজন্যে সকাল সকালই আজ বাড়ি ফিরছিলাম; পথে সবিতার সঙ্গে দেখা হয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল।···তুমি আগে আমার যেমন ছিলে, এখনও ঠিক তেমনই আছ অনু। কেন আমার ওপর মিথ্যে সন্দেহ করে নিজে কষ্ট পাও, আর আমাকেও কষ্ট দাও? মরতে যদি তোমার এতই সাধ হয়ে থাকে তা হলে চলো, দুজনে একসঙ্গেই মরিগে। তুমি আমায় ছেড়ে থাকতে পারলেও আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।

অণিমার কেরোসিন-তেল-মাখা দেহখানি জড়িয়ে ধরে আজ অনেক দিন পরে আবার অনিমেষ আদরে সোহাগে তাকে ভরিয়ে দিতে লাগল, আর অণিমা নিজেকে স্বামীর বুকের কাছে এনে তার গলাটি দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এমন দিনে তারে বলা যায়!

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে' এমন দিনে নাকি তারে বলা যায়, 'এই ঘন ঘোর বরষায়'। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু এমনি ঘন ঘোর বরষাতেই হোক আর চোখ-ঝলসানো রোদের আলোতেই হোক, কি দম-আটকানো কুয়াশাতেই হোক, প্রথম আলাপ শুরু হয় আবহাওয়া দিয়ে। আর সেই আলাপই টেনে নিয়ে যায় বহু সুখকর বিশ্রম্ভালাপের পথে। তাই ইংরেজ লেখাপড়া, আদবকায়দার সঙ্গে সঙ্গে কথা কওয়াটাও শেখে। আবহাওয়ার প্রসঙ্গটাও বাদ যায় না।

ভাল আবহাওয়ায়	বরষা-মুখর দিনে
কি সুন্দর দিন! তাই না?	কি যাচ্ছেতাই দিন!
রমণীয়!	ওঃ, অসহ্য!
সূর্য্য···।	বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি!
সত্যিই কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!	আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।
সত্যিই!	আমিও।
কেমন গরম যেন স্বর্গের···।	জুলাইয়ের এই দিনটাই মাটি।
আমার তো মনে হয় সূর্য্যের এই	সব জুলাইতেই।
উত্তাপটা স্বর্গীয়।	১৯৩৬ সালের কথাটা মনে···।
আমারও।	ওঃ, সে কথা আর বল না!
	আচ্ছা, ১৯৩৬ না ১৯২৮?
	১৯২৮ই হবে।
	১৯৩১ সালেও এমনি···।
	ও তো সব বছরেই···।

ইংল্যাণ্ডে কেউই চায় না দিনটা মাটি হোক। তাই ১৯২৮, ৩৬, ৩১ নিয়ে সেখানে অন্ততঃ বাদলা-দিনের হিসেবে কেউ খতিয়ে দেখে না, দেখতে চায় না।

সুভো ঠাকুর

সাত পুরুষ ধরে সুভো ঠাকুর কোলকাতার ছেলে হ'য়েও, ওব কি না বম্বেতে এসে হাইকোর্ট দেখতে হোলো········

তবে ভাগ্য ভালো যে, গরুর গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে! অর্থাৎ কি না, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলীটা। তা'র প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে—বম্বেতে হাইকোর্ট থাকলেও, কোলকাতার মত গরুর গাড়ি আছে কি না সন্দেহ! আর তা যদি বা থাকে, তবে মাসাধিক কাল থাকার পরেও, অন্তত পক্ষে ও'র তো নজরে পড়েনি এক দিনও।

ভি, টি, মানে—বম্বের ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে, সেই সবে মাত্র পা পড়েছে ও'র। মাল-পত্র সেই সবে মাত্র নামিয়েছে কামরা থেকে। তার পর একটুখানি নিশ্চিন্ত হ'তে না হতেই, হাজির এসে টিকিট-চেকার। ও' নির্ভাবনায় ইণ্টার ক্লাশের টিকিটের সঙ্গে ও'র সেকেণ্ড ক্লাশের 'বদল-নামা' খানা আর বুক-করা মালের রসিদটা, বুক ফুলিয়েই দিয়ে দিল তার হাতে। ও-দিকে কুলিরা ততক্ষণ ও'র মালপত্র প্ল্যাটফর্মে জমায়েৎ করা রূপ কর্ত্তব্য সমাপন ক'রে ব্রেক-ভ্যান-এ যে সব জিনিষগুলো আছে, ছুটেছে সেগুলো খালাশ করে আনতে।

সুভো ঠাকুরের সারা শরীরে দু'-রাত্রের ট্রেণ-জার্ণির পুঞ্জীভূত ক্লান্তির পরে, একটা পরম নিশ্চিন্ততার আরাম। থাক, 'নির্ঝঞ্ঝাটে বম্বে পৌছে যাওয়া গেছে' ভেবে একটা অবিমিশ্র আয়াস, সবে মাত্র ও'র মুখে যখন উদ্ভাসিত হব-হব—ঠিক সেই সময় কি না আবার সেই টিকিট-চেকারের আবির্ভাব! ও' দেখল—বুকিং-এর সেই কাগজপত্র আর টিকিট সমেত পুনশ্চ সেই টিকিট-চেকার ও'র ঘাড়ের কাছে ওৎ পেতে! উৎপাত বলে উৎপাত! ততক্ষণে জিজ্ঞাসা শুরু হ'য়ে গেছে—"প্ল্যাটফর্মে জমায়েৎ এই জিনিষগুলো সবই কি ও'র?"

ও' তখন বিরক্তির সঙ্গেই ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, কেন?"

টিকিট-চেকার এবার নিরুদ্বেগ নিশ্চয়তার সঙ্গেই এর জবাবে বললে—"আর কিছু না···বুকিং-এর রসিদে যে ক'টা জিনিষের উল্লেখ আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে তার বেশি। তাই মালগুলো এক বার ওজন করতে হবে।"

আবার ওজন! ও' মনে মনে ভাবল—বম্বের ষ্টেশনে পৌছতে না পৌছতেই যা ওজনের আয়োজন দেখা যাচ্ছে, তা'তে এই 'মাল ওজন' থেকে শুরু করে—ওজন করে চলা, কথা বলা, হাসা এবং কাশা···তার পর শেষ অবধি এই 'ওজন' ওকে কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ওঠাবে, তা হয়তো এক অন্তর্যামীই আঁচ করতে পারেন! ওজনের কথা এমনিতর মনন করতে করতে, ও'র নিজের ওজন যেন ক্রমশই হ্রাস হ'য়ে আসছে আন্দাজ করল।

যাই হোক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দাঁড়িপাল্লার দুর্ঘটনায় মনে মনে দস্তুরমত বিরক্ত হলেও ঘাবড়াবার মত লুক্কায়িত 'বাড়তি ওজন' ঐ মালপত্রের মধ্যে কিছু যে গোপন থাকতে পারে, তা অন্তত ও'র মনে হয়নি তখনো। আর তাই ত ও' সাঁচ্চা আদ্‌মির আস্পর্দ্ধা সহ আস্ফালনের আঙ্গিকেই আলাপ করতে বাধ্য হয়েছিল—সেই টিকিটের টিকটিকি কিনা টিকিট-চেকারের সঙ্গে। ওর ধারণা, কে, পি'র মত ওস্তাদ যখন ওজন করিয়ে রসিদ নিয়েছে, তখন দু-একটা ছোটোখাটো জিনিষ বাড়তি থাকলেও—তার ভার এমন কিছু মারাত্মক হবে না, যার জন্য ফের নতুন কোরে গচ্চা যেতে পারে ও'র গাঁটের থেকে। কিন্তু কে জানতো যে কে, পি, মাল বাবুর হাতে কিছু নগদা মাল দিয়ে, আখেরে মেরেছে ব্যবসাই দাঁওর লিখিয়েছে, জিনিষগুলোর ওজন অল্প করে। আর তাইত ও'র চোখের সামনেই, কলের দাঁড়ি-পাল্লার পাল্লায়, ওর ঐ মালপত্রের ভারগুলো যেন কোন্ মন্ত্র বলে, সাঁই-সাঁই কোরে ইয়া বড়-বড় ওজনদার পাথরের চাইয়ের মতই—ভারী হতে ভারীতর হ'য়ে উঠতে লাগল। ওর চক্ষু তো ছানাবড়া! কি আর করবে? এর পর নিরুপায় হিসেব কোরে সেই বাড়তি ওজনের অঙ্ক অনুযায়ী ও' পয়সা দিতে গিয়ে যা শ্রবণ করল, তা আরো সাঙ্ঘাতিক! আইনত, এই বাড়তি মাল বিনা ওজনে আনার জন্য নাকি ওর সেকেণ্ড ক্লাশ

টিকিটের যে ফ্রি য়্যালাউন্স তাও ও' আর পাবে না। এখন সমস্ত মালের উপরই পুরোদস্তুর মাশুল গুণতে হবে! যা হিসেব করলে দেখা যায়—ও'র পকেট বিলকুল ফাঁক করে দিয়ে গেছে। ক'টা টাকাই বা আর সঙ্গে ছিল ও'র?…তবু মিথ্যে আপশোষ করে সময় নষ্টতে ও নেহাত-ই নারাজ। সমুদ্রে যার বাস, সামান্য বারি-বিন্দুতে ভড়কালে তার চলে? যা সামান্য টাকা ও'র ট্যাঁকে ছিল, তার থেকে হিসেব-কিতেব মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়ালো, তখন সত্যিই যেন মুস্কিল-আসানের আরাম অনুভব করল অন্তরের অন্তস্তলে।

এর পর আর কালবিলম্ব নয়—দুটো বড় বড় ট্যাক্‌সি জোগাড় কোরে, সঙ্গে যা জিনিষপত্র ছিল, তা সব ছাতের মাথায় চাপিয়ে চলল—সেই নম্বর-না-জানা বাড়ির নাম-না-জানা ভদ্রলোকের উদ্দেশে! নিঃসম্বল পকেট—সম্বলের মধ্যে 'নেপিয়ান সি রোড আর মিঃ ভট্টাচারিয়া' এইটুকুই মাত্র যা সম্বল! অথচ সহরের সারা চত্বর চক্রমন ক'রে পাশাপাশি দু-দু'খানা ট্যাক্‌সি—মাল-পত্র বোঝাই—চলেছে যেন বম্বে সহর মাতিয়ে! এমন ভাবে চলেছে—যে, মনে হয়—সেই নম্বর-না-জানা বাড়ির, অজানা ফ্ল্যাটের নাম-না-জানা মালিককে খুঁজে বের করার পুরোদস্তুর বাহাদুরিটি যেমন করেই হোক পকেটে পুরবে!—সত্যিই সে একটা দৃশ্য বটে!

সহর প্রদক্ষিণ করে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে মোটর! ন্যাড়ো ঠাকুর সব ভুলে তখন সহর দেখতেই মশগুল! মনে মনে ও' তখন মেতে উঠেছে, বম্বের সঙ্গে কোলকাতার যেন একটা তুলনামূলক 'রম্য-রচনা' রচনা করতে। এতে ও' উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, দস্তুরমত। বাঙলা বইয়ের বাজারে আজকাল 'রম্য-রচনার' যা হিড়িক চলেছে—তারই ছোঁয়া যেন লেগেছে ওর মনেও। কিন্তু 'রম্য-রচনা' বলতে সঠিক কি যে বোঝায়, তা ও' কিন্তু এগোনো বুঝে উঠতে পারেনি। হয় তো বা ও'র বুদ্ধির দৌড়ে কুলিয়ে ওঠেনি।…তবুও, সেই মানে-না-বোঝা। 'রম্য-রচনারই রং, দেখে যেন এই বম্বে সহরে। সেই ভাষা-সর্বস্ব ঝরঝরে ভাষার মতই প্রথম নজরে মনে হয়—এ-সহরও বুঝি বা রাস্তাসর্বস্ব! রমণীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই রাস্তা, সীঁথি কেটে চলে গেছে বরাবর—'মেরিণ ড্রাইভ': এরই এক ধারে, পাঁচিলের প্যাঁচালো শাড়িতে উদ্ধত উলঙ্গ সমুদ্রকে শান্ত করা হয়েছে, সভ্য করা হয়েছে। আর একধারে, আধুনিক ধরণের 'বাক্‌স প্যাটার্ন' সাজানো। এ 'বাক্‌স প্যাটার্ন' কোলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের 'বাক্‌স প্যাটার্ন' নয়। এ হচ্ছে, বোম্বাই বাড়ির নবতম বাক্‌স-বন্দী আর্কিটেকচার। সার সার স্তূপীকৃত প্যাক্-বাক্‌সের স্থাপত্য—যেন এক আজব দেশে এসে হাজির। তুলনায়, কোলকাতার সঙ্গে এখানকার এই বাড়িঘরগুলো, খোকা ভোলানো খেলনার মতই—কেমন যেন মজার মজার মনে হয় ওর কাছে। পাওডার-মাখা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ভড়ং-এ নিঃসন্দেহে চাকচিক্যময় ওদের আপাদ-মস্তক। রং-এ বাহারে মোড়া চকলেটের বাক্‌স যেন সব। তবে হ্যাঁ, হোতে পারে হয়তো তথাকথিত স্মার্টসেটের কালচার উপযোগী! আবশ্যকতার তাগিদ মেটাতে তৎপর। শস্তা আরামের সৌখিনতায় সিনেমা-সুন্দরীদের মতই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বনেদিপণার বালাই বর্জ্জিত বম্বে সহরের এই বিচিত্র দেহ-ভঙ্গি— রুজ পাওডারের ঘটা সহ মেম সাহেবদের হাঁটু-ওঠা সজ্জার ঢং এই ছিরিছাদ আর ছাঁচে ঢালা।

এর পাশেই ও' মনে মনে তখন মনে করতে চেষ্টা করে—সেই কোলকাতা সহরের গলিস্ত গলির মধ্যের যে কোনো একটা বাড়ির কথা। অতি সাধারণ বালি-খসে-পড়া ইট-বের-করা যার ইমারৎ।··· এমন কি তারও যেন একটা বিশিষ্টতা আছে, ইজ্জত আছে! কতুর হলেও আজও সে বাড়ির মালিককে—'কি রান্না হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে—নবাবের নাতির 'বায়গন কি রোগান' খাওয়ার কায়দায়, গোঁফে তা মেরে তৎক্ষণাৎ 'বেগুন ভাতে'র জায়গায় বলে বসবে হয়তো—"বেগুনের দমপক্ত' হয়েছিল আজ।" 'কড়াইশুটির ডালনা'র জায়গায় বলবে হয়তো—'কড়াইশুটির কালিয়া'। মাছ কেনার পয়সা না থাকায়, মাছের টক্ বাদ পড়লেও, বুকটা চিতিয়ে জানাবে—"আর হয়েছিল, বুঝলে কিনা—যাকে বলে, 'মিছে আমশোলের'—অম্বল।" এ ছাড়া ভাঙা, ধুলো-পড়া সেই মান্ধাতা আমলের আসবাব আলমারিগুলোর দিকে তাকালে একবার, আর কি রক্ষা আছে? বাক্যের দ্বারা স্বয়ং ঠাকুরদাদার বাবাকেই এনে হাজির করবে সামনে। তার পর বলতে শুরু করবে—তখনকার দিনের সুতোনুটি গোবিন্দপুরের পুরাতন সব ইতিবৃত্ত; সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের গৌরবময় আর্থিক উজ্জ্বলতার আজগুবি আরো কত কি গল্প-কথা!

এ ভঙ্গি আজকের দিনের পট-ভূমিকায় ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু হলেও তবু এর একটা বনেদিপণা আছে। যার ইজ্জত এমন কি আজকের দিনেও একান্ত আলাদা। মৃতপ্রায় হলেও ইতিহাসের মর্য্যাদামণ্ডিত। এই আভিজাত্যের, এই বনেদিপণার নিতান্ত অভাব মনে হোলো যেন এখানকার এই নগর-সৌন্দর্য্যে!

এর পর বং-চং-এ বারোয়ারি সুবিধার্থে তৈরি আধুনিক বম্বের এই বণিক-মার্কা বস্তিবহুল ওর মত কোলকাতার এক পাকাপোক্ত আদিম বাসিন্দেকে দেখে, আর যেন সহ্য করতে পারে না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত ছিরকুটে মুখ ভেঙাতে আরম্ভ করে দিয়েছে বলেই মালুম হ'তে থাকে। কি করবে? স্বনামধন্যা সুন্দরী, বোম্বাই সহরের সঙ্গে প্রথম দর্শনে প্রেমেও আর পড়তে পারল কই? তবে অপেক্ষায় রইল—'লাভ য়্যাট্ ফার্ষ্ট সাইট' নয়, 'লাভ য়্যাট্ লাষ্ট সাইট' যদি হয়, তারই আশায়। এতে লোকের আর দোষ কি? সাধে কি আর লোকে কুৎসা কেটে 'কোলকাতার কেঁচো' এই লেজুড় জুড়ে দিয়েছে ও'র নামের সঙ্গে? ও' বলবে—এ ব্যাপারে ও' বিলকুল নাচার। উপরন্তু, আজকালকার ফ্রিডাম অফ স্পিচের যুগে মানুষের মুখ বন্ধ করার মত অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভের কোনো কল্পনাও আপাতত ও'র নেই।

এমন সময় হঠাৎ ট্যাক্সি-চালকের জিজ্ঞাসায় ও'র চমক ভাঙল! শুনলো, ট্যাক্সি-ড্রাইভার ত বলছে যে, নেপিয়ান সি রোডে পৌঁছে গেছে। এখন বাড়ির নম্বরটা জানতে পারলেই নিয়ে যেতে পারবে সেখানে! এইবার সুভো ঠাকুর পড়লো সত্যি সত্যিই প্যাচে। আদতে, বাড়ির নম্বরটাই তো ও'র মনে নেই! নম্বরটাই যদি জানা থাকবে—তবে আর বিপদটা হোলো কোথায়? ততক্ষণে মনের সমস্ত স্থান অস্থান হাঁটকে নয়-ছয় করেছে···হ্যাঁ, এই তো—এইবার মনে পড়েছে! এতক্ষণ পরে যাক শেষ অবধি নম্বর না হোলেও, বাড়ির নামটাতো মনে পড়েছে। হ্যাঁ, বাড়ির নাম সেস্যুন বিল্ডিংসই বটে···এ বিষয়ও স্থির নিশ্চিৎ। বাড়ির নাম যখন মনে পড়ে গেছে, তবে আর কি? এখন তো অর্দ্ধেক মুস্কিল আসান হ'য়ে গেছে ও'র। ডুবতে বসলে, মানুষ যেমন খড়-কুটোকেও আঁকড়ে ধোরে বাঁচতে চেষ্টা করে—ও' তেমনি কোরেই যেন আঁকড়ে ধরল ঐ বাড়ির নামটাকে। এর উপর ফ্ল্যাটের মালিকেরও মুণ্ডু-বিহীন যে নামটুকু জানা আছে, সেটুকুও পাছে আবার ভুলে যায় যদি—তাই, 'মিঃ ভট্টাচারিয়া,' নামের এই অসম্পূর্ণ ফালাটুকু নিয়েই জিবের আগায় জপমন্ত্রের মত নাড়াচাড়া করতে লাগল অনবরত।

তারপর, চলল এবার নাম ধরে সেই বাড়ি খোঁজার পালা। প্রত্যেকটি বড় বাড়ির সামনে ঐ দু-দুখানা ইয়া ট্যাক্সি থামিয়ে—সেস্যুন বিল্ডিংস্-এর সন্ধান শুরু হোলো। তাতে মাঝে মাঝে কৌতূহলী পথচারীদের ভীড় জমল রাস্তায়। 'সিন্ ক্রিয়েট' হোলো কিছুটা। কিন্তু সেস্যুন বিল্ডিংস-এর সন্ধান আর মিলল কই? বাড়ির নাম কিম্বা সেই ফ্ল্যাটের মালিকের নাম—দুটোর মধ্যে একটা নামও ওর কাজে লাগল না আপাতত। সেস্যুন বিল্ডিংস্ আর মিঃ ভট্টাচারিয়ার হদিস মিলল না কোথাও। সবার মুখেই যেন এক রা। যাকে জিজ্ঞেস করে—একের পর এক, সবাই সেই একই উত্তর দেয়—এ অঞ্চলে সেস্যুন বিল্ডিংস তো কোথাও নেই। আর 'ভট্টাচারিয়া সাব' এই সব বাড়ির মধ্যে কোনো একটাতে হয়তো থাকলেও থাকতে পারেন! কিন্তু বাড়ির নম্বর, ফ্ল্যাটের নম্বর ইত্যাদি সঠিক জানা না থাকলে, এখানে তার সন্ধান পাওয়া একরকম অসম্ভব বললেই চলে।

সত্যি, বোকা না বোকা! একবার নয় দু'বার নয়—সাত সাত বার সাত ঘাটের জল খেয়েও এতো বোকা থাকতে পারে মানুষ?—এ যে বিশ্বাসই হয় না। তা নইলে, ধরা যাক বম্বে নয়—কোলকাতা সহরই! যদি কেউ বে-পাড়ায় গিয়ে, নম্বর না জেনে, কেবল মাত্র বাড়ির নাম 'দাঁ বিল্ডিংস', এই ঠিকানা সম্বল কোরে—মিঃ দাশ গুপ্ত নামক জনৈক ভদ্র মহোদয়কে গরু খোঁজান খুঁজে বেড়ায়—তা হলেই কি পাত্তা পাবে তার? এই কমনসেন্স-ও যেন সুভো ঠাকুর বম্বে নেমে হারিয়ে ফেলতে বসেছে আজ। আদতে সত্যি সত্যিই ও' তখন প্রমাদ গুণছে। মনে মনে ভাবছে—আচ্ছা বিপদেই পড়ল যা হোক। এক বিপদ থেকে আর এক বিপদে হাত-সাফাই হওয়ার নামই দেখা যাচ্ছে জীবন। এমন সময় হঠাৎ কে যেন মনে করিয়ে দিল—বম্বে থেকে কোলকাতায় ফিরে রহমান সাহেব সেই সবে-ঠিক-কোরে-আসা ফ্ল্যাটের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হ'য়ে একদা যে বলেছিলেন—"সমুদ্রের গায়।" 'মেজেষ্টিক হোটেল থেকে এক পা।' 'বম্বে মিউজিয়ামের ঠিক মুখোমুখি। আর জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধা' বম্বে সহরের সেস্যুন বিল্ডিংস-এর সর্ব্ব উচ্চ শিখরে বিরাজ করছে সে গন্ধর্ব্বলোক—আর সেইখানেই তো তিনি আমাদের অস্থায়ী আবাস ধার্য্য করে এসেছেন আপাতত।"······এই কথাগুলো ও'র মনে পড়ে যেতেই ও' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে—

"আচ্ছা ম্যাজেষ্টিক হোটেলটা কোথায়? ম্যাজেষ্টিক হোটেল কি এই নেপিয়ান সি রোড অঞ্চলেই?"

ড্রাইভার বললে—"নেপিয়ান সি রোডে তো ম্যাজেষ্টিক হোটেল নেই। ম্যাজেষ্টিক হোটেল তো আমরা ফেলে এসেছি অনেকক্ষণ আগে।"

এবার আর যাবে কোথায়!—আবার সাজ-সাজ রব পড়ল! 'চলো, চলো দিল্লি চলো'র মত 'চলো চলো ম্যাজেষ্টিক হোটেল চলো'—সেখানেও এক বার সন্ধান কোরে' দেখা যাক।—কথায় বলে, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"

ড্রাইভাররা বললে—"আবার তা'হলে সেই ষ্টেশনের পথেই ফিরে যেতে হবে। 'তাজমহল,' 'মেজেষ্টিক,' ও-সবই তো কাছাকাছি··· কিন্তু বাবুজি, নেপিয়ান সি রোডে আসার জন্যেই ভাড়া ঠিক হয়েছিল, এখন ফিরে যেতে হোলে ডবল ভাড়া লাগবে।"

ও'র অবস্থা এমনিতেই তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' কে আর সেই অবস্থায় ড্রাইভারদের সঙ্গে দরাদরি নিয়ে চুলোচুলি করবে? পকেটে পয়সা নেই? তা নাই বা রইল! জোড়াসাঁকোর বদ্ অভ্যাসগুলো কিছুতেই যেন ওর অঙ্গ থেকে গেল না। এ-যেন সেই—'মরেও মরে না, এ কেমন বৈরি!' বাড়ি ফিরে সেই যে গাড়ি ভাড়া উপর থেকে চেয়ে পাঠিয়ে দিত ছোটো বেলায়, সেই যে ভি, পি, তে আসা-যাওয়া করা অভ্যেস হয়ে গেছে—সত্যিই সে অভ্যেস আর ও'র গেল না। এখনো সেই একই কায়দা। খালি, এখন আর গাড়ি ভাড়া উপরে থেকে পাঠানো সম্ভব হয় না। এখন যে ফ্ল্যাট-এ ও থাকে—তার উপর তলাই নেই, তো সে-উপরে হাত বাড়াবে কি ক'রে?—মাথা থাকলে তো মাথা ব্যথা! তাই ত' এখন, যার বাড়িতে অথবা যেখানে যায়, সেখানেই সটান রিক্শ অথবা ট্যাক্সি চড়ে এসে, ভাড়াটা ধার কোরেই শোধ করে। অবিশ্যি এই রকম করতে গিয়ে বিপদ যে হয়নি—তা নয়। অন্তত এক দিন যা বিপদে পড়েছিল, সে আর কহতব্য নয়। অবান্তর হলেও, ওর যেন আর এক বার মনে পড়ে যায় সেই ক্যালক্যাটা ক্লাবের লাঞ্চ-পার্টির ঘটনাটা:—বম্বে থেকে কে, কু, গান্ধি এসে কোলকাতার আর্টিষ্টদের ক্যালক্যাটা ক্লাবে, এক বেজায়-বড় বাজার-গরম-করা পার্টি দিয়েছে। ফেডারেশান অফ আর্টিষ্ট হবে—তারই সূত্রপাত। বিরাট লাঞ্চপার্টি। খাবারে হয়েছে পাহাড়, আর, বিয়ার বয়েছে নদীর মত। চুনোপুঁটি থেকে চাঁইরা সবাই জমায়েৎ সেখানে। সুভো ঠাকুর আর ম—দে এক সঙ্গে জুটেছে আবার সেখানে। খাওয়ার সঙ্গে দাওয়াও হয়েছে দারুণ। তার পর ফেরার সময় কে, কু, গান্ধি, ওদের গাড়িতে কোরে পৌঁছে দেবার কথা যখন প্রস্তাব করল, তখন চাল মেরে ওরাই তো বললে—'ধন্যবাদ ও'রা অন্য দিকে যাচ্ছে।' অথচ, সুভো ঠাকুর ভাবছে ম-দের কাছে নিশ্চয়ই কিছু আছে। আর ম-দে ভাবছে—সুভো ঠাকুর কি আর শূন্য পকেটে বেরোবে!—এমনি কোরে ওদের দু'জনের পকেটের অবস্থা দু'জনের কাছে যখন সত্যি সত্যি ধরা পড়ল—তখন চোখের সামনে, দুপুরের গড়ের মাঠের মতই তা খাঁ-খাঁ করছে। তখন 'ইট্ ইজ টু লেট'। কে, কু কখন চলে গেছে···

সুভো ঠাকুর দমা তো দূরের কথা, উল্টে ম-দে কে তখন উস্কে দিয়েই বললে—মা ভৈঃ! সুশীল গুপ্তর অফিস এই তো সামনেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া যাক ওর অফিসে—সব প্রবলেম শলভ হয়ে যাবে।

তার পর ট্যাক্সি নিয়ে একজোড়া অলুক্ষুণে পৌঁছল যখন ওর অফিসে—তখন দেখে, কা কস্য পরিবেদনা। উল্টে মুখের উপর দরজাটায়, চোখের উপর প্রকাণ্ড এক কুলুপ ঝুলছে!

নিজ নিজ ভাগ্যকে দু' পা দিয়ে দলন করতে করতে করতে ও'রা তখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা, চৌরঙ্গি থেকে পার্ক ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট থেকে পার্ক সার্কাস, এমনি কোরে সাত আট, জায়গায় ঘুরলো। কিন্তু যেখানেই যায় সেখানেই শোনে—"সাব মেমসাব বাবা লোক কোহি ভি নেই হ্যায়—সব্ বাহার।" এদিকে ট্যাক্সির মিটার, মিনিটে মিনিটে লাফিয়ে চলেছে। আদতে সেদিন যে রবিবার, সেটাই ভুলে গেছিল ও'রা এক দম। ম-দে নার্ভাস হ'লেও সুভো ঠাকুর কিন্তু অবিচলিত। হুঙ্কার দিয়ে হুকুম করে "ঘুমাও গাড়ি—শ্যামবাজার যায়গা।" তার পর শ্যামবাজার এলাকায় অ-বাবুর বাড়িতে এসে দু'টিতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মিটারে তখন, পনের টাকা বার আনা। তার পর সেখানে চা-টা খাওয়া যখন শেষ হয়েছে তখন কে যেন এসে খবর দিল—ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করছে—'থাকবো না ছেড়ে দেবেন?' তখন তো হুঁস হোলো ওদের।

বলা বাহুল্য—এতে অ-বাবুর কাছে হাওলাত-এর অঙ্ক সামান্যই একটু বাড়তে বাধ্য হয়েছিল মাত্র। আর তার পরেই তো সে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে ওরা উঠলো গিয়ে আবার একটা নতুন ট্যাক্সিতে···

এ অভিজ্ঞতা যা'র অহরহ—তার পকেট ফাঁকের দরুণ ফাঁপরে পড়ার ভয়?—একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আর বলতে গেলে কি—এই অতীত ঘটনা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ও' যেন আবার নতুন কোরে বুকে বল পেয়ে গেছে অনেকখানি! আর তাই ত' মনে মনে ও' তখন ঠিক-ও করে ফেলেছিল যে, এ অবস্থায়, হয় ফ্ল্যাটে নয় হোটেলে, যেখানেই উঠুক না কেন—'টাকা-পয়সা পরে হিসেব কোরে দেবো'—এই বলে, মিলিটারি মেজাজে ট্যাক্সি-ভাড়াটা তো আগে চুকিয়ে দেবার হুকুম করবে; তার পর কোলকাতা থেকে রহমান সাহেব আর কে-পি তো আসছেই, তখন শোধ করে দেবার ব্যবস্থা হবে সব। তাইতো ট্যাক্সিওলাবা ডবল ভাড়া লাগিবে বলতেও—ও' মোটেও ঘাবড়ালো না যেন!

যাই হোক, গাড়ি এবার গতি নিয়েছে। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে আবার ফিরে চললো—যে পথে এসেছিল সেই পথেই। তার পর কিছুক্ষণ বাদে ম্যাজেষ্টিক্ হোটেলের সামনেই গাড়ি যখন এসে থামল—ও' তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। আবার চলল সেই রাস্তার ভদ্রলোক ধরে ধরে শুধোনোর পালা। কিন্তু সেস্যুন বিল্ডিংস্-এর সন্ধান সঠিক কেউ দিয়ে উঠতে পারল না। তবে তাদের কথায় আন্দাজে অনুমান করল যে, দূরে নয়, বাড়িটা কাছাকাছি-ই কোথাও হবে।

স্নান নেই, খাওয়া নেই—হলেই বা ট্যাক্সিতে, আর কাঁহাতক এই রদ্দুরে টোঁ-টোঁ করা যায়? এবারে ও' মরিয়া হ'য়ে গিয়েই ঠিক করল—সি, সি, আই? অর্থাৎ ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়ায় টেলিফোন করে এক বার শেষ চেষ্টা করে দেখবে—'মিঃ ভট্টাচারিয়ার' হদিস হয়তো সেখানে পেলেও পেতে পারে। কারণ, রহমান সাহেব, ফ্ল্যাটের মালিক মিঃ ভট্টাচারিয়ার এক বার পরিচয় দিতে

গিয়ে বলেছিলেন যা—তাতেই তো জানা যায়, 'মিঃ ভট্টাচারিয়া' যুদ্ধের বাজারে ছিলেন মিলিটারিতে কর্ণেল পদবীধারী—তবে এখন নাকি সি, সি, আই-এর সচিবের পদ অলঙ্কৃত কোরে আছেন।

সি, সি, আই-এ টেলিফোন করার বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই ও' আবার গাড়িতে উঠে বসল। তার পর একটু এগুতেই রাস্তার মোড়ে জুয়েলারির জমকালো একটা দোকান দেখে, নেমে পড়ল গাড়ি থামিয়ে। জুয়েলারির দোকান যখন, তখন হয়তো টেলিফোন আছে—এই আন্দাজেই নামল ও' আদতে। দোকানে ঢুকতেই এক কোণে বসে-থাকা বুড়ো দোকানদার চশমাটা নাকের শেষ প্রান্ত থেকে টেনে তাকে স্বস্থানে বসিয়ে ও'র ঐ রুক্ষ দাড়ি-গোফ-ওয়ালা নিদারুণ চেহারায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"কি চাই?"

ও' তখন দোকানদারের বাঁ পাশে রাখা টেলিফোনটা নজর কোরে নিঃসংশয় আশ্বস্ত হয়েছে। তাই পরিচয় দেবার ভঙ্গিতেই ভূমিকা রচনা কোরে বলে যে, ও কোলকাতা থেকে আজকের মেল্-ট্রেণে বম্বে এসে পৌছিয়েছে। রাস্তা-ঘাট ভালো জানা নেই। এখানকার এক দোস্তকে টেলিফোন করবে—তাই টেলিফোনটা এক বার ব্যবহার করার অনুমতি চায়। তার পর মরিয়া হ'য়ে শেষ চেষ্টার মতই হঠাৎ ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—আচ্ছা, সেস্যন-বিল্ডিংসটি কোথায় বলতে পারেন কি?

উত্তরে দোকানদার বললে যে, হ্যাঁ, টেলিফোন তো বাবুজি জরুর ব্যবহার করতে পারেন—আর সেস্যন্ বিল্ডিংস? সে তো এই এক-পা। এই চক্করটা ঘুরলেই পাবেন—র‍্যাম্পার্ট রো-এ।

ও তখন আশায় উত্তেজিত হয়ে আবার শুধালো যে, ওখানে কর্ণেল ভট্টাচারিয়া কিম্বা মিঃ ভট্টাচারিয়া নামে কেউ বাঙালী থাকেন কি?

দোকানদার বললে—হাঁ, হাঁ, এক জন বাঙালী থাকেন বটে ঐ সেস্যন বিল্ডিংস-এ। তাঁর স্ত্রী ছবি আঁকেন, আর্টিষ্ট! কিছুদিন আগে তাঁর একটা এক্‌জিবিশনও হয়েছিল, এই জাহাঙ্গির আর্টগ্যালারিতে।

এর পর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে যেন তর সয় না ওর। যেমন ঝড়ের মত ঢুকেছিল, তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে উঠলো গিয়ে গাড়িতে। সি, সি, আই-এ টেলিফোন করার কথাটা ইস্তক ভুলেই গেল এক দম।

যাক্, এবার ও' সশরীরে সেস্যান বিল্ডিংস-এর একেবারে সামনে এসেই হাজির! আর কি? বাড়িটা পাওয়া গেছে যখন, তখন ফ্ল্যাটের সন্ধান পেতে আর দেরি হবে না বেশি। ফুটপাতের উপর গাড়ি-বারান্দা বের করা সেকেলে ঢং-এর বনেদি বাড়ি! যাক্, মেরিণ ড্রাইভের রংচং-এ চক্‌লেট বক্স নয়। বাঁচোয়া বলে বাঁচোয়া! গাড়ি থেকে নেমেই সর্ব্বাগ্রে ভগবানকে দু' বাহু তুলে ধন্যবাদ দিল। বম্বের কফিন মার্কা আধুনিক আর্কিটেক্‌চারের অকথিত অত্যাচারের হাত থেকে শেষ অবধি রক্ষা পেয়েছে তাহলে।

কোলকাতার অফিস-গদ্দি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আশে-পাশে কিম্বা ডালহাউসি অঞ্চলের অলি-গলিতে অবস্থিত কোনো মান্ধাতা আমলের অট্টালিকার সঙ্গে এ বাড়ির কিছুটা আদল আসলেও—ও' বেঁচে গেছে। একমাত্র সেকেলে বলেই বেঁচে গেছে এ-বাড়িতে। বাপ্‌স্! হালফ্যাসানি বোম্বাই-বাড়ির নতুনত্বের নিমর্ম নির্য্যাতনে নিত্য বিষম খেতে খেতে বেঘোরে প্রাণ হারানোর চেয়ে অনেক ভাল এই বাড়ি। ঐ সব বাড়ির যেকোনো একটাতে থাকতে হলেই হয়েছিল আর কি!—যে যাই বলুক, দম আট্‌কেই অক্কা পেত নির্ঘাত।

আহ্লাদে আটখানা, সামনের ক'টা সিঁড়ির ধাপ উঠে যেতেই, এবারে একেবারে লিফট-এর সামনে এসে হাজির। তার পর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লিফট-ম্যানকে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—যে, ভট্টাচারিয়া সাহেব—কর্ণেল ভট্টাচারিয়া—এইখানে, এই বাড়িতেই কি অধিষ্ঠান করেন?

উত্তরে লিফট-ম্যান বললে—"হ্যাঁ, তবে সে তো ছ'তলার উপর"

···যাক্, শেষ অবধি পাওয়া গেছে তাহলে ভট্টাচারিয়া সাহেবের ফ্ল্যাট—'সব ভাল যার শেষ ভাল!'

এবারে লিফট-এ চড়ে ছতলার উপর সটাং সেই ফ্ল্যাটের সামনে এসে হাজির। দরজার এক পাশে লেটার-বক্সটার গায়েই কলিং বেল। ও' তার ছোট্টো বোঁটার মত বোতামটা তখন টিপে ধরল একটা নিবিড় নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই। সঙ্গে সঙ্গে সিংহনাদের স্বায় দু'জোড়া কুকুরের বাঘা কণ্ঠস্বর বাড়ি কাঁপিয়ে তুলে ওকে সম্ভাষণ জানালো। ভাগ্যিস দরজাটা বন্ধ—আর সম্ভাষণটা দরজার ওধার থেকেই হয়েছে! কই, রহমান সাহেব ফ্ল্যাটের মালিকের সারমেয়-প্রীতির যে এমন একটা দুর্দান্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে—সে সম্পর্কে একটুখানি সামান্য ইঙ্গিতও কখোনো করেছিলেন বলে তো ও'র স্মরণ হোলো না!

শোনা যায়—অতীত যুগের তখনকার বর্ব্বর সমাজের অন্তর্ভুক্ত সেই ভারতীয় আশ্রমে, লালিত হোতো হরিণশিশু। আর এখনকার সভ্য-ভব্য-নব্য গৃহস্থাশ্রমে দেখা যাচ্ছে পালিত হয় কুকুর-শাবক! সামান্যই পার্থক্য বটে, তথাপি আকাশ-পাতাল প্রভেদ।—কে বলে আমাদের উন্নতি হয়নি? অবশ্যই আমাদের উন্নতি হয়েছে—কুরঙ্গিণী থেকে কুকুর! বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতার সীমানাভুক্ত! এ কি কম কথা?

ততক্ষণে, সস্নেহে এবং অতি সমাদরের সেই সারমেয়-সঙ্ঘকে শান্ত-শিষ্ট-শৃঙ্খলিত কোরে, বেয়ারা ও'কে দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে এসেছে।

এই ছ'তলার উপর উঠে ও' তখন কিন্তু বীর তেনজিং-এর এভারেষ্ট জয়ের অহঙ্কার অনুভব করতে লাগল অন্তরে। তার পর নজরে পড়ল—সামনের অর্ধেক ঢাকা ছাত-কাম্ বারান্দার উপর সুসজ্জিত লম্বা টেবিল—চার ধারে তার ছোটো ছোটো কুশান-লাগানো বেতের চেয়ার। দূরে এ-দিকে ও-দিকে দু'-চারটে পুরোনো পাথরের ভাঙা-চোরা মূর্ত্তি। লতা আর ফুল গাছে ভরা সারা জায়গাটা, গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় দিতে লাগল।

এই সারমেয়-সঙ্কুল আবাসের প্রতি ও'র মন শুরুতে প্রতিকূল থাকলেও এবার তা যেন আবার অনুকূলে আসার আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছে। ও' আস্তে আস্তে বারান্দায় এগিয়ে আসে। তার পর শরীরটাকে আরামসে এলিয়ে দেয় একটা চেয়ারে। ছ তলার উপর সমুদ্রের সেই অজস্র ঠাণ্ডা হাওয়ায় দু' দিনের ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে গেল ও'র।

এমন সময় মেম্ সাব কি না মিসেস ভট্টাচারিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখে—ও' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বিলকুল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বনে গেল······এ তো টুকু! টুকুই তো—আরে এ যে ও'র সম্পর্কে ভাইঝি—ও'র পিসতুতো ভাই মদনদার মেয়ে—টুকু যে!

[ক্রমশঃ।

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

"জুয়া খেলা যে, যে-কোন মানুষের পক্ষেই ক্ষতিকর—সামাজিক দিক থেকে, আর্থিক দিক থেকে, এমন কি নিজের মানবিক সত্তার প্রকাশের দিক থেকেও, এ-কথা প্রত্যেক দেশের শাস্ত্রকার এবং ধর্মগুরুরা বার বার করে বলে গেছেন, কিন্তু তবুও মানুষ এতটুকু সজাগ হয়নি, সচেতন হয়নি কেন? কেন যুগের পর যুগ ধরে তারা ছুটেছে অপ্রত্যক্ষ ভাগ্যের সঙ্গে লড়াইয়ের উত্তেজনা জনিত আনন্দলাভের মোহে? কেন মানুষ সচেতন হয়নি—কেন তারা নিজের সর্বনাশের কথা জেনেও সাবধান হতে শেখেনি?" মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমারই পরিচিত এক শিক্ষিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোক স্বনামধন্য পুরুষ, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত—সাহিত্যিক হিসাবে ভারত-জোড়া নাম, এমন কি ভারতের বাইরেও তিনি অপরিচিত ন'ন।

আমি বললাম: সামাজিক জীবনে অসমতা এর জন্য খানিকটা দায়ী, এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু এই বিক্ষোভ থেকে সৃষ্ট আত্মদাহের পরিণাম যে সর্বনাশ, এ কথা ত' আর কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না!

ভদ্রলোক নিজে এক জন জুয়াড়ী। রেসে যান, ফ্লাশ খেলেন—কিছুদিন শেয়ারের বাজারেও ঘুরাঘুরি করেছিলেন। বললেন: তোমার সমাজ থেকে অসমতা যত দিন না যাবে তত দিন তুমি কেমন করে আশা করো যে, সাধারণ মানুষকে তুমি জুয়া খেলা থেকে বিরত করতে পারবে? যে গরীব আছেই সে যদি ধনী হবার আশায় রেসের মাঠে সর্বস্ব খুইয়ে আরো গরীব হয়, তাতে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে খুব বেশী কিছু রদবদল হবে কি? তার এমনিতেই ত' ভাগ্য-পরিবর্তনের কোন সহজ সম্ভাবনা নেই—তাই সে যদি আর কোন উপায়ে অবস্থা উন্নতির পথ না দেখে এই পথে তার আত্মতৃপ্তির একটা সুযোগ নেয়, তাতে তোমার বাধা দেবার কোন অধিকার আছে কি?

আমি জানি এবং শুনেছিও যে, জুয়াড়ীরা নিজেদের মনোবৃত্তিকে সমর্থন করবার জন্য এই ধরণের জটপাকানো কথার উত্থাপন করেন এবং সত্যই হঠাৎ এই ধরণের প্রশ্নের এক কথায় কোন জবাবও দেওয়া যায় না। কারণ, এর জবাবের জন্য আমাদের অনেক গভীরে যেতে হবে। জুয়াড়ীদের এই মনোবৃত্তির জন্য প্রত্যেক দেশের ধর্মগুরুরা, শাস্ত্রকারেরা এবং সমাজ-সংস্কারকরা অনেক অংশেই দায়ী। কারণ তাঁরা সব সময়ই এটা ভাল নয়, এটা শাস্ত্রের নিষেধ, এটায় মানুষ অধঃপাতে যায়, এই কথাই বলেছেন। কিন্তু কেন নিষেধ, কেমন করে মানুষ নিশ্চিত ভাবে ধাপে ধাপে অধঃপাতে যায় কিংবা কেমন করে মানুষের ভাল সত্তাকে নষ্ট করে মন্দের প্রাধান্য জাগে—সে কথা কোন জায়গায় তেমন স্পষ্ট ভাবে বলেন নি। আজকের মানুষ যুগ-প্রভাবেই হোক বা বিবর্তনের ফলস্বরূপই হোক, যুক্তি বিনা কোন বক্তব্যকেই স্বীকার করতে বা মানতে চায় না। ওদিকে জুজু আছে, যেও না—এ কথায় আজকের ছেলেরা আগেকার ছেলেদের মত ভয় পায় না বরং তারা উঁকি দিয়ে দেখতে চায়, সত্যি জুজু আছে কি না কিংবা জুজুটা কেমন। তাই যাঁরা এক দিন কেবল উপদেশ দিয়ে মানুষকে পাপ থেকে, অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং যে চেষ্টার ধারা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত হয়ে এসেছে, তার ফলে মানুষের পাপবৃত্তি এবং অপরাধপ্রবণতা এতটুকু কমেছে বলা যায় না। কিন্তু বিবর্তনকে যদি স্বীকার করতে হয়, তা হলে এত দিনে মানুষের এই দিকের অনেক উন্নতি হওয়া উচিত ছিল না কি?

কেন হয় নি, তার ছোট্ট একটি কারণ আছে। মানুষ নিজেই নিজেকে কখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। ধর্মগুরুরাও ঠিক এই মনোভাব নিয়েই উপদেশ দিতেন। যেমন তাস খেলা যে কেবল অবসর বিনোদন হিসাবেই পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে চলতে পারে, এ কথা যাঁরা এই ভাবে অবসর বিনোদনের পক্ষপাতী নহেন, তাঁরা কিছুতেই স্বীকার করেন না! ইংরেজীতে এই সম্বন্ধে মজার একটা প্রবাদ আছে—'No gaining, cold gaming'

জুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্য বহু জায়গা থেকে বহু লোক মহাত্মা গান্ধীকে বহু বার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু মহাত্মাজীর মত লোকও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে সাহস পান নি। তিনি বলেছেন: **I know that many men have been ruined on the race course. But I must confess I have not had the courage to write anything against it. Having seen even an Aga Khan, prelates, viceroys, and those that are considered the best in the land, openly patronizing it and spending thousands upon it, I have felt it to be useless to write about it. [Young India, 27-4-21]**

মনুস্মৃতি থেকে যে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে, কাশীর ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার পণ্ডিত ভগবান দাস, মহাত্মাজীকে এ বিষয়ে আন্দোলন করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তা হল এই:

রাজা তাঁর রাজ্য থেকে জুয়াকে নির্বাসিত করে রাখবেন। কারণ, জুয়া রাজ্য এবং রাজার ধ্বংস সাধন করে। (২২১)

জুয়া খেলা এবং বাজী ধরা দিনের আলোয় ডাকাতি করার মত, সুতরাং রাজা সব সময়ই চেষ্টা করবেন, এই পাপকে দমিত করবার জন্য। (২২২)

যে জুয়া খেলে বা যে অপরদের জুয়া খেলায় সাহায্য করে, তাকে রাজা দণ্ডিত করবেন। এমন কি এর জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যাবে। প্রয়োজন হলে জুয়াড়ীদের দেশ থেকে নির্বাসিত করতেও পারবেন। (২২৪-২২৮) [ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৫-২১]

কিন্তু মনোবিজ্ঞানী বলেন: এই ধরণের নিষেধবাক্য মানুষের ব্যসন প্রবৃত্তিকে দূর করা বা দমিত করা দূরে থাক, তাকে আরো প্ররোচিত করে। যতক্ষণ না সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ মন কিছুতেই তা মেনে নেবে না, হৃদয়ের উপর তার কোন ছাপ পড়বে না। তাঁরা বলেন: **False lights and subtleties, however spacious, will never dissipate the illusions produced by favourite passions. Such passions, indeed, acquire new force as soon**

as plausible pretext for their indulgence is discovered in the weakness of the arguments with which they are assailed, while, by attacking them in a proper manner, he who has been deluded by them may be induced to open his eyes to the truth, and to perceive his errors. If, by such means, a reformation is not effected, it is in consequence of the same obstacles which render unavailing whatever may be alleged against things which are, from their very nature, unquestionably evil.*

যুক্তির দিক থেকে ধরতে গেলেও, গোঁয়াটে রাজনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের বুকনি ছাড়া জুয়াড়ীদের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু বলবার নেই, একথা এর আগে আমি বলেছি। কোন ঘোড়া রেস জিতবে একথা যেমন নিশ্চিত করে বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় (কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেণার ছাড়া), আপনি যে ভাল তাস পাবেনই এ কথা তাস সাজাবার ফন্দী জানা না থাকলে আপনার পক্ষে যেমন বলা সম্ভব নয়, তেমনি আপনি যে জুয়ায় জিতবেনই এ কথাও আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। জুয়ায় জিতে বড়লোক হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে যে কটি আপনারা জানেন, তার অনেক কোটি বেশী লোক ভিখারী হয়েছে এই জুয়ার নেশায়, পাগল হয়েছে, চোর-ডাকাত-পকেটমার হয়েছে। কেমন করে? একবার নিজের দিকে তাকান। যবে থেকে আপনি জুয়াখেলা আরম্ভ করেছেন, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনযাত্রাকে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরুন। দেখুন ত' আপনি ঠিক তেমনি কর্মঠ, তেমনি কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি আত্মত্যাগী, তেমনি সৎ আছেন কি না!

একথা আমি বলি না যে, সামাজিক মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমাদের অবিরাম পরিশ্রম করেই জীবন কাটাতে হবে, বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই বা চিত্তবিনোদনের অধিকার নেই আমাদের! উপরন্তু জীবন যাতে একঘেয়ে না হয়ে যায়, তার জন্য আনন্দ সংগ্রহের অধিকার আছে সকলের। কিন্তু সর্বনাশের সুরু এইখানে। আমরা আনন্দ সংগ্রহের জন্য যে মাধ্যমগুলি গ্রহণ করি, সব সময় সেগুলি শেষ পর্যন্ত আনন্দদায়ক থাকে না। যেমন ধরুন আমরা কেউ কেউ বেড়াতে ভালবাসি, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলতে ভালবাসি, কেউ ভালবাসি সাঁতার কাটতে, কারো বা মাছ ধরা ভাল লাগে, কারও বা অবসর সময়ে গান গাইতে, বই পড়তে ভাল লাগে আবার কেউ বা তাস খেলি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে খেলা—এগুলি এমনি খেলা হবে, না কোন রকম বাজী রেখে খেলা হবে? যখন এগুলি কেবল অবসর বিনোদন হিসাবেই খেলা হয় তখন তার মধ্যে কোনরকম গ্লানি থাকে না—এগুলি তখন দেহের ও মনের স্বাস্থ্য পরিপোষক হয়ে ওঠে, কিন্তু খেলার স্বাভাবিক সরল আনন্দ লাভের উপরে যখন একটু 'ক্রোস্ পয়সা' করবার জন্য বাজী ধরা হয়, তখন খেলার উত্তেজনা যেমন বাড়ে তেমনি গ্লানিরও সৃষ্টি হয়। অনেকে অবশ্য বলেন যে, যদি সে-কাউকেই নির্বিচারে আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করবার অধিকার আমার থাকে, তাহলে এমনি

খেলায় যে আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান বা পটু তাকে আমি যদি আমার চেয়ে তার ভাগ্য ভাল হওয়ার জন্য বা আমার চেয়ে অধিকতর পটু হওয়ার জন্য কিছু দিই, তাতে আপত্তি করবার কি আছে? যদি আগে থেকে পরস্পরের মধ্যে এমনি বাজীর একটা অঙ্ক স্থির করে নেওয়া হয়, তা হলে সামাজিক আইনের দিক থেকেও তাকে বে-আইনী বলা যায় না। কারণ, প্রত্যেক সামাজিক মানুষেরই এই সিদ্ধান্ত করবার অধিকার আছে যে, কি দামে বা কোন অবস্থায় সে অঙ্ককে তার অধিকারের একটা অংশ দিতে পারে। তা ছাড়া হার-জিতের সমান সম্ভাবনা থাকায় জিতের টাকা গ্রহণে আইনত কোন বাধাই থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে খেলা এক রকমের চুক্তি এবং প্রত্যেক চুক্তিতেই চুক্তিকারীদের পারস্পরিক সম্মতিই চূড়ান্ত আইন (this is an incontestable maxim of natural equity), এর উপর কারও হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।

এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখতে হবে। খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে স্বীকৃত চুক্তিই চূড়ান্ত, এর উপর আইনের কোন হস্তক্ষেপ চলবে না, এ কথায় বুঝতে হবে যে, যদি কোন বিবাদের সৃষ্টি হয়, তখনও তারা কোন আইনের আশ্রয় নিতে পারবে না। সাধারণত এমন চুক্তি লঙ্ঘন কদাচিৎ ঘটতে দেখা যায়, তবে একেবারে যে ঘটে না একথা বলা যায় না। এর জন্য-মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। সুতরাং আইনের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় যে, কারই এমন কোন চুক্তি করার অধিকার নেই যা দেশের প্রচলিত আইন বা সামাজিক বিধির পরিপন্থী। যেমন ধরুন, একদিন দু' জন ধনী যদি একটি খড়ের গাদার কাছে গিয়ে বাজী ধরে যে, দু' জনের মধ্যে যে গাদা থেকে সব চেয়ে বড়ো খড় টেনে বার করতে পারবে, সে অপরের সমস্ত সম্পত্তি পাবে। এখন, নিজের সম্পত্তি অপরকে দানের অধিকারের দিক থেকে স্বেচ্ছায় কিংবা এই বাজীর পরস্পরের মধ্যে স্বীকৃত চুক্তি অনুযায়ী যে ছোট খড় টেনেছে সে অপরকে তার সম্পত্তি দিতে বাধ্য হয়েও যদি সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে তা হলে সামাজিক নীতি অনুযায়ী এই অস্বীকৃতি বাজী ধরার চাইতে কম অপরাধ বলে গণ্য হবে। যদিও এক জুয়াড়ী অপর জুয়াড়ীর কাছ থেকে কি জিতলো বা কতখানি হারলো তাতে সমাজের এমন কিছু আসে যায় না, তা হলেও অপরের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আর একজন এমনি বিনা আয়াসে ভোগ করার সুযোগ পেয়ে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাতে সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। অর্থাৎ মানুষ পরিশ্রম করে নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করায় বিমুখ হয়ে ওঠে।

জুয়াড়ীরা ভাগ্যের উপর খুব বিশ্বাসী। তারা বলে: ভাগ্য-সুপ্রসন্ন হলে তার হার হবার কোন কারণই নেই। কিন্তু একথা তারা একবারও ভাবে না যে, জুয়া খেলায় আর যারা তার সঙ্গে খেলছে ভাগ্যদেবীর কাছে তারাও আবেদন পাঠিয়েছে সুপ্রসন্ন হবার জন্য। বেচারী ভাগ্য-দেবীর কি দুর্ভোগ বলুন ত! তাঁর ত আর কোন কাজ নেই, কোথায় কোন জুয়াড়ী জুয়া খেলতে বসেছে সেইখানে গিয়ে তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হবে। এদিকে যে জ্ঞান-তাপস নিজের জীবন বিপন্ন করে সকল মানুষের হিতের জন্য গবেষণাগারে বসে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অনুশীলন করে চলেছে—সে বেচারী নাজেহাল! আসলে ভাগ্যের উপর নির্ভর জুয়াড়ীর সজ্ঞান মনের পাপবোধের একটা অজুহাতের আচরণ মাত্র। অর্থাৎ ভাগ্য যদি প্রসন্ন হন, তা হ'লে ত' আমার জিত হবেই আর আমার জিত হলেই আমার আত্ম-পরিজনদের সুখের মাত্রা বাড়বেই। আর যদি ভাগ্যদেবী চান যে, আমার আত্ম-পরিজনরা দুঃখের সমুদ্রে ডুবে মরুক, তা হ'লে আমার হার হতেই থাকবে।

একটা কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় ভাগ্যদেবীর ইঙ্গিত অপ্রত্যাশিত-ভাবে মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়—কিন্তু তা সব সময়ই সেই সব ক্ষেত্রে এসেছে যেখানে মানুষের বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি উপায়-উদ্ভাবনের চেষ্টায় কোন রকম ত্রুটি করেনি—বা যা মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ এবং মহত্তর ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বেল বা অনুপ্রাণিত নয়। সুতরাং ভাগ্য এবং ভগবানকে যারা জুয়ার আড্ডায় টেনে আনে তারা ভাগ্য এবং ভগবানকে কতখানি উপহাস করে জানি না—তবে নিজেদের অপদার্থতা পুরামাত্রায় প্রমাণিত করে।

কথায় বলে: ভাগ্য এবং ভগবান তারই পিছনে থাকেন যে ভাগ্য এবং ভগবানের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর না করে নিজের পথে নিজেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

যে খেলায় দেহের এবং মনের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়, যে অবসর বিনোদনে মানুষের মনে প্রশান্ত তৃপ্তির সৃষ্টি হয়, তা মানুষকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুস্থ প্রতিযোগিতা সুস্থ মনের সৃষ্টি করে, কিন্তু যেখানে এই মনোভাব সর্ব্বদা সজাগ, কেমন করে অপরের সম্পত্তি বিনা আয়াসে নিজের করায়ত্ত করতে পারবো সেখানে মন সব সময়ই সোজা সুস্থ এবং সরল পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরবেই। এবং এই বাঁকা পথ গিয়ে পৌঁছেচে সর্ব্বনাশের পাতালে!

আগেই বলেছি, কোন্ জুয়াড়ী কত টাকা হারালো বা কে কত টাকা জিতলো তাতে সমাজের এমন কিছু আসে যায় না—কিন্তু কিছু যা আসে যায়, তা হল, নানা জনের পরিশ্রমে অর্জ্জিত অর্থ এক জন এমন লোকের কাছে আসা বা এমন একজন লোকের কাছে যাওয়ায় দেশের অগ্রগতির পথে ক্ষতিকারক। ফাটকা বাজারে যে জুয়াড়ী আজ লাখে-লাখে বাজী ধরছে, তাকে দেশের রাষ্ট্রের তরফ থেকে এ প্রশ্ন করবার অধিকার আছে যে, এই বাজী ধরার টাকা তুমি কোথায় পেলে, বা ফাটকা বাজারে জেতা এত টাকা তুমি কোথায় রাখলে, কোন কাজে লাগালে? দেশের সম্পদের মূলীভূত রূপ হচ্ছে টাকা। সুতরাং ফাটকা বাজারে ফাটকাওয়ালা যে লাখ-লাখ টাকা বাজী ধরে সে তার একার উপার্জ্জিত অর্থ নয়—দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথার ঘাম ফেলে সৃষ্টি করা টাকা, সে টাকা দিয়ে বাজী ধরবার যেমন তার নীতিগত অধিকার নেই তেমনি তার আইনগত অধিকারও থাকা উচিত নয়। ফাটকার মারফৎ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের উপার্জ্জন এক জনের ঘরে এসে উঠছে—আর ব্যয়িত হচ্ছে বিহার আর ব্যসনে। আর যে যখন হারছে তা ফিরে যাচ্ছে না দেশের লোকের কাছে—গিয়ে পৌঁছচ্চে আর এক জন ফাটকাওয়ালার ঘরে।

জুয়া এবং মাদক দ্রব্যের নেশা মানুষের কতখানি সর্ব্বনাশ করে, মানুষকে কতখানি নীচে নামিয়ে নিয়ে যায়, তা উপলব্ধি করতে পেরে মহাত্মাজী কংগ্রেসকে ভারতের সমাজ থেকে এই দুই

পাপবৃত্তিকে উচ্ছেদ করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যে দেশ ও সমাজ ধনীর উপর একান্ত নির্ভরশীল, সে দেশ থেকে জুয়ার নির্বাসন কল্পনাবিলাস মাত্র এবং এই জন্যই মহাত্মাজীর মত মহামানবও জুয়া সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলতে সাহস পান নি। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের শাসনভার আজ কংগ্রেসের হাতে—কংগ্রেস কি এখনও নীরব থাকবেন এ সম্বন্ধে?

একটা কথা নির্মম সত্য যে, ধনীদের কোন রকমেই লজ্জিত করা যায় না। ধনীদের মনে তাঁদের কৃত অপকর্মের জন্য অন্যায়বোধ সৃষ্টি করতে পারা আর স্বর্গ জয় করা প্রায় একই কথা! কিন্তু বড়লোকের যা সাজে তা কি আমার আপনার মত লোকের সাজে? ভগবান আমাদের মন দিয়েছেন চিন্তা করবার জন্য, আমাদের হাত-পা দিয়েছেন চলে-ফিরে এমন কাজ করবার জন্য যাতে সমস্ত মানুষের উপকার হয়, বিজ্ঞান এবং শিল্পের সৃষ্টি এবং প্রসার হয়—কিন্তু তা না করে আমরা যদি জুয়ায় মাতি তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত আত্মপরিজনের চোখের ধারা ত থামবেই না কোন দিন, উপরন্তু আমার কাজ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা, চিন্তা করবার ক্ষমতা সবই হারিয়ে যাবে আর আমিও হারিয়ে যাব সংসারের বুক থেকে! কথায় বলে: "বড় লোকের মরণ দেখে মরতে গেলাম সাধে, এখন দেখি বাঁশদড়ি দিয়ে বাঁধে!"

পৃথিবীর দুটো জায়গায় কোন শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ নেই। একটি হচ্ছে শ্মশান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জুয়ার আড্ডা। জুয়াখেলার মত উপযুক্ত টাকা থাকলে, সামাজিক ব্যবস্থায় আপনি যে স্তরেরই হোন না কেন, তখন পরস্পরের সামনা-সামনি পাশাপাশি বসতে একটুও আটকাবে না বা ঘৃণা বা লজ্জা হবে না। একসঙ্গে পান-ভোজনেও কোন বাধা থাকবে না ("At the gaming table, a community of feeling levels all the artificial distinctions of rank")। জুয়ার ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যে, যত বড় ঘরের এবং মহৎ লোকের সন্তানই আপনি হোন না কেন—জুয়ার আড্ডা পর্য্যন্ত যখন আপনি পৌঁছেছেন, তখন আপনার সততায়, সাধুতায় বা মহানুভবতায় বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। এ সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী আছে। কাহিনীটি সত্য।

১৮৩৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী লর্ড ডেনম্যানের এজলাসে লর্ড ড রস বনাম কামিং-এর একটি মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। স্যর উইলিয়াম ইঙ্গিলবীর জেরার উত্তরে কামিং বলে: আমি লর্ড ডি রসকে তাস ভাগ করবার সময় ভাগ করা তাসকে উল্টে নিতে দেখেছি—এবং অন্ততঃ পঞ্চাশ বার তাঁকে এমন ভাবে তাস বদলে নিতে দেখেছি। কবে সে লর্ড ডি রসকে প্রথম এমন ভাবে তাস উল্টে নিতে দেখে, তার উত্তরে কামিং বলে: বর্ত্তমান ঘটনার পাঁচ ছ' বছর আগে। কেন সে এমন ভাবে জুয়াচুরী ক'রে তাস উল্টে নেওয়া দেখেও কোন আপত্তি করে নি, এই প্রশ্নের উত্তরে কামিং বলে: জনসাধারণের মধ্যে এ কথা আমি প্রকাশ করিনি এই ভয়ে যে, সমাজের উপরের স্তরে যিনি একান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁর চরিত্র সম্বন্ধে এতটুকু অনুযোগ করবার কোন কারণ ঘটে নি আজ পর্য্যন্ত, সকলের নিকট যিনি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে আমার মত একটা নগণ্য লোক যদি এমন একটা অভিযোগ আনতো যে, তাস খেলার সময় লর্ড রস জুয়াচুরী করেন—তাহলে এতটুকু বুদ্ধি আমার তখনও ছিল যা দিয়ে আমি বুঝেছিলাম যে, তখনি আমার চারি পাশে পরিচিত-অপরিচিত এত লোকের ভীড় জমে উঠতো এবং তারা আমার প্রতি এমন ব্যবহার করবার জন্য এগিয়ে আসতো যাতে দরজা কিংবা জানলা কোন পথ দিয়ে আমি আত্মরক্ষা করবার জন্য পালাব, তা বিচার করবার সময়ও থাকতো না!

লর্ড ডি রসের সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই একথা জানতেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বলতেন না এই ভেবে যে, তাঁর বিপরীতে খেলে যে হার হোত তা পুষিয়ে যেত তাঁকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে খেলতে বসে। এক জন এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে এসে স্বীকারই করেছিল যে, এমন ভাবে খেলে গত ১৫ বছরে ৩৫,০০০ পাউণ্ড জিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত লর্ড ডি রসের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং এর কিছু দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। থিওডোর হুক নাকি লর্ড ডি রসের মৃত্যুর পর এই এপিটাফ লিখেছিলেন: Hear Lies England's Premier Baron Patiently Awaiting The Last TRUMP [The Dowagers —Mrs. Gore, 1843]

খেলাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করবার জন্য অল্প বাজী ধরে যখন খেলা হয়, তখন সেটা তেমন ক্ষতিকারক নয়—উপরন্তু প্রতিযোগিতাকে তীক্ষ্ণতর করে, কিন্তু যারা বলে, খেলাটাই আসল উদ্দেশ্য, টাকা হার-জিতে তেমন কিছু আসে যায় না অথচ বাজী ধরবার সময় ক্রমশঃ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করতেই থাকে, তারা মিথ্যা কথা বলে। টাকার উপর তাদের কোন আকর্ষণ নেই এ কথা সত্য হলে, তারা খেলার সময় বাজী ধরবে কেন—আর যে টাকা বাজী ধরে তার বদলে সেই পরিমাণ বা তার বেশী টাকা পাবার লোভের বশীভূত না হবে—তা হলে সে টাকা ত সে স্বেচ্ছায় কোন গরীবকেই দান করতে পারে!

জুয়ার নেশায় সমাজের উচ্চস্তরের কৃতীপুরুষেরাও কেমন ভাবে আত্মবিস্মৃত হন, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জন্ লকে। একদিন লর্ড এ্যাশলের (পরে আর্ল অব স্যালিসবারী) ভবনে অনেক কীর্ত্তিমান পুরুষদের একটা মজলিস বসে, সেখানে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হবার কথা ছিল। কিন্তু সকলেই এসে উপস্থিত হন নি বলে, যাঁরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা তাস খেলতে বসে গেলেন। পরে যাঁরা এলেন, তাঁরাও এসেই তাসে বসে গেলেন। জন্ লকে, এক পাশে বসে তাঁর পকেটবুকে কি যেন লিখতে আরম্ভ করলেন এবং এক মনে লিখে যেতে লাগলেন। এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর, হঠাৎ এক জনের দৃষ্টি জন্ লকের উপর পড়ে এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, জন্ লকে বসে বসে কি লিখছেন? উত্তরে জন্ বলেন, জীবনে একসঙ্গে এতগুলি কীর্ত্তিমান লোকের সাহচর্য্যে আসবার ভাগ্য আগে কখনও তাঁর হয় নি, তাই তিনি গত তিন ঘণ্টা ধরে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলছে, তাই টুকে নিচ্ছেন!

তাস খেলার সময় পরস্পরের মধ্যে কি ধরণের কথাবার্ত্তা হয় তা আপনারা যাঁরা তাসের জুয়া খেলেন কিংবা এমনি তাস খেলেন, তাঁরা একবার মনে মনে ভেবে দেখুন। জনের এই পরিহাসে সকলেই লজ্জিত বোধ করে তখনই খেলা বন্ধ করলেন। [ক্রমশঃ।

রমাপদ চৌধুরী

৬

বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বিদায় জানিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো হীরাবাঈ। আহত অভিমানে ফুলে ফুলে উঠলো, অশ্রু টলমল করলো তার চোখের কোণে।

তার রূপের মোহমন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে শোভা সিংহের কাছে। তার বিনীত অনুরোধকে উপেক্ষা করেছে মেদিনীপুরের সামান্য এক ভূম্যধিকারী।

হীরাবাঈয়ের মনে হ'ল, জীবনে সে এমন অপমানিত বোধ করেনি। তার সুর্মা-টানা চোখের চটুল কটাক্ষের কাছে বশ মেনেছে কত রাজা-বাদশা, কত শ্রেষ্ঠী আর ফিরিঙ্গী বণিক। তার মুজরার সুর ভেঙে দিয়ে যেতে সাহস পায়নি কেউ।

অথচ সামান্য এক ভুঁইঞা কি না হীরাবাঈয়ের আসরে দম্ভের আস্ফালন দেখিয়ে তার সম্মান মাটিতে লুটিয়ে দিলো! বাঈতল্লাটে এসে জমেছিল হিন্দুস্থানের নামী বাঈজীর দল। তাদের সামনে হীরাবাঈয়ের অপমান করে গেল শোভা সিংহ। যেন সাধারণ বেশ্যার ঘরে মত্তপ ইয়ারদোস্তদের মত ঈর্ষা তার কলজের বাঁধ বুনে দিয়ে গেল শোভা সিংহ. বাঈজীর আসরের রীতি-নীতি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল। লজ্জায় অপমানে অন্য অন্য বাঈজীদের কাছে মনে মনে ছোট হয়ে গেল হীরাবাঈ।

রেশমী রুমালে চোখের জল মুছতে মুছতে ওস্তাদ সৌকত খাঁকে বললে, তাঁবু তুলতে বলো ওস্তাদজী, আগ্রায় ফিরে যাবো আমি।

বুড়ো সৌকত খাঁ মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, কেন বেটি, মেলা শেষ হবার আগেই ফিরে যাবি, কার ওপর রাগ করে?

হীরাবাঈ কান্নার সুরে বললে, শোভা সিং আমার ইজ্জৎ ভেঙে দিয়েছে ওস্তাদজী!

ইজ্জৎ?

সত্যি, ওস্তাদ সৌকত খাঁ হীরাবাঈয়ের আসরে এমন ঘটনা কখনো দেখেনি! বাঈজীর ইজ্জৎ বোঝে না কাফের?

হীরাবাঈ বললে, শোভা সিংকে এর জবাব পেতে হবে ওস্তাদজী, হীরাবাঈয়ের ইজ্জৎকে যেমন সে ধূলোয় লুটিয়েছে, এমনি ধূলোয় লুটিয়ে দেবো তার শিরোপা।

এই প্রতিশোধের বাসনা নিয়েই কি বিবিবাজারের কালো বোরখার রহস্যময়ী বাঁদীকে কিনে নিলো হীরাবাঈ? কে জানে! নিলামদারের হাতে গুণে গুণে একশো মোহর তুলে দিয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বাঁদীকে কিনে নিলো হীরাবাঈ। তারপর ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে, কি নাম তোমার বহিন?

বহিন! চমকে উঠলো বাঁদী। ভয়ভীরু স্বরে বললে, লালী।

মৃদু হাসলো হীরাবাঈ।—লালী, না লয়লী? তারপর ধীরে ধীরে বললে, বাঁদী নও তুমি, তুমি আমার বহিন।

চোখ ঝলসে গেল লালীর। হীরাবাঈয়ের তাঁবুর ঐশ্বর্য্য দেখেই চোখ ঝলসে গিয়েছিল, আগ্রার অট্টালিকা দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল সে। নারীর পায়ে এত ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিতে পারে পুরুষ, জানতো না সে। জানতো না, নবাবী রংমহালের বাইরেও এমন রত্নালঙ্কারের ছড়াছড়ি।

একশো মোহর দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে এলো হীরাবাঈ। নিয়ে এলো আগ্রার হীরামহলে।

—আজ থেকে তুমি বাঁদী নও, আমার বহিন তুমি।

শুনে বিস্মিত হয়েছিল লালী। ভেবেছিল সুরাসক্তা হীরাবাঈয়ের খেয়াল হয়তো। হয়তো বা রাত পোহালেই সব ভুলে যাবে, ক্রোধে ফেটে পড়বে হীরাবাঈ তার এই রাত্রির বিভ্রান্তির জন্যে।

ছাদের ওপর নরম গালিচায় শুয়ে হীরাবাঈ তাকিয়ে ছিলো অন্ধকার আকাশের দিকে, আকাশের ক্ষীণালোক তারার দিকে।

হঠাৎ লালীর একখানা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে হীরাবাঈ আবার বললে, বাঁদী নও তুমি লালী, আজ থেকে তুমি আমার বহিন।

লালী কোন কথা বললে না।

হীরাবাঈ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসলো। বললে, তোমাকে না পেলে আমার সব বরবাদ হয়ে যেত লালী। সব বরবাদ হয়ে যেত।

এবারও কোন উত্তর দিলো না লালী। নিঃশব্দে রূপোর পাত্রে সুরা ঢেলে দিলে।

পাত্রটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখলো হীরাবাঈ।

ধীরে ধীরে বললে, কত খুঁজেছি তোমাকে, যেখানে গিয়েছি সেখানেই তোমাকে খুঁজেছি। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ বিবিবাজারে দেখা পেলাম তোমার।

বিস্মিত হয়ে লালীর চোখ যেন প্রশ্ন করলো, আমাকে চিনতেন আপনি? চিনতেন?

খিল-খিল করে হেসে উঠলো হীরাবাঈ।

বললে, হাঁ, তোমাকে দেখেই চিনেছি আমি। তুমিই পারবে। পারবে না আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে? আমার নাচ আর গানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না তুমি?

ভয়ে ভয়ে লালী অস্ফুটে বললে, পারবো।

—পারবে, নিশ্চয় পারবে? গভীর আবেগে লালীর হাতটা মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে ধরলো হীরাবাঈ।

তারপর সুন্দর একটি লীলায়িত মুদ্রায় তালি দিলো হাতে। সে আওয়াজ শুনে ছুটে এলো মণিবান্নু।

ঢুলু-ঢুলু স্বপ্নরঙিন চোখে হীরাবাঈ বললে, সরবৎ। একটু থেমে বললে, আর তম্বুখা।

মণিবান্নু হুকুম তামিল করতে চলে গেল, আর যাবার সময় একবার ফিরে তাকালো লালীর দিকে।

সে-দৃষ্টিতে যেন ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পেল লালী।

হীরাবাঈ তাকে একশো মোহর দিয়ে কিনে নিয়েছিল বিবিবাজার থেকে। হাজারো বান্দা আর বান্দী লালীর সৌভাগ্যে বিস্মিত হয়েছিল সেদিন।

আর মণিবান্নু চুপি চুপি বলেছিল, বাঁদীবাজারে তোর মত নসীব নিয়ে কেউ কখনও আসে নি লালী! আর আমাকে হয়তো সারা জীবন কাস্রি খোজার মার খেয়ে খেয়ে মরতে হবে। ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল মণিবান্নু।

একশো মোহর ছুঁড়ে দিয়ে হীরাবাঈ লালীকে নিয়ে এলো তার তাঁবুতে। এনে জিগ্যেস করলো, কি পেলে তুমি সুখী হবে লালী, কি করলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে?

লালী উত্তর দিলে, মণিবান্নুকেও আপনি নিয়ে আসুন সাহেবান।

খিল-খিল করে হেসে উঠলো হীরাবাঈ। পাঁচ মোহর কিম্মতের একটা বাঁদী চায় লালী? আর কিছু নয়?

লালীর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে মণিবান্নুকেও কিনে আনলো হীরাবাঈ।

অথচ সেই মণিবান্নুর চোখেই আজ ঈর্ষার জ্বালা!

আর লালী? হীরাবাঈয়ের সহানুভূতি তার চোখে স্বপ্ন দিয়েছে। হয়তো জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা নয়। হয়তো হীরাবাঈয়ের মুজরা থেকেই কোন নবাবজাদা তুলে নিয়ে যাবে তাকে। সাদী নয়, সুখ আর আনন্দ। সুরা আর ঐশ্বর্যের অবগাহনেই হয়তো জীবন কাটবে তার।

'একদিন একটি রাজ্যপরিচালনা করার শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়'। জ্যোতিষাচার্যের কথাটা বার বার মনে পড়লো লালীর। ঐশ্বর্য্যের লোভে ভুলে গেল সেই সুপুরুষ চেহারার সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে।

৭

রঘুনাথের উদ্ভিন্ন যৌবনও তখন মনে মনে অন্য এক স্বপ্ন বুনছে।

শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে নি রঘুনাথ। সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছে একখানি বজরা নিয়ে।

বিড়াই নদী থেকে কংসবতী। মাঝ রাত্রিতে কংসবতীর তীরে পৌঁছে নোঙর ফেলেছে রঘুনাথের বজরা, চন্দ্রপ্রভার নির্দিষ্ট ঘাটে তারপর ধীরে ধীরে খড়্গেশ্বরীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেছে রঘুনাথ

যুবরাজ রঘুনাথ নয়, বেশবাস দেখে মনে হয় কোন তীর্থযাত্রী পরিব্রাজক। সাধারণ গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে খড়্গেশ্বরীর মন্দিরের পথে যেতে যেতে ক্ষণে ক্ষণে গুপ্ত অস্ত্রে হাত স্পর্শ করে রঘুনাথ।

এক দিকে কুমারী চন্দ্রপ্রভার উপরোধ, অন্য দিকে সন্দেহ। হয়তো শোভা সিংহেরই কৌশল, হয়তো বা...

ক্রমশঃ মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছলো রঘুনাথ। আর দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখলো একটি মূল্যবান পালকি এসে থামলো মন্দিরের দ্বারে। পালকির গায়ে মিনার কারুকার্য্য চমক দিলো মশালের আলোয়। লাল রেশমের পর্দা নড়ে উঠলো।

পালকির দ্বার থেকে মন্দির পর্যন্ত সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মশালচীরা। পালকি নামিয়ে সরে গেল বেহারার দল।

আর পরমুহূর্তেই রঘুনাথ দেখতে পেলো দুটি সুন্দর পা লাল রেশমের পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিলো যেন। সে দুটি পা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরে গেল।

রঘুনাথ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে-দিকে। দূর থেকে লুকিয়ে দেখলো সে রূপ। কুমারী চন্দ্রপ্রভা ধীরে ধীরে পালকি থেকে নামলো। তার পিছনে পিছনে দু'জন রসিকা সখী। ক্রমে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল তিন জনই। আর রঘুনাথ নির্দ্দেশ অনুযায়ী খড়্গেশ্বরীর বিগ্রহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করে দেখলো, কুমারী চন্দ্রপ্রভা যেন অপাঙ্গে তাকিয়ে জনতার মধ্যে কাকে খুঁজছে।

পুরোহিতের হাত থেকে পূজার পুষ্প নিয়ে প্রণাম করলো চন্দ্রপ্রভা, তারপর একটি সোনার বিল্বপত্র রাখলো প্রণামীর থালায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আরেকটি স্বর্ণপত্র পড়লো।

চমকে চোখ তুলে তাকালো চন্দ্রপ্রভা, চোখোচোখি হ'ল রঘুনাথের সঙ্গে। আর উভয়ের চোখে মৃদু হাসি খেলে গেল। সে চোখ যেন পরস্পরকে বললো, চিনেছি। চিনেছি তোমাকে।

রঘুনাথ সরে এলো নির্জ্জন অন্ধকারে। আর চন্দ্রপ্রভা পালকির ঘুঙুর বাজিয়ে চলে গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কংসবতীর ঘাটে ফিরে এলো রঘুনাথ।

বজরায় ফিরে এসে ক্লান্ত হাতে বীণা তুলতে গিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রঘুনাথ। অন্ধকারে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটি নারীমূর্ত্তি যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে। দেহরক্ষীর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো। প্রশ্ন বুঝতে পারলো রক্ষী। বললে, সংবাদ পেয়েছি যুবরাজ। শোভা সিংহ এখন উড়িষ্যায়।

নারীমূর্ত্তি ততক্ষণে কাছে এসে পৌঁছেছে

নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পেল রঘুনাথ।—আমি বিষ্ণুপুর-যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে যুবরাজ নিজেই উপস্থিত হয়েছেন।

নারীকণ্ঠেও হাসির সুর শোনা গেল!—কুমারী চন্দ্রপ্রভা আপনার প্রতীক্ষায় আছেন যুবরাজ!

সখীকে অনুসরণ করে শোভা সিংহের প্রাসাদের গোপন সুড়ঙ্গ বেয়ে অন্দরমহলে এসে পৌঁছলো রঘুনাথ। সখীর ইশারায় চন্দ্রপ্রভা এসে দাঁড়ালো দ্বারপ্রান্তে। আর রঘুনাথ সে-দিকে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ নয়নে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে। চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভার। কথা খুঁজে পেল না। অথচ এই মুহূর্ত্তটির জন্যে কত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে।

সখীর কাঁধে ভর দিয়ে লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রঘুনাথের কাছে এগিয়ে এলো সে। তারপর সরমকাতর দু'টি চোখ তুলে বললে, একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন যুবরাজ, সে-কথা ভুলে গেছেন?

না, ভুলে যায় নি সে। কিন্তু কৈশোরের সেই দুর্ঘটনাকে রঘুনাথ এমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তার স্মৃতির পটে। তবু মৃদু হেসে বললে, সে দিন কি ভোলা যায় চন্দ্রপ্রভা?

সখী সুরঙ্গাক্ষী খিলখিল করে হেসে উঠলো রঘুনাথের কথা শুনে। আর চন্দ্রপ্রভার লজ্জানম্র চোখে কি যেন কৌতুক খেলে গেল, সখীর কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বললে চন্দ্রপ্রভা।

সখী ঠোঁট টিপে হাসলো সে-কথা শুনে। তারপর কৌতুকের স্বরে বললে, যে জীবন একদিন আপনি রক্ষা করেছিলেন যুবরাজ, সে জীবন আপনার পায়েই সমর্পণ করে বসে আছেন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রাজকুমারী? বিস্মিত হ'ল রঘুনাথ, সখীর কথা শুনে। বর্দ্ধমানাধিপতি কৃষ্ণরামের সন্দেহ কি তা হ'লে সত্য? শোভা সিংহ কি স্বাধীন রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠলো! কে যেন এই পথেই আসছে, পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রঘুনাথ।

চন্দ্রপ্রভাও বিচলিত বোধ করলো। প্রাসাদরক্ষীরা কি জানতে পেরেছে রঘুনাথের কথা? ভীতত্রস্ত ভাবে সখীর মুখের দিকে তাকালো চন্দ্রপ্রভা।

সখী সুরঙ্গাক্ষী ইশারায় পাশের কক্ষে সরে যেতে বললো চন্দ্রপ্রভাকে।

দুরু-দুরু বুকে অপেক্ষা করলো চন্দ্রপ্রভা, পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। না, রক্ষীদের সন্দেহ উদ্রেকের কারণ ঘটে নি হয়তো।

চন্দ্রপ্রভা ফিরে এলো আবার, কপালে তার স্বেদবিন্দুর মালা ফুটে উঠেছে তখন।

চন্দ্রপ্রভার শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি খেলে গেল রঘুনাথের মুখে। হাত বাড়িয়ে চন্দ্রপ্রভার হাত স্পর্শ করে বললে, তোমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরেই এসেছি চন্দ্রপ্রভা! বলো, কি বলতে চাও তুমি?

চন্দ্রপ্রভা চোখ নামালো।—একদিন জীবন বাঁচিয়েছিলেন, সম্মান বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিন।

শুধু সখী সুরঙ্গাক্ষী বললে, যুবরাজ, প্রথম দর্শনেই সখী দেহ-মন-প্রাণ আপনার কাছে সঁপে দিয়েছিল। সেই ক জানাবার জন্যেই আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। এর মর্য্যাদা করা না করা আপনার হাতে।

রঘুনাথ বললে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চন্দ্রপ্রভা, আর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে যে মূল্যই দিতে হোক আমি : থাকবো।

সুরঙ্গাক্ষী হেসে বললে, আরেকটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যুবরাজ।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালো রঘুনাথ।

সুরঙ্গাক্ষী বললে, সখীর এই রূপ এই যৌবন যেন শত পত্নীর ভিড়ে হারিয়ে না যায়। বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে যেন পাটরাণীর গৌরবে অধিষ্ঠিত হতে পারেন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, সে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি আমি। কোন দিন যদি অন্য নারীর অনুরক্ত হই, তার আগে যেন তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হয় চন্দ্রপ্রভা!

—ছি ছি একি কথা বলছেন যুবরাজ! রঘুনাথের মুখে হাত চাপা দিলো চন্দ্রপ্রভা।

আর রঘুনাথ গভীর আবেশে চন্দ্রপ্রভার কোমল নারীদেহকে আলিঙ্গনে পিষ্ট করে তার মুখে চুম্বন এঁকে দিলো। তারপর চন্দ্রপ্রভার অনামিকায় বিষ্ণুপুর-যুবরাজের চিহ্ন আঁকা অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিলো রঘুনাথ।

সুরঙ্গাক্ষী বললে, চলুন যুবরাজ, ভোর হওয়ার আগেই বিষ্ণুপুরে ফিরে যেতে হবে আপনাকে।

সুড়ঙ্গের পথ দেখিয়ে বজরায় পৌঁছে দিলো সে রঘুনাথকে। বজরা ছেড়ে দিলো। আর রঘুনাথের মনে পড়লো শৈশবের একটি দৃশ্য। কে জানতো, যে জীবন সেই একদিন বাঁচিয়েছিলো, সে-জীবন এমন ভাবে পথের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে!

রাত্রির অন্ধকারে শোভা সিংহের গুপ্তচরের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেসে চললো রঘুনাথের বজরা। কংসবতীর স্রোত বেয়ে বিষ্ণুপুরের পথে ফিরে যেতে যেতে রঘুনাথের মনে পড়লো প্রায় বিস্মৃত শৈশবের একটি ঘটনা।

আশ্চর্য্য! যে-ঘটনা রঘুনাথের মন থেকে মুছে গিয়েছিল, যে কন্যকার মুখ তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির অতলে, আজ নতুন করে রঘুনাথের মনে যৌবনের জোয়ার আনলো সেই ছবি!

নারীর হৃদয় বুঝি ভিজে মাটির পথ। একবার যার পায়ের ছাপ আঁকা হয়, কল্পনার রৌদ্র আর সময়ের বাতাসে শুকিয়ে সে ছাপ চিরজীবী হয়ে থাকে। আর পুরুষের মন বুঝি বা আয়নার মত, ক্ষণে ক্ষণে নতুন ছায়া পড়ে। কিন্তু এমন ভাবে কোন রূপসী নারী তার দেহ-মন উৎসর্গ করবার জন্যে উপযাচিকা হয়ে এগিয়ে আসতে পারে, কল্পনাও করতে পারে নি রঘুনাথ। এ দুঃসাহস কল্পনাতীত!

এমনি দুঃসাহস আরো একদিন দেখেছিল রঘুনাথ। কিন্তু সেদিন চন্দ্রপ্রভার দৃষ্টিতে ছিল তীব্রতা, ছিল রণোন্মাদিনীর তেজোদীপ্তি।

জগন্নাথধাম থেকে ফিরে আসছিলো তীর্থযাত্রীর দল। শত শত নারী-পুরুষ। কঙ্কা কুমারী, যুবতী আর বৃদ্ধা, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ। হঠাৎ খবর এসে পৌঁছলো রাজা দুর্জ্জন সিংহের দরবারে। গুপ্তচরের মুখে দুঃসংবাদ শুনলেন দুর্জ্জন সিংহ, হার্ম্মাদ দস্যুদের পঞ্চাশখানি সমুদ্রতরী দেখা গেছে বঙ্গোপসাগরে। সশস্ত্র পর্ত্তুগীজ দস্যুর দল নাকি যাত্রা করেছে জগন্নাথধামের উদ্দেশে। হার্ম্মাদ দস্যুর কথায় সেদিন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন দুর্জ্জন সিংহ।

পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচার আর লুণ্ঠনের কথা অজানা ছিল না। বালেশ্বর উপকূলের একটি দৃশ্য মনে পড়েছিল দুর্জ্জন সিংহের। পাঁচ হাজার নারী-পুরুষকে বন্দী করে এনে 'কড়ি' আর 'দামে'র মূল্যে তাদের বেচে দিয়ে গিয়েছিল ফিরিঙ্গী দস্যুর দল। লুণ্ঠন করেছিল উপকূলের শত শত গ্রাম। ধূলোয় লুটিয়ে গিয়েছিল নারীত্ব। কৌমার্য্য আর সতীত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছিল দস্যুদের অত্যাচারে, বিবাহ-মণ্ডপ ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, তারা লুঠে নিয়ে গিয়েছিল হাজারো সুন্দরী গৃহস্থ-বধূকে।

তাই দুর্জ্জন সিংহ বলেছিলেন, মোগল শক্তি হার্ম্মাদ দস্যুদের বাধা দিতে না পারলেও বিষ্ণুপুরকে এগিয়ে যেতে হবে। উড়িষ্যার সমুদ্রতীর রক্ষা করতে হবে ফিরিঙ্গীর অত্যাচার থেকে। কিন্তু······

সভাসদরা বুঝলেন দুর্জ্জন সিংহের দুশ্চিন্তা। উড়িষ্যা আর বাংলার প্রান্তবর্ত্তী রাজ্য বিষ্ণুপুর। হার্ম্মাদের দুঃসাহস ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে তখন। হয়তো বালেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর অভিমুখেও যাত্রা করবে পর্ত্তুগীজ অসুরের দল। অন্য দিকে বর্গীদের আশঙ্কা। ঘোড়সওয়ার বর্গী দস্যুরা মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে তখন উড়িষ্যার পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত, পাঠান শক্তি তাদের বাধা দিতে পারেছে না।

সভাসদরা মন্তব্য করলে, এ সময় বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হবে না মহারাজ! বর্গী শত্রুর হাত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্যে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।

দুর্জ্জন সিংহ বললেন, কিন্তু হার্ম্মাদের হাত থেকেও বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করতে হবে।

উভয়-সঙ্কটের মধ্যে কোন উপায় খুঁজে পেলেন না দুর্জ্জন সিংহ। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বিষ্ণুপুর রাজ্যে কি এমন কেউ নেই যে পর্ত্তুগীজ শক্তিকে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারে?

যুবরাজ রঘুনাথ তখন কিশোর। সহাস্য মুখে এগিয়ে এলো সে। বললে, আছে মহারাজ!

খুশি হয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন দুর্জ্জন সিংহ।

মাত্র একশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বালেশ্বর যাত্রা করলো রঘুনাথ। সমুদ্রতীরে শিবির ফেলে অপেক্ষা করলো গুপ্তচরের নির্দ্দেশের জন্যে।

জগন্নাথধাম থেকে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী তখন ফিরে চলেছে রথযাত্রা দর্শন করে। এমন সময় হঠাৎ খবর এসে পৌঁছল হিজলীর বন্দরে জাহাজ রেখে বালেশ্বরের দিকেই এগিয়ে আসছে দস্যুসেনা।

মাত্র একশো অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে গেল রঘুনাথ।

গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে চলেছে তখন হার্ম্মাদের দল। নৃশংস অত্যাচারের খবর পৌঁছচ্ছে। হাজার হাজার নারী আর পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে একদল দস্যু. আরেক দল এগিয়ে আসছে তীর্থযাত্রীদের সন্ধানে।

বন্দীদের হাতের তালু ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত চালিয়ে পশুর মত টানতে টানতে রণপোত বোঝাই করতে নিয়ে চলেছে তাদের। হয়তো অন্য কোন বন্দরে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দেবার জন্যে।

মাত্র একশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক কিশোর রঘুনাথ ছুটে চললো তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করবার সঙ্কল্প নিয়ে।

চাঁদবানীর কাছে এসে দেখা মিললো তীর্থযাত্রীদের। পঙ্গপালের মত চলছে তারা, নিশ্চিন্ত মনে। সামনে একটি সুসজ্জিত হাতী। অম্বারীর রঙিন পর্দা উড়ছে বাতাসে। দূর থেকে একটি কিশোরী মুখ দেখতে পেল রঘুনাথ, রঙ-ঝলমল হাওদার ওপর। কিন্তু কে এই আরোহিণী? রঘুনাথ বুঝতে পারলো না। পর্ত্তুগীজদের অত্যাচার থেকে তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে উঠলো তার মনে।

পিছন থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য রেখে চললো রঘুনাথ। এমন সময় হঠাৎ আসুরিক চিৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো পর্ত্তুগীজ দস্যু। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আর মুক্ত অসি নিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। গভীর অরণ্যে লুকিয়ে দূরবীক্ষণ চোখে দিয়ে দেখতে পেলো রঘুনাথ। তাদের সংখ্যাধিক্য আর নৃশংসতা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সে। গৌরবর্ণ সুপুরুষ চেহারা তাদের, গায়ে লাল মখমলের কুর্ত্তা, মাথায় উজ্জ্বল সবুজ রঙের শিরস্ত্রাণ।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রঘুনাথ দেখলো হাতীর পিঠে হাওদার ওপর উঠে দাঁড়ালো একটি কিশোরী সুদর্শনা! হাতে তার উন্মুক্ত অসি।

সঙ্গে সঙ্গে ইশারা করলো রঘুনাথ। একশো অশ্বারোহী বীরবিক্রমে বন্যার মত ভেঙ্গে পড়লো পর্ত্তুগীজ দস্যুদের ওপর।

পদাতিক হার্ম্মাদের দল বিমূঢ় হয়ে পড়লো। ছিন্নভিন্ন হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো তাদের দ্বিখণ্ডিত শরীর।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তে রঘুনাথ দেখলো, তেজোদীপ্তা কিশোরীর হাত থেকে তরবারি খসে পড়ছে, আর দু'দিক থেকে দু'জন পর্ত্তুগীজ দস্যু তাকে বন্দী করবার চেষ্টা করছে।

রঘুনাথ লাফিয়ে পড়লো তাদের ওপর। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই কিশোরীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো।

আর সেই সময়ে কামানের ধ্বনি শোনা গেল। শ্বেত পতাকা

তুলে দূরে সরে গেলো রঘুনাথ। বুঝলো, মোগল সৈন্যও এসে পৌঁছেচে।

মোগলের কামান আর বিষ্ণুপুরের বীরত্বের পায়ে প্রাণ দিলো শত শত পর্তুগীজ দস্যু, নিশ্চিহ্ন হল সমগ্র হার্মাদের দল।

আর কিশোরী চন্দ্রপ্রভার চোখে নামলো কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি। কে জানতো সে দৃষ্টি শুধু কৃতজ্ঞতার নয়, দেহ মন প্রাণ সমর্পণের। যে জীবন একদিন রঘুনাথই বাঁচিয়েছিল, সে-জীবন যে এমন ভাবে জড়িয়ে যাবে তার চলার পথের সঙ্গে, কোন দিন কল্পনাও করেনি সে।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার চোখে যে রোমাঞ্চের কাজল পরিয়েছিল সে, আজ চন্দ্রপ্রভার যৌবনরূপ সেই মোহ এঁকে দিলো রঘুনাথেরই চোখে। রঘুনাথ মনে মনে বললে, আমার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করবো আজীবন।

ফিরে এলো রঘুনাথ।

সমগ্র বিষ্ণুপুরে তখন দুঃখের ছায়া নেমেছে। দীর্ঘকাল ধরে রোগশয্যায় পড়েছিলেন দুর্জ্জন সিংহ। কিন্তু রাজবৈদ্যের ওপর আস্থা ছিল সকলের।

রঘুনাথ ফিরে এসে শুনলো, রাজবৈদ্য হতাশা প্রকাশ করেছেন।

বিষণ্ণ মুখে পিতার শয্যাকক্ষে গিয়ে হাজির হ'ল রঘুনাথ। দেখলে, পরিবারের সকলে দাঁড়িয়ে আছে হতাশার চোখ মেলে।

শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রঘুনাথ।

দুর্জ্জন সিংহের তন্দ্রার ঘোর কাটলো। অস্ফুটে ডাকলেন, রঘুনাথ!

জ্যোতিষাচার্য্য সামনেই বসে ছিলেন। বললেন, রঘুনাথ এসেছে মহারাজ!

—এসেছে? স্পর্শ পাবার আশায় হাত বাড়ালেন দুর্জ্জন সিংহ।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে শিয়রের কাছে গিয়ে বসলো।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অস্ফুটে দুর্জ্জন সিংহ বললেন, অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে রঘুনাথ। তাই মৃত্যুর আগে কয়েকটা কথা তোমাকে বলে যেতে চাই।

চোখের অশ্রু মুছলেন রাজপত্নী। রঘুনাথের চোখেও জল এলো। আর মৃদু হাসি দেখা দিলো দুর্জ্জন সিংহের মুখে। বললেন, রঘুনাথ, সারা বাংলা দেশ অশান্তিতে ডুবে আছে। এক দিকে মগ আর পর্তুগীজ, আর অন্য দিকে বর্গী আর পাঠান।

জ্যোতিষাচার্য্য বললেন, মোগলও তো অত্যাচারী মহারাজ। বিধর্ম্মী মোগলও বাংলার শত্রু।

দুর্জ্জন সিংহ হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, মোগলও অত্যাচারী মোগলও শত্রু। কিন্তু রঘুনাথ, স্থায়ী শত্রুকে সহ্য করা যায় প্রতিশোধ নেওয়া যায়। তা ছাড়া, মোগলের অত্যাচার হয়তো একদিন লুপ্ত হবে, কারণ মোগল রাজ্যশাসন করে। মগ আর বর্গী দস্যুর নির্য্যাতন আর লুণ্ঠন প্রতিরোধ করতে হলে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হবে রঘুনাথ, বিদ্রোহ করে বাংলাকে মোগলের হাত থেকে স্বাধীন করার সময় এখনো আসেনি।

—আপনার আদেশ বুঝতে পারছি না মহারাজ! জ্যোতিষাচার্য্য বললেন।

রঘুনাথও উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকালো পিতার রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে।

দুর্জ্জন সিংহ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ নির্জ্জীব পড়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, রঘুনাথ, মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবে, এই আমার ইচ্ছা। আর...

—আর?

—মুসলমানকে ঘৃণা করো না রঘুনাথ! ধর্ম্মের বিদ্বেষ যেন বিষ্ণুপুরকে কোন দিন কলঙ্কিত না করে। ধর্ম্মের হানাহানি সব মুছে যাবে রঘুনাথ, সব মুছে যাবে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের কাছে এ-কথা নতুন নয়। ধর্ম্মের হানাহানি সব মুছে যাবে, সব ঘুচে যাবে। এ-কথা বহু বার শুনেছে রঘুনাথ। সবার উপরে মানুষ সত্য! সবার উপরে প্রেম।

যবন হরিদাসের প্রসঙ্গ মনে পড়লো রঘুনাথের। জগন্নাথধামে হরিদাস মৃত্যুশয্যায়, তখন চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদের হরিদাসের পাদোদক সেবন করিয়েছিলেন। আর উৎসবে শ্রাদ্ধে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে তাঁরা আহার করতেন যবন হরিদাসের সঙ্গে।

তবে? তবে কেন বিবিবাজারের কালো বোরখায় শরীর লুকোনো সেই পরমাসুন্দরী বাঁদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্যায়বোধ জেগেছিল?

'মুসলমানকে ঘৃণা করো না রঘুনাথ!'

দুর্জ্জন সিংহের কথাটা বার বার মনের মধ্যে অনুরণন তুললো। যেন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মুসলমানীকেই মনে পড়িয়ে দিতে চায়।

না, শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে-প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে তাকে!

কিন্তু বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছেও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ সে। হয়তো শোভা সিংহের বিরুদ্ধে, চন্দ্রপ্রভার পিতার বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করতে হবে তাকে।

[ক্রমশঃ।

উত্তর

বাজে কথা। প্রথমে আসে হিট্, তাই গরম হয় ফিলামেণ্ট এবং জ্বলে আলো।

সম্ভব নয়।

না! শব্দ-শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তারের মধ্যে দিয়ে যায়।
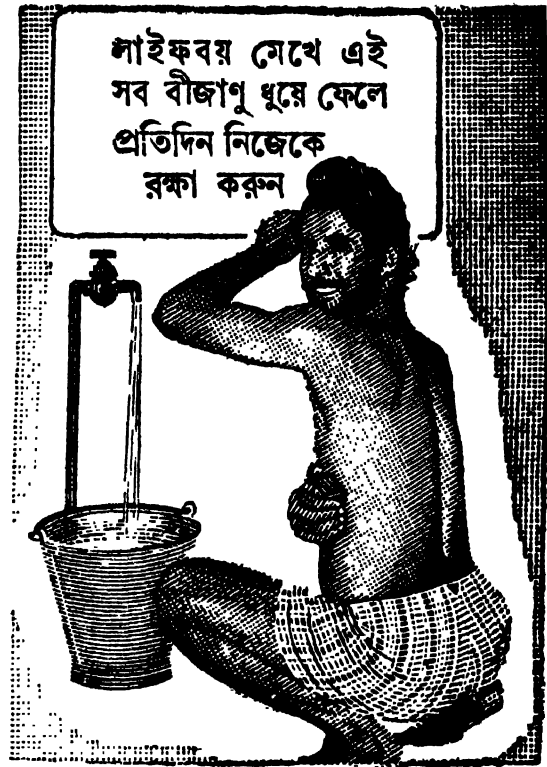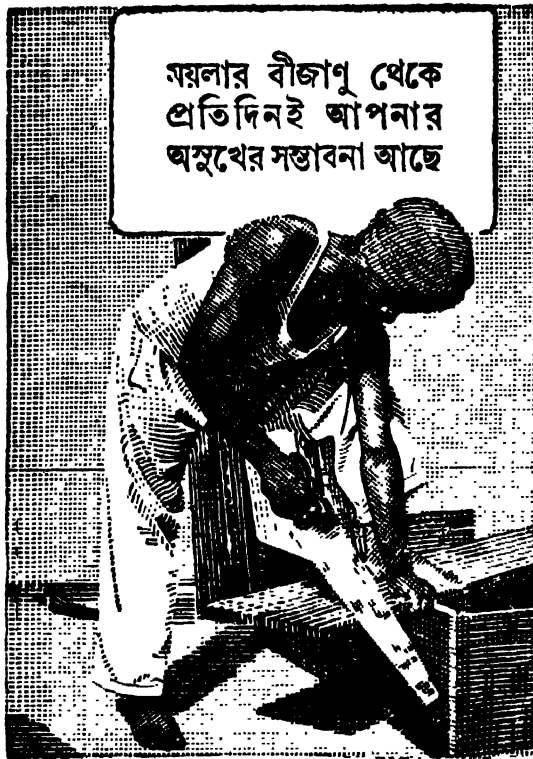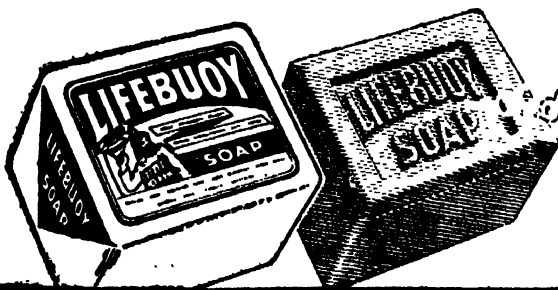
পথপ্রান্তে এক পানশালায় সুরাপানের অবকাশে জীবনের এই বেদনা-বিক্ষুব্ধ বিপর্যয়ের বিচিত্র-কাহিনী ফিলিপের সঙ্গে আলোচনা করছিল আঁদ্রে। করুণার কৃপাভিক্ষু সে নয়।

"আঁদ্রে কারো করুণা চায় না, পিতৃবিয়োগের বেদনা কিংবা কোনো তরুণীর প্রেমে পড়ে পরে যদি জানা যায় সে তারই আপন বোন; তাহ'লেও বৃথা শোক করবে না আঁদ্রে, সে পাত্র সে নয়। এলাইনকে কিছু বলিনি, কোনো দিন কাউকে বলবো না, বৃদ্ধ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে কথা গোপন রেখেছিলেন, তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গেই তার সমাপ্তি হোক্।"

মেয়েটির সঙ্গে যদি পরে কখনও দেখা হয় তাহলে সে তাকে জানাবে যে, তার এই নিদারুণ শোকের সে-ও অংশভাগী। ফিলিপে যে এই কথা গোপন রাখবে তা সে জানে, ওরা দুজনে মিলে একটা সমাধান স্থির করবে।

ফিলিপে তার মদের গ্লাসটা তুলে ধরে বলে—"আমরা দু'জনে একটা ব্যবস্থা করবোই!"

উভয়ে যখন মদ্যপান করছে তখনও বিপদ ওদের সঙ্গ ছাড়েনি। চেস্‌ট্‌নাট্ গাছের তলায় বাঁধা ধূসর ঘোড়াটি যে মারকাস ক্রটাসের তা ধরা গেছে, ইতিমধ্যেই রাজকীয় অশ্বারোহী-বাহিনীর এক দল এসে পানশালা ঘেরাও করে ফেলেছে।

পানশালার সংলগ্ন এক গোপন কক্ষে নোয়েল দ্য মেনেস স্তেভ্‌লিয়ে দ্য চ্যাবরিলেইনের সঙ্গে বসে অসহিষ্ণু ভাবে অপেক্ষা করছেন। বাইরের ঘোড়া দু'টির একটির আরোহী তাঁদের লক্ষ্যবস্তু একজন সার্জেন্ট ফিলিপেকে ভালমোরিণ সন্দেহে আটক করে বাদানুবাদ সুরু করতেই চ্যাবরিলেইন বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আঁদ্রে তখন বলছে—"উনি কিন্তু গীয়্যর ডুভ্যাল, লিমোজেনে বাড়ি। আমরা দু'জনেই স্থপতির কাজ করি।"

চ্যাবরিলেইন বাধা দিয়ে বললেন—"তোমরা পাষণ্ড বিশ্বাস-ঘাতক, তোমাদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার করছি।"

নোয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সেদিকে চোখ পড়ল চ্যাবরিলেইনের, তিনি বলে ওঠেন—"হুজুর! এই সেই ব্যক্তি, মারকাস ক্রটাস্ ছদ্মনামে ঘুরছে, আসল নাম ওর ভালমোরিণ।"

আঁদ্রে তবু বলে—"ওর নাম কিন্তু ডুভ্যাল!"

নোয়েলের উদ্ধত মুখে ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে। ফিলিপের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—"তার পর ডুভ্যাল, অনেক দিন পরে দেখা, ভারী খুশী হলাম।" বিস্মিত সার্জেন্টকে নোয়েল বললেন—"এ আমার বন্ধু।" তার পর ফিলিপের হাত ধরে তাকে সেই গোপন-কক্ষে নিয়ে গেল।

ফিলিপে কৃতজ্ঞ-ভঙ্গীতে বলে, "আপনার সহায়তার জন্য আমি বিশেষ অনুগৃহীত।"

নোয়েলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে বলল—"আমি স্বয়ং মার্কাস ক্রটাসের জন্যও এইটুকু করতাম। মহারাণীর শয়ন-কক্ষে যে ঐ সব মাথামুণ্ডু রেখে আসতে পারে সে কি কম লোক? তাই স্বহস্তেই তাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা ছিল আমার।"

তার পর ঘৃণাভরে হেসে ফিলিপের পরিবারবর্গ সম্পর্কে অত্যন্ত কুৎসিত মন্তব্য করলেন নোয়েল। ফিলিপে তৎক্ষণাৎ ওর গালে এক চড় বসিয়ে দেয়, তার পর অসিযুদ্ধের জন্য উভয়ে বাগানে

চল্‌লো। যাওয়ার সময় আঁদ্রেকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে বলে—"বাবাকে বোলো, তাঁর তরবারির সম্মান আমি রেখেছি।"

উন্মত্তের মতো আঁদ্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু চ্যাবরিলেইনের তরবারি তাকে দেওয়ালের সঙ্গে আটকে রাখে। তেভ্‌লিয়ে বল্‌লেন: "বেশী সময় লাগবে না, ওঁর মত অসিধারী কেউ নেই, প্রতিদিন ডিজনের 'ড্যুটোভ্যালের কাছে উনি অসি-শিক্ষা করেন।" বাইরে তরবারির আওয়াজ শোনা যায়।

সহসা আঁদ্রে জানলার পরদাটা ছিঁড়ে চ্যাবরিলেইনের মুখে চাপা দিয়ে দৌড়ে বাগানে গিয়ে পৌছায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই নোয়েলের তরবারি ফিলিপের শ্রান্ত দেহে প্রবেশ করেছে। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ফিলিপের তরবারিটা নিয়ে আঁদ্রে নোয়েলের সঙ্গে লড়াই সুরু করে।

নোয়েল যদি 'বিড়াল-ইঁদুর' খেলার আনন্দে তখন মসগুল না থাকতেন তাহ'লে তখনই আঁদ্রে মারা যেত, দু-এক সেকেণ্ডের বেশী লাগতো না। কারণ আঁদ্রে যদিচ অসীম সাহসিকতায় লড়ছে, তবু তার কলাকৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান অতি অল্প। নোয়েল আঁদ্রের ঘোড়ার দিকেই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন,—আঁদ্রে ঘোড়ার রেকাব থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে নোয়েলের দিকে লক্ষ্য করে বলে—"নোয়েল ত মেনেস এইবার তোমার মৃত্যু। কিন্তু বুলেটের আঘাতে নয়। ঠিক ওর মতই তোমাকে মারবো।" ওর কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ শোনালো। বেশ ধীর গলায় সে বলল—"আমি, আঁদ্রে মরোয়া, তোমাকে ঐ ভাবে তরবারির আঘাতেই শেষ করবো।" তার পর ফিলিপের মৃতদেহের পানে তাকিয়ে বলে, "ভাই ফিলিপে আমি শপথ করছি, ওর মৃত্যু আমার হাতে।"

এই বলে ভ্যালমোরিণের তরবারি কোমরে ঝুলিয়ে ঘোড়ায় উঠে পালালো আঁদ্রে।

নোয়েলের মুখে নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠে। চ্যাবরিলেইনকে হুকুম দেন—"ওকে ধরে আনো,—তবে ওকে জীবন্ত ধরে আনবে, মৃতদেহ নয়!'

সমস্ত অনুচরবৃন্দ নিয়ে ঠিক তার পিছনে ছুটলেন চ্যাবরিলেইন। আঁদ্রে ঘোড়া পিছনের পথে ছুটিয়ে গ্যাভরিলাক কবরখানায় ছুটলো। সদ্যনির্মিত সমাধির পুষ্পস্তবকের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালো এলাইন। —মূর্তিমতী পাষাণী!

আঁদ্রে অতি কোমল কণ্ঠে বলল—"স্মরণ করবে উনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন, তাতে উপকার পাবে।"

এলাইনের বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে ওঠে, সে বলে: "আপনি অতি সদাশয়. এই সময়ে আমার এমনই এক বন্ধুর অতি প্রয়োজন ছিল। আপনার করুণা আমি ভুলবো না।"

বড় ভায়ের মত স্নেহভরা কণ্ঠে আঁদ্রে প্রশ্ন করে,—"এখন তোমার কি হবে? বন্ধু-বান্ধব আছে? তারা কি বেশ বিশ্বাসযোগ্য?"

আঁদ্রের এই পরিবর্তিত ব্যবহারে বিস্মিত হয় এলাইন। সে

বলে—"এ জগতে নিশ্চিত হয়ে কি কোনো কিছু বলা যায়। যাই হোক্, তবে মারকুই ত্ত মেনেস—"

কর্কশ কণ্ঠে নামটা উচ্চারণ করলো আঁদ্রে,—স্বয়ং মহারাণী তাকে নাকি এলাইনের অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বাসনা যে এলাইন মারকুই ত্ত মেনেসের সহধর্মিণী হয়।

আঁদ্রে চীৎকার করে ওঠে—"না, কখনই নয়।"

"কিন্তু একথা বলার কি অধিকার তার?" এলাইন গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে। "আঁদ্রে, তুমি ক রাণীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারো?"

সহসা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়। আঁদ্রের মুখে অসহায়ত্বের চিহ্ন লক্ষ্য করে, আইভিমণ্ডিত একটি দরজার দিকে তাকে সরিয়ে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই চ্যাবরিলেইন এসে বলে ওঠেন, "আমরা এক আঁদ্রে মরোয়াঁর সন্ধানে বেরিয়েছি, বিশ্বাসঘাতক—"

কথাটি শেষ হল না, পাশের গলিতে আঁদ্রে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছে দেখে সেই দিকে তাঁরাও ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। স্তব্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখে এলাইনের ঠোঁট দু'টি প্রার্থনার বাণীতে কম্পিত হয়।

প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল আঁদ্রের। রাত হওয়ার পর ওর ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অনুসরণকারীরা ক্রমে এগিয়ে আসছে। লাক্রোশ সহরে বিনের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্য-সম্প্রদায় তাঁবু ফেলেছে, ঘোড়া থেকে নেমে পিছনের দরজা দিয়ে থিয়েটারে ঢুকে পড়ে আঁদ্রে।

নীচের তলায় সাজঘরে এক অদ্ভুত প্রাণী ওর দিকে এগিয়ে আসে। মুখে তার ভাঁড়ের মুখোস, মাথায় পাখীর পালক-বসানো টুপী, গায়ে লাল পোষাক, পরনে আঁটসাঁট পায়জামা—লোকটি বলে ওঠে আমি 'স্কারামুস' (মিলনান্ত নাটকের বিদূষক)। তার পরই নেশার তাড়নায় গড়িয়ে পড়ে যায়।

বিনে আঁদ্রেকে প্রকৃত স্কারামুস মনে করে ঠেলে ষ্টেজে ফেলে দেয়। এমনই জোরে পড়ে গেল আঁদ্রে যে পাজামা ছিঁড়ে গেল। দর্শকবৃন্দ হেসে ফেটে পড়লো। কিন্তু আঁদ্রের হৃদয় একেবারে ঠাণ্ডা হওয়ার জোগাড়। চ্যাবরিলেইন ও তার দলবল থিয়েটারে ঢুকে পড়েছে। স্তেভ্‌লিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে।

আঁদ্রে প্রাণপণে ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু সে আনাড়ি, তার অসুবিধা অনেক। কলমবাইনের সাজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হয়েছে লেনোর। নিঃসন্দেহে প্রেমাভিনয় এই সব ক্ষেত্রেই প্রদর্শিত হয়, কারণ লেনোর সোজা এসে ওর বাহুলগ্না হ'ল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই অতি মৃদুকণ্ঠে সে বলে ওঠে "ওঃ আঁদ্রে!" এই বলে তার গালে চড় মারে, লাথি মারে। দর্শকের করতালিতে কানে তালা লাগে।

অভিনয়ান্তে ষ্টেজের ওপর উঠে এসে চ্যাবরিলেইন বলেন, "আমরা আঁদ্রে মরোয়াকে খুঁজছি। লোকটা বিশ্বাসঘাতক। তার পর কর্কশ কণ্ঠে আঁদ্রেকে হুকুম করেন—"খোলো তোমার মুখোস।"

লেনোর চীৎকার করে ওঠে—"আঁদ্রে মরোয়া কি একই মুখে হাসে আর মিথ্যা কথা বলে? আচ্ছা ওর মুখোস খুলতে দিন।"

কিন্তু যেই চ্যাবরিলেইন স্বয়ং মুখোস খোলার উপক্রম করলেন, লেনোর এক গুপ্ত সুইচ টিপে দেয়। আঁদ্রে এক গুপ্ত দরজার পথে ষ্টেজের নীচে নেমে যায়।

চ্যাবরিলেইন নীচে সাজঘরে গিয়ে দেখেন স্কারামুস মাটিতে পড়ে আছে। বিজয়গর্বে স্তেভলিয়ে তার মুখোসটা সরিয়ে দিতেই অচৈতন্য আসল স্কারামুসের কুৎসিত মুখখানি বেরিয়ে পড়ে। স্তেভলিয়ে সদল বলে বেরিয়ে গেলেন।

লেনোর ঘরে ঢুকে কোমল গলায় বলে—"আঁদ্রে!" পোষাকের এক বিরাট ট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আঁদ্রে বলে, "তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে লেনোর। তুমি আমাকে ভালোবাসো।"

কিন্তু যে ছলনা আঁদ্রে তাকে করেছে সে কথা সহসা মনে পড়ে যায়। লেনোর চীৎকার করে ওঠে—"তোমাকে ভালোবাসি! আমি পাগল হয়েছিলাম তাই তোমার জীবন রক্ষা করেছি, কিন্তু ভেবো না তার অর্থ আবার যেখান থেকে সুরু করেছিলাম সেইখানে পৌঁছেছি।"

রাগে উন্মত্ত লেনোর আঁদ্রের বুড়ো আঙ্‌লটা মুখে পুরে কামড়ে দেয়। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যায়। আহত আঙ্‌লটি ঠিক করে নিয়ে আঁদ্রে তরবারিটা ধরে নিজের মনে আস্ফালন করে। মাতালের আচ্ছন্ন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"কি বাবা, ড্যাট্রেভাল কি খবর বন্ধু! মার্কুই ত্ত মেনেসকে যেমন শিখিয়েছ আমাকে একটু সেই রকম শিখিয়ে দেবে—?"

লোকটা আবার ঘুমিয়ে পড়ছে, আঁদ্রে তাকে তীব্র ভঙ্গীতে ঠেলা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করে, মাতালের পোষাক থেকে মার্কাস ক্রটাসের পুস্তিকার কয়েক খণ্ড মাটিতে পড়ে যায়।

আঁদ্রে প্রশ্ন করে—"এই পুস্তিকা তুমি কোথায় পেলে?"

—"তুমিই ত' দিয়েছ ড্যাট্রেভাল।"

ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করে আঁদ্রে মরোয়া।

এর পরের কয়েকটি সপ্তাহ আঁদ্রের জীবন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে রইল। বিনে বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য ওকে নিযুক্ত করেছে। নতুন স্কারামুসকে দেখার জন্য দূর-দূরান্তের দর্শক ভীড় করে আসতে থাকে। নাটকীয় ক্ষমতার অধিকারী আঁদ্রের অভিনয় ভালোই হচ্ছে।

নোয়েলের প্রাসাদে প্রতিদিন প্রভাতে ড্যাট্রেভালের কাছে অসিশিক্ষার অনুশীলন। নানা পথ ঘুরে এই প্রাসাদে পৌঁছতে হয়। মারকাস ক্রটাসের বন্ধু এই সংবাদ জানতে পেরে বিনা দ্বিধায় আঁদ্রেকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন।

এদিকে স্কারামুসের ভূমিকায় আঁদ্রের অভিনয়ের খ্যাতি এমনই ছড়িয়ে পড়লো যে, বিনের নাট্যসম্প্রদায় প্যারীতে আমন্ত্রিত হল অভিনয় প্রদর্শনের জন্য। আঁদ্রে লাক্রোশ কিছুতেই ত্যাগ করবে না—লেনোর মনে করলো এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো স্ত্রীলোক আছে। সে স্পষ্টই বললো, "রোজ ভোরে উঠে যার কাছে ছোটো নিশ্চয়ই তার জন্যে তুমি প্যারী যেতে চাইছো না।" তার পর আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে বলে—"আমাকে প্যারী নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি!" তবু কিছুতেই আঁদ্রে রাজী হল না। লেনোর রাগে জ্বলে ওঠে। কিন্তু কোনো ফল হয় না।

অসি-চালনা শিক্ষা বেশ বিনা বাধায় চলছো, একদিন প্রভাতে নোয়েল আস্তাবলে রাণীর জন্য তাজা ঘোড়া নির্বাচন করতে এলেন। ফেরার পথে অসি-ঘরে অসিচালনার শব্দ শোনা গেল। শুনেই উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তিনি ড্যাট্রেভ্যালকে

প্রশ্ন করলেন—"কত কাল আপনি বিশ্বাসঘাতক আঁদ্রে মরোয়াকে এই ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন ?"

আঁদ্রে হাসল। "উনি কখনো আঁদ্রে মরোয়ার নাম শোনেন নি। ওঁর ধারণা লোরেনের মণ্টগোমারীকে উনি অসিচালনা শিক্ষা দিচ্ছেন।"

উত্তেজিত নোয়েল ত্রুট্রেভ্যালকে হুকুম দিলেন ঘর ছেড়ে চলে যেতে। তার পর আঁদ্রেকে বললেন—"এই বার তোমার চূড়ান্ত শিক্ষা !"

আঁদ্রেকে পিছু হটতে হচ্ছে, নোয়েল স্বীকার করলেন—"হাঁ তুমি কিছু শিখেছ বটে। তবে সব শেখোনি।" ওপরের অলিন্দে পৌঁছাতে সামনে এসে দাঁড়ালো এলাইন, সে এখন নোয়েলের অভিভাবকত্বে আছে। হাঁফাতে হাঁফাতে আঁদ্রে বলে—"এলাইন, আমি শপথ করেছি ওর প্রাণ নেব। হয় ওর মৃত্যু নয় আমার।"

নোয়েল বলে—"পথ ছাড়ো এলাইন। সরে যাও।"

—"নোয়েল ওকে ছেড়ে দাও, উনি আমার বন্ধু।"

সহসা যেন ম্যাজিকের ফলে আঁদ্রের পিছনে একটা দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল। আঁদ্রে বলে ওঠে—"এলাইন, তোমার জন্য আমার জীবনটা বেঁচে গেল। দ্য মেনেস আবার দেখা হবে, আবার আমরা লড়বো।"

দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। গোপন-পথে ত্রুট্রেভ্যাল এসে বিদায় জানায়। আর তিনি স্বয়ং শেখাতে পারবেন না, তবে প্যারীতে তাঁর গুরুদেব পেরীগোর আছেন, বিখ্যাত অসিধারী, তাঁর কাছে যেতে বললেন।

আঁদ্রে বলে—"আমার শত্রুর যিনি অস্ত্রগুরু তাঁর কাছে শিক্ষালাভ, এর চাইতে সৌভাগ্য আর কি আছে !"

বাইরে প্রাঙ্গণে পৌঁছাতে লেনোরের সঙ্গে দেখা, সে রাগে চীৎকার করে—"সেই মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরছো, এলাইন দ্য গাভ্রিলাক। তুমি তাকে ভালোবাসো।"

গম্ভীর গলায় আঁদ্রে বলে,—"সারা পৃথিবী সহায় হলেও সে এলাইনকে ভালোবাসতে পারে না।"

—"তবে তোমার উদ্দেশ্যটা কি ?" লেনোর প্রশ্ন করে।

—"আমার পরম শত্রুকে নিহত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র-শিক্ষা। এখন আমরা প্যারী যাবো।"

—"প্যারী ?" প্রতিধ্বনি করে লেনোর, তার পর আঁদ্রের বাহুলগ্ন হয়।

পেরীগোরের কাছে অতি গভীর মনোযোগ-সহকারে অসিশিক্ষা করে আঁদ্রে। নোয়েল যে প্যারীতে আছে, এ সংবাদ আঁদ্রের জানা ছিল না, এক দিন স্টেজ-লিয়ে ওদের অভিনয় দেখতে এসে সাজঘরে এসে হাজির। বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি প্যারী এসেছেন, এলাইন দ্য গাভরিলাকের সঙ্গে এই সপ্তাহে বিবাহ হবে। সেই দিন সকালেই ওরা যুগলে প্যারী এসে পৌঁছেচে।

নোয়েলের কথায় আঁদ্রের মুখে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠলো, তা লেনোরের চোখ এড়িয়ে গেল না। নিভৃতে আঁদ্রেকে পেয়ে লেনোর বলে—"বুঝেছি, তুমি নোয়েলকে ঘৃণা করো এলাইনের জন্য ! কেমন তাই নয় ?"

আঁদ্রের কণ্ঠস্বর অতি শীতল,—যেন তরবারির ইস্পাতের ফলার মতই শীতল। সে শুধু বলে—"না, এলাইনের জন্য নয়।"

সারা রাত্রি আর ফিরে এলো না আঁদ্রে। পরদিন প্রভাতের অনুশীলন এমনই তীব্র হয়ে উঠল যে, পেরীগোর ভর্ৎসনা করে বললেন—"এ তোমার অসিশিক্ষা নয়, রীতিমত পথের লড়াই।" পরিশেষে কিন্তু তিনি ডবুকে নামক এক জন দর্শককে বললেন—"ও, হয়ত আমাদেরই লোক।"

পথের ওপর লেনোর ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত্রি জাগরণের ফলে তার আকৃতি অতি ক্লান্ত। সে প্রশ্ন করে, "কি কাণ্ড তোমার। কি হয়েছে ?"

গম্ভীর গলায় আঁদ্রে বলে—"কাল দ্য মেনেসের বাড়ি গিছলাম, সুরক্ষিত প্রাসাদ, ভেতরে যাওয়া কঠিন। কিন্তু আজ প্রভাতে আমি শপথ রক্ষা করবো, সাতটার সময় ও নাকি একা বইসে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়।"

লেনোর চোখে জল নামে। সে বলে—"তুমি কি পাগল ! এ যে নিশ্চিত মৃত্যু।"

শান্ত গলায় আঁদ্রে বলে—তাহলে আমার জন্য তুমি প্রার্থনা কোরো।"

প্রার্থনা হয়ত সে করেছিল। কিন্তু এলাইন দ্য গাভরিল্যাকের সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিল। আশ্চর্য ! অতি সহজেই তার শয়নকক্ষে প্রহরীরা তাকে নিয়ে গেল। কম্পিত কণ্ঠে লেনোর বলে, "আঁদ্রে মরোয়ার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে সে এসেছে।"

এলাইন সবিস্ময়ে বলে ওঠে—"মৃত্যু ! না—না ! এখনও মরেনি, তবে মরবে আধ ঘণ্টার ভিতর। বইসে তোমার প্রিয়তমের সঙ্গে সে লড়তে গেছে,—নিশ্চয়ই সে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।" তার পর সোজাসুজি প্রশ্ন করে—"তুমিও ত' তাকে ভালোবাসো ! নয় কি ? আঁদ্রের মৃতদেহ তোমার বা আমার কাছে কি সান্ত্বনা আনবে ?"

লেনোরকে পাশের ঘরে সরিয়ে রেখে নোয়েলকে ডেকে এলাইন বলে—"আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তুমি আজ সাতটায় বইসে যেতে পারবে না।"

তার এই উদ্বেগে প্রীত হয়ে নোয়েল বলে—"বেশ, আধ ঘণ্টা পরেই যাবো। তাহ'লে তোমার দুঃস্বপ্নের কাল কেটে যাবে।"

সাতটার সময় ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সচকিত আঁদ্রে দেখে এলাইন এসেছে। এই ভাবে অস্ত্র হাতে ঘুরছে দেখে সে তাকে গঞ্জনা দেয়। মেনেসের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে এলাইন বলল—"নোয়েল প্যারীতে কোনো দিন প্রভাতে বেড়ায় না।"

আঁদ্রে ধীর গলায় বলে—"সে যদি না বেড়ায়, অন্ততঃ আজ সকালে যদি না আসার সম্ভাবনা থাকতো, তাহ'লে তুমি এ সময় আসতে না। তুমি কি ওকে এতো ভালোবাসো যে এই ভয়।"

দৃঢ় গলায় এলাইন বলে—"না, যে মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি সেই থেকে তোমাকেই ভালোবেসেছি, আর কাউকে আমি ভালোবাসি না আর তুমিও আমাকে ভালোবাসো।"

আঁদ্রে অস্বীকার করে অতি তীব্র ভঙ্গীতে। কিন্তু এলাইন বলে—"আমি জানি, তুমি মিথ্যা বলছো। আমি চিরদিন তোমাকে ভালোবাসি।"

যেদিক থেকে নোয়েলের আসার সম্ভাবনা সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এলাইন। যখন এলাইনের সঙ্গে নোয়েলের দেখা হল, তখন সে যেন মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়েছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে নোয়েল বাড়ি ফেরে

বাসায় ফিরে রাগে জ্বলতে থাকে আঁদ্রে। এদিকে ডুবুকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে বোঝায়—জাতীয় রাষ্ট্র-পরিষদে জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে,—উদারনীতিকেরা এক জন বুদ্ধিমান বক্তার সন্ধান পেলেই অভিজাতবর্গ তাকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে হত্যা করে। আঁদ্রের মত এক জন সাহসী তরুণেরই আজ প্রয়োজন।—আঁদ্রের কিন্তু মোটেই উৎসাহ আসে না, অবশেষে শুনলো নোয়েলও এই পরিষদের অধিবেশনে আসে। তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো আঁদ্রে। শুনে লেনোরের মনে আতঙ্কের আর সীমা রইলো না। আবার সে গোপনে এলাইন অ গাব্রিলাকের সঙ্গে দেখা করলো।

নোয়েল পরিষদে এল না,—এলাইনের প্রভাবে রাণী তাকে অন্য কর্মে প্যারীর বাইরে পাঠাচ্ছেন। এদিকে প্রতিদিন এক জন সামন্ত আঁদ্রেকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানায় আর নিহত হয়।

চ্যাবরিলেইনের হাত ভাঙলো। সেই সন্ধ্যায় নোয়েল ফিরে এসে শপথ করলেন এর শোধ তিনি নেবেন।

এই কথা শুনে এলাইন এমন কাণ্ড করলো যা লেনোরকেও হার মানায়। সে কেঁদে বলল—"নিশ্চয়ই তুমি কোনো রমণীর কাছে যাবে।" তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য চ্যাবরিলেইনের প্রস্তাবে স্কারামুসের অদ্ভুত অভিনয় দেখতে যাওয়া স্থির হ'ল।

আর সেই রাত্রে দর্শক দলে উপস্থিত ছিলেন ফিলিপের শোক-সন্তপ্ত জনক-জননী।

এলাইন অপেরাগ্লাস দিয়ে লেনোরকে দেখছিল, তার পর সহসা স্কারামুসের পরিচয়ও সে বুঝে নিল।

আঁদ্রে যে মুহূর্তে নোয়েলের নাম উচ্চারণ করে তাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান জানালো এলাইন তখনই অসুস্থতার ভাণ করে নোয়েলকে অনুরোধ জানায় বাড়ি ফিরে যেতে।

কিন্তু নোয়েল উঠে দাঁড়াতেই আঁদ্রে বলে,—"এইবার চূড়ান্ত অভিনয়, তার পর রঙ্গমঞ্চের পর্দার প্রান্ত ধরে দুলতে দুলতে একেবারে নোয়েলের বক্সে এসে হাজির, বিদূষকের মুখোস খুলে সে বলে ওঠে—"তুমি নিশ্চয়ই আঁদ্রে মরোর্যার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে না?"

নোয়েলের মুখে কঠোর হাসি ফুটে উঠল, সে বলল—"এই তোমার শেষ অভিনয় স্কারামুস।"

তার পর সুরু হল অপূর্ব, অদ্ভুত, অভিনব অসিযুদ্ধ। এখন দু'জনেই সমকক্ষ। সারা রঙ্গমঞ্চ জুড়ে লড়াই চলছে। এক সময় এমনই কায়দায় আঁদ্রে তাকে ফেলল যে, নোয়েল আঁদ্রের কৃপাপ্রার্থী। বিকট আওয়াজ ক'রে আঁদ্রে তাকে বধ করতে যায়।

তার পর—তরবারি চরম আঘাতে উদ্যত, কিন্তু আঁদ্রের হাত শূন্যে যেন রুদ্ধ হল। কি হল আঁদ্রের? কি ছিল নোয়েলের চোখে, আঁদ্রের সব শক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, ইচ্ছাশক্তি অবলুপ্ত। আশ্চর্য্য! তরবারি মাটিতে ফেলে দিল আঁদ্রে।

রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরে এল আঁদ্রে। তখন রঙ্গমঞ্চ জনহীন। কিন্তু মঁসিয়ে অ ভ্যালমোরিণ তখনও অপেক্ষা করছেন তার জন্য।

ওদের তরবারির অপমান হয়েছে। আঁদ্রে তিক্ত গলায় বলে—"পারলাম না, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল না, ফিলিপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারলাম না, কি ছিল ওর চোখে,—ওর চোখ দেখে আমি আকুল হলাম—"

—"ওর চোখ দেখেও বোঝোনি!" অতি কোমল গলায় বৃদ্ধ ভ্যালমোরিণ বললেন—"তাহ'লে আমিই বলি! ছোটবেলায় তুমি প্রশ্ন করতে আপনি যদি আমার বাবা নয়, তাহ'লে আমার বাবা কে? মনে আছে? না না, ডি গাব্রিলাক তোমার বাবা ন'ন। তিনি স্বর্গতঃ মার্কুইস অ মেনেসের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। গাব্রিলাক তাঁর প্রিয় বন্ধুর এই গুপ্ত সংবাদ আজীবন রক্ষা করেছেন। স্বর্গতঃ মার্কুইস অতি সুপুরুষ ছিলেন, চোখ দু'টি ছিল অসামান্য। তাঁর সন্তানরা সেই চোখ পেয়েছে, কিন্তু হাসিটি পেয়েছে এক জন।"

—"তাহ'লে নোয়েল আমার ভাই?" সহসা আর একটি কথা মনে হল—"এলাইন আমার বোন নয়?"

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে লেনোর বলে—"না, সে তোমার বোন নয়, সুতরাং তাকে তুমি ভালোবাসতে পারো, ঠিক সে যেমনটি ভালোবাসে তোমাকে। এই বার আর অমন চঞ্চল হয়ো না, মনস্থির রেখো।"

লেনোরের চোখে জল—আঁদ্রে তাকে প্রেমভরে চুম্বনে অভিসিক্ত করে। কান্নাভরা গলায় লেনোর বলে—"আমি বলছি তাকে ভালোবাসো, আমাকে নয়।"

সেই দিন প্যারীর জনগণ বাস্তিলের পথে অভিযানে চলেছে। আঁদ্রের সঙ্গে আবার নোয়েলের দেখা হল।—মার্কুইস জনগণের পথরোধ করে তাদের বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করছেন। অভিযানকারীদের একজন নোয়েলের দিকে এগিয়ে এল, নোয়েল তরবারির আঘাতে তার হাতটি দ্বিখণ্ডিত করলো। তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত জনতা নোয়েলের দিকে এগিয়ে এল। পথের ধারে আঁদ্রে এক মুহূর্ত দ্বিধাভরে চিন্তা করলো, সে কোন পক্ষে। তার পর সে নোয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে জনতার বিপক্ষে লড়াই সুরু করে!

নোয়েলের মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হতে উভয়ের মুখেই হাসি দেখা যায়। সেই মুহূর্তে ওরা দুই ভাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। একটা মুগুর এসে পড়ে আঁদ্রের তরবারিটা ভেঙে দেয়, নোয়েল তখনই সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রতিরক্ষার চেষ্টায়। আঁদ্রেকে রক্ষা করবে নোয়েল। নিজের জীবনের বিনিময়ে ভাইকে বাঁচায় নোয়েল।

রাজপথে আনন্দ-কলরব। আজ আঁদ্রের বিবাহ। পথে, অলিন্দে, গৃহ-চূড়ায় লোক ভেঙে পড়েছে। গির্জা থেকে সুসজ্জিত গাড়ি বেরিয়ে এল। সদ্য-বিবাহিত এলাইন আর আঁদ্রে বসে আছে সেই গাড়িতে। লেনোরের বারান্দার নীচে এসে পৌঁছাতে ওপর থেকে একটা ফুলের তোড়া নীচে ফেলে দেয় লেনোর। নাকের কাছে তুলে ধরতেই আঁদ্রের মুখের ওপর বিকট শব্দ করে ফেটে যায় সেই ফুলের তোড়া,—তার সারা মুখ কালিতে ভরে যায়।

লেনোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল এক তরুণ লেফটেনান্ট। লেনোর তার হাতটি ধরে প্রশ্ন করে,—"কোথায় যেন তোমার বাড়ি বলছিলে—করসিকা!"

শেষ

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা.
গ্রাম ব্রিলিয়ান্টস,
টেলিফোন:-৩৪-১৭৬১

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ
২০০/২/সি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা. ফোন-পিকে: ৪৪১৬.
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে

ব্রাঞ্চ :—জামসেদপুর

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জননী সারদা দেবী

শুক্লা মজুমদার

মাতৃত্বের যে অম্লান-দ্যুতি শত শত ভক্তের হৃদয়পুরকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, স্নেহরসের অমৃত-সিঞ্চনে তাপিত সন্তানকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, সেই স্নেহনির্ঝরের উৎস যে নারী, যিনি দৈবীশক্তি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী, তিনিই ভারতের চিরন্তন-আরাধ্যা জননী শ্রীসারদা দেবী।

ভারতের নারী মাত্রেরই এক প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের ঐতিহ্যকে মহীয়ান ও নারীকে গরীয়সী করিয়াছে। পতিপ্রেমের অনির্ব্বাণ আলোক ভারত-নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই সতীত্বের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে মাতৃত্বের অমল মহিমা। ভারত-নারীর এই দুই মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল জননীর অন্তরের প্রধান ঐশ্বর্য্য। জগতে শাশ্বত কালের জন্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে অনন্ত নাট্যলীলা অভিনীত হইতেছে, সেই পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি সক্রিয়। নারী সেই প্রকৃতিরই অংশ। তাই নারীর চিরন্তন প্রেরণা পুরুষের জীবন-পথের অমূল্য পাথেয়। সারদা দেবীও নারীত্বের সেই গৌরবময় কিরীট ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সৃষ্টির পশ্চাতে দেখি শ্রীমায়ের অশেষ প্রেরণা। বিবাহের সময় অগ্নিসাক্ষী করিয়া এই আদর্শ-দম্পতী যাহা শপথ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জীবনে মধুর সত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ সহধর্ম্মিণী ও লীলাসঙ্গিনী। জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী জাতির আদর্শ গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রা। আবার সতীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অনসূয়া। পাশ্চাত্যের প্রতিকূল সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-নারী সেই সকল আদর্শস্থানীয়ার জীবন-বেদের মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই স্বয়ং আদ্যাশক্তি একটি জীবনে সেই সকল আদর্শের মর্ম্মবাণী কেন্দ্রীভূত করিয়া শ্রীমারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় সুকঠিন জীবন-সাধনার দ্বারা সেই আদর্শ ভারত-নারীর চিত্তপটে চিরমুদ্রিত করিয়া দিলেন।

শ্রীমা কখনো নিজে উপদেশ দিতেন না। তাঁহার পবিত্র জীবনই একটি মহান আদর্শ, একটি বিশাল উপদেশ। এই আদর্শ-দম্পতী পূর্ব্বেই অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলেন, নতুবা মাত্র ছয় বৎসরের বালিকার সহিত চব্বিশ বৎসরের এক অচেনা যুবকের আশ্চর্য্য মিলন হইল কি রূপে? সেই শুভ-মিলনের দিনই ক্ষুদ্র বালিকা সেই অজানা পুরুষের পায়ে অজান্তে আপনার নির্ম্মল জীবনটি উৎসর্গ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবী আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন পালন করেন। পরিপূর্ণ সংসারী হইয়াও এই আদর্শ স্বামি-স্ত্রী, সকল প্রকার দৈহিক ভোগবাসনার ঊর্দ্ধচারী ছিলেন।

প্রবাদ—"নারী নরকের দ্বার।" কিন্তু সারদা দেবী প্রমাণ করলেন যে, নারীর অঞ্চলেই স্বর্গদ্বারের চাবি বাঁধা। শঙ্করাচার্য্য কামিনীকে বিষবৎ পরিত্যজ্য বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবী স্বীয় জীবনের ভিতর দিয়া দেখাইলেন যে, পত্নী পতির তপস্যায় কত বড় সহায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্কীর্ণ, তমসাচ্ছন্ন মানবচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্যোতি বিকীর্ণ করার পিছনে আছে উমারূপিণী সারদা দেবীর নিরলস জীবন-সাধনা। সতীত্বের উজ্জ্বল আলোকপ্রভায় তাঁর এই সাধনা ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার সময় এক দিন ঠাকুর চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি কি আমায় সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?" মা বলিয়াছিলেন—"না না তা কেন, আমি তোমায় ইষ্ট-পথে সাহায্য করতে এসেছি।" সহকর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য এবং স্বামীর একান্ত অনুরোধে শ্রীমা সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের বৈধব্যের দুঃসহ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীমা সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ পরিচালনা করেন। তাঁহারই মাতৃস্নেহাঞ্চলের ছায়ায় বৃদ্ধি পাইয়া সেই ক্ষুদ্র সঙ্ঘ সুবিস্তৃত হয়। গভীর পতি-অনুরাগই এই সফলতার মূলে। সারদা দেবী তাঁর জীবন-সাধনার যে আদর্শ চিত্র ভারত-নারীর চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এ-যুগের সীতারই সতীত্বের জীবন্ত আলেখ্য। ভারত-নারী যদি এই আদর্শটিকে অন্তরে নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মত দীপ্যমান করিয়া রাখিতে পারে, তবে তাহার চিরন্তন উদ্দেশ্য সফল হইবে। শিবের পার্শ্বে যেমন শক্তিরূপিণী উমা, নারায়ণের পার্শ্বে কমলালয়া কমলা, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বে শ্রীসারদা দেবী যেন পরম পুরুষের পার্শ্বে পরমা প্রকৃতি।

সারদা দেবীর অন্তরে মাতৃত্বের অজস্র স্নেহসুধা-ধারার উৎস ছিল। তিনি ছিলেন মাতৃত্বের শুভ্র জ্যোতিতে ভাস্বর। মাতৃত্বের সহজ অনুভূতি তাঁহার অন্তরকে অপূর্ব্ব সুষমা দান করিয়াছিল। তাঁহার স্নেহকাতর হৃদয় "মা" এই মধুর ডাকের বড়ই প্রত্যাশী ছিল। তাই তিনি এক দিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হাঁ গো, একটা ছেলেপুলে হবে নি? সংসারধর্ম্ম বজায় থাকবে কি করে?" ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ছেলে চাও? পরে এত ছেলে হবে যে, অস্থির হয়ে উঠবে।" ঠাকুরের বাণী ভবিষ্যৎ ফল প্রসব করিয়াছিল। শত শত ভক্তের ভক্তিবিনম্র মাতৃ আহ্বানে মায়ের ব্যাকুল বাসনা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার এই মাতৃরূপই জগৎকে বিস্ময়মুগ্ধ করিয়াছে।

তাঁহার জীবননাট্যের তিনটি উল্লেখযোগ্য অঙ্ক—কন্যারূপিণী মা, ভার্য্যারূপিণী মা, ও মাতৃরূপিণী মা। ইহার ভিতর শেষাঙ্কটিই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। মাতৃত্বের অন্তঃশিলা ফল্গুধারা মাতৃহীনের, নিরাশ্রয়ের হৃদয়ে কি সরস গভীর স্পর্শানুভূতি জাগাইত! বিদেশিনী নিবেদিতাও তাঁহার হৃদয়ে কোন্ স্বর্গামৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী তাঁহার "Mother" নামক পুস্তকখানি। তিনি ছিলেন যেন জগজ্জননী। তাই তাঁহার বিশ্বব্যাপী স্নেহের নিকট সকল জাতিভেদ, উচ্চ-নীচ বোধ তুচ্ছ হইয়া গেল, সমস্ত জগৎমানব

এক সন্তানরূপে ধরা দিল। তাঁহার নিকট শরৎও যা, আজমও তাই। তাঁহার এক মনুষ্যত্ব বোধ ছাড়া আর কোন ভেদ-বোধ ছিল না। ভক্ত সন্তানদের জন্য তিনি জীবনব্যাপী বহু কৃচ্ছ্রসাধনা ও পরিশ্রম সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের তপস্যার তপোবন ছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নহবৎখানার ক্ষুদ্র ঘরখানি। জগতের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া তিনি যে জীবন-সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার মহত্ব আজি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই জগতে এত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিরাটের দিকে, মহতের দিকে মানুষের এক স্বভাবগত আকর্ষণ আছে। তাই বিংশ শতাব্দীর কলুষ-কলঙ্কিত মানুষও আজ সেই মহীয়সী জননীর পবিত্র জীবনানুধ্যান করিতে আকৃষ্ট হইয়াছে।

আজকের দিনে এমন অনেকেও আছেন, যাঁহারা সারদা দেবীর প্রতি মানুষের এই ভক্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের সমালোচককে সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলিতে চাহেন—সারদা দেবী বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন এই হিসাবে যে, তিনি স্বামীর ধর্ম্মপথে কোন বিঘ্ন ঘটান নাই। তাঁহার চরিত্র পবিত্র ছিল বটে। তাই বলিয়া তাঁহার কর্ম্মের কিছু স্বাক্ষর নাই।

আমার প্রশ্ন এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁহার সঙ্ঘটিকে বাঁচাইল কে? তাঁহারা হয়তো বলিবেন—স্বামীজি। কিন্তু আমি বলিব তাহা নহে। কারণ, যেখানে নারী নাই সেখানে পুরুষেরও জয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহার ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, স্বামীজি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, আর শ্রীমা গঠন করিয়াছেন।

কন্যারূপিণী শ্রীমার রূপটি বড়ই মধুর! জয়রামবাটী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জীবনের এই অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। নিরলস গৃহকর্ম্মরতার রূপখানি যেন তপস্যাচারিণী উমারই প্রতিচ্ছবি! গ্রামের সরল-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশটি তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁর অন্তর সরলতার স্বর্ণ-সুষমায় মণ্ডিত হইয়া বাহিরকেও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য ছিল কি না জানি না, কিন্তু তাঁর হৃদয়-সৌন্দর্য্য তাঁর দেহে স্বর্গীয় লাবণ্য আনিয়াছিল। তাঁহার চিত্তটি যেন একটি শুচি-শুভ্র বিকশিত শতদল। সেই শতদলের মধু-সৌরভে তাঁহার সমস্ত জীবন সুরভিত হইয়াছে এবং সংসার-উদ্যানকে চিরদিন নন্দিত করিয়াছে। সারদা দেবী মাত্র ছয় বৎসর বয়সেই গৃহের অধিকাংশ কার্য্য করিয়া মাতার পরিশ্রমের লাঘব করিয়া দিতেন। তার পর এক অজ্ঞাত যুবক আসিয়া এই শুচি-সুন্দর কুসুমটিকে চয়ন করিয়া হৃদয়ের ভূষণ করিয়া লইলেন।
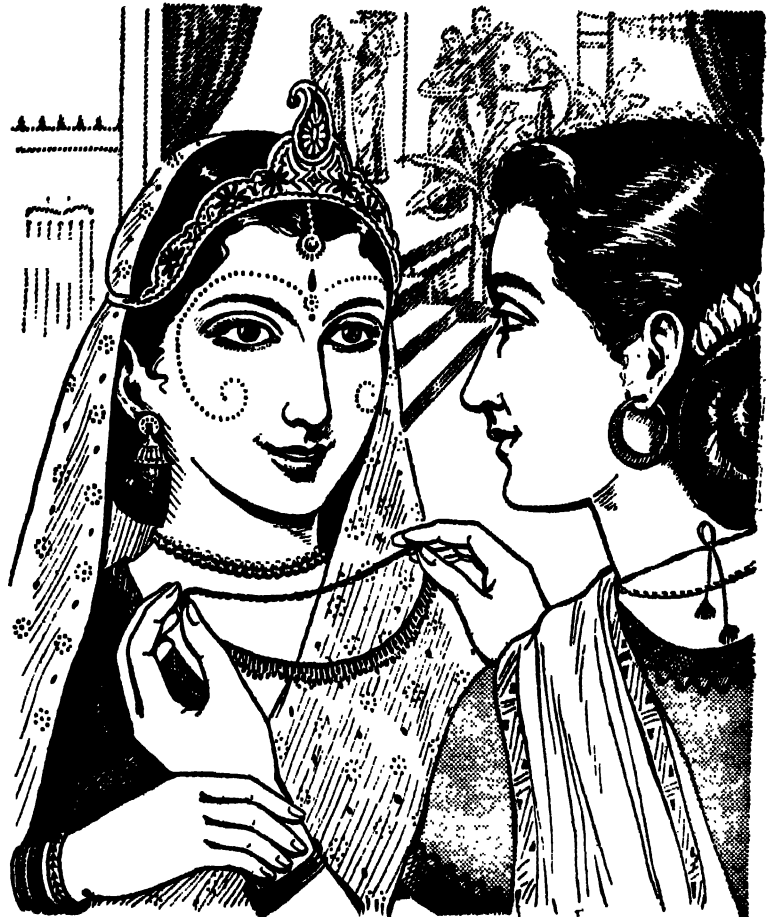
শ্রীমা কোন দিন লেখাপড়া করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবনের মধ্য দিয়াই জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ। স্বামীজি বলিয়াছেন—"মার ভিতর দিয়াই জগতে নূতনতর গার্গী-মৈত্রেয়ী আবির্ভূত হইবে।" অতি সহজ ভাষায় তিনি মানব-জীবনের মূলমন্ত্রকে উপদেশ দিতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ও কি যে-সে! ও যে সারদা, জ্ঞানদা। ও আমার সারদায়িনী সরস্বতী।" এক দিন সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করেন—"আমাকে তোমার কি মনে হয়?" ঠাকুর বলিলেন—"কি আবার? মন্দিরের ভবতারিণী মা, তুমিও তাই।" এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়, যখন দেখি ঠাকুর শ্রীমাকে জগন্মাতৃরূপে পূজা করিয়া তাঁহার চরণে জীবনের সকল সাধনা উৎসর্গ করেন। শ্রীমার অন্তরে দেবীভাব প্রবল ভাবে প্রকট ছিল বলিয়াই তিনি এই পূজা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই ঘটনার ভিতর দিয়াই দেবীর দেবীত্বের চরম বিকাশ!

সারদা দেবীর পূত জীবন সম্পূর্ণ আলোচনা করিবার মত লেখনী-শক্তি আমার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু অনুভব করিয়াছি, তাহাকে যদি পাঠকবর্গের অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমার লিখিবার সার্থকতা। সারদা দেবীর মাতৃরূপই কালের নিবিড় তমসা ভেদ করিয়া যুগে যুগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে মাতৃরূপে আমি সেই নারীত্বের আদর্শ, সরলতার জীবন্ত বিগ্রহ, শুচিস্নিগ্ধ কুসুমতুল্য এই মহীয়সী নারীর প্রতি, আমাদের শাশ্বত মাতার প্রতি, আমার ভক্তিপুষ্পের অর্ঘ্যথালি ও প্রণাম-অঞ্জলি উৎসর্গ করি।

কথা নয়—কাহিনী

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

বার বার বলা কথা, তবু বলতে এত দিন একটু ক্লান্তি অনুভব করেনি সুপর্ণা। বরং বুকের মধ্যে বেশ খানিকটা হালকা মনে করতো ও—যেন একখানা ভারি পাথর ওর চেতনার কোন অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে,—অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। মর্মমথিত কথাগুলি উজাড় করে দিতে পারলেই সুপর্ণা বেশ খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতো।

কথা ঠিক নয়—কাহিনী। মর্মবিদারক কাহিনী। কিন্তু ইদানীং শ্রান্তির কুয়াশা ওর দুই চোখের তারায় যেন থমথম করে,—বার বার বলা কাহিনী পুনরাবৃত্তি করতে বিশীর্ণ ঠোঁট দু'টি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

সুপর্ণার স্বামী সুপ্রিয় রেল-কারখানার ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব সহকর্মী মহলে সে শিকারী পরিচয়ে অধিক খ্যাত ছিল।

শিকারী সুপ্রিয়র নিপুণ গুলীচালনার সুদক্ষ কৌশল কে না জানে? আকাশে উড়ন্ত বকের ডানা ভেদ করে ঠিক বুকের মধ্যিখানে গুলী বিদ্ধ করতে বিচিত্র ক্ষমতা তার,—ঝিলে বিচরণকারী বালিহাঁস শিকারে তার কৃতিত্বের তুলনা হয় না।

এক দিনের স্মৃতি সুপর্ণা কিছুতেই ভুলতে পারে না। বছর আষ্টেক আগের কথা। তখন নূতন বিয়ে হয়েছে সুপর্ণার। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরবেলায় স্বামীর সঙ্গে ঝিলের ধারে শিকার করতে গিয়েছিল। টলমলে ঝিলের জলে বালিহাঁসগুলো চরে বেড়াচ্ছে,—আবার উড়ে যাচ্ছে,—হাঁস-দম্পতির কলকাকলীতে ঝিলের তীর মুখর হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে করুণ আর্তনাদ উঠলো,—সুপ্রিয়র সুদক্ষ হাতের গুলী একটি হাঁসের একটি চোখের মণিতে বিদ্ধ হয়েছে। হাঁসটির বিলাপধ্বনি আজও সুপর্ণার কানের পর্দায় ঠোক্কর খেয়ে ফেরে। দৃশ্যটি দৃষ্টিতে ভেসে ভেসে ওঠে। হাঁসটির গুলীবিদ্ধ চোখে অবিরল ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে,—আর এক চোখে সে চোখটি ফিরে পাওয়ার করুণ আবেদন জানাচ্ছে।

সুপর্ণা তবু স্বামীকে এ সৌখীন জীবন-বিলাস থেকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেনি,—কি দাবী জানায় নি,—খুশী হয়েই স্বামীর আনন্দ-অংশ গ্রহণ করেছিল।

তবে হিংস্র আর দুরন্ত জানোয়ারগুলিকে ও যখন নিপুণ কৌশলে বধ করে ফেলতো—সুপর্ণা স্বামীর বীরত্বের কৃতিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না।

ডুয়ার্সের জঙ্গলে কয়েক বার উন্মত্ত হাতী সে খতম করেছিল,—এ ছাড়া বাঘ বরাশূকর হত্যা তো তার নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনা ছিল।

বছর খানেক সুপ্রিয় শিকারে ইস্তফা দিয়েছে। কেন দিয়েছে,—সে দু'টি কথা নয়—সে কাহিনী।

সম্প্রতি প্রাক্তন জায়গায় আবার বদলি হয়ে এসেছে সুপ্রিয়,—বছর দশেক আগে এ দিককার রেল-কারখানায় নূতন ইঞ্জিনীয়ার সামান্য পদে চাকরী নিয়ে এসেছিল—এবার আবার এল উঁচুপদের গরিমা নিয়ে। রেল-কারখানায় ওর সম্বন্ধে আলোচনা জমজমাট হয়ে উঠেছে,—এবার যে ফোরম্যান বদলি হয়ে আসছে,—দুর্দান্ত অফিসার নয়—দুর্দান্ত শিকারী। সুপ্রিয়র প্রাক্তন সহকর্মীরা—বন্ধু-বান্ধব—গুণগ্রাহী দল সকলে একে একে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

মাস দুই-তিন অতিক্রম করছে—তবু ওদের আসার বিরাম নেই,—ঔৎসুক্যের অন্ত নেই।

ঔৎসুক্য বৈ কি। বিখ্যাত শিকারী কেন শিকারে ইস্তফা দিল? কৌতূহলী মনে জানবার ঔৎসুক্য প্রবল হয়ে ওঠে,—নানা প্রশ্ন ভীড় করে আসে। সব চেয়ে বিস্ময় বোধ করে ওরা—বৈঠকখানা-ঘরে আর সেই সুপ্রিয়র শিকার-আভিজাত্যের সমারোহ নেই। দেওয়ালে টাঙ্গানো নেই,—ফরাসে বিছানো নেই, ব্যাঘ্র মহারাজের চর্ম-আবরণ,—ওদের মস্তকের ও চোখের জৌলুসের এবং হরিণের আঁকা-বাঁকা শিঙের অভাবে ঘরখানাকে সদ্য-বিধবা মেয়ের মত নিরাভরণ দেখাচ্ছে। বিখ্যাত শিকারীর কেন এ বৈরাগ্য? কেন এ পরিবর্তন?

সে তো কথা নয়! কাহিনী। মর্মমথিত কাহিনী।

সুপ্রিয়র প্রাক্তন সহকর্মী ও গুণগ্রাহীদের সুপর্ণা জানায়—উনি এখন আর শিকার করেন না।

সুপর্ণার পাশে একখানা কৌচে বসে সুপ্রিয় একটার পর একটা চুরুট ধরায় আর শেষ করে—স্ত্রীকে বলে—তুমি ওদের কাহিনীটা বল পর্ণা, ওদের বল, ওরা এবার ওদের প্রিয় শিকারীকে ভুলে যাক্। ম্রিয়মাণ হাসে সুপ্রিয়। সহকর্মী আর গুণগ্রাহীদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কেন শিকার করি না—সে তো কথা নয় ভাই, কাহিনী—তোমরা ওঁর কাছে শোন।

মাস চার-পাঁচ ক্রমান্বয়ে এ কাহিনী শোনাচ্ছে সুপর্ণা ওদের—বার বার বলা কথা পুনরাবৃত্তি করতে এত দিন ও একটুও ক্লান্তি অনুভব করতো না। বরং বুকের মধ্যে বেশ খানিকটা হাল্কা মনে করতো। মর্মমথিত কাহিনী উজাড় করে একটু স্বাচ্ছন্দ্য সে পেতো। কিন্তু ইদানীং শ্রান্তির কুয়াশা ওর দুই চোখের তারায় যেন থম্‌থম্ করে। বার বার বলা কাহিনী পুনরাবৃত্তি করতে বিশীর্ণ ঠোঁট দু'টি কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

যেন মনে হয় আবার ওকে জীবন-প্রহসনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে—জীবন-প্রহসনকেই আলিঙ্গন জানাতে হবে। জীবন-প্রহসন ছাড়া আর কী?

এক দিন নয়—এক মাস নয়,—প্রায় সাত বৎসরের প্রতিটি মুহূর্তের মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ আর সুধা-রসে সে তাকে পূর্ণ করে রেখেছিল—সে তার সমস্ত হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিল। মেয়ে ছাড়া জীবন সুপর্ণার বরাবর শূন্যতার প্রতীক বলে মনে হয়েছে। দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে মেয়েকে এক দিন ছেড়ে সে থাকতে পারেনি,—মামাদের কাছেও পাঠায় নি।

সুপ্রিয়কে চাকরী উপলক্ষে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে হয়,—মেয়েকে শিক্ষার জন্যে কোনও পাহাড়ের বোর্ডিঙে রাখবার প্রস্তাবও করেছিল, কিন্তু সুপর্ণা সম্মত হতে পারেনি। ও তার শিক্ষার ভার নিজে নিয়েছিল। বলেছিল—মেয়েকে দূরে পাঠাতে সে ভরসা পায় না—যদি—আর সে ভাবতে পারে না, কী যেন শঙ্কায় ওর বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। কিন্তু ওর সব শঙ্কা, সব সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে একটি মুহূর্তে ওর খুকু ওর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সে বিচ্ছিন্নতার ঘটনা কথা নয়, কাহিনী।

সুপর্ণার বারে বারে মনে হয়—আবার এ জীবন-প্রহসনের কি বা প্রয়োজন ছিল? আবার আর এক বার ওকে মাতৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে—এ-যেন প্রহসন শুধু নয়, জীবন-ব্যঙ্গেরও ইঙ্গিত।

ইদানীং সুপ্রিয়র সহকর্মী ও গুণগ্রাহীদের তার শিকার-জীবনের বৈরাগ্যের কথা নয়, কাহিনী শোনাতেও রীতিমত ক্লান্তি অনুভব করে।

সুপ্রিয় স্ত্রীকে আর বসবার ঘরে ডাকতে সাহস পায় না। চিকিৎসকও অভিমত জানিয়েছেন—এ সময়টা ওঁর পক্ষে মানসিক প্রফুল্লতার বিশেষ প্রয়োজন।

সুপ্রিয় বন্ধুদের কাছে মার্জনা চেয়ে বলে—শিকার আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু কেন ছেড়ে দিয়েছি—এ প্রশ্ন তোমরা আমাকে কোরো না। সে কথা নয়, কাহিনী—কিন্তু বলবার অধিকারও আমার নেই। কারণ আমি সে মর্মমথিত কাহিনীর পাষণ্ড নায়ক।

এর পর কিছু দিন সুপ্রিয়র শিকারপ্রিয় বন্ধুরা আর আসেনি। সেদিন এল এক বন্ধুর চিঠি।

চঞ্চল মৈত্র রাজস্থান থেকে লিখছে—অনেক দিন পর বাঙলা দেশে দিন কতকের জন্যে যাচ্ছি। প্রায় দশ বছর পর। অনেক চেষ্টায় তোর ঠিকানা জোগাড় করেছি। তোর সঙ্গে এক দিন দেখা করব। প্রায় বারো বছর আমাদের দেখা-শোনা নেই। তোর শিকারের ঝোঁক নিশ্চয়ই আগের মতই আছে। মধ্যে দু-এক বার কাগজে ছবি দেখেছিলুম। প্রকাণ্ড এক বাঘ আর এক উন্মত্ত হাতী তুই বধ করেছিলি। সব গল্প তোর কাছে শুনবো—আর প্রকাণ্ড বাঘের ওই গাত্রাবরণটা তোর ঘরের সমৃদ্ধি যে আরও কত বাড়িয়েছে, তা গিয়ে দেখবো।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সুপ্রিয় আনমনা হয়ে গিয়েছিল। সুপর্ণাও চিঠিখানা পড়েছে। স্বামীর কাছে সরে এসে একখানা হাত তার কাঁধে রেখে বললে—এতে এত ভাবনার কী আছে তোমার? চঞ্চল বাবুকে তুমি আসতে লিখে দাও, আমি কথা নয়—কাহিনী শোনাব।

কিন্তু—সুপ্রিয় স্ত্রীকে দেখছে চিন্তিত দৃষ্টির বিষণ্ণতা নিয়ে। ক্লান্ত কণ্ঠে অথচ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলে—তোমার কষ্ট হবে যে পর্ণা!

সুপর্ণার কষ্ট হবে, এ কথা সত্যি। তবু সে স্বামীর কষ্ট তো খানিকটা লাঘব করতে পারবে। দুর্ঘটনা যে ঘটে গেছে তার নায়ক যে সুপ্রিয়, সুতরাং সে নাটকের নাট্যকার তো তাকে হতেই হবে। স্বামীকে উৎসাহিত করে বললো—কষ্ট হবে এ কথা সত্যি, তবু গর্বও তো আছে তার সঙ্গে। যে নাটকের তুমি নায়ক—আমি হব তার নাট্যকার। কত দূরান্তরের মানুষকে আমি শোনাবো—কথা নয় কাহিনী।

কয়েক দিন পর ঘরে ঢুকে চঞ্চল প্রথমেই বন্ধুকে প্রশ্ন করলো—এ কি! ঘরখানাকে একেবারে নিরাভরণ করে ফেলেছিস্ যে! ঠিক যেন সদ্যবিধবা মেয়ের মত শূন্যতায় থম্‌থম্ করছে। চঞ্চল সমস্ত ঘরখানায় আকুল আগ্রহ নিয়ে শিকারীর ঐশ্বর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ শিকারীর ঐশ্বর্য! প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের মসৃণ গাত্রাবরণ—উন্মত্ত হাতীর দন্তসারি,—চঞ্চল হরিণের আঁকা-বাঁকা শৃঙ্গ—কিন্তু ঘরে কোথাও তার আর চিহ্ন নেই!

ম্রিয়মাণ হাসলো সুপ্রিয়—ঘন ঘন চুরুট টানতে টানতে বললো—শিকার ছেড়ে দিয়েছি ভাই—

—শিকার ছেড়ে দিয়েছিস! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না যেন চঞ্চলের।

—হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছি—মনের শক্তি অর্জন করতে সুপ্রিয় আরও ঘন ঘন চুরুট টানছে—আস্তে আস্তে বললো, এখন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নির্মম নির্দেশে শিকারীর বন্দুক থমকে থেমে গেল!

এইবার চা ও জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুপর্ণা। দুপুরের রৌদ্রের মত একটু আতপ্ত হেসে বললো—হ্যাঁ, অদৃশ্য শক্তিরই নির্দেশ চঞ্চল বাবু! তাই কৌশলী শিকারীর নিপুণ গুলীতে তার একমাত্র বধূ শেষ নিঃশ্বাস ফেললো।

—আহা! কেঁপে উঠেছে চঞ্চল, যেন শিকারীর গুলীবিদ্ধ হয়ে একটা ঘুঘু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

সুপর্ণা বলতে লাগলো—ইচ্ছে করেই উনি ডুয়ার্সের জঙ্গলের দিকে বদলি চেয়ে নিয়েছিলেন। নূতন ব্রীজ নির্মাণ ও রেললাইনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অবসর সময়ে শুধু শিকার আর শিকার। ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে কত বুনো হাতী, বড় বড় বাঘ শিকার, এ ছাড়া হরিণ-হাঁস-পাখী এসব তো আছেই। কিন্তু জীবন নেবারও একটা প্রতিশ্রুতি আছে, জীবন ফিরিয়ে দিতে হবে বৈ কি জীবনের বিনিময়ে? সাত বছরের ঘুমন্ত মেয়ের তাজা রক্তে শোধ করে দিতে হোল অজস্র জীবনের দাম।

অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করলো চঞ্চল—যে জীবন বিঘ্ন ঘটায় সভ্য সমাজে, মানুষেরই মঙ্গল কামনায় তাদের তো বিনাশের প্রয়োজন। সুপর্ণা বললো,—ঘুঘুপাখী, হরিণ-শিশু, হাঁসদম্পতী নিশ্চয় সভ্য সমাজের প্রতিকূলে নয়, ওদের দীর্ঘশ্বাস ওদের অশ্রুজলের সমাধি রচিত হোল আমাদেরই কন্যার প্রাণস্পন্দনে শেষ বলিদানে।

হরিয়ালের বিলাপ কূজনে খুকুর মুমূর্ষু নিশ্বাস এক হয়ে মিশে গেল।

—থাক্ বউদি—অনুরোধ জানালো চঞ্চল—এ মর্মমথিত কথাগুলো আর শোনবার ধৈর্য্য নেই তার।

—না না—সুপর্ণা বললো,—এ তো কথা নয় কাহিনী, বাকী অধ্যায়টুকু তাকে শেষ করতেই হবে। সুপর্ণা বলতে লাগলো—সেদিন আমাদের প্রোগ্রাম ছিল অনেক দূরে এক ঝিলে বালিহাঁস শিকারে বের হব। খুব ভোরবেলা আমরা প্রস্তুত হয়েছি, টোটা-ভর্তি বন্দুক প্রস্তুত করা হচ্ছে। খুকু ঘুমুচ্ছে, ওকে ঝি-এর কাছে রেখে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে ঘটলো সেই দুর্ঘটনা,—কথা নয় কাহিনী। যেন শিকারী-জীবনের চরম প্রহসন,—শিকারীর হাতেই আকস্মিক ট্রিগারটা পিছলে গিয়ে বন্দুকের গুলী তার নিজের কন্যাকে একটি মুহূর্তে রাক্ষসের মত গ্রাস করে ফেললো। জীবনের পরিশোধ জীবনের বিনিময়ে করতে হোল।

এর পর ঘরের মধ্যে কেউ আর একটি বাক্য ব্যয় করতে পারেনি। শুধু একটা স্তব্ধতা থম-থম করছে। সুপ্রিয়র চুরুটের ফিকে কালো ধোঁয়া একটা রহস্যের জাল বুনে চলেছে।

অনেকটা সময় কেটে গেল—যে কাহিনী চঞ্চল এতক্ষণ শুনলো—, তা নাটক কী নাটকের প্রহসন, তা সে উপলব্ধি করতে পারলো না—কখন যেন সে নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করলো।

এক দিন ক্লান্ত গলায় সুপর্ণা স্বামীকে অনুযোগ ক'রে বললো—চঞ্চল বাবু সেদিন চলে গেলেন—বিশেষ কথাবার্তা হোল না,—খেলেন না তেমন কিছু—

তাতে কী! আবার ওকে ডাকবো এক দিন—সুপ্রিয় বললো,—তুমি ভালো হয়ে ওঠ, ওকে রাজস্থান থেকে নিমন্ত্রণ করে আনাবো। জানাবো, এক ছোট্ট মানুষ আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেছে—তার শোকগাথা তুমি শুনে গেলে। এবার এস। আর এক নূতন মানুষ এসেছে—তার আনন্দবার্তা নিয়ে যাও, তার নূতন জীবনযাত্রাকে অভিনন্দন জানাও।

—নূতন মানুষ—সুপর্ণার ঠোঁটে একটু হাসি চিকচিক করছে। ক্লান্তির কুয়াশা চোখের তারায় স্তিমিত হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে বললো,—আর যে উদ্যম নেই। এ জীবন-প্রহসনের আর কি প্রয়োজন ছিল?

সুপ্রিয় ওকে উৎসাহিত করে বললো,—মনে কর তুমিই আমাদের খুকু, বছর দুই কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে—ধরে নাও বিলেতে নার্সারিতে গিয়েছিলে। আবার ফিরে এসেছ।

উত্তর দেয় না সুপর্ণা, নিঃশব্দে কী যেন ভাবে। এক দিন আনন্দ প্রকাশ করে স্বামীকে বললো,—শোন, তোমার কল্পনা ভুল হয়নি। সত্যি খুকু আবার আমাদের কাছে আসছে।

—সত্যি তাই না কি? সুপ্রিয় স্ত্রীর দিকে আগ্রহ-উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

সুপর্ণা বললো,—কাল আমি স্বপ্ন দেখলুম, খুকু আমার পাশে শুয়ে আমার গায়ে একখানা হাত রেখে বলছে, মা—এখানে আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমার আছে আমি যাব।

সুপ্রিয় আনন্দ প্রকাশ করে বললো,—খুকু তাহলে আবার আমাদের কাছে আসছে,—অস্ফুট কণ্ঠে সুপ্রিয় কয়েক বার উচ্চারণ করলো খুকু—খুকু আসছে?

আবার দিন গুণতে সুরু করেছে সুপর্ণা। ক্রমশঃ ওর মাতৃত্ব আসন্ন হয়ে আসে—ওরা স্বামি-স্ত্রী আলোচনা করে, চঞ্চলকে ওরা প্রথমেই নিমন্ত্রণ জানাবে। সে চিঠির খসড়াও এক দিন তারা লিখে ফেললো।

* * * *

খুকু আবার এল।

হয়তো জন্মান্তর নিয়েই খুকু আবার সুপর্ণার শূন্য মাতৃত্বকে পূর্ণ করে দিল। শুধু পার্থক্য এই—সে বার খুকুর ছিল সুন্দর পটলচেরা দু'টি চোখ। এবার সুন্দর দু'টি চোখের—একটির দৃষ্টি একেবারেই অন্ধ। সে চোখে মণি নেই, তারা নেই,—একটা গভীর ক্ষত অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ হ'ল প্রসব-পর্ব সারা হয়ে গিয়েছে। নবজাতকের অন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে আর এক দিকে ফিরে শুয়ে রইল সুপর্ণা। সুপ্রিয় ওর পাশে এসে বসেছিল। স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, —সেই সে বার একটা ঘুঘুপাখীর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো—তোমার মনে আছে নিশ্চয়?

মনে শুধু নয়—সুপর্ণা জানালো—স্মরণের পটে একেবারে আঁকা হয়ে আছে।

সুপ্রিয় বললো—সেই ক্ষত চোখটি আমার মেয়েই ফিরে পেলো।

তা'তো পেতেই হবে—স্বপর্ণা বললো, দেওয়া আর নেওয়া—নেওয়া আর দেওয়া, এই বিনিময়ের মধ্যেই তো কথা নয়, কাহিনী যুগ যুগ ধরে মঞ্চস্থ হবে।

কখন যেন চঞ্চলকে লেখা চিঠির খসড়াখানা স্বপ্রিয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো—তার কয়েকখানি টুকরো হাওয়ায় উড়ে এসে স্বপর্ণার বিছানায় পড়লো—নূতন খুকুর গায়ে বিছিয়ে রইল।

খুকু তখন নিদ্রামগ্ন—ওর অন্ধ চোখের ক্ষতস্থানে জীবন-শূন্যতা থম্‌থম্‌ করছে।

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোদা দেবী

সেই অতি শৈশবের বরিশালের লীলাখেলার আবেষ্টন হইতে যে ভাবে বিদায় লইয়া ঢাকা নগরীতে আসিয়াছিলাম, আবার ঠিক সে ভাবেই পুনরায় ঢাকা হইতে বিদায় লইয়া মধুময় স্কুল-জীবন জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। ক্রমে ক্রমে দেশের নানা আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া মনটা অনেক সুস্থ হইতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণী বাড়ীতে আসিয়াই অনেক ভাল ভাল বই আনিয়া দিতে লাগিলেন। রাজস্থান, ডোরথীর জীবন-চরিত, সাধুদের নানা কাহিনী যুক্ত গল্পের বই ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজীটার দিকে বাদ পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সবই বেশ ভাল ভাবে মাতাঠাকুরাণী পড়াইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ইংরেজী পড়াইবার মত জ্ঞান তাঁহার ছিল না, সুতরাং তখন ইংরেজীটা মুখ্য না হইয়া গৌণ হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে একটা নূতন উপসর্গ দেখা যাইতে লাগিল। আমার দু'টি খুড়তুত বোন্ ও আমার বিবাহ যাহাতে একই সঙ্গে একই দিবসে সম্পন্ন হইয়া যায়, সে জন্য খুব চেষ্টা চলিতে লাগিল। খুড়তুত বড় বোনটির বয়স ১১॥ এগার বৎসর, আমার বয়স ১০ ও খুড়াতুত ছোট বোনটির বয়স ৯ বৎসর মাত্র, ইহাতেই নাকি আমার দিদিমার চক্ষের নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল মেয়েরা বড় হইয়াছে বলিয়া! কোন বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ হইলে ছোট দিদিকে নেওয়া হইত না, অত বড় অবিবাহিতা মেয়েকে ঘরের বাহির অর্থাৎ অন্যের বাড়ীতে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না! ছোট দিদি দেখিতে খুব সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল এক স্কুল-ইন্সপেক্টারের প্রথম পুত্রের সহিত। খুব মনে পড়ে মেয়ে দেখিয়া তাঁহার খুবই পছন্দ হইয়া গেল, আমাদের এক ছোট দাদামহাশয় কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মেয়ের নানা গুণ বর্ণনাতে একেবারে মাতিয়া গেলেন ও যত পারিলেন বাড়াইয়া অনেক কিছুই বলিতে লাগিলেন, "এ মেয়ে মাংস, চপ, কাটলেট ইত্যাদি সবই রান্না

করিতে পারে ও শেলাইতে কার্পেট ও রেশমের বহু রকমারী কারুকার্য্য করিতে পারে ইত্যাদি।" ছোট দিদি কিন্তু রান্নার 'র'ও জানিত না, সেলাই সম্বন্ধেও তদ্রূপই। এদিকে ছেলের পিতা মিষ্টি মিষ্টি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি অতি গরীব মানুষ মা, যদি আমার ঘরে যাইয়া আমাকে একটু 'সুক্তার' ঝোল ও পাতলা মুসুরীর ডাইল ও দু'টি ডাইলের 'বড়া' রান্না করিয়া দেয় তবেই আমার পরম সার্থক জীবন মনে করিব। আর সূচীকর্ম্ম? আমার ছেঁড়া কাপড় দিয়া যাচ্ছি ২।১ খানা কাঁথা সেলাই করিয়া দিতে পারে তবে ত কথাই নাই। ছেলের পিতার কথা শুনিয়া দাদা কিছু হতভম্ব হইয়া গেলেন কিন্তু দাদামহাশয় হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে একমত।" বেশ হাসাহাসির মধ্য দিয়া সেইদিনই ছোট দিদির শুভবিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া রহিল। এদিকে কিন্তু ভাবী বরের সম্বন্ধে সবাই বলিত 'বাবু' কেহ কেহ বলিত সাহেব, সে সময় পাত্র B. A. পড়িত ও হিন্দু হোষ্টেলে থাকিত এবং কেহ নাকি তাঁকে নাম ধরিয়া ডাকিলে তিনি বিরক্ত হইতেন, শোনা যায় তাঁকে সবাই "মিষ্টার সেন" বলিয়া হোষ্টেলে ডাকিত। পিতাপুত্রের আদর্শের ব্যবধান এইখানে কত!

এ সময় এক দিন গ্রামের বাড়ীতে বিকালবেলা ছোট দাদামহাশয় আমাকে বলিলেন, "চল্ আমরা তোর পিসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে যাই।" পিসিমার বাড়ী অতি নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক মাইলের মধ্যে, পিসিমা ত আমাদের পরম স্নেহশীলা, তাঁহার বাড়ীতে যাইব আমাদের মহা আনন্দ, ছোটর দল আমরা নাচিয়া উঠিলাম। আমরা কে কে গিয়াছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই, তবে আমার এক খুড়তুত ভাই এক জন গিয়াছিল সেকথা খুবই মনে পড়িতেছে। ধীরে আস্তে অথচ অতি উৎসাহে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া পিসিমার বাড়ীর গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম, দাদা যেন পূর্ব্বগামী পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটু শ্লথ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তিনটি যুবক দাদার ঐ লক্ষ্য স্থান হইতেই আগাইয়া আসিতেছে! এদিকে দাদা চলার গতিটা ক্রমেই কমাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার কারণ কিছুই বুঝিলাম না, আমি বার বার পিসিমার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়াই চলিলাম, ইত্যবসরে সেই মানুষ তিনটি আসিয়া দাদার সঙ্গ লইলেন। তন্মধ্যে একটিকে খুবই চিনিয়া ফেলিলাম, গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমাদের কাকা হন, বিশেষ করিয়া ঢাকার বাংলা বাজারের বাসায় পড়ুয়া ছেলের দলের এক জন তিনি। ঢাকা ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়াছি, অনেক দিন সেই কাকাকে দেখি নাই, তাই তাঁকে দেখিয়া খুবই খুসী হইলাম ও নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলাম। তিনিও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের এই কথা বলাবলির মধ্যে ঐ অপর দু'টি মানুষের অবস্থান হেতু যেন কেমন একটা বাধ-বাধ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া রহিল, তেমন যেন সহজ-সরল ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেছিলাম না।

এদিকে দাদা ত আধা ইংরেজী আধা বাংলায় অনেক কথাবার্ত্তা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন ঐ লোক দু'টির সঙ্গে। এদিকে সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন, আমরা ত পিসিমার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঐ লোকেরাও বুঝি পিসিমার বাড়ীর দিকেই কোথাও যাইবে, কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে, একটি ঘনপল্লবযুক্ত আমগাছের তলায় যাইয়া বেশ একটু থানা গাড়িয়া বসিয়া গল্প-গুজব চালাইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে কি হইল কেনই বা হইল জানি না, আমার খুড়তুত ভাইটি আমাকে বলিয়া বসিল, "ছোড়দি (অর্থাৎ ছোট দিদি) তোর না বিয়া?" এই কথা বলিতেই সবাই যেন একটু একটু হাসিতে লাগিল। আমি 'চুপ' বলিয়া এক ধমক দিয়াই আমবাগানের মধ্যে দূরে সরিয়া যাইয়া বসিয়া পড়িলাম ও মনে মনে দাদার মুণ্ডুপাত করিতে লাগিলাম; পিসিমার বাড়ীতে না লইয়া যাওয়ার দরুণ। কি আর করিব গাছের তলায় বসিয়া রহিলাম ও হঠাৎ আমার অতি শৈশবের কথাটা মনে জাগিয়া উঠিল। এমনি ভাবে ৫ বৎসর বয়সে দিদিকে বলিয়াছিলাম, "দিদি! দিদি! তোর না কি বিয়া," এখন আমার এই দশ বৎসর বয়সের ভাইটিকে ধমক দিয়াই আমার সেই পুরান কথাটা মনে হইতেই, উহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া উহার মনের অবসাদ দূর করিতে ব্যস্ত হইয়া গেলাম। ভাইটির তখন বয়স পাঁচ বৎসর ছিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, মানুষ তিনটি যথাসময়ে চলিয়া যাইতেই দাদা বলিয়া উঠিলেন, "আজ আর পিসিমার বাড়ী যাওয়া হইবে না বেলা একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে।"

রাগে দুঃখে বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম, বাড়ীতে পৌঁছিতেই দেখিতে পাইলাম সব মেয়ের দল ছাদে উঠিয়া কি যেন দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি দিতেছে। ক্রমে সবই প্রকাশ পাইল। গ্রামের ছেলেটি গোপনে তার এক আত্মীয়-বাড়ীতে আসিয়া বন্ধুগণ সহ আমাকে দেখিয়া গেলেন! ব্যস, আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম ও ঐ নির্লজ্জ লোকটির উপর বিষম রাগিয়া রহিলাম।

যাক্, এই সব উপদ্রবের মধ্যেও কিন্তু আমাদের খেলাধূলার উৎসবের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সব ছোট মেয়ের দল সকাল ৮টার সময় রাশি রাশি পান লইয়া সাজিতে বসিয়া যাইতাম। বড়দের মধ্যে মা ও খুড়ীমাদের মধ্যে যে কেহ আসিয়া চূণের মধ্যে শ্বেতচন্দন ও সামান্য একটু চিনি মিশাইয়া দিয়া যাইতেন, তাহা গুলিয়া এবং নানারূপ মসলা, সুপারী ইত্যাদির পরিমাণ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমরা তাহাদের কথা মত বহু রাশি রাশি পান সাজিয়া রাখিতাম, দিবা-রাত্রির জন্য ঠাকুর খুড়া বাড়ী থাকিলে তাঁহার জন্য দু'বেলা দুই শত পানের খিলি বরাদ্দ ছিল, তার পরে আরো ২।৩ শত পানের খিলি বরাদ্দ ছিল; এবং আরো ২।৩ শত পানের খিলি ভাঁড়ার ঘরে মার হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে আমরা পান সাজিবার কর্ম্ম হইতে অবসর লইতাম। প্রায় প্রত্যহ আমরা ৪।৫ শত পানের খিলি তৈয়ার করিতে বাধ্য থাকিতাম, ইহা কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত বা বাহুল্য কথা নয়, ইহা অতি সত্য কথা। এই পান সাজার কাজ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সারা দিনের ছুটি।

সকালে পান সাজা সমাপ্তির সঙ্গেই মাথায় একটু তেল দেই বা না দেই কাপড়খানা হাতে লইয়া দল বাঁধিয়া এ-পাড়া সে-পাড়ার মেয়ে ও ছোট ছোট ছেলে সকলে মিলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতাম পুকুরের জলে। তখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে ঘাটলাওয়ালা পুকুরের জন্ম হয় নাই, তাহার জন্ম বহু পরে। বাড়ীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টা পুকুর ছিল, যেদিন যেটায় ইচ্ছা হইত সেইটায় ঝাঁপাইয়া
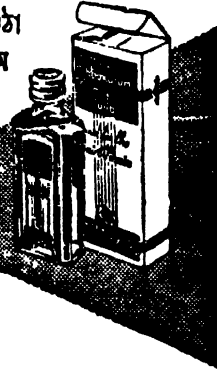
পড়িতাম। পাড়ার মেয়েরাও সময় বুঝিয়া আসিয়া হাজির হইয়া যাইত—আর 'মজার অন্ত কি! এইরূপ ঝাঁপাঝাঁপির কোন ধরাবাঁধা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, কারণ স্কুলের তাড়া বা কাজের তাড়া ত আর ঘাড়ের উপরে ভার ছিল না, মহানন্দে জলের মধ্যে কত রকমের ঝাঁপাঝাঁপিই করিতে থাকিতাম। এদিকে বেলা ত মধ্যাহ্ন প্রায় যায়-যায়, খাওয়ার সময় চলিয়া যাইতেছে, মায়ের দল ত সরোষে লগুড়হস্তে পুকুরঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন, তখন সকলের চৈতন্য হইত যে কত ঘণ্টা ব্যাপিয়া আমাদের এই জলকেলি চলিয়াছে; তখন ভয়ে ভয়ে সকলে জল হইতে উঠিয়া পড়িতাম। কিন্তু মায়ের দল তখন তাঁদের জলকন্যাদের অপরূপ রূপ দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন তাহার দিশা পাইতেন না। পুকুরে অল্পপরিসর জল, তাতে সবুজ শেওলায় আচ্ছাদিত, সুতরাং সাদা ধপধবে কাপড়খানা শেওলা ও কর্দ্দমে এক একখানা অপরূপ শাড়ীর রূপ হইয়া যাইত। গায়ের রোঁয়ার সঙ্গে মিহি শেওলা ও কর্দ্দম সংযুক্ত হইয়া গায়ের লোমগুলি ঠিক বনমানুষের রূপ ধারণ করিত। চক্ষু হইত জবাফুল রঙ্গে রঞ্জিত। মাথার এক রাশ চুল কাদা ও শেওলায় জট পাকাইয়া ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিত। এ-হেন রূপবতী কন্যাদের প্রতি মায়ের দলেরা রোষে ছুটিয়া আসিয়াও বেশী কাছে ঘেঁসিতে পারিতেন না। কারণ, আমরা তখন ভয়ে ভয়ে একটু বেশী দৌড়ঝাপ দিয়া যাইতে থাকিলেই তাহাদের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। আমরাও সে কথাটার বেশ আঁচ পাইতাম। তাই ভয়ে ভয়ে ও বেশ দ্রুতবেগেই তাঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে অপর পুকুরটির দিকে ছুটিয়া যাইয়া যতদূর সম্ভব অপরূপ রূপখানার পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিতাম। তাড়াতাড়ি কাদা-মাটি-শেওলা যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িতাম। ঠাকুর কাকা ভাত পরিবেশন করিতে আসিয়াই আমার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আমার ত আর কারণ বুঝতে বাকী নাই, আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া মাথা গুঁজিয়া অপরাধীর মত অল্প দু'টি ভাত খাইয়া উঠিয়া যাইতাম। খাওয়ার সময় অতীত, আবার এত জলে ডুবিয়া থাকা ও তৎসঙ্গে জলও প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং পেটে ক্ষুধাটা যেন একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। খাওয়ার পরই বিছানায় শুইয়া পড়িতাম।

এদিকে আমাদের স্নেহশীলা ঠানদিদি (আমার দাদামহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী) পরের দিনের জন্য আমাদের চুল ও দেহের পরিষ্কার সাধনের চেষ্টায় কত কত জিনিসের সন্ধানে লাগিয়া যাইতেন, মাথা ঘসিবার জন্য আতপ-চাউলের 'কুঁড়া' জবাফুলের পাতা, কলাইর ডাইল ভিজান বাটা ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়া চলিতে থাকিত রূপসীদের অঙ্গরাগ। মায়ের দলেরা কিন্তু ইহাতে তাদের পিসি-শ্বশ্রূমাতার উপর খুবই খুসী হইয়া যাইতেন। কেন না, এই রূপবতী কন্যাদের ঝালাই করিয়া লইতে অনেক সময়ের দরকার ও কার্য্যটি বড়ই বিরক্তিজনক ব্যাপার মনে করিত সন্দেহ নাই। মাতাঠাকুরাণী কিন্তু গ্রামে আসিবার পরে আমার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক কিছুই যথাসাধ্য যোগাড় করিয়া যাইতেছিলেন, মস্তবড় গাছের ডালে মস্ত একটি দোলনা ঝুলাইয়া দিলেন, 'স্কিপিং'এর মজবুত পাকা দড়ীর অভাব ছিল না। এখন যাকে 'পিক্‌নিক্' বলে তখন আমরা বলিতাম বনভোজন, বা বনভাত অথবা চড়ুইভাতি, ২।৪ পাড়ার মেয়ের দল মিলিয়া বনভোজন উৎসব চলিত। বলা বাহুল্য, এই সবের পিছনে ছিল মাতাঠাকুরাণীর অদম্য উৎসাহ। মোটের উপর ঢাকা হইতে বাড়ীতে আসিয়া যাহাতে আমাদের আনন্দের বিশেষ কোনও ঘাটতি না পড়ে সে বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বনভোজনের খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার গরীব ছোট ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের ছোটদের দিয়া মাতা-ঠাকুরাণী সকল উদ্বৃত্ত জিনিসগুলি যথাযথ ভাবে বিলিবাট করাইয়া দিতেন; তাহাতেও আমাদের আনন্দ উৎসাহের অন্ত থাকিত না। এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দময় হইয়া কাটিতেছিল।

ঐদিকে কিন্তু বিবাহ রূপ উপসর্গের ব্যস্ততারও অভাব ছিল না। ঠাকুর খুড়া দীর্ঘ দিনের ছুটী লইয়া বাড়ীতে আসিলেন, সেই সঙ্গে মহা আনন্দের খুড়াত ভাইটিকেও দীর্ঘকালের জন্য পাইয়া গেলাম, ভাইটি ঠাকুর খুড়ার বড় ছেলে, আমার ৪ বৎসরের ছোট ছিল, তাকে আমরা বড় বেশী কাছে রাখিতে পারিতাম না, কারণ ঠাকুর খুড়ার কর্ম্মস্থলেই মার কাছে সে থাকিত, এবার তাকে পাইয়া আমাদের আনন্দের মধ্যে যেন মহোৎসব লাগিয়া গেল। ভাইটি ছিল প্রিয়দর্শন, শান্ত, শিষ্ট ও বুদ্ধিমান্। এই অল্প বয়সেই যেন তার স্বভাবের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইত, আরো ভাল লাগিত আমরা বড় হওয়ার পরে দাদা-মহাশয়ের সঙ্গে ভাত খাওয়ার সময় আসন গাড়িয়া যখন আমাদের খাওয়ার আসনে সে স্থলাভিষিক্ত হইয়া শান্ত ভাবে ধীরে-সুস্থে দাদা-মহাশয়ের হাত হইতে ছোট ছোট ভাতের গ্রাসগুলি আনন্দের সহিত মুখে তুলিয়া লইয়া খাইতে থাকিত, চাহিয়া চাহিয়া যেন ঐ খাওয়ার মধ্যেই কত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইতাম! ভাইটি ছিল একটু দুর্ব্বল ভাবাপন্ন, বেশী দৌড়-ঝাঁপের ধার সে ধারিত না।

ঠাকুর খুড়া ছুটিতে বাড়ি আসিলেন। নানারূপ দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে আমাদের জন্য বড় বড় চীনামাটির পুতুল আনিয়া সবাইকে একটি-দুইটি করিয়া বিলিবাট করিয়া দিলেন। আমাদের আনন্দও একেবারে লাফালাফি ঝাঁপা-ঝাঁপিতে প্রমোশন পাইয়া গেল, ছুটিয়া যাইয়া ঠাইন দিদিকে ধরিলাম, কুমারবাড়ী হইতে হাঁড়িকুড়ি, থালা, বাটি ঘটী শিল নোড়া অর্থাৎ সংসারে যাহা যাহা প্রয়োজন সব আমাদের আনিয়া দেও; ঠাইন দিদিও অবিলম্বে চাকর ও ঝুড়ী লইয়া ছুটিলেন সেই দূরে কুমার-বাড়ীতে। গুণিয়া বাছিয়া সকলের জন্য সমান ভাগ যেন দেয়—এই ভাবে সব জিনিস-পত্র আনিয়া থই-থই করিয়া দিলেন। আমরাও ঠাইন দিদির উপর 'মহাখুশী হইয়া তাহার পিঠের উপর দলাই-মলাই আরম্ভ করিয়া দিলাম, তিনি ত এই মহোৎসবের হোতা হইয়া আহা! উহু! ছাড়! ছাড়! ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে হাসিয়া কুটি-কুটি হইতে থাকিতেন। ঠাইন দিদি বৃদ্ধা হইলেও অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। সদাপ্রফুল্ল ছিল তাঁর চিত্তখানা। আজও মনে পড়ে তাঁর অন্তহীন স্নেহমমতার সহজ সরল হৃদয়খানার কথা!

সমাপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

শুক্রবার রাত্রিটা খনি-মজুরদের হিসাবের সময়। মোরেলও হিসাব করত—খাদ বাটার দরুণ যে টাকাটা পেয়েছে, সেটা তার সঙ্গী আর মজুরদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিত। হিসাবটা হ'ত ব্রেটি'র নতুন সরাইখানায় কিম্বা তার নিজের বাড়িতে, অন্যেরা যেমন চাইত, তেমনি। বার্কার মদ ছেড়ে দিয়েছিল, তাই এখন ভাগাভাগিটা হ'ত মোরেলের বাড়িতেই।

এ্যানি এত দিন বাইরে কোন্ স্কুলে পড়াত, এখন আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। আগের মতই রয়েছে এখনও। তার বিয়ের সব ঠিকঠাক। পল নক্সা-আঁকা শিখছিল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মোরেলের মেজাজ বরাবরই ভালো থাকে, অবশ্য সপ্তাহের রোজগারটা যদি নেহাৎ অল্প না হয়। খাবারটুকু খেয়ে নিয়েই সে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল, হাত-মুখ ধুয়ে নেবার জন্যে গেল। পুরুষরা যখন হিসাব করবে, তখন মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে এই ছিল রীতি। মজুরদের রোজগারের ভাগাভাগি, এটা পুরুষদের নিজেদের ব্যাপার, এর মধ্যে মেয়েদের মাথা গলাবার রেওয়াজ ছিল না। সপ্তাহের রোজগারের সঠিক অঙ্কটা তাদের জানাতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কাজেই বাপ যখন হাত-মুখ ধুতে ব্যস্ত তখন এ্যানি এক ঘণ্টার জন্যে গেল পাশের বাড়ি বেড়াতে। মিসেস মোরেল রুটি সেঁকার দিকে রইলেন। হঠাৎ মোরেল ভীষণ ভাবে চীৎকার করে উঠল, 'দোর বন্ধ করে দে!'

এ্যানি বাইরে থেকে দরজাটা দুম করে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। সাবান মাখতে মাখতে মোরেল শাসাতে লাগল, 'আর কোন দিন যদি আমার চান করবার সময় দরজা খুলিস, তাহলে তোর গাল আর আস্ত রাখব না।'

তার শাসানি শুনে পল আর তার মা দু'জনেই ভুরু কুঁচকালেন। একটু পরেই মোরেল ছুটে বেরিয়ে এল চানের ঘর থেকে, তার গা থেকে সাবানের জল ঝরে পড়ছে, শীতে সে কাঁপছে। বললে, 'আরে, আমার তোয়ালেটা কোথায়?'

তোয়ালেটা গরম করবার জন্যে রাখা হয়েছিল আগুনের কাছে একটা চেয়ারের মাথায়। তা নইলে মোরেল আবার রেগে আগুন হয়ে উঠত। মোরেল চট্ করে নিজেকে শুকিয়ে নেবার জন্যে সেই রুটি-সেঁকা আগুনের সামনে বসে পড়ল। যেন শীতে কাঁপছে এমনি ভান ক'রে মুখে শব্দ করতে লাগল, 'উহুহু!'

'থামো।' মিসেস মোরেল বললেন, 'ছেলেমানুষী কোরো না। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয় আজ।'

চুলে হাত চালাতে চালাতে মোরেল বললে, 'তুমি যাও না ঐ ঘরটাতে সারা গায়ের কাপড় খুলে গা ধুতে। উঃ, যেন বরফের ঘর।'

'তাই বলে আমি ও-রকম হা-হুতাস করতাম না।' মিসেস মোরেল বললেন।

'না। যা শরীর তোমার, তুমি হলে কাঠ হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে। এত ঠাণ্ডা ঘরটাতে, মনে হয় যেন ঠাণ্ডা হাওয়া দেহ ভেদ করে ঢুকছে।'

'তোমার দেহ ভেদ করে ঢুকতে হাওয়ারও বেশ বেগ পেতে হবে।' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন।

মোরেল নিজের দেহের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করল। বলল, 'আর কেন? এখন ত' আমার হাড়গোড় বের করা রোগা খরগোসের মত চেহারা। হাড়গুলো যেন বেরিয়ে পড়তে চায়।'

'কোন দিক দিয়ে?' মিসেস মোরেল ঠাণ্ডা হয়ে বললেন।

'কোন্ দিক দিয়ে নয়? পাঁকাটির মত চেহারা হয়ে গেছে আমার।'

মিসেস মোরেল হেসে উঠলেন। এখনও মোরেলের দেহে যৌবনের শ্রী রয়েছে, মেদহীন পেশীবহুল দেহ। গায়ের চামড়া নরম, পরিষ্কার। শুধু যেখানে চামড়ার নীচে বহুদিন থেকে কয়লার গুঁড়ো জমেছে, সেখানে নীল নীল দাগ আর বুকে ঘন লোম ছাড়া, আটাশ বছর বয়সের যুবকের দেহের সঙ্গে মোরেলের দেহের কী-ই বা পার্থক্য! কিন্তু মোরেল গায়ে হাত দিয়ে করুণ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার ধ্রুব বিশ্বাস সে যখন মোটা হচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই উপোসী ইঁদুরের মত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে।

পল তার বাবার দিকে চাইল। মোটা, বাদামী রঙের হাত দুটো অসংখ্য কাটা-দাগে ভর্তি, নখগুলো ভাঙা, ওই হাত দিয়ে সে তার নরম গায়ে হাত বুলোচ্ছে—এর অসঙ্গতি পলকে গিয়ে আঘাত করল। কী আশ্চর্য্য, তারা একই রক্তমাংসের মানুষ। বলল, 'এক কালে তোমার চেহারা নিশ্চয়ই খুব ভালো ছিল?'

মোরেল চকিতে চার দিকে ভীরু দৃষ্টিপাত করে ছেলেমানুষের মত শুধু বলল, 'অ্যাঁ।'

'ছিল বই কি।' মিসেস মোরেল বলে উঠলেন, 'খালি কুঁজো হয়ে থেকে থেকে ঐ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। যেন কী করে সব চেয়ে কম জায়গা নিয়ে থাকা যায় তারই পরীক্ষা করেছে নিজের গায়ের উপর দিয়ে।'

'কী যে বলো।' মোরেল সবিস্ময়ে খেদোক্তি করল, 'আমার আবার ভালো চেহারা ছিল কবে! কোন্ দিন না আমি এমনি অস্থিচর্ম্মসার ছিলুম?'

'বটে।' মিসেস মোরেল উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'অমন ডাহা মিথ্যে কথা বলো না বলছি।'

'সত্যি বলছি আমি। যত দিন থেকে তুমি আমাকে দেখছ, কোন্ দিন না তোমার মনে হয়েছে যে, আমার চেহারা ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে?'

মিসেস মোরেল হাসতে হাসতে বসে পড়লেন। বললেন, 'তোমার দেহ লোহা দিয়ে গড়া। শরীরের দিক দিয়ে যদি শুধু বিচার করো, তা'হলে ক'টা পুরুষ আর ওর চেয়ে ভালো দেহ নিয়ে জীবন শুরু করে?' নিজের দেহে স্বামীর আগেকার যৌবনোচ্ছল রূপ ফুটিয়ে তুলবার ভঙ্গী ক'রে মিসেস মোরেল ছেলের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'ওর জোয়ান বয়সে তুমি যদি ওকে দেখতে।'

'না। সেটা যাতে মারাত্মক রকমের ঠাণ্ডা হয় তার ব্যবস্থা' তুমি নিজেই করে দেবে।'

কিন্তু এর মধ্যে মিসেস মোরেলের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পিঠ মুছবার কাজে মিসেস মোরেল বিশেষ মনোযোগ দেন নি। এবারে উপরে গিয়ে মোরেলের পাজামা তিনি নিয়ে এলেন। গা শুকিয়ে গেলে, মোরেল ঠেকেঠুলে শার্টটা গায়ে ঢোকাল। মেজে-ঘষে তার দেহ এখন ঝকঝকে উজ্জ্বল, গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ময়লা পা-জামার উপর দিয়ে ঝুলছে ফ্লানেলের শার্ট, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পরবার জামা-কাপড়গুলোকে সেঁকতে লাগল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, জামার ভেতর-বার টেনে-টুনে সে ওগুলোকে প্রায় ফেলবার দাখিল করল।

মোরেল লজ্জিত হয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। দেখল, তার প্রতি তার স্ত্রীর কামনা আজও নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এক মুহূর্তের জন্ত আবার জ্বলে উঠেছে তার দেহে মনে। লজ্জা অনুভব করল মোরেল, শুধু লজ্জা নয়, কেমন একটা শঙ্কা। নিজেকে একান্ত নিঃসম্বল মনে হতে লাগল তার। তবু আর এক বারের জন্তে পুরোন দিনের আভা জাগল তার মনে। পর মুহূর্তেই মনে পড়ল, এ কয় বছর কেমন করে নিজেকে সে নষ্ট করেছে। ইচ্ছে হতে লাগল, হৈ-চৈ করে এই বিপদটাকে কাটিয়ে দেয়, কিম্বা ছুটে পালিয়ে যায় কোন দিকে।

কোন কিছু না করে স্ত্রীকে শুধু সে বলল, 'আমার পিঠটা একটু ধুয়ে দাও না।'

মিসেস মোরেল এক টুকরো ফ্লানেল ভালো করে সাবান মাখিয়ে এনে তার কাঁধে ফেলে দিলেন। মোরেল লাফিয়ে উঠল, চেঁচিয়ে বলল, 'অলক্ষ্মী কোথাকার! এ যে বরফের মত ঠাণ্ডা!'

মোরেলের পিঠ ধুয়ে দিতে দিতে মিসেস মোরেল হেসে বললেন, 'তোমার উচিত ছিল মাছ হয়ে জন্ম নেওয়া।' পিঠ ধুয়ে দেবার মত এমন ব্যক্তিগত কাজ মোরেলের জন্তে এখন আর তিনি বড়-একটা করে দিতেন না। ছেলেমেয়েরাই এ-সব করত। আবার বললেন, 'তোমার যেমন গরম দরকার, পরের জন্মে তার আদ্ধেক গরমও তুমি পাবে না।'

মিসেস মোরেল তাড়া দিয়ে বললেন, 'ও কী হচ্ছে ? তাড়াতাড়ি পরে নাও না কাপড়-চোপড়।'

—'এই জলের টবের মত ঠাণ্ডা পাজামার মধ্যে ঢুকতে খুব ভালো লাগে বুঝি তোমার ?' মোরেল জবাব দিল।

শেষ পর্য্যন্ত ময়লা পাজামাটা ছেড়ে মোরেল কালো পোশাকটা পরে ভব্য সাজল। সবটুকু কাজই সে সারল আগুনের সামনে মেঝের কার্পেটটার উপর দাঁড়িয়ে। এ্যানি আর তার পরিচিত বন্ধুরা উপস্থিত থাকলেও সে এমনিই করত।

মিসেস মোরেল উনুনের উপর রুটিখানাকে উলটে দিলেন। এক কোণে একটা লাল মাটির বাসনে ময়দা মাখা, তাই থেকে খানিকটা নিয়ে ঠিক-ঠাক করে চটকে রাখলেন একটা টিনে। এমন সময় বার্কার এসে ঘরে ঢুকল। দেখতে ঠাণ্ডা, ছোটখাটো, আঁট-সাট বাঁধুনির লোকটি। দেখে মনে হয় যেন পাথরের দেয়াল ভেদ করেও ও এগিয়ে যেতে পারে। মাথার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা, মাথার হাড়গুলো উঁচু-উঁচু ; সাধারণ খনির মজুরদের যেমন হয়, ওরও তেমনি রঙ ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো, গড়ন মজবুত। মিসেস মোরেলের দিকে মাথা হেলিয়ে বলল, 'নমস্কার, মিসেস মোরেল।' ব'লে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেই একটা আসন টেনে বসল।

মিসেস মোরেল আন্তরিকতার সুরেই ওর অভিবাদনের জবাব দিলেন। মোরেল বলল, 'তোমার যে দেখছি ভারী দুরবস্থা।'

বার্কার বলল, 'হবে। ঠিক জানি নে।'

নিজেকে জাহির করবার কোন চেষ্টাই সে করল না। মিসেস মোরেলের রান্নাঘরে যারা আসত তারা সবাই যেন নিজেদের মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকত।

মিসেস মোরেল জিজ্ঞেস করলেন, 'গিন্নী কেমন আছেন ?'

বার্কার কিছুদিন আগে বলেছিল, 'আমাদের তিন নম্বরটি কিছুদিন বাদেই আসছে।' আজ মিসেস মোরেলের জিজ্ঞাসার উত্তরে মাথা চুলকে বার্কার বলল, 'এই মাঝামাঝি রকম। বরাবর যেমন আছেন, তেমনি।'

'তাই ত'।' তা' তারিখটা কবে ?'

'এখন যে কোন দিনই হতে পারে, তা'তে আশ্চর্য্য কিছু নেই।'

'বটে ! শরীর বেশ ভালোই আছে তা'হলে ?'

'হ্যাঁ। মোটামুটি।'

'তা'হলেই ভালো। কোন দিনই ত' শক্ত শরীর নয় ওঁর।'

'না। আর দেখুন···ভারী একটা বোকামী করে ফেলেছি।'

'কী রকম ?'

মিসেস মোরেল জানতেন, বড়ো কিছু বোকামী বার্কার কোন দিনই করবে না।

'আমি বাজারের থলেটা না নিয়েই চলে এসেছি।'

'আমারটা নিয়ে যান না।'

'তা' কী করে হবে ? সেটা ত' আপনাদেরই লাগবে।'

'না। আমি ত' বরাবরই দড়ির ব্যাগ নিয়ে যাই।'

মিসেস মোরেল জানতেন, বার্কার সারা সপ্তাহের বাজার শুক্রবার রাত্রেই করে রাখে। এই ক্ষীণকায় আত্মপ্রত্যয়ী লোকটির উপর তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। স্বামীকে তিনি প্রায়ই বলতেন, "বার্কার দেখতে ছোট হলে কি হবে, তোমার মত দশটা মানুষের সমান।'

ঠিক এই সময় ওয়েসন এসে ঘরে ঢুকল। দেখতে হালকা রোগা লোকটি, মুখে ছেলেমানুষের মত সারল্য আর খানিকটা বোকার মত হাসি। কে বলবে ওর সাতটি ছেলে-মেয়ে। ওর স্ত্রীর স্বভাবে আবার আবেগের প্রাধান্য। বার্কারকে দেখে খানিকটা শূন্য হাসি হেসে বলল, 'আমার আগেই এসে পৌঁছে গেছ, দেখছি।'

বার্কার বলল, 'হ্যাঁ।'

মাথার টুপি গলার প্রকাণ্ড পশমী গলাবন্ধটা খুলে নতুন আগন্তুকটি অপেক্ষা করতে লাগল। তার তীক্ষ্ণ নাসা রক্তিম হয়ে উঠেছে। মিসেস মোরেল বললেন, 'আপনার যেন ঠাণ্ডা লেগেছে, মিঃ ওয়েসন্।'

—'হ্যাঁ, বেশ শীত-শীতই করছে বটে।'

—'তা, আগুনের কাছে এসে বসুন।'

—'না, এই ভালো আছি।'

বার্কার আর ওয়েসন দু'জনেই দূরে বসে রইল। আগুনের কাছে এসে কার্পেটের উপর বসতে কাউকেই রাজী করানো গেল না। আগুনের সান্নিধ্যটা যেন গৃহের বিশেষ অধিকার, এখানকার কার্পেটটা শুধু বাড়ির লোকের জন্যে।

মোরেল চেঁচিয়ে বলল, 'এসো, এসো। এই লম্বা চেয়ারটায় হাত-পা মেলে বসো এসে।'

'ধন্যবাদ। এখানেই বেশ আছি।'

'না, না। আসুন আপনি।' মিসেস মোরেল আবার অনুরোধ করলেন। ওয়েসন উঠে এগিয়ে গেল, তার চলন-বলন সবই কেমন অদ্ভুত। মোরেলের লম্বা চেয়ারটায় বোকার মত বসে রইল সে। এ ধরণের গাঢ় অন্তরঙ্গতা তার সহ্য হচ্ছিল না। তবু আগুনের উত্তাপে ছিল আরাম, ওয়েসন বসে বসে তা উপভোগ করতে লাগল।

মিসেস মোরেল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বুকের অবস্থা কেমন ?'

ওয়েসন আবার হাসল। তার নীল চোখ দু'টি চকচক ক'রে উঠল। বলল, 'নিতান্ত মাঝামাঝি গোছের।'

'হ্যাঁ। হাপরের মত ঘড় ঘড় আওয়াজ সর্ব্বদাই চলেছে।' বার্কার সংক্ষেপে মন্তব্য করল।

মিসেস মোরেল জিবের শব্দ করে সহানুভূতি জানালেন। বললেন, 'আপনার সেই ফ্ল্যানেলের ফতুয়াটা তৈরী হ'ল ?'

'হয়নি এখনও।' ব'লে ম্লান হাসি হাসল বার্কার।

'কেন, এখনও হয়নি কেন ?' মিসেস মোরেল উত্তেজিত হয়ে বললেন।

'হবে শীগগিরই হবে।' ওয়েসন আবার হাসল।

বার্কার বলল, 'হ্যাঁ। যেদিন তুমি শেষ হবে, সেদিন।'

বার্কার আর মোরেল দু'জনেই ওয়েসন-এর উপর ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিল। দেহের দিক দিয়ে ওরা দু'জনেই পাথরের মত শক্ত আর সবল।

সাজসজ্জা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন মোরেল টাকার থলেটা পলের দিকে এগিয়ে দিল, প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল, 'গুণে রাখো ত' বাবা !'

পল বিরক্ত হয়ে বই-পেনসিল রেখে টাকার থলেটাকে টেবিলের উপর ঢেলে ফেলল। রুপো, মোহর আর খুচরো মিলিয়ে দেখা গেল

পাঁচ পাউণ্ড। চটপট গুণে ফেলে পল হিসাবের সঙ্গে মেলাতে বসল —কয়লা কাটার হিসাব। টাকাটা ভাগ করে সে সাজিয়ে রাখল। তার পর বার্কার আবার হিসাবগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

মিসেস মোরেল দোতলায় উঠে গেলেন, আর পুরুষ তিনটি এসে বসল টেবিলের পাশে। বাড়ির কর্ত্তা হিসাবে মোরেল এসে বসল তার লম্বা চেয়ারটায়, আগুনের দিকে পিঠ রেখে। অন্যেরা বসল ঠাণ্ডা চেয়ারে। কাউকেই টাকাটা গুণতে আর দেখা গেল না। মোরেল জিজ্ঞেস করল, 'সিমসন-এর কত যেন ঠিক হয়েছিল?' তখন অন্য দু'টি মজুর সিমসনের দিনের মজুরী নিয়ে খানিকটা বাদানুবাদ করল। তার পর তার ভাগটা সরিয়ে রাখল এক পাশে।

—'আর বিল্ নেলর-এর কত?'

ওই টাকাও রাখা হ'ল আলাদা করে।

এবার নিজেদের পালা। ওয়েসন থাকত কোম্পানীর বাড়িতে, মাইনে থেকে তার ভাড়া কেটে নেওয়া হ'ত। সেই জন্যে মোরেল আর বার্কার নিল চার শিলিং ছ'পেন্স করে। বার্কার আর ওয়েসন দু'জনেই নিল চার শিলিং করে। এর পরের হিসাব খুবই সোজা। মোরেল তাদের দু'জনকেই এক 'সভারিণ' করে ভাগ করে দিতে লাগল। দিতে দিতে 'সভারিণ' গেল ফুরিয়ে। তার পর প্রত্যেককে এক 'হাফ-ক্রাউন' দিতে দিতে তাও ফুরোল। পরে এক এক শিলিং করে দিতে গিয়ে শিলিংগুলোও আর রইল না। শেষ পর্য্যন্ত যদি বা কিছু থেকে গেল, কিন্তু তাকে আর ভাগ করা চলে না, সেটা হ'ল মোরেলের প্রাপ্য, ঐ দিয়ে তার মদের খরচ চলবে।

এবারে ওরা উঠে পড়ল। স্ত্রী নেমে আসার আগেই মোরেল সটকে পড়ল বাড়ি থেকে। দরজা বন্ধের শব্দ শুনে মিসেস মোরেল নীচে এলেন। উনুনের উপর রুটির দিকে একবার চাইলেন তিনি। তার পর টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলেন বাড়ির খরচের টাকাটা পড়ে আছে। *পল এতক্ষণ চুপচাপ কাজ করছিল।* মা যে টাকাটা গুণছেন আর তাঁর রাগ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, পল তা অনুভব করতে পারল। জিব দিয়ে বিরক্তির শব্দও করলেন তিনি। পল ভ্রূকুটি করল। মায়ের মেজাজ খারাপ হলে পলের মন বসে না কাজে। মিসেস মোরেল আবার টাকাটা গুণলেন। রাগতভাবে বললেন, 'মোটে এই পঁচিশ শিলিং? চেকটা ছিল কত টাকার?'

পল বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, 'দশ পাউণ্ড এগারো শিলিং।' এর পরের ফলাফল ভাবতেও তার ভয় করছিল।

—'আর তাই থেকে আমার জন্যে শুধু এই পঁচিশ শিলিং! তার উপর এ সপ্তাহে আবার ওর ক্লাবের চাঁদা দিতে হবে।...জানি আমি লোকটাকে। ভাবে, তুমি যখন আজ-কাল রোজগার করছ, কাজেই সংসার-খরচের টাকা দেবার তার আর দরকার নেই। ও শুধু আছে মদ গিলে টাকাটা উড়িয়ে দেবার তালে।...কিন্তু না, আমি ওকে মজাটা দেখাব!'

পল চেঁচিয়ে বলল, 'কি যা-তা বকছ, মা!'

—'বকব না ত' কী করব শুনি?' মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

—'হয়েছে। আবার শুরু করো না। আমি কাজ করতে পারব না তা'হলে।'

মিরিয়াম শুষ্ক গলায় মিন-মিন করে বলল, 'কেন ?'

—'আচ্ছা বেশ, তোমার জুতো দেখি।'

মিরিয়াম মহা অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে বসে রইল। বিয়াট্রিস হেসে বলল, 'দেখাতে সাহস হয় না বুঝি ?'

মিরিয়াম পোশাকের তলা থেকে পা বার করে দেখাল। তার জুতোজোড়ার মধ্যে এমন অদ্ভুত সঙ্কোচের ভাব দেখে মনে হয় যেন ওরা ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছে; মিরিয়াম নিজেই যে কতটা আত্ম-সচেতন, নিজের উপর তার যে একটুও আস্থা নেই, জুতো জোড়াই তার প্রমাণ। তার উপর জুতোগুলো আবার কাদা-মাখা।

বিয়াট্রিস বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'সর্বনাশ! একেবারে কাদায় কাদাময় যে! তোমার জুতো পরিষ্কার করে কে ?'

—'আমি নিজেই করি।'

—'বেশ বাহাদুর ত'! আমি হলে এমন জুতো নিয়ে আজ রাত্রে এক পাও নড়তুম না। তবে কিনা মনের টান থাকলে কাদা ঠেলেও লোকে চলে। কি বলো, পল ?'

পল ফরাসী ভাষায় জবাব দিল, 'আবার অনেক কিছুকে ঠেলেই বা নয় কেন ?'

'এই দেখ, এ যে আবার ভিনদেশী কথা কইতে শুরু করলে। এর মানেটা কী, মিরিয়াম ?'

শেষের কথাটির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি খোঁচা ছিল, কিন্তু মিরিয়াম তা ধরতে পারলে না। কথাটার ইংরেজী অর্থটা সে বলে দিল। বিয়াট্রিস বলল, 'বটে! তা'হলে তুমি বলতে চাও মনের টানে মানুষ বাবা, মা, ভাই, বোন, বন্ধু, বান্ধবী সবাইকেই উপেক্ষা করে চলে, এমন কী যাকে সে ভালবাসে তাকেও?' নিতান্ত নিরীহ ভাবে কথাটা বলল বিয়াট্রিস, ভান করল যেন সে কিছুই জানে না।

'আমি বলছিলুম, ভালবাসা মানেই একটা একটানা হাসির ব্যাপার।' পল জবাব দিল।

'বটে! তবে মুখ লুকিয়ে, তাই নয় পল ?' ব'লে বিয়াট্রিস আবার শব্দ না ক'রে টেনে টেনে হাসতে লাগল।

মিরিয়াম নীরবে বসে রইল। পলের বন্ধুরা সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে তার বিরুদ্ধে কথা বলে আনন্দ পায়, অথচ পল তাকে নিরুপায় ফেলে রেখে দূরে সরে পড়ে—এ যেন এক ধরণের প্রতিশোধ পল তার উপর নিচ্ছে। এক সময়ে বিয়াট্রিসকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি স্কুলে যাচ্ছ এখনও ?'

—'হ্যা।'

—'তুমি নোটিশ পাওনি তবে ?'

—'ধরে রেখেছি ঈষ্টারে পাব।'

—'সত্যি এ ভারী অন্যায়। তুমি পরীক্ষায় পাশ করো নি বলেই তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে না কি ওরা ?'

—'জানিনি।' বিয়াট্রিস নির্লিপ্ত গলায় বলল।

—'আগাথা বলছিল, তুমি খুবই ভালো পড়াতে পারো। কিন্তু ভারী অদ্ভুত লাগে আমার। তুমি পাশ করতে পারলে না কেন ?'

—'মস্তিষ্ক বলে পদার্থটির অভাব—কি বলো পল ?' বিয়াট্রিস সংক্ষেপে জবাব দিল।

পল হেসে বলল, 'কিন্তু লোককে খোঁচাবার সময় ত' মস্তিষ্কটির যথাযথ চালনার অভাব হয় না ?'

'তবে রে!' বলে বিয়াট্রিস লাফিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পলের কান মলে দিল। সুন্দর ছোট ছোট ওর হাত দু'টি। পল ওর কবজী ধরে বাধা দিতে গেল আর তাই নিয়ে দু'জনের কি ছুটোপাটি। অবশেষে পলের বাধা ছাড়িয়ে বিয়াট্রিস ওর ঘন বাদামী চুলের গোছা দু'হাতে ধরে সজোরে ঝাঁকিয়ে দিল।

তার পর আঙুল দিয়ে চুল সোজা করতে করতে পল বলল, 'বিয়াট্রিস জানো, তোমাকে আমি ঘেন্না করি ?'

বিয়াট্রিস খিল-খিল করে হেসে উঠল। বললে, 'শোন, আমি কিন্তু তোমার ঠিক পাশটি ঘেঁষে বসতে চাই।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

লেখকদের অদ্ভুত খেয়াল (৫)

রণজিৎকুমার বিশ্বাস

খেয়াল জিনিসটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এটা এক জনের কাছ থেকে আর এক জন কোন ক্রমেই দখল করতে পারেন না। সাধারণ মানুষের ভাল লাগা না-লাগার সংগে যাঁর মনের মিল নেই, তাঁকেই আমরা খেয়ালী বলে অভিহিত করি। সেই খেয়ালটুকুই তাঁর অসাধারণত্ব এবং তারই জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে থাকে। যে-কোন লেখকের জীবনী খুঁজলে এমনতর ঘটনা কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। তাঁর লেখার মধ্যে সেই খেয়ালী মনকে বের করা কঠিন হবে না। এর ফলে তাঁর বক্তব্য বিষয়ও বেশ খানিকটা সহজবোধ্য হয়ে পড়তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু লোকে বহু কিছুর নামকরণের জন্য আবেদন করত। এই নামকরণ করা কবির একটা অদ্ভুত খেয়াল; কারণ অনুরোধ মত নামকরণ করা ছাড়াও তিনি নিজে কত কিছুর নামকরণ করেছেন! এ সম্বন্ধে 'নীলমণি-লতা' কবিতা আর নাতনী নন্দিতার নামকরণ উল্লেখযোগ্য। এ রকম আরও আছে। এ যুগে শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী বা স্বপনবুড়োও দেখছি পাততাড়ি মারফত কবির অনুকরণ করছেন।

রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম শুনেছি, বাঁধানো মলাট না হ'লে সে পত্রিকায় লেখাই দিতেন না। বার্ণার্ড শ'র কিন্তু এত সব ছিল না। তিনি প্রথম জীবনে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েই যেতেন আর সপ্তাহ শেষে সেগুলো অমনোনীত হ'য়ে ফেরত আসত।

এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের খেয়াল ছিল আরও অদ্ভুত! ভাল ক'রে চেপে না ধরলে তাঁর কাছ থেকে লেখা বের করা কঠিন ছিল। রেঙ্গুনে থাকার সময় চিঠির পর চিঠি টেলিগ্রাফের পর টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে তবে যমুনা পত্রিকার জন্য তাঁর প্রথম লেখা আদায় করা হয়।

শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু যে বহু দিন ঘোরাঘুরির পর তাঁকে ঘরে আটকে তবে ভ্রমণ-কাহিনী পেয়েছিলেন, এ ত সবাই জানেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় যাঁকে পেতেন তাঁকেই তাঁর কবিতা শোনাতেন; আবার রাজশেখর বসু কাউকেই তাঁর কবিতা শোনাতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি সংস্করণে বইয়ের পরিবর্তন করতেন। ভাল না লাগলে আর প্রকাশ করতেন না। অপর দিকে শরৎচন্দ্র পরিবর্তনের বিশেষ ধার ধারতেন না, ভাল না লাগলে ছিঁড়ে ফেলতেন। ছিঁড়ে-ফেলা 'বাসা'ই হ'ল তাঁর প্রথম উপন্যাস।

লুকিয়ে থাকা যাবে না জেনেও যাঁরা ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, তাঁদেরও খেয়ালী বলা চলে। এই প্রসংগে প্রথমেই মনে পড়বে, প্রমথ বিশী মহাশয়ের নাম। অবশ্য 'বনফুল', 'ভাস্কর' প্রভৃতি নূতন কোন ছদ্মনাম গ্রহণ করছেন বলে জানি না। তাহ'লে তাঁরাও এই দলে পড়তেন। সম্প্রতিখ্যাত দীপক চৌধুরী মহাশয়ও এই দলে কি না তা-ও বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রবীন্দ্রনাথ মৈত্র দু'জনেই অন্য ধরণের খেয়ালী। তাঁরা দু'জনেই নিজেদের নামের প্রতিশব্দ ছদ্মনাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ভানুসিংহ আর দিবাকর শর্মার নাম তাই এই সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক নাটক লিখতে হ'লে গিরিশচন্দ্র গাদাকে-গাদা ইতিহাস পড়তেন, আর ডি, এল, রায় অনায়াসে তাঁর নাটকে অনৈতিহাসিক চরিত্র জুড়ে দিতেন।

লেখার বিষয়ে সব চেয়ে নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন বার্ণার্ড শ। তিনি রোজ ঠিক পাঁচ পাতা ক'রে লিখতেন। তাতে যদি একটা লাইনও অসম্পূর্ণ রাখতে হ'ত তা'ও রাখতেন, তবু ষষ্ঠ পাতায় এক অক্ষরও লিখতেন না। এ বিষয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র ছিলেন একেবারে বেপরোয়া। কোন সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুই লিখতেন না, দরকার হ'লে তিন-চার দিনেই একখানা নাটক শেষ করতে পারতেন না শুধু, করতেনও। আর শরৎচন্দ্রের ত' কথাই নেই। তিনি নাকি প্রথম পরিচ্ছেদ লিখে উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ লিখতে পারতেন। এমনি ভাবেই তিনি উপন্যাসের প্লট ভেবে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের ও-সব কোন বালাই ছিল না। তিনি কলম নিয়ে বসতেন আর লিখে চলতেন!

জলধর সেন কোন নবীন লেখকের লেখার সমালোচনা করতেন না। আশা উৎসাহ দিতেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর উল্টো। কলেজে পড়বার সময় তিনি (তখনও শাস্ত্রী হননি) ভবিষ্যৎ বাংলার বায়রণের কবিতা সংশোধন করেছিলেন।

বাংলার বায়রণ নবীনচন্দ্রই বোধ হয় সব চেয়ে আত্মভোলা কবি ছিলেন। কাব্যের কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর আর অন্য কোন কথা মনে থাকত না। রাত জেগে প্রবেশিকা পাসের পড়া তৈয়ারী করলেও পরবর্তী কালে তিনি রাতে লিখতে পারতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁর কাব্য-সাধনা করতেন রাত্রির শেষ প্রহরে। তাঁর স্ত্রী কিন্তু এ জন্যে ভীষণ বিরক্তি বোধ করতেন। তাঁর হয়ে কবি নিজেই লিখেছেন—

"বড় জ্বালাতন কর সারা রাতি,
কালি ফেলে কাগজ ছিঁড়ে জ্বালিয়ে মোমের বাতি।"

এ কথা সত্য হলে তিনিই বা খেয়ালী কম কিসে?

বার্ণার্ড শ নাকি কাউকে বিনা পয়সায় অটোগ্রাফ দিতেন না। তবে তাঁকে চটিয়ে দিতে পারলে বড় বড় চিঠি পাওয়া যেত তাঁর লেখা। সংবাদপত্রে সেটা বেশ চড়া দামে বিক্রী হ'ত। রবীন্দ্রনাথও নাকি নিজের হাতে যে কোন চিঠির উত্তর দিতেন। বার্ণার্ড শ'র লেখা স্কুলের সিলেকসনে প্রকাশের প্রস্তাব হলে তিনি বলেছিলেন—আমার লেখা বাধ্য হয়ে পড়ে ছেলেরা আমার উপর রেগে। যাক এ আমি চাই না।

সত্যেন্দ্রনাথের পাঠে যেরূপ মনোযোগ ছিল পাঠ্যপুস্তকে সেরূপ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থাও প্রায় তাই। সারা বছর কলেজের পড়া শিকেয় তুলে রেখে লাইব্রেরীর বই পড়ে কাটাতেন। পরীক্ষার সময় অসম্ভব খাটুনি খাটতেন। পরীক্ষায় কিন্তু প্রথমই হ'তেন।

রবীন্দ্রনাথ আর মধুসূদনের ছিল গান শোনার সখ। এক জন গান শুনে প্রজার খাজনা মাপ করতেন; অপর জন ব্যারিষ্টার হ'য়ে মক্কেলের কাছ থেকে ফি নেওয়ার বদলে গান শুনতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ নাকি কোন দিন মানিঅর্ডার ফর্ম পূরণ করেন নি। বলতেন—ও-সব কড়াকড়ি আমার সয় না। জায়গা মত না লিখে হয়ত উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বসব! তার চেয়ে এমনি আছি বেশ। আজব খেয়ালী বটে!

পরস্পর দেখা হ'লে বিবেকানন্দ আর গিরিশচন্দ্রের মাথায় এক মজার খেয়াল চাপত। তাঁরা পরস্পরকে একটু হেসে মধুর 'শালা' সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সারাটা জীবন ত' কাটলো বাঙালী বাঙালী ক'রে। তাঁর যা কিছু লেখা সব বাঙালী সম্বন্ধে। তাঁর বাতিক ছিল পোষ্ট-অফিসে যাওয়া। প্রতি মাসে কত জন অবাঙালী বাঙলার টাকা বাইরে পাঠাচ্ছে, তিনি তার হিসাব রাখতেন। প্রায়ই তিনি আর একটা কাজ করতেন। নিজের ত' তাঁর প্যাকাটির মত চেহারা। তাই নিয়ে তিনি নির্মম ভাবে ছেলেদের ঘুসি মারতেন। বলতেন, পরাধীন বাঙালীর কেমন শক্তি আছে দেখি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাম বাবু আর বিপিন বাবু অনেক বার আচার্যের হাতে কিল-চড় খেয়েছেন। তাঁদের কাছেই শুনেছি এ-সব কথা।

আর এক জনের কথা বললে আমার সংগ্রহের ঝুলি উজাড় হয়। তিনি হলেন—অবনীন্দ্রনাথ। শেষ বয়সে তিনি অতিমাত্রায় খেয়ালী হয়ে ওঠেন। পথে বের হ'লে যা' তাঁর সামনে পড়ত সবই তিনি কুড়িয়ে নিতেন। বাগানে গেলে হয়ত কুড়িয়ে আনতেন একটা বাঁশের গাঁট, নয়ত একটা কাঠি। এই বাতিকের ফলে তিনি গড়তেন হাজার রকম পুতুল—মায় রবীন্দ্রনাথের মুখ পর্যন্ত।

উপরি-লিখিত তথ্যগুলি নিম্নলিখিত বইগুলি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সঞ্চয়িতা, যুগান্তর পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমর কাহিনী, বিংশতি মহামানব, বঙ্কিমচন্দ্র, পরশমণি, আত্মচরিত, কপালকুণ্ডলা (সজনী দাস সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, আমাদের বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ, বিষের নেশা, আমার দেশের কবি, মৌচাক, শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী, শিশুসাথী। এছাড়া একই ঘটনা একাধিক বইয়ে পাওয়া গেছে।

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

আট

জ্বরটা বোধ হয় ভোরের দিকেই ছেড়েছিল। সকালে ডাক্তার এসে বলে গেলেন, জ্বর নেই। ম্যালেরিয়াই বটে।

নিশ্চিন্ত মনে সমরেশ গোবিন্দ একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়ে নিচে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে বসলেন। ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ এল কুইনিন-মিক্সচার। নিঃশব্দে এক দাগ গলায় ঢেলে দিয়ে বসে রইলেন।

সুমুখে রাস্তা দিয়ে লোক-যাতায়াত সুরু হয়েছে অনেকক্ষণ।

শহরের নাড়ি ম্যালেরিয়াগ্রস্তের মতো দপ্‌দপ্‌ করে। গ্রামের নাড়ি স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক, মন্থর। একটু হয়তো শিথিল। কিন্তু পায়ের নিচে সবুজ ঘাস, মাথার উপর ঘন ছায়া এবং তারও উপর কোমল আকাশের সঙ্গে এই শিথিলতাটুকু না থাকলেই বোধ হয় বেমানান লাগত।

অলস দৃষ্টিতে সমরেশ তাই দেখছিলেন। এমন সময় একটা ঢাকা-পাল্কী এসে অন্দরের দরজায় থামল।

সমরেশ প্রথম ভাবলেন, হরসুন্দরী এলেন বুঝি। তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে উঠতে যাচ্ছিলেন। মনে পড়ল, ও-বাড়িতে আজ অরুন্ধতীর নিমন্ত্রণ। পাল্কী এসেছে তারই জন্যে। হরসুন্দরী তার খবর নিতে আসেন নি। অরুন্ধতীর মুখেই নিশ্চয় খবর পাবেন, সমরেশের জ্বর ছেড়ে গেছে।

সমরেশ জানেন, এই নিমন্ত্রণের পিছনে হরসুন্দরীর কোন চাল লুকান আছে। জানেন, অরুন্ধতী না গেলেই ভাল হত। ছেলেমানুষ, সংসারের কুটিলতা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। হয়তো অনেক বিষ মনের মধ্যে পুরে নিয়ে ফিরবে। তবু এই নিমন্ত্রণ একটা সামাজিক আবশ্যকতা। এতে বাধা দেবার কোনো উপায় নেই।

অরুন্ধতী বোধ হয় স্নান সেরে তৈরি হয়েই ছিল। একটু পরেই ঢাকা-পাল্কী করে সে বেরিয়ে গেল। সমরেশ একটা কথাও বলতে পারলেন না। সেই রাস্তার দিকের বারান্দায় নিশ্চেষ্ট বসে রইলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাল্কী গিয়ে পৌঁছুলো জমিদার-বাড়ির অন্দরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমারোহ আরম্ভ হয়ে গেল। উপরে নিচে বেজে উঠল অনেকগুলো শাঁখ। হরসুন্দরী নিজে এসে পাল্কী থেকে অরুন্ধতীকে নামিয়ে নিলেন। ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে একগাছি হার তার গলায় পরিয়ে দিলেন। একটি ঝি রেকাবীতে করে মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই এক টুকরো তিনি পরম স্নেহে তার মুখে পুরে দিলেন।

শাশুড়ীর পিছনেই মণিমালা দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে অরুন্ধতীকে দেখছিলেন। বৌভাতের দিন অল্প একটু ক্ষণের জন্যে তিনি এক বার এসেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে তখনই চলে গিয়েছিলেন। অরুন্ধতীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। জলের ধারা দিয়ে অরুন্ধতীকে তিনিই উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

শাঁখগুলি অবিশ্রান্ত বেজেই চলেছিল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে পাড়ার সব বয়সী মেয়েদের একটা ভিড় জমে গিয়েছিল।

তাদের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু হেসে কিছু কেঁদে হরসুন্দরী বললেন, বিয়ের কনে শ্বশুরবাড়ি এসে সমরকেই আমি প্রথম পেয়েছিলাম মা। সে-ই আমার বড় ছেলে। শৈল এসেছে অনেক পরে। তার বিয়ে ঘটনাচক্রে ও-বাড়িতে হলেও এ-বাড়িতে তার বৌকে বড়বৌ-এর মর্যাদা দিয়েই আনতে হবে তো। নইলে আমার মন ভালো হবে কেন বল?

তাঁর উদারতায় সকলে বিগলিত হয়ে গেল।

ভাগ্যে সমরেশ ছিলেন না। তিনি থাকলে কি হতেন ভাববার কথা, বিগলিত হতেন না নিশ্চয়ই। হয়তো ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে ভাবতে বসতেন, এর অর্থ কি? এবং অর্থ খুঁজে না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠতেন।

কিন্তু শাঁখের শব্দ বাইরের বালাখানায় গিয়ে পৌঁছেছিল। রামপ্রসাদ কি একটা কাজে সেখানেই ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে শৈলেশ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শাঁখ বাজছে কেন?

মৃদু হেসে রামপ্রসাদ বলেছিলেন, বড়বৌ এলেন বোধ হয়।

—বড়বৌ?

—সমরেশ বাবুর স্ত্রীর আজ এখানে নিমন্ত্রণ আছে না?

—তার জন্যে শাঁখ বাজার কি আছে?

—বউ ঠাকরুণের খেয়াল!

—খেয়াল!

শৈলেশের বিস্ময় কিছুতেই কাটছিল না। হরসুন্দরীর খেয়াল বলে কিছু আছে, শৈলেশ তার জীবনে এমন দেখেনি।

রামপ্রসাদ হেসে বললেন, তাই বলেই মেনে নাও না বাবাজি! কি হবে ওঁর মনের কথা জেনে? ও কি কোনো দিন জানা গেছে?

শৈলেশ আর কথা বাড়ালেন না।

শাঁখ এবং জলের ধারাই শেষ নয়। দেখতে দেখতে পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে এসে জমল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি। সধবা এবং কুমারী। হরসুন্দরী এই উপলক্ষ্যে একটি ছোটখাটো বৌভাতেরই প্রায় আয়োজন করেছেন। তা নইলে নাকি ওঁর মন ভালো হবে না।

প্রথম পরিচয় হল অরুন্ধতীর মণিমালার সঙ্গে। মণিমালা অরুন্ধতীর চেয়ে অনেক বড়। প্রণাম ঠিক করতে পারলেন না। মাথা অনেকখানি হেঁট করে যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন। বললেন, বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড় হলেও সম্মানে তুমিই বড়। তাই আলগোছে একটা প্রণাম করে রাখলাম।

অরুন্ধতী তার মানে বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বয়সে যদি ছোটই আমি, তাহলে সম্মানে বড় কেন?

মণিমালা বললে, তুমি কি এঁদের কথা কিছুই জান না?

অরুন্ধতী নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে। এ-বাড়ির সবই তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। সাধারণ ভাবে যেটা যেমন হওয়া স্বাভাবিক, এখানে সেটা তেমন নয়। যে-ব্যাপার যেমন করে কেউ ভাবেনি, এখানে তা তেমনি করেই ঘটে।

মণিমালার কথা শোনবার জন্যে অরুন্ধতী তাই একটা বিস্ময়কর ঘটনার জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে নিজেকে প্রস্তুত করলে।

মণিমালা উভয়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিলেন প্রথমত। সেই সম্পর্কে বয়সে অনেক বড় হলেও মণিমালা ছোট-জা। অরুন্ধতী ছোট হয়েও গুরুজন। তার পরে সমরেশের বাল্য এবং পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে যতটুকু তিনি শুনেছেন,—সত্যে ও গুজবে মিশিয়ে,—সবই বললেন।

সমস্ত শুনে অরুন্ধতী বললে, তা যেন হল ভাই, কিন্তু এই নিয়ে আবার এত শাঁখ বাজান, আর এত খাওয়া-দাওয়া ধুমধাম কেন?

—তা জানিনে। ওঁর ইচ্ছে।—মণিমালা অকপটে স্বীকার করলেন।

—উনি কে? ঠাকুরপো?

এবারে মণিমালা হেসে ফেললেন।

—হাসছেন!—অরুন্ধতী বিব্রত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

মণিমালা ওকে সংশোধন করে বললেন, হাসছেন নয়, হাসছ বলবে। আমি তোমাকে বলব 'বড়দি', তুমি আমাকে বলবে 'ছোটদি'। কিন্তু কেউ কাউকে 'আপনি' বলব না। কেমন?

—বেশ। কিন্তু উনিটা কে, বললে না তো। ঠাকুরপো?

—না। নামে যদিও তিনি কর্তা, কিন্তু আসল কর্ত্রী যিনি তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। এ-বাড়িতে তাঁর ইচ্ছাই রাজত্ব করে। সর্বত্র। আমাদের কাজ প্রশ্ন করা নয়, নিঃশব্দে হুকুম তামিল করা।

অরুন্ধতী ব্যাপারটা তার নিজের মতো করে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

মণিমালা বললেন, ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন মনে হয়, ও-বাড়ির বটঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সব সময় একটা যুদ্ধ চলছে।

—যুদ্ধ!—অরুন্ধতী ভয়ে চমকে উঠল।

—তাই।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় না?

—না। দু'জনেই সমান ধূর্ত। বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ওঁদের ভাষা শুধু ওঁরাই বোঝেন। আমরা দেখে যাই, শুনে যাই, এই মাত্র।

মণিমালার কথাগুলি অরুন্ধতীর খুব ভালো লাগছিল। এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে, এমন লোক একটিও পায়নি। অসংকোচে প্রশ্ন করলে, কি নিয়ে ওঁদের যুদ্ধ?
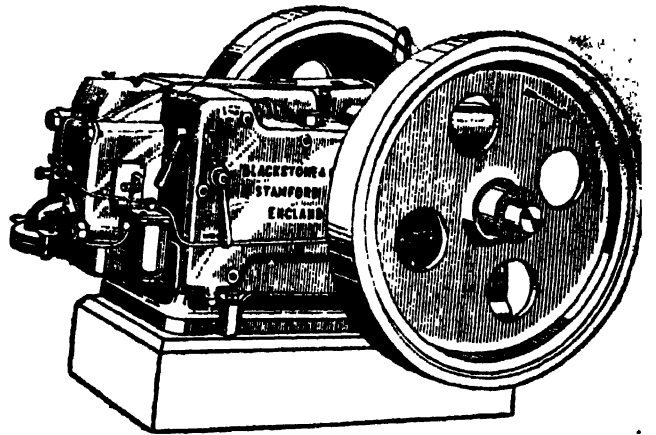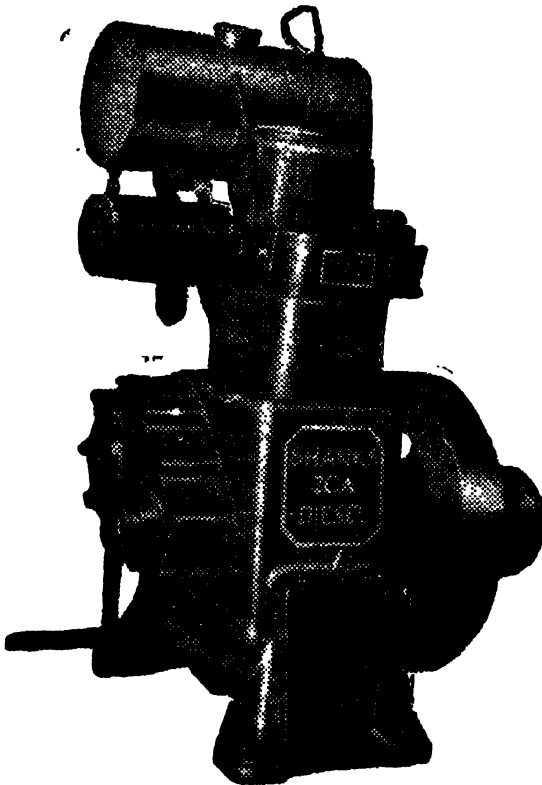
অবনীন্দ্র-চরিতম্

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

তার পরে সিগারে টান দিতে দিতে, কৌচে বসে পড়লেন গুরুদেব। সনাতন চিত্ত-চমৎকার হাসিটিকে গালের উপর ভুমো ক'রে ফুলিয়ে পুনর্বার বললেন—

"আর ভাবনা নেই। ছোট্‌বাবু এবার মডেল-ড্রয়িংএ পাশ হয়ে গেছেন।"

বলেই আবার সেই গান্ধর্নীয় রস-সঙ্কেত হাস্য ;

শ্রীমান্, আমাদের দেশে মেয়েমহলে, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ,—কৈশোর পেরোলেই মা এবং মেয়ের মধ্যে স্নেহের সম্বন্ধটি হঠাৎ সখী-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, ভয়-ভক্তির গণ্ডীটি রসিকতার মাধুর্য লেগে কেমন যেন হঠাৎ বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি তো তাই দেখে থাকি। তেমনি আর্টিষ্ট-মহলে শিষ্যের বিবাহ হয়ে গেলেই, শিথিল হয়ে যায় গুরুদের কৃত্রিম গাম্ভীর্য, হঠাৎ তাঁরা যেন সমান-বয়সী হয়ে যান, মুখোস খুলে বেরিয়ে পড়ে তাঁদের কলা-বিস্তার কামনা-ভরা নবীন মন। বললেন—

"এবার মডেল পেয়ে গেছিস্! লাল্‌বাসার মডেল। ঝুনো মডেল নয়। বুঝেছিস্ রে, রূপেয়া খরচ ক'রে কেল্লা থেকে গোরা ধ'রে, মডেল বসিয়ে এক দিন আমিও আঁকতুম ;—তা সে সব মডেল দিয়ে 'কাঠ' আঁকা যায় 'গাছ' আঁকা যায় না রে। পামার সাহেবের কাছে পাশও হ'য়ে গিয়েছিলুম—। তার পর যেই এল কঙ্কাল আর এনাটমির ভতুড়ে, অমনি ষ্টাডি পালা পালা,…১০৬ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে বাড়ী পালিয়ে তবে বাঁচি। আমার অবস্থা দেখে মা বললেন—'কাজ নেই তোর অমন ক'রে ছবি এঁকে।' ব্যাস্,—জ্যান্ত জ্যান্ত সাহেব-মেম মডেল ভাড়িয়ে ভাড়িয়ে আঁকা—সেই থেকে আমার ইস্তফা। বাব্বা,…সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেমটার কথা আজও কিন্তু মনে পড়ে। মডেল হোলো, ছবি আঁকলুম ; টাকা দিতে গেলুম, নেবে না, বলে—ছবিখানাই দাও। ছবি দেবো কি ? পামার সাহেব এক ধমকি দিতেই মেমসাহেব সিঁড়ি দিয়ে সুড়-সুড় করে নীচে নেমে চলে গেল। আজও তার জন্যে মন কেমন করে। দিলেই পারতুম ছবিখানা।…শেষে ছিঁড়েই তো ফেলেছিলুম ছবিগুলো এক সময়ে! দু'-একখানা আমার আঁকা তেলের ছবি কারুর কাছে এখনও এখানে-ওখানে ছিটকে থাকতে-পারে।"

আমি বললুম,—"মডেল নিয়ে আঁকার, তাহলে কি কোনো দরকার নেই আমাদের ?"

"খুব আছে রে। মডেল ত ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থটার মধ্যে। তোরা যে দেখতে শিখিস নি, তাই তোরা আঁকিস না। মডেলের বুনিয়াদ থেকেই গড়া সুরু, আঁকা সুরু করে দেয় শিল্পীরা।"

এই পর্যন্ত বললেই হঠাৎ খাপ-ছুরিয়াস হয়ে বললেন, "দাঁড়া, তোকে একটা মডেল-আঁকার তুক্ বাৎলে দি ;—ডান হাতের বুড়ো আঙুলটার নখের টিপনি দিয়ে বাঁ হাতের তেলোয়, যা ভালো দেখবি তাই আঁকবি—impression রাখতে অভ্যাস করবি। মডেলের ভয় আর থাকবে না। ঐ নখের টিপ্‌নি দিয়ে, অন্তরের টিপ্পনিটিকে ধরে রাখছে তোর মন! বুড়ো আঙুল হওয়া চাই কিন্তু, অন্য আঙুল চলবে না। বুড়ো আঙুলটি গেলো, তো আর্টিষ্টবাহাদুর খতম্। তবে বাপু, বিলিতি ধরণে মডেল শিল্পীরা নিয়ে, অতো বেশী মাতা-মাতিটা আমি পছন্দ করি না। ভারতবর্ষের চোখ রূপ দ্যাখে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমরা মডেলকে পেতে চাই রসের ঘরে, ভাবের ঘরে, আর পশ্চিমীরা মডেলকে পেতে চান চামড়ার ঘরে, মাস্‌লের ঘরে। মেডিকাল ষ্টুডেন্টের মন নিয়ে যতই ডিসেক্‌সন করতে যাবে আমাদের ছাত্তরেরা, ততই তারা দেখবে তাদের মনের সূক্ষ্মতা আর ঐক্যবোধ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে,—নিমগাছের আওতায় যুঁই ফুলের গন্ধের মত। একঘরে, কুণো হয়ে পড়ে থাকবে সেই সব ছাত্তরদের মানসিক অভ্যাস।

স্কিনের উপর একটা স্থির নর্থ লাইট পড়ছে, রঙ ফুটছে ; মডেল থেকে ঐটুকু আঁকবার পদ্ধতি তুমি না হয় শিখে নিলে। বলব ভালই করেছ, শিখেছ, যত জানবে ততই ভাল। কিন্তু এটুকু ভুলিস নি—ঐ স্কিনটা তার সমস্ত রঙ তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে প্রতিক্ষণ বদলাচ্ছে, আলোর কৃপায়, গতির কৃপায়, আর স্বাধীন একটা মনের হাব-ভাবের দোলার কৃপায়। মডেলের স্বাধীনতা থাকে না। মরা রঙ নিয়ে কারবার করা রসিক আর্টিষ্টের ধাতে সয় না। তবে কেউ যদি ঐ skin আর muscle আঁকাতেই হাত পাকায়, তাহলে তাকে অনুকারক হয়েই থাকতে হবে চির জীবন,—স্রষ্টার আনন্দ সে পাবে না। দুর্বল হয়ে যাবে, বুঝেছিস, কল্পনার ইঞ্জিনটা।"

এই সকলো সাত কথা বলতে বলতে ঝাঁকিয়ে উঠলেন গুরুদেব। শ্রীমান, আমার এখনো কানে বাজছে তাঁর সেদিনকার সেই ভাষা ;—

"ওরে শিষ্য, যার যতটুকু দেখা যায় না, তার ততটুকু রূপ, তার ততটুকু ছবি কেমন করে আঁকব ? যদি আঁকতে হয়, তার ভঙ্গিটাকে আঁকিস : নূপুর, ভঙ্গিই এনে দেবে সম্ভাব সঙ্গীত। ওরে নূপুর তো বাজল। দেখা তো শুনলি। বল ত শিষ্য, তুই এখন আঁকবি কেমন করে ঐ নৃত্যবতী পা ? গোদা পায়ে নূপুর আঁকলে লাথি খাবি। নাচনে পায়ে কোথায় থাকে আঙুল ? কোথায় থাকে একশ'টা নখটি ? উপরে যায় দৃষ্টির, রূপের বাইরে। আমি তো শুধু ওর কলরব-মুখরিত গানটুকুই পেলুম। সেই ধ্বনিটুকু ভেবেই আঁকিস্, বুঝেছিস। ঐ ধ্বনির সোহাগেই রূপ এল, রেখা এল। পায়ের কতটুকু পেলুম,—জানতে চাই না। ঘুঙুরের আওয়াজটা কেবল আমার কাগজে ফুটে উঠবে—সোনা, পান্না আর হলুদরঙের ঝলসানিতে। সেইখানেই ক্ষান্ত করিস রেখার টান, তুলির টান।"

কৌচ ছেড়ে বঙ্কশীষ লাঠিটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন গুরুদেব ; চললেন,—একটু এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে কী যেন একটু কী ভেবে নিয়ে ফিরে বললেন—

"আজ সন্ধ্যা ৭টার আমার ওখানে আসিস। লেটচায়ের নেমতন্ন রইল তোর। একটা মজার জিনিষ দেখবি।"

দেউড়িতে মোটর দাঁড়িয়ে। 'মহানন্দ'—দরোয়ান মোটরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে ; গুরুদেব উঠতে যাবেন মোটরে—দেখি বাবা তিনতলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন।

"এই যে পেসাদ, তুমি আবার নামতে গেলে কেন বলতো ? আজ আমি তোমার কাছে আসিনি কিন্তু। হঠাৎ, চট করে চলে এসেছি শিষ্যের কাজ দেখতে—ফাঁকি দেবার বয়েসটা এখন ওর এসেছে কি না। ওর হবে, ওর মন আছে।"

গুরুদেবের এ সব কথার কী আর উত্তর দেবেন আমার পিতৃদেব ? মোটরে বসে বাবাকে গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন, "শিষ্যটি আমার আদবকায়দা সব শিখে গেছে। তোমাকে খবর দিতে বারণ করে-ছিলুম, তবু খাতিরটা কিছু কম করেনি। তোমার বাক্স থেকে এই ছাগো এই প্রকাণ্ড সিগারটা সরিয়ে এনে, আমায় ধরিয়ে দিয়েছে।"

হাসতে লাগলেন পিতৃদেব। চলে গেল মোটর। কিন্তু আমার মাথায় পোকা নড়ল···কী মজার জিনিস দেখাবেন গুরুদেব সন্ধ্যেবেলায়।

সন্ধ্যা ৭টা বাজল। পাঁসিয়ান স্লিপার পায়ে, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে,—লেটচায়ের নেমতন্ন খেতে গেলুম। পাঁচ নম্বরে। কিন্তু, ওরে সর্বনাশ, ফটকে মোটরের এতো গাদি লেগেছে কেন ? উপরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখি,—নীরব, অথচ লোকের অরণ্য। কী ব্যাপার ? এমন সময়, মক ভক্তদের কাকপক্ষ বা বকপক্ষ কেশ-সংস্কারের উপর দিয়ে, উত্তরের বারান্দার রেলিঙ টপকিয়ে, মালতী ফুলের একগাছি মালার মত, ভিজে হাওয়ায় ভেসে এল বর্ষা-মঙ্গলের এক কলি গান, বোধ হয়,—

"শ্রাবণ-মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা···"

ভিড় সহ্য করতে পারি না, ভিড় দেখলেই কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠি, তাই একবার ভাবলুম,—ফিরে যাই। কিন্তু ফিরতে সাহস হল না। যদি জানতে পারেন গুরুদেব—তা হলে ক্ষেপে যাবেন। রাগতে গুরুদেবকে বড় একটা দেখিনি, কিন্তু যদি ক্ষেপলেন তাহলে রক্ষে নেই, নিমেষে হয়ে যেতেন অভিমানের আর চাপা-রাগের সমুদ্দুর। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠলুম।

Tagore Studio-তে রবিদা 'বর্ষামঙ্গলে'র রিহার্শাল দিচ্ছেন। গান ছাড়া টুঁ-টি-টা-টি শব্দটি নেই আসরে। অতো লোক, অন্ততঃ পক্ষে শ' দেড়েক হবে—বারান্দা ভর্ত্তি, ঘর ভর্ত্তি, সব ভক্তের দল—গীত-মোহিত হরিণের মত স্তব্ধ।

পা টিপে টিপে, পাশ কাটাতে কাটাতে দক্ষিণের বারান্দায় এসে দাঁড়াই। দেখি, গুরুদেব সিংহাসনে বসে আছেন, গান শুনছেন। কোনো কথা না বলে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে আমাকে নিয়ে গেলেন, বারান্দার পূর্ব কোণে রেলিং-এর ধারে ; চুপি চুপি বললেন—

"এটি আমার দেখবার খাস জায়গা, অবজারভেটারি—এই স্থানটা কেউ এসে দখল করবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা ক'রে মডেল স্থাখ্।"

চশমাধারী হুতুম-পেচকের মত গোল গোল চোখ পাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যাই। গুরুদেব নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়েন ;—আমি দেখতে থাকি।

শ্রীমান্, দেখব আর কি বলো ? তখনকার জমানায় রবিঠাকুর যেখানে বসে থাকতেন, সেখানে কি অন্য কাউকে দেখবার লোভে ছুটে যেতে পারে চোখ ? তার উপর নাতিনিম্ন নতুন প্রাচ্য ডিজাইনের ডিভানের উপর একটি পা মাটিতে এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন কবি,—গান শোনাচ্ছেন, মেয়েদের শেখাচ্ছেন গান। বাঁ পাশের দরজা জুড়ে ঢালব গায়ে বসে আছেন দিনুদা। শ্রীদিনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর)। কবির চাঁপা রঙের গরদের জোব্বার উপরে—দুলছে কালো-কারে-বাঁধা চশমা। মাঝে মাঝে গীতিরস ছড়িয়ে দিচ্ছে মরাল-মুখো হাত, শ্মশ্রুগুম্ফের আর্য শুভ্রতার মধ্যে পাতলা ওষ্ঠাধর কাব্য-পলাশের মত বঙ্কিম। ক্যাক্টিটাকুট্ কুসুমের ঝাড়ের মত শাদা বাবড়িতে "র আম্বারের" গম্ভীরতা। ডিভানের পিছনেই কাঠের প্যানেলিং, প্যানেলের মধ্যে দু'খানি রাজপুত পেন্টিং স্ক্রু দিয়ে আঁটা। সেই রাজপুত ছবি দু'টির মাথার কিছু উপরে, টাঙানো রয়েছে অবন ঠাকুরের "পদ্মপত্রে নীর" ছবিখানি।

কবিকে দেখে মনে হল—তিনি যেন সত্যিই, আমাদের মান্ধাতার যুগের ভরত-মুনি, নব্যযুগের আঙরাখা প'রে গীতাভিনয় শিক্ষা দিতে এসেছেন Tagore studio-তে। তুষারশিখর দেবতাত্মা হিমালয়ের যেন এক স্থগিত-নৃত্তির চারু কল্পনা,—যার গায়ে এসে লেগেছে মানব-তনাইএর পরিণতক্ষেত্রের হেমন্ত-দিনের সোনা।

দেখতে লাগলুম।

বিরাট ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে, ফরাসের উপর বসে রয়েছেন স্ত্রী-পুরুষ ভক্তবৃন্দ। মুখ চেনা যায় অনেকের। দু'-চার জন বন্ধুও দেখি বসে রয়েছেন। তাঁদের ব্যাকগ্রাউণ্ডে, প্যানেলের মাথায় দেয়াল-জোড়া দু-তিনখানি অজন্তা ফ্রেস্কো। এইগুলিই শ্রীমান, Mrs. Herringham-এর উদ্যোগে একদা শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ অবনীন্দ্র-শিষ্যেরা অজন্তায় গিয়ে কপি করে এনেছিলেন। এই ছবিগুলিরই প্রত্যক্ষ-দর্শন একদিন বঙ্গ-সমাজের ইঙ্গ-বঙ্গ হৃদয়টিকে চিত্রজগতে পূর্বমুখী হতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিল। কিন্তু,

বন্ধুদের গীতমোহিত ভাবাভিনয় দেখে, হাসি চেপে রাখা কি সহজ ? আহা, তাঁদের মধ্যে কেউ যেন কেউটে সাপের ফণা—তুবড়ীব আওয়াজে বিস্মৃত-চিত্ত হয়ে কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন ; কেউ যেন কোরিয়প্‌সিস ফুলের মত রঙচিত্তির আবেগে মুখ নিয়ে লীন ; একটি বন্ধু দেখি, তাঁর বিরাট বপুতে কালো সোনা পাড় নতুন-আমদানী মাদ্রাসী চাদর ঝুলিয়ে হাতীর বাচ্চার মত মৃদুমন্দ দুলছেন ; কারোর বা কান গান শোনার ভাণ ক'রব চোখ দিয়ে অন্ত চোখ দেখছে। একজনকে দেখলুম,—একমাথা পাতা-পাড় বিং-ঝোলন তেল-চুকচুকে চুল নিয়ে আত্ম-গরিমায় নিজেকে ভাবছেন গ্রীণ-রবীন্দ্রনাথ, এবং রবিয়ালী হস্তমুদ্রায় মরালের অনুকরণ ক'রে, গানের অনুসরণে হাত ঘুরিয়ে চলেছেন আলতো-আলতো ; মুখে ব্রহ্মজ্ঞ মিতহাস্যের রসাভাস।

মেয়েদের কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। যাঁরা সারাদিন অতিমুখর, তাঁরা এখানে মূক ; যাঁরা গাছ-কোমর বেঁধে দিনদুপুরে চর্কী ঘোরেন, সেই সব দস্যিরাও এখানে যেন, প্রেমলোকের ধ্রুবতারার মত দর্শনমধুর হয়ে কিরণে কিরণে ঝলকাচ্ছেন।

অতঃপর···বর্ষামঙ্গলের গানে ভেসে গেলুম। ততঃপর···হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তাই ত, গুরুদেব মডেল দেখতে বলেছেন···কই দেখা হল কই ? ও, হরি ! রিহার্শাল যে শেষ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে আসর ভাঙল। ভাঙতে ভাঙতেও পনর মিনিট। আটটা বেজেছে, কবিকে কোথায় যেন যেতে হবে। সহজ সৌজন্য ও চিত্তবৃত্তির তৃপ্তির মধ্য দিয়ে সকলেই একে একে বিদায় নিলেন। বড় সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় চলে গেলেন গগন ঠাকুর।

সকলের মধ্যে এতক্ষণ ঘুর-ঘুর করছিলেন গুরুদেব, এবার ছুটি পেয়ে দক্ষিণের বারান্দায় পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে নিজের আসনে এসে বসলেন, বললেন—

"আমি গান বাঁধি, ছড়ার গান, যাত্রার গান,—আর রবিকা গান বাঁধেন,—পড়ার গান, নড়ার গান। রবিকার আর সব কিছু, কালের প্রবাহে লোপ পেলেও, এই গানগুলো বাঙালীর মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা থাকবে। যাক্ আজকের মত ফাঁসাদ চুকল।"

"রাধু"-চাকর রূপোর থালায় করে মিষ্টান্ন নিয়ে এল। আর সর্পষ-ঢাকা এক গেলাস জল। দু'টি বড় বড় চৌকো চিত্রকূট, আর দুটো তালশাঁস-সন্দেশ রয়েছে থালায়। এত খাই কি করে ? মিষ্টির থালাটি টেবিলের উপর রেখে রাধু চলে গেল। ক্ষণপরেই আর একটি সর্পষ-ঢাকা রূপোর গেলাসে গুরুদেবের জন্য জল নিয়ে সে ফিরে এল। এক চুমুকে সমস্ত জলটিকে নিঃশেষ করে গুরুদেব বিস্তীর্ণ হাস্যে বললেন—

"খেয়ে ফেল ছোটুবাবু। যা জলতেষ্টাই না আমার পেয়েছিল!"

শ্রীমান্, এই আমার প্রথম জল-খাবার-খাওয়া গুরুদেবের কাছে, এবং এই আমার শেষ জল-খাবার-খাওয়া গুরুদেবের কাছে। এ রকম নিভৃতে বসে স্লেট্-চায়ের এমন নেমন্তন্ন, এমন মিষ্টি ক'রে আর কখনো কোথাও খাইনি। মনে পড়ে না। এক দিকে স্নেহ, আর এক দিকে ভক্তি ; এক দিকে তুলি, আর এক দিকে কাগজ,—তারি যেন এই মাখামাখি নেওতা। আর সত্যিই, আমার নিজের ঔদরিক ঔদার্যের রেকর্ড ব্রেক্ করে, সেদিন গুরুদেবের বাক্য-শ্রাবণের দুর্দান্ত ধারা-ধ্বনি শুনতে শুনতে কী ভোলা-মনেই না সেই চার-চার মিষ্টান্নই আমি খেয়ে ফেলেছিলুম। সেই ধ্বনির, সেই মর্ম-সিন্দুর বর্ণ-তরঙ্গের অভিনয় তোমাকে শ্রীমান, দেখাতে পারতুম। কারণ, গুরুদেবের কাছেই শিখেছি কিঞ্চিৎ অভিনয়-বিদ্যা। কিন্তু পাছে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে পাগল চিত্র-নট ভেবে বসো, তাই ভীতি-সঙ্কুচিত-চিত্তে গুরুদেবের ধ্বনি-মাঙ্গল্যের সংক্ষিপ্তসার শোনাচ্ছি,—

"মডেল-মডেল ক'রে, টেকনিক্ টেকনিক্ ক'রে এখনকার দিনের সকলেই চীৎকার করে বেড়াচ্ছেন। কী আশ্চর্য বলত ? আমি বলি—ঐ কেঠো মডেলের, ঐ সব ডামিগুলোর সন্ধানে দৌড়বার কোনো প্রয়োজন নেই তোদের। ঐ অনড় মূর্তিগুলোকে পিঠে চাপিয়ে দিয়ে শিল্পী-র মনের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলোকে জেরবরাৎ করা ছাড়া আর কিছু করা হয় না। পোটোদের রঙ-বাহারী উন্মাদনাটা বুঝেছিস, চিড় খেয়ে যায়!···চোখকে প্রথম ভোলায় রূপ, শিল্পীর মনের সাত্ত্বিক গুণ যদি সেই রূপের মধ্যে না অর্শালো, তাহলে বিনা-বাক্যে বাতিল হয়ে গেল সেই রূপ। যদি তা অর্শাল, তখনি বিশ্ব-দুনিয়ার মধ্যে থেকে, বাতাসের দোলার মধ্যে থেকে, গাছ-গাছালির পাখি-পাখালির মানুষ-মানুষীর মধ্যে থেকে, শিল্পী বেছে নেয় তার পরিপ্রেক্ষিত, তার শারীরস্থান। বেছে নিতে সে বাধ্য। এখন বলতে পারিস, কতটুকু সে বেছে নেবে ? আর যেটুকু সে বেছে নেবে—তাতে কতটুকু কাজে লাগবে এই ডামি-লব্ধ শরীর-বিজ্ঞান ? যে মায়া আমি রঙের জোৎস্না দিয়ে ধরতে চাই, ভাবের প্রগতির মধ্যে যে ছন্দটিকে আমি নাচাতে চাই দোলাতে চাই, সেইটুকু ফোটাবার আগ্রহে যেটুকু প্রয়োজন হয়, সেইটুকুই আমি নেব ; আমাদের নিতে হবে, আর সব বাতিল করে দিবি। কিন্তু শোন, যেটুক বাতিল হ'ল আলোর রাজত্ব থেকে, সেটুকু কিন্তু বাতিল হয়ে যায় না রূপের (form) এর পরিধি থেকে। রেখার ধার-মূর্তি দিয়ে শিল্পী তাকে আটকে রাখে, রঙের গভীরের মধ্যে তাকে ঢেকে রেখে দেয়, আঙ্গিক পরিপূর্ণতা থেকে তাকে খসে পড়তে দেয় না। তবেই ভালো হয় কাজ।"

দুটো পান মুখে পুরে চুরুটটি ধরিয়ে বেশ আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে আবার বলতে লাগলেন—

"ভাস্কর যখন গড়ে, তখন সে round-এ গড়ে। রেখা তার গৌণ। ডামি না হলে এক পা চলা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যখন সে রিলিফ কিংবা প্লাক্ গড়তে বসে, তখন কী হয় ? তখনি সে ছবিকারের এলাকার মধ্যে সেঁদোয়, তাকে রেখার সাহায্য নিতে হয় বাঁধনে বাঁধা পড়তে হয়। কিন্তু ভাস্করের টেকনিক্ আলাদা ; ছবিকারেরও দৃষ্টি-ভঙ্গি আলাদা। Loud করবার বা জোরালো প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে, দু'জনেই, মোহে পড়ে দু'জনের খাস রাজত্বের সীমানা মাড়িয়ে বসে, আর ফল হয়—ফেলিওর।

চিত্র আর ভাস্কর্যের ঐখানেই ঝগড়া।···প্রাচ্য শিল্পবুদ্ধি আর পাশ্চাত্য শিল্পবুদ্ধির মধ্যে মূলগত একটি ভেদ রয়েছে। নটা রসকে পুজো করবার জন্যে ভাবলাবণ্যের প্রাধান্য দিয়ে আমাদের দেশের গুণীরা গতি, ভঙ্গি এবং ছন্দের সেবা করেছেন, মনের বা স্বপ্নের সুরটিকে কাগজের উপর ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। দেহের অবাস্তব গড়নের খুঁটিনাটি বসিয়ে, ক্লান্ত করতে চাননি রসের ফূর্তিকে। গোলাপ আঁকতে হলেই যে আঁকতেই হবে কাঁটা,—এ-কথার কি কোনো মানে হয় ?

কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পে সেটি হবার জো নেই। দেহের গড়ন তাঁদের কাছে মুখ্য। দেবতার কল্পনা করতে গেলেও, তাঁরা আমার ঐ "রাধু"—চাকরটির মানব-কাঠামোর বাইরে যাবেন না। রূপ যে দেহাতীত হ'তে পারে, এ ধারণা তাঁরা, তর্কের খাতিরে, মনেও স্থান দিতে পারেন না। রাধুর ঐ চ্যাপ্টা চিমসে শরীরটাকে dummy খাড়া করে তাঁরা এপোলো গড়ে ফেলবেন। তার মধ্যে প্রথর করে ভরে দেওয়া হবে গতি-ভাব-ছন্দ। এইখানেই ব্যর্থ হয় দেবতা-গড়ার স্বাদ, অবশ্য পূর্ণদেহীর মাপজোপের গঠনগুলি সব সফল হোলো। একটা কথা সব-সময়ে মনে রাখিস্—পশ্চিম বড় ক'রে দেখছে মনুষ্যকে,—মনুষ্যের সেবা-দাসী এই পৃথিবীকে; ভারতশিল্প সব চেয়ে বড় করে দেখছে, মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে দেবতা রয়েছেন—তাঁকে।...গোড়া থেকেই তাই এই দুটো পশ্চিম-পূর্বী টেকনিক পৃথক। সহজে মিলবে বলে ত মনে হয় না।...চিত্রকর জন্মে ইস্তক তার মাকে দেখে; কিন্তু ধর, ছবিতে মাতৃভাব প্রকট করবার দরকার হয়ে পড়ল, তখন তার মাকেই কি মডেল করবার দরকার হয়ে পড়বে? নিজের মায়ের পুরোদস্তুর পোর্ট্রেট আঁকলেই কি তার মধ্যে ফুটে উঠবে বিশ্বের স্নেহ-মমতা-মাখানো মাতৃ-প্রতীকের ভাব? তা ফোটে না যে, তা ফোটে না। র‍্যাফেলের মা-ছেলের ছবিখানাই ধর। যীশুর মাকে কি অমনি দেখতে ছিল? না, এই ছবিটিই "মেরির" পোর্ট্রেট? অনেকেই তো মাদার এণ্ড চাইল্ডের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু, শিল্পী, র‍্যাফেলই পারলেন মাতৃভাবটুকু ফোটাতে; তিনি রয়ে গেলেন। মডেল থেকে কার্টুন আঁকলেন—শেষে কার্টুন বাতিল করলেন,—তবে আনতে পারলেন ভাবের ছন্দ।" এতক্ষণে আমার জল খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমার হাতে দুটো পান তুলে দিলেন গুরুদেব। বললেন—

"মেয়ে-মহলে আমার মতই দেখছি তুই দহরম্ মহরম্ করতে পারবি না। তবে বুঝলি, কৃপাদের চোখের দৌড় অনেক লম্বা। ঐ খাপ, মডেলের জন্যে না আবার তুই বিব্রত হয়ে পড়িস? তাহলে এতক্ষণ রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে কী দেখলেন ছোট্ট বাবু? এবার তো শুনতে হয়।"

আমি বললুম,—"বিহারীলাল দেখতেই সময় কেটে গেল, তা মডেল আর দেখলুম কখন?"

গুরুদেব একটু হাসলেন, বললেন—"বেশ করেছিস, মডেল না হয় দেখিস নি, রবিকার বিহারীলালের আসরখানা তো দেখেছিস?"

প্রশ্নের ব্যঞ্জনায় সপ্রতিভ হয়ে উঠে বলি—"তা দেখেছি বৈ কি।" এবং তার পরে শ্রীমান্, গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করতে করতে বলে গেলুম, আসরটিতে যা যা আমার চোখে পড়েছিল। খুঁটি-নাটি সব শোনালুম। আমার হস্তীমার্কা বন্ধুটি—গান শুনে যিনি দুলছিলেন,—গুরুদেব তাঁর কথা শুনে বেশ একটু হেসে উঠলেন। তারপর যখন সেই মেয়েটির কথা বললুম—যার একখানি হাত লুকিয়ে লুকিয়ে, তার পাশের গান-পাগল মেয়েটির অসাড় খোঁপা থেকে, যেন হাসতে হাসতে চুরি করছিল স্বর্ণচাঁপা—হাত তো নয়, যেন একখানা ফণীমুখ অস্তর,—তখন গুরুদেব হঠাৎ বলে উঠলেন—"ঐ তো রে হ'য়ে গেল তোর হাব-ভাবের রূপের চলন্ত মডেল দেখা। ঐ হয়ে গেল তোর মনের ভিতরে ছবির খসড়া। মডেলিং কিন্তু করতে হবে তোকে ছবিতে,—উপমার ভাবটিকে বজায় রেখে, আর ছন্দটিকে নিজের মাথায় রেখে; এবং ছবির সেই সেইখানেই হবে মডেলিং—যেখানে আবেগ (emotion) বা ছন্দের দোলা এসে লেগেছিল। উপমার পথ ধরেই, পরে তোকে পৌঁছতে হবে লাবণ্য-যোজনায়।"

শ্রীমান, এই সব খোস মেজাজের কথাগুলির অনুরণন গুরুদেবের বাগীশ্বরী লেকচার্সের গরম-গরম ভাষায় ফুটন্ত অবস্থায় তোমরা দেখতে পাবে।—যেমন—

"...ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিষ্টের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিষ্টের কাছে ঘটনার ছাঁচ পাস না রস, রসের ছাঁচ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা; হাড়মাসের ছাঁচ পায় না শিল্পীর মানস, কিন্তু মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়-ছন্দ, ভিতর-বাহির।...বীজের anatomy দিয়ে গাছের anatomy-র বিচার করতে যাওয়া, আর মানুষী মূর্ত্তির anatomy দিয়ে মানস-মূর্ত্তির anatomy-র দোষ ধরতে যাওয়া সমান মূর্খতা।

...মেঘের গতিবিধির মত সচল সজল anatomy, একেই বলা হয় artistic anatomy, যার দ্বারায় রচয়িতা রসের আধারকে রসের উপযুক্ত মান-পরিমাণ দিয়ে থাকেন। মানুষের তৃষ্ণা ভাঙতে যতটুকু জল দরকার তার পরিমাণ বুঝে, জলের ঘটি এক রকম হোলো, মানুষের স্নান করে শীতল হতে যতটা জল দরকার তার হিসেবে প্রস্তুত হ'ল ঘড়া, জালা ইত্যাদি; সুতরাং রসের বশে হোলো আধারের মান-পরিমাণ-আকৃতি পর্যন্ত; যার কোনো রস-জ্ঞান নেই সেই শুধু ভাখে—পানীয় জলের ঠিক আধারটি হচ্ছে চৌকোণা পুকুর, ফটিকের গেলাস নয়, সোনার ঘটিও নয়।...

...ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা, তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-মূলক।...

...বীজের anatomy নাশ করে যেমন বার হল গাছ, তেমনি বানরের anatomy পরিত্যাগ ক'রে মানুষের anatomy নিয়ে এল মানুষ; ঠিক এই ভাবেই medical anatomy নাশ করে আর্টিষ্ট আবিষ্কার করলে artistic anatomy,—যা রসের বশে কমে বাড়ে, আঁকে বাঁকে, প্রকৃতির সব জিনিষের মতো—গাছের ডালের মতো, বৃক্ষের মতো, পাপড়ির মতো, মেঘের ঘটার মতো, জলের ধারার মত।..."

গুরুদেব যখন আসন ছেড়ে উঠলেন তখন রাত হয়ে গেছে। বললেন—"এই বার বাড়ী যা। কাল দুপুরে আসিস,—তোর বয়সে কী রকম খেটেছিলুম, আর কাজ করতুম,—তোকে দেখাব। হাড়ছন্দ জানতে হয় আগে, আবার হাড়ছন্দ ভোলবার ফিকিরটাও জানা চাই, বুঝেছিস।"

প্রণাম করে বিদায় নিলুম। হাঁটতে হাঁটতে যখন নিজেদের বাড়ীর দেউড়ির কাছে এসেছি, তখন ক্যাটিয়া গাছের মাথাগুলোর মত আনন্দের ঝড়ে আমার মাথাটিও দুলছে।

এর পরের দিনটি শ্রীমান্, আমার কাছে আরো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আনন্দিত আশ্বিনের শিউলি ফুল ছড়াচ্ছে মনের বোধন-তলায়।

চুপ করে বসে কি সকালটাই না পোহাতে হয়েছিল! [ক্রমশঃ।

মহাশূন্যে বিচরণের দিন সমাগত। মানুষ অন্তরীক্ষে নির্মাণ করবে কৃত্রিম উপগ্রহ, আকাশ-যানে উপনীত হবে চন্দ্রপৃষ্ঠে। সত্যি কি না জানি না, কোন কোন দেশে শোনা যাচ্ছে এখন থেকেই চাঁদে যাবার টিকিট কেনা স্বরু হয়ে গেছে। আণবিক যানে যাত্রা স্বরু হবে ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০০ মাইল বেগে, পথে বহুবিধ কারণে বেগ আস্তে আস্তে যাবে কমে, তাই পৌঁছুতে লাগবে ৫ দিন। নতুন জগৎ আবিষ্কারের চেষ্টায় কলম্বাসকে ১০ সপ্তাহ ধরে সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করতে হয়েছিল। তার তুলনায় এই আকাশ-ভ্রমণের সময়ের পরিধি খুবই কম।

* * * *

আকাশ-ভ্রমণের প্রথমেই ওঠে ওজনবিহীনতার কথা। মানুষের দেহ বহু দিন ধরে এই পরিবেশ সহ্য করতে পারবে কি না তা এক বিরাট সমস্যা।

যাত্রা করেছেন চাঁদের পথে, পেছন থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে পৃথিবী আপনাকে টানছে—এই টান দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে যাবে কমে। চাঁদের কাছে গিয়ে পড়লে চাঁদ আপনাকে আকর্ষণ করবে অনেক জোরে। এই চাঁদ এবং পৃথিবীর আকর্ষণী পরিধির এক অঞ্চলে বিরাজ করছে নিরপেক্ষ অঞ্চল। এখানে চাঁদের টান আর পৃথিবীর টান, উভয়ে উভয়কেই খারিজ করে দিয়ে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, যেখানে আপনি কোন আকর্ষণই উপলব্ধি করতে পারবেন না। এই নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবতরণ করলে আপনি মহাশূন্যে অবস্থান করতে পারবেন। প্রশ্ন এখন বিজ্ঞানীদের, এই পরিবেশে মানুষ নিজেকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি না ?—পারলেও কতো দিনের জন্য ?

* * * *

খাদ্য, বাতাস এবং জল সরবরাহ, মহাকালের আর একটি বিরাট সমস্যা। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হওয়ার জন্য মনে হয় শরীরের ক্যালোরীর পরিমাণ যাবে অনেক কমে, তাই এখানে মানুষের খাদ্যের পরিমাণ খুব বেশী হবে না। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া হবে তরল অবস্থায় অথবা হাইড্রোজেন আর অক্সাইডরূপে। হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এক সঙ্গেই আমাদের অক্সিজেন, জল এবং উত্তাপ সরবরাহ করতে পারবে। এক বছর মহাশূন্যে অবস্থিতির জন্য নভোযানে কতোখানি খাদ্য বা পানীয় নেওয়া উচিত তার একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়েছে—২৪ জন নাবিকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদির ওজন প্রায় ৭০ টন হবে।

* * * *

এর পরেই আসে উত্তাপের কথা। এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে মহাশূন্যের উত্তাপ বরফের চেয়ে প্রায় ২০০ ডিগ্রী কম। আবার অনেকে বলেন, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আকাশ-যানকে ভয়ানক একটা কিছু বেগ পেতে হবে না। কারণ শূন্যের আবার উত্তাপ কি ? উত্তাপ কেবল কোন পদার্থেরই থাকতে পারে। সূর্য্য থেকে যানের ওপর পড়বে রশ্মি এবং তাই যানকে সরবরাহ করবে উত্তাপ। বিশেষ করে বুধ এবং মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে পতিত সূর্য্যরশ্মির পরিমাণ, পৃথিবীর পরিমাণের অর্দ্ধেক এবং দ্বিগুণের মধ্যে, সুতরাং এই অঞ্চলে যানের সংরক্ষণের ক্ষমতার ওপরই এর উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করা উচিত। অবশ্য যানের উপরিভাগের পালিশ খুব বেশী রূপালী এবং ঝকঝকে হলে রশ্মি থেকে তাপ সংগ্রহের ক্ষমতা যাবে অনেক কমে। নাবিকদের দেহ এবং যন্ত্রপাতি যে তাপের উদ্ভব ঘটাবে তাও এই মহাশূন্যে অবহেলার বস্তু নয়।

* *

মহাকাশে নভোযানের আর দু'টি সাংঘাতিক শত্রু হলো উল্কা এবং মহাজাগতিক রশ্মি। অপর শত্রু মহাজাগতিক রশ্মি সমগ্র বিশ্ব-জগতেই ছড়িয়ে আছে,—মাত্র বারো মাইল উঁচুতে এর পরিমাণ ধরাপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ৫০ গুণ বেশী। অবশ্য আরো উঁচুতে উঠলে এই পরিমাণ কমে গিয়ে প্রায় ১২-১৩ গুণে দাঁড়ায়। এরা মহাকাশে কি করতে পারে, তা সাধারণ ভাবে বলা খুবই কঠিন। এদের নভোযানে আটকাবার কোন উপায়ই নেই, কারণ পৃথিবীর চারি পাশের বায়ুমণ্ডলের ন্যায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য ১ গজেরও বেশী চওড়া সীসার পাতের আবরণ দরকার।

* * * *

খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদকে ভালো ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে, সেখানে অগুন্তি গহ্বর দেখা গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই সব গহ্বরগুলি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আবার কারো মতে যুগ যুগ ধরে উল্কার আঘাতেই চাঁদে এতো গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য উভয় কারণই যে দায়ী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চাঁদের সম্পূর্ণ উপরিভাগ পৃথিবীর জমির মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং কেবল মাত্র এর অর্দ্ধাংশই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ চাঁদ সব সময়েই পৃথিবীর দিকে এক পিঠ ফিরিয়ে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করছে। অপর পিঠের কিছু না দেখা গেলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দৃষ্টিগোচর পিঠের চেয়ে তার পার্থক্য খুব বেশী নয়। চাঁদে বাতাস নেই এবং এর আকর্ষণী শক্তি পৃথিবীর মাত্র ছ' ভাগের এক ভাগ হওয়ার জন্য, চাঁদে বসতি স্থাপনের সময় জগতের মানুষের অনেক সুবিধা হবে। চাঁদে গোধূলি অথবা দিন-রাত্রির মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। চাঁদে সব সময়েই চরম উত্তাপ অবস্থান করে, দুপুর বেলা সূর্য্য যখন মাথার ওপরে তখন তাপ ওঠে ১০০ ডিগ্রীর কাছাকাছি এবং রাত্রে উত্তাপ নেমে যায় বরফের চেয়ে প্রায় ১৫০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড নীচে। সাধারণ জল বলতে চাঁদে কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার আগে প্রাচীন বিজ্ঞানীরা চাঁদের কালো অংশকে সমুদ্র আখ্যাই দিয়েছিলেন। অস্বাভাবিক উত্তাপ এবং জল ও বাতাসের অনুপস্থিতির জন্য চাঁদে কোন প্রকার জীবনের আবির্ভাব অসম্ভব।

ছোটদের আসর

১৬

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সে দৃশ্য বাঙলা দেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা দেয় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা-রাতে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারি পটভূমিতে লেখা—তা হলে তার খানিকটে আস্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভুতুড়ে বলে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়ার পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছিনে, চিনতে পাচ্ছি তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছিনে। চতুর্দিক ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপচে পড়ে; মনে হয় এ-আলোতে অক্লেশে খবরের কাগজ পড়া যায়, অথচ এ-আলোতে লাল-কালোর তফাৎ যেন ঘুচে যায়। মেঘলা দিনে, এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশী ধরা পড়ে।

তাই,

মনে হ'ল পাখি, মনে হল মেঘ মনে হল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হ'ল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল।

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু' মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে, জ্বলজ্বল দু'টি ছোট সবুজ আলো; ওগুলো কি? ভূতের চোখ না কি? শুনেছি, ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। নাঃ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান—এদেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ-শব্দটি বাঙলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গোরু-বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এই রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখ যে লেভেলে দেখি উটের চোখ তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পাবো না বলো? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছ, রাত্রি বেলা—আবার বলছি, রাত্রি বেলা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে কত বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো-জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিভ দেখিয়ে দেখিয়ে নাচে আর শুষ্ককণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জোড়ে,

তুই আমায় কি করতে পারিস তুই ক্যাড়া?
তুই—(অশ্লীল বাক্য)—তুই ক্যাড়া?

এবং তার চেয়েও বদখদ বেতালা 'পদ্য'।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যে অবধি এ-রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওয়ানা হওয়ার পূর্বে পাঁচ শ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয়নি; তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ; পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধাতের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ীর 'কটকটাহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিন্হ ধাবহি (তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ট'-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন) শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকটি করছে। তাদের কী আনন্দ!

পল: 'সব-কিছু ভালো করে দেখে নে। মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুছিয়ে লিখতে পারি।'

পার্সি: 'তোর জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁটি কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ, মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাবো?'

পল: 'ঠিক বলেছিস্। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন, ভাব দিকিনি। কিন্তু, ভাই, ওঁরা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাউণ্ডুলেপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?'

পার্সি বললে: 'ঐ তো তোর দোষ! সমস্ত ক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদুত্তর খুঁজে পাবো না? ঐ তো স্যর রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস কর না। উনি কি বলেন।'

আমি বললুম: 'দোষ দেবেন, তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে না কি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায় কর্মই হয়ে থাকে, সেটাকে যখন বন্ধ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই'।

পার্সি বললে: 'আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হ'ল ছেড়ে দিয়েছে।'

চালাক ছেলে; সব দিকে খেয়াল রাখে।

মরুভূমিতে দিনের বেলা যে-রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেঁকে আমি যাচাই না করে বলতে পারবো না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়-মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল; ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাঙ্গ যেন জলে-ভেজা জুঁই ফুলের মত ফুলে উঠলো।

সৈয়দ মুজতবা আলী

[illegible] আমার জীবনে একাধিক বার হয়েছে পেশাওয়ার, জলালাবাদের ১২০।১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি খাকুই-জব্বারের ৬০ ডিগ্রীতে পৌঁছে কী আরাম অনুভব করেছিলুম সে অন্যত্র বর্ণনা করেছি। কোথায়? উঁহু, সেটি হচ্ছে না। বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নিখর্চায় চালিয়ে দিচ্ছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই, যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙলো তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কাইরো পৌঁছে গিয়েছি। গাড়ীর আর সবাই তখনো ঘুমচ্ছে। আমার সন্দেহ হ'ল ড্রাইভারও বোধ করি ঘুমচ্ছে। গাড়ী আপন মনে বাড়ীর দিকে চলেছে; সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ী খুঁজে নেয়।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুম: 'তবে না, বৎস, বলেছিলে, মরুভূমির সব টুকিটাকি পর্যন্ত মনের নোট-বুকে টুকে নেবে?' যেন আমি নিজে কতই না জেগে ছিলুম।

পার্সিও তালেবর ছেলে। তৎক্ষণাৎ দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই গজী টান। আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে। পল বেচারী আর কি করে? সে আস্তে আস্তে মাদমোয়াজেল শোনিয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'কাইরো পৌঁছে গিয়েছি।'

বাঙাল দেশে কথায় কয়—পশ্চিম বাঙলায় বলে কি না জানিনে—'সায়ের বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাঁদীকে দিলেন ঠ্যাঙ্গা, বাঁদী বেরালকে মারলে লাথি, বেরাল খামচে দিল নুনের ছালাটাকে।'

সংসারে এই রীতি!

এখানে অবশ্য প্রবাদটা টায় টায় মিলল না। তাই পল অতি সবিনয়ে মেম সাহেবকে জাগিয়ে দিলে।

মাদমোয়াজেল হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শুধালেন,—আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—'আমরা কোথায় পৌঁছলুম, মসিয়ো?'

'ল্য ক্যার'।

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানতো। আমাকে শুধালে: 'ল্য ক্যার' অর্থ হল 'দি কাইরো।' 'ল্য'-টা আবার পুংলিঙ্গ। একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ কি করে হয়?'

আমি বললুম: 'অত বিদ্যে আমার নেই, বাপু! তবে এইটুকু জানি, এ বাবদে ফরাসীই একমাত্র আসামী নয়। আমরা ব্রহ্মপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। কেন বলি তা জানি নে।'

পার্সি বললে: 'আমরা ইংরেজরাই বা জাহাজকে 'শী' অর্থাৎ স্ত্রী-লিঙ্গ দিয়েছি কেন?'

আমি বললুম: 'উপস্থিত এ আলোচনা অক্সফোর্ডের জন্য মুলতুবী রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছো—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্যটি উপভোগ করে নাও।'

সত্যি, এ রকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না! আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পৌঁছই তখন মাঝখানে ঘন বসতি আর বিস্তর জোরালো বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারিনে। এখানে মরুভূমি [illegible] একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত [illegible] করে।

ছ' তালা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা [illegible] লাল আলোতে জ্বালানো সেলাইয়ের কলের ছুঁচ [illegible] নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই [illegible] এক বিলিতি কোম্পানীর নাম। আমার মনে হল, [illegible] নাম যদি 'উষা' হত [illegible] করে সেদিন আসবে যেদিন [illegible] যাকগে।

আরো কত রকমের প্রজ্বলিত বিজ্ঞাপন। এ বিষয় কলকাতা কাইরোর বহু পিছনে।

করে করে শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানলা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার কথা বাদ দাও। এই শহরতলীতেই কত না রেস্তোরাঁ, কত না 'কাফে' খোলা; খদ্দেরে খদ্দেরে গিসগিস করছে। (আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি 'কাফে' অর্থাৎ কফির দোকান। আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি 'কাফে' হতে পারে, তবে চায়ের দোকান 'চাফে' হয় না কেন? 'চলো, ভাই, চাফেতে যাই' বলতে কি দোষ?')

আবার বলছি রাত তখন এগারোটা। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখেছি, কিন্তু কাইরোর মত নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়েনি।

কাইরোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম-ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাট্টি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মত নোংরা। তাতে কি যায়-আসে? কে যেন বলেছে, 'নোংরা রেস্তোরাঁতেই রান্না হয় ভালো; কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না?'

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ সব সায়েব-মেমরা সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরা 'মঁ দিয়ো', 'হ্যাব গট' কি যে বলবেন তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই।

আচম্বিতে দু'খানা গাড়িই দাঁড়ালো। বসে বসে সবাই অসাড় হয়ে গিয়েছি। সবাই নেমে পড়লুম। সক্কলেরই মনে এক কামনা। আড়মোড়া দিয়ে নি, পা দু'টো চালিয়ে নি, হাত দু'খানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আবুল আস্‌ফিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হাত দু'খানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটিশিয়নদের কায়দায় শ্রদ্ধানন্দ-পার্কী লেকচার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন,—কিন্তু ভাঙা ভাঙা ফরাসিসে,—

'মেদাম, মাদ্‌মোয়াজেল, এ মেসিয়ো'—

(ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রকুমারীগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ)

আমরা সকলেই এক্ষণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধাতুর। নগরী প্রবেশ-করতঃ আমরা প্রথমেই উত্তম কিম্বা মধ্যম শ্রেণীর ভোজনালয়ে আহারাদি সমাপন করবো। কিন্তু প্রশ্ন, সেখানে খেতে দেবে কি? তাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিস্বাদ স্যুপ, বিস্বাদতর ষ্টু, তদ্বিতর পুডিং। অর্থাৎ সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিম্বা অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান—যা-ই বলুন—রস-কসহীন খানা।

পক্ষান্তরে, এই শহরতলীতে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আদিম এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতিতে সুপক্ক খাদ্য ভোজন করি তবে কি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না ?

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দু'খানা গুটিয়ে নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন : 'অতি অবশ্য, রেস্তোরাঁগুলো নোংরা। চেয়ার-টেবিল সাফ-সুৎরো নয়, কিন্তু মেদাম, মাদমোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল-চেয়ার খেতে যাচ্ছিনে। আমরা খেতে যাচ্ছি খানা। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারেনি, তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে ? আপনারাই বলুন !'

কেউ কিছু বলার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠলে : 'অফ্‌কোস, অফ্‌কোস—আলবৎ, আলবৎ, আমরা নিশ্চয়ই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, তখন মিশরীয় খাদ্য খাবো না কেন ?'

মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বললেন : 'যাঁরা খেতে চান না, তাঁরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।'

আর আমি বুঝলুম, ফরাসী দেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় !

শেনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ডেলিকেট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোস্ট, দুধ, ডিম, মটর, কপি, আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন, তিনি যখন রাজী তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখন সবাই নিকটতম রেস্তোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে প্রস্তুত ; আমার মনে হয়, আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। কোথায় কোন্ খানদানী রেস্তোরাঁয় কখন পৌঁছব তার কি ঠিক-ঠিকানা ! সেখানে হয়তো এতক্ষণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-রুটি, দিতে হবে মুর্গী-মটনের দর। তার চেয়ে এই ভর ভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি তাই ভালো, সেই নিয়ে আমি খুশী।

রবি ঠাকুর বলেছেন,

> 'কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
> দূরের দুরাশাতে ?'

ইরাণী কবি ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

> 'Oh, take the Cash, and let the Credit go,
> Nor heed the rumble of a distant Drum !'

কান্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

> 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,
> দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক !

* * * *

রেস্তোরাঁওলা ছুটে এসে আমাদের আদর-কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিক্‌বাল) জানালে। তার 'বয়রা' বত্রিশখানা দাঁতের মূলো দেখিয়ে আকর্ণ হাসলে। তড়িঘড়ি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল এক জোড় করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসাবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবর্চী ছুটে এসে তোয়ালে-কাঁধে বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার ! শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছ্যাঁকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত ! এ রকম দুধের মত সুন্দর দাঁত হয় কি করে ? সে দাঁতের সামনে এ রকম রক্তকরবীর মত রাঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে ? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কী অদ্ভুত এক নবীন রঙ ! এ রঙ আমার দেশের শ্যামল নয়, এ যেন কি এক ব্রোঞ্জ রঙ। কী মসৃণ কী সুন্দর !

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুর্চীর ভুঁড়িটা। ওঃ ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জাঁদরেল !

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরাঁতেই ঢুকেছি।

ইতিমধ্যে আবুল আসফিয়া এবং মাদ্‌মোয়াজেল শেনিয়ে বাবুর্চীকে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাদির বাছাই-তদারক করতে।

ইতিমধ্যে গোটা চারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চেঁচাচ্ছে, 'বুৎ বালিশ, বুৎ বালিশ।'

সে আবার কী যন্ত্রণা ? ! ? !

বুঝতে বেশীক্ষণ সময় লাগলো না, কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের বাক্স আর গোটা দুই করে বুরুষ। ততক্ষণে আবার মনে মনে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে বুঝে গিয়েছি, আরবী ভাষায় 'ট' নেই বলে 'বুট' হয়ে গিয়েছে 'বুৎ' এবং 'প' নেই বলে 'পলিশ' হয়ে গিয়েছে 'বালিশ'—একুনে দাঁড়ালো 'বুৎ বালিশ' ! তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহর লালের নাম উচ্চারণ করে 'বান্দিৎ জওয়াহর লাল !' ভাগ্যিস আরবী ভাষায় 'ট' নেই। থাকলে নিরীহ 'পণ্ডিত' আরবিস্থানের 'ব্যাণ্ডিট' হয়ে যেতেন ! আদন অঞ্চলের আরবীতে আবার 'গ' নেই ; তাই তারা 'গান্ধী' নাম উচ্চারণ করে 'জান্দী'। অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয় :—সত্যের জন্য 'জান দি' বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন।

বাঙালী তেড়ি কাটাতে ব্যস্ত, ইংরেজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে কি না তার তদারকিতে ব্যস্ত, শিখেরা পাগড়ী বাঁধাতে ঘণ্টাখানেক সময় নেন, কাবুলীরা হামেহাল জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরোবাসীরা দেখলুম, বুৎ বালিশের নেশাতে মশগুল। তা না হলে রাত দুপুরে গণ্ডায় গণ্ডায় বুৎ বালিশওলারা কাফে রেস্তোরাঁয় ধন্না দিতে যাবে কেন ?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে। স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবান জল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পলিশ ছোঁয়ালে, প্রথম হাল্কা ক্যাম্বিশ পরে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে জুতোর জৌলুস বাড়ালে। তখন জুতোর যা অবস্থা ! তাতে তখন আয়নার মত মুখ দেখা যায়। বুরুষের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে জখম হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য-বোধ হল, সেই ঝাঁ চকচকে জুতো-জোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প—অতি অল্প—ম্যাটমেটে করে দিল কেন ? এতখানি মেহন্নৎ করে চাকচিক্য জাগানোর পর সেটাকে আবার ম্যাটমেটে করে দেবার কি অর্থ ?

একটা গল্প মনে পড়লো :

এক সায়েব পেসট্রি-ওলাকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে। কেকের উপরে যেন সোনালী নীলে তাঁর নামের আদ্যক্ষর পি. বি. ডাবলইউ লেখা থাকে। ডেলিভারি নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, 'হুঁ, কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম, কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অক্ষরে। আমি চাই ট্যারচা ধরণে, ফ্লরাল ডিজাইনে।'

দোকানী খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। বললে, 'এক্ষুণি করে দিচ্ছি। জন্মদিনের ব্যাপার—চাট্টিখানি কথা নয়।'

প্রচুর পরিশ্রম করে সে প্রথম কেকের উপরটা চেঁচে নিলে। তার পর প্রচুরতম গলদ্ঘর্ম হয়ে তার উপর হরফগুলো বাঁকা ধরণে আঁকলে, আরো মেলা ফুল-ঝালর চতুর্দিকে সাজালে।

সায়েব বললেন, 'শাবাশ, উত্তম হয়েছে।'

দোকানী খুশী হয়ে শুধালে, 'প্যাক করে আপনাকে দেব, না, কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে?'

সায়েব হেসে বললেন, 'কোনোটাই না। আমি ওটা নিজেই খাবো।'

বলেই ছুরি দিয়ে চাকলা চাকলা করে গবগব করে আস্ত কেকটা গিললেন!

দোকানী তো থ! তা হলে অত-শত করার কি ছিল প্রয়োজন?

বুং বালিশের বেলাও তাই।

বুং বালিশওলাকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি?

একটুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে, 'গাঁইয়ারাই শুধু অত্যধিক চাকচিক্য পছন্দ করে। শহরের ভদ্রলোক সব জিনিসেরই সেকদার মেনে চলেন।'

অ- -অ- - -অ- - !

তখন মনে পড়লো, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুর-বাড়ির মেয়েরাও আগের দিনে সোনার গয়না পরে পাল্কিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে নিতেন। বড্ড বেশী চাকচিক্য নাকি গ্রাম্যজনসুলভ বর্বরতা।

[ক্রমশঃ।

শচীন্দ্র মজুমদার

এ কথা তোমার সহজেই মনে হতে পারে যে, অবস্থাটা যদি এই রকমই হয়, তাহলে চিরকালই তোমার চেয়ে শক্তিমান, তোমার চেয়ে চতুর ও সাহসী মানুষ থাকবেই। সে ক্ষেত্রে তোমার এতো পরিশ্রম করে কি লাভ? মানুষ কখনো এক অবস্থায় স্থায়ী হয়ে থাকে না। মানুষ মাত্রেই উৎকর্ষ-পরায়ণ জীব। যেমন তার কার্যক্ষেত্র, সংগ্রাম তার যতোটুকু, সেই অনুপাতে বেড়ে চলাই মানুষের সহজ ধর্ম। মানুষের বিষয়ে এটা পরম সত্য কথা। বলেছি যে তুমি অসম্পূর্ণ। প্রয়োজন হলেই তোমার দেহ-মন তার উপযুক্ত নূতন শক্তি গঠন করে নেয়। এ অনিবার্য সত্য মনে করে রেখো।

ব্যায়ামের উদাহরণ দিয়ে এ কথাটা বোঝা যায়। পেশী পায় ক্রমবর্ধমান বাধার কারণে। প্রথম যখন তুমি ব্যা... আরম্ভ করলে তোমার নিজের দেহ সেই প্রয়োজনীয় বাধাটুকুর জোগ... দিয়েছে। যদি এক দিন হঠাৎ উপলব্ধি করো যে, পেশী আর বৃ... লাভ করছে না, তার অর্থ এই যে তোমার দেহ যতোটুকু বাধা দি... এতো কাল সক্ষম ছিলো, তোমার পেশী উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ ক... সে বাধাকে অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ তোমার গায়ে জোর বেড়েছে কাজেই তখন তোমাকে বৃহত্তর বাধা খুঁজতে হবে। সেই জ... কোন বিশিষ্ট ব্যায়াম-যন্ত্রে ক্রমবর্ধমান বাধা খোঁজা নিয়ম বারবেলের ব্যবহার এই কারণে তাতে বাধাটা ক্রমবর্ধমান তো বটেই, তার সঙ্গে একটু টাল সামলাবার কৌশলও আছে। বাধা আয়ত্তাধীন করতে পৈশিক শক্তি বাড়ে। কৌশল আয়ত্ত করতে গেলে মন ও শক্তির নিবিড় যোগ স্থাপন করবার সংস্কারটি সুতীক্ষ্ণ হয়। যদিও এই কৌশল বেশ পরিমিত, তবুও তাতে মানসিক উপকার আছে একটু। এই কারণে বারবেলের ব্যায়াম অভ্যাসে খুব তাড়াতাড়ি পেশী ও শক্তির উৎকর্ষ হয়। কিন্তু যেখানে মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে বাধাটা একান্ত ভিন্ন ধরণের, তোমার বিরুদ্ধে সে যা শক্তি প্রয়োগ করবে তার তারতম্য আছে। বিভিন্ন দিক থেকে, আকস্মিক ভাবে সে শক্তি তোমাকে আক্রমণ করে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে তোমাকেও নানা দিক থেকে, নানা উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়! মনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাহসের বিপক্ষে সাহস, চাতুর্যের বিপক্ষে চাতুর্য প্রয়োগ ক'রে তোমার সাহস ও চাতুর্য আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম-চর্চায় একটু বেদনা না পেলে পেশী উৎকর্ষ বা শক্তি লাভ করে না। ব্যায়াম করতে গিয়ে তুমি যদি বেদনার সন্ধিস্থলে না যেতে পারো, তাহলে হাজার বছর ধরে ব্যায়াম করলেও তোমার কিছু হবে না। বিশেষ ধরণের এই বেদনা দেহ ও মন গঠনের পরম ধন। এইটাই তোল শরীরচর্চার নিগূঢ় তত্ত্ব। বেদনাটা কেমন? ধরো তুমি বাহুর শক্তি লাভ করবার জন্য বারবেল ভাঁজছো। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাঁজটি সহজ, প্রয়াসহীন। তার পর যতো বার ভাঁজছো, একটু একটু করে ক্রমবর্ধমান প্রয়োগের দরকার হয়। যে পেশীর ব্যায়াম সেটা রক্ত চলাচলে স্ফীত হতে হতে শ্রান্ত হয়ে উঠছে। এই শ্রান্তির সন্ধিস্থলটি অতিক্রম করলেই বেদনা অনুভব হয়, কারণ পেশীগুলি জীর্ণ হয়ে যায়। সে স্থান নূতন পেশীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই নূতন পেশী পূর্বেকার পেশীর চেয়ে অধিকতর পুষ্ট, দৃঢ়তর এবং অধিকতর পরিমাণে শক্তিমান। মনে রেখো যে, বেদনার ভেতর দিয়েই নূতনের জন্ম হয়। মাতার বেদনার ভেতর দিয়ে তোমার জন্ম। সংসার তোমাকে যে বেদনা দেবে, তাইতেই তোমার নূতনতর সত্তার উৎকর্ষ ও শক্তির প্রতিশ্রুতি আছে। আরাম শক্তির বিরুদ্ধাচারী।

অন্য পক্ষে, মনের ক্ষেত্রেও বেদনা কার্যকরী। সাহসের সংঘাত না হলে সাহস বাড়ে না। ঘা না খেলে আমরা যাতে ঘা খেয়েছি তার বিষয়ে চৈতন্যবান হইনে। বেদনা না ভোগ করলে সাহস জন্মাতেই পাবে না। প্রচণ্ড ঘুষি যে খায়নি, তার ভয় ঘুষি খাবার

আগের মুহূর্ত্তটা পর্যন্ত। খাবার পর দেখা যায় যে, ঘুষিটাকে যতোটা প্রচণ্ড বলে ভাবা গিছলো প্রকৃত পক্ষে সেটা ততো প্রচণ্ড নয়। সুতরাং, পরে সে রকম কিছুর সম্মুখীন হতে আর ভয় হয় না। তার মানে, অভিজ্ঞতা দিয়ে ভয়টাকে অতিক্রম করা হয়। সংসারের বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন বিপদকে কল্পনা করে আগে থেকে যতোটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়, তার সঙ্গে সংগ্রাম করলে সে ভয়ঙ্কর আকারটা আর থাকে না, বিপদকেও দমনীয় বলে মনে হয়। খেলায় নিজের নাকের রক্ত দেখা, তার লবণাক্ত আস্বাদ নিজের মুখে পাওয়া অতি চমৎকার উপলব্ধি! তাতে ভয়তো যায়ই, দেহেরও অপূর্ব সহনশীলতা হয়। এ অভ্যাস তোমাকে করতেই হবে, কারণ এ উপায়ে যে মনটি লাভ হয়, তা কোটি টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না। সংসারে প্রবেশ করলে নিত্য নিরন্তর অনুভব করবে যে, সংসারটি অদৃশ্য নিরাকার ঘুশিতে ভরা! তার আঘাত ছেলেবেলার মানুষের হাতের ঘুষির চেয়ে অনেক বেশি নিদারুণ, অনেক বেশি রক্তমোক্ষণকারী; ছেলেবেলার ঘুষি সামান্য একটু রক্ত ঝরায়; দু'দিনের জন্য নাকে-চোখে একটু বেদনা রেখে যায়, আবার দু'দিনে সে সব সেরেও যায়। কিন্তু নিরাকার ঘুষি ভয়ঙ্কর বস্তু। তা সহ্য করবার মতো ঘাতসহ মন তৈরী না হলে, সংসারে মাথা খাড়া করে থাকা যায় না। শেষ পর্যন্ত মধ্য বয়সে বা তার আগেই উচ্চ ব্লাডপ্রেসার, বহুমূত্র, হৃদ্‌রোগ, পাকস্থলীতে ঘা, বাত নাড়ীর অপচয়জনিত কায়েমী অজীর্ণ ইত্যাদি লাভ হয়। এ সকল রোগ বাঙালীর ঘরে ঘরে। ওষুধ খেয়ে তা থেকে মুক্তি নেই। ছেলেবেলায় লক্ষ ঘুষি হজম করা কিছুই নয়। কিন্তু পরিণত বয়সে নিরাকার ঘুষির অপমান ও অপচয় সহ্য করে জয়ী হওয়া ঐকান্তিক সাধনা ও প্রস্তুতি ভিন্ন সম্ভব নয়। এই সাধনা, প্রস্তুতিই তোমার জয়যাত্রার পাথেয় হবে। শ্যামাকান্তকে আমি বাঘকে কুকুরের মতো খেলাতে দেখেছি! তিনি সাধনার দ্বারা বাঘের ভয়কে অতিক্রম করেছিলেন। আক্রামক ব্যায়ামকে আমি জীবন-সাধনার উপকরণ বলেই জানি, নচেৎ ওগুলোকে আমি অগ্রাহ্য করতুম। যেরূপে ওগুলো মানুষের অপচয় ঘটায়, সেগুলোকে আমি ঘৃণা করি।

পরাজয় কি না জানলে জয়ের আনন্দ অনুভব করা যায় না; দুঃখ-বেদনাকে না জানলে সুখ ও আনন্দকে লাভ করা যায় না। ভয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করে তাকে অতিক্রম না করলে নিজের ওপর আস্থা জন্মায় না। নিজের ওপর আস্থা-শ্রদ্ধা না থাকলে সংসারে টিঁকে থাকা অসম্ভব, শুধু অন্যের দ্বারা পদদলিত হবার জন্যেই বেঁচে থাকতে হয়। এখন বাঁচার সার্থকতা কোথায়? পরাজয়-দুঃখ-বেদনা সবই গঠনশীল। আপাতদৃষ্টিতে তা ক্ষয়, কিন্তু তখনই দৃঢ়তর উপকরণ দিয়ে তার পূরণ হওয়া সম্ভবপর। নূতনকে দিয়ে পুরাতনের স্থান পূরণ করে নেওয়া প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু পূরণটা যে দৃঢ়তর উপকরণ দিয়েই হবে, এমন কথা নয়। সেটা তোমার ওপর নির্ভর করবে। ভালো উপকরণ চাও, ভালো কথা। না চাও, কোমলতর, দুর্বলতর উপকরণ তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতি কোথাও ফাঁক রাখে না। দেহ-মন গড়ার বেলায় বলতে পারা যায়, যে ঠাকুরের তুমি আরাধনা করবে সেই ঠাকুরটি তোমার ওপর সদয় হবেন। বীর্যের ঠাকুর অথবা ক্লীবত্বের অপদেবতা, তোমাকে যাহোক এক জনকে বেছে নিতে হবে। উত্তর কালের বোঝা-বহুল সংসারের প্রকৃতিটি বুঝে নিতে পারলেই তোমার ঠাকুর বাছার সুবিধা হবে। সংসার চায় চওড়া কাঁধ, সাহসী হৃদয়, আক্রামক দৃষ্টিভঙ্গী, নিজের প্রতি আস্থা-আশ্বাসে ভরা দু'টি কর্মঠ বাহু, আর ভারসহ দু'টি পুরুষ-জঙ্ঘা।

ঠাকুরের কথা যে কালে উঠলো তখন নৈবেদ্য ও আহুতির কথাটাও বলতে হয়। নৈবেদ্য বলতে আমি সঞ্চয়ের একটুখানি দেওয়া বুঝি, তা সম্ভ্রম, ভক্তি, ভয়, ইচ্ছাপূরণ, যে কারণেই হোক। আর আহুতি হোল, দরাদরি না করে, তাতে তিলমাত্র কিছু না রেখে সংসারের হোমানলে ঝাঁপিয়ে পড়া। নৈবেদ্য দিতে যাও, সংসার পরম লোভীর মত রোজ তোমার কাছে ঘুষ চাইবে; তোমাকে জীবনের কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আহুতি দেবার জন্যে সদা-সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকো, সংসার তোমাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করবে। কবিগুরুর "আগুনের পরশমণি ছোঁওয়াও প্রাণে" গানটা নিশ্চয় জানো? সেইটি যুবজনের প্রকৃত প্রার্থনা, সাধনার মন্ত্র।

তোমার মধ্যে ঐ রাগ-জ্বলানো অম্লান ঊর্দ্ধশিখার দীপ্তি নিহিত আছে। ছেলেবেলায় আমি চমৎকার একটা উর্দু বাক্য শিখেছিলুম। "গিরতে হ্যয় শহ-সওয়ারই ময়দানে জঙ্গমে।" যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়-সওয়ারই কেবল ভূপতিত হয়। সংসারের তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়-সওয়ারেরই রক্ষা নেই। পদাতিকের কথা তো দূর!

আক্রামক ব্যায়াম অভ্যাসে আমি সংসার-কৌশলের ইঙ্গিত পাই। যুযুৎসু শিখতে গেলে সর্বপ্রথম Break Falls শিখতে হয়। তার মানে ভূপতিত হবার আর্ট, পড়ে গেলেও যেন আঘাত লেগে নিষ্ক্রিয় না হতে হয়। বক্সিং শেখার প্রথম দিনে আমার শ্বেত-গোরা ওস্তাদ গার্ল্ড বলেছিলো, তুমি আমার Punch Bag, তোমার নাক ভাঙা, ঠোঁট থেঁৎলানো, কানকুণ্ডলী পাকিয়ে দেওয়া আমার লক্ষ্য। আমি সংসারেরও পাঞ্চ ব্যাগ। আমায় নিয়ে সংসারেরও আমার নাক ভাঙার, ঠোঁট থেৎলানোর, কানকুণ্ডলী পাকিয়ে দেবারই লক্ষ্য। বক্সিং শুধু আক্রামক হতে শেখায়নি, পঁয়তারার আর্ট দিয়ে নাক-কান বাঁচাতেও শিখিয়েছে। বছর সতেরো বয়সে কুস্তি লড়তে গেলুম! প্রথম মাসটা তো আমার ওস্তাদ আমাকে ধোবার কাপড়ের মতো করে আছড়াল। তাতেও সে ক্ষান্ত হোল না। রোজ সে আমার ক্লান্ত পিঠের ওপর সওয়ার হয়ে বলতো, "বোঝ উঠাও।" এবং তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ানোমাত্র সে আমাকে আবার আছাড় মারতো। বলা বাহুল্য, এসব বলকর শিক্ষা। সংসারেরও একটা বোঝা তুলে দাঁড়ানোমাত্র অন্য বোঝা তৎক্ষণাৎ আমাকে আছাড় মারছে; এ ঘটনার শেষ নেই। প্রথম বয়স থেকে বোঝা ওঠাবার অভ্যাসটা হলে পা-কোমর আর দুঃখ পায় না, বোঝা তোলবার জন্য দেহ-মনও বেশ কৌশলী হয়ে যায়। তা ছাড়া, ঘুষি খাবার, বোঝা ওঠাবার একটা ফিলসফি হয় মনে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা, এই বোঝা তোলায় ও নাকে ঘুসি খাওয়ায় একটা আনন্দের অনুভূতি আছে। তার চেয়ে বড়ো কথা, এ অভ্যাসে মন কোন দরদীয়ার "আহা" শুনতে বিমুখ হয়। "আহা"-তে লজ্জার খোঁচা আছে। যে "আহা" দিয়ে নিজের মনে সেঁক দেয়, সে নিজের বীর্য নষ্ট করে। কিন্তু আমাদের ঘরে কি হয়? আমি আড়াই মণ বারবেল নিয়ে যখন ছিনিমিনি খেলতে পারতম, তখন একটা তোরঙ্গ

বা এক-বালতি জল তুলতে গেলে আমার মা শিউরে উঠতেন। বলতেন, "আহা, লেগে যাবে তোর!" গার্লও আর অহমদ অলির আখাড়ায় মা ছিলেন না, সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। সংসারের এই বিপুল দুর্মদ আখাড়ায় এখন আমার মা কোথায়? তাঁর "আহা"-ই বা কোথা গেলো?

বক্সিং ও কুস্তির স্বরূপ অনেকটা এক। বিপক্ষের সহিত দৈহিক সংগ্রামে ক্ষুন্ন না হওয়া দুটোরই মূল তত্ত্ব। তাতে গায়ে গা দেওয়ার কথাটা ওঠে। যদি এ কথাটা তোমার মনে থাকে যে, তুমি যেমন বিপক্ষের গায়ে গা দিতে ভয় পাচ্ছো, তার মনেও তোমার বিষয়ে, অর্থাৎ তোমার শক্তি, কৌশল, বুদ্ধির বিষয়ে ভয় আছে। কাজেই কার্যক্ষেত্রে বিপক্ষের ভয়টুকুকে নিজের কাজে লাগানো উচিত। এ কথাটা মনে থাকলে দেহ-সংঘর্ষণের ভয়টা আর থাকে না, প্রভূত আত্মবিশ্বাসও জন্মায়। এ দু'টি বিশিষ্ট সংগ্রামের কৌশল: নিজের শক্তি জড়ো করে রেখে প্রয়োজন মতো তার ব্যবহার করা, একটি উদ্যমে সেটা নিঃশেষ করা নয়: উপযুক্ত ক্ষণে শক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারা অনুশীলনের বস্তু, এক দিনে সেটা আয়ত্ত করা যায় না। এক বার সাঁতার শিখলে যেমন তা আর ভোলা যায় না, এ বিদ্যাটুকুও তেমনি এক বার আয়ত্ত করতে পারলে আর ভোলবার যো নেই, সেটা স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে দৈহিক সীমা ছাড়িয়ে এ বিদ্যা মানসিক শক্তি প্রয়োগের কাজে লাগে। প্রচুর ক্ষিপ্রতা এই দু'টি ব্যায়ামের অঙ্গ। আক্রমণের সুযোগ আসে পলের পরিধিতে, সেটা দেখতে পাওয়ার দৃষ্টি ভয়ের হয়ে যায়। সেইটুকু সময়ের ভেতর কর্তব্য ভেবে নেবার কাজটুকু সম্পন্ন করতে হয়; এবং শুধু ভাবা নয়, চিন্তার সঙ্গে ক্রিয়ারও সমন্বয় করে নিতে হয়, তা না হলে সে শুভমুহূর্তটি অতীত হয়ে যায়, আর কখনো সেটা ফিরে আসে না। আক্রমণে যেমন, আক্রান্ত হয়েও তাই, চিন্তা ও ক্রিয়ার ঐক্যের রূপটা এক। এ অভ্যাসের সব চেয়ে বড়ো অঙ্গ—মাথা ঠাণ্ডা রাখা, নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখা। আক্রান্ত হয়ে কিংবা আক্রমণ করতে গিয়ে মাথা গরম করলে, কিংবা ভয়ে একটি পলের জন্যে চোখ বুজোলে পরাজয় অনিবার্য। এই মাথা ঠাণ্ডা রাখার অভ্যাসটা সাংসারিক জীবনে খুব বেশী কাজে লাগে। কুস্তি ও বক্সিং আমাদের স্থির-বুদ্ধি হতে শেখায়।

আর শেখায় পঁয়তারা, অর্থাৎ মাত্র দেহভঙ্গী দিয়ে অনেক সঙ্কট এড়াতে। অনেক সঙ্কট, অনেক আক্রমণ শুধু নড়াচড়ার কায়দা দিয়ে এড়ানো যায়, নিজের শক্তিক্ষয় করবার দরকার হয় না। মুষ্টিযুদ্ধে যেমন একটু মাথা নিচু করলে, অথবা ঘাড় সামান্য কাৎ করলে একটা প্রচণ্ড আক্রমণ এড়ানো যায়, সংসারেরও তেমনি অনুরূপ কায়দার নিত্য প্রয়োজন আছে। ছেলেবেলার অভ্যাসে আমরা অনেক নিরাকার ঘৃণি একটু কৌশলের দ্বারা এড়াতে পারি। কুস্তির অভ্যাস আমাদের দেহকে ভারসহ ঘাতসহ বজ্র-কঠিন ও অতিশয় সহনশীল করে। আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় করতে কুস্তির আর একটি অপূর্ব অবদান আছে। সেটি বিপক্ষের নিচে পড়ে থেকেও, তার দ্বারা বিমর্দিত হয়েও আবার তারই ওপরে ওঠার মনোভাবটাকে প্রবল করে। এই হার-না-মানার পুষ্ট মনোভাবটা আমাদের সাংসারিক জীবনের বিপুল সহায়। মুষ্টিযুদ্ধে মুখটি ক্ষত-বিক্ষত হবার ভয় আছে বলে দর্শক ছাড়া অন্য বাঙালী ছেলে ওদিকে ঘেঁসে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর মুখের ত্বক মসৃণ নয়। সংসারের আঘাতে আঘাতে তাতে কত না দাগ, কত না রেখা! চোখের দৃষ্টিতে দীনতা, আর অবিশ্বাসের ছাপ সর্বাঙ্গে। হয়তো মুখে সংগ্রামের চিহ্ন বহন করে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হোত, প্রচণ্ড জেদ্ ও একগুঁয়েমি মনে বাসা বাঁধতো। মুখে সংগ্রামের চিহ্ন আর সংসারের কুঞ্চিত রেখা একেবারে ভিন্ন বস্তু। প্রথমটা পৌরুষের দ্বিতীয়টা মনের মলিনতার।

এ সকল অভ্যাসের চরম লক্ষ্য যোদ্ধৃমন তৈরী করা, সংসারযাত্রার পায়ে পায়ে আমাদের দরকার। খেলার সংগ্রামে মানুষের সহিত সংগ্রামে রক্ষা-করার পদ্ধতি আছে। কিন্তু জীবন এবং প্রকৃতি কখনো রক্ষা করে না। তারা কোন ক্ষমা ত্রুটি করে না কখনো। তাদের বিচারালয়ে আপিল নেই। পথ নিচুর হলে তাদের আদেশ: উদ্ধতা বা মৃত্যু। জীবন অহোরাত্র তোমাকে বলবে, হয় মাথা তুলে থাকো, না হয় যে মাথা তুলে থাকতে পারে তার জন্য পথ ছাড়ো। যার যোদ্ধৃমন সেই কেবল জীবনকে বলতে পারে, না লড়ে আমি পথ ছাড়চিনে, তুমি পারো তো আমাকে সরিয়ে দাও। জীবনকে যে নিজের চুলের মুঠি ধরতে দেবার আগে তারই চুলের মুঠি চেপে ধরে, তাকে জীবন সম্মান না করে পারে না। মানুষের মতো জীবনও প্রবলের খোসামোদ করে এবং দুর্বল ও বিনীতের যম হয়ে দাঁড়ায়। সংসারের সংঘাতে তোমার মুখ-বুকে চোট লাগা অনিবার্য, সেখানে চোটের নানা চিহ্ন থেকে যাবে: কিন্তু পিঠে যেন দাগ না লাগে, সেটা পরম পরাজয়ের। [ক্রমশঃ।

ইন্দিরা দেবী

৪

রাণী ও রকম কড়া কথা বলবে এলিস একটুও ভাবতে পারেনি। যাই হোক, সে সামলে নিয়ে বললে: আমি কচু-বাগানটি কেমন তা দেখতে চেয়েছিলাম হুজুরাণি!

রাণী খুসী হয়ে এলিসের মাথায় স্নেহভরে হাত দিল। অতটা মুরুব্বীয়ানা এলিসের পছন্দ হয়নি, তাই তার ভালো লাগলো না বলে চুপ করে রইল।

রাণী বলে চললো : বাগান বলছো, এটা কি আর বাগান। আমি যে সব বাগান দেখেছি, তার তুলনায় এটি জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। এলিস কোনো কথা-কাটাকাটি করতে চায় না। শুধু বললে : এ বাগান দিয়ে কি করে পাহাড়ে যাওয়া যায়?

—পাহাড়? পাহাড় কি বলছো, এটা একটা পাহাড় হলো? তাহলে সত্যিকারের পাহাড় তুমি কোনও দিন দেখনি। এটা পাহাড় কি—এটা তো সমতল জায়গা। এই বার এলিস প্রতিবাদ না করে পারলো না—বললে : বাঃ! পাহাড় আবার সমতল হবে কি করে? তোমার কথার কোনো মানে হয় না।

রাণী মাথা নাড়লো। বললো : হ্যাঁ, তোমার কাছে হয়তো এর মানে নেই, মানে নেই কথা আমি ঢের শুনেছি! আমি যত আবোল-তাবোল বলেছি তার তুলনায় তোমার কথাটা কিছুই নয়।

এই বার রাণী যে ভাবে কথা ক'টা বললে, তাতে এলিসের মনে হলো ওটা রাগের কথা—তাই তার একটু ভয় হলো, হাজার হোক রাণী তো! তাই তাড়াতাড়ি সে কুর্ণিশ করে তাকে খুসী করতে চাইলো। রাণী আর কোনো কথা না বলে রাস্তা দিয়ে গট্-গট্ করে হেঁটে চললো আর এলিসও কিছু না বলে তার পিছন পিছন চললে। কিছুক্ষণ চলবার পর তারা পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌঁছলো. তার পর পাহাড়ের উপরে উঠলো, বিশেষ কষ্ট হলো না।

পাহাড়ের উপরে উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে এলিস সব কিছু ভালো করে দেখতে পেলো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খোলা মাঠ, তারই মাঝখান দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে কতকগুলো নদী। নদীগুলো এমনি ভাবে গেছে যে, জায়গাটাকে ঠিক সতরঞ্চীর ছকের মত দেখাচ্ছে। একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গার মাঝখানে গাছের বেড়া,—প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টুকরো। এতক্ষণ এলিস একটাও কথা বলেনি, এই বার সে মুখ খুললে, বললে : এ তো দাবার ছকের মত দেখছে, কেবল ঘুঁটিগুলোর অভাব। কিন্তু কই তাও তো নয়—ঐ তো ঘুঁটি! বলতে বলতে এলিস উত্তেজিত হয়ে উঠলো, ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগলো। ভাবলো ব্যাপার কি, সমস্তটা জায়গা জুড়ে কি দাবাখেলা চলছে! ভারী মজা তো, আরো মজা হতো যদি আমিও ঘুঁটি হয়ে ওখানে গিয়ে খেলতে পারতাম। রাণী হলে তো কথাই ছিল না, কি মজাটাই না হতো, রাণী হওয়া তো ভাগ্যে নেই। রাণী না হলেও—সামান্য একটা বড়ে বা নৌকা ঘোড়া যা হয় হতে পারতাম। কথাগুলো এলিস শুধু মনে মনে ভাবছিল তাই নয়, মুখ দিয়েও বার হয়ে গেল।

পাশে রাণী দাঁড়িয়েছিল, কথাগুলো তার কানে গেল, কিন্তু সে রাগ করলে না বরং একটু মিষ্টি হেসে বললে : ও-রকম হতে আর কষ্ট কি। সাদা রাণীর দলে এখনি তোমায় ভর্ত্তি করে দেওয়া যায়। লিলি মেয়েটা বড্ড ছোট, তুমি না হয় তার জায়গায় ভর্ত্তি হও। এলিস অবাক হয়ে শুনতে লাগলো আর ভাবতে-লাগলো। হঠাৎ তার কানে এলো রাণী বলে চলেছে : প্রথম তোমায় দু'নম্বর ছক থেকে আরম্ভ করতে হবে—তার পর আট নম্বর ছক অবধি যদি তুমি গিয়ে পৌঁছতে পার তাহলে তোমায় রাণী করে দেবো।

রাণীর কথা শুনে এলিস মহাখুসী, কিন্তু হঠাৎ কি হলো দু'জনেই ছুটতে আরম্ভ করলো। ছুট, ছুট, ছুট! কি করে যে ছুটতে আরম্ভ করলো তা তাদের মনে নেই। এলিস কেবল বুঝতে পারলো যে, রাণীর হাতে হাত রেখে হাওয়ায় ভর করে প্রাণপণে ছুটে চলেছে। অত ছুটতে এলিসের রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু রাণী তাকে অনবরত বলছে : জোরে, আরো জোরে। এলিস আর পাচ্ছে না, তবু 'পাচ্ছি না' এ কথাটা বলতে পারার মত শক্তি তার ছিল না। দু'জনেই ছুটে চলেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাদের সঙ্গে সঙ্গে গাছ-পালাগুলো তো ছুটছে না! এলিস অবাক হয়ে ভাবছে : তাহলে আমাদের দু'জনের সঙ্গে সঙ্গে সবাই কি ছুটছে? কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই রাণী তার মনের কথা বুঝতে পেরে বললে : কথা নয়, ছুটে চলো আরো জোরে।

বেচারা এলিস—হাঁপিয়ে পড়েছে, আর ছুটবার ক্ষমতা নেই। তবু রাণী অনবরত বলে চলেছে : জোরে আরো জোরে।

আরো কিছুক্ষণ চলবার পর যেটুকু শক্তি ছিল তাই নিয়ে এলিস বহু কষ্টে শুধু এই কথাটি বললে : আর বেশী দূর নয় তো?

রাণী বললে : এই তো মাত্র দশ মিনিট ছোটা হয়েছে। চল চল, কথা বলো না।

এলিস অগত্যা ছুটে চললো—কি আর করবে!

তাদের পা আর মাটিতে লাগছিল না। পাখীর মত হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল দু'জনেই।

আরো কতক্ষণ এই ভাবে চলেছে, এলিসের কোনো হুঁস নেই। তার চলবার শক্তি আর নেই—এমন সময় হঠাৎ তার পায়ের তলায় মাটি ঠেকলো আর বেচারী মাটিতে থপ করে বসে পড়লো। কাছেই ছিল একটা পাইন গাছ, সেইটায় হেলান দিয়ে সে বসলো আর পাশে রাণীও বসলো। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেবার পর এলিস চার দিকে তাকিয়ে খুব অবাক হয়ে গেল। বললে : এ তো সেই পাইন গাছ—এর তলায় তো আমরা ছিলাম। এ তো নতুন কিছু নয়। তাহলে কি ছুটলাম মিছিমিছি?

রাণী বললে : হ্যাঁ সেই আগের জায়গাই তো! তুমি কি ভাবছিলে এটা একটা অন্য জায়গা হবে? এলিস বললে : তোমাদের দেশে সবই অদ্ভুত! আমাদের দেশে অনেকখানি ছুটতে পারলে অনেক অনেক দূরে চলে যাওয়া যেতো!

রাণী বললে : তোমাদের দেশের কথা আর বলো না। ওখানকার তো সব ঢিমে তেতালা। এখানে যদি খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে না পারো, তাহলে তোমার এক পা এগোনো হবে না। যেখানে ছিলে সেখানে থাকতে হবে। তুমি আর কি ছুটেছো, যা ছুটেছ তার ডবল ছুটতে পারতে যদি—তাহলে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হতে পারতো।

এলিস বললে : তাহলে আমার আর ছুটে কাজ নেই। যেখানে রয়েছি সেখানে থাকলে আমার চলবে। আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!

রাণী বললে : আমি আগেই জানতাম, তোমার ছুটবার দৌড় কত দূর! এই বলে তার পকেট থেকে একটা কৌটা বার করে এলিসকে বললে : খাবে একটা বিস্কুট?

এলিসের বিস্কুট খাবার ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু 'না' বলাটা অভদ্রতা হবে মনে করে সে হাত বাড়িয়ে বিস্কুট নিলো। বিস্কুট গলায় আটকে যাচ্ছিল কিন্তু তবু খেতে হলো।

রাণী বললে : তুমি বিস্কুট খেয়ে একটু বিশ্রাম করো, আমি ততক্ষণ কাজটা সেরে নিই—এই কথা বলে পকেট থেকে একটা লাল রিবণ বার করে মাপ-জোপ করতে আরম্ভ করে দিলো। এক এক জায়গায় পেরেক ঠুকতে লাগলো। মাপ-জোপ করতে করতে রাণী এক বার এলিসের দিকে তাকিয়ে বললেন : এর পর কি করতে হবে, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। ততক্ষণ ইচ্ছা হয়তো আর একটা বিস্কুট খেতে পারো—খাবে ?

এলিস বললে : ধন্যবাদ ! একটা তো খেয়েছি তাতেই যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার হবে না।

রাণী জিজ্ঞাসা করলে : তোমার তেষ্টা মিটেছে তো ?

এ কথার কি জবাব দেবে এলিস ভেবে পেলো না। ভাগ্যি ভালো, রাণী জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে নিজের কথাই বলে চললো : প্রথম দু'গজ অন্তর পেরেক ঠুকেছি, তার পর তিন গজ, পর পর পেরেক দেখতে পাবে। তার পর চার গজ অন্তর। পাঁচ গজ অন্তর পেরেক পোঁতা শেষ হয়ে গেলে আমার কাজ ফুরোবে, তখন আর আমায় দেখতে পাবে না।

একটু পরে সবগুলো পেরেক পোঁতা হয়ে গেল। এলিস এবার উঠে দাঁড়িয়ে এক-পা এক-পা করে পেরেক দিয়ে মার্কা-করা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। দু'গজ পরে যে পেরেক তার কাছে যাওয়া মাত্র রাণী বললে : প্রথম দু'ঘর চলবে তার পর তিন নম্বর ঘর পার হয়ে চার নম্বর পৌঁছতে রেলগাড়ী দরকার হবে। সেখানে টুইডলডাম আর টুইডলডীকে দেখতে পাবে। পাঁচ নম্বর জলভর্ত্তি, ছ'নম্বরে গেলে হামটী-ডামটীর সঙ্গে দেখা হবে।

এলিস কোনো কথা বলছে না দেখে রাণী থেমে বললে : কি, কোনো কথাই বলছো না যে ? তোমার কিছুই বলার নেই ?

এলিস থতমত খেয়ে বললে : আমার কি বলার থাকতে পারে ?

রাণী বললে : তোমার একটা কিছু বলা উচিত ছিল। আমি যে অত করে তোমায় বুঝিয়ে বলছি, সেটা তোমার মস্ত সৌভাগ্য বলে জানবে। তার পর সাত নম্বর ঘর বনজঙ্গল ভর্ত্তি। তা বলে তোমার ভাবনা নেই, এক জন সৈনিক তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে—তার পর আট নম্বরে গিয়ে যদি পৌঁছতে পারো, তাহলে সব রাণীদের সঙ্গে দেখা হবে, সেখানে খাবার-দাবার-হৈ-হুল্লোড় অনেক মজা। এলিস রাণীকে কুর্ণিশ করে আবার বসে পড়লো।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে রাণী বললে : যদি ইংরাজী কথা কখনও ভুলে যাও তাহলে ঘাবড়ে যেও না। ফরাসীতে কথা কইলে চলবে। আর বেশ টান হয়ে হাঁটবে। তুমি কে, সে কথা ভুলে যেও না, মনে রেখো।

এই কথা বলে রাণী আর একটু দূর এগিয়ে গেলেন। আর এলিস ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই—'আচ্ছা আমি আসি' বলেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। কি করে কি ঘটলো তা এলিস কিছুই বুঝতে পারলো না। হঠাৎ হাওয়ায় মিশে গেল, না ছুটে বনের ভিতর ঢুকে গেল তা বুঝতে পারলো না—শুধু বুঝতে পারলো আশে-পাশে কোথাও রাণী নেই, সে একলা শুধু একলাই নয়—সে আর এলিসও নয়—সে এখন দাবার ঘুঁটি।

এলিস ভাবলো, নতুন একটা দেশে এলাম, কোথায় কি আছে ভালো করে জানা দরকার। নদী-নালা তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না ? বোধ হয় নেই, পাহাড় তো মনে হচ্ছে একটাই, যার উপরে দাঁড়িয়ে আছি, সহর—তাই বা কোথায় ?

এমনি সময় হঠাৎ তার চোখ পড়লো কতক-কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর উপরে। ওগুলো কি প্রাণী, যে ভাবে ফু[ল] গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে আমাদের দেশ হলে বলতো মৌমা[ছি] কিন্তু মৌমাছি তো আর সত্যি সত্যি অত বড় হয় না ? তা[হলে] ওগুলো কি প্রাণী হবে ? ঐ তো একটা প্রাণী দল ছাড়া হয়ে এদি[কে] সরে আসছে—ভালো করে দেখে এলিস বললে : এ তো মৌমা[ছি] নয়, এ যে দেখছি হাতী ! আর ফুলগাছগুলো কি বড়—যেমন গা[ছ] তেমনি ফুল। আমাদের দেশে কুঁড়ে ঘরের ছাদ যত বড়—পাপ[ড়ি] সমেত এক একটা ফুল তার চেয়েও বড় বলে মনে হচ্ছে। অত ব[ড়] ফুলের মধুও হবে অনেক।

এলিসের এক বার মনে হলো, নীচে গিয়ে দেখে আসবে, কি[ন্তু] পরক্ষণেই ভাবলে অত বড় বড় প্রাণীর মাঝখানে না যাওয়াই ভালো কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে ! তা ছাড়া তাকে তো তিন নম্বর ঘ[রে] পৌঁছতে হবে—তাই আপাতত হাতী দেখা মুলতুবী থাক। তি[ন] নম্বরে যাবার জন্য রাণী যে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আ[র] কোনো দিকে না তাকিয়ে এলিস সেই রাস্তা ধরে লম্বা ছুট দিল।

হঠাৎ কানের কাছে কে বলে উঠলো : টিকিট দেখি ?

চমক কেটে যাবার পর এলিস তাকিয়ে দেখলো তার সামনে একটা ঘর, আর তাতে একটা জানলা, আর জানলা দিয়ে মুখ বাড়ি[য়ে] এক জন কে বলছে—টিকিট দেখাও।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল এলিস কিছু জানে না। তার চোখে সামনের সব দৃশ্য বদলে গেল। যে সব লোক-জন চলা-ফেরা করছিল সবারই হাতে একটা করে টিকিট। তারা সে লোকটাকে টিকি[ট] দেখিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসছে। হঠাৎ লোকগুলো কোথা থেকে এলো আর গাড়ীই বা কোথা থেকে এলো, তা সে বুঝতে পারলো না এ কী সব চোখের ভুল ? কই ভুল তো নয়—ভাল করে তাকিয়ে দেখলো সত্যিই তো রেলের প্ল্যাটফরম। রেলের যাত্রী, রেলগাড়ী টিকেট-চেকার কোনো কিছুরই অভাব নেই। সব তার মাথায় তাল গোল পাকিয়ে গেল, কিন্তু আর কিছু ভাববার অবসর না দিয়ে সে লোকটা আবার বলে উঠলো : কোথায় তোমার টিকিট ?

এবার লোকটা যে ধরণের কথা বললে, তাতে বোঝা গেল তা[র] খুব রাগ হয়েছে। আশে-পাশে যারা ছিল তারাও বলতে লাগলো কেন বাপু টিকেট দেখাতে দেরী করছো, জানো এর সময় ক[ত] মূল্যবান !

বেচারী এলিসের তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা, সে বললে বিশ্বাস করুন টিকিট আমার কাছে নেই, টিকিট আমার করাই হয়নি।

গার্ড সাহেব বললে : ও-সব বাজে ছুতো দেখিও না—টিকি[ট] করনি কেন ? ড্রাইভারের কাছে চাইলেই তো টিকিট পেতে ?

আশে-পাশের লোকগুলো এলিসের অবস্থা দেখে বেশ মজা পাচ্ছিল। তাই দেখে এলিসের রাগ হচ্ছিল কিন্তু কি করবে ?

এদিকে গার্ড সাহেব ততক্ষণে কোথা থেকে একটা দূরবীণ এনে এলিসকে অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে দেখে তাকে একটা কামরা

দেখিয়ে দিল। তার পর দরজা এঁটে দিয়ে গট্‌-গট্‌ করে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল : মেয়েটা ভুল রাস্তায় চলছে।

গাড়ীর কামরায় এলিসের ঠিক উল্টো দিকে সাদা পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি বললেন : কোন পথে যাচ্ছে, তা না জানবার মত কম বয়স নয় মেয়েটার, কোথায় যাচ্ছে তাই যখন জানে না, তখন কি নাম তা-ও জানে না।

সাদা পোষাক-পরা ভদ্রলোকের পাশে আর এক জন কে বসেছিল, সেও টিট্‌কারী করে বললে : আহা, কচি মেয়ে! কোথায় টিকিট পাওয়া যায় কি করে জানবে—এখনও অ-আ শেখা হয়নি।

এলিসের ভারি রাগ হলো। লোকটার মুখের দিকে তাকাতেই এলিস অবাক হয়ে গেল। লোক নয়তো মোটে, ওটা একটা ছাগল —এতক্ষণ চোখ বুঁজে দিব্যি মুরুব্বীয়ানা করে কতকগুলো কথা বলছিল। তার পাশেই বসেছিল একটা গুবরে পোকা। পর পর সবাই কথা বলছে, সে আর বাদ যায় কেন? সেও বললে : এখান থেকে ওকে বস্তার মত যেতে হবে, টিকিট নেই যখন, তখন বস্তা ছাড়া আর কি হবে?

গুবরে পোকার পিছনে কে বসেছিল, এলিস তা দেখতে পায়নি। এরা যে ধরণের কথা বলছিল, তাতে দেখবার ইচ্ছাও আর এলিসের ছিল না। সে শুধু শুনতে পেল হেঁড়ে গলায় কে যেন বলছে : ইঞ্জিন বদলাও। কিন্তু কথা বলা তার আর শেষ হল না, প্রবল কাশির চাপে কথা ঐখানেই বন্ধ করতে হলো।

এলিস ভাবলে, আওয়াজটা ঘোড়ার মত মনে হচ্ছে। এমনি সময় তার কানের খুব কাছে, খুব মিহি গলায় কে যেন বললে : তোমায় নিয়ে ওরা অত ঠাট্টা-তামাসা করছে, তুমি কিছু বলতে পারছো না?

কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে কে যেন বলে উঠলো : ওর গায়ে একটা লেবেল এঁটে দাও, তাতে লেখা থাকবে 'হুঁসিয়ার ছোট্ট মেয়ে।'

আবার কারা একসঙ্গে বলে উঠলো : ওকে ডাকবাক্সে ফেলে দাও, পার্শ্বেল হয়ে চলে যাবে।

এদের কথাবার্ত্তা শুনে এলিসের কান্না পাচ্ছিল। এমন সময় তার সামনে সাদা পোষাক-পরা যে লোকটি বসেছিল, সে বললে : যা বলছে বলুক, কান দিও না, কিন্তু এর পর যখন ট্রেণে উঠবে, তখন টিকিট কাটতে ভুলো না।

এলিস বললে : আমি তো ট্রেণে চড়তে চাইনি। এই তো একটু আগে আমি পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম,—ট্রেণে বেড়িয়ে আমার কাজ নেই, পাহাড়ের পাশে ফিরে যেতে পারলে আমি বাঁচি।*

[ক্রমশঃ।

* *Lewis Carroll*-এর লেখা 'Through the Looking-Glass and What Alice Found There' গ্রন্থের অনুবাদ।

ক্রিকেট

সাউথ-আফ্রিকা ও ইংলণ্ড দলের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচই ছিল সব চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল। ইংলণ্ড এই খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড জয়ী হয় এবং অপর দু'টি টেষ্ট ম্যাচে জয়ী হলে দুই দলের মনে আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়মান মনে দুই দলের অপূর্ব মনের জোর। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে জয়ী হ'ল ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন টেষ্ট অধিনায়ক আর্থার গিলিগান বলেন—দীর্ঘ তিরিশ বছরের মধ্যে সাগর-পারের কোন দলই এমন ফিল্‌ডিং-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। শুধু তাই নয়, তিনি সাউথ-আফ্রিকার খেলোয়াড়দের ব্যাটিং ও বোলিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ইংলণ্ডের তরুণ অধিনায়ক পিটার মের এই সাফল্যের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। তাঁর সুনিপুণ ব্যাটিং ও খেলোয়াড়দের ঠিক মত খেলান। এবারের পাঁচটি টেষ্টে দুই দলের মধ্যে তাঁর রাণ-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৫০২। তাঁর রাণের গড় হিসেব ৭২'৭৫। তার পরে রাণ-সংখ্যা হচ্ছে বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় টেষ্টেই টেষ্ট খেলার ৫০০০ রাণ পূর্ণ হয়ে যায়। ব্যাটিং তালিকার তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছেন সাউথ-আফ্রিকার সহ-অধিনায়ক ম্যাক্‌গ্লু। তিনি ৭৭৬ রাণ করেছেন।

বোলিং-এ সাফল্য অর্জন করেছেন ইংলণ্ডের ল্যাটা স্পিন-বোলার জনি ওয়াড্‌ল। তার পরে ফ্রাঙ্ক টাইসন।

সাউথ-আফ্রিকা দলের ট্রেভ গডার্ড, পিটার হাইন প্রমুখ বোলারগণ বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ—কেনিংটন ওভাল মাঠে পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হোল। বৃষ্টির ফলে প্রথম দিন মাত্র আড়াই ঘণ্টা খেলা হোল। ইংলণ্ডের এই খেয়ালী-প্রকৃতির জন্যে বাইরের অনেক দলকেই বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। বৃষ্টির ফলে পিচের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠলো, তাই টসে জয়লাভ করেই নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠালো ইংলণ্ড। প্রথম ইনিংসে ১৫১ রাণের বেশী সংগ্রহ করতে সক্ষম হোল না। সাউথ-আফ্রিকা দলের রাণ-সংখ্যা উঠলো আরও কম। মাত্র ১১২ রাণে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হলো।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ইংলণ্ড দলের কৃতী খেলোয়াড় কম্পটন, মে, গ্রেভনি দৃঢ়তার সংগে খেলে ২০৪ রাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হোল। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো। সাউথ-আফ্রিকা শিরে-সংক্রান্তি নিয়ে ব্যাট করতে নামলো। নিতান্ত বিপজ্জনক অবস্থা, তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—১৫১ (ক্লোজ ৩২, কম্পটন ৩০ ওয়াটস ২৫)

সাউথ-আফ্রিকা প্রথম ইনিংস—১১২ (ম্যাকগ্লু ৩০, ওয়েট ২

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস—২০৪ (পিটার মে ৮৯, কম্পটন ৩ ও গ্রেভনি ৪২)

ইংলণ্ড ৯২ রাণে জয়ী।

কলকাতা মাঠের ফুটবল এখন স্তিমিতপ্রায়। শীল্ডের খে ১লা সেপ্টেম্বর আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি ২রা তারিখে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বারে প্রথম ডিভিসন লীগের পর্যালোচনা মাঝপথেই ছে টেনে দিতে হয়েছিল, কারণ তখনও স্থির হয়নি কে রাণার্স-আ হবে আর কাকেই বা দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যেতে হবে।

এবারে প্রথম ডিভিসন লীগে ৩৫ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে লী রাণার্স আপ হয়েছে এরিয়ান্স ও ইষ্টবেঙ্গল দল।

গত বছরের দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান অরোরা ক্লা এবারেই প্রথম ডিভিসন খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, কিন্তু এবা লীগ-কোঠায় সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করায় পুনরায় তাকে দ্বিতী ডিভিসনে খেলতে হবে। আগামী বারে প্রথম ডিভিসনে খেলার যোগ্য অর্জন করেছে, এবারের দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান বালী প্রতিভা

বিশ্বযুব উৎসব

ওয়ারসতে বিশ্বযুব ক্রীড়া উৎসবে ভারতীয় হকি দল বিজয়-মুকু লাভ করেছে। হকিতে ভারতের এ সম্মান নতুন নয়।

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় দিল্লী ওয়াণ্ডার্স দল পরাজি হয়েছে। এ দলে ৬।৭ জন কৃতী খেলোয়াড় আছেন। তাই দিল্লি দলের পরাজয়ে ভারতের ক্রীড়ামোদীর প্রাণে এই আশঙ্কাই হয়েছে যে, আগামী অলিম্পিকে ভারতের এ সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না?...

নিউজিল্যাণ্ড ছাড়াও অন্যান্য দেশ হকিতে পুরোদস্তর অনুশীল চালাচ্ছে। ভারতের এই সম্মানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে যে প্রচেষ্টা, সে প্রচেষ্টা ফলবতী হবে এই কারণে, যদি না ভারত এখনও সজাগ না হয়

বিশ্ববিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারতকে হকি খেলা নতুন পদ্ধতি খেলার জন্ম গবেষণা করতে হবে আর খেলায় যত্নশীল হতে হবে। আশা করি, ভারতের হকি-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেবেন।

ডেভিস কাপ

এবারের বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়া তাদের পুরানো গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গত বার ডেভিস কাপের চূড়ান্ত খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আমেরিকা জয়লাভ করেছিল। এবার অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

উইম্বলডনে আমেরিকার জয়লাভের পর ডেভিস কাপে এমনি ভাবে শোচনীয় পরাজয় কেউ-ই কল্পনা করতে পারেন নি। বরং অনেকেই আশা করেছিলেন—"চ্যাম্পিয়নশিপ অফ দি ওয়ার্ল্ডে'র" খেলায় এবার বুঝি আমেরিকা শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। একটানা চার বছর অষ্ট্রেলিয়া যখন ডেভিস কাপ অধিকার করেছিল তখন নাটকীয় ভাবে আমেরিকার জয়লাভ বিস্ময়কর হলেও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু অচিরেই তাদের মুঠি শিথিল হয়ে গেল।

অষ্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকাকে পরাজিত করল।

আবার এই দুই দেশের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা মিলিত হবেন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ান্ সিপ খেলায়।

ডেভিস কাপে সিঙ্গল খেলায় বিজয়ী হলেন অষ্ট্রেলিয়ার কেন রোজ ওয়াল ভিক্ সেক্সাসকে (আমেরিকা) ৬-৩, ১০-৮, ৪-৬ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার লুইস হোড্ পরাজিত করেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ট্রণি টার্বাটকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩ ও ৮-৬ গেমে।

সব চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা হয়েছিল দুই শ্রেষ্ঠ ডাবলস জুটি জীবন পণ করে খেলছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন ট্রণি টাবোট ও ভিক্ সেক্সাস (আমেরিকা) লুইস হোড ও রেক্স হাটউইগ (অষ্ট্রেলিয়া) এর কাছে ১২-১৪, ৬-৪, ৬-৩, ৩-৬ ও ৭-৫ গেমে।

তৃতীয় দিনের খেলায় লুইস হোড ৭-৯, ৬-১, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ভিক্ সেক্সাকে।

কেন রোজওয়াল ৬-৪, ৩-৬, ৬-১ ও ৬-৪ গেমে হ্যাম রিচার্ড-সনকে পরাজিত করেন।

টুকরো খবর

সব চেয়ে আনন্দ-সংবাদ ক্রীড়া মহলে। স্বাধীনতা সপ্তাহে গুণীজন সম্বর্ধনায় বাংলার তথা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম দিক্‌পাল গোষ্ঠ পালকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

গোষ্ঠ বাবুকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয় ভেনাস-এর সম্বর্দ্ধনা-সভায় সভাপতির আসনে বরণ করে। প্রদেশ কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে পরোক্ষে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন। অভিনন্দন সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীপালকে একটি ৫ হাজার টাকার চেক্ উপহার দেওয়া হয়। এই সভাতেই মাননীয় রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি মোহনবাগান ক্লাব মারফৎ ১০ হাজার টাকার চেক্ উপহার দেবেন, এছাড়া মোহনবাগান থেকে তাঁকে আরও কিছু অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

খেলোয়াড় হিসেবে শ্রীপালের নাম বাংলা দেশে আবাল-বৃদ্ধের কাছে পরিচিত। তিনি বাংলার গৌরব। তাঁর এ সাফল্যের জন্য তাঁকে আমরা অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

রাজ্য সরকারের 'স্পোর্টস বিল' প্রসঙ্গে প্রত্যেকটি ক্রীড়ামোদীর অনুমোদন আছে। খেলাধূলাকে জাতীয়করণের মর্য্যাদা দান খেলা-ধূলার প্রকৃত মঙ্গল হবে বলে বিশ্বাস করি।

কেলেঙ্কারীর পুনরাবৃত্তি

বিশ্ব সাইকেল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের সাত জন সদস্যকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হতে হয়েছে ম্যানেজারের হঠকারিতার জন্য। তিনি সদস্যদের টাকা-পয়সা নিয়ে উধাও হন। বাধ্য হয়ে সদস্যদের পাথেয় সংগ্রহের জন্য সাইকেল বিক্রয় করতে হয়। শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যে মিলানে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন। এই সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের হাতে জাতীয় সম্মান যে সহজেই ক্ষুণ্ণ হোল, আশা করি তার সুবিচার হবে।

এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে কেলেঙ্কারীর সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

ভারত থেকে যে দলটি রাশিয়া সফরে গিয়েছে তারা পর পর দু'টি খেলায় পরাজিত হয়েছে।......

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নয়

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সোনার কাজললতাটা পৌত্রী স্বর্ণময়ীর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বসুধারা বললেন, খোপা থেকে কাজললতাটা যে পড়ে গিয়েছে, টের পাসনি বুঝি স্বর্ণ? এই নে।

স্বর্ণময়ী পিতামহীর হাত থেকে কাজললতাটা নেবার জন্য নিঃশব্দে কম্পিত ডান হাতটি বাড়িয়ে দিল, দাও।

দেখিস, ভাল করে গুঁজে রাখ, যেন আর পড়ে না যায়।

বাইরে এমন সময় পুনঃ নিশানাথের গলা শোনা গেল, মা।

কে? নিশা? আসছি বাবা!

বরের জোড়, অঙ্গুরি, কণ্ঠহার সব দেবে এসো মা।

বসুধারা ঘরের বাইরে এসে বললেন, সে সব এখন কি হবে নিশা? সে ত সম্প্রদানের সময় প্রয়োজন।

আমিও তাই বলেছিলাম মা! কিন্তু রায় বললেন, সম্প্রদানের পূর্বেই নাকি ও-সব বরকে পরিধান করতে হয়, রায়-বাড়ির কুলপ্রথা।

তবে চল, বের করে দিচ্ছি।

মাতা-পুত্র অলিন্দপথে বসুধারার কক্ষের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কাজললতাটা মাথায় গুঁজতে গুঁজতে স্বর্ণ সখীকে বললে, তুই বোস শ্রীমতী, আমি আসছি।

স্বর্ণময়ী কক্ষ থেকে বের হয়ে তার পিতার শয়নকক্ষের দিকে চলে গেল।

সানাই গাইছে মধুমিলনের রাগিণী! চারি দিকে আলো আর ফুলের ছড়াছড়ি। সমস্ত জমিদার-ভবন উৎসবে যেন মত্ত হয়ে উঠেছে।

পায়ে পায়ে স্বর্ণময়ী মায়ের এনলার্জ ছবিটির সামনে এসে দাঁড়াল। মা! মা গো। আশীর্বাদ করো মা, যেন কোন অমঙ্গল না স্পর্শ করে আমাকে।

সন্ধ্যালগ্নেই বিবাহ।

বিবাহ-মণ্ডপে সব প্রস্তুত। পাত্র ও কন্যাপক্ষের মাতব্বরেরা মণ্ডপের চারি পাশে এসে বসেছেন। তাদেরই এক পাশে পৃথক একটি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট রাজশেখর রায়। কি জানি কেন, বার বারই তার দৈবাচার্যের সতর্কবাণীই মনে পড়ছিল। তিনি বলেছিলেন, শশাঙ্কর কোষ্ঠী বিচার করে যে, চব্বিশ বৎসর বয়েসের সময় নাকি তার কোষ্ঠীতে সংসার-ত্যাগ যোগ রয়েছে। শশাঙ্কর এখন ঠিক চব্বিশ বৎসর বয়সই চলছে। চব্বিশ বৎসর তিন মাস! স্ত্রী সুরেশ্বরীর কথায় বিবাহে রাজী হলেন তিনি। কি জানি ভাল হলো, না মন্দ হলো। সুরেশ্বরীর করকোষ্ঠী ইত্যাদি গণনায় বিশেষ তেমন আস্থা নেই। কিন্তু তিনি নিজে ত জানেন, দৈবাচার্যের গণনা কত নির্ভুল। শুধু তার মায়ের মৃত্যুর কথাই নয়। তার—তারও কোষ্ঠী বিচার করে দৈবাচার্য যা বলেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গিয়েছে। এবং আজও সে দুঃস্বপ্ন তিনি ভুলতে পারেননি। সরযূর কথা যখনই তিনি ভাবেন, বুকের ভিতরটা তার কি এক আশঙ্কায় যেন দুরু-দুরু করে ওঠে! চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল রাজশেখরের, নিশানাথের কণ্ঠস্বরে।

রায়মশাই! তাহলে অনুমতি দিন, পাত্রকে সভায় নিয়ে যাই।

ও! হ্যাঁ। হ্যাঁ—নিয়ে যান।

বরশয্যায় কন্দর্পের মত কান্তিমান শশাঙ্কশেখরের দিকে তাকালে যেন আর চোখ ফিরান যায় না। কপালে শ্বেতচন্দন-তিলক। গলায় গজমতির হার। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় রেশমী চাদর। পাত্রকে তুলে এনে বিবাহ-মণ্ডপে পিঁড়ির উপরে দাঁড় করান হলো।

অন্দরের দিক থেকে তখন ঘন ঘন বহু কণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে, বিবাহ-মাঙ্গলিক। তার পরই দেখা গেল, সূক্ষ্ম রেশমী ভেলভেটের অবগুণ্ঠনে ঢেকে পিঁড়ির উপরে বসিয়ে চার জন যুবক স্বর্ণময়ীকে বিবাহ-মণ্ডপে নিয়ে আসছে।

কিন্তু কোন কৌতূহলই যেন নেই শশাঙ্কশেখরের। কোন আশা আকাঙ্ক্ষাই নেই! নির্বাক নিশ্চল কাষ্ঠপুত্তলিকার মত শুধু দাঁড়িয়ে থাকে শশাঙ্কশেখর।

পাত্র ও পাত্রীকে পাশাপাশি বসিয়ে পুরোহিত শুরু করলেন অনুষ্ঠান। চন্দন-পুষ্প-ধূপের সুরভি। পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে শশাঙ্কশেখর। এ কি মন্ত্র সে উচ্চারণ করছে। মন্ত্র নয়। মন্ত্র নয়—এ যে নাগপাশ! কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে এ মন্ত্র উচ্চারণ না করলেও কি সে মনে মনে প্রেমের দেবতাকে সাক্ষী রেখে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেনি সরযূর বেলায়? ধর্মমতে সরযূই ত তার স্ত্রী। এক স্ত্রী বর্তমানে আবার সে এ কোন্ মহাপাপে নিজেকে লিপ্ত করছে! সরযূ! সরযূ!···

না। না—এ সে পারবে না। পারবে না। কিন্তু হঠাৎ চোখ তুলতেই সামনে দেখলো, উপবিষ্ট পিতা রাজশেখর রায়। দুই চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তিনি তার দিকেই তাকিয়ে আছেন নির্নিমেষে।

দেখতে দেখতে এক সময় বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হলো। বর ও বধূকে বাসরঘরে এনে তোলা হল।

বাসরঘর। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ও মাথা ধরার অছিলায় বাসরঘরে প্রবেশ করেই শশাঙ্কশেখর শয্যায় শুয়ে পড়েছিল। এবং বরের শরীর অসুস্থ বলে বসুধারা বাসর-জাগানীদের তাড়াতাড়ি বাসরঘর থেকে নিজে বের করে দিয়ে ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুই চোখ বুজে নিঃশব্দে শয্যার উপর পড়ে থেকে এক সময় শশাঙ্কশেখর গায়ের চাদরটা গা থেকে সরিয়ে উঠে বসল। এবং উঠে বসতেই নজরে পড়ল, পাশে বসে পালঙ্কের উপরে অবগুণ্ঠনবতী স্বর্ণময়ী!

পলকের জন্য তার দিকে একবার তাকিয়েই শশাঙ্কশেখর শয্যা থেকে নেমে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সত্যিই মাথাটা ধরেছে শশাঙ্কর।

খোলা জানলা-পথে মধ্য রাত্রির হাওয়া আসছে মন্থর শীতল, হেমন্তের ঝরা শিশিরের আর্দ্রতা মাখানো।

এখনো বাতাসে ভেসে আসছে সানাই। কি সুর ধরেছে সানাই? মোহিনী! চেনা সুরটি শেখরের। উস্তাদজীর কণ্ঠে বহু বার শুনেছে ও।

[ছবি পাঠাবার সময় ছবির পেছনে নাম ধাম লিখতে যেন ভুলবেন না]

পূর্ব্বপুরুষ
-প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঞ্চনজঙ্ঘা
-অমিয় চক্রবর্ত্তী

ফাঁকি

—কুমারেশ নন্দী

জলযাত্রা —চিন্ময়ী দেবী

পূজারী —শোহনলাল লাহিড়ী

প্রতিকৃতি —তরুণ মজুমদার
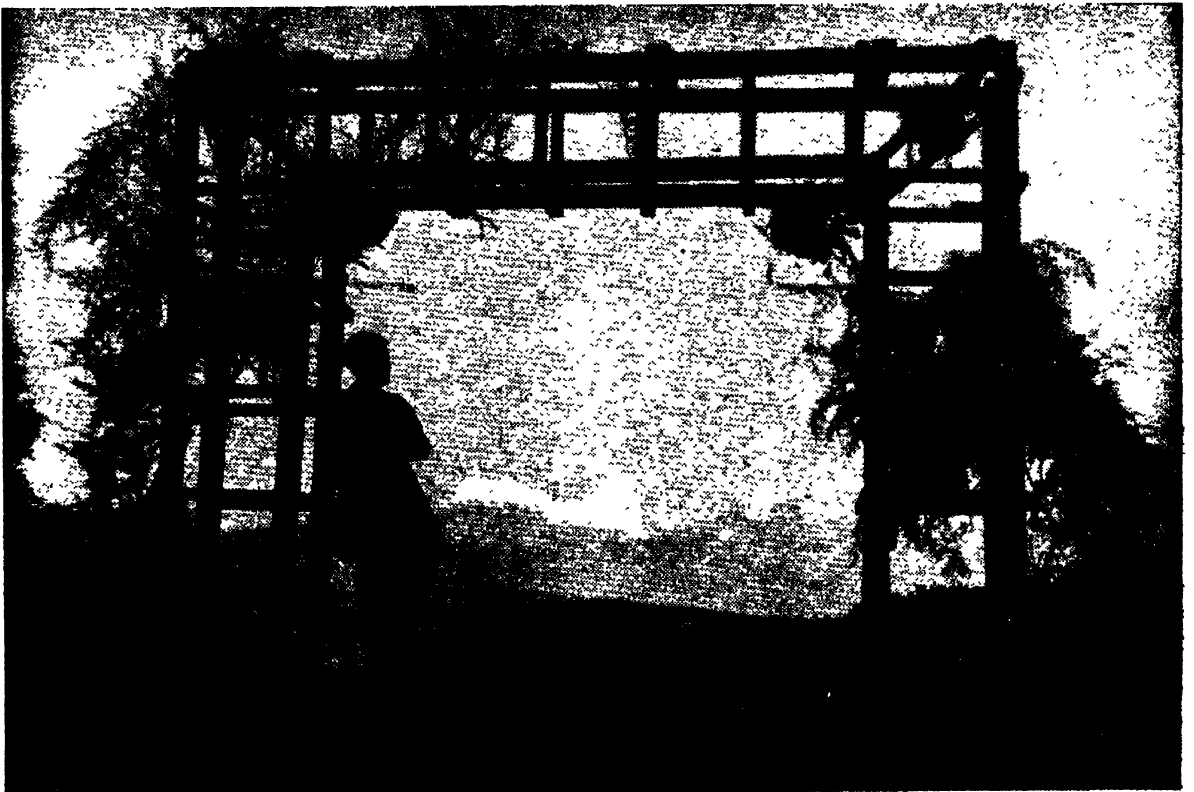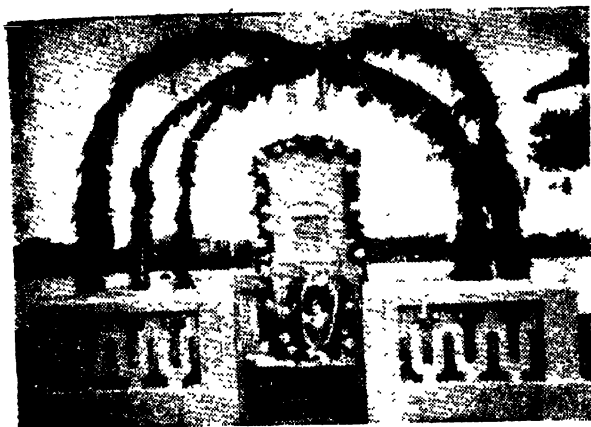
শহীদ-স্মৃতি-স্তম্ভ, বাবুগঞ্জ, হুগলী

—শ্রীঅজিতকুমার বসু

কর্কটরাশি

—তারা মুখোপাধ্যায়

—দিলীপ হাজরা

শিশুনারায়ণ ?

—মৃত্যুঞ্জয় পাল

জলের ধারে

—রণজিৎ রায়চৌধুরী

আসবার আগে উস্তাদজীর ঘরে গিয়েছিল শশাঙ্ক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

তানপুরাটি বুকের কাছে ধরে গুন্‌ গুন্‌ করে স্বর ভাঁজছিলেন প্রৌঢ় দবীর খাঁ। পদশব্দেও তাঁর খেয়াল হয়নি।

উস্তাদজী!

শশাঙ্কর কণ্ঠস্বরে এবার মুখ তুলে তাকালেন, কে? শশাঙ্ক—এসো বেটা! সাদি করতে চলেছো! আল্লা তোমাদের সুখী করুন!

হঠাৎ শশাঙ্কর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল নূপুর ও অলঙ্কারের ঝুনু ঝুনু শব্দে। ফিরে তাকাল শশাঙ্ক।

ইতিমধ্যে স্বর্ণময়ী কখন যে একেবারে তার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায়নি।

শিথিল অবগুণ্ঠন স্খলিত হয়ে পড়েছে। কপালে চন্দন-তিলক। ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখির কোলে সূক্ষ্ম কাজলের টান।

আপনি শোবেন না? মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে স্বর্ণময়ী

না। তুমি শোও গে যাও।

তবু নড়ে না স্বর্ণময়ী। ইতস্তত করে।

মাথার যন্ত্রণা কি এখনো কমেনি?

না।

মাথা টিপে দেবো?

না। কেন বিরক্ত করছো, তুমি শুয়ে থাকগে যাও!

বিরক্ত! তার কথায় বিরক্ত বোধ করছেন উনি! ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! মাথা নীচু করে ফিরে এলো স্বর্ণময়ী। শয্যায় শুয়ে চোখ বুজলো।

এই! এই—এত আকাঙ্খিত তার প্রথম স্বামি-সম্ভাষণ? স্বামী তার কথায় বিরক্তি বোধ করলেন। তবে কি! তবে কি স্বামীর তাকে পছন্দ হয়নি? স্বামী তাকে গ্রহণ করেননি? বার বার করে নিমীলিত দুই আঁখির কোল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ধারা। স্বর্ণময়ী উপাধানে মুখ গুঁজল।

মধ্য রাত্রি।

সরযুর চোখেও ঘুম ছিল না।

সেই যে তিন দিন আগে রাত্রিশেষে শশাঙ্কশেখর চলে গেল, আজ তৃতীয় রাত্রি—আজও সে এলো না!

রজনী সমাপ্ত-প্রায়। আকাশে লেগেছে ভোরের রঙ। কই? কেউ ত এসে ডাকল না সেই প্রিয় নামটি ধরে, চন্দ্রা! চন্দ্রা! আমি এসেছি। তবে কি সেদিনকার অস্ত্রাঘাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল? না, চন্দ্রাকে সে ভুলে গেল? ভুলে যাবে! শেখর। তার শেখর চন্দ্রাকে ভুলে যাবে?

হোক। হোক সে রাজশেখরের পুত্র। তবু—তবু তাকে সে ভুলতে পারবে না। যদি কোন অমঙ্গল আসেই ত সে তার শেখরের জন্য বুক পেতে নেবে। যদি আসে মৃত্যুও তবু সে ভয় পাবে না। তার শেখরের জন্য সে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে হাসিমুখে। তবু পারবে না সে তার শেখরকে ভুলতে।

কিন্তু সূর্যকান্ত? সূর্যকান্তর কথা সেদিন শেখর তাকে বলল কেন? কি করে পরিচয় হলো শেখরের সূর্যকান্তর সঙ্গে? তবে কি সূর্যকান্ত এতদূরেও তার সন্ধানে সন্ধানে এসেছে? কিন্তু তা সূর্যকান্ত পেলই বা কি করে? সূর্যকান্তকে সরযু ভোলেনি।

সেই সাপের মত চোখের দৃষ্টি সূর্যকান্তর। মনে পড়ে ঘরে কেউ ছিল না, সরযু একাকী জানালার ধারে বসেছিল। ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে দাঁড়িয়ে সূর্যকান্ত।

অমনি করে চুপটি করে জানালার ধারে বসেছিলে কেন? সূর্যকান্ত প্রশ্ন করে এগিয়ে আসে।

এমনি!

আচ্ছা সরযু, আমাকে তুমি ভয় কর কেন বলতে পারো? বাঘ না ভালুক, তোমায় কি গিলবো?

সরযু চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভিতর তার দুরু দুরু [illegible] কাঁপছে।

সরযু!

বলুন?

এগিয়ে এসে আচমকা সরযুর একখানা হাত চেপে সূর্যকান্ত, আমাকে তুমি বিয়ে করবে সরযু?

আপনি—আপনি যান।

না। আমি যাবো না। আগে বল তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

আপনি যান। নইলে এখুনি আমি চেঁচিয়ে পদ্মকে ডাকবো।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল সূর্যকান্ত। পদ্মাকে ডাকবে? ডাক! শোন সরযু, আজ আমি যাচ্ছি কিন্তু আবার আমি আসবো। তোমা আমি বিয়ে করবোই। তুমি জান না সরযু, তোমার জীবন কতখা বিপন্ন। কিন্তু তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর ত তোমার সব অমঙ্গল আমি মুছে নেবো। এ জগতে কারো সাধ্য নেই সূর্যকান্তর সবল বাহুর বন্ধন থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমা পীড়ন করে।

আপনি যান। যান বলছি।···

সূর্যকান্ত অবিশ্যি তার পর চলে গিয়েছিল কিন্তু তার প৹ পাঁচ সাত দিন সরযুর ভয়ে ভয়ে কেটেছে, কখন আবার না জা সূর্যকান্ত সামনে এসে তার হাজির হয়!

ঐ ঘটনার পর আর মাসখানেক সূর্যকান্ত তার সাম আসেনি। কিন্তু তবু সূর্যকান্ত সম্পর্কে আতঙ্ক তার যায়নি এবং তারই কিছু দিন পরে হঠাৎ রাত্রে নাটকীয় সেই ঘটন পরই রাজশেখর তাকে এখানে নিয়ে এসে বন্দী করে রাখল।

রায়-বাড়ির নীচের মহলে নিজের নিভৃত কক্ষের মধ্যে ব দবীর খাঁ তানপুরাটি বুকের কাছে ধরে বহু কাল পরে আজ আব বসন্ত আলাপ করছিলেন।

বাইরে হেমন্তর মধ্যরাত্রির আকাশ শিশির ঝরাচ্ছে। গা অচেতন রায়-বাড়ির সকলেই। কেউ কোথায়ও জেগে নে একমাত্র দবীর খাঁ ছাড়া।

ঠিক সেই সময় সর্বাঙ্গে কালো রেশমের ওড়না-জড়ানো এ অশ্বারোহী দ্রুত বেগে অশ্ব ছুটিয়ে কৃষ্ণসাগরের তীর দিয়ে রা বাড়ির দিকেই আসছিল। কাজ শেষ করে যেমন করে কে

রাত্রে। এই অন্ধকারে অন্ধকারেই অশ্বারোহীকে আবার বহু দূরে ফিরে যেতে হবে।

কেউ তাকে দেখে বা চিনতে না পারে, এই কারণেই সে রাত্রির অন্ধকারে এসেছে আবার অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফিরে যাবে।

আকাশে কৃষ্ণা তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদ। একটা ঝিমঝিমে আলোয় চারি দিক কেমন আবছা-আবছা মনে হয়। ওই দূরে দেখা যায় রায়-বাড়ি। অশ্বারোহী এবারে তার অশ্বের গতি একটু সংযত করে।

দীর্ঘ পথ একটানা অশ্ব চালনায়, গুরু পরিশ্রমে সমস্ত কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠেছে। কালো রেশমী ওড়নার প্রান্ত দিয়ে অশ্বারোহী স্বেদবিন্দুগুলি মুছে নিল।

রায়-বাড়ির দেউড়ির কাছাকাছি এসে বিরাট যে বকুল বৃক্ষটি, তার নীচে এসে অশ্বারোহী রেকাবে পা দিয়ে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করল; তার পর অশ্বকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে হেঁটেই এগিয়ে চলল দেউড়ির দিকে। রাত্রে দেউড়ির পাল্লা দুটো টানা থাকে মাত্র; হাত দিয়ে একটা পাল্লা ঠেলে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল অশ্বারোহী।

সমস্ত রায়-বাড়ি অন্ধকার। কক্ষে কক্ষে আলো গেছে নিভে। কেবল সদর দালানে একটি দেওয়াল-গিরি টিম্-টিম করে জ্বলছে। সদর পার হয়ে বাঁ হাতি যে অলিন্দ সেটা অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেই বহির্মহল। এবং বহির্মহল থেকে কোন পথে যে অন্দরে যাওয়া যায় এবং দ্বিতলে উঠবার সিঁড়ি কোথায় এবং কোথায় রাজশেখর রায়ের শয়নকক্ষ, কিছুই অশ্বারোহীর অজানা নয়। অনেক—অনেক দিন পরে হলেও সব সব আজও স্পষ্ট মনে আছে তার। ছবির মতই স্পষ্ট আজও তার মনের পাতায় রায়-বাড়ির প্রতিটি অলিন্দ কক্ষ, প্রাঙ্গণ চিনে ঠিক সে পৌঁছাতে পারবে।

বহির্মহলের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই কানে এসে প্রবেশ করল অশ্বারোহীর সুরেলা কণ্ঠে বসন্ত আলাপ।

বসন্ত না?

হ্যাঁ বসন্তই ত।

দাঁড়িয়ে গেল অশ্বারোহী। কত কত কাল আগের সেই প্রিয় সুরটি তার। ভুলে যায় যেন অশ্বারোহী কেন সে এই দীর্ঘ পথ দ্রুত অশ্ব ছুটিয়ে এই নিশীথ রাতে এখানে এসেছে দুঃসাহসে বুক বেঁধে? সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

মনের নিভৃতে ঘুমন্ত একটি তারে যেন হঠাৎ কার মৃদু অঙ্গুলি স্পর্শে জেগেছে বহু কালের সেই চেনা সুরটি। মন্ত্রমুগ্ধের মতই নিজের অজ্ঞাতে পায়ে পায়ে সেই সুরকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলে সে। দবীর খাঁর কক্ষের ভেজান দ্বারটি ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে। কখন এক সময় সুরালাপ থেমে গিয়েছে খেয়ালও নেই! হঠাৎ দবীর খাঁর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো, কে?

ঘরের প্রদীপের আলোয় দবীর খাঁও নির্নিমেষে তাকিয়েছিলেন সামনের দিকে! আঁটসাট করে কাছা দিয়ে শাড়ী পরিধানে, মুখখানি ওড়নার অবগুণ্ঠনে আবৃত, পায়ে জরীর নাগরা।

কে?

ধীরে ধীরে আগন্তুক মুখের উপর থেকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তাকাল দবীর খাঁর দিকে, উস্তাদজী!

কে! কে?—

চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন দবীর খাঁ ততক্ষণে। কার? কার কণ্ঠস্বর? ভোলেন নি, আজও ত ভোলেন নি ঐ কণ্ঠস্বর দবীর খাঁ! স্মৃতির পরতে পরতে আজও যে ঐ কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আছে!

উস্তাদজী! আমি অপর্ণা।

অপর্ণা! অপর্ণা!

দবীর খাঁ কি স্বপ্ন দেখছেন! অপর্ণা! অপর্ণা তাহলে আজও বেঁচে আছে?

সত্যি! সত্যি! অপর্ণা! বিটি তুই?

হ্যাঁ উস্তাদজী আমিই। বলতে বলতে অপর্ণা আরো এগিয়ে এলো। আজও আমি বেঁচেই আছি।

কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!···আনন্দের আবেগে দবীর খাঁর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। দু'হাতে অপর্ণাকে বুকের মধ্যে টেনে নেন দবীর খাঁ। বিটি! বিটি!···

আগন্তুক মহিলার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হলেও চেহারা দেখে কিন্তু সেটা বুঝবার উপায় নেই। অটুট নিটোল স্বাস্থ্যের লাবণ্য ঢল ঢল যেন এখনো। মুখের কোথাও একটি রেখা পর্যন্ত জাগেনি যা সাধারণত ঐ বয়সের নারীদের ও মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বয়স যেন হঠাৎ এসে এক জায়গায় থমকে থেমে দাঁড়িয়ে আছে।

মিলনের আনন্দের আবেগটা একটু থিতিয়ে আসবার পর দবীর খাঁ শুধালেন, কিন্তু তুই এত দিন পরে হঠাৎ এই রাত্রে কোথা থেকে এলি বেটি?

সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার মনে পড়ে গেল, এই নিশুতি রাতে দীর্ঘ পথ

একাকিনী অশ্বারোহণে কেন সে ছুটে এসেছে। এবং মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অপর্ণা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো। মুখের উপরে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া যেন নেমে এলো।

রাজশেখর রায়ের সঙ্গে আমি একবার দেখা করবো বলেই এই রাত্রে আমি এসেছি উস্তাদজী!

সর্বনাশ! না—না বেটি না! সে জানে তুই মারা গেছিস!

সেই জন্যই ত তাকে জানাতে চাই, এত কাল সে যা জেনে এসেছে তা ভুল, স্বপ্ন মাত্র! অপর্ণা আজও মরেনি। আজও এই বুকের মধ্যে সে প্রতিহিংসার অনল নিয়ে বেঁচে আছে। বোঝাপড়া আজ তাকে একটা আমার সঙ্গে করতেই হবে।

অপর্ণার কণ্ঠ হতে যেন একটা ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ঝরে পড়ল।

না। না বেটি না। রাজশেখর রায়কে কি তুই ভুলে গেলে বেটি? সে যদি জানতে পারে যে আজও তুই বেঁচে আছিস তাহলে এবারে আর সে তোকে জ্যান্ত রাখবে না। তুই তার হাত থেকে আর রেহাই পাবি না। হয়ত জ্যান্ত সে তোকে কৃষ্ণসাগরের জলের তলায় পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেলবে। লক্ষ্মী বেটি, আমার কথা শোন। ফিরে যা।

না উস্তাদজী! আমি দেখতে চাই আমার ভাগ্যের অদেখা পৃষ্ঠাগুলোতে—এখনো কি আমার জন্য লেখা হয়ে আছে। কুড়ি বছর। এক আধ দিন নয় উস্তাদজী, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে চোরের মত আত্মগোপন করে বেড়িয়েছি কিন্তু আর নয়—আর পালাবো না। ভাগ্যের সঙ্গে যদি প্রয়োজন হয়েই থাকে ত শেষ বোঝা-পড়াটা এবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েই করে যাবো।

শোন বেটি! আমার—এই বৃদ্ধের কথাটা শোন। যা হয়ে গিয়েছে তা ত আর ফিরবে না। তবে কেন আর মিথ্যে অতীতের কাদা ঘেঁটে তোলা। আমার কথা শোন! ফিরে যা।···

রঘুবীরকে সে হত্যা করেছিল জন্তুর মত বর্শাবিদ্ধ করে—

কি বলছিস অপর্ণা!

হাঁ! সে রাতের কথা তোমার মনে আছে উস্তাদজী! যেদিন গভীর নিশীথে রায়-বাড়ির পশ্চাতের উদ্যানের গোপন দ্বারপথ খুলে তুমি আমাদের দু'জনকে বিদায় দিয়েছিলে?—

আছে। আছে বৈ কি মনে দবীর খাঁর সে রাত্রির কথা! ছায়া-ছবির মতই ভেসে ওঠে দবীর খাঁর মানসপটে অতীতের সে কাহিনী!

রঘুবীর আর অপর্ণা ভালবেসেছিল তারা পরস্পর পরস্পরকে।

কিন্তু রাজশেখর রায় তাদের সে ভালবাসাকে ক্ষমার চোখে নিতে পারেননি। পিতৃমাতৃহারা অপর্ণাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন রাজশেখর রায়। কিন্তু সেই অপর্ণা, যখন জানতে পারলেন তাঁরই অধীনস্থ সামান্য এক রাজপুত-সর্দার রঘুবীর সিংকে ভালবেসেছে, প্রথমটায় তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু সংবাদটা যে দিয়েছিল সে যখন বললে, প্রমাণ সে দিবে, তখন রাজশেখর বলেছিলেন, ঠিক আছে। আর যদি তোমার কথা মিথ্যা হয়ত জেনো কৃষ্ণসাগরের জলের তলে তোমার সমাধি দেবো।

কিন্তু কথাটা আসলে সত্যিই, অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়। তাই প্রমাণ পাবার পরে রাজশেখর যেন ঘৃণায় লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। আর শুধু ঘৃণা আর লজ্জাই নয়, আক্রোশে তখন তিনি যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠলেন।

অপর্ণা! অপর্ণা কি না ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে শেষ পর্য্যন্ত এক সাধারণ রাজপুতকে ভালবাসল?

নিজ হাতে তিনি অপর্ণাকে অশ্ব চালনা থেকে লাঠি, অসি ও বর্শা চালনা শিখিয়েছিলেন। দবীর খাঁর কাছে সে সংগীত শিক্ষা করছিল।

কিন্তু যে মুহূর্তে প্রমাণ পেলেন যে, অপর্ণা সত্যি সত্যিই রঘুবীরকে ভালবেসেছে সেই থেকেই অপর্ণাকে তিনি সর্বক্ষণের জন্য নজরবন্দী করলেন। তার সমস্ত গতিবিধির উপরে নিষ্ঠুর শাসনে দাঁড়ি টেনে দিলেন। কিন্তু পঞ্চশরের ফুলবাণ যেখানে একের প্রতি অন্যকে করেছে আকর্ষণ সেখানে সামান্য মানুষের নিষেধের বা শাসনের গণ্ডি কেমন করে তাদের পরস্পরের পথ রোধ করে রাখবে? তাই অপর্ণা ও রঘুবীরকেও বেঁধে রাখতে পারেননি রাজশেখর রায়।

জানার সঙ্গে সঙ্গেই রঘুবীরকে বিতাড়িত করেছিলেন রাজশেখর রায়।

পিতামহের আমলের অস্ত্রধারী রক্ষক ছিল রাজপুত চন্দনসিং রায়-বাড়িতে। তারই মাতৃহারা পুত্র রঘুবীর। সামান্য বেতনভোগী! তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন রাজশেখর।

কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে গেল না। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে সে আসত দবীর খাঁর ঘরে। সেখানে অপর্ণার সঙ্গে তার মিলন হতো।

অত্যন্ত স্নেহ করতেন দবীর খাঁ অপর্ণাকে। তাই অপর্ণা যেদিন কেঁদে পড়লো, আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন উস্তাদজী!

দবীর খাঁ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, তাই ত বেটি! কি উপায় করি বল ত? তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র রাজশেখর। এ দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তোরা ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গা-ঢাকা দিবি। আর ও যদি জানতে পারে ঘুণাক্ষরেও তাহলে তোদের দু'জনের একজনকেও ও জীবিত রাখবে না।

ও-সব কোন কথা জানি না। তোমাকে একটা উপায় করে দিতেই হবে উস্তাদজী! অপর্ণা বললে।

তাই ত! আচ্ছা যা করেন খোদা! কাল রঘুবীর যখন রাত্রে আসবে তুই তার সঙ্গে পালা।

পালাবো?

হাঁ, রঘুবীরের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে তুই পালা। আমি আস্তাবল থেকে বাগানের পিছনে একটা ঘোড়া এনে রাখবো।

সেই মতই ব্যবস্থা হলো। এবং পরের রাত্রে রঘুবীর কখন এসেছে দবীর খাঁর ঘরে এবং অপর্ণাও তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে, এমন সময় দবীর খাঁর প্রহরারত ভৃত্য ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সর্বনাশ হয়েছে খাঁ সাহেব!

কী? ব্যাপার কী!

হুজুর টের পেয়ে গিয়েছেন, এই দিকেই আসছেন।

এঁ্যা, সে কি! অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে অপর্ণা।

রঘুবীর বলে, ঠিক আছে, আসুন হুজুর—সামনা-সামনি লড়বো।

অপর্ণা সভয়ে বলে ওঠে, না। না—তুমি জান না রঘু—ওর হাতের নিশানা অব্যর্থ। অন্ধকারেও লক্ষ্য ভেদ করে। [ক্রমশঃ।

এদের প্রথম কলহ...
এরা নববিবাহিত, কিন্তু...
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর...
আমি ওঁর জন্যে যথাসাধ্য করি, তবুও...
ঝগড়া কোরো না। আমি বুঝেছি গলদ কোথায়।
লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না!
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে!
এ ছাড়া পরিষ্কার করে কাচার উপায়ই বা কী?
সানলাইট সাবান ব্যবহার কর—যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়: সেইজন্যে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো!
আরে: সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন—আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

ইস্‌লাম ও সঙ্গীত

অমলেন্দুবিকাশ কর-চৌধুরী

ইস্‌লাম ও সঙ্গীত এই শব্দ দুইটি একটু জটিলতার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। কারণ, ইস্‌লাম সঙ্গীতকে চিরদিনই নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তাহার মধ্যে সঙ্গীতের স্থান না হইবারই কথা। কিন্তু তবুও, একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, পরস্পর-বিরোধী এই দুইটি শব্দের মধ্যে একটা যোগসূত্র রহিয়াছে, এবং একটি অপরটি হইতে কোন দিনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই।

ইস্‌লাম ধর্মের জন্মভূমি আরবে, ইস্‌লামের পূর্বেই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং ইস্‌লামের জন্মের পরে, (অর্থাৎ ৫৭০ খৃষ্টাব্দেরও কিছু পরে) হজরত মহম্মদ কর্তৃক সঙ্গীত 'হারাম' অথবা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গীত আরবে কোন দিনই অপাঙ্‌ক্তেয় হয় নাই। হজরত মহম্মদের পরবর্তী কালের খলিফারা এবং 'ওমায়েদ' ও 'আব্বাসিদ' বংশের সুলতানরাও ইহার পরিশীলন নিষিদ্ধ করিতে পারেন নাই—উপরন্তু 'ওমায়েদ' ও 'আব্বাসিদ' সুল্‌তানদের আমলে ইসলাম-শাসিত অঞ্চলে সঙ্গীতের জয়ধ্বনি ঘোষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মে ও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সুসভ্য সমাজের মধ্যে সঙ্গীত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করিলেও বৃহৎ মুসলমান সমাজ ইহাকে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কারণ, ধর্মের পথ হইতে সঙ্গীতের মাদকতা মনের একাগ্রতাকে বিচ্যুত করিতে পারে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ইসলাম মুসলমান সমাজের মধ্যে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গীত মুসলমান সমাজের মধ্যে কোন দিনই অপাঙ্‌ক্তেয় হয় নাই। প্রাক্‌-ইসলামিক যুগ হইতেই ইহা মুসলমান সমাজে রহিয়া গিয়াছিল—বরং আরব জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পর এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরবরা পারস্য অধিকার করিলে পর পারসীকদের সংস্পর্শে আরবদের মধ্যে তথা সমগ্র ইসলাম ধর্মের মধ্যে সঙ্গীতের প্রসার দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে।

ইসলামিক যুগেও আরবদের মধ্যে যে সঙ্গীতের চর্চা ছিল তাহা ঐতিহাসিক ডনকামেটের উক্তি হইতেও আমরা সমর্থন করিতে পারি। ডনকামেট বলিতেছেন যে, হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পূর্বেও (৬৩২ খৃঃ-পূর্ব) আরবদের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে আগ্রহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আরবরা সঙ্গীতরস বহুল পরিমাণে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, আরবদের সঙ্গীতে গ্রীস ও রোমের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং এই গ্রীক্‌ ও রোমক জাতিও তাঁহাদের সঙ্গীতের প্রেরণা বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে লাভ করিয়াছিল। বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "গ্রীস্‌দেশের সঙ্গীত যেইরূপে গীত হইত, তাহাতে ইহাকে অবশ্যই প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। মিশরীয় সঙ্গীতের ন্যায় গ্রীসের সঙ্গীতের মূলও হিন্দু সঙ্গীতের মধ্যে অথবা কোন সর্বজনীন সঙ্গীত পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত আছে, যাহার ধারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের স্বরূপ হয়ত আরব ও পারস্য মারফৎই ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে।" সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আরবদেশীয় সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বাণিজ্যিক যোগাযোগ মারফৎ ভারতীয় সঙ্গীত সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, উভয় ভূখণ্ডই পরস্পরের ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং মনীষী এইচ, জি, ফারমার যে বলিয়াছেন,

"আরব সঙ্গীতের মূল আরব সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত সঙ্গীত রূপ হইতেই রস সংগ্রহ করিয়াছিল এবং উহাই আবার পরে প্রত্যক্ষরূপে না হইলেও পরোক্ষরূপে গ্রীসের সঙ্গীতকে প্রভাবিত করিয়াছিল।" এ কথা মানিয়া লইলেও ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রথমে আরবরাই গ্রীক ও রোমদের সঙ্গীতে প্রভাবিত হইয়াছিল এবং যাহার মূল উৎস ছিল ভারতীয় সঙ্গীত, কারণ ফারমারই আবার বলিতেছেন, "ইস্লামের অব্যবহিত পূর্বে আরবের অন্তর্গত আলহিরা ও খাসান নামক এই অঞ্চল দুইটি পারসীক এবং গ্রীক সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এবং উভয়েই সম্ভবতঃ পীথাগোরাসের স্বরূপের সহিত পরিচিত হইয়াছিল।" কিন্তু এই পীথাগোরিয়ান মত সম্বন্ধেই এ্যালেন ডানিয়েলু (Alain Deniclon) বলিতেছেন, "গ্রীকদের সঙ্গীত পদ্ধতি নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিজের দেশে উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, পীথাগোরাস প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে এই পদ্ধতি আনয়ন করেন এবং তাঁহার দেশবাসী হেলাসের নাগরিকগণও ইহাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং আমরা ইহা বিশ্বাস করি যে, গ্রীক সঙ্গীত-পদ্ধতি ভারতীয় সঙ্গীতেরই অথবা চীনদেশীয় সঙ্গীতের মূল হইতে গৃহীত।" এবং স্বামী অভেদানন্দের এই কথাও সত্য যে, "ইহা কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, পীথাগোরাসের সময় হইতেই ভারত ও গ্রীসের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল—কারণ পীথাগোরাস হিন্দু-সংস্কৃতি হইতে জ্ঞান আহরণের জন্যই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।"

সুতরাং যে রূপেই দেখি না কেন, এই কথা অবিসংবাদিত রূপেই সত্য যে, ইস্লাম ও ইসলাম-পূর্ববর্ত্তী যুগের আরব দেশ ভারতীয় তথা হিন্দু সঙ্গীতের ধারায় প্রভাবিত হইয়াছিল। তবে এ কথাও সত্য যে, ইস্লামের পূর্বে ও পরে আরব দেশ যেখান হইতেই সঙ্গীতের ভাবধারায় প্রভাবিত হউক না কেন, সে কখনই নিজস্ব ভাবধারা হারায় নাই। পারস্য, গ্রীক, রোম কোন দেশীয় সঙ্গীতই আরবদের জাতীয় চেতনা ও সঙ্গীতকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারে নাই।

সমগ্র আরব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পর যখন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ আরবরা পারস্য দেশ অধিকার করিল, তখন পারস্য দেশের সঙ্গীতই আরবদের এবং সমগ্র ইসলামকে সঙ্গীতে যেমন সঞ্জীবনী রসধারায় সিক্ত করিয়াছিল, তেমনি আবার অপর দিকে নৈতিক অধঃপতনের শেষ সীমায় টানিয়া আনিয়াছিল। ইসলামধর্মী 'ওমায়েদ' ও 'আব্বাসিদ' সুলতানদের সময় আরব ও পারস্যে সঙ্গীত প্রসার লাভ ত করিয়াছিলই, উপরন্তু সমগ্র ইসলাম-সমাজের মেরুদণ্ডও বহুল পরিমাণে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। এই সম্বন্ধে আমীর আলি বলিতেছেন: "ওমায়েদ বংশের প্রথম খলিফারা তাঁহাদের বিশ্রাম কাল বেশীর ভাগই প্রাক্-ইসলামিক্ যুগের রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রবণে কাটাইতেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-২৪) এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৪৪ খৃঃ) তাঁহাদের বেশির ভাগ সময়ই সুরাপানোৎসবের এবং নৃত্যগীতের মাধ্যমে অতিবাহিত করিতেন। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পিগণও মক্কা ও মদিনা হইতে দলে দলে তৎকালীন সঙ্গীতের পীঠস্থান দামাস্কাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় সঙ্গীতের মধ্যে একটা বিকৃত রুচি উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ দূর-দূরান্ত হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুন্দরী নর্ত্তকী ও সঙ্গীতে পারদর্শিনী ক্রীতদাসীদের রাজদরবারে আনয়ন করা হইয়াছিল, যাহার ফলে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায় এবং সমাজের বনিয়াদে ভাঙ্গনের ঘুণ ধরে।"

'আব্বাসিদ' সুলতানদের আমলেও আরব এবং পারস্যে সঙ্গীত মুসলমান ধর্ম্মের অনুশাসনকে অমান্য করিয়া বহুল পরিমাণে সমাজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং সমাজের ও ধর্মের বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। মূলতঃ ইহার জন্য পারস্যদেশীয় ক্রীতদাসীরা ও নর্ত্তকীরাই দায়ী। আর পারস্যদেশীয় এই দুই ইস্লাম নিষিদ্ধ জিনিস ইসলামকে অমান্য করিয়া সমগ্র আরব ও পারস্যে ব্যাপ্তিলাভ করার মূলে ছিল 'আব্বাসিদ' সুলতান। আল-মনসুরের রাজত্বকাল হইতেই ইসলামের ভিতর বিশ্বভ্রাতৃত্বের ছদ্মবেশে পারস্যের রীতি-নীতি প্রবেশ করে, যাহা ইসলামীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছিল। তখন হইতেই ইসলাম নিষিদ্ধ 'মদ্য ও সঙ্গীত' হাত ধরাধরি করিয়া ইসলামের ভিতর চলিয়া আসিতেছে (পৃঃ ৭৫৪)। [ক্রমশঃ।

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের মধ্যে অনেকগুলি ভালো ভালো গান বেরিয়েছে। এখানে সংক্ষেপে পরিচয় উল্লেখ করা গেল:—

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N82659—শ্রীমতী উৎপলা সেন "আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা" এবং "হরি বল নৌকারে খোল"। দু'টি অতি জনপ্রিয় গানের সুললিত গীতিরূপ মনোরম হয়েছে। N82660—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুনাম অর্জন ক'রেছেন, এবারের আধুনিক গান দু'টিতে সে সুনাম আরও বৃদ্ধি পাবে। গান দু'টি "এলো ঘনিয়ে বরষা" এবং "কে তুমি প্রিয় এলে ঘুম ভাঙ্গাতে"। N82661—কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় সুরের জাল বুনেছেন তাঁর নতুন দু'টি আধুনিক গানে "আবছা মেঘের ওড়না গায়ে" এবং "যেথা আছে ওগো শুধু"। N76019—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "প্রশ্ন" বাণীচিত্রের গান "ভাঙ্গা তরী বেয়ে" এবং "নয়নে বহে জল"। N76020—কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "প্রশ্ন" চিত্রের আরও দু'টি গান "হে অতিথি" ও "প্রশ্ন শুধায় বাসন্তিকা"।

কলম্বিয়া

GE24762—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নতুন রবীন্দ্র-সঙ্গীত "চলে যায় মরি হায়" ও "যামিনী না যেতে" এক কথায় অনবদ্য। GE24763—অপরেশ লাহিড়ীর কণ্ঠে "ভাঙ্গা ঐ শাম্পানে" ও "ডিম্ ডিম মাদলের তালে"। সুরের বৈচিত্র্যে মনোরম। GE24764—শ্রীমতী রাধারাণীর কীর্ত্তন গান পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, চণ্ডীদাসের দু'খানি কীর্তন "রাই আমার সদাই চঞ্চল" এবং "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার" তিনি এবার উপহার দিয়েছেন। GE23923—ভ্যান শিপ লের দু'খানি ইলেকট্রিক গীটার বাজ্য, সুর "জুতা হ্যায় জাপানী" (শ্রী ৪২০ চিত্রের গান) এবং "চলো চলো মা" (জাগৃতি চিত্রের গান)। GE30295—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "রাত ভোর" চিত্রের গান "বনে নয় মনে আজ" এবং "রিম ঝিম ঝিম্ তানে"।

কলিঙড়া—ত্রিতাল

কে বলে সখি, সরোজে শশী নাহি পিরীত
তার চাঁদমুখ নিরখিলে দেখ,
হৃদয় কমল বিকশিত ॥
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন
হৃদয় কমল হয় মুদিত ॥

কথা ও সুর—নিধু বাবু * স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

০ ১ ২´ ৩
পদা মপা মপা দদা | পপা মগা মা পা I দা পদা নর্সা -া | নদা না দা পা |
কে০ ব০ লে০ ০০ ০০ ০০ স খি স রো০ ০০ ০ জে০ ০ শ শী

০ ১ ২´ ৩ ০
পদা পা মগা -া | মপা পমা গমা গা I ঋা সা -া -া | না সা গা -া | মা দা -া -া |
না০ হি পি০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ রী ত ০ ০ তা র চাঁ দ্ মু খ ০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
মা দা না না I -া র্সঋ্া ঋর্সা না | র্সা র্সা -া -া | দা না র্সা র্গা | ঋ্া র্সা -া -া I
নি র খি লে ০ ০০ ০০ ০ দে খ ০ ০ হৃ দ য় ক ম ল ০ ০

২´
না দনা নর্সা নদা | র্সা না দা পা II
বি ক০ ০০ ০০ ০ ০ শি ত

০ ১ ২´ ৩
দা দা না -া | র্সা ঋ্া র্সা -া I র্সঋ্া ঋর্সা না র্সা | র্সা -া -া -া |
ত প নে ০ ক ম লে ০ ০০ ০০ ০ প্রী ত ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
না র্সা র্গর্মা র্পা | র্গা র্মা -া র্গর্মা I র্পর্পা র্পর্মা র্গর্মা র্গা | ঋ্া র্সা -া -া |
এ নি য়০ ০ অ নু ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ চি ত ০ ০

১ ১ ২´ ৩
দা ঋ্া র্সা -া | না না নর্সা র্সনা I দা দা -া পা | দা পমা গা -া |
অ রু ণ ০ ন য় ন০ ০০ হে রে ০ ত বে কে০ ন ০

০ ১ ২´ ৩
দা সা গা গা | মা পা -া দদা I পপা মা- গা গা | মপা পমগা ঋা সা II
হৃ দ য় ক ম ল ০ ০০ ০০ হ য় মু ০০ ০০০ দি ত

* পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত সুমধুর টপ্পা গানে গুলামনবী ও শোরীর প্রেমকাহিনী অমর হয়ে আছে। সুললিত ঢং এবং তানের অপরূপ সমাবেশ টপ্পা গানকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত করেছে। টপ্পা গানের সুর ও ছন্দ অবলম্বনে, বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম নিধু বাবু (রামনিধি গুপ্ত) সরল ও মধুর ভাষায় বাঙ্গলা গান রচনা করেন। প্রেমের পূজারী নিধু বাবু তাঁর রচিত প্রণয়-সঙ্গীতে কথা ও সুরের যে অপরূপ সমাবেশ করেছেন, তার তুলনা বিরল। বাঙ্গলা সঙ্গীতে নিধু বাবুর দান আজও অক্ষয় হয়ে আছে। দুঃখের বিষয়, এই সকল গান লুপ্ত হতে চলেছে। বাঙ্গলার সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এই সকল গান পুনরুদ্ধার করা এবং শিক্ষা ও প্রচারে যত্নবান হওয়া।

সাঙ্গীতিক

সম্প্রতি বিষ্ণুপুর হাই স্কুল-হলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাট্য-নৃত্য-সংসদের সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত-রত্নাকর মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, রমেশবাবুর প্রতিভা এবং ভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ দান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। রমেশ বাবু তাঁর ভাষণে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাট্য-নৃত্যসংসদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন এবং সঙ্গীত যে আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে পরম অনুকূল, সে বিষয় উল্লেখ করেন। সঙ্গীত-আসরে সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ নন্দী এবং শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী যোগদান করেন। কলিকাতার সাহিত্যিকার পক্ষ হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষে রমেশ বাবু একটি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

গত ১৭ই জুলাই 'মহারাষ্ট্র নিবাস হলে' 'সুরশিল্প-আশ্রমে'র উদ্যোগে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তানসেন, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মীরাবাঈ, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি স্বনামধন্য কবিগণের রচিত বর্ষা-সঙ্গীত বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে গীত হয়। নৃত্যানুষ্ঠানগুলিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আমার কথা (৯)

শ্রীরাইচাঁদ বড়াল

সুরের মাঝেই আমার জন্ম। আমার জন্মের আগে থেকেই বাড়িতে গান-বাজনার চর্চা ছিল। বাবা স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল ছিলেন সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক। আমি বাপ-মার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। আমার বড়দা' ও মেজদা' দু'জনেই গুণী শিল্পী। বড়দা শ্রীকিষণচাঁদ বড়াল (গঙ্গু বাবু) ও মেজদা শ্রীজুলু বড়াল যথাক্রমে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত (স্বরোদ) নিয়ে আজও সাধনা করে চলেছেন।

আমাদের বাড়ি সঙ্গীত-সাধনার পবিত্র পীঠ। ছোট বলে আমার বাবার আদর বেশীই পেয়েছিলুম। শিশুকালটা তাঁর পাশে পাশে, স্নেহ-আদরের সঙ্গে কাটে। বাবা গাইতেন, চার পাশে ছড়ানো থাকতো নানা বাদ্যযন্ত্র। কোনটা কী বুঝতুম না, খেলার ছলে তবলায় চাঁটি মারতুম, সেতারের তারগুলোর ওপর আঙুল ছোঁয়ালেই যে মিষ্টি শব্দ উঠতো তা শুনে মনে আনন্দ পেতুম। বাবা গাইতেন, শুনে শুনে তা অনুকরণ করার চেষ্টা করতুম। এই ভাবে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগলুম ততই সুর-সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলুম।

ছেলেরা যে বয়সে স্কুলে যায় সে বয়স এলে আমিও এক দিন স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। স্কুলে পড়ি। মাষ্টার মশায়রা যে পড়া দেন, বই খুলে সে পড়া তৈরী করতে গিয়ে তার ভেতর সুরের সন্ধান করি। আসল পড়ার থেকে সুর খোঁজাই আমার কাছে বড় হয়ে ওঠে। স্কুলে মাষ্টার মশায় পড়াচ্ছেন আমি বই খুলে তখন চেষ্টা করে দেখছি, পাঠ বিষয়টিকে সুরে বাঁধলে কেমন দাঁড়ায়। এই ভাবে সুর আমায় পেয়ে বসলো। পড়ায় তেমন মন বসছে না দেখে, এক দিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। ছকে-বাঁধা শিক্ষার সমাপ্তি আমার শেষ হয়ে গেল।

অলস হয়ে বসে থাকার জন্যে দুনিয়ায় কেউ আসেনি। সঙ্গীত যখন আমার মন হরণ করেছে, তখন সঙ্গীতকেই জীবনের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলুম। হাফেজ আলি খাঁ, মুস্তাফ হোসেন খাঁ প্রভৃতির কাছে দাদারা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। যদিও আমি এঁদের কাছে (যাঁদের নাম একটু আগে উল্লেখ করেছি) সরাসরি ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করিনি, তবে মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে সঙ্গীত বিষয়ে এই আলোচনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। বলতে গেলে কণ্ঠ-সঙ্গীতের শিক্ষাগুরু আমার বাবা ও বড়দা'। কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাধনা করতে করতে এক বার আমার তবলা শেখার ইচ্ছে জাগে। তবলা শিখেছি আজকের দিনের সুখ্যাত তবলা-বাদক কেরামতুল্লার বাবা ওস্তাদ মসিতুল্লা খাঁ (মসিদ খাঁ) সাহেবের কাছে।

সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত কিছুটা আয়ত্তাধীন হলে জনসমাজে নিবেদনের ইচ্ছা মনে জাগলো। তখন ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন খুলেছে শহরের বুকে। বিদেশী আমার গুণের তারিফ

শ্রীরাইচাঁদ বড়াল

করলেন—গ্রহণ করে সঙ্গীত-বিভাগের যাবতীয় কাজের ভার তুলে দিলেন আমার হাতে। বেশ কিছু দিন চললো, তার পর মন বলতে লাগলো: তোমার জায়গা এখানে নয়, তোমার প্রতিভা বিকাশের পথে এখানে বহু বাধা। এক দিন উক্ত ভার ত্যাগ করে সিনেমা-রাজ্যে প্রবেশ করলুম। প্লে ব্যাক করা ও সঙ্গীত নির্দেশনায় আমার প্রথম ছবি যথাক্রমে নীতিন বসুর 'ভাগ্যচক্র' ও নিউ থিয়েটার্সের 'দেনা-পাওনা'। চার্লির City Life দেখে এদেশের ছায়াছবিতেও যে ইনসিডেন্টাল মিউজিক দেওয়া যায় এ প্রেরণা জাগে। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর আমার সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করলো দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস' ও হিন্দী 'পুরাণ ভাগত' ছবিতে। এর পর অর্কেষ্ট্রাকে হার্মনাইজড্ করে যখন ছায়াছবির পেছনে রেখে তা শ্রোতাদের কানে তুলে ধরলুম তখন সুরু হলো তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা রকম কটু ও কঠোর মন্তব্য। এতে আমি যে কিছুটা ভয় পাইনি তা নয়, তবে সব ভয় দূর করে দিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। দেখা করে আমার ইচ্ছা ও বক্তব্য তাঁর কাছে নিবেদন করলুম। কবি বললেন: "তুমি ভয় করো না, নির্ভয়ে এগিয়ে চল। তুমি যে-পিতার সন্তান, সে-সন্তানেরই এ কাজ করার কথা। যদি লোকের কথায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাও, তাহলে আমি দুঃখ পাব।" কবিগুরুর আশীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করে নির্ভয়ে এগিয়ে চললুম আমার লক্ষ্যের পথে। কবিগুরুর আশীর্বাদ বিফল হল না, দেশ হার্মনাইজড্ অর্কেষ্ট্রা বস্তুটিকে গ্রহণ করলো।

ছায়াছবি যে নিজে তুলিনি, তা নয়। এক বার কার্টুন ছবি তোলার ইচ্ছে মনে জাগলো। এদেশে তখনো কার্টুন ছবি জন্মলাভ করেনি। কেবলই ভাবি, কী রকম কার্টুন ছবি তুললে এদেশের লোকের ভালো লাগবে। চিন্তা করতে করতে মাথায় এসে গেল ভাবনার বস্তুটি। কয়েক দিন অক্লান্ত চেষ্টা করে তুললুম কার্টুন ছবি P. Brothers in on a Moonlit Night. নিজেদের ছবির কথা বেশী বলবো না, শুধু এটুকু বললে অন্যায় করা হবে না যে, আমাদের P. Brothers in on a Moonlit Night ছবিখানি এ দেশের প্রথম কার্টুন ছবি।

নিজের কথা বলতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ এবং লজ্জা লাগছে মনে। আর কথা দীর্ঘ করবো না। শুধু এটুকু বলেই 'আমার কথা' শেষ করবো: সুর-সাধনাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। কতটুকু জেনেছি আর কতটুকুই বা সেই পরিমাণে দান করেছি? এত দিন যে নিবেদন করে এসেছি তা যদি দেশবাসীর এক জনেরও ভালো লেগে থাকে তাহলে জানবো আমার সাধনা ব্যর্থ হয়নি এবং সেটুকু আনন্দ নিয়েই এগিয়ে চলবো নতুন কিছু পাবার ও দেবার সন্ধানে।

মুখ

শ্রীকরুণাময় বসু

ধূসর অস্পষ্ট ছায়া সায়াহ্নের নির্জন বাসরে,
স্ফটিক-প্রদীপাধারে গন্ধদীপ জ্বলে জ্বলে সারা;
কাঁকণের শব্দ আসে জন্মান্তর পার হয়ে যেন,
অচেনা শব্দের ঢেউ, বাজিছে স্মৃতির একতারা।

কুঙ্কুম-ছড়ানো পথে উজ্জয়িনী, অবন্তী-নগরে
পায়ে পায়ে হেঁটে যাই স্মরণের অলি-গলি পথে;
সপ্তপর্ণা ফুল ঝরে, বসন্ত-সেনার প্রিয়দূতী
শুধাল আমারে বুঝি, এলে পান্থ কোন্ দেশ হ'তে?

রক্তিম ওড়না ওড়ে স্বপ্নখসা বিস্মৃতির মতো,
অস্ফুট নূপুর-ধ্বনি, দেহ-নৃত্যে মদির হিন্দোলা;
আশ্চর্য আবেশ যেন মোহময়ী সর্পিণীর পাক,
এ কোন্ অতীত প্রিয়া, চাঁদ ওঠে, মনে লাগে দোলা?

পার হয়ে চলে যাই, জন্মান্তের সরু-সিঁড়ি ধরে
বনান্ত-রেখার শেষে ধূসর সমুদ্র-উপকূলে,
ঝিনুকের মায়াদেশে চন্দন আঁকানো জ্যোৎস্না রাত;
হারানো কালের গন্ধ কবরীর শুকানো বকুলে।

কতো কথা মনে আসে, মনে তাই আশ্চর্য কৌতুক,
তোমার মুখের ছাঁচে জন্মান্তের ফিরে-পাওয়া মুখ।

কেনা কাটা

আবার এসে পড়ল পূজোর বাজার!

আর মাত্র একটি মাস বাকী। কেনা-কাটার মরসুম লেগে গেছে এর মধ্যেই। দোকানে-দোকানে ভীড়ও বাড়ছে ক্রমে। কয়েকটি দোকান এর মধ্যেই প্রি পূজা-সেল শুরু করে দিয়েছেন দেখলাম। গত বৎসরও ঠিক এমনি সময়ে দোকানদারগণের উদ্দেশ্যে পূজার বাজারে কেনা-বেচার প্রসঙ্গে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথা আমরা জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, (১) পূজায় পোষাকের মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। (২) পোষাক বেশী দিন টিঁকে না কেন? (৩) দামের সামান্ত মাত্র বৃদ্ধি হওয়াই উচিত। এবং সে বৃদ্ধিও সকলের একই হারে করা উচিত। (৪) দোকানগুলিতে উপহার, কমিশন, লটারী, র‍্যাফেল ইত্যাদি করার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলাম কেনা-বেচার বৃদ্ধির জন্ত। সেগুলি তো বটেই, এবারে আরও দু'-একটি প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করছি। অনেক দোকানে সেলসম্যান বড় কম। পূজোর সময় বিশেষ করে দু'-এক জন লোক বেশী করা উচিত। আলাদা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া এখনই দরকার। বাইরের—মানে দোকানের অঙ্গসজ্জা করা একান্তই প্রয়োজন। লালশালুর ওপর কাপড় কেটে কেটে বা তুলো দিয়ে লিখে 'পূজা বাজারের আয়োজনের' ফেষ্টুন লাগালেই খুব বড় কিছু একটা করা হল, এ দৃষ্টিভঙ্গী পালটাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অবিলম্বে।

অল্প খরচায় ব্যবসা—কপির চাষ

কপি শীতের ফসল। এবং সত্যি কথা বলতে কি শীতকালের তরকারী হিসাবে কপিই যেন সকলের প্রিয়। কপি তিন প্রকার। ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি। শীতকালের প্রথম ফসল ফুলকপি, পরে বাঁধাকপি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওলকপি পাওয়া যায়। খাদ্যবস্তু হিসাবে তিন প্রকার কপিই উৎকৃষ্ট। তা ছাড়া যে কোনও প্রকারের কপিই হোক না কেন, তার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

ফুলকপির চাষ অতি লাভজনক ব্যবসায়। ঠিকমত ভাবে চাষ করতে পারলে প্রতি বিঘায় তিন-চারশো টাকা অবধি লাভ করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

ফুলকপি বালুকামিশ্রিত জমিতেই ভাল ফলে আর বাঁধাকপি ও ওলকপির জন্ত কাদা-মেশানো মাটিই শ্রেষ্ঠ। জলসেচন কপিচাষের জন্ত একান্ত ভাবে দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, এই জলসেচনের ওপরই কপির চাষের সব-কিছু নির্ভর করে। কপির সাইজ বড় হবে জল দিলে, চারা-গাছ বাঁচবে। কপির স্বাদ ভাল হবে। পুকুর বা কোনও ইন্দারার কাছে কপির চাষ করলে তা'তে করে জলসেচনের খরচা কম হবে, এমন কি কপি-কল করেও জল দেওয়া চলবে।

কপি চাষ করার প্রশস্ত সময় শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। সোজা দিকে আর আড়া-আড়ি ভাবে দু' প্রকারেই চাষ দিতে হবে জমিতে। এর পর মাটি গুঁড়া করা দরকার। ছোট-বড় আগাছা তুলে ফেলাও প্রয়োজন। কপি চাষের জন্ত জমি সমতল হওয়া চাই, খুব নরম হওয়াও দরকার। জমি নরম হলে তা'র ওপর গোবর-পচা সার দিতে হবে। পচা-গোবরের সার বিঘা-প্রতি ১০০-১৫০ মণ ব্যবহার করাই সঙ্গত।

জল সেচনের জন্ত ক্ষেতে জলপ্রণালী রাখাই কপি চাষের নিয়ম। এগুলি ২ ফুট প্রশস্ত ও ৩।৪ ইঞ্চি গভীর হয়। বাঁধাকপিতে সোরা-সার ব্যবহার করতে পারেন। ফল ভাল হবে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ বাঁধাকপিতে এ সার দিতে পারেন। সোরা দেবার সময় লক্ষ্য রাখবেন, যেন গাছের পাতায় গায়ে না লাগে। তা'তে করে পাতা পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফুলকপিতে সরষের খোল আর ওলকপিতে গোবরসহ ছাই দিলেও কাজ ভাল পাওয়া যায়। প্রতি-বিঘা বাঁধাকপির জন্ত তিন মণ সোরা সার, ফুলকপির জন্ত তিন মণ সরষের খোল, দেড় মণ চুণ বা ছাই এবং ওলকপির জন্ত ৩ মণ গোবরই যথেষ্ট।

১। ফাইল বা উকা—নানান সাইজের। রাউণ্ড, ফ্ল্যাট, হাফ-রাউণ্ড, স্কোয়ার 'পর পর সাজানো আছে। খালি ফ্ল্যাট আর হাফ-রাউণ্ড ফাইলের সাইড-ভিউ বা ধার থেকে দেখলে কেমন দেখাবে তাই দেখানো রয়েছে

২। থ্রি স্কোয়ার ফাইল—ট্রায়াঙ্গুলার ফাইলও বলে। তিন ধার। খুব বেশী কাজ হয় এতে।

প্রতি বিঘা জমি চাষ করতে এক ছটাকের মত বীজ লাগে। এক ছটাক বীজের দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মত। উৎকৃষ্ট পাটনাই বীজ লাগানোই শ্রেয়ঃ। তা'তে ফসল ভাল হয়।

কপির জন্য Seed Bed বা বীজজমি তৈরী করতে হয়। বীজ-জমির জন্য পচা-পাতা আর গোবরই উৎকৃষ্ট সার। এই জমি সাধারণতঃ জমি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে হয়। বীজজমি দরমা বা তালপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা দরকার। চারা-গাছকে পোকার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাঝে মাঝে ছাই দেওয়া উচিত। লাল-পিপীলিকার হাত থেকেও তা'তে রেহাই পাবেন। রোজ সকাল-বেলায় বীজ-জমির ঢাকনা খুলে দিতে হয় ২/৩ ঘণ্টার মত। রোদ না পেলে চারার বৃদ্ধি হয় না। ২/৩ তিন দিন অন্তর একটু একটু জল ছিটানোও উচিত।

গাছগুলি ৩/৪ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হ'লে অর্থাৎ চার-পাঁচটি পাতাবিশিষ্ট গাছ খুব সাবধানে বীজজমি থেকে তুলে জল-প্রণালীর ধারে ধারে একটা আন্দাজমত, ধরুণ, এক ফুট তফাতে লাগিয়ে দিন। বীজ-জমি থেকে চারা তোলবার সময় নজর রাখবেন যেন শিকড় ছিঁড়ে না যায়। বেশী রোদ হলে আড়াল দিয়ে দিয়ে কপিকে বাঁচানো উচিত। কচুপাতা দিয়ে বা কলাপাতা দিয়েই বেশীর ভাগ ঢাকা দেওয়া চলে। কপির জমিতে ৫।৬ বার জলসেচন করতে হয়।

প্রতি বিঘায় এক কি দেড় ফুট অন্তর কপি লাগালেও এবং ২ ফুট প্রশস্ত জলপ্রণালী দিয়েও প্রায় সাড়ে তিন হাজার কপি পাওয়া সম্ভব। কপি সাড়ে চার কি পাঁচ হাজার অবধি লাগানো যাবে। শতকরা ২০।২৫টি গাছ যদি নষ্টও হয় তবু আয়-ব্যয়ের হিসাব করলে প্রচুর লাভ পাওয়া যাবে।

আয়	ব্যয়	
২৫০০ কপির জন্য গড়ে দাম—৫০০৲ টাকার মত (গড়ে পাইকারী হিসাবে টাকায় পাঁচটি কপি পাওয়া যাবে, এই হিসাবই ধরলাম। স্থান-কাল-পাত্রভেদে দামের তফাৎ হওয়া খুবই সম্ভব।)	জমির খাজনা—	১৫৲
	জমিতে ৬ বার চাষ দেওয়া—	৩০৲
	জমি সমতল ও আগাছা শূন্য করা—	১০৲
অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় তিনশো টাকার মত লাভ করা মোটেই অসম্ভব নয়।	প্রণালী তৈরী—	১০৲
	চারা রোপণের ব্যয়—	১০৲
	সার—	২৫৲
	বীজ—	৪০৲
	চারা তোলবার খরচ—	২৫৲
	অন্যান্য খরচ—	২০৲
	মোট—	১৮৫৲

কপি চাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর Diamond back moth নামে এক প্রকার পোকা প্রায়ই লাগে। ঝারি-পিচকারি দিয়ে তামাকপাতা আর সাবানের জল ছিটান হ'লে এ পোকা মরে যায়। দুই গ্যালন জলে এক সের তামাক পাতা ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বা আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করে ঐ জলে এক পোয়া বার-সোপ মিশিয়ে কপিবাগানে দিলে উপকার পাবেন। পোকা লাগবে না।

যন্ত্রপাতির পরিচয়

গত সংখ্যায় স্প্যানার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেছে। এবারে আসছি কারিগরী বিভাগের আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ ফাইল বা উকার প্রসঙ্গে।

উকা বা ফাইল

ফাইল নানা আকারের এবং নানা সাইজেরও হয়। সাধারণ ভাবে কোনও অসমান অংশকে সমান করার জন্য, সমতল করার জন্যই ফাইলের কাজ। কোনও গর্তকে বড় করা, ডায়মেটার বা পরিধি বাড়ানো ইত্যাদির কাজেও এর ব্যবহার হয়।

মোট কয়েক রকমের ফাইল রয়েছে। রাউণ্ড ফাইল, ফ্ল্যাট-ফাইল, হাফরাউণ্ড ফাইল, স্কোয়ার ফাইল, থ্রি স্কোয়ার ফাইল, ক্রশ-কাট ফাইল আরও কত রকম! এ ছাড়াও সিঙ্গল-কাট নিডল ফাইল, ডবল-কাট নিডল ফাইল ইত্যাদি এনগ্রেভিং, লেটারিং, মেটাল ষ্টেন্সিল করার কাজেও ব্যবহার হয়। ফাইল মোটামুটি ষোল ইঞ্চি অবধি পাওয়া যাবে।

কাজের তফাতে দরকার অনুযায়ী ফাইলের ধার বা দাঁতও হয় নানা রকমের। ফাইলের 'কাট' অতি দরকারী বস্তু। এর ওপরই

কাজের ভাল-মন্দ নির্ভর করবে। কাজ অনুযায়ী 'কাট' ঠিক করে নিতে হয়।

মোটামুটি যে ক'রকমের 'কাট' পাওয়া যায় :

(১) Rough or extra rough cut.
(২) Rough cut.
(৩) Middle cut.
(৪) Bastard Cut.
(৫) Second Cut.
(৬) Smooth Cut.
(৭) Dead-Smooth Cut.

এতগুলি 'কাটের' ফাইল পাওয়া গেলেও, কিন্তু সাধারণ ভাবে ওয়ার্কশপে Rough, Second, Smooth আর Dead-Smooth Cut এরই কাজ হয় বেশী।

কোনও গোল জিনিষ বা মেসিন-পত্রের অংশে কাজ করার সময় হাফ-রাউণ্ড, রাউণ্ড ইত্যাদি উকা কাজে লাগে। ফ্ল্যাট, স্কোয়ার আর থ্রি-স্কোয়ার জায়গা-বিশেষে সব কাজেই লাগে। খুব ভাল করে টেম্পার করা, স্পেশাল হার্ড ষ্টীল থেকে তৈরী হয় ফাইল।

ফাইল করার পদ্ধতিও নানা রকমের। সাধারণ ভাবে ফাইল করার জন্য এক রকম ভাবে ফাইল করতে হবে। বাঁ-হাত আর ডান-হাত কি ভাবে কি রকম পজিসনে রাখতে হবে, চিত্রে দেখুন, সে অবস্থায়। খুব সূক্ষ্ম ভাবে ফাইল করতে হয় কখন কখন, সে সময় ফাইলের ব্লেডটাকে রাখতে হয় সোজা আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের পজিসনও লক্ষ্য করুন চিত্র মারফৎ। তৃতীয় পদ্ধতিটিকে বলে 'Draw-filing' work। হাতের পজিসন লক্ষ্য করুন। ব্লেড টানা এবং ঠ্যালার কায়দাটাও সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিন ছবিতে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কি ?

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অব ম্যাড্রাস, ব্যাঙ্ক অব বম্বে এই তিনটি ব্যাঙ্ককে একত্র করে ১৯২১ সালে তৈরী হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আসলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক্ষমতা এতেই যথেষ্ট কমে যায়। তবু ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ সালে সারা ভারত জুড়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৪৪৫টি। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাজের একটা ছক দিচ্ছি,

(হাজারের হিসাব ধরবেন)

সন	আদায়	রিজার্ভ	সরকারী আমানত	সাধারণের জমা
১৮৭০	৩,৩৬,২৫	২৫,৫৭	৫,৪৩,০৫	৬,৩৯,৬১
১৯২০	৩,৭৫,০০	৩,৭৭,৭৯	৯,০২,৬৩	৭৮,০১,৯০
১৯৪০	৫,৬২,৫০	৬,৬২,৫০	....	৯৬,০৩,১৭
১৯৫২	৫,৬২,৫০	৬,৩৫,০০	....	২০৫,৮৫,০০

১৯৩৫ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই সরকারী আমানতের কাজ করছে। শুধু যে সব জায়গায় সরকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নেই বা কম আছে সেখানে সরকারী কাজ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও করে এসেছে এত দিন।

১৮০৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ভারতের বে-সরকারী ইংরাজের সহায়তায় যে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক চালু হয়েছিল ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই, জাতীয় সরকার তা' ন্যাশানালাইজ করে ষ্টেট
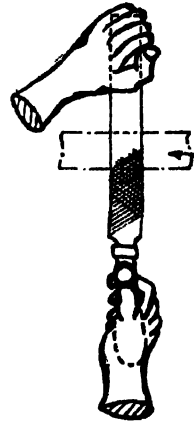
৩। ফাইল ঘষার পদ্ধতি—প্লেন করার জন্ম। সাধারণ কাজ। হাতের পজিসন্ লক্ষ্য করুন।
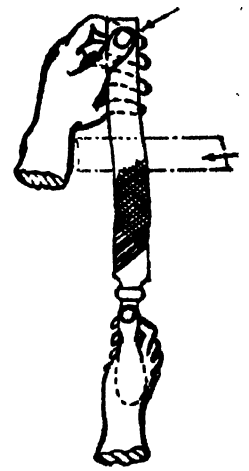
৪। ফাইল ঘষার পদ্ধতি—খুব আস্তে আস্তে কাজ করার সময়। খুব সূক্ষ্ম কাজ করার প্রয়োজনে।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পত্তন করলেন। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা সরকারী হলেও বে-সরকারী অর্থ সেখানে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ থাকবে। দেশের গ্রামে গ্রামে কৃষিঋণ দেওয়ার চেষ্টাও চলছে সঙ্গে সঙ্গে। জাতীয়করণের প্রথম সোপান হিসেবে এই ব্যবস্থাটিকে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি।

রাষ্ট্রীয় শ্রমিক-বীমা

ষ্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের কাজ নিয়ে সম্প্রতি কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে নানা গোলযোগ হয়ে গেছে। শ্রমিক-বীমার প্রিমিয়ম কাটবার সময় শ্রমিকদের একাংশ হাওড়ার কয়েকটি চটকলে এবং অন্য দুই-একটি স্থানে অবস্থান ধর্মঘট করেন। শ্রমিকরা বলেছেন যে, তাঁরা বীমা চান না। এই কারণেই শ্রমিক-বীমা সম্পর্কে আমরা কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু আলোচনা করবো স্থির করেছি।

১৯৪৩ সালে প্রফেসর আদারকরের চেষ্টায় এই বীমার কাজ শুরু করেন ভারত সরকার। ১৯৪৮ সালের ২রা এপ্রিল তা আইনে পরিণত হয়। পরে ১৯৫১ সালে এক বার তা সংশোধিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে আর কাণপুরে চালু হয়। এই বীমা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা কর্পোরেশনের নামে এক
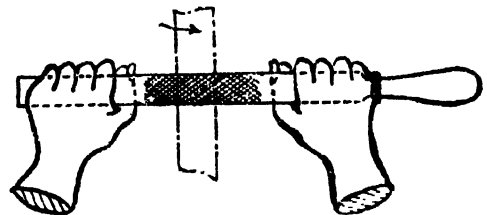
৫। ফাইল ঘষার পদ্ধতি—ইংরাজীতে বলে ড্র-ফাইলিং। চেপে কাজ করতে হয়। এখানেও হাতের পজিসন লক্ষ্য করুন

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত পাঁচ জন ব্যক্তি, ক ও খ রাজ্যগুলির প্রত্যেকটি থেকে এক জন করে মনোনীত ব্যক্তি, গ রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত এক জন করে প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত মালিকদের পাঁচ জন প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত শ্রমিকদের পাঁচ জন প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত দুই জন ডাক্তার প্রতিনিধি এবং সংসদের নির্ব্বাচিত দু'জন সদস্য।

এই পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কাণপুর, দিল্লী। সমগ্র দেশে এই আইনের আওতায় নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন ১৪ হাজার কারখানার প্রায় ২৫ লক্ষ শ্রমিক।

বীমা পরিকল্পনা ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ কি কি সুবিধা পেতে পারবেন।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

শ্রমিকদের অসুস্থকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হবে। 'এক্সরে', মল, মূত্র, রক্ত, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষা বিনাব্যয়ে করাতে পারবেন এমন বন্দোবস্ত থাকবে। প্রয়োজন মত হাসপাতালে রেখে বা বিশেষজ্ঞ দিয়েও চিকিৎসা করানো যাবে। এজন্য বীমা কর্পোরেশন প্যানেল ডাক্তার নিয়োগ, আউটডোর ডিসপেন্সারী এবং অতিরিক্ত হাসপাতালের বা স্থায়ী হাসপাতালগুলিতে অতিরিক্ত বেডের ব্যবস্থা করবেন। এই জন্য প্যানেল ডাক্তার শ্রমিক-পিছু ৬।৹ টাকা করে কর্পোরেশন থেকে পাবেন। যে কোনও প্যানেল ডাক্তারের কাছে ১০০০ শ্রমিক নাম লেখাতে পারবেন। কর্পোরেশন প্রতি ৮০০ জন শ্রমিকের জন্য একটি হসপিটাল-বেড, প্রতি ১৬০০ জন শ্রমিকের জন্য একটি যক্ষ্মা-বেড এবং প্রয়োজনমত হাসপাতাল রাখবেন। কেবলমাত্র বীমাকৃত শ্রমিক এসব সুবিধা পাবেন।

শ্রমিক-বীমা প্রতি সভ্যরাষ্ট্রেই রয়েছে। শ্রমিক-বীমা শ্রমিকদেরই শুভ ফলদায়ক। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা আগামী সংখ্যায় করব।

'আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি' কি 'শো'?

নাম শুনেছেন কেউ? ব্যবসায়ী সমিতিগুলি সম্পর্কে এর আগে আমরা বহু আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা করছি সেই সমিতির অধিকতর নতুন কয়েকটি দিক দিয়ে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থে প্রতিপালিত কয়েকটি সমিতি সম্প্রতি বাঙলা দেশে গজিয়েছে। মোটা মোটা চাঁদা দিয়ে নানা দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এদের পুষে থাকেন। খুব বড় বড় গালভরা নাম হয় এদের। কাজের খুব বড় বড় ফিরিস্তি থাকে। কিন্তু অষ্টরম্ভা! একটা জার্নাল থাকে যার পঞ্চাশ পাতার মধ্যে ত্রিশ পাতা বিজ্ঞাপন আর আজে-বাজে কথা দিয়ে ভর্ত্তি গাদা খানেক হাফ-টোন ব্লক চড়িয়ে, দামী কাগজে ছেপে কর্মকর্ত্তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ বেশ ভালই গুছিয়ে নেন। প্রায়ই অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরী হয় এগুলি। পরিচালনার ভার থাকে এদের ওপরেই। ফলে ন'মণ তেলও পোড়ে না, রাধাও নাচে না। আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি, 'কোয়ালিটি কনট্রোল' কত সব মজার মজার নাম! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এদের কাজটা কি? ইণ্ডাষ্ট্রিকে কতখানি আর্ট এরা জুগিয়েছেন? কাপড়, জামা, ছিটের কোনও ডিজাইন, ডবি, প্যাকিং, লেবেল কোথাও কোনও উন্নতি এঁরা কি ঘটিয়েছেন? কুটীর-শিল্পের দিকে চেয়েছেন? দ্রব্য-মানের কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে? বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্ত্তাগণের এদিকে একটুও নজর নেই কেন? কতকগুলো 'স্নব'কে পোষবার জন্য পয়সা খরচ করে এ 'শো' বজায় রাখার কি মানে, অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলবেন কেউ? আমরা বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরকেও এ বিষয়ে খোলাখুলি প্রশ্ন করছি।

ওরা

শ্রীঅমিতা চট্টোপাধ্যায়

ট্রেণ এসে গেছে; জনতা-সমুদ্রে ওঠে প্রচণ্ড কল্লোল
'বন্দে মাতরম্!'
ওরা এসে গেছে; ফুলের পাহাড় ওঠে জমে
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের শ্রদ্ধা অবদান।
তে-রঙা পতাকা আর অশ্রুর মালায়
ঢাকা পড়ে যায় সব, নিরুদ্ধ নয়ন।
ওরা এসে গেছে নিত্যানন্দ যাদবের দল,
জনতার মহারণ্যে পুষ্পিত পাদপ;
ওদের বুকের রক্তে ফুটে ওঠে ফুল।
মৃত্যুর তমসা-গর্ভে অমৃতের বীজ।

বেয়নেট বন্দুক আর লাঠির আঘাতে
ওরা মরে নাকো—শুধু রেখে যায়
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে ভবিষ্যের বীজ।
কালের ভাণ্ডারে জমে প্রাণের সঞ্চয়
ওদের প্রাণের রসে পুষ্ট হয়ে ওঠে
অনাগত ভবিষ্যের বিরাট শাল্মলী।
ওদের প্রাণের দীপশিখা—
লক্ষ প্রাণে জ্বেলে দেয় দীপালী-উৎসব।
সে আলোকে অভিষেক দেশ-মাতৃকার।
অমৃতের অধিকারী ওরাই বিশ্বের।

ওরা পথ-প্রদর্শক যোগ্য কর্ণধার।
সত্যাশ্রয়ী সত্যাগ্রহী সত্যের সাধক,
বিংশ শতাব্দীর নব দধীচির দল
শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ের লহ নমস্কার!

জেনেভা সম্মেলনের পরে—

জেনেভায় বৃহৎ চারি-রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের সাফল্য এক দিকে যেমন আশাবাদের আতিশয্য সৃষ্টি করিয়াছে আর এক দিকে তেমনি এই সাফল্যকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টাও যে চলিতেছে না তাহা নয়। এই সাফল্যের সম্মুখে যে বৃহৎ অগ্নিপরীক্ষা আসিতেছে, আগামী অক্টোবর (১৯৫৫) মাসে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে, সে-কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য্য। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের মূলে যে চারিটি প্রধান সমস্যা রহিয়াছে বলিয়া জেনেভা সম্মেলনে স্বীকৃত হইয়াছে সে-গুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধান একমত হইয়া পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। তদনুযায়ী অক্টোবর মাসে বৃহৎ চারি পররাষ্ট্র-সচিবের সম্মেলন হইবে। তাঁহাদের এই সম্মেলনেই সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে, এতখানি আশা করা অবশ্যই সম্ভব নয়। বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের সাফল্য যে আশাবাদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে সমাধানের প্রচেষ্টায় একাধিক বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন হইবে, এইরূপ আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে গত ২৯শে জুলাই (১৯৫৫) নিউইয়র্কে পঞ্চশক্তি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। জেনেভা সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, এই পঞ্চশক্তি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। অধিবেশনের সভাপতির আসন হইতে রুশ-প্রতিনিধি গত মে মাসে (১৯৫৫) নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটিতে রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহারই পুনরালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জেনেভা-সম্মেলনে বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের প্রত্যক্ষ অনুরোধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটির প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন। গত জুন মাসে (১৯৫৫) এই নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটির অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

পঞ্চশক্তি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটিই শুধু প্রতিনিধি দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধিবেশনগুলি যথারীতি গোপনেই হইতেছে। তথাপি ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, আলোচনার অগ্রগতি অত্যন্ত অসন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। খুব তাড়াতাড়ি চমকপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে, ইহা আশা করাও সম্ভব নয়। জেনেভার সাফল্যের শুভ-প্রতিক্রিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে দেখা যাইতেছে না তাহাও নয়।

জেনেভায় বৃহৎ রাষ্ট্র-প্রধানদের বৈঠকে সুদূর প্রাচ্যের কোন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব হয় নাই বলিয়া মার্শাল বুলগানিন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখ প্রকাশের সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে। বর্ত্তমানে ইউরোপ অপেক্ষা সুদূর প্রাচ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলনে সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা না হইলেও ঘরোয়া ভাবে নাকি এ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। উভয় দেশের অসামরিক বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে গত ১লা আগষ্ট (১৯৫৫) জেনেভায় যে চীন-মার্কিণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে জেনেভা সম্মেলনের সাফল্যকে সুদৃঢ় করিবার প্রয়াসই দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি হওয়ার পর কম্যুনিষ্ট চীন ১৫ জন মার্কিণ সামরিক বন্দীকে মুক্তি না দেওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে উহা নূতন আর একটি বিরোধের কারণে পরিণত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এই বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশে উহার সেক্রেটারী জেঃ হ্যামারশিল্ডের পিকিংয়ে যাইয়া এ-সম্পর্কে আলোচনা করা, নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী ফরমোসা সম্পর্কে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে কম্যুনিষ্ট চীনকে আমন্ত্রণ, কম্যুনিষ্ট চীন কর্ত্তৃক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বিষয় লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। গত জুন মাসে (১৯৫৫) কম্যুনিষ্ট চীন চারি জন মার্কিণ বৈমানিককে মুক্তিদান করে। জেনেভায় চীন-মার্কিণ আলোচনা আরম্ভ হওয়ার দিন অবশিষ্ট ১১ জন মার্কিণ বৈমানিককে মুক্তিদান করা হইয়াছে। চীনে এখন আর কোন মার্কিণ সামরিক বন্দী নাই; কিন্তু অসামরিক মার্কিণ বন্দী আছে ৪১ জন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নাকি প্রায় পাঁচ হাজার চীনা ছাত্র আটক রহিয়াছে। চারি জন মার্কিণ বৈমানিককে যখন মুক্তি দেওয়া হয় সেই সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও কিছু সংখ্যক চীনা ছাত্রকে 'এক্সিট ভিসা' দিয়াছিলেন।

জেনেভায় যে চীন-মার্কিণ আলোচনা চলিতেছে, তাহা রাষ্ট্রদূতের স্তরে আলোচনা। চেকোশ্লোভাকিয়াস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ এলেক্সি জনসন এবং পোল্যাণ্ডস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূত মিঃ ৱোং পিং নানের মধ্যে এই আলোচনা চলিতেছে। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া হইলেও এই আলোচনার অগ্রগতি এখন পর্য্যন্তও আশাপ্রদ বলিয়াই

মনে হইতেছে। এই চীন-মার্কিণ আলোচনা আরও উচ্চস্তরে হওয়ার সম্ভাবনাও যে একেবারে নাই তাহাও নয়। প্রেঃ আইসেন-হাওয়ার গত ২৭শে জুলাই (১৯৫৫) সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রদূতের স্তরে চীন-মার্কিণ আলোচনা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজন হইতে পারে। ৩০শে জুলাই (১৯৫৫) চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফরমোসার মুক্তির জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ চিয়াং কাইশেক) সহিত আলোচনা চালাইতে এবং একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফরমোসাকে মুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল ঘটনা যেমন শান্তির সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে, তেমনি জেনেভা সম্মেলনের সাফল্যকে ব্যর্থ করিবার জন্য পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রয়াসও যে চলিতেছে না, তাহাও নয়।

মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের উল্লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস গত ২রা আগষ্ট (১৯৫৫) সাংবাদিক-সম্মেলনে বলেন যে, "the U. S. A. hoped eventually to obtain from China a declaration renouncing the use of force." কম্যুনিষ্ট চীন শক্তি প্রয়োগ বর্জ্জন করায় মিঃ ডালেস খুব খুসী হইয়াছেন, কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনের এই শক্তি-প্রয়োগ বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি বর্জ্জন করিবে, সে সম্বন্ধে তিনি কোন ইঙ্গিতই প্রদান করেন নাই। বরং তিনি স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীনের শক্তিপ্রয়োগ নীতি বর্জ্জনের মূল্যস্বরূপ সিয়াটো ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাই। জেনেভা সম্মেলন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যেমন এক দিকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন, আর এক দিকে তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধে তোষণ নীতির অভিযোগও উঠিয়াছে। কিন্তু শান্তির জন্য চেষ্টা করিতে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ বর্জ্জনের জন্য আগ্রহে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন মানুষ এবং জাতি সমূহের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছে, তাহা তিনি মানিয়া লইবেন না। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য কি, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। তাঁহার এই উক্তি ঠাণ্ডাযুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হওয়ার সূচনা বলিয়াই কি মনে হয় না? প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের উল্লিখিত উক্তির সঙ্গে ইন্দোচীন ও দক্ষিণ-কোরিয়ার ঘটনাবলীর কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইন্দোচীন, ফরমোসা এবং কোরিয়া যে বর্ত্তমানে এশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অঞ্চল, এ-কথা অনস্বীকার্য্য। গত বৎসর জেনেভায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইন্দোচীন সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় যে-আশার সঞ্চার হইয়াছিল, প্রথম হইতেই তাহাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান এখানে নাই। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ভিয়েটনামে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার কথা, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ২০শে জুলাই (১৯৫৫) তারিখে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েটনামের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। দক্ষিণ ভিয়েটনামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ দিয়েম তাহাতে রাজী হন নাই। অধিকন্তু জেনেভায় বৃহৎ রাষ্ট্র-প্রধানদের সম্মেলন চলিতে থাকার সময়ই গত ২০শে জুলাই মিঃ দিয়েমের সমর্থকগণ শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শনই করে নাই, সাইগণের দুইটি হোটেলের যে-গৃহে ইন্দোচীন ট্রুস কণ্ট্রোল কমিশনের সদস্যগণ বাস করেন সেগুলিও আক্রমণ করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনেভা সম্মেলনের কো-চেয়ারম্যান মঃ মলটভের চেষ্টায় বৃহৎ চতুঃশক্তি আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিতে এবং জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দক্ষিণ ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। মিঃ দিয়েম যে এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তিনি স্বাধীন ভাবে এই মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত এবং সমর্থন না থাকিলে মিঃ দিয়েম জেনেভা চুক্তি ভঙ্গ করিতে সাহস করিতেন না। মিঃ দিয়েম দ্বিতীয় সীংম্যান রী হইয়া উঠিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সাইগনের হাঙ্গামা হইতে দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সীংম্যান রী যেন নূতন এক পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ জাতি পরিদর্শক কমিশনের নিকট এক চরম পত্র দিয়া তাঁহাদিগকে ১৩ই আগষ্টের মধ্যে চলিয়া যাইবার দাবী করেন। ইহার পর দক্ষিণ-কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট এক ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ বিরতির ফলে দক্ষিণ-কোরিয়ার যে-অঞ্চল হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহা দখল করিয়া

লইবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত আছেন। নিরপেক্ষ জাতি পরিদর্শক কমিশনকে চরম পত্র দেওয়ার পর ডাঃ সীংম্যান রীর সমর্থকগণ কমিশনকে অবিলম্বে চলিয়া যাইবার দাবীর ধ্বনি তুলিয়া গত ৭ই আগষ্ট (১৯৫৫) বিপুল ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এখানে এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবরণ দেওয়ার স্থানাভাব। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জেনেভায় বৃহৎ রাষ্ট্রনায়কদের সম্মেলন আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে গত ১৫ই জুলাই (১৯৫৫) দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান সামরিক নেতারা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ-বিরতি বিধি-বহির্ভূত ঘোষণা করেন এবং শীঘ্রই উত্তর-কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, বলিয়া হুমকীও উহাতে দেওয়া হয়। উত্তর-কোরিয়া অভিযানে বিরত থাকার যে-পাঁচটি সর্ত্ত তাঁহারা দাবী করেন, তন্মধ্যে নিরপেক্ষ জাতি পরিদর্শক কমিশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া অন্ততম। অন্ত কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য ব্যতীত-ই দক্ষিণ-কোরিয়া উত্তর-কোরিয়ায় সামরিক অভিযান চালাইবে, ইহা মনে করিবার অবশ্যই কোন কারণ নাই। তথাপি এই ধরণের হুমকীর বিশেষ একটা যে তাৎপর্য্য আছে, সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই ঘোষণা করিবার জন্ত যে সময়টি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারাই উহার উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্য কতখানি সাফল্য লাভ করিবে, তাহা বলা কঠিন। দক্ষিণ-কোরিয়া যেমন মার্কিণ সামরিক সাহায্য ব্যতীত উত্তর কোরিয়া অভিযান চালাইতে সাহস করিবে না, তেমনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তাহার মিত্রশক্তিবর্গকে সঙ্গে না লইয়া নূতন কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে চাহিবে না। প্রকৃতপক্ষে যে-দুইটি সামরিক শক্তি তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারে সেই দুইটি সামরিক শক্তি—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া—বর্ত্তমানে যুদ্ধ এড়াইয়া চলিবারই পক্ষপাতী। বৃটেন ও ফ্রান্সও যুদ্ধ চায় না। কোন সমস্তার সমাধান হউক আর না-ই হউক তাহারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবারই পক্ষপাতী। উহা-ই জেনেভা সম্মেলনের সাফল্যের একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাফল্য আপাততঃ শুধু দৃষ্টতঃ হইলেও ভুল বুঝাবুঝি ও অবিশ্বাস দূর হওয়ার এবং শুভেচ্ছা ও সহাবস্থান নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযোগী আবহাওয়া যে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইহা চাহেন না তাঁহারা জেনেভা সম্মেলনের সাফল্যকে ব্যর্থ করিবার জন্ত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। বৃহৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অক্টোবর সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত উহা আরও তীব্র আকার ধারণ করিবে কি না, তাহা বলা কঠিন।

মরক্কো ও আলজিরিয়া—

মরক্কো এবং আলজিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক ও কঠোর দমননীতি অনুসরণ করিয়া দমন করিতে পারেন নাই। এই সংগ্রাম চলিতেছে কখনও স্তিমিত ভাবে, কখনও বা প্রবল বিস্ফোরণের মধ্যে হইতেছে উহার অভিব্যক্তি। মরক্কোর সুলতান মহম্মদ বেন ইউসুফের অপসারণ ও নির্ব্বাসনের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে মরক্কোর অধিবাসীরা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হয় এক ব্যাপক হাঙ্গামা। ঐ সময় আলজিরিয়াতেও প্রবল সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থান হয়। ফ্রান্সের অধীনস্থ এই দুইটি দেশে গত ২০শে আগষ্ট (১৯৫৫) যে হাঙ্গামা হয়, তাহার ফলে এক শত জন ইউরোপীয় সহ ৪৫৪ জনেরও অধিক লোক নিহত এবং ১১১ জন লোক আহত হয়। ইহার পর ফ্রান্সের দমন-নীতি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থার সৈন্তবাহিনীর অঙ্গীভূত ফরাসীবাহিনী এই স্বাধীনতা-আন্দোলন দমনের জন্ত ফরাসী গবর্ণমেণ্ট উত্তর-আফ্রিকায় প্রেরণ করিয়াছেন। এই সৈন্তবাহিনী ফ্রান্সের নিজের হইলেও উহার সমস্ত রকম ব্যয়ভার উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থাই বহন করিয়া থাকে। সুতরাং এই সৈন্তবাহিনী ফ্রান্সের হইলেও উহা আর ফ্রান্সের নাই, উহা উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থার। ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থার বাহিনীই স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্ত উত্তর-আফ্রিকায় পাঠাইয়াছে। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থা বা উহার কোন সদস্য ইহাতে আপত্তি করেন নাই। কাজেই এই চুক্তি-সংস্থা যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের উপনিবেশগুলি রক্ষার জন্ত গঠিত হইয়াছে, এই ব্যাপারে এই ধারণা আরও অধিকতর দৃঢ়মূল হইয়াছে। বস্তুতঃ, মিশরের প্রধান মন্ত্রী কর্ণেল নাসের উহাকে আরবদের বিরুদ্ধে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থার শত্রুতামূলক কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অবশ্য মরক্কোকে একটা শাসন-সংস্কার দিবারও আয়োজন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে উদার মনোভাবসম্পন্ন মঃ গ্র্যাণ্ডভেলকে মরক্কোর রেসিডেণ্ট জেনারেল করিয়া পাঠান হয়। কিন্তু মরক্কোকে শাসন-সংস্কার দিতে মঃ গ্র্যাণ্ডভেলের অভিপ্রায় কলোনদের অর্থাৎ মরক্কোস্থিত ফরাসীদের মনঃপূত হয় নাই। ফ্রান্সের জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের দিন ১৪ই জুলাই (১৯৫৫) তাহারা প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ প্রদর্শন উপলক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গামা, বোমা-বিস্ফোরণ ও মরক্কোবাসীদের হত্যা করাও চলিয়াছিল, এমন কি তাহাদের হাত হইতে রেসিডেণ্ট জেনারেল মঃ গ্র্যাণ্ডভেলও নিস্তার পান নাই। তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে, এমন কি লাথিও মারিয়াছে। তিনি শাসন-সংস্কার দিবার জন্ত যে প্রস্তাব করেন তাহা আসলে কিছুই নয়। তাঁহার প্রস্তাব হইল এই যে, মরক্কোকে একটা শাসন-সংস্কার দিতে হইবে এবং বর্ত্তমান সুলতানের পরিবর্ত্তে নূতন কোন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু ইস্তিকলাল দল নির্ব্বাসিত সুলতানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার দাবী করে। মঃ গ্র্যাণ্ডভেল চাহিয়াছিলেন ২০শে আগষ্টের পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইবে। ঐ তারিখে মরক্কোর সুলতানের নির্ব্বাসনের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে প্রবল অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করিয়া উহা নিরোধের জন্তই এই প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সুলতান মহম্মদ বেন আরাফানকে সকল দল লইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্ত যথেষ্ট সময় দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে বিলম্ব করেন।

মঃ গ্র্যাণ্ডভেলের প্রস্তাব ২০শে আগষ্টের পূর্ব্বে কার্য্যকরী করা হইলে এই হাঙ্গামা রোধ করা যাইত কি না, এখন এই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হওয়ার মূল্যস্বরূপ মঃ গ্র্যাণ্ডভেলকে মরক্কোর রেসিডেণ্ট জেনারেলের পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সুলতান মহম্মদ বেন আরাফানের স্থলে একটি রিজেন্সী কাউন্সিল গঠন করা হইবে এবং এই রেজেন্সী কাউন্সিল ১২ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মরক্কোর সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া যে-গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন সেই গবর্ণমেণ্ট শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চালাইবেন।

কাজেই, আলোচনার ফল কি হইবে, মরক্কো কিরূপ শাসন-সংস্কার পাইবে, উহাতে ইস্তিকলাল দল সন্তুষ্ট হইবে কি না, সে-সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এদিকে মরক্কো এবং আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের দমননীতি প্রচণ্ড ভাবেই চলিতেছে।

মরক্কোকে যৎসামান্য স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু আলজিরিয়াকে তাহাও দিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। তাঁহাদের দৃষ্টিতে টিউনিশিয়া ও মরক্কো আশ্রিত রাজ্য, কিন্তু আলজিরিয়া ফ্রান্সেরই একটা অংশবিশেষ। আলজিরিয়াকে তাঁহারা সম্প্রসারিত ফ্রান্স বলিয়াই মনে করেন। কারণ, আলজিরিয়াকে তাঁহারা জয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ১৯৪৭ সালে 'আলজিরিয়ান ষ্টেটিউট' গৃহীত হইবার পর আলজিরিয়ার জন্য আর কিছু করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মনে করেন না। আলজিরিয়ার অধিবাসীরা ফ্রান্সেরই নাগরিক, একথা আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী দল Movement for the Triumph of Democratic Liberties-এর মনে দাগ কাটিতে পারে নাই। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট উহাকে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর দল বলিয়া মনে করেন। এই দলের কার্য্যকলাপকে তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে সেতিফ অঞ্চলে ব্যর্থ বিদ্রোহের পর ১৯৫৪ সালের নবেম্বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আলজিরিয়ায় অশান্তি বড় দেখা দেয় নাই। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ১লা নবেম্বর পূর্ব্বে আলজিরিয়ায় আবার যেন আকস্মিক ভাবেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তার পর আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়, গত ২০শে আগষ্ট (১৯৫৫)। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের নেতা মেসালি হাদীকে ১৯৫২ সালে ফ্রান্সে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

আলজিরিয়া মেট্রোপলিটান ফ্রান্সেরই অঙ্গ, উহার অধিবাসীরা ফ্রান্সের নাগরিকদের সমান অধিকার ভোগ করে, ইহাতে ৭০ লক্ষ মুসলিম আরব ১০ লক্ষ মুসলিম বারবার এবং অরেস ও সাহারা অঞ্চলের নিগ্রোজাতীয় লোকদের আনন্দিত হইবার কিছুই নাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বিষয়েই কোন উন্নতি তাহাদের হয় নাই। যাহা কিছু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সমস্তই ভোগ করিতেছে আলজিরিয়াস্থিত ১০ লক্ষ ইউরোপীয়।

সাইপ্রাস সমস্যা—

সাইপ্রাস সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটেন, তুরস্ক ও গ্রীসের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ গত ২৯শে আগষ্ট (১৯৫৫) লণ্ডনে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। দশ দিন আলোচনার পর ৭ই সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলন সম্মেলনে বলেন যে, বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্বের অধীনে সাইপ্রাসকে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দিতে বৃটেন রাজী আছে। এই দিনই রাত্রে তুরস্কের তিনটি সহর ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা এবং ইজমিরে গ্রীক-বিরোধী হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। হাঙ্গামাকারীরা জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া 'সাইপ্রাস তুরস্কের' এই

ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ১১টি গ্রীক গীর্জায় অগ্নিসংযোগ করা হয়, গ্রীকদের দোকানপাট, বাসগৃহ লুণ্ঠিত হয়। ইজমিরে অবস্থিত ন্যাটোর ১৫ জন গ্রীক অফিসার পর্য্যন্ত আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তুরস্কের এই তিনটি সহরে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। এই গ্রীক-বিরোধী বিক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) উত্তর-আটলাণ্টিক কাউন্সিলের অধিবেশন পর্য্যন্ত হইয়াছে। সুতরাং একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না যে, সাইপ্রাস সম্পর্কে আলোচনার জন্য লণ্ডনে যে-সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, উহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে তুরস্কের তিনটি সহরে গ্রীক-বিরোধী হাঙ্গামার মধ্যে। এই অবস্থায় বিশ্ববাসীর মনে স্বাভাবিকই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, সাইপ্রাস সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল কেন? এই সম্মেলনের কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ শাসনের অধীনে সাইপ্রাসকে স্বায়ত্তশাসন দিতে চান, একথা বলিবার জন্য এইরূপ সম্মেলন আহ্বানের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই ধরণের ঘোষণা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক বার করিয়াছেন ১৯৪৮ সালে, আর এক বার করিয়াছেন ১৯৫৪ সালে। কিন্তু এই দুই বারই গ্রীক সাইপ্রিয়টরা এই ধরণের স্বায়ত্ত শাসন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদের দাবী 'এনোসিস্' অর্থাৎ গ্রীসের সহিত যুক্ত হওয়া। সাইপ্রাসে গ্রীক সাইপ্রিয়টদের সংখ্যা ৪ লক্ষ এবং তুর্কী সাইপ্রিয়টদের সংখ্যা এক লক্ষ। এই এক লক্ষ তুর্কী সাইপ্রিয়টদের কথা ভাবিয়া তুরস্ক সাইপ্রাসের গ্রীসের সহিত যুক্ত হওয়ার ঘোর বিরোধী। তুরস্ক চায় সাইপ্রাস যেমন বৃটিশের অধীনে আছে তেমনি থাকুক, আর সাইপ্রাসের শাসন কর্তৃত্ব যদি অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর করিতে হয়, তবে তুরস্কই তাহা পাওয়ার অধিকারী। এই কথাটাও নূতন নয়। গ্রীস অবশ্য চায় যে, সাইপ্রাস গ্রীসের সহিত-ই যুক্ত হউক। একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, সাইপ্রাস সম্বন্ধে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করার জন্যই লণ্ডনে এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। সুয়েজখাল হস্তচ্যুত হওয়ার পর সাইপ্রাসই পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। বৃটেন এই ঘাঁটি ছাড়িতে রাজী নয়। সাইপ্রাসের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে বৃটেন ও তুরস্কের মধ্যে মতভেদ নাই। এই অবস্থায় গ্রীসের দাবীর যে কোন মূল্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই অর্থহীন সম্মেলনের কোন প্রয়াজন ছিল কি? প্রয়োজন অবশ্য থাকিতে পারে গ্রীসকে সমঝাইয়া দিবার জন্য যে, 'দেখ, গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসকে যুক্ত করার নামেই তুরস্কে কিরূপ গ্রীক-বিরোধী হাঙ্গামা বাঁধিয়া গেল, আর যুক্ত হইলে ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে।' কিন্তু কি ঘটিতে পারে? গ্রীস ও তুরস্ক উভয়েই উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থার সদস্য। তাহারা বলকান সামরিক চুক্তিরও সদস্য। কাজেই সাইপ্রাস লইয়া গ্রীস ও তুরস্কে যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা নাই। তুরস্কে গ্রীক-বিরোধী হাঙ্গামা হইয়াছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সাইপ্রাসেও যে হাঙ্গামা হয় নাই তাহাও নয়। বৃটেন সাইপ্রাসকে সামরিক শক্তি দ্বারা দাবাইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু উহা চির অশান্তির স্থান হইয়া থাকিবে। সামরিক ঘাঁটির উদ্দেশ্য উহাতে সিদ্ধ হইবে কি?

গাজা-সীমান্তে সংঘর্ষ—

আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা বিশ্ববাসীর মন এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন বিপজ্জনক অঞ্চলের কথা মনের অতল তলে তলাইয়া গিয়াছিল। জেনেভায় বৃহৎ রাষ্ট্র-প্রধানদের সম্মেলনের পর আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা অনেকটা দূরে সরিয়া যাওয়ায় আবার যেন এই সকল অঞ্চলের বিপজ্জনক অবস্থা আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তন্মধ্যে গাজা যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই আজ সহাবস্থান নীতির জয়ের কথা শোনা যাইতেছে। কিন্তু মধ্য প্রাচীতে আরব ও ইসরাইলদের মধ্যে সহাবস্থান নীতির প্রতি কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে গাজা-সীমান্তে মিশর ও ইসরাইলদের মধ্যে সংঘর্ষের পর গত ২২শে আগষ্ট (১৯৫৫) আবার সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান যুদ্ধ-বিরতি পরিদর্শক মেজর জেনারেল বার্ণের চেষ্টায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) মিশর ও ইসরাইল উভয় পক্ষই গাজা-সীমান্তে সংঘর্ষ বন্ধ করিতে সম্মত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির কয়েক ঘণ্টা পরেই ইসরাইল রাষ্ট্র এই চুক্তি ভঙ্গ করে। অবশ্য ইহার জন্য ইসরাইল মিশরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। ইসরাইল-মিশর মিশ্র যুদ্ধ-বিরতি কমিশন ২২শে আগষ্ট তারিখের ঘটনার জন্য উভয়পক্ষকেই অবশ্য দায়ী করিয়াছেন। এই সংঘর্ষ বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রায় এক পক্ষ কাল স্থায়ী হইয়াছে এবং উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এক শতেরও অধিক।

গাজা-সীমান্তে এই সংঘর্ষে পশ্চিমী শক্তিবর্গ উদ্বিগ্ন হইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। ইসরাইল-মিশর সংঘর্ষের পরিণতিতে আরব-ইসরাইলের মধ্যে পুনরায় ব্যাপক যুদ্ধ বাধিয়া উঠার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) জর্ডান সুপ্রীম ডিফেন্স কাউন্সিলের অধিবেশনের পর সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, আরব-ইসরাইল সীমান্তের কোন অংশ লঙ্ঘন করা হইলেই আরব যৌথ নিরাপত্তা-চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র আরব-সীমান্তই লঙ্ঘন করা বুঝায়। ইহার পূর্ব্বে ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) ইরাক মিশরকে জানায় যে, সে মিশরকে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য দিতে প্রস্তুত। ঐদিনই সিরিয়ার রেডিও হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ইসরাইল রাষ্ট্রকে মরণ আঘাত হানিবার জন্য আরবরাষ্ট্র সমূহ উহার চারি দিকে সৈন্যসমাবেশ করিতেছে। আরব রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই ইসরাইল রাষ্ট্রের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না, তাহা বলা হয়ত সম্ভব নয়। সোভিয়েট রাশিয়া আরবরাষ্ট্র সমূহকে অস্ত্রসাহায্য দিতে চাহিয়াছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে, তাহার গুরুত্ব বোধ হয় একেবারে অস্বীকার করা যায় না। রাশিয়া ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিয়া আরবরাষ্ট্রগুলিকে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিলে বিস্ময়ের বিষয় না-ও হইতে পারে। পাছে আরবরাষ্ট্রসমূহ সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে ঢলিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় পশ্চিমী শক্তিবর্গ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে, ইহাও স্বাভাবিক।

১৯৫০ সালে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স মিলিত ভাবে এক ত্রিপক্ষীয় ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণায় আরবরাষ্ট্র সমূহ ও ইসরাইল রাষ্ট্রের শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার এবং সীমান্ত লঙ্ঘিত হইলে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

গত ২৬শে আগষ্ট (১৯৫৫) মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস ঘোষণা করেন যে, বলপূর্ব্বক আরব-ইসরাইল সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য চুক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করিতে রাজী আছে। আরবরাষ্ট্রসমূহ এই ঘোষণাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা আরব-রাষ্ট্রগুলিকে ইসরাইলের খপ্পরে নিক্ষেপ করা বলিয়াই মনে হইয়াছে।

মিঃ ডালেস মনে করেন, প্রধান আরব-ইসরাইল সমস্যা তিনটি: (১) নয় লক্ষ আরব উদ্বাস্তু সমস্যা, (২) পুনরায় যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা এবং (৩) আরবরাষ্ট্র-সমূহ ও ইসরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট সীমান্ত না থাকা। কিন্তু সীমান্ত সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে নির্দ্ধারিত হইলেই আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ বন্ধ হইবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। আসল সমস্যাটা সীমান্তের সমস্যা নয়। ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বই আরব রাষ্ট্রসমূহ বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না, ইহা-ই প্রধান ও একমাত্র সমস্যা। ইসরাইলের পক্ষে আরব উদ্বাস্তুদিগকে ফিরাইয়া লওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অন্যান্য দেশ হইতে এত ইহুদী ইসরাইল রাষ্ট্রে গিয়াছে যে, তাহাদেরই স্থান সঙ্কুলান করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আরব উদ্বাস্তুদিগকে গ্রহণের জন্য এই সকল ইহুদীকে অপসারিত করিতে ইসরাইল রাষ্ট্র রাজী নহেন। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে আরবরাষ্ট্রগুলিতে এই সকল উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসন সম্ভব হইতে পারিত। হইতেছে না শুধু ইউ-এন-আর-ডব্লু-এর সাহায্য বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায়, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

ডাঃ এডেনারের মস্কো মিশন—

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ কনরাড এডেনার ৯ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে সোভিয়েট নেতাদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনার প্রথম দিকে পূর্ব ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে ঐক্য বিধান, রাশিয়ায় আটক-জার্ম্মাণ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা লইয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ও পশ্চিম-জার্ম্মাণ নেতৃবর্গ রাশিয়ায় আটক জার্ম্মান-বন্দীদের মুক্তিদান এবং উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে এক মত হইয়াছেন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গত ৭ই জুন (১৯৫৫) পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনারকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করেন। ইহার পূর্ব্বে পর পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্যারী চুক্তি অনুমোদিত হওয়াই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৫ই মে (১৯৫৫) পশ্চিম-জার্ম্মাণী সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদে আনুষ্ঠানিক ভাবে আসন গ্রহণ করে। ১৫ই মে ভিয়েনায় বৃহৎ চতুঃশক্তি কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উহার পূর্ব্বেই ১০ই মে পৃথিবীর বৃহৎ সমস্যা সমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়াকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করে এবং রাশিয়াও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। ইহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাত দিনব্যাপী আলোচনার পর ২রা জুন (১৯৫৫) রুশ-যুগোশ্লাভ মৈত্রী স্বাক্ষরিত হওয়া। তাছাড়া ওয়ারশতে রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রবর্গ দেশরক্ষার জন্য আটলাণ্টিক চুক্তির অনুরূপ এবং উহার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি সংস্থা-গঠনের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই সকল ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর, বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানদের আলোচনার জন্য প্রস্তুতি যখন চলিতেছিল সেই সময় ডাঃ এডেনার মস্কোতে আমন্ত্রিত হন। এই আমন্ত্রণ পুরাপুরি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ সম্পর্কে উপদেশ বা নির্দ্দেশ গ্রহণের জন্য তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও গিয়াছিলেন। অতঃপর রাশিয়ার আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিলেও তাঁহার মস্কো যাওয়ার তারিখ জেনেভা-সম্মেলনের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হয় নাই। জেনেভা-সম্মেলনে পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় তাঁহার জন্য রাশিয়ার নিকট হইতে কি আদায় করিতে সমর্থ হন, তাহার প্রতীক্ষা যে তিনি করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের পূর্ব্বে ডাঃ এডেনার যদি মস্কো যাইতেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দর-কষাকষি করার পক্ষে অনেক সুবিধা হইত, এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। হয়ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও চাহে নাই যে, ডাঃ এডেনার জেনেভা সম্মেলনের পূর্ব্বে মস্কো যান। জেনেভা-সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের প্রশ্ন ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের সহিত জড়িত করা হইয়াছে। অক্টোবর মাসে বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। কাজেই পশ্চিম-জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনায় ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের প্রশ্ন একত্র লাভ করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি রাশিয়ায় আটক জার্ম্মাণ যুদ্ধবন্দী, রাশিয়া ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে মতৈক্য হওয়া ডাঃ এডেনারের মস্কো মিশন সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। —১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

বিদ্বৎ-সভার বিলোপ প্রসঙ্গে

বাংলা দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ক্রমবর্ধমান পাঠকগোষ্ঠী একটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা দেশে আজ উল্লেখযোগ্য কোন বিদ্বৎসভা নেই। অথচ বিদ্যোৎসাহীর সংখ্যা আগের তুলনায় নিশ্চয় বেড়েছে, যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে। "বিদ্বৎসভা" বলতে আমরা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সর্বশ্রেণীর বিদ্যোৎসাহীদের সভার কথা বলছি। বাংলা সাহিত্যের আজ নিশ্চিত প্রসার হ'চ্ছে, সাহিত্যিকের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, এমন কি সম্পূর্ণ সাহিত্যনির্ভর পেশাদার লেখকের সংখ্যাও আজ অল্প নয়। সবই আশার কথা। কিন্তু এত আশার আলোকোজ্জ্বল আকাশে দু'-একটি সামাজিক দুর্লক্ষণের খণ্ডমেঘ এমন ভাবে বিচরণ করছে, যা দেখলে কোন দূরদর্শী ব্যক্তিই চিন্তিত না হয়ে পারবেন না। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় অশুভ লক্ষণ হ'ল বিদ্বৎ-সভার বিলুপ্তি। আজ বাংলা দেশে এমন একটি সভা নেই, যেখানে এক মাসে এক দিন বা তিন মাসে এক দিন সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক ও বিদ্যোৎসাহীরা মিলিত হ'তে পারেন, এবং পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময় করতে পারেন। এ রকম কোন সভা নেই বলেই আজ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন প্রীতির সম্পর্ক নেই, কোন চেনা-জানার সুযোগ নেই। ক্রমেই তাঁরা বাইরের বৃহত্তম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মাভিমুখী হয়ে উঠছেন এবং "কিবা রূপ, কিবা ধ্বনি" গোছের ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ সব দল-উপদল ও চক্র গ'ড়ে তুলছেন। চক্রগুলি কতকটা সেকালের তান্ত্রিকদের ভৈরবীচক্রের মতন। এই সব চক্রের আলোচ্য বিষয় সাহিত্য বা জ্ঞানবিজ্ঞান নয়, ভিন্ন চক্রের সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি অনুধাবন ও অনুশীলন। বাংলা সাহিত্যের সুদিন আসছে যখন, তখন সাহিত্যের আসল পরিবেশটি এই ভাবে কলুষিত হয়ে উঠছে। এতে যাঁদের দলের যত শক্তিই থাকুক না কেন, দলগত ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে কোন সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীই লাভবান হবেন না। প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, কারণ, কারও সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ হবে না এবং তার ফলে, সুদিনের সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় হারিয়ে আমরা সাহিত্যের উপযুক্ত সেবা করতে পারব না।

বিদ্বৎ-সভার উদার পরিবেশে আজ যখন সর্বশ্রেণীর ও দলের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সব চেয়ে বেশী মিলিত হওয়ার প্রয়োজন, তখন বিদ্বৎ-সভার এই বিলীয়মান অবস্থা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কথা যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি এসিয়াটিক সোসাইটির মতন, বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতন পুরাতন বিদ্বৎ-সভাগুলিও আজ বৃদ্ধের মতন অকর্মণ্য ও জরদ্গব হয়ে গিয়েছে। বার্ধক্যের জরা গ্রাস ক'রে ফেলেছে এই সভাগুলিকে। বৈঠকে বা অধিবেশনে চার-পাঁচজনের বেশী লোক হয় না এবং দেশের বিদ্যোৎসাহীদের মুখে এদের নাম উচ্চারণও শোনা যায় না। এমন কোন নতুন বিদ্বৎসভাও এর পর গ'ড়ে ওঠেনি, যেখানে মধ্যে মধ্যে সাহিত্যরসিক ও সুধীজনদের সমাবেশ সম্ভব। গড়ে না ওঠার প্রধান ও প্রথম কারণ, আমাদের মনে হয়, রাজনৈতিক এবং দ্বিতীয় কারণ, অর্থনৈতিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে দেশের রাজনৈতিক দলাদলির তীব্রতা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বাকি সমস্ত দল, সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি, তার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, সকলের অগোচরে যে কত বড় সামাজিক ও মানসিক বিপ্লব হয়ে গেছে, আজও আমরা তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারিনি। চরিত্রের ভিত্তি, মানুষের মূল্যবোধ, সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে। সমাজের চারি দিকে বিদ্বেষ, হিংসা হীন স্বার্থপরতা ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ-সব চিরদিনই মানুষের সমাজে ছিল, কিন্তু এ রকম উলঙ্গ ও নির্লজ্জ ভাবে ছিল না। আজ তাই রাজনৈতিক দল ছাড়া কোন দল নেই, রাজনৈতিক সভা ছাড়া কোন সভা নেই। এমন কি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানুষের আর কোন ব্যক্তিত্বও নেই। হয় ধর্মসভায়, না হয় রাজনৈতিক সভায় আজ তাই লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়, কোন সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক সভায় হয় না। সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদেরও আজ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তাই সেকালের উদার বিদ্বৎ-সভার অস্তিত্ব আজ বাংলা দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভিন্ন পথ ও মত থাকা সত্ত্বেও কেন উদার সহনশীলতা ও মানবিকতার ভিত্তিতে দেশের সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যোৎসাহীরা কোন বিদ্বৎ-সভার উন্মুক্ত বৈঠকে একত্রে মিলিত হয়ে, পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবেন না, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তা বোঝান যায় না। আজ একথা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞজনদের বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

বাংলার বাইরের বাঙালী পাঠক

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্রমেই নতুন নতুন উদ্যোগী প্রকাশকদের আবির্ভাব হচ্ছে। বইয়ের ব্যবসাটা যে ঠিক চাল, ডাল, কয়লা-কাপড়ের ব্যবসায়ের মতন দাঁড়িপাল্লা ধরার ব্যবসা নয়, একথাও তাঁরা জানেন ও বোঝেন। সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য যে তার প্রসার ও প্রচারের প্রয়োজন, প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন দেখেই বোঝা যায়, এ-সত্যও তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের কাঠামোর হ'ল দেশের শিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠী। প্রধানতঃ আজও তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর

লোক। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও বাংলা দেশে বেশী। কিন্তু সকলেই কলকাতা শহরে বাস করেন না। এমন কি বাংলা দেশেও না। বাংলার বাইরে এই মধ্যবিত্তের খুব বড় একটা অংশ বসবাস করেন, প্রায় স্থায়িভাবে। আসামে, উড়িষ্যায়, বিহারে, উত্তর প্রদেশে। এই প্রবাসী-বাঙালীদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত ও ভাল চাকুরীজীবী। আজ বঙ্গ বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য এই প্রবাসী-বাঙালীদের প্রত্যক্ষ ভাবে নানা উপায়ে সাহায্য করা কর্তব্য ব'লে আমাদের মনে হয়। বাইরের প্রবাসী-বাঙালীরা নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যকে অন্যান্য প্রত্যেক বাঙালীর মতনই ভালবাসেন। তাঁরা নিশ্চয় কামনা করেন, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হোক। কিন্তু সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠীর বিস্তার না হলে, অর্থাৎ পাঠকসংখ্যা না বাড়লে যে কোন দেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে না, একথাও নিশ্চয় তাঁরা জানেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা আজ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এই সময় বাংলার বাইরের বাঙালীরা যদি আগের চেয়ে আরও বেশী সচেতন ও উদ্যোগী হয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে ব্রতী হন, তাহলে আরও দ্রুত বাঙালী-পাঠকের সংখ্যা বাড়তে পারে। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা যত, সেই অনুপাতে এখনও বাংলা বইয়ের বিক্রয়-সংখ্যা যে বাড়েনি, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। তার প্রধান কারণ, শিক্ষিতদের একাংশের মধ্যে এখনও বাংলা বই কেনার ও পড়ার প্রচলন তেমন হয়নি। তাঁরা মাসে দু'খানা ইংরেজী বই কিনবেন, কিন্তু বাংলা বই কিনবেন না। আজ একথা তাঁদের বোঝা উচিত যে, ইংরেজী বা বিদেশী ভাষার বইয়ের সঙ্গে বাংলা বইও দু'একখানা কেনা তাঁদের জাতীয় কর্তব্য। প্রবাসী-বাঙালীদের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা বাংলা বইয়ের প্রচার সম্বন্ধে আরও বেশী অবহিত হোন। প্রকাশকদেরও আমরা অনুরোধ করব, প্রবাসী-বাঙালীদের কাছে বাংলা বইয়ের খবর তাঁরা আরও বেশী ক'রে, নিয়মিত ভাবে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।

পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলা বই

দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি অবাধে বিক্রী হত। বাংলা বই-এর বাজার ছিল বিস্তৃত, দেশ বিভাগের পর তা সংকীর্ণ হয়ে এল, নানাবিধ বিধি-নিষেধের গণ্ডী এড়িয়ে দু-চারখানি বই বা পত্রিকা যা ওপারে পৌঁছয় তার মূল্য মুদ্রামানের দৌলতে ঠিকমত পাওয়া কষ্টসাধ্য হ'ত। সম্প্রতি মুদ্রামান হ্রাস পাওয়াতে বই-এর বাজারের কিন্তু সুবিধা হয়নি, ঠিক যে কি জাতীয় অসুবিধা তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমেরিকা কানাডা ও ইংলণ্ডের মধ্যে যেমন যোগসূত্র একই ভাষা, তেমনই পূর্ব আর পশ্চিমে এই ভাষার সূত্র অভিন্ন রইল। ফলে পূর্ব-বাংলার বই পশ্চিমে আর পশ্চিমের বই পূর্বে চালু থাকবে, বাজার বাড়বে শিক্ষিত পাঠক যত বৃদ্ধি পাবে। শুধু খাওয়া-পরা নয়, তার পর চাই আর একটু অতিরিক্ত আনন্দ। সে আনন্দ দেবে সাহিত্য, চিরকালীন সাহিত্য, সাধারণের সাহিত্য। সম্প্রতি কোনো কোনো পূর্ব-পাকিস্তানবাসী প্রকাশক বাংলা গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন সংবাদ পাওয়া গেল। যদি

সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনানুসারে এই প্রকাশন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহলে সাহিত্যিক মাত্রেরই আশার কথা, কিন্তু যদি কোনো রকম অসাধুতা চলে, যা অবাঙালী প্রকাশকরা করছেন, তাহলে তা গভীর মর্মবেদনার কারণ হবে। উভয় বাংলার সাহিত্যিকদের সম্মিলিত হওয়ার সময় এসেছে, তাতে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হবে।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ

সাহিত্য পরিচয়ের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে, আমরা এই বিভাগে বাংলা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশের আবেদন জানিয়েছিলাম। আমাদের কোনো বিশিষ্ট প্রকাশক এই বিষয়ে আগ্রহশীল হয়েছেন দেখে আমরা খুশী হয়েছি। খুব অল্পকালের ব্যবধানে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যথা, মধুস্মৃতি (গুরুদাস), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ (নিউএজ), রাজনারায়ণ বসুর আত্মস্মৃতি (ওরিয়েন্ট), শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (সিগনেট), ও হুতোমপ্যাঁচার নকসা (নূতন সাহিত্য ভবন)। আমরা এই জন্য অতিশয় আনন্দিত, কিন্তু এই গ্রন্থাবলীর মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক বেশী, সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্দ্ধে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সা বসুমতী সংস্করণে—মাত্র দু' টাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু এ যুগে ভাবতে পারেন কেউ হুতোম প্যাঁচার নকসার দাম পাঁচ টাকা। তাই প্রকাশকগণের কাছে আমাদের আবেদন, এই সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার সুলভ সংস্করণ প্রকাশে তাঁরা উদ্যোগী হ'ন। প্রকাশকের আনুসঙ্গিক ব্যয় কিঞ্চিৎ হ্রাস করলেই তা সম্ভব হবে।

রেলওয়ে ষ্টলে বাংলা বই ও সাময়িক পত্র

আমাদের পাঠক-পাঠিকার চিঠিপত্রে প্রায়ই অনুযোগ থাকে যে, হুইলার বা অন্যান্য রেলওয়ে ষ্টলে উপযুক্ত বাংলা বই বা উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্র পাওয়া যায় না। সস্তা গোয়েন্দাকাহিনী, আর বটতলার আধুনিক সংস্করণের তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলী আর চটকদার সিনেমা সাহিত্য সুদূর-প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র পরিচয়। স্বভাবতঃই এই ব্যবস্থা দুঃখকর, কিন্তু এই সব রেলওয়ে ষ্টলের এমনই ডিকটেটরী যে সৎপ্রকাশক বা সাময়িক পত্রিকা পরিচালকরা সেখানে বই বা পত্রিকা জমা দিতে উৎসাহ বোধ করেন না। অবিক্রীত কপি যখন ফেরৎ আসে তখন আর তার কোনো মূল্য থাকে না। এই সব এজেন্টবৃন্দ একটা মোটা কমিশন পান, তদুপরি রবারষ্ট্যাম্পের ছাপ দিয়ে ক্রেতাদের কাছে কিছু বর্ধিত মূল্য আদায় করেন। কেন্দ্রীয় রেলদপ্তর এবং শিক্ষাবিভাগ এই বিষয়ে একটু মনোযোগী হলে অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাই আমরা এ দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

Dr. B. C. Roy

মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে এক বার আমরা ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে তাঁর আত্মজীবনী লিখতে বলেছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার সময় কোথায়?' সত্যিই সময়ের তাঁর একান্ত অভাব। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকংগ্রেস কমিটির চেষ্টায় তাঁর জীবনী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। জীবনী সঙ্কলন করেছেন কে, পি, টমাস। সমস্ত না হলেও তাঁর জীবনের একটি বড় অংশকে খণ্ড খণ্ড করে পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়ে দীর্ঘ ২৬৬ পাতার একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে ইংরাজীতে। কর্ম্মী বিধানচন্দ্রের কাজের পরিধি শুধু চিকিৎসক বা রাজনীতিবিদ হিসাবেই নয়, ব্যবসায়ী বিধানচন্দ্রের অপর আর একটি পরিচয় আছে। তা' ছাড়া শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক জন সৈনিক ইত্যাদি নানা ভাবে বিধানচন্দ্রকে মিষ্টার টমাস দেখিয়েছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নানা বয়সের কয়েকটি ছবি বইটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। একটা বিষয় একটু আক্ষেপ না জানিয়ে পারলাম না। অনেকের সঙ্গেই বিধানচন্দ্রের নানা ছবি ছাপা হয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর একটা ছবি ছাপা সম্ভব হত না কি? শেষে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের সঙ্গে লেখকের এবং তাঁর দুই ভাইপোর ছবি দু'খানি ছেপে বইটির চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথাও বলব। আর বিধানচন্দ্রের সহকর্ম্মী বন্ধুদের কোন পাত্তাই নেই? বইটি বাঙলা-ভাষায় রচিত হ'লে বাঙালী পাঠক-সমাজ ডাঃ রায়ের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারতেন, সন্দেহ নেই। বইখানির ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য দশ টাকা। প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষে অতুল্য ঘোষ, ৫৯সি রোড, কলকাতা—২০।

সোমলতা

সমালোচকের মতে ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী এবং সোমলতা এই ট্রিলোজিই শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই তিনখানি উপন্যাস একটি বিরাট উপন্যাসের তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড। 'ময়ূরাক্ষী'তে দেখি নায়িকা বিনোদিনী পল্লীসমাজের ভালো-মন্দ সমস্ত সংস্কার নিয়ে কাটাচ্ছে তার গার্হস্থ্য জীবন। সুখে, দুঃখে, আশা-নিরাশায় ভরা অপূর্ব সে জীবন-কাব্য! সেই জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল রসময় বাউলের আখড়ায়, যেখানে বন্ধন নেই, আছে শুধু অনন্ত মুক্তি। অনন্ত মুক্তির লঘুতম হাওয়া 'গৃহকপোতী'র ডানায় সাড়া জাগায় না। উঁচুতে ওড়া তার অভ্যেস নেই তবু উড়তে হয়। নিচে নামার উপায় কোথায়? শেষে নিচে নামারও উপায় হল তার জীবনের তৃতীয় পর্বে। সুদূর উচ্চলোক থেকে যে সোমরস সে পান করে এল, পিতৃগৃহের পরিবেশে তা যেন তাকে নতুন করে, অপূর্ব করে সৃষ্টি করলো। 'সোমলতা'র বিনোদিনী যেন এই পৃথিবী, কলঙ্কে ও মহিমায় তার আর তুলনা নেই। দীর্ঘ সতেরো বছর পরে 'সোমলতা'র দ্বিতীয় সংস্করণ অপূর্ব প্রচ্ছদে, সুন্দর কাগজে ঝলমলে ছাপা হয়ে বের হয়েছে। প্রকাশ করেছেন: ন্যাশনাল পাবলিশার্স ১৪৫।বি, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা—২।—দাম: সাড়ে তিন টাকা।

ম্যাজিক-লণ্ঠন

বর্তমানে রম্যরচনার হিড়িক চললেও সত্যিকার রম্যরচনা ক'জন লিখেছেন তা বলা যায় না। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের সঙ্গে কুড়ি-বাইশটি রম্যরচনা ম্যাজিক লণ্ঠনে স্থান পেয়েছে শ্রীপরিমল গোস্বামীর সদ্য প্রকাশিত 'ম্যাজিক লণ্ঠন' গ্রন্থে। সংযোজিত লেখাগুলি যেমন তথ্যবহুল, তেমনি সরস ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীযুত গোস্বামীর রচনার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই। তিনি রস-সাহিত্যিক হিসাবে স্বনামেই খ্যাত। চল্লিশটি

প্রবন্ধ : দাম আড়াই টাকা। মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। প্রকাশক : বিহার সাহিত্য-ভবন লিঃ, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলকাতা—৪।

ফোমা গারদিয়েফ

বিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাকসিম গর্কী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফোমা গারদিয়েফ উপন্যাসটি রচনা করেন। সাহিত্যিক হিসাবে তখনও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি, কিন্তু প্রচলিত ধারার সম্পূর্ণ বিরোধী এক নূতন ভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে সাহিত্য-পাঠক লেখকের শক্তিমত্তা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, সেই তরুণ লেখকের প্রতিভার স্পর্শ এই ফোমা গারদিয়েফ উপন্যাসে পাওয়া যাবে। মুনাফা-শিকারী পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী যুবক ফোমার অক্লান্ত সংগ্রাম এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। সেদিন ফোমার বিদ্রোহ জয়যুক্ত হয়নি, কিন্তু পরে পুঁজিবাদের কি ভাবে ধ্বংস ঘটেছে তা ইতিহাসের কথা। শ্রীযুক্ত সত্যগুপ্ত অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে এই বৃহৎ উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন। প্রকাশক, সংস্কৃতি ভবন, ১১৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

ঝুমরা বিবির মেলা

কল্লোল যুগের লেখকগোষ্ঠীর পর যে ক'জন প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, নিঃসন্দেহে রমাপদ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তরুণতর লেখকদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। পাঠক মহলে তিনি যে কী পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর রচিত "দরবারী" এবং "প্রথম প্রহর"। স্বল্প-পরিসরে বহু বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক বৎসরের মধ্যে দরবারীর তিনটি সংস্করণ এবং ছ' মাসের মধ্যে প্রথম প্রহরের প্রথম সংস্করণের নিঃশেষ বর্তমান বাংলা বইয়ের বাজারে অভাবনীয়। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত ছোট গল্পের সংগ্রহ 'ঝুমরা বিবির মেলা" যে সমান সমাদর লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঝুমরা বিবির মেলা এগারোটি অতুলনীয় ছোট গল্পের সংগ্রহ। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪৭, হৃদয়গ্রাহী প্রচ্ছদ। দাম ২৷৷০, প্রকাশক : সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১১৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বপ্ন-সাধ

বাঙলা ভাষায় লেখা কাব্য-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হওয়া খুব সহজ কথা নয়—ভেতরে বেশ কিছু মাল মশলা থাকলে তবেই সে বই চলে। স্বপ্ন-সাধের কবি হুমায়ুন কবির দীর্ঘ দিন কাব্য সাধনা করছেন এবং শুধু কবিতা নয়, তাঁর প্রবন্ধেও বাঙলা সাহিত্য-কানন সমৃদ্ধ। মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে বইটিতে প্রায় পঞ্চাশটির অধিক কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতাই কবির স্বকীয়তা ও রচনার গুণে সুউজ্জ্বল। প্রকাশক : এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা—১২। দাম : দু' টাকা।

পথে পথে

'পথে পথে' ভ্রমণ-কাহিনীটি লিখেছেন শ্রীপরিমল গোস্বামী। 'পথে পথে'তে গ্রন্থকারের ছ'টি দেশ ভ্রমণ স্থান পেয়েছে এবং তাঁর ছ'টি ভ্রমণই ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রস-রচনায় পরিমল বাবু সিদ্ধহস্ত। তাই নিছক ভ্রমণ-কাহিনী না হয়ে 'পথে পথে' হয়ে উঠেছে একখানি রস-সমৃদ্ধ ভ্রমণ কাহিনী। সুখ্যাত লেখক ছাড়াও পরিমল বাবুর আর একটি পরিচয় তিনি খ্যাতনামা ফোটোগ্রাফার। চীন সম্পর্কে লেখাটি কলকাতা ও শহরতলীর চীনা পল্লীর নিখুঁৎ আলেখ্য বলতে হয়। প্রত্যেকটি ভ্রমণের সঙ্গে পরিমল বাবুর তোলা কয়েকখানা করে ছবি থাকায় বইখানি আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছে। প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। দাম: তিন টাকা।

উল্কা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কার' মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সেই সূক্ষ্ম নীতির ওপর নির্ভর করেই উল্কার কাহিনী রচিত। নিয়তির নির্মম বিধান, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অরুণাংশু জন্মেছিল তার বাপের বাহ্যিক রূপ ও তার যৌবনের ক্রিমিন্যাল মনের বীভৎস যুগ্ম প্রতিক্রিয়ার ছাপ নিয়ে আরো বীভৎস হয়ে। কিন্তু বাপের চেহারা নিয়ে জন্মালেও অরুণাংশু পেয়েছিল তার মা কমলার কোমল মনটি। তাই সে ব্যর্থ হয়নি এক দিক থেকে, যার ঠিক বিপরীত হয়েছিল রাজীবের দ্বিতীয় সন্তান সুবীর। সে পেয়েছিল মার রূপ আর বাপের মন। আগাগোড়া সেই সত্যটাকেই 'উল্কা' কাহিনীর মধ্যে ঘটনা বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাতে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন সুখ্যাত লেখক ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক ন্যাশনাল পাবলিশার্স অপূর্ব প্রচ্ছদ: সুন্দর ছাপা ও কাগজ। দাম: সাড়ে চার টাকা।

পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রম্য রচনা নতুন এক পরিমণ্ডল গঠন করেছে। রম্যরচনা লিখে কয়েক জন সাহিত্যিক ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছেন, কিন্তু "পত্রনবীশ" নতুন এক সুর যোজনা করে রম্যরচনাকে রম্যতর করে তুলেছেন। তাঁর লেখা "শুভদৃষ্টি" পাঠক ও লেখকদের মধ্যে শুভদৃষ্টি ঘটিয়েছে। তিনি স্বনামে ও বেনামে বসুমতী ও বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচনায় কৌতুক নেই, ব্যঙ্গ আছে, জ্বালা নেই, শ্লেষ আছে; নিরানন্দ নেই, আনন্দ আছে। কেনবার মতো বই। প্রকাশক: ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দু টাকা।

পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে অসামান্য কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী। বিগত ত্রিশ বছর ধরে ছোট গল্পের অনুশীলন হয়েছে সব চেয়ে বেশী, নানাবিধ ফর্ম্ বা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা হয়েছে, ভাষা ও রূপকল্পের পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনই অবারিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আর বিচিত্র পটভূমি। পূর্ববাংলায় আজ নব বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হয়ত স্বীকৃতি লাভ করবে, তাই পূর্ববাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের ত্রিশটি গল্পের সংকলন "পূর্ব-বাংলার সমকালীন সেরা গল্প" একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। আলাউদ্দিন আল আজাদের "কয়েকটি কমলালেবু", সিরাজুল ইসলামের "কয়েকটি লাল ফুল", শওকত ওসমানের "নূতন জন্ম" সৈয়দওয়ালি উল্লাহের 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' আর আবুল কালাম সামসুদ্দীনের 'জিবরাইলের ডানা' যে কোনো সংকলন গ্রন্থে সসম্মানে স্থান পাবে। সম্পাদক রহুল আমিন নিজামী সাহেবের নির্বাচন এবং সম্পাদন ত্রুটিহীন। মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জা সুরুচিসম্পন্ন। দাম পাঁচ টাকা,—প্রকাশক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স—৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মধ্যে কিছু দিন অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকার পর, "বিশ্বভারতী পত্রিকা" (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২), শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সুযোগ্য সম্পাদনায় আবার প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমরা সুখী হয়েছি। বাংলা দেশের বিদ্বজ্জনের কাছে বিশ্বভারতী পত্রিকার নতুন ক'রে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা ও চিঠি, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীরাজশেখর বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সুখ্যাত সাহিত্যিকদের মূল্যবান রচনা-সম্ভারে বর্তমান সংখ্যাটিও সমৃদ্ধ। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের "ইতিহাসের মুক্তি" নামে রচনাটি খুবই মূল্যবান রচনা। রচনা ছাড়াও, বিশ্বভারতী পত্রিকার আর-একটি আকর্ষণ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের রঙিন চিত্রের পরিবেশন। ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকার মধ্যে, আমরা যত দূর জানি, বাংলাদেশে আর একটি পত্রিকাও নেই, যা বিশ্বভারতী পত্রিকার সমান সাহিত্যিক মর্য্যাদা দাবী করতে পারে। কিন্তু ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার অদৃষ্ট আমাদের দেশে চিরদিনই মন্দ। আমরা আশা করি, বাংলা সাহিত্যের নতুন পরিবেশে আজ বিশ্বভারতী পত্রিকা পোষকতা ও সমর্থন অনেকের কাছ থেকেই পাবেন।

কন্যাকাল

'কন্যাকাল' প্রভাত দেব সরকারের সর্বশেষ উপন্যাস। পাঁচকড়ি বাবু, স্ত্রী সিন্ধুবাসিনী, তাঁদের এক বিবাহিতা ও অপর কয়েকটি অবিবাহিতা কন্যা, ভাস্বরপো সুকুমার প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে উপন্যাসখানি লেখা। মেয়েরা বয়স্থা হলে, যথাসময় বিয়ে না হলে যে যন্ত্রণা তাকে ও তার আত্মীয়-স্বজনকে সহ্য করতে হয়, তারই এক চিত্র নিখুঁত করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। দাম: দু'টাকা চার আনা।

রূপসী বোম্বেটে, মুখোসধারী যাদুকর, রূপসীর প্রতিহিংসা, ডাক্তারের ডিগবাজি

পুস্তক প্রকাশক বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা—১২ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরী

রূপসী বোম্বেটে, মুখোসধারী যাদুকর, রূপসীর প্রতিহিংসা, ডাক্তারের ডিগবাজি এই সিরিজের যথাক্রমে তিন, চার, পাঁচ ও ছ' নম্বরের উপন্যাস। যাঁরা রহস্য-রোমাঞ্চ পড়তে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নতুন করে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই সিরিজের একমাত্র ডাক্তারের ডিগবাজির দাম আড়াই টাকা আর উল্লিখিত বাকী তিনটি উপন্যাসের প্রত্যেকটির দাম ছ' টাকা।

অন্তরাল

জীবনচক্রে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার যে চিরন্তনী সুর স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলেছে শ্রীঅবিনাশ সাহা তাঁর 'অন্তরাল' উপন্যাসের মাধ্যমে সেই কথাটি নিপুণ ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। রোমান্টিক উপন্যাস হলেও 'অন্তরাল' নিছক কবি কল্পনা কিংবা অসম্ভব নয়। প্রত্যেকটি চরিত্র এখানে জীবন্ত—স্ব স্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল। শোভন সংস্করণ: চার টাকা, সুলভ সংস্করণ তিন টাকা। প্রকাশক: ভারতী লাইব্রেরী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

চেনা মানুষের নক্সা

শ্রীঅমল দাশগুপ্তের 'চেনা মানুষের নক্সা' গ্রন্থটির পাতা উল্টোলে দেখা যায় ষোলটি নক্সা এবং প্রত্যেকটি নক্সার সঙ্গে শিল্পী খালেদ চৌধুরীর একটি করে রেখাচিত্র। পূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রশংসিত রচনাও এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। প্রকাশক: নতুন সাহিত্য ভবন, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলকাতা—২০। দাম: আড়াই টাকা।

রন্ধন-সঙ্কেত

রন্ধন অনন্ত প্রকার। সেই অনন্ত প্রকার রন্ধনের কয়েকটি সাধারণ রন্ধনের প্রণালী 'রন্ধন-সঙ্কেতে' লিপিবদ্ধ করেছেন লেখিকা শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র। বইটিতে দুষ্পাচ্য রন্ধনের কথা বড় একটা নেই। সাধারণতঃ বাঙালীরা যা খেয়ে থাকেন সেই রকম কয়েকটা নতুন প্রণালীর রন্ধন বইটিতে দেওয়া হয়েছে। নিরামিষ রন্ধন যে মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যদায়ক একথা সকলেই বলবেন, কিন্তু নিরামিষ রন্ধন আজকের দিনের লোক ভুলতে বসেছে। শুধু নিরামিষ রন্ধন দিলে বইটি সম্পূর্ণ হবে না বলে লেখিকা কয়েকটি নতুন ধরণের আমিষ রন্ধনের প্রণালীও বইটির ভেতর লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের মূল্য অত্যন্ত বেশী ধার্য্য করা হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান:—৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট, কলকাতা। দাম: ছ' টাকা।

কথার কথা

মানুষের নিজস্ব সংবাদদাতা নাক, কান, চোখ, রসনা, আর ত্বক্‌, তারাই নানা খবর বয়ে এনে আমাদের জানায়। শব্দ কাকে বলে, মানে কথার মানে কি, শব্দ রূপ আর ব্যাকরণের এমন সরস আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আর কখনও হয়নি। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য অনমুকরণীয় ভঙ্গীতে লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথার কথা। প্রকাশক—স্বাক্ষর, দাম দেড় টাকা মাত্র।

আমরাও হতে পারি

আমরাও হতে পারি সিরিজের প্রথম দু'খণ্ড 'বিদ্যুৎ বিশারদ' ও 'মুদ্রণ বিশারদ' প্রকাশিত হয়েছে। অসংখ্য চিত্রশোভিত এই গ্রন্থমালায় অতি সহজে বিদ্যুৎ এবং মুদ্রণ বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া আছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে নতুন দিনের ছেলে মেয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা রচিত। প্রকাশক স্বাক্ষর, দাম দু টাকা চার আনা মাত্র।

শিশুমনের সহজ কথা

দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর লেখিকা শ্রীমতী দীপিকা পাল শিশুমনের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অতি সহজ ভাষায় 'শিশুমনের সহজ কথা' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভূমিকায় ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন—"এই পুস্তক প্রণয়নে মনস্থ করে তিনি সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন।" খেলাধুলা, কান্না, অবাধ্যতা, ঈর্ষা, ভয়, মিথ্যা কথা, অপরাধ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি যাঁদের উপর শিশুপালনের ভার আছে, তাঁদের সাহায্য করবে। প্রকাশক—প্রবীর পাল, ২নং রঙ্গলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৩, মূল্য দু' টাকা মাত্র।

বন-কেতকী

শ্রীমতী ছবি মুখোপাধ্যায় নামটি সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত নয়। কিন্তু 'বন-কেতকী' উপন্যাসে এই নূতন লেখিকা অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা, আঙ্গিক ও কাহিনীতে মুন্সীয়ানার ছাপ আছে। শেষ দৃশ্যে পাগলের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে। এই যদি প্রথম রচনা হয়, তাহলে লেখিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সন্দেহ নেই। প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী, দাম সাড়ে চার টাকা মাত্র।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতি-মাল্য,' 'গীতালী' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য-প্রবাহের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। অতি সহজ ভঙ্গীতে লিখিত হওয়ায় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী সম্পর্কে সার্থক আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশক—শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম দু' টাকা চার আনা মাত্র।

রঙ্গপট

অভিনয়শাস্ত্রের নানা দিক—ক্যারেকটারাইজেশন্
(চরিত্রচিত্রণ)

কি কঠিন ব্যাপার বলুন দেখি ! আপনি, আমি,হরিহর চ্যাটার্জ্জী কি হারাধন ব্যানার্জ্জীকে হতে হবে মহারাজা নন্দকুমার, সিরাজ, ঔরঙ্গজেব কি দারা। আপনি গীতা দত্ত কি মমতা মুস্তাফী আপনাকে অভিনয় করতে হবে লুৎফা কি জাহানারার অভিনয়! কি অসম্ভব ব্যাপার! অথচ আমরা তো তাই প্রতিনিয়ত করছি। রাজা, উজীর,মন্ত্রী, বাদশা থেকে পাইক বরকন্দাজ অবধি সবই তো সাজছি প্রতিনিয়ত। কি হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। সবই বিফলে যাচ্ছে। দামী দামী সাজ-পোষাক গায়ে চড়িয়ে, মুকুট মাথায় বসিয়ে, কোয়ার্টার ইঞ্চি মেক-আপ দিয়ে বৃথাই রাতের পর রাত চিৎকার করে যাচ্ছি। গীতা দত্ত কি মমতা মুস্তাফীকে প্রশ্ন করি, জাহানারার তিনি কি জানেন, কতখানি জানেন? জাহানারার পারিবারিক ইতিহাস জানা আছে তাঁর? জাহানারার কোনও ছবি তিনি ভাল করে দেখেছেন কখনও? তাঁর কবি-প্রকৃতির সম্পর্কে গীতা দত্ত কি মমতা মুস্তাফীর কোনও ধারণা আছে? জাহানারা কি লুৎফার মত রাজ-অন্তঃপুরের কোনও রমণীকে তিনি দেখেছেন? তেমনি কোমল কণ্ঠ তাঁর? তেমনি নরম হাত? চাঁপার কলির মত আঙ্গুল? ভ্রূ-ভঙ্গী? সেই পদক্ষেপ? কি আপনি আনতে পারবেন শুনি? তবে কোন্ সাহসে আপনি অভিনয় করতে চান, বলুন? ওফেলিয়ার অভিনয় করতে চান অথচ দেখেন নি ভ্যান ডাইকের ছবি। রেঁনোয়ার ছবিগুলো দেখবার জন্ত লুভর মাড়ান নি এক বারও। বটিচেল্লী, লিওনার্দো কি র্যাফায়েলের আঁকা মেয়েদের হাতগুলো দেখেন নি জীবনে। আপনি কি করে হবেন অভিনেতা? তর্ক করতে পারেন, হাত তো দেখলাম, চেহারাও না হয় পেলাম। কিন্তু কোথায় পাব লুৎফার পদক্ষেপ? সে চলা কোথায়? ওফেলিয়ার হাঁটা দেখবো কি করে? সম্ভব তাও। ইষ্টারের রাতে গীর্জ্জায় গিয়ে নানদের সারিবদ্ধ ভাবে চলা দেখেছেন কোন দিন? যান, এক বার দেখুন। পাইলে পাইতে পারেন অমূল্য রতন।

তাহলেই বুঝুন কত শক্ত এই চরিত্র অঙ্কন, প্রস্ফুটন! কত সাধনা আর সময়-সাপেক্ষ!

একখানা বহু প্রাচীন বই পাচ্ছি। The Actor, A treatise on the Art of playing, London. Printed for R. Griffiths, at the Denciad in St. Paul's Church-Yard MDCCL.

ক্যারেকটারাইজেশনের প্রসঙ্গে বইখানি বলছে, The actor who is to express to us a peculiar passion and its effects, if he would play his character with truth, is not only to assume the emotions which that passion would produce in the generality of mankind; but he is to give it that peculiar form under which it would appear, when exerting itself in the breast of such a person as he is giving us the portrait of.

অর্থাৎ তিনটি বস্তুর সমন্বয়। সেই আত্মার বিকাশ। তিনের সাধনায়। The soul the author thought of, the one the director explained to you, the one you brought to the surface from the depth of your being. No other but that one. বলছেন এক জন বিশিষ্ট অভিনেতা এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে। লেখকের চিন্তাধারা, পরিচালকের কল্পনা আর সেই পুরোনো ছবির প্রতিবিম্ব এই তিনকে একত্র করে গড়ে তুলতে হবে চরিত্র। অভিনীত অংশ তবে হবে পারফেক্ট, যথাযথ।

লেখকের মনের সঙ্গে অভিনেতাকে হতে হবে পরিচিত। এজন্ত লেখকের প্রত্যেকটি রচনার সঙ্গে অভিনেতার পরিচয় থাকা প্রয়োজন। লেখকের মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আরও ভাল হয়। পরিচালকের দায়িত্ব তাঁর নিজেরই।

চরিত্রচিত্রণের মধ্যে অভিনেতার কথাও ভাবতে হবে নাট্যকারকে সব সময়। Gilbert Emery-র Tarrish এর কথাই ধরছি। Ann Harding আর Tom Power এর এক দৃশ্যে আড়াই পাতা তিনি ছিঁড়ে ফেললেন বই থেকে। কেন? কারণ Ann শুধু অপরের কথা শুনতে শুনতে শারীরিক হাবভাবের মধ্য দিয়ে দর্শকগণের চোখে জল আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কথার দরকার নেই বুঝলেন Emery। তাই বাদ দিলেন অতিরিক্ত অংশ। ভাব আনতে যেটুকু প্রয়োজন তাই রাখলেন। লেখকের চিন্তাধারার প্রসঙ্গে Romeo and Juliet এর কথা ভাবুন। লেখক বলছেন, তার বয়স চোদ্দ। অথচ সে বলছে,

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite,

এ কি কোন চোদ্দ বছরের Juliet বলছে ? না কবি বলছেন ? এই জন্যই দরকার পরিচয় লেখকের চিন্তাধারার সঙ্গে।

এত সব জানা থাকলে তবেই চরিত্রচিত্রণ হবে ঠিক ঠিক।

ড্যানি কে কে ?

নিউইয়র্কের এক নাইট ক্লাবে ড্যানি কের সঙ্গে দেখা ইমপ্রেসারিও হেনরী শেরেকের ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের এক নৈশ ভোজে। ঠিক হল সঙ্গে সঙ্গে শেরেক ড্যানি কে কে নিয়ে যাবেন লণ্ডনে। সেই সুরু হল ড্যানি কের ভাগ্য পরিবর্তন সাফল্যের পথে।

১৯১৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী ব্রুকলিনে ড্যানি কের জন্ম। ইউক্রেণের এক কারবারী ছিলেন তাঁর বাবা। এক দেশ থেকে আর এক দেশে অশ্বের চালান দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ।

শিক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া তাঁর ভাগ্যে নেই। জীবিকা অর্জনের তাগিদায় এক সোডা ফাউণ্টেনে চাকরী নিলেন ড্যানি। কিন্তু সে চাকরী বেশী দিন থাকল না। ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে জুটলো একটা কাজ। লাখখানেক টাকার হিসেবের এক গরমিলে সে চাকরীও শীঘ্রই গেল তার। ঠিক এমনি সময়ই তার সঙ্গে দেখা হল হেনরী শেরেকের।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! লণ্ডনেও জমাতে পারলেন না ড্যানি। চল্লিশ পাউণ্ড (ইংলণ্ডে প্রায়ই সপ্তাহের হিসাবে মাহিনা হয়) মাইনের চাকরীটাও গেল তার আবার।

কথায় বলে, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। আর যার পক্ষেই হোক, ড্যানি কের পক্ষে কিন্তু স্ত্রী-ভাগ্যই আনল ধন, সৌভাগ্য, সম্মান সব কিছু। সিলভিয়া, ড্যানি কের স্ত্রীর সঙ্গে নিজে এক কনট্রাক্ট পেলেন আবার আমেরিকায় ফিরে এসে।

কিন্তু ড্যানি কে কে ঠিক ঠিক ভাবে জনসমাজে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার সবটুকু কৃতিত্ব মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের স্যাম গোল্ডউইনের। Wonder Man আর up in Arms ছবিতে কাজ পেলেন ড্যানি কে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম ছড়ালো চার দিকে। তবে একটু একটু করে। ধীরে, অতি ধীরে।

১৯৪৮ সালে আবার লণ্ডনে ফিরলেন ড্যানি। এবার জয়মাল্য হস্তে। সমস্ত লণ্ডন ড্যানির জন্য ক্ষেপে উঠল। প্যালাডিয়মেতে দিনের পর দিন অনুষ্ঠান শেষেও দর্শকগণ বসে থাকত শুধু ড্যানি কে কে আর এক বার দেখবে বলে। গাইত, For he's a jolly good fellow ইত্যাদি।

এর পরের জীবন ড্যানি কের শুধু সৌভাগ্যের শিখরে শিখরে আরোহণ করার। White christmas, Knock on wood ইত্যাদি ছবি দেখেছেন যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে শুধু এখানেই নয় ড্যানি কে অনেক অনেক সৌভাগ্যের পথে নিঃসন্দেহে এগিয়ে চলেছেন।

স্যামুয়েল গোল্ডউইন

(মেট্রো গোল্ডউইন মেয়রের প্রতিষ্ঠাতা)

শুধু সাদা আর কালোয় সন্তুষ্ট নন গোল্ডউইন। শুধু ফটোগ্রাফী, লেন্স, সেট-সেটিং, সাউণ্ড ট্রাক নিয়ে থাকতে রাজী নন। টেকনিকালার, থ্রি-ডি, কি ষ্টেরিওফোনিক সাউণ্ড নিয়ে মাথা ঘামিয়েই খুসী নন তিনি। আসলে তিনি এক জন আর্ট কনয়শিয়র। সারা পৃথিবী খুঁজে দুষ্প্রাপ্য ছবি পেইণ্টিং, জলরঙ, তেলরঙ, লাইফ, স্কেচ জোগাড় করা তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত শখ!

১৮৮২ সালে ওয়ারশতে স্যামুয়েল গোল্ডউইনের জন্ম। পিতা-মাতার নাম এ্যাব্রাহাম আর হানা। ১৮৯৬ সালে আমেরিকায় গিয়ে এঁরা বসবাস শুরু করেন। ১৯১৩ সালে স্যামুয়েল ছবির কাজে হাত দিলেন। নাম—Josse Lasky Feature Photo Play Company। ১৯১৬ সালে গোল্ডউইন পিকচার্স কর্পোরেশন। পরে তারই নাম পালটিয়ে রাখা হল মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার।

ছবি সংগ্রহ করা তাঁর হবি। পিকাসো, ম্যাটিসে প্রভৃতির আরজিন্যাল কিছু ছবি আছে তাঁর সংগ্রহশালায়।

ছবির কাজ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে। I used to make 36 Pictures a year when I was with Lasky, then I used to make 26 a year. Then I started on my own, because I wanted quality and not quantity, and stories don't come along that easily, and a good story is foundation of everything.

অর্থাৎ কি না, লাস্কির সঙ্গে যখন ছিলেন তখন বছরে তিনি ৩৬টি করে ছবি করেছেন। পরে বছরে ছাব্বিশটি। এখন আরও কম। আরও বলছেন, ভাল গল্পের বড় অভাব। গল্পই ছবির কাঠামো। ভাল গল্প পাওয়া দুষ্কর।

চার মিলিয়ন ডলার খরচা করে তিনি Hans Anderson ছবি তুলেছেন। সামান্য একটা পরীর গল্প নিয়ে এত টাকা খরচা করার মত সাহস আছে তাঁর। অবশ্য পয়সা তাঁর বৃথা যায়নি। কি বলেন?

Wuthering Heights তাঁর আর একখানি কৃতিত্বপূর্ণ ছবি। লণ্ডনের এক সাংবাদিক-সভায় এ নিয়ে তিনি চমৎকার একটি রসিকতা করেছেন। 'You remember Wuthering Heights? That was the greatest love story ever screened. The head of oxford inirted me down there once during the war.' I said to him, 'Tell me, why did you ask me to come here? I did not go to College or anything,' 'well', he said. 'I have been trying to interest my students in Wuthering Heights for years and you have done better in one afternoon than I have in Years.'

অর্থাৎ, অক্সফোর্ডের ভাইস চ্যান্সেলার 'উইদারিং হাইটস' সম্পর্কে তাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। বলেছেন, বছরের পর বছর অক্সফোর্ডে আমি যা ছেলেদের মনে আনতে পারিনি রাতারাতি আপনি তা' তাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

পথের পাঁচালী

পথের পাঁচালী পড়ে আমি কেঁদেছিলাম, বেশ মনে আছে। অনেকক্ষণ ধরে শুধু একান্তে বসে বসে ভেবেছিলাম, কি পড়লাম! শুধু কাটা কাটা ছবিগুলো মনের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, মানুষ কত অসহায়! প্রকৃতির ওপর কতখানি নির্ভরশীল! তবু এই সব দারিদ্র্য, অসহনীয় কষ্টের মাঝখানেও আনন্দের পণ্যসম্ভার বয়ে নিয়ে আসে মিঠাইওয়ালা, বিয়ের ব্যাণ্ড, বায়স্কোপ একটি বুভুক্ষু অন্তরের কাছে। কি পরম রমণীয় সব কিছু! কি ব্যথা-ভরা অন্তর নিয়ে এ-সব লেখক এঁকেছেন! সংবেদনশীল মনে অতি যত্নে সবটুকু রেখে নিংড়ে নিংড়ে সেই মাটির একান্ত কাছাকাছি থেকে রসটুকু পরিবেশন করেছেন। পথের পাঁচালীতে আমি এই রসটুকু চেয়েছিলাম। পেয়েছিও। পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে ধন্যবাদ।

অপু আর দুর্গা। পাড়াগাঁয়ের সাধারণ দু'টি ছেলে-মেয়ে। মা সর্বজয়ার সর্বদা ভয় তার ছেলেমেয়ে দু'টির দুরন্তপণার জন্য। কে বুঝি কি বলল! চাকরি নেই হরিহরের। সংসার চলে না। বৃদ্ধা পিসী ইন্দির ঠাকরুণ, সমস্ত সংসারেরই শুধু নয়, সারা বিশ্বেরই যেন বোঝা। নাটকীয় ঘটনা খুব কিছু নেই। কিন্তু আছে ঘটনার এক চমকপ্রদ বিন্যাস। কয়েকটি টাইপ চরিত্রে আছেন গ্রামের পণ্ডিতমশাই, যিনি এক দিকে মুদীর দোকান অপর দিকে ছাত্র পড়ানো দু' হাতে করেন, চক্রবর্তীও অপর একটি চরিত্র।

ছবি মানেই সাদা আর কালো। অর্থাৎ ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট। কিন্তু বাঙলা ছবি দেখে প্রায়ই একথা ভুলে যেতে হয়। কালোই যেন বেশী। ক্যামেরার এত ভাল কাজ বাঙলা ছবিতে বড় একটা দেখেছি বলে মনে হয় না। অথচ আলোক-চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র 'দি রীভার' ছাড়া আর কোনও ছবিতে কাজ করেছেন বলে তো জানি না। ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও প্রতিভার ছাপ রয়েছে পরিচালনার সর্বত্র। আলাদা করে সরোবরের দৃশ্যগুলি, মাছি উড়ে এসে ইন্দির ঠাকরুণের গায়ে পড়া, বৃষ্টির দৃশ্যগুলি অসামান্য। কলসীর ভেতর দিয়ে দুর্গার মুখ দেখানো, কাশবনের মধ্যে রেলগাড়ী দেখা, পানাপুকুরে হার ফেলে দেওয়া, নারকোলের মালায় আচার মেখে খাওয়া, নুণ না আনার চড়ুইভাতি ফেঁসে যাওয়া, সব কিছুর মধ্যেই যত্ন আর প্রচুর পরিশ্রমের পরিচয় বর্তমান। স্থানে স্থানে রবিশঙ্করের বাজনা আবহাওয়া জমিয়ে তুলতে ভারি সাহায্য করেছে। ছবিখানির সম্পাদনা করেছেন দুলাল দত্ত এবং তা হয়েছেও ভাল। শব্দগ্রহণও যে ছবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, তা বোঝা গেল এ ছবি দেখে। ট্রেণ আসার সময় রেল-রাস্তার ওপর গুম্-গুম্ শব্দ, টেলিগ্রাফ পোস্টের আওয়াজ। নিশ্চিন্তপুরের কাছে বোড়াল গ্রামে ছবিটির প্রায় সবটাই তোলা হয়েছে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। তাই ছবিখানিতে এমন প্রাণের স্পর্শ লেগেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ, এত টাকা খরচ করে তাঁরা একখানি ছবির মত ছবি তুলেছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই এদিক থেকে প্রথম। এই সঙ্গে আরও আশা করছি, তাঁরা আরও এমনি ধারা ভাল ছবির উৎপাদনের দিকে নজর দেবেন। ভাল ছবির বাজার চিরকালই আছে, একথা যেন তাঁরা না ভোলেন।

অভিনয়ের দিক থেকে চুণীবালার নামই করব প্রথম। এত অধিক বয়সেও তাঁর অভিনয় অবাক হয়ে বসে দেখেছি।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিহর), করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সর্বজয়া), তুলসী চক্রবর্তী (গুরুমশাই) ইত্যাদির অভিনয়ও নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। অপু আর দুর্গাও ছবিখানিতে প্রাণ এনে দিয়েছে তাদের অভিনয় দিয়ে।

দস্যু মোহন

বাঙলার রবিনহুড। যার ভয়ে ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী সর্বদাই বিব্রত। কিন্তু তার স্থান দরিদ্র জনসাধারণের অন্তরে। ধনীর অর্থ সে অপহরণ করে দরিদ্রকে বিতরণের জন্য। তবু সমাজে তার স্থান নেই। তার জন্য প্রেম নেই, ভালবাসা নেই। সকলেই তাকে ঘৃণা করে। বলে, দস্যু মোহন। এই কাহিনী অবলম্বন করে ছবি তুলেছেন পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে দস্যু মোহন সিরিজের প্রত্যেকটি বই খুবই প্রিয়। আর তা' ছাড়া এ্যাড্‌ভেঞ্চারাস ছবির বাজারও আছে, শ্রীমুখোপাধ্যায় মনে হয় এই ভেবেই ছবিখানি তুলেছেন। অর্থব্যয় করতেও তিনি কৃপণতা করেন নি। সুমিত্রা দেবী এবং প্রদীপকুমারকে বোম্বাই থেকে সংগ্রহ করেছেন। ট্রুপ নিয়ে রেঙ্গুণ গেছেন। সেখানকার নানা বাজনা এবং তৎসহ একটি বর্মী নৃত্যও পরিবেশন করেছেন। জাহাজের মধ্যেই প্রচুর ছবি তোলা হয়েছে। কয়েকটি সমুদ্রের দৃশ্য বাঙলা ছবিতে সার্থক সংযোজন।

ছবি শুরু হল কিন্তু কেমন যেন গোলমাল এবং কৃত্রিমতার মধ্যে। সন্ন্যাসীর পোষাক পরনে কয়েক জন দস্যু এক ধনীব্যক্তির কাছ থেকে 'চেক' লিখিয়ে নিচ্ছে। সন্ন্যাসীদের মেক-আপ খুবই খারাপ হয়েছে। প্রিন্সের সাজে, আর্টিষ্টের মেক-আপে দুই মোহনের মধ্যে প্রভেদটা মোটেই স্পষ্ট নয়। যে কোনও ছেলেমানুষের পক্ষে তা' বলে দেওয়া সহজ। ঠিক ওই একই কথা, বর্মায় প্রিন্স এবং ফেরার পথে জাহাজে সুমিত্রা দেবীর (রমা) কাছে ব্যবসাদার বলে পরিচয় দেওয়ার সময়। অরুন্ধতীর (চপলার) সম্পর্কেও ওই এক কথা। ঘড়ি চুরি করার ব্যাপারটা, ইনসাইড পকেট থেকে একটা লোকের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বিশেষ করে যে লোক পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার তাঁর কাছ থেকে ওটা কি একটু অস্বাভাবিক হয় নি? পার্টির ছবিতে নেকলেশ চুরি যাওয়ার দৃশ্যটির পরিকল্পনা ভাল হয়েছে। তবে ওই নাচের দৃশ্যটুকুতে রঙ দেবার কি প্রয়োজন হল, বুঝতে পারলাম না। মনে হয়, রঙ না দিলেই দৃশ্যটি জমতো ভাল। কালারিংও ভাল হয়নি মোটেই। বর্মার প্যাগোডার দৃশ্যগুলি, সাম্পান এবং বিভিন্ন ধরণের বাজনা, জাহাজের দৃশ্যগুলি আলাদা করে ভালই লেগেছে। পরিচালনার কাজ স্থানে স্থানে ভালই হয়েছে বেশ। কুকুরের যকলেশে নেকলেশ রাখার দৃশ্য, রাস্তা দিয়ে কুকুরের বেড়াল ধরতে দৌড় বেশ। ফটোগ্রাফীও খুবই উৎকৃষ্ট ধরণের হয়েছে স্থানে স্থানে।

ছবিটির মধ্যে একটু গল্পের আঁচ পাওয়া গেল রমার সঙ্গে মোহনের দেখা হবার পর। রমা আগ্রার এক ক্যুরিও-কলেক্টর ধনী পিতার কন্তা। মোহন এক জন দস্যুমাত্র। এক্ষেত্রে ভালবাসা থাকলেও বিয়ে করা সম্ভব কি? তাই মোহন পুলিশের কাছে ধরা দিলে রমার কথা রাখতে। এটটুকুই ছবির গল্প। এরই পাশে পাশে অবস্ত চপলার এক মৌন প্রেমের দেখা পাওয়া গেল মোহনের প্রতি। শেষে ওই দাদা-বোন হয়ে যাওয়াটা উপন্তাসের দুর্বলতারই পরিচায়ক। ওটা ছবিতে বাদ দিলেও কি ক্ষতি হত?

অভিনয়াংশে প্রদীপকুমারকে মোহনের ভূমিকায় মানিয়েছে মন্দ নয়। মেক-আপ খারাপ না হলে তাঁর অভিনয়. খারাপ হয় নি, একথা না বলে ভালই হয়েছে বলতে পারতাম। সুমিত্রা দেবীকে অনেক দিন পর বাঙলা ছবিতে দেখে অনেকেই খুসী হবেন। তাঁর অভিনয়ও মন্দ হয় নি। অরুন্ধতী, বিকাশ রায় ভালই। ছবি বিশ্বাস, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও মন্দ নন।

কঙ্কাবতীর ঘাট ও গোধূলি

'কঙ্কাবতীর ঘাট' মহেন্দ্র গুপ্তের একদা জনপ্রিয় নাটকের চিত্ররূপ। স্বামীর আরোগ্য কামনা করে প্রদীপ মাথায় করে জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন সতী কঙ্কাবতী। সেই আদর্শই মাথায় করে নিয়ে সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে শিলাও ডুব দিল জলে তার স্বামী প্রবীরকে বাঁচাবার জন্য। এরই মধ্যে দর্শনীয় দিকটা হচ্ছে অভিনয়। চন্দ্রাবতী যেন একাই একশো চামেলী বিবির ভূমিকায়। নন্দুরায় চরিত্রে কমল মিত্র, লালমোহন আড্ডির চরিত্রে শ্যাম লাহা, মিষ্টার মুখার্জীর চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিলার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী, প্রবীরের ভূমিকায় উত্তমকুমার ভালই। তবে কলেজের মেয়ে হিসেবে সন্ধ্যারাণীকে মোটেই মানায় নি একথাও বলবো। চন্দ্রাবতীর প্রায় মূক অভিনয় অপূর্ব! এ ছবিতেও ভাল হয়েছে আলোকচিত্রের কাজ। পরিচালনায় কালীপদ সেন বিশেষ মারাত্মক রকমের কিছু ভুল করেন নি। সঙ্গীত ক'খানি মন্দ লাগেনি।

'গোধূলি' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনস্তাত্বিক একটি গল্প। ইন্দুর সঙ্গে অনুপমের সংসার একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে। সুখের সংসার। তা'তে আগুন লাগলো এক ঘর ভাড়াটে এসে। ভাড়াটেদের মধ্যে ইন্দুর দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয় অধ্যাপক চিন্ময়। শুধু অধ্যাপক নয় কবি। কবিও শুধু নয় গায়কও। তার সঙ্গে ভালবাসা ইন্দুর।
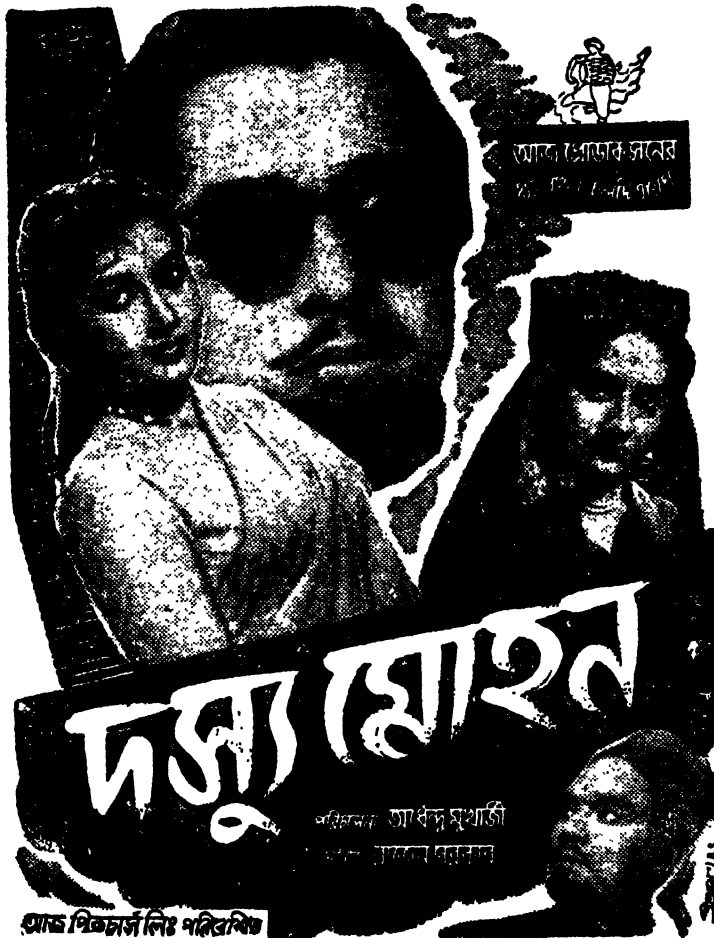
ছোটবেলার খেলার সাথীকে পেয়ে কেমন যেন চিড় খেয়ে গেল সংসারটায়। মধ্যে এক মেয়ে এল ঝুনু। চিন্ময় তাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। ইন্দুর ইচ্ছে বাইরে চিন্ময় তাকে বিয়ে করুক। শেষ অবধি তাই হল। নানা ভুল বোঝাবুঝির পর ঝুনুকেই বিয়ে করতে রাজী হল চিন্ময়। নতুন করে ইন্দুকে ফিরে পেল অনুপম। সাবিত্রী এবং অরুন্ধতী চলনসই গোছের অভিনয় করে গেছেন। জহর গাঙ্গুলী, রাজলক্ষ্মী, তুলসী লাহিড়ী আর তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় ভালোই! তবে ডাক্তার রুগী দেখতে এ'সে যন্ত্র ফেলে যায়, অত রাতে বাড়ী ফিরে এসে চিন্ময় আর ইন্দু দরজা খোলা রেখেই উঠে এল ওপরে, অত তাড়াতাড়ি কবিতা লেখা হয়ে গেল, কবিতাটা টোকার দরকার কি হল এ সব বুঝলাম না। ফটোগ্রাফী, শব্দগ্রহণ ইত্যাদি এ ছবির ভালই হয়েছে দেখলাম। পরিচালনায় কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় যতখানি উন্নত রুচির পরিচয় দেবেন ভেবেছিলাম, ততখানি কিন্তু পাই নি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সমুদ্রে ওঠে ঢেউ। ঢেউএর মুখে প'ড়ে হাবুডুবু খায় প্রকাণ্ড জাহাজ। নদীতে যখন ঝড় আসে, দুরন্ত ঝড়ে যখন ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায় হাল, ছিঁড়ে যায় পাল—আরোহীদের দিশাহারা কোরে

শাপমোচনের একটি দৃশ্যে অরুণেশ্বর (উত্তম বসু) ও কমলিকা (সুনন্দা সেন)

তোলে ভাঙা তরীখানা। নবগঠিত প্রতিষ্ঠান শ্রীরূপম তুলছেন "ঢেউ"। "ঢেউ"এর বেগ সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছেন সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। আরোহীও অনেকেই। ছবি, ছায়া, অসিতবরণ, কাবেরী, সাবিত্রী, শিশির, ভানু, অনুপকুমার প্রভৃতি শিল্পীরা।

"সংমা" নামটা শুনলেই কেমন যেন ভয় হয়! ঐ নামটার বিরুদ্ধে বরাবরই অভিযোগ শোনা যায়। "সংমা" নাকি চিরকালই অসৎ। নিজের স্বার্থ দেখাটাই তাঁর নাকি গুরুতর অপরাধ! সারদা চিত্রপীঠ যে "সংমা"কে পর্দ্দায় তুলে আনছেন, তিনি সত্যই অপরাধী কি না, সে বিচারের ভার পড়বে শীঘ্রই দর্শক-সাধারণের ওপর। "সংমা"কে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মণি ঘোষ। গানে গানে তাকে মুগ্ধ কোরে রাখার ভার কমল দাশগুপ্তের ওপর।

পদে পদে যারা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাদের জীবন সত্যই দুর্ব্বিষহ। কোনো একটা কারণে যদি লাঞ্ছনা হয়, সহ্য করা যায়, কিন্তু অকারণে লাঞ্ছনা খুবই মর্ম্মান্তিক। বিধায়ক ভট্টাচার্য্য যাকে "লাঞ্ছিতা" বোলে স্বীকার কোরেছেন, দর্শক-সাধারণের কাছ থেকেও সেই স্বীকারোক্তি পাবার আশায়, বি, কে, আর প্রোডাকসন্স "লাঞ্ছিতা"কে শীঘ্রই রূপালী পর্দ্দায় নিয়ে আসবেন। প্রণতি, সাবিত্রী, শোভা সেন, ছবি বিশ্বাস, বিমান, শিশির, নৃপতি, ভানু প্রভৃতি শিল্পীরা এই সামাজিক ছবিখানিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এক দিকে ভারত কথাচিত্রম "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" রূপী কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে স্বতন্ত্র ছবি তোলায় ব্যস্ত, অপর দিকে নারায়ণ ফিল্ম প্রোডাকসন্স "শ্রীমা" ছবিখানিতে অনুভা গুপ্তকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করাচ্ছেন। গুরুদাসকে নামিয়েছেন সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণের ভূমিকায়। একই চরিত্রের দু'টি অভিনেতার, সুষ্ঠু অভিনয়ের বিচারের ভার নিতে হবে দর্শকদের।

"চিরকুমার সভা" আহ্বান কোরেছেন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে পরিচালক দেবকী বসু। সভায় ইতিমধ্যে এসে হাজির হ'য়েছেন বিবাহিতরাই বেশী। শিল্পীদের মধ্যে আছেন অহীন্দ্র, জহর, নীতীশ, বিকাশ, জীবেন, উত্তমকুমার, সুচিত্রা, ভারতী, শোভা সেন, তপতী প্রভৃতি আরো অনেকে। সভার গানের আসর সরগরম কোরে রাখার ভার নিয়েছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত।

অর্দ্ধ+অঙ্গিনী ইতি অর্দ্ধাঙ্গিনী—ব্যাকরণসম্মত সন্ধি বিচ্ছেদ। পুরাণে আছে অর্দ্ধনারীশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যেই যখন অর্দ্ধনারী বর্ত্তমান, তখন এক আত্মা স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে, স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বোলে আখ্যা দেওয়া শাস্ত্রমতে যৌক্তিক বলা চলে। কোনো এক "অর্দ্ধাঙ্গিনী"র রূপ রূপালী পর্দ্দায় তুলে দেখাবার ভার নিয়েছেন প্রযোজক বিকাশ রায়। আধুনিক যুগে অর্দ্ধাঙ্গিনী নাম বজায় আছে বটে, কিন্তু আসলে, অঙ্গ দু'জনের হয়ত টালা, টালিগঞ্জে ছাড়াছাড়ি অবস্থায় পড়ে আছে। সুনন্দা, মঞ্জু, ভারতী, সবিতা, সাবিত্রী, পাহাড়ী, বিকাশ, অসিত, নির্ম্মলকুমার, জীবেন বসু প্রভৃতি শিল্পীরাই "অর্দ্ধাঙ্গিনী"র সন্ধান দেবেন।

সোনালী পিকচার্স এবার পরিবেশন কোরবেন "মাষ্টার মশাই"কে। বিকাশ, প্রণতি, সাবিত্রী প্রভৃতি শিল্পীরা "মাষ্টার মশাই"এর সঙ্গেই আছেন। সত্যজিৎ মজুমদার তাঁকে গানের সুরে মশগুল কোরে রাখার ভার নিয়েছেন। সব কিছু পরিচালনার দায়িত্ব

নিয়েছেন ভুজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়। "মাষ্টার মশাই"টি কেমন, ছবি দেখলেই বোঝা যাবে।

হিন্দুশাস্ত্রে সবর্ণ আর অসবর্ণ বোলে যে দু'টি বর্ণের উল্লেখ করা আছে, সে দু'টি বর্ণের মধ্যে আদান-প্রদানগুলি বিভিন্নমুখী কোরে রেখেছে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। পিনাকী মুখার্জ্জী এক "অসবর্ণা"র ছবি তোলার ব্যাপারে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য যে সব শিল্পীদের নাম প্রচার করা হ'য়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নামকরা, যেমন, সুমিত্রা, সুপ্রভা, রেণুকা, বিকাশ, জীবেন প্রভৃতি। "অসবর্ণা"র ভাগ্য দেখবার জন্য নিশ্চয়ই এক দিন ভিড় হবে বিভিন্ন সিনেমা-হাউসগুলিতে।

২১শে আগষ্ট সোমবার উজ্জ্বলা প্রেক্ষাগৃহে উদয়শিল্পীর বাৎসরিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হয়। দু'-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে সমগ্র ভাবে 'শাপমোচন' উদয়শিল্পীর একটি সুষ্ঠু ও মার্জ্জিত পরিবেশনা। নৃত্য পরিচালনায় সরস্বতী বসু মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত পরিচালনায় প্রভাতকমল উল্লেখযোগ্য। অভিনয়াংশে অরুণেশ্বরের ভূমিকায় কৃষ্ণা বসু এবং কমলিকার ভূমিকায় সুনন্দা সেন উল্লেখযোগ্য। 'নির্জ্জন বনে' কমলিকার ধ্যানমূর্ত্তিতে যেখানে অরুণেশ্বরের আবির্ভাব, সেখানে কৃষ্ণা বসু নৃত্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। মদ্ররাজ-গৃহে, রাজবধূ বেশে এবং 'নির্জন বনে' কমলিকার নৃত্য সত্যই প্রশংসনীয়। সংগীতাংশে সুমিত্রা সেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন। তাঁর 'এসো আমার ঘরে' গানটি উল্লেখযোগ্য। পুরুষ কণ্ঠে শৈলেন্দ্রকুমার দত্তের "তুমি কি কেবলি ছবি" এবং বিশ্বনাথ মুখার্জির "বাহিরে ভুল হানবে" গান দুটি সুন্দর ভাবে গীত হয়েছে। সূত্রধর অমিত দাশগুপ্ত সুন্দর

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

কুশলী অভিনেত্রী শ্রীমতী তপতী ঘোষ

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীমতী তপতী ঘোষ—চলচ্চিত্র-জগতে নবীনা হ'লেও ধীরে ধীরে হ'য়ে চলেছে তাঁর প্রতিষ্ঠা। এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'বে এ সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। নিষ্ঠা, উদ্যম ও সাধনা—এ দিয়ে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি তাঁর শিল্পি-জীবনকে। চিত্র ও নাট্যজগতে তিনি এরই ভেতর একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন আপনার জন্যে। কুশলী অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর কাছ থেকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে জানবার অনেক কিছু থাকতে পারে, তাই একবার গেলুম তাঁরই বাসভবনে। মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ও বধূ তিনি, শিল্পি-জীবন গ্রহণ করলেও স্বামিগৃহে দেখা গেল তাঁকে আদর্শ বধূরূপেই।

আমাদের আলোচনার প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—এ লাইনে আসা আপনি কেন বেছে নিলেন? শ্রীমতী তপতী ধীর ভাবে উত্তর ক'রলেন,—এ লাইনে আসবো এ লক্ষ্য আমার প্রথমটায় ছিল না। ছোটবেলায় স্কুলে যখন পড়তুম সে সময় অভিনয়ের নেশা অবশ্য ছিল। তার পর প্রধানতঃ অবস্থা বিপর্য্যয়েই অভিনয়টাকে করে নিতে হ'লো জীবনের পেশা। গোড়ার দিকে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পেয়েছি বাধা ও অবহেলা। কিন্তু এখন সে অবস্থা কেটে গেছে।

১৯৫১ সালে 'পাত্রী চাই' ছবিতে আমি প্রথম অভিনয় করি—বলে চললেন শ্রীমতী তপতী তাঁর স্বাভাবিক সহজ সরল ভঙ্গীতেই। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমার সব চেয়ে তৃপ্তি হ'য়েছে, এ একটি কঠিন প্রশ্ন। যখন যে ছবিতে যে ভূমিকাতেই অভিনয়ের সুযোগ আমার হয়েছে, আনন্দ পেয়ে আসছি অফুরন্ত। তবু যদি বলবার দাবী করেন, তবে বলবো 'বিল্বমঙ্গল' ছবিতে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে পেরে আমি খুব বেশী রকম তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছি—যেমনটি হয়তো অন্যত্র পাইনি।

আপনার দৈনন্দিন সাধারণ কর্ম্মসূচী কি? এ প্রশ্নটি তুলে ধরা মাত্র শ্রীমতী তপতী সলজ্জ ভাবে বললেন—মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে বা বধূরা যে ভাবে কাজ-কর্ম্ম করে, আমিও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বামি-গৃহে ঝি-চাকর অবিশ্যি রয়েছে, কিন্তু কোন কারণে যে দিন তারা রইলো না সে দিন নিজ হাতেই সব কিছু করি। অবসর যখন পাই সে সময়টা কাটিয়ে দিই পড়াশুনো করে কিম্বা সেলাই কাজ করে। অমনি হবি বলতে আমার বিশেষ কিছু নেই—পড়াশুনো ও সেলাইটাকেই বরং আমার হবি ব'লতে পারেন।

খেলা-ধূলোয় আমার তেমন আগ্রহ নেই—সাঁতার দেখতে আমার ভাল লাগে। সাময়িক পত্র-পত্রিকা আমি পড়ে থাকি,

এর ভেতর সিনেমার কাগজগুলোই পড়তে আমি ভালবাসি। মাসিক বসুমতীও পড়ার অভ্যাস আমার আছে এবং ভালও লাগে পড়তে। পুঁথি-পুস্তকের মধ্যে রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলো পড়তে আমি আনন্দ পাই।

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন—পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব অভিমত কি? শ্রীমতী তপতী অল্প কথায় বললেন, সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদই আমি অন্তত পছন্দ করি। জাঁকালো পোষাকের পরিবর্ত্তে সকল ক্ষেত্রেই সাদা-সিধে ধরণের পোষাক বাঞ্ছনীয়। আমার এ' মত সব মেয়েরা মেনে নেবেন কি না বলতে পারিনে, তবু আমার ব্যক্তিগত রুচি জানিয়ে রাখবো।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণ অত্যাবশ্যক—জানতে চাইলুম আমি। শ্রীমতী তপতী নম্রতার সুরে উত্তর করলেন—আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, অভিনেতা বা অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে একান্তই চাই শিল্প-প্রতিভা ও অভিনয়-দক্ষতা। তার পর সুচেহারা, কণ্ঠস্বর, শিক্ষা এবং সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করবার মনোভাব, এ কয়টিও না হলে নয়। চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতির জন্য অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান আমি সমর্থন করবো। অন্য সব পাঁচটা বৃত্তির ন্যায় এ-ও একটা গ্রহণযোগ্য বৃত্তি বা উপজীবিকা। আজ-কাল অবিশ্যি বহু শিক্ষিত ছেলেমেয়ে এ লাইনে এসেছেন এবং এটা আশারও কথা। শিল্পীদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন বেশী রকম, কারণ শিল্পীর প্রতিষ্ঠা অনেকটা নির্ভর করছে তার স্বাস্থ্যের উপর।

শ্রীমতী তপতী ঘোষ

এর পর আমি একটি হালকা প্রশ্ন করলুম—বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি? হালকা ভাবেই উত্তর করলেন শ্রীমতী ঘোষ—আমার ক্ষেত্রে আপত্তি উঠেনি এটুকু জানি, পরন্তু আমার স্বামী আমায় উৎসাহিত করেছেন এ লাইনে। অন্যের ক্ষেত্রে কি হয় বা হয়েছে, আমার পক্ষে বলা কঠিন।

এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চললো আমাদের ভেতর। দেখলুম চলচ্চিত্র-জগতে নবাগতা হ'লেও অভিজ্ঞতা তাঁর কম হয়নি। এ-ও দেখলুম, এ শিল্প সম্পর্কে নিবিড় ভাবে জানবার একটা দুরন্ত আগ্রহ রয়েছে তাঁর। আমার সর্ব্বশেষ প্রশ্ন—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবনই বা কি ভাবে কাটাতে চান? শ্রীমতী তপতী নিঃসঙ্কোচে উত্তর করলেন—পড়াশুনো, গান-বাজনা, খেলাধূলো—এসবের ভেতর দিয়ে আমার শৈশব জীবন কাটে। আমি ছিলুম বাপ-মায়ের মেজ সন্তান। আমার যখন বছর তের বয়স সে সময় মা মারা যান। তখন থেকেই সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে আমার উপর। ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনো, লেখা-পড়া শেখান সবই আমাকে দেখতে হয়। অনেক অশান্তির মাঝে মাতৃহারা জীবনে আমার দিনগুলো কাটতে থাকে। বাবার ব্যবসা ছিল, কিন্তু সেও প্রায় অচল হ'য়ে পড়লো কিছু দিন মধ্যেই। কি করা যায়, এ দুশ্চিন্তা আমার মনকে করে তুললো ব্যাকুল। শেষ পর্য্যন্ত ফিল্ম্‌এ যোগদান করাই স্থির করলুম এবং সে বাবার সম্মতি নিয়েই। দুঃখের বিষয়, আত্মীয়-স্বজনরা অমাদের অবস্থা জেনেও আমার এ লাইনে আসাটাকে পছন্দ করলেন না। এমন কি, তাঁরা প্রকাশ্যে অবহেলা জানাতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু কোন কিছুই আমাকে পিছু-পা করতে পারেনি সে দিন।

শ্রীমতী তপতী আরও বলে চলেন—এক বার যখন এ লাইনে এসে পড়লুম তখন আর্থিক প্রশ্নটাই বড় হয়ে থাকলো না আমার কাছে। এ লাইনটিকে ভাল ভাবে জানা এবং নিজের শিল্পিজীবনকে বিকশিত ও সার্থক করে তোলা, এখন এই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার প্রধান লক্ষ্য। ভবিষ্যতে সাংসারিক জীবনই আমি কাটাতে চাই, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না।

[উপন্যাস]
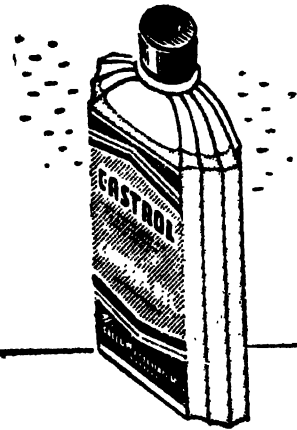
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

রাণী তার দিদি দেবীকে নিয়ে ঝুল বারাণ্ডায় এসে অরুণার পায়রার প্রতীক্ষা করছিল। পালা অনুসারে এ দিন অরুণাই পায়রা ছাড়বে, আর সেই পায়রার মারফত তারা জবাব পাঠাবে—এই রকম ব্যবস্থা স্থির করা আছে। আগামী কাল আবার এই সময় রাণী ও দেবী তাদের শিখানো পায়রা ছাড়বে চিঠি দিয়ে। দু'জনেই আকাশ পথে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে—রাণীর চোখে চশমা। অতিরিক্ত পড়াশোনায় তার চোখের দোষ হওয়ায় চশমা ব্যবহার করতে হয়েছে। সুশ্রী অথচ নূতন ধরণের চশমা চোখে ওঠায়, রাণীর মুখের সৌন্দর্য যেন কিছুতে বেড়ে গেছে। দেবীর এ-সব বালাই নেই। সেই যা কলকাতায় প্রথম এসে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি তাকে ভুগিয়েছিল—যে জন্য তার স্মৃতিভ্রংশ হয়। তাছাড়া, বর্তমানে সে সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাস্থ্যবতী এবং তার চোখের দৃষ্টিও প্রখর। দুই ভগিনীই আকাশের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। দেবীই প্রথমে আনন্দে করতালি দিয়ে বলল: ঐ আসছে—ঐ দেখ—ঐ যে রে!

রাণী প্রথমে দেখতে পায়নি, দেবীর নির্দেশ মত এখন দেখতে পেল এবং তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আরও আবিষ্কার করল—একটি নয়, দু'টি। অজিতের বিলাত যাত্রার পর থেকে অরুণা একাই তার পালার দিনে পায়রা পাঠিয়ে আসছে। আজ আগুপেছু দু'টি পায়রা আসছে দেখে সে একটু বিস্মিত হলো। দেবীও জানে, শুধু অরুণার পায়রা পত্র বহন করে আনে। একটা পায়রার চিন্তাই তার মাথায় ঘুরছিল—পিছনে যে আর একটি পায়রা আসছে, সেটা দেখেনি। এখন ভালো করে তাকাতেই দেখতে পেয়ে বলল: ওটা বোধ হয় আর কারো পায়রা।

রাণী বলল: না, আমাদের শিক্ষিত পায়রা বাইরের পায়রার সঙ্গে মেশে না। ঐ দেখ না—এদিকেই আসছে, আর এলো বলে।

একটু পরেই দু'টি পায়রা পর পর এসে বারাণ্ডার নির্দিষ্ট জায়গাটির উপরে পাশাপাশি বসল। দেবীই বলল: আরে ওটা যে অজিত বাবুর পায়রা! সে তো বিলেত গেছে—তবে?

রাণী বলল: হাতে পাঁজী মঙ্গলবারে কি দরকার—দেখাই যাক না।

কথার সঙ্গেই সে এগিয়ে গিয়ে দুটো পায়রার পায়ের দিকে তাকাল; দেখল, দুটোই চিঠি এনেছে। অভ্যস্ত কৌশলে পায়রা দুটোর পা থেকে পাকানো পত্র দু'খানা খুলে উপরের লেখা পড়েই সে উল্লাসের সুরে বলল: তোর নামে চিঠি রে দিদি!

দেবী বলল: অরুণা তো আমাকে চিঠি দেয় না—তবে?

রাণী বলল: অরুণার চিঠি নয়—হাতের লেখা আলাদা, এখন পড়ে দেখ—কে দিলে!

রাণীর নামের চিঠিখানা তাকে দিয়ে দেবী তার চিঠিখানা খুলতে লাগল। চিঠির গোড়াটা পড়েই দেবী চীৎকার করে উঠল ক্রুদ্ধকণ্ঠে: কি রকম আস্পর্দ্ধা দেখ রাণী, চিঠিতে আমাকে কি সব নোংরা কথা লিখেছে!

নিজের চিঠি থেকে কৌতূহলাক্রান্ত মুখখানা তুলে জিজ্ঞাসা করল: সে কিরে—কে লিখেছে?

চিঠিখানা রাণীর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে বলল: দেখ্ তো তুই—পোড়ারমুখোটা কে?

রাণীর চিঠি তখন পড়া হয়ে এসেছে, চাপা গলায় দিদিকে সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে বলল: চুপ চুপ, মস্ত লোকের ছেলে যে—গাল দিসনি; অরু ওর কথা আমাকে লিখেছে।

দেবী মুখখানা মচকে বলল; গাল দেব না তো কি! আমাকে কি সব লিখেছে দেখ না—জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে—

রাণী তার চিঠিখানা নিয়ে দেবীর সামনে এসে বলল: এই শোন্—অরু লিখছে—আমাদের নিকট আত্মীয়, সম্পর্কে জেঠাবাবু—যাঁর বাড়ীতে তোমাদের আফিস, বিলেত গিয়েছিলেন জান ত? তিনি স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে তাঁর ভাগনে প্রশান্তকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। ভাগনেটির সঙ্গে দেবীর বিয়ের কথা হোচ্ছে। প্রশান্তদা' রাজি, খাসা ছেলে তিনি। নিজেই উপযাচক হয়ে দেবীর সঙ্গে আলাপ করবার আশায় দাদার পায়রাকে দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন। দেবীকে বলিস জবাব দিতে। প্রশান্তদা' ভারি ভালো ছেলে; চিঠিতে জানা-শোনা হোক, তার পর আমি তাকে নিয়ে গিয়ে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেব।

চিঠি শুনতে শুনতেই দেবী অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। রাণীর পড়া শেষ হতেই রুক্ষ মেজাজে বলল: ভালো ছেলে হোলে বুঝি এমনি করে অভদ্রের মত লেখে—মাই ডিয়ার দেবী, যদিও তোমার সঙ্গে আলাপ নেই, কিন্তু এখানে এসেই আমার প্রিয় ভগিনী অরুণার মুখে তোমার কথা শুনেই তোমাকে আমার মন-মন্দিরে দেবীর আসনে বসিয়েছি। দেবী-দর্শনের জন্যে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি, চিঠির উত্তর পেলেই—মাগো মা! লেখবার শ্রী দেখছ, লজ্জায়, ঘেন্নায় আমার দেহ রী-রী করছে, আমি মাকে সব বলছি—

চিঠিখানা নিয়ে দেবী মায়ের কাছে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই রাণী বাধা দিয়ে বলল: এ তো আমাদের খেলা, ভালো না লাগে—খেলিসনি; কিন্তু মাকে ব'লে কি হবে? যাসনি দিদি—

কিন্তু দেবীর অন্তর্নিহিত নারী-সত্তা তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশুদ্ধা কুমারীর প্রতি অপরিচিত পুরুষের প্রেরিত এরূপ লিপি যে

অবৈধ এবং এটা গোপন করা অসঙ্গত, মায়ের কাছে লব্ধ শিক্ষাই তাকে এ সম্বন্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। সুতরাং রাণীর বাধা অগ্রাহ্য করে সে ভিতরে ছুটল মাকে চিঠিখানা দেখিয়ে নালিশ করবার উদ্দেশ্যে।

বাড়ীর বাহির মহলে পাশ্চাত্য আদর্শে সাজসজ্জা ও আদব-কায়দা দেখলে যেমন গৃহস্বামীর আধুনিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্দর-মহলে একেবারে তাহার বিপরীত। গৃহকর্ত্রী যে অত্যন্ত রক্ষণশীলা—সেকালের রীতি-নীতি এবং কৌলিক ক্রিয়া-কর্মাদি নিষ্ঠা সহকারে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, বাহিরে এলাকা পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহা যেমন জানা যায়, পক্ষান্তরে, তেমনি এক পবিত্র ভাবধারায় আগন্তুকের চিত্তও আবিষ্ট হয়। চৌরঙ্গী অঞ্চলের বড় বড় হোটেলগুলি থেকে সরাসরি দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে এলে মনোভাবের যেমন একটা পরিবর্তন ঘটে, বোগলা-ভবনের বহির্মহল থেকে ভিতর মহলে এলেও চিত্তের তেমনি অবস্থান্তর হয়ে থাকে। আধুনিকতার একান্ত পক্ষপাতী গৃহস্বামীর প্রতাপ-প্রতিপত্তিও এখানে যেন সসম্ভ্রমে অবনত। এ মহলের ঠাকুরঘর, পাকশালা, পাঠাগার, ভোজনকক্ষ, ভাঁড়ারঘর, বসবার স্থান, এমন কি শয্যাগৃহগুলি পর্যন্ত প্রাচীন আদর্শবতী গৃহকর্ত্রীর রুচির নিদর্শন বহন করে।

দেবীকে উত্তেজিত ভাবে ছুটে আসতে দেখেই সুলোচনা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে রে—হাতে কার চিঠি?

হাঁফাতে হাঁফাতে দেবী উত্তর দিল: দেখ মা—পায়রার পায়ে বেঁধে ও-বাড়ীর প্রশান্ত নামে একটা ছোঁড়া আমাকে এই চিঠি দিয়েছে।

সুলোচনা দেবীর চোখ-মুখ রাঙা হয়ে ওঠে মেয়ের কথা শুনে। চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেন। দেবী এই সময় বলল: জানো মা, রাণী বলে, এ চিঠির জবাব দিতে হবে। আমি বলি—মাকে আগে দেখাই; সে কি আসতে দেয়? আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।

যৌবনে পদার্পণ করলেও, দেবীর কথার মধ্যে বালিকা-সুলভ টান ও সারল্যের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মায়ের প্রতিটি কথা ও উপদেশ তার কণ্ঠস্থ; মাকে জিজ্ঞাসা না করে সে কোন কাজই করে না, কোথাও যায় না, কারও সঙ্গে কথা বলে না। মাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর মত নিয়ে তবে সে রাণীর সঙ্গে পায়রা নিয়ে খেলায় যোগ দিয়েছিল, সেই খেলা থেকে আজই অশান্তির উৎপত্তি!

মা বললেন: এর পর আর তুমি রাণীর সঙ্গে মিশে এ খেলা খেলো না। আর, তুমি নিজেই ভেবে দেখ, এ চিঠির কি জবাব দেওয়া উচিত। এমন শক্ত জবাব দাও, ঐ প্রশান্ত ছেলেটা আর কোন দিন যাতে চিঠি লিখতে ভরসা না করে, সে-ও টিট হয়ে যায়! আমার সামনে বসেই লেখ।

এই ঘরেই দেবী মায়ের কাছে পড়াশোনা করে। পড়ার যাবতীয় বই ও লেখবার উপাদান সবই গৃহমধ্যে সাজানো রয়েছে।

ঘরের দেওয়ালে পুরাণের দেব-দেবী এবং এ যুগের মহাপুরুষদের আলেখ্যগুলি শোভা পাচ্ছে।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই কয়েক ছত্রে দেবী চিঠিখানার জবাব এই ভাবে লিখে মাকে দেখতে দিল। দেবী লিখেছে—

"জানা নেই, পরিচয় নেই, অথচ এক ভদ্রকন্যাকে এভাবে বেহায়ার মত চিঠি লিখে আপনি গুরুতর অন্যায় করেছেন। এমন কুকর্ম আর করবেন না। ইতি—"

চিঠিখানা পড়ে মা বললেন: ঠিক লিখেছ, রাণী যখন বলছে—তার হাতে দাও, সে পাঠিয়ে দিক।

দেবী বলল: চিঠিতে আমার নাম লিখিনি মা, ঠিক করিনি?

মা বললেন: ঠিক করেছ। আমি তোমার লেখা দেখে খুশি হয়েছি। আমার মনে হয়, রাণীও এমন করে লিখতে পারত না। যাও মা, দিয়ে এস তাকে।

দেবীর আচরণটা রাণীর ভাল লাগেনি। প্রশান্ত বাবু এমন কিছু খারাপ কথা লেখেন নি, যার জন্যে দেবী ও ভাবে রেগে উঠবে। বাবার ইচ্ছা, তারা আধুনিকা হয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু মা যে ভাবে দেবীকে নিয়ে পড়েছেন, তাতে তার উন্নতির কোন আশাই নেই। অরুণার চিঠির জবাব লিখে, রাণীই দেবীর হোয়ে প্রশান্তকেও এক চিঠি লিখেছে এই ভাবে: অরুণার চিঠিতে আপনার কথা জানলাম। আপনি আমার দিদিকে চিঠি লিখলেও সে জবাব দিতে অনিচ্ছুক। সে বলে—আগে আলাপ-পরিচয় হোক, তার পর চিঠি। দিদির একটু লজ্জা বেশী। যাই হোক, আপনি কিছু মনে করবেন না। দিদির হোয়ে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি—সন্ধ্যার পর অরুণার সঙ্গে এ বাড়ী আসবেন, দিদির সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

শিক্ষিত পায়রা দু'টি এতক্ষণ যথাস্থানে বসে রাণীর দেওয়া পাকা ফল টুকছিল। বড়লোকের বাড়ীর পোষা পায়রা, ফল, মেওয়া, ক্ষীর, ছানা খেতে অভ্যস্ত, রাণীও এ সব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত—পাণ থেকে চুণটুকু খসতে দেয় না। পায়রা দুটোও জানে, জবাব নিয়ে তাদের যেতে হবে। খেতে খেতে এক এক বার মুখ তুলে ও মুখ দিয়ে একটা মিষ্টি স্বরে যেন জানাচ্ছিল—তাড়াতাড়ি কর।

দুটো পায়রার পায়েই চিঠি দু'খানা বেঁধে দিয়েছে রাণী, এমন সময় দেবী এসে তার চিঠিখানা দিল রাণীর হাতে। বলল: এই চিঠি পাঠিয়ে দে। আর, কাল থেকে আমি আর এ খেলায় নেই।

এক নিশ্বাসে কথা কটা বলেই সে চলে গেল। রাণী চিঠিখানা পড়ে নাক-মুখ সিঁটকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল, সেই সঙ্গে পায়রা দুটোকেও উড়িয়ে দিল।

বাড়ীর বারমহল ও অন্দর মহলের মাঝখানে পাশাপাশি সুসজ্জিত ঘর দু'খানি গৃহস্বামী ব্যবহার করেন এবং তাঁর প্রবেশপথের পরিধি এই পর্যন্ত। অন্দর মহলে জুতা পায়ে দিয়ে কিম্বা কোন রকম স্বেচ্ছাচারের উপায় নেই নিষ্ঠাবতী গৃহিণীর দপদপায়। বহির্মহলে অতিথি সংকারকল্পে বিদেশীয় ব্যবস্থায় ড্রয়িংরুম ও পান-ভোজনের বৃহৎ হল থাকা সত্ত্বেও ভিতর মহলে পরিজন বা অন্তরঙ্গ দু'চার জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে এখানেই ভোজনপর্ব চলে। সংলগ্ন কক্ষান্তরে শয়নের ব্যবস্থা। গৃহিণীর প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মিল না হলেও তিনি তাঁর এলাকায় কোন দিনই অনধিকার প্রবেশ করেন না। এই ক্ষুদ্র মহলটিই মধ্যস্থরূপে গৃহিণীর সঙ্গে গৃহস্বামীর যোগসূত্র বজায় রাখে। এ দিনও নিত্যানন্দ বাবুর বাড়ী থেকে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে বগলাপদ বাড়ী ফিরলেন—তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

অন্যান্য দিন বাড়ী ফিরে প্রথমে বহির্মহলে তাঁর কক্ষেই প্রবেশ করেন বগলাপদ। এ দিন একেবারে মধ্যম মহলে তাঁর শয়নকক্ষে সরাসরি ঢুকেই গৃহিণীকে আহ্বান করলেন। গৃহিণীও ও-বাড়ীর কে—প্রশান্ত নামে এক ফাজিল ছোকরার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই কর্তার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। পরিচারিকাকে পর্যন্ত বলে রেখেছেন—কর্তা ফিরেছেন শোনবামাত্র যেন তাঁকে জানায়। এখন কর্তা সরাসরি তাঁর ঘরে এসে তাঁকেই ডাকছেন শুনে একটু বিস্মিত হলেও তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গৃহিণী সুলোচনা দেবীই উষ্ণ ভাবে প্রথমে স্বামীকে শুধালেন: হাঁগা, ও বাড়ীতে প্রশান্ত বলে কে একটা ছেলে এসেছে জান?

বগলাপদ স্মিতমুখে বললেন: কেন, তাকে নিয়ে কি হলো?

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: বিকেলে ঐ ছোঁড়া এমন এক কাণ্ড করেছে, শুনে অবধি রাগে আমার সর্বশরীর নিসপিস্ করছে, তোমাকে বলবার জন্যে।

বলই না—কি হয়েছে তাকে নিয়ে?

তোমার আধুনিকা কন্যে রাণী ও-বাড়ীর অরুণার পাল্লায় পড়ে পায়রা দিয়ে চিঠি চালাচালি করে জানো তো? বাপের জন্মে কখনো এ রকম খেলা দেখিনি, নামও শুনিনি। এলানী, দেবীকেও ঐ খেলায় নামিয়েছে। আজ বিকেলে দেবী তো হন্তদন্ত হয়ে আমাকে এক চিঠি দেখালে, বললে—ও-বাড়ী থেকে প্রশান্ত তাকে এই চিঠি দিয়েছে, অথচ সে তাকে চেনেও না, জানেও না।

বগলাপদ বেশ সহজ ভাবেই বললেন: বটে! তা সে চিঠি কোথায়?

আঁচলের খুঁট থেকে চিঠিখানি খুলে সুলোচনা দেবী স্বামীর হাতে দিলেন। পকেট থেকে চশমা বা'র করে চোখে লাগিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়ার পর হো-হো শব্দে হেসে বললেন: এই ব্যাপার?

বিস্ময় ও বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করে সুলোচনা দেবী স্বামীকে শুধালেন: যার জন্যে আমি বিকেল থেকে রেগে জ্বলে মরছি, তুমি তাকে উপহাস করে হাসছ?

বগলাপদ বললেন: ব্যাপারটা সব শুনলে, তুমিও আমার মতন হাসবে; আর সেই কথা বলবার জন্যই আমি বাড়ী সেঁধিয়ে বরাবর তোমার এলাকার কাছেই এসেছি। ঐ যে প্রশান্তর কথা বললে, জানো ও কে? অরবিন্দ বাবুর ভাগনে, তা ছাড়া ঐ এখন তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

সুলোচনা দেবী বললেন: কেন, ওঁর ছেলে থাকতে—

সে ছেলে নেই। বলেই বগলাপদ ইউরোপে দুর্ঘটনার কথা যেমন শুনেছিলেন, স্ত্রীকেও শুনিয়ে দিলেন এবং প্রশান্তকে উপলক্ষ্য করে দেবীর সম্বন্ধে যে কথাবার্তা এক রকম পাকা হয়ে গেছে, সে সবও বিস্তারিত ভাবে বললেন।

অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী-পুত্রের অকাল বিয়োগের বার্তায় অভিভূত হয়ে শোক প্রকাশ স্বাভাবিক—বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। কিন্তু তারই পরের খবর—অত বড় একটা সর্বনাশের পরেই বিয়ের প্রসঙ্গ সুলোচনার পক্ষে যেমন অশোভন মনে হলো, তেমনি তাঁর এই বড়

আদরের মেয়েটিকে নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে হরগৌরীপুরে নীলের উৎসবের দিন শিবের ঘরে সবার সামনে ললিতের মায়ের সঙ্গে যে বাগ্‌দান হয়ে আছে, সে দৃশ্যটিও চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি কথা দিয়ে এসেছ ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বগলাপদ বললেন : নিশ্চয়ই ; এমন সুযোগ কখনো ছাড়া যায় ? আমি প্রশান্তকে এখানে আসবার জন্যে বলেছি—

কথাটা শুনে সুলোচনা দেবী রীতিমত গম্ভীর হয়ে শুধালেন : দেশে ললিতের বাবাকে সেদিন কি বলেছিলে ? উপহাসের ভঙ্গিতে হেসে বগলাপদ বললেন : আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি টেনে আনছ ? আগেই তো বলেছি তোমাকে, বারো বছর আগে কি ছিলুম, আর এখন কি হয়েছি—দুটো অবস্থা মিলিয়ে দেখে বাস্তব দৃষ্টিতে স্থির করতে হবে—এখন কি কর্তব্য।

সুলোচনা দেবী সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : এ অবস্থায় বিবেক যা বলে, সেইটিই মেনে চলা কি উচিত নয় ?

দৃঢ়স্বরে বগলাপদ বললেন : সবার বিবেক তো সমান নয় ? ভিখিরীর বিবেক ভিক্ষার নির্দেশ দেয়, দস্যুর বিবেক ডাকাতি করতে বলে, বুদ্ধিমানের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে বলে। আমার বিবেক বলছে—এ ঠিক, যা স্থির করেছি। তার পর, মেয়ে যখন আগেকার কথা সব ভুলে গেছে। আমি জোর করে বলতে পারি, প্রশান্তকে দেখলে, তার সঙ্গে মিশলে দেবীও তাকে মেনে নেবে।

সুলোচনা দেবী বললেন : তা হয় না। তুমি যে বলছ দেবী স ভুলে গেছে, কিন্তু আগেকার দেখা বা জানা কোন কিছু যদি ওর মে জাগে, তখনি ওর বিবেক নাগিনীর মত ফণা তুলে উঠবে, কে ওকে—

ক্রুদ্ধস্বরে বাধা দিয়ে বগলাপদ বললেন : থামো : যদি (নাগিনীকে কেউ ক্ষেপিয়ে তোলে, সে তুমি। কিন্তু তাকে ব করবার দাওয়াইও আমার জানা আছে।

কণ্ঠস্বর গাঢ় করে সুলোচনা দেবী বললেন : তুমি আমার ওপ বৃথা সন্দেহ করছ। যে দিন থেকে তুমি আমাকে বারণ করেছ, আ দেবীকে আগের কথা বলে জাগাতে কোন চেষ্টা করিনি। তা কারণ, আমি জানি যে, ওর বিবেকই ওকে জাগাবে—একা পীঠস্থান আর পুণ্যদিনের কথা কখনো মিছে হোতে পারে না, যা অন্তর থেকে সে কথা বেরিয়ে থাকে। তোমার যা ইচ্ছা হয় ক আমি শুধু মায়ের প্রাপ্য অধিকারটুকু নিয়ে ওর দিকে নজর রাখব— পথ থেকে না পা পিছলে পড়ে !

কথার সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে চোখ দু'টি মুছতে মুছতে সুলোচন দেবী তাঁর মহলে চলে গেলেন। বগলাপদ অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সেদিক কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আপন মনে বললেন : ননসেন্স !

[ক্রমশঃ

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ?

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারত বিভাগের পর হইতে ভারত সরকার পাকিস্তানের হাতে বহু টাকা তুলিয়া দিয়াছেন অম্লান বদনে। ভারতের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়াই কাশ্মীরে ভারতের মুণ্ডপাত করিবার চেষ্টা পাকিস্তান করিয়াছে। তবু ভারত সরকারের কর্ণধারদের আত্মঘাতী ঔদার্য্যের অবসান হয় নাই। আর কিছু না হৌক, উদ্বাস্তু সম্পত্তির ব্যাপার লইয়াই পাকিস্তান যেভাবে ভারতের সঙ্গে বঞ্চনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় নেতাদের শক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা সে লক্ষণ দেখান নাই। ফলে পাকিস্তানী-মার্জার নরম মাটি আঁচড়াইতে ছাড়িতেছে না।"

—দৈনিক বসুমতী।

চিনির বদলে

"পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন, জনসাধারণ চিনির উপর বিক্রয়কর দিতে অনিচ্ছুক হইলে, গুড় খাইতে পারেন। আর গুড় খাওয়া সব দিক হইতেই ভালো, কেন না উহা চিনির চেয়ে পুষ্টিকর। শুনিয়াছি, ব্যক্তিবিশেষে চিনি খাওয়া মহা অনিষ্টকর—তাই ঐ রোগাক্রান্তেরা চা'য়ের সহিত স্যাকারিণ খান এবং সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়স, পিঠা-পুলি তাঁহারা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করেন। এমন কি, শ্বেতসার ও শর্করা-প্রধান বলিয়া তাঁহারা ভাত, আলু ইত্যাদিও খান না। এই শ্রেণীর নরনারীরা নিশ্চয়ই বিনা ক্লেশে চিনি ত্যাগ করিয়া (এবং গুড় না খাইয়া) চালাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু অন্য সকলের কি হইবে? গুড়ের চা ত কাহারো মুখে রুচিবে না, নূতন গুড়ের পায়স ও সন্দেশ প্রথম প্রথম দুই-চার দিন চলিলেও, পুরানো গুড়ের মিষ্টান্ন শুধু চেহারার দোষেই নব্য সমাজে অপাঙক্তেয় হইবে। তেঁতুল ও কুলের আচার কোন মতে গুড়ে বানানো চলিলেও, জ্যাম, জেলি, মোরব্বা বানানো কখনোই চলিবে না। সুতরাং? তবে হ্যাঁ, গুড়েরও একাধিকার ক্ষেত্র আছে—যেমন পাটালী, বাতাসা, মুড়কি, মোয়া, পকান্ন গুড়েই ভাজা হয়। জাতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক তামাক ত গুড় ভিন্ন হয়ই না। আর এই গুড়োৎপন্ন পরম সম্পদটির জন্যই বাঙ্গলাদেশ গৌড় ভূমি নামে খ্যাত। কিন্তু হা হতোহস্মি তামাকও ত ট্যাক্স-কবলিত! কাজেই চিন্তভাবে গুড় করিয়াও ষোল-আনা নিস্তার নাই!"

—যুগান্তর।

আইন না বে-আইন ?

"পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার জনৈক কমিউনিষ্ট দলীয় সদস্য বিধান-সভায় দাঁড়াইয়া পুলিশের হস্তে নিজের লাঞ্ছনার কাহিনী ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন, এক দিন অসতর্ক ও অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করিলে পুলিশ কর্তৃক তিনি ধৃত হন এবং তাঁহাকে মুক্তি ক্রয় করিতে হয় একটি ফাউণ্টেন পেনের বিনিময়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় তাঁহার এই ক্ষতির সংবাদে ব্যথিত হইয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য নিজের কলমটি তাঁহাকে প্রদান করিতে চাহেন। নিজের লাঞ্ছনার কাহিনী ব্যক্ত করিতে গিয়া কমিউনিষ্ট সদস্য নিশ্চয়ই এমন কথা মনে করেন নাই যে, ডাক্তার রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁহারই অধীন পুলিশ কর্তৃক গৃহীত উৎকোচের ক্ষতিপূরণ করিতে ন্যায়তঃ এবং ধর্মতঃ বাধ্য; তিনি বিধান সভায় দাঁড়াইয়া অতীত সে কাহিনীর অবতারণা করেন ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য যে, ডাক্তার রায়ের পুলিশ বিভাগে দুর্নীতির প্রভাব আজও কত প্রচুর! ডাক্তার রায় এই উপহার প্রদান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট কমিউনিষ্ট সদস্য তাহা বিনা প্রতিবাদে পরিপাক করিয়া সম্মিলিতভাবে উৎকোচ গ্রহণের ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। আইনে বলে, ঘুষ যে লয় সে যেমন অপরাধী, ঘুষ যে দেয় সেও অপরাধী সমপরিমাণ। ইহাই যদি আইন হয় তাহা হইলে গৃহীত উৎকোচের ক্ষতিপূরণ প্রস্তাব কোন্ পর্য্যায়ে পড়িবে?"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নেহরু নীতির জিন্দা

"গোয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করায় ইতিপূর্ব্বেই প্রধান মন্ত্রী নেহরু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রগুলির সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছিলেন—এখন মার্কিণ দেশের আধা-সরকারী সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'ও প্রশংসাপত্র দিয়া বলিয়াছেন যে, গোয়া সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রভাব প্রয়োগ করিয়া প্রধান মন্ত্রী নেহরু ঠিক এবং বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে, এই সকল সাম্রাজ্যবাদী মহলের মুখপানে তাকাইয়াই কংগ্রেস সরকার গোয়া মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এই কলঙ্কজনক পথ গ্রহণও করিয়াছেন। কাজেই, ইহাদের প্রশংসা তো পাইবারই কথা। কংগ্রেস দলের সাধারণ সভ্য এবং সমর্থকগণও আশা করি এখন নেতাদের নির্লজ্জ নীতির স্বরূপ কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

—স্বাধীনতা।

শ্রমিক বীমা বিবেচনাহীন

"শ্রমিক বীমা প্রবর্তন লইয়া কলিকাতার চটকল-শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চলিয়াছে, পাটনার ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয় গুলী চালাইবার ভরসা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট সময় মত সতর্ক হইলে এই গোলযোগ ঘটিতে পারিত না। বীমার নিয়মই এই যে, ভবিষ্যতের সুবিধার আশায় বর্তমানে কিছুটা ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করিতে হয় এবং এই কথাটা বুঝিতে হইলে কিছু জ্ঞান দরকার হয়। অশিক্ষিত শ্রমিকদের পক্ষে ইহা না বোঝা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারকার্য্য করিয়া এটা বুঝানো উচিত ছিল, না বুঝিলে তাঁহাদের মধ্যে বীমা প্রবর্তন না করাই ভাল হইত। গবর্ণমেণ্ট শ্রমিক বীমায় যে স্কীম করিয়াছেন তাহাতে শ্রমিক, মালিক বা রাষ্ট্র কাহারও কল্যাণ হইবে কি না সন্দেহ! ইহাও আর পাঁচটা বিবেচনাহীন আইনের একটি ভিন্ন আর কিছু নয়।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

সেই তো সমস্যা !

"এবং কি যে আমাদের করণীয় আর কি যে করণীয় নয়, তা আমরা প্রায় সবই জানি। আর যে অভাবই আমাদের থাকুক, তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের অভাব নাই, এটা নিঃসন্দেহ। কসুর কেবল, সুযোগ পেলে অধিকতর সুবিধাটার প্রতি অনুরাগের আনুগত্য ছাড়তে পারি না, তাতে অপরের যা হবার তাই হোক। পণ্ডিতেরা বলেছেন সংগৃহীত খাদ্যবণ্টন, নির্ঝঞ্ঝাট প্রয়োজন-মেটানো আর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের পথেই আদিম মানুষের যূথবদ্ধ জীবন ক্রমশঃ সমাজ ও রাষ্ট্রে রূপায়িত হয়েছে। আমরা মূর্খের দল দেখছি হাজার হাজার বছর পরেও মানুষের সামনে আজও ঠিক সেই সমস্যা! অন্তর্জাতিক, জাতীয়, প্রাদেশিক, জানপদিক কিংবা গ্রাম্য সব জায়গাতেই ওই এক কথা। প্রয়োজনের বিস্তার বেড়েছে, আয়োজনের তাগিদ বেড়েছে কিন্তু সেই আদিমতম কালেও কোন সুব্যবস্থা হয়নি। হাজার হাজার বছরেও যদি আমরা যৌথজীবনকে পারিবারিক জীবনে পরিণত করতে না পারি তাহলে এই কথাটাই কি প্রমাণিত হয় না যে "we are weighed and found wanting in balance" (মাপ করে দেখা গেল, আমরা ওজনে খাটো)? আসলে জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার প্রথম ধাক্কা মিলতে পারা। মিলতে গেলে ভালবাসতে হয়! বিধান দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে একত্রিত হওয়া যায়, মিলিত হওয়া যায় না সেই তো সমস্যা!

—পাঞ্চজন্য (কান্দি)

গ্রাম্য পঞ্চায়েত

"কিন্তু গ্রামসভার বেলায় ভিন্ন অবস্থা। ইহাদের দায়িত্বের তালিকা বেশ দীর্ঘ এবং তাহা সুস্পষ্ট ভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য বাধ্যতামূলক অর্থাৎ আইনতঃ করিতেই হইবে ছাড় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্ব স্বেচ্ছামূলক। তৃতীয় শ্রেণীর দায়িত্ব সরকারী নির্দ্দেশে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ অঞ্চল-পঞ্চায়েতের কর্ত্তা শুধু অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 'রিং মাষ্টার' নয়, গ্রামসভাকেও চাবুক মারিয়া দৌড়ানর ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য জনসাধারণ ইহা ব্যবহার করিতে দিবে কি-না, সে স্বতন্ত্র। অথচ অর্থের বেলায় আসল চাবিকাঠি অঞ্চল-পঞ্চায়েতের ভার তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা সেক্রেটারীর। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি এই যে, ইহা গঠনতন্ত্রের নির্দ্দেশের বিরোধী। অথচ মন্ত্রী ঈশ্বরদাস জালান ইহাকেই গঠনতন্ত্রের নির্দ্দেশ পালন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। গঠনতন্ত্রের নির্দ্দেশ হইতেছে গ্রামপঞ্চায়েত করিতে হইবে এবং স্বায়ত্ত শাসনের অংশ হিসাবে তাহাদের ক্ষমতা দিতে হইবে। বিলের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যাইবে, মন্ত্রী মহাশয়ের দাবী শুধু ভিত্তিহীন নয়, বরং তিনি ধৃষ্টতার সহিত গঠনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন ইহাই বলা যায়।"

—নতুন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

২৩০০৲ টাকার গরমিল ?

"কৈলাসহর—প্রকাশ, শ্রীহীরেন্দ্র দাস নামক স্থানীয় এক যুবক কাচনঘাট সড়ক নির্ম্মাণে দুর্নীতির এক মিলিত অভিযোগ সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছে। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, আদায়ীকৃত ৩৮০০৲ টাকার মধ্যে আনুমানিক ১৫০০৲ টাকার কাজ হইয়াছে। আগরতলা ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার এই অভিযোগের তদন্ত করিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ তদন্তের ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে।"

—সেবক (আগরতলা)

কর্ত্তব্য

"গ্রামাঞ্চলে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ বর্তমান ধানভানা স্কীম প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ধানভানা পল্লীগ্রামের নিঃস্বদের একটি জীবিকার উপায়। ইহাতে গ্রাম্যরমণীগণের স্বাস্থ্যচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটি কুটির-শিল্পের প্রসার ঘটিত; কিন্তু পল্লীগ্রামের এই শিল্পটি আজ মরণোন্মুখ হইয়াছে। হাস্কিং মেসিন গ্রামাঞ্চলে একাধিপত্য লাভ করিয়াছে এবং অধিকাংশ গৃহস্থই, এমন কি অনেক দরিদ্র পরিবারও ইহার দাস হইতে বসিয়াছে। সুতাকাটা আদি অন্য কোনরূপ শিল্পের প্রসার না ঘটায় বসিয়া বসিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা যেন আজ-কাল এক শ্রেণীর পল্লীবাসীর অভ্যাসগত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই কর্তৃপক্ষকে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধানভাঙ্গুনীদের অধিকতর সুবিধা দিতে হইবে। ধানভানার কাজে সরকার প্রতি দেড় মণ ধানে ৩৫ সের চাউল লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন বে-সরকারী সংস্থা বা সমবায় প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে অগ্রণী হইলে এই কার্য্য চালু করা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের মতে যাহাতে ভাঙ্গুনীরা অন্ততঃ /৫ সের করিয়া এবং সরবরাহকারী সংস্থা /২ সের করিয়া চাউল পাইতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।" —নীহার (কাঁথি)।

অপব্যয় নিবারণ

"বহু ঠিকাদার তো একেবারে যা-'তা' করিয়াছে। এমন সব ভেজাল চালাইয়াছে যে, একেবারে পয়সা মাটি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লজ্জার কথা, ভারপ্রাপ্ত রাজ-কর্ম্মচারীরা অনেকেই এ-সব দেখিয়াও দেখেন নাই। দুষ্টলোকে যদি ইহাদের দুর্ণাম রটায়, তাহা হইলে কি-ই বা বলা যায়? কংগ্রেস-সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে গণসংযোগ দ্বারা সমধিক জনপ্রিয় হইতে বার বার উপদেশ দিতেছেন। এই সব সরকারী কাজের অপব্যয় নিবারণে অগ্রসর হইতে পারিলেই যে কংগ্রেস-কর্ম্মীরা অতি অনায়াসে জনচিত্তে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, কথাটা প্রদেশ-কংগ্রেস সভাপতি হইতে মফঃস্বলের নেতারা পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিলে সুখী হইব। কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, আরও অনেক কোটি টাকা খরচের কাজ আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময় যাহাদের নষ্টামীর জন্য জাতির একটি আধলাও নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উপেক্ষা করিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। কাজটা খুবই অপ্রিয় তাহা জানি। কিন্তু জাতির স্বার্থে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকেই এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দরিদ্র প্রজার বুকের রক্ত লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিবে, জাগ্রত জাতি তাহাদের ক্ষমা করিতে পারে না।" —পল্লীবাসী (বর্দ্ধমান)।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

"বর্তমানে আবার নতুন যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণকে ভারতের সমস্ত প্রদেশে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। জানি না, কার্য্যে অগ্রসর হইলে সরকারের এই উত্তম কত দূর সফল হইবে, অথবা তাহা উদ্বাস্তুগণের শুধুমাত্র নির্বাসনেই পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু, সত্যিকারের জীবিকা অর্জনের পন্থা এবং গ্রহণযোগ্য সামাজিক পরিবেশ না পাইলে যে এই বাস্তুহারাগণকে চিরদিনই বিড়ম্বিত জীবনের বোঝা টানিয়া বেড়াইতে হইবে এবং মানুষের মত যে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তাহারা পাইবে না ইহা সর্বতোভাবে সত্য। কাজেই সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রসঙ্গে নূতন কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে যেমন আর্থিক পুনর্বাসনের (Economic Resettlement) দিকটি বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবেন, তেমনি লাল-ফিতার প্রশ্রয়-পুষ্ট—বিভাগীয় গলদ সমূহও দূর করিবার প্রয়াস পাইবেন—এ আবেদনও জানাইতেছি।" —উদয়ন (মালদহ)

সরকারের জ্ঞানোদয়

"মুর্শিদাবাদ কুমিটোলার উদ্বাস্তুদের মুর্শিদাবাদ ও নবদ্বীপুরের মধ্যে ট্রেণ থামাইতে গিয়া ৬ জনের মৃত্যুবরণের পর ডাঃ রায় ও শ্রীমতী রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে একজন কেরাণী চেক পাঠাইতে দেরী করায় সাস্পেণ্ড হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুনর্বাসন বিভাগের সাহায্যদান ব্যাপারে টাকার আতশ্রাদ্ধ চলিতেছে। কত জোচ্চোর কত যে টাকা ফাঁকি দিয়াছে, তাহা ধরার কি কেহ নাই? বাস্তবাড়ীতে ঢুলি আছে বহুৎ; কেউ বাজায় কেউ ঢোল কাঁধে নিয়ে শুধুই লাফায়। উদ্বাস্তুগণ রাজ্যের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নাগাল না পাইয়া মাঝে মাঝে রেলপথে ট্রেণ থামায়। কোন নাশকতামূলক উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা কাজ করে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গই তাহাদের লক্ষ্য। এ যাবৎ তাঁহারা বহু বার গাড়ি থামাইয়াছে; কিন্তু মারাত্মক দুর্ঘটনা কোথাও ঘটে নাই। অন্যত্র রেল-কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর দিয়া রেল চালাইবার নির্দেশ দেন না। মুর্শিদাবাদের ঘটনাটি কিন্তু রহস্যময়! তীব্র হেড লাইট জ্বালাইয়া অগ্রসর হইবার কালে এঞ্জিন-চালক দলবদ্ধ লোকদিগকে দেখিতে না পাইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া বিধেয়। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অবহিত হইলে সদ্বিবেচনার পরিচয় দিবেন।" —জঙ্গিপুর সংবাদ

সেটেলমেন্টের ভৌতিক কাণ্ড?

"সেটেলমেন্টের পর চাষীদের অবস্থা প্রায় পরলোকের কাছাকাছি যাইয়া পৌঁছিয়াছে। আইন অনুযায়ী জমির মালিকানা তাহাদের

নামে লেখা হইলেও রাতারাতি তাহাদের নামের বদলে তালুকদারদের নাম রেকর্ড হইয়া বসিয়া আছে। 'ডিসপুট' দাও—ঘন ঘন সেটেলমেণ্ট অফিসে যাইয়া দিনের পর দিন বসিয়া ধন্না দাও—দরখাস্ত, টিপসহি প্রভৃতি কত বিরাট পর্ব্ব! চুলায় যাক, চাস-বাস! মাসের পর মাস এমনি অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখিলেই জমির ভাগীদার বা চাষের অংশীদারের অবস্থা চরমে উঠিবে। উপরিওয়ালা'কে জানাইলে 'এনকোয়ারী' হইবে বলিয়া দুই মাস—তার পর যদিও কোথাও 'এনকোয়ারী' হয় তখন প্রয়োজন পুনরায় দরখাস্ত পেশ করিবার আদেশ বা কাগজে-কলমের বহু লেখাপর্ব্ব। সাঁওতাল, বাউরী, সাধারণ অশিক্ষিত চাষী আশ্চর্য্য হয়, অভিশাপ দেয়,—বা কাঁদে—উপোস করে কপালের দোহাই দেয়।" —দামোদর (বর্দ্ধমান)।

ভয়াবহ বেকার-সমস্যা

"দেশে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যেও দেশের লোকের কোন স্থান নাই। চাকুরী দ্বারা দেশের বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে যাহাতে দেশের যুবকগণ স্থান লাভ করিতে পারে তাহার জন্য সরকারকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হয়। ইহার জন্য যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহার সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত বলিয়া আমরা মনে করি। দেশের যুবকগণ বেকার ও নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে ইহা কোন দায়িত্বশীল সরকার বরদাস্ত করেন না। বক্তৃতায় হা-হুতাশ করিলে সমস্যার সম্মুখেও আসা যায় না। যদি আমাদের সরকার বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে সত্যই উদ্বেগ বোধ করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা। যদি তাঁহারা ইহা দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, দীর্ঘদিনের অবহেলায় সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন চাকুরী সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের পথ নয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে যেখানে কোটি কোটি টাকার লেন-দেন চলিতেছে সেখানে যদি কেবল দর্শক হইয়া থাকিতে হয় তবে সমস্যার সমাধান কোন দিন সম্ভবপর হইবে না। বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য দূর করা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা সন্দেহ নাই কিন্তু এই সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অবস্থাটা যে কি তাহা দেশের পরিচালকবর্গকে আমরা ধীর-স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

এ, আই, সি, সির সুপারিশ

"মুখে সংস্কারের বাক্যস্ফুলিঙ্গ ছুটাইলে এবং প্রচলিত ব্যবস্থাকে বজায় থাকিতে দিলে দেশের সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইবে। দেশের শিক্ষার সংপ্রসারণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্ম্মসংস্থানের পথ আবিষ্কার করিতে পারিলে কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতি থাকিবে না, দেশের লোকও চিন্তামুক্ত হইবে। পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষিত বেকারগণের কল্যাণার্থে ২০০ কোটি টাকা সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করার সদিচ্ছাকে আমরা সাধুবাদ দিব কিন্তু এই সামান্য বিপুলায়তন শিক্ষিত বেকার-সম্প্রদায়ের কল্যাণ কতটা সাধিত সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ না করিয়া পারা যায় না। বেকার সাময়িক অক্ষমতা বৃত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য প্রবর্ত্তন করিলেও সমস্যা—সমস্যাই থাকিয়া যাইবে। আর এই তোলা-সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকিয়া 'মুণ আনিতে পান্তা ফু যাইবে।' শিক্ষিত বেকার-সম্প্রদায় আজও কায়িক শ্রমে পঢ় সকলেই White collar job পরিবেত Tanul labour ২ না, এমনই অভিযোগ আজকাল শুনা। শিক্ষিত বেক আত্মাভিমান আজ আর নাই, তথাপি যদি আমাদের রাষ্ট্রকর্ণধ নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিতে সমস্ত অভিযোগ এই বিশেষ সম্প্রদ বিরুদ্ধে করেন, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই।" —নবপ্রবাহ (হুগলী)

শোক-সংবাদ

কার্ত্তিকচন্দ্র বসু

ভারতবর্ষে রসায়ন ও ঔষধ-শিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কার্ত্তিকচন্দ্র বসু গত ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার তাঁহার আমহার্ষ্ট স্ট্রী বাসভবনে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিৎসকরূপে তিনি সকলের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত হই ছিলেন। সার্জ্জারি ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনএ কৃতিত্ব প্রদর্শনের তিনি পুরস্কার লাভ করেন। গত দুই বৎসর তিনি সক্রিয় জী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত ছিলে তাঁহার নিজ গ্রাম চাংড়িপোতায় একটি হাসপাতাল ও দেশঘরে এব যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। আগা সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় লিখিত মৃত্যুর স্মৃ প্রকাশিত হইতেছে।

ডাঃ অমরনাথ ঝা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিহার পাবলিক-সার্ভিস কমিশনে চেয়ারম্যান ডাঃ অমরনাথ ঝা গত ২রা সেপ্টেম্বর সায়াহ্নে তাঁহা পাটনার বাসভবনে অকস্মাৎ হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগম করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল ডাঃ ঝা কিছু দিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। ডাঃ অমরনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সাহিতল গ্রামের বিশি মৈথিলী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ ঝা বহু বৎস এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ছিলেন।

সার অতুল চ্যাটার্জ্জী

বৃটেনে ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার সার অতুল চট্টোপাধ্যা গত ৮ই সেপ্টেম্বর সাসেক্সে সমুদ্রতীরে বেক্সহিলে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

পত্রিকা সমালোচনা

আমি আপনার 'মাসিক বসুমতীর' বহু দিনের গ্রাহক ও পাঠক, নীচে গ্রাহক-নম্বর দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আমার ছাত্র-জীবন সহরে কাটে, ছাত্রাবস্থায় সহরের লাইব্রেরী ও ক্লাবে গিয়া নানা রকম বই পড়ার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল, মাঝে মাঝে মাসিক বসুমতীও পাঠ করতাম। ছাত্র-জীবন শেষে যখন সহর থেকে ঘুরে বাড়ী ফিরি, তখন বাড়ীতে নানা রকমের বই পড়ার সুযোগ সুবিধা ঘটেনি। কারণ, মফঃস্বলে কোন লাইব্রেরী নাই বা আমার এমন কোন সঙ্গতি ছিল না যাতে নানা রকম বই কিনে পড়ি। সেজন্য বহু চিন্তা, আলোচনা ও অনুসন্ধান ইত্যাদি ক'রে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম যে, যদি মাসিক বসুমতী পত্রিকাখানা এনে পড়া যায় তবে এতে নানাবিধ উপন্যাস, গল্প, সাময়িক প্রসঙ্গ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি একই বইয়ে পাব ও সস্তায় হবে। সত্য সত্যই 'মাসিক বসুমতী' বিবিধ রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ, মনের খোরাক যোগাবার পক্ষে উপযুক্ত পুস্তক। তাছাড়া আমি যত দিন থেকে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়েছি তত দিন থেকে নিয়মিত ভাবে এই পত্রিকাখানা পড়ে আসছি, শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য। ইহা ছাড়া আমার সমস্ত পরিচিত শিক্ষককে তাহাদের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য 'মাসিক বসুমতীর' গ্রাহক হইতে ও পাঠ করিতে উপদেশ দিই। মাসিক বসুমতী পাঠ করে আমি খুব আনন্দ পাই, যতক্ষণ আমি এই বইখানা পড়ি ততক্ষণ চিন্তাশূন্য থাকি ও সংসার-জ্বালা থেকে কিছুক্ষণ মুক্ত থাকি। তবে আপনার মাসিক বসুমতীতে বর্ত্তমান "শিক্ষা" ও "কৃষি" এই দুইটি বিভাগ প্রবর্ত্তন করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। এবার পর পর কিছু কিছু লিখে জানাব। শ্রীবিভূতিভূষণ পড়্যা। প্রধান শিক্ষক, বামুনিয়াবাড় উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

আপনাদের 'মাসিক বসুমতী'র বিচিত্র বিভাগগুলি আমাকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছে, তা ভাষায় অপ্রকাশ। সাধারণত সাময়িক পত্রিকায় যে ধরণের মামুলি 'রঙ্গপট', 'সাহিত্য জগৎ', 'নাচ-গান-বাজনা' প্রভৃতি বিভাগ থাকে, আপনাদের প্রচেষ্টা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা, অভিনয়শাস্ত্রের নানা দিক, সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণতঃ সাময়িক পত্রিকায় কোন আলোচনাই হয় না। আপনারা এই নতুন পদ্ধতিতে সাময়িক বিভাগ পরিচালনা করে সাধারণ পাঠকদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। গত শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীসুনীল ঘোষের 'দ্বিধা হৃদয়' গল্পটি চমৎকার হয়েছে। ইহার করুণরস মর্ম্মস্পর্শী। লেখককে আমার ধন্যবাদ দেবেন। আপনাদের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় নতুন প্রতিভাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছেন ; তজ্জন্য আপনারা ধন্যবাদার্হ। ইতি, ভবদীয় শ্রীস্বদেশরঞ্জন লোধ, রামরাজাতলা মল্লিকবাড়ী—পোঃ সাঁত্রাগাছী জিঃ—হাওড়া।

গত ৮ বছর ধরে আমি বাংলার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "মাসিক বসুমতী" পড়ে আসছি, দাম হয় তো বেড়েছে, কিন্তু বইয়ের উন্নতি হয়েছে দামের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশী। তবে এর মাধ্যমে আমি ২।১টি কথা বলতে চাই। 'মাসিক বসুমতী' অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরাও গভীর আগ্রহে পড়ে থাকে। কাজেই এই পত্রিকার ভিতর যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা ঐ সব কিশোর-কিশোরীদের মনে কিরূপ রেখাপাত করতে পারে, তা একটু ভেবে অগ্রসর হলেই ভাল হয়। আশা করি, অনেক পাঠক-পাঠিকাই ঐ বিষয়ের প্রকাশ অনুমোদন করতে স্বীকৃত হবেন না। আরও একটি বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হচ্ছে প্রতি সংখ্যায় আপনারা 'মাসিক বসুমতীর' মলাটের উপর ভাল ভাল ছবি ফটো ইত্যাদি দেন—কিন্তু ঐগুলি পড়ার সময় হাতে নষ্ট হয়ে যায়। নূতন অবস্থায় ছিঁড়ে ফেলে বইয়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু পরে দেখি, ঐ ওপরকার ছবি ইত্যাদি খুলে রাখার মত আর নাই। ভিতরে কোনখানে দিলে কেমন হয়? শ্রীসুশীলকুমার রায়।

জলপাইগুড়ি।

আপনার জনপ্রিয় মাসিক বসুমতী বর্ত্তমানে মাসিক পত্রিকার মধ্যে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয়। কিছু দিন যাবৎ আপনারা মাসিক বসুমতীতে দেশের মহাপুরুষদের জীবনালেখ্য ধারাবাহিক ভাবে বাহির করিয়া সাধারণের মধ্যে এক বিরাট কাজ করিতেছেন।

বঙ্গ তথা ভারত-গৌরব শ্রীঅরবিন্দের জীবনী আজও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যথাযোগ্য প্রচার ও প্রকাশ হয় না। অথচ বঙ্গবাসী হিসাবে শ্রীঅরবিন্দকে বাদ দিয়া বঙ্গদেশের পরিচয় প্রায় কিছুই দেওয়া যায় না। আশা করি, পরমপুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবনী সমাপ্ত হওয়ার পর আপনারা শ্রীঅরবিন্দের জীবনী জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন রায়চৌধুরী। বাইনান, হাওড়া।

চার জন সম্পর্কে

এ মাসের মাসিক বসুমতীতে অধ্যাপক শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী দেখে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলাম। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে ডক্টর শাস্ত্রী প্রেরণা লাভ করেছেন বলে লিখেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব আশুতোষ-অধ্যাপক ডক্টর শাস্ত্রীর (এবং আমারও) আচার্য্য মহাপণ্ডিত ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী আপনাদের পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সাতকড়ি বাবুর সমস্ত জীবন এক সুগভীর জ্ঞানের সাধনা। তাঁর জীবনী পাঠে কেবল সংস্কৃতানুরাগী নয়, সকলেই বিশেষ উপকৃত হবে। সাতকড়ি বাবু এখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর জীবনী ছাপা হবে আপনাদের পত্রিকায়। আমাদের সংস্কৃত বিভাগ একটি রত্নখনি-বিশেষ। এমন বহু মনীষী এখানে আছেন বা ছিলেন—যাঁদের জীবনী প্রকাশ করে আপনাদের পত্রিকাই ধন্য হবে। এইরূপ এক জন মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধুনাতম প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনীও আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রৌঢ় বয়সে

বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া নিজের চেষ্টায় ডক্টর শাস্ত্রী আজ এত উচ্চে উঠিয়াছেন। শ্রীসুশান্ত সিংহ।

[আপনি যদি উক্ত ব্যক্তিবিশেষদের সম্পর্কে লিখে পাঠাতে পারেন আলোকচিত্রসহ, আমরা নিশ্চয়ই প্রকাশ ক'রবো। স]

"চার জন" শীর্ষক নিবন্ধে শ্রাবণ সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যে জীবনকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটি ভুল আছে,—১৮১৭ সালে কলিকাতার বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস হয় নাই (১৮১৭ সালের কংগ্রেস লক্ষ্মৌ সহরে হইয়াছিল,—সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত)। উহা ১১০১ সালে হয়, সভাপতি দিনশা ইদলজি ওয়াচা। ১৮১৬ সালে কলিকাতার "টিভলি গার্ডেনে" (বালিগঞ্জ) কংগ্রেস হয় বটে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে যোগদান করেন নি। তিনি ১১০১ সালে বিডন স্কোয়ারের কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন, তখন তিনি তরুণ যুবক।

এই কংগ্রেসের সহিত একটি স্বদেশী প্রদর্শনী বিডন স্কোয়ারে হয়। তাহার উপর বড় বড় করিয়া লেখা ছিল Remember your country in all your purchases আমি শুনিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ এই লেখাটির দিকে প্রত্যহ এক বার তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতেন ও পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন। অপালা বসু (লেক কলোনি, কলিকাতা—৩৩)

চার জন প্রবন্ধে অগ্নিযুগের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয়ে লেখার মধ্যে কিছু ভুল আছে।

(ক) Civil Disobedience Committee গঠন করেন 'দেশপ্রিয়' 'জে. এম. সেনগুপ্ত' (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) জে, সি, সেনগুপ্ত বলিয়া কেহ নয়।

(খ) ১১৩৫ সালে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Congress National Partyর' পক্ষ হইতে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যুর পর উপনির্ব্বাচনে Legislative Assembly (Central)এ বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে Uncontested নির্ব্বাচিত হন। শেষ পর্য্যন্ত কুমার দেবেন্দ্রলাল খান বা বীরেন্দ্রলাল খান (বীরেন্দ্রনাথ নহে) কেহই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। শ্রীআশুতোষ সেন, ডোভার লেন, কলিকাতা—২১।

লালবাঈয়ের প্রকাশক কে ?

মাসিক বসুমতীতে দেখিলাম যে, রমাপদ চৌধুরীর "লালবাঈ" উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। দয়া করিয়া যদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় 'লালবাঈ' উপন্যাসখানা ডাকযোগে পাঠান তাহা হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব। আপনাদের কাছে 'লালবাঈ' বইখানা আছে বলিয়া আশা করি। আমি ভিঃ পিঃ ছাড়াইয়া লইব। হরেন চট্টোপাধ্যায়। দি বিষ্ণুপুর কে, জি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট।

[উপন্যাসটি পত্রিকায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে না। লালবাঈয়ের প্রকাশক, ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা।

চিত্রশিল্পীদের ভবিষ্যৎ কি ?

মাসিক বসুমতীর কেনাকাটা বিভাগটি আমার দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছে। আমি এই বিভাগটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কা[মনা] করি। ইহাতে বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার জানিবার ও উপ[ভোগ] লইবার বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করে। আমায় একটি বি[ষয়ে] উপদেশ দান করিলে বিশেষ ভাবে বাধিত হইব। বর্ত্তমানে কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বেকার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে কোনরূপ কার্য্য বা সুযোগ তাঁরা পান না। উহাদের মধ্যে অনে[কে] স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কোন্ কোন্ কোম্পানী এজেন্সি, বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে যাইলে কার্য্য পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা অবগত নহেন। সেই জন্য তাহাদের চেষ্টা ও যত্ন থাকা সত্ত্বে কোনরূপ সুযোগ বা সুবিধা পান না। ফলে তাঁহাদের অনেক সম[য়] বেশ হতাশ হইতে হয়। আমার মতে কেনাকাটা বিভাগে প্রসি[দ্ধ] প্রসিদ্ধ স্থানের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিলে নবীন শিল্পিগণে[র] বিশেষ সুবিধা হয় এবং তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য দেখাইয়া চেষ্টা করিতে পারিবেন। ১১৫৬ সালের ক্যালেণ্ডারের জন্য বিবিধ পেন্টিং—লে আউট—লেটারিং প্রভৃতি স্বল্প মূল্যে নবীন শিল্পিগণ বিশেষ উৎসাহে করিবেন এবং তাঁহাদের বেকারত্ব দূর হইয়া উপকারও হইবে। কিন্তু উপরিলিখিত অসুবিধাগুলিই প্রধান। বসুমতীর কেনাকাটা বিভাগ বিশেষ ভাবে উক্ত বিষয়ে সাহায্য করিলে বহু শিল্পীর উপকার ও সহযোগিতায় সাহায্য করিবে। অতএব আমার বিনীত নিবেদন এই যে, উক্ত বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। এস, এন, নন্দী, ৭৫ সি, কালীঘাট রোড। কলিকাতা-২৬।

ঘোড়দৌড় সম্পর্কে লেখা চাই

মাসিক বসুমতীর আমি এক জন নিয়মিত পাঠক। মাসিক বসুমতীতে সব রকম রচনা প্রকাশিত হয়। আমার মনে হয়, প্রত্যেক রসপিপাসু পাঠক মাত্রেরই তৃপ্তি আনে বিভিন্ন রচনার রসাস্বাদে, বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী এক-একটি বিভাগ প্রবর্ত্তন করায় মাসিক বসুমতী দিন দিন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও লোভনীয় হয়ে উঠছে। 'নাচ-গান-বাজনা', 'রঙ্গপট', 'খেলাধূলা' প্রভৃতি পধ্যায়গুলি যেমন সার্থক স্থান পেয়েছে ; তেমনি যদি আর একটি বিভাগ খোলা হয় তো মন্দ হয় না,—'ঘোড়দৌড় বিভাগ।' 'জুয়ায় আপনি হারবেনই' এটাই বড় কথা নয়। যা হোক, বিষয়টি 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' কলমে প্রকাশ করবেন এবং সমর্থনযোগ্য কি না তাও জানা যাবে। অমিয়কুমার রায়, ১০ নং নফরচন্দ্র দাস রোড, বেহালা, কলি—৩৪

যৌনতত্ত্ব সম্পর্কে লেখা

পাঠক-পাঠিকার চিঠিতে বোন মায়ারাণী পালের যৌনতত্ত্ব লেখা ও আলোচনা সম্বন্ধে লেখা চিঠিখানি আমার খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এবং ইহাতে আমিও বোন মায়ারাণী পালের সহিত একমত হইয়া মাসিক বসুমতীতে যৌনতত্ত্ব লেখা ও আলোচনা প্রকাশ করিতে আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। আমার এই দুই জনের

হইবে না। কারণ যৌনতত্ত্ব লেখা ও আলোচনা সম্বন্ধে প্রকাশ করা নরনারীর যৌনজীবনে অপরিহার্য্য আবশ্যকীয় বিষয়। ইহার আলোচনার অভাবে শুধু কুমারী-জীবন নয়, বিবাহিত জীবনেও দাম্পত্য সুখের অভাব হইয়া নষ্ট-নীড়ের সৃষ্টি করে। সুখের সংসার যাহাতে দুঃখের বিষে মৃত্যুমুখে না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ দেওয়া অন্যায় ও অপরাধ নয় নিশ্চয়ই। সবার উপরে যাহার আসন সেই পত্রিকা মাসিক বসুমতী যদি পাঠক-পাঠিকা ও জনসাধারণের সব কিছুই জানবার ও শেখবার অভাব নির্ভয়ে দূর করে, তবে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখা ও আলোচনা প্রকাশ করিয়া অজানা-অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক দিয়া পথ দেখাইতে স্পষ্ট ও নির্ভীক মতবাদী মাসিক বসুমতী ইহাতে ভয় পাইবে কেন? আমার এই সুদীর্ঘ পত্রখানি প্রকাশ করিলে আমার মতের সহিত অন্য পাঠক-পাঠিকার যৌনতত্ত্ব লেখা ও আলোচনা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিবার মতামত সংগ্রহে আপনার কষ্ট হইবে না। শ্রীমতী ভক্তিরাণী মাইতি। বরগোদা। মেদিনীপুর।

যাযাবর নহেন

মাসিক বসুমতীর একজন দীন পাঠক হিসাবে আমি একটি অনুরোধ জানাচ্ছি, আশা করি বিবেচনা করে দেখবেন। বসুমতীতে বিভিন্ন বৈদেশিক রাজ্যের সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করতে চাই, যেমন ১৩৫০।৫১।৫২ সালের মাসিক বসুমতীর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রবন্ধ। 'রাজায়-রাজায়' 'চিত্র ও বিচিত্র' এবং 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' খুব ভাল লেগেছে। আর একটা কথা, 'চিত্র ও বিচিত্র' এর লেখক 'নীলকণ্ঠ' আর 'বিক্রমাদিত্য' ও দৃষ্টিপাতের লেখক 'যাযাবর' কি একই ব্যক্তি? শ্রীসূর্য্যকুমার দে (প্রধান শিক্ষক) কালিকাডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেদিনীপুর।

[উক্ত লেখকগণের মধ্যে একজনও যাযাবর নন। —স]।

চলচ্চিত্র-শিল্পীদের মতামত সম্পর্কে

শিল্পীর জীবনী প্রসঙ্গে শিল্পী রবীন মজুমদার সম্বন্ধে একটা ভুল আপনাদের হয়েছে বলে আমার মনে হয়। শিল্পী এক দিন ধর্ম্মতলা অঞ্চলে আসেন, বড়ুয়া সাহেবের অফিসে। সেই সময় আজকের অনেক নাম-করা পরিচালক ও চিত্রশিল্পী ঐ অফিসে ছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শিল্পী চলে গেলে বড়ুয়া সাহেব এক জন সহকারীকে (বর্ত্তমানে পরিচালক) বলেন, "ছেলেটির হাসিটি বেশ মিষ্ট"। অর্থাৎ 'শাপমুক্তি'তে তাকে নেওয়া হ'ল। এই তার 'শাপমুক্তি'তে আসার ইতিহাস। শ্রীপরেশনাথ দাস। কড়েপুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-২৪।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর ("দেশে-বিদেশের" লেখক) নিকট হইতে আপনাদের সুবিখ্যাত "মাসিক বসুমতীর" প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনি যদি বৈশাখ ১৩৭২ হইতে আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ এই কয়েক সংখ্যা পত্রিকা পাঠান, তবে বিশেষ সুখী হইব। পাকিস্থানে আপনাদের Bankers কে জানাইলে টাকা জমা দিব। India তে আমার কোন Bank account নাই। আমার ভ্রাতার আপনি বন্ধু বটেন—এইজন্য আপনাকে বিরক্ত করলাম। ত্রুটি মার্জ্জনীয়।—সৈয়দ মোস্তাফা আলী। Asstt. Secretary, Food & Agri (Relief) Deptt., Eden Buildings. P. O. Ramna. Dacca.

দয়া করিয়া আমাকে উপরোক্ত ঠিকানায় ১৩৭১ সালের শ্রাবণ মাসের একখানা বসুমতী ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইলে বাধিত হইব। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রক্ষিত। থান, বোম্বাই।

Please change my address and send all the issues to the address given below. With best regards. Rajarshi Roy. Po. Barkakana, Dt. Hazaribagh, Behar.

Please send me Per V.P.P. a copy of Monthly Basumati for the month of Sraban on receipt of this Postcard. N. K. Banerjee. Govt. College, Ludhiana.

আমি এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর মূল্য ১৫৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া ১৬।৮।৬৫ তারিখে পাঠাইয়াছি। আজও পোষ্টাপিস হইতে রসিদ পাই নাই। আশা করি টাকা যথাসময়ে পাইয়াছেন—তাহা না হইলে পোষ্টাপিসকে লিখিব। নিখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ দিল্লী।

আমার গ্রাহিকা নং ৫০৪৮৬, আমি কোন্ মাস পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। আমাকে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা জানাইতে পারেন, তাহা হইলে পুনরায় আমি ৬ মাসের টাকা দিয়া গ্রাহিকা হইতে পারি, 'মাসিক বসুমতী'র জন্য! আশা করি, চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি পাইব। মায়া দাস। অবন্তিকাবাঈ গোখেল ষ্ট্রীট, বোম্বাই—৪।

আমি মাসিক বসুমতীর একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। কার্য্য ব্যপদেশে আমাকে প্রতিনিয়তই এখানে-সেখানে ঘুরিতে হয়, তাই নিয়মিত গ্রাহক হওয়া সম্ভব হয় না। আমি এ যাবৎ প্রতি মাসেই উক্ত পত্রিকা হকারদের কাছ থেকেই ক্রয় করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৩৭১ সালের "ফাল্গুন সংখ্যাটি" আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই—এমন কি আপনাদের অফিসে পত্রালাপ করিয়া এবং যথাসম্ভব হকারদের কাছে খোঁজ করিয়া কোথাও একখানা অতিরিক্ত কপির সন্ধান পাইলাম না। অগত্যা আমি এই মাসিক পত্রিকা মারফৎ সব গ্রাহকদের ও এজেন্টদের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া উপরোক্ত সংখ্যাটি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার বর্ত্তমান ঠিকানা দিলাম। শ্রীঅনিলবরণ বসু। ১১৫, লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনী, কলিকাতা—৪০।

স্বপনের মোহজাল রচে . .
হিমকল্যাণ
আয়ুর্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।
পামিকোকো
মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল।
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।
ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
মহোপকারী
কেশতৈল।
যোজনগন্ধা
অনুপম
সুরভি নির্য্যাস।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪
প্রসাধনের সার্থকতায় প্রতিটি অপরিহার্য . .
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৪শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬২] (স্থাপিত ১৩২৯) [প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
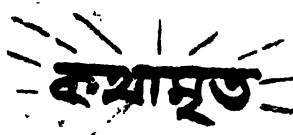
কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—"ওরে, যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধ'রে ঈশ্বরকে দর্শন করবে ব'লে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে ; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগ যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত সিদ্ধ, পুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখ বে ব'লে এসেছে, অন্য সব বাসনা, ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে সেজন্য, ঈশ্বর সব জায়গায় সমান ভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ ; যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাত কো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না,—যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।"

"গরু যেমন পেট ভ'রে জাব, খেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক জায়গায় ব'সে সেই সব খাবার উগ রে ভাল ক'রে চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখ্‌বার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জেগে উঠে সেই সব নিয়ে একান্তে ব'সে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয় ; দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপরসে, মন দিতে নাই ; তা হ'লে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।"

—"ওরে, যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে ; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই!" "যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে, তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায় ; আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? অনেক সময়ে শুনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছে ; তার পর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা-বেষ্টা ক'রে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে! তীর্থে বাস করতে গিয়ে কত লোকে সেখানে আবার দোকান-পাট-ব্যবসা ফেঁদে বসে! মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা সেখানেও তাই। এখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশ-ঝাড়টি যেমন, সেখানকার সে গুলিও তেমনি! তাই দেখে হৃদুকে বলেছিলাম, 'ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখ্‌তে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই! কেবল, মাঠে-ঘাটের বিষ্ঠাগুলো দেখে মনে হয় এখনকার লোকের হজম শক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে অধিক।"

আমার মা সত্য কি না?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

[১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতে নব শক্তির অভ্যুত্থানের অঙ্কুর-যুগ। এ যুগে মাতৃ-সাধনার বীজমন্ত্র উপ্ত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবামাচরণ, শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীবারদীর ব্রহ্মচারীর সাধন প্রচেষ্টায়। এর পাঁচ বছর আগে বেলঘরিয়ার বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব মিলন। ঠিক এই সময় অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে মা দেখা দিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃ-সন্ধানে মগ্ন হয়ে গেলেন—ভবিষ্যৎ মাতৃ-সাধনার মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'। পূর্বসংস্কার-নিশ্চিহ্ন-মন নিয়ে নব সাধনার দীক্ষা নিতে সমবেত হলেন, নবযুগের নিত্যসিদ্ধ কিশোর যুবক দল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সমাজ ও ধর্ম-সাধনার আমূল পরিবর্তন হ'ল। কেশবচন্দ্রের জীবনী-লেখক চিরঞ্জীব শর্ম্মা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন—"ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলা, বিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু-বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য কীর্ত্তন করেন, শেষ জীবনে কেশব তাহা অবিকল দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা, প্রার্থনা, ইদানীং তিনি যাহা করিতেন, তাহা যে উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল, একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কেশব ভিন্ন কয় ব্যক্তি সে-ভাবের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে?" নববিধান আশ্রমের একাদশ ভাদ্রোৎসব, ৭ই ভাদ্র রবিবার, ১৮০২ শকে কেশবচন্দ্র এই ভাষণ দেন।—স]

তোমরা অনেক ভদ্রলোক এই মন্দিরে বসিয়া আছ। এই আনন্দের দিনে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া উৎসব সম্ভোগ করিতেছ। তোমাদিগকে আজ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং আমি বিবেচনা করি লাভের সম্ভাবনা। সে প্রশ্নটি এই, তোমরা আমার মাকে দেখিয়াছ কি না? আমার মন জানিতে চায়, তোমরা কেহ কি এই মন্দিরের ভিতরে আমার মাকে দেখিয়াছ? আমার জননীকে তোমরা কি এই বিশ্বমধ্যে এই নগরে, কোন স্থানে, এই মন্দিরের মধ্যে কখনও দেখিয়াছ? তোমরা বিশ্বজননীকে দেখিয়াছ কি না, সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মাকে দেখিয়াছ কি না, এ কথা বলিয়া আমার প্রশ্নকে শিথিল ও ক্ষীণ করিব না; কিন্তু আমার মাকে কি তোমরা কেহ দেখিয়াছ, অন্তকার এই প্রশ্নের উত্তর দাও। মাতায় মাতায় বিরোধ উপস্থিত করিতেছি না। তোমাদের মা কি আমার মা নহেন? বিশ্বজননী কি আমার জননী নহেন? পূর্ব্বাঞ্চলের মা কি পশ্চিমাঞ্চলের মা নহেন? প্রাচীন জগতের মা কি বর্ত্তমান জগতের মা নন? আর্য্য যোগী, ঋষি এবং ভক্তদিগের মা কি তোমার আমার মা নহেন? সকলেরই স্রষ্টা এক, সে বিষয়ে কোন তর্কের সম্ভাবনা নাই। সমুদায় মনুষ্য-পরিবারের একই মাতা। আমার প্রশ্ন তত্ত্বসম্বন্ধীয় নহে, ভক্তি সম্বন্ধীয়। তোমরা ভক্তিভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা কর।

আমি যে একজন লোক ক্রমাগত এই বেদী হইতে আমার মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে তাঁহার গুণের কথা শুনাইয়াছি আমি অবশ্যই এখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তোমরা কি আমার সেই মাকে কখনও দেখিয়াছ? এই মন্দিরে ভিতর আমার মা লুকাইয়া আছেন। তোমাদিগের পার্শ্বে তিনি বসিয়া আছেন। ঐ সঙ্গীতের স্থলে এবং ঐ যবনিকার অন্তরালে যেখানে মহিলারা বসিয়া আছেন সেখানেও আমার মা বসিয়া আছেন। কেহ কি তাঁহাকে দেখিয়াছ বল ঠিক করিয়া। এই বেদী হইতে এত বৎসর আমি যে মার কথা বলিলাম সেই মাকে কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমরা কি মনে কর একজন যাদুকর তাহার নিজের কল্পনা দ্বারা নানা প্রকার ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া এই বেদী হইতে প্রতি সপ্তাহে সেই সকল নূতন নূতন ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখাইয়া ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে লোকের মন মোহিত করে? তোমরা কি মনে কর এই যাদুকরের কথার জালে শ্রোতাদের বুদ্ধি এমনি জড়িত হয় যে, আর বিচার করিতে পারে না এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া মনোহর কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া উহার পূজা করে? আমি কি তবে এই মন্দিরে যাদুকরের ব্যবসায় চালাইতেছি এবং কল্পিত ঠাকুর দেখাইয়া তোমাদের মন ভুলাইতেছি? এরূপ ভয়ানক অসত্য কথা বলিয়া যদি আমার নামে অভিযোগ কর, তাহা হইলে আমাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

আমার মার সম্পর্কে আমি মিথ্যা কল্পনা প্রচার করিয়াছি, এ অপবাদ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি কি তোমাদিগকে এই বেদী হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রবঞ্চনা করিয়াছি? হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা আমার মাকে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লও। যদি তোমরা আমার যথার্থ জীবন্ত মাকে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া না লও, তবে ভবিষ্যদ্বংশের জন্য তোমরা কল্পনা রাখিয়া যাইবে। যদি আপনারা বাঁচিতে চাও এবং জগতের কল্যাণ সাধন করিতে চাও তবে মাকে কতকগুলি কল্পনার সমষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে দিও না। কি কলিকাতা কি অন্য স্থানে মা বাস্তবিক নাই, এবং মার প্রেমরাজ্যও নাই, কেবল একখানি কল্পনাচিত্রিত ছবি আছে, এরূপ ভয়ানক মিথ্যা কথা এ পৃথিবীতে তোমাদের থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এই জন্য আজ তোমাদিগকে মাতৃপরীক্ষা করিতে বলিতেছি। যে মার কথা তোমাদিগকে এত কাল বলিলাম, যদি তোমরা তাঁহাকে আমার কল্পনা মনে কর, তবে এই অপরাধী মিথ্যাবাদীকে উপযুক্তরূপে দণ্ড দিয়া তোমাদিগের সমাজ হইতে নির্ব্বাসন কর। কিন্তু ভাই পরীক্ষকগণ, তোমরা যদি নিজে অপরাধী হও, আমার নিকট সমুচিত দণ্ড লইয়া তোমাদিগকে আমার মার শরণাগত হইতে হইবে। আমি আমার মাকে কল্পনা দ্বারা সৃজন করিয়াছি, এরূপ ভয়ানক অপবাদকে আমি কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি বিবিধ কল্পনার সাজে সাজাইয়া এক বিশ্বজননী প্রস্তুত করিয়াছি, এই অপবাদ খণ্ডনের জন্য আমি তোমাদিগের বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি।

আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি মাকে কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করি নাই। মার স্বরূপ সম্পর্কে আমি যে সকল বর্ণনা করিয়াছি সে সমস্ত সত্য, অভ্রান্ত সত্য। সে সকল বর্ণনাতে ভ্রান্তি ভ্রম কিছুই নাই। মার রূপ ঠিক যেমন দেখিয়াছি সেইরূপ বলিয়াছি। মার মুখে যাহা শুনিয়াছি ঠিক তাহাই বলিয়াছি, আমার নিজের কল্পিত কথা কিছুই নাই। তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারে, যাঁহাকে ব্রাহ্মেরা এক বলেন, আমি তাঁহাকে তেত্রিশ কোটি বলিয়াছি। আমি এককে বহু কল্পনা করিয়াছি। আমি এখনও বলিতেছি, যদিও আমার মা এক, তাঁহার রূপ গুণ অসংখ্য ও অগণ্য। আমি চিরকাল কল্পনার প্রতিবাদ করি; আমি নিজে কল্পনার দাস হইব? যদি মার কোটি রূপের কথা বলিয়া থাকি, সে এই জন্য যে অনেকগুলি রূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নির্জ্জনে, পরিবারমধ্যে, বন্ধুদিগের মধ্যে, দেশ-বিদেশে, নানা স্থানে তাঁহার অনেক রূপ দেখিয়াছি। তাঁহার এক রূপ নহে, তাঁহার অসংখ্য রূপ, যে দেখিয়াছে সে বলিবেই বলিবে। যে তাঁহার এক রূপ অথবা এক বর্ণ বলিবে, সে অসত্য কথনদোষে অপরাধী হইবে। অপরাধ আমার নহে, যে মার অসংখ্য রূপ অস্বীকার করে—তাহার। এই মন্দিরে এক এক রবিবারে সেই রূপের এক একখানি ছবি চিত্রিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক রবিবারের ছবি অন্য রবিবারের ছবির সঙ্গে মিলে না। বিচিত্র ছবি, যেন ভিন্ন ভিন্ন মা। কখনও সরস্বতী, কখনও লক্ষ্মী, কখনও যোগেশ্বরী, কখনও মহাকালী। এবার কি? এত ভিন্ন প্রকার দেবমূর্ত্তি! আমি কি করিব? যাহা দেখিলাম তাহাই বলিলাম। মার বিচিত্র রূপ, সুতরাং ছবি এবং বর্ণনাও বিচিত্র হইল। এ বিচিত্রতা তোমরা অস্বীকার করিতে পার না।

আমি যে মার কথা বলিতেছি তিনি তোমাদেরও মা, আমারও মা। যদি তোমরা তাঁহাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ কর বা সঙ্কুচিত হও, তবে তিনি দেশ-বিদেশে কেশবের মা বলিয়া পরিচিত হউন। যদি সে বিষয়ে লজ্জা ভয় না থাকে তাহা হইলে আমার মাকে এখনি তোমাদেরও মা বলিয়া স্বীকার কর এবং তাঁহার যতগুলি মনোহর রূপ বর্ণনা করিয়াছি সমুদায় মানিয়া লও। আমার মা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া লও। তাঁহাকে দেখিলে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। যদি আমি মার কোন একটি রূপ মিথ্যা কল্পনা করিয়া থাকি তবে আমি মিথ্যাবাদীর অপরাধে কলঙ্কিত হইব। কিন্তু আমি কি সেই ভয় করি? সর্ব্বারাধ্যা মোক্ষদায়িনী মার সম্পর্কে মিথ্যা বলিতে পারি না। আমি কি পুতুল বিক্রয় করিবার জন্য এই মন্দিরে দোকান খুলিয়াছি! আমি কি মার কল্পিত মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি! এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিলে আমার দিন চলে না, তাই কি লক্ষ্মী, বাগদেবী প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লোকের নিকট সে সকল মূর্ত্তি উপস্থিত করিতেছি? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে জগজ্জননীর এ সকল রূপ অবশ্য আছে? আমি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিতরূপ বলিতেছি মার এ সকল রূপ অবশ্য আছে। আমার হাতে মার এ সকল রূপের গঠন হয় নাই।

আমি এক ব্রহ্মের অসংখ্য রূপ ও গুণ মানি। সেই বেদ-বেদান্তের বর্ণিত নিরঞ্জন নিরাকার সনাতন পরব্রহ্মকে আমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, আদ্যাশক্তি ভুবনমোহিনী রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিয়াছি। হিমালয়ে যোগেশ্বরী, দীনের ঘরে দীনবন্ধুরূপে দেখিয়াছি। যখন স্বচক্ষে সেই জগজ্জননীর বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিলাম, তখন কিরূপে সে সকল অস্বীকার করিব, কিরূপেই বা গোপন করিব? যদি তোমরা বল, লক্ষ্মী বলিলে, সরস্বতী বলিলে সাকার রূপ মনে হয়, মা বলিলেই একজন স্ত্রীলোক মনে হয়, তোমাদের যদি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ এরূপ ভাব মনে হয় আমি কি করিব? বিরুদ্ধ দেশাচারের অনুরোধে সত্য বিনাশ করা যায় না। আমি কোন মতেই মার মূর্ত্তি সম্পর্কে সাকার ভাব আসিতে দিব না। মার অসংখ্য রূপ, কিন্তু তাঁহার কোন রূপের আকার নাই। মার মুখ সহস্র প্রকার, কিন্তু সমুদয় নিরাকার। এই মন্দিরের মধ্যেই তাঁহার নানা মূর্ত্তি দেখ, এই বেদীর সমক্ষে, ঐ কাষ্ঠাসনে, ঐ সঙ্গীতস্থলে, ঐ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মার বিচিত্র রূপ দর্শন কর। ঐ মাকে যে দেখিয়াছে সে জানে তাঁহার কত রূপ। যদি তোমরা মাকে দেখ আপনা আপনি তোমাদের চক্ষু হইতে ভক্তির জল উথলিয়া পড়িবে এবং সেই জলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় মার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিফলিত হইবে। মার অসংখ্য রূপ, অসংখ্য বর্ণ। প্রেমোন্মাদিনী মার মিনিটে মিনিটে বর্ণপরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মগণ, এই অসংখ্যরূপধারিণী মা তোমাদিগের নিকট পরীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন, তোমরা আজ ভক্তির সহিত ইহার বিচিত্র নিরাকার রূপ পরীক্ষা কর। মার রূপেতে ত্রিভুবন আলোকিত। মা আজ হাসিয়া বলিতেছেন, "সন্তান, আমার না কি তোমার কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে? আমি তোমার মা বিচিত্রবর্ণা, মানবকুল উদ্ধারের জন্য আমি বিবিধ রূপ ধারণ করিব। আমার বিবিধ স্বরূপ আছে কি না, তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ। পরীক্ষিত হইবার জন্য আমি তোমার নিকট প্রকাশিত হইতেছি; মার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখ, কত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। একই মার মুখে জ্ঞান, শক্তি, পুণ্য, আনন্দ প্রভৃতি সহস্র সহস্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। প্রতি মিনিটে আমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, তোমার চক্ষের সমক্ষে প্রতি পলকে মার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ আমি এক বর্ণা কি বিচিত্রবর্ণা। সন্তান! যদি, সত্য সত্যই আমার মুখের নিত্য নূতনরূপ দেখ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইবে, আনন্দে মুগ্ধ হইবে!

মার পরীক্ষকগণ, মার বিচারকর্ত্তৃগণ, এখন কি বল? মার এত রূপ, এত গুণ, আজ মা কোটি রূপ ধারণ করিয়া এই উৎসব-মন্দিরে আসিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র মন্দিরে মা তাঁহার আপনার অসংখ্য মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার কোন সন্তানের যোগের বর্ণ, কাহারও ভক্তির বর্ণ, কাহারও সেবার বর্ণ, এক এক সন্তান মার এক এক বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। জননী তাঁহার সমুদয় শিষ্য-প্রশিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। মার রূপের আকর্ষণ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যাহার চক্ষে একবার মার স্নেহের রূপ প্রতিভাত হয়, সে আর উঠিতে পারে না। কে বলে মার রূপ নাই? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, ইহা কেবল ফাঁকি দিবার কথা। তোমরা কি মার রূপ দেখিবার জন্য এত দিন আকুল হইয়াছিলে? এত দিন জননীর বিচিত্র রূপ তোমাদের কাছে কেন প্রচ্ছন্ন ছিল? মা তোমাদের ঘরে কেন অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না? তোমরা যে বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া

আছ, সেই এক পুরাতন জীর্ণ কল্পিত ব্রহ্মরূপ প্রত্যহ দেখিবে ! তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এক মৃত মাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার মা সেই আদ্যাশক্তি, জীবন্ত শক্তি—মৃত নহেন ; তিনি প্রতিদিন নব নব রূপ ধরেন, এবং নবজীবন দান করেন।

সাধকগণ, তোমরা প্রতিদিন মাকে বলিতে পার, "মা, আজ আবার তোমার এ কি রূপ ?" তিনি হাসিয়া বলিবেন, "আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" মা সর্ব্বদাই রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন। কেন তাহা কে বুঝিবে, কে বলিবে ? এ মধুর রহস্য জননীই জানেন, আর কে বুঝিতে পারে ? মা পলকে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ঘুরাইয়া ভক্তকে মোহিত করিতেছেন ; তিনি কেবল বসিয়া দেখিতেছেন ও সম্ভোগ করিতেছেন। এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখাইলেন, একটু পরেই আবার শান্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। এই অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় প্রশান্ত ছিলেন, এই আবার মহাব্যস্ত হইয়া ভক্তকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! এই যোগীদিগের সঙ্গে গম্ভীররূপে বসিয়াছিলেন, আবার এক মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতে নৃত্যগোপালরূপ ধরিয়া বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন !! সেই গম্ভীরপ্রকৃতি যোগেশ্বর যোগিবন্ধু বালকদিগের সঙ্গে বালকবন্ধু হইয়া এমন আনন্দের বাল্যখেলা খেলিলেন যে, তদ্দর্শনে সকলে মোহিত হইয়া বলিতে লাগিল, ইনি আবার গম্ভীর হইবেন কিরূপে ? মার একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহার বিচিত্র লীলা দেখিয়া ভক্তেরা মুগ্ধ হন এবং পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করেন। সন্তানদিগকে মাতাইবার জন্য তিনি নিরন্তর রূপান্তর হইতেছেন, এবং বিবিধরূপে সদাকাল নাচিতেছেন। সেই নৃত্য দেখিলে তোমাদিগের প্রাণ মন আর তোমাদের বশে থাকিবে না। আমার মা, তোমাদের মা, তোমার আমার প্রাণের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে নাচিতেছেন, আনন্দময়ী আনন্দ বিস্তার করিতেছেন। প্রতিজনের দেহমন্দিরের মধ্যে তিনি নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার যে কোন রূপ ভক্তের নয়নগোচর হউক না কেন তাহাতে ভক্ত মোহিত ও অবাক্ হন। যখন দেখিবে তিনি মা হইয়া জীবকে স্তন্য পান করাইতেছেন, সেই মধুর মাতৃরূপের মাধুর্য্যে তোমার মন ভুলিয়া যাইবে। মার মুখ স্থির আবরণে আবৃত বটে ; কিন্তু ভাবুক ভক্তদিগের নিকট মা সেই আবরণের ভিতর হইতে তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। মা তাঁহার ভক্ত প্রেমিকদিগকে দেখা দিবার জন্য অসংখ্য রূপ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক, মা আপনার মুখের আবরণ খুলিবেন। এই মন্দিরের কোণে তিনি বসিয়া আছেন, তোমরা তাঁহাকে অন্বেষণ কর। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার হাতে তোমার হাত ঠেকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহার পুণ্যের সুমিষ্ট সৌরভ তোমার নাসিকা অনুভব করিবে, ততক্ষণ খুঁজিয়া বেড়াও। তিনি এই মন্দিরেই লুকাইয়া আছেন, উপযুক্ত সাধনের পর ভক্তের মন যখন প্রস্তুত হয়, তখন তিনি তাঁহার নিকট আপনার মুখ খোলেন। সেই মুখ দেখিয়া ভক্ত স্তম্ভিত হন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, ও অবশেষে আবার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করেন।

হে ভক্ত, মনে করিও না তুমি মাকে দেখিলে বলিয়া সকলেই স্তন্য পান করিতে লাগিলে। সে মধুর ইঙ্গিত কি সকলে বুঝিতে পারে ? শত শত লোকের মধ্যে দুই-একজন মাকে দেখিলেন, সেই দুই-এক জন ছাড়া অবশিষ্ট লোকেরা যেন বলাবলি করিতে লাগিল, কৈ মা ? মা তো এখানে নাই ! ব্রাহ্মগণ, তোমরা সকলে কেন আজ মাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর না। তিনি তোমাদের খুব নিকটে আছেন, তিনি এই মন্দিরে ঠিক তোমাদের চক্ষের সমক্ষে আছেন। ভাবের নৈকট্য হইতেছে না বলিয়া দেখিতে পাইতেছ না। একবার ভাবের ঘরে প্রবেশ কর, দেখা হইবে। ব্রাহ্ম, ক্রমাগত তিনি তোমাকে ঐ ভাবের ঘরে ডাকিতেছেন, তুমি যাও না কেন ? মার নিমন্ত্রণ পাইয়া মধুময় কল্যাণকর আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া মার নিকটে যাও, সেই বিচিত্ররূপধারিণী উজ্জ্বলবর্ণ মাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক কর, তাঁহার স্নেহে বশীভূত হও। আর কেন বিলম্ব কর ? এখনি দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া লও। সেই মাকে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এমন গভীর আনন্দের ভিতরে পড়িবে, যে মাতৃদর্শন ভিন্ন তোমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না, এবং মাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র মাকে দেখিবে। তখন দেখিবে স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইয়াছে, পৃথিবী দেবলোক এক হইয়াছে, সংসার বৈকুণ্ঠ এক হইয়াছে।

যখন মার হস্ত তুমি স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার হাত মাকে ধরে নাই, কিন্তু মার হাত তোমাকে ধরিয়াছে। তুমি ধরিলে ছাড়িতে পার ; স্বয়ং ব্রহ্ম ধরিয়াছেন তোমার হস্ত, তুমি আর কিছুতেই ছাড়াইয়া যাইতে পার না। মা বলিতেছেন—"আমার লোক অতি অল্প, আমি তোমাকে চলিয়া যাইতে দিব না।" মার মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তের মনে কত আহ্লাদ হয়। যে ভক্ত বিধাতার করতলন্যস্ত তাহার কত সুখ ! শরণাগত জীব মার স্নেহ-শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল। মা বলিলেন,—আজ কোন মতে সন্তানকে ছাড়িব না। আজ উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, আজ ভক্তকে চলিয়া যাইতে দিব না। এই বলিতে বলিতে সন্তানের প্রতি মার অনুরাগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া ক্রন্দনের আকার ধরিল। মার স্নেহের কথা শুনিয়া ছেলে আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন সাকার, চক্ষের জল চক্ষে দেখা যায়। ওদিকে মার গভীর ঘন প্রেমের উচ্ছ্বাস নিরাকার ক্রন্দনে পরিণত হইল। ভক্তকে পাইয়া মা অনুরক্ত উপাসনান্তে পাছে ভক্ত চলিয়া যায়, এই ভাবে উদ্বেলিত ঘনতর অনুরাগ মাকে কাঁদাইল। মার গাঢ় অনুরাগই ভক্তের পক্ষে অসহ্য ক্রন্দন। মা প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ভক্তকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। ভক্ত বলিল "আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আমাকে ডাকিতেছে, আমার কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইবে, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি সংসারে ফিরিয়া যাই।" মা বলিলেন—"কি বলিলে, কি বলিলে সন্তান !" বলিতে বলিতে মার স্নেহচক্ষু হইতে বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। আহা মরি কি সুন্দর মার প্রেমাশ্রু ; ছেলে মার স্নেহ দেখিয়া বিগলিত হইল। মা এই সুযোগে ছেলের হাত দু'খানি আরও দৃঢ়তার সহিত আপনার অঞ্চলে বাঁধিলেন। সন্তানকে নিজের অঞ্চলে বাঁধিয়া আপনার অনুরাগের কত ছবি, কত মনোহর মূর্ত্তি, কত সুন্দর রূপ দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে মার ব্যবহারে পরাস্ত হইয়া সন্তান বলিল—"আর ফিরে যাব না মা,

আজ প্রমাণ করিয়া দিলে। আজ দেখিলাম মা, তুমি কেবল নির্লিপ্ত উদাসীন বৈরাগী ব্রহ্ম নহ, কিন্তু তুমি যথার্থই আমার মা হইয়া আমাকে তোমার স্নেহের বিচিত্র রূপ দেখাইতেছ। জননী তুমি কাহারও কল্পনাসমুদ্ভূত নহ, তুমি সত্য সত্যই আমার জীবন্ত প্রেমময়ী মাতা। তুমি আমাকে সত্য সত্যই ভালবাস।"

সাধে কি মাকে আমরা ভালবাসি? এমন মাকে যে দেখিয়াছে সে যে মার রূপের ছটা দেখিয়া প্রেমানন্দে পাগল হয় না, এই আশ্চর্য্য! আমার মা কেমন, এখন দেখিলে তো! ছাড়িবে? কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবে? কেমন, আমার মাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইল! এমন মাকে ছাড়িয়া কি কোন সন্তান বাঁচিতে পারে? আজ ব্রহ্মমন্দির আমার মার গুণকীর্ত্তন করুক। কেবল কীর্ত্তন করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়, কিন্তু মাকে দেখিয়া আজ সকলে মোহিত হউন। আজ জগজ্জননী প্রত্যেক সন্তানের কাছে দাঁড়াইয়া বলুন—"বৎস! ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, নারদ, ঈশা, মুসা, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ভক্তই আমার রূপে মোহিত হইয়াছে, তুমিও আমাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর। তোমার মা কেমন সৌন্দর্য্য ও প্রতাপপূর্ণ দেখ। তোমার মা বিদ্যাতে সরস্বতী, ধনধান্যে লক্ষ্মী, বলে আদ্যাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তোমার মার রূপে ত্রিভুবন মোহিত হইয়াছে, তুমি মোহিত হইবে না? তোমার মার অনুরোধ কাটাইয়া তুমি মাকে ছাড়িয়া আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।" যে মা এমন মধুর কথা বলেন বন্ধুগণ, সে মা কেমন? খুব ভাল—না? সকলে সেই মার হাতে ধরা দেও।

এই উৎসবমন্দিরে আজ মা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া সভা করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কোটি রূপ চারি দিকে বিকীর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে পাপ-তাপ-রোগ-শোক সমুদয় চলিয়া যায়। মাকে দেখিয়া আজ আমরা পুণ্যবান পুণ্যবতী হইলাম। এই মন্দির—সন্তাপহারিণী সুখমোক্ষদায়িনী মার মন্দির; এই মন্দিরে যে কেহ আসিবে, মার রূপ দেখিয়া শীতল হইবে। এখানে মা যে ভক্তকে শ্রীচরণ দিবেন, তাহাকে আর ছাড়িবেন না। ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, প্রত্যেকে আজ প্রতিজ্ঞা কর এমন মাকে আর ছাড়া হইবে না। মার কোটি কোটি রূপের জালে জড়িত হইবে, চারি দিকে মার রূপ, ভিতরে বাহিরে মার রূপ, সর্ব্বত্র মার রূপ। মাকে দেখিতে দেখিতে মার সহাস্যমূর্ত্তি প্রফুল্ল বদন তোমার নয়নগোচর হইবে। মার সহাস্য বদন—সকল নাস্তিকতার ও অবিশ্বাসের উত্তর। মা বলিতেছেন—"বৎস, অবিশ্বাসীরা বলে আমি নাই; কিন্তু এই দেখ আমি হাসিতেছি!" মার মুখের সুন্দর হাস্য একটি সোনার শৃঙ্খল, ভক্তকে বাঁধিলে আর ছাড়ে না। সেই হাস্য দেখিলে আর ভক্ত সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে না। তাহার সকল সন্দেহ, দুঃখ, পাপ চলিয়া যায়। সেই হাস্য অমৃতসরোবর, সেই অমৃত পান করিলে এ জীবনে প্রমত্ততা শেষ হইবে না। সেই হাস্যে যে মুগ্ধ হইল তাহার আর মৃত্যু নাই। মার কোটি রূপের সার রূপ এই হাস্যমূর্ত্তি। ভ্রাতৃগণ, এই সহাস্যবদনা মাকে দেখিয়া বালকের মত তাঁহার সমক্ষে খেলা কর! মার মধুর হাস্যে সমস্ত নাস্তিকতা চূর্ণ হইল। আর আমার মাকে তোমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে না, বিচার করিতে হইবে না। মা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আমাদিগের পানে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া আনন্দ বদনে হাসিয়া সমুদয় বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। আইস আমার ভাই, মার সুন্দর বাগানে মার হাত ধরিয়া বেড়াই। মা আমাদিগকে বালক সন্ন্যাসিরূপে সাজাইয়া দিবেন। মার যেমন অনেক রূপ আমাদিগকেও তেমনি বিচিত্র সাজে সাজাইবেন। মার বশীভূত হইয়া, হে ভক্তগণ, এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

হরতাল! হরতাল!! হরতাল!!!

"হরতাল" কথাটি শুনলেই কেমন যেন ছুটি লাভের আনন্দে অনেকে অধীর হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক দল আর উপদলের মাতব্বরেরা কোন কোন কারণে হরতাল পালন করতে আবেদন করেন কখনও কখনও। আমরাও নিজেদের কাজ থেকে বিরত থেকে, হরতাল পালন ক'রে থাকি। রাজনীতির ইতিহাসে বহু বিখ্যাত ঘটনা বা দুর্ঘটনার প্রতিবাদে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছে, কলকাতা তথা বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে। যাই হোক, হরতাল শব্দটি কোথা থেকে এবং কি ভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়, কেউ কি কোন দিন ভেবে দেখেছেন? তবে শুনুন হরতাল কথার ইতিহাস। আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য বাজারে কর বা Tax দেওয়ার রীতি বহু কাল থেকে চালু ছিল। এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়, বাজারের মধ্যে এই ধরণের কর ওসুল করার জন্য অকট্রায় পোষ্টের (Octroi Post) মত একটি স্থান থাকে। মধ্যপ্রদেশে এই ব্যবস্থা এখনও আছে। আমাদের দেশীয় ভাষায় যাকে বলে 'চবুতরা'। যখন কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বা অন্য কোন কারণে বাজার বন্ধ করতে হয়, তখন এই বিষয়টি জ্ঞাপনের জন্য হরতাল (হরিতাল) নামে একটি পীত ধাতুর দ্বারা চবুতরার দেওয়ালে দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ ছুটির চিহ্ন। যারা চবুতরা বন্ধ হওয়ার পর বাজারে আসে, তারা এই দাগ দেখে ফিরে যায়। সুতরাং যখন বাজার বন্ধ থাকে তখনই লোকে বলে, 'আজ হরতাল'। কালক্রমে বাজার বন্ধ করা থেকে যে কোন কাজ-কর্ম্ম থেকে বিরতির বোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে 'হরতাল' কথাটি। ইংরেজীতে যাকে Strike বলে, হরতাল শব্দটি তারই বঙ্গার্থে পরিণত হয়েছে।

সার্কাসে বাঙালী

শ্রীষষ্ঠীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একশো বছরেরও উপর থেকে, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ত' বটেই, অনেক সময় ভারতেরও সীমা ছাড়িয়ে বর্ম্মা, সিঙাপুর, ফিলিপাইন, হংকং, সাংহাই, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রথমে বাংলা পরে ভারতের আরও একটি রাজ্য অগ্রণী হয়ে বহু সার্কাস-পার্টি গঠন করেন। অনেক পার্টির অস্তিত্ব এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যেমন আর নেই, তেমন অনেক নূতন নূতন পার্টিও তৈরী হয়েছে। আজ ছোট, মাঝারী এবং বড় নিয়ে প্রায় ১৫০টি ভারতীয় পার্টি ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এরূপ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোনও বিবরণ বা আলোচনা এ পর্য্যন্ত কোনও সংবাদপত্রে বা সাময়িকীতে চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

বড়দিনের সময় হাওড়া ময়দানে বা ক'লকাতার ভিতর পার্ক সার্কাস, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, শ্যামবাজার প্রভৃতির ফাঁকা জায়গাগুলির যে কোনও একটিতে সার্কাস-পার্টির তাঁবু পড়ে, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা যায়—অনেকেই যাই, ট্রাপিজের খেলা, বারের খেলা, বাঘ-সিংহের খেলা প্রভৃতি দেখে খুসী মনে ফিরে আসি। প্রশংসা যা করি, তাদের পরমায়ু কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ফেরার পথটুকু, বড় জোর তার পরের দিন দু'-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, যাঁরা সেদিনও ঐ সার্কাস দেখেন নি।

কিন্তু ঐ সার্কাস-পার্টির ক্রীড়া-কৌতুকগুলি ঠিক তামাসা নয়। একজন খেলোয়াড়ের সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য বা অতি নগণ্য একটি ত্রুটির জন্য তার জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। পার্টির প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্রতিটি পদক্ষেপে অত্যন্ত সচেতন এবং সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত বিপজ্জনক খেলার যথোপযুক্ত মর্য্যাদা আমরা দিই কি? মর্য্যাদা ত' নয়ই, সম্যক আলোচনাও হয় না—সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। নৃত্যানুষ্ঠান, রঙ্গমঞ্চে বা চলচ্চিত্রে অভিনয়, সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা হয়, সার্কাস পার্টির ঐ সমস্ত বিপজ্জনক খেলা থাকা সত্ত্বেও সেরূপ কিছুই হয় না। পার্টির বিজ্ঞাপনে আলোচনা বাদ দিয়ে দর্শকের তরফ থেকে ঐ ধরণের কোনও আলোচনা তেমন হয় না। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করার উৎসাহই যেখানে কম, সেখানে তার আয়োজনও সীমাবদ্ধ, আলোচনার মসীকলমও হয়ত তাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাই ফুটবলে—যেখানে এগারটি খেলোয়াড়ের ভিতর অনায়াসেই একজন বেশ ডাঁটের উপর ফাঁকি দিয়েও সুখ্যাতি নিতে পারে, যেটা নাকি সার্কাস-পার্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই সমস্ত ভারতীয় সার্কাস-পার্টির প্রবর্ত্তনে যাঁরা যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হলো, বর্ত্তমানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সে বিস্মৃতপ্রায় দীর্ঘ ইতিহাসের অনেক অংশই প্রকাশ পেল না। কোনও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা "বসুমতী" মারফৎ অবগত করালে বাধিত হবো।

সঠিক জানা না গেলেও, অনুসন্ধানে যতদূর পাওয়া যায়, ইং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, চেতলার জগু বাবুই (যাঁর প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুরের বিখ্যাত জগু বাবুর বাজার), এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ভিতর প্রথম অগ্রণী হয়ে, সার্কাস-পার্টি গঠনে উৎসাহিত হন। সেকালে (এ কালেই বা কম কি?) বড়লোকদের ভিতর এক-এক জনের এক একটা বাতিক ছিল—এটা বাতিক কি না জানিনে, দুষ্টু, ডান-পিঠে, অথচ শক্তিধর ছেলেপিলেদের উনি খুব ভালবাসতেন। ঐ রকম যাকে বলে 'মায়ে-মারা বাপে-খেদান' ছেলের সন্ধান এক বার পেলেই হ'ল—জগু বাবু লোক পাঠিয়ে তাকে আনাবেনই, তা গোপনেই হোক, আর সদর্পেই হোক। জগু বাবুর তোষাখানা সেই সমস্ত ছেলেদের নিকট স্বর্গবিশেষ ছিল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, দুটি-চারটি করে, এই ভাবে তাঁর আখড়ায় বহু ছেলের সমাবেশ হয়ে গেল। তাদের কুস্তী-কসরতের ব্যবস্থাও ছিল—তারা খেতো-দেতো আর ঐ আখড়াতে কুস্তী-কসরত করে মনের আনন্দে থাকতো।

ক'লকাতায় সে বার এক ইংরেজ কোম্পানীর "ফিড্‌জ্যাল সার্কাস" নামে একটা সার্কাস-পার্টি আসে। বছর বছর এই রকম দু'-একটা কোম্পানী আসতো এবং ক'লকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলে, সব প্রথম কলকাতাতেই তাদের সবারই আসবার আকর্ষণ থাকতো। জগু বাবু তাদের খেলা দেখে ভাবলেন—"আখড়ার ছেলেগুলোকে ঐ রকম খেলা শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে নিজেই ত' একটা দল গড়তে পারি! এদেরও প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ হবে, মনে স্ফূর্ত্তি বাড়বে, দেশের ভিতর নির্দোষ আনন্দও পরিবেশন করা যাবে।" দেশে তখন যথেষ্ট সম্পদ থাকলেও, দেশের সম্পদ ঐ ভাবে বিদেশে যাওয়াটাও পছন্দ করলেন না, ভাবলেন—"কম টাকাগুলো বিদেশে চলে যাচ্ছে! আমরা দল করলে, দেশের টাকা দেশেই থাকবে।"

যেমন চিন্তা তেমনই কাজ। "ফিড্‌জ্যাল সার্কাস" কোম্পানীর ম্যানেজার প্রভৃতি দু'-এক জন কর্ত্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে, দু'জন ইংরেজ শিক্ষক নিলেন এবং সুরু হয়ে গেল তাঁর আখড়ার ছেলেদের বারের খেলা শেখা, ট্রাপিজের খেলা শেখা—এল বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু। কী প্রচণ্ড উৎসাহ যে সেদিন খেলোয়াড়দের এবং উদ্যোক্তাদের ছিল! এঁদেরই ঐকান্তিক এবং সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতে প্রথম গড়ে উঠলো "গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস।" গড়ের মাঠে তাঁবু খাটানো হলো, সহরময় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যে মধ্যমণিকে কেন্দ্র করে এই বাঙালী প্রতিষ্ঠান সর্ব্বভারতে যেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে, সেই দিনই স্বনামধন্য জগু বাবু জগৎ থেকে বিদায় নিলেন, যমরাজের হঠাৎ আহবানে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। যোগীন পাল মশাই ছিলেন জগু বাবুর প্রিয় শিষ্য, ছাত্র এবং দক্ষিণ হস্ত। জগু বাবুর অবর্ত্তমানে তিনিই ঐ "গ্রেট্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ সার্কাস" পরিচালনার ভার নিয়ে, এক দিকে যেমন পরিচিতির সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করতে লাগলেন, অন্য দিকে পরিভ্রমণও আরম্ভ হলো ভারতের ভিতর বিভিন্ন প্রদেশে, শেষে ভারতেরও সীমান্ত পার হয়ে বর্ম্মা, মালয়, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি মুলুকগুলিতেও। এঁর দলের বারের খেলায় কলকাতা আহীরিটোলা নিবাসী কৃষ্ণলাল বসাক, ঘোড়ার খেলাতে রঘু ডাকাত, বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর খেলায় ভূতনাথ বোস, ঘোড়ায় চড়ায় মন্মথ ঢোল, হরাইজেণ্টাল্‌ বারে শিব বাবু প্রভৃতির সুনামও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সেই সময় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কথা শুনে আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং সর্ব্বজনমান্য প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহেরুর পিতা স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরু, তাঁর কোনও আত্মীয়ের নেতৃত্বে কৃষ্ণলাল বসাক, দেবেন্দ্রনাথ দে, পান্নালাল বর্দ্ধন, শিব বাবু প্রভৃতিকে সংগ্রহ করে একটি দল পাঠালেন। সর্ব্বভারতে তখন বাঙালী খেলোয়াড়রাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তাঁদের ক্রীড়া-কৌতুক সেদিন সেই সমুদ্রপারের বিদেশী রাষ্ট্রেও কম খ্যাতি লাভ করেনি।

দলবল সসম্মানে ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁরা দেশে এসে দেখলেন, যোগীন পাল মশায়ের পাল (অর্থাৎ পার্টি) ছত্রভঙ্গের মুখে। এবল সাহেব তখন পাঞ্জাব থেকে অনেক টাকা লোকসান দিয়ে তাঁর সার্কাস-পার্টি নিয়ে কোনো মতে কলকাতা পৌঁছলেন। তাঁর দল আর টেকে না। কলকাতার প্রাতঃস্মরণীয় হরিমোহন রায় মশাই এবল সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করে তাঁর দলটি পুনরুজ্জীবিত করে দিলেন এবং কৃষ্ণলাল বসাক এবং আরও দু' এক জন এবল সাহেবের গ্রেট এবল সার্কাসে যোগ দিলেন। কিছু দিন সেখানে সুনামের সঙ্গে কাটালেও, কৃষ্ণ বাবুর স্বাধীন চিত্ত এ বন্ধনটুকু বেশী দিন সহ্য করতে পারলো না। তিনি অধিকাংশ বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে বের হয়ে এলেন এবং অচিরেই "হিপোড্রোম সার্কাস" নাম দিয়ে বিরাট সার্কাস পার্টি খুললেন। অবশ্য জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত খাকো বাঁড়ুজ্যে মশাই এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এই "হিপোড্রোম সার্কাসও" ভারতের প্রত্যেক বড় বড় সহরে এবং ভারতেরও সীমা পেরিয়ে একাধিক বার চায়না, জাপান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি স্থানেও খেলা দেখিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। এঁর দলে পূর্ণচন্দ্র পাইন এত বলবান ছিলেন যে তাঁকে সবাই "স্যাণ্ডো বাবু" বলতো। এঁর দলের শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় মশাই আজও সৌভাগ্যক্রমে জীবিত আছেন। ইনি "হরাইজেন্টাল বারে" এবং ট্রাপিজের খেলায় বিখ্যাত ছিলেন এবং আজও ভারতে এঁর সমকক্ষ খেলোয়াড় দুর্লভ। ভারতীয় ছাড়া এঁর দলে অনেক ইউরোপীয় খেলোয়াড়ও ছিল এবং কৃষ্ণ বাবুর পরিচালনা ও নেতৃত্ব মেনে নিতে তাঁদের সেদিন একটুও বাধেনি—এমনিই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা ছিলেন তিনি!

হায় বাঙালীর দুর্ভাগ্য! বাঙালী পরিচালিত এত বড় সার্কাস-পার্টিও, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভের সময়েই কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে যেন ডুবে গেল! তখন খাশ চীনে তাঁদের খেলা দেখান হচ্ছে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী লেডী অ্যাশবী যেহেতু জার্ম্মাণ-দেশীয় ছিলেন এবং তাঁর দলে কয়েক জন জার্ম্মাণ খেলোয়াড়ও ছিলেন, সেই হেতু তাঁর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। খেলার পূর্ব্বে প্রস্তুত হবার জন্য জুতোর ফিতে বাঁধার সময় কৃষ্ণ বাবু এই দুঃসংবাদ হঠাৎ শুনেই (Brain concoction-এ) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কোথায় বা গেল তাঁর দল, প্রাণ নিয়েই শশব্যস্ত। দেশে ফিরে এসে, বহু দিনের সুচিকিৎসায় সুস্থ হ'য়ে উঠলেন অবশ্য, কিন্তু সেই হারানো জোট আর জোড়া লাগলো না। অনেক দিন পর অপেক্ষাকৃত সুস্থ এবং কর্ম্মক্ষম হ'য়ে উড়িষ্যার আউল রাজের অনুরোধে "আউলরাজ সার্কাস-পার্টি" গঠন করে, তাঁরই নেতৃত্ব নিয়ে ভারতের বহু স্থানে ঐ সার্কাস দেখিয়ে বেড়ান।

মাঝের কিছু কথা বলা হয়নি। কৃষ্ণলাল বসাক মশাই যখন এই ভাবে বিদেশে জাভা, জাকার্তায়, "হিপোড্রোম সার্কাস" নিয়ে যাত্রার পথে জয়মাল্য অর্জ্জন করছিলেন, তখন তাঁর এই সৌভাগ্য দেখে বাংলার ভিতর "পদ্মমালা" লেখক মনমোহন বোস মহাশয়ের দু'টি ছেলে, মতিলাল বোস এবং প্রিয়নাথ বোস উৎসাহিত হলেন এবং যথাক্রমে "গ্রাণ্ড বোসেস সার্কাস" এবং "প্রফেসর বোসেস সার্কাস" নাম দিয়ে দু'টি পৃথক পৃথক সার্কাস-পার্টি খুললেন। "বসুমতী"-প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মশাইও "সিজন সার্কাস" নাম দিয়ে, একটি সার্কাস-পার্টি গড়ে তোলেন, কিছু দিনের মধ্যেই পার্টি উঠিয়ে, সমস্ত উৎসাহ "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করেন, যা আজও স্বমহিমায় সমধিক সমুজ্জ্বল।

যোগীন পাল মশাইয়ের দল থেকে যেমন কৃষ্ণলাল বসাক মশাই বের হয়ে এসে "হিপোড্রোম সার্কাস" করলেন, তেমনি তাঁর পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র শ্যামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইও এসে ঐ অঞ্চলে একটি দল গড়ে তোলেন এবং অসমর্থিত এক ভদ্রলোকের উক্তিতে জানা গেল যে, ঐ শ্যামকান্ত বাবুই নাকি পরবর্ত্তী জীবনে "সোহহং স্বামী" নামে বিখ্যাত হ'য়ে উঠেন এবং শ্বাস প্রাণায়াম প্রভৃতি যৌগিক পদ্ধতিগুলির প্রথম অনুশীলনে উৎসাহিত হলেন, ঐ সার্কাস-পার্টির তাঁবুর ভিতর থেকেই। ঐ শ্যামকান্ত বাবুর প্রিয় ছাত্র মহেন্দ্রলাল দাসও বের হয়ে এসে "মহেন্দ্র দাস সার্কাস" নাম দিয়ে সার্কাস-পার্টি গঠন করে ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং বুকে হাতী উঠিয়ে অগণিত লোকের অজস্র প্রশংসা ও খ্যাতিতে তাঁর স্ফীত বুক যেমন স্ফীততর হয়েছিল, বাঙালীর বুকও মহেন্দ্রনাথের গৌরবে তেমনই যাকে বলে ফুলে দশ হাত হয়েছিল। বিখ্যাত যাদুকর গণপতি বাবুও কিছু দিন প্রিয়নাথ বাবুর "বোসেস্ সার্কাসে" কাটিয়ে, শেষে বের হয়ে এসে পাকা যাদুকর হয়ে, ঐ খেলাই দেখিয়ে বেড়াতেন। এর অনেক পরে এক সময় কাশিমবাজারে "মারাঠা সার্কাস" নামে একটা পার্টি এসে যখন ভেঙে পড়ে, তখন দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় উৎসাহ ও সাহায্য দিয়ে সেই পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং কিছু দিন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকূল্যে প্রকৃত পক্ষে তাঁরই দল হয়েই ঐ পার্টি বহু স্থানে তাঁদের খেলা দেখিয়ে বেড়ান।

তখনও ভারতের ভিতর অন্য কোনও দেশে এইরূপ সার্কাস্-পার্টি গঠন এবং পরিচালনের কল্পনাও কেউ করছেন না। বাংলা দেশই এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় এবং ঐ ক'জন বাঙালীর নাম তাই সার্কাসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার মত। কিন্তু বাঙালীর সৌভাগ্য দেখে এবং ঐশ্বর্য্যে কেউই যে ঈর্ষিত হবেন না, প্রলুব্ধ হবেন না, তা কি সম্ভব? তাছাড়া বাঙালী দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম চলতো না, পরস্পর দল-ভাঙাভাঙিতে প্রায় প্রত্যেকেই সচেষ্ট ছিলেন—ফলে এঁর খেলোয়াড় ওঁর কাছে যাওয়া প্রায়ই ঘটতো। আজ এ-দল, কাল সে-দল, এ সবের কিছু কিছু নমুনা এবং দলের ভিতর থেকে এসে উপদল গঠন প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি।

মহারাষ্ট্রে বুদগাঁওয়ের মহারাজা এ সব লক্ষ্য করছিলেন। বিভিন্ন সার্কাস্-পার্টি যখনই মহারাষ্ট্রে যেত, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে

আপনা থেকেই সহজ ভাবে মিশে সহযোগিতা করতেন। পরিশেষে প্রিয়নাথ বোস মশাই যখন তাঁর বিখ্যাত 'বোসেস সার্কাস' নিয়ে মহারাষ্ট্রে গেলেন, তখন মহারাজ যেন বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বিশস্ত অনুচর বিষ্ণুপন ছত্রীকে ডাকিয়ে, অবিলম্বে সার্কাস-পার্টি গঠনের কথা জানিয়ে বললেন—"পরিশ্রম তোমার এবং টাকা যা লাগে আমার—আমিই দেব। মালাবার উপকূল থেকে মাউলী (অপভ্রংশে মাপলা) সৈন্য নিয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ শিবাজী বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন—আনো সেই সব মাউলীদের। তাদের পেশা হলো শরীরচর্চ্চা, কুস্তীলড়া ইত্যাদি, তারাই অনায়াসে পারবে, এই সব ট্রাপিজের খেলা, বারের খেলায় অচিরেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে—তারাই দোলনায় শরীর ঘুরিয়ে খেলা দেখিয়ে দর্শকের মাথা ঘুরিয়ে দেবে।"

মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিষ্ণুপন ছত্রীর নেতৃত্বে তৈরী হল বিখ্যাত "ছত্রী-সার্কাস" এবং অল্প দিনেই অনেক বাঙালী খেলোয়াড় বিভিন্ন দল থেকে এসে ঐ "ছত্রী সার্কাসে" যোগ দিল এবং ভারতের ভিতর সুবৃহৎ এবং সুবিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর সার্কাসরূপে অচিরেই পরিচিতি লাভ করলো।

পরবর্ত্তী যুগে মহারাষ্ট্র দেশের "দেবল সার্কাস", "সেলার্স্ সার্কাস," "কার্লেকার সার্কাস" প্রভৃতি সকলেই ঐ মালাবার উপকূলের মাউলীদের সুশিক্ষিত করে নিয়ে, খেলা দেখিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠলো এবং আজও ভারতের বিভিন্ন সার্কাস-পার্টির তারাই স্তম্ভস্বরূপ।

কিন্তু ভারতীয় এই সমস্ত সার্কাস-পার্টির আজ এই সমস্ত কথা কেন বলছি? দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এই সার্কাস-পার্টিগুলি কি পরাধীন যুগে, কি স্বাধীনোত্তর যুগে শাসকগোষ্ঠীর কৃপা কোনও দিনও পাননি। যেখানেই এঁরা যান না কেন, শাসকগোষ্ঠী এঁদের যেন অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন। মনে করেন না কি,…"খামকা কতকগুলো টাকা লোক ঠকিয়ে নিয়ে যাবে?"…অথচ সেই শাসকগোষ্ঠীরই নিত্য-নূতন সিনেমা-গৃহের এবং সিনেমা কোম্পানীর লাইসেন্স মঞ্জুর করতে কোথাও বেধেছে বলে কানে আসেনি। অবশ্য এই সিনেমা ব্যবসায়ে, বিশেষ কয়েক জন প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গের কথা বাদ দিয়ে, বাকী অনেকেই ত' যাঁকে ব'লে মুখ-ভেংচী করেই টাকাগুলো নেন্। খুব নিরপেক্ষ ভাবে বলতে গেলে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য কোথায়? লেখক বই লিখে দেন, প্রযোজক খুঁটি-নাটি প্রভৃতি সমস্ত কিছুর নির্দ্দেশ দেন—এঁদের স্বাতন্ত্র্য এই সব কারণে কি-ই বা এমন থাকে? আর সার্কাস-পার্টির খেলোয়াড়দের? মুখবন্ধেই বলেছি, তাঁদের অবস্থা প্রতি পদক্ষেপেই বিপজ্জনক। চায়ের দোকানে যে ছেলেটি আজ হয়ত এঁটো কাপ ধুয়ে, কোনো ক্রমে তার বিড়ম্বিত জীবন যাপন করছে, কালে সেই ছেলেটি, উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে ট্রাপিজে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে পৃথিবী-পূজিত হতে পারে।

আজ নাচ-গান অভিনয় কলা প্রভৃতি শেখাবার জন্য রাষ্ট্রকে চাপ দিয়ে শিক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতি সরকারী সাহায্যে নির্ম্মাণের চেষ্টা চলছে, কিন্তু তৈরী সার্কাস-পার্টিগুলি অবহেলিত বললেই সব বলা হয় না, তারা পদে পদে বাধা পেয়েই আসছে।

বর্ত্তমান নিয়মে, এই পার্টিগুলিকে প্রত্যেক স্থানেই খেলা দেখাবার পূর্ব্বে, মহকুমা বা জেলা-শাসকের নিকট লাইসেন্স নিতে হয় এবং তিনি তা দেন পুলিশের বিবরণী অনুযায়ী। ৭ মাইল দূরে, ৭ দিন পরে তাঁদের তাঁবু বদলাবে—আবার সেই পুলিশের দোরে ধর্ণা, আবার সেই জেলা বা মহকুমা-শাসকের কেরাণী বাবুর কাছে যেয়ে সেই "হুজুর", "হুজুর।" এর কি প্রতিবিধান হয় না?

আমরা বলবো, প্রদেশ অনুযায়ী বাৎসরিক লাইসেন্স মঞ্জুর করা হোক। তবে যেখানেই তাঁরা যাবেন, এবং যে ক'দিন থাকবেন, সে সংবাদটা সেই অঞ্চলের জেলা বা মহকুমা-শাসক মশাইকে জানিয়ে দেবেন এবং তিনি পুলিশের মাধ্যমে ঐ পার্টির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সুযোগ মত আরও আলোচনা করবার ইচ্ছা থাকলো।

চায়ের পেয়ালা

(চীনা কবি লো-তুং)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভিজায়,
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে;
তৃতীয় পেয়ালা মশগুল্ করে
মজলিশ ক্রমে জমিয়া আসে।
চৌঠা ঘুচায় কৌটার ঢাকা,—
মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!
পঞ্চমে জাগে মৃদু স্বেদ-লেখা,—
শুদ্ধির শত পন্থা খোলে।

ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—
মর্ত্ত্য-মানবে অমর করে!
সপ্তম;—আর চলে না আমার
চলেনাক' আর ছয়ের পরে।
এখন কেবল হয় অনুভব
আস্তিনে হাওয়া পশিছে এসে!
স্বর্গপুর—সে কত দূর? আমি
এ হাওয়ায় চড়ি' যাব সে দেশে!"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো তেতাল্লিশ

'নরেন কি নিষ্ঠুর!' আক্ষেপ করছেন ঠাকুর। 'আমার এই অসুখ আর এই সময়ে আমাকে ও ছেড়ে গেল! কানাই ঘোষালের ছেলে, যাকে এখানে সে আশ্রয় দিল, সেই তারক ওকে নিয়ে গেল ভুলিয়ে। আর কালীকেও সঙ্গে নিলে!'

বালককে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমনি করে বললে এক জন! 'কোথায় আর যাবে! এই এসে পড়বে একদিন ছুট করে।'

'সত্যিই তো যাবে কোথায়!' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হল: 'তার আর আছে কোন আস্তানা? ওলতলা বেলতলা, সেই আসতে হবে ফের বুড়ির কাছে। আমার কাজের জন্যে মহামায়া যখন তাকে এনেছে তখন আমার পেছনেই তাকে ঘুরতে হবে। যাবে কোথায়!'

কিন্তু সত্যি কি আর নরেন ফিরবে? সে চলে এসেছে বুদ্ধগয়া।

নির্বেদ এসেছে নরেনের মনে। সমস্ত মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে নির্বাণ-নগরীর দিকে! কঠোর তপস্যায় যদি ঈশ্বর দর্শন হল তো হল নইলে আসনে বসেই দেহপাত করে যাব। ঠাকুরের স্নেহ ও বন্ধন, সেই বন্ধনও ছিন্ন করতে হবে।

'হে ভবতৃষ্ণা, বহু জন্ম ধরে আমার এই দেহগৃহ নির্মাণ করে আসছ, এইবার সেই দেহ ভেঙে দিলাম। আর পারবে না বাসা বাঁধতে।' উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব।

নির্বাণ-নগরের দ্বাররোধ করে দাঁড়িয়ে আছে 'তন্‌হা', তৃষ্ণা— তোমার কামনা বাসনা। তারাই কর্মের সৃষ্টি করছে আর সেই কর্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়ে তৈরি করছে মাকড়সার জাল। তারই নাম 'মার'। এই 'মার'কে পরাভূত করতে হবে, ছিন্ন করতে হবে ঊর্ণতন্তু। সেই বাসনার বোঝা ফেলে দিতে পারলেই হাল্কা হবে তোমার দেহ-নৌকা। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে সেই নির্বাণ-বন্দরে।

ও তো হল নিজের মুক্তির কথা। নিজে সরে পড়া। তা হলে চলবে না, পরের কথাও ভাবতে হবে, অন্যকেও পৌঁছে দিতে হবে সেই আনন্দলোকে। প্রেমে ও প্রসাদে করুণায় ও মৈত্রীতে তোমার শূন্যতাকে ভরে তোলো। প্রেমপ্রবাহে প্রসারিত হয়ে পরিপ্লুত করো সবাইকে।

মৈত্রী করুণা মুদিতা আর উপেক্ষা।

'সুখং বসন্তি মিত্রাণি বিবর্ধন্তু সুখঞ্চ বঃ।' হে মিত্রগণ, তোমরা সুখে থাকো ও তোমাদের সুখ বর্ধিত হোক। এই হচ্ছে মৈত্রী। আর শত্রুর দুঃখে হৃষ্ট না হয়ে বলো, তোমার সর্বদুঃখের বিমোচন হোক। এই হচ্ছে করুণা। আর মুদিতা কি? আমাদের মতের বা পথের যারা বিরোধী তাদের অভ্যুদয়ে আমাদের আর ক্লেশ নেই, তাদের পুণ্যাংশ চিন্তা করে মনে আনো এবার প্রসন্নতা। আর উপেক্ষা কা'কে বলে? কে পাপকারী? কার প্রতি তোমার এত অবজ্ঞা, এত ক্রূরতা? কার তুমি বিচার করবে? বলো, আমি নিজেই পাপকারী, নিজেই বিচারপ্রার্থী, তোমাকে আর আমি কি বলতে পারি? এই মনোভাবের নামই উপেক্ষা। এই সব ভাবনা করে চিত্তের শোধন-সাধন করো।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কুশীনারায় দেহ রাখছেন তথাগত, ম্লান মুখে শিষ্যরা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। আনন্দকে ডেকে নিলেন কাছটিতে, বললেন, 'আনন্দ, আত্মদীপ হও। জ্ঞানালোকের জন্যে বাইরে কোথাও অনুসন্ধান কোরো না। তোমরা নিজেরাই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র উৎস। একমাত্র প্রদীপ। সত্য যদি কোথাও থাকে তা তোমাদের নিজেদের মধ্যে।'

অহংকে আত্মাতে দান করো। তা হলেই দুঃখের অপসরণ হবে। কার দুঃখ, কার সুখ? তোমার নিজের সুখ ঘটিয়েই বা তোমার শান্তি কোথায়? অন্যের সুখেই যে তোমার সুখের নিশ্চিন্ততা। সুতরাং এক সুখ এক দুঃখ। তোমার আমার সুখ নয়, নয় তোমার আমার দুঃখ। দুঃখ দুঃখ বলেই নিবারণীয় আমার তোমার বলে নয়। তেমনি সুখ সুখ বলেই প্রাপণীয়, আমার তোমার বলে নয়। এক অখণ্ড দুঃখ, এক অভিন্ন সুখ। নিজ-নিজ খণ্ড-খণ্ড সুখ আহরণ করতে গিয়েই একে অন্যকে দুঃখ দিয়ে নিজ-নিজ দুঃখের বোঝা বাড়াচ্ছি। যেমন এক দেহ তেমনি এক পৃথিবী। অঙ্গের এক অংশের ব্যাধিতে সর্বদেহ নিপীড়িত, তেমনি এক অংশের আরোগ্যে সর্বদেহের নৈরুজ্য নেই। চাই সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্য। সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য। আমি স্ফীত আর তুমি বিশীর্ণ, তার অর্থ সমস্ত দেহই কদাকার, রোগক্লিষ্ট। কোথাও গণ্ডী নেই, পৃথক সত্তা নেই। তাই সকলের দুঃখমোচন সকলের সুখসাধন চাই। তা কিসে হবে? তার উপায় কি? একমাত্র উপায় মৈত্রী। আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর, ভালোবাসা।

'সুখের আকাঙ্ক্ষা বর্জন না করলে দুঃখ দূর হয় না।' বলছে বুদ্ধদেব। 'সংসারে যারা দুঃখ পায় সুখের ইচ্ছাতেই সে দুঃখ পায়। আর যারা সুখী হয় পরের সুখেচ্ছাতেই সুখী হয়। সুতরা 'আমি'কে দান করো। নিজের আর পরের উভয়ের দুঃখ দূ করবার জন্যে উৎসর্গ করো 'আমি'কে।'

নদীতীর দিয়ে যাচ্ছে আনন্দ, দেখল একটি মেয়ে কলসী জল ভরছে। কলসী কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি, আন

তার কাছে এসে বললে, 'আমি তৃষ্ণার্ত্ত, আমাকে একটু জল দেবে ?'

মেয়েটি তাকাল চোখ তুলে। আনন্দের অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিল।

জল খেয়ে চলে যাচ্ছে আনন্দ, মেয়েটি তার পিছু নিল। তোমার তৃষ্ণা দূর করলাম, এবার আমার তৃষ্ণা দূর করো।

ঘরে ফিরে এসে ধূলায় শুয়ে কাঁদতে লাগল মেয়ে। মা মাতঙ্গীকে বললে, 'আমি দেখে এসেছি কোথায় তিনি থাকেন। তাঁর নাম আনন্দ। আমার যদি বিয়ে দিতে চাও তবে তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দাও। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

কে আনন্দ, সন্ধানে বেরুল মাতঙ্গী। আনন্দ ? তাকে চেন না ? সে যে শ্রমণ। বুদ্ধশিষ্য।

'এ তোর কী অসম্ভব কথা ?' মা ফিরে এসে শাসন করল মেয়েকে। 'সে বুদ্ধের ভক্ত, সে কি করে বিয়ে করবে ?'

'মা, তুমি তো মন্ত্রতন্ত্র জানো। এবার সেই শক্তি প্রয়োগ করো।' মেয়ে মায়ের পা চেপে ধরল।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করল মেয়ে। মায়ের মন গলল। গৃহে ভিক্ষা নেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল আনন্দকে।

আসছে ? আসবে বলেছে ? মেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে।

আনন্দ এসে দাঁড়াল ভিক্ষাপাত্র হাতে। মাতঙ্গী বললে, 'আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করো।'

শান্ত স্বরে বললে আনন্দ, 'আমি শীল গ্রহণ করেছি, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি না।'

'তোমাকে পতিরূপে না পেলে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করবে।'

কোনো অনুনয় কানে তুলল না আনন্দ। ফিরে যাবার জন্যে যাত্রা করল।

'তোমার তন্ত্রমন্ত্র কোথায় গেল ?' মায়ের উদ্দেশে গর্জে উঠল মেয়ে। 'কোথায় তোমার ইন্দ্রজাল ?'

'এমন মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নেই যা বুদ্ধ বা বুদ্ধের শিষ্যদের অভিভূত করতে পারে।' অসহায়ের মত বললে মাতঙ্গী।

'তা হলে দ্বার বন্ধ করে দাও।' আকুলা কন্যা আবার রোদন করে উঠল। 'আমার কাছেই রয়েছে সে ইন্দ্রজাল। রাত্রি সমাগত হলে স্বভাবতই উনি আমার পতি হবেন।'

মাতঙ্গী দ্বার বন্ধ করে দিল। মন্ত্র দিয়ে বদ্ধ করলে আনন্দকে। মেয়ের জন্যে শয্যারচনা করলে।

আনন্দ অক্ষুণ্ণ উদাসীন। সর্বজ্বরবিবর্জিত।

মন্ত্রবলে আগুন আকর্ষণ করল মাতঙ্গী। আনন্দকে টানতে টানতে নিয়ে এল অগ্নিকুণ্ডের কাছে। বললে, 'যদি আমার মেয়েকে এ দণ্ডে বিয়ে না করো তবে তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।'

কি আশ্চর্য, মন্ত্রের মায়া কাটাতে পাচ্ছি না এখনো ? একমনে বুদ্ধদেবকে ডাকতে লাগল আনন্দ। আগুন নিবে গেল। খুলে গেল রুদ্ধ দ্বার।

গৃহগণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলো আনন্দ।

'মা, ও যে চলে যায় !' মেয়ে আবার কেঁদে উঠল অনাথের মত।

মা বললে, 'আমি আগেই বলেছি আমার মন্ত্রের এমন ক্ষমতা নেই

তবু আনন্দচিন্তা ত্যাগ করতে পারল না মেয়ে। পরদিন সকালে উঠে আবার চলল আনন্দের সন্ধানে। আনন্দ ভিক্ষায় বেরিয়েছে, পিছু পিছু চলল তার ছায়া হয়ে। বিহারে এসে ঢুকল, মেয়ে তবু কাঁদতে লাগল দ্বারের বাইরে।

বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'তুমি কি চাও ? কেন আনন্দের পিছু নিয়েছ ?'

স্পষ্ট দুঃসাহসে বললে তরুণী : "আনন্দকে পতিরূপে বরণ করতে চাই।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তাকিয়ে দেখেছ আনন্দের দিকে ?'

'দেখেছি।'

'তার মাথায় চুল নেই দেখেছ ?'

'দেখেছি।'

'কিন্তু তোমার মাথা-ভরা চুল। তুমি আনন্দের মত মাথা মুণ্ডন করতে পারবে ? নির্মূল করতে পারবে কেশভার ? যদি পারো তোমার হাতে দিয়ে দেব আনন্দকে।'

'পারব।'

'তবে যাও, মাথা মুণ্ডন করে এস।'

মেয়ে ফিরে গেল মায়ের কাছে। বললে, 'তোমার মন্ত্রতন্ত্র যা পারেনি তা অনায়াসেই সফল হতে চলেছে। বুদ্ধ বলেছেন ক্ষুর দিয়ে মাথা মুড়িয়ে নিলেই পাব সেই পরমরম্যকে।'

মাতঙ্গী ক্রুদ্ধ হল। বললে, 'আহা, কি রূপের ছিরি হবে তখন ! বলি, দেশে কত ধনী-গুণী লোক আছে, তাদের কাউকে মনোনীত কর। শ্রমণ ছাড়া কি আর মোহন-মনোরম নেই ?'

'মরি আর বাঁচি, আমি আনন্দের।'

অভিশাপ দিল মাতঙ্গী। তবু মেয়ে নিরস্ত হয় না। তখন কি আর করে, কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের মাথা কামিয়ে দিল ক্ষুর দিয়ে।

মুণ্ডিত মাথায় বুদ্ধ সমীপে দাঁড়াল এসে মেয়ে। বললে, 'আমি এসেছি। এবার দিন আমার আনন্দকে।'

'তুমি আনন্দকে ভালোবাসো ?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব।

'বাসি।'

'দেহের কোন অংশ ভালোবাসো ?'

'চোখ কান নাক মুখ, চলন বলন, সমস্ত—'

'চোখে কানে মুখে নাকে দেহের প্রতি অংশেই ঘৃণিত মল। ক্লেদে-কলুষে মানুষের জন্ম, ক্লেদে-কলুষেই মানুষের মৃত্যু। কাকে তুমি ভালোবাসছ ? এই নশ্বর দেহকে ? যার অস্তিত্বেও দুঃখ অবসানেও দুঃখ ? সত্যি যদি আনন্দ চাও, এমন আনন্দের সন্ধান করো যার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই।'

দেহের অভ্যন্তরের কঙ্কালদর্শন হল তখন সেই তরুণীর। সেই তো সত্যদর্শন। স্বরূপদর্শন। সেই দর্শনে দিব্যজ্ঞান হল। অর্হত্ব লাভ করল।

বুদ্ধদেব বললেন, 'এবার চলে যাও আনন্দের ঘরে।'

শ্রমণা তখন পড়ল প্রভুর পাদমূলে। বললে, 'ভগ্নতরী কেলে এবার তীরে এসে উঠেছি। অন্ধের যষ্টিলাভ হয়েছে। আর আমার কোন বাসনা নেই।'

আমি শান্ত হয়েছি, অভাবনামুক্ত হয়েছি, অপ্রমাদচিত্ত হয়েছি।

'আমি দীপাকাঙ্খীর দীপ, শয্যাকাঙ্খীর শয্যা, আরোগ্যাকাঙ্খীর মহৌষধ। যতক্ষণ না ব্যাধির বিচ্ছেদ হচ্ছে ততক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে চলবে আমার পরিচর্য্যা। যত দিন আকাশ থাকবে যত দিন জগৎ থাকবে তত দিন জগতের সর্বদুঃখ অপনয়ন করতে আমিও থাকব।

বৈশালী থেকে রাজগৃহে ফিরছেন বুদ্ধদেব। দেখলেন নগরের উপকণ্ঠে এক ব্রাহ্মণ চাষী তার গৃহে খুব উৎসবে মেতেছে। চলছে নৃত্য, চলছে গান ভোজন। কি ব্যাপার? নতুন ফসল উঠেছে ঘরে, ভবনাঙ্গন ভর-ভর, তাই এই উৎসব। ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন এসে দুয়ারে। বললেন, 'ভিক্ষা দাও।'

'এখানে কিছু হবে না।' ব্রাহ্মণ, নাম ভরদ্বাজ, তিরস্কার করে উঠলো। 'কত কষ্টে জমি চষে ঠিকমত সময়ে বীজ বুনে দেহপাত পরিশ্রম করে শস্য ফলাই, আর তুমি বিনাশ্রমের ভিখিরি, দিব্যি হাত পেতে আমাদের উপভোগে ভাগ বসাতে চাও! লজ্জা করে না! আমার কথা শোনো। ঘরে ফিরে যাও। চাষ করো জমি। বীজ বোনো। পরিশ্রমের ফসল ফলাও।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'বন্ধু, আমিও জমি চাষ করি বৈ কি। আমিও বীজ বুনি। মানবজীবনই আমার ভূমি। বীর্য বৃষ, বিনয় হল, প্রজ্ঞা ফাল। সংকর্মের বৃষ্টিতে ভূমি উর্বর হয়, তারপর সম্যক দৃষ্টির বীজ বুনি। বর্ষণে বর্ষণে যে জঞ্জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার নাম তৃষ্ণা। তার পরে ভূমি ফল দেয়। আর সেই ফলের নাম নির্বাণ।'

'অমন কথা সব ভিক্ষুই বলে থাকে।' প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করল ভরদ্বাজ। 'দেখাতে পারো?'

'পারি। এস আমার সঙ্গে।'

নগরের প্রমোদ-উদ্যানে পৌরনাগরদের ভিড় হয়েছে। কি ব্যাপার? নগরের প্রধানা নর্তকী কুবলয় নাচছে রঙ্গমঞ্চে। সেইখানে ভরদ্বাজকে নিয়ে হাজির হলেন বুদ্ধদেব।

স্পর্ধিনী রূপসী নাচছে লাস্যের তরঙ্গ তুলে। কামার্ত চোখে নগরবিলাসীর দল পান করছে রূপসুধা। অনন্ত রূপের আধার প্রভু তথাগত যে পাশে দাঁড়িয়ে সে দিকে কারু চোখ নেই।

নাচতে নাচতে হঠাৎ জনতাকে লক্ষ্য করে কুবলয় বলে উঠল, 'আমার মত সুন্দরী আর দেখেছ কাউকে সংসারে?'

লালসাবিলোল চোখে হতবাক জনতা নিস্পন্দ হয়ে রইল।

'আমি দেখেছি।' জনতার মধ্য থেকে বলে উঠলেন বুদ্ধদেব। 'আর সে তোমার থেকে শত সহস্রগুণ বেশি সুন্দরী।'

'কোথায়? কোথায়?' মিলিত স্বরে জনতা হুঙ্কার করে উঠল। 'দেখাও সেই সুন্দরীকে।'

'দেখাচ্ছি।'

কোথেকে দেখাবে? কুটিলকটাক্ষ হেনে আবার নাচতে লাগল কুবলয়। লাবণ্যের সরোবরে ফুটতে লাগল আবার লাস্যের শতদল।

বুদ্ধদেব তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। এ কি! এ কি অঘটন!

ক্রমে-ক্রমে মাথার চুলে পাক ধরল নটিনীর। কুন্দদন্ত খসে পড়ল একে-একে। দুই গালে গহ্বর হয়ে গেল। দুই চোখ প্রবেশ করল কোটরে। ধীরে-ধীরে মৃত পত্রের মত খসে পড়ল রূপ-লাবণ্য। বয়োজ কঙ্কালে পরিণত হল। বিবসনা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গমঞ্চে। ভয় পেয়ে কেউ চোখ বুজল, কেউ বা ঘৃণায় পালিয়ে গেল সভা ছেড়ে।

প্রভু বললেন, 'কুবলয়, এবার দর্পণে নিজেকে দেখ। দেখ কত সহস্র গুণ সুন্দরী হয়ে উঠেছ। মায়াবসন ছেড়ে ধরেছ এবার তোমার নিত্য সৌন্দর্যের আকৃতি।'

বসন কুড়িয়ে নিয়ে কুবলয় প্রভুর পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'চিনতে পেরেছি তোমাকে। তোমার করুণা অন্তহীন। তুমি নির্বাচিত করেছ আমাকে। তোমার চরণতলে ডেকে নিয়েছ নিজের থেকে। প্রভু, আর আমাকে বিচ্যুত কোরো না।'

'আমিও চিনেছি তোমাকে।' ভরদ্বাজও ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। 'তুমি কোন কৃষির কৃষক? কি তোমার হল-বৃষ? কি তোমার বৃষ্টিধারা? আমাকেও ডেকে নাও তোমার চাষের কাজে। আমাকেও কৃষাণ করো।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র সব খুব বড়-বড় দেখি। সব যেন রাক্ষসীর মত। আগে ভারি ভয় ছিল। কাকুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে মা আনন্দময়ীর এক-একটি রূপ বলে দেখি।' আবার বলছেন, 'দেখ ছাদে একবার উঠতে পারলে হয়। ওঠবার পর ছাদে নাচাও যায় কি বলো, যায় না? কিন্তু সিঁড়িতে নাচো, তোমার সাধ্য কি সাধকের অবস্থায়ই খুব সাবধান। তখন মেয়েমানুষ থেকে অন্তরে থাকো। একবার সিদ্ধ হয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। তখ মেয়েমানুষ মাত্রই সাক্ষাৎ ভগবতী।'

বলরাম বোসের বাড়ির একতলায় তখন একটা বালিকা বিদ্যাল বসে। শৌচান্তে ঠাকুরের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে বাবুরাম, ইস্কুলে একটা মেয়ে আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছ ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গে সমুখ দিয়ে। বাবুরামকে বললেন ঠাকুর, 'দেখে রাখ্। পুরুষকে ঐ রকম করে বেঁধে বন বন করে ঘোরায় মেয়েরা। তুইও কি ওদে হাতে পড়ে ঐ রকম করে ঘুরতে চাস?'

স্বগতোক্তি করছেন ঠাকুর। 'আমি এক জায়গায় যেতে চে ছিলাম। রামলালের খুড়িকে জিগগেস করাতে বারণ করলে, আ যাওয়া হল না। খানিক পরে ভাবলুম, আমি সংসার করিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারে কাছে কি রকম বশ!'

'সেই পাঁড়ে জমাদার খোট্টা জমাদারকে চেন? তার চে বছরের বউ! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে-খুলে লো দেখে। তাকে আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে জমাদারের।'

তিন বন্ধু, নরেন কালী আর তারক, গয়ায় নেমে মাইল পথ হেঁটে সোজা চলে এল বোধগয়ায়। এই সেই বোধি এই সেই শিলাসন। এখানে বসেই জগৎ সংসারের নিবারণের তপস্যা করেছিলেন বুদ্ধদেব। মানুষের মুক্তি কিসে, প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। দুঃখ নিবারণের উপায় তৃ উন্মূলনে। আর মানুষের মুক্তির উপায় আত্মার উন্মীলনে।

একদিন সন্ধ্যার নির্জনে সেই শিলাসনে বসে ধ্যানস্থ

নরেন। কতক্ষণ পর পাশে বসা তারকের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

'সে কি, কাঁদছ কেন?'

'ভাই, বুদ্ধদেবকে দেখলাম। সেই করুণাঘন ক্ষমাসুন্দর প্রশান্ত মূর্তি।'

মন্দিরের মোহান্তের আশ্রয়ে তিন দিন ছিল কোনো রকমে। তিন দিনের পরেই পিছুটান। আবার ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। সেই সরল সুন্দর প্রেমস্মিত স্নিগ্ধ হিরণ্ময় পুরুষ। তাঁকে ছাড়া সব যেন নিরুদক মরুভূমি। চল চল ফিরে চল নিজের ঘরে। কিন্তু বাহির ঘুরে এলেই তো নিজের ঘরের মর্যাদা।

ঠাকুরের সেই কথা। 'কোথায় আর যাবে? আকাশ একটু দেখুক উড়ে-উড়ে। শেষকালে বসবে ঠিক এই বৃক্ষশাখে। তার নিজের জায়গায়।'

নরেন ফিরে এসেছে। ঠাকুর শুনে মহা খুশি। কোথায় আর যাবে! এখানে ও যেমনটি দেখেছে তেমনটি আর দেখবে না কোথাও। এখানে এমন একটা কিছু ওর চোখে পড়েছে যা আর কোথাও স্পষ্ট নয়।

আমার প্রভুর পায়ের তলে কি শুধু মাণিক জ্বলতেই দেখেছ? শত শত মাটির ঢেলাও সেখানে স্থান পেয়ে কাঁদছে লুটিয়ে লুটিয়ে। আমার গুরুর আসনের কাছটিতে যে ক'টি চেলা জমেছে সবাই কি সুবোধ? অবোধও ক'টি আছে আশে-পাশে। সেই অবোধজনকেও কোল দিয়েছেন বলেই তো আমি তাঁর চেলা হতে পেরেছি।

গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তার পথ অনেক। সাগরের দিকে সব নদীই যায় কিন্তু সবাই এক পথে এক নদী হয়ে যায় না। ঠাকুর সব পথে গিয়েছেন। যত মত তত পথ। [ক্রমশঃ।

মহাচীন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চিরদিন তুমি মহাভারতের প্রতিবেশী সুমহান,
সৌম্য সুহৃদ, শিষ্য শ্রদ্ধাবান।
তব মনে জাগে যাহার পুণ্যস্মৃতি—
মোরা সে ভারতই আহ্বান করি নিতি,
শত রাজসূয় বিশ্বজিতের যজ্ঞে বহ্নিমান।

সে সমৃদ্ধি ত্যাগ ও মৈত্রী ফিরে পেতে চাই মোরা,
তপঃশৌর্য্য নাহিক যাহার জোড়া।
কাহারও সঙ্গে নাহিক বিসম্বাদ,
সবাকারে শুধু আপনার করা সাধ,
অনন্ত যেথা মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীর দান।

তুমি প্রশান্ত মহাসাগরের সদা প্রশান্ত দেশ,
নাহি জিঘাংসা নাহি তব বিদ্বেষ।
যুদ্ধ আসিয়া হানা দেয় বারে বারে,
তুমি প্রাণপণে প্রতিহত কর তারে,
মার্কণ্ডেয় সম লভ তুমি, আবার নূতন প্রাণ।

প্রাচীন প্রাচীর প্রাচীর বিশাল হে চীন তোমারে চিনি,
উভয়ে আমরা উভয়ের কাছে ঋণী।
জগজ্জ্যোতির জ্যোতির অংশীদার,
উদার হৃদয়, পূজারী অহিংসার,
চেয়েছ শান্তি, চেয়েছ মুক্তি জগতের কল্যাণ।

নগরে ভূধরে নদীর বক্ষে বাস কর রচি' নীড়,
সবল সরল দুলাল প্রকৃতির।
কয়টি আখরে ভাবকে ফুটাও কবি,
তোমার তুলির আঁচড়েই যে হয় ছবি,
করে তব ধ্যান-নেত্র সদাই অমৃতের সন্ধান।

মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ, বারুদ, চীনামাটি, চীনাবাটি—
দিয়াছ চা, চিনি, রঙিন শীতলপাটি।
তুমি আমাদিকে দিয়াছ অনেক কিছু,
জবা চেরী চারু চন্দ্রমল্লী লিচু,
চীনাংশুক যে করেন মোদের দেবতারা পরিধান।

তোমারে দেখেছি দানযজ্ঞেতে নিরঞ্জনার তীরে,
পাটলিপুত্রে রাজন্তদের ভিড়ে।
তক্ষশিলা ও নালন্দা সারনাথে,
হে বিদ্যার্থী—দেখিয়াছি পুঁথি-হাতে,
কপিলবাস্তু লুম্বিনী সাঁচী তব তীর্থস্থান।

তোমরা গড়েছ আমাদের সাথে ভারতের ইতিহাস,
এখনো প্রসাদী কমলের পাই বাস।
আবার পাঠাও করি মোরা আহ্বান,
হোয়েন্-সাঙ, নূতন ফা-হিয়ান
তাদের পুরানো গতিপথে আজও সেই অজানার টান।
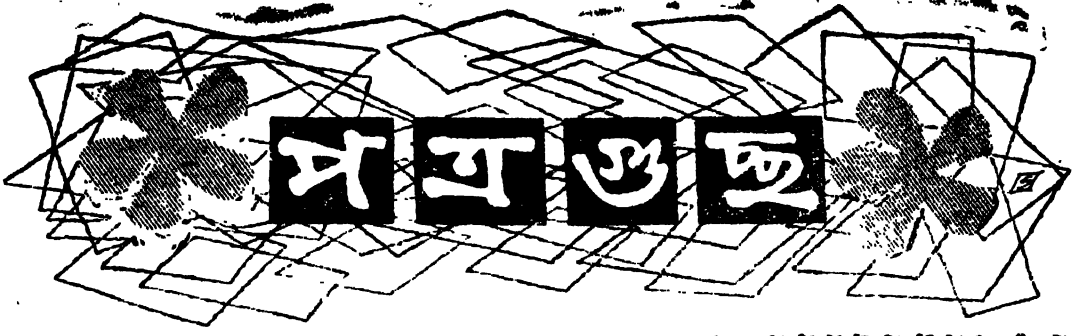
চন্দননগর তথা বাংলার প্রবীণতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতন দিনের কথা-সম্বলিত পত্র। *

শ্রীহরিহর শেঠকে লিখিত

[শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চন্দননগরে অবস্থিতি সম্বন্ধে জানিতে চাওয়ায় সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু জানাইয়াছিলেন। অদ্য এই পত্রখানি পাই। তাঁহার বার্দ্ধক্য হেতু বিস্মৃতি বশতঃ হয়ত সামান্য কিছু কিছু ভুল থাকিলেও, যেমন স্বর্গীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নীর নাম অবলা বসুর পরিবর্ত্তে ঊর্মিলা এবং বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "জাহ্নবী-নিবাস" বাটীতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি মাত্র এক দিন এক রাত্রি ও এক বেলা ছিলেন—যোগেন্দ্র বাবুর পর আর এসব কথা শুনাইবার কেহ না থাকায়, আমি এই পত্রখানি মূল্যবান বিবেচনা করিয়া মাসিক বসুমতীতে প্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীহরিহর শেঠ, ৫ই অক্টোবর, ১৯৫৫]

৫৯নং বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯
মঙ্গলবার ৩রা আশ্বিন, ৬২

প্রিয় হরিহর বাবু,

আমার আশীর্ব্বাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানিবেন। আপনি অসুস্থ হইয়াছেন জানিয়া চিন্তিত হইলাম। ঈশ্বরের নিকট আপনার আরোগ্য কামনা করি। বর্ষার অবসানে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হইবে বলিয়া আশা করি।

আপনি চন্দননগরের অতীত কালের কথা কিছু জানিতে চাহেন। আমি যাহা জানি, তাহা আপনাকে জানাইতেছি।

রাধানাথ সিকদার

ইনি সেকালের হিন্দু কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেব বাবু, মাইকেল মধুসূদন, রাজনারায়ণ প্রভৃতি হিন্দু কলেজে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। পরে ইনি ভারত সরকারের জরীপ বিভাগের অধিকর্ত্তা ক্যাপ্টেন এভারেষ্টের অধীনে কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "গৌরীশঙ্করের" উচ্চতা পরিমাপ করেন। ঐ উচ্চতা ২৯০০২ ফিট, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ চূড়া। ইনি তাঁহা[র] উপরওয়ালার নামে ইংরাজীতে "Mount Everest" নামকর[ণ] করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কিছু কাল চন্দননগ[রে] বাস করিয়াছিলেন। কুঠীর মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বাড়ী দয়াল ডাক্তার কিনিয়াছিলেন, সিকদার মহাশয় সেই বাড়ীতে বা[স] করিতেন। তিনি ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারে প্রিয় ছিলেন। আ[মি] আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, ভূদেব বাবু বাবাকে সঙ্গে লইয়া একদি[ন] রাধানাথ বাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন ছাত্রকে দেখি[য়া] বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কথায় কথায় ভূদেব বাবু তাঁহা[কে] বলিয়াছিলেন, "শুনিলাম আপনি বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে[ন]। বিলাত যাইলে সমাজ আপনাকে জাতে ঠেলিবে না কি?" উ[ত্তরে] রাধানাথ বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকে ঠেলে তো ফেলি[বার] জন্য। আমি তো কাত হইয়া আছি। আমাকে ঠেলিয়া আর [কি করিবে] কি?" তাঁহার কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যে বাটীতে রাধানাথ সিকদার থাকিতেন তাহার ঠিক প[শ্চিমে] লিচুবাগানের বাটীতে মহাকবি মাইকেল কিছু কাল বাস ক[রিয়া]ছিলেন। ইহা বোধ হয় আপনিও জানেন।

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি কলিকাতা বহুবাজারের হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের [...] লোকে তাঁহাকে বলিত হিদেরাম বাঁড়ুজ্জ্যে; তাঁহারই [নামে] কলিকাতায় হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন বিদ্যমান আছে। শুনি[য়াছি] নীলকমল বাবু দুর্দ্ধর্ষ মাতাল ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দুই জন ভূপেন ও নগেন বাল্যকালে আমাদের খেলার সঙ্গী [ছিল]। নীলকমল বাবুর পাঁচ ছয়টি পুত্র ছিল। সকলেই ভয়ানক মা[তাল ও] দুশ্চরিত্র ছিল। সে জন্য সকলেই অতি অল্প বয়সেই মারা [যায়]। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ষ্টেশন-রোডের চৌমাথার দক্ষিণ-পশ্চিম কো[ণে] দ্বিতল অট্টালিকা আছে অর্থাৎ মাইকেলের বাসার ঠিক [...] নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। চন্দননগর বড়বাজারে নী[লকমল] বাবুর আ'ও দুই-তিনখানা বাড়ী ছিল। শুনিয়াছি নীলকম[ল] কলিকাতার কোন সরকারী অফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন।

---

* বিখ্যাত মহাজনদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চন্দননগরে বাস করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসর গ্রহণের পর বেশ কিছু কাল চন্দননগরে অতিবাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত রচনার সঙ্গে চন্দননগরের গঙ্গাবক্ষ জড়িত আছে। অত্র প্রকাশিত পত্রের পত্রদাতা ও পত্রগ্রহীতাদের মধ্যে কেউ উক্ত বিষয় উল্লেখ না করায় আমরা উল্লেখ করছি।—স

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইনি কিছু দিন গঙ্গার ধারে আপনার "জাহ্নবী নিবাস" অট্টালিকায় বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং আমা অপেক্ষা আপনি তাঁহার বিষয় বেশী জানেন। আমি এবং আমার বন্ধু বিনোদ ভড় প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকট যাইতাম। রায় মহাশয় সর্ব্বদাই নগ্ন পদে চলাফেরা করিতেন। এমন কি ট্রামেও ভ্রমণের সময়ও নগ্ন পদে ভ্রমণ করিতেন। তিনি জুতা পায়ে দেন না কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "জুতা পায়ে দেওয়াটা স্বাস্থ্যহানিকর। জুতা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।"

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুর

৺বঙ্কিম বাবুর অগ্রজ ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান রাজপরিবারে প্রতাপচাঁদের জীবনী অবলম্বনে "জাল প্রতাপচাঁদ" নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুর জালিয়াত নহেন। তিনি সত্যই মহারাজা। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং উৎকোচের প্রভাবে তিনি ইংরাজের আদালতে জাল বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল। তিনি তখন গ্রেপ্তারের ভয়ে ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি যে বাটীতে ছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাহা নিত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরের দক্ষিণে চৌমাথার উপরে দ্বিতল বাটী। তিনি চন্দননগর হইতে চলিয়া যাইবার সময় কয়েকটি আসবাবপত্র ঐ বাটীর তৎকালীন স্বত্বাধিকারী ৺নীলকণ্ঠ সরকারকে দিয়া যান। তাঁহার প্রদত্ত একটি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কৌচ আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। এখনও উহা আছে কি না জানি না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি। সরকার মহাশয়দের যে বাড়ীর কথা বলিলাম, তাহা ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ফরাসী সরকারের হাসপাতাল ছিল। তাহার একটা প্রমাণ এই যে, উহার নিম্নতলের বা দ্বিতলের জানালা-দরজাগুলি নয় ফুট দীর্ঘ ও পাঁচ ফুট প্রস্থ। এইরূপ সুবৃহৎ জানালা-দরজা বাঙ্গালীর বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। উপর-নীচের কক্ষগুলিও খুব বড়। ঐ বাটীর পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী বাগানের মধ্যে আছে। বাগানের দক্ষিণ দিকের পাঁচীল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তা হইতে সেই পুকুরটি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ঐ ভবনে হাসপাতাল ছিল সে সময় আমার প্রপিতামহ নেড়োরবনের শিবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ফরাসী কুঠির দেওয়ান ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হইলে আমার প্রপিতামহের খুল্লতাত রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ফরাসী কুঠির দেওয়ান হন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার প্রপিতামহ শিবানন্দ দেওয়ান হন। তিনি দেওয়ান থাকা কালে ফরাসী সরকারের ব্যয়ে হাসপাতাল-ভবনের পশ্চিমে উল্লিখিত পুষ্করিণী খনন করান। তাঁহার আর একটি প্রাচীন কীর্ত্তি কুঠির ঘাট। প্রাচীন ফরাসী দুর্গ "দে অরলাঁ"র দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিজ ব্যয়ে গঙ্গায় ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ঘাটের ঠিক দক্ষিণে দুর্গের বাহিরে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল গঙ্গাগর্ভে বাস করিবার জন্য একটি সুন্দর বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করান। সে বাড়ী হউন, রাণী তারাসুন্দরী ঐ বাটীতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রাজবাটীর ঠিক দক্ষিণে দত্তর-ঘাট নামে যে ঘাট আছে, রাণী তারাসুন্দরী তাহার একটি সুন্দর চাঁদনী প্রস্তুত করাইয়া দেন সেই জন্য ঐ ঘাটকে অনেকে রাণীর-ঘাট বলে। চাঁদনীর উপরে কার্নিশের নীচে রাণী তারাসুন্দরীর নাম এবং চাঁদনী নির্ম্মাণের তারিখ লেখা আছে। কিন্তু ঐ ঘাটটি রাণীর নির্ম্মিত নহে।

এই প্রসঙ্গে দত্তর ঘাটের কথাও আমার পিতার মুখে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিতেছি, আমার পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স ১২১ বৎসর হইত। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চন্দননগরের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বাল্যকালে ৮০।৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর পান নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন যে, দত্ত উপাধিধারী কোন ধনবান ঐ স্থানে গঙ্গার তীরে ঘাট নির্ম্মাণের জন্য ভিত্তি খনন আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় ৩ হাত গভীর মাটির নীচে একটা পুরাতন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ বাহির হয়। তখন তিনি সেই স্থানের সমস্ত মাটি উঠাইয়া ফেলেন। মাটির নীচে খুব ছোট ছোট ইটের গাঁথুনি একটা বড় ঘাট ভগ্ন অবস্থায় বাহির হয়। ওই ঘাট গঙ্গার জল হইতে বেশী দূরে ছিল না। দত্ত মহাশয় তখন সেই পুরাতন ঘাট বজায় রাখিয়া তাহার নীচের দিকে আরও বাড়াইয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত লইয়া যান। দত্ত মহাশয়ের সময়ে প্রচলিত ১"ইঞ্চি ইটেই ঘাট নির্ম্মাণ করেন। পুরাতন ঘাট যেরূপ ছোট ইটের গাঁথুনি, সেরূপ ছোট ইট তাঁহার সময় ব্যবহৃত হইত না। এই তো গেল দ্বিতীয় স্তরের কথা। তার পর বাল্যকালে আমি যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতাম, তখন গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটী ওই ঘাটকে আরও বাড়াইয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এই নবনির্ম্মিত অংশটা এখনকার প্রচলিত দশ ইঞ্চি ইটে গাঁথা। সুতরাং দত্তর-ঘাটে তিন যুগের তিন প্রকার ইটের গাঁথুনি দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ যুগের অংশটা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। বর্ষার জলস্রোতে ভিতরের মাটি বাহির হইয়া যাওয়াতে ঘাটটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। মধ্যস্তর নির্মাতা দত্ত মহাশয় কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক কি তন্তুবায় ছিলেন, তাহা সে কালের অতিবৃদ্ধেরাও বলিতে পারেন নাই।

জগদীশচন্দ্র বসু

বাল্যকালে যখন আমরা কলিজিয়েট-স্কুলে পড়িতাম, তখন আমরা প্রায় দেখিতাম, কোট-প্যাণ্ট পরিহিত গৌরবর্ণ এক সুশ্রী যুবক সপত্নীক একটা ভাউলের ছাদে বসিয়া বিচরণ করিতেন। ভাউলের নাম লিখা ছিল,—"ঊর্মিলা"। পরে আমরা শুনিয়াছিলাম যে সেই যুবক ইংলণ্ড হইতে সদ্যপ্রত্যাগত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু। ভাউলেটি তাঁহার নিজের। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের জড়-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁহার পত্নীর নাম ঊর্মিলা। তিনি পত্নীর নামেই তরণীর নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ হাটখোলা অথবা গোঁদলপাড়া গঙ্গার ধারে কোন বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়কার একটা ঘটনা আমার মনে আছে। এক দিন তাঁহাদের জলভ্রমণ কালে একটা ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া

বা দাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে জলে লাফাইয়া পড়িয়া বসুপত্নীকে উদ্ধার করে। সেজন্য বসু মহাশয় মাঝিকে ১০০৲ টাকা বক্‌সিস্ দিয়াছিলেন। হাটখোলা ও গোঁদলপাড়া ব্যতীত চন্দননগরের অন্য পল্লী গঙ্গার ধারে অবস্থিত নহে। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় এই দুই পল্লীর যে কোন এক পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু দিনের জন্য চন্দননগরে থাকিয়া হাটখোলায় দয়ের ধার নামক পল্লীতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। হাটখোলার গঙ্গার ধারের যে অংশটায় ষ্ট্রাণ্ড এর মত অনেকটা রেলিং দেওয়া আছে, সেই রেলিং-এর পশ্চিম পার্শ্বে রাজপথ এবং পূর্বদিকে গঙ্গাঘাট। সেই স্থানে গঙ্গাতে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে। নিকটেই ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার মণ্ডপ আছে। ঐ দেবতার নাম অনুসারে ঘূর্ণাবর্ত্তের নাম হইয়াছে, 'ভুবনেশ্বরী দহ' এই দহ হইতেই পাড়ার নাম হইয়াছে, 'দহের ঘাট'। গঙ্গার ধারে যে রাস্তা ছিল, তাহার কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়াতে সে রাস্তায় আর এখন গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। দহের নিকটেই রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বের বাড়ীতে শাস্ত্রী মহাশয় সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। আমি অবসর পাইলেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। আমার পিতার সহিতও তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের বাড়ীতে ১।২ বার আসিয়াছিলেন। সেটা বোধ হয় ১৮৮৬।৮৭ খৃষ্টাব্দে হইবে।

মহেশচন্দ্র চৌধুরী

সেকালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার আমাদপুর গ্রামে,—মেমারী ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তিনি একবার অসুস্থ হওয়াতে চিকিৎসকের পরামর্শে গঙ্গাগর্ভে বাস করিবার জন্য ষ্ট্রাণ্ডের দক্ষিণে পাতাল বাড়ীতে আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং আরও পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাস করিয়াছিলেন। মহেশবাবু যখন চন্দননগরে ছিলেন, সে সময়ে এক অপরাহ্নে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, একটা জুড়িগাড়ীতে দুই জন ভদ্রলোক ষ্ট্রাণ্ড রোড ধরিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। তখন এদেশে মোটর গাড়ী আসে নাই। আমার নিকটে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন,—"যোগেন, তুমি ইঁহাদিগকে চেন?" আমি "চিনি না" বলাতে তিনি আমাকে বলিলেন—"হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহারা মহেশ বাবুকে দেখিতে আসিয়াছেন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

লালবিহারী দে মহাশয় দীর্ঘকাল হুগলী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া আমি যখন হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হই, তখনও দে সাহেব হুগলী কলেজেই ছিলেন। তাঁহার কাছে ৮।৯ মাস পড়িবার পর তিনি পেন্‌সান গ্রহণ করেন। দে সাহেব এক পারসিক-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দে সাহেব ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাঁহার পুত্রকন্যারা কেহই কৃষ্ণকায় হয়েন নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র হরমদী টেগোর দে আমার সহপাঠী ছিল। তিনি অনেক দিন চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। বড় আদালতের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে যে স্থানটা আজকাল আকন্দ জঙ্গলে পরিণত হইয়া আছে, সেইখানে গাড়ী বারান্দাওয়ালা একটি দ্বিতল বাড়ী ছিল। দে সাহেব সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি ধর্মে খৃষ্টান এবং চালচলনে সম্পূর্ণ সাহেব হইলেও কখনও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। সাদা প্যান্টলান, কালো চাপকান্ এবং মাথায় টারকিস্ ক্যাপের ন্যায় একটি উচ্চ টুপি ব্যবহার করিতেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

চন্দননগর আদালতের ঠিক দক্ষিণে যে বাড়ীটা আছে—তাহা প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তখন ঐ বাড়ীর দোতলা অংশটা ছিল না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়ার স্কলারসিপ নামক বৃত্তি লইয়া হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন এবং ভাগীরথীর ধারে ধারে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় চন্দননগরে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে দত্তর-ঘাটে যাইবার যে পথ আছে (যাহা এখন ভূদেব মুখোপাধ্যায় রোড) নামে অভিহিত। সেই পথের দক্ষিণে পুরাতন কলেক্টরীর ঠিক সম্মুখে যে একটি প্রাচীন ভবনের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে, উহাই ভূদেব বাবুর প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্মৃতিচিহ্ন। ভূদেব বাবু চন্দননগরে কখনও বাস করেন নাই। তিনি চুঁচড়া বাসা করিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে চন্দননগর যাতায়াত করিতেন।

চন্দননগর সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করিয়া যে সকল প্রবাদ আখ্যায়িকা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ছোট গল্প, সেকালের কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

(১) "তৈলবট"। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সম্বন্ধে লেখা (২) "কাশীনাথ প্রতিষ্ঠা" ইন্দ্রনারায়ণের পৌত্র কাশীনাথ চৌধুরী সমাজে উঠিবার কথা। (৩) "মাহু ঘোষের রথ"। (৪) "কি সেনের গড়"। (৫) "মজুমদারের গড়"। (৬) "কনে বৌয়ের মন্দির" (৭) "সরকার দীঘি"।

প্রভৃতি গল্পগুলি আপনি বোধ হয় মাসিক পত্রে পড়িয়াছে আমাদের পাড়ার সাহেব-পুকুর নামক পুষ্করিণীর কে খননকর্তা, ত আমি জানিতে পারি নাই। বাল্যকালে কোন কোন বৃদ্ধের মু শুনিয়াছি যে, ঐ পুষ্করিণীর নাম "মাণিক সাহের পুকুর"। লালবাগ "বিশালক্ষ্মী বেনেপুকুর" এবং কলু পুকুরের রাস্তার দক্ষিণে "চা বেনেপুকুর" নিশ্চয়ই কোন সুবর্ণ বণিকের দ্বারা খনিত হইয়াছি "বিশালক্ষ্মী বেনেপুকুরের" চারি দিকে যে বৃহৎ বাগান আছে, "বাবাজীর বাগান" নামে খ্যাত। আমি শুধু এইটুকু জানি পারিয়াছি যে, সরিষা পাড়ায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম f "বাবাজীর রথ" নামে যে রথ আছে, তাহা লালবাগানের আখড়ার রথ। আমার গবেষণার ফল এই পর্য্যন্ত। আপন প্রতিবেশী মহাভারত পাল এবং রূপনাথ দে মহাশয়দের সম্বন্ধে অপেক্ষা আপনিই বেশী জানেন। আজ এইখানেই ইতি।

ভবদীয় শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

এ কলকাতার কথা থাক ; এখন হোক সে কলকাতার কথা।

যে-কলকাতার মুখ কালো ছিল না এত ; হৃদয় ছিল না এত হৃদয়হীন ; বড়লোকী বস্তটা ছিল না যে-কলকাতায় এত দরিদ্র। সে-কলকাতায় আদর ছিল আতরের। বারো আনার সেন্টের উৎকট গন্ধ ছিল অনুপস্থিত ; কাগজের ফুলে সাজাতে হত না ড্রয়িং-রুম। সত্যিকারের ফুল কলকাতার সন্ধ্যাকে দিত সুন্দরের স্পর্শ : মাতাল করা গন্ধে পাগল হত মন। ফুল সে দিন রমণীর অলকে হত রমণীয় ; ফুল সেদিন যেমন-তেমন খোঁপাকে করত আরেকটু বিউটিফুল। এ-কলকাতা যেমন কেরাণীর, সে-কলকাতা তেমনি ছিলো শুধু কাপ্তানের।

দেড় টাকা সিরিজের বই আজ বিদ্যাকে করেছে ব্যবসা। দশ আনা দামের সিনেমার টিকিট সাহিত্যকে করেছে সংদের অনধিকার চর্চা। যা দুর্লভ তাকে সুলভ করতে গিয়ে ব্যবসায়ী হয়েছে লাভবান ; কিন্তু রসিকের হয়েছে ক্ষতি। Mass-এর জন্য নয় যে সব জিনিষ, তাকে জোর করে ম্যাসের জন্যে করতে গিয়েই সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প ম্যাসাকার হয়ে গেছে এ যুগে। জীবনে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিভেদ নয় বাঞ্ছনীয় : কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে বোধ হয় অধিকারী-অনধিকারীর বিভাগ মেনে নেওয়াই ভালো। জীবনের মুখ না চেয়ে জনতার মুখ চেয়ে সৃষ্টি করলে তা সৃষ্ট না হয়ে অনাসৃষ্টি হয় ; সাহিত্য না হয়ে হয় শ্লোগান ; গান যতক্ষণ ছিল দু'একটি তৈরী কানের জন্যেই মাত্র, ততক্ষণ তা ছিলো গান। মেসিনের মাধ্যমে যেই সে বেরুল সকলের পেছনে ধাওয়া করে, সেই সে আর গান রইল না ; সেই মুহূর্ত থেকে সে হল মেসিনগান ; গ্রেস দিয়েও যে ব্যর্থতাকে আর সৃষ্টির জাতে তোলা গেল না কিছুতেই, তারই নাম দেওয়া হল প্রোগ্রেস। প্রোগ্রেসের বাংলা করা হ'ল প্রগতি। আর সেই প্রগতির, "অনেক দূরগতি, অনেক দুর্গতি তার।"

সেই যুগের কলকাতায় সখের পায়রা ওড়াতেন বাবুরা। রক্ষিতার কাছে থেকে পয়সা খরচ করে কিনে আনতেন অসুখ। পানপাত্র আর পতিতা ছিল বড়লোকীর অপরিহার্য দু'টি প্রয়োজন।

কলকাতায় ফিরঙ্গী বণিক এসেছে মস্ত আয়না বেচতে। খদ্দের না পেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সওয়া লক্ষ টাকায় সওদা করবার মত লোক নেই কলকাতায়, তাই সে ফিরে যাচ্ছে শহর ছেড়ে শিকারে। ফিরঙ্গী বণিক জানত বিজ্ঞাপনের তীর লক্ষ্যভেদ করবেই ; লক নয় লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন ছাতু বাবু লাটু বাবু। বুকে বাজল তাঁদের। কিনলেন সেই আয়না। খোয়া-বাঁধানো চৌরঙ্গীতে ডেলিভারী দিতে বললেন তাঁরা। ভোর ছ'টায় রাস্তার ওপর আয়নাটাকে শুইয়ে রেখে অপেক্ষা করছে ফিরঙ্গী বণিক ; টাকা নেওয়া হয়ে গেছে তার ; Received in good condition-এ সই পেলেই, এবারে তার ছুট। ভোর সাড়ে-ছটায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ খোয়া-রাস্তায়। আয়নার কাছে এল গাড়ী। ঘোড়ারা মুখ দেখলো সেই আয়নায়। কিন্তু ঘোড়াদের মালিকরা নয়। গাড়ী থামলো না। লক্ষ টাকা দামের সেই আয়নার ওপর দিয়ে ছাতু বাবু লাটু বাবু গাড়ীকে দিলেন গড়িয়ে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া কাচের টুকরোর সামনে মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে সেই ফিরঙ্গী বণিক সেদিন কী ভেবেছিল তা দেখবার জন্যে দাঁড়ানো দরকার মনে করেন নি ছাতু বাবু লাটু বাবু। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বাড়ীর পথ ধরেছেন তাঁরা। আস্তে আস্তে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই খোয়ার তরঙ্গের ওপর দিয়ে তীরের মত চলে গেছে তুরঙ্গ-শাবকেরা।

সেই কলকাতারই এই অন্ধকারের মত আলোর দিক ছিলো এক নয়, অনেক। আলোর,—আলেয়ার নয়। বিদ্যুতের নয় রেড়ির তেলের আলোয় সে কলকাতায় দেশের বর্ণ পরিচয় করাতে বসেছেন বিদ্যাসাগর। কয়েদীকে হাত-কড়া পরাতে ব্যস্ত হননি ব্যারিষ্টার মাইকেল ; মাতৃভাষাকে সংস্কারের বেড়ীমুক্ত করতে উন্মুখ হয়েছেন কবি শ্রীমধুসূদন। পায়ের তলায় পরাধীন দেশের মাটি, তারই বক্ষ-বিদীর্ণ করা মন্ত্র পড়েছেন সেদিন বঙ্কিম ; বন্দে মাতরম্। ম্যাটিক পাশ করানো মাষ্টারী নয় ; শিক্ষার পৌরোহিত্য গ্রহণ

পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও এগিয়ে আসতে। সুপুরুষ নয় শুধু; পৌরুষের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দ বয়ে এনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী; যার রুটি রোজগারের নেই ক্ষমতা, তার অধিকার কী ভগবানকে ডাকবার? ডলারের দেশ এ্যামেরিকাকে ডলাই-মলাই করে ছেড়েছেন। বলেছেন: My brothers & sisters of America....

শিবনাথ শাস্ত্রী এসেছেন শাস্ত্র নিয়ে নয়, কাজ নিয়ে। 'মরবার সময় নেই,'—এ-কথা শুধু মৌখিক বাহুল্যে নয় জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন শিবনাথ। যেদিন তিনি মারা গেলেন সেদিন সত্যি সত্যি মরবার সময় ছিল না তাঁর। তখনও অনেক কাজ বাকী। রামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় ডেকেছেন শিবনাথকে। শিবনাথ এলেন অনেক পরে। রামকৃষ্ণ অনুযোগ করলেন।

শিবনাথ বললেন: আপনার কাছে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আপনার ভক্তদের জন্যে আসা সম্ভব হয় না।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেন; কেন?

শিবনাথ: আপনারা ভক্তরা আপনাকে ইতোমধ্যেই 'ভগবান' বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেছে তা জানেন?

রামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। সেই বরাভয় হাস্য! রামকৃষ্ণ যা বললেন, শিবনাথ তাঁর ইংরাজি পুস্তকে তা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন: Ramkrishna said, God dying of Cancer;...রামকৃষ্ণ কী তাই বুঝি নি আমরা; ভগবান তাঁর কাছে কি ছিলেন, তা বোঝার সাধ্য কী আমাদের?

শ্রীরামপুরে বসেছে মুদ্রাযন্ত্র; মুদ্রা-অর্জনের অভিপ্রায় নিয়ে নয়; শিক্ষা-বিস্তারের আদর্শ নিয়ে। এক লক্ষের ওপর বই ছাপা; চল্লিশটির বেশি ভাষায়। আর যাদবপুরে স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনলজির সামনে দিয়ে আসতে আসতে মনে পড়ছে সেই মানুষটির কথা, যাঁর নাম বর্তমান সরকারের দপ্তর-নায়করা শোনেননি নি বোধ হয় কেউ। শুনলে স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনলজির নামের সঙ্গে যোগ হত পঞ্চানন কর্মকারের। বাংলার প্রথম প্রিন্টার। শিবের জটা থেকে গঙ্গার মুক্তি নয়, সাহেবদের একচেটিয়া সম্পত্তির প্রথম চাবিকাঠি দখল; Press ছাড়া কিছুই express করা সম্ভব নয় একথা যাঁরা সেদিন বুঝে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নমস্কার।

মধ্যাহ্ন গগনের যে রৌদ্রদীপ্ত রুদ্র সূর্যের কিরণালোকে ঝলমল করে উঠেছিল পরাধীন বঙ্গভূমি, সেই স্বর্ণসূর্যের শেষ স্পর্শ লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের বাণীতে; শ্রীঅরবিন্দের শুভ্রতায়, সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নে। কারাগারে বন্দী শ্রীঅরবিন্দ, সঙ্গে বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর। ফাঁসীর দড়ি নিশ্চিন্ত ঝুলছে; জেলে সকলের হাত দেখছে একজন গণৎকার। শ্রীঅরবিন্দকে সে বলছে; অসম্ভব! পৃথিবীর কোন কারাগার তোমাকে ধরে রাখতে পারে এত বড় নয়। পৃথিবীর সম্রাট তুমি, সম্রাটের চেয়ে অনেক বড়, একটি মাথার মুকুটে নও সম্রাট, সকলের মাথার মুকুট তুমি, একটি সিংহাসন নয় তোমার জন্যে, দেশ জোড়া তোমার আসন! স্মিত হাসি হেসেছেন শ্রীঅরবিন্দ। কুইন ভিক্টোরিয়ার ক্রোড়ে যাঁর জীবনারম্ভ, জীবনের মধ্যাহ্নে স্বদেশভূমিকে ক্রোড়চ্যুত করবার চেষ্টায় তিনিই আরেক দিন দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়ারই বংশোদ্ভব কুলাঙ্গারদের কাঠগড়ায়। সেই অরবিন্দকেই ত' প্রণাম জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

সেই সূর্য মিলিয়ে গেছে যখন, তখনও রেখে গেছে তার আশীর্বাদ। আকাশ তখনও রাঙা হয়ে আছে। এসেছে আরেক দল। তারা কারা? তারা? তারা তরুণ যাত্রীদল। তাদেরই কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: যে-তরুণ যাত্রীদল বাহিরিল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে। স্বাধীনতার সেই রুদ্ধদ্বারে প্রথম যিনি করাঘাত করলেন তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত বাঙ্গালী, কিন্তু তাঁর সেনাপতি অবাঙ্গালী, গুজরাট-তনয়।

নূতন ভারতবর্ষের ভূমিকা রচনার ভার নিতে যাঁদেরা, ডাক পড়ল প্রথম, তিনি হলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তখনও দেশবন্ধু নন। দেশের লীডার নন: লীডার অফ দি বার। ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ!

সি, আর, দাশকে ডাকলেন গান্ধীজি। সি, আর, দাশের রোজগার তখন কুবেরের ঈর্ষাযোগ্য। তিনি বললেন: নিন যত টাকা প্রয়োজন, আমার কাছ থেকে নিন। সি, আর দাশ ব্যারিষ্টার হলে কী হবে, সামান্য বাঙ্গালী। মোহনদাস ব্যারিষ্টার হিসেবে তাঁর কাছে কিছুই না হলে কী হবে, ব্যবসা বুদ্ধিতে ঝানু বানিয়া। তিনি বললেন: চিত্তরঞ্জন, তোমার টাকা চাই না; তোমাকে চাই।

সি, আর, দাশ, বিসর্জন দিলেন আইন ব্যবসা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে দেশের কাজে। প্রতিজ্ঞা করলেন মামলা লড়বেন না আর। দেশের মুক্তি-যুদ্ধে লড়বেন। এদিকে ভারত-সরকারের পক্ষ নিয়ে একটি মামলা চালাবার জন্যে আগে থেকেই প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। চিঠি লিখলেন কর্তৃপক্ষকে—আমাকে অব্যাহতি দিন মামলা-চালানোর হাত থেকে। আমি প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ; কাজেই মামলা আমি, আপনি ছুটি না দিলে, চালাতে বাধ্য। যদিও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশের কাজের জন্যে ত্যাগ করেছি আইন-ব্যবসা তবুও সত্য-বদ্ধ আমি; তাই এই মামলা আমাকে করতেই হবে কারণ 'সত্য' দেশের চেয়েও বড়। তবে ঐ-মামলায় আমার ম[illegible] থাকবে না। কাজেই সত্য না রক্ষার অপরাধে আমি হ[illegible] অপরাধী। তাই ছুটি চাইছি আপনার কাছে! যাঁর কা[illegible] করেছিলেন আবেদন তিনি লিখে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহা[illegible] চিত্তরঞ্জনের মত এত বড় 'সত্য-প্রিয়' মানুষ বিরল। সে-যুগে[illegible] সাহেবরা ছিলো খাঁটি! এ-দেশীয়দের প্রতি শাসন-কর্তার আসন থে[illegible] নেমে এসে হাত বাড়াতেন; মানুষ যেমন বাড়ায় মানুষের উদ্দেশ্যে।

সেই চিত্তরঞ্জন চিঠি লিখছেন সুরেন মল্লিককে; সঙ্গে হাজ[illegible] টাকার চেক। চিত্তরঞ্জনের পিতার ঋণ ছিলো মল্লিকদের কা[illegible] এত দিন জানতেন না তিনি। পুরানো ডায়েরীতে পাওয়া গে[illegible] এখন ঋণমুক্ত করবার জন্যে লিখেছেন চিঠিতে।

ঋষি শুধু সত্যযুগেই জন্মায় নি! দাশ হলেই হয় না ব্রাহ্মণেত[illegible] এমন 'দাশে'র পায়ের তলায় সত্যিকারের ব্রাহ্মণ লুটোতে রাজি অ[illegible] দাসানুদাস হয়ে।

চিত্তরঞ্জন! কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকক্ষে ব্যবহারজী[illegible] আসবে, যাবে। বিচারপতির বদল হবে। ধারা বদলাবে বিচা[illegible] বেঁচে রইবে শুধু চিত্তরঞ্জনের একটি উক্তি: "If love of Coun[illegible] is a Crime, then I am a Criminal"

এখন যে-কলকাতায় প্রবেশ করব সে-হল উনিশ শ' [illegible]

কলকাতা। বাংলা দেশের giant-রা তখনও যাই-যাই করেও যান নি। সূর্য অস্ত গেলেও আকাশে তখনও যে রঙের সমারোহ, তারই সঙ্গে তুলনা চলে সেদিনকার বাংলার।

সেই বাংলার প্রধান শহর কলকাতা তখনও ভারতবর্ষের শাসন-কর্তা। নতুন দিল্লী নয়; সেদিন Clive street ruled India. সেই কলকাতায় উনিশ শ' বিশ সালে দুর্গা নিয়ে এলো নীলমণিকে এক দিন, তার দাদামশায়ের বাড়ীতে।

সেই ছেলেটি যে দুর্গার কলম ধার নিয়ে তবে দিয়েছিল নিজের পরীক্ষা; আর পরীক্ষার পর রাস্তায় নেমে দুর্গাকে নিজের পরিচয় দিয়েছিল শুধু এই বলে: আমার নাম নীলমণি; আপনার?—সেই নীলমণি দুর্গার সঙ্গে তার দাদামশায়ের লোয়ার সার্কুলার রোডের পর্ণকুটীরের সামনে এসে বিস্ময়ে থেমে গেল; বিস্ময়,—প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার নাম পর্ণকুটীর বলে নয়; বিস্ময়,—ওই দৈত্যকুলে দুর্গার আবির্ভাব হল কেমন করে, সেই কথা ভেবে।

সে-কথা সত্যিই ভাববার এবং ভেবেও কোন জবাব না পাওয়ারই মত। অর্থের প্রাচুর্যে, ক্ষমতার স্পর্ধায়, আত্মবিশ্বাসের অহমিকায় 'পর্ণকুটীর' সেদিন ফেটে পড়তে চাইছে; বিদ্যা এ-বংশকে দান করে নি বিনয়, দিয়েছে দম্ভ; অর্থ আনে নি বদান্য; এনেছে আরও অর্থের লালসায় মেশান অকারণ অপচয়ের আর অপব্যয়ের দুরন্ত নেশা; ক্ষমতাকে এঁরা ব্যবহার করেন নি দুর্বলকে রক্ষা করায়, ক্ষমতাকে এঁরা অস্ত্র করেছেন এঁদের অন্তহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষীণতম প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করবার কাজে। যাঁর অকৃপণ আশীর্বাদে মানুষ দেবতা হয়, সেই ভাগ্যের অবারণ অভিশাপে এঁরা হয়েছেন দানব। ভাগ্য-নিহত এঁরা সৌভাগ্য উদয়ের দিন থেকেই; কিন্তু তখনও দেওয়ালের লেখা পড়ে নি দৃষ্টিতে, তাই বাংলা দেশের স্বর্গ মর্ত পাতাল এঁদের পায়ের তলায় টলমল করলেও এঁরা তখনও নিশ্চিন্ত। পুরুষকারের দম্ভ চিরকাল পুরুষকে করেছে মাতাল। তাদের রমণীকে করেছে ধ্বংসের অঙ্কুর। চিরকালই ভাগ্যের ছলনা পুরুষকে করেছে পাগল, রূপোর, আর রমণীকে রূপের জন্যে!

অবশ্য তার জন্যে পুরো দোষ দেওয়া যায় না দুর্গার দাদামশাই অম্বিকাচরণ সরকারকে। তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনের দিন কেটেছে দুঃসহ দারিদ্র্যে। বিদ্যাসাগরের বিদ্যারম্ভ রাস্তার আলোয়; আজ ইতিহাস হয়ে গেছে; কারণ বিদ্যাসাগর রয়েছেন আজও পর্যন্ত সর্বপ্রধান বাঙালী। অম্বিকাচরণের তা' হয় নি। না হ'ক, তবু যে-কথা সত্য তা' হ'ল বিদ্যার সাগরে তাঁরও ভাঙ্গা ভেলায় পাড়ি দেওয়া। এবং পারে উত্তীর্ণ হওয়াও প্রথম। কত বড়, আর কী ভীষণ দুর্যোগ, কত ঝাপটা আর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অপসারিত করে এগুতে হয়েছে অম্বিকাচরণকে তার বর্ণনা সম্ভব; উপলব্ধি অসম্ভব।

এ-দেশের শেষ শিক্ষা-পর্ব সমাপ্ত করে অম্বিকাচরণ হলেন শ্রীরামপুর কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক। অঙ্কে শুধু পারদর্শী ছিলেন না তিনি; তিনি ছিলেন 'প্রতিভা'। সেই কলেজেই এক দিন নিজের বসবার ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন তিনি। এমন সময়ে এসেছেন সেদিনকার শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজ অধিকর্তা। প্রিন্সিপ্যালের খোঁজ করতে অম্বিকাচরণ জানিয়েছেন তিনি নেই।

সাহেব জিজ্ঞেস করেছেন: তুমি কে? আমি, এখানকার অঙ্কের অধ্যাপক সরকার—অম্বিকাচরণের উত্তর। সাহেবের "My Lord, I have come here to meet you professor. Are you that wizard-mathematician?"—বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহেব।

ঝাঁটা ফেলে অম্বিকাচরণ দ্বিধার সঙ্গে ধরেছেন সেই হাত, বলেছেন "I am sorry to receive you like this. Sir. সাহেব আরও আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বলেছেন: "But I am not, professor, rather I have the proudest pair of hands to shake with."

সেই অধ্যাপক শ্রীরামপুর কলেজ ছেড়ে ওই সাহেব এবং এদেশের কয়েক জন বন্ধুর সাহায্যে বিলেতে পাড়ি জমালেন আরও ডিগ্রী-অর্জনের অভিপ্রায়। বিলেত যাবার দিন, সকালে, দিদিকে জানাতে এলেন অম্বিকাচরণ, সেই সু-খবর। দিদি বললেন: কী? ম্লেচ্ছর দেশে যাচ্ছিস, সেই খবর এলি বলতে? এই বলে, হাতে ছিলো পেতলের ঘটি, ছুঁড়ে মারলেন তাই। কেটে গেল কপাল। দাগী হয়ে গেল চিরকালের মত। কপালের সেই জায়গায় হাত বুলোলে এখনও যেন জ্বালা করে অম্বিকাচরণের।

কিন্তু তবুও বিলেত গেলেন অম্বিকাচরণ। গেলেন এগ্রিকালচারের একটা ডিগ্রী নিতে, সেটা পাওয়ায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেবার জন্যেও হলেন ব্যগ্র। তাঁর অর্থ ছিল না, সামর্থ্য ছিল। শুধু স্কলারশিপের টাকার জন্যে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে চললেন। যে পরীক্ষায় প্রথম হ'লে পাওয়া যাবে অর্থকরী পুরস্কার সেই পরীক্ষাই দিলেন প্রয়োজন না থাকলেও। ইংল্যাণ্ডের শীত সহ্য হল না অম্বিকাচরণের। দুরন্ত বাতে কুঁকড়ে এল দীর্ঘ ঋজু দেহ বিকল হল অঙ্গ। বাতের যন্ত্রণা ভুলতে মদ ধরলেন। রোপণ করলেন নিজের হাতে বিষবৃক্ষের চারা।

টলতে টলতে এসেছেন একদিন পরীক্ষাগৃহে। শুয়ে পড়েছেন দরজার মুখে। গার্ড তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে ভেতরে। পরীক্ষা দিয়ে বেরুবার সময়ে অম্বিকাচরণের খাতা দেখে পিঠ চাপড়েছে শিক্ষিত গার্ড, বলেছে, "You don't know what you have written, young man;" কিন্তু ভুল বলেছিলেন সেই গার্ড, অম্বিকাচরণ জানতেন, তিনি কি লিখেছেন, তিনি জানতেন পরীক্ষা দিলেই প্রথম হতে হয়।

ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে, দূরে ফেলে দিলেন, এগ্রিকালচারের ডিগ্রী। আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন; কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। ছ'মাস বাদে আবেদন করলেন প্রভাবশালী এক ব্যক্তির দরবারে, মুনসেফীর জন্যে! আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সেই বিরাট মানুষটি আশীর্বাদ করলেন। বললেন: আরও ছ'মাস দেখ। দেখতে হ'ল না সেই ছ'মাসে। সেই ছ'মাসের মধ্যে অম্বিকাচরণের ভাগ্যের চাকা গেল ঘুরে। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর বিবাদ না হয়ে মিলন হ'ল তাঁর জীবনে। ক'লকাতা হাইকোর্টের বিচারকক্ষে ধ্বনিত হ'ল সম্পূর্ণ নূতন এক কণ্ঠ। ধ্বনিত হয়েও প্রতিধ্বনিত হ'ল দেশ জুড়ে আর একটি নাম যুক্ত হ'ল ব্যবহার-জীবিদের নামের সব শেষে নয় সর্বপ্রথম, তলায় নয় ওপরে, অনেকের মধ্যে এক নয়, একের মধ্যে সেই অনেক ক্ষমতা নিয়ে এলেন অম্বিকাচরণ এসেই আরম্ভ হ'ল জয় শুধু জয় নয়, বিজয়! বিজয় নয়, দিগ্বিজয়!

কলকাতা তখন স্বদেশী মামলার উত্তেজনায় অস্থির। কিন্তু যিনি এই মামলা লড়বার মোটামুটি প্রস্তুতি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম আর আজ কেউ মনে রাখে নি। মনে রাখবার মত কাজও যে করেন নি অম্বিকাচরণ। দেশের ডাকের চেয়ে সেদিন তাঁর কাছে বড় হয়েছিল অর্থের লালসা। তাই মামলা যাঁরা তদারক করছিলেন বাইরে থেকে, তাঁরা যখন অর্থাভাবের কথা জানালেন, অম্বিকাচরণ অপারগ হলেন সেই মুহূর্ত থেকে। অম্বিকাচরণ রয়ে গেলেন তাই ধুরন্ধর ব্যবহারজীবি মাত্র। হতে পারলেন না দেশের নায়ক। সেদিন অর্থের জন্য যে-সুযোগ তিনি হারালেন, সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে অম্বিকাচরণের নামের আরও একটি অর্থ হ'ত হয়ত। বাংলা দেশ আর বাঙ্গালী জাত তাঁকে মাথায় করে রাখত, অসাধারণ আইনজীবি বলে নয়, দশের একজন নয়, স্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জন ব'লে। কিন্তু দেশপ্রেম ছিল না সেদিনকার অম্বিকাচরণের ; থাকলেও, তার চেয়ে বেশি ছিল অর্থের প্রতি অনুরাগ !

আলিপুর বমব কেসেরই একটি শাখা-মামলায় ফাঁসীর আসামী হয়েছেন ক'লকাতার শ্রেষ্ঠীকুলের এক জনের একমাত্র ছেলে। বাঁচবার আশায় আসামীর পিতা শরণ নিয়েছেন অম্বিকাচরণের। আদালতে মামলা ওঠবার মুহূর্তে দেখা নেই অম্বিকাচরণের। অস্থির পদচারণায় আকুল পিতার প্রতিটি দণ্ড-পলকে মনে হয় অনন্তকাল। অবশেষে দৌড়ে আসেন অম্বিকাচরণের কাছে। অম্বিকাচরণ বলেন : আমার টাকা? ধনীশ্রেষ্ঠ বিস্মিত হয়ে বলেন : সে কী? দু'দিনের হাজার টাকা ত' অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছি। অম্বিকাচরণ বলেন : আপনি জানেন পাঁচশো নেই আর ; আমার 'ফি' করে নিয়েছি দাঁড়ালেই, হাজার টাকা।"

আবার হাজার এক টাকার চেক হাতে নিয়েই লাফিয়ে ওঠেন অম্বিকাচরণ! কী করব বলুন? টাকা না পেলে আমি তাগত্ পাই না যে : চলুন এবার থুড়ে আসি পুলিশকে।

সত্যিই শুধু থুড়ে নয়, দুমড়ে-মুচড়ে-ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিলেন পুলিশের শিরদাঁড়া। পুলিশের প্রমাণ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ; পদদলিত করে হুঙ্কার দিলেন, ডেপুটি কমিশনরকে : লায়ার! একটি টুঁ শব্দ করল না কোর্ট শুদ্ধ্ লোক। ইংরেজ বিচার-কর্তাও নয়। কারণ তিনি জানেন আইন অনেক ; কিন্তু আইনের ফাঁক একটিই ; আইনজানা লোক আছে অনেক, আইনের ফাঁক,—সে শুধু জানেন অম্বিকাচরণ সরকার।

দিল্লী গেছেন অম্বিকাচরণ একটি মামলায় ; নতুন দিল্লী তৈরী হয়নি তখনও ; পুরনো দিল্লীর প্রান্তে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করছেন অম্বিকাচরণের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা রুদ্রচরণ। প্রণাম করতে গেলেন অম্বিকাচরণ। পা সরিয়ে নিলেন তাঁর বাবা, অভিশাপ দিলেন ; বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে ধিক্কার দিয়ে বললেন : যত উঁচুতে উঠেছিস ততখানি নীচুতে নামতে হবে তোকে !

অম্বিকাচরণের ঠাকুর্দা তারাচরণ জন্ম-সাধক। তিনি তাঁর গ্রামের বহু কিম্বদন্তীর নায়ক। এমন কি ৺মা কালীর সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, এমন কথাও রটেছিল লোকের মুখে। রটেছিল আরো অনেক কথা। অবিশ্বাস্য অসম্ভব, অলীক রোমাঞ্চকর ঘটনা। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন নাকি তারাচরণ। নিজের স্ত্রীকে নাকি শেষ বার বাঁচান। তার পর ৺মা কালীর আদেশ হয় নাকি এ কাজ না করবার জন্যে। দ্বিতীয় বার স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তারাচরণকে আর প্রবৃত্ত করান যায় নি ও-কাজে। পুত্র রুদ্রচরণও সাধনার পথেই গেলেন জীবনের প্রারম্ভেই। কিম্বদন্তীর নায়ক না হলেও তিনিও হয়ে উঠেছিলেন গাঁয়ের শেষ ভরসা।

অম্বিকাচরণ আরাধনার পথে গেলেন না, গেলেন অধ্যয়নের পথে। শাস্ত্রের অতীতকে না ধরে, আঁকড়ে ধরলেন শাস্ত্রকে। পণ্ডিত হলেন, ভগবৎ-প্রেমিক হতে পারলেন না। রস পেলেন না, শুষ্ক বিদ্যার অধিকারী হলেন। সংস্কৃত-চর্চার চূড়ান্ত করলেন। এমন কি বিবাহ-বাসরে পুরোহিতকে উঠিয়ে দিলেন ভুল সংস্কৃতোচ্চারণের কারণে। সেই অম্বিকাচরণ যখন অর্থ ও সামর্থ্যের যোগাযোগে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন তখনই বাপের অভিশাপ তাঁকে বিঁধল।

তিনি আত্মগোপন করে কাশীতে গিয়ে কুল-পুরোহিতকে ধরে যজ্ঞ করালেন, আরও অর্থ, কুবেরের ঐশ্বর্য কামনায় সে-যজ্ঞে আহুতি দিলেন তিনি। যজ্ঞে কোথাও ত্রুটি হয়ে থাকবে। কিংবা পিতার অভিশাপ অব্যর্থ হবে বলে সমস্ত জীবনটা দক্ষযজ্ঞের মত তণ্ডুল হয়ে গেল অম্বিকাচরণের।

সেই করুণ ইতিবৃত্ত বিবৃত হচ্ছে পরে। তার আগের কথা বলি। ফুলে ফেঁপে উঠেছেন তখন অম্বিকাচরণ। পাদদেশ থেকে প্রক্ষণনের মধ্যমণি ব্যারিষ্টর অম্বিকাচরণ মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করেন না। নিয়তিকে নিয়তই উপহাস করেন। জীবনকে মনে করেন যন্ত্র। এবং নিজেকে মনে করেন যন্ত্রী।

এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম জমিদার বংশে। আরেক মেয়ের জন্যে পাত্র এনেছেন সাধারণ পরিবার থেকে। সাধারণ পরিবার.—কিন্তু অসাধারণ ছেলে। কৃষ্ণনগর ডিষ্ট্রিক্টের পয়লা নম্বর ছাত্র। হীরের টুকরো! অনন্তকুমার মিত্র। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ যুবক। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠালেন ব্যারিষ্টার হবার জন্যে! বিয়ে দেবার তিন মাসের মধ্যে মেয়ে মারা গেলেন। অনন্তকুমার তখন বিলেতে। মেয়ে মারা যাবার পরেও প্রবাসের ব্যয়ভার বহন করতে দ্বিধা করলেন না অম্বিকাচরণ। চালিয়ে গেলেন অনন্তকুমারের বিলেতে থাকা-খাওয়ার খরচা। বিবেকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন তিনি : সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে অম্বিকাচরণকে ভুলবেন না কখনও।

ভুলতে দিলেনও না অম্বিকাচরণ। দেশে ফেরা মাত্র অনন্তকুমার শুনলেন তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন স্বামী যেন তাঁর স্ত্রীর পরের বোনকে পত্নী বলে গ্রহণ করেন। অনন্তকুমার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করলেন ; মৃতা স্ত্রীর কথা মতই স্ত্রীর পরের বোনকে করলেন বিবাহ।

ভেতরটা চিনতে ভুল করেন অম্বিকাচরণ ; বাইরেটা নয়। কিন্তু জামাই-র ক্ষেত্রে ভিতর-বাহির কোনটা চিনতেই ভুল করেন নি তিনি। অনন্তকুমার তাঁর কাছে জামাতা হয়ে এলেন। কিন্তু হ'য়ে উঠলেন ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের ছেলের অভাব ছিল না তাঁর। অভাব ছিল উপযুক্ত ছেলের। অনন্তকুমারকে নির্বাচন করেছিলেন তিনি মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলে নয় ; নিজের জীবনের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করতেই। আইন ব্যবসায় প্রভূত অর্থের অধিকারী অম্বিকাচরণ সমাজের জাতে ওঠবার জন্যে জমিদারী

কিনেছেন; অভিজাত হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনের ঐকান্তিক কামনা ছিল, শুধু অভিজাত হওয়া নয়; সমস্ত জাতের অভিভাবক হওয়ার। লীডার অফ দি বার নয়; লীডার অফ দি নেশান। তাই শুধু আইন নয়; অন্য ব্যবসা-বাণিজ্য; শিল্প মারফৎ ক্রমশঃ বিস্তার করতে চাইছিলেন নিজেকে; আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের প্রধান ব্যক্তিদের মানচিত্রে চাইছিলেন আর একটি নাম যোগ করতে: অম্বিকাচরণ সরকার।

তাঁর অর্থ ছিল; সামর্থ্য ছিল না আর। অনন্তকুমারের সামর্থ্য ছিল; ছিল না অর্থ। অম্বিকাচরণের সঙ্গে অনন্তকুমারের যোগ হ'ল সোনায় সোহাগা কিংবা মণি-কাঞ্চন যোগের মত সস্তা নয়। এত দিন ঘোড়ায় টানছিল গাড়ী। ঘোড়ার বদলে এল হর্স পাওয়ার। টর্চ রেডিই ছিল; প্রয়োজন পড়ে ছিল Eveready battery-র। বারুদ ছিল স্তূপীকৃত; দরকার হয়েছিল দেশলাইয়ের।

দু'বার দারপরিগ্রহ করলে, জন্ম-মুহূর্তেই অনন্তকুমারের বিবাহ হয়েছিল 'কর্মের' সঙ্গে। কাজ, কাজ, কাজ। মানুষ নয় মেসিন। একটু মুহূর্ত সময় নয় নষ্ট; অনন্ত অলস অবসরের মানস-সরোবরে নয় কল্পনার ময়ূর-পঙ্খী ভাসানো। জীবন-রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা';—প্রণয় আর পরিণয় নয় নারীর সঙ্গে; পরিশ্রম আর অধ্যবসায় কর্মের সঙ্গে সঙ্গে। রমণীয় নয়: অনমনীয়। রমণী নয়; রণ। স্তব করে তুষ্ট করা নয়; বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হওয়া।

মাতৃগর্ভে সন্তানের স্বাভাবিক ভাবেই যত কাল থাকতে হয় তত সময়ও অপেক্ষা করতে পারেন নি অনন্তকুমার। ভূমিষ্ঠ হয়েছেন আগেই। তাই অস্বাভাবিক যত্নে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের মর্যাদাও রাখলেন! দীর্ঘ; মজবুত, ইস্পাতের মত দুর্ভেদ্য বর্মে তৈরী হ'ল দেহ। মন হ'ল বিশ্বকর্মার কারখানা।

শুধু লেখা-পড়া নয়, খেলা-ধূলাও। ন্যাশনাল ক্লাবের সভ্য, জন্ম হয় নি তখন ১৯১১-র মোহনবাগানের, 'তাজহাট' টিমের হয় নি আবির্ভাব। ন্যাশনাল এর ফুল ব্যাক তখন অনন্তকুমার। টেনিস খেলেন; ক্রিকেটও। বিত্তবান অম্বিকাচরণের কাছে যখন বুদ্ধিমান অনন্তকুমার এলেন, তখন অম্বিকাচরণ প্রবীণ; অনন্তকুমার যুবক, এক জন বিজ্ঞ, আরেক জন অনভিজ্ঞ; এক জন শ্রান্ত, আরেক জন অক্লান্ত। তাই যুগলযাত্রায় এল নূতন জোয়ার। সারা বাংলা দেশ ভেসে যাবার মত হ'ল সেই জোয়ারে!

অনন্তকুমার ব্যারিষ্টারী করতে আরম্ভ করলেন। অর্থ পেলেন কিন্তু মান পেলেন না। শীর্ষস্থানে গেলেও লোকে বলবে, শ্বশুরের কৃপায় পার হয়েছেন ব্যারিষ্টারীর বৈতরণী। ছেড়ে দিলেন নিশ্চিন্ততার নির্ভরতার নিঃশঙ্কতার পথ। অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

উদ্বোধন করলেন বাঙালী পরিচালিত কাপড়ের মিলের, প্রথম বাঙালী ব্যাঙ্কের দিলেন জন্ম।

বাঙালী শুধু ভাঙতে জানে না; বাঙালী গড়তেও জানে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে আস্ফালনের আওয়াজ তোলে না শুধু, বৃহত্তর বঙ্গের দেখে স্বপ্ন। রামরাজ্যের, অবাঙালীদের রামরাজত্বের বিরুদ্ধে মনে মনে গজরায় না। কর্মে মূর্ত হয়ে ওঠে। আরামের রাজ্যে রমণীমোহন নয়, পরিশ্রমের স্বরাজ্যে রামমোহন হ'তে চায় সে।

অনন্তকুমার মিত্রের মত বাঙালী অন্ত করতে চায় বাঙালীর সেই অসহায় অবস্থার। অনন্ত সুযোগের স্বর্গ খুলে দিতে চায়। কর্ম-জীবনের আদিপর্বেই অনন্তকুমার অনাদি সম্ভাবনার স্বপ্নে আকুল হয়ে ওঠেন। সেই অনন্তকুমারের প্রথম সন্তান হ'ল দুর্গা। অনন্তকুমার পরিশ্রম করে গেছেন, দুর্গা তাঁর জীবনে নিয়ে এল পুরস্কার। ভাগ্যোদয় হ'ল।

কৃষ্ণনগর থেকে ক'লকাতায়, ক'লকাতা থেকে গৌড়বঙ্গে বিস্তৃত হ'ল অনন্তকুমারের পরিচয়। জীবিকারম্ভ হয়েছিল অম্বিকাচরণের জামাতা হিসেবে। সে-হিসেব নিজের হাতে চুকিয়ে দিয়ে নতুন খাতা খুলে বসেছিলেন অনন্তকুমার। জামাতা নয়, সব কিছুর হর্তা-কর্তা! শ্বশুরের সমস্ত ব্যাপারেও, হ্যাঁ কি না, বলবার শেষ ক্ষমতা, অশেষ ক্ষমতা তাঁরই। অনেকগুলি ছেলে হয়ে পরিবার বড় হ'ল। ভাইদের নিয়ে এসে লাগিয়ে দিলেন কাউকে কাজে, কাউকে লাগলেন পড়াতে। গাড়ী করলেন, শ্বশুরের বাড়ীতে থাকতে থাকতেই বাড়ীও করলেন নিজে। দক্ষিণ কলকাতায় সেই বাড়ীর মার্বেল-চূড়ার জনশ্রুতি অনেকেরই টাটালো চোখ, জ্বালা ধরিয়ে দিল অনেকেরই বুকে। অনেকের সুখ-নিদ্রায় আনলো ঈর্ষ্যার ব্যাঘাত।

নীলমণিকে দুর্গা যখন নিয়ে এল তখনও দুর্গারা দাদামশায়ের বাড়ীতেই থাকে, তার বাবার নিজের বাড়ীর নির্মাণ-কার্য অসমাপ্ত তখনও। নীলমণি দুর্গার দাদামশায়ের বাড়ীতে ঢুকেই যা আবিষ্কার করল তা হচ্ছে সে-বাড়ী মানুষের নয়, বড়মানুষীর।

বিস্তীর্ণ লনের সবুজ-প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সামনে পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি! ভক্তির মহিমায় নয়, ঐশ্বর্যের গরিমায়। ভৃত্য নেই, বেয়ারা আছে। পাত-পেড়ে খাওয়ার পাট এঁদের বাড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তার পরিবর্তে ডিনার টেবলে মোগলাই খানা, ঠাকুরের বদলে আছে বাবুর্চি। মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজীতে হয় বাক্যালাপ। গালাগালের বেলায় ডাক পড়ে হিন্দীর। স্লিপিং-স্যুট পরে শোওয়া, ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে ঘোরা। বাইরে বেরুনর জন্যে র‍্যাংকেনের বাড়ীর দর্জির দস্তখত চাই কাপড়ের ওপর। বাজাবার জন্যে পিয়ানো, বাজনা শোনবার জন্যে বিলাতি গানের রেকর্ড। বাজার করবার জন্যে সরকার আছে, কর্ত্রীরা যান মার্কেটিংএ। কাঁসার গেলাসে কুঁজোর জল তৃষ্ণা করে না দূর। মদের পাত্রে পেগের মাত্রা তৃষ্ণা বাড়ায় মাত্র। বাড়ীর ছেলেরা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরয় না। ছুটির পর শিকারে যায়। বন্য পশুকে বাগাতে না পেরে নিরীহ স্ত্রীলোকের পেছনে ধাওয়া করে। মৃগের বদলে মৃগনয়নারা ধরা পড়ে, সার্থক হয় মৃগয়া! গেটের দরজায় সারাক্ষণ মোতায়েন আছে দরোয়ান। গাড়ীতে করে গেলে কুর্ণিশ করে। পায়ে হেঁটে এলে কেউ, স্লিপ চায়।

সেই স্বর্ণলঙ্কায় দুর্গা যেন বন্দিনী মানবকন্যা। এই বড়লোকী আর বিলাস, অন্যায় আর অপচয়, মানুষকে অপমান করার ধিক্কারে কাঁদছিল নিরুপায় হয়ে একা। নীলমণি যেই এলো তার জীবনে, দুর্গা তাকে শেষ আশ্রয়ের মত যেন সমস্ত জোর দিয়ে জড়িয়ে ধরল! দুর্গার সব ছিলো, শূন্য ছিলো সব। পূর্ণ হওয়ার প্রহরে এল নীলমণি। দুর্গা ভালবাসল তাকে।

[ক্রমশঃ।

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

ছয়

মহানগর অভিমুখে

কলকাতা!

নবযুগের নতুন মহানগর। মধ্যযুগের তীর্থনগর, রাজনগর বা কেবল বাণিজ্যসর্বস্ব বন্দরনগর নয়। প্রাচীন তীর্থ আছে, বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য আছে, নতুন রাজাও আছে কলকাতা শহরে। মধ্যযুগের নগরে যা ছিল, সবই আছে। পিতার উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন পুত্রের জন্ম হয়, মধ্যযুগের সমস্ত নাগরিক উত্তরাধিকার নিয়ে তেমনি কলকাতা শহরেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার সঙ্গে যা ছিল না কোন মধ্যযুগের নগরে, তাও ছিল কলকাতা মহানগরে।

নতুন যুগের শিক্ষানগর কলকাতা। নব্যবঙ্গের নতুন সংস্কৃতি-নগর। প্রাচীন ও নবীন জীবনাদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতে কলরব-মুখর মহানগর। কোন শিক্ষারই শেষ হয় না, সেখানে না গেলে। এ যুগের মনুষ্যত্বেরও যেন পূর্ণবিকাশ হয় না, তার গভীর স্পর্শ ছাড়া।

এত সব কথা চিন্তা ক'রে বীরসিংহের গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেন নি। তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার পাঠশালায় ঈশ্বরের যা শিক্ষা করা আবশ্যক তা হয়েছে। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দিলেই ভাল হয়। ইংরেজ জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহরে না গেলে যে ইংরেজী শিক্ষা করা সম্ভব নয়, একথা তখন কলকাতার বাইরে বাংলাদেশে প্রায় সকলেই জানতেন। কালীকান্তও জানতেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন হ'ল কেন? তখন পর্যন্ত ফারসী শিক্ষারই প্রচলন ছিল না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা রাজকার্যের জন্য ফারসী শিক্ষা করতেন। যাঁরা সংস্কৃত শিক্ষা করতেন, তাঁরা প্রধানত: টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, অথবা রাজসভায় সভাপণ্ডিতের কাজ করতেন। কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন হলেও, তার প্রচলন তেমন হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক সুহৃদ্ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র রায় এ-সম্বন্ধে তাঁর "আত্মজীবন চরিতে" যা লিখে গেছেন, তা তাঁর সমকালীন অবস্থার প্রামাণ্য বর্ণনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য:

"তৎকালে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত আট-দশ ক্রোশের বহির্দ্দেশে ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না। সে সময় স্কুলে শিক্ষকের ও কেরানীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন ং মফঃস্বলে দৃষ্ট হইত না; এবং এই সকল পদের বেতন বা ম অধিক ছিল না। দেশের সমস্ত জেলার রাজকার্য পারস্য ভাষ নির্বাহ হইত। সে সকল পদের বেতন অধিক না হউ উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত এবং পদেরও গৌরব বিলক্ষণ ছি এই কারণে মফঃস্বলের প্রধান পরিবারেরা আপন আ সন্তানদিগকে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া পারস্য বিদ্যা শি দিতেন।"(১)

কলকাতার বাইরে তখন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের সং নিতান্ত অল্প ছিল। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র গণনা ক'রে তাঁদের নাম বলেছে "নবদ্বীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহি হরিনারায়ণ পাল,প্রতাপচন্দ্র পাল, এই কয়েকজন মাত্র আমা জানিত ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন।" নবদ্বীপে ও কৃষ্ণনগ যদি এই অবস্থা হয়, তা'হলে বীরসিংহ ও তার আশপাশের অবস্থা হ'তে পারে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। আট বছর বয়সে ঈশ্বরচ পাঠশালার শিক্ষা শেষ হবার পর, যখন তাঁর গুরুমহাশয় তঁ ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছি তখন কার্ত্তিকেয়চন্দ্র এক হিন্দুস্থানী লালার কাছে ফারসী শি আরম্ভ করেন। কি ভাবে তাঁর এই ফারসী শিক্ষা চলতে থ তার সামান্য একটু আভাস দিচ্ছি (২):

"অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথ একজন হিন্দুস্থানী লালা নিযুক্ত হন, তিনি তিন টাকা পাইতেন ও বাটীতে আহারাদি করিতেন। আমি ও অ পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন রায় তাঁহার নিকট পাঠারম্ভ মধুসূদনকে আমি মধ্যমদাদা বলিয়া ডাকিতাম, এবং এ বলিয়া থাকি। কিয়ৎকালানন্তর শিক্ষকের সুরাসক্তি প্রকাশ হইল। তৎকালে আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণ আর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুত বা বিক্রীত হইত না।

---

(১) দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়: আত্মজীবনচরিত: ৮

(২) আত্মজীবনচরিত: ৮ পৃষ্ঠা

"তিনি প্রত্যহই মধ্যাহ্নে ঐ বাজার হইতে মদ্যপান করিয়া যাইতেন এবং কখন সামান্য দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন। এ কারণে গুরুজনেরা তাঁহাকে বিদায় করিয়া এক মুসলমানকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন।

"এ ওস্তাদের পান-দোষ ছিল না বটে, কিন্তু বিষম দোষান্তর প্রকাশ হইল। তিনি আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা বেতন পাইতেন এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণে তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম।..."

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করার কারণ হ'ল, একই সময়ে বাংলা দেশের একটি আট বছরের বালককে যখন ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসার কথা হ'চ্ছে, তখন আর একটি আট বছরের বালককে পরিবারের তত্ত্বাবধানে রেখে, হিন্দুস্থানী শিক্ষক ও মুসলমান ওস্তাদের কাছে ফারসী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। দুই বালকের জন্য দুই পরিবারের এই দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র ও কার্তিকেয়চন্দ্র দু'জন সমবয়স্ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছিল ব'লে, কেবল তাঁদের কথা উল্লেখ করলাম। আসলে দু'জনকে দু'টি সামাজিক দৃষ্টান্ত বলেই ধরা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান, কার্তিকেয়চন্দ্র নবদ্বীপের (কৃষ্ণনগর) রাজবংশের দেওয়ান-পরিবারের সন্তান। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তানরা বাল্যকালে তখন সংস্কৃত শিক্ষা করতেন এবং পরিণত বয়সে কুলপুরোহিত বা সভাপণ্ডিতের কাজ করতেন, অথবা অনেকটা স্বাধীন ভাবে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা ক'রে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করতেন। সেইজন্য তাঁদের রাজভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হ'ত না। দেওয়ান-পরিবারের সন্তানদের অথবা রাজসরকারের কর্মচারীদের বংশধরদের তা করলে চলত না। প্রাপ্ত বয়সে সরকারী চাকরীর যোগ্যতা যাতে তাঁরা অর্জন করেন, তার জন্য তাঁদের ফারসী শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সম্ভ্রান্ত চাকুরীজীবী হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও তাই সকলেই প্রায় তখন আরবী ফারসী শিক্ষা করতেন, বেশী মনোযোগ দিয়ে। সংস্কৃতও তাঁরা শিখতেন না যে তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী যত্ন ও পরিশ্রম ক'রে ফারসী শিখতেন। রামমোহন রায়ও তাই শিখেছিলেন। আট বছর বয়সে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দেবার কথা তাঁর অভিভাবকরা কেউ চিন্তাই করতে পারেন নি। তখন অবশ্য কলকাতা শহরে ইংরেজী শিক্ষার তেমন প্রচলনও হয়নি। রামমোহন ছিলেন অভিজাত রাজকর্মচারী-বংশের সন্তান। নবাবী আমলের শিক্ষার প্রথা অনুযায়ী তিনি বাল্যজীবনে ফারসী ও আরবী শিখেছেন। কাশীতে থেকে রামমোহন সংস্কৃতও শিক্ষা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হ'ল, বাইশ-তেইশ বছর বয়সের আগে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন কি না সন্দেহ। (৩) সাতাশ আটাশ বছর বয়সে তিনি ভাল ক'রে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বেশ বোঝা যায়, শিক্ষিতদের কাছেও ইংরেজী তখন তার রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেনি। রাজার সিংহাসন যত দ্রুত বদলায়, প্রচলিত রীতি বা প্রথা তত দ্রুত বদলায় না। তার মধ্যে আবার শিক্ষার রীতিনীতি যে সময়ের মধ্যে বদলায়, সামাজিক রীতিনীতি বদলাতে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। কারণ শিক্ষার ধারা ও রীতি সাধারণতঃ সমাজের শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজরা রাজকার্যাদি নবাবী আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিলেন। আরবী ফারসীর সমাদর তাই অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁরা এ-ভাষা বাতিল ক'রে দিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা যাঁরা আরবী ফারসী শিক্ষা করেছিলেন, তাঁদের সব শিক্ষাই প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন ক'রে তাঁদের মনোযোগ দিয়ে ইংরেজী শিখতে হ'ল। এই প্রসঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন: "বহু যত্নের ও পরিশ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।"(৪)

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের এই উক্তির সামাজিক তাৎপর্য লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন যে, বিদ্বান ব'লে যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তা নির্মূল হয়ে গেল। এটা ঐতিহাসিক উক্তি। পূর্বে লোকসমাজে তাঁরাই বিদ্বান ব'লে গণ্য হতেন, যাঁরা আরবী-ফারসী শিখে নবাব সরকারে রাজকার্যের যোগ্যতা অর্জন করবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইংরেজ আমলে সমাজে যে পরিবর্তনের সূচনা হ'ল, তাতে 'বিদ্বান' কথার সংজ্ঞাও বদলে যেতে লাগল। সামান্য ইংরেজী শিখে যাঁরা ইংরেজী বুলি কপচাতে শিখলেন, তাঁরাও বিদ্বান ব'লে গণ্য হ'তে লাগলেন এবং আরবী-ফারসীবিদ্ মৌলবী-মুন্সীরা, সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা ধীরে ধীরে বিদ্বানের খ্যাতি হারাতে আরম্ভ করলেন। শিক্ষার ও বিদ্যার ধারা পরিবর্তনের ফলে, কলকতা শহরে নতুন যে বিদ্বৎসমাজ গ'ড়ে উঠতে লাগল, তার মধ্যে সেকালের পণ্ডিতেরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে ক্রমে যেন একঘরে হয়ে গেলেন। বিদ্বৎসমাজের মধ্যেই তাঁরা রইলেন, কিন্তু যেন অনেকটা বিচ্ছিন্ন ও একঘরে হয়ে রইলেন।

---

(৩) S. D. Collet: Life and Letters of Raja Rammohan Roy (Calcutta 1913): P. 8. রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে কোলেট লিখেছেন: "...he only began to learn English in 1796, and had not obtained much proficiency in it by 1801."

(৪) আত্মজীবনচরিত: ৩৪ পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, নতুন কলকাতা মহানগরে যে বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, তা প্রধানতঃ সেকালের পণ্ডিত ও মুনশী-মৌলবীদের নিয়ে। এছাড়া ইংরেজদের যে বিদ্যাসমাজ ছিল তখন, তার সঙ্গে এদেশীয় বিদ্যাসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না। 'এসিয়াতিক সোসাইটির' প্রথম যুগের ইতিহাসেই তার প্রমাণ রয়েছে। (৫) সংস্কৃত ও ফারসী বিদ্যার চর্চা তখন কলকাতা শহরে পূর্ণোদ্যমে হ'ত এবং মৌলবী ও পণ্ডিতেরা শিক্ষকতা ক'রে অর্থও উপার্জন করতেন স্বচ্ছন্দে। কলকাতার আশেপাশে, নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর কাঞ্চনগর হালিশহর ভাটপাড়া হরিনাভি চাংড়িপোতা জয়নগর-মজিলপুর, হাওড়া হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি নানাস্থানে যে সব পণ্ডিতবংশের বাস ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে টোলচতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনার দ্বারা জীবিকা-অর্জন করবার জন্য কলকাতা শহরে এসেছিলেন। কলকাতার নতুন ধনিকবংশের কুলপুরোহিত ও সভাপণ্ডিত হয়েও অনেকে এসেছিলেন। পাদ্রি ওয়ার্ড সাহেব তাঁর গ্রন্থের অধ্যাপকদের তালিকায় কলকাতার আটাশ জন পণ্ডিতের নাম দিয়েছেন। তাঁদের টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন।(৬) এই তালিকা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত সে-সময় কলকাতাতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিৎপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে চিৎপুর অঞ্চলে অধ্যাপক রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারীটের (হাওড়া) ভট্টাচার্য-বংশীয় ঠাকুরদাস চূড়ামণির বিখ্যাত টোল ছিল হাতীবাগানে। স্বনামধন্য মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ঠাকুরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। হাতীবাগানে হরচন্দ্র তর্কভূষণের একটি চতুষ্পাঠী ছিল। হরিনাভির (২৪ পরগণা) ভট্টাচার্যবংশীয় রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারের আড়পুলিতে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। হরিনাভির রামদাস তর্করত্নের টোল ছিল 'এন্টনগরের শিমুল্যগ্রামে' (শিমলের)। বড়বাজারবাসী বিশ্বনাথ মতিলালের পোষকতায় পণ্ডিত শ্রীধর শিরোমণি 'মলঙ্গাধামে' (মলাঙ্গা) একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সোম প্রকাশ সম্পাদক, ঈশ্বরচন্দ্রের সহকর্মী বন্ধু, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কলকাতার কাঁসারিপাড়াতে তাঁর টোল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী ও বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতি রাজপুর গ্রাম (হরিনাভি ও রাজপুর পাশাপাশি গ্রাম) ছেড়ে কলকাতায় এসে ঠনঠনেয় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন : "আমার পিতা রাজপুরের অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া ঠন্ঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎভাগে দেবী ঘোষের ভূমিতে কর্ণওয়ালিস রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, কলিকাতার অধ্যাপক (অর্থাৎ ছাত্রশূন্য অধ্যাপক) হইলেন। মাসিক ৷৹ আট আনা করিয়া ঐ জায়গার খাজনা দিতে হইত। তখন কিঞ্চিদধিক বিদায় পাইতেন, তাহাতেই ঐ বৃহৎ গোষ্ঠীর ভরণপোষণ অতিকষ্টে নির্ব্বাহ হইত।" (৭) ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট-জ্ঞাতি সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার সম্ভবতঃ কলকাতায় চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস এই ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে, প্রথম কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এরকম আরও অনেক পণ্ডিতের টোল-চতুষ্পাঠী কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কলকাতা শহরের নতুন ধনিকবংশের অনেক পণ্ডিত সভাপণ্ডিতরূপে প্রতিপালিত হতেন। শোভাবাজারের রাজপরিবারে, ঠাকুর-পরিবারে, মল্লিক-পরিবারে, বিখ্যাত সব পণ্ডিতদের সমাবেশ হ'ত। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উপস্থিত থাকতেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী কলকাতায় (চিৎপুরে) যখন হিন্দু কলেজের প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধন-সভায় শহরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণালে' তাঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, শোভাশাস্ত্রী রামতুলাল তর্কচূড়ামণি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ শোভানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। (৮) বোঝা যায়, এঁরা সেকালের কলকাতার বিদ্বৎসমাজের অগ্রগণ্য ছিলেন। এই সব সভাপণ্ডিত কুলপুরোহিত, টোলচতুষ্পাঠীর অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়াও, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরাও তখন কলকাতায় থাকতেন। কলকাতার তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজ প্রধানতঃ এই পণ্ডিতদের নিয়েই গঠিত ছিল। ইংরেজ আমলের নতুন বিদ্বৎসমাজ গ'ড়ে উঠতে আরম্ভ করে, দু'চারটি ফিরিঙ্গীদের (শেরবোর্ণ, ড্রামণ্ড প্রভৃতির) ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এবং বিশেষ ক'রে হিন্দু কলেজের উদ্বোধনের পর। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে।

চাকরিবাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজরা ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ইংরেজী না জানলে ইংরেজদের সান্নিধ্যেতে আসা যায় না এবং ইংরেজদের সান্নিধ্যে না এলে কলকাতা শহরের নতুন সামাজিক আভিজাত্যের সিঁড়ির উচ্চ ধাপে ওঠাও সম্ভব নয়। সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সন্তানেরা তাই গুরু মুন্শী বজায় রেখেও, ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করলেন। এই সময়কার প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ব্যঙ্গচিত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাবুর উপাখ্যান" ও "নববাবুবিলাসের" মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গচিত্রে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও, সামাজিক সত্যও তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রথমে গুরুমহাশয় নিযুক্ত ক'রে বালকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। অক্ষর লেখার পর "কৃষ্ণরাম গোবিন্দ

---

(৫) Researches of Asiatic Society (1784—1883) গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা "এসিয়াতিক সোসাইটির" ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৬) Rev. W. Ward : A View of the History, Literature and Mythology of the Hindos (3rd ed. 1820), Vol IV দ্রষ্টব্য।

(৭) গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলিকাতা ১৯০১) : ৬ পৃষ্ঠা

(৮) The Calcutta Monthly Journal : January 27, 1817, Vol 30, No 267.

নারায়ণ বাসুদেব ইত্যাদি" নামাভ্যাস করানো হয়। তারপর অঙ্কশিক্ষা—"কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌউকে নামতা পর্য্যন্ত।" অঙ্ক শিক্ষা শেষ হ'লে "কদলীপত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি প্রভৃতি" শেখানো হয়। গুরুমহাশয়ের পর মুন্সী নিযুক্ত হন। "অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্তি করিলেন, গোলেস্তাঁ। বোস্তাঁ। আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন।" গুরু ও মুনশীর পর সাহেব মাষ্টারের পালা। "ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিংকস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন।" অবশেষে কোন জন সাহেবকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সাহেবের কাছে শিক্ষা পেয়ে উদীয়মান বাবু "গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটেহেল এইরূপ কতকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই-একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন।"(১)

শিক্ষাক্ষেত্রে এ যেন ভারতবর্ষের তিনটি ঐতিহাসিক যুগের মহামিলন বা ত্রিবেণী সঙ্গম, হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও ইংরেজ যুগের। তবে প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে নয়, বদ্ধ কূপের মধ্যে। গুরুমহাশয় প্রাচীন হিন্দু যুগের প্রতীক, মুন্সী মুসলমান যুগের এবং আরাতুন পিংকস; জন সাহেব ইত্যাদি ইংরেজ যুগের। ক্রমে গুরুমহাশয় ও মুনশীরা বিদায় নিতে লাগলেন এবং জনসাহেবদেরই জয় হ'তে লাগল। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে 'বাবুর উপাখ্যান' মূল ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যবর্তী 'ইণ্টারল্যুড' ছাড়া কিছু নয়। এই ইণ্টারল্যুডের অভিনয়কালেই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস কলকাতা শহরে এসেছিলেন জীবিকার অন্বেষণে। পিতার শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাই স্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন: "এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল।" ঈশ্বরচন্দ্রের যখন কলকাতায় আসার কথা হ'ল, তখন ইংরেজীর শিক্ষার অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দশ বছরের বেশী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু হিন্দু কলেজ নয়, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হেদুয়ায় ইংরেজী স্কুল, ভবানীপুরের জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় থেকে, যাঁরা ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, তাঁরাই হয়েছিলেন নবযুগের শিক্ষকশ্রেণী। তাঁরা "গো-টেহেল বেরিগুডের" যুগের ইংরেজীবিদ্ ছিলেন না, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষাপ্রসঙ্গে "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় এই সময় (১৮২৯ সালে) যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তাতে শিক্ষার এই ধারাবদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তার ভাষা এই:

> "গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য। ইহার পূর্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিগিরিদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে।"... (সমাচার দর্পণ, ৭ মার্চ ১৮২৯)

এই সব বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা পাচ্ছিলেন, তাঁরাই কলকাতা শহরে নবযুগের নতুন বিদ্বৎসমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার এক নতুন পর্বের সূত্রপাত হচ্ছিল তখন। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার পাঠও সাঙ্গ হ'ল। বয়স হ'ল তাঁর আট বছর! গুরুমহাশয় কালীকান্ত কলকাতায় যাবার কথা প্রস্তাব করলেন।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতিসার রোগে কিছুদিন ভুগে, ছিয়াত্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখতে রামজয় একবার কলকাতা শহরে এসেছিলেন। নতুন মহানগরের নির্মম পরিবেশে কিশোর পুত্রের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনী শুনে, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটানিবাসী ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর আশ্রয়ে তিনি ঠাকুরদাসকে রেখে বীরসিংহে ফিরে গিয়েছিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটার সেই সিংহমহাশয়ের বাড়ীতে পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের ঐতিহাসিক কাহিনী শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

পিতৃকৃত্য সমাপনের জন্য ঠাকুরদাস কলকাতা থেকে বীরসিংহে যান। কলকাতাই ছিল কর্মস্থল, তাই বীরসিংহে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইত না। পিতৃকৃত্য শেষ ক'রে তিনি কলকাতায় ফিরে আসবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন স্থির করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন: "তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম।" ইংরেজী ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন।

গ্রামের উৎসব পার্বণ তখন প্রায় একরকম সব শেষ হয়ে গেছে। ঢাকঢোল সব নিস্তব্ধ। গ্রাম্য বালকবন্ধুদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কল্পিত কলকাতা শহরের আলাপ-আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবৃদ্ধদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, পাঁজিপুঁথি দেখে, কলকাতা যাত্রার শুভ দিনক্ষণও স্থির হয়েছে নিশ্চয়।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা যাত্রা করা তখন দূর দেশান্তরে যাত্রা করার মতন ছিল। দুশ্চিন্তায় ভগবতী দেবী ও দুর্গা দেবী কত বিনিদ্র রাত্রি যে কাটিয়েছেন তার ঠিক নেই। তখন রেলপথ

একমাত্র হাঁটাপথ, অথবা নদীপথ। নৌকায় নদীপথে যাওয়া যায়। বীরসিংহ থেকে ঘাটাল এসে, নদীপথে নৌকায় রূপনারায়ণ দিয়ে গঙ্গায় প'ড়ে কলকাতার ঘাটে এসে ওঠা যায়। কিন্তু নদীপথে তখন বিপদ-আপদের ভয় বেশী। নৌকাডুবির ভয় নয়, ডাকাতের হাতে লুঠপাটের ভয়, প্রাণহানির ভয়। যাত্রীরা তাই সব সময় নদীপথে দলবেঁধে, একাধিক নৌকার বহর নিয়ে, যাত্রা করতেন। যাত্রা বলতে অবশ্য তখন ছিল বাণিজ্যযাত্রা, আর তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রা যাঁরা করতেন তাঁরা ইহলোক থেকে পরলোকে যাত্রা করছেন, এই মনে করেই বাড়ী থেকে বেরুতেন। ঠ্যাঙাড়ে বা ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে কি না যাবে, সে চিন্তায় তাঁরা কাতর হতেন না। তীর্থের টানে প্রাণের টান ও সংসারের টান সব ছিন্ন ক'রে দিয়ে, জোয়ারের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিতেন। বাণিজ্যযাত্রা যাঁরা করতেন, সঙ্গে তাঁদের রক্ষীদল থাকত। ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের আড্ডা-আস্তানা তাঁরা সব জানতেন। তাদের হাতে রাখার কৌশলও তাঁরা জানতেন। হয় ভেট দিতেন, না হয় রাতের অন্ধকারে সেই সব আড্ডামুখো নৌকা ভেড়াতেন না। এই ভাবে তাঁদের বাণিজ্যযাত্রা চলত।

ডাকাতির উপদ্রব তখন বাংলাদেশে খুব প্রবল হয়েছিল। ইংরেজরা প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের গড়নটিকে ভেঙে দিয়ে যখন নতুন কোন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলেন না এবং সমাজের নির্দিষ্ট বংশানুক্রমিক পেশাগত স্তর থেকে উৎখাত লোকগুলিকে যখন অন্য কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের মধ্যে আত্মসাৎ করতে অক্ষম হলেন, তখন সমাজ ও পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষ কতকটা যাযাবর জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু কেবল যাযাবর-বৃত্তিতেও জীবনধারণ করা যায় না। তাই তাদের নতুন সামাজিক পেশা হ'ল অসামাজিক দস্যুবৃত্তি। বড় বড় ডাকাতের দল গ'ড়ে উঠলো বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় জেলায়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, সব জায়গায়। নদীপথে তাদের দৌরাত্ম্য বাড়ল সবচেয়ে বেশী। নদীর তীরবর্তী নানাস্থানে ডাকাতের সব আড্ডা গ'ড়ে উঠলো এবং বিখ্যাত সব ডাকাতে কালীর প্রতিষ্ঠা হ'ল। অবাধ্য আসামীদের নরবলি দিয়ে ডাকাতেরা শক্তির উৎসব করত বীভৎসভাবে। দামোদর, রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর তীরবর্তী বহু গ্রামে আজও এরকম অনেক ডাকাতের আস্তানার কথা ও ডাকাতে কালীর নরবলির রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়।'

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের এই যাত্রাপথ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এই পথের সমকালীন একটি বিবরণ পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রে। বিবরণটি এই (১০):

"কলিকাতা এবং তৎ উত্তরোত্তরাঞ্চল হইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান সকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা হেমোয়ানি প্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোক সকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তাহার বিলম্বেরও সম্ভাবনা......" (সমাচার দর্পণ, ৪ জুলাই ১৮২১)

উলুবেড়িয়া থেকে মহেশডাঙ্গা পর্য্যন্ত খাল-কাটা উপলক্ষে এই পথের বর্ণনা দেওয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতা যাত্রা করেন, উলুবেড়িয়ার এই খাল দিয়ে তখন নৌকা যাতায়াত করত এবং প্রতি নৌকায় একদফে দু'আনা কর আদায় করা হ'ত। তাতে হেমোহনার ভয়াবহতা অনেক দূর হয়েছিল, যাত্রীরা নতুন খালপথে যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু কোম্পানীর কাটা খালের জন্য ডাকাতের উপদ্রব কমেনি। বরং নতুন খালের পথে আরও দু'চারটে ডাকাতে আস্তানা গজিয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রার পূর্বে তাই অনেক ভেবেচিন্তে পথ বেছে নিতে হয়েছিল, নদীপথ ও হাঁটাপথের মধ্যে মহানগর অভিমুখী একটি কোন পথ।

তীর্থযাত্রী বা বাণিজ্যযাত্রী কোনটাই ঈশ্বরচন্দ্র ন'ন। মহানগরও নবযুগের তীর্থ বটে, কিন্তু ধার্মিকদের তীর্থ নয়। নতুন জীবনাদর্শের তীর্থ, নতুন জ্ঞানাবস্থার তীর্থ কলকাতা। সেদিক দিয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রও তীর্থযাত্রী। কিন্তু তাঁরা পুণ্য-বা-মুনাফা লোভাতুর ন'ন ব'লে, ঠাকুরদাস হাঁটা পথই বেছে নিলেন। সাধারণ মানুষ হাঁটা পথেই যাতায়াত করত বেশী। হাঁটা পথও তেমনি দুর্গম পথ। বীরসিংহ থেকে বেরিয়ে, ঘাটাল হয়ে, আরামবাগের ভিতর দিয়ে, পুরাতন বারাণসী রাস্তা ধ'রে, চাঁপাডাঙ্গা শিয়াখালার উপর দিয়ে সালিখার ঘাট পর্যন্ত—পথ! পথের উপর নদীনালার অন্ত নেই! শিলাই, দ্বারকেশ্বর, কানা দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর সব পার হয়ে, অবশেষে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষস্পর্শ ক'রে মহানগরতীর্থ কলকাতায় পৌঁছতে হয়! যাতায়াতের পথে আশ্রয়স্থল হ'ল আত্মীয় স্বজনের বাড়ী অথবা চটি বা সরাইখানা। পথের উপর পাতুলগ্রামে ঠাকুরদাসের মামাশ্বশুর বাড়ী, সন্ধিপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী, একটু উত্তরে তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে এক ভগিনীর বাড়ীতে বিশ্রাম নেবার সুবিধা ছিল। আট বছরের বালককে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রায় চল্লিশ মাইল পথ, বিশ্রামের ভাল স্থান থাকার দরকার পথের উপর। সব দিক চিন্তা ক'রে এই হাঁটা পথেই কলকাতা যাত্রা করা হবে স্থির হ'ল।

যাত্রার শুভদিনে সূর্য উঠল। ঈশ্বরচন্দ্র ঘুম থেকে উঠলেন। দুর্গা দেবী ও ভগবতী দেবীর নিশ্চিন্তে ঘুম হবার কথা নয়। শেষ রাত্রে থেকে উঠে তাঁরা পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে দিচ্ছিলেন নিশ্চয়। বাইরে গ্রামের লোক দু' একজন ক'রে এসে অনেকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রীও নিশ্চয় ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে এসেছিলেন, বালকের দুষ্টুমিতে যত বিরক্তই তাঁরা হ'ন না কেন, আজ আর সেই বিরক্তি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি তাঁদের স্নেহ-ভালবাসাটুকু তাঁরা ঢেকে রাখতে পারলেন না। দুষ্টু ঈশ্বরের জন্য গ্রাম্য বধূদের অকৃত্রিম চোখের জল ঝ'রে পড়ল। কপাটি ও কুস্তী খেলার

---

(১০) "সমাচারদর্পণ" পত্রিকার সংবাদগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" দুই খণ্ড থেকে গৃহীত। বিহারীলাল সরকার তাঁর "বিদ্যাসাগর" জীবনচরিতে লিখেছেন: "তখন জলপথ বড় সুগম ছিল না। উলুবেড়ের নূতন খালও তখন কাটা হয় নাই" (৩য় সংস্করণ, ৩৭ পৃষ্ঠা)। এ উক্তি ভুল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন কলকাতা যাত্রা করেন, তখন উলুবেড়িয়ার খাল সবেমাত্র কাটা হয়েছে

নিত্য সঙ্গীরা 'কলকাতা কোথায়, কত দূরে' ভেবে, ঈশ্বরের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। জননী ও পিতামহীর চোখের জলে যাত্রাপূর্বের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি শেষ হ'ল।

শুরু হল যাত্রা। মহানগরের পথে।

সহযাত্রী হলেন পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকান্ত ও ভৃত্য আনন্দরাম গুটি। দীর্ঘ পথ চলতে যদি আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ক্লান্তি আসে, যদি ছোট ছোট পা দু'খানা আর কিছুতেই না চলতে চায়, তাহ'লে গুটির কাঁধে চ'ড়ে তিনি কলকাতায় যাবেন। আনন্দরামকে তাই সঙ্গে নিলেন ঠাকুরদাস।

গ্রাম্য পথের বাঁকে ঈশ্বর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বীরসিংহ গ্রামের সিংহশিশু গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেল। পড়ে রইল শুধু গ্রাম। বাংলার শতসহস্র গ্রামের মতন নিস্পন্দ প্রাণহীন গ্রাম। গ্রাম্য শূন্যতা যেন বিষণ্ণতাকে আরও তীব্র ক'রে তুলল।

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চললেন পথের উপর দিয়ে। মহানগরের পথ। জীবনের চলার পথে প্রথম পদধ্বনি। কত পথ, আরও কত দুর্গম ভয়াবহ পথ তাঁকে চলতে হবে! তখন সঙ্গী থাকবে না কেউ। পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকান্ত ভৃত্য আনন্দরাম, কেউই সঙ্গী থাকবে না তখন। অনেক পথ একাকীই চলতে হবে।

মহানগর কলকাতার কথা মধ্যে মধ্যে চলার পথে মনে পড়ছে। বীরসিংহ গ্রাম নয়, পাতুলও নয়, কলকাতা শহর। না জানি, কি রকম শহর!

Stadtluft mach freit !

খুব প্রাচীন একটি জার্মান প্রবাদ: ইয়োরোপের লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। অর্থ হ'ল; 'Town air makes a man free! "নগরের হাওয়ায় মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়।" কথাটা ঠিক। কেবল ঠিক নয়, খুব বড় কথা। ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। নাগরিক পরিবেশে মানুষ প্রথম তার ব্যক্তিজীবনের মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে।

কলকাতা যাত্রা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রা নয়। সুতানুটি গোবিন্দপুরের সংলগ্ন একটি নগণ্য গ্রামও নয় কলকাতা। কলকাতা এখন নতুন শহর, নবযুগের বর্ধিষ্ণু মহানগর। তার পরিবেশ ভিন্ন। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। গ্রামের সীমানা আছে, শহরেরও আছে, কিন্তু সেটা ভৌগোলিক সীমানা। শহরের আর কোন সীমানা নেই। জীবনের সীমানা, মনের সীমানা, কিছুই নেই সেখানে। গ্রাম্যসমাজে স্বাতন্ত্র্য সীমাবদ্ধ, নাগরিক সমাজে স্বাতন্ত্র্য সীমাহীন।

একালের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি যদি সেকালে প্রচলিত থাকত, তাহ'লে বড় বড় বৈদ্যুতিক অক্ষরে ভাগীরথীর পূর্বতীরে কোথাও লেখা থাকত হয়ত:

কলকাতা শহরে এস, স্বাধীন হও!

গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রা তাই ঐতিহাসিক যাত্রা। পুরাতনকে ছেড়ে নতুনের পথে যাত্রা! সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে উদারতার পথে যাত্রা!

কিন্তু সেই বহুকালের পুরাতন বারাণসী পথ দিয়ে যাত্রা ও অহল্যাবাই রোড, পুরাতন বারাণসী তীর্থযাত্রীর পথ! সেই ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চলেছেন জীবনের নতুন পথে, কলকাতা অভিমুখে। ইতিহাসের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট।

পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করে ইতিহাসে নতুনের বি হয় না। নতুন যুগেরও নয়, নতুন সত্যেরও নয়। ধারাবাহিক ইতিহাসের ধর্ম। সেই ধারার উত্থানপতন আছে। এক একঘেয়ে তার ছন্দ নয়, তরঙ্গ নয়। সবই ঠিক। কিন্তু মূল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন অভাবনীয় নতুন ধারায় ইতি এগিয়ে চলেনা, চলে নি কোন দিন।

বারাণসী তীর্থযাত্রীদের পুরাতন পথের উপর চলতে চ বালক ঈশ্বরচন্দ্র এত কথা তখনও চিন্তা করার অবকাশ পান তবু মনে হয়, ইতিহাস যেন তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই ঐতিহা পথের পথিক করেছিল। নবযুগের নতুন পথের অন্যতম পথি প্রাচীন পথের উপর দিয়েই তাঁর নতুনের যাত্রা শুরু করেছিলেন।

পথের উপর খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে পাতুল গ্রাম। জন মাতুলালয়। ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যা ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন। অসুখবিসুখ করলে তিনি বীরসিংহে গিয়ে নাতিটিকে নিয়ে আসতেন পাতুলে। পাতুলের বিদ্যাভূষণ-পরিবারের স্নেহ-শুশ্রূষায় ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের বহ পরম নিশ্চিন্তে ও আনন্দে কেটেছে। কলকাতা যাত্রার পথে পা বিশ্রাম না করলে, ঈশ্বরের শান্তি হবে না, ঠাকুরদাস জানে তাছাড়া, রাধামোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ঈশ্বরের পক্ষে কলকাতা যাওয়াও শোভন নয়।

পাতুলে একদিন অবস্থান করে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভিন্ন অন্ত এক আত্মীয়ের বাড়ী ঠাকুরদাস তাঁর পুত্র ও সঙ্গীদের উঠলেন। সেখান থেকে পরদিন শিয়াখালা-সালিখার বাঁধা দিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বাঁধা পথে এক মাইল অন্তর পাথরের মাইলষ্টোন পোঁতা থ পথের ধারে ধারে মাইলষ্টোনের এরকম দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পথে কোনদিন দেখেনি। কৌতূহলী মনে তাঁর প্রশ্ন জাগল, ধারে এগুলো কি বস্তু? দেখিনি তো কোনদিন? পিত প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল।

পুত্র। বাবা, রাস্তায় ধারে বাটনাবাটা শিল পোঁতা কেন?

পিতা। বাটনাবাটা শিল নয় বাবা, এগুলোকে 'মাইলষ্টোন।'

পুত্র। সেটা আবার কি? ঠিক তো শিলের দেখতে। মা তো এই রকম শিলের উপর বাটনা বাটন দে

পিতা। 'মাইলষ্টোন' ইংরেজী কথা। দু'ম এক ক্রোশ হয়, এক মাইলে আধ ক্রোশ। 'ষ্টোন' মানে প এক মাইল বা আধ ক্রোশ পথ অন্তর এরকম এক একটি পুঁতে দিয়ে দূরত্ব জানানো হয় বলে, এর নাম 'মাইলষ্টোন'

পুত্র। বুঝেছি। তাহ'লে এর উপর এক, দুই, তিন, সব লেখা আছে নিশ্চয় ?

পিতা। সব লেখা আছে। যেমন, সামনের এই পাথরটার গায়ে ইংরেজীতে লেখা আছে 'উনিশ'। অর্থাৎ বাঁধা পথে উনিশ মাইল বা সাড়ে নয় ক্রোশ পথ আরও চলতে হবে।

পুত্র। 'উনিশ' লেখা আছে? একের পিঠে নয় তো উনিশ?

পিতা। নামতায় পড়েছ তো? একের পিঠে নয় উনিশ, ঠিক বলেছ।

পুত্র। (অক্ষরের গায়ে হাত বুলিয়ে) তাহ'লে এই অক্ষরটা তো ইংরেজীর 'এক', আর এর পিঠে এই যে অক্ষরটা, এইটাই তো 'নয়'?

পিতা। হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছ।

পুত্র। তাহ'লে এর পর আঠার, সতের, ষোল, এই ভাবে এক পর্যন্ত লেখা পাথর দেখতে পাব তো?

পিতা। হ্যাঁ পাবে, তবে যে পাথরটায় 'এক' লেখা আছে, সেখান দিয়ে আমরা আজ যাব না। 'দুই' পর্যন্ত যাব, তার পর সেঁকে গিয়ে অন্য পথ দিয়ে গঙ্গার ঘাটে উঠবো। যদি সেটা দেখতে চাও, আর একদিন দেখাবো।

পুত্র। দেখার আর দরকার কি? 'এক' তো দেখেছি, চিনে নিয়েছি। নয়ের পর থেকে দুই পর্যন্ত দেখলেই তো সব ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর চেনা হয়ে যাবে।

পিতা। তা যাবে, কিন্তু চলতে চলতে ঠিক চিনে নিয়ে মনে রাখতে পারবে?

পুত্র। হ্যাঁ পারব, তুমি দেখো!

গুরুমহাশয় কালীকান্ত উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সব কথা। ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা শুরু হ'ল, বিনা গুরু সাহায্যে, শিয়াখালা-সালখের বাঁধারাস্তায়।

ঠাকুরদাস বললেন, "পরীক্ষা করব, কেমন শিখেছ।" গুরুমহাশয়ও প্রস্তুত হলেন পরীক্ষা করবার জন্য। আনন্দরাম উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। যতক্ষণ একের পিঠের উপর অন্য অঙ্কগুলি ছিল, ততক্ষণ আঠারোর পর সতের হবে, সতেরর পর ষোল হবে, এই ভাবে হিসেব ক'রে যে ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষরগুলি না চিনেও আন্দাজে বলতে পারেন, এ কথা ঠাকুরদাসের ও গুরুমহাশয়ের মনে হ'ল। তাই যখন একের পিঠটি স'রে গেল, কেবল অক্ষরগুলি পৃষ্ঠাশ্রয়হীন হয়ে সামনে দাঁড়াল একে-একে, তখন মধ্যের ষষ্ঠ মাইলের অক্ষরটি ইচ্ছা ক'রে বাদ দিয়ে, পঞ্চম মাইলের অক্ষরটি দেখিয়ে, ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি অক্ষর বল?

মধ্যের ছয় অক্ষরটি ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে পাননি। পিতা তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন। একে তো একের পিঠটি নেই, তার উপর কৌশলে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে মধ্যের পাথরটিকে। ডবল পরীক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন: "এটা ছয় হবে বাবা, কিন্তু ভুল ক'রে পাঁচ লিখেছে কেন?"

পরীক্ষায় পাশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। চলার পথে চলতে চলতে পরীক্ষা, গ্রাম্য বালকের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

উত্তর শুনে সকলেই খুব খুশী হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন:

(১১) "এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন, তিনি আমার চিবুক ধরিয়া, 'বেশ বাবা বেশ', এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।"

আনন্দরাম গুটির আনন্দের কথা কেউ বলেননি। পিতাও নয়, গুরুমহাশয়ও নয়, গ্রাম্য-ভৃত্য আনন্দরাম। পিতার মতন স্নেহ যার ঈশ্বরের প্রতি, পথের এই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করাতে তার আনন্দ হয়নি, এ কখন হ'তে পারে না। পথের মধ্যে হয়ত আনন্দ প্রকাশ করেনি আনন্দরাম। সব আনন্দ তার প্রকাশের অপেক্ষা ক'রেছিল বীরসিংহ ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।

প্রথমে সে বীরসিংহ ফিরে ঈশ্বরের মা ঠাকুমার কাছে এই বাটনাবাটা শিলের গল্প বলবে। তারপর ধর্মতলার মণ্ডপটিতে জাঁকিয়ে ব'সে গ্রামের বারোজনের কাছে ঈশ্বরের প্রতিভার কথা সগর্বে শোনাবে।

উনিশ মাইল লেখা মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন। পঞ্চম মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অর্থাৎ সালখের বাঁধা রাস্তায় চৌদ্দ মাইল পথ হাঁটা হয়েছে। আট বছরের বালকের পক্ষে একটানা চৌদ্দ মাইল পথ হাঁটার ক্লান্তি ও কষ্ট যে কতখানি হ'তে পারে, তা কারও মনে নেই।

পথ চলার ক্লান্তিতে যখন বালক ঈশ্বরের দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন পিতা ঠাকুরদাস বা গুরুমহাশয় কালীকান্ত "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের" রাজপুত্র রোহিতের সেই পথচলার গল্পটি বলেছিলেন কি না জানি না। রাজপুত্র রোহিত যখন দীর্ঘকাল পথ চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরমুখো চলেছেন, তখন ব্রাহ্মণবেশী দেবতা ইন্দ্র তাঁকে বলেন:

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদবরো জন: ইন্দ্র ইচ্চরত: সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

"হে রোহিত! চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে সে নীচ হ'তে থাকে। অতএব, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠত:।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগ:॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

---

(১১) মাইলস্টোনের কাহিনীটি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বরচিত জীবন-চরিতেও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কাহিনীটি মিথ্যা নয়, সত্য ঘটনা।

"যে বসে থাকে তার ভাগ্যও ব'সে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

"ঘুমিয়ে থাকাটাই হ'ল কলিকাল, জাগলেই হ'ল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই হ'ল ত্রেতা, আর এগিয়ে চলাই হ'ল সত্যযুগ। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।"

ঈশ্বরচন্দ্র রাজপুত্র রোহিত হ'ন। রোহিতের মতন তিনিও যেন শুনেছিলেন—"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি ঈশ্বর শুশ্রুম।" ঈশ্বর! চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার শ্রীর অন্ত নেই, এই কথা চিরদিন শুনেছি! ঈশ্বর শুনেছিলেন, "সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্"—"চেয়ে দেখ ঐ সূর্য্যের দিকে, যে সৃষ্টির আদি থেকে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি।" অতএব হে ঈশ্বর এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!

বাঁধাপথের শেষ হ'ল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের ঘাটের ধারে। সামনে ভাগীরথীর পূর্বতীরে, ভোরের সূর্যের মতন কলকাতা মহানগর বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। পথচলার প্রথম পর্ব শেষ হ'ল।

[ক্রমশঃ

দমদম-বুলেটের জন্মকথা

বুলেট, সে যে কোন ধরণেরই হউক, নিশ্চয়ই মারাত্মক। তবে এদিক থেকে দমদম বুলেটের স্থান হয়ত সকলের উপরে। গঠনগত পার্থক্য থেকেই প্রকৃতি বা গুণগত ভীষণতা বেড়ে যায় এব অনেকখানি। ভারতে ইংরেজ শাসন আমলের এটিও একটি কালিমাপূর্ণ অবদান। এক কালে এ প্রচুর সন্ত্রাস বা বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, শুধু এ দেশেই নয়, এ দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের 'ঝড়' উঠেছিল সেদিন এর বিরুদ্ধে, এর নৃশংস বীভৎস রূপের বিরুদ্ধে, সে জন্যেই।

অতি মারাত্মক এ দমদম বুলেটের সৃষ্টির ইতিকথা পর্যালোচনা করতে হ'লে আমাদের চলে আসতে হ'বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে। সে সময় ইংরেজ সরকার ও তাহার চতুর সৈন্য-সামন্তরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে নিয়ে বড়ই বিব্রত। সীমান্তের উপজাতি হানাদারদের কিছুতেই বশে আনতে পারছিলেন না তাঁরা। তাঁদের অভিযান কালে তাঁরা চালালেন এমন কি তখনকার নামকরা 'মার্ক-২' কার্ত্তুজ বা বুলেট। কিন্তু এ নিতান্ত তুচ্ছ প্রমাণিত হয়ে যায় বিদ্রোহী উপজাতিদের কাছে। তারা হয়তো আঘাত পেল শরীরের এক যায়গায় নয়, বেশ কয়েক স্থানেই, কিন্তু আশ্চর্য্য, আবার তারা মুহূর্ত্ত মধ্যে লড়াই-এ এগিয়ে এলো। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তখন প্রমাদ গুণলেন, খুঁজতে সুরু করলেন এর একই নিশ্চিত উপায়ান্তর।

এমনি সঙ্কট মুহূর্ত্তে বৃটিশ মেজর জেনারেল টুইডুল এলেন এগিয়ে একটি নয়া বুলেটের পরিকল্পনা নিয়ে। এটি ঠিক ১৮৮৯ সালের কথা। টুইডুলের পরিকল্পনা ছিল—শীসের বুলেটের সূচালো অগ্রভাগে নিকেলের একটি পাতলা আবরণ থাকবে—আবরণটির গা হবে কাটা কাটা রকমের। পরিকল্পনাটি সরকার লুফে নিলেন, তখনকার মত পরীক্ষাও চাললেন এ নিয়ে অনেক। এটি 'মার্ক-৩' বুলেট নামে পরিচিত হ'ল, এ নমুনা বুলেটের একদম অগ্রভাগটি ছিল ফাঁকা। সরকার ভাবলেন এতেই তাঁদের কাজ হাসিল হ'বে—সীমান্তের দুঃসাহসী উপজাতিদের সায়েস্তা করতে ভাবতে হ'বে না। কিন্তু কার্য্যতঃ এ-ও অকেজো ও ব্যর্থ প্রমাণিত হল। বুলেটটি সংঘাতে সম্প্রসারিত হবে বলে যে সম্ভাবনা ছিল, বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেল, সেটা নিতান্তই ভুল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বর্জন করলেন এ শ্রেণীর বুলেট।

সাম্রাজ্যলিপ্সু দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ সরকার এখানেই কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না। সংঘাতে বুলেট যাতে সম্প্রসারিত হয়ে যায়, তার জন্যে গবেষণা চালালেন আবারও তাঁরা কঠিন ভাবে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা অবশ্য কৃতকার্য্যও হলেন—তাঁদের নবনির্ম্মিত বুলেটের অগ্রভাগে তাঁরা পূর্ব্বের ন্যায় শুধু একটি পাতলা নিকেল আবরণই জুড়ে দিলেন না, বুলেটটির সরু মুখে করে দিলেন একটি বিশেষ ধরণের ছিদ্র। সম্প্রসারণশীল হাল্কা আবরণটি চিরে চিরেও দেওয়া হ'ল লম্বালম্বি ভাবে। দেখা গেলো, কাজ এতেই হয়ে গেছে চমৎকার। সংঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বুলেট সম্প্রসারিত তো হ'লই—পরন্তু মানুষের দেহের যেখানেই এ প্রবেশের সুযোগ পেল—পচনশীল ক্ষত বিস্তার করল সেখানে দেখতে না দেখতে।

ইংরেজ সৈনিকের হাতের এই যে মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর বুলেট একটি তৈরী হয়, আসলে এ কলকাতারই নিকটবর্ত্তী দমদম সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানায়। সরকারী কাগজপত্র ও অস্ত্রতালিকায় এর পরিচয় যদিও লেখা হয় 'মার্ক—' বুলেট বলে কিন্তু বাইরে দমদম অস্ত্র কারখানায় তৈরী বিশেষ মারাত্মক বুলেটটি চলতি হয় দমদম বুলেট নামে বিদেশে সর্ব্বত্র। দমদম বুলেটই নিজেদের বহু-প্রতীক্ষিত দুর্দ্দান্ত বুলেট—এ দেখাবার জন্যে ইংরেজ পুলিশ ও সামরিক মহলে পড়ে গেল তাড়াহুড়া। সীমান্ত প্রদেশের অবাধ্য উপজাতিদের দমন ব্যাপারে এ তো লাগানই হ'ল—এমন কি, সুদানেও দেওয়া হ'ল চালান। ১৯০৪-৫ সালে যে রুশ-জাপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে এ নিষ্ঠুর বুলেট ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ উঠে। তখনই এর উপর সারা বিশ্বের সামরিক ও শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগী হয়ে যায়—প্রতিবাদ উঠল এর নির্ম্মম প্রয়োগের বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে। কিছু দিন বাদে দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে এই নিয়ে হঠাৎ তুমুল বিতর্ক ও আলোচনা হয়। এর পরই এক আন্তর্জাতিক ঘোষণা দ্বারা এই কুখ্যাত বুলেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় বরাবরের মতো।

মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর

[সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নীরব সাধক]

মনে পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই প্রথম পাদের কথা। যশোহর জেলার পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (কুশারী) এসে বাসা বাঁধলেন বর্তমান কেল্লার কাছ বরাবর গঙ্গার ধারে—জাহাজের খালাসীরা ধুতি ও উত্তরীয় পরিহিত এই বাঙালী ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর মশাই' বলে শ্রদ্ধা জানাল। ক্রমে এই কুশারী-ঠাকুরের বংশধরেরা 'ঠাকুর' নামেই পরিচিত হতে থাকলেন। সৃষ্টি হোল কলকাতার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নব জন্ম হোল বাঙলা দেশের—নতুন সমাজ চোখ মেলে চাইলো, নতুন জীবন প্রবেশ করল প্রাণে, নতুন করে আবার মানবতা জন্ম নিল। স্বর্গত হরকুমার ঠাকুরের দুই ছেলেই স্বনামধন্য পুরুষপ্রবর—জনগণের সেবায় বিদ্যোৎসাহিতা, শিল্প সাধনায় সঙ্গীতারাধনায় এঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। যতীন্দ্রমোহনের চারটি সন্তানই মেয়ে হওয়ায় ১৮৮২ সালের অনুজ সৌরীন্দ্রমোহনের ন'বছরের মেজ ছেলে প্রদ্যোতকুমারকে দত্তক গ্রহণ করলেন। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার বিলাতের রয়্যাল ফোটোগ্রাফী সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য (১৮৯৮ খৃঃ)। ভারতীয়দের মধ্যে এঁর পরেই এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন স্বর্গীয়- সুকুমার রায়। প্রদ্যোতকুমার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৯৩৪)। প্রদ্যোতকুমারের বিশ্ব-বিখ্যাত একটি শিল্পসংগ্রহশালা ছিল। বহু লক্ষ টাকা এর পিছনে তিনি ব্যয় করেন। প্রদ্যোতকুমার অপুত্রক ছিলেন, তিনি দত্তক গ্রহণ করলেন তাঁর অনুজ ৺কুমার শিবকুমার ঠাকুরের ছোট ছেলে প্রবীরেন্দ্রমোহনকে। এই আখ্যায়িকার নায়ক মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে।

কলকাতায় ১৩১৫ সালের ২১এ চৈত্র (এপ্রিল ১৯০৯) মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহনের জন্ম। মহারাজা কোন বিদ্যালয়ের পাঠ নেননি, বাড়ীতেই তাঁর সমস্ত শিক্ষা। বিদ্যালয়ের মতই দশটা-চারটে করে বাড়ীতেই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কাছে তিনি পাঠ নিয়েছেন। প্রথম অক্ষর-পরিচিত হোল মিস্ ম্যালবাসের কাছে ইনি 'প্রাসাদেই' থাকতেন, তার পর এলেন মিস্ শ্লেটার—তারপর এলেন মিঃ অটো পড়াশুনো ছাড়া ইনি শরীরবিদ্যা ও নৃবিদ্যা সম্বন্ধেও অনেক কিছু শিখেছেন এই জার্মাণ অটো সাহেবের কাছ থেকে। অটো সাহেবের পর মিঃ আর দত্ত এলেন সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠ দিতে। তারপর মিঃ ওয়াটসন্ সঙ্গীত সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর ইনি শিক্ষালাভ করেছেন ওয়াটসন সাহেবের কাছে। তারপর মিঃ বাকেন্‌হাম (বাকিংহাম নয়) পড়াশুনা ছাড়া কুমার প্রবীরেন্দ্রমোহনকে ইনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা গতানুগতিকতা।

সবার শেষে এলেন হেনরি উইলিয়ম বান মোরেনো—ইনি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। প্রথমে মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের একান্ত সচিব হিসেবে ইনি "প্রাসাদ"-এ আসেন ও পরে মহারাজকুমার প্রবীরেন্দ্র-মোহনের গৃহশিক্ষক হন। ডক্টর মোরেনো "ইতিহাস"-এ বিশেষ শিক্ষা দিলেন মহারাজকুমারকে। বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষাতেও প্রবীরেন্দ্রমোহনের দক্ষতা আছে, এই দু'টি বিষয়ে তাঁকে পাঠ দেন

৺বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত তারাচরণ ভট্টাচার্য, ১৯২১ সালে প্রবীরেন্দ্রমোহনের প্রাথমিক গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষার সমাপ্তি হোল ও সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে স্থলবসন্তপুরের বিখ্যাত পাকড়াশী বংশীয় ৺প্রিয়নাথ পাকড়াশী মহাশয়ের একমাত্র মেয়ে সুরীতি দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন মহারাজকুমার প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যে বংশের বধূ হয়ে বধূরাণী সুরীতি আবির্ভূতা হলেন সে বংশের পূর্ণ মর্যাদা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। সঙ্গীতপ্রীতি কলানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা প্রমুখ সব কটি সদ্গুণেরই অধিকারিণী মহারাণী সুরীতি ঠাকুর মহোদয়া।

প্রত্যহ পড়াশুনো ছাড়া ব্যায়ামও মহারাজকুমারের বাল্যজীবনের অবশ্য করণীয় কর্তব্য ছিল। বেঙ্গল ওয়েট লিফটিং অ্যাসোসিয়েশান ও পৃথিবীর নানা দেশের ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর

প্রবীরেন্দ্রমোহন এ-বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিতেন সেদিনের বিখ্যাত ব্যায়ামবীর পরলোকগত ডক্টর ওয়ালটার চিট্টুন।

এ ছাড়া জনগণের সঙ্গেও প্রবীরেন্দ্রমোহনের যোগ কম নয়। দ্বিতীয় কলকাতা বয়েজ স্কাউট য়্যাসোসিয়েশানের বিভাগীয় কমিশনার, মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর ব্রীটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশান, এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, বিলাতের রাজকীয় হর্টিকালচারাল সোসাইটি ও রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস্-এর ফেলো প্রভৃতি সম্মান পদগুলিরও ইনি অধিকারী। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনেরও সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে আছেন মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন।

মহারাজার বাসস্থান "প্রাসাদ"—প্রাসাদ-এর জন্ম ১৮৮৪ সালে। নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য, পৃথিবীটা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কৃতী সন্তানদের ব্যবহৃত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ এই প্রাসাদে—তাঁর প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিরাম নেই দেশী-বিদেশী দর্শকদের ভিড়ের। প্রাসাদের নাচঘরে, রিসেপশান্ রুমে ও অন্যান্য জায়গায় সাজানো আছে বিশ্ববন্দিত মনীষীদের স্মৃতিচিহ্ন। "প্রাসাদ"-এর তিন তলায় আছে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত একটি পারিবারিক গ্রন্থাগার। বিরাট একটি মহল জুড়ে রয়েছে এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার ব্যতীত এর মধ্যেও আছে একটি বিশ্রামাগার, একটি পাঠশালা ও একটি গ্রন্থাগারিকের কার্যালয়। অনূন তিরিশ হাজার গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থাগারে। প্রায় আটশ পাণ্ডুলিপি আছে তন্ত্র-পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যগুলির। ঐতিহাসিক নথিপত্রও আছে প্রায় দু'হাজার সে যুগের প্রত্যেকটি দিকপাল সাহিত্যিক (সকলের নাম সম্ভব নয়—কার নাম করতে কার নাম ভুল হয়ে যাবে এই ভয়) এই গ্রন্থাগারে এসে কাজ করে গেছেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে লিখিত সে দিনের সুধীবৃন্দের চিঠিও রয়েছে প্রচুর আর আছে জনগণ-বন্দিত সাহিত্য-সাধকের কত অমর রচনার পাণ্ডুলিপি!

ধনীর দুলাল মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে চাটুকারদের স্তব পাঠ শুনতে শুনতে বিলাসের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে জীবন কাটান নি—তিনি জীবন কাটিয়েছেন বা কাটাচ্ছেন পরিপূর্ণ সংযত ও সংযত জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে। তাঁর দিন কাটে সারাদিন নিজের বৈষয়িক কাজকর্ম দেখে—প্রত্যহ নিয়মমাফিক মহারাজা আপিসে বসেন তাঁর অবসর সময় পড়াশুনো করে ও নানা সুধীবৃন্দের সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ভিতর দিয়ে। ইতিহাস মহারাজার প্রিয় বিষয়। শেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ মহারাজার প্রিয়পাঠ্য। নানা দেশের নানা রকমের গ্রন্থ মহারাজার কণ্ঠস্থ—বিভিন্ন বিদ্যায় মহারাজের আছে দক্ষতা। চিকিৎসা ও আইনবিদ্যায় মহারাজের যথেষ্ট দক্ষতা আছে। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আপিসের পর মহারাজা দেশ বিদেশের সাহিত্যিকদের রচনা, নানা দেশের ইতিহাস, তার শাসনপ্রণালী রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজ-ব্যবস্থা শিক্ষা-ব্যবস্থা খুঁটিয়ে পড়েন। মহারাজার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি চলন-বলন প্রত্যেকটি আচার-ব্যবহার নিয়মমাফিক শৃঙ্খলাবদ্ধ—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সৌজন্যপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর।

পৃথিবীর একটি বিশিষ্ট পরিবারে মহারাজের জন্ম। আভিজাত্য তাঁর সর্বাবয়বে পরিস্ফুট, জ্ঞানের, রুচির, শিক্ষার ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁর মধ্যে নেই অহঙ্কার—নেই মদগর্বিতা, নেই আত্মপ্রচারণার প্রচেষ্টা। সদালাপী, মধুভাষী বন্ধু-বৎসল মহারাজার আননে সদাসর্বদা মাখানো থাকে এক স্নিগ্ধ হাসি। সাফল্যের যেন মূর্ত প্রতীক মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন।

আজ জমিদারী-উচ্ছেদের দিনে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য আমি জিজ্ঞাসা করি—তিনি বলেন—জমিদারদের এ বিষয়ে দুঃখ করার কারণ নেই, প্রজারাই আমাদের পুত্রবৎ, কোন্ বাপ-মা চায় না যে তাঁদের সন্তান সুখী হোক। সরকারের পরিচালনায় সত্যি যদি এরা সুখে থাকতে পায়, তার চেয়ে আর কি আনন্দ আমরা আশা করতে পারি!—দরদী জমিদার মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহনের সুযোগ্য উক্তিই বটে!

সাংবাদিকদের উপরে মহারাজা পোষণ করেন একটি গভীর সহানুভূতি ও একটি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা—তিনি বলেন, সাংবাদিকরা জাতির কণ্ঠ, তাঁদের লেখনীর মধ্যে দিয়েই ঝরে পড়ে কোটি কোটি জনগণের বক্তব্য—আজকের দিনে সাংবাদিকদের প্রতি তাঁদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

"বসুমতী" পাঠ করেন মহারাজা ও মহারাণী দু'জনেই—মহারাজাকে মুগ্ধ করে বসুমতীর পক্ষপাতহীন অথচ নির্ভীক জোরালো ও স্পষ্ট বক্তব্য।

ক্যাপ্টেন শ্রীকিরণ সেন

[অধুনালুপ্ত লেক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতের বিশিষ্ট চক্ষুবিশেষজ্ঞ]

চোখ বিরাট মানবদেহে একটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করে আছে দু'টি চোখ—এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর থেকে সে ছড়িয়ে পড়ে নিখিল বিশ্বে—ব্যাপ্তি তার সুদূর অসীমে, চেতনা তার প্রতিটি অণু পরমাণুতে, আর তার আনন্দ বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি এই রূপময় জগৎ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় এই দু'টি চোখ—কথা কয় না, গান গায় না, নির্বাক, নির্লিপ্ত, তবুও কথায়-গানে হাসিতে-কান্নায় আনন্দে অনুভূতিতে ভরিয়ে রেখেছে সারাটি বিশ্ব। এর আছে ব্যথা আছে বেদনা, আছে যন্ত্রণা—ক্রমে সেই সমস্ত যন্ত্রণা একত্রীভূত হলেই আসে শিথিলতা—ক্রমশঃই হিমের মত শীতল হতে থাকে তার পর এক দিন হয়ে যায় স্পন্দহীন শব্দহীন প্রাণহীন। ছোট দু'টি চোখ অবশ হওয়া মানেই সারা পৃথিবী অন্ধকার-পাখীর কলকাকলী শোনা যায়—প্রিয়ার প্রেমপূর্ণ স্পর্শ অনুভব করা যায়—চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোর রেখা দেহে এসে পড়ে, কিন্তু কিছু দেখে উপলব্ধি করা যায় না—দেখার আনন্দ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে।

এর জন্যে চাই চিকিৎসক—যে বিধান দেবে এর বিষয়ে যে রোধ করবে চক্ষুর অকালমৃত্যু, যে কিছুতেই চক্ষুকে বঞ্চিত হতে দেবে রূপময়ী পৃথিবীকে অবলোকন করার আনন্দ থেকে। অতএব প্রয়োজন চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। বাঙলার খ্যাতিমান চক্ষুচিকিৎসককুলের শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন শ্রীকিরণ সেন মহাশয়।

চট্টগ্রামে আদি বাড়ী। পুরো নাম শ্রীকিরণলাল সেন। '১৮ সালে জন্ম। ১৯১১সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারী পড়তে থাকেন। ১৯১৭ সালে 'এম-বি' উপাধি লাভ করেন। যোগদান করেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল

সার্ভিসএ। ছ'বছর এর জন্যে কাটাতে হয়েছে ভারতের বাইরে। আই-এম-এস হয়ে জীবন কাটানোর বাসনাই ক্যাপ্টেন সেনের ছিল, কিন্তু ক্রমে এ জগতে শাদা ও কালোর মধ্যে একটি তীব্র পার্থক্য বোধ উপলক্ষ্য করেই এ বাসনা তাঁকে পরিহার করতে হয় একেবারে। কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এই বিষময় পার্থক্যবোধের মাঝখানে নিজেকে মিশিয়ে রাখলে সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটাই সকরুণ হয়ে উঠবে। চট্টগ্রামে প্র্যাকটিশ করলেন চার বছর, তার পর বিলেতে চলে গেলেন। সেখানে লণ্ডনের ফ্যাকাল্টি অফ ফিজিসান্‌স্ য্যাণ্ড সার্জেন্‌স্ থেকে 'ডি-ও-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর এডিনবারা, সেখানে এফ-আর-সি-এস হলেন ১৯৩০ সালে। তার পর সারা ইউরোপ ভ্রমণ করলেন চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্যে, এক বছর বাদে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে—কলকাতা। এখানে মেয়ো হাসপাতালে লে: ক: কারওয়ানের সঙ্গে এক বছর রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ছিলেন। তার পর ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবেল (বর্তমানে স্যার নীলরতন সরকার) মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের অবৈতনিক শল্যচিকিৎসক ও অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পান বসন্ত, মেনিনজাইটিস্ ও কালেবায় চোখ নষ্ট হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে গবেষণা করেন ও এই অন্ধত্বের প্রতিকারকল্পে নিজেকে মিশিয়ে রাখেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক শল্যচিকিৎসক ছিলেন—এই সময়ে ভিটামিন 'এ'র অভাবে কারাটোম্যালেশিয়া অন্ধতা সম্বন্ধে পড়াশুনো করেন। অল ইণ্ডিয়া অপথালমোলজিকাল সোসাইটি থেকে চোখের পোষ্টাই বিকলত্ব' সম্বন্ধে গবেষণা করে 'স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন (১৯৩৫)। লেক মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯৪৭), ১৯৪৮ সালে লেক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ক্যাপ্টেন সেন। আবার ১৯৫১ সালে ঐ কলেজের তত্ত্বাবধায়কের আসনও গ্রহণ করতে হয় ক্যাপ্টেন সেনকে। একই সঙ্গে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে যেতে হয় ক্যাপ্টেন কিরণ সেনকে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে লেক মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ক্যাপ্টেন সেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চক্ষুবিভাগের অধ্যক্ষের আসনে সমাসীন। য়্যাসোসিয়েশন অফ দি প্রিভেনশান অফ ব্লাইণ্ডনেসের যুগ্ম অবৈতনিক সচিব, অল বেঙ্গল অপথালমলজিক্যাল সোসাইটির মূল সভাপতি, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সেক্রেটারী, এবং বম্বে অধিবেশনের সভাপতি প্রভৃতি পদগুলি অলঙ্কৃত করেছেন বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান ক্যাপ্টেন কিরণ সেন। চোখের বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করার জন্য একটি 'আই-ইনফরমার' ও চোখের নানা বিভাগের বিষয়ে গবেষণার জন্যে একটি ইনষ্টিটিউট অফ অপথালমলজি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ক্যাপ্টেন সেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে একটি সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন সেন জানালেন যে এ বিষয়ে সরকার নিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেও দেখছেন। চক্ষুরোগের প্রতিকার এবং অন্ধত্ব নিবারণ কল্পে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের কার্যাবলীর প্রতি ক্যাপ্টেন সেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে—'এ বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গালায় যা হচ্ছে ভারতের আর কোন প্রদেশে এমনটি হচ্ছে না।' তিনি জানালেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ভারতবর্ষে এই প্রথম ১৯৫৫ সালের মার্চ পর্যন্ত দুশো আঠারটি সমবায় ও থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে (এক-একটি সমবায় সতেরোটি ও এক একটি থানা একশো উনচল্লিশটি গ্রাম নিয়ে গঠিত)। সরকার এখনও ১৯৫৫—৫৬ সালের মধ্যে পর্যন্ত আরও উনসত্তরটি সমবায় ও তেইশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলবার ইচ্ছে করেন। অন্ধত্ব মোচনকল্পে য়্যাসোসিয়েশান ফর দি প্রিভেনসান অফ ব্লাইণ্ডনেসের ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়গুলি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কাজ করছেন। সেই সঙ্গে অন্ধত্বের কারণ এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধেও জনগণকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বর্তমানে ক্যাপ্টেন সেনের একটিমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, তা হচ্ছে অন্ধত্ব নিবারণ করা এবং চক্ষু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা। চিকিৎসক জীবনে চোখের র‍্যাটিনা সরিয়ে দেওয়ায় ক্যাপ্টেন সেনের বিশেষত্ব আছে। সরকারকে যে অভিমত ক্যাপ্টেন সেন পাঠিয়েছেন, এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—আমি ইয়োরোপ ও আমেরিকার চক্ষু চিকিৎসালয়গুলির কার্যাবলী খুঁটিয়ে দেখেছি, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সরকারকে প্রেরিত আমার অভিমত রচনা করা।

ছাত্রজীবনে টেনিস ও বিলিয়ার্ডে ক্যাপ্টেন সেনের দক্ষতা ছিল। ক্যাপ্টেন সেন অবসর অতিবাহিত করেন দেশী-বিদেশী সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে।

বাঙ্গলায় তথা ভারতে চক্ষুচিকিৎসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন সেনকে প্রশ্ন করায় জোর দিয়ে হেসে ক্যাপ্টেন বলেন—নিশ্চয়ই আশাপ্রদ, তবে সময়সাপেক্ষ।

ক্যাপ্টেন শ্রীকিরণ সেন

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

[অন্যতম শক্তিমান বাঙালী চিত্রশিল্পী]

কলিকাতা নাথের বাগানের সিংহরা ব্যবসায়ী হিসেবেই প্রসিদ্ধ। এই ব্যবসায়ী বংশেরই একটি ছেলে ভবিষ্যতে এক দিন হতে চাইল শিল্পী, তার ছোট্ট মনের মণিকুট্টিমে আপনা থেকে বাসা বাঁধতে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনে শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষা। শুধু তাই নয়, শিল্পী হবে সে—শুধু এইজন্যে সে কোন দিন কোন বিদ্যালয়ের ধারে গেল না, পাছে তার সাধনার ধারা অন্তর্মুখী হয়। বাড়ীতেই শিক্ষালাভ করলে সে—তার জন্মই হয়েছে শিল্পের জন্যে! পিতৃ-পিতামহের পেশার ধারে সে গেল না—গেল না কোন বিদ্যালয়ের ধারে—সারা জীবন সে তপস্যায় কাটিয়ে দিল শিল্পের তপস্যায়। তারপর এক দিন লাভ করল সে সিদ্ধি—শিল্পক্ষেত্র তাকে বরণ করে নিল কৃতী শিল্পীর শিরোনামায়। আজকের দিনের বাঙলার তথা ভারতের বরেণ্য চিত্রশিল্পী শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের শিল্পী হওয়ার এই ইতিহাস।

৺অন্নদাপ্রসাদ সিংহের বড় ছেলে শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৪ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে ব্যবসায়ী-পরিবারে। এই বংশের বংশধর লেখাপড়া ছেড়ে—ব্যবসা-বাণিজ্যে মাথা ফাটাফাটি না করে যে এক জন শিল্পী হয়ে গড়ে উঠবে—এ জিনিষটা বাড়ীর খুব পছন্দসই হোল না। কিন্তু মানুষের পছন্দ-অপছন্দে শিল্পীর কিছু যায়-আসে না। সে স্রষ্টা। আনন্দ ও অনুভূতিতে মগ্ন। বাহ্যিক নিন্দা-স্তুতি তার মনে কণামাত্র দাগ কাটতে পারে না, বিধাতার আশীর্বপূত স্নেহধারা সদাসর্বদাই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আলো দেখাচ্ছে, পথ দেখাচ্ছে।

শিল্পী সতীশচন্দ্র শিক্ষালাভ করেন আর্ট স্কুলে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ভারতের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় শিল্পী স্বর্গীয়
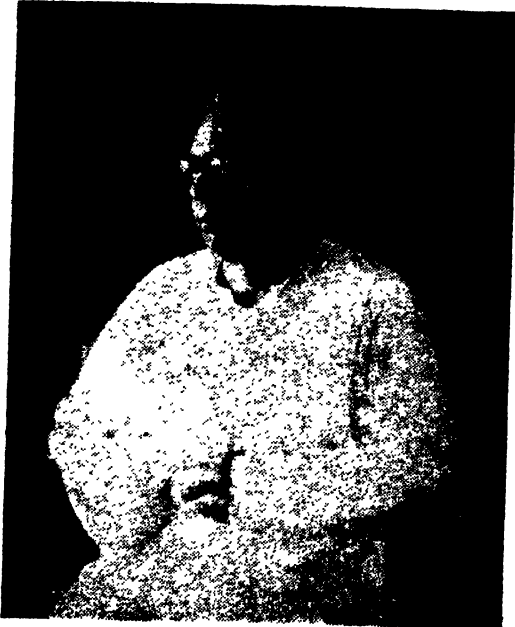
শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন সতীশচন্দ্র। ছাত্রজীবনে সতীশচন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁরাও বরণীয় হয়েছেন দিকপাল শিল্পিরূপে, তাঁরা শিল্পী যামিনী রায় ও শিল্পী অতুল বসু এই তিন বন্ধুতে তখন গলায় গলায় ভাব। কি অটুট বন্ধুত্ব! যা করতেন যা ভাবতেন যা আঁ... পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে, ভবিষ্যতে কিন্তু তিন তিনটি বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করে যশস্বী হলেন, এঁদের প্র... ধারাগুলি পরস্পর থেকে পৃথক। তবে তাঁদের অন্তরের সখ্য বন্ধন এখনও নিশ্চয়ই অটুট আছে। সেখানে এতগুলি ব... ব্যবধানেও কোন রকম অদল-বদল হয়নি। ১৯২১ সালে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত হোল সতীশচন্দ্রের, এই সময় পিতৃবিয়ো... পর কিছু-কালের জন্যে সতীশচন্দ্রকে ইনসিওর ও শেয়ারের দা... করতে হয় জীবিকার জন্যে। তবে সেটা অল্পকালের আবার শিল্পজগতে ফিরে এলেন সতীশচন্দ্র। তবে তাঁকে হল ব্যবসায়ী-শিল্পী (Commercial artist)। ব্যা... জীবনে সতীশচন্দ্রের প্রথম কীর্তি ৺দীনেশচন্দ্র সেনের "সঁ... ভোগ" সমস্ত (দু'শো খানি ছবি আঁকা) এই সময় স্থা... ব্যাঙ্ক ফেল হোল—প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নষ্ট হ'য়ে সতীশচন্দ্র সিংহের। এর পরেই আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অ... মুকুল দে সতীশচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন আর্ট স্কুলে অধ্যাপক (১৯২৪ খৃঃ), ১৯৪৮ সালে সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ অতুল... অবসর গ্রহণ করলে সতীশচন্দ্রকে বরণ করা হোল অধ্যক্ষের আসনে তবে ইতিমধ্যে সতীশ বাবুরও চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় অধ্যক্ষ পদ স্থায়িত্ব লাভ করলে না। ১৯৪৯ সালে একটি শতা... এক-চতুর্থাংশ কাল কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করার পর সতী... অবসর গ্রহণ করলেন। ১৯২২ সাল হতে নিয়মিত ভাবে সতীশচ... ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে—দু' তিন বার প্রথম পুরস্কাররূপী জয়... সতীশচন্দ্রের কণ্ঠেই স্থানলাভ ক'রেছে। কালি-কলমে (Pen a... ink) আঁকা সতীশচন্দ্রের "পাতালকন্যা" ছবিটি সারা ভা... প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই ছবিটিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভ... তুলেছিলেন শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথ, শিল্পতাত অবনীন্দ্রনাথ।

সারা জীবনে শিল্প-সম্বন্ধীয় বই কিনেছেন প্রায় চল্লিশ হা... টাকা খরচ করে। দেশের নানা শিল্পজ্ঞদের শিল্প-সংগ্রহশালা খুঁ... খুঁটিয়ে দেখেছেন সতীশচন্দ্র শিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উদ্দে... এই সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে সতীশচন্দ্রকে সব চেয়ে বেশী আ... করে পাথুরিয়াঘাটার ৺মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকু... ও পাকপাড়ার ৺রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের সংগ্রহশালা। দেশের সংগ্রহশালাগুলি দেখেই সতীশচন্দ্র ক্ষান্ত হন নি, স... ভারত তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন চিত্রশিল্পের সন্ধানে। বর্তম... ষাট পেরিয়েও সতীশচন্দ্র প্রত্যহ ছ' সাত ঘণ্টা ছবি আঁ... পিছনে অতিবাহিত করেন।

বসুমতীর সঙ্গে সতীশ বাবুর পরিচয় বহু দিনের, আপনারা যাঁ... আগেকার দিনের পুরোনো বসুমতী দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, ত... বসুমতীর পাতা ওল্টালেই দেখা যেত সতীশচন্দ্রের আঁকা ছবি... তিনি বলেন যে, প্রতিবেশী সূত্রে তাঁর পরিবারের সঙ্গে স্বর্গ... উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়। বসুমতীর সতীশচন্দ্র...

ছিলেন শিল্পী সতীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু। বয়সে সাংবাদিক সতীশচন্দ্র শিল্পী সতীশচন্দ্রের থেকে বছর তিনেকের বড় ছিলেন। সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বেঁচে থাকলে যিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনতে পারতেন, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর কাছে লোকান্তরের অপরিহার্য আহ্বান) অকাল বিয়োগ বিশেষ ভাবে ব্যথিত করেছে রামচন্দ্রের পিতৃবাৎসল্য শিল্পী সতীশচন্দ্রকে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে শিল্পীর স্থান সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন—অত্যন্ত খারাপ সকল কালে সকল যুগেই কথার মাঝখানে প্রকাশ পায় শিল্পীর অন্তরের দুঃখ, ধারণার অজান্তেই যেন শিল্পীর মনের মধ্যে বেদনার নীরব ধারা বয়ে যায়, এ দুঃখ ব্যক্তিবিশেষের নয়, এ দুঃখ জাতিগত সমষ্টিগত শ্রেণীগত। ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্র বলেন—সে যুগে দরবারে টাকা চাইতে গেলে টাকার পরিবর্তে শিল্পীর পিঠে পড়ত চাবুক; কেবলমাত্র মোগলযুগে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময় শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন···এই ধরুন পটুয়া—পটুয়ারা তো সাধারণ শিল্পী নয়, অত্যন্ত উঁচুদরের প্রতিভাশালী ও শক্তিমান শিল্পী তারা, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন কীর্তিমান সন্তানদের পাশে কি তাদের স্থান—কত দূরের কত নীচে কত পিছনে তারা! শিল্পীদের ভাগ্যই বিড়ম্বিত।···আজকের দিনের শিল্পীদের প্রসঙ্গেও সতীশ বাবু বলেন যে আজকের দিনের শিল্পীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার উন্নতির পথের সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

সবার শেষে জিজ্ঞাসা করি, পরিপূর্ণ শিল্পী হতে হলে কি কি গুণের প্রয়োজন? একটু ভেবে সতীশচন্দ্র বলেন, পরিপূর্ণ শিল্পী হতে হলে সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয়, সব চেয়ে আবশ্যক পরিপূর্ণ মানবত্ব। যে কাঞ্চন হতে চায় পরিপূর্ণ শিল্পী তাকে সবার আগে হতে হবে পরিপূর্ণ মানুষ।

অধ্যাপক ডক্টর শি িরকুমার মিত্র

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী বৈজ্ঞানিক]

কোন্নগরের ৺জয়কৃষ্ণ মিত্র কার্যোপলক্ষে দেশ ছেড়ে ভাগলপুরে গিয়ে বাসা বাঁধলেন ১৮৯২ সালে। তাঁর বড় ছেলে সতীশচন্দ্রের ছোটবেলা থেকে ছিল বিজ্ঞানের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ। যাকে বলে জাত-আকর্ষণ। সতীশচন্দ্রের এই বিজ্ঞান-প্রীতি সব থেকে আরৃষ্ট করে তাঁর সেজ ভাইকে। সতীশচন্দ্র যদি আজ জীবিত থাকতেন, তা'হলে হয়তো আজ তিনিও আসন পেতেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকদের দরবারে। কিন্তু নিষ্ঠুর করাল কালের কুটিল হস্ত তাঁকে টেনে নিয়ে গেল ওপারের দরবারে—বিংশ শতাব্দী তখন সবে জন্মগ্রহণ করেছে। সতীশচন্দ্রের অস্তিত্ব পৃথিবীর মাটি থেকে মুছে গেল বটে, কিন্তু যে মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের বীজ তিনি একদা পুঁতে দিয়েছিলেন এ-কালে সেই মাটির বক্ষ ভেদ করে জন্ম নিল বিরাট মহীরুহ। সতীশচন্দ্রের সেদিনকার সেই বালক ভাইটি বড় দাদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একাগ্রচিত্তে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা করে যেতে লাগলেন, ফলে যথাসময়ে লাভ করলেন সিদ্ধি, যশ, প্রতিষ্ঠা। সেদিনকার সেই ছোট্ট ছেলেটিই আজ বিজ্ঞান-দরবারে সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়।

১৮৯০ সালের ২৪শে অক্টোবর শিশিরকুমারের জন্ম। এফ-এ (বর্তমান কালের আই-এ) অবধি তিনি ভাগলপুরেই পড়েন। তারপর কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, সেখান থেকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯১২ সালে। এর পর গ্রহণ করলেন অধ্যাপকের জীবন। বাঁকুড়া পাটনা ভাগলপুরেও ইনি অধ্যাপনা করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সায়েন্স কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হোল। কলকাতায় চলে এলেন শিশিরকুমার, পদার্থ বিভাগে সায়েন্স কলেজে লেকচারারের পদ গ্রহণ করলেন। এই সময়ে এই বিভাগটির প্রধান ছিলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডক্টর স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ। সায়েন্স কলেজে শিশিরকুমারের প্রথম গবেষণা রামণের সঙ্গেই হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-এস-সি' উপাধি পেলেন শিশিরকুমার ১৯১৯ সালে। ১৯২১ সালে যাত্রা করলেন প্যারী (ফ্রান্স) সেখান থেকেও বিজ্ঞানে 'ডক্টরেট' উপাধি পেলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমার যোগদান করলেন প্যারী সর্বঁ (Sorbonne) বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার এরই মধ্যে ফ্রান্সের ন্যান্সী (Nancy)তে গবেষণা করতে লাগলেন রেডিও-ভাল্ভ সম্বন্ধে। এই রেডিও ভাল্ভগুলির তখন প্রচলন সবে শুরু হয়েছে বা হচ্ছে। শিশিরকুমার প্যারীর 'ইনস্টিটিউট অফ রেডিয়াম'এ আলোক সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন জগদ্বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক মাদাম্ ক্যুরীর সঙ্গে।

অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র

ফ্রান্সে তখন শিশিরকুমার নিত্য নব গবেষণায় উন্মত্ত। বিজ্ঞানের বিশাল নীরধির মাঝখানে ডুবসাঁতার কেটেই চলেছেন নব নব রত্নরাজির সন্ধানে—এমন সময় সুদূর জন্মভূমির আহ্বান পেলেন বাঙলার সন্তান শিশিরকুমার। বাঙলার বাঘ পূজনীয় আশুতোষ আহ্বান জানালেন শিশিরকুমারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পদার্থে 'খয়রা অধ্যাপক'-এর পদ গ্রহণ করতে। আশুতোষের আহ্বান শিরোধার্য করে পদ গ্রহণ করলেন। ফিরে এলেন ভারতবর্ষে বাঙলাদেশে কলকাতায়, গ্রহণ করলেন আশুতোষের নির্ধারিত পদ—হলেন অধ্যাপক (১৯২৩)।

শিশিরকুমারের অধ্যাপক-জীবনও কৃতিত্বপূর্ণ—রেডিও সম্বন্ধে ইনি বিশেষ আগ্রহশীল এবং ভারতবর্ষে রেডিও সম্বন্ধে গবেষণার মূল শিশিরকুমার। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সির (পদার্থ) ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় সঙ্গে সঙ্গে রেডিও সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও শিশিরকুমারের প্রচেষ্টাতেই প্রথম হয় (১৯২১)। ১৯৩৫ সালে 'খয়রা অধ্যাপক' শিশিরকুমার হলেন 'স্যার রাসবিহারী ঘোষ' অধ্যাপক—এখনও সেই পদেই গৌরবের সঙ্গে ইনি সমাসীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল, রেডিও সম্বন্ধে জানবার বা শেখবার মত এত বেশী বিষয় আছে, যাতে করে একটি বিশেষ বিভাগের সঙ্গে তাঁকে সংযুক্ত করে রাখা যায় না। তাই রেডিও বিদ্যার জন্যে 'ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিও ফিজিক্স য়্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স' নাম দিয়ে আর একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ বিভাগ খোলা হোল এম-এস-সি পরীক্ষার্থীদের জন্যে। এই বিভাগটির তত্ত্বাবধায়ক হলেন শিশিরকুমার। সাধারণ এম. এ বা এম-এস-সি ছাত্রদের পাঠ্য-সময় নির্ধারিত করা থাকে দু'বছরের, কিন্তু এই বিভাগটির ছাত্র হলে তিন বছর পড়তে হয়—তার কারণ বিষয়টির মধ্যে অনেক কিছু প্রয়োগসাপেক্ষ বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়, যাতে করে দু'বছরে কুলিয়ে ওঠা যায় না। অগত্যা এক বছর সময় বাড়াতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার এই বিভাগটির উন্নতির জন্যে কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং সেই টাকার একটি অংশবিশেষ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা মঞ্জুর হয়েছে। শিশিরকুমার গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। কলকাতার 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির'এর কার্য্যনির্বাহক সমিতির এক জন সভ্য শিশিরকুমার। এ ছাড়া ইনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর (বর্তমানে দি এশিয়াটিক সোসাইটি) সভাপতি (১৯৫১-৫৩) ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বরোদা অধিবেশনের মূল সভাপতি (১৯৫৫) অচিরে কলকাতা রোটারি ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'চক্রবৈঠক'এরও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত হয়েছে শিশিরকুমারের দ্বারা। এঁর 'দি আপার য়্যাটমোস্‌ফিয়ার' গ্রন্থখানি সম্প্রতি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও ফ্রান্সে অদ্ভুত সম্বর্ধনা পেয়েছে এবং বিদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাতেও সাদরে স্থান পেয়েছে, ১৯৪৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়—১৯৫২ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে অনেক পরিবর্ধিত আকারে। বর্তমানে এর মূল্য আটচল্লিশ টাকা।

শিশিরকুমার এক জন শক্তিমান গল্পলেখকও বটে, তবে এঁর লেখক-জীবনের একটি তাৎপর্য এঁর প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারণা সুপরিস্ফুট। গল্প বলার ছলে বিজ্ঞানের অনেক কিছু দুরূহ তত্ত্ব শিশিরকুমার 'জলবৎ তরলং' করে তুলে ধরেছেন অগণিত নর-নারীর সমাজে। এমনই ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক শিশিরকুমার! সরলা দেবীর 'ভারতী' দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী', উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' কুমুদিনী সিংহের 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নিয়মিত লেখক ছিলেন শিশিরকুমার মিত্র।

ছোটবেলা থেকেই বড় দাদার দেখাদেখি বিজ্ঞানকে ভালবেসে ফেলেছিলেন শিশিরকুমার, কিন্তু সে ভালবাসা ক্ষণিকের ভালবাসা নয়—শাশ্বত চিরন্তন এক আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞান ও শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে। শিশিরকুমারের একটিমাত্রই আকাঙ্ক্ষা ছেয়ে আছে তাঁর জীবনে—সে আকাঙ্ক্ষাটি বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা সর্বসাধারণেরই উপযোগী ভঙ্গিমায়। গবেষক-জীবনে শিশিরকুমার সব চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানের দুই জন্মদাতা পথিকদের কাছ থেকে। তাঁরা হচ্ছেন পদার্থগুরু জগদীশচন্দ্র ও রসায়ন-গুরু প্রফুল্লচন্দ্র। আজ সাড়ে ছ'য়ের কোঠায় পা দিয়েও বর্ষীয়ান এই বৈজ্ঞানিকের মনে পড়ে ছাত্রদের উদ্দেশে জগদীশচন্দ্রের একটি বাণী—"পশ্চিম দেখুক ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানের গবেষণা হয়—তারা জানুক যে, ভারতেও বৈজ্ঞানিকের জন্ম হতে পারে"—বিজ্ঞানের এই উক্তি শিশিরকুমার গবেষক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাথেয় বলে মনে করেন।

জিজ্ঞাসা করি শিশিরকুমারকে—যারা বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় অথচ প্রবেশের দরজাটা খুঁজে পায় না, কোন পথে গেলে এই দরজাটা এরা খুঁজে পাবে? অধ্যাপক উত্তর দেন—'আমি ইতিহাসের গ্রন্থ পড়ে তার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারব, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক আমার গ্রন্থ পড়ে যাবেন কিন্তু তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। কারণ বিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাথমিক 'ক-খ-গ' আছে সেইগুলো না জানলে এর মধ্যে ঢোকা যাবে না, এবং এর রসও আস্বাদন করা যাবে না। এই 'ক-খ-গ' গুলি স্কুলেই পড়িয়ে দেওয়া উচিত, তবে স্কুলের পক্ষ থেকে কতকগুলো বাধা উঠতে পারে। যেমন একটি ব্যয়সাপেক্ষ গবেষণাগারাদি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার জন্যে খানিকটা জায়গা দিতে হবে—কিনতে হবে যন্ত্রপাতি, তাতেও কিছু পয়সা-কড়ি খরচ করতে হবে। তার উপর চাই সুষ্ঠু শিক্ষাদাতা। অধ্যাপনা যিনি করেন তিনিই অধ্যাপক ন'ন, শুধু পরের বক্তব্যকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ব্যাখ্যা করলেই চলবে না—সেই সঙ্গে নিজের বক্তব্যও যিনি প্রকাশ করতে পারবেন, সেই রকম অধ্যাপকেরই আজ প্রয়োজন এবং তাঁরাই প্রকৃত অধ্যাপক।

অধ্যাপক মিত্র দিন কাটান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়ে—যে সকল প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের খোঁজখবর নিয়ে এবং নানা পত্র-পত্রিকার মধ্যে থেকেও "মাসিক বসুমতী" পড়ে। শুধু মাসিক পত্রিকা বলেই বসুমতী এঁর প্রিয় নয়—এঁকে আকৃষ্ট করেছে বসুমতীর মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার বসুমতীর নানাবিধ জ্ঞাতব্য রচনামালা জনহিতকর ক্ষেত্রে তার গৌরবময় অবদান।

সবার শেষে জিজ্ঞাসা করি—'আপনার হবি কি?'

—বৈজ্ঞানিক উত্তর দেন—'ইতিহাস পড়া।'

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত)

[ভুলক্রমে শিল্পী ভুল বানানটি ভুল করিয়াছেন।—স]

উদয়ভানু

নাটমন্দিরের পূজায় বিঘ্ন হয়। পতিত হয়ে যায় প্রাতঃসন্ধ্যা। পুরোহিত হয়তো মন্ত্র বিস্মৃত হন। বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করতে না করতে অঘটনের কথা কানে যায় পুরোহিতের। শুনলেন, নাটমন্দিরের দালানে রাজমাতা মূর্চ্ছা গেছেন। ক্রোধের আতিশয্যে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থা হওয়ায় চেতনা লোপ পেয়েছে বিলাসবাসিনীর। জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি কোপ প্রকাশ করতে করতে সহসা পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়েছেন। আত্মজ্ঞান হারিয়ে মূলচ্যুত বৃক্ষের মত দালানের মেঝেয় প'ড়ে গেছেন। আঘাত পেয়েছেন, রক্তাভ চিহ্ন ফুটেছে কপালে। চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত হয়ে আছে। হাতের মুঠি কঠোর। নাটমন্দিরের যাজক, ব্রাহ্মণ ও পূজারী ব্রহ্মচারীদের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। কেউ যেন এগোতে সাহসী হন না। দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন নীরবে। রাণী সর্ব্বমঙ্গলা নিজ ক্রোড়ে তুলে নিয়েছেন বিলাসবাসিনীর মাথা। ঘন ঘন জলসিঞ্চন করছেন রাজমাতার মুখে-চোখে। ছোট রাণী সর্ব্বজয়া হাতপাখা চালনা ক'রে চলেছেন অবিরাম।

—চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং!

কার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভাসলো নাটমন্দিরের দালানে! কোন এক জোরালো কণ্ঠের।

দুই রাণী, কেন কে জানে, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন যেন। সলজ্জায় গুণ্ঠনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ভয়ের দৃষ্টি ফোটে চোখে।

ফুল, চন্দন আর আতরের সুগন্ধময় বাতাস থমকে থাকে যেন। নাটমন্দিরের কেমন এক স্তব্ধতা। পূজাবেদীর আশপাশে ধুনুচি জ্বলছে কতগুলো। ধূমায়িত, তাই ধূসর ধূম্রাবরণে অদৃশ্য হয়েছে মূর্ত্তি। শুধু দেখা যায়, মূর্ত্তির দেহের সোনার অলঙ্কার, হলুদ-রঙ চেলী আর লাল পদ্মের মালা। ধুনুচির ধূসর-ধোঁয়া সর্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠছে। রাশি রাশি গুগগুল পুড়ছে ধুনুচিতে।

কোমর বাঁধতে বাঁধতে এসে উপস্থিত হয়েছেন কুমার কাশীশঙ্কর। দালানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং! চিন্তা-ভাবনাতেই রাজমাতা সারা হ'লেন! অকারণ অনাহার-উপবাসের এই কুফল!

কুমারের সজোর কথায় চমকে চমকে ওঠেন দুই রাণী। নাটমন্দিরে প্রতিধ্বনি ভাসতে থাকে ঘন ঘন। কোথায় কোন্ অদৃশ্য থেকে কে যেন কুমারের কথার অনুকৃতি করতে থাকে। বধূরাণীদের পরিচর্য্যাই যথেষ্ট, এই ভেবে কাশীশঙ্কর আর অধিক অগ্রসর হন না। ব্যস্ততায় পায়চারী করেন দালানে।

—কুমার বাহাদুর!

পুরোহিত ধীরে ধীরে এসে সসম্ভ্রমে ডাকলেন। পুরোহিত ঈষৎ যেন শ্রদ্ধাবনত। যুক্তকর।

—আজ্ঞা করেন।

পায়চারী থামিয়ে বললেন কাশীশঙ্কর।

—রাজমাতাকে যদি সামান্য চরণামৃত দেওয়া হয়?

ভয়ে ভয়ে শুধোলেন পুরোহিত। উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকলেন ব্যাকুল চোখে।

—ক্ষতি কি তায়? বরং ভালই।

রাজমাতার স্থির ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হঠাৎ চাঞ্চল্যে কেঁপে উঠলো। নিমীলিত আঁখি মেললেন বিলাসবাসিনী। দীর্ঘ দুই চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। চক্ষু এখনও ঘোর রক্তবর্ণ।

কাশীশঙ্কর উদাত্ত কণ্ঠে ডাকলেন,—জননি!

রক্তাভ চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। বিলাসবাসিনী এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি।

—চরণামৃত পান কর' মা!

বলতে বলতে পুরোহিতের হাত থেকে তাম্রপাত্র নিজেই ধারণ করেন কাশীশঙ্কর। চরণামৃতের পাত্র।

রাজমাতা অতি ধীরে মাথা দোলালেন। অসম্মতি প্রকাশ করলেন। প্রাতের পূজাপাঠ শেষ হ'লো না এখনও, তৎপূর্ব্বে জল গ্রহণ করবেন না। চরণধোয়া জল, তবুও নয়।

—বৌরাণী, মাতৃদেবীর জপ-আহ্নিক এখনও কি সমাধা হয় নাই?

কাশীশঙ্কর কথা বলছেন বধূরাণীদের প্রতি। দুই রাণী যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হয়ে ওঠেন।

সর্ব্বমঙ্গলা মিহি কণ্ঠে বললেন,—নাটমন্দিরে পৌঁছেই এমন হয়েছে। পূজা-আহ্নিক শেষ হ'ল কৈ?

মৃদু হাসির সঙ্গে কাশীশঙ্কর বলেন,—চরণামৃত পানেও দোষ? লুপ্তজ্ঞান, তবুও বাছবিচার ঠিক আছে! সিংহরাশিতে জন্ম যে রাজমাতার, তাই এত তেজ!

চোখ মেলেছেন রাজমাতা,—সব চেয়ে বেশী যেন খুশী আর নিশ্চিন্ত হয়েছেন পুরোহিত। সহাস্যে তিনিও বললেন,—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, 'সিংহস্থিতে চন্দ্রমসি প্রধানা নারী ভবেৎ শৌর্য্য-সমন্বিতা চ।' অর্থাৎ সিংহরাশিতে জন্ম হ'লে সে রমণী প্রধানা ও তেজস্বিনী হয়েই থাকে।

—যথার্থই বলেছেন আপনি।

বললেন কুমার বাহাদুর। কথার শেষে চরণামৃতের পাত্রটি হস্তান্তরিত করলেন পুরোহিতকে।

ইশারায় ডাকলেন বিলাসবাসিনী। ভ্রূভঙ্গিমায়! কনিষ্ঠ সন্তানকে ডাকলেন নিকটে।

কাশীশঙ্কর কাছে এসে ব'সতে বিড়বিড়িয়ে কি যেন বললেন বিলাসবাসিনী। অস্ফুট কথা কইলেন, বোঝা গেল না। কেবলমাত্র একটি শব্দ শোনা যায়, সেই শব্দটি 'মুসলমানী'।

অনুমানে বুঝলেন কাশীশঙ্কর। বোঝেন, এ অভিযোগ রাজার বিরুদ্ধে। অগ্রজ রাজা কালীশঙ্করের বিপক্ষে। কিন্তু রাজমাতার আসল বক্তব্য অবোধ্য থেকে যায়। কুমার বললেন,—কি যে বল' কিছুই সমঝাই না। মুসলমানী কোথা হ'তে এলো?

কুমার বাহাদুর জানেন না কিছুই। শুধু জানেন, রাজার নাচঘরে গত রাতে আলোর রোশনাই হয়েছিল। নর্ত্তকী এসেছিল। জানেন না যে, দু'টি বশরাই গোলাপ এসে উঠেছে রাজগৃহে। অনিন্দ্য রূপের দুই তাম্রিজকন্যা এসেছে সুদূর তুর্কী আর পারস্যের মিলনভূমি থেকে। দাম দিয়ে কিনে ফেলেছেন রাজাবাহাদুর। নগদ মূল্য দানে।

মৃদুস্বরে বিলাসবাসিনী বললেন,—জাত-জন্ম সব যে গেল! কি আর বলবো কি?

কাশীশঙ্কর বলেন,—বিনা পাপে জাত-জন্ম যেতে যায় কেন?

রাজমাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—রাজা যে উদিকে মুসলমানী ছুঁটোকে ঘরে তুলেছে!

চিন্তার রেখা ফুটলো যেন কুমার বাহাদুরের প্রশস্ত ললাটে। ইতি-উতি দেখলেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। কি যে বলবেন ভেবে পান না যেন। নাটমন্দিরের দালানে ব'সে সারি সারি স্তম্ভের ফাঁক থেকে আকাশ দেখলেন কাশীশঙ্কর। নিরাশ চাউনি যেন চোখে। মুখে যেন হতাশা।

—কথা নাই কেন? হঠাৎ আবার ক্ষীণ সুরে কথা বললেন রাজমাতা।

চমকে চমকে উঠলেন দুই রাণী। মাতা-পুত্রের কথায় যেন বিচলিতা হন থেকে থেকে। জল-সিঞ্চনে বিরতি পড়েছে, কিন্তু হাতপাখা চালনা অবিরত আছে।

কুমার বাহাদুর বললেন,—রক্ষা করেছেন শাস্ত্রকারেরা! কথার শেষে স্বল্প হেসে আবার বললেন,—ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী অগম্যা নয়। তাতে কোন' দোষ হয় না। রক্ত দূষিত হয় না। পুরুষের দেহে তো রক্ত প্রবেশ করে না, যে জন্য ব্রাহ্মণীর শূদ্র অগম্য!

পরাজয়ের মুখভাব ফুটলো রাজমাতার। তাঁর অভিযোগ টিঁকলো না যে! শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে মায়ের অভিযোগ খণ্ডন ক'রে দিলেন ছেলে।

ধীরে ধীরে উঠে বসলেন বিলাসবাসিনী। অনেক কষ্টে যেন দেহ তুললেন।

দুই রাণী এক জনের প্রতি আড়নয়নে দেখলেন। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে যতটুকু দেখা যায়।

—তুমি বাধা দেবে না কুমার বাহাদুর? রাজমাতা কেমন যেন কাতরে কাতরে কথা বলেন। কত যেন কষ্ট হয় কথা বলতে। শ্বাসের কষ্ট হয়।

—রাজমাতা, বাধা দিয়া কি ফল হয়? ভেবে ভেবে বললেন কাশীশঙ্কর। কথাগুলি বললেন যেন ঈষৎ নতকণ্ঠে। বললেন,—বৌরাণীরা আছেন, রাজরাণী একেবজনা, যেনাদের বাধা মানবে কি? আমি তো দূরের মানুষ।

কাঠফাটা গরম বোশেখের। তপ্ত হাওয়া বইছে থেকে থেকে। প্রস্তর না উংরোতে মাটি উষ্ণ হয়েছে। নাটমন্দিরের সারি সারি স্তম্ভের ফাঁক থেকে রৌদ্রের ফালি ছড়িয়েছে কুমারের প্রশস্ত বক্ষে। কাশীশঙ্কর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছেন।

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি প'ড়লো। সেবায় রতা রাণীদের দিকে রুষ্টদৃষ্টিতে দেখলেন রাজমাতা। অব্যক্ত আক্রোশ ফুটেছে যেন রক্ত-লাল চোখে। শ্বাস রুদ্ধ ক'রে বিলাসবাসিনী বললেন,—তোমরা, রূপের ধুচুনীরা, আছো কি করতে? গলায় দড়ী পড়ে না?

—রাজমাতা! ধমকানির সুরে ডাকলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—বৌরাণীদের কি দোষ?

গঞ্জনার কথা শুনে দুই রাণী দৃষ্টি নত ক'রেছেন। রাজমাতা আবার বললেন,—রূপের বালাই নিয়া মর' এখন। আমার সমুখ থেকে বিদেয় হও।

সর্ব্বমঙ্গলা উঠে পড়লেন বাক্যবাণে জর্জ্জরিতা হয়ে। সূক্ষ্ম দুই ভ্রূ আকুঞ্চিত হয় সর্ব্বজয়ার। হাতপাখা এক পাশে রেখে তিনিও উঠলেন।

—নারীর বল চোখের জল।

কেমন যেন করুণ কণ্ঠে বললেন সর্ব্বমঙ্গলা। কথার শেষে দালান ত্যাগ করলেন শব্দহীন পদক্ষেপে। সর্ব্বজয়াও চললেন সহোদরার পেছন পেছন।

—খাসমহলে যাও রাজমাতা। কাশীশঙ্কর গম্ভীর সুরে কথা বলেন। মাতৃপদে হাত রেখে বলেন,—বৃথা উত্তেজিতা হও কেন? বৌরাণীদের সেবা-যত্নেরও কোন' মূল্য নাই?

—চাই না আমি সেবা যতন। প্রত্যাশা করি না।

বিরক্তির মুখাকৃতি হয় কুমার বাহাদুরের। আর কোন কথা যেন বলতে ইচ্ছা হয় না আর। তবুও বলেন,—যাই হোক, তুমি এখন খাসমহলে ফিরে যাও। নাটমন্দির পূজার স্থান, সেটা ভুলে যাও কেন?

—ব্রজ কোথায় গেল? আমার ব্রজবালা?

ইদিক-সিদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন বিলাসবাসিনী। কথা বলেন দুঃখকাতর সুরে।

ব্রজবালা ছিল অদূরেই। কুমার দালানে আসতেই সভয়, সলজ্জায় লুকিয়েছিল এক থামের আড়ালে।

কাশীশঙ্কর উঠে পড়লেন। সহসা তার মনে পড়েছে, কা'কে যেন বসিয়ে এসেছেন বৈঠকখানায়। ফেলে-ছড়িয়ে এসেছেন কত কাজকর্ম্ম। ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায় কুমারের মুখে যেন। আকাশে চোখ তুলে দেখলেন যেন সূর্য্যের ঠিকানা। দেখতে দেখতে বেশ বেলা হয়েছে। তপ্ত হাওয়া চলেছে বোশেখের।

—মুখে জল দাও গিয়ে। কি নিদারুণ প্রখর রৌদ্র!

কুমার কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগোলেন। কিছু দূরে এগিয়ে আবার ফিরলেন। বললেন,—রাজমাতা, পদধূলি দাও। কোম্পানীর পাট্টায় সহি করতে চলেছি যে! পাকা কথা পেয়েছি রামনারাণের মুখের।

কথা বলতে বলতে বিলাসবাসিনীর দুই পা স্পর্শ করলেন কুমার বাহাদুর।

—আমাকে ধর' ব্রজবালা। খাসমহলে নিয়ে চল'। প্রায় কম্পিতকণ্ঠে বললেন রাজমাতা। কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো সুরে। বললেন,—অশান্তির কারণ হ'তে চাই না আমি।

—আশীর্বাদ কৈ রাজমাতা?

কাশীশঙ্কর প্রণামের শেষে বললেন ভক্তিমাখা সুরে।

কোন' কথা উচ্চারণ করলেন না বিন্ধ্যবাসিনী। কুমারের মাথায় হাত ছোঁয়ালেন বারেক। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে হাসি মুখে চললেন কুমার।

বিলাসবাসিনী ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—কুমার, যেও না, কথা আছে। আমার শেষ-কথা জানিয়ে দিই তোমাকে।

কাশীশঙ্কর মাতৃআহ্বান শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন,—শেষ-কথা কি আবার?

ক্ষণেক নীরব থেকে রাজমাতা বললেন,—আমার চাঁপাডাঙ্গার তালুক আমি সনদ দিতে ইচ্ছা করি। দানপত্র লিখে দেবো আমি। চাঁপাডাঙ্গা তালুকের বার্ষিক লভ্য কয়েক লক্ষ টাকা।

কাশীশঙ্কর কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন শেষ-কথা শুনে। বললেন,—কা'কে দেবে তাই শুনি?

—বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামীকে। কৃষ্ণরামকে।

রাজমাতার তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ কুমার বাহাদুরের কানে যেন বজ্রপাতের মত শোনায়।

চাঁপাডাঙ্গা তালুক রাজমাতার নামে। এই তালুক থেকে যা আয় হয় তা রাজমাতার প্রাপ্য। ভবিষ্যতে পুত্ররা যদি মাতার প্রতি বিমুখ হয় সেই আশঙ্কায় স্বর্গত রাজা চাঁপাডাঙ্গা তালুক আপন ধর্মপত্নীর নামে দান ক'রেছিলেন। চাঁপাডাঙ্গা আরামবাগের অন্তর্গত। কয়েক হাজার ঘর প্রজার বসতি সেখানে।

—যা ইচ্ছা হয় কর'।

কাশীশঙ্কর কথা বললেন ভগ্ন-উৎসাহে। বললেন,—তত:পর তোমার কোথা দিয়া দিন গুজরাণ হবে? রাজগৃহে যদি শেষে ঠাঁই নাই মিলে?

রাজমাতা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন,—গাছতলায় থাকবো। ভিক্ষে মেগে খাবো। হাত পাতবো।

হেসে ফেললেন কুমার বাহাদুর। অসম্ভব এক কথা শুনে মানুষ যেমন হাসে। হাসতে হাসতেই বললেন,—বেশ কথা। যা মন চায় কর'। তোমার তালুক তুমি যদি দান কর' কে কি করতে পারে?

বিলাসবাসিনী তপ্ত শ্বাস ফেললেন। বললেন,—চাঁপাডাঙ্গা তালুকের দলিলখানা দিয়ে দাও কুমার বাহাদুর!

হাসি মিলিয়ে যায় মুখের। কাশীশঙ্কর বলেন,—এখনই চাই না কি রাজমাতা?

—হাঁ, এখনই পাই তো ভাল হয়।

কথা বলতে বলতে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন বিলাসবাসিনী। শরীর যেন টলছে এখনও। পা দু'টো কাঁপছে ঠকঠকিয়ে।

কুমার বললেন,—রাজার সঙ্গে পরামর্শ করবে না একবার? দলিল তো আছে রাজকাছারীতে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যেন রাজমাতা। সক্রোধে বললেন—রাজা-বাদশাহের পায়ে তেল দিতে পারবো না আমি। পরামর্শের ধার ধারি না আমি। আমার কথাই শেষ কথা।

—তথাস্তু! রাজাকে আমি জানাবো।

দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন কাশীশঙ্কর। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না।

বিলাসবাসিনী আবার ডাকলেন,—ছোটকুমার, দাঁড়াও কথা আছে।

কে কার কথা শোনে! কুমার বাহাদুর দ্রুত বেগে ফিরে চলেছেন যে-পথে এসেছিলেন। কত জরুরী কাজকর্ম ফেলে-ছড়িয়ে এসেছেন তিনি। বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেছেন রামনারায়ণকে। কথার মধ্যপথে উঠে চলে এসেছেন।

কত দূর থেকে দেখা যায়, ছোটকুমারের গৃহের আঙিনায় শালকাঠের গুঁড়ি খাড়া হয়েছে সারি সারি। বাঁশের চালা বাঁধার কাজ চলেছে। ঘরামিরা কাজ করছে তড়িৎ গতিতে। বাঁশ বাঁধছে। চালায় খড়ের আঁটি উঠছে রাশি রাশি। মাটি লেপছে কেউ কেউ। আড়তের ঘর উঠছে। দিবারাত্র কাজ চলেছে। মশাল জ্বালিয়ে কাজ হয়েছে রাতভোর। কুমার স্বয়ং কাজের তদারক করছেন। চাল, ডাল আর কাঁচা মশলার আড়তদার হবেন কাশীশঙ্কর!

ঘরামিদের কলকোলাহলে মুখর হয়ে আছে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ-প্রান্ত। ধারালো কাস্তে পড়ছে বাঁশের কঠিন অঙ্গে। কাঠ কাটছে কারা!

কাশীশঙ্করের কথাগুলি কানে বাজতে থাকে রাজমাতার। কথা তো নয়, যেন কামানের গর্জন ধ্বনি!

বিলাসবাসিনী বললেন,—ব্রজবালা কৈ গো? আমাকে ধরে নিয়ে চল' ব্রজ। পা যে কাঁপে!

কুমার দৃষ্টির বাইরে গেলে দাসী ব্রজবালা আসে। সযত্নে ধরাধরি করে রাজমাতাকে। তার পিঠে হাত রেখে বিলাসবাসিনী অবশ পায়ে নাটমন্দির ত্যাগ করলেন। অন্ধের মত চললেন যেন!

নাচঘরের দেওয়ালগিরি নিবু-নিবু হয়।

সারা রাত ধ'রে আলো যুগিয়ে আলোকশিখা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণে। বাতিদানের ক'টা বাতি পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। রাতে যেন ঝড় বয়েছে নাচঘরে, তাই হেলাগোছা হয়ে আছে ফরাস আর তাকিয়া। ফুল, আতর আর গোলাপজলের বাসি সুবাসে ঘর যেন টইটম্বুর হয়ে আছে।

রাজার সঙ্গে সঙ্গে তাত্রিস্তকল্পাবাও পান ক'রেছিল অতি মাত্রায়। চুরানো মদ খেয়েছিল ভরা-পেয়ালায়! রাজাবাহাদুরের প্রেমলাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেধেছিল দু'জনের মধ্যে। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গালি দিয়েছিল। বাকযুদ্ধ থেকে চুলাচুলি মারামারি হওয়ার উপক্রম হ'তে দেখে সহাস্যে মধ্যস্থতা করেছিলেন রাজা কালীশঙ্কর। বিবাদ ক্ষান্ত করার জন্য দু'জনকে নিজের দুই পাশে রেখেছিলেন।

রঙমহলের কপাটে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। পাছে কেউ অনধিকার প্রবেশ করে তজ্জন্য দু'জন অস্ত্রধারী পাইক বন্ধ দ্বারের মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছিলেন রাজাবাহাদুর। কালো আকাশের পুব-প্রান্তে আলোর আভাস ফুটতে ধীরে ধীরে কখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিদ্রাভঙ্গ হয় কালীশঙ্করের। রাতে জাগা, দিনে ঘুম। ঘুম ভাঙলো, কিন্তু নেশা যেন কাটলো না। চোখে লেগে আছে নিদ্রার জড়িমা, শরীরও যেন কি কারণে জড়তাপূর্ণ হয়ে আছে। রাজা চোখ মেলতে দেখলেন, নর্ত্তকীরা তখনও ঘোর নিদ্রায় অচেতন। এত রূপের ঐশ্বর্য্য, দিনের আলো ফুটতে কোথায় যেন হারালো! নর্ত্তকীরা কেমন যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় হয়ে প'ড়ে আছে। নধর নিটোল দেহ, ভরা যৌবন, দুধের মত দেহবরণ,—তবুও গভীর ঘুমের মাঝে সকল কিছুই যেন লুপ্তশ্রী হয়। কি বিশ্রী দেহভঙ্গিমা ঐ নিদ্রিত রূপবতীদের! এক জন হাঁ করে আছে ঘুমন্ত অবস্থায়। অন্য জনের পা অস্বাভাবিক প্রলম্বিত হয়ে আছে! ভাগাড়ের মড়া যেন! কাক আর শকুনে ঠুকরে খেয়েছে না কি!

হাতের কাছেই ছিল পেটাঘড়ি। রাজাবাহাদুর ঘড়ি পিটলেন বার কয়েক। কম্পমান ও অবসন্ন হাতে থেমে থেমে পিটলেন। নর্ত্তকীদের এক জনের একখানি হাত নিজের পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন কালীশঙ্কর। ঘন ঘন ঘড়ি পিটছেন, অথচ সাড়া মিলছে না। কারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

নাচঘরের দ্বার রুদ্ধ মাত্র ছিল, বন্ধ ছিল না।

কে এক জন দ্বারের কপাট সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো প্রায় চুপিসাড়ে। ভয়ে ভয়ে।

—শূয়ারের বাচ্চারা গেল কোথা?

ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন রাজাবাহাদুর। ঘুমভাঙ্গা চোখে রোষদৃষ্টি যেন। বললেন—জরিমানা একেক মাসের বেতন।

কথার শেষে আবার ঘড়ি পিটতে থাকেন ঘন-ঘন।

ঘুমন্ত নর্ত্তকীরা ঘোর নিদ্রার মাঝে অস্থির হয় সেই বিকট শব্দে, কিন্তু নিদ্রা যেন ভঙ্গ হয় না। চুয়ানো মদের নেশায় এখনও যে জ্ঞানহারা।

—সেলামালেকুম্!

খাস খানসামা সেলাম জানায় নাতিউচ্চ কণ্ঠে। কুর্ণিশ করে সামনে ঝুঁকে। বাম হাত বুকে রেখে ডান হাত কপালে ঠেকায়।

কালীশঙ্কর বললেন,—অন্দরমহলে যেতে চাই এখনই।

—পালকি তৈয়ার আছে হুজুর! জরিমানা খারিজের হুকুম হয় হুজুর!

পালকি নয়, মনুষ্যবাহী সুখাসন। নরযান। বহন ক'রে নিয়ে যাবে জঙ্গল থেকে নিশকালো কাফ্রী। এডেন বন্দর থেকে চালানে-আসা কেনা-গোলাম। দাস।

—দেওয়ানজী কোথা?

বিরক্তস্বরে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। একটা ভেলভেটের তাকিয়ার 'পরে দু'হাতে দেহের ভর রেখে সত্বর উঠলেন রাজা।

—দেওয়ানজী কাছারীর অন্দরে।

—লে আও শালাকো। পাকড়ে লে আও। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে হেথা-সেথা তাকিয়ে আবার বললেন,—নেহি নেহি। ছোড় দেও।

রাজাবাহাদুরের হাতে ছিল মুঠোয়-ধরা রেশমী রুমাল। রামধনু রঙের পাতলা, হালকা রুমালে মুখের কালিমা মুছতে মুছতে নাচঘর থেকে বেরুলেন রাজা। রাত্রির কালিমা মুছলেন হয়তো।

কি যেন, কাকে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে কালীশঙ্করের। স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে কে যেন! টলতে টলতে চলেছেন রাজা। অসংযত পদক্ষেপে চলতে চলতে সুখাসনে উঠে ধপাস ক'রে বসে পড়লেন।

দেওয়ানজী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হন। প্রাতঃপ্রণাম জানান যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে। যাতে রাজার চোখে পড়ে তাই সুখাসনের সম্মুখে দাঁড়ালেন। বললেন,—রাজা কালীশঙ্করের জয়!

—দরবার খোলা হোক দেওয়ানজী। হুকুমের সুরে বললেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—আমার ফিরতে বড় দেরী হবে না। এখনই ফিরবো। দরবার ক'রবো এসে।

—যথাজ্ঞা রাজাবাহাদুর। আপনি জয়যুক্ত হোন! দেওয়ানজী বললেন বিনয়নম্র ভঙ্গীতে বললেন,—মহাশয়ের কি অপরিসীম কর্ম্মক্ষমতা!

সুখাসন এগিয়ে চললো নড়নিয়ে। দুলতে দুলতে।

একেই গুরুভার সুখাসন, তদুপরি স্থূলকায় রাজাবাহাদুর। কাফ্রীর দলকে তবুও বহন করতে হয়। এই কাজের জন্যই তারা গ্রাসাচ্ছাদন পায়। দাম দিয়ে কেনা হয়েছে কাফ্রীদের।

কার জন্যে হঠাৎ মন কেঁদেছে কালীশঙ্করের। স্মৃতির পটে হঠাৎ ভেসে উঠেছে আর এক পলের জন্য ভাল লাগলো না নাচঘরের বিলাসসুখ! মন চাইলো না নর্ত্তকীদের কাছে থাকতে। একমাত্র পুত্রকে কেন কে জানে মনে পড়েছে রাজার। রাজপুত্র শিবশঙ্করকে দেখতে সাধ হয়েছে। অথচ রাজপুত্রকে নাচঘরে আসতে আজ্ঞা করা যায় না। দেখানো যায় না নাচঘরের বেআবরুতা।

রাজপুত্র তখন লিখন-পঠনের অভ্যাস করছে গুরুর কাছে।

কাষ্ঠফলকে খড়ির আঁচড় কাটতে শিখছে। স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষরগুলি লিখতে চেষ্টা করছে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে থেকে থেকে। কাষ্ঠফলক রেখে দিয়ে শিবশঙ্কর বলে,—গুরুমশাই, গুরুমশাই, ছড়া শুনান একটা। ছড়া না শুনালে লেখালেখি বন্ধ থাক।

নস্যির টিপ নাকে পুরলেন গুরু। প্রায় পোয়াটাক নস্যি পুরলেন দুই নাসারন্ধ্রে। তার পর বললেন,—ছড়া শুনালে অক্ষর লিখবা তো?

—হাঁ। আর ছড়া না শুনালে?

অগত্যা গুরু বললেন,—তবে বলি ছড়া। শুন মন দিয়া। কথা বলতে বলতে খানিক ভেবে ছড়া ধরলেন সুরেলা কণ্ঠে। বললেন:

আয় রে রে ছেলের পাল মাছ ধরতে যাব।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলে দোলায় চড়ে যাব।
দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাব।
ছোট খাঁপা বড় খাঁপা ঝুমঝুমু বাজ।
দুর্গা তেল জল টুকু ঝিকিমিকি করে।
তাতে বসে বাবা খুড়ো কন্যা দান করে।

ছড়া বলতে বলতে খানিক থামলেন গুরু। কোঁচার খুঁটে নাক মুছলেন। রাজপুত্র আব্দারের সুরে বললে,—তার পর, তার পর গুরুমশাই? গুরু আবার ছড়ার জের ধরলেন। বললেন:

কন্যা দান করতে করতে চোখ পড়লো লো।
হাত পেতে নাও গামছা চোখের পুছলো।

আজ থাক রে বরকনেরা ঘি মধু খেয়ে।
কাল যাবে রে কনেরা সংসার কাঁদিয়ে॥
আগে কাঁদে মাসী পিসী তার পর কাঁদে পর।
কানতে কানতে গেল খুড়ো ঘর।
খুড়ো দিল বুড়া বর।
ও খুড়ো তুই পুড়ে মর।
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর॥
এইখানটি পালছিলাম ভাঁড় টাটি নিয়ে।
এইখানটি কঁদে দাও ময়না কানী দিয়ে॥
চাঁদ উঠল ফুল ফুটল ঝলক মলক দিয়ে।
ওর বেটা পান খেয়েছে শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে॥

শিশুসুলভ হাসি হাসতে থাকে রাজপুত্র। ছড়া শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে যেন মাদুরে। কচি কচি দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে ওঠে শিবশঙ্করের উল্লসিত হাসিতে। হাসির বেগ থামতে রাজপুত্র বললে,—আর একটা ছড়া শুনান গুরুমশাই। আর একটা—

সস্নেহে গুরু বললেন,—অক্ষর লিখবে না তবে? ছড়াই শুনবে?

—আর একটা শুনালেই আবার লেখা করবো।

গুরু বললেন,—তবে শোন'। এটাই শেষ। অতঃপর অক্ষর লেখা চাই। স্বরবর্ণের প্রথম চার অক্ষর লিখন চাই। কথার শেষে আবার ধরলেন:

আঁকড় ফুলে ঝাঁক ঝাঁক।
বেঁচ ফুলের পেঁড়ি॥
আজ থাক মা দুধ পান্ত খেয়ে।
কাল যাবে মা সহর কাঁদিয়ে।
পাছে যাচ্ছে ভাব বাউটি॥
আগে যাচ্ছে ডুলি।
দাঁড়া রে বাজ বাজন্দার॥
মায়ে বোধ করি॥
নির্ব্বুদ্ধি মা গো কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর॥

গুরু থামতেই আবার হাসতে থাকে শিবশঙ্কর। সেই লুটিয়ে-পড়া সহজ-সরল হাসি। মাদুরে লুটিয়ে পড়েছে রাজপুত্র। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসছে তো হাসছেই।

—শিবশঙ্কর!

পিতৃকণ্ঠ হঠাৎ শুনে চমকে ওঠে যেন রাজপুত্র। হাসি উবে যায় মুখ থেকে, মুহূর্ত্তমধ্যে। উঠে বসতে হয় ঠিকঠাক।

—কাছে এসো রাজকুমার।

রাজা কালীশঙ্কর স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন পাঠকক্ষের দ্বারে। দুই বাহু বাড়িয়ে সাদরে ডাকছেন। বললেন,—গুরুমহাশয়, আজকে উহাকে অব্যাহতি দেন, এই অনুরোধ। আমার মন বড় কাঁদে পুত্রের অদর্শনে।

—আপনি যেমত আদেশ করেন রাজাবাহাদুর! আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন গুরু। রাজার আকস্মিক আবির্ভাবে তিনিও যেন বিস্ময়াবিষ্ট।

শিবশঙ্কর এক পা এক পা অগ্রসর হয়। রাজাকে দেখে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয় রাজপুত্রকে। ছেলে কাছে আসতেই দু'হাতে তাকে বক্ষে তুললেন রাজাবাহাদুর। বুকে তুলে নিয়ে চললেন অন্দরাভিমুখে। রাজপুত্র কোমল দুই হাতের বেষ্টনে পিতাকে জড়িয়ে থাকলো।

কালীশঙ্কর বললেন,—আমার চোখের মণি, আমার আদরের দুলাল!

শিবশঙ্কর এক ঝলক হাসলো স্নেহের কথা শুনে। কচি কচি দাঁত দেখিয়ে হাসলো মৃদু মৃদু।

—বড়রাণী কোথায়? তোমার জননী?

ছেলেকে একটি চুমা খেয়ে প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। অন্দরে এগিয়েছেন তিনি। কাষ্ঠপাদুকার শব্দ উঠেছে অন্দরে।

শিবশঙ্কর বলে,—মাইমা আছে রসুইয়ে।

পাটরাণী উমারাণী জ্বলন্ত উনানের কাছে। গনগনে আগুনের মুখে বসেছেন! কাঁচা কাঠ পুড়ছে দাউ-দাউ। অগ্নিতাপে চোখ ঝলসে যায় যেন। উমারাণী লালপাড় পট্টবস্ত্র পেঁচিয়ে পরে রাঁধতে ব'সেছেন। স্বামি-পুত্রের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করছেন। পবিত্র গঙ্গাজলে রাঁধছেন যত কিছু।

ঘামতেল মেখেছেন যেন প্রতিমা! সদ্যঃস্নাতা উমারাণীর মুখ তৈলচিকণ। উনানের আঁচে দরদরিয়ে ঘামছেন উমারাণী। কেমন যেন বিষণ্ণ মুখ ভাব। উনানের আগুনে স্থির দৃষ্টি। গত রাত্তে রাজাবাহাদুর অন্দরমুখো হনান। সারারাত দেখা মিললো না তাঁর। অাঁচ জেগে ব'সে রইলেন উমারাণী। রাত কেটে গেল চোখের সমুখে। প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে আকাশ ফর্সা হয়ে গেল কখন! ঘর্ম্মরেখা না অশ্রুরেখা চোখে! কে জানে কি! অশ্রুর বন্যা না কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে!

রাণীর মুখ যেন বিমর্ষ, দুঃখে ভরা। ক্লান্ত-চাউনি চোখে। উমারাণীর রাঙা অধরও কেমন যেন বিবর্ণ। চোখে জলের ধারা। কিন্তু রসুই ঘরে মসলা-ফোড়নের খোসবয় বইছে। পাকা রাঁধুনি নাকি রাজরাণী। ভারি মিষ্টি রান্নার হাত।

নিরামিষ রান্নার পর আমিষ রান্নায় হাত দিয়েছেন। মাছের ঘন্ট তৈরী করছেন। আর কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মুসলমানীদের ঘরে তুলেছেন রাজাবাহাদুর। সেই দুঃখে অশ্রুপাত করছেন আপন মনে সকলের অলক্ষ্যে। [ক্রমশঃ।

বেদান্ত কি?

বেদান্তশাস্ত্র অদ্বৈতবাদীও নহে, দ্বৈতবাদীও নহে, প্রকৃতিবাদীও নহে, মায়াবাদীও নহে; কোনো বাদীই নহে। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি বাদী বলিতেই হয়, তবে তাহা সত্যবাদী। সত্যবাদী বলিতে এক হিসাবে সর্ব্ববাদী বুঝায়, আর এক হিসাবে নির্ব্বিবাদী বুঝায়।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
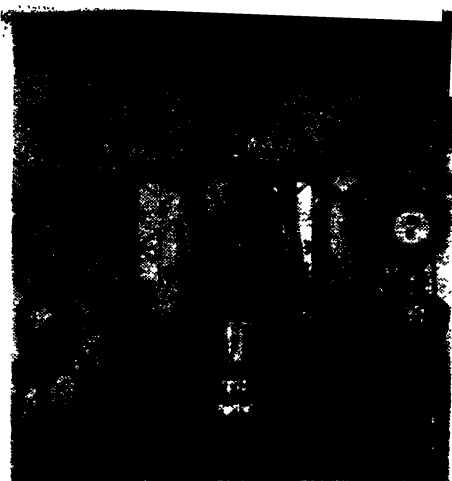
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

—জয়শ্রী গুহ
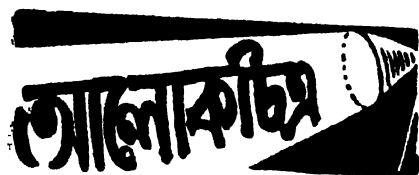
বোম্বে হাইকোর্ট

—অজিত মিশ্র

খেলার মাঠে

—শেফালী বসু

দার্জিলিং-কন্যা

—সুনীল জানা

—রণজিৎ রায়-চৌধুরী

দিল্লীর প্রদর্শনীতে

ছায়া ও কায়া —কে, পি, ব্যানার্জ্জী

সুভো ঠাকুর

টুকু সম্পর্কে ও'র ভাইঝি হলেও, বয়েস তুললে বলতে গেলে এক রকম ওরা সমবয়সীই। তাই একদা খুড়ো-ভাইঝিতে আর্টের আলোচনা থেকে সাহিত্যের সমালোচনায় সমান তালে মেতে উঠতে কম যেতো না কেউ। এমন কি, অনেক সময় সে আলোচনা, তর্ক থেকে তকরার-এর সবজামিনে থামলেও পিছ-পা হোতো না কোনো পক্ষ-ও। অবিশ্যি, পরস্পরের স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্কে এতে মুহূর্ত্তের জন্যেও শ্যাওলা ধরেনি কখোনো। আর সেই টুকুর সঙ্গে কি-না আজ —তা' কম পক্ষে প্রায় পঁচিশ বছর পরে দেখা! কিন্তু ও' ঠিক-ঠিক চিনতে পেরেছে তো—এই মনে কোরে, নিজে নিজেই তখন আত্ম-প্রসাদে আটখানা হবার দাখিল।···হ্যাঁ, শুনেছিল বটে ও'র বিয়ে হ'য়ে গেছে। আর্মির এক কর্ণেল-এর সঙ্গেই তো বিয়ে হয়েছে শুনেছিল। তা' সুভো ঠাকুরের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কবেই বা আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে যে, এই নতুন জামাতার নাম-ধাম কিম্বা পরিচয়ের পাত্তা থাকবে ও'র কাছে? বলতে গেলে, জোড়াসাঁকোর বাড়ি পবিত্যাগের পর, বাড়ির লোকের সঙ্গে কদাচিৎ ব্যবহার ঘটেছে ও'র। ভাল-মন্দের উড়ো খবর মাঝে-সাঝে কানে আসলেও—সঠিক বৃত্তান্ত থাকে ও'র অগোচরেই। ঘোরার ঘূর্ণিতে আজ এ-দেশ কাল সে-দেশ করতে করতেই যেন ফুৎকারে ফুরিয়ে যায় ও'র দিনগুলো। ও'র মনে পড়ে, সেই দার্জ্জিলিং-এর স্মৃতি···কৈশোর বয়েস—স্বপ্নের বয়েস—সামান্ত ঘটনাও মানুষের মনে কি অজানা উদ্দীপনাই না আনতে পারে সে-বয়েসে! দার্জ্জিলিং-এর সে আনন্দ, সে উচ্ছলতা—এখন এই বয়েসে 'ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা'তে গেলেও মিলবে কি না সন্দেহ! মনে পড়ে—মদনদা, প্রকৃতি বৌঠান, নেপুদা এরা সব 'লারস্' বলে একটা বাড়িতেই তো উঠেছিল···আর ও' উঠেছিল একটা হোটেলে। কিন্তু বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা—চব্বিশ ঘণ্টাই তো ও'দের ওখানেই। ক্ষুদে দেবরদের জন্যে টুকুর মা, প্রকৃতি বৌঠানের সে কি আপ্যায়ন! —সে কথা কি ভোলবার? ও'র চোখের পর্দ্দায় তখন পঁচিশ বছর আগের দিনগুলি ঝিলমিল্ করে—কোন্ অতীত উষার অস্পষ্ট আলোয় আদর-করা জুড়োনো স্পর্শের মত!

টুকু তখন বেরিয়ে এসেছে—'সুভোকাকা' বলে। তারপর সেই অর্দ্ধেক ঢাকা ছাত-কাম্ বারান্দার বুকে, এগিয়ে আনলো আরো কত-গুলো মোড়া আর বেতের চেয়ার। ও' তখন সেই যে টুকুকে দেখে চেয়ার নিয়েছে—আর ওঠবার নামটি নেই। ক্লান্ত শরীরটাকে নির্ব্বিবাদে এবার যেন আরো নিবিড় কোরে এলিয়ে দিয়েছে কুর্শির কোলটিতে। চোখ চেয়ে চেয়েই মনে করছে, যেন চোখ বুঁজে আছে—আর শুনতে পাচ্ছে, টুকু বলে যাচ্ছে—"তোমার এতো দেরি হোলো কেন সুভোকাকা? আমি এই তো ওদের টেলিফোন করছিলাম, খবর নেবার জন্যে—লেট ছিল বুঝি ট্রেণ?"

সুভো ঠাকুরের আর নড়ন-চড়নটি নেই।—আরামসে সেই একই রকম ভাবে চেয়ারে এলিয়ে একটা অলস উদাস সুরেই বলে—"না, না, দুর্ভোগের কথা বল কেন? রহমান সাহেবের কাছ থেকে ঠিকানাটা লিখে নিতে ভুলে গেছিলুম। তার উপর জামাতা বাবাজীবনের পুরো নামটাই কি ছাই জানা ছিল? শুধু 'মিঃ ভট্টাচারিয়া—সেস্থান বিল্ডিংস—নেপিয়ান সি রোড—' এই টুকুই যা মনে। রহমান সাহেব ঘুণাক্ষরে বলেনি—যে তুমি—মানে তোমার এখানেই ওঠার ব্যবস্থা করেছে। আমি কি ছাই জানি যে, টুকু আর তার বর-এর কাছে আসছি? আমি জানি, মিঃ ভট্টাচারিয়া আর মিসেস্ ভট্টাচারিয়া—বম্বে সমাজের এক প্রকাণ্ড বড় চাঁই—আর তাঁদের কাছেই শেষ অবধি ঠাঁই মিলেছে আমাদের।"

টুকু বললে—"রহমান তো আচ্ছা লোক—একেবারে চেপে গেছে—বল কি? কিচ্ছু বলেনি! মিছিমিছি নাকাল করা তোমায়—এ অন্যায়!"

ও' তখন বললে—"সারপ্রাইজ দেবার জন্যেই চেপে গেছে—বুঝলে কি না? আজকালকার ছেলে-ছোক্রা তো, বুড়োদের পেলেই এক হাত নেবার চেষ্টা।"

টুকু বললে—"তা না হয় বুঝলুম—কিন্তু এখানে নেপিয়ান সি রোড এলো কোথা থেকে? নেপিয়ান সি রোড—সে কি এখানে?

সে তো কোথায়! এটা তো র‍্যাম্‌পার্ট রো—ছ নম্বর র‍্যামপার্ট রো—ষ্টেশন থেকে তো বেশি দূর নয়।"

ও' বললে—"আর বোলো না! যত দোষ সবই তো নন্দ ঘোষের—দোষ তো আমারই সব! নাম ধাম লিখে আনা উচিত ছিল। স্মরণশক্তি যে বৈতরণীর পানে ধাইছে—উজান বাইতে নেহাত-ই নারাজ—সে হুঁস তো আমারই রাখা কর্ত্তব্য ছিল।"

টুকু বললে—"লাইফ বিগিন্‌স্ এট ফর্টি, আর আমার হিসেবে—তোমার বয়েস তো এই সবে মাত্র বিয়াল্লিশ। আমার চেয়ে খুব জোর কয়েক বছরের বড়!—আর এর মধ্যেই স্মরণ-শক্তি বৈতরণীর পানে ধাইছে?…বুঝেছি, বুড়ো বনবার সখ চেপেছে বুঝি এখন?…আচ্ছা, তা' না হয় হোলো, কিন্তু র‍্যাম্‌পার্ট রোর জায়গায় নেপিয়ান সি রোড উড়ে এসে জুড়ে বসল কি কোরে?"

ও' বললে—"দাঁড়াও, স্থির হও, এবা'রে নির্ঘাৎ পাকড়াও করতে পেরেছি সেটার কারণ। নেপিয়ান সি রোডটা মাথায় ঢুকলো কেমন কোরে—বলি শোনো—আদতে, ভট্টাচার্জ্জি বিভ্রাটই এই ঠিকানা-বিভ্রাট ঘটিয়েছে বুঝলে কি না!"…

টুকু বললে—"ও—বুঝেছি—বুঝেছি, আমিও এবার ধরতে পেরেছি! তুমি ঠিকই ধরেছ সুভোকাকা—রঙমান এখানে এসে নির্ম্মল ভট্টাচার্য্যির বাড়িতেই যে গোড়ায় উঠেছিল। আর সে-বাড়ি, নেপিয়ান সি রোডেই বটে।"

ও' বললে—এবার তাহলে ঠিকই ধরা পড়েছে—যাকে বলে—হাতে-নাতে ধরা, তাই—কি বল 'ভাইঝি? নির্ম্মল বাবুর 'নেপিয়ান সি রোড' আর তোমাদের 'সেস্থান বিল্ডিংস', এই দুটোর মিলন ঘটাতে গিয়েই—আদতে হয়েছে আমার এই বিভ্রাট! যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি, এখন তো এসে পড়েছি তোমার জিম্মায়। আর ভাবনা কিসের?…খালি জামাতা বাবাজীবন এলে, প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদটা করব—তাই বসে আছি।

কিন্তু ও' যা ভেবেছিল—হোলো ঠিক কি তার উল্টোটা! কোন শাস্ত্রে শোনা গেছে যে, জামাই শ্বশুরকে শাসন করছে? বম্বে এসে শুভো ঠাকুরের কপালে তাও ঘটল।

ইতিপূর্ব্বে যদিও মিষ্টার এণ্ড মিসেস ভট্টাচারিয়ার কাছে উঠছে বলেই জানতো, কিন্তু আদতে এই মিষ্টার এণ্ড মিসেস ভট্টাচারিয়া যখন টুকু আর তার বর-এ রূপান্তরিত হোলো—তখন জামাতা বাবাজীবনের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত হোলে—ভেবেছিল কম-বয়েসী জামাতাকে পেয়ে—ও'কে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে ভারিক্কে চালে আশীর্ব্বাদ করার একটা মওকা মিলবে ও'র। কিন্তু এ কি, এ-যে ও'র চেয়ে বয়েসে বড় জামাই—বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতে দেখা গেল—চোখ পাকিয়ে শ্বশুরকেই শাসন করতে শুরু করে দিয়েছে:—"তোমাদের সব কাণ্ড…যেমন ভাইঝি তেমনি খুড়ো! এতদূর পথ এলে—অথচ উঠবে যেখানে, সেখানকার ঠিকানাটাই আনতে ভুলে গেলে—বলিহারি বটে!—আর যাচ্ছ তোমরা বিলেত-অ্যামেরিকা! ও-সব দেশে এই রকম করলেই হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তুমি না হয় কবি-আর্টিষ্ট—তা রঙমান কি করছিল? সে যে সেক্রেটারি সেজেছে—তারও কি হুঁস-পর্ব্ব লোপ পেয়েছে? তোমায় একলা ছেড়ে দিয়ে কোলকাতায় দিব্বি মজা মারছে!—এই রকম হলেই, হবে ভাল করে, তোমাদের এক্‌জিবিশান।"

টুকু এর উত্তরে ও'র স্বামীকে বললে—"তোমার ব্যাপার তো? আমার কাছ থেকে অর্দ্ধেক ঘটনা শুনতে না শুনতেই তোমার চোখ-রাঙানির যা রোশ্‌নাই—তাতে আজ রাত্রেও মনে হচ্ছে না যে, ইলেকট্রিকের বাতিগুলো আর জ্বালাবার দরকার হবে।…কোথায় সুভোকাকা এলো, একটু আলাপ-পরিচয় করো—তা না…"

টুকুর স্বামী এর উত্তরে উত্তেজিত হয়ে উঠে জবাব দেয়—"হুঁঃ, আমাকেও আবার আদ্যোপান্ত শুনে সময় নষ্ট করতে হবে নাকি? যা করলেই তো আগাগোড়া আঁচ করে ফেলি। মিলিটারি ইণ্টেলিজেন্সে কাজ করে চুল পেকে গেছে আমার—সেটা সব সময় মনে করিয়ে দিতে হয় কেন?"

বেচারা টুকু, এবার বাক্যালাপের মোড় ঘোরাতে গিয়ে ও'র কাকার উদ্দেশ্যেই বললে—"জানো, সুভোকাকা, তোমার জামাতা বাবাজীবন তোমার জন্যেই কিন্তু অফিস কামাই করে এই অসময়ে হাজির হয়েছেন আজ। যা দেখছি—তা'তে মনে হচ্ছে, শ্বশুরের উপর অনেকখানি টান—তা নইলে আমি যদি মরেও যাই, অফিস যাওয়ায় এক মিনিটের জন্যেও লেট্ হওয়ার জো নেই।"

জামাতা বাবাজীবন তখন নবাগত খুড়-শ্বশুরের সামনেই তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দাবড়ি দিয়ে বললে—"ন্যাকামি রেখে কাজ কর—ঠাকুরবাড়ির যেখানে সম্পর্ক, সেখানেই কি ন্যাকামির ফুলকো লুচি ফুলে?"

টুকু এর উত্তরে আবহাওয়া হাল্কা করবার উদ্দেশ্যেই উপহাস করে বলে—"ওগো, তুমি যে দেখছি, শেষ অবধি নিকুম্ভিলা যজ্ঞের মত, ন্যাকামি-নিধন যজ্ঞ আরম্ভ না কোরেই ছাড়বে না।"

এর উত্তরে ও'র স্বামী বললে—"থাম, থাম, কাজের নেই নাম, খালি কথা। এই কথার জোরে কেল্লা ফতে করা আর চলবে না, চলবে না। লোকের চোখে ধুলো ছড়িয়ে আর কত কাল চালাবে তোমরা? নদের নৈয়ায়িকের বংশ—স্বদেব ভট্টাচার্য্যির কাছে ওসব খাটবে না।…দু' দিনের পথ পেরিয়ে এলো—খুড়োর স্নান-খাওয়ার খবর নেওয়া দূরে গেল, শুরু হোলো কবি-কাহিনী!"

টুকুও ও'র স্বামীকে এবার মুখঝাম্‌টা দিয়েই বলে উঠলো—"তার আগে তুমিই একটু থাম তো বাপু। আমরা খুড়ো-ভাইঝিতে কোথায় বিশ-বাইশ বছর পরে দেখা, একটু কথা বলছি—তাতে তোমার এতো গাত্রদাহ কেন?"

জামাতা বাবাজীবন এবার খুড়শ্বশুরকে ছেড়ে তার ভাইঝিকে নিয়েই পড়লেন—দস্তুরমত আর এক পশলা হ'য়ে গেল ওর উপর। তার পর বললেন—"আধিক্যেতা রেখে, স্নানের জন্যে গরম জলের ব্যবস্থা কর না। কোলকাতা থেকে ট্রেণে এসেছে, লোকটার দু'দিন ধরে গরম ভাত পড়েনি পেটে—শুধু পেটে কবিত্বের কচ্‌কচানি কোনো শর্ম্মার বরদাস্ত হয় না, জেনো।" এর পর আর অপেক্ষা না কোরে নিজে নিজেই হুঙ্কার ছাড়লেন বেয়ারাকে, গরম জলের জন্যে। তার পর, খুড়-শ্বশুরের পরিচর্য্যা শুরু হোলো। প্রথমেই খবর হোলো—মালপত্র এনে ঘরে ঠিকমত গুছিয়ে রাখা হয়েছে কি না?

বেয়ারা বললে—"বহু আগেই সে কর্ত্তব্য সমাপন করেছে সে।"

এর পর বলা বাহুল্য যে, গাড়িভাড়া তারও আগে চোকানো

হ'য়ে গেছে কখন—এখন ধোপদুরস্ত তোয়ালে এলো। এলো এক শিশি বাথগেটের হেয়ার অয়েল আর সুগন্ধ সাবানের একটা কেক্। আয়োজন নিখুঁত।

ও'র কিন্তু লোকটিকে বেশ ভাল লেগেছে। প্রথম আলাপেই সবে-এসে-পৌঁছন আগন্তুক খুড়-শ্বশুরকে ধরে শাসন করা—এই আজব ভাইঝি-জামাইটিকে ও'র দস্তুরমতই মনে ধরেছে। সত্যি সত্যিই ইণ্টারেষ্টিং লোক। উপরন্তু চেহারাটায় অধুনা য্যামেরিকায় অধিষ্ঠিত—য্যানি বেসেণ্টের আবিষ্কৃত মেশায়া কৃষ্ণমূর্ত্তির সঙ্গে অনেকখানি আদল। ঠিক সেই রকম কাঁচা-পাকা চুলগুলো—সেই রকম একই ভঙ্গিতে কপালের উপর বঁটির মত বেঁকে। চোখা নাক-চোখ যেমনি—চোখা চোখা কথাবার্ত্তাও তেমনি···

যাই হোক, ও' কিন্তু এবার সন্তুষ্ট চিত্তেই স্নান-ঘরের সন্ধানে রওনা দিতে পারল।

তার পর স্নান সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে যখন সেই বারান্দায় আবার পুনরাবির্ভূত হোলো—তখন সমুদ্রের বুকের থেকে ওঠা দোদুল্যমান নীলোৎপলের মত ঐ দূরান্তের দ্বীপ, লাল-নীল-সিন্দুর-বিন্দুর মত নানান রঙের ছোটো-বড়ো জাহাজ, জেলেদের নৌকো, আর নোণা হাওয়ায় আর্দ্র আকাশের অঙ্গ-সৌরভ—ও'র সর্ব্বাঙ্গে বয়ে আনলো এক অপূর্ব্ব অনুভূতি, এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নতুনতর আবেশ। যার অনতিপূর্ব্ব আদরের অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতায়—এবার নিঃশেষে অভিভূত হ'য়ে পড়ল, আবিষ্ট হয়ে পড়ল ও'।

এই দ্বিতীয় দর্শনেই বম্বের সঙ্গে হোলো যেন ও'র শুভদৃষ্টি!—এই জন্যেই কি হিন্দু বিবাহ পদ্ধতিতে শুভদৃষ্টির প্রচলন এবং তার এতো কড়াক্কড়ি নিয়ম-কানুন? পাঁজি-পুঁথি দিন-ক্ষণ-লগ্নের এতো মহামারী ব্যাপার? শুভদৃষ্টির এই মহান মূল্য ও' যেন এবার অনেকখানি আন্দাজ করতে পারল। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা অনুভব করতে পারল—হিন্দু সমাজের ভাবধারা।

ততক্ষণে সেই ছায়া-ঘেরা বারান্দার নানা ফুল গাছ আর লতার মধ্যে বেছানো টেবিলে, এসে গেছে—গরম ভাত, মাছের ঝোল, শুক্তো-চচ্চড়ি, ভাজা-ভুজি, নানা রকমের পাতে পাতে আর তার মধ্যিখানে ছোটো একটি রূপোর বাটিতে মাখম-মারা ঘি। ও'র ভাল লাগল, টুকুর রন্ধন ব্যাপারে এই রুচি-জ্ঞানের পরিচয়! ও'র ভাল লাগল, ও'দের পরিবারের মেয়েদের এই মোলায়েম দিশি চালচলন আর সৌন্দর্য্য-বোধ। যতখানি পেরেছে সামান্য টুকিটাকি দিয়ে সুন্দর করার প্রচেষ্টা করেছে সব কিছু—অথচ তাতে চোখ-ধাঁধানো অর্থের উগ্রতা নেই কোথাও।

ও' টুকুর এই গিন্নিপণায় মনে মনে তারিফ করতে করতে হঠাৎ নজর করল—কই, জামাতা বাবাজীবন কই? তাকে তো দেখতে পাচ্ছে না আর? তার পর আবিষ্কার করল, ওদের মধ্যে থেকে কোন ফাঁকে জামাতা বাবাজীবন ফস্কে গেছে। অনুসন্ধান করতে—টুকু বললে, "উনি তো অফিসে ফিরে গেছেন, কখোন হোলো। সেই তুমি যখন স্নান করতে গেছিলে—তখনই তো। ওনার যে অফিস-অন্ত-প্রাণ। তুমি আসায় এই যে পাঁচ মিনিট অফিসে কামাই হয়েছে, এতেই তো দম আটকাবার দাখিল···আর বল কেন?"

এর পর, গল্প করে আস্তে আস্তে খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে, ওদের প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেল। ও'র মেয়েদের স্কুল থেকে ফেরার হ'য়ে এলো সময়। টুকু এবার টেবিল থেকে উঠে চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি আরম্ভ করল। তার পর গোয়ানিজ ভৃত্য 'জন্'কে ডেকে—মেয়েদের আনতে পাঠাবার আদেশ দিল। ততক্ষণে, সেই দ্বিপ্রাহরিক আহার-পর্ব্ব শেষ হতে না হতেই তদারকী শুরু হয়ে গেছে পুনশ্চ—অপরাহ্ণ চায়ের আয়োজনের। জলসমেত চায়ের কেৎলি তখন রান্নাঘরের রাজসিংহাসনে—উনুনের উপর চড়ে বসেছে···

সুভো ঠাকুর এত কাল পরে এইতো সর্ব্বপ্রথম অবসর পেলো সংসার-ধর্ম্মের অতি-আবশ্যকীয় গৃহ-পরিচালন-পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায় অধ্যয়ন করার। আদত্তে ব্যাপারটা ও' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই নজর করে চলেছিল—সেই তখন থেকেই তো। সত্যিই, এ যেন বারো মাসে তের পার্ব্বণেরও বাড়া। চব্বিশ ঘণ্টায় যেন ছাব্বিশ রকম কন্সার্টের পালা—অথচ টুকুর বাহাদুরি তো এইখানেই। ও'র এই সংসার কত স্বচ্ছন্দ গতিতে দিনগত রুটিন অনুযায়ী কি সুষ্ঠু ভাবে গড়িয়ে চলেছে—মহামারী আড়ম্বর নেই, চিৎকার নেই, ঝগড়া নেই—নিঃশব্দ রবার-টায়ার চাকার মতই স্বচ্ছন্দ-গতি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে তারা···মনে মনে ও' বুঝলো—এক কথায় একেই বলে, সংসার করা। চাট্টিখানি কথা নয়, এও যেন একটা অকাট্য আর্টেরই সামিল!

টুকু এবার চা আর চিঁড়ে-ভাজা নিয়ে হাজির। তার পর বললে—"সুভোকাকা, তুমি তো দু'রাত্তির ট্রেণে কাটিয়েছো, চা-টা খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নাও না একটু?"

ও' জবাবে বললে—"ছোট্টো বেলায়, পাছে দিনের বেলায় ঘুমোনো কিম্বা শোয়া অভ্যাস হয়, তাই আমাদের ভয় দেখানো হোতো—'দিনের বেলায় ঘুমোলে, পরজন্মে পেঁচা হয়ে জন্মায়।' সেই ভয়, আজো কি গেছে? তাই ত সেই বাল্য-বয়েস হতেই কদাপি দিবা-নিদ্রা অথবা দিবা-শয়ন অভ্যাস হয়েছে আমার। তাই বলছি, এই অ-বেলায় নিদ্রাদেবীর সঙ্গে সুভো ঠাকুরের 'নিকা' উৎসব আপাতত স্থগিত রেখে, চলো তোমার সঙ্গে বোম্বাই হাল-চালের হদিস নেওয়া যাক একটু। জান তো এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে—কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। সিদে ভাষায়, আমার ছবির একটা প্রদর্শনী করে' কিছু টাকা ওঠানো। আমাদের হাতে নগদ পয়সা কড়ি বিশেষ কিছু নেই। অথচ সরকারি তকমা পড়েছে পিঠে। তা যাচ্ছি প্রায় চৌদ্দ পনেরটা দেশে"—

টুকু বললে—"হ্যাঁ, সে তো জানি—রহমান সব বলেছে আমায়—তোমাদের নাকি বহু টাকা খরচ হয়ে গেছে। বিদেশে রওনা হবার আগে, সে সব-কিছুর হিসেব-পত্তর চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে—এই তো?"

ও' বললে—"হ্যাঁ, তুমি তো দেখছি সবই জানো। তবে বুঝছো কি না টুকু—টাকাটা ওঠাতে হবে একজিবিশানের স্যুভেনিয়ারে বিজ্ঞাপন নিয়ে। কারণ জিনিষপত্র তো বিক্রি করার মত কিছু নেই—আমার ঐ শিল্প-সংগ্রহগুলো নিয়ে বিদেশে একজিবিশান করার জন্যেই তো টাকা মঞ্জুর করেছে কি না সরকার বাহাদুর—এখন তা থেকে বিক্রি করলে সঙ্গে নিয়ে যাব কি?"

টুকু বললে—"তার জন্তে ভেবো না, হয়ে যাবে। আমিও খাটব না হয় তোমার সঙ্গে। তবে জেনে রেখো,—দলাদলি এখানেও কিছু কম নয়। এমন কি এখানে এসেও, এই ক'ঘর বাঙালীদের মধ্যে—পুজোর ব্যাপার নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব নিয়ে, কিছু কমতি হয় না দলাদলি। এই তো, আমার এখানে হপ্তায় দু'দিন কোরে ছোটো ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নাচ-গানের একটা ক্লাশের মত হয়—তা নিয়েও আরম্ভ হয়েছিল দলাদলি। তবে শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে—অঙ্কুরেই তা আমি বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি।"

ও'বললে—"কি আর করবে বল টুকু—বাঙলা দেশটা দলাদলি করতে করতেই উচ্ছন্নে গেল। আগেকার কালে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিল—তাই দলাদলি করলেও—মানিয়ে যেত, নজরে পড়ত না অত। এখন সে জায়গায় হয়েছে—'বিষ নেই, খালি কুলোপানা চক্কর!' যে কেষ্ট ঠাকুর গোবর্ধন ধারণ করতে পারে, একমাত্র তারই যে বস্ত্রহরণ মার্জ্জনা করা যায়—এই সামান্ত মাত্রা জ্ঞানও লুপ্ত-প্রায় লোকের মস্তিষ্ক থেকে। বাঙলা দেশের সে বৈভব নেই, সে ঔদার্য্য নেই, বিশিষ্ট আদর্শের জন্তে জীবন উৎসর্গের যে দৃঢ় সঙ্কল্প—সে সব কিছুই নেই, সব লোপ পেয়েছে। এখন কেবল থাকার মধ্যে দালালি আর দলাদলি। এই দুই 'দ'-ই আমাদের দেশটাকে দহে মজিয়ে ছাড়ল।"

টুকু বললে—"বাঙলার সঙ্গে বম্বের তফাৎ কি জানো সুভো-কাকা? এরা মুখে খুব মিষ্টি, মেজাজ মোলায়েম—যা কিছু করার, কাজে করে, কথা বলে কম।"

ও'বললে—"তা ঠিক বলেছ—বাঙালী, আমরা যে বাক্য-বাগীশের বংশ। কথায় কেল্লা ফতে করতে আমাদের মত ওস্তাদ আর কে আছে?"

এমনি ধারা আলাপ-আলোচনা চলতে চলতে এক ফাঁকে টুকুর মেয়েরা এসে হাজির হয়ে গেল স্কুল থেকে। বড়টির বয়েস, বছর আষ্টেক! ছোটোটির ছ' বছর। বড়র ডাক নাম বুড়ি। ছোটোর ডাক নাম নুড়ি। ফুটফুটে ফুলের মত, চঞ্চল চড়াই পাখীর মত ওদের আচরণ ও'কে মুগ্ধ করে তুললো। বুড়ি কথাবার্ত্তায় পাকা বুড়িটি যেন। আর নুড়ি ঝর্ণার নুড়ির মত সব সময় নেচে নেচে গড়িয়ে পড়ছে। ও' মেতে উঠলো ওদের সঙ্গে। কত গল্প শুনলো আর শোনালো। ওরাও এই দাড়িওয়ালা দাদুটিকে পেয়ে দারুণ খুশী।

এমনি করে' কখন ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলো তা' ও'র হুঁস-ই নেই। আদতে ও'র হুঁস হোলো—যখন জামাতা বাবাজীবন আবার ফিরে এলো অফিস থেকে, রখন নৈশ-ভোজনের ভোজ্য বস্তুর পুনরায় সমাগম হোলো টেবিলের উপর—তখন-ই তো আবার যেন হুঁস হোলো ও'র নতুন কোরে। আর সঙ্গে সঙ্গে শীতের গাঢ় কুয়াশার মত একটা সুগভীর ক্লান্তিও নেমে এলো ও'র সর্ব্বাঙ্গ আঁকড়ে। শ্রান্তিটা এতক্ষণ পরে অনুভব করলে ও' তাকে বিলকুল পাত্তা না দিয়ে, হাঁসের গায়ে জলের মতই 'গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিয়ে ও' এবার খাবার টেবিলে এসে বসল। রান্ত-রাশের রকমারি রসনা-রোশনাই-কারি নানা রংয়ের প্লেটগুলো ও'কে দস্তুর মত 'ট্যান্টালাইজ' কি না প্রলুব্ধ করে তুলেছে তখন। তার পর মেনু দেখার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটাও খোলতাই হয়ে উঠলো আর এক বার বাছাই করা বিলিতি খাবার সি. সি. আই থেকে তৈরি হয়ে এসেছে। আশ্চর্য্য ঘটনা—বিশেষ করে আকস্মিক ভাবে হাজির হয়েছে, ঠিক যে যে বিদেশি খাত্ত বস্তুগুলো একান্ত ও'র কাছে প্রিয়—যে গুলির রসাস্বাদ হতে বহু দিন বঞ্চিত ও'র রসনা—বেছে বেছে ঠিক যেন সেইগুলোই এসে হাজির হয়েছে ও'র সামনে।

টুকু বললে—"বিশ্বাস করনি ত' এখন দেখছ—জামাতা বাবা-জীবনের তোমার উপর টানখানা? 'অর্দ্যো' এনেছেন তোমার জন্তে, তার পর 'গ্রিল্‌ড্‌ মাট্‌ন্‌' আর 'ম্যাস্‌'—আর 'ফ্রুট স্যালাড্‌ উইথ ক্রিম্‌।' সাধারণত রাত্রে আমাদের হাল্কা ধরণের, বিলিতি-ঘেঁসা রান্নাই হ'য়ে থাকে। একটা 'স্যুপ,' কাট্‌লেট্‌ কিম্বা চপ আর পুডিং নয়তো ক্ষীর। 'অর্দ্যো' পেতে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। এটা একান্ত তোমার অনারে এসেছে।"

ও' বললে—"এই জন্তেই তো ভাল লাগছে তোমার সংসার! টিকিধারী বামনাই ধাঁচও নেই, আবার ড্রেস্‌ স্যুটপরা য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানি আঁচ-ও নেই। অথচ এই দুই-এর সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব 'হারমনি' তৈরি হয়েছে তোমার সংসারে। তা ছাড়া, আশ্চর্য্য বলে আশ্চর্য্য—তোমার কর্ত্তাটি যেন আজ বেছে বেছে আমার একান্ত প্রিয় জিনিষগুলোই এনেছে দেখছি।"

উত্তরে এবার জামাতা বাবাজীবন বললে—"তা আনব না—আন্দাজেই ধরেছি যে শ্বশুরের রুচি। দাড়ি রেখে ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে কি হবে? ওতো জহরলালের হিন্দি লেকচার—ঘুমের ঘোরে কিন্তু বিড বিড় করে ঠিক ইংরিজি। শুক্তো-চচ্চড়ি গলদা চিংড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গদ্‌গদ্‌ হলেও সামনে 'য়্যাস্‌প্যারাগ্রাস্‌' অবলোকন করলে আর কি রক্ষা আছে? সঙ্গে সঙ্গে নোলায় জল! ও-সব ঢের দেখেছি, ও-সব আমার নখ দর্পণে। এতো দিন যে আর্ম্মি ইন্টেলিজেন্সিতে ছিলুম সেটা কি ফালতো?... তবে জেনে রেখো—আজকে প্রথম দিন বলেই না একটু খাতির দেখালুম খুড়ো! কিন্তু—আজকেই সে খাতিরের পালা সুরু এবং শেষ। কাল থেকে আমার আটপৌরে আচার-ব্যবহার।"

ও', বয়ঃজ্যেষ্ঠ জামাতা বাবাজীবনের এমনি ধারা মজার মজার কথায় বেশ মজে উঠেছে তখন—মতলব আরো কিছুক্ষণ চলুক। ও'র, শারীরিক শ্রান্তি—ভ্রান্তিতে ফিরে গেছে ফের। ও'র চোখের পাতায় ঘুমের কোন পাত্তাই নেই যেন। কিন্তু জামাতা বাবাজীবন, সে সাধে বাদ সেধেই হুমকি মারল—"আর রাত্তির কোরে কাজ নেই, আমার এখানে থাকতে হলে, ভোরে উঠতে হবে—তার উপর তুমি তো দু'-রাত্তির ট্রেণে—এগন তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় দিকি লক্ষ্মীছেলের মত। ভোরে ওঠা অভ্যেস না থাকলে, ভয় নেই, আমিই সে অভ্যেস করিয়ে দেব এখানে।"

টুকু এবার বলে উঠলো—"না, না, সুভোকাকাকে আর ভোরে ওঠানোর অভ্যেস করিয়ে দরকার নেই—বেচারার দু'-রাত্তির ভাল ঘুম হয়নি—ও'কে নিয়ে আবার কেন টানা-হ্যাঁচড়া? তোমার ঐ 'ভোরে ওঠানোর' অত্যাচারে অতিথিরা এক দিনের পর দু'-দিনের দিনই পাত্ত তাড়ি গোটাতে পথ পায় না—মনে করে, ঘাড় থেকে নাবাবার

এ একটা তোমার অভিনব পন্থা! মনে কর দেখি, প্রথম প্রথম আমাকেই কি তুমি কম কষ্ট দিয়েছ? গোড়ায় গোড়ায় অত ভোরে উঠতে—সত্যিই আমার কান্না পেত।"

শুভো ঠাকুর ভোরে ওঠার ব্যাপারে ওদের এই কথাবার্তায় সত্যি বেশ আমোদ অনুভব করল। এর পর ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে দিয়ে নৈশ-ভোজের পালা তখন যথোপযুক্ত ভাবে শেষ হয়েছে। ও' দেখলো, খাওয়া শেষ হতেই উঠে পড়েছে সবাই। এখানে যেন 'আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ' এই বালক-সুলভ নিয়ম, সুবোধ বালকের মতই পালন করে সবাই। তাই অগত্যা ও'-ও এবার সটাং নিজের ঘরের দিকে এগোলো।

যে ঘরে বসবাস করবে, সে ঘরটার সঙ্গে এখোনো অবধি ও'র চাক্ষুস চোখাচোখি ঘটেনি। তাই ত ঘরে ঢুকে, গোছগাছ কোরে শোবার আয়োজন করার আগেই উত্তেজনার মাথায় একটা এলোপাথাড়ি সাভে শুরু করে দিল সব কিছুর। আদতে, ও'র ঘুম, চোখের পাতা থেকে সেই যে পাততাড়ি গুটিয়েছে আর তার ওয়ার্পস্ আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না আপাতত। ও' তাইত এবার চারি দিক চেয়ে দেখলো—ও'র মনে হোলো এ তো ঘর নয়, যেন জাহাজের কোনো কেবিন। তার পর চোহদ্দি ধার্য্য করতে গিয়ে ওর চোখে পড়ল—চতুর্দ্দিকের জানলাগুলো, কাচের সার্সি দেওয়া সব জানলা! বে-অফ-বেঙ্গলের দিকে নিতম্ব রেখে আরব সাগরের উপর উত্তমাঙ্গ এগিয়ে সারি সারি সে বে-উইণ্ডো-গুলো—ও' তারিফ না কোরে পারল না। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া ও'র ঘরময় তখন লুকোচুরি খেলছে। ওর বেজায় ভাল লাগল ঘরটা। জাহাজে ওঠার আগেই, এই ঘরেই যেন জাহাজে ওঠার ভূমিকা রচনা হয়েছে ও'র জন্যে। ঘরের মেঝেটাও ভারি মজার। উঁচুনীচু নানা থাকে ভাগ করা। যেন প্রকাণ্ড এক একটা সিঁড়ির চাতাল। এই রকম একটা সিঁড়ির চাতালে, ও'র স্প্রিংএর খাটখানা চিতিয়ে। আর এক হাত নীচু, আর একটা চাতালের শেষ প্রান্তে ড্রেসিং টেবিল আর ছোট্ট একটি রাইটিং টেবিল। এছাড়া খাটের পাশে, একটা টি-পয়ের উপর একটা রিডিং-ল্যাম্পের বামন অবতার বিরাজমান। তার পর মাথার কাছে, খোলা ছাতের মত ইয়া চওড়া প্রকাণ্ড সেই বারান্দার এক প্রান্ত—আর ঠিক তার পরেই রাস্তা।

একে উপাদেয় খাওয়া, তার উপর সমুদ্রের গা-ঘেঁসে এই ঘর। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় যেন! সমুদ্রের সেই ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও পরম আরামে এবার বিছানার উপর বিছিয়ে দিল নিজেকে। ও'র দু'দিনের ট্রেনজার্নি অন্তে সকল ক্লান্তি এবার সুগভীর সুষুপ্তি এসে নীলকণ্ঠের মত শুষে নিল সব।

এর পর সমুদ্রের শীতল বায়ুতে রাত্রির পরমায়ু কখন পৌঁছিয়েছে এসে নব দিবসের পদ-প্রান্তে কে তার হুঁস রাখে? বলা বাহুল্য, রাত্রি শেষে ঘুমের ঘোরটা তখন গাঢ় হতে গাঢতর হয়েই ঘনিয়ে এসেছিল ও'র। আর তখনি ত ঘটল গিয়ে সেই কাণ্ড! হুঁস বলে হুঁস—হুঁস না হয়ে উপায় ছিল কি কিছু?···

ও' তখন দু'দিনের জমাট-বাঁধা ক্লান্তি নিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আর সেই ঘুম—সুগভীর নীল অতলস্পর্শী সমুদ্রের মত ঘুম—কি না নিমেষে চমকে উঠে, চমকে উঠে—যেন, ছত্রাকার ছড়িয়ে পড়ে গেল সব চার ধারে। আর সেই ছড়ানো ঘুমের ঘোলাটে আমেজের অন্তরাল থেকেই তো অনুভব করল ঘুমের ঘোরটা যেন ও'র বোজা চোখের উপর তখনো আঠার মত এঁটে বেজায় জোরে চেপে বসে। তার পর হঠাৎ সেই ঘুমের ঘোরেই ও'র মনে হোলো—এ কি! এ যে দাড়িটা আস্তে আস্তে কেমন যেন ভিজে-ভিজে আসছে, আঁশওয়ালা আমের আঁটির মতই সেটাকে আরামসে কে যেন চুষছে।···

ও' সেই ঘুমের ঘোরেই তখন ভাবতে শুরু করে দিয়েছে—বিদঘুটে-মার্কা এ আবার কি স্বপ্ন? সাইকো এনালিসিসে অর্থাৎ বাংলা পরিভাষায় যাকে মন-বীক্ষণ বলা হয়—তাই করলে, এই বৃদ্ধ বয়সে দেহ-তন্ত্রের চাপা কোনো গোপন-বৃত্তির গোঁজামিল প্রকাশ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়বে না তো?—ছি—ছি—সেই ঘুমের ঘোরেই ও' যেন কুণ্ঠায় কুঁকড়ে ক্রমাগত কণ্টকিত হয়ে উঠতে লাগল। এমন সময় গায়ের উপর কার যেন একটা পরিপুষ্ট ওজনদার অবয়ব অবলীলা-ক্রমে গড়িয়ে পড়ল। ও' এবার আচমকা আঁতকে উঠে, বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে···

তখন দূর থেকে বারান্দায় পায়চারিরত জামাতা বাবজীবনের উদাত্ত কণ্ঠে সূর্য্যমন্ত্রের শ্লোক ধ্বনিত হচ্ছে—'জবাকুসুমসঙ্কাশম্···' তার পর হঠাৎ সেই মন্ত্রপাঠ মাঝপথে থেমে গিয়ে শোনা গেল জামাতা বাবাজীবন কাকে যেন দারুণ তড়পাতে শুরু করেছে, আর মুখ দিয়ে অনবরত সেই আওয়াজ—সু-উ-উ—সু-উ-উ—এরই মাঝ-খানে কখনো কখনো গমকের মত আবার আবার ধমকের জের টেনে হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন—"যত রাজ্যের কোথাকার সব অকর্ম্মা হাতী··· কাজের কিছু নয় খালি খাওয়া। এবারে রেশন বন্ধ করে দেব বলছি—ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ—এখোনো ঘুম হচ্ছে বামুনের ছেলের। ভোরে উঠে স্নান নেই সন্ধ্যাহ্নিক নেই—যা, যা, ওঠ শীগ্‌গির, ওঠ—ওঠ বলছি"···এর সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই মুখ দিয়ে ধ্বনি—সু-উ-উ—সু-উ-উ।—প্রতিধ্বনির মত এবার তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হোলো—ঘেউ-ঘেউ—কি সর্ব্বনাশ! তা হলে কি এলসেসিয়ানের ঘাড়ে পড়া নিবিড় আলিঙ্গন আর মুখ-লেহনের উপাদেয় আনন্দ উপভোগ করছিল এতক্ষণ ধরে? ও' চোখটা রগড়ে ভাল করে তাকাতে দেখলো—আকাশের আয়নায় রাত্রিশেষের শুক তারার মুখ, ফুলঝুরি থেকে খসে-পড়া একটি অনির্ব্বাণ আগুনের ফুলকির মত দপ্ দপ্ করছে! বালিশের তলা থেকে পকেট ঘড়িটা বের করে দেখল—রেডিয়াম লাগানো ঘড়ির কাঁটা তখন ভোর চারটের চবুতরার উপর, থমকে দাঁড়িয়ে, আর মিনিটের কাঁটা তার চার ধারে ননষ্টপ ভারতনাট্যম নেচে চলেছে।

ও' তখন খাটের উপর উঠে বসে একটা সিগরেট ধরাবার উপক্রম করল। এমন সময় জামাতা বাবাজীবন স্বয়ং ঘরে। শুধু তাই নয়, শাসিয়ে বললে—"যেমন ভাইঝি তেমনি খুড়-শ্বশুর'! এখনো বসে থাকা?"···

ততক্ষণে সেই বিরাটাকার এলসেসিয়ানটা ও'র পেছু পেছু এসে একদম শুভো ঠাকুরের ঘাড়ের উপর দু'পা উঠিয়ে গায় লাফিয়ে ওঠবার তাল কসছে। ও' এবার বিনা বাক্যব্যয়ে সুবোধ বালকের মত ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। চিনে চোগা আর ড্রেসিং

গাউনের বর্ণসঙ্কর সেই বস্তুটাকে গায় চাপিয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, বারান্দায় টেবিলের উপর মর্ণিং-টির নিখুঁত সরঞ্জাম! মায় টি-পটে টি কোজিটি অবধি আঁটা।

তখন তাজমহল হোটেলের পদ্মফুলের কুঁড়ির মত গম্বুজ গড়িয়ে দিনের আলো আস্তে আস্তে নেমে আসছে বম্বের বুকে। সেই উষার আবছা আলোয় আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে, রাস্তার ওপারে—মিউজিয়ামের বহিরবয়ব—তার পাশে তেড়ছা হ'য়ে—মেজেষ্টিক হোটেল। আর ঐ তো অদূরে হাঁ-করা বম্বে হাইকোর্ট আকাশের গায়ে হাঁ কোরে তাকিয়ে।

ও' সেই ভোর চারটেতে ঘুম ভেঙে উঠলেও এবার হাই তুলে আর আলিস্যি ভেঙে পেয়ালাটায় চা ঢালতে ঢালতে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল—যাক্, বম্বেতে এসে হাইকোর্ট দেখলেও, শেষ অবধি কোলকাতার ছেলের যে গরুর গাড়ি চাপা পড়তে হয়নি—এই যথেষ্ট। বম্বের মত জায়গায় ঠিকানা জানা নেই, নাম জানা নেই, শেষ অবধি খুঁজে বের করেছে তো এই ফ্ল্যাট আর তার মালিককে—নিশ্চিত, বাহাদুরি আছে বটে!

[ক্রমশঃ।

টেলিফোন

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর
তাতানো দুপুর
অফিসে চেয়ারে
বসে এক ধারে
ভাবি কি যে করি
টেলিফোনে ধরি
নমিতাকে।
এক ফাঁকে
উঠে গিয়ে ডাকি
এক্সচেঞ্জ নাকি?
প্লিজ পুট মি
সাউথ থ্রি-থি।
তার পরে গুম্
ভাবি: নিঝঝুম্
নির্জ্জনে—'মিতা'
আমারি কবিতা
হয়ত পড়ছে।
অথবা ধরেছে
'তারাশংকর।'
শুনি ঘর-ঘর
হঠাৎ ওপাশে
গলা খ্যাস-খেসে
'তুমি' ত পাষাণ
হায় ভগবান!
আমারে দেখ না
শুনেও শোন না,
যমের অরুচি
মরে গেলে বাঁচি।
একজোড়া শাড়ী
চেয়েছি ত ভারি
গয়না কি তুল
(পাছে হবে ভুল)
সেই ভয়ে ভয়ে
চেপে গেছি সয়ে।'
তার পরে চুপ
শুধু টুপ-টুপ

ফোঁপানো আওয়াজ
কাঁদে ক্যাঁচ ক্যাঁচ্।
মোলায়েম করে
আরো মিঠি স্বরে
বলি নমিতাকে:
তুমি ত আমাকে
কৈ কোন দিন
ওটা কিনে দিন
বলোনি ত'। আজ
এ কি দিলে লাজ?
এত দিন পরে,
এত ঘটা করে
টেলিফোন দিয়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে
বলতে এসেছ?
তুমি কি ভেবেছ—
রেগে উঠি যেই
অমনি ওপাশে
গলা খ্যাস-খেসে
বলে বাব বাব
ছেড়ে দিন, প্লিজ রং নাম্বার।
ফিরে ডাকাডাকি
এক্সচেঞ্জ না কি?
প্লিজ পুট মি—
সাউথ থ্রি-থ্রি...।
ভাবি, আনমনে
এবার দু'জনে
খুব নিরিবিলি
পাতাবো মিতালা
শুধু প্রাণ খুলে
দু'কূলে দু'কূলে
কথা আর কথা
যত আকুলতা
শেষ করে দেব।
আর চেয়ে নেব
একটু সময়
আজ সন্ধ্যায়

লেকের ও-ধারে
কাছাকাছি বসে
কচি-পাতা ঘাসে
আলোক-আঁধারে
হব বাঙ্ময়।
এমন সময়,
'ইউ রাসকেল্
ঠুকে দেব জেল
নেহাৎ ছ'মাস
চোর, বদমাস
টাকা নিয়ে ভাগা,
পাজী, হতভাগা
লুকিয়ে লুকিয়ে
ভুল নাম দিয়ে
পালিয়ে বেড়ানো?'
বলি: হায় বামো!
একি হল হায়
যত জঞ্জাল,
আমারি কপালে?
যন্ত্রের জালে
জড়ায়ে পড়েছি।
ঠিক যা' ভেবেছি
গম্ভীর স্বরে
তারের ও-ধারে
কথা শোনা গেল:
ছেড়ে দিন স্যার
রং নাম্বার।'
এক-ঘেয়ে ঘুরে
দূরভাষিণীরে,
ফিরে ডাকাডাকি
সেই হাঁকাহাঁকি
প্লিজ পুট মি
সাউথ থি-থি।
তারে জড়াজড়ি
উত্তর এল,
মন দমে গেল:
'এনগেজ্ড সরি!

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশ

হুজুর অর্থাৎ রাজশেখর আসছেন। এবং সে আসা যে কি আসা আর কেউ তেমন না জানলেও উস্তাদ দবীর খাঁ ভাল করেই জানতেন। তাই রঘুবীর তাঁর সামনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়াতে চাইলেও দবীর খাঁ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, ছেলেমানুষী করো না রঘুবীর! তুমি জান না কিন্তু আমি জানি, সে যদি একবার এসে তোমাদের পথ আগলে দাঁড়ায় ত তোমার মত দশ জনও তাকে রুখতে পারবে না। ইস্পাতের মত শক্ত কব্জীতে বিদ্যুতের মত লাঠি ঘোরে তার, হাতের নিক্ষিপ্ত বর্শা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতই অমোঘ! তার চাইতে যত তাড়াতাড়ি পারো পালাও রাজশেখরের এলাকা ছেড়ে। উদ্যানের বাইরে তোমাদের জন্য আমি ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছি—দেখো যদি সে ঘোড়ায় চেপে পালাতে পারো।

তাই। তাই চল রঘু! অপর্ণা রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে সানুনয়ে বলে।

পালাবো?

হাঁ, আর দেরি করো না বেটা! দেরি করলে যে কোন মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটতে পারে। শীগ গির তোমরা বের হয়ে পড়।

আর বিলম্ব না করে তখুনি দবীর খাঁ বহির্মহলের পশ্চাতের অলিন্দ-পথে ওদের নিয়ে অগ্রসর হলেন। অন্ধকার অলিন্দ-পথ—সরু অপ্রশস্ত। একটি মাত্র দেওয়ালগিরী জ্বলছে। তারই স্বল্পালোকে সমস্ত অলিন্দ-পথটি যেন একটা অদ্ভুত এক আলো-ছায়ার রহস্যে থম্ থম্ করছে।

রঘুবীর অপর্ণার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে। পশ্চাতে চলেছেন দবীর খাঁ।

অলিন্দ-পথের শেষ প্রান্তের দরজাটা খুলে তিন জনে পশ্চাতের উদ্যানে এসে পড়লেন। আকাশে কৃষ্ণাচতুর্দশীর ক্ষীণ চন্দ্রের আলো। উদ্যান অতিক্রম করে সকলে উদ্যানের পশ্চাতের দ্বার খুলে বাইরে এলেন।

মাণিকলাল! চাপা কণ্ঠে ডাকলেন দবীর খাঁ।

উস্তাদজী! কণ্ঠস্বর ভেসে এলো অদূরবর্তী বটবৃক্ষের তলায় জমাট-বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে।

ঘোড়া এনেছিস?

হাঁ।

নিয়ে আয় এদিকে।

সহিস মাণিকলাল নিঃশব্দে ছায়ার মত সামনের বটবৃক্ষের তলায় অন্ধকারের স্তূপের ভিতর থেকে বের হয়ে এলো অশ্বের লাগামটা হাতে ধরে।

যা বেটি অপর্ণা! আর দেরি করিস না।

ব্রাহ্মণকন্যা অপর্ণা মুসলমান উস্তাদ দবীর খাঁর পায়ের কাছে নীচু হয়ে প্রণাম জানাতেই দবীর খাঁ ত্রস্তে দুই বাহু বাড়িয়ে অপর্ণাকে বক্ষে টেনে নিলেন। বড় ভালবাসতেন অপর্ণাকে তিনি, আপন কন্যার মতই স্নেহ করতেন। বললেন, থাক বেটি, থাক্! আল্লাহ তোদের প্রেমকে সার্থক করুন। চোখের কোল দুটি দবীর খাঁর অশ্রুতে ঝাপ্ সা হয়ে যায়। তার পর রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুদাতাল্লাকে স্মরণ করে তোমার হাতে আমি আমার অপর্ণা বিটিকে তুলে দিচ্ছি রঘু! আজ থেকে ওর সব শুভাশুভ ভাল-মন্দের ভার জেনো তোমারই উপর।

রঘুবীর কোন কথা বললে না, এগিয়ে গিয়ে অশ্বের রেকাবে পা দিয়ে পৃষ্ঠে আরোহণ করে হাত বাড়িয়ে অপর্ণাকে সামনে তুলে নিল।

পর মুহূর্তেই শিক্ষিত অশ্ব ছুটে ক্ষীণ কৃষ্ণাচতুর্দশীর চন্দ্রালোকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখের জল তখনও দবীর খাঁর শুকিয়ে যায়নি। অশ্রু-ঝাপ সা চোখে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন দবীর খাঁ। সহসা তাঁর চমক্ ভাঙ্গল রাজশেখর রায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে।

উস্তাদজী!

কে? ও, রাজশেখর!

কোথায় তারা?

দবীর খাঁ তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই দাঁড়িয়ে রাজশেখর রায়। মালকোছা এঁটে ধুতি পরা, গায়ে বেনিয়ান, হাতে ঝক্‌ঝকে বর্শা! চোখের মণি দুটো তার দুখণ্ড অঙ্গারের মতই যেন ঝক্‌ঝক্ করছে।

কারা? কাদের কথা বলছো রাজশেখর!

অপর্ণা আর রঘুবীর কোথায় বলুন?

রাজশেখর, শোন!

প্রচণ্ড একটা থাবা বসিয়েই যেন থামিয়ে দিলেন দবীর খাঁর উদ্যত রসনাকে রাজশেখর। এবং কঠিন নির্মম কণ্ঠে বললেন, এখনো বলুন তারা কোথায়! কোথায় তাদের লুকিয়ে রেখেছেন।

তারা নেই রাজশেখর!

নেই?

না। তারা চলে গেছে!

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর প্রচণ্ড আক্রোশে গুলী-খাওয়া বাঘের মতই জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন রাজশেখর রায় দবীর খাঁর দিকে। তার পর বললেন, কি বলবো, গুরু বলে আপনাকে আমি প্রণাম দিয়েছি উস্তাদজী! নইলে হাতের এই বর্শা চালিয়েই—বলতে বলতে সহসা যেন নিজেকে সামলে নিলেন রাজশেখর। এবং বললেন, বেশ! আমিও দেখছি। কত দূরে তারা পালাবে। এক সঙ্গে দুটোকে আমি বর্শা দিয়ে গেঁথে তবে ফিরবো। বলেই ফিরে দাঁড়ালেন রাজশেখর।

শোন রাজশেখর! শোন!···চিৎকার করে উঠলেন দবীর খাঁ। কিন্তু সে ডাকে কর্ণপাতও করলেন না রাজশেখর। তার দীর্ঘ দেহটা উদ্যানের গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছুটে এলেন রাজশেখর আস্তাবলে এবং নিজের প্রিয় অশ্বটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে নিমেষে রায়বাড়ির দেউড়ি দিয়ে বের হয়ে গেলেন।

উপরের শয়নকক্ষের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রায়বাড়ির বধূ সুরেশ্বরী। তিনি দেখলেন, স্বামী তাঁর অশ্বারোহণে রায়বাড়ির দেউড়ি দিয়া বের হয়ে গেলেন। এবং কেন যে গেলেন তাও তিনি জানতেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুকখানি কাঁপিয়ে তার বের হয়ে এলো।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে অশ্ব সামনের দিকে। দু' বাহুর বন্ধনে অপর্ণাকে আঁকড়ে ধরে মুঠির মধ্যে লাগাম চেপে রয়েছে রঘুবীর।

দূরে বহু দূরে তাকে পালাতে হবে। রাজশেখর রায়ের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথায়ও এই রাত্রের মধ্যেই যেমন করে হোক হয়ত পশ্চাতে ছুটে আসছেন রাজশেখর।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদ অস্তমিত-প্রায়। ক্রমে অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে সামনের পথ।

কি একরোখা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজশেখর রায় লোকটা! রঘুবীর নিজেও তা জানে। কৃষ্ণসাগরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যে রাজশেখর তাদের পিছনে পিছনে ছুটে আসবেনই তা রঘুবীর জানে। অশ্বের গতি আরো দ্রুত করে রঘুবীর।

ওদিকে রাজশেখরের অশ্বও বায়ুর গতিতে ছুটে চলেছে। রঘুবীর তার চোখের সামনে থেকে অপর্ণাকে নিয়ে চলে যাবে। না। কখনোই তা তিনি হতে দেবেন না। পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্তও যদি যেতে হয় তাও তিনি যাবেন। কোথায় পালাবে রঘুবীর অপর্ণাকে নিয়ে?

দীর্ঘ তিন ক্রোশ পথ একটানা উর্ধশ্বাসে অতিক্রম করবার পর হঠাৎ রাজশেখরের মনে হলো যেন দ্রুত ধাবমান অশ্বখুরধ্বনি একটা শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

কান পেতে ভাল করে শব্দটাকে শোনবার চেষ্টা করতেই বুঝলেন, তার অনুমান মিথ্যা নয়। অশ্বখুর-ধ্বনিই বটে।

তার পরই কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে দেখতে পেলেন অস্পষ্ট এক ধাবমান অশ্ব। মুহূর্ত্ত আর দেরী করলেন না, ধাবমান অশ্বের বল্গাটা বাঁ হাতে শক্ত মুষ্টিতে চেপে ধরেই ডান হাতে সেই ধাবমান অশ্বকে লক্ষ্য করে তুললেন ধারালো বর্শা। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে নিক্ষেপ করলেন উত্তোলিত বর্শা!

হাওয়ার গতিতে বর্শা ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বেটক্কর টাল না সামলাতে পেরে অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হলেন রাজশেখর।

শিক্ষিত অশ্ব সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেটক্কর ভূতলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় বাঁ হাতে চোট লেগেছিল রাজশেখরের।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতি করে যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, সম্মুখের ধাবমান সেই অশ্ব দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে তখন।

অতিকষ্টে পুনরায় অশ্বারূঢ় হয়ে রাজশেখর আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই মাটিতে সেই নিক্ষিপ্ত তার বর্শাটি পড়ে আছে দেখতে পেয়ে তুলে নিলেন। বর্শার ফলকে তখন টকটকে তাজা লাল রক্ত-চিহ্ন! বুঝলেন তার হাতের নিশানা ব্যর্থ হয়নি।

যা হোক, কি ভেবে আর অগ্রসর হলেন না রাজশেখর রায়। অশ্বের মুখ ফিরালেন।

রায়বাড়ির দেউড়িতে এসে যখন রাজশেখর প্রবেশ করলেন, তার কানে এলো দবীর খাঁর কণ্ঠস্বর। তানপুরা সহযোগে দবীর খাঁ রামকেলির আলাপ করছেন। অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে রাজশেখর দবীর খাঁর কক্ষের দিকেই এগিয়ে চললেন।

কক্ষের এক কোণে প্রদীপদানে প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে গালিচার উপর তানপুরাটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে সুরালাপ করছেন দবীর খাঁ।

মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়িয়ে রাজশেখর যেন কি ভাবলেন। তারপরই হাতের বর্শাটা সামনের দিকে ছুড়ে দিলেন। ঠং করে একটা শব্দ হতেই নিজেই যেন রাজশেখর চমকে উঠলেন।

দবীর খাঁ কিন্তু সাড়াও দিলেন না। রক্তাক্ত বর্শাটা সেইখানেই গালিচার উপরে তেমনি পড়ে রইলো। নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন রাজশেখর রায়। এবং সোজা একেবারে প্রবেশ করলেন দ্বিতলে তাঁর শয়নঘরে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন রাজশেখর, সামনেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্ত্রী সুরেশ্বরী!

স্বামী চাইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে, স্ত্রী চাইলেন স্বামীর মুখের দিকে।

কয়েকটা নির্ব্বাক্ মুহূর্ত্ত পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর রাজশেখর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ধরতে পারলাম না অপর্ণাকে!—কিন্তু যাবে কোথায় সে, খুঁজে তাকে আমি আবার বের করবোই। বলতে বলতে পালঙ্কের উপর বসতে গিয়ে সহসা একটা অস্ফুট যন্ত্রণা-কাতর শব্দ বের হয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে।

সুরেশ্বরী ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। সেই শব্দ কানে যেতেই ফিরে দাঁড়ালেন, কি হলো?

হাতের হাড়টা বোধ হয় ভেঙ্গেছে।

হাতের হাড় ভেঙ্গেছে!

আরো কাছে ততক্ষণ এগিয়ে এসেছেন সুরেশ্বরী।

হাতের হাড়ে লেগেছে? উৎকণ্ঠিতা সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন স্বামীকে।

হাঁ। সেই রকমই মনে হচ্ছে।

দেখি?

রাজশেখরের হাতের নিক্ষিপ্ত বর্শা যে লক্ষ্য ভেদ করেছিল, তার প্রমাণ ত পাওয়াই গিয়েছিল সেই বর্শার ফলকে রক্ত-চিহ্নে। তবে লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হলেও পলাতক রঘুবীরের গতিরোধে সক্ষম হয়নি।

পশ্চাতে অশ্বখুরধ্বনি রঘুবীরও শুনতে পেয়েছিল। এবং অশ্বের গতি সে আরো দ্রুতও করেছিল কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে রাজশেখরের হস্ত-নিক্ষিপ্ত বর্শা ধাবমান রঘুবীরের পৃষ্ঠদেশে এসে গেঁথে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে উঠে রঘুবীর।

কি হলো রঘু!

বর্শা! অশ্ব চালাতে চালাতেই জবাব দিল রঘুবীর অপর্ণার প্রশ্নের।

হাঁ, বর্শা পিঠে বিঁধেছে! তুমি লাগামটা ধর অপর্ণা! আমি বর্শাটা খুলে ফেলি।

অপর্ণা অশ্বের লাগামটা নিল রঘুবীরের হাত থেকে। রঘুবীর ডান হাত দিয়ে পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ বর্শাটা টেনে খুলে মাটিতে ফেলে দিল। এবং বর্শা তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তস্রাব সুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তস্রাবে রঘুবীর নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। বেশী পথ আর তারা অতিক্রম করতে পারল না। রঘুবীর যে

নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অপর্ণার বুঝতে কষ্ট হয় না। সে অশ্বের বলগা টেনে তার গতিরোধ করল।

ও কি, থামলে কেন অপর্ণা?

দাঁড়াও—আগে তোমার ক্ষতস্থানটা আমাকে দেখতে দাও।

পূবের আকাশে তখন আলোর ছোঁয়া লেগেছে। তরল অন্ধকারে ক্রমে সব স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

গায়ের জামাটা রক্তে ভিজে একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। দেখেই চমকে উঠল অপর্ণা। সর্বনাশ! এ কি হয়েছে রঘু!

রঘু তখন আর দাঁড়াতে পারছে না। মাটির উপরেই সে বসে পড়ে। ক্লান্তিতে দু' চোখের পাতা তার জড়িয়ে আসছে তখন।

রক্তাক্ত জামাটা তুলে ক্ষতস্থান দেখে দ্বিতীয় বার শিউরে উঠলো অপর্ণা।

অপর্ণা।

রঘু!

বড় পিপাসা, একটু জল! একটু জল!

জল? দাঁড়াও। দেখছি—সচকিতে বৃথাই চারি দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অপর্ণা। কোথায় জল! সামনেই দুর্ভেদ্য অশ্বের জংগল দৃষ্টি প্রতিহত করছে। আশে-পাশে কোথাও জলের চিহ্নমাত্রও নেই। তা ছাড়া এ সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। কিছুই জানে না অপর্ণা।

একটু জল অপর্ণা!...

আশে-পাশে শ্যামল ধরিত্রী আর সম্মুখেই ঐ দুর্ভেদ্য অশ্বের জংগল, কোথায়ও এক ফোঁটা জল নেই। জল ভরে আসে অপর্ণার দুটি চক্ষের কোলে! ঝর-ঝর ধারায় জল ঝরে পড়ে অপর্ণার দুটি চক্ষু থেকে।

কি করবে অপর্ণা! কি করবে!

একটু জল অপর্ণা!...

ক্রমশঃ চারি দিক আরো স্পষ্ট হয়ে আসে! প্রত্যুষের স্নিগ্ধ আলো চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাথরের মতই মৃত্যুপথযাত্রী রঘুবীরের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকে অপর্ণা। নিদারুণ রক্তস্রাবে প্রাণবায়ু ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

অপর্ণা!

রঘু!

ঐ শেষ কথা! ঐ শেষ ডাক! তার পরই রঘুবীরের মাথাটা শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হেলে পড়ল।

ভুলতে ত পারিনি, আদোতে ভুলতে পারিনি ওস্তাদজী রঘুর সে মৃত্যু! 'বলতে বলতে বহুকাল পরে আবার অপর্ণার দু' চোখের কোল জলে ঝাপসা হয়ে এলো।

একটি কথাও প্রত্যুত্তরে বলতে পারলেন না দবীর খাঁ। কেবল নিঃশব্দে মাথাটা দোলাতে লাগলেন। তাঁর চোখের কোল দুটিও শুষ্ক ছিল না।

ধীরে ধীরে অপর্ণার মাথায় একখানি হাত রেখে দবীর খাঁ বললেন, প্রাণের বদলি প্রাণ নয় বেটি! রাজশেখরের প্রাণ নিলেও ত আজ রঘুর প্রাণ আর তুই ফিরে পাবি না! ফিরে যা বেটি!...

এমন সময় বাইরে কার যেন পদশব্দ পাওয়া গেল।

অপর্ণা যেন আরো কি বলতে যাচ্ছিল দবীর খাঁকে, কিন্তু সেই পদশব্দে বাধা দিলেন দবীর খাঁ, চুপ! কে যেন এদিকে আসছে। তুই এখানে অপেক্ষা কর—বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দরজা ফাঁক করে বাইরে তাকাতেই দবীর খাঁ দেখলেন, তারই কক্ষের দিকে আসছে আর কেউ নয়, স্বয়ং রাজশেখর-গৃহিণী সুরেশ্বরী।

মুহূর্ত আর দেরি করলেন না দবীর খাঁ। তাঁর কক্ষের পশ্চাতের দ্বারপথে এক প্রকার ঠেলেই অপর্ণাকে বের করে দিলে। দরজায় খিল তুলে দিয়ে জাজিমের উপরে এসে বসলেন। এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেজান দ্বার ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করলেন সুরেশ্বরী।

ফুলশয্যার মধুরাতি আজ। জীবনের শ্রেষ্ঠ বসন্ত-রজনী! রেশমী শাড়ী, স্বর্ণ ও পুষ্পালঙ্কারে ইন্দ্রাণীর মতই সাজিয়েছে ভ্রাতৃবধূ স্বর্ণময়ীকে মাধবী। ফুলে ফুলে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল সমস্ত কক্ষটি মাধবী। অগুরু চন্দন, আতর ও পুষ্প গন্ধে ঘরের বাতাস যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। নহবৎখানা থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের মিলন রাগিণী।

এত উৎসব এত আনন্দ চারি দিকে কিন্তু স্বর্ণময়ীর প্রাণে কোন আনন্দ নেই। কত আশার কত স্বপ্নের এ মধুরাতি তবে কেন বুকের পাঁজরের তলায় দীর্ঘশ্বাসের বেদনা থেকে থেকে গুমরে উঠছে? কেন মনে হয় সব মিথ্যা?...

রাত প্রায় এগারটা বাজে কিন্তু এখনো শশাঙ্কশেখরের দেখা নেই! মাধবী পাশে বসেছিল স্বর্ণময়ীর। সে শুধায়, ঘুম পাচ্ছে না ত বৌদি!

মৃদু হাসল স্বর্ণময়ী।

দাদাটা যে কি! এখনও দেখা নেই!

পাড়া থেকে যে সব মেয়েরা এসেছিল রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে তারা বিদায় নেয়।

উৎকণ্ঠিতা সুরেশ্বরী কেবলই বার বার পুত্রের খোঁজ নেন, হ্যাঁ রে শেখর এলো?

শেষ পর্যন্ত রাত বারোটায় এলো শশাঙ্ক।

দাদাকে ফিরতে দেখে মাধবী বলে, আচ্ছা দাদা ভাই, তোমার কি আক্কেল বল ত! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

তা দিয়ে তোর দরকার কি রে মুখপুড়ি?

এতক্ষণ পাড়ার সব বসে থেকে থেকে চলে গেল।

বেশ হয়েছে। এখন তুইও বিদেয় হ দেখি!

পুত্রের সাড়া পেয়ে সুরেশ্বরী ঘরে এসে ঢুকলেন, কোথায় ছিলি রে শেখর এত রাত পর্যন্ত?

বাগানে বেড়াচ্ছিলাম মা!

পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বরীর যেন মনে হয়, বড় বিষণ্ণ ক্লান্ত যেন মুখখানা। উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠেন তিনি। পুত্রের আরো কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলেন, মুখ তোর অত শুকনো কেন রে শেখর! অসুখ করেনি ত?

না মা!

তবু বুঝি সন্দেহ ঘোচে না। পুত্রের কপালে হাত দিয়ে দেখেন। মনে হয় যেন ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ করছে কপালটা। কপালটা কেমন ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে!

ও কিছু না মা !

এই তিনের মধ্যে কেউ বাইরে থাকে এত রাত পর্যান্ত ? তার পর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, আয় মাধু, ওদের শুতে দে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াল শশাঙ্কশেখর। দুগ্ধফেননিভ ফুল-ছড়ানো পালঙ্কের শয্যার উপরে বসে আছে স্বর্ণময়ী। পাতলা ভেলের ভিতর দিয়েও তার দুটি চক্ষু দেখা যায়। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

শশাঙ্ক জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাতের মন্থর প্রহরগুলো গড়িয়ে চলে। মধুরাতি অবসানের পথে পলে পলে এগিয়ে চলে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতেই ফিরে তাকাল শশাঙ্ক, স্বর্ণময়ী তেমনি বসে আছে শয্যার উপরে।

ও কি ! তুমি এখনো বসে আছো কেন ? শুয়ে পড়।

কিন্তু কোন সাড়া এলো না স্বর্ণময়ীর কাছ থেকে। যেমন সে বসেছিলো তেমনি বসে রইলো। এবারে এগিয়ে এলো শশাঙ্ক পালঙ্কের অতি নিকটে।

শোন স্বর্ণময়ী, তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

মুখ তুলে নিঃশব্দে তাকালো স্বর্ণময়ী স্বামীর মুখের দিকে।

আমার মার অনুরোধকে না ঠেলতে পেরেই তোমাকে আমি বিবাহ করেছি কিন্তু স্ত্রী বলে কোন দিনই মনের মধ্যে তোমাকে আমি স্থান দিতে পারবো না। তোমার কোন কাজেই আমি কখনো কোন বাধা দেবো না। যেমন তোমার ইচ্ছা তুমি চলতে পারো। আর আমার সম্পর্কে কখনো কোন প্রশ্নই তুমি করো না। কোন কথা জানতেও চেও না।

কেন আচমকা স্বর্ণময়ীর ছোট্ট দু' অক্ষরের ঐ প্রশ্নটিতে মুখ তুলে তাকাল শশাঙ্ক স্ত্রীর মুখের দিকে ? বঙ্কিম গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকিয়ে আছে স্বর্ণ তারই মুখের দিকে। মাথার গুণ্ঠন স্খলিত হয়ে পড়েছে। ভ্রূ-জোড়া ঈষৎ উত্তোলিত। বধূ বরণের সময় তার মায়ের দেওয়া আশীর্বাদী হীরার কণ্ঠিটার পাথরগুলো ঝলমল করছে। বিস্ময়ে কয়েকটা মুহূর্ত যেন শশাঙ্কর বাক্য সরে না। এমনি একটি প্রশ্ন যে উচ্চারিত হতে পারে সে যেন ভাবতেই পারেনি।

কেন আবার কি ! যা বললাম তাই মনে রেখো। বলে শশাঙ্ক এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

কোথায় যাচ্ছ ? দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারিত হলো।

যেখানে আমার খুশি যাচ্ছি—রাগত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় শশাঙ্ক।

আজকের রাত্রে এ ভাবে না গেলেই কি ভাল হয় না ?

কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা কি তোমার কাছ থেকে আজ আমাকে শিখতে হবে ?

তা আমি বলিনি। লোকে কি বলবে তাই বলছিলাম—

যার যা খুশি সে ভাবুক, তাতে আমার কিছু এসে-যায় না।

কিন্তু তুমি যাবেই বা কেন ? তুমি শয্যায় গিয়ে শোও, আমি নীচে শোবো খন।

না। আবার শশাঙ্ক দরজার অর্গল খুলবার জন্য অগ্রসর হতেই সহসা পালঙ্ক থেকে নেমে এলো স্বর্ণময়ী পায়ের নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর বাজিয়ে এবং শশাঙ্ক ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই সোজা গিয়ে বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সরে দাঁড়াও স্বর্ণময়ী ! পথ ছাড়—

না। দৃঢ় সতেজ কণ্ঠ।

সর বলছি।

না।

স্বর্ণময়ী !

বললাম ত না ! যেতে আমি তোমাকে দেবো না।

দেবে না ?

না।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর

—আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি—

শাদায় আর কালোয় যতখানি করা সম্ভব তা করেছে এ যাবৎ কাল মাসিক বসুমতী। প্রতি মাসে আট পাতা ভর্ত্তি সেরা সেরা ফটো, ছোট বড় নানা সাইজের, কথাটি না কয়ে ছেপে গেছে। কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন শেষ হয়ে যায়ই। আবার সেই প্রায়-শূন্য কলসী ভরে নিতে হয়। তাই কয়েক মাস ধ'রে ডাক পড়েছে আবার নতুন ছবির জন্য। ভাল ভাল ছবিগুলি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার আপনাদের ছবি আবার নতুন ছবি পাঠাবার দিন সমাগত। বিষয়-বস্তু নির্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হোন। ছবি যেন একঘেয়ে না হয়। আলোর কম-বেশী ; প্রিণ্টের গোলমাল না থাকে। ছবির সাইজ বড় হয়। আগে নিজে ছবিগুলিকে নিজেই বাছাই করুন। পরে সেই বাছাই-করা সব চেয়ে সেরা সেরা ছবিগুলি মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠিয়ে দিন। কদাচ যেন ছবির পেছনে ছবির বিষয়-বস্তু এবং ফটোগ্রাফারের নাম-ধাম দিতে ভুলবেন না। এমন ছবি পাঠান, যা দেখে পাঠক-পাঠিকার চোখ জুড়োয়, আপনারও ছবি-তোলা সার্থক মনে হয় ; মাসিক বসুমতীর ঐতিহ্যও বজায় থাকে।

ছবির জন্য আবার ডাক পড়েছে, স্মরণ রাখুন !

অনিলবরণ ঘোষ

উত্তর-পূবে রেল-লাইন, দক্ষিণ-পশ্চিমে টবিন রোড আর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। মাঝে ধূ-ধূ করা ধানের জমি। বর্ষায় দাঁড়ায় হাঁটু জল, খরায় শুকিয়ে খট্‌-খট্‌। কোথাও নেই একটা গাছ কিংবা একটু ছায়া। অকৃপণ হাতে সূর্য্য ছড়ায় আগুন, চাঁদ বিলায় আলো।

লাইনের উপর দিয়ে গাড়ী যখন যায়, মাটি কেঁপে ওঠে থর-থর করে। সেই সাথে ললিতার বুকের মাঝেও কেঁপে ওঠে গুর-গুর করে। ঐ গাড়ীর দিকে তাকালেই ওর মনে পড়ে ফেলে-আসা বাড়ির কথা, ছেড়ে-আসা গাঁয়ের কথা। কেন জানি ভয় করে ওর! মনে হয়, ঐ দৈত্য বুঝি ওকে আর ঘর বাঁধতে দেবে না, টেনে নিয়ে যাবে আরও দূর-দূরান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে।

নদী-নালার দেশের মানুষ ললিতা। রেল-লাইন ছিল না ওদের তল্লাটে। গয়না নৌকো নয়, লক্ষ করে দু' ক্রোশ ডিঙ্গিয়ে সদরে উঠলে পাওয়া যেত রেল গাড়ী।

ললিতার কখনও দরকার পড়েনি রেল গাড়ী চড়ার। স্বামী ওর বৈরাগী-গোঁসাই। গাঁয়ের মাঝে পুরুষানুক্রমে তারা করে আসছিল গোঁসাইগিরি। শিষ্য কয়েক ঘর ছিল ভক্তিমান, বিত্তবান। দিন চলে যেত কৃষ্ণের কৃপায়। তা ছাড়া স্বামী কৃষ্ণদাস ছিল সে তল্লাটের নামজাদা পালা-কীর্ত্তন-গাইয়ে। তার মাথুর শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারে এমন নিঠুর দেখেনি কেউ।

কৃষ্ণদাসের ইচ্ছা ছিল না পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসার। কিন্তু শিষ্যরা যখন একে একে ছেড়ে এল গুরুকে, তখন গোঁসাই-স্ত্রী ললিতা বোঝালে স্বামীকে নানা ভাবে। বললে: দিন চলবে কি করে? কে শুনবে গান? কে দেবে সিধে?

ভয় পেয়ে গেল গোঁসাই। নির্ব্বিরোধী মানুষ। বউর যুক্তিকে স্বীকার করে উঠে এল হিন্দুস্থানে। কয়েক ঘর শিষ্য ঘর বেঁধেছিল টবিন রোডের ঐ মাঠের পাশে। তারা একটু জায়গা ছেড়ে দিল গুরুকে।

গোঁসাই নিজেই বাঁশ-খড় যোগাড় করে তুলে নিল ছোট একটু ঘর। ঝকঝকে তকতকে করে ললিতা নিকিয়ে নিল উঠোন। এক পাশে গড়ল ছোট্ট একটি তুলসী-মঞ্চ, অন্য ধারে লাগাল স্থলপদ্ম, বেলা আর মাধবী-লতার ঝাড়।

ললিতার নতুন সংসার শুরু হ'ল। গুরুকে আর্থিক সাহায্য করার মত অবস্থা আর শিষ্যদের নেই। যতই দিন যায়, হাতের সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে আসে। দুশ্চিন্তায় ললিতার মসৃণ কপালে দেখা দেয় একটা নতুন রেখা।

ললিতার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণদাস। বলে: এ ভাবে দিন আর চলবে না বউ! গোঁসাইগিরি অচল। কল-কারখানায় কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নি,—কি বলো?

শিউরে ওঠে ললিতা। স্বামীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার পর বলে, অমন অলুক্ষণে কথা আর মুখে এনো না, তুমি না গোঁসাই? শিষ্যরা শুনলে কি ভাববে ছিঃ—

কৃষ্ণদাস আর কথা বাড়ায় না। ডুবে যায় ভাবনার সাগরে। নদীর ঢেউয়ের যেমন গুণতি নেই, ওর ভাবনারও বুঝি শেষ নেই! শুধু পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কে মাঝে মাঝে প্রাণপ্রিয় শ্রীখোলটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বোল তোলে, গুন্‌-গুন্‌ করে কলি ভাঁজে আর ভাবে ...শুধু ভাবে...

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ললিতা বসে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্‌ দিয়ে। তাকায় মাঠের পানে, তাকায় বি, টি রোডের দিকে, দৃষ্টি গিয়ে পড়ে লাইনের ধারে টেলিফোন-তারগুলির উপর। ভয়াতুর দৃষ্টি ওর থমকে দাঁড়ায়। একটা তারের উপর বসে নাচছে একজোড়া কালো-কাজল ফিঙ্গে। হঠাৎ বিদ্যুতের শিখার মত শূন্যে লাফিয়ে উঠল পুরুষ-ফিঙ্গেটা। কিছুটা উপরে উঠে দু'পাখার সঞ্চালন বন্ধ করে হাওয়ায় ভর করে নামতে থাকে।

ঠোঁটে-ধরা একটা পোকা নিয়ে ফিঙ্গে বসল বউর পাশে। পোকা-শুদ্ধ ঠোঁট ওর গুঁজে দিল বউর মুখের মাঝে। ফিঙ্গেনী চেপে ধরে বরের ঠোঁট। ঠোঁট আর ছাড়ে না সে। ঠোঁট ছাড়াবার তাড়াও নেই ফিঙ্গের। শুধু আনন্দে বিচিত্র লেজ দু'টি ওদের নাচতে থাকে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে।

...আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী! মানভঙ্গ করি সুমুখে আনিল নাগর যতন করি। সোনার নাগর নাগরী স্বচ্ছ স্বচ্ছ ত্যাগেতে করিল দান আপনার বরঅঙ্গ।......

ঘরের মাঝে কৃষ্ণদাস গুন-গুন করছে। মৃদঙ্গের বাণী নানা ছন্দে মুখর হয়ে উঠছে। কান পেতে একটু শুনে নিয়ে ললিতা ডুবে যায় স্মৃতির সাগরে।

মাত্র দশ বছর আগের কথা। গোঁসাই গিয়েছিল ললিতাদের বাড়ি গান গাইতে। বিশ বছরের সুন্দর-সুঠাম শ্যামল যুবা। কাঁধেতে লুটান ঢেউখেলান চুলের রাশি। স্বপ্নেভরা দু'টি আঁখি। গোষ্পদে যদি ধরা দেয় আকাশ, শাঁখের মাঝে যদি সাগর, তা'হলে কৃষ্ণদাসের দু'টি চোখের মাঝে ললিতা দেখেছিল দুনিয়া।

রাত্তিরে নৌকাবিলাস দিয়ে আরম্ভ হ'ল গান। মধুর রসে ডুবে গেল মণ্ডপ। শেষ রাত্তিরে হ'ল মাথুর, কান্নায় চোখ ফুলিয়ে ফিরে গেল গাঁয়ের লোক।

এদিকে গান শেষে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে ললিতা। ঘরের বিগ্রহ দেবতা মাধব যেন গায়ক ঠাকুরের রূপ ধরে এসে বলছে,—জাগো যদি রাই ওঠো না কেন...

রোমাঞ্চিত ললিতা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। কিন্তু কোথাও নেই কেউ। স্তব্ধ ঘর অন্ধকার!

ললিতার বাবা শ্রীনিবাস ঠাকুরেরও পছন্দ হয়েছিল ছেলেটি। খোঁজ-খবর নিয়ে মাতৃপিতৃহীন গায়ককে বেঁধে নিলেন স্নেহের বন্ধনে। স্বামি-ঘর করতে এসে রাই সাজল রাজরাজেশ্বরী। লক্ষ্মীর মত রাঙা টুকটুকে বউ দেখে শিষ্যদের আনন্দ আর ধরে না।

...বঁধু আমার মত তোমার অনেক রমণী, তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী। কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি।

ঘরের মাঝে বুঝি কৃষ্ণদাসের ভাব এসেছে। গাইছে প্রাণ খুলে হৃদয়ের দরদ দিয়ে, কণ্ঠে মধু ঢেলে। সুমধুর মীড় আর গিটকিরি ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে-বাতাসে।

গান শুনতে শুনতে ললিতার মনে পড়ে, দেশের বাড়িতে গোঁসাইর গান গাইবার দৃশ্য। গোঁসাই গান ধরলে চার পাশ থেকে ছুটে আসত কত লোক। গোঁসাই কাঁদালে তারা কাঁদত; হাসালে হাসত। আর আজও গোঁসাই গেয়ে চলেছে গান। একটি ভক্তও তার এসে বসেনি পাশে।

হঠাৎ চমকে ওঠে ললিতা। একমাত্র সন্তান গোপাল রোদ্দুরে লাল হয়ে কাদামাটিতে সমস্ত দেহ লেপে আগল ঠেলে এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছে।

ললিতার স্মৃতির রোমন্থন থেমে যায়। দ্রুত পদক্ষেপে দাওয়া ছেড়ে নেমে যায় সে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

: কে অমন করে কাদা ছিটিয়ে দিলে রে গোপাল?

মার কোলের মাঝে একটা ডিগবাজী খাবার চেষ্টা করে গোপাল বলে: হোলী খেলছিলাম মা!

: কাদা দিয়ে ও-সব খেলা ভাল নয় বাবা, আর খেলো না, কেমন?

: আচ্ছা আচ্ছা, খেলবো না আর, খেতে দাও, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

ললিতার মুখের উপর ঘন কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। পেট ভরে খেয়ে থিয়ে একটু পরেই যদি খেতে চায় অবুঝ ছেলে, তা'হলে কি করে কি দিয়ে সামলাবে ললিতা? আগেকার দিন কি আর আছে?

: খেতে দাও মা! অধৈর্য্য ছেলে আব্দার তোলে।

রাতের জন্য জল-ঢেলে-রাখা ভাত রয়েছে ঢাকা। মুড়ি-চিড়া ঘরে নেই একটিও। ছেলেকে এখন কি খেতে দেয় ললিতা!

: বা রে খেতে দিচ্ছে না—

: চল কাদা ধুইয়ে দি—

: ভাত খাব না কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি!

: ছিঃ! অমন করতে নেই বাবা!

: আমার বেলাই কেবল অমন করতে নেই, অমন করতে নেই। ওদের বাড়ীর সন্টু কেমন পাটালীগুড় দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিল, আমিও পাটালীগুড় দিয়ে মুড়ি খাব—খাবই…হ্যাঁ…

: আজকে ভাত খেয়ে নাও, কাল তোর বাবা গুড়মুড়ি এনে দেবে—

: যা চাই, তাই কেবল কাল এনে দেবে, কাল এনে দেবে বলো! না…আমি আজই গুড়-মুড়ি খাব। ছেলে বেঁকে দাঁড়াল।

হঠাৎ চলে যায় ললিতা। ছেলের দিকে কঠিনদৃষ্টিতে তাকিয়ে গর্জ্জে ওঠে সে: কেবল বায়না আর বায়না, দাঁড়া তোকে খাওয়াচ্ছি পাটালীগুড়!

ছেলের কান শক্ত করে চেপে ধরে গায়ের জোরে একটা থাপ্পড় কষে দেয় ললিতা।

আচমকা চড় খেয়ে বিস্ময়ে মা'র দিকে তাকায় গোপাল। তার পর প্রচণ্ড এক চিৎকার তুলে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ছেলের কান্নার আওয়াজ পেয়ে শ্রীখোলটা এক পাশে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণদাস। বাপকে দেখে অভিমানক্ষুব্ধ ছেলের কণ্ঠ আরও চড়ে যায়। হাত পা ছুঁড়ে সে চিৎকার করতে থাকে।

এগিয়ে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নেয় গোঁসাই। স্তব্ধ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে: কি হয়েছে বউ?

: কি আর হবে, বায়না ধরেছে পাটালীগুড়-মুড়ি খাবে।

নিঝুম হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেকে নিয়ে ঘাট পাড়ে চলে যায় গোঁসাই। সে দিকে তাকিয়ে থেকে ললিতার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর ধুইয়ে-পুঁছিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে ফিরে এল গোঁসাই। কোলের মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলে। ছেঁড়া মাদুরের উপর থেকে শ্রীখোলটা সরিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল গোঁসাই। তার পর স্ত্রীর কাছে এসে অস্ফুট কণ্ঠে বললে: দু'-আনা পয়সা হবে না বউ?

স্বামীর মুখের দিকে ললিতা তাকায় স্থির দৃষ্টিতে।

বোকার মত হাসে কৃষ্ণদাস। মাথা চুলকিয়ে বলে, ঘুম থেকে উঠে যদি আবার বায়না ধরে, তাই কিনে এনে রেখে দিলে খুব জব্দ হবে ছোঁড়া, কি বলো…এ্যাঁ…

স্বামীর দিকে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ললিতা উঠে যায় ঘরের মাঝে। তোরঙ্গ খুলে বের করে আনে একটা দু'-আনি। স্বামীর হাতে দিয়ে আবার নিঝুম হয়ে বসে পড়ে সে খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, ছেলের উঠবার নাম নেই। নিঃসাড়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে গোপাল। দু'বার ললিতা এসে ডেকে গেছে, কোন উত্তর পায়নি। তেলের অভাবে তুলসীমঞ্চে আজ-কাল আর সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। ললিতা গিয়ে প্রণামটুকু সেরে আসে।

কৃষ্ণদাস গিয়ে বসেছে বি, টি রোডের ধারে। লোকটা আজ-কাল কেবল নির্জ্জন নিরিবিলিই খোঁজে।

ছেলেকে আর ঘুমুতে দেওয়া চলে না। ঘরে এসে ললিতা গোপালের গায়ে হাত দেয়। পরমুহূর্তেই চম্‌কে সে হাত টেনে নেয়। আগুনে-পোড়া লোহার মত পুড়ে যাচ্ছে ওর গায়ের চামড়া।

ভয়ে ললিতা হ্যারিক্যানটা জ্বালিয়ে ফেলে। ছেলের মুখের কাছে এনে তুলে ধরে। হাঁ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস টানছে গোপাল। বড় বড় চোখের পাতা দু'টি কেঁপে কেঁপে উঠছে। অন্তর্দাহে মসৃণ কপাল কুঁচকে যাচ্ছে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ললিতা বসে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে কৃষ্ণদাস আসে। ছেলের জ্বর দেখে তার মুখ কালো হয়ে যায়। ললিতার পাশে সে-ও বসে পড়ে নিশ্চল হয়ে।

সারা রাতে ছেলের জ্ঞান আসে না ফিরে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওরা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলক পড়াও বুঝি ওদের বন্ধ হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো ফুটে ওঠে। মিঠে হাওয়া ছুঁয়ে যায় ওদের রাতজাগা-মুখে। বাইরের দিকে তাকিয়ে ললিতা চম্‌কে ওঠে। ডুকরে ওঠে ওর কণ্ঠ।

সারা রাতে ছেলে যে এক বারও তাকালে না, ডাক্তার ডেকে আনো গো—

কৃষ্ণদাস স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় অসহায়ের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে। ললিতা আঙুল দিয়ে তাকের উপর রাখা একটা পুরোনো বার্লির কৌটো দেখিয়ে বলে, ওখানে আমার শেষ সম্বল চারটে টাকা আছে, যা করবার করো গো…দেরী করো না আর…

কৃষ্ণদাস উঠে দাঁড়ায়। কাপড়ের খুঁট খুলে গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়!

ডাক্তার আসেন। গোপালের দেহের তাপ নিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করেন। ওষুধের এক লম্বা ফর্দ লিখে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, বুকে ঠাণ্ডা লেগেছে, খুব সাবধানে রাখতে হবে। যে কোন সময় নিমোনিয়ার রূপ নিতে পারে। সমস্ত দিনে জ্বর না কমলে ওবেলা যেন তাঁকে ডেকে আনা হয়।

দু'টাকা ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বাকী দু'টি টাকা পকেটে নিয়ে কৃষ্ণদাস ডিস্পেন্সারীতে যায় ওষুধ আনার জন্ম। কিন্তু মুখ কালো করে ফিরে আসে সে ডাক্তারখানা থেকে। ওষুধের দাম প্রায় আট টাকার উপর পড়বে।

ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণদাস চারি পাশে তাকায়। বিক্রী করার কিছুই নজরে পড়ে না। দৃষ্টি তার ঘুরতে ঘুরতে শ্রীখোলটার উপর গিয়ে পড়ে। সযত্ন ঘষা-মাজায় চক্-চক্ করছে খোলটা। তিন পুরুষ যাবৎ তাদের বাড়িতে রয়েছে এটা। কৃষ্ণদাসের ঠাকুদা তার গুরুদেবের কাছ থেকে শ্রীখোলটা উপহার পেয়েছিলেন। অপূর্ব মিঠে এর আওয়াজ। অতি স্পষ্ট এর বাণী, দীর্ঘ সময়স্থায়ী এর রেশ।

জোর করে শ্রীখোলটার উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় কৃষ্ণদাস।

স্বামীর মুখে টাকার কথা শুনে ললিতা নিঝুম হয়ে বসেছিল। তারই বা কি আছে দেবার? সামান্য দু'-একটি গয়না যা ছিল, সে যে বিকিয়ে গেছে আগেই! কেবল রয়েছে গলার হারছড়াটি। বহু আশায় সেটা সে রেখে দিয়েছে গোপালের বউর জন্ম। সে হার-ছড়াই সে খুলে দেয়। আগে গোপাল···তার পর ত' বউ—

স্তব্ধ হয়ে কৃষ্ণদাস দাঁড়িয়ে থাকে।

ললিতা উঠে হারছড়া স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে: আর দেরী করো না ওষুধ নিয়ে এসো—যাও—

মাথা নীচু করে কৃষ্ণদাস বেরিয়ে যায়।

আরও চার দিন কেটে গেল। গোপালের সেই একই অবস্থা! সমস্ত দিন ও রাত আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। শুধু সকালের দিকে একটু চোখ মেলে তাকায়।

ডাক্তার আসছে। ইন্‌জেক্‌শান দিচ্ছেন। যা ভয় করেছিলেন, তাই নাকি দেখা দিয়েছে। নিউমোনিয়া আক্রমণ করেছে শিশুর দু'টি ফুসফুস।

হার-বেচা টাকা ফুরিয়ে গেছে। শিষ্যদের দোরে দোরে ঘুরে সামান্য কিছু জোগাড় করে আনে কৃষ্ণদাস। কয়েক বছর আগে এক জমিদারের বাড়ী কেত্তন গেয়ে একটা শাল উপহার পেয়েছিল সে। তোরঙ্গের মাঝ থেকে সে শালখানা বের করে বেচে আসে। উৎসবাদিতে মাধবের কাছে ভোগ সাজিয়ে দেবার জন্ম ঘরে ছিল দুটো পেতলের গামলা। কৃষ্ণদাসের বাপের আমলে কেনা; বেশ পুরু আর সাচ্চা জিনিষ। দুপুরে বাসনওয়ালা যেতে দেখে বেচে দিল গামলা দু'টি।

পঞ্চম দিন সকাল থেকেই গোপালের অবস্থা খারাপ। সন্ধ্যের পর ইন্‌জেক্‌শান দিতে এসে ডাক্তার কিছুক্ষণ বসে থাকেন। একটা নতুন ইন্‌জেক্‌শানের নাম লিখে দিয়ে গেলেন। সকাল থেকে এটা দেওয়া সুরু করবেন।

শেষ রাত্তিরে গোপালের জ্ঞান ফিরে আসে। ছেলের স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকিয়ে মা-বাপ আশান্বিত হয়ে ওঠে। ঝুঁকে তাকায় তারা। বেশ স্পষ্ট করে গোপাল কথা বলে। কণ্ঠের মাঝে একটুও জড়তা নেই। কানে এসে আঘাত করে অমনই স্পষ্ট কথা।

ললিতার কেমন যেন ভয় করে। স্বামীর দিকে সে ভয়ার্ত দৃষ্টি তাকায়।

কৃষ্ণদাস উঠে দাঁড়ায়। কাপড়ের ট্যাঁকে অবশিষ্ট কয়েক আনা পয়সা আঙুল দিয়ে সে টিপে দেখে। আজ থেকে নতুন ইন্‌জেক্‌শান দিতে চেয়েছেন ডাক্তার। যে ভাবেই হোক ইন্‌জেক্‌শানের টাকা তাকে জোগাড় করতেই হবে।

শতাব্দীর ঐতিহ্য নিয়ে শ্রীখোলটা গর্বভরে ঘরের কোণে ঝুলছে। কৃষ্ণদাস তাকিয়ে থাকে শ্রীখোলটার দিকে। পলক তার পড়ে না, দৃষ্টি তার নড়ে না। ধীরে ধীরে দৃষ্টির মাঝে তার ফুটে ওঠে একটা জ্বালা। এগিয়ে যায় সে শ্রীখোলটার দিকে। হাত বাড়িয়ে পেরেক থেকে খুলে নেয় ওটা। নিঃশব্দে কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে যায় সে।

হঠাৎ রাস্তার উপর থমকে দাঁড়ায় গোঁসাই কার কাছে সে একে বিক্রী করবে? শিষ্যদের মাঝে যোগেশের একটু সখ আছে গান-বাজনার, এক সময় কৃষ্ণদাসের দলে দোঁহা ধরত সে। সে কি নেবে শ্রীখোল?

দুরু-দুরু বক্ষে কৃষ্ণদাস এসে দাঁড়ায় যোগেশের আঙিনায়।

গুরুকে দেখে বেরিয়ে আসে শিষ্য। ভূমিষ্ঠ হয়ে পাদ স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করে, গোপাল ভাল আছে ঠাকুর? তার পর পিঠ থেকে ঝোলান শ্রীখোলটা দেখে সে সত্রাস মুখে বলে: কোথাও বুঝি গাইতে যাচ্ছেন? আমার পোড়া কপাল, কত দিন যাবৎ শ্রী-নাম মুখে নিতে পাইনে—বলেই একটা সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগেশ।

নিজেকে কৃষ্ণদাস সামলে নেয় প্রাণপণে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে: শ্রীখোলটা তুমি কিনবে যোগেশ? তুমি নিলে আমার বড় উপকার হয়।

অনুনয়ে গুরুর কণ্ঠ কেঁপে ওঠে।

চমকে ওঠে যোগেশ। মুহূর্ত্ত কাল সে তাকায় গুরুর মুখের পানে। কি যেন ভাবে! লোভাতুর হয়ে ওঠে ওর মুখের পেশী। ধীরে ধীরে বলে: আমার ঘরে অত টাকা নেই ঠাকুর! মাত্র দশটা টাকা আছে আমার, ওতে কি হবে আপনার?

কৃষ্ণদাস ঠোঁট চেপে ধরে দাঁত দিয়ে। দশ টাকা···মাত্র দশ টাকা দাম বললে যোগেশ? এ শ্রীখোলের ইতিহাসও যোগেশের অজানা নয়। এর আওয়াজ নিশ্চয় ভুলে যায়নি যোগেশ!

ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ মনে কৃষ্ণদাস পা তোলে। কয়েক পা এগিয়ে যায়। কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। ফিরে আসে। পিঠ থেকে নামিয়ে শ্রীখোলটা যোগেশের হাতে দেয়।

একটা বোলের পড়া নিয়ে পরখ করে দেখে যোগেশ।

যোগেশের আঙুলের প্রতিটি টোকা কৃষ্ণদাসের হৃৎপিণ্ডের মাঝে গিয়ে যেন আঘাত করে। যন্ত্রণা-কাতর মুখে সে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘর থেকে টাকা এনে দেয় যোগেশ।

* * * *

আবার ডাক্তার আসে। আসে নতুন ইন্‌জেক্‌শান। কিন্তু দুপুর নাগাদ সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় গোপাল।

ললিতা লুটিয়ে পড়ে কান্নার ভারে।

কৃষ্ণদাসের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তাকের মাঝে। পাঁচ দিন আগে কিনে-আনা মুড়ি আর পাটালীগুড়ের ঠোঙাটা হাওয়ায় একটু একটু নড়ছে।

প্রফুল্ল রায়

বাদামী বালির বেলাভূমি থেকে একটা উদার হাতের মত প্রসারিত হ'য়ে রয়েছে পথটা। চক্রতীর্থের পথ। ত্ব'পাশে ঝাউএর সারি। পাতায় পাতায় অশ্রান্ত মর্মর। ডাল-পাতার মধ্য দিয়ে জাফরীকাটা রোদ এসে পড়েছে। অনেক দূরে অবজারভেটরীর পোষ্টটা ঝলসে যাচ্ছে। একটা শাণিত রূপালী দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তার পরেই নীল একখানা কাচের মত পড়ে রয়েছে বিশাল সমুদ্র। আচক্রবাল। ধূ-ধূ। ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশে সে উধাও। কয়েকটা বিন্দুর মত চক্রাকারে পাক খেয়ে চলেছে সামুদ্রিক পাখীর ঝাঁক।

চক্রতীর্থের পথ ধরে সমুদ্রের দিকে আসছিলাম। ঘন নীল সমুদ্র একটা অপরূপ ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দিয়েছে চোখে। নুলিয়াদের নৌকাগুলো দোল খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের কাছ থেকে তারা উপহার চায়। রাশি রাশি রূপালী ফসল। মাছ। পমফ্রেট, গাঙ-ভেটকী, শীতলী। দৃষ্টিটা উধাও-ধাওয়া হয়ে সমুদ্রের ধূ-ধূতে হারিয়ে গিয়েছিল! পূজোর ছুটির এই কয়েকটা দিন পুরীর সমুদ্র এক আশ্চর্য ভালবাসায় ভরে দিয়েছে।

অবজারভেটরীর কাছাকাছি এসে সুমন্তর সঙ্গে দেখা হলো। উল্লসিত হয়ে উঠলাম। কারণও ছিল। য়ুনিভার্সিটির সেই আশ্চর্য দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো, সেই দিনগুলো ক্রিকেট কার্ণিভাল, জলসা, ফাংশন্—এ সবের রেখায় বন্দী ছিল। সেদিন সুমন্তর সাহচর্যে মুহূর্তগুলো সত্যিই রাশি রাশি প্রজাপতির পাখার বর্ণময় মত মনে হ'ত। সিনেমা, লাইব্রেরী, সোশ্যাল—সব জায়গায় সুমন্ত আর আমি পাশাপাশি, কাছাকাছি। সব সময়। অন্য বন্ধুরা সরস টিপ্পনী কাটতো: "তোমাদের ত্ব জনের একজন ফেয়ার সেক্স হ'লে লোকের মুখে কিন্তু রীতিমত গুঞ্জন হ'তে পারতো।"

আশ্চর্য। য়ুনিভার্সিটির সেই হাউস্ ডিঙিয়েই জয়পুরে চাকরি নিয়ে চলে সুমন্ত। তার পর তিন বার দেখা হয়েছে এই পাঁচ বছরে। একবার দিল্লীতে, আর একবার এলাহাবাদে। আর শেষ বার কলকাতায়! কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল। আগে চিঠি আসতো। নিয়মিত। সপ্তাহের প্রাথমিক কোন দিনে ভারী এনভেলপ বয়ে আনতো জয়পুরের উত্তাপ। সেই উত্তাপ অদর্শনের হিমে হিমে জুড়িয়ে এলো একটু একটু। সপ্তাহ থেকে মাসে এনভেলপ থেকে পোষ্টকার্ডের নিরুচ্ছ্বাস কুশল জিজ্ঞাসায় মুছে আসতে লাগলো য়ুনিভার্সিটির সেই স্বপ্নময় কয়েকটি দিনের সুখস্মরণ।

আবার দেখা। রূপার দ্যুতি-ছড়ানো অবজারভেটরী স্তম্ভের নীচে মুখোমুখি হলাম। অনেক, অনেক দিন পর।

আমি বললাম, "কী রে, এখানে কবে এলি? জয়পুরেই আছিস তো? পুরীতে ক'দিন থাকবি? এখানে কোথায় উঠেছিস?" আমার অনেকগুলো কৌতূহল একসঙ্গে প্রশ্নের রূপ নিল।

"আমি, মানে—আমি—তারপর তুই কেমন আছিস?" একটু থতমত খেলো সুমন্ত। চার দিকে তাকালো ইতি-উতি। পরিষ্কার বুঝলাম আমার প্রশ্নগুলোকে এলোমেলো কথায় এড়িয়ে যেতে চাইছে সুমন্ত।

আমি আবারও বললাম, "তুই কোথায় উঠেছিস?"

"আমি, মানে সী ভিউ হোটেলে। তবে আজই রাত্রে এখান থেকে জয়পুর চলে যাবো।" আর দাঁড়ালো না সুমন্ত। আমার ত্ব'টি চোখকে বিস্মিত করে, আমার চেতনাকে বিক্ষত করে হন-হন করে সমুদ্রতীরের পথ ধরে হাঁটতে সুরু করল। সুমন্ত পেছন দিকে একবারও তাকিয়ে দেখলো না। আমার মনে হলো, সে পলাতক হলো। সে ফেরারী হ'লো।

কয়েকটি বিহ্বল মুহূর্ত। তার পরেই শরীরের সমস্ত পেশী-গুলোকে সংহত করে হোটেলের দিকে পা চালালাম। মাথার ওপর সূর্যটা তির্যক রেখায় ঝলছে! পেটের মধ্যে ক্ষিদের রীতিমত ঘোষণা।

ছুরির ফলার মত একটা কৌতূহল মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঁকি দিচ্ছিল। সারাটা ত্বপুর একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে কাটামর হ'য়ে রইল। বিকেলের দিকে সী ভিউ হোটেলের দিকে রওনা হলাম। সমুদ্রের পাড় দিয়ে পথ। বাদামী বেলাভূমির প্রান্ত থেকে নিবিড় নীল মসলিনের মত আদিগন্ত সমুদ্র। বিকেলের আলোতে পান্নার মত জলছে। এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। তারপর আবার চলতে সুরু করলাম। কয়েক দিন ধরে পুরী এসেছি। স্বর্গদ্বার থেকে পুরীর মন্দিরে প্রাচীন ভারতের শিল্পাসন দেখতে দেখতে, চক্রতীর্থের পথ ধরে বি, এন, আর হোটেলের পাশ দিয়ে সোনার গৌরাঙ্গ দেখে কাটিয়েছি। বিস্মিত দৃষ্টির সামনে একটি স্বর্ণকুম্ভের মত সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে প্রথম সূর্য। রজনীগন্ধার মত একটি একটি সুরভিত দল মেলেছে জ্যোৎস্না, থরে থরে ঝরেছে সমুদ্রের ওপর।

আজ কিছুই ভালো লাগল না। একটু একটু করে পথটুকু পার হয়ে এলাম। সী ভিউ হোটেল। বারান্দায় মুখোমুখি। সুমন্ত দাঁড়িয়ে আছে। আর, আর তার পাশেই সুবালাকে দেখে প্রায় আর্তনাদ করেই উঠতাম। সহসা আমার দৃষ্টিটা থমকে গেল সুবালার ত্ব'টি নিবদ্ধ চোখের মণিতে। আর, আর সুমন্ত যেন একটা কবন্ধ দেখেছে! কে যেন এক চুমুকে মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছে তার! ধূসর কাগজের মত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তার মুখটা। আশ্চর্য কুৎসিত দেখাচ্ছে সুমন্তকে।

অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুমন্ত আর সুবালা। সুবালার সীঁথির ওপর সিন্দুরের নিশানা। নির্ভুল ভাবেই সুমন্তর পরমায়ু চিহ্নিত হ'য়ে রয়েছে।

এক সময় সুমন্তই বলল : "তুই কী মনে করে অরুণ ?"

আমার গলায় অভিমান ছিল। বললাম, "আমি আসতে তুই কী খুশী হোস নি ? তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস সুমন্ত !"

"না, না। আয়, আয়"—একটু উচ্ছল হবার চেষ্টা করলো সুমন্ত। "এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি সুবালা মিত্র। আমার, মানে—মানে"—

তার কথা শেষ হবার আগেই বললাম, "ওরে রাসকেল, আমাকে না জানিয়েই বিয়ে করেছিস ? আউট্ অব্ সাইট হলেই আউট্ অব মাইণ্ড হতে হয় না কী রে ? ভালো !" আমার ভঙ্গিতে রীতিমত অনুযোগ ছিল।

সুমন্ত বলল। আশ্চর্য হিমাক্ত তার কণ্ঠ ; "সুবালা, ইনি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার অনেক দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

পুতুল নাচের পুতুলের মত যান্ত্রিক হাত দুটো যুক্ত হয়ে কপালে উঠে গেল সুবালার। আমি প্রতি-নমস্কার করতে ভুলে গেলাম। শুধু নিরুদ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম, সুবালার নিবদ্ধ চোখ দুটো থেকে একটু করুণ প্রার্থনা আমাকে অভিভূত করে ফেলছে। এ প্রার্থনা আমি বুঝলাম।

কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হয়ে গেল। কোন কথা বলল না কেউ। সুমন্ত না, সুবালা না এবং আমিও না। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি একটা মর্গে এসে পড়েছি। এই প্রেতায়িত পটভূমি থেকে আমাকে এখনই সরে যেতে হবে। আমার স্নায়ুগুলো যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছে। নিজের অজান্তেই পথে এসে নামলাম। আশ্চর্য ! ওরা আমাকে বসতে পর্যন্ত অনুরোধ জানালো না। প্রীতির স্পর্শ দিয়ে আমাকে রোমাঞ্চিত করলো না !

অপরাহ্ণ এখন সোনালী হয়েছে। আকাশ-গঙ্গা এক বিচিত্র মাধুর্যে ভরে গিয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি আজ-আর সেই সমুদ্রে স্নান করলো না। শুধু মনের মধ্যে ঘূর্ণপাক খেতে লাগল একটি মুখ, একটি নাম, দু'টি প্রার্থনাভরা চোখ। সুবালা !

উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগে আমি সরকারী চাকরী করি। বছর চারেক আগে ছিলাম কুপার্স ক্যাম্পে। সেখানেই প্রথম দেখেছিলাম সুবালাকে। ফরিদপুর জেলায় বাড়ী। বাবা ছিলেন ওখানকার জেলা-স্কুলের মাষ্টার। মা নেই। একটি মাত্র ভাই। ক্ষুদ্রতম এই পরিবারটি আশ্রয় নিয়েছিল কুপার্স ক্যাম্পে। চেহারাটি মনোরম ! দৃষ্টিকে প্রসন্ন করার মত। ভ্রমর-চোখ থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত নিখুঁত। শাঁখ-সাদা রঙ। প্রিয়হাসিনী। আমার তরুণ রক্তে কয়েকটি ভালো-লাগার পদ্ম ভাসিয়ে দিয়েছিল ! ছল-ছল করে দুলেছিল মন।

এমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারার মধ্যে একটি খুঁতময় মন যে ছিল, তা আগে জানি নি। মাস দুয়েক পরেই তার সন্ধান পেলাম। চৈত্রের এক আগুনঝরা দুপুরে হঠাৎ ক্যাম্পময় গুঞ্জন উঠল, সুবালা নেই। আমারই এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মনোরম সেনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। মনটা বিস্বাদ তিক্ততায় ভরে গেল।

তার পর অনেক দিন পার হয়েছে। কুপার্স ক্যাম্প থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছি। সুবালাকে নিয়ে, মনের মধ্যে যে

রঙীন বুদ্বুদটা ফুলে উঠেছিল, সেটা এক দিন ফেটে চৌচির হ'য়ে গিয়েছে। স্মৃতির বাল্যুঘরে নগণ্য একটি ফসিলের মত হারিয়ে গিয়েছে সুবালা!

কিন্তু কৃপার্স ক্যাম্পের সেই মেয়ে কেমন করে সুমন্তর বাহুবন্দিনী হলো? ভাবনাটা পাক খেয়ে চলল মনে। অসংলগ্ন পা দু'টি এলোমেলো ছাপ আঁকতে লাগল বাদামী বালির বেলাভূমিতে।

হোটেল থেকে ভোর হবার আগেই উঠে এসেছি সমুদ্রের পাড়ে। নানা প্রদেশের মানুষ। একেবারে আন্তর্জাতিক পরিবেশ! বাঙালী, মাদ্রাজী, বিহারী, বম্বাইয়া। সকলের দৃষ্টি সূর্যোদয়ের বিন্দুটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। চার পাশে ঝিনুক-বিলাসিনীদের উল্লাস। কৃতী পুরুষেরা ঝিনুকের খোঁজে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। নানা মানুষের কলশব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে বেলাভূমি।

সূর্য ফুটলো। মসলিনের মত পাতলা কুয়াশার পর্দা সরিয়ে স্বর্ণপদ্মের মত দেখা দিল সূর্যটা। তন্ময় হ'য়ে দেখছিলাম। সহসা চমকে উঠলাম। একটি পরিচিত কণ্ঠ কানে এলো। আশ্চর্য ভয়ে থর-থর করছে! "অরুণ বাবু"—

ফিরে তাকালাম। সুবালা দাঁড়িয়ে রয়েছে পেছনে। তার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা সঙ্কুচিত হলো। একটা রাত্রির মধ্যে তার পরমায়ু থেকে অনেকগুলো বছর যেন খসে পড়েছে! চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ, হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

বললাম: "কী ব্যাপার সুবালা?"

"আমাকে বারোটা টাকা দিতে পারেন? কলকাতায় যাবার ভাড়া পর্যন্ত আমার নেই।" আর্তনাদ করে উঠলো সুবালা।

"কেন, সুমন্ত কোথায়? কী ব্যাপার?" বিস্ময় ঠিকরে বেরুলো কণ্ঠটি চৌকাঠ করে।

"সুমন্ত বাবু কাল রাত্রেই চলে গিয়েছেন জয়পুর। কখন যেন গেছেন টের পাইনি। আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! সুমন্তটা এমন রাসকেল তা তো জানতাম না আগে? স্ত্রীকে ফেলে রেখে"—

আমার কথা শেষ হলো না; সুবালা প্রায় চীৎকার করে উঠলো; "স্ত্রী! না, না। আমি তো তার স্ত্রী নই!"

"সে কী?" আমার পায়ের নীচে, বাদামী বেলাভূমিটা যেন দুলে উঠলো এক বার!

মাথাটা যেন ঝুলে পড়েছে সুবালার, "আমাদের মত মেয়েদের কী বিয়ে হয়?"

"তবে, তবে—সেই মনোরম সেন কোথায়?"

"এক বছর একসঙ্গে ছিলাম। তার পর এক দিন মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেলেন। আর এলেন না। তার পর এখানে ওখানে, আজ দিল্লী, কাল পুরী, পরশু গোপালপুর করে বেড়াচ্ছি। মনোরম বাবুদের তো অভাব নেই। আর আমার প্রাণটা, ছেলেটার প্রাণটাও তো বাঁচাতে হ'বে। এখানেই দেখা সুমন্ত বাবুর সঙ্গে। সীঁথিতে সিঁদুর দিয়ে হোটেলে উঠেছিলাম।"

বুঝলাম, আমার কণ্ঠ কাঁপছে, "তুমি আমার কাছে আসতেও তো পারতে। একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে পারতাম? এত লোক রিলিফ নিল!"

"তা হয়তো হ'তো। কিন্তু আপনি কী আমাকে গ্রহণ করতেন? মনোরম বাবু আমাকে যে রিলিফের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সে রিলিফ আপনি কী দিতেন?" আশ্চর্য দু'টি চোখ তুলে তাকালো সুবালা "আজ কিন্তু আপনার রিলিফের দরকার।"

"কী বললে? গ্রহণ? তোমার মত মেয়েকে?" চীৎকার করে উঠলাম। তার পর আর দাঁড়ালাম না। হন্ হন্ পা চালিয়ে চলে এলাম হোটেলে।

ঝড়ের মত একটা প্রহর পার হলো। ভাবনায় পাক-খাওয়া দু'টি মুখ, সুমন্ত আর সুবালা এক সময় স্থির হলো। সহসা চমকে উঠলাম। সুবালা তো কয়েকটা টাকা চেয়েছিল। দ্রুত পা চালিয়ে সমুদ্রের পাড়ে এলাম। যত দূর দেখা যায়, সুবালা নামে কোন পরিচিত মেয়ের মুখ দেখলাম না!

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা
গ্রাম ব্রিলিয়্যান্টস,
টেলিফোন:-৩৪-১৭৬১

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ
২০০/২/সি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা·ফোন-সিকে:৪৪১৬
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে

ব্রাঞ্চ :—জামসেদপুর

(সাঁওতালী গল্প)

শ্রীসাধনা কর

ছেলে নেই, মেয়ে নেই, ভাই নেই, বোন নেই—সাঁওতালী বুড়ির ভারি দুঃখ! সে কেবল ভাবে—বুড়ো হয়ে গেলাম, কত কাল আরো বাঁচব, কে জানে? আমি তো আর এখন ধান-কলে গিয়ে খাটতে পারি নে, ঢেঁকিতেও ধান ভানতে পারি নে। ধান কুড়িয়ে পাতা কুড়িয়ে বেড়াই: কোনো রকমে খেয়ে আছি। আরো বয়েস হলে কে আমাকে দেখবে, খেতে-পরতেই বা কে দেবে? একটা যদি ছেলে থাকত!

অঘ্রাণ মাসের সকাল। শীতটা কন্‌কনে, কুয়াসা ঘিরে আসছে। খুব হাওয়া। বুড়ির ঘরে চাল বাড়ন্ত, ধান কুড়িয়ে আনতেই হবে। বুড়ি একখানা ছেঁড়া কাপড় ভাঁজ করে গায়ে জড়ালে; ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে মাঠের দিকে চলল। মনে মনে বললে—হে ভগবান, আমি আর বাঁচতে চাই নে। আমাকে আর কষ্ট দিও না।

ঠক্‌ ক'রে বুড়ির পায়ে কী ঠেকল। বুড়ি চোখে ভালো দেখে না, ভাবলে ঢেলা। হাত দিয়ে সরিয়ে রাখতে যাবে, চোখের সামনে একটু তুলে ধরলে,—না দেখে তো কিছু ফেলতে নেই। দেখে—ওমা, কতো বড়ো একটা ডিম! সাদা ধবধব করছে। মুরগীর ডিমের চেয়ে অনেক বড়ো, হাঁসের ডিমের দেড়টা হবে। কিসের ডিম হতে পারে? ডিম, না, বোঙার (ভূতের) কাণ্ড! নেবে কি না-নেবে, ভাবতে ভাবতে বুড়ি তা ঘরেই নিয়ে এল।

বুড়ির ঘরে দুটো মুরগী ছিল, ডিমটাকে এনে সে তাদের কাছে রেখে দিল। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, বুড়ি ডিমের কথা ভুলেই গেছে। এক দিন দেখে তার মুরগীর খোঁয়াড় থেকে কী সুন্দর একটা মোরগ বেরিয়ে এসেছে। মাথায় লাল টক্‌টকে ফুলের মতো ঝুঁটি, পিছনে পালকগুলি ঝুলে ঝুলে পড়েছে—তার মধ্যে সাদা-কালো লালে-হলুদে কত কাজ করা। সে বেরিয়েই ডেকে উঠল,—

—কুকুরচু, কুকুরচু বুড়িমা,
বড় খিদে পেয়েছে, খেতে দিবি না?

সাঁওতালী বুড়ি তো অবাক। এমন সুন্দর আর এত বড় মোরগ, সে কি না আবার মানুষের মতো কথা বলে! এ তো যে-সে মোরগ নয়? বুড়ি দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, হাত ভরে ধান এনে খাওয়ালে। সাঁওতালরা সবাই এসে দেখলে, বললে—ও বুড়ি, তোর কেউ নেই ব'লে দুঃখ ছিল, এ মোরগটা তাই দেবতা তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বুড়ির খুসীর আর অন্ত নেই। মোরগটাকে ছেলের মতো ভালোবাসে। নিজের হাতে খাইয়ে দেয়, নিজের বিছানায় বুকের কাছে নিয়ে শোয়, 'কুকুরচু' ব'লে ডাকে। মোরগটাও খুব ভালো। বুড়ির পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। মাঠে যায়, ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে ধান তোলে, বুড়ির ডালা ভরে দেয়। ডাল আর পাতা কুড়িয়ে বুড়ির বস্তায় রাখে। মাঝে মাঝে বলে—

ধান কুড়োবো পাতা কুড়োবো
বুড়িমাকে খাওয়াবো
রাজার মেয়ে বিয়ে করবো।—
মেয়ে কোথায় পাবো?

বুড়ি হেসে কুটি-কুটি, সাঁওতালরা হেসে লুটোপুটি, কী সুন্দর কথা বলে মোরগটা! রাজার মেয়ে বিয়ে করতে চায়। কুকুরচু এক দিন সত্যি সত্যি জেদ ধরে বসল—

ও বুড়িমা,—হাসি নয় গো হাসি নয়,
রাজার মেয়ে বিয়ে করবো
রাণীর মেয়ে বিয়ে করবো,
তোমার হবে জয়।

সত্যি বলছি বুড়িমা, রাজার মেয়ের খোঁজে আমি বাইরে যাবো।

সাঁওতালী বুড়ির মুখ শুকিয়ে গেল, বললে—না, না, তুই যে মোরগ, মানুষের মেয়ে বিয়ে করবি, সে কি হয়? বাড়ি থেকে বেরুলেই তোকে শেয়ালে ধরবে, মানুষে কেটে-কুটে খেয়ে ফেলবে। তুই কোথাও যাস্‌নে। তোকে আমি খুব সুন্দর দেখে একটা মুরগী এনে বিয়ে দেব।

কুকুরচু কি তা শোনে? বুড়ি কত বোঝালে, ভয় দেখালে, তার পরে কাঁদলে, কুকুরচু তার কোলে বসে বসে বললে—কাঁদিস্‌ নে, বুড়িমা কাঁদিস্‌ নে। আমি তোকে ছেড়ে যাব না। সাত দিন পরে ঠিক ফিরে আসব। ভয় করিস নে, ভাবনা করিস নে।

অনেক বুঝিয়ে-সমঝিয়ে কুকুরচু বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে দিন ফুরিয়ে গেল, রাত নেমে এল, সামনে একটা প্রকাণ্ড বন। লাল লক্‌লকে জিভ্‌, ভাঁটার মতো জ্বলজ্বলে চোখ, ছুরির ফলার মতো দাঁত, একটা শেয়াল এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল হাঁ ক'রে। কুকুরচু মিষ্টি সুরে বললে—শেয়ালদাদা, শেয়ালদাদা, আমাকে খেয়ে তোমার আর কতটুকু পেট ভরবে? কত মুরগী খেতে চাও, চলো আমার সঙ্গে, পেট ভরিয়ে খাইয়ে দেব।

শেয়াল তার মিষ্টি কথায় ভুলে গেল। বললে কী করে যাবো?

—এসো আমার পালকের তলায়। এই ব'লে কুকুরচু তার পালকের ভিতর থেকে একটা ছোট্ট থলে বের করে দিলে, আর, শেয়ালটা আরো ছোটো একটা পিঁপড়ের মতো হয়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল। কুকুরচু হাঁটতে শুরু করলে। হালুম ক'রে কোত্থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক বাঘ। কুকুরচু ভয় খেয়ে থমকে দাঁড়াল। বাঘমামা, বাঘমামা, মস্ত তোমার হাঁড়ি-পেট, আমাকে খেয়ে তো সেটা ভরবে না। ছাগল গরু কত খাবে, চলো আমার সঙ্গে।

বাঘটাকেও পালকের তলায় সে ঢুকিয়ে নিলে। যেতে যেতে দেখে, বনে বনে আগুন ধরে গেছে, যাবার আর পথ নেই। কুকুরচু এগিয়ে গিয়ে বললে—আগুন ভাই, আমার সঙ্গে চল, তোমাকে রাজার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাব।

পালকের ভিতর থেকে থলে বের করলে, সুড়-সুড় করে আগু তার মধ্যে ঢুকে গেল।

এদিকে রাত শেষ হয়ে এসেছে, আকাশে ভুল্‌কো তারা দেখ দিয়েছে, একটা বড় সাঁওতাল-গাঁ চোখে পড়ল। কুকুরচু ফুর্তিভ এগিয়ে যাবে,—দেখে একটা নদী। কী করে পেরুবে! আবা থলে বের করে নদীকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। কুকুর এবার জোরে জোরে পা ফেলে সাঁওতাল-গাঁয়ে এসে ঢুকল রাজ-বাড়ি—খড়ের দোতলা, খড়িমাটিতে নিকোনো, সিমেন্টের মতো চকচকে পালিশ করা। কুকুরচু উড়ে গিয়ে সে-বাড়ি চালের উপর বসল, জোর গলায় ডেকে উঠল—কুকুরচু, কুকুরচু রাজার মেয়ে বিয়ে করব; কুকুরচু, কুকুরচু, রাণীর মে বিয়ে করব।

সে ডাক শুনে সাঁওতাল-রাজার ঘুম ভাঙল, রাণীর ঘুম ভাঙল, রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। সব সাঁওতালরা ভিড় করে এল। আবছা অন্ধকারে দেখে একটা মোরগ! ডেকেই চলেছে—কুকুরচু,, কুকুরচু, রাজার মেয়ে বিয়ে করব; রাণীর মেয়ে বিয়ে করব।

রাজা বললে—মোরগটা তো অদ্ভুত দেখছি, ধর তো ওটাকে, আমি পুষব।

সবাই চেষ্টা করতে লাগল, ধরতে পারলে না। কতকগুলি চাল ছড়িয়ে দিল। চালের লোভে যেই কুকুরচু নেমে এল, ধরা পড়ে গেল। মুরগীর খোঁয়াড়ে তাকে তালা দিয়ে রাখা হল। কুকুরচু বললে—শেয়াল-দাদা, মুরগী খাবে খাও, খোঁয়াড় ভেঙে যাও।

শেয়াল থলে থেকে বেরিয়ে এল। রাজার কত শত মুরগী, খেয়ে আর শেষ করতে পারে না, শেষটা হাঁসফাঁস করতে করতে বেড়া ভেঙে বেরিয়ে বনে চলে গেল। কুকুরচু সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসে চালে বসল। গলা ফুলিয়ে নেচে নেচে বলতে লাগল—কুকুরচু কুকুরচু, রাজার মেয়ে বিয়ে করব; রাণীর মেয়ে বিয়ে করব।

রাজা, রাণী, রাজকন্যা সাঁওতাল-গাঁয়ের সবাই অবাক!—ও কি! মোরগটা কি করে ছাড়া পেল! খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে দেখে খোঁয়াড় ভাঙা, একটা মোরগও বেঁচে নেই, শেয়াল খেয়ে গেছে। কুকুরচু ডেকেই চলেছে, রাজা-রাণী বললে—এ মোরগটা তো ভারী বদমাস। গরুর গোয়ালে বেঁধে রাখো, বেলা হলে কেটেই খাবো।

আবার অনেক কষ্টে ভুলিয়ে তাকে ধরে ফেলা হল, গোয়াল-ঘরে শক্ত করে বেঁধে রাখা হল। কুকুরচু এবার বাঘকে বের করে দিলে; গরু মোষ ছাগল ভেড়া খেয়ে বাঘ আই-ঢাই করতে লাগল। কুকুরচু বললে—এবার আমার শিকল ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাও।

বাঘ তাই করলে। কুকুরচু আবার গিয়ে চালে বসে ডাকতে শুরু করলে। রাজা, রাণী, সাঁওতালরা বিষম ভড়কে গেল—এ কী কাণ্ড! বাঘ এলো কোত্থেকে, শেয়াল এল কোত্থেকে! সবাইকে খায়, এ মোরগটাকে খায় না কেন? রাজা বললে—ওকে ধরেই এবার কেটে ফেলতে হবে, ওটা নিশ্চয় অপদেবতা।

কুকুরচু বললে—আমাকে ধরতে পারবে না। তোমাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, নয় তো মহা বিপদ ঘটবে।

রাজা-রাণী তো রেগে অস্থির—এত বড় আস্পর্ধা! মোরগ হয়ে চায় রাজ-কন্যাকে বিয়ে করতে! রাজা হুকুম দিলেন, সবাই মিলে ওকে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল। কুকুরচু তাড়াতাড়ি থলে খুলে আগুনকে দিলে বের করে, এ চালে ও চালে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে সাঁওতালপাড়া ছেয়ে ফেললে। সাঁওতালরা হতবুদ্ধি। কুয়ো থেকে জল দিতে লাগল, বালি ছিটিয়ে দিতে লাগল, তাতে কি আর অত আগুন নেবে? ঘরের পরে ঘরে আগুন উড়ছে, ছেলে-মেয়ে কান্নাকাটি চেঁচামেচি শুরু করেছে, সাঁওতালরা কলরব করে বলতে লাগল—অপদেবতা, নির্ঘাত

...ভা! কুকুরচু বললে—রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, ...নি আগুন নিবিয়ে দেব।

রাজা-রাণীর মুখ কালো হয়ে উঠল। তাদের যে ওই একটিই ...র মেয়ে, অমন সুন্দর মেয়ে, তাকে কি না একটা মোরগের ... বিয়ে দিতে হবে? রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে বললে—গাঁ ...ড়ে ছারখার হবে, সবাই বিপদে পড়বে, তার চেয়ে আমাকে ...বিয়ে দিয়ে দাও।

রাজা রাজি হয় তো রাণী রাজি হয় না। সাঁওতালদের মা, বাবা এবং বিয়ের ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকের সম্মতি চাই, নয় তো বিয়ে হয় না। ওদিকে আগুনের জোর বাড়ছে, সাঁওতালরা হাহাকার করছে, এদিকে রাজকন্যা কেবল বলছে—তোমরা মত দাও, আমার জন্য যে সব ছারখার হয়ে গেল!

রাজা-রাণী আর কি করে!—মত দিলে। অমনি কুকুরচু খলে থেকে নদীর জল বের ক'রে সব আগুন নিবিয়ে দিলে। তার পরে নেমে এসে বললে—এবার বিয়ে দাও।

সাঁওতালরা খুব সত্যবাদী, যে কথা বলে, তা সহজে ভাঙে না। রাজকন্যার সঙ্গে মোরগের বিয়ে দিলে। কুকুরচুর ভারি আনন্দ। গর্বে সে ঝুঁটি ফুলিয়ে গরুর গাড়ি চড়ে সারা গাঁ ঘুরে বেড়ালো। আর, রাজকন্যা লজ্জায় মাথা নীচু করে তার পাশে বসে রইল। রাজা-রাণী দুঃখে ক্ষোভে ঘরের দরজা বন্ধ করে রইল। এক দিন গেল, দু'দিন গেল, রাজা-রাণী ঘরের থেকে বেরুলো না, রাজকন্যা ভাতটি পর্য্যন্ত মুখে তুললে না, সাঁওতাল ছেলেরা রেগে আগুন। ভাবে,—মুরগীটাকে কেটে খেয়ে ফেলি না কেন, আপদ চুকে যায়। কিন্তু পাছে আবার কোনো বিপদ ঘটে, তাই তারা সাহস পায় না। কুকুরচু খুব ডেকে ডেকে বেড়ায়, রাজকন্যার পাশে পাশে নেচে নেচে বলে—

—রাজার মেয়ে রাণীর মেয়ে
রাজকন্যা গো,
রাতের বেলা ঘুমিয়ে কেন
দিনের বেলা জাগো?

মোরগের উপরে রাজকন্যার এত রাগ, তার দিকে সে ফিরেও তাকায় না, কথাও কান পেতে শোনে না। রাত্রিবেলা মোরগটাকে দূরে শুইয়ে রেখে নিজে এক পাশে চোখ বুজে ঘুমিয়ে থাকে। এপাশে ফিরেও তাকায় না। কুকুরচু আর কি করবে, চুপটি ক'রে ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন অনেক রাত। রাজকন্যার ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলে—এখন তো মোরগটা ঘুমোচ্ছে, এবারে ওর গলা টিপে ফেলতে পারা যাবে। আস্তে আস্তে একটুও শব্দ না করে সাঁ... রাজকন্যা এপাশ ফিরলে। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল—... কোথায়! এ যে কালো কুচকুচে সুন্দর এক সাঁওতাল ... গোছা-গোছা থোপা-থোপা চুল। দেহে যেন ভরা-জলে ঢেউ খে... মাথার কাছে পড়ে আছে সেই মোরগের খোলসটা। রাজ... অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে দেখলে—রাজপুত্র নড়েও শ্বাসও ফেলে না। মোরগের ছদ্মবেশ ধ'রে এ কোন্ রাজ... এসেছিল? কী ক'রে একে এখন বাঁচানো যায়! রাজকন্যা ভে... ভেবে ভেবে এক সময় উঠে খোলসটা পুড়িয়ে ফেললে, অমনি রাজপু... ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল। রাজকন্যা হেসে-কেঁদে তাকে বললে, তুমি কে? কুকুরচু বললে—আমি ছদ্মবেশী রাজপুত্র। ডাইনীর শাপে মোরগ হয়েছিলাম। সে বলেছিল, যদি সাঁওতাল রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, আর সে তোমার খোলসটা পুড়িয়ে ফেলে তবে তুমি আবার মানুষ হতে পারবে।

রাজকন্যার তখন কী আনন্দ—রাজা-রাণীকে ডেকে আনলে, সাঁওতালদের ডেকে আনলে, সবাই মিলে খুব ধুম করে একটা ভোজ খাওয়া হল। রাজা-রাণী বললে—আমরা বুড়ো হয়েছি, তুমি রাজা হয়ে এখানে থাকো।

রাজপুত্র বললে—আমি বুড়িমাকে আনতে যাব, সে আমার প... চেয়ে আছে।

ভোর তখনো হয়নি, রাজপুত্র-রাজকন্যা বুড়ির দোরে গিয়ে ডাকে—বুড়িমা, বুড়িমা, দরজা খোলো না।

সাঁওতাল বুড়ি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কুকুরচুকে স্বপ্নে দেখছিল, চমকে উঠে বসল—সত্যি কি আমার কুকুরচু ফিরে এল! তারই গল... শুনতে পাচ্ছি যেন!

দুরু-দুরু বুকে এসে দরজা খুলে দেখে—কুকুরচু নয়, দুটি সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে। রাজপুত্র তাকে প্রণাম দিয়ে বললে—আমিই তোমা... কুকুরচু।

বুড়ি দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

রমাপদ চৌধুরী

৮

লালী নয়। লালবাঈ। বিবিবাজারের দস্যুলুণ্ঠিত বাঁদী নয়। ধনী সওদাগর আর নবাবজাদারা যার পায়ে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিতে চায়, এমন এক রূপসী কলাবিদ।

হীরাবাঈ যেন তার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। প্রতিশোধ নেবার অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে এত দিনে। সমস্ত শক্তি দিয়ে, নৃত্য-গীতের সব জ্ঞান ঢেলে দিয়ে যেন লালীকে নতুন করে গড়তে চায় হীরাবাঈ।

বুড়ো সৌকত খাঁ লালীকে গান শেখাতে শেখাতে থেমে পড়ে। মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু মৃদু হাসে হীরাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু হীরাবাঈয়ের যেন ক্লান্তি নেই, সাধনালব্ধ সব জ্ঞান যেন কয়েকটি বছরের মধ্যে লালীর হৃদয়ে ঢেলে দিতে চায়।

তাই বুড়ো ওস্তাদ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হীরাবাঈ তখন নাচ শেখাতে সুরু করে। তওয়ায়েফার আদবকায়দা, জলসায় দাঁড়িয়ে পোষাক বদলের কানুন দেখিয়ে দেয়।

লালীর রক্তেও নেশা ধরে যায়। হীরাবাঈয়ের ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি, ভোগবিলাস লালীর মনেও স্বপ্ন জাগায়। অথচ ওস্তাদ সৌকত খাঁ বুঝতে পারে না, কেন এই দুর্জ্জয় সাধনা হীরাবাঈয়ের!

হীরাবাঈ নির্জ্জনে লালীকে বলে, গালে ফাগ নয়, আগ লাগাও তোমার চোখে। যেন পুরুষের কলিজা পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে আগুনে।

লালী হেসে বলে, যাকে মোহব্বতের চোখে দেখবো সেই মাশুককেও পুড়িয়ে ফেলবো যে তা হ'লে।

—মোহব্বৎ? ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় হীরাবাঈ।

বলে, ওসব মিথ্যে লালী, সব মিথ্যে। পুরুষকে কোন দিন বিশ্বাস করো না, কোন দিন তার মোহব্বৎকে বিশ্বাস করে নিজেকে ধ্বংস করো না। আর···আর কোন দিন ভুলে যেও না—হিন্দু কাফের, হিন্দু কখনও ভালবাসতে পারে না।

কৌতুকের স্বরে লালী বলে, তুমিও তো হিন্দু ছিলে। হিন্দু কাফেরের ঘরেই তো জন্ম তোমার।

হীরাবাঈ গম্ভীর স্বরে বলে, হ্যাঁ লালী। হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই তাকে আরও ভাল করে চিনেছি।

চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে হীরাবাঈয়ের। আর সে-চোখ দেখে ভয় পায় লালী। সুর্মাটানা দু'টি অপরূপ চোখ, যে-চোখের দৃষ্টির কাছে সিংহ বশ মানে, যে চোখের চটুল চাহনীর মোহে কত রাজকোষ নিঃস্ব হতে দেখেছে সে, সেই চোখের পিছনে এত জ্বালা দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে লালী।

সৌকত খাঁ দাড়িতে হাত বোলায় আর হাসে। বলে, প্রেম কি জিনিস যেদিন বুঝবি বেটি, সেদিন জানতে পারবি হীরার মনে কেন এই জ্বালা।

সে-কথা জানে লালী। জানে হিন্দুর ধর্ম্ম শুধু প্রেমের গান গায়, কিন্তু প্রেমের দাম দিতে নারাজ। হীরাবাঈয়ের কাছেও শুনেছে সে, শুনেছে হিন্দু রাজা আর ভূঁইঞাদের কথা। মুসলমানী বাঈজীর লালসায় আসক্ত হয়ে সর্বস্ব হারাতে বসে তারা, তবু তাকে পত্নীর মর্য্যাদা দিতে রাজি নয়। প্রেমের চেয়ে ধর্ম্ম বড়ো তাদের কাছে।

কানে কানে সে-মন্ত্র বহু বার শুনিয়েছে হীরাবাঈ, বলেছে, পুরুষকে নিঃস্ব করাই তোমার ব্রত হবে লালী।

তবু মনে মনে কত স্বপ্নই না দেখে সে। হঠাৎ কোন দিন হয়তো মনে পড়ে যায়, বিবিবাজারের সেই সুপুরুষ চেহারার সাদা-ঘোড়ার সওয়ারকে। আর সারা রাত ঘুম নামে না তার চোখে। রঘুনাথ। এক টুকরো বিধর্ম্মী নাম, মনের হাতে বার বার নাড়াচাড়া করে লালী। স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন বোনে।

সেদিনও এমনি কি এক স্বপ্ন দেখছিল লালী, বিলাসের শয্যায় শরীর এলিয়ে, চোখ বুজে। নরম গালিচার ওপর পা টিপে টিপে কখন হীরাবাঈ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি।

—লালী!

ডাক শুনে চমকে চোখ ফেরালো লালী। উঠে বসলো হীরাবাঈকে দেখতে পেয়ে।

হীরাবাঈ মৃদু হেসে বললে, খবর আছে লালী, খুশখবর।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো ও।

হীরাবাঈ হাসলো আবার ঠোঁট টিপে টিপে। বললে, এবার ওড়না তোলবার দিন এসেছে তোমার। লালী নয়, এবার থেকে তোমার নাম হবে লালবাঈ। আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।

ভয়ে থর-থর করে কেঁপে উঠলো লালী। বললে, আমি? আমি যাবো মাইফেলে?

—কেন যাবে না বহিন? মৃদু হাসলে হীরাবাঈ। বললে, সব তাল তো ওস্তাদজীর কাছে শিখে নিয়েছো, মজলিসী আদব তো শিখিয়েছি সবই। এখন থেকে মুজরায় না গেলে বাঈজীর কলিজা বানাবে কি করে লালী!

লালীর চোখে-মুখে ফুটলো আশঙ্কার ছাপ।

বললে, কিন্তু আমি যে কিছুই শিখিনি, কিছুই জানি না আমি! না, না, যাবো না আমি, যাবো না—

লালীর পাশে এসে বসলো হীরাবাঈ। কৌতুকের হাসি হেসে তার পিঠে একটা হাত রেখে বললে, সব শিখেছো তুমি, সব, সব। তোমার এই রূপ যৌবন দেখেই রহিম খাঁ মুগ্ধ হবে লালী, তোমার গানের রোশনি তাকে মুগ্ধ করবে।

—রহিম খাঁ? বিস্মিত চোখ তুলে তাকালো লালী।

—হ্যাঁ। পাঠান রহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে আমাদের।

লালী ফিস-ফিস করে বললে, বেশ, যাবো আমি, যাবো।

আর সে কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠলো হীরাবাঈ। স্থির অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লালীর চোখের তারায় চোখ রেখে। কি যেন খুঁজলে লালীর এই আকস্মিক সম্মতিতে।

হীরাবাঈয়ের মনে বুঝি সন্দেহ উঁকি দিলো। নরম দিল্ মেয়েটার চোখে কার ছায়া? অযোধ্যাপ্রসাদ? খিল খিল করে হেসে উঠলো লালী, হীরাবাঈয়ের প্রশ্ন শুনে।

অদ্ভুত মানুষ এই অযোধ্যাপ্রসাদ। শুধুই যেন রহস্যে ঘেরা। ওস্তাদ সৌকত খাঁকে যতই দেখছে, ততই যেন ভালবেসে ফেলছে লালী। মেহেদি-রাঙানো আবক্ষ দাড়ি, রক্তিম তমাশবিন্ চেহারা, আর সুর্মাটানা দু'টি বড়ো বড়ো শান্ত চোখ।

সারা জীবন ধরে মানুষটা যেন শুধু গানকেই ভালবেসেছে। নারীর প্রেম যেন তাকে স্পর্শও করেনি।

আর অযোধ্যাপ্রসাদ? আশ্চর্য্য, বাঈজীর তবলচী হয়েও লোকটার হিন্দুয়ানীর অহঙ্কার যায়নি। কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, গলায় তুলসীর মালা, পরনে গরদের ধুতি আর চাদর।

কেমন যেন বেমানান লাগে এই আবহাওয়ায়। তবু কেন যে অযোধ্যাপ্রসাদকে সহ্য করে হীরাবাঈ, লালী বুঝতে পারে না।

কেমন যেন সন্দেহ হয় ওর। বহু বার দেখেছে, হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে হঠাৎ এক এক সময় বড়ো তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে অযোধ্যাপ্রসাদ। তবলার তাল কেটে যায়। ধমক দিয়ে ওঠে ওস্তাদ সৌকত খাঁ।

লজ্জায় সারা মুখ কালো হয়ে যায় তখন, বড়ো বিষণ্ণ দেখায় অযোধ্যাপ্রসাদকে, চোখ দুটো হয়ে ওঠে করুণ।

এই অযোধ্যাপ্রসাদের কাছেই শুনেছে লালী, শুনেছে হীরাবাঈ[য়ের] জীবনের ইতিহাস।

রূপে গুণে অদ্বিতীয়া এক ব্রাহ্মণ-কন্যার বিয়ে হয়েছিল এক সচ্ছ[ল] পরিবারে। তার পর কয়েকটি বছর কেটেছিল তাদের সুখে-শান্তিতে। কিন্তু যার রূপ-যৌবনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারি দিকে, কি নিশ্চিন্তে থাকতে পারে? সুবেদারের লালসার ইন্ধন যোগান[োর] জন্যে গ্রামে গ্রামে ভৈরবীর বেশে ঘুরে বেড়াতো ঘটকী চর, তাদে[র] দৃষ্টিতে পড়লো সেই গৃহবধূ।

একদিন যথারীতি কলসী কাঁখে নিয়ে গ্রামের অন্য মেয়েদের স[ঙ্গে] নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে আর ফিরে এলো না সে।

—ফিরে এলো না? বিস্মিত স্বর ফুটেছিল লালীর গলায়।

—না। বিষণ্ণ হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলো অযোধ্যাপ্রসাদ। বলেছিল, না, ফিরে এলো না। শুধু সঙ্গীরা ভয়ে আতঙ্কে ছুট[তে] ছুটতে এসে খবর দিলো: সুবেদারের ফৌজ-বোঝাই দু'খানা বজ[রা] নাকি লুকিয়েছিল আড়ালে, হঠাৎ তাদের ওপর লাফিয়ে প[ড়ে] হীরাকে জোর করে বজরায় তুলে নিয়ে চলে গেছে তারা।

—তারপর?

অযোধ্যাপ্রসাদের চোখ ছল-ছল করে উঠেছিল। বলেছি[ল], তার পর ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে এলো মেয়েটির স্বামী দেখলো শুধু কলসীটা পড়ে আছে, আর তার পাশে কয়েক টুক[রো] ভাঙা শাঁখা। সেগুলো বুকে আঁকড়ে ফিরে গেল সে। ভাবে[নি] আর বুঝি কোন দিন ফিরে পাবে না তাকে।

শুনতে শুনতে লালীর চোখেও জল এসেছিল। কান্নার স্ব[রে] বলেছিল, পায় নি ফিরে?

—পেয়েছিল। কিন্তু, কিন্তু ফিরে নিতে পারেনি সে। এ[ক] বছর বাদেই সুবেদারের লোক সেই ঘাটেই নামিয়ে দিয়ে গে[ল] তাকে। কিন্তু মুসলমানের উচ্ছিষ্ট হয়ে ফিরে এসেছে যে মে[য়ে] তাকে সমাজ ফিরে নিতে চাইলো না। সপরিবারে সকলকে পতি[ত] হতে হবে, ভয় দেখালো সমাজপতির দল।

শুনে বিস্মিত না হয়ে পারেনি লালী।

মনে পড়েছিল শুধু হীরাবাঈয়ের কথাটা। 'হিন্দুর ধর্ম্ম শু[ধু] প্রেমের গান গায় লালী, প্রেমের দাম দিতে নারাজ'।

সত্যিই হয়তো তাই। হীরাবাঈয়ের কাছেও তো শুনেছে এমনি এক বিচিত্র কাহিনী। আর সে কাহিনী শুনতে শুনতে সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে লালীর। মনে হয়েছে, কখনও যদি সুযোগ পা[য়] ও, তা হলে মুসলমানের প্রতি হিন্দু কাফেরের এই ঘৃণার প্রতিশো[ধ] নেবে। প্রতিশোধ নেবে নারীর ওপর পুরুষের এই হৃদয়হীন নির্য্যাতনের।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের অত্যাচার এদিকে ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। আগ্রা থেকে অসুখের ভাণ করে লুকিয়ে পালিয়েছেন মারাঠা-সূর্য্য শিবাজী। আর তাই আক্রোশে ফেটে পড়ছেন শাহ আলম।

নিজের কীর্ত্তির গ্লানি মনের আয়নায় হয়তো দেখতে পেতেন শাহ আলম। তাই ফরমাণ জারি করলেন, কেউ ইতিহাস লিখতে পাবে না তাঁর রাজত্বকালের। তাঁর জীবনের কোন ঘটনাই লিপিবদ্ধ করতে পাবে না কোন হিন্দু বা মুসলমান।

আগ্রার দুর্গে বন্দী অবস্থায় সাজাহানের মৃত্যু ঘটেছে। পার্ব্ব-

মূষিক বলে যাকে বিদ্রূপ করেছিলেন, তার কৌশলের কাছে পরাভূত হয়েছেন বারংবার। আর, আর শাহ সুজা? এক অবোধ্য দুঃস্বপ্নের মত তখনও শাহ আলমের মনের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শাহ সুজার বিভীষিকা। সুজার মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না আওরঙ্গজেব, বিশ্বাস করতে পারেন না কোন মানুষকে।

হঠাৎ মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর, আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠেন। মনে হয়, যেন পারস্যের মিত্রসৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে সুজা। কখনও বা দেহরক্ষীর চোখে অবিশ্বস্ততার কুটিল হাসি খুঁজে পান।

জীবনের সব আনন্দ যেন ঘুচে গেছে তাঁর। সমস্ত মন শুধু আশঙ্কায় আর বিপদে আচ্ছন্ন। তাই অন্যের আনন্দও সহ্য করতে পারেন না। নৃত্যগীতে এত দিন তাঁর নিজেরই বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু অন্যের তৃষ্ণাকেও অতৃপ্ত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন শাহ আলম। হিন্দুর যাত্রাগান আর মেলা নিষিদ্ধ করে দিলেন, নিষিদ্ধ হ'ল নৃত্য-গীতের চর্চা।

ওস্তাদ সৌকত খাঁ দুঃখের হাসি হেসে বললে, সঙ্গীত ছিল আমার একমাত্র বেগম, তাকেও তালাক দিতে হবে বেটি!

হীরাবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।—সত্যি ওস্তাদজী! গান আর নাচকে কবর দিতে চায় শাহ আলম, এ যে কল্পনাও করা যায় না।

আর লালী বললে, তার চেয়ে চলো পাঠান রহিম খাঁর রাজত্বে চলে যাই আমরা।

বুড়ো সৌকত খাঁর চোখে জল টলমল করলো। বললে, বেটি, নিজের কথা ভাবছি না। ভাবছি, হাজার হাজার গুণী খেতে না পেয়ে মারা যাবে হিন্দুস্থানে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বললে, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে হারিয়ে যাবে, আমাদের গান, হাজার বছরের সাধনা?

—হাঁ অযোধ্যাপ্রসাদ! গলার কালো সুতলিতে বাঁধা রূপোর চৌকো তাবিজটা নাড়াচাড়া করতে করতে সৌকত খাঁ বললে, সব হারিয়ে যাবে, বেবাক হারিয়ে যাবে সব!

হীরাবাঈ শুধু বললে, না ওস্তাদজী, সারা আগ্রা আর দিল্লীর ওস্তাদ আর বাঈদের দল নিয়ে যাবো আমরা শাহ আলমের কাছে আর্জি করতে। এ ফরমাণ বদল করতে হবে।

আওরঙ্গজেবের আদেশ বদল করতে চায় হীরাবাঈ!! সৌকত খাঁ হাসলো মনে মনে। তবু আপত্তি করলো না।

তার পর দল বেঁধে একদিন আর্জি পেশ করতে গেল সকলে। শাহ আলমের 'ঝরোকা-দর্শনের' সামনে।

আওরঙ্গজেব সেদিনও এসে দাঁড়ালেন ঝরোকার সামনে। সব গুজবকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে প্রতিদিন যেমন দর্শন দিয়ে জানাতেন, আমি বেঁচে আছি। সেদিনও তেমনি এসে দাঁড়ালেন ঝরোকার সামনে। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল তাঁর সামনের পথে।

কফিন-ঢাকা কয়েকটি মৃতদেহের প্রতিকৃতি নিয়ে চলেছে এক দল লোক, আর পিছনে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে নারী-পুরুষের মিছিল।

শাহ আলম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কার মৃতদেহ চলেছে পথ দিয়ে?

উত্তর শুনে হাসি ফুটে উঠলো আওরঙ্গজেবের মুখে। সঙ্গীতের? বললেন, কবরটা খুব ভালো করে খুঁড়তে ব'লো। আমার রাজ্যে যেন কোন দিন আর মাথা তুলে না উঠতে পারে নাচ আর গান।

এই নৃশংস রসিকতা শুনে বুক কেঁপে উঠলো সকলের। বুঝলো, শাহ আলমের মত বদলানো যায় না। বুঝলো শুধু সঙ্গীতেরই নয়, সঙ্গীতজ্ঞেরও মৃত্যু ছাড়া আর পথ নেই এ মোগল রাজত্বে।

শুধু হীরাবাঈ বললে, ছ'টি জায়গা আছে ওস্তাদজী! সেখানেই যেতে হবে আমাদের।

—কোথায় বেটি? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলো সৌকত খাঁ। বললে, শাহ আলমের রাজত্বের বাইরে কোথায় যাবি?

হীরাবাঈ হেসে বললে, পাঠান রহিম খাঁর রাজত্বে। রহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে ওস্তাদজী!

সৌকত খাঁ সম্মতি জানালো।—হ্যাঁ, সেখানেই যেতে হবে।

হীরাবাঈ বললে, রহিম খাঁ যদি ইজ্জৎ না দেয়, বিষ্ণুপুর যাবো ওস্তাদজী! শাহ আলমের গোলাম নয় বিষ্ণুপুর। আর, আর বিষ্ণুপুরের কুমার রঘুনাথ সঙ্গীত-রসিক···

কিন্তু সেখানেও কি আশ্রয় পাবে হীরাবাঈ? শাহ সুজাকে যে ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আওরঙ্গজেব, তেমনি করেই সঙ্গীতের বিরুদ্ধেও জেহাদ চালাবে দিনের পর দিন।

শাহ সুজা! সত্যিই কি বেঁচে আছেন তিনি? কে জানে, হয়তো আওরঙ্গজেবের সন্দেহই ঠিক। শক্তি সঞ্চয় করবার জন্তেই হয়তো মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিয়েছেন সুজা।

সুজার কথা মনে পড়লেই বুকে সহানুভূতির ব্যথা অনুভব করে হীরাবাঈ। আরাকানরাজ স্বর্দার ভোগ-লালসা চরিতার্থ করতে বাধ্য হয়েছে সুজার ছই কন্যা, শুধু পরীবানু নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে সব গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কুচবিহার-রাজের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল হীরাবাঈ। ফেরার পথে গৌড়ের মেলায় গ্রাম্য বাউলের মুখে সুজার এ কাহিনী শুনেছে সে। শুনে সুজার দুঃখে চোখে জল এসেছে সকলের। যাত্রাগানেও হয়তো এমনি করেই শাহ আলমের স্বরূপ প্রকাশ করে দিচ্ছে গ্রাম্য কবির দল। তাই হয়তো নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা আর মেলাও নিষিদ্ধ করেছেন শাহ আলম।

হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর ছাড়া আর বুঝি আশ্রয় নেই হীরাবাঈয়ের। একমাত্র ভরসা রহিম খাঁ।

মণিবানুকে ডেকে হুকুম দিলো হীরাবাঈ। বললে, হাতীর পিঠে হাওদা চড়াতে বলো। আর ওস্তাদজীকে বলো সারেঙ্গীদের খবর দিতে।

৯

রূপোর হাওদায় রংদার রেশমের আম্বারী, আম্বারীর গায়ে মখমলের ঝালর। মখমলের ওপর জরি আর আয়নার তারা। রূপোর পাতে রঙ-বেরঙের মিনা।

হাওদা থেকে নামলো হীরাবাঈ, হীরাবাঈয়ের পিছনে পিছনে লালী। আর পিছনের হাতীর পিঠ থেকে নামলো বুড়া ওস্তাদ, তবলচী অযোধ্যাপ্রসাদ আর সারেঙ্গীর দল।

রহিম খাঁর রঙমহলের দরজায় নামলো সকলে। পাইক পেয়াদা দাসদাসী সবাই সেলাম করে আদাব জানালো।

কিন্তু হীরাবাঈ যেন খুশি হল না। রহিম খাঁ আসে নি কেন? আদপ জানে না লোকটা? ভাবে, আসরফি ছুঁড়ে দিলেই মন পাওয়া যায়, গান শোনা যায়?

না, রহিম সেখ তার কেল্লায় গেছে সৈন্তদের কাছে একটা সুখ[illegible] পৌঁছে দিতে। তাদের চোখে নতুন স্বপ্ন এঁকে দিতে গেছে রহিম খাঁ সারা হিন্দুস্থানের লোক, মোগল সৈন্তদের শিবিরে শিবিরে বিষা[illegible] ছায়া নেমেছে। ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেবের ওপর তাদের সু[illegible] আক্রোশটা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে হয়তো। আর ভাবতব[illegible] পাঠানশক্তিকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করার এই সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু সুখস্বপ্নটা কি, জানতে পারলো না হীরাবাঈ? ভাবে[illegible] নাচের মুজরায় কোন এক দুর্বল মুহূর্তে জেনে নেবে, রহিম খাঁ[illegible] স্বপ্ন।

একটি একটি করে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠলো রহিম খাঁর রঙমহলে[illegible] আতরদান এলো, এলো সুরার পাত্র। আর হায়দারী আঙুর।

যথাসময়ে হীরাবাঈয়ের কাছে রহিম খাঁর আমন্ত্রণ এ[illegible] পৌঁছলো।

প্রসাধন সেরে লালীকে সঙ্গে নিয়ে নাচঘরের পর্দার আড়া[illegible] এসে থামলো হীরাবাঈ। লালীকে অপেক্ষা করতে বলে না[illegible] তালে তালে ঘুঙুরের ছন্দ কাঁপিয়ে পর্দা সরালো হীরাবাঈ।

কিন্তু দ্রুত পায়ে নাচঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়[illegible] হীরাবাঈ। নূপুরের ছন্দে হঠাৎ যেন তাল কেটে গেল, র[illegible] খাঁর পাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে গোপন পরামর্শে রত শো[illegible] সিংহের চোখে চোখ পড়তেই। বিবিবাজারের সেই ঘটনার ছ[illegible] ভেসে উঠলো হীরাবাঈয়ের মনে।

বাঈজীর সম্মান রাখেনি আহাম্মক। তার সব ইজ্জৎ ধু[illegible] লুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সারেঙ্গীবাদকদের সামনে। কিন্তু মেদিনীপু[illegible] ভূস্বামী উড়িষ্যায় এসেছে কোন উদ্দেশ্যে? কেন এই গো[illegible] পরামর্শ? মনের প্রশ্ন আর আক্রোশ চাপা দিয়ে মুখে হাসি আন[illegible] হীরাবাঈ।

রহিম খাঁকে তস্‌লিম করে দাঁড়ালো হীরাবাঈ ভেড়ু[illegible] পিঠে পা তুলে দিয়ে। আর তার সুন্দর পা থেকে জরি আর পা[illegible] বসানো নাগরাটা খুলে নিলো আরেক জন ভেড়ুয়া।

রহিম খাঁ দিল ছুঁড়ে দেওয়ার ইশারা করে নাচের অনুম[illegible] দিলো। বললে, খুশির দিন আজ, খুশি মনে নাচো হীরাবাঈ?

শোভা সিংহ হেসে সায় জানালো।—হ্যাঁ, দিল্ জখম করে [illegible] তোমার গানে।

হীরাবাঈ রহিম খাঁর সামনে গিয়ে কুর্ণিশ করলে; বাদশাহ! শোভা সিংহের কাছে গিয়ে বললে, রাজাবাহাদুর!

দু'জনেই কৌতুকের হাসি হেসে তাকালো।

হীরাবাঈ বললে, এ পূর্ণিমার চাঁদ আর কত নাচ দেখাবে বাদ-[illegible] তার চেয়ে গান শুনুন লালবাঈয়ের। দ্বিতীয়ার চাঁদ সে, তিল [illegible] করে বাড়ছে তার রূপযৌবন।

—লালবাঈ? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রহিম খাঁ।

—হ্যাঁ হুজুর! ব'লেই ইশারা করলে হীরাবাঈ।

আর পর্দার আড়াল থেকে নাচের তালে তালে রহিম[illegible] সামনে এসে দাঁড়ালো লালী।

রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে র[illegible] সেদিকে।

লাল রেশমের ঘাগরা, রেশমী জমিতে জরি আর পোখরা[illegible]

রোশনাই। লাল মখমলের আঁট কাঁচুলিতে যৌবনের বহ্নি। আর সাদা মসলিনের ওড়না লালবাঈয়ের মুখের স্বচ্ছ আবরণ।'

মোহগ্রস্তের মত সেদিকে তাকিয়ে রইলো রহিম খাঁ। এ রূপ যেন কখনও দেখেনি সে, এ সৌন্দর্য্য বুঝি বা বেহেস্তের হুরীর শরীরেই সম্ভব।

হীরাবাঈ ফিস্‌ফিস্ করে বললে, ওড়না তুলে দিন বাদশাহ. পহেলি মাইফেল হোক্ আজ আপনার রঙমহলে।

—পহেলি মাইফেল?

লালসালুব্ধ চোখে লালবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নেশার পায়ে টলতে টলতে এসে ওড়না তুলে দিলো রহিম খাঁ।

জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যে ওড়না তুললো লালবাঈ। রহিম খাঁ দিলো পহেলি মাইফেলের আদেশ। এ রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করতে হবে তাকে আজীবন। স্বেচ্ছায় মুক্তি না চাইলে বাঈজীর সম্মান আর আশ্রয় দিতে হবে রহিম খাঁকে, যত দিন না লালবাঈ নিজে মুক্তি চায়।

কিন্তু হীরাবাঈ? তার ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার। নিজেকে এত অসহায় বুঝি কখনো মনে হয়নি তার। চিন্দুবাজ্য বিষ্ণুপুরে গিয়েই কি তাকে শেষ জীবন কাটাতে হবে?

নৃত্যরতা লালবাঈয়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রহিম খাঁ ইশারায় ডাকলে হীরাবাঈকে। তাকিয়া হেলান দিয়ে কাছে বসতে বলল তাকে। তারপর এক সময় সুরার নেশায় ডুবে গেল রহিম খাঁ, ডুবে গেল শোভা সিংহ।

লালবাঈয়ের নাচের ঘূর্ণীতে তখন ঝড়তুফান। উড়ছে ওড়না, ঘুরছে ঘাগরার জরিদার সলমা-চমক কিনার। লাল মখমলের কাঁচুলি দুলছে, কাঁপছে। জ্বলন্ত যৌবনের শিখা যেন। তালে তালে বেজে চলেছে ঘুঙুরের ঝমক। নাচ নয়, যেন তুফান।

ধীরে ধীরে সুর ফুটলো হীরাবাঈয়ের কণ্ঠে। জমে উঠলো জলসার মস্কুর।

গানের ভাঁজে ভাঁজে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলো হীরাবাঈ রহিম খাঁর চোখে, তারপর মৃদু হেসে সুরু করলে দরবারীর তেরানা। সপাট্ তনা আর ছুটতানের ফুলঝুরি উড়লো।

তেজ, তাবিশ আর মিঠাসের জৌলুষে জলসা মেতে উঠেছে তখন। নাচের ঘুঙুর বেজে চলেছে লালবাঈয়ের পায়ে।

এমন সময় আতঙ্কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো লালবাঈ। ঘুঙুরের আওয়াজ থমকে থেমে গেল।

বিস্ময়ে সবাই ফিরে তাকালো লালীর দিকে। আর তার চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলো, দরজার পর্দা সরিয়ে রহিম খাঁকে কুর্ণিশ করে দাঁড়িয়ে আছে এক মসীকৃষ্ণ দৈত্যরূপী হাবসী।

লালীর আতঙ্কের চিৎকার শুনে সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসলো হাব্‌সীটা, তারপর আবার কুর্ণিশ করলো রহিম খাঁকে।

চিনতে পারলো লালী। চিনতে পেরেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল সে। মনে পড়লো বিবিবাজারের সেই দৃশ্য। ফকির সাহেবের চবুতরা থেকে বাঁদী পা্টির তাঁবুতে ফিরে আসার ঘটনাটুকু মনে পড়লো।

সেদিন চাবুকের পর চাবুক পড়েছিল হাব্‌সীটার পিঠে, রক্তের রেখা ফুটে উঠেছিল তার ঘনকৃষ্ণ পিঠের ওপর। আর বাঁধন খুলে দেওয়ার পর তর্জ্জনী তুলে লালীকে শাসিয়েছিল হাব্‌সীটা।

সে দৃশ্য মনে পড়তেই ভয়ে ভয়ে হীরাবাঈয়ের পাশে এসে বসলো লালী, মুখ তুলে হাবসীটার দিকে তাকাতেও সাহস হ'ল না।

১০

কল্কা-তোলা পশমী বনাতের পর্দায় ঢাকা তাঞ্জাম ফিরে এলো নবাব ইব্রাহিম খাঁর প্রাসাদে। জলসামহলের দারোগার কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললে মুসলমানী সিদ্ধুকী। দারোগা খবর দিলো খোজা প্রহরীকে!

তার পর খোজার কাছ থেকে শুনলো ইব্রাহিম খাঁর বিশ্বস্ত বাঁদী। সুরার পাত্র তুলে দিতে গিয়ে কি যেন বলতে গেল সে নবাবের কানে কানে।

আর পরক্ষণেই তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আয়েশী শরীরটাকে তোলবার চেষ্টা করে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ইব্রাহিম খাঁ।—চুপ রহো বেয়াদপ! দরবারের খবর কিনা রঙমহলে পৌঁছে দিয়ে জলসার মৌতাত ভেঙে দিতে এসেছে বেকুফ!

ধমক শুনে ভয়ে সরে গেল বাঁদী।

মুহূর্ত্তের জন্যে নাচের ঘূর্ণী থামিয়ে ইব্রাহিম খাঁর চোখে চোখ রেখে কটাক্ষ হানলে তয়ফা। যৌবনের লোভানি জ্বালালো শরীরের ছন্দে।

সুরার নেশায় মশগুল হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ইব্রাহিম খাঁ। দুনিয়া রসাতলে যাক, এমন নাচের মেজাজ নষ্ট করতে পারবে না সে, সুদূর রাঢ়ভূমির এক ভৌমিক-কন্যার দুঃসাহসের খবর শুনে।

একদৃষ্টে ইরাণী তয়ফার দিকে তাকিয়ে রইলো ইব্রাহিম খাঁ। নাচের তালে তালে উড়ে পড়ছে গোলাপী ওড়না, কাঁপছে সোনালী জরির কাঁচুলী, চুণীচমক ঘাগরার মগজি ভেসে উঠছে ইরাণী মেয়ের কোমর ঘিরে।

যৌবন লালসার বিকৃত আনন্দে ডুবে গেল ইব্রাহিম খাঁ, ডুবে গেল বাংলার সুবেদারী মসনদ।

সুবেদারের অন্তঃপুর নয়, যেন বিলাস আর প্রমোদের রঙ্গভূমি। সহস্র নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণের কাছে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের দুঃখ আর কান্না। সুরা আর সুরসুন্দরীর নেশায় ডুবে গেছে তখন সমগ্র জলসামহল।

কিন্তু সেই ফাঁকে অন্দরমহলে দেখা দিয়েছে কুটিল চক্রান্ত। অন্দরমহলের কর্ত্রী 'বেগমসাহেবা' দিলরস বেগমের ঈষৎ শুভ্রকেশ তখন সাকিনা বেগমের বিরুদ্ধে চক্রান্তের হিসেব কষে কষে শুভ্রতর হয়ে উঠছে। আর নবাবের প্রিয়পাত্রী সাকিনা বেগমের মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। অথচ দিলরসের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করা চলে না। সমগ্র সুবা যেমন পরিচালিত হয় নবাবের অঙ্গুলিসঙ্কেতে, তেমনি সমগ্র অন্দরমহলের শাসনকার্য্য, বিচার রীতি-নীতি সবকিছুই চলে যে বর্ষীয়সীর তর্জ্জনী সঙ্কেতে কেবলমাত্র সেই 'বেগমসাহেবা' নামের অধিকারিণী। নবাবের যত প্রিয় বেগমই হোক, বেগমসাহেবার সম্মান তার প্রাপ্য নয়, সাকিনা জানে। জানে, 'বেগমসাহেবা'র শক্তির কাছে সে কত তুচ্ছ।

সাকিনার গোপন প্রেমাভিসারে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে প্রৌঢ়া

দিলরস বেগম। অথচ প্রকাশ্য ভাবে তার আসানাইয়ে বাধা দিতে পারে না 'বেগমসাহেবা'। মনে হয়, নবাব আত্মীয়া দিলরস বেগমের যৌনাচারের কথাও তা হলে প্রকাশ হয়ে পড়বে সাকিনা বেগমের আক্রোশে, সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে বেগমসাহেবার। শুধু বয়স আর আত্মীয়তার সূত্রে নয়, রূপসী কন্যার জননী বলেই অন্দরমহলের বেগমসাহেবার কর্তৃত্ব পেয়েছে দিলরস। আর তাই নিজের কন্যাকে ইব্রাহিম খাঁর প্রিয়পাত্রী করে তুলতে চায় সে।

অন্তরায় শুধু সাকিনা বেগম। তার রূপ আর যৌবনের মোহে অন্ধ হয়ে আছে ইব্রাহিম খাঁ। লক্ষ লক্ষ আসরফি ঢেলে দেয় তার পায়ে, সাকিনা বেগমের মুখে হাসি ফোটাবার জন্তে তৈরী হয় লক্ষ মুদ্রার হামাম-ই-গুলাব।

গোলাপ-নির্য্যাসে স্নান করবার জন্তে শ্বেত মর্ম্মরের এক বিশাল হামাম তৈরী হয়েছে সাকিনা বেগমের খাসমহলে। আর সে স্নানাগার পরিণত হয়েছে প্রণয়াভিসারের গোপন কক্ষে।

এই হামাম-ই-গুলাবের প্রসাধন কক্ষে তখন অপেক্ষা করে আছে সাকিনা বেগম।

রূপসী বাঁদীর দল তখন সাকিনার প্রসাধনে ব্যস্ত। গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী জরি সুপুষ্ট দু'টি বেণীর গাজে এঁকে-বেঁকে লুটিয়ে পড়েছে আয়নায় মোড়া মেঝের ওপর। গোলাপী মসলিনের ওড়নার নীচে কাশ্মীরী রেশমের স্তনাবরণ। আসমানী আঙিনার গায়ে চুণী পান্না হীরা জহরতের চমক। আর স্বচ্ছ রেশমের চম্পাবরণ পায়জামার কিনারায় রূপালী জরির নক্সায় ফিরোজা বসালেন। হীরে মুক্তার টায়রা সীঁথিতে, কণ্ঠের সাতনরীর মুক্তামালা বুকের তরঙ্গ বেয়ে লুটিয়ে পড়েছে!

মণিবন্ধের কঙ্কণের সারি সরিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটির ছোট্ট আয়নায় বার বার নিজের রূপ দেখে সাকিনা, নিজেই মুগ্ধ হয়।

বাঁদীরা অনুযোগ করে, এমন চাঁদের রূপ কি ঐ ছোট্ট আয়নায় ধরা দেয় মালিকা বেগম!

শুনে খুশির হাসি হাসে সাকিনা, ঠোঁটের রঙ আর চোখের কোণে সুর্ম্মার রেখা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে তাকায় দেয়ালের বড়ো আয়নার দিকে।

দেয়ালের চার পাশে, মাথার ওপরে আর পায়ের নীচে—সমস্ত ঘরখানাই ওলন্দাজ বণিকদের কাছে কেনা দামী আয়নায় সাজানো। আর সেদিকে তাকিয়ে হাজারো সাকিনা বেগমের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় সে।

কপালের বাঁকা টায়রার নীচে যেন তুলিতে আঁকা একজোড়া ভ্রূ, আর তারও নীচে রহস্যময় একজোড়া চোখ। ক্ষণে ক্ষণে দরজার মখমলের সবুজ পর্দ্দাটার দিকে তাকায় সাকিনা বেগম, আর বাঁদীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রসাধনের মেজ থেকে কস্তুরীর পাত্রটা তুলে নিয়ে হঠাৎ বাঁদীদের গায়ে ঢেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো সাকিনা। তারপর এসে বসলো শ্বেতপাথরের বাঁধানো ফোয়ারার বেদীতে, বসলো আঙুরের ভারে নুয়ে পড়া লতাঝোপের পাশে। নগ্ন নারীমূর্ত্তির ফোয়ারা থেকে অবিরত ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ-শীতল গোলাপজলের স্রোত। তাজা গোলাপের পাপড়ি ভাসে সে জলের তরঙ্গে। আর ফোয়ারার অন্য মূর্ত্তিটির হাতের সুরাপাত্র থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফুটন্ত জল।

এক দিকে ঠাণ্ডা জল, অন্য দিকে ফুটন্ত গরম জল এসে মিশছে অন্যমনস্ক ভাবে সেদিকে চোখ রেখে অপেক্ষার সময় গো সাকিনা বেগম। এখনই এসে পৌঁছবে দশহাজারী মনসবদ সুলতান খাঁ, যার অবৈধ প্রণয়ের আশক সাকিনা। ক্ষণে ক্ষ দরজার সবুজ মখমলের পর্দ্দাটার দিকে আশার চোখে তাক সাকিনা বেগম, পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে বাঁদীদের ওপর।

আভের পাখা নেড়ে বাতাস করছিলো দু'জন বাঁদী, তাদে একজনের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তার মুখের ও ঘা কয়েক বসিয়ে দিলে সাকিনা, ময়ূরের পেখমগুলো ভেঙে গে সে আঘাতে।

তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো সাকিনা বেগ প্রসাধনের মেজ থেকে গজদন্তের কারুকার্য্য করা সোন আতরদানটা তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখলো। নিকষ কা পাথরের পাত্রটা থেকে এক মুঠো অভ্রের রেণু নিয়ে কালো চুে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে দিলো। তীব্র আলোয় ঝিকমিক কার উঠে কালো চুলের ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালী জরির সুতো আর অভ্রের কুচি

তারপর এসে বসলো সাকিনা, শ্বেতপাথরে বাঁধানো বেদীটা চৌবাচ্চার ওপর আবলুস কাঠের আবরণ।

স্নানের সময়ে ছুটো খোজা ঢাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই আবরণ সরি দেয়, বাঁদীরা ছড়িয়ে দেয় তাজা গোলাপের পাপড়ি! মুহূর্তে নির্দ্দেশে ঠাণ্ডা জলের ধারাবর্ষণ বন্ধ হয়, ঝরে পড়ে উত্তপ্ত জলে স্রোত।

কিন্তু সেদিকে চোখ নেই সাকিনা বেগমের। এমন গভ রাত্রিতে স্নানের জন্তে আসে নি সে হামাম-ই-গুলাবে। এসেছে প্র অভিসারে।

ঝরোকার পাশে গিয়ে বসে সাকিনা, যে ঝরোকার গা বে উঠেছে আঙুরের লতা, নুয়ে পড়েছে রসালো সমরখন্দী আঙু ভারে।

ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে সাকিনা বেগম, তারপরই হতাশা দেখা দে তার চোখে।

হঠাৎ একটা শিস বেজে উঠলো। সাকিনার দু' চোখ উৎস হয়ে উঠলো সে ইসারায়। পরক্ষণেই পায়ের শব্দ শুনতে পে সাকিনা। এ পদশব্দ তার চেনা।

বাঁদীরা ছুটে গেল, আর পরমুহূর্ত্তেই একজন বাঁদী কিংখাবে পার্দ্দাটা তুলে ধরলো। সুদর্শন সুপুরুষ চেহারার তুরাণী মনসবদ সুলতান খাঁ একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো, আলিঙ্গন কর সাকিনা বেগমকে।

চোখে হাত চাপা দিয়ে সরে গেল বাঁদী আর খোজার দল।

সাকিনা বেগমের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাঁদী হামিদা পর্দ্দার বাই এসে প্রহরায় নিযুক্ত রইলো। ইব্রাহিম খাঁর জলসার দরোজা এখ থেকে দেখা যায়। সেদিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইলো হামিদা জলসামহলের খোজা দারোগাকে কুর্নিশ করতে দেখলেই বুঝতে হ নবাব ইব্রাহিম খাঁ বালাখানা থেকে বেরিয়ে আসছেন। শিসু দি সাবধান করে দিতে হবে তখন।

খোজা প্রহরী দু' জনকে ইশারা করলে হামিদা, চাকা ঘুরি চৌবাচ্চার সব জল নিষ্কাশন করার জন্তে। প্রয়োজন ঘটলে যেন

চৌবাচ্চার আবলুস কাঠের আবরণের নীচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে সুলতান খাঁ।

খোজাদের নির্দ্দেশ দিয়ে জলসামহলের দিকে ফিরে তাকালো হামিদা। আর পরমুহূর্ত্তেই দেখলে অদূরের আবছায়া অলিন্দে যেন একটি নারীমূর্ত্তি ছায়ার মত দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাকে! চোখাচোখি হতেই মূর্ত্তিটা আড়ালে সরে গেল।

বিস্মিত হল হামিদা।

বেগমসাহেবা দিলরস বেগম না? আতঙ্কে শিউরে উঠলো বাঁদী। সে জানে, নবাব-আত্মীয়া দিলরস বেগম এ আনন্দমহলের সর্ব্বময় বেগমসাহেবাই নয়, তার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জল্লাদের খড়্গও নামতে পারে সুলতান খাঁর ঘাড়ের ওপর।

রুদ্ধশ্বাসে পর্দ্দার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকেই হামিদা ফিসফিস করে ডাকলে, মালিকা বেগম!

দূর থেকে হামিদা বাঁদীর চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে নিজের মনেই হাসলো বেগমসাহেবা দিলরস। মূর্খ বাঁদী জানে না, এখনও বেগমসাহেবার চক্রান্ত সম্পূর্ণ হয়নি। অকারণে ইব্রাহিম খাঁর মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে সাকিনা বা সুলতানকে দগ্ধ করতে চায় না দিলরস। চায় আপন কন্যার প্রতিষ্ঠা। সাকিনা বেগমের পরিবর্ত্তে রেজিনা বানুকে করতে চায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর প্রিয়-পাত্রী।

আর সে স্বপ্ন সফল করবার জন্যেই সেনাপতি মুকল্লা খাঁর সঙ্গে চক্রান্ত করে সিন্ধুকী নিয়োগ করেছিল দিলরস, সুরাবিভোর নবাবকে পাঞ্জাছাপ দিতে বাধ্য করেছিল শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার জন্যে তাঞ্জাম পাঠানোর সময়।

হিসেব ভুল হয় নি দিলরস বেগমের। অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে পাইকের দল, ফিরে এসেছে শূন্য তাঞ্জাম। কিন্তু সে খবর গোপন রেখেছে বেগমসাহেবা, বিশেষ মুহূর্ত্তের জন্যে।

বাংলার মসনদে প্রধানা বেগমের মর্য্যাদা দিতে হবে রেজিনা বানুকে। বিলাসী মূর্খ ইব্রাহিম খাঁ যদি দিলরসের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হ'লে ইব্রাহিম খাঁকে সে অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন করবে আলমগীরের কাছে। ইব্রাহিম খাঁর নবাবী তক্তে বসাবে ফৌজদার মুকল্লা খাঁকে। রেজিনা বানুর ওপর মুকল্লার আসক্তির কথা অজানা নয় দিলরস বেগমের। অজানা নয় শাহ আলম আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের কথা।

অপমানে অত্যাচারে হিন্দু ভূস্বামী আর ভৌমিকদের বিদ্রোহী করে তুলবে দিলরস। ইব্রাহিম খাঁর কাপুরুষতা প্রমাণ করবে দিল্লীশ্বরের কাছে।

১১

এদিকে দূর উড়িষ্যার পাঠানদুর্গে রহিম খাঁর সঙ্গে বিদ্রোহের মন্ত্রণা করতে করতে শোভা সিংহ তার অনুজ হেমন্ত সিংহের চিঠি পেলো সেই সময়ে।

আক্রোশে জ্বলে উঠলো শোভা সিংহ। বললে, মোগলের দুঃসাহস ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে বন্ধু!

রহিম খাঁ বিস্মিত হয়ে তাকালো শোভা সিংহের দিকে। বিচলিত বোধ করলো যেন।

শোভা সিংহ নিজের মনেই বললে, আওরঙ্গজেব দক্ষিণের শিবাজীকে দেখেছে, কিন্তু বাংলার শোভাজীর পরিচয় পায়নি এখনও।

রহিম খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলে, লেফাফা কি খবর এনেছে দোস্ত?

শোভা সিংহ সহাস্যে বললে, নপুংসক ইব্রাহিম খাঁ শোভা সিংহের কন্যাকে তার অন্দরমহলে নিয়ে যাবার জন্যে তাঞ্জাম পাঠিয়েছিল রহিম শেখ!

—তারপর?

—চিন্তার কারণ নেই বন্ধু, শোভা সিংহের কন্যা সে-তাঞ্জাম পদাঘাত করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো রহিম খাঁ। বললে, শোভা সিংহের কন্যার যোগ্য উত্তরই দিয়েছে দোস্ত। কিন্তু—

—কিন্তু, কি রহিম শেখ?

চিন্তার রেখা দেখা দিলো রহিম খাঁর কপালে। বললে, এ অপমানের খবর আওরঙ্গজেবের কাছেও গিয়ে পৌঁছবে শোভাজী! আর সে-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হ'লে বর্দ্ধমানরাজকেও আনতে হবে বিদ্রোহীর দলে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো শোভা সিংহ। বললে, মোগলের দাস কৃষ্ণরাম হবে বিদ্রোহী? অসম্ভব রহিম শেখ, অসম্ভব!

—হিন্দুর ওপর মোগলের অত্যাচারে রাজা কৃষ্ণরামও বিরক্ত হয়ে আছেন, তাঁকে বন্ধুতে পরিণত করা কঠিন নয় শোভাজী!

—পথ?

রহিম খাঁ হেসে বললে, শুনেছি রাজা কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী এক কন্যা আছে। তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠাও শোভাজী। আত্মীয়তার চেয়ে বড়ো বন্ধন আর নেই।

আত্মীয়তার চেয়ে বড়ো বন্ধন আর নেই! রহিম খাঁর কথাটা বারংবার মনের চার পাশে ঘুরে বেড়ালো। চিন্তার দ্বন্দ্বে ডুবে গেল শোভা সিংহ।

বিবিবাজারের হীরাবাঈয়ের জলসায় যে অপমান ছুঁড়ে দিয়েছিল রাজা কৃষ্ণরাম, তার প্রতিশোধ নেবে, না তাকে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বেঁধে উত্তর দেবে সে লালসামত্ত ইব্রাহিম খাঁর ঘৃণ্য দুঃসাহসের।

উড়িষ্যা থেকে চিতোয়া-বরদার পথে ফিরে আসতে আসতে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হ'ল শোভা সিংহের মনে। পথের আশে-পাশে অসংখ্য দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ক্ষণে ক্ষণে আক্রোশ জ্বলে উঠলো তার বুকে। আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের প্রতিটি চিহ্ন যেন ঘৃতাহুতি দিলো শোভা সিংহের ক্রোধাগ্নিতে।

মেদিনীপুরের পরগণা চিতোয়া-বরদায় ফিরে এলো শোভা সিংহ, ফিরে এসেই শুনলো আওরঙ্গজেবের নতুন নির্দ্দেশ। তাম্রলিপ্ত থেকে ভুবনেশ্বরধাম পর্য্যন্ত সমগ্র দেবমন্দির বিনষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন দিল্লীশ্বর।

প্রজারা ভিড় করে এসে নিবেদন জানালো, চিতোয়া-বরদার প্রত্যেকটি মন্দিরকে বাঁচাতে হবে বিধর্ম্মী সম্রাটের অত্যাচার থেকে।

অত্যাচারের পর অত্যাচার। তখন আলমগীর স্বপ্ন দেখছেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করার। সুবে বাংলার বুকেও হিন্দু প্রজাদের ওপর জিজিয়া ধার্য্য হ'ল। পরোয়ান

এসে পৌঁছলো দেববিগ্রহ অপবিত্র করার নির্দ্দেশ নিয়ে। গৃহস্থবধূর লক্ষ্মীর আসনেও হাত পৌঁছলো মুসলমান মনসবদারের। নিষিদ্ধ হ'ল নাচ আর গান, হিন্দুর মেলা, দীপালী উৎসব আর হোরী উৎসব। রাজকর্ম্মে হিন্দু কর্ম্মচারী নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হ'ল। পেশকার, দিওয়ানীয়ান, ক্রোরীর আসন থেকে অবসর নিতে হ'ল হিন্দু কর্ম্মচারীদের। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ মাশুল ধার্য্য হ'ল পণ্য-দ্রব্যের ওপর।

দুর্দ্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছলো হিন্দু প্রজারা। দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ প্রজা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলো।

তবু সব সহ্য করে ছিল শোভা সিংহ, বিদ্রোহের স্বপ্নই দেখেছে শুধু, স্বপ্ন দেখেছে সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে হিন্দুরাজ্য। বিদেশী বিধর্ম্মী সম্রাটের হাত থেকে রাঢ়ভূমিকে ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে দিনের পর দিন।

কিন্তু সহ্যেরও বোধ হয় সীমা আছে। শোভা সিংহ কোন দিন কল্পনাও করে নি, মোগল ঔদ্ধত্য শেষে তারই কন্যার দিকে লোভের হাত বাড়াবে। কল্পনা করেনি, তারই জায়গীরের দেবমন্দির ধূলিসাৎ করার আদেশ দেবে আওরঙ্গজেব।

মনে মনে সঙ্কল্প ঠিক করে দূত পাঠালো শোভা সিংহ। বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠিয়ে।

কিন্তু সে-প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হ'লেন কৃষ্ণরাম। দরবার কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসলো কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম।

কৃষ্ণরাম সহাস্যে বললেন, শোভা সিংহের এ প্রস্তাবের উত্তর দেবে সত্যবতী, তার কাছেই পাঠিয়ে দাও এ পত্র।

খবর পৌঁছে গেল অন্দরমহলে।

দূতের চিঠি আর উপহারের স্বর্ণথাল হাতে নিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে এসে দাঁড়ালো আলাপনী কাদম্বরী।

প্রসাধন করতে করতে বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালো সত্যবতী, প্রশ্ন করলে, কিসের উপহার কাদম্বরী?

কাদম্বরী কৌতুকের হাসি হেসে বললে, মহারাজার অধীন এক তুচ্ছ জায়গীরভোগী শোভা সিংহ দূত পাঠিয়েছে রাজকুমারী! পরমাসুন্দরী সত্যবতীকে বিয়ে করতে চায় একজন সামান্য ভৌমিক।

অপমানে ক্রোধে ফেটে পড়লো সত্যবতী। বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী কন্যাকে পত্নীরূপে পেতে চায় এক সামান্য ভূস্বামী? কাদম্বরীর হাতের স্বর্ণপাত্রের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালে সত্যবতী।

কাদম্বরী বললে, শোভা সিংহ এই যৌতুক পাঠিয়েছে রাজকুমারী! মহারাজার ইচ্ছা, এ ঔদ্ধত্যের জবাব আপনি নিজে দেবেন।

এক-জোড়া স্বর্ণখচিত শঙ্খকঙ্কণ আর দুটি নারকেলের গায়ে সিঁদুরের প্রলেপ! সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সত্যবতী বললে দূতকে বলে দাও কাদম্বরী, এ কঙ্কণ শোভা সিংহের হাতেই মানাবে, আমার হাতে এই কৃপাণই একমাত্র ভূষণ। ব'লে কটিবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিটা বের করে দেখালো সত্যবতী।

খিলখিল করে হেসে উঠলো কাদম্বরী। বললে, আর এ নারকেল ভাঙার জায়গা কোথায় শ্বেত-পাথরের এই রাজপ্রাসাদে, বরং শোভা সিংহের মাথায়—

দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠলো খিলখিল করে।

উত্তর শুনে দূত বিদায় নিলো, আর রাজা কৃষ্ণরাম দেওয়ানজীকে নির্দ্দেশ দিলেন গোপনে চিতোয়া-বরদার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে। এ দুঃসাহসের পিছনে নিশ্চয় কোন প্রস্তুতি আছে, নিশ্চয় গোপনে শক্তি সঞ্চয় করছে শোভা সিংহ। পুত্রের উদ্দেশে বললেন, শোভা সিংহের এ ঔদ্ধত্যের খবর সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে জগৎরাম!

ইব্রাহিম খাঁর দরবারে খবর পৌঁছে দিলো জগৎরাম। কিন্তু অলস আর ভীরু স্বভাব ইব্রাহিম খাঁ বিশ্বাস করলো না জগৎরামের কথা। প্রবল-প্রতাপ আলমগীরের রাজত্বে কিনা একজন সামান্য জায়গীরদার বিদ্রোহ করবার স্বপ্ন দেখছে! অসম্ভব।

ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে শুনলো অন্দরমহলের বেগমসাহেবা দিলরস বেগম। শুনে হাসলো। বললে, মিথ্যে দুশ্চিন্তা জাঁহাপনা! আলমগীরের রাজত্বে কারও বিদ্রোহ করার সাহস থাকতে পারে না। আর তুচ্ছ শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলেও সে আগুন আপনা থেকেই নিবে যাবে।

কিন্তু মনে মনে বললে, বিদ্রোহ বাইরে নয় ইব্রাহিম খাঁ, বিদ্রোহ তোমার অন্দরমহলে। [ক্রমশঃ।

বৈদ্যগণ চিকিৎসা করুন

চিকিৎসক হওয়া বা চিকিৎসা করা বৈদ্যজাতির প্রধানতম শাস্ত্রীয় অবলম্বন। বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ যে অভিন্ন, শাস্ত্রেও তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলছে। আমাদের বক্তব্য সপ্রমাণ করতে নীচে কয়েকটি শাস্ত্র-উক্তি উদ্ধৃত করছি।

পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পঠয়ামাস যত্নতঃ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।—মনু।

অম্বষ্ঠানাং রোগশাস্ত্রাদিচিকিৎসা।—কুল্লুক।

চিকিৎসকং শাস্ত্রং বৈদ্যকম্।—টীকাকার রামচন্দ্র।

চিকিৎসকঃ শাস্ত্রং বৈদ্যকম্।—গোবিন্দরাজ।

রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ বৈদ্যে চ চিকিৎসকঃ।—অমরকোষ।

বৈদ্যবৃত্তা ভেষজানি।—ব্যাস।

বৈদ্যাঃ চিকিৎসা-কুশলাঃ।—মহাভারত।

বৈদ্যঃ (অম্বষ্ঠঃ) চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।—উশনাঃ।

শাস্ত্রে কথিত আছে, 'তোমাদিগকে (বৈদ্যগণকে) ব্রাহ্মণগণ যে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তোমরা (বৈদ্যগণ) আসক্ত ও সন্তুষ্ট থাকিও। অন্য পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিও না। আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য পুরাণাদি তোমাদের উচ্চার্য্য নহে।'

বৈদ্যদিগের পৈতা গ্রহণের পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত করেন রাজা রাজবল্লভ। "Rajballav, a person of the Baidya class, steward to the Nawab of Mursidabad, but a hundred years ago first procured for Baidyas a honour of wearing the Paita."

Tribes and Castes of Bengal. Vol I. P 48.

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 258-X52 BG

বৃক্ষ-বন্দনা

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

সৃষ্টির আদিযুগে ধরণী যখন নবীনা, সেদিন এই ভারতের শ্যামসুন্দর অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়াতেই মানব-মনে জেগেছিল সভ্য হ'বার', উন্নত হ'বার, পূর্ণ হ'বার প্রেরণা। মানব-সভ্যতার পথিকৃৎ সেই সর্বপ্রথম অমৃতপুত্রের দল বনলক্ষ্মীর তরুসন্তানদের সাহচর্যেই আরম্ভ করেছিলেন জীবনযাত্রা। তাই প্রাচীন কাল হ'তেই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল বনানীর শ্যামল ক্রোড়ে। অরণ্যের ছায়া-নিবিড় কুটীর-প্রান্তেই ক্রান্তদর্শী ঋষি দর্শন ক'রেছেন বেদ-উপনিষদের মর্মবাণী—নিখিলের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃতির সজ্জ মিতালী পাতিয়ে অনাড়ম্বর আরণ্য-জীবনই ছিল তাঁদের আদর্শ। অরণ্য হ'তে আহৃত অরণি ছিল তপোবনবাসীর নিত্যকরণীয় ধর্মযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আর কী-ই না মাধুর্য ছড়িয়ে আছে সেই সব বনখণ্ডগুলির নামের মায়ায়! পঞ্চবটী, বিন্ধ্যাটবী, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, রামগিরি প্রভৃতি বহু বিচিত্র ও রমণীয় কানন-কান্তারের রূপ-বর্ণনায় আমাদের সাহিত্য মুখর। ঋগ্বেদের ওষধি এবং আরণ্যসূক্তে দেখি বৃক্ষেরই বন্দনাগীতি। সেদিনের ঋষি কবি যথার্থই উপলব্ধি ক'রেছিলেন—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" এদের প্রত্যেকেরই ভিতরে আছে সংজ্ঞা বা চেতনা। সুখদুঃখের অনুভূতিও রয়েছে পূর্ণভাবে। পৃথিবীর আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অরণ্যানীর যে বর্ণনা ও স্তুতি রয়েছে, তা'তে দেখি, কবির কী নিবিড় অন্তরংগতা!

"অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী (১০।১৪৬।১)

চতুর্থ মণ্ডলে ক্ষেত্রপতি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন ঋষি—"মধুমতীরোষধীর্নো ভবতু।" (৪।৫৭।৩)

আমাদের প্রাচীন কবিকুলের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ভারতীয় কবি-মানসের এক বিশেষ প্রবণতা। বিশ্বপ্রকৃতির আপাতদৃশ্য জড়তার অন্তরালে পরম চৈতন্যময়ের অনন্ত লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা, প্রজ্ঞা-সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে। বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড পরাশক্তিরই অদ্বয় প্রকাশ ভারতবর্ষে শুধু দার্শনিকেরই জ্ঞানের কষ্টিপাথরে ধরা পড়েনি, কবির রস-মধুর সৃষ্টিতেও তাই হ'য়েছে প্রকাশিত, শিল্পীর কলানৈপুণ্যে তাই হ'য়েছে প্রতিফলিত। এই বিবর্তনধারার উদয়াচলে র'য়েছেন বেদমন্ত্রের উদ্গাতা ঋষিকুল, তার পরে আরণ্যক উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানী তপস্বি-বৃন্দ, রামায়ণ-মহাভারতের মনস্বী মহাকবিযুগল, কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী সারস্বতমণ্ডলী, তার বহু পরে, বহু শতাব্দীর অবসানে 'বন-বাণী'-'পত্রপুটে'র ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ।

এই মহাভাবধারায় অবগাহন করে এক দিন উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে সেই "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"কে জানিয়েছিলেন প্রাণের প্রণতি—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

বিংশ শতাব্দীতে রবিকবির মর্মবীণাতেও সেই অনাহত সুরই হয়েছে ঝংকৃত—

"অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য।" (নৈবেদ্য)

রামায়ণে জন্মদুঃখিনী অপহৃতা সীতা আরণ্য প্রকৃতিকেই তাঁর একমাত্র সমব্যথীরূপে উপলব্ধি ক'রে তাদের কাছেই জানিয়েছিলেন করুণ আবেদন।

"আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।
দৈবতানি চ যান্ত্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্।"
(আরণ্য ৪৯।৩০, ৩২)

"হে জনস্থান, ওগো কুসুমিত কর্ণিকারবৃন্দ, তোমাদের আমি অনুরোধ ক'রছি, তোমরা সত্বর রামকে জানাও যে, রাবণ সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। তরুরাজি-সমাকুল এই বনে যত বনদেবতা র'য়েছেন, তাঁদের আমি প্রণতি জানাই। অপহৃতা আমার কথা তাঁরা যেন আমার স্বামীকে জানান।" সেই আর্ত আবেদনে সাড়া দিয়েছিল আরণ্য-তরু। নানা পক্ষিসমাকুল বনপাদপসমূহ ঊর্দ্ধগামী বায়ুভরে আন্দোলিত হ'য়ে অগ্রভাগ কম্পিত ক'রে যেন বলছিল—"সীতা, আমরা এখানে র'য়েছি; তোমার কোন ভয় নেই।"

"উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
মা ভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ।"
(আরণ্য ৫২।৩৪)

মানুষ এবং অন্যান্য জীবগণের মত বৃক্ষলতারও প্রাণ আছে, এই কথাই স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে মহাভারতে—

"সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাং অচৈতন্যং ন বিদ্যতে।"
(মহাভারত। শান্তি। ১৭২।১০)

"সুখদুঃখের গ্রহণে, ছিন্ন অংশের পুনরুদ্গমে, আমি দেখছি তরুরাজিরও প্রাণ আছে। অচেতন কিছুই দেখছি না।"

সেই যুগে গার্হস্থ্য আশ্রমই মানব-জীবনের একমাত্র আশ্রয় ছিল না। ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই আশ্রমত্রয়ের অবলম্বনে জীবনের তিন-চতুর্থাংশ অরণ্যেই অতিবাহিত হ'ত। ফলে আরণ্য প্রকৃতির সংগে মানব-চিত্তের স্থাপিত হ'ত এক অখণ্ড ঐক্যবোধ—নিবিড় একাত্মতা। সুখৈশ্বর্য্যের উত্তুঙ্গশীর্ষে অধিষ্ঠান করতেন যে রাজন্যবর্গ, তাঁদেরও সেদিন অনুসরণ করতে হ'ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন—"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।" বিদ্যাকেন্দ্র ছিল তরুরাজি-পরিশোভিত শান্তরসাস্পদ তপোবন। তাই পার্বত্য অরণ্য সেদিন মানবসমাজে লাভ ক'রেছিল জনপদের চেয়েও অধিকতর মর্য্যাদা এবং গভীরতর প্রীতি।

কবিকুলচক্রবর্তী কালিদাস এই মহাসত্যকে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশলের মধ্য দিয়ে এক রসসুন্দর পরিণতিতে করেছেন উৎসারিত। বনদুহিতা শকুন্তলা এক দিন বলেছিলেন—"অত্থি মে সোদরসিনেহোবি এদেসু।"—"এই তপোবন-তরুগণের প্রতি আমার রয়েছে সহোদর-স্নেহ।" তাই, বায়ুচলিত পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা সেই বকুল বৃক্ষও তাঁকে কাছে ডাকতো—"বাদেরিদপল্লবাঙ্গুলিহিং তুবরেদি বিঅ মাং

কেসরকৃত্যও।" কুমারী-জীবনের লীলাভূমি পরিত্যাগ ক'রে পতিগৃহে যাত্রাকালে "যেতে নাহি দিব" ব'লে সহচরী শকুন্তলার বসনাঞ্চল টেনে ধরেছিল তপোবন প্রকৃতি, মঙ্গলবাণী উচ্চারণ ক'রেছিল বনদেবী এবং বধূবেশিনী শকুন্তলার জন্যে ক্ষৌমবসন, অলক্তক, এবং বিবিধ উপহার যুগিয়েছিল তরুরাজি।

"ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্
নিষ্ঠ্যূতোপরতোপরাগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাঃ করতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈঃ
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদঃ প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥"

রঘুবংশে কবি আশ্রম-ঋষির কণ্ঠ দিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—

"পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥"

"নিজের সামর্থ্যানুসারে পয়োঘটের দ্বারা আশ্রমের তরুবালকগণকে সংবর্দ্ধিত ক'রে তুমি পুত্রজন্মের পূর্বেই নিঃসংশয়ে লাভ ক'রবে স্তনন্ধয় শিশুপালনের প্রীতি।" কালিদাসের কাব্যে বালবৃক্ষ সর্বদাই স্তন্যপায়ী শিশু। "কুমারসম্ভবে"ও দেখি, অতন্দ্রিতা উমা নিজেই শিশুবৃক্ষগুলিকে ঘটস্তন-প্রস্রবণের দ্বারা বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। এই পূর্বজাত পুত্রগুলির প্রতি তাঁর সন্তানস্নেহ কার্তিকের চেয়ে মোটেই কম নয়—

"অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥" (কুমার—৫।১৪)

রাজপণ্ডিত বাণভট্টের কাদম্বরীতেও দেখি, এরই প্রতিচ্ছায়া—
"ভগবতো মহামুনেরগস্ত্যস্য ভার্যয়া লোপামুদ্রয়া স্বয়মুপরচিতালবালকৈঃ করপুটসলিলসংবর্ধিতৈঃ সুতনির্বিশেষৈরুপশোভিতং পাদপৈঃ...।"
(কাদম্বরী)

কুমারসম্ভবে বসন্তোজ্জীবিত বনস্থলীতে আরণ্যতরুগণ পর্য্যাপ্তপুষ্প-স্তবক-স্তনবতী প্রদীপ্তপল্লবোষ্ঠযুক্তা মনোহর লতাবধূগণের বিনম্র শাখা-ভুজবন্ধনে অনুভব করছে নিবিড় আলিংগন। এই পটভূমিকায় তরুরাজিপ্রসূত সুকুমার কুসুমসম্ভারেই লাবণ্যময়ী উমার আবির্ভাব ঘটালেন রসিকজনের কান্ত কবি কালিদাস—

"অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারম্
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥" (৩৫৩; ৫৪)

মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে করুণার যে অশ্রুধারা প্রবাহিত ক'রেছেন, তাতেও আরণ্যতরুর প্রভাব অপরিসীম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁদেরই অনুবর্তনে অনুভব করেছেন—
"ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা। ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তাহ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।" একদিন সপ্তপর্ণ বৃক্ষের ছায়াতলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্তঃকর্ণে শুনেছিলেন বৃক্ষের ভিতরে মৌনমুখরতায় চঞ্চল প্রাণের সংগীত তথা প্রাণময়ের আহ্বান। এই আহ্বানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন মুক্তির বাণী—

"আজি আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, উর্দ্ধে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
দিবস-প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে।" (প্রান্তিক)

এই মুক্তির মন্ত্রে ছাত্রদের হৃদয় যা'তে উদ্বোধিত হয়, তাই, তিনি তাঁর তপোবন প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন শালবনে-ঘেরা আম্রকুঞ্জে। প্রকৃতি যখন তৃষাতুর বক্ষে প্রতীক্ষা করে প্রথম বর্ষণ-ধারার, আষাঢ়ের সেই মেঘমেদুর অম্বরতলে মঙ্গলঘটে আরোপিত শিশুতরুকে জানানো হয় আহ্বান—

"আয় আমাদের অংগনে
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহসংগ নে
চল আমাদের ঘরে চল।
শ্যাম-বংকিম ভংগিতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।"

অন্তিম কাল পর্যন্ত কবি স্মরণ ক'রে গেছেন বৃক্ষের সহিত তাঁর পরম আত্মীয়তা "সান্ত্বনা", "বোবার বাণী", "আম্রবন" প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। "বনবাণী"তে "বৃক্ষবন্দনায়" মধ্যে কবি জানিয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠ প্রণতি।

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হ'তে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ;
উর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ পরে। তব প্রাণে প্রাণবান্,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান্,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তা'রি দূত হ'য়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশীর তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।"

এই ভাবে যুগে যুগে আমাদের ঋষি-পিতামহগণ এই বৃক্ষের মধ্যে দেখেছিলেন অনন্ত মাধুর্যের সমাবেশ। এই বৃক্ষের পত্র-পল্লবে পুষ্পে-কাণ্ডে তাঁর মূর্ত দেখেছিলেন এক অসীম কল্যাণেচ্ছা—চিৎশক্তির প্রাণময় বিকাশ। প্রকৃতির সৃষ্টি সমাবেশের অনন্ত প্রতিকূলতার মধ্যে অসহায় মানব-সভ্যতাকে লালন করার জন্যে জননীর দায়িত্ব বরণ ক'রেছিল অরণ্যানী। তাই, যা' ছিল অদ্ভুত, পৃথিবীর অন্তর থেকে তাই হ'ল অন্তর্ভূত। বসুন্ধরার অন্তরতম মণিকোঠা থেকে রূপ-রস-গন্ধ আহরণ ক'রে উন্নত মাথা তুলে দাঁড়ালো সে অনন্ত দ্যুলোকের দিকে। মানুষের রোগে দিল সে ওষধি, ক্ষুধায় দিল ফল, যজ্ঞে যোগাল সমিধ। তারই পত্রে বল্কলে লিপিবদ্ধ হ'ল বেদগান,

স্নেহচ্ছায়ায় শান্তিময় হ'ল ঋষির তপোবন। আবার, তারই পুষ্প-গুচ্ছে সজ্জিত হ'ল মানুষের প্রিয়ার দেহ, পদতল রঞ্জিত হ'ল তারই লাক্ষা রাগে। কবি কালিদাস যে অম্লান-সুন্দর কুসুমদামে যক্ষ-প্রিয়াকে সাজিয়েছেন, সে তো তরুলতারই দান—

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্। (উত্তর মেঘ)

নব যুগের কালিদাস রবীন্দ্রনাথও সেকালের প্রেয়সীর দিনচর্য্যায় তরুলতার অবদানকেই বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :—

"অশোককুঞ্জ উঠ্‌তো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হ'তো ফুল্ল, প্রিয়ার মুখের মদিরাতে
* * * *
আসৃতো তারা কুঞ্জবনে চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে।
অশোক-শাখা উঠ্‌তো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।

কুরুবকের পর্‌তো চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈতো হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজ্‌তো কুন্দফুলে,
শিরীষ পর্‌তো কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখতো মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকৃতো সাজে।
কুরুবকের পর্‌তো মালা কালো কেশের মাঝে।"
(সেকাল, ক্ষণিকা)

তাই, সেদিন আশ্রমের কুটিরাঙ্গণ হতে রাজপ্রাসাদের কুঞ্জবন পর্য্যন্ত সর্বত্র চ'ল্‌তো বৃক্ষ বন্দনার উৎসব পালন। সেদিনের গৃহলক্ষ্মী প্রাঙ্গণের অশোক-তরুতল মার্জনা ক'রে আল্‌পনা দিয়ে প্রণাম জানিয়ে আরম্ভ ক'রতেন প্রতিটি প্রভাত। শকুন্তলার মত শত শত মুনিকন্যার কুমারী-হৃদয়ের অসীম স্নেহে শোভন ও উন্নত হয়ে উঠতো আলবালের তরুশিশুরা। রাজপ্রেয়সীর মুখের মদিরাতে পুষ্পিত হ'ত বকুলের শাখা, অলক্ত রঞ্জিত, নূপুর শিঞ্জিত পদাঘাতে বহ্নিশিখার মতো উৎসবের দীপালি জ্বালিয়ে তুল্‌তো অশোক-পলাশের দল।

কাল ক্রমে এলো নতুন-যুগের নবীন সভ্যতা। সভ্য নাগরিক তার চিরদিনের সহযোগী তরুলতাকে নির্মম ভাবে নির্বিচারে ক'রলো আক্রমণ। বনদেবীর শ্মশানভূমিতে রচিত হ'ল নগরলক্ষ্মীর অভ্রভেদী শোকের তাজমহল। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলী বনলক্ষ্মী, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে মানুষ নিয়ে এলো বিরাট এক অভিশাপের পশরা। ভারতের উত্তরাংশ এক সময় ঋষি-মহর্ষি-অধ্যুষিত ছায়াশীতল মহারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু, মানুষের গৃধ্নুতার জন্যে আজ সেখানে মরুভূমি এগিয়ে আসছে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। নাগরিকতার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত ক'রে আমেরিকাতে এক সময় বহু অরণ্যানী ধ্বংস করা হ'য়েছে। তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে ঝড় আসছে, শস্যক্ষেত্র হচ্ছে বিনষ্ট। বায়ুকে নির্মল করার ভার যে তরুলতার ওপর, যার গলিত পত্রে মৃত্তিকা হয় উর্বর, ভূমি-ক্ষয় রোধ করে যার শিকড়জাল, বিধাতার আশিস-বৃষ্টিকে নিয়ে আসে যে অরণ্যানী, লোভী মানুষ তাকেই নির্মূল ক'রে ডেকে এনেছে নিজের মৃত্যুকে। যে অরণ্যের গভীর প্রশান্তিতে আরণ্যকের অমর শ্লোক রচিত হ'য়েছে, যে বনানীর কল্যাণ-স্নিগ্ধ ছায়াতলে তপোবনে তপোবনে সত্যভিক্ষু বিদ্যার্থীর দল শত শত বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রেছেন অনলস অধ্যয়নে, নির্বাসিত রাজকুমার ও রাজবধূর জীবনের অশ্রু-মধুর কাহিনীর নীরব সাক্ষী ছিল যে চিত্রকূট ও পঞ্চবটী বন, বিরহ-বিধুর যক্ষের বেদনখিন্ন ব্যথাদীর্ণ জীবনের সমব্যথী ছিল যে রামগিরি আশ্রম, আজকের ভারত তাদের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত!

তোমার মধ্যেও আছে—আমার মধ্যেও আছে

প্রশ্ন। বেদান্ত আমাদের দেশের গোড়ার শাস্ত্র, তা' তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে—বেদান্তের গোড়ার শাস্ত্র কি, সেইটেই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য।

উত্তর। সব শাস্ত্রের যাহা গোড়ার শাস্ত্র, বেদান্তেরও তাহাই গোড়ার শাস্ত্র। সে শাস্ত্র তোমার মধ্যেও আছে—আমার মধ্যেও আছে। সে শাস্ত্র আর কিছু না—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান।

প্রশ্ন। হইতে পারে যে, তাহা তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু কই—আমার মধ্যে আমি তো তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর। চশমা রহিয়াছে তোমার নাকে বসিয়া—অথচ তুমি চশমা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছ না। যে শাস্ত্র তোমার অন্তরাত্মায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা যদি তুমি না দেখিতে পাও, তবে আমি তাহা তোমাকে দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্ত্তিকচন্দ্র বসু

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ৮ই ভাদ্র (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) তারিখে পরিণত বয়সে ডক্টর কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইলে তাহাদিগের উপকারীর শবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য যে দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানরা দলে দলে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় প্রকট হইয়াছিল। আর তাহাতেই মানুষের কর্ম্মজীবনের সার্থকতা। দীর্ঘ জীবনে এই অক্লান্তকর্ম্মী বাঙ্গালী যে সব কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা করিতে স্বতঃই আগ্রহ হয়। অবশ্য তাঁহার "কলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর"; কিন্তু ৮০ বৎসর বয়সেও তিনি যখন যুবকের আগ্রহে নানা পরিকল্পনা বিবৃত করিতেন, তখন মনে হইত, জরা তাঁহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিলেও বুঝি তাঁহার মন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্ত্তিক (কার্ত্তিক পূজার দিন) ২৪ পরগণা জিলার চাংড়িপোতা গ্রামে পিতা প্রসন্নকুমারের গৃহে কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্ম হয়। প্রসন্নকুমার চৈতন্যদেবের সময়ের গৌড়বঙ্গের স্বাধীন পাঠান সুলতান হুসেনশাহের প্রধান কর্ম্মচারীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশগৌরব ছিল, কিন্তু অর্থগৌরব ছিল না। তিনি কলিকাতায় কোন য়ুরোপীয় সওদাগরের কার্যালয়ে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। তাঁহার অগ্রজ ব্যবসা করিতেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের অল্প দিন পরে জ্যেষ্ঠতাত রাজকুমার কলিকাতায় (গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে) একখানি বাড়ী ক্রয় করিলে উভয় ভ্রাতা সপরিবারে সেই বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু কয় বৎসর পরেই রাজকুমার সপরিবার কাশীবাসী হইবার জন্য বাড়ী বিক্রয় করেন। প্রসন্নকুমার ক্রেতার নিকট হইতে বাড়ীর একাংশ ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস করিয়া রামাপুকুর লেনে ক্রীত এক টুকরা জমীতে—অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া—একখানি ছোট বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নূতন বাড়ীতে সংসার গুছাইয়া বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় ৩টি পুত্র ও ২টি কন্যা লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান পুত্রের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র। সেই দুঃসময়ে প্রসন্নকুমারের ভগিনী ভবতারিণী আসিয়া মাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের লালন-পালন কার্য্যভার স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না—একমাত্র কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। প্রসন্নকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র পিসীমা'কেই "মা" বলিতেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় ৯ বৎসর। অগ্রজ প্রবোধচন্দ্র তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাছে তাঁহার অধ্যয়নে বাধা হয়, সেইজন্য পিসীমা'র ব্যবস্থায় কার্ত্তিকচন্দ্রকেই ভ্রাতার ও ভগিনীদ্বয়ের লালনপালনে ও গৃহকার্য্যে পিসীমা'কে সাহায্য করিতে হইত। সেই সময় হইতেই তাঁহার কাজ করিবার অভ্যাস হয়—পরে তাহা অনুশীলনে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর কাজ করিয়া অবসর সময়ে পল্লীর লোকের কাজও করিয়া আনন্দলাভ করিতেন—সঙ্গে সঙ্গে রিপন কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ চলিতে থাকে। তখন তিনি গল্পের বহি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠ করিতে এবং বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী কণ্ঠস্থ করিতে ভালবাসিতেন।

প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রিপন কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। অগ্রজ তখন বৃত্তিলাভ করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন; সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের মেডিক্যাল কলেজে পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার মত অর্থ-সামর্থ্য প্রসন্নকুমারের ছিল না। সব শুনিয়া প্রসন্নকুমারের এক সতকর্ম্মী কার্ত্তিকচন্দ্রকে স্বীয় পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কিছু সুবিধা হইল বটে, কিন্তু মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ে অসমর্থহেতু কার্ত্তিকচন্দ্রকে সহপাঠীদিগের গৃহে যাইয়া সে সব পুস্তক পড়িয়া আসিতে হইত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন অসম্ভব হইবে। তিনি পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য সব পুস্তক পাঠ বর্জন করিয়াছিলেন—কলেজে অধ্যাপক যাহা বলিতেন, তাহা লিখিয়া লইয়া—পরে কোন সতীর্থের গৃহে যাইয়া পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেন। পরীক্ষায় তিনি কখনও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-বি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার লাভ করেন।
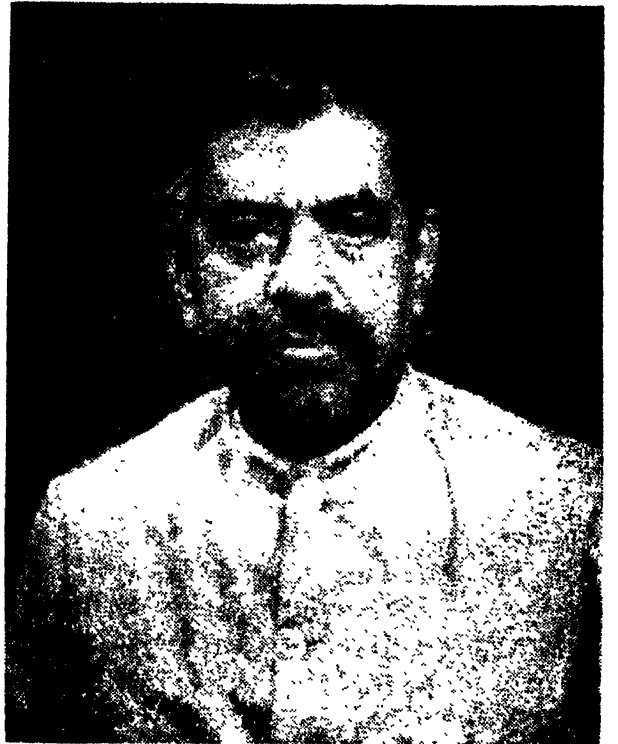
কার্ত্তিকচন্দ্র বসু

তিনি প্রথমে কলেজের চক্ষু বিভাগে চিকিৎসকরূপে খ্যাতি লাভ করিলেও কর্ম্মের প্রেরণায় সে পদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিখ্যাত ঔষধ-ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর ব্যবস্থাপক-চিকিৎসক হ'ন। তিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসর ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকেন এবং তাহাতে তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে।

এই সময় বাঙ্গালার এক দিকে নূতন চেষ্টা হইতেছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে গবেষণা করিয়া ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সহকারী চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বহু আলোচনার পরে স্থির করেন—বাঙ্গালায় একটি ঔষধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেই সঙ্কল্পের ফলে—বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসুটিক্যাল ওয়ার্কস ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হয়। প্রথম কিছু "সিরাপ" দিবার জন্য পত্র পাওয়া যায়। বড়বাজার চিনিপটি হইতে এক বস্তা চিনি আনিতে হইবে। প্রফুল্লচন্দ্রের এক ভ্রাতা আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে চিনি আনার ভার দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি কেবল যাইবার জন্য ট্রামভাড়া পাইলেন; কারণ, আসিবার সময় তাঁহাকে মুটিয়ার সঙ্গে আসিতে হইবে। প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে কার্ত্তিকচন্দ্র ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁহার বিচক্ষণতা, কর্ম্মশক্তি ও দূরদৃষ্টি—বিশেষ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত উন্নতির সহায় হইল। প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ রাসায়নিকদিগের ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিবার যোগ্যতা থাকিলেও সময় ছিল না। সে অভাব কার্ত্তিকচন্দ্র পূর্ণ করিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি লিমিটেড লায়েবিলিটী কোম্পানীতে পরিণত করা হয় এবং কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার অন্যতম ডিরেক্টার হ'ন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার কার্য্যকালে কোম্পানীর মূলধন ২৫ হাজার টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকায় পরিণত করা হয়। মাণিকতলায় যে স্থানে উহার অন্যতম বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত, সে জমি কার্ত্তিকচন্দ্র স্বয়ং ক্রয় করিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দেই কার্ত্তিকচন্দ্র দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে ইংরেজীতে পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার পরীক্ষাগারেই সর্পগন্ধার ও অর্জ্জুন গাছের ছালের ভেষজ-গুণ পরীক্ষিত হয়; প্রথমটি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় ও গবেষণায় কবিরাজ গণনাথ সেন তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিবার পরে ঐ বৎসর তিনি নিজস্ব গবেষণাগার "ডক্টর বসুজ ল্যাবরেটরী" প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে প্রথমে দেশীয় ভেষজের মানবদেহের উপর ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে বিস্তার লাভ করে এবং তাহার বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কাজ হইতে থাকে। এখন উহা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "উনিয়ন ডিষ্টিলারী" প্রতিষ্ঠিত করিয়া রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সুরাসার ঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয়ের কারখানায় তাহা হইত না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেলিয়াঘাটায় এসিড প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বসু মহাশয়ের কারখানায় নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

ইহা ভিন্ন ধাতু ঢালাইয়ের কারখানা ও নলকূপের পাম্প প্রভৃতি নির্ম্মাণের কারখানাও তিনি স্থাপিত করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মাণিকতলা পল্লীতে তিনি পরীক্ষার্থ একটি গুড় পরিষ্কার করিবার কারখানা স্থাপিত করিয়া আবশ্যক পরীক্ষা ও গবেষণার পরে উহা ২৪ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার গ্রামে বৃহৎ চিনির কারখানায় পরিণত করেন—তাঁহার মাতার নামে উহার "রাজলক্ষ্মী সুগার ফ্যাক্টরী" নামকরণ হয়। ঐ স্থানে বিস্তৃত জমিতে চিনির জন্য ইক্ষুর চাষ হইত। বাঙ্গালা এক সময়ে চিনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মোগল শাসনের শেষ দশায় এ দেশে আসিয়া পর্য্যটক বার্ণিয়ার বলিয়া গিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় এত চিনি প্রস্তুত হইত যে, তাহাতে বাঙ্গালার প্রয়োজন মিটাইয়া আরবে ও অন্যান্য দেশেও চিনি রপ্তানী করা হইত। বাঙ্গালায় তখন দুই প্রকার চিনি হইত—খেজুর গুড়ের ও ইক্ষুর গুড়ের। এখন ইক্ষুরস হইতেই অধিক চিনি প্রস্তুত হয় এবং বিহার প্রভৃতি প্রদেশে বহু চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাঙ্গালায় তাহার অভাব শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গের এ বিষয়ে দৈন্য অসাধারণ।

দীর্ঘ জীবনে কার্ত্তিকচন্দ্রের বহু কাজের মধ্যে দেশের লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানদান জন্য প্রচারিত সাময়িক পত্রগুলিরও উল্লেখ করিতে হয়।—তিনি ইংরেজীতে "ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ" নামক ত্রৈমাসিক পত্র ও "হেলথ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস" নামক মাসিক পত্র প্রচার করেন এবং বাঙ্গালায় "স্বাস্থ্য-সমাচার", হিন্দীতে "স্বাস্থ্য-সমাচার" ও উর্দুতে "তন্দুরস্তি" প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই সকল সাময়িক পত্রের নিয়মিত প্রচার জন্য যেমন, বিবিধ কারখানার ও ঔষধের জন্য আবশ্যক ছাপার জন্য তেমনই তাঁহাকে একটি বৃহৎ ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। নানা বিভাগে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ও তাহা যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই কার্ত্তিকচন্দ্রের অভিপ্রায় ও আদর্শ ছিল।

তাঁহার ৫ পুত্রকে তিনি সুশিক্ষিত করিয়া বিরাট প্রতিষ্ঠানের এক এক বিভাগের পরিচালন জন্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের আর একটি দিকেরও গুরুত্ব অসাধারণ—সে গ্রাম উন্নয়ন ও গ্রাম গঠন। বাঙ্গালায় বহু পুরাতন সমৃদ্ধ গ্রাম নানা কারণে অবনত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয় বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশে নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও অসাধারণ। ইহা কার্ত্তিকচন্দ্র বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইংরেজীতে কথা আছে—Charity begins at home—প্রথম দান গৃহেই ভাল। এই কথার বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ, পরিবারের অভাব ও অভিযোগ যেমন জানা থাকে, তেমনই সে সকলের প্রতীকার করা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কল্যাণকর কার্য্য প্রথম পরিবারে আরম্ভ করিলে—তাহা সহজেই সমাজে ব্যাপ্ত করা যায়—গ্রামই সমাজের কেন্দ্র। সেইজন্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্র আপনার গ্রামের

কল্যাণসাধনে অর্থ ও মনোযোগ দিতে থাকেন। গ্রামে যাইবার পথ সংস্কৃত হইল—তিনি পথে আলোক দিবার জন্ম লোহার স্তম্ভ ঢালাই করিয়া দিলেন। গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল—তাহাতে সুশিক্ষিত চিকিৎসক রাখিয়া রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল; এমন কি প্রয়োজনে ঔষধও বিনামূল্যে দেওয়া হইতে লাগিল। চাংড়িপোতা গ্রামে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মাতুল-গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা সাংবাদিক-জগতে প্রসিদ্ধ। তিনি 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। এই 'সোমপ্রকাশ' সর্ব্বাগ্রে লর্ড লিটনের ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত পত্রের অধিকার-সঙ্কোচক আইনের আক্রমণ সহ্য করে। সে কথা গ্লাডষ্টোন বৃটেনের পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের নামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে কার্ত্তিকচন্দ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। শিক্ষা-কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে অবহিত হইলেন। কারণ, রোগ নিবারণ করাই চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক ফলোপধায়ক। গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দূর করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। কার্ত্তিকচন্দ্র গভীর নলকূপ বসাইয়া তাহার জল পাম্পে উচ্চে রক্ষিত আধারে তুলিয়া তথা হইতে নলে সমগ্র গ্রামে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। এই কাজ কিরূপ ব্যয়সাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। সে জন্য তাঁহাকে বয়লার বসাইয়া জল তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। তখনও পল্লীগ্রামে মরণাপন্ন রোগীকে "তীরস্থ" করা প্রচলিত প্রথা ছিল। লোকের কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি শ্মশানঘাট, ও ঘাটে কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীকে দিলেন। গ্রামে একটি কবিরাজী ঔষধের কারখানা ও গোশালা প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিরাট আশা ও বিপুল উৎসাহ লইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র কাজ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রামে এক সম্প্রদায়স্থ লোকরা তাঁহার কাজে সহযোগিতা না করিয়া বাধা দিতেই প্রবৃত্ত হইল। তাহারা জল সরবরাহের ব্যবস্থাও বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তাহারা কার্ত্তিকচন্দ্রের সাধু উদ্যম অনেকাংশে ব্যর্থ করিল। কিন্তু তথাপি তিনি গ্রামের প্রয়োজন ভুলেন নাই। তিনি বলিতেন, "যে আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই কেন করুক না যখন মনে করি, প্রসূতিরা হয়ত আবশ্যক সাহায্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন আর স্থির থাকিতে পারি না।" সেই জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে গ্রামে একটি মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যজনিত দৌর্ব্বল্যে যখন সে কাজে আবশ্যক মনোযোগদান অসম্ভব বুঝেন, তখন উহার জন্য জমি ও ২৫ হাজার টাকা সরকারকে দিয়া সরকারকে সে কাজ সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করেন। সরকার তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন—প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় একটি শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্র তাহা দেখিয়া গিয়াছেন।

বিশ্রাম যে অনেক রোগীর আরোগ্য বিধানে ঔষধ অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকরী, তাহা কার্ত্তিকচন্দ্রের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস ছিল—

> মুক্ত বায়ু, হিত পথ্য, তমোহর রবির কিরণ,
> সংযম, বিশ্রাম, শান্তি শ্রেষ্ঠৌষধ এরাই ক'জন।

সেই বিশ্বাসে কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমে বৈদ্যনাথে একটি বিশ্রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ফল পরীক্ষা করেন। ফল আশানুরূপ হয়। পরীক্ষাকালে তাঁহাকে সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে কলিকাতার কাজ ফেলিয়া বৈদ্যনাথে যাইতে হইত। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার নিকটে একটি বড় বিশ্রামমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি সে কাজ করিতে না করিতে তাহাতে বাধা উপস্থিত হয়। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। সামরিক প্রয়োজনে বিস্তৃত ভূমিতে ঐ সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া সরকার উহা সামরিক প্রয়োজনে অধিকার করেন। পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ায় কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যথিত হইয়াছিলেন। বাইবেলে আছে, রাজা ডেভিড বলিয়াছিলেন—তিনি ভগবানের জন্য মন্দির নির্ম্মিত করিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নহে জানিয়া তাঁহাকে সে কাজ যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য রাখিয়া যাইতে হয়। আমরা আশা করি, সরকারের ও জনগণের সমবেত চেষ্টায় কার্ত্তিকচন্দ্রের পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিয়া দেশের লোকের কল্যাণ সাধন করিবে।

স্বগ্রামে তিনি গ্রাম উন্নয়নের চেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রাম গঠনে সেই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত করিবার সঙ্কল্পে চব্বিশ পরগণা জিলায় কৃষ্ণপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম লইয়া "পল্লী-সংস্কার সমিতি" গঠিত করিয়া বালক-বালিকাদিগকে বিনা বেতনে আক্ষরিক ও কুটীরশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। তথায় পাঠশালার সঙ্গে তাঁতশালা ও কৃষিশালাও প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহাই কার্ত্তিকচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল। জনহিতকর কার্য্যের ব্যয়ভার কার্ত্তিকচন্দ্রই বহন করিতেন। স্থানীয় লোকের ত্রুটিতে এই কাজ আশানুরূপ ফলপ্রদ হইতে পারে নাই। কার্ত্তিকচন্দ্র এই অঞ্চলে যে বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কার্ত্তিকপুর নামে পরিচিত। স্থানটি কলিকাতা শ্যামবাজার হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরবর্ত্তী। এই কেন্দ্রে কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁহার প্রায় ৪ শত বিঘা জমি, বাড়ী, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি "কার্ত্তিকপুর কৃষি সমবায় উপনিবেশ" করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগের বাস জন্য দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় স্যর ডানিয়েল হ্যামিলটনের প্রতিষ্ঠিত 'গোসাবা সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠান' ব্যতীত এরূপ বৃহৎ গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান আর নাই।

এ সকলই এক জন বাঙ্গালীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ও আন্তরিক চেষ্টার সাফল্য প্রতিপন্ন করিতেছে। এই সকল কার্য্যের মূলে ছিল—দয়া ও সহানুভূতি। তাহার জন্যই তিনি বহু দরিদ্রকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য দিয়াও চিকিৎসা করিতেন।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্‌এ ঘর ভাড়া করে নিনা ক্রিমসন যেদিন জেমসন লেনএ উঠে এল সেদিন কিসের যেন একটা ছুটি ছিল।

মনে পড়লে এখনো নিনার ঠোঁটের কোণে হাসি ঝিলমিল করে ওঠে।

হ্যারি ক্যামেরণ হিক্‌স্ কুইন কোম্পানির একটি ভ্যান দিয়েছিলো তাকে। নিজের সামান্য যা-কিছু আসবাব-পত্তর তাইতে চাপিয়ে এ বাড়ীতে উঠে এসেছিল সে।

আসবাব-পত্তর সামান্য—কিন্তু তাই দেখেই যেন পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্‌এর অন্যান্য ভাড়াটেদের চোখে কৌতূহল ফুঠে উঠলো। সত্যিই তো——এ বাড়ীতে ক'টা মেয়ের নিজের ড্রেসিং-টেবিল আছে, নিজের রেডিও-সেট আছে? জুডি ফিসারের নয়, ন্যান্সি ব্রাউনের নয়, অলগা ম্যাকডারমটের নয়,···এ জানলায় ও জানলায় ওদের মুখ দেখেই নিনা বুঝে নিলো ওরা ঠিক সেই শ্রেণীর মেয়ে—যারা কেরোসিন কাঠের টেবিলের উপর কাঠের ফ্রেম দাঁড় করিয়ে তা'তে চীনে বাজার থেকে কিনে-আনা সস্তা আয়না চাপিয়ে, তার দুপাশে নিজের হাতে বোনা লেশ ঝুলিয়ে, তারই সামনে আরেকটি কেরোসিন কাঠের ছোট বাক্সের উপর বসে প্রসাধন সারে। তারপর কালকের ব্লাউসটির উপর পরশুর স্কার্টখানি সাজিয়ে, কাঁধে প্লাষ্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে যার নিজের কাজে। ওদের কেউ বা ডেলহাউসির কোনো মার্চেন্ট অফিসে টাইপিষ্ট আর কেউ বা চৌরঙ্গির জমকালো সাহেবী দোকানে শপ-এ্যাসিষ্ট্যান্ট।

জীবন? এরা জীবনের কি দেখেছে—নিনা নিজের মনে হেসেছিলো একটুখানি। জীবনের কি-ই বা জানে? বড় জোর বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে সিনেমায়; নয় তো বা ক্লাবে, আর মাসের প্রথম দিকে হাতে টাকা থাকলে কোথাও কোন হাউসির আসরে! দু'এক চক্কর নাচ, দু'এক বোতল বীয়ার, দু'-একজনের সঙ্গে ঘরোয়া প্রেম—এই তো এদের জীবন! আর এতেই ওই রোগাটে চেহারা, তীক্ষ্ণ ক্ষুধার্ত্ত চোখ, চোখের কোণে কালি···। যে সব ঝড় নিনার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তার কিছুও যদি ওদের জীবনে আসতো, তা'হলে? নিনাকে দেখে কে বলবে তা'র বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ? তার টানা নীল চোখ, গমের শীষের মতো রঙ, পাটের মতো চুল, আর শরীরের সুঠাম গঠনের সঙ্গে ভাঁজে ভাঁজে লেপ্টে-যাওয়া সিল্কের গাউন দেখে কে বলবে সে···যাক, সে কে এবং কি, এদের না জানাই ভালো, নিনা ভাবলো।

এ জানলায় ও জানলার অনেকের চোখই মেপে নিচ্ছিলো তাকে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ববি, শ্যাম আর পিটার। ছবিটা পরিষ্কার মনে আছে নিনার। শ্যাম তার

ববি দাঁড়িয়েছিলো আমেরিকান ছায়াচিত্রের কাওবয়দের মতো উদ্ধত ভঙ্গীতে। পিটারের সচল চোয়ালখানি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে মুখের ভিতর চুয়িংগাম চর্বিত হচ্ছে। হঠাৎ ও পাশের কাদের বাড়ির দোতলার জানলা থেকে ভেসে এলো গানের কলির শীস। গানটি নিনার জানা, বহুদিনের পুরোনো গান—আই আই আই আই আই আই লাভ্ য়ু ভেরী—ঈ মাচ,···

সেদিন সারা দুপুর কেটে গেল ঘর-দোর গোছাতে। বাড়িময় তখন হৈ-হুল্লোড়, দাপাদাপি, ছুটির দিনের কোলাহল। এঘরে রেকর্ড, ও ঘরে হেঁড়ে গলায় গান, ওপর তলায় বুড়ো আর বুড়ি জ্যাসপারের কলহ! রাস্তায় বাচ্চা ছেলেদের টেনিস বল দিয়ে ফুটবল খেলা। কে যেন একবার দরজার কড়া নাড়লো! দরজা খুলে নিনা দেখে একজন কাবলীওয়ালা।

"হাপকিন? হাপকিন সাহাপ,···"

বিরক্ত হোলো নিনা।

"কোইভি সাহাব ইটার নেহি রেহ্‌তা হাই"—

"মেম্ সাহাপ,···"

"নো মেমসাহাব। Buzz off, you···!"

দরজাটা কাবলীওয়ালার মুখের উপর বন্ধ করে দিলো নিনা।

একটু পরে আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ।

আবার কে? অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আবার এসে দরজা খুলে দিলো নিনা।

সামনে দাঁড়িয়ে এক মাঝ-বয়েসী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে-ছেলে।

"ইয়েস···?"

অতি বিনীত ভাবে হাসলো মেয়েছেলেটি। বললো, "আমি মিসেস কানিংহাম, ওপাশে থাকি। সুইট নাম্বার টেন। ওই কাবলীওয়ালাটা তোমায় কি কোনো ট্রাবল্ দিচ্ছিলো? যদি কোনো অসুবিধে হয়তো আমায় বোলো। আমার ছেলে যখন স্কুলে পড়তো তখন ব্যান্টাম-ওয়েট্‌এ রানার্স-আপ হয়েছিলো। এখনো ফোর্ট উইলিয়ামে মাঝে

মাবে বক্সিং করে। প্রায় প্রফেশানেল, 'ইউ নো? কাগজে ওর নাম নিশ্চয়ই পড়েছো,—ওর এক বন্ধু এ ঘরে থাকতো, ওই কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলো কিছু। কি অন্যায়, যাওয়ার আগে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। তুমি নতুন এসেছো বুঝি? মে আই কাম ইন, আমি কি ভেতরে আসতে পারি, মিস…

"প্লীজ একস্‌কিউস্ মি, এক্ষুনি আমার একজন বন্ধু আসবেন", দরজাটা বন্ধ করে দিলো নিনা।

বন্ধ দরজার ওপার থেকে কানে এলো বাইরের প্যাসেজে মিসেস কানিংহাম কাকে যেন বলছে—কী দাম্ভিক মেয়েটি!…'

হু ইজ শি?

এর পর তাকে নিয়ে কি আলোচনা হবে নিনা জানে। এ রকম বাড়ি সে অনেক দেখেছে।

সন্ধ্যের পর একবার রুটি-মাংস কিনতে বেরুলো নিনা। ফেরার পথে দেখলো কয়েকটি মেয়ে ও দু'চার জন ছেলে নীচে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কি যেন খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছিলো ওরা, নিনাকে দেখে থেমে গেল। নিনার মনে হোলো ওরা যেন আলোচনা করছে তাকে নিয়েই। সে চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ঘড়িতে যখন ন'টা বাজলো, আর নিস্তব্ধ হয়ে এলো জেমিসন লেন, পিয়ানোর সুর ভেসে এলো সামনের বাড়ি থেকে আর রাস্তা দিয়ে মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে চলে গেল একটি নিষ্কর্মা ছেলে, নিনা এসে দাঁড়ালো ড্রেসিং-টেবিলের সামনে। দেখলো চোখের কোণে ক্লান্তির কালো ছায়া নেমেছে। মনে পড়লো, এতক্ষণে হয়তো হুল্লোড় সুরু হয়ে গেছে পেলিকান বার-এ। একটি নতুন বিদেশী জাহাজ এসেছে কলকাতা বন্দরে, সাদা ইউনিফর্ম-পরা নাবিকেরা হয়তো এসে ভিড় জমিয়েছে সেখানে। গেলাসের পর গেলাস রাম, জিন, হুইস্কি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এ-পাশে ও-পাশের টেবিলে, বার-এর মেয়ে-অভ্যাগতদের সঙ্গে ওদের ভাব হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তাদের রঙচঙে মুখ আর সস্তা প্রসাধনের সৌরভ হয়তো ঝড় তুলেছে অনেক নাবিকের বুকে, ঘোর লেগেছে তাদের ঘোলাটে চোখে। পয়সার মমতা করে না বিদেশী নাবিকেরা—এক রাতে পোনেরো দিনের খরচা উঠে যায়।

ড্রয়ার টেনে ফাউণ্ডেশানের কৌটোটি বা'র করলো নিনা, একটু ভাবলো, তার পর আবার রেখে দিলো। বড্ডো ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। আজ আর বেরুবো না, স্থির করলো সে।

আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে বসলো—আনমনে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়লো সামনের বাড়ির জানলায়।…

নিনা ক্রিমসনের জীবনে নতুন অধ্যায় সুরু সেদিন থেকে।

ওদের নাম পরে জেনেছিলো সে। ছেলেটির নাম জ্যাকি গ্রীণ, ওর বৌয়ের নাম লিলি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা নিনা যখন জানলায় এসে বসেছিলো, তখন ওদের বাইরের ঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলো জ্যাকি। পাশে একটি ইজিচেয়ারে বসে একটি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো লিলি

গ্রীণ। মেঝেতে বসে একটি টেডি-বেয়ার নিয়ে খেলছিলো জ্যাকির মেয়ে সিলীন। এক পাশে জ্বলছিলো একটি টেবিল-ল্যাম্প, অতি স্নিগ্ধ তার শেড।

চার দিক তখন নিস্তব্ধ। দূরে কোথায় যেন রেডিও বাজছে। আকাশে এক-ঝাঁক ঝিলমিল তারা, চাঁদ উঁকি মারছে ওদিকের তেতলা বাড়িটির ছাতের ওপার থেকে।

একটু পরে বাজনা থামিয়ে জ্যাকি মুখ ফিরিয়ে কি যেন বললো। লিলি উঠে সিলীনকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরের জানলায় টুক করে জ্বলে উঠলো ইলেকট্রিক আলো। নিনা দেখলো লিলি সিলীনকে নিয়ে বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। সিলীন বুকের ওপর হাত দুটো জুড়ে বিড়-বিড় করে কি যেন বললো, তারপর উঠে পড়লো খাটের উপর। লিলি তার গায়ের উপর চাদর টেনে দিয়ে, মুখ নীচু করে তাকে চুমু খেলো, তারপর সুইচ অফ করে আলো নিবিয়ে ফিরে এলো বসবার ঘরে।

জ্যাকি তখনো পিয়ানো বাজাচ্ছে। লিলি এসে ওর পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়ালো। জ্যাকি মুখ ফিরিয়ে হাসলো। লিলি হাত বাড়িয়ে টেবিল-ল্যাম্পটি নিবিয়ে দিলো। অন্ধকার নামলো সে ঘরে।

পিয়ানোর সুরটা কি রকম যেন ক্ষীণ। শুধু বাঁ হাত দিয়েই বাজানো হচ্ছে যেন—তারপর আবার দু' হাতেরই কাজ সুরু হোলো কী-বোর্ডে। পিয়ানো বেজে চললো অনেকক্ষণ···অনেকক্ষণ··· অনেকক্ষণ···তারপর থেমে গেল এক সময়। লাইট আর জ্বললো না সে ঘরে।

নিনা ক্রিমসন অনেকক্ষণ বসে রইলো জানলায়। কি রকম যেন একটি বিষণ্ণতা নামলো তার মনে। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা।···তার মা-ও এমনি বসে পিয়ানো বাজাতো সন্ধ্যের পর, পাশে একটি কৌচে বসে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে খবরের কাগজ পড়তো তার বাবা। টেডি-বেয়ার তো তারও একটি ছিলো!

কতো দিন আগেকার কথা!

আজ সে মিস নিনা ক্রিমসন, সন্ধ্যের পর বসে থাকে পেলিকান বার'এ, নয়তো বা আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় চৌরঙ্গিতে। কতো বন্ধু তা'র···কতো চেনা···কতো অচেনা।···

টাকা? হ্যাঁ, টাকা আসে আর যায়। কিন্তু আর যেন ভালো লাগে না।

কতো সুখী ওই মেয়েটি, যে সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে উওমেন্‌স্ ওন্ ম্যাগাজিন পড়ে, যার পাশে বসে পিয়ানো বাজায় নির্ঝঞ্ঝাট স্বামী।

তার পরদিন সন্ধ্যেবেলাও বেরুলো না নিনা ক্রিমসন, তার পর-দিন না তার পরদিনও না। সন্ধ্যের পর সন্ধ্যে কাটিয়ে দিলো জানলায় বসেই, জ্যাকি আর লিলি গ্রীণের বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

এমনি ধারা একটি জীবন যদি তারও থাকতো—ভাবতে সুরু করলো নিনা ক্রিমসন।

এমন সময় একদিন এসে উপস্থিত হোলো হ্যারি ক্যামেরণ। বেশ অবস্থাপন্ন লোক সে, হিকস্ এ্যাণ্ড কুইন কোম্পানীতে এসিষ্ট্যান্ট সেলস্ ম্যানেজার। নিনা ক্রিমসনের অল্প কয়েক জন নিয়মিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অন্যতম। মাস ছয়েক হোলো বৌ মারা গেছে। তখন থেকে অন্তরঙ্গতা আরো বেশী।

নিনাকে সে অনেক বার বলেছিলো,—অন্য সবার সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দাও। আমি তো আছি। তোমার ভাবনা কি?

নিনা ওর কথা কানে তোলেনি কোনো দিন। পুরুষ জাতটাকে তার খুব ভালো করেই জানা আছে। দু' দিন পর যখন আকর্ষণ কেটে যাবে, তখন?

"কি ব্যাপার? তোমায় পেলিকান্‌এ দেখছি না কয়েক দিন?" হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

নিনা বললে, "ভালো লাগছে না। রুটিন-বাঁধা জীবনের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি কিছু দিনের জন্যে।"

এর মধ্যে যেন বিপুল হাস্যরসের সন্ধান পেলো হ্যারি ক্যামেরণ। হাসতে লাগলো খুব। মুখ থেকে তার এলকোহলের গন্ধ। পকেট থেকে সে হুইস্কির বোতল বার করলো।

এমন সময় পিয়ানো বাজতে সুরু করলো সামনের বাড়ি থেকে। নিনা সরে এলো জানলার কাছে। তার পর হ্যারিকেও ডাকলে।

হ্যারি আর নিনা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখলো অনেকক্ষণ।

"বাঃ, মেয়েটি তো খুব সুন্দর দেখতে"! হ্যারি বললো।

কি মিষ্টি ওদের জীবন, বললো নিনা।

একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললো, "নিনা, এ রকম জীবন তো তোমারও হতে পারে।"—

"কি করে হতে পারে বলো?"

"যদি আমায় এসে থাকতে দাও তোমার সঙ্গে।"—

নিনা অনেকক্ষণ ভাবলো, তারপর রাজি হয়ে গেল। দেখাই যাক না কিছুদিন, সে বোঝালো নিজেকে।

তার পরদিন একটি সুটকেস নিয়ে নিনার ঘরে উঠে এলো হ্যারি ক্যামেরণ।

সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাষ্ট তৈরী করা, হ্যারি অফিসে বেরুনোর আগে তার কপালে একটি ঠাণ্ডা চুমু, দুপুর বেলা ঘুম, ঘুম ভেঙে উঠে হীটারে চায়ের জল চাপিয়ে হ্যারির জন্যে অধীর প্রতীক্ষা, সন্ধ্যের পর চৌরঙ্গির দিকে বেড়াতে বেরুনো, শনিবার ক্লাবে নাচের আসর, রোববার হাউসি, হাউসির পর সিনেমা, রাত্তিরে পাশাপাশি শুয়ে গল্প, তার পর ঘুম···জীবনের উপর হঠাৎ যেন কি রকম একটা নেশা লেগে গেল নিনা ক্রিমসনের।

আগের দিনের কথাগুলো আর যেন মনেই পড়ে না···

ইতিমধ্যে একদিন আলাপ হয়ে গেল জ্যাকি আর লিলির সঙ্গে! সেদিন নিনা আর হ্যারি গিয়েছিলো সিনেমায়, শো ভাঙবার পর বাইরে এসে দেখে খুব বৃষ্টি। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকি আর লিলি।

হ্যারি বললো, "কি বিচ্ছিরি আবহাওয়া···"

জ্যাকি উত্তর দিলো, "বড্ডো।"

"আমি হ্যারি ক্যামেরণ।"

জ্যাকি করমর্দন করলো হ্যারির সঙ্গে, "হাও ডু' ডু। আমি জ্যাকি গ্রীণ। মীট মাই ওয়াইফ, লিলি।"

জ্যাকি নিনাকে দেখিয়ে বললো, "মিসেস ক্যামেরণ······"

নিনা সর্বাঙ্গে একটি শিহরণ অনুভব করলো।

কারো স্ত্রী বলে পরিচিত হওয়ায় এতটা আনন্দ, সে ভাবতেই পারেনি কোনো দিন।

ট্যাক্সিতে একসঙ্গে ফিরলো ওরা সবাই। জ্যাকি ছাড়লো না। ওদের ধরে চা খাওয়াতে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

সেখানে অনেকক্ষণ বসে গল্প, গান, জ্যাকির পিয়ানো। হ্যারি যে এত ভালো গান গায় কে জানতো! লিলি বার বার বলে তার কাছ থেকে গান শুনলো একটার পর একটা।

সেদিন থেকে যাওয়া-আসা সুরু হোলো ওদের মধ্যে। এক সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, ডান্সে যাওয়া, হাউসি খেলতে যাওয়া। জ্যাকির অবস্থা খুব ভালো নয়, তবে তার একটি পিয়ানো সারানোর দোকান আছে। লিলির চাকরিটি ভালো, কোন এক বিলিতী ফার্মের ম্যানেজারের পার্সন্যাল এসিষ্টান্ট, তাইতেই সংসার চলে। সুতরাং বেশীর ভাগ দিনই ওরা বেরুতো হ্যারির অতিথি হয়ে।

একদিন নিনা হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে, লিলি তার সঙ্গে ঠিক আগের মতো সহজ নেই। তার বাড়িতে সে আর আসেও না। লিলির ওখানে গেলে খুব ভালো করে কথা বলে না!

নিনা তখন কমিয়ে দিলো ওদের বাড়ি যাওয়া। হ্যারিকে কিছু বললো না। হ্যারি যাওয়া-আসা করতে লাগলো আগের মতো।

সেদিন বিকেল বেলা রাস্তার মোড়ে জ্যাকির সঙ্গে দেখা। জ্যাকি নিনাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার নিনা, আজ-কাল তোমায় আর দেখা যায় না কেন?"

নিনা একটি মামুলী উত্তর দিয়ে অন্য কথা পাড়ছিলো, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হোলো লিলি। নিনাকে দেখে কিছু বললো না, জ্যাকির হাত ধরে বললো, "ডার্লিং, চলো আমরা বাড়ি যাই—।"

জ্যাকি একটু অবাক হোলো, বললো, "নিনাও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আসছে—।"

"আই ডোণ্ট থিঙ্ক সো," লিলি গম্ভীর ভাবে বললো। "আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই জানো যে দিস উওমেন ইজ নট কোয়াইট রেসপেকটেবল্। ওর নাম খুব ভালো নয়।"

লিলির নিষ্করুণ অভদ্রতায় স্তম্ভিত হোলো জ্যাকি।

"কি বলছো লিলি?"

হ্যাঁ, ওকে জিজ্ঞেস করো। আমি যদ্দূর জানি হ্যারি ক্যামেরণ ওর কেউ নয়। আসল মিসেস ক্যামেরণ মারা গেছে বেশ কিছুদিন আগে। এ মেয়েটি অমনি থাকে হ্যারির সঙ্গে। তুমি কি চাও আমার মতো রেসপেকটেবল মহিলা ওর সঙ্গে মেলামেশা করে? কাম্ এলং, আমরা বাড়ি যাই—।"

লিলি আর জ্যাকি চলে গেল।

নিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার এক পাশে—আর তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল অনেক পথিক, অনেক গাড়ি, ট্রাম, বাস, রিক্সা।

হ্যারি বাড়ি ফিরলো সন্ধ্যের পর।

কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো নিনা ছুটে এসে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না।

হ্যারি অবাক হয়ে দেখলো নিনা চুপচাপ বসে আছে এক কোণে একটি ইজিচেয়ারে। মুখ তার শীতের গোধূলির মতো থমথমে, সরু সরু আঙুলের মাঝখানে একটি সিগারেট। আর সামনে অজস্র সিগারেটের টুকরো ছড়ানো।

সে চোখ তুলে একবার তাকালো, তার পর আবার সিগারেট টানতে লাগলো নিজের মনে।

"কি হয়েছে ডার্লিং?"

নিনা উত্তর দিলো না।

"কেউ তোমায় কিছু বলেছে?"

নিনা চুপ করে রইলো।

হ্যারি আর কিছু না বলে কোটটা খুললো, টাই-এর গ্রন্থি শিথিল করে দিলো। তার পর চুপচাপ বসে পড়লো একটি চেয়ারে।

অনেকক্ষণ পর কথা বললো নিনা।

বললো, "হ্যারি, তুমি এখানে আর থেকো না, তুমি চলে যাও।"

"কেন?" হ্যারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার উচিত নয় এখানে থাকা।"

"কেন? ডোণ্ট য়ু লাভ মি এনি মোর, ডার্লিং—তুমি কি আমায় আর ভালবাসো না?"

একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো নিনা। তার পর বললো, "তোমরা রেসপেকটেবল্, বড়ো বড়ো অফিসের বিগ শট্স্। আমি একটি খারাপ মেয়েছেলে—"

"কে বলে সে কথা?"

"লিলি জ্যাকিকে বলেছে আমার সঙ্গে না মিশতে—।"

"লিলি?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না নিনা," হ্যারি বললো, "ওরা নিশ্চয়ই তোমায় হিংসে করে।"

"আমায় হিংসে করে? কেন?" অবাক হোলো নিনা।

"কারণ আমি তোমায় এত ভালবাসি, তুমি আমায় এত ভালবাসো—।"

"তা'তে ওদের হিংসে হওয়ার কি আছে?"

"ওদের মধ্যে তো এত ভালোবাসা নেই—।"

"সে কি? ওরা যে স্বামি-স্ত্রী," নিনা অবাক হয়ে বললো।

"স্বামি-স্ত্রী হলেই কি ভালোবাসা হয়?"

"কিন্তু ওদের দেখে যে আমার মনে হয়েছিলো—।"

"বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না নিনা," হ্যারি বললো।

নিনার মনে পড়লো সেদিনকার সন্ধ্যেটি—হ্যারি বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। পাশে বসে একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে লিলি। এক পাশে একটি ল্যাম্প, তার শেডখানি খুব স্নিগ্ধ। মনে হয়েছিলো, ওরা কতো সুখী, হিংসে হয়েছিল ওদের দেখে, নিজের জীবন সম্বন্ধে আক্ষেপ এসেছিলো তার মনে, ভেবেছিলো যদি ওদের মতো হওয়া যেতো! আর সেজন্যেই তো হ্যারির সঙ্গে এই ঘরকন্না ওদের অনুকরণ করে।

"কিন্তু তুমি ওদের কথা কি করে জানলে?" নিনা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি? আমি—?" একটু থেমে গেল হ্যারি, "আমি আন্দাজ করেছি। ওদের দেখে-শুনেই আমার এ কথা মনে হয়েছে।"

নিনা ফিরে দাঁড়ালো। "আচ্ছা, হ্যারি, লিলি আমার কথা কি করে জানলো? তুমি লিলিকে কিছু বলোনি তো?"

"আমি? আমি বলতে যাবো তোমার কথা? লিলিকে?" তারপর একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললো, "দেখ, একটা কথা তোমায় এদ্দিন বলিনি। হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, আমিও কিছুদিন

হয়ে ওদের ওখানে আর যাচ্ছি না। কারণ লিলি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো তোমার কথা।"

"আমার কথা?"

"হ্যাঁ, লিলি বলছিলো, সে নাকি তোমায় আগে দেখেছে দু' একজন সেইলারের সঙ্গে।"

লিলি চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, "হ্যারি—!"

"কি?"

"আমার একটা কথা রাখবে?"

"বলো।"

"চলো, আমরা বিয়েটা করে ফেলি।"

"কেন, এই তো বেশ আছি।"

"না, হ্যারি! আমি তোমার বিয়ে-করা বৌ নই বলে লিলি আমায় যা খুশি তাই বলেছে। আমি যতোক্ষণ না ওদের দেখিয়ে দিতে পারি, আমিও মিসেস ক্যামেরণ, আর তোমার-আমার সংসারের সুখ ওদের সংসারের সুখের চাইতে একটুও কম নয়, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।"

হ্যারি একটু ভাবলো। তার পর বললো, "কিন্তু, আমায় বিয়ে করলে কি আগের মতো স্বাধীন জীবন তোমার থাকবে?"

"সে আমি আর চাই না হ্যারি।"

একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললো, "কিন্তু··"

"কিন্তু কি? তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না?"

"না, না, নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু আরো কিছু দিন যাক।"

"কেন?"

"আমার একটি লিফট্ পাওয়ার কথা আছে বছরের শেষে। সেটি হয়ে যাক, তার পর।"

নিনা চোখ তুলে তাকালো। বললো, "বেশ, তাই হবে।"

লিলিদের যাওয়া-আসা বন্ধ সেদিন থেকে। নিনা আর লিলি রাস্তায় দেখা হলে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। জ্যাকির সঙ্গে দেখা হলে সে শুধু টুপি তুলে অভিবাদন করে চলে যায় পাশ কাটিয়ে।

হ্যারি ক্যামেরণ রাত করে বাড়ি ফেরে মাঝে মাঝে। নিনা রাগ করে, ঝগড়া করে, অনুযোগ করে। হ্যারি সয়ে যায় মুখ বুজে।

মাঝে মাঝে রাত্তিরে ফেরেই না হ্যারি—অফিসের কাজে তাকে নাকি কলকাতার বাইরে যেতে হয় অনেক সময়।

তখন নিনা চুপচাপ বসে থাকে জানলায়।

কিন্তু জ্যাকি গ্রীনের জানলা অন্ধকার।

কিছু দিন ধরে পিয়ানো বাজাচ্ছে না সে।······

একদিন হ্যারি রাত্তিরে ফিরলো না। যাওয়ার আগে কিছু বলে যায়নি। তাই তার পরদিনও যখন তার দেখা নেই, ওর অফিসে টেলিফোন করলো নিনা ক্রিমসন। কিন্তু অফিসের অপারেটর লাইন দিলো না কিছুতেই। বললো, হ্যারি কলকাতায় নেই।

"বাইরে যাওয়ার আগে আমায় নিশ্চয়ই বলে যেতো"—নিনা বললে।

"ভেরি সরি মিস"—বলে অপারেটর লাইন কেটে দিলো।

সারা দিন জানলার কাছে গুম হয়ে বসে রইলো নিনা। নভেম্বরের দুপুর বেলার সোনালী নীল আকাশে উড়ে গেল বকের সারি। তাই দেখলো বসে বসে।

সিগারেট শেষ হয়ে গেল একটার পর একটা। পাহাড় গড়ে উঠলো প্লাষ্টিকের সস্তা এ্যাশ-ট্রে'তে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোলো। বাড়ির ছায়াগুলো দীর্ঘতর হোলো সামনের রাস্তায়। স্কুলবাস এসে নামিয়ে দিয়ে গেল এ বাড়ি ও বাড়ির ফুটফুটে মেয়েদের।

অফিস থেকে ফিরলো একজন একজন করে চেনা-জানা সবাই, ওপর তলার অস্কার, পাশের বাড়ির ডোনাল্ড, একতলার রবিনসন, মিসেস ডিকসনের মেয়ে অলগা, বুড়ো জ্যাসপারের বোনঝি জ্যানি, ডোনাল্ডের বোন রোজমারি আর আরো অনেকে।

নভেম্বরের বিকেল ফিকে হয়ে এলো গোধূলির বিষণ্ণ আবছায়ায়।

দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

কান পেতে শুনলো নিনা। কে, হ্যারি?

কড়া নড়ে উঠলো আবার।

নিনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

"হ্যারি—!!!"

হ্যারি নয়। সে জ্যাকি।

জ্যাকির এলোমেলো চুল। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর এসে বসলো।

"কি ব্যাপার জ্যাকি?" জিজ্ঞেস করলো নিনা।

"তুমি জানো না বুঝি?" জ্যাকি আস্তে আস্তে বললো।

"নিনা তাকিয়ে রইলো জ্যাকির দিকে। তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো জুড়ে বিস্ময় আর প্রশ্ন।"

"লিলি চলে গেছে—।"

"লিলি? সিরিয়াস্‌লি বলছো?"

"ভেরি!"

"শুনে খুব দুঃখিত হলাম জ্যাকি! কিন্তু—"

"চলে গেছে হ্যারির সঙ্গে?"

"কার সঙ্গে?" লিলি উঠে দাঁড়ালো।

"হ্যারির সঙ্গে—।"

"হ্যারি ক্যামেরণ?"

জ্যাকি চুপ করে রইলো!

"হ্যারি? কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিলো—।"

নিনা জ্যাকির কাছে শুনলো সবই। জ্যাকির দোকানের অবস্থা ভালো নয়, তার আয়ে সংসার চলে না। লিলির আয়ের প্রায় সবটাই চলে যেতো সংসার চালাতে। এই নিয়ে চাপা অসন্তোষ অনেক দিন থেকে!

ইতিমধ্যে হ্যারির সঙ্গে লিলির আলাপ হোলো, আলাপ থেকে বন্ধুতা, বন্ধুতা থেকে অন্তরঙ্গতা।

জ্যাকি টের পাচ্ছিলো সবই, কিন্তু কিছুই বলেনি। বলবার মুখ তার নেই—বৌয়ের আয়ে সংসার চলে, কিছু বললে দু'কথা শুনিয়ে দেবে।

কিছুদিন পর লিলি এসে বললো, "জ্যাকি, আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো।"

জ্যাকি আপত্তি করলো না। ডিভোর্স হয়ে গেল।

"তারপর কাল রাত্তিরে লিলি চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে। সে চিঠি আজ পেলাম." বলে থামলো জ্যাকি।

"হ্যারি তাও লিখে রেখে যায়নি", নিনা বললো।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো নিনা ক্রিমসন। তারপর হাসতে সুরু করলো। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লো চেয়ারের উপর।

"হাসছো কেন?" জ্যাকি জিজ্ঞেস করলো।

হাসতে হাসতে নিনা বললো, "তোমার আর লিলিকে দেখে এক সময় আমার হিংসে হোতো। ভাবতুম, ওর জীবন যদি আমারও হয়। মনে হোতো আদর্শ স্ত্রী তোমার বৌ লিলি। তাই আমিও কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম আদর্শ স্ত্রী হবার, যদিও হ্যারি আমার বিয়ে করা স্বামী নয়! দেখছিলাম আদর্শ স্ত্রী হতে কি রকম লাগে। কিন্তু জ্যাকি, এই সমস্যার উত্তর কি? সত্যি সত্যি কি করে সুখী হওয়া যায় বলো তো?"

জ্যাকি চুপ করে রইলো।

নিনা বললে., "আমার আগের জীবন কি ছিলো জানো?"

জ্যাকি আস্তে আস্তে বললো, "হাঁ জানি। লিলি বলছিলো।"

"কিন্তু লিলি কি করে জানলো বলো তো?"

"ওকে হ্যারি বলেছে।"

"হ্যারি—?"

সোজা উঠে দাঁড়ালো নিনা। "হ্যারি? আমাদের হ্যারি ক্যামেরণ?"

আবার বসে পড়লো সে। বসে রুমাল চাপা দিলো চোখে। সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠলো।

জ্যাকি বসে রইলো চুপটি করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরে এলো চার দিকে। আলো জ্বললো না নিনার ঘরে।

চোখ থেকে রুমাল নামিয়ে সোজা হয়ে বসলো নিনা ক্রিমসন।

"এবার কি করবে?" জ্যাকি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"কি আর করবো?" নিনা খুব সহজ ভাবে বললো, "হয়তো আগের জীবনে ফিরে যাবো। আমার কোনো ভাবনা নেই। আমার কতো বন্ধু। আমার মতো মেয়ের কতো কি করবার আছে—।"

"নিনা!"

"কি?"

একটুখানি নিস্তব্ধতা কাটিয়ে জ্যাকি বললো, "আমি বলছিলুম কি, আমার একটি পিয়ানো সারানোর দোকান আছে জানো তো? আমি একা দেখাশুনো করতে পারি না। যদি তুমিও আসো, তা'হলে—"

নিনা অনেকক্ষণ ভাবলো। তার পর বললো, "আচ্ছা, আরেক বার চেষ্টা করে দেখা যাক।"

"আমি বেশী কিছু দিতে পারবো না", জ্যাকি টাইটা ঠিক করতে করতে বললো, "তবে তোমায় ছাড়িয়েও দেবো না কোনো দিন। আমি বড্ড গরীব। পয়সা-কড়ি আমার খুব বেশী নেই। আমার পিয়ানো তোমার ভালো লাগে?"

নিনা হাসলো। জ্যাকি অন্ধকারে সে হাসি দেখতে পেলো না, অনুভব করলো শুধু।

একটু পরে জ্যাকি চলে গেল।

নিনা গিয়ে বসলো জানলার কাছে। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলো জ্যাকির ঘরে পিয়ানো বাজছে।

নভেম্বর মাস কেটে গেল। তার পর ডিসেম্বর···তার পর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ,···তার পর এপ্রিল।

মে' মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যেবেলা জ্যাকি আর নিনা বাড়ি ফিরছিলো সিনেমা দেখে। পথে নিউ মার্কেট থেকে কিছু সওদা করে ওরা বাড়ির পথ ধরলো এ-পথ ও-পথ ঘুরে। পথে পড়লো পেলিকান বা'র।

নিনা হেসে বললো, "জানো জ্যাকি, এক সময় আমি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যের পর এখানে বসে থাকতাম।"

"ও-সব দিনের কথা ভুলে যাও নিনা", জ্যাকি বললো, "আমরা এখন বেশ সুখে আছি।"

"পুরোনো জায়গাটি দেখে হঠাৎ মনে পড়লো—"

জ্যাকি কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল।

পেলিকান বা'র থেকে বেরিয়ে এসেছে কে একজন।

খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

হাঁ, লিলিই তো। মুখে তা'র এলকোহলের গন্ধ।

লিলি?

"হ্যালো লিলি," খুব সহজ ভাবে বললো জ্যাকি, বহুদিন দেখা না হওয়া পুরানো বন্ধুর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলে!

লিলি এক নজর দেখলো নিনাকে। তারপর তাকে অবহেলা করে জ্যাকিকে বললো, "হ্যালো জ্যাকি? কি রকম আছো?"

"মীট মাই ওয়াইফ নিনা," জ্যাকি উত্তর দিলো, "ওকে নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি।"

"তোমার ওয়াইফ?" ভুরু উপর দিকে তুললো লিলি।

নিনা চুপ করে রইলো হাসিমুখে।

"হাঁ, মাস ছয়েক হোলো আমাদের বিয়ে হয়েছে," জ্যাকি আস্তে আস্তে বললো।

"ও! কনগ্র্যাচুলেশানস্। আচ্ছা পরে দেখা হবে। বাই—বাই।" পাশ কাটিয়ে চলে গেল লিলি।

জ্যাকি আর নিনা এগিয়ে গেল একটুখানি, তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখলো।

লিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের পাশে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এমন সময় পেলিকান বার থেকে বেরিয়ে এলো একজন বিদেশী নাবিক। লিলির হাত ধরে বললো, "কাম অন ডার্লিং, এবার যাওয়া যাক।"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো লিলি। তারপর চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে।

নিনা জ্যাকির হাত ধরে বললো, চলো জ্যাকি, আমরা বাড়ী যাই।"

ওরা মিশে গেল পথচলতি জনতায়। লিলির পাশ দিয়ে বয়ে গেল অনেক পথিক, অনেক গাড়ি, ট্রাম, বাস, রিক্শ। মে মাসের সন্ধ্যা আরো নিবিড় হয় নামলো কলকাতায়। ফুটপাথের পাশে দোকানে দোকানে নানা রঙের ইলেকট্রিক আলো আর নিওন সাইন ঝলমল করে উঠলো।

[উপন্যাস] শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

আধুনিকতার মোহে বগলাপদ আহারাদির ব্যাপারে ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত ব্যবহারে রীতিমত অনাচারী হোলেও স্ত্রী সুলোচনা দেবীর রক্ষণশীলতার উপর এ পর্য্যন্ত কোন দিন হস্তক্ষেপ করেন নি। এমন কি, তাঁর অন্তঃপুরের মধ্যেও তিনি মাথা গলাতে চাইতেন না। দেবীর অসুস্থ অবস্থায় রাণীকেই হাতের কাছে পেয়ে তিনি তাকে ও-বাড়ীর আদর্শে আধুনিকা ও শিক্ষিতা করে তুলতে যখন উৎসাহী হয়ে ওঠেন, সুলোচনা দেবী স্বামীর মনোভাব বুঝে কোন কথা বলেন নি। তার পর দেবী সেরে উঠে যখন পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলে, তিনি নিজেই সে সময় তাকে আস্তে আস্তে পড়াতে থাকেন। বগলাপদও তাতে কোনরূপ বাধা দেননি বা দেবীকেও রাণীর মত স্কুল-কলেজে শিক্ষা নিতে পাঠান নি। অবশ্য স্ত্রীর উপর শুধু নির্ভর না করে পরে সুশিক্ষিতা রাণীর কাছেই তিনি দেবীকে ইংরাজী পড়তে ও প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। তখন বগলাপদর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; সুতরাং পরীক্ষার্থিনীদিগকে শিক্ষা দিতে সিদ্ধহস্ত একাধিক কৃতবিদ্য শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়, দেবীকে ঠিকমত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দেবী উত্তীর্ণা হোলে বগলাপদর উৎসাহ বৃদ্ধি পায়—তিনি তাকে রাণীর মতই কলেজে পাঠাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন, কিন্তু সুলোচনা দেবী সে সময় এই ব'লে আপত্তি তুলেছিলেন যে, ওকে আর কলেজে না পাঠানোই ভাল, যখন ওর মাথাটা দুর্বল। লোকের সেবা-যত্ন সংসারের কাজ-কর্ম শিখালে ক্ষতি কি? বগলাপদ সেদিন ক্ষতির কথাটা ভাবেননি—তাই স্ত্রীর কথামত তাকে আর কলেজে পাঠান নি। কিন্তু এখন দেবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিপুল সম্ভাবনা তাঁর সে মত পালটে দিয়েছে। সারা পথটাই তিনি আপশোষ করতে করতে এসেছেন—ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুলেই কেন তিনি দেবীকে কলেজে ভর্তি করে দেননি! স্ত্রীর আপত্তির কথা মনে পড়তেই তিনি তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনেও তাঁর যে আগেকার মনের পরিবর্তন হয়নি—এর জন্য তিনি কি সামান্য দুঃখিত? দেশের সেই পর্ণকুটীর, এঁদো পুকুর, বনবাদাড়, আর সেই ললতে ছোকরার সঙ্গে দেবীর বিয়ের বাগ্‌দানের কথা এখনো তিনি ভুলে যাননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন! কিন্তু তাঁদের জীবনে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে যে সুযোগ এসে গেছে, কোন বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই দেবীকে নিয়ে এদিনের বিতর্ক সূত্রে তিনি বেশ দৃঢ় হয়েই অবশেষে বললেন: প্রশান্ত ছোকরার সামনেই দেবীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল বলেই দেবীকে সে খেলার ছলে চিঠি দিয়েছিল। এতে তার দোষ নেই।

সুলোচনা দেবীও মুখখানা কঠিন করে, কর্তাকে শুনিয়ে দিলেন: দেবীও যে চিঠির জবাব দিয়েছে—যাকে বলে, মুখের মত জুতো।

কথাটা শুনেই বগলাপদ লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে, সেই সঙ্গে স্ত্রীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হুমকি দিলেন: কি লিখেছে দেবী? আমি এখুনি জানতে চাই, সত্যিই যদি তেমন কিছু কড়া কথা লিখে থাকে, এখনি তাকে দিয়ে প্রশান্তর কাছে মাপ চাইয়ে তবে ছাড়ব।

কথাগুলি বলতে বলতেই তিনি উত্তেজিত ভাবে দ্রুত পদে বহির্মহলের দিকে চলে গেলেন। সুলোচনা দেবীও তখন রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের এই দীর্ঘ পথ সন্তর্পণে এগিয়ে এসে এখন স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখী অবস্থায় বাগ্‌যুদ্ধ অত্যন্ত অন্যায় ও অপ্রীতিকর ভেবে তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করে ইষ্টদেবীর চরণে শরণ নিলেন। কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে কক্ষের দেওয়ালে একটি বিশেষ স্থলে সংস্থিতা ইষ্টদেবীর আলেখ্য লক্ষ্য ক'রে মিনতি জানালেন: ইচ্ছাময়ী তুমি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে জানি। তবুও বলি—অন্তর্য্যামিনীরূপে জানছ ত, যত বড় সুযোগ-সুবিধাই আসুক, তার মোহে সত্যকে হেলা করবার প্রবৃত্তি আমার যেমন নেই, স্বামীর মনেও আঘাত দিয়ে তাঁকে নীচু করবার প্রবৃত্তিও যেন আমাকে না পেয়ে বসে। মন বুঝে তুমিই বুদ্ধি দিও মা—মুখ রক্ষা ক'রো!

পিছন থেকে দেবী এসে বলল: মা, তুমি কাঁদছ?

আঁচলে চোখ দু'টি মুছতে মুছতে মা বললেন: ঠাকুর-দেবতাকে মন দিয়ে ডাকলেই চোখ দিয়ে জল পড়ে মা—তাকে কান্না বলে না। কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দেবী বলল: ঠাকুরঘরে ধূনো-গঙ্গাজল দেব ব'লে যাচ্ছি।

যাও—কাপড় ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বলেই মা নিজের কক্ষে যাবার জন্য সেখান থেকে চলে গেলেন।

এদিকে বগলাপদ বহির্মহলে এসেই রাণীকে ডাকতে ডাকতে দ্রুত পদে মেয়েদের পড়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। দেবীও এখানে এতক্ষণ ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ায় অভ্যাস মত এইমাত্র তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়েছে। রাণী বুঝতে পারে, মায়ের শিক্ষামত দেবীর টনক নড়েছে—ঠাকুর-ঘরের মোহ তাকে টানছে। কিছু না ব'লে মুখ টিপে শুধু সে হাসল। বাবা ও মায়ের বিভিন্নমুখী প্রকৃতি সে লক্ষ্য করে; বাবার কাছে ধর্মকর্ম ঠাকুর-দেবতা, পূজা-পাঠ এ সবের কোন মূল্য বা মর্যাদা নেই—এ সব নিয়ে সময় ও অর্থনষ্ট করবার কোন সার্থকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না! অথচ, মায়ের কাছে এগুলির

প্রতিটি অপরিহার্য্য, তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধার অন্ত নেই। অথচ, বাড়ীতে ধর্মানুষ্ঠান হোলে বাবার পক্ষ থেকে কখনো কোনরূপ বাধা ত' আসেই না, বরং তার ক্রটিহীন সমাপ্তি সম্বন্ধে তাঁকেও উৎসুক দেখা যায় এবং বন্ধুবান্ধব সে সময় উপস্থিত থাকলে, ড্রয়িংরুমে প্রসাদের ডিস পাঠাবার জন্ম তাগিদও পড়ে। পিতা-মাতার প্রকৃতিগত এরূপ বৈষম্য কন্যার অন্তরে যে সমস্যা তোলে, তাতে সে নির্লিপ্ত থাকাই সঙ্গত মনে করে। দেবীর অনুকরণে রাণীও ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে মাথা খুঁড়তে অভ্যস্ত নয়, এ সংবাদ পিতাকে যেন রীতিমত উৎসাহ দেয়—সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি কন্যার দিকে তাকান, সেই দৃষ্টি থেকেই রাণী বুঝতে পারে যে, পিতা তার ব্যবহারে প্রসন্ন হয়েছেন। এ অবস্থায় রাণী ভাবে, পিতা যেমন তাঁর কর্ম্মের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন—লোকদেখানো ধর্মাচরণে তাঁর প্রবৃত্তি নেই, সে-ও তেমনি পিতাকেই অনুসরণ করে নির্লিপ্ত থাকবে। অবশ্য, মা বা ভগিনী যাতে তার আচরণে অসন্তুষ্ট না হন, সে দিকটা বজায় রাখবার জন্ম সে স্থির করেছে, এ সব অনুষ্ঠান নিয়ে কখনো তর্ক তুলবে না বা ধর্মকর্ম ও ঠাকুর-দেবতার প্রতি তার যে বিশ্বাস নেই, মাতা বা ভগিনীকে জানতেও দেবে না। যদি ধর্ম বলে কিছু থাকে, ঠাকুর-দেবতা সত্য হন, তাহলে এক দিন তাঁরাই তার চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দেবেন, সত্যই তাঁদের অস্তিত্ব আছে। পড়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসর পেলেই রাণীর মনে এই চিন্তা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় এবং এরই মধ্যে সে ধড়মড় করে উঠে নিজেকে শক্ত করে নিজের মনেই বলতে থাকে—এ সব চিন্তা আমার পক্ষে ঠিক নয়, আমি যে—আধুনিকা।

পড়ার ঘরে বসে সন্ধ্যা সমাগম দেখে দেবী তাড়াতাড়ি উঠে যেতেই রাণীর মনে দিদির সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তাটি আবার জাগ্রত হয়ে ওঠে। এমনি সময় বগলাপদ তাকেই ডাকতে ডাকতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাণী তাড়াতাড়ি উঠে নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: ডাকছেন আমাকে বাবা?

বগলাপদ একটা কেদারায় বসতে বসতে বললেন: হ্যাঁ, ব'স—কথা আছে।

রাণী আস্তে আস্তে তার স্থানটিতে পুনরায় বসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে তাকাতেই বগলাপদ বললেন: তোমার অরবিন্দ জেঠামণি বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁর ভাগনে প্রশান্তকে নিয়ে। ঐ ছোকরাই এখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

এই প্রসঙ্গে বগলাপদ বিদেশে ওঁদের বিপত্তির কথা বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। রাণীও সঙ্গে সঙ্গে আর্ত কণ্ঠে বলল: অরুণা আমাকে চিঠিতে সে সব কথা লিখেছে। খুবই দুঃখের কথা। এখন ঐ ভাগনেই ওঁর ভরসা। অরুণা লিখেছে, আজই সন্ধ্যার পর প্রশান্ত বাবুকে নিয়ে এখানে আসবে।

বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: ও! তুমি তাহলে খবরটা এরই মধ্যে পেয়ে গেছ? অরুণা মা'র পায়রাই বোধ হয় খবরটা এখানে সরবরাহ করেছে?

রাণী মুখখানি নিচু করে মৃদু হেসে ঘাড়টি ঈষৎ দুলিয়ে বলল: হ্যাঁ।

বগলাপদ একটু থেমে, কন্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর এক বার তাকিয়ে বললেন: তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে চিঠির আ[illegible] প্রদান হয়েছে? প্রশান্ত সম্বন্ধে অরবিন্দ দা'র সঙ্গে আমার সব কথা হয়েছে, অরুণা শুনেছিল মনে হচ্ছে, তাহলে ও [illegible] আভাসও যে—

রাণী পিতাকে আর প্রশ্নটি নূতন করে বলবার অবসর না দি[illegible] ক্ষিপ্র ভাবে নিজেই বলল: হ্যাঁ বাবা, অরুণার চিঠিতে আমরা [illegible] জেনেছি, দিদিও—

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বগলাপদ বললেন: দেবীও শুনে[illegible] তার পর?

পরের ঘটনা রাণী খুব সংক্ষেপেই বলল: প্রশান্ত বাবু নি[illegible] তাঁর পরিচয় দিয়ে দিদিকে একখানা চিঠি দেন—অজিত ব[illegible] পায়রার পায়ে বেঁধে। দিদি তো সে চিঠি পড়ে রেগেই আ[illegible] তখনি সেখানা নিয়ে মা'র কাছে নালিশ করতে যায়। মা-ও [illegible] চিঠি পড়ে খুব চটে যান, তার পর দিদিকে দিয়েই সে চিঠির জ[illegible] লিখিয়ে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

ব্যগ্র কণ্ঠে বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: সে জবাব নিয়ে অজি[illegible] পায়রা তাহলে চলে গেছে নিশ্চয়ই? আর তুমি আশা করছ অরুণা এখনি প্রশান্তকে নিয়ে আসবে? তোমার মা তো তা[illegible] আশার পথে কাঁটা দিয়েছেন। তুমি সে জবাবটা পড়েছিলে?

অপাঙ্গে পিতার উগ্র মুখখানির দিকে একটি বার চেয়ে তাঁর মন[illegible] ভাবটুকু বুঝে নিয়ে রাণী বলল: পড়েছি, আর সেটা কড়া হয়ে[illegible] বুঝতে পেরে দিদিকে ঠকিয়েছিলুম, সে চিঠি ও-বাড়ীতে যায়নি।

উল্লাসের সুরে বগলাপদ বললেন: বল কি! তাহলে?

আঁচলের খুঁট থেকে চিঠিখানি খুলে রাণী বগলাপদর হাতে দি[illegible] বলল: অরুণা আমাকে সব কথাই সংক্ষেপে লিখেছিল। দি[illegible] সে-সব কথা জানত না বলেই, রেগে উঠে মা'র কাছে যা[illegible] চিঠিখানা পড়ে আমার মনে হয়—কিছুতেই পাঠানো উচিত ন[illegible] দিদি অবশ্য জানে না যে, চিঠিখানা পাঠানো হয়নি, সরি[illegible] ফেলেছিলাম।

প্রসন্ন মনে বগলাপদ বললেন: তুমি বুদ্ধিমতী, বি[illegible] সিচুয়েসনটাকে সেভ করে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ। এই তো চাই তোমার মা তো দেবীকে সত্যযুগের মেয়ে করবার জন্যে উঠে-প[illegible] লেগেছেন। কিন্তু এটা যে আধুনিক যুগ, এখানে আধুনিকাদের কদর বেশী, উনি তা বুঝবেন না। সেই জন্যই দেবীর শিক্ষাভা[illegible] তোমার ওপর চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। জানি, তোমার চেষ্টা দেবীও এক দিন আধুনিকা হয়ে উঠবে।

রাণী মনে মনে ভাবে, আধুনিকা বলতে বাবা কি বোঝেন কলেজে কতিপয় সহপাঠিনীর সঙ্গেও রাণীর এই 'আধুনিকা' সম্ব[illegible] কথা হয়। তারাও রাণীর মত ভেবে স্থির করতে পারে না—'আধুনিকা' এই কথাটি শুনলেই এক শ্রেণীর রক্ষণশীল সমাজে চাঞ্চল্য ওঠে কেন? কলেজে পড়লে, কোন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক স[illegible] না নিয়ে পদব্রজে কিম্বা ট্রামে-বাসে অসঙ্কোচে স্বচ্ছন্দ ভাবে একাকিনী যাতায়াত করলে এবং তৎকালে প্রয়োজন স্থলে অপরিচিত পুরুষদে[illegible] সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেই কি 'আধুনিকা' বলে চিহ্নি[illegible] হওয়া যায়? শুধু কি বাহ্যিক ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করেই রক্ষণশীল সমাজ অধ্যয়নশীলা তরুণীদিগকে উক্ত আখ্যায় অভিহিত ক[illegible]

থাকেন? অনেক সময় পড়ার ঘরে বসে রাণী এ সম্পর্কে নিজের মনেই আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার ইচ্ছা হয় যে, উপযুক্ত প্রমাণ ও নজীর সব সংগ্রহ করে সমাজপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রতিপন্ন করবে—আধুনিকার প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং সেই সংজ্ঞা অনুসারে আধুনিকা নারী ভারতীয় সমাজে শ্রদ্ধেয়া কি না? অবশ্য, সে এক কঠোর পরীক্ষা এবং দীর্ঘ সময় ও সাধনা-সাপেক্ষ।

বেয়ারা এসে খবর দিল, ও-বাড়ীর দিদিমণির সঙ্গে নতুন এক দাদাবাবু এসেছেন। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অরুণা রাণীর সন্ধানে দ্রুতপদে পড়বার ঘরে ঢুকেই গৃহস্বামীকেও সেখানে দেখে চমকে উঠল। সে ভেবেছিল, পড়ার ঘরে এ সময় রাণী ও দেবীকে দেখতে পাবে। তখনই সঙ্কুচিত হয়ে বলল: আপনি এখানে জানতুম না কাকাবাবু, হয়ত প্রাইভেট কথা হচ্ছিল আপনাদের, আমাকে মাপ করবেন।

বগলাপদ হেসে ফেলে বললেন: কথা শোন পাগলী মেয়ের! নিজের মেয়ে আর তুমি—আমার চোখে দু'জনেই সমান, তোমাদের কাছে আবার প্রাইভেট কি? ব'স মা!

অরুণা একটু ব্যস্ত ভাবেই বলল: তাহলে এখানে আর বসব না কাকাবাবু, প্রশান্ত দা' এসেছিল কি না, ড্রয়িং-রুমে তাঁকে—

তাই বল! প্রশান্ত বাবাজীকে সঙ্গে করে এনেছ—চল মা, তার সঙ্গে আলাপ করি। আর রাণী, তোমার দিদিকে ড্রয়িং-রুমে ডেকে আনো। সেই সঙ্গে দিশি খাবার-দাবার যা তৈরী আছে, তোমার মাকে পাঠাতে বলবে।

অরুণা জিজ্ঞাসা করল: কাকাবাবুর বাড়ীতে কি দিশি-বিলিতি খাবার-দাবার হামেশাই তৈরী থাকে?

বগলাপদ বললেন: রুচি ত সবার এক রকম নয় মা! প্রশান্ত সন্ত বিলেত থেকে আসছে, দিশি খাবার ওর মুখে এখন ভালোই লাগবে বলে ব্যবস্থা করতে বললাম। আর তোমার কাকীমার একটা মস্ত সখ—বাড়ীতে নিজের হাতে খাবার তৈরী করা চাই-ই, আর সে খাবার চপ-কাটলেট-পুডিং-এর সঙ্গে আমাদের না খাইয়ে ওঁর তৃপ্তি নেই।

অরুণা সহাস্যে বলল: কাকীমার হাতের খাবার সত্যিই উপাদেয়, আমি ত যখনই আসি আপনার বাবুর্চির চপ-কাটলেট ফেলে রেখে কাকীমার হাতের গোকুল পিঠে, মোহনপুরী, পাটিসাপটা তোয়াজ করে খাই।

বগলাপদ বেয়ারার পানে চেয়ে হুকুম দিলেন: আবদুলকে বল, দু'জন গেষ্ট এসেছেন, চা, টোষ্ট, বোষ্ট শীগ্‌গির যেন হাজির করে। চলো মা, আমরা ও-ঘরে যাই।

রাণী অন্য দরজা দিয়ে ভিতরে গেল; বগলাপদ অরুণাকে নিয়ে ড্রইংরুমের দিকে চললেন।

সাহেবী কায়দায় ইভিনিং ড্রেস পরে প্রশান্ত এ-বাড়ীতে এসেছে। তার মুখে পাইপ, সেই অবস্থায় ড্রয়িংরুমে আস্তৃত কার্পেটের

উপর ফাঁক ফাঁক করে পা ফেলে সে বিভিন্ন আধারে সাজানো ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি, দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি অয়েল-পেণ্টিং ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। অরুণাকে নিয়ে বগলাপদ প্রবেশ করতেই প্রশান্ত সসম্ভ্রমে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল, বগলাপদ সানন্দে সেই প্রসারিত হাতে হাত দিয়ে বিলাতী কায়দায় সাদর আপ্যায়ন করতে করতে বললেন: তোমার মামাবাবু এলে আরো খুসি হতাম।

প্রশান্ত বলল: আপনি ত তাঁর দেহের অবস্থা দেখে এসেছেন। বাইরে বেরুবার শক্তি নেই, বেশী নড়া-চড়া তোলেই হার্টের ট্রাবল বাড়ে। অত বড় শোক, তার ওপর য়্যাকসিডেন্টের ধাক্কা সামলাতে এখনো পারেন নি।

সহানুভূতির স্বরে বগলাপদ বললেন: সবই জানি বাবা, বুঝিও সব, তবু মন কেমন করে—শুভ কথা আজ হলো, বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধূলো পড়লে সেটা যেন সার্থক হোত, আমরাও তৃপ্তি পেতাম। তবু বলব বাবাজী, ওঁর মনের খুব জোর—অত বড় ছুটো ঘা খেয়েও শয্যা নেন নি, উঠে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! যাক্, তুমি যে সঙ্গে এসেছ, তবু ওঁর পক্ষে অনেকখানি ভরসার কথা।

প্রশান্ত বলল: আমার ইচ্ছা ছিল, আরো বছর খানেক ওখানে থেকে আজকালের ফ্যাসানের কতকগুলো বাড়ী তৈরীর কাজ-কর্মগুলো করে দেখব। কিন্তু মামাবাবুর অবস্থা দেখে আর হলো না, কিছুতেই উনি আর ওদেশে থাকতে চাইছিলেন না, তাই তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হল।

এই সময় রাণীর সঙ্গে দেবীও ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করল। বগলাপদ বললেন: আমার ছেলে-পুলে বলতে এই তু'টিকে নিয়েই সব। এইটি বড়, নাম—দেবী; আর ছোটটি—রাণী।

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে রাণী সহাস্তে নিজের হাতখানিও বাড়িয়ে দিয়ে সম্ভাষণ-পর্ব শেষ করল। কিন্তু দেবীর দিকে হাত বাড়াতেই সে ছ'পা পিছিয়ে এসে নিজের হাত ছ'খানি যুক্ত করে কপালে ঠেকাল। এ শিক্ষা সুলোচনা দেবীই কন্তাকে দিয়েছিলেন। দেবীর দেখাদেখি প্রশান্তও যুক্ত করে নমস্কার করতে বাধ্য হলো। বগলাপদ দেবীর আচরণে বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। পরক্ষণে প্রশান্তকে বললেন: দেবী বয়সে বড় হলেও পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছিল অসুখের জন্তে। নৈলে ওরও মেধা কম নয়। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছে।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল: এখনো পড়ছেন?

রাণী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বগলাপদ গপ করে বললেন: পড়বে বৈ কি; ওর ইচ্ছা, আগের মত প্রাইভেটে কলেজের পড়া পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয় তাতে স্মার্ট-নেসটা ফুটে ওঠে না। সাধারণত: আমার ও মেয়েটি যত গুণের হোক, এদিকে কিন্তু 'সাই'। আমার ছোট মেয়ের মত স্মার্ট নয়। কিন্তু এ যুগে মেয়েদের লজ্জাটা অনেকে পছন্দ করে না। সেই জন্তেই ওকে রাণীর মতই কলেজে ভর্তি করে দেব ঠিক করেছি।

প্রশান্ত প্রসন্ন ভাবেই বলল: ভালই করেছেন। আমারও ধারণা—কলেজে না পড়লে যেমন চালাক-চতুর হওয়া যায় না, তেমনি আউট নলেজও হয় না। তা ছাড়াও আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমিও ওঁকে হিষ্ট্রী য়্যাণ্ড কালচার সম্বন্ধে পড়াতে পারি।

উৎফুল্ল মুখে বগলাপদ বললেন: আপত্তি কেন হবে, খুব ভালো প্রস্তাব। অজিত এখানে থাকতে প্রত্যেক দিনই অরুণাকে নিয়ে আসত; কত কথা, গান গল্প, পড়াশোনা নিয়ে চর্চা; লজ্জা, সঙ্কোচ ব'লে কিছুই ছিল না। তুমিও বাবা, তেমনি আসবে, আলাপ-আলোচনা করবে, তার ওপর—যদি দেবীকে পড়াও তো কথাই নেই। আর—অরুণা মা, তোমারও ঐ সঙ্গে আসা চাই, তুমি না এলে রাণীর দিকটা হাল্কা হবে, ও আনন্দ পাবে না।

অরুণার আগেই প্রশান্ত বলল: আসবে বৈ কি, ঐ তো আমার গেট-পাস্—আমি নিজেই ধরে নিয়ে আসব। তার পর—ওকে আনবার আরো উদ্দেশ্য আছে, সে সব কথা পরে বলব। মোট কথা, আপনারা আমাকে ছেলের মতই ভাববেন, অজিতকে যে চোখে দেখেছেন, আমার ওপরে সেই দৃষ্টি রাখলেই আমি ধন্য হবো।

অরুণা বলল: দেখছেন কাকাবাবু, এক দিনেই এ ছেলে নিজের কোলে ঝোল টানবার কায়দাগুলো কেমন জেনে নিয়েছে! কিন্তু দেবীদি', তুমি যে এ-ঘরে এসে অবধি মুখ বুজিয়ে আছ—প্রশান্তদা'র সঙ্গে আলাপ কর, জিজ্ঞাসা কর য়্যাদ্দিন বিলেতে কি ভাবে কাটিয়েছেন—

রাণী খিল্-খিল্ করে হেসে বলল: তাহলে কর্ণিক নিয়ে ওঁর সঙ্গে দিদিকে বোঝাপড়া করতে হয়। দিদি কিন্তু স্থপতি-বিজ্ঞানের বদলে চিত্র-বিজ্ঞানটাকে সেকেণ্ডারী শিক্ষারূপে বেছে নিয়েছেন।

অরুণা সোৎসাহে বলল: তাই না কি? কিন্তু কৈ শুনিনি তো, আর ও বিদ্যার কোন নমুনা দেখিছি বলে ত মনে হয় না?

বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: দেবী ছবি-আঁকা শিখছে? বটে!

প্রশান্ত বলল: ও দেশের মেয়েরা, কিন্তু আর্টের ভারি ভক্ত; যাঁরা ছবি আঁকেন, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাও তাঁদের খুব। তা' ইনি শিখছেন কোথায়? আর্ট কলেজে?

এই সময় দেবীই আস্তে আস্তে বলল: আমি কখনো ইস্কুল-কলেজের ছায়াও মাড়াই নি। ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের ছবি দেখে আমার ছবি আঁকবার সখ হয়। তার পর ম্যাট্রিক পড়ার সময় গঙ্গা দেবী নামে একটি মেয়ে অঙ্ক আর জ্যামিতি শেখান আমাকে। তিনি ছবিও আঁকতেন। আমি চুপি চুপি ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকি জানতে পেরে, তিনি সেই ছেলেমানুষী আঁক সুধরে দিয়ে হাতে ধরে ধরে কিছু দিন শিখিয়েছিলেন। এই আমার পুঁজি।

প্রশান্ত বলল: বেশ ত, আপনার পুঁজির দফ্তরটি আনুন না, আমরা সকলে দেখি।

দেবী ঘাড় নেড়ে বলল: হাতে-খড়ি দিয়েই কেউ যদি কাঁচা হাতের দাগা বুলানো দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে চায়, লোকে তাকে নিশ্চয়ই পাগল বলবে। আমি তো এখনো পাগল হইনি!

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে কাঁসার রেকাবিতে পাঠানো বাড়ীতে প্রস্তুত সাত্ত্বিক ধরণের খাদ্যসম্ভার এসে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চিখানার আবদুলের তৈরী পোরসিলিনের ডিসে-ভরা চপ্-কাটলেট, মামলেট, দোলমা প্রভৃতি তামসিক খাদ্যগুলিও যেন পাল্লা দিতে এলো। ওদিকে টেলিফোন বেজে ওঠে, সে-ঘরের কেরাণী ছুটে এসে খবর দিতে বগলাপদকে উঠতে হয়। যাবার সময় তিনি দেবী ও রাণীকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা দুই বোনে মিলে যত্ন করে এঁদের খাওয়াও। আমি কলটা ধরেই আসছি।

শ্রদ্ধাভাজন গৃহস্বামী উপস্থিত থাকায়, রাণী ও অরুণা এতক্ষণ যেন লাগাম দিয়ে মুখ কষে রেখেছিল, এখন লাগাম সরতেই—তারাও বে-পরোয়া হয়ে উঠল। প্রশান্তও যে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে ও আবল-তাবল কথা বলে বাহাদুরি দেখাতে খুব পটু, বিকেলের শিষ্টাচারবর্জ্জিত চিঠিখানা থেকেই দেবী সেটা উপলব্ধি করেছে। সেই লোক সন্ধ্যার পর এ-বাড়ীতে আসায় পিতার আদেশ মত রাণী বাইরের ড্রয়িং-রুমে আসবার জন্য দেবীকে বলতেই সে মাকে জিজ্ঞাসা করল, কি করবে। বিকেলে ও-ভাবে যে লোক চিঠি লিখেছিল, সে এসেছে এবং বাবা ডাকছেন ওখানে যাবার জন্য।

বুদ্ধিমতী সুলোচনা দেবী, স্বামীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি রেখে কন্যাকে বললেন: উনি যখন ডাকছেন, যাবে বৈ কি। ছেলেটি যা জিজ্ঞাসা করবে, জানা থাকলে বলবে। নিজে থেকে কোন কথা জানতে চাইবে না। হাজার পীড়াপীড়ি করলেও ওঁদের সঙ্গে খাবে না, কোন কথা নিয়ে হাসাহাসি করবে না।

রাণীকে তিনি কিন্তু কিছুই বলেন নি। কর্ত্তা তাকে আধুনিকা করবেন, বিদেশী আদব-কায়দা শিখাচ্ছেন, সে বি-এ পাস করে এম-এ পড়ছে, কাজেই তাকে বলবার তাঁর কিছু নেই। তবে একটি কথা তিনি রাণীকে একদা বলেছিলেন: দেখ মা, ইংরেজরাও সপ্তাহে একটা দিন সকাল বেলায় বাড়ীশুদ্ধ সবাই মিলে গীর্জায় যায়—ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর উপাসনা করে। অন্ততঃ সেই নজিরটাও যদি নাও, একটা দিন অন্ততঃ সকাল বেলায় ঠাকুরঘরে বসে খানিকটা সময়—যে কোন ঠাকুরকে ইচ্ছা হয়, যদি ডাক, নিজের যা কামনা জানাও, তাহলে মা, কেউ নিন্দা করবে না। করলেও সাহেবদের কথা বললে, তখন দেখবে—জোঁকের মুখে নুণ পড়েছে। মায়ের সেই কথার মধ্যে রাণী একটা যুক্তি পায়, তাই অবহেলা করতে পারেনি। প্রথম প্রথম বাধ-বাধ ঠেকলেও ক্রমশঃ সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়—মন্দ লাগে না ঠাকুরঘরে বসে খানিকক্ষণ তার বাঞ্ছিত কোন ঠাকুরকে নিজের মনের কথা জানানো, কিম্বা একান্ত অভিলষিত কোন কিছু চাওয়া। মা বলেছেন, ঠাকুর-দেবতার নাম রূপ প্রকৃতি আলাদা হ'লেও আসলে তাঁরা এক। এমন কি, নিজের পিতা কিম্বা মাতাকে অথবা পিতা-মাতা উভয়কে যদি নিজের ঈপ্সিত দেবদেবীর প্রতীক করে ভক্তিভরে অর্চনা করা যায়, তাও ব্যর্থ হয় না—সর্বরূপ সর্বশক্তি সর্বপ্রকৃতির আধার যে পরমেশ্বর—তাঁকেই তাতে ডাকা হয় এবং তিনি সে অর্চনা গ্রহণ করেন, প্রার্থনা শোনেন। মায়ের এই উক্তি উদ্ভট হ'লেও বিদুষী মেয়ে রাণীর অন্তরে এমন গভীর ভাবে দাগ লাগে যে মুছবার বা ভুলবার উপায় থাকে না। এক একবারও তার মনে হয়—বাবা মা দু'জনকে সামনে বসিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখে মায়ের এই কথাগুলি, কিন্তু লজ্জায় বাধে। হয়ত, মা আপত্তি করবেন না, কিন্তু দুরন্ত ও নাস্তিক দেবতার প্রতীকরূপে পিতাই কথা শুনে ক্ষেপে উঠবেন—নস্যাৎ করে দেবেন মায়ের এত বড় অভিনব 'থিওরী'টা। যাই হোক, অতি বড় নাস্তিকের সংস্পর্শে থেকে, তাঁর আদর্শ উপলব্ধি ক'রে, তাঁর আদরিণী কন্যা হয়েও রাণী কিন্তু মায়ের কাছে পাওয়া অতি সহজ ও সাদাসিধে এই নির্দেশটির প্রতি
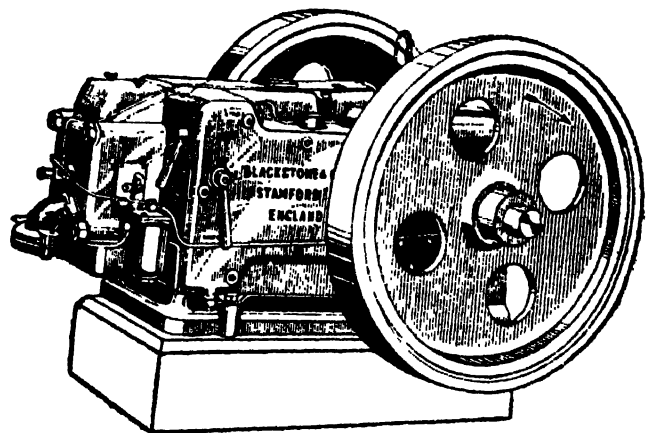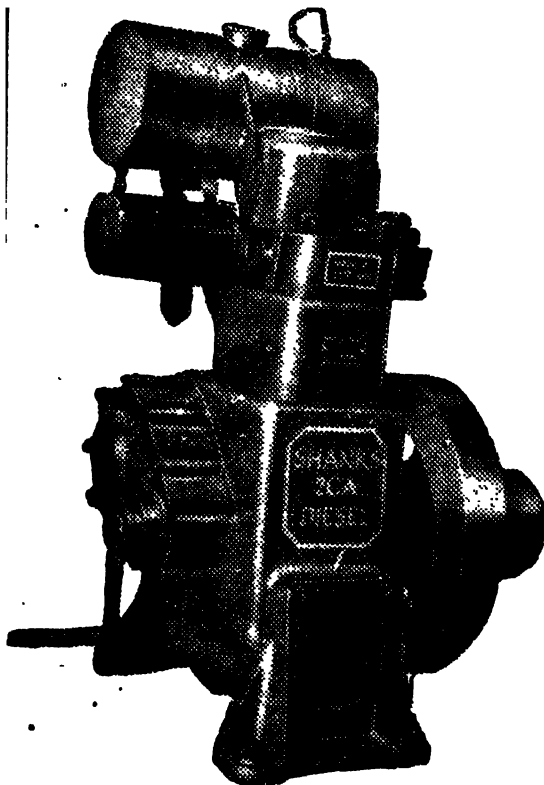
এমনি আত্মাবতী হয়ে পড়েছে যে, সবার অজ্ঞাতে সংগোপনেও তাকে অন্ততঃ পনেরো মিনিটের জন্যও সে নির্দেশ পালন করতেই হবে। ঠাকুরের কাছে তার কামনা-প্রার্থনা শুধু একটি দুর্লভ বস্তু, সেটি হ'চ্ছে—শক্তি। তার বিদ্যা, তার কথা, তার ইচ্ছা, তার প্রেরণা—প্রত্যেকটি যেন শক্তিময়ী হয়ে ওঠে, এই প্রার্থনাটুকু শক্তিরূপা দেবীর কাছে তাকে জানাতেই হবে। বাস্তব-জগতে কেউ যেন তাকে হারিয়ে দিতে না পারে—সে হয় সর্বত্র ও সবার কাছে অজেয়া, এর বেশী কোন কামনাই তার নেই।

বরালাপর ড্রয়িং-রুম থেকে উঠে যেতেই অরুণা খিল-খিল করে হেসে বলে উঠল: কথা বলবার জন্যে পেট ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠেছিল, অথচ কাকাবাবুর জন্যে স্পীকটি নট্—এখন চিচিং-ফাঁক। দেবীদি,' তুমি যে অমন করে আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব নিয়ে থাকবে, সেটি হ'চ্ছে না—প্রশান্তদা'র পাশে বসে পড়, ওঁর পার্টনার হও।

প্রশান্ত তখন অপর ডিস থেকে কাঁটা-চামচ তুলে বাড়ীর ভিতর থেকে প্রেরিত খাদ্যগুলির উপর চালিয়ে তাদের আস্বাদ নিতে ব্যস্ত পরমোৎসাহে। অরুণার প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হয়ে দেবীকে আহ্বান করল: আসুন, আসুন। আপনি এ ব্যাপারে পার্টনার হ'লে হয়ত এমনি আর এক নূতন আনন্দ পাব।

মৃদু হেসে রাণী জিজ্ঞাসা করল: আপনার কথাটাও যে নূতন, মানে বুঝিয়ে দিন।

প্রশান্ত বলল: এই দেখুন না—ঐ ডিসখানার মেনুগুলো কত জানা-শোনা, কিন্তু এখানার খাদ্যগুলি নতুন ধরণের দেখে, আগেই আলাপ সুরু করি। কিন্তু স্বাদ পেয়ে আর ছাড়তে পারছি না—এমনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। ওঁকে পেলেও হয়ত এই দশাই হবে। বুঝলেন মানেটা?

অরুণা বলল: দেবীদি', প্রশান্তদা'র আর একটা মস্ত গুণ—খুব হাসাতে পারেন, রসিক পুরুষ। কিন্তু ও কি, ওঠ—

দেবী দিব্য সহজ কণ্ঠে বলল: আপনারা দু'জনে এখানে অভ্যাগত, আপনাদের অভ্যর্থনার জন্যই মা নিজের হাতে ঐ রেকাবীর খাবারগুলি তৈরী করেছেন। ওঁর ভাল লেগেছে শুনলে, মায়ের মনেই বেশী আনন্দ হবে। আপনারা খান, আমরা দুই বোন আপনাদের পরিচর্যা করব।

প্রশান্ত মুগ্ধের মত দেবীর মিষ্ট কথাগুলি শুনছিল। অরুণা একটু বিস্মিত ভাবেই বলল: বা রে, আমরা দু'জনে খাব—আর তোমরা দেখবে! আমি ভেবেছিলুম—চার জনের জন্যই খাবার এসেছে।

রাণী বলল: এ সময় ত' আমরা খাই না; আর খানিক পরে আমরা খাব।

প্রশান্ত বলল: তাহলে আর খানিক পরেই এগুলো পাঠালে ভাল হোত। আমরা ততক্ষণ গল্প করতাম, তার পর একসঙ্গেই খেতাম। অবিশ্যি, মনের ক্ষুধা তাতে তৃপ্তি পেত বটে, কিন্তু পেটের ক্ষুধা রেগে তখনি বাপান্ত করত—

এমন ভঙ্গিতে ভোজ্য-ভক্ষণ করতে করতে প্রশান্ত কথাগুলি বলল যে, শুনে তিন জনেই হেসে ফেলল। দেবী রাণীকে অনুচ্চ স্বরে বলল: ওঁর রেকাবী খালি হয়ে গেছে; বিলাসী গেল কোথায়, না হয়—তুমি নিয়ে এস।

কিন্তু গৃহিণী সুলোচনা নিজেই ভোজ্যপাত্র নিয়ে ড্রয়িংরুমে এলেন। তাঁকে দেখেই অরুণা তাড়াতাড়ি উঠে বলল: কাকীমা, আপনি নিজে এসেছেন পরিবেশন করতে, কি আশ্চর্য!

সুলোচনা দেবী বললেন: আশ্চর্য নয় মা! আমারই উচিত ছিল আগে আসা। কিন্তু নিজে তৈরী করছিলাম, গরম-গরম তোমরা খাবে তাই আসতে পারিনি। তুমি ব'স মা ব'স। খাবারগুলি যে তোমাদের ভাল লেগেছে, এতেই আমার আনন্দ। খাও বাবা!

প্রশান্তও উঠছিল, কিন্তু সুলোচনা দেবী বাধা দিয়ে বললেন: থাক থাক বাবা, উঠতে হবে না, খাও তো—

প্রশান্তর খালি রেকাবীখানি তিনি পুনরায় ভরিয়ে দিয়ে বললেন: তোমার কথা শুনিছি, কিন্তু দেখা তো হয়নি।

খেতে খেতেই প্রশান্ত বলল: অরুর কাছে আপনার আদর-যত্নের কথা শুনিছি। আর, আপনার হাতের তৈরী খাবার খেয়ে বুঝিছি কাকীমা, মিষ্টি মন না হ'লে এমন মিষ্টি খাবার তৈরী করা যায় না। এই দেখুন না, আমরা দু'জনেই এক নম্বর ডিস শেষ করে ফেলেছি অথচ, বাবুর্চির ডিসে এখনো হাতই দিইনি। মায়েদের হাতের তৈরী খাবার যে এত ভালো হয়, তা জানা ছিল না কাকীমা! এর পর কিন্তু প্রায়ই এসে উপদ্রব করব।

সুলোচনা দেবী বললেন: ভালোই ত বাবা, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তো মায়ের কাছে খাবার জন্যে আবদার করে। কিন্তু মায়েরা কি তাকে উপদ্রব মনে করে বাবা? যত কিছু আনন্দ তো ওরই মধ্যে আসবে বৈ কি বাবা, মনে করবে এ তোমাদের নিজের ঘর-বাড়ী, আর এরা আপনার বোন। খাও বাবা তুমি, কারও মুখ চেয়ে লজ্জা ক'রো না, ভালো করে খেতে পাবাই তো মায়ের কাছে ছেলের বাহাদুরী।

প্রশান্তর রেকাবীতে সুলোচনা দেবী পাত্র থেকে আরও কতকগুলি খাদ্য দিতে থাকেন। ওদিকে তার ভোজনের ঘটা দেখে রাণী অরুণা মুখ টিপেও হাসি সম্বরণ করতে পারছিল না। সুলোচনা দেবী সেজন্য অরুণাকে ধমক দিয়ে বললেন: তোমাকে তো জানতে বাকি নেই—পাখীর আহার তোমাদের! কেউ ভালো করে খেলেও ঠাট্টা করবে, এ কি ভালো কথা? সেই জন্যই তো এই রকম লিকলিকে দেহ হচ্ছে। তুমি খাও বাবা, কারও পানে চেও না, খাও।

ফলতঃ, প্রচুর ভাবে খেয়ে এবং সেই সঙ্গে দু'-চারটে সরস কথা বলেই একদিনে প্রশান্ত যেন এ বাড়ীতে তার ঠাঁই করে নিল।

[ক্রমশঃ

ইঙ্গ-বঙ্গ-প্রীতি

"I wish I could read Bengali as the discussion of Dhiman's and Bitapala's art would interest me much. But I am too old to learn new languages."

—Vincent Smith.
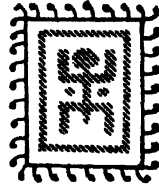
ছোটদের আসর

১৭

আমরা তেতো, নোণা, ঝাল, টক, মিষ্টি এই পাঁচ রস দিয়ে ভোজন সমাপন করি। ইংরেজ খায় মিষ্টি আর নোণা; ঝাল অতি সামান্য, টক তার চেয়েও কম এবং তেতো জিনিস যে খাওয়া যায়, ইংরেজের সেটাও জানা নেই। তাই ইংরিজি রান্না আমাদের কাছে ভোঁতা এবং বিস্বাদ বলে মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ ভালো কেক-পেস্ট্রি-পুডিং বানাতে জানে—তাও সে শিখেছে ইতালিয়ানদের কাছ থেকে এবং একথাও বলবো আমাদের সন্দেশ রসগোল্লার তুলনায় এ-সব জিনিস এমন কী, যে নাম শুনে মূর্চ্ছা যাবো?

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন—অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। আমি প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু বহু দেশে বহু রান্না খেয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, মোগলরা এ-দেশে যে মোগলাই রান্নার তাজমহল বানালেন (এবং ভুললে চলবে না, সে রান্না তাঁরা আপন দেশে নির্মাণ করতে পারেন নি, কারণ ওঁদের মাতৃভূমি তুর্কীস্থানে গরম মশলা গজায় না) তারই অনুকরণে আফগানিস্থান, ইরাণ, আরবিস্থান, মিশর—ইস্তেক স্পেন অবধি আপন আপন ক্ষুদে ক্ষুদে রান্নার তাজমহল বানাতে চেষ্টা করেছে। এ রান্নার প্রভাব পূর্ণ ইয়োরোপের গ্রীস, হাঙ্গেরি রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ইতালি পর্য্যন্ত পৌঁছেছে।

এ সব তত্ত্ব আমার বহু দিনকার পরের আবিষ্কার। উপস্থিত আবুল আসফিয়া আর ক্রোদেং নিয়ে এলেন বারকোষে হরেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুর্গী মুসল্লম, শিককাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচ ছয় অজানা জিনিস। জানা জিনিসগুলো যে ঠিক ঠিক কলকাত্তাই খুশবাই নিয়ে এল তা নয়, কিন্তু তাতেই বা কি? জাহাজের আইরিশ ষ্টু আর ইটালিয়ান মাকারনি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গিয়েছে; এখন এ-সব জিনিসই অমৃত। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছে ভাজা, সোনা মুগের ডাল, পটল ভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য—অত শত বলি কেন, শুধু ঝোল-ভাতের জন্য—কিন্তু ওসব জিনিস তো আর

সৈয়দ মুজতবা আলী

বাঙলা দেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কি লাভ?

তাই দেখিয়ে দিলুম, আমার কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন সেই বারকোষ থেকেই।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্লেটে দু'টি শসা নিয়ে খেতে বসেছে। দু'টি শসা—তা সে যত তিন ডবল সাইজই হোক না—কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। তাও আবার দোকানে ঢুকে, টেবিল চেয়ার নিয়ে, সস্-চাটনি সাজিয়ে। তবে ইংলণ্ডের মত 'খানদানী' দেশেও তো মানুষ রাস্তায় দুটো আপেল কিনে চিবোয়—রেস্তোরাঁয় ঢুকে সস্-চাটনি নিয়ে সেগুলো খেতে বসে না। তবে কি এদেশ ইংলণ্ডের চেয়েও খানদানীতর? এদেশে কি এমন সব সর্বনেশে আইন-কানুন আছে যে-রাস্তায় শসা বিক্রী বারণ, যে-রকম শিবঠাকুরের আপন দেশে,

> 'কেউ যদি পা পিছলে পড়ে,
> প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
> কাজীর কাছে হয় বিচার
> একুশ টাকা দণ্ড তার।
> সেথায় সন্ধ্যে ছ'টার আগে,
> হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে;
> হাঁচলে পরে বিন টিকিটে—
> দমদমাদম্ লাগায় পিঠে,
> কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
> একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে। (১)

কি জানি কি ব্যাপার!

এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শসা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাঝখানে দিলে দু'হাতে চাপ। অমনি হড়হড় করে বেরিয়ে এল পোলাও জাতীয় কি যেন বস্তু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো! আমি তো অবাক! হোটেলওলাকে গিয়ে বললুম, 'যা আছে কুল-কপালে আমি ঐ শসাই খাবো।'

এল দু'খানা শসা। কাঁটা দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই বেরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো (এদেশে যাকে বলা হয় 'কিমা,') টমাটোর কিমা এবং গুঁড়নো পনীর। বুঝলুম এ-সব জিনিস পুরেছে সেদ্ধ শসার ভিতর এবং সেই শসাটা সর্বশেষে ঘিয়ে ভেজে নিয়েছে। যেন মাছ-পটলের দোল্মা—শুধু মাছের বদলে এখানকার শসায় পোলাও, মাংস, টমাটো এবং চীজ! তারই ফলে অপূর্ব এই চীজ।

শসাকে চাক্তি করে পোলাওয়ের সঙ্গে মুখে দিয়ে বুঝলুম, একই গ্রাসে একই সঙ্গে ভাত, মাংস, সব্জী, ফল এবং 'সেভরি' খাওয়া হয়ে গেল।

আর সে কী সোয়াদ! মুখে দেওয়া মাত্র মাখমের মত গলে যায়।

এ-রকম পাঁচেক্কে পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও খাইনি।

আরেকটা জিনিস খেলুম সে-ও অতুলনীয়। মিশরি সিম্-বীচি।

(১) সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল, পৃঃ ৩২, তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ।

'আলীবাবা' বায়স্কোপে যে সব বিরাট বিরাট উঁচু তেলের জালা দেখেছ, তারই গোটা দু-তিন সিমেতে ভর্তি করে সমস্ত রাত ধরে চালায় সিদ্ধকর্ম। সেই সিমে অলিভওয়েল আর এক রকমের মশলা মিশিয়ে খেতে দেয় সকাল বেলা থেকে। আমরা খেলুম রাত্তিরে। তার যা সোয়াদ!—এখনো জিভে লেগে আছে। আমাদের সিম-বীচি তার কাছে কিছুই না। পল-পার্সিও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলে চীন দেশের সোয়াবীনও এর সামনে কেন, পিছনেও দাঁড়াতে পারে না।

শুনলুম এই সিম-বীচি গরীব থেকে আরম্ভ করে মিশরের রাজা দু'সন্ধ্যা খেয়ে থাকেন। হোটেলওলা বললে পিরামিড নির্মাতা এক ফারাও-মহারাজা নাকি এই বীন খেতে এত ভালোবাসতেন যে, প্রজাদের বারণ করে দিয়েছিলেন তারা কেউ যেন বীন না খায়! সাধে কি আর লোকে ফারাওদের খামখেয়ালি বলতো?

শুনলুম এই বীনের আরবী শব্দ 'ফুল'।

পরের দিন সকাল বেলাকার ঘটনা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ আছে বলে এই সুবাদেই বলে নি।

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক, ইতালি, ইংরেজ বসবাস করে বলে এবং জাত-বেজাতের বিস্তর টুরিষ্ট আসে বলে কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইন-বোর্ড সাজায়। পরদিন সকাল বেলা আমরা যখন শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরছি তখন দেখি, এক সাইন-বোর্ডে লেখা,—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলুম। একসঙ্গেই থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অট্টহাস্য করে উঠলুম।

"আহাম্মুকদের রেস্তোরাঁ!"

বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল Fool শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ফুল' অর্থাৎ 'বীন' অর্থাৎ 'সিমের বীচি' অর্থে। 'আহাম্মুক' অর্থে নয়। অর্থাৎ এ দোকানী উত্তম 'সিম-বীচি' বেচে। তার পর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখি, যে ক'টি খদ্দের সেখানে বসে আছে তাদের সক্কলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি—'ফুল'—'Fool'।

* * * *

হাসলে তো?

আমিও হেসেছিলুম।

কিন্তু তার পর কলকাতা ফিরে—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা।

"কপির শিঙাড়া"

অর্থাৎ ফুলকপির পুর দেওয়া শিঙাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু 'কপি' শব্দের অর্থ নিলুম 'বাঁদর'। অর্থাৎ বাঁদরদের শিঙাড়া। তা হলে অর্থ দাঁড়ালো, ও-দোকানে যারা শিঙাড়া খেতে যায় তারা বাঁদর। অর্থাৎ Fool's Restaurantতে যে রকম আহাম্মুকরা যায়!

যেমন মনে করো, যখন সাইন-বোর্ডে লেখা থাকে,—

"টাকের ঔষধ"

তখন কি তার অর্থ, 'টাক' দিয়ে এ ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ এ ঔষধ টেকোদের জন্য। অতএব 'কপির শিঙাড়ার' অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিঙাড়া নয়, 'কপি'—বাঁদরদের জন্য এ শিঙাড়া!

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা-অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতার সৃষ্টি করে তার একটা সচিত্র কলেকশন করেছিল আমার এক ভাইপো। 'হবি'টা মন্দ নয়। তার মধ্যে একটা ছিল:—

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হাটিয়াল।

মচ্ছ—।•

মাঙ্গশ—।।•

নিড়ামিশ—।৵•

যাকগে এসব কথা। আবার কাইরো ফিরে যাই। আহারাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। আবুল আসফিয়া দেখলুম ড্রাইভারদের নিজের পয়সায় খাওয়ালেন। তার পর গাড়িতে উঠে বললেন, 'কাইরোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি তোমাদের নেই। অথচ আমরা তোমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের যেখানে খুশী নিয়ে গিয়ে দু'পয়সা কামাতে পারো।'

তারা তো প্রাঞ্জল প্রস্তাবখানা শুনে আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু আবুল আসফিয়া যে দর হাকলেন তা শুনে তাদের পেটের 'ফুল' পর্যন্ত আচমকা লাফ মেরে গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, আবুল আসফিয়া ইতিমধ্যে কাইরোতে ট্যাক্সি ফি মাইলে কত নেয় তার খবরটা জেনে নিয়েছেন এবং হাকছেন তার চেয়ে অনেক কম। এবার তিনি ওদের বাগে পেয়েছেন। ওরা বেশী কিছু আপত্তি জানাতেই তিনি অভিমান-ভরা কণ্ঠে বলেন, 'তা ভাই, তোমরা যদি না যেতে চাও তবে যাবে না। আমি তো আর তোমাদের বাধ্য করতে পারিনে। তোমাদের যদি, ভাই, বড্ড বেশী পয়সা হয়ে থাওয়ায় আর কামাতে না চাও, তা হলে আমি আর কি করতে পারি বলো? আল্লা তালাও তো কুরাণ শরীফে বলেছেন, 'সন্তুষ্টি সদ্গুণ।'

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে, ভাইরা, আমরা তা হলে অন্য ট্যাক্‌সি নি। তোমরা স্বচ্ছন্দে ফিরে যাও। আল্লা তোমাদের সঙ্গে থাকুন; রসুল তোমাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু ভাই, এ ক'ঘণ্টা তোমাদের সঙ্গে কেটেছিল বড় আনন্দে।'

কেটেছিল আনন্দে না কচু! পারলে আবুল আসফিয়া ওদের গলা কাটতেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম লোকটার 'ভণ্ডামি' দেখে। গুটিকয়েক টাকা বাঁচাবার জন্য কি অভিনয়ই না লোকটা করলে!

আর পায়রার মত বকবকানি! এবং এ সে-ই লোক যে জাহাজে যে ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকতো তাতে মনে হত কথা বলা রেশনড হয়ে গিয়েছে।

ঠিক আবুল আসফিয়ার দরে নয়, তার চেয়ে সামান্য একটু বেশী রেটে তারা শেষটায় রাজী হল।

আবুল আসফিয়া মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'পিরামিড'। ততক্ষণে আমরা কাইরো সহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি।

কোথায় লাগে কলকাতা রাত বারোটার সময় কাইরোর কাছে। গণ্ডায় গণ্ডায় রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, ডান্স-হল কাবারে খদ্দেরে খদ্দেরে তামাম সহরটা আবজাব করছে।

আর কত জাত-বেজাতের লোক!

ঐ দেখ, অতি খানদানি নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দু'খানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মত দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য! আমি জানি এরা তেল মাখে না, কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে। এদের চামড়া এতই সুচিক্কণ সুমসৃণ যে আমার মনে হয়, এদের শরীরে মশা-মাছি বসতে পারে না—পিছলে পড়ে মশার পা দু'খানা কম্পাউণ্ড ফ্রেকচর হয়ে যায়, ছ' মাস পটি বেঁধে হাসপাতালে থাকতে হয়।

ঐ দেখো, সুদানবাসী। সবাই প্রায় ছ' ফুট লম্বা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ' ফুটের চেয়েও বেশী। এদের রঙ ব্রোঞ্জের মত। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মত পুরু নয়, টকটকে লালও নয়। কিন্তু সব চেয়ে দেখবার জিনিস ওদের দু'খানি বাহু। একেবারে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে আজানুলম্বিত—অর্থাৎ জানুর শেষ পর্যন্ত যেখানে হাঁটুর হাড্ডি অর্থাৎ "নী ক্যাপ" সেই অবধি।

শ্রীরামচন্দ্রের বাহু ছিল আজানুলম্বিত এবং তাঁর ছিল নবজলধর-শ্যাম, কিম্বা নবদূর্বাদলশ্যাম। তবে কি শ্যামবর্ণ কিম্বা ব্রোঞ্জ-বর্ণ না হলে বাহু এতখানি লম্বা হয় না? তবে কি ফর্সাদের হাত বেঁটে, শ্যামলিয়াদের হাত লম্বা? কে জানে! সুযোগ পেলে কোনো এক নৃতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হঠাৎ দেখি, সম্মুখে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য! সমস্ত রাস্তা জুড়ে এত ভিড় যে দু'খানা গাড়িকেই বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। আমি বারণ করার পূর্বেই পল পার্সি দু'জনাই লাফ দিয়ে উঠে গেল হুডের উপর। ওরা দেখতে চায়, ভিড়ের মাঝখানে ব্যাপারটা কি। আমার ওসব জিনিস দেখবার বয়স গেছে। মাদমোয়াজেল রুদেৎ শেমিয়ে পর্যন্ত উঠি উঠি করছিলেন; আমি তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করলুম।

ইতিমধ্যে ঘোড়-সওয়ার পুলিশ এসে রাস্তা খানিকটে সাফ করে দেওয়াতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। পল-পার্সি হুড থেকে নেমে এসে আমার দু' পাশে বসেছে।

আমাকে কিছুটি জিজ্ঞেস করতে হ'ল না, ব্যাপার কি। ওরা উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। একসঙ্গে কথা বলছে। শেষটায় পলকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'পার্সি, তুমিই বলো কি হয়েছিল?'

'ঐ যে আপনি দেখালেন সুদানবাসীদের, তাদেরই এক জন একটা ইংরেজ-সেপাইয়ের গলা ধরেছে বাঁ হাত দিয়ে আর ঠাস্-ঠাস্ করে চড় মারছে ডান হাত দিয়ে। গোরা কিছুই করতে পারছে না, কারণ সুদানীর হাত লম্বা বলে গোরাকে এমনই দূরে রেখেছে যে, গোরা তার গাল নাগাল পাচ্ছে না। এ রকম তো চললো মিনিট দু'-তিন। তার পর পুলিশ এসে গোরাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সুদানীই তো ঠ্যাঙাচ্ছিল; তাকে ধরে নিয়ে গেল না? যে মার খেল তাকে ধরে নিয়ে গেল, যে মার দিলে তাকে ধরে নিয়ে গেল না, এটা কি করে হয়?'

পল পার্সি সমস্বরে বললে, 'সেই তো মজার কথা, স্যর! সাংহাই-টাংহাই কোনো জায়গাতে কেউ যদি গোরাকে ঠ্যাঙায়, তবে তাকেই ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। কেউ একবারের তরেও প্রশ্ন করে না, দোষটা কার?'

আমি তখন ড্রাইভারকে রহস্য সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানালুম।

ড্রাইভার বললে, 'দারোয়ানির কাজ এ-দেশে ক'রে সুদানীরা। তাদের উপর কাইরোবাসীদের অসীম বিশ্বাস। কোনো সুদানী কখনো কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, এ কথা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমার কানে কখনো পৌঁছয়নি। এরা বড়ই ধর্মপ্রাণ। পাঁচ ওক্ত্ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ যায়, তসবী জপে। আর বসে বসে বাড়ি আগলায়। এই যে সুদানী গোরাকে মার দিচ্ছিল, সে এক রেস্তোরাঁর দারওয়ান। গোরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে-দেয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হোটেলওলা তাকে চ্যালেঞ্জ করে খেল ঘুসি। তখন সুদানী দারওয়ান তার যা কর্তব্য তাই করেছে। পুলিশ এক বার জিজ্ঞেস করেই বিশ্বাস করেছে সুদানীকে, আর ধরে নিয়ে গিয়েছে গোরাকে। সবাই জানে, সুদানীরা বড় শান্ত স্বভাব, তারা মারপিটের ধার ধারে না।'

যাক্, সব বোঝা গেল। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করবো; একা একা কারো সাহায্য না নিয়ে, পল্টনের গোরাকে ঠ্যাঙাতে পারে এক সুদানীই। পাঠান পারে কি না জানিনে। পারলে পারতেও পারে, কিন্তু তার বাহু আজানুলম্বিত নয় বলে সেও নিশ্চয় দু'-চার ঘা খাবে।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় অতি দৈবাৎ। তা-ও দু'-এক ইঞ্চির বেশী নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল-কাফের বারান্দায় কিম্বা চাতালে। শুনলুম, এখানকার বায়স্কোপও বেশীর ভাগ হয় খোলা-মেলাতে।

বাঙলা দেশে আমরাও চায়ের দোকানে বসে গালগল্প করে সময় কাটাই। কেউ কেউ হয়তো রোজ একই দোকানে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটায়, কিন্তু কাফেতে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোর রেওয়াজ আরম্ভ হয় ফ্রন্টিয়ার থেকে। কাবুলে দেখবে, চার বন্ধু চলেছেন বরফ ভেঙে চা-খানায় গিয়ে গল্পগুজোব করবেন বলে—যেন বাড়িতে বসে ও-কর্মটি করা যায় না। ওদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'বাড়িতে মুরুব্বিরা রয়েছেন, কখন এসে কাকে ধমক লাগান তার ঠিক নেই। কিম্বা হয়ত বলবেন, দেখ বাছা, ফিরোজ বখৎ, যাও দিকিনি মামার বাড়িতে—(আড়াই মাইলের ধাক্কা) সেখানে গিয়ে মামাকে বলো, আমার নাকের ফুসকুড়িটা একটু সেরেছে, তিনি যেন চিন্তা না করেন। আর দেখো, আসবার সময় দোপানীকে একটু শুধিয়ে এসো—(সে আরো দেড় মাইলের চক্কর)—আমার নীল জোব্বাটা,' —ইত্যাদি।

এবং সব চেয়ে বড় কারণ, বাড়িতে মা-জ্যাঠাই-মা ওরকম জালা জালা চা দিতে রাজী হন না। ওনারা যে কঞ্জুস তা নয়। আমি যদি এখখুনি বলি 'জ্যাঠাই মা, আমার বন্ধুরা এসেছে, ওরা বলছে, পিসিমার বিয়ের দিনে আপনি যে ধুন্ধা-ধুমধাম করেছিলেন তারা

সেইটে খাবে। কিন্তু ওদের বায়নাক্কা, দুম্বার ভিতর যেন কোফতা পোলাও আর মুর্গী থাকে, মুর্গীর ভিতর যেন কিমা পোলাও আর আণ্ডা থাকে, এবং আণ্ডার ভিতর যেন পোনা মাছের পুর থাকে।'

জ্যাঠাইমা তদ্দণ্ডেই লেগে যাবেন ঐ বিরাট রান্না করতে। তাতে দশ-বিশ টাকা যা লাগে লাগুক।

অথচ আমাদের চায়ের খরচা এক সন্ধ্যায় কতটুকুন? দু'আনা, চার আনা, মেরে-কেটে আট আনা। উঁহু সেটি হচ্ছে না। ঘন ঘন চা খেলে নাকি ক্ষিদে মরে যায়, আহারের রুচি একদম লোপ পেয়ে যায়।

তাই, ভাই, চায়ের দোকানই প্রশস্ততর। সেখানে এক বার ঢুকতে পারলে বাবা-চাচার তম্বিতম্বার ভয় নেই, মামা-বাড়িতে গিয়ে বাবার নাকের ফুসুকুড়িটার লেটেষ্ট বুলেটিন ঝাড়তে হয় না, জালা-জালা চা পাওয়া, অন্ত ড'টার জন ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে মোলাকাৎও হয়, তাস-দাবা যা খুশী খেলাও যায়—সেখানে যাবো না তো, যাবো কোথায়?

প্রথম বারেই প্রথম কাবুলী ভদ্রসন্তান যে আমাকে এই সব কারণ এক নিশ্বাসে বুঝিয়ে বলেছিল তা নয়। একাধিক লোককে জিজ্ঞেস করে ক্রমে ক্রমে চায়ের দোকানে যাবার যাবতীয় কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম।

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এঁরা সত্য কথাই বলেছিলেন, এবং এঁরা যে ঘর ছেড়ে চায়ের দোকানে যান তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, বাঙালীদের বেলাও তো এই সব আপত্তি-ওজুহাত টেকে। আমাদের মা-পিসিরাও চান না আমরা যেন বড্ড বেশী চা গিলি, বাবা-কাকাও ফাই-ফরমায়েস দেওয়াতে অতিশয় তৎপর; কাবুলীদের বেলা যে শির পীড়া বাঙালীদের বেলাতেও তাই, তবে আমরা চায়ের দোকানকে বাড়ির ব্যতিক্রম করে তুলিনে কেন?

এর সদুত্তর আমি এখনো পাইনি। তাই সে যাই হোক, এটা বেশ লক্ষ্য করলুম, রাত বারোটা একটা অবধি কাফেতে বসে সময় কাটানোতে কাইরোবাসী সব চেয়ে বড় ওস্তাদ; বন্ধুর বাড়িতে জমানো আড্ডা দশটা-এগারটার ভিতর ভেঙে যায়, কারণ বাড়িশুদ্ধ লোক তাড়া লাগায় খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ার জন্য। এখানে সে ভয় নেই। উঠি-উঠি করে কেউই ওঠে না। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তারা এক একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুনেছি, এখানকার কোনো কোনো কাফে খোলে রাত বারোটায়!

মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব-কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এই বারে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতিরমণীয় এক দৃশ্য! নাইল, নীল নদ।

আমি পূব-বাঙলার ছেলে। যা তা নদী আমাকে বোকা বানাতে পারে না। আমি যে গাঙে সাঁতার কাটতে শিখেছি সেই ছোট্ট মনু নদ থেকে আরম্ভ করে আমি বিস্তর মেঘনা-পদ্মা, গঙ্গা-যমুনা এবং পরবর্তী যুগে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী তাপ্তী-নর্মদা-সিন্ধু, ইয়োরোপে রাইন ডানয়্যুব-মোজেল-রোন দেখেছি। নদী দেখলে আর পাঁচ জন বাঙালের মত আমিও গামছা খুঁজতে আরম্ভ করি—ঐ নদীতে কটা লোক গত সাত শ' বছরে ডুবে মরেছিল তার ষ্টাটিসটিক্সের সন্ধান না নিয়ে—একটা ডিঙি কি কৌশলে চুরি করা যায় তার সন্ধানে মাথায় গামছা বেঁধে নি, পাটনিকে কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে খেয়া নৌকো থেকে নামতে হয় সেটা এক মুহূর্তেই আবিষ্কার করে ফেলি।

এই যে পৃথিবীর সব চেয়ে মধুর ভাটিয়ালী গীত! সৃষ্টিকর্তা যদি তাঁর পূব-বাঙলার লীলাঙ্গনে শত শত নদীর আলপনা না আঁকতেন তবে কি কখনো ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হত? আর এ কথাও ভাবি; তিনি রচেছেন মোহনিয়া প্রবাহিনী আর আমরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রচেছি ভাটিয়ালী। অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে ধার করে! আমরা যখন ও—ও—ও—

বলে ভাটিয়ালীর লম্বা সুর ধরি, মাঝে মাঝে কাঁপন জাগাই তখন কি স্পষ্ট শুনতে পাও না, দেখতে পাও না, 'ও'-'র লম্বা টানে যেন নদী শান্ত প্রশান্ত রূপে এগিয়ে চলছে, যখন কাঁপন লাগাই তখন মনে হয় না, নদী যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে দ'য়ের সৃষ্টি করেছে?

প্যারিস-ভিয়েনার রসিকজন সম্মুখে আমি আমার হাজারোটা নদী কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির করতে পারবো না, কিন্তু ভাটিয়ালীর একখানা উত্তম রেকর্ড শুনিয়ে দিতে পারি।

আমি বে-আক্কেল তাই এক বার করেছিলুম। তার কি জরিমানা দিয়েছিলুম শোনো।

ভিয়েনাতে পাশের ঘরে থাকতো এক রাশান। সে এসেছিল সেখানে কন্টিনেন্টাল সঙ্গীত শিখতে। ভিয়েনা শহর বেটোফেন্ মোৎসার্টের কর্মভূমি—আমাদের যে রকম তানসেন, ত্যাগরাজ, বাঙালীর যে রকম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল্ ইস্লাম্।

ভিয়েনা ডানয়্যুব নদীর পারে। 'ব্লু ডানয়্যুব' তোমাদের কেউ কেউ হয়তো শুনেছ।

একদিন সেই রাশান বললে, 'ডানয়্যুব, ফানয়্যুব সব আজে-বাজে নদী। এ সব নদী থেকে আর কি গান বেরিয়েছে। আমার রাশার ভল্‌গা নদী থেকে যে ভল্‌গার মাঝির গান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? তুমি 'গড়'-'ফড়' কি সব মানো না? আমি মানি নে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিকে তারই অন্যতম মধুর প্রকাশ নদীতে। সেই নদীকে আমরা মাধুর্যে হার মানাই ভল্‌গা মাঝির গান দিয়ে।' (২)

বাড়ি ফেরা মাত্রই সে ভল্‌গা-মাঝির রেকর্ড শোনালে। আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'চমৎকার!'

কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঙাল-রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। বাঙালরা অবশ্য জানো, তার অর্থ কি? 'ঘটি' অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙলার লোক তাই নিয়ে হাসাহাসি করে। করুক। আমার তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা তো আমাদের ভাটিয়ালী ভালোবাসে, আমরা তো ওদের 'বাউল' শুনে 'বাউলে' হয়ে যাই!

আমার গরম রক্ত তখন টগবগ করে বলছে, 'বাঙলা দেশ শত শত নদীর দেশ রাশাতে আর ক'টা নদী আছে? তারই একটা, ভল্‌গা। সে নদী হারিয়ে দেবে বাঙলা দেশের তাবৎ নদীকে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

---

(২) রবীন্দ্রনাথও এই রকমের 'দম্ভ' করেছেন তাঁর 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গানে। রেকর্ডে গেয়েছেন, শ্রীযুক্তা রাজেশ্বরী বাসুদেব।

ভাগ্যিস, আব্বাস উদ্দিনের 'রঙিলা নায়ের মাঝি' আমার কাছে ছিল। সেইটে চড়িয়ে দিলুম বাশানের গ্রামোফনে।

সে চোখ বন্ধ করে শুনলে। তার পর বললে—যা বললে তার অর্থ—'ধাপ্পা।'

আমি বললুম, 'মানে?'

সে বললে, 'সুরটি অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং তার চেয়েও বেশী কানে ধরা পড়ে ওর অভিনবত্ব। আমি করজোড়ে স্বীকার করছি, এরকম গীত আমি পূর্বে কখনো শুনিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো, এ গীত লোক-গীত নয়। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো ভূমিতেই গ্রাম্য গীতে এতগুলো 'নোট' লাগে না। তাই বলছিলুম, তুমি ধাপ্পা দিচ্ছো।'

আমি বললুম, 'বাছা, ঐ হল ভাটিয়ালীর বৈশিষ্ট্য। ও যতখানি ওঠা-নামা করে পৃথিবীর আর কোনো লোক-গীত তা করে না।'

কিছুতেই স্বীকার করে না ওটা লোক-গীত। তার ধারণা ওটা লোক-গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝখানে উপস্থিত ঝুলছে, আর কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই কোনো গুণী সেটাকে 'উচ্চাঙ্গ' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বরণ করে তুলে নেবেন।

তার পর এক দিন সে স্বীকার করলে। বি বি সি'র কল্যাণে। বি বি সি পৃথিবীর লোকগীত শোনাতে শোনাতে ভাটিয়ালী শুনিয়ে বললে এটা পুব বাঙলার লোক-গীত।

আমি লড়াই জিতলুম কিন্তু তখন থেকেই শুরু হল আমার জরিমানা। আশ্চর্য লাগছে না, যে জিতলে সে দেবে জরিমানা! হয়, প্রায়ই হয়। মার্কিনিংরেজ জর্মণী জয় করে বহু বৎসর ধরে সেখানে ঢালছে এবং এখনো ঢালছে বিস্তর টাকা। সে কথা যাক্। জরিমানাটা কি ভাবে দিতে হল বুঝিয়ে বলি।

এর পর যখনই সে আমাকে সাজা দিতে চাইত তখনই তার বেয়ালাতে বাজাতে আরম্ভ করতো ভাটিয়ালীর সুর।

বোঝো অবস্থাটা! বিদেশে বিভূঁইয়ে একেই দেশের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে তার উপর ভাটিয়ালীর করুণ টান।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকণ্ঠ বাবুর মত (৩) আমি কাতর রোদনে তাঁকে বেয়ালা বন্ধ করতে অনুনয়-বিনয় করতুম।

কিন্তু আজও বলি, লোকটা যা বেয়ালাতে ভাটিয়ালী চড়াতে পারতো তার তুলনা হয় না।

কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলুম, কত জানাজনের দুর্ব্যবহার, হিটলারের মত বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে সব বড় বড় জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এই সব ছোট-খাটো কিছুতেই ভুলতে পারিনে। মনে হয় যেন আজ সকালের ঘটনা।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরণের খোলা মহাজনী নৌকা—হাওয়াতে কাৎ হ'য়ে তেকোণা পাল পেটুক ছেলের মত পেট ফুলিয়ে দিয়ে। হাওয়া বইছে সামান্যই, কিন্তু এই পেটুক পাল এর, ওর, সবার খাবার যেন কেড়ে নিয়ে পেটটাকে ঢাকের মত ফুলিয়ে তুলেছে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয়, নৌকোটা পেছনের ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়েই এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তাঁর বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেন। তাই এ দেশের কবি গেয়েছেন,

> ওগো নীল নদ প্লাবিতা ধরণী আমি ভালোবাসি তোরে,
> ঐ ভালোবাসা ধর্ম আমার কর্ম আমার ওরে।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ) [ক্রমশঃ।

(৩) রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, ২১৫ পৃঃ।

নিজেকে গড়ো

শচীন্দ্র মজুমদার

যৌবন কালে অসিচর্চা শেখার আমার পরম সাধ ছিলো, কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি। এক তো শেখবার ওস্তাদ মেলেনি। তার ওপর সেটা ছিলো ইংরেজের দাপটের কাল, শেখাও অসম্ভব ছিলো। এখন আমাদের নিজের দেশ, যৌবনের এ অসিধর্ম শেখার সুযোগ হয়েছে, শেখাটাও আমাদের কর্তব্য কর্ম। তা যদি পারো, তাহলে কুস্তি, বক্সিং অভ্যাস করবার দরকার হবে না। অসিচর্চা পুরুষের মহত্তম চর্চা।

এবার তোমাদের একটা নিদারুণ বিপদের কথা বলি। আমি না বললে আর কেউ সে কথাটা বলবে না। তোমাদের যৌবন আক্রান্ত। পুরুষের পুরুষালি, নারীর নারীত্ব ঘোরতর ভাবে বিপন্ন। সেটা কালধর্মের ফল। হয়তো বা এ কালের কৃতকর্মের শাস্তি।

যদি না জেনে থাকো, শীঘ্রই এক দিন জানতে পারবে যে হ্যাভেলক এলিস এ কালের এক জ্ঞানতপস্বী ঋষি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন এলিসও তেমনি আমার ঋষিগুরু। বোধ করি তিরিশ বছরেরও আগে এলিস কালপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন যে, আমাদের 'এই শতাব্দীটায় "The sexes tend to approxi mate to each-other, অর্থাৎ রমণী পুরুষভাবাপন্ন ও পুরুষ রমণীভাবাপন্ন হয়ে যাবে। কথাটা ভয়ানক। কিন্তু ঋষি-বাক্য কখনো ভুল হয় না। যেদিন বুকে ধাক্কা দেবার মতো ও বাক্যটা পড়েছিলুম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি অত্যন্ত সচেতন হয়ে এ ঘোর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে আসছি। এ ঘটনাটা আগে ইউরোপে ঘটেছে, এখন তার ঢেউ এসেছে আমাদের দেশে। যে সব দেশে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব, সে সব দেশে এই মর্মন্তুদ ঘটনাটা ঘটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

এ পরিবর্তনকে আসক্তিকরণ বলে। বলেছি যে তোমাদের যৌবন আক্রান্ত; নরনারীর স্বভাব আক্রান্ত। এ বইটা মেয়েদের জন্য নয়, তবুও প্রসঙ্গক্রমে তাদের কথা একটু বলতে হয়। মেয়েরাই স্ব-ভাব থেকে বেশি দূরে গিয়ে পড়েছে। পুরুষের সমকক্ষ হবার অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলে যুবতী রমণীর আসক্তিকরণ ঘটে। মেয়েদের পুরুষালি খেলা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ। এ পরিবর্তন অন্তর

বাহিরের। খেলোয়াড়ী-মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গী পুরুষের। তাদের দেহ থেকে গৌণ নারীচিহ্নগুলি মুছে গিয়ে দেহ পুরুষভাবাপন্ন হয়ে চলেছে। এ সব মেয়েদের চেপ্টা সমতল বুক, শ্রোণীদেশ পুরুষের মতো সঙ্কুচিত ও চেপ্টা। তাদের সত্তায় অস্বাভাবিক উপায়ে পুরুষালি নিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইওরোপে এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও আপত্তি হলেও, বিজ্ঞানীরা কালের গতি রোধ করতে পারেন নি। আমাদের অনুকরণধর্মী দেশেও এখন আসক্তিকৃত মেয়েদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে।

অন্য পক্ষে, যাদের যুবক-মরদ হয়ে গড়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি ছিলো, এমন অসংখ্য ছেলে নারীভাবাপন্ন হয়ে চলেছে। তাদের মেয়েদের মতো কোমল অঙ্গ, হাত-পায়ে পুরুষালি দাপট নেই। খোলপড়া অপরিণত বুকে দম নেই, পুরুষালি দম্ভের স্থান নেই। আমাদের দেশটা নিম্ন-নিরিখ মানুষ দিয়ে ভরা, কাজেই ছেলেদের এ আসক্তি-করণের দ্রুত প্রসার সম্ভব হয়েছে। মেয়েদের আসক্তিকরণের যুক্তিপূর্ণ কারণ আছে, পুরুষের এ পরিবর্তনের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এখনো নির্ণীত হয়নি। ইওরোপ এই নূতন মেয়েদের নামকরণ করেছিলো The third sex. নূতন পুরুষের নামকরণ এখনও হয়নি। আরম্ভেই যৌবনের এই অপচয়, এই দুর্গতিটাকে সমূলে উৎপাটিত না করলে এমন ছেলে-মেয়ে দিয়ে আমাদের সমাজ ছেয়ে যাবে, বাঙালীর বংশে ঘুণ ধরবে। ঘুণ ধরেইছে, আরো ধরলে সেটা থাকবে কি?

কয়েক শত বৎসর পূর্বে বাঙালী ধর্মাচার্যেরা বলে বেড়াতেন "কায়া সাধো", "কায়া সাধো"। আমি আচার্য না হলেও তোমাদের বলবো, শরীর সাধো, মরদানগী সাধো; রুক্ষ-দৃঢ় পৌরুষ যৌবনের সাধনা করো। কুস্তি লড়ো, বক্সিং করো, অসিব্রতী হও। ব্যক্তি শক্ত হলে আমাদের জাতিও শক্ত হবে। না হলে এক দিন আমরা বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যাবো।

* * * *

নিশ্চয়ই তোমরা প্রশ্ন করবে এবং করাও উচিত, যে এ সবের সঙ্গে ঊর্দ্ধপরিণাম সাধনার সম্পর্ক কি? সংক্ষেপে ভিন্ন ধরণের একটা কাহিনী শোন তাহলে।

হিন্দুর বৈদিক ধর্ম ঊর্দ্ধপরিণাম সাধনারই ধর্ম। সেই একই ধর্ম-ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দুইই গঠন করতো এবং অন্য দু'টি শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত সাধনা ও আচার নির্দেশ করে দিয়েছিলো। প্রত্যেক ব্যক্তির নিহিত শক্তিকে চরমোৎকর্ষের রূপ প্রদান করা ঊর্দ্ধপরিণাম সাধনার উদ্দেশ্য। কাজেই যে স্বভাবে ব্রাহ্মণ, সে এই ধর্মপথে তার নিহিত ব্রাহ্মণত্বের অনুসরণ করতো, ক্ষত্রিয়স্বভাব ক্ষাত্রধর্মের সাধনা করতো। আমি যে শক্তি সাধনার কথা বলছি তা ক্ষাত্রধর্মের অঙ্গ। কালক্রমে উপযুক্ত সাধনার অভাবে আমাদের ধর্ম নির্জীব হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গড়ে ওঠার ব্যাপারটারও আমাদের দেশে অবসান হয়। কাজেই বৈদিক ধর্মের কথাটা এইখানেই শেষ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে শুধু এই কথাটাই বলবো যে, বৈদিক ধর্ম, ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব মৃত্যুহীন। আবার তাদের নূতন করে অভ্যুদয় হতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম যে কালক্রমে ভারত থেকে তিব্বত ও চীনদেশ হয়ে জাপানে গিয়েছিলো, আশা করি এ কথাটা তোমাদের অজানা নয়। এতো করে দেশভ্রমণ করলে মানুষের মতো ধর্মেরও দেশকাল-পাত্র ভেদে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। যে জাতির যেমন মূল স্বভাব, সে জাতি নবাগত ধর্মকে সেই ধরণে খাপ খাইয়ে নেয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের এক রূপ, চীন দেশে অন্য এবং জাপানে ভিন্ন। যদিও মূলতত্ত্বে ভেদ নেই। এ বিভিন্নতা ব্যবহারে।

এই পরিবর্তনশীল রূপটি একটি মূল ধার্মিক শব্দের পরিবর্তনে বেশ পরিস্ফুট। আমাদের যা "ধ্যান" চীনদেশে তা "ঝান", ও জাপানে সেটি "জেন" বলে জ্ঞাত। কিন্তু বস্তুত সেটা ধ্যানই। এই জেন বৌদ্ধধর্মটি এখনো জীবন্ত একটি ধর্ম। জীবন্ত বলতে এই বোঝা যায় যে, সেটি জাপানীদের নিত্য সাধনা, তার প্রভাব তাদের সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত। সেটা আমাদের হিন্দু ধর্মের মতো কেবল মাত্র অনুষ্ঠান-আচারে পর্যবসিত হয়নি। সাধনা-বিচ্যুত হয়ে ধর্ম অনুষ্ঠানে পরিণত হলে সেটি নির্জীব হয়; তখন বোধ করি সেটা কেবল জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে থাকে।

জৈন ধর্মের ষষ্ঠ আচার্যের কাল পর্যন্ত তার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে বেশ যোগ ছিলো, সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে জাপানীরা ওটিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজস্ব করে নিয়েছে। শুধু বৌদ্ধ নয়, খৃষ্টের ধর্মকেও জাপানীরা নিজের করেছে। জেন অতিশয় শক্তিশালী হয়েছে কয়েক শতাব্দীর উগ্র সাধনার ফলে।

বাংলা দেশের বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মটি, একেবারে নির্বাণ প্রাপ্ত না হলেও, হতাদরে ও অবনতিতে মৃতপ্রায়। শুনি যে, সেটা পরবর্তী কালে ব্যভিচারে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। ব্যভিচারে সম্যক মৃত্যু হয়, কিন্তু সহজ ধর্মের নানাবিধ গুণের কারণে তা হয়নি। এ কথাটা আমার আলোচ্য নয়। আমি জেন ও সহজধর্মের সাদৃশ্য দেখি, নাম থেকে পরিণাম সাধনতত্ত্ব পর্যন্ত এ দু'টি ধর্মের বেশ ঘন সাদৃশ্য আছে। আমার ধারণা, বাংলা দেশের উপেক্ষার কারণে প্রাচীন কালে সহজ ধর্মটি চীনদেশ হয়ে জাপানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলো।

সহজ ধর্মের কোন সংজ্ঞা হয় না। সহজ সহজ। জেনও যে কি বস্তু তার বিচক্ষণ আচার্যেরাই বলতে পারেন না; জেনের কোন সংজ্ঞা নেই। জেনের পরিচয় জেন। কিন্তু কয়েকটি শতাব্দী ধরে এই সজীব পরিণাম সাধনা জাপানী জীবনের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে জাপানীদের সকল কর্মে জেন। সেইটাই এখানে আমার বলবার কথা।

হাসি ও গান সহজ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। জেনেও তাই। জাপানীদের কাব্যে জেন; চিত্রশিল্পে কারুশিল্পে জেন; চা পান অনুষ্ঠানে জেন; ঘরে ফুল সাজানোতে জেন; অসি সাধনা, বীরত্ব সাধনায় জেন। মরিস মেটরলিঙ্ক ও হ্যাভেলক এলিস জাপানীদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যপ্রিয় জাতি বলে বর্ণনা করে গেছেন। তাদের ব্যাপক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জেন সাধনার ফল। জাপানীরা যে তুচ্ছ কারণেও আত্মহত্যা করতে পারে, এ কথা ভুবনবিদিত। এই জেন সাধনার প্রভাবেই ওরা জীবনকে তুচ্ছ করে। জেনধর্ম ও জাতিটাকে শিখিয়েছে যে, মানুষই জীবনের প্রভু, জীবন মানুষের প্রভু নয়। জেন-প্রাণের মমতা শেখায় না।

যুযুৎসু কুস্তির একটা ধরণ। সেটি জেনের একটি প্রকৃষ্ট অঙ্গ। এই আক্রামক ব্যায়াম পদ্ধতিটিতে আক্রমণ করাটা গৌণ কথা;

আক্রান্ত হয়েও আততায়ীকে জয় করাটাই মুখ্য তত্ত্ব। জেন বলে "Walkon"—এগিয়ে চলো, থেমো না।

এ বাক্যটার মূলে একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তা তোমাদের জানার এখন দরকার নেই। কারণ, বললেও তোমাদের পক্ষে শেষটা বোঝা অসম্ভব হবে। জেনের সকল তত্ত্বে এই "এগিয়ে যাওয়া আছে" আছে। আক্রান্ত হয়েও যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আততায়ী—মানুষ বা ঘটনা যাই হোক না কেনো—বলশূন্য হয়! সেই বলশূন্য হবার ক্ষণটি তো যুযুৎসু আততায়ীকে আয়ত্তে করে জয় করে। তার ভেতর একটা খুব বড়ো কথা এই যে, জয় করতে বলক্ষয় হয় না। কথাটা বুঝিয়ে বলি। তুমি যদি আমাকে আক্রমণ করো ত'তে দু'টি ঘটনা ঘটে। প্রথম, আমি বাধা দিলে তবে সে আক্রমণ কার্যকরী হবে। দ্বিতীয়, যতোক্ষণ তোমার দেহ তোমার আয়ত্তাধীন ততোক্ষণই তুমি আমাকে বশ করে জয় করতে পারো। কিন্তু আমি যদি তোমাকে বাধা না দিয়ে দক্ষিণ বা বাম দিকে অথবা পিছন পানে দু' এক পা এগিয়ে যাই তাহলে তোমার দেহের আর টাল থাকবে না, নিজের ভারের ঝোঁকে তুমি অবশ একটা অবস্থায় গিয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় আমি নিজের শক্তি একটুও ক্ষয় না করে অবলীলায় তোমাকে জয় করতে সক্ষম হবো। অন্য উদাহরণ জলের। জলকে তুমি যতো জোরে মুঠো করে ধরতে যাবে, সে বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে ততো সহজে তোমার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবে। এ তত্ত্বটি জাপানীরা সব কাজে প্রয়োগ করে। ছেলে বয়স থেকে প্রত্যেক জাপানী যুযুৎসু নিহিত জেন ধর্মটি শেখে।

কেনযুযুৎসু অথবা অসিচর্চা জাপানের শ্রেষ্ঠতম ক্ষাত্রধর্ম। যুযুৎসু ও কেনযুযুৎসুর জেন তত্ত্বটি একই। জেন থেকে ওদের বুশিদো নীতির উদ্ভব হয়েছে। বুশিদো জেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত জীবনধর্ম। আমাদের যেমন ক্ষত্রিয়, জাপানের সামুরাই জেন দ্বারা গঠিত। সামুরাইরা উগ্রবীর্য ক্ষত্রিয়, অসিব্রতী, তারা জীবনজয়ী। এই সামুরাইরা জেন মঠে গিয়ে আচার্যদের কাছে তত্ত্ব শিখতো, পরিণাম সাধনা করতো। জেনের কৃপায় জাপানে একাধারে কবি ও যোদ্ধার উদ্ভব হয়েছে। জেন সাধনায় কর্মহীন হয়ে আলস্যে দিন কাটাবার যো নেই। জেন ধর্মীর কাছে সব কাজের এক রকম গুরুত্ব, তার মধ্যে ছোট-বড়ো নেই। জেন আচার্যেরা, আমরা যাকে হীন কাজ বলি তা নিজেরা করে। জেন মঠের পরিচ্ছন্নতা ভুবনবিখ্যাত। জাপানীরা তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছন্ন জাতি।

আমাদের সহজ ধর্মের কায়াসাধনা একটি মহিমময় ধন। জেন ধর্মেও কায়াসাধনা আছে, তার নাম মা-জেন (Za-Zen) সহজিয়া কায়া সাধনার মতো সেটা সমৃদ্ধ কোন পদ্ধতি কি না, তা আমার জানা নেই।

জেনের পরিণাম সাধনায় চেতনার অনুশীলনের পদ্ধতিটি তুলনারহিত। সেইটি স্বরূপ সন্ধান। আমার মনে হয় সেটি সহজিয়া—স্বরূপ সন্ধানের মতো! এ বিষয়ে আমি যা জানি, পরে তোমাদের তা বলবার ইচ্ছা রাখি।

এই থেকে প্রমাণ হয় যে, তোমার পরিণাম সাধনায়, যে উপায়েই হোক, নিজের দেহ-মনকে আক্রামক করে গড়ে তোলায় তত্ত্বগত কোন অন্তরায় নেই। তত্ত্ব বরং তোমার অনুকূল।

* * *

দেহের সংস্কার না হলে দেহের চেয়ে যা মহত্তর—মন সেটি গঠিত হবে না। দৈহিক উৎকর্ষের সীমা আছে, মনের নেই। দৈহিক বল সীমাবদ্ধ। তোমার মনে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সম্ভাবনা আছে, তার উৎকর্ষের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। এই শক্তি স্ফুরণের কারণে সাধারণ মানুষই মহামানব হয়। উপযুক্ত সাধনার দ্বারা দেহকে ইচ্ছার দাস করা যায়, দেহের ওপোর মনের ছাপ পড়ে। আত্মার নির্ভীকতা গড়বার পূর্বে দেহের নির্ভীকতা গঠন করবার বিপুল প্রয়াস করা যায়। তাতে হাতে হাতে লাভ এই হয় যে, মিথ্যা কথা কইতে হয় না, মিথ্যা কপট আচরণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটি একটি বড়ো মুক্তি। এ লাভ সংসারের পরমতম লাভ। আমাদের দুর্বল দেহ ও চিত্ত অনুক্ষণ মিথ্যা বলায়, মিথ্যা আচরণ করায়।

আক্রামক ব্যায়ামের অভ্যাস কখন করা উচিত? ছাত্রাবস্থা তার যোগ্যকাল। কিন্তু সে সময়েও তাতে মত্ত হয়ে যেও না, যেনো কুস্তি-বক্সিং তোমার নেশা হয়ে না দাঁড়ায়। খেলা ও ব্যায়ামের নেশা আড্ডা দেবার ও আফিসের নেশার চেয়ে একটুও কম তীব্র নয়। লক্ষ্যের বিষয়ে তোমাকে সচেতন থাকতে হবে। তোমাকে কুস্তি ও বক্সিং-এর ক্ষীরটুকু গ্রহণ করতে হবে, জলটা নয়। জলটা নিতে গেলে অবশেষে সে অগাধ সলিলে ডুবে যাবে। তুমি গামা পহলবান তো কখনই হতে পারবে না, কেবল উৎসন্নে যাবে।

আর একটি বিষয়ে তোমাকে সচেতন হতে হবে। নবযৌবনের কালে তোমার মনে হবেই যে ওই কালটাই যেনো তোমার জীবনে চিরস্থায়ী। অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা মানুষের ধর্ম হলেও বেশি করে যুবজনের ধর্ম। কিন্তু বাড়ীতে মাঝে মাঝে বাপ-খুড়োর দিকে দেখলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে যে, তোমাকেও এক দিন তাঁদের মতো পরিণত বয়স্ক হতে হবে। সেইটাই তোমার জীবনের চরমতম অবস্থা। সে সময়ে বার বার নিজেকে প্রশ্ন কর যে, তুমি যা করেছ তা তোমার পরিণত বয়সটাকে মজবুত করবে কি না? এ মাপ-কাঠিটাকে কখনও ভুলে যেও না। উত্তর কালের সাংসারিক জীবনটাই তোমার প্রয়াসের মাপকাঠি।

সুতরাং ফেলে দিতে শেখো। রোজ এক বার করে মনের ওপর সম্মার্জনী বুলিয়ে যা আবর্জনা বলে মনে হবে, তা তৎক্ষণাৎ ফেলে দিও। ফেলে দিয়ে হাল্কা হতে শেখো। ফেলে দেওয়াটাকে আমি জীবন-শিল্প বলে মনে করি। মনের রাজত্ব আরম্ভ হলেই কুস্তি ও বক্সিংকেও ফেলে দাও, কেবল তা থেকে পাওয়া যোদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গীটা নিজের বলে রেখো! জীবনের অনেক কিছু আখ খাওয়ার মতো, রসটুকু গ্রহণ করে ছিবড়েটা ফেলে দিতে হয়।

খেলা ও ব্যায়ামের নিম্নলিখিত অপগুণগুলি তোমাকে মনে রাখতে হবে:—

১। চর্চার আতিশয্যের কারণে মন গভীরতা হারিয়ে বাহ্যিকতায় মগ্ন হয়ে থাকে, সুতরাং মনন শক্তিটা হারিয়ে যায়। ব্যায়ামীর মন শিশুসুলভ হয়ে যায় বলে তার সংসারের বিষয়ে কোন জ্ঞান হয় না। উপযুক্ত অর্থার্জন করতে এবং সংসারের ভার বহন করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। আতিশয্যশীল খেলোয়াড়ী ও ব্যায়ামী সাধারণত পরাশ্রয়ী হয়, সমাজের তলায় পড়ে থাকে। তাদের মনে নিম্ন বেদনাগুলির ও পশুবৃত্তির প্রকাশ হওয়া খুবই সম্ভব হয়।

২। আতিশয্যশীল ব্যায়ামীর স্বকাম (Narcissism) ও আত্মপূজা একটি গুরুতর বিপদ, সেগুলো নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। সর্বদা আত্মস্তুতি করবার প্রবণতার কারণে তার মনে সমাজবিরোধী বেদনার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়।

৩। সহনশীল কর্মঠ ও দৃঢ়চরিত্র মানুষ হবার পরিবর্তে আতিশয্যশীল খেলাড়ী ও ব্যায়ামী আরামপ্রিয় এবং শ্রমকাতর হতে বাধ্য।

৪। এ ধরণের ছেলেদের পক্ষে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা করা অসম্ভব কথা।

৫। আতিশয্যশীল খেলাড়ীর পক্ষে উর্দ্ধপরিণাম লাভ করা অসম্ভব কথা।

৬। মানুষের হৃদযন্ত্রের একটি বিশিষ্ট ছন্দোময় গতি আছে। খেলা ও ব্যায়াম সেই গতিটাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলা ও ব্যায়ামে আমরা হৃদযন্ত্রটির কাছে যে অস্বাভাবিক ক্রিয়া ও গতির দাবী করি তা প্রকৃতিবিরোধী। এ ক্রিয়া ও গতি অত্যন্ত উৎকট (Violent) যৌবনের নিত্য অভ্যাসে হৃদযন্ত্র এই অনুচিত ক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হয় না বটে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে প্রকৃতি অনিবার্য ভাবে তার প্রতিশোধ নেয়। আমাদের দেশে প্রথম তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে ব্যক্তি তার হৃদযন্ত্রটিকে অত্যধিক পরিমাণে পরিশ্রম করায়, তার প্রৌঢ় বয়সে হৃদযন্ত্রের রোগ হওয়া ছাড়া অকাল মৃত্যুর বেশি সম্ভাবনা ঘটে। প্রণালীবিহীন গ্রন্থিগুলির পরমশ্রান্তি ও অবনতি ঘটা অনিবার্য কথা, তাছাড়া বাত নাড়ী প্রকরণের অত্যন্ত অবনতি হয়। মৃত্যু না হলেও মধ্য বয়সটা নীরোগ ও সুস্থ হয়ে কাটাবার সম্ভাবনা খুবই কম হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে যে, প্রথম বয়সের দৈহিক ও মানসিক সকল ক্রিয়ার প্রভাব জড়ো হয়ে মধ্য বয়সে আত্মপ্রকাশ করে। মধ্য বয়সের রোগ ও মানসিক অশান্তি প্রথম বয়সের অনুচিত আচরণের পরিচায়ক।

দু'ধরণের ছেলেদের পক্ষে খেলা ও ব্যায়াম মারাত্মক। প্রথম, যাদের ঘরে পুষ্টিকর খাদ্য সুলভ নয়। এ অবস্থায় খেলা-ব্যায়ামে মেতে গেলে ক্ষয়রোগ হওয়া অনিবার্য হয়। দ্বিতীয়, যারা হাইপোপ্লাষ্টিক (Hypoplastic) আকৃতির মানুষ, অর্থাৎ যাদের ত্রিকোণাকার সুচালো শীর্ণ মুখ, দীর্ঘ কঙ্কালসার শরীর, দেহের অস্থিগুলি পাতলা, ধারালো ও ক্ষীণ শক্তি। এদের পক্ষে যে-কোন ধরণের খেলা ও সাধারণ ব্যায়াম মারাত্মক এবং বিবাহিত জীবন সাংঘাতিক। এই গঠনের মানুষ উর্দ্ধপরিণাম সাধনাও করতে পারে না, তাতে তাদের পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

এখন খাদ্যের কথা ওঠে। আমাদের দেশে এ কথাটা মর্মান্তিক দুঃখের। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ভিন্ন দেহ বা মন কিছুই গঠিত হয় না। খালি পেটে কোন সাধনাই হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ যুবজন তাই ম্লান, উৎসাহহীন, আধা-রোগী। বর্তমান খাদ্যপীড়ার কারণে, আমার মতে বাঙালীর অন্তত একটি বংশক্রম নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষম প্রভাব থেকে উদ্ধার পেয়ে জাতিকে আবার সবল হয়ে উঠতে দু'টি বংশক্রমের সুরক্ষণ প্রয়োজন হবে। যে দীপে তেল নেই তাতে শিখা জ্বলে না। কাজেই খাদ্যহীনকে কোন যুক্তি দিতে আমি সক্ষম নই। যে প্রদীপে তেল আছে তাতে সজ্ঞানে শিখা প্রজ্বলিত করবার কথাটাই আমি বলছি।

গঠনমূলক খাদ্য নানা ধরণের। অনেকগুলো কেবল দেহ গড়ে; অনেকগুলো দেহ ও মন, দুই-ই গঠন করবার সাহায্য করে। খাদ্যের কারণে মানুষ বা ইতর প্রাণী আক্রামক স্বভাব পায়। মাদ্রাজীদের খাদ্য পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে খারাপ, তার পরেই বাঙালীর খাদ্য। পঞ্জাবী ও ইংরেজের খাদ্য প্রণালী পৃথিবীর সর্বোত্তম। এটা অবশ্য এক জন বিশিষ্ট ইংরেজ খাদ্য-বিজ্ঞানীর মত। তাঁর নাম ম্যাক্‌ক্যারিসন (Col. Mac Carrison)। তিনি ইঁদুর দিয়ে চমৎকার একটা পরীক্ষা করেছিলেন। চার দল ইঁদুরকে তিনি উক্ত চারটি জাতির খাদ্য দিয়ে পালন করেছিলেন। মাদ্রাজী ও বাঙালী ইঁদুর হোল ক্ষয়িষ্ণু, উৎকর্ষহীন, ভীতু ও পলায়নপর। পঞ্জাবী ও ইংরেজ ইঁদুরের তার ঠিক ঠিক বিপরীত প্রকৃতি দেখা যায়। খাঁচায় হাত দিলেই পঞ্জাবী ও ইংরেজ ইঁদুর আক্রমণ করতো, তারা শক্তি ও উৎকর্ষ-প্রবণ। এ তথ্য আবিষ্কার করা সত্ত্বেও এই ইংরেজ ডাক্তারটি ইংরেজ জাতিকে শ্রেষ্ঠতর পঞ্জাবী খানা ধরাতে পারেন নি। খাদ্যের জাতীয় ধারা বদলে দেওয়া, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা একই কথা।

কিন্তু ইঁদুর দিয়ে কি মানুষের সত্য প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়? কে জানে! আমার মনে হয় পরীক্ষাগারের এ গবেষণা সত্য ও মূল্যবান হলেও তাতে কোথায় চুক আছে। অনেক অবস্থাপন্ন বাঙালী শিক্ষা ও রুচির কারণে বৃটিশ বেশ, ভাষা ও খাদ্যধারাটা গ্রহণ করেছেন। সারা জীবন ইংরেজের আচার পালন করেছেন এমন আত্মীয়-বন্ধুদের কাউকে আমি বৃটেন হয়ে যেতে দেখিনি। আমিও কিছুকাল পঞ্জাবী ও ইংরেজ খানার ওপর নির্ভর করেছি, কিন্তু দেহ ও মনের বিশেষ কোন পরিবর্তন অনুভব করিনি। পরীক্ষা করে জানি যে, যদি তাতে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাংস থাকে বাঙালী খাদ্য বাঙালীর দেহ গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়। অ্যালেকিসস্ ক্যারেল তর্ক করে গেছেন যে, পৃথিবীর যতো বিজয়ী বীর তারা সকলেই মাংসাহারী তৃণভোজী, দুগ্ধসেবী নয়। কথাটা ওই সীমানার ভিতর সত্য। কিন্তু যাঁরা উচ্চস্তরের মানুষ তাঁদের সকলেই দুগ্ধসেবী ও নিরামিষাশী। মাংসহীন খাদ্য সহনশীলতা বর্দ্ধন করে, তার দ্বারা শক্তির ব্যবহারটাকে দীর্ঘকালস্থায়ী করা হয়। মাংস কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কালের পরিধিতে শক্তির অত্যুগ্র উত্তেজনা সাধন করতে পারে। আমার মতে আমাদের সাধারণ জীবনের জন্য দুইয়েই সমন্বয় হলে ভালো হয়। উত্তর প্রদেশের বা পঞ্জাবের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীর দেহ বাংলা দেশের বাঙালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃষ্টতর খাদ্য ও জলবায়ু তার কারণ। কিন্তু মনন শক্তি ও নির্ভীকতায় উৎকৃষ্টতর খাদ্যভোজীরা যে বাঙালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, একথা স্বীকার করে নিতে আমি রাজী নই। [ক্রমশঃ।

বুদ্ধিমান

শ্রীরবিদাস সাহা-রায়

বল খেলে বলরাম জ্বরে ভোগে তিন মাস,
বল খেলা ছাড়ে তাই খেলারাম বিশ্বাস।
কড়ি খেলে হরিদাস মরে শূল বেদনায়,
সেই থেকে ছাড়ে খেলা তেহ্বার খাঁদু রায়।
তাস খেলে কাশ রোগে মারা গেল কেষ্টা,
বুদ্ধির ঢেঁকি ভোলা খেলা ছাড়ে শেষটা।
বকুমারি লেখাপড়া—হতে গেলে বিদ্বান,
ইস্কুল ছেড়ে তাই যদু দেয় পিঠ টান।

ইন্দিরা দেবী

৫

এলিসের কিছুই ভালো লাগছিল না। কি করে সে পাহাড়ের ধারে ফিরে যেতে পারে ভাবছিল। এমন সময় তার কানের কাছে মিহি গলায় কে বলে উঠলো, 'সবাই তোমায় নিয়ে ঠাট্টা করছিল, আর তুমি একটা কথারও জবাব দিতে পারলে না?' বার বার একই ধরণের কথা বলতে এলিসের ভালো লাগছিল না। সে এবার থাকতে না পেরে বলে উঠলো: 'ওরকম জ্বালাতন করো না। তোমার যদি ঠাট্টা করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে তুমি যত খুসী ঠাট্টা করগে, আমায় ঘাঁটাতে এসো না।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে এলিসের কানের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হলো। আওয়াজটা এত মৃদু যে, কানের কাছে হয়েছে বলে শোনা গেল। আবার এলিসের কানের কাছে ভেসে এলো সেই মিহি গলার আওয়াজ—'আমার উপর রাগ করো না। তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাই আমি, কিন্তু আমি তো সামান্য ছোট্ট একটা কীট।'

এলিস বললে: 'কি ধরণের কীট?' তার আওয়াজে বোঝা গেল, সে ভয় পেয়েছিল। কে জানে কি ধরণের কীট, পোকামাকড়, কামড়ে দেবে কি না কে জানে!

এলিসের কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দু'টো-একটা কথা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ইঞ্জিন হুইশেল দিয়ে আওয়াজ করে উঠলো যে ও কি বলতে যাচ্ছিল চাপা পড়ে গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজে সবাই চমকে উঠলো। ঘোড়া একটু আগে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল, সে মুখটা টেনে নিল। সবাই-এর মুখে-চোখে ভয় আর ভাবনা, কি এমন হলো যার জন্য ইঞ্জিন ঐ রকম চীৎকার করে উঠলো—কিন্তু একটা বিপদ-টিপদ ঘটবে না তো?

ঘোড়া তখন সকলকে আশ্বস্ত করে বললে: না তেমন কিছু নয়—এখনি লাফিয়ে একটা নদী পার হতে হবে, তাই ও-রকম আওয়াজ দিচ্ছিল। ঘোড়ার কথা শুনে আর সবাই আশ্বস্ত হলো, কিন্তু এলিস ভরসা পেলো না। লোকজন শুদ্ধ গোটা গাড়ীটা লাফিয়ে নদী পার হবে, একথা ভাবতে তার ভয় হচ্ছিল। তবু সে ভাবলে, যা হয় হোক চার নম্বর ঘরে নিয়ে যদি পৌঁছয়, তাহলে মন্দের ভালো। তার পরক্ষণেই গাড়ীটা লাফিয়ে শূন্যে খানিকটা উঠে গেল আর একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনী দিল। এলিস ভয়ে চোখ বুঁজে হাতের কাছে যা জড়িয়ে ধরলো, সেটা আর কিছু নয়, পাশে যে ছাগলটা বসেছিল তার দাড়ি।

তার পর কি যে হলো এলিসের একটু মনে নেই, খালি মনে ছিল হাত বাড়িয়ে যখন ছাগলের দাড়ি মুঠো করে ধরতে গেল, তখন দাড়ি-শুদ্ধ ছাগল কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু ছাগল কেন, লোকজন সমেত গোটা গাড়ীটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এর পর যখন এলিসের ভালো করে বোঝবার ক্ষমতা এলো, তখন চারি দিক তাকিয়ে দেখলো যে, সে একটা গাছের তলায় বসে আছে। কাছে কোনো জন-প্রাণী নেই, শুধু মস্ত বড় একটা মাছি, গাছের একটা ডাল খুব নীচু হয়ে ঝুলছিল, তারই আগায় বসে মাছিটা ক্রমাগত ডানা মেলে তাকে হাওয়া দিচ্ছিল। ও-রকম বড় মাছি এলিস এর আগে কখনও দেখেনি। একটা মুরগীর বাচ্চার মত বড় হবে অথবা তার চেয়ে বড়। এই বার এলিস বুঝতে পারলো গাড়ীতে থাকবার সময় যে খুব মিহি সুরে কথা বলছিল এ মাছিটা সেই। এইবার এলিসকে চোখ মেলতে দেখে মাছি বললে, 'পোকা-মাকড়দের তুমি দু'চক্ষে দেখতে পারো না—না?'

এলিস বললে: 'না তা কেন? যারা কথা বলতে পারে তাদের আমার খুব ভালো লাগে। আমি যে দেশে থাকি সে দেশের পোকা-মাকড় কেউ কথা বলতে পারে না।' মাছি তখন বললে, 'আচ্ছা তোমার দেশের পোকা-মাকড়দের মধ্যে কা'কে তোমার ভালো লাগে?' এলিস বললে: 'ভাল কা'কেও লাগে না। কতকগুলো পোকাকে তো রীতিমত ভয় করি। তাদের কারুর কারুর নাম জানতে চাও তো বলে দিতে পারি।'

মাছি খুব মন দিয়ে এলিসের কথা শুনছিল। এবার বললে, 'আচ্ছা, নাম ধরে ডাকলে তারা সাড়া দেয় কি?'

এলিস বললে: 'না ডাকলে তারা কেউ সাড়া দেয় না।'

মাছি বললে: 'তাহলে নাম থেকেই বা লাভ কি? আমরাই ভাল আছি। আমাদের নামের বালাই নেই।' তার পর খানিকক্ষণ কি ভেবে বললে—'আচ্ছা তুমি তো আবার দেশে ফিরে যাবে, তখন যদি তোমার নামটা এখানে ফেলে রেখে যাও তাহলে বেশ মজা হয় না?'

এলিস বললে: 'মজা আবার কি?'

মাছি বললে: 'মজা নয়? ধরো সকাল বেলা তোমাকে যিনি পড়াতে এসেছেন, তিনি তোমায় ডাকতে গিয়ে তোমার নাম খুঁজে পাচ্ছেন না, আর তোমার নাম বলা হচ্ছে না বলে তুমিও পড়তে গেলে না। সমস্ত দিনটা ছুটি হয়ে গেল—মজা নয়?'

এলিস বললে: 'ও রকম যা-তা বলো না, নাম আবার লোকেরা ফেলে যাবে কি করে?'

মাছি সে কথার জবাব দিল না। এবার অন্য কথা পাড়লো। বললে: আমাদের দেশে কত রকমের পোকা-মাকড় রয়েছে এদের কারুর সঙ্গে তোমার দেখা হলো না। আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তার খুব কাছে ডান দিকে যদি একটু এগিয়ে যাও তাহলে দেখতে পাবে তোমাদের দেশের বাচ্চা ছেলেরা যেমন কাঠের ঘোড়ায় চেপে দোল খায়—ঠিক সেই রকম পোকা দেখতে পাবে।'

শুনে এলিসের দেখতে ইচ্ছা করলো। মাছির সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গাছতলার ঝোপ-ঝাড়ে-আড়ালে সে যা দেখলো—তাকে প্রথমে রঙচঙে সত্যিকারের একটা কাঠের ঘোড়াই ভেবেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ ওখানে দাঁড়ানো সম্ভব হলো না। মাছিটা তাকে কাছাকাছি দার একটা ঝোপে নিয়ে গেল, সেখানে ঘন ঝোপের আড়ালে সে দেখতে পেলো নতুন একটা পোকা। এলিস বললে: 'জানো পুডিং দিয়ে এর গা তৈরী আর মাথার ভিতরটা কিসমিস-ভর্ত্তি। বিস্কুট আর কেক ছাড়া এরা অন্য কিছু খায় না।'

এলিস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মাছি বললে: 'চল, এক জায়গায় অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কি করে চলবে?'

খানিক দূর এগোবার পর তারা দেখতে পেলো, ঘাসের উপর দিয়ে আর একটা পোকা আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। দেখতে অনেকটা এলিসের দেশের প্রজাপতির মত। শুধু তফাৎ এই যে, এর গোটা শরীরটা রুটি আর মাখন দিয়ে তৈরী।

বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থেকে এলিস বললে: 'আচ্ছা এরা কি খেয়ে বেঁচে থাকে?'

মাছি বললে: 'পাতলা চা আর ক্রীম।'

: 'এ যদি সব না পাওয়া যায়?'

: 'তাহলে মরতে হবে।'

এর পর এলিসের মনে হলো, আর জানবার মত কোনো কথা নেই। তাই সে চুপ করে থাকলো।

হঠাৎ তার কানের কাছে খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হলো। আওয়াজটা লক্ষ্য করে তাকাতেই এলিস দেখতে পেলো, তার বন্ধু মাছি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার বড় বড় চোখ দুটোর কানায় কানায় জল ভর্ত্তি।

এলিসের ভারী দুঃখ হলো, যার জন্য ও-রকম চোখ-ভর্ত্তি জল। কিন্তু অবাক কাণ্ড—কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মাছি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এধার-ওধার চার দিকে তাকিয়েও কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না।

এলিসের ঐখানটা থাকতে আর ভাল লাগলো না, সে এক পা দু'পা করে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে একটা খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল। মাঠের পাশেই ঘন বন—আগে যে বনটা দেখেছিল, এটা যেন তার চেয়েও ঢের বড়, আর ঘন বলে মনে হলো। ও বনের মধ্যে ঢুকবে কি করে, এই ভেবে খুব ভয় হলো তার মনে। কিন্তু ভয় করে কি লাভ, যেতে তো হবেই। আট নম্বর ঘর না পৌঁছান পর্য্যন্ত তার থামবার উপায় নেই। এলিস ভাবলে, এটা নিশ্চয়ই সেই বন যেখানে কোনো কিছুরই নাম নেই। কিন্তু আমার তো নাম রয়েছে। বনে ঢুকলে আমার নামের কি হবে? নাম হারিয়ে যাবে না তো?

কে জানে আমার নামটা হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হবে, আর আমাকে হয়তো দিয়ে দেবে অন্য কারুর কাছ থেকে একটা বিচ্ছিরী নাম। তার পর হয়তো আমার নামকে ক'দিনে খুঁজে পাওয়া যাবে কে জানে? এলিসের মনে পড়লো, দেশে থাকতে কত দিন খবরের কাগজে দেখেছে কুকুর হারিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞাপন। লম্বা লোমওয়ালা সাদা কুকুর গলায় চামড়ার বেল্ট লাগানো 'টমি' বলে ডাকলে সাড়া দেয়। শেষকালে তাকেও তো নাম ধরে ডেকে খুঁজে বার করতে হবে। এই রকম ভাবতে ভাবতে এলিস কখন গিয়ে বনে ঢুকে পড়েছে খেয়াল নেই। দু'ধারে ঝাকড়া-মাথা লম্বা লম্বা গাছ আর ছায়ায় ঢাকা গাছের তলায় হাঁটতে হাঁটতে মুহূর্ত্তের মধ্যে এলিসের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবলে, বাঃ এই গাছটি তো বেশ! পরক্ষণেই গাছটার নাম মনে করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। কিছুতেই নামটা মনে পড়ছে না। প্রথম ভেবেছিল, চট করে নামটা মনে পড়ে যাবে, কিন্তু তার পর অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই নামটা মনে পড়লো না, তখন সে ভাবলে সত্যিই এ বনে নাম হারিয়ে যায়—তাহলে আমার নাম?' এই যাঃ, মনে পড়ছে না তো? নিজের নাম ভুলে যাবে এটা কখনও সম্ভব হতে পারে না বলে এলিসের কোন দিন বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু আজকে অসম্ভবও সম্ভব হলো। কিছুতেই নিজের নাম মনে হচ্ছে না। শুধু মনে পড়ছে নামের বানানে একটা 'ল' অক্ষর ছিল, কিন্তু ব্যস ঐ পর্য্যন্ত, তার চেয়ে বেশী কিছু আর মনে করতে পারছে না।

এমনি সময় একটা নাদুস-নুদুস বাচ্চা হরিণ ছুটে সেখানে এলো। চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ এলিসকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এলিসকে দেখে একটুও ভয় পেলো না। টানা টানা চোখ মেলে তার দিকে তাকালো। এলিস ছুটে গিয়ে পাশে দাঁড়ালো। গালিচার মত নরম তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এলিস তার সঙ্গে ভাব করতে চাইলো। হরিণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'তুমি কে? তোমায় সবাই কি বলে ডাকে?' ভারি মিষ্টি আওয়াজ হরিণের—কিন্তু এলিস তার কথার জবাব দিতে পারলে না। নামটাই তো তার মনে পড়ছে না। হরিণ বললে: 'আচ্ছা আর একটুক্ষণ ভাবো, তার পর বলো।'

কিন্তু অনেক ভেবেও এলিসের নাম আর কিছুতেই মনে পড়লো না। তার পর তার মাথায় এক নতুন বুদ্ধি এলো, সে হরিণকে বললে: 'আচ্ছা, তোমার নামটা বলো না ভাই, তাহলে আমার নামটা বলে দেওয়া সহজ হবে।'

হরিণ বললে: সে তো এখানে সম্ভব নয়, তুমি আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে চলো তখন বলতে পারবো। বলতে বলতে হরিণ এগিয়ে গেলো, আর এলিস তার গলা জড়িয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে চললো।

খানিক দূর যাবার পর তারা বন পার হয়ে যেই একটা মাঠে পৌঁছলে সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা এক লাফ দিয়ে এলিসের কাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমি কে জিজ্ঞাসা করছিলে? আমি বাচ্চা হরিণ।'

পরক্ষণেই হরিণটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এই বার এলিসেরও মনে পড়ে গেল তার নাম এলিস! বার বার এলিস নামটা বলতে বলতে সে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনও এ নাম ভুলবে না।

এবার সামনে তাকিয়ে এলিস রাস্তা দেখতে পেলো। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়, ভেবে এলিস সে রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো খানিকটা এগিয়ে যাবার পর রাস্তার ধারে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলো, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'এ রাস্তার ধারে টুইড্‌ল ডাম আর টুইড্‌ল ডীর বাড়ী' এলিস সাইনবোর্ডটাকে ডাইনে রেখে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। এবার তার গতি খুব তাড়াতাড়ি হলো। বেলা খুব বেড়ে চলেছে—সন্ধ্যার আগে তো সেই আট নম্বর ঘরে পৌঁ

পৌঁছনো চাই। খানিক দূর গিয়েই রাস্তাটা হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে, আর সেই মোড় ধরে খানিকটা এগোতেই অদ্ভুতমূর্ত্তি ছুটো মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। হঠাৎ সে মূর্ত্তি ছুটো দেখে এলিস হকচকিয়ে গেল।

মূর্ত্তি ছু'টো একটা গাছের তলায় কাঁধ ধরাধরি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। এলিস বুঝতে পারলো এরাই টুইডেল ডাম আর টুইডেল ডী ছাড়া আর কেউ নয়। ভালো করে তকিয়ে সে দেখলো যে, তাদের এক জনের গায়ে জামার কলারের উপর 'ডাম' আর এক জনের 'ডী' লেখা আছে। বাকীটা অর্থাৎ টুইডেল কথাটা কাঁধ ধরাধরি করে ছিল বলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এলিস বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ছিল। এরকম কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি সে জীবনে কখনও দেখেনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এমন সময় শুনতে পেলো রাশভারী গলায় এক জন বলছে, 'হাঁ করে দেখছো কি, আমরা কি মোমের তৈরী পুতুল? তাই যদি ভেবে থাক, তাহলে বিনা পয়সায় অতক্ষণ তাকানো যেতে পারে না।' কথাগুলো বলছিল 'ডাম' লেখা ভদ্রলোক। তার কথা শেষ হতে না হতে 'ডী' লেখা ভদ্রলোক বলে উঠলো, 'আমাদের যদি জ্যান্ত মানুষ বলেই মনে করে থাকো, তাহলে কি কথা বলতে হয় না? একটা সাধারণ ভদ্রতা আছে তো!'

ওরকম ধরণের কথার জন্য এলিস তৈরী ছিল না। তাই বললে, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না।'

এদের সঙ্গে যখন কথা বলছিল, তখন এলিসের মনে পড়ছিল কিছু দিন আগে পড়া একটা ছড়ার কথা। তাতে টুইড্‌ল ডাম আর টুইড্‌ল ডী'র কথা আছে। কি একটা সামান্য কারণে তাদের মধ্যে খুব ঝগড়াঝাঁটি চলছে, এমনি সময় যেই তাদের মাথার উপর দিয়ে একটা কালো কাক উড়ে গেল তখনি ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে ভয় পেয়ে ছু'জনেই যে যার ঘরে ঢুকে পড়লো। এই নিয়ে কবিতাটা লেখা হয়েছিল। সেকথা মনে পড়াতে এদের সাহসের কথা ভেবে এলিসের হাসি পেলো। এলিস যখন এই সব কথা ভাবছে তখন টুইড্‌ল ডাম বলে উঠলো: তুমি যা ভাবছো তা একটুও সত্যি না।

এলিস বললে: 'আমি কি ভাবছি তোমরা তা জানবে কি করে? আমি ভাবছিলাম, কি করে এই বন থেকে বার হওয়া যায় সেই কথা। তোমরা নিশ্চয় জানো, দয়া করে বলে দেবে—রাস্তাটা কোথায় পাবো?' ওরা সে কথার জবাব না দিয়ে এক জন আর এক জনের দিকে তাকাতে লাগলো।

এলিস দেখলো মহাবিপদে পড়া গেছে। ওদের কাছ থেকে কখন কথার জবাব পাওয়া যাবে, আর যাবে কি না তাই বা কে জানে?

কায়া ও মায়া

[সংযুক্ত অক্ষর ও ছুই অক্ষরের বেশী শব্দ বিবর্জ্জিত গল্প]

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কায়া আর মায়া—ছুই হ'লো এক। এক হ'লো ছুই। যার কায়া তার মায়া—যার মায়া তার কায়া।

কায়া শুধু কায়া—পা নেই—খোঁড়া। আছে শুধু চোখ আর খুব বোধ। সে শুধু দেখে আর ভাবে। কি আর করে?—আর কেউ তো কোথা নেই—তার মায়া আছে, তার মাঝে লীন—এক হয়ে তার সাথে মিলে ও মিশে।

কায়া ভাবে—আমি হই বহু, আমি করি লীলা—আমি করি খেলা। তাই আগে কায়া হ'লো ছুই—কায়া আর মায়া। মায়া পেলো শুধু বল—পাই নি কোন চোখ। মায়া হ'লো কানা। তার না হ'লো কোন বোধ—তাই হলো বোকা। মায়া কিছু দেখে না—কিছু ভাবে না।

কায়া শুধু বসে থাকে—নড়ে না—চড়ে না। কায়া শুধু ভাবে আর দেখে—মায়া, যার চোখ নেই বোধ নেই—যে শুধু শুধু গড়ে আর ভাঙে, ভাঙে আর গড়ে—শুধু শুধু হাসে আর কাঁদে।

কায়া শুধু ভাবে আর দেখে—ঐ যে মায়া, তার খেলা তার কাজ—ভাঙা আর গড়া। মায়া কিছু ভাল গড়ে না—আধ খানা গড়ে আর ভাঙে—হাসে আর কাঁদে। কায়া ভাবে মায়া কেন হাসে—কেন কাঁদে—কিসে হয় তার সুখ, কেন হয় তার ছুঃখ। তার সাধ হয় সেও করে খেলা—মায়া যে খেলা করে—যে কাজ করে—তা'তে সে দেয় যোগ।

কায়া ধীরে ধীরে ডাকে—ওলো মায়া! তুমি শুধু শুধু ভাঙো আর গড়ো! তোর কোন খেলা, কোন কাজ তো ভাল হয় না। বুঝে সুঝে খেলা করো—তা'তে যা' হবে খেলা—তাই হবে কাজ। শুধু জোরে কি কিছু হয়? আগে ভাবো, পরে কাজ করো—না ভেবে করে কাজ। সে পায় ছুঃখ লাজ।

মায়া চারি দিকে ঘোরে আর বলে—কে গা তুমি? কোথা তুমি? কোথা থেকে তুমি কথা বলো! তুমি কে? আমি কে?—আমি তো কিছু দেখি না।

মায়া বলে—আমি কে, তা' কি তুমি জান? মনে হয়, তুমি আমি এক। আমি তোর—তুমি মোর! কভু মনে হয়, তুমি আছ কাছে—কভু মনে হয়, তুমি আছ দূরে—বহু দূরে।

কায়া বলে—তুমি আমি এক—তবু তুমি থাক দূরে। আমি খোঁড়া, তাই তোর কাছে থেকে দূরে আছি! এস, এক সাথে মিশি আর খেলা করি। তাতে যা' হবে খেলা—তাই হবে কাজ।

মায়া বলে—আমি তো কিছু দেখি না—আমি তো বোকা। কি করে আগে ভেবে খেলা করি—কাজ করি তাই মন যা' চায় তাই গড়ি—মন যা' চায়—ভাঙি। আমি চুপ করে থাকি না—ভেবে কোন কাজ করি না—কাজ করে পরে ভাবি না। ভুল করে গড়ি—ভুল করে ভাঙি। হাসি পেলে হাসি—চোখে জল আসে কাঁদি।

কায়া বলে—আমি যা' যা' বলি, তুমি তাই করো। যা' বলি তাই গড়ো—যা' বলি তাই ভাঙো! তাহ'লে সে হবে ভালো খেলা—ভালো কাজ। খেলা হবে কাজ—কাজ হবে খেলা!

মায়া বলে—আমি আছি কোথা, তুমি আছ কোথা! আগে সাথী হও—সাথে সাথে থাকো—তবে তো তুমি ঠিক ঠিক বলে দেবে!

কায়া হেসে বলে—সে তো ঠিক কথা! আমি হবো সাথী!

মায়া হাসে আর বলে—তুমি বলো—তুমি খোঁড়া—তবে কি ভাবে হবে সাথী! আমি তো ভেবে পাই না।

কায়া হাসে আর বলে—তুমি এসো কাছে—আরো কাছে—তুমি আমি এক—এই কথা ভাবো—আমি তোর কাঁধে চড়ি—আর তোর

জোরে তোর পায়ে চলি—আর তুমি মোর চোখে দেখ, আর যা' যা' বলি সেই সেই খেলা করো। তাতে যা' হবে খেলা, তাই হবে কাজ।

মায়া এসে কাছে ঘেঁসে বসে—হাসে আর বলে—বেশ! এসো মোর কাঁধে ওঠো—হও মম সাথী চিরদিন!

কায়া ওঠে কাঁধে—মায়া চলে ধীরে ধীরে। কায়া বলে—মায়া গড়ে। কায়া বলে—মায়া ভাঙে! কানা মায়া পেল তার চোখ—তার বোধ। খোঁড়া কায়া পেল তার গতি আর বল।

কায়া আর মায়া এক সাথে হাতে হাতে তালি দিয়ে নেচে নেচে চলে। করে নানা খেলা—হয় নানা কাজ।

কায়া হলো বহু। হলো নানা গুণ—নানা রূপ—নানা রস। হ'লো দেশ—হ'লো কাল। হ'লো জল, বায়ু, তেজ, সব। হ'লো রবির হ'লো চাঁদ—এক নয়, দুই নয়—কোটি কোটি। হ'লো দিন—হ'লো রাত! হ'লো নানা শিলা—নদ-নদী। হ'লো গাছ—হ'লো নানা জীব—তার দেহ তার মন। হ'লো তার সুখ, দুঃখ, ভয়! তবু তারা ভাবে না—কোথা থেকে তারা সব এলো—কোথা তারা সব ফিরে যাবে! তারা দেখে—সব দিন নব নব সাজে আসে কোথা হ'তে কত রূপে কত শত জন। আর কত ভাবে কোথা চলে যায় কত শত জন। তারা ভাবে কত শত কথা! শুধু ভাবে না—ঐ কথা—'কোথা হ'তে আসি কোথা ফিরে যাই'—কে এ সব করে!—কে তিনি? কোথা তিনি?

এই হ'লো মায়া আর তার খেলা। কায়া ভাবে—মায়া হাসে। কায়া দেখে—মায়া কাঁদে। জীব সব তার সাথে হাসে আর কাঁদে। কেঁদে কেঁদে মরে যায়—তবু ভাবে না এই সব রূপ, রস, গুণ, দেশ, কাল, তার পারে কে আছে?—তাকে ডাকে না—তার কথা ভাবে না। এই ভাবে চলে চিরদিন। হেথা থেকে যায় আর ফিরে ফিরে আসে—নানা সাজে, নানা রূপে! শুধু দুই এক জন আর ফেরে না—সে শুধু বলে যায়—তিনি সব! সব তিনি।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ!

এস সবে মোরা এক সাথে বলি—শুভ হোক! শুভ হোক! শুভ হোক!

নারী কি ও কে?

(মনুসংহিতানুযায়ী)

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো, নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ ক্রিয়া।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

অর্থ—স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ নাই; পৃথক ক্রিয়া নাই; পতিকে যে শুশ্রূষা করে, তদ্দ্বারাই সে স্বর্গে সম্মানিত হয়।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥

অর্থ—নারী বালিকাই হউন, যুবতীই হউন বা বৃদ্ধাই হউন, স্বীয় গৃহেও স্বাধীন ভাবে কোনও কার্য্য করিবেন না।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

অর্থ—নারী বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবেন; যৌবনে পতির বশে থাকিবেন; পতির মৃত্যুর পরে পুত্রদিগের বশে থাকিবেন; স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না।

মনুই অন্য স্থানে বলিতেছেন:—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈব পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥

অর্থ—পিতা, ভ্রাতা, পতি বা দেবরগণ, যদি কল্যাণ চান, তবে নারীকে সম্মান করিবেন এবং বেশভূষা দ্বারা ভূষিত করিবেন।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অর্থ—নারীগণ যেখানে সম্মান পান, সেখানে দেবতাগণ প্রসন্ন, যেখানে ইঁহাদের আদর নাই, সেখানে সমুদয় ক্রিয়া বিফল।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

অর্থ—স্ত্রী, ভগিনী, স্নুষা প্রভৃতি কুলকামিনীগণ যে-গৃহে দুঃখে দিন কাটায়, সে-গৃহ ত্বরায় বিনষ্ট হয়; ইহারা যেখানে সুখে থাকে, সে-গৃহের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

অর্থ—অতএব কল্যাণেচ্ছু পুরুষগণ নারীদিগকে সর্ব্বদা সমাদরে রাখিবেন এবং ক্রিয়া, কর্ম্ম ও উৎসবাদিতে বসন, ভূষণ, অন্নপানাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

নয়

ঘটনাটা এমনই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল!

লক্ষ্ণৌ-এর একজন বিশিষ্ট গায়ক সহরে এসেছিলেন। শৈলেশ গোবিন্দ নিজে যে ভালো গাইয়ে অথবা বাজিয়ে তা নয়। কিন্তু গান শোনার শখ অপরিমিত। শহরে কোনো ওস্তাদের আসার খবর পেলেই তিনি যে কোনো উপায়ে হোক, তাঁকে নিজের বাড়িতে আনবেনই। এবং কয়েক দিন রেখে গান-বাজনা শুনে উপযুক্ত দক্ষিণান্তে বিদায় করেন। এ স্বভাবটা ওঁদের বংশগত। এখন ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে পারা যায়।

বর্তমান ওস্তাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হল না। গত কাল দ্বিতীয় দিন তাঁর গান হল। তিনি একা আসেন নি, বাজিয়ে-পরিবৃত হয়েই এসেছেন। তা ছাড়া শৈলেন গোবিন্দের কয়েকটি উকিল-বন্ধুও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

গান হল রাত একটা পর্যন্ত। মদ্যপানও চলল সেই পর্যন্ত। তার পরে আহারাদির পর্ব। সে-ও একটা বিরাট ব্যাপার! অন্দরে যেতে শৈলেশের আড়াইটা বেজে গেল।

তার পরে রাত্রি যখন চারটে, কি তারও বেশি, তখন শৈলেশ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম ছটফট করতে লাগলেন। এটাকে মাতলামিরই একটা অভিনব অধ্যায় ভেবে মণিমালা প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু ক্রমে তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর ডাকে বাড়ির সকলেই উঠে পড়ল। হরসুন্দরীও এলেন।

প্রথমে ব্যাপারটা যে কি, সেইটে বুঝতেই সকলের অনেকখানি সময় গেল। তার পরে যখন বুঝলে যে, এটা সামান্য ব্যাপার নয়, তখন কয়েক জন ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

তখন ভোর হয়ে এসেছে।

সুতরাং ডাক্তারকে পেতে বিলম্ব হল না। জমিদার-বাড়ির আহ্বান শুনে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন। তখন অবস্থা অন্তত তাঁর আয়ত্তের বাইরে। মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে তিনি একটা ইন্‌জেকশন দিলেন বটে, কিন্তু তার ফল যে কিছুই হবে না, জেনেই দিলেন।

তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই শৈলেশের মৃত্যু হল।

ডাক্তার নিঃশব্দে মাথা নিচু করে যখন বেরিয়ে গেলেন, তখনও পরিজনবর্গ বুঝতে পারলে না। বুঝতেও কিছু সময় নিলে। মৃত্যু যে এমন আচম্বিতে আসতে পারে, এ যেন কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

বোঝার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের মতো সকলের কান্না যেন ফেটে বেরিয়ে এল। মৃত্যু যেমন আকস্মিক, সেই গগনবিদারী কান্নাও তেমনি।

কিন্তু তখনও পায়ের গোড়ায় মণিমালা এবং মাথার দিকে হরসুন্দরী নিঃশব্দে বসে! হঠাৎ মণিমালা চীৎকার করে হরসুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল: মা গো! এ আমার কি হল!

হরসুন্দরী সাড়া দিলেন না। মণিমালার দিকে ফিরেও চাইলেন না। শুধু কাঠের মতো শক্ত হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে রইলেন।

সে একটা দৃশ্য! শব্দমাত্র না করে শোক যে এমন মুখর হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

খবর পেয়ে সমরেশও এলেন।

নিচের ঘরে একান্তে বসে তিনি দত্ত-বাটীর রক্ষিতদের নায়েবের সঙ্গে একটা বৈষয়িক কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

কাজটা জরুরী। এবং সদরে উকিলের মারফৎ তিনি গোপনে নায়েবকে আনিয়েছেন। তাঁর উকিলই তাঁকে জানিয়েছিলেন, রক্ষিতদের কাছে শৈলেশ গোবিন্দের যে বন্ধকী-কবালা আছে, সেটা তাঁরা বিক্রি করতে চান।

কথাটা শুনে তিনি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু তার পর যখন শুনলেন, অন্নদা রক্ষিত মারা গেছেন এবং তাঁর দুটি ছেলেই কলকাতায় থাকে, তারা সুদী-কারবার পছন্দ করে না, মামলা মোকদ্দমার ঝক্কিও পোয়াতে চায় না,—তখন মনে হল, এ দাঁও ছাড়া সঙ্গত হবে না। তিনি উকিলকে জানিয়েছিলেন, ওঁদের পক্ষ থেকে কেউ যদি অনুগ্রহ করে আসেন, তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

সেই আলোচনাই চলছিল।

সমরেশ বলছিলেন, সিকি সুদ নিয়ে তমসুকখানা দিলে তিনি কিনতে পারেন।

নায়েব মশাই হেসে উত্তর দিচ্ছিলেন, আপনি জ্ঞানী লোক। এ প্রস্তাব আপনার উপযুক্ত হল না। বারো আনা সুদ ছেড়ে দেওয়াটা কি সামান্য ব্যাপার!

সমরেশ এর একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভৃত্যের মুখে দুঃসংবাদটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ব্যস্ত ভাবে বললেন, কথা এই পর্যন্ত রইল। দিন পোনের-কুড়ি বাদে যদি আসেন, তখন শেষ কথা হবে।

শৈলেশ গোবিন্দের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে নায়েব মশাইও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন, দুই ভায়ের মধ্যে শত্রুতা যতই থাক, এ প্রসঙ্গ এখন বন্ধ থাকবেই। বললেন, সেই ভালো। আমি পরেই আসব। ইতিমধ্যে বাবুদের সঙ্গে একটা আলোচনাও করতে পারব।

তিনি চলে গেলেন।

সমরেশও একখানা চাদর কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। ভিতরে খবরটা দিয়ে বলে দিলেন, অরুন্ধতীও অবিলম্বে যেন চলে আসে।

বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকলেও মণিমালার সঙ্গে অরুন্ধতীর এক দিনের সাক্ষাতেই যেন একটা সখিত্ব গড়ে উঠেছিল। অবিলম্বে সে-ও গিয়ে উপস্থিত হল।

পূজার প্রীতি-অভিনন্দন
প্রস্তুতকারীদের পক্ষ থেকে

প্রথম কয়েকটা মুহূর্তের স্তম্ভিত ভাবটা কাটবার পরেই শোক মুখর হয়ে ওঠে। ভাষায় নিজের তীব্রতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তার পরে ভাষাও এক সময় নিঃশেষ হয়ে আসে। আর সে শোকের নাগাল পায় না। তখন আসে একটা স্তব্ধতা।

অত্যন্ত দীন, অত্যন্ত রিক্ত একটা স্তব্ধতা, যার চেয়ে দুঃসহ দৃশ্য আর নেই।

সমরেশ নিঃশব্দে হরসুন্দরীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। অরুন্ধতী মণিমালার লুণ্ঠিত মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন।

সমরেশ এই প্রথম আত্মীয়ের মৃত্যু দেখলেন। মায়ের মৃত্যু তাঁর মনে নেই। নিতান্তই ছোট তখন। বাপের মৃত্যুর সময় বাইরে। এই প্রথম আত্মীয়ের মৃত্যু দেখলেন। মণিমালা বোধ করি অজ্ঞান! হরসুন্দরী একদৃষ্টে শূন্যের পানে চেয়ে। তাঁরও জ্ঞান আছে কি না বোঝা যায় না। আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী পাড়া-প্রতিবেশী আকুল হয়ে কাঁদছে। যারা শৈলেশকে ভালো বাসত আর যারা বাসত না, গ্রাম সম্পর্কে সকলেই উপস্থিত। কারও চোখ শুষ্ক নয়।

অশ্রুতে অশ্রু টানে। কিন্তু সর্বত্র বোধ হয় টানে না।

সমরেশের চোখে জলের বাষ্পটুকুও নেই। কিন্তু যদি কেউ ভাবে, শৈলেশকে তিনি ঈর্ষা করতেন, তাঁর সর্বনাশ কামনা করতেন বলেই বুঝি তাঁর চোখ শুষ্ক, তাঁরাও ভুল করবেন। চোখে জল তাঁর আসে না। হয়তো মৃত্যুর মুখোমুখী না দাঁড়ালে তিনি নিজেও তা জানতে পারতেন না।

হরসুন্দরীরও চোখে জল নেই। কিন্তু সে একটা কারণে। সমরেশের চোখে জল নেই, সে আর একটা কারণে। এক জনের বুকের অশ্রু শোকের আগুনে বাষ্প হয়ে উবে গেছে। অন্যজনকে শোক স্পর্শই করে নাই। শোকের আঘাতে যে স্নায়ুটা ঝন-ঝন করে বেজে ওঠে, সেই স্নায়ুটাই ওঁর নেই।

হরসুন্দরীর কাছে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ সমরেশ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় ওঁকে দেখতেই পেলেন না। সমরেশ ধীরে ধীরে রামপ্রসাদ বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

হাউ-হাউ করে কাঁদছিলেন তিনি। সমরেশকে দেখে বললেন, বড় বাবু, এ আমাদের কি হল?

সমরেশ এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কি উত্তরই বা দেওয়া যায়? তাঁর কাছে এ রকম প্রশ্ন করাও ছেলেমি, এর উত্তর দেওয়াও ছেলেমি।

জিজ্ঞাসা করলেন, খোকা কোথায়?

কমলেশের নাম তিনি জানেন না। কার কাছে যেন শুনেছিলেন, শৈলেশের একটি ছেলে আছে এবং সেটি কলেজে পড়ে।

—সে তো সহরে।—রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন।

—তাকে তো একটা খবর দেওয়া দরকার?

কমলেশ বাইরেই থাকে। ছোটখাটো ছুটিতে বড় একটা বাড়ি আসে না। লম্বা ছুটিতে আসে এবং দিন-রাত পাড়ার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বেড়ায়,—সেটা শৈলেশ মোটে পছন্দ করতেন না। রাগতেন, কিন্তু ছেলে বড় হয়েছে, তাকে মুখে কিছু বলতেন না। ছুটি শেষ হলে কমলেশ যখন সহরে ফিরে যেত, শৈলেশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। প্রজাদের অন্তরঙ্গ মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। ওটা তাঁদের বংশের রীতিবিরুদ্ধ।

সুতরাং কমলেশের কথাটা ম্যানেজার বাবুর খেয়ালই হয়নি। কিছুটা শোকের মুহ্যমানতার জন্যে, কিছুটা অনভ্যাসের জন্যেও। সমরেশ তার কথা তোলা মাত্র তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বললেন, ন'টার ট্রেণে যদি কাউকে পাঠান হয়, সে কি সময় মত ওকে নিয়ে ফিরতে পারবে?

সমরেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু চিন্তা করলেন।

বললেন, ফিরতেই হবে। সে না এলে তো কিছুই হবে না!

—না।

সমরেশ বললেন, এক জন বুদ্ধিমান লোক পাঠান। সে খোকাকে নিয়ে এখানে না এসে একেবারে গঙ্গাতীরের শ্মশানে যাবে।

এটা সম্ভব! শ্মশান এখান থেকে মাইল দশেক দূরে, ওদের আগের ষ্টেশন থেকে কাছে। লোকটি যদি এগারোটায় শহরে পৌঁছয় এবং কমলেশকে নিয়ে ছুটোর ট্রেণ ধরতে পারে, তাহলে আগের ষ্টেশনে নেমে পাঁচটার আগেই শ্মশানে পৌঁছুতে পারবে। ইতিমধ্যে এখান থেকে শব নিয়ে যাত্রা করবে এবং শবযাত্রীরা শ্মশানকৃত্যের জন্যে কমলেশের অপেক্ষা করবে।

রামপ্রসাদ বললেন, এই উত্তম যুক্তি।

সমরেশ বললেন, শ্মশানস্থ করা সম্বন্ধেই বা কি করবেন?

রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন, এখানে ব্রাহ্মণের শব অন্যকে দিয়ে তে… নিয়ে যাওয়ার প্রথা নেই?

—জানি।

—সেই রকম ব্যবস্থাই করতে হবে।

—কত জন যাবে?

—জন পঁচিশের কম হলে কি ভালো দেখাবে? কর্তাবাবুর সম… পঞ্চাশ জন গিয়েছিল। আপনি কি বলেন?

—কিছুই বলি না। ভালো দেখানো মন্দ দেখানোর ব্যাপারট… আমি ঠিক বুঝি না। যিনি বোঝেন তাঁর ওই অবস্থা!

সমরেশ হরসুন্দরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

তার পর বললেন, যাই করবেন তাড়াতাড়ি করবেন। শো… করার সময় তো পরে অনেক পাবেন।

কণ্ঠস্বর কঠিন এবং পাটোয়ারী। তার মধ্যে স্নেহ-মায়া-মম… শোক-দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই।

ম্যানেজার বাবু যদিও কর্মচারী, কিন্তু শৈলেশকে বলতে গে… কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। সেই সম্মান শৈলেশও যথাসা… তাঁকে দিয়েছেন। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে কর্মচারীর মতো ব্যবহ… করেন নি। তাঁর উপরে কথাও বলেন নি। অবশ্য সকলের মাথ… উপর হরসুন্দরী আছেন। সেজন্যে কথা বলার আবশ্যকও হয়নি।

শৈলেশের আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতটা তিনিও যেন সহ্য কর… পারছিলেন না। চোখ মুছতে মুছতে তিনি শবযাত্রার আবশ্যক… ব্যবস্থা করবার জন্যে বাইরের দিকে চললেন।

কিন্তু তখনই হঠাৎ ফিরে এসে সমরেশের কাছে দাঁড়ালেন।

সমরেশ শৈলেশের দিকে চেয়ে ছিলেন। রামপ্রসাদের পা… শব্দে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে একটু দ্বিধা করে রামপ্রসাদ বললেন, এই মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার মনে কোনো সন্দেহ হয় না ?

সমরেশের ললাট মুহূর্তের জন্তে রেখাঙ্কিত হল। জিজ্ঞাসা করলেন, তেমন সন্দেহের কি কোনো কারণ আছে ?

—মৃত্যুটা এমন আকস্মিক যে, সন্দেহ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে সমরেশ বললেন, মৃত্যু আকস্মিক হলেই সব সময় অস্বাভাবিক হয় না ম্যানেজার বাবু !

তা হয় না অবশ্য। কিন্তু এটা—রামপ্রসাদের মনে সন্দেহ জেগেছে একটু।

—ডাক্তার এসেছিলেন ?

—শেষ মুহূর্তে এসেছিলেন।

—তিনি কি বলেন ?

—বলেন নি কিছুই। মানে জিগ্যেসও করা হয়নি।

—জিগ্যেস করুন তাঁকে।

—হাঁ। করতে হবে।

দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—ইতিমধ্যে কি করবেন ?

—বলুন কি করা যায় ?

—আমি কি বলব ? সন্দেহ জেগেছে আপনার মনে। কর্তব্যও আপনাকেই স্থির করতে হবে।

রামপ্রসাদ চুপ করে রইলেন।

সমরেশ বললেন, শৈলেশকে খুন করতে পারে আমি ছাড়া আর কোনো লোক আপনার জানা আছে ?

রামপ্রসাদ থতমত খেয়ে বললেন, না, না। আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না। আপনার কথা আমার মনেই ওঠেনি। তাহলে আপনার সামনে নিশ্চয়ই প্রসঙ্গটা তুলতে সাহস করতাম না।

—তাহলে কার কথা আপনার মনে উঠেছে ?

মাথা চুলকে রামপ্রসাদ বললেন, ঠিক কারও কথা যে মনে উঠেছে তা নয়। এরকম কেউ করতে পারে, বলে ভাবতেই পারছি না। কিন্তু—

বাধা দিয়ে সমরেশ বললেন, ভাববার কোনো কারণও নেই ম্যানেজার বাবু ! যত দূর বিশ্বাস, হঠাৎ হার্টফেল করেই শৈলেশ মারা গেলেন। ডাক্তারকে জিগ্যেস করে দেখুন, তিনিও সম্ভবত তাই বলবেন।

হার্টফেল করার ব্যাপারটা তখনও পাড়াগাঁয়ে অজ্ঞাত। সুতরাং আর কিছু বলতে সাহস না করলেও রামপ্রসাদ এটা ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু ন'টার ট্রেণের আর দেরি নেই। কমলেশের কাছে লোক পাঠানর জন্তে এবং শবযাত্রার ব্যবস্থা করতে তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শবযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন করে মধ্যাহ্নে সমরেশ বাড়ি ফিরলেন। তাঁর মাথায় তখন রক্ষিতদের কাছে দেওয়া শৈলেশের তমসুকখানার চিন্তা। রক্ষিতদের ছেলে দুটির

যে বিবরণ তিনি পেয়েছেন, তাতে তাঁর সন্দেহ মাত্র নেই যে, তারা যতশীঘ্র সম্ভব ওটা এবং আরও যে সমস্ত তমসুক আছে সবই সুবিধা দরে বিক্রি করে ফেলবে। ইতিমধ্যেই তারা নাকি কলকাতায় ফেরবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অন্ত তমসুক সম্বন্ধে সমরেশের আগ্রহ নেই। বস্তুত, জমিদারি কেনার চেয়ে মহাজনী কারবারই তাঁর পছন্দ। কিন্তু সম্পত্তিটা তাঁদেরই এবং পিতা মৃত্যুকালে তাঁকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেছেন, এটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

শৈলেশের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে যে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছেন, তাতে নিঃসংশয়ে বুঝেছেন যে, সমস্ত সম্পত্তিই অচিরে ঋণের সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। অত বড় সম্পত্তি কিনতে পারেন, এত টাকা তাঁর নেই। কিন্তু এই গ্রামের এবং পাশাপাশি আর দু'-একখানা গ্রামের জমিদারিও যদি তিনি কেনেন, তাহলে তাঁদের বংশের মর্যাদা কতকটা রক্ষা পায়।

কিন্তু শুধুই কি তাই? তমসুক কেনার মধ্যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের কোনো চক্রান্ত কি নেই?

বহু কাল পরে আজ প্রথম শৈলেশের মুখের দিকে তিনি সোজা ভাবে চাইলেন। বলতে গেলে, গৃহত্যাগের পর এই প্রথম তিনি শৈলেশকে দেখলেন। ফিরে আসার পরে এক-আধ দিন অল্প একটুক্ষণের জন্তে শৈলেশের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকবে হয়তো, কিন্তু সেটা দেখাই নয়। কেউ কারও দিকে মুখ তুলে চাননি।

শিশু শৈলেশের মুখখানাই সমরেশের আবছা মনে পড়ে মাত্র। সেই মুখের সঙ্গে এই মুখের কত পার্থক্য, অথচ কত সাদৃশ্য! একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রেখেই মানুষের চেহারার পরিবর্তন হয়।

সেই শৈলেশ! সমরেশ যখন তাঁকে ইন্দারার মধ্যে ফেলবার জন্তে টেনে নিয়ে চলেছে, তখনও সে হাসছে! সে হাসি কত নির্ভয়! কিছুই জানে না সে। দাদার উপর শিশুসুলভ নির্ভরতায় ভাবছে, এও এক খেলা বুঝি!

তার পরে কালক্রমে কত বদলে গেল সে! কোনো নিগূঢ় সাদৃশ্য রেখে নয়, আমূল পরিবর্তন! সমরেশের উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা তো রইলই না,—তার জায়গায় এল অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ।

মানুষের মন কি আশ্চর্য বদলে যায়! মূলের কোনো চিহ্নই কি রাখে না?

রামপ্রসাদের সন্দেহের কথাটা মনে পড়তে সমরেশ ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। ওরা কি তাঁকে সন্দেহ করছে নাকি?

সমরেশ হাসলেন। খুন তিনি করতে পারেন না তা নয়। খুন করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। শুধু সম্পত্তি নিয়েই নয়, অরুন্ধতীর মন হরসুন্দরী এমনই বিষিয়ে দিয়েছেন যে, সে ওঁর ছায়া মাড়ায় না। খুন তিনি করতে পারেন। শুধু শৈলেশকে কেন, প্রয়োজন হলে যে কোনো লোককেই করতে পারেন। তাতে তাঁর দ্বিধা নেই। যার দ্বিধা থাকে, তাঁর মতে সে স্ত্রীলোকেরও অধম।

কিন্তু খুন তিনি করবেন কেন?

খুনী হাতে ছোরা তুলে নেয় ভয়ে! যাকে সে মনে মনে ভয় পায়, তাকেই খুন করে। ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু বিদ্বেষ অতখানি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নয়। তাই শুধু বিদ্বেষে খুন করে না। খুন করে ভয়ে। যখন হাতের কাছে প্রতিশোধের আর কোনো উপায় খুঁজে পায় না, তখন। যখন মনে করে আ[...] যদি ওকে খুন না করি, ও আমাকে খুন করতে পারে, তখন।

সমরেশ ওঁকে খুন করতে যাবেন কেন? তিনি তো ওঁকে [...] পান না। ওঁর উপর প্রতিশোধ নেবার অন্ত সমস্ত অস্ত্রও নিঃ[...] হয়ে যায়নি। যথেষ্ট অস্ত্র রয়েছে হাতে। আরও অস্ত্র এসে যাচ্ছে। খুন করার কোনো প্রয়োজন তো দেখা দেয়নি! বরং শৈলেশ তাঁকে ভয় করেন। এবং শৈলেশ না হয়ে আজ সমরেশ যদি দৈব ওই ভাবে মারা যেতেন, তাহলে শৈলেশের উপরই সন্দেহ হওয়া বরং একটা সঙ্গত কারণ থাকত।

সমরেশ আপন মনেই হাসলে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সমস্ত গ্রাম যেন থমথম কর[...] শৈলেশের জন্তেই নিশ্চয়। মাতালই হোক, আর দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খ[...] হোক, গ্রামের লোক শৈলেশকে ভালোবাসে, বেশ বোঝা যায়।

সমরেশের মনে প্রশ্ন জাগল, তাঁর মৃত্যুতে গ্রাম কি এম[...] থমথম করবে? গ্রামের লোক তাঁকে ভয় করে, ঘৃণাও করে [...] হয়। ভালোবাসে না। তাঁর মৃত্যুতে কেউ কাঁদবে না। হয়[...] মৃতদেহটাকে এক বার ঠেলা দিয়ে প্রত্যেকে দেখে যাবে, লোক[...] সত্যই মরেছে কি না!

ভাবতেও সমরেশের হাসি এল।

না করুক। অমন হাপুস নয়নে কান্না সমরেশ পছন্দও করে ন[...]

কিন্তু কেউই কি কাঁদবে না? অরুন্ধতী? সে'ও কি [...] ছেড়ে বাঁচবে?

অরুন্ধতীর কথা মনে হতেই সমরেশের চিন্তা অন্ত পথে গে[...] সেই সকালে সে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে আসে, এখনও ফিরল না। করছে এতক্ষণ ধরে? করবারই বা আছে কী! মেয়েমানুষে[...] কাণ্ডই আলাদা!

তাকে আনতে কাউকে পাঠান দরকার কি না সমরেশ ভাবছে[...] এমন সময় অরুন্ধতীকে দেখা গেল। চোখ আরক্ত, থমথম ক[...] মুখ, হাঁটছে কিন্তু মনে হচ্ছে দেহটা যেন তার নিজের নয়!

সমরেশ অবাক হয়ে গেল।

শৈলেশকে অরুন্ধতী কখনও দেখেনি, চেনেও না। তাঁর [...] ওর শোকের কি আছে? সমরেশ ভাবতে পারলেন না, ভা[...] অভাস্তও নন যে, শোক শুধু তারই জন্তে নয় যে চলে যায়, যারা র[...] তাদের বেদনাও যে কোনো মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

তাঁর মনে হল, অরুন্ধতী যদি অপরিচিতের জন্তেও এমনি কাঁ[...] পারে, তাঁর জন্তেও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে নিশ্চয়।

সামনে এগিয়ে এসে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, এত দেরি হল [...] মা, বৌমা বোধ হয় খুব শোকার্ত, না?

এ কী আশ্চর্য প্রশ্ন! এ কি একটা প্রশ্ন?

অরুন্ধতী অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে এক বার চেয়েই নিঃ[...] পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সমরেশ ওর চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে এ[...] দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বসলেন।

রক্ষিতদের নায়েবকে একটা খবর দেওয়া দরকার। শ্রাদ্ধ[...] চুকে গেলেই যেন তিনি চলে আসেন। যেমন গোপনে এসেছি[...] এমনি করে। শুভ কাজে বিলম্ব নিরর্থক।

[ক্রম-

কার আয়ু কত দিন?

শোনা যায়, মঙ্গল গ্রহের মানুষদের পরমায়ু নাকি হাজার হাজার বছর। কিন্তু এটা ধারণা মাত্র। যত দিন না মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তত দিন সেখানকার প্রাণিজগতের ব্যাপারটা অনুমানই থেকে যাবে।

বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে বলেছেন যে, আপাততঃ যতদূর জানা গেছে তাতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া নিখিল বিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণিজগতের অস্তিত্ব নেই। প্রাণ আছে কেবল মাত্র পৃথিবীতে। এই পৃথিবীর মানুষের জীবনীশক্তি কতটুকু? কিন্তু যতটুকুই হ'ক, পৃথিবীর জীবিত প্রাণীদের মধ্যে মানুষের পরমায়ু অবহেলার নয়। কেবল মাত্র কচ্ছপ এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে হাতী ছাড়া মানুষের আয়ু প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক।

গালাপাগোস ও সেসিল দ্বীপপুঞ্জের বিরাটকায় কচ্ছপরা দু'শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তবে সাধারণতঃ তাদের আয়ু দেড়শো বছর পর্যন্ত। মানুষের আয়ু কোন কোন ক্ষেত্রে দেড়শো বছর পর্যন্ত দেখা বা শোনা গেছে। সম্প্রতি জানা গেছে যে, রুশিয়ার জনৈক লোকের বয়স দেড়শো বছর পার হয়ে গেছে। আরও শোনা যায়, আমাদের দেশে তৈলঙ্গ স্বামী নাকি তিনশো বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

বৃহৎ শ্রেণীর কচ্ছপদের মধ্যে অধিকাংশেরই আয়ু শতাধিক বৎসর। গালাপাগোস ও সেসিল দ্বীপের কচ্ছপ ছাড়া মরিসাস দ্বীপ এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার কচ্ছপরাও দীর্ঘজীবী। ছোট জাতের কচ্ছপদের আয়ু কদাচিৎ শত বৎসর অতিক্রম করে।

নেংটি ইঁদুর থেকে আরম্ভ করে অতিকায় তিমি পর্যন্ত সর্বজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কচ্ছপের পর দীর্ঘজীবী হ'ল হাতী। হাতীদের মধ্যে এক জাতীয় হাতী মানুষের চেয়ে অধিক দিন জীবিত থাকে—অন্যান্য হাতীদের আয়ু মানুষের সমান বা তার চেয়ে কম। বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানীর রেকর্ড অনুযায়ী জানা যায়, তাদের ১৭ হাজার হাতীর মধ্যে শতকরা মাত্র ১টি ৫৫ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং শতকরা দু'টিরও কম হাতীর আয়ু ৬৫ বছর অতিক্রম করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাতীরা শতায়ু হয় না। হাতীরা যে শতায়ু হয় না, তা নয়,—কিন্তু সেটা কদাচিৎ ঘটে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাতীদের আয়ু সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত খবর শোনা যায়।

হাতীর পরই ঘোড়াদের স্থান। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোড়া ৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। একটা ঘোড়া কেবল ৬২ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিল। চল্লিশ পার হলে বুঝতে হবে ঘোড়া অনেক দিন বাঁচলো। কিন্তু অত বয়স পর্যন্ত পৌঁছুবার পূর্বেই অধিকাংশ ঘোড়ার মালিক তাঁদের ঘোড়া মেরে ফেলেন। জলহস্তী, গণ্ডার, পিপীলিকাভুক এবং গাধার পরমায়ু ৪০ বছরের কিছু কম বা বেশী। কোন কোন ভল্লুক ৩০ থেকে ৩৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। কুকুরের আয়ু ২০ বছর পর্যন্ত হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুকুর তার অনেক আগেই মারা যায়। বিড়ালের আয়ু কিন্তু কুকুরের চেয়ে বেশী। কোন কোন বিড়াল ৪০ বছরের কাছাকাছি পর্যন্ত যায় এবং অনেকে ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। তিমি মাছ ৩৭ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে বলে জানা গেছে।

অন্য দিকে ক্ষুদ্রাকার কীটদের জীবন স্বল্পস্থায়ী। তবে একবার একটা ফিতা ক্রিমি মানুষের পেটের মধ্যে নাকি ৩৫ বছর বেঁচে ছিল।

সাধারণতঃ দেখা যায়, জীবজন্তুরা বন্য অবস্থার চেয়ে বন্দিদশায় অধিক দিন বাঁচে। বন্য অবস্থায় প্রকৃতির সর্বপ্রকার আঘাত সহ্য করে জীবজন্তুদের পক্ষে বার্দ্ধক্যদশায় পৌঁছন প্রায়ই হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের যে সব অক্ষমতা দেখা দিতে আরম্ভ হয়, তার জন্যও অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে থাকে। এই প্রাকৃতিক আক্রমণ, শারীরিক বৈকল্য এবং অপেক্ষাকৃত বলশালীর কোপ এড়িয়ে অতি অল্পসংখ্যক জীবজন্তুই তাদের স্বাভাবিক আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছুতে সমর্থ হয়। কিন্তু বন্দিদশায় এসব হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। সেখানে বিনা আয়াসে পর্য্যাপ্ত আহার, নিরাপদ আশ্রয়, ব্যাধিতে চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য স্বভাবতঃই তারা জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছতে পারে। পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, খেঁকশিয়াল বন্দিদশায় ২৫ বছর পর্য্যন্ত বাঁচে। কিন্তু বন্য অবস্থায় ১৪।১৫ বছরেই তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

জীবনীশক্তির দিক থেকে পাখীরাও কম যায় না। ১৮৮৭ সালে ডার্বিশায়ারে একটা রাজহাঁসকে গুলী করে মারার পর দেখা যায়, তার পায়ে ১৭১১ সালে খোদাই করা একখানা টিনের চাকতি রয়েছে। অর্থাৎ এর বয়স তখন ১৭৬ বছর। ১৮৪৫ সালে ফ্রান্সে একটা ঈগল মেরে ফেলার পর তার গলায় একটা পাতলা টিনের চাকতি থেকে জানা যায়, তার বয়স ১০ বছরেরও বেশী। দাঁড়কাককে প্রায় ৭০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচতে দেখা গেছে। তোতা-পাখীর আয়ু শতাধিক বছর। কাকাতুয়া ১০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। ছোট ছোট পাখীরা সাধারণতঃ ১০ বছরের বেশী বাঁচে না এবং অল্প দু'চার শ্রেণীর পাখী ছাড়া অধিকাংশ পাখীর আয়ু ১০ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

আয়ুর কম-বেশীর দিক থেকে গাছের রেকর্ড সবার উঁচে। কাকৃতি নামে এক শ্রেণীর ফুল আছে তাদের আয়ু মাত্র কয়েক ঘণ্টা। গমের ফুলের আয়ু দু' ঘণ্টা মাত্র। আর অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে ম্যাক্রোজামিয়া বলে এক গাছ আছে। তার বয়স অন্ততঃপক্ষে ১২ হাজার বছর—যদিও গাছটা উচ্চতায় মাত্র ২০ ফুট। ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের ওরোটাভা'র বিখ্যাত ড্রাগন গাছগুলির বয়স ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার বছর। তবে এই সব গাছের অধিকাংশই ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে। দক্ষিণ মেক্সিকোর ওয়াক্সাকার নিকট সান্তামেরিয়া ডা তুলে গ্রামে এক গীর্জার প্রাঙ্গণে একটা সাইপ্রেস গাছ আছে, তার বয়স ৫ হাজার বছর। গাছটার উচ্চতা প্রায় ১৫০ ফুট এবং তার গুঁড়িটা ২৮ জন লোকে হাত ধরাধরি করে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করতে পারে না।

উদ্ভিদ-জগৎ বাদ দিলে প্রাণি-জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই স্থায়িভাবে দীর্ঘজীবী। দু'একটি ক্ষেত্রে জীবজন্তুদের মধ্যে দীর্ঘ জীবন দেখা গেলেও মানুষের আয়ু অনেকক্ষেত্রে শতাধিক হয়ে থাকে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

'ইস্।' পল বললে, 'তার চেয়ে একটা খেঁকশিয়ালীকে পাশে নিয়ে বরং বসব।' বললে বটে, কিন্তু মিরিয়াম আর নিজের মাঝখানে ওর জন্যে একটু জায়গাও করে দিলে।

বিয়াট্রিস্ চেঁচিয়ে বললে, 'আহা, বাছার সুন্দর চুলগুলোকে এমন এলোমেলো করলে কে ?' বলে নিজের চিরুণী দিয়ে ওর চুল আঁচড়ে দিলে। 'আর ওর বেঁটে গোঁফ-জোড়া !' বলতে বলতে ওর মাথা তুলে ধরে গোঁফের উপর দিয়ে চিরুণী চালিয়ে দিল। বলল, 'কিন্তু পল তোমার গোঁফের মধ্যে সারা রাজ্যের দুষ্টুমি। বিপদের সঙ্কেত জানাবার মত লালও এর রঙ।···আচ্ছা, তোমার ঐ সিগারেটগুলো আর আছে ?'

পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার করে দেখাল পল। বিয়াট্রিস্ দেখে বলল, 'আহা, শেষ সিগারেটটিও আমি নিয়ে নিলুম,' ব'লে সিগারেটটি নিয়ে পুরলো ঠোঁটের ফাঁকে। পল একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরল, আর বিয়াট্রিস মহা আরামে টানতে লাগল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'ধন্যবাদ, প্রিয়তম !' ওর কথাবার্ত্তার মধ্যে দুষ্টুমির আনন্দ। মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করল, 'পল এ সব কাজ ভারী সুন্দর ক'রে করতে পারে, কী বলো মিরিয়াম ?'

—'হ্যাঁ, চমৎকার !' মিরিয়াম বলল।

পল নিজের জন্যে একটা সিগারেট তুলে নিল। বিয়াট্রিস নিজের মুখের সিগারেটটি ওর দিকে নাবিয়ে ধরে বলল, 'নাও বাপু, ধরিয়ে নাও।'

মাথা নীচু করে পল ওর সিগারেট থেকে নিজের সিগারেট ধরাতে গেল। সেই মুহূর্ত্তে বিয়াট্রিস-এর চোখে কী যেন এক ইশারা খেলে গেল। মিরিয়াম দেখল, পলের চোখ দু'টি দুষ্টুমিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে, তার আবেগভরা মুখ উচ্ছ্বাসে থরথর করে কাঁপছে। পল যেন তার নিজের মধ্যে নেই। মিরিয়ামের অসহ্য লাগল। এ পল ত' তার নয়। এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এর কাছে তার থাকা-না-থাকা সমান। মিরিয়াম দেখল, ওর রাঙা ঠোঁটে সিগারেটটি দুলে দুলে উঠছে। দেখল, ওর ঘন চুল অবিন্যস্ত হয়ে, বিয়াট্রিসের কপালের উপর এলিয়ে পড়েছে। দেখে তার মন ঘৃণায় ভরে গেল।

'দুষ্টু ছেলে !' ব'লে বিয়াট্রিস্ পলের চিবুক তুলে ধরে ছোট্ট একটি চুমু দিল গালে। পল বলল, 'দাঁড়াও, তোমার চুমুটা ফিরিয়ে দিচ্ছি !'

বিয়াট্রিস্ লাফিয়ে উঠে বলল, 'কক্ষণো নয়।' তারপর সরে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। মিরিয়ামকে বলল, 'ভারী বেহায়া, নয় মিরিয়াম ?'

মিরিয়াম বলল, 'ভীষণ।···তবে কথাটা কি, রুটিটার কথা একেবারে ভুলে যাচ্ছ না ত' ?'

'সর্ব্বনাশ !' ব'লে পল উনুনের ঢাকনা খুলে দেখল। বেরিয়ে এলো খানিকটা নীল রঙের ধোঁয়া আর পোড়া রুটির গন্ধ।

বিয়াট্রিস ছুটে এলো এদিকে। পলের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ'ল ত' !···প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে থাকার ফল এই।'

পল উনুনের সামনে উবু হয়ে বসে পোড়া রুটিগুলো সরিয়ে রাখছিল। বিয়াট্রিস্ তার কাঁধের পাশ দিয়ে এসে উঁকি মারল। একটা রুটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে, আর একটা ইটের মত শক্ত।

পল বলল, 'আহা, বেচারা মা !'

বিয়াট্রিস বলল, 'এটাকে ঝাড়তে হবে। চট্ ক'রে একটা ঝাড়ন নিয়ে এসো।' উনুনের উপর রুটিগুলো সরিয়ে রাখল সে। পল ঝাড়ন নিয়ে এলে তাই দিয়ে একটা খবরের-কাগজের উপর পোড়া রুটিটাকে ঝাড়া হ'ল। পোড়া রুটির গন্ধ যাতে দূর হয়ে যায়, তার জন্যে পল উনুনের মুখ খুলে দিল। বিয়াট্রিস সিগারেটের ধোঁয়া টানতে টানতে রুটি থেকে কালো ছাই ঝাড়তে লাগল। বললে, 'আমার মতে, মিরিয়াম তোমাকেই এর জের টানতে হবে।'

মিরিয়াম সবিস্ময়ে বলল, 'আমাকে ?'

—'হ্যাঁ গো। পলের মা বাড়ি ফেরার আগেই তুমি সরে পড়ো বাপু। তা'হলে পল হয়ত বানিয়েও বলতে পারবে যে, কাজের ভুলে এমনি ঘটে গেছে—অবশ্য যদি ওর মাকে বিশ্বাস করাতে পারে। আর যদি বুড়ি এসে আগেই হাজির হয়, তা'হলে পলের বদলে, যার নেশায় পলের এমন অবস্থা তার কান দুটোর উপর দিয়েই চোটটা যাবে।' ব'লে উচ্চস্বরে সে হেসে উঠল। মিরিয়ামও যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই যোগ দিল হাসিতে। কেবল পল মুখ ভার করে আগুনটাকে জ্বালাতে লাগল।

বাগানের ফটকে সাড়া পাওয়া গেল।

'জলদি !' ব'লে বিয়াট্রিস্ তাড়াতাড়ি চাচা রুটিটাকে দিল পলের হাতে। বললে, 'শীগ্গির একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুড়ে ফেল এটাকে।'

পল ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিয়াট্রিস্ সাত-তাড়াতাড়ি রুটির চাঁচাছোলাগুলি জড়ো ক'রে আগুনে ফেলে দিল, দিয়ে ভাল-মানুষের মত বসে রইল। দুপ্-দাপ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল এ্যানি। খাপছাড়া কিন্তু সপ্রতিভ। ঘরের জোর আলোতে চোখ কুঁচকে গেছে। বলল, 'পোড়া-পোড়া গন্ধ পাচ্ছি।'

বিয়াট্রিস মহা গম্ভীর ভাবে বলল, 'হুঁ, সিগারেট পোড়ার গন্ধ।'

'পল কোথায়?'

এ্যানির পেছনে লিওনার্ডও এসে ঢুকেছিল। ওর লম্বাটে মুখ দেখলেই কেমন হাসি পায়, ঘন নীল চোখে গভীর বিষাদের ছায়া। বলল, 'সে বুঝি তোমাদের দু'টিকে রেখে সরে পড়েছে, যা হোক একটা মীমাংসা তোমরাই বাপু করে নাও।' মিরিয়ামের দিকে সমব্যথীর মত মাথা নোয়াল সে, আর বিয়াট্রিসের সঙ্গে করল মৃদু রহস্য।

বিয়াট্রিস জবাব দিল। বলল, 'না। সে ত' গেছে ন' নম্বরের সঙ্গে।'

লিওনার্ড বলল, 'আমার সঙ্গে যে এইমাত্র পাঁচ নম্বরের দেখা হ'ল, সে খোঁজ করছিল পলের।'

—'হ্যাঁ গো!' বিয়াট্রিস বলল, 'আমরা ওকে ভাগাভাগি করেই নেব—'সলোমন'-এর গল্পের সেই শিশুটির মত।'

এ্যানি হাসল।

লিওনার্ড বলল, 'ভালো কথা। তা, তুমি কোন অংশটি নেবে?'

'জানি নে।···আগে অন্য সবাইকে তাদের অংশ দিয়ে, নিতে দেব।'

'আর তারা যা ঝেড়ে ফেলে দেবে সেইটুকু থাকবে তোমার।' ব'লে লিওনার্ড রীতিমত মুখের ভঙ্গীকে হাস্যকর ক'রে তুলল।

এ্যানি উনুনের দিকে চেয়েছিল। মিরিয়াম উপেক্ষিতার মত বসে রইল। পল এসে ঘরে ঢুকল।

—'চমৎকার!' এ্যানি বলল, 'কী চমৎকার রুটিই না করে রেখেছ তুমি, পল!'

পল বলল, 'নিজে এখানে থেকে করে দিলেই ত' ভাল হয়।'

এ্যানি সমানে জবাব দিল, 'বটে! যে কাজ তোমার করবার সেটা ত' তোমারই করা উচিত।'

'সত্যি ত'।' বিয়াট্রিস্ সায় দিল, 'ওরই ত' করা উচিত।'

লিওনার্ড বলল, 'কিন্তু ওর সময় কোথায়? উনি ত' বেজায় ব্যস্ত।'

এ্যানি বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই হেঁটে আসতে খুব অসুবিধা হয়েছে, নয় মিরিয়াম?'

—'হ্যাঁ।···কিন্তু এ সপ্তাহে আর ত' বেরুই নি···তাই'—

—'একটু পরিবর্তন ত' চাই।' লিওনার্ড সহানুভূতির সুরে যোগ দিল। এ্যানিও সায় দিল তার কথায়। বলল, 'নয় ত' কি। সারাক্ষণ বাড়িতে খুঁটি গেড়ে বসে থাকা ত' আর চলে না।' আজ এ্যানির ব্যবহার বড় মধুর। বিয়াট্রিস্ তার জামা ধরে টেনে তাকে আর লিওনার্ডকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার নিজের লোকের সঙ্গে তার এবার দেখা করতে হবে।

এ্যানি বলে গেল, 'রুটির কথাটা ভুলে থেকো না, পল।' তারপর মিরিয়ামকে শুভরাত্রি জানিয়ে বলল, 'আজ রাতে বৃষ্টি হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

ওরা চলে গেলে পল তোয়ালে দিয়ে মোড়া রুটিটাকে নিয়ে এলো। রুটিটাকে খুলে বিষণ্ণ মুখে নিরীক্ষণ করতে লাগল। বলল, 'দেখ ত' কী কেলেঙ্কারী ব্যাপার!'

মিরিয়াম আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারল না। বলল, 'কী এমন হয়েছে? ছুঁপেনি বা বড় জোর আড়াই পেনি ত' ওর দাম!'

'হুঁ। কিন্তু···মায়ের মনে বড় লাগবে। তাঁর এত সাধের রুটি। থাক্, এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই।' ব'লে পল রুটিটাকে নিয়ে গেল ভাঁড়ার ঘরে। এখান থেকে মিরিয়াম খানিকটা দূরে বসেছিল। কয়েক মুহূর্ত মিরিয়ামের সামনাসামনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পল ভাবতে লাগল, বিয়াট্রিসের সঙ্গে তার একটু আগের আচরণের কথা। অন্তরে অন্তরে নিজেকে অপরাধী মনে হলেও সে তবু খুশিই হয়ে উঠল। যেন অকারণেই তার মনে হতে লাগল মিরিয়ামের যোগ্য শাস্তিই হয়েছে এতে। এর মধ্যে তার অনুশোচনা করবার কিছুই নেই।

মিরিয়াম অবাক হয়ে পলকে দেখছিল আর ভাবছিল ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ও কি চিন্তা করছে। ওর ঘন চুলের রাশি কপালের উপর অবিন্যস্ত। সে কি পারে না আবার ওর চুল পরিপাটী করে দিতে, বিয়াট্রিসের চিরুণীর ছাপ মুছে দিতে ওর চুলের রাশি থেকে? কেন সে তার দু'হাত দিয়ে ওর দেহ স্পর্শ করতে পাবে না। সুঠাম ওর দেহ, দেহের প্রতি অংশটি ওর প্রাণচঞ্চল। কেন সে অন্য মেয়েদের কাছে ধরা দেয়, কিন্তু তার বেলাতেই যায় দূরে সরে।

হঠাৎ পল আবার সজাগ হয়ে উঠল। কপালের চুল সরাতে সরাতে সে যখন মিরিয়ামের দিকে এগিয়ে গেল, তখন মিরিয়ামের কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। পল বলল, 'সাড়ে আটটা যে হয়ে গেল! তাড়াতাড়ি কর, পড়া করবে কখন?'

মিরিয়াম মুখ নীচু করে দাঁতে দাঁত চেপে ফরাসী অনুশীলনের খাতাখানা বের ক'রে দিল। প্রতি সপ্তাহে নিজের মনের কথা ডায়েরীর মত ক'রে ফরাসী ভাষায় পলের জন্যে সে লিখে আনত। তাকে দিয়ে ফরাসী লেখাবার এই একটা পথ পল ভেবে বের করেছিল। তার লেখাটুকু হয়ে উঠত প্রায় প্রেমপত্রের মত। এবার পল খাতাখানা পড়বে। মিরিয়ামের মনে হ'ল পলের মনের এখন যে অবস্থা তাতে তার অন্তরের ইতিবৃত্ত ওর হাতে শুধু অবমানিতই হবে, তার পবিত্রতা সে রক্ষা করতে পারবে না। পল বসেছিল তার পাশেই। তার বলিষ্ঠ, দৃঢ়, উষ্ণ হাতে খাতাখানা ধরে সে তার ভুল সংশোধন করেছে। মনে হচ্ছে সে শুধু এর ভাষাটাকে বিচার ক'রে চলেছে, এর মধ্যে তার অন্তরের যে কাহিনী তাকে অবজ্ঞা ক'রে। কিন্তু ক্রমশ পলের হাত হয়ে এলো নিশ্চল। স্থির হয়ে একাগ্রে সে পড়তে শুরু করল। দেখে মিরিয়ামের দেহ মন কেঁপে উঠতে লাগল।

পল পড়ল তার ফরাসী ভাষার লেখাটুকু।

মিরিয়াম কম্পিত চিত্তে ও লজ্জায় বেশ খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে বসে রইল। পল স্থির হয়ে বসে ওকে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। সে জানে মিরিয়াম তাকে ভালবাসে। ওর ভালবাসা দেখে তার ভয় হয়। এ ভালবাসা গ্রহণ করবার যোগ্যতা তার নেই, তার নিজের অসম্পূর্ণতাই এর জন্য দায়ী। দোষ যদি কিছু থাকে, সে তার নিজের, মিরিয়ামের নয়। মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠে পল ওর লেখার ভুলগুলো শুধরে দিল, ওর লেখার উপরে লিখে দিল নিজের হাতে। বলল, 'শোন। এখানে ব্যাকরণের ভুল হয়েছে। এখানে ক্রিয়াকে কর্ম্মের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে হবে।'

মিরিয়াম মাথা নুইয়ে দেখতে আর বুঝে নিতে চেষ্টা করল। তার কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো গিয়ে লাগল পলের মুখে। যেন উত্তপ্ত কোন কিছুর স্পর্শ লেগেছে এমনি ভাবে

পল চমকে উঠল, [illegible]. মিরিয়াম একদৃষ্টে খাতার পাতার দিকে চেয়ে আছে। তার লাল ঠোঁট দু'টি করুণ, অসহায়তায় ঈষৎ বাঁকা হয়ে রয়েছে। গোলাপী গালের পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে গোছা গোছা কালো চুলের রাশি। ডালিমের মত ওর গায়ের আভা। ওর দিকে চেয়ে চেয়ে পলের বুক যেন মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে এলো। হঠাৎ মিরিয়াম চোখ তুলে চাইল তার দিকে। কালো দু'টি চোখে স্পষ্ট লেখা তার ভীরু কামনার কাহিনী। পলের চোখও কালো, সে চোখ দুটি মিরিয়ামকে গিয়ে যেন আঘাত করল। মিরিয়ামের উপর সেই চোখ দু'টি যেন আধিপত্যের দাবী জানাতে থাকে। এদের সামনে মিরিয়াম তার সমস্ত আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলে, তার অন্তরের ভীরু কামনা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। পলও জানে ওকে চুমা দিতে যাবার আগে নিজের মধ্যে থেকে একটা কিছু জিনিসকে তার বের করে নিতে হবে। আর সেই জন্যেই মিরিয়ামের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা এসে তার অন্তর অধিকার করে। আবার সে খাতা দেখার দিকে মন দেয়।

হঠাৎ একবার পল পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে এক লাফে উনুনের কাছে এগিয়ে গেল, গিয়ে রুটিটা পাল্টে দিল। তার এই অস্বাভাবিক দ্রুততাকে কেমন অশোভন মনে হ'ল মিরিয়ামের কাছে। সে শুধু যে চমকে উঠল তা নয়, তার মন এতে সত্যি সত্যিই আহত হয়ে উঠল। এমন কি উনুনের সামনে পল যে ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তাও যেন মিরিয়ামের মনকে পীড়া দিতে লাগল। এ যেন পলের হৃদয়হীনতার আর একটি পরিচয়—এমন ব্যস্তভাবে রুটিটাকে পাত্র থেকে উঠিয়ে আবার নামিয়ে রাখা, এ যেন নিষ্ঠুরতার নামান্তর। চলন-বলনে আর একটু যদি ধীর-স্থির হ'ত পল, তা'হলে মিরিয়াম আশ্বস্ত হ'ত, শান্তি পেত। কিন্তু পলের এই আচরণ তাকে শুধু আঘাতই করত।

ফিরে এসে পল খাতা দেখা শেষ করল। বলল, 'এ সপ্তাহের কাজ তোমার বেশ ভালই হয়েছে।'

মিরিয়াম বুঝল তার ডায়েরী পড়ে পল আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কিন্তু মিরিয়াম যা চেয়েছিল, সবটুকু তার পাওয়া হ'ল না।

পল বলল, 'মাঝে মাঝে তোমার বেশ একটা উচ্ছ্বাস আসে। তোমার কবিতা লেখা উচিত।'

মিরিয়াম খুশি হয়ে মুখ তুলল, আবার সন্দিগ্ধের মত মাথা নাড়ল। বলল, 'অতটা বিশ্বাস নেই নিজের উপরে।'

—'চেষ্টা করতে দোষ কি?'

মিরিয়াম আবার মাথা নাড়ল। পল বলল, 'এখন কি পড়া হবে, না রাত অনেক হয়ে গেছে?'

—'রাত একটু হয়েছে বই কি। তবু, এসো না, খানিকটা পড়ে নিই।' মিরিয়াম অনুনয়ের সুরে বলল।

সত্যি করে বলতে গেলে, আগামী সারা সপ্তাহের জন্যে এইটুকুই তার মনের খোরাক, প্রাণের সঞ্চয়।

পল ওকে দিয়ে বোদ্‌ল্যের কবিতা নকল করিয়ে, ওকে প'ড়ে

শোনাল সেই কবিতা। ওর গলার স্বর স্বভাবতই মৃদু ও মধুর, কিন্তু থেকে থেকে আবার নির্মম হয়ে ওঠে।

পড়তে পড়তে যখন আবেগ আসে, তখন সেই গভীর আবেগে বিচলিত হয়ে সে ঠোঁট ওলটায়, ওর দাঁত চিকচিক করে ওঠে। এখনও তাই করল পল। মিরিয়ামের মনে হ'ল পল যেন তাকে দু'পায়ে দলে এগিয়ে চলেছে। পলের দিকে চোখ তুলে চাইতে তার সাহস হ'ল না। মাথা নীচু করে সে বসে রইল। পল কেন এমন বিক্ষুব্ধ অশান্ত হয়ে ওঠে সে বুঝতে পারে না। তার মন খারাপ হয়ে যায়। বোদ্‌ল্যেয়রকে মোটের উপর তার ভাল লাগে না। ভার্লেনকেও নয়। তার মন রস পায়—

"ওই দেখ ওই মাঠের মাঝে বায় গেয়ে
পাহাড় দেশের সঙ্গীহারা মেয়ে।"

এই ধরণের কবিতায়। কিম্বা—

"শুচিস্নাতা সন্ধ্যা নামে, পূত তপস্বিনী,
নির্মল বাতাস বয়, কল্যাণকারিণী।"

এ তার নিজের মনের ছবি। আর পল—আবেগে গলা কাঁপিয়ে পড়ছে অন্য ধরণের, অন্য কিছু।

কবিতা পড়া শেষ হ'ল। উনুন থেকে রুটিটা নাবিয়ে, পোড়া রুটিগুলোকে সে রাখল আলমারির নীচে, ভালোগুলোকে উপরে। ছাড়ানো রুটিটা তোয়ালে ঢাকা অবস্থায় রইল স্নানের ঘরে। বলল, 'সকালের আগে মা জানতেও পারবেন না। রাত্রে জানবার চেয়ে সকালে জানলে মেজাজ খারাপ হবার সম্ভাবনা কম।'

মিরিয়াম বাইরে আলমারিটা খুঁজে দেখতে লাগল। সব বইয়ের মধ্যে থেকে একটা পছন্দমত বই তুলে নিল সে। তারপর গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। দরজায় তালা দিয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল না।

পল যখন বাড়ি ফিরল, তখন পৌনে এগারোটা। মিসেস মোরেল দোলন-চেয়ারটায় বসে। এ্যানি আগুনের সামনে একটা ছোট টুলের উপর হাঁটুতে কনুই রেখে গোমড়া মুখে বসে আছে। টেবিলের উপর সেই যত-নষ্টের-গোড়া রুটিখানা, তার ঢাকনা খুলে ফেলা হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই পলের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। কেউ কোন কথা বলল না। মা স্থানীয় সংবাদ-পত্রটির উপর চোখ নিবদ্ধ করে রেখেছেন। পল কোট খুলে সোফায় বসতে গেল। মা একটু সরে গিয়ে তার রাস্তা করে দিলেন। কারও মুখে কথা নেই। ভারী অস্বস্তি লাগল পলের। টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কয়েক মিনিট পড়ার ভাণ করল সে, তারপর বলে উঠল, 'রুটিটার কথা ভুলে গিয়েছিলুম মা!'

কেউই কোন উত্তর দিল না।

'কী-ই বা হয়েছে।' পল আবার বলল, 'মোটে আড়াই পেনিই ত'। দিয়ে দিচ্ছি সেটা।'

তিনটে পেনি টেবিলের উপর রেখে, পল রাগতভাবে ঠেলে দিল মায়ের দিকে। মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর ঠোঁট দু'টি শক্ত করে চাপা।

এ্যানি বলল, 'জানো না ত', মায়ের শরীর কত খারাপ!' বলে উনুনের দিকে মুখ তার ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

—'কেন, খারাপ কেন?' পল তার স্বভাবসিদ্ধ উগ্র গ[লায়] জিজ্ঞেস করল।

—'আর কেন!' এ্যানি বলল, 'আজ বাড়ি ফিরে আস[তে] পারছিলেন না।'

পল ভাল ক'রে চাইল মায়ের দিকে। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁ[কে]। তবু চড়া গলাতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, বাড়ি ফিরে আ[সতে] পারছিলে না কেন?'

মা জবাব দিলেন না। এ্যানি বলল, 'এসে দেখি সাদা ফ্যা[কাশে] হয়ে বসে আছে এখানে।' তার গলায় চাপা কান্নার সুর।

পল বলল, 'কিন্তু কেন', তার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল—অ[ধীর] আগ্রহে চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল।

মিসেস মোরেল বললেন, 'সবারই অমন হ'ত। এত ধকল, [এত] সব মোট ব'য়ে আনা—শাকসব্জী, মাংস, তার উপর এক জো[ড়া] পর্দা'—

—'কেন, তুমি বয়ে আনতে গেলে কেন। কী দরকার [ছিল] তোমার?'

—'তবে কে আনতে যাবে?'

—'এ্যানি গেল না কেন মাংস আনতে?'

—'হ্যাঁ গো। আমিই যেতুম, কিন্তু জানব কি ক'রে। যখন বাড়ি এলো, তখন তুমি ত' মিরিয়ামে নিয়ে হাওয়া খে[য়ে] গেছ।'

পল মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল ত'?'

মা বললেন, 'বোধ হয়, আমার বুকের ব্যামোটাই'—মু[খের] কোণে সত্যিই তাঁর নীল ছায়া।

—'এর আগে আর কোন দিন হয়েছে এমন?'

—'হ্যাঁ। মাঝে মাঝেই ত' হয়।'

—'তবে বলো নি কেন আমাকে? ডাক্তারকেই বা দেখাও [নি] কেন?'

মিসেস মোরেল চেয়ার ঘুরিয়ে বসলেন। পলের অবি[রাম] প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

এ্যানি বলল, 'তোমার চোখে ত' কিছু পড়বে না। তুমি মিরিয়ামের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে সর্বদা উসখুস করছ।'

'বটে! আর তুমি যে লিওনার্ডের সঙ্গে, সেটা কী!'

—'জানো, আমি পৌনে দশটা বাড়িতে ফিরে এসেছি।'

কিছুক্ষণ ধরে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে। হঠা[ৎ] মিসেস মোরেল রুক্ষ-স্বরে বললেন, 'আমি ভাবতেও পারিনি তু[মি] ওকে নিয়ে এতটা মেতে থাকবে যে এক উনুন-ভর্তি রুটি পুড়ে ছা[ই] হয়ে যাবে।'

—'শুধু সে কেন, বিয়াট্রিসও ত' ছিল এখানে।'

—'তা হবে। কিন্তু রুটিগুলো নষ্ট হ'ল কেন তা আমরা জানি।'

— কেন হ'ল'? পল ফোঁস করে উঠল।

—'কারণ, তুমি মিরিয়ামকে নিয়ে মত্ত ছিলে তখন।' মি[সেস] মোরেলও গরম হয়ে জবাব দিলেন।

—'বেশ ত'—কি হয়েছে তাতে?' চটে গিয়ে জবাব দিল প[ল]। নিজেকে তার একান্ত নিরুপায়, দুর্দশাগ্রস্ত বলে মনে হতে লাগ[ল]। সে জানে মা তাকে ভর্ৎসনা করতে চান। মায়ের অসুস্থ

কারণটাও তার জানা দরকার—এও একটি চিন্তার কারণ। তাই শুয়ে পড়বার ইচ্ছা হলেও সে জেগে বসে রইল। স্তব্ধ একটা নীরবতা, শুধু ঘরের ঘড়িটা টিকটিক করে বেজে যেতে লাগল।

মা রুক্ষ আদেশের সুরে বললেন, 'তোমার বাবা বাড়ি ফেরবার আগে শুয়ে পড় গে যাও। আর কিছু খেতে হ'লে নিয়ে খাওগে।'

—'কিছু চাই না আমার।'

শুক্রবার রাত্রে বরাবরই মা বাজার থেকে ওর জন্যে ভালো কিছু খাবার কিনে আনতেন। কয়লাখনির মজুরদের জীবনে শুক্রবার রাতটুকুই একটু বিলাস করবার সময়। আজ আলমারি থেকে সেই খাবার বের করে আনতেও পল উঠল না, এতই তার রাগ! এতে অপমান বোধ হ'ল মায়ের। বললেন, 'আমি যদি আজ তোমাকে বলতুম, সেলবি যেতে, তা'হলে তুমি ত' একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে। কিন্তু সে যদি আসে, তা'হলে তোমার আর তখন শ্রান্তি-ক্লান্তি থাকে না; তখন তোমার খাবার, জল, কিছু না হলেও চলে।'

—'একা একা ওকে যেতে দিই কী করে?'

—'বটে! কিন্তু ও আসেই বা কেন?'

—'আমি বলিনি ওকে আসতে।'

—'তুমি না চাইলে ও আসত না।'

—'বেশ ত'। আমি যদি চাই ও আসুক, কী হয়েছে তাতে?'

—'কিছুই নয়। কিন্তু ওর মধ্যেও ভালমন্দের একটা মাত্রা আছে। এই কাদার মধ্যে মাইলের পর মাইল চড়াই ভাঙা আর তারপর মাঝরাতে বাড়ি ফেরা। আবার সকালে উঠে যেতে হবে সেই নটিংহাম।'

—'তা না হলেও তুমি এমনিই করতে।'

—'করতুম ত'। করতুম, কারণ এর কোন মানে নেই। এমন কি মনভোলানো মেয়ে ও, যে সারা রাস্তা ওর পেছনে ছুটবে তুমি।' বিদ্রূপে শাণিত হয়ে উঠলেন মিসেস মোরেল। মুখ ফিরিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে নিজের 'এপ্রন্'-এর কালো পাড়টাতে এমন তালে তালে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন, দেখে, পলের আরও খারাপ লাগল। বলল, 'আমার ভাল লাগে ওকে, কিন্তু'—

—'ভালো লাগে।' মিসেস মোরেল তেমনই খোঁচা দিয়ে বললেন, 'আমার ত' মনে হয় আর কাউকে, দুনিয়ার আর কোন কিছুকে তোমার ভালো লাগে না। এ্যানি না, আমি না,—অন্য কেউ তোমার কাছে এখন কিছু নয়।'

'কেন মা বাজে বকছ? তুমি জানো আমি ওকে ভালবাসি না। আবার বলছি ওর সঙ্গে আমার ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি আমার হাতে হাত দিয়েও ও পথ চলে না, কারণ আমিই তা চাই না।'

—'তবে কেন তুমি ঘন ঘন ছুটে যাও ওর কাছে?'

—'ওর সঙ্গে কথা কইতে আমার ভাল লাগে—এ ত' আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ভালবাসি না আমি ওকে।'

—'কথা বলার লোক কী আর নেই?'

—'না। আমরা যে সব কথা বলি, তেমন কথা বলবার লোক নেই। অনেক জিনিস আছে, তোমার তাতে আগ্রহ নেই, কিন্তু'—

—'কী তেমন জিনিস, শুনি?'

মিসেস মোরেলের এই ব্যগ্রতা দেখে পলও উত্তেজিত হয়ে উঠল, সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। বলল, 'কেন—ধরো, ছবি আঁকা কিম্বা বই। হার্বার্ট স্পেন্সারের বই নিয়ে তোমার কোন ঔৎসুক্য নেই।'

—'নেই ত।' মা নিচে গিয়ে জবাব দিলেন, 'আমার বয়সে তোমারও থাকবে না।'

—'কিন্তু এখন আছে। আর মিরিয়ামেরও আছে।'

—'কিন্তু।' মিসেস মোরেল আবার জ্বলে উঠলেন, 'তুমি কী করে জানলে আমার নেই। ছবিটি কী ধাঁচে আঁকা তাও তুমি জানতে চাও না।'

—'কে বলল তোমায়? কোন দিন বলতে চেয়েছ আমায় এ সব কথা? চেষ্টা করেছ কখনও?'

—'কিন্তু তুমি জানো মা, এর কোন দাম নেই তোমার কাছে। এ সব নিয়ে তুমি এখন আর মাথা ঘামাবে না।'

—'তবে কিসের—কোন জিনিসটার দাম আছে শুনি আমার কাছে?' মা তেতে উঠে বললেন। পল ব্যথিত হয়ে ভুরু কুঁচকাল, বলল, মা তোমার বয়স হয়েছে, আর আমাদের এখনও কাঁচা বয়স।'

পল শুধু বলতে চেয়েছিল যে বেশী বয়সে মায়ের যে সব জিনিস ভালো লাগবে, অল্প বয়সের ভালো লাগার সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। কিন্তু কথাটা বলেই সে বুঝতে পারল, একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে।

—'হ্যাঁ। আমি বুড়ো হয়ে গেছি ভালো করেই জানি। এখন আমি এক পাশে পড়ে থাকি, তোমার সঙ্গে আর কি আমার। আমি শুধু তোমার সেবা করি, এই তুমি চাও……আর বাকী যা কিছু সব মিরিয়ামের।'

পল আর সহ্য করতে পারল না। নিজের অন্তরে সে অনুভব করল, 'মায়ের প্রাণ তার মধ্যেই। আর, যতই কিছু না হোক তার কাছেও মা-ই সবার উপরে, মা-ই তার জীবনের একমাত্র সম্পদ।

'তুমি জানো মা, এ সত্যি নয়। এ সত্যি হতে পারে না।' বলল পল।

পলের করুণ আবেদনে মায়ের করুণা হ'ল। নিজের নৈরাশ্যকে প্রায় বিসর্জন দিয়ে বললেন, 'কিন্তু তোমার ভাব দেখে তাই মনে হয়।'

—'না মা। সত্যি আমি ভালবাসি না ওকে। ওর সঙ্গে কথা কই বটে, কিন্তু ঘরে ফিরে আসতে চাই তোমার কাছেই।'

পল গলাবন্ধ আর 'টাই' খুলে ফেলেছিল, এবার শোবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মাকে চুমা দিতে যাবার জন্যে নীচু হতেই মা নিজের দু'বাহু দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে, ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর গলার স্বর এমন অস্বাভাবিক যে, পলের মন বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। কান্নার সুরে মা বললেন, 'এ আমার সহ্য হয় না। অন্য কোন মেয়ে হলে আমার এমন হ'ত না, কিন্তু ওর্কে নয়। ও চায় সবটুকু দখল করতে, আমার জন্যে একটুও বাকী রাখবে না।' আর তখনই মিরিয়ামের প্রতি পলের জাগল নিদা[রুণ] বিতৃষ্ণা।

—'তুমি ত' জানো পল, আমার স্বামী থেকেও নেই। [আমি] আমার সত্যিকার জীবন।'

মায়ের চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল পল; তার গ[লার] কাছেই মায়ের মুখ।

—'তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে ও যেন সুখ পা[য়]। সাধারণ মেয়েদের মত ও নয়।'

—'থাক্ মা ও কথা। তবে এইটুকু জেনে রেখো, আমি [ওকে] ভালবাসি না।' পল অস্ফুট স্বরে বলল। মাথা নীচু করে নিজ[েকে] বিপন্নের মত মায়ের কাঁধে মুখ লুকিয়ে রইল সে। মা গভীর আগ্র[হের] সঙ্গে, অনেকক্ষণ ধরে তাকে চুম্বন করলেন। নিজের অজ্ঞাতসা[রে] পল মায়ের মুখে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল।

মা বললেন, 'এবার শুয়ে পড়োগে। কাল সকালে খুবই শ[রীর] খারাপ লাগবে তোমার।' বলতে বলতে স্বামীর আসার [শব্দ] শুনতে পেলেন। 'ওই তোমার বাবা আসছে—যাও এখন।' [তার] পর যেন কতকটা ভয়ে ভয়েই পলের দিকে চেয়ে বললেন, 'হ[য়ত] আমি শুধু আমার কথাই ভাবছি! সত্যিই তুমি যদি ওকে চ[াও] তা'হলে ওকেই নাও।'

তাঁর চোখ-মুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। পল কাঁ[পতে] কাঁপতে মাকে চুম্বন করল। ধীরে ধীরে শুধু বলল, 'থাক, মা।'

মোরেল এসে ঘরে ঢুকল। চলনের তাল ঠিক নেই, মা[থার] টুপিটা চোখের কোণ ঢেকে নুয়ে পড়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে [সে] তাল সামলে নিল, গলার সুরে বিষ ঢেলে দিয়ে বলল, 'ফের [সেই] বাঁদরামো হচ্ছে?'

সহসা মিসেস মোরেলের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ রূপান্ত[রিত] হ'ল এই হতভাগা মাতালটার প্রতি অকথ্য ঘৃণায়। বলে[ন] 'আর যাই হোক, এর মধ্যে মাতলামো নেই।'

'হুঁ হুঁ।' মোরেল বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল। তার[পর] পাশের কামরায় গিয়ে টুপি আর কোট রেখে সে গেল ভাঁড়ার ঘ[রে]। যখন ফিরে এলো তার মুঠোতে এক টুকরো মাংসের কাবাব। [ও] বিকেলে মিসেস মোরেল ছেলের জন্যে এই খাবারটুকু কি[নে] এনেছিলেন।

'রাখো, এ তোমার জন্যে আনা হয়নি। দেবার বেলায় মোটে পঁচিশ শিলিং। এদিকে পেট পুরে মদ গিলে আসবেন, [আর] আমি মাংসের কাবাব কিনে এনে ওঁকে খাওয়াব!'

'কী, কী বললে?' মোরেল গর্জ্জন করে উঠল। হঠাৎ [টাল] সামলাতে না পেরে পড়ে যাবার উপক্রম হ'ল তার।—'আমার [জন্যে] নয়—আঁা?' ব'লে একবার মাংসের টুকরোটার দিকে দৃষ্টি নি[ক্ষেপ] করে ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে।

পল বসেছিল এবার দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, 'নষ্ট করতে [হয়] নিজের জিনিস নষ্ট করো।'

'বটে বটে!' মোরেল বেয়াড়া চীৎকার করে ঘুষি বা[গিয়ে] উঠল। বলল, 'দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি, বাছাধনকে!'

পল ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'বেশ, দেখাও মজা।' [ত]খন মনে হচ্ছিল এই মুহূর্ত্তে সামনে যাকেই পায় তাকেই দু'ঘা বসি[য়ে]

দেয়। মোরেল গুটি মেরে, ঘুষি বাগিয়ে এগিয়ে আসবার উপক্রম করছিল। পলের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'এই যে'—বলতে বলতে মোরেল তার মুষ্টিটাকে ছেলের মুখের ধার ঘেঁষে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। ছেলেকে স্পর্শ করবার সাহস তার হ'ল না।

'সাবাস!' পল বাপের মুখের দিকে একবার চাইল। আর এক মুহূর্ত্ত পরেই তার ঘুষি গিয়ে লাগত বাপের মুখে, তার মন চাইছিল এখনি এমনি এক আঘাতে ওকে চূর্ণ করে দিতে। কিন্তু পেছন থেকে ক্ষীণ করুণ শব্দ শুনে পল চমকে উঠল। মায়ের সমস্ত রক্ত যেন উবে গেছে, তাঁর সাদা মুখে মৃত্যুর কালিমা। এদিকে মোরেল আর একবার ঘুষি বাগিয়ে ধরে তৈরি হচ্ছে।

'বাবা!' পল চীৎকার করে বলল। কথাটা যেন ঝমঝম ক'রে উঠল সারা ঘর জুড়ে।

মোরেল থমকে দাঁড়াল।

'মা।' ছেলে ডাকল কাতর কণ্ঠে, 'মা গো!'

মা নিজের সঙ্গে নিজেই যুঝতে লাগলেন। চোখ দু'টি মেলে রাখলেন ছেলের দিকে। কিন্তু নড়বার শক্তি নেই তাঁর। ধীরে ধীরে মা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলেন। একটা সোফায় তাঁকে শুইয়ে পল দৌড়ে উপরে গেল হুইস্কি আনতে। অল্প অল্প চুমুক দিয়ে সেটুকু পান করলেন মা। পলের মুখ অশ্রুধারায় ভেসে যাচ্ছে। মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে পল। সে কাঁদছে না, তবু অবাধ্য চোখের জল তার মুখ বেয়ে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে। ঘরের অন্য দিকে মোরেল পায়ের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে এদিকে চেয়ে আছে। একবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ওর?'

—'মূর্চ্ছা গেছে।' পল জবাব দিল।

—'হুঁ।'

বসে বসে বুটের ফিতা খুলতে লাগল মোরেল। তারপর টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এ বাড়িতে তার শেষ সংগ্রাম আজ সমাপ্ত।

পল মায়ের কাছে বসে মায়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বার বার বলতে লাগল 'ভালো হয়ে ওঠো মা। ভালো হয়ে ওঠো।'

মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ও কিছু নয়, বাবা।'

অনেকক্ষণ বসে থেকে পল উঠল। এক টুকরো বড় কয়লা এনে ঘরের আগুনটাকে জ্বালিয়ে তুলল ভালো করে। ঘর দোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে সকালবেলার খাবার ঠিকঠাক করে রাখল। তারপর মায়ের বাতিদানটা নিয়ে এল। বলল, 'এখন শুতে যাবে মা?'

'যাব।'

'এ্যানির সঙ্গে শোও গে মা। ওর সঙ্গে নয়।'

'না। নিজের বিছানায় শোব আমি।'

'ওর সঙ্গে শুতে যেও না মা।'

'আমি নিজের বিছানায় ঘুমোব।'

মা উঠলেন। গ্যাসের বাতি নিবিয়ে দিয়ে পল বাতিদান নিয়ে মায়ের পিছু-পিছু উপরে উঠে গেল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মায়ের কাছ ঘেঁষে সে তাঁকে চুম্বন করল।

'শুভরাত্রি, মা।'

'শুভরাত্রি!' মা বললেন।

শয্যায় ফিরে এসে বালিশের উপর মুখ রেখে পল অশান্তির জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। তবু, অন্তরের গভীরে কোথায় যেন নিবিড় শান্তি অনুভব হ'ল তার, এখনও মায়ের প্রতি ভালবাসাই তার সব চেয়ে বড়ো ভালবাসা। যা হ'ল তাই ভালো—এই বৈরাগ্যের শান্তিটুকুই হ'ল তার সম্বল।

পরের দিন বাপ এল তার সঙ্গে মিটমাট করতে। সে আর এক লজ্জায় ব্যাপার।

বাড়ির সবাই চেষ্টা করল সেদিনের ঘটনার কথা ভুলে যেতে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য

বাঙলা ভাষায় সাধু ও ইতর

বহু সংখ্যক বাঙলা শব্দকে ইতর বলে সাহিত্য হতে 'বহিষ্করণ'-এর কোনই বৈধ কারণ নেই। মৌখিক ভাষার মধ্যেই সাধু এবং ইতর উভয় প্রকারেরই বাক্য আছে। যে বাক্য ইতর বলে আমরা মুখে আনতে সঙ্কুচিত হই, তা আমরা কলমের মুখ দিয়েও বার করতে পারিনে। কিন্তু যে-সকল কথা আমরা ভদ্রসমাজে নিত্য ব্যবহার করি, যা কোন হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেই সকল বাক্যকে সাহিত্য থেকে বহির্ভূত করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিত্যের। ভদ্র এবং ইতরের প্রভেদ আমাদের সমাজে এবং সাহিত্যে যেরূপ প্রচলিত, পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য দেশে সেরূপ নয়। আমরা সমাজের যেমন অধিকাংশ লোককে শূদ্র করে রেখে দিয়েছি, ভাষা-রাজ্যেও আমরা সাধুতার দোহাই দিয়ে তারই অনুরূপ জাতিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি এবং অসংখ্য নির্দ্দোষী বাঙলা কথাকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করে, তাদের সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে দিতে আপত্তি করছি।

—বিবেকানন্দ-স্তোত্র—

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

১১

তা'বোলে ভেবো না যেন সব কিছুতেই
নরেনের সন্দেহ,
—মোটেই তা' নয়।
যদি বলো —"ছুঁলে জাত যায়।
অপবিত্র হয় নিঃশ্বাসে."
—স-কথা সে মানবে না ঠিকই,
কিন্তু যদি বলো কোনো দিন—
"মহাবীর 'হনুমান' থাকে কলাগাছে,
সরল প্রার্থনা নিয়ে যদি কেউ ডাকে,
হুপ্ কোরে নেমে এসে এক লাফে দর্শন দেন."
—তাহলে সে এক্ষুণি যায়
সরল বিশ্বাস নিয়ে,
সন্দেহ করে না সে-কথায়।
অতিশয় বুদ্ধিমান কি না,
তাই
যে-বিশ্বাসে খ'তে দেখে লোকসান নেই কানাকড়ি,
বরং লাভের আশা অতিমাত্রায়,
তা'কে সে ছাড়ে না কিছুতেই।
ওটা ওর চিরকেলে ধাত্।
যদি দেখা নাই পায় তা'র
বোলবে না,—"কেন ধোঁকা দাও।"
আবার সুবিধে পেলে কলাবনে যাবে নির্ঘাত।

অধিকন্তু তা'ছাড়া,
'রামায়ণ' শুনে-শুনে তা'র
'হনুমানে' কেন যেন লোভ'ধ'রে গেছে
বীর ভক্তটির
সাঙ্ঘাতিক একাগ্রনিষ্ঠার
বিচ্ছিরি নেশা ধরে গেছে।
ভক্তটি কি সোজা ?
সশক্তিক 'রামচন্দ্র' থাকে ওর বুকে
বিশ্বাস না হয় তুমি 'রামায়ণ' খুলে দেখে নিও।

১২

ভবিষ্যতে কোনো একদিন
রামকৃষ্ণলীলা-সহচর
'মহাবীর' শিষ্যকে বলেন,—
"যা' বলি তা' শোন্—
বৃন্দাবন-লীলা-ফীলা রেখে 'দে এখন।
খোল-করতালে
সারা দেশ মেয়ে ব'নে গেছে।
দেশকে তুলতে যদি চাস্
পুজো চালা 'হনুমানজী'র।
'মহাবীর' ধ্বনিতে ধ্বনিতে
দিগ্‌দেশ কম্পিত কর।
একদিকে সেবাভাব,
অন্যদিকে তাঁর
ত্রিলোকসন্ত্রাসী বিক্রম
চোখের সামনে তোরা আদর্শের মত তুলে ধর্।
আরও একটা কথা শুনে রাখ্,—
মনে যদি হীন বুদ্ধি আসে
কাপুরুষ ক্ষীণ দুর্বলতা,
একমনে পুজো কর তাঁর ;
নিশ্চয়ই পাবি উদ্ধার।"

* * * *

"গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্।
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্।
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলম্
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাম্
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্।...
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্। *

* "যিনি সাগরকে গোষ্পদতুল্য এবং রাক্ষসকে মশকসদৃশ জ্ঞান কোরেছিলেন, যিনি রামায়ণরূপ মহামালার রত্নতুল্য, সেই বায়ুপুত্রকে বন্দনা করি। জানকীর শোকনাশকারী, (রাবণপুত্র

"আহা !
মহাজিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান ;
ব্রহ্মত্ব শিবত্ব দাও—ছুঁড়ে ফেলে দেবে !
বার-তিথি-নক্ষত্রের রাখে না সন্ধান !
*   *   *   *
আমাদের জাতীয় জীবনে
'মহাবীর'টি'কে,
ত্রিলোকসন্ত্রাসী ঐ বীর ভক্তটিকে
চোখের সম্মুখে তোরা আদর্শের মত তুলে ধর্ !
দাস্যভাবঘন মূর্তি একমনে খুব পুজো কর,
—পাবি, পাবি, পাবি উদ্ধার।"

১৩

নিশ্চই পাবে।
যে দেশে মরে না 'মহাবীর'
সে দেশে কি মরা অত সোজা ?
বেঁচে কিন্তু শি:খ নিও তুমি
কি কোরে কোরতে হয় 'মহাবীর-পূজা'।
*   *   *
তবে বলি শোনো,—
নরেনের সঙ্গী এক পথে যেতে যেতে
পড়ে গেছে একেবারে গাড়ীর তলায়।
দুর্দান্ত পশুর 'চাটে' ঐ বুঝি থেঁতো হ'য়ে যায়।
পথে যত লোক ছিল আঁতকে ওঠে ভয়ে,
সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখে চোখ বোঁজে !
নরেন তখন
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে
এক লাফে ঝাঁপ, মারে গাড়ীর তলায় !
মত্ত ঘোড়া ঐ বুঝি দু'টোকেই থেঁতলে দিয়ে যায়।
পথচারী করে—"হায় হায়" !!
কিন্তু নরেন
আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে
বন্ধুটিকে একটানে
ঝুঁটি ধ'রে বার ক'রে আনে ;
কি কোরে তা' ভগবান জানে !
'মহাবীর' খুসী হন নরেনের প্রচণ্ড পুজোয় !

অক্ষনামক রাক্ষসনিধনকারী, লঙ্কাবাসীদের ভীতি উৎপাদক সেই অঞ্জনানন্দন বানরশ্রেষ্ঠ বীরকে আমি বন্দনা করি।

যিনি অবলীলাক্রমে সমুদ্র লঙ্ঘন কোরে সীতার শোকাগ্নি গ্রহণপূর্বক তদ্দ্বারাই লঙ্কা দহন কোরেছিলেন, সেই অঞ্জনানন্দনকে করযোড়ে নমস্কার করি।…

• যেখানে-যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয়, সেখানে-সেখানে যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক সাশ্রুনয়নে অবস্থান করেন, সেই রাক্ষসবিনাশী মারুতিকে তোমরা সকলে প্রণাম কর।"

বাস্তবিক,
—এ পুজোটা বেশ।
'রামচন্দ্র' 'হনুমান' দু'দুজনকে হাত করা যায়,
এক ঢিলে কাত করা যায় !
সবাই যে দুগ্ধ:বশী-রাম ;
রোগ-শোক-দুঃখ থেকে
'রাম'কে না বাঁচালে কি
'হনুমান' গাছ থেকে আসে বোকারাম ?

১৪

প্রায় * 'Avalanche' এর ঠাটে
দুনিয়াতে প'ড়ে ছিল ঠিকই,
তবে,
দুনিয়া ফাটার আগে
প্রথমে নিজেরি মাথা ফেটে চৌচির।
*   *   *
সেদিন সকালবেলা বাড়ির উঠোনে
সাজ্ঘাতিক শব্দ কোরে
ঠিক যেন বজ্রপাত হ'ল !
সবাই ছুটে এল পাড়া খালি কোরে।
দ্যাখে কি—নরেন
পুজোর দালান থেকে ছিট্‌কে এসে বাড়ির উঠোনে
কাঠ হয়ে পড়ে আছে,
—কোনো জ্ঞান নেই।
হুলুস্থুলু প'ড়ে গেল সারা পাড়াটায়।
ডাক্তার ছুটে এল এক নিমেষেই।
এক ঘণ্টা শুশ্রূষার পরে
নরেনের জ্ঞান ফিরে এলো।
জীবনের ভয় কিছু নেই,
তবে,
আঘাত দারুণ !
—তা' সে যাই হোক,
ছেলেটা যে বেঁচে গেছে খুব ভাগ্যি ভাল।
*   *   *
'দুনিয়ার'ও ভাগ্য ভাল বোলতেই হবে ;
'Avalanche' স্বেচ্ছায় আগে কেটে গিয়ে
কোরেছে বহুত উপকার।
এর পরে
যদি ঘাড়ে পড়ে,
ধড়ে প্রাণ থাকতেও পারে।
*   *   *
বহুকাল পরে
'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব'
নরেনের কপালেতে 'কাটাদাগ' দেখে
'দুনিয়াকে' অভয় দিলেন,—

"এই ভাবে মহামায়া
নরেনের শক্তিক্ষয় করে।
তা' না হ'লে পৃথিবীটা তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে যেত।"

* * * *

সেদিনের ক্ষত
চিরদিন স্বামিজীর ছিল অক্ষত!
ও কি ক্ষতি?
ও যে মা'র স্মৃতিচিহ্ন. মৃত্যুরূপা প্রলয়রূপিণী
ব্রহ্মাণ্ডবিনাশী মা'র পদচিহ্ন,
—তাই সুখ-স্মৃতি।

* * * *

"Fools... put a garland of skulls
Round Thy neck,
And then start back in terror,
And call Thee 'the Merciful' !!"
—"I worship the Terrible !"
"...For Terror is Thy name !
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,...
Who dares misery love
And hug the form of Death,
Dance in Destruct'on's dance
To him the Mother comes."*

* "মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় 'দয়াময়ী'!"
"আমি বীভৎসরূপের উপাসক"!—
[নিবেদিতার "The Master as I saw him"]

১৫

আর,
ওরই বা কি দোষ?
অসম্ভব শক্তি নিয়ে ও-বেচারা প'ড়েছে মুশ্‌কিলে!
শক্তির স্বভাবই বিপর্যয়,
মানে, একটা কিছু করা;
—হয় প'ড়া,
ন'য় যে পড়ছে তা'কে ছুটে গিয়ে ধরা।
'সুশীলে'র মত শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা নয়।
বজ্র গর্জন করে কেন?
পাহাড়টা কেন অগ্ন্যুৎপাত?
—শক্তি আছে তাই।
'ভেড়া' কেন ছাড়ে না হুংকার
'সুশীল' ওঠে না 'মগডালে'?
—শক্তি নেই তাই।
বুকের ভেতরে যার আগুনের চাষ
হল্কা তার বেরোবে না চোখ-কান দিয়ে?
তবে,
আগুন কি রোজ-রোজ বস্তি পোড়ায়?
—ডাল ভাত দেয় নাকো রেঁধে?
নরেন কি খালি-খালি আনে বিপর্যয়?
বাঁচায় না তোমায় বিপদে? [ক্রমশ

"করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
তোর ভীমচরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে.
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"
[স্বামিজীর "Kali the Mother" কবিতাটি থেকে উদ্ধৃত

পাঠক-পাঠিকার প্রতি

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বরচিত 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' পাঠক-সাধারণকে উৎসর্গীকৃত। লেখক উৎসর্গপত্রে লিখেছেন:

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র—
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপাচক্ষে হের
একবার। শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে
বহুমানে লব শির পাতি।"

কেনা কাটা

সমবায় প্রথায় ব্যবসা

"যেখানে সভ্যতার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে দেশের কোন এক দল লোক উপবাসে মরিবে, বা দুর্গতিতে তলাইয়া যাইবে, ইহা মানুষ সহ্য করিতে পারে না,—কেন না মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগে সকলের ভাল হওয়া ইহাই সভ্যতার প্রাণ।"

রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা বিশেষ কঠিন নয়। দেশকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাতে হলে সমবায় পদ্ধতিই একমাত্র পথ। যে কাজ এক জনের সাধ্য নয়, পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধলে তা অনায়াসে করা যায়। ইউরোপ-আমেরিকার চাষীরা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। জমি-হাল লাঙ্গল-গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করতে পারলে গরীব চাষীরা কলের সাহায্যে চাষের সব কাজ করবার সুযোগ পাবে।

খণ্ড খণ্ড জমিতে খণ্ড খণ্ড ভাবে চাষ করলে ফসলও বেশী হয় না এবং পরিশ্রমও বেশী করতে হয়। তার পর বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে চেয়ে থাকা। কিন্তু একখানা মাঠের সমস্ত জমির চাষ যদি এক সঙ্গে একযোগে করা যায়, তাহলে ফসল বেশী হয় এবং সমবেত প্রচেষ্টায় তার দামও বেশী পাওয়া যায়। এবং সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করলে সেচের ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে। যদি অনেক চাষী মিলে এক গোলায় ধান তুলতে পারে ও এক জায়গা থেকে বেচবার ব্যবস্থা করে, তাহলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বেঁচে যায়। অনেক গরীব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মেলাতে পারলে সেই মিলনই হবে মূলধন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন, ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির করিতে হইবে। তার একটি উপায় শিক্ষা বিস্তার, আর অপর উপায় জীবিকার ক্ষেত্রে দেশের সর্ব্বসাধারণকে মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া।"

স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকারের সাহায্যও সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। পাঁচশালা পরিকল্পনায় সরকার সমবায় পদ্ধতির প্রতি নজর দিয়েছেন। সমবায় পদ্ধতিতে গ্রাম পরিচালন-পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামের সমস্ত জমি ও অন্যান্য সম্পদ গোটা গ্রামের স্বার্থে নিয়োগ করা হবে। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখেই সমবায় পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা চলবে এবং একই ধরণের কাজে যারা নিযুক্ত হবে, তারা সকলেই সমান পারিশ্রমিক পাবে। ইতিমধ্যেই দেশের বহু স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু সরকারী সাহায্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে না থেকে চাষীরা যদি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করতে প্রবৃত্ত হন, তবেই সমস্যা সমাধান সহজ হবে।

তাই সমবায়ের প্রধান কথা হ'ল দল বেঁধে কাজ করা। দারিদ্র্য ভয়টা ভূতের ভয়ের মত। একসঙ্গে অনেক লোক থাকলে যেমন ভূতের ভয় করে না, তেমনি অনেক মানুষ একসঙ্গে কাজ করলে দারিদ্র্যও থাকে না। বিদ্যা, টাকা, প্রতাপ, ধর্ম্ম—সব কিছুই দল বেঁধে নইলে পাওয়া যায় না। বালি জমিতে ফসল হয় না, কারণ তা আঁট বাঁধে না, ফাঁক দিয়ে সব গলে যায়। জমির দারিদ্র্য ঘোচাতে হলেও তাতে পলিমাটি, সার প্রভৃতি দিতে হয়। যাতে তার ফাঁক বোজে, রস জমে, আঠা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই। ফাঁক বেশী হলে তার শক্তি কাজে লাগে না। এই ফাঁক বোজাতে পারলে অর্থাৎ এক জোট হলে তবেই মানুষের শক্তি কাজে লাগবে। চাষের ক্ষেত্রেও যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি তেমনই কার্য্যকরী। সারা ভারতের সহরাঞ্চলে প্রায় আট হাজার সমবায়

টাকা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ অতি সামান্য। তাই এ বিষয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এখনও দিগন্ত প্রসারিত।

সরকারী সেলস এম্পরিয়ম প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শেষ পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, মাসিক বসুমতীতে কয়েক মাস পূর্ব্বে লেখা হয়,—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেলস্ এম্পরিয়মের শাখা দক্ষিণ-কলকাতায় উন্মুক্ত করলে সরকার নিশ্চয়ই লাভবান' হবেন এবং শহরবাসীরও বহু সুবিধা হবে। যাই হোক সংবাদে প্রকাশ :

GOVT. SALES EMPORIOM

Opening of Ballygunj Branch.

The Ballygunj Branch of Govt. Sales Emporium under the Directorate of Industries, West Bengal was opened at 159/A Rashbehari Avenue, Calcutta, on the 27th September last for the convenience of South Calcutta consumers.

এখন আমরা অনুরোধ জানাবো, শুধু দক্ষিণ-কলকাতার বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য নয়, বাঙলার প্রত্যেক জেলার বিশিষ্ট শহরগুলিতে একেকটি শাখা স্থাপিত হোক। বর্দ্ধমান কিংবা কৃষ্ণনগর কিংবা হাওড়ার পুরুষ এবং মহিলাগণ নিশ্চয়ই কলকাতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সওদা করতে আসবেন না। এবং কলকাতা ছাড়া বাঙলার অন্যত্র আর এক জনও 'কনজুমার' নাই—তা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।

অল্প খরচায় ব্যবসা—কেশতৈল তৈয়ারী

আমরা এ যাবৎ জমি বা ভূমি সংক্রান্ত অল্প খরচায় ব্যবসার কথা পাঠক-পাঠিকাকে জানিয়েছি কিছু কিছু। এ জন্য বহু জন আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বহু পত্র দিয়েছেন। কেন না, বাঙলার অন্য কোন কাগজে না কি আজ পর্য্যন্ত ঠিক এই ধরণের সহজ-সরল ধরণে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে কোন লেখা প্রকাশ হয়নি। পাঠক-পাঠিকা ও বাঙলার ব্যবসায়ীদিগের সহযোগ থাকলে এই কেনা-কাটা বিভাগ নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী উন্নত হবে। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় সুগন্ধি কেশতৈল তৈয়ারীর বিষয় বিবৃত করছি। যে কেউ এই ব্যবসা করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না, পারফুমারী বা প্রসাধন শিল্প-ব্যবসায়ে বাঙলা দেশ আজ অগ্রণী। বেঙ্গল কেমিক্যাল; সি, কে, সেন; এন, এন, সেন; জুয়েল অব ইণ্ডিয়া। ক্যালকাটা কেমিক্যাল; কোহিনুর; বাতগেট; লক্ষ্মীবিলাস; শর্ম্মা-ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি আজ পৃথিবীব্যাপী। বর্ত্তমান সংখ্যায় অল্প খরচায় ব্যবসা হিসাবে সুগন্ধি কেশতৈল তৈয়ারীর প্রক্রিয়া প্রকাশ করছি।

রিসোর্সিন (Resorcin)	দেড় ড্রাম
টিংচার ক্যাপসিকাম্ (Tinc. Capsicum)	আধ আউন্স
টিংচার কুইল্যায়া (Tinc. Quillaya)	এক আউন্স
গ্লিসারিন (Glycerine)	দুই ড্রাম
টিংচার ক্যান্থারাইডিস (Tinc. Cantharides)	তিন ড্রাম
রোজমারি স্পিরিট (Rosemary Sprit)	দেড় আউন্স
গোলাপজল (Rose water)	সাড়ে চার আ

এগুলি মিলিয়ে চমৎকার কেশতৈল হয়। প্রারম্ভিক খ[রচ] অতি অল্প।

জাহাজের ব্যবসায়ে বাঙালী

অনেক দিন আগেকার কথা।

"স্বদেশী" নামক একখানা জাহাজ হাওড়ার ব্রিজে লেগে গেল। ভারি লোকসান হল এতে।

এটা কাহিনীর শেষ কথা। গোড়া থেকে গল্পটা বলি।

কলকাতার এক জন পয়সাওয়ালা লোক এক দিন এ[কটা] জাহাজের খোল কিনে আনলেন নিলাম থেকে। জাহাজ চ[ালাবেন] এই তাঁর ইচ্ছে। তিনি ভাবেন, দেশের লোকে জাহাজ [...] চালায় না! তাই তিনি ঠিক করলেন, জাহাজ চালা[নোর] ব্যবসাটা তিনি নিজে করবেন।

জাহাজের খোলটার উপরে এঞ্জিন এঁটে আর ঘর তৈরি [করে] একটা আস্ত জাহাজ গড়ে তোলা হ'ল। তার পর চলতে ল[াগল] সেই জাহাজ।

কিন্তু দেখা গেল, জাহাজ চালানোটা সহজ কাজ নয়। [...] বিলিতি কোম্পানি, তাদের প্রতিযোগিতার ধাক্কা তিনি [...] সামলাতে লাগলেন। সামলাতে গিয়ে তাঁর অনেক ক্ষতি [...] লাগল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তাঁর যে লড়াই বাধলো, [...] লড়াই-এ তিনি যে সব অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন, সেগুলো [...] পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু সেই ক্ষতির পথটাই তিনি বেছে নিলে[ন]।

যাত্রীরা দেখল, তাঁর জাহাজে চড়লে ভাড়া দিতে হয় [...] শুধু তাই নয়, বিনামূল্যে মিষ্টান্নও খেতে পাওয়া যায়। যা[ত্রীরা] ভাবে, এ কেমন জাহাজের মালিক!

জাহাজের মালিক তো পাকা ব্যবসাদার নন, তিনি ভা[বুক] মানুষ। ভাবের ঘোরে ব্যবসা চালাতে-চালাতে তাঁর ক্ষতির পরিম[াণ] হয়ে উঠল অনেক।

তার পর এক দিন তাঁর জাহাজ হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে ডু[বে] গেল, আর তাঁর ব্যবসাও হয়ে গেল বন্ধ।

এই জাহাজ চালাতে গিয়ে তিনি ফতুর হলেন, কিন্তু সেটা [...] কথা নয়। শেষ কথা হল সফল হওয়া আর তার জন্যে অবিশ্রান্ত চে[ষ্টা] করা। একক চেষ্টায় যদি না হয়, তবে সমবেত ভাবে চেষ্টা করা।

যাঁরা পথ দেখান এবং প্রথমে চেষ্টা করে বিফল হন, আর যাঁ[রা] পরিশেষে সফল হন, তাঁরা সকলেই সমান সম্মানের অধিকারী।

এই "স্বদেশী" জাহাজের মালিক কলকাতার বিখ্যাত ঠাকু[র] বংশের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। —যতীন্দ্রনাথ পা[...]

রাষ্ট্রীয় শ্রমিক-বীমা

গত সংখ্যায় রাষ্ট্রীয় শ্রমিক বীমার শ্রমিকগণের মঙ্গলক কয়েকটি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছি। কি কি বিষয়ে শ্রমিকগণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন সে বিষয়ে সূত্রপাত করেছি এবারেও এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কিছু আলোচনা করছি।

অসুস্থতা ভাতা

যে কোনও শ্রমিক (বীমা করা থাকলে) এই ব্যবস্থায় বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। ভাতা পাবেন মূল বেতনের ৭/১২ অংশ। এই ভাতা পাওয়া যাবে বৎসরে ৮ সপ্তাহ বা ৫৬ দিন অবধি। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত শ্রমিক দু'বছর বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ছাড়াও ১৮ সপ্তাহ অর্থ সাহায্য পাবেন।

প্রসূতি ভাতা

নারী শ্রমিকদের জন্য এই ভাতায় প্রসবের আগে ও পরে মোট বারো সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। দৈনিক বারো আনা করে তাঁরা প্রসূতি ভাতাও পাবেন।

অক্ষম ভাতা

কাজ করতে করতে যদি কোনও শ্রমিক অসুস্থ হন বা কোনও দুর্ঘটনায় পড়েন তো তাঁকে মূল বেতনের অর্দ্ধেকের মত ভাতা দেওয়া হবে যত দিন না তিনি তাঁর কর্মক্ষমতা ফিরে পান।

পারিবারিক ভাতা

কোনও শ্রমিক কাজ করতে করতে মারা গেলে তাঁর স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা যাতে কষ্টে না পড়েন সেজন্য পেন্সনের মত ব্যবস্থা করা হয়েছে এই পরিকল্পনায়। পুত্র বা কন্যা উপযুক্ত হলে অবশ্য আর ভাতা পাওয়া যাবে না। শ্রমিকের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ না থাকলে পিতা-মাতা এই ভাতা পেতে পারেন।

এ সব সুযোগ সুবিধা পেতে গেলে শ্রমিকদের বীমা করতে হবে এজন্য তাঁদের প্রতি সপ্তাহে চাঁদাও দিতে হবে নিয়মিত ভাবে।

শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ		টা	আ
দৈনিক মজুরীর হার	১ টাকার কম	০	০
	১ টাকা থেকে দেড় টাকার মধ্যে	০	২
	১।০ টাকা থেকে দুই টাকার মধ্যে	০	৪
	২ টাকা থেকে ৩ টাকার মধ্যে	০	৬
	৩ টাকা থেকে ৪ টাকার মধ্যে	০	৮
	৪ টাকা থেকে ৬ টাকার মধ্যে	০	১১
	৬ টাকা থেকে ৮ টাকার মধ্যে	০	১৫
	৮ টাকা বা তার চেয়েও বেশী	১	৪

বীমাতে শ্রমিক যা দেবেন মালিককে তার দ্বিগুণ জমা দিতে হবে সরকারী দপ্তরে।

শ্রমিক-বীমা শ্রমিকের মঙ্গলের জন্য একথা ঠিকই। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানাবো যে, পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশেই শ্রমিক-বীমার জন্য শ্রমিকদের কিছুই দিতে হয় না। ভারতেও সে ব্যবস্থা করতে পারলেই ভাল হত।

বর্তমানে কলকাতা আর হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে এ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আড়াই লক্ষ শ্রমিক এই পরিকল্পনার আওতায় এসেছেন। ১৬টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং সাড়ে সাত শত চিকিৎসক

ও "রূপকাহিনীর দেশে" তরুণ বন্দ্যো: N 82673 "সন্ধ্যাবেলা নীল আকাশের" ও "রূপকাঠি গাঁয়ে", শ্যামল মিত্র N 82674 "সারাবেলা আজ কে ডাকে" ও "একটি কথাই লিখে যাব", শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ N 82675 "বিদায় নেবার ক্ষণে" ও "যাই যে চলে", ভানু বন্দ্যো: ও নমিতা সেনগুপ্তা N 82676 (কৌতুক-নক্সা) বিবাহ-বীমা (দু' খণ্ড)।

কলম্বিয়া

হেমন্ত মুখো: GE 24771 "ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলি" ও "স্বপ্নভরা স্বপ্ন মায়ায়" কুমারী গায়ত্রী বসু GE 24772 "ঐ বাজে রিনিঝিনি" ও "আমার ভুবনে প্রদীপ জ্বালাতে", পান্নালাল ভট্টাচার্য্য GE 24773 "ওমা কালী চিরকালই" ও "কোথা ভবদারা দুর্গতিহরা", শচীন গুপ্ত GE ·24774 "তুমি নেই শুধু" ও "চরণ দু'খানি কাজল-অলকে ঢেকে", শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যো: GE 24775 "বাঁশ বাগানের মাথার ওপর" ও "এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা", ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য GE 24776 (রাগপ্রধান) "চলে শ্রীমতী শ্যাম-অভিসারে" ও "কবির খেয়ালে প্রেমময় তুমি" গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখো: GE24777 "ও ঝরা পাতা" ও "হয়তো কিছুই না'হি পাবো", গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যো: GE24778 "করেছি পূজার আয়োজন" ও "ডেকে ফিরে গেছে মা" এ ছাড়াও "দস্যুমোহন", "উপহার" "ফল্গু" ও "কঙ্কাবতীর ঘাট" বাণীচিত্রগুলির গান সকল "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডে প্রকাশিত হ'য়েছে।

কলকাতার সংগীত মরসুম শুরু হয়ে গেছে। গত সেপ্টেম্বর ২৩—২৭ রাত নটা থেকে সারারাত্রিব্যাপী নিখিল ভারত সদারং সংগীত-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ভারতী চিত্রগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম দু'দিনের অনুষ্ঠান তেমন প্রীতিপ্রদ হয়নি, কিন্তু শেষ তিনটি দিনের অধিবেশন বহু দিন শ্রোতাদের মনে জাগরুক থাকবে। এবারের অধিবেশনে যোগদানকারী বাইরের শিল্পীদের ভেতর ছিলেন বড়ে গোলাম আলী, শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর, বিলায়েৎখান, রবিশঙ্কর, শান্তাপ্রসাদ ইত্যাদি ও স্থানীয় শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম গাঙ্গুলী, কেরামৎউল্লা, সাগীরুদ্দীন, দবীর খান, মহাপুরুষ মিশ্র প্রভৃতি বহু গুণী শিল্পীরা। আলোচনা করতে বসে প্রথমেই ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের কথা বলতে হয়। শেষ দিন দেশ রাগে তিনি যে সেতার বাজিয়েছেন তার তুলনা হয় না। বহু দিন শ্রোতাদের কানে লেগে থাকবে তাঁর ঐ দিনের বাজনার আওয়াজ। পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। বড়ে গোলাম আলীর কাছে আমরা অনেক কিছু আশা করেছিলুম, কিন্তু এবার তিনি আমাদের সাধ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এবার একটি নতুন শিল্পীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ। শিল্পীটি হলেন পণ্ডিত শিবকুমার শুক্ল। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি শ্রোতাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। স্থানীয় শিল্পীদের ভেতর শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্যাম গাঙ্গুলী ও শ্রী এ. কাননের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কথক-নৃত্যে বোম্বাইয়ের রোশনকুমারী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

আলাউদ্দিন সঙ্গীত-সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত-মহাসম্মেলন আগামী ২৫শে হইতে ২৮শে নভেম্বর রঙ্গমহল নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত হইবে। যথারীতি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং ভারতের বিশিষ্ট শিল্পিগণ অংশ গ্রহণ করিবেন। এই সঙ্গীত সমাজ সত্ত প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছে সুধী মহলে।

আমার কথা (১০)

উৎপলা সেন

মাসিক বসুমতীর মত সাহিত্য-পত্রিকায় 'আমার কথা' লিখতে বসে কি যে ভয় করছে, তা বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। নিজের কথা বলতে স্বভাবতই মানুষের সঙ্কোচ এবং লজ্জা হয়, কিন্তু সম্পাদক ম'শায় যখন অনুরোধ করেছেন, তখন স্বল্প কথায় আমার সম্বন্ধে দু'-চার কথা লিখছি।

আমার জন্ম হয় ঢাকা শহরে আজ থেকে বছর বত্রিশ আগে, বাংলা ১৩৩১ সালের ২৮শে ফাল্গুন। আমার বাবার নাম রায় বাহাদুর প্রফুল্লকুমার ঘোষ।

আমি গায়িকা হিসেবেই পরিচিতা। গান আমি শিখছি আমার যখন বয়েস আড়াই বছর তখন থেকে। মার কাছেই আমি প্রথম গান শিখি। এর পর শিক্ষাগুরু হিসেবে দ্বিতীয় জন যাঁকে পেলাম তাঁর নাম শ্রীখগেশ চক্রবর্তী। তাঁর কাছে গান শিখি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চলে স্কুলে পড়াশুনা। আমি ঢাকা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কলকাতায় এসে আর্টস পড়ার জন্যে ভর্ত্তি হই স্কটিশ চার্চ কলেজে। আই-এ পরীক্ষা দেওয়া আর আমার হয়নি, কারণ ছাত্রী অবস্থাতেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমার স্বামী শ্রীসতীন্দ্রকুমার সেন।

ঢাকাতেই গান-বাজনা শেখা শুরু, একথা আগে বলেছি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হই ১৯৩৯ সালে। সে সময় স্বর্গীয় সুগায়ক সুধীরলাল চক্রবর্তী মশায় ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ট্রেনার হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর কাছেই আমি আধুনিক গান ভালো ভাবে শিখি। তখন শ্রীসুনীল বসু (বর্ত্তমান এ, আই, আর কলকাতা কেন্দ্রের এ্যাসিষ্টান্ট ডাইরেক্টর) ঢাকা বেতার-কেন্দ্রে ছিলেন। আমি তাঁর কাছেও সঙ্গীতের তালিম নিই। এর কয়েক বছর পরে ১৯৪২ সালে কলকাতায় চলে আসি। এত দিন আমার কোনো গানের রেকর্ড ছিল না। কলকাতায় এসে আমার প্রথম রেকর্ড বের হয়, 'দূরে গেলে মনে রবে না জানি।' এ গানটি আমি গেয়েছিলুম শ্রীদুর্গা সেন মহাশয়ের ট্রেনিং-এ। এর পর থেকে হিন্দুস্থান, কলম্বিয়া, এচ, এম, ভি প্রভৃতি রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান আমার

কত যে রেকর্ড বের করেছেন, তার হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন। যত রেকর্ড আমার আছে তার মধ্যে আমার প্রিয় 'এক হাতে মোর পূজার ডালা' এটি আমি স্বর্গীয় সুধীরলাল চক্রবর্তী মশায়ের ট্রেনিংএ রেকর্ড করিয়েছিলাম। এ রেকর্ডখানি বাজারে বের হবার পরই আমি জনপ্রিয় গায়িকা হবার সৌভাগ্য লাভ করি। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে আমি গান গাইছি ১১৪৪ সাল থেকে।

রেডিও, রেকর্ড ও গানের জলসা ছাড়াও আমায় বহু বার প্লে-ব্যাক গাইতে হয়েছে। শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় 'মাই সিষ্টার' ছায়াছবিতে আমি প্রথম প্লে-ব্যাক গাই। তার পর শ্রীরাইচাঁদ বড়াল মশায়ের সঙ্গীত পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবিতে, শ্রীদক্ষিণামোহন ঠাকুর পরিচালিত 'পথের দাবী' চিত্রে, শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ সেন, শ্রীসত্যজিৎ মজুমদার, শ্রীরাজেন সরকার, শ্রীনচিকেতা ঘোষ, শ্রীঅনিল বাগচী পরিচালিত বহু ছায়াছবিতে আমি প্লে-ব্যাক গেয়েছি।

আমি আধুনিক সংগীত-গায়িকা হ'লেও রবীন্দ্র সংগীত গাইতে খুব ভালোবাসি, কিন্তু একমাত্র শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী মশায় ছাড়া আর কেউ আমায় রবীন্দ্র সংগীত গাইবার সুযোগ দেন নি। তাঁর সংগীত পরিচালিত 'রাত্রির তপস্যা' ছবিটিতে আমি কবিগুরুর 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু' গানটি গেয়েছিলুম, জানি না সেই সংগীতটি আমার প্রিয় শ্রোতাদের ভালো লেগেছিল কি না। কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি দ্বিজেন বাবু যিনি আমায় রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন তাঁকে এই সুযোগে আমার সুগভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

লঘু সংগীতের গায়িকা হিসেবে আমিই প্রথম দিল্লি, লখনৌ, পাটনা, এলাহাবাদ, নাগপুর, জলন্ধর, কটক, শিলং, গৌহাটি প্রভৃতি বেতার-কেন্দ্রে কণ্ঠসংগীত গেয়েছি। দিল্লি বেতার-কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় সংগীত অনুষ্ঠানে লঘু সংগীত পরিবেশনের জন্যে বাঙালা দেশ থেকে শ্রীপঙ্কজ মল্লিক ও আমার প্রথম নিমন্ত্রণ আসে ও আমরা গেয়েছি!

গান এমন একটি জিনিস, যা সারা জীবন সাধনা করলেও শেষ হয় না, তাই আজও আমি ছাত্রী। বর্তমানে আমি শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে গান শিখছি। এবার শারদীয়ায় তাঁরই পরিচালনায় এচ, এম, ভি থেকে আমার রেকর্ড বেরুচ্ছে।

আজ গায়িকা হিসেবে বহু লোকের কাছে আমি স্নেহের পাত্রী হয়েছি। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙালার প্রদেশপাল শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মশায়ের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। টি, বি, ফাণ্ডের জন্যে Stars of India শো ক'রে আমি তাঁর স্নেহের পাত্রী হই। কণ্ঠসংগীত ছাড়া আমার রান্না করতে বড় ভালো লাগে। কিন্তু যে কাজ আমি করি, তাতে মন দিয়ে রান্না করা সকল সময়ে আমার হয়ে ওঠে না। তবে লুকাতে চাই না, খেতেও আমি খুব ভালোবাসি।

উৎপলা সেন

বর্তমানে সংগীত-জগৎ বেশ উন্নতির পথে চলেছে দেখে আনন্দ হয়। আজকের শ্রোতারা ভালো-মন্দ বিচার করতে শিখেছেন, তাঁদের বিচারের ক্ষমতা বেড়েছে দেখে খুশী হই। এটা সংগীত-জগতের পক্ষে একটি স্বাস্থ্যকর সুলক্ষণ বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

আহ্বান

শ্রীসতী সেনগুপ্ত

স্তম্ভিত তুমি—উত্থিত ঐ মৌনী হিমাদ্রি :
বঞ্চিত কেন লুণ্ঠিত বল কৈ সে বিধাতৃ!
দুর্বল নও—সবার পিছনে রয়েছ কেন তবু
কেন তবু বল নিজেরে হারাও ভবিষ্য-প্রতিভূ!

ঐ শোন ঐ শাল-পাইনের উদ্ধত জয়গান—
শিখরে শিখরে শুভ্র মেঘের নির্ভীক অভিযান।
কুহেলিকা থাক—আঁকা-বাকা পথ হোক যত বন্ধুর—
ওঠ তবু ওঠ কোকিলের মত আনো জাগরণী সুর!

তুমি নও ভাই ক্ষীণের সানাই গভীর মাঝে ব্যাপ্ত—
শ্যামের হাতের বাঁশরী বাজাও থেক'না থেক'না সুপ্ত।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বিংশ শতাব্দীতে নারী জাগরণের স্বরূপ

সতী সেন

যাঁরা শরৎ বাবুর "নারীর মূল্য" পড়েছেন—সেই সব ভাই-বোনেরা নিশ্চয়ই পড়েছেন, প্রাচীন সমাজের অশুভ-অসম দৃষ্টিভঙ্গির কথা। যা'র ফলে নারীকে ঠিক মানব মনে না ক'রে একটি ইতর'জীব-বিশেষের মতনই মনে করা হতো। নারীর শ্রমে অর্জ্জিত হতো কৃষকের শস্য-সম্ভার! নারী ছিল গৃহস্থের তৈজসপত্রের পর্য্যায়ভুক্ত একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। যাকে ইচ্ছামত নাচান যায়—হাসান যায় ও বলদের অভাব হ'লে হালে লাগান যায়! 'নারীর মূল্য' পড়ে অনেক নর-নারীই হয়ত সে যুগের নারী নির্য্যাতনের প্রথাকে দোষ দেবেন আর বলবেন—'এটা সাময়িক বিদেশীর আক্রমণে সমাজের অতি সাবধানতার ফলেই আত্মরক্ষার জন্য দরকার হয়েছিল।' তাছাড়া আমাদের শাস্ত্রে বলে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। সেই জন্যই সে যুগের অবরুদ্ধ নারীকে গৃহের অন্তরালে রেখে তাকে করা হয়েছিল 'অসূর্য্যম্পশ্যা'—সূর্য্য মামাও যা'র মুখ দেখেন না।

কিন্তু ইতিহাস পড়লেই জানা যাবে যে, প্রচীন রোম ও গ্রীক দেশের সভ্য লোকেরা স্ত্রী-শিক্ষার দিকে বিশেষ উদারতা দেখান নি। নারী শিক্ষার বেলায় একটি অসম ও অনুদার দৃষ্টিই দেখতে পাই। নারী ছিল একটি প্রয়োজনের সাধন। আধুনিক শিক্ষা 'রুসোর' কাছে অনেক ইঙ্গিত পেয়েছে শিক্ষাধারায়। কিন্তু যাঁরা রুসোর 'Emile' পড়েছেন, তাঁরা জানেন—রুসোর নারী-বিরোধী চিত্তবৃত্তি।

রেনাসাঁযুগের সর্ব্বদিকের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে, সাহিত্যে, সভ্যতায় নারী সচেতন হয়ে উঠেছিল। নারী উপেক্ষণীয়া নয়··· তা'র ভিতরও চেতনার স্পন্দন আছে! Enlightment-এর যুগে নারী সচেতনতা, পুরুষের সঙ্গে সমান মানবতার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলে যে-সব ধার্ম্মিক, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বাধা, রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে উপলব্ধি হয়েছে, নারী-স্বাধীনতার পথেও ছিল সেই সব বাধা। কৃশ্চান-মিশনারিরা বলেছেন—"নারীর 'আত্মা' ব'লে কিছু নেই। কারণ, মনে রেখ—ইভ আদমের পাঁজরার একখানি হাড় থেকেই তৈরী হয়েছিল, আত্মা থেকে নয়!" তবে আর নারীর আত্মা আসবে কোথা থেকে? যা আদিতে নেই, তা বংশে হওয়া সম্ভব নয়। তাই 'অনাত্মবাদ' সম্ভব হয়েছিল নারীর ক্ষেত্রে। আমাদের দেশেও নারী-বিরোধী এমন সব দুর্ব্বাক্য আছে, যা' 'মনুর' মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করে। নারী মানব-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

কিন্তু 'গরজ বড় বালাই'। রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষে নারীর বাহিরে—সংগ্রাম ক্ষেত্রে আসবার যখন দরকার হল, তখন বাছা বাছা যুক্তি, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নানা ভাবে মনুর—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" কথাটি অমান্য ক'রেও প্রচলিত হ'ল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় যে স্বাদেশিকতার গীতি বেজে উঠেছিল; তা'র মধ্যে একটি নতুন সুর ছিল—"না জাগিলে আজ ভারত ললনা, এ ভারত আর জগে না—জাগে না।" নারীর জীবনের ক্ষেত্র পরিসরের সঙ্গে সঙ্গে তা'র মূল্যও গেল বেড়ে।

অনেকে নারীকে পূজনীয়া বলে, বরণীয়া বলে স্তুতি করলেন। যে স্তুতি কারও কারও কানে একটা যুক্তির ফাঁকি বলে মনে হ'ল। নারী যখন 'দেবী' তখন তার আসন তো অনেক ঊর্দ্ধে হবে—নারী পুরুষের সমান হবে কেন? ইহাই ইউরোপে chivalry-র নামে নারীর প্রতি কৃত্রিম বা মিথ্যা সম্মান প্রদর্শনের স্থান নিয়েছিল। ভারতেও তা'ই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টীয় মিশনারি-সমাজ ও রাজনৈতিক প্রগতিবাদী নর-নারীর কল্যাণে এই যুক্তির ফাঁকি ধরা পড়ল। ভাল ভাল সাড়ী ও গয়না পরিয়ে গৃহলক্ষ্মীর শোভা বাড়ে বটে—মর্য্যাদা বাড়ে না। নারী চায় না দেবীর মাহাত্ম্য—তারা চেয়েছিল মানবীয় অধিকার। নারী সম্বন্ধে—'অনাত্মবাদ' যতখানি মিথ্যা,—'দেবীবাদ'ও ততখানি মিথ্যা ও গালাগালি!

বর্ত্তমান যুগের নারী-পুরুষের সাম্যবাদ একটি ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ বা অভ্যুদয়ের ফল।

রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রয়োজনের কথা অনেক দেশ-নেতারা ব'লেছেন, কিন্তু বাহির দিক দিয়ে নর-নারীকে সত্যকার জীবন-সংগ্রামে নামাল অর্থনৈতিক প্রয়োজন। অনেক সময় মহাবিপদের ভিতর থেকেও সম্পদ আসে, ভারতের দারিদ্র্য যদি সমাজের কোনও উপকার করে থাকে, তবে—এনেছে নারী-জাগরণ। দরিদ্র পুরুষ সাহায্যের জন্য চেয়েছেন অন্নপূর্ণার দিকে ভিক্ষার আশায়। গৃহলক্ষ্মী কাব্যে নয়—জীবনে সত্য হ'য়ে উঠেছে। রুশ ও চীনের নারী-জাগরণের ইতিহাস ও কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রগতি—ভারতীয় নর-নারীর জীবনেও জাগরণ এনেছে—এক দিব্য "সোনার কাঠি" ছুঁইয়ে। দরিদ্র-সমাজে, নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছে—শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, পারিবারিক ধন উপার্জ্জনের ক্ষেত্রেও। আর বিশ্বের ক্ষেত্রে, পুরুষের রাজনীতি, মানব-সমাজ মন্থন ক'রে, যে মহাযুদ্ধের বিষ উত্থিত করেছে,—সেই বিষপানের প্রয়োজনে বিশ্বশান্তির পরিকল্পনায়—বিশ্বসমাজে শান্তিময়ী নারী প্রকৃতির আহ্বান এসেছে, নীলকণ্ঠ হবার জন্য। হয় তো সকলে আজও এ ডাক শুনতে পাননি!

আধুনিক যুদ্ধলাঞ্ছিত, দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত সমাজ, উপলব্ধি করেছে—শুধু মস্তিষ্ক নয়—হৃদয়েরও প্রয়োজন একান্ত ভাবেই দরকার। শুধু Logos নয় Erps এরও প্রয়োজন! শুধু পুরুষ নয়, প্রকৃতিরও আরাধনার দরকার। অবজ্ঞাত প্রকৃতি, নিষ্পেষিত হৃদয়াবেগ ও নির্য্যাতিত নারী-শক্তি—আজ মানব-সভ্যতার স্বপ্নরাজিকে অলীক প্রতিপন্ন করেছে—মহাযুদ্ধের ধ্বংসময় প্রলয়মূর্ত্তিতে। তাই শুনতে পাই Democracy-র যুগে—নর-নারীর তুল্যাধিকারের কথা—

দেবী নয়,—দাসী নয়,—শুধু মানুষ। এই সত্যাদর্শকে যে অস্বীকার করবে, তার সভ্যতা টিঁকবে না—তার জীবন-সাম্য যাবে নষ্ট হয়ে নারী-পুরুষের সম্বন্ধে।

মনোবিজ্ঞান বলে, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির সহযোগিতা যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে দরকার, নারী ও পুরুষের—Eros ও Logos এর সামঞ্জস্য ততোধিক দরকার। ব্যক্তিজীবনে উপেক্ষিত প্রবৃত্তি, যে সকল মানসিক ব্যাধি—Neurosis, Psycho-neurosis ও Psychosis এর সৃষ্টি করে,—সমাজ, দেশ, ও বিশ্বের ক্ষেত্রে সেইরূপ আনে—অসামঞ্জস্য ও অন্যায় যুদ্ধ—যা' মনোবিকারেরই ফল। এতে শুধু বিশ্বের শান্তিহানি নয়—হয় স্বাস্থ্যহানি।

অতএব নারী-জাগরণের স্বরূপ, মানুষের এই প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি; Eros ও Logos-এর সামঞ্জস্য, যাহা আধুনিক সভ্যতার অবদান। হিগেলীয়-ডায়লেক্‌টিক্স-এর ছন্দে বলতে গেলে—অতীতের ধূসর যুগে ছিল নারী ও পুরুষের বৈষম্য বা Antithesis,—বিংশ শতাব্দীতে আভাস পাই এক সাম্য-জীবনের Synthesis-এর, যাহা সত্যকার মানবীয় সভ্যতাতেই হয় সম্ভব।

মাধুর্য রসের ভাবপ্রবাহ

শ্রীমহামায়া দে

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই একটি স্বভাবগত ভাবের প্রবাহ আছে। সেই ভাবের প্রবাহই রূপ পরিগ্রহ করে সাহিত্যের নানা দিকে। আমি এখানে রস-সাহিত্যের কথাই বলছি—যে সাহিত্য যুগে যুগে মানুষের অন্তরে রসের ধারা বইয়েছে। ভাবের প্রেরণাই এই রসের ধারা সৃষ্টি করেছে। এই ভাবের ও তার প্রকাশভঙ্গীর মূলে আছে দুইটি সত্তা—পুরুষ এবং নারী। নারী পুরুষকে অবলম্বন করেই রসসাহিত্যের সৃষ্টি।

একেবারে উচ্চ স্তর থেকে বলা যেতে পারে, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম এবং গুণময়ী সাকারা প্রকৃতিকে নিয়েই যা কিছু। অবশ্য আমি এখানে তত্ত্বকথা বলতে বসিনি; আমি কেবল বলতে চাই মধুর আনন্দময়তার সৃষ্টি একটিকে ধরে হয় না, দু'টি সত্তার দরকার।

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও সাকারা 'আমি' থাকে। আমার অদৃশ্য প্রিয়তমের কাছে নানা ভঙ্গীতে আমার প্রেম নিবেদন করে মধুর আনন্দের সৃষ্টি করি এবং সেই আনন্দঘন অমৃতরসে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে বিভোর হয়ে থাকি।

বৈষ্ণব সাধকেরা নানা ছন্দে রসিয়ে রসিয়ে রচনা করেছেন প্রিয় ও প্রিয়ার মিলনতত্ত্বের গাঢ়তা ও গভীরতা তাঁদের নিজেদের অন্তরের ভাবমাধুরী দিয়েই। মেঘদূতকে, হংসদূতকে প্রেমবার্তা বহনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন কবি অন্তরের ভাবময় আকুলতার মধ্য দিয়েই। প্রিয়-অন্বেষণই সেখানে মুখ্য। প্রিয় বা প্রিয়া না হলে আমরা যেন বাঁচি না। তাই আমাদের বলতে হয়—"ওগো মেঘ, তুমি যাচ্ছ যখন ঐ দিক দিয়েই, তখন আমার একটা নিবেদন শুনে যাও। ঐ দিকেই আছেন আমার প্রিয়া, তুমি ক্ষণেক দাঁড়িয়ে আমার প্রিয়তমাকে বলে যেয়ো আমার কথা। আমি এখানে বন্দী—একা, প্রিয়া-বিরহী। সেখানে প্রিয়াও আমার একা প্রিয়-বিরহিণী। আকাশ-পথে বার্তার মধ্য

দিয়ে আমাদের মিলন সংযোগ কর তুমি"। যক্ষের প্রিয়াবিরহের এই ব্যাকুলতা—এ ব্যাকুলতা আমাদের সবার অন্তরতম ব্যাকুলতা—চিরন্তন ব্যাকুলতা।

তেমনই—গোপন জলপথে হংসদূতের মুখে প্রেমলিপি পাঠাই আমরা প্রিয়তমের কাছে—"ওগো প্রিয়তম এসো আমাকে গ্রহণ কর। আর যে আমি বাঁচি না, কতো দিন আর অপেক্ষা করবো"। কাব্যের মধ্য দিয়ে এই যে অন্তরের ব্যাকুলতা নানান ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে—এ কি আমাদেরই অন্তরের ব্যাকুলতা নয়?

মিলন-মাধুর্য দিয়েই সাহিত্য সার্থক হয়ে ওঠে—এর মধ্যে একটুও দ্বিমত নেই। সবার মূলে প্রেম। এই প্রেমকে নানামুখী করে অন্তরকে আমরা সরস রাখি। দাস্য, বাৎসল্য এই প্রেমেরই এক-একটি রূপ। কিন্তু মাধুর্যই সবার প্রধান। তাই এই মাধুর্যের বর্ণনা কবিরা নানা দিক দিয়েই করেছেন। বৈষ্ণবগণ করেছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধুর রস-বর্ণনা, শাক্ত শৈবরাও করেছেন প্রেম-অনুরাগী শিবকে অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী। আবার 'ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী।' সবই প্রেম-অনুরাগের নানা ভঙ্গিমায় অভিব্যক্তি। সবই মানুষের নিজের মনের মাধুরী দিয়ে রচিত।

এ হল উচ্চ স্তরের দিক, যাকে আমরা আধ্যাত্মিক দিক বলি। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেরও এই দিয়ে ব্যাখ্যা আছে। সুন্দর হচ্ছেন চিরসুন্দর পরমপুরুষ, আর বিদ্যা হচ্ছেন ব্রহ্মবিদ্যা পরাপ্রকৃতি। এই বিদ্যাসুন্দরের যে সাধারণ ব্যাখ্যা প্রচলিত—সেই সাধারণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই কবি পরমপুরুষ চিরসুন্দরের সঙ্গে পরাপ্রকৃতি বিদ্যার মিলন রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন!

বৈষ্ণব কবির প্রেম-চম্পুট, উজ্জ্বলনীলমণি সে-ও ঐ রসিয়ে রসিয়ে প্রেম-মাধুর্যের বর্ণনা!

মানুষের দেহে তিনটি স্তর আছে—উচ্চস্তর, মধ্যস্তর ও নিম্নস্তর। হৃদয় হচ্ছে মধ্য স্তর, স্বতঃপ্রধান ভালবাসা বা প্রেমের ক্ষেত্র। প্রেম ভালবাসা স্বভাবতঃই নরম, কোমল বৃত্তি। এই বৃত্তিকে নারীর সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়।

মধ্যস্তরকে যদি নারী বলা যায়, অপর দুটি স্তরকে বলতে পারা যায় পুরুষ। উচ্চ স্তর উত্তম পুরুষ, ঊর্দ্ধদিকের সদা চেতনাময় পুরুষ; আর নিম্ন স্তর অধম পুরুষ, নিম্ন দিকের মোহাচ্ছন্ন পুরুষ। এক দিকে প্রেমিক—অপর দিকে কামুক। মানুষের দুই দিকের দুই পুরুষবৃত্তি মধ্যের নারীবৃত্তি বা কোমলবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দু' রকম ফল উৎপন্ন করে।

হৃদয়-বৃত্তি যখন ঊর্দ্ধদিকের সদা চেতনাময় প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন মাধুর্যের শতসহস্র ধারায় সম্প্রসারণে আনন্দের অমৃতের বন্যা সৃষ্টি করে; আবার যখন হৃদয়বৃত্তিকে নিম্নদিকের মোহাচ্ছন্ন অধম পুরুষ কামের দ্বারা আকর্ষণ করে, তখন মানুষের মধ্যে ভূতের নৃত্যের আবিলতা সৃষ্ট হয়।

হৃদয়বৃত্তিকে নিয়েই লেখকেরা গদ্যে-পদ্যে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীতে চরিত্র বিকশিত করেছেন, কখনও ঊর্দ্ধদিকে তুলে মিলন-মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছেন, যেমন কামগন্ধহীন স্থিতধী অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা; আবার কখনও নীচে নামিয়ে বাস্তবের ধূলোমাটিতে চরিত্রকে ম্লান করে তুলেছেন। হৃদয়বৃত্তিকে নিয়ে অনুলোম বিলোম দুয়ে খেলিয়েছেন।

দুই দিকে দুই পুরুষবৃত্তি, সচেতন এবং অচেতন, মধ্যে প্রকৃতিস্বরূপা হৃদয়বৃত্তি এ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। কি নারী কি পুরুষ, দু'জনের ভিতরেই আছে এই দুই বৃত্তি কম-বেশী প্রভাব নিয়ে।

গল্প উপন্যাসে যে রূপদান সে-ও ঐ গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত পুরুষ প্রকৃতি বৃত্তির রং নিয়েই। পূর্বদিনের যে কাব্যাদি সাহিত্যে চরিত্র সংযোজনা বা বর্ণনা, আজকের দিনে আমাদের কাছে তা পুরান ইতিহাসরূপে দেখা দিয়েছে। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে আজ সে গ্রন্থের পূজা করি আমরা। আবার আজকের দিনেও এমন গল্প-উপন্যাস-কাব্য যথেষ্ট রচিত হয়েছে বা হচ্ছে, যা সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই সমাদৃত হবে।

সাহিত্যে এই রসসাধনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—ঊর্দ্ধদিকের পরমপুরুষ চিরসুন্দরকে আশ্রয় করে যে রচনা সেইটাই হয় আমাদের সাধন মার্গ। সেখানে কামগন্ধের লেশমাত্রও নাই, কিন্তু আছে প্রেমের বন্যায় মিলন-মাধুর্য। আর নিছক বাস্তব নিয়ে যে রচনা, বাসনা-কামনা নিয়ে জীবনে সুখ-দুঃখের আবর্তন, সেইটাই হচ্ছে এই আপদগ্রস্ত সংসার, যার মধ্যে ডুবে থাকতে সচেতন মন আদৌ চায় না।

কিন্তু এর মধ্যেও লেখকের বৈচিত্র্য রচনার কেরামতি আছে। তিনি কলমের মুখে সংসারেও সৃষ্টি করেন স্বর্গ এবং স্বর্গ থেকেও ঘটান পতন। অঘটন ঘটন সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে তিনি বিশেষ পটু। তবে তার মধ্যেও তিনি সচেতন থাকেন। পঙ্কের মধ্যে পদ্ম ফুটিয়ে স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলেন; স্বর্গের দেবদেবীরও পদচ্যুতি ঘটে, কিন্তু সে পদচ্যুতি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিছু শাস্তি কিছু পরীক্ষার পর আবার তাঁরা ঘুরে স্বর্গে উপনীত হন। লেখকদের কল্পনার রং-এ কলমের মুখে রচিত হয়ে চলে এইরকম বিবিধ বিচিত্র মিলন-রহস্য।

মান দিয়ে, অভিমান দিয়ে, বিরহ দিয়ে, মিলন দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, গ্রহণ দিয়ে, ভয় দিয়ে সন্দেহ দিয়ে যত ভাবে পারা যায় রসিয়ে রসিয়ে, খেলিয়ে খেলিয়ে কবি, গ্রন্থকার প্রেমতত্ত্ব রচনা করে চলেন।

এ বৃত্তি মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। কেউ বা এ মিলন-তত্ত্ব লিখছে, কেউ তা পড়ে উপভোগ করছে, কেউ বা তা নিয়ে ধ্যানের মধ্যে নিজের অন্তরে বৃন্দাবন রচনা করছে, উপভোগ করছে সহস্রারে রাসলীলা, কপালের দিব্যক্ষেত্র, যেখানে কল্পনা করা হয় কৈলাস, সেখানে উপলব্ধি করছে হর-গৌরীর মিলন।

মোট কথা, প্রত্যেক মানুষের অন্তরই প্রেম বা মিলন অনুরাগী। শরীরে সে একা হলেও অন্তরে সে একা নয়, সেখানে বহু তুঁহু আছে। এক অন্তরের মধ্যেই সেই বহু তুঁহু দিয়ে রচিত হয় বিরাট এক একটি আলাদা জগৎ। যেদিন থেকে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিন থেকেই সুরু হয়েছে সেই তুঁহুর বর্ণনা ও রচনা। সে রচনার মধ্যে রসসৃষ্টিই প্রধান লক্ষ্য যা একজনকার অন্তর থেকে অন্যের অন্তরে প্রবাহিত হতে পারে বা হয়।

মহাকবি বাল্মীকির কাব্যের মূলে ক্রৌঞ্চ-দম্পতি। বাল্মীকি নিষ্ঠুর ও অরসিক বলেই খ্যাত ছিলেন। দেবতার বরে এবং কঠোর তপস্যায় তাঁর নিষ্ঠুরতা ও অরসিকতার অপবাদ যখন ঘুচলো, তখন

এদের প্রথম কলহ···
এরা নব-বিবাহিত, কিন্তু···
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর···
আমি ওঁর জন্যে যথাসাধ্য করি, তবুও···
ঝগড়া কোরো না। আমি বুঝেছি গলদ কোথায়।
লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না !
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে !
এ ছাড়া পরিষ্কার করে কাচার উপায়ই বা কী ?
সানলাইট সাবান ব্যবহার কর—যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে -কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়: সেইজন্যে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)।
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো !
আরে : সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন—আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
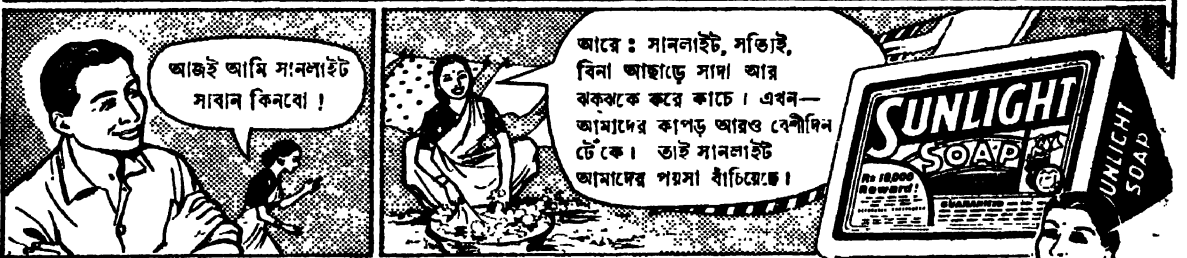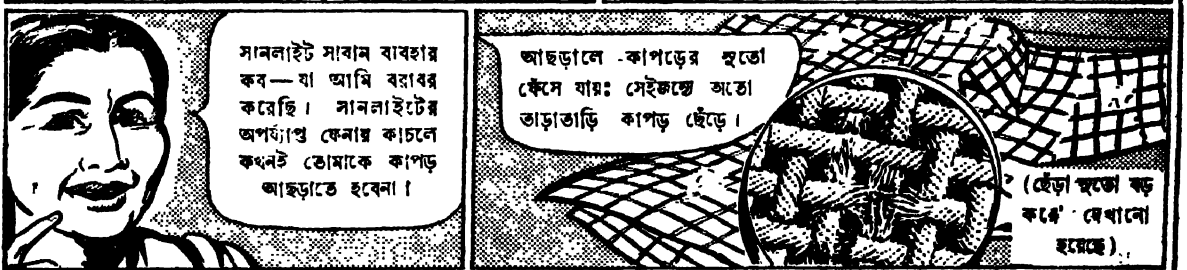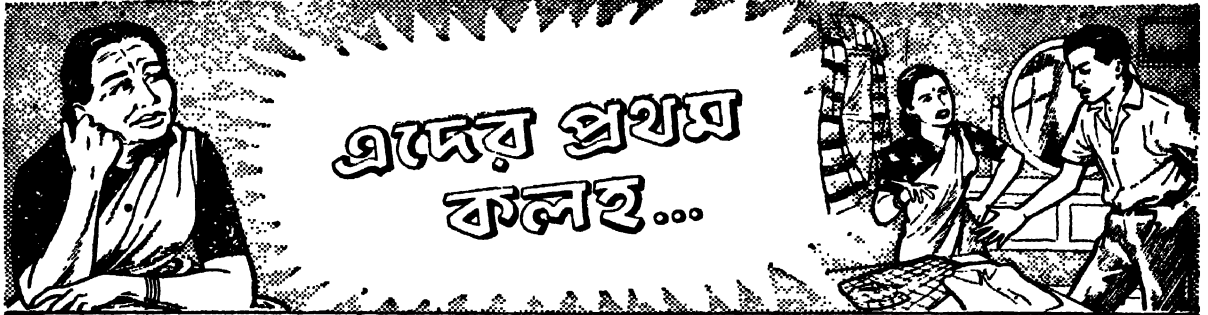
তাঁর কবিশক্তির উদ্বোধন করল এক ক্রৌঞ্চদম্পতি—তাদের একের জন্তে অপরের বিরহ বিধুরতা। হৃদয়ের দ্বার খুলে গেল বাল্মীকির সেই দ্বার দিয়ে মিলন-বিরহের সুষমা ঝরে পড়ল অজস্র ধারায়। ধন্য হলো তাঁর লেখনী, তিনি হলেন কল্পলোকের স্থায়ী অধিবাসী।

অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচনা করলেন ব্যাসদেব। তার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানি রক্তারক্তির ব্যাপারই বেশী, কিন্তু তারও ফাঁকে ফাঁকে অন্তঃসলিলা প্রেমের চিত্র আঁকতে ব্যাসদেব কৃপণতা করেন নি, যা মনকে কঠিন কঠোর হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও রসিয়ে দেয়। বিবৃতির প্রয়োজন নেই, একটি মহনীয় প্রেম-অনুরাগের কথা বলি, সেটি হচ্ছে পতি-প্রেমময়ী গান্ধারীর কথা। অন্ধ পতির অনুরাগে নিজের কৃত্রিম অন্ধতার সৃষ্টি করা তাঁর চরম প্রেমের নিদর্শন।

রামচন্দ্রকে প্রজা-রঞ্জনের জন্য বাহ্যিক ভাবে নির্মম হতে সীতার প্রতি শাস্তি বিধান করতে হলেও, অন্তর ছিল রামের সীতার প্রেমে ছাওয়া। দৃঢ়চিত্ত হলেও সময়ে সময়ে রামচন্দ্রকে সীতার বিরহে ভেঙ্গে পড়তে দেখি। বাইরে কঠোর রাজকার্যে লিপ্ত থাকলেও অন্তরটি ছিল সীতাময়। সেখানে সীতা ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই। এ যেন উত্তপ্ত বালুর তলায় প্রেমের ফল্গুধারা।

গ্রন্থকারের মনের মাধুরীতেই এই সৃষ্টি। আনুসঙ্গিক বহু কিছু থাকলেও সকল কিছুকেই বিকৃত করে রেখেছে একটি তন্ত্রী, সে তন্ত্রীটি হচ্ছে প্রেম-রহস্যের। সে রহস্য চিরন্তন, সকলের অন্তরতম। কারোর অস্বীকার করবার নয়। বরং স্বীকৃতির মধ্যেই আছে আনন্দ। তাই কবি মৃত্যুর মধ্যেও সে রস আস্বাদ করতে চেয়েছেন। বলেছেন—

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাট্যের বিচার

শ্রীমতী মঞ্জু মিত্র

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি মুখ্যতঃ গভীর অধ্যাত্মরসের নাটক।

প্রথমেই প্রয়োজন 'রূপক' এবং 'সাঙ্কেতিক' নাটকের রীতি-প্রকৃতি অনুসারে এই নাটকের জাতি নির্দ্ধারণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রে 'রূপক' এবং 'সাঙ্কেতিক' নাটকের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বহু কথাই বলা হয়েছে। সুধীদের এই সকল বিশিষ্ট মতবাদ উদ্ধৃত করবার পূর্বে শব্দগত অর্থের দিক থেকে এর কি অর্থ দাঁড়ায় পর্যালোচনা করা সমীচীন। 'রূপ'—শব্দটির অর্থ হ'ল—প্রকাশ, যা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। এই 'রূপ'-এর সঙ্গে অল্পার্থে 'ক' যোগ করে উৎপন্ন হয়েছে রূপক শব্দটি। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় পরিপূর্ণ রূপ নয়, অস্পষ্ট কোনও এক 'রূপক'-এর দ্বারা অদৃশ্য কোন অরূপের আভাসবাণী ইঙ্গিতে যা প্রকাশ করে তাই "রূপক"। অতএব এ যে রূপের মত একটা সম্পূর্ণ কিছুকে প্রকাশ না করে একটা অসম্পূর্ণ অর্থাৎ রূপেরই অপ্রকাশিত কোন অনুভবের আভাস দেবে তা সহজেই অনুমেয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে একেই বলা হয়েছে—Symbolic Drama—এ মনের এক প্রকার অরূপরাজ্যের ইঙ্গিত দেয়, তা মেনে নিয়েছে অরূপকে, অপ্রকাশকে, অতীন্দ্রিয় বোধ জগতের ইঙ্গিতকে। মনোজগতের এই সূক্ষ্ম অনুভব-সাপেক্ষ বস্তুকে পরিপূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, তাই কোন প্রতীক বা Symbol এর দ্বারা তার আভাসমাত্র করতে হয়। এই জন্য Symbolic Drama বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার একটা বস্তুর দ্বারা যখন অন্যতর কোন বিষয়েরই কথা ইঙ্গিত করা হয়, বা সঙ্কেত করা হয় তখন তাকে বলি সাঙ্কেতিক নাটক। এখানে কিন্তু অতীন্দ্রিয় কোন বোধের অস্পষ্টতার কথা নেই। নাটকের মধ্যে অবর্তমান কোন নীতি বা তত্ত্বের সঙ্কেত করে বলেই তাকে বলা হয়েছে সাঙ্কেতিক নাটক। পাশ্চাত্য সাহিত্যে একেই বলা হয়েছে allegory.

রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচক অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই রূপকের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয়, কি করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাবকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে, খানিকটা আলগা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার যে তাহার আবরণ সরাইয়া তাহাকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।"

এইবার বিচার করে দেখা প্রয়োজন 'রাজা' নাটকটিকে কোন শ্রেণীতে ফেলা যাবে। রূপকথার রাজা-রাণীর আড়ম্বরপূর্ণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে অদৃশ্য অরূপ ব্রহ্মকে লাভ করবার পথে সাধকজীবনের ক্রমপরিণতির কথাই এখানে বিভিন্ন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পার্থিব জীবনের রূপমোহগ্রস্ত অপ্রস্তুত মন নিয়ে অধ্যাত্মসাধনার পথে সাধকের অভিযাত্রা—কিন্তু রূপের প্রলুব্ধতার মধ্যে আছে বাসনার হাহাকার তার মাঝে অরূপ যিনি, নিত্যসিদ্ধ নির্মল অদৃশ্য অপরূপ—তাকে লাভ করা কোন মতেই সম্ভব নয়, তাই বাসনার আগুনে পুড়ে দগ্ধ হয়ে, আত্মশুদ্ধির দ্বারা সাধক-জীবনের প্রস্তুতি এবং সিদ্ধি। সেই আভাসই এখানে ক্রমপরিণতির স্তরের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবজীবনের অধ্যাত্ম সাধনার সেই গুহাহিত তত্ত্ব দৃশ্যসিদ্ধ নয়, পরন্তু অনুভবসিদ্ধ কাহিনীর দৃশ্যরূপের অন্তরালে অরূপানুভূতির রূপকাভাস তাই এই নাট্যের মধ্যে কাহিনী যে মূলতঃ রূপকনাটক তাতে সন্দেহ নেই। যে অবাধ্য মনসোগোচর অনুভূতির বাস্তবে অস্ফুট বিকাশমাত্র সম্ভব, নাট্যরূপে তো তার প্রস্ফুট প্রকাশ কোন মতেই সম্ভব নয়, তা উপলব্ধিরই ব্যাপার; এবং এই জন্তেই এই নাটক রূপক হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ ভাবে।

অধ্যাত্মরসের নাটক বলে রূপকই এর সংজ্ঞা কিন্তু সাঙ্কেতিকতাও এর মধ্যে আছে, তা হ'ল পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে। অন্ধকার ঘরে যেখানে অরূপ রাজার সঙ্গে অর্থাৎ উপনিষদের 'অদৃষ্টমদৃশ্যমব্যয়ম্'-এর সঙ্গে সুদর্শনা রাণীর কথোপকথন সেখানে রূপ থেকে রূপাতীতে যাওয়ার গূঢ় সাধনতত্ত্বের রূপকাভাস। সুদর্শনার জীবন সেই সাধনার সিদ্ধ, তাই তার আলোর জন্য নেই কোনো ছটফটানি। অন্ধকার ঘরে এই যে সাধনার তত্ত্ব—এ হ'ল রূপকত্বের ঠাস বুনানি। সুরঙ্গমা উপনীত হতে পেরেছে এই অধ্যাত্ম অনুভূতির চরম তীর্থে, তার কথাবার্ত্তায় তারই আভাস, সে বুঝে নিয়েছে ভগবান শাসনে রুদ্র, পালনে শিব। তাই

বলেছে "কী নিষ্ঠুর ! কি নিষ্ঠুর। কি অবিচলিত নিষ্ঠুরতা, তিনি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, জন্মের মত বেঁচে গেলুম"। কিন্তু সুদর্শনার কাছে এ সব কথাই হেঁয়ালি। সাধন ক্ষেত্রে তার মন অপ্রস্তুত। বস্তুরূপের বাসনার ঝাঁঝ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে নেশার মত। তাই পরমকে চরমকে সে লাভ করতে চায় এই সীমাময় রূপের মধ্যে। কিন্তু আলোর হাজার হাজার রূপের মধ্যে হৃদয়ের এই রাজাটিকে চিনে নেবার জন্য যে চিত্তপ্রস্তুতির প্রয়োজন তাই তো সাধকের সাধনা। যে প্রস্তুতি সুদর্শনার মধ্যে আসেনি, তাই তার এত চাঞ্চল্য, বস্তুরূপের নেশায় তার মন ভরপুর—তার রাজার কল্পনা নববর্ষার জলভরা মেঘের অপরূপতায়; শরতের শিশিরস্নাত সেফালি-বনের মধ্যে কুন্দফুলের মালা গলে, শ্বেতচন্দন বুকে, মাথায় সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ—ইত্যাদি দৃশ্য সমারোহের মধ্যে তাহার অন্তরতমের কমনসুন্দর রাজবেশ। এ সবই রাণীর বস্তুরূপের মাদকতার ইঙ্গিত বহন করে। তাই রাজা বারে বারে সতর্ক করেছেন—"মন যদি তার মত হয় তবেই সে মনের মত হবে। আগে তাই হোক"। এই চিত্তপ্রস্তুতি এবং পরিণতির ক্রমোচ্চমান গতি এবং সিদ্ধির কথা দিয়েই ঘাত-প্রতিঘাতময় 'রাজা' নাটকখানি।

ঠাকুরদাদার সহজ সাধনার মধ্য দিয়েও এই রূপকত্বের আভাস. তাই তাঁর কথাবার্ত্তার চরম একটা অনুভূতির তীব্রতার অস্পষ্ট ইঙ্গিত। তিনি জানেন—"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"। তিনি বুঝে নিয়েছেন বিশ্বদেবতা আছেন প্রতি রূপে-রূপে, আবার তিনিই বিরাজ করছেন মানুষের অন্তরে। তাই পথিক একজন যখন বললো—"আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে, কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।" তখন ঠাকুরদা উত্তর দিল—"ওর মাঝে আছে. প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোক মিলে সূর্য্যে ফুঁ দিলে সূর্য্য অম্লান হয়েই থাকেন।"—কাঞ্চী, কোশল, অবন্তী প্রভৃতি রাজাদের মধ্যেও এই অরূপ সাধনার রূপকত্বের আভাস, কেউ এই রাজারূপী ভগবানটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করেছেন, কেউ সংশয় করেছেন। নাটকের শেষে দেখি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়ে ভাগবত সাধনার বিভিন্ন পন্থানুসারী সকলেই মিলেছে এসে এক বলে দিয়েছে—"এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাকে পৌঁছুবে, সামনে চলে যাও।"

সুদর্শনা নিল দক্ষিণের কুঞ্জবনের পথ—তাই বাসনা-আগুনে তাকে পুড়ে পরিশুদ্ধ হয়ে নিতে হল। সাত রিপুর টানাটানি হানাহানির মধ্য দিয়ে চোখের জলে তার এই সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হ'ল। অজিত চক্রবর্ত্তী বলেছেন—"এইখানেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ। তাহার অর্ঘ্য যে সৌন্দর্য্যের অন্তরতর রিক্ত নির্মল "সব রূপডোবান রূপে'র কাছে না পৌঁছাইয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের ভোগলালসা প্রদীপ্ত স্থূল রূপের মলিনতার মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ধূলায় লুটাইয়াছে, যে মুহূর্ত্তে ইহা অনুভব করিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রায়শ্চিত্তের শুরু এবং মুক্তির সূত্রপাত।

সৌন্দর্য্যবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন তো পাপ নয়; পাপ, যখন লালসা সৌন্দর্য্যবৃত্তির স্থান জুড়িয়া বসে। সে লালসা নিতান্ত ইন্দ্রিয়ের জিনিষ—হৃদয়কে তাহা নষ্ট করিতে পারে না।

কাঞ্চী রাজাদের সাধনার সূত্রপাত অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আসল রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই জোর করে তিনি অবিশ্বাস করুন নকল রাজার নকলটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না, তাই সুবর্ণের ফাঁকিটুকু তিনি সহজেই ধরতে পারেন। তাই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রুদ্রের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধির পথ। নাটকের শেষ দৃশ্যে আবার দেখি অন্ধকার ঘরের মধ্যে সুদর্শনার সাধনার পরিতৃপ্তি। তাই তার মধ্যে আর সেই অস্থিরতা নেই, রূপের জন্যে নেই কোন উন্মাদনা। বাসনা, দম্ভ সব কিছু ঘুচে গেছে বলেই সে বলতে পেরেছে—"আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী। আমাকে সেবার অধিকার দাও।"

সাধনার পরিণতিতে অপূর্ব মানসশান্তি লাভ করতে পেরেছে বলেই সুরঙ্গমার মত স্থির ভাবে দ্রষ্টার মত অতীত জীবনের ক্ষুদ্রতা এবং বাসনামত্ততা নিত্য লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তাকাতে পেরেছে। আমার প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, তুমি সুন্দর নও তুমি অনুপম।—এই আধ্যাত্মিক অরূপ সাধনার রূপক ব্যঞ্জনা আছে কাহিনীর রূপচিত্রণের অন্তরালে—এইখানেই রাজা নাট্যের সার্থক রূপকত্ব। যে অদৃশ্য নায়ক 'রাজা' তার কথোপকথন ও চরিত্র-রচনায় কবি অপূর্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এই 'রাজা'র সম্বন্ধে এতটুকু বস্তুরূপের ইঙ্গিত কবি কোনখানে করেন নি, তাঁকে সর্ব্বদা সযতনে নেপথ্যে রেখে গেছেন—নতুবা নাটকের রূপকত্ব নিমিষে ভূমিসাৎ হয়ে যেত। সুরঙ্গমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, তথাপি তার উক্তির মধ্যেও 'রাজা'র প্রত্যক্ষতার ইঙ্গিত কোথাও মেলে না। সে রাণীর কাছে বলেছে—"এখন এমন হয়েছে, যে সকাল বেলায় যখন তাঁকে প্রণাম করি, তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকে তাকাই, আর মনে হয় এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে যেমন রাজার বিরাটত্বের আভাস পাই, তেমনি অরূপের অপরূপত্ব আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি রাজার 'পায়ের তলার মাটি' না বলে যদি 'পায়ে'র কথাই বলতেন তবে এই সামান্য বস্তুরূপের ইঙ্গিতে রাজার সর্বব্যাপী বিরাটত্ব এক মুহূর্ত্তেই ক্ষুণ্ণ হয়ে যেত। সুরঙ্গমা বা ঠাকুরদাদাও তাই রাজার প্রত্যক্ষ রূপের কথা কোথাও বলেন নি। আবার ঠাকুরদাদার মুখে কবি বলিয়েছেন—"এতে রাগ কর কেন বিভু? ওর রাজা কুৎসিত বৈ কি। ও আয়নাতে যেমন আপন মুখটি দেখে আর রাজার চেহারাও তেমনি ধ্যান করে।" অর্থাৎ তিনি হলেন নির্বিশেষ অব্যয় ও অদ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রতিরূপে তার প্রতিফলন। তাই নাটকের শেষে সিদ্ধিলাভের পর রাণী আপন মনোমন্দিরে সেই অরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে নির্ভয়ে বেরিয়ে এসেছে রূপের জগতে! রাজা রাণীকে আহ্বান করেছেন আলোর মধ্যে। কিন্তু আলোকের মধ্যে রাজার এ আবির্ভাব ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ আবির্ভাব নয়, পরন্তু রাণীর অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টিতে বাস্তবস্তুর প্রতিরূপের মধ্যে তার ধ্রুব উপস্থিতি। তাই সুদর্শনা অন্ধকারের অন্তরতম সেই প্রভুকে প্রণাম করে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নত হয়ে তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে তবেই বাইরের জগতে আসতে চায়। এই হল 'রাজা' নাটকের রূপকত্ব।

রূপকত্বের সঙ্গে সাঙ্কেতিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এ নাট্যে। পথের দৃশ্যে যে বিভিন্ন নাগরিকদের চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, তাঁদের বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে যেমন হাস্যরস ফুটে উঠেছে, তেমনি প্রচলিত বহু রীতিনীতির প্রতি ইঙ্গিতে কটাক্ষপাত করা হয়েছে। বিশ্বাস বা কোন সত্য উপলব্ধি বাদ দিয়ে একটা অন্ধসংস্কারের পিছনে ছুটে চলাই যে আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির অভ্যাস। তার প্রতি কটাক্ষপাত কবির প্রায় সব রচনাতেই পাওয়া যায়। এখানেও পরিবেশ রচনায় সেই সাঙ্কেতিকতার দৃষ্টান্ত। সহজ প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে আইনকানুনের বিধি-বিধান দিয়ে রুদ্ধ করে রাখার যে কৃত্রিমতা, তা হ'ল সহজ প্রাণের অবমাননা। তাই এক পথিক বলেছে, "আমাদের রাজা বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো। রাস্তা পেলে প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে।" আবার পুঁথিগত শাস্ত্রবিধানের সংস্কার আমাদের এ দেশের লোকেদের যে কি পরিমাণ বন্ধনগ্রস্ত করে রেখেছে তার প্রতিও সুন্দর কটাক্ষপাত কবি করেছেন। কৌণ্ডিল্য বলেছে—"আমার বাবাকে তো জান—কত বড় মহাত্মা লোক ছিল, শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডী কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে, একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়। সে এক বিষম মুস্কিল, শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশের যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই; অতএব ওই চার নয়, উনপঞ্চাশকে উল্টে নিয়ে নয় চার চুরনব্বুই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ীর বাইরে পোড়াতে পারি; নইলে ঘরের মধ্যেই দাহ করতে হ'ত। বাবা এত আঁটাআঁটি, এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ।"

আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে নকল রাজার প্রবঞ্চনা চলে সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ কবি করেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সুযোগ পেলে নিতান্ত অক্ষম ব্যক্তিও বহিঃচাকচিক্যের জাঁকজমক দিয়ে মন ভুলিয়ে প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠে। তখন রাজার চেয়ে রাজার ধ্বজাটাই হয়ে ওঠে বড় এবং তীব্র। "কিংশুক ফুল আঁকা একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।" এক রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সাত রাজার প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা, তার পর পরস্পর আত্মকলহের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তার পরিসমাপ্তি। এই সকল রীতিনীতির প্রতি সঙ্কেত যেন সমগ্র নাটকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

যে অরূপের সাধনা এবং সিদ্ধির কথা এই নাটকের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে, তাই হ'ল রবীন্দ্র-সাধন-তত্ত্বের স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাধনা বৈদান্তিক মায়াবাদীর সাধনা নয়। রূপকে উপেক্ষা করে অপরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির বিজ্ঞানময় স্তরে অবস্থান করাই সাধনার চরম সিদ্ধি—এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলবেন না। কবি নিজেই বলেছেন, তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার মধ্যে একটা পালা আছে, তা হ'ল সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের পালা। কবি রূপসাগরেই ডুব দিয়েছেন কিন্তু অরূপরতন আশা করে। কবি বলবেন, পৃথিবীর রূপরসকে আকণ্ঠ পান

করে ধন্য হতে হবে, কিন্তু তার জন্য চাই মনের প্রস্তুতি। রূপের মধ্যে বস্তুরূপের বাসনামত্ততাই যদি মনকে প্রলুব্ধ করে বারে বারে, তবে সেখানে সৌন্দর্য্য এবং আত্মার অবমাননার একশেষ। রূপের মধ্যে অরূপের অপরূপতা আবিষ্কার করবার দৃষ্টিই মানবজীবনের সাধনা, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে ভ্রষ্টাচারের ভয় থাকে না, তখন অনুভব হয়—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" সুদর্শনার চরিত্র অরূপ সাধনার আত্মপ্রস্তুতির কথাই সমগ্র নাটকে বলা হয়েছে। তাই রাজার মধ্যে মনের মত রূপ দেখার কথা যখন রাণী বলেছে, তখন রাজা তাকে এই চিত্তপ্রস্তুতির কথাই বলেছে। —"মন যদি তার মত হয় তবেই সে মনের মত হবে, তার আগে নয়।" অর্থাৎ অরূপ সাধনায় সিদ্ধ হতে পারলে—তবেই প্রতি রূপের মাঝে মনোমত অরূপকে আবিষ্কার করে মন তৃপ্ত হতে পারবে। বাসনার অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়ে সেই সিদ্ধি রাণীর জীবনে ঘটল, তাই শেষ দৃশ্যে রাজা রাণীকে আলোয় অর্থাৎ রূপের জগতে আহ্বান করেছেন। বৈদান্তিকের কিন্তু এ পথ নয়, তিনি বলবেন না যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে আবার ফিরে এস রূপের জগতে। এইখানেই রবীন্দ্র-সাধনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যই শেষদৃশ্যের অন্ধকার ঘরের প্রতিটি কথোপকথনই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাণীর এখানে আত্মোপলব্ধি ঘটেছে, তাই সে আজ রাজার শ্রীচরণের দাসী। তার বাসনার প্রমোদবনে রাণীসুলভ দম্ভের মধ্য দিয়ে আর রাজাকে সে লাভ করতে চায় না। সে যখন বুঝেছে—"তুমি সুন্দর নও প্রভু, তুমি অনুপম।" তখনই রাজা বলেছেন—"আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম; এখানকার লীলা শেষ হ'ল। এসো এবার আমার সঙ্গে এসো—বাইরে চলে এস আলোয়।" অর্থাৎ অরূপ বিশ্বাস করে মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চলে এসো রূপের জগতে, ভয় থাকবে না, বিড়ম্বনায় পড়বে না। সুদর্শনা বললো—যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নি। সুদর্শনা অরূপকে, অন্ধকারের প্রভুকে প্রণাম করে, অর্থাৎ অন্তরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চলে এলো আলোর জগতে। রবীন্দ্রনাথের এই অরূপের অন্ধকার ঘর পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়, সেই নির্দেশই, সুরঙ্গমা দিয়েছে, কিন্তু রূপের স্থূল আবরণটা ভেদ করে তবেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। "এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরী।"

রবীন্দ্রনাথের এই সহজের সাধনায় সিদ্ধ ঠাকুরদাদার চরিত্রটি। রবীন্দ্রনাথের সেই সাধনতত্ত্বই ঠাকুরদাদার কথা ওখানে প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুরদাদার চরিত্র সম্বন্ধে গান বেঁধেছ কবি কেশরী—

"যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,
সেখানে তোমার মত ভোলা কে?"

ঠাকুরদাদার সাধনপন্থা কোন কৃচ্ছ্র সাধনার দুরূহতার মধ্যে নয়। পথের প্রান্তে তার তীর্থ নয়, পথের দু'ধারেই আছে তার দেবালয়।

ঠাকুরদাদা চরিত্রটি আদৌ অবান্তর নয়; বরঞ্চ অপরিহার্য্যই। এই নাট্যের সাধনতত্ত্বটিকে অনেকে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আবার কেউ বৈষ্ণবসাধনপন্থার সঙ্গে এর মূলপার্থক্য নির্দ্দেশ করেছেন। যে কোন সাধনতত্ত্বের সঙ্গেই রবীন্দ্র-সাধনতত্ত্বের তুলনা চলে,—কারণ সকল সাধনাতেই চিত্তপ্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মোপলব্ধিই সকল সাধনার সার কথা। নাটকের মধ্যেই কবি বলেছেন—"এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌছুবে।"

শেষ

প্রশ্ন

শ্রীমতী অমিতা মজুমদার

হে প্রণম্য,
তোমারে প্রণমি বারংবার
নতশিরে।
আজি গেলে ফিরে—
রূপ, রস বর্ণময়ী ধরিত্রী যেখানে
যোগাসনে বসিয়াছে। শান্ত সামগানে
উচ্ছকিত ভূলোকের গিরি, গুহা, বন—
নৈঃশব্দের জাল ভেদি' করিলে যে অমৃতমন্থন
জ্যোতির সমুদ্র হতে।

অনন্তের পরিক্রমা পথে,—
নিত্য যারা চলে যায়, আর যারা আসে
মৃত্যুরে লঙ্ঘন করি অমৃতের উজ্জ্বল আভাসে
জীবন সেখানে সত্য। অনিত্যেরে ফেলিয়া পশ্চাতে
সংশয়, দ্বিধায় ভরা এ সংসার, ঘাতে ও সংঘাতে
কালস্রোতে হয় যে বিলীন।
সীমাহীন
পথপ্রান্তে তীর্থ যাত্রীজনা—
ব্যাকুল বিবশ কে যে মেলে না ঠিকানা—।

বিশ্বের অতীত স্তরে আনন্দ আলোতে
মিলিবে কি নির্ভরতা অনন্তের স্রোতে?
এই প্রশ্ন মনে জাগে, মুক্তি কোথা
কোথা লোকান্তর—?
প্রতিধ্বনি আসে ফিরে
কে তাহার দেবে গো উত্তর?

ত্রিকুটের শিবমন্দির (দেওঘর) —অজিতকুমার দত্ত

মুর্শিদাবাদ বড়নগরে রাণী ভবাণী প্রতিষ্ঠিত 'চারি বাঙলা' মন্দির।—বিজয়কুমার লাহা

পাখীর দেশ

হাসিমুখে

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

শিল্পী —অসিত ঘোষ (এডেন)

ঝিলম নদীর তীরে —কৃষ্ণগোপাল রায়

[illegible] —দ্বিজনকুমার সেন

আই, এফ, এ, শীল্ড

ক'লকাতা মাঠের ফুটবলের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হ'ল আই, এফ, এ, শীল্ড। আই, এফ, এ, শীল্ডের খেলাগুলি আলোচনা করার পূর্ব্বে এই শীল্ডের ইতিবৃত্ত বলা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ফুটবল ভারতের জাতীয় খেলা না হলেও এই বিদেশী খেলার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা ভারতের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। দিন দিন ফুটবল খেলার আকর্ষণ যে কত বাড়ছে, সে কথার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই আমায় করতে হবে না।

আই, এফ, এর সৃষ্টি হয় ১৮৯৩ সালে। তখন ইংরাজদের প্রতিষ্ঠা ভারতের মাটিতে। ট্রেডস কাপের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সম্পর্ক নিকটতম। 'ট্রেডস্ কাপ' প্রতিযোগিতার পর এ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সামরিক, বে-সামরিক, ভারতীয় ও কলেজ দলগুলি যোগদান করতে থাকায় 'ট্রেডস কাপের' পরিচালনার জন্ত শক্তিশালী এসোসিয়েসনের হাতে দেওয়া হল আর তখনই সৃষ্টি হল আই, এফ, এ-র। সেটা ১৮৯৩ সাল।

১৮৯৩ সাল থেকে আই, এফ, এ, শীল্ড খেলা সুরু হয়। প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি উইলিয়াম ম্যাকফিয়ার্সন এবং প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন এ, আর, ব্রাউন। ভারতীয় হিসাবে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সন্তোষের মহারাজা।

এ বৎসর আই, এফ, এ, শীল্ডের ৬২তম অনুষ্ঠান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ত কেবলমাত্র ১৯৪৬ সালে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারে শীল্ডে ৪০টি দল যোগদান করেছিল। ঢাকা ওয়াণ্ডার্স ছাড়া আরও পনেরটি বাংলার বাইরের দল এতে যোগদান করেছিল।

ক'লকাতার চারটি শক্তিশালী দল মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইষ্টবেঙ্গল ও রাজস্থান ক্লাবকে ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (বোম্বাই) হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট (বাঙ্গালোর) মহামেডান স্পোর্টিং (করাচী) ও হায়দরাবাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে তৃতীয় রাউণ্ডে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এরিয়ান্স ও রাজস্থান দল শীল্ডের ফ্যাইনালে উঠেছে।

শীল্ডের কোয়ার্টার ফ্যাইনাল থেকে খেলাগুলি কিন্তু আকর্ষণীয় হয়েছিল। এরিয়ান্স দল মহামেডানকে হারিয়ে সেমি-ফ্যাইনালে উঠল। অপর পক্ষে হায়দ্রাবাদ স্পোর্টস ক্লাব যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় শীল্ড-তালিকা পরিবর্তন করে শিবসাগর এমেচার ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিবসাগরের সংগে খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলকে জয়লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। প্রথম দিনে অমীমাংসিত ভাবে খেলাটি শেষ হয়েছে। এ দিনে য শিবসাগর দল জয়লাভ করতো, তাহলে খেলার মান অনুযায়ী তা জয়লাভ যে অসঙ্গত হ'ত না একথা বলতে পারি। বহিরাগ এই দলটির খেলা এ বছরের শীল্ডের একটি উল্লেখযোগ্য খেল যদিও দ্বিতীয় দিনের খেলায় তারা পরাজয় বরণ করেছে ত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইষ্টবেঙ্গল ও শিবসাগর স্পোর্টিং- খেলা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। কিন্তু শেষ পর্ ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে ক'লকাতার অন্য খ্যাতনামা দল রাজস্থানের কাছে।

এবারের শীল্ডের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় খেলা হয়েছে এরিয়া বনাম মোহনবাগানের খেলাটি। এক দিকে তরুণ বাঙালী খেলোয়া পুষ্ট এরিয়ান্স অপর দিকে এ বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগা দল। এরিয়ান্স দল এ বছরের প্রথম ডিভিসন লীগে যে ভা খেলেছে তার জন্ত তারা সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য। লীগে রাণার্স আপ এরিয়ান্স দল শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানকে হারি শীল্ড ফ্যাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করল।

এরিয়ান্স বনাম রাজস্থানের ফ্যাইনাল খেলা ঠিক তেম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এরিয়ান্সের খেলার উন্নতি দেখা গিয়েছিল ফ্যাইনালে ঠিক সে মনোহ দেখা যায়নি। তবে একথা বলা যায়, রাজস্থান অপেক্ষা এরিয়া দল অনেক ভালই খেলেছে। উভয় পক্ষই সুযোগ পেয়েছি তিনটি করে। রাজস্থানের প্রতিটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়ে এরিয়ান্সের খেলোয়াড়রা। অপর পক্ষে এরিয়ান্স যে তিনটি সুযো পেয়েছিল নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ কোনটি গোল হয় নি। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

শীল্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলাটি সাধারণ খেলা হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম কয়েক মিনিট এরিয়ান্স দল বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করলেও অতর্কিতে গোল খাওয়ায় খেলার মাঝে বিচ্ছিন্নতা এসে পড়ে ও নিজেরা ভুল ভাবে বল আদান-প্রদান করতে যাওয়ায় বার বার তরুণ খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই বেশী করে চোখে পড়ে। এই সুযোগে রাজস্থান দলের খেলোয়াড়রা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলাটি একটি মাত্র গোলের দ্বারাই মীমাংসিত হয়।

১৯৪১ সাল হইতে পূর্ববর্তী শীল্ড-বিজয়িগণ। ১৯৪১-৪২ মহঃস্পোর্টিং ১৯৪৩—ইষ্টবেঙ্গল ১৯৪৪—বি-এণ্ড রেলওয়ে ১৯৪৫—ইষ্টবেঙ্গল ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ত খেলা স্থগিত। ১৯৪৭-৪৮—মোহনবাগান ১৯৪৯-৫১—ইষ্টবেঙ্গল ১৯৫২ সালে মোহনবাগান ও রাজস্থান দলের খেলাটি দু'বার অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৫৩ ইণ্ডিয়া কালচার লীগ ১৯৫৪—মোহনবাগান।

এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজস্থান দল এই বার সর্বপ্রথম শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করল।

খেলার মাঠে ছাত্রদের অসৎ আচরণ

আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায়—ইলিয়ট শীল্ডের ফ্যাইনাল খেলায় আশুতোষ কলেজ ও আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের

প্রথম দিনের খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলাটি হচ্ছিল ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান মাঠে। সূচনা থেকেই উভয় পক্ষ হতেই চলছিল বিদ্রুপ বাণ। এক দিক থেকে কেউ যদি এক কথা বলে উঠল তো, অপর দিক থেকে অপর পক্ষ বলল দু' কথা। ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে চিল ছোড়াছুড়ি হ'ল। ইতিমধ্যে বিরতির সময় সেদিনকার সভাপতি এম, এম, বসু মহাশয়কে ছাত্রদের কাছে অনুরোধ জানাতে হয়। তাদের অসৎ আচরণের জন্য সাময়িক ভাবে শান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটিতে পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বারও এদের মাঝে একটা কলহের সৃষ্টি হয়েছিল।

ছাত্রদের এ আচরণ কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যায় না। খেলার মাঠে অসৎ আচরণ নতুন ব্যাপার নয়! তবুও ছাত্রদের এ আচরণ কোন ক্রমেই শোভন নয়। সামান্যতম একটি খেলাতে এমনি হীন মনোবৃত্তির পরিচয় কি ছাত্রসমাজের মুখ উজ্জ্বল করে দিলো? সমগ্র দেশের কাছে বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রসমাজের পরিচয় উদ্ঘাটিত হ'ল। এর জন্যে দায়ী কে?

ছাত্রবন্ধুদের কাছে একটিমাত্র প্রশ্ন যে, খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতার সার্থকতা কি? যেখানে দর্শক কেবলমাত্র ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় কেমন করে সম্ভব হলো? আশা করি, ছাত্রবন্ধুরা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য ভবিষ্যতে সচেষ্ট হবেন।

টেনিস

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান টনি টাবার্টকে ডেভিস কাপের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার লুই হোডের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় লন্ টেনিস্ চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলায় ট্রাবার্ট হোড এবং কেন রোজওয়ালকে হারিয়ে দিলেন যথাক্রমে সেমি ফাইনাল ও ফাইনালে। আমেরিকার কৃতী খেলোয়াড় ট্রাবার্ট বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় মার্ভিন রোজ আর ডব্লিউ গিলমোর আসায় প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয় সাউথ ক্লাবে। ভারত চ্যাম্পিয়ান কৃষ্ণণ ও সুমন্ত মিশ্র এঁদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা কোনটিতে জয়লাভ করতে পারেন নি। পরের দিন গিলমোর মিশ্রকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণণ ও রোজের খেলায় উভয়েই একটি করিয়া সেট পান। খেলায় হারজিতের প্রশ্ন না থাকায় খেলাটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল। রোজের নৈপুণ্য শুধু নয়নমুগ্ধকর নয়, উপভোগ্য।

টুক্‌রো খবর

ইণ্ডিয়ান লাইফ-সেভিং সোসাইটির বার্ষিক অনুষ্ঠানে কিছু দিন পূর্বে ঢাকুরিয়া লেকে 'ওয়াটার-ব্যালে' নাটিকা 'বেহুলা' হ'ল। সাঁতারের মাধ্যমে, সমস্ত জিনিষটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ক্রীড়াজগতে এ এক নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন এঁরা। সাঁতারের মাধ্যমে অভিনয়ের কলা-কৌশল নয়নমুগ্ধকর।

মেলবোর্ণে ১৯৫৬ সালে ২২শে নভেম্বর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সুরু হবে। ২৪ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৯শে অক্টোবর মেলবোর্ণ অলিম্পিক গ্রাম প্রতিযোগিবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের সম্বর্ধনা জানানর জন্যে সরকারীভাবে উদ্বোধন হবে। ৬২টি দেশ প্রতিনিধি পাঠানর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

১৯৫৬ সালে অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সফর শেষ হওয়ার সংগে সংগে পাকিস্থান ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসবে বলে জানা গিয়েছে।

অক্টোবর মাসের সাতাশ তারিখ থেকে ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার শুরু হবে। উনিশে নভেম্বর ফাইনাল খেলা শেষ হবে বলে স্থির হয়েছে। ডুরাণ্ড কাপে খেলার জন্য ৬০টি দল আবেদন করে, তন্মধ্যে ৩৭টি দলের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। কলকাতার ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান্স, রেলওয়ে স্পোর্টস, হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশ প্রভৃতি দলকে খেলতে দেখা যাবে।

সাংবাদিকদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রফুল্ল সরকার স্মৃতিকাপের ফাইনাল খেলায় 'দেশ' পত্রিকা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে দৈনিক জনসেবককে ৫—২ গোলে হারিয়ে। পরাজিত দলকে সত্যেন্দ্র স্মৃতিকাপ দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হিসেবে প্রথম ইংলিস চ্যানেল পার হবার বাসনা জানিয়েছেন প্রবাসী ভারতীয় ব্যারিষ্টার মিহির সেন। ইতিপূর্বে তিনি দু'বার ব্যর্থ হয়েছেন। তবু তাঁর দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হোক, ভারতবাসী হয়ে এই কামনাই করি।

বিশ্ব যুব উৎসব হকি চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় হকি দল ইউরোপ ভ্রমণের শেষ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বাছাই দলকে ৫—১ গোলে পরাজিত করে। অধিনায়ক উধম সিং-এর হ্যাট্রিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাশিয়া সফর করে ভারতীয় ফুটবল দল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। সাতটি খেলার মধ্যে ১টিতে জয়লাভ, ১টিতে ড্র ও অপর খেলায় পরাজিত হয়েছে। লণ্ডন অলিম্পিক ও ম্যানিলার মত পেনাল্টির অপব্যবহার করেছে ভারতীয় দল। মস্কোর দু'টি খেলা বাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির অংশ গ্রহণ এবং শান্তিময় জগৎ গঠনে তার অবদান বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জনে বর্ত্তমান কালে সকলেই অত্যন্ত আগ্রহশীল। সর্ব্বসাধারণের এই অনুসন্ধিৎসার তৃপ্তিবিধানের জন্য সম্প্রতি 'ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অফ্ ইনফরমেসন সার্ভিসের' উদ্যোগে ক'লকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। চিত্র এবং তৎসঙ্গে লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে পরিবেশিত এই প্রদর্শনীর চিত্তাকর্ষক ও প্রাঞ্জল আলোচনা যে ক'লকাতার জনসাধারণের সন্তুষ্টি বিধানে সমর্থ হয়েছে, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতি ক্ষুদ্র যে পরমাণু, তার অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির পরিমাণ এবং তার কল্যাণকৃৎ মহৎ প্রচেষ্টার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শক মনে-প্রাণে নতুন এই অণু-পরমাণুর যুগকে জানিয়েছে স্বাগতম্। পরমাণু মানুষকে জোগাবে শক্তি, ঘটাবে তার রোগমুক্তি, কৃষিকার্য্য এবং পশুপক্ষী পালন ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে তার আগামী প্রচেষ্টাকে করে তুলবে সাফল্যমণ্ডিত। এই প্রদর্শনী নিউ ইয়র্ক সহরে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় এবং চার মাস পরে ভারতীয় শান্তিকামী জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একে আনা হয়েছে ভারতবর্ষে।

পরমাণু শক্তির পরিমাণ এবং তার ব্যবহারিক দিক সমূহের এক সম্পূর্ণ চিত্র এই প্রদর্শনীতে পাওয়া গিয়েছে। পরমাণু শক্তি কি? তার গবেষণার স্বরূপ কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে?—প্রাচুর্য্যময় জগৎ গঠনে তার অবদানের এক অসাধারণ চিত্র, যে কোন সাধারণ লোকই এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারবেন। যে কয়টি স্বয়ংক্রিয় মডেল সংযোজন করা হয়েছিল, তার মধ্যে পরমাণু চুল্লীর সাহায্যে তাপশক্তি সৃষ্টি করে তাকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রদর্শনটি সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। প্রতিদিন সংবাদপত্রে আমরা পাঠ করছি, আগামী ভবিষ্যতে পরমাণু শক্তিই নতুন প্রাচুর্য্যময় বিশ্বরচনায় হবে মানুষের প্রধান সহায়, সুতরাং তার কার্য্যকলাপের এই সংক্ষিপ্ত নিদর্শন নিঃসন্দেহে সকলেরই আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হবে। সক্রিয় মডেলগুলির মধ্যে একটি গাইগার কাউণ্টারের উপস্থিতি সমান চিত্তাকর্ষক। ইউরেনিয়াম খনিজের অবস্থিতি অনুসন্ধানের জন্য এই যন্ত্রই আমাদের প্রধান সহায়। গাইগার কাউণ্টারের পর্য্যবেক্ষণসীমার মধ্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই যন্ত্র মানুষকে ঐ রশ্মির উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেয়।

গবেষণার জগৎকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি ভাবে সহায়তা করছে, তার এক অতুলনীয় উপলব্ধিও এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। একটা উদাহরণই ধরা যাক না কেন। মুরগীর ডিমে ক্যালসিয়াম থাকে এবং মানুষের দেহকে সেই ডিমই ক্যালসিয়াম জোগায়। একটি সবল ভালো জাতের মুরগীর টাটকা ডিমে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে তার জন্য মুরগীর খাদ্যে কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকা দরকার তা এক প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয়। মুরগীকে খাদ্যের সঙ্গে কতোখানি ক্যালসিয়াম দিলে তার ডিমে ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে, তা তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হয়। মুরগীটিকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়াম খাওয়ানো হলো এবং পরে তার ডিমের তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়াম পরিমাপ করে সহজেই জানা যাবে কতোখানি ক্যালসিয়াম খাওয়ানো হলে, কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম ডিমে আসে এবং কতখানি মুরগীর দেহ গ্রহণ করে। কৃষিকার্য্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার এই প্রদর্শনীতে সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফৎও জানা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয় সারের বিবেচনা সম্মত ব্যবহার অনেক দেশ বহুগুণ ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন এনেছে। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার তার চিকিৎসার জন্য মানুষের প্রধান সম্বল তেজস্ক্রিয় রশ্মি।—রেডিয়াম অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ার জন্য বর্ত্তমান কালে ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের ব্যবহার ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে তেজস্ক্রিয় স্বর্ণের দানও উল্লেখযোগ্য। ওভারী এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানের পুরোনো ক্যান্সারে তেজস্ক্রিয় স্বর্ণের ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে হয়েছে টিউমার, এর স্থান নির্ণয়ের জন্য বর্তমান কালে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ব্যবহার চিকিৎসকদের অন্যতম প্রধান সহায়। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায়ও বেশ কার্য্যকরী। তেজস্ক্রিয় ফসফরাস, ক্যান্সার টিস্যুর সঙ্গে সাধারণ টিস্যুর পার্থক্য নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম, তাই এই রোগ আক্রমণের স্থান নির্ণয়কল্পে তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের ব্যবহার খুবই সুফলদায়ক। এছাড়াও বিভিন্ন রোগ নির্দ্ধারণ এবং তার চিকিৎসাকল্পে বর্ত্তমান কালে তেজস্ক্রিয় কার্ব্বণ, ষ্ট্রন্সিয়াম, গেলিয়াম, সোডিয়াম, বোরণ ইত্যাদি আরও বহুবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার শিল্পজগতে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, তাও সক্রিয় মডেল এবং চিত্রাবলীর মাধ্যমে এই প্রদর্শনীতে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাগজ, কাপড়, রবার এবং ধাতুশিল্পে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে, পদার্থের ঘনত্বের মান রক্ষা করা সম্ভব। প্রস্তুত দ্রব্যাদির অন্তর্নিহিত কোন দোষ এবং ত্রুটিও তেজস্ক্রিয় রশ্মি অনায়াসে নির্দ্দেশ করতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির দোষই কেবল নির্ণয় করে না। নির্দ্দোষকরণের সহায়তাও বর্ত্তমান শিল্পজগতে তাদের অন্যতম প্রধান অবদান। ছাঁচে ঢালাই করে ধাতুর যে সব বড় বড় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করা হয়, তার ঢালাইয়ের মধ্যে কোন গলদ আছে কি না তা তেজস্ক্রিয় রশ্মি অতি সহজেই পরীক্ষা করতে পারে। রঙ এবং মোমশিল্পেও তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বহু দেশেই

টিনজাত খাদ্য সংরক্ষণ অন্যতম প্রধান শিল্প। এই রশ্মির দ্বারা খাদ্যকে বহু কাল অবিকৃত রাখা যায় কি না সে বিষয়ে আমেরিকার এ্যাটমিক এনার্জ্জী কমিশন যথেষ্ট গবেষণা চালাচ্ছেন। ব্রুকহাভেনের. জাতীয় গবেষণাগারেও এই ধরণের পরীক্ষার সাফল্য যথেষ্ট আশাপ্রদ। এই 'বিজ্ঞান-বার্ত্তা'র মাধ্যমেই পূর্ব্বে আপনাদের কাছে তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা আলু সংরক্ষণের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। আশা করা যায়, পরমাণু গবেষণার অগ্রগতি অদূর ভবিষ্যতে সংরক্ষিত খাদ্যশিল্পকেও প্রভাবান্বিত করবে।

নীলস্ হেনরিক ডেভিড্ বোর

বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী ডেনদেশীয় পদার্থবিদ্ অধ্যাপক নীলস বোরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আজ আলোচনা করবো। পরমাণু-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে নীলস বোরের অসামান্য দানের কথা বিজ্ঞানী জগৎ চিরকাল স্মরণ করবে। এমন কি বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন স্বয়ং বিশ্বাস করতেন, নীলস বোরের নেতৃত্ব এবং সহায়তা ব্যতীত পরমাণু শক্তির গবেষণা এতো তাড়াতাড়ি বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হতো না। নীলস বোরই আবিষ্কার করেছিলেন কেবল ইউরেনিয়াম—২৩৫ এর পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে শক্তির আবির্ভাব ঘটায় এবং এর কিছু দিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন ইউরেনিয়াম—২৩৫ বিদীর্ণ করণের ফলে জন্মলাভ করে 'চেন-রিএ্যাকসান', যার ভিত্তিতেই পরমাণু বোমা নিৰ্ম্মাণ এবং তৎসঙ্গে পরমাণু শক্তির শান্তিকামী ব্যবহারের পরিকল্পনা সঠিক রূপ লাভে হয়েছে সক্ষম।

নীলস বোর ১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর কোপেনহেগেন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯১১ সালে বোর বিজ্ঞানে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি লাভ করে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার জোসেফ, জে, থমসনের নিকট পরমাণু-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করবার জন্য কেমব্রিজ যাত্রা করেন। এর পর বোর যান ম্যাঞ্চেষ্টারে, সেখানে জগৎবন্দিত পরমাণু-বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ডের গবেষণাগার অবস্থিত। বোর বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের পরমাণু কাঠামো বিষয়ক বিখ্যাত মতবাদ আরও গভীর ভাবে জানতে আগ্রহশীল ছিলেন। রাদারফোর্ডের মতবাদ অনুসারে পরমাণু কাঠামোর অন্তর্নিহিত পরিস্থিতির কিছু অংশের ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছিল না, বোর এ বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন এবং ১৯১৩ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে এই সমস্যার একটা যুক্তিমূলক সমাধান ঘটিয়ে আজকের পরমাণু-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার করলে সূত্রপাত। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত নীলস বোর রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে অবস্থান করার পর ফিরে এলেন নিজের দেশে, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিওরেটিক্যাল ফিসিক্স'এর অধ্যাপক হয়ে। মাত্র চার বৎসরের মধ্যে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিওরেটিক্যাল ফিসিক্স'এর নতুন গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে 'কোপেনহেগেন' বিশ্বের পরমাণু গবেষণার এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

নীলস বোরের ঐতিহাসিক গবেষণার ফলস্বরূপ পরমাণু কাঠামোর বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলো এবং ১৯২২ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

১৯৩৮ সালে বোর আমেরিকার 'প্রিন্সটন' বিশ্ববিদ্যালয়ে আলবার্ট আইনষ্টাইনের সঙ্গে একত্রে গবেষণা করেন। এই সময়ই তিনি ইউরেনিয়াম—২৩৫ এর বিদীর্ণ হওয়ার তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এর পরে তিনি কোপেনহেগেনে ফিরে এলেন কিন্তু তাঁর শান্তিতে বাদ সাধলো হিটলার। জার্ম্মাণী ডেনমার্ক দখল করার পরেই তাঁকে একটি ছোট মাছ ধরার নৌকোতে পালাতে হলো সুইডেনে। সেখান থেকে একটি বোমারু বিমানে ইংল্যাণ্ড হয়ে যাত্রা করলেন আমেরিকায়। সঙ্গে ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরমাণু বিষয়ক হিসাবপত্র, যা পরবর্ত্তী কালে আমেরিকাকে আণবিক বোমা নিৰ্ম্মাণে সহায়তা করেছিল। প্রথম পরমাণু নির্ম্মাণের গবেষণাগারে সর্ব্ববিষয়ে তিনি আমেরিকাকে সহায়তা করেন।

মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকাতে বাস করতে বোরের মন চাইলো না, তিনি আবার কোপেনহেগেনে ফিরে এলেন এবং তখন থেকে তিনি সস্ত্রীক, স্বদেশ ডেনমার্কেই বসবাস করছেন।

বিজ্ঞানী নীলস্ হেনরিক ডেভিড বোরকে বর্ত্তমান পরমাণুবাদের জন্মদাতা বলা হয়।

রঙ্গপট

অভিনয়শিল্পের নানা দিক—অবজার্ভেসন বা সূক্ষ্মদৃষ্টি

অভিনয়শিল্প আয়ত্ত করতে হ'লে সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা চাই। অনেকের ধারণা আছে, লেখক বা চিত্রশিল্পীদেরই শুধু সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, অন্য কারও নয়। কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও যে এই বিশেষ দেখার বা লক্ষ্যের চোখ থাকা চাই, এ কথাও সত্য। বিখ্যাত অভিনেতা আলেকজাণ্ডার উলকট বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয় দেখেছেন বছরের পর বছর। শুধু দেখেছেন বললে কম বলা হয়, উলকট মনে রেখেছিলেন সেই দেখার অভিজ্ঞতা। অতঃপর তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন মঞ্চে। জনৈক সমালোচক তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন: He watched actors for years. He remembered their tricks. Then he took a part and started to act it. সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, সত্যিকার অভিনেতা হওয়ার জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে চলবে না। আবার কেবল অন্যের অভিনয় লক্ষ্য করলেই কাজ হবে না, নিজের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অভিনয়শিল্পী হওয়ার জন্য মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিনের পর দিন অভিনয় ক'রে যেতে হবে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। লক্ষ্য রাখতে হবে, গত কাল যে ধরণের অভিনয় করা হয়েছে, আজ তদপেক্ষা উন্নত হয়েছে কি না। নিজের প্রতি চোখ না থাকলে এই উন্নতি চোখেই পড়বে না। রিচার্ড বোলেস্লাভস্কি বলছেন: All that is necessary to become an actor is to act, act and act. অভিনয়ের এই পুনরাবৃত্তি বা দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে নিজের দোষ-গুণ চোখে পড়বে, বোঝা যাবে উন্নতি না অবনতি হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন আমাদের কাছে, তিনিও রাতের পর রাত ধ'রে দেখেছেন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, ও দানী বাবু প্রভৃতির অভিনয়। বহু বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী আয়নার সমুখে থেকে অভিনয়শিল্প দখল করেছেন। সমুখে আয়না রাখলে দোষ বা গুণ দুই-ই চোখে পড়ে।

অভিনয় করবার ক্ষমতা হয়তো অনেকের ভেতরেই থাকে। কিন্তু সেই ক্ষমতাকে সঞ্জীবিত করতে হ'লে অন্যের প্রতি এবং নিজের প্রতি চোখ রাখা চাই। জমিতে উর্ব্বরাশক্তি থাকে, কিন্তু হলকর্ষণ যোগে জমিতে ফসল ফলাতে হয়। বনভূমিতে ফল জন্মায়, চাষের জমিতেও ফল হয়। বুনো ফল তিক্ত, কসায় ও কঠোর। আর চাষের ফল হয় সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত। ঠিক এই পার্থক্য দেখা যায় অজ্ঞ, অশিক্ষিত আর বিজ্ঞ, সুশিক্ষিতের মধ্যে। জার্ম্মাণীতে শিশুবিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা গতদিনের গতিবিধি চলাফেরা, আদবকায়দা, কাজকর্ম্ম প্রভৃতির পুনরভ্যাস করতে পারে আজ। এই অভ্যাসে তিনটি ফল পাওয়া যায়। যথা—স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি; কৃতকর্ম্মের বিশ্লেষণ; সূক্ষ্মদৃষ্টির ক্ষমতা অর্জ্জন। এই পুনরভ্যাস দেখে দেখে ঐ শিশুদের কার কিসের প্রতি ঝোঁক তাও স্থির করা যায়। শুধু শিশুদের বেলায় নয়, বয়স্কদের জন্যেও এই পদ্ধতি পালন অপরিহার্য্য। বহু লোককে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন, গত কাল তাঁরা কি কি কাজ করেছেন, বা কি ভাবে চলাফেরা করেছেন, তা আজ আর বলতে পারছেন না। যাই হোক, অভিনয়ের অভ্যাসটি নীরবে পালন করতে হবে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। কেন না, Silence helps concentration and brings out hidden emotions.

আবার শুধু দৃষ্টি থাকলেই চলবে না। কোন অভিনেতার কথোপকথন লক্ষ্য করলেই চলবে না, দেখতে হবে তাঁর উচ্চারণের ধরণ, মুখাকৃতির ভাব পরিবর্ত্তন, অঙ্গভঙ্গী, চালচলন। কারণ, The gift of observation must be cultivated in every part of your body, not only in your sight and memory.

এই সকল শিক্ষা বা অভ্যাস মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার অনেক আগে থেকে আয়ত্ত করতে হবে। অনেক কিছু দেখা-শোনার পর তবেই মঞ্চে নামতে হয়, কেন না, এক বার মঞ্চে নেমে পড়লে তখন আর সময় বা ফুরসৎ থাকে না। বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন: To act is the final result of a long prosedure. Practice everything which precedes and leads towards this result, when you act, it is too late.

শুধু বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের দিকে আর নিজের প্রতি চোখ রাখলেও পুরা কাজ হবে না। সজাগ চোখে দেখতে হবে আশ-পাশের সর্ব্বসাধারণকে। গোয়েন্দার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সর্ব্ব প্রকার মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি চোখ রাখতে হবে। এক জন প্রবলপ্রতাপ রাজপুরুষকে যেমন দেখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে রাস্তার এক জন অন্ধ ভিখারীকে। রাজার রাজকীয়তা দেখতে হবে, আবার অন্ধের সভয় পদক্ষেপও দেখতে হবে। সমালোচক বলছেন: As a rule. I. believe that inspiration is the result of hard work, but the only thing which can stimulate inspiration in an

actor is constant and keen observation every day of his life.

সুতরাং শুধু টানা-টানা, পটলচেরা আর আকর্ণবিস্তৃত চোখ থাকলেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়া যায় না; চাই আরেক চোখের আরেক চাউনি, অর্থাৎ gift of observation.

ভালবাসা

দু'টি বন্ধু—অঞ্জনা ও তপতী। তপতীর বিয়ে হয়েছে দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ শিবনাথ ঘোষের সঙ্গে, শিবনাথ ভালবাসায় বিশ্বাসী, তাঁর মতে জীবনের সার্থকতা একমাত্র ভালবাসায়—ভালবাসার মধ্যে দিয়েই জীবনের আনন্দ, উপলব্ধি, অনুভূতি। পুজোয় দেশে ফিরে যায় শিবনাথ, তপতী ও তাঁদের একমাত্র মেয়ে ঝিকিমিকি—সেখানে শিবনাথ পড়ল অসুখে, সে অসুখে তার চোখ দু'টো গেল চিরতরে নষ্ট হয়ে—তপতী ভেবে ভেবে দিশাহারা হয়ে পড়ে—সংসারের খরচ চালাবে কি করে, একটি চালু সংসার—বিরাট খরচ তার—তার উপর স্বামীর চিকিৎসা—কলকাতায় এসে উঠেছে অঞ্জনাদেরই বাড়ীতে। এ দরজা সে দরজা ঘোরে তপতী চাকরীর জন্যে কোথাও সুবিধে হয় না—তার উত্তপ্ত সৌন্দর্য অন্যায় ভাবে ভোগ করবার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পিছুও নেয় কয়েক জন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে তপতী ছুটে যায় প্রযোজক পরিচালক রবি দত্তের কাছে (রবি দত্ত—অঞ্জনার পিসতুতো ভাই) অভিনয়ের জন্যে—নায়িকা নির্বাচিতা হয়—ছায়াচিত্র থেকে হয় উপার্জন—শিবনাথের হয় চিকিৎসা। শিবনাথ জানে তপতী শিক্ষাদান করে এই অর্থ উপার্জন করছে। শিবনাথ ক্রমে সেরে যায়—জার্মাণ চিকিৎসকের দ্বারা চোখে তার অস্ত্রোপচার হয়। এক দিন যে ব্যক্তি আগে কিছুকাল তপতীর পিছনে ঘুরেছিল সেই ব্যক্তি সুযোগ বুঝে শিবনাথকে জানিয়ে যায় তপতীর ফিল্মে অভিনয়ের কথা। শিবনাথ আঘাত পায়। এদিকে রবি দত্তের বাবা-মা তপতীকে ভালবেসে ফেলেছেন নিজের মেয়ের মত। তার জীবনকাহিনী শুনে তাঁরা তাকে উৎসাহিত করেন এই পটভূমিকায় একটি গল্প লিখতে—লেখা হোল—তপতীই হোল নায়িকা। এদিকে তপতীর কথা শুনে শিবনাথ যখন ঘা খেয়েছে খুব, সেই সময় তপতী ছুটে আসে স্বামীর কাছে—শিবনাথ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সেখান থেকে তপতী আসে স্টুডিও-এ, কিছু কাজ বাকী ছিল সেখানেই। একটি নাটকীয় মুহূর্তে শিবনাথ ছুটে আসে এবং ক্ষমা চায়। তার পরেই মধুরেণ সমাপয়েৎ।

পরিচালক দেবকীকুমারই এ চিত্রের কাহিনীকার, তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই আমরা এ চিত্রের কয়েকটি দোষ দেখাচ্ছি,—যত আধুনিক সমাজই হোক না কেন—ছেলে বাপকে 'স্যার' বলে, এ তো আমরা কখনো শুনি নি! তপতীর লেখা বইতে 'প্রিয়া'র একটি নামকরণ করলে ভাল হোত। রামচন্দ্র দত্তচৌধুরী যে চাকরের নাম সে চাকরের মাথায় অত বড় পাগড়ী কেন? অভিনয়ে বিকাশ রায়ের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—'দুঃখের বরষায়···' গানটির সময় সুচিত্রা সেনের অভিনয় মুগ্ধ করে—মলিনা দেবী এবারে চেষ্টা দিয়েছেন ও ভালই করেছেন—কমল মিত্রের অভিনয় একটু যেন অতি-গম্ভীর। বসন্ত চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, বনানী চৌধুরী, ভানু বন্দ্যো, কুমারী শ্রীজাতা, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি ভালই। সুখেনকে দিয়ে যে অংশ করানো হয়েছে—ঐ ভূমিকাটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল, বইটির মধ্যে ঐ ভূমিকাটি ঢোকানো উচিত হয় নি কিন্তু কৃতী অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের কিন্তু ভা[ল] লাগেনি। দু'খানি রবীন্দ্র সঙ্গীত যথাস্থানেই প্রযোজিত হয়েছে সব চেয়ে প্রশংসার দাবী যদি কেউ করতে পারেন, তো পারে[ন] চিত্রশিল্পী প্রবোধ দাস। তাঁর কাজ অতি সুন্দর হয়েছে।

মেজ-বৌ

অভয় উপার্জনক্ষম সংসারী মানুষ—বিমাতা, দু'টি বৈমাত্রেয় ভা[ই] স্ত্রী, এক ভ্রাতৃবধূ, ও একটি ছেলে নিয়ে তার সুখের সংসার। এ পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে মেজ ভাই অশোক ডেকে নিয়ে এল অশান্তি বান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অশোক এম-এ পাশ করে ভা[ল] চাকরীর সঙ্গে সঙ্গেই একটি পাকা রেসুড়ে হ'য়ে উঠল। ক্রমে দুর্যোগ জট পাকাতে থাকে—তার প্রধান বন্ধু রেসের আড্ডার ধ[র্তা] খগেন বাবু তাকে উস্কোতে থাকেন তার বাড়ীর বিরুদ্ধে—স্ত্রীকে নি[য়ে] পৃথক হয় অশোক—ভুল বোঝে তার আপনার জনদের। অশোকে[র] এই ব্যবহার সহ্য করতে পারে না অভয়; ভগ্ন হৃদয়ে অকালে সম[স্ত] সংসার ভাসিয়ে দিয়ে মৃত্যুর কোলে তাকে নিতে হয় আশ্রয় অভয়ের অকালপ্রয়াণ পরিবর্তন আনে অশোকের জীবনে—ছে[ড়ে] দেয় কুসংসর্গ—ছাড়ে রেস খেলা! স্ত্রীকে নিয়ে আবার বাড়ীতে ফি[রে] আসে—খগেন বাবু আবার নানা ভাবে চেষ্টা করেন অশোককে তাঁ[র] দলে ফেরাতে—অশোক নারাজ। রেসুড়ে জীবনের দেনার দা[য়ে] এক দিন অশোক জেলে যেতে থাকে, হঠাৎ কোত্থেকে খগেন বাবু এ[সে] টাকা দিয়ে তাকে উদ্ধার করেন (পরিকল্পিত ব্যাপার)—ঐ টাকা টোপে অশোককে খগেন বাবু চাইলেন গাঁথতে, পারলেন না—অশোকের স্ত্রী অলোকা নিজের গয়না দিয়ে খগেন বাবুর দে[না] মেটায়। সেই গয়না ছাড়াতে অশোককে করতে হয় প্রাণপা[ত] পরিশ্রম। আরও দু'-চারটি পার্টটাইম চাকরি জোটাতে হয় তাকে গয়নার প্রসঙ্গ উঠবে ভেবে অলোকা চলে যায় পিত্রালয়ে। এদি[কে] সব কাজ সেরে বাড়ী আসতে অশোকের আবার আগেকার মত রা[ত] হতে থাকে—ছোট ভাই অমল ভুল বোঝে—আবার মনকষাকষি—ভু[ল] বোঝাবুঝি। পিত্রালয়ে ভাজের বাক্যবাণে জর্জরিতা অলোকা পড়[ে] কঠিন অসুখে। অবশেষে সেখানেই সকলের মিলন ও স[ব] গণ্ডগোলের পরিসমাপ্তি।

সাংসারিক সামাজিক গল্প—নারায়ণ ভট্টাচার্যও শরৎচন্দ্রে[র] প্রভাবমুক্ত নন। পরিচালনায় কয়েক জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। একটি সামাজিক গল্পে একেবারে কথা-সঙ্গীত বা[দ] দিয়ে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায় দেবনারায়ণ গুপ্তর কৃতিত্ব আছে এবং এই গান না থাকায় ছবিটিতে কোথাও কোন রসহা[নি] ঘটেনি। এক্ষেত্রে দেবনারায়ণ বাবুর প্রতিভার পরিচয় পাও[য়া] যায়। একদম শেষের অংশে বিকাশ রায় ও অনুপকুমারের মধ্যে যে সংলাপ দেওয়া হয়েছে, তাতে ছবিটির ভাল সমাপ্তিই দেখানো হয়েছে। অফিসে অজিত চট্টো প্রভৃতি রেসুড়ে বন্ধুদের স[ঙ্গে] বিকাশ রায়ের পরামর্শের সময় অধস্তন কর্মচারীদের আড়া[ল] থেকে কথাগুলি শোনার দৃশ্যটুকুও বেশ জমিয়ে তুলেছে। তাড়া[তাড়ি]

তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দৈনন্দিন ঝগড়াঝাঁটির একটি নিখুঁত স্তব চিত্র দেবনারায়ণ বাবু এখানে তুলে ধরেছেন।

অভিনয়ে সব চেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন বিকাশ রায় মা ঃ শ্যামল—এই বালক অভিনেতাটির প্রতি বাঙলার চিত্র- দৃষ্টি আকর্ষণ করি, বিকাশ বাবুকে একটা অনুরোধ, স্যুট পরে চলার সময়ে চলার ঐ হাস্যকর ভঙ্গীটা তাঁকে ত্যাগ ত হবে। জহর গঙ্গোপাধ্যায় স্নেহপ্রবণ অগ্রজের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। আর একটি স্নেহপ্রবণ অগ্রজের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল যে জায়গাটায় সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী সেই জায়গাটিতেই তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। নতুবা অন্যান্য জায়গায়- বিশেষ করে শেষ দিকটায় তাঁর অভিনয় ভালই হচ্ছিল। নীতীশ মুখোপাধ্যায় অনুপকুমার নবাগত শ্রীপতি চৌধুরী, জহর রায়, অজিত চট্টো সুপ্রভা মুখো, মলিনা দেবী, রেণুকা রায় বেশ সু-অভিনয়ই করেছেন। এই বইটিতে নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন দর্শকদের আনন্দবর্ধন করেছেন, তাঁর অভিনয় যেন এই বইটিতেই আরো ভালো লাগল।

দেবী মালিনী

অনেক দিন আগে বৈশালী নগরে শাসনদণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজশক্তি ও সন্ন্যাসীশক্তির মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষ অবলম্বন করে গল্পের গতি—এই সঙ্ঘর্ষের মাঝে দেখা দেয় একটি তরুণ মঠাধ্যক্ষ—শ্রীজ্ঞান (পূর্বজীবনে যুবরাজ সুরেশ্বর) ও একটি তরুণী—রাজার প্রিয়তমা—সর্বজনমনোরঞ্জিনী নর্তকী মালিনী (পূর্বজীবনে উদ্যানপালের নাতনী মালিনী)। বিগত জীবনে এরা পরস্পর পরস্পরকে ভাল বেসেছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন পিতৃসত্যরক্ষার্থে সুরেশ্বরকে হতে হয় সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞান। সদ্য-আঘাতপ্রাপ্তা মালিনী অনেক চেষ্টা করে তাকে ফিরিয়ে আনতে—কিন্তু পারে না। অবশেষে ভাগ্যদুর্বিপাকে তাকেও নিতে হয় নটীর জীবন। এদিকে রাজা প্ররোচিতা করেন মালিনীকে প্রলুব্ধ করতে—সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞানকে। যাতে করে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে তিনি আর একটি বাণ খুঁজে পান। এইবার সুরু হয় আবার দু'জনের প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব। কখনো মালিনী তুলে ধরে তার প্রেমের অর্ঘ্য সুরেশ্বরের সামনে, সুরেশ্বর মুখ নেয় ফিরিয়ে, আবার কখনো সুরেশ্বর চায় মালিনীর প্রেম—মালিনী করে প্রত্যাখ্যান। এক দিন রাজা দেখতে পান উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। সন্ন্যাসী পণ্ডিতকে প্রত্যক্ষ করিয়ে শ্রীজ্ঞানকে রাজা করালেন গ্রেপ্তার। বসে বিচার, আসে মালিনী, খোলে আবরণ—দেখা যায় বহুজনবাঞ্ছিতা নটী মালিনী হয়েছে সন্ন্যাসিনী, দেবী মালিনী। গুরুরূপে বরণ করে শ্রীজ্ঞানকে। উভয়কেই দেওয়া হয় নির্বাসন। আবার বিচ্ছেদ। এক সাধুর আশ্রমে মালিনী গ্রহণ করে কুষ্ঠরোগীদের নিরাময় করে তোলার ভার। রাজ্যে দেখা দেয় মহাব্যাধি—কুষ্ঠ। রাজা পর্যন্ত রোগের কবলে পড়েন। এমনি সময়ে আসেন মগধের রাজগুরু, সম্রাট-প্রতিষ্ঠিত উজ্জয়িনী তীর্থে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেছে, কোন সাধ্বীর স্পর্শ না পেলে সে দুয়ার খুলবে না, গুরুদেব এই জন্যেই এসেছেন মালিনীর কাছে। রাজাকে নিয়ে গুরুদেব যান মালিনীর আশ্রমে, সঙ্গে যায় সারা দেশ। তার পর মালিনীর পূত পবিত্র করস্পর্শে খুলে যায় মন্দিরের বন্ধ দুয়ার। দেখা হয় ক্ষত-বিক্ষত শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে। গুরুদেব উভয়ের হাতে দিয়ে যা বিগ্রহসেবার ভার।

অতীতকে কেন্দ্র করে গল্প। উত্তম শত বার প্রশংসনীয়। সম ছবিটির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে এর সংলাপ—সংলাপকা জনগণের অভিনন্দনের অধিকারী। কাহিনীর অগ্রগতির সর্বপ্রধা সহায়ক এই সংলাপ। কয়েকটি দৃশ্যে নীরেন লাহিড়ীও তাঁ পরিচালনক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রাজা কম মিত্রের রূপসজ্জা আরও খানিকটা বিকৃত করা উচিত ছিল। কবিরু রবীন মজুমদারকে আরও দু'-একবার দেখিয়ে তাঁর চরিত্রানুযায় সংলাপ দিলে বইটি আরও উৎরে যেত। অনুপকুমার ও তাঁ সহবাসীদের দিয়ে ও রকম কথাবার্তা না বলালেই ভাল হোত একটি মঠের—বিশেষ করে সে অত্যন্ত সংহত ও সংযত জীবনযাত্র ছিল—সে ক্ষেত্রে অনুপকুমারের ঐ জাতীয় ব্যবহার সত্যিই অশোভ হয়ে পড়েছে বা সন্ন্যাসীদের লুকিয়ে লুকিয়ে মালিনীর নাচ দেখাট মোটেই ভাল হয় নি—এই দেখিয়ে সমস্ত গল্পটির উপর একটু অন্যায় করা হয়েছে। কাপালিক ও দার্শনিককে দিয়ে ঐ রকম ভাঁড়ামি—মালিনীর প্রতি অনুরক্তি বড় বিসদৃশ লাগে।

অভিনয়াংশে সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন কমল মিত্র ও রবীন মজুমদার। অল্প আবির্ভাবে মাতিয়ে রেখেছেন রবীন বাবু। নায়ক ও নায়িকা উভয়েই প্রতিভা প্রকাশের প্রভূত সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু কয়েকটি জায়গায় তাঁরা একেবারে ঝুলে পড়েছেন। তবে তেমনই আবার কয়েক জায়গায় তাঁরা দুজনেই অদ্ভুত অভিনয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের। ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যাল (যীশু খৃষ্ট বলে ভুল করবেন না যেন) ও অল্প সুযোগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও নিজেদের সুনাম নষ্ট হতে দেন নি।

ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার কে?

নায়কের ভূমিকায় যখন জিমি ষ্টুয়ার্টকে পর্দায় দেখা গেল তখন থেকে তাঁর নাম হোল ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার। ১৯১৩ সালের ৬ই মে জিমির জন্ম। চল্লিশের ঘর গ্র্যাঞ্জার পার হয়ে গেছেন—এখনো তাঁর সুগঠিত দেহ, সুগম্ভীর আবির্ভাব ও সুদর্শন কান্তি পৃথিবীর কোটি কোটি চিত্রামোদীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে।

"কিং সলোমনস্ মাইনস্"-এ ১৯৪৯ সালে প্রথম আবির্ভাব। তার পর আজ দু'বছর ধরে বহু চিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন—ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার তার মধ্যে ওয়াইল্ড নর্থ, স্ক্যারামুস, প্রিজনার অফ জেণ্ডা, সালোমি, ইয়ং বেস, ব্যু ব্রুমেল, এবং গ্রীন ফায়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অতি অদ্ভুত এবং খেয়ালী লোক এই গ্র্যাঞ্জার। বহু পরিচালক অনেক আয়াস করেই এঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে থাকেন—এঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া এক ভীষণ ব্যাপার, পরিচালকের পরিচালনা ইনি মানবেন না, নিজের খুশী মত অভিনয় করবেন, বলতে গেলেই রাগ—এক বার এই নিয়ে এক প্রযোজকের নাকে ঘুষি মারতে গিয়েছিলেন। সলোমন মাইনস্-এ অভিনয়ের প্রথম

দিন স্ক্রিপ্ট দেখে ষ্টুয়ার্ট উঠলেন ক্ষেপে। বললেন—"ইয়ার্কি পেয়েছ, এই চরিত্রটির মধ্যে এক ঝুড়ি কথা ব্যাড়োর ব্যাড়োর করাবার মানে কি? শিকারী-বীরের চরিত্র—কথার চেয়ে কাজের দাম তাদের কাছে বেশী, তারা কাজের মানুষ।" এই ছবিতেই অভিনয়ের সময় তাঁদের যখন সদলে আফ্রিকায় যেতে হয়, তখন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে বলা হলে তিনি নারাজ। ফাঁকা আওয়াজ তিনি করবেন না, সত্যি সত্যি ঐ হাতিগুলোকে উনি একেবারে মেরে ফেলতে চান! এঁর এই একরোখামির জন্তে চিত্রনির্মাতাদের বিপদেও কম পড়তে হয়নি। ভয়াবহ জায়গা বলে তাঁকে একলা শিকারে যেতে বারণ করা হোল, কে শোনে কার কথা!

শেষে এক দল বুনো মোষের পাল্লায় পড়ে পাঁজরার দু'খানা হাড় ভেঙে তবে নিশ্চিন্দি—এতে কিন্তু গ্র্যাঞ্জার এতটুকুও দুঃখিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হন না। ছোটবেলা থেকে ষ্টুয়ার্টের মনোভাব এই রকম অনমনীয় দৃঢ় ও সুগম্ভীর। এই রকম শিল্পী হয়ে আজও ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার এত জনপ্রিয়, তাঁকে পরিচালকদের নিতেই হয়, তার কারণ তাঁর অভিনয় কত স্বচ্ছ, কত স্বাভাবিক, কত সুন্দর!

ষ্টুয়ার্ট দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী জিন্ সিমন্সকে। জিনকে ইনি বেহালা বাজানো শিখিয়েছেন—এঁর মতে "সি ইস্ এ পারফেক্ট নাইস্ পারসন্, সি ইস্ সুইট"—আবার ষ্টুয়ার্টের তাই বলে শাসনও কম নেই—মাঝে মাঝে স্ত্রীর মাথায় গাঁট্টা মারতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই জন্তেই স্ত্রী বলেন—"হি ইস্ এ টেরিবল্ টাস্কমাষ্টার।

ষ্টুয়ার্ট মার্কিণ ভাবধারায় বিশ্বাসী। রোজ তিনি নিজে বেঁধে থাকেন, কারণ সহধর্মিণী এখনও ভাল ক'রে ওই বিদ্যাটি আয়ত্তে আনতে পারেন নি।

পরিচালক হবার সখ আছে গ্র্যাঞ্জারের, কারণ প্রসঙ্গে নিজে অভিনেতা হয়েও গ্র্যাঞ্জার বলেন—"অভিনয় করা মানুষের কাজ নয়।"

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

যাত্রী পার করার দায়িত্ব অনেক। কারণ ঝড় আছে, তুফান আছে; নৌকো ভেসে যাওয়ার ভয়ও আছে। সন্তর্পণে হাল না ধরলে, ঘূর্ণিপাক খেয়ে, মাঝদরিয়ায় নৌকো বানচাল হতে পারে। মাঝিকে হুঁশিয়ার হ'য়ে নৌকো সামলাতেই হবে। শ্রীলেখা পিকচার্স "পারঘাটের যাত্রী"র পারাপারের দায়িত্ব নিয়েছেন। সারা পথের ছবিও তুলেছেন তাঁরা। যাত্রীটির জীবনের ইতিহাস, পাতার পাতায় দেওয়া, কলাও ব্যাপার যাকে বলে আর কি! মোট কথা, এক কথায় মোটা কিছু টাকা, লে আউট করা। "মানরক্ষা" করার দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা দুর্গা বোলে নেমে পড়লেন, তাঁদের মধ্যে পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত আর সঙ্গীতাংশে কমল দাশগুপ্তের দায়িত্বটাই বেশী। "মানরক্ষা" এখন হ'লেই হয়।

আগেকার আমল আর এখনকার আমল একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। সেকালে সিনেমার অস্তিত্বই ছিল না বললেই চলে। আর আজ? সিনেমার দুনিয়া বললেই চলে। কাজেই দিনবদল বলা যেতে পারে। কবেকার দিনটি যে কবে বদল হয়েছিল, নবচিত্রমের "দিনবদল" ছবিখানি পর্দায় প্রকাশ পেলেই বোঝা যাবে। আসল ইতিহাসটি প্রসূন বসুর ডায়েরীতে পাওয়া যাবে।

"ভাদুড়ী মশাই" এখনও ষ্টুডিয়োর মধ্যেই রয়েছেন। তাঁকে টেনে বের করার উপায় এখন নাই। তাঁকে সাজাবার ভার নিয়েছেন প্রযোজক রবিপ্রসাদ দত্ত। "ভাদুড়ী মশাই" এর জীবনী অবশ্য লিখে রেখেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়! জীবনী পড়া এক জিনিষ, আর বাস্তব জীবন চোখে দেখে অনুভব করা আর এক জিনিষ। "ভাদুড়ী মশাই" এর বাস্তব রূপটি, রূপায়ন প্রোডাকসন্স, শহরের পর্দায় তুলে ধরবেন যেদিন, সেই দিনই পরিষ্কার বোঝা যাবে আসল লোকটিকে।

আবার স্বর্গত শরৎচন্দ্রের লেখনীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি "বড়দিদি"কে নতুন কোরে পর্দায় আনার প্রচেষ্টা চলেছে। এক দিন মলিনা দেবী এই "বড়দিদি" চরিত্রটিকে সুন্দর কোরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন রূপালী পর্দায়। আজও সে কথা মনে পড়ে। জানি না, এবারকার নতুন ভাবে তোলা "বড়দিদি" ছবিটির নাম ভূমিকায় যিনি আত্ম-প্রকাশ কোরবেন, তিনি কতখানি সমাদর পাবেন! ছবিখানি পরিচালনা কোরছেন অজয় কর।

শরৎকাল। মা আবার আসছেন। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সকলেই আনন্দে মেতে উঠেছে। মায়ের আদর পেতে কে না চায়? কিন্তু সে মা তো কল্পনার মা! বাস্তবে যে মায়ের ছবি দেখি চোখের সামনে, সেই "মা"র একখানি প্রতিচ্ছবি শহরের পর্দায় তুলে দেখাবেন পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। অলকা দেবী লিখেছেন এই "মা"-এর জীবনী। অরুন্ধতী, চন্দ্রাবতী, সাবিত্রী, বিনতা প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যেই সত্যিকারের মায়ের মত মাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ছবিখানি পরিবেশন করার ভার নিয়েছেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রঙমহল থিয়েটারে দক্ষিণ-কোলকাতার নৃত্য-গীত শিক্ষায়তন "গীতিকা" প্রযোজিত "চন্দনমালা" নৃত্যনাট্যটি অভিনীত হয়। প্রবীণ সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি"র টুকরো গল্প অবলম্বন কোরে আর সেই সঙ্গে নিজের কিছু কল্পনা জুড়ে, নৃত্যনাট্যটি রচনা কোরেছিলেন নিত্যধন চক্রবর্তী। দৃশ্যপটের বৈচিত্রে ও অভিনব সাজ-পোষাকে রূপকথার গল্পটি জমেছিল বেশ। বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা সেনগুপ্তা, স্বর্ণ

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

জনপ্রিয়া চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মা দেবী

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

প্রথম জীবনটা এঁর বিয়োগান্ত নাটকই বলা চলে। কিন্তু যাঁর ভেতর সজীব ও বলিষ্ঠ শিল্পী মন ও শিল্পপ্রতিভা রয়েছে, তাঁকে আটকে রাখবে কে? এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মা দেবীর অগ্রগতি বা প্রতিষ্ঠাও রোধ করা যায়নি এবং এর প্রধান কারণই হ'লো শিল্পী হিসেবে ইনি একটা জীবন্ত প্রতিভা। প্রথম থেকে তাঁর জীবনধারা যদি স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হ'তো, তা হ'লে আজ আমরা হয়তো তাঁকে দেখতুম পুরাদস্তুর গৃহস্থ বধূ—শিল্পী পদ্মা দেবীকে আমরা না-ও পেতে পারতুম। কিন্তু প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত এলো তাঁর জীবন, আদর্শ বধূরূপে স্বামি-গৃহে যাওয়ার কিছু দিন পরেই। কিন্তু প্রতিভা আপন পথ আপনিই খুঁজে নিল—বিপদের মুখে পদ্মা দেবী দাঁড়াবার শক্ত ভিৎ পেলেন এ চিত্র-জগতে এসে।

এবার যখন চারু এভিনিউএ পদ্মা দেবীর বাসভবনে গেলুম চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শুনবো বলে, একটু ইতস্তত ভাব ও সঙ্কোচের সঙ্গে তিনি বললেন তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের বহু অকথিত কথা। "আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের বাসভূমি যদিও পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু আমার জন্ম হয় কলকাতা কালীঘাটে এক রক্ষণশীল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ-পরিবারে। আমার বাবা এক জন বড় রকমের তান্ত্রিক ছিলেন। পুজো-অর্চ্চনার মধ্য দিয়েই আমার বাল্যজীবন হয় অতিবাহিত। ৯ বছর যখন আমার বয়স তখনই বে' হয়ে যায় আমার। স্বামী ছিলেন তখন জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার। সাত, আট বছর একরকম নিশ্চিন্তেই কাটলো, কিন্তু তার পরেই আসে আমার জীবনের উপর অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়। স্বামী একদিন সেই যে জাহাজে গেলেন আর ফিরে এলেন না। দু'টি সন্তান নিয়ে আমি হ'য়ে পড়লুম সম্পূর্ণ দিশেহারা। স্বামীর সন্ধানে আমি কত জায়গায় ঘুরলুম, শেষ পর্য্যন্ত সন্তান দুটিকে নিয়ে চলে যাই বোম্বাইয়ে—সেখানে তাঁকে পাবো বলে। কিন্তু আমার সব আশা, সব চেষ্টা বিফল হ'য়ে যায়।

শ্রীমতী পদ্মা দেবী একথা বলে একটু থামলেন। তার পর বেদনাসিক্ত কণ্ঠে আবার বলতে থাকেন—স্বামীর সন্ধান যখন কিছুতেই মিললো না, তখন দুটো শিশুর মুখে কি ভাবে অন্ন জোগাই কেমন করে তাদের মানুষ করি, এ প্রশ্নটি খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। একটা কিছু ক'রবার জন্তে আমার মন বিশেষ ব্যাকুল হয়ে উঠে, এ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে এগিয়ে আসেন আমার একটি দূর সম্পর্কীয় ভাই। তিনিই, জানি না আমার কি গুণ লক্ষ্য করে, পরামর্শ দিলেন আমি যেন চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করি। সে প্রবেশের সুযোগও করে দিলেন তিনিই। এই তো আমার অভিনেত্রী জীবন বরণ করার মূল কথা। এ'র পেছনে যে অর্থনৈতিক প্রশ্ন ছিল দারুণ—তা বোধ হয় আর খুলে না বললে চলে। বাল্যে লেখাপড়া শেখবার সামান্য সুযোগই মিলেছিল আমার, কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে যখন আত্মনির্ভর হওয়ার দাবী এ'লো আমার কাছে, তখন বোম্বাইতেই আমি পড়াশুনো করে শিখে নিলুম ইংরেজী, হিন্দি, তেলেগু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা। এ'তে করে চলচ্চিত্র জগতে ঠাঁই করে নিতে আমার তেমন আটকালো না।

এর পর আমাদের মধ্যে সুরু হলো চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে আলোচনা। প্রায় ২৫ বৎসর পদ্মা দেবী এসেছেন ছায়াছবির জগতে। এ লাইনে তাঁর যখন প্রথম আবির্ভাব, তখন এদেশে এ শিল্পের উন্নতি হয়েছে আর কতটুকু? আজ যে ভারতে ছায়াচিত্র একটা মানে উন্নীত হ'য়েছে, সে তো এঁদের মত কৃতী শিল্পীদেরই অবদান। এ ক' বৎসরে কত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ইনি সঞ্চয় করেছেন, জানতে পারলুম এঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেয়ে।

"১৯৩২ সালে বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবি 'বীর কেশরী'তে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ"—বলতে থাকেন শ্রীমতী পদ্মা দেবী পুরনো দিনের স্মৃতিকে সামনে এনে। "এর পর হিন্দী, বাংলা বহু ছবিতে আমি অবতীর্ণ হ'য়েছি বিচিত্র ভূমিকায়। এখনও আমি এ লাইন ত্যাগ করতে পারিনি—এ শিল্পের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে বলেই বোধ হয়। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, প্রশ্নটি সহজ নয় বলতে যদি হয়ই, বলবো—১৯৫০ সালে 'বাংলার মেয়ে' ছবিতে দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করে আমার প্রচুর আনন্দ হ'য়েছিল সুন্দর, স্বাভাবিক ও সাবলীল চরিত্র আমার ব্যক্তিস্বভাবের বেশ খাপ খায়। 'বাংলার মেয়ের' দেবী ছিল ধীর শান্ত প্রকৃতির তাই এ অভিনয় করতে যেয়ে আমি নিজের সত্তাই অনুভব করেছিলুম প্রতি মুহূর্ত্তে।"

শ্রীমতী পদ্মা দেবী

ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আপনার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোন বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল কি?—নিঃসঙ্কোচে শ্রীমতী পদ্মা উত্তর করলেন, "পারিবারিক জীবনের কথা তো শুনলেনই, কোনরূপে সংঘাত আসবার অবকাশ কোথায় ছিল? সামাজিক জীবনে সংঘাতের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল কিছুটা এবং তখনকার দিনে সেটা ছিল অবধারিত। কিন্তু সমাজের সে ভাব ও অবস্থা এখন আর নেই।

আমার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে পদ্মা দেবী বললেন—"আমার দৈনন্দিন কর্মসূচী সম্পর্কে আর কি বলবো? সে তো আর পাঁচ জনারই মত। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ও বধূরা যে ভাবে দিন কাটায় আমার দিনগুলো সে ভাবেই কাটে এ-কাজ ও-কাজের মধ্য দিয়ে। অপর দশ জনের মত আমাকেও সংসারের ও বাইরের সকল কাজই করতে হয়। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আমার বিরাট সংসার। রাত্রির দিকে একটু পড়াশুনো করি। সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে যাবার সুযোগ হয় না আমার কোথাও।"

আপনার কোন বিশেষ হবি আছে কি? প্রশ্ন ক'রলুম আমি। শ্রীমতী পদ্মা ধীর ভাবে উত্তর করলেন—"আধ্যাত্মিক জীবনই আমার ভাল লাগে ছেলেবেলা থেকে। সময় পেলে রবিবার রবিবার বেলুড়মঠ যাওয়া আমার এখনও অভ্যাস। হবি বলতে—পড়াশুনো ও গান-বাজনা, বিশেষ করে বিদেশ ঘোরা, এই মাত্র রয়েছে। সারা ভারতই আমি ভ্রমণ করেছি। ভ্রমণে প্রচুর আনন্দ পাই বলে। প্রায় সব কয়টি পত্র-পত্রিকাই আমি পড়ে থাকি। 'মাসিক বসুমতী'ও আমি পড়ি এবং ভাল লাগে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি আমার সব চাইতে পছন্দ। পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে আমি সাদা সিধে ধরণের পোষাকই ভালবাসি—জমকালো পোষাক আমি পছন্দ করি না কখনই।"

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে যে কটি গুণ অপরিহার্য, পদ্মা দেবী বলে চললেন, আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে—"সে গুণগুলোর ভেতর প্রথমেই উল্লেখযোগ্য প্রখর বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান। এ দুটো যাঁর রয়েছে তিনিই ভাল অভিনয় করতে পারেন, এ আমার বিশ্বাস। ভাল ছবি তৈরী করতে হলে অপর দিকে চাই সুদক্ষ শিল্পী, বলিষ্ঠ পরিচালনা, জোরালো কাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সব কিছু। সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতিফলন যাতে থাকবে সে ছবিই হবে সার্থক, এ-ও আমার অভিমত। আমার আর একটি অভিমত শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ লাইনে আসা উচিত। এঁরা এলে এ লাইনটা আরও ভাল হবে, সুন্দর হ'বে।"

বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চললো আমাদের ভেতর চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আলোচনার শেষ মুহূর্তে আমি জানতে চাইলুম সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? পদ্মা দেবী উত্তর করলেন স্পষ্ট ভাবে—"চলচ্চিত্রের স্থান সমাজজীবনে অতি উচ্চে। মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, আমি বলবো। যত দিন পারি এ শিল্পকে নিয়ে আমি কাটাতে চাই। এর থেকে যখন অবসর নিতে হবে, তখন আশ্রম-জীবনই হবে আমার কাম্য।"

পুনর্মুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সুসম্পাদনা প্রয়োজন

সম্প্রতি দু'-চার জন প্রকাশক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের দিকে নজর দিয়েছেন। নজরটি প্রশংসনীয়, কিন্তু কাজটি যে ভাবে করা হ'চ্ছে তাতে সাহিত্যবোধের চেয়ে বাণিজ্যবোধটি প্রখর মনে হ'চ্ছে বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস, সে-কালের কলকাতার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের দিকে পাঠকগোষ্ঠীর কৌতূহল জেগেছে দেখে, একদল লেখক ও প্রকাশক "এই সুযোগে কিছু লুটে নেওয়া যাক্" গোছের মনোভাব নিয়ে সাহিত্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার উপর রচনার এখন কোন অর্থ থাক না থাক, কেবল "রম্য" হলেই হ'ল। সুতরাং কলকাতা নিয়ে অজস্র রচনা বেরুচ্ছে, যার যা খুশী তাই লিখছেন, ভুলভ্রান্তির অন্ত নেই, কিন্তু তার জন্ত সঙ্কোচ বা দ্বিধারও বালাই নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা, রাজনারায়ণ বসুর রচনা, হুতোমপ্যাঁচার নক্শা ইত্যাদি পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারও এই হিড়িকে চলছে। শুভবুদ্ধি প্রণোদিত সদিচ্ছার চেয়ে পুনর্মুদ্রণের পশ্চাতে হিড়িকের তাড়না যে বেশী, তা পুনর্মুদ্রিত বইগুলির রূপ দেখলেই বোঝা যায়। হুতোমপ্যাঁচার নক্শাকে খুব রঙচঙে চিত্রিত-বিচিত্রিত করা হয়েছে। বাজারে যাতে চালু হয় সেইজন্ত। কিন্তু তাতে আসল বইখানির মূল্য ও মর্যাদার হানি হয়েছে ব'লে আমরা মনে করি। বসুমতী সাহিত্য মন্দির মূল সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত ক'রে (অনেক সুলভ মূল্যে) অনেক উপকার করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুসম্পাদিত সটীক সংস্করণ আরও বেশী মূল্যবান। রঙচঙ না দিয়ে যদি টীকা-টিপ্পনি ও 'Reference Notes' দিয়ে বইখানি প্রকাশ করা হ'ত, তাহ'লে তার মূল্য ও মর্য্যাদা দুই-ই বাড়ত। শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ", "আত্মচরিত", রাজনারায়ণ বসুর "আত্মচরিত" ইত্যাদি প্রসঙ্গেও এই একই মন্তব্য করা যেতে পারে। এই ধরণের দুষ্প্রাপ্য মৌলিক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ কালে সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। প্রকাশকরা স্বচ্ছন্দেই তা করিয়ে নিতে পারতেন। মূল গ্রন্থের কোথাও বিকৃত না ক'রে, পাদটীকায়, ও পরিশিষ্টে সম্পাদকের উচিত তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্য সংযোজন ক'রে দেওয়া। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশকরা এদিকে নজর দেবেন এবং সুকাজ সুসম্পন্ন করাই যে উচিত, একথা নিশ্চয় তাঁরাও স্বীকার করবেন।

বাংলা বইয়ের মূল্য প্রসঙ্গে

বাংলা বইয়ের মূল্য প্রসঙ্গে সম্প্রতি কিছু আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ আলোচনাই ঠিক সঙ্গত ভাবে হচ্ছে ব'লে আমাদের মনে হয় না। কেউ কেউ ঢালাও মন্তব্য করছেন যে, বাংলা বইয়ের বিক্রী বেশী হয় না, তার কারণ বইয়ের দাম বেশী করা হচ্ছে। এই ধরণের মন্তব্যের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন, মূল্য ও চাহিদার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকলেও, বস্তুভেদে তার তারতম্য আছে। মনে করুন, 'চীজে'র দাম যদি এদেশে খুব কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লেও তার চাহিদা বাড়বে না, কারণ 'চীজ'ভক্ষণ করা আমাদের অভ্যাস নয়। মাছের দাম যদি কমে এবং তেল অগ্নিমূল্য হয়, তাহ'লে মাছ বাজারেই পচবে, ঘরে যাবে না।

দাম কম-বেশীর সঙ্গে চাহিদার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হ'লেও, তার সঙ্গে আরও অনেক সমস্যা জটিলতার সৃষ্টি করে। বইয়ের দাম প্রসঙ্গেও তাই বলা যায়। দর্শনশাস্ত্রের একখানি বইয়ের দাম দশ টাকার বদলে পাঁচ টাকা করলে তার পাঠক দ্বিগুণ বাড়বে, এমন কোন কথা নেই। আবার চটকদার কোন উপন্যাসের দাম চার টাকা থেকে দু'টাকা করলে তার বিক্রী হয়ত চতুর্গুণ বাড়তে পারে। সুতরাং মুড়ি-মিছরির বিচার প্রথমে বইয়ের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে করা দরকার, তার পর মূল্যের কথা ওঠে। এসব কথা না ভেবে, ফর্মা গুণে বইয়ের মূল্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হাস্যকর ছাড়া কিছু নয়। চার আনা ক'রে ফর্মার 'রেট', ডিটেকটিভ্ ও যৌন সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন হিসাব করা হয়, তেমনি ভাল উপন্যাস, গল্প ও কবিতার ক্ষেত্রে, অথবা গবেষণাসাপেক্ষ ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও হবে, এরকম ভাবা বালসুলভ চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। কোন দেশেই তা হয় না, হতে পারে না। বইয়ের মূল্য নির্ধারিত হয়, তার সম্ভাব্য পাঠকসংখ্যা হিসাব ক'রে। সব বইয়ের সমান পাঠকসংখ্যা কোন দেশেই থাকে না। সুতরাং কুড়ি ফর্মার উপন্যাস, আর কুড়ি ফর্মার ইতিহাসের বইয়ের দাম এক হয় না। উপন্যাসের দাম যদি এক্ষেত্রে চার আনা ফর্মা রেটে পাঁচ টাকা হয়, তাহলে ইতিহাসের বইয়ের আট আনা বা বারো আনা রেটে দশ থেকে পনের টাকা হওয়া উচিত। কারণ প্রথম বইয়ের পাঠকসংখ্যা দ্বিতীয় বইয়ের তুলনায় দ্বিগুণ কি তিনগুণ বেশী।

বইয়ের দাম সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে, এসব কথা বিচার করা প্রয়োজন হয়। এমনিতেও দেখা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চারগুণ থেকে পাঁচগুণ বেশী মূল্য বেড়েছে এবং সেই তুলনায় বইয়ের মূল্য বেড়েছে সবচেয়ে কম, কোন ক্ষেত্রেই দ্বিগুণের বেশী নয়। চার টাকার চাল কুড়ি টাকা দিয়ে, দু'টাকার কাপড় আট টাকা দিয়ে, আমরা দিব্যি কিনে খাচ্ছি ও পরছি, কিন্তু দু'টাকার বই চার টাকা দিয়ে কিনে পড়তে হলেই অনুযোগ করি। এক

পয়সার কুমড়োর ফালি বাজারের ফড়িয়াকে চার পয়সায় বেচতে হয় জীবন ধারণের জন্ত, কিন্তু দু'টাকার বই গ্রন্থকার ও প্রকাশকরা যখন চার টাকায় বিক্রী করতে চান, তখন অনেকে অভিযোগ করেন। তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, লেখক ও প্রকাশকদেরও বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে, জীবনধারণের মান তাঁদেরও বেড়েছে এবং কাটা-কাপড় বা তেল-নুণ-লকড়ির বদলে বইয়ের ব্যবসাদার হয়ে তাঁরা এমন কিছু অপরাধ করেননি যে অর্থনীতির নিয়ম তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না! এ-সব কথা অনুযোগকারীরা অনুগ্রহ ক'রে বিবেচনা করবেন।

বইয়ের মূল্য তখনই কমতে পারে, যখন বইয়ের পাঠক বাড়বে। এক হাজার বা দু'হাজারের বেশী যে-দেশে বই ছাপানো যায় না, সে-দেশে বইয়ের দাম কমবে কি ক'রে বোঝা যায় না। পেনগুইন বা পেলিক্যান সিরিজের দাম কম করা সম্ভব হয়েছে, লক্ষ লক্ষ কপি বই বিক্রী হয় ব'লে। আমাদের দেশে লক্ষ কপির দরকার নেই, ভাল বই দশ পনের হাজার কপি বিক্রী হবে, এ-রকম বিশ্বা প্রকাশকদের হ'লে তাঁরা সানন্দে বইয়ের মূল্য অর্ধেক কমিয়ে দিতেও রাজী হবেন এবং লেখকরাও লভ্যাংশের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কোন জিনিসের চাহিদা বাড়লে, তার উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব, এবং উৎপাদন বাড়লে দাম কমানো সম্ভব। এ-ও অর্থনীতির নিয়ম। কুটীরশিল্পজাত কাপড়, আর মিলের কাপড়ের দাম এক নয় এই কারণে। বই এখনও কুটীরশিল্পের স্তরে আছে আমাদের দেশে। এই অবস্থায় তার মূল্য কমানো কি ক'রে সম্ভবপর? কথাটা সকলে বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

বাংলা গ্রন্থের বিক্রয়কর

দেশের বৃহত্তর কল্যাণের যাঁরা অভিলাষী, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন বাংলা গ্রন্থের প্রচার বৃদ্ধি হোক। জনশিক্ষার বাহন মুদ্রিত পুস্তক। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক পুস্তক বা সকল প্রকার পুস্তকের ওপর ধার্য বিক্রয়কর ওঠানোর প্রস্তাব মাঝে মাঝে ওঠে, আবার সাগরলহরীর মত সাগরেই মিলিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, আমেরিকা, ফ্রান্স, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, এমন কি ভারতের কয়েকটি প্রদেশ (উত্তর প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে) বইয়ের উপর বিক্রয়কর ধরা হয় না। বাংলা দেশে বিক্রয়কর কিছুতেই ওঠানো গেল না। স্থানীয় বিধান-সভায় শিক্ষিত এবং সাহিত্যরসিক সভ্যের অভাব নেই। বাংলা গ্রন্থের অবাধ প্রচার ব্যবস্থার সহায়ক হয়ে তাঁরা জনগণের প্রকৃত কল্যাণে উদ্যোগী হন, এই আমাদের অনুরোধ।

এক নামের একাধিক বই

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, কয়েকখানি প্রচলিত গ্রন্থের নামানুসারে অপর লেখক তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। চিন্তার দৈন্য এই জাতীয় অনুকরণের একমাত্র কারণ। পাঠকগণের স্মরণ থাকা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তিন পুরুষের' নাম পরিবর্তন করেছিলেন, বাজারে ঐ নামে আর একখানি গ্রন্থ চালু ছিল বলে। সাম্প্রতিক কালে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত উপন্যাস 'ভুয়া ভুঁইয়া'র অনুকরণে অন্য লেখক [illegible] 'বাংলার রাজায়' করা হয়েছে। স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচার অনুসারে যা সঙ্গত এবং শোভন তাই করা হয়েছে। এই সূত্রে যুগান্তর পত্রিকার পৃষ্ঠায় কিছু আলোচনা হয়েছিল। পাঠকদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হওয়া সম্ভব, কিন্তু লেখকের পক্ষে সেটা এক অমার্জনীয় ত্রুটি। বাংলা ভাষার বিরাটত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়, সেই ভাষায় নূতন কোনো নাম পাওয়া কি খুব কঠিন? পাঠক এবং জনসাধারণকে এই ভাবে বিভ্রান্ত করা অনুচিত।

বাংলা ভাষায় বিদেশী বই

সম্প্রতি রাশিয়ায় মুদ্রিত একখানি ছবির বই বাজারে ভীষণ চালু হয়েছে। অসংখ্য ছবি, অথচ মাত্র চার আনা দাম। (যদিও বইটির কোথাও কোনো দাম লেখা নেই)। ছবির বই সকলের ভালো লাগে, তার ওপর এমন চমৎকার ছাপা এবং এত কম দাম! সকলেই বিক্রী করছে (চানাচুরওলা পর্যন্ত) এবং সকলেই কিনছে। কোনোটাতেই আমাদের আপত্তি নেই। তবে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে—(১) গ্রন্থটিতে যে-কাহিনী আছে সে কাহিনী এ দেশে শিশুরাও রচনা করতে পারে (২) অনুবাদ তৃতীয় শ্রেণীর (৩) ইহার সার্থকতা কি? এই ক'টি প্রশ্ন ছাড়া আর একটি সমস্যার কথা উল্লেখযোগ্য, অবশ্য তার জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীরাই অধিকতর উদ্বিগ্ন হবেন। এই জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশী ব্যবসা শেষ পর্যন্ত এক সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হবে। কাগজের মূল্য, ছাপার খরচ, ছবির ব্লক ইত্যাদি আনুসঙ্গিক ব্যয় বহন করে—এ দেশের যাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্প পুঁজির পুস্তক ব্যবসায়ী, তাঁরা কি দাঁড়াতে পারবেন? সমগ্র বিষয়টি সরকারের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত।

বাংলা সাহিত্যে "কলা দেখিয়ে রথ বেচার" পর্ব

চিরকাল শুনেছি, রথ দেখিয়ে কলা বেচার কাহিনী। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, কলা দেখিয়ে রথ বেচা হ'চ্ছে। তা-ও মর্তমান কলা নয়, একেবারে দয়াকলা দেখিয়ে উরদো-রথ বেচা হ'চ্ছে সাহিত্যের বারোয়ারী মেলায়। কেউ শুনেছেন কখন, সাহিত্য-পত্রিকায় ষ্টলে বা বইয়ের দোকানে ক্র্যাকার ফাটে, পুলিশ আসে। তাও ফাটছে ও আসছে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও দস্যু-গোয়েন্দা কাহিনীর নায়করা ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হচ্ছেন। সব রকমের ষ্টাণ্ট ও টেকনিক তাঁদের জানা আছে। সাহিত্যিকদের টাকা দিয়ে কেনা যায় (সকলকে নয় অবশ্য) তাঁরা জানেন এবং সিনেমা অভিনেত্রীদের মতন সাময়িক রূপে ও রঙ্গে যাঁরা "বক্স অফিস সাক্সেস" হ'তে পারেন, এরকম দু'-চারজনকে টাকার বিনিময়ে তাঁরা কিনেছেন পাঠকদের "শো" করার জন্য। যে দু-চারজন টাকা নিয়ে যেখানে খুশী লেখা বেচেন, তাঁরাও অবশ্য কলা দেখিয়ে রথ বেচেছেন। সব মিলিয়ে মনে হয়, সাহিত্যকে নিয়ে খেম্টানাচ নাচানো হচ্ছে কলকাতা শহরে। সাহিত্যে এই সব অস্পৃশ্য ব্যাধির ঘৃণ্য উপসর্গের আমদানিতে, সুরুচিসম্পন্ন বিচারশীল পাঠকগোষ্ঠী ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী অবশ্যই বিচলিত হচ্ছেন। আশা ভরসা একমাত্র পাঠকগোষ্ঠী। তাঁদের সুবিচার বোধ ও সুরুচি বোধ আজ প্রখর [illegible]

বস্তুকে যদি তাঁরা নির্মম ভাবে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করতে পারেন, তাহলে বাংলা সাহিত্য তার মহত্ত্বের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলবে। তা না হলে, সাহিত্যের ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা রথ দেখিয়ে কলা বেচে যাবে।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি নতুন সংকলনগ্রন্থ "ইতিহাস" নামে প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত রচনার মধ্যে কোন কোন রচনা পূর্বে অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, কতকগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই আজ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। অধুনালুপ্ত পত্রিকাদি থেকে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন এই রচনাগুলি সন্ধান ক'রে গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাস", "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা", "শিবাজী ও মারাঠা জাতি", "ভারত-ইতিহাস-চর্চা", "ঝান্সীর রাণী", "সিরাজদ্দৌলা", প্রভৃতি বহু মূল্যবান রচনা, আলোচনা ও গ্রন্থ-সমালোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে এদেশের ইতিহাস-প্রসঙ্গে যে-সব কথা বলেছেন, তা সমগ্র ভাবে কোন দিনই আমাদের পড়বার এবং প'ড়ে চিন্তা করবার সুযোগ হয়নি। "ইতিহাস" গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম সেই অভাব পূরণ করল। ইতিহাস যে কেবল রাজবংশের পরিচয় নয়, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী নয়, সন-তারিখের ভয়াবহ অরণ্য নয়, প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একথা আমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" রচনাটির মধ্যে তিনি নিজে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস হ'ল একটা জাতির সমগ্র সত্তার দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সমন্বয়ের ইতিহাস। উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের বন্ধুর পথে, যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পদধ্বনিই হ'ল ইতিহাসের ছন্দ। পরিবর্তনশীলতা ও প্রবহমানতা হ'ল ইতিহাসের প্রাণধর্ম। ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষার তাৎপর্য আজ আমাদের নতুন ক'রে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বিরাট একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে শ্রীমতী লিজেল রেমঁ ইতিমধ্যেই ফরাসী দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষেও তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। লিজেলের রচনা Fille de L' Inde গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠকপাঠিকার পরিচয় অবশ্যই আছে। এই জীবনী লিখতে লেখিকাকে সাহায্য করেছেন নিবেদিতার অন্যতমা অন্তরঙ্গ মিস্ ম্যাকলয়েড। এ যাবৎ বাঙলা বা ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, এমন কি ইংরাজীতেও নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী ছিল না বললেই চলে। বাঙালীর পক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাকর সন্দেহ নেই। একজন বিদেশী মহিলা এই কার্য্য সুসম্পন্ন করলেন শেষ পর্য্যন্ত। এই গ্রন্থ পাঠ করতে করতে মনে হয় ভগিনী নিবেদিতার মত শ্রীমতী লিজেলও যেন আমাদের স্বদেশবাসী। অনুবাদিকা নিজের কথায় বলেছেন, "আয়র্ল্যাণ্ড দুহিতা নিবেদিতা নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছিলেন ভারত ভাগ্য-বিধাতার কাছে। তাঁর জীবনে শুধু গোত্রান্তর ঘটেনি, ঘটেছিল রূপান্তর। মায়েরই মত প্রাণ দিয়ে তিনি প্রাণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে আমরা ভুলিনি, ভুলতে পারি না"। শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর তর্জমা হয়েছে যেন মূললেখার মতই চিত্তাকর্ষক। এই মহাগ্রন্থ বাংলা ও বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। গ্রন্থের মূল্য সাড়ে সাত টাকা। প্রকাশক উমাচল প্রকাশনী। ৫৮।১।৭-বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

তারাপীঠ ভৈরব

পাপী তাপী হলেও প্রত্যেকেরই অধিকার আছে ভগবানের নাম করবার। ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থান-পতনে, জীবনে যখন ধিক্কার জন্মায়, তখন মানুষ খোঁজে একটু শান্তির আশ্রয়; সেই আশ্রয় মানুষ পায় মহামানব তথা ভগবানের পবিত্র নামে। শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা ধর্মরক্ষার্থে এই কলিযুগে এসেছিলেন তারাপীঠে ভৈরবরূপে। সেই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষেপার জীবনভক্ত শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেছেন আলোচ্য 'তারাপীঠ ভৈরব' গ্রন্থে। শ্মশানচারী জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য সাধারণ দেশবাসীর প্রায় অজ্ঞাত। আশা করি, এই গ্রন্থখানি আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিকাদের সে অভাব পূরণ করবে। প্রকাশক: বামদেব সংঘ, ৮ প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬। দাম: পাঁচ টাকা।

জনসভার সাহিত্য

প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে: 'পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটাবটের দলভুক্ত হ'য়ে পড়েন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। শুধু ভারতচন্দ্র কেন, একশো-দেড়শো বছর আগে পর্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এই একই ইতিহাস। সাহিত্যের পোষণ করেছেন রাজা-মহারাজা এবং বিত্তবান সমাজের মুষ্টিমেয় গুণগ্রাহী। পরিবর্তে নানাধানা গুণগান করে তাঁদের তোষণ ক'রেছেন, স্তবস্তুতি করেছেন কবি এবং লেখকরা। এবং প্রতিভা যদিও জন্মগত সংস্কার, তাহলেও পৃষ্ঠপোষকের রুচির সঙ্গে রফা ক'রে তবেই সেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হ'য়েছে।

বিত্তবান পেট্রনদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে লেখক এবং সাহিত্যের পরম কাম্য মুক্তির ইতিহাস—ছাপাখানা আর প্রকাশক-গোষ্ঠীর রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তান্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আনুপূর্বিক বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যের, তদুপরি ছাপাখানা এবং প্রকাশক সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে প্রভূত পরিমাণ তথ্য এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে লেখক বিনয় ঘোষ এই তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশের সঙ্গে ছাপাখানা আর প্রকাশকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে কত বড় বিপ্লবের সূত্রপাত ক'রেছে, সে বিষয়ে এ ধরণের বিশদ আলোচনার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এই প্রথম। সমাজ-তাত্ত্বিকের জিজ্ঞাসা নিয়ে লেখা অভিনব বিষয়বস্তুর আলোচনাও যে গল্পের মতোই কতদূর মনোজ্ঞ হ'তে পারে, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে লেখা এই লেখকেরই 'কলকাতা কালচার', 'কালপেঁচার দু কলম' প্রভৃতি বই। তাঁর চিন্তাশীল মনের অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়কর এবং বিষয়বস্তু

নির্বিশেষে তাহার সুরসতা অপ্রত্যাশিত। সাধারণ পাঠক ছাড়া, এ বই তাঁদের কাছেও মূল্যবান বলে মনে হবে, যাঁরা সাহিত্যের—বিশেষত বাংলা সাহিত্যের—ছাত্র এবং অধ্যাপক। মূল্য পাঁচ টাকা আট আনা। প্রকাশক সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১১৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সরল শ্রীশ্রীখোলবাদ্য শিক্ষা

মৃদঙ্গাচার্য শ্রীভোলানাথ দত্তের 'সরল শ্রীশ্রীখোলবাদ্য শিক্ষা' গ্রন্থটির আগে কোনো বিশুদ্ধ তালমাত্রা-নিবদ্ধ খোলবাদ্য শিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যাঁদের কীর্তন-গানবাদ্য সম্বন্ধে মোটেই কোন জ্ঞান বা ধারণা নেই, তাঁরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করে কীর্তনগান-বাদ্য সম্বন্ধে তত্ত্ব অবগত হবেন এবং যাঁরা খোলবাদ্য শিক্ষা করতে চান তাঁদের পক্ষে সে শিক্ষা সহজ হবে। বইখানি একাধারে যেমন সহজ, সরল তেমনি বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে লেখা। বইটির দাম বড্ড বেশী মনে হয়। প্রাপ্তিস্থান: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম: সাড়ে ছ' টাকা।

থির বিজুরি

বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষ এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন। কল্পনার বলিষ্ঠতা, বিষয়-বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকের চমকপ্রদ পরিবেশনে তাঁর তুলনা মেলে না। সুবোধ ঘোষের নূতনতম গল্প সংগ্রহ "থির বিজুরি" তাই নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন। লেখকের কয়েকটি সাম্প্রতিক গল্প এই সংগ্রহে স্থানলাভ করেছে। এই গল্পগুলির অধিকাংশই গত বছরের শারদীয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। গল্পগুলির মধ্যে 'থির বিজুরি' 'শশ্মান চাঁপা,' 'চোখ গেল,' 'স্বপ্নচারিনী,' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ গল্প হিসাবে মর্যাদালাভের দাবী রাখে। অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত এই গল্পগ্রন্থের প্রকাশক এম, সি সরকার এ্যাণ্ড সনস্ লিঃ মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বাঙ্গালার কবিমনীষা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও দেবেন্দ্রনাথ সেন সম্পর্কে চারটি আলোচনামূলক নিবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ধারাবাহিকত্ব রক্ষার দিকে লেখক তেমন আগ্রহশীল নন। তবু সৎ প্রচেষ্টা হিসাবে লেখক শ্রীমনোরঞ্জন জানার এই গ্রন্থটি প্রশংসনীয়। যখন আরো খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা আছে, তখন কাল এবং ধারানুসারে প্রবন্ধগুলি সাজাবার চেষ্টা করা উচিত। রচনাগুলিতে পরিশ্রম এবং মৌলিকত্বের পরিচয় আছে। প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ জানা, ৩৬, সাউথ এণ্ড পার্ক, কলিকাতা—২৯। দাম সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

ইউরোপের চিঠি

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জর্নালধর্মী রচনা ইউরোপের চিঠি প্রথম প্রকাশিত ভাদ্র ১৩৫০ সালে। আজ বারো বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। সদগ্রন্থের প্রচার কত কম তাই সবিস্ময়ে ভাবি। অন্নদাশঙ্করের শাণিত রচনা নূতন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। অনেক আগে রচিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে রচিত এই চিঠিগুলি আজ অনেক দিন পরেও তাই সুখপাঠ্য এবং চমকপ্রদ মনে হয়। এই গ্রন্থটিরও প্রকাশক—এম, সি, সরকার

দুই ধ্রুব

আধুনিক মারাঠী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রী ভি, এস, খন্দেকর রচিত 'দোন ধ্রুব' মারাঠী সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মারাঠী ভাষার সঙ্গে বাংলার অনেক মিল, মনেরও মিল অনেক। বিখ্যাত দেশকর্মী শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় অনেক পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন 'দোন ধ্রুব' নামে। আজ বাংলা ভাষায় অনেক সং ও অসংগ্রন্থ অনূদিত হয়, কিন্তু প্রতিবেশী প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রচেষ্টা তেমন দেখা যায় না। তাই ভূপেন বাবুর এই প্রচেষ্টা অধিকতর প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির প্রকাশক—বলাকা পাবলিসার্স, ৪৫ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। দাম সাড়ে চার টাকা মাত্র।

স্যানিন

ইংরাজী তিরিশ দশকে কলকাতার ছাত্রমহলে মিখাইল আরৎজিবাসেভের স্যানিনের ইংরাজী অনুবাদ পড়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। তারপর এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি আর বাজারে দেখা যায়নি। অনেক কাল পরে এই সংস্কার বিবর্জিত বিশিষ্ট উপন্যাসটির অনুবাদ কৃতী সাহিত্যিক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ 'মাসিক বসুমতীতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে টলষ্টয় একদিন বলেছিলেন, "স্যানিন একটি প্রকৃত মহৎ সাহিত্য এবং উচ্চমানের শিল্পকর্ম।" তবু এই উপন্যাসটি একদা নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুশ ভাষায় এবং য়ুরোপীয় ভাষায় এই বিশিষ্ট উপন্যাসটির অনুবাদ অতিশয় কৃতিত্ব সহকারে নির্মল বাবু সম্পাদন করেছেন। সুন্দর প্রচ্ছদ, শোভন মুদ্রণ,—প্রকাশক ক্লাসিক প্রেস দাম তিন টাকা।

বিদেশী শিশুনাটিকা

শ্রীমতী সুলতা কর ইতিপূর্বে "এণ্ডারসনের রূপকথা" 'অসকার ওয়াইলডের গল্প' প্রভৃতি অনুবাদ করেছেন ছোটদের জন্য। এই গ্রন্থে পৃথিবীখ্যাত পাঁচটি বিখ্যাত শিশুনাটিকা অনূদিত হয়েছে 'তুষার রাণী', 'নক্ষত্রকুমার,' 'সেরা গোলাপ,' 'গোলাপ ও শামুক' 'জেলে ও জলকন্যা'। ছোটদের পক্ষে অতিশয় আকর্ষণমূলক অনুবাদ। কয়েকটি সুন্দর ছবিও আছে। প্রকাশক এম, সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স—দাম আড়াই টাকা মাত্র।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও চীন—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের দশম অধিবেশন গত ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) আরম্ভ হইয়াছে। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাশিয়ার পক্ষ হইতে মঃ মলটোভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এবং অন্যান্য শাখায় প্রজাতন্ত্রী চীনকে অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন প্রদানের জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পক্ষ হইতে ব্যাপারটি এবারের সমগ্র অধিবেশনের জন্য মুলতুবী রাখার জন্য একটি পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ভোটে রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং কম্যুনিষ্ট-চীনকে আসন প্রদানের ব্যাপারটি এবারের সমগ্র অধিবেশনের জন্য মুলতুবী রাখার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন প্রদানের প্রশ্নটি আরও এক বৎসরের জন্য পিছাইয়া গেল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশন যে অনুকূল আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়ার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেণ্টকে অপসারিত করিয়া কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন প্রদান করা সম্ভব হইল না কেন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন নয়। কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন প্রদানের প্রস্তাব মুলতুবী রাখিবার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে যাঁহারা ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বিবেচনা করিলেই ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না, আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ল্যাটিন-আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রই মুলতুবী রাখিবার মার্কিণ প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়াছে। বস্তুতঃ ল্যাটিন-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি যতদিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথায় চলিবে ততদিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করা সম্ভব নয়। বৃটেন কেন মুলতুবী রাখিবার অনুকূলে ভোট দিয়াছে, তাহার কারণটি সত্যই খুব অদ্ভুত। বৃটেনের প্রতিনিধি মিঃ নাটিং বলিয়াছেন যে, ইহা সকলেই জানেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চীনের প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে চীনের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাও মনে করেন যে, সুদূর প্রাচ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে যে সকল সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক তন্মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন প্রদানের প্রশ্নটি অন্যতম। অর্থাৎ একথা মিঃ নাটিংকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার ন্যায্য আসন হইতে বঞ্চিত রাখিয়া সুদূর প্রাচ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয়। তথাপি তাঁহার কাছে এই প্রশ্নটিকে অত্যন্ত বিতর্কমূলক বলিয়া মনে হইয়াছে এবং তিনি মুলতুবী রাখিবার অনুকূলেই ভোট দিয়াছেন। বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া নিউজীল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র মুলতুবী রাখিবার অনুকূলে ভোট দিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু বান্দুং সম্মেলন সত্ত্বেও এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি মুলতুবী রাখিবার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে :— ব্রহ্মদেশ, বাইলো রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, ইউক্রাইন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুগোশ্লাভিয়া। ভোটদানে বিরত ছিল আফগানিস্থান, মিশর, ইসরাইল, সৌদী আরব, সিরিয়া, ইয়েমেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পাকিস্তান, ইরাক, ইরাণ, লেবানন, লাইবেরিয়া মুলতুবী রাখিবার অনুকূলেই ভোট দিয়াছে। আফগানিস্থান, মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া ও লেবানন ভোটদানে বিরত রহিল কেন, তাহা কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? বান্দুং সম্মেলনের সাফল্য লইয়া অনেক মাতামাতি করা হইয়াছে। এ সম্মেলনের পর ইহা আশা করা খুব অসঙ্গত ছিল না যে, অন্ততঃ এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণের অনুকূলেই ভোট দিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। জেনেভায় বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন, কম্যুনিষ্ট চীন কর্ত্তৃক অসামরিক মার্কিণ নাগরিকদের মুক্তি দান, সামরিক শক্তি দ্বারা ফরমোসা দখল করিতে চেষ্টা না করিতে কম্যুনিষ্ট চীনের আশ্বাস সত্ত্বেও চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণ করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অনিচ্ছুক। তথাকথিত স্বাধীন পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাব তাহার আর এক দফা পরিচয় এই ভোট গ্রহণ উপলক্ষ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই অপ্রতিহত প্রভাব সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণের পথে বাধাদান যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। বোধ হয় এইজন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে

দ্বারা সদস্যপদ গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিল। প্রস্তাবটা অবশ্য ঘরোয়া ভাবেই করা হইয়া থাকিবে। তবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এইরূপ প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই অস্বীকৃতি সত্ত্বেও ইহা অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঘরোয়াভাবে ভারতের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে এবং ভারত ইহাতে রাজী হয় নাই। কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার ন্যায্য অধিকার না দেওয়ার পক্ষে উহা যে একটি উৎকৃষ্ট উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধন করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আর সংশোধন করা হইলেও এবং কম্যুনিষ্ট চীন ও চিয়াং কাইসেক উভয়কেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখা সম্ভব হইলেও সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

জাতিপুঞ্জে আলজিরিয়া সমস্যা—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে আলজিরিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের অনুকূলে ২৮ ভোট এবং বিপক্ষে ২৭ ভোট হয়। পাঁচটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। ষ্টীয়ারিং কমিটি আলজিরিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কিন্তু সাধারণ পরিষদ এই প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে রাজী হওয়ায় ফ্রান্স অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরই ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনে রোষ্ট্রামে উঠিয়া বলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ২ (৭) ধারা ভঙ্গ করার পরিণাম সম্বন্ধে তিনি দুই বার পরিষদকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, "I do not know what will be the consequence of the vote on the relation between France and and the U N." অর্থাৎ 'ফ্রান্স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে সম্বন্ধের উপরে এই ভোটের প্রতিক্রিয়া কি হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না।' তাঁহার এই উক্তি যে ফ্রান্সের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ত্যাগের হুমকী তাহাতে সন্দেহ নাই। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাঁহাদের প্রতিনিধি দলকে স্বদেশে ফিরিয়াই নিয়াছেন। তথাপি ফ্রান্স সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করিবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ফ্রান্স আলজিরিয়ার ব্যাপারকে তাহার ঘরোয়া বিষয় বলিয়া মনে করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেও তাহাই বুঝাইতে চায়। আলজিরিয়া ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপার হইল কিরূপে, তাহা সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। ফ্রান্স আলজিরিয়া জয় করিয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার অনুকূলে আর কোন যুক্তি নাই। ফ্রান্স যদি আইন করিয়া কোন দেশকে ফ্রান্সের অঙ্গীভূত করিয়া লয়, তাহা

করিলেই যদি উহা তাহার ঘরোয়া ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারিত? ১৮৪৮ সালে একটি আইন রচনা করিয়া আলজিরিয়াকে মেট্রোপোলিটান ফ্রান্সের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। কিন্তু আইনের এই দাবী সত্ত্বেও আলজিরিয়া যে ফ্রান্সের অধীন দেশ, ফ্রান্সের দমন নীতি যে আলজিরিয়ার অধিবাসীদের উপর চরমভাবে চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফ্রান্স সামরিক শক্তি দ্বারা এই দেশ অধিকার করিয়াছে এবং সামরিক শক্তি দ্বারাই উহাকে অধীনে রাখিয়াছে। আলজিরিয়ায় ১০ লক্ষ ফরাসী আছে। আরব অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ। এই দশ লক্ষ ফরাসীই আলজিরিয়ার শাসনযন্ত্র পরিচালন করিয়া থাকে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শতকরা ৮০ভাগ তাহাদেরই দখলে। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কোন দিক হইতেই ৮০ লক্ষ আরবের কোন অধিকার নাই। আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের দমন নীতি কি ভাবে চলিতেছে, 'Le Monde' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন 'ফিলিপেভিল' হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রামের সমস্ত সমর্থ পুরুষ পাহাড়ে পালাইয়া গিয়াছে। মোট ৫০ জন বৃদ্ধ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাকে হত্যা করা হইয়াছে। কুকুরের চীৎকার ছাড়া ঐ গ্রামে আর কিছু শোনা যায় না। ফ্রান্স এই ভাবেই আলজিরিয়া শাসন করিতেছে। কাজেই আলজিরিয়া যে ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপার একথা স্বীকার করিতে হইবে বৈ কি?

আলজিরিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গৃহীত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর যে ফ্রান্সের অভিমান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট ব্লকের সহযোগিতায় আফ্রিকা-এশিয়া দল ফ্রান্সের দাবীকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশও আলজিরিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই রাষ্ট্রগুলিকে

বিরুদ্ধে ভোট দিবার জন্য প্রস্তাব বিস্তার করিলে আলজিরিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারিত না। আলজিরিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়া যে সাম্রাজ্যবাদীদের একটা বড় পরাজয় এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সাইপ্রাস সম্পর্কে সাধারণ পরিষদে আলোচনা হইবে না, অথচ আলজিরিয়া সম্পর্কে আলোচনা হইবে, ইহাও ফ্রান্সের পক্ষে কম ক্ষোভের বিষয় নয়।

ডাচ নিউগিনি—

গত ৩রা অক্টোবর (১৯৫৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ডাচ নিউগিনি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের অনুকূলে ৩১ ভোট এবং বিপক্ষে ১৮ ভোট হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফরমোসা হল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে নাই। ভোটের শেষে হল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলিয়াছেন, "I particularly regret the attitude of the United States", তুরস্ক এই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল, ইহাও লক্ষ্য করার বিষয়। ডাচ নিউগিনি সম্পর্কে আলোচনার বিরুদ্ধে হল্যাণ্ডের আপত্তির যে কারণটি হল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তাহা সত্যই অত্যন্ত চমৎকার। ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের মধ্যে সম্পর্কের যে উন্নতি হইয়াছে, সাধারণ পরিষদে নিউগিনি সম্পর্কে আলোচনা হইলে উহার ক্ষতি হইবে। এই ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়াও তাহাকে সমর্থন করে। কিন্তু অপ্রিয় সত্যকে চাপা দিয়া রাখিলেই বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। হল্যাণ্ড ডাচ-নিউগিনি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছে বটে, তবে ফ্রান্সের মত রাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই। আলজিরিয়া ও ডাচ-নিউগিনি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে আলোচনাও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের নিন্দা করিয়া কোন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা যে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আসন্ন বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন—

বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের ২৭শে তারিখ জেনেভায় যে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন আরম্ভ হইবে তাহার পরিকল্পনা সম্বন্ধে একমত হওয়া সম্ভব হইয়াছে, ইহা অবশ্য একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এ সম্পর্কে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্পর্কে চারিজন বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব একমত হইয়াছেন। গত জুলাই মাসে (১৯৫৫) জেনেভায় অনুষ্ঠিত চারি বৃহৎ রাষ্ট্রনায়ক সম্মেলন যে সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অব্যাহত রহিয়াছে, একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। এই সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার আরও উন্নতি হইবে কি না, সে সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা কঠিন। বস্তুতঃ বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনে জার্ম্মাণ সমস্যাই অগ্রাধিকার লাভ করিবে। বৃহৎ চারি রাষ্ট্রনায়ক সম্মেলনের পর পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনার মস্কো গিয়াছিলেন এবং রুশ রাষ্ট্রনায়কদের সহিত আলোচনার ফলে রাশিয়া ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। রাশিয়ায় যে সকল জার্ম্মাণ বন্দী আছে, তাহাদের সম্পর্কেও একটা চুক্তি হইয়াছে। এগুলি অবশ্য সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার উন্নতিই সূচনা করে সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল সমস্যা হইল ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন। এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যেই শুধু ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করা সম্ভব। এই কাঠামো কিরূপ হইলে উভয় পক্ষ এবং পশ্চিম জার্ম্মাণীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে, তাহা অনুমান করা সত্যই কঠিন। ইহা অবশ্য খুবই ঠিক যে, রাশিয়া ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় রাশিয়া পশ্চিম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু ডাঃ এডেনারের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর প্রতিনিধিদল মস্কো গমন করেন। অতঃপর পূর্ব্ব জার্ম্মাণীকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ডাঃ এডেনারের পক্ষে এখন ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের ব্যাপারটা বড় সহজ হইবে না। পশ্চিম জার্ম্মাণী উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদে স্থান পাইয়াছে। পূর্ব জার্ম্মাণ এখন পূর্ব্ব ইউরোপ রক্ষা ব্যবস্থায় স্থান পাইবে। বস্তুতঃ ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন এখন পশ্চিম জার্ম্মাণী ও পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর মধ্যে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে রাশিয়া অনুরূপ কোন প্রস্তাব করিবে কি না তাহা বলা কঠিন। কিন্তু এই আলোচনায় পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর উপস্থিতি যে রাশিয়া দাবী করিবে, সে কথা নিঃসন্দেহ বলা যায়।

ইউরোপীয় নিরাপত্তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যারও নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমানে পশ্চিমী শক্তিবর্গ সামরিক দিক হইতে, বিশেষতঃ স্থল ঘাঁটির দিক হইতে যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার সামান্য কিছু ত্যাগ করিতেও রাজী হইবে কি না সন্দেহ। জেনেভা সম্মেলনে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সামরিক তথ্যাদির আদান-প্রদান এবং বিমান হইতে পরিদর্শনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা রাশিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইবে না, খুব স্বাভাবিক। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিজের দলের লোকেরা এবং আমেরিকার মিত্র-শক্তিবর্গ কতখানি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবে তাহাও বলা কঠিন। ইতিমধ্যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায় যে-সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের উপর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তিনি এখন আরোগ্যপথে বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেই যোগদান করা বা মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না। পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি নিজে কতকটা নিয়ন্ত্রণ করিতেন, একথা বলিলে ভুল বলা হয় না। তাঁহার অসুস্থতার জন্য মিঃ ডালেস-ই যে পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার প্রতিক্রিয়া বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে শুভ ফলপ্রদ হইবে, ইহা মনে করা কঠিন। বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের

সাফল্য সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেনও আশাবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃটিশ রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে আলোচনা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইবে, হয়ত কোন অগ্রগতি না হইয়াই সম্মেলন স্থগিত রাখিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলন অতটা নিরাশাবাদ প্রকাশ করেন নাই। তবে আলোচনার ফলে কোন বিস্ময়কর সাফল্য লাভ হইবে বলিয়াই তিনি আশা করেন না। তবে কার্য্যকরী ভাবে যদি কিছু অগ্রগতি হয়, তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, সম্মেলনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে রাশিয়ার মনোভাব বুঝিতে হইবে। কারণ, যুদ্ধের সময় জার্মাণীর হাতে রাশিয়ার যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার তিক্তস্মৃতি এখনও রাশিয়ার মনে রহিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম জার্মাণী যে-ভাবে ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয় তাহাতে রাশিয়ার আশঙ্কা পশ্চিমী শক্তি-বর্গের গ্যারান্টিতে দূর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ—

মিশর সোভিয়েট ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে সিদ্ধান্ত করায় মধ্যপ্রাচীতে পশ্চিমী শক্তিবর্গ, বিশেষ করিয়া বৃটেন ও আমেরিকা নূতন এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে দেশরক্ষার এক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তিতে বৃটেন ও পাকিস্তান যোগ দিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রও উহাতে যোগদান করিবে, এই আশা তো নষ্টই হইয়াছে, অধিকন্তু রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে মিশরের অস্ত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচীতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই সূচনা করিতেছে বলিয়া তাহাদের ধারণা। শুধু মিশরই নয়, সিরিয়া ও সৌদীআরবও রাশিয়ার নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে পারে। কম্যুনিষ্ট দেশের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে মিশর হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত করিয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৫৫) মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া আরব রাষ্ট্রগুলির নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইহার পরদিনই বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন কোন আরব রাষ্ট্রের নিকট, সম্ভবতঃ মিশরের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচনা যে অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছিল, অন্ততঃ গাজা লইয়া সঙ্ঘর্ষ বাধিবার সময় হইতে চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে সিদ্ধান্ত করায় মিশরের উপর বৃটেন ও আমেরিকার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁহারা অবশ্য বলিতেছেন যে, ইহাতে ইস্রাইল রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা বাড়িয়া যাইবে। হয়ত বাড়িবে, ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেশরক্ষার জন্য, অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে কোন দেশের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে। মিশরের অভিযোগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক। এই অবস্থায় রাশিয়া যদি মিশরের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে চায়, তবে মিশর সেগুলি ক্রয় করিবে না কেন? তুর্কী-ইরাকী দেশরক্ষা চুক্তিতে মিশর এবং আরও কয়েকটি আরব রাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এই অসন্তোষের সুযোগে রাশিয়া মধ্যপ্রাচীতে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছে এবং তাহার এই উদ্যোগ সাফল্যের পথেই অগ্রসর হইতেছে। মধ্য প্রাচ্য রক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা হইয়াছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। সেই রাশিয়াই এখন মধ্যপ্রাচীতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকার মিশরের উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। বৃটিশ রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেন বলিয়াছেন, "The Middle Eastern situation was serious and could be dangerous." অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার জন্যই কি উহা বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা করা হইয়াছে? কিন্তু মিশরের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্রসজ্জা যদি চলিয়া থাকে, তবে একতরফাই চলিতেছে। অর্থাৎ শুধু ইসরাইল রাষ্ট্রকেই অস্ত্রসজ্জিত করা হইতেছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ যে ইসরাইল রাষ্ট্রের বিলোপ চায়, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। উহা লইয়া বৃটেন ও আমেরিকার মাথা ব্যথা খুব বেশী তাহা নহে। তাহারা ভীত হইয়াছে মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কায়।

পেরণের পতন—

প্রায় দশ বৎসর আর্জেন্টিনার প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর গত সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৫৫) সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেণ্ট পেরণের পতন হইয়াছে। গত জুন মাসে (১৯৫৫) যে সামরিক অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহাকে ব্যর্থ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানকে আর তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। পেরণ এই অভিযোগ করিয়াছেন, যে-সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তাঁহার পতন হইল তাহার পিছনে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমর্থন রহিয়াছে। বৈদেশিক শক্তি বলিতে তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন তাহা অবশ্য বলা কঠিন। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে পেরণের অভিযোগকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গত এপ্রিল মাসে কালিফোর্ণিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সহিত সান্টাক্রুজ অঞ্চলের তৈল উত্তোলন সম্পর্কে পেরণ এক চুক্তি করেন। এই চুক্তি লইয়া অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক দল সমূহের এক প্রতিনিধিদল এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আর্জেন্টিনার তৈল আর্জেন্টিনার অধিবাসীদের সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে এবং উহা নিয়োজিত করা হইবে, জাতীয় স্বাধীনতার উন্নয়নের জন্য। এই ঘোষণার মূলে পেরণের প্রেরণা ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পেরণ এবং তাঁহার পত্নী ইভা পেরণ উভয়ে মিলিয়া আর্জেন্টিনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে শিখিতে হইত, "আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বাধীন হইবে, সামাজিক দিক হইতে হইবে ন্যায়পরায়ণ এবং রাজনৈতিক দিক হইতে হইবে সার্ব্বভৌম।" পেরণ ও তাঁহার পত্নীকে শ্রমজীবীরা দেবতার মতই ভক্তি করিত। তাঁহার নীতিতে অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাকে ডিক্টেটর বলিয়া অভিহিত করিতেন। অনেকে মনে করেন, ১৯৫২ সালে তাঁহার পত্নী ইভা পেরণের মৃত্যুর পর হইতে পেরণের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। ইভা পেরণ বাঁচিয়া থাকিলে পেরণকে এই বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ তাঁহার সত্যিকার বিপদ সৃষ্টি হয় ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে, যখন রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ্চের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠে। ইহার চরম পরিণতি দেখা দেয় জুন মাসে। গত ১৬ই জুন (১৯৫৫) ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু পোপ এক ইস্তাহার জারী করিয়া আর্জেন্টিনার যাঁহারা ক্যাথলিক চার্চ্চের অধিকার পদদলিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহ তিনি দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহে তাঁহার পতন ঘটিল। পেরণ ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আর্জেন্টিনাকে সামরিক শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। এই সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহই তাঁহার পতনকে টানিয়া আনিয়াছে।

জেনারেল জুয়ান ডোমিনগো পেরণ একজন অখ্যাত সৈনিক হইতে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। উহার মূলেও ছিল সামরিক বিদ্রোহ। আর্জেন্টিনার গত ৪০ বৎসরের ইতিহাসে সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্ত্তন বিরল ঘটনা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ১৯১২ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট সায়েঞ্জ গোপন ও বাধ্যতামূলক ভোটের যে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন একমাত্র তাহাতেই রেডিক্যাল পার্টির মনোনীত প্রার্থী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে সামরিক ও অসামরিক বিদ্রোহে তাঁহার পতন না হওয়া পর্য্যন্ত তিনিই প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এখানে সমস্ত ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান নাই। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় আর্জেন্টিনা মিত্র শক্তির অনুকূল এবং নাৎসী অনুকূল এই দুই মতবাদে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তরুণ সামরিক অফিসারগণ একটি গুপ্ত দল গঠন করেন। তাহাতে পেরণ বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গুপ্তদলের প্রচেষ্টায় প্রেসিডেণ্ট বা ডিক্টেটর রামিরেজের পতন হয় এবং জেনারেল ফারেল প্রেসিডেণ্ট হন। ইহা ১৯৪৪ সালের কথা। প্রেসিডেণ্ট ফারেল পেরণকে যুদ্ধ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ করেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি ৯ই অক্টোবর (১৯৪৫) পদত্যাগ করেন। ১৩ই অক্টোবর তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার গ্রেফতারে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সন্তুষ্ট হইলেও কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ইভার প্রচেষ্টায় কৃষক ও শ্রমিকদের অপ্রতিহত দাবীর সম্মুখে গবর্ণমেণ্ট পেরণকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে নির্ব্বাচন হয়, তাহাতে পেরণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫১ সালের নির্ব্বাচনে তিনি পুনরায় বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। পেরণের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাকে নাৎসী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার পতনের পর নিয়মতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি সত্যই আর্জেন্টিনায় প্রবর্ত্তিত হইবে কি না ভবিষ্যৎ ইতিহাস দিবে তাহার সাক্ষ্য। সামরিক শক্তি একবার শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া বসিলে আর সহজে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে চায় না। ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ল্যাটিন আমেরিকায় জনগণের ভোট অপেক্ষা সামরিক শক্তি দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকে। আর্জেন্টিনায় এখন যাঁহারা ক্ষমতা দখল করিলেন, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার অজুহাতে কত দিন তাঁহারা ক্ষমতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন তাহা বলা কঠিন।

পূজা
দুর্গাপূজা ঘরে ঘরে আনন্দের, উৎসবের বার্তা নিয়ে আসে। সে উৎসবকে রমনীয় করে তুলতে গৃহলক্ষ্মীরা পরিবার ও অতিথিবর্গের জন্য নানারকম মিষ্টান্ন ও খাবারের আয়োজন করেন। আর তার মানেই হচ্ছে ডালডা বনস্পতি, কারণ হিসেবী গৃহিনীরা জানেন যে উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাবার করতে ডালডা চাইই। তাছাড়া ডালডায় খরচ কত কম হয়। আর একথা কে না জানেন যে ভিটামিন 'এ'র উৎপত্তিমূল হিসেবে ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। সীলকরা টিনে ডালডা সর্ব্বদাই তাজা ও বিশুদ্ধ থাকে।
এই সব কারণে আপনার পূজার বাজারের তালিকায় ডালডা বনস্পতি নামটা যোগ করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।
সকলের সুবিধার জন্য ১।২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৫ পাঃ, ও ১০ পাঃ টিনে সর্ব্বত্রই বিক্রী হয়।
ডালডা
মার্কা
বনস্পতি
বিনামূল্যে
উৎসবের রান্নাবান্না
পাকপ্রণালী সম্বলিত এই ছোট বইটি আজই লিখে আনিয়ে নিন। এতে নানারকম রান্নার পাকপ্রণালী ও অন্য খুঁটিনাটি আছে। আজই লিখুন:
দি ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস।
পোষ্ট বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১।
HVM. 254-X52 BG

মনোজ বসু

৩

পর্বতের মাঝে প্রশস্ত সমভূমির মতো দেখাচ্ছে। যৎকিঞ্চিৎ ফসলও ফলেছে। এখানে-ওখানে গোটাকয়েক ঘর—সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে গ্রাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে যেন আকাশ থেকে। উপজাতিদের বসতি। নিচে নেমে গিয়ে দেখুন না। দরাজ বুকের উপর লুফে নেবে আপনাকে; অথবা বলা নেই কওয়া নেই বুলেটে ছেঁদা করে দেবে আপনার বুক।

বিস্তর উঁচু পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ থেকে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পার হতে দেবে না। তাই কি শুনি আমরা? আপনারা পাঠাচ্ছেন, আপনাদের শুভেচ্ছা রয়েছে পেছনে—গায়ে বল কত! এক লম্ফে উঠে পড়লাম চূড়ার উপর। কত উঁচুতে উঠেছি, আরও উঠছি। তবু মনে হচ্ছে পাহাড়ের গা ঘেঁসে যাচ্ছি, গড়িয়ে চলেছি পাহাড়ে উপরে। ভয় হয়—এই রে:, লাগল বুঝি ঘা, সব শুদ্ধ তালগোল পাকিয়ে আগুনে পুড়ে জলে পড়ে রইলাম এই অপরিজ্ঞাত দুরারোহ অঞ্চলে।

কিছু যে হয়নি, সে তো টের পাচ্ছেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, এই যে মাসের পর মাস জ্বালাতন করছি। পর্বত পার হয়ে এবারে সমভূমি—বিশাল এক জলপথ। প্লেনের বেগ কমেছে—এসে গেল বুঝি! জুতোজোড়া খুলে আরাম করে বসেছিলাম, তাড়াতাড়ি পায়ে ভরলাম। মতামতের জন্য একটা ছাপা কাগজ দিল হাতে—কেমন লাগল ভ্রমণ? প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তা সত্ত্বেও ত্রুটি হতে পারে। ইটের ঢিল বা ফুলের তোড়া (brickbats or boqucts)—যা দেবেন খুশি মনে মাথা পেতে নেবো।

পর্বতে আবার পথ আটকে গেল। দুই পর্বতের ফাঁকে নদী; শহর নদীর উপরে। পেটি বাঁধবার লেখা ফুটল। অতএব যা ভেবেছি—কাবুল, ঐ যে শহর কাবুল। পাহাড়ের নানান গলিঘুঁজি পার হয়ে আবার ফাঁকায় এসে পড়লাম। জল জমে আছে চতুর্দিকে, কৃষিক্ষেত্র। অজস্র জনবসতি। পাহাড়-ঘেরা একটুকু সমতল জায়গায় প্লেন নেমে পড়ল। কাবুল।

মাথায় কাবুলি টুপি, দীর্ঘদেহ এক ব্যক্তি এয়ারফিল্ডে। কাবুলিওয়ালা শ্যাম বর্ণেরও হয় নাকি? কাছে এসে বাংলা কথা, আপনি ডাক্তার মজুমদার?

উঁহু, সাদামাঠা বোস আমি। সামান্য ব্যক্তি।

নাম বলতে সমাদরে তিনি হাত জড়িয়ে ধরলেন। আপনাকে খুঁজছি তো! আমি গুপ্ত—অপূর্বভূষণ গুপ্ত। কে. এল. এম. বিমান-কোম্পানির ম্যানেজার।

এই যে লিখে লিখে এত জ্বালাতন করি আপনাদের,—দেখা গেল, এত দূরে কাবুল এরোড্রামেও সে পাপ গোপন নেই। মাসিক বসুমতী এখানেও আসে—এমন যে হিমালয় পর্বত তাকে রুখতে পারে না। বাঙালি তো আড়াই ঘর—চীনের লেখাগুলো বরাবর এঁরা পড়ে আসছেন। এবং এমন ক্ষমাশীল, গালমন্দ না করে তাজ্জব বচন ছাড়তে লাগলেন।

কাস্টমসে মাল ছাড়ান হচ্ছে—খুঁজে দেখি, বইয়ের প্যাকেট লোপাট। অধমের লেখা কিছু বই যাচ্ছে মস্কোয়। পাখনা নাই থাক, বই কিন্তু দস্তুরমতো ওড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনার আলমারির খাঁচা থেকে বের করে কয়েকটা দিন ফেলে রাখুন বাইরে। আর নেই। হীরেমুক্তো বরঞ্চ এক জায়গায় পড়ে থাকে, বই কদাপি নয়। আকাশলোকে প্লেনের গহ্বরেও, দেখছেন তো, ঠিক তাই। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। কোথাও পাত্তা নেই। বইয়ের গাদা দেখিয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে কিঞ্চিৎ পসার জমাবো ভেবেছিলাম (ভিতরের বস্তু পড়তে পারছে না, তখন ভাবনাটা কি?)। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গুপ্তর বিষম খাতির—বিশেষ করে এই এয়ারফিল্ডের চৌহদ্দির মধ্যে। খুঁজে-পেতে দেখ, যে বাপু, প্লেনের মধ্যে আছে কি না প্যাকেট। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আছেই তো একটা। সব মাল বেরিয়ে গেছে, ওটা ঘাপটি মেরে পড়ে রইল—কোনও সাহিত্যপ্রেমিক তস্করের কারচুপি কি না, কে জানে!

কাবুলের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মাত্র আমাদের দায়-দায়িত্ব চুকে গেছে। সোবিয়েত অ্যাম্বাসির হেফাজতে এখন। মনিব্যাগের মুখ বেঁধে ফেলেছি, খাওয়া-শোওয়া ও ঘোরাঘুরির যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁদের। তাঁরা হাজির আছেন। বিষম মুশকিলে পড়ে গেছেন ভদ্রলোকেরা। উত্তম হোটেল এখানে সর্বসাকুল্যে দুটো। মালিক হলেন খোদ আফগান-গবর্ণমেন্ট—আপনি-আমি ইচ্ছে করলে হোটেল খুলতে পারব না এখানে। কাবুল-হোটেলের নতুন এক ব্লক বানানো হয়েছে সেটা চালু হয়নি এখন অবধি। স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তার উপরে আজ মঙ্গলবার—ভারত থেকে প্লেন আসার দিন। দুটো প্লেন এসে পৌঁছল, একটা নিয়মমাফিক, বাড়তি আর একটা আমরা ভাড়া করে নিয়ে এলাম। এয়ারফিল্ড থেকে শহরে যাবো তার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। ঝনাৎ করে টাকা ফেলে ট্যাক্সি ভাড়া করবেন, সে জায়গা কাবুল নয়। কড়া রোদে পথের ধারে সকলে দাঁড়িয়ে আছি—আসছে, ঐ যে ধুলোয় ঝড় উঠেছে, ঐ বুঝি আসছে গাড়ি! কিন্তু ঝড় তুলবার জন্য কাবুলের রাস্তায় মোটরকারের প্রয়োজন হয় না, জন দুই-চার লোকেই বীর পদক্ষেপণে চতুর্দিক অন্ধকার করে তুলতে পারে। অ্যাম্বাসির লোকেরা লজ্জা পেয়েছেন—অপ্রতিভ হাসি হেসে বারম্বার ভরসা দিচ্ছেন, দেরি নেই—এসে পড়ল বলে মেশিন; বেশি আর দেরি হবে না। মেশিন অর্থে মোটরগাড়ি বুঝে নেবেন।

অবশেষে এসে পড়ল একখানা কার ও একটি ষ্টেশন-ওয়াগন। মানুষের যা হয় হোকগে, মাল মিলিয়ে তুলে ফেলা যাক তো আগে। মাল বোঝাই হয়ে ষ্টেশন-ওয়াগন শহরমুখো চলল। ড্রাইভারের পাশে দুটো মানুষের জায়গা হয়, আমি আর প্রেমচাঁদ চড়ে বসলাম। বয়স কম হলে কি হয়, প্রেমচাঁদ অসামান্য ব্যক্তি। হেন বিদ্যা নেই যা তাঁর অজানা। মায় উর্দুতে পদ্য বানানো অবধি। বিশ-পঁচিশ গণ্ডা রাশিয়ান কথা জানা আছে, সে জন্য খাতিরের অবধি নেই। দলের সেক্রেটারি এবারের চালানে আসেন নি, পিছনের দলে আসছেন।

কুশীর বিত্তার জোরে. প্রেমচাঁদকে কাঁচা-সেক্রেটারি করে নিয়েছেন দলপতি। সকলের দেখাশুনা ও বিলিবন্দোবস্ত উনিই করবেন আপাতত। ষ্টেশন-ওয়াগনের ড্রাইভারটি জাতে রুশ, দু-চারটি রুশ-কথার ফোঁড়ন দিয়ে প্রেমচাঁদ তার তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এটা 'কি ওটা কি—জিজ্ঞাসা করছেন, ড্রাইভার যথাজ্ঞান জবাব দিচ্ছে। নিজেও উপযাচক হয়ে এটা-ওটা দেখাচ্ছে।

আগে ভিন্ন এক হোটেলে গিয়ে দাঁড়াল। না, সেখানে জায়গা নয় আমাদের। দুটো ছাড়া হোটেল নেই—অতএব নিশ্চিন্ত কাবুল-হোটেলে। সামনে কাঁচা নর্দমা, তার ও'পারে ফুটপাথ। সেইখানে মালপত্রের পাহাড় ঢেলে দিয়ে গাড়ি আবার এরাম্বফিল্ডে চলল মানুষ আনবার জন্য।

প্রেমচাঁদ হাঁক দিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও—আমি যাবো। সেক্রেটারি মানুষ—মালপত্রের মতন মানুষগুলোও গুণে গেঁথে হিসাবপত্র হিসাব-কিতাব করে নিয়ে আনবেন বুঝি! ভাল, দায়িত্বজ্ঞান একেই বলে!

ও হরি, যাচ্ছেন নিজের গরজে। মাথার টুপি কোথায় ফেলে এসেছেন, খুঁজে পেতে আনতে চললেন। ফুটপাথ থেকে জিনিষ বয়ে বয়ে হোটেলে নিয়ে এলো। সাবেক ঢঙের বাড়ি, ছোট ছোট ঘর। জাঁদরেল সরকারি হোটেল—তা ড্রইংরুমে লম্বার দিকে একটা মানুষ পুরো পা ছড়িয়ে শুতে পারে, চওড়ার দিকে হয়তো বা একটু পা গুটাতে হয়। পাঁচ-সাতটি প্রাণী বসতে পারে টায়েটোয়ে। দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে সেই ঘরের ভিতর দিয়ে—তার এক ধাপে চড়লেন তো পরের ধাপ দেখতে পাবেন কোমরের কাছাকাছি। নেহাৎ পক্ষে হাত তিনেক মাপের এক-একখানা পা হলে ঐ সিঁড়ি ভেঙে অবাধে উঠা যায়। মালপত্রে তামাম ড্রইংরুম ভরাট হয়ে গিয়ে এবারে ঐ সিঁড়ির উপর থাক দিচ্ছে। ধাপ আরও উঁচু হয়ে উঠল।

সহযাত্রীরা সামাল করে দিয়েছেন—তিলেকের অসাবধানে বাক্সটা-ব্যাগটা নাকি এদিক-ওদিক সরে যাবে। সতর্ক চোখ মেলে খাঁড়া দাঁড়িয়ে আছি তাই। আর জনান্তিকে শুনছি, এত লোকের জায়গা হবে না হোটেলে—এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দেবে। পাকাপাকি ঘর নিয়ে আছেন অনেকে। পাইলটের জায়গা রিজার্ভ করা থাকে, দু-দুখানা প্লেনের যাবতীয় পাইলট হাজির আজ এক সঙ্গে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তার উপরে আমরাও ষোল জন এই মাত্র নির্বিঘ্নে পৌঁছলাম।

আছি দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ পরে মোটর করে মেয়েরা এসে পড়লেন। এবং তন্মধ্যে তেজা সিং। দাড়িওয়ালা হাতে বালা-পরা শিখ। বেঁটে মানুষ—পাগড়ি বেঁধে বিনুনি-করা চুলের ঝুঁটি অদৃশ্যে ঢেকে দিয়েছেন এবং আকারেও কিঞ্চিৎ লম্বা হয়েছেন। কেওকেটা ব্যক্তি—পেপসুর চীফ-জাস্টিস ছিলেন, পাঞ্জাব য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার। অতএব দলপতি হয়েছেন। দলপতিত্ব এবং পাকা দাড়ির গৌরবে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঠাঁই দিয়ে পয়লা গাড়িতে ওঁকে নিয়ে এলেন। অন্য সবাই পথে বসে আছেন ষ্টেশন-ওয়াগন উদ্ধার করে আনবে এই প্রতীক্ষায়।

হে. . .ম্যানেজারের সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলে তেজা সিং গতিক বুঝে নিলেন। গোমড়া মুখে বসে আছেন। ভেবে ভেবে তড়াক করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আসুন—ঘরদোর বেছে নেওয়া যাক।

আমি ঘাড় নাড়লাম. সকলে এসে পড়ুন—

এসে পড়লে তখন কি আর মনের মতন বাছাবাছি চলবে?

বোকারাম আমি, হিতকথা কানে গেল না। একটা বাক্স চেপে পা ছড়িয়ে বাহিরের পানে চেয়ে আছি। দুর্লঙ্ঘ্য সিঁড়ি বেয়ে বুড়ামানুষ তেজা সিং শম্বুকগতিতে উঠতে লাগলেন। উত্তম ঘর পাবার লোভে মেয়েরাও মহোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। ওরে বাবা, রেলিঙে ঝুল খেয়ে এ-বোঝা ও-বোঝার উপর দিয়ে পাহাড়ে চড়ার মতো আলটপকা উঠে গেলেন দলপতিকে বিস্তর পিছনে ফেলে। হিমালয়ে তুলে দিলে, যা কাণ্ড, তেনজিঙের আগেই তো এঁরা এভারেষ্টে চড়ে বসতেন।

ঘর দখলের কাজ সমাধা করে তেজা সিং নেমে এসে খাবার তাগিদ দিলেন। মহিলারাও নামতে লাগলেন। মিনিট দশ-পনেরোর বেশি নয়—আহা-হা, কি হয়ে সব আসছেন ইতিমধ্যে! ঘরের চেয়ে ওঁরা সাজ-বদলের জন্তেই অধিক আকুল হয়েছিলেন। স্নান নামক বিলাসিতার যৎসামান্য রেওয়াজ এখানে, অত জনের স্নানের জল কে জোগাড় করে রেখেছে? যেটুকু ছিল, তা এঁদের মুখ-হাত যথাযথিতেই ব্যয় হয়েছে। ব্যয় সার্থক বটে! ঈশ্বর মোটামুটি এক চেহারা দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায়ে কি অসাধ্য-সাধন হয়—স্বয়ং সেই সৃষ্টিকর্তা এখন এঁদের দেখলে চিনতে পারবেন না।

তেজা সিং হোটেল-ম্যানেজারের উপর হাঁকড়াচ্ছেন, কই গো, আর কত দেরি? আমায় বললেন, খাইগে চলুন যাই—

হুকুম দলপতির হলেও ঘাড় নেড়ে বসলাম। বন্ধুরা পথে পড়ে, আমি এখন খাবো না।

অনেক দেরি হবে তাদের আসতে।

দেরি যা-ই হোক, আমি বসে আছি এখানে। তাদের ফেলে খাবো না।

দলপতি বললেন, আমি চললাম তবে বাপু। কিছু মনে কোরো না।

যথা আজ্ঞা! আগের হুকুম না মেনে অপরাধী হয়েছি, পুনশ্চ সেটা আর করতে চাই নে। উনি খানাঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আমি কিছু মনে করলাম না।

ক্রমশ সকলে এসে পড়লেন। কাষ্টমস বাবদে এবং যানবাহনের অভাবে দু-তিন ঘণ্টা পথের উপর ঘোরাঘুরি করে মেজাজ সমধিক উষ্ণ।

মালপত্র?

নির্ভয় হন। সেগুলো ঠিক আছে। কোনখানে নিয়ে তুলবেন, সেই ভাবনা ভাবুন।

লীডার কোথায়?

দেখা হবে না, বিশেষ কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন।

তা হলে সেক্রেটারি মশায়—

প্রেমচাঁদ জিভ কেটে বলে উঠলেন, এই যাঃ—আবার এয়ারফিল্ডে দৌড়তে হল। জিনিষ ফেলে এসেছি।

টুপি তো ঐ মাথায়—

উঁহু, কোলিওব্যাগ ভুলে এসেছি বারান্ডায়—

একটা গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে, দৌড়ে তার ভিতর ঢুকে পড়লেন। অস্থায়ী যদিচ, তাহলেও সেক্রেটারি। মানুষ ও মালপত্রের যাবতীয় দায়ঝক্কি ওঁর উপর। দলপতি বাছাই করেছেন। মানুষ উপযুক্ত, কাবুলে পা দিয়েই মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

এয়ারফিল্ড থেকে এক ভদ্রলোক পিছু নিয়েছেন। চেহারা ও হিন্দি জবানে প্রকট হল ভারতীয়। জীপ গাড়ি সঙ্গে—যাকে সামনে পান, কাতরাচ্ছেন গিয়ে, উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন। কেউ কানে নেয় না। আপনি কে হলেন মশায়? রুশ-রাজদূতের অতিথি—যত্র তত্র গেলে ইজ্জত থাকে?

ভদ্রলোক অতএব ক্ষুণ্ণ মনে ফিরলেন। তা বলে নিরস্ত হবার পাত্র নন। ফিরে এসে বসে আছেন হোটেলে। জাতভাইরা এসে পড়েছে, উপকার না করে কিছুতে ছাড়বেন না। আর আছেন অপূর্ব গুপ্ত। ছায়ার মতন সেই থেকে সঙ্গে ঘুরছেন। দুপুর গড়িয়ে যায়—তা হোক, তা হোক, খাওয়া-নাওয়া তো রোজই আছে। আপনাদের সকলের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—সেইটি দেখে তবে যাবো।

জনা তিনেক কাল্তু হয়ে যাচ্ছি। যা গতিক, মেজের সতরঞ্চি বিছানো ছাড়া উপায় দেখি নে। জীপের মানুষটি পরম পুলকে এগিয়ে এলেন। তবে আর কি, উঠে পড়ুন এবার জীপে। ইণ্ডিয়ান ক্লাবে খাট-বিছানা পেতে রেখে এসেছি। তোফা থাকবেন। কেন মিছে ঝামেলা বাড়ান এখানে?

নিরুপায় হয়ে তখন ভদ্রলোকের পরিচয় নিতে হয়। গোবর্ধন দাস মালহোত্র—টালিগঞ্জ জবা-ইঞ্জিনিয়ারিঙের লোক। বছর কয়েক ধরে কাবুলের মা-লক্ষ্মীদের সেলাই-কল যোগান দিয়ে আসছেন। আমি বালিগঞ্জে থাকি, তবে তো এক পাড়ার লোক—বান মশায়, আগে বলতে হয়!

ঐ জীপের খবরও বেরিয়ে পড়ল। ভারত-সরকারের গাড়ি—অ্যাম্বাসি থেকে মালহোত্রের জিম্মায় দিয়েছে আমাদের কাজে-কর্মে লাগে যদি। কিচ্ছু তো বলেন নি এতক্ষণ—মিনমিন করছিলেন, জীপের মালিকানা তবে তো আমাদেরই অর্শায়। নিজের গাড়িতে ড্যাং-ড্যাং করে ঘুরব, তাতে আর কথা কি আছে?

উঠুন—

তিন নয় কিন্তু, চার বাঙালি আছি। কে পড়ে থাকবে তার জন্তে কি টস করতে বসব এখন?

মালহোত্র বললেন, চারই চলে আসুন। আন্দাজি চার বিছানা পেতে রেখে এসেছি, গিয়ে দেখতে পাবেন। আমার কেমন মনে হল, বাড়তি একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সে তো হল, কিন্তু দলপতির অনুমতি চাই যে! তিনি রাজি না হলে স্বয়ং যমরাজও যদি এসে পড়েন, তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হবে। খোঁজ, খোঁজ, কোথায় আছেন দলপতি।

খানাঘরে সেই যে ঢেকে গেলেন আমাকে, তখন থেকেই চালাচ্ছেন। সর্বনাশ! হোটেলের মালিক খুদ আফগান গভর্নমেন্ট—খেয়েই তাদের কসুর করবেন। ভারতের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা রয়েছে—এই নিয়ে শেষটা দুই গভর্নমেন্টে বিরোধ না বেধে যায়!

পরে অবশ্য টের পেয়েছিলাম আশঙ্কা অমূলক। হাড়ে-হাড়ে নয়, নাড়িতে নাড়িতে বুঝলাম। যে-সব লোকের উপর হোটেলের কর্তৃত্ব, তারা অতিশয় হিসাবী। সোবিয়েত থেকে ফেরার মুখে এক রাত্রি খেয়েছিলাম হোটেলে। তাই যথেষ্ট। মুরগির কোর্মার মাংসগুলো নিপুণ হাতে চেঁচে নিয়ে লম্বা লম্বা হাড়গুলো ঝোলে ডুবিয়ে রেখেছে। দাঁতের কত শক্তি ধরেন, পরীক্ষা দিন খানা-টেবিলে বসে বসে। নাজেহাল হয়ে দাঁতের বিশ্রাম দিয়ে শেষ অবধি হয়তো বিবেচনা করলেন, ঝোল শুধুই কিঞ্চিৎ উত্তম করে নেবেন। তা ঝাললঙ্কা এমন ঠেলে দিয়েছে—মুখবিবর থেকে উদর অবধি তপ্ত তৈলের ছ্যাঁকা দিতে দিতে এগুবে। জলে ঠাণ্ডা হবে না। মুখব্যাদান করে ঘণ্টাখানেক অন্তত লালা ঝরাবেন। খাদ্যের এই মাহাত্ম্য সেদিন জানা ছিল না। তাই ভাবলাম, তেজা সিং অকুতস্থ সাপটাচ্ছেন এত বেলা ধরে।

একজনে খানাঘরে ছুটলেন অনুমতির জন্যে। আর ফেরেন না। বলা যায় না, মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বসে গেলেন বা! ক্ষিধের নাড়ি পট-পট করছে—তার চেয়েও বড় ব্যাপার, ধুলোয় আপাদমস্তক বিভূষিত। ঘণ্টা তিনেক পরে এই কাণ্ড—সহ্যের সীমা শেষ হয়ে এলো।

পুনশ্চ একজন, তাঁরও পাত্তা নেই। তাগিদ দিতে তখন আরও একজন গেলেন। সর্বশেষ আমি। যাই হোক, মিলে গেল অনুমতি। মুরগির হাড় স্তূপীকৃত পাতের পাশে। এতক্ষণ ঐ তালে ব্যস্ত ছিলেন—ভরতি মুখ থেকে কায়ক্লেশে বলেছিলেন, দাঁড়ান—ভেবে দেখি। একে একে এসে চুপচাপ এঁরা সারবন্দি দাঁড়িয়ে। উনি খাচ্ছেন আর ভাবছেন। সমস্তগুলো প্লেট নিঃশেষিত হবার পর ভাবনা শেষ হল। অনুমতি দিয়ে দিলেন।

অতএব যাবতীয় মালপত্র এবং মালহোত্র ও শ্রী গুপ্ত সমভিব্যাহারে চললাম ইণ্ডিয়ান ক্লাবে। সগর্জনে এবং সগৌরবে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটতে ছুটতে—হঠাৎ একি হয়ে গেল, চারিদিক দিব্যি নজরে তো এসে যাচ্ছে, ধুলো নেই, আওয়াজও বেশ কোমল হয়ে এসেছে। তাকিয়ে দেখি, রাস্তায় পিচ দেওয়া। সারা শহরে একমাত্র পিচের রাস্তা—শাহী-সড়ক এর নাম—মাইল দেড়েক হবে লম্বায়, কাবুলবাসী এই সড়কের গুমরে বাঁচেন না।

শাহী-সড়ক ছাড়িয়ে আরও নানান বাঁকে ঘুরে ইণ্ডিয়ান ক্লাবে পৌঁছানো গেল। খাস বাড়ি—চওড়া উঠান, ফুলবাগিচা। টেনিস-লন আছে, সারি সারি আপেলের চারা লনের এক দিকে। অদূরে পাহাড়—ঘরে শুয়ে পাহাড় দেখা যায়, ভারি সুন্দর জায়গা। হাত-মুখ ধুয়ে অগৌণে আহারে বসা গেল। অতি মহাশয় লোক মালহোত্র, সব দিকে খর দৃষ্টি, ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্ত্রী দিন পনের দিল্লি চলে গেছেন। তারপর ইনি ক্লাব-বাড়িতে এসে উঠেছেন। কর্তৃস্থানীয় এক জন—এঁদেরই চেষ্টায় ক্লাব গড়ে উঠেছে।

শ্রী গুপ্ত এতক্ষণে বিদায় নিলেন। পাঁচটায় (আমাদের ছটা) কাবুল-হোটেলে আসবেন আবার, ঐখানে সকলে গিয়ে জুটব। ভারত-দূতাবাসের নিমন্ত্রণ, সেখানে যেতেই হবে। আর

খাদ্য পরিপাটি। বটের পাখীর মাংস, পোলাও ও তন্দুরা। ঘি নির্ভেজাল—সের আড়াই টাকার মতো। চাল এমন মিহি, বোধ করি ফুঁ দিলে উড়ে যায়। হাতে ঠাসা অতিকায় রুটির মতন বস্তুর নাম হল তন্দুরা। চিনি দেওয়া নয়, অথচ চিবিয়ে দেখুন কি মিষ্টি। এখানকার গমের গুণ। খাওয়ার পরে ফল—আঙুর তরমুজ, আপেল। বড় আঙুরের সের দু-আনা। আপেলের পাউণ্ডও দু-আনার মতো। দেদার খেয়ে যান, এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। কাবুলে মা বারুণীর সাক্ষাৎ পাবেন না, ইসলামি নিয়মে শহর শুকনো করে রেখেছে। কিন্তু ক্লাববাড়িতে, যদি হুকুম করেন,' টইটম্বুর বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখেন এঁরা। সমস্ত ভালো, পাবেন না কেবল সঙ্গ। পুরুষের বেলা তবু না হোক, মেয়েদের ভারি কষ্ট। নিতান্ত মজুরনী ছাড়া অতিশয় কড়া পর্দা। পথ-চলতি কদাচিৎ একটি দুটি মেয়ে দেখবেন—দেখতে পাবেন দীর্ঘ একখানি বোরখা চলেছে জুতোপরা দুটি পায়ে নির্ভর করে। শ্রীমতী মালহোত্র দিল্লি পালিয়ে গিয়ে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

গুরুভোজনের পর পাৎলুন ছেড়ে লুঙি পরে আরামসে লেপের নিচে গিয়েছি, শ্রীযুক্ত মুখুজ্জে এলেন। সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ভারত-দূতাবাসের কেষ্টবিষ্টু একজন, হাতে একগাদা যুগান্তর কাগজ। সাতদিন অন্তর ভারতের ডাক, একদিনে ওঁরা হপ্তার কাগজ পড়েন। আর বললেন, মাসিক বসুমতীও আসে। দেখুন ভাই, অধমের কলমের কসরৎ হিমালয় পার হয়েও চলে এসেছে! দিব্যি করছি, লিখবার জন্ত ভবিষ্যতে এমন কাগজ বাছাই করব কম্পোজিটার ও প্রুফ-রিডার ছাড়া যা কেউ পড়ে না। তা হলে এই সমস্ত নানান কথা শুনতে হবে না। বস্তুত, শ্রীমুখুজ্জে এমন সব বিশেষণ ছাড়তে লাগলেন—মুখটুখ লাল করে একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবার কথা, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত পাকা রং বিধায় সে যাত্রা কাটিয়ে উঠলাম। ডেলিগেটদের লিষ্টি দিল্লি থেকে আগেই কোন গতিকে এসে গেছে—তার মধ্যে নাম পেয়েছেন। এতক্ষণ ফুরসৎ হয় নি, অফিসের পরে এই বেলা তিনটের সময় ছুটতে ছুটতে এসেছেন—নাওয়া হয় নি, খাওয়া হয়নি। যেতে হবে একবার আমার বাসায়, যেমন করে হোক সময় করতে হবে। ছেলে বড্ড দেখতে চায়। ছেলের মা-ও চান। তিনি অবশ্য অ্যাম্বাসির নিমন্ত্রণে যাবেন, সেখানে দেখাশুনো হবে। ছেলে সেখানে যাবে না।

মুখুজ্জে চলে গেলেন তো টানা ঘুম তার পরে। অ্যাম্বাসির জীপ উঠানে এসে ভকভক করে তাগাদা দিচ্ছে। উঠে চোখ মুছতে মুছতে পুনশ্চ কাবুলের রাস্তায়। রাস্তা বটে! জীপ গাড়ি শক্ত ইস্পাতে বানানো, ভেঙে চুরে তাই ছত্রখান হয় না। বাংলাদেশের জেলে জলে ধুলোর মাটিতে দেহগুলো পাকাপোক্ত করে তবে আমরা পথে বেরিয়েছি, আমাদেরই বা করবে কি?

দেরি দেখে গুপ্ত আমাদের হল্লাসে আবার ক্লাবমুখো চলেছেন। তাঁকে তুলে নেওয়া হল। কিন্তু এলাম কার কাছে? দলপতি গুরুদ্বার-দর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন। একসঙ্গে জুটেপুটে হোটেল থেকে অ্যাম্বাসিতে যাওয়া তবে আর হল কই?

গাড়ি ঘোরাতে বললেন গুপ্ত। তবে এই ফাঁকের দিকে আমার আপেল তো জানি ফলের দোকানে 'বাক্সবন্দি হয়ে থাকে, আঙুর দু-চার থোলো সামনে ঝুলিয়ে রসিকের রসনা লালাসিক্ত করে। এ হেন আঙুর-আপেল গাদা গাদা গাছে ঝুলছে, দেদার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই রূপকথার দেশ মর-ভুবনেই আছে, এই কাবুল শহর। অপূর্ব গুপ্তর উঠানে ঢুকে আঙুরের মাচার নিচে দিয়ে যাচ্ছেন—মাথা নিচু করে যাবেন, নয়তো সুপক্ক আঙুরের থোলোর থাবড়া খাবেন বারে বারে। মাচায় আর কিছু দেখবার জো নেই, খালি আঙুর। এমনি ধারা সর্বত্র—আঙুরের সের দু-আনা হবে না তো কি! খাচ্ছে, শুকিয়ে কিসমিস বানাচ্ছে, আর কি করবে ভেবে পায় না। তারপরে উঠানের আঙুরের অত্যাচার সয়ে সয়ে বারাণ্ডায় উঠলেন তো পাশেই নিচু আপেলগাছ। আপেল পেকে লাল টুকটুক করছে। অতিথিকে যা-ই কিছু দেবেন, সঙ্গে মস্ত বড় ফলের প্লেট। শ্রীমতী গুপ্ত দক্ষিণ-ভারতের মেয়ে—ইংরেজি বলনেওয়ালা তো বটেই, বাংলা বলেও বহু খাস বাঙালিনীকে লজ্জা দিতে পারেন। রান্নাই বা কী চমৎকার! কিন্তু এক মারাত্মক দোষে সব মাটি করেছে—বিষম খাওয়ান। আসনে বসে বসে খাওয়াচ্ছেন—ছুটোছুটি করে একটা জিনিষ আনতে গেছেন, তখনও কড়া নজর—ঐ অবসরে আপনি কোন এক পদে ফাঁকিজুকি না দিয়ে বসেন।

আর কাকে ফেলে কার কথাই বা বলি! শ্রীমতী মুখুজ্জে—ফিরতি মুখে এসে এঁদের দু-বাড়িতে দুই সাঁজ খেয়েছিলাম। বাপরে বাপ, প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড! মেয়েদের শৌখিনতার চোটে বিস্তর পুরুষ কতুর হয় যায়। সকলের সেরা শখ দেখলাম, মানুষ খাওয়ানো। রাশিয়াকে এত প্রগতিবান বলেন, কিন্তু সেখানকার মেয়েরাও এই বনেদি অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি। পুরুষদের জবর রকম খাইয়ে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলে এঁরা বিজাতীয় আনন্দ পান।

দেশের বাইরে ঘোরাঘুরি হল তো যৎকিঞ্চিৎ। একটা জিনিষ ঠাহর করেছি—অজানা জায়গায় কোন এক গৃহচূড়ায় হঠাৎ যখন আমাদের তেরঙা ঝাণ্ডা দেখতে পাই, মন কেমন তুড়ি-লাফ দিয়ে ওঠে। যেন আমার নিজের বাড়ি, ভিতরে আমার নিজের লোকেরা। আমার দেশভুঁয়ের কথাবার্তা, এলাকপোশাক খাওয়াদাওয়া—দেয়ালে দেয়ালে আমাদের ভালবাসার মানুষদের ছবি। এই হল ভারতীয় অ্যাম্বাসি। অকূল সমুদ্রের মধ্যে সবুজ দ্বীপ। ছোট বড় তা-বড় কত নেমন্তন্ন ছেড়েছি, কিন্তু ভারত-এ্যাম্বাসি থেকে যেখানে যে কেউ ডেকেছেন, কোন দিন অবহেলা করিনি।

অ্যাম্বাসি সদর রাস্তার উপরে, সুন্দর দোতলা বাড়ি, উন্মুক্ত কম্পাউণ্ড। আরও বাড়ানো হচ্ছে। দুপুরবেলা এয়ারফিল্ড থেকে হোটেলে যাবার মুখে ইতিপূর্বেই সামনে দিয়ে গেছি। রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ভগবৎদয়াল, উত্তর প্রদেশের লোক—চিরকাল কলেজে মাষ্টারি করেছেন। কূটনীতির কাজ কতদূর কি করেন আমার জানবার কথা নয়, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও পড়াশুনোর কথায় প্রবীণ মানুষটি মেতে ওঠেন। এমনি ব্যাপার আরও শুনে এলাম। মস্ত মস্ত জায়গায় ভারত যাঁদের দূত করে পাঠিয়েছে—তাঁরা কাজু ডিপ্লোম্যাট নন, দিকপাল পণ্ডিত। যেমন রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন মস্কোয়।

রাজাকান্ত ট্যাপিন নাকি পরমাগ্রহে এদেশ-ওদেশের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে পড়লেন, রাজনীতির কথা হল না। চীনে গেলাম, তার ঠিক আগেই রাষ্ট্রদূত ছিলেন সর্দার পানিকর। পানিকর ও তাঁর মেয়ের গল্পে চীনের ইতরভদ্র পঞ্চমুখ। এমনই সব লোক পাঠিয়ে বাইরের ভুবনে আমরা এত বড় ইজ্জত গড়ে তুলেছি। ভারত বড় ভালো! মানুষগুলো কেমন দেখ—শয়তানি ফেরেব্বাজির ধার ধারে না, আত্মভোলা পণ্ডিত। সেকালের ও বিদগ্ধেরা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে জনচিত্ত জয় করতেন, সেই ধারাই চলছে খানিকটা।

অ্যাম্বাসিতে উত্তম উত্তম আয়োজন—ও সব তো আখচার হয়ে থাকে, একটা সামান্য জিনিষ মনে রয়ে গেছে—নুন-পেস্তা। পেস্তা এক রকম জঙ্গুলে গাছ, তার আর কি দাম আছে বলুন, নুনের সঙ্গে জারিয়ে বেড়ে বানিয়েছে—টপাটপ গালে ফেলতে মন্দ লাগেনা। শ্রীমতী দয়াল ও তাঁর মেয়ে আছেন—মা-মেয়ে খুব খাটছেন অতিথিদের আদর অভ্যর্থনায়। আর সেখানে আলাপ হল শ্রীমতী মুখুজ্জের সঙ্গে। আলাপ জমতেই দিলেন না তিনি—আহো কি সৌভাগ্য!—ইত্যাকার বচনের পরে কোন পামর টিকতে পারে সেই জায়গায়? আমার তো মনে হয় ভদ্র ভাবে এই এক সরিয়ে দেবার কায়দা।

. বড়যন্ত্র হল, নেমন্তন্নের আসর থেকে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়া যাক। এ তো চলল এখন বিস্তর রাত অবধি। রাশিয়ার প্লেন এসে বসে আছে, সকালবেলা আমাদের নিয়ে উড়ে পালাবে। অতএব বসে বসে গুলতানি না করে, যা পারা যায় দেখে নিই।

বাবরের কবর—সেটা রাত্রিবেলা হবে না। আমানুল্লা শহর বসাচ্ছিলেন, প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—মাইল চার-পাঁচ এখান থেকে। অ্যাম্বাসির জীপে সেই মুখো বেরিয়ে পড়া গেল। কনকনে শীত। কাবুল নদীর পাশে পাশে পথ। ও হরি, ইনি হলেন নদী নাকি! খাল বললেও মান দেখানো হয়—আয়তনে উল্টাডিঙির খালের আধাআধি হতে পারেন। বর্ষায় জল-সম্পত্তি কিছু নাকি বাড় হয়। তা সে কত—আঙুল ফুলে কলাগাছ হোক, শালগাছ হতে পারে না! হাণ্ডা বাত্রে চাপানায় জমজমাট। গরিব হতে পারে—কিন্তু আমিরি জাত এরা, সন্দেহ নেই। জীবনের আমোদ স্ফূর্তি ছেড়ে টাকার ধান্দায় ঘুরতে হবে, এ তত্ত্ব তারা মান্য করে না। দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা, তাই দেখবেন, আড্ডা কখনো ফাঁকা নয়। উৎকৃষ্ট আড্ডাধারীদের খাতিরও খুব, পথ চলবার সময় চাপানা কফিখানা তারস্বরে ডাকাডাকি করে, চা-কফি মুফতে মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে। আমাদের জীপের ধুলো ও আওয়াজে বোধ হয় রসভঙ্গ হচ্ছে, ভ্রূকুটি-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওরা। বস্তুত মোটরগাড়ি এই জায়গায় বেমানান, মোটরের জন্য তাই রাস্তাঘাট বানায় নি কেউ।

শ্রীযুত মুখুজ্জের বাসা হয়ে ওঁদের ছেলেটিকে তুলে নেওয়া হল। প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়—বছর বারো বয়স, স্বাস্থ্য আর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ফেটে পড়ছে। কি কাণ্ড, বইটই পড়ে নাম জেনে বসে আছে। দেশের মানুষ পায় না, বাংলা কথা শুনে কী খুশি! মুজতবা আলী সাহেবের 'দেশে-বিদেশে' বইটা লাইন-কে লাইন পড়েছে। এখানকার লোকের সৌজন্যে ও আতিথেয়তার কথা উঠল। দেখা হলে কুশল প্রশ্নের বান ডেকে যায়। বলেই চলেছে গড় গড় করে—কমা-সেমিকোলন নেই, জবাবের জন্য তিলেক থামবে না, জবাবের পরোয়াই করে না—

থামো, থামো, লিখে নিই—

তখন প্রবীর থেমে থেমে বলছে। খাতা বের করে তাড়াতাড়ি টুকে নিলাম। দেখা হলে এক জনে অন্যকে অন্তত পক্ষে এই ক'টি কথা বলবেই:

চেতোর হাস্তেদ্ (কেমন আছ); জান মনে তন জোর আস্ত্ (তোমার শরীর ভাল আছে)? বেখ্যাব হাস্তেদ্ (ভাল আছ তো)? চুচা বাচ্চায়ে তন খুব আস্ত্ (ছেলেপুলে ভাল আছে তো)? সোমা খুব হাস্তিদ্ (আপনি ভাল আছেন)? ···এমনি ধারা নিরবধি চলল।

পাহাড়ের লম্বা লাইন—আমাদের রাস্তা সেই পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে, রাস্তার জায়গাটুকুতে কেবল পাহাড় নেই? হতে পারে, কোন এক পুরাকালে পাহাড় কেটে সমান চৌরস করে রাস্তা বের করে দিয়েছে। জনশ্রুতিও তাই। নাকি, বিশাল ফটক ছিল রাস্তার এই জায়গায়; ফটক বন্ধ হলে বাইরের কেউ কাবুল শহরে ঢুকতে পারত না। পাহাড়ের মাথায় বিদ্যুতের আলো—আমাদের ডাইনে বাঁয়ে টানা চলে গিয়েছে। রূপসি রূপসি জঙ্গলগুলো কালো কবরীতে আলোর মালা পরেছে যেন। কবেকার কোন রণ-বিজয়ের স্মৃতি। শহরে আলো জ্বলুন বা না জ্বালুন—পাহাড়ে আলো জ্বলবেই।

আরো এগিয়ে চলেছি। জ্যোৎস্না ফুটফুট করেছে। পথ নির্জন। ধাবমান মোটরগাড়িতে কনকনে হাওয়া ঢুকে সর্বদেহ কাঁপিয়ে তোলে। উপরে উঠছি—দার্জিলিঙের রেলগাড়ির মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় ধুরিয়ে ঘরিয়ে উঁচুতে নিয়ে তুলছে। হঠাৎ দেখি, আকাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক অট্টালিকা। জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে তার গায়ে। দরজা-জানলা বন্ধ। একটা ক্ষীণ আলো নেই কোন অলিন্দে।

রাস্তা সেই অবধি গিয়ে শেষ। পৌঁছানোর এখনো দেরি আছে, আরও দুটো তিনটে বাঁক ঘুরতে হবে। উঠছি—উঠেই যাচ্ছি। জেয়াথার কাছে রেলের কামরা আর রেলের গাড়ি চিত-কাত হয়ে পড়ে আছে। ছোট শিশু রাগ করে যেমন খেলনার গাদা ছড়িয়ে ফেলে যায়। বছরের পর বছর রোদে বৃষ্টিতে বরফে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। যেন টাকা-পয়সায় কেনা নয়—মাংনা এসেছে।

গতিক তাই বটে! আমানউল্লার মাথায় পোকা ঢুকেছিল, শিক্ষা শিল্প রুচি ও সাজসজ্জায় জাগরণের জোয়ার বইয়ে দেবেন। রেললাইন পাতবেন সারা দেশ জুড়ে, বিদ্যুৎগামী প্রগতির রথ ছুটবে। আফগানিস্তানের কামাল পাশা! ফলে যা দাঁড়াল, তাবৎ দুনিয়ার মানুষের জানা আছে। আমাদের চোখের উপরে সামান্য একটু নমুনা রেলের সাজ-সরঞ্জাম—ওরে বাবা, কার এমন বুকের পাটা, যত্ন করে রাখতে যাবে অলক্ষুণে বস্তুগুলো! যার দায়ে অত বড় আমিরি খসে গেল আমানউল্লার, পরিজনের হাত ধরে দেশ ভুঁই ছেড়ে পালাতে হল। প্রাণে মনে যাদের ভাল চেয়েছিলেন, সারাজীবনে তাদের একটু চোখের দেখা দেখবার উপায় রইল না। অতএব থাক এসব দুর্বুদ্ধি; তামাম আফগানিস্তান বরঞ্চ দেমাক করে বেড়াক, বোরখাবিহীন একটি মেয়ে পথে দেখবে না; সিকি মাইলও রেলগাড়ি নেই সমস্ত দেশে। নির্ভেজাল প্রাচীন ঐতিহ্যবাদী হেন দেশ দেখাও দিকি কোথায় আর একটি আছে!

ঘেউ-ঘেউ কুকুর ডেকে উঠল। বাঘের মতন এক কুকুর তেড়ে আসছে গাড়ির দিকে। নির্মানুষ পুরীর সতর্ক পাহারাদার। যেন হাঁক দিল—এগিও না, এক ইঞ্চিও আর নয়, ফিরে চলে যাও।

অবশেষে বিশাল অট্টালিকার চত্বরে এসে পৌঁছানো গেল। বড় বড় কক্ষ, মোটা মোটা থাম। সে কী জ্যোৎস্না, যেন দিনমান। ফুল ফুটে আছে চৌদিকে। জায়গা একটা বাছাই হয়েছিল বটে—কাবুল শহর এবং পাহাড়ে-ঘেরা সমগ্র উপত্যকা পরিষ্কার নজরে আসে। কিন্তু হলে কি হবে, জ্যোৎস্নালোকে মনে হচ্ছে, বিশাল এক গোরস্থান।

মানুষের জন্য চেঁচামেচি করছি, আজ কে এখানে? দেয়ালগুলো গমগম করে; প্রতিধ্বনি আহ্বান ফেরত দেয়, কে আজ?

ফটক খোলা। দলসুদ্ধ উঠে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে দেখছি। তখন দেখি, টাটকা ফুলের তোড়া নিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসছে। বাড়ির প্রহরী—থাকে বাগানের ভিতরে কোন অলক্ষ্য কুটিরে কি কোথায়, বলতে পারি নে। লোক দেখে হয়তো বা তাড়াতাড়ি ফুল তুলে তোড়া বাঁধতে বসেছিল। কিঞ্চিৎ দক্ষিণার আকাঙ্ক্ষা।

উপহারের ফুল হাতে নিয়ে উপর-নিচে চতুর্দিকে চক্কোর দিয়ে এলাম। রূপকথায় যেমন শুনি—পাতালপুরীর রাক্ষসে খাওয়া এক রাজবাড়ি। লাখ লাখ টাকার এমন প্রাসাদ বিলকুল খালি পড়ে আছে—যাহোক একটা সরকারি অফিসও তো বসানো যেত!…কি বস্তু এটা? কিনা, প্রাসাদের আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রণের লক্ষাধিক খরচ করে আমানউল্লা ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন। ঐ অভিশপ্ত জিনিষ ছুঁতে যাচ্ছে কে বলুন! যে মায়া দেখাতে যাবে, তারও যদি আমানউল্লার দশা হয়! বছরের পর বছর আলগা পড়ে থেকে অত দামের জিনিষ এখন অকেজো লোহার আণ্ডিল।

নেমে আসছি। পায়ে হেঁটে নামছি। জীপগাড়ি পিছনে থেমে থেমে আসছে। বাঁক ঘুরতে না ঘুরতে সেই কুকুর। ক্ষেপে গেছে, গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুঝি! নিশিরাত্রে নির্জন পাথুরে কন্দরে কন্দরে কুকুরের ডাক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! না গো, গতিক ভাল নয়। জীপে উঠে পড়ো—ধুলোয় ধুলোয় জ্যোৎস্না অন্ধকার করে পালিয়ে চলো কাবুল শহরে।

[ক্রমশঃ]

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে বাঙলার এক পল্লীবালার আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী
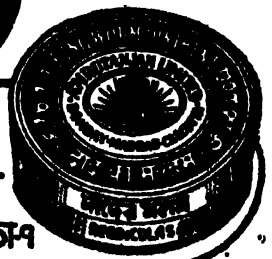
সীমা কমিশনের অবিচার

"উত্তর প্রদেশ ভাগ হওয়া নিতান্ত উচিত ছিল উহার পূর্বাংশের কতক বিহারকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়া বাঙ্গালাভাষী অঞ্চল বাঙ্গালাকে দিলে ন্যায় বিচার হইত। উত্তরপ্রদেশের মত এত বিরাট প্রদেশ রাখার কোন সার্থকতা নাই। উত্তর প্রদেশ ভাঙ্গা তো হইলই না, বরং তাহার চেয়েও বড় একটি মধ্যপ্রদেশ সৃষ্টি হইল। মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্রীয় জেলাগুলি ছাড়িয়াছে, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণের চূড়ান্ত দেওয়া হইল। আসামের লাভ অপ্রত্যাশিত। গোয়ালপাড়া এবং কাছাড় যাহাকে ন্যায় বিচার মানিতে হইলে ছাড়িতে হয়, সেই প্রদেশ ঐ দুই জেলা তো রাখিলই, অধিকন্তু ত্রিপুরা পাইয়া গেল। আসামে মাইনরিটিদের উপর আসাম যে অন্যায় অবাধে করিয়া চলিয়াছে, সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত যে গভর্ণমেন্টকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই আসামের হাতে আরও মাইনরিটি ঢুকাইয়া দেওয়া, তাহাকে আরও শক্তিশালী করা কোন ন্যায় বিচারের আদর্শ তাহা কয় জনের বোধগম্য হইবে জানি না। বাঙ্গালীদের উপর সহস্র বাধা-নিষেধ আবিষ্কারে এবং নির্লজ্জভাবে তাহার প্রয়োগে যে প্রাদেশিক সরকার সিদ্ধহস্ত, তাহার হাতে আরও বাঙ্গালী সমর্পণের সিদ্ধান্ত কমিশন কি করিয়া করিতে পারিলেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙ্গালার উপর যে ঘোর অবিচার হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের উপায় আছে। এখনও সময় আছে। কিন্তু সেজন্য যে সজ্ঘবদ্ধতা, যে চেষ্টা হওয়া দরকার তাহার পরিচয় এখনও মিলিতেছে না, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য!" —দৈনিক বসুমতী।

সুরাওয়ার্দ্দির রূপান্তর

"গোয়ায় বুঝি পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ আছে? নিপীড়ন আছে? অবিভক্ত বাঙলার কুখ্যাত নেতা মিষ্টার সুরাওয়ার্দ্দি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া সাফ সাফ রায় দিয়াছেন—সব ঝুটা হ্যায়! তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, গোয়ায় উপনিবেশবাদের বা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের বাষ্পমাত্র নাই। মিষ্টার সুরাওয়ার্দ্দির পেশাই অবশ্য উঁচু দরের ওকালতি: যে পক্ষ তাঁহাকে ফী দিয়া নিয়োগ করিবে তিনি তাহারই সমর্থনে যাহা কিছু বলিবার আছে তার সব কিছু বলিবেন, কখনো কখনো তারও বেশী। উকিলের নিয়োগকর্তা খুনী খুন করে না, চোর চুরি করে না। মিষ্টার সুরাওয়ার্দ্দি যদি গোয়ায় বেলায়ও উকিলের ভূমিকারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে কাহারো কিছু বলিবার নাই। ফী লইয়াছেন কি না জানি না। তবে সুরাওয়ার্দ্দি সাহেব হঠাৎ গোয়ায় গিয়াছিলেন কোন্ দুঃখে? তাঁহার দুঃখের অবশ্য অবধি নাই, অমন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রিত্বটা হাতে আসিতে আসিতেও আসিল না। কিন্তু, আহা, তাই বলিয়া গোয়ায় কেন? ইহার আগে যখন তাঁহাকে রাজনৈতিক নির্বাসনে যাইতে হইয়াছিল তখন তিনি জেনেভায় গিয়াছিলেন; এবারও সেখানে নয় কেন? কিংবা পর্তুগালে? বৃটেনের শীত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কর্মজীবনের অবসানে অনেক ইংরেজ শুনিয়াছি পর্তুগালে গিয়া নীড় রচনা করেন। সুরাওয়ার্দ্দি সাহেবকেও আমরা ওই পরামর্শই দিব, কেন না পাকিস্থানের শীতল অবহেলা এড়াইবার জন্য তিনি যদি গোয়ায় বাসা বাঁধেন, তবে কিছুদিন পরে আবারও তাঁহার উদ্বাস্তু হওয়া অসম্ভব নয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

জন্মনিয়ন্ত্রণ চাই

"দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে পরিবার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহার যুক্তিগুলি অকাট্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভারতে প্রতি বৎসর যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক মরে ১১ বছরের কম বয়সে। অর্থাৎ বয়স্কদিগের তুলনায় শিশু ও কিশোরদিগের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক বেশী। তথাপি প্রতি পরিবারে নবজাতকের সংখ্যা হ্রাসের দ্বারা শিশু ও কিশোরদিগের মৃত্যু সংখ্যা কমাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা না হওয়ায় তিনি গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। গৃহকর্তার পক্ষে যতগুলি সন্তানকে "মানুষ" করা সম্ভব, ভারতে অধিকাংশ পরিবারেই সন্তানের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী? প্রত্যেকটি সন্তানের খাওয়া, পরা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধার জন্য যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন, পিতা বা অভিভাবক তাহা ব্যয় করিতে পারেন না। ফলে পুষ্টির অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, রোগ হইলে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু ঘটে—এবং নিতান্ত দৈবানুগ্রহে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। যে সকল শিশুকে বাঁচাইবার সামর্থ্য নাই,

তাহাদিগকে পৃথিবীতে আনিবার প্রয়োজন কি? বরঞ্চ প্রতি পরিবারে নবজাতকের সংখ্যা হ্রাস পাইলে অবশিষ্ট প্রতিটি শিশুর জন্য এখনকার তুলনায় বেশী খরচ করা ও যত্ন লওয়া সম্ভব। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে; খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও জীবনের অন্যান্য উপকরণের দিক দিয়া তাহারা বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে। অন্য দিকে যতগুলি সন্তানকে প্রতিপালন করা সম্ভব, তদতিরিক্ত সংখ্যক সন্তানের খাওয়া-পরা জোগাইতে কিম্বা তাহাদের রোগব্যাধিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে অক্ষমতার জন্য পিতামাতা নিয়ত মনস্তাপ ভোগ করিবেন না। বরঞ্চ, সংখ্যায় কম হইলেও, প্রাণের পুত্তলিদিগকে হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান হইতে এবং শিক্ষা লাভ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিমল আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। একটি কৃতী পুত্র এক শত মূর্খ পুত্র অপেক্ষা বেশী কামনীয়। একদিক দিয়া চিন্তা করিলেই প্রতি পরিবারে সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার অত্যাবশকতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে।"

—যুগান্তর।

শেষ কথা জনসাধারণেরই

"কমিশনের এই সকল অগণতান্ত্রিক এবং নীতিহীন সুপারিশকে কখনও গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব নহে। যে সকল জাতি এবং অঞ্চলের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, সেই সকল জাতি এবং অঞ্চলের মানুষ, কখনও নীরবে কমিশনের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসমূহ মানিয়া লইতে পারে না। এই সকল আমলাতান্ত্রিক এবং অন্যায় সুপারিশকে নাকচ করিবার জন্য মিলিত প্রতিবাদ এবং ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন তাই অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারের আচরণ এবং রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের অভিজ্ঞতার মধ্যে জনসাধারণ ইহাই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কেন্দ্র করিয়া যে জাতিসমস্যা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ভারতের বর্তমান শাসক-শ্রেণী তাহার সমাধান করিবে না। বিভিন্ন জাতির সৌভ্রাত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন এবং সংগ্রামের মধ্যেই এই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইবে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অগণতান্ত্রিক ও নীতিহীন সুপারিশসমূহ সংশোধন করে মিলিত আন্দোলনই হইতেছে এই পথে প্রথম পদক্ষেপ। শেষ কথা জনসাধারণেরই।"

—স্বাধীনতা।

ডালমিয়ার গ্রেপ্তার

"ডালমিয়ার গ্রেপ্তার এবং কৃষ্ণমাচারীর ডালমিয়ানগর ভ্রমণ লইয়া লোকসভায় তীব্র বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। জামাতা ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে শ্বশুর নেহরুর তর্কযুদ্ধ বেশ ভাল মতই হইয়াছে। নেহরু বলিয়াছেন, ডালমিয়ার গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত তিনি এবং দেশমুখ ছাড়া আর কেহই জানিতেন না। তবে কি আমরা ইহাই বুঝিব যে, তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীকে পুরা বিশ্বাস করেন না, ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন? কৃষ্ণমাচারীর সম্বন্ধে যতটা তথ্য লোকসভায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাঁহার উপর জনসাধারণের বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে। তিনি পদত্যাগ করিয়া যাওয়ায় লোকে খুসীই হইয়াছিল, তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া তাহারা পছন্দ করে নাই। ডালমিয়াকে ডালমিয়া বলিয়াই গ্রেপ্তার করা হইল, অথবা ইহা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান ইহা কিন্তু স্পষ্ট হইল না। এই গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে জীপ কেলেঙ্কারীর নায়কদের বাঁচাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত বেমানান হইয়াছে।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

বহরমপুর পৌরসভার কেলেঙ্কারী

"বহরমপুর পৌরসভায় গত ৩০এ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা পৌরবাসী এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বর্তমানে ইহার বেশী কিছু বলা সঙ্গত নয়, উপযুক্তও নয়। যাঁহারা নির্বাচিত হইয়া কোনও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ সম্ভ্রান্ত পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আপত্তিকর সংবাদে আমরা সাধারণতঃ দুঃখবোধই করি। একই স্থানে দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে একই দিনে উপস্থিত হইয়া যদি এইরূপ সম্ভ্রান্ত সদস্য দুই বার ভ্রমণ-ভাতার বিল করিয়া টাকা লন, তবে তাহা প্রকৃতই অন্যায়। এই জাতীয় সংবাদই আমরা পাইয়াছি; আরও জানিয়াছি যে, এ, জি, বি হইতেই নাকি হিসাব নিরীক্ষায় ইহা ধরা পড়িয়াছে এবং একটি অধিবেশনের ভ্রমণ-ভাতা-বিলের টাকা নাকি প্রত্যর্পণের নির্দেশ আসিয়াছে।"

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

জমিদারীর তহশীলদার

"সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতঃ স্বহস্তে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্বের গোমস্তাদিগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তহশীলদার নিযুক্ত করিতেছেন। ইহা খুবই ভাল কথা, কিন্তু গোমস্তাদের 'ইণ্টারভিউ' কালে অনেকে নগদ টাকা জামিনস্বরূপ দিতে অপারগ, ইহা প্রকাশ করায় চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। পরে সরকার নগদ টাকার পরিবর্তে 'ফাইডিলিটি বণ্ড' চালু করিয়া নগদ টাকা জমা দেওয়ার অসুবিধা দূর করিয়াছেন। পূর্বোক্ত গোমস্তারা এক্ষণে চাকুরীর উমেদার হইলেও চাকুরী পাইতেছেন না। এইরূপ বঞ্চিত গোমস্তাদিগকে চাকুরী দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। অধুনা নিয়োগকালে কোন কোন তহশীলদার তাঁহাদের স্বগ্রাম তহশীল করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইতেছেন। আমাদের মনে হয়, স্বগ্রামের তহশীল কোন তহশীলদারকেই দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে বহু নিরীহ ব্যক্তি বিপদে পড়িবে এবং গ্রাম্য-দলাদলিতে এই তহশীলদাররা ইন্ধন যোগাইতেও পারেন।"

--প্রলাপ (মেদিনীপুর)।

মতামত

"একমাত্র সুষ্ঠু সমালোচনা সরকারকে গণতান্ত্রিক পথে চালনা করিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র ত্রিপুরায় কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকৃতির সংবাদপত্রেই জনসাধারণের পক্ষ হইতে সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ রহিয়াছে। এই কয়েকখানি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা অতি সুনিপুণ ভাবে করা হয়। চিফ-কমিশনার সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া প্রথমতঃ ইহাকে

মিটিং বা মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা আখ্যা দিয়া সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বানচাল করিয়া আসিতেছেন। দ্বিতীয়ঃ তাঁহার প্রদত্ত তথ্যের প্রশ্ন করার সুযোগ সাংবাদিকগণকে সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া সম্মেলনকে প্রকারান্তরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা হইতেছে। এই ভাবে আহ্বান করিয়া অনর্থক সাংবাদিকগণের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।"

—সেবক (আগরতলা)

বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে নরক সৃষ্টি

"বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের কিছুটা পরিবর্দ্ধন হইলেও, হাসপাতালটি (সেবাসদন) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই। হাসপাতালের দক্ষিণপ্রান্তে স্তূপীকৃত জঞ্জাল অনেক সময় পূতিগন্ধময় হইয়া উঠে। হাসপাতালের মধ্যস্থলে অবস্থিত গরু-মহিষের খাটালটি হাসপাতালে নরক সৃষ্টি করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ বর্ষার দিনে এই খাটালটির জন্য হাসপাতালের মধ্যস্থলে যে জলকাদার সৃষ্টি হয়, তাহার পচা গন্ধেও মশামাছির উৎপাতের ফলে এক দুঃসহ অবস্থার উদ্ভব হয়। নিকটেই হাউস সার্জ্জেনের কোয়ার্টার, এবং অদূরে সংক্রামক রোগ চিকিৎসার ওয়ার্ডটি অবস্থিত। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ কি চোখ থাকিতে অন্ধ ? হাউস সার্জ্জেনরা সিভিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাটালটি অপসারণের জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে নীরব আছেন। আবার হাসপাতালের উত্তর দিকে আর একটি আবর্জ্জনার স্তূপ গড়িয়া তুলিতে কর্ত্তৃপক্ষ মনোনিবেশ করিয়াছেন।"

—বর্দ্ধমানের ডাক।

জমিদারী উচ্ছেদের পর

"জমিদারী গ্রহণের সমগ্র প্রচেষ্টাই পরীক্ষামূলক। প্রকৃতপক্ষে জমিদারী বলিতে যাহা বুঝা যায় কেবল তাহা যদি আইনে যাইত, তবে সাধারণের জন্য এত কথা বলিতে হইত না। জমিদার নহেন অথচ সামান্য জমি-জমা লইয়া বসবাস করে, এরূপ লোকের সংখ্যা সারা পশ্চিমবঙ্গে নিতান্ত কম নয়। জমিদারী গ্রহণের এক ঢালা ব্যবস্থায় তাঁহারা সকলেই পড়িয়াছেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা কোন কূল কিনারা পাইতেছেন না। গ্রহণপর্ব্ব সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। কিছুকাল না গেলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে না। কিন্তু অনুমানে যাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে তাহাতে অত্যধিক আশান্বিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। ইহার ফলে ভূমিহীন ভূমি পাইবে তাহাও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। সুতরাং জমিদারী গ্রহণ কার্য্য দেশের ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় সমস্যার সহজ সমাধান করিতে পারিবে, একথা মনে করা যায় না।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

করিমগঞ্জ লোক্যালবোর্ডের অচল অবস্থা

"প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে করিমগঞ্জ লোক্যালবোর্ডের সদস্য নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত না হওয়ায় বর্তমানে বোর্ডের অচলাবস্থা সৃষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী কে বা কাহারা—সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই প্রশ্নের সদুত্তর করিমগঞ্জবাসী অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। গত ২৬শে জুলাই তারিখে লোক্যালবোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের তারিখ নির্দ্ধারিত হয়। বোর্ডের কংগ্রেস দল ও সম্মিলিত পার্টির মধ্যে নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় দেখা যায় যে, কংগ্রেস দল সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু তবুও যে কোনও রূপে কংগ্রেসী বোর্ড গঠন করা যায় কি না সেই উদ্দেশ্যে তোড়জোড় চলিতে থাকে এবং এই উপলক্ষে কোন কোন মন্ত্রীও করিমগঞ্জে আসিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, সম্মিলিত দলের প্রার্থীদিগকে কংগ্রেস দলে ভিড়াইবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অতঃপর চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিনও দেখা গেল সম্মিলিত দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কংগ্রেসী দলের অন্যতম সদস্য শ্রীশৈলজামোহন দাস উক্ত সভায় সরকার-মনোনীত সভাপতি ছিলেন ; তিনি এক অবৈধ 'পয়েণ্ট অব অর্ডার'-এর উপর ভিত্তি করতঃ সভা ভঙ্গের আদেশ দেন। সম্মিলিত দল হইতে আইন-কানুন দেখাইয়া বলা হয় যে, কংগ্রেস দলের উক্ত অবৈধ ও উদ্দেশ্যমূলক 'বৈধতার প্রশ্ন' টিকিতে পারে না। এই সম্বন্ধে সরকারী নির্দেশাদিও সম্মিলিত দল হইতে দাখিল করা হয়। কিন্তু 'কোন যুক্তি নাহি খাটে শ্রীশৈলজা'র কাছে।"

—যুগশক্তি (কাছাড়)।

কর্ত্তব্য কি ?

"গত বৎসরের অজন্মাহেতু স্বভাবতঃ অভাব-অভিযোগ ও দৈন্য অবস্থা আমাদের নিত্যসঙ্গী, তাহাতে যে কয় জন লোকই পূজার আনন্দ উপভোগ করিবে বা পূজার বাজারে অংশ গ্রহণ করিতে

করিবে তাহাও দেখিবার বিষয়। বিশেষতঃ সম্মুখে কার্ত্তিক মাস আসিতেছে, প্রায় সকলের ঘরেই অন্নাভাব এবং এক টানাটানির সময়। চারিদিক হইতেই শুধু সরকারী দয়া আকর্ষণের জন্য রিলিফ চাই ও টেষ্ট রিলিফ চাই আর্ত্ত ধ্বনি উঠিতেছে। এ অবস্থায় এই অন্নাভাবক্লিষ্ট দেশে অন্নপূর্ণার আবির্ভাবে দেশবাসীকে প্রকৃতপক্ষে আনন্দ দিতে হইলে পর্য্যাপ্ত রিলিফ ও লোন আদি দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য পক্ষে দেশবাসিগণেরও অযথা ব্যয়-বাহুল্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। বিলাসব্যসন যেরূপ এক শ্রেণীর লোককে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের না চলিলে উপায় কি আছে! একে ত আধি-ব্যাধি চিকিৎসা ও শিক্ষা-দীক্ষা আদি বিষয়ে লোকের জীবনধারণের ব্যয় বাড়িয়াছে, তার উপর বিলাসব্যয় সঙ্কুলান হয় কি করিয়া? দ্বিতীয়তঃ দেশবাসীর আর্থিক সংস্থানের পথও সঙ্কুচিত। কাজেই কোনরূপ উৎসবের আতিশয্যে অযথা বিলাসব্যয় যাহাতে পীড়াদায়ক না হয়, তৎপ্রতি প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা সমীচীন।"

—নীহার (কাঁথি)।

পশ্চিমবঙ্গ মুদ্রক সম্মেলন

"আজিকার পৃথিবী এবং সভ্যতার ধারক ও বাহক মুদ্রণ-শিল্পের মুখ্য মাত্রেরই একটি বড় দায়িত্ব রহিয়াছে এবং সেই দায়িত্ব যদি নিজেকে আরও স্ফীত করিতে অপরকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে উহা দেশ ও জাতির এক কলঙ্কময় দিক বলিয়া গৃহীত হইবে। আমরা মনে করি, কলিকাতার বড় প্রেসগুলি মফঃস্বল প্রেসের কার্য্য যেরূপভাবে গ্রহণ করিতেছেন উহা সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম দুষ্ট ব্রণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! আমরা মফঃস্বল বাঙলার প্রেস মালিকগণের পক্ষ হইতে মুদ্রক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও মুখ্য মুদ্রকগণের নিকট পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রণশিল্পের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সম্মেলনের ভিতর হইতে এইরূপ একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠন করুন, যাহাতে সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের যাবতীয় কার্য্য উক্ত সংস্থা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে পারে। উক্ত সংস্থা একটি মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া মহকুমা বা জেলার প্রেসগুলির মধ্যে তাহাদের কার্য্য গ্রহণের (Capacity) পরিমাণ মত কার্য্য বণ্টন করিয়া দিবেন এবং বণ্টন করিবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে উহা স্থানীয় অঞ্চলের বাহিরের প্রেস গ্রহণ করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে পশ্চিম-বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের মুদ্রণশিল্পগুলি তাঁতশিল্পের মত অনিবার্য্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। উহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কাহার?"

—বারাসাত বার্ত্তা।

স্কুলবোর্ডের নির্ব্বাচন

"বর্দ্ধমান জেলা স্কুলবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনে যে সমস্ত ইউনিয়ান বোর্ড সদস্য কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করিবে, তাহাদিগকে পঞ্চায়েতে নমিনেশন দেওয়া হইবে এবং প্রেসিডেন্টদিগকে "জাষ্টিস অব পীস" করিয়া দেওয়া হইবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ও প্রচার করিয়া সম্প্রতি স্কুলবোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সমস্ত আসনেই জয়লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যতের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ভোটদান কেন্দ্রে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যই কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছেন। ব্যালট বা গোপন প্রথায় ভোট নহে—প্রকাশ্য ভাবে প্রার্থীর নাম উচ্চারণ করিয়া ভোট দিতে হইবে। কংগ্রেসের শাসন চলিতেছে, তাদের এজেন্ট সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে, কাহার মাথায় কয়টা মাথা রহিয়াছে যে, কংগ্রেস ছাড়া কাহাকেও ভোট দেয়? বর্ত্তমান ইউনিয়ান বোর্ড হইতেও অযথা প্রস্তাবিত পঞ্চায়েতের নমিনেশনের ভাঁওতায় যাঁহারা প্রলুব্ধ হন নাই, পাছে তাঁহাদের স্কুলের কোন ক্ষতি হয়, সেজন্য "দস্যুকে দূরে পরিহার" বিবেচকের কাজ বুঝিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করিয়াছেন! বর্ত্তমান স্কুলবোর্ড যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং তাহাতে সরকার পক্ষীয় ছাড়া কেহ সংখ্যাধিক্য হইতে পারে না, ইহা জানা কথা।

—দামোদর (বর্দ্ধমান)

মহাত্মাজীর ধ্যানের রূপ

"এমন সব লোকও এখন মহাত্মাজীর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন, চোরা-কারবারী বা মুনাফাখোরদের মুরুব্বি বলিয়া যাঁহাদের দুর্নাম ঘুচে নাই। যাঁহারা গান্ধীবাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে, অন্ততঃ গান্ধীজয়ন্তীর পুরোভাগ হইতে তাহাদের বাদ দিলেই শোভন হয়। ব্যভিচারদুষ্ট জীবনে কেহ যখন মালপোয়ার মহোৎসবে মস্তকে তিলকে পরমবৈষ্ণব সাজিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হয়, অথবা চরিত্রহীন বড়লোকদের ধামাধরা দল যখন অন্নদাতাদের ধার্ম্মিক সাজাইয়া সনাতনী ঢাক বাজাইতে সুরু করে, তখন যেমন লোকের সর্ব্বাঙ্গ রী-রী করিয়া উঠে, তেমনি এই শ্রেণীর লোকগুলাকে গান্ধীটুপী পরিয়া গান্ধীবাদ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিতে শুনিলে, ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভাঙিয়া যায়। সূত্রযজ্ঞের সময় ইহাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না, গান্ধীজীর সম্বন্ধে ভাষণের সময় ইহারা পরস্পর গল্প করে, পবিত্র রামধুন গানের সময় সরিয়া গিয়া পরমানন্দে বিড়ি ফুঁকিতে থাকে! বালক-বালিকাদের সমক্ষে এই অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা জয়ন্তীর শুচিতা ও গাম্ভীর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির মূলে যে কতখানি আঘাত করে, দুঃখের বিষয়, আয়োজনকারীদের অনেকেরই তাহার উদ্বোধ নাই। গান্ধীজী মরিয়াছেন—তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে মরিতে দাও। গান্ধীবাদ বরবাদ করিয়া দিয়া তাঁহারই আশীর্ব্বাদলব্ধ প্রসাদ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে থাক। সাবধান! মহতের অবমাননা করিও না, জাতি মার্জ্জনা করিবে না। আর যদি গান্ধীজীর নাম ভাঙাইয়া ভবিষ্যতের ভরসা রাখিতে হয়, তবে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। আদর্শের অবমাননা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

—পল্লীবাণী (কালনা)

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পত্রিকা সমালোচনা

["রাজায় রাজায়" উপন্যাসটা বাস্তবিক অপূর্ব। তবে নাম-পরিবর্তন সম্বন্ধে অধ্যাপিকা সুধীরা নাগের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ঠিক এই শ্রেণীর লেখা পড়েছি বলে মনে হয় না। উপন্যাসের মূল সুরের সঙ্গে ভাব, ভাষা এবং চরিত্র অদ্ভুত সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে। তা' ছাড়া "উদয়ভানু"র লেখায় সকলের চেয়ে যেটা বড় আকর্ষণ বলে আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে তাঁর ভাষার cream quality।

...দিন থেকে আপনার পত্রিকায় যে-অভাবটা বোধ করছিলাম, সেটা পূর্ণ কোরেছেন "বিবেকানন্দ-স্তোত্রে"। শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, "পরম পুরুষ" প্রকাশ ক'রে। "নিবেদিতা"র স্বাদ পেয়েছি "লিজেল রেম'র" লেখায়। অথচ রামকৃষ্ণ-নিবেদিতা, অর্থাৎ ঐ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-জীবনের রাখী বাঁধলেন যিনি, সেই বিবেকানন্দকে আমরা এ যাবৎ আপনার পত্রিকায় পাইনি।

... রামকৃষ্ণকে বাদ দিলে বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ ছাড়া যেমন কিছু নয়, তেমনি বিবেকানন্দকে বাদ দিলে নিবেদিতা কেবলমাত্র Miss Margaret Noble-ই। অর্থাৎ, হয় তিন জনকেই জানতে হবে, নয়তো কাউকেই নয়। যাই হোক, আমরা আজ তিন জনকেই পেয়েছি। "বিবেকানন্দ-স্তোত্র" অদ্ভুত লাগছে। লেখকের ভাব, ভাষা এবং লেখার 'টেক্‌নিক্' সম্পূর্ণ নতুন।

সূচিপত্রে "বিবেকানন্দ-স্তোত্র"কে কবিতা বলে উল্লেখ কোরেছেন। কবিতা না বলে 'জীবন-কাব্য' বললে কেমন হয়?

"সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা" বিশেষ ভালো লাগছে না। টীকা আর টিপ্পনি দিয়ে লেখাটাকে অনর্থক লম্বা করা হচ্ছে।

রমাপদ চৌধুরীর "লালবাঈ" বেশ জমে উঠছে। লেখার styleটা বেশ।

"সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা" অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বাস্তবিক আপনার সব দিকে চোখ আছে।

আচ্ছা, আপনার "রত্নমালা" বাজারে বেরিয়েছে কি? প্রকাশক কে? কবে প্রকাশিত হবে, দয়া করে জানাবেন। রবি ঘোষ ও মন্দিরা ঘোষ। ৭।২।সি, হাজরা লেন, কলিকাতা।

[রত্নমালা শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পরেই বাজারে প্রকাশিত হবে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা।—স]

একমাত্র 'মাসিক বসুমতী'র বিচিত্র-বিভাগ নব-নব রূপে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে শুধু উপস্থিত হইয়া আনন্দ দানই করে না, মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। ক্রীড়া-বিভাগও সেইরূপ ক্রীড়া-রসিকদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ক্রীড়া-বিভাগে 'ফুটবল', 'হকি', 'ক্রিকেট', 'ব্যাডমিন্টন' প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ আলোচনা থাকিলেও 'ভলিবল' খেলা বিষয়ে আলোচনা বিশেষতঃ থাকে না। কিন্তু ভলিবল খেলাও আজ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। সম্প্রতি আমাদের ভারতের 'ভলিবল'টীম চীনযাত্রার প্রস্তুতি শেষ করিয়াছে। ভারতের 'ভলিবল' খেলার মান খুব নিম্নস্তরের নহে। তাহার প্রমাণস্বরূপ বিশ্বচ্যাম্পিয়ান রাশিয়ার সহিত টেষ্ট খেলায় ভারত 'রাবার'-জয় করিয়াছিল। ভলিবল খেলার নিয়মাবলী অত্যন্ত জটিল। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি যদি এই খেলার নিয়মাবলী ধারাবাহিক রূপে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আগামী মরশুমে আলোচনা করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রাহক নং—৮১৮০, আমতা, হাওড়া।
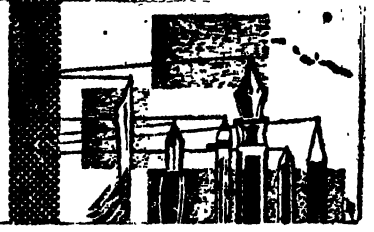
পাঠক-পাঠিকার চিঠি

মাসিক বসুমতীর গত কয়েক সংখ্যায় যৌনতত্ত্ব লেখা সম্পর্কে অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার মতামত প্রকাশিত হইতেছে। আমিও সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের মত সমর্থন করি। যৌন অনভিজ্ঞতার জন্য অনেক যুবক-যুবতী যৌবনের নবপ্রভাতে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য হারিয়ে প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হন। যৌনবিজ্ঞান আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য্য বিষয়। বিবাহিত জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য যৌন সম্পর্কীয় লেখার প্রয়োজন যে খুবই, তা আশা করি আমার মত অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারা ইহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন ক'রবেন। বিগত ৩৩শ বর্ষ ধরে মাসিক বসুমতী বাঙ্গালীর সেবায় যে নিষ্ঠা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আসছে—বর্ত্তমান ৩৪শ বর্ষেও সে গতি তার অব্যাহত রয়েছে। আমার একান্ত অনুরোধ অনুগ্রহ পূর্বক আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা মাসিক বসুমতীর মাধ্যমে যৌনসম্পর্কীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায় পরিচালক—"কালাচাঁদ লাইব্রেরী" চিল্কীগড়। মেদিনীপুর।

ভাদ্র সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠিতে শ্রীমতী ভক্তিরাণী মাইতি শ্রীমতী মায়ারাণী পালকে সমর্থন করিয়া এই পত্রিকায় খোলাখুলি যৌনতত্ত্বের আলোচনা করিতে আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা কোন ক্রমেই মানিয়া লইতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আমি জলপাইগুড়ির শ্রীসুশীলকুমার রায় মহাশয়ের সহিত একমত। এই পত্রিকা এত প্রিয় যে বাড়ীর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরাও গভীর আগ্রহে পড়ে, শুধু তাহাই নহে, এই পত্রিকায় একটি শিশু-বিভাগও রহিয়াছে। কাজেই এই পত্রিকায় যৌনতত্ত্ব আলোচনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। নবেন্দুকান্তি দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন কলোনী, যাদবপুর।

আমি যে সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা পড়ে থাকি, তার মধ্যে মাসিক বসুমতীকে স্থান দিয়েছি সবার উপরে, কিছুটা 'খেলাধূলা' 'চার জন', 'লেখকদের অদ্ভুত খেয়াল', 'পত্রগুচ্ছ', বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ এগুলো ভারি ভাল লাগে। এখানে আমি যা বলতে চাই, (বলার দাম দেওয়া হবে কি না জানি না) যৌনতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু অনেক ভাল বই ত' বাজারে বেরিয়েছে, অতএব মাসিক বসুমতীতে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা না করাই ভাল। এ বিষয়ে শ্রীসুশীল রায়ের মতকে আমি সমর্থন করি এবং মলাটের ছবি সম্বন্ধেও একমত। 'ঘোড়দৌড়' বিভাগ সম্বন্ধে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যদিও এটা খেলামাত্র তা' হ'লেও জুয়া, এটি মাঠেই থাকুক। মাসিক বসুমতীতে এর জন্য নূতন বিভাগের প্রয়োজন, তা আমি কিছুতেই মনে করি না। অতএব আপনারা বিবেচনা করবেন বিভাগটি খুলবেন

-'াক না। আশা করি, শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা মহলে সমর্থন পাওয়া যাবে। শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, বরিজহাটী, চণ্ডীতলা, হুগলী।

আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক। মাসিক বসুমতীর পরবর্তী সংখ্যা কবে বাহির হইবে, তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকি। পূর্ব্বে আমি গ্রামে থাকিতাম। তখন আমাদের গ্রামে অনেকেই মাসিক বসুমতী লইতেন—আমার কাজই ছিল সেকলি আগে ... করা এবং পড়িয়া ফেলা। বর্ত্তমানে সহরে আসিয়া আমি নিজেই মাসিক বসুমতীর নিয়মিত ক্রেতা হইয়াছি—পাঠক যে আছি বা হইয়াছি সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমি যে দিনে পত্রিকা কিনি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতে আমার আর কিনিয়াও পড়া সম্ভব হয় না। আমি মনকে প্রবোধ দিই—এখন আমার নিজস্ব মাসিক বসুমতী যখন রহিয়াছে—তখন আমি ত পড়িবই—বন্ধুবান্ধবদেরও একটু অমৃত রসের সন্ধান দেই। আজ মাসিক বসুমতী পড়িতে পড়িতে নিজের অজ্ঞাতসারেই নিম্নের কয়েকটি ছত্র লিখিয়া ফেলিয়াছি। লেখা শেষে ছত্র ক'টি পড়িয়া অবাক হইলাম। আমি একে ... সন্দেহ নাই—কিন্তু এত ভালবাসি জানিতাম না। ছত্র ক'টি হইল—

কার জয়গানে মুখর আজিকে রসপিপাসুর দল
কার রূপে আজ মোহিত সকলে, কোন সে শতদল?
চারি দিকে তাই চাহিয়া দেখিনু অনুসন্ধানী চোখে
রসিকের হাতে সদা ঘুরিতেছ কোন সে পরম সুখে।
শুনিলাম আজি জনতার ভিড়ে উঠিয়াছে তব স্তুতি
বুঝিলাম আমি কেন এই পূজা পায় 'মাসিক বসুমতী'।
পুরুষের তুমি বাঞ্ছিতা ওগো শিশুদের তুমি কামনা
জননীর তুমি স্নেহ ... শিশুমনের বাসনা।
প্রবাসে ... রূপে প্রবাসীর চোখ রাঙে
তব কণ্ঠের গুঞ্জন গীতে আমাদের ঘুম ভাঙে।
তাইতো আজিকে পত্রিকা ভিড়ে তব তরে ওঠে গীতি
তুমি যে মোদের মরমের কথা ব'লে দাও বসুমতী।

উচ্ছ্বাসের বেগে ছত্র কয়টি লিখিয়াছি এবং ইহার নাম দিয়াছি "হে বসুমতী"। যদি আপনাদের মনোরঞ্জন করে ইহাকে অন্যত্র ছাপিতে পারেন। মাসিক বসুমতীর অগ্রগতিতে আমার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রীঅমিতকুমার রায়। কাইতি, পোঃ বর্ধমান।

আমি "মাসিক বসুমতীর" গ্রাহক নই বটে তবে আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আপনাদের অধুনা প্রবর্ত্তিত 'চারজন' বিভাগটি আমার খুবই প্রিয়। কৃতী বাঙ্গালীদের পরিচয় লাভের যে সুযোগ আপনারা করে দিয়েছেন, তার জন্তে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি এখানে কয় জন কৃতী বাঙ্গালীর পরিচয় জানাবার জন্ত অনুরোধ করব। তাঁদের নাম নীচে দিলাম। ডাঃ হীরালাল রায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ডাঃ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—অধ্যাপক উক্ত কলেজ। ডাঃ ত্রিগুণাচরণ সেন—অধ্যক্ষ ঐ কলেজ। ডাঃ যতীনাথ বসু এম, এস, এ, অধ্যাপক ঐ কলেজ। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, লেখিকা অনুরূপা দেবী। এঁদের সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা খুব আছে এবং এঁরা সকলেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি, কিন্তু জানবার সুযোগ হচ্ছে না। আপনারা যদি এই কয় জনের জীবনী কৃপা প্রকাশ করেন তবে অত্যন্ত সুখী হ'ব। শ্রীমানসকুমার মৈত্র। কামডহরী, পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

আপনারা 'চারজনের' মধ্যে সব কয়টিই পুরুষদের জীবনী ছাপান। কিন্তু একটাও মেয়েদের জীবনী ছাপেন না কেন? এমন একটিও কি বাংলা দেশে মেয়ে নেই যে, তার জীবনী মাসিক বসুমতী 'চার জনের' মধ্যে স্থান পায়? উপহারের জন্য মাসিক বসুমতী নিতে গেলে কি তার জন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়?—স্মৃতি চৌধুরী। ১১, স্মৃতিকান্ত রোড, কলিকাতা ৪১।

[পূর্ব্বেও মহিলাদের জীবনী ছাপা হয়েছে, ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হবে।—স]

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Enclose three crossed British Postal Orders to the value of £3/- for subs. of your monthly magazine. It takes quite a long time for me to get letters from you. ... in future I am informed two months ahead to enable me to send the money in time. A. N. Ganguly. Technical Assistant. P. W. D. Office Johore, Malya.

ভারত গভর্ণমেণ্টের Estate of Bombay এই চার বার এবং B. I. S. N. Co.এর জাহাজও ছয় বার আফ্রিকা পৌঁছে গেল। আজও মাসিক বসুমতী এসে পৌঁছালো না দেখেই কি আমি বুঝে নেবো আপনারা V. P. P.তে পত্রিকা পাঠাতে অনিচ্ছুক? যদি উহা সত্য হয় তবে দয়া করে জানাবেন একযোগে আপনারা কত বছরের চাদা নিতে পারেন। আমি একযোগে সমস্ত চাঁদা পাঠিয়ে দোবো। আজ শুনলাম V. P. P. এখানে চলে না, C. O. D. করতে হয়। অবশ্য উভয়ই এক।—S. K. Chakraborti. Taboha, Tanganyiiika Teritory. East Africa.

আপনাদের বিশিষ্ট ও সুপরিচিত মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা তালিকাভুক্তা হওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রাহক-মূল্য পাঠাইলাম। পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাইতে থাকিলে খুশী হইব।—মিসেস বুলারাণী নাগ। ১০এ কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪।

Please enroll me as the subscriber of your monthly from the month of Bhadra—Satyen Sarker. Postal Clerk, Burnpur, Nadia.

আপনাদের পত্রানুযায়ী টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।—নবকৃষ্ণ রায়চৌধুরী। কাজিগাঁও, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ।

Please enter my name as a regular customer of M. Basumati for which one year's Subs. is sent herewith. A. Goswami. Asst. Engineer. N. E. F. A. P.O. Ziro. Assam.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। চাদা পাঠাইলাম অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইবেন।—অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় C/O, এ, এন, ব্যানার্জী। রাজকুমারগঞ্জ, দ্বারভাঙ্গা।